ত্রৈমাসিক সূচীপত্র

৬ষ্ঠ বর্ষ : ৪র্থ খণ্ড

শুক্রবার, ২০ মাঘ, ১৩৭৩—শুক্রবার, ১৪ বৈশাখ, ১৩৭৪

Friday 3rd February, 1967-Friday 28th April, 1967.

লেখক	বিষয় ও পৃষ্ঠা
॥ অ ॥	
অজয় বসু	খেলার কথা ৫৫, ১৫৬, ২১০, ২৯৫, ৩৬৬, ৪৫২, [illegible], [illegible], ৭০৮, ৭৮১, ৮৯৩;
অজিত চট্টোপাধ্যায়	বৃহৎ প্রাণী তিমি (আলোচনা) ১০৩৭;
অজিত মুখোপাধ্যায়	রূপের পরিমাণ (গল্প) ৯০৭;
অর্ধেন্দ্রকুমার গঙ্গোপাধ্যায়	বিপ্লবপন্থ রাজা মানসিংহ (আলোচনা) ১০৩৯;
অনন্য রায়	নাটক তবু নাটক নয় (আলোচনা) ২৬৮;
অমিতা রায়	গাউনের বিবর্তন (আলোচনা) ৫৮৯;
অরুণ ভট্টাচার্য	আমার শবদেহ (কবিতা) ৭৪৬;
অসীম বর্ধন	উদ্বেগ ও রাতজাগা (আলোচনা) ৪৭৬; লোইজেনিসিস : [illegible] অর্জনের মনোবৈজ্ঞানিক সূত্রাদি (আলোচনা) ৯৭৫;
অসীমা পাল	নানা রাজ্যের শাড়ীর বাহার (আলোচনা) ৮১৩;
॥ আ ॥	
আজহারউদ্দীন খান	ডক্টর মুহম্মদ শহীদুল্লাহ (আলোচনা) ৭৯১;
আভা পাকড়াশী	অলংকারের শিঞ্জিনী (আলোচনা) ৬১৪;
× ×	আলোচনা ৮১০;
আশিস সান্যাল	অনেক গভীর রাতে (কবিতা) ৯০৬;
আশুতোষ মুখোপাধ্যায়	নগরপারে রূপনগর (উপন্যাস) ৫৭, ২১৭, ২৯৭, ৩৭১, [illegible], ৫৩৫, ৬৩৭, ৭২১;
॥ ক ॥	
[illegible]প্রণকুমার বসু	কবি অতুলপ্রসাদের জীবনী ১০৪৭;
[illegible]ী খাঁ	ব্যঙ্গচিত্র ৩২, ১৪৩, ৩৪৮, ৪৩২, ৬৮৮, ৭৬৪, ৮৭৬, ৯২৮;
[illegible]শঙ্কর সেনগুপ্ত	কবিতার শব্দজগৎ : জীবনানন্দ ও সুধীন্দ্রনাথ (আলোচনা) ৯৮৭;
[illegible]কুম দে	পদ্মপত্রে জল টলোমলো (কবিতা) ৩৪২;
[illegible] বসু	কান্না শুকনো অশ্রু (গল্প) ৬৭৫;
[illegible] সান্যাল	সাংস্কৃতিক বিনিময় ও বিদেশে ভারতীয় চলচ্চিত্র (আলোচনা) [illegible];
॥ গ ॥	
× ×	গানের জলসা ৪১, ২০৮, ২৯০, ৩৬৫, ৫২৯, ৭০৭, ৭৭৯, ৮৯০, ৯৪১, ১০১৯;
[illegible]জাপতি ভট্টাচার্য	তিন শিকারী (শিকার কথা) ৭৩১;
[illegible]শঙ্কর ভট্টাচার্য	অনুবাদ জগতের দু'চার কথা (আলোচনা) ১১৩;
× ×	বিউটিফিজিটি (আলোচনা) ৬০১;
॥ [illegible] ॥	
[illegible]খর মুখোপাধ্যায়	অনেক বই, কম সময় (আলোচনা) ৯৭২;
× ×	চিঠিপত্র ৪, ৮৪, ১৬৪, ২৪৪, ৩২৪, ৪০৪, ৪৮৪, [illegible], ৬৬০, ৭৪০, ৮২০, ৯০০, ৯৮০;
[illegible]	প্রদর্শনী পরিচয় ৭৮, ৩১৮, ৪৭৯, ১০৪০;
[illegible] সেনগুপ্ত	অকাল বসন্ত (গল্প) ৪১৩;
[illegible] গোস্বামী	বিশশতকে ত্রিপুরার সাহিত্য (আলোচনা) ৮৪২,
[illegible] গুহঠাকুরতা	দিবস যামিনী (কবিতা) ৫০০;

লেখক	বিষয় ও পৃষ্ঠা
॥ জ ॥	
শ্রীজয়ন্ত বিশ্বাস	একজন অতি আধুনিক শিল্পী (আলোচনা) ৯৬০;
শ্রীজানকীনাথ বসু	পুস্তক ব্যবসায়ের সমস্যা (আলোচনা) ১০১;
× ×	জানাতে পারেন ৮০, ২২৬, ৩১৪, ৩৭০, ৪৭৮, ৫৫২, ৭০৬, ৮১৪, ৮৭৮, ৯৬২, ১০০৬;
॥ ত ॥	
শ্রীতপন পালিত	ভারতে ধূমপান (আলোচনা) ৭১৭;
শ্রীতপন বাগচী	ক্রিকেটে অবহেলিত (আলোচনা) ১৪৫;
শ্রীতারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়	বিচিত্র চরিত্র ৬, ৮৬, ১৬৬, ২৪৬, ৩২৬, ৪০৫, ৪৮৬, ৫৬৬, ৬৬২, ৭৪২, ৮২২, ৯০২, ৯৮২;
শ্রীতারাপদ পাল	শীতের কুয়াশায় ফুলের মেলায় (আলোচনা) ৯;
শ্রীতারাপদ রায়	অদ্বিতীয় ৯০০, ১০৫৪;
শ্রীত্রিদিব মালাকার	কাছাড়ের কবিয়াল (আলোচনা) ৪৬৯;
শ্রীত্রিপুরাশঙ্কর সেনশাস্ত্রী	বাণী বিদ্যাদায়িনী (আলোচনা) ৯৩;
॥ দ ॥	
শ্রীদক্ষিণারঞ্জন বসু	আত্মচরিতে সমাজচিত্র ১৩, ১১৩, ২২৩, ৩০৯, ৩৮১, ৪৫৪, ৫৪৭, ৬৪৩, ৭১৩, ৮০৭, ৮৬০;
শ্রীদর্শক	খেলাধুলা ৫১, ১৫৮, ২১৩, ২৯১, ৩৬৮, ৪৪৯, ৫০১, ৬৫৫, ৭১০, ৭৮৩, ৮৯১, ৯৪২, ১০২০;
শ্রীদিলীপ মালাকার	বিদেশে বাংলা বইয়ের চাহিদা (আলোচনা) ১১৬; রিভিয়েরা (আলোচনা) ৩৯৯; ক্লাস দ্য নেজ (আলোচনা) ১০৩৫;
শ্রীদীপক চৌধুরী	কপাল (গল্প) ৪৯৩;
শ্রীদীপ্তি রায়	পোশাক-পরিচ্ছদে রুচি (আলোচনা) ৬১৯;
শ্রীদীপালি ঘোষ	দরভাঙ্গার ছুটিয়া মেলা (আলোচনা) ৪৭৩;
শ্রীদেবনাথ চট্টোপাধ্যায়	কোম্পানীর কলকাতায় মাতাল সম্প্রদায় (আলোচনা) ৩৯৮;
× × ×	দেশেবিদেশে ৩১, ১৪৬, ২২৭, ২৭৩, ৩৪৭, ৪৩১, ৫১৫, ৬৩৫ ৬৮৭, ৭৬০, ৮৭৩, ৯১৭, ১০০৮;
॥ ধ ॥	
শ্রীধ্রুব রায়	প্রাচীন চিত্রে প্রসাধন (আলোচনা) ৫৯৩; বিহারের কারুশিল্প (আলোচনা) ৮৪৭;
শ্রীধ্রুবজ্যোতি সেন	প্রাচীন ও মধ্যযুগে ভারতীয় সাজসজ্জা (আলোচনা) ৬০৯;
॥ ন ॥	
শ্রীনকুল চট্টোপাধ্যায়	বই বিক্রি একটি শিল্প (আলোচনা) ১১৭;
শ্রীনান্দীকর	প্রেক্ষাগৃহ ৪০, ১৪৮, ১৯৮, ২৮৩, ৩৫৫, ৪৪০, ৫২৩, ৬৪ ৬৯৭, ৭৭১, ৮৮৩, ৯৩১, ১০১১;
শ্রীনিখিল সেন	ওড়িয়া সাহিত্যের সেকাল-একাল (আলোচনা) ৮৩৫;
শ্রীনিখিলরঞ্জন রায়	শিশুসাহিত্যের তীর্থঙ্কর : যোগীন্দ্রনাথ (আলোচনা) ৪১১;
শ্রীনিতাই ঘোষ	উড়িষ্যার দেবদেউল (আলোচনা) ৮৪৫;
শ্রীনির্মলচন্দ্র গঙ্গোপাধ্যায়	বিদেশী পথিক (গল্প) ৭৫৭;
শ্রীনির্মলাশিস সেন	বটতলা কালচার (আলোচনা) ১২৩;
শ্রীনিরঞ্জনপ্রসাদ চৌধুরী	আরব তিউনিসিয়া (আলোচনা) ৩২৮;
শ্রীনীলিমা মুখোপাধ্যায়	ভালবাসায় ভোলাব (গল্প) ৬৯;
॥ প ॥	
শ্রীপরিব্রাজক	বিচিত্র বিশ্ব ৪৫৯, ৭৩৫, ৭৮৮;
শ্রীপুলক চন্দ্র	আর্নেস্ট ডাউসন : শতবর্ষের আলোকে (আলোচনা) ৯১৩;
শ্রীপুলকেশ দে সরকার	নীলদর্পণ ও অমৃতবাজার পত্রিকা (আলোচনা) ৯৫১;
শ্রীপ্রণবেন্দু দাশগুপ্ত	প্রশ্ন (কবিতা) ১৭২;
শ্রীপ্রদ্যোৎ মিত্র	দরভাঙ্গার ছুটিয়া মেলা (আলোচনা) ৪৭৩;
শ্রীপ্রফুল্লরতন গঙ্গোপাধ্যায়	ভারতে চতুর্থ সাধারণ নির্বাচনের পটভূমি (আলোচনা) ১৩৭;
শ্রীপ্রবাসজীবন চৌধুরী	ভারতীয় সংস্কৃতি ও জাতির পুনর্গঠন (আলোচনা) ৬৬৮;
শ্রীপ্রমীলা	অঙ্গনা ৬৪, ১৪০, ২০৪, ৩০৬, ৩৮৫, ৪৬০, ৫৪১, ৭৩৩, ৮৭১, ৯৫৭, ১০২৯; রূপসজ্জায় আদিবাসী জীবন (আলোচনা)

লেখক	বিষয় ও পৃষ্ঠা
॥ ব ॥	
শ্রীবনফুল	সরষে ফুল (কবিতা) ২৪৯; আত্মীয় (গল্প) ৮২৭;
শ্রীবাসবী নন্দী	ফ্যাসানের বৈচিত্র্য (আলোচনা) ৬০৫;
শ্রীবিকাশকান্তি রায়চৌধুরী	পেট্রল পাহাড় (গল্প) ৬৮৬;
শ্রীবিনতা রায়	মেয়েদের রূপসজ্জা (আলোচনা) ৫৮৪;
শ্রীবিনয় চট্টোপাধ্যায়	রাজধানীর রঙ্গমঞ্চে ১৯৪, ৭৬২;
শ্রীবিপুল বন্দ্যোপাধ্যায়	ফুটবলের যাদুকর (আলোচনা) ১০২৪;
শ্রীবিশু মুখোপাধ্যায়	বইয়ের বিজ্ঞাপন (আলোচনা) ১১১;
শ্রীবিশ্বনাথ মুখোপাধ্যায়	সঙ্কেত (রহস্য কাহিনী) ৫৫৩; একটি চিঠির জন্য (রহস্য কাহিনী) ৯৫৩;
শ্রীবিশ্বনাথ বসু	ধনভাণ্ডার বাঁকে (শিকার কাহিনী) ৮০০;
শ্রীবিষ্ণু দে	স্বপ্নে দুঃস্বপ্নে (কবিতা) ৮২৬;
শ্রীবীরু চট্টোপাধ্যায়	হীরক হরণের কাহিনী (আলোচনা) ৫৫৭;
শ্রীবীরেন্দ্রকিশোর রায়চৌধুরী	সুরের সুরধুনী ৮১৫, ১০৫৫;
শ্রীবীরেন্দ্র চট্টোপাধ্যায়	আমার সন্তান যেন থাকে দুধে ভাতে (কবিতা) ৯৮৬;
শ্রীবুদ্ধদেব বসু	রাইনের মারিয়া রিলকে অবলম্বনে (কবিতা) ৯১, ৫৭০; গোলাপ কেন কালো (উপন্যাস) ৭৪৭, ৮৬৭, ৯৪৭, ১০০১;
শ্রীবুদ্ধদেব ভট্টাচার্য	শ্রীনগরের পথে পথে (আলোচনা) ২৫৭;
শ্রীবুদ্ধদেব গুহ	জোয়ার (গল্প) ৩৯২;
শ্রীবেগম মরিয়ম আজিজ	প্রত্যাবর্তন (গল্প) ৯৬৯;
শ্রীব্রেন্ডা ডেভিস	ব্রিটিশ চলচ্চিত্রের ধারা (আলোচনা) ৯০৯;
শ্রীবেলা দে	মেয়েদের পোশাক : এদেশে ওদেশে (আলোচনা) ৬০৪;
শ্রীবৈদ্যনাথ মুখোপাধ্যায়	নাট্যকারের চোখে সেকাল (আলোচনা) ৯৭০;
× × ×	বৈষয়িক প্রসঙ্গ ৩২, ১৪৪, ২২৯, ২৭৫, ৪০২, ৫১৩, ৬০৪, ৬৮৮, ৭৬৫, ৮৭৬, ৯২৯, ১০১০;
॥ ভ ॥	
শ্রীভবানী মুখোপাধ্যায়	১৯৬৬ সালের চমকপ্রদ বই (আলোচনা) ১০৫; পত্রনাটক ডিয়ার লায়ার (আলোচনা) ৪৫৭; বসন্তলীলা (আলোচনা) ৫৭৭;
॥ ম ॥	
শ্রীমধু বসু	আমার জীবন (স্মৃতিকথা) ৩৭, ১৯৫, ২৭৮, ৩৫২, ৪৩৭, ৫১৮, ৬২৭, ৭৬৮, ৮৭৯;
শ্রীমধুশ্রী দাশগুপ্তা	সূচীশিল্প (আলোচনা) ৬২৫;
শ্রীমনোজ বসু	সেতুবন্ধ (উপন্যাস) ২৭, ১৮৯, ২৬৯, ৩৪৩, ৪২৭, ৫০৭, ৬২৭, ৬৮৩, ৭৮৫, ৮৫১;
শ্রীমঞ্জুশ্রী দাশ	মানবিক ভোর (কবিতা) ১৭২;
শ্রীমানস রায়চৌধুরী	অন্তর্ধান (কবিতা) ৪১০;
শ্রীমিহির আচার্য	অন্ধকারে একা (গল্প) ২৫১;
শ্রীমীরা চৌধুরী	গৃহসজ্জায় বাটিক (আলোচনা) ৫৯৯;
শ্রীমুকুল চট্টোপাধ্যায়	বৃহৎ মার্জার (আলোচনা) ৯৬৬;
শ্রীমৃগাঙ্ক রায়	তোমরা (কবিতা) ৯০৬;
শ্রীমৃত্যুঞ্জয় মাইতি	অন্ধকার নদীপথে (কবিতা) ৪১০;
॥ র ॥	
শ্রীরণজিৎকুমার সেন	অশ্বিনীকুমার দত্ত : জীবন ও সঙ্গীত (আলোচনা) ১৭৩;
শ্রীরণজিৎ চট্টোপাধ্যায়	সচল যুগে অচল ট্রাম (আলোচনা) ৭১৬;
শ্রীরঞ্জিত বন্দ্যোপাধ্যায়	অসীম সংখ্যা ও শ্রেণী (আলোচনা) ১০৩১;
শ্রীরত্নেশ্বর হাজরা	বয়স (কবিতা) ৭৪৬;
শ্রীরথীন্দ্রনাথ রায়	জানোয়ারনামা (আলোচনা) ৭২;
শ্রীরবীন বন্দ্যোপাধ্যায়	বাংলায় বিজ্ঞান গ্রন্থ (আলোচনা) ১২৪;
শ্রীরমানাথ রায়	ঘরে ফেরা (গল্প) ৩৩৩;
শ্রীরাজ বসু	তারপর স্তব্ধ হয়ে যায় (কবিতা) ৬৭৪;
শ্রীরাসবিহারী রায়	বিশ্বের বিচিত্র বই (আলোচনা) ১২০;
শ্রীরাহুল বর্মণ	আজকের ভাস্কর (আলোচনা) ৩৭৯; অসমীয়া সাহিত্য কথা (আলোচনা) ৮৩৬;

লেখক		বিষয় ও পৃষ্ঠা
॥ র ॥		
শ্রীরত্ন পাল	... ...	প্রতিবেশী রাষ্ট্র : নেপাল (আলোচনা) ৬৬৯ ;
শ্রীরমা গুহঠাকুরতা	... ...	কেশসজ্জা (আলোচনা) ৫৮৫ ;
শ্রীরূপচাঁদ পক্ষী	... ...	সড়ক সৌধ কানাগলি ২৩, ১৩১, ২৩২, ৩৫০, ৪৭১, ৫৫১, ৭ ৮০৬, ১০৪২ ;
॥ ল ॥		
শ্রীলীলা মজুমদার	... ...	রূপচর্চা ও গৃহসজ্জায় বৈচিত্র্য (আলোচনা) ৫৮১ ;
শ্রীলোকনাথ ভট্টাচার্য	... ...	পানের দোকানের আয়নায় (কবিতা) ১৬ ;
॥ শ ॥		
শ্রীশঙ্করবিজয় মিত্র	... ...	হকির গৌরবে বাংলা কোথায় (আলোচনা) ৯৪৪ ;
শ্রীশংকর চট্টোপাধ্যায়	... ...	অভিমান (কবিতা) ৯৮৬ ;
শ্রীশক্তিপদ রাজগুরু	... ...	স্বর্ণমৃগয়া (গল্প) ১৭৭ ;
শ্রীশক্তি চট্টোপাধ্যায়	... ...	এই যে নিত্যনতুন খেলার সঙ্গী (কবিতা) ৫০০ ;
শ্রীশান্তনু দাস	... ...	সাঁকো পার হলে (কবিতা) ১৬ ;
শ্রীশান্তিকুমার ঘোষ	... ...	তুঁত রঙের একটা-দুটো (কবিতা) ৩৪২ ;
শ্রীশিবদাস চৌধুরী	... ...	বেদশ্রী দুর্গামোহন ভট্টাচার্য (আলোচনা) ৩৯৬ ;
শ্রীশিশির নিয়োগী	... ...	সুন্দরবনের অতীত ও বর্তমান (আলোচনা) ২৩৯ ; সার্কুলার রেলওয়ে (আলোচনা) ৯৬৩ ;
শ্রীশিশির রায়	... ...	বুদ্ধিদীপ্ত স্বতঃস্ফূর্তি (আলোচনা) ৯৬৭ ;
শ্রীশুভঙ্কর	... ...	বিজ্ঞানের কথা ৬৭, ২৩৬, ৩৮৯, ৭১৯, ৮৬৪ ;
॥ স ॥		
শ্রীসঞ্জীব দত্ত	... ...	ক্রুশের কথা (আলোচনা) ৩১২ ;
শ্রীসনৎকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়	... ...	মধুবিলাপ (আলোচনা) ৪৬৮ ;
শ্রীসমরেন্দ্র সেনগুপ্ত	... ...	এখন কুয়াশা (কবিতা) ৬৭৪ ;
× × ×		সম্পাদকীয় ৫, ৮৫, ১৬৫, ২৪৫, ৩২৫, ৪০৫, ৪৮৫, ৫৬৫, ৬ ৭৪১, ৮২১, ৯০১, ৯৮১ ;
শ্রীসন্ধানী	... ...	ইতিশ্রুয়তে ৩৩৬, ৪০৯, ৪৯২, ৬৭৩, ৭৯৯, ৮৬৬ ;
× × ×		সংবাদ প্রসঙ্গ ৩৪, ১৪২, ২৩০, ২৭৫, ৩৫৭, ৪৩৪, ৪৮৯, ৬ ৬৮৯, ৭৬৬, ৮৯৬ ;
শ্রীসাংবাদিক	... ...	নভশ্চর ভ্যামিদির কোমারভ (আলোচনা) ১০৪৪ ;
× × ×		সাহিত্য ও সংস্কৃতি ২১, ১২৬, ১৮২ ২৬৩, ৩৩৭, ৪২২, ৫ ৬৪২, ৬৭৮, ৭৫১, ৮৫৫, ৯১৬, ৯৯৬ ;
শ্রীসুতপা চক্রবর্তী	... ...	ঋতুবদলে গৃহসজ্জা (আলোচনা) ৫৯৬ ;
শ্রীসুধা বসু	... ...	জনকল্যাণকামী শাসক সম্রাট জাহাঙ্গীর (আলোচনা) ৩১৫ ; মধ্যযুগে রাষ্ট্রদূত বিনিময় (আলোচনা) ১০০৫ ;
শ্রীসুধীর করণ	... ...	ঋণং কৃত্বা (আলোচনা) ৭৬ ;
শ্রীসুধীরচন্দ্র সরকার	... ...	বাংলাদেশে পুস্তক প্রকাশন (আলোচনা) ৯৯ ; বসন্তকালীন খাদ্যবিচার (আলোচনা) ৬০৮ ;
শ্রীসুব্রতকুমার দাশগুপ্ত	... ...	বাংলার শিল্পধারায় কৃষ্ণলীলা (আলোচনা) ৫৭৩ ;
শ্রীসুভাষ সিংহ	... ...	জন্ম থেকে মৃত্যু থেকে জন্ম (গল্প) ৯৮৯ ;
শ্রীসুমন্ত বসু	... ...	কমিউনিটি অর্কেস্ট্রা (আলোচনা) ৪৭৭ ;
শ্রীসুশান্ত ভদ্র	... ...	ত্রিপুরা রাজ্যের কারুশিল্প (আলোচনা) ৮৪৯ ;
শ্রীসৈয়দ মুস্তাফা সিরাজ	... ...	বন্যার পরে (গল্প) ১৭ ;
শ্রীসোমনাথ চট্টোপাধ্যায়	... ...	কোম্পানীর কলকাতায় পক্ষীসমাজ (আলোচনা) ১০৪৬ ;
শ্রীস্বরাজ বন্দ্যোপাধ্যায়	... ...	আঁধি (উপন্যাস) ১০২৫ ;
॥ হ ॥		
শ্রীহরিপদ বসু	... ...	ঐতিহাসিক দক্ষিণেশ্বর (আলোচনা) ৩৮৮ ;
শ্রীহরেকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায়	... ...	শ্রীশ্রীদোলযাত্রা (আলোচনা) ৫৭১ ;
শ্রীহিমানীশ গোস্বামী	... ...	অধিকন্তু ৩৬, ১৩৬, ১৪৮ ;
শ্রীহেমচন্দ্র ঘোষ	... ...	সাধক লালাবাবু (আলোচনা) ৫১৪ ;
শ্রীহেমপ্রভা মল্লিক	... ...	গৃহসজ্জায় চটের কারুশিল্প (আলোচনা) ৬২১ ;
॥ ক্ষ ॥		
শ্রীক্ষেত্রনাথ রায়	... ...	বিশ্ব টেবিল টেনিসের আসর (আলোচনা) ১০২২ ;

সমথনাথ ঘোষের

প্রকৃতি-চেতন উপন্যাস

বনরাজিনীলা

"...উপন্যাসটি নামেও যেমন কবিত্বময়, আন্তঃপ্রকৃতিতেও তেমনি সৌন্দর্যরসাপ্লুত। এর মধ্যে সিংভূম ও সাঁওতাল পরগণার বিভিন্ন-জাতীয় আদিবাসীঅধ্যুষিত বন-ভূমির অতি চমৎকার রূপ ও ভাবসঞ্চার শক্তির বর্ণনা কাব্যানুভূতিময় ভাষায় অভিব্যক্ত হয়েছে...একটি ভ্রমণ কাহিনীর পটভূমিকায় এক অন্তর্বেদনাক্রান্ত জীবন-বিমুখ তরুণ প্রাণের শূন্যতাবোধ-পূরণের মনস্তাত্ত্বিক ইতিহাস বিন্যস্ত হয়েছে। এরই মাধ্যমে নায়িকার মনে ঔৎসুক্যরস সঞ্চারের উপায়স্বরূপ নানা নূতন নূতন দৃশ্য-বৈচিত্র্যের ছবি ও নানা অপরিচিত জীবনরীতির কৌতূহলময় দৃষ্টান্ত উপস্থাপিত করা হয়েছে। ভ্রমণের কৌতূহল ও আদিবাসীদের জীবন-প্রথাবৈচিত্র্য ছিন্নমূল জীবনতরুর শিকড়-জালে রসসিঞ্চিত করেছে। উপন্যাসখানি পড়তে পড়তে সময় সময় সন্দেহ জাগে যে, লেখক সুকৌশলে উপন্যাসের বেনামীতে পাঠকের নিকট নৃতত্ত্বের বৈজ্ঞানিক তথ্যসম্ভার পরিবেশন করছেন না তো? এই বৈচিত্র্যময় দৃশ্যসৌন্দর্য ও জীবনকথা কৌতূহলের প্রবল স্রোতে তরুণীর হৃদয়-বেদনা যেন দৃষ্টিপথের অন্তরালে ভেসে গেছে। বিষয়সন্নিবেশের রীতিবৈশিষ্ট্যে মুখ্য ও গৌণ স্থান বিনিময় করেছে বলে মনে হয়। উপন্যাসের একেবারে শেষের দিকে মানুষ প্রকৃতির অভিভব থেকে মুক্ত হয়ে নিজ স্বাধীন সত্তার পুনরুদ্ধার করেছে। সমস্ত উপন্যাসে মানবপরিচয় প্রকৃতি-পরিচয়ের তুলনায় গৌণরূপে প্রতিভাত হয়েছে।...উপন্যাসটিতে প্রকৃতি-রূপমুগ্ধতা ও তার অন্তর-সৌরভ অপূর্ব সক্ষ্মদর্শিতার সঙ্গে অনুভূত হয়ে তার সমস্ত আকাশ-বাতাসকে ঘন পরিব্যাপ্ত করেছে।.. প্রকৃতি পরিবেশের বিভিন্নতা ও তার রূপসজ্জার আবেদনবৈচিত্র্য লেখকের অন্তর্মুখী অনুভব প্রকাশনাশক্তির সাহায্যে অপূর্ব ভাবে ও প্রত্যেকের সত্তাবৈশিষ্ট্যে ফুটে উঠেছে। এই প্রকৃতিচেতনার সৌকুমার্যই উপন্যাসটির প্রধান কৃতিত্ব।"

(ডঃ) **শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়**

॥ সাত টাকা ॥

সমথনাথ ঘোষের

নীলাঞ্জনা ৭॥

*** বাঁকাস্রোত ৬॥**

তারাশংকর বন্দ্যোপাধ্যায়ের

গন্নাবেগম ৮৲

সন্দীপন পাঠশালা ৫॥০ কালিন্দী ৭॥০ না ২॥০ উত্তরায়ণ ৫॥০

অবধূতের

নীলকন্ঠ হিমালয় (২য় মুদ্রণ) **৮॥**

প্রবোধকুমার সান্যালের

উত্তর হিমালয় চরিত ১১৲

(২য় মুদ্রণ)

"It is a valuable addition to my Library"

বলেছেন কাশ্মীরের প্রাক্তন যুবরাজ ও রাজ্যপাল — **করণ সিং**

প্রমথনাথ বিশীর

লালকেল্লা ১৪৲

কেরী সাহেবের মুন্সী ৮॥০ সিন্ধুনদের প্রহরী ৩॥০

গজেন্দ্রকুমার মিত্রের

উপকণ্ঠে ৯৲ বহ্নিবন্যা ৮॥

জন্মেছি এই দেশে ৪॥০ প্রেরণা ২৸০ মনে ছিল আশা ৪৲

বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের

অথৈজল ৫॥ অনুবর্তন ৬৲

আরণ্যক ৬৲ দেবযান ৬৲ ......আদর্শ হিন্দু হোটেল ৪॥০

বিমল মিত্রের

কড়ি দিয়ে কিনলাম

১ম খণ্ড—১৬৲, ২য় খণ্ড—১৪৲

একক দশক শতক ১৪৲

বিমল করের

পরবাস ৪॥ খোয়াই ৩৲

জীবনায়ন ৫৲ সীমারেখা ৪॥০ পান্থশালা ৩॥০

বিভূতিভূষণ মুখোপাধ্যায়ের

স্বর্গাদপি গরীয়সী

১ম খণ্ড—৫৲, ২য় খণ্ড—৫॥০, ৩য় খণ্ড—৬৲

মিত্র ও ঘোষ : ১০ শ্যামাচরণ দে স্ট্রীট, কলিকাতা—১২ ফোন : ৩৪-৩৪৯২, ৩৪-৮৭৯১

৭ম বর্ষ
১ম খণ্ড

১৩শ সংখ্যা
মূল্য
৪০ পয়সা

Friday 28th July, 1967. শুক্রবার, ১১ই শ্রাবণ, ১৩৭৪ 40 Paise

সূচীপত্র

পৃষ্ঠা	বিষয়		লেখক
৯৬৪	চিঠিপত্র		
৯৬৫	সম্পাদকীয়		
৯৬৬	প্রতিধ্বনি		
৯৬৮	যেমন বলেন	(কবিতা)	—শ্রীবিষ্ণু দে
৯৬৯	সূর্য কাঁদলে সোনা	(উপন্যাস)	—শ্রীপ্রেমেন্দ্র মিত্র
৯৭৫	কিংবদন্তীর বিষ্ণুপুর		—শ্রীরবিরঞ্জন চট্টোপাধ্যায়
৯৭৯	সাহিত্য ও সংস্কৃতি		
৯৮৪	সড়ক সৌধ কানাগলি		—শ্রীরূপচাঁদ পক্ষী
৯৮৫	সত্যমিথ্যা	(গল্প)	—শ্রীমানবেন্দ্র পাল
৯৯১	দেশেবিদেশে		
৯৯২	ব্যঙ্গচিত্র		—শ্রীকাফী খাঁ
৯৯৩	বৈষয়িক প্রসঙ্গ		
৯৯৪	ভিভিয়ান লের সঙ্গে কানন দেবীর সাক্ষাৎকার		
৯৯৬	বার্লিন চলচ্চিত্র উৎসব '৬৭		—শ্রীদিলীপ মালাকার
৯৯৮	প্রেক্ষাগৃহ		
১০০৪	গানের জলসা		
১০০৫	খেলাধুলা		—শ্রীদর্শক
১০০৬	টেস্ট ক্রিকেটে ভারতবর্ষের একশত খেলা		—শ্রীক্ষেত্রনাথ রায়
১০০৯	ফুটবলের প্রেক্ষাপটে		—শ্রীবিপুল বন্দ্যোপাধ্যায়
১০১১	আধুনিক	(উপন্যাস)	—শ্রীবিভূতিভূষণ মুখোপাধ্যায়
১০১৫	অঙ্গনা		—শ্রীপ্রমীলা
১০১৭	বার্চবনের ছায়ায়	(বড় গল্প)	—শ্রীপারিজাত মজুমদার
১০২২	বিচিত্রবিশ্ব		—শ্রীপরিব্রাজক
১০২৩	গৌরাঙ্গ-পরিজন		—শ্রীঅচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্ত
১০২৬	আমারে এ আঁধারে	(জীবনী)	—শ্রীকল্যাণকুমার বসু
১০৩৩	পুরনো পাতা : রাজাবাজি		—মৃত্যুঞ্জয় বিদ্যালঙ্কার
১০৩৮	জানাতে পারেন		
১০৩৯	প্রদর্শনী		—শ্রীচিত্ররসিক

প্রচ্ছদ :

স্বপ্ন-বিশ্লেষণ প্রসঙ্গে

গত ৩০-৬-৬৭ তারিখের অমৃত পত্রিকায় প্রকাশিত শ্রীত্রিপুরাশঙ্কর সেনের স্বপ্ন-বিশ্লেষণ প্রসঙ্গে আমার কিছু বক্তব্য আছে। লেখক ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতা নিয়ে কিছু লেখেন নি। আমি আমার ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতা থেকে স্বপ্ন সম্বন্ধে কিছু ব্যাখ্যা করবার চেষ্টা করছি।

লেখক স্বপ্নে ভেষজ প্রাপ্তি সম্বন্ধে নিজস্ব মতামত কিছুই ব্যক্ত করেন নি। কিন্তু আমি স্বপ্নে দুটি দুরারোগ্য ব্যাধির ভেষজ পেয়েছি পর পর ছ মাস অন্তর। প্রত্যেকটি ভেষজই শিব কর্তৃক প্রদত্ত। অথচ আমি শিবের ধ্যান কোন দিনই করি নি এবং শিব যে স্বপ্নে আমাকে ভেষজ দেবেন এ আমার ধারণাতীত ছিল। অবশ্য আমার প্রতিবেশী দুটি রোগী সম্বন্ধে আমি খুব চিন্তিত থাকতাম। কিন্তু অকস্মাৎ শিবের আগমন, এ কেমন করে সম্ভব হলো? তাহলে—স্বপ্ন সম্বন্ধে অবচেতন মনের ক্রিয়া প্রতিটি ক্ষেত্রে বিশ্বাস্য নয়। কারও কারও বেলায় স্বপ্নে একটি দৈবিক-শক্তি কাজ করে, বর্তমানে উক্ত রোগী দুটি উক্ত ওষুধে সম্পূর্ণ নিরাময় হয়ে গেছে।

১৯৪৮ সালে যেদিন বৃত্তি পরীক্ষা দিতে যাব তার ঠিক আগের রাত্রে উক্ত পরীক্ষার ফলাফল ইংরেজীতে টাইপ করা একটি কাগজ স্বপ্নে আমার হাতে আপনা আপনি এসে যায়। উক্ত কাগজে শীর্ষদেশে অর্থাৎ এক নাম্বার ও দু নাম্বার জায়গায় নাম ছিল। আমি উক্ত দুজনের নামধাম কোন দিন শুনি নি। যখন কিছু দিন পর সত্যি-সত্যিই ফলাফল বের হল অবিকল সেই স্বপ্নে দেখা কাগজটি। পূর্বোক্ত দু ব্যক্তিই পরীক্ষায় প্রথম ও দ্বিতীয় স্থান অধিকার করেছে। আশ্চর্য! স্বপ্ন?—এ স্বপ্নগুলি দুর্জ্ঞেয় অবচেতন মনের ক্রিয়া নয়।

সন্তোষকৃষ্ণ গুপ্ত
রাঁচি-৪

(২)

'অমৃত'তে প্রকাশিত শ্রীযুক্ত ত্রিপুরা-শঙ্কর সেন মহাশয়ের প্রবন্ধটি 'স্বপ্ন-বিশ্লেষণ' প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য বেশ সুন্দর সমন্বয়। প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য দর্শনে, সাহিত্যে, সমাজজীবনে, লোকচরিত্রে এই স্বপ্ন দেখার ইতিবৃত্তের ভূরি ভূরি নিদর্শন আছে। আমাদের বেদের থেকে আরম্ভ করে প্রয়েড পর্যন্ত মনীষীদের লেখার মাধ্যমে এই স্বপ্ন-তত্ত্বের প্রচুর নিদর্শন পাই। আমাদের আগা-গোড়া জীবনটাই এই স্বপ্ন দিয়ে ঘেরা। বহু মনীষী ব্যক্তির স্বপ্নই আজ বাস্তবে রূপায়িত হয়েছে। এক সময় যে সমস্ত ভাব-ধারা ও আদর্শকে আমরা নিছক বাতুলের প্রলাপ বলে মনে করতাম, তাই আজ বাস্তবে রূপ নিয়েছে। একদিন যাদের আমরা স্বপ্নের মানুষ বলে মনে করতাম, তাঁরাই এনে দিয়েছেন এই জীবনকে সুন্দর করবার বহু উপাদান। রেখে গেছেন তাঁদের জীবনের স্বাক্ষর, প্রতি স্তরে প্রতি ক্ষেত্রে। তাই কবি গেয়েছেন "Dreamer of Dreams, born out of my due time why should I strive to set the crooked straight." এই স্বপ্নতত্ত্ব দুই ধারায় নেমে যেতে পারে। উর্ধ্বস্তরের ও নিম্নস্তরের স্বপ্ন। উর্ধ্বস্তরের স্বপ্নই এনে দেয় আমাদের জীবনের সার্থকতা। শ্রীযুক্ত সেন মহাশয় প্রবন্ধটির উপসংহারে সুন্দরভাবে ব্যক্ত করেছেন, 'তবু ধন্য তাঁরাই যাঁরা এই স্বপ্ন-পুরীতে বাস করেও বড়ো বড়ো স্বপ্ন দেখেন আর সেই সব স্বপ্নকে বাস্তবে রূপায়িত করার প্রয়াস পান। মহৎ স্বপ্নই আমাদের মহৎ কর্মের প্রেরণা দেয়, সর্বপ্রকার বাধা বিঘ্নকে অতিক্রম করার শক্তি দেয়, এবং প্রয়োজন হলে আমাদের ভেতর মৃত্যুকেও বরণ করার সাহস সঞ্চার করে।

কালীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়
কলকাতা-৩৯

আজকের পোষাক পরিচ্ছদ

বিগত ৮ই আষাঢ় ১৩৭৪ (৭ম সংখ্যা) 'অমৃতে' অঙ্গনায় রত্না দেবী 'আজকের পোষাক-পরিচ্ছদ' সম্পর্কে যে সুন্দর সুস্পষ্ট আলোচনা করেছেন তা সময়োপযোগী ও হৃদয়গ্রাহী। লেখিকাকে এজন্য আন্তরিক ধন্যবাদ জানাই।

বর্তমান যুগকে অনেকে বলেন নারী প্রগতির যুগ। এ যুগে, আমার মনে হয়, অধিকাংশ আধুনিকা মেয়ের যাঁরা দ্রুততালে উদ্দামগতিতে ছুটে চলেছেন তাঁদের পোষাকসর্বস্ব আধুনিকতার অনুসরণ করে তাঁরা অনেক সময় এমনভাবে পোষাক-পরিচ্ছদ ব্যবহার করেন যে, প্রায়ই দেখে মনে হয়—পোষাকের মাধ্যমে কে কতটা দেহকে নগ্ন করে তুলতে পারেন তারই যেন প্রতিযোগিতা চলেছে। এই সব রুচিহীন আধুনিকাদের দেখলে পোষাক-পরিচ্ছদের প্রধান উদ্দেশ্য যে লজ্জানিবারণ করা তা মনে হয় না।

লেখিকা ঠিকই বলেছেন — বাঙালী মেয়েরা অনুকরণপ্রিয়। তাঁদের অনুকরণ-প্রিয়তা প্রায়ই তাঁদের পোষাক-পরিচ্ছদে সৌন্দর্য এনে দিতে পারে না, উপরন্তু অনেক সময় এমনই দৃষ্টিকটু হয় যে, তা সুস্থ চোখকে পীড়া দেয়। তাঁদের পোষাক-পরিচ্ছদের মাধ্যমে এই যে দেহকে নগ্ন করে, লোভনীয় করে তোলার দুরন্ত অপপ্রয়াস তা অনেক প্রাপ্ত-অপ্রাপ্ত বয়স্ক পুরুষকে উন্মার্গগামী করে তুলতেও সক্ষম। বলতে দ্বিধা নেই, তাঁদের রুচিহীন পোষাক-পরিচ্ছদ সমাজদেহের একটা ব্যাধিস্বরূপ।

আজ এই সব আধুনিকা যদি তাঁদের পোষাক-পরিচ্ছদে শালীনতা ফিরিয়ে না আনেন তবে এ ব্যাধি সংক্রামিত হয়ে সমাজকে আবিল করে দিতে পারে। সুস্থ সমাজের দিকে তাকিয়ে, অপ্রাপ্তবয়স্ক ভাইদের কল্যাণ কামনা করে আজ সমগ্র নারীজাতিকে পোষাক-পরিচ্ছদে রুচিহীনতা দূর করতে বিশেষভাবে প্রয়াসী হতে আমি আন্তরিক অনুরোধ জানাই।

দিলীপকুমার পাল
কাল্লা, আসানসোল

পোষাকের বিবর্তন প্রসঙ্গে

'অমৃতে' পত্রিকায় প্রকাশিত পোষাকের 'বিবর্তন' শীর্ষক দুটি রচনা পড়ে অত্যন্ত আনন্দিত হয়েছি। রচনা দুটি সার্থক ও যুগোপযোগী হয়েছে।

একথা অত্যন্ত সত্য যে, আমাদের ছেলেদের চোঙা প্যান্টের মধ্যে এবং মেয়েদের হাতকাটা নুলো জগন্নাথ করে তোলা ব্লাউসের মধ্যে আর যাই থাক, কোন সুরুচিবোধের পরিচয় আছে বলে মনে হয় না। আধুনিকাদের কাপড় পরার ভঙ্গি, ব্লাউসের কাটিং, চুল বাঁধার রীতি দেখলে মাঝে মাঝে মনে হয়, এটা সভ্যতার প্রগতি না অধোগতি। আমরা এগিয়ে যাচ্ছি, না পিছিয়ে পড়ছি। আধুনিকারা সকলেই যেন কে দেহের কতখানি নগ্ন দেখাতে পারে তারই প্রতিযোগিতায় নেমেছে। পোষাকের মধ্যে মানুষের সৌন্দর্যবোধ, রুচিবোধ ফুটে ওঠে। কিন্তু আধুনিকাদের পোষাকের মধ্যে বিকৃত রুচিবোধই স্পষ্ট হয়ে উঠছে। নারীদের এই বিকৃত পোষাক দেশের ও জাতির জীবনে এক চরম নৈতিক বিপর্যয় এনে দিচ্ছে। পরণে ঢাকাই শাড়ী, কপালে সিন্দুর—এ বেশেই বঙ্গ নারীকে সুন্দর দেখায়।

শিক্ষা ও সংস্কৃতির সার্থক উন্নতির সঙ্গে সঙ্গে এই কুৎসিত রুচির বিলোপ দরকার। তা না হলে জাতির নৈতিক জীবনে এক বেদনাদায়ক পতন দেখা দেবে। জানি না জাতির এই অশৌচের মুক্তিস্নান কোন দিন হবে কিনা।

পরিশেষে ধন্যবাদ জানাই আপনাকে, এ ধরনের সামাজিক সমস্যা বিষয়ক রচনা প্রকাশ করার জন্য।

বিদ্যুৎকুমার চট্টোপাধ্যায়
আমতা, হাওড়া

প্রতিধ্বনি বিভাগ

প্রতিধ্বনি বিভাগ খুলে আপনারা সত্যিই ধন্যবাদার্হ হয়েছেন। বাংলা দেশে এখানে-ওখানে বিক্ষিপ্ত অবস্থায় ছড়িয়ে থাকে সেগুলো। কাগজের স্টলে মফস্বল থেকে প্রকাশিত পত্র-পত্রিকার সন্ধান মিলবে না। কিন্তু লক্ষ্য করলে দেখা যাবে, সেখানেও চলেছে নতুন নতুন পরীক্ষা-নিরীক্ষা। আপনারা সেই সব অচেনা কাগজগুলোর খোঁজখবর নিয়ে তাদেরও আপনাদের 'প্রতি-ধ্বনি' বিভাগে স্থান দেবেন। এ আশা বোধ করি অযৌক্তিক হবে না।

রমাপ্রসাদ দত্ত
কলকাতা—৩৫

অমৃত

আইনের শাসন

জনসাধারণ কি নিজের হাতে আইন নিতে পারেন? আইনের শাসন যে-দেশে প্রচলিত আছে সেখানে এই প্রশ্নের একমাত্র উত্তর হবে, না। জনসাধারণের ন্যায্য অভাব-অভিযোগ প্রতিকারের জন্য রয়েছে আইনানুগ প্রতিষ্ঠিত সরকার। সরকার জনসাধারণের প্রতিনিধি, জনতার ভোটেই তাঁরা নির্বাচিত হয়েছেন। সামাজিক ন্যায়বিচার, শৃংখলা ও নিরাপত্তা রক্ষার দায়িত্ব সরকারের। সরকার যদি মনে করেন যে, প্রচলিত আইন সামাজিক কল্যাণ বা নিরাপত্তার পক্ষে যথেষ্ট নয় তাহলে সংবিধানের আওতার মধ্যে সেই আইন সংশোধন করার অধিকার সরকারের আছে। এমনকি সংবিধান সংশোধনের অধিকারও জনগণের নির্বাচিত প্রতিনিধিদের হাতে দেওয়া হয়েছে। কারণ, জনগণের সুখ, শান্তি ও উন্নয়ন বিধানের জন্যই গণতন্ত্র। জনগণকে বাদ দিয়ে সরকার নয়।

এই কথাগুলি জনসাধারণের মনে রাখা দরকার। জনতার যাঁরা প্রতিনিধি তাঁদেরও একথা মনে রাখা কর্তব্য। সম্প্রতি পশ্চিমবঙ্গে এবং ভারতের অন্যান্য জায়গাতেও জনসাধারণের একাংশের মধ্যে একটা প্রবণতা দেখা দিয়েছে যা আইন ও শৃংখলা রক্ষার পরিপন্থী। পশ্চিমবঙ্গের শিল্পক্ষেত্রে, ভূমিসমস্যার ক্ষেত্রে এবং সাধারণভাবে নাগরিক জীবনযাত্রার ক্ষেত্রেও কোথাও কোথাও জনতার একাংশের এই উগ্রতার ফলে আইন ও শৃংখলা বিপর্যস্ত হবার আশংকা দেখা দিয়েছে। মুখ্যমন্ত্রী শ্রীঅজয় মুখোপাধ্যায় বিধানসভার ভিতরে ও বাইরে সুস্পষ্ট ভাষায় ঘোষণা করেছেন যে, কোনো অবস্থাতেই আইন ও শৃংখলা-ভঙ্গকারীদের সরকার রেহাই দেবেন না। পুলিশ তার কর্তব্য করে যাবে। প্রসঙ্গত তিনি জমি নিয়ে নানা স্থানে যে গণ্ডগোল সৃষ্টি হচ্ছে তার উল্লেখ করে বলেছেন যে, জোতদারকে যেমন বেআইনীভাবে বর্গাদারকে উচ্ছেদ করতে দেওয়া হবে না তেমনি বর্গাদারদেরও বেআইনীভাবে জমি দখল করতে দেওয়া হবে না। এর প্রতিকারের দায়িত্ব সরকারের; অতি দ্রুত সরকার ভূমি-সমস্যা সমাধানে বদ্ধপরিকর। মুখ্যমন্ত্রীকে একথা বলতে হয়েছে তার কারণ, যুক্তফ্রন্টের অন্তর্ভুক্ত কয়েকটি দল ভূমিসংস্কার আন্দোলনের সঙ্গে প্রত্যক্ষভাবে জড়িত। তারা বর্গাদারদের জমি দিতে প্রতিশ্রুত। স্বভাবতই সরকার গঠনের পর জমি দখলের কার্যসূচীও বেশ জোরদার হয়ে উঠেছে। নকশালবাড়ির ঘটনা তো সারা ভারতেই চাঞ্চল্য সৃষ্টি করেছে। মন্ত্রিসভার সিদ্ধান্ত অনুযায়ী সরকার নকশালবাড়িতে উগ্রপন্থীদের দমনের জন্য ব্যবস্থা গ্রহণ করেছেন। প্রায় বিনা রক্তপাতে এই বিদ্রোহ দমনের চেষ্টা চলছে। অবস্থা অনেকটা আয়ত্তের মধ্যে এসেছে। কিন্তু ইতিমধ্যেই যুক্তফ্রন্টের কোনো কোনো শরিক মুখ্যমন্ত্রীর এই আইনানুগ ব্যবস্থার বিরুদ্ধে প্রতিবাদ জানিয়েছেন। বলা বাহুল্য, এইভাবে সরকার চালানো কঠিন। একই সঙ্গে কোনো দল সরকারপক্ষ ও বিরোধীপক্ষের ভূমিকা নিতে পারে না। সরকারী সিদ্ধান্ত যৌথ সিদ্ধান্ত। বিরোধ যদি থাকে মন্ত্রিসভার ভেতরেই তার মীমাংসা হওয়া উচিত। প্রকাশ্যে এক শরিক যদি অন্য শরিকের ওপর দোষারোপ করেন, এক মন্ত্রী যদি অন্য মন্ত্রীর নির্দেশের সমালোচনা করেন তাহলে সরকারের যৌথ দায়িত্ব বলে কিছু থাকে না।

জনসাধারণের অনেক অভাব অভিযোগ আছে। খাদ্যসংকট এই রাজ্যে চরমে উঠেছে। চালের যা দাম তা গত দুই দশকের মধ্যে অভূতপূর্ব। সুতরাং জনসাধারণের মনে বিক্ষোভ ও অসন্তোষ থাকা অস্বাভাবিক কিছু নয়। কিন্তু এই সমস্যা সমাধানের জন্যই জনসাধারণ যুক্তফ্রন্ট সরকারকে গদীতে বসিয়েছেন। সরকারের ওপর বিশ্বাস হারিয়ে যদি জনসাধারণ নিজের হাতে আইন নিতে আরম্ভ করে তাহলে এই সরকারের অস্তিত্ব বিপন্ন হবে। এই সত্য কথাটা যেন জনসাধারণ তলিয়ে দেখেন। শুধু শিল্পক্ষেত্রে বা ভূমিসমস্যার ক্ষেত্রেই যে অশান্তি সীমাবদ্ধ তা নয়। সামান্য কারণে যখন তখন উপদ্রব সৃষ্টি করাও কিছু সংখ্যক লোকের অভ্যাস। সম্প্রতি শিয়ালদা-বনগাঁ লাইনে কয়েকবার ট্রেন চলাচল বন্ধ হয়ে গিয়েছিল। ড্রাইভারদের মারধোর করা, ভয় দেখানো এবং ট্রেনের গতিরোধ করে উচ্ছৃংখল কিছু লোক ট্রেন চলাচলেই শুধু ব্যাঘাত ঘটায়নি, লক্ষ লক্ষ যাত্রীর অবর্ণনীয় দুর্দশারও কারণ ঘটিয়েছে।

সরকারকে অবশ্যই এর প্রতিবিধান করতে হবে। মুষ্টিমেয় উচ্ছৃংখল লোকের জন্য গোটা সমাজ ক্ষতিগ্রস্ত হতে পারে না। সরকারও এই সমস্ত ঘটনার সামনে নিষ্ক্রিয় থাকতে পারেন না। আমরা জানি সাধারণ মানুষ শান্তিপ্রিয়, সহিষ্ণু এবং আইনের সঙ্গে সহযোগিতা করতে প্রস্তুত। অভাব অভিযোগ বা বিক্ষোভের প্রতিকারের রাস্তা গুণ্ডাবাজী নয়, জবরদখল নয়, তীর-ধনুকের লড়াইয়ের পথ নয়। সামগ্রিকভাবে ভারতবর্ষের অর্থনৈতিক ও সামাজিক চিত্র আজ হতাশাচ্ছন্ন। তার মধ্যে পশ্চিমবঙ্গের অবস্থা আরও খারাপ। কারণ সীমান্তরাজ্য হিসাবে বহু সমস্যায় জর্জরিত এই রাজ্য। উদ্বাস্তু সমস্যা, বেকার সমস্যা ও খাদ্য সমস্যার মতো তিনটি বৃহৎ সমস্যা এই সরকারের ঘাড়ে। সুতরাং সামাজিক কল্যাণ ও উন্নয়নকর্ম সফল করতে হলে সরকারকে সময় দিতে হবে। যারা শর্টকাটে বিশ্বাসী তাদের জন্য গণতন্ত্র নয়। অথচ পশ্চিমবঙ্গের সাধারণ মানুষ গণতান্ত্রিক পদ্ধতিতেই সরকারের পরিবর্তন ঘটিয়ে উন্নততর জীবনের প্রত্যাশায় অপেক্ষমান। আইন ও শৃংখলা ভঙ্গ করে এই প্রত্যাশাকে যারা বিনষ্ট করতে চাইছে তাদের সম্পর্কে কোনো দুর্বলতা যেন সরকার না দেখান।

ভগিনী নিবেদিতা

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

পৃথিবীতে সকলের চেয়ে বড়ো জিনিস আমরা যাহা কিছু পাই তাহা বিনামূল্যেই পাইয়া থাকি, তাহার জন্য দরদস্তুর করিতে হয় না। মূল্য চুকাইতে হয় না বলিয়াই জিনিসটা যে কত বড়ো তাহা আমরা সম্পূর্ণ বুঝিতেই পারি না। ভগিনী নিবেদিতা আমাদিগকে যে জীবন দিয়া গিয়াছেন তাহা অতি মহৎ জীবন, তাঁহার দিক হইতে তিনি কিছুমাত্র ফাঁকি দেন নাই, প্রতি দিন প্রতি মুহূর্তেই আপনার যাহা সকলের শ্রেষ্ঠ, আপনার যাহা মহত্তম, তাহাই তিনি দান করিয়াছেন, সেজন্য মানুষ যতপ্রকার কৃচ্ছ্রসাধন করিতে পারে সমস্তই তিনি স্বীকার করিয়াছেন। এই কেবল তাঁহার পন ছিল যাহা একেবারে খাঁটি তাহাই তিনি দিবেন—নিজেকে তাহার সঙ্গে একটুও মিশাইবেন না—নিজের ক্ষুধাতৃষ্ণা, লাভলোকসান, খ্যাতি-প্রতিপত্তি কিছু নাই—ভয় না, সংকোচ না, আরাম না, বিশ্রাম না।

এই যে এতবড় আত্মবিসর্জন আমরা ঘরে বসিয়া পাইয়াছি ইহাকে আমরা যে অংশে লঘু করিয়া দেখিব সেই অংশেই বঞ্চিত হইব, পাইয়াও আমাদের পাওয়া ঘটিবে না। এই আত্মবিসর্জনকে অত্যন্ত অসংকোচে নিতান্তই আমাদের প্রাপ্য বলিয়া অচেতনভাবে গ্রহণ করিলে চলিবে না। ইহার পশ্চাতে কত বড়ো একটা শক্তি, ইহার সঙ্গে কী বুদ্ধি, কী হৃদয়, কী ত্যাগ, প্রতিভার কী জ্যোতির্ময় অন্তর্দৃষ্টি আছে তাহা আমাদিগকে উপলব্ধি করিতে হইবে।

যদি তাহা উপলব্ধি করি তবে আমাদের গর্ব দূর হইয়া যাইবে। কিন্তু এখনও আমরা গর্ব করিতেছি। তিনি যে আপনার জীবনকে এমন করিয়া দান করিয়াছেন সে দিক দিয়া তাঁহার মাহাত্ম্যকে আমরা যে পরিমাণে মনের মধ্যে গ্রহণ করিতেছি না, সে পরিমাণে এই ত্যাগস্বীকারকে আমাদের গর্ব করিবার উপকরণ করিয়া লইয়াছি। আমরা বলিতেছি তিনি অন্তরে হিন্দু ছিলেন, অতএব আমরা হিন্দুরা বড় কম লোক নই। তাঁহার যে আত্মনিবেদন তাহাতে আমাদেরই ধর্ম ও সমাজের মহত্ত্ব। এমনি করিয়া আমরা কাজের দিকে দাবিকে যত বড়ো করিয়া লইতেছি তাঁহার দিকের দানকে ততই খর্ব করিতেছি।

...তিনি হিন্দু ছিলেন বলিয়া নহে, তিনি মহৎ ছিলেন বলিয়াই আমাদের প্রণম্য। তিনি আমাদেরই মতন ছিলেন বলিয়া তাঁহাকে ভক্তি করি তাহা নহে, তিনি আমাদের প্রণম্য। তিনি আমাদেরই মতন ছিলেন বলিয়া তাঁহাকে ভক্তি করিব তাহা নহে, তিনি আমাদের চেয়ে বড়ো ছিলেন বলিয়াই তিনি আমাদের ভক্তির যোগ্য। সেইদিক দিয়া যদি তাঁহার চরিত আলোচনা করি তবে হিন্দুত্বের নহে, মনুষ্যত্বের গৌরবে আমরা গৌরবান্বিত হইব।

(বিশ্বভারতী পত্রিকা। বৈশাখ-আষাঢ় ১৩৭৪)

স্কিজোফ্রেনিয়া ও বংশানুক্রম

অরুণকুমার রায়চৌধুরী

জনসাধারণের মধ্যে এই রোগের প্রাদুর্ভাব প্রায় এক শতাংশ। স্কিজোফ্রেনিয়া রোগকে "বিভক্তমনা" বা "বিভক্ত ব্যক্তিত্ব" হিসাবে আখ্যা দেওয়া হয়। মধ্যবয়স্কদের অপেক্ষা অল্পবয়স্ক যুবক-যুবতীদের মধ্যে এই রোগের হার বেশী। স্কিজোফ্রেনিয়া রোগীর বিভিন্ন ধরনের লক্ষণ দেখা যায়। হাবার মত একদৃষ্টে তাকিয়ে থাকা, বাস্তব জ্ঞানবর্জিত অবস্থায় থাকা প্রভৃতি সাধারণ স্কিজোফ্রেনিয়া রোগীর বৈশিষ্ট্য। অনেক সময় রোগীকে অনেকক্ষণ ধরে কোন এক বিশেষ অবস্থায় নিশ্চল হয়ে পড়ে থাকতে বা পাথরের মূর্তির মত দাঁড়িয়ে থাকতে দেখা যায়। যদি কেউ তার সেই অবস্থা পরিবর্তন করবার চেষ্টা করে, তবে সে রেগে ওঠে এবং বাধা দেয়। কিন্তু যেই তাকে ছেড়ে দেওয়া হয়, তৎক্ষণাৎ সে তাহার পূর্বের অবস্থায় ফিরে আসে বা দাঁড়িয়ে থাকে—এমন কি কখন কখন সকলের সামনে নগ্ন থাকতেও সঙ্কোচ বোধ করে না। তাদের কথায় ও কার্যে অস্বাভাবিক অসঙ্গতি লক্ষ্য করা যায়। যদি রোগীকে কোন দুঃসংবাদ দেওয়া যায়, তবে সে তখন ফিকফিক করে হেসে ওঠে। আবার এক শ্রেণীর স্কিজোফ্রেনিয়া রোগী আছে, যারা সব সময় অহেতুক ভয় ও সন্দেহের মধ্যে বাস করে। এই রকমের রোগী ভাবে—তাকে মেরে ফেলবার জন্যে তার ভাতে বিষ মিশিয়ে দেওয়া হয়েছে বা তার পিছনে গুণ্ডা লাগানো হয়েছে—ইত্যাদি। লক্ষণের শ্রেণী-বিভাগ করে স্কিজোফ্রেনিয়া রোগকে সাধারণতঃ চার ভাগে ভাগ করা হয়। মাঝে মাঝে বিভিন্ন শ্রেণীর লক্ষণ একই রোগীর মধ্যে বিভিন্ন সময়ে প্রকাশ করা যায়, ফলে মানসিক রোগের চিকিৎসকের পক্ষে স্কিজোফ্রেনিয়া রোগীর শ্রেণী-বিভাগ করা সময় বিশেষে কঠিন হয়ে পড়ে।

স্কিজোফ্রেনিয়া রোগের উৎস সম্বন্ধে বিভিন্ন মতবাদ প্রচলিত আছে। কেউ বলেন বিপাক বিশৃঙ্খলার ফলে, কেউ বলেন মনস্তাত্ত্বিক বিপর্যয়ের ফলে এই রোগের উৎপত্তি হয়ে থাকে। আবার কেউ পরিবেশকে এবং কেউ বংশানুক্রমকে দায়ী করেন। যে কোন শারীরিক ব্যাধির ন্যায় স্কিজোফ্রেনিয়া মানসিক রোগ এত সাধারণ যে, অনেকে এই রোগকে বংশজাত বলে স্বীকার করতে চান না। স্কিজোফ্রেনিয়া রোগের উৎপত্তির মূলে বংশানুক্রমের প্রভাব পূর্ণভাবে না থাকলেও আংশিকভাবে যে আছে, যমজ-সন্তান পরীক্ষার সাহায্যে তার পরিচয় পাওয়া গেছে।

(জ্ঞান ও বিজ্ঞান ।। জুন ১৯৬৭)

গটফ্রীডবেন

ফনফেডে ফেন্ডসিপার

দশ বছর আগে (১৯৫৬ সালে) আধুনিক জার্মাণ সাহিত্যের শক্তিশালী, সর্বশ্রেষ্ঠ ও প্রখ্যাত কবি বার্লিনে মারা যান। তাঁর নাম গটফ্রীডবেন। জার্মাণীতে যদিও তিনি খুব প্রসিদ্ধ হয়ে উঠেছেন বিদেশে বিশেষতঃ ইউরোপের বাইরে এখনও তিনি অপেক্ষাকৃত অচেনা এবং তাঁর কাব্য উপযুক্ত দৃষ্টি আকর্ষণ করেনি।

বাংলা সাহিত্যে জীবনানন্দ দাশের যে স্থান জার্মাণ সাহিত্যে গট ফ্রীডবেনের সেই স্থান। তাঁর কাব্য ও গদ্য একটা নতুন পথ দেখিয়েছে এবং রূপ, শব্দ ও অর্থে তিনি একটা নতুন পথের নির্দেশ দিয়েছেন।......বেন বলেছেনঃ 'একটি কবিতা এমনি উদ্ভূত হয় না, একটি কবিতাকে তৈরী করতে হয়, নতুন কবিতা, কাব্য, একটি কৃত্রিম সৃষ্টিকর্ম'। কবিতা তৈরী করতে গেলে কবিকে কেবল কবিতার দিকে তাকালে চলবে না, নিজের মনের দিকেও তাকাতে হবে।' তিনি আরও বলেছেন যে, 'রূপই কবিতা' এবং একটি কবিতা আছে, এটাই তার যুক্তি ; কি প্রকাশ করতে চায় সেটা বড় কথা নয়।' ...বেন বিশ্বাস করেন যে শিল্পীর সৃষ্টি একটা গূঢ় কাজ। এতে পৃথিবীর ও বিশেষতঃ সামাজিক ও রাজনৈতিক অবস্থার পরিবর্তন হয় না। এক বেতার সাক্ষাৎকারে তিনি—'কবিরা পৃথিবীকে পরিবর্তন করতে পারেন কি?' এই প্রশ্নের উত্তরে বলেন যে, কবির তাঁর নিজের যুগের উপর কোন প্রভাব

ফেলতে পারেন না এবং ইতিহাসের ধারা তিনি পালটাতে পারেন না, কবি মূলত ইতিহাসের বাইরে তিনি অনৈতিহাসিক। যেন কবি ও তাঁর সৃষ্টিকে প্রচলিত শ্রেণী বিভাগ ও রীতি বহির্ভূত বলে মনে করেন। কবি ও তাঁর সৃষ্টি সম্পূর্ণ একক ও অদ্বিতীয়।

(বিচিত্রা ।। দ্বিতীয় বর্ষ, ফাল্গুন-চৈত্র ১৩৭৩)

ভাইরাস

আশিসকুমার চন্দ্র

দুইটি মাত্র জৈব উপাদানে ভাইরাসের দেহ গঠিত হয়। ইহার বহিরাবরণ প্রোটিন দ্বারা গঠিত এবং ভিতরে পুরের ন্যায় থাকে নিউক্লিক অ্যাসিড। অন্যান্য প্রতি জীব-কোষেই DNA ও RNA এই দুই প্রকার নিউক্লিক এ্যাসিডই বর্তমান থাকে কিন্তু ভাইরাসের ভিতর কখনই উভয় প্রকার নিউক্লিক এ্যাসিড থাকিতে পারে না। পক্ষান্তরে শুধু এক প্রকারই থাকিবে। যেমন ব্যাকটিরিয় ভাইরাসে DNA ও দীর্ঘাকার উদ্ভিদ ভাইরাসে RNA বর্তমান থাকে।

...সক্রিয় অবস্থায় কোন ভাইরাস একমাত্র ঐচ্ছিক জীবকোষের ভিতরই থাকিতে পারে ও বংশবৃদ্ধি করিতে পারে। এই কারণেই মারাত্মক ব্যাধিকারী ভাইরস লইয়া পরীক্ষা করা এক সমস্যা ছিল যতদিন পর্যন্ত না গবেষণার জন্য ইহাদের পালন করিবার কোন কৃত্রিম উপায় উদ্ভাবিত হয়। ১৯৩১ সালে গুডপাসচার ও উডরাফ নামক দুই আমেরিকান বিজ্ঞানী হাঁস-মুরগী জাতীয় প্রাণীর ডিমের ভিতরে ভ্রূণের মধ্যে ইহার চাষ করিবার পদ্ধতি উদ্ভব করিয়া এই সমস্যার সুষ্ঠু সমাধান করেন। বর্তমানে কৃত্রিম উপায়ে মাংসপেশী ও তন্তুর মধ্যেও ইহাদের চাষ করিবার পদ্ধতির সৃষ্টি হইয়াছে। যেমন পলিও ভাইরাস স্নায়ুতন্তুর ভিতর ও বসন্তের ভাইরস জীবন্ত চর্মখণ্ডের ভিতর চাষ করা হয়। উদ্ভিদের ভাইরাস কিন্তু এইরূপ প্রাণীকোষের ভিতর বর্ধিত হইতে পারে না। সেইজন্য ইহাদের উদ্ভিদ কোষ সমষ্টির ভিতর পালন করিতে হয়। যেমন টমাটোর মূল বা তামাকের জীবন্ত মূল পরীক্ষাগারে কৃত্রিম উপায়ে বর্ধিত করিয়া তাহাতে বিভিন্ন ভাইরাসের চাষ করা যাইতে পারে।

ভাইরাস আক্রান্ত অনেক উদ্ভিদের কোন বহিঃপ্রকাশ ঘটে না আবার বিভিন্ন ভাইরাসের একত্র বা পৃথক পৃথকভাবে আক্রমণে একই উদ্ভিদে ও ভিন্ন ভিন্ন উদ্ভিদে একইরূপ বাহ্যিক চিহ্ন পরিলক্ষিত হয়। এইসকল ক্ষেত্রে প্রকৃত রোগটি নির্ণয়ের জন্য এবং বিশেষতঃ বাহ্যিক লক্ষণহীন উদ্ভিদের রোগমুক্ত বীজগুলি বাছিয় লইবার জন্য কতকগুলি প্রায়োগিক উদ্ভিদ ব্যবহৃত হয়। যাহাদের নির্দেশক বা পরিচায়ক উদ্ভিদ বলে। পরীক্ষার্থ রোগযুক্ত উদ্ভিদের রস এই উদ্ভিদগুলিতে প্রবেশ করাইয়া দিলে অতি অল্পদিনের মধ্যেই ইহাদের ভিতরে বৈশিষ্ট্য-মূলক চিহ্ন পরিলক্ষিত হইবে। সাধারণত ধুতরা, গুলমকমল, লঙ্কা ও শশা প্রভৃতি এই জাতীয় উদ্ভিদ। সর্বাপেক্ষা ব্যাপক-হারে এই প্রয়োজনে ব্যবহার হয় Chenopodium arnarantieolir নামক একটি আগাছা। এইসকল উদ্ভিদ ব্যবহার করিয়া প্রকৃত ভাইরাস রোগ নির্ণয় করা সহজ-সাধ্য হয়। অনেক ক্ষেত্রেই পুষ্টির অভাবে বা কোন ব্যাকটিরিয়া বা ছত্রাক আক্রমণেও একইরূপ বহিঃপ্রকাশ হয় সেই সকল ক্ষেত্রে এই পরিচায়ক উদ্ভিদ ব্যবহার করিয়া অন্তঃ-কারের রোগটি নিরূপণ করা যায়।

(বিজ্ঞান বার্তা ।। এপ্রিল মে ১৯৬৭)

মুদ্রণশিল্পের পথিকৃৎ

দেবীপ্রসাদ গঙ্গোপাধ্যায়

একথা মনে করিলে ভুল হইবে যে যোহানজেমফ্লিচ ফনগুটেনবার্গ মুদ্রণযন্ত্রের আবিষ্কার করিয়াছেন। কারণ তাঁহার জন্মের বহু পূর্বে হইতেই ইউরোপে কাঠের ব্লক ও কাঠের মুদ্রাযন্ত্রের প্রচলন ছিল। ঐতিহাসিক-গণ আরও প্রমাণ করিয়াছেন যে, যীশু জন্মের ২৫০০ বৎসর পূর্বে মিশর দেশে হায়ারগ্লিফিকস অর্থাৎ চিত্রাক্ষর মুদ্রণের প্রসার ছিল। এই হায়ারগ্লিফিকস মুদ্রণের সাহায্যে মিশরবাসীগণ নিজেদের ঘর-বাড়ী, কাগজ এবং দেহের ওপর বিচিত্র রং-এর মাধ্যমে চিত্রিত করিতেন। তাহারা যে একাধিক রং একই সঙ্গে ছাপিতে পারিতেন এবং রং-এর উজ্জ্বলতা সম্বন্ধেও তাহারা যে সচেতন ছিলেন, তাহার প্রমাণ বর্তমানে বৃটিশ মিউজিয়ামে রক্ষিত একাধিক নমুনা হইতে জানিতে পারা যায়। এতদিনের পুরাতন মুদ্রণ হইলেও তাহার রং-এর উজ্জ্বলতা আজও বিবর্ণ হয় নাই। কিন্তু এই সব মুদ্রণের মধ্যে আমরা আক্ষরিক পরিচয় পাই না—চিত্রকলাই ছিল এই মুদ্রণের মূল বিষয়। এই প্রথা হইতে বর্তমানের সিল্ক স্ক্রীন মুদ্রণ-এর জন্ম হইয়াছে। ঐতিহাসিকগণ আরও বলেন, যীশু জন্মের প্রায় ৬৫০ বৎসর পূর্বে চীন দেশে কাঠের ব্লকের মুদ্রণ বহু প্রচলিত ছিল এবং চীন দেশেই প্রথম একক কাঠের টাইপের সাহায্যে ছাপা হইয়াছিল। যদিও চীন দেশেই সর্ব-প্রথম একক কাঠের টাইপের প্রচলন হইয়া-ছিল, তথাপি চীনের অক্ষর ৩০০০ এর বেশী হওয়ায় তাঁহারা কাঠের টাইপে না ছাপিয়া কাঠের ব্লকের মাধ্যমেই ছাপাকে গ্রহণ করিয়াছিলেন। ঐ প্রাচীন ছাপাগুলি হস্ত নির্মিত কাগজে ছাপা হইত। ...ঐ হস্ত নির্মিত কাগজের উপরে হস্ত দ্বারা ছাপাই ছিল প্রাচীন চীনের মুদ্রণ প্রথা। কোন কোন বিশেষজ্ঞ তাই হায়ারগ্লিফিকস মুদ্রণ ও চীনের প্রথম যুগের কাঠের ব্লক মুদ্রণকে ঠিক মুদ্রণের আওতায় আনিতে ইচ্ছুক নহেন। ঐ প্রথাগুলি সাধারণত চিত্র শিল্পীগণই গ্রহণ করিয়া থাকেন। যোহান-জেমফ্লিচ ফনগুটেনবার্গ ১৩৯৪-১৪০০ সালের মধ্যে জার্মাণ দেশের মেনৎস শহরে জন্মগ্রহণ করেন। যে সকল ব্যক্তি তাঁহাদের নিজস্ব সাধনার মধ্য দিয়া মুদ্রণ শিল্পকে অগ্রগতির পথে লইয়া গিয়াছেন, গুটেনবার্গ তাঁহাদের মধ্যে অন্যতম পথিকৃৎ। ...যোহান গুটেনবার্গ টাইপের আবিষ্কারক এবং প্রথম একক টাইপে মুদ্রিত বই-এর প্রথম মুদ্রক হইলেও, প্রথম প্রকাশকের কৃতিত্ব তিনি লইতে পারেন নাই। তিনি প্রথম কারিগরি নিয়ম অনুযায়ী ছাপা, কালি ও ধাতু নির্মিত টাইপের সমন্বয় ঘটান। ইহার পূর্বে ইউরোপে কাঠের ব্লকে কাঠের মুদ্রাযন্ত্রে ছাপা হইত এবং ঐ ছাপার কালি গুটেন-বার্গের ব্যবহৃত কালি হইতে সম্পূর্ণ পৃথক। কারণ গুটেনবার্গ ধাতু নির্মিত টাইপের সহিত যে কালি ব্যবহার করিয়াছিলেন তাহা তাঁহারই আবিষ্কার। সম্ভবত, ইহাই প্রথম ছাপার কালি, যাহার উৎকর্ষতার মাধ্যমে আজিকার কালির জন্ম। তিনিই প্রথম পথিক, যিনি মুদ্রণশিল্পের উৎকর্ষতার জন্য বিজ্ঞানকে যোগ করিলেন কলা ও শ্রমের সহিত।

(মুদ্রাঙ্কন ।। প্রথম বর্ষ ।। জ্যৈষ্ঠ-আষাঢ় ১৩৭৪)

যেমন বলেন—

(রাফায়েল আলবের্তি)

বিষ্ণু দে

যেমন বলেন, য়ুয়ান দে মাইরেনা,
আমি বলি, মিত মিত্রাক্ষরই সেরা,
পদ্যে যা প্রায় শোনা যায়—নাকি-যায়-না।

যে কোনো বিষয়ে গেয়ে উঠি যদি আজ,
দশটি শব্দ হবে যথেষ্ট তাতে,
এমন কি অর্ধেকে সারা যায় কাজ।

সর্বদা কাটি সব খরচার বহর,
যেটুকু বলি তা কাঠিন্যে সংহত,
প্রকৃতই বয় আমার কণ্ঠস্বর।

রুটিবরদার আমিই কত না ঘরে,
বেকুবের দলে ভিড়ে বলতেও পারি না,
"ঠকাও লোককে দুমুখো মুখের জোরে।"

গেয়ে উঠি, যেই স্বয়ং সুর তা চায়—
প্যাঁচ বিনা, যদি চাই নিজে তবে ফেলি
অশ্রু, যতই দুঃসহ হোক হায়।

গানটি আমার যদি ঠিক মনে ধরে,
শুভ্র জলের বিন্দুতে করি শুরু,
আর শেষ করি জটিল গভীর সাগরে।

আমার কাজের রীতি যেন এক তীর,
কবিতাটি মনে স্থাবর হবার আগেই
বৃত্তটি ভেদ ক'রে ছুটে যায় স্থির।

প্রভাতের সে যে তীরন্দাজ, সে বাতাসের সন্তান,
যেই টেনে ধরি আকর্ণ আঁট ছিলা
নিমেষে আলোকলক্ষ্যও খান্ খান্।

দিনকাল যদি এতটা না হত মন্দ,
গড়ে তুলতুম চারণের গাথা জাঁকিয়ে,
শত ময়ূরের তোরণে গঠিত ছন্দ।

কিন্তু অন্য হালচাল দেখি, বর্বরে
একে ছুরি মারে, ওকে ক'রে দেয় লুপ্ত,
আরেকজনাকে পাঠায় গুপ্তি—কবরে।

তাই আমি করি বিবিক্ত মিত গান
আর ধরি তনু বাহুল্যহীন সুর,
শব্দেরা তাই বয়ে নিয়ে যায় দূর।।

তস্য তস্য অথবা সূর্য কাঁদলে সোনা

প্রেমেন্দ্র মিত্র

অর্থাৎ তস্য তস্য!

না, শ্রীঘনশ্যাম দাস নয়. মর্মরের মত মস্তক যাঁর মসৃণ. ইতিহাসের অধ্যাপক সেই শিবপদবাবুই উক্তিটি করলেন ঈষৎ ব্যঙ্গের সুরে।

এ উক্তির প্রতিবাদ স্বয়ং শ্রীঘনশ্যাম দাসের কণ্ঠেই শোনা গেল উদার সহিষ্ণুতার সুরে।

না, তস্য তস্য নয়, ইনি সেই অনন্য অদ্বিতীয় ঘনরাম!

ঘনরাম! — মেদভরে হস্তীর মত যিনি বিপুল সেই সদাপ্রসন্ন ভবতারণবাবু বিস্ফারিত চক্ষে জিজ্ঞাসা করলেন—মানে আপনার সেই আদিপুরুষ ঘনরাম দাস, যিনি সেই পৃথিবীর প্রথম ট্যাঙ্ক আবিষ্কার করেছিলেন.........

আর ছেলেবেলাতেই ভারতবর্ষের পশ্চিম উপকূলের সমুদ্রে পর্তুগীজ বোম্বেটেদের লুট-করা, জ্বালিয়ে দেওয়া তাম্রলিপ্তির সদাগরী জাহাজ থেকে রক্ষা পেয়েও ধরা পড়ে প্রায় অর্ধেক যৌবন পর্যন্ত পোর্টুগ্যাল স্পেনে এবং পরে এখন যা আমরা কিউবা আর মেক্সিকো বলে জানি, সেই দুই দেশে ক্রীতদাস হয়ে কাটিয়ে ওই 'মাল্টা' আবিষ্কারের পুরস্কারস্বরূপ দাসত্ব থেকে মুক্তি পেলেও নিজের বংশের ধারায় ওই চরম গ্লানি ও পরম গৌরবের অধ্যায় চিরস্মরণীয় করে রাখবার জন্যে দাস পদবীই গ্রহণ করেছিলেন।—সদাপ্রসন্ন ভবতারণবাবুর অসমাপ্ত বাক্যটি একদমে ময়দানের মনুমেন্ট-মুখো মিছিলের মত এই বাক্যস্রোতে পূরণ করে' শ্রীঘনশ্যাম দাস যখন থামলেন, তখন উপস্থিত আর সকলের বিশেষ্য বিশেষণ ক্রিয়া ক্রিয়ার বিশেষণ কনজংশন প্রিপোজিশন, কর্তা কর্ম ক্রিয়া ইত্যাদির জট থেকে পদ্যাংশ উদ্ধার করে তাৎপর্যে পৌঁছোতে হিম-সিম খাওয়া গলদঘর্ম অবস্থা।

মর্মর-মসৃণ শিরোদেশের শিবপদবাবুই প্রথম বোধহয় চরকি-পাক থেকে মাথাটি স্থির করতে পেরে জিহ্বা সঞ্চালন করতে পারলেন। বললেন,—কিন্তু আপনার সে ঘনরাম দাস ত টেনচ্‌টিটলান-বিজয়ে কর্টেজ-এর কীর্তিকেও কানা করে আতলান্তিকের এপারে ওপারে বাহাদুরকা খেল দেখিয়ে স্বাধীনতার সনদ নিয়ে দেশে ফিরে গেছলেন!

শিবপদবাবুর গলার সুরে ঠাট্টার খোঁচাটা আগের চেয়েও একটু বেশী তীক্ষ্ণ।

তা তীক্ষ্ণ হওয়ার আর দোষ কি!

অমন মোক্ষম সময়ে মুখের কথা কেড়ে নিলে কার মেজাজ আর ঠিক থাকে।

এমনিতেই শ্রীঘনশ্যাম দাস উপস্থিত থাকলে আর কারুর কোন মোকা বড় একটা মেলে না। তাতে অমনভাবে আসরটা জমিয়ে তোলার পর ওই একটা বিদঘুটে ফোড়ন কেটে সব ফাঁসিয়ে দেওয়া!

না, শিবপদবাবু আজ সত্যিই মনে মনে খুব বেশীরকম চটেছেন।

ঘনশ্যাম দাসের ফোড়নে যদি ঝাঁঝ থাকে, তাহ'লে তাঁর টিপ্পনিতেও কি জ্বালা শিবপদবাবু বুঝিয়ে দেবেন।

আজকের বেয়াদপিটা কিছুতেই তিনি ক্ষমা করতে রাজী নন। দাসমশাই রোজ ত নিজেই আসর মাৎ করেন, আজ একটু ধৈর্য ধরে তিনি শুনতে পারতেন না!

শিবপদবাবু আজে-বাজে গল্প ত ফাঁদেন নি। শুরু করেছিলেন নীল নদের উৎস আবিষ্কারের আশ্চর্য রোমাঞ্চকর কাহিনী। একদিনে সে উৎস ত আবিষ্কার হয়নি, আবিষ্কারের অভিযান সাফল্যের আনন্দে এক একবার যেখানে এসে থেমেছে, দেখা গেছে নীল নদের উৎপত্তির রহস্য তারও চেয়ে দূরে দুর্ভেদ্য যবনিকার আড়ালে গোপন।

সে রহস্য-যবনিকা সরিয়ে দিতে কত রকমের মানুষই না এগিয়ে এসেছে।

নেহাৎ মূর্খ গোঁয়ার বেপরোয়া গোছের বাউণ্ডুলে যেমন, তেমনি আবার এমন জ্ঞানী-গুণী-পণ্ডিত গোছের বিচক্ষণ মানুষও যাদের কাছে এই অজানা উৎস-সন্ধান আধ্যাত্মিক সাধনারই সামিল।

এই সন্ধানী পর্যটকদের মধ্যে রিচার্ড বার্টনের মত বিচিত্র অদ্ভুত মানুষেরও দেখা মেলে। অসামান্য পণ্ডিত, জীবন-রসিক, সকল রকম নকল গণ্ডি-ভাঙা বিদ্রোহী, এক হিসেবে নেহাৎ মুখ্যু গরীব ইতরদের জমায়েৎ থেকে সভ্য আরব জগতেরই ভুলে-যাওয়া হেলায় পায়ে-ঠেলা, কল্পনার উধাও-ডানা-মেলা আরব্য উপন্যাস গল্প-সাহিত্যের একটি বিরল মুকুটমণি চিনে উদ্ধার করে আনার মত আসল জহুরীর চোখ আর খাঁটি রসিকের কলজের জোরের বিশেষত্বে

নিজের যুগের মাথা-ছাড়ানো রিচার্ড বার্টনের মত মানুষ ভেতরকার কি প্রেরণায়, কি তাগিদে অজানা আফ্রিকার অন্ধকার গভীরে অতবড় দুঃসাহসী অভিযানে বেরিয়ে টাঙ্গানায়িকা হ্রদ আবিষ্কারের উপলক্ষ্য হয়েছিলেন, শিবপদবাবু নাটকীয়ভাবে জবাব দেবার জন্যে নিজেই সে প্রশ্নটা তুলে ধরেছিলেন।

হয়ত দেনার দায়ে!

এতক্ষণের বক্তৃতার ফুঁয়ে ফাঁপানো-ফোলানো রং-বাহারদার বেলুনটাকে যেন চোখের ওপর ওই বিদ্রুপের আলপিনের খোঁচায় ফুস্ করে ফেঁসে-চুপসে যেতে দেখা গেল।

কে বললে কথাটা?

কে আর! ওই পাকা-কাঠে করাত-চালানো অদ্বিতীয় গলা একমাত্র শ্রীঘনশ্যাম দাসের ছাড়া আর কারুরই হ'তে পারে না।

তাঁকে সশরীরে ঠিক শিবপদবাবুর পিছনেই মুখে তাঁর সেই মার্কামারা করুণা আর অবজ্ঞা-মেশানো হাসিটি আর হাতে চিরন্তন অবিচ্ছেদ্য ছাড়িটি নিয়ে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখা গেল।

কখন তিনি এসে দাঁড়িয়েছেন, কেউ যে লক্ষ্য করেন নি, শিবপদবাবুর গল্প জমাবার আংশিক সাফল্য তা থেকে অন্ততঃ প্রমাণিত হয়।

এখন তাঁকে দেখে সবাই কেমন একটু লজ্জিত হয়ে তাঁকে জায়গা দেবার জন্যে ব্যস্ত হয়ে উঠলেন।

কুম্ভের মত উদরদেশ যাঁর স্ফীত, সেই ভোজন-বিলাসী রামশরণবাবু কেমন করে অমন ত্বরিৎবেগে তাঁর পাশে দাসমশাইকে জায়গা দেবার ব্যবস্থা করে ফেললেন সেটি একটি দর্শনীয় বস্তু।

শ্রীঘনশ্যাম দাস কর্তৃক অলংকৃত এই সান্ধ্য-সভাটি আমাদের করুণ আত্মছলনার একদা হ্রদ নামে অভিহিত ও বর্তমানে সরোবরে সংকুচিত হয়েও সম্মানিত একটি জলাশয়ের এক প্রান্তে বেদিকা-বেষ্টিত যে নাতি-বৃহৎ একটি বৃক্ষের তলায় প্রায় নিয়মিতভাবে বসে, এ সংবাদ দাসমহাশয়ের অনুরক্ত মহলের কারুর বোধহয় অজানা নয়।

দাসমশাই আসন গ্রহণ করাতে মস্তক যাঁর মর্মর-মসৃণ, সেই শিবপদবাবু আর সকলের মত অমন কৃতার্থ বোধহয় হতে পারলেন না। তাঁর কণ্ঠের ঈষৎ ক্ষুব্ধ তিক্ততাতেই তা বোঝা গেল।

'দেনার দায়ে মানে?'—শিবপদবাবু রুক্ষস্বরে জিজ্ঞাসা করলেন।

মানে,—দাসমশাই নিজের সংক্ষিপ্ত উক্তি বিস্তারিত করলেন,—সহজ সরল অর্থে যা হয় তাই। খাতক হয়ে উত্তমর্ণের ভয়ে দেশান্তরী হ'তে গিয়ে ভূগোলের সীমা বিস্তৃত করার দৃষ্টান্ত অতীতে একেবারে বিরল নয়। তাছাড়া দেনার দায় না থাকলে প্রৌঢ় এক পর্যটক চার শতাব্দী আগেকার সংকীর্ণ পৃথিবীকে মরণ-পণ দুঃসাহসে প্রসারিত করে সে-যুগ এ-যুগ নিয়ে বোধহয় সর্বকালের সমৃদ্ধতম দেশ আবিষ্কারে উৎসাহী হতেন কিনা বলা যায় না। অন্ততঃ কল্পনার স্বর্ণলংকাকেও হার মানানো সত্যিকার সোনায় বাঁধানো এক বাস্তব স্বপ্ন-কথার দেশ আবিষ্কারের গৌরব একজন দেনদারের। সে দেনদায় আবার দেনার দায়ে কারারুদ্ধও হয়েছিলেন সেভিল-এ। সেদিন কারাগার থেকে তাঁকে উদ্ধার করবার জন্য একজন যেন ভোজবাজিতে সেভিলে উদয় হয়েছিলো। তা না হলে পৃথিবীর হয়ত কল্যাণই হ'ত, কিন্তু ষোড়শ শতাব্দীকে বিদ্যুৎ-চকিত করা একটি আবিষ্কার তখনকার ইওরোপীয় সভ্যজগতের হৃদস্পন্দন অত দীর্ঘকাল অমন দ্রুত করে তুলত না।

মেদভারে যিনি হস্তীর মত বিপুল সেই সদাপ্রসন্ন ভবতারণবাবু যেন 'দাসমশাই'-এর কথা শেষ হবার জন্যে মুখ বাড়িয়ে ছিলেন। দাসমশাই থামতেই তিনি *নিজেই যেন ধন্য হবার ব্যাকুল উৎসাহে গদ্গদ* স্বরে জিজ্ঞাসা করলেন, সেই ভোজবাজিতে যিনি উদয় হয়েছিলেন, তিনি কে? আপনার কেউ নিশ্চয়ই? ঠাকুরদার ঠাকুরদা তস্য ঠাকুরদা গোছের কেউ কেমন?

না, পিতামহ কি অতিবৃদ্ধ প্রপিতামহও নয়—বলে সহিষ্ণুভাবে শুরু করে দাসমশাই আর বক্তব্যটা শেষ করতে পারলেন না।

শিবপদবাবু তাঁকে সে সুযোগ না দিয়েই ব্যঙ্গভরে বলে উঠলেন, বুঝেছি! বুঝেছি! অর্থাৎ তস্য তস্য......

এর পর এ সভায় উত্তর-প্রত্যুত্তর কিভাবে কোথায় গিয়ে থেমেছে তা আগেই বলা হয়েছে।

তাঁর আদিপুরুষ ঘনরাম দাসের দাসত্ব-শৃঙ্খল থেকে মুক্তি পেয়ে দেশে ফিরে যাওয়ার বৃত্তান্ত যে দাসমশাই-এর মুখ থেকেই শোনা একথা স্মরণ করিয়ে দিয়ে শিবপদবাবু যদি তাঁকে একটু বিব্রত করতে চেয়ে থাকেন সে আশা তাঁর কিন্তু পূর্ণ হল না।

আদি পুরুষের দুঃখ স্মরণ করেই যেন বিষণ্ণ সুরে দাসমশাই বললেন, না স্বাধীন হয়ে আর দেশে ফিরতে পারলেন কই? দাসত্ব থেকে মুক্তি আর দেশে ফেরা তখনও তাঁর ভাগ্যে নেই।

তার মানে আপনার আদিপুরুষ সেই ঘনরাম দাস ক্রীতদাস হয়েই রইলেন। স্ফীতোদর রামশরণবাবু নীল নদের উৎস-আবিষ্কারকদের জীবনের রহস্য রোমাঞ্চের কথা অনায়াসে ভুলে গিয়ে ঘনরাম দাসের জন্যে উদ্বিগ্ন ও কাতর হয়ে উঠলেন,—কিন্তু তিনি ত স্বয়ং কর্টেজের ছাড়পত্র পেয়েছিলেন;

স্পেনের সম্রাট বুঝি তা মানলেন না! এ ক্রুদ্ধ সমালোচনা শোনা গেল সদাপ্রসন্ন ভবতারণবাবুর কণ্ঠে। ভবতারণবাবুর বিপুল মেদবহুল হাতের কাছে থাকলে, স্পেনের সে সম্রাটের কি দুর্দশাই যে হ'ত তা পরের কথাতেই বোঝা গেল,—এ সব সম্রাটের কি হওয়া উচিত জানেন?

দাসমশাইকে তাড়াতাড়ি ভবতারণবাবুকে শান্ত করতে হ'ল তাঁর ভ্রান্ত ধারণাটুকু সংশোধন করে।

না, না, সম্রাটের কোন দোষ নেই। বোঝাকান—দাসমশাই—সম্রাটের হাতে পড়লে তাঁর নিজের হুকুমনামা দেওয়া কর্টেজের ছাড়পত্র নিশ্চয়ই তিনি স্বীকার করতেন। কিন্তু ঘনরাম তাঁর ছাড়পত্র সম্রাটকে দূরে থাক, সেভিলের বন্দরের কাউকেও দেখবার সুযোগ পান নি।

কেন? কেন? সে ছাড়পত্রের হ'ল কি। প্রায় সমস্বরে প্রশ্ন করলেন রামশরণ ও ভবতারণবাবু। শিবপদবাবু শুধু তখনো নীরব।

যা হ'ল তা বড় জঘন্য—দার্শনিক নির্লিপ্ততা রাখার যেন বৃথা চেষ্টা করে বললেন শ্রীঘনশ্যাম দাস,—মানুষ সম্বন্ধে তাতে হতাশই হতে হয়। কল্পনার নয়, বাস্তবের স্বর্ণলঙ্কা আবিষ্কারের কাহিনী কিন্তু সে কুৎসিত ঘটনায় বিবরণটুকু ভূমিকা হিসেবে আগে না জানালে দুর্বোধ অসম্পূর্ণই থেকে যাবে।

তার মানে ঘনরাম দাস স্বাধীন থাকলে ওই আপনার সত্যিকার স্বর্ণলঙ্কা আর মুখের ঘোমটা খুলতো না?

শিবপদবাবুর কথাগুলো এখনো বেশ বাঁকা। কিন্তু দাসমশাই সহিষ্ণুতার অবতার। পিন-ফোটানোটা যেন পালক-বোলানোর মত নিয়ে হাসিমুখে বললেন,—স্বর্ণলঙ্কা কত দিনে কিভাবে আবিষ্কৃত হ'ত তা হয়ত ঠিক বলতে পারব না। কিন্তু স্বাধীন থাকলে ঘনরাম দাস সেভিলের বন্দরে জাহাজের গারদ ভেঙে বেরিয়ে সমুদ্রে নিশ্চয় ঝাঁপ দিতেন না। একদিন পশ্চিমের নতুন মহাদেশে বন্ধুত্বের আদর্শ হিসেবে যাঁর নাম লোকের মুখে-মুখে ফিরবে সেই দীয়েগো দ্য অ্যালম্যাগরোর জাহাজে লুকিয়ে তাঁকে আবার অতলান্তিক পার হ'তে হ'ত না। আর তখনকার সবচেয়ে আজগুবি এক অভিযানে লোকসানের পর লোকসানেও টাকা ঢেলে যাবার মন্ত্র নতুন মহাদেশের সবচেয়ে বড় গুপ্ত মহাজন গ্যাস্পার দ্য এসপিনোসার কানে দেবার কেউ থাকত না, আসল হর্তাকর্তাদের মন বিষিয়ে দিয়ে অভিযান মূলেই মুড়িয়ে দেবার জন্যে সব কিছুই কালিমেড়ে দেখানো বিবরণ গোপনে পাঠাবার সত্যিকার শয়তানি চালাকি তাহলে কেউ ধরে সাবধান করে দিত না; দশ বছরের মধ্যে স্পেনকে ঐশ্বর্য আর গৌরবের শিখরে যে তুলবে, তখনো অজ্ঞাত অখ্যাত দেনার দায়ে দেউলে আধ-বুড়ো একটি মানুষকে শুধু কারাগার থেকে ছাড়ানো নয়, ভবিষ্যতের চরম সংকটের দিনে ভাগ্যের পাশার দান উল্টে দিতে 'ল্লান্টু'র ওপর কোরা-কেংকুর পালক গোঁজা কারুর সাধ্য হত না।

কি বললেন,—শিবপদবাবুই প্রথম তাঁর সন্দিগ্ধ বিস্ময় জ্ঞাপন করলেন,—ল্লান্টুর ওপর কার কেংকু না কি!

লান্টু নয় ল্লান্টু! ধৈর্য ধরে বোঝালেন ঘনশ্যাম দাস,—উচ্চারণ জিভে আনা একটু শক্ত। ল্লান্টু হ'ল একরকম নানারঙের ভাঁজ-দেওয়া পাগড়ি গোছের উষ্ণীষ, বাস্তবের স্বর্ণলঙ্কার অধীশ্বররা যা পরতেন।

আর ওই কার কি কেঁউকু যা বললেন। মেদভারে বিপুল ভবতারণবাবু উদগ্রীব হয়ে জানতে চাইলেন।

কার কি কেঁউকু কি কেংকু নয়,—করুণাভরে সংশোধন করে দিলেন দাস-

মশাই—কথাটা হল কোয়াকেঙ্কু: কোয়াকেঙ্কুর ছিল দুনিয়ার দুষ্প্রাপ্যতম পাখি। বোখারা সমরকন্দের সুদিগ্ধ সমৃদ্ধতম বাদশার হারেমের সেরা সুন্দরীর চেয়ে কড়া পাহারায় সকলের চোখের আড়ালে তাদের পালন করা হত। সত্যিকার স্বর্ণলঙ্কার অধিশ্বরের মাথার উষ্ণীষ ল্লান্টুতে গোঁজা হত তার দুটি পালক।

আপনার আদিপুরুষ ঘনরাম ওই কোয়াকেঙ্কুর পালক ল্লান্টুর ওপর গুঁজে ভাগ্যের পাশা উল্টে দিয়েছিলেন? কেন কি করে? বিস্ময়-বিস্ফারিত চোখে ভক্তিভরে জিজ্ঞাসা করলেন কুম্ভোদর রামশরণবাবুবাবু।

তা বলতে গেলে ওখানেই ত থামা চলবে না! হাসলেন দাসমশাই,—যে বিষফলের গাছ পোঁতার ব্যাপারে কিছু ভাগ তাঁর ছিল, একদিন তা বেড়ে উঠে আকাশ-বাতাস বিষিয়ে তুলে ন্যায়ধর্মের টুঁটি যখন চেপে ধরে, তখন গোড়ায় কোপ দিয়ে তা শেষ করার চেষ্টায় কি ভূমিকা ঘনরামের ছিল তা পর্যন্ত বলতে হয়। কিন্তু সে যখনকার কথা তখনই বলা যাবে। ঘনরামের জীবনের নতুন পালার যা থেকে সূত্রপাত, ক্রীতদাস হওয়ার অভিশাপ থেকে মুক্তি পেয়েও ঘনরাম তাঁর স্বাধীনতা আবার কি করে খোয়ালেন, সেই করুণ বৃত্তান্তেই আগে ফিরে যাওয়া যাক।

এবার শিবপদবাবুরও কোনো আপত্তি দেখা গেল না।

ঘনরাম ঘটা করেই স্পেনে ফিরছিলেন। শুরু করলেন দাসমশাই। কর্টেজ সত্যিকার ভালবাসায় আর কৃতজ্ঞতায় তাঁর মুক্ত ক্রীতদাসকে উপহার হিসাবে যা দিয়েছিলেন, খানদানি স্প্যানিশ হিড্যালগোরদেরও তা ঈর্ষার বস্তু।

সেই ঈর্ষাই জেগেছিল এক স্পেনের সৈনিকের মনে। ঘনরামের সঙ্গে একই জাহাজে সে দেশে ফিরছিল। কর্টেজের আদি বাহিনীর লোক সে নয়। কর্টেজ-এর বিরুদ্ধে পাঠানো নার্ভেজ-এর দলেই মেক্সিকোতে এসে সে কর্টেজ-এর পক্ষ নেয়। বেশীর ভাগ ট্রাসফালায় অন্য বাহিনীতে ছিল বলে ঘনরামকে আগে সে দেখে নি। সে নিজের উন্নতিও মেক্সিকোয় এসে এ পর্যন্ত তেমন কিছুই করতে পারে নি। সত্যিকার লড়াই বেশীর ভাগ সে ফাঁকিই দিয়েছে। ঠিক প্রমাণ না পাওয়া গেলেও কর্টেজ-এর বিরোধী দলের ষড়যন্ত্রে হয়ত আছে এই সন্দেহে তাকে এখন ফেরৎ পাঠান হচ্ছে। যুদ্ধ না হোক লুটতরাজে সোরাবিয়ার উৎসাহ খুব। তাতে কিন্তু যা পেয়েছে সবই বলতে গেলে উড়িয়ে দিয়েছে জুয়া খেলে আর সাজ-পোষাকের বিলাসিতায়। সোরাবিয়ার ধারণা তার মত সুপুরুষ নেই। সুন্দরী মেয়েরা তাকে দেখলেই মূর্ছা যায়।

জাহাজে ঘনরামের সঙ্গে ঠোকাঠুকি তার বেশী করে লেগেছে এই ব্যাপারে।

ঘনরামের সঙ্গে সোরাবিয়ার পরিচয় আগে ছিল না। জাহাজে একই যাত্রার সঙ্গী হিসেবে দেখে চেহারা সাজ-পোষাকে ঘনরামকে বেশ শাঁসালো কেউ বলেই মনে হয়েছে সোরাবিয়ার। সেই সঙ্গে জুয়ায় নামিয়ে ভাল করে নিংড়ে নেবার মতলবও মাথায় এসেছে।

ঘনরামকে স্পেনে ফেরার সে জাহাজে দেখলে কেউ-কেটা বলে ভুল করা খুব অস্বাভাবিক কিছু নয়। কর্টেজ-এর হুকুমে সম্মানিত অতিথির মর্যাদাই তাঁকে দেওয়া হয়েছে। সাজ-পোষাকে কথায়-বার্তায় চাল-চলন ব্যবহারে সে মর্যাদার সম্পূর্ণ যোগ্য বলেই তাঁকে বোঝা গেছে। কর্টেজ ঘনরামকে বিদায় দেবার সময় পয়সা-কড়ি ছাড়া যে সব সম্ভ্রান্ত সাজ-পোষাক সঙ্গে দিয়েছিল তাতে তাঁকে বেমানান লাগে নি।

সোরাবিয়া গোড়ায় একটু গায়ে পড়েই ঘনরামের সঙ্গে ভাব করেছে।

তখনকার দিনের পাল-তোলা মাত্র সত্তর টনের মাঝারি জাহাজ। একশ টনের জাহাজ হলেই সেকালে খুব বড় বলে গণ্য হবার যোগ্য হত। এখনকার তুলনায় মোচার খোলার মত সে ছোট জাহাজের সংকীর্ণ খোলে যাত্রীদের পরস্পরকে এড়িয়ে চলাও শক্ত।

ঘনরাম এড়িয়ে যেতে যেমন চান নি, তেমনি উৎসাহও দেখান নি কারুর সঙ্গে নিজে থেকে আলাপ করার।

সোরাবিয়াই প্রথম একটা ছুতো বার করেছে তাঁর সঙ্গে আলাপ শুরু করার।

তখন সবে সকাল হয়েছে। ঘনরাম জাহাজের খোলা ডেকের নিচু রেলিং ধরে সামনের সমুদ্রের দিকে চেয়েছিলেন।

হঠাৎ একটু চমকে উঠেছেন কাছেই একজনের গলা পেয়ে। পেছন ফিরে তাকিয়ে দেখছেন জাহাজের আর এক যাত্রী এক স্প্যানিশ হিড্যালগো ছোকরা মাথায় টুপিটা খুলে অভিবাদনের ভঙ্গিতে দাঁড়িয়ে তাঁকেই কি যেন বলছে।

কথাগুলো প্রথমে বুঝতে একটু দেরী হওয়ার কারণ ছিল। হিড্যালগো ছোকরা একেবারে যাকে বলে রাজ-দরবারের কেতায় তাঁকে কুর্ণিশ করে যা বলছে তা একটু অদ্ভুত ও অপ্রত্যাশিত।

হিড্যালগো ছোকরা কুর্ণিশ সেরে হাতে একটা স্প্যানিশ সোনার মুদ্রা বাড়িয়ে ধরে বলছে—মহামান্য 'সেনর' কিছু যেন মনে না করেন। তাঁকে বাধ্য হয়ে বিরক্ত করতে হচ্ছে। এই পেসস-দে-অরোটি যেন সেনরের জামা থেকেই গড়িয়ে পড়ল মনে হচ্ছে। সেনর যদি একটু কষ্ট করে দৃষ্টিপাত করে এটি তাঁর কিনা বলেন!

ঘনরাম পেসোটা দেখেই চালাকিটা ধরতে পেরেছেন। তখনও তাঁর সঙ্গে এভাবে মিথ্যে অজুহাত বানিয়ে আলাপ করার কারণটা বুঝতে পারেন নি।

তবু আলাপের ঔৎসুক্য, তা সে যারই হোক অবজ্ঞায় উপেক্ষা করার শিক্ষা ঘনরামের নয়।

তিনি একটু হেসে বলেছেন,—পেসোর গায়ে ত আমার নাম লেখা নেই। আছে স্বয়ং মহামান্য সম্রাটের ছাপ। সুতরাং ওটা আমার কিনা বোঝবার মত কোন প্রমাণ পাচ্ছি না। এইটুকু শুধু বলতে পারি যে, আমার কোন পেসো হারিয়েছে বলে এখনো আমি জানতে পারি নি।

আশ্চর্য ত! সত্যিই যেন বিব্রত হয়ে সোরাবিয়া এবার সোজা হয়ে দাঁড়িয়েছে,—আমার যেন স্পষ্ট মনে হল আপনি ওদিক থেকে চলে আসবার সময় ওটা গড়িয়ে পাটাতনের ধারে গিয়ে পড়ল।

তা সেটা আপনার থলি থেকেও ত পড়তে পারে? বলেছেন ঘনরাম সহজ পরিহাসের সুরে, আপনার নিজের পয়সা-কড়ি গুনে দেখেছেন?

দেখি নি! সোরাবিয়াও সহজ হয়ে বলেছে, তবে দেখবার দরকার নেই। কারণ আমার কাছে স্পেনের এরকম কোন মুদ্রাই নেই।

তাহলে আমার বা আপনার কারুরই যখন নয়, তখন পেসোটা আমাদের পাইলট সানসেদোর কাছেই জমা দিন না। তিনি কার সম্পত্তি খোঁজ করে দিয়ে দেবেন।

তাই দেবেন, না নিজের থলে মোটা করবেন কে বলতে পারে? সোরাবিয়া হেসে উঠে আরো ঘনিষ্ঠ হবার চেষ্টা করেছে,—

তার চেয়ে আপনার আমার কারুরই যখন নয় এটা নিয়ে একটা বাজিই ধরা যাক। ওই যে সাগর-বাজটা আমাদের জাহাজের মাথার ওপর ডানা মেলে ভাসছে ওটা মাছ ধরতে কোন দিকে জলে ছোঁ মারবে জাহাজের বাঁয়ে না ডাইনে, বলতে হবে। ঠিক যে বলতে পারবে এ পেসো-দে-অরো তার।

হিড্যালগো জোয়ানের স্বরূপটা বুঝে ফেলতে ঘনরামের আর দেরী হয় নি। তবু তাকে একেবারে নিরাশ না করে তালে তাল দিয়ে তিনি বলেছেন,—ভালো কথা! কিন্তু পেসোটা যখন আপনিই কুড়িয়ে পেয়েছেন, তখন প্রথম সুযোগটা আপনিই নিন।

আমাকেই নিতে বলছেন,—সোরাবিয়া এরকম প্রস্তাব ঠিক বোধহয় আশা করে নি।

বেশী আপত্তি করলে ধরা পড়ার ভয় আছে বলেই বোধহয় একটু দ্বিধার ভাব দেখিয়েই সে নিজের অনুমান জানিয়েছে।

সেটা ভুল প্রমাণ হওয়ায় খুশিটা প্রায় চাপতে না পেরে বলেছে, এবার আপনার পালা সেনর!

আমার পালাটা বোধহয় বৃথাই গেল! ঘনরাম মুখে একটু আশাভঙ্গের ভাব ফুটিয়েছেন।

কেন? কেন! জিজ্ঞাসা করেছে সোরাবিয়া ব্যস্ত হয়ে।

কারণ আমাদের বাজি ধরার খবর বোধহয় ও পেয়েছে! মুখ টিপে একটু হেসে বলেছেন ঘনরাম,—বিরক্ত হয়ে জুয়াড়ীদের সংস্রব ছেড়ে বোধহয় চলেই যাবে তাই।

ঘনরামের গণনা নির্ভুল প্রমাণ হতে কয়েক মুহূর্ত দেরী হয়েছে মাত্র। সাগরবাজটা ভাসতে ভাসতে হঠাৎ সবেগে ডানা মেড়ে দূরে আকাশে উড়ে চলে গেছে।

আশ্চর্য ব্যাপার ত সেনর,—সোরাবিয়ার চোখে সত্যিকার সম্ভ্রম আর বিস্ময় এবার ফুটি-ফুটি করেছে,—আপনি কি যাদুটাদু জানেন নাকি!

না যাদু জানি না। হেসে বলেছেন ঘনরাম,—শুধু চোখ-কান একটু খোলা রাখতে জানি।

সোরাবিয়ার মুখটা তবু হাঁ হয়ে আছে দেখে বুঝিয়ে বলেছেন,—আমাদের জাহাজের গলুই-এ জলের ঢেউ-এর সাদা ফেনা আর দেখছেন? লক্ষ্য করেছেন যে পালগুলো ঢিলে হয়ে দুলতে শুরু করেছে। হাওয়া গেছে বন্ধ হয়ে। আমাদের জাহাজ প্রায় অচল। সাগর-বাজ আর কি আশায় আমাদের সঙ্গী হয়ে থাকবে। মাছের লোভে সমুদ্রের এ সব পাখি আমাদের সঙ্গ দেয়।

বাহবা! বাহবা! চমৎকার,—সোরাবিয়া সত্যিই হাততালি দিয়ে তারিফ করে বলেছে,—আমাকে রীতিমত আহাম্মক বানিয়ে ছেড়েছেন। এখন আমার এমন শিক্ষা দেবার গুরুটি কে জানতে পারি? অধীন তার আগে নিজেই নিজের পরিচয় দিচ্ছে! এ অধমের নাম সোরাবিয়া। কর্টেজের অধীনে লড়াই করে মহামান্য সম্রাটের সেবা করার সঙ্গে নিজের ট্যাঁকও ভারী করে ফিরব আশা ছিল। সে আশা পূর্ণ হয় নি। এবার কোন নৌ-সেনাপতির সঙ্গে পরিচয় হবার সৌভাগ্য আমার হল যদি জানায়।

ঘনরাম সোরাবিয়ার ছ্যাবলামিতে একটু হাসলেও তার সঙ্গে সুরে মেলান নি। গম্ভীর গলাতেই বলেছেন,—আপনাকে একটু হতাশ হতে হবে সেনর সোরাবিয়া। নৌ-সেনাপতি ত নয়ই জাহাজের একজন মাঝি-মাল্লাও আমি নই। সত্যি কথা বলতে গেলে মানুষ হিসাবে আমায় গণ্য না করলেও আমি কিছু মনে করব না। কারণ তাই আমার অভ্যাস আছে।

সোরাবিয়া এ ঘোরালো কথা দু পিঠের মানে অবশ্য বুঝতে পারে নি, বিনয়ের আরেক প্যাঁচ ভেবে ঘনরাম কোথাকার লোক এবং আসলে কে, সে পরিচয় জানতে আরো উদ্গ্রীব হয়ে উঠেছে।

মুখে সে ব্যাকুলতা প্রকাশ করতে সে-দ্বিধা করে নি। বিনয়ের পাল্লা দিয়ে বলেছে,—সমুদ্র ও জাহাজের বিষয়ে আপনার অদ্ভুত হুঁশিয়ারী আর নজর দেখে আপনাকে নৌ-সেনাপতি ভাবা আমার যদি বেয়াদবি হয়ে থাকে মাপ করবেন। তবে আপনার সঙ্গে পরিচিত হবার সৌভাগ্যই যখন হল তখন আপনাকে সম্বোধন করতে না পারাটা বড় দুঃখের হবে এটুকু না জানিয়ে পারছি না।

সৌজন্যের জিলিপি প্যাঁচ আর না বাড়িয়ে ঘনরাম বলেছেন,—পুলকিত হয়ে সসম্ভ্রমে সম্বোধন করবার মত কেউ আমি কিন্তু নই। আমার নাম ঘনরাম দাস।

ঘনরাম দাস! সোরাবিয়ার একে স্প্যানিশ. তায় বাক্‌দেবীর সঙ্গে সম্পর্ক ছাড়া জিহ্বায় উচ্চারণ লালাতেই যেন জড়িয়ে গেছে। স্পেনের এপার-ওপার মনের আঙুল বুলিয়েও এ ধরনের নামের উৎস খুঁজে না পেয়ে বেশ একটু বিমূঢ় হয়ে দাসকে ডশ উচ্চারণ করে সে জিজ্ঞাসা করেছে,—আচ্ছা দাস বললেন, কোথাকার দাস বলুন ত? ফার্নান্দিনায় ওরকম পদবীর একটি পরিবার আছে বলে যেন শুনেছি। কাস্তিল থেকে এসে তারা পদবীটা নাকি বেঁকিয়ে ওই রকম করেছে!

ফার্নান্দিনা ছিল কিউবার তখনকার নাম। ঘনরাম ফার্নান্দিনায় তাঁর বংশ চালান করবার চেষ্টা দেখে মনে মনে হেসে বলেছেন, —না ফার্নান্দিনায় আমাদের বংশধররা স্পেন থেকে আসে নি। আমরা যেখানকার সেই-খানেই আছি ও থাকব বলেই আমার বিশ্বাস। আমাদের ঘরানা কোথাকার যদি জানতে চান তাহলে তাম্রলিপ্তির নামই করতে হয়।

তাম্রলিপ্ত, শুনেই শব্দটা উচ্চারণ করতে বা বোঝা বনবার ভয়েই বোধহয় আর কিছু জিজ্ঞাসা করতে সোরাবিয়া সাহস করে নি।

মনে যদি একটু বিরক্তি কি জ্বালা থাকে বাইরে সৌজন্যের বিনিময় করে সোরাবিয়া তখনকার মত চলে গেছে। আড়ালের দুর্ভোগ যা দিয়ে বর্তোলমে বাজি ধরা সেই স্বর্ণমুদ্রাটা সঙ্গেই নিয়ে গেছে ভুলে।

ঘনরামও হাওয়ার অভাবে নিস্তরঙ্গ পুকুরের মত স্থির সমুদ্রের দিকে খানিক চেয়ে থেকে পাইলট সানসেদো যেখানে টঙ-এ বসে আছেন জাহাজ চালাতে সেই দিকে পা বাড়িয়েছেন।

পা বাড়িয়েও হঠাৎ চমকে ঘনরামকে থামতে হয়েছে। ওপরের ডেক থেকে নিচের খোলে যাবার সিঁড়িতে একটা চাপা হাসির তরল ঝঙ্কার দ্রুত পদশব্দের সঙ্গে মিলিয়ে গেছে।

একটু চুপ করে দাঁড়িয়ে থেকে ঘনরাম আবার পাইলট সানসেদোর সন্ধানেই গেছেন। এ হাসিতে চমকে উঠলেও বিমূঢ় তিনি হন নি। এ হাসি ও পদশব্দ কার তা তিনি জানেন। এই হাস্যময়ীকে তাক লাগাবার উদ্দেশ্যেই কার্তিক কিম্বা তার ময়ূরটি সেজে সময়ে অসময়ে পেখম-তোলা ভঙ্গিতে ঘোরাফেরা করার দরুণই হিড্যালগো সোরা-বিয়াকে প্রথম তিনি লক্ষ্য করেন।

মেয়েটি কে তাও ঘনরাম জানেন। ক্র্যাভিহেরো নামে এক হিড্যালগো সেনা-নায়কের সদ্যবিধবা যুবতী স্ত্রী। সে হিসেবে তার এরকম হাস্যচপলতা বেশ বিসদৃশ বেহায়াপনা মনে হওয়ারই কথা। তবে মেয়েটির স্বপক্ষে এইটুকু বলা যায় যে, ক্র্যাভিহেরো এক হিসেবে প্রায় বিয়ের পর দিনই স্ত্রীকে কিউবায় ত্যাগ করে পালিয়ে কর্টেজ-এর বাহিনীর সঙ্গে মেক্সিকো অভিযানে চলে আসে। মেক্সিকোয় যাবার পর স্ত্রীর কোন খোঁজ সে ত করেই নি, মেক্সিকোর বার বার বহু সুন্দরীকেই ঘরণীও করেছে। ক্র্যাভিহেরোর স্ত্রী স্বামীর প্রেমের টানে নয়, তার ওপর আক্রোশেই তার সত্যিকার স্বরূপ নিজের চোখে দেখবার জন্যে পরম দুঃসাহসে পাইলট সানসেদোকে ধরে তাঁরই জাহাজে মেক্সিকো পর্যন্ত আসে। এসে সে জানতে পারে যে, যুদ্ধে নয়, মাতাল অবস্থায় তিয়োৎচিৎলানের রাস্তায় নারীঘটিত ব্যাপারের দাঙ্গাতেই মারা গিয়ে ক্র্যাভিহেরো সব সমস্যা মিটিয়ে দিয়ে গেছে।

মেয়েটি তাই আবার ফার্নানদাইন অর্থাৎ কিউবাতেই ফিরে যাচ্ছে। স্বামীর কাছে প্রতারণা ছাড়া কিছু যে পায় নি, স্বামীর মৃত্যুসংবাদে তার একেবারে ভেঙে পড়া খুব স্বাভাবিক বোধ হয় না। তার একটু আধটু তরল চাঞ্চল্যও তাই বোধহয় ক্ষমার যোগ্য।

কিন্তু সেদিনের হাসিটা কেমন একটু হিসেবের বাইরে বলে ঘনরামের মনে হয়। হাসিটা যেন ঝংকৃত হতে একটু দেরী হয়ে গেছে।

সোরাবিয়া উপস্থিত থাকতে থাকতেই হাসির লহরীটা ওঠবার কথা নয় কি?

এ হাসির লহরী কি হিংসার তুফান যে তুলবে তা ঘনরাম যদি জানতেন।

জানলে অবশ্য করতেনই বা কি?

তিনি ত এ চঞ্চলা হাস্যময়ীকে কোন প্রশ্রয় দেন নি। নির্লিপ্ত নির্বিকার দূরত্বেই নিজেকে সরিয়ে রেখেছেন।

কিন্তু মুস্কিল হয়েছে জাহাজ হঠাৎ একেবারে অচল হওয়ায়। সাগর-বাজ নিয়ে বাজী ধরার সকাল থেকে সেই যে হাওয়া বন্ধ হয়ে গেছে তারপর সোমোয়া আনা-র চুলের একটা গুছিও কাঁপায় নি।

মাস্তুলে পালগুলো ঢিলে হয়ে ঝুলছে। জাহাজের পতাকাটাও তাই।

নতুন মহাদেশ থেকে স্পেনে ফেরার পথে এই একটি জায়গায় ভয়ে নাবিক যাত্রী সবাই তটস্থ হয়ে থাকে। সমুদ্রের মাঝখানে সত্যিই এ এক বদ্ধ জলা। নাম সার্গাসো সাগর। সমুদ্রের শেওলা দাম জমে জমে এ অঞ্চলটাকে এমনিতেই বেশ দুর্ভেদ্য করে রেখেছে। তার ওপর সেখানে বাতাসও প্রায় ঘুমন্তই থাকে। সেকালের পাল-তোলা জাহাজ একবার সেখানে হাওয়া বিহনে আটকে পড়লে আকাশের দেবতা দয়া করে একটু ঝড়-তুফান না পাঠানো পর্যন্ত তার আর নিষ্কৃতি নেই। চারিদিকে অসীম সমুদ্রের মাঝখানে অচল হয়ে থাকা তখন এক শাস্তি।

সে শাস্তি হাল্কা করতে একটু আমোদ-প্রমোদ স্ফূর্তির ব্যবস্থা করতেই হয়। তাতে যাত্রীদের পরস্পরের মধ্যে মেলামেশাটাও খুব আড়ষ্ট থাকে না।

জাহাজে পনেরোজন নাবিক। তাদের অধিনায়ক হলেন সানসেদো। যাত্রী ঘনরাম আর সোরাবিয়াকে নিয়ে সবশুদ্ধ সাতজন মাত্র। তার মধ্যে দুজন মাত্র স্ত্রীলোক। সেনোরা আনা আর তার সঙ্গিনী পরিচারিকা এক প্রৌঢ়া।

পুরুষ পাঁচজনের মধ্যে একজন ফ্রানসিসকান পাদ্রী। বর্বরদের অন্ধ তমসার নরক থেকে সত্যধর্মে দীক্ষিত করবার জন্যে স্পেন থেকে তাঁর ধর্মভাইদের আনতে যাচ্ছেন। ঘনরাম বাদে বাকি তিনজনই সৈনিক হিডালগো। তবে সোরাবিয়াই তার মধ্যে একটু দুর্নামের কলঙ্ক নিয়ে মেক্সিকো থেকে একরকম বরাবরের জন্যে বিদায় নিয়েছে। অন্য দুজন হিডালগোর মধ্যে স্যানসো কিনটেরো মেক্সিকোর সেনাবাহিনীর জন্যে স্পেন থেকে ঘোড়া কিনে আনতে যাচ্ছে আর বার্নাল সালাজার যাচ্ছে স্বয়ং কর্টেজের দূত হয়ে স্পেন সম্রাটের কাছে কর্টেজের পত্র আর মহামূল্য সব উপহার নিয়ে।

এসব যাত্রীদের মধ্যে একমাত্র বার্নাল সালাজারেরই ঘনরামের পূর্ব-পরিচয় জানা সম্ভব ছিল। কারণ দু-একবার কর্টেজের সঙ্গে তাঁর নিজস্ব কামরাতেই সালাজার দেখা করতে আসার সুযোগ পেয়েছে। কর্টেজের পেয়ারের ক্রীতদাস হিসাবে ঘনরামকে একটু-আধটু লক্ষ্য করা তার পক্ষে অসম্ভব ছিল না।

তবে ক্রীতদাসের দিকে কে আর কবে ভালো করে চেয়ে দেখে!

ঘনরাম নিজেই কর্টেজের সঙ্গে প্রথম পরিচয়ের সময়ে সে-কথা বলেছিলেন। ক্রীতদাসেরা গরু-ছাগলের সামিল বলে নিজের নাম বলেছিলেন গানাদো।

সালাজার ঘনরামকে মনে রাখবার মত করে লক্ষ্য নিশ্চয়ই করেনি। তার ওপর ক্রীতদাসের ভূমিকা ছেড়ে নতুন সাজপোশাক আর মর্যাদায় ঘনরামের ভোল যা বদলে গেছে, তাতে তাকে চিনতে পারা অসম্ভব বললেই হবে।

দাসত্ব থেকে ঘনরামের মুক্তির খবর ঢাক-ঢোল পিটিয়ে সকলের মধ্যে প্রচার করা হলে শুধু হয়ত নতুন মুখ ও চেহারায় ধাঁচ ও সেই সঙ্গে নামটাম শুনে কেউ কেউ একটু সন্দিগ্ধ হতে পারত।

কিন্তু কর্টেজ ডোনা মারিনারই পরামর্শে ঘনরামের সেই উপকারটুকু করেছেন। ঘনরামকে মুক্তি দিয়ে নতুন সাজপোষাকে সম্ভ্রান্ত করে তুলে স্পেনে পাঠাবার ব্যবস্থা করেছেন একেবারে নিঃশব্দে। কেউ ঘুণাক্ষরেও কিছু জানতে পারেনি।

স্পেনের গ্র্যাণ্ডীদেরই কেউ হিসাবে ঘনরামের নতুন চেহারায় তার পুরোন পরিচয় একেবারে চাপাই পড়ে গেছে।

নতুন মহাদেশ আবিষ্কৃত হবার পর থেকে কম দিন ত যায়নি, হিসপ্যানিওলা, ফার্নানদিনা, নয়া স্পেন য়ুকাটান এমনকি পানামা পর্যন্ত অনেক জায়গাতেই স্পেনের উপনিবেশ ছড়িয়ে পড়ে শিকড় পর্যন্ত মেলেছে।

ঘনরাম দাসকে একটু ভিন্ন গোছের যাদের মনে হয়েছে, তারা তাঁকে তাই য়ুকাটান কি পানামার প্রবাসীই ভেবে নিয়েছে সম্ভবতঃ।

হিডাল্গোদের তাঁর সঙ্গে মেলামেশা ও আলাপ করার ধরনে ঘনরাম তাই বুঝেছেন। এক সোরাবিয়া ছাড়া তাঁর সম্বন্ধে বেশী কৌতূহল কেউ প্রকাশও করেনি।

সার্গাসো সমুদ্রে জাহাজ অচল হওয়ায় আগে পর্যন্ত খুব বেশী মেলামেশার সুযোগও ছিল না। যে যার নিজের গণ্ডির মধ্যেই তখন থেকেছে। খাবারটেবিলে কখনো সকলের একসঙ্গে দেখা হয়েছে, কখনো হয়নি। আজকালকার জাহাজের মত খাওয়া-দাওয়ার নির্দিষ্ট সময় আর কেতাদুরস্ত ব্যবস্থা তখনকার এসব সেপাই আর মাল বওয়া জাহাজে ছিল না। যার যখন মর্জি খেতে শুতে যেত।

ঘনরাম ত' ইচ্ছে করেই কোনদিন সকলের সঙ্গে এক টেবিলে তখন খেতে বসেননি। দরকারও অবশ্য হয়নি তার। পাইলট সানসেদোর সঙ্গে তিনি আলাদাই খেতেন।

সানসেদোর সঙ্গে ঘনরামের আগের আলাপ অবশ্য ছিল না। আলাপ হয়েছে এই জাহাজে ওঠার পরই। কর্টেজ সানসেদোকে একটা চিঠি দিয়েছিলেন সেনর ঘনরাম দাসকে যত্ন করে স্পেনে পৌঁছে দেবার জন্যে। ঘনরাম কে, কি বৃত্তান্ত আর কিছুই তাতে লেখেননি। লেখাটা অবশ্য অস্বাভাবিক নয়।

স্বয়ং কর্টেজ যার জন্যে চিঠি লিখে পাঠান, তাকে উপরি খাতির করতেই হয়। সে খাতির থেকে ভাব জমে উঠেছে প্রৌঢ় আর জোয়ানের মধ্যে। ঘনরাম সুবিধা থাকলে সানসেদোর সঙ্গেই সময় কাটিয়েছেন এতদিন।

সার্গাসো সমুদ্রে সব ওলটপালট হয়ে গেল।

বেকার মাঝিমাল্লারা পুরো একদিন হাওয়ার আশায় আশায় থেকে নিজেদের মধ্যে জুয়ায় বসে গেল। তারা এ হতচ্ছাড়া জায়গার হালচাল জানে। একবার যদি হাওয়া থামে ত' জাহাজশুদ্ধ সবাইকে একেবারে না কাঁদিয়ে আর বইবে না।

আগেকার ফিনিসিয়ান গ্রীক কি রোম্যান জাহাজ হলে তাতে পালের সঙ্গে দাঁড়েরও ব্যবস্থা থাকত। হাওয়া না থাকলে দাঁড়ই হত ভরসা। কিন্তু সে সাগর-দাঁড়ী জাহাজ নামে চালানো, আসলে বড় নৌকো 'মেরায়ই নস্ত্রেম'-এর কূল ঘেঁসে ঘেঁসেই চালানো যেত, আতলান্তিকের ঢেউ সামলানো তাদের কর্ম নয়।

মাঝিমাল্লাদের তাই কোন দায়ই নেই এ-জাহাজে, হাওয়া যদি বন্ধ হয়।

তারা পাইলটের শাসন কি বকুনির কোন ভয় নেই জেনে নিশ্চিন্ত হয়ে জুয়ায় বসেছে।

তাদের দেখাদেখি হিড্যালগো সৈনিকরাও নিজেদের আসর বসাতে দেরী করেনি। ঘনরাম সে-আসর প্রথমটা এড়িয়েই থেকেছেন কিন্তু তাতে নতুন এক অস্বস্তি দেখা দিয়েছে।

সেনোরা আনা পর্দানশীন নয়। স্বামীর খোঁজে কার্নাভিনা থেকে অজানা বিপদের দেশ মেক্সিকোয় যে বেপরোয়া হয়ে পাড়ি দিতে পারে সে লজ্জাবতী লতা গোছের হবে আশা করাই ভুল।

প্রথম প্রথম কিন্তু খানদানী সমাজের ভব্যতা মেনে সে নিজেকে একটু আড়ালে আড়ালেই রেখেছে। জাহাজের ডেকে তাকে একা কোন সময়ে দেখা যায়নি। সঙ্গে 'স্যাপেরোন' থেকেছে প্রৌঢ়া পরিচারিকা। তখনও তার চোখের কোণে কটাক্ষ যদি ঝিলিক দিয়ে থাকে, তা সোজাসুজি নয়। কারণ সেনোরা আনা তখন যে সময়টুকু ডেকের ওপর থাকত, ততক্ষণ তার মুখ ফেরানো থাকত সমুদ্রের দিকেই।

হাওয়া বন্ধ হবার প্রথম দিন বাজি ধরে আলাপের চেষ্টার পর সোরাবিয়া চলে গেলে ডেক থেকে নিচে নামবার সিঁড়িতে, যে তরল হাসিটুকু শোনা গেছল, সেইটেই সেনোরা আনার ব্যবহারের প্রথম দুর্বোধ ব্যতিক্রম বলা যেতে পারে।

সোরাবিয়া অবশ্য সেই সময়টাতেই সুযোগ নিত ঝুঁটিদার মোরগের মত নিজেকে সেনোরার কাছে জাহির করবার। হিড্যালগোদের মধ্যে এক কিনটেরোর সঙ্গে তখন পর্যন্ত তার কিছু পরিচয় ছিল। তাকে হাতের কাছে পেলে হাসি-ঠাট্টার মাতামাতি যে তার মাত্রা ছাড়িয়ে যেত, ঘনরাম ছাড়া অন্যেরাও হয়ত তা লক্ষ্য করে থাকবে।

কিনটেরোকে না পেলে যে-কোন মাঝি মাল্লাই সোরাবিয়ার কাছে সই। একা একা ত' আর কথার কেরামতি দেখানো যায় না।

জুয়ার আসরে বসবার পর থেকেই সোরাবিয়ার এ-মোরগনাচ যা একটু কমেছে।

জাহাজ অচল হওয়ার পর থেকেই সেনোরা আনার চালচলন একটু বেশী স্বাধীন হতে শুরু করেছে। স্যাপেরোন ছাড়াই তাকে এখন প্রায়ই ডেকের ওপর দেখা যায়। আর পিঠটা জাহাজের দিকে না হয়ে সমুদ্রের দিকেই ফেরানো থাকে বেশীর ভাগ।

আরেকটা ব্যাপারও লক্ষ্য করে ঘনরাম একটু অস্বস্তি বোধ করতে শুরু করেছেন তখন। সোরাবিয়া আর দলবল যেখানে জুয়ায় বসত, তিনি সাধারণত সেখান থেকে একটু দূরেই থাকতেন। হঠাৎ তিনি লক্ষ্য না করে পারলেন না যে, সেনোরা আনাও যেন জুয়ার আড্ডা থেকে দূরে থাকবার জন্যে তাঁরই মত উৎসুক।

মানে যাই হোক, এরকম ঘটনার মিল আর বাড়তে দেওয়া উচিত নয় বলে মনে হয়েছে ঘনরামের। এর মধ্যে সোরাবিয়া বারকয়েক তাঁকে খেলতে ডাকলেও তিনি কোনরকমে সে-অনুরোধ এড়িয়ে গেছেন। কিন্তু শেষবার অবস্থাটা একটু অস্বস্তিকর হয়ে দাঁড়িয়েছে।

খেলুড়ে কম পড়ায় সোরাবিয়া তাঁকে খেলায় যোগ দেবার জন্যে অনুরোধ করতেই এসেছিল। তার ছ্যাবলা ধরনেই সাধাসাধি করে সে বলছিল—মশাই, জাহাজ থেকে নেমেই মাথা কামিয়ে সোজা ফ্র্যানসিসক্যান মঠে ঢুকবেন বুঝতে পারছি। একটু পাপতাপ সুতরাং পথে করে যাওয়াই ত' আপনার উচিত। দোষই যদি না করেন তো পরমপিতার ক্ষমা চাইবেন কিসের জন্যে। ধোয়া কাপড় আবার ধোলাই করে লাভ কি! আসুন একটু কালির ছিটে লাগাবেন আমাদের সঙ্গে।

নির্দোষ পরিহাসের সুরে কথা বলতে বলতে হঠাৎ সোরাবিয়ার মুখের ভাব আচমকা বদলে যাওয়ায় ঘনরাম বেশ অবাক হয়েছেন।

সোরাবিয়ার মুখের ভাব শুধু বদলায়নি, গলার স্বরও তারই সঙ্গে পাল্লা দিয়ে তীক্ষ্ণ কঠিন হয়ে উঠেছে।

ও! আপনি আমাদের জুয়ায় কেন বসতে চান না, তা আহাম্মক বলেই আমি বুঝতে পারিনি। আপনি আরো বড় বাজির খেলোয়াড়।

সোরাবিয়ার মুখের ভাব থেকে গলার সুর হঠাৎ বদলাবার কারণটা বুঝতে পেরে ঘনরাম তখন সত্যিই একটু অবাক হয়েছেন। সেদিন ওই বেলাটায় অন্তত তিনি নিজেকে একাই মনে করেছিলেন। সোরাবিয়ার দৃষ্টি অনুসরণ করে কিন্তু অদূরে একটি মাস্তুলের আড়ালে সেনোরা আনাকে দাঁড়িয়ে থাকতে তিনি দেখেছেন এবার। মাস্তুল থেকে ঝুলে থাকা পালটা তাকে অর্ধেক আড়াল করে আছে।

ঘটনাটার মানে সোরাবিয়া যা আর যে-কোন লোকের কাছে কি হওয়া স্বাভাবিক, ঘনরামের তা অজানা নয়। সোরাবিয়াকে মাথায় চড়তে না দেওয়ার জন্যে তাই তাঁকে অন্য ভঙ্গি নিতে হয়েছে। সে-ভঙ্গি সোরাবিয়ার সঙ্গে পাল্লা দেওয়া দম্ভ ও ঔদ্ধত্যের।

তিনি স্পষ্টই নাক বেঁকিয়ে বলেছেন, আপনি ঠিকই ধরেছেন সেনর সোরাবিয়া, আমি বড় বাজি ছাড়া খেলি না। আপনাদের ও এলেবেলে ছেলেখেলায় তাই আমার মন ওঠে না।

বটে! সোরাবিয়ার চোখে যেন ছোরার ঝিলিক দেখা গেছে, কিরকম বাজি হলে খেলায় আপনার মন ওঠে! প্রতি বাজিতে এক পেসো-দে অরো? দুই, পাঁচ, দশ পেসস্ দে-অরো?

পেসস দে-অরো হল স্পেনের সোনার মোহর। সোনার দশ পেসো মানে বেশ কিছু টাকা। গরীবদের পক্ষে প্রায় এক বছরের উপার্জন।

ঘনরামকে কর্টেজ বিদায় দেবার আগে দিল খুলে উপহার দিয়েছেন বটে, কিন্তু তা আর কতটুকু! সাবধানে খরচ করলে তা দিয়ে স্পেন পর্যন্ত পৌঁছে সেখানে ভদ্রভাবে দু এক বছর চালান যায়, কিংবা ফিরে যাওয়া যায় পোর্তুগীজদের কোন ভারত-মুখো জাহাজে অন্তত তাদের সেখানকার ঘাঁটি দমন, দীউ কি গোয়ায় ফিরে যাওয়া যায়। ফি বাজিতে দশ পেসো করে ধরলে সে-পুঁজিতে একদিনও কুলোয় কিনা সন্দেহ, বিশেষ যদি পড়তা খারাপ পড়ে।

কিন্তু সোরাবিয়ার কাছে এখন পিছু হটার চেয়ে মরণই ভালো।

ঘনরাম যেন অনুগ্রহ করার ধরনে বলেছেন, তা দশ পেসো হলে চলতে পারে!

তাহলে আসুন দয়া করে আমাদের আসর ধন্য করতে।

সোরাবিয়া কুর্ণিশের ভঙ্গিতেই কথাটা বলেছে। ঘনরাম কিন্তু তার দাঁতে দাঁত ঘষার শব্দটাও শুনেছেন সেই সঙ্গে।

প্রতি দানে দশ পেসস্—দে—অরো!

মনটাকে শক্ত করে আসরের দিকে যেতে যেতে ঘনরামকে একটু থামতে হয়েছে। সোরাবিয়াকেও সেই সঙ্গে।

সেনোরা আনা তাদের সামনে দিয়েই জাহাজের একদিক থেকে আর একদিকে পার হয়ে যাচ্ছে।

যেতে যেতে দ্বিধাহীনভাবে সোজা ঘনরামের মুখের দিকে যে দৃষ্টিটা সে চকিতে ছুড়ে দিয়ে গেছে, তাতে কৌতুকের সঙ্গে একটা তারিফ আর উৎসাহের উস্কানি স্পষ্টভাবেই ফুটে উঠেছে।

এ-দৃষ্টি সোরাবিয়ার চোখেও পড়েছে সন্দেহ নেই।

(ক্রমশঃ)

রবিরঞ্জন চট্টোপাধ্যায়

সাদা ঘোড়ার পিঠে চলেছেন রঘুনাথ। জোছনা পড়েছে পিঠে, মুখে, গায়। রাজা চলেছেন মাঠ পেরিয়ে, ঘাট পেরিয়ে; সংগী-সাথীদের পেছনে ফেলে অনেক দূরে, অনেক দূরে। দিল্লী নগর জবর নগর, রাজারাজড়ার বন্দর, চলেছেন সেই দেশে। কোথায় বিষ্ণুপুর কতদূর, কোথায় দিল্লী অনেক দূর—খাদুপুর। দিল্লীর আকাশ ভারী কোলাহলে, সেখানকার সব চোখঝলকান। কান্নাকুনি, ব্যাপার।

দিল্লীর কাজ সেরে রাজা এলেন ফিরে পাল্কী এসে থামল, সোনার কাজকরা ভেলভেটের ঝালর দেওয়া পালকী থেকে যে নামল তার ঝলমলে পোষাক, ঝিনঝিন গহনার শব্দ। রাজা দিল্লী থেকে এনেছেন নতুন রাণী লালবাঈকে। লালবাঈ ধর্মে মুসলমান। পুরানো রাণী হয়ে গেল দুয়োরাণী। চন্দ্রপ্রভা অন্তঃপুরেই রইলেন। চন্দ্রপ্রভার প্রেমের মালা তাঁর হাতেই শুকিয়ে গেল, মনের বনে ফোটা ফুল মনের বনেই ঝরে গেল। রাজা লালবাঈয়ের চোখের ঝিলিকে পথ ভুললেন।

প্রজার ঘরে আত্মীয় কুটুম্বের ঘরে গেল নিমন্ত্রণ, শাস্ত্র মতে হবে মুসলমান রাণীর ছেলের অন্নপ্রাশন। প্রজার মুখ শুকিয়ে গেল। দল বেঁধে তারা যায় পট্টমহারাণী চন্দ্রপ্রভার কাছে।

রাত নিঃঝুম, ঘুটঘুট। রাণীর চোখে ঘুম নেই, রাজদেউড়ী খোলা, প্রাসাদের সবাই ঘুমে অচেতন। নিশীথ রাত, আঁধারের গা ঘেঁসে এসে দাঁড়ায় কতগুলি ছায়া, কালো ছায়া, খোলা দেউড়ী, নিশীথ রাত, প্রজারা রাজার প্রাণপাখী নিয়ে পালায়। রাণী মূর্ছিতা হয়ে পড়লেন।

চিতা জ্বলে উঠে, রাণী হলেন সহমৃতা। লোকে বলল—পতিঘাতিনী সতী, আর সেই নতুন রাণী, তাকে সবাই বলে ডুবিয়ে মারা হয়েছিল, ঐ সেই লালবাঁধের জলে লালবাঈয়ের ভরা নাওয়ের হল ভরা ডুবি।

বিষ্ণুপুরের লালবাঁধের ধারে বসে মনে পড়ছিল অতীতের সেই গল্প। কানের কাছে যেন বাজতে লাগল—মত্ত ঘোড়ার খুরের আওয়াজ। লালবাঁধের সংগে লালবাঈয়ের নামও হয়ে রইল অমর, অমর হয়ে রইলেন এরই সংগে ২য় রঘুনাথ সিংহ।

সে হল মোগল পাঠান দ্বন্দ্বের যুগ। বাদশাহ আকবর শাহ। এই দ্বন্দ্বের সুযোগে অনেক জমিদার সুযোগ মত রাজ্য বিস্তার করেন ও ক্ষমতা বৃদ্ধি করেন। পাঠান আমলে বিষ্ণুপুররাজ ছিলেন প্রায় স্বাধীন। কতলু-মানসিংহ যুদ্ধে প্রথমে তিনি পাঠান পক্ষেই যোগ দিয়েছিলেন।

বাদশাহ আকবরের দুর্দান্ত সেনাপতি মানসিংহ। বিহারের দু-একজন অশান্ত জমিদারকে শাসন করে পাঠানদের হাত থেকে উড়িষ্যা কেড়ে নেবার জন্য চলেছেন। রাজা ঝাড়খণ্ড হয়ে এগোলেন। বর্ষা শুরু হয়েছে। রাজা ভাবলেন বর্ধমান পার হয়ে জাহানাবাদে বর্ষাটাকে কাটাবেন। ওদিকে কতলু খাঁ পঁচিশ ক্রোশ দূরে ধরপুরে এগিয়ে এসেছেন। রাজা তখন পুত্র জগৎ সিংহের অধীনে এক দল সৈন্য পাঠালেন। জাহানাবাদ প্রান্তরে মুখোমুখি দাঁড়ালেন বাহাদুর খাঁ আর জগৎ সিংহ। চালাক পাঠান যুদ্ধের পথ পরিহার করে করল সন্ধি-প্রস্তাব। প্রবঞ্চিত হলেন জগৎ সিংহ। কুম্ভস্থাল দুর্গের শিখরে দাঁড়িয়ে দেখলেন রাজা হাম্বিরমল্ল, চিন্তিত মনে দূত পাঠালেন জগৎ সিংহের শিবিরে। কিন্তু না, চারিদিক থেকে ঘেরাও হয়েও সাবধান হলেন না জগৎ সিংহ। এক অসতর্ক মুহূর্তে পাঠান আবার করল আক্রমণ। জগৎ সিংহের সৈন্যদের প্রতিরোধ করবার কোন পথই রইল না। শিবির ছেড়ে জগৎ সিংহকে পালাতে হল। এবার এগিয়ে এলেন রাজা হাম্বির।

জগতের প্রাণই শুধু রক্ষা পেল, রাজা তাঁকে নিয়ে গেলেন নিজ আশ্রয়ে, রাজা মানসিংহ মুগ্ধ অন্তরে দাঁড়ালেন হাম্বিরের পাশে।

পুত্রের পরাজয়ে ক্ষুব্ধ হলেন মানসিংহ। ভাগ্যক্রমে এর দশ দিন পরে মারা গেলেন কতলু খাঁ। পাঠান এবার সত্যিই সন্ধি করলো। সর্ত রইল পাঠান মোগল বাদশাহের নামে খোৎবা চালাবে ও মুদ্রা প্রকাশ করবে। পুরী ছেড়ে দেবে, জমিদারদের ওপর অত্যাচার করবে না। মীমাংসার পরে রাজা ফিরে গেলেন বিহারে।

মোগল পাঠানে সন্ধি হলে হাম্বির যোগ দিলেন মোগল পক্ষে। কতলু খাঁর মন্ত্রী ঈশা খাঁ লোহানীর জীবদ্দশায় পাঠান সন্ধি ভাঙল না। দুই বছর পরে তাঁর মৃত্যুর পর তারা আবার পুরী দখল করল। শুধু তাই নয়, হাম্বীরের অধিকৃত বিষ্ণুপুরের দক্ষিণ ভাগ লুঠ করল। সে আক্রমণের সামনে দীপ্ত তেজে দাঁড়ালেন হাম্বীর। যে পথ দিয়ে পাঠান এসেছিল সে পথ দিয়ে তারা আর ফিরতে পারল না।

কার্যতঃ কোনদিন বিষ্ণুপুর পাঠানের পদানত হয় নি। এখানকার ভিতরকার ব্যাপারে মোগলও নাক গলায় নি কোনদিন।

●

তোডরমলীয় বিভাগ অনুযায়ী প্রাচীন বিষ্ণুপুর মাদরণ-এর সীমার মধ্যে ছিল। আর বাংলার পশ্চিম প্রান্তীয় বিষ্ণুপুর পঞ্চকোট প্রমুখ রাজারা মোগল সম্রাটকে বার্ষিক নজরানা পেস্কাস দিতে রাজী হন। পরে পূজার সময় এই আয় নাম পেল সরকার পেস্কাস। পাঁচ মহালে এই আয় ছিল ৫৯,১৪৬ টাকা।

শ্যামরায় মন্দির

যদিও মল্লরাজারা কিছু বার্ষিক কর দিতেন কিন্তু একথা ঠিক যে, তাঁরা ছিলেন প্রায় স্বাধীন। তাঁদের কোন আভ্যন্তরীণ ব্যাপারে মোগলরা আসে নি।

৬৯৪ খৃঃ আদিমল্ল রঘুনাথ প্রতিষ্ঠা করেছিলেন এই মল্লরাজবংশের। দীর্ঘ হাজার বছর অম্লান ছিল এঁদের প্রতাপ-প্রতিপত্তি। পাঠান ও মারাঠা আক্রমণ এঁরা রুখেছেন।

রাজা হাম্বীরমল্ল ছিলেন আকবর বাদশাহর সমসাময়িক। যদিও ইনি প্রকাশ্যে মোগল বাদশাহর বিরোধিতা করেন নি কিন্তু এঁর সংগে বাংলার অন্য ভুইঞাদের যোগ ছিল গভীর।

শত্রুর হিন্দুধ্বংসী শক্তির সামনে রাজা হাম্বীর দাঁড়ালেন দৃপ্ততেজে। পরিখা কাটলেন মল্লভূম ঘিরে। তাদের তীরে তীরে দাঁড়াল ঘাটোয়াল বাহিনী, আর অগ্নিস্রাবী কামান। সীমান্তে দ্রুত সংবাদ আদান-প্রদানের জন্য গড়লেন স্তম্ভ, মাচান। সেখানে থাকত দক্ষ সৈন্য সংকেতের আশায়। নগরের সীমায় সীমায় থাকত রণদক্ষ সৈন্য।

বনবিষ্ণুপুর ছিল বনপূর্ণ, আদিবাসী ধীবর, বাউরী, হাড়ি, ডোম প্রভৃতির বাস। বন কেটে বসত ও সুরম্য অট্টালিকা করেছিলেন মল্লরা। তাঁরা শিক্ষাদীক্ষায় কারও চেয়ে কম ছিলেন না। কোন কোন প্রাচীন গ্রন্থে এঁদের দস্যু বলে, অনার্য বলে অভিহিত করা হয়েছে। অবশ্য আভিধানিক অর্থে এঁরা আর্য ছিলেন না। বাংলার এই প্রান্ত দেশে আর্য সভ্যতা মূল ভূখণ্ডের অনেক পরে পৌঁছায়। এঁরা পূর্বে ঠিক সনাতন হিন্দু ধর্মভুক্ত ছিলেন না। বিষ্ণুপুরে আজও গোপ, ধীবর প্রভৃতি জাতির মধ্যে প্রাচীন ক্রিয়াকান্ড দেখা যায়। ভৈরব স্থানে মাটির ঘোড়া দিয়ে পূজার মধ্যে কিছু অনার্য প্রভাব আছে বৈকি!

গোপ, বাগদী, ধীবর প্রভৃত জাতি চিরদিনই বীর ও যোদ্ধা। তখন জমিদাররা যেমন ডাকাত পুষতেন তেমনি নিজেরাও করতেন; এতে যেন অগৌরবের কিছু ছিল না, ছিল বীরত্বের অংশ। হাম্বীরও এই অর্থে এঁদের গ্রন্থে দস্যু ও অনাচারী বলে বর্ণিত হয়ে থাকবেন। বাঁকুড়ার নিম্নবর্ণীয়দের সাহস ও বীরত্বের প্রকাশ এই সেদিনও ঘটেছিল, দুশ বছর আগে। বর্ধমান বিষ্ণুপুর রাজের মধ্যে তুমুল যুদ্ধে তা প্রকাশ পেয়েছিল।

ঐতিহাসিকরা বলেন, এঁরা আগে শৈব শাক্ত, লৌকিক ও কৌম ধর্মের পোষক ছিলেন। একথা বলা যায় যে, আর্যতর জাতির মধ্যে শিব ও শক্তি পূজার প্রচলন অধিক দেখা যায়। অবশ্য প্রকৃত হিন্দুত্বের গন্ডীতে এঁরা আসেন মধ্যবঙ্গের ব্রাহ্মণ প্রভাবে। যেমন এসেছিলেন একাদশ শতাব্দীতে পঞ্চকোটের রাজা ,হরিশ্চন্দ্র। এক সময়ে মল্লরাও ব্রাহ্মণ প্রভাবে সম্পূর্ণভাবে হিন্দুত্বের গন্ডীতে এসে পড়েন। পরে অনেক আদিবংশীও ব্রাহ্মণ বংশসম্ভূত ও ক্ষত্রিয়ত্ব দাবী করেন। ইতিহাসকার বলছেন ...'প্রথমে বৃন্দাবন অঞ্চলের তীর্থযাত্রী ক্ষত্রিয় রাজার রাণীর এই স্থানেই প্রসব বেদনা ঘটায় শ্রীকুশমেয়া বাগদী নামক লোক (জাতি নহে) প্রসূত বালকের পালনের ভার বহন করিল, পরবর্তীকালে এই পালকের ব্রাহ্মণ হইয়া ওঠা কষ্টকর হইল না; এবং বাগদীর রাজা, বাগদী রাজা নহে, এ ব্যাখ্যা সহজে চলিল। হাম্বীর দস্যুদের নেতা ছিলেন এবং শ্রীনিবাস আচার্য প্রভুর কৃপায় বৈষ্ণব হইলেন একথা লোকে বিস্মৃত হইল।' ......

...'প্রত্যন্ত ভাগে ত্রিপুরা, বিষ্ণুপুর প্রভৃতি স্থানে বাঙালী ব্রাহ্মণের প্রভাবে শিক্ষা-দীক্ষার প্রসার হয়।'

হাম্বীরের ছেলে রঘুনাথ সিংহ উপাধি ধারণ করেন। রাজাকে সুরক্ষিত ও সুশাসিত করলেন। দুশ বছর ধরে তাঁরা যেভাবে রাজ্য শাসন করেছিলেন তা দেখে অনেক বিদেশীও স্তম্ভিত হয়ে যায়।

হাম্বীরের ও বিষ্ণুপুরের সম্বন্ধে নানা গল্প শোনা যায়, কোনটি হয়ত চালু হয়েছে লোকমুখে, কোনটি রচিত অর্বাচীন ঐতিহাসিকের হাতে, আর কোনটি বা প্রকৃত ইতিহাস। কিন্তু এই সব নিয়েই গড়ে উঠেছে—বনবিষ্ণুপুরের গল্প। সেই গল্প বলতে এসেই আজ এতটা পথ এগিয়েছি।

বৃন্দাবনের গোঁসাইরা 'গাড়ি ভরি অমূল্য রতন' গ্রন্থ পাঠিয়েছেন গৌড় দেশে। ঘন বন, পাহাড় ঘেরা পথ, পার হয়ে গাড়ী পৌঁছাল বনবিষ্ণুপুরের পথে। মল্লভূমের গোপালপুরে হাম্বীরের লোক লুঠ করল সেই গ্রন্থে ভরা পেটিকা অর্থভ্রমে। সেই পেটিকার মধ্যে ছিল মহামূল্য 'শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত'।

লুণ্ঠিত দ্রব্য খুলতে গিয়ে বিস্ময়ে হতবাক হলেন রাজা হাম্বীর, দেখেন এতো সাধারণ ধন নয় অমূল্য রত্ন। এদিকে বৈষ্ণবরা শ্রীনিবাস আচার্যসহ রাজসভায় উপস্থিত হয়েছেন। সেখানে শ্রীনিবাসের প্রভাবে ভাবান্তর হল হাম্বীরের; সপরিষদ, সপরিবারে তিনি বৈষ্ণব হলেন।

এদিকে যথাসময়ে শ্রীশ্রীচৈতন্যচরিতামৃত লুণ্ঠনের খবর পৌঁছাল কৃষ্ণদাস কবিরাজের কানে। ১৬৫১ খৃঃ এই খবর পেয়ে দেহত্যাগ করলেন কবিরাজ কবি।

কিংবদন্তী আছে রাজা বীর হাম্বীরই বিষ্ণুপুরের মদনমোহন প্রতিষ্ঠা ও পূজার প্রচলন করেন। এই মদনমোহন ঘরণী নামে এক ব্রাহ্মণের ঘরে পূজিত হতেন। একদিন রাজা হাম্বীর শিকারের জন্য বেরিয়েছেন। দেখলেন ব্রাহ্মণের ঘরের মূর্তিটি। তিনি মুগ্ধ হলেন, অনুরোধ করলেন ব্রাহ্মণকে—'আমায় মূর্তিটি দাও।' কিন্তু শত অনুরোধ-উপরোধেও তিনি রাজী হলেন না তাঁর ইষ্টদেবকে দিতে। রাজা তখন কৌশলে মূর্তি অপহরণ করলেন। তারপর তাঁকে নিয়ে এলেন বিষ্ণুপুরের রাজবাড়ীতে। উৎসবে মেতে উঠল রাজবাড়ী। এদিকে ব্রাহ্মণ বিষ্ণুপুরে এসে উপস্থিত হলেন। কিন্তু লুকানো মূর্তিটি ফিরে পাওয়া অসম্ভব জেনে বললেন নদীতে জীবন দেবেন। তাঁর এই অন্তিম সময়ে এক বৃদ্ধা এসে তাঁকে বললেন রাজা কোথায় বিগ্রহটি রেখেছেন। ব্রাহ্মণ তখন গেলেন রাজার কাছে, বললেন তাঁর মূর্তি ফিরে না দিলে তিনি আত্মহত্যা করবেন। রাজা এদিকে কারিগরদের অবিকল অমনি একটি মূর্তি গড়তে আদেশ দিলেন। কিন্তু সেই ব্রাহ্মণ এতে ভুললেন না। মদনমোহন স্বপ্নে ব্রাহ্মণকে বললেন—তিনি হাম্বীরের প্রতি সন্তুষ্ট হয়েছেন, তাঁকে ছেড়ে যেতে পারবেন না। তখন থেকেই নাকি শুরু মদনমোহন পূজার।

মল্লদের অবনতির কালে বিগ্রহটি চৈতন্য সিং বাগবাজারের গোকুল মিত্রকে বন্ধক দেন, তারপর পৃথক মূর্তি বাঁকুড়ায় প্রতিষ্ঠিত হল, সেটিও শোনা যাচ্ছে কিছু দিন হল অপহৃত।

কথিত আছে ঐ মদনমোহনই বর্গী ভাস্করকে হটিয়ে দেন।

●

রেলে করে কলকাতা থেকে ১২৫ মাইল (২০১ কিঃ মিঃ) দূরে শক্ত পাথরে লাল-মাটির দেশ বিষ্ণুপুর।

আজ ঐ লাল মাটির ওপর হয়েছে পাকা রাস্তা; উঠেছে আকাশ-চুম্বী অট্টালিকা, নতুন তৈরী হচ্ছে অতিথি-শালা সরকারী তত্ত্বাবধানে। বাঁকুড়া জেলার বরেণ্য মানুষ রামানন্দ চট্টোপাধ্যায়ের নামে গড়ে উঠেছে রামানন্দ কলেজ, ঠিক লাল-বাঁধের ধারে।

বিশাল লালবাঁধ, এপার থেকে ওপার দেখা যায় না। যেমন স্বচ্ছ তার জল, তেমনি হিমশীতল। এখানে এমন জলাশয় আরও

কয়েকটি আছে। নামগুলিও তার অদ্ভুত। চতুষ্কোণ বিশাল লোকা বাঁধের কথাই ধরুন না, এত বড় বাঁধ বড় চোখে পড়ে না। এ ছাড়াও আছে যমুনা বাঁধ, কৃষ্ণ বাঁধ প্রভৃতি। বাঁধগুলি এক সময় চাষীকে দিয়েছে চাষের জল, তৃষ্ণার্তকে দিয়েছে পানীয়। আজও এরা এখানকার মানুষের প্রয়োজন মেটাচ্ছে।

বিষ্ণুপুরে পাকা বাড়ীর সংখ্যা প্রচুর নতুন গড়ে উঠলেও পুরোনও কম নয়। পুরোন বাড়ীর অনেকগুলিই ভেঙে পড়ছে। স্বচ্ছল মানুষও কম নেই. খাঁটি বাংলা ছাঁদের (চালা ঘর) ঘরগুলি অপূর্ব মনোহর। এ ছাঁদ ভারতের আর কোথাও নেই। মাটিতে গড়া দেওয়ালগুলি ইঁটের মত শক্ত, স্থায়ী ও মজবুত।

●

কলেজ থেকে বেরিয়েই অল্প দূরে অতীতের সাক্ষ্য নিয়ে পড়ে আছে দলমাদল কামান তার বিশাল দেহ নিয়ে খোলা আকাশের তলায়। দলমাদলের আরেক নাম দলমর্দন। কামানটির দৈর্ঘ্য সাড়ে বার ফুট। লম্বা লোহার নলের উপর ৬৩টি লোহার

বিখ্যাত দলমাদল

রাসমঞ্চ
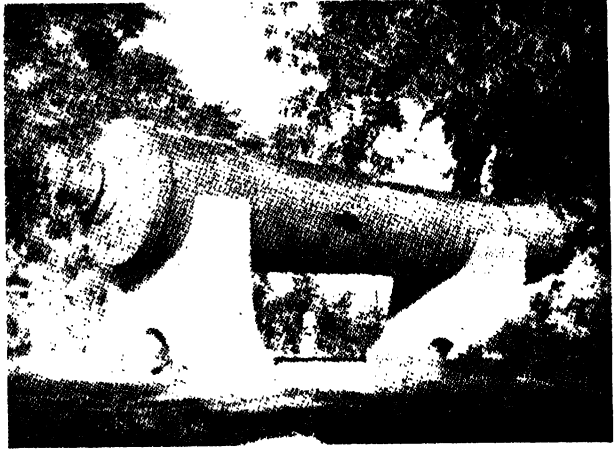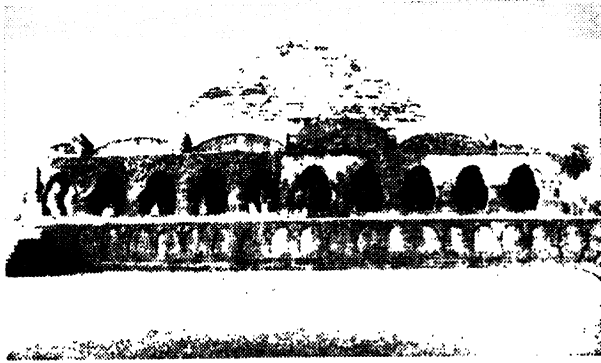
বালা ঝালাই করে লাগান। মাটির তলায় লুকিয়ে ছিল দলমাদল—১৯১৯ সালে একে স্বমর্যাদায় স্থাপন করা হয়েছে।

দলমাদলের নীচের তলার অংশটি নেই আছে শুধু নলটি। মনে হয় কে যেন অসংখ্য চুড়ি পরিয়ে দিয়েছে। এর গঠন দেখলে আর কিভাবে একে ব্যবহার করা হয়েছে ভাবলেও বিস্ময় জাগে। তখন শ্রদ্ধা জাগে মধ্যযুগের কর্মকার জনার্দন, জগন্নাথ, বিশ্বম্ভব প্রভৃতির ওপর, যাঁরা নির্মাণ করেছিলেন জাহানকোষা, দলমাদল, কালে খাঁ, ফতে খাঁ প্রভৃতি কামান।

সে ছিল বর্গী হাঙ্গামার যুগ, বর্গীদের মদমত্ত পায়ের ছাপ বাংলার মাটিকে রঞ্জিত করে দিয়েছে, কম্পমান বাংলার মসনদও। ১৭৪২ খৃঃ মারাঠা সর্দার ভাস্কর পণ্ডিত যখন বিষ্ণুপুরে হামলা করেন রাজা ছিলেন তখন গোপাল সিংহ। মদনমোহন নাকি স্বয়ং তখন এই দলমাদল চালনা করে গোপাল সিংহকে বর্গীর হাত থেকে রক্ষা করেন। খোলা আকাশের তলে পড়ে আছে দলমাদল। মরিচার চিহ্নমাত্র নেই কোথাও।

দেখে মনে পড়ে দিল্লীর লৌহ স্তম্ভের কথা।

বিষ্ণুপুর মন্দিরময়। এখানকার পাতলা ইঁটের তৈরি মন্দিরগুলির গঠনপ্রণালী অপূর্ব। এগুলিতে বাংলার স্বতন্ত্র শিল্প-রীতির উজ্জ্বল বৈশিষ্ট্য। জোড়াবাংলা মন্দির, কালাচাঁদ, মুরলীধরের মন্দির, রাসমঞ্চ, দুর্গদ্বার আরও অনেক মন্দির শিল্পের অনিন্দ্যসুন্দর নিদর্শন। এগুলির পোড়ামাটির কাজও অপূর্ব।

রাসমঞ্চ :—এটি ১৬৮০ খৃঃ নির্মিত। এটি প্রচলিত স্থাপত্যরীতিতে নির্মিত নয়। গঠনপদ্ধতি অভিনব। অনেকটা পিরামিডের ধরনে তৈরি। কৃষ্ণ পূজার জন্য এটি প্রতিষ্ঠিত হয়। বিষ্ণুপুরের যাবতীয় বিগ্রহ এখানে এনে পূজা করা হোত, গর্ভ-গৃহের চতুষ্কোণ স্থানটি বীর হাম্বীর প্রতিষ্ঠিত বলে কথিত। এর চারদিকে বসবার জায়গা, বাইরে বারান্দাপথে দশটি দ্বার। এর বর্তমান রূপটি অবশ্য সংস্কারের

ঐতিহাসিক লালবাঁধ

পরের রূপ তবে পুরোনকে খুব পরিবর্তন করা হয় নি। অল্প-বিস্তর কালের ছাপ হয়তো পড়েছে। এর থামগুলি এত বড় ও সংখ্যায় এত বেশী যে, দিনের বেলায়ও ভেতরটা অন্ধকার দেখায়, অনায়াসে এর মধ্যে লুকিয়ে থাকা যায়। পিরামিডের আকারে এর চূড়োটি খাঁজে খাঁজে উপরের দিকে উঠে গেছে। প্রতি দুটি থামের মধ্যকার স্থানটি চালাঘরের ছাঁদে অলংকৃত। বিষ্ণুপুরের মন্দিরগুলি চারি ভাগে ভাগ করা যায়।

মদনগোপাল মন্দির :—১৬৬৫ খৃঃ নির্মিত। রাজা বীরসিংহের রাণী শিরোমণি এটি তৈরি করেন, পাঁচটি চূড়াবিশিষ্ট মাকরা পাথরের প্রাচীন দুটি থাম, কারুকার্য বা শিল্পকার্য সম্ভবত নষ্ট হয়ে গেছে। সমস্ত পাথরের ওপর বালি প্লাস্টার করা। বিশেষজ্ঞরা এটিকে পাথরের পঞ্চরত্ন মন্দিরগুলির মধ্যে শ্রেষ্ঠ মনে করেন।

লালজীর মন্দির :—এই ছোট মন্দিরটি কৈলাশতলার একটু আগে দেখা যায়। কৈলাশতলায় দর্শনীয় কিছু অবশ্য নেই তবুও উল্লেখ করছি এই জন্য যে, বৈষ্ণব বিষ্ণুপুরেও এই স্থানে শিব, দুর্গা প্রভৃতি মাটির গড়া অনেকগুলি মূর্তি রয়েছে। এখানে বিষ্ণু পূজার সংগে অন্য পূজারও প্রচলন এটি থেকেই ধরা যায়।

মদনমোহন মন্দির :—এই সেই বিখ্যাত মদনমোহন মন্দির। ১৬৯৪ খৃঃ অব্দে দুর্জন সিং এটি তৈরি করান। বাংলা চালাঘর ছাঁদে এটিও তৈরি। এটিতে একটি শিখর বা চূড়ো দেখা যায়। ইঁটে তৈরি একরত্ন মন্দিরগুলির মধ্যে এটিই শ্রেষ্ঠ। মন্দিরের গায় পোড়ামাটির সুন্দর কারুকার্য রয়েছে। উঁচু পাঁচিল দিয়ে এটি ঘেরা। মন্দিরটির সামনে কারুকার্যকরা একটি ভাঙা বাংলা ছাদের পরিত্যক্ত মন্দির রয়েছে।

মন্দিরটির পোড়ামাটির কাজ সত্যই নয়নরঞ্জক। এখানকার বকাসুর বধ, ধনুর্ধারী পিঠে তূন, রথযাত্রী, ফুল, দুই দলের যুদ্ধের দৃশ্য; এক দল হরিণ, পেখম তুলে ময়ূর প্রভৃতি এত দিন আগে তৈরি কিন্তু এখনো কত জীবন্ত।

মন্দিরের চারিদিক প্রায় দশ-বার ফুট উঁচু পাঁচিল দিয়ে ঘেরা। দরজাটিও সুদৃশ্য। দরজার পাশে একটি অদ্ভুতদর্শন ইঁদারা। চৌকা মাটিরই লেবেলে। চারিদিকে সিঁড়ি নীচে নেমে গেছে। জলও দেখা গেল চকচক করছে। বোধহয় মন্দিরের কাজের জন্য এটিকে ব্যবহার করা হোত।

রাজবাড়ী :—বিষ্ণুপুরে রাজবাড়ী ও তার চারিপাশ, মধ্যস্থ দুর্গদ্বার মন্দির একাধারে বৈষ্ণবী দীনতা বিনয়, ভক্তি ও বীরত্বের ও শিল্পকৌশলের সমন্বয়ে গঠিত।

প্রথম দরজাটির দু পাশে সরু সিঁড়ি আড়াল করা। এটি দিয়ে উপরে একদম চূড়োয় ওঠা যায়। সেখানে রয়েছে পাহারাদারদের পাহারা দেবার স্থান। গোল ঘেরা প্যারাপিটের সর্বাঙ্গে রয়েছে ছোট ছোট ফোকর, বোধহয় এই ছোট ছোট গর্তগুলি থেকে প্রহরীরা চারিদিকে দৃষ্টি রাখত বা বন্দুকের নল বার করা থাকত। এখান থেকে সমস্ত স্থানটি দেখা যায় যেন ছবির মত।

পাথর দরজা :—এটি মাকড়া পাথরে তৈরি। সপ্তদশ শতকে মল্লরাজ বীরসিংহ এটি গড়েন। ইনিই বিষ্ণুপুরকে বেড়ে পরিখা খনন করেন। যার কিছু এখনও দৃষ্ট হয়।

রাধাশ্যাম মন্দিরটি চৈতন্য সিংহ নির্মাণ করেন।

জোড়বাংলা মন্দির :—এর জুড়ি পাওয়া ভার। ১৬৬৫ খৃঃ অব্দে রাজা রঘুনাথ সিংহ এক জোড়া বাংলা ধরনের মন্দির করেন। এটিরও দেওয়ালে নানারকম পোড়ামাটির কাজ করা আছে।

মন্দিরটি যেন একটি দুর্গ। এর দু পাশ দিয়ে উঠে গেছে সরু সিঁড়ি। একটি লোক কোনরকমে উঠতে পারে। সিঁড়িটি এতই অন্ধকার যে, কোলের মানুষও দেখা যায় না। বাধ্য হয়ে আমাদের দেশলাই জ্বালাতে হল। উপরে উঠে চারিদিকে পরিখা ঘেরা স্থানটি দেখা যায়।

মন্দিরগাত্রের কারুকার্যগুলি অপূর্ব। বিশেষ করে পূর্বরাগ, অশ্বারোহী যোদ্ধা, (ছয় দাঁড়ীর) নৌকা যাত্রা, গোধন যাত্রা প্রভৃতি উল্লেখযোগ্য। চিত্রগুলির কারুকার্য আজও সে যুগের বাঙালীর শিল্পের গৌরবময় দিনগুলির কথা ঘোষণা করে।

রাস্তার উপরেই ইঁটে তৈরি সোজা গাঁথা একটি উঁচু চৌকা ঘর (?)। এটি দেখা গেল না। অনেকে বলেন এটি ছিল সে যুগের ওয়াটার ট্যাঙ্ক। অনেকে বলেন, না এখানে ফেলে দোষীদের শাস্তি দেওয়া হত, এর ভেতরে নাকি আছে প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড ত্রিশূল পোঁতা।

●

গান বাজনা মতিচুর
তবে জানবি বিষ্টুপুর

তামাক তসর মতিচুর
তবে জানবি বিষ্টুপুর।

তামাক, তসর, গান-বাজনা। এদের জন্য বিষ্ণুপুরে যে খ্যাতি সে যুগে ছিল তার কিছু আজও বর্তমান আছে বৈকি।

তামাকের কথাই ধরা যাক, বিষ্ণুপুরের তামাক বিখ্যাত। ঐতিহাসিকেরা বলেন সপ্তগ্রামে পর্তুগীজ আগমনের পরেই তামাকের চাষ হয়। বিষ্ণুপুরে তখন রাজা বীর হাম্বীর। তার ছেলে রঘুনাথ। বিখ্যাত শ্যামরায়ের মন্দির এঁর তৈরি। এর গায়ে আছে পর্তুগীজ রণতরীর ছবি। এক পাশে গড়গড়াপানরত এক পর্তুগীজ।

আরেক কিংবদন্তী (বা ইতিহাস)। ১৫৯০ খৃঃ ২১শে মে, জগৎসিংহকে নেশায় অচৈতন্য অবস্থায় আক্রমণ করলে হাম্বীর তাঁকে উদ্ধার করেন। সেই সূত্রেই তামাকের আগমন।

আর একটি কিংবদন্তী এইরূপ—বীরসিংহের লালজিউ বিগ্রহের পুরোহিত ভোগরাগ প্রস্তুতের সময় মধ্যে মধ্যে গোপনে তামাক খেতেন। ব্যাপারটি গোপন রইল না। ক্রুদ্ধ রাজা পুরোহিতকে ডাকালেন। ভয়ে জড়সড় ব্রাহ্মণ দোষ গোপন করে বললেন যে, তামাক তিনি খান না। খান লালজীউ স্বয়ং। রাজা কিন্তু তাঁর কথায় ভুললেন না, বললেন, সাত দিন পরে তাঁকে দেখাতে হবে যে, লালজী তামাক খান। উপায় নেই। অগত্যা ব্রাহ্মণ মন্দিরে হত্যা দিয়ে পড়লেন। সাত দিন পরে রাজা পাত্রমিত্র সমেত এলেন মন্দিরে। পুরোহিত তামাকসহ ভোগরাগ বেড়ে দরজা বন্ধ করে দিলেন। বাইরে সবাই রয়েছে। এমন সময় ভেতরে তামাক খাওয়ার শব্দ পাওয়া গেল। সবাই স্তম্ভিত। পরে মন্দির খোলা হল। ঘর সুগন্ধি তামাকের গন্ধে পূর্ণ। রাজা পুরোহিতের পদধূলি নিলেন। এর পর থেকে লালজীর ভোগে তামাক বরাদ্দ হল।

বীরসিংহের আমলে তৈরি নানা ধ্বংসাবশেষের মধ্যে তামাকের কলকেও নাকি পাওয়া গেছে।

বিষ্ণুপুরের গান ভারতবিখ্যাত। বিখ্যাত 'বিষ্ণুপুর ঘরায়ানা'। চতুর্দশ শতাব্দীতে রাজা পৃথ্বীমল্লর আমলে বিষ্ণুপুরে সংগীতের আদর শুরু হয়। তারপর থেকে সব রাজাই এই সংগীতের আনুকূল্য করেন। দিল্লীর ওস্তাদ বাহাদুর খাঁ আর পীর বক্স এখানে করেছেন সংগীতসাধনা। তারপরে এসেছেন অনেক গায়ক, যেমন—কৃষ্ণমোহন গোস্বামী, রামশংকর ভট্টাচার্য, ক্ষেত্রমোহন গোস্বামী, দীনবন্ধু গোস্বামী এবং বিখ্যাত যদু ভট্ট। ভারতীয় সংগীতে প্রথম স্বরলিপির আবিষ্কর্তা বলে অভিহিত হন ক্ষেত্রমোহন। তারপর আসেন অনন্তলাল বন্দ্যোপাধ্যায়, আর তাঁর প্রিয় শিষ্য রাধিকাপ্রসন্ন। অনন্তলালের ছিল তিন ছেলে, রামপ্রসন্ন, গোপেশ্বর, স্যার সুরেন্দ্রনাথ। গোপেশ্বরের পুত্র রমেশ্বর বিখ্যাত গায়ক। পরলোকগত জ্ঞান গোস্বামী এক সময়ে সর্বভারতীয় সংগীতজ্ঞদের সংগে পাঞ্জা কষে দিগবিজয় করেন। সুরেন্দ্রনাথ এখনও জীবিত। সত্যকিঙ্কর, অশেষ বন্দ্যোপাধ্যায় প্রভৃতি এখানকার সন্তান।

বিষ্ণুপুরের মতিচুরের সেই পুরোন ঐতিহ্যবাহী কারিগর আজও হয়তো কেউ কেউ আছে। তবে বাংলার মতিচুর বালা, মতিচুর চুড়ি সম্ভবতঃ বিষ্ণুপুরের মতিচুরেরই নাম বহন করছে। গহনার এ ডিজাইন আজও মহিলাদের প্রিয়।

পুরোন দিনের তসরের নামডাক আজও আছে। এখানকার তসর সিল্কের প্রসিদ্ধি ভারতময়। ঘরে ঘরে তাঁত চলেছে।

মহাকালের অমোঘ বিধানে বিষ্ণুপুরের সে গর্ব খর্ব হয়ে এল। সামন্ত রাজারা এক দিন পরিণত হলেন সামান্য জমিদারে। বৈষ্ণব ধর্ম নিয়ে রাজাদের গোঁড়ামি প্রবল হয়ে উঠল। গোপাল সিংহের সময় হরিনাম হলো অবশ্যকরণীয়, উদ্ভূত হল 'গোপাল সিংহের বেগার' কথাটি। বাগবাজারের মিত্তিরদের কাছে বাঁধা পড়ল মদনমোহন।

১৮০৬ সালে খাজনা খেলাপের দায়ে মল্লরাজের জমিদারী বিক্রী হয়ে যায়, বর্ধমান রাজ কিনে নেন সে জমিদারী।

নেতাজী প্রসঙ্গ (১)

নেতাজী সুভাষচন্দ্র বসুর জীবন ও কর্ম বিষয়ে ইতিমধ্যে প্রচুর গ্রন্থ প্রকাশিত হয়েছে। সেই সব গ্রন্থগুলি বিভিন্ন শ্রেণীতে ভাগ করা যায়, ভক্তিমূলক, উচ্ছ্বাস-মূলক, বিদ্বেষমূলক, উদ্দেশ্যমূলক এবং নিরপেক্ষ বিশ্লেষণমূলক। বলাবাহুল্য ব্যব-সায়িক মনোভাব নিয়ে আজাদ হিন্দ ফৌজের বিচারকালে বাজার যখন সরগরম ছিল তখন অনেকেই নেতাজীর নাম ভাঙিয়ে দু পয়সা রোজগারের চেষ্টা করেছেন। ইদানীং মাঝে মাঝে হিউ টৈ জাতীয় গোয়েন্দা লেখক রচিত নেতাজী চরিত দু একখানি প্রকাশিত হয়েছে। হিউ টয় রচিত "দি স্প্রিঙইং টাই-গার" গ্রন্থটি বাংলায় অনুবাদ করেছেন সুভাষ মুখোপাধ্যায়। এই গ্রন্থটিতে নেতা-জীর নিন্দা আছে প্রচুর কিন্তু সেই সব নিন্দার মধ্যেও নেতাজীর স্বদেশপ্রেম, অসমসাহসিক শৌর্য ও অমিতবীর্য মূর্তি প্রকাশিত হয়েছে। নেতাজীর ইমেজটুকু যদি এই সব নেতাজী সংক্রান্ত গ্রন্থে সামান্য-তমও পাওয়া যায় তাহলেও আমরা খুশি হই। নেতাজী সম্পর্কে গবেষণার কাল এখনও উত্তীর্ণ হয়নি। এবং এই আশা দুরাশা নয় যে, একদা কোনো যোগ্য গবেষক হয়ত নেতাজী সম্পর্কে বিশ্বাসযোগ্য ও প্রামাণ্য গ্রন্থ রচনা করবেন।

সম্প্রতি এম শিবরাম নামক জনৈক সাংবাদিক "দি রোড্ টু ডেল্লী" এই নামে নেতাজীর জাপান ও দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার নানাবিধ ক্রিয়াকলাপকে উপজীব্য করে গ্রন্থ রচনা করেছেন। এর আগে তিনি "দি ভিয়েতনাম ওয়ার : হোয়াই?" (১৯৬৬), এবং "দি নিউ সায়াম ইন মেকিং" (১৯৪৮) লিখেছেন। মধ্য প্রাচ্যের অনেক মুখ্য শহরে তিনি কাজ করেছেন। এবং সম্প্রতি নয়া-দিল্লীর "দি ইনটারন্যাশনাল প্রেস ইনস্টি-টিউট"-এর সঙ্গে তিনি সংশ্লিষ্ট।

এম শিবরাম কিন্তু একটু বিলম্বে তাঁর ডায়েরীর ধুলো ঝেড়ে অনেক "ঠান্ডা তথ্য এবং এযাবৎ অপ্রকাশিত তথ্য" সংযোগে নেতাজী সংক্রান্ত এই গ্রন্থটি নাকি রচনা করেছেন। গ্রন্থটি অতিশয় মূল্যবান কাগজে মুদ্রিত হয়েছে জাপানে।

এই গ্রন্থটির প্রথম ৬টি পরিচ্ছেদে আছে নেতাজী সুভাষচন্দ্রের তোকিও আগ-মনের পূর্বেকার ইতিহাস। এই ১১০ পৃষ্ঠায় স্বাভাবিক কারণেই বিপ্লবী নেতা রাসবিহারী বসুর প্রসঙ্গ আলোচিত হয়েছে। রাসবিহারী বয়সে প্রাচীন, তার ওপর ভারত-বর্ষ থেকে দীর্ঘদিন বাইরে থাকার ফলে স্বদেশের সঙ্গে যোগসূত্র হারিয়ে ফেলে-ছিলেন, কিন্তু বিপ্লবের আগুন ছিল তাঁর অন্তরে। তাই রাসবিহারী নেতৃত্বভার গ্রহণ করেছিলেন প্রবাসী ভারতীয়দের। কিন্তু রাসবিহারীর শরীর জীর্ণ এবং ভারতীয়-দের সংগঠিত করার কাজও ঠিকমত অগ্রসর হচ্ছিল না। এমন সময় জাপানীরা সংবাদ দিলেন যে, সাউথ-ইস্ট এশিয়ায় সুভাষচন্দ্রের আগমনের ব্যবস্থা প্রায় প্রস্তুত। এই পরি-স্থিতির ফলে রাসবিহারী ইস্ট-এশিয়ার ভারতীয়দের সম্মেলনের তারিখ পিছিয়ে দিলেন। শিবরাম লিখেছেন—

> "It was evident that Japan was getting ready with a big scheme for the Indian Campaign — a Campaign that required more forceful leadership that what Rash Behari was able to provide".

শিবরাম লিখছেন যে, ভারতীয় অভি-যান সংক্রান্ত পরিকল্পনার ব্যর্থতা সম্পর্কে সে সময় অতি অল্পলোকের মনে সংশয় ছিল। স্বয়ং লেখকের কি মনে হয়েছিল সে কথা অবশ্য স্পষ্ট করে বলা নেই।

সমগ্র জাপান যেদিন পার্ল হারবারের নায়ক এডমিরাল টোগোর মৃত্যুতে শোকে মুহ্যমান সেইদিন প্রত্যুষে সিঙ্গাপুর থেকে একটি সামরিক বিমান তোকিয়োর হানেদা বিমানবন্দরে নেতাজী সুভাষচন্দ্রকে নিয়ে অবতরণ করে। জাপানী সরকার ও ইম্পি-রিয়াল জেনারেল স্টাফ তাঁকে সম্বর্ধনা জ্ঞাপন করেন। পরদিন প্রভাতে জাপানের সমস্ত সংবাদপত্রে নেতাজীর আগমনবার্তা প্রকাশিত হয় এবং সেই সঙ্গে তাঁর ভারত-বর্ষ থেকে পলায়নের রোমাঞ্চকর কাহিনীও পরিবেশিত হয়। নেতাজীর আগমনে যে ভারতীয় অভিযান জোরদার হয়ে উঠবে এমন ইঙ্গিতও সেদিনের সংবাদপত্রে ছিল।

সুভাষচন্দ্র পক্ষকাল সেখানে ছিলেন এবং প্রতিদিন সংবাদপত্রের হেডলাইন তাঁকে নিয়েই রচিত। রেডিয়ো বক্তৃতা, প্রধানমন্ত্রী তোজোর সঙ্গে আলোচনা, পররাষ্ট্রমন্ত্রী সিগেমাৎসুর সঙ্গে সাক্ষাৎকার, প্রেস কন্ফারেন্স ইত্যাদি চলতে থাকে। এই গ্রন্থের লেখক লিখেছেন :

> "Now that the Japanese had brought to East Asia an Indian leader of the caliber ' Subhas they certainly meant business. And, if an Indian of Subhas Chandra Bose's record of dedicated patriotism and integrity could trust the Japanese, well, who were they to question Japan's sincerity?"

যাই হোক, এরই দুদিন পরে ১৬ই জুন ১৯৪৩ তারিখে জেনারেল তোজো "ইম্পিরিয়াল ডায়েটে" (রাজসভা) জাপানের ভারতবর্ষীয় নীতি ঘোষণা করলেন। দর্শকের আসনে ছিলেন সুভাষচন্দ্র। নেতাজী তাঁর প্রথমতম বেতারভাষণে তোজোর এই ভাষণ সম্পর্কে বলেন :—

> "An epoch making declaration that will live in history for all time".

এই বেতারভাষণে সুভাষচন্দ্র যুদ্ধ পরিস্থিতি এবং ভারতবর্ষ সম্পর্কে অক্ষ-শক্তির মনোভংগীর কথাও ঘোষণা করেন। সুভাষচন্দ্রের বিশ্বাস ছিল যে, অক্ষশক্তি যুদ্ধে বিজয়ী হবেনই। তাঁর স্বদেশবাসীদের উদ্দেশে তিনি বলেন যে, ইংরাজ আমাকে প্রলোভনে বশ করতে পারেনি, সুতরাং অন্য কোনো শক্তির পক্ষে অনুরূপভাবে আমাকে প্রলুব্ধ করা সম্ভব নয়।

সুভাষচন্দ্র আর একটি ভাষণে বললেন :

> "It was in accordance with the will of my countrymen that I left home and homeland and whatever I have done since then, was also in accordance with their will".

সুভাষচন্দ্র বললেন যে, ভারতের বাইরে যাঁরা আছেন তাঁরা যদি না সাহায্য করেন তাহলে ভারতবর্ষের স্বাধীন হওয়ার সম্ভা-বনা কম। সুভাষচন্দ্রের এই দীপ্ত ঘোষণা একটা প্রচণ্ড শিহরণ এনে দিল। তোকিয়োর ইম্পিরিয়াল হোটেলে হাজার হাজার টেলি-গ্রাম এসে পৌঁছাতে লাগল। কেউ জানিয়েছে অভ্যর্থনা, কেউ বা জানিয়েছেন অকুণ্ঠিত সমর্থন এবং সহায়তার প্রতিশ্রুতি। দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ায় নব জাগরণের সাড়া পড়ে গেল। সুভাষচন্দ্রকে সবাই ভারতের প্রাণ-পুরুষ হিসাবে গ্রহণ করলেন।

২রা জুলাই সুভাষচন্দ্র সিঙ্গাপুরে পৌঁছালেন তখন তাঁকে বিরাট সম্বর্ধনা জ্ঞাপন করলেন ভারতীয়রা। শিবরাম লিখে-ছেন বয়োবৃদ্ধ রাসবিহারী পিছিয়ে পড়-লেন। কথাটা সুপ্রযুক্ত মনে হয় না, কারণ রাসবিহারীর শরীর ভেঙে পড়েছিল, তা ছাড়া সুভাষচন্দ্রের আবির্ভাবে তিনি উপযুক্ত উত্তরাধিকারী লাভ করেছেন। তাই সিঙ্গাপুরের আকাশ বাতাস প্রকম্পিত করে ধ্বনিত হল—"সুভাষবাবু কি জয়।"

সুভাষচন্দ্রের দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার এই আবির্ভাবে সারা পৃথিবীতে একটি সাড়া জাগল। ভারতবর্ষে রাজনৈতিক অচল অবস্থা চলছিল। লর্ড লিনলিথগোর স্থলে ওয়া-ভেল তখন ভাইসরয় হয়েছেন। কিন্তু ভারতবর্ষের অচল রাজনৈতিক অবস্থা সত্ত্বেও ভারতভূমিতে অ্যাংলো-আমেরিকান সমরব্যবস্থা বিশেষ সাফল্যমণ্ডিত হয়েছিল। নয়াদিল্লী থেকে প্রচারিত ব্রিটিশ প্রচারযন্ত্র সুভাষচন্দ্র সম্পূর্ণ নীরব। তাই দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার ভারতীয়দের পক্ষে বোঝা

কঠিন হল যে সুভাষচন্দ্র সম্পর্কে ভারত-ভূমিতে কি ধরনের চাঞ্চল্য সৃষ্টি হয়েছে।

বিশ্বযুদ্ধ ঠিক সেইকালে এমন একটা অবস্থায় পেঁৗছেচে যে, বিজয়লক্ষ্মী যে, কার গলায় বরমাল্য দেবেন তা অনুমান করা কঠিন হয়ে উঠেছিল। সুভাষচন্দ্র অমিত-বিক্রমে স্বাধীনতাসংগ্রামে আত্মসমর্পণ করলেন। গড়ে উঠল "আজাদ হিন্দ ফৌজ", মুক্ত ভারতের নাম হল আজাদ হিন্দ্—আর, "জয় হিন্দ" ধ্বনি-দ্বারা অভিবাদন জ্ঞাপন করার প্রচলন হল ব্যাপক, আর সুভাষচন্দ্র হলেন "নেতাজী"।

এই সব প্রসঙ্গে অবশ্য আজ আর অজানা কিছু নেই, শিবরাম যদিও বলেছেন যে, অপ্রকাশিত তথ্য। সেই তথ্যাবলীর ভিত্তিতে রচিত নেতাজী প্রসঙ্গ আমাদের কাছে অমৃত সমান। তাই আগামী সংখ্যায় এই গ্রন্থে পরিবেশিত তথ্য বিষয়ে অবশিষ্ট আলোচনা প্রকাশিত হবে।

—অভয়ংকর

তারাশংকরের সম্বর্ধনা ॥

গত ১৬ই জুলাই কলকাতার তামিল লেখক সঙ্ঘের রবীন্দ্র-জয়ন্তী উৎসব উদ্‌যাপিত হয়। এই অনুষ্ঠানে 'জ্ঞানপীঠ' পুরস্কার বিজয়ী প্রখ্যাত সাহিত্যিক শ্রীতারাশংকর বন্দ্যোপাধ্যায়কে সম্বর্ধনা জানান হয়। অনুষ্ঠানে উদ্বোধন করেন পশ্চিমবঙ্গের রাজ্যপাল শ্রীধর্মবীর। তিনি তাঁর ভাষণে বলেন, "জাতীয় সংহতির দিক থেকে ভারতের ইতিহাসে এমন সংকটময় দিন এর আগে কখনও আসেনি। আজকের তরুণদের এই দায়িত্ব উপলব্ধি করতে হবে। সাহিত্যিকদের দায়িত্বও এদিক থেকে গুরুত্বপূর্ণ।" শ্রীধর্মবীর আরও বলেন যে, "যদিও ভারতবর্ষ বিভিন্ন ভাষা ও ধর্মের দ্বারা বিভক্ত, তবু এক জাতীয়তা বোধের দ্বারা আবদ্ধ। ভারতবর্ষের জাতীয় সংহতিকে দৃঢ় করতে হলে ভারতের বিভিন্ন ভাষায় রচিত সাহিত্যের স্বাদ গ্রহণ প্রয়োজন। অনুবাদের মাধ্যমেই তা সম্ভব।" রবীন্দ্রনাথের প্রতি শ্রদ্ধা নিবেদন করে তিনি বলেন যে, রবীন্দ্রনাথ কেবল কবিই ছিলেন না। তিনি ছিলেন জাতির নেতা। তিনি এই ভারতবর্ষের ঐতিহ্যকে বিশ্বসভায় উপস্থিত করেছেন। তাঁর বাংলা সাহিত্য সেবা প্রকৃতপক্ষে ভারতীয় সায়িত্যকে দিয়েছে প্রেরণা।

সভাপতির ভাষণে শ্রীতুষারকান্তি ঘোষ তামিল লেখক সঙ্ঘের বিশেষ প্রশংসা করেন এবং জানান যে, এই সঙ্ঘের সঙ্গে দীর্ঘদিন ধরে তিনি যুক্ত আছেন। এখানেই তিনি 'পদ্মভূষণ' পাবার পর সম্মানিত হয়েছিলেন। এখানেই প্রখ্যাত সাহিত্যিক শ্রীতারাশংকর বন্দ্যোপাধ্যায়ের সম্বর্ধনার ব্যবস্থা হওয়াতে তিনি বিশেষ আনন্দ প্রকাশ করেন। তিনি রবীন্দ্রনাথের প্রতিও শ্রদ্ধা নিবেদন করেন। তিনি বলেন, 'রবীন্দ্রনাথ তাঁর জন্মের দ্বারা সমগ্র পৃথিবীকেই সম্মানিত করেছেন।"

তামিল লেখক সঙ্ঘের সভাপতি শ্রীপি, এন, থঙ্গরাজন তাঁর ভাষণে বলেন যে, রবীন্দ্রনাথ ভারতীয়দের মাতৃভাষা সাধনায় সাহস সঞ্চার করেছেন। তিনি বর্তমান যুগকে রবীন্দ্র যুগ বলে আখ্যাত করেন এবং বলেন যে, "যদিও রবীন্দ্রনাথ বাংলা ভাষায় সাহিত্য রচনা করেছেন, তবু তিনি সারা ভারতের।" এই প্রসঙ্গে তিনি বাংলা সাহিত্যে তারাশংকরের অবদানের কথা উল্লেখ করেন।

সম্বর্ধনার উত্তরে শ্রীতারাশংকর বন্দ্যোপাধ্যায় বলেন, 'তাঁকে যে সম্মান এখানে প্রদর্শন করা হল, তা প্রকৃতপক্ষে বাংলা সাহিত্যকেই সম্মান প্রদর্শন।' রাজ্যপাল শ্রীবন্দ্যোপাধ্যায়কে মাল্যদান করেন। এই অনুষ্ঠান তামিল লেখক সঙ্ঘের পক্ষ থেকে মুখ্যমন্ত্রীর বন্যাত্রাণ তহবিলে তিনটি এক'শ টাকার চেক প্রদান করা হয়। সঙ্ঘের সম্পাদক কুমুস্বামী সমবেত সকলকে অভিনন্দন জানান।

পাকিস্থানে রবীন্দ্রসংগীত ॥

ঢাকা বেতার কেন্দ্রের কর্তৃপক্ষ, সম্প্রতি এই বলে সমস্ত শিল্পীদের সাবধান করে দিয়েছেন যে, যদি তাঁরা অবিলম্বে রবীন্দ্র-সংগীত বন্ধ করার জন্য সরকারী নির্দেশের সমর্থনে একটি বিজ্ঞপ্তিতে স্বাক্ষর দান না করেন, তাহলে বেতার কেন্দ্র থেকে তাঁদের সমস্ত অনুষ্ঠান বাতিল করে দেওয়া হবে।

পাকিস্থানের কেন্দ্রীয় প্রচারমন্ত্রী শ্রীখাজা শাহাবুদ্দিন ইতিপূর্বে এ বিষয়ে যে বিবৃতি দিয়েছিলেন, তা 'অমৃতে'র পৃষ্ঠায় প্রকাশিত হয়েছে। কিন্তু পাকিস্থানের শিল্পী, লেখক এবং সংস্কৃতিসেবীরা এই সিদ্ধান্তের তীব্র প্রতিবাদ করেন। সেই কারণেই কেন্দ্রীয় প্রচারমন্ত্রী সক্রিয়ভাবে রবীন্দ্র-সংগীত বন্ধ করবার কাজে নেমেছেন। তাঁর ধারণা, রবীন্দ্র-সংগীত বন্ধ করতে না পারলে হিন্দু সংস্কৃতির হাত থেকে মুসলমান সংস্কৃতিকে রক্ষা করা অসম্ভব।

এই নির্দেশ সত্ত্বেও কিন্তু পূর্ব বাংলার লেখক ও সংস্কৃতিজীবীরা প্রচারমন্ত্রীর সিদ্ধান্তের প্রতিবাদ করে চলেছেন। ঢাকায় প্রখ্যাত কবি জসিমউদ্দীনের বাড়িতে এই বিষয়ে একটি সভা অনুষ্ঠিত হয়। সভায় উপস্থিত ব্যক্তিরা সরকারের এই সিদ্ধান্তের তীব্র বিরোধিতা করেন। যাঁরা সরকারের এই সিদ্ধান্তের প্রতিবাদে ভাষণ দেন, তাঁদের মধ্যে ছিলেন, ডঃ কাজী মোতাহার হোসেন, বেগম সুফিয়া কামাল, ডঃ আনিসুজ্জমান, এবং পূর্ব বাংলার 'সাংবাদিক সঙ্ঘের' সম্পাদক শ্রী আলী আসরাফ।

অশীতিবর্ষে নরেন্দ্র দেবের সম্বর্ধনা

গত ১৬ জুলাই সর্বজনপ্রিয় সাহিত্যিক শ্রীনরেন্দ্র দেব অশীতি বর্ষে পদার্পণ করেন। এই উপলক্ষে বাংলার সাহিত্যিক ও বিভিন্ন সাহিত্য প্রতিষ্ঠানের পক্ষ থেকে তাঁর আদিম বাসস্থানে, কলকাতার ঠনঠনিয়ার 'নকটবর্তী' পৈত্রিক নিবাসে সম্বর্ধনা জানান হয়।

অনুষ্ঠানটি অনুষ্ঠিত হয় নিতান্ত ঘরোয়া পরিবেশে। পৌরোহিত্য করেন ডঃ সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়। তিনি তাঁর ভাষণে বলেন, 'মহান ব্যক্তিদের মহত্ত্বকে দীর্ঘ প্রশস্তির মাধ্যমে প্রকাশ না করে তাকে হৃদয়ের একান্ত অভিব্যক্তি ও শ্রদ্ধার সঙ্গে স্বল্প কথায় প্রকাশ করা উচিত। কেননা, এতে আরও গভীরভাবে তাঁর প্রতি শ্রদ্ধা ও সম্মান—দুই-ই প্রদর্শন করা হয় এবং তা দীর্ঘকাল স্থায়ীত্ব লাভ করে। স্বল্প প্রশস্তির এই রীতি ভারতের দাক্ষিণাত্য এবং পশ্চিমের অনেক দেশেই দেখা যায়। কবি নরেন্দ্র দেবের প্রতিও আমাদের শ্রদ্ধা নিবেদনের ভাষা স্বল্প কথায় দাক্ষিণাত্যের 'বেদপুরুষের' মতন হওয়া দরকার।'

সম্বর্ধনার উত্তরে শ্রীনরেন্দ্র দেব সকলকে আন্তরিক অভিনন্দন জানান। নিজের কথা বলতে গিয়ে তিনি বলেন—'সাহিত্যকর্মে আমি আর কতটুকু করেছি। কিন্তু সারা জীবন যে অগণিত ভালবাসা সাধারণ মানুষের কাছ থেকে পেয়েছি, তা তুলনারহিত।' তিনি আরও জানান যে, জীবনে তিনি অনেক মহাপুরুষের সান্নিধ্য লাভ করেছেন। তাঁদের স্মৃতি এখনও তাঁর মনে প্রেরণা জাগায়।' অনুষ্ঠানটিতে বহু বিশিষ্ট ব্যক্তির সমাগম ঘটে।

বাংলার লোকসাহিত্য বিষয়ে

সম্প্রতি রবীন্দ্রভারতী-ভবনে রবীন্দ্র-ভারতী সমিতি ও রাইটার্স গিল্ড-এর যুক্ত উদ্যোগে অনুষ্ঠিত একটি সভায় ডকটর আশুতোষ ভট্টাচার্য 'বাংলার লোক-সাহিত্য' সম্পর্কে একটি হৃদয়গ্রাহী ও তথ্যপূর্ণ আলোচনা করেন। তিনি বলেন, বাংলা দেশ ও তার আশপাশের অনেক অঞ্চলে বাংলা লোক-গাথা, রূপকথা প্রভৃতি যে কতরূপে ও কতভাবে ছড়িয়ে আছে, তার পরিমাপ করা যায় না। উড়িষ্যার বৈষ্ণব সম্প্রদায় যারা বাংলা ভাষা জানে না তারাও রাধাকৃষ্ণর গান বাংলা ভাষাতেই গেয়ে থাকে। বাংলার সাহিত্য সেই কোন্ প্রাচীন কাল থেকে লোকমুখে মুখে, যাত্রা ও পালা গানের মধ্য দিয়ে বংশ পরম্পরায় প্রচলিত হয়ে আসছে। গ্রাম বাংলার মানুষের মনের ওপর আজও সেই রামায়ণ মহাভারতের প্রভাব বিদ্যমান।

বিভিন্ন তথ্য উত্থাপন করে ডকটর ভট্টাচার্য দেখালেন যে, লোক-সঙ্গীত ও লোক-সাহিত্য চর্চা ও গবেষণা করতে গিয়ে তিনি

১৬ জুলাই কলকাতার বেদভবনে তামিল লেখক সংঘ আয়োজিত রবীন্দ্র-জয়ন্তী অনুষ্ঠান উপলক্ষে ভারতীয় জ্ঞানপীঠ পুরস্কার জয়ী শ্রীতারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়কে রাজ্যপাল শ্রীধরমবীর সম্বর্ধনা জানাচ্ছেন। অনুষ্ঠানের সভাপতি শ্রীতুষারকান্তি ঘোষকে পার্শ্বে উপবিষ্ট অবস্থায় দেখা যাচ্ছে।
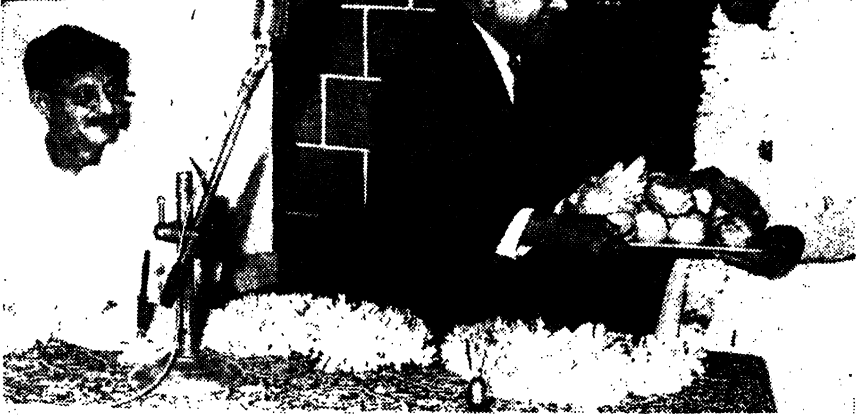
বরাবর এই সত্যে উপনীত হয়েছেন যে দেশ কাল জাতি ও পাত্রভেদে মানুষের সঙ্গে মানুষের বন্ধন অচ্ছেদ্য ও অভিন্ন। তাঁর অনুসন্ধান কাজে তিনি দেখেছেন যে ভৌগোলিক ও রাজনৈতিক সীমা রেখা এক দেশ থেকে অপর দেশকে, এক জাতি থেকে অপর জাতিকে যতই দূরে রাখুক, মনের দিক থেকে এবং সংস্কৃতির দিক থেকে তারা একই পরিবার ভুক্ত, গোষ্ঠীভুক্ত।

সময়োপযোগী সংকলন ॥

অ্যাগেন্স ফ্রাঁ প্রেসের আফ্রিকা বিশেষজ্ঞ ক্লড অথিয়ার সাহিত্য ও চিন্তার জগতে আফ্রিকার বৈশিষ্ট্য নিয়ে একটি তুলনামূলক আলোচনার অবতারণা করেছেন তাঁর 'দি লিটারেচার অ্যান্ড থট অব মডার্ণ আফ্রিকা' নামক বইটিতে। প্রায় ১৫০ জন লেখকের রচনার বৈশিষ্ট্য, চিন্তার মুক্তি ও কল্পনা-প্রতিভার আলোচনা প্রসঙ্গে যেমন আছে সমালোচনা তেমনি লেখকদের রচনার থেকে উদ্ধৃতিসহযোগে সেগুলিকে সমর্থন করেছেন ক্লড আথিয়ার। এ'রা প্রায় প্রত্যে-করেছেন ক্লড অথিয়ার। এ'রা প্রায় প্রত্যেসব দেশে অপরিচিত। আলোচ্য বইটি যে আফ্রিকার সাহিত্য ও সংস্কৃতির ক্ষেত্রে ত'র দান সম্পর্কে জানতে সহায়তা করবে তাতে কোন সন্দেহ নেই। প্রকাশ করেছেন 'পলমল' সংস্থা। দাম ৪৫ শিলিং।

পরলোকে প্রখ্যাত কবি কার্ল স্যান্ডবার্গ

২২শে জুলাই কবি কার্ল স্যান্ডবার্গ তাঁর বাসভবনে ৮৯ বছর বয়সে পরলোকগমন করেছেন।

জেমস জোন্সের নতুন উপন্যাস ॥

'ফ্রম হিয়ার টু ইটারনিটি' লিখে জেমস বিখ্যাত হয়েছিলেন কথাশিল্পী হিসাবে। তা ছিল যুদ্ধের কাহিনী। এরপর আর কয়েকটি বই লিখেছিলেন জোনস্—'দি পিস্তল,' 'দি থিন্ রেড লাইন,' 'সাম কেম রানিং' প্রভৃতি। অশেষ জনপ্রিয়তা লাভ করলেও পূর্বগৌরবকে এ বইগুলো ছুঁতে পারে নি। হালে বেরিয়েছে তাঁর নবতম উপন্যাস 'গো টু দি উইডো মেকার'। বইটি একদিকে যেমন এর জনপ্রিয়তা ও ব্যবসায়িক সাফল্য লাভ করেছে অন্যদিকে এই সাফল্যের আরো একটি অন্যতম কারণ আছে। তা হচ্ছে আলোচ্য উপন্যাসটিতে বিষয়ের বৈচিত্র্য, জোন্সের নিভৃত উপলব্ধিজাত মনোবিশ্লেষণভঙ্গী ও এক সম্পূর্ণ নতুন ও অভিনব জীবনদর্শন। যুদ্ধ নয়, একেবারে উপন্যাসের মৌল উপাদান মানুষের অন্তর্নিহিত যৌনজীবন ও বিকৃত ক্ষুধা। আর ঠিক একারণেই এ বইটিকে ঘিরে জনসাধারণে অশেষ উত্তাপসৃষ্টি।

'গো টু দি উইডো মেকার'-এর লক্ষণীয় বৈশিষ্ট্য চরিত্রসৃষ্টি। ত'র নিভৃত উপলব্ধি হচ্ছে : অত্যন্ত সুস্বাস্থ্যের অধিকারী শেষ পর্যন্ত একাধিক রমণীর সঙ্গে যৌনতায় লিপ্ত না হয়ে পারে না। ...যেন জোনস নিজেই আলোচ্য উপন্যাসের নায়ক রন গ্রান্টের ভূমিকায় অবতীর্ণ হয়ে চারশো পুরুষের প্রেমিকা নায়িকা লাকি ভিডেল্দির সাহচর্য লাভে বাধ্য হয়েছেন।'...বলেন একজন প্রখ্যাত সমালোচক। লাকির আকর্ষণ ছিল প্রধানত নাট্যকার, ঔপন্যাসিক প্রভৃতি লেখকসম্প্রদায়কে ঘিরে—উপন্যাসটিতে এই প্রবণতা এক অদ্ভুত দর্শনের আকার নিয়েছে। আরেকটি উল্লেখযোগ্য ব্যাপার হোল নায়িকার লেখকসম্প্রদায়ের প্রতি দুর্নিবার আকর্ষণকে স্থায়ী উদাহরণ হিসাবে দেখানোর জন্যে জেমস জোনস্ (সম্ভবত সচেতনভাবেই) উপন্যাসটির বিভিন্ন চরিত্রের ইওরোপ আমেরিকার কয়েকজন বিখ্যাত লেখকের সঙ্গে মিল রেখেছেন। নর্মান মেইলার, টম্ শ্যামেলস-এর ব্যক্তিগত জীবনের হুবহু পরিচয় পাওয়া যায় উপন্যাসটির দুটি চরিত্রে। হলিউড চিত্রনাট্যকারের চরিত্রটিতে নাট্যকার ক্লিফোর্ড ওডেটসকে সহজেই খুঁজে পাওয়া যায়। বলা বাহুল্য, রন গ্রান্ট জেমস স্বয়ং জেমস জোনস্—উপন্যাসে যার পরিচয় একজন নাট্যকার হিসাবে এবং যে অমিতবীর্যের অধিকারী পুরুষ।

জন হেইনেজ-এর কবিতা গ্রন্থ ॥

জন হেইনেজ ওয়েসলিয়ান সিরিজের একজন নতুন কবি। এ'দের উদ্যোগে সম্প্রতি হেইনেজের একটি কবিতাগ্রন্থ বেরিয়েছে। নাম—'উইন্টার নিউজ'। এটি তাঁর প্রথম কবিতার বই। হালের আমেরিকায় কবিতা চর্চা যে আবর্তে বয়ে চলেছে জন হেইনেজ তাঁর ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতায় তাঁর এক বিপরীত মেরুতে অবস্থান করছেন। বলা চলে তাঁর কবিতাগুলোর স্বাদ একটু নতুনধরণের। হেইনেজের কবিতার সঙ্গে তাঁর ব্যক্তিগত

জীবন ও পরিবেশের অপরিসীম প্রভাব। থাকেন সীমানার কাছাকাছি—আলাস্কা অঞ্চলে। চাষ-আবাদ করে, শিকার করে, মাছ ধরে, দুরন্ত শীতকে অগ্রাহ্য করে এক আশ্চর্য বিজনভূমিতে আছেন তিনি। জেমস্ টিউলিপ এ'র কবিতা সম্পর্কে বলেছেন, 'হেইনেজ-এর কবিতা পড়াটাই একটা অভিজ্ঞতা।'

হেইনেজ-এর কবিতা কখনই কবিতার প্রকাশকে খুশী করতে পারবে না। তার অন্যতম কারণ—তাঁর কবিতার গুণগত পার্থক্য। অত্যন্ত সরল ও নিরাভরণ ভঙ্গীতে কবিতাগুলি লিখিত। ছন্দ এবং যুক্তির প্রতিও তাঁর অবহেলা। স্বভাবত, এক ধরণের দুঃখবাদ তাঁর কবিতায় পরিমণ্ডল রচনা করে। তাঁর কবিতা ও মনোরাজ্যের একমাত্র স্বপ্নময় পৃথিবী 'আলাস্কা'।

'দি তুন্দ্রা' কবিতাটির মধ্যে আলাস্কার রহস্যময়তা ফুটে উঠেছে। হেইনেজ-এর কবিতাগুলি অনেকটাই রবার্ট ফ্রস্ট ধরণের। মোটকথা, হেইনেজ যে একজন প্রতিশ্রুতিবান তরুণ কবি তা সকলেই স্বীকার করবে।

দেব-দেবীর তত্ত্ব-বৈচিত্র্য ও দেবতার বাহন-রহস্য

ভারতের অধ্যাত্ম সাধনার ক্রম-বিকাশের বিচিত্র ধারার ভেতরে যাঁরা ঐক্যসূত্রটি আবিষ্কার করতে পারেন, তাঁরাই ভারতবর্ষকে যথার্থরূপে জানেন। যাঁরা মনে করেন, উপনিষদের ঋষিগণের সাধনাই একমাত্র সত্যের সাধনা, তাঁরা ভ্রান্ত বা একদেশদর্শী। বাস্তবিক পক্ষে, তথাকথিত বৈদিক বা বেদান্তপ্রতিপাদ্য ধর্ম, স্মৃতিনির্দিষ্ট ধর্ম, পৌরাণিক ধর্ম ও তান্ত্রিক ধর্মে কোনো অত্যন্তবিরোধ নেই। বহু বৈদিক দেবতা ক্রমবিকাশের ধারায় পৌরাণিক দেবতায় রূপান্তরিত হয়েছেন। আবার, অনেক লৌকিক দেবতাও কালক্রমে বিভিন্ন পুরাণে স্বীকৃতি লাভ করেছেন। ভারতের ঋষিগণ এই সত্য উপলব্ধি করেছিলেন যে, মানুষ নির্গুণ ব্রহ্মের উপাসনা করতে পারে না, তার উপাস্য হচ্ছেন সগুণ ব্রহ্ম বা ঈশ্বর। পাশ্চাত্ত্যের অনেক দার্শনিক পণ্ডিতও ব্রহ্ম ও ঈশ্বরের মধ্যে ভাগবত পার্থক্য স্বীকার করেছেন। তাঁদের মতে ব্রহ্ম হচ্ছেন The Absolute of Philosophy আর ঈশ্বর হচ্ছেন The God of Religion. এই ঈশ্বর অশেষ কল্যাণগুণের আকর, তিনি করুণাসিন্ধু আবার পাপীর দণ্ড-দাতা। পাশ্চাত্ত্য দার্শনিকের মতে He is infinite in the infinity of His Infinite attributes. সেমেটিক ধর্মসমূহে এক, অদ্বিতীয়, নিরাকার, সগুণ ব্রহ্মের উপাসনায় ও অকুণ্ঠচিত্তে তাঁর নির্দেশ পালনের বিধি রয়েছে।

ভারতের ঋষিগণ বলেছেন, ব্রহ্ম এক ও অদ্বিতীয় কিন্তু পণ্ডিতেরা বহু প্রকারে তাঁকে বর্ণনা করেছেন। কেউ তাঁকে বলেছেন অগ্নি, কেউ তাঁকে বলেন যম, কেউ তাঁকে বলেন মাতরিশ্বা। অর্থাৎ বিভিন্ন দেবতা বা দ্যোতমান পদার্থ এক ব্রহ্মসত্তারই বিচিত্র প্রকাশ। সুতরাং ভারতের মনীষী-দের দৃষ্টিতে একেশ্বরবাদ ও বহুদেববাদের মধ্যে কোনো বিরোধ নেই। ভট্ট মোক্ষ-মূলের ভারতীয় একেশ্বরবাদের এই বৈশিষ্ট্য-টুকু লক্ষ্য করেছেন। এই বিশিষ্ট একেশ্বরবাদকে তিনি বলেছেন Henotheism.

তন্ত্রশাস্ত্রের একটি প্রসিদ্ধ শ্লোকে বলা হয়েছে, যিনি চিন্ময় ও অদ্বিতীয়, যিনি নিষ্কল ও অশরীরী, সেই ব্রহ্মই সাধকের হিতের জন্যে বিবিধ রূপ পরিগ্রহ করেন। (শ্লোকটির প্রচলিত অর্থ গ্রহণ করলেও অন্তর্নিহিত ভাবের বিশেষ পরিবর্তন হয় না)। বিভিন্ন পুরাণে নানা দেবদেবীর সম্পর্কে যে সমস্ত আখ্যায়িকা বর্ণিত হয়েছে, তা যেমন কৌতূহলোদ্দীপক, তেমনি তাৎপর্যপূর্ণ। আমাদের পুরাণকারেরা আষাঢ়ে গল্প রচনা করেননি আখ্যায়িকার ভেতর দিয়েই তাঁরা আমাদের গভীর তত্ত্বের উপদেশ দিয়েছেন। বিভিন্ন দেব-দেবীর মূর্তিকল্পনা ও তাঁদের বাহনের পরিকল্পনার ভেতরেও পুরাণকারগণের গভীর অন্ত-দৃষ্টির পরিচয় পাওয়া যায়। তাঁরা ছিলেন যথার্থ কবি বা ক্রান্তদর্শী, তাঁরা ছিলেন উদারধী ও লোককল্যাণব্রতে দীক্ষিত। মনস্বী বিপিনচন্দ্র পাল বলেছেন, হিন্দুরা পৌত্তলিক নন, তাঁরা যে মূর্তির উপাসনা করেন, তা ব্রহ্মের বিচিত্র ভাব বা গুণেরই দ্যোতক; idolatry নয়, উহাকে বরং idea-latry বলা যায়। পাশ্চাত্ত্যের অন্যতম মনস্বী জেকব তাঁর Western Psychotherapy and Hindu Sadhana গ্রন্থে যথার্থই বলেছেন—

> Polytheism .... in practice the religion of many Europeans exists in India only on the surface, for the Gods are not meant to be idols or stocks and stones, but symbols of the one (Pratima, Pratika) which, being beyond thought, 'requires in ordinary worship first a fixation of mind'.

হিন্দুধর্মের ক্রম-বিকাশের ধারা অনু-সরণ করতে হলে বৈদিক, পৌরাণিক ও লৌকিক দেব-দেবীর মূর্তিকল্পনা ও তাঁদের বিচিত্র বাহনের অন্তর্নিহিত তত্ত্ব অবগত হতে হয়। কিন্তু এ সম্পর্কে এ যাবৎ বাংলা ভাষায় কোনো প্রামাণ্য গ্রন্থই রচিত হয়নি। এদিক দিয়ে 'দেব-দেবী ও তাঁদের বাহন' গ্রন্থের রচয়িতা স্বামী নির্মলানন্দকে পথিকৃৎ বলা যায়। অবশ্য, এবিষয়ে যে দু'একটি বিক্ষিপ্ত প্রবন্ধ চোখে পড়েছে (যেমন চন্দ্র-নাথ বসুর "সাবিত্রীতত্ত্বে যম" সম্পর্কিত আলোচনা বা তাঁর রচিত "সিদ্ধিদাতা গণেশ" নামক প্রবন্ধ বা অতুলচন্দ্র গুপ্তের "গণেশ" শীর্ষক প্রবন্ধ), তাকে কিছুতেই বিশদ আলোচনা বলা চলে না। যতদূর মনে পড়ে অধুনালুপ্ত "বান্ধব" এবং "চিকিৎসা-বিজ্ঞান ও সমীরণ" পত্রিকার পৃষ্ঠায় এ সম্পর্কে দু' একটি রচনা স্থানলাভ করেছিল।

"দেবদেবী ও তাঁদের বাহন" গ্রন্থের প্রথম অধ্যায়ে "দেবদেবীর তত্ত্ব-বৈচিত্র্য" ও দ্বিতীয় অধ্যায়ে "দেবপূজার সাধারণ রূপ ও বিধি" আলোচিত হয়েছে। কারণ, এই দুটি বিষয়ের সম্পর্কে সুস্পষ্ট ধারণা না থাকলে আমাদের ব্যক্তিগত, জাতীয় ও অধ্যাত্ম জীবনে দেবপূজার সার্থকতা হৃদয়ংগম করা যায় না। দ্বিতীয় অধ্যায়ে গ্রন্থকার "দেবো ভূত্বা দেবং যজেৎ" (স্বয়ং দেবতা হয়ে দেবতার আরাধনা করবে) এই বচনের সার্থকতা প্রতিপন্ন করেছেন। তারপর তিনি যে সকল বৈদিক বা পৌরাণিক দেবতার রূপকল্পনা ও বাহনের সার্থকতা সম্পর্কে পাণ্ডিত্যপূর্ণ আলোচনা করেছেন, তাঁরা হচ্ছেন যথাক্রমে—সরস্বতী, ব্রহ্মা, বিশ্বকর্মা, বিষ্ণু, অগ্নি, সূর্য, ইন্দ্র, যম, লক্ষ্মী, শীতলা, মনসা, শিব, দুর্গা, গণেশ, কার্তিকেয়, ষষ্ঠী, গঙ্গা, গন্ধেশ্বরী, জগদ্ধাত্রী, শনি এবং বায়ু, পবন ও মরুদ্-গণ। শ্রদ্ধেয় গ্রন্থকার নানা উদ্ধৃতির সাহায্যে এই কথাটি প্রতিপন্ন করেছেন যে, এই সকল দেব-দেবীর উপাসনার যথার্থ তাৎপর্য হৃদয়ঙ্গম করলে আমরা ব্যক্তিগত ও সামাজিক জীবনে কল্যাণ লাভ করতে পারি। এ কথাটিও আমাদের স্মরণ রাখা প্রয়োজন যে, আর্য ঋষিগণ ইহকাল-বিমুখ ছিলেন না, তাঁরা ঐহিক ও পারত্রিক কল্যাণের ভেতর কোনো সীমারেখা অঙ্কিত করেননি। মহর্ষি কণাদ ধর্মের সংজ্ঞা দিয়েছেন—যার দ্বারা মানুষ অভ্যুদয় বা পার্থিব সম্পদ ও নিঃশ্রেয়স বা পরম মঙ্গল লাভ করে, তাই হচ্ছে ধর্ম। বাস্তবিক, দেব-দেবীর উপাসনার মধ্য দিয়ে আমরা যুগপৎ ঐহিক ও পারত্রিক মঙ্গল লাভ করতে পারি, দেবতার স্মরণ-মনন-চিন্তনের মধ্য দিয়েই আমরা দেবতা হয়ে উঠতে পারি। কিন্তু আজ আমরা প্রায় প্রত্যেকেই শ্রদ্ধাহীন,

আত্মপ্রত্যয়হীন; সুতরাং যিনি আমাদের মধ্যে শ্রদ্ধা-বোধ ও আত্মপ্রত্যয় জাগ্রত করে আমাদের বীর্যবান ও শক্তিশালী করে তুলতে চান, তিনি আমাদের হিতাকাঙ্ক্ষী। এই উদ্দেশ্যে প্রণোদিত হয়েই স্বামী নির্মলানন্দজী "দেবদেবী ও তাঁদের বাহন" গ্রন্থখানি রচনা করেছেন। বিদগ্ধ লেখক যেমন শাস্ত্রের আশ্রয় গ্রহণ করেছেন, তেমনি স্বাধীন ও বলিষ্ঠ যুক্তিরও অবতারণা করেছেন। দেবতার মূর্তির পরিকল্পনার সঙ্গে যে তাঁর বাহনের সম্পূর্ণ সঙ্গতি আছে, এটাই হচ্ছে প্রত্যেকটি নিবন্ধে লেখকের প্রতিপাদ্য।

ঐতিহাসিকমাত্রই বোধ হয় এ কথা স্বীকার করবেন যে, ভারতবাসীর দুর্গতি ও পরাধীনতায় একটি প্রধান কারণ—সংহতির অভাব। এই সংহতির অভাবের মূলে অবশ্য বহু কারণ রয়েছে। তথাপি, একথাও বলা চলে যে, যেদিন থেকে আমরা আমাদের ধর্মের যথার্থ তাৎপর্য বিস্মৃত হয়েছি, যেদিন থেকে আমাদের ধর্ম শুধু আচার-অনুষ্ঠানে পর্যবসিত হয়েছে, সেদিন থেকে আমরা স্বদেশ ও স্বজাতির স্বার্থকে বিস্মৃত হয়ে পরস্পর দ্বন্দ্ব ও কলহে প্রবৃত্ত হয়েছি। আমরা আজও পূজা-পার্বণ উপলক্ষে উৎসবানন্দে মত্ত হই, কিন্তু আমাদের সর্বপ্রধান উৎসবে যে সংহতি-সাধনা ও শক্তিশালী জাতি গঠনের ইঙ্গিত রয়েছে, সে কথা গভীরভাবে চিন্তা করি না। আবার দেবসেনাপতি কার্তিকেয়ের উপাসনা আমাদের সুপ্ত বীর্যকে জাগিয়ে তোলে না,—তাঁর যে মূর্তি আমাদের মৃৎ-শিল্পীরা গড়ে তোলেন, তা কমনীয়কান্তি বিলাসী যুবকের মূর্তি, অথচ কার্তিক হচ্ছেন ক্ষাত্রবীর্যের প্রতীক, স্বাধীনতা-সাধনার মূর্ত বিগ্রহ, অত্যাচারী তারকাসুরের বিনাশের জন্যেই তিনি ধরাধামে আবির্ভূত হয়েছেন। গ্রন্থকার দেখিয়েছেন, দেবদেবীর উপাসনার ভেতর দিয়ে আমরা কেমন করে ব্যক্তিগত জীবনে অভ্যুদয় ও নিঃশ্রেয়স লাভ করতে পারি এবং জাতীয় জীবনে সংহত ও ঐক্যবদ্ধ হতে পারি। আমরা জীবনে চাই অন্তর্নিহিত শক্তির উদ্বোধন,—চাই সম্পদ, চাই পরা ও অপরা বিদ্যা,—চাই দৈহিক ও মানসিক বল, চাই সকল কার্যে সিদ্ধি। দেবদেবীর আরাধনার ভেতর দিয়েই আবার আমরা জাতি হিসাবে বীর্যবান ও শক্তিমান হয়ে উঠতে পারি, জীবনে যা কিছু প্রার্থনীয়, সকলই লাভ করতে পারি। আমাদের মনে রাখতে হবে,—জাতিকে শক্তিমান, ঐক্যবদ্ধ ও সুসংহত করে তোলার জন্যেই একদিন মনস্বিনী মহিলা সরলা দেবী বাংলাদেশে বীরাষ্টমী উপলক্ষে লাঠি ও ছোরা খেলার প্রবর্তন করেছিলেন এবং লোকমান্য বালগঙ্গাধর তিলক সারা ভারতে গণপতি উৎসবের প্রবর্তন করেছিলেন। স্বামী নির্মলানন্দজীও জাতিকে সংহত ও আত্ম-সম্বুদ্ধ করার মহান উদ্দেশ্য নিয়েই "দেবদেবী ও তাঁদের বাহন" গ্রন্থখানি রচনা করেছেন।

অবশ্য, ভারতের বাইরে, প্রাচীন গ্রীসদেশে এবং প্রাচ্যভূমির নানা অঞ্চলে যে সব বিচিত্র মূর্তির উপাসনা প্রচলিত হয়েছিল, গ্রন্থকার কোথাও তার কোনো উল্লেখ করেন নি। আশা করি পরবর্তী সংস্করণে লেখক ভারতীয় দেবদেবীর মূর্তির সঙ্গে ভারত-বহির্ভূত দেশসমূহের এই সকল মূর্তির বাহ্য সাদৃশ্য ও ভাবদৃষ্টিগত পার্থক্য সম্পর্কে আলোচনা করবেন। এতে ভারতীয় দেবদেবীর মহিমাই আমাদের চোখে অধিকতর দীপ্যমান হয়ে উঠবে।

স্বামী নির্মলানন্দজী নানা শাস্ত্রে পারঙ্গম, কিন্তু তাঁর ভাষা সরল ও প্রাঞ্জল। মাঝে মাঝে চলতি বুলির ব্যবহার করাতে তাঁর বক্তব্য অধিকতর হৃদয়গ্রাহী হয়েছে। আশা করি, তাঁর গ্রন্থখানি বাঙালী পাঠকের কাছে উপযুক্ত সমাদর লাভ করবে।

ত্রিপুরাশঙ্কর সেন

দেবদেবী ও তাঁদের বাহন : (আলোচনা) : **স্বামী নির্মলানন্দ ; ভারত সেবাশ্রম সঙ্ঘ ও শ্রীশ্রীপ্রণবমঠ : ২১১, রাসবিহারী এভিনিউ, কলিকাতা-১৯।**

সংকলন ও পত্র-পত্রিকা

'কণিকা'র দ্বিতীয় বার্ষিক সংখ্যাটি প্রখ্যাত ও নতুন লেখকদের রচনায় সমৃদ্ধ। এই সংখ্যার লেখকসূচীর মধ্যে আছেন ডাঃ নন্দলাল পাল, পাঁচুগোপাল বন্দ্যোপাধ্যায়, মানস দেববর্মণ, গীতা মিত্র, ধীরেন্দ্রনাথ চক্রবর্তী, শক্তি চট্টোপাধ্যায়, সুশান্ত অধিকারী এবং আরো অনেকে। গল্প, কবিতা, প্রবন্ধ ও নাটকে বর্তমান সংখ্যাটি বেশ আকর্ষণীয় হয়েছে।

কণিকা : ধীরেন্দ্রনাথ চক্রবর্তী ও বাদল পোদ্দার সম্পাদিত এবং বিবেকানন্দ ক্লাব, ভদ্রকালী, কোতরং থেকে প্রকাশিত।

●

সপ্তম বর্ষের প্রথম সংখ্যায় 'চতুষ্কোণ' নিজস্ব বৈশিষ্ট্য বজায় রেখেছে। মূল্যবান আলোচনা, গল্প ও কবিতায় সংখ্যাটি বিশেষ আকর্ষণীয় হয়েছে। প্রবন্ধ লিখেছেন সুধাংকর চট্টোপাধ্যায়, সুধীর করণ, শিশিরকুমার ঘোষ, স্বামী শংকরানন্দ, মনোরঞ্জন রায়, নেপাল মজুমদার এবং অন্যান্য। দুটি গল্প লিখেছেন মৃণাল চৌধুরী এবং দেবদত্ত রায়, কবিতা লিখেছেন মণীন্দ্র রায়, গণেশ বসু, অমিতাভ চট্টোপাধ্যায়, শ্যামসুন্দর দে, মুকুল গুহ ও মৃণাল করগুপ্ত। এ ছাড়া মূল্যবান গ্রন্থ আলোচনা এবং প্রাসঙ্গিক আলোচনা। মূল্যবান রচনাসম্ভার ছাড়াও বর্তমান সম্পাদনায় যথেষ্ট মুন্সিয়ানার পরিচয় রয়েছে।

চতুষ্কোণ—শিবপ্রসাদ চক্রবর্তী প্রমুখ সম্পাদিত। ৭৭।১, মহাত্মা গান্ধী রোড, কলকাতা—৯ থেকে প্রকাশিত। দাম—এক টাকা।

●

অশোকগড় আদর্শ বিদ্যালয়ের পত্রিকা 'নতুন পাতা' ছাত্রছাত্রীদের লেখায় সমৃদ্ধ। আলোচনা, গল্প এবং কবিতা পাঁচকাটি ঠাসা। লেখার মান প্রশংসনীয়। অনেকেরই ভবিষ্যৎ সম্ভাবনা রয়েছে। রুণু বসু, শিপ্রা মুখোপাধ্যায়, বিজন সেনগুপ্ত, তরুণ বসু ও অন্যান্য লেখায় বেশ নৈপুণ্য দেখিয়েছেন।

নতুন পাতা—রমাপ্রসাদ দত্ত সম্পাদিত ও অশোকগড় আদর্শ বিদ্যালয়, কলকাতা—৩৫ থেকে শৈলেন দে কর্তৃক প্রকাশিত।

●

'দীপায়ন' ত্রৈমাসিক শিশু-সাহিত্য পত্রিকা। এটি দ্বিতীয় সংকলন। বিভিন্ন বিষয়ে লিখেছেন—স্বপনবুড়ো, বুদ্ধদেব ভট্টাচার্য, রমাপ্রসাদ দত্ত, কমল ভট্টাচার্য, নন্দগোপাল সেনগুপ্ত, বিজন সেনগুপ্ত, শম্ভুনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, বিশ্বদেব চৌধুরী এবং অন্যান্য।

পত্রিকাটির পরিকল্পনা ও সম্পাদনা প্রশংসনীয়।

দীপায়ন : রমাপ্রসাদ দত্ত সম্পাদিত ও ৬, মাতৃমন্দির লেন, কলকাতা—৩৫ থেকে প্রকাশিত। দাম—৩০ পয়সা।

●

প্রিন্টিং টেকনোলজী সংক্রান্ত কোন নিয়মিত পত্রিকা আমাদের দেশে আছে বলে জানা নেই। 'মুদ্রাঙ্কন'-এর প্রকাশ তাই সম্প্রতিকালেই অভিনন্দনযোগ্য। প্রথম সংখ্যায় আছে মুদ্রণশিল্প সম্বন্ধে কয়েকটি মূল্যবান আলোচনা। মুদ্রণশিল্পে প্রীতি, মুদ্রণশিল্পে মূল্য নিরূপণ অথবা কস্টিং, এবং গুটেনবার্গ সম্পর্কে আলোচনা করেছেন যথাক্রমে জোৎস্নারঞ্জন কর, দীপঙ্কর সেন, দেবীপ্রসাদ গঙ্গোপাধ্যায়। এ ছাড়া নিয়মিত বিভাগ 'মুদ্রণশিল্পে বিজ্ঞানের প্রয়োগ' নিঃসন্দেহে আকর্ষণীয়।

মুদ্রাঙ্কন বাংলা দেশে এক বলিষ্ঠ প্রচেষ্টা।

মুদ্রাঙ্কন : শ্রীদেবীপ্রসাদ গঙ্গোপাধ্যায় সম্পাদিত। ৬৭, গাঙ্গুলীবাগান লেন, পোঃ রিষড়া। দাম—এক টাকা।

সড়ক সৌধ কানাগলি

আলোকচিত্র : শ্রীহরি গঙ্গোপাধ্যায়

কলকাতার নানা জিনিসের ক্রয়মূল্য যে হারে বেড়েছে বা বাড়ছে, আশ্চর্যের কথা, বাড়ি ভাড়া সে হারে মোটেই বাড়ে নি। গত বছর পাঁচ-সাত ধরে মোটামুটি স্থিতাবস্থায় আছে। অনেকেই আমাদের এ মন্তব্যে সায় দিতে পারবেন না; কিন্তু, একটু খতিয়ে দেখলে তাঁরা আমার মন্তব্য যে কোন হঠকারী উক্তি নয়, সে সম্বন্ধে নিশ্চিত হতে পারবেন। আমি অতি-আধুনিক মোজেইক-ফ্লোর, ফ্রন্ট-ব্যাক-ইয়ার্ড-অলা বাড়ির কথা লিখতে বসি নি। সাধারণ গৃহস্থ বাড়ির কথাই বলছি। সেক্ষেত্রে খুব পুঙ্খানুপুঙ্খ বিচার করে দেখা গেছে, যে কোন কারণেই হোক, বাড়ির ভাড়া মোটামুটি একই রয়ে যাচ্ছে গত কয়েক বছর ধরে। আশার কথা, সন্দেহ নেই! কিন্তু এই পরমাশ্চর্য ব্যাপারটি ঘটছে কিভাবে একবার পর্যালোচনা করার প্রয়াস পাওয়া যাক।

প্রথম কারণ হিসেবে সরকারি ও ইমপ্রুভমেন্ট ট্রাস্ট-এর হাউজিং স্কীমের কথা এসে পড়ে। সাধ্য-সম্মত ভাড়ায় ভদ্র বসবাসের উপযোগী এ ধরনের বাড়ির সংখ্যা কলকাতার তুলনায় অকিঞ্চিৎকর হলেও কম নয়। দিনের পর দিন বছরের পর বছর এই ধরনের সর্বজনীন বাসগৃহ কলকাতার সব অঞ্চলেই তৈয়ার করার পরিকল্পনা আছে। এর ফলে এক দিকে যেমন বস্তি-বাসের উচ্ছেদ হচ্ছে; অন্যদিকে তেমনি মধ্যবিত্ত বাসের অনুপযুক্ত প্রায়ান্ধকার প্রকোষ্ঠ ছেড়ে লোকে নতুন স্বাস্থ্যপ্রদ জায়গায় উঠে আসতে পারছে। ভাড়াও সচরাচরের তুলনায় যথেষ্ট স্বল্প। খুব একটা বড় পরিবার না হলে, যা সম্প্রতি কালে প্রায় নেই বললেও চলে, অসুবিধা হবার কথা নয়। তাছাড়া ভাড়া অল্প হওয়ার দরুণ এবং সেলামি, দালালি প্রভৃতি পয়ঃনালী না থাকার জন্যেই মধ্যবিত্তের পকেটে বিশেষ টান পড়ে না। নাজেহাল হতে হয় না তাকে। আমরা সরকারি ও ট্রাস্ট উদ্যমকে স্বাগত জানাই। বাড়িঅলা নামক সম্প্রদায়ের হাত থেকে সাধারণ ভাড়াটিয়ারা বেঁচে গিয়ে আজ স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলছেন। ভবিষ্যতে কলকাতার গায়ে যদি এভাবে, এই অনুপাতে বদলের হাওয়া লাগে—তাহলে সুখের কথা সন্দেহ নেই। তাহলে কলকাতা হয়তো কলকাতাতেই রয়ে যাবে।

আরেক ধরনের লোক আছেন, যাঁরা এই সব বাড়ির ব্যারাক-লাইফ আদর্শেই পছন্দ করেন না। তাঁদের একাংশ কলকাতা ছেড়ে শহরতলীর দিকে ঝুঁকেছেন। বিশেষ করে, ইলেকট্রিক ট্রেন চালু হবার পর থেকে, কম সময়ের যাতায়াতের মধ্যে, কোন আধা-শহর আধা গ্রামাঞ্চলে তাঁরা বাড়ি খুঁজতে বেরিয়ে পড়েছেন। আনন্দের কথা নিঃসন্দেহ। ইলেকট্রিক ট্রেনের কল্যাণে আজ আপনার তিরিশ-বত্রিশ মাইল পথ এক ঘন্টার আওতায় এসে পড়েছে। সুতরাং যেতে বাধা কি? দমদম থেকে ডালহৌসী পেঁছুতে আপনার কি এর চেয়ে কিছু কম সময় লাগে? কিম্বা পাতিপুকুর, পাইকপাড়া বা টালিগঞ্জ-চেতলা থেকে? তাছাড়া, হিসেব করে দেখুন একবার, বাস ভাড়া আর ট্রেনের মান্থলির ফারাক কতো? ভিড়ের বাসে আপনি পাদানিতে পা রাখবার জন্যে সূচাগ্র ভূমি পাবেন কিনা সন্দেহ। সুতরাং, কলকাতা ছেড়ে মাইল বিশ-পঁচিশের ভেতর যেতে আপনার বাধা কি? সেখানে কিছু না হোক, এক টুকরো জমি পাবেন ঘর দুখানির লাগোয়া। তাতে সংসারের সাশ্রয় হয় এমন শাকসব্জি লাগিয়ে দিন না—লাউ কুমড়ো লাগিয়ে তুলে দিন ঘরের ছাদে। আপনাকে ঠেকায় কে? হাতের কাছে দাওয়ার নিচে, ছাঁচতলার কাছ বরাবর লাগান লংকার গাছ। ছাই যেখানে ডাঁই করে ফেলেন—দুটো মান কচুর গাছ তার মধ্যে অনায়াসে লাগিয়ে দিন। এরা বিশ্বাসঘাতকতা করবে না। আপনার আদর-যত্নও কাড়বে না অধিক। তার ওপর যদি একটা টগর জবা বেলের গাছ বসাতে পারেন তো কথাই নেই। মাধবীলতার ঝাড় আপনার দাওয়ায় ছায়া দিয়ে ঘরের চালে উচ্ছল হয়ে ফুটে থাকবে। তার সুরভিও নেহাৎ কম নয়। আপনার শুধু কলকাতা থেকে বাড়ি ফেরার অপেক্ষা। একবার ফিরে আসতে পারলেই—সুনিবিড় শান্তিকুঞ্জে আপনার নিশ্চিন্ত বিশ্রাম: অন্তত রাতটুকুর জন্যে। তা কি আপনি কলকাতায় পেতেন?

আপনি বলবেন, আমাদের এ মন্তব্য কলকাতার সর্বাংশের জন্যে প্রযোজ্য নয়। তা ঠিক। আমরা সাধারণ মধ্যবিত্ত কলকাতার জন্যে যে চেনা চত্বর আছে সে সবের ওপরই গুরুত্ব বেশী দিচ্ছি।

আমাদের অনেকের মুখে ফ্যাসিনেশান কথাটি খুব চালু। সেই কথার চাপে পড়ে অনেক সংসারের তালরক্ষা দায় হয়ে ওঠে। এ ছাড়াও সাধারণ ভীতির কথা একটি প্রাসঙ্গিকভাবে এসে পড়ে তা হলো : উত্তর কলকাতার লোক দক্ষিণ কলকাতা যেতে নারাজ। দক্ষিণ কলকাতার কিছু নতুন চটকদার অঞ্চল বাদ দিলে উত্তর-দক্ষিণে বাস্তবিক তেমন কোন বিরোধ নেই। উত্তর কলকাতার পুরোনো জায়গাগুলোর সঙ্গে আপনি দক্ষিণের ভবানীপুর, কালিঘাট, চক্রবেড়ে অঞ্চলের সাদৃশ্য দেখতে পাবেন।

কিন্তু নিউ আলিপুরের সঙ্গে বাগবাজারের তফাৎ হবে না? দুটো অঞ্চলের বয়সের একটা তারতম্য নেই? সুতরাং সেটা মেনে নেওয়াই তো উচিত। যাই হোক, এসব কথা বিচার করে কলকাতার ভাড়াটে মানুষ যদি একটু স্বচ্ছন্দ বিহারের পক্ষপাতী হয়ে ওঠেন তাহলে আমাদের মনে হয়, ভাড়ার স্থিতাবস্থা বজায় থাকা সম্ভব।

আমাদের মধ্যে একজন প্রশ্ন করেছিলেন, ফিরিঙ্গী পাড়ায়—অর্থাৎ আপনার ইলিয়ট রোড, রয়েড স্ট্রীট, টাঁট লেন প্রভৃতি অঞ্চলে বাড়িভাড়া শস্তা। তা বলে কি আপনি শ্যামবাজার কি কালীঘাট ছেড়ে চট করে সেখানে উঠে যেতে পারবেন?

আমাদের পাল্টা প্রশ্ন হলো, কেন যাবো না? প্রথম প্রথম অপরিচিত বাঙালীবিহীন পরিবেশে হয়ত কিছুটা অস্বস্তি লাগবে। পরে ঠিক হয়ে যাবে। ওখানে কি পুরোন বাঙালী পরিবারের বসবাস নেই? অজস্র। আমাদের যা করতে হবে তা হলো—ছুঁৎমার্গিতা বিদায়। নচেৎ তো কলকাতা, বাংলার বাইরের শহরের মতন, বাঙালীটোলা, বিহারীটোলা, মাদ্রাজীটোলায় ছেয়ে যাবে! দিল্লীর মতন অবস্থা হতেও তো বেশী দিন অপেক্ষা করতে হবে বলে মনে হচ্ছে না। দিল্লীতে প্রকৃতপক্ষে বাঙালী দেখতে যেতে হয় করোলবাগ কিম্বা গোলমার্কেটে। আশা করি, কলকাতা ইতিমধ্যে নিজেকে যথেষ্ট বুঝতে পেরেছে।

—রূপচাঁদ পক্ষী

রুচিরা বাড়ি ঢুকল—তখন সবে সন্ধ্যে সাড়ে সাতটা। এর চেয়ে ঢের রাত করে সে অন্যদিন বাড়ি ফেরে। তার জন্যে কারও কাছে কৈফিয়ৎ দিতে হয় না। আজকেও সে স্বাচ্ছন্দে দেরি করে ফিরতে পারত। কিন্তু দেরি করেনি। দেরি করতে ইচ্ছে করল না। পৃথ্বীশকে সে মিথ্যে কথা বলেছে। তার ভালোর জন্যেই বলেছে। এখনো সময় আছে। এমনি কঠিন আঘাত পেতে পেতে হয়তো সে এখনো ফিরতে পারে। নইলে, বুঝতে পারছে না এ ব্যর্থতা তাকে শেষ পর্যন্ত কোথায় নিয়ে গিয়ে ফেলবে!

বাড়ি ঢুকেই অভ্যাস মতো রুচি বা মাকে জিজ্ঞেস করল, চিঠিপত্র কিছু আসেনি?

ইদানীং প্রায় রোজই এই প্রশ্ন। আর রুচিরার মাকে রোজই এক উত্তর দিতে হয়—না। এখন তাঁর উত্তর দিতেও কষ্ট হয়। সবই তো বুঝতে পারেন। তাই তিনি মুখ ফুটে 'না' বলতে পারেন না। চোখ নত করে মাথাটা একটু নাড়েন।

নিজের ঘরে ঢুকে কাপড় ছাড়তে ছাড়তে রুচিরা ভাবছিল সন্দীপের কথা। হল কি ওর? সত্যিই তার ওপর আকর্ষণ কমে গেল নাকি? না কি চিঠি না দিয়ে আগ্রহ বাড়িয়ে তোলা?

অবশ্য সে এখন কলকাতার বাইরে। তিন মাসের জন্যে সিমলা গেছে। এই তিন মাসের মধ্যে প্রথম মাসে বেশ ক'খানা পেয়েছিল, দ্বিতীয় মাস থেকেই চিঠি কমতে শুরু হয়েছে। অথচ তার নিজের তরফ থেকে চিঠির উত্তর দিতে দেরি সয় না।

রুচিরা ঠিক করল, এবার চিঠি এলে সে নিজেও চট করে উত্তর দেবে না।

কিন্তু আজ সন্দীপের কথা ভাবতে ভাবতে পৃথ্বীশের কথাও মনে হচ্ছিল।

অন্য দিনের মতো আজও রুচিরার অফিসে পৃথ্বীশ টেলিফোন করেছিল। সেই এক অনুরোধ—সন্ধ্যের সময় কোথায় দেখা করতে হবে। দেখা করেও ছিল। তারপর তার সেই এক কথা। তখন নিজে বাঁচবার জন্যে, আর বেচারিকে বাঁচাবার জন্যে রুচিরা নিজের মনের কথা প্রকাশ করলে। সন্দীপের কথা বললে। আশ্চর্য! তাতেও পৃথ্বীশ পিছিয়ে গেল না। বললে, 'তবুও আমি প্রস্তুত।'

রুচিরা ভ্রূকুটি করে বলেছে, ছেলে-মানুষী কোরো না।

পৃথ্বীশ পাল্টা জবাব দিল, ছেলে-মানুষী বলে সব কথা উড়িয়ে দেবার চেষ্টা কোরো না, আমি সীরিয়াস।

রুচিরা হাসতে হাসতে বলেছিল, সব ছেলেই নিজেদের এক এক সময়ে খুব সীরিয়াস বলে মনে করে, আসলে তারা ইমোশানাল।

—সব ছেলেই?

—অন্তত আমি যে কজনের সংগে মিশেছি। বলেই উঠে পড়ল।

ও বললে, এগিয়ে দেব একটু? বাস-স্টপেজ পর্যন্ত?

—না। আর শোনো, অপিসে যখন-তখন আমায় টেলিফোনে ডেকো না।

নির্লজ্জ তখনি বললে, তোমার কথা আমি সাধ্যমতো রাখবার চেষ্টা করব, তুমিও আমার প্রস্তাবটা ভেবে দেখো।

রুচিরা সে কথার কোনো জবাব না দিয়েই চলে এসেছে।

রুচিরার মা এমন সময়ে ঘরে ঢুকে বললেন, শুয়ে পড়লি কেন? চা হয়ে গেছে।

তাড়াতাড়ি উঠে বসল রুচিরা।

—চা এনে দেব?

রুচিরা হেসে বললে, আমি বুঝি রান্না-ঘর পর্যন্ত যেতে পারি না? বলে হাসতে হাসতে ছেলেমানুষের মতো মায়ের কাঁধে ভর দিয়ে রান্নাঘরের দিকে চলল।

কিন্তু বাড়ির সকলের সঙ্গে এই আনন্দ-টুকু আর কতক্ষণ? তারপর সেই রাত্রি গভীর হবে, নিজের ঘরটিতে হাল্কা নীল আলোটি জ্বালিয়ে বিছানায় গা ঢেলে দেবে অমনি সেই নির্জন কক্ষে কোথা থেকে সন্দীপ যেন হাওয়ায় ভেসে আসবে। তার চুলের গন্ধ, চুরুটের আগুন, গলার স্বর—এমন কি তার আদর করার বিশেষ ভঙ্গি-গুলো পর্যন্ত এই নির্জনতায় যেন মূর্ত হয়ে ওঠে।

কৌতুকের বিষয় এই—সন্দীপ আর রুচিরার প্রেমের দুর্ভেদ্য দুর্গে আজ কিছু-কাল হল কোথা থেকে কিশোর বেলার পৃথ্বীশ ফিরে এসে ক্ষীণ মুষ্টিতে করাঘাত শুরু করেছে। সেও প্রবেশাধিকার চায়। সম্ভবত সন্দীপকে সরিয়ে দিয়ে!

রুচিরার আবার মনে পড়ল পৃথ্বীশের সেই কথাটি আজ সন্ধ্যেতেই বলেছিল, 'তবুও আমি প্রস্তুত।'

বোধহয় সব মেয়েই জানে, জীবনে এক-একটি পুরুষ এমন আচমকা উৎপাতের মতো এসে হাজির হয় যে ইচ্ছে করে তাকে সেই মুহূর্তেই দূর করে দেয়। কিন্তু তাদেরই মধ্যে আশ্চর্য এক-এক ধরনের মানুষ থাকে যাদের অনাকাঙ্ক্ষিত মনে হলেও কিছুতেই সামনে দাঁড় করিয়ে অপমান করা যায় না, দুটো রূঢ় কথাও বলা চলে না। কেমন যেন মায়া হয়। আর এই মায়া একবার জন্মানো তো সর্বনাশ! পৃথ্বীশ সেই ধরনের পুরুষ। তাছাড়া বুদ্ধিমান। সে টের পেয়েছে, তার ওপর মায়া পড়েছে। এছাড়া আরও একটি সামান্য ইতিহাস আছে। এক সময়ে—রুচিরার বয়েস তখন তেরো-চোদ্দ, ঐ পৃথ্বীশের সঙ্গে রুচিরারই কোনো নিকট আত্মীয়া লঘু পরিহাসে বিয়ের প্রস্তাব করেছিলেন। সেই কথাটা কেমন করে দুজনেই জানতে পেরে-ছিল। তারপর একদিন, যখন কোনো বিয়ে বাড়িতে দুজনের দেখা হয়েছিল, তখন সবার অলক্ষ্যে উনিশ বছরের তরুণ পৃথ্বীশ তার হাতে অতি গোপনে একটা গোলাপ ফুল গুঁজে দিয়েছিল। রুচিরা খুশি মনেই সে ফুল গ্রহণ করেছিল, আর তার সামনেই ফুলটি অতি আদরে ব্লাউজের ভেতরে লুকিয়ে রেখেছিল।

সামান্য এই ইতিহাসটুকু পরবর্তীকালে যৌবনের প্রখরতর উত্তাপে সেই গোলাপ ফুলটির মতোই কবে যে শুকিয়ে ঝরে গিয়েছিল রুচিরার তা খেয়াল ছিল না। আজ সেই কিশোর নায়ক যখন তার পরি-পূর্ণ যৌবনকালে কোথা থেকে ফিরে এসে রুচিরার রুদ্ধ দুয়ারে করাঘাত করতে লাগল, তখন অসহ্য হলেও রুচিরাকে মানতে হল—পৃথ্বীশের শুধু বুদ্ধি ধৈর্য বা জেদই নেই, দাবীও আছে। তাই প্রায় প্রত্যেক দিন তার আপিসে আসছে পৃথ্বীশের টেলিফোন —আউটরামঘাটে, ইডেন গার্ডেনে কিম্বা ভিক্টোরিয়া হলের প্রাঙ্গণে ঘন-ঘন দেখা করার করুণ মিনতি। আর রুচিরাও প্রায় প্রত্যেক বারই সে আহ্বানে সাড়া দিয়েছে। শুধু একটা কথা সে বুঝতে পারে না—এই সাড়া দেওয়াটা কিসের জন্যে? পৃথ্বীশ কষ্ট না পায় তার জন্যে, না তাকে আঘাত দিয়ে কষ্ট দিয়ে ফিরিয়ে দেবার অভিপ্রায়!

আঘাত দেবার জন্যেই। নির্জনে নির্ধারিত সময়ে সে পৃথ্বীশের সঙ্গে দেখা করেছে ঠিকই; কিন্তু একটা দিনের জন্যেও কি পৃথ্বীশকে প্রশ্রয় দিয়েছে, কোনো দিন কথা বলতে গিয়ে তার গলার সুরে আবেগ মিশেছে? চোখের পাতা ভারী হয়েছে? না। বরঞ্চ প্রতিবারই তাকে বিদ্রূপ করেছে—অতি সাধারণ কথাগুলিকেও শাণিয়ে নিয়ে ছুঁড়ে মেরেছে।

একদিন তো পৃথ্বীশকে স্পষ্টই বলে-ছিল, তুমি আমাকে অমন করে ডাক কেন?

পৃথ্বীশ নিঃসংকোচে বললে, ভালো-বাসি বলে।

কিন্তু আমি যদি বলি তোমায় ভালোবাসি না?

আজ না বাসলেও একদিন বাসতে পার। প্রথম দর্শনেই ভালোবাসা যায়, আবার বহু দর্শনের পরও ভালোবাসা জন্মায়। বলেই পৃথ্বীশ একটু হেসেছিল। —আমার শেষের কথাটা তোমার মনঃপূত না হতে পারে, কিন্তু অবিশ্বাস্য নয়। আমাদের সমাজে 'লাভ-ম্যারেজ' প্রচলিত হবার আগেও স্ত্রীরা স্বামীকে কখনো কখনো ভালো-বেসেছে বৈকি।

উপযুক্ত জবাব খুঁজে না পেয়ে রুচিরা তখন তাকে সোজাসুজি আঘাত করে বলেছে, তোমার সঙ্গে স্বামী-স্ত্রীর সম্পর্ক নিয়ে আলোচনা করতে ইচ্ছে করি না।

কিন্তু আমি করি। আমি তোমাকে ভালোবাসি। সুতরাং আমি তোমাকে চাই।

এই 'চাই' কথাটা এমন জোরে সেদিন পৃথ্বীশ উচ্চারণ করেছিল যে রুচিরার বুক কেঁপে উঠেছিল। মনে হয়েছিল এই নির্জনতার সুযোগ নিয়ে হিংস্র পশুর মতো হয়তো বা এখনি তার ওপর ঝাঁপিয়ে পড়বে। কিন্তু তা পড়েনি। বরঞ্চ মুখের ওপর স্নিগ্ধ কোমল একটি হাসি ফুটিয়ে বলেছিল, সত্যিই কি তোমার আপত্তি আছে?

রুচিরা বলেছিল, আছে।

—কেন?

—আমি এনগেজড।

পৃথ্বীশ হেসে বলেছিল, এই 'এন-গেজড' কথাটা পশ্চিমী সমাজের। এর ঠিক অর্থ আমাদের সমাজে সব সময়ে পুরো-পুরি খাটে না। তুমি কথাটা আরও একটু স্পষ্ট করে বলো।

রুচিরা তখন চোখটা একটু অন্যদিকে ফিরিয়ে, অথচ স্পষ্ট গলায় বললে, আমার জীবনে অন্য কেউ ইতিমধ্যেই এসে গিয়েছে। কথাটা বলেই রুচিরা পৃথ্বীশের দিকে স্পষ্ট করে তাকিয়েছিল। ভেবেছিল, একথায় পৃথ্বীশ নিশ্চয় আঘাতে মুষড়ে পড়বে। কিন্তু আঘাত তো দূরের কথা—দেখা গেল, পৃথ্বীশ ঠোঁট টিপে টিপে হাসছে।

—অমন করে হাসছ যে?

পৃথ্বীশ বললে, যে মেয়ের বয়েস ষোলো ছাপিয়ে গিয়েছে তার জীবনে কোনো না কোনো পুরুষের শুভাগমন ঘটেছেই। তোমার তো সাতাশ হয়ে গেছে না?

সেদিন ঐ পর্যন্তই। তারপর আজ। আজও সেই এক কথা। রুচিরা দ্বিধা সংকোচ কাটিয়ে বলে ফেলল, সন্দীপকে আমি ভালোবেসেছি।

পৃথ্বীশ অমনি বললে, ভালোবাসবে বৈকি। ভালোবাসতে পারাও একটা ক্ষমতা। তুমি যদি ভালোবাসতে না পার, আমি তবে তোমায় ভালোবাসি কোন গুণে? সে কি শুধু চেহারার চটকে?

বিরত হয়ে উঠেছিল রুচিরা। একে কি কিছুতেই হটিয়ে দেওয়া যাবে না? ওর মুখের ঐ টিপিক্যাল হাসি— ও কি মায়ামন্ত্র-পড়া?

তারপরেই অকস্মাৎ পৃথ্বীশের দুচোখের পাতা যেন বেদনায় নুয়ে পড়ল। স্খলিত কণ্ঠে বললে, আমি সর্বান্তঃকরণে কামনা করি তোমাদের ভালোবাসা সার্থক হোক। তবে, সব পুরুষই সমান হয় না রুচিরা। ভালোবাসাটা কারও কারও কাছে নেশা। ডায়রির পাতায় প্রণয়-প্রার্থিনীদের তালিকা বাড়ানোর দিকেই তাদের লক্ষ্য। সন্দীপকে আমি জানি না। কাজেই তোমাদের বিয়ে হওয়া পর্যন্ত আমাকে অপেক্ষা করতেই হবে।

সন্দীপ যদি শেষ পর্যন্ত আমাকে ফিরিয়েই দেয় তখন তুমিই বা কী করতে পারবে?

এবার কিন্তু তার সুরে বিদ্রূপ ছিল না। তবে কি তখন তার মনে সত্যিই কোনো সন্দেহ ছায়া ফেলেছিল?

এই কথা মনে হতেই এই মুহূর্তে রুচিরা যেন চমকে উঠল। পৃথ্বীশের কাছে তার দুর্বলতা ধরা পড়েনি তো?

পৃথ্বীশ অবশ্য তৎক্ষণাৎ উত্তর দিয়েছিল, তেমন ঘটনা ঘটলে আমি অনেক কিছুই করতে পারি।

রুচিরার কণ্ঠে আবার বিদ্রূপ ঝলকে উঠেছিল। বলেছিল —কিছুই করতে পারবে না। তখন তুমিই বলবে, যে হৃদয় অন্যকে দান করেছ সে হৃদয় আর কাউকে দেওয়া যায় না। তখন এই তুমিই, যে-যুগে বিয়ের পর বউ বরকে ভালোবাসে সেই যুগের নায়ক হয়ে বসবে।

পৃথ্বীশ সে কথার উত্তরে তার শান্ত স্নিগ্ধ দুই চোখ মেলে গভীর কণ্ঠে বললে, আর যদি বলি, তবুও আমি প্রস্তুত?

নীল আলো-জ্বালা এই নিস্তব্ধ ঘরে পৃথ্বীশের ঐ কথাটা বারে বারেই তার কানের কাছে বাজতে লাগল 'আমি প্রস্তুত' 'আমি প্রস্তুত'।

পৃথ্বীশের ডাকে এই যে সে বারে বারে সাড়া দেয়—আজ এই মুহূর্তে নিজেকে চিরে-চিরে বিশ্লেষণ করে দেখল সে কেবল পৃথ্বীশকে আঘাত করে ফিরিয়ে দেবার জন্যেই। তার ওপর নিজের কোনো দুর্বলতা নেই। কিন্তু তার এই সাড়া দেওয়াটা পৃথ্বীশ কেমন ভাবে নেয় কে জানে! তাকে আসতে দেখলে পৃথ্বীশের মুখে এমন একটি হাসি ফুটে ওঠে যা কখনো মনে হয় কৃতার্থতার হাসি, কখনো মনে হয় যেন কুটিল আত্মপ্রসাদের।

না, পৃথ্বীশের কথা আর নয়। তাকে প্রত্যক্ষভাবে না হলেও পরোক্ষে অনেকখানি প্রশ্রয় দেওয়া হয়ে যাচ্ছে। রুচিরার মনে হল সন্দীপের পর এ হৃদয় আর কাউকে দেওয়া যায় না, আর কারও কথা মনে করাও পাপ।

আরও কিছুদিন কেটে গেল। সন্দীপের কাছ থেকে কোনো সাড়া নেই। তিন মাসের জন্যে সিমলা গিয়েছে। দু'মাস কেটে গিয়েছে, আর এক মাসও বাকি নেই। চিঠির জন্যে প্রতীক্ষা করে করে রুচিরা ক্লান্ত হয়ে পড়ল। ওদিকে পৃথ্বীশকে সেই যে টেলিফোন পর্যন্ত করতে বারণ করে দিয়েছিল, আর সে টেলিফোনও করেনি। মনের এই অবস্থায় হঠাৎই রুচিরা এক মাসের ছুটি নিয়ে বসল। হিসেব করে দেখল ঠিক তিন মাসের মাথায় যদি সন্দীপ ফিরে আসে তাহলে তখন কলকাতায় খোঁজ করে রুচিরাকে পাবে না।

রুচিরার এই ছুটি নেওয়া ব্যাপারটা বাড়ির সকলের আশ্চর্য ঠেকল। কিন্তু কিছু জিজ্ঞেস করতে পারল না। ছুটি নিয়ে কলকাতায় রুচিরার একটা দিনও মন বসল না, চলে গেল ধুলিয়ানে কাকীমার কাছে।

মুর্শিদাবাদ জেলার এই সামান্য শহরে হঠাৎ দীর্ঘকাল পর রুচিরার আবির্ভাবে কাকীমাও কম বিস্মিত হলেন না। রুচিরা তাঁর কৌতূহল নিবৃত্তি করে হেসে বললে, কলকাতায় থেকে থেকে বড়ো একঘেয়ে হয়ে গেছে। তাই রেস্ট নিতে এলুম। এক মাসের আগে এখান থেকে নড়ছি নে।

সত্যিই কলকাতার মানুষের এখানে মন টেকে না। রুচিরারও কোনো দিন ভালো লাগেনি ধুলিয়ান। তবু আজ এই নির্জনতার মধ্যেই পালিয়ে এল 'রেস্ট নিতে' নয়, নিরিবিলিতে একটু ভাবতে, নিজেকে ভালো করে বুঝতে।

বাড়ির কাছে পিঠে তেমন লোকবসতি নেই। আছে কেবল আমবাগান আর এখানে-ওখানে দু-চার ঘর গরিব মুসলমান পরিবার। সারা দুপুর রুচিরা একাই ঘুরে বেড়ায়। দুপাশে কুলের গাছ। ছেলেরা মাটির ঢেলা ছুঁড়ে কুল পাড়ছে। সামনে এবড়ো-খেবড়ো ভুঁই। কার্তিক মাসে লাঙল পড়েছিল চৈতালি ফসলের জন্যে। কিন্তু বৃষ্টি হল না। ফসল ফলল না তেমন। রুচিরা সেই ভুঁইয়ের ওপর দিয়ে এগিয়ে চলল। সব নতুন—এখানকার আলো, এখানকার বাতাস, এখানকার ছেলেমেয়েদের মুখগুলো, ঐ ঝাঁকড়া ঝুড়ি মাথায় গাছতলায় শুকনো পাতা কুড়িয়ে বেড়াচ্ছে—সবই যেন নতুন। ক্ষণকালের জন্যে রুচিরা ভুলে যায় তার অতীতকে। মনে হয়, এই বর্তমানই সত্য। হায়, যদি এ দেশের জল-মাটির সঙ্গে, এই সরল অনাড়ম্বর জীবনের মধ্যে দিয়ে সে বড়ো হয়ে উঠতে পারত!

তবু এই পথচলার মাঝে মাঝে আবাল্যের পরিচিত কলকাতার পটভূমিতে কোনো একটি বিশেষ রাস্তা, একটি বিশেষ বাড়ি—অপরাহ্ণের আলোয় আঁকা কয়েকটি বিশেষ মুহূর্তের ছবি চোখের সামনে ভেসে ওঠে বৈকি। পৃথ্বীশের কথাও মনে উঁকি দিয়ে যায়। ওর সম্বন্ধে সবচেয়ে আশ্চর্যের কথা এই—রুচিরাকে সে সমস্ত মন-প্রাণ দিয়ে চায়। ভিক্ষুকের আর্জি দিয়ে তার প্রণয় প্রার্থনা করে সত্য, কিন্তু একটি দিনের জন্যেও তাদের অতীতের কথা স্মরণ করিয়ে দাবী করে না। সে যেন পুরনো খাতার পাতা কটাকে একেবারে উড়িয়ে পুড়িয়ে দিয়েছে। তার কাছে বর্তমানটাই সত্য—সে বর্তমান যতই রূঢ়—যতই তার প্রতিকূলে রায় দিক না কেন। সেই সত্য-বর্তমানের সঙ্গেই তার যেন চ্যালেঞ্জ। মনোবিশ্লেষণের এইখানটায় পেঁছে রুচিরাকে থমকে যেতে হয়। এইখানে পৃথ্বীশকে যেন হঠাৎ খুব বড়ো বলে মনে হয়, এইখানে এসে আর তার যেন নাগাল পাওয়া যায় না।

ভুঁই ছাড়িয়ে এবার রুচিরা আমবাগানে ঢোকে। এ কদিনে এই বাগানটির সঙ্গে তার আত্মীয়তা হয়ে গেছে। ফাঁক-ফাঁক গাছ। মাঝখান দিয়ে পায়ে-চলার পথ। এক এক জায়গায় খানিকটা ফাঁকা জায়গা। সেখানে পাখি আর কাঠবিড়ালী ছাড়া আর কোনো প্রাণীর চিহ্নমাত্র নেই। অবাক—সেই নিস্তব্ধ জায়গা! এই নিস্তব্ধতার আকর্ষণেই রুচিরা এখানে আসে। এখানে এলে নিরাবরণ প্রকৃতির সঙ্গে নিজের প্রকৃতিটাকে অমনি একেবারে নিরাবরণ করে মিশিয়ে দেখতে ইচ্ছে করে। হায়! এই নির্জনতা কি একা উপভোগ করবার? প্রকৃতি যে এখানে সহস্র বাহু মেলে প্রবৃত্তিকে আহ্বান করে। সে আহ্বানে কেমন করে সাড়া দিতে হয় তা বোধহয় একটি মাত্র পুরুষই জানে—সন্দীপ! কেবল সন্দীপের মধ্যেই যেন একটা অরণ্য-বালকের উন্মাদনা আছে। ওর গায়ের রঙে পাতার সবুজ—ওর হাসিতে রক্তপলাশের ফুল ফোটা—ওর নিবিড় আলিঙ্গনে অকৃত্রিম বন্যবর্বরতা।

রুচিরার হঠাৎ মন কেমন করে উঠল সন্দীপের জন্যে। ধুলিয়ান থেকে পালিয়ে এল কলকাতায়। কিন্তু ধুলিয়ানের সেই নির্জন নিস্তব্ধ পটভূমির শিহরণ তার মনে চিরস্থায়ী হয়ে রইল।

ফিরে এসেই চিঠির খোঁজ। চিঠি কয়েকটা এসেছিল বটে, কিন্তু তেমন কোনো প্রত্যাশিত জনের কাছ থেকে নয়।

হিসেব করে দেখল, এতদিনে সন্দীপ নিশ্চয় কলকাতায় ফিরেছে। যদি ফিরে থাকে তাহলে তার সঙ্গে দেখা করতে আসা উচিত ছিল। চিঠির উত্তর না হয় নাই দিল। চিঠি হয় তো পায়নি—যা ডাকের গণ্ডগোল। কিম্বা হয়তো ঠিকানায় কিছু ভুল আছে, অথবা খামে-আঁটা চিঠির ওপর মেয়েলি হাতের লেখা অন্যের পক্ষে আত্মসাৎ করা কি খুবই অসম্ভব?

রুচিরা একদিন দুদিন এক সপ্তাহ বাড়ি থেকে বেরোল না—যদি সন্দীপ হঠাৎ এসে পড়ে!

কিন্তু সন্দীপ এল না।
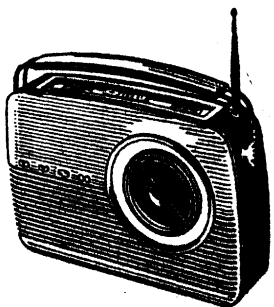
বিক্ষুব্ধ মনকে সান্ত্বনা দেবার জন্যে যখন আর কোনো অবলম্বন বাকি রইল না তখন তার মনে হল সন্দীপ নিশ্চয় ফেরেনি। কিন্তু পরে আবার মনে হল এতদিন সিমলাতে বসেই বা সে কী করছে?

তখন একদিন রুচিরা নিজেই বেরিয়ে পড়ল। সন্দীপের ঠিকানা জানা আছে। ঠিক করল ওর বাড়িতে কখনোই ঢুকবে না, কিন্তু তার বাড়ির সামনে দিয়ে সাধারণ পথিকের মতো যেতে তো বাধা নেই। সেই সময়ে যদি সন্দীপের সঙ্গে দৈবাৎ দেখা হয়ে যায়!

যদি দেখা হয়ে যায় তাহলে কী বলবে?

মনে মনে একটা উত্তর ঠিক করে নিয়ে রুচিরা বাসে উঠল।

গড়িয়াহাটার মোড়ে বাস ছেড়ে দিয়ে রুচিরা হাঁটতে লাগল। অভিজাত এই অঞ্চলের অলি-গলি তার নখদর্পণে। কতদিন সন্দীপের সঙ্গে লেক থেকে ফিরছে এই সব পথ দিয়ে। তরুণ যৌবনের প্রেমবিহ্বল সেই সমস্ত দুর্লভ মুহূর্ত আজ আরও একবার আঁকড়ে ধরতে ইচ্ছে করল। চোখের কোলে জল টলমল করে উঠল। চশমার লেন্স উঠল ভিজে। তাড়াতাড়ি রুচিরা রুমাল দিয়ে চোখ মুছে নিল। না, এখন দুর্বল হবার সময় নেই। এখন ধৈর্য ধরতে হবে—সহ্য করতে হবে। ঐ যে ওদের দোতলা বাড়িখানা দেখা যাচ্ছে।

এই লেনটা বড়ো নির্জন। স্তিমিত আলো, তার ওপর কতকগুলো পামগাছের ভিড়। অদ্ভুত রোমান্টিক লাগছিল। একই কলকাতায়—মাত্র চল্লিশ মিনিটের পথ! কিন্তু রুচিরার মনে হচ্ছিল সে যেন কত দূরে থেকে, কোন অসম্ভব স্বপ্নজগতের সিংহ-দ্বারে এসে পৌঁচেছে। এইখানেই থাকে তার রূপকথার রাজপুত্র!

ভয়ানক সংকোচ হচ্ছিল বাড়িটার দিকে তাকাতে। তবু রুচিরা ক্ষণকালের জন্যে সে বাড়ির সামনে দাঁড়িয়ে পড়ল। একবার বুঝি দোতলার কোনো বিশেষ ঘরের দিকে তাকালো। ঐ যে আলো জ্বলছে! এ ঘর সন্দীপের। সে না থাকলে এ ঘরে তালা ঝোলে।

সন্দীপ তাহলে এখানেই আছে!

ওপরের জানলার দিকে চকিতে তাকিয়ে নিয়েই রুচিরা এগিয়ে চলল ফিরতি বাসের জন্যে। মনে মনে বললে, তোমার ঐ ঘরে আমায় নিয়ে যাবার জন্যে কতদিন সাধ্য-সাধনা করেছিলে। সেদিন ভেবেছিলাম, তোমার ঘরে যদি সত্যিই কোনো দিন যাই বড়ো প্রবেশাধিকার নিয়েই যাব, বাড়ির কারও কৌতূহলের বা সমালোচনার পাত্রী হয়ে যাব না। আর আজ—!

আবার চশমার লেন্স ঝাপসা হয়ে উঠল।

এই দীর্ঘ গলিপথ সে সন্ধ্যায় রুচিরা যে কত দ্রুত অতিক্রম করেছে তা সে কল্পনাই করতে পারেনি। সে মুহূর্তে তার কেবল এই কথাই মনে হচ্ছিল—তার এই ব্যর্থ অভিসার না জানি কত জনে কতভাবে দেখল!

সন্দীপ সম্বন্ধে রুচিরা তবুও শেষ সিদ্ধান্তে পৌঁছতে পারল না। অনেক দিনের পরিচয়। তিল তিল করে ভালোবাসায় বিশ্বাসের প্রাকার গড়ে উঠেছিল। সেই বিশ্বাস কোন নিশ্চিত প্রমাণে এখনি ধূলিসাৎ হবে? ও তো চিরকালই একটু চঞ্চল স্বভাবের—ও তো চিরদিনই একটু বেশি ভোলা মন: কোনো কিছুতেই ওর যেন গভীর আসক্তি নেই। আর সেইজন্যেই না তার মতো মেয়ে মরতে বসেছে ওর জন্যে। নইলে পৃথ্বীশের মতো যদি কাঙাল মনোবৃত্তি নিয়ে দাঁড়াতো তার কাছে, তা হলে কি রুচিরা এমনি করে নিজেকে জ্বলতে দিত! জীবনে কি কম পুরুষ এল এরই মধ্যে! কত ভাবে—কত ছলে প্রেম-নিবেদনের ঘটা! তবে অবশ্য পৃথ্বীশ ওদের মধ্যে ব্যতিক্রম। সত্য কথা অকপটে বলার দুঃসাহস আছে ওর। মনে পড়ল তার এক-দিনের কথা—আমি তোমাকে ভালোবাসি। সুতরাং আমি তোমাকে চাই।

মনে আছে আজও এই 'চাই' কথাটা এমন সুরে উচ্চারণ করেছিল যে তার বুকের রক্ত ছলাৎ করে উঠেছিল।

সন্দীপ তাকে না চাইতেই পেয়েছে, তাই তার মুখ থেকে এমন করে 'চাই' কথাটা শোনার সৌভাগ্য হয় নি। এই কথাটা যদি সন্দীপের গলায় বাজত তাহলে রুচিরা হয়তো সেই মুহূর্তে আনন্দে উত্তেজনায় ভয়ংকর একটা কিছু করে ফেলত।

এমনি সময়ে একদিন আপিসে টেলি-ফোন বাজল।

হ্যাঁ, পৃথ্বীশই।

নিঃসংকোচ কণ্ঠে বললে, তোমার কথা কিন্তু এত দিন ধরে রাখলাম। আজ ইচ্ছে করেই ব্রতভঙ্গ।

রুচিরা আজ আর রাগ করল না। হেসে বললে, তোমার তাহলে নিজের ওপরে যথেষ্ট কনট্রোল আছে বলো!

এর প্রমাণ কি আগে কোনো দিন দিইনি তোমার কাছে?

সে প্রমাণ বহুবার পেয়েছে বৈকি। চট করে তাই উত্তর জোগালো না রুচিরার।

বুদ্ধিমান পৃথ্বীশ বোধ হয় তা অনুমান করতে পারল। তাই নিজেই প্রসঙ্গ বদলে বলল, ধূলিয়ান থেকে ফিরে পর্যন্ত দেখা পাইনি। দর্শন প্রার্থনা করি।

কবে?

আজই নয় কেন?

কোথায়?

পৃথ্বীশ নিঃসংকোচ গলায় বললে, চলে এসো গোল পার্কের কাছে। ঠিক ছটায় আমি থাকব।

আবার সেই গড়িয়াহাটপাড়ায়—গোল পার্ক! রুচিরার বুকটা কেঁপে উঠল। কোনো রকমে বললে, আচ্ছা।

সেদিনও যথাসময়ে রুচিরা গোল পার্কের ধারে এসেছিল। রুচিরাকে দেখলেই বোঝা যাচ্ছিল সোজা আপিস থেকে আসেনি। সম্ভবত আপিস থেকে একটু আগে বেরিয়ে বাড়ি গিয়ে মুখ হাত ধুয়ে কাপড় বদলে এসেছে। ঝকঝক করছে মুখখানি।

পৃথ্বীশ বললে, একটা ট্যাক্সি করে যদি কিছু দূরে ঘুরে আসা যায়, তাহলে কি আপত্তি হবে?

রুচিরা সোজাসুজি সম্মতি জানাল না। রিস্টওয়াচটার ওপর একবার দৃষ্টি বুলিয়ে নিয়ে বললে, আমায় কিন্তু তাড়া-তাড়ি ফিরতে হবে।

পৃথ্বীশ হেসে বললে, আমার সঙ্গে বেরোলে কোন্ দিন না তোমার তাড়া থাকে। বলেই একটা ট্যাক্সি দাঁড় করিয়ে উঠে পড়ল।

ট্যাক্সিতে উঠে পৃথ্বীশ নিঃসংকোচে বললে, তোমার হাতটা একটু পেতে পারি?

কী হবে?

আনন্দ।

রুচিরা অবহেলায় হাতটা পৃথ্বীশের কোলের ওপর ফেলে বললে, এই হাতটা পেলেই আনন্দ?

হাতটা নিজের মুঠোয় তুলে নিয়ে পৃথ্বীশ হেসে বললে, তার চেয়ে বেশি দাবি করার অধিকার যে তুমি কিছুতেই দিতে চাচ্ছ না।

রুচিরা হঠাৎ গম্ভীর বেদনায় বলে উঠল, কেন তুমি বারে বারে আমায় ঐ এক কথা বল? তুমি তো জান—

বাধা দিয়ে পৃথ্বীশ বললে, হ্যাঁ, আমি তো বলেইছি—আমি প্রস্তুত। সব জেনেই বলছি।

রুচিরার বুকের ভিতর গুমরে গুমরে কেঁদে উঠল। পৃথ্বীশের গলায় আবার সেই ভয়ংকর সুর বেজে উঠেছে। রুচিরার মনে হল পৃথ্বীশ যেন বুঝতে পেরেছে সন্দীপের সঙ্গে তার সম্পর্ক কাটল ধরেছে। সেই সুযোগে সে তস্করের মতো ঢুকে পড়তে চায়। তার মনে হল, সে নিজেও যেন কেমন দুর্বল হয়ে পড়ছে। আর বোধ হয় নিজেকে ঠিক রাখতে পারবে না—আত্মসমর্পণ করতেই হবে।

রুচিরা পৃথ্বীশের মুঠো থেকে নিজের হাত সরিয়ে নিল। হাতখানা পৃথ্বীশের হাতের ঘামে ভিজে উঠেছে। হাতটা যেন এখুনি ভালো করে না ধুয়ে ফেললেই নয়।

পৃথ্বীশ আবার বললে, বিশ্বাস করো, আমি প্রস্তুত। সব জেনেই প্রস্তুত।

সব জেনে? রুচিরার গলায় এবার বিদ্রূপের সুর ছুরির ফলার মতো লিক্-লিক্ করে উঠল।

না, সব জান না। সব জানলে তুমি এমনি করে আমাকে নিয়ে আজ আর ঘুরতে পারতে না।

পৃথ্বীশ গভীর স্বরে বললে, বলো না শুনি।

ট্যাক্সি তখন যাদবপুর পার হয়ে ছুটেছে গড়িয়ার দিকে। রুচিরা খোলা জানলার দিকে তাকিয়ে কী যেন ভাবতে লাগল।

কই বলো। পৃথ্বীশ যেন ব্যাকুল হয়ে উঠল।

কী হবে শুনে। তুমি সহ্য করতে পারবে না।

পৃথ্বীশের মুখে এবার ভাবান্তর দেখা দিল। তবু জোর করে হেসে বললে, পারব। তুমি বলো।

রুচিরা কিছুক্ষণ চুপ করে রইল। তারপর ধীরে ধীরে বললে, আমি এক-জনকে ভালোবাসি তা তুমি জান।

পৃথ্বীশ তৎক্ষণাৎ বলে উঠল, সে কথা তুমি ইতিপূর্বে সহস্রবার বলেছ।

আজ আর আমার কোনো গোপনতা নেই, অন্ততঃ তোমার কাছে। যদি ইচ্ছে কর তার ঠিকানাও প্রকাশ করতে পারি।

তার দরকার নেই। তুমি যা বলতে চাইছিলে, সেই কথাই বলো।

সে আমার সব। তার কাছে আমার অদেয় কিছুই নেই। এই বলে রুচিরা পৃথ্বীশের মুখের দিকে একবার তাকিয়ে নিল।

তার সন্তান আমার পেটে এসেছিল। আমি তাকে রাখতে পারিনি।

ঠিক এই মুহূর্তেই ড্রাইভার ব্রেক কষল। সমস্ত গাড়িটা প্রবল ঝাঁকুনি খেয়ে থেমে গেল। আর একটু হলেই একটা ছেলে চাপা পড়ত।

রুচিরা পৃথ্বীশের মুখের দিকে তাকালো। দেখল, তার সমস্ত মুখখানা বিবর্ণ হয়ে গেছে।

।। কী হল পৃথ্বীশ?

পৃথ্বীশ নিজেকে সামলে নিয়ে বললে, আর একটু হলেই ছেলেটা চাপা পড়েছিল। কিন্তু তোমার সন্তানকে রাখলে না কেন?

রুচিরা তার দুই ঝক্‌ঝকে চোখের দৃষ্টি পৃথ্বীশের চোখের ওপর প্রসারিত করে বললে, যদি বলি সন্দীপ চায় নি?

তা হলে আমি বলব, সে তোমাকেও চায়নি।

রুচিরার মুখের ওপর কে যেন কশাঘাত করল। স্খলিত কণ্ঠে বললে, তা হয়তো হতে পারে।

।। তবে তুমি এ ভুল করলে কেন?

।। এ ভুলের দায়িত্ব আমাদের দুজনের কারোরই নয়।

।। তবে?

।। পৃথ্বীশ, নির্জনতার সঙ্গে তোমার কখনো পরিচয় ঘটেছে?

।। নির্জনতা!

হ্যাঁ, ট্যাক্‌সির মধ্যের এ নির্জনতা নয়, কিম্বা পার্ক স্ট্রীটের কোনো রেস্টুরেন্টের

'আমায় কিন্তু তাড়াতাড়ি ফিরতে হবে'

পর্দা ফেলা কেবিনের কামরার নির্জনতার কথাও বলছি না—এ একেবারে—

রুচিরা হঠাৎ থেমে গেল।

পৃথ্বীশ উৎসুক কণ্ঠে বললে, চুপ করলে কেন? বলে যাও।

রুচিরা ট্যাক্‌সির খোলা জানলা দিয়ে বাইরের দিকে তাকিয়ে ভাবগাম্ভীর স্বরে বলে যেতে লাগল—এক পাশে নীল ফুলে ভরা তিসির ভুঁই, আর একদিকে এক রাশ হলদে ফুল নিয়ে মাথা ছাড়িয়ে উঠেছে অড়হরের ক্ষেত। জানুয়ারি মাসের নিস্তব্ধ দুপুর। একটি ছেলে আর একটি মেয়ে মনের আনন্দে ভুঁই থেকে কখনো ছোলা তুলে খাচ্ছে, কখনো মাটির ঢেলা ছুঁড়ে কুল পাড়ছে। সামনেই বিরাট আমবাগান। আঁকাবাঁকা পথ সেই বাগানের ভিতর দিয়ে কোথায় যে চলে গিয়েছে, তার ঠিকানা নেই। মনে করো দুটি মানুষ চলেছে সেই আম-বাগানের মধ্যে দিয়ে। একজনের হাতের মুঠোয় আর একজনের হাত। জনমানবের সাড়া নেই এখানে। শুধু কাঠবিড়ালী আর চড়ুই পাখির জটলা। এক জায়গায় এসে তারা বসল। চারিদিকে শুকনো পাতা ছড়ানো। বাতাসে ভেসে আসছে হলুদের গন্ধ। দূরে কোথায় হলুদ তোলা হচ্ছে।

হঠাৎ কিসের যেন শব্দ।

ছেলেটি নতুন এসেছে এ দেশে। সে চমকে উঠল। —কেউ আসছে!

মেয়েটি হেসে বললে, না, পাতা পড়ল।

।। আমি কিন্তু ভয় পেয়েছিলাম।

।। কিসের ভয়?

।। এখানে এভাবে আমাদের দুজনকে কেউ দেখলে—

মেয়েটি হেসে বললে, তুমিও তাহলে ভয় পাও?

ছেলেটি তার উত্তর দিতে পারল না। একথায় মেয়েটির মুখের দিকে তাকাতেই দেখল মেয়েটি তারই মুখের দিকে তাকিয়ে কেমন একরকম ভাবে হাসছে।

ছেলেটি বললে, এমন নির্জন জায়গা আমি এর আগে কখনো দেখিনি। এ নির্জনতার মধ্যে কেমন যেন একটা খ্রিল আছে।

।। এর চেয়েও নির্জন জায়গা আমি আবিষ্কার করেছি। দেখবে?

ছেলেটির দু চোখ লুব্ধ হয়ে উঠল। বললে, দেখব।

।। এসো তবে।

এই পর্যন্ত বলে রুচিরা থামল। পৃথ্বীশের দিকে দৃষ্টি ফিরিয়ে সকৌতুকে বললে, শোনো পৃথ্বীশ, আমি যদি সাহিত্যিক হতাম তাহলে বর্ণনা এইভাবে করতাম।

এগিয়ে চলেছে নায়িকা। হলুদ রংএর একখানি শাড়ি তার গৌরবর্ণ তনু দেহখানি জড়িয়ে রয়েছে। শীতের অপরাহ্নের আলো সেই দেহটিকে পলকে পলকে যেন সোনা-গলানো জলে স্নান করিয়ে দিচ্ছে। গায়ে একখানা মণিপুরী চাদর। চাদরের এক প্রান্তে ধুলো লেগে—একটু আগে যখন বসেছিল, তখন এই চাদরটা ছিল মাটির ওপরে। নায়িকা এগিয়ে চলেছে নায়ককে পথ দেখিয়ে।

সামনেই আখের ক্ষেত। গুড় তৈরির জন্যে এখান থেকে আখ নিয়ে গেছে গাড়ি গাড়ি। মাটিতে তখনো আখ আর শুকনো পাতা বিছিয়ে আছে। তারই মধ্যে দিয়ে দুজনে ঢুকল আখের বরজে। এ যেন মহলের পর মহল। মাথা ছাড়িয়ে ওঠা দীর্ঘ এক এক সার আখ যেন পাঁচিলের মতো আড়াল করে নিচ্ছে এদের। কারও মুখে কথা নেই। কী যেন এক দুর্নিবার উত্তেজনা তাদের দুজনকে ভীষণ একটা পরিণতির দিকে হাতছানি দিয়ে ডাকছে। আর তারাও একটার পর একটা মহল পার হয়ে ক্রমশঃ ভেতরে অদৃশ্য হয়ে যাচ্ছে। তারপর এক সময় বাইরে থেকে তাদের অস্তিত্বের আর কোনো চিহ্নই দেখা গেল না।

এমনিভাবে কতক্ষণ—কতক্ষণ কেটে গেল। দূরে ফেলে আসা ভুঁয়ের ওপর যে নির্বোধ উলঙ্গ দুটি বালক-বালিকা উন্মুক্ত প্রকৃতির মধ্যে স্বচ্ছন্দে ছোলা তুলে খাচ্ছিল হঠাৎ তারা যেন চমকে উঠল। পরস্পর পরস্পরকে দেখল উলঙ্গ। লজ্জায় জিব কাটল। তারপর ছুটে পালিয়ে গেল যে যার বাড়ি। তারপর—

রুচিরা থামল। হেসে বললে, তারপর আরও শুনবে?

পৃথ্বীশ সে কথার জবাব দিল না। গম্ভীরভাবে ড্রাইভারকে বললে, গাড়ি ফেরাও।

রুচিরা হাসতে হাসতে পৃথ্বীশের পিঠের ওপর মুখ ঘষতে লাগল। সকৌতুকে বললে, কী হল! ভয় পেলে?

পৃথ্বীশ উত্তর দিল না।

—যদি এবার আমি এগিয়ে আসি, পারবে আমাকে ফিরিয়ে না দিয়ে?

পৃথ্বীশ এবারও উত্তর দিল না। অন্যদিকে মুখ ফিরিয়ে সিগারেট ধরালো।

রুচিরা মনে মনে নিজের বুদ্ধির তারিফ করলে। যাক এক ঢিলে দুই পাখি মারা গেল। প্রথমত, পৃথ্বীশের হাত থেকে মুক্তি পাওয়া গেল, দ্বিতীয়ত বড়ো বড়ো বুলি আওড়ানো প্রেমের আর একবার পরীক্ষা নেওয়া হল। বাড়ি ফিরে এসে রুচিরা পেল সন্দীপের চিঠি। সন্দীপ লিখছে, সিমলার কোনো সদাশয় পরিবারের সহায়তায় সে চলেছে পশ্চিম জার্মানীতে অনির্দিষ্টকালের জন্য। কর্তব্যবোধে রুচিরাকে তা জানানো হল।

চিঠিখানা হাতে নিয়ে রুচিরা বিহ্বল বেদনায় স্তব্ধ হয়ে দাঁড়িয়ে রইল।

ঠিক পরের দিনই রুচিরা পেল আর একখানি চিঠি। পৃথ্বীশ লিখছে—আর একবার ভেবে দেখলাম সব জিনিসটা। তুমি যে আমার কাছে কিছুই গোপন করনি এইটেই আমার প্রতি তোমার অকৃত্রিম অনুরাগের জ্বলন্ত স্বাক্ষর। আবার বলছি—আমি প্রস্তুত।

রুচিরা এই চিঠি পড়তে পড়তে ঝরঝর করে কেঁদে ফেলল।

তিন মাস পরে।

সে দিন উৎসবান্তে রুচিরাকে নিয়ে পৃথ্বীশ ফিরে এসেছে নিজের কোয়ার্টারে। চারিদিকে ফাঁকা। সামনে এক টুকরো মাঠের ওপারে সার সার নারকেল গাছ। ওপাশে শিমুল গাছটা লাল ফুলে ভরা। খোলা মাঠের ওপর দিয়ে হুহু করে বাতাস আসছে।

আজ সারা দিন ধরে কী অপরিসীম উৎসাহে পৃথ্বীশ সাজিয়েছে ঘরখানি। জানলায় জানলায় পর্দা। ঘরের এক কোণে ছোটো টিপাইয়ের ওপর পিতলের কলসীতে রজনীগন্ধার ঝাড়। দেওয়ালে একখানি মাত্র অয়েল-পেন্টিং—কোনো আর্টিস্ট বন্ধুর উপহার। আর ড্রেসিং-টেবিলের ওপর এদের দুজনের বিয়ের ছবি।

বিকেলবেলা স্নান সেরেই পৃথ্বীশ কোথা থেকে নিয়ে এল দুটি ফুলের মালা। রুচিরা তখন গা ধুয়ে এসেছে সবে। পৃথ্বীশ একটি মালা পরলে নিজের গলায় আর একটি পরিয়ে দিল রুচিরাকে। হেসে বললে, আজই হবে আমাদের যথার্থ ফুলশয্যার উৎসব।

বলেই তাকালো রুচিরার দিকে উত্তরের প্রত্যাশায়। কিন্তু রুচিরা ভালো করে পৃথ্বীশের দিকে তাকাতে পারল না।

পৃথ্বীশ রুচিরার চিবুক স্পর্শ করে মুখটা একটু তুলে ধরে বললে, এই লজ্জাটিই হচ্ছে সব মেয়েদের ভূষণ—তা সে চাকরীজীবীই হোক আর—

কথা শেষ হল না। রুচিরা হঠাৎ গম্ভীরভাবে উঠে গেল জানলার ধারে।

পৃথ্বীশ সেই উঠে যাওয়াটি গভীর দৃষ্টিতে লক্ষ্য করল।

ক্রমে রাত্রি গভীর হল। ফাল্গুনের আজ কোন্ তিথি কে জানে। আকাশ উপচে পড়েছে চাঁদের আলো। খোলা মাঠের ওপর দিয়ে ছুটে আসছে দুরন্ত বাতাস—বাতাবী ফুলের গন্ধে ভরা। মাঠের ওপারে সারীবদ্ধ নারকেল গাছগুলোর পাতা যেন জ্যোৎস্না দিয়ে ধোওয়া। জানলার ফাঁক দিয়ে সেই জ্যোৎস্নার ধারা এসে পড়েছে বিছানার ওপর।

পৃথ্বীশ ধীরে ধীরে রুচিরাকে আকর্ষণ করতেই চমকে উঠল—রুচিরার চোখে জল।

ক্ষণকালের জন্য পৃথ্বীশের বাহুবন্ধন শিথিল হয়ে গেল। তারপর রুচিরার শুভ্র ললাটে অতি গাঢ় প্রেমে একটি চুমু দিয়ে বললে, সুখের দিনে এই চোখের জল—এও খুব স্বাভাবিক; নয় কি?

এ কথায় রুচিরা যেন শিউরে উঠল। কিন্তু শত চেষ্টা করেও মুখ ফুটে কিছু বলতে পরল না।

পৃথ্বীশ ধীরে ধীরে রুচিরার একখানি হাত নিজের হাতের মুঠোয় তুলে নিয়ে গাঢ় স্বরে বললে, আজ আমার ব্রতপূর্ণ। জীবনের এক পর্ব আজ শেষ হল। নতুন উৎসাহে এবার দ্বিতীয় পর্বের উদ্বোধন করব। কিন্তু তুমি আজ সারা দিনে একটি কথাও বলনি।

রুচিরা সহসা পৃথ্বীশের বুকে মুখ গুঁজে ফুঁপিয়ে উঠল। তার উত্তেজিত মুঠোয় পৃথ্বীশের জামা কুঁচকে গেল। অশ্রুরুদ্ধ কণ্ঠে রুচিরা বলে উঠল—দয়া করে তুমি আমার একটা কথা বিশ্বাস করো—আর যাই করে থাকি দেহটা অন্তত পবিত্র আছে। সেদিন তোমায় যা বলেছিলাম তা মিথ্যে।

এই বলে কাতর চোখে তাকালো পৃথ্বীশের দিকে।

পৃথ্বীশ প্রথমে যেন একটু অবাক হয়েছিল। পরক্ষণেই সরল প্রাণখোলা হাসি হেসে উঠল হা-হা করে। সে হাসির তরঙ্গাঘাতে রুচিরার সত্যাশপথ খান্ খান্ হয়ে গেল।

রুচিরা বিহ্বল বেদনায় দুই জলভরা চোখ মেলে আর্ত স্বরে বলে উঠল, তুমি আমায় বিশ্বাস করতে পারলে না?

পৃথ্বীশ তার অশ্রুভেজা চোখে চুমু খেয়ে শান্ত কণ্ঠে বললে, তুমি এখন ঘুমোও। বড়ো ক্লান্ত দেখাচ্ছে।

রুচিরার মনে হল, কী নিষ্ঠুর এই মানুষটা!

দেউলিয়া নীতি

পররাষ্ট্র নীতির উদ্দেশ্য কি? সংক্ষেপে বলা যেতে পারে, কোন দেশের স্বার্থকে আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে সুরক্ষিত করা।

ভারতীয় সংবিধানের নির্দেশক নিয়মাবলীতে (৫১ ধারা) বলা আছে, রাষ্ট্রে আন্তর্জাতিক শান্তি ও নিরাপত্তাকে এগিয়ে নিতে চেষ্টা করবে, বিভিন্ন দেশের সঙ্গে ন্যায্য ও সম্মানজনক সম্পর্ক বজায় রাখবে, আন্তর্জাতিক আইন ও চুক্তির দায়-দায়িত্বের প্রতি মর্যাদাবোধ সৃষ্টিতে সহায়তা করবে, এবং সালিশীর দ্বারা আন্তর্জাতিক বিরোধ মীমাংসায় উৎসাহ দেবে।

ভারত রাষ্ট্রের স্বার্থের পক্ষে নিরাপদ হবে ভেবেই সংবিধান-রচয়িতারা পররাষ্ট্র নীতির এই নির্দেশগুলি দিয়ে গিয়েছিলেন। পরে এর সঙ্গে যুক্ত হয়েছিল জোট-নিরপেক্ষতার আদর্শ।

ভারতের আজকের পররাষ্ট্র নীতির গতি-প্রকৃতির দিকে তাকালে দেখা যাবে এই নির্দেশাত্মক নীতিগুলি কিভাবে লঙ্ঘিত হচ্ছে।

পশ্চিম এশিয়ার পরিস্থিতি সম্পর্কে ভারতের অনুসৃত নীতি তার একটা ক্লাসিক দৃষ্টান্ত। জোট-নিরপেক্ষতার আদর্শ এখানে প্রকাশ্যভাবেই উপেক্ষিত, কারণ আরব জোটের সঙ্গে ভারত গোড়া থেকেই গাটছড়া বেঁধে বসেছিল। আর তার ফলে সংবিধানের নির্দেশানুযায়ী কাজ করা ভারতের পক্ষে সম্ভব হয়নি।

প্রথমত, পশ্চিম এশিয়ায় শান্তি ও নিরাপত্তা বিধানে যে সক্রিয় ভূমিকা ভারত নিতে পারত তা পারেনি, কারণ সে নিরপেক্ষ ছিল না।

দ্বিতীয়ত, ভারতীয় মুখপাত্রেরা বিভিন্ন সময়ে বলেছেন এবং সম্প্রতি নিউ ইয়র্ক টাইমস পত্রিকায় এক চিঠিতে আরেকবার বলা হয়েছে যে, রাষ্ট্র হিসেবে ইস্রায়েলের বেঁচে থাকার অধিকার ভারত স্বীকার করে। অথচ ৫ জুনের যুদ্ধ আরম্ভ হবার আগে ও পরে আরব নেতৃবৃন্দ যখন প্রকাশ্যেই বলতে থাকেন যে, এই যুদ্ধ ইস্রায়েলকে মানচিত্র থেকে মুছে ফেলবার যুদ্ধ, ভারত তখন তার বিরুদ্ধে কোন প্রতিবাদ করেনি। এটা ইস্রায়েলের সঙ্গে ন্যায্য ও সম্মানজনক সম্পর্ক রাখার দৃষ্টান্ত নয়।

তৃতীয়ত, প্রেসিডেন্ট নাসের যখন আকাবা উপসাগর ও তিরান প্রণালী দিয়ে ইস্রায়েলের জাহাজ চলাচল নিষিদ্ধ করে দিয়েছিলেন (যার ফলেই পশ্চিম এশিয়ায় যুদ্ধ ত্বরান্বিত হয়েছিল) তখন একটি আন্তর্জাতিক চুক্তি লঙ্ঘিত হয়েছিল। কারণ ১৯৫৬ সালের সাইনাই যুদ্ধের মীমাংসার শর্ত হিসেবেই ইস্রায়েল এই উপসাগর ও প্রণালী দিয়ে যতায়াতের অধিকার পেয়েছিল। কিন্তু ভারত প্রতিবাদে একটি কথাও বলেনি, বরং প্রেসিডেন্ট নাসেরের সিদ্ধান্তকে জোরালোভাবে সমর্থন করেছিল।

অর্থাৎ যে মূল আদর্শগুলি ভারতের পররাষ্ট্রনীতির ভিত্তিস্থানীয় বলে কথিত এবং যে আদর্শগুলি অনুসৃত না হলে আন্তর্জাতিক উত্তেজনা প্রশমিত হতে পারে না, তার সবগুলিই ভারতের পশ্চিম এশিয়া নীতিতে লঙ্ঘিত। একে পররাষ্ট্রনীতির পরিবর্তন বলে ভুল করার হেতু নেই। কেননা পশ্চিম এশিয়া সম্পর্কে ভারত বরাবরই এই একদেশদর্শী নীতি অনুসরণ করে এসেছে। তফাৎ ছিল এই যে, আগে এই নীতিকে কোন বাধা বা বিপত্তির সম্মুখীন হ'তে হয়নি। এখন সংকটের মুখে পড়ে এই নীতির দেউলিয়াপনা এক নিমেষে প্রকট হয়ে পড়ল।

তার ফল হয়েছে দু'রকম : আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে আরব জোটের কাছ থেকে আমরা প্রচুর পরিমাণে বাহবা পেয়েছি সত্যি, কিন্তু সাধারণভাবে পৃথিবীর চোখে ভারতের প্রতিচ্ছবি অনেকখানি ম্লান হয়ে গেছে। কেউ যেন একথা মনে না করেন ইস্রায়েলের প্রতি সমর্থন জানালেই ভারতের পররাষ্ট্রনীতির পবিত্রতা বজায় থাকত। মোটেই নয়। আরব উদ্বাস্তু সমস্যা সৃষ্টি করে ইস্রায়েলই যে পশ্চিম এশিয়া পরিস্থিতিকে ঘোরালো করে তুলেছে একথা অনস্বীকার্য। এর বিরুদ্ধে সঙ্গতভাবেই প্রতিবাদ করা উচিত। কিন্তু আমরা নৈতিক প্রতিবাদ আর পক্ষপাতদুষ্ট প্রতিবাদের মধ্যে তফাৎ করতে চাইছি। উদ্বাস্তু প্রশ্নের সমাধান যুদ্ধের মাধ্যমে করা আরব দুনিয়ার পররাষ্ট্রনীতি হ'তে পারে। কিন্তু তাই বলে সেটা ভারতেরও পররাষ্ট্র নীতি হবে এটা কেমন কথা? আরব উদ্বাস্তুর সংখ্যা বড় জোর বারো লক্ষ। পূর্ববঙ্গ থেকে উদ্বাস্তু এসেছে ৫০ লক্ষেরও বেশি। এখন যদি এই উদ্বাস্তুরা পূর্ববঙ্গের সীমান্তে আরব কম্যান্ডোদের আদর্শে গোলমাল সৃষ্টি করতে চায়, ভারত সরকার কি তাতে অনুমতি ও সমর্থন দেবেন? ভারত পক্ষপাতদুষ্ট হয়ে নৈতিক প্রতিবাদের জোর হারিয়ে ফেলেছে এই কথাটা আজ স্পষ্ট করে জেনে রাখা দরকার।

দ্বিতীয়ত, আভ্যন্তরীণ ক্ষেত্রে এই দেউলিয়া পররাষ্ট্র নীতি সম্পর্কে তীব্র বিরুদ্ধ সমালোচনা ধ্বনিত হতে শুরু করেছে। এমন কি এই নীতির নিয়ামকেরা নিজেদের দলের কাছ থেকেও বিচ্ছিন্ন হতে বসেছেন। সংসদে সাম্প্রতিক পররাষ্ট্র বিতর্ক এবং কংগ্রেসের পার্লামেন্টারী পার্টির সাম্প্রতিক আলোচনা থেকে এটা অত্যন্ত স্পষ্টভাবে প্রতীয়মান।

১৮ই জুলাই লোকসভায় পি-এস-পি'র শ্রীনাথ পাই যখন বলেছিলেন ভারতের নিরপেক্ষতাকে সাইনাই উপদ্বীপের মরুবালুর নীচে কবর দেওয়া হয়েছে, তখন তিনি এই দেউলিয়া নীতির বিরুদ্ধেই প্রতিবাদ জানাচ্ছিলেন। ১৭ই জুলাই আচার্য কৃপালনী কথাটাকে আরও পরিষ্কার করে বলেছিলেন। তিনি বলেন, ভারতীয় পররাষ্ট্র নীতি পরিচালিত হচ্ছে একটা ভয়ের দ্বারা, এবং গোষ্ঠী নিরপেক্ষতার নীতিকে ব্যবহার করা হচ্ছে একটা আড়াল হিসেবে।

কংগ্রেস পার্লামেন্টারী পার্টির সভায় (১৯ জুলাই) বিরোধিতা আরও চরমে উঠেছিল। এমনকি প্রধানমন্ত্রী যখন বলেন যে, সরকারের পশ্চিম এশিয়া নীতি দলের সমর্থনপুষ্ট, তখন অনেকেই ভোট নেবার দাবী জানিয়েছিলেন। সরাসরিই এই অভিযোগ করা হয়েছিল যে, দলের মতামতকে উপেক্ষা করেই এই নীতি গ্রহণ করা হয়েছে।

এই সোচ্চার সমালোচনার কোন শক্ত, আত্মবিশ্বস্ত জবাব সরকারী নেতৃবৃন্দ দিতে পারেননি। কেবল বস্তাপচা যুক্তিগুলিই মুখস্তের মত আউড়ে গেছেন। দেউলিয়াত্বের এটাও একটা প্রমাণ। পার্লামেন্টারী পার্টির সভায় দল থেকে যখন তীব্র ভাষায় পশ্চিম এশিয়া নীতির বিরোধিতা করা হয়, তখন প্রধানমন্ত্রী বলেন যে, এই নীতির পেছনে জাতির সমর্থন আছে। আরেকটু চাপে পড়লে তিনি হয়ত বলতেন এর পেছনে আরব দুনিয়ার সমর্থন আছে। এই ধরনের কথার অন্তর্নিহিত অসারতা ব্যাখ্যা করে বোঝাতে হয় না।

১৭ই জুলাই লোকসভার আলোচনায় হস্তক্ষেপ করে শ্রীমতী গান্ধী বলেছিলেন, শান্তি রক্ষার ব্যাপারে ভারতের একটা বৃহৎ ভূমিকা রয়েছে। কি ভূমিকা, যখন পশ্চিম এশিয়ায় যুদ্ধ ঠেকাতে কিংবা যুদ্ধোত্তরকালে উত্তেজনা প্রশমিত করতে ভারত সম্পূর্ণ ব্যর্থ হয়েছে? তিনি আরও বলেন, সরকারের (পররাষ্ট্র নীতির) আদর্শবাদ জনগণের স্বার্থ থেকে বিচ্ছিন্ন নয়। আরব রাষ্ট্র কিভাবে আমাদের স্বার্থ রক্ষা

করেছিল যখন পিকিংয়ে আমাদের দূতাবাস আক্রান্ত ও অবরুদ্ধ হয়েছিল?

তবু যদি প্রধানমন্ত্রী-কথিত শান্তির ভূমিকা ও আদর্শবাদ নিয়ে একটা জবান-বন্দী খাড়া করা চলত, সমস্ত প্রত্যাশাকে ধূলিসাৎ করে দিলেন ১৮ জুলাই পররাষ্ট্রমন্ত্রী শ্রীচাগলা। তিনি বললেন, পশ্চিম এশিয়াকে খুশি রাখা ভারতের পক্ষে একান্ত প্রয়োজন কারণ ঐ সব দেশের সঙ্গে ভারতের বছরে ১০০ কোটি টাকার বাণিজ্য হয়ে থাকে। আদর্শবাদের কি শোচনীয় পরিণতি! টাকার জন্যে নীতি? কি চমৎকার! অন্তঃসারশূন্য চিন্তাধারার কি সুন্দর উদাহরণ! এর পরে কি ভারতের নৈতিক উপদেশ দেবার কোন অধিকার রইল?

নীতি ও চিন্তার এই দৈন্য আমাদের উদ্বিগ্ন করছে। এর কারণ শুধু এই নয় যে, ভারতের আন্তর্জাতিক মর্যাদা এর ফলে একেবারেই বিলুপ্ত হতে পারে। এর গভীরতর কারণ আছে অন্যত্র। এই দৈন্য যত দীর্ঘায়িত হবে, সমালোচনাও ততই হবে প্রখর। আর সমালোচনা যত প্রখর হবে ততই লাভবান হবে তারা যারা ভারতকে একটি বিশেষ শিবিরের সঙ্গে যুক্ত করতে চায়। এরা যে ইতিমধ্যেই যথেষ্ট তৎপর হয়ে উঠেছে সেটা বোঝা যায় ভারত, নেপাল, ব্রহ্ম ও সিংহলকে নিয়ে একটি চীন-বিরোধী সামরিক জোট গড়ে তোলার প্রস্তাবে, এবং দলাইলামাকে সর্ব-প্রকার সাহায্য দিয়ে তিব্বত উদ্ধারে প্রবৃত্ত হবার দাবী থেকে। পশ্চিম এশিয়ায় ভারতের পররাষ্ট্র নীতির ব্যর্থতা এই শ্রেণীর সমালোচকের কাছে একটা মস্তবড় সুযোগের মত এসেছে।

নোবেল পুরস্কার বিজয়ী আলবার্ট লুথুলি নিহত

২১শে জুলাই নোবেল পুরস্কার বিজয়ী আলবার্ট লুথুলি ডারবানে এক মালবাহী ট্রেনের ধাক্কায় নিহত হন। তাঁকে শান্তির জন্য নোবেল পুরস্কার দেওয়া হয়েছিল।

মিঃ লুথুলির বয়স ছিল ৬৮ বছর। ১৯৫২ সালে সরকার তাঁকে জুলু অধি-নায়কের পদ থেকে অপসারিত করেছিলেন।

এই ট্রেনের ধাক্কায় তিনি গুরুতর-ভাবে আহত হলে তৎক্ষণাৎ তাঁকে হাস-পাতালে পাঠান হয়। অস্ত্রোপচার করা হয়েছিল এবং ডারবান থেকে সার্জেনও

পাঠানো হয়েছিল। কিন্তু তার পূর্বেই তিনি শেষনিঃশ্বাস ত্যাগ করেন।

গত আট বছর ধরে মিঃ লুথুলি তাঁর গৃহে অন্তরীণ ছিলেন। রেলসেতুর ওপর দিয়ে যখন তিনি যাচ্ছিলেন, তখন ট্রেনটি তাঁকে ধাক্কা দেয়।

মিঃ লুথুলি আফ্রিকান জাতীয় কংগ্রেসের ভূতপূর্ব সভাপতি। ১৯৬১ সালে তিনি নোবেল পুরস্কার আনতে অসলো গিয়েছিলেন।

নট্ নড়ন চড়ন --- নট্ কিচ্ছু

জনমত

মাথায় ভেঙ্গে পড়বে নাকি?

বৈষয়িক প্রসঙ্গ

মূল্য, মজুরী, মুনাফা

কর্মচারীদের ক্রমাগত মহার্ঘ-ভাতা বৃদ্ধির বিকল্প হিসেবে একসঙ্গে মজুরী, লাভ ও মূল্যবৃদ্ধি বন্ধ করার প্রসঙ্গ বিগত মুখ্যমন্ত্রী সম্মেলনে আলোচিত ও অনেকাংশে অনুমোদিত হওয়ার পর দেশের বহু রাজনৈতিক ও ট্রেড ইউনিয়ন নেতা এবং শিল্পপতিরা এই সম্পর্কে যে মতামত এযাবত ব্যক্ত করেছেন তা কোন অংশে গঠনমূলক না হলেও, প্রস্তাবের ত্রুটি ও ফাঁকগুলো জনসাধারণের সামনে তুলে ধরার অনেকখানি সহায়ক হয়েছে। প্রস্তাব উত্থাপিত হওয়ার অব্যবহিত পর থেকে এই প্রসঙ্গ নিয়ে যে দেশব্যাপী আলোচনার সূচনা হয়েছে তাতে দেখা যাচ্ছে যে, কংগ্রেস নেতৃবৃন্দ এবং শিল্পপতিরা প্রস্তাবের সমর্থন করছেন, অপরপক্ষে, বামপন্থী রাজনৈতিক নেতারা এবং দেশের সমস্ত ট্রেড ইউনিয়ন নেতারা এর ঘোরতর বিরোধিতায় এগিয়ে এসেছেন। প্রস্তাবের বিরোধিতায় বামপন্থী সরকারী নেতৃবৃন্দের মধ্যে সবচেয়ে মুখ্য ভূমিকা নিয়েছেন কেরলের মুখ্যমন্ত্রী শ্রী ই এম এস নাম্বুদ্রিপাদ। তিনি বলেছেন যে, বর্তমান অবস্থায় এই ধরণের প্রস্তাবের কোন মূল্যই নেই। প্রায় দশ বছরেরও বেশী সময় ধরে মূল্য ক্রমাগত বেড়েই চলেছে। মূল্যবৃদ্ধি রোধের কথা বহুবার উঠেছে বটে, কিন্তু রোধ সম্ভব হয়নি। এখনো হবে বলে কেউ বিশ্বাস করে না। মূল্যবৃদ্ধির কারণ সম্পর্কে পুঙ্খানুপুঙ্খ অনুসন্ধান ছাড়া, এ রোধ করা সম্ভব বলেও কেউ মনে করে না।

বস্তুতঃ বামপন্থী নেতৃবৃন্দ এবং ট্রেড ইউনিয়ন নেতাদের বক্তব্যের নির্গলিতার্থ এই যে, মূল্যবৃদ্ধি ঘটছে কেন্দ্রীয় সরকারের ত্রুটিপূর্ণ অর্থনীতির ফলে যার হঠাৎ কোনো পরিবর্তন ঘটানো সম্ভব নয়। ফলে যদি এই ধরণের কোনো অর্থনৈতিক বিধি চালু করার চেষ্টা হয় তাহলে মজুরী বৃদ্ধি রোধই সম্ভব হবে, কিন্তু মূল্য বা শিল্পপতি ও ব্যবসায়ীদের অতিরিক্ত লাভ বৃদ্ধি বন্ধ করার কোনো ব্যবস্থা কার্যকর হবে না। এই অবস্থায় কর্মচারী ও শ্রমিকদের জীবনধারণের মান আরো সংকুচিত হয় এইরূপ কোনো ব্যবস্থা তাঁরা সমর্থন করতে পারেন না।

আই-এন-টি-ইউ-সি অনুমোদিত জাতীয় রেলকর্মী সংঘের সভাপতি শ্রী এস আর বাসবদা বলেছেন যে, মহার্ঘ-ভাতা সাধারণভাবে জীবনধারণের ব্যয়ের মানের সঙ্গে জড়িত, কাজেই, মূল্যহ্রাস পেলে মজুরী ত' নিজে থেকেই হ্রাস পাবে। আসলে, সরকারের উচিত মূল্যবৃদ্ধি রোধের জন্য চেষ্টা করা।

মূল্য, মজুরী বৃদ্ধি রোধের প্রসঙ্গ নিয়ে দেখা যাচ্ছে যে আই এন টি ইউ সি এবং এ আই টি ইউ সি—দেশের এই দুটো শীর্ষস্থানীয় ট্রেড ইউনিয়নের মধ্যে মতের কোনো বিভেদ নেই। প্রস্তাবটি মুখ্যমন্ত্রী সম্মেলনে আলোচিত হওয়ার পর শ্রীডাঙ্গেই প্রথম এর বিরোধিতা করেন। পরে এ আই টি ইউ সির অন্যান্য নেতারা এই প্রস্তাবের—বিশেষভাবে মজুরী বৃদ্ধি রোধের প্রস্তাবের বিরুদ্ধে তীব্র আপত্তি প্রকাশ করেন। এ আই টি ইউ সির গুজরাট শাখার সেক্রেটারি শ্রীপি ডি গান্ধী ত সোজা ভাষায়ই বলেছেন যে, দ্রব্যমূল্যের স্থায়িত্ব-বিধানের কোনো চেষ্টা হলে আমরা তা সমর্থন করব, কিন্তু মজুরী বৃদ্ধি রোধের চেষ্টা হলে সর্বতোপণে তাতে বাধা দেব। নিঃ ভাঃ পোর্ট ও ডককর্মী ফেডারেশনের সভাপতি শ্রী এস আর কুলকার্ণি ত সোজাসুজিই বলে দিয়েছেন যে মজুরী বৃদ্ধি রোধের সিদ্ধান্ত হলে সংঘবদ্ধ শ্রমিকরাও 'কাজ বন্ধের' কথা চিন্তা করবে।

বলা বাহুল্য, শিল্পপতিদের অধিকাংশেরই বিবৃতিতে মজুরী বৃদ্ধি রোধের প্রস্তাবটি বিশেষভাবে সমর্থন লাভ করেছে, যদিও তাঁদের দিক থেকেও গঠনমূলক কোনো প্রস্তাব নেই। অর্থাৎ মূল্যবৃদ্ধি রোধের জন্য সরকারের পক্ষে কি করণীয় এবং তাঁদের পক্ষেই বা কি কর্তব্য, এই সম্পর্কে কোনো বাস্তব প্রস্তাব তাঁরা দিতে সমর্থ হননি। ফলে মুখ্যমন্ত্রী সম্মেলনের প্রস্তাবটি শুধু দেশবাসীর মতামতকে দুই শিবিরে বিভক্ত করা ছাড়া আর কোনো দায়িত্বই সম্পাদন করতে পারেনি।

গত সপ্তাহে লোকসভায় শ্রম দপ্তরের বাজেট সম্পর্কে আলোচনার কালেও এই প্রসঙ্গটি ওঠে। এইদিনের আলোচনায় মজুরী বৃদ্ধি রোধের যাঁরা তীব্র বিরোধিতা করেন তাঁরা সকলেই কংগ্রেসী। কেন্দ্রের প্রাক্তন উপমন্ত্রী শ্রী বি ভগবতী এই প্রসঙ্গে বলেন যে, যে দেশে শ্রমিকদের এখনও সর্বনিম্ন মজুরী দেওয়া ব্যবস্থা সম্ভব হয়নি, সেদেশে এই ধরণের প্রস্তাব অত্যন্ত ক্ষতিকর। বাংলার প্রবীণ কংগ্রেসী ও ট্রেড ইউনিয়ন নেত্রী ডঃ মৈত্রেয়ী বসু শ্রম দপ্তরের ব্যর্থতার তীব্র নিন্দা করে বলেন যে, যে মন্ত্রী দপ্তর এখন পর্যন্ত জাতীয় সর্বনিম্ন মজুরী নির্ধারণ এবং শ্রমিকদের সমস্ত মরসুমে পুরোপুরি কাজের কোনো আশ্বাস দিতে পারেনি তার টিকে থাকার কোনো অর্থ নেই। উত্তর-দেশের প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী শ্রীমতী সুচেতা কৃপালনীও কঠোর সমালোচনা করেন।

আলোচনার উত্তরে শ্রম দপ্তরের মন্ত্রী শ্রী এল এন মিশ্র লোকসভাকে এই সুস্পষ্ট আশ্বাস দেন যে, মূল্যবৃদ্ধি কার্যকরভাবে রোধের ব্যবস্থা হওয়ার আগে সরকার মজুরী বৃদ্ধি রোধে হাত দিতে যাচ্ছেন না। সরকার এপর্যন্ত মূল্যবৃদ্ধি রোধ করতে সমর্থ হননি, ফলে গত ২০ বছর ধরে শ্রমিকদের জীবনযাত্রার মান ক্রমাগত হ্রাস পেয়ে চলেছে। মূল্যবৃদ্ধি রোধে সরকারের প্রথম কাজ হচ্ছে ব্যাংকগুলোর ঋণদান ও অর্থলগ্নী নীতি নিয়ন্ত্রণের জন্য ব্যাংক ব্যবসায়ের ওপর সামাজিক কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠা করা। এক্ষেত্রে স্মরণ করা যেতে পারে যে, কেন্দ্রীয় অর্থমন্ত্রী শ্রীমোরারজী দেশাই দিনকয়েক আগে দেশের শীর্ষস্থানীয় ব্যাংক ব্যবসায়ীদের এক সম্মেলনে ডেকে ব্যাংকগুলোর ওপর সামাজিক নিয়ন্ত্রণের প্রসারের প্রয়োজনীয়তা বিবৃত করেন এবং তাঁদের কাছ থেকেও এই সম্পর্কে সুপারিশ আহবান করেন। এই সুপারিশ এখন পর্যন্ত সরকারের হস্তগত হয়নি এবং কেন্দ্রীয় সরকার যাঁদের ওপর 'রিপোর্ট' তৈরী করার ভার দিয়েছেন তাঁরাও এখন পর্যন্ত তা পেশ করেন নি। এই রিপোর্ট ও সুপারিশ হস্তগত হলে সরকার হয়তো তাঁদের পরবর্তী কর্মপন্থা বিবেচনা করতে পারবেন। তবে এই প্রসঙ্গে বলা দরকার যে মূল্যবৃদ্ধির সমস্যাটি শুধু ব্যাংক ব্যবসায়ীদের লগ্নীনীতির সঙ্গে সম্পর্কিত এই ধরণের চিন্তা না করে, সরকারী ব্যয় ও কর নীতিও এই সম্পর্কে কতখানি দায়ী তাও বিশেষভাবে ভেবে দেখা কর্তব্য। গত বৎসর রিজার্ভ ব্যাংকের গবর্ণর আয়, মজুরী ও মূল্যনীতি সম্পর্কে পর্যালোচনা ও রিপোর্ট দানের জন্য একটি কমিটি নিয়োগ করেন। গত জানুয়ারী মাসে এই কমিটির রিপোর্ট প্রকাশিত হয়। রিপোর্টে তাঁরা সোজাসুজিই বলেছিলেন যে বর্তমান অবস্থায় আয়ের সর্বোচ্চ সীমা বা মজুরীর সর্বনিম্ন হার কোনটাই বেঁধে দেওয়া সম্ভব নয়। কমিটি বরং এই অভিমত প্রকাশ করেন যে, লগ্নী—বিশেষভাবে শেয়ার ও মূলধনের ওপর যথোপযুক্ত লাভ হতে দেওয়া দরকার, তবে মূলধনের ওপর লাভের সঙ্গে শ্রমের মূল্যেরও সংগতি থাকা চাই। রিজার্ভ ব্যাংকের বিশেষজ্ঞদের এই রিপোর্ট দেওয়ার ছ'-সাত মাসের মধ্যে দেশের বৈষয়িক অবস্থার এমন কোনো পরিবর্তন ঘটেনি যাতে ভিন্নরূপ প্রস্তাব উঠতে পারে।

বিগত দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের পর থেকেই মুদ্রাস্ফীতির দরুণ ক্রমাগত মূল্যের গতি উর্ধমুখী রয়েছে। স্বাধীনতার পর থেকে সরকারের লগ্নীনীতি এই মুদ্রাস্ফীতিকে আরো আকাশ-ছোঁয়া করে তুলেছে। ভারী শিল্পগুলোকে অত্যধিক গুরুত্বদান, ভোগ্যপণ্যের উৎপাদন বৃদ্ধিতে তাচ্ছিল্য, কৃষি উৎপাদন বৃদ্ধিতে অবহেলা, কেন্দ্র ও বিভিন্ন সরকারের বছরের পর বছর ধরে ঋণাত্মক ব্যয় ভারতের অর্থনীতিকে এমন এক গুরুতর অবস্থার সম্মুখীন করেছে যা থেকে মুক্তির সহজ কোনো দাওয়াই নেই। বছরের পর বছর কর বৃদ্ধি দ্বারা কেন্দ্রীয় সরকার পণ্যমূল্যকে আরো উর্ধমুখী করার কাজে সহায়তাই করে এসেছেন। এই অবস্থায় সাময়িক কোনো প্রলেপ দিলে রোগের প্রশমন হবে না বরং তার বৃদ্ধি ঘটে দেশে আরো বিশৃংখলার সৃষ্টি হবে।

ভিভিয়েন লের সঙ্গে কানন দেবী

ভিভিয়েন লের সঙ্গে কানন দেবীর সাক্ষাৎকার

মাত্র কয়েক ঘণ্টার দেখা, তাও কতদিন আগে। কিন্তু মনের মধ্যে যেন আলোর মত স্বচ্ছ আর উজ্জ্বল হয়ে রয়েছে এখনও ভিভিয়েনের মধুর ব্যক্তিত্ব। পত্রিকার প্রথম পাতায় 'ভিভিয়েন লে ডেড্'—কথাটা যেন প্রচণ্ড ধাক্কার মত মনে এসে লাগল। আর পাতাও ওল্টানো হোলো না, কোনো খবর পড়াও হোলো না, সব কাজের ফাঁকে ফাঁকে যেন গানের প্রথম চরণের মত মনের মধ্যে বাজছে রিনরিনে মিষ্টি স্বর "বিলিভ মি, আই লাভ ইন্ডিয়া"—বলছিলেন কানন দেবী। ভিভিয়েন লে প্রসঙ্গে ঠিক সেইদিনই, যেদিন পত্রপত্রিকায় ভিভিয়েনের মৃত্যুসংবাদ ঘোষিত হোলো।

'কতদিন আগে ভিভিয়েন লের সঙ্গে দেখা হয়েছিল? কি উপলক্ষ্যে?' জিজ্ঞেস করি।

"১৯৪৭ সালে যখন ওদেশে যাই দেশ দেখবার বাসনা ছাড়াও মনের মধ্যে একটা প্রবল তাগিদ ছিল হলিউড দেখবার। হলিউডের সম্বন্ধে এত শুনেছিলাম যে ও বস্তু না দেখে ফিরবই না এমনই পণ করে বেরিয়েছি। দেখে তাজ্জব বনে গেছি। স্বপ্নকেও হার মানায়—"ফ্যাক্টস্ আর স্ট্রেঞ্জার দ্যান ফিক্‌শন"—কথাটা নতুন করে উপলব্ধি করলাম যেন। যাক্ যা বলছিলাম। "গন উইথ দি উইন্ড"-এ স্কারলেটের ভূমিকায় অভিনয় করে ভিভিয়েন তখন যাকে বলে বিশ্বজয় করে ফেলেছেন। অন্য সবার মত আমিও ও'র খুব অ্যাডমায়ারার হয়ে উঠেছি। নানা দেশ ঘুরতে ঘুরতে অবশেষে ভিভিয়েন লের দেশে পৌঁছলাম। ও'র সঙ্গে দেখা হবার আগে ও দেশের অনেক সমকালীন তারকা যেমন স্পেন্সার ট্রেসি, ক্লারক গ্যারল, ক্যাথরিন হেপবার্ণ, অ্যাডাল্ট মঞ্জু এ'দের সঙ্গেও দেখা হয়েছে, আলাপও হয়েছে। ও'রা সকলেই খুব আনন্দময়, সদালাপী, ভদ্র, অমায়িক। তবু সকলকে ছাপিয়ে ভিভিয়েন যেন মনের মধ্যে পরিব্যাপ্ত হয়ে রয়েছে। ফুলের মিষ্টি সৌরভ যেমন অজান্তেই মনকে আচ্ছন্ন করে ঠিক সেই রকম যেন তার আকর্ষণ।"

"খুব কথা বলতে পারতেন বুঝি?"

"মোটেই না। বরং যাকে বলে স্বল্প-ভাষিণী, তিনি তাই।"

"খুব ব্যক্তিত্বসম্পন্না?"

"প্রখর ব্যক্তিত্বশালিনী বলতে যা বোঝায় ঠিক তা নয়। কিন্তু খুব প্লেজেন্ট পার্সোনালিটি। দেখামাত্রই শুধু চোখই টানে না মনও টানে। আগের অ্যাপয়েন্টমেন্ট অনুযায়ী স্টুডিও সেটেই ও'র সঙ্গে দেখা হোলো। উনি স্টুডিও মেক-আপে ছিলেন। পরনে ছিল নেটের ভেল, স্কার্ট আর আমাদের কাশ্মীরী কোটের ধরনের এমব্রয়ডারীকরা একটি ঘন নীল কোট।

ছবির ডিরেক্টার ও'কে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে হাত, পা নেড়ে কি যেন বোঝাচ্ছিলেন। ছোট্টখাটো, মিষ্টি চেহারার মেয়ে। ওড়নার জন্যই বোধহয় রহস্যঘেরা হয়ে মুখখানি বড় সুন্দর দেখাচ্ছিল। ঠিক যেন একটি পরী। সলজ্জ হাসি, মধুর চাউনি, আন্তরিকতা ভরা ব্যবহার সব মিলিয়ে এমন একটা কোমল সুষমা ও'কে মাধুর্যময়ী করে তুলেছিল! এ সৌন্দর্যের মধ্যে যেন একটা ভারতীয় গন্ধ ছিল যাকে বলে "ওরিয়েণ্টাল টাচ্"— হয়ত সেইজন্যই এত ভাল লেগেছিল।"

"কোন ফিল্মের স্যুটিং হচ্ছিল?"

"যতদূর মনে পড়ছে, 'এ স্ট্রীট কার্ নেম্ড ডিজায়ার"— "গন উইথ দি উইণ্ড"-এর মত এ বইটিও অস্কার প্রাইজ পেয়েছিলো।"

"ও'র সঙ্গে কি কথা হোলো?"

"আলাপ হতেই জিজ্ঞেস করলেন আমাদের দেশে কি ধরনের ফিল্ম তৈরী হয়, বছরে কটা। টেকনিশিয়ান, স্টুডিও, মেশিনারীর বিষয়ও জানতে চাইলেন। আমিও বলেছিলাম, জানই ত আমাদের দেশ কত গরীব? প্রতিভাবান টেকনিশিয়ানের অভাব হয়ত আমাদের নেই কিন্তু আপ-টু-ডেট ইকুইপ্মেণ্টস-এর অভাবে তাদের যথার্থ আত্মবিকাশ হচ্ছে না। ফিল্মে আমরা সাধারণতঃ গল্পের ওপরই জোর দিই বেশী, গান যাতে চিত্তাকর্ষক হয় সেদিকে বিশেষ নজর থাকে। কারণ নানা অভাব ও সমস্যা-ক্লিষ্ট সাধারণ মানুষ অল্পখরচে একটু আনন্দ করতে যায় ত? তাই চিত্তবিনোদনের দিকটির কথা সবসময় মনে রাখতে হয়।"

শুনে একটু যেন অপ্রতিভ হয়ে লাজুক হাসির ছন্দে বললেন—"তোমাদের দেশের ছবি দেখতে আমার এত ইচ্ছে করে। অনেক দিন ওদেশে ছিলাম বলে কিনা জানি না, ভারতবর্ষের ওপর আমি কেমন যেন একটা অজানা আকর্ষণ (আননোন অ্যাট্রাক্শন) অনুভব করি। **বিলিভ মি আই লাভ ইন্ডিয়া।**—হ্যাভ ইউ গট এনি পিক্চার?"

"অবিশ্বাস করবার কোনো কারণ ছিল ছিল না। ও'র কথাগুলি যেন আন্তরিকতায় ভেজানো। এ যদি ও'র পোজ হোতো তাহলে এমন করে আমার অন্তর স্পর্শ করত না। বিদেশিনীর ভারতপ্রীতি। আনন্দে কৃতজ্ঞতায় মনকে যেন ভিজিয়ে দিল। বেশ মনে পড়ে চোখে জল এসে পড়ছিলো। দেশকে যে কত ভালবাসি বিদেশিনীর দুটি কথায় তা যেন নতুন করে অনুভব করলাম। যাই হোক আবেগ সামলে নিয়ে বললাম—"আমি ত' এদেশে কোনো ব্যবসায়িক উদ্দেশ্যে আসিনি। তোমাদের দেশ, তার শিল্পী ও শিল্পকলা দেখবার বড় ইচ্ছে ছিল তাই আসা।"

কথাবার্তার পর আমায় ও'র স্যুটিং দেখতে নিয়ে গেলেন। উনি যতক্ষণ স্যুটিং-এ ব্যস্ত ছিলেন, অন্যান্য সবাই সমানে আমার কাছে কাছে ছিলেন। যা জানতে চাইছিলাম খুব আগ্রহভরে বুঝিয়ে দিচ্ছিলেন। জিজ্ঞাসু চোখগুলি যেন বলছিলো—"হোয়াট ক্যান্ উই ডু ফর ইউ?" বড় অতিথিপরায়ণ।

স্যুটিং শেষ হওয়ার পর একসঙ্গে লাঞ্চে বসলাম। ও'রা আগেই নিমন্ত্রণ করে রেখেছিলেন। অন্যান্য অনেক নামী আর্টিস্টও ছিলেন। ভিভিয়েন আমায় খুব আদর করে পাশে নিয়ে বসলেন। খেতে বসে সমানেই আমার খাওয়ার তদারক করছিলেন। যাতে আমার এতটুকু অসুবিধা না হয় নিপুণা গৃহকর্ত্রীর মত সেদিকে ও'র লক্ষ্য ছিল। পুডিং খাওয়ার সময় জিজ্ঞেস করলেন "হাউ ডু ইউ লাইক ইট্?" "ভেরী নাইস।" আমি বল্লাম। সঙ্গে সঙ্গেই দুষ্টু হাসি হেসে বল্লেন,—"বাট্ নট্ লাইক্ ইওর পায়েস।" তারপর নিজের মনেই যেন বলে চল্লেন—"আমাদের পুডিংএ সেণ্ট দিয়ে গন্ধ তৈরি করতে হয় কিন্তু ইণ্ডিয়ার পায়েসের চালে নিজস্ব গন্ধেই ভরপুর (রিচ্ উইথ্ ইট্স ওন ফ্লেবার)।" আমি অবাক হয়ে চেয়েছিলাম। ভারতবর্ষের খুঁটিনাটি জিনিস উনি এমন করে মনে রেখেছেন।

আমায় যখন "নাইটিঙ্গেল স্টার অফ্ ইণ্ডিয়া" বলে ও'র সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দেওয়া হয়েছিলো উনি উচ্ছ্বসিতভাবে আমায় জড়িয়ে ধরে "অন্ততঃ একটি (এ্যাট্ লিস্ট ওয়ান) টেগোরস সঙ্গ" শুনতে চেয়েছিলেন। কিন্তু অল্পসময়ের মধ্যে আলাপ, স্যুটিং, স্টুডিও দেখা, লাঞ্চ খাওয়া ইত্যাদি প্রোগ্রামে ঠাসা ছিল বলে গান শোনানো আর হয়ে ওঠেনি।" কানন দেবী থামলেন।

"তারপর?"

"তারপর আর কি? আমি ও'কে গান শোনাতে পারিনি কিন্তু ও'র মধুর কথা, আচরণ, বিদায়-বেলার হাসিভরা চাউনি গান হয়ে যেন আমার অন্তরে বাজছে। অনেক জিনিস থাকে না? কাছে থেকে ঠিক অনুভব করা যায় না। কিন্তু সময় ও দূরত্বের থিতিয়ে যাওয়া আলোয় যেন স্থির নক্ষত্রের মত স্মৃতির আকাশে জ্বলজ্বল করে। ভিভিয়েন এমনই একটি স্নিগ্ধ তারা, তার দীপ্তি আছে কিন্তু দাহ নেই, আলো আছে তবু তীব্রতা নেই।"

পশ্চিমের সেই সুন্দর তারা আজ অস্তমিত। সেই অস্ত আলোর, রঙিন ম্লানতার দিকে করুণ চোখে চেয়ে আছে পূবের আর একটি তারা।

[শ্রীমতী কানন দেবীর সঙ্গে আমাদের প্রতিনিধি শ্রীমতী সন্ধ্যা সেনের সাক্ষাৎকার]

বার্লিন চলচ্চিত্র উৎসব '৬৭

দিলীপ মালাকার

বার্লিন, জুলাই, সমালোচকরা সাধারণতঃ কঠোর ও নির্মম হয়ে থাকে। জার্মান চলচ্চিত্র সমালোচকরা এই নীতির বাইরে নয়। কিছু জার্মান সমালোচক বলেছেন যে, বছরের পর বছর বার্লিন ফিল্ম ফেস্টিভ্যালের মান অবনতির দিকে। কিন্তু আরেকদল সমালোচক একথাও বলেছেন যে, শুধু ফেস্টিভ্যালের দোষারোপ করলে হবে কেন? ভাল ও মনের মতন ছবি যদি না আসে বার্লিনে তাহলে শুধু ফেস্টিভ্যালকে দোষ দিয়ে লাভ কি? ভাল ও মনের মতন ছবি আজকাল খুব বেশী তৈরী হচ্ছে না। তারপর বার্লিনের রাজনৈতিক অবস্থিতির জন্যে অনেক দেশ এখানে ছবি পাঠায় নি। ভাল ছবিগুলো পাঠায় কান, মস্কো ও ভেনিসে। তবে এবছরের বার্লিন ফেস্টিভ্যালে অনেক নতুনত্ব দেখেছি, বার্লিন ফেস্টিভ্যাল সুরু হওয়ার পর থেকে গত বছর পর্যন্ত কোনো কম্যুনিস্ট দেশের ছবি আসে নি। এবারই প্রথম এসেছে। এবং যুগোস্লাভিয়া প্রতিযোগিতায় প্রথম যোগদান করেই একটি সরকারি পুরস্কার লাভ করেছে। অবশ্য এই রাজনৈতিক কারণের জন্যেই ফেস্টিভ্যালের গোড়ায় রটে যায় যে, যুগোস্লাভিয়া একটা পুরস্কার পাবেই। ফেস্টিভ্যালের রাজনীতি এখানেই।

দ্বিতীয়তঃ বার্লিন ফেস্টিভ্যাল এখন থেকে একটি কোম্পানীতে পরিণত হয়েছে। সরকারের কোনো একাধিপত্য থাকবে না। কোম্পানীর ডিরেক্টররা যা করবার করবেন। এদের আর্থিক অবস্থা খারাপ হওয়ায় এবছর এরা বিদেশীদের নেমতন্ন করেছে কম এবং অনেক অতিথিদের একবেলা উপোষ রেখে পয়সা বাঁচিয়েছে।

বার্লিন ফেস্টিভ্যালের সবচেয়ে বড় খবর হল ভারতের এই প্রথম গোল্ডেন বিয়ার বা প্রথম পুরস্কার লাভ। ডকুমেন্টারি বিভাগে ভারতের "থ্রু দি আইজ অফ এ পেন্টার" ছবিটা প্রথম পুরস্কার বা গোল্ডেন বিয়ার পেয়েছে। এর আগে অনেক ভারতীয় ছবি বিভিন্ন পুরস্কার লাভ করেছে কিন্তু কখনো গোল্ডেন বিয়ার পুরস্কার পায়নি। এদিক দিয়ে এটি ঐতিহাসিক।

দি হুইসপারার্স ছবির নায়িকা শ্রীমতী ইভান্স।

সিনেমা ফেস্টিভ্যালের গুণাগুণের চেয়ে উৎসবের বৈচিত্র্যপূর্ণ খবরের দিকেই আমার বরাবর ঝোঁক। প্রতিটি ছবির আঙ্গিক বৈশিষ্ট্য নিয়ে চুলচেরা বিশ্লেষণে সময়পাত ও সংবাদপত্রের কাগজের অভাববোধই আমায় সচেতন রাখে। তাই সংক্ষেপে সারছি। ১৯৬৫ সালে একটি অশ্লীল জাপানি ছবি নিয়ে বার্লিন ফেস্টিভ্যালে বেশ সোরগোল আনে। জার্মান সাংবাদিকেরা তাকে বলেছিল কেলেঙ্কারি। ফলে জাপান সরাসরি প্রতিবাদ জানিয়ে বলেছিল যে তারা আর বার্লিন ফেস্টিভ্যালে যোগদান করবে না। সম্ভবত ওদের কলহ মিটে গেছে। তাই তারা এবার ছবি পাঠায়! '৬৫ সালের অশ্লীল জাপানি ছবির ঠিক বিপরীত ছবি এবার দেখান হয় বার্লিনে। ছবির নাম 'প্রেমের তিন রূপ'। ছবি দেখে মনে হবে যেন ভারতীয় ছবি দেখছি। ছবিটা আগাগোড়া নাটকীয়।

এবছরের বার্লিন ফেস্টিভ্যালে পূর্ণ দৈর্ঘ্যের ছবি দেখান হয় তেইশটি। দুটো ছিল প্রতিযোগিতার বাইরে। প্রতিযোগিতার বাইরে দুটো ছবিই ছিল উৎকৃষ্ট। প্রতিযোগিতার মধ্যে থাকলে নিশ্চয়ই পুরস্কার পেত। একটি হল আমেরিকার 'ও ড্যাড, পুয়োর ড্যাড' আর বৃটিশদের "দি পেন্ট হাউস"। এই ছবির এক জায়গায় রেকর্ডে সেতার শোনান হয়। বিদেশী ছবিতে সম্ভবতঃ এই প্রথম ভারতীয় সঙ্গীত পরিবেশন। ডকুমেন্টারি বিভাগে দেখান হয় একুশটি ছবি। পূর্ণ দৈর্ঘ্যের বিভাগে যোগদান করে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র, যুগোশ্লাভিয়া, বৃটেন, ডেনমার্ক, ইতালি, ফ্রান্স, হল্যান্ড, জার্মানী, আর্জেন্টিনা, বেলজিয়াম, জাপান, নরওয়ে, সুইডেন, গ্রীস। বার্লিন ফেস্টিভ্যালে এই প্রথম ভারতীয় ছবি আসেনি বা গৃহিত হয়নি। এসম্পর্কে ভারত সরকারের তথ্য বিভাগ ও ফেস্টিভ্যাল কমিটির মধ্যে লুকোচুরি খেলা হয়েছে বলে মনে করি। সত্যজিৎ ছটি ভারতীয় ছবি বার্লিনের জন্যে মনোনীত হয় কিন্তু

গৃহীত হয়নি একটিও। 'বালিকা বধূ' কেন এল না এসম্পর্কে এখনও আমরা অন্ধকারে। "বালিকা বধূ" বার্লিন প্রতিযোগিতায় দেখান হলে একটা না একটা পুরস্কার সে পেতই। সে বিষয়ে আমি নিঃসন্দেহ।

ডকুমেন্টারি বিভাগে যোগদান করে উপরোক্ত দেশ ছাড়াও আয়ারল্যান্ড, কানাডা, ভারত, ইস্রায়েল ও তিউনিশিয়া। একমাত্র তিউনিশিয়া বাদে আর কোনো আরব রাষ্ট্র এবারকার বার্লিন ফেস্টিভ্যালে যোগদান করেনি।

অন্যান্য বছরের তুলনায় এবার পুরস্কারের বহরও কমান হয়। পুরস্কার বিতরণে রাজনীতির ছোঁয়াচ থাকেই। প্রথম পুরস্কার বা গোল্ডেন বিয়ার পাওয়া বেলজিয়ান ছবির পরিচালক এক পোলিশ এবং নায়ক-নায়িকা ফরাসী। একালের তরুণ সমাজের ওপর তোলা এই ছবি। ছবির নাম "ল্য দেপার" বা যাত্রা। দ্বিতীয় পুরস্কার বা সিলভার বিয়ার দেওয়া হয় শ্রেষ্ঠ পরিচালনার জন্যে যুগোশ্লাভ ছবি 'দি এ্যাওয়েকেনিং অব র‍্যাটস' ছবির পরিচালক মিঃ পাভলোভিচ্‌কে। কম্যুনিস্ট দেশের প্রথম ছবি বার্লিনে আসে বলে গোড়াতেই রটে যায় যে, এ ছবিকে একটা না একটা পুরস্কার দেওয়া হবেই। তবে ছবিটা খারাপ নয়। তার গুণের জন্যেই সে পুরস্কার পেয়েছে।

শ্রেষ্ঠ অভিনেতা ও অভিনেত্রীর পুরস্কার সিলভার বিয়ার সুপাত্রেই দেওয়া হয়েছে। সেবিষয়ে কারুর দ্বিমত নেই। ফরাসী ছবি 'ল্য ভিয়েই ওম্‌ এ লফ'-এর প্রধান নায়ক মিশেল সিমঁর অভিনয় সবাইকে মুগ্ধ করেছে। এক বৃদ্ধ ও এক ইহুদি বালকের মধ্যে কীভাবে প্রীতি গড়ে ওঠে দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের মধ্যে তারই কাহিনী। শ্রেষ্ঠ অভিনেতা ও অভিনেত্রীর দুটো পুরস্কার এবার দেওয়া হয় বৃদ্ধ-বৃদ্ধাদের। শ্রেষ্ঠ অভিনেত্রীর পুরস্কার দেওয়া হয় বৃদ্ধার ভূমিকায় অভিনয়ের জন্যে মিসেস এডিথ ইভান্সকে। বৃটিশ ছবি 'দি হুইস্‌পারার্স'-এর এক বৃদ্ধার করুণ কাহিনী অনবদ্যভাবে ফুটিয়ে তুলেছেন মিসেস ইভান্স। এছবিটা প্রথম পুরস্কার পেলে সবাই খুশী হত।

ফেস্টিভ্যাল জুরিদের বিশেষ পুরস্কার দেওয়া হয় ফরাসী ছবি "লা কলেকশিওনোজ" ছবির বিষয়বস্তুর জন্যে। একালের যুব সমাজের সমস্যা নিয়ে তোলা ছবিটা। অভিনয় মন্দ হয়নি। তবে এটি প্রথম শ্রেণীর ছবি নয়। এই বিভাগে তৃতীয় পুরস্কার দেওয়া হয় পশ্চিম জার্মানীর 'আগ্লে ইয়ার ভিডের' ছবির পরিচালক মিঃ শ্লেনডর্ফকে। ফরাসী ছবির মতন একালের সামাজিক সমস্যা নিয়ে তোলা ছবিটা।

ডকুমেন্টারী বিভাগে প্রথম বা গোল্ডেন বিয়ার পুরস্কার পেয়েছে চিত্রশিল্পী এম. এফ. হুসেন এর 'থ্রু দি আইজ অব এ পেন্টার'। শিল্পীর দৃষ্টিতে দেখা রাজ-

ল্য ভিয়েই ওম এ লফ' ছবির একটি দৃশ্য।

স্থানের সাধারণ মানুষের জীবনযাত্রা। দ্বিতীয় বা 'সিলভার বিয়ার' পুরস্কার দেওয়া হয় আয়ারল্যান্ডের "স্লি কোইল" উৎসব ছবি। আইরিশ উৎসবে জনসাধারণের অভিব্যক্তি প্রকাশ পেয়েছে এই ছবিতে।

বেসরকারি পুরস্কার দেওয়া হয় অনেকগুলো (১) বার্লিন সিনেটের 'তরুণদের সমস্যা' পুরস্কার দেওয়া হয় ফরাসী ছবি "লা কলেকশিওনোজ"কে। (২) আন্তর্জাতিক সিনেমা সমালোচক সমিতির পুরস্কার দেওয়া হয় জার্মান ছবি 'আগ্লে ইয়ার ভিডের'কে। (৩) প্রোটেস্টান্ট পুরস্কার দেওয়া হয় নরওয়ের 'হার হায় ডু ডিট্‌ লিভ' ও ফ্রান্সের 'ল্য ভিয়েই ওম্‌ এ লফ'কে। নরওয়ের ছবিটা এপিকধর্মী। বড্ড বেশী বড় হওয়ায় অন্য বড় পুরস্কার পায়নি। (৪) ক্যাথলিক পুরস্কার দেওয়া হয় 'দি হুইসপারার্স'কে। (৫) প্রোটেস্টান্ট পুরস্কারের দুটো ছবিকে আবার দেওয়া হয় 'সিভাল্ক পুরস্কার'। (৬) সিনেমা সমালোচক সমিতির আরেকটি দল 'ইউনিক্রিট'দের পুরস্কার দেওয়া হয় বেলজিয়ান ছবি 'ল্য দেপার'কে। (৭) ডিরেক্টার আর্ট সমিতির পুরস্কার দেওয়া হয় নরওয়ের 'হার হায় ডু ডিট্‌ লিভ' ছবিকে।

খেয়া চিত্রে মাধবী মুখোপাধ্যায়

প্রেক্ষাগৃহ

আজকের কথা :

পশ্চিমবঙ্গে জাতীয় নাট্যশালা সম্পর্কে ধ্যান-ধারণা (৪)

বিশ্বরূপা নাট্য-উন্নয়ন পরিকল্পনা পরিষদ আয়োজিত নবম বার্ষিক বঙ্গনাট্য-সাহিত্য সম্মেলনের ১০ই এবং ১১ই জুলাই, সোম ও মঙ্গলবারে অনুষ্ঠিত পঞ্চম ও ষষ্ঠ অধিবেশন দুটিতে আলোচ্য বিষয়বস্তু ছিল "জাতীয় নাট্যশালার সংজ্ঞা নির্ধারণ এবং রবীন্দ্র-সদনের গঠন ও কর্মসূচী"। প্রথম দিনের বক্তাদের মধ্যে ছিলেন নাট্যকার-পরিচালক-অভিনেতা রমেন লাহিড়ী, ঐ দিনের প্রধান অতিথি সাহিত্যিক মনোজ বসু, দেবব্রত বেজ, অধ্যাপক ডঃ অজিতকুমার ঘোষ, বিগতদিনের প্রথিতযশা মঞ্চশিল্পী ও নাট্য-পরিচালক সতু সেন, ভারতীয় গণ-নাট্য সঙ্ঘের অন্যতম প্রতিষ্ঠাতা সুধী প্রধান এবং রবীন্দ্রভারতী বিশ্ববিদ্যালয়ের নাট্য বিভাগের অধ্যক্ষ ডঃ সাধনকুমার ভট্টাচার্য। আমরা এ'দের প্রত্যেকেরই বক্তব্যের সারাংশ নীচে বিবৃত করছি।

রমেন লাহিড়ী : প্রশ্ন ওঠে, জাতীয় বলতে আমরা কি বুঝব—বাঙালী, না ভারতীয়? জাতীয় রঙ্গালয় নেবে আমাদের সংস্কৃতিকে তুলে ধরার দায়িত্ব ; সঙ্গে সঙ্গে আমাদের সকল রকম গোঁড়ামিকে দূর ক'রে হবে আমাদের অগ্রগতির সহায়ক। সারা ভারতের বিভিন্ন রাজ্যের মধ্যে একটি ভাবগত ঐক্য যাকে বলি ন্যাশনাল ইনটিগ্রেশন—[illegible]

তোলবার যে সমস্যা আমাদের সামনে রয়েছে, আমাদের জাতীয় রঙ্গালয়ের মূল কর্মসূচী হবে তাই, নাটকের ভিতর জাতিগত মূল সূত্রগুলিকে তুলে ধ'রে, জাতীয় চেতনাকে উদ্বুদ্ধ ক'রে এক অখণ্ড ভারত গড়ে তোলায় সচেষ্ট হ'তে হবে। শিশিরকুমারের (ভাদুড়ী) দাবির সূত্র ধরে বলা যেতে পারে যে, রবীন্দ্র-সদন যাতে নাট্য অনুশীলন-কারীদের কাছে সহজলভ্য হ'তে পারে, জন-সাধারণের ভাষা, আশা-আকাঙ্ক্ষা যাতে এর মাধ্যমে সুষ্ঠুভাবে রূপায়িত হ'তে পারে, তাই আমাদের কাম্য। রবীন্দ্র-সদনের নিজস্ব নাট্যানুষ্ঠান—মাসে অন্তত দু'টি—যাতে মর্যাদাসম্পন্ন ও সকল দিক দিয়ে আদর্শ-স্বরূপ বলে গণ্য হয়, সে-বিষয়ে অবহিত হওয়া উচিত। এর পরিচালন-পরিষদ মনোনয়ন— pick and chose পদ্ধতিতে গঠিত করতে হবে।

মনোজ বসু : রাশিয়ার বিভিন্ন রাজ্যে পৃথক পৃথক জাতীয় নাট্যশালা দেখেছি : তাদের প্রত্যেকের রূপ স্বতন্ত্র, প্রত্যেকের অভিনয়ধারা স্বতন্ত্র। ইমোশানাল ইনটিগ্রেশন যাতে হয়, তারজন্যে দেশের প্রতিটি রাজ্যের বিশেষ ঐতিহ্যকে স্বীকার করতে হবে, মর্যাদা দিতে হবে। রবীন্দ্র-সদনের পরি-চালকমণ্ডলী গণতন্ত্রসম্মত পদ্ধতিতে গঠিত হওয়া দরকার। রবীন্দ্র-সদনে যেন বাঙলার রূপ দেখতে পাওয়া যায়। মনে রাখতে হবে, যাঁর নাম এর সংগে জড়িত, সেই রবীন্দ্রনাথ সর্বভারতীয় কেন, আন্তর্জাতিক হ'লেও মূলে ছিলেন বাঙালী। রবীন্দ্র-শতবার্ষিকী উপলক্ষে বিভিন্ন রাজ্যে যে-সব রবীন্দ্রভবন বা সদন নির্মিত হয়েছে, তার সবগুলিতেই প্রতি রাজ্যের জাতীয় নাট্যশালা প্রতিষ্ঠিত হ'লে তাদের মধ্যে ভাবধারায় আদান-প্রদানের মাধ্যমে সর্বভারতীয় ঐক্যবদ্ধ চেতনা জাগ্রত হতে পারে।

দেবব্রত বেজ : সংলাপের মাধ্যমে ব্যষ্টি ও সমষ্টির মধ্যে সম্পর্ক স্থাপন করাই হচ্ছে নাটকের উদ্দেশ্য। জাতির অনুভব, চিন্তা, ইচ্ছা, মত প্রভৃতি যাতে প্রকাশিত হয়, তাই হচ্ছে জাতীয়। জাতীয় মানসিকতার যে প্যাটার্ণ, তাই যাতে প্রতিফলিত হয়, সেই হচ্ছে জাতীয় নাটক। রবীন্দ্র-সদন একটি স্বয়ং-শাসিত সংস্থারূপে কাজ করলেই ভালো। বাঙলা দেশের সকল নাট্যামোদীদের নিয়ে যদি একটি থিয়েটার সোসাইটি গড়া যায়, তার থেকে নির্বাচিত প্রতিনিধিদের নিয়ে রবীন্দ্রসদনের পরিচালকমণ্ডলী গঠিত হতে পারে।

ডঃ অজিতকুমার ঘোষ : বাঙলার প্রথম প্রতিষ্ঠিত সাধারণ রঙ্গালয় ন্যাশনাল থিয়েটারের উদ্দেশ্য ছিল নাটকের মাধ্যমে জাতীয় ভাব প্রচার করা ; তখন জাতি ছিল পরাধীন। আজ স্বাধীন ভারতে জাতীয়তার অর্থ হয়েছে স্বতন্ত্র। আজকের ন্যাশনাল থিয়েটার বা জাতীয় নাট্যশালা সামগ্রিকভাবে জাতীয় ভাব, সংস্কৃতি ও সংহতির প্রচার করবে। যাঁরা নাটকের অনুরাগী, যাঁরা নাটক সম্বন্ধে চিন্তা করছেন, তাঁদের সকলেরই স্থান থাকবে জাতীয় নাট্যশালায়। নাট্য-সাধনা, নাট্যপ্রচেষ্টা ও নাট্যাদর্শের কেন্দ্রীভূত রূপ হবে জাতীয় নাট্যশালা। ন্যাশনালাইজড্ ও ন্যাশনাল থিয়েটার এক নয়। সরকারী কর্তৃত্বাধীনে নাট্যশালা থাকলে তা হবে ন্যাশ-নালাইজড্ থিয়েটার, তাকে জাতীয় নাট্য-শালা বলা চলে না। ভাষার বোধ্যতা বা দুর্বোধ্যতার উপরে নাটকের উপভোগ্যতা নির্ভর করে ; তাই দিল্লীতে হিন্দী নাটক যত আদরণীয় হবে, অন্য ভাষায় অভিনীত নাটক, এমনকি বাঙলা নাটকও ততখানি আদর পেতে পারে না। এদিক দিয়ে নৃত্য-নাট্যের উপযোগিতা ব্যাপক। বিভিন্ন রাজ্যের নাট্য-প্রচেষ্টার মধ্যে যোগসূত্র স্থাপনের জন্যে একটি কেন্দ্রীয় নাট্য-প্রতিষ্ঠান থাকা উচিত। রবীন্দ্রসদন জাতীয় নাট্য-আন্দোলনের মিলন-কেন্দ্রে পরিণত হবে, এই ছিল আমাদের আশা। কিন্তু সরকার তার পরিচালনার জন্যে নিলেন নিজেদের মতাবলম্বী লোকেদের এবং এর ওপর থাকল সরকারী নিয়ন্ত্রণ। কিন্তু রবীন্দ্রসদনের স্বয়ং-সম্পূর্ণ সংস্থায় পরিণত হওয়া উচিত। এর পরিচালনপরিষদে বিশ্ব-রূপা নাট্য-উন্নয়ন পরিকল্পনা পরিষদ, রবীন্দ্র-ভারতী বিশ্ববিদ্যালয়, পশ্চিমবঙ্গ সংগীত-নৃত্য-নাটক আকাদামী, অপেশাদার নাট্য-সংস্থা, পেশাদার নাট্যালয় প্রভৃতি সকল নাট্যকর্মী, নাট্যামোদী, নাট্যাভিজ্ঞ প্রভৃতির ব্যক্তিগত ও সংস্থাগতভাবে প্রতিনিধিত্বের ব্যবস্থা থাকার প্রয়োজন আছে। আর লরেন্স অলিভিয়ার যেমন ইংলণ্ডে ন্যাশনাল থিয়ে-টারের পরিচালক মনোনীত হয়েছেন, আমাদেরও একজন পরিচালক নির্বাচিত হবেন। এই ন্যাশনাল থিয়েটার ভ্রাম্যমাণ ইউনিট পাঠাবেন বাঙলার বিভিন্ন অঞ্চলে ; দেশের সমগ্র অংশের সংগে এই জাতীয় নাট্য-শালার যোগ থাকা উচিত। নাট্যাভিনয় ছাড়া নাটক সম্বন্ধে আলোচনা, বিতর্ক, সিম্পোসিয়ম, পঠন-পাঠন ও পরীক্ষা-নিরীক্ষার সুযোগ থাকবে এই জাতীয় রঙ্গালয়ে। এবং এখানে বাস্তবধর্মী, ঐতিহাসিক, পৌরাণিক, গীতি-নাট্য অনূদিত নাটক প্রভৃতির অভিনয় হবে সকলের আদর্শস্বরূপ। মোটকথা, দেশের সর্বাত্মক নাট্যচিন্তাকে কেন্দ্রীভূত করতে হবে আমাদের জাতীয় নাট্যশালায়।

মন্তু সেন : আমি ইয়োরোপ, আমেরিকায় সকল দেশের নাট্যমঞ্চ দেখে এসেছি ; কিন্তু

নবেন্দু চট্টোপাধ্যায় পরিচালিত অদ্বিতীয়া চিত্রের মহরতে সর্বেন্দর, লিলি চক্রবর্তী এবং শ্রীতুষারকান্তি ঘোষ। ফটো ঃ অমৃত

কোথাও ন্যাশনাল থিয়েটার দেখিনি—ফরাসীর নেই, ইটালীর নেই, জার্মানীর নেই। সরকারের হাতে রবীন্দ্রসদনকে ছেড়ে দিলে তা যদি ন্যাশনালাইজ্‌ড থিয়েটার হয়, তাতে ক্ষতি কি? ন্যাশনাল থিয়েটার স্থাপন করতে হ'লে গ্রামে গ্রামে গিয়ে নির্বাচন ক'রে থিয়েটার পার্লামেন্ট তৈরী করতে হবে: সেই পার্লামেন্ট রচনা করবেন ন্যাশনাল থিয়েটারের নিয়ম-কানুন, পরিচালনপদ্ধতি। তা ছাড়া প্রশ্ন আছে ন্যাশনাল থিয়েটার সর্বভারতীয় হবে, না শুধু আমাদের পশ্চিমবঙ্গের?

সুধী প্রধান : হরেনদা' (বিখ্যাত ইম্প্রেসারিও হরেন ঘোষ) একটি খসড়া পরিকল্পনা করেছিলেন ন্যাশনাল থিয়েটারের। আমাদের দেশে গণতান্ত্রিক নাট্যআন্দোলন অনেক দিনের—প্রায় ২৭ বছরের। গণনাট্য সংঘ নাটককে সারা ভারতের গ্রামে গ্রামে, প্রতিটি জেলায় নিয়ে যাবার চেষ্টা করেছে; এর উদ্যোক্তারূপে আমরা নাটক বলতে নাটকের সঙ্গে গান, নৃত্য প্রভৃতি মঞ্চ থেকে জনসাধারণের সামনে যা-কিছু পরিবেশন করা যায়, সবই বুঝেছিলুম। মঞ্চ হবে হাউস অব কালচার; মঞ্চকে আজ সারা দেশে ছড়িয়ে দিতে হবে। যেখানেই সুযোগ আছে, সেখানেই মঞ্চ তৈরি করতে হবে। বাঙলাদেশে যদি মঞ্চ হয়, সেখানে প্রধানত বাংলা নাটকই অভিনীত হবে। স্টেট-এর মঞ্চ হচ্ছে রবীন্দ্রসদন। এর পরিচালন ব্যবস্থার জন্যে ইলেকটোরাল কলেজ হবে; এই কলেজে থাকবে সকল নাট্য, নৃত্য, সঙ্গীত, পুতুলনাট্য প্রভৃতি সংস্থার প্রতিনিধি। আমাদের এখানে প্রচুর ব্যক্তিগত, গোষ্ঠীগত স্বার্থ আছে: তবুও রবীন্দ্রসদন যাতে গণতান্ত্রিক ভাবে গঠিত পরিচালকমণ্ডলীর অধীনে আসে, সে-সম্পর্কে যথাসাধ্য চেষ্টা করব।

ডঃ সাধনকুমার ভট্টাচার্য : সরকার দ্বারা রবীন্দ্রসদন নির্মিত না হ'লে জাতীয় রঙ্গালয় সম্পর্কে আমরা হয়ত এমনভাবে আন্দোলন করতুম না। আজ প্রচুর লোক থিয়েটার দেখছে, প্রচুর লোক থিয়েটার করছে। থিয়েটার করবার সুযোগ পাওয়ার জন্যে নাট্য-সম্প্রদায়গুলি আজ দরজায় দরজায় ঘুরছে; আর সেইজন্যেই আজ কিছু ব্যবসায়ী হন্যে হয়ে ঘুরছে একটুখানি জায়গার জন্যে, যেখানে 'মুক্ত-অঙ্গন'-এর মতো একটি থিয়েটার খোলা যায়। যদি ব্যবসা চলে, তাহ'লে ন্যাশানাল থিয়েটার গ্রামে গ্রামেও হতে পারে। আশঙ্কা করেছি, একদিন না আমাদের থিয়েটারগুলি ন্যাশনালাইজ্‌ড্ থিয়েটারে পরিণত হয় এবং তখন আমরা দেখব—ন্যাশনাল থিয়েটার এক নম্বর, ন্যাশন্যাল থিয়েটার দুই নম্বর, তিন নবর ইত্যাদি। পশ্চিমবঙ্গ সরকারের লোকরঞ্জন শাখা হচ্ছে ন্যাশানালাইজ্‌ড থিয়েটার! ন্যাশানাল থিয়েটার বলব তাকেই, যা হবে সমস্ত দেশের জাতীয় ঐতিহ্যের ধারক ও বাহক; যার মধ্যে থাকবে রেপার্টরি থিয়েটার—৭০০।৮০০ আদর্শ শিল্পী যেখানে কাজ করবে—এই থিয়েটার গিরিশচন্দ্রের জন্ম-সপ্তাহ পালন করবে তাঁর বাছা বাছা নাটকাকে যোগ্যতা ও মর্যাদার সঙ্গে মঞ্চস্থ ক'রে তেমনি শেক্সপীয়র, ইবসেন জন্ম-সপ্তাহও পালন করবে, রবীন্দ্র জন্মসপ্তাহও পালন করবে। সেখানে কোনো কালজয়ী নাটকের বিখ্যাত ভূমিকায় আজ একজন বড়ো অভিনেতাকে দেখতে পাওয়া যাবে কাল আর একজনকে, পরশু অন্য আর একজনকে। যে-কোনও নাট্যগোষ্ঠীক সস্তায়, ধরুন ৫০০ টাকায় অভিনয় করতে দিতে হবে, এমন আবদার রক্ষে করতেই হবে, নইলে ন্যাশানাল থিয়েটার হবে না, এ-চিন্তা বাতুলে করে। ন্যাশানাল থিয়েটার মঞ্চ প্রযোজনার আদর্শ সকলের সামনে তুলে ধরবে—নতুন ও পুরোনো, দু' ধরণেরই নাটক এখানে অভিনীত হবে। রাজ্যসরকার যদি নাটকের অগ্রগতির জন্যে নাট্যবিষয়ে জাতির শিক্ষার জন্যে তাঁদের বাজেটে পৃথকভাবে অর্থ বরাদ্দ ক'রে ন্যাশানাল থিয়েটার স্থাপনে অগ্রসর হন তাহ'লে ন্যাশানাল থিয়েটার বা জাতীয় রঙ্গালয় সম্ভব হবে।

—নান্দীকর

'খেয়া' চিত্রের শুভমুক্তি

শ্যামল মিত্র প্রযোজিত ও সুরকৃত রূপছায়া চিত্রের 'খেয়া' ২৮শে জুলাই থেকে বসুশ্রী, বীণা, আলোছায়া প্রভৃতি চিত্রগৃহে শুভমুক্তি লাভ করছে। রূপক-গোষ্ঠী পরিচালিত এছবির প্রধান চরিত্রাবলীতে রূপদান করেছেন মাধবী মুখোপাধ্যায়, অনুপকুমার, বিকাশ রায়, তরুণকুমার, বঙ্কিম ঘোষ, ভানু বন্দ্যোপাধ্যায়, প্রসাদ প্রসাদ মুখোপাধ্যায় ও জ্ঞানেশ মুখোপাধ্যায়। ছবিটির পরিবেশক রূপছায়া।

"মহাশ্বেতা" চিত্রের কাহিনী প্রসঙ্গে

গত সপ্তাহে বি, কে, প্রোডাকসন্সের নির্মীয়মাণ চিত্র 'মহাশ্বেতা'র যে গল্প স্টুডিও থেকে বলছি' বিভাগে জানানো হয়েছিল সেটি জরাসন্ধ রচিত 'মহাশ্বেতার ডায়েরী' উপন্যাসের সংক্ষিপ্ত কাহিনী। উক্ত কাহিনীর চিত্ররূপ "মহাশ্বেতা" হলেও পরিচালক ও চিত্রনাট্যকার পিনাকী মুখোপাধ্যায় মূলচিত্রনাট্যে কাহিনীর যথেষ্ট পরিবর্তন সাধন করেছেন। বারান্তরে যথার্থ কাহিনীটুকু পুনরায় জানানোর ইচ্ছে রইলো।

"শজারুর কাঁটা" চিত্রের শুভমহরৎ

মঞ্জু দে প্রোডাকসন্সের নতুন ছবি শরদিন্দু বন্দ্যোপাধ্যায় রচিত "শজারুর কাঁটা"র শুভমহরৎ গত ১৭ জুলাই ক্যালকাটা মুভিটন স্টুডিওয় সাড়ম্বরে অনুষ্ঠিত হয়। ক্ল্যাপস্টিক প্রদান করেন শ্রীমতী কানন দেবী, শ্রীমতী দে কৃত চিত্রনাট্যের প্রধান চরিত্রে অভিনয় করছেন সোমেন চক্রবর্তী, বাসবী নন্দী, তরুণকুমার, গীতা দে, নীলিমা দাস, সীতা দেবী ও পাহাড়ী সান্যাল। আলোকচিত্রগ্রহণ ও সঙ্গীত পরিচালনার দায়িত্ব নিয়েছেন জ্যোতি লাহা এবং সুধীন দাশগুপ্ত।

"অদ্বিতীয়া" চিত্রের শুভমুহূর্ত

এ-আর-সি প্রোডাকসন্সের নতুন ছবি "অদ্বিতীয়া" চিত্রের শুভমহরৎ গত ২২শে জুলাই ক্যালকাটা মুভিটন স্টুডিওয় পালিত হল। অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন

শ্রীতুষারকান্তি ঘোষ। ছবিটি পরিচালনা করছেন তরুণ পরিচালক নবেন্দু চট্টোপাধ্যায়। সুররচনায় থাকছেন হেমন্ত মুখোপাধ্যায়। নায়ক-নায়িকা চরিত্রে নির্বাচিত হয়েছেন সর্বেন্দর ও মাধবী মুখোপাধ্যায়।

"দিল নে পুকারা" মুক্তিপ্রতীক্ষিত

কাহিনীকার, প্রযোজক ও পরিচালক মোহন সম্প্রতি দিল নে পুকারা" চিত্রের সম্পূর্ণ দৃশ্যগ্রহণ শেষ করেছেন। বর্তমানে সম্পাদনার কাজ সুসম্পন্ন হচ্ছে। মোহন ফিল্মসের এই রঙিন ছবিতে অভিনয় করেছেন শশি কাপুর, রাজশ্রী, সঞ্জয়, হেলেন, অচলা সচদেব, মনমোহন কৃষ্ণ ও মেহমুদ। কল্যাণজী-আনন্দজী ছবিটির সুরকার।

"মেরে হামদাম মেরে দোস্ত"

কেওলংজী প্রোডাকসন্সের "মেরে হামদাম মেরে দোস্ত" চিত্রটির দৃশ্যগ্রহণ বর্তমানে সুসম্পন্ন হচ্ছে কারদার স্টুডিওতে। অমরকুমার পরিচালিত এই রঙিন ছবির মুখ্য চরিত্রে অভিনয় করছেন ধর্মেন্দ্র, শর্মিলা, রেহমান, মমতাজ, অচলা সচদেব ও ওমপ্রকাশ। সংগীত-পরিচালনায় রয়েছেন লক্ষ্মীকান্ত প্যারেলাল।

"সাগির্দ" চিত্রের বহির্দৃশ্যগ্রহণ

সুবোধ মুখার্জী প্রোডাকসন্সের 'সাগির্দ' চিত্রের একটানা বহির্দৃশ্যগ্রহণ বর্তমানে কাশ্মীর অঞ্চলে সুসম্পন্ন হল। ছবিটি পরিচালনা করছেন সমীর গাঙ্গুলী। সম্প্রতি এছবির অন্তর্দৃশ্য ফিল্মীস্তান স্টুডিওয় শুরু হয়েছে। প্রধান চরিত্রে অভিনয় করছেন শায়রা বানু, জয় মুখার্জী, আই, এস, জোহার, মদনপুরী, নাজির হুসেন, অসিত সেন ও অচলা সচদেব। লক্ষ্মীকান্ত প্যারেলাল ছবিটির সুরকার।

অসিত সেন পরিচালিত 'তেরী আরজু'

ইউনিভার্সাল প্রোডাকসন্সের 'তেরী আরজু' ছবিটি পরিচালনা করছেন অসিত সেন। আজিজ কাশ্মিরী রচিত এ কাহিনীর নায়ক-নায়িকা চরিত্রে রূপদান করছেন বিশ্বজিৎ ও সাধনা। একটি বিশেষ চরিত্রে রয়েছেন রাজকুমার। এস ডি বর্মন ছবিটির সুরকার।

'রোশনি' চিত্রের সংগীতগ্রহণ

সংগীত-পরিচালক লক্ষ্মীকান্ত প্যারেলাল সম্প্রতি ফেমাস ল্যাবরেটরীতে 'রোশনি' চিত্রের সংগীত গ্রহণ করলেন। ছবিটি পরিচালনা করছেন আর ভট্টাচার্য। প্রধান চরিত্রে রয়েছেন নন্দা, সঞ্জয়, রমেশ দেও, রাজেন্দ্রনাথ, হেলেন ও প্রতিমা দেবী।
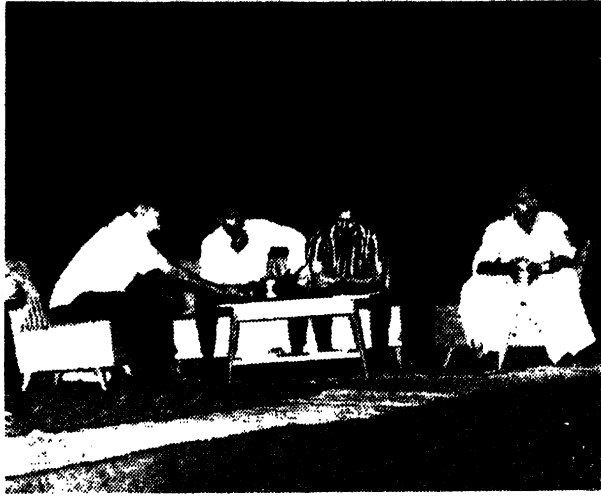
চতুরঙ্গ কর্তৃক অভিনীত "কৃষ্ণচূড়ার মৃত্যু" নাটকের একটি দৃশ্য

অনামিকা প্রযোজিত "শুতুর মুর্গ" (হিন্দী):

অস্ট্রিচ পাখীর হিন্দী নাম হচ্ছে শুতুর মুর্গ। চারদিক থেকে পাখীটাকে যদি হঠাৎ ঘিরে ধরা হয় এবং বেচারা কোনোমতেই যদি পালাবার সুযোগ না পায়, তখন অস্ট্রিচ পাখী নিজের চোখদুটিকে বন্ধ ক'রে নিজের দীর্ঘ চঞ্চুটিকে জল বা মাটির মধ্যে যথাসম্ভব গুঁজে দিয়ে ও মনে করে—ওকে কেউ দেখতে পাচ্ছে না এবং ও নিজেকে সুরক্ষিত ক'রে ফেলেছে। ঠিক এই ধরণের মনোবৃত্তি মানুষের মধ্যেও আছে, যারা বাস্তব সত্যের দিক থেকে চোখ ফিরিয়ে রেখেই মনে করে সত্যের হাত থেকে তারা মুক্তি পেয়েছে।

জ্ঞানদেব অগ্নিহোত্রী রচিত ব্যঙ্গাত্মক নাটক "শুতুর মুর্গ" শুতুর নগরী নামে এক কাল্পনিক রাজ্যের বাস্তব অবস্থাবিমুখী রাজা, তার স্বার্থসর্বস্ব মন্ত্রিগণ, বুভুক্ষিত জনতা এবং স্বার্থান্বেষী জননেতার কার্যকলাপকে দর্শকদের চোখের সামনে তুলে ধরেছে। কোনো রাজ্যেরই অধিনায়কের প্রত্যক্ষ বাস্তব অবস্থাকে উপেক্ষা ক'রে রঙীন কল্পনালোকে বাস করা উচিত নয়; জনসাধারণের ভবিষ্যৎ সুখের জন্যে স্বর্গরাজ্য প্রতিষ্ঠার কল্পনার মধ্যে ডুবে না থেকে বাস্তববুদ্ধিসম্পন্ন দৃষ্টি নিয়ে জনগণের দৈনন্দিন সমস্যার সমাধানে যত্ন না নিলে রাজ্যে বিশৃঙ্খলা এবং অশান্তি দেখা দেবার সম্ভাবনা প্রবল হয়ে ওঠে—এই কঠিন সত্যকে চমৎকার ভাবে ব্যঙ্গ ও কৌতুকের মাধ্যমে উপস্থাপিত করেছেন নাট্যকার শ্রীঅগ্নিহোত্রী।

নাটকটির সুরুচিপূর্ণ ও শিল্পসম্মত প্রযোজনায় "অনামিকা" নাট্যগোষ্ঠী অসামান্য কৃতিত্ব দেখিয়েছেন। দৃশ্য, মঞ্চসজ্জা ও বেশভূষাদির পরিকল্পনায় খালেদ চৌধুরী তাঁর শিল্পকৃতির নিদর্শন রেখেছেন। নাট্য-পরিচালনায় শ্যামানন্দ জালানের কৃতিত্ব অনস্বীকার্য; রূপক নাট্যের উপযোগী চলন এবং অঙ্গ-ভঙ্গীতে প্রতিটি শিল্পীকে একটি বিশেষ সুরে গ্রথিত করেছেন তিনি। রাজার মুখ্য-ভূমিকায় শ্রীজালানের বাচনভঙ্গী বিশেষ তাৎপর্যপূর্ণ। অন্নমন্ত্রী বেশে উত্তমরাম নাগরের বাচন ও কণ্ঠ তাঁর দক্ষতার পরিচায়ক। দাসীর ভূমিকায় অরুণা কাপুরের অভিনয় আন্তরিকতাপূর্ণ; তাঁর দরদীকণ্ঠ দর্শকহৃদয়কে স্পর্শ করে। রাণীরূপে চেতনা তিওয়ারীর অভিনয় যথেষ্ট প্রশংসার দাবি রাখে। তবে তাঁর বিশেষ অঙ্গভঙ্গী একটু আতিশয্যপূর্ণ। অপরাপর ভূমিকায় বিষ্ণু চনচনিয়া (ভাষণমন্ত্রী), বিমল লাঠ (বিরোধীলাল), অমর গুপ্ত (মামুলীরাম), মোতিশঙ্কর পাণ্ডোলী (রক্ষামন্ত্রী) প্রভৃতির অভিনয় উল্লেখযোগ্য হলেও, উন্নতির অবকাশ আছে।

হিন্দী মঞ্চাভিনয়ে অনামিকার "শুতুর মুর্গ" একটি স্মরণীয় সংযোজন।

রাজধানীতে "কৃষ্ণচূড়ার মৃত্যু"

নাট্যকার পার্থপ্রতিম চৌধুরীর লেখা "কৃষ্ণচূড়ার মৃত্যু" পরিবেশন করে চতুরঙ্গ নাট্যক্লাব রাজধানীতে তাদের খ্যাতি তুঙ্গে তুলেছেন বলা চলে। ভালো নাটক সুন্দর অভিনয়ে প্রাণবন্ত করে তোলা এ্যামেচার সংস্থার পক্ষে কৃতিত্বের পরিচায়ক, সে কৃতিত্ব "চতুরঙ্গ" অনায়াসে দাবী করতে পারে। নাট্যামোদী জনসাধারণ 'চতুরঙ্গের' নিকট ভবিষ্যতেও সুনির্বাচিত নাটকের যোগ্য পরিবেশন আশা করেন।

সম্প্রতি নয়াদিল্লীর আইফ্যাকস্ হ'লে

'কৃষ্ণচূড়ার মৃত্যুর প্রতিফলন দেখা গেল শর্মিলার মনপ্রান্তরে। প্রেমের অন্ধ জগতে সূক্ষ্ম বিচার প্রবেশ করে যে জটিলতা সৃষ্টি করতে পারে, নির্মম নিষ্ঠুরতা ছিন্ন করে দেয় নিবিড়তার বন্ধন, তাকে মৃত্যুর রূপান্তর বলা চলে কিনা, এই নাটক সেই জিজ্ঞাসার প্রতীক। প্রেমিক পুরুষ শুধু অর্থের আধার নয়, নয় শুধু কবিতা, শুধু নয় প্রভু কিম্বা সহাবস্থানের উপযোগী বন্ধু। শর্মিলার কাছে পৌরুষ সর্বগুণের একান্ত ও নিবিড় সমষ্টি। নক্ষত্র, প্রিয়ব্রত, অলোকরঞ্জন বা সুপ্রতিম কেউ একক তার নারীত্বের কাছে আকর্ষণীয় হয়ে উঠতে পারেনি। তাই শর্মিলা স্বামীত্বে বরণ করতে পারেনি কাউকে।

বন্ধু মহাশ্বেতার জীবন ও মৃত্যু নতুন আলোকপাত করেছে শর্মিলার বিশ্লেষণপ্রবণ মনের উপর। ধারাবাহিক ও গতানুগতিক স্বামী-স্ত্রীর অভাবক্লিষ্ট সংসারজীবন, সন্তানপালন, গৃহকর্মের ঘাত-প্রতিঘাত কখনও বৈচিত্র্যে ও সুসমঞ্জস প্রফুল্লতায় মহাশ্বেতাকে আপ্লুত করে তুলতে পারেনি। সে জীবন অভিপ্রেত নয় শর্মিলার।

শর্মিলার চরিত্র রূপায়ণে শ্রীমতী আরতি সেন চৌধুরী সর্বজনের সাধুবাদ অর্জন করেছেন। তাঁর অভিনয়-সুখ্যাতি 'চতুরঙ্গের' গৌরব বৃদ্ধি করবে।

মিঃ সঞ্জয়ের ভূমিকায় শ্রীসুধীশ সর্বাধিকারীর সাবলীল ও স্বাচ্ছন্দ অভিনয় প্রশংসা পাবার যোগ্য হয়েছিল। মিঃ সঞ্জয়ের মোটর ড্রাইভার ইন্টার পাশ নির্মল অপূর্ব নিপুণতায় আত্মপ্রকাশ করেছেন গোড়া থেকে শেষ অবধি। মালিকের মেয়ের সাথে আলাপে, শর্মিলার বন্ধু-গোষ্ঠীর সাথে ব্যবহারে বা বিরক্ত ও ক্রুদ্ধ মিঃ সঞ্জয়ের মন্তব্যের প্রতিবাদ করতে গিয়ে নির্মলের ভূমিকায় শ্রীচিত্ত মিত্রের অভিনয় বিশেষ কৃতিত্বের দাবী করতে পারে। একটি অপ্রধান ভূমিকায় এমন নিখুঁত অভিনয় সচরাচর দেখা যায় না।

'সে কি এলো, সে কি এলো না'

নাট্যানুরাগীর কাছে রহস্যঘন নাটকের একটা বিশেষ আবেদন আছে একথা ঠিক। কিন্তু নাটকীয় ঘাত-প্রতিঘাতের মধ্য দিয়ে রহস্যের জাল বুনে চলা এবং শেষ পর্যন্ত প্রত্যাশিত পরিণতির সীমায় রহস্যের অবগুণ্ঠন মোচন করা খুব একটা সহজ কাজ নয়। কিন্তু মাঝে মাঝে এ প্রচেষ্টার মধ্যে এমন দুর্বল, শ্লথ গতি চিহ্নিত হয় যাতে করে এই ধরনের নাটক সম্পর্কে আমাদের সবটুকু ধারণা বিপর্যস্ত হয়। সম্প্রতি ষ্টার থিয়েটারে সাউথ ক্যালকাটা জুনিয়ার চেমবার্সের 'সে কি এলো, সে কি এলো না' নাটক দেখে এধরনের নাট্যসৃষ্টি সম্পর্কে একটা বেদনাজনিত মনোভাব বাসা বেঁধেছে। নাটকের কয়েকটি মুহূর্ত সুন্দর, কিন্তু বহু চরিত্রের ভীড়ে, বিশেষ করে ছটি নারী চরিত্র সৃষ্টিতে নাটক রহস্যের গাম্ভীর্য দিতে পারেনি, এবং চরিত্রগুলো সংঘাতসমৃদ্ধ হয়ে উঠতে বাধা পেয়েছে। নাট্যকারকে এবিষয়ে আরো সচেতন হোতে অনুরোধ করি।

সামগ্রিক অভিনয় খুব একটা উন্নত মানের হয়নি। প্রতিটি শিল্পীর অভিনয়ে অনুশীলনের অভাব মর্মান্তিকভাবে স্পষ্ট হয়ে উঠেছে। প্রাণবন্ত চরিত্র রূপায়ণের নজীর এ নাট্যপ্রযোজনায় নেই। বৈজ্ঞানিক প্রবাল চৌধুরীর পোষাক দু'এক জায়গায় দৃষ্টিকটু হয়েছে। অন্ততঃ চরিত্রের গভীরতা আর মানসিকতা এতে ব্যাহত হয়েছে নিশ্চই। অনিমা ও রণদেব মুখো-পাধ্যায় চরিত্রে শীলা মুখার্জী ও অলোক বসুর অভিনয় মন্দ নয়। অন্যান্য চরিত্রে অভিনয় করেন এইচ, এন, মুখার্জী, প্রভাত ব্যানার্জী, অমিয় চ্যাটার্জী, এ. চ্যাটার্জী, এ. ব্যানার্জী, অশোক ব্যানার্জী, তিলক চক্রবর্তী, রীজ চাতরা, মৈনা হালদার, ঊষা ব্যানার্জী, চিত্রলেখা ব্যানার্জী, কৃষ্ণা ব্যানার্জী, অঞ্জলি চ্যাটার্জী।

প্রতিযোগিতার ফলাফল

হাওড়া জেলা সামাজিক ও সাংস্কৃতিক পরিষদ আয়োজিত প্রথম বার্ষিক একাংক নাটক প্রতিযোগিতার ফলাফল সম্প্রতি প্রকাশিত হয়েছে।

'সান্ধ্যতনী সংস্থা' 'আদব' নাটক প্রযোজনার জন্য শ্রেষ্ঠ দল হিসাবে বিবেচিত হয়েছে। দ্বিতীয় স্থান অধিকার করেছে 'শিল্পতীর্থ', নাটকের নাম 'রসাভাষ'। এই নাটকের সত্যেন মুখো-পাধ্যায় ও 'আদব' নাটকের মিহির চট্টো-পাধ্যায় যথাক্রমে শ্রেষ্ঠ পরিচালক ও দ্বিতীয় শ্রেষ্ঠ পরিচালক নির্বাচিত হয়েছেন। শ্রেষ্ঠ অভিনেতা হয়েছেন অরুণ সরকার (গ্রীন এ্যামেচার), দ্বিতীয় : সত্যেন মুখোপাধ্যায় (শিল্পতীর্থ)। শ্রেষ্ঠা অভি-নেত্রীর পুরস্কার লাভ করেছেন গোপা বন্দ্যোপাধ্যায়। "কল্লোলে"র অমল বসু ও রবীন্দ্র ভট্টাচার্য পার্শ্ব চরিত্রে যথাক্রমে প্রথম ও দ্বিতীয় স্থান অধিকার করেছেন।

বিবিধ সংবাদ

বঙ্গীয় চলচ্চিত্র সাংবাদিক সংঘের নবনির্বাচিত কার্যনির্বাহক সমিতি

বঙ্গীয় চলচ্চিত্র সাংবাদিক সংঘের নব-নির্বাচিত কার্যনির্বাহক সমিতি সম্প্রতি অনুষ্ঠিত বাৎসরিক সাধারণ সভায় ১৯৬৭-৬৮ সালের জন্যে বঙ্গীয় চলচ্চিত্র সাংবাদিক সংঘের যে সকল কর্মাধ্যক্ষ ও কার্যনির্বাহক সমিতির সদস্য নির্বাচিত হয়েছেন, তাঁদের নাম : সভাপতি : শ্রীঅশোককুমার সরকার, সহ-সভাপতি : শ্রীমহেন্দ্র সরকার ও শ্রীপশু-পতি চট্টোপাধ্যায়; সম্পাদক : শ্রীসেবাব্রত গুপ্ত; সহ-সম্পাদক : শ্রীসৌমেন মুখো-পাধ্যায় ও শ্রীশ্যামল চক্রবর্তী; কোষাধ্যক্ষ : শ্রীরণজিৎ দত্ত। কার্যনির্বাহক সমিতির সদস্যগণ : সর্বশ্রী প্রীতিদেবী মুখোপাধ্যায়, বাগীশ্বর ঝা, মনুজেন্দ্র ভঞ্জ, জ্যোতির্ময় বসুরায়, আশীষতরু মুখোপাধ্যায়, প্রেমনাথ উপাধ্যায়, বচন সিং, এ এস কুমার, গোপেন লাহিড়ী, অশোক মজুমদার, সৌমেন কুন্ডু, বীরেন সিমলাই বিজন দত্ত, রণবীর সাহিত্য-লঙ্কার, ওয়াশিমুল হক।

পৃথিবীসৃষ্টির কার্টুন ফিচার ফিল্ম

সায়ান্স-ফিকশ্যান সিনে ক্লাবের উদ্যোগে গত রবিবার অ্যাকাডেমি অব দি ফাইন আর্টস প্রেক্ষাগৃহে চেক দূতাবাসের সৌজন্যে এক অতুলনীয় পূর্ণ দৈর্ঘ্যের কার্টুন ছায়াচিত্র প্রদর্শনের আয়োজন করা হয়েছিল। বাইবেলের প্রারম্ভিক 'জেনিসীস' অধ্যায়ে পৃথিবীসৃষ্টির যে উপাখ্যান আছে, বৈজ্ঞানিক চিন্তার পরিপ্রেক্ষিতে সুদক্ষভাবে রঙীন কার্টুন ফিল্মে তার অপূর্ব রূপায়ণ দর্শক-সদস্য ও অভ্যাগতদের মুগ্ধ করে। ঐ চেক ফিলমটির ইংরেজী নাম 'ক্রিয়েশন অব দি ওয়ার্লড'। এই সঙ্গে আর একটি ছোট চেক কার্টুন দেখানো হয় যেটির ইংরেজী নাম 'দি ম্যাজিশিয়ান'। ফিলমটি ফ্যানটাসি ধরণের কল্পনা কৌতুকাবহ।

সায়ান্স-ফিকশ্যান সিনে ক্লাবের বিগত দেড় বছরের অনুষ্ঠানধারার মধ্যে গত রবিবারের ফিল্ম প্রদর্শনীটি এক অতুল-

নীয় অভিনবত্বের পরিচয় বহন করে এনেছে, একথা সকলেই একবাক্যে স্বীকার করেছেন।

উল্লেখযোগ্য এই যে, গত রবিবার ক্লাবটিতে 'ক্রিয়েশন অব দি ওয়ার্ল্ড' ফিলমটি দেখানোর পরে ক্লাবের পরবর্তী অনুষ্ঠানসূচীতেই আছে 'ওয়ার অব দি ওয়ার্ল্ড'—আগামী ১৫ই অগাস্ট লাইট হাউস সিনেমায়।

ফিল্‌ম-ক্লাব উৎসাহীদের অবগতির জন্য জানানো হয়েছে, ডিসেম্বর মাস পর্যন্ত এই ক্লাবটিতে নতুন সদস্যের আবেদনপত্র নেওয়া বন্ধ থাকবে।

খরাত্রাণে ছাত্রদের প্রচেষ্টা

খরাত্রাণের সাহায্যার্থে সর্ববঙ্গীয় ছাত্র-পত্রিকা 'পথের সংগ্রহের' উদ্যোগে সম্প্রতি ব্রজেন দে'র 'কৃপণের ধন' নাটকটি মঞ্চস্থ হয় খৃষ্টান কলেজ মঞ্চে। রামপুর সবাই মিলের নাট্যশাখা নাটকটি সাফল্যের সাথে মঞ্চস্থ করেন। নাটকটি পরিচালনা করেন শ্রীরমাপ্রসাদ পাত্রকর্মকার। প্রধান চরিত্রের শিল্পীরা যেমন প্রশংসা পান পার্শ্বচরিত্রের শিল্পীরাও সেইরূপই প্রশংসা পান। অভিনয়ে অংশগ্রহণ করেন সর্বশ্রী সুজয় চ্যাটার্জী, সুনীল চ্যাটার্জী, দুর্গাপ্রসাদ পাত্রকর্মকার, তারাপ্রসাদ পাত্রকর্মকার, পরিমল পাঠক, নিখিলগোপাল পাত্রকর্মকার, রমাপ্রসাদ পাত্রকর্মকার, সুভাষ কুণ্ডু, অসীম চ্যাটার্জী, শঙ্কর দাস, স্বপন রায়, প্যাগল দাস, অজিত সূত্রধর, অধীর সূত্রধর, নিমাই গরাই, শৈবাল দাস, নবীন চক্রবর্তী। এই অনুষ্ঠানেই পল্লীগীতি পরিবেশন করেন বর্ধমান বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র তপন মুখোপাধ্যায়, কিশোর কোনার, তাঁদের সাথে ছিলেন বাউল সুধীর দাস। অনুষ্ঠানের সুরুতে বাঁকুড়া খৃষ্টান কলেজের অধ্যক্ষ শ্রীরবীন্দ্রনাথ দাস এক ভাষণ দেন এবং খরাত্রাণে 'পথের সংগ্রহের' প্রচেষ্টাকে অভিনন্দন জানান। পথের সংগ্রহের অনুষ্ঠানটিকে সাফল্যমণ্ডিত করতে সর্বতোভাবে সহযোগিতা করে বাঁকুড়া খৃষ্টান কলেজ সোস্যাল সার্ভিস লীগ ও রামপুর সবাই মিলে। অনুষ্ঠানে সংগৃহীত সমস্ত অর্থ তুলে দেওকা হয় খৃষ্টান কলেজ সোস্যাল সার্ভিস লীগের হাতে, তাঁরা খরাত্রাণের জন্যে যে কাজে নেমেছেন তার সহযোগিতা করতে।

অনামিকা কলাসঙ্গম ঃ

কলকাতার হিন্দীভাষী রসিক সমাজের মধ্যে নাট্যরসপিপাসা কি পরিমাণে বৃদ্ধি পেয়েছে, তা পাঠকদের বোধগম্য হবে, যখন তাঁরা "অনামিকা কলাসঙ্গম" সংস্থাটি কি এবং কেন এর জন্ম, সে-কথা শুনবেন। কথাটি নিবিষ্টচিত্তে শোনবার মতো এবং শুনে অবাক হবার মতো। ভারত ইউনিয়নের বিভিন্ন রাজ্যে আজ নাট্যকলার অনুশীলন হচ্ছে প্রকৃষ্টভাবে। দিল্লীতে মিঃ ই, অলকাজির নেতৃত্বে দি ন্যাশনাল স্কুল অব ড্রামা, রমেশ মেহতার নেতৃত্বে থ্রী আর্টস ক্লাব, দি লিটল থিয়েটার গ্রুপ (দিল্লী) বোম্বাইয়ের মিসেস ডলি রিজভীর নেতৃত্বে দি ক্রিয়েটিভ ইউনিট, সত্যদেব দুবের থিয়েটার ইউনিট অব বোম্বে ইত্যাদির কথা এই প্রসঙ্গে বলা যায়। এ-ছাড়া আমাদের আছে ঐতিহ্যমণ্ডিত নৌটঙ্কীর মার্জিত রূপ, হাথরাসের ব্রজ কলাকেন্দ্র প্রভৃতি নাট্য, নৃত্য ও সাংস্কৃতিক সংস্থা। কলকাতায় হিন্দীভাষী রসিক সমাজ এস, এস, কানোরিয়া, শ্যামানন্দ জালান, কমলাকান্ত বর্মা প্রভৃতি নাট্যামোদী সংগঠনকারীর নেতৃত্বে নিজ কলকাতা এবং ভারতের বিভিন্ন অঞ্চলের প্রতিষ্ঠাপন্ন নাট্যপ্রচেষ্টার সঙ্গে পরিচিত হবার জন্যে "অনামিকা কলাসঙ্গম" নাম দিয়ে একটি শ্রোতৃসঙ্ঘের প্রতিষ্ঠা করেছেন। এই সঙ্ঘে সদস্য নেওয়া হবে বর্তমানে মাত্র পাঁচশো জন এবং ইতিমধ্যেই এর সদস্য সংখ্যা হয়েছে প্রায় দেড়শো জন। এই সঙ্ঘ মার্চ মাসে নিবেদন করেছেন দিল্লীর লিটল থিয়েটার গ্রুপের "শ্রীভোলানাথ"। আসচে আগস্ট মাসে তাঁরা সদস্যদের সামনে পেশ করবেন দিল্লীর থ্রী আর্টস ক্লাবের "বড়ে আদমী" এবং 'উলঝন"; এর পরে সেপ্টেম্বরে বোম্বাইয়ের ক্রিয়েটিভ ইউনিটের "আফটার থি ফল" ও "স্নো ডান্স অন দি কিলিং গ্রাউণ্ড"। এইভাবে ভারতের বিভিন্ন দেশ থেকে প্রতিষ্ঠিত নাট্যসংস্থার অভিনয়ের ব্যবস্থা ছাড়াও স্থানীয় "বহুরূপী", "থিয়েটার সেণ্টার", "শৌভনিক" প্রভৃতির নাট্যনিবেদনগুলিও তাঁরা পরিবেশনের ব্যবস্থা করবেন সদস্যদের কাছে। নাট্যশ্রোতৃসঙ্ঘের প্রতিষ্ঠা একটি অভিনব ব্যাপার নয় কি?

নাট্যতীর্থের 'দৃষ্টান্ত'

নাট্যতীর্থ গোষ্ঠী গত ২৫শে জুন সাহানগর স্কুল মঞ্চে সুনীত মুখোপাধ্যায়ের আধুনিকতম নাটক 'দৃষ্টান্ত' অভিনয় করলেন গোপাল দাসের পরিচালনায়। দুই বাড়ির সমস্যা ও সংঘাতকে কেন্দ্র করে নাটকটি রচিত। অভিনয়ে বিশেষ সাফল্য প্রদর্শন করেন বিশ্বনাথ দে, সুনীল মোদক, পঙ্কজ ভট্টাচার্য, রবীন মজুমদার, তপন চক্রবর্তী, সীমা গুহঠাকুরতা, তপন ঘোষ, চিন্ময় কুশারী, সমর মুখার্জী, দিলীপ সেনগুপ্ত, সুকুমার পাল, বিপ্লব বসু ও সমরেশ ভট্টাচার্য। আবহসঙ্গীতে ভোলানাথ অধিকারী প্রশংসনীয়।

গানের জলসা

গ্রামোফোন কোম্পানীর আর একটি অবদান

সম্প্রতি প্রকাশিত লং-প্লেয়িং-এ গ্রামোফোন কোম্পানীর "বর্ষামঙ্গল ও বাল্মীকি প্রতিভা"—অভিনন্দনের দাবী রাখে। "ঘন-গৌরবে নব-যৌবনা বরষা" যখন বারিধারার নূপুর বাজিয়ে অবতীর্ণপ্রায়। 'ধূলায়, ধূসর, রুক্ষ, উড্ডীন', দাবদগ্ধ-ধরিত্রী পুঞ্জীভূত মেঘের বুকে আসন্ন বর্ষণের প্রতিশ্রুতি পেয়ে রুদ্ধশ্বাসে প্রহর গুনছে ঠিক বহুপ্রতিক্ষিত সেই স্নিগ্ধসজল লগ্নে "বর্ষামঙ্গল"-এর মুক্তি, ময়ূরের মত রসিকচিত্তকে নাচিয়ে তুলবে এই ত স্বাভাবিক।

সেদিন পত্র, পুষ্প আলপনায় সজ্জিত নলিনী সরকার স্ট্রীটে হিজ মাস্টারস ভয়েসের রিহার্স্যালরুমে সাংবাদিকমহলকে যখন রেকর্ড দুটি বাজিয়ে শোনানো হচ্ছিল, শ্রোতাদের মানসপটে ভেসে উঠেছিল ১৩২৮ সালের ১৭ই ভাদ্রের ভরা-ভাদরের এক সজল সন্ধ্যা যখন জোড়াসাঁকোস্থ বাস-ভবনে বর্ষামঙ্গল উৎসবের প্রথম অবতারণা করেন স্বয়ং কবিগুরু। 'বর্ষাবরণ'-এর মন্ত্রে বাঙালীর দীক্ষাগ্রহণ সেই দিনটিতেই।

সেই ঐতিহ্যের ধারা, রেকর্ড করে গ্রামোফোন কোম্পানীর প্রতি ঘরে ঘরে পৌঁছে দেবার মহৎ আয়োজন সংগীত-রসিকের উজ্জ্বল অভিনন্দন লাভ করবেই। কবিকণ্ঠে বর্ষাবরণের শুরু বিশেষ ব্যঞ্জনা-দ্যোতক। মনে হয় যেন অতীতের তীর থেকে ভেসে আসছে কবির বর্ষাবরণ বাণী। অনেক চেনা জনপ্রিয় গানের সুষ্ঠু পরিবেশনা করা হয়েছে—সর্বশ্রী পংকজ মল্লিক, হেমন্ত মুখোপাধ্যায়, দ্বিজেন মুখোপাধ্যায়, চিন্ময় চট্টোপাধ্যায়, সুচিত্রা মিত্র, কণিকা বন্দ্যোপাধ্যায় প্রভৃতি প্রথিতযশা শিল্পী এবং অন্যান্য তরুণতর শিল্পীগোষ্ঠীর কণ্ঠে। গানগুলির নির্বাচন ও বিন্যাসে শ্রীসন্তোষ সেনগুপ্তের সুযোগ্য সঙ্গীত-পরিচালনার উজ্জ্বল স্বাক্ষর ব্যক্ত। নির্বাচন হয়ত আরো ভালো হতে পারত। কিন্তু যা হয়েছে তার দামও কম নয়। তবে বারিধারার এফেক্টকে তীব্র না করে শ্রোতাদের কল্পনা ও গানের ব্যঞ্জনার ওপর ছেড়ে দিলে সৌন্দর্যপ্রকাশ সূক্ষ্মতর হতে পারত।

দ্বিতীয় অবদান "বাল্মীকি প্রতিভা"। বিদেশ-প্রত্যাগত কবির কৈশোরের সৃষ্টি। জ্যোতিরিন্দ্রনাথের সহযোগিতায় ও স্কচ ও আইরিশ সুরের প্রভাববৈচিত্র্যে বাল্মীকি প্রতিভার নাট্যধর্মিতা অপূর্ব রসমূর্তি লাভ করেছে। অপেরা আঙ্গিকে রচিত এই নাটকের মর্মবস্তু সহজেই হৃদয়ে প্রবেশ করে।

দস্যু রত্নাকরের ঋষি বাল্মীকিতে মহৎ রূপান্তর কবির ভাষায় "এই জনমেই জন্মান্তর ঘটা"র এক হৃদয়গ্রাহী আলেখ্য। উপযুক্ত সুরে ভাবে এবং রসের ঐশ্বর্যে উজ্জ্বল। বাল্মীকি ভূমিকায় হেমন্ত মুখোপাধ্যায়ের কিছু অংশ হয়ত ঠিক সুরে লাগেনি কিন্তু তাঁর কণ্ঠের পরিবেশ রচনার দুর্লভ শক্তি সে ত্রুটি ঢেকে দিয়েছে। প্রথম দস্যুর ভূমিকায় তরুণ বন্দ্যোপাধ্যায় এই চরিত্রের কৌতুকের দিকটিকে প্রাণবন্ত করে তুলেছেন। আবহসংগীত বিশেষ ড্রামের শব্দ ভয়ালরহস্যকে সুন্দর প্রতিধ্বনিত করেছে। বর্ষামঙ্গলের প্রায় সকল শিল্পীসহ এই নাট্যগীতি রূপায়ণে এই রেকর্ডের সুষ্ঠু পরিচালনা করেছেন সন্তোষ সেনগুপ্ত।

উত্তর কলিকাতা সঙ্গীত সম্মেলন

এবার উত্তর কলকাতা সংগীত সম্মেলন শুরু হয় শ্রীঅরুণ মজুমদারের সেতার দিয়ে। রাগ "ইমন কল্যাণ"। তরুণ শিল্পীর বাজনায় প্রতিশ্রুতির ছাপ যে একেবারেই নেই তা নয়, তবে এখনও দানা বেঁধে ওঠেনি। আর কিছুদিন রেওয়াজ করে আসরে বাজালে ভাল হয়।

এর পরের শিল্পী ছিলেন দীপালি নাগ। বহুদিন বাদে এঁকে গানের আসরে অংশগ্রহণ করতে দেখা গেল। শ্রীমতী নাগের শিল্পীজীবনের বিদগ্ধ পটভূমিকা এই প্রসঙ্গে স্মরণীয়। দুই দশক-এরও পূর্বে গানবাজনা যখন আমাদের প্রমোদের উপকরণরূপে পরিগণিত হোতো বিশেষ সম্ভ্রান্ত ঘরের মহিলারা উচ্চাঙ্গসংগীত পরিবেশন করবেন একথা কারুর কল্পনাতেও আসত না, সেই যুগে সঙ্গীতকে গ্রহণ করে নিষ্ঠা ও সাধনা দিয়ে তিনি প্রমাণ করেছেন সঙ্গীত আমোদের বস্তু নয়—আনন্দের আশ্রয়। এ শুধু তাঁর আন্তরিক সঙ্গীতানুরাগ নয়, সাহসেরও পরিচায়ক। আজ বাংলাদেশের ঘরে ঘরে উচ্চাঙ্গসংগীতের প্রসারের মূলে যাঁরা প্রেরণাস্বরূপ শ্রীমতী নাগ (তালুকদার) তাঁদেরই একজন। মীরা বন্দ্যোপাধ্যায় মালবিকা কানন তাঁদের স্বপ্ন ও কল্পনার ফলশ্রুতি।

শ্রীমতী নাগ আগ্রা ঘরানার শিল্পী। বসির খাঁ, ফৈয়াজ খাঁ উভয়ের কাছেই তালিম পেয়েছেন। তবে তাঁদের 'পুরুষালী' রীতি বর্জন করে ইনি নিজস্ব এক 'গায়ন-পদ্ধতি' আয়ত্ত করেছেন। এর বিস্তারে আগ্রা ঘরানার স্পষ্ট স্বচ্ছ প্রকাশ আছে অথচ মহিলাকণ্ঠের উপযোগী সুরের বিকাশও দুর্লভ নয়। সেদিন ইনি শুরু করলেন গাড়া কানাড়া দিয়ে। তারপর রাগের পথ বেয়ে নটবেহাগে পৌঁছে অনুষ্ঠান সমাপ্ত করলেন। তানের ঔজ্জ্বল্য হয়ত আশানুরূপ হয়নি, সরগমেও জোলুষের কিছু অভাব। কিন্তু বোলতানের নানান ভঙ্গী ও বিস্তারে তাঁর কল্পনাপ্রবণ শিল্পীমনটি ব্যক্ত। একতাল, ঝাঁপতাল, ত্রিতালের বিভিন্ন তালে ছন্দবৈচিত্র্যও ছিল যথেষ্ট। বিশ্বনাথ বোসের সুযোগ্য সঙ্গত এঁকে বিভিন্ন তাল-পরিক্রমণে সাহায্য করেছে।

সঙ্গীত-সঙ্গম

সম্প্রতি ৮৪।এ আহিরীটোলা স্ট্রীটে 'সঙ্গীত সঙ্গম' নামে একটি নতুন সঙ্গীত প্রতিষ্ঠানের উদ্বোধন ঘটল। এই প্রতিষ্ঠানের অধ্যক্ষ কুমার বীরেন্দ্র-কিশোর রায়চৌধুরী। প্রতিষ্ঠানের অন্যতম কর্ণধার ডাঃ অরুণ শীল উদ্বোধন ভাষণে এই সংস্থার উদ্দেশ্য ও লক্ষ্য বর্ণনা-প্রসঙ্গে বলেন—সঙ্গীত প্রতিষ্ঠান এই শহরে প্রচুর আছে, এখনও হচ্ছে আরো আরো হবে। অন্যান্য সংস্থাগুলির সঙ্গে এই সংস্থার প্রভেদ হলো, উত্তর ভারতীয় সঙ্গীতের একটি প্রাচীন, প্রামাণ্য এবং অভিজাত ধারার সঙ্গে ভাবীকালের শিল্পীদের পরিচয় ঘটানো এবং তাঁদের সহায়তায় এই ধারার শুদ্ধতাকে বাঁচিয়ে রাখা। এই নবজাত প্রতিষ্ঠানের পরম সৌভাগ্য যে কুমার বীরেন্দ্রকিশোর রায়-চৌধুরীর মত গুণী ও একনিষ্ঠ সঙ্গীত সাধককে অধ্যক্ষ ও শিক্ষকরূপে পেয়েছে। বাংলা তথা ভারতের সঙ্গীতজগতে বীরেন্দ্রকিশোরের পিতা প্রশ্বেয় ব্রজেন্দ্র-কিশোর ও গৌরীপুরের অবদান অঙ্গাঙ্গী-ভাবে বিজড়িত। ইনি এখনও পরিবারের সেই ঐতিহ্যকে আপন সাধনায় অব্যাহত রেখেছেন।

সেনী ঘরানায় শিক্ষাদান করবার এই যোগ্যতম ব্যক্তির কাছে তালিম পাবার সুযোগ শিক্ষার্থীদের দুর্লভ সৌভাগ্য।

সেদিনের সঙ্গীতাসরের একক শিল্পী ছিলেন কুমার বীরেন্দ্রকিশোর। ইনি কণ্ঠ-সঙ্গীতে ইমন কল্যাণ-এর সম্পূর্ণ রূপ প্রদর্শন করলেন। পুরোপুরি ধ্রুপদাঙ্গে ইনি বিলম্বিত, মধ্যজোড় ও ধামার পরি-বেশন করলেন। এঁর যন্ত্রসংগীত শুনতেই আমরা অভ্যস্ত, কিন্তু কণ্ঠসংগীতের ওপর অনন্যসাধারণ দক্ষতা আমাদের অজ্ঞাতই থেকে যেত যদি না সেদিন শুনতাম। প্রতিটি স্বরের বিশুদ্ধতা শ্রুতিসৌন্দর্য তাঁর মধুর কণ্ঠে অনুরণিত হয়ে এক ভাবমিশ্রিত গাম্ভীর্য সৃষ্টি করেছে। সেনী ঘরানার সঙ্গে অন্যান্য ঘরানার পরিবেশন-রীতি তিনি সুন্দরভাবে বুঝিয়ে দিয়েছেন। যা পূর্ণ তাই সরল। এই স্বচ্ছ সহজভাই পূর্ণতার দ্যোতক। ইনি দেখালেন ডাগার বাণীর সঙ্গে খাণ্ডার বাণী মিলিয়ে কেমন করে সহজ জিনিষকে অলঙ্কৃত করতে হয়। অলংকার হতে সঙ্গীতাবয়বের ভার না হয়ে সৌন্দর্যবর্ধক হয় সেদিকে কেমন করে দৃষ্টি রাখতে হয়। একাধারে শিক্ষক ও শিল্পীর এমন সমন্বয় বিরল। কণ্ঠ-সঙ্গীতের পর সুরশৃঙ্গারে পুরিয়া ও পাহাড়ী ঝিঁঝিট বাজিয়ে অনুষ্ঠান সমাপ্ত করলেন। তবলায় পাখোয়াজের অঙ্গের বোলে এঁকে সুন্দরভাবে অনুসরণ করেছেন সুবোধ নন্দীর সুযোগ্য ভ্রাতা শ্রীবালক নন্দী।

খেলাধুলা

দর্শক

ইংল্যান্ড সফরে ভারতীয় স্কুল ক্রিকেট দল

ষোলজন খেলোয়াড় নিয়ে গঠিত ভারতীয় স্কুল ক্রিকেট দলটি ৬ সপ্তাহের ইংল্যান্ড সফরের তালিকা অনুযায়ী খেলা শুরু করেছে। ইংল্যান্ডে ভারতীয় স্কুল ক্রিকেট দলের এই প্রথম সফর। ১৯৬৫-৬৬ সালের ক্রিকেট মরসুমে লণ্ডন স্কুল ক্রিকেট দল প্রথম ভারত সফরে এসেছিল। সেই সফরের বিনিময় হিসাবে লণ্ডন স্কুলস ক্রিকেট এসোসিয়েশনের ব্যবস্থাপনায় ভারতীয় স্কুল ক্রিকেট দলের বর্তমান ইংল্যান্ড সফর। খেলাধুলোর মাধ্যমে কমনওয়েলথ গোষ্ঠীভুক্ত দেশগুলির জনসাধারণের মধ্যে সৌহার্দ্যের ক্ষেত্র অনুকূল করার উদ্দেশ্যেই এই ধরনের সফরের আয়োজন।

বর্তমান ইংল্যাণ্ড সফরকারী ভারতীয় স্কুল ক্রিকেট দলের অধিনায়ক বোম্বাইয়ের অজিত নায়েক একজন কৃতী চৌকস খেলোয়াড়। দলের খেলোয়াড়দের বয়সের গড় ১৬ই বছর। দলের সঙ্গে ম্যানেজার হিসাবে আছেন ভারতবর্ষের প্রাক্তন টেস্ট খেলোয়াড় লেঃ কর্নেল হেমু অধিকারী।

অজিত নায়েক—অধিনায়ক
ভারতীয় স্কুল ক্রিকেট দল

দলের ষোলজন খেলোয়াড়ের মধ্যে বাংলার আছেন দুজন খেলোয়াড়—দীপঙ্কর সরকার এবং রাজা মুখার্জি। দলের বিশেষ আকর্ষণ হলেন প্রখ্যাত ভারতীয় টেস্ট খেলোয়াড় লালা অমরনাথের দুই পুত্র—সুরীন্দর এবং মহীন্দর অমরনাথ। দলের ব্যাটিং এবং বোলিং শক্তির উপর খুবই আশা করা যায়। ব্যাটসম্যান হিসাবে কিরমানি, সুরীন্দর অমরনাথ, রাজা মুখার্জি, আশিক এবং কারমারকারের নাম উল্লেখযোগ্য। মিডিয়াম পেস এবং লেগস্পিন বোলাররা হলেন দলের বোলিং শক্তি।

ইংল্যান্ড সফরে ভারতীয় স্কুল ক্রিকেট দলটি ইংল্যান্ডের পাঁচটি প্রখ্যাত টেস্ট মাঠে খেলবে—যেমন ওভালে লণ্ডন স্কুল দল, লর্ডসে এম সি সি সম্মিলিত স্কুল দল, ওল্ড ট্রাফোর্ডে ল্যাংকাসায়ার ফেডারেশন দল, ট্রেন্ট ব্রিজে নটিংহ্যামসায়ার এবং ডার্বিসায়ার স্কুল দল এবং এজবাস্টনে ইংলিশ স্কুল দলের বিপক্ষে। দুদিনব্যাপী টেস্ট ম্যাচ খেলবে তিনটি—ইংলাণ্ড, ওয়েলস এবং স্কটল্যান্ড স্কুল দলের সঙ্গে। সফরের মোট ১৭টি খেলার মধ্যে শেষ দুদিনের খেলা শুরু হবে আগামী ২৯শে আগস্ট।

ভারতীয় স্কুল ক্রিকেট দলের ব্যাপক দেশ ভ্রমণের উদ্দেশ্যে যতদূর সম্ভব বিস্তৃত অঞ্চল জুড়ে সফরের তালিকা তৈরী হয়েছে। দলের সুখ-স্বাচ্ছন্দ্য এবং অভ্যর্থনার আয়োজন এক রাজসিক ব্যাপার। এম সি সি'র হেডকোয়ার্টার্স লর্ডস মাঠের ঐতিহাসিক লংরুমে সম্বর্ধনা এবং ভোজসভার আয়োজন, বৃটিশ প্রধানমন্ত্রী মিঃ হ্যারল্ড উইলসনের সঙ্গে তাঁর সরকারী বাসভবন ঐতিহাসিক ১০নং ডাউনিং স্ট্রীটে সাক্ষাৎকার, রাণী এলিজাবেথের আমন্ত্রণে উইণ্ডসর ক্যাসেল পরিদর্শন, লণ্ডনের লর্ড মেয়র এবং গ্রেটার লণ্ডন কাউন্সিল প্রদত্ত সম্বর্ধনা সভা, লণ্ডন স্কুলস ক্রিকেট এসোসিয়েশনের সভাপতি স্যার এডওয়ার্ড বয়েল প্রদত্ত কমন্স সভায় মধ্যাহ্নভোজ, এম সি সি'র প্রাক্তন সভাপতি ডিউক অব নরফোকের বাসভবনে নিমন্ত্রণ, লর্ড মাউন্টব্যাটেনের ব্রডল্যান্ডস কাউন্টি হোমে (হ্যাম্পসায়ার) মধ্যাহ্নভোজ—সফরের বিশেষ উল্লেখযোগ্য কর্মসূচী।

ইডেন উদ্যানে আয়োজিত প্রথম বিভাগের ফুটবল লীগ প্রতিযোগিতায় ইস্টবেঙ্গল বনাম মহমেডান স্পোর্টিং দলের খেলার একটি দৃশ্য। ফটো : অমৃত

প্রথম বিভাগের ফুটবল লীগ

গত সপ্তাহে (জুলাই ১৭—২৩) প্রথম বিভাগের ক্যালকাটা ফুটবল লীগ প্রতিযোগিতায় যে ১৫টি খেলা হয়েছে তার সংক্ষিপ্ত ফলাফল : জয়-পরাজয়ের নিষ্পত্তি ১২ এবং ড্র ৩।

গত বছরের লীগ চ্যাম্পিয়ান ইস্টবেঙ্গল ক্লাব লীগ তালিকায় শীর্ষস্থান ঠিক রেখেছে—১৯টা খেলায় ৩২ পয়েন্ট। তারা আলোচ্য সপ্তাহে বাটা স্পোর্টসকে ১—০ গোলে পরাজিত করে মহমেডান স্পোর্টিং দলের সঙ্গে গুরুত্বপূর্ণ খেলা ড্র (০—০) করে।

লীগ তালিকার দ্বিতীয় স্থানে আছে বি এন আর—২০টা খেলায় ৩০ পয়েন্ট। আলোচ্য সপ্তাহে তারা ২—১ গোলে এরিয়ান্স এবং ৭—০ গোলে খিদিরপুরকে পরাজিত করে। এবছরের প্রথম বিভাগের ফুটবল লীগের খেলায় তাদের এই সাত গোলই একটি খেলায় সর্বাপেক্ষা বেশী গোল দেওয়ার রেকর্ড। তাদের এই সাত গোলের মধ্যে এল সি বসুর হ্যাটট্রিক ছিল।

গত বছরের রানার্স-আপ মোহনবাগান আলোচ্য সপ্তাহে তিনটে খেলায় ৫ পয়েন্ট সংগ্রহ করেছে। ইস্টার্ণ রেলওয়ের সঙ্গে তাদের খেলা গোলশূন্যভাবে ড্র যায়। লীগ তালিকায় বর্তমানে তাদের স্থান ৫ম—১৭টা খেলায় ২৪ পয়েন্ট। ইস্টবেঙ্গল দলের নিকট প্রতিদ্বন্দ্বী মহমেডান স্পোর্টিং দল ১৬টা খেলায় ২৭ পয়েন্ট সংগ্রহ করেছে।

টেস্ট ক্রিকেটে ভারতবর্ষের একশত খেলা

ক্ষেত্রনাথ রায়

বার্মিংহামের এজবাস্টনে আয়োজিত ইংল্যান্ড বনাম ভারতবর্ষের ১৯৬৭ সালের টেস্ট সিরিজের গত তৃতীয় টেস্ট খেলাটি ভারতবর্ষের পক্ষে খুবই গুরুত্বপূর্ণ ছিল। আন্তর্জাতিক সরকারী টেস্ট ক্রিকেট খেলার আসরে এই খেলাটি ছিল ভারতবর্ষের নিজস্ব শততম টেস্ট ম্যাচ। ইংল্যান্ডের মাটিতে টেস্ট ক্রিকেট খেলায় ভারতবর্ষের হাতে খড়ি এবং ঘটনাচক্রে এইখানেই তাদের শততম টেস্ট খেলার আসর বসেছিল। ভারতবর্ষের এই দুই ঐতিহাসিক খেলাতেই ইংল্যান্ড জয়ী হয়। ইংল্যান্ড, অস্ট্রেলিয়া, ওয়েস্ট ইণ্ডিজ, পাকিস্তান এবং নিউজিল্যাণ্ড—এই পাঁচটি দেশের বিপক্ষে সরকারী টেস্ট ক্রিকেট খেলার সূত্রে ভারতবর্ষের একশত টেস্ট খেলা পূর্ণ হয়েছে (জুলাই ১৩, ১৯৬৭)। ভারতবর্ষ বিগত ৩৬ বছরে (১৯৩২-৬৭) সরকারী টেস্ট ম্যাচ খেলেছে—ইংল্যাণ্ডের বিপক্ষে ৩৭, ওয়েস্ট ইণ্ডিজের বিপক্ষে ২৩, অস্ট্রেলিয়ার বিপক্ষে ১৬, পাকিস্তানের বিপক্ষে ১৫ এবং নিউজিল্যাণ্ডের বিপক্ষে ৯টি। একমাত্র ওয়েস্ট ইণ্ডিজ দলের বিপক্ষে ভারতবর্ষ একটা টেস্ট খেলাতেও জয়ী হয়নি। এই পাঁচটি দেশের বিপক্ষে মোট ২৪টি টেস্ট সিরিজ খেলে ভারতবর্ষ ৪বার 'রাবার' জয়ী হয়েছে—ইংল্যাণ্ডের বিপক্ষে ১ বার, পাকিস্তানের বিপক্ষে ১ বার এবং নিউজিল্যাণ্ডের বিপক্ষে ২বার। টেস্ট সিরিজ অমীমাংসিত থেকে গেছে ৫বার—ইংল্যাণ্ডের বিপক্ষে ২, পাকিস্তানের বিপক্ষে ২ এবং অস্ট্রেলিয়ার বিপক্ষে ১বার। এই ২৪টি টেস্ট সিরিজের ১০০টি খেলার ফলাফল দাঁড়িয়েছে—ভারতবর্ষের জয় ১০, পরাজয় ৪০ এবং ড্র ৫০।

টেস্ট ক্রিকেটে বিবিধ রেকর্ড

ভারতবর্ষের প্রথম টেস্ট খেলার তারিখ

ভারতবর্ষে

বিপক্ষে	তারিখ ও স্থান
ইংল্যান্ড	১৫ ডিসেম্বর, ১৯৩৩; বোম্বাই
ওয়েস্ট ইন্ডিজ	১০ নভেম্বর, ১৯৪৮; নিউদিল্লী
পাকিস্তান	১৬ অকটোবর, ১৯৫২; নিউদিল্লী
নিউজিল্যান্ড	২০ নভেম্বর, ১৯৫৫; হায়দরাবাদ
অস্ট্রেলিয়া	১৯ অকটোবর, ১৯৫৬; মাদ্রাজ

টেস্ট খেলার সংক্ষিপ্ত ফলাফল

বিপক্ষে	খেলা	ভারতবর্ষের জয়	পরাজয়	ড্র
ইংল্যান্ড	৩৭	৩	১৮	১৬
ওয়েস্ট ইন্ডিজ	২৩	০	১২	১১
অস্ট্রেলিয়া	১৬	২	৯	৫
পাকিস্তান	১৫	২	১	১২
নিউজিল্যান্ড	৯	৩	০	৬
মোট :	১০০	১০	৪০	৫০

টেস্ট সিরিজের সংক্ষিপ্ত ফলাফল

বিপক্ষে	সিরিজ	ভারতবর্ষের জয়	পরাজয়	ড্র
ইংল্যান্ড	১০	১	৭	২
ওয়েস্ট ইন্ডিজ	৫	০	৫	০
অস্ট্রেলিয়া	৪	০	৩	১
পাকিস্তান	৩	১	০	২
নিউজিল্যান্ড	২	২	০	০
মোট :	২৪	৪	১৫	৫

বিদেশে

বিপক্ষ দল	তারিখ ও স্থান
ইংল্যান্ড	২৫ জুন, ১৯৩২; লর্ডস
অস্ট্রেলিয়া	২৮ নভেম্বর ১৯৪৭; ব্রিসবেন
ওয়েস্ট ইন্ডিজ	২১ জানুয়ারী, ১৯৫৩; পোর্ট অব স্পেন
পাকিস্তান	১ জানুয়ারী, ১৯৫৫; ঢাকা

এক ইনিংসে দলগত সর্বাধিক রান

ভারতবর্ষের পক্ষে

বিপক্ষে	রান — স্থান — বছর
পাকিস্তান :	৫৩৯ (৯ উইঃ ডিক্লেঃ), মাদ্রাজ, ১৯৬০-৬১
নিউজিল্যান্ড :	৫৩৭ (৩ উইঃ ডিক্লেঃ), মাদ্রাজ, ১৯৫৫-৫৬
ইংল্যান্ড :	৫১০, লিডস, ১৯৬৭
ওয়েস্ট ইন্ডিজ :	৪৫৪, নিউদিল্লী, ১৯৪৮-৪৯
অস্ট্রেলিয়া :	৩৮১, এডিলেড, ১৯৪৭-৪৮

ভারতবর্ষের বিপক্ষে

বিপক্ষ দল	রান — স্থান — বছর
অস্ট্রেলিয়া :	৬৭৪, এডিলেড, ১৯৪৭-৪৮
ওয়েস্ট ইন্ডিজ :	৬৪৪ (৮ উইঃ ডিক্লেঃ), দিল্লী, ১৯৫৮-৫৯
ইংল্যান্ড :	৫৭১ (৮ উইঃ ডিক্লেঃ), ম্যাঞ্চেস্টার, ১৯৩৬
নিউজিল্যান্ড :	৪৬২ (৯ উইঃ ডিক্লেঃ), কলকাতা, ১৯৬৫
পাকিস্তান :	৪৪৮ (৮ উইঃ ডিক্লেঃ), মাদ্রাজ, ১৯৬০-৬১

এক ইনিংসে দলগত সর্বনিম্ন রান (পুরো ইনিংসের খেলায়)

ভারতবর্ষের পক্ষে

বিপক্ষে	রান — স্থান — বছর
অস্ট্রেলিয়া :	৫৮, ব্রিসবেন, ১৯৪৭-৪৮
ইংল্যান্ড :	৫৮, ম্যাঞ্চেস্টার, ১৯৫২
নিউজিল্যান্ড :	৮৮, বোম্বাই, ১৯৬৫
ওয়েস্ট ইন্ডিজ :	৯৮, ত্রিনিদাদ, ১৯৬১-৬২
পাকিস্তান :	১০৬, লক্ষ্ণৌ, ১৯৫২-৫৩

ভারতবর্ষের বিপক্ষে

বিপক্ষ দল	রান — স্থান — বছর
অস্ট্রেলিয়া :	১০৫, কাণপুর, ১৯৫৯-৬০
ইংল্যান্ড :	১৩৪, লর্ডস, ১৯৩৬
পাকিস্তান :	১৫০, দিল্লী, ১৯৫২-৫৩
নিউজিল্যান্ড :	১৩৬, বোম্বাই, ১৯৫৫-৫৬
ওয়েস্ট ইন্ডিজ :	২২২, কানপুর ১৯৫৮-৫৯

এক ইনিংসে ৫০০ বা তার বেশী রান

ভারতবর্ষের পক্ষে—৪ বার

৫৩৯ (৯ উইঃ ডিক্লেঃ), বি, পাকিস্তান, মাদ্রাজ, ১৯৬০-৬১
৫৩৭ (৩ উইঃ ডিক্লেঃ), বি. নিউজিল্যান্ড, মাদ্রাজ. ১৯৫৫-৫৬
৫৩১ (৭ উইঃ ডিক্লেঃ), বি. নিউজিল্যান্ড. দিল্লী, ১৯৫৫-৫৬
৫১০ বিপক্ষে ইংল্যান্ড, লিডস, ১৯৬৭

ভারতবর্ষের বিপক্ষে

ইংল্যান্ড—৫ বার

৫৭১ (৮ উইঃ ডিক্লেঃ), ম্যাঞ্চেস্টার, ১৯৩৬
৫৫৯ (৮ উইঃ ডিক্লেঃ), কানপুর, ১৯৬৩-৬৪
৫৩৭, লর্ডস, ১৯৫২
৫৫০ (৪ উইঃ ডিক্লে), লিডস, ১৯৬৭
৫০০ (৮ উইঃ ডিক্লেঃ), বোম্বাই, ১৯৬১-৬২

ওয়েস্ট ইন্ডিজ—৮ বার

৬৪৪ (৮ উইঃ ডিক্লেঃ), দিল্লী, ১৯৫৮-৫৯
৬৩১ (৮ উইঃ ডিক্লেঃ), কিংস্টন, ১৯৬১—৬২
৬৩১ নিউদিল্লী, ১৯৪৮-৪৯
৬২৯ (৬ উইঃ ডিক্লেঃ), বোম্বাই, ১৯৪৮—৪৯
৬১৪ (৫ উইঃ ডিক্লেঃ), কলকাতা ১৯৫৮-৫৯
৫৮২, মাদ্রাজ, ১৯৪৮-৪৯
৫৭৬, কিংস্টন, ১৯৫২-৫৩
৫০০, মাদ্রাজ, ১৯৫৮-৫৯

অস্ট্রেলিয়া—৩ বার

৬৭৪, এডিলেড, ১৯৪৭-৪৮
৫৭৫ (৮ উইঃ ডিক্লেঃ), মেলবোর্ণ, ১৯৪৭-৪৮
৫২৩ (৭ উইঃ ডিক্লেঃ), ১৯৫৬-৫৭

পুরো এক ইনিংসে ১০০ রানের কম
ভারতবর্ষের পক্ষে—১০ বার

ইংল্যাণ্ডের বিপক্ষে ৫ বার : ৫৮ ও ৮২ (একটি খেলার উভয় ইনিংসে), ম্যাঞ্চেস্টার, ১৯৫২; ৯২ রান, এজবাস্টন, ১৯৬৭; ৯৩ রান, লর্ডস, ১৯৩৬; ৯৮ রান, ওভাল, ১৯৫২।

অস্ট্রেলিয়ার বিপক্ষে ৩ বার : ৫৮ ও ৯৮ (একটি খেলার উভয় ইনিংসে) ব্রিসবেন, ১৯৪৭-৪৮; ৬৭ রান, মেলবোর্ণ, ১৯৪৭-৪৮।

ওয়েস্ট ইন্ডিজের বিপক্ষে ১ বার : ৯৮, ত্রিনিদাদ, ১৯৬১-৬২।

নিউজিল্যান্ডের বিপক্ষে ১ বার : ৮৮, বোম্বাই, ১৯৬৫

ভারতবর্ষের বিপক্ষে শূন্য

ভারতবর্ষের বিপক্ষে টেস্ট খেলায় এ পর্যন্ত কোন দেশ পুরো ইনিংসের খেলায় একশতের কম রান করেনি।

ভারতবর্ষের পক্ষে এবং বিপক্ষে

এক সিরিজে সর্বাধিক মোট রান

(ব্যক্তিগত)

পক্ষে : ৫৮৬—ভি এল মঞ্জরেকার, বিপক্ষে ইংল্যান্ড, ১৯৬১—৬২।

বিপক্ষে : ৭৭৯—ই ডি উইকস (ওয়েন্ট ইণ্ডিজ), ১৯৪৮—৪৯।

এক সিরিজে সর্বাধিক মোট উইকেট

পক্ষে : ৩৪টি—ভিনু মানকাদ (বিপক্ষে ইংল্যান্ড), ১৯৫১—৫২।

৩৪টি—সুভাষ গুপ্তে (বিপক্ষে নিউজিল্যান্ড), ১৯৫৫—৫৬।

বিপক্ষে : ৩০টি—ওয়েসলী হল (ওয়েন্ট ইণ্ডিজ), ১৯৫৮—৫৯।

একটি খেলায় সর্বাধিক উইকেট

পক্ষে : ১৪টি—জে এম প্যাটেল (বিপক্ষে অস্ট্রেলিয়া), কানপুর, ১৯৫৯—৬০।

বিপক্ষে : ১২টি—ফজল মামুদ (পাকিস্থান), লক্ষ্মৌ, ১৯৫২—৫৩।

১২টি—এ কে ডেভিডসন (অস্ট্রেলিয়া), কানপুর, ১৯৫৯—৬০।

এক ইনিংসে সর্বাধিক উইকেট

পক্ষে : ৯টি—সুভাষ গুপ্তে (বিপক্ষে ওয়েন্ট ইণ্ডিজ), কানপুর, ১৯৫৮—৫৯।

৯টি—জে এম প্যাটেল (বিপক্ষে অস্ট্রেলিয়া), কানপুর, ১৯৫৯—৬০।

বিপক্ষে : ৮টি—ফ্রেডী ট্রুম্যান (ইংল্যান্ড), ম্যাঞ্চেস্টার, ১৯৫২।

৮টি—এল গিবস (ওয়েস্ট ইণ্ডিজ), বার্বাদোজ, ১৯৬১—৬২।

৩০০০ বা তার বেশী রান

৩,৬৩১ রান—পলি উমরীগড় (খেলা ৫৯, ইনিংস ৯৪, নট আউট ৮ এক ইনিংসে সর্বোচ্চ রান ২২৩, সেঞ্চুরী ১২ এবং গড় ৪২·২২)।

৩,২০৯ রান—ভি এল মঞ্জরেকার (খেলা ৫৫, ইনিংস ৯২, নট আউট ১০, এক ইনিংসে সর্বোচ্চ রান ১৮৯ নট আউট, সেঞ্চুরী ৭ এবং গড় ৩৯·১৩)।

এক ইনিংসে ব্যক্তিগত শত রান

ভারতবর্ষের পক্ষে ৭৪		ভারতবর্ষের বিপক্ষে ৯৩	
বিপক্ষে	সেঞ্চুরী সংখ্যা	বিপক্ষ দল	সেঞ্চুরী সংখ্যা
ইংল্যাণ্ড	২৭	ইংল্যাণ্ড	২৮
ওয়েস্ট ইণ্ডিজ	১৬	ওয়েস্ট ইণ্ডিজ	৩৪
নিউজিল্যাণ্ড	১৫	নিউজিল্যাণ্ড	৮
অস্ট্রেলিয়া	৮	অস্ট্রেলিয়া	১৫
পাকিস্তান	৮	পাকিস্তান	৮
মোট	৭৪		৯৩

এক ইনিংসে ব্যক্তিগত সর্বোচ্চ রান

ভারতবর্ষের পক্ষে

বিপক্ষে	রান	খেলোয়াড়	স্থান	সাল
নিউজিল্যাণ্ড	২৩১	ভিনু মানকাদ	মাদ্রাজ	১৯৫৫-৫৬
ইংল্যাণ্ড	২০৩*	পতৌদির নবাব	দিল্লী	১৯৬৩-৬৪
ওয়েস্ট ইণ্ডিজ	১৭২*	পলি উমরীগড়	ত্রিনিদাদ	১৯৬১-৬২
পাকিস্তান	১৪৬*	বিজয় হাজারে	বোম্বাই	১৯৫২-৫৩
অস্ট্রেলিয়া	১৪৫	বিজয় হাজারে	এডিলেড	১৯৪৭-৪৮

* আউট

ভারতবর্ষের বিপক্ষে

পক্ষে	রান	খেলোয়াড়	স্থান	সাল
ওয়েস্ট ইণ্ডিজ	২৫৬	রোহন কানহাই	কলকাতা	১৯৫৮-৫৯
ইংল্যাণ্ড	২৪৬*	জিওফ বয়কট	লিডস	১৯৬৭
নিউজিল্যাণ্ড	২৩০*	বি সাটক্লিফ	দিল্লী	১৯৫৫-৫৬
অস্ট্রেলিয়া	২০১	ডি জি ব্র্যাডম্যান	এডিলেড	১৯৪৭-৪৮
পাকিস্তান	১৬০	হানিফ মহম্মদ	বোম্বাই	১৯৬০-৬১

অল-রাউণ্ডার

২০০০ রান ও ১০০ উইকেট

২১০৯ রান ও ১৬২টি উইকেট—ভিনু মানকাদ।

ব্যাটিং পরিসংখ্যান—খেলা ৪৪, ইনিংস ৭২, নট আউট ৫, মোট রান ২১০৯, এক ইনিংসে সর্বোচ্চ রান ২৩১, সেঞ্চুরী ৫টি এবং গড় ৩১'৪৭।

বোলিং পরিসংখ্যান—৫২৩৫ রানে ১৬২ উইকেট (গড় ৩২·৩১)।

ভিনু মানকাদকে নিয়ে টেস্ট ক্রিকেট খেলার ইতিহাসে মাত্র চারজন খেলোয়াড় ২০০০ রান এবং ১০০ উইকেট সংগ্রহ করেছেন। অপর তিনজন—ইংল্যাণ্ডের উইলফ্রেড রোডস এবং টি ই বেইলী এবং অস্ট্রেলিয়ার কিথ মিলার।

১৯৫২ সালে পাকিস্থানের বিপক্ষে বোম্বাইয়ে ভিনু মানকাদ তাঁর ২৩তম টেস্ট খেলায় ১০০০ রান এবং ১০০ উইকেট পূর্ণ করার সূত্রে সর্বাপেক্ষা কম টেস্ট ম্যাচ খেলে এই ডাবল সম্মান লাভের বিশ্ব রেকর্ড করেন।

প্রথম টেস্ট খেলতে নেমে সেঞ্চুরী
ভারতবর্ষের পক্ষে

ইংল্যাণ্ডের বিপক্ষে :

১১৮—লালা অমরনাথ, বোম্বাই ১৯৩৩—৩৪

১১২—আব্বাস আলী বেগ, ম্যাঞ্চেস্টার, ১৯৫৯

১০৫—হনুমন্ত সিং, দিল্লী, ১৯৬৩—৬৪

পাকিস্থানের বিপক্ষে :

১১০ ডি এইচ শোধন, কলকাতা, ১৯৫২—৫৩

নিউজিল্যাণ্ডের বিপক্ষে :

১০০*এ জি কৃপাল সিং, হায়দরাবাদ ১৯৫৫—৫৬

একটি খেলার উভয় ইনিংসে সেঞ্চুরী
ভারতবর্ষের পক্ষে

১৪৫ ও ১১৬ রান—বিজয় হাজারে, বিপক্ষে অস্ট্রেলিয়া, এডিলেড, ১৯৪৭-৪৮।

ভারতবর্ষের বিপক্ষে

১৩২ ও ১২৭*—ডি জি ব্র্যাডম্যান, মেলবোর্ণ, ১৯৪৭-৪৮।

১৬২ ও ১০১—এভার্টন উইকস, কলকাতা, ১৯৪৮-৪৯।

টেস্টে ডাবল সেঞ্চুরী
ভারতবর্ষের পক্ষে

২৩১ ভিনু মানকাদ (বি, নিউজিল্যাণ্ড), মাদ্রাজ, ১৯৫৫—৫৬।

২২৩ ভিনু মানকাদ (বি, নিউজিল্যাণ্ড), বোম্বাই, ১৯৫৫—৫৬

২২৩ পলি উমরীগড় (বি, নিউজিল্যাণ্ড), হায়দরাবাদ, ১৯৫৫—৫৬।

২০৩* পতৌদির নবাব (বি, ইংল্যাণ্ড), দিল্লী, ১৯৬৪।

২০০* দিলীপ সরদেশাই (বি নিউজিল্যাণ্ড) বোম্বাই, ১৯৬৫

ভারতবর্ষের বিপক্ষে

ইংল্যাণ্ড (৩টি) : ২১৭ ডবলু হ্যামণ্ড (ওভাল, ১৯৩৬), ২০৫ নট আউট জে হার্ডস্টাফ (জুনিয়র), লর্ডস, ১৯৪৬; ২৪৬ নট আউট জিওফ বয়কট, লিডস, ১৯৬৭।

অস্ট্রেলিয়া (১টি) : ২০১ ডি জি ব্র্যাডম্যান (এডিলেড, ১৯৪৭—৪৮)।

ওয়েস্ট ইণ্ডিজ (৩টি) : ২৫৬ আর কানহাই, কলকাতা, ১৯৫৮—৫৯; ২৩৭ ফ্র্যাঙ্ক ওরেল, কিংস্টন, ১৯৫২—৫৩; ২০৭ এভার্টন উইকস, ত্রিনিদাদ, ১৯৫২—৫৩।

নিউজিল্যান্ড (১টি) : ২৩০ নট আউট বি সাটক্লিফ, নিউদিল্লী, ১৯৫৫—৫৬।

৬০০ রানের ইনিংস

৬৭৪—অস্ট্রেলিয়া, এডিলেড, ১৯৪৭—৪৮।
৬৪৪ (৮ উইঃ ডিক্লেঃ)—ওয়েস্ট ইণ্ডিজ, নিউদিল্লী, ১৯৫৮—৫৯।
৬৩১ (৮ উইঃ ডিক্লেঃ)—ওয়েস্ট ইণ্ডিজ, কিংস্টন, ১৯৬১—৬২।
৬৩১—ওয়েস্ট ইণ্ডিজ, নিউদিল্লী, ১৯৪৮—৪৯।
৬২৯ (৬ উইঃ ডিক্লেঃ)—ওয়েস্ট ইণ্ডিজ, বোম্বাই, ১৯৪৮—৪৯।
৬১৪ (৫ উইঃ ডিক্লেঃ)—ওয়েস্ট ইণ্ডিজ, কলকাতা, ১৯৫৮—৫৯।

ভারতবর্ষের টেস্ট মাঠে সর্বোচ্চ রান

দিল্লী ৬৪৪ (৮ উইঃ ডিক্লেঃ)—ওয়েস্ট ইণ্ডিজ, ১৯৫৮—৫৯।
বোম্বাই ৬২৯ (৬ উইঃ ডিক্লেঃ)—ওয়েস্ট ইণ্ডিজ, ১৯৪৮—৪৯।
কলকাতা ৬১৪ (৫ উইঃ ডিক্লেঃ)—ওয়েস্ট ইণ্ডিজ, ১৯৫৮—৫৯।
মাদ্রাজ ৫৮২—ওয়েস্ট ইণ্ডিজ, ১৯৪৮-৪৯
কানপুর ৫৫৯—ইংল্যান্ড, ১৯৬৪
হায়দরাবাদ ৪৯৮ (৪ উইঃ ডিক্লেঃ)—ভারতবর্ষ, ১৯৫৫—৫৬
লক্ষ্ণৌ ৩৩১—পাকিস্তান, ১৯৫২—৫৩

সর্বনিম্ন রান
(পুরো এক ইনিংসের খেলায়)

কানপুর ১০৫—অস্ট্রেলিয়া, ১৯৫৯-৬০
লক্ষ্ণৌ ১০৬—ভারতবর্ষ, ১৯৫২—৫৩
কলকাতা ১২৪—ভারতবর্ষ, ১৯৫৩—৫৪
দিল্লী ১৩৫—ভারতবর্ষ, ১৯৫৯—৬০
বোম্বাই ১৩৬—নিউজিল্যান্ড, ১৯৫৫—৫৬
মাদ্রাজ ১৩৮—ভারতবর্ষ, ১৯৫৯—৬০
হায়দরাবাদ ৩২৬—নিউজিল্যান্ড ১৯৫৫—৫৬

উপর্যুপরি ইনিংসে সেঞ্চুরী

৪টি : **এভার্টন উইকস (ওয়েস্ট ইণ্ডিজ)—১২৮ (নিউদিল্লী), ১৯৪ (বোম্বাই), ১৬২ ও ১০১ (কলকাতা), ১৯৪৮—৪৯।**

৩টি : বিজয় হাজারে (ভারতবর্ষ)—১২২ (বোম্বাই)—বিপক্ষে ওয়েস্ট ইণ্ডিজ ১৯৪৮—৪৯; ১৬৪ নট আউট (নিউদিল্লী), ১৫৫ (বোম্বাই)—বিপক্ষে ইংল্যান্ড, ১৯৫১—৫২।

৩টি : পলি উমরীগড় (ভারতবর্ষ)—১১৭ (মাদ্রাজ), ১১২ (নিউদিল্লী)—বিপক্ষে পাকিস্থান, ১৯৬০—৬১ এবং ১৪৭ নট আউট (কানপুর)—বিপক্ষে ইংল্যান্ড, ১৯৬১—৬২।

৩টি : ডন ব্র্যাডম্যান (অস্ট্রেলিয়া)—১৩২ ও ১২৭* (মেলবোর্ণ) এবং ২০১ (এডিলেড), ১৯৪৭—৪৮

এক সিরিজে ব্যক্তিগত ৬০০ রান

৭৭৯ রান (গড় ১১১·২৮)—এভার্টন উইকস, ১৯৪৮—৪৯।
৭১৬ রান (গড় ১০২·২৮)—এভার্টন উইকস, ১৯৫২—৫৩।
৭১৫ রান (গড় ১৭৮'৭৫)—ডন ব্র্যাডম্যান, ১৯৪৭—৪৮।
৬১১ রান (গড় ৮৭·২৮)—বি সাটক্লিফ, ১৯৫৫—৫৬।

একদিনের খেলায় সর্বাধিক রান

২১৭—ওয়াল্টার হ্যামণ্ড, ওভাল, ১৯৩৬।
২০৩—রোহন কানহাই, কলকাতা, ১৯৫৮—৫৯।
২০১—ডন ব্র্যাডম্যান, এডিলেড, ১৯৪৭—৪৮।

এক ইনিংসে সর্বাধিক বাউণ্ডারী

৪২টি বাউণ্ডারী (২৫৬ রানে)—রোহন কানহাই, কলকাতা, ১৯৫৮—৫৯।

চতুর্থ ইনিংসে সর্বাধিক রান

৩৭৬—ভারতবর্ষ (বিপক্ষে ইংল্যান্ড), ম্যাঞ্চেস্টার, ১৯৫৯।
(ভারতবর্ষ ১৭১ রানে পরাজিত হয়)
৩৫৫ (৮ উইঃ)—ভারতবর্ষ (বিপক্ষে ওয়েস্ট ইণ্ডিজ), বোম্বাই, ১৯৪৮—৪৯। (খেলা ড্র যায়। ভারতবর্ষের জয়লাভের জন্যে ৩৬১ রানের প্রয়োজন ছিল)।

ভারতবর্ষের টেস্ট মাঠে সর্বাধিক ব্যক্তিগত রান

কলকাতা : ২৫৬—আর কানহাই (ওয়েস্ট ইণ্ডিজ), ১৯৫৮—৫৯।
মাদ্রাজ : ২৩১—ভিনু মানকাদ (বিপক্ষে নিউজিল্যান্ড), ১৯৫৫—৫৬।
নিউদিল্লী : ২৩০*—বি সাটক্লিফ (নিউজিল্যান্ড), ১৯৫৫—৫৬।
বোম্বাই : ২২৩—ভিনু মানকাদ (বিপক্ষে নিউজিল্যান্ড), ১৯৫৫—৫৬।
হায়দরাবাদ : ২২৩—পলি উমরীগড় (বিপক্ষে নিউজিল্যান্ড), ১৯৫৫—৫৬।
কানপুর : ১৯৮—জি সোবার্স (ওয়েস্ট ইণ্ডিজ), ১৯৫৮—৫৯।
লক্ষ্ণৌ : ১২৪*—নাজির মহম্মদ (পাকিস্থান), ১৯৫২—৫৩।

এ পর্যন্ত ভারতবর্ষের সাতটি স্থানে অনুষ্ঠিত টেস্ট ক্রিকেট খেলায় ভারতবর্ষের খেলোয়াড়রা তিনটি টেস্ট কেন্দ্রে এক ইনিংসের খেলায় সর্বাধিক ব্যক্তিগত রানের রেকর্ড করেছেন। বাকি চারটি কেন্দ্রে নিউজিল্যান্ড, ওয়েস্ট ইণ্ডিজ এবং পাকিস্থানের খেলোয়াড়দের রেকর্ড আছে।

উল্লেখযোগ্য ঘটনা

একদিনে সর্বাধিক রান (দুই দলের) **৫৮৮ রান (৬ উইকেটে) :** ৩৯৮ রান (৬ উইকেটে)—ইংল্যান্ড এবং ১৯০ রান (কোন উইকেট না পড়ে)—ভারতবর্ষ — (বিশ্ব রেকর্ড)।

একদিনে সর্বাধিক রান (এক দলের) ৪৭১ (৮ উইঃ)—ইংল্যান্ড (বিপক্ষে ভারতবর্ষ, ওভাল, ১৯৩৬।

একদিনে সর্বনিম্ন রান : ১১৭ (৫ উইকেটে)—ভারতবর্ষ (বিপক্ষে অস্ট্রেলিয়া) মাদ্রাজ, ১৯৫৬।

এক ইনিংসে সর্বাধিক জনকে আউট (উইকেটকিপারের পক্ষে) : ৫টি (কট ৩ এবং ষ্টাম্পড ২)—বি কে কুন্দরণ (ভারতবর্ষ) বিপক্ষে ইংল্যান্ড, বোম্বাই, ১৯৬১—৬২।

পাঁচটি টেস্টেরই টসে জয়

১৯৬৩—৬৪ সালে ইংল্যান্ডের বিপক্ষে ভারতবর্ষের অধিনায়ক পতৌদির নবাব এবং ১৯৪৮—৪৯ সালে ভারতবর্ষের বিপক্ষে ওয়েস্ট ইণ্ডিজের অধিনায়ক জে ডি সি গডার্ড টেস্ট সিরেজের পাঁচটি খেলাতেই টসে জয়ী হন।

প্রথম উইকেট জুটির বিশ্ব রেকর্ড

৪১৩ রান : ভি মানকাদ এবং পি রায়, বিপক্ষে নিউজিল্যান্ড, মাদ্রাজ, ১৯৫৫—৫৬।

সিরিজের পাঁচটি খেলায় পরাজয়

(১) ইংল্যান্ডের বিপক্ষে ১৯৫৯ সালে এবং (২) ওয়েস্ট ইন্ডিজের বিপক্ষে ১৯৬১-৬২ সালের টেস্ট সিরিজের পাঁচটি খেলাতেই ভারতবর্ষ পরাজয় বরণ করে।

সিরিজের পাঁচটি খেলাই অমীমাংসিত ৩বার—পাকিস্তানের বিপক্ষে দু'বার (১৯৫৪-৫৫ ও ১৯৬০-৬১) এবং ইংল্যান্ডের বিপক্ষে ১বার (১৯৬৩-৬৪)।

ক্রিকেট খেলোয়াড়-জীবনের প্রথম টেস্ট খেলার সময় বয়সের ভিত্তিতে ভারতবর্ষের সর্ব কনিষ্ঠ টেস্ট খেলোয়াড়—বিজয় মেহরা (১৭ বছর ২৬৫ দিন) এবং বয়োজ্যেষ্ঠ অমর জে জামসেদজী (৪১ বছর ২৮ দিন)।

টেস্টের একই আসরে দুই সহোদর ১৯৩৪ সালে মাদ্রাজে (১) সি কে এবং সি এস নাইডু (২) ওয়াজির এবং নাজির আলী; ১৯৬১ সালে বোম্বাইয়ে কৃপাল এবং মিলখা সিং। ভারতবর্ষের বিপক্ষে একই আসরে দুই সহোদর খেলেছেন ১৯৫২ সালে পাকিস্তানের হানিফ মহম্মদ এবং ওয়াজির মহম্মদ এবং ১৯৬০ সালে হানিফ মহম্মদ এবং মুস্তাক মহম্মদ।

সর্বাধিক টেস্ট খেলা

ভারতবর্ষের পক্ষে : ৫৯টি—পলি উমরীগ

ভারতবর্ষের পক্ষে সর্বপ্রথম

টেস্ট খেলায় জয়লাভ : ইংল্যান্ডের বিপক্ষে এক ইনিংস ও ৮ রাণে, মাদ্রাজ ১৯৫১-৫২।

টেস্ট সিরিজ ড্র : ইংল্যান্ডের বিপক্ষে ১৯৫১-৫২।

টেস্ট সিরিজে রাবার জয় : পাকিস্তানের বিপক্ষে ২—১ খেলায় (ড্র ২) ১৯৫২-৫৩।

ফুটবলের শ্রেষ্ঠাংশে

প্রদীপ ব্যানার্জী

(ইস্টার্ন রেল)

মাত্র কয়েক সেকেণ্ডের, কয়েক মুহূর্তের একটি ঘটনা—কিন্তু সে-মুহূর্তকটি অবিস্মরণীয়।

ঘটনাটি ১৯৬০ সালের কেরালার কালিকটে অয়োজিত জাতীয় ফুটবল প্রতিযোগিতাকে ঘিরে। লীগ এবং নক-আউট প্রথায় পরিচালিত সন্তোষ ট্রফির খেলা প্রায় চূড়ান্ত পর্যায়ে পেঁাছে গেছে। রেলওয়ে খেলছে সার্ভিসেসের বিরুদ্ধে। রেল শুধু একটি পয়েন্ট পেলেই মূল প্রতিযোগিতার সেমি-ফাইনালে উঠবে। এক গোলে এগিয়ে ছিল থঙ্গরাজের নেতৃত্বাধীন সার্ভিসেস। খেলা ভাঙার কয়েক সেকেন্ড মাত্র বাকি—বল রেলওয়ের রাইট উইংয়ের পায়ে, গোল প্রায় অবধারিত। বুটের ডগা থেকে বুলেটের মত বল ছুটে লাগলো গিয়ে সার্ভিসেস সেণ্টার হাফ মমতাজের বুকে; মমতাজ পড়ে গেলেন সঙ্গে সঙ্গে; থঙ্গরাজ উপায়ান্তর না দেখে গোল ছেড়ে বেরিয়ে এসেছেন, রেলওয়ের রাইট আউটের সামনে তখন গোলের শেষ বাধাটিও সরে গেছে, বল শুধু আলতো করে ঠেললেই ফাইনালের সড়ক গড়া হয়ে যায়।

কিন্তু তাজ্জব ব্যাপার! রেলের রাইট আউট তথা অধিনায়ক এই সুবর্ণ সুযোগ কাজে না লাগিয়ে ভূলুণ্ঠিত, অচেতনপ্রায় মমতাজকে তুলে নিলেন। দলের স্বার্থ ভুলে গেলেন তিনি। সমাপ্তির বাঁশী বাজলো, হার হোল রেলের।

কালিকট মিউনিসিপ্যাল স্টেডিয়ামে তখন আর এক দৃশ্য, বিজিত রেলওয়ে দলের অধিনায়ককে বুকে জড়িয়ে ধরেছেন ম্যানেজার শ্রীকল্যাণকুমার দাস। 'এই তো প্রকৃত খেলোয়াড়; এমনটিই আমরা চাই। তোমার জয় হোক।' বললেন শ্রীদাস।

রেলের সেই রাইট আউট—প্রদীপ ব্যানার্জি; ভারতের লক্ষ লক্ষ ক্রীড়ামোদী যাকে "পি কে" বলেই জানেন। দ্বিতীয় মহাযুদ্ধোত্তর পর্বে ভারতে এমন রাইট আউট দেখা যায়নি, সম্ভবত তার পূর্বেও না। সমস্ত গুণে গুণী তিনি। প্রকরণগত নৈপুণ্য, তীব্র গতিবেগ, বল আয়ত্তে রাখা সব মিলিয়ে সুদেহী প্রদীপ ভারতীয় ফুটবলের মাপকাঠিতে অতুলনীয়, অপ্রতিদ্বন্দ্বী। প্রদীপ একটি নতুন অধ্যায়, নতুন সংযোজন, সর্বজনস্বীকৃত এক বিরাট প্রতিভা। চিন্তা ও প্রয়োগের এক সার্থক সংমিশ্রণ ঘটেছে প্রদীপের মধ্যে।

১৯৩৬ সালের ২৩শে জুন জলপাইগুড়ি জেলার ময়নাগুড়িতে প্রদীপের জন্ম। বাবা স্বর্গীয় প্রভাতকুমার ব্যানার্জি কোর্ট অব ওয়ার্ডসে চাকরী করতেন। তিনপুরুষ জলপাইগুড়ির বাসিন্দা প্রদীপদের কিছু জমিজমাও ছিল; কিন্তু ভাগ্যের নির্মম আঘাতে প্রভাতবাবু জমিজমা, ব্যবসা সবকিছুই হারালেন। ১৯৪২ সালে স্ত্রী-পুত্র-কন্যার হাত ধরে ছাড়লেন জলপাইগুড়ি। প্রদীপ তখন জলপাইগুড়ি জেলা স্কুলের ছাত্র। প্রভাতবাবু ভেবেছিলেন পিতৃ-পিতামহের ভিটে বাঁকুড়ার জয়রামবাটী কামারপুকুরেই গিয়ে উঠবেন, কিন্তু তা হোল না। আত্মীয়স্বজনরা নিয়ে গেলেন জামশেদপুরে। প্রদীপদের তখন বড় কষ্টের সময়। বাবার ব্যবসা, চাকরী কিছু নেই, সমস্ত আয়ের পথ বন্ধ, দিন কাটছে যাযা-

বরের মত, কখনও ভাড়া বাড়ীতে, কখনও পরিত্যক্ত সামরিক ছাউনিতে। দুঃস্বপ্নে ভরা ফেলে-আসা অভিশপ্ত দিনগুলির কথা বোলতে বোলতে প্রদীপের গলা ধরে যায়, চোখে জল আসে আজও।

ছেলেবেলা থেকেই প্রদীপ সর্বজনপ্রিয়, সবার আদরের। জামশেদপুরে কে এম পি এস স্কুলে পড়ার সময় অ্যাথলেটিকস্, ক্রিকেট ও ভলিবলে ডাক পড়তো কিন্তু ফুটবলে না। একেবারে বাচ্চা যে! কালক্রমে এই বাচ্চাই ফুটবল মাঠে নামলো ১৯৫১ সালে জামশেদপুরে প্রথম ডিভিসনের সাকচী অ্যাথলেটিক ক্লাবের হয়ে। ম্যাট্রি-কুলেশন পাশের পর ভর্তি হলেন সিউড়ি কলেজের বিজ্ঞান বিভাগে। সিউড়িতে পড়ার সময় মোহনবাগান ভেটারেন্স ক্লাবের বিরুদ্ধে খেলার সময় নজরে পড়লেন সর্বশ্রী বি ডি চ্যাটার্জি ও ডি সেনের। সে খেলায় সিউড়ী কলেজ জিতেছিল ২—১ গোলের ব্যবধানে! ১৯৫২ সালে বাঙ্গালোরে আয়োজিত জাতীয় ফুটবলের আসরে বিহারের প্রদীপই ছিলেন সর্বকনিষ্ঠ খেলোয়াড়। এই বছরেই আই এফ এ শীল্ড খেললেন জামশেদপুরের হয়ে কালীঘাটের সঙ্গে। জামশেদপুরের হার হোল ২—০ গোলে।

তারপর সেই ১৯৫৩ সাল। কলকাতায় সেবার জাতীয় ফুটবল। প্রদীপ এলেন নতুন প্রতিশ্রুতি নিয়ে। মাদ্রাজকে ১—০ গোলে হারিয়ে বাংলার মুখোমুখি হোল বিহার। পরপর দুদিন 'ড্র'-এর পর (০—০, ১—১), তৃতীয় দিনে বিহারের পরাজয় ঘটলো; কিন্তু প্রদীপ নজর কাড়লেন সবার! ২—১ গোলে বিহার হারলো বাংলার কাছে। দলের একমাত্র গোলটি প্রদীপেরই। এরপরই কলকাতায় আই এফ এ শীল্ড। জামশেদপুর একদিন 'ড্র' করে আই সি এল-এর কাছে হেরে গেল। ১৯৫৪ সালে তাঁর কাছে এরিয়ান ক্লাবের ডাক এলো। কলকাতায় এলেন প্রদীপ। পরের বছর চাকরী নিলেন ইস্টার্ন রেলে। চাকরীর বড় দরকার ছিল প্রদীপের সে সময়।

ফুটবল প্রশিক্ষক রহিম সাহেবের নজরে পড়লেন। ১৯৫৫ সালে এলো আন্তর্জাতিক স্বীকৃতি। এশীয় কোয়াড্রাঙ্গুলারের (ঢাকা) সেরা খেলোয়াড় নির্বাচিত হলেন তিনি। সবকটি খেলায় প্রদীপের গোল। ১৯৫৬ সালে গেলেন মেলবোর্ণ ওলিম্পিকে এবং মোহনবাগানের সঙ্গে দূরপ্রাচ্য সফরে। ১৯৫৭ সালে যান ভারতীয় দলের দূরপ্রাচ্য সফরে (সর্বোচ্চ গোলদাতা প্রদীপ ও নেভিল ডি'সুজা)। গুণের কদর হোল। প্রদীপ ও নেভিল যুগ্মভাবে এশিয়ার সেরা খেলোয়াড়-রূপে স্বীকৃতি পেলেন। ১৯৫৮ সালে টোকিওতে আয়োজিত তৃতীয় এশীয় ক্রীড়ার যোগদানের পর ব্রহ্ম সফরে যায় ভারতীয় ফুটবল দল। প্রদীপ তখন ভারতীয় দলের অন্যতম তারকা। ১৯৫৯ সালে প্রাক-ওলিম্পিক পর্বে আফগানিস্থান এবং ইন্দোনেশিয়ার সঙ্গে খেলার পর প্রদীপ স্বীয় ক্রীড়াকৃতিই যোগ্য পুরস্কার পেলেন —রোম ওলিম্পিকে ভারতীয় দলের অধি-নায়ক নির্বাচিত হলেন। ১৯৬১ সালে মারদেকা এবং ১৯৬২ সালে এশীয় ক্রীড়ায় (জাকার্তা) ফুটবল প্রতিযোগিতায় ভারতীয় দলের অন্যতম খেলোয়াড় ছিলেন প্রদীপ। সেবারের সেই রাজনৈতিক ঝটিকাবিক্ষুব্ধ আসরে তিনি গোল দিয়েছিলেন অন্যূন পাঁচটি। দক্ষিণ কোরিয়ার বিরুদ্ধে ফাইনালের সেই খেলা আজও তাঁর স্মৃতিপটে জ্বলজ্বল করে ভাসছে। সারা স্টেডিয়াম জুড়ে প্রায় এক লাখ লোক (অধিকাংশই চীনা) ভারতীয় দলকে বিদ্রূপ করছে, তারই মাঝখানে ২—১ গোলে ভারতের জয়। সে কি উত্তেজনা,

কি দুশ্চিন্তা! গোল করেছিলেন প্রদীপ নিজে একটি, আর একটি জার্ণাইল সিং। ১৯৬৩ সালে সিংহলের বিরুদ্ধে প্রাক-ওলিম্পিক খেলার পর আহত হলেন প্রদীপ, ফলে ইরানের বিরুদ্ধে তাঁর খেলাই হোলো না। ১৯৬৫ সালে মারদেকা, ১৯৬৬ সালে বার্মা সফর এবং এশীয় ক্রীড়ায় যোগদানের পর দীর্ঘ এক যুগ অন্তে তরুণদের সুযোগদানের জন্য আন্তর্জাতিক ফুটবলের আসর থেকে অর্জুন পুরস্কারপ্রাপ্ত অনন্য-সাধারণ প্রদীপ সরে দাঁড়ালেন ভারতেরই স্বার্থে।

অভিজ্ঞতার মূলধনে সমৃদ্ধ প্রদীপের মতে শারীরিক যোগ্যতা ব্যতিরেকে ফুটবলে সাফল্য সুদূরপরাহত। এই সামর্থ্যের দিকে দৃষ্টি রেখেই গড়তে হবে আমাদের খেলার ছক। স্যুটিং দক্ষতা, দম, শক্তি, নৈপুণ্য এবং গতি এই পাঁচটি গুণেই হোল চূড়ান্ত সাফল্যের বাহক। প্রদীপ নিজের খেলোয়াড়-জীবনের প্রথম প্রভাত থেকে সেই পাঁচটি গুণকে অর্জন করার জন্য অক্লান্ত সাধনা করে চলেছেন, সে-সাধনার বুঝিবা শেষ নেই!

জার্ণাইল সিং

(মোহনবাগান)

হাওড়া স্টেশনের দীর্ঘ প্লাটফর্ম থেকে দুরু দুরু বুকে বাইরে খোলা আকাশের নীচে এসে দাঁড়িয়ে রীতিমত ঘাবড়ে গিয়েছিলাম, সামনে গঙ্গা আর তার বুকের ওপর দৈত্যের মত ঐ ব্রীজটা। এতো ভারী, বনেদী শহর—এখানে লাখো লোকের মিছিলে হারিয়ে যাবো না তো?

পাঞ্জাব মেলে আগত শিখ যুবক ভাবছিলেন; ঠিক এই সময় পেছন থেকে ডাক এলো—জার্ণাইল। পেছন ফিরে দেখলেন স্মিতহাস্যে দাঁড়িয়ে আছেন শ্রীগজানন খৈতান, রাজস্থান ক্লাবের সর্বেসর্বা। পায়ের নীচে মাটি খুঁজে পেলেন জার্ণাইল। মনে মনে বললেন: 'গুরুজীকো জয় হো।'

পাঞ্জাব থেকে বাংলা—বহুৎ দূরে। কিন্তু তবু বাংলাকে প্রথম দর্শনেই ভালবেসে ফেললেন জার্ণাইল। সেই একই রূপে: সেই শ্যামল শষ্যক্ষেত্র, সেই ঝিলাম, শতদ্রু বিপাশার মত গঙ্গা, দামোদর, রূপনারায়ণ। পাঞ্জাব তাঁর জন্মভূমি, বাংলা ধাত্রীগেহ। মোহনবাগান তথা ভারতীয় দলের জার্ণাইল সিং এখন বাংলার কাছের মানুষ, বাংলার পরমাত্মীয়।

সর্বভারতীয় ফুটবলে স্টপার জার্ণাইল সিং এখন আর নতুন করে পরিচিতির অপেক্ষা রাখেন না। স্বীয় ক্রীড়াদক্ষতার নাম তাঁর লোকের মুখে মুখে। কিন্তু জার্ণাইল যে উত্তর পর্বে এত প্রতিষ্ঠা লাভ করবেন

সে কথা কেউ বা ভেবেছিলেন। ১৯৫৮ সালে হোসিয়ারপুর থেকে ভারতীয় বিমান বাহিনীর প্রকাশ সিংয়ের চিঠি নিয়ে তিনি যখন কলকাতার রাজস্থান ক্লাবে ফুটবল খেলতে এলেন তখন অনেকেই বলেছিলেন: 'পাঞ্জাবীরা হকি খেলুক, অ্যাথলেটিকস করুক, ফুটবলে কিছু হবে না।' কিন্তু জার্ণাইল তাঁদের সেই ধারণাকে ভেঙে-চুরে খান খান করে দিয়েছেন; জার্ণাইল এখন শুধু ভারতেরই স্বনামধন্য কৃতী খেলোয়াড় নন, সারা এশিয়াতে তাঁর খ্যাতি, সর্বএশীয় দলের সুযোগ্য অধিনায়ক। দুপায়ে সমান জোরালো সট, জবরদস্ত ট্যাকলিং, হেডিং, পরিশ্রম করার অসাধারণ ক্ষমতা, সর্বোপরি ঠাণ্ডা মেজাজ জার্ণাইলকে জাতীয় ক্রীড়াঙ্গণে আজ খ্যাতির সূর্যশিখরে দাঁড় করিয়ে দিয়েছে। ১৯৫৮ সালে রাজস্থানে তেমন চোখে না পড়লেও পরের বছরে মোহনবাগানে এসে জার্ণাইল নিজের প্রতিভার পূর্ণ প্রকাশ ঘটালেন। ১৯৫৯ সালে গেলেন মোহনবাগানের সঙ্গে পূর্ব আফ্রিকা সফরে। প্রথম থেকে মোহনবাগানেই রয়ে গেছেন। আজ তিনি মোহনবাগানের অধিনায়ক।

হোসিয়ারপুরে জন্ম জার্ণাইল সিং-এর। বাবা সর্দার উজাগর সিং এবং মা গুরবচন সিং কাউরের দুটি ছেলে এবং ছটি মেয়ে। শিক্ষা সারাহালা খালসা স্কুলে (মুদিয়া)। এস জি জি এস খালসা কলেজ থেকে পাশ করেছেন বি-এ। স্কুলে পড়ার সময় ফুটবল খেলেছেন হাল্কাভাবে। কলেজে ঢুকে শারীরশিক্ষক সর্দার হরদয়াল সিংয়ের কাছ থেকে পেলেন বিপুল অনুপ্রেরণা। হরদয়াল সিং ছিলেন কৃতী ফুটবল খেলোয়াড়। জার্ণাইল নিজেও এখন সাংগরুর জেলার স্পোর্টস অফিস (পাতিয়ালা)। রীতিমত গেজেটেড পোস্ট

১৯৫৯ সালে জার্ণাইল সিং স... ভারতীয় স্বীকৃতি পেলেন। এই বছ... আফগানিস্থানের বিরুদ্ধে প্রাক ওলিম্প... প্রতিযোগিতায় খেলার সুযোগ হয়। কি... দিন পরেই এর্ণাকুলামে আয়োজিত এশী... ফুটবলে সেরা খেলোয়াড় নির্বাচিত হলে... জার্ণাইল। কলকাতা এবং জাকার্তায় ইন্দো... নেশিয়ার বিরুদ্ধে প্রাক ওলিম্পিক প... তিনি ছিলেন ভারতের সেণ্টার হাফ. পরব... পর্বে ১৯৬৪ সালে বিশ্ব ওলিম্পিক ফু... বলের মূল আসরে, রোমেও। মারদে... ফুটবলে খেলেছেন ১৯৬১, ১৯৬... ১৯৬৪, ১৯৬৫ এবং ১৯৬৬ সা... ১৯৬৭ সালের প্রাথমিক দলেও স্থান হয়ে... তাঁর। ১৯৬৬ সালে মারদেকার ভারত... দলের অধিনায়ক ছিলেন জার্ণাইল সি... ১৯৬৬ এবং ১৯৬৭ সালে এশীয় অলস্... দলের নেতৃত্ব করার আসামান্য গৌরবও ... ওপর ন্যস্ত হয়েছিল। ১৯৬৪ সা... টোকিও ওলিম্পিকের পূর্বক্ষে প্র... ওলিম্পিক প্রতিযোগিতায় সিংহল ও ইরা... বিরুদ্ধেও জার্ণাইল ছিলেন ভারতীয় দ... স্টপার—কলম্বো, কলকাতা এবং তেহরা... এই বছরই এশীয় কাপ ফুটবলে ইস্রাই... বিরুদ্ধে ফাইনালে ভারতের প্রতিনি... করে তেলআবিবে। এ ছাড়া ১৯৬৫ স... ভারত সফরকারী সোভিয়েট ফুটবল দ... বিরুদ্ধে চারটি স্টেট ম্যাচেই জার্ণা... জাতীয় দলে ছিলেন। এ ছাড়া চেকোশ্... ভাকিয়া দলের বিরুদ্ধে এবং মোহনবাগা... প্লাটিনাম জুবিলী উৎসব উপল... হাঙ্গারীর ভাভোবানিয়া দলের বিরুদ্ধে... জার্ণাইল সিং অসাধারণ ক্রীড়াকৃতীর নজ... রেখেছেন।

ভারতীয় ফুটবল সম্পর্কে জার্ণাইল রীতিমত আশাবাদী। জার্ণাইলের ম... আন্তর্জাতিক ফুটবলের আসরে নামতে হ... ৪-২-৪ প্রথায়ই খেলতে হবে এবং ... পদ্ধতির সুচারু বিন্যাসের জন্য ভারত... খেলোয়াড়দের শারীরিক যোগ্যতা ... করতে হবে সর্বাগ্রে। ৯০ মিনিট লড়ার ... অফুরন্ত দম চাই, অসাধারণ পরিশ্রম ক্ষম... চাই। দুটোতেই আমরা পিছিয়ে অ... দুটোতেই আমাদের ঘাটতি। শারীরিক অক্ষমতা দূর না হলে আন্তর্জাতিক ফুট... ভারত যে তিমিরে সেই তিমিরেই থাক... খেলার সময় বাড়িয়ে দিয়ে, খেলার স... কমানো উচিত। কলকাতার সিনি... ডিভিসনের প্রতিযোগী দলগুলির স... দশের ঘরে নামালে খেলোয়াড়রাও কি... বিশ্রাম পাবেন, ক্রীড়ামানেরও উন্নতি হ... সবাই মিলে ঐক্যবদ্ধভাবে হাত লাগ... বর্তমান রীতিনীতি পাল্টানো যায়—কে... জার্ণাইলের ধারণা চেষ্টার অসাধ্য কিছু ... তার প্রমাণ জার্ণাইল নিজে।

।। আঠার ।।

আদিনাথ যে মাস তিনেকের মধ্যে একবারও আসেনি, তা নিতান্তই আসতে পারেননি বলেই। সুরবালা যখন সন্দীপকে নিয়ে চলে আসেন তার কিছুদিন আগে থেকেই ওঁদের কারখানাটা বাড়াবার তোড়-জোড় নিয়ে ব্যস্ত ছিলেন উনি। বাড়ি তৈয়ের হয়ে এসেছিল এবং সুরবালা চলে আসবার মাসখানেকের মধ্যেই যন্ত্রপাতিও এসে পড়ায় বিশেষজ্ঞদের সহযোগে সেগুলো বসিয়ে চালু করার কাজে লিপ্ত হয়ে পড়েন।

ছেড়ে চলে আসার মতো রাগ বা অভিমান থাকে সুরবালার দিকেই, তবে সেটা স্বল্পায়ুই হয়ে থাকে সাধারণত, খুব বেশি হল তো দিন দশেক। তারপর চিঠিপত্র শুরু হয়ে যায় এবং তারপরই মনের তাপ-মাত্রা নেমে আসতে থাকে; ইচ্ছা, প্রয়োজন অথবা সুবিধা অনুযায়ী ফিরেও যান। থেকে যাওয়ার তেমন কিছু তাগিদ থাকলে, আদিনাথও এর মধ্যেই এসে পড়েনই একবার না একবার। কলকাতায় কাজ থাকলে একাধিকবারও হয়ে যায়।

বাঁড়ুজ্জ্যে-পরিবারের নিয়মিত ঘটনা, বছরের মধ্যে বারকয়েক করে হচ্ছেই। উদ্বেগ-উৎকণ্ঠার কিছু নেই, উনি এলেই শুধু একটি মিষ্ট কৌতূহল জেগে ওঠে সবার মন, বিশেষ করে ভাই আর ভাজেদের মধ্যে; তারমধ্যে বেশি করে হেমাঙ্গিনী আর সনাতনের। ঠাট্টা বিদ্রূপের একটি বিষয় হাতে আসে, সুবিধা মতো সদ্ব্যবহার ক'রে বেশ চলে দিনকতক। আদরের ভগ্নী, একজনের তো ননদই, হটবার পাত্রী নয় সুরবালাও; ফলে, ছোটবড়য় একই সমতলে এসে দাঁড়িয়ে উভয়পক্ষেরই উপভোগ্য হয়ে পড়ে পরিস্থিতিটুকু।

তিন মাস যখন পেরিয়ে গেছে এই রকম যোগাযোগ আবার হোল একদিন।

সন্ধ্যার একটু আগে খোলা ছাতে বসে গল্প করছিলেন—হেমাঙ্গিনী, সুরবালা, মেজবৌ অপর্ণা আর পাড়ার একটি মেয়ে, অপর্ণার সমবয়সী, তমালও রয়েছে। সনাতন নীচে থেকে একটু ব্যস্ত হয়েই এসে প্রশ্ন করলেন—"হ্যাঁগা, সুরো আছে এখানে?"

সঙ্গে সঙ্গেই ওর দিকে চেয়ে—"এই যে রয়েছিস, একটা খবর আছে।"

এরমধ্যে ভঙ্গিটুকু যে অভিনয়, কিছু একটা শুরু হওয়ার ভূমিকা, অনেক অভ্যাসে সুরবালার সেটা জানা। একটু নিশ্চিন্ত-ভাবে খানিকটা আড়ে চেয়ে বললেন—"কি খবর আনলে আবার? ভালো হয়তো বলো বাপু, নয়তো থাক, আমার মন ঠিক নেই এখন।"

মুখ ভার করে খানিকটা অভিনয়েই উত্তরও।

"খবর ভালো কি মন্দ তা আমি কি করে জানব, তোদের দু'জনের সম্বন্ধটা যা চলছে।" —মন্তব্য করলেন সনাতন।

আফিসের পোষাকেই রয়েছেন, হাত দুটো বুকে জড়িয়ে রেলিঙে ঠেস দিয়ে দাঁড়িয়ে বললেন—"আদিনাথ কাল আসছে, টেলিগ্রাম দিয়েছে।"

"জানি।...মস্ত খবর!" —নিরুৎসুক কণ্ঠেই উত্তর করলেন সুরবালা। অপর্ণা আর মেয়েটি মুখ মুছিয়ে ঠোঁটে একটু হাসি টিপে উঠে গেলেন। তমালও উঠেছে, সনাতন বললেন—"আমার চা'টা এখানেই নিয়ে আয়—"

সুরবালাকে প্রশ্ন করলেন—"তোকেও দিয়েছে চিঠি?"

"আমি আবার একটা মানুষ যে চিঠি পাব!" —উত্তর করলেন সুরবালা।

"না পেলেও টের পায় লোকে।" —হেমাঙ্গিনী টিপ্পনী করলেন। সুরবালা বললেন—"ঐ শোন গিন্নি কি বলেন। সব জানা তাঁর। বাপের বাড়ি গেলে তোমার আর ডাক খরচ করে কাজ নেই মিছিমিছি।"

হেমাঙ্গিনীর দিকে চকিত দৃষ্টিক্ষেপ ক'রে আবার সনাতনের দিকে চেয়ে বললেন—"আমি এবার যাব দাদা, কালই।"

"কেন, মুখ দেখবিনি?"

"এসব মেয়েলী চিপটেন-কাটা যাঁর কাছে শেখা তাঁর জন্যে তুলে রাখো দাদা, আমার ভালো লাগে না।" —ওদিকে আর একটা তির্যক দৃষ্টি হেনে সনাতনের দিকেই চেয়ে বললেন—"একটু মাথা খাটালেই বুঝতে পারে লোকে। কলকব্জাগুলো বসছে, যার জন্যে একজনের ফুরসৎই ছিল না। তিনি চলে এলে আর একজনকে গিয়ে থাকতে হবে না?"

হেমাঙ্গিনী স্বামীর দিকে চেয়ে বললেন—"এতক্ষণে বোঝা গেল।"

"কি, সেটা শুনতে পাই ?"—প্রশ্ন করলেন সুরবালা।

হেমাঙ্গিনী স্বামীর দিকেই চেয়ে বললেন—"ঐ ছুতো করে চিঠি আসত ঠাকুরজামাইয়ের না আসার, সেই রাগ ঠাকুরজির।"

তমাল চা দিয়ে চলে গেল। সনাতন একটা চুমুক দিয়ে বললেন—"তাহলে তাই হবে।"

"গিন্নি বললেন—এই, অমনি কর্তা বললেন—তাই হবে তাহলে"—দুজনের কণ্ঠকটা অনুকরণ করার ঢৌনেই বললেন সুরবালা। তারপর উঠে পড়েই বললেন—"তার চেয়ে এ-জায়গা ছেড়ে যাওয়াই ভালো বাবা!"

গটগট করে চলেও গেলেন। সনাতন হেঁকে বললেন—"ওরে শোন সুরো, আসল কথাটাই বলা হয়নি!"

সিঁড়ির মাঝখানে থেকে উত্তর এল—"রাখো নিজের কাছে, তাড়াতাড়ি গোছগাছ করে নিতে হবে!"

চায়ের কাপ মুখের কাছে নিয়ে গিয়েছিলেন সনাতন, থেমে গিয়ে বধূরে দিকে চেয়ে বললেন—"সত্যিই ক্ষেপল না তো ?"

"একেবারে অতটা হয়তো নয়, সামনেই রাত। তবু দেখি। বিশ্বাস নেই তো বোনকে, আস্কারা দিয়ে দিয়ে যা মাথায় তুলেছ।" —উঠে পড়ে সিঁড়ির দিকে এগুতে সনাতনও রেলিং ছেড়ে এগুলেন কাপ-ডিস হাতে করে। বললেন—"বড় ভাইয়ের কাছে পাবে না আস্কারা একটু ?"

"আমারও বড় ভাই আছেন।"—এগুতে এগুতে ঘাড়টা ঘুরিয়ে উত্তর করলেন হেমাঙ্গিনী।

"কিন্তু তুমি ক'জনের মাথায় থাকবে ?" উত্তরটা দিয়েই সঙ্গেই সঙ্গে বললেন—"সত্যিই কিন্তু একটা কথা আছে, চলে যেও না শোন।"

দাঁড়িয়ে পড়লেন হেমাঙ্গিনী। সনাতন বললেন—"আছে একটা কথা, যার জন্যে আমিই ডেকে পাঠিয়েছি আদিনাথকে। সেটা সুরোকে তো বলা চলত না..."

এমন কি কথা ?"—একটু শঙ্কিত-ভাবেই প্রশ্ন করলেন হেমাঙ্গিনী।

"না ভাবনার কিছু নয়। বলা চলত না এই জন্যে যে আমার ডাকেই এসেছে শুনলে আবার একচোট অভিমান হোত তো। ছাতেই এসো বরং, বলছি।"

বারান্দার একটা টিপয়ে চায়ের ডিশ-কাপ রেখে দিয়ে দুজনে এসে আবার পাশা-পাশি রেলিঙে ঠেস দিয়ে দাঁড়ালেন।

সনাতন আরম্ভ করলেন—"ভাবনার কথা নয়ই বা কেমন করে বলি ? ঐ যার জন্যে সুরো সন্দীপকে তাড়াতাড়ি নিয়ে এল এখানে..."

"দেখো, তোমরা ভাই-বোনে সমান।" —কথার পিঠে বলে উঠলেন হেমাঙ্গিনী—"কী করে তোমাদের যে বোঝাই..."

"না, সে কি অস্বীকার করছি যে, বদলেছে অনেকটা ? যদিও আমার ওদিকে নজর দেওয়ার সময় নেই বেশি, তোমরা সবাই রয়েছো। চোখেও পড়ছে। তবু, যে-উদ্দেশ্যে ওকে এই ক'মাস বসিয়ে রাখা—সুরোও আটকে পড়েছে, খুব অসুবিধেও হচ্ছে ওদিকে আদিনাথের,—তার যেন অনেকটা বাকিই রয়েছে। অন্তত এমন যে অন্যের চোখে ধরা পড়ে যায়। সবটা শুনলেই বুঝতে পারবে।"

পকেট থেকে সিগারেট কেস বের করে একটা ধরিয়ে বললেন—"কাল বিকেলে আমাদের কর্তা যে পার্টিটা দিয়েছিলেন, তাইতেই আমায় একটু আলাদা ডেকে নিয়ে বললেন কথাটা..."

"মজুমদারসায়েব ?" একটু উৎসুক হয়েই প্রশ্ন করলেন হেমাঙ্গিনী।

"মজুমদারসায়েব।" —মাথা দোলালেন সনাতন। বললেন—"উনি কন্ট্রাকটারদের হাতে ছেড়ে না দিয়ে নিজেও ঘুরে ঘুরে দেখে বেড়ান তো, জিজ্ঞাসা-বাদ করে; একবার আমাদের টেবিলের সামনে এসে খোঁজ-খবর নিয়ে ফিরে যাওয়ার সময় আমার কাঁধে একটু হাতটা চেপে বললেন—'সনাতনবাবু, যাওয়ার আগে একবার আমার সঙ্গে দেখা করে যাবেন, আমি লনেই রয়েছি।"...আমি নজর রেখেই যাচ্ছিলাম, শেষ হলে গিয়ে দেখা করতে শামিয়ানা থেকে খানিকটা বাইরে বেরিয়ে গিয়ে জিজ্ঞেস করলেন—'এদিকে একটা টেবিলে আরও তিনজন ইয়ংম্যানের সঙ্গে ফাঁপা উড়ুনি গায়ে দিয়ে যে ছেলেটি বসেছিল সেটি শুনলাম আপনার ভাগ্নে, তাই না ?'... বললাম —'হ্যাঁ স্যার।'...একটু রগড়েও আছেন তো, বললেন—'আর সবই সাধারণ পোষাকে, তার মাঝে একজন ছোটদের রূপ-কথার তুলোবুড়ির মতো জবুথবু হয়ে বসে রয়েছে—নজর পড়ায় গিয়ে দেখি আপনার ভাই রঞ্জন রয়েছে, তার কাছেই বাকি তিন-জনের পরিচয় নিতে জানলাম, ছেলেটি আপনাদেরই ভাগ্নে..."

হেমাঙ্গিনী একটু হেসে মন্তব্য করলেন—"ঠাকুরপোই তো আরও জোর করে নিয়ে যায় ঐভাবে।"

"জানি। আমার সঙ্গেও তো তর্ক করে। বাকি দুটো ছিল ওদেরই ক্লাবের, রঞ্জনের কাছে পরে ঘুরিয়ে জিজ্ঞেস করে জানলাম। তা থাক না যে-পোশাকে খুশি, কিন্তু তার পরেরটুকু শোন না।" মজুমদারসায়েব বললেন—'আর সবাই ভদ্রতার খাতিরে দাঁড়িয়ে উঠল, ইয়ংম্যানই তো, ও-ছেলেটি কিন্তু আরও জবুথবু মেরে যেন গুটিয়ে গেল চেয়ারে। হয়তো সামলে নিতে যাচ্ছিল, কিন্তু আমি রঞ্জনের কাঁধে হাত দিয়ে ওদের তিনজনকে বসিয়ে দিতে আর ওঠার দরকার হোল না ওর। কিন্তু..."

হেমাঙ্গিনী ভ্রূ তুলে বলে উঠলেন—"দ্যাখো কেলেঙ্কারি!"

সনাতন বললেন—"কিছু নয়, ঐ রকম হবেই কিনা। আমিও লজ্জিত হয়ে ওর দোষের কথাটা বলতে যাচ্ছিলাম" মজুমদারসায়েব হেসে বললেন—'আরে না, না, আমি আপনার কাছে নালিশ করছি না আপনার ভাগ্নের নামে। বলছি ও একটা রোগ, আপনার নজরে পড়েছে কিনা, জিজ্ঞেস করছি। আমারও ছিল কিনা এক সময়, লক্ষণগুলো চিনি। এমনি একরকম চলছে বেশ, কিন্তু যদি একটু নতুন পরিস্থিতির মধ্যে পড়লাম, নতুন কেউ এল তো নার্ভাস হয়ে যেন নিজেকে হারিয়ে ফেললাম। যখন উঠে দাঁড়াম দরকার তখন বসেই থাকতাম, যখন হয়তো বসে থাকাটাই ভদ্রতা তখন দাঁড়িয়েই থেকে কি করে পরিত্রাণ পাওয়া যায় তার উপায় খুঁজতাম, কথা যেত জড়িয়ে। সাজগোজও ছিল ঐ রকম ঢিলে ঢালা, যদিও সে-যুগে সবারই সাজগোজ ঐ রকম ঢিলেঢালা ছিল বলে নজরে পড়বার মতো কিছু ছিল না সেটা। কিন্তু আজ-কালকার ছেলে ঐ রকম জোড়ে-আসা জামাইবাবুর মতন হয়ে চলবে কেন ? বয়স হয়েছে তো। কি করে ছেলেটি ?'

সব বললাম, ঐ রকম স্বভাবের কথাও, ঠিক হোল কিনা জানি না; একটু স্মার্ট করে তোলবার জন্যেই যে ওকে নিয়ে এসেছি এখানে সে কথাটাও বললাম ওঁকে। পায়চারি করতে করতে গল্প হচ্ছে আমাদের, শুনে উনি একটু চুপ করে থেকে বললেন—'আপনার ভগ্নীপতির তো ভাল ব্যবসা আছে ?'...বললাম—'হ্যাঁ, পেপার, লোহা; লোহার দিকটা বাড়াচ্ছেও এখন।' বললেন—'ইস! চমৎকার ফিল্ড রয়েছে ছেলেটির, অথচ এইরকম জবুথবু মেরে যাচ্ছে। এক কাজ করুন না। কলকাতায় বেকার যেলে রাখলেই তো কাজের স্মার্ট হয়ে যাবে না, বরং উল্ট-দিকেই স্মার্ট হয়ে যাওয়ার ভয়ই বেশি, বাপের অবস্থা ভালো, ঐ একমাত্র সন্তান। আমি বলি, থাক কলকাতাতেই, হাওয়ার একটা গুণ আছেই, তবে বসে না থেকে কিছু করুক। কোন আফিসে চাকরি, নিদেন এ্যাপ্রেন্টিসগিরি। একটা ট্রেনিং হতে থাকবে—নিজের ফার্মে কাজ দেবে।'

আবার একটু চুপ করে পাইচারি করবার পর উনিই বললেন—'আমাদের এদিকেই নিয়ে নিতে পারতাম, কিন্তু আমাদের এ হচ্ছে ফিল্ম-ইণ্ডাস্ট্রির লাইন, সুবিধে হবে না ওর। আপনাদের মত থাকে তো দেখেশুনে অন্য কোনখানে ওকে বসিয়ে দেওয়া যায়। আপনিও খোঁজ রাখবেন। সন্ধান পেলে আমায় জানাবেন।'
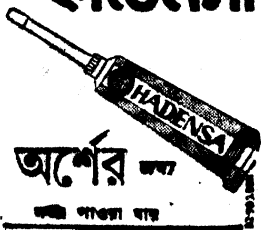
নিজে হতে এতটা আগ্রহ দেখালেন, আমি কালই টেলিগ্রাম করে দিই আদিনাথকে একবার চলে আসতে। যুক্তিটা ভালো দিলেন উনি, এখন ওর সঙ্গে বসে একটা পরামর্শ করা দরকার। টেলিগ্রাম অবশ্য শুধু চলে আসবার জন্যেই; আজ উত্তর এসেছে। তোমার কি রকম মনে হয়?"

"ভালোই তো, খুবই ভালো, বিশেষ করে ঐ-রকম একজন লোক যখন পেছনে রয়েছেন। চাকরির অবশ্য কি দরকার সন্তুর, তবে পাঁচজন ভালোমন্দ লোকের সঙ্গে মিশবে, একটু কথাবার্তা কইতে শিখবে..."

'হ্যাঁ, সে কথা তোমায় বলিনি, মনে পড়ে গেল।"—হেসে বললেন সনাতন,—"বোধ হয় ওকে একটু সতর্ক করে দেওয়ার জন্যেই রঞ্জন ও'র পরিচয়টা দিতে সন্তু আরও এমন ঘাবড়ে গেল—মজুমদারসায়েব বলেন—'কি জিজ্ঞেস করছি, কি উত্তর দিতে হবে, যেন খেই হারিয়ে ফেলতে লাগল। শেষে, নেমন্তন্ন করে একটা কৃতঘ্নতা করব নাকি?—তাড়াতাড়ি সরে এলাম আমি'...একটু ঐ ধরণের লোক তো, ঐসব দিকে নজর পড়ে যায় খুব ও'র।...আসুক আদিনাথ, হবেই রাজি। দরকার হয়ে পড়েছে ঐ রকম কিছু একটা।"

হেমাঙ্গিনী বললেন—"আর কিছু না হোক, ওর ঐ পোশাকটা ঘুচবে বাপু। আমাদেরও যেন চোখে কি-রকম ঠ্যাকে, যে-কালের যেটা। ছন্দমান্দ ঠাকুরপোদের ক্লাব পর্যন্ত চলতে পারে—শুনেছি নাকি কবিদেরই আড্ডা। চায়ও না বেচারি, চোখে পড়ে গেছে তো অনেক সময়, তবু রঞ্জন ঠাকুরপো জোর করে নেওয়াবে, বলে—না, তোমার গায়ে তোমার পরিচয়টা লেখা থাকা দরকার।...ঐ সামন্তান পরিচয়।"

হাসতে হাসতে ঐ আলোচনা করতে করতে নেমে গেলেন দুজনে।

।। উনিশ ।।

সুরবালা যে বললেন তাঁকে বাড়ি ফিরে যেতে হবে, তার জন্য গোছগাছ করতে যাচ্ছেন বলে নেমেও গেলেন, সেখানে কল-কাতা বলানোর সঙ্গে তার কোন সম্বন্ধ নেই। কথাটার মানে ধরে সেভাবে নেন নিও ও'রা। যদি বা সুরবালার হঠকারিতা সম্বন্ধে একটা ভয় থাকেই, সেটা সক্রিয় হয় কিন্তু সেখান থেকে আসবার সময়েই; বাপেরবাড়ি থেকে সেখানে যেতে সব মেয়ের মতো একটা গড়িমসির ভাবই থাকে লেগে।

তবু একটা কারণ ছিলই, যদিও সেটা রাতারাতি কলকাতা ছেড়ে যাওয়ার মতো তেমন কিছু নয়। আদিনাথের কলকাতায় এসে পড়াটা ও'র মনোমত হওয়ার কথা নয়, কেননা সন্দীপ সম্বন্ধে যে অভিমত এবং আশঙ্কা উনি নিজের মনে এখানে চালিয়ে-ছেন সেটা আদিনাথেরই। ও'র মতং ছিল উল্টোটাই, এখানে এসে বা আসতে আসতে বদলেছে। ব্যাপারটা এই জন্য আরও বিসদৃশ হয়ে দাঁড়িয়েছে যে, উনি নিজের প্রশ্রয়, নিজের ঔদাসীন্য আবার আদিনাথেরই ওপর চাপিয়ে সন্দীপের এই অবস্থার জন্য তাঁকেই করেছেন দায়ী। উনি একেই সব যাবে ফাঁস হ'য়ে। এই সম্ভাবনাটুকু কাটিয়ে দেওয়ার জন্য উনি এদিকে চিঠিগুলোয় নিজেই শীঘ্র ফিরে আসছেন লিখে আদিনাথের আসাটাও ঠেকিয়ে রাখছিলেন। একেবারে শেষের দিকে অন্তত নিজে একবার সেখান থেকে ঘুরে আসবার জন্য প্রস্তুত হচ্ছিলেন, এই সময় খবরটা দিলেন সনাতন।

যেসব দম্পতির মধ্যে ওপরে-ওপরে ঝগড়ার ভাবটা প্রবল, তাদের মধ্যে ভেতরে ভেতরে একটা অলিখিত সন্ধির ভাব থাকে, নৈলে সংসার অচল হয়ে পড়ে। সুরবালা ঠিক করেছিলেন সেখানে গিয়ে স্বামীকে ভুজং-ভাজুং দিয়ে ঠিক করে নেবেন, এই সুদীর্ঘ বিরহের পর সেটা শক্তও হোত না; কিন্তু বিপদটা হঠাৎ এসেই পড়ল ঘাড়ে। অবশ্য এর জন্য ফাঁসিকাঠেও ঝুলতে হবে না, আদুরে মেয়ের এসব ছেলেমানুষী পিতৃ-গৃহে সবার কিছু কিছু জানা, প্রকাশ হয়ে পড়তে একটি ক্ষমাশীল কৌতুকের-হাসির পরাজয়, একটা লজ্জাই।

রাতারাতি ফিরে যাওয়ার গোড়ার কাহিনী এই। খানিকটা ফলেও গেল। ফিরে যাওয়াটা কিছু একটা সংকল্পও ছিল এমন নয়। রুটিন যেমন চলছে চলল; রাত্রে, পরদিন সকালেও। সকালেই আসবার কথা ছিল আদিনাথের; এলেন না, একটু হয়তো নিশ্চিন্ত মনেই সুরবালা আহারাদি করে যথারীতি একটা বই নিয়ে শুতে গেলেন।

বিকালে যখন উঠলেন, প্রথমেই দেখা হোল তমালের সঙ্গে; উনিও আড়মোড়া ভেঙে উঠে বসেছেন, তমালও এসে প্রবেশ করল;—ওর কথাবার্তা যেমন চড়া-পর্দায় বাঁধা থাকে সেইভাবেই ভ্রূ কপালে তুলে বলল—"উঃ, কী দুর্দান্ত ঘুম তোমার পিসিমা! বোধ হয় পঞ্চাশবার এসে এসে ফিরে গেছি—এবারও যদি দেখতাম ঘুমচ্ছই নাক ডাকিয়ে তো নির্ঘাত তুলে দিতাম—দিতাম তুলে বলে আসছিলাম—যা থাকে কপালে..."

"অনন্ত দুর্গতি থাকত, কপাল ভালো বলে বেঁচে গেছিস'—বিরক্তিতে মুখ কুঁচকে মন্তব্য করলেন সুরবালা, প্রশ্ন করলেন—"কেন ব্যাপারখানা কি?"

"ব্যাপারখানা কি!...তুমি নিশ্চিন্তে হয়ে ঘুমচ্ছ, ওদিকে পিসেমশাই এই দুপুরে রোদ্দুরে দু'শো মাইল ছুটে এসে কখন থেকে যে বসে আছেন।"

—যতটা পারল গুরুগম্ভীর করে রিপোর্ট দিল তমাল। সুরবালা ভ্রূ কুঁচকে একটু চাইলেন ওর দিকে, তারপর একটা হাই তুলে নিশ্চিন্ত কণ্ঠেই প্রশ্ন করলেন—"কোন কেউ নেই সেখানে, দাদা-বৌদিদের কেউ?"

"কেউ নেই বলছ! মা, কাকিমা, রেবা-পিসি, বাবা—কে-দা আছে? শুধু...'

ফ্যাঁচ-ফ্যাঁচ করিসনি তমু, যা, বেরো।"—ধমক দিয়ে উঠলেন সুরবালা। বললেন—"যা, দিকিন, ঝিকে ডেকে দে। একটা কাজ হয়।"

ও চলে গেলে একটু তাড়াতাড়িই বিছানা থেকে নেমে পড়ে আঁচলটা গুছিয়ে নিলেন—না জানি এর মধ্যে কিসের কথা হয়ে গেছে। তারপর নিশ্চিন্ত ভাবটা ফোটাবার জন্য এদিক-ওদিক চেয়ে আর কিছু না দেখতে পেয়ে সামনের টেবিল থেকে ডিজাইন তোলার সরঞ্জাম তুলে নিয়ে মন্থর গতিতে অগ্রসর হলেন।

চৌকাঠ পেরুতেই সনাতন বললেন—"এই যে এসে গেছিস। হ্যাঁরে, তুই যে এসেই সেবারে বললি, আদিনাথ..."

আদিনাথই মুখের কথা কেড়ে নিয়ে হেসে প্রশ্ন করলেন—"তুমি নাকি দাদা-বৌদিদের বলেছ—আমি সন্দীপকে ঐ রকম জংলো করে তুলেছি! অথচ..."

"দাদা-বৌদি'রা যখন আমার কথা বিশ্বাস করেন না, জানই, তখন তোমার ভাবনাটা কিসের?"

রেবার দিকে চেয়ে তাকে সাক্ষী মানলেন—"বল রেবা?" সঙ্গে সঙ্গে প্রশ্ন করলেন—"তুই এলি কখন ডায়মন্ডহারবার থেকে?"

রেবার মুখেও একটু হাসি ফুটে উঠেছিল, মিলিয়ে নেওয়ার চেষ্টা করে বললেন—"আমি এসেছি দুপুরেই; তুই ঘুমুচ্ছিলি।"

"তুলিস নি যে?...আর তাতে হাসিরই বা কি আছে?"

আসল কথাটাকে কি করে যে চাপা দেবেন যেন ভেবে পাচ্ছেন না সুরবালা। এরপরে আদিনাথের দিকে দৃষ্টি ঘুরিয়ে প্রশ্ন করলেন—"তা তোমার এত দেরি হোল যে?...খরগোসগুলো আর কাকাতুয়াটা ভালো আছে তো?"

সনাতনই ওদিকটা চাপা দিলেন। সকলের মুখেই ও'র এই প্রতিপদেই কথা ঘুমিয়ে ঘুরিয়ে নেওয়ার জন্যে একটু করে কৌতুকের আভাস, উনি বললেন—"কাজের কথায় আয়। তোর খরগোস কাকাতুয়া না বহালতবিয়তে থাকলে আসতে ভরসা করত? ওকে আবার এখনি বেরুতে হবে, অনেকগুলো দরকারি কাজ নিয়ে এসেছে, কাল সকালেই আবার চলেও যেতে হবে। সন্দীপের কথাটা বলেছি ওকে। ও খুব রাজি। তবে একটা বিষয়ে ওর মত পাচ্ছি না, এত তাড়াতাড়ি..."

"আর দেরি করা চলে? যখন একটা অন্য লোক পেছনে দাঁড়াবে বলছে। ছেলেটা যেরকম হয়ে যাচ্ছে—(স্বামীর দিকে চকিতে একটু চেয়ে নিয়ে)—না হয় মানলাম মায়ের আস্কারাতেই..."

"আঃ, বলতে দেবে না তো!"—অধৈর্য হয়েই উঠলেন সনাতন। থামিয়ে দিয়ে বললেন—"সে তাড়াতাড়ির কথা হচ্ছে না, ওদিকে তো যত শীগ্গির হয় শুরু করে দিতেই হবে চেষ্টা। তাড়াতাড়ির কথা বলছিলাম—মানে, তোরা নাকি সুন্দর বিয়ের পরামর্শ করছিস এর মধ্যে?"

মুখটা হঠাৎ থমথমে হয়ে গেল সুরবালার। হেমাঙ্গিনী যেন একটু সতর্কই ছিলেন প্রতিক্রিয়াটা কি হয়, উত্তরের সময় না দিয়ে বললেন—"আমিই বললাম, ঠাকুরজামাই এসে পড়াতেই। অবশ্য, তাড়াতাড়ির কি আছে তেমন, তবে..."

"তাড়াতাড়ি নয়ই বা কেন আমায় বুঝিয়ে বলো।"—কথাটা যখন গেছেই বেরিয়ে, একটা নূতন যুক্তিও এসে পড়ল মাথায়। হেমাঙ্গিনীকে প্রশ্নটা করে, সনাতনের দিকে চেয়ে চেয়ে বললেন—"হয়েছে পরামর্শ দাদা, আমিই তুলেছি কথা—(স্বামীর দিকে দৃষ্টিপাত করে) সব দুর্বুদ্ধি তো আমারই। কিন্তু দোষটা কি হয়েছে বুঝিয়ে দাও আমায়। একলা থাকতে হয় সেখানে—ছেলে, তার নিজের বাতিক আছে, তাই নিয়ে থাকে—তোমার ভগ্নীপতির—এই তো দেখতেই পেলে—এতদিন ধরে একটা মানুষ কোন্ চুলোয় পড়ে আছে—টেলিগ্রাম না গেলে..."

"আরে রাজি নয় কে বলছে—তুই যে উল্ট বুঝ্ল দিদি'—গলার স্বর ধরে আসছে দেখে তাড়াতাড়ি সামলে নিলেন সনাতন।

বললেন—"তাড়াতাড়ির কথা এই জন্যে বলছিলাম—তোরা শুনলাম একেবারে এই সামনে ফাগুন মাসের কথা বলছিলি না, তাও আবার গোড়ার দিকে?...তাই যেন তুমি বললে না গা?"

শেষের প্রশ্নটা হেমাঙ্গিনীর দিকে চেয়ে করলেন। একটু খুব সূক্ষ্ম ইসারাও থেকে থাকবে, হেমাঙ্গিনী একটু স্খলিতকন্ঠেই দুদিক দেখে উত্তর করলেন—'হয়েছিল যেন কথা ঐ রকম।...তবে সেটা কি আর সম্ভব? এত শীগ্গির!"

"কেন নয় শুনি?"—চ্যালেঞ্জের ভঙ্গিতেই ঘুরে চাইলেন সুরবালা। ভাই-ভাজকে বলতে হলে আড়াল রেখে কথা কইবার অভ্যাস নেই, বললেন—"কারুর দিকে টেনে কথা বলতে পারবে না বৌদি আমার ভালো লাগে না, সে তোমাদের ঘরের ব্যাপার ঘরেই রাখো। ..এই যে ছেলেকে স্মার্ট করবার জন্যে সরিয়ে রাখবার ব্যবস্থাটা হচ্ছে—দোষ কার সে-কথা থাক—কিন্তু আমি সেখানে থাকি কি করে সেটা বিবেচনা করে বলো সবাই। কাকাতুয়া আর খরগোস নিয়ে?"

ভাই আর স্বামীর দিকেও চ্যালেঞ্জের দৃষ্টি নিয়েই চাইলেন। আদিনাথ চুপ করেই রইলেন, এত তপ্ত কড়ায় তেল ছাড়তে সাহসের অভাবেই। সনাতন বললেন—"তবু এত তাড়াহুড়ি?—একটা বিয়েই তো, ভালো করে একটু না দেখে-শুনে..."

"আমারও মনে হয়..."

আদিনাথও পা টিপে-টিপে এগুতে যাচ্ছিলেন, সুরবালা মুখভার করে বলে উঠলেন—"সে মাথাব্যথাও আমারই কাউকে ভাবতে হবে না। আমার একরকম ঠিকই..."

হেমাঙ্গিনী চোখ তুলে মুখের দিকে চাইতে চুপ করে গেলেন।

(ক্রমশঃ)

অঙ্গনা

মণ্ট্রিল বিশ্ব মেলায় সোভিয়েটের কিরঘিজিয়ান অঞ্চলের তিনশোর বেশি চামড়া ও কারুকার্যমণ্ডিত দ্রব্যাদির প্রদর্শনী হয়। এর মধ্যে ছিল সাংসারিক দ্রব্যাদি থেকে শুরু ঝলমলে সাজপোষাক। চিত্রে দুটি তরুণীকে কারুকার্যখচিত পোষাকে দেখা যাচ্ছে।

প্রমীলা

ভাবতে হবে

সেদিন কোন একটি শিল্প প্রতিষ্ঠানে গিয়েছিলাম। সম্পূর্ণটাই ব্যক্তিগত উদ্যোগে পরিচালিত হচ্ছে। সরকারী আর্থিক সাহায্য সামান্য। নানা প্রসঙ্গে কথা হচ্ছিল। এই প্রতিষ্ঠান থেকে শুরু করে নানা বিষয়ে দশটা কথা আপনি এসে পড়ছিল। ভদ্রমহিলা কথা বলছিলেন আর ব্যস্ত হয়ে দরজার দিকে তাকাচ্ছিলেন। স্পষ্টই বুঝতে পারা যাচ্ছিল কারও প্রতীক্ষা করছেন। ব্যবসায়িক প্রয়োজনে কারও আসার কথা আছে মনে করে আমিও একটু দ্বিধাজড়িত হয়ে পড়ছিলাম। কথাবার্তা প্রায় হয়েই এসেছিল। নমস্কার জানিয়ে বিদায় নেব ভাবছি। আমরা দুজনেই উঠে দাঁড়িয়েছি। এমন সময়ে হাসি হাসি মুখে দুটি ছেলে ঘরে ঢুকলো। ভদ্রমহিলার মুখও তৎক্ষণে আনন্দে উজ্জ্বল। আমায় আর একটু বসে যাবার জন্য তিনি অনুরোধ জানালেন।

ছেলে দুটির সঙ্গে তিনি তৎক্ষণে গল্প জুড়ে দিয়েছেন। গল্পের ফাঁকে ফাঁকে কাজের কথাও হচ্ছিল। ওরা ব্যাগ থেকে বার করে কতরকম হাতের কাজ ভদ্রমহিলাকে দেখাচ্ছিলেন। যেগুলো পছন্দ হলো তিনি নিলেন। বাদবাকীগুলিও ফেরৎ দিলেন না—কিছুটা অদল-বদল করে আবার নিয়ে আসতে বললেন। তারপর আবার কিছু নতুন কাজের অর্ডার দিয়ে ছেলে দুটিকে বিদায় দিলেন। এতক্ষণে ভদ্রমহিলার সারা মুখে বেশ একটা তৃপ্তির ভাব দেখা গেল। ছেলে দুটিকে বিদায় করে এবার তিনি আমাকে নিয়ে পড়লেন।

ততক্ষণে আমি এটুকু বুঝতে পেরেছি যে, ছেলে দুটি ডেফ অ্যান্ড ডাম্ব স্কুল থেকে এসেছে। ভদ্রমহিলা আমাকে জানালেন, ওরা এখান থেকে নিয়মিত কাজ নিয়ে যায় এবং দিয়ে যায়। ওদের হাতের কাজের সবাই তারিফ করে। সেজন্য ওদের দিয়েই যথাসম্ভব কাজ করানোর চেষ্টা করি। এটা দেখানোর জন্যই আমি আপনাকে ধরে রেখেছি। এবার আর চট করে ওঠা হলো না। এত বড় একটা তথ্য তিনি বেমালুম চেপে যাবার চেষ্টা করেছিলেন। ধরতে পেরে খুটিয়ে খুটিয়ে দুটো-একটা কথা বার করে নেবার চেষ্টা করি। কিন্তু তার আগেই তিনি আমায় সব বলে দিয়েছেন। 'এখানে যা কিছু হাতের কাজ দেখছেন' ভদ্রমহিলা বললেন, 'সবই ওদের হাতে শিল্পসমৃদ্ধ।' এত নিখুঁত কাজ ওরা করতে পারে, না দেখলে বিশ্বাস করার উপায় নেই। আমার তন্ময়তা লক্ষ্য করে তিনি বললেন, 'তাছাড়া ওদের ওপর সহজে আস্থা স্থাপন করা যায়। নিজেদের দুর্বলতা ওরা জানে। তাই কাজগুলি মন-প্রাণ ঢেলে করে। যাতে সবাই খুশি হয় এবং আরও কাজ পাওয়া যায়।' কথা আরও কিছুদূর গড়িয়েছিল। সে প্রসঙ্গ এখানে অবান্তর।

এই শিল্প প্রতিষ্ঠানে এরকম দশটি ছেলেমেয়ে কাজ করে। আরও অনেক প্রতিষ্ঠান তো ঘুরেছি কিন্তু কোথাও এমনটি দেখিনি। সবাই দক্ষ শিল্পী খোঁজে। এদের দক্ষতা একবার তাঁরা বাজিয়ে দেখেন না কেন? এ প্রশ্নের উত্তর পাইনি। হয়তো তাঁরা জানেন না। কিন্তু ওদের কথা জানার দায়িত্ব আমাদের সকলের—ওদের কথা না ভাবলে আমাদের অপরাধ হবে ক্ষমার অযোগ্য।

উপকরণ ও কারিগর

সুখের সংসারই নারীর একান্ত কাম্য। বিশেষ করে বিবাহিত জীবনে সুখ-শান্তির প্রত্যাশা সকলেরই। কিন্তু নারীর কাছে এই সংসার বলতে কি বোঝায়? এর উত্তরে অনেকেই বলবেন, সংসার বলতে বোঝায়, সংসারের আত্মীয়-পরিজন এবং স্বামী-পুত্র-কন্যা নিয়ে যে নীড়। আমি কিন্তু বলব, নারীর কাছে আত্মীয়-পরিজন পরিবৃত সংসারের চেয়ে স্বামী, পুত্র এবং কন্যা নিয়ে যে সংসার, তার মূল্য অনেক বেশী। কারণ, মা হিসাবে যে গুরুদায়িত্ব নারীর মস্তকে অর্পিত থাকে, সেটা তাঁকে প্রয়োগ করতে হয় পুত্র, কন্যা পরিবৃত সংসারেই। কিন্তু আত্মীয় পরিজনাবৃত যে সংসার সেখানে তার দায়িত্ব যতটা বেশী প্রয়োজন, তার চেয়ে কর্তব্য বেশী প্রকট। সংসারের এই শান্তি বজায় রাখতে স্বামীর দায়িত্ব যতটা তার চেয়ে অনেক বেশী দায়িত্ব স্ত্রীর—বিশেষ করে যিনি মা। এই দায়িত্ব পালনে যে মা যত বেশী সতর্ক, তিনিই ভবিষ্যতে তত বেশী শুভ ফল ভোগ করেন। নচেৎ নবজীবনে মুহূর্তের একটা ভুলে পা দিয়ে সারাজীবন তাঁকে জ্বলে-পুড়ে মরতে হয়।

আমাদের সামনে আদর্শের অভাব নেই। সেই আদর্শের ছায়া ধরেই আমরা নিজেদের গড়ে তুলতে অভ্যস্ত। তবে এক্ষেত্রে একটা জিনিস বিশেষভাবে লক্ষণীয় যে, চোখ ঝলসানো আলোর দিকেই আমাদের দৃষ্টি বার বার নিবদ্ধ হয়; কিন্তু আলোর পিছনে যে অন্ধকার, তারও যে একটা রূপ আছে, তারও যে একটা আলাদা সত্তা আছে, সেটা একবারও ভেবে দেখবার সময় পাই না আমরা। বিজলী বাতির তীব্র মাদকতায় তাই আমরা অন্ধ, বিভ্রান্ত। কিন্তু একথা ভেবে দেখা প্রয়োজন, নারীর স্বাভাবিক বিকাশ এবং বৈশিষ্ট্য থেকে আমরা কতদূরে সরে গেছি। একদিন পবিত্রতা, সরলতা, কর্তব্যনিষ্ঠা এবং মমতা ছিল আমাদের নারী-চরিত্রের বৈশিষ্ট্য. আজ তাকে বিসর্জন দিয়ে আমরা নগ্নতার মধ্যেই আনন্দ এবং গৌরবকে হাতড়ে বেড়াচ্ছি। কিন্তু কোথায় সে গৌরব, কোথায় সে নারীত্ব? যে আপন গর্ভজাত সন্তানকে আপনার বলে দাবী করতে পারে না, যে আপন সন্তানকে সমাজের বুকে প্রতিষ্ঠার আসনে সমাসীন করতে পারে না, সে নারীর বৈশিষ্ট্য, সে নারীর স্বাতন্ত্র্য, সে নারীর গৌরব বলে

কিছু থাকতে পারে—এ তো মনেই হয় না। রাংতার মোড়কে আপন মুখমণ্ডলকে ঢাকা দেওয়া যায়, হৃদয়ের অভিব্যক্তিকে যায় না।

মায়ের কাছে শিশুর চেয়ে মূল্যবান আর কোন বস্তু আছে বলে আমার মনে হয় না। অতএব এই শিশুর প্রতি মায়ের দায়িত্ব যে কত, তা বোধহয় বার বার না বললেও চলবে। কারণ, এ সম্বন্ধে বহু আলোচনাই ইতিপূর্বে হয়ে গেছে। এই প্রবন্ধে আমি কিছু নতুন তথ্য নিয়ে আলোচনা করতে চাই।

শিশুকে গড়ার অর্থই হল, শিশুর কাদা-মাটির ন্যায় মনটাকে ছাঁচে ঢেলে নব-নব আকৃতি ও প্রকৃতিতে গঠন করা। কুমোর যেমন দেবীমূর্তি গঠন করে, মাকেও ঠিক তেমনি করে দিনের পর দিন অক্লান্ত পরিশ্রমে একতাল কাদামাটি নিয়ে খেলা করতে হবে। হ্যাঁ, খেলাই বটে। একটা অজানা কক্ষ থেকে ঝরে পড়া একটা তারকা-খণ্ড যেমন শূন্যপথে আলোকের সৃষ্টি করে, ঠিক তেমনি করেই এতকাল কাদামাটি দিয়ে একটা পূর্ণাঙ্গ শিশু গড়ে তাকে ছেড়ে দিতে হবে সমাজের বুকে, যে দেশের এক-জন হয়ে পিতা-মাতার মুখ উজ্জ্বল করে তুলবে। অতএব সেখানে শিশুর ভূমিকা যত বড়, তার চেয়ে অনেক, অনেক বড় ভূমিকা গর্ভধারিণী মায়ের। কারণ, শিশু এখানে সমাজ গড়ার উপকরণ আর মা হলেন সমাজ গড়ার কারিগর। তাই কারিগরের শিল্প-নৈপুণ্যই সমাজসুষমার পরিচয়। এই কর্তব্যে যে মা বিচলিত হন, তাঁকে বোধহয় 'মা' বলা যায় না। তবে এখানে একটা কথা আছে যে, একথা সব মায়ের ক্ষেত্রেই প্রযোজ্য হবে না। কারণ শিশু গঠনের দায়িত্ব মায়ের ওপর যেমন নির্ভর করে, তেমন পরিবেশ ও পরিবারের অবস্থাকে মনোযোগ দেওয়া সম্ভবপর হয়ে ওঠে না। আধুনিক অনেক পরিবারেই আর্থিক, সাংসারিক, মানসিক, ইত্যাদি বহু রকমের সমস্যা লেগেই আছে। সেই সমস্ত সমস্যার সমাধান করতে অনেক মাকেই হাড়ভাঙ্গা খাটুনি খাটতে হয়। অতএব এই স্থানে আবার শিশুর জীবন নিয়ে চিন্তা করার সময় তাঁদের আর থাকে না। সেই সমস্ত পরিবার ও সেই সমস্ত মায়েদের সম্পর্কে বলব যে, তাঁরা অবসর যেটুকু সময় পান, সেটুকু সময়ই তাঁরা তাঁদের শিশুর চরিত্র-গঠনের প্রতি মন দেন।

এখন আমি শিশুদের প্রতি মায়েদের দু-একটি ত্রুটি-বিচ্যুতি নিয়ে আলোচনা করতে চাই। এই আলোচনার প্রথমেই আধুনিক মায়েদের অমার্জিত রুচির কথা বলা প্রয়োজন। যে কোন শিশুর জীবনে পিতা-মাতার অমার্জিত রুচি যে কতখানি প্রভাব বিস্তার করে, তা একটু লক্ষ্য করলেই বোঝা যায়। আধুনিক এবং উগ্র আধুনিক বহু পরিবারেই দেখা যায় গর্ভবতী মায়ের সাবধানতার কোন বালাই থাকে না। যৌবনের উত্তেজনা এবং সোস্যাল লাইফের জেরকে তাঁরা কাটিয়ে উঠতে না পেরে গর্ভবতী অবস্থাতেই পর্যাপ্ত পরিমাণে প্রসাধন এবং সাজ-পোষাক করে থাকেন। শুধু মা-ই নয়, বহু পিতাকেও এইরূপ রুচির বশবর্তী হতে দেখেছি। এতো গেল শিশু গর্ভে থাকা-কালীন। শিশু ভূমিষ্ট হওয়ার পর এবং দিনে দিনে শিশু বেড়ে ওঠার পরও বহু পিতা-মাতা তাঁদের বিগত ধারাটাকে কাটিয়ে উঠতে পারেন না, ফলে কোমলমনা শিশুর সামনেই তাঁরা উচ্ছৃঙ্খল জীবনযাপন করতে থাকেন। যথেষ্ট বয়েস হওয়া সত্ত্বেও বহু মাকে বিকৃত পোষাক পরিহিতা হয়ে পাশে উপযুক্ত সন্তানকে নিয়ে হয় সিনেমা, না হয় থিয়েটার কিংবা অন্য কোন প্রমোদ্যানে যেতে দেখা যায়। অনেক সময় পাশে পরম গুরু পিতাকেও দেখা যায়। কিন্তু এটা তাঁরা বোঝেন না যে, পিতা-মাতার শরীরের উচ্ছৃঙ্খলতা কিভাবে সংক্রামক ব্যাধির মত সদ্যোজাত শিশুচরিত্রে প্রকটিত হয়। আর ঠিক এই কারণেই জন্ম-লগ্নে বহু সন্তানকে পঙ্গু হতে দেখা যায়।

সবশেষে মায়েদের আর একটি মারাত্মক ত্রুটি নিয়ে আলোচনা করতে চাই।

আজকের বেশীর ভাগ মানুষই পরশ্রী-কাতর। অপরের সুখে তাঁরা যেন কোন মতেই সুখী হতে পারেন না। এছাড়া পরকে নিয়ে আলোচনা করতেও তাঁরা বেশ অভ্যস্ত। নারীর ক্ষেত্রে এ অপবাদটা আজকের নয়, বহু যুগ আগের। কিন্তু সেই অপবাদটাকেই আজ নারী জাতির অঙ্গ থেকে সমূলে উৎখাত করার সময় এসেছে। মা হয়ে আজ আর পরশ্রীকাতর এবং পর-আলোচনায় মনোনিবেশ করলে চলবে না, তাতে আপন শিশুরই হবে চরম ক্ষতি। কথাটা বুঝিয়ে বলার প্রয়োজন আছে। অনেক পরিবারেই দেখবেন, (বিশেষ করে একান্নবর্তী পরিবারে) হয়ত সে পরিবারে ভায়ে ভায়ে কিংবা জায়ে জায়ে কিংবা আত্মীয়ে-অনাত্মীয়ে মিল নেই, হয়ত মাঝে মাঝে তার ফলে ভীষণ ঝগড়াঝাটিও চলে। সেই পরিবারেই হয়ত উভয় জা-এর কিংবা আত্মীয়ের ছোট ছোট ছেলেমেয়ে আছে। এখন ভেবে দেখুন ঐ শিশুগুলির ভবিষ্যৎ কোথায় গিয়ে দাঁড়াবে! অবশ্য এখানে মা কিংবা বাবা যদি কঠোর এবং মার্জিত রুচি-সম্পন্ন হন তবে শিশুর পক্ষে ততটা ভয়ের কারণ থাকে না। কিন্তু ঘটনাটা ঘটে ঠিক তার উল্টো। এই অবস্থায় অনেক মা-বাবাকেই তাঁদের শিশুকে বা সন্তানকে বলতে শুনেছি, 'এই খবরদার বলছি ওদের ঘরে যাবি না।... কিছু খেতে দিলে খাবি না।...ওদের সঙ্গে কথা বলবি না।'...ইত্যাদি ইত্যাদি। মা-বাবাই যদি শিশুর মনকে এইভাবে বিষাক্ত করে তোলেন, তবে উন্নতির দিকে এগিয়ে যাওয়া তো দূরের কথা, দিনের পর দিন শিশু সমাজের আবর্জনাই হয়ে ওঠে। এছাড়া আরও অনেক সময় দেখা যায় যে, নিজের শিশুর সামনেই অনেক বাবা-মা অন্যের শিশুকে কটু কথা বলেন, গালিগালাজ করেন, ঘৃণার ভাব দেখান, কিংবা নিজের শিশুকে প্রত্যক্ষভাবে অন্য শিশু বা অন্য মানুষকে ঘৃণা করতে শেখান। তাঁদের এই ঘৃণার পাত্র-পাত্রীরা হচ্ছেন, সমাজের নিম্ন শ্রেণীর মানুষেরা অথবা শত্রুভাবাপন্ন আত্মীয়-অনাত্মীয়েরা। পিতা-মাতার এই অভাবনীয় ত্রুটির বিচার পাঠক-পাঠিকার হাতেই ছেড়ে দিলাম।

পরবর্তী সময়ে ঐ সমস্ত শিশুই যখন সংসারক্ষেত্রে পদার্পণ করবে তখন তারা যে কিভাবে পদে পদে বিপর্যস্ত হবে, তা কল্পনারও অতীত। তাদের জীবনের এই অভাবণীয় পরিণতির জন্য তারা কাকেও যখন দোষী করতে পারবে না, তখন তারা তাদের নিজেদের অভিশাপ নিজেদের মস্তকেই বর্ষণ করবে। আর জীবনের শেষে সমাজের ডাস্টবিনে নিতান্ত আবর্জনার মতই তারা বাতিল হয়ে যাবে।

বিজ্ঞান সাধনায় নারী

শুঁয়োপোকার বিবর্তন সম্বন্ধে সপ্তদশ শতাব্দী পর্যন্ত মানুষ প্রায় অজ্ঞ ছিল। এক্ষেত্রে তৎকালে প্রথম যিনি আগ্রহী হয়ে উঠেছিলেন তার নাম মারিয়া সিবিল্লা। তিনি ছিলেন একাধারে চিত্রশিল্পী ও গবেষক। শুঁয়োপোকাদের অদ্ভুত বিবর্তন এবং পুষ্প থেকে পুষ্টিলাভ নামে তিনখণ্ডে এই পুস্তকটি তার দীর্ঘ গবেষণার ফলে লিখিত এবং আজও বিশেষ সমাদৃত।

১৬৪৭ সালে মারিয়া সিবিল্লা ফ্রাঙ্ক-ফুর্টে জন্ম গ্রহণ করেন। বাবা জাকোব মারেল ছিলেন শিল্পী। কন্যাকে তিনি অঙ্কনবিদ্যা ও খোদাই করার কাজ শিখিয়েছিলেন। আঠারো বছর বয়সে মারিয়া স্থাপত্য-অঙ্কন শিল্পী জোহান আন্দ্রিয়াস গ্রাফকে বিবাহ করেন ও নুরেমবের্গে গিয়ে শিল্পচর্চা শুরু করেন। সেখানে তিনি সাধারন ফুল আঁকতেন। ঐ সময় ফুল আঁকা সম্বন্ধে তিনি 'নতুন ফুল' নামে একখানি বই লিখেছিলেন। এই বইতে তামার এনগ্রেভিংয়ে যেসব ফুলের ছবি আছে সেগুলি পরে বিশ্বখ্যাতি লাভ করেছে।

স্বামীর সঙ্গে পরবর্তীকালে বিচ্ছেদের পর তিনি তার দুই কন্যাসহ আমস্টারডামে যান ও পরে উষ্ণপ্রধান দেশের কীট-পতঙ্গ সম্বন্ধে জ্ঞানলাভের জন্য তিনি ওলন্দাজ উপনিবেশ গায়নায় গিয়ে দু বছর বসবাস করেন। সেখানে মরণাপন্ন রোগে আক্রান্ত হয়ে তিনি ইউরোপে প্রত্যাবর্তন করেন।

সম্প্রতি নুরেমবের্গের জার্মানীর ন্যাশনাল মিউজিয়াম মারিয়া সিবিল্লার জীবন ও কর্ম সম্বন্ধে একটি মনোরম প্রদর্শনীর আয়োজন করেছিলেন। তৎকালীন কুসংস্কার-গ্রস্ত ইউরোপের অনেকেই এই আলোকপ্রাপ্তা মহিলা সম্বন্ধে প্রচুর কুৎসা রটিয়েছিল কিন্তু সেসব কিছুই তাকে নিরস্ত করতে পারেনি। তিনি একাগ্রমনে বিজ্ঞান ও শিল্পের সাধনা করে গেছেন।

—অপপ্রভা মল্লিক
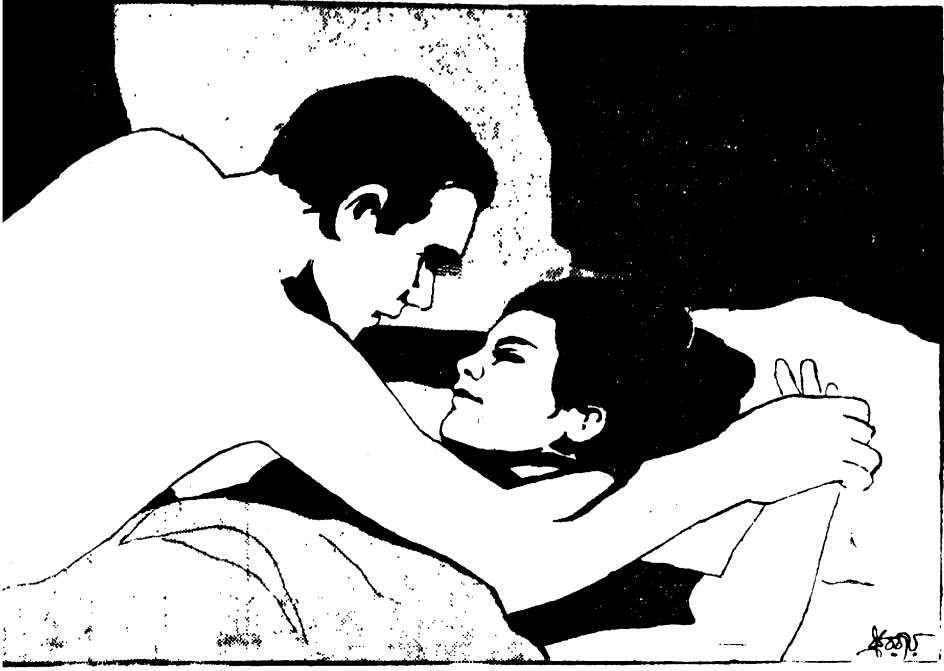
(পূর্ব প্রকাশিতের পর)

(চার)

হাসপাতালে পড়ে আছি আজ দিন াঁচেক হল।

নিমা রোজ নিয়মিত আমাকে দেখতে াসে। কোনোদিন শুধু হাতে আসে না। কেক, বিস্কুট চকোলেট, কিছু না ছু একটা হাতে থাকেই।

"ওসব কেন আনো? শুধু শুধু রচ!" —বলি আমি।

ও মাথা নীচু করে থাকে। কোনো জবাব য় না—

জিনিসের দাম দিতে গেলে ও ব্যথা য়। ওর মুখে ছায়া পড়ে। তাই দামও তে পারি না।

রোজ ভিজিটিং আওয়ার-এ ওর জন্যে তীক্ষা করি আমি। ঐকান্তিক প্রতীক্ষা। দি কোনোদিন আসতে একটু দেরী হয়, তিটি সেকেণ্ড গুনি। পাছে ও না াসে, সেই ভয়ে বুক দুরুদুরু করে। রপর, যখন ও হাসিমুখে আমার সামনে সে দাঁড়িয়ে বলে, "আজ কেমন আছেন?" ামি যেন নতুন জীবন পাই।

মনে মনে ভীত হয়ে উঠছি আমি। কি আসক্তির বন্ধনে আমি ধীরে ধীরে ড়িয়ে পড়ছি? ওকে ভালোবেসে ফেলছি াকি! এরই নাম কি প্রেম?

প্রেম-প্রেম খেলায় আনন্দ আছে। কিন্তু ত্যিকারের প্রেম? সে যে অতি ভয়ঙ্কর। যে পৃথিবীর সবচাইতে বড় লুটেরা।

সর্বস্ব কেড়ে নিয়ে নিঃস্ব করে ফেলে দেয় পথের ধুলোয়।

কিন্তু এই রোগশয্যায় শুয়ে নিজেকে সংযত করতে আমি একেবারেই অক্ষম। এখানে আমার কেউ নেই। একমাত্র ও ছাড়া। এই নিঃসঙ্গ প্রবাসে একমাত্র ওই আমার পরম আপনজন।

...দিন চলে যায়।

প্রায় মাসখানেক লেগে গেল আমার সেরে উঠতে। অসুখটা বেশ বাঁকা পথই নিয়েছিল। কিন্তু প্রথম থেকেই হাসপাতালে ভর্তি হয়েছিলুম বলে রক্ষা পেয়ে গেলুম।

আজকাল আমি খুব সাবধানে থাকি। ঠাণ্ডা একেবারে লাগাই না। সন্ধ্যে হতে না হতে ঘরে এসে ঢুকি।

যদি কখনো এতটুকু অনিয়ম করি, নিমার কাছে ধমক খেতে হয়।

যদি কখনো হাতে গ্লাভস না পরে, গলায় কমফর্টার না জড়িয়ে বেরিয়ে পড়ি বাইরে নিমা পিছন থেকে ডাকে।

গ্লাভস এনে নিজেই পরিয়ে দেয় আমার হাতে। কমফর্টার এনে জড়িয়ে দেয় গলায়।

অফিস থেকে যখন বাসায় ফিরি, ছুটে এসে আমার জুতোর ফিতে খুলে দেয় ও। বাথরুমে গিয়ে রেখে আসে ধোয়া তোয়ালে আর গরম জল, আমার হাতমুখ ধোবার জন্যে।

দেখতে দেখতে এক অদৃশ্য নাগপাশে নিমা আমাকে বেঁধে ফেলছে ধীরে ধীরে—অক্টোপাসের মত। আমার জীবনে নিজেকে করে তুলছে অপরিহার্য।

বিশেষ করে এই শীতের দিনগুলোতে।

কি বিষণ্ণ নিঃসঙ্গতা নিয়েই এসেছে ডিসেম্বর।

সমস্ত শহর খালি করে বেশীর ভাগ লোক চলে যাচ্ছে সমতলের দিকে। অফিসও অনেক ফাঁকা। যাদেরই ছুটি পাওনা ছিল, সব ছুটি নিয়ে চলে গেছে বাইরে শীতটা কাটিয়ে আসবে।

অফিস আজকাল আগের চাইতে সকাল-সকাল ছুটি হয়। তবু বাসায় ফিরবার আগেই সন্ধ্যার অন্ধকার ঘনিয়ে আসে চারদিকে। এক-আধ দিন যদি কোনো কারণে দেরী করে বাসায় ফিরি, তবে দেখতে পাই সন্ধ্যে ছ'টার মধ্যেই বেশীর ভাগ দোকানেই ঝাঁপ ফেলে দিয়ে দোকানদার চলে গেছে। সাতটার আগেই বাস সার্ভিস বন্ধ। হাড়-কনকনানো ঠান্ডায় আড়াই মাইল পথ হেঁটে বাসায় ফিরতে হয়।

দেরী করে ফিরলেও, নিমা কোনো অনুযোগ করে না। আমার জন্যে খাবার সাজিয়ে বসে থাকে। আমি এলে পর সব গরম করে আবার। উনুন জ্বালানোই থাকে। একটা নয়, গোটা তিনেক। ইঁটের উনুন তো একটা আছেই রান্নাঘরে। এছাড়া দুটো বালতি-উনুনও কিনে এনেছে ও। সে দুটো আমার শোবার ঘরে রেখে দেয় সন্ধ্যে থেকে—ঘর গরম করার জন্যে। জানলা-দরজা সব বন্ধ থাকায় ঘরের হাওয়াটা গরম হয়ে ওঠে। তারপর একটু বেশী রাতে উনুন দুটোকে শোবার ঘরের বাইরে বার করে দিই আমি।

এছাড়া, আমি শোবার পর গরম জল-ভরা দুটো হট্‌ব্যাগও এনে নিমা রেখে দেয় আমার বিছানায়। তারপর বাসনপত্র সব ধুয়ে মুছে রাখে। এত সব করার পর ও ছুটি পায়।

বাড়ী ফিরতে ওর একটু রাতই হয়ে যায় মাঝে মাঝে। আর এই পাহাড় অঞ্চলে একটু রাত মানেই গভীর রাত। বিশেষ করে, শহরের বাইরে এই জংলী এলাকায় তো বটেই। সন্ধ্যে সাতটাতেই লোকে ঘরের দরজা বন্ধ করে এমন ঘুম ঘুমিয়ে পড়ে যে ডাকাত পড়লেও জাগে না।

মাঝে মাঝে ভাবি, নিমাকে বলব—আমার এখানেই রাত্রিবেলা শুতে। নইলে এই শীতের রাত্তিরে ও যখন একলা অন্ধকার পাহাড়ী পথ দিয়ে ঘরে ফেরে, বড় কষ্ট লাগে দেখতে।

কিন্তু বলি-বলি করেও বলতে সাহস পাই না। ভয়। ভয় করে আমার। ভয় করে নিজেকে। ভয় করে নিমার যৌবনকে।

তাই, চুপ করে থাকি আমি।

নিমা যখন সামান্য একটা সুতির চাদর মাত্র সম্বল করে কাঁপতে কাঁপতে ঘরে ফেরে আমার কাজ সেরে, ওকে বাধা দিতে পারি না আমি। বলতে পারি না, 'নিমা, তোমার ঘরে গিয়ে কাজ নেই। তুমি এখানেই থাকো। এতগুলো ঘর খালি পড়ে আছে, তোমার জায়গার অভাব হবে না।'

কিন্তু একদিন—

একদিন সেকথা বলতেই হল।

সেদিন সকাল থেকেই আকাশ ছিল মেঘে মেঘে অন্ধকার। সূর্যের মুখ একবারও দেখা যায়নি সারাদিনের মধ্যে।

অফিসে লোক প্রায় আসেইনি বলতে গেলে। যারা এসেছিল তারা সবাই বলাবলি করতে লাগলো বহু বছরের মধ্যে এমন শীত নাকি পড়েনি এ মুলুকে। দু-এক দিনের মধ্যেই বোধহয় বরফ পড়তে সুরু হবে।

অফিসে বসে সেদিন কাজ করা সত্যিই দুরূহ হয়ে উঠল। গ্লাভস পরে কাজ করা যায় না। কিন্তু গ্লাভস খুললেও তো মুশকিল আঙুলগুলো জমে আসে। লিখব কি করে?

ঘরের সব আলো ক'টাই জ্বলছে। বন্ধ কাচের জানলা দিয়ে দেখছি বাইরে দুপুর-বেলাতেই প্রায় সন্ধ্যার অন্ধকার ঘনিয়ে আসছে। দিনের চেহারা যে এমন হতে পারে এর আগে কখনো জানা ছিল না আমার।

বিকেল সাড়ে তিনটে হতে না হতেই অফিস ফাঁকা। সুতরাং আমিও ধরলুম বাসার পথ।

বাংলোয় ফিরে নিমাকে বললুম—'আজ খিচুড়ি করো। খিচুড়ি, ওমলেট, আর চাটনি।'

'রুটি খাবেন না?'

আশ্চর্য হল নিমা।

'রোজই তো রাতে রুটি খাই। আজ আর নয়। একেবারে বাঙালী খানা খাবো আজ। বহুদিন খাইনি।'

আমাকে চা-জলখাবার দিয়ে নিমা রান্না-ঘরে যাচ্ছিলো, ওকে ফিরে ডাকলুম।

'শোনো, আজ তুমিও এখানে খাবে।'

ছোট্ট মেয়ের মত ঘাড় নাড়লো নিমা। অকারণ কথা ও বলে না।

সব রান্না শেষ করে নিমা আমার কাছে এসে বসলো।

আজ ও বালতি-উনুন দুটো আমার ঘরে এনে রেখে দিয়ে গেছে অনেক আগেই। তবু ঘরের হাওয়া তেমন গরম হয়ে ওঠেনি এখনও। এতেই আন্দাজ করতে পারছি বাইরে ঠান্ডা এখন কতটা।

এই ঠান্ডাতেও যে কি করে পাহাড়ী মেয়েরা ঠান্ডা জলে কাজ করে।

গায়ে গরম জামাও তো বিশেষ দেখি না ওদের। সম্বলের মধ্যে ঐ একখানা চাদর। নিমারও তাই। ওর কি একটা সোয়েটারও নেই?

'এত ঠান্ডায় শুধু একটা চাদরে চলে কি করে তোমার? কষ্ট হয় না?' জিজ্ঞেস করলুম নিমাকে।

'কষ্ট হলে আমাদের চলে না, বাবু। সবকিছু সহ্য করতে না পারলে কি বাঁচতে পারতাম?'

'আচ্ছা, রাত্তিরবেলা তোমরা কি করো?'

'কাঠকুটো জ্বালাই। ঐ জন্যেই তো সারা বছর ধরে জ্বালানি কুড়িয়ে রাখি।...সন্ধ্যেবেলা রোজ দেখেন না পাহাড়ী বস্তিতে আগুন জ্বালিয়ে অনেক লোক ঘিরে বসে আছে?'

'হ্যাঁ, দেখি তো।'

'যাদের গরম জামা-কাপড় কেনার ক্ষমতা নেই তারা ওই করে।'

একটু ইতস্ততঃ করে কিছু টাকা বের করলুম সুটকেশ থেকে। বললুম, 'এই টাকাটা তোমায় দিচ্ছি। উল কিনে একটা সোয়েটার বুনে নিও।'

'এ মাসের মাইনে তো আমার এখনো পাওনা হয়নি!'

'এটা আমি তোমায় বাড়তি দিচ্ছি, এমনি। তুমি যেমন হাসপাতালে আমার জন্যে রোজই কিছু না কিছু নিয়ে যেতে, তেমনি।'

নিমা তবু ইতস্তত করতে লাগলো।

হেসে বললুম, 'তুমি ইতস্তত করছ কেন? তুমি আমার জন্যে যা করেছ বা করছ তাতে তোমার পাওনা এর চাইতে অনেক বেশী হয়েছে।'

এবার টাকাটা তুলে নিলো নিমা।

'তুমি দাবা খেলতে জানো, নিমা?'

জিজ্ঞেস করলুম ওকে।

সময় আজ আর কিছুতেই কাটতে চাইছে না। মনের অবস্থাও অত্যন্ত বিপর্যস্ত। এক অদ্ভুত বিষাদ চেপে বসছে মনের ওপর—বার-বার। চেষ্টা করেও তাকে সরাতে পারছি না।

নিমা দাবা খেলতে জানে না। ওকে শেখাবো কি? তাহলে পরে মাঝে মাঝে খেলতে পারবে আমার সঙ্গে। দাবা বেশ ইন্টারেস্টিং খেলা। মনকে ভুলিয়ে রাখতে পারে অনেকক্ষণ।

বাক্স থেকে বার করলুম আমার দাবার ছকটা।

কিন্তু নিমাকে শেখাতে গিয়ে দেখলুম, ও একদিনের কর্ম নয়। বেশ মনোযোগও যে ও দিচ্ছে, এমন মনে হল না। খানিক বাদেই হাঁফিয়ে উঠে ও বললো, 'একটু গান দিন না, বাবু।'

'কোন গান?'

'সেদিন যে সেই শুনিয়েছিলেন—অনেক-গুলো গান?'

'শ্যামা নাটকের গানগুলোর কথা বলছ?'

কিছুদিন আগে ওকে রেকর্ড প্লেয়ারে 'শ্যামা' নাটক শুনিয়েছিলুম। তারই কথা বলছে ও।

'বেশ, গানই শোনাচ্ছি তোমায়।'

দাবার ছক তুলে রেখে দিলুম।

রেকর্ড প্লেয়ারটা চালিয়ে দিয়ে বিছানায় এসে বসলুম ফের।

বজ্রসেন, শ্যামা, আর উত্তীয়ের কাহিনী গানের ভাষায় বাজতে লাগলো রেকর্ডে।

নমা মুগ্ধ হয়ে শুনছে। ও কি সব পারছে?

ন্যায়' শেষ হতে আরো খানিকক্ষণ বাজালুম আমি।

নমা খুব খুশী। ছোট্ট মেয়ের মত

কলকাতার গল্প বলবেন না বাবু,

কলকাতার গল্প! মানে আমার ছেলে আর ছাত্রজীবনের গল্প।

সব গল্প আমি ওকে বহুবার করেছি কাছে। একাগ্রচিত্তে ও শুনেছে। আজ সেই গল্প শোনার জন্যে ঘরে বসলো ক।

কিন্তু আজ আমার গল্প করায় মন চিন্তার খেই হারিয়ে ফেলছি বারবার। দাস হয়ে যাচ্ছে।

নমা বুঝতে পারলো। হঠাৎ বলে, 'আপনি যেন কি ভাবছেন, বাবু!'

ভাবিনি কিছু ঠিক। তবে—'

আপনার মন কেমন করছে কলকাতার?'

মন কেমন করছে ঠিকই। কিন্তু তার জন্যে নয়।'

তবে?'

ক জানি, কি যে চাই বুঝতে পারছি এই দুরন্ত শীতের জন্যেই বোধহয় হচ্ছে। মনে হচ্ছে, কি যেন চাই, পাচ্ছি না। বড় একা—নিজেকে বড় মনে হচ্ছে।'

একা?'—হাসলো নিমা—'কিন্তু একা ঠিক নেই আপনি এখন। আমি তো রেই বসে রয়েছি, গল্প করছি!'

সেটাই একটা মস্ত বড় সান্ত্বনা। তো আর তুমি বাড়ী যাবে না, নিমা? উপায়ই তো নেই। বরফ পড়ছে।'

সই ভাবছি। আজ ঘরে ফিরবো কি

চিন্তিত দেখালো নিমাকে।

আজ আর ঘরে ফেরা হয়েছে তোমার!' ফেললুম আমি, 'স্বয়ং ভগবান যদি হন!'

গাড়ীতে ভাববে। আসার সময় যদি আসতুম আজ ফিরবো না, তাহলে চিন্তা থাকতো না! কি করে আজ রাতেই এমন বরফ পড়তে হবে!'

ইরে এখন অশ্রান্ত বরফ পড়ছে। মধ্যে বসে থেকেও তার ঝর্ঝর শব্দ পাচ্ছি।

শুধু তুষারবর্ষণই নয়। ঝোড়ো ও মিলেছে তার সঙ্গে। এমন উন্মাদ বহু বছরের মধ্যে নাকি আসেনি এই বুকে। অন্তত নিমা স্মরণ করতে না।

এবার আপনার খাবার নিয়ে আসবো' জিজ্ঞেস করলো ও।

এসো। আর রাত করে লাভ নেই।' আমার খাওয়া হল। আমাকে খাইয়ে নিজে খেতে গেল।

খাওয়া-দাওয়ার পাট চুকিয়ে, রাতের কাজ-কর্ম সব সেরে, নিমা আমার ঘরে এল।

'উনুনে দুটোতে আর চারটি কাঠ কয়লা দাও নিমা, আগুনের জোর কমে আসছে।' বললুম ওকে।

'হ্যাঁ দিই।'

কাঠকয়লা নিয়ে এল ও কড়াইয়ে করে, ঢেলে দিলো আগুনের মধ্যে। তারপর ডাইনিং রুমে গিয়ে ঢুকলো।

ওর পিছন পিছন গেলুম আমি—কৌতূহলবশে। গিয়ে দেখি মেঝেয় বিছানো কার্পেটের ওপর শোবার ব্যবস্থা করছে ও।

'ঠাণ্ডায় মরে যাবে যে!', বলে উঠলুম আমি, 'তুমি এই পাশের ঘরটায় শোও, ঐ খাটের ওপর। তোমায় বালিশ আর একটা কম্বল দিচ্ছি আমি। আর ঐ কার্পেটটাও ঝেড়েঝুড়ে নাও, কম্বলের ওপর চড়িয়ে নেবে। যে শীত।'

আমার হুকুমমতই কাজ করলো নিমা।

ওকে শুতে পাঠিয়ে ঘরের দরজা সব বন্ধ করলুম আমি।

আমার ঘরের তিনটে দরজা। তার মধ্যে একটা দিয়ে নিমার ঘরে যাওয়া যায়। দরজাটার দুদিকেই ছিটকিনি আছে, কিন্তু নিমার ঘরের দিকের ছিটকিনিটা একেবারে মরচে-পড়া, জং-ধরা। অনেক চেষ্টা করলেও সেটাকে নাড়ানো যায় না একচুল।

নিমাকে শুনিয়ে শুনিয়ে আমি আমার দিকের ছিটকিনিটা সশব্দে লাগালুম। ও যেন না ভাবে, আমার কোনো মন্দ মতলব আছে।

ঘুম এখনি আসবে না।

গোটা কয়েক পুরোনো বই খুলে বসলুম বিছানায়, বালিশে ঠেস দিয়ে।

ফার্সী আর উর্দু কবিতার বই—সেকেণ্ডহ্যাণ্ড বইয়ের দোকান থেকে সংগ্রহ করা। পাশে পাশে অনুবাদ লেখা আছে, সুতরাং কোনো অসুবিধে নেই।

সব বই কটা পড়তে গেলে রাত ভোর হয়ে যাবে।

তা যদি যায় তো যাক না।

এমন তুষার-ঝরা রাত কি অনেক আসবে জীবনে? মনে হয় না।

ঝরছে। তুষার ঝরছে। বার্চবনের পাতায় পাতায়, সীডার কুঞ্জের সর্বাঙ্গ ঢেকে দিয়ে, এই পাহাড়ের উঁচু মাথাটায় শাদা আস্তরণ বিছিয়ে, অবিশ্রান্ত ঝরছে তুষার। গাছের পাতায় পাতায় আহত ঝোড়ো হাওয়া আর তুষারের ক্রন্দন বেজে উঠছে রাত্রির বুক চিরে—ধ্বনিত প্রতিধ্বনিত হয়ে ছড়িয়ে যাচ্ছে দূরে দিগন্তরে।

মন জানে নিমা আছে পাশের ঘরেই। সামনে খোলা দিওয়ান-ই-হাফিজ।

একখানি বই নয়। একটা জগৎ। সে জগতে আছে শুধু দুজন। আমি, আর আমার সাকী।

আমার সাকীর আনত মুখ ঘোর লাল ওড়নায় ঢাকা, তাই সে মুখ আমি ভালো করে দেখতে পাচ্ছি না। আমার কল্পলোকের মাঝখানে সে দাঁড়িয়ে আছে এক মনোরম ভঙ্গিতে। ঐ রঙ্গিণীরূপের সঙ্গে তুলনা করা যায় এমন কিছু কি আছে এ বিশ্বসংসারে?

হাফিজ বলেছেন—নেই।

তাই তো তিনি গেয়েছেন, 'একটি রাতের জন্যেও যদি প্রিয়ার সঙ্গে আমার মিলন হয়, তবে আমি হব মৃত্যুঞ্জয়। যদি তার অধরের স্বর্গসুধা আমি পান করতে পাই বারংবার, তবে আমি তার আঁখির পলক হব, বসন হয়ে ঘিরে রইবো তার অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ নিবিড় আলিঙ্গনে।'

হাফিজ আর ওমর খৈয়ামের পথ বেয়ে এখন আমি চলে এসেছি দূরে—অনেক দূরে।

আমার মানস-উপবনের সাকী দাঁড়িয়ে আছে ঐ তো আমার সামনে! মনে হচ্ছে, ঐ মুখের রেখায় রেখায় আমার ভারী চেনা একটি মুখের আভাস আছে। কিন্তু লাল ওড়নার আড়াল থেকে আমার সাকীর মুখ স্পষ্ট হয়ে ফুটে উঠতে না উঠতেই মিলিয়ে যাচ্ছে বারবার—আমার দৃষ্টি ছুঁই-ছুঁই করেও তাকে ছুঁতে পারছে না শেষ পর্যন্ত!

কল্পনায় দেখছি আমার হাতের কাছেই রয়েছে রঙিন সিরাজী, স্বর্ণকলস ভরা। কিন্তু সেই সিরাজীর চেয়ে রঙিন আমার প্রিয়ার ঠোঁট! ঐ ঠোঁটের একটি চুম্বনের জন্যে আমি এসেছি দূর বহু দূর থেকে—কত অরণ্য কত গিরি-পর্বত কত দুস্তর সমুদ্র পেরিয়ে। এসেছি মরুভূমির আকণ্ঠ তৃষ্ণা নিয়ে। সে তৃষ্ণা মেটাবার সাধ্য ঐ রাঙা সিরাজীর নেই। তা মিটবে শুধু আমার পরমতমার চুম্বন-মদিরা পান করতে পারলে!

কিন্তু তাকে ধরা যায় কই? ধরি-ধরি করেও তো ধরতে পারছি না তাকে! স্বপ্নের মতই জীবন্ত সে, কিন্তু তবুও তো বাস্তব নয়!...

একটি চুম্বন! একটি চুম্বনের জন্যে আমার প্রতিটি রক্তকণিকায় এক গভীর কামনার অনুরণন বেজে উঠলো।

তুষারের চুম্বন এখনো ঝরছে বার্চবনের পাতায় পাতায়। অজস্র। অবিশ্রান্ত!...

'বাবু! বাবু!'

দরজায় ধাক্কা পড়লো হঠাৎ।

ধাক্কার শব্দ প্রতিধ্বনিত হয়ে বেজে উঠলো আরো জোরে। পাহাড়ে জায়গায় এরকমই হয়।

কিছু বুঝবার আগেই নিমার ঘর আর আমার ঘরের মাঝখানের দরজটা খুলে ফেললুম আমি।

দেখি, নিমা দাঁড়িয়ে আছে উদভ্রান্তের মত—আমার সামনে।

ওর চোখে ভয়ার্ত দৃষ্টি, চুল এলোমেলো, বেশবাস অসংযত। বুকে আঁচল নেই, কোমরে জড়ানো—পাহাড়ী মেয়েদের মত। যেমন শুয়েছিল তেমনি উঠে এসেছে।

'কি হয়েছে, নিমা?'

হঠাৎ কোনো উত্তর দিতে পারলো না ও। ফ্যালফ্যাল করে চেয়ে রইলো আমার দিকে।

'কি হয়েছে?'

আবার জিজ্ঞেস করলুম।

এতক্ষণে একটু ধাতস্থ হল ও।

আস্তে আস্তে বললে, 'অদ্ভুত স্বপ্ন দেখলাম, বাবু! যেন কতকগুলো ডাকাত জানলা-দরজা ভেঙে সব ঘরে ঢুকছে! হঠাৎ ঘুম ভেঙে মনে হল যেন সব সত্যি! উঃ, কি ভয় পেয়েছিলাম! কোনোদিন তো একলা শুইনি এমন!'

'কেন, সেদিন? যেদিন আমার অসুখের জন্যে এক রাত থেকে গিয়েছিলে এখানে?'

'ওঃ, সেদিনের কথা বলছেন! সেদিন তো চোখে পাতায় একই করিনি আমি! আলো জেলে ঠায় বসেছিলুম দোরগোড়ায় ঠেস দিয়ে।'

'সারা রাত?'

'সারা রাত!'

'আমি ভাবতুম পাহাড়ী মেয়েরা খুব সাহসী বুঝি। কিন্তু এখন দেখছি তা নয়। আমি পাশের ঘরেই রয়েছি, তবু তুমি একলা শুতে ভয় পাচ্ছো?'

নিমা লজ্জা পেলো।

'ঠিক আছে, এক কাজ করো। এ দরজাটা শুধু আলগা করে ভেজিয়ে দিচ্ছি আমি, ছিটকিনি লাগাবো না। আর তোমার ঘরের আলোটা জেলে রাখো। তাহলে আর ভয় করবে না।'

নিমা চুপ।

'কেমন, এতেই হবে তো?'

ঘাড় নেড়ে সম্মতি জানালো ও। তারপর আবার ফিরে গেল ওর বিছানায়।

দরজাটা ভেজিয়ে দিয়ে আমিও ফিরে এলুম আমার খাটে। ক্ষণপূর্বে দেখা নিমার উদভ্রান্ত মূর্তি ভাসছে চোখের সামনে।

রাতের দৃষ্টিতে কেমন একটা আচ্ছন্নতা থাকে। সেই আচ্ছন্নতার ঘোরে আমি দেখেছি নিমাকে। আশ্চর্য সুন্দর দেখাচ্ছিল ওকে!

এখনো সামনে খোলা ফার্সী কবিতার বই। এবার যেন মনে হচ্ছে, আমার কল্পলোকের সাকীর ঘোমটা-ঢাকা আধফোটা মুখখানাকে চিনতে পারছি আমি। সে মুখ আর নিমার মুখ একাকার হয়ে যাচ্ছে!...

মন থেকে ওই মূর্তিকে সরিয়ে দিতে চেষ্টা করছি বার বার। কিন্তু পারছি কই?

আঃ, কিছুতেই সরে না ওই মূর্তি—চোখের সামনে থেকে।

রাত কত হল?...

ঝর-ঝর ঝর-ঝর ঝর-ঝর...

তুষার এখনো ঝরছে। ঝরছে অবিরাম। ঐ বর্ষণের ধ্বনি সুতীক্ষ্ণ একটা বেদনার মত বাজছে আমার বুকে। সঙ্গিহীন রাত্রির অঘোর ক্রন্দন জাগিয়ে তুলছে আমার রক্তের আদিমতম কান্না।

কাঁদছে। আমার প্রতিটি অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ কাঁদছে—আরেক দেহের সুরভি স্পর্শ পাবার তীব্র-ব্যাকুল কামনায়।

আস্তে—আস্তে—উঠলুম আমি।

এগিয়ে গেলুম আলগাভাবে ভেজানো সেই দরজাটার দিকে, যার ওপারে আছে নিমা।

হ্যাঁ, নিমা।

এই দরজার ওপারে।

সামান্য, এইটুকু মাত্র ব্যবধান।

এই ব্যবধানটুকু সরালেই ওকে দেখতে পাবো আমি।

খুব আস্তে—খুব সন্তর্পণে—দরজাটা ঠেললুম আমি। কোনো শব্দ না করে।

একটু, একটু, আরেকটু...

হ্যাঁ, এখন প্রায় সম্পূর্ণই খুলে গেছে দরজাটা।

সেই খোলা দরজার চৌকাঠে দাঁড়িয়ে আমি ওদিকে তাকালুম।

ওই—ওই তো ঘুমোচ্ছে ও।

ওই কি নিমা?

ওকে তো চিনতে পারছি না আমি! মনে হচ্ছে, অচেনা কোন ভিনদেশী রাজকন্যা ঘুমিয়ে পড়েছে পালঙ্কের ওপর!

রুক্ষ চুলের মোটা বেণী লুটিয়ে পড়েছে একধারে। কাজলটানা চোখ দুটি বোজা। কি নিষ্পাপ ওই মুখ!...

লাল ব্লাউজে মোড়া দুটি উদ্ধত উন্নত বুক। ঠিক যেন দুটি ঘুমন্ত পদ্মের কোরক। কোন সোনার কাঠির ছোঁয়ায় কোন রাজপুত্র তাদের ঘুম ভাঙাবে—তারই প্রতীক্ষায় আছে। নিশ্বাস-প্রশ্বাসের সঙ্গে সঙ্গে দুটি বুক উঠছে নামছে। যেন কোন গভীর, গোপন প্রতীক্ষায় কাঁপছে দুটি পদ্ম-কোরক।

মনে হচ্ছে, আমি—আমিই সেই প্রতীক্ষিত রাজপুত্র! আমারই স্পর্শের জন্যে উন্মুখ হয়ে প্রতীক্ষা করছে ঐ স্বপ্নময় কৌমার্য—ঐ দুটি নিটোল পুষ্পস্তবকের মত সুন্দর বুক। কি এক অমোঘ আকর্ষণে এগিয়ে গেলুম আমি। পায়ে পায়ে।

তারপর নিমার কপালে একটা হাত রাখলুম।

ও এখনো ঘুমোচ্ছে। নিঃসাড়ে।

ওর আধ-খোলা দুটি রক্তাভ ঠোঁট আমন্ত্রণ জানাচ্ছে আমাকে। যেন বলছে, 'এসো, পান করে নাও। রসের পেয়ালা আছে ভরা বহুদিন থেকে, শুধু তোমারই জন্যে! শুধু তোমারই জন্যে!'

তুমি আমাকে ভালোবাসো, নিমা, আমি জানি। তোমার এ দেহ আমারই। আমারই। আমারই। এতে আর কারো অধিকার নেই!

ওর কপালে চুলে হাত বুলোতে লাগলুম ধীরে ধীরে।

এক সময় ও চোখ মেললো। চোখ মেলেই অবাক হল।

আমার হাত অজান্তেই কখন থেমে গেছে আপনি।

আমি চেয়ে আছি ওর দিকে, ও চেয়ে আছে আমার দিকে। তেমনি নির্নিমেষে, যেমন করে চেয়ে থাকে দূরআকাশের তারা—রাতের পৃথিবীর দিকে।

আস্তে আস্তে এক সময় আমার মুখ নেমে এল ওর মুখের ওপর।

ওর ঠোঁটে, গালে, চুলে, কপালে, গলায়, বুকে—ঝরে পড়লো আমার চুম্বন—আকুল অজস্রতায় ঝরে পড়ে কদমফুলের রেণু, বৃষ্টিভেজা বাতাসে।

ওর লীলায়িত তনুদেহ নিষ্পেষিত হল আমার হাতের নির্মম পেষণে। ওর নারীদেহের সমস্ত সৌরভ আমি আকণ্ঠ পান করে নিতে চাইলুম একটি রাত্রিতেই।

নিমা আমাকে বাধা দিলো না।
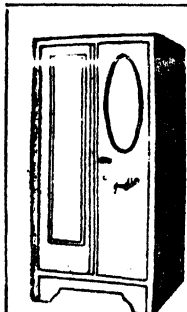
মনে হল, ও যেন বহুদিন থেকে এরই প্রতীক্ষা করেছিলো।

নিষ্পিষ্ট রজনীগন্ধার মত নিমার অর্ধ-মূর্ছিত দেহটা ফেলে রেখে আমি চলে গেলুম নিজের ঘরে।

ক্লান্ত, আচ্ছন্ন চেতনায় কখন যে গভীর ঘুম নামলো জানতেও পারলুম না।

পরদিন যখন ঘুম ভাঙলো, বেলা তখন প্রায় আটটা।

ভাগ্যক্রমে দিনটা রবিবার। অফিস যাবার তাড়া নেই।

বাথরুমে গিয়ে দেখলুম—গরম জল, সাবান, তোয়ালে রোজকার মতই সাজানো আছে যথারীতি।

মুখ-হাত ধুয়ে ঘরে আসতেই চা-খাবার নিয়ে এল নিমা।

কাল রাতে যা ঘটেছে, ও কি তার জন্যে অনুতপ্ত?

ওর মুখের ভাব থেকে সেটা অনুধাবন করতে চেষ্টা করলুম।

নাঃ, তা তো মনে হচ্ছে না।

বেশ শান্তভাবেই তো সাজিয়ে রাখছে ঘরের টুকিটাকি জিনিস, অন্যান্য দিনের মত।

আমার কিন্তু নিজেকে কেমন অপরাধী-অপরাধী মনে হচ্ছে।

আমি ওর কৌমার্য হরণ করেছি। দস্যুর মত ভোগ করেছি ওর দেহসম্ভার—যা ও আমার হাতে তুলে দিয়েছে গভীর ভালো-বাসার সঙ্গে। হ্যাঁ, ভালোবাসার সঙ্গে। শুধুমাত্র ক্ষণিক আসঙ্গলিপ্সায় নয়।

ও আরো বিশ্বাস করেছে যে—আমি ওকে ভালোবাসি।

ওর এ বিশ্বাস কি মিথ্যে?

না। মিথ্যে নয়।

আমি ওকে ভালোবাসি। সত্যিই বাসি।

তবে?

তবে কাল রাতে আমি যা করেছি, তারপর আমার কর্তব্য কি?

বিদ্যুৎচমকের মত একটা শব্দ জেগে উঠলো আমার বুকের মাঝখানে—

বিয়ে!

বিয়ে?

হ্যাঁ, বিয়ে।

বিয়ে ছাড়া আর কি পথ আছে? আমি যা করেছি তার ফলাফল বহুদূর পর্যন্ত যেতে পারে—বহুদূর।

কিন্তু এটা বিজ্ঞানের যুগ। যদি কিছু হয়, কিছু টাকা খরচ করলেই তো তার হাত থেকে পার পাওয়া যায়।

কিন্তু নিমা? সে কি রাজী হবে?

সে যদি রাজী না হয়?

সে কি ভাববে আমার সম্পর্কে? তার কাছ থেকে যে অকৃত্রিম ভালোবাসা আর শ্রদ্ধা পেয়েছি, তা কি হারাবো না এক মুহূর্তে?

সবচাইতে বড় কথা, ওকে সঙ্গে নিয়ে হোটেলে খাওয়া, বেড়ানো, সিনেমা-দেখা এসব করার ফলে এখানকার বাঙালী সমাজে তো আমার দুর্নাম যা রটবার তা রটেই গেছে। ওকে বিয়ে করলে আর সেটা এমন কিছু বাড়বে কি? আমার আড়ালে অফিসের লোকে আমাকে আর নিমাকে নিয়ে অনেক কিছুই আলোচনা করে, আমি জানি। ওর সঙ্গে আমি কোনো দৈহিক সম্পর্ক কালকের আগে পর্যন্ত করিনি। কিন্তু লোকে কি তাই ভাবে? ভাবে না। তবে?

সমাজের চোখ-রাঙানিকে আমি এতদিন ভয় করিনি। আজই বা করবো কেন? নিমাকে বিয়ে না করে যদি অন্যভাবে বাঁচতে চাই, তবে সেটা হবে কাপুরুষতা। এধরনের কাজ যারা করে তারা সমাজকে খুব বেশী মানে বলেই করে, মানুষকে মর্যাদা দেবার সাহস তাদের নেই।

যদি নিমার কিছু হয়, এখানকার বাঙালীরা না জানুক, পাহাড়ী সমাজের জানতে বাকী থাকবে না। তারা মনে করবে, সমতল থেকে অনেক বাবুলোক যেমন এখানে এসে ফূর্তি করে পাহাড়ী মেয়েদের নিয়ে, আমিও তেমনি করেছি। ঐ আমার পেশা, ঐ আমার চরিত্র!...

নানারকম এলোমেলো চিন্তা ভিড় করে আসছে মনের মধ্যে। ইচ্ছে করছে দূরে কোথাও পালিয়ে যাই, অনেক দূরে।

(ক্রমশঃ)
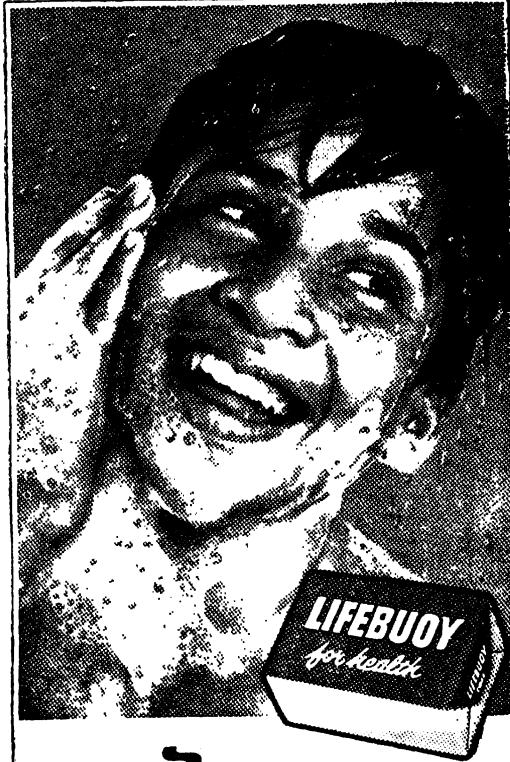
পুরাণ কাহিনী

পুরাণ কাহিনী ইতিহাস নয়, বা ধর্মকথাও তাকে বলা যায় না। তবু যে-কোন দেশের ইতিহাস ও ধর্মীয় চিন্তার সংগে পুরাণের অবিচ্ছেদ্য সম্পর্ক। তার সংগে যুক্ত হয়েছে কবির কল্পনা, কথকের পর্যাবৃত্ত চিন্তা ও যুগ-যুগান্তের বিচিত্র সংস্কার। প্রকৃতির নানা রূপও পুরাণ কাহিনীতে কম বৈচিত্র্য আনেনি। তবু আশ্চর্য হতে হয় পৃথিবীর নানা দেশের পুরাণ কাহিনীর অবিশ্বাস্য সাদৃশ্যে। মনে হয় একই কাহিনীর যেন কিছুটা রূপান্তর ঘটেছে স্থান কাল ও পাত্রের পরিবর্তনে।

মানব-সভ্যতার প্রথমযুগে, যখন এই বিশ্বচরাচরের কোন রহস্যজাল মানুষের কাছে উদ্ঘাটিত হয়নি তখন বিভিন্ন নৈসর্গিক পদার্থ ও শক্তিকে সে নানাভাবে ব্যাখ্যা বিশ্লেষণের চেষ্টা করত। যেমন, তারা হয়ত মনে করত, যা প্রতিদিন ঘটা তাদের কাম্য তা কিছুতেই ঘটবে না যদি না ঘটার অনুরূপ কাজ তারা করে! পূর্ব থেকে পশ্চিমে সূর্যের নিত্য-পরিক্রমা বন্ধ হয়ে যাবে যদি না একটি অগ্নিবলয় একইভাবে ঘোরানো হয়, শস্য ফলবে না মাটিতে, যদি না তার পূর্বে একটি পাত্রে সেই শস্যের বীজ অংকুরিত না করা হয়। ক্রমে ঐসব অনুষ্ঠানের সংগেই নানা ধর্মীয় ও লৌকিক আচরণ সংযুক্ত হয় ও তার সঙ্গে প্রচারিত হয় নানা কাহিনী। কবে কোন রাজা বা গোষ্ঠীপতি প্রথম কোন অনুষ্ঠানে প্রবর্তিত করে ধরিত্রীকে শস্যশ্যামলা করেন, কোন নৃপতির পূজায় তুষ্ট হয়ে বৃষ্টির দেবতা ধারাবর্ষণে তৃষ্ণার্ত পৃথিবীর তৃষ্ণা দূর করেন, কোন রক্ষাকর্তা সর্বনাশা রাক্ষসের বিরুদ্ধে সংগ্রাম করে সৃষ্টিকুল রক্ষা করেন, ইত্যাদি, ইত্যাদি। বিভিন্ন পূজা প্রথা ও ব্রতের প্রবর্তকরা পরে আবার এটাও উপলব্ধি করেন যে শুধু পালনের জয়গান গাইলেই অভীষ্ট-সিদ্ধ হয় না, লংঘনের ভয়াবহ পরিণতির কথাও প্রচার হওয়া দরকার। তাই বিপরীত কাহিনীও তৈরি হতে লাগল। কথকরা গেয়ে শোনাতে লাগল মন্ত্রমুগ্ধ শ্রোতৃমণ্ডলীকে কোন হতভাগ্য রাজা সামান্য কোন ভুলের জন্য কোন অশুভ-শক্তির অভিশাপে সর্বস্বান্ত হয়, বা কোন দুর্বুদ্ধি অবিবেচক নিজের অবিশ্বাসের খেসারত দিতে সব খুইয়ে পথের ভিখারী হয়। বলা বাহুল্য, পৃথিবীর সব দেশে সব পুরাণ কাহিনীই প্রচলিত হয়েছিল অশিক্ষিত অজ্ঞ ধর্মভীরু সাধারণ মানুষের মনে কতকগুলি বিশ্বাস দৃঢ়মূল করার উদ্দেশ্যে, এবং সে প্রয়াসে কাহিনীগুলির সাফল্য অনুল্লেখ্য নয়। সভ্যতার প্রথমযুগে সমাজের অনুশাসন ও যাবতীয় বিধি-নিষেধ সর্বজনগ্রাহ্য করার জন্য পুরাণ কাহিনীগুলির সবিশেষ প্রয়োজন ছিল। পরবর্তীকালে সমাজ-জীবনের বিবর্তনের সংগে সংগে কাহিনীগুলির গুরুত্ব হ্রাস পায়, কিন্তু মানুষের স্মৃতি থেকে সেগুলি মুছে যায় না। পরন্তু নানাদেশের নানা-কাহিনী ও কিংবদন্তীর প্রভাবে তা বিচিত্রতর রূপলাভ করে। গল্প উপন্যাসবর্ণিত আদিম বিশ্বের কথক প্রচারিত পুরাণ কাহিনীগুলিই ছিল সকল মানুষের কাছে সবচেয়ে বড় আকর্ষণ।

চার হাজার বছর আগে ব্যাবিলনে প্রচলিত কয়েকটি পুরাণ কাহিনীর লিখিত ও চিত্রিতরূপের সন্ধান পাওয়া গেছে তৎকালীন সম্রাট আসুরবানিপালের নিনেভে নগরীতে অবস্থিত গ্রন্থাগারে। প্রায় বিশ হাজার মৃৎলিপি সম্বলিত ঐ গ্রন্থাগারটির সন্ধান পাওয়া যায় ১৮৭৩ সালে। সাতটি মৃৎলিপিতে ধারাবাহিকভাবে লিখিত একটি কাহিনী 'সেভেন ট্যাবলেটস অফ ক্রিয়েশন' নামে পরিচিত। আশ্চর্য সাদৃশ্য রয়েছে ঐ কাহিনীটির সঙ্গে বাইবেলের প্রথম অধ্যায়ে সংকলিত হিব্রুদের পুরাণ কাহিনী "সেভেন ডেজ অফ ক্রিয়েশন'-এর।

"সেভেন ট্যাবলেটস অফ ক্রিয়েশন"-এ বর্ণিত কাহিনী হ'ল—ঘোটকীরূপিণী দানবী তিয়ামাত-এর উৎপীড়নে যখন স্বর্গ-মর্ত্য তোলপাড় এবং কোন দেবতা যখন তার সম্মুখীন হওয়ার সাহস পাচ্ছেন না, তখন পরবর্তীকালে দেবতাদের প্রধান ও ব্যাবিলনের আরাধ্যদেবতা মার্দুক বলেন, তিনি তিয়ামাতের সঙ্গে যুদ্ধ করতে প্রস্তুত আছেন যদি অবশ্য তাঁকে দেবতাদের প্রধান করা হয়। নিরুপায় দেবসভা সে প্রস্তাবে সম্মত হ'লে তিনি তখনই তীর-ধনুক, বর্শা ও বজ্র নিয়ে দানবীদলনে যাত্রা করেন। দেবপিতা ঈ মার্দুককে মন্ত্রঃপূত করে দেন ও দেবী ইশতার মার্দুকের অনুগমন করেন অস্ত্রবাহিকারূপে। সপ্ত-বায়ুও মার্দুকের সহায় হয়। দীর্ঘ-সংগ্রামে করে মার্দুক শেষ পর্যন্ত ঐ দানবীকে নিহত ও দ্বিখণ্ডিত করেন ও তার দেহের দুই-অংশ থেকে সৃষ্ট করেন স্বর্গ ও মর্ত্য। তারপর মার্দুক বিভিন্ন গ্রহ-উপগ্রহ সৃষ্টি ক'রে তাদের কক্ষপথ স্থির করে দেন। ঐ সময়েই মানুষ সৃষ্ট হয় এক ভগবানের রক্ত কাদায় মিশিয়ে। হিব্রু প্রচারিত সৃষ্টি-কাহিনীও দানব-দেবতা সংগ্রাম-ভিত্তিক এবং সে-কাহিনীরও শেষ কথা মানুষের সৃষ্টি। সেখানে মানুষ সৃষ্টি হয়েছে কাদা থেকে, তবে তার অপর উপাদান ব্যাবিলন কাহিনীর দেবরক্ত নয়, দেবতার নিঃশ্বাস। হিব্রু-ব্যাবিলনের সৃষ্টিকাহিনীর সঙ্গে আমাদের দেবাসুর সংগ্রাম, সাগরমন্থন, মহিষাসুর বধ কাহিনীগুলির আশ্চর্য সাদৃশ্য।

ব্যাবিলনের আর একটি বিখ্যাত পুরাণ-কাহিনী হ'ল বিশ্বপ্লাবন। মানুষের প্রতি রুষ্ট ভগবান এনলিল অপর ভগবান আনুকে প্ররোচিত করলেন প্লাবন দিয়ে বিশ্বচরাচর ভাসিয়ে দিতে। আনু সেই-মতো কাজ করলেন, কিন্তু জগত রক্ষা পেল মানবপ্রেমী ভগবান ঈর কল্যাণে। তিনি ধার্মিক উৎনাপিশতিমকে দিয়ে বিশ্বচরাচর রক্ষা করলেন। ঐ ধার্মিকের জাহাজে সবজাতের পশুপক্ষী ও মানুষ আশ্রয় পেয়ে রক্ষা পেল। এই কাহিনীর সঙ্গে বাইবেলের নোয়াকাহিনীর প্রায় সম্পূর্ণ সাদৃশ্য। সুমার, এসিরিয়া, ব্যাবিলন ও হিব্রু পুরাণে প্লাবন কাহিনী থাকার একমাত্র কারণ হল টাইগ্রিস ও ইউফ্রেটিস নদীর সর্বনাশা আচরণ, যা বারবার ঐ অঞ্চলের সভ্যতা ধ্বংস করেছে। উর ও কিশ নামক স্থানের ধ্বংসস্তূপ প্রমাণ করে, ইউফ্রেটিশ ও টাইগ্রিসের বন্যা বারবার কি ধ্বংসের প্লাবন বইয়েছে ঐ এলাকায়।

পুরাণ কাহিনীর উপর প্রকৃতির প্রভাব কতখানি তা বোঝা যায় মিশরের পুরাণ কাহিনীগুলি পর্যালোচনা করলে। সে দেশের পুরাণে প্লাবনের ধ্বংসলীলা নিয়ে কোন কাহিনী নেই। তার কারণ হ'ল মিশর সভ্যতার জন্মদাত্রী নীলনদী, যা কোন দিন রুদ্র হয়ে ইউফ্রেটিশ-টাইগ্রিসের মতো সভ্যতাকে ধ্বংস করেনি। মরুগ্রস্ত মিশরের জীবনদায়িনী নীলনদীর কল্যাণময়ী রূপই মিশরবাসীরা চিরদিন দেখেছে। মিশরের সব পুরাণ-কাহিনীর সংগেও তাই, নীলনদীর অবিচ্ছেদ্য সম্পর্ক। ওসাইরিসের মৃত্যু ও পুনর্জন্ম আসলে নীলনদীর শুষ্কতা ও প্লাবন। ওসাইরিসের মৃত্যুতিথি মিশরবাসীরা পালন করত নীলনদীর কাদায় তৈরী একটি পুতুলের গায়ে শস্যবীজ লাগিয়ে সেটিকে নীলনদীর জলে ফেলে দিয়ে। তারপর নীলনদীর প্লাবনে উর্বরা মিশরের কৃষিক্ষেত্র যখন শস্যপূর্ণ হয়ে উঠত তখনই শুরু হত ওসাইরিসের নবজীবন লাভের উৎসব।

প্রাচীন রোম ও গ্রীসের লোকেদের মধ্যে ভাষা ও জাতিগত সাদৃশ্য থাকলেও রোমের পুরাণ-কাহিনীর সংখ্যা গ্রীসের তুলনায় নগণ্য। তার কারণ রোমের তুলনায় গ্রীস অনেক বেশী এশিয়ার সমীপবর্তী। সেজন্য পশ্চিম এশিয়ার পুরাণ-কাহিনীগুলি বিশেষভাবে প্রভাবিত করেছে গ্রীসের পুরাণ সাহিত্যকে। প্রাচীন গ্রীস ছিল ন্যায় যুক্তির দেশ, তাই তার ভগবৎভক্তি তেমন গাঢ় হতে পারেনি। দেবলোক ও ইহলোক এক হয়ে গিয়েছিল গ্রীসের পুরাণকরাদের কাছে। স্বর্গের দেবতা জিউস শুধু যে মর্ত্যের দেবতা ছিলেন তাই নয়, মর্ত্যের নারীকে তিনি ভালবাসতেন যে-কোন মর্ত্যের প্রেমিকের মতো। তিনি পশুর ছদ্মবেশে ঘুরতেন, নিজ স্ত্রীর সঙ্গে কলহ করতেন এবং এমন বহু কাজই করতেন যেগুলি দেব চরিত্রের উপযোগী নয়। এদিক থেকে গ্রীক পুরাণ-কাহিনীর সঙ্গে আশ্চর্য সাদৃশ্য আছে ভারতীয় পুরাণ-কাহিনীর। ভারতে যুগে যুগে প্রচারিত পুরাণ-কাহিনীগুলিতে বিভিন্ন দেব-দেবীর আচরণ খুব কম ক্ষেত্রে দেবজনোচিত। তার কারণ ঐসব দেব-দেবী ছিলেন সমকালীন সমাজ ও রাষ্ট্রের বিভিন্ন শক্তির প্রতীক।

—পরিব্রাজক

দুই মুকুন্দ

(১৩)

মুকুন্দ দত্ত

মুকুন্দের জন্ম চট্টগ্রামে। জাতিতে বৈদ্য। প্রথমে নবদ্বীপ, পরে কাঞ্চনপল্লী বা কাঁচরাপাড়ায় এসে বাস করে।

আর গান গায়। কীর্তন করে। গানের চেয়ে পরতর আর কিছু নেই। কীর্তনই সাধন-ভজনের শ্রেষ্ঠ অঙ্গ। 'সর্ববৈষ্ণবের প্রিয় মুকুন্দ একান্ত। মুকুন্দের গানে দ্রবে সকল মহান্ত।।'

নিমাইয়ের সঙ্গে এক টোলে পড়ে মুকুন্দ। মুকুন্দের সঙ্গে নিমাইয়ের বেশি ভাব। মুকুন্দ যে গাইতে জানে।

মুকুন্দকে কাছে পেলেই নিমাই 'ফাঁকি' জিজ্ঞেস করে। বলো তো এটার কী মানে। মুকুন্দ যথাসাধ্য উত্তর দেয়।

হল না।

তুমি বললেই হল না?

কেন হল না বুঝিয়ে দিচ্ছি। নিমাই জলের মত করে বুঝিয়ে দেয়।

মুকুন্দ অবাক হয়ে তাকিয়ে থাকে! ভেবেছিল নিমাই ব্যাকরণের ছাত্র, অলঙ্কারের কী জানে। মুকুন্দ তাই অলঙ্কার দিয়ে ব্যাকরণকে চেয়েছিল ব্যাহত করতে। কিন্তু মুকুন্দ দেখল নিমাই অলঙ্কারেরও অলঙ্কার।

তুমি একটু কৃষ্ণকথা বলতে পার না? মুকুন্দ নিমাইকে তেড়ে আসে।

আমার দরকার কী। নিমাই হাসে। তোমার বলতে হয় তুমি বলো।

সেদিন মুকুন্দ গঙ্গাস্নানে যাচ্ছে, পথে নিমাইয়ের সঙ্গে দেখা।

দেখামাত্রই মুকুন্দ পালিয়ে গেল। ফাঁকির রাজা আবার কী ফাঁকি জিজ্ঞেস করে বিপদে ফেলে বলা যায় না।

ও আমাকে দেখে পালিয়ে গেল কেন বলতে পারো? গোবিন্দকে জিজ্ঞেস করলে নিমাই।

আর কোথাও হয়তো কাজ আছে।

কাজ না আরো-কিছু! আমার মুখে কেন কৃষ্ণকথা কৃষ্ণজিজ্ঞাসা নেই তাই ও আমাকে এড়িয়ে চলে। আচ্ছা আমিও দেখাব একদিন।

কী দেখাবে তা কে বলবে।

মুকুন্দ শুধু গানই গাইতে পারে না, গানে প্রাণ ঢালতে পারে। ঈশ্বরপুরী নবদ্বীপ এসেছে, উঠেছে অদ্বৈতের ঘরে। অদ্বৈত বললে, মুকুন্দ, একখানা গান গাও।

কৃষ্ণচরিতের গান ধরল মুকুন্দ। প্রাণে যত প্রেম আছে সব সুরে সঞ্চারিত করে দিল।

ঈশ্বরপুরী কাঁদতে লাগল। সর্বাঙ্গে জাগল প্রেমবিকার।

তখন সবাই চিনতে পারল ঈশ্বরপুরীকে। মুকুন্দের গানই তাকে চিনিয়ে দিল।

গয়া থেকে নিমাই যখন ফিরে এল মহাভক্তিযোগের প্রতিমূর্তি হয়ে, তখন শচীমাতার ঘরে মুকুন্দেরও ডাক পড়ল, দেখ, নিমাইকে চেন কিনা, দেখ তাকে পারো কিনা শান্ত করতে।

'নাহি জানি আসিয়াছে কোন্ মহাশয়।'

কোন কোন শ্লোক ভক্তিযোগসম্মত বেছে নিয়ে মুকুন্দ পড়তে লাগল। তার কন্ঠে উচ্চারিত শ্লোক শোনাল দিব্যধ্বনির মত।

হরিপ্রেমে উত্তাল হল নিমাই। 'ত্রাস হাস কম্প স্বেদ পুলক গর্জন। একেবারে সর্বভাব দিল দরশন।।'

নিমাইয়ে কীর্তন-প্রকাশ আরম্ভ হল। আর সে-কীর্তনে মূল গায়ক মুকুন্দ।

মুকুন্দই গদাধর পণ্ডিতকে নিয়ে গেল পুণ্ডরীকের কাছে। পুণ্ডরীক চট্টগ্রামের লোক, আগে থেকেই তাকে চিনত মুকুন্দ। বিষয়ীর আচ্ছাদনে পুণ্ডরীক তার মহা-বৈষ্ণবত্ব ঢেকে রেখেছে।

বাইরের বিলাসব্যসন দেখে গদাধরের মন যখন বিমুখ হতে চাইল তখন মুকুন্দই ভাগবতের একটি শ্লোক আবৃত্তি করে চিনিয়ে দিল পুণ্ডরীককে। 'মুকুন্দ সুস্বর বড়—কৃষ্ণের গায়ন।' যেই সেই কৃষ্ণকরুণার মহিমা বর্ণনা করল, যে করুণা রুধিরাশনা রাক্ষসী পুতনাকে পর্যন্ত সদ্গতি দেয়—পুণ্ডরীকের বাহ্যিক বিষয়-আবরণ নিমেষে অপসৃত হয়ে গেল। পুণ্ডরীক মাটিতে মূর্ছিত হয়ে কাঁদতে লাগল কাঙালের মত।

তারপর অনুতপ্ত গদাধর যখন তার চিত্তদোষের প্রায়শ্চিত্ত করতে চাইল তখন মুকুন্দই গদাধরের আবেদন জানাল পুণ্ডরীককে।

গদাধর আপনার কাছে মন্ত্রদীক্ষা চায়।

আমার এত ভাগ্য!—শিষ্য পেয়ে পুণ্ডরীকই যেন কৃতকৃতার্থ।

মহা-প্রকাশের সময় গৌরাঙ্গ সবাইকে ডেকে বর দিচ্ছেন, কিন্তু কী আশ্চর্য, মুকুন্দের ডাক নেই। যে তাঁর কীর্তন-সহচর তারই বেলায় কিনা তিনি নিরুচ্চার থাকবেন!

মুকুন্দের প্রতি প্রভুর কেন এই বৈমুখ্য কেউ বুঝতে পারছে না। মুকুন্দেরও সাহস নেই, বিনা ডাকে প্রভুর সামনে এসে দাঁড়ায়। শুধু অন্তরে দুঃখ নিয়ে দূরে দাঁড়িয়ে থাকে।

শ্রীবাসের আর সহ্য হল না। বললে, মুকুন্দের প্রতি তোমার এত বিরাগ কেন? সে কী করেছে? যার গান শুনে সকলের প্রাণ দ্রবীভূত হয় তার প্রতিই তুমি এত কঠিন? তার যদি কোনো অপরাধ হয়ে থাকে তাকে শাস্তি দাও, তাকে দূরে রেখে পরিহার করছ কেন?

মুকুন্দের কথা আমার কাছে কিছু বোলো না। প্রভু বিরক্ত হয়ে বললেন, ও কখনো দন্তে তৃণ ধরে, কখনো আবার আমাকে লাঠি মারে। ওর মুখও আমি দেখব না।

সে কী কথা! সবাই স্তম্ভিত হয়ে রইল।

প্রভু বললেন, ও যখন যে দলে যায় সেই দলের কথায় সায় দেয়। এদিকে ভক্তিযোগে নাচে গায়, ওদিকে আবার অদ্বৈতের কাছে গিয়ে যোগবাশিষ্ঠ পড়ে। আবার অন্য সম্প্রদায়ে গিয়ে তাদের মত কথা বলে। ভক্তিই যে সমস্ত এই সম্বন্ধে ওর যেন এখনো সংশয় আছে। ভক্তির চেয়েও বড় কিছু আছে বলে যে ব্যাখ্যা করে সে আমাকে লাঠি মারে না তো কী। যাও, তাকে বলো, তার ভক্তিস্থানে অপরাধ হয়েছে তাই সে আমার দর্শন পাবে না।

বাইরে থেকে সব শুনতে পেল মুকুন্দ। ঠিক করল এই অপরাধী শরীর আজ রাতেই শেষ করে দেব।

শুধু একটি কথা। শ্রীবাসকে ধরল মুকুন্দ। প্রভুকে গিয়ে জিজ্ঞেস করো, কখনো কোনোদিন কি তাঁর দর্শন পাব?

প্রভু বললেন, কোটি জন্মের পরে পাবে।

কোটি জন্ম! তার হিসেব করতে গেল না মুকুন্দ। পাবে—শুধু এই আনন্দেই সে নৃত্য করতে লাগল।

পাব, পাব, আমিও পাব। একদিন না একদিন তো পাব। নিশ্চয় পাব। কোটি-জন্মের কথা কে ভাবে। কোটি জন্মের পরেও তো হবে আমার নিশ্চয়-প্রাপ্তি।

সে কী আনন্দ মুকুন্দের।

শ্রীবাস, মুকুন্দকে আমার কাছে নিয়ে এস।
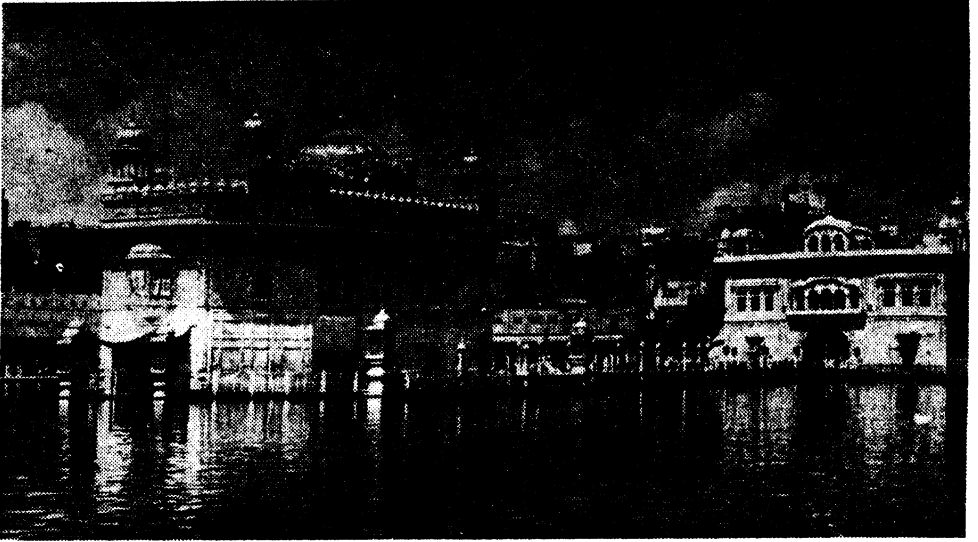
স্বর্ণমন্দির (অমৃতসর) ফটো : মানসরঞ্জন কুন্ডুচৌধুরী

দণ্ডই প্রসাদ হয়ে দেখা দিল।

মুকুন্দ কাছে এসে দাঁড়াতেই প্রভু বললেন, মুকুন্দ, আমি কোটি জন্মের কথা বলেছিলাম, তুমি তিলার্ধ সময়ে তা পার করে দিলে। আমার বাক্য যে অব্যর্থ তোমার এই বিশ্বাসই তোমাকে জয়ী করল।

মুকুন্দ প্রভুর চরণে পড়ে কাঁদতে লাগল।

ওঠো। তুমি আমার গায়ক। প্রভু তাকে তুলে নিলেন। তোমার আর বিন্দুমাত্র অপরাধ নেই। তোমার শরীর ভক্তময়, তোমার জিভেই আমার অধিষ্ঠান।

মুকুন্দ শোক করতে লাগল। তোমাকে শুধু দেখেই বা কী হবে? যদি অন্তরে ভক্তি না থাকে তবে তোমাকে তুমি বলে চিনব কী করে? তোমার বিশ্বরূপ তো দুর্যোধনও দেখেছিল কিন্তু তোমাকে চিনল কই? ভ্রান্ত দর্শনে সবংশে মারা গেল। আমি পাপিষ্ঠ, আমার অবিমিশ্র ভক্তি ছিল না, তবু তুমি, অনাথের নাথ, আমাকে কৃপা করলে।

প্রভু বললেন, তোমাকে আমি পরিপূর্ণ ভক্তি দেব। সর্বাগ্রে দেব তোমার কণ্ঠস্বরে। যখন যেখানে তুমি গান গাইবে সেখানে আমি অবতরণ করব। যখন আমি অবতরণ করব, সেখানে তুমি আমার গায়ক হবে।

মুকুন্দের ভক্তি মোর বড় প্রিয়ংকরী।
যথা গাও তুমি তথা আমি অবতরি ।।
যেখানে যখন হয় মোর অবতার।
তথায় গায়ন তুমি হইবে আমার ।।

ভক্তবৃন্দ নিয়ে গৌরাঙ্গ যখন নাট্যমঞ্চে অবতীর্ণ হলেন, মুকুন্দ কীর্তন দিয়ে শুভারম্ভ করল।

গৌরাঙ্গের আনন্দলোকের দ্বারপাল মুকুন্দ। মুকুন্দ গান গেয়ে দ্বার খুলে দিয়েছে আনন্দের অভিষেক।

প্রভুর সন্ন্যাসগ্রহণের সময়েও মুকুন্দের কীর্তন। সমস্ত বিহিত কার্যের সম্পাদনায়ও মুকুন্দ। রাত্রে আবার মুকুন্দকেই আদেশ করলেন কীর্তন করতে। আর সেই কীর্তনের মধ্যেই গৌরহরি কেশব ভারতীকে আলিঙ্গন করলেন, যার ফলে কেশব ভারতীতে ভক্তির জাগরণ হল।

পরদিন ভাবাবেশে গৌরাঙ্গ যখন পথে বেরুলেন, ভক্তদলও সঙ্গ নিল। কিন্তু মুকুন্দের দায়িত্বই কঠিনতম। সারা পথ একটানা তাকেই গাইতে হল কীর্তন। আবার নীলাচলের পথে মুকুন্দই গৌরাঙ্গের সঙ্গী। কীর্তনে প্রভুর ভাবকে কখনো উত্তাল করে কখনো বা সংহত করে রাখে। কখনো বিষাদ আনে, কখনো বা অমর্ষ। কখনো চাপল্য জাগায় কখনো বা দৈন্যে অভিভূত করে দেয়।

অদ্বৈতের ঘরে মুকুন্দই তো সেই করুণ কীর্তন গাইল। 'হা-হা প্রাণপ্রিয় সখি কিনা হৈল মোরে, কানুপ্রেমবিষে মোর তনু-মন জরে। রাত্রি-দিনে পোড়ে মন, সোয়াস্তি ন পাও, যাঁহা গেলে কানু পাও তাহা উড়ি যাও ।।'

ভাবের প্রহারে জর্জর হলেন প্রভু, যত ভাবসৈন্য আছে, নির্বেদ বিষাদ রোষ অমর্ষ ঔৎসুক্য চাপল্য গর্ব আর দৈন্য, যুদ্ধ করতে এল প্রভুর সঙ্গে। কখনো বা ভাবে-ভাবে মহারণ উপস্থিত হল। সমস্তর মূলে ঐ মুকুন্দের কীর্তন।

গোপীনাথ আচার্যের সঙ্গে মুকুন্দের নবদ্বীপেই পরিচয় ছিল। নীলাচলে মন্দিরের সিংহদ্বারে দেখা হতেই চমকে উঠল গোপীনাথ। একি, তুমি এখানে?

আমরা প্রভুর সঙ্গে এসেছি। বললে মুকুন্দ।

প্রভু! প্রভু কোথায়?

তিনি পথের মধ্যে আমাদের ছেড়ে একাই চলে এসেছেন। এখন লোকমুখে শুনতে পাচ্ছি, সার্বভৌম তাঁকে মন্দির থেকে কুড়িয়ে তাঁর বাড়িতে নিয়ে গিয়েছেন। আমরা এখন সেই সার্বভৌমের বাড়ি খুঁজছি।

গোপীনাথ সার্বভৌমের ভগ্নীপতি। বললে, আমি তোমাদের নিয়ে যাচ্ছি সেখানে। কিন্তু আমি ভাবছি—

গোপীনাথ বুঝি জগন্নাথ দর্শনের কথা বলতে চাইছে।

না, না, আগে আমাদের প্রভুর কাছে নিয়ে চলো। আগে প্রভুকে দেখে পরে আমরা জগন্নাথকে দেখব।

আমি সেকথা বলছি না। আমি ভাবছি সার্বভৌমকে কৃপা করবার জন্যেই বুঝি প্রভু দলছাড়া হয়ে একা চলে এলেন মন্দিরে। তোমরা সবাই সঙ্গে থাকলে এই একান্ত-দর্শন হত না। চলো দেখিগে কী হচ্ছে।

শেষ পর্যন্ত সার্বভৌমের অভিমানের খণ্ডন হল। প্রভুর দুটি বন্দনাশ্লোক লিখে জগদানন্দের হাতে দিয়ে বললে, প্রভুকে দিও।

জগদানন্দ শ্লোকদুটি পড়তে দিল মুকুন্দকে।

মুকুন্দ পড়েই বুঝল এই শ্লোকপত্র প্রভু ছিঁড়ে ফেলে দেবেন, আত্মস্তুতি সহ্য করতে পারবেন না। কিন্তু শ্লোকদুটি যে ভারি সুন্দর, ভক্তকণ্ঠের রত্ন-হার। মুকুন্দ তাড়াতাড়ি ঘরের বাইরের দেয়ালে শ্লোক-দুটি লিখে রাখল।

বৈরাগ্য-বিদ্যা ও ভক্তিযোগ শিক্ষা দেবার জন্যে যে করুণাসিন্ধু পুরাণ-পুরুষ শ্রীকৃষ্ণ-চৈতন্য শরীর ধারণ করেছেন আমি তাঁর শরণ নিই। কালপ্রভাবে বিনষ্ট-প্রায় ভক্তি-যোগকে পুনরুজ্জীবিত করতে যিনি শ্রীকৃষ্ণ-চৈতন্য নামে আবির্ভূত হয়েছেন তাঁর চরণ-পদ্মে আমার চিত্তভৃঙ্গ প্রগাঢ়রূপে আসক্ত হোক।

যা ভেবেছিল মুকুন্দ, প্রভু সেই শ্লোক-পত্র ছিঁড়ে ফেললেন।

কিন্তু মুকুন্দের কৃতিত্বে শ্লোকদুটি লুপ্ত হতে পেল না। ভক্তদের কন্ঠে-কন্ঠে ধ্বনিত হতে লাগল। গাঢ়ং গাঢ়ং লীয়তাং চিত্তভৃঙ্গঃ।

ব্রহ্মানন্দ ভারতী এসেছে। মুকুন্দ প্রভুকে বললে, তোমার সঙ্গে দেখা করতে চায়।

ব্রহ্মানন্দ ঈশ্বরপুরীর গুরুভাই। সে সম্পর্কে গৌরাঙ্গের গুরুস্থানীয়।

তাঁকে এখানে আসতে হবে না, আমিই তাঁর কাছে যাব। চলো তুমিও সঙ্গে চলো। মুকুন্দ প্রভুকে ব্রহ্মানন্দের কাছে নিয়ে এল।

ব্রহ্মানন্দ মৃগচর্ম পরে আছেন।

প্রভু শুধোলেন, ভারতী গোঁসাই কই?

মুকুন্দ বললে, এই তো তোমার সামনে বসে আছেন।

এতো অন্য লোক। ভারতী গোঁসাই চর্ম পরবেন কেন? তুমি আমাকে ভুল জায়গায় নিয়ে এসেছ। চলো কোথায় ভারতী গোঁসাই?

ব্রহ্মানন্দ প্রভুর কথার তাৎপর্য মুহূর্তে বুঝে নিল। চর্মাম্বর দম্ভের পরিচায়ক। দেখ আমি কতবড় সন্ন্যাসী, আমি বস্ত্রের বিলাসিতাকেও প্রশ্রয় দিই না। আমি পশু-চর্মেই আবৃত থাকি।

প্রভু, তুমি ঠিক বলেছ। ব্রহ্মানন্দ অনু-তপ্ত স্বরে বললে, যে অভিমানী সে ভক্তি-হীন। দম্ভের কাছে ভগবান নেই। আমি আজ থেকেই চর্মাম্বর ত্যাগ করব।

প্রভু বহির্বাস আনিয়ে দিলেন। চর্ম ছেড়ে ব্রহ্মানন্দ বসন পরল।

নীলাচলে প্রায় প্রতি বছরেই আসে মুকুন্দ, চার মাস করে থেকে যায়। গানে-কীর্তনে মাতিয়ে রাখে।

কিন্তু প্রভুর সন্ন্যাসক্লেশ দেখে মুকুন্দের কষ্ট। আবার মুকুন্দের কষ্টে প্রভুর বেদনা।

অন্তরে দুঃখী মুকুন্দ—নাহি কহে মুখে
ইহার দুঃখ দেখি আমার দ্বিগুণ হয় দুঃখে।

বলছেন প্রভু, হরিদাস ঠাকুরের কৃপায় আমি নামের মহিমা শিখেছি আর আমার কৃষ্ণভক্তি জেগেছে গৌড়ীয় ভক্তদের কৃষ্ণনাম প্রচারে। আর সেই প্রচারের প্রধান পুরোহিত মুকুন্দ।

মুকুন্দ শব্দের অর্থই তো প্রেমদাতা। এমন প্রেম যা মুক্তিকে পর্যন্ত তুচ্ছ করে। সেই প্রেমদাতা কে? শ্রীকৃষ্ণই সেই প্রেমদাতা। তাই শ্রীকৃষ্ণেরই আরেক নাম মুকুন্দ।

(১৪)

মুকুন্দদাস

মুকুন্দ দাসের বাড়ি শ্রীখণ্ডে, জাতিতে বৈদ্য। নরহরি সরকারের বড় ভাই। রঘু-নন্দনের পিতা।

ব্যবসায়ে রাজবৈদ্য। গৌড়েশ্বর নবাবের চিকিৎসা করে।

তার অন্তরে যে কৃষ্ণপ্রেম সে খবর কে রাখে?

নবাবের ঘরে উচ্চমঞ্চে বসে মুকুন্দ নবাবের সঙ্গে চিকিৎসাবিষয়ে কথাবার্তা বলছে, নবাবের ভৃত্য পাখা নিয়ে এল নবাবের মাথায় বাতাস করতে। মুকুন্দ দেখল সেই পাখায় ময়ূরপুচ্ছ।

চকিতে প্রেমাবেশ হল মুকুন্দের। জাগল কৃষ্ণস্মৃতি। কৃষ্ণ-উদ্দীপন।

মুকুন্দ মূর্ছিত হয়ে পড়ে গেল মাটিতে।

নবাবের ভয় হল রাজবৈদ্য মারা গেল বোধহয়। তাড়াতাড়ি মঞ্চ হতে নেমে এসে সেই সেবাযত্ন করে সচেতন করল মুকুন্দকে।

কোথায় ব্যথা পেলে? জিজ্ঞেস করল নবাব।

না, না, তেমন কিছু ব্যথা পাইনি। সামান্যই লেগেছে।

কিন্তু তুমি পড়লে কেন?

মুকুন্দ আত্মগোপন করল। বললে, আমার মৃগী রোগ আছে। তাই এরকম হয় মাঝে মাঝে। ও কিছু নয়।

কিন্তু নবাব জানে মৃগী রোগের লক্ষণ কী! কৃষ্ণ-উদ্দীপন মৃগী রোগ নয়। মুকুন্দ যে সাধন-সিদ্ধ মহাপুরুষ এ বুঝে নিতে তার দেরি হল না। তারই জন্যে তো তার আত্মগোপন।

'আপন ভজন-কথা, না বলিবে যথা-তথা, ইহাতে হইবে সাবধান।' কিংবা—
'অন্য বোল গন্ডগোল, না শুনহ উতরোল,
রাখ প্রেম হৃদয়ে ভরিয়া।'

মুকুন্দের বাড়ির পুকুরপারে কদম গাছ। সে গাছ সারা বছর ফুলে ভরে থাকে। মুকুন্দের যে ইচ্ছে কদম ফুল দিয়ে প্রত্যহ কৃষ্ণবিগ্রহের কর্ণভূষণ তৈরি করি। ভক্ত-বাঞ্ছা-কল্পতরু কৃষ্ণ মুকুন্দের জন্যে নিত্য-পুষ্পিত কদম্ব-তরু হয়েছেন।

মুকুন্দ গৌরাঙ্গকে জিজ্ঞেস করলে, প্রভু আমার কাজ কী?

প্রভু বললেন, তোমার কাজ ধর্মে ধন-উপার্জন। ধর্মপথে থেকে ধর্মকে রক্ষা করে ধন-উপার্জন।

ছোটভাই নরহরি জিজ্ঞেস করলে, আমার কী কাজ?

প্রভু বললেন, তোমার কাজ আমার ভক্ত-সঙ্গে থেকে কৃষ্ণ-কথার আলোচনা করা।

আমার কী কাজ? জিজ্ঞেস করল রঘু-নন্দন, মুকুন্দের ছেলে।

তোমার কাজ কৃষ্ণসেবা। কৃষ্ণসেবা ছাড়া তোমার মন যে আর কোথাও বসে না। তাই তুমি কৃষ্ণকে নিয়েই থাকো।

রঘুনন্দনের আনন্দ তখন দেখে কে।

প্রভু মুকুন্দকে জিজ্ঞেস করলেন, 'মুকুন্দ, তুমি বাপ, রঘুনন্দন ছেলে, না রঘুনন্দন বাপ তুমি ছেলে?

মুকুন্দ বললে, রঘুনন্দন বাপ আমি ছেলে। রঘুনন্দনের থেকেই আমার কৃষ্ণভক্তি জন্মেছে, সুতরাং রঘুনন্দনই আমার পিতা, আমার গুরু।

তুমি ঠিক বলেছ। তোমার আগে রঘু-নন্দনের কৃষ্ণভক্তি জন্মেছে, সুতরাং ভাগবত-জীবনে সে তোমার পূর্ববর্তী। তোমার ভাগবত-জন্মদাতা। সুতরাং নিঃসন্দেহে রঘুনন্দনই তোমার পিতা, সত্যিকারের পালনকর্তা।

ভক্তকথা বলতে ভক্তের মহিমা বর্ণনা করতে গৌরাঙ্গ পঞ্চমুখ।

আর, মুকুন্দের প্রেম, ভক্তদের বলছেন গৌরহরি, যেন তপ্তকাঞ্চন। যেমন নির্মল তেমনি নিগূঢ়।

(ক্রমশঃ)

কবি অতুলপ্রসাদের জীবনী

কল্যাণকুমার বসু

(পূর্ব প্রকাশিতের পর)

আর একটি আমাদের প্রধান প্রয়োজন ও কর্তব্য বাংলার বাইরের বাংলা-সাহিত্যের ও ভাষার প্রচার। আমাকে যদি কেহ জিজ্ঞাসা করে তোমাদের বাঙালীজাতির সবথেকে গর্বের বিষয় কি? আমি তৎক্ষণাৎ কোন দ্বিধা না করে উত্তর দিই আমাদের ভাষা। আমার নিজের গানের কথায় বলবো, 'মোদের গরব মোদের আশা আমারি বাংলাভাষা'। ভারতের সমস্ত সাহিত্যের মধ্যে বাংলা-সাহিত্য যে সর্বোচ্চ স্থান অধিকার করেছে, তা অস্বীকার করার উপায় নেই। কি করে করবে। জগৎ যে সে-কথা স্বীকার করে বসে আছে। আজও জগতের নানা দেশ বাংলা-সাহিত্য-সম্রাট রবীন্দ্রনাথকে সম্মানের মুকুট পরাবার জন্যে লালায়িত। তারপর আমাদের শরৎচন্দ্র অকস্মাৎ এসে ভারতের সাহিত্যসভার প্রথম পংক্তিতে আসন গ্রহণ করেছেন। সকলেই বলেছেন, এ-আসন তাঁরই প্রাপ্য। ভারতের অন্যসব কথা সাহিত্যে শরৎচন্দ্রের উপন্যাস ও গল্পে অনুবাদ করে কৃতার্থ হচ্ছে। এপ্রসঙ্গে একটা পুরোনো কথা মনে হল। তখন আমি পাঠ্যাবস্থায় বিলেতে ছিলাম। ১৮৯০ সনের কথা। ছেলেবেলা থেকেই আমার বাংলা-সাহিত্যে একটু অনুরাগ ছিল। লণ্ডনে বৃটিশ মিউজিয়ামে লাইব্রেরী জগৎ-বিখ্যাত পুস্তকশালা। অতবড় লাইব্রেরী বোধহয় জগতে একটাই আছে। সেখানে আমি মাঝে মাঝে অবসরে পড়তে যেতাম। লাইব্রেরীর ক্যাটলগগুলির মধ্যে দেখি একটি বাংলা বইয়ের ক্যাটলগ। তাতে একটি জিনিস দেখে আমার বড় গর্ব হল। বাংলায় যত পুস্তক ছাপা হয়েছে এবং জগতের যে যে ভাষায় বাংলা পুস্তকের তর্জমা হয়েছে, তার তালিকাও তাতে দেখলাম। বঙ্কিমচন্দ্রের উপন্যাসের তর্জমা ভারতীয় ও ইউরোপীয় ভাষায় তর্জমা হয়েছে। 'কপালকুণ্ডলা'র তর্জমা করেছিলেন Mr. NAD Phillips I.C.S এবং সেই ইংরাজি তর্জমা থেকে জার্মান এবং অন্যান্য ইউরোপীয় ভাষায় কপালকুণ্ডলার অনুদিত হয়েছে। যেদিন থেকে বৃটিশ মিউজিয়ামে জিনিসটি আবিষ্কার করলাম, সেদিন থেকে মাতৃ-সাহিত্যের প্রতি অনুরাগ দশগুণ বেড়ে গেল। তারপর রবীন্দ্রনাথের ত কথাই নেই। যদি আপনারা কখনো বোলপুর যান, সেখানকার লাইব্রেরীতে দেখতে পাবেন জগতের এমন ভাষা নেই যে ভাষায় রবীন্দ্র-নাথের রচনাবলী অনুদিত হয়নি। দেখলে গর্বে বক্ষ স্ফীত হয়। এমন যে আমাদের ভাষা আমাদের প্রকৃষ্ট সম্পদ তা আমরা বঙ্গের বাইরের বাঙালীরা কি সম্ভোগ করবো না? না করলে যে পাপ হবে। তাই বলি, এদেশীয় বাঙালী ভাই-বোনেরা এদেশেও মাতৃভাষায় পূজা সমারোহ কর। এ পূজায় আমাদের যে শুধু আনন্দ এ-বিষয় আমাদের দায়িত্বও আছে। বাঙালী ছোট ছোট মেয়েরা যখন বাঙালী অলংকারের সংগে সামঞ্জস্য করে ওদেশীয় অলংকারও পরে, বড় মধুর দেখায়। তেমনি আমরাও এ দেশীয় সাহিত্যের ভূষণ ভাণ্ডার থেকে রত্ন সংগ্রহ করে বাঙলা সাহিত্য-সুন্দরীকে নতুন ভূষণে সজ্জিত করতে পারি। এদিকে আমাদের দৃষ্টি রাখা কর্তব্য। এক সময়ে বাঙলা-দেশে কোন কোন সাহিত্যিকেরা ফারসী সাহিত্যে বিশেষ আগ্রহী ছিলেন এবং তাঁরা ফারসী সাহিত্যের সাহায্যে বাঙলা ভাষার সৌষ্ঠব বৃদ্ধি করেন। ঈশ্বরচন্দ্রের কবিতায় পারস্য কবিতার অনুবাদ যথেষ্ট পাওয়া যায়। হাফিজের অনেক কবিতা তিনি অনুবাদ করেছেন অথবা তা অবলম্বন করে কবিতা লিখেছেন। 'কাঁটা হেরী ক্ষান্ত কেন কমল তুলিতে, দুঃখ বিনা সুখলাভ হয় কি মহীতে' ওটি তর্জমা অথচ একথা দুটি সকল বাঙালীর কণ্ঠেই শুনতে পাওয়া যায়। অনেকেই জানেন বৈষ্ণব পদাবলী বাংলা সাহিত্যের নতুন সম্পদ। চণ্ডীদাস, জ্ঞানদাস; বিদ্যাপতির পদাবলী হিন্দী। ব্রজভাষা বাঙালীর ভাষা না হয়েও বাংলা ভাষায় স্থান করে নিয়েছে। আমরা যারা বাঙলার বাইরে থাকি, আমাদের কর্তব্য হিন্দী, উর্দু, ফারসি, গুরমুখি ইত্যাদি ভাষার উদ্যান থেকে মধু আহরণ করে আমাদের বাংলা সাহিত্যকে আরো মধুময় করা। এই দায়িত্বর দিকে আপনা-দের দৃষ্টি আকর্ষণ করছি।

সাহিত্য সম্বন্ধে আরও দু'একটি কথা বলা আবশ্যক মনে করি। প্রবাসী সাহিত্য-সেবী বাঙালীদের প্রতি আমার দু' একটি নিবেদন আছে। অতি স্নেহ সহকারে ও শুভ অভিপ্রায়ে আপনাদের কাছে সে নিবেদন জানাচ্ছি। যদি কারও মনঃপুত না হয় তাহলে আমায় মার্জনা করবেন। যে নিবেদন করছি সাহিত্য-সেবীরা সেদিকে মনোনিবেশ করলে সুখী হবো। আমার মতে সাহিত্যের উপকরণ সাধারণতঃ তিনটি। ভাব, ভাষা ও ভঙ্গি—

ভাব

যদি আমি ভাবের নিয়মমত্ততার পক্ষপাতি তথাপি আমি কখনও বলি না যে কতগুলি হিতোপদেশই সাহিত্যের একমাত্র লক্ষ্য। বর্তমান বাঙলা সাহিত্যে দু'একটা জিনিস দেখে একটু দুঃখিত ও শঙ্কিত হই। কয়েকটি আবর্জনা আমাদের সাহিত্য সম্পদকে কিঞ্চিত মলিন করে তুলছে। কোন কোন লেখা অশ্লীলতার দোষে দুষ্ট। আর্টের দোহাই দিয়ে, বাস্তবতার দোহাই দিয়ে সাহিত্যে অশ্লীল-তার প্রচলন ও প্রচার করলে অন্যায় করা হবে। উদীয়মান সাহিত্যিকেরা এ বিষয়ে একটু সতর্ক হবেন। বাস্তবতাকে বর্জন করলে সাহিত্য চলে না, একথা স্বভাব-সিদ্ধ। বঙ্কিমচন্দ্র, রবীন্দ্রনাথ, শরৎচন্দ্র কেউই বাস্তবতাকে উপেক্ষা করেন নাই। সত্যের ওপর সাহিত্যের আসন। তবে সব মলিন সত্য বা কুৎসিত বাস্তবতাই সাহিত্যের আধার নয়। কতগুলি বাস্তবতা সুসাহিত্যে বর্জনীয়। কেননা সাহিত্যের আশ্রয় শুধু সত্য নয়, শিব ও সুন্দরও সাহিত্যের আশ্রয়। যে সাহিত্য অ-শিব, অ-সুন্দর সে সাহিত্যে যত বাস্তবতা থাক না কেন তা পরিত্যাজ্য।

বর্তমান বঙ্গ সাহিত্যে আর একটি ত্রুটি কখোনো কখোনো লক্ষিত হয়, সেটি হচ্ছে ভাবের অস্পষ্টতা। ভাবের অস্পষ্টতার সংগে ভাষারও অস্পষ্টতা দেখতে পাই। সাহিত্য যদি এত দুরোধ-গম্য হয় যে তার অর্থ বুঝবার চেষ্টা পদে পদে প্রতিহত হয়, তাহলে সাহিত্য শুধু একটা সমস্যাতে দাঁড়ায়। সাহিত্যের লক্ষ বোধহয় তা নয়। অবশ্য এ দলের লেখকেরা হয়ত বলবেন এ পাঠকদের বুঝবার ক্ষমতার অভাব, লেখকের লেখার দোষ নয়। কোন কোন স্থানে হয়তো একথা সত্য, কিন্তু আমার মনে হয় না যে একথা সম্পূর্ণ সত্য। কোন কোন স্থলে লেখকেরা হয়তো নিজেরাই হৃদয়ংগম করতে পারেন না কি লিখছেন। তাঁদের কাছে না বুঝতে পারা অথবা না বোঝাতে পারায়ও একটা আনন্দ আছে। সেই আনন্দে তাঁরা বিভোর। মাঝে মাঝে দেখতে পাই ভাব যখন খুব প্রচ্ছন্ন ও আচ্ছন্ন ভাষায় আড়ম্বর ও সাজসজ্জা তত বেশী। ভাষায় আচ্ছাদন ও আলোড়ন এত বেশী যে ভাবের শুভ-দৃষ্টির পথ রুদ্ধ হয়ে থাকে। সাহিত্যের উদ্দেশ্য পুরাতনকে নূতন করে দেখানো। যে নূতন ভাব-সৌন্দর্য পূর্বে চোখে পড়ে নাই, তা চোখের সামনে মনের সামনে ধরা, কিন্তু দেখতে পারা চাই। লেখক যদি শুধু নিজেই বুঝলেন বা না বুঝলেন আর কেউ না বুঝুন, তবে লেখার সার্থকতা কি। আমাদের নবীন লেখকদের এই বিষয়ে একটু সতর্ক হতে অনুরোধ করি? কালিদাস বলে গেছেন বাক্য এবং অর্থ দুয়ের সমাবেশ হলে তবে হর-পার্বতীর মিলন হয়। সাহিত্য সম্বন্ধেও তাই।

ভাষা

সাহিত্যের ভাষা সম্বন্ধে মতামত প্রকাশ করা বড় কঠিন। এ বিষয়ে গোঁড়ামি করা ধৃষ্টতা। সাহিত্যের ভাষা কিরূপ হওয়া উচিত সে সম্বন্ধে মতভেদ থাকবেই। ভাষার বৈচিত্র্য অবশ্যম্ভাবী ও বাঞ্ছনীয়। ইহা লেখকের রুচি, শিক্ষা ও অভ্যাসের ওপর নির্ভর করে। আমি নিজে যদিও সরল ও

সুপাঠ্য ভাষার পক্ষপাতি তবু আমি মার্জিত ও সংস্কৃতঘেঁষা খুব সম্ভোগ করি। কাঁচা বয়েসে রবীন্দ্রনাথ মাইকেল মধুসূদন দত্তের ভাষায় বিদ্রূপার্থক সমালোচনা করেছিলেন, কিন্তু তারপরে তিনি সমালোচনায় ভ্রম নিজে স্বীকার করেছিলেন। যে ভাষা শ্রুতিমধুর, যে ভাষা ভাবকে সুন্দরভাবে প্রকাশ করতে পারে—যে ভাষা নিতান্ত আড়ষ্ট বা অস্পষ্ট নয় সে সাহিত্যের সমীচীন ভাষা। আমি নিজে সরল ভাষার পক্ষপাতী কিন্তু তরল ভাষার বিরোধী। আধুনিক সাহিত্যেও কখনও কখনও তরলতা লক্ষ করি। আমি নিজে লিখিত ভাষায় প্রাদেশিকতার আতিশয্য অপছন্দ করি। কলকাতার ভাষা যদিও সাহিত্যের ভাষা হয়ে দাঁড়িয়েছে তবু তারও আতিশয্য নিরাপদ নয়। ধরুন যদি চট্টগ্রামবাসী কিম্বা শ্রীহট্টবাসী বা বঙ্গের অন্যান্য স্থানের সাহিত্যিকেরা জেদ ধরেন তাঁদের স্থানীয় ভাষাও বাঙলা সাহিত্যে চালাতে হবে তাহলে বাংলা সাহিত্যের কি দুর্দশা হবে বুঝতেই পারেন। মনে রাখতে হবে বাংলা সাহিত্য সমস্ত বাংলার সাহিত্য। বাঙালী যে যেখানে আছেন তাঁদের সাহিত্য। বড়ই গৌরবের বিষয় আমাদের বাঙালী মুসলমান ভাইদের মধ্যে অনেক সুসাহিত্যিকের আবির্ভাব হয়েছে। অনেক স্থানেই তাঁদের বাংলা ভাষা বড় মনোরম। আমি তাঁদের রচনা খুব আগ্রহের সঙ্গে পাঠ করি। তাঁরা অনেকেই সাহিত্যের উচ্চস্থান অধিকার করেছেন। তাঁরা বাঙালী তাই তাঁদের ভাষাও বাংলা। আমি অন্তরের সহিত কামনা করি হিন্দু-মুসলমান সাহিত্যিকদের ভাষায় যেন কোনরূপ প্রকট পার্থক্য না এসে পড়ে। উভয়ের আদর্শের আদান-প্রদানে যেন বাংলা সাহিত্যের সৌষ্ঠব বৃদ্ধি পায়।

ভঙ্গী

ভাষার ভঙ্গী অর্থাৎ স্টাইল, সাহিত্য-কলার এক প্রধান অঙ্গ। লেখকের ভাষার ভঙ্গীর ওপর তাঁর রচনার সম্মোহনতা অনেকটা নির্ভর করে। রচনার ভাব ও ভাষা যতই গুরুগম্ভীর হোক না কেন যদি তার প্রকাশভঙ্গী মনোরম না হয় তাহলে সাহিত্য হিসেবে সে রচনা পঙ্গু। রচনাভঙ্গীর কোন বাঁধাধরা নিয়ম নেই। ভঙ্গীর বৈচিত্র্য সাহিত্যের ঐশ্বর্য। বড় বড় সাহিত্যিক যাঁরা, তাঁদের রচনাভঙ্গী মনোহারী ও স্বতন্ত্র। যুগ হিসেবে হয়ত সাহিত্যের স্টাইলের অনেকটা ঐক্য ও সাম্য লক্ষ্য করা যায়, যেমন বৈষ্ণব কবিদের যুগ। মাইকেল, হেমচন্দ্র, নবীনচন্দ্রের যুগ, রবীন্দ্রনাথের যুগ আর এখন শরৎচন্দ্রের যুগ। এঁদের লেখার ছাপ সমসাময়িক লেখকদের ওপর পড়ে। এবং সেই যুগপ্রবর্তকদের স্টাইল সে যুগের স্টাইল বলা যেতে পারে। কিন্তু সুলেখক মাত্রেই একটা নিজের প্রকাশভঙ্গী আছে যাহা অনুকরণীয়। অনুকরণের চেষ্টা বিস্তর হয়। কিন্তু সফলমনোরথ হওয়া ততটা সহজ নয়। যদিও বাস্তব অনুকরণ দুঃসাধ্য তবু সাহিত্যমহারথীদের প্রভাব এড়ানো সমসাময়িক লেখকের পক্ষে ততদূরই দুঃসাধ্য। বাংলা সাহিত্যের একছত্র সম্রাট রবীন্দ্রনাথের সাহিত্যের প্রভাব বাঙালী লেখকমণ্ডলির ওপর অল্প বিস্তর পড়েছে। শত চেষ্টায় প্রকৃত অনুকরণ সহজ নয়, তেমনি শত চেষ্টায় প্রধান সাহিত্যিকের রচনাভঙ্গীর প্রভাব এড়ানো সহজ নয়। তবু আমি নবীন লেখকদের বলি তাঁরা যেন তবু অনুকরণের চেষ্টা না করেন, তাঁদের নিজস্ব স্টাইল যেটা আপনা হতে আসে সেটাকে যত্নে রক্ষা করেন। অজ্ঞাতসারে অপরের প্রভাব পড়ে পড়ুক। সুলেখকের স্টাইলের স্বকীয়তা অক্ষুণ্ণ রাখা বাঞ্ছনীয় মনে করি। মুখোস পরে নিজের আকৃতির দৈন্য অনেকদিন ঢেকে রাখা যায় না। নিজের সাহিত্যের আকৃতিকেই সুপরিমার্জিত করে স্বাভাবিক উপায়ে তাকে অন্তত হাস্যাস্পদ হতে হয় না।

উপসংহারে আমি গর্বের সহিত বলি, বর্তমান বাংলা সাহিত্যের যা কিছু ত্রুটি থাক না কেন, আমাদের বাংলা সাহিত্য ক্রমেই উন্নতির স্তরে আরোহণ করবে। একদিন তখন বাঙালী সাহিত্যে কয়েকজন মহারথী ছিলেন তার বাকী সব নিম্নস্তরের, আজকাল সুসাহিত্যের স্তরও বিস্তর উঁচুতে—যাকে ইংরাজীতে বলে 'লেভেল' সেটি অনেক উন্নতি লাভ করেছে। এটি খুবই আশার বিষয়। যদি কিছুক্ষণের জন্যে রবীন্দ্রনাথ, শরৎচন্দ্র, কেদারনাথ প্রমুখ সাহিত্যিকদের লেখা তুলে রাখা যায়, তবু সুপাঠ্য ও সুখপাঠ্য সাহিত্যের দৈন্য কেহ বোধ করবেন না। এটি খুব বড় কথা।

●

দীর্ঘ অভিভাষণ শেষে ক্লান্ত হয়েছেন অতুলপ্রসাদ। সভা শেষে সাহিত্যিক কেদারনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়কে অতুলপ্রসাদ বলেছেন, অভ্যর্থনা সমিতির সভাপতি চন্দ্রচূড় দাস মহাশয়ের সঙ্গে দেখা হয়েছে কি? আমি তাঁর বাড়িতে আছি। চলুন না দেখাটাও হয়ে যাবে।

সেখানে চলুন দেখা করে আসি, চলুন।

শরীরটা ভালো মনে হচ্ছে না। কেদার বন্দ্যোপাধ্যায়কে বলেছেন অতুলপ্রসাদ, আমি আজই চলে যাব ভাবছি।

কেদারনাথ বললেন, আপনার না আসাই উচিত ছিল, কেন এমন শরীর নিয়ে আপনি এলেন?

অতুলপ্রসাদ হেসে বললেন, না এলে আমার উপায় ছিল না, উদ্যোক্তাদের কথা দিয়েছিলাম যে।

অসুস্থ শরীর তবু একজন মহিলা হঠাৎ তাঁকে গাইবার অনুরোধ করলেন। মহিলার অনুরোধে গাইতে হল। কাকেও ক্ষুন্ন করতে চাইলেন না। তাঁকে একেলা লখনউ ফিরতে দিতে ইচ্ছে ছিল না, কেদারনাথ ও কুমুদরঞ্জনের। তাঁরা অতুলপ্রসাদের শরীরের জন্যে ভাবিত হলেন।

• • •

গোরক্ষপুরে অধিবেশনের পর লখনউতে ফিরে এলেন অতুলপ্রসাদ। লখনউ-এ কিছু মাস এগিয়ে গেল, শরীর সুস্থ হল না। ডাক্তারেরা বললেন, আপনার জলহাওয়া পরিবর্তন হওয়া দরকার।

এখানে আপনার শরীর ভাল থাকছে না, আপনি সমুদ্রতীরে কিছুদিন বিশ্রাম নিয়ে আসুন। সমুদ্রের জলহাওয়া ব্লাডপ্রেসার রুগীদের পক্ষে মঙ্গল।

দাদা লিখলেন, নদীতীরে তোমার জন্যে একখানা ছোট বাড়ি দেখে রেখেছি, চমৎকার জায়গায়, তুমি আসবে লিখলে তোমার জন্যে বাড়িটি ভাড়া নিয়ে রেখে দেবো, তুমি আমার কাছে এসে বিশ্রাম কর।

কিরণ লিখল, তুমি কলকাতায় এসো। নীলরতন সরকারের ট্রিটমেন্টে তোমার আগেও একবার উন্নতি হয়েছিল। কলকাতার ডাক্তাররাই তোমার শরীর সারাতে পারবেন।

চৈত্র মাসে কলকাতায় যাওয়াই একরকম স্থির হল। অতুলপ্রসাদ ব্যারাকপুরে থাকেন, কাজকর্ম বন্ধ। অতুলপ্রসাদ লখনউ থেকে বিদায় গ্রহণ করলেন, একি চিরবিদায়ের আভাস। বন্ধু-বান্ধব, আত্মীয়-স্বজন গুণমুগ্ধ লখনউর অধিবাসীরা একে একে আসতে হলেন দুঃখিত মনে লখনউ স্টেশনে। অনেকে বিদায় জানাতে এসে সাশ্রুনয়ন হলেন।

ভাগলপুরেতে সহযাত্রী ছিলেন কিছুদূর পর্যন্ত রাধাকুমুদ মুখোপাধ্যায়। প্রতাপগড় পর্যন্ত একসঙ্গে চললেন। তাঁর কাছে বিদায় নিতে হাত বাড়িয়ে চিরবিদায়ের আশঙ্কার ছায়া দেখে শিউরে উঠলেন রাধাকুমুদ, ভাবী দুর্ঘটনার ছায়া তাঁর মন ছেয়ে রইল। এমন কি তিনি শেষ পর্যন্ত কলকাতায় পোঁছতে পারবেন কিনা সে আশঙ্কা রাধাকুমুদের মন অধিকার করে বসল। তাঁকে একাকী ট্রেনের মাঝে রেখে দিয়ে প্রতাপগড়ে নেমে গেলেন রাধাকুমুদ।

কলকাতায় এসে অতুলপ্রসাদ বালিগঞ্জে কিরণের বাড়িতে উঠলেন। যথারীতি চিকিৎসা শুরু হল। শরীর বুঝি কিছু সুস্থ হয়, তারপরই আবার অত্যাচার শুরু হল ডাক্তারের কথা হেসে অমান্য। কেদারনাথ এসে নেমেছিলেন অতুলপ্রসাদের বাড়ি থেকে অল্প দূরে ধূর্জটিপ্রসাদের বালিগঞ্জের বাড়িতে। প্রায়ই আসতেন, গল্প করতেন। সেদিন অতুলপ্রসাদ বললেন, আমি এখন বেশ ভালো আছি কেদারবাবু।

কেদারনাথ হাসলেন, বললেন, বেশ ভালো তো।

বিশ্বাস করুন।

যাবার আগে অনিষ্ঠ উষ্ণ আলিঙ্গনের মধ্যে দিয়ে এযে শেষ বিদায়ের ইঙ্গিত। কেদারনাথ কেমন যেন বিষন্ন মনে ফিরে এলেন।

অনেকদিন পর কি জানি কেন প্রফুল্লমনে অতুলপ্রসাদ দাদা সত্যপ্রসাদকে চিঠি লিখলেন।

P 27 Rash Behary Avenue
Calcutta 6-3-34

আমার পরম আপন দাদা,

কিরণের বাসায় তোমার স্নেহপূর্ণ চিঠিখানি পেলাম। আমার স্বাস্থ্য সম্বন্ধে কিছু বলি। দু মাস পূর্বে আমার ব্লাডপ্রেসার খুব বেশী ছিল, ২৩৫ হয়েছিল। খুব দুর্বল ও রোগা হয়েছিলাম। হঠাৎ একদিন বাঁদিকটা অবশ ও ঝিমঝিম বোধ হয়েছিল, সেটা এখনও যায় নি। সেই অবধি আমি

ড়ে চিকিৎসার জন্যে এখানে এসেছিলাম। র নীলরতন সরকার এবং অন্যান্য ডাক্তারেরা দেখেছিলেন। একেবারে র শুয়েই ছিলাম ৩।৪ সপ্তাহ। ধু ফল খাচ্ছিলাম আর দুধ-দই কিছু ই আর একবেলা সব্জি কিছু মুন না য়ে খাচ্ছিলাম। গত দুবারেও allumen cast পাওয়া যাচ্ছে না। দুর্বলতা মেছে। বাঁদিকে যে অবশ ও র্যানো ভাব ল, তা সামান্য কমেছে। হাঁটতে কষ্ট হয় । তবে হাতে ও পায়ে আড়ষ্ট ও জ্বালা-লা ভাব এখনও আছে, একটু কম। জনে খুউব কমে গিয়েছিলাম এখন সামান্য বেড়েছি। দু মাস কাজ ছেড়ে আছি। এখন র চলে না। ডাক্তারেরা বলেছেন খুব light কাজ করতে পারি। তবে খাওয়া সম্বন্ধে খুউব সাবধান থাকতে হবে। আমি রেশু লখনউ ফিরে যাবো। তাই এখন এ বস্থায় চাঁদপুর যাওয়া হবে না। ভবিষ্যতে ওয়ার ইচ্ছে রইল। সেখানে কি নদীর রে বাড়ি পাওয়া যাবে? এখন ত আবার ড়-বৃষ্টির সময় এসে পড়ল। চাঁদপুরে কান কোন সময়ে স্বাস্থ্যকর ও সুবিধা-নক? লখনউএ জানিও। ভালো কথা, এখন য় ১ই মাস থেকে ব্লাডপ্রেসার ১৮০ থেকে ১৯০-তে স্থির হয়ে আছে। ১৮০ আমার প্রায় নর্মাল অনেকদিন থেকে। আমার হার্ট-এ কোন দোষ নাই। কিডনি প্রায় সেরেছে, মাথাটা মাঝে মাঝে খুউব গরম য়। আবার সেরে যায়।

আমি যখন ফিরে যাবো, তখন রমারা য়তো আসবে। বেশ, দেখা হবে। আশা রি বৌঠান ও তোমরা সকলে ভালো আছো। সকলে আমার ভালোবাসা নিও।

ইতি তোমার স্নেহের ভাই
অতুল।

একমাস একদিন পরে সত্যপ্রসাদকে শেষ চিঠি দিলেন। এর মাঝে লখনউ উপস্থিত হয়েছেন। ডাক্তারের নির্দেশমত অল্প অল্প কোর্টে বেরিয়েছেন, কোর্টের কাজ কিছু করেছেন। আবার শরীর ভেঙেছে, কাজকর্ম থেকে বিদায় নিয়েছেন। স্থির করেছেন, পুরীতে স্বাস্থ্য উদ্ধারের জন্যে কিছুদিন গিয়ে বাস করবেন। পুরী যাবেন অথচ হাতে টাকা নেই। কাজকর্ম বন্ধ। অথচ খরচের কি কমতি আছে! সকল-কিছুই রাখতে হবে, কিছু ত্যাগ করা চলবে না। দান-ধ্যান সমানে চলে—চিরজীবন যেমন চলছে তেমনি। আজ এলাহাবাদ থেকে লালগোপাল মুখোপাধ্যায় এলাহাবাদের কোন একটি বিদ্যালয়ের সাহায্যের জন্যে দান-স্বরূপ কিছু টাকা চাইলেন, 'পাঠিয়ে দাও একটা একশত টাকার চেক।' সুরেশ চক্রবর্তীর 'উত্তরা' চলছে না। 'এই শেষবার আর নয়। রামকৃষ্ণাশ্রমের, ব্রাহ্মসমাজের উন্নয়নমূলক কাজ হবে ('দাও দাও টাকা. ওদের ত দিতেই হবে।' বিধবা মা তার মেয়ের বিয়ে দিতে পারছেন না 'কত টাকা লাগবে জিজ্ঞেস কর'...... এখন উপায় নেই অথচ ইচ্ছা আছে, একি নবাব-শহর লখনউএ বাস করে নবাবী দিলদরিয়া মন, তা নয়, এ তাঁর চিরকালের ছেলেবেলার টাকার

নিরাত্তারের কিম্বা লক্ষ্মীর ভাণ্ডারের মামার বাড়িতে যখন ছিলেন, তখন কারো দুঃখ-কষ্ট দেখলেও অস্থির হয়ে পড়তেন। কোন ভিখারী তাঁর কাছ থেকে রিক্ত হয়ে ফিরতে পারত না। মুষ্টিভিক্ষার জায়গায় তার থলি ভরে দিয়ে তাকে বিদায় দিতেন। মা কত-দিন হাসিমুখে বলেছেন, 'অতুলের জন্যে আমার ভিক্ষার চাল সবসময়ে ভাঁড়ার ভরে রাখতে হয়, অল্প দিয়ে ওর তুষ্টি নেই।'

পুরীর সমুদ্রের জলহাওয়ায় শরীর ভালো যখন হবে ডাক্তারের অভিমত, তখন সেখানে যেতে হবে বৈকি।

টাকা চাই?

সেণ্ট্রাল ব্যাংকের কাছ থেকে পাঁচ হাজার টাকা ধার নিলেন। ড্রাইভার এসে বললে, সাহাব, একটা কথা বলবো যদি মেহেরবানি করেন—

কি বল না কি বলবে?

দেখো বাড়িতে অসুখবিসুখ করেছে আমার পরিবারের। ছুটি চাই।

বেশ, যখন তোমার পরিবারের অসুখ করেছে, যাও ছুটি দিলাম।

ড্রাইভার একটু ইতস্তত: করে বললে, সাহেব আর একটা কথা যদি মেহেরবানি করে আমাকে কিছু টাকা দেন হুজুর ধার।

কত টাকা চাই?

বড় অসুবিধায় পড়েছি সাহাব, ৫০০ টাকা হলে এ-যাত্রায় আমি বিপদ থেকে পার হতে পারি।

তুমি কিছু, কিছু কাজ কর না, তুমি এক পয়সা পাবে না।

ড্রাইভার জানে তার আবেদন মঞ্জুর হয়েছে। পাঁচ হাজার টাকার মধ্যে থেকে পাঁচশো টাকা তিনি তাকে দিলেন। জানেন হয়তো সে দেবে টাকা, হয়তো নাও দিতে পারে তাই বলে তার অসময়ে অতুলপ্রসাদ টাকা দেবেন না। কেউ বিপদের সময়ে তাঁর কাছে এসে দাঁড়িয়েছে অথচ সাহায্য পাবে না একি কখনো হয়েছে। একমাস একদিন পরে অতুলপ্রসাদ দাদাকে চিঠি লিখলেন।

পুরীর যাত্রাপথে লখনউ থেকে কলকাতা এসে পৌঁছেছেন, কলকাতা থেকে চিঠি লিখলেন। সত্যপ্রসাদ চিঠিখানি পেলেন দু-চারদিন পরে।

Calcutta 13.4.34

দাদা,

তোমার পি-সি পেয়েছি। আমি পরশু পুরী যাচ্ছি। সেখানে একটি ছোট্ট বাড়ি নিয়েছি। হুটকী, কুন্তু ও দিলীপ আমার সঙ্গে যাচ্ছে ও থাকবে, একা থাকবো না। পুরী শুনেছি ব্লাডপ্রেসারের জন্যে ভালো, এখন ব্লাডপ্রেসার কম আছে। বাড়ির ঠিকানা সেখানে গিয়ে তোমাকে জানাবো।

তোমরা আমার ভালবাসা নিও।

তোমার ভাই অতুল

পুরীর ঠিকানা:—

রায়বাহাদুর মহেন্দ্রলাল মিত্রর কুঠি,
পাথারপুরী

(২৫)

১৯৩৪এর এপ্রিল মাসের মাঝামাঝি মাসখানিক বা মাস-দেড়েকের জন্যে স্বাস্থ্য উদ্ধারের জন্যে কলকাতায় কিরণের বাড়ি থেকে পুরী যাত্রা করলেন অতুলপ্রসাদ। সেই সময়ে পুরীর আবহাওয়াটা বেশ ভালো। সঙ্গে চলল একমাত্র ছেলে দিলীপ, ছোট বোন প্রভা (হুটকী) আর তার মেয়ে কুন্তু। সকলের মনেই খুব আনন্দ বেড়াতে যাওয়ার নামে। মহেন্দ্রলাল মিত্রর বাড়ি ভাড়া নেয়া আছে।

কুন্তুর মা দিলীপের হুটকী পিসি বলেন, দেখ দিলীপ-কুন্তু তোমরা পুরী গিয়ে কোথাও বেড়াতে যাবার নাম করবে না, যদি বেড়াতে যেতে হয় কোথাও তোমরা দুজনে যেও, দাদাকে (অতুলপ্রসাদ) নিয়ে যাওয়ার চেষ্টা করো না। আমরা পুরীতে কি কারণে এসেছি জান ত, শুধু বিশ্রামের জন্যে। কোথাও পুরী থেকে যাওয়া চলবে না।

পুরীতে পৌঁছে দাদাকে বলেন হুটকী' চুপচাপ এখানে শুয়ে-বসে বিশ্রাম নিতে হবে তোমাকে। দূরে কোথাও বেড়াতে যাবার নাম করবে না। শুধু যেতে পার সমুদ্রের ধারে। আমরা সকলে সকালে-বিকেলে সমুদ্রের ধারে বেড়াবো, সকলে অরুণাচলের জন্যে স্নান করবো সমুদ্রে। বেশী পরিশ্রম নয়।

বাজার-টাজার যেতে পারবো না। নিজে হাতে বাজার করার সুখ থেকে আমায় বঞ্চিত করবে? নিজে হাতে বাজার করার মত আনন্দ আর আছে!

এখন নয়, তোমার শরীর একটু ভালো হোক। তারপর নিজে হাতে বাজার করো, মন্দির দেখতে যেও। এখন শুধু বিশ্রাম।

অতুলপ্রসাদ সবথেকে ছোটবোনের স্নেহের শাসনটুকু উপভোগ করেন। প্রথম প্রথম পুরীতে পৌঁছে বেশী ঘোরাঘুরি পরিশ্রম শরীরে সহ্য হবে না অতুলপ্রসাদ জানতেন। সেইজন্যে পরিশ্রমের কোন কাজ করার ইচ্ছাও নেই। এসেছেন যখন বিশ্রামের জন্যে, তখন যতটা সম্ভব বিশ্রামই হোক। সকাল-সন্ধ্যায় বালুকাবেলায় দিলীপ ও কুন্তুর হাত ধরে ঘুরে বেড়াতেন অতুলপ্রসাদ হাঁটতে হাঁটতে ফ্ল্যাগ-স্টাফ পর্যন্ত, অন্যদিকে স্বর্গদ্বার। বালির ওপর বসতেন দিলীপ এবং কুন্তু পাশে বসে থাকতো। বালুকাবেলায় নানা মানুষের পায়ের ছাপ, ছুটোছুটি করে খেলা, নুলিয়াদের স্নান করানো, স্নানার্থীদের জলেতে হুটোপুটি, জেলেদের মাছ ধরা ও সমুদ্রে সংগ্রাম, সমুদ্রের অবিরাম ঢেউ আর গর্জন, ঝড়ের মত হাওয়া আর পরিষ্কার নীল আকাশ সব মিলিয়ে। সমুদ্রের ওজন-ভরা আঁসটে হাওয়ায় প্রথম প্রথম একটু অস্বস্তি হলেও এখন সয়ে গেছে। খোলা হাওয়ায় শরীরের সব ক্লান্তি, সব অবসন্নতা মুছে নিয়ে যায়।

সমুদ্রস্নানে-বাতাসে ভ্রমণে শরীরটা ধীরে ধীরে বল ফিরে পায় যেন। একদিন দেখা হয়ে গেল সমুদ্রবেলায় এলাহাবাদ বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক দক্ষিণারঞ্জন ভট্টাচার্য এবং অধ্যাপক সাতকড়ি দত্তর সঙ্গে, ও'রা একপাল ছেলেমেয়েদের নিয়ে বালুকাবেলায় বেড়াচ্ছিলেন। অতুলপ্রসাদকে দেখে সদলবলে এগিয়ে এলেন।

আপনি কবে এলেন, আপনার শরীর অসুস্থ শুনেছিলাম? দক্ষিণারঞ্জন বললেন।

অতুলপ্রসাদ হেসে বললেন, শরীরের জন্যেই ত পুরীতে আসা। আপনারা দেখছি বিরাট দল নিয়ে পুরীতে......

আমাদের ইউনিভারসিটির মিউজিয়ামের জন্যে প্লান্ট কালেকসনে বেরিয়ে পুরীতে এসে পৌঁছেছি। আমরা কয়েকটা দিন এখানে এখন থাকবো স্থির করেছি। হেসে বললেন দক্ষিণারঞ্জন, আসলে আমাদের রথ দেখা কলা বেচা দুই কাজই হচ্ছে। দক্ষিণারঞ্জনের মুখেই শুনলেন লখনউ বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য জ্ঞানেন্দ্র চক্রবর্তী মহাশয় সস্ত্রীক লখনউ থেকে কলকাতা হয়ে পুরীতে এসে পৌঁছেছেন, নেমেছেন বি এন আর হোটেলে।

জ্ঞান চক্রবর্তী এসেছেন? আমাদের লখনউর মানুষ—দেশের মানুষ—কি যে ভালো লাগছে। এই পৃথিবীটা গোলাকার, ঠিক দেখা হয়ে যায় কোথাও না কোথাও, চেনা-পরিচিত মানুষদের সাথে।

জ্ঞান চক্রবর্তী এলেন সস্ত্রীক তাঁর বিদেশী পুত্রস্থানীয় কাইটেঙ্গ সাহেবকে নিয়ে মহেন্দ্রলাল মিত্রর কুঠিতে অতুলপ্রসাদের সঙ্গে দেখা করতে। কুশল বিনিময়ের পর তিনি বললেন, আপনি কবে এলেন অতুলবাবু?

এলাম এপ্রিলের সতেরো-আঠারো তারিখে। আপনি কবে এলেন?

এই তো কয়েকদিন হল। শুনেছেন কৈলাসনাথ কাটজু সাহেবের সঙ্গে গান্ধীজি এসেছেন পুরীতে। গান্ধীজির সঙ্গে তো আপনার আলাপ আছে।

আছে আছে।

যাবেন নাকি?

যাওয়া যায়। নিশ্চয়ই যাব। গান্ধীজিকে আমার ভালো লাগে। গান্ধীজিকে আমি শ্রদ্ধা করি। আমার অনেক মতবাদ ও'র সঙ্গে মেলে।

গান্ধীজিরও আপনাকে ভালো লাগে। আপনার গান শুনেছেন। ওই যে ওই গানটি 'কে আবার বাজায় বাঁশী এ-মধু কুঞ্জবনে' গান্ধীজির খুব প্রিয় গান। গান্ধীজি যদি শোনেন আপনি এখানে এসেছেন, তিনি নিশ্চয়ই আপনাকে গান শোনাবার জন্যে ডাক পাঠাবেন।

গান্ধীজি আমাকে গান গাইতে বললে গান শোনাবো বইকি!

মিঃ সেন, আপনাকে লখনউতে যেরকম দেখেছিলাম, এখন তার থেকে একটু ইমপ্রুভড্ মনে হচ্ছে।

হাঁ, এখন নিজেকে একটু ভালো মনে করছি। শরীরে একটু যেন জোর পাচ্ছি।

জ্ঞান চক্রবর্তী বললেন, আমার ওখানে আপনি কবে আসচেন, একদিন খাওয়া-দাওয়া গান-বাজনা করা যাক।

এই যাব একটু সময় পেলে।

অল্পদিনের মধ্যেই পুরীর সমুদ্রের হাওয়ার গুণে অতুলপ্রসাদের ভাঙা স্বাস্থ্য অনেকটা জোড়া লাগলো। তিনি তখন সবল হয়ে হেঁটে চলে বেড়াচ্ছেন পুরীর রাস্তায়। সমুদ্রে দুবেলা অনেকক্ষণ স্নান করছেন। মনেই হয় না তাঁর শরীরে কোন অসুখ-বিসুখ থাকতে পারে। ইতিমধ্যে বোন কিরণ এসে পৌঁছে গেল পুরীতে ভাইদাদার বাড়িতে। লখনউ থেকে এলেন রাধাকুমুদ মুখোপাধ্যায়। অতুলপ্রসাদকে দেখে তাঁরা খুউব খুশী হলেন।

রাধাকুমুদ বললেন, আপনার শরীরের জন্যে আমি বড় ভাবছিলাম। সত্যি জানেন, কয়েকমাস আগে আপনাকে যখন ট্রেনের কামরায় রেখে প্রতাপগড়ে নেমে গেলাম, তখন কি যে দুর্ভাবনা হচ্ছিল কি বলবো।

এখন কিরকম মনে হচ্ছে?

এখন আপনি কিছুটা সেরেছেন।

অতুলপ্রসাদ বললেন, কিছুটা মানে আমি সম্পূর্ণ সেরেছি। জান, এখানে এসে এই পুরীর জল-হাওয়ার গুণে আমি আবার আগের জীবন ফিরে পেয়েছি। এখানে এসে কতগুলি গানও লিখে ফেললাম। শরীর ভালো থাকলে গানও আসে। আর একটা কথা, আমার পরিচয় এখানকার লোকেরা পেয়েছে, আর একটা কাণ্ড ঘটে গেছে।

কেন কি কাণ্ড হল?

গান গাইতে হবে।

গান?

হ্যাঁ হ্যাঁ, এখানেও মজলিশ-টজলিশ আছে দেখছি, রোজই একটা না একটা লেগে আছে দেখছি, ওরা আমাকে বলে গান গাইতে হবে। আপনার গান আমরা শুনতে চাই, আপনাকে যখন হাতে পেয়েছি।

গাইছেন নাকি গান?

একটু-আধটু গাইছিও। গান গাইতে আমার কষ্ট হয়নি কোনদিন, এখন একটু-আধটু কষ্ট হয়। তবে গান গাইলে মনটা খুব খুশী হয়।

অধ্যাপক দক্ষিণারঞ্জন ভট্টাচার্য তাঁর দলবল সমেত নেমেছেন দেবপ্রসাদ সর্বাধিকারী মহাশয়ের বাড়ি। দক্ষিণারঞ্জন নিজে সংগীতজ্ঞ, সংগীতরসিক। একদিন এসে অতুলপ্রসাদকে ধরে নিয়ে গেলেন তাঁদের আড্ডায়। সেদিন অতুলপ্রসাদ সেখানে অনেকগুলি স্বরচিত গান গাইলেন। দক্ষিণাবাবুও অনেকগুলি গান সকলকে শোনালেন। চমৎকার একখানা গানের আসর দক্ষিণবাবুর বাসায় হল।

গান্ধীজি অতুলপ্রসাদকে ডাক পাঠালেন। জানালেন, আপনি যখন এখানে আপনার গান শোনার জন্যে অতুল আগ্রহ নিয়ে আমি প্রতীক্ষা করে আছি।

বেশ তো, গান্ধীজি যখন ডাক পাঠিয়েছেন, তখন যাওয়া যাবে। একদিন তাঁকে গান শুনিয়ে আসবো। গান্ধীজি যেন কি গান ভালোবাসেন। 'কে আবার বাজায় বাঁশী এ-মধু কুঞ্জবনে', বেশ সেই গানই শোনান হবে। একই সুরে সেই গানটির হিন্দী অনুবাদ হয়ে গেল। অনুবাদ করলেন অতুলপ্রসাদ। তারপর গান গেয়ে শোনালেন গান্ধীজিকে অতুলপ্রসাদ সুরেলা মধুর ছন্দে।

শরীর এখন বেশ সুস্থ। দুর্বলতা নেই। বেশ সতেজ শরীর। সমুদ্রের হাওয়া দেড় মাসের মধ্যে তাঁর শরীরকে আশ্চর্যরকম সারিয়ে তুলল। ফিরে এল সেই উজ্জ্বলতা। পুরীর জীবন ক্রমে একঘেয়ে হল। অতুলপ্রসাদ বললেন, চল ছুটকী কিরণ আমরা এবার ফিরে যাই।

পুরী থেকে প্রথমে কলকাতায় এলেন পরিজনসহ। তারপর দিলীপকে নিয়ে পুরাতন কর্মক্ষেত্রে লখনউর পথে পা বাড়ালেন অতুলপ্রসাদ। তাঁকে দেখে কাছে পেয়ে লখনউর বন্ধুবান্ধব, ভক্ত-পুরবাসীদের মনে আনন্দ ধরে না। অনেকে আশ্বস্ত হয় তাঁর স্বাস্থ্যের উন্নতি দেখে। পুরীর সমুদ্র তাঁকে নতুন জীবন, উজ্জ্বল স্বাস্থ্য ফিরিয়ে দিয়েছে। তিনি এখন তবে অনেকদিন জীবিত থেকে তাঁর শ্রেষ্ঠ কীর্তি উপহার দেবেন।

কিন্তু কে জানতো ক্ষণিকের এই উজ্জ্বলতা, ক্ষণিকের এই দীপশিখার

…ই মহাকালের মহাসমাধির ইঙ্গিত …কিয়ে আছে।

(২৬)

আজ সেণ্ট্রাল ব্যাঙ্কের সেই ৫০০০ …কার শেষ কিস্তিটা শোধ করে দিয়ে …নাম জান হেমন্ত। আর কোন ভাবনা-…ন্তা নেই, আমার উইলটাও হয়ে গেছে, …মরা দুজন সাক্ষী রইলে, আমার সব কাজ …ষ, এবার নিশ্চিন্তে আরাম।

ব্যারিস্টার হেমন্তকুমার ঘোষ হয়তো …দিন বলেছিলেন, আপনার এত তাড়াতাড়ি …ল করার কোন দরকার ছিল না, আপনি …খনও অনেকদিন বাঁচবেন। আপনাকে আজ …ত্যি খুব Bright মনে হচ্ছে।

সেদিন ২৩ আগস্ট, শুক্রবার, ১৯৩৪ …ল।

আমি বলছি ত আমি সম্পূর্ণ সেরে …ছি, আমার শরীরে কোন বেদনা নেই, …ন ক্লান্তি নেই, আমি খাটতে পারি, ২০ …র আগে যেরকম খাটতাম। কি, তুমি কি …মার শক্তি পরীক্ষা করতে চাও নাকি?

ব্যারিস্টার হেমন্তকুমার ঘোষ হেসে …লেন, না-মা।

সেদিন তাঁকে খুউব উৎফুল্ল এবং …জ্বল দেখাচ্ছিল। পুরীর সামুদ্রিক জল-…ওয়ার গুণে তাঁর শরীরের সব অসুখ যেন …রে গেছে। একেবারে নীরোগ বলে মনে …চ্ছিল।

পরের দিন ২৪ আগস্ট শনিবার …ংলা ৮ই ভাদ্র। সেদিন সকালে হঠাৎ … মনে হল তিনি পাড়ার চেনাজানা …নুষদের বাড়িতে গেলেন, হাসিমুখে …কলের খবরাখবর নিলেন, 'কে কোথায় …ছে', 'কে কেমন আছে'... প্রাতঃভ্রমণে …তিদিন সকলেই বেরোতেন। সকলের …বরাখবরও নিতেন। কিন্তু সেদিন যেন …শেষ করে প্রতিটি চেনা-পরিচিত মানুষের …ংবাদ জানার জন্যে ব্যাকুল। ব্যারিস্টার …াবকে বললেন, তোমার মেয়েরা কোথায়? …দের অনেকদিন দেখিনি। ডাক ত দেখি, …রা সকলে কেমন আছে। হেমন্তর বড় …য়েটির দিকে অনেকক্ষণ তাকিয়ে রইলেন, …দর করলেন। রাধাকৃষ্ণ শ্রীবাস্তবের বাড়িতে …খন পৌঁছলেন, রাধাকৃষ্ণ বড় জামবাটি-ভরা …ধ, 'ব্যারিস্টার সাহাবের' জন্যে সামনে এনে …লেন, 'আইয়ে আইয়ে সেন সাহাব …রাজিয়ে।'

ছেলেমানুষের মত হেসে সেন সাহেব …ন-দুধ পান করলেন।

প্রাতঃভ্রমণ সেরে ফিরে এলেন অতুল-…সাদ। সুবালামাসি এবং তাঁর মেয়ে উমা …কছুদিন আগেই লখনউ থেকে কলকাতায় …রে গেছেন। চারবাগের বাড়িতে কেবল …লীপ। অসুস্থ হেমকুসুম ক্যাণ্টনমেণ্ট …াডের বাড়িতে। হিরণ বিলেতে, কিরণ …নিতালে, প্রভা কলকাতায়, দাদা পূর্ব-…ংলায়—একাকী অতুলপ্রসাদ দীর্ঘ দেহ, …খে সকল সময়ে হাসি, ফিরে আসছেন …াঁর চারবাগের শূন্য প্রাসাদ হেমন্তনিবাসে। …সাদ তো নয়, পান্থশালায়...হৃদয়-ভরা …খ, মুখে হাসি সবসময়ে, কণ্ঠে গান...,

যেন কিছু দিন আগে অতুলপ্রসাদ গান গেয়েছিলেন, 'তুমি যে শিব তাহা বুঝিতে দিও'। শ্রোতা ছিলেন দিলীপকুমার রায়। গাইতে গাইতে তাঁর কণ্ঠ এসেছিল গাঢ় হয়ে সে সন্ধ্যায়। দিলীপকুমার রায়কে যেদিন সে গানটি শেখান, বলেন, দিলীপ এ গানটি কিন্তু যার তার কাছে গেও না। এ গান আমার বড় ব্যথার দিনে লেখা। তারপর প্রাণ খোলা হাসি হেসে মাতিয়ে তুললেন সকলকে।

অনেক রাতে একসঙ্গে শুয়ে অতুল-প্রসাদ দিলীপকুমারকে বলেছেন, জান মণ্টু, কি আমি প্রার্থনা করি জান ঈশ্বরের কাছে?

দিলীপকুমার বলেছেন কি অতুলদা?

অতুলপ্রসাদ বলেছেন, শ্মশানে যেদিন আমাকে নিয়ে যাবে সেদিন চিতায় শুয়ে হঠাৎ যেন একবার সকলের দিকে চেয়ে হেসে চোখ বুজি।

সেদিন কি তিনি বুঝতে পেরেছিলেন তাঁর যাওয়ার সময় হল। এ জগতের বাইরের কোন রহস্যময় জগৎ তাঁকে হাতছানি দিয়ে ডাক দেয়। এ জগতের মানুষকে ছেড়ে যেতেও কষ্ট হয় বুঝি। এদের দুঃখ-দুর্দশা, দৈন্য-বেদনা তাঁর মনকেও বেদনা দেয়...তাই কি তিনি বলেছেন, আমি হাসি মুখে যেতে চাই...।

"তুমি যখন পৃথিবীতে এলে তুমি কেঁদেছিলে, জগৎ হেসেছিল। এখন তুমি এমন কাজ করে যাও যেন এ লোক থেকে যাবার সময়ে তুমি হাসতে হাসতে চলে যাবে জগৎ তোমার জন্যে কাঁদবে।"

অতুলপ্রসাদ প্রাতঃভ্রমণ শেষে ফিরলেন চারবাগের বাড়ি হেমন্তনিবাসে—প্রতিটি মানুষে বোধহয় নিঃসঙ্গ একাকী জীবন-ভোর। ভৃত্যরা শশব্যস্ত হয়েছিল। মালি ফটক খুলে সরে দাঁড়িয়ে সাহেবের পথ করে দিয়েছিল। ফুলবাগিচার মাঝ দিয়ে লাল সুরকি ঢালা পথ। পায়ে পায়ে চলে এসে দাঁড়িয়েছিলেন বোধহয় ফুলবাগিচায়, ফুল তিনি ভালবাসতেন, রক্তগোলাপ। নিজে হাতে ফুলগাছের তদারকি করতেন। সেদিনও হয়ত মালির সঙ্গে ফুলগাছ সম্বন্ধে আলোচনা, উপদেশ অথবা মৃদু ভর্ৎসনা করেছেন, রোজকার মত। নিজে হাতে গোলাপ কাটা কাঁচি হাতে ঝোপঝাড় পরিষ্কার করতে নিজেই বাগানের কাজে নেমেছেন। বাগানের কাজে ছিল তাঁর ভীষণ শখ। বাগিচায় দাঁড়িয়ে মায়ের নামের স্মৃতি-ধরে-থাকা তাঁর আপন প্রিয় প্রাসাদখানির দিকে তাকিয়েছিলেন। মাকে মনে পড়েছিল হয়ত বেদনাভরা হৃদয়ে—মা চিরকাল একাকী জীবন কাটিয়েছেন, হেমকুসুম সেও চিরটা কাল একাকী জীবন কাটালো, বড় দুঃখী হেমকুসুম। সংসারটা কেমন যেন ছন্নছাড়া হয়ে গেল। অথচ কত যত্নে এ সংসারটা গড়ার ইচ্ছে ছিল, আশা ছিল মনে। মনে আশা ছিল এক সুস্থ সুখী পরিবারের... কিন্তু সব আশা ভেঙে খানখান হয়ে গেল।

কি জানি কেন আপন ছেলে দিলীপ, তার কথা ভেবে দীর্ঘশ্বাস পড়ল! ক্ষণিকের জন্যে দাঁড়ালেন গাড়িবারান্দার নীচে। তারপর সিঁড়ি ধরে দু ধাপ উঠে ডাকলেন—

দিলীপ...দিলীপ!

দিলীপ এলো।

বললেন, বেলা হয়েছে যাও স্নান করে নাও। আমরা একসঙ্গে খেতে বসবো। খেতে খেতে তোমার সঙ্গে একটা বিষয়ে কথা বলবো। দেরী করো না।

দিলীপ স্নান সারতে গেল। তিনি লেখার টেবিলের কাছে চেয়ার টেনে বসে এলাহাবাদে কোন একজন পরিচিত মহিলাকে চিঠি লিখলেন। চিঠির শেষে লিখলেন আমি যাবার আগে কাউকে যেন কষ্ট না দিই, ও নিজে না কষ্ট পাই এই কামনা করি। চিঠি লেখা শেষ হলে হঠাৎ মনে হল কে যেন একখানা অটোগ্রাফের খাতা রেখে গেছে। টেবিলের ওপরই ছিল কালো কাগজের মলাট দেয়া খাতাখানি, হাতে নিয়ে কলম তুলে লিখলেন—

"যে জন রহিতে চায় নিজ রুদ্ধ ঘরে
হারানিধি নিরবধি সেই খুঁজে মরে"

লেখা শেষ করে স্নান সেরে ভাত খেতে বসেছেন। সুস্থ মানুষ, সবল মানুষ। ভাত খেয়ে কোরটে যাবেন। দিলীপ এসে সামনে দাঁড়ালো। দুজনে খেতে বসলেন।

দিলীপের সঙ্গে সামান্য দু-চার কথা... শরীরটা যেন কেমন আনচান করে উঠল। রগ দুটো ধরে গেল, মাথা গরম হল।

দিলীপ বলল, কি হল? অমন করছ কেন? শরীরটা কি খারাপ মনে হচ্ছে?

না ঠিক আছি।

কয়েক মুহূর্ত গেছে, দিলীপ চিৎকার করে বললে বাবা...

খেতে খেতে চামচেটা তাঁর হাতের মুঠো থেকে খসে পড়ে গেল প্রথমে। তারপর তিনি চেয়ার থেকে জ্ঞান হারিয়ে মাটিতে লুটিয়ে পড়লেন। তখনই তাঁকে ধরাধরি করে তুলে এনে খাটে শোয়ানো হল। দিলীপ ছুটে গিয়ে ব্যারিস্টার এইচ কে ঘোষকে খবর দিল। হেমন্ত ঘোষ ডাঃ সেনকে ডেকে আনলেন, ডাঃ হেমন্ত মিত্র এলেন, কর্ণেল হাণ্টার, ডাঃ ড্যাস—চিকিৎসকে চিকিৎসকে ছেয়ে গেল তাঁর চারবাগের বাড়িখানি।

সন্ন্যাস রোগে আক্রান্ত হয়ে অতুলপ্রসাদ অজ্ঞান, এ সংবাদ ছড়িয়ে গেল সারা লখনউ শহরময়। হিতকাঙ্ক্ষী অগণিত জনসাধারণ ভেঙে পড়ল এ পি সেন রোডে হেমন্ত-নিবাসের সামনে। আরোগ্যের খবরাখবর পাওয়ার জন্যে জনসাধারণের চলল ঘণ্টার পর ঘণ্টা নিশ্চল-নিস্তব্ধ-উৎকণ্ঠিত উদ্বিগ্ন প্রতীক্ষা।

বেলা তখন একটা-দেড়টা হবে। এক-খানি গাড়ি এসে হেমন্তনিবাসের সামনে দাঁড়ালো। গাড়ির মধ্যে একটি মহিলা অসুস্থ শোকে অবসন্ন, দু চোখে অঝোর জলধারা। হাত তুলে সে অশ্রু মুছে নেওয়ার শক্তি নেই। শরীরের একটি অঙ্গ অসাড় অবশ চিরকালের মতো—তিনি হেমকুসুম।*

এই প্রথমবার এবং সম্ভবতঃ শেষবার চারবাগে হেমন্তনিবাসে এলেন হেমকুসুম, এই ঘর, এই বাড়ি তাঁর স্বামীর, এখানেই আজ কোন একখানি ঘরে তাঁর স্বামী

মুমূর্ষু মৃত্যুপথযাত্রী...আজ এখানে অবারিত দ্বার নয়। জনসাধারণের প্রবেশ নিষেধ। শান্তি ভঙ্গ হবে আশঙ্কায় সেন সাহেবের কুঠি হেমন্তনিবাসের পথ চিরকালের জন্যে বন্ধ।

কালো কাপড়ে ঢেকে শরীরটাকে বয়ে নিয়ে স্বামীর শিয়রে একবার এসে দাঁড়ান। তারপর সকলের অলক্ষ্যে সকলের সেবা-শুশ্রূষার মাঝে নিজেকে অপাংক্তেয়, নিতান্তই অপ্রয়োজনীয় ভেবে অশ্রুপূর্ণ আঁখিতে হেমন্তনিবাস শেষবারের মত ছেড়ে চলে গেলেন হেমকুসুম।

• • •

ঘুম আসে না হেমকুসুমের। শরীরে যন্ত্রণা, মানসিক যন্ত্রণা, উদ্বেগ উৎকণ্ঠা। রাত তখন একটা বেজে প'য়তাল্লিশ মিনিট। হাওয়ায় বোধহয় কপাট খুলে গেল, অতুলপ্রসাদ এসে হেমকুসুমের শিয়রে দাঁড়ালেন।

তুমি কখন এলে...কেমন করে এলে গো, সদর দরজা বন্ধ, কে খুলে দিল তোমায়?

অতুলপ্রসাদ খুব হাসচেন, আর তাঁর সেই রসাত্মক কণ্ঠস্বর, কেন তুমি তো।

তাঁর চেহারায় হঠাৎ যেন তারুণ্য ফিরে এসেছে। উজ্জ্বলতা ফিরে এসেছে। এসে দাঁড়িয়েছেন অবিকল সেই পোষাকে, যখন প্রথম দেখা হয় বিবাহ-রাতে।

কুসুম, কুসুম তোমার জন্যে আমার বড় মন কেমন করছিল, তোমাকে আমার এক-বারটি দেখতে ইচ্ছে হয়েছিল, তুমি তখন গেলে অথচ তোমার সঙ্গে কোন কথা বলতে পারলাম না দেখ ত! তাই এলাম। তুমিও আমার কথা শুয়ে শুয়ে ভাবছিলে তাই না!

তোমাকেও 'চোখের দেখা' পেতে আমার ইচ্ছে হয়েছিল গো। তুমি এসেছ যখন, আমার বিছানার পাশে একবারটি বসো, তুমি সেরেছ সুস্থ হয়েছে আমার কি যে আনন্দ হচ্ছে, আমার গায়ে একটু হাত বুলিয়ে দাও।

'কুসুম' অতুলপ্রসাদ যেন কিছু বলতে চেষ্টা করলেন, কিছু দ্বিধাগ্রস্ত। হেম-কুসুমের শয্যার পাশে বসলেন, দুলে উঠল পালংখানি। ধীরে ধীরে মাথায় হাত বুলিয়ে দিলেন। বললেন কুসুম তুমি ভালো হয়ে যাবে, সুস্থ হয়ে উঠবে...কুসুম কুসুম তোমাকে আমি অনেক দুঃখ দিয়েছি, তোমার জন্যে আমার দুঃখ হয়। তোমাকে আমি সুখে রাখতে পারি নি কোনদিন।

কেন তুমি সুখে রাখনি গো? বল!

তুমিও ত আমাকে দুঃখ দিয়েছ। আঘাত করেচ। সুখ কেড়ে নিয়েছো, শান্তি নিয়েছ। প্রতিদিনে প্রতিমুহূর্তে যে আঘাত করেছ আমায় সে আঘাতে আমি ভেঙে খান খান হয়েছি...অপ্রত্যাশিত ছিল তোমার এ আঘাত...কেন আমাকে এত, এত আঘাত দিলে কুসুম! উত্তেজিত, ক্ষুব্ধ অতুলপ্রসাদ।

বিশ্বাস করো গো, আমি তোমাকে আঘাত দিতে চাই নি...চাই নি, আমি তোমাকে ভালবেসেছিলাম, এখনো ভালবাসি, সকলকে ত্যাগ করেও তোমাকে নিয়ে থাকতে চেয়েছি...তুমি বারেবারে আমাকে ভুল করেছ।

কি বললে! ভুল, এদেশে আমাদের বিয়ে হল না। তাই আমি তোমাকে বিয়ের জন্যে কত দূরে বিদেশে নিয়ে গিয়েছিলাম। আমার ভালবাসার কি কোন ফাঁক ছিল? মনে পড়ে তোমার লণ্ডন-কলকাতার দিন-গুলো...মনে পড়ে কুসুম, তোমার সে সব দিনগুলোর কথা...আমাদের মনে কত আশা ছিল, আকাঙ্ক্ষা ছিল...তোমাকে পেয়ে আমার মন ভরেছিল—মন ভেবেছিল সব পূর্ণ হল কিন্তু এ কোন অপূর্ণতা...কি পেলাম তোমার কাছ থেকে। বল আমি কি পেলাম। তুমি কি দিয়েছ আমাকে? ভালবাসা? কোথায় তোমার ভালবাসা—কতটুকু ভাল-বাসা।

বিশ্বাস করো গো আমি তোমাকে মনপ্রাণ দিয়ে ভালবাসি।

—ভালোবাসো তাই আমাকে ছেড়ে বারে বারে চলে গিয়েছিলে।

—চলে গিয়েও চলে যেতে পারলুম কই?

—ভালোবাসো তাই আমাকে অপমান করেছিলে বারেবারে...ভালোবাসো! তাই ভালোবাসা...তুমি ভালোবাসা...

—তুমি বিশ্বাস কর।

—বিশ্বাস নেই এ জগতে কোথাও। ভালোবাসাও নেই...কোথাও নেই সৎ মানুষ--স্বার্থপরতা আর স্বার্থপর মানুষ। লোভী মানুষ, নীচতা, নোংরামি এ জগৎময়... ভালোবাসা প্রেম কোথাও নেই...তবু আমি পেয়েছি কুসুম আজও এ জগৎ চলে যার জন্যে তিনি ক্ষমাপরায়ণ, সেই সত্যকে। যাকগে আমি যাই হেম, আমার সময় হয়ে গেছে আমাকে যেতে হবে।

হেমকুসুম হাত বাড়িয়ে অতুলপ্রসাদকে ধরতে গেলেন পারলেন না। হেমকুসুম বিছানায় শুয়ে ফুঁপিয়ে কাঁদলেন অঝোর-ঝরে। বালিস থেকে অতিকষ্টে মুখ তুলে বললেন, একটু দাঁড়াও লক্ষ্মীটি। রাগ করো না। আমার কথা শুনে যাও। একটু দাঁড়াও তুমি, আমার কবে আসছ?

আর আমার আসার প্রয়োজন ফুরিয়েছে হেম।

তুমি যেও না...আমার একটা কথার জবাব দিয়ে যাও...তুমি যে বল ঈশ্বর...!

সহসা হেমকুসুম দেখেন অতুলপ্রসাদ খুব হাসছেন ক্ষমাসুন্দর হাসিতে। হাত তুলে তাঁর চিরাচরিত ভাবাবেগে সুরেলা গলায় বললেন, দেখ এতক্ষণ যা বললাম ভুলে যাও। তুমি অনুতাপ বা দুঃখ কিছু করো না, কেমন। তুমি...তুমি যা দিয়েছ প্রতিদিন প্রতিমুহূর্তে সে তোমারই দান, সে সম্পর্কের তুলনা নেই। ভগবানেরও বোধহয় এই ইচ্ছে ছিল। আমরা অবশ্য দুঃখ পেলাম।...আচ্ছা চলি। চলি কুসুম। ভালো থাকো এই কামনা করি।

হাওয়ায় দরজায় শব্দ হল। কার যেন পদধ্বনি দূরে থেকে দূরে মিলিয়ে গেল। আধ ঘুমে আধো জাগরণে হেমকুসুম অতি-কষ্টে বিছানায় উঠে বসলেন।... তিনি কি এসেছিলেন, তিনি কি চলে গেলেন...তবে কি তিনি নেই! দু চোখে হেমকুসুমের জল--স্মৃতি, শুধু স্মৃতির বোঝা...শুধু জমে থাকা।

• • •

ঘুম ভেঙে লখনউবাসী শুনলো তাদের প্রিয় সেন সাহেব আর নেই। লখনউর আকাশে বাতাসে ছড়িয়ে পড়ল সে কথা। জজরা কাছারী বন্ধ করে দিলেন। উকিলেরা বার লাইব্রেরীতে শোকসভা ডাকলেন। লখনউ বিশ্ববিদ্যালয় স্কুল-কলেজ বন্ধ হল। সারা লখনউ শহর ভেঙে পড়ল হেমন্তনিবাসের সামনে তাদের প্রিয় অতুলপ্রসাদ সেন-সাহেবকে শেষ দর্শনের জন্যে। শোকের সংবাদ লখনউ অতিক্রম হয়ে ছড়িয়ে পড়ল বাংলা দেশে। বাংলা দেশের মানুষ মর্মাহত হয়ে শুনলো তাদের প্রিয় কবি গীতিকার অতুলপ্রসাদ আর মরলোকে নেই।

সাঙ্গ হল কাঁদা হাসা

কবিগুরু রবীন্দ্রনাথ লিখলেন—

বন্ধু, তুমি বন্ধুতার অজস্র অমৃতে
পূর্ণপাত্র এনেছিলে মর্ত্য ধরণীতে।
ছিল তব অবিরত
হৃদয়ের সদাব্রত,
বঞ্চিত করোনি কভু কারে
তোমার উদার মুক্ত দ্বারে।।
মৈত্রী তব সমুচ্ছল ছিল গানে গানে
অমরাবতীর সেই সুধা-ঝরা দানে।
সুরে-ভরা সঙ্গ তব
বারে বারে নব নব
মাধুরীর আতিথ্য বিলালো;
রসতৈলে জেলেছিলে আলো।।
দিন পরে গেছে দিন মাস পরে মাস,
তোমা হ'তে দূরে ছিল আমার আবাস।
"হবে হবে দেখা হবে"
একথা নীরব রবে
ধ্বনিত হয়েছে ক্ষণে ক্ষণে
অকথিত তব আমন্ত্রণে।।
আমারো যাবার কাল এলো শেষে আজি
"হবে হবে দেখা হবে" মনে ওঠে বাজি
সেখানেও হাসি মুখে
বাহু মেলি লবে বুকে
নব জ্যোতি-দীপ্ত অনুরাগে,
সেই ছবি মনে মনে জাগে।।
এখানে গোপন চোর ধরার ধুলায়—
করে সে বিষম চুরি যখন ভুলায়।
যদি ব্যথাহীন কাল
বিনাশের ফেলে জাল,
বিরহের স্মৃতি লয় হরি।
সব চেয়ে সে ক্ষতিরে ডরি।।
তাই বলি দীর্ঘ আয়ু দীর্ঘ অভিশাপ,
বিচ্ছেদের তাপ নাশে সেই বড়ো তাপ।
অনেক হারাতে হয়
তারেও করিনে ভয়;
যতদিন ব্যথা রহে বাকি,
তার বেশি যেন নাহি থাকি।।

(শেষ)

সত্যকুমার মুখোপাধ্যায়ের পুত্র সঞ্জীব-কুমার মুখোপাধ্যায়ের কাছে শোনা, তাঁর চোখে দেখা।

মৃত্যু ১৯৩৪ সালের ২৫শে আগস্ট, রাত ১-৪৫ মিনিট।

মৃত্যুঞ্জয় বিদ্যালঙ্কার

শ্রীবিক্রমাদিত্যের পর এই হিন্দুস্থানে পর্যন্ত গুণেতে আকবর শাহের সমান আর কেহ হন নাই। পরে ইহার বিষয়ে প্রামাণিক লোকেদের প্রমুখাৎ আর ক কথা শ্রুত আছে, তাহার এক কথা থ।

প্রয়াগতীর্থে শ্রীমুকুন্দ নামে এক চারী থাকিতেন, তাঁহার নিত্যসেবাকারী ভক্ত এক ব্রাহ্মণ তাঁহার নিকটে তেন, ঐ ব্রহ্মচারী নিত্য যোগ করিতেন তু যোগ সিদ্ধ হয় নাই, এমন কালে এক ন দুগ্ধপান করিয়াছিলেন, তাহাতে লোম ছিল, তিনি সেই গো-লোম ত দুগ্ধ পান করিয়া বসিয়া ন, ইতিমধ্যে তাহার অন্তঃ-ণর বিকার হইয়া সাংসারিক ভোগা-ষ মুহুর্মুহু হইতে লাগিল, ইহাতে ভাবিত হইয়া মনে মনে চনা করিয়া জানিলেন যে, আমি লোম খাইয়াছি, তৎপ্রযুক্ত আমার মনে র হইয়া ভোগাভিলাষ হইল, অতএব র এ শরীর রাখা কর্তব্য নহে। এই র করিয়া বাঞ্ছাবটকে আলিঙ্গন দিয়া জ্ঞানেচ্ছাতে প্রয়াগতীর্থে দেহত্যাগ লেন। তদনন্তর তাহার ঐ ভক্ত ব্রাহ্মণও গ্যাগ করিল, এই মুকুন্দ নামে ব্রহ্মচারী বর নামে বাদশাহ হইলেন, ঐ ভক্ত ণ বীরবর নামে তাঁহার সভাসদ হইল, ঐ আকবর আপনি প্রকাশ করিয়া-ন, অতএব তিনি জাতিস্মরও ছিলেন, হেতু পাছে অন্য কেহ এই প্রকার করিয়া য় হয় এই শঙ্কাতে ঐ বাঞ্ছাবটে শিহা ইয়া পাথরে গাঁথাইয়া দিয়াছেন।

আর ইহার আবিষ্কারের শেষে কালা-ড় নামে এক যবন হইয়াছিলেন, তিনি ষোঢ়াসিদ্ধিতে সিদ্ধ এক ব্রাহ্মণ ন, বাংলার এক বাদশাহ তাঁহার সহিত কন্যার বিবাহ দিয়া যবন করিয়া-ন, তিনি ঐ সিদ্ধিবলে প্রধান দেব-া ব্যতিরেকে যে দেবপ্রতিমাকে প্রণাম ন, সে প্রতিমা হত্য হইল। এইরূপ যবন হওয়াতে দেবতাদের উপর শ করিয়া অনেক দেবপ্রতিমা নষ্ট জগন্নাথে আসিয়া তথাকার রাজা দদেবের হাতে মারা গেলেন। শেষে নিকটে মন্ত্রী ও পণ্ডিত প্রভৃতি উত্তম যে যে ছিল, তাঁহারা ক্রমে ক্রমে মরিল, পশ্চাৎ বাদশাহও মূর্ছা ত মরিলেন। ইহার বাদশাহী সর্ব-৫১।২৯ দিন। আর কোনহ রাখে ৫৬ বৎ লিখে। ইহার কারণ এই ার প্রথমাবস্থাতে বয়রম খাঁ খানখানা ছিলেন, তিনিই রাজ্য ব্যাপার করিতে লাগিলেন, ইহাতেই কেহ ঐ সময় হইতে ইহার বাদশাহী ৫২।২৯ দিন লিখে, কেহ বা পূর্ব হইতে ৫৬ বৎসর লিখে।

তাহার পর তাঁহার পুত্র নূরুদ্দিন মহম্মদ জাহাঙ্গির বাদশাহ হইলেন, তিনি কিছু অনবস্থিত-চিত্তের মত ছিলেন, ইনি যে মহাপুরুষের প্রসাদে জাত হইয়াছিলেন সেই মহাপুরুষ আকবরকে আজ্ঞা করিয়া-ছিলেন যে, তোমার হিন্দু রাণীর গর্ভে যে পুত্র হইবে তিনি কিছু অনবস্থিত-চিত্তের মত হইলে ইহাতে তুমি তাঁহার প্রতি কখনও বিরক্ত হইবে না, সেই বাদশাহ হবে। ইনি ১০১৪ হিজরির সনে আকবরাবাদের কিল্লাতে তক্তে বসিয়া পিতৃশাসিত সকল দেশের প্রজাদের প্রতিপালন করিতে লাগিলেন। হিন্দু রাজার এক কন্যা আনাইয়া পিতার জীবদ্দশাতে বিবাহ করিয়াছিলেন। ঐ রাণীর গর্ভে শাহজাদা নামে ইহার পুত্র আকবরের বর্তমানে জন্মিয়া ছিল, ইনি প্রায় হিন্দুদের মত বেশভূষা ধারণ করিতেন। ইহার মাতা স্নেহপ্রযুক্ত ইহার কর্ণবেধ করাইয়া কুন্ডল পরাইয়া ছিলেন, তাহাতেই ইনি কুণ্ডল ধারণ করিয়া তক্তে প্রায় বসিতেন। কিছুদিনের পর বাংলাতে শেরবারগণ খাঁ নামে এক ওমরা ছিল, সে ইহার বাদশাহীর সময়ে মারা গেল, তাহার স্ত্রী অতি বড় সুন্দর ও অতি বড় গুণবতী, পণ্ডিতা, কবি, বুদ্ধিমতী ও বিবেচিকা ছিলেন, অতএব ঐ স্ত্রীকে আনাইয়া জাহাঙ্গির নিকা করিলেন। ঐ স্ত্রীতে জাহাঙ্গির বাদশাহ দিনে দিনে অতিশয় আসক্ত হইলেন, তার পরে নূরজাঁহা নাম দিলেন। খোতবা ও সিক্কাতে ঐ নাম আপন নামের সহিত জারি করিলেন। নূর-জাঁহা বেগমকে একদিন আজ্ঞা করিলেন যে, ন্যায় ব্যতিরেকে বাদশাহীর যে কিছু বিষয় সে সকলি তোমার, কেবল আদ সের মাংস ও, এক সের মরিদা তুমি আমাকে নিত্য দিবা। নূরজাঁহা দরিদ্র, কাঙ্গালী ও ফকির-দিগকে অনেক ধন দিতেন ও অবিবাহিতা অনেক কন্যাদের বিবাহ বড় ঘটাতে দিতেন, শাহজাঁহাও এমন পিতৃভক্ত ছিলেন যে, এ ব্যাপারেতেও পিতার প্রতি কোনমতে বিরক্ত না হইয়া সর্বদা সর্বতোভাবে পিতাতে বড়ই অনুরক্ত থাকিতেন ও পিতৃ-আজ্ঞাতে আর আর অনেক দেশ আয়ত্ত করিলেন, যখন রাণার দেশ জয় করিয়া শাহজাঁহা আসিলেন তখন জাহাঙ্গির বাদশাহ অনুবর্জিয়া পুত্রকে আনিয়া পুত্রস্নেহে ও পুত্রের জয়েতে স্নেহার্দ্রচিত্ত চিত্ত হইয়া পুত্রকে আপন ক্রোড়ে বসাইয়া অনেক ধন বিতরণ করিলেন ও অনেক বহুমূল্য রত্ন পুত্রের নিছোনি করিয়া ছিলেন এবং অনেক বহুমূল্য রত্নেতে পুত্রের সম্মান করিলেন ও পুত্রের সঙ্গে যে যে ওমরারা গিয়াছিল তাহাদেরও প্রত্যেকে উপযুক্ত মত খিলাত ও নানা প্রকার রত্নাদি দিয়া পুরস্কার করিলেন। এবং আপন নিকটস্থ প্রধান প্রধান ওমরাদিগকে আজ্ঞা দিয়া আপন নিকটেই পুত্রকে নজর দেওয়াইলেন এবং নূরজাঁহাও অনেক ধন বিতরণ করিয়া নানাপ্রকার রত্নাদি সামগ্রী শাহজাঁহার নিকটে নজর পাঠাইয়া দিলেন। জাহাঙ্গির বাদশাহ যথার্থ ন্যায় করিতেন, তাহাতে কাহারও উপরোধ করিতেন না। এক দিবস শাহজাঁহা বাদশাহজাদা ঘোড়ার উপর চড়িয়া মৃগয়া করিতে গিয়াছিলেন, তাঁহার আসিবার কালে এক পুত্রাবন্ধ্যা এক স্ত্রীর পুত্র অশ্বের পদাঘাতে নষ্ট হইয়াছিল, তাহাতে ঐ বৃদ্ধা স্ত্রী আপন মৃত পুত্রকে ক্রোড়ে করিয়া কান্দিতে কান্দিতে বাদশাহের নিকটে আসিয়া পুত্রকে বাদশাহের সাক্ষাৎ ফেলিয়া দিয়া নিবেদন করিল যে, আমার পুত্রকে কে মারিল, ইহা বিবেচনা করিয়া যথার্থ দণ্ড করুন, ইহাতে বাদশাহ অনু-সন্ধান করিয়া বুঝিলেন যে, শাহজাঁহা বাদশাহজাদার ঘোড়ার পদাঘাতে মরিয়াছে, অতএব ঐ বাদশাহজাদাকে আনাইয়া ঐ বৃদ্ধা স্ত্রীকে দিলেন ও আজ্ঞা করিলেন তোমার পুত্র ইহা হইতে নষ্ট হইয়াছে। অতএব ইহাকে আমি তোমাকে দিলাম, যাহা মনে হয়, তাহাই কর। ইহাতে ঐ বন্ধ্যা স্ত্রী রাণীর ও আর আর বেগমদের নানা প্রকার লোভ প্রদর্শন না মানিয়া আপন কুটিরে নিকটে ঘরে রাস্তার ওপরে বাদশাহজাদাকে আনিয়া বসাইল। শাহজাঁহাও এমত পিতৃভক্ত

পুরনো পাতা

'হোম' থেকে আগত সিভিলিয়ানদের এদেশী ভাষা ও সাহিত্য শিক্ষার জন্য ফোর্ট উইলিয়াম কলেজের প্রতিষ্ঠা। উইলিঅম কেরী ছিলেন অধ্যক্ষ। তিনি দেশীয় ভাষায় পাঠ্য-পুস্তক রচনার জন্য যে সমস্ত ব্যক্তি-দের নিয়োগ করেছিলেন তাঁদের মধ্যে মৃত্যুঞ্জয় বিদ্যালঙ্কারের নাম বিশেষভাবে স্মরণযোগ্য। তিনি বত্রিশ সিংহাসন (১৮০২ খৃঃ) হিতোপদেশ (১৮০৮ খৃঃ), রাজাবলি (১৮০৮ খৃঃ) প্রবোধচন্দ্রিকা (১৮৩৩ খৃঃ) রচনা করেন। যখন ইতিহাসের উপাদান সংগ্রহ ছিল একান্তই কঠিন, ঠিক সেই সময়েই মৃত্যুঞ্জয়ের 'রাজাবলি' রচনা নিঃসন্দেহে দুঃসাহসিক কাজ। ভারতের এই রাজনৈতিক ইতিহাসে মুসলমান যুগের কথা বর্ণনা করা হয়েছে সংস্কৃতাশ্রিত বাংলা ভাষায়। ইংরেজ যুগের পূর্ববর্তীকালের ইতিহাস রচনা ছিল কঠিন ব্যাপার। হিন্দু যুগের ইতিহাস রচনায় তিনি সংস্কৃত ও পুরাণ গ্রন্থাদির সাহায্য পেলেও মুসলমান যুগের ইতিহাস রচনায় তাঁকে জনশ্রুতির ওপর নির্ভর করতে হয়েছিল। মুসলমান ঐতিহাসিকদের বিবরণ থেকে উপাদান সংগ্রহ করেছিলেন কিনা সন্দেহ।

ছিলেন যে, পিতৃ আজ্ঞা রক্ষার্থ ঐ বৃদ্ধা স্ত্রী আপন মৃত পুত্রের চারিদিকে শাহজাঁহার হাত ধরিয়া সাত বার ফিরাইয়া কহিল যে, যা, আমার এই মৃত পুত্রের নিছোনি করিয়া তোকে তোর প্রাণ দিলাম। পরে আর এক দিবস যে নূরজাঁহা বেগমেতে বাদশাহ এত আসক্ত ছিলেন, ঐ নূরজাঁহা বেগমের সহোদর ভ্রাতা কোনহ এক স্ত্রীকে বলাৎকার করিয়াছিল। বাদশাহ বিচারাসনে বসিয়া ঐ বিষয়ের ন্যায় করিয়া নূরজাঁহা বেগমের নিকটে গিয়া পোঁহুছিলেন। নূরজাঁহা বেগম নজর হাতে লইয়া বাদশাহের সাক্ষাৎ আসিয়া দাঁড়াইলেন। বাদশাহ আজ্ঞা করিলেন যে, এ কিসের নজর? নূরজাঁহা বেগম নিবেদন করিলেন, আপনি যে যথার্থ ন্যায় করিয়াছেন, তাহাতে আমার যে আনন্দ হইয়াছে তাহারি নজর। বাদশাহ আজ্ঞা করিলেন ভাল, আজি যদি তোমার এই আনন্দ না হইত তবে আজি তোমাকেও তোমার ভ্রাতার সঙ্গী করিতাম। পরে পুরাণা দিল্লীতে ব্রাহ্মণাদি হিন্দু লোকেরা অনেক বাস করিতেন। তাহারা বাদশাহের চাকরি করিতেন না, আর কখনও কোন বিবাদ করিয়া বাদশাহের নিকটে ফরিয়াদ করিতে আসিতেন না, আপনারাই সমজ্ঞস করিতেন। দৈবাৎ তাহাদের মধ্যে কোনহ এক স্ত্রী- পুরুষের ব্যভিচার প্রকাশ হইল, ইহাতে ঐ স্ত্রীর কর্তা ঐ স্ত্রীকে মারিয়া ফেলিল ও ঐ পুরুষের কর্তা ঐ পুরুষকে মারিয়া ফেলিলে তথাকার ফৌজদার ঐ বিষয়ের অনুমান করিয়া তাহাদের নিকটে লোক পাঠাইল। ইহাতে ঐ বিশিষ্ট লোকেরা বাদশাহের নিকটে আসিয়া নিবেদন করিল যে, আমাদের পূর্বাপর এই রীতি আছে যে, আমাদের মধ্যে কাহারও ঘরে যদ্যপি কোন বিরোধ কিম্বা মন্দ ক্রিয়া দৈবাৎ হয় তবে তাহার প্রতিকার আমরা বিবেচনাপূর্বক আপনারাই করি, সে কথা রাজদ্বারে প্রকাশ করাতে আমাদিগের মর্যাদার হানি হয়, এ কারণ এ বিষয় আমরা রাজদ্বারে প্রকাশ করি নাই কিন্তু তথাকার ফৌজদার আপনা হইতে এই বিষয়ের অনুসন্ধান করিয়া আমাদিগের নিকটে লোক পাঠাইয়া দিয়াছেন। বাদশাহ তাহাদের কথার দ্বারা বিশিষ্ট বিষয় জানিয়া তাহাদের সম্মান করিয়া সকল বিষয় তাহাদেরই অধীন করিয়া দিয়া তাহাদিগকে রাজশাসনের বহির্ভূত করিয়া বিদায় করিলেন, ইনি যখন বিচার করিতেন তখন অর্থি-প্রত্যর্থির কথা আপনি সাক্ষাৎ শুনিতেন, কখন কাহারও দ্বারায় শুনিতেন না। ইহাদের এইরূপে বিচারেতে দেশে দেশে বড় প্রতাপ হইল, প্রায় দেশ বিবাদরহিত হইল, যদি কখনও দৈবাৎ কোথাও বিবাদ হইত, তবে সে বিবাদ আপনাতেই সমজ্ঞস হইত, বাদশাহের সাক্ষাৎ প্রায় আসিত না, আর ইনি বন্য-ব্যাঘ্রদিগকে আনাইয়া আপন সাক্ষাৎ ছাড়িয়া দিতেন, তাহাতে যদি কেহ কহিত আপনি এ কি করেন, এ ব্যাঘ্রজাতি হিংস্র স্বভাব, না জানি কখন কি করে। ইহাতে আজ্ঞা করিতেন যে, আমি কি কেবল মনুষ্যদের রাজা, ইহাদের কি রাজা নহি। বস্তুত সে বন্য ব্যাঘ্রেরাও বাদশাহের নিকটে নতমস্তক হইয়া থাকিত। আর ইহার তক্তের উভয় পার্শ্বে সোহনা ও মোহনা নামে দুই শূকর থাকিত; যদি কোনহ মুসলমান কহিত যে, এরূপ মহম্মদি দীনের ধর্ম নহে, আপনি এ কি করেন, বাদশাহ আজ্ঞা করিতেন, সে বস্তুত বটে, আমি তাহা জানি। কিন্তু মাতৃকুলের ধর্ম প্রতিপালনার্থে এই দুই শূকরকে কেবল আপনি নিকটে রাখি ও পিতৃকুলধর্মরক্ষার্থে ভক্ষণ করি না। ইহার অধিকারের সময় অবধি বাদশাহী সিংহাসনের সম্মুখে ওমরাহদের বসিবার বারণ হইয়া দাঁড়াইয়া থাকিবার প্রথা হইল। নূরুদ্দিন মহম্মদ জাঁহাঙ্গির শাহ বাদশাহের এইরূপ অনেক প্রকার কথা প্রসিদ্ধ আছে। ইনি রোগগ্রস্ত হইয়া মরেন, ইহার বাদশাহী সর্বশুদ্ধ ২২ বৎসর। তাহার পর তাঁহার পুত্র শাহাবুদ্দিন মহম্মদ শাহজাঁহা বাদশাহ হইলেন, ইহার বাল্যাবস্থাতে খোরম নাম ছিল, আকবরাবাদের কিল্লাতে ইনি জলুস করিলেন এবং ইনি পিতৃ বর্তমানে আপন বাহুবলে অনেক অনেক দেশও সুশাসিত করিয়াছিলেন, তৎপ্রযুক্ত সে সময়েও প্রতাপান্বিত ছিলেন, বাদশাহ হইলে পর ততোধিক দোর্দণ্ডপ্রতাপশালী হইলেন, ইহার মহম্মদী মতে কিছু তাৎপর্য ছিল, ইনি বাদশাহ হইয়াই আপন সন্তান ব্যতিরেকে হিন্দুস্থানকৃত স্বকীয় বংশের সমূলে বিনাশ করিলেন। এক প্রধান পণ্ডিতকে আনাইয়া মন্ত্রী করিলেন। তাঁহার নাম সাদুল্লা খাঁ, সে কোনহ ওমরার সন্তান ছিল না, কিন্তু পাণ্ডিত্যেতে ও নানা গুণেতে মনুষ্যত্বাপন্ন হইতে যে যে উপযুক্ত হয় সে সকলেতে সম্পূর্ণ ছিল, আর আর সকল মন্ত্রিমধ্যে ও ওমরাদের মধ্যে ইনি প্রধান ছিলেন এবং রাজকীয় যাবৎ ব্যাপার সকলি ইহার পরামর্শের অধীনে ছিল। ইনি মন্ত্রী হইলে পর অতিজীর্ণ ও মলিন পূর্বাবস্থার আপনার পরিধেয় বস্ত্র অতি যত্নপূর্বক এক সিন্দুকের মধ্যে রাখিয়াছিলেন, যখন বাদশাহের সম্মুখে যাইতেন তখন ঐ বস্ত্র অবলোকন করিয়া যাইতেন, ইহাতে আর আর ওমরারা ও মন্ত্রিরা বাদশাহের নিকটে নিবেদন করিল যে, সাদুল্লা খাঁ যখন সাক্ষাৎ আইসেন তখন এক সিন্দুকের মধ্যে কি আছে তাহাই দেখিয়া আইসেন, ইহাতে বুঝি সাক্ষাৎ হইতে তাহার প্রতি উত্তরোত্তর যে অধিক অনুগ্রহ হইতেছে তাহার কারণ এই হইবে। ইহাতে বাদশাহ ঈষৎ সন্দিগ্ধ হইয়া লোক দ্বারা ঐ সিন্দুক সাক্ষাৎ আনাইয়া দেখিলেন যে, কয়েকখানি জীর্ণ বস্ত্র মাত্র আছে। আজ্ঞা করিলেন সাদুল্লা খাঁ এ কি? সাদুল্লা খাঁ নিবেদন করিল, এ আমার পূর্বাবস্থার স্মারক। বাদশাহ আজ্ঞা করিলেন ফল কি? সাদুল্লা খাঁ নিবেদন করিল, রাজপ্রাসাদজন্য মত্ততার অঙ্কুশ-স্বরূপ, কেননা পুরুষ বিষয়মদে মত্ত হইলে অপ্রকৃতিস্থ হয়, অপ্রকৃতিস্থ হইলে কর্তব্যাকর্তব্য গ্রাহ্য থাকে না, কর্তব্যাকর্তব্য গ্রাহ্য না থাকিলে সর্বনাশ হয়, অতএব উত্তম পুরুষের এই কর্তব্য ঈশ্বরেচ্ছা প্রযুক্ত ভালই হউক কিম্বা মন্দই হউক তাহাতে মত্ত ও বিষণ্ণ না হইয়া সর্বদা আপনার স্বরূপ-স্মরণ ত্যাগ করিবে না। ইহাতে বাদশাহ সাদুল্লা খাঁর প্রতি অত্যন্ত সন্তুষ্ট হইয়া ঈশ্বরের ধন্যবাদ করিয়া আজ্ঞা করিলেন, তোমার যে উত্তমত্ব জানিয়া আমি তোমাকে মন্ত্রিপদাভিষিক্ত করিয়াছি আজি সে উত্তমতা বরং ততোধিক উত্তমতার ইহা হইতে বিলক্ষণ মতে লোকতঃ প্রকাশ হইল। আর শাহজাঁদা দিল্লীর প্রান্তে ক এক কোটি টাকা খরচ করিয়া অতি বড় এক সহর ও ' কিল্লা আবাদ করিয়া তাহার নাম শাহজাহানাবাদ রাখিলেন। পরে ক এক কোটী টাকা খরচ করিয়া এক রত্নময় সিংহাসন প্রস্তুত করিয়া তাহার নাম তক্ত তাউসী রাখিয়া ঐ কিল্লাতে ঐ সিংহাসনে বসিলেন। পরে ঐ কিল্লাতে দেওয়ান খাসের দ্বারের জালী ও বহিঃ প্রকোষ্ঠের কাঠরা ও ছাত মড়াইতে ক এক কোটি টাকার রূপা ও সোনা লাগাইয়াছিলেন এবং আর আর প্রধান প্রধান প্রাসাদের নির্মাণেতে সঙ্গতরমর ও সঙ্গমুসা ও সঙ্গ বাদল ও সঙ্গএসম ও ঘকীকও ও ফীরোজা প্রভৃতি নানা জাতীয় ও নানাবর্ণ প্রস্তর ও সোনা রূপা ও নানাপ্রকার রত্ন যথোপযুক্ত স্থানে বিনিবেশিত করিয়াছিলেন এবং আপন খুশির ছলেতে কেবল গরীব গোবরাদের প্রতিপালনার্থে প্রায় আপনার খুসির মজলিসে কোনহ খুসিতে ১০,০০০০০ লক্ষ, কাহাতে ২০,০০০০০ লক্ষ ও কাহাতেও ২৫,০০০০০ লক্ষ টাকা খরচ করিতেন। এই বাদশাহ অতি বড় দাতা ছিলেন শাহজাহানাবাদে আপনি আর প্রতি-সুবাদে বাদশাহের প্রতিনিধিরূপে সুবেদারেরা স্বর্ণ ও রৌপ্যাদি তৈজসের ও ব্রীহি যবাদি সামগ্রীর মাসে মাসে দুই তুল দান করিতেন। ইনি ধর্মনিষ্ঠ বড় ছিলেন, পিতার সাক্ষাৎ সুরাপান ত্যাগ করিয়া তিন লক্ষ টাকার রত্নাদি নির্মিত পানপাত্র সকল দরিদ্রাদিগকে বিতরণ করিয়া দিয়াছিলেন তদবধি আপন জীবদ্দশা পর্যন্ত কখনও সুরাপান করেন নাই, আর ইনি যথাকালে রাজকীয় ব্যাপার করিয়া ঈশ্বরপর হইয়া থাকিতেন, প্রাতঃকালে প্রাতঃকৃত্য সকল সমাপন করিয়া তসবি জপিতে জপিতে কিরণ নামে এক অলঙ্কার মুখের পার্শ্বে ধারণ করিয়া দর্শনি ঝরকা নামে এক গবাক্ষ দ্বারে আসিয়া নিত্য বসিতেন, যেখানে বাহিরে কানা, খোঁড়া, নুলা ও আতুরাদি দরিদ্রেরা একত্র হইয়া থাকিত, তাহাদিগকে সেই সময় স্বর্ণ রৌপ্যাদি দানেতে পরিতোষ করিতেন, দুই প্রহরের পর শাহ জাঁহানাবাদে যেখানে যে বুভুক্ষিত লোক থাকিত তাহাদের নিকটে খানখানা পাঠাইয়া পশ্চাৎ আপনি খানা খাইতেন, এই মত দুই প্রহর রাত্রি করিতেন। ইহার অধিকারের সময়ে প্রজারা ও ওমরা সকলে বড় সুখী ছিল, আর ইহার তাজমহল বেগমের গর্ভজাত চারি পুত্র ও তিন কন্যা ছিলেন, পরে ঐ তাজমহল বেগম কিছুদিনের পর মরিলেন, তাহাতে শাহজাঁহা বাদশাহ অত্যন্ত দুঃখিত হইয়া প্রায় অনেক রাজভোগ ত্যাগ করিলেন ও ঐ বেগমের যত ধন ছিল সে সকল ধন তাঁহার সন্তানদিগকে

করিয়া দিলেন, ও ঐ বেগমের এক কিছু অধিক কোটি টাকাতে তৈয়ার দিলেন, ঐ মকবরার রোজা তাজমলুক রাখিলেন, তথাকার কোরাণখানি ও বাঁটা প্রভৃতি খরচের কারণ প্রত্যহ হাজার টাকা নির্বন্ধ করিয়া দিলেন। াহজাঁহা বাদশাহের অন্যান্য দেশে াম হইল যে, ঈরাণ ও তুরাণের বাদ- ইহা হইতে সশমতক হইয়া প্রায় ম্বারা প্রতি বৎসর উপঢৌকন সামগ্রী তন এবং বক্ষ প্রভৃতি কএক দেশের হরা ইহার নিকুটে আসিয়া শরণাপন্ন স্ব স্ব দেশে নিঃশঙ্ক হইয়া বাদশাহী লাগিলেন, পরে বাদশাহ আপন পুত্রের মধ্যে আরঙ্গজেবকে দাক্ষণ অধিকার দিলেন, শাহ সুজাকে পূর্ব অধিকার দিলেন, মহম্মদ মুরাদকে ট প্রভৃতি দেশের অধিকার দিলেন, াপন জ্যেষ্ঠ পুত্র দারাসিকোকে অত্যন্ত করিতেন অতএব তাঁহাকে যুবরাজ আপন নিকটে রাখিলেন, কিছু- পরে বাদশাহ মূর্ছা রোগগ্রস্ত , ইহাতে অন্য অন্য দেশে গিয়াছিলেন রো তাহারা সকলে এ বার্তা শুনিয়া বিরোধ করিয়া শাহসুজা আসাম পর্যন্ত পলায়ন করিলেন। মহম্মদ দারা- ঈরাণ পর্যন্ত পলায়ন করিয়া যাইতে- , পথিমধ্যে মরিলেন, মহম্মদ মুরাদও গেলেন, আরঙ্গজেব রাজধানীতে া পিতাকে কয়েদ করিয়া আপনি তক্তে ন। শাহবুদ্দিন মহম্মদ শাহজাঁদা য়দে মরিলেন, ইহার বাদশাহী সর্ব- ৩১।৩।২০ দিন।

াহার পর মহিউদ্দিন মহম্মদ আরঙ্গজেব গীর বাদশাহ হন, ইঁহার পিতৃ নে এক জলুস পিতার মৃত্যুর পর এক জলুস ১০৬৮ হিজরি সনে হয়; মহম্মদীতে অতি বড় তৎপর হইলেন। প্রধান প্রধান অনেক দেবস্থান নষ্ট লন, হিন্দুদের মতে সূর্যার্ঘ্য ও গণেশ দি দেবকৃত্ত সকল বাদশাহী কিল্লার আকবর অবধি নিয়মিত ছিল সে সকল বারণ করিলেন আকবর অবধি যে আইন ছিল, সে সকল আইনের মধ্যে অনেক া করিয়া স্বকপোল রচিত অনেক জারি করিলেন, দক্ষিণ দেশে যে যে শাসিত ছিল না সে সকল দেশের নর নিমিত্ত লোক পাঠাইলেন ও আপন পুত্র আজম শাহকে কাশ্মীর প্রভৃতি র অধিকার দিলেন। পরে ঈরাণ তুরাণ ও বোখারা ও মিসর ও কাসগর ও বসরা সকল দেশের বাদশাহদের ঔকিলেরা সে দেশের উত্তম উত্তম সামগ্রী ও মঙ্গল পত্র সমেত বাদশাহের সাক্ষাৎ আসিল, দিগকে যথোপযুক্ত সম্মান করিয়া কের প্রত্যুত্তর পত্র ও উত্তম সামগ্রী দিয়া র করিলেন। ঈরাণের বাদশাহের কিছু ব উপস্থিত হইয়াছিল তৎপ্রযুক্ত ঐ াহ সাহায্য চাহিয়াছিলেন, অতএব র সাহায্যার্থে অনেক সৈন্য পাঠাইয়া দিনের পর আপনিও তাহার র্থ্যার্থে যাইতেছিলেন, পথিমধ্যে শুনি- লেন যে, ঈরাণের বাদশাহের সহিত যে উপদ্রব করিয়াছিল সে রোগে মরিয়াছে, ইহা শুনিয়া পথ হইতে ফিরিয়া আসিলেন। পরে দক্ষিণ দেশের বিজানগরের হাকিম আদলশাহ কিছু কিছু পেশকোষ বরাবর ইহাদিগকে দিত, তিনি তাহা দিলেন না, অতএব অনেক সৈন্য সহিত রাজা জয়সিংহ রায়কে তাহার দমনার্থে পাঠাইলেন, তিনি তথায় গিয়া তাহাকে যুদ্ধে পরাস্ত করিয়া তাহার দেশ সকল আয়ত্ত করিয়া গড়সেতার প্রভৃতি অনেক গড় অধিকার করিয়া আসিলেন পরে গুলকণ্ডার হাকিম আবুল হোসেন খাঁ তানাশাহ বাদশাহের জ্যেষ্ঠ পুত্র মহম্মদ মাহম বাহাদুর শাহের সহিত আপন কন্যার বিবাহ দিয়া স্বদেশে উপযুক্ত মত রাখিয়াছিলেন, পরে ঐ তানাশাহ আলমগীর বাদশাহ হইতে কিছু বিমনা হইল, তৎপরে আলমগীর আপন পুত্র-পুত্রবধূকে কোন ছলে আপন নিকটে আনাইয়া তাহাদিগকে কয়েদ করিয়া আপনি সসৈন্য গুলকণ্ডাতে গিয়া তানাশাহকে যুদ্ধে পরাস্ত করিয়া গুলকণ্ডা গড়সমেত তাহার দেশ সকল অধিকার করিয়া স্বস্থানে আইলেন, এইমতে দক্ষিণ দেশীয় বাদশাহদের দেশ ও গড় সকল অধিকার করিয়া ও যথেষ্ট নানা প্রকার রত্নাদি ধন পাইয়া সর্বশুদ্ধ ২২ সুবা ক্রান্ত করিলেন, সেই ২২ সুবার বিবরণ এই। দক্ষিণে নয় সুবা, উত্তরে এক সুবা, পূর্বে তিন সুবা, পশ্চিমে আট সুবা ও সাহ- জাহানবাদে এক সুবা। ইহাতে আলমগীর বাদশাহের অতি বড় প্রতাপ ও ঐশ্বর্য হইল, প্রায় রাজা বিক্রমাদিত্যের পর এমন ঐশ্বর্য ও প্রতাপ কোনহ দিল্লীর রাজার হয় নাই, নিত্য মিলোথানাতে সসজ্জ হইয়া ৫০ হাজার সওয়ার প্রাতঃকাল অবধি সন্ধ্যাকাল পর্যন্ত হাজির থাকিত, সন্ধ্যাবধি প্রাতঃকাল পর্যন্ত অন্য ৫০ হাজার এইরূপ নিত্য হাজির থাকিত। ইহার বালককালে মহিয়ুদ্দিন মহম্মদ নাম ছিল, পরে এক দিবস শাহজাঁহা বাদশাহ সেমহল্লার উপরে বসিয়া হস্তিযুদ্ধ দেখিতেছিলেন, ঐ দালানের দ্বিতীয় মহলে বসিয়া বাদশাহজাদারা কৌতুক দেখিতে- ছিলেন, এই কালে হস্তীসকল অতি মত্ত হইয়া বড় যুদ্ধ করিতে লাগিল, ইহাতে শাহজাঁহা বাদশাহ আপন জ্যেষ্ঠ পুত্র মহম্মদ দারাসিকোকে নিকটে ডাকিয়া লইলেন। মহিয়ুদ্দিন মহম্মদ বারান্দাতে দাঁড়াইয়া কৌতুক দেখিতেছিলেন, ইত্যবসরে এক মত্ত হস্তী হামলা করিয়া মহিয়ুদ্দিন মহম্মদকে শুঁড়ে জড়াইয়া লইল, তৎক্ষণে মহিয়ুদ্দিন মহম্মদ কিছু উপায় না পাইয়া কোমরে যে খঞ্জর ছিল, তাহা লইয়া ঐ হাতীর কণ্ঠদেশ বিদারণ করিয়া আপন প্রাণ রক্ষা করিলেন, তৎপ্রযুক্ত বাদশাহ অত্যন্ত তুষ্ট হইয়া আরঙ্গজেব খেতাব দিলেন। পরে বাদশাহ হইলেন ও আলমগীর নাম হইল, আর যখন এই আরঙ্গজেব দক্ষিণ দেশে গিয়াছিলেন তখন সৈন্য খরচের কারণ এক গুজরাটী মহাজন হইতে অনেক টাকা কর্জ লইয়াছিলেন, সে কর্জের তমসুক লেখা গেল, সেই তমসুকের খাতক বাদশাহ হইলেন, পূর্বে মহাজনের নামের নীচে খাতকের নাম লেখা যাইত, এই রীতি ছিল, বাদশাহের নাম নীচেতে লেখা উপযুক্ত নহে, অতএব এই তমসুকের খাতকের নাম মহা- জনের নামের উপরে লেখা গেল, তদবধি ফারসী তমসুক লেখার এই শৈলী হইল। আর তখন এমনি মহাজন সকল ছিল যে, এই মহাজন ঐ টাকার মধ্যে কেবল এই বাদ- শাহের জলুসি এক রকম কোটি টাকা দেয়। পরে জ্যেষ্ঠ পুত্র বাহাদুর শাহের প্রতি তুষ্ট হইয়া তাহার দোষ ক্ষমা করিয়া ১৪ বৎসর পর তাহাকে কয়েদ হইতে খালাস করিয়া কাবোল দেশের অধিকার দিলেন ও মধ্যম পুত্র আজমশাহকে দক্ষিণ দেশের অধিকার দিলেন। পরে জ্যেষ্ঠ পুত্রের পুত্র মহম্মদ ময়ীউদ্দিন ও আজিমুদ্দিন নামে দুই পৌত্রকে পাটনা ও কোরা এই দুই দেশের অধিকার দিলেন, পরে কামবক্স নামে পুত্রকে বাংলার ও কিছু দক্ষিণ দেশ সহিত উড়িষ্যার অধিকার দিলেন। আজমশাহের পুত্র বেদার- বক্তকে মালুয়া ও খান্দোসের অধিকার দিলেন, এই এইরূপে পুত্র ও পৌত্রেরা যে যে দেশের অধিকার পাইলেন, সে সে দেশের বিলক্ষণ শাসন করিয়া বাদশাহের আজ্ঞারহমতে পরমসুখে থাকিলেন এবং আসদ খাঁ উজির ও জাফর খাঁ ওমিরল ওমরা ও রাজা রঘুনাথ নামে প্রধানমন্ত্রী প্রভৃতি হজুরি ওমরারা অন্যান্য দেশীয় বাদশাহেদের হইতে অধিক সুখে ছিলেন, এবং সুবেদাতেও যে যে ওমরারা ছিল, তাহারাও বড় সুখে ছিল। আর বাদশাহ প্রায় যোগ্যাভ্যাসে থাকিতেন ও তপস্বীর ন্যায় আচরণ করিতেন ও আপন পৈতৃক কয়েক বিঘা ভূমির করেতে যাহা পাইতেন, তাহাতেই গ্রাসাচ্ছাদন হইত, রাজভোগ কিছুই করিতেন না ও মদ্য মাংসাদি কিছুই খাইতেন না এবং সকল জিনিষের মাসুল বারণ করিয়াছিলেন ও কম্বলে শয়ন করিতেন ও সপেতে বসিতেন ও দেড় টাকার অধিক বস্ত্র পরিতেন না ও মহম্মদের ব্যবস্থার বিরুদ্ধে কিছু করিতেন না, ইনি ৪০ বৎসর বয়সে বাদশাহ হইয়া এই এইরূপ ব্যবহার করিতে লাগিলেন, কিন্তু পিতৃ বর্তমানে অনেক রাজভোগ করিয়াছিলেন। আর যখন তক্তে বসিতেন, তখনি কেবল রাজোপযুক্ত বস্ত্রভূষণ ধারণ করিতেন। পরে দক্ষিণ দেশের মারহাট্টারা বড়ই উপদ্রব করিতে লাগিল, ইহাতে বাদশাহ অনেক সৈন্য সহিত দক্ষিণ দেশে গিয়া ভিঁওরা নদীর তীরে ছাওনি করিলেন, ও বাদশাহ প্রায় তথায় থাকিতেন। এক দিবস মারহাট্টারা এমন যুদ্ধ করিল যে, তাহাতে বাদশাহেরও রক্ষা পাওয়া ভার হইল, তাহাতে তোপখানার ইংরাজেরা ব্যূহ রচনা করিয়া বাদশাহের প্রাণরক্ষা করিলেন। তাহাতে বাদশাহ সন্তুষ্ট হইয়া প্রধান প্রধান ইংরাজ- দিগকে উত্তম উত্তম পদ দিতে চাহিলেন। তাহারা সে সকল কিছুই না লইয়া কেবল এই কলিকাতাতে কিছু ভূমি লইলেন। এই ইংরাজবাহাদুরের এ হিন্দুস্থানে ভূমি সম্বন্ধের প্রথমাঙ্কুর হইল। তাহার পর বাদশাহ এক দিবস সৈন্যের মজুদাত হইলেন, তাহাতে অন্যান্য সৈন্যের কথা কি লিখিব, কেবল হাতী ৫০ হাজার হইল। ইহাতে

বাদশাহের মনে বড় অহঙ্কার হইল। সেই অহঙ্কার চূর্ণ করিতে ঈশ্বরেচ্ছা প্রযুক্ত ভিওরা নদীর এমন এক দহ পড়িল যে, তাহাতে প্রায় সকল সৈন্য নষ্ট হইল। ইনি প্রধান প্রধান অনেক দেবস্থানের ব্যাঘাত করিয়াছিলেন। কিন্তু জ্বালামুখি ও লচমনঝোলাতে বিলক্ষণ প্রতিফল পাইয়া তাহাদিগকে মানিয়া সেবার্থে অনেক টাকার ভূমি নিযুক্ত করিয়া দিয়াছিলেন।

পরে ঐ আওরঙ্গাবাদে ১২ বৎসর থাকিয়া এক ব্রাহ্মণের শাপে বিকৃত শব্দ করিতে করিতে মরিলেন। ইহার বাদশাহী ৪১ বৎসর। তাহার পর তাঁহার জ্যেষ্ঠ পুত্র বাহদুর শাহ দিল্লীতে বাদশাহ হইলেন। আজমশাহ প্রভৃতি ভ্রাতারা বাহাদুর শাহের সঙ্গে পিতার মরণের পর যুদ্ধেতে মারা গেলেন। বাহাদুর শাহ বাদশাহ হইলেন, ইনি স্ববিদ্যাতে বড় পণ্ডিত ও দাতা ছিলেন এবং পণ্ডিত ও কবিলোকদের সহিত সর্বদা আলাপ করিতেন। লাহোরে কোন কার্য-প্রযুক্ত গিয়াছিলেন। ইহার বাদশাহী ৫ বৎসর। তাহার পর তাঁহার পুত্র মযুদ্দিন জাহাদার শাহবাদশাহ হইয়া লাহোরের কিল্লাতে জলুস করিলেন ও জুলফকার খাঁকে উজির করাতে আর আর ওমরা সকল বাদশাহ হইতে মনে মনে বিরক্ত হইলেন। পরে পাটনার ও জৌনপুরের হাকিম হোসন আলি খাঁ ও হোসেন আলি খাঁ এই দুই ভ্রাতা বাদশাহের ভ্রাতৃপুত্র মহম্মদ ফররুখসিয়রকে আনাইয়া বাদশাহের সঙ্গে যুদ্ধ করিতে শাহজাহানাবাদে যাইতে উপস্থিত হইলেন। বাদশাহ এ বার্তা শুনিয়া লাহোর হইতে অতিত্বরাতে জুলফকার খাঁ মন্ত্রিকে সঙ্গে লইয়া প্রস্থান করিলেন। এলাহাবাদে উভয় পক্ষের যুদ্ধ হইল; সেই যুদ্ধে বাদশাহ ভগ্ন হইয়া দিল্লী গেলেন ও পাছে পাছে মহম্মদ ফররুখসিয়র সসৈন্য দিল্লী গিয়া বাদশাহকে উজির সহিত নষ্ট করিয়া আপনি বাদশাহ হইলেন।

জাহাদার শাহের বাদশাহী সর্বশুদ্ধ ৯ মাস। তাহার পর ফররুখসিয়র বাদশাহ হইয়া এই হোসেন আলি খাঁকে উজির করিলেন। আর ঐ হোসেন আলি খাঁকে ওমরিলওমরা করিলেন। তাঁহারা দুই ভাই এক পরামর্শ হইয়া বাদশাহকে মারিয়া ফেলিল, ইহার বাদশাহী ৭ বৎসর। তাহার পর ঐ দুই ভাই আপনাদের বাদশাহী হওয়াতে অন্য অন্য ওমরাদের হইতে সশঙ্ক হইয়া রফীয়দ্দরজাত নামে আলমগীরের প্রপৌত্রকে কএদ হইতে আনাইয়া বাদশাহ করিলেন। ইনি কিছুদিনের পর ক্রমে ক্রমে কিঞ্চিৎ প্রতাপ প্রকাশ করিতেই ঐ দুই ভ্রাতা ইঁহাকে কএদ করিল। ইনি সেই কএদেই মরিলেন। ইহার বাদশাহী ৩ মাস। পরে ঐ দুই ভ্রাতা পরামর্শ করিয়া রফীয়দ্দোলা নামে আর এক প্রপৌত্রকে কএদ হইতে আনাইয়া তক্তে বসাইয়া আপনারাই বাদশাহী করিতে লাগিল। পরে রফীয়দ্দোলা কিছু কিছু বাদশাহী জারী করাতে তাঁহাকে ঐ দুই ভ্রাতা মারিয়া ফেলিল। ইহার বাদশাহী ১ মাস। ঐ দুই ভ্রাতা এইরূপে রফীয়দ্দোলাকে মারিলে পর তাহাদের অন্তরঙ্গ লোকেরা কহিল যে, এরূপে বাদশাহজাদাদিগকে বাদশাহ করিয়া মারা হইতে বরং আপনারা বাদশাহ হউন সেও ভাল। এই মত অন্তরঙ্গলোকের কথাতে হোসেন আলি খাঁর বাদশাহ হইতে ইচ্ছা হইল। পরে এক দিবস শুভ সময় নিরূপণ করিয়া বাদশাহী পোশাক পরিয়া সিংহাসনের নিকটে আসিবামাত্র ভয়েতে মূর্ছিত হইয়া পড়িল।

পরে তাহার অন্তরঙ্গ লোকেরা তাহাকে উঠাইয়া লইয়া গেল। কিঞ্চিৎ পরে মূর্ছা-ভঙ্গ হইলে মোসাহেব লোকেরা জিজ্ঞাসা করিল যে, আপনি মূর্ছিত হইলেন কেন? হোসেন আলি খাঁ কহিল, আমি যখন তক্তের নিকটে গেলাম, তখন তীক্ষ্ন খড়্গহস্ত শূকরমুখাকৃতি বানরমুখাকৃতি এতদ্রূপ নানা-প্রকার ভীষণ মূর্তি দেখিতে পাইলাম, তৎ-প্রযুক্ত ভয়েতে মূর্ছিত হইলাম। পরে কয়েকদিনের পর মহম্মদশাহকে কএদ হইতে খালাস করিয়া তক্তে বসাইল। তিনি কয়েক-দিন তক্তে বসিয়াছেন। ইতিমধ্যে একদিবস হোসেন আলি খাঁকে কোন বিষয়ে কিছু আজ্ঞা করিলেন। ইহাতে হোসেন আলি খাঁ মনে মনে বিরক্ত হইয়া মহম্মদ শাহকে কোন ছলে একান্তে লইয়া গিয়া বড় চড় মারিল ও কহিল যে, আমি তোকে সেদিন বাদশাহ করিলাম, ইহারি মধ্যে তুই আমারি উপর হুকুম করিস্। যা আজ তোকে মাফ করিলাম, আর কখনও যদি এমত করিস, তবে প্রাণে মারিয়া ফেলিব। তদনন্তর বাদশাহ কাঁদিতে কাঁদিতে আপন মাতার নিকট গেলেন, তাঁহার মাতা তাঁহাকে সান্ত্বনা করিয়া সেইদিন অবধি তাঁহাকে আর বাহির হইতে দিলেন না, আর হোসেন আলি খাঁ প্রভৃতিকে কহিলেন, আমার পুত্র বালক, ইনি কি জানেন, ইনি অন্তঃপুরেই থাকুন, তোমরাই বাদশাহী ব্যাপার সকলেই কর। ইহাতে হোসেন আলি খাঁ প্রভৃতিরা বড় ভাগ হইল মনে মনে বুঝিয়া আপনারা বাদশাহী করিতে লাগিল। পরে হোসেন আলি খাঁ দক্ষিণে গেল, এই অবসরে মহম্মদ শাহের মাতা মহম্মদ আলি খাঁ ও চিকনিচ খাঁ নামে যে দুইজন পূর্বে ওমরা ছিল, তাহাদের সঙ্গে সাহিত্য করিয়া ঐ হোসেন আলি খাঁর কনিষ্ঠ ভ্রাতা হোসন আলি খাঁকে মারিয়া ফেলিল। পরে হোসেন আলি খাঁ এই বার্তা শুনিয়া ঐ বাদশাহকে নষ্ট করিয়া আর এক বাদশাহ করিতে মনে করিয়া ১,০০০,০০ লক্ষ সওয়ার ও আর আর অনেক প্রকার সৈন্য লইয়া দিল্লী আসিতে-ছিল, পথে মহারাজ জয়সিংহ তাহাকে যুদ্ধে নষ্ট করিলেন, তাহার পর সলতনৎ কাএম হইল। তখন মহম্মদশাহ নিষ্কণ্টক হইয়া রাজ্য ব্যাপার করিতে লাগিলেন ও মহম্মদ আমীর খাঁকে উজির করিলেন, আর চিক-নিচ খাঁকে নিজামুলমুল্ক আসফজা খেতাব দিয়া দক্ষিণে বিদায় করিলেন। ইঁহার সঙ্গে ৯,০০০,০০ লক্ষ সেনা থাকিত। পরে মহম্মদশাহ বাদশাহ জকরিয়া খাঁকে ৬০০০ হাজার মোগলসওয়ার সহিত সিন্ধুদেশের মোক্তিয়ার করিয়া বিদায় করিলেন ও মহারাজ জয়সিংহকে আকবরাবাদের সুবেদার করিলেন ও সাদৎ খাঁ জব, ছুনাকে অযোধ্যার সুবেদারী দিলেন। ঐ সময়ে সুজাওদ্দৌলা বাঙ্গালা ও উড়িষ্যার সুবেদার ছিলেন, তিনি অনেক খাজনা ও উপঢৌকন সামগ্রী বাদশাহের সাক্ষাৎ পাঠাইলেন। তাহাতে তাঁহার উপর বড় তুষ্ট হইয়া উড়িষ্যা ও বাঙ্গালা ও আজীমাবাদ—এই তিন সুবার মোক্তিয়ার করিলেন।

পরে বঙ্গাস পাঠানকে উপযুক্ত মর্যাদা ও মনসব খেদমৎ দিলেন ও আমির খাঁ প্রভৃতি নিকটস্থ ওমরাদিগকেও মনসব খেদমৎ দিলেন। এইরূপে রাজ্যের বন্দোবস্ত করিয়া পূর্ববৎ সলতনৎ কাএম করিয়া রাজ্য ব্যাপার করিতে লাগিলেন। কিছুদিন পরে আহম্মদ আমীর খাঁ উজির রোগে মরিলেন। পরে মহম্মদ শাহ বাদশাহ তাঁহার পুত্র কমরুদ্দিন খাঁকে পিতৃপদস্থ করিলেন, খাঁনদৌরা খাঁকে আমীরল ওমরা করিলেন। ইনি কিছু বেশবৎ লইতেন না। এই প্রযুক্ত ইহাকে এক কোটি টাকার জায়গীর দিলেন এবং বাদশাহের বড় প্রত্যয়-পাত্র হইলেন। প্রায় ইহারি কথামতে বাদশাহ রাজ্য ব্যাপার করিতেন। কিছুদিন এইরূপে গেলে পরে বাদশাহ মকরুদ্দিন খাঁ উজির দুইজনে বিহার, বিলাস, নৃত্য, গীত ও সুরাপান এই সকলেতে অত্যন্ত আসক্ত হইলেন ও রাজ্য ব্যাপারে মনোযোগ থাকিল না ও সুবে-জাতেতে সুবেদারেরাও অপদস্থ ও স্থানান্তর না হওয়াতে প্রায় স্ব স্ব প্রাধান্য ব্যবহার করিতে লাগিল এবং খাঁনদৌরা খাঁ রাজকার্যে অত্যন্ত প্রদীপ্ত হইতে লাগিল। ইহাতে মকরুদ্দিন খাঁ মন্ত্রী, যদ্যপি রাজ্যে কর্তৃত্ব ব্যবহার করিতেছিল, তথাপি মনে মনে কিঞ্চিৎ ভাবাপন্ন হইলেন। আর নিজামুল-মুল্ক পূর্বে বাদশাহের অধীনতা ব্যবহার যাহা করিত তাহার কিছু অন্যথা আচরণ করিল, তাহার এইরূপ ব্যবহারে তাহার প্রতি বাদশাহের কিছু চিত্তের বৈলক্ষণ্য হওয়াতে বাদশাহের নিকটস্থ নিজামুল্‌মুল্কের বিপক্ষ লোকেরা পুষ্টি করিতে লাগিল। ইহাতে বাদশাহের নিকট হইতে নিজামুলমুল্কের তলপ গেল। তাহাতে নিজামুল্‌মুল্ক আইল এবং বাদশাহীতে যেমন যেমন পূর্বাপর রীতি আছে, সেইমতে বাদশাহের সাক্ষাৎ গেল। বাদশাহও তাহার সহিত যেরূপ ব্যবহার করিলেন, তাহাতে বাহ্য সন্তোষ ও আন্তরিক রোষ প্রকাশ হইল, ইহাতে নিজামুল্‌মুল্ক তদ্রূপ হইয়া বাদশাহের নিকট হইতে বিদায় হইয়া দক্ষিণ দেশে স্বস্থানে গেলেন। কিছুদিনের পর নিজা-মুল্‌মুল্কের বাদশাহী সলতনতের প্রতি শৈথিল্য জানিয়া খোরাসান হইতে অনেক সৈন্যসমেত নাদরশাহ দিল্লীতে আসিয়া পৌঁছিল। ইহাতে খানদৌরা খাঁ আমীরল ওমরা অনেক সৈন্য লইয়া নাদরশাহের সহিত ঘোরতর রণ করিয়া প্রায় তাঁহাকে পরাস্ত করিয়া সন্ধ্যার সময়ে ডেরাতে আসিয়া নমাজ করিতেছিল, ইতিমধ্যে এক গুলী আসিয়া লাগিল তাহাতেই খানদৌরা খাঁর প্রাণবিয়োগ হইল। তাহার পর নাদিরশাহ শাহজাহানাবাদের কিল্লাতে আসিয়া পৌঁছু-ছিলেন, ইহাতে কএক ওমরা তৎক্ষণে

মর্যাদার খ্যাতিরা বিষ খাইয়া মরিল। তাহার পর নাদরশাহ সহরের স্থানে স্থানে আপন চৌকি বসাইলেন। পরে মহম্মদশাহ বাদশাহ আর কোন উপায় না পাইয়া মলকজমানিয়া নামে বাদশাহ বেগমের পরামর্শমতে কিল্লার বাহির হইয়া বাদশাহের সঙ্গে শিষ্টাচার করিয়া কেল্লার মধ্যে তাহাকে আনিয়া এক তক্তে দুইজনে বসিলেন এবং পরস্পর শিষ্টসম্ভাষও অনেক হইল। এইরূপে কএক দিন গেলে পর একদিন জুমা মসজিদে নমাজ পড়িয়া নাদরশাহ আসিতেছেন, ইত্যবসরে তাহার কর্ণমূলের নিকট হইয়া এক গুলী চলিয়া গেল, ইহাতে নাদরশাহ অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হইয়া কতলামের আজ্ঞা দিলেন। এই আজ্ঞামতে নাদরশাহের যত সৈন্য ছিল, সকলকেই কাটিতে আরম্ভ করিল। ইহাতে আবালবৃদ্ধবনিতা মনুষ্যজাতি ও হস্তিঘোটকাদি কুক্কুর বিড়াল পর্যন্ত পশুজাতি কাটা যাওয়াতে খণ্ডপ্রলয়ের ন্যায় এক প্রলয়বিশেষ হইল। তাহার পর মহম্মদ শাহ নাদরশাহের নিকটে আসিয়া প্রাণরক্ষার্থে প্রার্থনা করিলেন। তাহাতে নাদরশাহ ক্ষান্ত হইয়া কতলাম বারণের আজ্ঞা দিলেন. এ কতলাম সওয়া-দিন পর্যন্ত ছিল। তাহার পর মহম্মদশাহ বাদশাহের সহিত নাদরশাহের এই প্রতিজ্ঞা হইল যে, সকল দেশ তোমার ও মালসকল আমার এইরূপ প্রতিজ্ঞামতে আকবর অবধি যে দৌলৎ বাদশাহীতে এপর্যন্ত জমা হইয়াছিল, সে সমস্ত দৌলত লইয়া ইরাণে প্রস্থান করিলেন। কিছুদিনের পর আবদালী উপদ্রব করিতে লাগিল, তাহার দমনার্থে আপন পুত্র আহম্মদ শাহকে পাঠাইয়া আপনি রোগগ্রস্ত হইয়া মরিলেন। ইহারি বাদশাহীর সময়ে মহারাজ জয়সিংহ এক অশ্বমেধ যজ্ঞ করিয়াছিলেন। সেই অশ্বমেধ যজ্ঞে সর্বশুদ্ধ ৩৬,০০০০-০০০ কোটি টাকা খরচ হইয়াছিল। ইহার বাদশাহী ৩১ বৎসর। তাহার পর মহম্মদ শাহের পুত্র আহাম্মদ শাহ বাদশাহ হইলেন। ইনি পিতৃবর্তমানে সরহিন্দে আবদালির সহিত অতিবড় যুদ্ধ করিয়া সেই যুদ্ধে তাহাকে পরাস্ত করিয়া আসিতেছেন। পথে লাহোরে বাদশাহের মৃত্যুবার্তা পাইয়া প্রতিত্বরাতে আসিয়া শাহজাহানাবাদের কিল্লাতে জলুস করিলেন ও শুজাওদ্দোলার পিতা সফদরজঙ্গকে উজির করিলেন। ইহাতে আর আর ওমরালকল বাদশাহ হইতে বিরক্ত হইয়া সফদরজঙ্গের সহিত যুদ্ধ করিতে উপস্থিত হইল। ইহাতে বাদশাহ ঐ সফদরজঙ্গকেও জারত হইতে তগীর করিয়া সুবে অযোধ্যার মোক্তিয়ার করিয়া বিদায় করিলেন, পরে ইন্তেজামদ্দোলাকে উজির করিলেন। পরে গাজুদ্দিন খাঁ নামে নিজামুল্মুল্কের পৌত্র ঐ আহম্মদ শাহের সঙ্গে আবদালীর যুদ্ধকালে বড় যুদ্ধ করিয়াছিল এবং পূর্বপুরুষেরা উজির ছিল, ও আপনিও উজির হওয়ার উপযুক্ত ছিল কিন্তু বাদশাহ ইহাকে উজির করিলেন না। অতএব ঐ গাজুদ্দিন খাঁ মনে মনে ক্রুদ্ধ হইয়া বাদশাহের চক্ষুতে শিলাই ফিরাইয়া তাঁহাকে অন্ধ করিয়া কএদ করিল এবং ইন্তেজামদ্দোলা উজিরকে নষ্ট করিয়া তাহার যথাসর্বস্ব লুট করিয়া লইয়া তৎকালে ঐ গাজুদ্দিন খাঁ শাহ জাহানাবাদ সহরে আতঙ্ক্যাপক হইল। অহমদশাহ বাদশাহ ঐ কএদে নষ্ট হইলেন, ইহার বাদশাহী ৭ বৎসর। তাহার পর ঐ গাজুদ্দিন খাঁ বাহাদুর শাহের পৌত্র আজিমুদ্দিনকে কএদ হইতে খালাস করিয়া তক্তে বসাইয়া আপনি উজির হইল। ইহার জলুসীনাম আলমগীর সানি হইল। ঐ নাম সিক্কা ও খোসবাতে জারী হইল। এ বাদশাহ অত্যন্ত অযোগ্য ছিলেন এবং বৃদ্ধাবস্থাতেও দিবারাত্রি স্ত্রী লইয়া থাকিতেন। গাজুদ্দিন খাঁ বড় প্রদীপ্ত হইল। ইহাতে অন্য অন্য ওমরারা বড় বিমনা হইল। এই বাদশাহের দুই পুত্র অত্যন্ত বিরক্ত হইয়া একজন পশ্চিমে গেলেন, আর এক পূর্বদেশে আইলেন এবং ওমরারাও শাহজাহানাবাদ হইতে উঠিয়া গেল। ইহাতে ঐ গাজুদ্দিন খাঁ মনে মনে সভয় হইয়া উপযুক্ত আর এক বাদশাহজাদাকে বাদশাহ করিতে ইচ্ছা করিয়া আলমগীর সানিকে মারিয়া ফেলিল, ইহার বাদশাহী ৭ বৎসর। এই আলমগীর সানি বাদশাহের বাদশাহীর সময়ে ১৮২৫ সম্বতে, ১১৬৪ বাঙ্গালী সনে হিন্দু ও মুসলমানের অতিবড় এক যুদ্ধ হইয়াছিল, তাহার বিবরণ এই—

মথুরাতে আবদালী সসৈন্যে আসিয়া কতলাম করিল, তাহাতে অনেক ব্রাহ্মণ নষ্ট হইলেন। ইহাতে অবশিষ্ট ব্রাহ্মণেরা একত্র হইয়া পেশোয়া ও শাহুজী মহারাজের সাক্ষাৎ নিবেদন করিলেন, হে মহারাজ! আমরা মথুরাস্থ ব্রাহ্মণ, আমাদের অনেক জ্ঞাতি, বন্ধু ও পুত্র, পৌত্র প্রভৃতিকে আবদালী নিরপরাধে নষ্ট করিল, আপনি ব্রাহ্মণের প্রিয় পাত্র, অতএব আবদালীর বিহিত প্রতিকার করিয়া অবশিষ্ট ব্রাহ্মণদের রক্ষা করুন। নতুবা আমরাও প্রাণত্যাগ করিব। ইহাতে পেশোয়া ও শাহুজী মহারাজ অত্যন্ত ব্যস্ত হইয়া আপনারা উঠিয়া ব্রাহ্মণদিগকে বসাইয়া নানাপ্রকার বাক্য কৌশলে ব্রাহ্মণদিগকে সান্ত্বনা করিয়া আপন সৈন্যদিগকে সসজ্জ হইতে আজ্ঞা দিলেন। যে সৈন্যেতে যে যে প্রধান সরদারেরা ছিল, তাহাদের নাম বিশ্বাজী, আপার, পুত্র, সদাশিবরাও ভাউসাহেব এই অষ্ট প্রধানের মধ্যে মুখ্য প্রধান ছিল, আর বালারাও নানাসাহেবের জ্যেষ্ঠ পুত্র বিশ্বাসরাও ইহার এই যুদ্ধের সময়ে ২১ বৎসর বয়স ছিল এবং চিত্র পুত্তলিকার ন্যায় অতিবড় সুন্দর ও মহাবল পরাক্রম ছিল ও জনকোজী সিন্ধিয়া ও দত্তাজী সিন্ধিয়া ও এব্রাহিম খাঁ গারদীও হোকর ও পটুনায়ক ও হুজরাত মুখমাজী গায়কবাড় ইত্যাদি অনেক অনেক মহারাষ্ট্রীয় সরদারেরা আর তার অনেক হিন্দুরাজাও ছিল। স্বপক্ষে আবদালী ও বাদশাহী অনেক ওমরা ও সুজাওদ্দোলা প্রভৃতি অনেক প্রধানেরা ছিল। এই উভয় পক্ষে অতিবড় যুদ্ধ হইল। এই যুদ্ধে ৩,০০০,০০ লোক মরে। বিশ্বাসরাওর কপালে গুলী লাগিল, তাহাতেই বিশ্বাসরাও মরিল, ইনি এমন সুন্দর পুরুষ ছিলেন যে, তাহার মরাতে বিপক্ষপক্ষীয় লোকেরাও শোকান্বিত হইল। সদাশিবরাও ভাউসাহেব বিশ্বাসরাওর মরণ নিমিত্ত শোক ও লজ্জাতে এমত অন্তর্ধান হইল যে, তাহার অদ্যাবধি উদ্দেশ হয় নাই। এইরূপে বিশ্বাসরাওর মরাতে আর আর প্রধানেরা সকলেই যুদ্ধ হইতে ক্ষান্ত হইল। আবদালী তৈমুরলং নামে আপন পুত্রকে লাহোর প্রভৃতি দেশের অধিকারী করিয়া সেই দেশে রাখিয়া আপনি পেশোয়ার দেশে গেলেন। পরে মহারাষ্ট্রেরা ও শিখেরা ও দিনা বেগ খাঁ ইহারা সকলে একত্র হইয়া তৈমুর শাহের সহিত বড় যুদ্ধ করিয়া তাহাকে সে দেশ হইতে উদস্ত করিয়া দিল, তৈমুরশাহ স্বদেশে পলাইল, মহারাষ্ট্রেরা কিছুদিন লাহোর প্রভৃতি দেশ অধিকার করিল। পরে শিখেরা মহারাষ্ট্রীদিগকে যুদ্ধে পরাস্ত করিয়া আপনারা লাহোর ও মুলতান প্রভৃতি দেশ অধিকার করিল, তদবধি লাহোর ও মুলতান প্রভৃতি দেশ শিখেদের অধিকার হইল। আর নাদরশাহী কতলামের পর, দিল্লী বাদশাহীর দিনে দিনে শৈথিল্য হওয়াতে মহারাষ্ট্রদের যে বৃদ্ধি হইয়াছিল, তাহারও কিঞ্চিৎ হ্রাস হইল। তাহার পর তাহার জ্যেষ্ঠ পুত্র আলিগওহরশাহ বাদশাহ, তাহার জলুসি নাম শাহ আলম। তাহার বিবরণ এই—

পূর্বে ইনি পিতা হইতে বিমনা হইয়া পূর্বদেশে আসিতে ইচ্ছা করিয়া প্রথমতঃ লক্ষ্ণৌতে আসিয়া পৌঁহুছিলেন। তখন তথাকার নবাব সুজাওদ্দোলা শাহজাদার বাদশাহী রীতিমত ব্যবহার করিয়া যথেষ্ট মর্যাদা করিল। তাহার পর কাশীতে আসিয়া আলিগওহর পৌঁহুছিলেন, তখন কাশীর রাজা বলবন্তসিংহ, তিনিও বাদশাহজাদার যথেষ্ট মর্যাদা করিয়া অনেক উপঢৌকন দিলেন। তাহার পর পাটনাতে আসিয়া পৌঁহুছিলেন, তখন রাজা রামনারায়ণ পাটনার সুবা ছিলেন। ইনি পূর্বে নবাব মহাবতজঙ্গের সুবেদারীর সময়ে মহারাজ জানকীরাম যখন পাটনার সুবেদার ছিলেন, তখন তাহার নাএব ছিলেন, তাঁহার মৃত্যুর পর ঐ রাজা রামনারায়ণ পাটনার সুবেদার হইলেন। সেই রাজা রামনারায়ণ বাংলার সুবেদার জাফর আলি খাঁর অধীনে ছিলেন, অতএব তাহাকে শাহজাদার পাটনাতে পৌঁহুছিবার সমাচার পত্র দ্বারা নিবেদন করিলেন। তাহাতে বাঙ্গালার সুবেদারের আজ্ঞানুসারে ঐ রাজা রামনারায়ণ শাহজাদার সঙ্গে যুদ্ধ করিলেন। পশ্চাৎ ঐ জাফর আলি খাঁর পুত্র মিরণ অনেক সৈন্যের সহিত পাটনাতে পৌঁহুছিয়া শাহজাদার সঙ্গে যুদ্ধ করিলেন। তাহাতে ঐ শাহজাদা যুদ্ধ করা ভাল না বুঝিয়া পাটনা হইতে ঝড়ীর পথ দিয়া বর্ধমানে আসিয়া পৌঁহুছিলেন। তখন বর্ধমানের রাজা তিলকচন্দ্র ছিলেন। তিনিও অপ্রকাশরূপে বাদশাহজাদাকে অনেক টাকা দিলেন এবং ঐ মহারাজ জানকীরামের পুত্র মহারাজ দুর্লভরাম, তিনিও অপ্রকাশরূপে ঐ বাদশাহজাদাকে দিলেন। তাহার পর বাদশাহজাদা কামদার খাঁ নামে একজন ওমরা ঝড়ী এদেশে ছিল, তাহার সঙ্গে সাহিত্য করিয়া ঐ প্রদেশে থাকিলেন। এই সময়ে কামগারী খাঁ আপন শ্বশুর নবাব জাফরালী খাঁর

তরক্ক হইয়া কলিকাতাতে আসিলেন ও বড় সাহেব বিনসটর প্রভৃতি সাহেব লোকদের নিকটে জাফরালী খাঁর প্রতি কুল্যাচরণ করিয়া ঐ সাহেবদের সঙ্গে সাহিত্য করিয়া আপনি নবাব হইলেন। পরে মুর্শিদাবাদে গিয়া জাফরালী খাঁকে কএদ করিয়া কলিকাতা পাঠাইয়া দিয়া আপনি তথায় নবাব হইয়া কিছুদিন থাকিলেন। পশ্চাৎ শাহজাদার সঙ্গে সাহিত্য করিয়া তাঁহা হইতে সুবেদারীর সম্বন্ধ হাসিল করিলেন ও আলীজা খেতাব পাইলেন। পরে সাহেবান ইংরাজদের হইতে বিরক্ত হইয়া বড় উপদ্রব করিতে লাগিলেন। তখন ঐ শাহজাদা এলাহাবাদে গিয়াছিলেন। এই সময়ে আলমগীরসানী বাদশাহ গাজুদ্দিন খাঁ হইতে মারা যান। অতএব তৎকালে দিল্লীর সিংহাসন শূন্য হইল, শাহজাদা গাজুদ্দিন খাঁ হইতে সমাত্ত হইয়া সহসা দিল্লীর সিংহাসন আক্রমণ করিতে না পারিয়া ভটস্থ প্রায় হইয়া থাকিলেন। মহারাজা ও সুজাওদ্দোলা ইচ্ছা করিলেন যে, এই সময়ে এই শাহজাদাকে বাদশাহ করিয়া স্বদেশে রাখিয়া বাদশাকে আয়ত্ত করিয়া আপনারা উজির হইয়া আর আর দেশ দখল করিব। ঐ সময়ে কাশমলী খাঁর দমনার্থে ঐ প্রদেশ গিয়াছিলেন যে সাহেবান ইংরাজ বাহাদুরেরা তাঁহারা শাহজাদার সঙ্গে মিশিলেন। ইহাতেই যাহার মনে যে ইচ্ছা ছিল, সে কিছু হইতে পারিল না। তদনন্তর ঐ মহারাষ্ট্রেরা ও সুজাওদ্দোলাও সাহেবান ইংরাজ বাহাদুর সকলে একত্র হইয়া ঐ শাহজাদার আনুকূল্য করিয়া তাঁহাকে দিল্লীর তক্তে বসাইলেন। এইরূপ আলিগওহরশাহ বাদশাহ হইয়া আপনি শাহআলাম নামে এই হিন্দুস্থানে খোতবা ও সিক্কা জারি করিলেন ও সুজাওদ্দোলাকে উজির করিলেন। কিছুদিনের পর লর্ড ক্লাইব নামে বড় সাহেব দিল্লী গিয়াছিলেন তখন নবাব সফরদ্দোলার খাসে আজম খেতাব ও হস্তহাজারী মনসব ও বাঙ্গালার সুবেদারী এবং কোম্পানী বাহাদুরের বাংলা, উড়িষ্যা ও বেহার এই তিন সুবার বাদশাহী দেওয়ানী এবং বাদশাহের ইচ্ছামতে আপনার সাবজঙ্গ খেতাব এবং নবাব মুজাফর জঙ্গের খানখানান খেতাব ও জায়গীর ও হস্তহাজারী মনসব, ২০,০০০ হাজার মোসহরা এবং মহারাজ দুর্লভরামের মহীন্দ্র খেতাব ও জায়গীর, স্ব স্ব হাজারী মনসব ও ১৬ হাজার মোসহারা এবং রাজা শেতাব রায়ের মহারাজ খেতাব ও পঞ্চহাজারী মনসব ও সুবে বেহারের নেয়াবত এবং মহারাজ দুর্লভরামের পুত্র রাজবল্লভের বায়রায়ানি কার্য ও জায়গীর ও তাহার হাজারী মনসব এবং জগৎ শেঠ মহাতাব রায়ের পুত্র খোসাল চন্দ্রের জগৎ শেঠ খেতাব এবং মুনসী নবকৃষ্ণের রাজগী খেতাব ও পাঁচ সদি মনসব এই সকল বন্দোবস্ত করিয়া বাঙ্গালাতে আসিয়া ঐ সকল ওমরাহদিগকে লইয়া সাহেবান ইংরাজ বাহাদুর ঐ তিন সুবার মুক্তিয়ার হইলেন, কিন্তু বাঙ্গালার চৌথে উড়িষ্যা বর্গিদের দখলে থাকিল। পরে ঐ শাহআলম বাদশাহ আলিগওহর হিজরির ১২২১ সালের ৬ রমজান সম্বৎ ১৮৬৩ সালের কার্তিক সুদি অষ্টমী বাঙ্গালার ১২১৩ সালে ৪ঠা অগ্রহায়ণে ইংরাজী ১৮০৬ সালের ১৮ নবেম্বর তাঁহার জলুসি সনের ৩৯ সনে পরলোকগত হইলেন। ইহার বাদশাহী সর্বশুদ্ধ ৪৬ বৎসর এক মাস। তদনন্তর তাঁহার পুত্র সানি আকবর বাদশাহ হইলেন। এই পর্যন্ত সম্রাট রাজাদের ও বাদশাহদের সবিশেষ বিবরণ সমাপ্ত হইল।

পরবর্তী সংখ্যায়

বিচিত্র লেখা

ইন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়

(প্রশ্ন)

১। সংবাদপত্রে প্রথম বিজ্ঞাপনের প্রচলন করেন কে এবং কবে?

২। SODA WATER-এর আবিষ্কারক কে? তাতে কোন গ্যাস মিশ্রিত করা হয়?

অমল সরকার
ও
সোনালী সেন,
আসাম।

●

১। বিধানসভায় যে "গিলোটিন" কথাটি ব্যবহৃত হয় তার অর্থ ও প্রয়োজনীয়তা কি?

২। ফরাসী, ইংরেজী ও জার্মান সাহিত্যে আধুনিক কবি ও সাহিত্যিকদের নাম ও তাঁদের সংকলনের নাম জানতে চাই।

কমলেন্দু দাস,
কোলকাতা—৩৭।

●

অমৃতে প্রথম সংখ্যায় কোন কোন সাহিত্যিক লিখেছিলেন? কোন বৎসরের কত তারিখে প্রকাশিত হয়েছিল?

গীতা সাহা
কলকাতা—৩

৮। স্বাধীন ভারতের সংবিধানের সংশোধনীসহ বাংলা সংস্করণের প্রাপ্তিস্থানের ঠিকানাসহ মূল্য জানতে চাই।

শ্রীমোহান্ত গুরুসদয় বিদ্যাবিনোদ,
হাইলাকান্দি (কাছাড়), আসাম।

●

১। বাঙ্গালা ভাষায় প্রকাশিত শ্রেষ্ঠ রহস্য নাটকের নাম কি ও লেখক কে?

২। উত্তরবঙ্গে উল্লেখযোগ্য নক্‌আউট ফুটবল প্রতিযোগিতা কোথায় কোথায় অনুষ্ঠিত হয় এবং পরিচালনা সংস্থার নাম কি?

প্রবীরকুমার দে,
বিলাসীপাড়া,
আসাম।

●

(উত্তর)

৭ম বর্ষ ৭ম সংখ্যায় প্রকাশিত মৃণাল সেন মহাশয়ের প্রশ্নের উত্তরে জানাই যে, স্ট্রেপটোমাইসিন আবিষ্কারক সেলম্যান ওয়াকম্যান রাশিয়ায় বসবাস করতেন। ঐ ৭ম বর্ষ ৮ম সংখ্যায় প্রকাশিত সুতপা চৌধুরীর প্রশ্নের উত্তরে জানাই যে।—

রবার্ট চেম্বার—১৭৩৭ খৃঃ নিউক্যাসেল শহরে জন্ম, এইখানেই শিক্ষালাভ করেন। পরে অক্সফোর্ড লিন্‌কন কলেজে প্রবেশ করেন। ইনি এম-এ ও বি-সি-এল উপাধি পান, অকস্‌ফোর্ড বিশ্ববিদ্যালয়ে ফেলো নির্বাচিত হন। ১৭৭৪-তে কলকাতার সুপ্রিম কোর্টের জজ হন। তাহার জনসন, বার্ক, গোল্ডস্মিথ, রেনলডস প্রভৃতি প্রসিদ্ধ মনীষীদের সঙ্গে সাহিত্য-সভায় আলোচনা করতেন। পরে ইনি বাংলার চীফ জাস্টিস নিযুক্ত হন, ১৭৯৮ অবসর গ্রহণ করেন। কলকাতায় ভবানীপুরে সস্ত্রীক বসবাস করেন। ১৮৩৯ লর্ড চেম্বার্সের মৃত্যু হয়। কলকাতা হাইকোর্টে অর্ধায়তন একটি তাঁহার তৈলচিত্র রক্ষিত রয়েছে।

রেভাঃ জেমস্ লং—১৮১৪ খৃঃ জন্ম, কিছুকাল রাশিয়ায় ছিলেন, তাঁর কর্মক্ষেত্র কলকাতায় হয়। তিনি বাংলা ভাষা ভাল করে শিক্ষা করেছিলেন। ইনি বাংলার অধিবাসী, ভাষা, সহিত্য সম্বন্ধে অনেক গ্রন্থ লিখেন, ১৮৬১ খৃঃ নীলদর্পণ ইংরাজীতে অনুবাদের সাহায্য করেন। ১৮৭২ খৃঃ ইংলণ্ডে ফিরে যান। তিনি বাংলাকে অন্তরের সঙ্গে ভালবাসতেন। Trubner's Oriental Series নামক ধারাবাহিক গ্রন্থের জন্য ল সাহেব Eastern Proverbs & Emblems Illustrating old truths নামক প্রবন্ধ লিখেছিলেন। ১৮৮৭ খৃঃ ২৩ মার্চ লোকান্তর ঘটে। পিটার গ্রান্ট নামর জন— ইনি K.C.B., G.C.M.G.—বাংলার বিহার, উড়িষ্যার দ্বিতীয় লেফটেন্যান্ট গভর্ণর, ১৮০৭ খৃঃ ২৩ নভেম্বর জন্ম, ইনি বাল্যকালে ইটন স্কুলে পরে এডিনবরা বিশ্ববিদ্যালয়ে শিক্ষাপ্রাপ্ত হন।Haileybury থেকে বাংলা সিভিল সার্ভিসে নিযুক্ত হন ভারতবর্ষ ত্যাগ করে ১৮৬২-১৮৬৬ খৃঃ পর্যন্ত ইনি জ্যামেকার গভর্ণর হন। ১৮৯৩ খৃঃ ৬ই জানুয়ারী এর মৃত্যু হয়।

প্রদর্শনী পরিক্রমা

পশ্চিমবঙ্গের দুর্ভিক্ষ ও খরাত্রাণের শে বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের কর্মতৎপরতার সাংস্কৃতিক সংস্থাগুলিও এগিয়ে ছন। সোসাইটি ফর প্রমোশন অব ন্যাশনাল কালচারাল এক্সচেঞ্জ রূপে 'স্পাইস') সংস্থা এ-মাসের য় আ্যাকাডেমি অব ফাইন আর্টসে কল-র তেইশজন শিল্পীর বিরানব্বইখানি য়ে প্রদর্শনীর ব্যবস্থা করেন, তার উদ্দেশ্য ছিল—বিক্রয়লব্ধ অর্থের রা পঞ্চাশ ভাগ বাঁকুড়ার দুর্ভিক্ষের য্যে এবং বাকি অংশ শিল্পীদের রে বিতরণ করা। তরা থেকে ৯ই ই অনুষ্ঠিত এই প্রদর্শনীতে নয় থেকে শের যেসব শিল্পীরা নিয়মিত শিল্প-করে যাচ্ছেন, তাঁদের শিল্পকর্মের একটা নি দেখা গেল। এ ধরনের প্রদর্শনীতে নে বিক্রয়লব্ধ অর্থসংগ্রহটাই প্রধান শ্য, সেখানে প্রদর্শনীর কিছুটা অসমান উর্ড এবং খানিকটা বিচ্ছিন্ন রূপ ত পাওয়া অসম্ভব নয়। তবু মোটের প্রদর্শনীটি বর্ণাঢ্য হয়েছিল। অনীত্র নীর কতকগুলি ল্যান্ডস্কেপ, গোপাল র চিরাচরিত জল রং ও প্যাস্টেলের এবং নিসর্গ দৃশ্য, গোপাল সান্যালের অ্যাবস্ট্রাক্ট কয়েকটি ক্যানভাস, ব্যানার্জির বর্ণাঢ্য লিথোগ্রাফ, প্রকাশ রের কয়েকটি ছোট কিন্তু সুন্দর ইনের গ্রাফিকস্ এবং সুনীলমাধব র লোকশিল্পের ভিত্তিতে করা অনেক সুন্দর বৈচিত্র্যময় ছবি প্রদর্শনীর আকর্ষণ ছিল। এছাড়া সুশীল র্জি এবং পরিতোষ সেনের কয়েকটি ভাস দর্শনীয় হয়েছিল। অন্যান্য দীদের মধ্যে চিত্রা দত্ত, মহিম রুদ্র, তী সেন, গণেশ হালোই, রবীন মণ্ডল মনীতা রায়চৌধুরীর কয়েকটি কাজ থযোগ্য।

●

বাংলাদেশের শিল্প-সংস্কৃতির নব-রণের যুগে জাপানের শিল্পকলার প্রতি বিশেষ আকর্ষণ এবং নব্যভারতীয় র ওপর তার একটা বিশেষ প্রভাব লক্ষ্য গিয়েছিল। পরবর্তী যুগে সে-প্রভাবের অনেকটা ক্ষীণ হয়ে আসে। বিশেষ-জাপানী রীতির চর্চা তেমন কাউকে কদিন করতে দেখা যায়নি। কিন্তু জন ভারতীয় গৃহিণী যে দীর্ঘকাল এই রীতির প্রতি আকৃষ্ট হয়ে জাপানের চারু ও কারুকলার চর্চা করে যাচ্ছিলেন, তা তরা জুলাই কলকাতা তথ্যকেন্দ্রের প্রদর্শনী দেখার আগে অনেকেই জানতেন না। নমিতা বসু, সোমা বন্দ্যোপাধ্যায় ও হেমা পাণ্ডের কাজ প্রদর্শিত হবার সঙ্গে সঙ্গে কলকাতার শিল্পরসিকদের ভিড় তাঁদের প্রচেষ্টাকে স্বীকৃতি দিয়েছে। এঁদের মধ্যে নমিতা বসু অবশ্য অপরিচিতা নন। ইতিপূর্বে এখানেই তাঁর জাপানী পুষ্পসজ্জার (ইকেবানা) প্রদর্শনী দেখা গিয়েছে। দীর্ঘ ষোল বছর তিনি এই শিল্প শিক্ষা করেছেন। জাপানেও তাঁর প্রদর্শনী সেখানকার রসিকদের প্রশংসা অর্জন করেছে। তিনিই একমাত্র ভারতীয় মহিলা যিনি জাপানের বাইরে এই শিল্প শেখার অধিকার লাভ করেছেন এবং কল-কাতায় একটি শিক্ষাকেন্দ্র খুলেছেন। শ্রীমতী বসু জাপানের প্রাচীন ও আধুনিক এই উভয় রীতির পুষ্পসজ্জার কাজে দক্ষ। প্রদর্শনীতে প্রায় ত্রিশখানির মত নিদর্শন তিনি উপস্থিত করেছিলেন। অধিকাংশই তিনি দেশীয় পুষ্প ও অন্যান্য উপকরণের সাহায্যে তৈরী করেছেন। সজ্জার রং পুষ্পাধারের বৈচিত্র্য বিশেষভাবে লোচন-গ্রাহী হয়েছিল। কয়েকটি চাবানা (চা-পান উৎসবে ব্যবহৃত) অতিসুন্দর লাগল।

সোমা ব্যানার্জি কলকাতা বিশ্ববিদ্যা-লয় থেকে প্রাচীন ভারতীয় ইতিহাস ও সংস্কৃতির শিল্প-বিভাগে স্নাতকোত্তর পরীক্ষায় প্রথম স্থান অধিকার করেন। এ-ছাড়া শান্তিনিকেতনে নন্দলাল বসু ও বিনোদবিহারী মুখোপাধ্যায়ের কাছে তাঁর শিল্পশিক্ষা লাভ হয়। স্বামীর বৈদেশিক দপ্তরে কর্ম উপলক্ষে তিনি জাপান ভ্রমণ করেন ও জাপানের শিল্পের প্রতি আকৃষ্ট হন। সুমি-এ, ইকেবানা, বনসাই (ছোট গাছ তৈরী), জাপানী পুতুল এবং জাপানী

আকাদমি অফ ফাইন আর্টসে স্পাইস আয়োজিত শিল্পপ্রদর্শনীতে অন্যান্যদের সঙ্গে শ্রীসত্যজিৎ রায়।

সম্প্রতি আকাদমি অফ ফাইন আর্টসে শিল্পী অজিত কুমারের মাটির সাহায্যে তৈরী নেতাজীর জীবনের বিভিন্ন ঘটনা অবলম্বনে রিলিফ ধর্মী কাজের সুন্দররূপ "কর্মযোগী সুভাষচন্দ্র" বহু দর্শককে আকৃষ্ট করে। — ফটো : অমৃত

বাটিকের কাজ শিক্ষা করেন। শ্রীমতী ব্যানার্জি তাঁর কাজ নিখুঁত করবার জন্যে দীর্ঘ পরিশ্রম করে থাকেন। তাঁর বাটিকের কাজ, সুমি চিত্র এবং বিশেষভাবে জাপানী পুতুলগুলি সকলের দৃষ্টি আকর্ষণ করে। বাস্তবিক এত নিখুঁত পুতুল সচরাচর দেখা যায় না।

হেমা পান্ডে এ'দের মধ্যে সর্বকনিষ্ঠা। তাঁর জ্যেষ্ঠা ভগিনী সোমা বন্দ্যোপাধ্যায়ের কাজ থেকে তিনি অনুপ্রেরণা লাভ করেছেন। এ'র শিল্পে হাতেখড়ি হয় শিল্পী হেমন্ত মিশ্রের কাছে। পরে ইনি জাপানে গিয়ে জাপানী রীতিতে চিত্রাঙ্কন, পুতুল তৈরী এবং বাটিক শিক্ষা করেন। প্রধানত নিহনগেই রীতির ছবির প্রতি এ'র আকর্ষণ (একাজ কতকটা টেম্পারা ধরনের) তাছাড়া তৈলচিত্রের নিদর্শনও আছে। চুজেনজি হ্রদ এবং করমোরেণ্ট ফিশিং-এর ছবি ও একটি স্টিল লাইফ অনেকখানি সম্ভাবনাময়। এই তিন শিল্পীই জাপানী ভাষায় পারদর্শিতা অর্জন করেছেন এবং শ্রীমতী পান্ডে ভারতীয় পুরাণের কাহিনী ও লোকসাহিত্য কিছু কিছু জাপানী ভাষায় অনুবাদও করেছেন।

●

১৩ই জুলাই অ্যাকাডেমি অব ফাইন আর্টসে ফরাসী চিত্রকলার একত্রিশখানি প্রতিলিপির প্রদর্শনীর উদ্বোধন হয়। প্রদর্শনীর আয়োজন করেন আলিয়াঁস ফ্রাঁসেজ এবং উদ্বোধন করেন ফরাসী রাষ্ট্রদূতের সাংস্কৃতিক উপদেষ্টা মঃ ফ্রান্সিস দোরে। প্রদর্শনীতে বুদাঁ, মোনে, দেগা, রেণোয়া, মরিসো, উত্রিয়ো, বুফে এবং বেলোনির ছবি দেখা গেল। প্রদর্শনীটি মোটামুটি গত শতাব্দীর ইম্প্রেশনিস্টগোষ্ঠী এবং তার পরবর্তী যুগের কয়েকজনের কাজের নমুনা নিয়ে সাজান। অবশ্য ইম্প্রেশনিস্টগোষ্ঠীর অনেক দিকপালের কাজ—যেমন, মানে, পিসারো, সিজ্‌লে প্রভৃতি অনুপস্থিত। প্রধানত রেণোয়া এবং উত্রিয়োর কাজই বিশেষভাবে এখানে উপস্থিত করা হয়েছে। বুদাঁ এবং মোনের দু'-তিনখানি অনবদ্য ল্যান্ডস্কেপ, রেণোয়ার বিখ্যাত মুলাঁ দলা গালেত্‌, দোলনা, সেন ও আরজঁতইলের দৃশ্য ও কয়েকটি রমণীমূর্তি এবং দেগার দুখানি চমৎকার প্যাস্টেল দর্শনীয়। বার্থ মরিসোর কোন শ্রেষ্ঠ কাজের প্রতিলিপি দেওয়া হয়নি। উত্রিয়োর মোঁমার্ত্র সিরিজের নগরের দৃশ্যগুলি মনোহারী। বুফের দুখানি জোরালো রেখায় আঁকা প্যারিসের ছবি এবং ইম্প্রেশনিস্ট রীতিতে আঁকা আধুনিক শিল্পী বেলোনির একটি ছবি চমৎকার লাগল। ছবির ছাপা অতি উচ্চস্তরের। কিন্তু ছাপা ছবিতে দুধের সাধ ঘোলে মেটাতে হয়। তবে ভরসা পাওয়া গিয়েছে যে, আগামী বছর হয়ত কিছু আধুনিক শিল্পীদের মূল ছবি আসতে পারে।

●

স্টুডিও এভারেস্টে ১০ থেকে ৩১শে জুলাই ভূষণ চন্দোকের আরেকটি ফটোগ্রাফের প্রদর্শনী হচ্ছে। এবারের বিষয়বস্তু হল রমণীরূপের বিভিন্ন প্রতিচ্ছবি। প্রায় পঞ্চাশখানির কাছাকাছি ফটোগ্রাফের মধ্যে কতকগুলি পোর্ট্রেট খুবই সুন্দর হয়েছে। দু-তিনটি ফিগার স্টাডিও উল্লেখযোগ্য। তবে রঙিন ছবিগুলির অধিকাংশই যথেষ্ট উন্নত মনে হল না। ইতিপূর্বে এখানে আয়োজিত এই শিল্পীর আরেকটি ফটোগ্রাফের প্রদর্শনী আরো মনোগ্রাহী হয়েছিল।

●

ওয়েস্ট বেঙ্গল আর্টিস্ট ইউনিয়ন ১৪ই জুলাই সুবোধ মল্লিক স্কোয়ার থেকে এক মিছিল নিয়ে অ্যাসেমব্লিতে যান ও মুখ্যমন্ত্রীর কাছে এক স্মারকলিপি পেশ করেন। মুখ্যমন্ত্রী পরে তাঁদের সঙ্গে সাক্ষাৎ করা বলে নাকি জানিয়েছেন। শিক্ষামন্ত্রী শিক্ষার উপমন্ত্রীর কাছেও স্মারকলি দেবার কথা তাঁদের বলা হয় বলে জানা যা এই সংস্থা শিল্পীদের শিল্পসৃষ্টির মা মশলা সস্তায় দেবার জন্যে এবং যে শিল্পীদের সরকারী সাহায্য দেবার দ করেন। তাছাড়া শিল্পীদের কর্মসংস্থ কলকাতায় স্থায়ী শিল্প-গ্যালারী, ললি কলা আকাদমীর কলকাতায় শাখা প্রতি শিল্প শিক্ষার সুবন্দোবস্ত, শিল্প শিক্ষ দের বেতনের হার বৃদ্ধি ও ইন্ডিয়ান কা অব আর্ট অ্যান্ড ক্র্যাফট্‌সের শিল্প সরকার কর্তৃক ভারগ্রহণও এ'দের অন্য দাবী।

মুখ্যমন্ত্রীর কাছে আরেকটি স্মার লিপিতে এই সংস্থা অ্যাকাডেমি অব ফাই আর্টসের কাজকর্ম সম্পর্কে অনুসন্ধান দাবী জানান, কারণ তাঁদের মতে অ্যাকাডেমি কর্মপদ্ধতি এবং যে-উদ্দেশ্যে এ সরকারী জমি দেওয়া হয়েছে, তা না সার্থক হয়নি।

●

২০শে থেকে ২৬শে জুলাই ওয়ে বেঙ্গল আর্টিস্টস্‌ ইউনিয়নের উদ্যো ল্যান্সডাউন রোডের মোনালিসা গ্যালারী দুই তরুণ ভাস্কর সাগর সরকার ও মাণি তালুকদারের ভাস্কর্যের প্রদর্শনী হচ্ছে ছোট গ্যালারীর অল্প পরিসরে নয়খানি বেশী নিদর্শন সাজানো সম্ভব হয়নি সব কয়টিই মুখমন্ডলের প্রতিকৃতি কয়েকটি শিশু ও একটি বৃদ্ধের প্রতিকৃ অনেকটা রসসৃষ্টি করতে সমর্থ হয়েছে এই উভয় শিল্পীর মধ্যে মাণিক তালু দারের কাজে কতকটা পরিণতির লক্ষণ দে যায়। ২, ৭, ৮ এবং ৯ নম্বরের প্রতিকৃতি গুলি বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য।

—চিত্ররসি

অমৃত পাবলিশার্স প্রাইভেট লিঃ-এর পক্ষে শ্রীসুপ্রিয় সরকার কর্তৃক পত্রিকা প্রেস, ১৪, আনন্দ চ্যাটার্জি লেন, কলিকাতা—৩ হইতে মুদ্রিত ও তৎকর্তৃক ১১।১, আনন্দ চ্যাটার্জি লেন, কলিকাতা—৩ হইতে প্রকাশিত।

নিয়মাবলী

লেখকদের প্রতি

১। 'অমৃতে' প্রকাশের জন্যে সমস্ত রচনার নকল রেখে পাণ্ডুলিপি সম্পাদকের নামে পাঠান আবশ্যক। মনোনীত রচনা কোনো বিশেষ সংখ্যায় প্রকাশের বাধ্যবাধকতা নেই। অমনোনীত রচনা সঙ্গে উপযুক্ত ডাক-টিকিট থাকলে ফেরত দেওয়া হয়।

২। প্রেরিত রচনা কাগজের এক দিকে স্পষ্টাক্ষরে লিখিত হওয়া আবশ্যক। অস্পষ্ট ও দুর্বোধ্য হস্তাক্ষরে লিখিত রচনা প্রকাশের জন্যে বিবেচনা করা হয় না।

৩। রচনার সঙ্গে লেখকের নাম ও ঠিকানা না থাকলে 'অমৃতে' প্রকাশের জন্যে গৃহীত হয় না।

এজেণ্টদের প্রতি

এজেন্সীর নিয়মাবলী এবং সে সম্পর্কিত অন্যান্য জ্ঞাতব্য তথ্য 'অমৃতে'র কার্যালয়ে পত্র দ্বারা জ্ঞাতব্য।

গ্রাহকদের প্রতি

১। গ্রাহকের ঠিকানা পরিবর্তনের জন্যে অন্তত ১৫ দিন আগে 'অমৃতে'র কার্যালয়ে সংবাদ দেওয়া আবশ্যক।

২। ভি-পি'তে পত্রিকা পাঠানো হয় না। গ্রাহকের চাঁদা মণিঅর্ডারযোগে 'অমৃতে'র কার্যালয়ে পাঠানো আবশ্যক।

চাঁদার হার

		কলিকাতা		মফঃস্বল
বার্ষিক	টাকা	২০-০০	টাকা	২২-০০
ষান্মাষিক	টাকা	১০-০০	টাকা	১১-০০
ত্রৈমাসিক	টাকা	৫-০০	টাকা	৫-৫০

'অমৃত' কার্যালয়

১১/১ আনন্দ চ্যাটার্জি লেন,
কলিকাতা—৩
ফোন : ৫৫-৫২৩১ (১৪ লাইন)

৭ম বর্ষ
২য় খণ্ড

১৪শ সংখ্যা
মূল্য
৪০ পয়সা

Friday, 4th August, 1967. শুক্রবার, ১৮ই শ্রাবণ, ১৩৭৪ 40 Paise

সূচীপত্র

পৃষ্ঠা	বিষয়		লেখক
৪	চিঠিপত্র		
৫	সম্পাদকীয়		
৬	প্রতিধ্বনি		
৮	ঘোরানো সিঁড়ি ধরে	(কবিতা)	—শ্রীপূর্ণেন্দুবিকাশ ভট্টাচার্য
৮	আমি এবং ছায়া	(কবিতা)	—শ্রীসমরেন্দ্র ভট্টাচার্য
৯	আমার কাল আমার দেশ	(স্মৃতিচারণ)	—শ্রীসুধীরচন্দ্র সরকার
১৪	সড়ক সৌধ কানাগলি		—শ্রীরূপচাঁদ পক্ষী
১৫	মহাপুরুষ মহারাজ		—শ্রীহেমচন্দ্র ঘোষ
১৯	বাহিরবৈশ্টন	(গল্প)	—শ্রীবিশ্বনাথ মুখোপাধ্যায়
২৫	সাহিত্য ও সংস্কৃতি		
৩১	সূর্য কাঁদলে সোনা	(উপন্যাস)	—শ্রীপ্রেমেন্দ্র মিত্র
৩৫	দেশেবিদেশে		
৩৬	ব্যঙ্গচিত্র		—শ্রীকাফী খাঁ
৩৭	বৈষয়িক প্রসঙ্গ		
৩৮	প্রেক্ষাগৃহ		—শ্রীনান্দীকার
৪৭	গানের জলসা		
৪৮	খেলাধূলা		—শ্রীদর্শক
৫০	এ পরাজয় কেন !		—শ্রীকমল ভট্টাচার্য
৫১	ফুটবলের শ্রেষ্ঠাংশে		—শ্রীবিপুল বন্দ্যোপাধ্যায়
৫৪	রবীন্দ্রসাহিত্যের 'তৃতীয়া' নারী		—শ্রীচিরশ্রী বিশী-চক্রবর্তী
৫৭	আধুনিক	(উপন্যাস)	—শ্রীবিভূতিভূষণ মুখোপাধ্যায়
৬১	অঙ্গনা		—শ্রীপ্রমীলা
৬৩	গৌরাঙ্গ-পরিজন		—শ্রীঅচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্ত
৬৬	মারণাস্ত্রের ব্যবসা		—শ্রীসত্যব্রত দে
৬৭	বর্ষার রূপ		—শ্রীসঞ্জীবকুমার বসু
৬৯	বার্চবনের ছায়ায়	(বড় গল্প)	—শ্রীপারিজাত মজুমদার
৭৫	জানাতে পারেন		
৭৬	রেখাচিত্র		—শ্রীপুলকেশ দে সরকার
৭৮	পুরনো পাতা : বিচিত্র লেখা		—ইন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়

ভারতীয় চিত্রে নারী তুরঙ্গম

২১শে জুলাই, ১৯৬৭—অমৃত পত্রিকায় প্রকাশিত লেখিকা সুধা বসুর লেখা প্রবন্ধ 'ভারতীয় চিত্রে নারী তুরঙ্গম' মনোযোগ সহকারে পড়েছি। নব-নারী-তুরঙ্গ-রূপের বিশদ ব্যাখ্যার জন্য লেখিকাকে অশেষ ধন্যবাদ জানাই। তিনি লিখেছেন, শ্রীমদ্ভাগবতে নয়টি গোপবালা কর্তৃক পশু-রূপের ভিন্ন ভিন্ন রূপ ধারণের কোন বিশদ বিবরণ নেই। হয়ত তাই। কারণ, আমি মূল সংস্কৃত ভাগবত সম্পূর্ণরূপে পড়িনি। তবে বাংলা অনুবাদে 'অনুরাগবল্লী' খণ্ডে 'নব-নারী-কুঞ্জের' রূপের বিশদ বিবরণ পাওয়া যায়। লেখিকা কর্তৃক উদ্ধৃত, ফরাসী পর্যটক তাভার্নিয়েরের ভারতবিবরণীতে ও গোলকুণ্ডার নর্তকীদের দ্বারা 'নব-নারী কুঞ্জর' রূপ ধারণপূর্বক সুলতানকে পিঠে করে মসলিশস্থলে পৌঁছানোর বিশদ বিবরণ পাওয়া যায়। লেখিকার অনুমান, সেই সময়ে সমাজে একশ্রেণীর নারী ছিলেন, যাঁরা সংগীত-নৃত্যের সঙ্গে শরীরচর্চা ও অস্ত্রক্রীড়ায়ও নৈপুণ্য অর্জন করতেন। এ অনুমান শ্রীকৃষ্ণের যুগেও প্রমাণিত হয়েছে। যথা—যদুসৈন্য ও অর্জুনের যুদ্ধে সুভদ্রার অপূর্ব সারথ্যকর্ম, বালক অভিমন্যুকে যুদ্ধবিদ্যা শেখানো, গোপিনীগণ কর্তৃক অপূর্ব রাস-নর্তন ইত্যাদি। মহাভারতের যুগ থেকে মুঘল শাসনকাল পর্যন্ত স্ত্রী-শিক্ষার একটি নতুন ধারা চলে এসেছিল। ব্রিটিশ-শাসনে তা বিলুপ্ত হয়, তবে নিশ্চিহ্ন হয়নি। বহু-প্রাচীন-ভারতে আমরা লীলাবতী, গার্গী, মৈত্রেয়ীর একটা বিবরণ পাই, কিন্তু সে শিক্ষা আর এ শিক্ষায় তফাৎ ছিল। বর্তমান প্রবন্ধে পশুরাজ চিত্র নিয়ে আলোচনা হলেও উক্ত সব কথাই স্মরণ-পথে আপনা-আপনিই এসে যায়।

সন্তোষকৃষ্ণ গুপ্ত,
ধুরুআ, রাঁচী—৪।

রবীন্দ্র-জয়ন্তী প্রসঙ্গে
দ্বিতীয় বক্তব্য

অমৃতের ৬ষ্ঠ সংখ্যায় প্রকাশিত আমার লেখা একটি চিঠিকে কেন্দ্র করে কোন এক সাহিত্যিক একটি পত্রিকায় তাঁর ফিচার লিখেছেন দেখে আনন্দিত হলাম।

কিন্তু সবিনয়ে বলব, ফিচার রচয়িতার লেখাতে আমাদের জাতীয় দুঃখবোধ বৃদ্ধিই পেল। বিভিন্ন অনুষ্ঠানে যোগদানের জন্য তাঁর নির্দেশিত পোষাকের জন্য তিনি ধন্যবাদার্হ। কিন্তু একটি কথা, বছরের সব কটা দিনই যদি আমরা অত্যধিক আধুনিক-আধুনিকা হবার উদগ্র বাসনায় ইউকাট, চুঙ্গ-প্যান্ট, বগলী জামা, হর্সটেল ইত্যাদিতে সাজতে পারি, তবুও মাত্র বিশেষ কয়েকটি অনুষ্ঠানে, রবীন্দ্রজন্মোৎসবে ধুতি-শাড়ী শ্বেত কবরীতে ক্ষণিক [illegible] হতে কি আমরা সত্যিই অপারগ? তা ছাড়া বিকল্পে, হিন্দী ফিল্মগৃহ তো উচ্চমার্গের রসিকবৃন্দের জন্য সদা উন্মুক্ত।

ফুটবল মাঠে খেলোয়াড় বাদে দর্শকদের যদিও হাফ-প্যাণ্ট পরে যাবার প্রয়োজন হয় না, তবু মাঠের প্রায় সকলেই যে ফুটবল-রসিক, একথা নিঃসন্দেহে বলা যায়। কীর্তন গান শোনার জন্য শ্রোতৃমণ্ডলীকে নামাবলী গায়ে দেবার প্রয়োজন হবে না, কিন্তু গায়ক অবশ্যই (প্রায়শঃই) নামাবলী পরে তিলক কেটে আসরে ভক্তির পরিবেশ সৃষ্টি করতে কার্পণ্য করেন না। পোষাক-পরিচ্ছদ যে, অনুকূল পরিবেশ সৃষ্টি করতে সাহায্য করে, তাতে বোধ হয় দ্বিমত নেই।

"আরিস্তি", "বোন" (বন) রিদয়/হিদর, "অম্রিত", "সম্মান"—আমাদের দৈনন্দিন কথাবার্তায় অত্যন্ত লজ্জাজনকভাবে সহনীয়। কিন্তু কোন অনুষ্ঠানের মাইকে বা সাহিত্যের পৃষ্ঠায় তা নিশ্চয় ক্ষমার্হ নয়। "গর্দভ" কোথাও "গর্ধভ" হয়েছে বলে শুনিনি, তবে মাইকেল দত্ত অমিত্রায়ের মত মিকেল-ডাট্ হয়েছে।

প্রসঙ্গত একটি কথা অবশ্যই লক্ষণীয় যে, বাংলা শব্দের অশুদ্ধ শ্রুতিকটু উচ্চারণ স্বরূপ শিক্ষিত বাঙালীরাই আত্মগর্বে বেশী করেন। আর ইংরাজীতে গ্রামারিমিস্ট অশুদ্ধ উচ্চারণ উচ্চ শিক্ষিতরাও ওষ্ঠ বাঁকিয়ে কায়দা করে বলে থাকেন।

অধীপ রায়,
সাঁতরাগাছি, হাওড়া।

"তথ্যচিত্র" প্রসঙ্গে

গত কয়েক বছরে ভারতের চলচ্চিত্র-শিল্পে কাহিনীচিত্রের সঙ্গে সঙ্গে তথ্য-চিত্রেরও অনেক উন্নতি হয়েছে। আজ সারা পৃথিবীতে চলচ্চিত্রে ভারতবর্ষের স্থান কাহিনীচিত্র বা তথ্যচিত্র উভয় ক্ষেত্রেই বিশেষ উল্লেখযোগ্য। প্রসঙ্গত এবছর বার্লিন উৎসবে ভারতের তথ্যচিত্র এম, এফ, হোসেন পরিচালিত 'থ্রু দী আইজ অব্ এ পেইনটার' গোল্ডেন বিয়ার বা স্বর্ণভল্লুক অর্জন ক'রে শ্রেষ্ঠ সম্মানের অধিকারী হয়েছে। অথচ আমাদের দেশের দর্শক-সমাজের একটা বড় অংশ কিন্তু তথ্যচিত্র সম্পর্কে এখনও মোটেই তেমন আগ্রহী নন। এমনকি এটুকুও তাঁরা বিশেষ জানেন না—তথ্যচিত্র কি এবং কেন? কাহিনী-চিত্রের মত তথ্যচিত্রও যে একটি উল্লেখযোগ্য শিল্প এবিষয়ে তাঁরা সম্যক অবহিত নন। এর কারণ কি?

এর প্রধান কারণ, মনে ধরার মত তথ্যচিত্রের সীমিত প্রদর্শন। সিনেমা দেখতে গিয়ে ফাউ হিসেবে মাঝে মাঝে যে তথ্য-চিত্রগুলি সাধারণ দর্শকরা দেখেন—তার মধ্যে ক'টি চিত্র তথ্যগুণে বা শিল্পগুণে বৈশিষ্ট্যের দাবী রাখে? বেশীর ভাগই নেতিবাচক প্রচারমূলক মামুলি ছবি যা দর্শককে খুশী ক'রে উৎসাহিত তো করেই না বরং পীড়া দেয়। কিন্তু তার মধ্যেও দু-একটি তথ্যচিত্র অপেক্ষাকৃত ভাল হ'লে দর্শককে উৎসাহিত হতে দেখেছি। যেমন কিছুদিন আগে দেখানো হচ্ছিল বি, ডার্মা পরিচালিত 'দি গিল্টী'।

তাই মাঝে মাঝে ভাল তথ্যচিত্র প্রদর্শিত হ'লে দর্শকগণ স্বাভাবিকভাবেই তথ্যচিত্র সম্পর্কে আগ্রহী হবেন। কিন্তু এ ব্যাপারে কর্তৃপক্ষের তেমন কোন চিন্তা নেই। আমরা অনেকেই জানি প্রখ্যাত কাহিনীচিত্র পরিচালক শ্রীহরিসাধন দাশগুপ্ত একজন কৃতী তথ্যচিত্র নির্মাতা। তাঁর সহোদর শ্রীবুলু দাশগুপ্ত (যিনি বম্বাইতে নিহত হয়েছেন) তথ্যচিত্রের একজন সুদক্ষ আলোকচিত্রী ছিলেন। তাদের ক'টি তথ্য-চিত্রের সঙ্গে সাধারণ দর্শকের পরিচয় আছে? গত কয়েক বছরে প্রথম শ্রেণীর কয়েকজন কাহিনীচিত্র পরিচালক দ্বারা কয়েকটি প্রথম শ্রেণীর তথ্যচিত্র নির্মিত হয়েছে—। যেমন, শ্রীসত্যজিৎ রায়ের 'রবীন্দ্রনাথ' এবং 'টু'। শ্রীঋত্বিক ঘটকের 'ফিয়ার'। শ্রীমৃণাল সেনের 'মাটির মনীষ'। শ্রীতপন সিংহের 'ডঃ রাধাকৃষ্ণন'। শ্রীসুশীল রায়ের 'সুগামিয়া কৃষিকাজ'। সর্বোপরি শ্রীহোসেনের 'থ্রু দী আইজ অব্ এ পেইনটার' যা ভারতকে সর্বোচ্চ সম্মানে ভূষিত করেছে। উল্লিখিত প্রায় প্রত্যেকটি তথ্যচিত্রই শিল্পে, ভাবে ও ভাবনার বিশিষ্টতায় স্বতন্ত্র। অথচ ঐ ছবিগুলি কিছু সংখ্যক ফিল্মক্লাবের সদস্য ছাড়া কতজন সাধারণ দর্শকের দেখবার সুযোগ ঘটেছে? যে শিল্পের আলোটুকু তাদের কাছে পৌঁছল না সেই শিল্প সম্পর্কে তাদের আগ্রহ, উৎসাহ বা শিল্পবোধ আসবে কোথা থেকে।

সেই কারণে প্রথম শ্রেণীর তথ্যচিত্র-গুলির ব্যাপক প্রদর্শন হওয়া দরকার। কাহিনীচিত্র সম্পর্কে দর্শকগণ আজ যতটা শিল্পসচেতন হয়েছে, পাঁচ-সাত বা দশ বছর আগে তাঁরা এতটা ছিলেন না। এই শিল্পসচেতনতা এনে দিয়েছে কাহিনী-চিত্রের শিল্পগুণ ও তার ব্যাপক প্রদর্শন। তথ্যচিত্রের জনপ্রিয়তাও নির্ভর করছে এই প্রদর্শনের উপর।

এ ব্যাপারে সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষের দৃষ্টি আকর্ষণ করছি।

বাবলু দাশগুপ্ত
রাজপুর, ২৪-পরগণা।

মহান সমাজের অন্যদিক

প্রেসিডেন্ট জনসন কার্যভার গ্রহণ করে আমেরিকার মানুষদের একটি 'মহান সমাজ' গঠনের স্বপ্ন উপহার দিয়েছিলেন। দুনিয়ার তাবৎ দেশের মধ্যে সম্পদে ও শক্তিতে আমেরিকার দ্বিতীয় তুলনা নেই। তার উদ্বৃত্ত খাদ্য অন্য দেশে যায় কখনো সাহায্য হিসেবে, কখনো ঋণ হিসেবে। তার সামরিক শক্তিও প্রায় অতুলনীয়ই বলা যেতে পারে। একমাত্র সোভিয়েট ইউনিয়ন ছাড়া তার সঙ্গে রণশক্তি ও সম্ভারে পাল্লা দেবার মতো রাষ্ট্র এখন পর্যন্ত নেই। মহাকাশ গবেষণা, পরমাণু বোমা তৈরী ইত্যাদি কাজে আমেরিকার যা ব্যয় হয় তা দিয়ে এশিয়া ও আফ্রিকার উন্নয়নশীল দেশগুলির বহু বৎসরের উন্নয়ন পরিকল্পনা নির্বিঘ্নে সম্পন্ন করা যায়। এ হেন সমৃদ্ধ দেশেও যখন দারিদ্র্য ও বঞ্চনার বিরুদ্ধে ক্ষোভ দেখা দেয় তখন বিস্মিত হতে হয়। মার্কিন সমাজের এই স্ব-বিরোধিতা নিয়ে আমেরিকার সমাজবিজ্ঞানী, অর্থনীতিবিদ এবং রাজনীতিজ্ঞরাই অনেক কথা বলেছেন। একই দেশে একদিকে সম্পদের প্রাচুর্য এবং অন্যদিকে দৈন্য, বর্তমান থাকলে ক্ষোভ জাগবেই এবং সেই ক্ষোভ চরমপন্থীদের অনেকদূর ঠেলে নিয়ে যেতে পারে।

সম্প্রতি আমেরিকায় কয়েকটি শহরে বর্ণবিদ্বেষের জন্য দাঙ্গাহাঙ্গামা হয়ে গেছে। তাতে বেশ কিছুসংখ্যক লোকের মৃত্যু হয়েছে। ডেট্রয়েট, নেওয়ার্ক শহর দুটিতেই হাঙ্গামা জোরদার হয়েছিল। খাস নুয়র্ক শহরেও বিক্ষোভকারীরা শৌখীন পাড়া ফিফথ্ আভেন্যুতে দোকানপাট ভেঙে প্রচণ্ড বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি করেছিল। প্রতি বৎসরেই এই গ্রীষ্মকালে আমেরিকার নিগ্রো মহল্লায় এই ধরনের বিক্ষোভ ও হাঙ্গামা ঘটে, এবারে তা ব্যাপকতর হয়েছে বলেই বাইরের দুনিয়ার দৃষ্টি আকর্ষণ করেছে।

জন এফ কেনেডির আমলে এই বঞ্চিত নিগ্রোদের মনে আশা জেগেছিল যে, তাদের প্রতি বৈষম্যের দিন বোধহয় শেষ হয়ে এল। তিনি আততায়ীর হাতে প্রাণ দেওয়ার পর সেই প্রত্যাশায় আঘাত লেগেছিল। কিন্তু নিগ্রো সমাজের যে অংশ শান্তিপূর্ণভাবে এই সমস্যার সমাধানে আগ্রহী তাঁরা সংযম ও সহিষ্ণুতার সঙ্গে বিরাট আন্দোলন তৈরী করে হোয়াইট হাউসকে মনে করিয়ে দিলেন যে, তাঁরা অনেকদিন অপেক্ষা করে আছেন, এবার কিছু করা হোক। প্রেসিডেন্ট জনসন সে ইঙ্গিত বুঝলেন, মার্কিন কংগ্রেস নিগ্রোদের সমানাধিকার আইন পাশ করল। কিন্তু আইন পাশ করলেই রাতারাতি সমাজের সংস্কার দূর হয়ে যায় না। জনসন শক্তিমান প্রেসিডেন্ট হলেও মার্কিন সমাজের যে-অংশ গোঁড়া, সংস্কারান্ধ এবং কালো মানুষদের সমানাধিকার প্রতিরোধে কৃতসংকল্প তাদের শক্তি এখনো অটুট। সেই কারণেই আগুন জ্বলছে। মার্কিন সমাজের পক্ষে এটা শুধু ভয়ের কারণ নয়, এর ফলে তার সামাজিক অগ্রগতিও ব্যাহত হতে পারে।

সামাজিক বৈষম্যের এই চিত্র অন্য দেশেও যে নেই তা নয়। বহুজাতিভিত্তিক সমাজে সংখ্যালঘুদের অভিযোগ প্রায় প্রত্যেক দেশেই কোনো না কোনো স্তরে শোনা যায়। কিন্তু আমেরিকান সমাজে এই বৈষম্য দুনিয়ার শুভবুদ্ধিসম্পন্ন মানুষের মনে ক্ষোভ সৃষ্টি করে। তার কারণ, সঙ্গতি থাকা সত্ত্বেও মার্কিন সমাজ এই বঞ্চনা দূর করতে পারছে না বা করতে দিচ্ছে না। সংস্কার ও বিদ্বেষ ছাড়া একে আর কী নামে অভিহিত করা যায়? তার ফলে বঞ্চিত মানুষ মারমুখো হয়ে উঠছে, হিংসার পথে যাচ্ছে। কখনো কখনো মনে হয় এর ফলে একটা গৃহযুদ্ধ বেধে যাওয়াও বিচিত্র নয়। শান্তিবাদী নিগ্রো নেতা ডঃ মার্টিন লুথার কিং অনেক চেষ্টায় নিগ্রো সমাজের এই বিস্ফোরণ আটকে রেখেছিলেন। সত্যাগ্রহ করে, অনুনয় করে, বুঝিয়ে-সুঝিয়ে তিনি মার্কিন 'মহান সমাজে'র কাছ থেকে বঞ্চিত নিগ্রোদের দাবী আদায়ের চেষ্টা করছেন। মার্কিন সরকার যুক্তি দিয়ে তার দাবী বুঝলেও সমাজের নিঃসঙ্গ ষড়যন্ত্র ভাঙতে পারছেন না। তার ফলে আমেরিকার কালো মানুষ দারিদ্র্য, অশিক্ষা ও সামাজিক বৈষম্য থেকে মুক্তির জন্য ক্রমশ চরমপন্থার দিকে ঝুঁকছে। আফ্রিকার মুক্তির পর মার্কিন নিগ্রোদের মধ্যে প্রত্যাশা আরও বেড়েছে। তাঁরা দেখতে পাচ্ছেন যে, তাঁদেরই জাতভাইরা স্বাধীন দেশ চালাচ্ছেন, রাষ্ট্রসংঘে এসে মানবমুক্তির স্বপক্ষে বক্তৃতা দিচ্ছেন, হোয়াইট হাউসে প্রেসিডেন্ট জনসনের সঙ্গে সমমর্যাদায় আলোচনা করছেন। অথচ এই 'মহান সমাজে' তাঁরা বাস করেও সাফল্য ও সৌভাগ্যের সেই সোপানে আরোহণ করতে পারছেন না।

প্রেসিডেন্ট জনসন সাম্প্রতিক হাঙ্গামার তদন্তের জন্য কমিশন বসিয়েছেন। গত রবিবার দিনটিতে তিনি সারা আমেরিকায় 'শান্তি ও সুমীমাংসার জন্য' প্রার্থনা দিবসরূপে উদ্‌যাপনের আবেদন জানিয়েছেন। কিন্তু শুধু প্রার্থনা দিয়ে এর সুমীমাংসা হবে না। সমাজের একটি অংশ যদি চিরকাল বঞ্চিত থাকে তারা একদিন বিদ্রোহ করবেই। মার্কিন সমাজের সংস্কারান্ধ অংশ বৈষম্যবিরোধী ব্যবস্থাগুলিকে বারবার বানচাল করে দিয়ে নিজেদেরই বিপদ ডেকে আনছে। শান্তি ও সহযোগিতার পথে এর মীমাংসা না হলে, নিগ্রো বিক্ষোভের নেতৃত্ব নেবে চরমপন্থীরা, যারা কালোমানুষদের সম্পূর্ণরূপে বিচ্ছিন্ন করে নিয়ে যেতে চায় মার্কিন শ্বেতাঙ্গদের 'মহান সমাজ' থেকে। তার জন্য কি মার্কিন সমাজ প্রস্তুত?

ভারতীয় ঐতিহ্য

হুমায়ুন কবির

ইংরেজ আমলে এবং দুঃখের বিষয় আজও যেসব পাঠ্য-পুস্তকের মাধ্যমে তরুণ সম্প্রদায় ভারতবর্ষের ইতিহাস শেখে, তাদের অধিকাংশ মধ্যযুগের ভারতবর্ষে বিরোধ ও সংঘর্ষের বিস্তৃত বিবরণ দেয়, কিন্তু সে-যুগে বিভিন্ন সমাজ ও ধর্মবিশ্বাসের মধ্যে মিলন ও সমন্বয় সাধনের যে প্রয়াস হয়েছিল, হয় তার একেবারেই উল্লেখ করে না অথবা করলেও অত্যন্ত সংক্ষেপে ইংগিত করেই ক্ষান্ত হয়। রাজবংশের উত্থান-পতনের কাহিনীর সঙ্গে সঙ্গে বহিরাগত নতুন নতুন অভিযাত্রীদের ভারত আক্রমণের বিবরণ ও লুণ্ঠন অত্যাচার ও ধ্বংসের বর্ণনায় সে-ইতিহাস মুখর কিন্তু যে সমস্ত নতুন সামাজিক ও অর্থনৈতিক প্রচেষ্টা ও প্রতিষ্ঠান বহু শতাব্দীর সাধনায় হিন্দু-মুসলমানের যুক্ত প্রচেষ্টায় গড়ে উঠেছিল, তাদের কোন আলোচনা সে-ইতিহাসে মেলে না। ফলে হিন্দু-সমাজের অধিকাংশ লোকের বিশ্বাস যে, ভারতবর্ষে সভ্যতার যে বিকাশ, যে সমস্ত প্রতিষ্ঠান ও অনুষ্ঠানের মাধ্যমে সংস্কৃতি রূপ নেয়, সেগুলি একান্তভাবে প্রাক্-ইসলামিক ভারতবর্ষেই গড়ে উঠেছিল, তাই ভারতীয় সংস্কৃতি হিন্দু সংস্কৃতিরই অন্য নাম। মুসলমানদের মধ্যেও অধিকাংশ অনুরূপ মতে বিশ্বাসী এবং ফলে তাদের মনে আত্মঅবিশ্বাস, সন্দেহ ও দ্বিধা। হাজার বৎসর ভারতবর্ষে বাস করেও ভারতীয় সংস্কৃতি সৃষ্টি করতে মুসলমান সমাজ সাহায্য করেনি এ-কথা যদি সত্য হয়, তবে ভারতীয় সংস্কৃতির স্বভাবে নিশ্চয়ই বিরোধী উপাদানের জন্যই তা সম্ভব হয়েছে মনে করে তারা ভারতীয় সংস্কৃতির প্রতি বীতরাগ হয়ে পড়ে। বস্তুতপক্ষে হিন্দু এবং মুসলমান দুইয়েরই ধারণার মূলে গলদ রয়েছে এইজন্য যে, তারা উভয়েই হাজার বৎসরের সহযোগিতা ও সমবেত প্রচেষ্টার কথা ভুলে গিয়েছে। হাজার বৎসর পরস্পরের প্রতিবেশী থেকেও যদি সহযোগ এবং সহানুভূতির বন্ধন দৃঢ় না হয়, তবে মানব-অভিজ্ঞতার যে বিপুল অপচয়, তার ফলে যে তারা পরস্পরকে সন্দেহ ও ঘৃণা করবে, তাতে বিচিত্র কি? পরস্পরের সহযোগ এবং প্রীতির ভিত্তিতে ভারতবর্ষে মধ্যযুগে সভ্যতা ও সংস্কৃতির যে অপূর্ব বিকাশ, সে বিবরণ জনসাধারণের কাছে যেদিন স্পষ্ট হয়ে উঠবে, সেদিন দুটি সম্প্রদায়ের মধ্যে বর্তমানের সন্দেহ এবং ঈর্ষার নিরসন হবে।

সমস্ত তথ্য না জানলেও, মানুষের সাধারণ অভিজ্ঞতার ভিত্তিতে বলা যায় যে, ভারতবর্ষের মধ্যযুগের ইতিহাস সম্বন্ধে প্রচলিত ধারণা ভিত্তিহীন। দুইটি সমৃদ্ধ এবং প্রাণবন্ত সংস্কৃতি পরস্পরের সংস্পর্শে আসবে অথচ নতুন সংস্কৃতির বিকাশ হবে না, এ-কথা বিশ্বাস করা যায় না। মানুষের অভিজ্ঞতায় এরকম কখনো ঘটেনি। ভারতবর্ষের হিন্দু সংস্কৃতির প্রসার ও গভীরতা সমস্ত বিশ্বের শ্রদ্ধা আকর্ষণ করেছে। ভারতবর্ষের রঙ্গমঞ্চে যেদিন মুসলমানের আবির্ভাব, সেদিন হিন্দু-মানসের তেজ এবং দীপ্তি খানিকটা কমে আসলেও, তখনো তার জীবনশক্তি লোপ পায়নি, তখনো বিশ্ব-সভ্যতায় তার দেয় অনেক। নবযৌবনদীপ্ত মুসলমান সেদিন ভারতীয় সংস্কৃতির বহু অনুদানকে শ্রদ্ধার সঙ্গে গ্রহণ করেছিল। একদিকে গ্রহণেচ্ছু মুসলমান এবং অন্যদিকে দানোৎসুক হিন্দু—উভয়ের সম্মিলনে ভারত-বর্ষে সংস্কৃতির নতুন সম্ভাবনা দেখা দিল। ভারতবর্ষে সামরিক সংঘর্ষে হিন্দুদের পরাজয় হল কিন্তু সংস্কৃতির ক্ষেত্রে হিন্দু-মুসলমানের সম্মিলিত সাধনায় যে নতুন ভারতীয় সংস্কৃতি গড়ে উঠল, সেখানে জেতা ও বিজেতার কোন প্রশ্ন রইল না। জীবনের বিভিন্ন ক্ষেত্রে হিন্দু ও মুসলমানের পরিচয়, সহযোগ ও সমন্বয়ের সাধনাই তাই মধ্যযুগের ভারতবর্ষের সত্যিকার ইতিহাস।

(চতুরঙ্গ ।। কার্তিক ।। ১৩৭৩)

রসিক রবীন্দ্রনাথ

প্রেমেন্দ্র মিত্র

রবীন্দ্রনাথকে তুষারমৌলী হিমালয় করে তুলতে গিয়ে তাঁর বরফগলা রসের নির্ঝরই যেন বাদ পড়েছে। রবীন্দ্রনাথ লেখক, শিল্পী, সুরকার, দার্শনিক এবং আরো অনেককিছু, সেই অনেককিছুর ভেতর থেকে তাঁর বিশ্বব্যাপী স্তুতিতে যে বিষয়টি সাধারণতঃ বাদ পড়ে তা তাঁর কৌতুকরস। সভা-সমিতিতে যা শুনি, কাগজপত্রে যা পড়ি তাতে তাঁর পরিচয়ের এইদিকটি একেবারে অজ্ঞাত বলে মনে হয়। রবীন্দ্রনাথের বিশালতা বা তাঁর গাম্ভীর্যের মহিমার কথা বলতে গিয়ে তাঁর চোখের কৌতুকের ঝিলিকের কথা আমরা ভুলেই যাই। সেই সঙ্গে একথাও বিস্মৃত হই যে, আকাশের মত যা বিরাট, তাতে মেঘের রং বাহার না থেকে পারে না।

একটা প্রচলিত ধারণা অনেকের মনেই বদ্ধমূল যে বড় মানেই গুরুগম্ভীর। রসিকতার সঙ্গে অসামান্যতার যেন সতা-সতীন সম্পর্ক। সেই ধারণা থেকেই বোধ হয়, রবীন্দ্রনাথ সম্পর্কে আলোচনায় তাঁর হাল্কা সরস দিকটার প্রতি আমরা চোখ বুজে থাকতে চাই। আমাদের বোধ হয় ভয় হয় যে চিরকুমার সভা কি শেষরক্ষা তার মুক্তধারা কি রক্তকরবীর মর্যাদা লঘু করে দেবে, ব্যঙ্গ-কৌতুক হাস্য-কৌতুক কি বৈকুন্ঠের খাতা তাঁর গোরা কি যোগাযোগ-এর মহিমায় কলঙ্ক লেপন করবে।

কিন্তু তা কি সত্যি করে বরং উল্টো-কথাটাই কি সত্য নয়, যে প্রতিভা যেখানে অভ্রভেদী সেখানে তার বিরাটত্ব কৌতুকের প্রসন্ন আলোতেই সবচেয়ে উজ্জ্বল।

ব্যক্তিগতভাবে যাঁরা রবীন্দ্রনাথের সহজ সান্নিধ্যে এসেছেন, তাঁরা জানেন সরস হাস্য-পরিহাসে তাঁর জুড়ি ছিল না। শুধু দামী গম্ভীর কথাই তিনি বলতেন না,—সেকথার স্রোত ক্ষণে ক্ষণে কৌতুকের ঢেউ-এ ছলকে উঠত।

সাধারণ আলাপ-আলোচনায় যেমন, সাহিত্যের ক্ষেত্রেও তেমনি তাঁর কৌতুক-বিলাসী মনের ছাপ তিনি সব-কিছুতেই রেখে গেছেন। চিরকুমার সভা, বৈকুন্ঠের খাতা কি শেষরক্ষার মত নাটক কি হাস্য কৌতুকের মত নক্সায় শুধু নয়, কবিতায় গানে পর্যন্ত তাঁর অনাবিল কৌতুকরসের ধারা তিনি প্রবাহিত করে গেছেন।

[প্রগতি ।। রবীন্দ্র-নজরুল সংখ্যা ঃ ১৩৭৪]

সুধীন্দ্রনাথের মানসিকতা

আশিস মজুমদার

সুধীন্দ্রনাথ দুর্বোধ্য নন, দুরূহ-ও নন। তাঁর সত্তা নিরাবরণ, ঋজু, শাশ্বত, আধুনিক। তাঁর কণ্ঠস্বর হার্দ্য, যুক্তি তীক্ষ্ম, বুদ্ধি উদার। তিনি সংস্কৃত, তাঁর ভাষা তাই সংস্কৃত, অর্থবহ, ব্যঞ্জনাময় বাংলা। সুধীন্দ্রনাথ রোমান্টিক। মানব মনের মানব সম্পর্কের বিষামৃতপূর্ণ সমুদ্রমন্থন তাঁর কবিতাবলী। হোমর-বাল্মীকি-দান্তে-কালিদাস তাঁর নখাগ্রে। মালার্মে প্রবর্তিত কাব্যদর্শ তাঁর অন্বিষ্ট। বাস্তবে এবং প্রাতি-ভাসিক জীবন এবং জীবনবোধের সমাহার তাঁর প্রস্তর কঠিন সনেটগুচ্ছ। বুদ্ধদেব বসু বলছেন, 'তাঁর মতো নানা গুণসমন্বিত পুরুষ রবীন্দ্রনাথের পরে আমি অন্য কাউকে দেখিনি।'

সুধীন্দ্রনাথের অধিকাংশ কবিতার, অধিকাংশ কেন প্রায় সব কবিতার নায়ক কবি নিজে। পার্শ্বচরিত্রে আছে 'তুমি'—আছে পৃথিবী, পরিবেশ। কবির ব্যক্তিগত অনুভূতি

এবং বিশ্বাস, অন্বেষণ, নিরীক্ষা প্রকাশ করতে গেলে গীতি-কবিতার আশ্রয় ছাড়া উপায় নেই। সুধীন্দ্রনাথও তাই গীতি-কবিতা লিখেছেন—কেবলই গীতি-কবিতা। আজকের প্রেম-ভাবনা তাঁর অনেক কবিতারই সার-কথা। অবশ্য কোন ক্ষেত্রেই শেষ কথা নয়। তবু প্রায় শতাধিক কবিতায় প্রেম সম্পর্কে কবির ব্যক্তিগত রুচি এবং মার্জিত-মনা বিচারবোধ কখনও স্পষ্টস্বরে কখনও অস্পষ্টতায় আপনাকে ব্যক্ত করে গেছে।

বৈষ্ণব কবির মতই সুধীন্দ্রনাথ শাশ্বত মানবসম্পর্কে বিশ্বাসী। তাই তাঁর প্রেম অজড় অমর। 'ধরায় যে প্রেয়সীরে আজিকে মধুর মিলনে' কাছে পেলেন, তা অনিত্য। তাৎক্ষণিক বা ভঙ্গুর কবির পক্ষে এ-ভাবনা অসম্ভব। তাই তাঁর প্রেম-ভাবনায় প্রাগৈতিহাসিক স্মৃতির প্রত্যুষে যেমন সময়ে-অসময়ে দেখা দিয়েছে, তেমনি এ-ও বারবার তিনি বলবার চেষ্টা করেছেন যে, মানুষ যেহেতু অমৃতের পুত্র, সেহেতু তার প্রেমসম্পর্ক অর্থহীন প্রগলভতায় শেষ হবার নয়।

সুধীন্দ্রনাথের মনে হতাশা না থাকলেও সংশয় ছিল। বিশেষ কোন দর্শন, ভূয়ঃ বা ভ্রান্ত, তাঁর গ্রাসাচ্ছাদনের ব্যবস্থা করে দিতে পারেনি। এমনকি Individualism শব্দুক-অস্তিত্ব-ও তাঁর পক্ষে স্বীকার করা সম্ভব হয়নি। তার ফলে সচেতন মানস যা করে, তিনিও তাই করেছিলেন। তাকে নৈতিবাদ না বলে অবশ্য 'কিনীতিবাদ' বলা চলে। দ্বিতীয় মহাযুদ্ধ, এলিয়টের ওয়েস্ট ল্যান্ড তিনি মর্মে অনুধাবন করেছেন, য়ুরোপের 'মূঢ় অপব্যয়' এবং প্রাচ্যের অন্ধতা উভয়েই তাঁকে সমান ভাবিয়েছে। কিন্তু মৃত্যুর প্রাক্-মুহূর্তেও রবীন্দ্রনাথ যেমন বলে যেতে পেরেছিলেন, 'তথাপি মানুষের প্রতি বিশ্বাস হারানো পাপ' সুধীন্দ্রনাথ বা তাঁর সমসাময়িক সম-মেধাসম্পন্ন কোন মানুষের পক্ষে কখনই তা সম্ভব ছিল না। তাই মরুভূমির ঊষরতা, গলঘণ্ট কুষ্ঠরোগী, পিশাচী-চমূরু, মিশরী শব, কালপেঁচা, বাদুড়, শৃগাল, নাটসী পিশাচ, শকুন্তের স্পর্শে কলুষিত অভিজ্ঞান এমনি অজস্র কথাবার্তা রয়েছে সুধীন্দ্রনাথের কাব্যে। এবং যদিও সময়ে-অসময়ে তিনি 'নিখিল নাস্তির মৌনে সোহংবাদ করেছি ধ্বনিত' বলে জানান দিয়েছেন, আসলে আধুনিক কালে 'সোহংবাদ' স্বীকার করার মতো অসুবিধে আর নেই। কারণ পারিপার্শ্বিক তাকে প্রতি মুহূর্তে বিদ্রূপ করে এবং কোরাসে গান না গাইলে এ-যুগে যেমন গান গাওয়া মিছে, তেমনি একক কণ্ঠস্বর কিছুকাল বাদে আত্ম-হননের পথে অগ্রসর হতে চেষ্টা করে। অথচ দেশ এবং কাল?

শূন্যে ঠেকেছে লাভে লোকসানে মিলে
ক্লান্তির মতো, শান্তিও অনিকাম।
এরই আয়োজন অর্ধশতক ধ'রে,
দু-দুটো যুদ্ধে একাধিক বিপ্লবে
কোটি কোটি শব পচে অগভীর গোরে।

(ক্রন্দন ।। জুলাই ।। ১৯৬৭)

ঘোরানো সিঁড়ি ধরে ।।

পূর্ণেন্দুবিকাশ ভট্টাচার্য

ঘোরানো সিঁড়ি ধরে ধ্বনিত যাওয়া-আসা!
আখর ভুলে যাই, তথাপি মনে মনে
রেলিঙে সারি সারি টবের নীল ভাষা।

না হয় নাই তেজ, সোনালী আলো আসা!
অদূরে মাঠ শাদা; বাতাস দিন গোনে :
বরফ কেটে গেলে ফোটাবে রাঙা আশা।

অবুঝ বার্চ, ফার, ওকের মৃদু ভাষা,—
লরেল-ডালে শোনে চড়ুই আনমনে,
যদিও সারা ভোর বাইরে কী কুয়াশা!

এখন রেখো বুকে সাহসী ভালোবাসা।
পথিক, এসো, থামো, পাহাড়ে কোণে কোণে
তাকাও চোখ মেলে; পূরবে প্রত্যাশা?

এখানে নেই মেঘ : আকাশে নীল বাসা;
মিলিয়ে যায় ফগ; পাখিরা ওড়ে বনে;—
সবুজ পাতা নিয়ে জবাকুসুম আশা।

ঘোরানো সিঁড়ি ধরে চর্তুক কাঁদাহাসা।
এখন সারা দিন সোনালী আশা মনে।
না হয় বুঝি নাই টবের দৃঢ় ভাষা,
সবুজ বনে ওড়ে পাখির ভালোবাসা।।

আমি এবং ছায়া ।।

সমরেন্দ্র ভট্টাচার্য

আমি এখন সূর্যের দিকে মুখ ক'রে হাঁটবো,
কারণ,
সূর্যের দিকে পিছন ফিরলেই দেখব :
আমার দেহ ন্যুব্জ
অথচ আমার ছায়া নিটোল এবং সোজা।

সূর্যের দিকে পিছন ফিরলেই দেখব :
ধুলো লাগার ভয়ে
আমি আমার জন্মদাত্রী পৃথিবীকে
কাছে টানিনি,
অথচ,
আমার ছায়া
কত সহজে পৃথিবীর বুকে স্থান করে নিয়েছে।

সূর্যের দিকে পিছন ফিরলেই দেখব :
মৃত্যুর পর
যেখানে আমি শান্তিতে নিদ্রা যাবো
মনে মনে ভেবে রেখেছি,
আমার ছায়া
আমার আগেই সেখানে আশ্রয় নিয়েছে।

যখন ছোট ছিলাম
চীৎকার করে কাঁদিতাম
দুঃখ সহ্য না করতে পেরে।
যৌবনে অমিততেজে
দুঃখকে ধমক দিয়েছি,
প্রতিশোধ নেবার চেষ্টা করেছি।

এখন বার্ধক্যে
দুঃখকে শুধু অভিশাপ দিই,
আর আনন্দে কাঁদি :
হায়, আনন্দকে বোধহয় এই শেষ দেখা।

আমি এখন সূর্যের দিকে মুখ করে হাঁটবো,
কারণ,
সূর্যের দিকে পিছন ফিরলেই দেখব :
আমার ছায়া নিটোল এবং সোজা,
কত সহজে পৃথিবীর বুকে স্থান করে নিয়েছে,
এবং আমার আগেই শান্তিতে নিদ্রা যাচ্ছে।।

সুধীরচন্দ্র সরকার

মানুষের চলার শেষ কোথায়?

শেষ আছে কিনা তাও জানি না। কারণ গতিই জীবন। এই গতি যেদিন থেমে যায়, সেদিন পৃথিবীতে মানুষেরও কাজ ফুরিয়ে যায়, বিদায় নেয় পৃথিবী থেকে।

এই দীর্ঘ পথপরিক্রমার পর যখন সে পথের শেষপ্রান্তে এসে থমকে দাঁড়ায় তখন তার দৃষ্টি চলে যায় সেই সুদূরে যেখানে তার পথের শুরু হয়েছে। মনে পড়ে একে একে ফেলে-আসা দিনগুলির কথা যে দিনগুলি আনন্দে ও বেদনায় ভরা, হাসি ও অশ্রুতে সমুজ্জ্বল, আশা ও নিরাশায় দোদুল্যমান। মনে পড়ে কত চেনা-অচেনা মুখের কথা, মনের পর্দায় ভেসে ওঠে কত খণ্ড খণ্ড বিক্ষিপ্ত ছোট ছোট ঘটনার কথা —অবসর সময়ে সেগুলি রোমন্থন করতে কখনো বা ভাল লাগে, কখনো বা শিউরে উঠি। কখনো সেইসব ঘটনা মনে প্রেরণা জোগায়, কখনো বা সেগুলি এনে দেয় ভবিষ্যতের সাবধানবাণী।

আমি আজ জীবনের সায়াহ্নবেলায় দাঁড়িয়ে দীর্ঘজীবনের পথপরিক্রমায় ক্লান্ত হয়ে অতীতের দিকে চক্ষু ফেরাতেই নানা ঘটনা আর চরিত্রের ভীড়ে নিজেকে হারিয়ে ফেলেছি। ছায়াছবির ঘটনার মত সবকিছুই একে একে মনের পর্দায় ভেসে উঠছে। এ যেন নিজের জীবনের হিসাবনিকাশের একটা ব্যালান্স সীট টানার মত।

বহু সাধারণ ও অসাধারণ, জ্ঞানী, গুণী ও সুধীজনের সংস্পর্শে এসে আমার অভিজ্ঞতার আলোকে এই শতাব্দীর দেশ সমাজ এবং দেশের মানুষকে কি রকম দেখেছি তারই একটা মোটামুটি চিত্র তুলে ধরতে চেষ্টা করছি পাঠকদের কাছে। আমার পরিশ্রম সার্থক হলে ধন্য মনে করব নিজেকে।

আজ থেকে ৭৫ বছর আগে—১৮৯২ সালে বহরমপুরে আমি প্রথম পৃথিবীতে আলো-হাওয়ার সংস্পর্শে আসি। আমার পিতা রায়বাহাদুর মহিমচন্দ্র সরকার তখন সেখানে আইনজীবী হিসাবে বিশেষ প্রভাবশালী। ভাইবোনে মিলে আমরা ছিলাম তেরোজন কিন্তু এখন বেঁচে আছি শুধু আমি ও আমার এক বোন।

বাবাকে নানা জায়গায় ঘুরে বেড়াতে হত। সেইজন্যে বাবার সঙ্গে আমরাও যেতাম। বাবা ছিলেন অত্যন্ত রাশভারী রক্ষণশীল ও পুরাতনপন্থী ধরনের। তাঁর কর্তব্যনিষ্ঠা এবং নিয়মতান্ত্রিকতার মাঝে আমরা বড় হয়ে উঠেছিলাম। আমোদ আহ্লাদ বা খেলাধুলার দিকে তাঁর বিশেষ উৎসাহ ছিল না। আপাতদৃষ্টিতে বাবাকে দেখলে মনে হত অত্যন্ত কঠোরপ্রকৃতির কিন্তু আসলে তা ছিলেন না তিনি—তাঁর মনটি সত্যই কোমল ছিল। আমার যতদূর মনে পড়ে বাবার সঙ্গে আমি প্রথম যাই রাজসাহী, তারপর বাবা চলে আসেন হাওড়ায় ১৯০৩-৪ সালে। সেখানে আমরা ৩।৪ বছর ছিলাম। এই সময়ই রুশো-জাপানী যুদ্ধ লাগে, শেষকালে অবশ্য জাপানীরাই পোর্ট আর্থারের যুদ্ধে জয়লাভ করে। এই রুশো-জাপান যুদ্ধের বিবরণী তখনকার সব খবরের কাগজে খুব ফলাও করে বেরুত। আর সেইসব সংবাদ আমাদের কিশোর মনে দারুণ আগ্রহ জাগিয়ে তুলত। রোজ সকালে উঠে খবরের কাগজ পড়ার উৎসাহ একটা নেশার মত দাঁড়িয়ে গেল। আমার সাহিত্য-জীবনের এই সূত্রপাত।

এর পর বাবা যান পাবনায়। বহরমপুরে আমার জন্মস্থান হলেও আমাদের আসল পৈত্রিক ভিটা হল পাবনা জেলার মালঞ্চী। ইছামতী নদীর তীরে ছোট্ট একটি গ্রাম। তারপর পাবনা থেকে পুরুলিয়া—সেখানে তিনি মুন্সেফ থেকে সাব-জজ হন। এখানে ২।৩ বছর থাকার পর কলকাতার আলিপুরে আসেন সাব-জজ হয়ে এবং তার ২।৩ বছর পরেই তিনি অবসর গ্রহণ করেন ১৯১০ সালে। এই সময় ১৯১১ সালে তদানীন্তন ভারত-সম্রাট পঞ্চম জর্জ ভারতে আসেন এবং বাবাও রায়বাহাদুর খেতাব প্রাপ্ত হন। অবসর নেবার আগে বাবা আমার এক ভাইকে ছোট আদালতের বিচারক ও ভগ্নিপতিকে মুন্সেফ করে দিয়েছিলেন।

বাবার বই লেখার খুব ঝোঁক ছিল—লিখেছেনও অনেকগুলি, তবে সেগুলি সবই আইনসংক্রান্ত বই (Law Book) এবং ইংরেজিতে। এইসব আইন-পুস্তকের চাহিদা খুব ভাল ছিল, সেই কারণে বেশ কিছু টাকাও পাওয়া যেতে লাগল। বাবা তখন আমার মেজভাই সুবোধচন্দ্র সরকারকে নিয়ে বর্তমানের এম সি সরকার এণ্ড সন্স পুস্তকের দোকানের পত্তন করেন ১৯১০ সালে। আজ সার্ধ শতাব্দীরও বেশী হয়ে গেল প্রকাশক এবং পুস্তকবিক্রেতা হিসাবে অতীব সম্মান এবং গৌরবের সঙ্গে এম সি সরকার এণ্ড সন্স চলে আসছে।

আমাদের পরিবারের অনেকেরই মধ্যে সাহিত্যানুরাগ প্রবল ছিল। বাবার তো ছিলই, তা ছাড়া প্রখ্যাতা মহিলা সাহিত্যিক সরলাবালা সরকার ছিলেন আমার বড় বৌদি, শরৎচন্দ্র সরকারের পত্নী। তিনি সুকবি ছিলেন—তাঁর প্রথম কবিতার বই হল 'প্রবাহ'। এ ছাড়াও তাঁর অন্যান্য বই আছে। তখনকার 'সাহিত্য জাহ্নবী' প্রভৃতি পত্রিকায় তাঁর কবিতা নিয়মিত প্রকাশিত হত। তারপর 'আনন্দবাজার' ও 'দেশে'ও তাঁর বহু লেখা বেরিয়েছে। ইনি রামকৃষ্ণ মিশনের সঙ্গে যুক্ত ছিলেন এবং সে সম্পর্কে একটি বইও লেখেন। এঁরই মেয়ে হলেন শ্রীমতী নির্ঝরিণী সরকার—আনন্দবাজার পত্রিকার বর্তমান সম্পাদক ও কর্ণধার শ্রীঅশোককুমার সরকারের মাতা।

কবি কাদম্বিনী দেবী ছিলেন আমার বড়দিদি। লোকসমাজে যে বিশেষ পরিচিতা ছিলেন তা বলা চলে না। উচ্চশিক্ষিতা বলতে আমরা যেরকম বি-এ এম-এ পাশকরা লোককেই সাধারণত বুঝি—তিনি তাও ছিলেন না। তবু কবিগুরু রবীন্দ্রনাথ তাঁকে অত্যন্ত স্নেহ ও প্রীতির চক্ষে দেখতেন। বড়দি আধ্যাত্মিক জগতেই বিচরণ করতে ভালবাসতেন, তাঁর ঈশ্বরজিজ্ঞাসা ও "অসামান্য ধীশক্তি" রবীন্দ্রনাথকে বিশেষভাবে মুগ্ধ করেছিল। প্রায় ত্রিশ বৎসর ধরে উভয়ের মধ্যে পত্রযোগে নানা বিষয়ের আলাপ-আলোচনা চলেছিল। তাঁদের মধ্যে কি ধরনের পত্র বিনিময় হতো তারই একখানি নীচে তুলে দিলাম :

ওঁ ৯ই মে, ১৯০৬

কল্যাণীয়াসু

আমার নববর্ষের আশীর্বাদ গ্রহণ করিবে।

সংসারক্লিষ্ট হৃদয়ের শান্তির জন্য ঈশ্বরের অনুগ্রহ ছাড়া আর কোনো উপায় নাই। ইহা নিশ্চয় জানিয়ো সুখ দুঃখ বাহিরের ঘটনার উপরে সম্পূর্ণ নির্ভর করে না, বাহিরের ঘটনা অতি ক্ষুদ্র উপলক্ষ্য মাত্র, ঈশ্বর যাহার অন্তঃকরণে সুখী হইবার শক্তি দেন সেই জীবন হইতে জগৎ হইতে সুখ লাভ করিতে পারে। আমি অনেক লোককে জানি যাহারা সুখকর সমস্ত উপকরণ দ্বারা বেষ্টিত, কিন্তু চিরজীবন সুখ অনুভব করিল না। দূর হইতে উপদেশ দেওয়া সহজ—কিন্তু আমি জানি অন্তঃপুরের সংকীর্ণ অধিকারের মধ্যে জীবন যখন সর্বদা সঙ্কুচিত হইয়া থাকে তখন জগৎ হইতে রস আকর্ষণ করা অত্যন্ত কঠিন। ...তোমার চারিদিকে যেটুকু লেশমাত্র সুখ যেটুকু কণামাত্র আনন্দ আছে তাহাকেই মনের সম্মুখে রাখ—বল 'আনন্দং পরমানন্দম্।' পরাভূত হইয়ো না—দুঃখকে সর্বদা দুঃখ বলিয়া স্বীকার করিতে থাকিলেই তাহার জাল ছিন্ন করা কঠিন হইয়া উঠে—সমস্ত দুঃখ দৈন্য অভাবের চেয়ে যে আমি বড় ইহা বারবার মনকে বুঝাইবে।..... মন যখনই অপ্রসন্ন হইতে চাহিবে তখনি

তাহাকে তোমার সমস্ত শক্তিতে ঊর্ধ্বের দিকে টানিয়া তুলিবে, বলিবে—

সুখং বা যদিবা দুঃখং
প্রিয়ং বা যদিবাপ্রিয়ম্
প্রাপ্তং প্রাপ্তমুপাসীত
হৃদয়েনাপরাজিতা—

সুখই হউক দুঃখই হউক, প্রিয়ই হউক অপ্রিয়ই হউক যাহাই প্রাপ্ত হইবে তাহাকেই অপরাজিত চিত্তে উপাসনা করিবে।

ইতি ২৬শে বৈশাখ, ১৩১৩।

আশীর্বাদক
শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

আর একখানি চিঠিতে স্বাধীনতালাভের পথ সম্বন্ধে রবীন্দ্রনাথ ও গান্ধীজির মতদ্বৈধতার পরিচয় পাওয়া যায়—তিনি লিখেছিলেন :

"ইংরেজের অত্যাচার সহ্য করতে হবে কিম্বা ভারতবর্ষ কোনদিন স্বাধীন হবার চেষ্টা করবে না এমন কথা আমি বলিনি। মহাত্মাজি বলেছেন ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের মধ্যেই আমরা থাকব এবং সে রকম থাকবার ইচ্ছা না করা religiously wrong অর্থাৎ ধর্মবিরুদ্ধ। আমি সে কথা বলিনে। আমি বলি স্বাধীনতা বাইরের কোন একটা ঘটনার উপর নির্ভর করে না ; দেশের যে অবস্থা ঘটলে স্বাধীনতার মূলে পত্তন হয়, স্বাধীনতা সত্য হয় সে অবস্থা ঘটাবার জন্যে চেষ্টা করাই আমাদের বর্তমান কর্তব্য। সে অবস্থা চরকা কেটেও হয় না, জেলে গিয়েও হয় না—তার সাধনা তার চেয়েও কঠিন ও বিচিত্র—তাতে শিক্ষার দরকার এবং দীর্ঘকালের তপস্যা চাই। হঠাৎ একটা কিছু করে বসা তপস্যা নয়। যে সব কাজে মনের সমস্ত শক্তির জাগরণ ও দীর্ঘকালের প্রাত্যহিক ত্যাগস্বীকার চাই সে কাজে যখন আমাদের ছেলেদের কোনো উৎসাহ দেখিনে যখন দেখি তারা নিরন্তর তীব্র হৃদয়াবেগের নেশায় মেতে থাকতে চায় "তদা ন সংশে বিজয়ায়, সঞ্জয়।" ইতি ২২ মাঘ, ১৩২৮

শুভানুধ্যায়ী
শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর।

এই ধরনের প্রায় ৯০ খানি রবীন্দ্রনাথের লেখা চিঠি কয়েক বছর আগে আমি বিশ্বভারতীকে দিয়েছি। রবীন্দ্রগ্রন্থাবলীর 'চিঠিপত্র' (৭ম ভাগে) এই চিঠিগুলি মুদ্রিত আছে।

বড়দির বিয়ে হয় কুষ্ঠিয়ার রূপিহাট গ্রামের প্রাণগোপাল দত্তের সঙ্গে, কিন্তু বিয়ের অল্পদিনের মধ্যে জামাইবাবু মারা যান। এই অল্পবয়সে বিধবা হওয়ায় তিনি যে দারুণ আঘাত পেয়েছিলেন, এই শোকের হাত থেকে খানিকটা সান্ত্বনালাভের আশায় তিনি রবীন্দ্ররচনাবলীর মধ্যে আশ্রয় লাভ করেন এবং ক্রমশ রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে পত্রালাপ শুরু করেন।

এই রবীন্দ্রসাহিত্যচর্চায় বিশেষ উৎসাহ দিতেন বড়বৌদি অর্থাৎ শ্রীমতী সরলাবালা সরকার। কবির 'রাজর্ষি' পড়ে বড়দি এতদূর প্রভাবান্বিত হয়েছিলেন যে, সেই সময় তিনি যে কাণ্ডটি করেছিলেন তাতে আমাদের পরিবারের সকলের মনেই একটা বিরাট পরিবর্তন এনে দিয়েছিল। ঘটনাটি ছিল এই—

আমি আগেই বলেছি যে আমাদের আদি বাড়ী হল পাবনা জেলার দুলগাছী গ্রামে। আমাদের দেশের বাড়ীতে খুব ধুমধামসহকারে দুর্গাপুজো হতো। সেখানে আমরা অনেকেই যেতাম পুজোর সময়। বাংলাদেশের গ্রামের সঙ্গে সেই আমার প্রথম পরিচয়। বাংলামায়ের সে শস্যশ্যামলা রূপও যেমন এখন আর চোখে পড়ে না—তেমনি চোখে পড়ে না আগেকার মত শান্ত-শিষ্ট সরল মানুষগুলিকে। এখনকার যান্ত্রিক সভ্যতা আর রাজনৈতিক আবহাওয়ায় সবার মধ্যেই এনে দিয়েছে বিরাট পরিবর্তন।

এই পুজোর সময় আমাদের ওখানে পাঁঠাবলি হতো। পাঁঠার মাংস খেতে যতই ভাল লাগুক, চোখের সামনে একটা নিরীহ জীবকে বলি দেওয়া হচ্ছে এ দৃশ্য দেখতে সাধারণত মন চায় না। তবু একটা প্রথা চিরকাল ধরে চলে আসছে—কারু ভাল লাগুক বা না লাগুক এটা একটা পুজোর অঙ্গ হিসাবেই চলে আসছিল।

বড়দি এই সময় ঝোঁক ধরে বসলেন বলি বন্ধ করতে হবে। জ্যেষ্ঠদের অনেক অনুরোধ উপরোধ, অনুনয় বিনয় প্রভৃতি করার পরও যখন তাঁর কথা কেউ শুনলেন না তখন তিনি অনশন শুরু করেন।

মহাষ্টমির দিন অনেক পাঁঠা বলি দেবার জন্যে আনা হয়েছে। আমি এবং আমার সমবয়সী ছেলেরা একটা চাপা উত্তেজনার মধ্যে দিয়ে ঘুরে বেড়াচ্ছি। যতই বলির সময় এগিয়ে আসতে লাগল ততই আমাদের উত্তেজনাও বৃদ্ধি পেতে লাগল।

বলির সময় আসতেই হঠাৎ এ কি দৃশ্য! আমরা সবাই অবাক বিস্ময়ে তাকিয়ে দেখলাম দিদি পাঁঠাবলির হাঁড়িকাঠের ভেতর মাথাটি ঢুকিয়ে দিয়ে বসে আছেন। এর আগে তিন দিন ধরে বড়দি আহার ত্যাগ করেছেন। পুরোহিত থেকে বাড়ীর সকলেই তাকে অনুরোধ করতে লাগলেন! একি অলুক্ষণে কাণ্ড! এতদিনের প্রথা—বলি রহিত হলে সংসারে মহা অমঙ্গল ঘটবে যে!

কিন্তু বড়দির মুখে শুধু এক কথা—আগে বলি বন্ধ কর, তবে আমি উঠব। নইলে আমাকেই আগে বলি দাও।

শেষে বড়দিরই জয় হল। আমাদের বাড়ীর যাঁরা অভিভাবকস্থানীয়, তাঁরা জগজ্জননীর সামনে দাঁড়িয়ে প্রতিশ্রুতি দিলেন যে এ বাড়ীতে আর কখনও পশু বলি হবে না। তখন দিদি হাঁড়িকাঠ থেকে বেরিয়ে এসে অনশন ভঙ্গ করেন। দিদির এই অদ্ভুত মনের জোর আমাদের কিশোর মনকে যথেষ্ট প্রভাবান্বিত করেছিল।

বনলতা দেবী সম্পাদিত কেবল মহিলাদের দ্বারা পরিচালিত ও লিখিত "অন্তঃপুর" মাসিক পত্রে (প্রকাশ ১৩০৪ মাঘ) বড়দির কিছু কিছু রচনা প্রকাশিত হয়েছিল। সরলা দেবী চৌধুরাণী প্রতিষ্ঠিত ভারত-স্ত্রী মহামণ্ডলে তিনি কয়েক বৎসর শিক্ষকতা করেন।

সুতরাং ছোটবেলা থেকেই আমাদের বাড়ীতে যে সাহিত্য-আলোচনা হত তা আমি শুনতাম। বাবা, দাদা, বৌদি, দিদিদের সাহিত্য থেকে আমারও মনে ধীরে ধীরে সাহিত্যানুরাগ জন্মাতে শুরু করে। সেই থেকে আজ পর্যন্ত জীবনের গতি একমুখী হয়েই চলেছে—পুস্তক, পত্রিকা এবং প্রকাশনক্ষেত্রে।

বড়দার মেয়েই হলো নির্ঝরিণী। এর সঙ্গে বিয়ে হয় প্রফুল্লকুমার সরকারের পুরুলিয়ায় ১৯০৩-৪ সালে। তখন প্রফুল্লকুমার বি এ পাশ করেছেন। আমরা যখন ভবানীপুরের বাড়ীতে আসি, তখন সেইখানে থেকে প্রফুল্লকুমার আইন পড়তে শুরু করেন।

বাংলা ভাষায় প্রফুল্লকুমার অত্যন্ত মেধাবী ছাত্র ছিলেন। বি-এ পড়ার সময় 'বঙ্কিমচন্দ্র' সম্বন্ধে একটি রচনা প্রতিযোগিতায় তিনি প্রথম স্থান অধিকার করেন।

আমার যতদূর জানা আছে চৈতন্য মহাপ্রভুর প্রসঙ্গের চেয়েও তাঁর বঙ্কিম-সাহিত্যে অধিকার বেশী ছিল। আমরা ওঁর দু'তিনখানি বই ছেপেছিলাম।

তারপর বি-এল পাশ করার পর উড়িষ্যার ঢেনকানাল রাজ্যে কিছুদিন কাজ করে আনন্দবাজার পত্রিকায় যোগদান করেন এবং জীবনের শেষদিন পর্যন্ত এই পত্রিকার সঙ্গেই যুক্ত ছিলেন।

আমার যতদূর মনে পড়ে ১৯০৬ সালের ডিসেম্বর মাসে পুরুলিয়া থেকে কলকাতা এসে ভবানীপুরে কেদার বসু লেনে আমরা উঠি। এর আগে ১৯০৩-৪ সালে হাওড়া জেলা স্কুলে আমি পড়েছি। সেই সময় ভবানীপুরে পোড়াবাজারে কংগ্রেসের অধিবেশন হচ্ছিল। এই কংগ্রেস অধিবেশনের সঙ্গে একটা প্রদর্শনীও হয়েছিল। কংগ্রেস অধিবেশন ৩।৪ দিনে শেষ হলেও প্রদর্শনীটি কিন্তু অনেকদিন ধরে চলেছিল। এই কংগ্রেস অধিবেশনে সভাপতি ছিলেন বিখ্যাত কংগ্রেস-নেতা দাদাভাই নৌরজী। তিনি সেইসময় সর্বপ্রথম 'স্বরাজ' কথাটি ব্যবহার করেন। তিনি প্রচার করলেন যে, কংগ্রেসের আদর্শ হল 'স্বরাজ' লাভ করা। এই 'স্বরাজ' কথাটি ব্যবহার করে দেশে রাজনৈতিক মহলে বেশ একটা আন্দোলনের সৃষ্টি করলেন। আমাদের স্বরাজ লাভ করাই তখন একমাত্র ধ্যান-জ্ঞান হয়ে পড়লো।

আমি কলকাতায় এসে ভবানীপুরে সাউথ সুবার্বন স্কুলে ভর্তি হলাম। এর আগে আমাকে ছাত্রজীবন কাটাতে হয়েছে উকীলস ইনস্টিটিউশান, ঢাকা, পাবনা ইনস্টিটিউশান, পাবনা; হাওড়া জেলা স্কুল, হাওড়া; ভিক্টোরিয়া ইনস্টিটিউশান, পুরুলিয়া; এল এম এস ইনস্টিটিউশন, ভবানীপুর প্রভৃতি।

যাই হোক, এই সাউথ সুবার্বন স্কুলটি তখন হরিশ পার্কের গায়ে লাগানো ছিল। আমি এই স্কুলে ভর্তি হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে মনে হল যে জলের মাছ ডাঙায় এসে পড়লাম। অর্থাৎ আমি তখন সেকেণ্ড ক্লাসে পড়ি—আমাদের ক্লাসের সব ছেলেই কলকাতার। পুরুলিয়া থেকে এসেছি বলে ক্লাসের ছেলেরা আমায় 'বাঙাল' বলে নানারকম

টিটকারী দিত যদিও আমার জন্ম-স্থান হল পশ্চিমবঙ্গে। এবং সেই টিটকারীর বহর অনেকদিন পর্যন্ত চলেছিল। এখানে বলা দরকার যে তখন শেয়ালদা স্টেশনে নামলেই সকলকে 'বাঙাল' বলে পরিচিত হতে হত। কিন্তু আমি পুরুলিয়া থেকে হাওড়ায় এসে নামলেও এই 'বাঙাল' আখ্যা থেকে আমি পরিত্রাণ পেলাম না।

কলকাতার স্কুলে ভর্তি হওয়ার পর তিনটি জিনিসের পরিবেশ আমার খুব ভালো লাগলো। ক্রিকেট এবং ফুটবল খেলা দেখা এবং স্বদেশী আন্দোলনের নানারকম পরিস্থিতি। এই তিনটি জিনিসের মধ্যে আমি হাবুডুবু খেতে লাগলাম।

ক্রিকেট খেলার কথা 'বলতে গেলে উল্লেখ করতে হয় মহারাজা অফ্ নাটোরস ইলেভেন, মহারাজা অফ কুচবিহারস্ ইলেভেন এবং ক্যালকাটা ক্রিকেট ক্লাব। এই তিনটি ক্লাবই কলকাতায় তখন সেরা ক্রিকেট টীম ছিল। আমরা দল বেঁধে সবাই ইডেন গার্ডেনসে এই তিনটি দলের খেলা দেখে শীতকালটা কাটিয়ে দিতাম।

এই সময় আর একটি উৎসব গড়ের মাঠে অনুষ্ঠিত হয়েছিল—সেটি হলো 'লেডী মিণ্টো ফ্যান্সী ফেট্'। তৎকালীন ভাইসরয়-পত্নী লেডী মিণ্টো কর্তৃক নার্সদের সাহায্য-কল্পে এই উৎসবটি অনুষ্ঠিত হয়। এই উৎসবের প্রধান আকর্ষণ ছিল ফুটবল প্রতিযোগিতা। তখনকার কালে সমস্ত দেশের মধ্যে ক্যালকাটা ফুটবল ক্লাব ছিল সাহেবদের মধ্যে দুর্ধর্ষ ও সর্বশ্রেষ্ঠ ফুটবল দল। এই প্রতিযোগিতায় তখনকার বাঙালী ফুটবল ক্লাব মোহনবাগান দুর্ধর্ষ ক্যালকাটা ফুটবল দলকে হারিয়ে দিয়ে ক্রীড়ামহলে দারুণ চাঞ্চল্যের সৃষ্টি করল। এতে আমরা খুবই উৎসাহিত হয়ে উঠলাম, কারণ রোগা লিকলিকে একদল বাঙালীর ছেলে খালি পায়ে খেলে ওরকম একটা দুর্ধর্ষ দলকে হারিয়ে দিল—যাদের বুটের সামনে এগুনোই রীতিমত একটা ভয়ের ব্যাপার ছিল।

এ যেন আমাদের একটা জাতীয় জয়। কিন্তু এ আনন্দ আমাদের বেশীক্ষণ স্থায়ী হল না—হরিষে বিষাদ এসে গেল। কারণ ক্যালকাটা দল প্রতিবাদ জানায় যে মোহন-বাগান দল প্রফুল্ল বিশ্বাস নামক একজন খেলোয়াড়কে খেলিয়েছিল যে তাদের ক্লাবের সদস্য নয়। সেজন্যে মোহনবাগানকে সে প্রতিযোগিতা থেকে বাতিল করে দেওয়া হয়। অবশ্য এই একটা জিনিস ভালভাবে প্রমাণিত হলো যে রোগা লিকলিকে বাঙালীর ছেলেরা খালি পায়ে খেললেও তাদের মনোবল এত অসাধারণ ছিল যে তারা শ্রেষ্ঠ ইউরোপীয় দলকে হারিয়ে দিতে পারে।

বিখ্যাত বাঙালী খেলোয়াড়দের মধ্যে ভাদুড়ী ভ্রাতৃদ্বয়, সুধীর চট্টোপাধ্যায়, অভিলাষ ঘোষ প্রভৃতি ছিলেন। এর প্রতিশোধ অবশ্য মোহনবাগান দল নিজেই নিয়েছিল ১৯১১ সালে। পর পর পাঁচটি দুর্ধর্ষ ইউরোপীয় দলকে (যেমন থার্ড মিডল্‌সেক্স, ডালহৌসী, রাইফল ব্রিগেড, রেঞ্জার্স, ইস্ট ইয়র্ক) হারিয়ে বাংলার তরুণ খেলোয়াড়েরা প্রমাণ করল যে তরাও ইউরোপীয় দলের মতই দুর্ধর্ষ।

ঐতিহাসিক আই-এফ-এ শীল্ড ফাইনালের খবর এখানে কিছু দেওয়া দরকার। মোহনবাগান খেলছে ইস্ট ইয়র্ক দলের সঙ্গে। হাফ-টাইমের আগেই দেখা গেল গোরা দল ১—০ গোলে এগিয়ে গেছে। অনেক আশা নিয়ে আমরা দেখতে গেছি খেলা কিন্তু এই বিপর্যয়ে শুধু আমরা কেন সমগ্র বাঙালীসমাজই যেন দারুণ মুষড়ে পড়ল। আমরা তখন এই খেলাটিকে একেবারে জাতীয় খেলা বলে ধরে নিয়েছিলাম।

কিন্তু বিরতির পর চাকা গেল ঘুরে। নতুন উদ্যমে মোহনবাগান খেলতে শুরু করল। আমাদের সকলের আন্তরিক ইচ্ছা এবং খেলোয়াড়দের আন্তরিক প্রচেষ্টায় যেন ভাগ্যদেবী সুপ্রসন্না হলেন। পর পর দুটো গোল দিয়ে মোহনবাগান আই-এফ-এ শীল্ড জয়লাভের অভূতপূর্ব গৌরব অর্জন করল। তখন অবশ্য খেলা দেখবার জন্যে গ্যালারীর বন্দোবস্ত ছিল না। বড় বড় কাঠের বাক্সের ওপর দাঁড়িয়ে খেলা দেখতে হতো। বহু লোক এই বাক্স ভাড়া দিয়ে বেশ দু' পয়সা উপার্জন করত।

এখানে একটা সামান্য ঘটনার কথা উল্লেখ করলেই বোঝা যাবে যে এই খেলা দেখবার জন্যে লোকেরা কিরকম উত্তেজিত হয়ে পড়েছিল। কলকাতায় সে সময় একটি ইংরাজী সান্ধ্য পত্রিকা প্রকাশিত হতো—তার নাম ছিল 'এম্পায়ার'। ক্যালকাটা ফুটবল ক্লাবের মাঠ থেকে মিশন রো'য় এম্পায়ার পত্রিকার অফিস পর্যন্ত একটি বিশেষ টেলিফোন লাইন বসানো হয়েছিল। খেলার হাফ-টাইম পর্যন্ত খবর নিয়ে একটি বিশেষ সংস্করণ প্রকাশিত হলো, এবং খেলার মাঠে তা বিক্রি হতে লাগল। এই থেকে বোঝা যাবে যে কলকাতায় তখন এই খেলার হার-জিৎ নিয়ে বাঙালী ও সাহেবদের মধ্যে কতখানি উদ্দীপনা ও উত্তেজনার সৃষ্টি হয়েছিল। সে একদিন গেছে, এখন আমরা সেই গৌরবোজ্জ্বল দিনের কথা যেন ভুলেই গেছি।

কারণ তখনকার মোহনবাগান আর এখন-কার মোহনবাগান দলে অনেক প্রভেদ। তখন সেটা সত্যিকার বাঙালী দল ছিল, এখন অবাঙালী খেলোয়াড়রাও অনেকে মোহন-বাগানে খেলেন। মোহনবাগান তখন খালি পায়ে খেলত, এখন বুট পায়ে দিয়ে খেলছে। বেটা বাঙালীর বিশেষ দোষ ছিল।

ফুটবলের মত ক্রিকেট খেলা দেখারও ঝোঁক আমার কম ছিল না। কলকাতার তখন ক্রিকেট দলগুলির ভিতর তিনটি দলের খুব নাম-ডাক ছিল। যেমন ক্যালকাটা, কুচবিহার মহারাজার একাদশ এবং নাটোরের মহারাজার একাদশ। বাইরে থেকেও মাঝে মাঝে ২।১টা দল ক্রিকেট খেলতে আসত, যেমন পাতিয়ালা মহারাজার একাদশ এবং জাম সাহেবের একাদশ। এইসব দলে আমরা দেখেছি কর্নেল মিস্ত্রি, নাটোরের বিখ্যাত বোলার পি, বালু যিনি পরে প্রথম ভারতীয় দলের সঙ্গে বোলার হিসেবে ইংলণ্ডে খেলতে গিয়েছিলেন; আর ছিলেন কুচ-বিহারের বিখ্যাত বোলার ওয়ার্ডেন; কুচবিহারের মহারাজার পুত্র যুবরাজ হিটিও বেশ ভালো খেলতেন।

এই সময় কলকাতার ক্রীড়াজগতে এমন একটা ঘটনা ঘটে, যাতে চারদিকে বেশ সাড়া পড়ে যায়। সেবারে কলকাতায় খেলতে এসেছিলেন প্রিন্স রঞ্জি। ক্যালকাটা মাঠে ক্যালকাটা ক্লাব তাদের একজন নিয়মিত খেলোয়াড়ের অভাবে ভারতীয় গ্রাউণ্ডসম্যান ফাগুরামকে মাঠে নামান। ফাগুরাম দলের মধ্যে নিয়মিত না খেললেও অনুশীলনের সময় রীতিমত বল করতেন। যাই হোক, কয়েকটা বল খেলবার পর ফাগুরামের বলেই রঞ্জি আউট হয়ে যান।

আর একটি ঘটনার কথাও এখানে উল্লেখ করা যেতে পারে। সে সময় একদিন পাতিয়ালা টীমের খেলা মহারাণী দেখবেন বলে তাঁর গাড়ীকে মাঠের ভিতরে ও প্রায় টেন্টের ভিতরে ঢুকতে দেওয়া হয়েছিল। এই সুবিধাটুকু দেওয়া হয়েছিল পাতিয়ালার রাণীর সম্মানে।
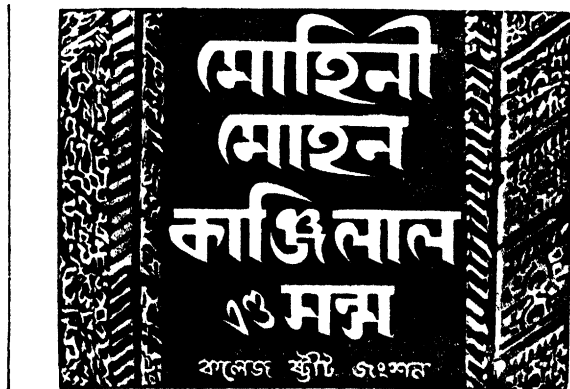
আবার মোটরের কাঁচেরও এমন কারসাজি যে আরোহিণী ভালভাবে খেলা দেখতে পায়েন, কিন্তু বাইরের কেউ তাঁকে দেখতে পাবে না। অবশ্য আজকের দিনের ক্রিকেট খেলা দর্শনার্থীদের ভিড়ের তুলনায় সে ভিড় অতি নগণ্য।

ছাত্রজীবনটা যে আমি শুধু খেলাধুলো দেখেই কাটিয়েছি তা নয়, সেই সময় সবথেকে আমাদের তরুণ মনকে চঞ্চল করে তুলেছিল স্বদেশী আন্দোলন। সে বিষয়ে দু'চার কথা বলতে চাই—

বাংলাদেশেই এই আন্দোলনটা তখন বেশ জোরদারভাবে চলেছে। আমাদের ক্লাসে দু' একজন ছাত্র ছিলেন যাঁরা এই বিপ্লবী-দের সঙ্গে প্রচ্ছন্নভাবে যুক্ত ছিলেন। আবার দু' একজন এমন ছাত্র ছিলো যারা ব্রিটিশ সরকারের গুপ্তচরের কাজ করত। তাদের কাজ ছিল ক্লাসের কোনো ছেলের সন্দেহ-জনক গতিবিধি বা কার্যকলাপ দেখলেই সরকারীভাবে পুলিশে খবর দেওয়া। আমরা এ স্বদেশী আন্দোলনকে মনেপ্রাণে সমর্থন করতাম বটে, তবে প্রচ্ছন্নভাবে।

বিপ্লবীদের কার্যকলাপের বিষয়ে পড়বার জন্যে মনটা সবসময় উদ্‌গ্রীব হয়ে থাকত। তাই প্রতিদিন বিকেলে স্কুলের ছুটির পর ব্রহ্মবান্ধব উপাধ্যায়ের 'সন্ধ্যা' কাগজখানি না পড়লে মনে স্বস্তি পেতাম না। এ ছাড়াও প্রতি শুক্রবার অনুশীলন দলের সাপ্তাহিক পত্রিকা 'যুগান্তর' পড়তাম।

তখন সবচেয়ে রোমাঞ্চকর খবর ছিল—আলিপুরের বিখ্যাত বোমার মামলা। স্কুলের ছুটি হওয়া পর্যন্ত সবুর সইত না, কোন কোন দিন স্কুল কামাই করেও আমরা কয়েকজন বন্ধু মিলে যেতাম আলিপুরে ফৌজদারী আদালতে এই বোমার মামলার আসামীদের দেখতে। কোর্টের সামনে প্রকাণ্ড দুটি কালো রঙের মোটরগাড়ী দাঁড়িয়ে থাকত। এই গাড়ীগুলিকে ইংরাজিতে Black Maria বলা হয়। প্রথম গাড়ী আসামী ভর্তি হয়ে গেলে বাকী আসামীরা দ্বিতীয় গাড়ীতে উঠতেন। বেশ মনে আছে সবশেষে উঠতেন শ্রীঅরবিন্দ। গাড়ীর চালক এবং রক্ষীরা সকলেই ছিলেন এ্যাংলো-ইণ্ডিয়ান সার্জেণ্ট। গাড়ীর দরজা বন্ধ হয়ে যাবার পর সকলের শেষে আসতেন নরেন গোস্বামী। আসামীদের কাছে নরেন গোস্বামী তখন বিশ্বাসঘাতক বলে পরিচিত। গাড়ীর চালকের পাশে তাঁকে বসানো হতো যাতে কোনো অঘটন না ঘটে। যতক্ষণ না গাড়ীটি আদালত প্রাঙ্গণ থেকে বেরিয়ে আমাদের দৃষ্টির বাইরে চলে যেত ততক্ষণ আমরা দাঁড়িয়ে থাকতাম। শেষে একটা দীর্ঘনিশ্বাস ফেলে আমরা যে যার বাড়ীর দিকে রওনা দিতাম।

নরেন গোস্বামীর জন্য বোমার দলের আসামীরা ধরা পড়ে—এ বিশ্বাসঘাতকতার কি করে প্রতিশোধ নেওয়া যায়, তার চেষ্টা তখন তলে তলে চলছিল। শেষে একদিন জেল-খানার হাসপাতালের মধ্যে কানাই দত্ত ও সত্যেন বসু নরেন গোস্বামীকে হত্যা করে এ বিশ্বাসঘাতকতার প্রতিশোধ নিলেন। ফলে যা অনিবার্য তাই হল। কানাই দত্তের ফাঁসি হল। জেলের ভেতর ফাঁসি হওয়ার পর যখন কেওড়াতলা শ্মশানঘাটে কানাই দত্তের মৃতদেহ নিয়ে আসা হল সৎকারের জন্য তখন আমি সে স্থানে উপস্থিত ছিলাম। কয়েকজন ধুরন্ধর ব্যবসায়ী সঙ্গে সঙ্গে কানাই দত্তের ছবি ছেপে গোপনে বিক্রি করতে লাগল। আমিও একটি ছবি কিনে স্কুলের খাতার মধ্যে রেখে দিলাম। তার কিছুদিন পরে সেটি নষ্ট করে ফেলে-ছিলাম পুলিশের ভয়ে।

বৃটিশ সরকারের মতে এঁরা দেশদ্রোহী বলে চিহ্নিত হলেও আমাদের তরুণ মনে তাঁরা হলেন শহীদ। দেশকে ভালবাসা অপরাধ নয়, বিদেশীর শাসন থেকে দেশকে মুক্ত করা কি দেশদ্রোহিতা? শাসকসম্প্রদায় বিদেশী বলে তাঁরা আমাদের মনে এই সব ধারণা ঢুকিয়ে দেবার জন্য যথাসাধ্য চেষ্টা করতেন। আমাদের খোলাখুলিভাবে এই সব বিপ্লবী দলে যোগ দেবার সাহস বা সামর্থ্য না থাকলেও আন্তরিক সমর্থন ছিল এঁদের কাজে। তখন প্রায়ই মনে হত যদি এঁদের হয়ে একটা কিছু কাজ করতে পারি, তাহলে জীবন সার্থক মনে করব।

তারপর নানা বিপ্লবীদের হাতে অনেক পুলিশ কর্মচারীর হত্যাকাণ্ড সংঘটিত হয়, তাদের বিস্তৃত বিবরণ না দেওয়াই ভালো। কিন্তু সেইসব ঘটনার মধ্য দিয়েই আমাদের বাল্যকাল অতিবাহিত হয়েছে। প্রায় প্রত্যেক দিনই কাগজ খুললে একটা-না-একটা ঘটনার বিবরণ পাওয়া যেতো। শ্রীঅরবিন্দ, বিপিনচন্দ্র পাল, ব্রহ্মবান্ধব উপাধ্যায়, মনোরঞ্জন গুহঠাকুরতা, সুরেন্দ্র-নাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, লালমোহন ঘোষ, রাস-বিহারী ঘোষ প্রভৃতি সকলের অগ্নিগর্ভ বক্তৃতা শোনবার সুযোগ ও সৌভাগ্য আমার হয়েছিল।

এই সময় আমাদের বাংলা দেশে দুটি আন্দোলন বেশ জোরালো হয়ে উঠেছিল, একটি আন্দোলন হচ্ছে 'শিবাজী উৎসব'। মহারাষ্ট্র দেশ থেকে মহামান্য তিলক মহারাজ এসে এই আন্দোলনের পুরোভাগে দাঁড়ালেন। রবীন্দ্রনাথও এই আন্দোলনে যোগ দিলেন। কবিগুরুর 'শিবাজী উৎসব' কবিতাটি এই সময়েই রচিত।

"কোন দূর শতাব্দের কোন
এক অখ্যাত দিবসে
নাহি জানি আজি
মারাঠার কোন শৈলে
অরণ্যের অন্ধকারে বসে
হে রাজা শিবাজি
তব ভাল উদ্ভাসিয়া এ ভাবনা
তড়িৎ প্রভাবৎ
এসেছিল নামি—
"এক ধর্মরাজ্য পাশে
খণ্ড ছিন্ন বিক্ষিপ্ত ভারত
বেঁধে দিব আমি।"

অপর আন্দোলনটির নাম দেওয়া যেতে পারে "বঙ্কিম আন্দোলন"। অমর ঔপন্যাসিক বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের 'আনন্দমঠ' তখন ঘরে ঘরে পঠিত হোত। 'বন্দেমাতরম' সঙ্গীতকে তখন আমরা জাতীয় সঙ্গীতরূপে গ্রহণ করেছিলাম। অর্থাৎ বঙ্কিমচন্দ্রের 'আনন্দমঠ' তখন গীতা-বাইবেলরূপে পরিগণিত হতো। এ ছাড়া স্বামী বিবেকানন্দের পুস্তকগুলিও বাংলাদেশের তরুণ মনে দারুণ উদ্দীপনা ও উৎসাহের সঞ্চার করতো।

এইভাবে আমাদের স্কুলজীবন শেষ হলো। এল এম এস স্কুল থেকে প্রবেশিকা পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হবার পর ১৯১০ সালে ভর্তি হলাম সিটি কলেজে। এইখানেই আমার সঙ্গে বন্ধুত্ব হয় শ্রীঅমল হোমের।

এখানে বলা দরকার যে, আমার সাহিত্যে হাতে-খড়ি এর মধ্যেই হয়ে গেছে। ১৯০৮-৯ সালে আমি প্রথম 'ভারতী'তে লেখা পাঠাই। তখন ভারতীর সম্পাদিকা ছিলেন শ্রীমতী স্বর্ণকুমারী দেবী। প্রথম লেখা পাঠানোর পর অধীর আগ্রহে অপেক্ষা করছি, কবে ছাপার অক্ষরে নিজের লেখাটি দেখতে পাব। ছাপার অক্ষরে নিজের লেখার সঙ্গে নিজের নাম দেখার মধ্যে যে অপূর্ব অনুভূতির সঞ্চার হয় তা বোধহয় নিজের নবজাত সন্তানদর্শনের চেয়ে কোন অংশে কম নয়। একদিন স্বর্ণকুমারী দেবী আমাকে ডেকে পাঠালেন তাঁর সঙ্গে দেখা করার জন্যে।

তখনও স্কুলের ছাত্র, কতটুকুই বা জ্ঞান বা অভিজ্ঞতা হয়েছে তখন আমার! তার ওপরে দেখা করতে হবে তখনকার দিনের

সবথেকে প্রগতিশীল ঠাকুরপরিবারের স্বর্ণকুমারী দেবীর সঙ্গে। দুরু দুরু বক্ষে গেলাম তাঁর সঙ্গে দেখা করতে। কিন্তু আমার সব ভয় কেটে গেল যখন জানতে পারলাম যে লেখাটি আমার মনোনীত হয়েছে এবং আগামী সংখ্যায় তা প্রকাশিত হবে। এ ছাড়াও তিনি আমাকে অনেক উৎসাহ এবং উপদেশ দিলেন।

শুরু হলো আমার সাহিত্য-জীবন। ভারতী ছাড়াও অন্যান্য দু-একটি কাগজেও লিখতে শুরু করলাম। কিন্তু আসলে আমার সাহিত্যরচনার শিক্ষানবীশী আরম্ভ স্বর্গত অমূল্যচরণ বিদ্যাভূষণের অধীনে। তিনি তখন হেদুয়ার ধারে মানিকতলা স্ট্রীটের ওপর এডওয়ার্ড ইনস্টিট্যুশান নামে একটি স্কুল খুলেছিলেন। বিদ্যাভূষণ মহাশয় প্রথমে আমাকে পরীক্ষা করবার জন্য দেন ICONOGRAPHY নামক একটি প্রবন্ধ বাংলায় অনুবাদ করতে দিলেন। আমি অত্যন্ত সাফল্যের সঙ্গে সেই পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হলাম। তিনি খুশী হয়ে আমাকে যথেষ্ট উৎসাহ দিলেন।

এই সময় বিখ্যাত পুস্তকপ্রকাশক গুরুদাস চট্টোপাধ্যায় এণ্ড সন্স 'ভারতবর্ষ' নামক একটি মাসিক পত্র প্রকাশের আয়োজন করছিলেন। দ্বিজেন্দ্রলাল রায় হবেন এর সম্পাদক কিন্তু হঠাৎ দ্বিজেন্দ্রলাল মারা যাওয়ায় তিনি আর সম্পাদক হতে পারলেন না। তাঁর জায়গায় সম্পাদক হলেন অমূল্যচরণ বিদ্যাভূষণ মহাশয়। তখন আমি ও আমার বন্ধু প্রভাতচন্দ্র গঙ্গোপাধ্যায় ভারতবর্ষে দুজনে মিলে অনেক প্রবন্ধ লিখেছিলাম।

এর আগে 'জাহ্নবী' নামক মাসিক পত্রিকার পুনরুত্থান হয়। এই পত্রিকাটি প্রথমে বের করেছিলেন নলিনীরঞ্জন পণ্ডিত, কিন্তু কয়েক বৎসর পরে বন্ধ হয়ে যায়। পরে এটির পুনঃপ্রকাশ করেন শ্রীসুধাকৃষ্ণ বাগচী। কয়েক সংখ্যা প্রকাশের পর আমরা কয়েকজন মিলে এই পত্রিকার সম্পাদনা করতে লাগলাম। আমাদের মধ্যে ছিল অমল হোম, প্রেমাঙ্কুর আতর্থী, প্রভাতচন্দ্র গঙ্গোপাধ্যায়, হেমেন্দ্রকুমার রায় ও আমি। এই কয়জনের নামই সম্পাদক হিসেবে প্রকাশিত হয়েছিল। অত অল্প বয়সে সম্পাদক হিসাবে নাম প্রকাশিত হওয়ায় আমরা খুবই গর্ব অনুভব করতাম। আমি ছাড়া সকলেই তখন সাহিত্যক্ষেত্রে বেশ পরিচিতি লাভ করেছিল।

নবীন চিত্রশিল্পী হিসেবে চারু রায় তখন বেশ নাম করেছেন এই 'জাহ্নবী'তেই ছবি এঁকে। তিনি আমাদের সম্পাদিত 'জাহ্নবী'র প্রচ্ছদপট এঁকে দেন।

'জাহ্নবী'র নিজস্ব লেখকগোষ্ঠী নিয়ে মাঝে মাঝে সাহিত্যসভা বসত—আমরা সবাই সেই সাহিত্যসভায় মিলিত হতাম। ছাত্র অবস্থাতেই আমি সম্পাদক হয়েছিলাম, একথা ভাবলে এখন কি রকম আশ্চর্য বোধ হয়। আমাদের মধ্যে একজন সম্পাদক, সেই সময় বিখ্যাত ইংরাজ লেখিকা মারী করেলীর চিঠি সংগ্রহ করে পত্রিকায় প্রকাশ করেছিলেন। আমিও সেই কাগজে তখন বিখ্যাত রুশ লেখক ম্যাক্সিম গোর্কীর একটি ছোটগল্প বাংলায় প্রথম অনুবাদ করি।

এরপর আমার সঙ্গে ঘনিষ্ঠভাবে যোগাযোগ ঘটে তদানীন্তন বিখ্যাত মাসিক 'যমুনা' পত্রিকার সঙ্গে। স্বর্গীয় ফণীন্দ্রনাথ পাল ছিলেন এর সম্পাদক। 'যমুনা'র অফিসটি ছিল কর্ণওয়ালিস স্ট্রীট ও সুকিয়া স্ট্রীটের সংযোগস্থলে, দোতলায়। এইখানেই আমি নানা সাহিত্যিকের সংস্পর্শে আসি এবং পরিচিত হই। এইখানে একদিন একটা খুব মজার ঘটনা ঘটেছিল। সেটা বলি।

একদিন দুপুরবেলা আমরা কয়েকজন বন্ধু মিলে বেশ আড্ডা জমিয়েছি। দলের মধ্যে ছিল প্রেমাংকুর আতর্থী, চারু রায়, হেমেন্দ্রকুমার রায় ইত্যাদি। নানা ধরনের গালগল্পের ভেতর দিয়ে দুপুর গড়িয়ে বিকেল হতেই ক্ষিধেটা বেশ মাথাচাড়া দিয়ে উঠল। অফিসের দরজাটি বন্ধ করে তার সদ্ব্যবহারে ব্যস্ত আছি। আলোচনা হচ্ছিল 'যমুনা' প্রকাশে ক্রমশই বেশ দেরী হয়ে যাচ্ছে সেই বিষয়ে। আর এই দেরীর একমাত্র কারণ হচ্ছেন শরৎচন্দ্র। শরৎচন্দ্র তখন রেঙ্গুনে ছিলেন—সেখানে থেকে সময়মত তাঁর 'চরিত্রহীনের' কিস্তি এসে পৌঁছুচ্ছে না। শরৎবাবুর প্রতিভা অবশ্য তার পূর্বেই স্বীকৃত হয়ে গেছে। এর আগে ১৩১৪ সালে 'ভারতী'তে শরৎচন্দ্রের 'বড়দিদি' পড়ে আমরা মুগ্ধ ও বিস্মিত হয়েছিলাম। যদিও প্রথম দুটি সংখ্যায় লেখকের নাম প্রকাশিত হয়নি। তৃতীয় অর্থাৎ শেষ সংখ্যায় লেখকের নাম প্রকাশিত হয়েছিল— শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়।

যাই হোক, এই নিয়ে আমরা একটু উত্তেজিতভাবে আলোচনা করছি—আমাদের কে যেন বলে উঠল 'শরৎবাবু নিশ্চয়ই চরিত্রহীন তাই 'চরিত্রহীন' লেখা পাঠাতে দেরী করছেন। কথাটা অবশ্য খুবই হাল্কাভাবে ঠাট্টাচ্ছলে বলা হয়েছিল—কিন্তু ঠিক সেই সময়েই ঘরের দরজাটি খুলে একজন প্রবেশ করলেন। সঙ্গে আবার একটা কুকুর। সাধারণ জামা-কাপড়পরা শীর্ণকায় লোকটি। ঘরে ঢুকতেই তাঁকে জিজ্ঞেস করলাম, কাকে চাই?

তিনি বললেন, ফণীবাবুর সঙ্গে দেখা করতে চাই।

তাকে বলা হোল যে তিনি তো এখন নেই, সন্ধ্যাবেলায় আসবেন তখন এলে তাঁর সঙ্গে দেখা হবে।

আগন্তুক ভদ্রলোকটি বললেন, তাহলে আমি একটু অপেক্ষা করে তাঁর সঙ্গে দেখা করেই যাব। অনেক দূরদেশ থেকে আসছি কিনা। একটু থেমে আবার বললেন, আর একটা কথা—শরৎচন্দ্র চরিত্রহীন নন, তিনি ঠিক সময়েই লেখা দেবেন।

হঠাৎ শরৎচন্দ্র সম্বন্ধে তাঁকে ওকালতী করতে শুনে প্রেমাঙ্কুর বলে উঠলো, শরৎচন্দ্র ঠিক সময়ে লেখা দেবেন কিনা সে খবর আপনি জানলেন কি করে?

ভদ্রলোক একটু হেসে বললেন, আমারই নাম শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়।
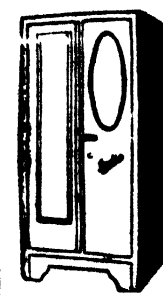
ঘরের মধ্যে হঠাৎ একটা বোমা ফাটলেও বোধহয় আমরা এতটা অবাক হতাম না। সেই সময় শরৎচন্দ্রকে যাঁরা দেখেছেন তাঁরা ছাড়া কেউ কল্পনাও করতে পারবেন না যে দাড়িসম্বলিত তাঁর চেহারা কি রকম অদ্ভুত ছিল। সুদূরপ্রসারী কল্পনার সাহায্যেও কেউ ভাবতে পারতেন না যে কোন সাহিত্যিকের এরকম চেহারা হতে পারে। কয়েক মুহূর্ত আমাদের মুখ দিয়ে কোন কথাই বেরুল না। সকলেই চুপচাপ। শরৎচন্দ্র একটা চেয়ারে বসে মৃদু মৃদু হাসছেন, আর তার পায়ের কাছে বসে তাঁর প্রিয় কুকুর ভেলু আমাদের এই অস্বস্তিকর অবস্থাটাকে বেশ উপভোগ করছে। তারপর চারুই নিস্তব্ধতা ভঙ্গ করে বলল, আপনিই শরৎচন্দ্র—সত্যি কথা বলতে কি—আমরা ভেবেছিলুম কোন—

মুখের কথাটা কেড়ে নিয়ে শরৎচন্দ্র বললেন: কোনো দপ্তরী!

বলে হাসতে লাগলেন। আমরাও সে হাসিতে যোগ দিলাম।

এই রকম অদ্ভুতভাবে শরৎবাবুর সঙ্গে আমাদের পরিচয় হয়। এঁর সম্বন্ধে পরে আরও বলছি।

(ক্রমশঃ)

সড়ক সৌধ কানাগলি

আলোকচিত্র—শ্রীহরি গঙ্গোপাধ্যায়

আমাদের এ-কথায় সম্ভবত সবাই এক-বাক্যে সায় দেবেন যে, ট্যাক্সি চাইলে, ট্যাক্সি পাওয়া যায় না কখনো। এ সেই 'না চাহিলে পাওয়ার'ই এক কদম। ঠিক প্রয়োজনের সময় রাস্তার দু'দিকে আপনি জিরাফের মতন তাকিয়ে দেখুন—সন্ধের অন্ধকার হলে দিগন্ত পর্যন্ত ঠাহর হবে, কোথাও কিছু দেখবেন না। ট্যাক্সিও অন্তর্যামীর খেলা খেলে বেড়ায় তখন। আর হয়তো যেসময় আপনার তেমন প্রয়োজন কিছু নেই ট্যাক্সি চড়ার, তখনই দলে দলে আপনার পিছনে জমা হয়ে হর্ণ বাজাবে। হাসি পায় কিনা বলুন? মস্করা না কি? পকেটে টাকা থাকলে কে আর বাস-ট্রামে গাদাগাদি করে যায় বলুন? সুতরাং এ-এরকমের ফোরস্‌ড এক্সপেনডিচারের পাল্লায় পড়া।

দরকারের সময়েই যদি না পাওয়া গেলো তাহলে আর ট্যাক্সিতে কী লাভ, অনেকেই সে কথা বলবেন। অস্বীকার করার উপায় নেই। তবে অনেকে তো দরকারের সময়, তাড়াতাড়ির সময় মজাসে ট্যাক্সি চড়েন। অর্থাৎ চোখের ওপর দিয়ে আলস্যভরা আরোহীবোঝাই যতো ট্যাক্সি দৌড়ুচ্ছে, কী করে বলা যায় সেইসব আরোহী অদরকারে, অপ্রয়োজনে ট্যাক্সি চড়ে হাওয়া খাচ্ছেন। ব্যাপারটা সেরকম মোটেই নয়। সবাই সবসময় দরকারে ও তাড়ায় ট্যাক্সি পান না। আমরা সে দলের মধ্যে সবচেয়ে হতভাগ্য। মনে তো পড়ে না, বাস্তবিক তাড়ার দিনে কবে ট্যাক্সি চড়েছি। যে সময়টা হাতে নিয়ে বের হলুম, সে সময়ের মধ্যে ট্যাক্সি ধরে সেই গন্তব্যে পৌঁছুনো যায়। কে আর হিসেব করে বলুন? ট্যাক্সি না পেলে কতোটা সময়? বাসে-ট্রামে গেলে কতোটা? কিছুই যদি না মেলে তাহলে আছে হন্টন? অসম্ভব কথা!

একটা আধুনিক শহরে সর্বত্রই কাজের অসম্ভব তাড়া। তারই জন্যে এতো যানবাহন —দেখা যাচ্ছে কাজের সময় সে-যানবাহনের সাহায্য যা পাচ্ছেন তা একেবারে না পাবার মতন।

আর একটা মজার ব্যাপার অনেকেই লক্ষ্য করেছেন নিশ্চয়। আপনি রাস্তার যে প্রান্তে ট্যাক্সির জন্যে দাঁড়িয়ে, দৈবক্রমে উল্টোপথে যদি কোনো ট্যাক্সি এলো, আপনি অন্ধের মতন দৌড়ে গিয়ে জানলেন দক্ষিণ-মুখী গাড়ি, মধ্য উত্তরেও যাবে না। কেন? রাতভিত তেমন নয়, লাঞ্চ-টাইম নয়—যাবেন না কেন? উত্তর হচ্ছে, সে আমার ইচ্ছে। আপনি কী করবেন করুন। স্রেফ বলে দিলো, যাবো না আপনি থানাপুলিশ করতে পারেন। যে লোক ট্যাক্সির জন্যে সপরিবারে আধঘন্টার ওপর দাঁড়িয়ে তাঁর পক্ষে থানা-পুলিশের সাহায্য নেবার এই উপদেশ দিচ্ছে দোষী। কথা হলো, তোমার ব্যক্তিগত অসুবিধার জন্যে যদি হয়, তুমি 'ডিফেকটিভ' বোর্ড লাগিয়ে, মিটারে গামছা বেঁধে যেভাবে চালিয়ে যাচ্ছো সেভাবেই চলতে থাকো। আমরা ট্যাক্সিপ্রত্যাশী যারা তারা তোমাদের ঐ পুরোনো কৌশলে অভ্যস্ত হয়ে গেছি এতোদিনে। কপালে আলো জেলে মিটার-উঁচু ওভাবে স্বেচ্ছাচারী চলা তোমার বন্ধ করতে হবে।

আর এক ধরনের বোকা বানানোর কৌশল আছে ওদের। ধরা যাক, অনবধান-বশতই মাথায় আলো জ্বালা, কিন্তু আরোহী-সুদ্ধ ট্যাক্সি থামাতে হাত দেখিয়ে পথচারীই বা বিভ্রান্ত হবেন কেন? বহু ট্যাক্সি-অলাই এই খেয়ালের অভাবের জন্যে সাধারণের কাছে গালমন্দ খান। উভয়দিকেই এই দোষারোপের ব্যাপারটাই ওঠে না যদি একটু খেয়াল করে চলা যায়। এবং দুপক্ষের জন্যেই তা মঙ্গলের। আসলে লোকসংখ্যার তুলনায় ট্যাক্সির সংখ্যা অতি সামান্য। মাঝে শুনতে পাওয়া গিয়েছিলো যে কয়েকশত ট্যাক্সির পারমিট ইসু করা হয়েছে। কিন্তু তাও এ-শহর মহাসিন্ধুতে বিন্দুর মতন কোথায় মিলিয়ে গেলো।

মধ্য রাত পার হলে, বিশেষ করে ফাইভ-পয়েন্ট বা ফোর-পয়েন্ট জংশনে সারবন্দী ট্যাক্সি দাঁড়িয়ে থাকতে কিন্তু অনেকেই দেখেছি। তখন গাড়ি-ঘোড়া সব বন্ধ। সুতরাং বাড়ি পৌঁছানোর একমাত্র ব্যবস্থা এই ট্যাক্সি। কিন্তু সারাদিন থেকে মধ্যরাত পর্যন্ত যে ট্যাক্সি এতো স্বেচ্ছাচারী ও স্বাধীন ছিলো, এখন সেই ট্যাক্সি কতো বুঝদার, কতো যাত্রী-দরদী হয়ে পড়েছে। এক ট্যাক্সিতে অল্প ভাড়ায়, ওদের ভাষায় শেয়ারে মোটামুটি বাড়ির কাছ বরাবর আপনি পৌঁছুতে পারছেন। যে আরামে আপনি দিনের দিকে ট্যাক্সি চড়ে থাকেন, এখানে সে-আরামের চিহ্নমাত্র নেই বটে, কিন্তু কতো সুবিধা ও সাশ্রয় হলো বলুন দেখি? তিনজনের আসনে একটু ঠাসাঠাসি করে সাত-আটজন বসলেন না হয়। সময়ই বা কতো লাগবে আর? মিনিট কয়েকের মধ্যেই তো পৌঁছুচ্ছেন। তাছাড় আর্থিক সাশ্রয়ও কম হলো না—শ্যামবাজার মোড় থেকে ঘাটগাছি পৌঁছুতে কম করেও মিটারে উঠতো তিন থেকে চার টাকার মতন, রিটার্ন সামান্য কিছু চাওয়াও আশ্চর্য নয়। তাছাড়া এই মধ্যরাতে ট্যাক্সি একাকী আপনাকে নিয়ে হয়তো যেতেই চাইবে না। কে আপনি? কি আপনার অভিসন্ধি। সত্যিকার কোনো কুমতলব নিয়ে যে আপনি ট্যাক্সি চড়তে আসেন নি, তাই বা কে বলতে পারে। ঘটনাও তাই—অনেক সময় এভাবেই ট্যাক্সিঅলারা বিপদগ্রস্ত হয়েছে। তার দিনের রোজগারের লোভে আততায়ী তার জীবনহানি পর্যন্ত করতেও পিছুপা হয় নি। সুতরাং, এই সম্মিলিত ট্যাক্সি চড়ার ব্যাপারে সে রকম রিস্ক্‌ নেই মোটে। আয়েও যথেষ্ট। নিজেদের মতন ব্যবস্থা। রাতের দিকে শ্যামবাজার পাঁচমাথার মোড়ে গেলেই দেখতে পাবেন—আলাদা আলাদা রুট ধরে সারবন্দী ট্যাক্সি। যার যার গ্যারেজ ও বাড়ির দিকে মুখ করা। দমদম-মুখী গাড়ি আপনাকে বরানগরে নিয়ে যাবে না। ওপথের গাড়ি আপনি বাঁহাতি রাস্তায় পাবেন—বাগবাজার স্ট্রীটের কাছাকাছি।

এই যে সুবন্দোবস্ত, কিছুতেই কি এমন মধ্যরাতের শেষে ছাড়া হবার উপায় নেই! ট্যাক্সিঅলারাও স্বতঃপ্রণোদিত হয়ে করতে পারেন। অফিস-টাইমে ডালহৌসী আসার জন্যে এইভাবে নির্দিষ্ট কয়েকটি বড় রাস্তার ক্রশিং-এ শেয়ার-ট্যাক্সি দাঁড়াতে পারে। একাকী না গিয়ে চার থেকে পাঁচ জনে মিলে যান। অপচয় বন্ধ করুন। এতো বাস্তবিক এক ধরনের অপচয়ই। একাকী ট্যাক্সি না চড়ে সম্মিলিত-চড়ায় যানবাহন সমস্যার সত্যিকারের সুরাহা হবে। আর্থিক সাশ্রয়ের কথা ছেড়েই দিচ্ছি। অনেকগুলি ক্ষেত্রেই আমরা এরকম ট্যাক্সি চড়ার স্বপক্ষে।

—রূপচাঁদ পক্ষী

হেমচন্দ্র ঘোষ

বারাসাতের উত্তর-পূবে কিছুদূরে বড়া গ্রাম। গ্রামটির পশ্চিমে ছোট জাগুলিয়া একটা নামকরা জায়গা। উনিশ শতকের প্রথমে এখানকার সামাজিক জীবনে এসেছিল একটি নতুন জীবনের স্পন্দন। গ্রামের মধ্যে বিভিন্ন জাতির মধ্যে গড়ে উঠেছিলো এক প্রীতির বন্ধন। বড়া গ্রামটা নিতান্ত ছোট নয়। তখন দিগন্তব্যাপী সবুজ ধানের ক্ষেতও লক্ষ্মীর সকরুণ কৃপায় ভরে উঠতো। দুপুরের তপ্ত অশ্বত্থতলা মেতে উঠতো রাখাল বালকের উদার বাঁশির সুরে। শান্ত, মধুর, প্রকৃতির লীলাপ্রাচুর্যে ভরিয়ে তুলেছিল যেন চারদিক।

আঠার শতকের মধ্যভাগের কথা। রাজনৈতিক জগতে তখন কালো মেঘ জমছে। নৈতিক জীবনে কালো দাগ স্ফুটিত হচ্ছে। মুর্শিদাবাদের মসনদ টলমল। জাফর খাঁর সঙ্গে মহারাজ কৃষ্ণ-চন্দ্রের সহযোগিতা নষ্ট হোল। ইংরেজ বাংলার রাজপাটে। তারা বোকা বনিয়ে সারা দেশটা দখল করে নিল। সংস্কারের নামে ইংরেজ "স্কুল" আটিতে শুরু করল। মহারাজ কৃষ্ণচন্দ্রের সেদিনের সাহায্য ইংরেজ ভুলে গেল আমলই দিল না। কৃষ্ণ-চন্দ্রের অনুতপ্ত হৃদয় উদ্বুদ্ধ হয়ে উঠল দেশকল্যাণে।

—ঘোষাল মশাই—

—ডাক এলো বাইরের দাওয়া থেকে।

কর্তা রামকুমার তখন ভিতর বারান্দায় তামাক খাচ্ছিলেন।

—কি গো, মজগুল হয়ে তামাক টানছো, বাইরে কে একজন যে ডাকাডাকি করছে শুনতে পাচ্ছ না!

—ওঃ তাই নাকি!

হুঁকোটা রেখে রামকুমার বাহিরে এলেন।

পদাতিক রামকুমারের হাতে পত্রখানি দিলেন। মহারাজের আমন্ত্রণ।

—মহারাজা কেন ডেকেছেন বলো তো?

বিস্ময়াবিষ্ট স্ত্রী স্বামীর মুখের দিকে তাকালেন। একটু থেমে বললেন।

—ব্যাপারটা তো বুঝলাম না! বোধহয় তুমি ভাল লোক কিনা?

রামকুমার হেসে উঠলেন।

—দেশে আমি কি একাই ভাল লোক।

স্ত্রী গর্বভরে উত্তর দিলেন।

—তা না তো কি? তবে!

—তবে আবার কি?

—এই তামাকটা খা একটু বেশী খাও। আগুন যোগাড় করতে আমার প্রাণান্ত।

রামকুমার উচ্চৈঃস্বরে হেসে উঠলেন।

—এটা আমাদের বংশের দোষ।

মহারাজা কৃষ্ণচন্দ্রের দরবার। বহু পণ্ডিতের সমাগম সেখানে। হাস্যরসিক গোপাল মহারাজের চিত্তবিনোদনের সুযোগ খুঁজছে। জমকালো দরবার, তবুও মহারাজের মনে অশান্তির খোঁচা মাঝে মাঝে তাঁকে অশান্ত করে তুলছিলো। পলাশীর প্রাঙ্গন, ক্লাইভের দাপট, জাফর খাঁর কৃতজ্ঞতা একযোগে ছায়াছবির মতো ভেসে যাচ্ছে। রামকুমার দ্বারপ্রান্তে। রক্ষী আটকালো—দরবারে যেতে দেবে না।

—আমি যেচে আসিনি। মহারাজ আমায় আমন্ত্রণ করেছেন।

মৃদু হৈ চৈ সুরু হয়েছে। দ্বারদেশে সকলের দৃষ্টি পড়ল।

—গোপাল, দেখে তো ব্যাপারটা কি?

বেঁটে খাঁটো লোকটা হেলতে দুলতে রামকুমারের সামনে উপস্থিত।

—ওঃ, এযে নারায়ণ! প্রণাম হই ঠাকুর।

দ্বাররক্ষীর দিকে তাকিয়ে গোপাল বলল,

—আরে ব্যাটা, করিছিস কি?

দ্বাররক্ষীর মুখখানা চুন হয়ে গেল। এবার তার রক্ষে নেই, বরখাস্ত নিশ্চয়ই।

রামকুমার গোপালের দিকে ফিরে বললেন,

—না ভাই! ওর কোন দোষ নেই। চিঠির কথা তো ওকে বলিনি। দারোয়ানের দিকে ফিরে বললেন

—তোমার তো কোন দোষ হয়নি। কিছু ঘটলে আমি নিশ্চয়ই মহারাজকে বলব।

গোপাল রামকুমারকে নিয়ে গেল।

—মহারাজ। আপনার আমন্ত্রণে এই ব্রাহ্মণ মানপুর থেকে এসেছেন।

কৃষ্ণচন্দ্র রামকুমারের মুখের ওপর দৃষ্টি দিলেন। তেজস্বিতা আর প্রসন্নতার দিব্যজ্যোতিঃ রামকুমারের মুখখানাকে প্রোজ্জ্বল করে তুলেছিলো।

—ব্রাহ্মণ আমি আপনার সততার পরিচয় ইতিপূর্বেই পেয়েছি। আমার রাজ্যে নিষ্ঠাবান সদ্‌ব্রাহ্মণ প্রতিষ্ঠা করতে চাই।

—আমি তো গৃহহীন নই, মহারাজ।

কথাটা মহারাজার কাছে খুব আশ্চর্য ঠেকলো। ব্রাহ্মণত্বের প্রথম পরিচয় নির্লোভতা।

—আপনার মতো ব্রাহ্মণ আমার রাজ্যে বসবাস করে দেশটাকে উন্নত করবে এইটাই আমার আশা। আপনাকে পঞ্চাশ বিঘে ব্রহ্মোত্তর দেবো।

রামকুমার নির্বাক। তাঁর বংশে কেউতো কখন দান গ্রহণ করেন নি।

—দান!

—দান নয়, ব্রাহ্মণ! এ সদ্‌জীবনের সম্মান।

—এতো জমি নিয়ে কি কোরব মহারাজ!

মহারাজ কৃষ্ণচন্দ্র একটু হাসলেন—

—নির্লোভী ব্রাহ্মণ! ভবিষ্যতের ব্যয়াধিক্যের কথা মনে রেখে আমার এই সিদ্ধান্ত।

রামকুমার সম্মতি দিলেন।

—কিসমৎ আনারপুরে বড়ার নিকট ভালো জমিই দেওয়া হবে। সাতদিনের মধ্যেই আমডাঙ্গা কাছারী থেকে তায়দাদ যাবে।

মহারাজার মঙ্গল কামনা করে রামকুমার চলে এলেন।

—আসতে এতো দেরী হলো যে?

রামকুমার উচ্ছ্বসিত কণ্ঠে বললেন,

—গিন্নী। সে এক বিরাট ব্যাপার।

—সে সব পরে শুনবো! বেলা একেবারে পড়ে গেছে।

—অভুক্ত হয়ে মহারাজার বাড়ী থেকে কোন ব্রাহ্মণ কখন ফিরে আসে না।

—তাহলে এখন রান্নাঘর সেরে আসি।

—তুমি এখনও খাওনি!

—স্বামী অভুক্ত নয় না জানা পর্যন্ত কোন হিন্দু নারী অন্ন গ্রহণ করে নাকি'

—এইটেই আমার মাঝে মাঝে কেমন ঠেকে! আমরা খুব স্বার্থপর—না?

—আর শাস্তর আওড়াতে হবে না, আমি চল্লাম।

রামকুমার কোলকেতে আগুন ধরাতে বসে গেলেন।

মহারাজার আদেশমত ঠিক সময়ে রামকুমারের তায়দাদ এলো।

শীঘ্রই মানপুর ছেড়ে যেতে হবে।

সকালে একঘটি দুধ নিয়ে কান্ত সরদার রামকুমারের বাড়ীতে হাজির, প্রণাম করে বল্ল—

—দাঠাকুর, তুমি নাকি চলে যাচ্ছ।

রামকুমারের মনটা কিন্তু খুব ভারাক্রান্ত। ছোট করে হুঁকোয় দুটো টান দিলেন।

—হাঁ, কান্ত!

কান্ত দেখলো রামকুমারের চোখ দিয়ে জল গড়াচ্ছে।

করিম রামকুমারের জমি মাঝে মাঝে চাষ করে দেয়। সে লাঙ্গল গরু নিয়ে মাঠে যাচ্ছে।

—ঠাকুরমশাই, তুমি নাকি মোদের ছেড়ে যাচ্ছ?

—রাজার হুকুম, করিম! কি কোরব বলো! যেখানেই থাকি তোমাদের কথা এই বুকে গেঁথে থাকবে।

করিমের সঙ্গে ছিল তার একটি ছেলে, বয়েস দশের বেশী নয়। তার মনটা খুব গম্ভীর।

—তাহলে দাদাঠাকুর, হরিলুঠের বাতাসা মোদের কে দেবে!

রামকুমার একটু জোরে হেসে উঠলেন।

—কেন, আর যাঁরা থাকলেন!

—ছাই দেবে! মোদের দূরে দূরে করে তাড়িয়ে দেয়—তারা আবার বাতাসা দেবে।

বড়ায় চলে এসে রামকুমারের কিছুই ভাল লাগছিলো না।

—গিন্নী; এখানে মনটায় ভাল ঠেকছে না।

—আসতে তো আর কেউ মাথার দিব্যি দেয়নি—না এলেই তো হতো।

—হতো না, গিন্নী, হতো না। মহারাজকে অমান্য করার ক্ষমতা আমার ছিল না। এখানে সব জিনিসরই দাম বেশী। টাকায় এক মণ চাল—দাম তো কিছুতেই কমছে না। আমাদের সংসারটা তো একেবারে ছোট্ট নয়।

মদনমোহন ও রামকানাই দুটি ভাই। তাদের পাঠশালায় ভর্তি করা হল।

—মোহন! তুমি তো বড় হয়েছো—তোমার কোন অসুবিধা নেই, কিন্তু কানাই যে একেবারে ছোট!

—না বাবা! আমার কোন অসুবিধা নেই। পাঠশালে যেতে বেশ ভাল লাগে।

বর্ষাকালে রাস্তাঘাট ছাপিয়ে ওঠে। মেটে রাস্তার স্থানে স্থানে জলে ঢাকা গর্ত-গুলো লোকদের বিভ্রান্ত করে তাদের বেসামাল করে দেয়। রাস্তা কাদায় কাদা।

—মোহন! কানাইকে পথ দেখিয়ে নিয়ে যেও।

—আমি সব জানি, বাবা! রাস্তার গর্তগুলো আমার মুখস্থ।

রামকুমার পুত্রের মাথায় হাত বুলিয়ে উৎসাহিত করলেন।

পাঠশালাটা বাড়ী থেকে অনেকটা দূরে। খড়ের ছাউনি লম্বা চালাঘর। চাঁচাছোলা কঞ্চির বেত গুরুমশাই-এর শাসনদণ্ড।

পড়ুয়ারা দুলে দুলে পাঠ মুখস্থ করে। গুরুমশাই যেত উঁচিয়ে মাঝে মাঝে হাঁক দেন।

—কিরে! কি হচ্ছে।

রামকানাই-এর পড়ায় খুব মন। সহপাঠী বাসুদেব কাছে এসে হেসে বলল—

—দূর। খুব যে পড়ছিস এত পড়লে মাথা খারাপ হয়ে যাবে।

রামকানাই-এর উত্তর না পেয়ে বাসুদেব চলে গেল।

মোহনের পড়া শেষ হয়ে গেছে। কানাই-এর কাছে এসে বলল—

—কানাই, বাড়ী চ'। শরীরটা ভাল ঠেকছে না। একটু রোদ পিঠ করে বোসতে ইচ্ছে হচ্ছে।

দাদার কথায় কানাই পড়া বন্ধ করল। গুরুমশাইকে প্রণাম করে দু'ভাই রওনা হল বাড়ীর দিকে। স্বল্পদীর্ঘ পথ ধরে দু'ভাই চলতে শুরু করল। রাস্তাটা বড্ড সরু, দুধারে সেঁকুল কাঁটার ঝোপ। মোহন দেহের কাঁপুনিতে সামলাতে না পেরে সেঁকুল কাঁটার ঝোপে পড়ে গেল। কানাই ভাইকে উঠিয়ে হাত ধরে চলতে থাকে।

—দাদা, তোমার চোখ দুটো জবাফুলের মতো লাল হয়ে উঠেছে—গা'টা যেন পুড়ে যাচ্ছে।

রামকুমার তখন বাহির বাড়ীর উঠানে। শ্যামলা গরুর মুখে কচি ঘাসের কুচি তুলে দিচ্ছেন।

—কিরে। এত সকালে ফিরলি যে!

—দাদার শরীরটা খুব গরম ঠেকছে—কি রকম কাঁপছে।

রামকুমার কপালের স্পর্শ নিলেন।

—তাই তো রে, জ্বরটা বেশী হয়েছে।

মোহন শুয়ে পড়ল, চোখ দুটো বোজা।

—দাদা, তোমার কপালটা টিপে দেবো।

মোহন ভাই-এর দিকে তাকালো।

—এখনও যে কিছু খাওনি, কানাই।

—তা হোক, তোমার কষ্ট হচ্ছে, একটু টিপে দি।

মা এলেন। মোহনের কপাল স্পর্শ করে চমকে উঠলেন

—ইস্, গাটা যে একেবারে পুড়ে যাচ্ছে। কর্তার যেমন ঝোঁক, এখানে জ্বর, আর জ্বর। তোদের কেমন করে বাঁচাব!

তাঁর চোখ দিয়ে অশ্রু ঝরে পড়ল।

—কানাই! দুটো ভাত ভেজানো আছে। লেবু আর নুন রেখে এসেছি—খেয়ে নাও। কখন দুটো মুখে দিয়েছো।

—মা, দাদার বড্ড কষ্ট হচ্ছে দেখছো না। আমি একটু পা টিপে দি।

—বাপ, মা ভাই-এর ওপর যার এত টান সে জীবনে কখন কষ্ট পাবে না—মা জগদম্বা তার ভাল করবেনই।

পাড়ায় হচ্ছে রক্ষেকালী পুজো। খুব ঢাকঢোল বাজছে। যাঁরা বয়স্কা তাঁরা ডালি নিয়ে আসতে শুরু করেছেন। মায়ের কাছে মাননত দিয়ে অভিষ্ট লাভ করবেন। মোহনের মা সারাদিন উপবাসী। ছেলেদের কল্যাণে পুজো না দেওয়া পর্যন্ত জলগ্রহণ করবেন না। সন্ধ্যা হয়ে এসেছে। মাটির প্রদীপ, তার মিটমিট আলো বেড়ার ফাঁক দিয়ে বাইরে ছিটকে পড়ছে। শাঁখ দূরন্তের পাল্লা দিয়ে ঘরে ঘরে বেজে উঠলো। পুজোব্রতী রামকুমার সুমুখে তাঁর জগদম্বার পটমূর্তি। একাগ্রচিত্তে তাঁর আরাধনা।

—কানাই! পুজোটা দিয়ে আসি, আমার সঙ্গে চলো।

মায়ের পরনে চওড়া লাল টুকটুকে পাড়ের কাপড়—হাতে পুজোর সম্ভার।

কানাই পাঠ বন্ধ করে উঠে দাঁড়াল।

—মাগো! তুমিই আমার জগদম্বা।

কানাই প্রণত হলো।

—ওরে ছুঁসনে—ছুঁসনে। হাতে আমার পুজোর জিনিস। পাগল আর কি!

তিনি দু' পা সরে দাঁড়ালেন।

রামকুমারের সংসারে খুব স্বচ্ছলতা না থাকলেও অনাটন ছিল না। মহারাজার দেওয়া ব্রহ্মোত্তর, তার উপস্বত্বে রামকুমারের সংসারে অভাবের ছোঁয়াচ লাগেনি। বেশ সুখেই দিনগুলো কাটতে লাগল। মেধাবী ছাত্র কানাই বৃত্তি পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হল।

—বৌমা—ও বৌমা।

পাশের বাড়ীর বৌকে ডাকলেন রামকুমারের স্ত্রী।

—বৌমা! আমার কানাই একটা হোয়েছে।

—ঠাকুরপোর কি হয়েছে! এই যে দেখলুম সকালে।

—ওরে না—না! অন্য কিছু না। পড়ায় খুব বড় হয়েছে।

—ওমা তাই বলো। তা বেশ।

—গিন্নী, এবার তো ব্যবস্থা করতে হয়. মা জগদম্বা যখন কৃপা করেছেন, পুজোর আয়োজনটা করা যাক।

স্বামীর মুখের দিকে তাকালেন—নিষ্কলঙ্ক মুখে ফুটে উঠলো স্নিগ্ধ গরিমা

বারাসাতে যেতে হবে।

রামকানাই প্রস্তুত হতে লাগলেন পাঁজিপুঁথির ব্যাপারে মোহন নাকি অভ্রান্ত

—ওরে মোহন! একটা ভাল দিন দেখে দিস্

—হাঁ বাবা, সেটা ঠিক করেই রেখেছি

চাপকান—বুকের ওপর পাকান উড়ুনির ঘের ও মাথায় শ্যামলা রামকানাই পিতা-মাতাকে প্রণাম করলেন। মায়ের চরণধূলো মাথায় নিলেন। মায়ের চোখ দিয়ে তখন ঝরে পড়ছে আনন্দাশ্রু—যেন গঙ্গার প্রবাহ

আবেগকণ্ঠে কানাই বল্লেন—মা, তুমি কাঁদছো!

—নারে—না। বহু কষ্ট করেছো—মা জগদম্বা আজ মুখ তুলে চেয়েছেন। এ আমার কান্না নয়—মা জগদম্বার কাছে আমার অর্চনা।

বারাসাত কোর্ট।

ক্লাইভ জাফর খাঁর কাছ থেকে মোচড় দিয়ে যে কয়টি পরগণা নিয়েছিলো তার সমষ্টি হলো চব্বিশ পরগণা। সে সময়ের চব্বিশ পরগণার কতকাংশ এখন পাকিস্থানে। বারাসাত জেলার হেড-কোয়ার্টার্স। তার স্থায়িত্ব ছিল ১৮৬১ সাল পর্যন্ত। বারাসাতের চারিপাশে নীলকুঠি নীলকরেরা ছিল ইউরোপের বিভিন্ন জাতির মানুষ। এ দেশের লোকদের ওপর তাদের এতটুকু মায়ামমতা ছিল না। অত্যাচারের জাঁতাকলে নেটিভদের নিষ্পেষিত করে লাভের অংশ কি করে বাড়ান যায় এই ছিল তাদের মুখ্য উদ্দেশ্য। যুগ পাল্টে যাচ্ছে চারিদিকে বিশৃঙ্খল—অশান্তি। কিসমৎ আনারপুর নদীয়া রাজার হস্তচ্যুত। জান-বাজারের রাণী রাসমণি কিছুটা অংশ কিনে মালিক হলেন। বারাসাতে একটা কাছারী-বাড়ী রাখতে হল। কোর্টের হাকিম সাহেব চলছে পারসী ভাষা। লর্ড রবার্টস-এর বাবা যে বাড়ীতে থেকে ক্যাডেট কোর কলেজের অধ্যক্ষতা করতেন সেটা আসলে নীলকরদের আপিস ছিল। তখন সেখানে কোর্ট বসতো—এখনও বসে। কোর্টে একটা বিরাট মামলা

তারকনাথের মনটা খুব ব্যাকুল হয়ে চলছে। টাকীর চৌধুরীরা গোবিন্দদেবের পূজারীকে হস্তগত করে বিগ্রহ হাতিয়ে নিলেন। নূরনগরের রাজারা ছাড়ার পাত্র নন। মামলার উদ্ভব হল। প্রতাপাদিত্য রাজা বসন্ত রায়ের মনোরঞ্জনের জন্যে উড়িষ্যা থেকে এই বিগ্রহ সংগ্রহ করেছিলেন।

—"নীলাচল হতে গোবিন্দকে আনি
রাখিলেন কীর্তিযশঃ ঘোষয়ে ধরণী।"

বারাসাতের ম্যাজিস্ট্রেট মিঃ জে, এইচ বারলোর কাছে বিচার হচ্ছিল। কোর্টের উকিল মোক্তার সকলেই একপক্ষ না একপক্ষ সমর্থন করলেন। নূরনগরের রাজারা আসামী। দেশব্যাপী এক তুমুল আলোড়নের সৃষ্টি হলো। টাকির চৌধুরীরা পয়সাওয়া লোক আবার তাঁদের ছিল "লাঠির জোর"। এ সত্ত্বেও দেশবাসী রাজাদের সমর্থক ছিলেন। প্রতাপের বংশধর আসামীর কাঠগড়ায়—লোকেরা উত্তেজিত, উন্মত্ত হয়ে উঠলো। বিচার শুনতে দূর দূর থেকে লোক আসত। তাদের মধ্যে বাগবিতণ্ডার পরিণতি লাঠির ব্যবহার দু'পক্ষের সমর্থকদের সঙ্গে চলতে লাগল। মিঃ বারলো রায় দিলেন—

It is ordered that the accused b acquitted from the charge without any slur on them and that the Thakurs do remain in their posseniore."

মামলার দিনে কোর্টে যেন একটা মেলা বসে যেতো। জমিদাররা কেউ কেউ নিজে আবার কেউ লোক পাঠিয়ে মামলার তদ্বির করতেন। রাণীর লোকেরা কোর্টে আসতেন। তাঁদের একজন মোক্তারের প্রয়োজন ছিল।

—আমাদের স্টেটের কাজ করা কি আপনার সম্ভব হবে?

—কোন্ স্টেট?

—রাণী রাসমণি।

রামকানাই সুন্দর, সুপুরুষ, সঠাম তাঁর ব্যক্তিত্বের প্রস্ফুটিত দীপ্তি আর প্রতিভা-ভাস্বর এক স্বর্গীয় আনন্দে উদ্বেলিত হয়ে উঠল। দু'হাতে কপাল ছুঁলেন।

—প্রাতঃস্মরণীয়া রাণী রাসমণি। তাঁর কাজ পেলে আমি ধন্য মনে করব।

বারাসত থেকে দু' মাইল পূবে ঘোলায় কাছারী। দুঃখ-দৈন্যের মূর্তিমান প্রতীক দেশের কৃষকেরা রামকানাই-এর সমবেদনার স্নেহধারায় সঞ্জীবিত হতো। বাড়ী থেকে বারাসতে কাজকর্মের খুব অসুবিধা। রাণী রাসমণির নিকট থেকে বারাসতে বাসস্থানের ভূমি পেলেন। ধর্মপ্রাণ রামকানাই কোর্টে সাফল্যের কৃতিত্বে সমাদৃত হয়ে পড়লেন। বিশ্ববিখ্যাত পণ্ডিত রোমা রোলাঁ 'রামকৃষ্ণ' পুস্তকে বারাসতের মোক্তার কানাই ঘোষালের ভূয়সী প্রশংসা করে গেছেন।

দক্ষিণেশ্বর কালীবাড়ী—রাণী রাসমণির কীর্তিস্তম্ভ। পাদদেশে পতিতোদ্ধারিণী গঙ্গা। সাম্য পরিবেশ। ধর্মাচরণের প্রকৃষ্ট সাধনক্ষেত্র।

কামারপুকুরের ঠাকুর এসেছেন দক্ষিণেশ্বরে—মায়ের মানসপূজারী। আত্মভোলা ব্রাহ্মণের মায়ের চরণে আত্মনিবেদন এক অলৌকিক স্বর্গীয় সুষমা মধুচক্রের মত যার চারদিকে উদ্ভাসিত হয়ে উঠেছিলো নবীন তপস্বীদের অনুভূতির আলোড়ন। তেজস্বী পুরুষ নরেন্দ্রনাথ ধর্মের সঙ্গে কর্মযোগের সন্ধান দিলেন। হতমান দেশবাসীর হৃদয়ে জাগিয়ে তুললেন দেশসেবার উগ্র বাসনা। বর্ণবিদ্বেষ তাঁর কাছে ছিল বিধ্বংসী আত্মহত্যা। এদিকে রামকানাই এক মস্ত অসুবিধায় পড়েছেন—তাঁর হয়েছে স্ত্রীবিয়োগ। তিন মাসের শিশুকন্যা—কেই বা তাকে দেখে।

—তারক! তুমি একবার নিমতেয় যাও, দেখ তাঁরা যদি বাচ্চাটিকে রাখেন।

তারকের মনে ছিল মহাসংশয়। অনিচ্ছাটা প্রকট হয়ে উঠল।

পুত্রের মনোভাব রামকানাই লক্ষ্য করলেন।

—একবার দেখেই এসো।

নিমতে ঈশ্বর বাঁড়ুজ্যের বাড়ী।

—এই যে তারক। ঘোষাল মশাই কেমন আছেন?

—বাবার শরীরের চেয়ে মনের অসুস্থতাই বেশী।

—তা আর হবে না। রামসুন্দরী বুক দিয়ে সংসার টানছিলো। ঘোষালমশাই যত উড়ো ঝক্কি তার ঘাড়ে চাপিয়ে দিয়ে তাকে শেষ করলেন।

—মা তো কোনদিনই আপত্তি করেননি। ইস্কুলের ছেলেদের কত ভালবাসতেন—নিজের মতো।

—আরে তাইতো বলছি। রামসুন্দরীর মতো মেয়ে আমাদের বংশে আর জন্মায়নি। তা তারক! ঘোষালমশাই পাঠিয়েছেন কেন?

তারকের মাতুল-পত্নী খুব খরখরে মানুষ।

—এ আর বুঝলে না—ঐ বাচ্চাটার জন্যে।

তারককে কথা বলার অবকাশ না দিয়ে বল্লেন—

—আমাদের খুবই অসুবিধে। ঠাকুর-জামাইকে বোলো, সুবিধে হলে রাখতাম।

তারকনাথ উঠে পড়লেন।

—দুটো খেয়ে যাও।

—না মামীমা। ছোট বোনটি এতক্ষণ খুব কাঁদছে, তাকে বাগ্দী মাসির কাছ থেকে দুধ খাইয়ে আনতে হবে।

মামারবাড়ী ছেড়ে এলেন। তারকনাথের দুচোখ তখন জলে উছলে উঠছে।

রামকানাইকে আবার বিয়ে করতে হল। তারকনাথ তা নীরবে সহ্য করে নিলেন। যে দুরন্ত ছেলে পাড়ার মধ্যে দুষ্টুমিতে শীর্ষস্থান অধিকার করে বসেছিলেন—চড়কের সন্ন্যাসীদের প্রশ্নবাণে নাজেহাল করে দিতেন, সেই তারকনাথ পিতৃগৃহের নতুন সাজপাটে অতৃপ্ত মন নিয়ে দিনগুলো কাটাতে লাগলেন। করুণাময়ী মায়ের স্নেহচন্দন এখনও যেন ললাটে সমুজ্জ্বল হয়ে রয়েছে। অন্যমনস্ক হয়ে কপালে হাত দিলেন—কই কিছু তো নেই। ব্যথিত বুকের নীরব হাহাকার, নিভৃত অশ্রুজল মায়ের যতখানি স্নেহ ছিল, সবটুকু যেন মুছে দিয়ে গেছে। বাড়ীতে যারা থেকে পড়াশুনো করত, তাদের কথাগুলো তো তারকনাথ কোনদিনই কানে দেননি।

—কতদূরে থেকে এসে তোমাদের বাড়ীতে থেকে পড়ছি, কিন্তু তোমার তো পড়ায় কোন মন নেই—এটা ভালো না।

তারকনাথ একটু হাসলেন।

—পড়াশুনো আমার ভাল লাগে না—আর পড়েই বা কি হবে!

চিরব্যস্ত পিতা তারকনাথের পড়ার দিকে লক্ষ্য রাখতে পারেননি। বারাসতে থাকা তাঁর পক্ষে অসহনীয় হয়ে পড়ল। রেলের চাকরী নিয়ে তারকনাথ চলে গেলেন পশ্চিমে। সেখানে এক বন্ধু জুটল—প্রসন্নবাবু।

—জগৎসংসার ভুলে গিয়ে সমাধির আনন্দে ডুবে থাকা কি সহজ কথা!

তারকনাথের উত্তর ছিল অতি সংক্ষিপ্ত।

—চেষ্টা করেছি কিন্তু সফল হতে পারলাম কই!

—সমাধি সম্ভব হয়েছে একমাত্র ঠাকুরের—পরমহংসদেবের—দক্ষিণেশ্বরে।

উঠলো পরমহংসদেবের দর্শনলাভের জন্যে। কলকাতায় ফেরার সুযোগও পেয়ে গেলেন।

—"তোমাকে বিয়ে করতেই হবে। নীরদাকে পাত্রস্থ করার জন্যে বদলী বিয়ের ব্যবস্থা করেছি।"

পিতার পত্রে তারকনাথ কিংকর্তব্যবিমূঢ় হয়ে পড়লেন। সংসারী হবার ইচ্ছে তাঁর মনে কোনদিনই জাগেনি। ভেঙ্গে-পড়া মন নিয়ে তারকনাথ যেন বিষের যন্ত্রণা অনুভব করতে লাগলেন। পশ্চিমের ভীষণ গরম। তারকনাথ কর্মস্থল থেকে নিজের ঘরে ফিরে এসেছেন। অসহ্য গরমের তীব্র জ্বালা দেহের রক্ত যেন শুকিয়ে দিচ্ছে। মন অস্থিরতায় ভরা। তখন আঁধার নেমে আসছে। রুক্ষ গাছগুলোর নীরস শাখাপল্লব অন্তর জ্বালায় যেন মাথা নুইয়ে আছে। ঘরের সন্নিকটে বিরাট ময়দান। মেটে মেটে জোছনার কোলে থেকে থেকে উত্তপ্ত বায়ুর হিল্লোল তারকনাথের মুক্ত দেহের স্পর্শ নিয়ে অনন্তে ছুটে চলেছে।

—এই বিরাট ব্রহ্মাণ্ডের স্রষ্টা যে কত-বড়—মানুষের বুদ্ধির বহির্ভূত চেতনার সূত্রে তা আবিষ্কার করা কি এতই সহজ!

চিন্তাধারার ভরে উঠলো তারকনাথের মন।

ঈশ্বর তো নিরাকার, তবে কেন দেব-দেবীর সামনে এমনি মাথাটা নিচু হয়ে আসে। নিরাকার কি কখন সাকার হতে পারে! চিন্তার মোড় ফিরল। পিতা স্বর্গ পিতা ধর্ম—পিতৃআজ্ঞা, পিতার নির্দেশ অলঙ্ঘনীয়। তারকনাথ স্থির করলেন—বিয়ে তাঁকে করতেই হবে।

মহেশ্বরপুর বারাসত থেকে কিছু-দূরে। পঞ্চানন চট্টোপাধ্যায়ের সর্ব-সুলক্ষণা কন্যা নিত্যকালীর সঙ্গে তারক-নাথের বিয়ে হয়ে গেল। তারকনাথ বদলি হলেন কলকাতায়।

—ঠাকুর! আমায় মুক্তির পথ দেখিয়ে দিন।

তারকনাথের আকুল আবেদন। সম্মুখে পরমহংসদেব—সৌম্য মূর্তি, পদ্মফুলের ন্যায় দেহ থেকে লাল আভা ফুটে বেরুচ্ছে—সরল মুখখানার ওপর দিব্য জ্যোতির ছাপ স্পষ্টতর হয়ে উঠেছে।

ধীর বীণানিন্দিত কণ্ঠে প্রশ্ন হল,

—তোমার বাড়ী কোথায়?

—বারাসতে। রাণী রাসমণির মোক্তার ঘোষালমশাই-এর পুত্র।

আনন্দে উৎফুল্ল ঠাকুর।

—তুমি ঘোষালমশাই-এর ছেলে! আমার বড্ড গা জ্বালা করতো, ঘোষালমশাই-এর মাদুলি দিয়ে কিন্তু সেরে গেল। ঘোষাল-মশাই মায়ের একনিষ্ঠ সাধক।

—আমি ব্রাহ্মসমাজে যেতাম, তৃপ্তি পাইনি। তাই এখানে এসেছি।

—বেশ তো ছুটি পেলেই আসবি। নরেন—ও নরেন! দ্যাখনা, কে এসেছে।

নরেন্দ্রনাথ ছুটে এলেন। তীক্ষ্ণদৃষ্টিতে তারকনাথকে দেখে নিলেন।

—আমরা সাধুরা এখানে সবাই ভাই।

তারকনাথ নরেন্দ্রনাথের দিকে তাকালেন। তাঁর পদ্মপলাশের প্রদীপ্ত নয়নদুটি যেন জ্ঞানগরিমার মুক্তধারা স্বচ্ছ স্নিগ্ধ প্রবাহ নিয়ে মরা সমাজটাকে পুনর্জীবিত করার সংকল্প নিয়েছে। ধুলোয় লোটা মানুষকে আশা ও আশ্বাসের বাণী শুনিয়ে তাকে মাথা তুলে দাঁড়াবার জন্যে যেন ডাক দিচ্ছে।

—ঠাকুর তো তোমায় সঙ্গে নিলেন কিন্তু আমাদের কাজ বিষম কঠিন—পূর্ণ ব্রহ্মচর্য।

তারকনাথ চুপ করে রইলেন। অন্তরের শ্রদ্ধা ঠাকুরের চরণে একটু নিবেদন করলেন —প্রার্থনা—ঠাকুর পরীক্ষায় যেন উত্তীর্ণ হই। ঠিক এই সময়ে পিতার আহ্বান এলো বারাসতে আসার জন্যে। বয়স্থা পুত্রবধূ ঘরে, আবার সুন্দরী। রামকানাই-এর পরে কঠোরতা ছিল। তারকনাথ বারাসতে আসতে বাধ্য হলেন।

ফাল্গুনী পূর্ণিমা। জ্যোৎস্নাবিধৌত ধরিত্রীর বুকে মায়াময় সান্ধ্যবায়ু সুগন্ধী পুষ্পের মধুসৌরভে টলটল করছে।

—তারক! গার্হস্থ্য জীবন পালন করাই মানুষের ধর্ম—ভগবানের নির্দেশ—এর কোন বিকল্প নেই।

তারকনাথ পিতার মুখের দিকে তাকালেন—তাঁর স্নিগ্ধ দৃষ্টি ভীতিবিহ্বলে যেন জড়িয়ে এলো।

কিছুটা রাত হয়েছে। তারকনাথ ঢুকলেন শয়নকক্ষে। একদিন যে এই ঘরে স্নেহময়ী মাকে দুরন্তপনায় উত্যক্ত করেছেন সেই কথাগুলো ছবি হয়ে তাঁর চোখের সামনে যেন ছায়াছবির মত ফুটে উঠলো। ঘরের দেয়ালে দেয়ালে রন্ধ্রে রন্ধ্রে মায়ের প্রতিচ্ছবি যেন মূর্তিমতী হয়ে উঠলো।

নিত্যকালী একরাশ ফুল নিয়ে ঘরে ঢুকলেন।

—এ-ফুলে কি হবে?

নিত্যকালী হেসে ফেল্লেন।

—ফুলে হবে ঠাকুরপুজো।

বিস্মিতনেত্রে তারকনাথ তাকালেন—

—ঠাকুর! তিনি তো এখানে না—দক্ষিণেশ্বরে।

নিত্যকালীর কণ্ঠস্বর ভারী হয়ে উঠলো:

—আমার ঠাকুর এইখানে—আমার সামনে। দক্ষিণেশ্বরে নয়।

আরক্তিম মুখখানায় স্বর্গীয় সুষমা টেনে দিল।

নিত্যকালী গলবস্ত্রে প্রণাম করলেন।

তারকনাথ আত্মভোলা—নিত্যকালীর মুখের ওপর তাঁর মায়ের ছাঁচ প্রোজ্জ্বল হয়ে উঠলো।

পরদিন দক্ষিণেশ্বরে।

—দেশ থেকে ফিরলে কখন?

—এই তো আসছি।

—ঠাকুরের সঙ্গে দেখা হয়েছে?

—এখনো যাইনি।

নরেন্দ্রনাথ তারকনাথের মুখের দিকে তীক্ষ্ণ দৃষ্টি দিলেন।

—বৌমার হাতের রান্না খেয়ে এলে?

সরলমনে তারকনাথ উত্তর দিলেন,

—নিত্যকালী মায়ের মূর্তি নিয়ে আমার সামনে এলো।

—ওঃ তাই নাকি!

সোল্লাসে বলে উঠলেন নরেন্দ্রনাথ—

—তাহলে তুমি তো দেখছি 'মহাপুরুষ'! মহাপুরুষ মহারাজ তোমায় অভিনন্দন জানাই।

গঙ্গার প্রবাহের মতো ঘটনাবৈচিত্র্যে দক্ষিণেশ্বর আর বেলুড় সজীব হয়ে উঠলো। নরেন্দ্রনাথ জেনে দিলেন বিশ্বের দ্বারে দ্বারে অতীত ভারতের শাশ্বত ধর্মের অবদান। নরেন্দ্রনাথ হলেন স্বামী বিবেকানন্দ, তারকনাথ হলেন শিবানন্দ মহারাজ। সংঘাধ্যক্ষ শিবানন্দ মহারাজ সংগঠনের কঠোরতা এতটুকু শিথিল হতে দেননি। মাতৃসুলভ মমতা নিয়ে তাঁর পরিচালিত কর্মপন্থা সবার হৃদয় জয় করে নিয়েছিলো। এক সময়ে বাঁকুড়া ও সাঁওতাল পরগণায় ভীষণ দুর্ভিক্ষ দেখা দিল। মহাপুরুষ মহারাজ খুব বিচলিত হয়ে পড়লেন। বেলুড় মঠ থেকে ত্রাণকার্যে বহু সেবক পাঠিয়ে দিলেন। সেবাধর্ম বেলুড় মঠের একটা বৈশিষ্ট্য। সেবারত সন্ন্যাসীদের উদ্দেশে লিখলেন :

—নববর্ষ! তোমাদের সকলকে, সমগ্র ভারতকে এবং সমগ্র জগৎকে শান্তি প্রদান করুক।'

বিশ্বশান্তি প্রচেষ্টার আকুল আবেদন স্বার্থের দোলায় ভারতের সন্ন্যাসীদের কখন এতটুকু চঞ্চল করতে পারেনি। ভারতের সন্ন্যাসী নিজেকে বিলিয়ে দেন সারা বিশ্বের মঙ্গল কামনায়—তাই ভারতের সন্ন্যাসী সামাজিক বন্ধনহীন মুক্ত পুরুষ।

শ্রীরামকৃষ্ণের আদর্শে গড়া মঠ ও মিশনের অধ্যক্ষ শিবানন্দ প্রেম ও ভালবাসার মুক্ত অঙ্গনে জগতের সামগ্রিক মঙ্গল কামনায় উদ্বুদ্ধ হয়ে উঠলেন। শত-সহস্র শিষ্যের মনে জাগিয়ে তুললেন ঠাকুরের প্রেম-মাহাত্ম্য, সংকল্প সাধনার নৈতিক প্রেরণা জাগিয়ে দিলেন স্বামীজীর সেবাধর্ম।

১৯৩৪ সালের ২০ ফেব্রুয়ারী মহাপুরুষ মহারাজের মহাসমাধির দিন। যশোর রোডের ধারে রামকানাই-এর ভিটার ওপর সুদৃশ্য স্মৃতিমন্দির—রামকৃষ্ণ-শিবানন্দ আশ্রম। চারিদিকে ফল-ফুলের গাছ। সন্ধ্যায় স্তোত্রগানে মন্দিরটা মুখরিত হয়ে ওঠে। উৎসব মুখরিত মন্দির-প্রাঙ্গণ কর্মব্যস্ত শিষ্যদের সুস্থ পরিবেশে সেবাধর্মের পীঠস্থানে পরিণত হয়ে উঠেছে।

বাক্সবেক্সটন

বিশ্বনাথ মুখোপাধ্যায়

সাসেক্সের অনুচ্চ পর্বত ঘেরা একটি পল্লীভবনের বিশালায়ত ড্রইং রুমে এক বরফ-ঝরা খৃস্টমাস ইভের রাত্রে বড় বড় কাঠের টুকরোর আগুন-জ্বালা চিমনীর সামনে বসে এ কাহিনীটির প্রধান নায়কের মুখ থেকেই এটি আমার শোনা।

এক যুগেরও আগে, অপেক্ষাকৃত অল্প বয়সে যখন প্রথম আমি ইংল্যান্ডে আসি তখন আর পাঁচজন নবাগতের মত আমিও এদেশের সামাজিক ও পারিবারিক জীবনের সঙ্গে ঘনিষ্ঠতার জন্যে উন্মুখ ছিলাম। লন্ডনের কয়েকটি পূর্ব-পশ্চিম বন্ধুত্ব সংস্থা অনুরূপ পরিচয়াকাঙ্ক্ষীদের খৃস্ট-মাসের ছুটিতে সে সুযোগ করে দেয়। বৃটেনে বহু পরিবার আছে যারা খৃস্টমাসে এদেশে প্রবাসীদের সঙ্গে পারিবারিক উৎসব উদযাপন করতে চায়. আনন্দের ভাগ দিতে চায়। সেই পরদেশী অতিথিদের কাছ থেকে তারাও শুনতে চায় তার দেশ ও পরিবারের কথা। এমনি সূত্রেই সে দিনের সেই সন্ধ্যায় এলকিনটন পরিবারের সঙ্গে আমার সেই স্মরণীয় সাক্ষাৎ।

আসবার আগে সংস্থাটি উক্ত পরিবারটি সম্পর্কে সামান্য পরিচয় দিয়ে বলেছিল যে, তারা ব্যবসায়ী। কিন্তু তখন বুঝি নি যে, তাঁরা রীতিমত ধনাঢ্য। সেই সঙ্গে সুজন, দরদী ও প্রকৃত অতিথিবৎসল।

খৃস্টমাসের ঐতিহ্যমত প্রস্তুত টার্কী মাংস, পুডিং ও অঢেল পানীয়ে ভরা ডিনার শেষ করে আমরা যখন সেই বসবার ঘরটিতে পৌঁছলাম তখন মনে হলো এলকিনটন পরিবারের সবাই, স্বামী-স্ত্রী তাঁদের দুই সন্তান ফিলিপ ও আইলীন বেশ মদিরাচ্ছন্ন। ফিলিপ ও আইলীন দুজনেই ডারহ্যাম বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়ে। দুজনেই বাঘা সোস্যালিস্ট ও সুরসিক এবং পরস্পরের সঙ্গে খুনসুটি করবার কোন সুযোগই হেলায় হারায় না। তাদের সেই খুনসুটি, পরস্পরকে টেক্কা দেবার চতুর পাল্লা দেখতে-দেখতে আমার মনটাও কৈশোর ও প্রথম যৌবনের স্মৃতির অলি-গলিতে মুহুর্মুহু ঘুরে-ফিরে আসছিল। সম্ভবত ফেলে-আসা স্মৃতির কুহেলিতে মনের এই ক্ষণে-ক্ষণে হারিয়ে যাওয়া-ফিরে আসার প্রভাবেই এক সময় আমি চিমনীর সেই লেলিহান অগ্নি শিখার দিকে তাকিয়ে বললাম, “এই ধরনের খোলা আগুন আমার খুব ভালো লাগে। তার একটা কারণ বোধহয় আমরা ছোটবেলায় আসামের খাসিয়া পাহাড়ের শিলং ও চেরা-পুঞ্জীতে বড় হয়েছিলাম। সেখানে আমাদের বাড়ীতেও এমনি খোলা আগুন ছিল। এ আগুনের কেমন যেন প্রাণ আছে, ছন্দ আছে।”

কথাটা বলে দেখি গৃহকর্তাও তাঁর আরাম কেদারায় দেহটি এলিয়ে দিয়ে তাঁর মদিরালস চোখ দুটি দিয়ে সেই অগ্নি-শিখার নৃত্যই দেখছিলেন। আমার কথা শুনে সোজা হয়ে বসলেন। ছাইদানী থেকে নিভন্ত চুরুটটি তুলে নিয়ে জ্বালালেন। তারপর তাতে একটি টান দিয়ে বললেন, “খোলা আগুনের একটা স্মৃতি আমার মনেও চিরজ্বলন্ত হয়ে আছে। তবে সেটা বাল্যের মধুর অতীত নয়। আমার কর্ম-জীবনের প্রথম বড় সাফল্যের স্মৃতির আশ্চ-

পাপিষ্ঠ নরকের আগুনের মত ভয়ঙ্কর।" তার কথা শুনে শ্রীমতী এলকিনটন তাড়াতাড়ি বলে উঠলেন, "আহ! আজ এমন দিনে তোমার সেই সাংঘাতিক কাহিনীটা না বললেই নয়!"

আইলীন তাঁর পাশ থেকে গলা উঁচু করে সকৌতুকে বলে উঠলো, "আচ্ছা মা, সেই ঘটনার পর থেকে আমাদের বাড়ীতে কোন অতিথি কি এসেছেন যাঁকে বাবা সেই কাহিনীটা না বলেছেন?"

আমি সেই সুযোগে চট করে বললাম, "তাহলে আমিই বা বঞ্চিত হবো কেন?"

গৃহকর্তা আমার কথায় ভরসা পেয়ে বললেন, "ঠিকই তো! আর তাছাড়া ও ধরনের বিপদ তো সবারই ঘটতে পারে। সুতরাং অপরের অভিজ্ঞতা জেনে রাখা তো ভালোই!"

ফিলিপ এতক্ষণ কোচের ওপর পা তুলে সিগার টানছিল। বাপের কথা শেষ হবার মুহূর্তেই বলে উঠলো, "অন্তত এইটুকু শিক্ষা হবে যে কেউ 'ড্রিংকস অফার' করলেই তার পিছু নেওয়া উচিত নয়।"

ফিলিপের কথা শুনে তার মা বলে উঠলেন, "ফিলিপ এটা বেয়াদপী।"

আইলীন টিপ্পনী কাটলো, "সেটা আর ওর পক্ষে নতুন কি?—ড্রিংক করলেই ও ঐ রকম হয়ে ওঠে!"

কিন্তু যাঁর প্রতি বেয়াদপী নিয়ে ঐ বিতর্ক তিনি কিন্তু প্রসন্নভাবেই বললেন, "ফিলিপের কথাটা কিন্তু একদিক থেকে ঠিকই। মুখার্জি, তুমি নতুন এসেছো, তোমার এটা জানা ভালো। যে কেউ ড্রিংক অফার করলেই তার সঙ্গে জুটে যেও না। তাতে অন্য বিপদও ঘটতে পারে!"

আমি বললাম, "না, তা আমি জুটবো না। কিন্তু আপনার গল্পটা তো শুরু করলেন না!"

মিঃ এলকিনটন এবার ভালো করে গুছিয়ে বসে বলতে শুরু করলেন, "সে এগারো বছর আগে এক একুশে নভেম্বর। ফিলিপ তখন আট বছরের আর আইলীন পাঁচ। সেদিন সকালে গিয়েই অফিসে খবর পেলাম যে, আমাদের ফার্ম গ্লাসগোর উপান্তে একটা নতুন পল্লী গঠনে জল সরবরাহ ও নিষ্কাশনের যাবতীয় ব্যবস্থার বায়নাটা পেয়ে গেছে। এ বহু লক্ষ পাউন্ডের বায়না। সারা বৃটেনের অনেক নামজাদা ফার্ম ঐ বায়নাটা পাবার জন্যে রীতিমত চেষ্টা করছিল। তাদের সবাইকে টপকিয়ে সেটা আমরা পেয়ে যাওয়া কম কথা নয়। ভাবলাম শ্বশুর মশায়ের যে ব্যবসাটা উত্তরাধিকারী হিসেবে আমি পেয়েছিলাম এতদিনে তা উপযুক্তভাবে গুছিয়ে নিতে পারবো। ঠিক করে ফেললাম সেই দিন আমার ক'জন প্রধান সহকর্মীকে নিয়ে ক্লাইটেরীয়ানে গিয়ে লাঞ্চ খেয়ে এই শুভ-দিনটা উদযাপিত করবো।" তাঁর স্ত্রীর দিকে ইঙ্গিত করে বললেন, "প্যাট্রেসিয়াকেও একটা ফোন করলাম। কিন্তু সে তখন বাড়ী ছিল না।

লাঞ্চটা একটু প্রলম্বিতই হলো। অফিসে ফিরে এসে দেখি প্যাট্রেসিয়া একটি চিঠি রেখে গেছে "রূপোর বাসন ও সরঞ্জামগুলি ক্রেনের গুদামে।" সেই রূপোর জিনিসগুলি আমার এক কাকীমা আমাকে উইল করে দিয়ে গিয়েছিলেন। সেগুলি সাবেকী ভারী এবং বেশীরভাগই খুব মূল্যবান। কিন্তু আটপৌরে ব্যবহারে অচল। তাই আমরা ভেবেছিলাম ওগুলো প্রাচীন কারুশিল্পের দোকানে বেচে দেবো। ভালো দাম পাওয়া যাবে। ভাবলাম প্যাট্রেসিয়া ওগুলোকে ক্রেনের গুদামে সেই জন্যেই পৌঁছে দিয়েছে এবং একবার আমায় গিয়ে দেখে আসতে বলেছে।

বিকালের আর পাঁচটা কাজের চাপে ক্রেনের গুদামে যাবার কথা ভুলেই গিয়েছিলাম। কিন্তু অফিস থেকে বেরিয়ে মনে হলো একবার ঘুরেই আসা যাক।

উত্তর-পশ্চিম লণ্ডনের ক্রিকিলউড অঞ্চলে ক্রেনের গুদামটাই বোধহয় সবচেয়ে বড় গুদাম। অনেকখানি জায়গা জুড়ে তার বাঁ দিকের পাঁচিল। বড় ফটকটার সামনে গিয়ে দেখি তা বন্ধ হয়ে গেছে এবং চারদিকে কেউ কোথাও নেই। ঘড়ির দিকে তাকিয়ে দেখি প্রায় ছ'টা বাজে। শীতের সন্ধ্যে তাই চারিদিক নির্জন হয়ে আসছে। ভাবলাম এতখানি যখন এসেইছি তখন পেছনের ছোট ফটকে দেখে যাই। হয়তো গুদামের রক্ষী ফ্রেডিকে পেয়ে যাবো। লোকটা আগে আমাদের ফার্মেই আর্দালীর কাজ করতো। কিন্তু অসম্ভব মদ্যপ, বলে তাকে বরখাস্ত করেছিলাম। তবে তার সঙ্গে আমার সদ্ভাবই বজায় ছিল এবং দেখা হলে তাকে প্রায়ই কিছু-না-কিছু বকশীস দিতাম।

আমার অনুমান ঠিকই হলো। পেছনের ফটকের পাশে ছোট্ট রক্ষী কুঠিটায় আলো জ্বলছিল। আমার গাড়ীর শব্দ শুনে ফ্রেডি বেরিয়ে এসে আমাকে অভিবাদন করে বললে, "মিসেস দুপুরে এসে প্রয়োজনীয় সব কিছু করে গেছেন। মালগুলির যথারীতি ব্যবস্থা করা হয়েছে।"

আমি খুশি হয়ে বললাম, "ফ্রেডি, আমি জানতাম যে, তুমি যখন আছো তখন ভাবনার কিছু নেই। ফ্রেডি কি মেজাজে ছিল কে জানে! হঠাৎ রুষ্ট হয়ে বলল, "কিন্তু আমি যতদিন আপনার ফার্মে কাজ করতাম তখন তো সে কথা মনে হয় নি।"

আমি একটু অপ্রস্তুত হয়ে বললাম, ফ্রেডি সেকথা তোমার এতদিনে ভুলে যাওয়া উচিত ছিল। আর আমিও তোমাকে আগেও বলেছি যে, যে-দিন তুমি ফের চাইবে সেই দিনই আমি তোমাকে আমার অফিসে ফিরিয়ে নেবো।"

ফ্রেডির তৎক্ষণাৎ মেজাজটা ফের পাল্টে গেল। বলল, "গবর্নর! আমি জানি আপনি সত্যিকারের ভালো লোক! আজ থেকে আমি আগের সব কথা ভুলে যাবো।" তারপর চোখের একটা ইঙ্গিত করে বলল, "আমাদের ভবিষ্যৎ সদ্ভাবের জন্যে এটা টোস্ট করলে কেমন হয়? বেসমেন্টে (ভূগর্ভ কক্ষে) সব ব্যবস্থাই আছে। তারপর না হয় আপনার মালগুলি আপনাকে দেখিয়ে দেবো। মিসেস যে কাগজপত্রগুলি রেখে গেছেন সেগুলো দেখে যেতে পারেন।"

গাড়ী চালানোর আগে যদিও আমি মদ্য স্পর্শ করি না তবু অরাজি হলে ফের ফ্রেডির মেজাজ বিগড়ে যাবে,—এই আশঙ্কায় হেসে বললাম, বেশ তো! খুব ভালো প্রস্তাব। শুধু টোস্টের আগে কাগজপত্রগুলি দেখলে ভালো হয়। ফ্রেডি তাতেই রাজি হলো।

লম্বা-লম্বা, আঁকা-বাঁকা স্তূপীকৃত ও বিচিত্র মাল জড়ো করা বারান্দায় আলো জ্বালাতে জ্বালাতে ফ্রেডি আমাকে অফিস ঘরে নিয়ে গেল। বলল, কেরানী মিঃ প্লামার আপনি আসবেন অনুমান করেই কাগজপত্রগুলি বের করেই রেখে গেছেন।

কাগজপত্রগুলি দেখলাম। রূপোর পাত্রগুলির বিস্তৃত তালিকা এবং দশ হাজার পাউন্ডের একটি বীমা।"

মিঃ এলকিনটন এর পরে স্ত্রীর দিকে তাকিয়ে হেসে বললেন, "প্যাটের ঠিক উপযুক্ত কাজই। সাবধানী, হিসেবী এবং যথাযথ।" শ্রীমতী এলকিনটন মিষ্টি হেসে স্বামীর সেই স্নেহময় বিশ্লেষণগুলি তারিফ করলেন। ওদিকে বাকপটু ফিলিপ টিপ্পনী করলো, "একটু বেশী মাত্রায়। আমাদের পকেট খরচার ব্যাপারে আরেকটু বেহিসেবী ও অসাবধানী হলে ভগবানকে ধন্যবাদ দিতাম।"

গল্পের খেইটা হারিয়ে ফেলার কথা ভেবে আমি মিঃ এলকিনটনকে জিজ্ঞাসা করলাম, "তারপর কি হলো?"

তিনি বললেন, "কাগজ দেখা হলে ফ্রেডি আমাকে তার বেসমেন্টের ঘরে নিয়ে গেল। নোংরা ও অগোছালো ছোট্ট ঘর। সে আলো জেলে বিদ্যুতের চুল্লীটার সুইচ টিপে দিলে। আমাকে বসবার জন্যে একটা নড়বড়ে চেয়ার দিলে। তারপর ইস্পাতের পাতের তৈরী দরজাটা বন্ধ করে দেয়াল আলমারী থেকে আধ বোতল হুইস্কী ও দুটি গ্লাস বের করলে। ততক্ষণে আমি সেই ঘরটার চারদিকে তাকিয়ে দেখলাম কঠিন কংক্রিটে তৈরী একটি নীচু কিন্তু প্রশস্ত ঘর। সম্ভবত জরুরী দলিল কিম্বা তহবিলের সিন্দুক রাখবার জন্যে এটি প্রথমে তৈরী হয়। তারপর ক্রমে সে কাজে আর না লাগায় আজ এটি ফ্রেডির আস্তানা।

ফ্রেডি দুটি গ্লাসে হুইস্কী ঢালবার পর আমরা ভবিষ্যৎ সদ্ভাবের জন্যে গ্লাসে-গ্লাস ঠেকিয়ে টোস্ট করলাম। গলা দিয়ে এক চুমুক হুইস্কী নামতেই ফ্রেডির কেমন ভাবান্তর হয়ে গেল। সে এজীবনের ঝঞ্ঝাট, বিশেষ করে মেয়েদের নিয়ে অশান্তির কথা জুড়ে দিল। আমি সকৌতুকে জিজ্ঞাসা করলাম, "তোমার শেষ নারীটি কে?" ফ্রেডি বললে, "এই গুদামেরই একজন চার উওম্যান অর্থাৎ ঝাড়ুদারনী।"

আমি জিজ্ঞাসা করলাম, "কেন অসুবিধাটা কোথায়?'

"না সে ভয়ানক মদ খায় আর মাতাল হলেই বমি করে।' ফেডি উত্তর দিলে।

ঘরের মধ্যে আমরা সবাই হেসে উঠলাম। মিঃ এলকিনটন বললেন, "হ্যাঁ,

আমিও সেদিন হেসে উঠেছিলাম। কিন্তু ফ্রেডি গম্ভীর হয়ে উত্তর দিয়েছিল "গবর্নর! দুজনেরই এক দোষ থাকলে চলবে কেন?"

যাই হোক মনের দুঃখের কথা বলতে বলতেই ফ্রেডি আরেক গেলাস করে হুইস্কী ঢাললো। আমার আপত্তি সত্ত্বেও আমাকে দিয়ে এক রকম জোর করেই সেটা শেষ করালে। ওদিকে আমার দেরী হয়ে যাচ্ছে। তাছাড়া ফ্রেডি মাতাল হয়ে পড়বার আগেই স্থান ত্যাগ বিধেয় মনে করে আমি উঠে পড়লাম।

ফ্রেডি উঠে গিয়ে হাতল ধরে দরজাটা খুলতে গিয়েই পেছিয়ে এলো। আমি অবাক হয়ে বললাম, "কি হলো? ব্যাপার কি?"

ফ্রেডি উত্তর দিল, "কি জানি! হাতলটা এমন করে তেতে গেল কি করে?"

তাকে পেরিয়ে আমি হাতলে হাত দিয়ে দিয়ে দেখি সত্যিই সেটা রীতিমত তেতে উঠেছে! সেই লোহ কপাটটার অন্যত্র হাত দিয়েও দেখি সেটা তাতা!

আমরা পরস্পরের দিকে মুহূর্ত মাত্র তাকালাম। তারপর আমি সজোরে দরজাটা একটা ঝটকা মেরে খুলে ফেললাম। আর আমার হৃদপিন্ডটা আমার বুকের মধ্যে সত্রাসে লাফিয়ে উঠলো। আগুনের একটা প্রচন্ড ঝলক এসে আমাদের ঝলসে দিয়ে গেল।

বাইরে সাংঘাতিক, মারাত্মক আগুন লেগে গেছে। সমস্ত বারান্দাটা যেন একটা ভয়াল ভীষণ আগুনের নদী। আর সেই আগুনের নদী থেকে শত শত আগুনের সাপ ফণা তুলে ফুঁসছে, গর্জন করছে। চার পাশে যা কিছু পাচ্ছে তাকেই ছোবল মারছে। সঙ্গে সঙ্গে তা জ্বলে উঠছে, ভেঙে পড়ছে। যা কিছু চোখে পড়ছে তাই জ্বলছে, হু-হু করে, দাউ দাউ করে জ্বলছে।

দরজাটা বন্ধ করে আমি ফ্রেডির দিকে তাকালাম। তার যেন বাকশক্তি রুদ্ধ হয়ে গেছে। ঘরের মধ্যে এক গাঢ়, অতল স্তব্ধতা। আমিই সেই মারাত্মক নিঃশব্দতা ভঙ্গ করে বলে উঠলাম, ফ্রেডি এ কি করে হোল?— কোন বিদ্যুতের তার থেকে নাকি?"

ফ্রেডি আতঙ্ক থরথর কণ্ঠে উত্তর দিল "হয়তো তাই। কিন্তু এখন আমরা কী করবো? সারাটা গুদাম জ্বলছে। আমাদের পালানোর পথ নেই।"

ক্রেনের গুদামটা আমি খুব ভালো করেই চিনতাম। তার একতলা থেকে আট-তলা পর্যন্ত দাহ্য বস্তুতে ঠাসা। বাড়ী কংক্রিটের, কিন্তু পুরোনো। তার ওপর তার অনেকখানিই কাঠের। অতএব একে-একে প্রত্যেকটি তলা ধ্বসে ধসে পড়বে। হয়তো মাটির নীচে এই নিরেট কংক্রিটের ঘরটা ভেঙ্গে পড়বে না। তবু বিশাল ভগ্নস্তূপের নীচে, পর্বত প্রমাণ কাঠ-কয়লা কড়ি-বড়গার তলায় আমরা চাপা পড়বো। হয়তো কেউ জানতেই পারবে না বহুদিন। কিন্তু তার চেয়েও ভাবনা সেই কুঠিটার উত্তাপ বাড়ছে। গরম ক্রমশ অসহ্য হয়ে উঠছে।

গরম, গরম, অসহ্য গরম। আমি দেওয়াল থেকে সরে দাঁড়ালাম। তবুও কী গরম। আমি কোট, টাই, শেষ পর্যন্ত সার্টটাও খুলে ফেললাম। তারপর উদ-ভ্রান্তের মত ঘরের চতুর্দিকে হাতড়ে বেড়াতে লাগলাম যদি বাঁচার কোন পথ পাওয়া যায়। হায়! হায়! বৃথা, সব কিছু বৃথা। কোথাও কোন পথ নেই, ফাঁক নেই, রন্ধ্র নেই।

ঘরের আলোটা দুলে উঠলো। বুঝলাম ঘরের ছাদের ওপর বিশাল কিছু ধ্বসে পড়লো।

এতক্ষণে বাইরে হয়তো সর্বশক্তি নিয়োগ করে আগুন নেভানোর চেস্টা করছে। হায়! কী সীমিত সেই সর্বশক্তি!

এই আগুনের উন্মাদ ঘূর্ণি, মত্ত হুংকারের বিরুদ্ধে অসহায় কয়েকটি মরিয়া মানুষের জলের পিচকারীর আক্রমণ!

আমি ফ্রেডির দিকে তাকালাম। ফ্যাল-ফ্যাল, অর্থহীন ড্যাবডেবে চোখে সেও আমার দিকে তাকালো। তারপর আস্তে-আস্তে গিয়ে ফের হুইস্কীর বোতলটা বের করে আনলো। তার চোখ মুখ লাল, ঘামে সর্বাঙ্গ জবজব করছে। তবু সে হুইস্কী ঢালতে শুরু করলো। দুটি গ্লাসেই ঢাললো। আমার দিকে একটি গ্লাস বাড়িয়ে দিল। আমি সেটা প্রত্যাখ্যান করে আরেকবার মরিয়া হয়ে পালানোর পথ খুঁজতে লাগলাম। যদি দেওয়াল ভেদী কোন পাইপ, বাতাস যাতায়াতের কোন রন্ধ্র, ঘুলঘুলি কোথাও কিছু থাকে। ফ্রেডির জিনিসপত্র রাখার আলমারীটা ঠেলে সরালাম। আর সহসা একটা ভ্যাপসা ভারী ঠান্ডা বাতাসের স্পর্শ পেলাম। উপুড় হয়ে পড়ে তার উৎস কি দেখবার চেস্টা করলাম। হাত কয়েক নীচু, একটা টেনিস র‍্যাকেটের মাথার ঘেরের চেয়ে কিছু বড় ব্যাসের একটা ম্যানহোল। আপ্রাণ-ভাবে তার তলাটা দেখবার চেস্টা করলাম। পুরু ইস্পাত পাতের জালি। অমসৃণ, বন্ধ আঁটা, জং ধরা। হয়তো কোন দিন, কোন ধরনের সাফাই নালী হিসেবে তৈরী হয়েছিল। তারপর তা নিস্প্রয়োজন হয়ে যেতে বন্ধ করে দেওয়া হয়েছে। তবু সন্দেহ নেই যে, বাইরে কোথাও গিয়ে এটা শেষ হয়েছে। নয়তো এর শেষটা এ বাড়ীর মধ্যেই হলে গরম বাতাস আসতো। তবু সেটুকুর জন্যেও ভাগ্যকে ধন্যবাদ দিলাম। তারপর নিস্তেজ, অন্তহীন অপার হতাশা, উদ্বেগ ও একটা বোবা আতঙ্ক নিয়ে ফিরে এসে ফ্রেডির সামনে বসলাম। সে তখন নেশায় ডুবে যাচ্ছে। আমার দিকে তাকিয়ে জিজ্ঞাসা করলো, "আমাদের কি আর কিছু করবার নেই? পালাবার সব পথই কি বন্ধ?"

আমি উত্তর দিলাম, "আমি কিছুই ভেবে পাচ্ছি না। সম্ভবত একটা পথই শুধু ছিল। কিন্তু তাও বন্ধ হয়ে গেছে!" তার-পর আমি যে দৃশ্য দেখলাম তা জীবনে ভুলবো না। আজো দুঃস্বপ্নের মধ্যে আমার মনে তা প্রায়ই জেগে ওঠে। দেখলাম নেশায় চুর ফ্রেডির মুখে আতঙ্ক, অতি নিষ্ঠুর মৃত্যুর নিশ্চিত আতঙ্ক জেগে উঠলো। সে আমার দিকে বিস্ফারিত, নিষ্পলক চোখে তাকিয়ে থাকলো। সে দৃষ্টি সহ্য করতে না পেরে আমি বললাম, "আগুন তো এক সময়ে নিভবেই। তার দুয়েক দিন পরে হয়তো উদ্ধারকারীরা আমাদের খুঁড়ে বের করবে।"

ফ্রেডি আচম্বিতে চিৎকার করে উঠলো, "কখনোই নয়। তা হতে পারে না। বাঁচবার একটা পথ আছেই।" তারপর সে নিস্তেজ হয়ে বসে পড়লো। বোতল থেকে আবার হুইস্কী ঢাললো। আমার দিকে বোতলটা

এগিয়ে দিল। আমি তাকে ধন্যবাদ দিয়ে জানালাম আমার তার কোন প্রয়োজন নেই। তখন সে নিজেই বোতলটা নিঃশেষ করলো।

ওদিকে ঘরের উত্তাপ ক্রমশ বাড়তে বাড়তে প্রায় অসহ্য হয়ে উঠছে। ফ্রেডির মুখ দিয়ে গেঁজলা বেরুচ্ছে। ক্রমে তার মাথাটা ঝুঁকে পড়লো।

সেই দ্রুতবর্ধিষ্ণু উত্তাপের মধ্যে বসে থাকতে থাকতে হঠাৎ আমার মনের মধ্যে আতঙ্কের দুঃস্বপ্ন দাউ দাউ করে জ্বলে উঠলো। আমি দেখতে লাগলাম বিরাট বিপুল আগুনের শিখা লাফ দিয়ে দিয়ে উঠে আকাশ ছুঁচ্ছে আর দিগ-দিগন্তে ছড়িয়ে পড়ছে। বাড়ীঘর, প্রাসাদ-অট্টালিকা, পাহাড় বন-মাঠ সব জ্বলে যাচ্ছে, লক্ষ কামানের গর্জনের মত আগুনের হুহুঙ্কারে আকাশ-বাতাস ধ্বনিত-প্রতিধ্বনিত হচ্ছে।... মুহূর্তের জন্যে চৈতন্য ফিরে পেলাম। দেখলাম ফ্রেডির মাথা আরো নুয়ে পড়ছে।

আবার মহানন্দের স্বপ্ন নেমে এলো। এবার ঘোরের মধ্যে দেখলাম আমাদের সেই ভূগর্ভের প্রকোষ্ঠটা দারুণ শব্দ করে ফেটে গেল। ভেঙে গেল। আমি লাফ দিয়ে উঠে পড়লাম।

যন্ত্রণাবিদ্ধ খাঁচায় বন্দী জন্তুর মত আরেকবার সেই কংক্রিটের ঘরের মধ্যে লাফিয়ে ঝাঁপিয়ে, দাপাদাপি করে এলাম। কংক্রিটের দেওয়াল এতই উত্তপ্ত হয়ে উঠেছে ছোঁয়া যায় না। আমার হাতের ঘড়ির ধাতুর ব্যান্ডটাও আর সহ্য হচ্ছে না। সেটাকে খুলে মেঝেয় ছুড়ে ফেলে দিলাম।

তারপর আবার নিজের চেয়ারে ফিরে এলাম এবং সেই মুহূর্তে ফ্রেডি চেয়ার থেকে মাটিতে লুটিয়ে পড়লো। উঠে গিয়ে তার বুকে হাত দিলাম। তার হৃদপিণ্ড অচল হয়ে গেছে। তার নাড়ী টিপলাম, তা বন্ধ হয়ে গেছে।

আবার চেয়ারে ফিরে এসে বসলাম। এবার মনের অবস্থা অন্য। এবার শুধু অতীত স্মৃতিতে ডুবে যাওয়া। আমার ও প্যাটের পূর্বরাগ। আমাদের বিয়ে। পশ্চিম ভারতীয় দ্বীপপুঞ্জে মধুযামিনী। সেখানে সমুদ্রতীরে মায়াবী আলো ছড়ানো এক অপরাহ্ণে প্যাটের সেই স্বগতোক্তি, "ভাগ্য আমাদের দুজনকে এক করে দিয়েছে। মনে হয় আমাদের যুগল জীবনে ভাগ্যের ভূমিকা রীতিমত।"

আমি ভাগ্য মানি না। মানি প্রত্যুৎপন্নমতিত্ব ও সুযোগের সদ্ব্যবহার। কিন্তু সেই ভয়ঙ্কর ক্ষণে প্যাটের সেই বহুদিন আগেকার কথার মধ্যে কেমন যেন সান্ত্বনা খুঁজে পেতে লাগলাম। মনে হলো আমি বাঁচবো, বাঁচবো। এই মহাবিপর্যয় থেকে উদ্ধার পাবো।

ফিলিপ ও আইলীনের মুখ ভেসে উঠলো মনের মধ্যে। মনে হলো তারা যেন সামনে এসে দাঁড়িয়েছে। চোখ খুললাম। সেই ভয়ঙ্কর বিশ্রী কংক্রিকেটর চাপা ঘর। মেঝের ওপর ফ্রেডির নিষ্প্রাণ, নোংরা দেহ। হঠাৎ মনে হলো, ঐ টিমটিমে আলোটা জ্বলছে কি করে? এতক্ষণে তো তার তারটা পুড়ে কিম্বা ছিঁড়ে-কেটে যাবার কথা!

আবার স্বপ্নের মধ্যে ডুবে গেলাম। ভাবতে লাগলাম প্যাট তো স্বয়ংসিদ্ধা: আমার মৃত্যুর পর সে নিশ্চয়ই যা কিছু আছে তা গুছিয়ে নিতে পারবে। ব্যবসাটা বেচে দেবে, প্রভূত ইনসিওরেন্স আছে আর...আর আছে ওপরের প্রজায় আগুনে গলে যাওয়া রুপোর জিনিসগুলির জন্যে দশ হাজার টাকার বীমা।...

অকস্মাৎ একটা টেলিফোন ক্রুকরে উঠলো! আবার মনের মধ্যে বিভ্রান্তি জাগছে? — কিন্তু না তো টেলিফোন তো বাজছে...বাজছে...বাজছে। লাফিয়ে উঠে পড়লাম। হ্যাঁ। ঐ তো আলমারীর ওদিক থেকে ভাঙাচোরা জিনিসপত্র, কাগজপত্র, জঞ্জালের আড়াল থেকে। ছুটে গিয়ে সব কিছু সরিয়ে নড়িয়ে ঠেলে ফেলে রিসিভারটা তুললাম। একটা পুরোনো আদ্যিকালের ফোন।...হ্যালো! হ্যালো! হ্যালো!

ওদিক থেকে সবিস্ময় উত্তর এলো, "একি! কে যেন উত্তর দিচ্ছে। এও কি সম্ভব?...হ্যালো কে আপনি? ফ্রেডি?"

"না...না আমি এর্লাকিনটন! — টেড এর্লাকিনটন!"

"সে কী! কোন এর্লাকিনটন?...কনট্রাক্টর এর্লাকিংটন?"

"হ্যাঁ।"

"কিন্তু ওখানে কেন? ফ্রেডিকে দেখেছেন?"

"হ্যাঁ দেখেছি। সে এই ঘরেই হৃৎপিণ্ডের ক্রিয়া বন্ধ হয়ে মরে পড়ে আছে। একটা মালের ব্যাপারে খোঁজ নিতে এসে তার সঙ্গে দেখা হয়। তার কথা শুনে এই ঘরে এসে আটকে পড়ে গেছি।"

"আর আমি ক্রেনের গুদামের ম্যানেজার টার্ণার। ফায়ার ব্রিগেডের নির্দেশে প্রত্যেকটা টেলিফোন লাইন পরীক্ষা করে দেখছিলাম, ফ্রেডির কোন সন্ধান পাওয়া যায় কিনা।... সব লাইন নষ্ট হয়ে গেছে। অবশেষে এই অতি পুরোনো বিস্মৃতপ্রায় লাইনটা—"

"কিন্তু ফ্রেডি তো লাইনটা সম্পর্কে কিছু জানতো বলে মনে হয় না।"

"না জানাই সম্ভব! এ লাইনটা আদৌ আছে কিনা তাই নিশ্চয় করে কেউ জানতো না, জীবন্ত থাকার কথা তো দূরের কথা। তাছাড়া ফ্রেডি ঐ ঘরটা ব্যবহার করছিল মোটে মাস খানেক। তবে ওসব কথা থাক। আপনাকে উদ্ধার করার তো কোন উপায় দেখা যাচ্ছে না।...ইতিমধ্যে আপনি কারুর সঙ্গে ফোনে কথা বলতে চান? এক্‌সচেঞ্জের সুইচ বোর্ডে এ লাইনটা সংযোগ করে দেওয়া যেতে পারে।"

আমি মরিয়া হয়ে বলে উঠলাম, "হ্যাঁ হ্যাঁ নিশ্চয় চাই। স্পিডওয়েল ৪৯১০, এখুনি যোগ করে দিন।"

এবার কয়েক মুহূর্ত অপেক্ষা করার পালা। আমি প্রাণপণে আমার মনের উদ্বেলিত আবেগ, উৎকণ্ঠা ও শঙ্কাকে সংযত করে নেবার জন্যে নিজের সঙ্গে যুদ্ধে বদ্ধ করলাম। কিন্তু সেই কটি মুহূর্ত কি দীর্ঘ!
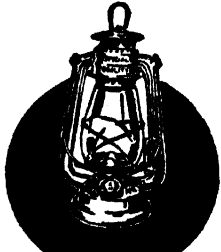
ওদিকে ফোনের ঝঙ্কার শুনতে পেলাম। ফিলিপ এসে ফোন ধরলো। "বাবা! তুমি এতক্ষণ কোথায় ছিলে? কি করছো? মা রীতিমত ব্যস্ত হয়ে উঠেছে!"

আমি যতটা সম্ভব স্বাভাবিকভাবে উত্তর দিলাম, 'আমি বাড়ীর কাছেই আছি ফিলিপ-উড়ে। কিন্তু তুমি আমার কথা শুনতে পাচ্ছো?'

"নিশ্চয়, কেন নয়? মা তোমার জন্যে অপেক্ষা করে-করে শেষ পর্যন্ত হার্ভিদের বাড়ী চলে গেল। আজ সেখানে সন্ধ্যের বুক ক্লাবের মিটিং। ওদিকে কোথায় আগুন লেগে গেছে। কী অদ্ভুত দৃশ্য, আকাশ লালে লাল! বাবা, গত বছর ছুটিতে সিসিলির সমুদ্রতীরে সূর্যাস্তের কথা মনে পড়ে? আজকের সন্ধ্যায় আকাশ তেমনি লাল হয়ে উঠেছে। আমার খুব বাইরে যেতে ইচ্ছে করছে। কিন্তু মা নেই—।"

আমি ফিলিপকে থামিয়ে বলে উঠলাম, "ফিলিপ আমার সময় নেই। তোমার মাকে ডেকে আনাও সম্ভব নয়।"

ফিলিপ এতক্ষণ চুপ করে বসে তার বাবার মুখে সেদিন সন্ধ্যেকার ঘটনার বর্ণনা শুনেছিল। এতক্ষণে বলে উঠলো, "আমি, বাবার কথাবার্তায় অবাক হয়ে গিয়েছিলাম। কিন্তু সে যে মৃত্যুর মুখোমুখি হয়ে আমার সংগে কথা বলছে তা কিছু টের পাই নি।"

মিঃ এলকিনটন বললেন, "আর যাতে সে টের না পায় তার জন্যে রিসিভারটা তাড়াতাড়ি নাবিয়ে রাখবার আগে ফিলিপকে শুধু বললাম, "ফিলিপ এখন বিদায়। কিন্তু শীঘ্রই আমি ফিরছি।"

আর তিনটি মাত্র কথা, "শীঘ্রই আমি ফিরছি।" আমার মনকে মুহূর্তে উদ্দীপিত করে তুলল। রক্তে জাগালো আশ্চর্য প্রেরণা। আমি বলে উঠলাম আমাকে বাঁচতেই হবে। আমি বাঁচবো। আমি সেই বহ্নিবেষ্টনী থেকে পরিত্রাণ পাবো।

আবার মরণ-জয়ের তূর্যধ্বনির মত ফোনের ঝঙ্কার। মরণ-সমুদ্রের ওপার থেকে টার্ণারের অভয় কণ্ঠ। সে বলছে "মিঃ এলকিনটন, আপনাকে উদ্ধারের একটা প্রায় অসম্ভব পথ আছে। কিন্তু আমরা কিছুই করতে পারবো না। ফায়ার ব্রিগেডের কর্তাদের সংগে কথা বলে দেখেছি। উত্তাপ এতই বেশী যে আমরা প্রায় পঞ্চাশ গজ দূরে যে অফিস ঘরটি থেকে ফোন করছি সেখানে দাঁড়ানোই অসম্ভব হয়ে উঠছে। কিন্তু আপনি একবার মরিয়া হয়ে চেষ্টা করে দেখুন!"

"কি সেটা?"

"ঘরের এক দিকে একটি ম্যানহোল আছে। দেখেছেন কি?"

"দেখেছি।"

'ওটা হচ্ছে একটা বিশ ইঞ্চি পাইপের শেষ প্রান্ত। বহু বছর আগে এক বিশেষ ধরনের ড্রেন ব্যবস্থার জন্যে তৈরী হয়। প্রায় তারপর থেকেই অকেজো হয়ে পড়ে আছে। পাইপটা অফিসের পেছনের রাস্তার তলায় ড্রেনে এসে পড়েছে। ফায়ার ব্রিগেডের লোকেরা ইতিমধ্যেই রাস্তার দিকের প্রান্তটা ভেঙে পথ করে রাখছে। আপনি ঐ পাইপের মধ্যে দিয়ে কোন রকমে হামাগুড়ি দিয়ে শেষ পর্যন্ত যদি পৌঁছতে পারেন তাহলে সেখানে এক দড়ি ঝুলতে দেখতে পাবেন।"

আমি বলে উঠলাম, "আমি তাই করবো।"

"তবে করুন। নষ্ট করবার মত কোন সময় নেই। ভাগ্য আপনার সহায় হোন। মনে রাখবেন মাথাটা আগে বাড়িয়ে নামতে হবে। কারণ রাস্তার ড্রেনের সমান্তরাল হবার আগে পাইপটা এল-এর মত বেঁকে আছে।"

গেল। আমি হুমড়ী খেয়ে পড়লাম। দুটি বাহু ও পিঠ দারুণ যন্ত্রণায় অসাড়!

সেই কালো, সঙ্কীর্ণ, অনিশ্চিত গর্তটার মুখে দাঁড়িয়ে কয়েক মুহূর্ত কিংকর্তব্যবিমূঢ় ও স্থাণু হয়ে গেলাম। কিন্তু ফিলিপকে যে কথা দিয়েছি, 'শীঘ্রই আমি ফিরছি,' তা মনে ঝলক দিয়ে উঠতেই আমি বিদ্যুৎপৃষ্ঠের মত চকিত হয়ে উঠে মাথা নীচু করেই গর্তের অন্ধকারে ঝাঁপ দিলাম। পাইপের ঘর্ষণে গায়ের চামড়া ছিঁড়ে গেল। কিন্তু সে তো মুহূর্ত মাত্র। সাতআট ফিট নীচেই প্রথমে হাত, তারপর মাথা ও মুখ নরম কাদার ওপর থুবড়ে পড়লো। পা দুটো ওপরে সিধে হয়ে আছে। এক হাত দিয়ে পাইপের বাঁকটা অনুভব

...উদ্ধারকারীরা আমাদের খুঁড়ে বের করবে

আমি ছুটে গিয়ে সেই ম্যানহোলের ঢাকনীটি খোলবার চেষ্টা করলাম। সেটি মারাত্মকভাবে তেতে উঠেছে। হাতে প্রায় ফোস্কা পড়ে যায়। গায়ের সার্টটা দিয়ে চেপে ধরে খুলতে গেলাম, অসম্ভব।

উঠে গিয়ে আছাড় দিয়ে একটা চেয়ার ভেঙে তার একটা পা নিয়ে এসে ঢাকনীটাকে চাপ দিলাম। হায়, হায় বৃথা। সব বৃথা। জোর। জোর! আরেকটু জোর। হয়তো সেই মুহূর্তে আমিই পৃথিবীর সবচেয়ে বলশালী লোক হয়ে উঠেছিলাম! আর সেই মরিয়া শক্তি দিয়ে ঢাকনীটাকে আবার, আবার চাপ দিতে থাকলাম। ঢাকনীটার মরচে খসে গেল। নড়ে উঠলো। তারপর আচমকা খুলে গেল। আমার হাত থেকে চেয়ারের পায়াটা পিছলে

করে সাপের মত এগোতে লাগলাম। একটু পরেই বাঁক পেরিয়ে পাইপের মধ্যে সোজা হয়ে ঢুকতে পেরেছি। এবার সরীসৃপের মত বুকে ভর দিয়ে কাদা-পাঁক ঠেলে ঠেলে অন্তত দেড়শ গজ মত এগোতে হবে। মাথা ঝিম ঝিম করছে মনে হলো দি হাল ছেড়ে। সেই নোংরা, পচা দুর্গন্ধের মধ্যেই শুয়ে থাকি। তারপর এক সময় গাঢ় ঘুমের মত, বিবশ করা নেশার মত মৃত্যু এসে আমাকে আচ্ছন্ন করে ফেলবে। কিন্তু সেই মুহূর্তে আবার মনে হলো আমার জীবন তো আমার একার নয়। এ জীবন প্যাটের, ফিলিপের, আইলীনের। আমার কর্তব্যের। যা কিছুর মধ্যে ছড়িয়ে-জড়িয়ে আছি সব কিছুর।

অতএব শেষ পর্যন্ত লড়াই না করে আমার মরবার অধিকার নেই। তাই সর্বশক্তি সংহত করে এগোতে লাগলাম। এগোলাম, এগোলাম, এগোলাম। সেই পঙ্কিল, দুর্গন্ধ ভরা, অন্ধকার পাইপের মধ্যে দিয়ে সরীসৃপের মত এগোতে লাগলাম। কখনো সচেতন, কখনো প্রায় অবচেতন।

এক সময় মনে হলো মানুষের কণ্ঠ, অস্পষ্ট কোলাহল কানে আসছে। আরো এগোলাম। একটি ঝুলন্ত দড়ির স্পর্শ পেলাম। অবস ক্লান্ত হাতে সেটি টেনে নিলাম। তার প্রান্তে একটি ফাঁস। বুক গলিয়ে সেটি কোমরে বেঁধে নিলাম। অস্পষ্টভাবে অনুভব করলাম ওপরে উঠছি, উঠছি। পাইপের ঘষটানীতে চামড়া ছিঁড়ছে।...তারপর সব অন্ধকার। সব চেতনা অবলুপ্ত।

চেতনা ফিরে এলো হাসপাতালে। মাথার কাছে প্যাট ও দু পাশে ফিলিপ ও আইলীন। কপালে প্যাটের হাতের স্পর্শে আমার নবজীবন ফিরে এলো। সে প্রথম সংবাদ আমাকে কি দিলো জানেন?"

জিজ্ঞাসা করলাম "কি?"

শ্রীমতী এলকিনটন মৃদু হেসে নিজেই তার উত্তর দিলেন, "আমি চিরদিন যা বিশ্বাস করে এসেছি তারই পুনরাবৃত্তি করলাম,—ভাগ্য আমাদের মিলন ঘটিয়েছে এবং তা সৌভাগ্য। বহু বছর আগেই ক্লেনের গুদামের ঐ পাইপটা আমার বাবার ঠিকেদারীতেই তৈরী হয়েছিল।

সাহিত্য ও সংস্কৃতি

নেতাজী প্রসঙ্গে (২)

ক্যাথে হল সিঙ্গাপুরে অল-ইস্ট এশিয়া কনফারেন্স অনুষ্ঠিত হল। সভাগৃহে অসংখ্য মানুষের ভীড়। বাইরেও ততোধিক। রাসবিহারী বসু সভাপতির ভাষণে বললেন:

"I have brought you this present Subhas Chandra Bose — who needs no introduction to you, to India, or to the world. He symbolizes all that is best, noblest, the most daring and most dynamic in the youth of India".

রাসবিহারীর বক্তৃতার শেষ ধ্বনি ছিল "ইনকিলাব জিন্দাবাদ", কিন্তু আর একটি কথা সেই সঙ্গে সুরু হল, "দেশসেবক সুভাষ কি জয়।"

সুভাষচন্দ্র ভাষণ দিলেন, সুদীর্ঘ ভাষণ। ভারতের রাজনৈতিক সংকট, য়ুরোপের যুদ্ধপরিস্থিতি—তারপর বললেন:

Action in a war crisis demands, above all, military discipline".

এই প্রথম ভাষণেই সুভাষচন্দ্র স্বাধীন ভারতের জন্য একটি অস্থায়ী সরকার গঠন করলেন, এই সরকার স্বদেশে বিপ্লবের পথ উন্মুক্ত করবে, বিপ্লব সার্থক হলে—

"It will then make room for a permanent government to be set up inside India, in accordance with the will of the people".

এই ঐতিহাসিক ভাষণের শেষেই সুভাষচন্দ্র বলেছিলেন—

"In this final marcl to freedom, you will have to face hunger, thirst, privation, forced marches — and death".

এর পরদিন সুভাষচন্দ্র তাঁর বে-সামরিক পোষাক ত্যাগ করে পরলেন মিলিটারি ইউনিফর্ম, ফলে তাঁর ব্যক্তিত্বের প্রভাব প্রচণ্ডতরো হয়ে উঠল—ভারতীয় সেনাবাহিনীর অফিসার ও সৈনিকবৃন্দের প্রতিও তাঁর প্রভাব অতি সহজেই বিস্তারিত হল, সকলে তাঁকে অতি সহজেই নেতা হিসাবে গ্রহণ করলেন।

ইণ্ডিয়ান ইণ্ডিপেণ্ডেন্স লীগের সরকারি মুখপাত্র হিসাবে এই গ্রন্থের লেখক শিবরাম সাংবাদিক সম্মেলন ডেকে এই নতুন প্রতিষ্ঠানের জন্মবিবরণ ঘোষণা করলেন। মুখপাত্র বললেন:—

"The sole object of the INA is to destroy British Power and influence in India and to make an India for Indians . . ."

সুভাষচন্দ্রের ছিল অদম্য উৎসাহ এবং প্রচণ্ড প্রাণশক্তি। জাপানের ভূমিতে পৌঁছে তিনি একটিও মুহূর্ত বৃথা ব্যয় করেননি। সাংগঠনিক কাজে তৎক্ষণাৎ লেগে গিয়েছেন।

সুভাষচন্দ্র যখন আহ্বান জানালেন—"চলো দিল্লী!" তখন তিনি ইস্ট এশিয়ার ভারতীয়দের জন্য আর একটি স্লোগান রচনা করলেন—

"Let the slogan of all Indians in East Asia be: Total Mobilization for a Total War".

এই ঘোষণা ধ্বনিত হল সিঙ্গাপুরের এক বিশাল জনসভায়। পুরুষ বাহিনীর মত নারী বাহিনীও গড়ে উঠল। অসংখ্য নরনারী আত্মদানের জন্য এগিয়ে এলেন। সুভাষচন্দ্র লেঃ কর্নেল এ সি চ্যাটার্জিকে সেক্রেটারী জেনারেল নিযুক্ত করলেন, এবং কর্নেল চ্যাটার্জিও অতিশয় যোগ্যতার সঙ্গে কাজ সুরু করলেন। শ্রীযুক্ত শিবরাম লিখেছেন সুভাষচন্দ্রের বক্তৃতা শোনা একটা ভাগ্যের কথা—

"It was a treat listening to Subhas, especially when he explained the Indian scene".

লেখক শিবরাম বলেছেন তিনি এবং এস. এ. আয়ার ছিলেন প্রচার বিভাগে। প্রচার বিভাগের জন্য তাঁরা আগে সুভাষচন্দ্রের কাছে উপদেশ নিতে যেতেন, সুভাষচন্দ্র বলতেন ভারতের জাতীয় নেতৃবৃন্দের কোনো নির্দিষ্ট নীতি নেই, কোনো সুস্পষ্ট পরিকল্পনা নেই, ব্রিটিশের হাত থেকে ক্ষমতা ছিনিয়ে নেওয়ার কথা তাঁরা চিন্তা করেন না। ঘরোয়া আলোচনায় ভারতীয় রাজনৈতিক অবস্থা সম্পর্কে সুভাষচন্দ্র যে সব আলোচনা করতেন তার মধ্যে থাকত অনেক আশ্চর্য নতুন চিন্তার পরিচয়। ইতস্তত না করেই তিনি ভারতীয় নেতৃবৃন্দ সম্পর্কে খোলাখুলি মন্তব্য করতে পারতেন, কোনো কিছুতেই তিনি ভ্রূক্ষেপ করতেন না। শিবরাম বলেছেন—সুভাষচন্দ্র যখন যে সব নেতাকে বহির্ভারতীয় অঞ্চলের ভারতীয়গণ পূজা করতেন তাঁদের কথা উল্লেখ করতেন তখন অনেকেই একটু বিভ্রান্ত হয়ে পড়তেন। কিন্তু কোনো কিছু রেখে ঢেকে বলার স্বভাব সুভাষচন্দ্রের ছিল না, তিনি দ্বিধাহীন চিত্তে তাঁর বক্তব্য বলতে পারতেন। ফলের দিকে তাকিয়ে কথা বলতেন না।

সুভাষচন্দ্রের প্রাইভেট সেক্রেটারি হাসান সর্বপ্রথম প্রস্তাব করেন সুভাষচন্দ্রকে "নেতাজী" নামে সম্বোধন করার জন্য। প্রচার বিভাগের এস. এ. আয়ারের এই সম্মানসূচক অভিধায় আপত্তি ছিল কিন্তু শিবরাম নাকি বৈজ্ঞানিক পদ্ধতির প্রচার ব্যবস্থায় এই অভিধা ব্যবহারে সুবিধা হতে পারে মনে করে তা ব্যবহার করেন। অচিরেই "নেতাজী" এই অভিধা অতিশয় জনপ্রিয় হয়ে উঠেছিল, এবং ভবিষ্যতে কথাটি কিভাবে সুভাষচন্দ্রের স্বদেশবাসী গ্রহণ করেছেন সে কথা কারো অজানা নেই। সুভাষচন্দ্র বেতার ভাষণে বললেন—

"The road to Delhi is the road to freedom".

সুভাষচন্দ্রের ভাষণ এবং চতুর্দিকে ভ্রমণ ও বক্তৃতার ফলে ভারতবাসী মাত্রেই অতিশয় প্রেরণালাভ করলেন, একটা নতুন উদ্দীপনার সঞ্চার হল সকলের মনে। সুভাষচন্দ্র মালয় ও থাইল্যাণ্ডে জনসভা, সম্মেলন এবং সাক্ষাৎকারের মাধ্যমে আজাদ হিন্দ ফৌজের উদ্দেশ্য প্রচার করলেন। জাপানী বোমারু বিমানে তিনি থাইল্যাণ্ড ও বর্মা সফর করলেন। ব্যাংকক, রেঙ্গুন, মানিলা, সাইগন যেখানেই ভারতীয়রা ছিলেন তাঁরা সকলেই সুভাষচন্দ্রের ভাষণ এবং তাঁর সঙ্গে বিচরণরত মিছিল দেখে প্রেরণা লাভ করেছেন। শিবরাম বলেছেন—

"In Bangkok and Rangoon, where I was a member of Netaji's party, I have seen no State visit so glamourous as that of Subhas Chandra Bose".

লেখক বলেছেন রাজনৈতিক কলাকৌশলে সুভাষচন্দ্র ছিলেন অতুলনীয়। জনতার প্রতি প্রভাব বিস্তারে তাঁর অসামান্য শক্তি ছিল। শিবরাম লিখেছেন—

"Subhas was leadership personified".

সুভাষচন্দ্র একদিন বক্তৃতা প্রসঙ্গে বলেছিলেন যে—

"Before the end of this year (1943) we shall stand on Indian soil".

জাপানীরা এই কথায় বিস্মিত হল, তারা এই সংবাদ সেন্সার করে বাদ দিতে চায়। নেতাজীর প্রচার বিভাগ যখন তাঁকে এই সংবাদ জানালেন তখন তিনি বললেন—আমি নিজেই এই কথা আমার বেতার-ভাষণে ঘোষণা করব।" জাপানীরা বলল—তা করতে পারেন। কিন্তু সরকারি জাপানী সংবাদ মারফৎ নয়। ডোমেই নিউজ এজেন্সীতেও নয়। সেই রাত্রেই আজাদ হিন্দ রেডিয়োর মাধ্যমে নেতাজী স্বয়ং শ্রোতাদের বললেন:

Before the end of this year, we shall stand on Indian soil".

শিবরাম লিখেছেন আজাদ হিন্দ ফৌজের সর্বাধিনায়ক সুভাষচন্দ্র যখন তখন সামরিক শিবিরে এসে হাজির হতেন। রেঙ্গুনে রেল ষ্টেশনে তিনি স্বয়ং উপস্থিত থেকে সৈন্যদের বিদায় জ্ঞাপন করেন। সেইদিন তাঁর মনে ছিল প্রচণ্ড ভাবাবেগ, তিনি বললেন:—

". . . There, there in the distance, beyond that river, beyond those jungles, beyond those hills,

lies the promised land — the soil from which we sprang, the land to which we shall now return".

লেখক শিবরাম যেসব উধৃতি ব্যবহার করেছেন, যেসব বক্তৃতার অংশ বিশেষ উল্লেখ করেছেন তা এতদিনে অনেকেরই মুখে মুখে। ২৬৪ পৃষ্ঠার এই গ্রন্থটিতে এমন কোনো বিশেষ ধরনের তথ্য পাওয়া গেল না যা ইতিপূর্বে জানা যায়নি।

এ কথা সমালোচকদের মনে হওয়া হয়ত অন্যায় হবে না যে বিগত কুড়ি বছরেরও বেশীকাল ধরে যেসব তথ্য বিভিন্ন লেখক ও নেতাজীর সহচরবৃন্দ লিখে গেছেন লেখক মুখ্যত তারই ভিত্তিতে গ্রন্থটি লিখেছেন।

লেখক শিবরাম যে নেতাজীর সঙ্গ লাভ করেছিলেন এবং ঘনিষ্ঠ সাহচর্যে ধন্য হয়েছেন এমন পরিচয় গ্রন্থটিতে নেই। বরং মাঝে মাঝে কিঞ্চিৎ অশ্রদ্ধার ভঙ্গী ফুটে উঠেছে নেতাজীর চরিত্র-চিত্রণে।

শিবরামের এই গ্রন্থটি তাই পূর্ব-প্রকাশিত ইতিহাসের সংক্ষিপ্ত একটি বিবরণ। আবেগ বা প্রেরণার স্পর্শে লেখক অনুপ্রাণিত না হয়ে হয়ত অন্য কোনো প্রচ্ছন্ন উদ্দেশ্যে চালিত হয়ে এই গ্রন্থটি লিখেছেন।

গ্রন্থটি সুমুদ্রিত এবং নীরের মধ্য থেকে যাঁরা ক্ষীরটুকু বেছে নিতে পারবেন তাঁদেরই এই গ্রন্থ পড়া উচিত।

—অভয়ংকর

THE ROAD TO DELHI: by M. Sivaram. Published by Charles E. Tuttle Co. Rutland, Vermont and Tokyo, Japan. Price 3.50 cents.

একটি নতুন উপন্যাস ॥

ভারতীয়দের মধ্যে যাঁরা ইংরেজী ভাষায় সাহিত্য রচনা করে বিশেষ খ্যাতি অর্জন করেছেন, তাঁদের মধ্যে রাজা রাও অন্যতম। সম্প্রতি তাঁর একটি নতুন উপন্যাস প্রকাশিত হয়েছে। গ্রন্থটির নাম 'দি ক্যাট অ্যান্ড শেক্সপীয়র'।

গ্রন্থটির কাহিনী রচিত হয়েছে ত্রিবান্দ্রমের দুইজন সরকারী কর্মচারীকে কেন্দ্র করে। গ্রন্থকার বলেছেন, এই উপন্যাসটি হল, একটি মনস্তাত্ত্বিক উপন্যাস। এর প্রতি পৃষ্ঠাতেই পাঠকের চোখে জল আসুক, আমি তা চাই। আমার কাছে গ্রন্থটি হল এক ধরনের প্রার্থনা। উপন্যাসটির গঠন-ভঙ্গীতেও কিছুটা অভিনবত্ব আছে। একজন যেন সমস্ত ঘটনাটা বলে যাচ্ছেন। যিনি এই ঘটনাটি বলছেন, তিনি হলেন একজন কোংকান সারস্বত পণ্ডিত সম্প্রদায়ের লোক। কাজ করেন রাজস্ব বিভাগে। তাঁর প্রতিবেশীর নাম গোবিন্দন নায়ার। তিনি কাজ করেন একটি রেশনের দোকানে। তিনি কথা বলতে ভালবাসেন এবং সব সময়ই বক্ বক্ করেন। বাড়িতে ফিরে এলে কিন্তু তাঁর মনোভাবের পরিবর্তন হয় এবং উপনিষদ বা কোনও কবিতা গ্রন্থ পাঠের মধ্যেই নিজেকে নিয়োজিত করেন। যাই হোক, এভাবেই উপন্যাসটির কাহিনী গড়ে উঠেছে। কাহিনীর মাধ্যমে কিন্তু লেখক কেরলবাসীদের জীবন ও সমাজের প্রতি তীব্র কটাক্ষ করেছেন। এঁদের জীবনে সংস্কার, দারিদ্র্য এবং দুর্নীতি যেন সমাজকে চতুর্দিক থেকে আচ্ছন্ন করে রেখেছে। লেখক যদিও তাঁদের ভেতর থেকে কিছু কিছু শুভ চিন্তারও কথা প্রকাশ করেছেন, তবু মনে হয় যেন, লেখকের দৃষ্টিভঙ্গির সঙ্গে সকলে একমত হবেন না। ইদানিং তথাকথিত ভারতীয় ইংরেজীভাষী লেখকদের মধ্যে একটা প্রবণতা লক্ষ্য করা যাচ্ছে যে, তাঁরা ভারতের কুৎসা প্রচারের দিকেই বেশি নজর দিচ্ছেন। এতে বিদেশে বাহবাও পাওয়া যায় এবং পুরস্কারও পাওয়া যায়।

তবে উপন্যাসটির সবচেয়ে যে দিকটা পাঠকদের ভাল লাগবে, তা হল, এতে বিচিত্র ধরনের চরিত্রের সমাবেশ ঘটেছে। রচনা-রীতিও খুব সুন্দর। গ্রন্থটি তাঁর খ্যাতিকে আরও প্রসারিত করবে বলে আশা করি।

বিদেশে ভারত ॥

ভারতবর্ষ সম্বন্ধে ভারতীয়রা বিদেশে কি করছেন, অথবা ভারত সম্বন্ধে বিদেশীদের ভাবনা কি, তা নিয়ে তেমন কোনও উল্লেখযোগ্য পত্রপত্রিকা এখনও পর্যন্ত প্রকাশিত হয়নি। তবে, ইতস্তত কিছু ছোটখাট পত্রিকা বিভিন্ন স্থান থেকে প্রকাশিত হয়। যদিও এগুলির তেমন সাহিত্যিক মূল্য নেই, তবু প্রচেষ্টা হিসেবে অভিনন্দনযোগ্য। লন্ডন থেকে 'ইণ্ডিয়া উইকলি' নামে যে সাপ্তাহিক পত্রিকাটি প্রকাশিত হয়, তা সংবাদ পরিবেশনে বা অন্যান্য দিক থেকে সত্যই উল্লেখযোগ্য। অস্ট্রেলিয়ার মেলবোর্ন থেকে প্রকাশিত হচ্ছে "ইণ্ডিয়ান নাইবারস"। সম্প্রতি প্রকাশিত এই পত্রিকাটিতে কয়েকটি উল্লেখযোগ্য প্রবন্ধ সংকলিত হয়েছে। যাই হোক, যে কয়জন উৎসাহী এ কাজে ব্রতী হয়েছেন, তাঁরা যে সকলের সমর্থন লাভ করবেন, তাতে সন্দেহ নেই।

হিন্দি সমালোচনা সাহিত্য ॥

হিন্দী সাহিত্যে ইদানিং বিভিন্ন প্রবন্ধ গ্রন্থ প্রকাশিত হচ্ছে। এইসব প্রকাশিত প্রবন্ধগুলি সম্বন্ধে একটা বিশেষ বৈশিষ্ট্য হচ্ছে এই যে, এর অধিকাংশ প্রবন্ধই লিখিত হচ্ছে প্রধানতঃ লেখক এবং কবিদের দ্বারা। নৈমচন্দ্র জৈন রচিত "অধুরে সাক্ষাৎকার" গ্রন্থে বিভিন্ন সাহিত্যিকদের সঙ্গে সাক্ষাৎকারের বর্ণনা লিপিবদ্ধ হয়েছে। গিরিজাকুমার মাথুর রচিত "নয়ে কবিতা—সীমাএঁ আউর সম্ভবনাএঁ" গ্রন্থটি এর মধ্যে খুবই বিতর্ক সৃষ্টি করেছে। সকলেই জানেন, আধুনিক হিন্দী কবিতার ইতিহাসে "তার সপ্তক" একটি অভিনব সংযোজন। প্রকৃতপক্ষে এই গ্রন্থটির মাধ্যমেই আধুনিকতার সূত্রপাত হল হিন্দী সাহিত্যে। গ্রন্থটি সম্পাদনা করেছিলেন 'অজ্ঞেয়'। এই "তার সপ্তক"-এর অন্যতম পুরোধা ছিলেন শ্রীগিরিজাকুমার মাথুর ও শ্রীনৈমচন্দ্র জৈন। আলোচ্য গ্রন্থে এঁদের কাব্যমূল্যের উপর যে আলোচনাটি প্রকাশিত হয়েছে, তা সত্যই অনুধাবনের যোগ্য। কবিতার উপর এরকম সমালোচনা গ্রন্থ হিন্দীতে খুব কমই প্রকাশিত হয়েছে বলে অনেকে মনে করেন।

তারাশঙ্কর জয়ন্তী ॥

গত মঙ্গলবার মহাজাতি সদনে তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়ের সপ্ততিতম জন্ম-জয়ন্তী উপলক্ষে একটি সভায় সম্বর্ধনা জানান হয়। সভায় পৌরোহিত্য করেন ডঃ শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় এবং প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন ডঃ রমেশচন্দ্র মজুমদার। অনুষ্ঠানটির উদ্বোধন করেন শ্রীফণিভূষণ চক্রবর্তী।

প্রধান অতিথির ভাষণে ডঃ মজুমদার বলেন, বাংলা সাহিত্যের বিভিন্ন বিভাগের মধ্যে উপন্যাস ও ছোটগল্পই সর্বাধিক জনপ্রিয়। তারাশঙ্কর এই দুই শাখাকেই যেভাবে সমৃদ্ধ করেছেন, তার জন্য বাঙালী মাত্রেই তাঁর কাছে কৃতজ্ঞ থাকবেন। 'জ্ঞানপীঠে'র পক্ষ থেকে শ্রীলক্ষ্মীচাঁদ জৈন তারাশঙ্করের প্রতিভা আলোচনা করে তাঁর প্রতি শ্রদ্ধা নিবেদন করেন। রবীন্দ্রভারতী বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য শ্রীহিরন্ময় বন্দ্যোপাধ্যায় বলেন, শুধু চরিত্রই নয়, ব্যাপক সামাজিকতার দিক দিয়েও তাঁর সাহিত্য অভিনব। ডঃ রমা চৌধুরী সংস্কৃতে একটি স্বরচিত কবিতার মাধ্যমে তারাশঙ্করের প্রতি শ্রদ্ধা নিবেদন করেন। শ্রীরবীন্দ্রলাল সিংহও ভাষণ দেন।

সম্বর্ধনার উত্তরে শ্রীবন্দ্যোপাধ্যায় বলেন, "আমি দীর্ঘ চল্লিশ বৎসর ধরে সাহিত্য সেবা করে চলেছি। কি লিখেছি, তা জানি না। তবে এটুকু বলতে পারি, আমি কখনও রচনায় ফাঁকি দেইনি। এই আমার সান্ত্বনা।"

ইউজিন ও-নিলের নামে ডাকটিকিট ॥

আমেরিকার পোস্ট অ্যান্ড টেলিগ্রাফ সংস্থা কিছুকাল পূর্বে লেখক ও শিল্পী-দের নামে কয়েকটি ডাকটিকিট প্রকাশ করবেন বলে সিদ্ধান্ত করেছিলেন। সম্প্রতি এ'দের উদ্যোগে প্রখ্যাত মার্কিন নাট্যকার ইউজিন ও-নিলের একটি ডাকটিকিট প্রকাশিত হয়েছে। ডাকটিকিটের মাধ্যমে দেশজ সাংস্কৃতিক বহির্বিশ্বে প্রচার করার এই প্রচেষ্টা নতুন না হলেও একজন আধুনিককালের নাট্যকারের নামে ডাক-টিকিট প্রকাশ করার পরিকল্পনাটি সত্যিই অভিনব।

একটি অভিনব চরিত্র ॥

সারহা বার্নহারদৎ এর নাম হয়তো অনেকেরই জানা। এই ফরাসী মহিলা এক অভিনব চরিত্র। সারহার নাম আজও রূপ-কথা হয়ে আছে।

সারহা ফরাসী দেশের মঞ্চাভিনেত্রী। সৌন্দর্য ও শিল্পপ্রীতির জন্য তিনি তৎ-কালীন বহু মনীষার কাছে ঋণী হয়ে আছেন। দীর্ঘ ৬১ বছর সারহা দক্ষ তরুণীর মতো মঞ্চাভিনয় করে গেছেন। তাঁর সৌন্দর্যের জনশ্রুতি তাঁকে ফরাসী দেশে নেপোলিয়ানের মতোই জনপ্রিয় করেছিল।

সারহা অদ্ভুত চরিত্রের। অসম্ভব উচ্ছ্বাসিলত্বী ও ব্যক্তিকেন্দ্রিক, দুঃসাহসী। শরীরে ছিল একধরনের ক্রনিক রোগ তথাপি আত্মশক্ত ও অবারিত আত্মবিশ্বাসে অটল। নিজেকে জাহির করা ও অন্যকে অনায়াসে প্রভাবান্বিত করার এক আদর্শ ক্ষমতা ছিল। তাঁর প্রণয়ী ও রূপাসক্ত গুণমুগ্ধের সংখ্যা ছিল অনেক। তবে লেখক ও শিল্পী সম্প্র-দায়ই ছিল সর্বতোভাবে তাঁর রূপমুগ্ধ। কেননা সারহারও ব্যক্তিগত রুচি ছিল সাহিত্য ও শিল্পকর্মের প্রতি। ভিকটর হুগো, এমিল জোলা, আলেকজান্দার ডুমা, গামবেত্তা, গুস্তাভ ফ্লবেয়ার, লুই পাস্তুর, হেনরি আরভিং, অস্কার ওয়াইল্ড, ওয়েলস-এর রাজপুত্র প্রভৃতি তাঁর গুণমুগ্ধদের মধ্যে অন্যতম। হুগোর 'হারনানি' নাটকের দোল-সোল চরিত্রে অভিনয় দেখে হুগো তাঁকে চিঠির মাধ্যমে প্রণয় জানিয়েছিলেন, 'তুমি মহৎ এবং সৌন্দর্যের শ্রেষ্ঠা, আমার মতো বৃদ্ধ যোদ্ধাকে তুমি চঞ্চল করেছ, আমার চোখের জল রাখলাম তোমার পায়ের পাতায়।' লণ্ডনে তাঁর প্রথম আবির্ভাবে ফোকস্টোনের সিঁড়িতে অস্কার ওয়াইল্ড একগুচ্ছ সাদা লিলিফুল ছড়িয়ে রেখেছিলেন যাতে সারহা হেঁটে যেতে একটুও ব্যথা না পান। এমিল জোলার বিখ্যাত বই 'ন্যাকুইজ' তিনি রচনা করেন তারই প্রেরণায়। ম্যাক্স বিয়ারবহম্ হ্যামলেট চরিত্রে সারহাকে অবতীর্ণ হতে দেখে বলেছিলেন 'হ্যামলেট, প্রিন্সেস অব ডেনমার্ক'।

এই সব ঘটনা ও ইতিহাসকে অত্যন্ত সংবেদনশীল ও আন্তরিকতার সাহায্যে বর্ণনা করেছেন কর্নেলিয়া ওটিস্ স্কিনার তাঁর 'ম্যাডাম সারহা' গ্রন্থে। এছাড়া, সারহার অপূর্ব কণ্ঠস্বর, বয়স না মানা সৌন্দর্য, ও বিশ্বযুদ্ধের সময় সৈনদের উৎসাহিত করার জন্য যুদ্ধের বিপদসীমায় গমনাগমন ইত্যাদি ঘটনা, সারহার মানব ও স্বদেশপ্রীতির পরিচয়ও বইটির আরেক সম্পদ।

মানুষের ইতিহাস ॥

ডঃ কার্লটন এস, কুন হচ্ছেন আমে-রিকার একজন প্রখ্যাত নৃতত্ত্ববিদ। সম্প্রতি বেরিয়েছে তাঁর 'দি লিভিং রেসেস্ অব্ ম্যান্' নামক একটি বই। এতে নানাসূত্রে ও স্বীয় উপলব্ধিবলে মানুষে মানুষে জাতিগত ও আকৃতিগত বিভিন্নতার জন্য তিনি দায়ী করেছেন প্রকৃতিকে। প্রাকৃতিক পরিবেশের জন্যই যে মঙ্গোলীয়, ককেশীয়, বা আমেরিকান, ইউরোপীয়, এশীয় ইত্যাদি জাতিবিভাগগুলির উদ্ভব হয়েছে তিনি তার তথ্যসমৃদ্ধ বর্ণনা করেছেন। কিন্তু মানুষের আসল পরিচয় হচ্ছে মানুষ হিসেবে। তাই সমগ্র মানবজাতির উত্থানকে তিনি বলেছেন জুলজিক্যাল কনসেপ্ট। প্রায় ৫০০ পৃষ্ঠার এই গ্রন্থটিতে ডঃ কুন মানবজাতির উত্থান, জনসংখ্যা, গোষ্ঠিগত বিভাগ, রক্তের সম্পর্ক, আকৃতিগত বৈষম্য প্রভৃতি বিষয় পৃথিবীর নানাপ্রকার ভৌগোলিক জটিলতা ও পরিবর্তনশীল জল-বায়ুর পরিপ্রেক্ষিতে আলোচনা করেছেন। ভৌগোলিক ও জলবায়ুর প্রভাবকে প্রমাণ-সাপেক্ষ নজির হিসেবে দেখাতে গিয়ে বইটিতে বহুমূল্যোবান মানচিত্র সংযোজিত হয়েছে। ইতিপূর্বে তাঁর 'দি অরিজিন অব্ রেসেস্' বইটিতে মানবজাতির উত্থান ও ক্রমবিকাশের ইতিহাস অত্যন্ত নিপুণভাবে বর্ণিত হয়েছে। আলোচ্য বইটি তারই পরিপূরক ও অগ্রবর্তী অধ্যায়ের ইতিহাস।

জন আপডাইকের সংবর্ধনা ॥

জন আপডাইক হালের মার্কিন সাহিত্যে একটি উজ্জ্বল নাম। বয়সে তরুণ হলেও আপডাইক কৃতবিদ্য ঔপন্যাসিক ও ছোটগল্পকার হিসেবে ইতিমধ্যেই কৃতিত্ব অর্জন করেছেন। তাঁর 'দি মিউজিক স্কুল' যেমন একদিকে তাঁকে দিয়েছে অশেষ জন-প্রিয়তা তেমনই উক্ত বইটি ছিল গতবছরের অন্যতম বেস্ট সেলার। সম্প্রতি আমেরিকার 'ইন্সস্টিটিউট ফর দি কালচারাল ফ্রীডম' সংস্থা জন আপডাইককে উপন্যাস রচনায় তাঁর অশেষ কৃতিত্বের জন্য সম্বর্ধনা জানান। এই সম্বর্ধনা অনুষ্ঠানে আমেরিকার বহু তরুণ কবি ও ঔপন্যাসিক উপস্থিত ছিলেন। এ'দের মধ্যে হ্যারল্ড রবিন্স, বার্থ লিলি, ডরোথি কার এবং বিদগ্ধ সমালোচক এডমান্ড উইলসনের নাম বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য।

লরেন্স ডারেল-এর প্রথম নাটক ॥

প্রধানত, কবি এবং কাব্যসমালোচক হিসেবেই লরেন্স ডারেল সমধিক খ্যাত। হালে তিনি একটি নাটক লিখেছেন। লক্ষ-"স্যাফো"। স্যাফো হচ্ছেন প্রখ্যাত গ্রীক মহিলা কবি। স্যাফোর গীতিকবিতা সবদেশেই আদৃত। কিন্তু স্যাফোর কবিকর্ম সম্পর্কে বহু তথ্য আমাদের জানা থাকলেও তাঁর জীবনী সম্পর্কে তেমন কিছু জানা যায় না। লরেন্স ডারেলের নাটকটির প্রতিপাদ্য স্যাফোর নাটকীয় জীবন। অর্থাৎ স্যাফোর প্রেমিকবর্গ, মদ্যাসক্তি ও রাজ-নৈতিক চক্রান্ত ইত্যাদি ঘটনা ও সংঘর্ষময় অতীতকে নিয়ে তাঁর নাট্যবস্তু আবর্তিত। যুদ্ধ এই নাটকটির আরেকটি প্রধান পট-ভূমি। তাতে অংশ নিয়েছে প্রাচীন গ্রীসের অপরাপর প্রদেশগুলি। নাট্যকার ডারেল ইতিহাসের তথ্যগুলিকে সঠিক প্রয়োগ করে অত্যন্ত যত্নসহকারে চরিত্র ও সংলাপ সংযোজন করেছেন। বলা বাহুল্য নাটকটি কবিতায় লেখা। ছন্দচাতুর্যে আছে পরীক্ষা-নিরীক্ষা। ভূমিকম্পের দৃশ্য ও লেসবস্ শহরের পতনের অংশটি স্মরণীয় ও কবিত্বময়। নাটক হিসেবে 'স্যাফো' অত্যন্ত অনাবশ্যক দীর্ঘ এবং দক্ষ, কিন্তু প্রাণহীন কল্পনা।

চেক-সাহিত্যে বিদেশী প্রভাব ॥

ভেরা ব্ল্যাকওয়েল সম্প্রতি চেক-সাহিত্যে বিদেশী প্রভাব সম্পর্কে কিছু নতুন আলোকপাত করেছেন। হালের চেক-সাহিত্যে এর প্রভাবের কারণ অনুসন্ধান করতে গিয়ে তিনি বলেন যে, চেক-তরুণ-দের মধ্যে ইউরোপের অন্যান্য সাহিত্যের সঙ্গে পরিচিত হয়ে ভাব বিনিময়ের মাধ্যমে নতুন রীতিতে লিখবার প্রবণতা দেখা দিয়েছিল প্রধানত দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পরে। পঞ্চাশের গোড়ার দিকে চেক-তরুণ লেখকদের নীরবতার একটি কারণ ছিল নিভৃত সাধনা। ষাটের দশকের সূচনা থেকে ভাবধারায় যে তীব্র গতিবেগ চেক-সাহিত্যকে প্লাবিত করেছে তা পঞ্চাশের লেখকদের আত্মপ্রকাশকেই সপ্রমাণ করে। এ সময়ে পঞ্চাশের লেখকরা ছাড়া চল্লিশের অনেক প্রতিভারও পুনর্জাগরণ ঘটেছে। এই নতুন চাঞ্চল্য ও প্রাণবেগের অন্যতম কারণ বিদেশী সাহিত্যের অনুসরণ। ব্ল্যাকওয়েল এই অনুসরণকে সমধর্মী চিন্তাধারার অগ্র-গতির লক্ষণ বলেও অভিহিত করেছেন।

ভ্যাকল্যাভ হ্যাভেলএর নাটক 'দি গার্ডেন পার্টি' আয়েনেস্কোর কথা মনে পড়ায়, যোসেফ্ স্কভরেকির উপন্যাস 'দি কাওয়ার্ডস' সেলিঞ্জারের নাম মনে আনে, জ্দেনেক ম্যাহ্লারের নাটক 'দি মিল' মনে পড়ায় পিটার ওয়েস্কে, ভেরা লিনহার-টোভার উপন্যাসের সঙ্গে অ্যালেন রোবে-গ্রিলের সমধর্মিতা অনায়াসেই খ্ঁজে পাওয়া যায়। এছাড়া যেসব লেখকের প্রভাব প্রধানত স্থায়ী ছিল তাঁদের মধ্যে কবিতায় ওয়াল্ট হ্ইটম্যান, এডগার লি মস্টার্স, কার্ল স্যাণ্ডবার্গ প্রভৃতি, গদ্যশাখায় উই-লিয়াম ফক্নার এবং হেমিংওয়ে। এইসব লেখকরা চেক্ভাষায় অন্বাদের মাধ্যমে এবং গ্র্প ৪২-এর সহযোগে এদেশে বিশেষভাবে পরিচিত হয়ে উঠেছেন। তবে মার্কিন সাহিত্য এখানে ব্যাপক প্রসারলাভ করলেও ফরাসী সাহিত্যের কদর ইদানীং বেশ কমে গেছে। ভ্যাকল্যাভ সার্ণির অন্বাদ কর্মের মাধ্যমে ফরাসী অস্তিত্ববাদ একসময় খ্ব জনপ্রিয় হয়ে উঠলেও হালের চেকতর্ণদের তার প্রতি আর কোন আগ্রহ নেই।

একগ্চ্ছ উজ্জ্বল রচনা ॥

র‍্যাল্ফ্ এলিসন-এর নাম সকলেরই জানা। একটিমাত্র বইয়ের নামেই পাঠকদের যিনি দ্ষ্টি কাড়তে পারেন—'দি ইনভিজি-বল ম্যান'-এর প্রণেতা তিনিই। দীর্ঘকাল নিঃশব্দ থাকার পর সম্প্রতি তাঁর কয়েকটি মননশীল প্রবন্ধের সংকলিত বই বেরিয়েছে। নাম 'শ্যাডো অ্যান্ড অ্যাক্ট'। নিগ্রো সঙ্গীতের প্রকাশভঙ্গী, নিগ্রো-আমেরিকান য্ক্ত সংস্কৃতি প্রভৃতি রচনাগ্লি উল্লেখযোগ্য। প্রকাশ করেছেন 'সেকার অ্যান্ড ওয়ারবার্গ' সংস্থা। দাম ৪২ শিলিং।

টি এস এলিয়ট ॥

কবি এলিয়টের ব্যক্তিগত জীবনের অনেক জ্ঞাতব্য ও গ্র্ত্বপূর্ণ পরিচয় কয়েক-জন প্রখ্যাত সাক্ষাৎকারীর ব্যক্তিগত উপলব্ধি ও সওয়াল জবাবের অভিব্যক্তিতে উজ্জ্বল হয়ে এতোকাল ছিল চোখের আড়ালে। অ্যালেন টেট্ স্বীয় প্রচেষ্টায় এই সব সাক্ষাৎকারীদের সঙ্গে যোগাযোগ করে উক্ত পরিচয়-স্ত্রগ্লোকে একত্র করে 'টি, এস্, এলিয়ট' এই শিরো-নামায় একটি ম্ল্যবান গ্রন্থ সম্পাদনা করেছেন। বইটি একদিকে যেমন কবি এলি-য়টের বিষয়ে অনেক তথ্য জানতে উৎসাহিত করে তেমনি এর একটি সাহিত্যম্ল্যও আছে।

প্রধানত, এলিয়টের সঙ্গে প্রথম সাক্ষা-তের অভিজ্ঞতা, মান্ষ এলিয়ট এবং কবি এলিয়ট,—এই বিষয়গ্লিই বিভিন্ন প্রবক্তার ব্যক্তিগত রচনাগ্লির মাধ্যমে পরিস্ফ্ট হয়ে উঠেছে। তবে এলিয়ট বিষয়ে প্রথম উক্তিতেই কিছ্ বলতে যাওয়ার বিনয়স্লভ ভয় অনেকেরই আলোচনায় লক্ষ্য করা গেছে। যেমন হাবার্ট রীড—এলিয়টের ধর্মবিশ্বাস ও কবিত্বের দ্বন্দ্বে শিল্পবিচারের প্রতি যতোটা মনোযোগী ততটাই শঙ্কিত ধর্মবিষয়ে তাঁর উপলব্ধির সমালোচনায়। স্টিফেন স্পেন্ডার লিখেছেন : 'মান্ষ হিসাবে তিনি উচ্চবংশীয়, বিদ্রূপকারী, দৃঢ়চেতা কিন্তু বন্ধ্র মতো, যদিও তাঁর বন্ধ্ত্বে থাকে একটি পর্দা।' গত দশ বছরের ব্যক্তিগত জীবন ও তাঁর কাব্য-ভাবনায় প্নর্ম্ল্যায়ণের সংহতিস্চক স্পেন্ডারের মন্তব্যটিও গ্র্ত্বপূর্ণ। আই-এ-রিচার্ডস্ তাঁর রাজনৈতিক বিশ্বাস ও মান্ষ এলিয়ট সম্পর্কে আলোচনা করতে গিয়ে উক্তি করেছেন : 'এ ম্যান অব কম্প্লিট ইনটি-গ্রিটি।' ফ্র্যাঙ্ক মোরলে এলিয়ট ও তাঁর ছোটবেলার স্ম্তি গল্পকারে বলেছেন। মার্টিন ব্রাউন মঞ্চ ও থিয়েটারের সঙ্গে এলিয়টের সম্পর্কের বর্ণনা করেছেন। হেলেন গার্ডনারের বিষয় 'হাস্যরসিক এলিয়ট'। এ ছাড়া ফ্রাঙ্ক কারমোড, জন ক্র্ র‍্যানসম্, কন-রাড্ আইকেন প্রভৃতির আলোচনাও উল্লেখ-যোগ্য। ভারতবর্ষের বি, রাজন এলিয়টের 'এন্লাইটেন্ড মিস্টিফিকেশান' বিষয়ে মনন-শীল আলোচনার স্ত্রপাত করেন। অ্যালেন টেট্-এর এই সময়োপযোগী বইটির জন্য তিনি সবার কৃতজ্ঞতাভাজন হবেন তাতে কোন সন্দেহ নেই।

কবি কার্ল স্যাণ্ডবার্গ

কার্ল স্যান্ডবার্গ মারা গেছেন। মাত্র চার বছর আগেও বেরিয়েছিল তাঁর হানি অ্যান্ড সল্ট কাব্যগ্রন্থ। এতে আছে ৭৭টি জীবন ম্ত্যু ও প্রেম সম্পর্কে বলিষ্ঠ ও ভাবগম্ভীর কবিতা। শতাব্দীর শ্র্ থেকে আজ পর্যন্ত এই বর্ষীয়ান কবি অনেক লেখাই লিখেছেন, অনেক গানই গেয়েছেন। কিন্তু আজ সেই ম্খর কবির কন্ঠ নীরব। কনিমেরা ফার্মের শান্তপল্লী পরিবেশে তাঁর দিন কাটানোর পালা শেষ হয়েছে। জীবনের ধ্সর সন্ধ্যার দিকে চেয়ে চেয়ে কাটানো দিনগ্লো শেষ হোল।

আজও হয়তো অনেকের কানেই বাজে গীটার হাতে পল্লীসঙ্গীত শিল্পীর বৈরাগী কন্ঠের স্র। তবে স্যান্ডবার্গ কেবল গাইয়ে নন, এবং বাজিয়েও নন তিনি বিখ্যাত জীবনীকার, সাংবাদিক, উপন্যাসিক, টেলিভিশনের ব্যাখ্যাকার এবং সকলের উপরে তিনি কবি। আমেরিকার সাহিত্য জগতের শ্রেষ্ঠ সম্মান প্লিৎসার প্রস্কার তিনি কবি হিসাবে যেমন পেয়ে-ছেন তেমনি শ্রেষ্ঠ জীবনীকার হিসাবেও এই প্রস্কার দিয়ে তাঁকে সম্বর্ধিত করা হয়। ১৯৫৯ সালে 'কম্প্লিট পোয়েমস' নামে কাব্য সঞ্চয়নের জন্য এবং ১৯৪০ সালে কয়েক খণ্ডে সমাপ্ত মহানম্ক্তিদাতা লিঙ্কানের জীবনীর জন্য তিনি এই প্রস্কার লাভ করেন।

স্যান্ডবার্গ জন্মেছিলেন স্ইডিশ পিতামাতার ঘরে। তারপর প্রতিক্ল পরি-বেশের সঙ্গে সংগ্রাম করে জীবনের পথে এগিয়ে গিয়েছেন। সে জীবন কত বাঁক নিয়েছে। সেই বালক ও তর্ণ কবি খেতে-খামারে কাজ করেছেন, গাড়ী চালিয়েছেন, রাজমিস্ত্রীর কাজ করেছেন—হোটেলে, রেস্তোরায় বাসনকোশন ধোয়ার কাজ করেছেন। এই সকল কাজের মাধ্যমে জীবনোপায় করেছেন, শিক্ষার পথেও এগিয়ে গিয়েছেন। কলেজীয় শিক্ষাও তিনি গ্রহণ করেছিলেন। তারপরে ঝ্ঁকে ছিলেন সাংবাদিকতার দিকে। কিছ্কাল 'শিকাগো ডেলী নিউজে' অন্যতম সম্পাদক হিসাবেও কাজ করেছিলেন।

তাঁর কাব্য এই বিচিত্র জীবনের বিচিত্র অভিজ্ঞতারই ফসল। সাধারণ মান্ষের জীবনের সরিক এই কবির কাব্য এজন্যই এদের জীবনের উত্তাপে সঞ্জীবিত। সাধারণ মান্ষের স্খ দ্ঃখ, আশা নিরাশা তাঁর কাব্যের প্রধান বিষয় বস্তু। সহজ সবল মান্ষের মতই তাঁর কাব্যের ভাষা ও ছন্দ সহজ আড়ম্বর বর্জিত। ১৯০৪ সালে তাঁর প্রথম কাব্যগ্রন্থ প্রকাশিত হয়। এটি ছিল একটি সামান্য প্স্তিকা। সেই অনামী অখ্যাত তর্ণ কবির কাব্যখানি কাব্য জগতে সামান্য তরঙ্গও স্ষ্টি করেনি। তখন পোয়েট্রি নামে সাময়িক পত্রিকাখানি আমে-রিকার বিদগ্ধ পাঠক মহলে খ্বই সমাদৃত। বিশ্বের বহ্ বিখ্যাত কবির কাব্য এই পত্রিকায় প্রকাশিত হয়েছে। এই পত্রিকাখানি স্ধী জনসমাজে তাঁদের তুলে ধরেছে। ১৯১৪ সালের প্র্বে স্যাণ্ডবার্গের কোন কবিতাই ঐ সাময়িক পত্রিকায় প্রকাশিত হয়নি। ঐ সময়ের পর থেকে অবশ্য তাঁর বহ্ কবিতা ঐ পত্রিকায় প্রকাশিত হতে থাকে। "শিকাগো" শীর্ষক কবিতাটিও তখনই প্রকাশিত হয়। এর দ্বছর পরে শিকাগো পোয়েমস নামে তাঁর কাব্য সঞ্চয়নও প্রকাশিত হয়। শিকাগো শীর্ষক কবিতাটিও ঐ গ্রন্থের অন্তর্ভুক্ত হয়। এই গ্রন্থখানিও এই ছোট্ট মান্ষটির কাব্য মঞ্জ্ষা বিশ্বের দরবারে এনে হাজির করে, খ্যাতির জয়মাল্য এনে দেয়।

তখন গতান্গতিকতা বর্জিত সহজ চলতি ভাষায় গতি ছন্দে রচিত এই কাব্য পাঠ করে অনেকে যেমন প্রশংসায় ম্খর হয়ে উঠেছিলেন তেমনি র্ঢ় বাস্তবের র্পায়ণে তাঁর অসংস্কৃত ভাষায় অনেকে আঘাতও পেয়েছিলেন। যেমন শিকাগো শীর্ষক কবিতায় ঐ সহরটির বর্ণনা প্রসঙ্গে তিনি লিখেছেন : এই সহরটি হচ্ছে 'হগ ব্চার ফর দি ওয়ার্লড'। এজন্য যেমন তাঁর বিদ্রূপ ও বির্দ্ধ সমালোচনার সম্ম্খীন হতে হয়েছিল তেমনি শিকাগো অঞ্চলের লেখকবর্গের মধ্যে তিনি প্রধান লেখক ও সাহিত্যিক মহলের স্বীকৃতিও পেয়েছিলেন।

কারণ বৃদ্ধতার অন্তরালে ছিল প্রতিদিনের জীবনের সৌন্দর্য উপলব্ধি করার মতো একটি সংবেদনশীল মন, আর মানুষের ভবিষ্যৎ সম্পর্কে একটা সুদৃঢ় প্রত্যয়। উজ্জ্বল ভবিষ্যৎ সম্পর্কে প্রচণ্ড আস্থাবান এই কবির কাব্যের পেয়ালা প্রতিদিনের "জীবনের মাধুর্যের সঞ্চয়ে ভরে উঠেছে। প্রতিফলিত হয়েছে প্রেয়ীর সীমাহীন প্রান্তরের রৌদ্রের উজ্জ্বলতা আর ক্ষুদ্র জীবনের কত কাহিনী। ভবিষ্যৎ সম্পর্কে দৃঢ় প্রত্যয়ের আভাস পাওয়া যায় প্রেয়ী শীর্ষক কবিতায়। কবি লিখছেন :

আমি বলে যাই

নূতন মানুষ আর সহরের কথা।
পুরোনো দিন
আর অতীত তো ছাই হয়ে গেছে,
গতকাল চলে গেছে
দমকা হাওয়ার মতো,
অস্তাচলে ডুবে গেছে সূর্যের মতন।
আমি তোমাদের বলি :
এই পৃথিবীতে কিছু নেই,
না অতীত, না বর্তমান।
আছে শুধু অন্তহীন,
আগামীকালের পারাবার,
আছে শুধু আগামীকালের মহাকাশ।
যারা ধান ভানে, খেটে খায়—
তাদেরই সরিক আমি।
সন্ধ্যা নেমে এলে তারা বলে :
সুদিনের পাবো দেখা, কাল সুপ্রভাতে।

ত্রিশটিরও বেশী গ্রন্থ তিনি রচনা করেছেন। এই সকল গ্রন্থের মধ্যে আছে কমপ্লিট পোয়েমস ১৯৩৬ সালে প্রকাশিত 'দি পিপল ইয়েস' নামে একটি সংকলন, পল্লী-সঙ্গীত, শিশুদের জন্য রচিত গল্পলহরী, তাঁর ছেলেবেলার কাহিনী—'অল ওয়েজ দি ইয়ং স্ট্রেঞ্জার', লিঙ্কনের প্রখ্যাত জীবনী এবং 'রিম্যামব্রান্স রক' নামে একটি উপন্যাস।

"কমপ্লিট পোয়েমস"এর জন্য তাঁকে পুলিৎসার পুরস্কার দিয়ে সম্মানিত করা হলেও মিসেস স্যান্ডবার্গ কবির 'দি পিপল ইয়েস' নামে গ্রন্থটিকেই শ্রেষ্ঠ রচনা বলে গণ্য করেন। বিখ্যাত সাহিত্য সমালোচক থর্প বলেন, 'এই সংকলনে আমেরিকার যেমন একটি সামগ্রিক পরিচয় পাওয়া যায় এমন পরিচয় আর কোন গ্রন্থেই পাওয়া যায় না।

সহর থেকে অনেক দূরে কনেমারায় খামারে এসে কবি বাসা বেঁধেছিলেন। সঙ্গে মিসেস স্যান্ডবার্গই তার সুদীর্ঘ জীবনের সঙ্গী। ১৯৬৫ সালে গুরুতর অসুস্থ হওয়ার পর কবি কারো সঙ্গে দেখা সাক্ষাৎ করতেন না। একটি মেয়ে থাকত তাদের কাছাকাছি। সেই বৃদ্ধ পিতা-মাতার অনেকখানি সেবা করেছে। দুপুরের খাবার পর বাবার চিঠি-পত্রের উত্তর লিখে দিত, দেখাশোনা করত।

স্বাধীনতা সংগ্রামের ইতিহাস নতুন তথ্য

ভারতে ১৮৫৭ খৃঃ প্রথম স্বাধীনতা সংগ্রামের সূচনা। আন্দোলন দমিত হলেও বৃটিশশক্তি সচকিত হোল। বেশ কিছুকাল পরে কলকাতায় প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল ব্রিটিশ ইন্ডিয়ান অ্যাসোসিয়েশন। ১৮৮৫ খৃঃ প্রতিষ্ঠিত হয় ইন্ডিয়ান ন্যাশনাল কংগ্রেস। ততদিনে জাতীয়তাবাদী আন্দোলন বেশ ধীর এবং আপোষমূলক মনোভাব নিয়ে এগিয়ে চলেছে। ১৯০৪ খৃঃ পর্যন্ত কংগ্রেস ইংরেজ সরকারের করুণার ওপরই নির্ভর করে এসেছে নানা ব্যাপারে। ১৯০৫ খৃঃ ভাইসরয় লর্ড কার্জন যখন দেশের জনগণের বিরোধীতাসত্ত্বেও বঙ্গ-ভঙ্গ করতে এগিয়ে গেলেন তখনই জাতীয় ইতিহাস নতুন পথে অগ্রসর হল।

ব্রিটিশের বিভেদনীতির ফলে ১৯০৬ খৃঃ জন্ম নিল মুশলীম লীগ। কংগ্রেস স্বীকার করে নেয় লীগকে। কিন্তু ভারতীয় বিপ্লবীরা স্বীকার করে নিতে পারেনি।

শক্তি প্রয়োগের সাহায্যে ভারত শাসন করতে চেয়েছিল ইংরেজ। বিপ্লবীরাও বোমা এবং পিস্তল নিয়ে এগিয়ে এল। ১৯০৮ খৃঃ প্রথম বোমা পড়ে মজঃফরপুরে। তারপর ১৯১২ খৃঃ দিল্লীতে ভাইসরয়কে লক্ষ্য করে।

১৯১৪ খৃঃ আরম্ভ হয় প্রথম বিশ্বযুদ্ধ। গান্ধী এবং কংগ্রেস কয়েকটি শাসনতান্ত্রিক সংস্কারের প্রত্যাশায় ইংরেজশক্তির সঙ্গে সহযোগিতা করেন। কিন্তু বিপ্লবীরা জার্মানীর সহযোগিতায় ইংরেজশক্তির ওপর চরম আঘাত হানেন এই সময়ে। কিন্তু যুদ্ধের পর ১৯২১ খৃঃ গান্ধীজির অহিংস ও অসহযোগ আন্দোলন অধিক জনপ্রিয় হয়ে ওঠে। কারণ দুর্বলমানুষের পক্ষে এ ছিল আন্দোলনের একটি শ্রেষ্ঠ মাধ্যম। ১৯৩০, ১৯৩২, ১৯৪২ খৃঃ গণ-আন্দোলন চলে। মাঝে মাঝে পুরোন পদ্ধতিতে আপোষ আলোচনাও চলছিল। অবশেষে ১৯৪৭ খৃঃ এসে হোল দেশবিভাগ ও ক্ষমতা হস্তান্তর।

অগ্নিযুগের রক্তঝরা সংগ্রামময় দিনগুলির এক ঐতিহাসিক বিবরণ তুলে ধরেছেন ভারতের অন্যতম শ্রেষ্ঠ বিপ্লবী শ্রীযোগেশচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, তাঁর সম্প্রতি প্রকাশিত আত্মস্মৃতিমূলক রচনা 'ইন সার্চ অফ ফ্রিডম' গ্রন্থে।' ষাট বৎসর আগে স্বাধীনতা সংগ্রামের যে ভয়ঙ্কর পথে তিনি যাত্রা সুরু করেছিলেন, তারই সুনিপুণ চিত্র বর্তমান গ্রন্থের পাতায় পাতায় ফুটে উঠেছে। বহু চরিত্র বহু ঘটনা—যাদের সম্পর্কে আমাদের অজ্ঞানতার পরিধিই ছিল বিস্তৃত—তারা যেন আজ অনেকটা নিকটেই চলে এসেছেন ভারতে। বৈপ্লবিক কার্যাবলীর আদি ইতিহাস এমনভাবে কোন গ্রন্থে বর্ণনা করা হয়নি সম্ভবত।

১৮৯৫ খৃঃ ঢাকায় শ্রীযোগেশচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের জন্ম। ছাত্রাবস্থাতেই তিনি অনুশীলন সমিতির সঙ্গে যুক্ত হয়েছিলেন। তার পরবর্তী জীবনের ঘটনাপ্রবাহ এইরকম : প্রথমে অনুশীলন সমিতির কুমিল্লা শাখার সভা, পরে গ্রেপ্তার এড়িয়ে কলকাতায় এলেন,

ইন সার্চ অফ ফ্রিডম গ্রন্থের মূলে প্রচ্ছদপটের রেখাচিত্র

পাথুরিয়াঘাটায় গ্রেপ্তার, কিড স্ট্রীটের অত্যাচার, প্রেসিডেন্সী জেল, অনশন ধর্মঘট, রাজশাহী সেন্ট্রাল জেল, প্রথম বিশ্বযুদ্ধকালীন ঘটনা, কংগ্রেসের ভূমিকা, যুদ্ধপরবর্তী অবস্থা এবং ১৯২০ খৃঃ জেল থেকে মুক্তি ; আসামের চা-বাগানে কুলি ধর্মঘট, কুমিল্লায় হাউস অফ লেবরস্ প্রতিষ্ঠা ১৯২২ খৃঃ অভয় আশ্রম প্রতিষ্ঠা ; ১৯২৩ খৃঃ পর্যন্ত তিনি বাংলাদেশের বিপ্লবীদের একজন নেতৃস্থানীয় ব্যক্তি ছিলেন ; তারপর তিনি উত্তর ভারতে চলে যান বিপ্লবীদের তৈরি করা এবং আন্দোলন পরিচালনার জন্য ; তারপর আছে ১৯২৩ খৃঃ পূর্বে উত্তরপ্রদেশের অবস্থা, গোপনে কুমিল্লায় আগমন, এম এন রায়ের সঙ্গে যোগাযোগ, আন্তর্জাতিক কম্যুনিষ্ট আন্দোলনের সম্পর্কে ওয়াকিবহাল, গোপনে পণ্ডীচেরী গমন, ১৯২৪ খৃঃ কলকাতায় গ্রেপ্তার, প্রেসিডেন্সী, বহরমপুর এবং হাজারীবাগ সেন্ট্রাল জেলে দিনগুলি, কাকোড়ী ষড়যন্ত্র মামলায় নেতৃত্বের অভিযোগে অভিযুক্ত, অনশন ধর্মঘট,

কাকোড়ী ষড়যন্ত্রে ধৃত ব্যক্তিরা, উত্তর প্রদেশে কংগ্রেসী মন্ত্রীত্বকালে মুক্তিলাভ, আগ্রা সেণ্ট্রাল জেলে অনশন, লক্ষ্ণৌ সেণ্ট্রাল জেল, নৈনি সেন্ট্রাল জেল, তারপর মুক্তিলাভ ; দিল্লীতে গ্রেপ্তার, মায়ের অসুখ ও মুক্তি, কংগ্রেস সোস্যালিস্ট পার্টিতে যোগদান. ত্রিপুরী কংগ্রেস, লক্ষ্ণৌ সম্মেলন, দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ। কংগ্রেসত্যাগ, রেভুালেশনারি সোস্যালিস্ট পার্টি গঠন ; বিবিধ রাজনৈতিক কার্যাবলী, বিয়াল্লিশের বিপ্লব, পুনরায় গ্রেপ্তার, কংগ্রেস আমলে মুক্তিলাভ, দেশ-বিভাগ, উদ্বাস্তু সংকট প্রভৃতি ভারতীয় ইতিহাসের সুদীর্ঘ পর্যায় নিজের জীবনে যেরূপে দেখা দিয়েছিল তারই তথ্যনিষ্ঠ বিবরণ তুলে ধরেছেন শ্রীচট্টোপাধ্যায়।

বর্তমান গ্রন্থে অনুশীলন সমিতির কর্মপদ্ধতি ও রীতির খুঁটিনাটি বিবরণ পাওয়া যায়। বাংলাদেশে ১৯০২ খৃঃ এই সমিতি ব্যারিস্টার পি মিত্র এবং শ্রীঅরবিন্দ ও অন্যান্যরা তৈরি করেন। বাংলাদেশের বিভিন্ন প্রান্তে সমিতির শাখা প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল। বাংলার বুকে জন্ম নিয়েছিল বহু দুঃসাহসী বিপ্লবী। তারপর প্রতিষ্ঠিত হয় যুগান্তর দল। এই দুটি দলই বাংলা-দেশে বিপ্লবের আগুন জেবলে দিয়েছিল। ক্রমে বাংলাদেশের বাইরেও এদের কাজকর্ম ছড়িয়ে পড়ে। এরা চেয়েছিল ইংরেজকে বিতাড়িত করে পূর্ণ স্বাধীনতা। রাজনৈতিক মুক্তির সঙ্গে সঙ্গে চেয়েছিল আত্মিক মুক্তি।

কাকোড়ী ষড়যন্ত্র মামলার প্রসঙ্গে অনেক গোপনীয় ইতিহাস তুলেধরা হয়েছে। এই বিখ্যাত ঘটনার নেতৃত্ব নিয়েছিলেন শ্রীচট্টো-পাধ্যায়। তিনি ভারতের বিভিন্ন প্রান্তরে জেলে কাটিয়েছেন প্রায় চব্বিশ বৎসর। এর মধ্যে প্রায় আড়াই বৎসর কেটেছিল অনশনে নানান সময়ে। একবার একটানা ১৪২ দিন অনশন করেছিলেন।

যোগেশচন্দ্রের বিপ্লবী জীবনে বহু বিখ্যাত বিপ্লবী তাঁর নিকটসাহচর্যে এসে-ছিলেন। তাঁদের মধ্যে রামপ্রসাদ বিস্‌মিল, রাজেন্দ্রনাথ লাহিড়ী, আসফখল্লা খান, রোশন সিং, চন্দ্রশেখর আজাদ, যতীন্দ্রনাথ দাস, সরদার ভগৎ সিং প্রভৃতির জীবনের নানান উল্লেখযোগ্য মুহূর্ত বর্ণনা করা হয়েছে। শ্রীচট্টোপাধ্যায়ের হাতে গড়া দুজন বিপ্লবী হলেন বটুকৃষ্ণ দত্ত এবং অজয় ঘোষ (কম্যুনিস্ট পার্টির পরলোকগত সেক্রেটারী)।

এই মূল্যবান গ্রন্থখানির ভূমিকায় শ্রীরমেশচন্দ্র মজুমদার লিখেছেন :

"Some of the incidents narrated by Shri Chatterji were hitherto unknown to many, and even many of those that were generally known sometimes appear in an altogether new light on account of the intimate personal knowledge with which he describes them. On the whole, it may be said without hesitation that, as could be expected, Shri Chatterji's book is a valuable addition to the literature on the revolutionary movement in India in the first half of the twentieth century. Those who are anxious t have a clear grasp and significance of that movement for freeing India from the British yoke must make it a point to read this book from the beginning to end.

শ্রীচট্টোপাধ্যায়ের এই গ্রন্থখানি স্বাধীনতা সংগ্রামের ইতিহাসের এক আশ্চর্য দলিল। ঐতিহাসিক, গবেষক, এমন কি সমস্ত শ্রেণীর পাঠক গ্রন্থখানি পাঠে উপকৃত হবেন। গ্রন্থের প্রচ্ছদটি অর্থবহ এবং উল্লেখযোগ্য।

In Se--h of Freedom — by Jogesh Chandra Chatterjee, M.B. Published by P. C. Chatterjee. 6, Mission Row, Calcutta-1. Distributor: Firma K. L. Mukhopadhyay, Calcutta. Price: Rs. 25.

কবিতার অনুবাদ

কবিতার যথার্থ অনুবাদ হয় কিনা, এ প্রশ্ন সুদীর্ঘ দিনের। ষোড়শ শতকের ফরাসী কবি ডু্য ব্যালে বলেছিলেন, কবিতার অনুবাদ হয় না। সাম্প্রতিক কালের রবার্ট ফ্রস্ট পর্যন্ত এই মতেরই অনুসারী। একটি ইতালীয় প্রবাদে বলা হয়েছে, অনুবাদক হচ্ছেন, বিশ্বাসঘাতকের তুল্য। রবীন্দ্রনাথও সুরেন্দ্রনাথ মৈত্রের ব্রাউনিং-এর অনুবাদ পড়ে, তাকে নাবিকবৃত্তির সঙ্গে তুলনা করে-ছিলেন। অন্যত্র এক জায়গায় তিনি বলে-ছিলেন, অনুবাদের মাধ্যমে কবিতাপাঠ যেন এটর্ণীর মাধ্যমে প্রেম করার মতো। কবিতা অনুবাদের ক্ষেত্রে কয়েকটি মৌল সমস্যা রয়েছে বলেই বোধকরি এই বিষয়টি নিয়ে এত মতভেদ। তবু কিন্তু কবিতার অজস্র অনুবাদ হয়েছে, এবং হচ্ছে। অনুবাদ মূলের স্বাদ অনেকখানি ব্যাহত হচ্ছে জেনেও কিন্তু কবিতার অনুবাদ পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে, বিভিন্ন ভাবে হচ্ছে। কেননা এ ছাড়া আর কোনও পথ নেই। বর্তমান পৃথিবী মানুষকে করেছে নিকটতর। পরস্পরকে জানার এবং বোঝার প্রয়োজনীয়তাও উপলব্ধ হচ্ছে ক্রমাগত বেশি করে। এই জানা বা বোঝা কেবলমাত্র রাজনৈতিক দিক দিয়ে কখনই সম্ভব হতে পারে না। বিভিন্ন দেশের সাহিত্য এবং শিল্পের সঙ্গেও পরিচিত হওয়া দরকার। পৃথিবীতে একই ভাষার প্রবর্তন সম্পূর্ণ অবৈজ্ঞানিক। তাই অনু-বাদের প্রয়োজনীয়তা আজকে আরও বেশি করে দেখা দিয়েছে। এছাড়াও অনুবাদ মূল ভাষাকে সমৃদ্ধ করে। এইসব কারণেই সুনীল গঙ্গোপাধ্যায় অনূদিত "অন্য দেশের কবিতা' গ্রন্থটিকে অকুন্ঠ অভিনন্দন জানাতে হয়।

এই গ্রন্থে বিশ শতকের ফরাসী, ইতালী জার্মান, স্প্যানিশ ও রুশ ভাষা থেকে অনু-বাদ করা হয়েছে। কবি হিসেবে অনুবাদক বাংলা কাব্যজগতে প্রতিষ্ঠিত। এই কারণেই অনুবাদগুলিও খুব স্বচ্ছ এবং সুন্দর হয়ে উঠেছে। তবু কয়েকটি অনুবাদ সম্পর্কে প্রশ্ন না তুলে উপায় নেই। মনে হয়, মূল কবিতা থেকে অনুবাদক অনেকখানি দূরে সরে এসেছেন। বলা যেতে পারে, কবিতার অনুবাদে এরকম হয়। কিন্তু অনুবাদ একটি খুব দায়িত্বপূর্ণ কাজও বটে। যিনি করবেন, তাঁকে বেশী সময় এবং পরিশ্রম দিতে হবে। মূলানুগত্যের সঙ্গে মৌলিকদের মিলনেই অনুবাদের সার্থকতা। যেমন গেয়র্গ ট্রাবল-এর কবিতাটির অনুবাদে মূল কবিতার প্রতি আরও আনুগত্য প্রকাশ করা উচিত ছিল। এরকম আরও কয়েকটি উদ্ধৃতি দেওয়া যেতে পারে। কাব্য আন্দোলন এবং কবিতা সম্বন্ধে আলোচনাগুলোও আরও তথ্যসমৃদ্ধ হলে ভাল হতো। কেন জানি না, আলোচনাগুলো যেন একটু পাঠ্য বইয়ের ধার ঘেঁষা হয়ে গেছে। তৎসত্ত্বেও শ্রীগঙ্গোপাধ্যায়কে অকুন্ঠ ধন্যবাদ জানাই। এবং ভবিষ্যতে তিনি বাংলা সাহিত্যকে আরও অনুবাদ গ্রন্থ উপহার দেবেন বলে অনুরোধ জানিয়ে রাখছি। প্রচ্ছদ ও বাঁধাই সুন্দর।

অন্য দেশের কবিতা : সুনীল গঙ্গো-পাধ্যায়। পরিবেশক—সিগনেট বুক শপ, কলকাতা—১২। দাম ছয় টাকা।

তস্য তস্য অথবা সূর্য কাঁদলে সোনা

প্রেমেন্দ্র মিত্র

(পূর্ব প্রকাশিতের পর)

(২)

দশ—'পেসস—দে অরো'র বাজির খেলা। সারা জাহাজে যে সাড়া পড়ে গেছে, তা আর বলবার দরকার নেই।

সালাজার এ-খেলায় থাকতে রাজী হয়নি।

জুয়ার নেশায় কি করতে কি করব কে জানে! শেষে সম্রাটের সোনায় হাত দিয়ে ফেলি যদি! হাল্কা ঠাট্টার সুরে অজুহাত দেখিয়ে সে সরে দাঁড়িয়েছে।

বাকি শুধু অ্যালনসো কিনটেরো। সে স্পষ্টই জানিয়েছে, দশ সোনার পেসো করে বাজি ধরায় মুরোদ তার নেই। তাছাড়া স্পেনে শুধু ঘোড়া কিনতে নয়, সে বিয়েও করতে যাচ্ছে তার প্রেমিকাকে। সুতরাং জুয়ায় ফকির হবার যেমন তার ভয়, আমীর হবারও তেমনি। কথায় বলে জুয়ায় হার মানে প্রেমে জিৎ। তার উল্টোটাও সত্যি। তাই জুয়ায় জিতে সে প্রেমিকাকে হারাতে চায় না।

খেলা তাহলে শুধু সোরাবিয়া আর ঘনরামের মধ্যেই হতে পারে। তাতে আপত্তি আছে কিনা জিজ্ঞাসা করেছে সোরাবিয়া বেশ ঠেস দিয়ে।

না, আছে, আপত্তির ঠিক বিপরীত। জুয়ায় দ্বন্দ্বযুদ্ধই তার পছন্দ।—বলেছেন ঘনরাম।

খেলতে বসার আগে বাধা এসেছে দুদিক থেকে দুবার। খবর পেয়ে প্রথমে ফ্র্যান্সিসক্যান ফাদার ছুটে এসে ধর্মোপদেশ দিয়ে তাদের নিরস্ত করতে চেষ্টা করেছেন। জুয়া যে কত বড় পাপ তা বুঝিয়েছেন।

সোরাবিয়া খানিকক্ষণ সহ্য করে বিরক্ত হয়ে বলেছে, আমরা পাপ না করলে আপনারা উদ্ধার করবেন কাকে?

আমরা উদ্ধার করবার কেউ নই। তৃণাদপি সুনীচ হয়ে বলেছেন পাদ্রীবাবা, উদ্ধার করবার তিনিই মালিক। তবে জ্ঞান-পাপীর উদ্ধার পাওয়া যে বড় কঠিন।

এবার ঘনরাম একটু হেসে বলেছেন—কিন্তু উদ্ধার যিনি করেন, তিনি চোখে কম দেখেন না নিশ্চয়ই।

চোখে কম দেখেন!—পাদ্রীবাবার সঙ্গে আর সবাইও অবাক হয়ে তাকিয়েছে ঘনরামের দিকে।

পাদ্রীমশাই বলেছেন, কথাটা যে বুঝতে পারলাম না বাছা!

না, আমি বলছিলাম—ঘনরাম বুঝিয়ে বলেছেন, চোখে কম না দেখলে তিনি দশ সোনার পেসোও যেমন, এক রুপোর পেসোও তেমনি স্পষ্ট দেখতে পান। সে চাঁদির পেসোর জুয়ার সময় তাঁর হয়ে মাল্লাদের পাপের কথা শোনাতে আপনি কেন আসেননি তাই ভাবছিলাম।

সবাই হেসে উঠেছে। পাদ্রীবাবা ক্ষেপে গিয়ে অন্যমূর্তি ধরে গালাগাল দিয়েছেন—তুই! তুই পাষণ্ড! জার্মানীর সেই শয়তানের দূত নাস্তিকটার চেলা, নিশ্চয়! চিরকাল নরকে পড়ে মরবি!

জার্মানীর শয়তানের দূত মানে অবশ্য মার্টিন লুথার। তাঁর ধর্মের স্বাধীনতার আন্দোলনকে যেকোন ছুতোয় শাপান্ত না করে, দক্ষিণ ইওরোপে তখন এমন ক্যাথলিক নেই।

পাইলট সানসেদো নিজে এসে ন
থামালে পাদ্রীবাবাকে ঠাণ্ডা করা সেদিন শ
হত।

সানসেদোও কিন্তু দুজনকে অত চড়
বাজি ধরে না খেলতে বলেছেন। নাবিক
সৈনিকদের জুয়া খেলতে মানা করা মিথ্যে
তিনি জানেন। জীবন নিয়েই যারা জু
খেলছে তারা দুটো পয়সা লোকসানের ি
পরোয়া করে!

তবে খুব বেশি চড়া দানের জুয়া
বেশীর ভাগ কিছু-না-কিছু কাজি
কেলেংকারী হয়ই। সে-কেলেংকারী রক্ত
রক্তি পর্যন্ত গড়ায়। তাঁর নিজের জাহাজে
সেটা তিনি চান না। বিশেষতঃ কর্টে
যাকে খাতির করে পৌঁছে দেবার নির্দে
দিয়ে চিঠি দিয়েছেন, তার প্রতি সানসেদে
একটা দায়িত্ব আছে।

ঘনরামকেই তাই তিনি অনুরো
করেছেন বাজিটা একটু নামিয়ে ধরতে।

ঘনরাম হেসে বলেছেন, কত নামি
ধরব বলুন! দশ থেকে পাঁচ? ভাগ্য য
বেঁকে দাঁড়ায় তাহলে কাটা যে পড়বার
এক কোপের জায়গায় দু কোপে পড়বে
এই ত! তাতে লাভ কিছু হবে কি?
'কাপিটান' ছুড়ে দেওয়া দস্তানা আমি তু
নিয়েছি। এ-জেদের লড়াইয়ে আমি মা
নোয়াতে রাজী নই।

আমিও নই! গরম হয়ে বলে
সোরাবিয়া।

দশ সোনার পেসো ফী দানে বা
ধরেই খেলা শুরু হয়েছে। এমন খে
দেখবার সুযোগ কালেভদ্রে হয়। মা

জুয়াড়ীরা নিজেদের খেলা ফেলে ঘিরে দাঁড়িয়েছে। পাদ্রীবাবা পর্যন্ত চলে যেতে পারেননি জায়গা ছেড়ে। কাপিতান সান-সেদো অপ্রসন্ন মুখে দুজনের মাঝামাঝি দাঁড়িয়ে থেকেছেন বেশ একটু উদ্বেগ নিয়ে।

সমস্ত মন খেলায় নিবদ্ধ করে থাকলেও এমন কিছুর আভাস ঘনরাম হঠাৎ পেয়েছেন যা সত্যিই তিনি ভাবতে পারেন নি।

তাঁদের চারধারের ভিড় এক দিকে একবার একটু যেন ফাঁক হয়ে গেছে। অমূল্য রেশমী কাপড়ের ভাঁজে ভাঁজে মৃদু ঘর্ষণ লাগার একটা ফিসফিস শব্দ শোনা গেছে। সেই সঙ্গে একটা সুবাসের ঝলক।

সব আদব-কায়দা ভেঙে কে যে একবার উঁকি দিয়ে গেছে অনায়াসে বুঝলেও ঘন-রাম মুখ তোলেন নি।

তখন তিনি হারতে হারতে তাঁর পুঁজির প্রায় তলানিতে গিয়ে ঠেকেছেন। কিন্তু তাঁর মুখ দেখে শুধু চোয়ালের একটু কাঠিন্য ছাড়া আর কিছু ভাবান্তর বোঝবার নেই।

ওদিকে সোরাবিয়ার চোখ মুখ তখন সাফল্যের উল্লাসে জ্বলছে। উদ্ধত দম্ভে সে যেন ফেটেই পড়বে। অবজ্ঞাভরে তাস বাঁটতে বাঁটতে সে বলেছে, আর ক'দান খেলতে চান আমাদের 'ভালিয়েন্তে কাবালিয়েরো'!

ভালিয়েন্তে কাবালিয়েরো অর্থাৎ সাহসী ভদ্রলোক বলে ব্যঙ্গটা এ সময়ে একেবারে বিষাক্ত হুলের মত বিঁধেছে ঘনরামকে।

সাহসের তাঁর অভাব নেই, কিন্তু ভদ্রলোক থাকা আর খানিক বাদে কঠিন হয়ে পড়বে তাঁর পক্ষে বুঝতে পারছেন।

কাবালিয়েরো অর্থাৎ ভদ্রলোকের মান-মর্যাদা ধুলোয় লুটিয়ে পড়ে, যদি জুয়ার দেনা সে শোধ না করে। মনে মনে হিসেব করে ঘনরাম তখন বুঝেছেন যে, আর কয়েকটা দান এমনি তাসের পড়তা পড়লে জমে-ওঠা-দেনা তাঁর পক্ষে শোধ করা সম্ভব হবে না।

কেন যে ভাগ্য তাঁর এত বিপক্ষে তিনি বুঝতে পারছেন না। সোরাবিয়া ভালো খেলোয়াড় এ বিষয়ে সন্দেহ নেই। কিন্তু খেলার দোষে তাঁর নিরবচ্ছিন্ন হার হচ্ছে বলা ঠিক হবে না। আগাগোড়াই খারাপ তাস পাচ্ছেন বলেও নয়। কারণ তাস তিনি মাঝে মাঝে বেশ ভালোই পাচ্ছেন। ভালো করে লক্ষ্য করে তিনি দেখেছেন সোরাবিয়ার তাস দেওয়ার সময়ই তাঁর হাত যে খারাপ পড়ছে এমন নয়। সুতরাং সোরাবিয়ার হাতের কারসাজি বলে সন্দেহ করবার কোন কারণই তিনি পান নি। তাস ভালো-মন্দ দুজনের হাতেই আসছে। শুধু সোরাবিয়া ভালো তাসের বেলা তার লাভ ষোলো আনার ওপর আঠারো আনা নিংড়ে আদায় করে খারাপ তাসের বেলা কেমন যেন পিছলে আগে থাকতে পালিয়ে যাচ্ছে।

একি শুধু তার ভাগ্য না তার সঙ্গে সিনসিসকান পাদ্রীবাবার অভিশাপও কাঁধ মিলিয়েছে!

হারে প্রায় সোরাবিয়ার সমান খুশি যদি কেউ হয়ে থাকেন তাহলে তিনি পাদ্রীবাবা। খেলা শুরুর আগেই তিনি ঘনরামের দিকে প্রায় ভস্ম-করা-দৃষ্টি ফেলছিলেন। ঘন-রামের গো-হারান-হার ক্রমশঃই বাড়বার পর সে দৃষ্টিতে ব্যস্তোরিয়ার পাষণ্ড নাস্তিকের চেলার উপযুক্ত শাস্তিতে ধর্মের জয়ের উল্লাস ফুটে উঠেছে।

অন্য দর্শকেরা কিন্তু তখন স্তব্ধ হয়ে গেছে। কাপিতান সানসেদো সত্যিই শঙ্কিত হয়ে ঘনরামকে এবার খেলায় ক্ষান্ত হতে অনুরোধ করেছেন।

ঠিকই বলেছেন কাপিতান! ঘনরাম স্বীকার করেছেন, লাভ থাকতে থাকতে সেনর সোরাবিয়াকে এবার উঠে পড়ার সুযোগই দেওয়া উচিত।

নিজের বিদ্রূপের উপযুক্ত জবাবের বিছুটির জ্বালায় চিড়বিড়িয়ে উঠেছে সোরা-বিয়া। তার পক্ষে সৌজন্যের আবরণ বজায় রাখাই শক্ত হয়েছে।

দাঁতে দাঁত চিবিয়ে সে বলেছে,—আমায় সুযোগ দেবার জন্যে ব্যস্ত হবেন না। আপনার কতখানি দৌড় তাই দেখিয়ে যান।

তাহলে একটা প্রস্তাব করি সেনর সোরাবিয়া। একটু যেন কৌতুক মুখে ফুটিয়েই ঘনরাম হঠাৎ নিজের হাতের আংটিটা টেবিলের ওপর ফেলে দিয়ে বলেছেন, হারজিতের হিসেব যা লেখা হচ্ছে তা ত খেলার শেষে শোধ হবেই, কিন্তু শুধু ওই লেখালেখির বদলে একবার চাক্ষুষ হারজিতের খেলা হোক। আমার এই আংটি রইল বাজি আপনার হাতের ওই আংটির বিরুদ্ধে। তিন দান খেলায় দু দান যে জিতবে দুটো আংটিই তার।

না, আংটির খেলা খেলতে আমি বসি নি! গর্জে উঠেছে সোরাবিয়া, যা ঠিক হয়েছে আমি সেই দশ পেসোর খেলাই খেলব।

ও দশ পেসোর চেয়ে আংটি খোয়াবার ভয় আপনার তাহলে বেশী সেনর সোরাবিয়া? মিছরির ছুরির মত গলায় বলেছেন ঘনরাম, আপনারটার কথা জানি না, কিন্তু আমার আংটিটার দাম দশ পেন্স—দে-অরো-র অন্ততঃ পাঁচ গুণ। কাপিতান সানসেদো কি আপনার বন্ধু সেনর সালা-জারকেই পরীক্ষা করতে বলতে পারেন।

সানসেদো ঘনরামের মুখের কথা খসতে না খসতেই আংটিটা হাতে তুলে নিয়ে-ছিলেন। ভালো করে পরীক্ষা করে তিনি সালাজারের হাতে তা দিয়ে বলেছেন, আপনিও দেখুন সেনর সালাজার। এ আংটির শুধু পান্নাটারই দাম অন্ততঃ পঞ্চাশ পেসো।

সালাজার কাপিতান সানসেদোর কথায় সম্পূর্ণ সায় দিয়েছে। সায় দেওয়াটা আশ্চর্য কিছু নয়। আংটিটা আজে-বাজে সস্তা কিছু নয় সত্যিই দামী। মেক্সিকো থেকে আসবার সময় ঘনরামকে এই আংটিটিই উপহার দিয়েছিল ডোনা মারিনা। বলেছিল,—তোমাকে নিজের ভাই-এর মতই দেখেছি গানাদা। বোনের এই উপহারটুকু তোমায় নিয়ে যেতেই হবে।

সাত সমুদ্র পারের এই পাতানো বোনের স্নেহের পরিচয়ে সত্যিই সেদিন চোখে জল এসেছিল ঘনরামের।

আজ তারই দেওয়া আংটি বাজি ধরায় সময় মনটা বিদ্রোহ করে উঠেছিল একবার। কিন্তু তারপর নিজেকে বুঝিয়েছিল—এ ছাড়া উপায় নেই বলে।

এদিকে সানসেদো শুধু নয় সমস্ত নাবিকরা পর্যন্ত ঘনরামের পক্ষ নিয়ে তখন আংটির বাজি সোরাবিয়াকে নিয়ে না ধরিয়ে ছাড়বে না।

কাপিতান ত রেগে উঠেই বলেছেন, কিরকম জুয়াড়ী আপনি! জুয়ায় তাল-ঠোকার জবাব দেওয়াই ত কাবালিয়েরো-র লক্ষণ বলে জানি। বিশেষ দান যখন আপনাকে সে জবাব দিয়েছে।

আর নারাজ হওয়া সোরাবিয়ার পক্ষে সম্ভব হয়নি। রাগে ফুলতে ফুলতে সে বাঁ হাতের অনামিকা থেকে আংটিটা খুলে টেবিলের ওপর ছুঁড়ে দিয়েছে।

এ আংটিটাও একেবারে ফেলনা না হলেও ঘনরামের আংটির চেয়ে যে অনেক নিরেশ তা পাশাপাশি দুটো আংটির চেহারা দেখেই নেহাৎ গোলা লোকের কাছেও ধরা পড়বে। সোরাবিয়ার আংটির পাথরটা একটু যা বড়, কিন্তু ঘনরামের আসল পান্নার কাছে তা সস্তা কাঁচের সামিল।

এত হারের পর এ দামী জিনিষটা তার চেয়ে খেলো আংটির বিরুদ্ধে বাজি রাখাটা ঘনরামের আহাম্মকী বলেই মনে হচ্ছিল কাপিতান সানসেদোর। কিন্তু জুয়াড়ীদের মতিগতিই আলাদা। দুই-এ দুই-এ চারের হিসেব মানলে তারা কটা ঘুঁটির চাল কি তাসের পড়তার ওপর তাদের সর্বস্ব জলাঞ্জলি দিতে তৈরী থাকবে কেন?

খেলা এতক্ষণ যথেষ্ট জমেছিল। কিন্তু এইবার যারা দেখছে তাদেরও যেন নিশ্বাস বন্ধ হবার যোগাড় হয়েছে।

তাসের এ প্রিমিয়েরো খেলা পোর্টুগালের আমদানি। অজানা মহাদেশ আবিষ্কারের পর যারা সেখানে যশ আর ঐশ্বর্যের লোভে প্রাণ তুচ্ছ করে যায় তাদের মধ্যে এ খেলার চল তখন দিনদিন বাড়ছে। য়ুকাটানের জঙ্গলে জান দিতে দিতে বেঁচে এসে সেখানকার সমস্ত রোজগার আর লুট এক রাত্রের 'প্রিমিয়েরো'তে উড়িয়ে দিয়েছে এমন জুয়াড়ী কাবালিয়েরো-র তখন অভাব নেই।

মোক্ষম সময়ে তাসের ভেতর দিয়ে ভাগ্য কি মুখ দেখাবে, তার ওপরই এ খেলায় হার জিৎ।

প্রথম খেলা রুদ্ধশ্বাসে দেখতে হয়েছে সবাইকে। এক একটি তাসের টানে ভাগ্য একবার যেন ঘনরাম একবার সোরাবিয়ার দিকে হেলেছে।

শেষপর্যন্ত জয় হয়েছে সোরাবিয়ার।

তারপর দ্বিতীয় খেলা। এ খেলায় হারলেই ডোনা মারিনার উপহারের চরম অপমান ত বটেই শেষ কড়ি দিয়ে জুয়ার দেনা শোধ করে একেবারে ফতুর হতে হবে, ঘনরাম তা বুঝেছেন।

তবু বুকে যেন তাঁর এখন নতুন সাহস আর বিশ্বাসের জোর। ভাগ্য চরম বেইমানী না করলে তিনি আর হারবেন না এ যেন তিনি জানেন।

সত্যিই দ্বিতীয় খেলায় ঘনরামের জিৎ হয়েছে। জিৎ হয়েছে সোরাবিয়ার খেলার ভুলে এইটেই আশ্চর্য ব্যাপার। এতক্ষণের দৃঢ় আত্মপ্রত্যয়ের ভিৎ হঠাৎ যেন তার নড়ে গিয়েছে। অন্যমনা হয়ে চালের ভুল করেছে সে। তাস টেনে আগের মত নির্ভুল আন্দাজে তার দাম বুঝে উল্টে রাখবার সাহস তার হয়নি। পাকা তাসের হাত কাঁচা করে দিয়েছে নিজেই বেশী তাস টেনে।

সোরাবিয়ার হঠাৎ এই পরিবর্তনে অবাক হলেও দর্শকরা যেন তার পরাজয়ে খুশি মনে হয়েছে।

সেটা হয়ত পরাজিতের প্রতি সাধারণের স্বাভাবিক সহানুভূতি, হয়ত সোরাবিয়ার দম্ভ আর আস্ফালনের বিরুদ্ধে আক্রোশ।

এবার তৃতীয় খেলা।

সোরাবিয়ার চোখ দুটো যেন ছুরির ফলা হয়ে ঘনরামকে বিদ্ধ করতে চায়।

ঘনরামের মুখে কিন্তু এবার একটু বিদ্রুপের হাসি।

আপনার আংটিটা খুব পয়া; তাই না সেনর সোরাবিয়া?—সরলতার ভান করে জিজ্ঞাসা করেছেন ঘনরাম।

সোরাবিয়া জবাব না দিয়ে চোখের দৃষ্টিতে ছুরি চালিয়ে তাস টেনেছে।

তাস টেনেছেন ঘনরামও।

দুজনের তাসই উবুড় করে রাখা।

আর তাস টানবেন নাকি সেনর?—বিদ্রুপের সুর ছুঁইয়ে জিজ্ঞাসা করেছেন ঘনরাম।

সোরাবিয়ার মুখচোখ লাল হয়ে উঠেছে তখন। কপালের ওপর একটা শিরা স্পষ্টই দপদপ করে কাঁপছে। একবার ঘনরামের সামনে উপুড় করে রাখা তাসটার দিকে, একবার তাঁর মুখের দিকে চেয়ে কি যেন বোঝবার চেষ্টা করে কিছুতেই সে মনঃস্থির করতে পারেনি।

কি সেনর সোরাবিয়া!—বিঁধিয়ে বলেছেন ঘনরাম—হঠাৎ যেন বড় বেশী সাবধানী হয়ে পড়লেন! আগে ত চটপট দান চুকিয়ে ফেলছিলেন!

নাবিকরাও কেউ কেউ এককথায় হেসে উঠেছে। সেই সঙ্গে তরল জলতরঙ্গের মত একটা মৃদু হাসির ঝংকার শোনা গেছে।

এবার ঘনরাম মুখ তুলে তাকিয়ে দেখেছেন। হ্যাঁ, আর কারুর নয়, হাসিটা, সেনোরা আনারই। এ উত্তেজনার টান কাটাতে না পেরে ডেকে বেড়াবার ছলেই বুধা ঝিকে নিয়ে তাদের আসরের পাশ দিয়ে উঁকি দিয়ে যেতে গিয়ে নিজেকে সে সম্বরণ করতে পারে নি।

সোরাবিয়ার কানেও সে ঝঙ্কার গেছে, তবে মধু নয়, তরল বিষের মত। সেনোরা আনার চকিত দৃষ্টির মুগ্ধতাটুকু কসের ওই অবস্থাতেই তার চেয়ে বেশী কেউ বোধহয় লক্ষ্য করেনি।

কিন্তু আর দ্বিধাভরে হাত গুটিয়ে বসে থাকলে চলল না। মনস্থির এবার করতেই হয়। যা টেনেছে তাই ওপর ভরসা করে শান্ত হয়ে থাকতে সাহস করেনি সোরাবিয়া। প্রায় কম্পিত হাতে একটা তাস টেনেছে।

চেয়ে দেখেছে, ঘনরামের দিকে তার মতলব বোঝবার জন্যে।

ঘনরামের মুখ কিন্তু এখন মুখোস, গাম্ভীর্যের নয়, বিদ্রুপে বাঁকা কৌতুকের। সে মুখোসের তলায় ঘনরামের মনের খবর একেবারে লুকোন।

কি করবেন এবার?—কাপিতান সানসেদো জিজ্ঞাসা করেছেন ঘনরামকে।

কিছুই করব না! সেই মুখোশের মত মুখেই বলেছেন ঘনরাম, যদি চান ত' আমাদের ভালিয়েন্তে কাবালিয়েরো তাঁর প্রাপ্য শেষ তাসটাও টানতে পারেন।

তাই টেনেছে সোরবিয়া দাঁতে দাঁত চেপে। আর দুজনের তাস চিৎ করবার পর দেখা গেছে তাতেই সর্বনাশ হয়ে গেছে সোরাবিয়ার।

ঘনরামের একটিমাত্র টানা তাস বেশ বড়ই ছিল, কিন্তু সোরাবিয়ার প্রথম দুটো তাস মিলে তাকে ছাপিয়ে গিয়েছিল দামে। তিনবারের বার টানা তাসটি টেনেই সোরাবিয়া সে ভালো হাতটা পচিয়ে দিয়েছে।

নাবিকেরা চিৎকার করে উঠেছে আনন্দে। কাপিতান পর্যন্ত নিজের আনন্দটা গোপন করতে পারেন নি। শুধু পাদ্রীবাবাকে পেছন থেকে বেশ একটু জোরে জোরে পা ফেলে চলে যেতে দেখা গেছে। তিনি এতক্ষণ এই পাপের সংস্পর্শে ছিলেন এইটেই আশ্চর্য।

উবুড় করা তাস চিৎ করে ফেলার পর সোরাবিয়া কিছুক্ষণ হতভম্বের মত এক-দৃষ্টে সেগুলোর দিকে চেয়েছিল। নাবিকরা তখন কে কি উল্লাস প্রকাশ করেছে তা বোঝবার মত হুঁসই তার ছিল না।

তারপর ঘনরামকে আংটিগুলো নিজের দিকে টেনে আনতে দেখে গায়ের সমস্ত হিংস্র জ্বালাটা তাসগুলোর ওপরই ঝালিয়ে সেগুলো টেবিলের পর ছুঁড়ে ফেলে সে উঠে পড়তে গেছে।

ওকি! উঠছেন কি সেনর সোরাবিয়া!—কাপিতান সানসেদো তাকে বাধা দিয়ে বলেছেন,—খেলা কি এখনই শেষ নাকি!

উনি বোধহয় আর আমার দৌড় দেখতে চান না!—কাটা ঘায়ে নুনের ছিটের মত চিপটেন কেটেছেন ঘনরাম।

সোরাবিয়াকে মুখখানা কালো করে আবার খেলতে বসতে হয়েছে। নজর তাঁর তখন নিজের আংটিটার দিকেই। ঘনরাম নিজের আংটির সঙ্গে সেটা কাছের দিকে টেনে আনলেও কোনটাই কিন্তু আঙুলে আর পরেন নি।

একটু বেশ অদ্ভুতভাবেই সোরাবিয়ার দিকে চেয়ে থেকে বলেছেন, আপনার আংটির পয়টা না নিয়েই ভাগ্যের চাকা ঘোরে কিনা দেখা যাক্।

তা ভাগ্যের চাকা ধীরে ধীরে সত্যিই ঘুরে গেছে। কাগজে লেখা সোরাবিয়ার লাভের হিসেব নামতে নামতে সত্যিই শূন্যে গিয়ে ঠেকবার পর হঠাৎ ঘনরামই

তাসটা ঠেলে দিয়ে বলেছেন, থাক্, আমাদের পাওনা দেনা কারুর কাছেই কারুর কিছু আর নেই। এইখানেই সুতরাং দাঁড়ি টানা থাক্। শুধু আপনার এই আংটিটা!

ঘনরাম সোরাবিয়ার আংটিটা টেবিল থেকে তুলে নিয়ে যা বলতে যাচ্ছিলেন তা তক্ষুনি আর বলতে পারেন নি। কাপিতান সানসেদো আগেকার খেলা এইভাবে মোড় ঘুরে যাওয়ার পর থেকেই ভুরু কুঁচকে কি যেন ভাবছিলেন। ঘনরাম আংটিটা তুলতেই সেদিকে ব্যস্তভাবে হাত বাড়িয়ে সন্দিগ্ধ স্বরে বলেছেন, দেখি একবার আংটিটা।

ঘনরাম কিন্তু আংটিটা সানসেদোকে দেন নি। হাতটা সরিয়ে নিয়ে হেসে বলেছেন, না কাপিতান, এ আংটির যাদু আর পয় বড় বেশী। আপনার মত লোককেও জুয়ায় টানতে পারে। তার চেয়ে এটিকে সবার নাগালের বাইরে রাখাই ভালো।

ঘনরাম তারপর যা করেছেন সকলে তাতে তাজ্জব! হাঁ হাঁ করে ওঠা সত্ত্বেও ঘনরাম ডেকের ওপর থেকে ছুঁড়ে আংটিটা সমুদ্রের জলে ফেলে দিয়ে সেখান থেকে উঠে চলে গেছেন আর একটি কথাও না বলে।

সোরাবিয়ার মাথা তখন নিজের অজান্তেই বুঝি একটু নিচু হয়ে গেছল। দৃষ্টিটাও কেমন বিমূঢ়। কাপিতান সানসেদো আর সেনর সালাজার নিজেদের মধ্যে দৃষ্টি বিনিময় করে কি যেন বলতে গিয়ে থেমে গেছেন।

নাবিকেরা এ রেষারেষির জুয়া যে যার নিজের মত বুঝে উত্তেজিতভাবে আলোচনা করতে করতে চলে যাবার পর নিজে উঠে পড়ে কাপিতান শুধু বলেছেন,—কাবালিয়েরো কাকে বলে আজ দেখবার সৌভাগ্য হল। কি বলেন সেনর সোরাবিয়া।

সোরাবিয়া কোন জবাব দেয়নি।

আশা করি আজকের কথা কেউ আমরা ভুলব না।—বলে কাপিতান সেনর সালাজারের সঙ্গে চলে গেছেন।

ভুলতে বারণ করেছিলেন কাপিতান সানসেদো।

জাহাজ স্পেনে পৌঁছোবার অনেক আগেই সোরাবিয়া তা ভুলে গেছে।

শুধু ভোলেনি, ঘনরামের বিরুদ্ধে হিংসায় আক্রোশে সে প্রায় ক্ষিপ্ত হয়ে উঠেছে।

তা হলেই বা ক্ষিপ্ত, শুধু সোরাবিয়া ক্ষিপ্ত হয়ে কতখানি ক্ষতি আর করতে পারত ঘনরামের! বড়জোর একদিন খোলা তলোয়ার নিয়ে এ বিরোধের মীমাংসা করতে হত,—তার বেশী কিছু নয়।

কিন্তু ঘনরামের ভাগ্যাকাশের কুগ্রহ তার চরম লাঞ্ছনার জন্যে অনেক বেশী জটীল ফাঁসের রশি তখন গোপনে টানছে।

সেদিন রাত্রে এক সঙ্গে বসে খাওয়ার সময় কাপিতান সানসেদো তাঁর গণনায় সেই ইঙ্গিতই দিয়েছিলেন।

খেতে বসে বিশেষ কিছু ভূমিকা না করে সানসেদো সোজাসুজি সোরাবিয়ার আংটির কথাটা তুলেছিলেন। বলেছিলেন—আংটিটা আমায় দেখতে দিলেন না কেন বলুন ত!

কি আর দেখতেন, ওই একটা সাধারণ আংটিতে! —ঘনরাম প্রসঙ্গটা চাপা দিতে চেয়েছিলেন।

কি দেখতাম! সানসেদো চাপা দিতে না দিয়ে বলেছিলেন, দেখতাম হয়ত, পাথর নয় আংটিটায় একটা ঈষৎ রঙীন আয়নার কাচই কৌশলে বসানো। আংটিটা যার আঙুলে থাকে, তাস বিলোবার সময় চেষ্টা করলে বিলোনো তাস এই কাচের ছায়া থেকে সে চিনে নিতে পারে!

ঘনরাম কাপিতানের দিকে চেয়ে কিছুক্ষণ চুপ করে থেকে বেশ একটু কৌতুকের সুরে বলেছিলেন,—যে আংটি সমুদ্রের জলে ডুবে গেছে তা নিয়ে আর জল্পনা-কল্পনায় লাভ কি কাপিতান! আংটি ডুবলে হয়ত মানুষটা ভাসতে পারে।

এবার কাপিতানও হেসে উঠে বলেছিলেন,—ঠিকই বলেছেন সেনর দাস!

তারপর হঠাৎ ঘনরামের ডান হাতটা টেনে নিয়ে টেবিলের ওপর চিৎ করে রেখে বলেছিলেন,—মাপ করবেন সেনর দাস। মানুষ সম্বন্ধে অন্যায় অশোভন কৌতূহল আমার নেই, কিন্তু দু' একজনকে দেখলে তাদের ভাগ্য জানবার আগ্রহ আমি চাপতে পারি না। আপনার সঙ্গে পরিচয় হবার পর কোনো ব্যক্তিগত প্রশ্ন আমি যে করিনি তা আপনি ভালো করেই জানেন। ও সব বিবরণে আমার প্রয়োজন নেই। আপনাকে দেখা মাত্র কিন্তু আমার মনে হয়েছে আপনার ভাগ্যলিপি অদ্ভুত কিছু হতে বাধ্য। আপনার হাতটা তাই একটু দেখতে চাই।

হাতের রেখার ভাষা আপনি জানেন! ঘনরামের কথায় কৌতূহলের চেয়ে কৌতুকই বেশী প্রকাশ পেয়েছিল।

কিন্তু সানসেদোর প্রথম কথাতেই তিনি চমকে উঠেছিলেন!

যেটুকু পড়তে পারি, মনে করতাম,—বেশ গম্ভীরভাবে বলেছিলেন সানসেদো,—তা ত এখন ভুল মনে হচ্ছে!

তার মানে! —সত্যি কৌতূহলী হয়ে উঠেছিলেন ঘনরাম।

মানে, আমার বিচার ঠিক হলে বুঝতে হয়, যে তিন সমুদ্র পার হয়ে চতুর্থ সমুদ্রও আপনি দেখবেন। সবিস্ময়ে ঘনরামের দিকে চেয়ে বলেছিলেন সানসেদো।

পুরোপুরী না বুঝলেও যেটুকু বুঝেছেন তাতেই ভেতরে ভেতরে চমকে উঠেছিলেন ঘনরাম। মনে মনে তখন তিনি শিশুকালের কালাপানি থেকে আরবসাগর আর তারপর লিসবনে ক্রীতদাস হিসেবে বিক্রী হতে আসার সময় আফ্রিকার উপকূলের সেই অসীম সাগর, পরে যা আতলান্তিক বলে জেনেছেন—তা গুনে ফেলে বিস্মিত হয়ে উঠেছেন সানসেদোর গণনা শক্তিতে। কিন্তু সে বিস্ময় গোপন করে জিজ্ঞাসা করেছিলেন,—এ ত হেঁয়ালির মত শোনাচ্ছে। অর্থ কি এ কথার!

অর্থ আমিও ত জানি না। সরলভাবে স্বীকার করেছিলেন কাপিতান সানসেদো। সমুদ্রে পাড়ি দেওয়া যাদের নিয়তি তাদের হাতে যে চিহ্ন থাকে তাই দেখেই যা বলবার বলেছি।

এ গণনা আপনি শিখলেন কোথায়? বিশেষ আগ্রহভরে জিজ্ঞাসা করেছিলেন ঘনরাম।

শিখেছি আমাদের এসপানিয়াতেই। তবে সুদূর এক দেশের আশ্চর্য এক জ্যোতিষীর কাছে।

সুদূর দেশের আশ্চর্য এক জ্যোতিষী!—ঘনরাম অবাক হয়ে সে দেশের নাম জানতে চেয়েছিলেন।

(ক্রমশঃ)

সংকটের মুখোমুখি

যে-চারটি রাজ্যের মন্ত্রিসভা সমর্থকদের দল বদলা-বদলির ফলে বিপর্যয়ের সম্মুখীন হয়েছিল তাদের ভেতর পশ্চিমবঙ্গ ও বিহার সাময়িকভাবে বিপদকে পাশ কাটিয়ে গেছে। উত্তর প্রদেশ অগ্নিপরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়েছে এবং মধ্যপ্রদেশ শক্তি পরীক্ষার প্রথম দিনে ফাঁড়া এড়িয়ে গেছে। যদিও এই খবর লেখার সময় পর্যন্ত (শনিবার সকাল) বোঝা যাচ্ছে না যে, সেই সাময়িক অস্ত্র সম্বরণ 'নবাবের অনুমতি কাল হবে রণে'র মতো একদিনের জন্য শুধু রণকে বিলম্বিত করেছে কিনা।

পরবর্তী সংবাদে জানা গেছে, মধ্যপ্রদেশে শ্রীমিশ্রের মন্ত্রীসভার পতন ঘটেছে এবং শ্রীগোবিন্দনারায়ণ সিং-এর নেতৃত্বে নতুন মন্ত্রীসভা শপথ গ্রহণ করেছে।

পশ্চিমবঙ্গে কয়েকজন এম-এল-এর যুক্তফ্রন্ট ত্যাগ করে কংগ্রেস দলে যোগদান এবং আরো কিছু সদস্যের সম্ভাব্য দল-ত্যাগের গুজবকে কেন্দ্র করে মন্ত্রিসভার যে আসন্ন বিপর্যয়ের আশংকা অনেকে করছিলেন তা ২০শে জুলাই তারিখে আরো প্রবল হয়ে ওঠে যখন সাধারণ শাসন খাতে বরাদ্দের দাবীর বিরুদ্ধে কংগ্রেসের দুটো ছাঁটাই প্রস্তাব মাত্র ৮ ভোটে বাতিল হয়ে যায়। এর পর এই আশংকা আরো চরমে ওঠে ২৬শে জুলাই যখন এই রকম একটা খবর ছড়িয়ে পড়ে যে খাদ্যমন্ত্রী ডঃ প্রফুল্ল ঘোষ বাম কম্যুনিস্টদের আচরণে ক্ষুব্ধ হয়ে পদত্যাগ পত্র প্রেরণ করেছেন এবং ঐ দিন বিধানসভায় বেলা তিনটার সময় তিনি একটা বিবৃতি দেবেন। কংগ্রেস দল সম্ভাব্য শক্তি-পরীক্ষার জন্য তৈরী হয়েছিল। দলের সকল সদস্যকে হাজির থাকার জন্য পূর্ব থেকেই নির্দেশ দেওয়া হয়েছিল। এবং একজন অসুস্থ থাকায় ইনভ্যালিড্ চেয়ারে করে তাঁকে নিয়ে আসা হয়েছিল। যুক্তফ্রন্টও তাঁদের সব সদস্যরা যাতে হাজির থাকেন এবং ভোট দেন তার জন্য কড়া নজর রেখেছিল। অপরাহ্নে সরকারের খাদ্যনীতির বিরুদ্ধে প্রতিবাদ জানাবার জন্য একটা মিছিলও বিধানসভার গেটে এসেছিল, খাদ্য-মন্ত্রীই যাদের মূল লক্ষ্য হবে বলে অনেকে অনুমান করেছিলেন। কিন্তু শেষ পর্যন্ত জানা গেলো যে এঁরা ডঃ ঘোষের বিরুদ্ধে কোনো শ্লোগান দেন নি। এদিকে বেলা তিনটা বাজল কিন্তু ডঃ ঘোষ কোনো বিবৃতি দিলেন না, এবং কংগ্রেস দলের পক্ষ থেকেও কোনো শক্তি পরীক্ষার উদ্যোগ দেখা গেলো না। এই অ্যান্টি ক্লাইম্যাক্সের অবস্থায়ই বিধানসভার অধিবেশন দিন বারোর জন্য মুলতুবী রয়ে গেল।

ডঃ প্রফুল্ল ঘোষের পদত্যাগের সম্বন্ধেও যে গুজব উঠেছিল তাও রহস্যের অন্তরালেই রয়ে গেল। কারণ তথ্যমন্ত্রী সোমনাথ লাহিড়ী পদত্যাগের গুজব ভিত্তিহীন বলে বর্ণনা করেছেন এবং ডঃ ঘোষও এ সম্পর্কে কিছু বলতে রাজী হন নি।

বিহারেও এই রকমই একটা শক্তি পরীক্ষা ঘনিয়ে এসেছিল ২৬শে তারিখে অর্থপ্রয়োগ বিলের ভোটকে কেন্দ্র করে। কিন্তু জি এম মারান্ডি নামে একজন জন-সংঘ সদস্যকে কংগ্রেসের কোনো সদস্য কর্তৃক আটক রাখার অভিযোগকে কেন্দ্র করে এই দিন বিধানসভায় যে প্রচণ্ড ঝড় ওঠে তাতে সরকার ও বিরোধী পক্ষের সদস্যরা পরস্পর পরস্পরের উক্তির প্রতিবাদ করেন, গালাগালি এবং পাল্টা গালাগালি দেন এবং নাটকের শেষ অধ্যায়ে বিরোধী কংগ্রেস দলের নেতা মহেশপ্রসাদ সিংহ ক্রোধভরে সভাকক্ষ ত্যাগ করেন। ফলে সংকট এলো না, অর্থপ্রয়োগ বিল ফাঁকা মাঠে ওয়াক-ওভারের মতো পাশ হয়ে গেলো এবং একথা বলা যায়, বিপদের কোনো আশংকা যদি থেকেও থাকে, বিহার মন্ত্রিসভা আলগোছে তাকে পাশ কাটিয়ে গেলেন।

উত্তর প্রদেশের চরণ সিং মন্ত্রিসভা যে সংকটের সম্মুখীন হয়েছিলেন তার ভূমিকা রচিত হয়েছিল মুষ্টি ও পাদুকাযোগে, তার আভাস ছিলো অগ্নিগর্ভ অথচ অতি সংক্ষিপ্ত। (বিরোধী কংগ্রেস নেতা চন্দ্রভান গুপ্ত মাত্র নয়টি শব্দে ২৫শে জুলাই অনাস্থা প্রস্তাব উত্থাপন করেন)। আগমন দ্রুত এবং অন্তর্ধানও দ্রুত, যার শেষে চরণ সিং-এর মন্ত্রিসভা বজায় রয়ে গেলেন যাকে ইংরেজীর আক্ষরিক অনুবাদে বলা যায় 'স্বচ্ছন্দ সংখ্যাগরিষ্ঠতায়'। ২৬শে জুলাই উত্তর প্রদেশ বিধানসভায় অনাস্থা প্রস্তাবের আলোচনা শুরু হয়। তার আগের দিন বিধানসভায় সেচ বিভাগের বরাদ্দ নিয়ে আলোচনার কালে আবহাওয়া বেশ উত্তপ্ত হয়ে ওঠে বিরোধী দলের ভোট দাবীকে কেন্দ্র করে। সরকারী দলের একজন সদস্য নাকি নিরপেক্ষ সদস্যদের সমর্থন ভিক্ষায় ঘোরাঘুরি করতে থাকলে কংগ্রেস সদস্যরা তাঁকে ধাক্কা দেন। ফলে, প্রথমে কংগ্রেস ও সংযুক্ত বিধায়ক দলের সদস্যদের মধ্যে কথা কাটাকাটি শুরু হয়। মধ্য খণ্ডে ঘুষো-ঘুষি চলে এবং শেষ খণ্ডে সদস্যরা পরস্পরের প্রতি নিক্ষেপের অভিলাষে জুতো আস্ফালন করতে থাকেন। এর আগের দিন বিরোধী দলের নেতা অনাস্থা প্রস্তাব উত্থাপন করেছিলেন। স্পীকার অতঃপর ঘোষণা করেন যে, পরদিনই অনাস্থা প্রস্তাবের আলোচনা আরম্ভ হবে এবং দুদিন ধরে চলবে। অলোচনার দ্বিতীয় দিনে সন্ধ্যার সময়ে যখন ভোট গৃহীত হয় তখন দেখা যায় যে, প্রস্তাবের পক্ষে ২০০ ভোট পড়েছে এবং বিপক্ষে ২২০ ভোট। এইদিনও বিধানসভার দুজন সদস্য দলীয় আনুগত্য বদল করে দিক পরিবর্তন করেন। একজন ফিরে আসেন জন-কংগ্রেস থেকে কংগ্রেসে। অপর জন পূর্বে এসেছিলেন রিপাবলিকান পার্টি থেকে কংগ্রেসে এবং এইদিন আবার দল বদলে আসেন জন-কংগ্রেসে।

মধ্যপ্রদেশে ৩৪ জন-কংগ্রেস সদস্যের ২০শে জুলাই তারিখে বিরোধী দলে যোগ-দানের পর রাজ্যপাল মুখ্যমন্ত্রী ডি পি মিশ্রের পরামর্শে বিধানসভার অধিবেশন অনির্দিষ্ট-কালের জন্য স্থগিত রাখেন। বাজেট আলো-চনার কালে বিধানসভার অধিবেশন এইভাবে স্থগিত রাখার যৌক্তিকতা নিয়ে দেশব্যাপী এক ঘোরতর বিতর্ক দেখা দেয়। গোয়ালিয়-রের রাজমাতা বিজয়া রাজে সিন্ধের নেতৃত্বে বিরোধী দলের পক্ষ থেকে দাবী তোলা হয় যে, বিধানসভার মোট ২৯৬ জন সদস্যের মধ্যে ১৫৭ জন বর্তমানে তাঁদের সমর্থক। কাজেই মন্ত্রিসভা গঠনে তাঁদের সুযোগ দিতে হবে। বিরোধী সদস্যরা তাঁদের এই দাবী আরো জোরদার করার জন্য সকলে মিলে দিল্লীতে যান এবং রাজমাতা রাষ্ট্রপতি ও প্রধানমন্ত্রীর সঙ্গে সাক্ষাৎ করে তাঁদের দাবী আদায়ের জন্য বিশেষভাবে সচেষ্ট হন। অপর পক্ষে মুখ্যমন্ত্রী ডি পি মিশ্র বলেন যে, পদত্যাগের একটা হেস্তনেস্ত করার জন্য তিনি অন্তর্বর্তীকালীন নির্বাচনের পক্ষ-পাতী এবং সংবিধান অনুযায়ী তাঁর এই রকম দাবী করার অধিকার আছে। দিল্লীতে প্রথমে তাঁর এই দাবীর সমর্থন লাভের কিছুটা সম্ভাবনা দেখা দিলেও শেষ পর্যন্ত স্বরাষ্ট্র ও আইন দপ্তরের মধ্যে দাবীর যৌক্তিকতা নিয়ে মতভেদ দেখা দেয়। ফলে, কংগ্রেস হাইকম্যাণ্ড তাঁকে শেষ পর্যন্ত শক্তির বোঝাপড়ার জন্য বিধানসভার সম্মুখীন হওয়ার নির্দেশ দেন। এই নির্দেশ অনুযায়ী রাজ্যপাল ২৮শে জুলাই বিধান-সভার অধিবেশন আহ্বান করেন এবং সকলেরি মনে এইরকম একটা নিশ্চিত ধারণা ছিল যে, এইদিন বাজেটের শিক্ষা খাতের বরাদ্দ নিয়ে যে ভোট হবে তাতে দুপক্ষের শক্তির চূড়ান্ত পরীক্ষা হয়ে যাবে। কিন্তু অধিবেশনের শুরুতেই কংগ্রেস পক্ষ থেকে অভিযোগ ওঠে যে, তাদের পক্ষের প্রভুদয়াল গালোদ নামক একজন সদস্যকে এম-এল-এদের বাসভবন থেকে অপহরণ করে আটকে রাখা হয়েছিল, পরে অবশ্য তিনি আটকের জায়গা থেকে সরে পড়েছেন। এই প্রসঙ্গ নিয়ে উভয় পক্ষে তীব্র বিতর্ক আরম্ভ হলে স্পীকার ঘোষণা করেন যে, তিনি বিষয়টি প্রিভিলেজ কমিটিতে পাঠাচ্ছেন। এবং এর পর অধিবেশন পর দিবসের জন্য মুলতুবী রাখা হয়, যার ফলে, অন্ততঃ এখনকার মতো বলা যায় যে, শক্তির চূড়ান্ত পরীক্ষা হয়তো একদিনের জন্য বিলম্বিত হয়েছে।

বিতর্কিত সফর

ফরাসী রাষ্ট্রপতি দ্য গল সম্প্রতি ক্যানাডা সফরে গেছিলেন। কিন্তু আপাতঃদৃষ্টে যে কারণে তিনি মধ্যপথে সফর ভঙ্গ করে দেশে ফিরে এসেছেন তা তাঁকে শুধু বিদেশে নয়, স্বদেশেও গুরুতর সমালোচনার সম্মুখীন করেছে। ক্যানাডার চল্লিশ লক্ষ ফরাসী অধ্যুষিত কুইবেক প্রদেশে স্বাতন্ত্র্যকামী

ফরাসীরা দীর্ঘকাল ধরে ক্যানাডীয় ফেডারেশন থেকে বেরিয়ে আসার জন্য আন্দোলন করছে। মাতৃভূমি ফ্রান্সের পক্ষে এদের প্রতি সহানুভূতি থাকা অবশ্য অস্বাভাবিক নয়। কিন্তু কোনো দেশের আতিথ্য গ্রহণ করে রাষ্ট্রীয় সফরে এসে এই আন্দোলনে অনকটা প্রকাশ্য উৎসাহদান নিতান্ত দৃষ্টিকটু। দ্য গলকে যখন কুইবেকের সিটি হলে সম্বর্ধনা জানানো হচ্ছিল তখন বিপুল ফরাসী জনতা হলের বহির্ভাগে সমবেত হয়ে ক্যানাডার জাতীয় সংগীতকে ছাপিয়ে দিয়ে ফরাসী সংগীত বাজাতে থাকে এবং 'কুইবেক কুইবেকবাসীদের, স্বাধীন কুইবেক জিন্দাবাদ' প্রভৃতি ধ্বনি করতে থাকে। দ্য গল এর পর হলের অলিন্দে বেরিয়ে আসেন এবং 'স্বাধীন কুইবেক জিন্দাবাদ' ধ্বনি করে জনতার অভিবাদন গ্রহণ করেন। কুইবেক থেকে দা গল ফরাসী ক্যানাডার প্রাচীনতম অঞ্চলের মধ্য দিয়ে ১৮০ মাইল দূরবর্তী মন্ট্রিলে যান। যেখানেই তিনি থেমেছেন সেখানেই তাঁর বক্তৃতার বিষয়বস্তু ছিলো, ফরাসী ক্যানাডিয়ানরা নিজেদের অদৃষ্ট নিয়ন্ত্রণের ক্ষমতা অর্জন করুন। সেন্ট ন্যানে দ্য পেরাদে গ্রামবাসীদের উদ্দেশে তিনি বলেন, তোমরা ফরাসী জনগণের অংশ, ফ্রান্স তোমাদের ভালবাসে।

ফরাসী প্রেসিডেণ্ট অকস্মাৎ কেন যাত্রাভঙ্গ করে স্বদেশে ফিরে এলেন তার কারণ স্পষ্ট নয়। মন্ট্রিলের একখানা সংবাদপত্রে খবর বেরিয়েছিল যে, দ্য গল যখন কুইবেক সিটি হলের অলিন্দে এসে দাঁড়িয়েছিলেন তখন তাঁর অত্যন্ত কাছ দিয়ে একটা রাইফলের গুলী চলে যায়। কিন্তু পুলিশ এই সংবাদের সত্যতা অস্বীকার করেছে। স্বাতন্ত্র্যবাদীদের সমর্থন সত্ত্বেও কানাডা সরকার অটোয়ায় তাঁকে সম্বর্ধনা জানাবার আয়োজন করছিলেন। ক্যানাডার প্রধানমন্ত্রী লেস্টর পিয়ার্সন এক বিবৃতিতে বলেছেন, যেসকল ঘটনার পরিপ্রেক্ষিতে প্রেসিডেন্ট দ্য গল তাঁর সফর বাতিল করেছেন তা সহজেই বোধগম্য, কিন্তু তাতে ক্যানাডা সরকারের কোনো হাত ছিল না। কাজেই শুধু দুঃখ প্রকাশ ছাড়া আমাদের আর কিছু করবার নেই।

প্রকাশ, দ্য গল দেশে ফিরে এসেও ফরাসী মন্ত্রিসভার অন্যান্য সদস্যদের কঠোর সমালোচনার সম্মুখীন হয়েছেন। কেউ কেউ নাকি এরকমও বলেছেন যে, প্রেসিডেন্টের আচরণের কোনো রকম কৈফিয়ৎ খুঁজে পাওয়া যায় না। দ্য গল নাকি তাঁর ন'বছর ব্যাপী শাসনকালের মধ্যে আর কখনো সহকর্মীদের এই রকম নিন্দার সম্মুখীন হন নি।

পরলোকে জাস্টিস দ্বিজেন্দ্রনাথ রায়

এলাহাবাদ হাইকোর্টের ভূতপূর্ব বিচারপতি স্বনামধন্য জাস্টিস দ্বিজেন্দ্রনাথ রায় গত ৯ই মে এলাহাবাদে পরলোকগমন করেছেন। গাজীপুরের তদানীন্তন স্বনামপ্রতিষ্ঠ আইনজীবী যোগেন্দ্রনাথ রায়ের তিনি চতুর্থ পুত্র।

মাত্র তেইশ বছর বয়সে এম-এ, এল-এল-বি, সসম্মানে পাশ করে মুনসেফি গ্রহণ করেন। তারপর ১৯৪৮ খৃঃ—৫৩ খৃঃ পর্যন্ত কেন্দ্রীয় ও ইউ পি সরকারের উচ্চপদে অধিষ্ঠিত থাকেন। ১৯৫৩ খৃঃ এলাহাবাদ হাইকোর্টের বিচারপতি নির্বাচিত হন। বিচারক হিসাবে তাঁর গভীর আইনজ্ঞান, ভদ্রতা, ধৈর্য ও সদ্ব্যবহার সর্বজনবিদিত। ১৯৬০ খৃঃ অবসর গ্রহণের পরই ইনি তৃতীয় ফাইনান্স কমিশনের সদস্য নির্বাচিত হন। কমিশনের কাজ শেষ হলে একের পর এক উচ্চপদে অধিষ্ঠিত থেকে মাত্র আড়াই বছর আগে এলাহাবাদে ফিরে এসেছিলেন। দ্বিজেন্দ্রনাথ এলাহাবাদের বহু শিক্ষায়তন ও লোকহিতকর প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে যুক্ত ছিলেন। সমাজের সর্বোচ্চ স্তর থেকে আপামর জনসাধারণের সমাজ পর্যন্ত সর্বত্রই তাঁর গতিবিধি ছিল, যার সাহচর্যে এসেছেন তাকেই নিজের বলে গ্রহণ করেছেন। ভারতীয় শিক্ষা-সংস্কৃতিই ছিল তাঁর চরিত্রের ভিত্তি: সুখে-দুঃখে অনুত্তেজিত স্থির-প্রাজ্ঞ।
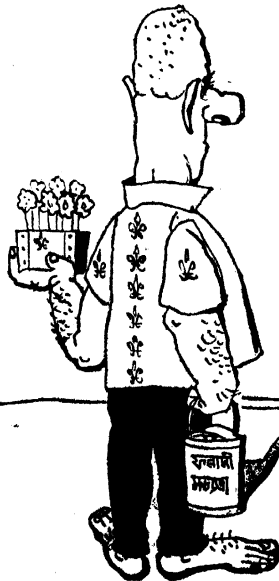
অনিশ্চিত পরিকল্পনা

ভারত সরকার ১৯৬৭-৬৮ সালের জন্যে যে বার্ষিক পরিকল্পনা গত ২৬ জুলাই সংসদে পেশ করেছেন, তা অনিশ্চয়তায় ভরা।

এই পরিকল্পনায় ২,২৪৬ কোটি টাকা খরচ করবার কথা বলা হয়েছে। যদিও ১৯৬৬-৬৭ সালের বার্ষিক পরিকল্পনায় ব্যয়ের হিসাবের চাইতে এই অঙ্ক ২৫ কোটি টাকা বেশি, তবু তার পরে জিনিসপত্রের দাম যে রকম বেড়েছে তা ধরলে প্রকৃত হিসাবে এই অঙ্ক গত বছরের তুলনায় কম।

প্রথম অনিশ্চয়তা এই কারণে যে, সামগ্রিকভাবে চতুর্থ পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা আজ পর্যন্ত রচিত হয়নি। টাকা-পয়সা কি রকম পাওয়া যাবে তার কোন নিশ্চয়তাই নেই। সুতরাং গোটা পরিকল্পনার সঙ্গে বার্ষিক পরিকল্পনাকে কিভাবে খাপ-খাওয়ানো যাবে সে সম্পর্কে এখনো কোন পরিষ্কার ধারণা করা সম্ভব নয়। বার্ষিক পরিকল্পনা সংক্রান্ত দলিলে অবশ্য বলা হয়েছে যে, এর ফলে কোন অসুবিধে হবে না, কারণ এই পরিকল্পনা চতুর্থ পরিকল্পনার খসড়ার উল্লিখিত নীতি ও কার্য-সূচীর সঙ্গে সঙ্গতি রেখেই রচনা করা হয়েছে এবং এতে কৃষি ও পরিবার পরিকল্পনার ওপরেই জোর দেওয়া হয়েছে। এই দুটিই হচ্ছে চতুর্থ পরিকল্পনার মূল লক্ষ্য।

দ্বিতীয় অনিশ্চয়তা, ২,২৪৬ কোটি টাকার এই ছোট আকারের পরিকল্পনারও পুরো টাকাটার সংস্থান এখন পর্যন্ত নেই: মোট ৫৪ কোটি টাকার ঘাটতি থেকে যাচ্ছে।

তৃতীয়ত, উন্নতির গতিবেগ বজায় রাখতে গেলে যে পরিমাণ বিনিয়োগ প্রয়োজন, বার্ষিক পরিকল্পনার বিনিয়োগ তার তুলনায় কম। পরিকল্পনা রচয়িতারা স্বীকার করেন যে এই বিনিয়োগ বাড়ানো দরকার। কিন্তু কিভাবে বাড়ানো সম্ভব তা তাঁরা বুঝতে পারছেন না। তাঁদের একটা আশা যদি এ বছর ভালো বর্ষা হয় এবং তার ফলে যদি ফলন ভালো হয় তাহলে খাদ্য ও সারের জন্য যে সাবসিডি তাঁরা দিয়ে থাকেন তা তুলে নেওয়া যেতে পারে। তার ফলে রাজস্ব কিছুটা বাড়বে। কিন্তু সবটাই একটা বিরাট যদি'র ওপর নির্ভর করছে। অন্যান্য বিষয়ের মধ্যে সরকার ভূমি রাজস্ব ও ঋণের বকেয়া আদায়ের জন্যে জোরদার চেষ্টা চালাবার কথা ভাবছেন। কিন্তু বর্তমান চিন্তাধারা ভূমি রাজস্ব তুলে দেবার পক্ষে। তাছাড়া গোটা ব্যাপারটাই ভালো ফলনের সঙ্গে জড়িত।

এর সঙ্গে চতুর্থ একটি অনিশ্চয়তা যোগ করা যায়। তা হল কার্যক্ষেত্রে সাফল্যের প্রশ্ন। ১৯৬৬-৬৭ সালে অর্থাৎ চতুর্থ পরিকল্পনার প্রথম বছরে এই সাফল্যের পরিমাণ মোটেই আশাপ্রদ নয়। এর প্রভাব পরবর্তী বছরেও কিছুটা পড়তে বাধ্য।

পরিকল্পনা কমিশনের দলিলে একথা স্পষ্টই স্বীকার করা হয়েছে যে, ১৯৬৫-৬৬ সালের গুরুতর বিপর্যয়ের আঘাত ১৯৬৬-৬৭ সালে কাটিয়ে ওঠা যাবে বলে যে আশা করা গিয়েছিল তা ব্যর্থ হয়েছে। পর্যাপ্ত ও সময়োচিত বৃষ্টিপাতের নিদারুণ অভাবে কৃষি উৎপাদন ভীষণভাবে ব্যাহত হয়েছে। যেখানে লক্ষ্য ছিল ৯ কোটি ৭০ লক্ষ টন সেখানে উৎপন্ন হয়েছে মাত্র ৭ কোটি ৬০ লক্ষ টন। উল্লেখযোগ্য যে, ১৯৬৪-৬৫ সালেও ৮ কোটি ৯০ লক্ষ টন উৎপন্ন হয়েছিল। এমন কি ১৯৬০-৬১ সালেও উৎপাদনের পরিমাণ ছিল ৮ কোটি ২০ লক্ষ টন।

শিল্পের ক্ষেত্রেও একই ব্যর্থতা লক্ষ্য করা যায়। তৃতীয় পরিকল্পনার প্রথম তিন বছরে শিল্পের উৎপাদন ছিল অগ্রমুখী। ১৯৬১-৬২ সালে উৎপাদন বেড়েছিল ৬.৯ শতাংশ, ১৯৬২-৬৩ সালে ৭.৭ শতাংশ এবং ১৯৬৩-৬৪ সালে ৮.৫ শতাংশ। তার পরেই উৎপাদনে শৈথিল্য আসে। ১৯৬৪-৬৫ সালে উৎপাদন বাড়ে ৭ শতাংশ, ১৯৬৫-৬৬ সালে তা আরও কমে হয় ৩.৯ শতাংশ, এবং ১৯৬৬-৬৭ সালে মাত্র ৩ শতাংশ।

এই শোচনীয় ব্যর্থতার একটি প্রধান কারণ অবশ্য কৃষির ক্ষেত্রে বিপর্যয়। কৃষি-ভিত্তিক কাঁচা মালের অভাব অনেকগুলি শিল্পকে পঙ্গু করে রাখে। খাদ্যসামগ্রীর দাম অত্যধিক বাড়ায় শিল্পজাত দ্রব্যের চাহিদা স্বাভাবিকভাবেই কমে যায়। তার ওপর বেসরকারী পথে শিল্পক্ষেত্রে বিনিয়োগের পরিমাণ ছিল কম। প্রয়োজনীয় যন্ত্রপাতি ও যন্ত্রাংশ আমদানীর অসুবিধার দরুণ উৎপাদন ক্ষমতার অনেকখানি অলস পড়ে থাকে।

দ্রব্যমূল্য অস্বাভাবিকভাবে বেড়ে যায়। ১৯৬৫-৬৬ সালে গড়পরতা সামগ্রিক পাইকারী মূল্য সূচক ছিল ১৬৫.১। ১৯৬৬-৬৭ সালে তা বেড়ে হয় ১৯১.০: অর্থাৎ বৃদ্ধির পরিমাণ ১৫.৭ শতাংশ। পরিকল্পিত অগ্রগতির সূচনা থেকে এপর্যন্ত আর কখনো বছরে এতটা মূল্য-বৃদ্ধি ঘটেনি। এক্ষেত্রেও প্রধান কারণ কৃষিক্ষেত্রে বিপর্যয়। দ্বিতীয় বড় কারণ টাকার বিনিময় মূল্য হ্রাস।

সুতরাং ১৯৬৭-৬৮ সালে যদি অগ্রগতি সাধন করতে হয় তাহলে কৃষির ক্ষেত্রেই সর্বাগ্রে সাফল্যের পরিচয় রাখতে হবে। বার্ষিক পরিকল্পনায় তাই কৃষির ওপর সঙ্গতভাবেই জোর দেওয়া হয়েছে।

সরকার আশা করছেন, গত দু' বছরে ফলন ভালো না হলেও অগ্রগতির যে সম্ভাবনা গত দু' বছরে গড়ে তোলা সম্ভব হয়েছে তার সুফল এখন পাওয়া যাবে। অধিক-ফলন বীজ ব্যবহারের আশাও যথেষ্ট সুফল পাওয়ার আশা আছে। সারের আভ্যন্তরীণ উৎপাদনকে পরিপূরণ করার জন্যে ব্যাপক হারে বিদেশ থেকে সার আমদানীর অনুমতি দেওয়া হয়েছে। তার ওপর আশা করা যাচ্ছে এবার সময়মত পর্যাপ্ত বৃষ্টি হবে। সব মিলিয়ে, সরকারের ধারণা, সাড়ে ৯ কোটি টন খাদ্য উৎপাদন করা অসম্ভব হবে না। এবং যদি হয় তাহলে কৃষিক্ষেত্রের খাদ্য-বহির্ভূত বিভাগেও উৎপাদন বেড়ে যাবে। এর ফলে কৃষি উৎপাদনের সূচক সংখ্যা ১৯৬৬-৬৭ সালের ১৩৫.৭-এর তুলনায় ১৬৯.১-এ দাঁড়াবে। অর্থাৎ সরকার আশা করছেন ১৯৬৭-৬৮ সালে কৃষি উৎপাদন ২৪.৬ শতাংশ বাড়বে।

পরিকল্পনা কমিশন স্পষ্টই স্বীকার করেছেন যে, ১৯৬৭-৬৮ সালের প্রথম ভাগে শিল্পের উৎপাদন বাড়বার কোন সম্ভাবনা নেই। দ্বিতীয়ার্ধে উৎপাদন লক্ষ্যনীয়ভাবে বাড়বে বলে তাঁরা আশা করছেন, কারণ তখন কৃষির অবস্থাও ভালো হবে।

কিন্তু এখানেও কথা আছে। কৃষির অবস্থা ভালো যে হবেই তার কোন নিশ্চয়তা নেই। তাছাড়া জিনিসপত্রের দাম কতখানি কমানো বা স্থিতিশীল রাখা সম্ভব তার ওপর শিল্পজাত দ্রব্যের কাটতি নির্ভর করছে। অন্যান্য যেভাবেই শিল্পোৎপাদনের সহায়তা করে দেওয়া হোক, এই দুটি মূল বিষয়ের সুরাহা করা সম্ভব না হলে কোন হেরফের হবে না।

যা-ই হোক, এই সব অসুবিধা দেখা দেবে না কিংবা দূর করা সম্ভব হবে এই আশা নিয়ে ভারত সরকার ১৯৬৭-৬৮ সালের পরিকল্পনা রচনা করেছেন। মোট ২,২৪৬ কোটি টাকার মধ্যে কেন্দ্রীয় খাতে ১,১৭২ কোটি, রাজ্য খাতে ১,০১০ কোটি এবং কেন্দ্র-শাসিত এলাকার জন্যে ৬৪ কোটি টাকা ধরা হয়েছে।

রাজ্যগুলির বরাদ্দ এইভাবে ভাগ করা হয়েছে : অন্ধ্র প্রদেশ ৬৮.৯৮ কোটি টাকা; আসাম ৩০ কোটি; বিহার ৬৬.৩৬ কোটি; গুজরাট ৭০ কোটি; হরিয়ানা ২৪.১৫ কোটি; কেরল ৪২.৬৩ কোটি; মধ্যপ্রদেশ ৬০.৩৭ কোটি; মাদ্রাজ ৭৭.২৮ কোটি; মহারাষ্ট্র ১২২.৩৮ কোটি; মহীশূর ৬০.২৫ কোটি; উড়িষ্যা ৪৬ কোটি; পাঞ্জাব ৪২ কোটি; রাজস্থান ৪৩ কোটি; উত্তর প্রদেশ ১৫৫ কোটি; পশ্চিমবঙ্গ ৬০.৮৭ কোটি; জম্মু ও কাশ্মীর ২০-২৫ কোটি; নাগাল্যান্ড ৬.২৫ কোটি।

কেন্দ্রশাসিত এলাকাগুলির বরাদ্দ এই রকম : আন্দামান ও নিকোবর দ্বীপপুঞ্জ ২.৫৮ কোটি; দাদরা ও নগর হাভেলি ৩৪ লক্ষ; দিল্লী ২৫.৩০ কোটি; গোয়া, দমন ও দিউ ৭.৫১ কোটি; হিমাচল প্রদেশ ১৫.৭২ কোটি; লাক্ষা দ্বীপ, আমিনদিভি ও মিনিকয় দ্বীপপুঞ্জ ৫৬ লক্ষ; মণিপুর ২.৯১ কোটি; নেফা ২.১৫ কোটি; পণ্ডিচেরী ২.১৮ কোটি; ত্রিপুরা ৪.১৬ কোটি, চণ্ডীগড় ৬৯ লক্ষ।

প্রেক্ষাগৃহ

আজকের কথা

পশ্চিমবঙ্গে জাতীয় নাট্যশালা সম্বন্ধে ধ্যানধারণা (৫) :

বঙ্গনাট্যসাহিত্য সম্মেলনের ১১ই জুলাই তারিখে অনুষ্ঠিত ষষ্ঠ বা সমাপ্তি অধিবেশনে "জাতীয় নাট্যশালার সংজ্ঞা-নির্ধারণ এবং রবীন্দ্রসদনের গঠন ও কর্মসূচী" বিষয়ে বক্তব্য পেশ করেন রণজিৎ দত্ত, রাসবিহারী সরকার, পশুপতি চট্টোপাধ্যায় এবং উপস্থিত শ্রোতৃমণ্ডলী থেকে আমন্ত্রিত হয়ে সরল ঘোষ ও ডঃ অবনীকুমার সিংহ। এছাড়া পঞ্চম ও ষষ্ঠ অধিবেশনের সভাপতিরূপে 'জাতীয় নাট্যশালা ও রবীন্দ্রসদন' সম্পর্কে আন্দোলনকারীদের অন্যতম পুরোধা নাট্যকার মন্মথ রায় এ ব্যাপারে তাঁর বিশেষ বিবৃতি দান করেন।

রণজিৎ দত্ত বলেন : শিশিরকুমার 'পদ্মশ্রী' উপাধি প্রত্যাখ্যান করেছিলেন জাতীয় নাট্যশালার দাবি পূরণ করা হয়নি বলে। কংগ্রেস সরকার রবীন্দ্রসদন নির্মাণ করেছেন নিজের অভিরুচি অনুযায়ী, তাঁরা অভিজ্ঞ ব্যক্তিদের আহ্বান করে তাঁদের মতামত নেওয়ার প্রয়োজনীয়তা অনুভব করেননি। Stage is the Life of a nation পেশাদারী রঙ্গমঞ্চে মূলত ব্যবসাটাই বড়ো। এই ব্যবসায়ী মনোবৃত্তির ঊর্ধ্বে উঠে জাতীয় নাটক অভিনয়ের জন্যে জাতীয় নাট্যশালার প্রয়োজন। সমস্ত জাতির আশা, আকাঙ্ক্ষা, জাতীয় চেতনা যে-নাটকের ভিতর রূপ পায়, তাকেই বলি জাতীয় নাটক। এই জাতীয় নাটক হবে যুগচেতনার ধারক, এই নাটক মানুষের সুস্থ চিন্তাকে সাহায্য করবে। সরকার যদি অন্যায় করে, কোনও ব্যক্তি বা দল যদি অন্যায় করে, তার বিরুদ্ধে জেহাদ ঘোষণা করবে এই নাটক। রবীন্দ্রসদনের বর্তমান পরিচালনাব্যবস্থা সম্বন্ধে প্রধান আপত্তি হচ্ছে, যে-সরকারের কোনও রকম মুনাফা অর্জনের (profiteering) মনোবৃত্তি থাকা উচিত নয়, সেই সরকার একটি অভিনয়ের জন্যে ১,০০০্ টাকা ভাড়া নেন কেন? রবীন্দ্রসদনকে প্রকৃত জাতীয় নাট্যশালায় পরিণত করতে হবে।

রাসবিহারী সরকার বলেন : "যুক্তফ্রণ্ট সরকারের নিকট নাট্যশিল্পোন্নয়নের জন্য খসড়া পরিকল্পনা" শীর্ষক মুদ্রিত পুস্তিকার মাধ্যমে জাতীয় নাট্যশালা সম্পর্কে আমি আমার মতামত পেশ করেছি। বর্তমান যুগে জাতীয়তাবাদকে সংকীর্ণ রাজনৈতিক মতবাদপ্রসূত বলা যেতে পারে। বিশেষ করে সংস্কৃতির ক্ষেত্রে জাতীয় কথাটার সার্থকতা আছে কিনা, এ প্রশ্ন স্বাভাবিকভাবেই উঠতে পারে। বর্তমানে জাতীয়তাবাদের স্থান গ্রহণ করেছে আন্তর্জাতিকতাবাদ, মানবতাবাদ। এ ছাড়া জীবনধারা পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে
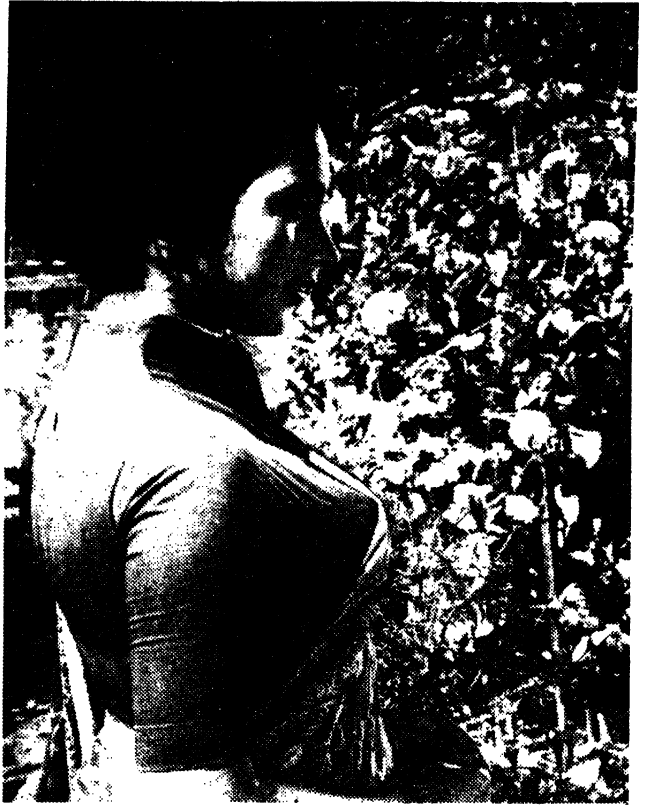
প্রস্তর স্বাক্ষর চিত্রে সন্ধ্যা রায়

জাতীয়তাবোধের পরিবর্তনও অবশ্যম্ভাবী। আমাদের এই বহু ভাষাভাষী ভারত ইউনিয়নের—যেখানে বিভিন্ন রাজ্যে বিভিন্ন সাহিত্য ও শিল্পবোধ রয়েছে, সেখানে ন্যাশনাল থিয়েটার স্থাপনের চেষ্টা ফলবতী হবে কি করে?" চারশো বছর ধরে বিশেষ

> **ত্রুটি স্বীকার :** গেল সংখ্যার **আজকের কথার পশ্চিমবঙ্গে জাতীয় নাট্যশালা সম্বন্ধে ধ্যানধারণা (৪)** শীর্ষক নিবন্ধে নট-নাট্যকার রমেন লাহিড়ীর বক্তৃতার শেষ পংক্তিটি মুদ্রাকর প্রমাদের কৃপায় বিপরীত অর্থবহ হয়ে পড়েছে। তাঁর বক্তব্য ছিল : **এর পরিচালন-পরিষদ মনোনয়ন অর্থাৎ** pick and choose **পদ্ধতিতে গঠিত না হয়ে অভিজ্ঞ ব্যক্তিদের নিয়ে ব্যাপকভাবে নির্বাচনের ভিত্তিতে গঠিত করতে হবে।** আমরা এই অনিচ্ছাকৃত ত্রুটির জন্যে শ্রীলাহিড়ী এবং পাঠক-পাঠিকাদের কাছে ক্ষমা প্রার্থনা করছি।
>
> —নান্দীকর

ধরনের নাট্যসংস্কৃতির বিকাশের পরে বহু বছরের চেষ্টায় আজ ইংলণ্ডে সার লরেন্স অলিভিয়ারকে ডিরেক্টার করে ন্যাশনাল থিয়েটার প্রতিষ্ঠা সম্ভব হয়েছে ইংলণ্ডে। আমাদের দেশে কিন্তু কোনো অখণ্ড ভারতীয় নাট্যরীতি গড়ে ওঠেনি। কাজেই এখানে রাজ্যে রাজ্যে জাতীয় রঙ্গালয় গড়ে উঠতে পারে, কিন্তু কোনো কেন্দ্রীয় জাতীয় রঙ্গালয় সম্ভব নয়। সরকারী বা বেসরকারী অর্থব্যয়ের ওপর একটি রঙ্গালয়ের জাতীয় অভিধা নির্ভর করে না, নির্ভর করে এর পরিচালনপদ্ধতি এবং আদর্শের ওপর। আমাদের রবীন্দ্রসদন State-owned (রাজ্য-সরকারের মালিকানাধীন) থিয়েটার হতে পারে, কিন্তু তাই বলে একে বর্তমান ব্যবস্থায় আমাদের রাজ্যের জাতীয় রঙ্গালয় বলা চলে না। জাতীয় নাট্যশালার চারিত্রিক রূপ পরীক্ষা করে দেখা দরকার, সরকারী আমলাদের খেয়ালখুশীর ওপর এর পরিচালনব্যবস্থা থাকা উচিত নয়।......আজ সরকারের কাছে জাতীয় নাট্যশালা স্থাপনের দাবি না তুলে আমাদের দাবি করা উচিত সামগ্রিক নাট্যশিল্প উন্নয়নের সঙ্গে সক্রিয় সহযোগিতা করবার জন্যে। এর জন্যে

পশ্চিমবঙ্গে একটি বিশেষ সাংস্কৃতিক মণ্ডল সৃষ্টির উপায় চিন্তা করতে হবে। তাই আমার দাবি, পশ্চিমবঙ্গ সরকারের একটি সাংস্কৃতিক দপ্তরের সৃষ্টি করতে হবে, যা পরিচালিত হবে সংস্কৃতির ক্ষেত্রে অভিজ্ঞ ব্যক্তিদের সমন্বয়ে গঠিত এই পরামর্শদাতা কমিটির কার্যকরী সহায়তায় এবং যার অধীনে থাকবে : (১) সাহিত্য একাদেমী, (২) নৃত্য-নাটক-সঙ্গীত একাদেমী ও (৩) ললিতকলা একাদেমী। এর মধ্যে আবার নৃত্যনাটক একাদেমীকে (ক) লোকরঞ্জন, (খ) চলচ্চিত্র, (গ) রবীন্দ্রসদন, (ঘ) মহাজাতি সদন, (ঙ) নাট্যশিল্প—পেশাদার ও অপেশাদার, (চ) লোকশিল্প, (ছ) যাত্রা (জ) নৃত্য—আধুনিক, ধ্রুপদী ও লোক এবং (ঝ) সঙ্গীত—আধুনিক, ধ্রুপদী ও লোক—এই ন'টি সাব-কমিটিতে বিভক্ত করা যেতে পারে। পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য বাজেটে এ বছরে সাংস্কৃতিক খাতে আনুমানিক ব্যয় ধরা হয়েছে ১৪,৫০,০০০৲ টাকা। রবীন্দ্রসদনের পরিচালনাব্যয় ৫০,০০০৲ এবং নূতন কোনো সংযোজনব্যবস্থার জন্যে বরাদ্দ হয়েছে ৫ লক্ষ টাকা। সাংস্কৃতিক খাতের জন্য নির্দিষ্ট এই সাড়ে চোদ্দ লক্ষ টাকা দ্বারা এই রাজ্যের নাট্যশিল্পের এবং অপরাপর সাংস্কৃতিক বিষয়ের উন্নতির জন্যে অনেককিছু করা সম্ভব, যদি এই উন্নতির জন্যে সুষ্ঠু বাৎসরিক পরিকল্পনা গ্রহণ করা হয়। মনে রাখা উচিত, আজ পশ্চিমবঙ্গের নাট্যআন্দোলন ও নাট্যশিল্পের উন্নতি মূলত অপেশাদার নাট্যসংস্থাগুলি দ্বারাই পরিচালিত হচ্ছে। এমনকি, আজকের অপেশাদার নাট্যসংস্থাগুলির জন্যে বিশেষভাবে রচিত নাট্যসাহিত্য বৈচিত্র্যে ও বহু রসের পরিবেশনে প্রাণবন্ত। কাজেই আমাদের রবীন্দ্রসদনের অন্যতম উদ্দেশ্য হোক, আমাদের অপেশাদার নাট্যসংস্থাগুলির অগ্রগমনে সাহায্য করা। রবীন্দ্রসদনে ন্যূনকল্পে ৪৫০টি অভিনয়ের ব্যবস্থা সম্ভব প্রতি বৎসর। এর মধ্যে ২৪।২৫টি প্রতিষ্ঠাপন্ন নাট্যসম্প্রদায়ের মধ্যে অন্তত ৪০০টি অভিনয় ভাগ করে দেওয়া সম্ভব এবং তাদের প্রত্যেককে সার্থক অভিনয়ের সুযোগদানের জন্যে আর্থিক এবং অন্য সবরকম সরকারী সাহায্য দেওয়া হোক। এইসব অভিনয় থেকে টিকিট বিক্রয়লব্ধ অর্থ দ্বারা রবীন্দ্রসদনের তহবিল পূর্ণ করা হোক; এই তহবিলের অর্থ রবীন্দ্রসদনের সংস্কার এবং উন্নয়নকল্পে ব্যয় করা হোক। এই ২৪।২৫টি দলের মধ্যে যে ২।৩টি দল শ্রেষ্ঠ বলে বিবেচিত হবে, সরকারী ব্যবস্থায় তাদের ভারতের অন্য রাজ্যে পশ্চিমবঙ্গের নাটক ও নাট্যপ্রযোজনার পরিচয়দানের জন্যে প্রেরণ করা হোক। আবার শ্রেষ্ঠ দলগুলির ভিতর থেকে শ্রেষ্ঠ শিল্পীদের নির্বাচন করে তাদের দ্বারা গঠিত দলকে বহির্ভারতে কোনো আন্তর্জাতিক নাট্যোৎসবে যোগদানের জন্যে কিংবা অন্য কোনো দেশের সাংস্কৃতিক বিভাগের মাধ্যমে সেই দেশের লোকেদের সামনে অভিনয়ের জন্যে প্রেরণের ব্যবস্থা করা যেতে পারে। আমাদের প্রার্থিত সাংস্কৃতিক দপ্তরের ওপর বাঙলার গ্রামে গ্রামে, মহকুমায় মহকুমায় নাট্য-আন্দোলন চালু রাখা এবং উন্নয়নের ব্যবস্থা করার ভার অর্পিত হওয়া উচিত। রবীন্দ্রসদনের সুষ্ঠু পরিচালনব্যবস্থার জন্যে একটি সংবিধান রচনাকারী পর্ষদ প্রতিষ্ঠিত হওয়া প্রয়োজন।

সরল ঘোষ বলেন : জাতীয় রঙ্গালয়ের মারফত যেমন আমাদের নাট্যঐতিহ্যকে তুলে ধরা প্রয়োজন, তেমনই নূতন সৃষ্টিকেও আহ্বান করা দরকার। নাট্যরচনা ও প্রযোজনা বিষয়ে বহু পরীক্ষানিরীক্ষার মধ্যে অনেক সময়ে ছেলেমানুষী দেখতে পাওয়া গেলেও তাদের মধ্যে যথার্থ অনুশীলনী মনোবৃত্তি কাজ করে। নাট্য বিষয়ে অংশগ্রহণকারী সকলকেই উৎসাহ দান করা প্রয়োজন। আমাদের মধ্যে যতদিন পর্যন্ত নিজেদের গা বাঁচিয়ে চলার মনোবৃত্তি অটুট থাকবে, ততদিন পর্যন্ত জাতীয় নাট্যশালার পরিকল্পনা সার্থক হবে না। জাতীয় নাটক হচ্ছে সেই নাটক, যা মানুষকে অনুপ্রেরণা দেবে, মানুষ যখন প্রতিকূল বাস্তবের চাপে ভেঙে পড়বার উপক্রম করবে, তখন তাকে আশার আলো, বাঁচবার পথ দেখাবে।

ডঃ অবনীকুমার সিংহ বলেন : স্বাধীনতালাভের পরে জাতীয়তা সম্পর্কে আমাদের ধ্যানধারণা আজও অস্পষ্ট এবং অসম্পূর্ণ।

সভাপতিরূপে নাট্যকার **মন্মথ রায়** বলেন : জাতীয় নাট্যশালা ও রবীন্দ্রসদন সম্পর্কে যে আন্দোলন আমরা তিন বছর আগে শুরু করেছিলুম, তা চালিয়ে যাব শেষ পর্যন্ত—যতদিন না সরকার আমাদের দাবি মেনে নিচ্ছেন। ১৯৬১ সালে রবীন্দ্র-জন্মশতবার্ষিকীতে ভিত্তিস্থাপনের সময়ে ডঃ বিধানচন্দ্র রায় পরিচালিত রাজ্যসরকার ঘোষণা করেছিলেন, রবীন্দ্রস্মরণী (যা এখন রবীন্দ্রসদন নামে পরিচিত) জাতীয় নাট্যশালারূপে দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন, নাট্যাচার্য শিশিরকুমার প্রভৃতির স্বপ্ন সার্থক করবে। কিন্তু আজও তা হয়নি। রবীন্দ্রসদন পরিচালনার ভার নির্বাচিত স্বয়ংশাসিত সংস্থার উপর অর্পণ করা হোক—আমাদের এই দাবি আজও উপেক্ষিত। আমাদের দাবি, এই পরিচালনসমিতি রেজেস্ট্রীকৃত নাট্য, নৃত্য ও সংগীত সংস্থা ও বিশিষ্ট শিল্পী,

কলাকুশলী, নাট্যকারসংঘ, নাট্যসমালোচক, নাট্যবিষয়ক অধ্যাপক প্রভৃতিদের ভিতর থেকে নির্বাচিত প্রতিনিধিদের নিয়ে গঠিত হোক। সরকারের আর্থিক সাহায্যে রবীন্দ্র-সদন পরিচালিত হলেও অডিট (হিসাব পরীক্ষা) করা ছাড়া এই প্রতিষ্ঠানের ওপর সরকারের কোনো নিয়ন্ত্রণাধিকার থাকবে না। আমরা যে দাবিপত্র পশ্চিমবঙ্গ সরকারের কাছে পেশ করেছিলুম ১৯৬৬ সালে, তার অগণিত স্বাক্ষরকারীর মধ্যে উল্লেখযোগ্যভাবে আছেন বর্তমান কেন্দ্রীয় সরকারের শিক্ষামন্ত্রী ত্রিগুণা সেন এবং পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য সরকারের শিক্ষামন্ত্রী জ্যোতি ভট্টাচার্য। ......আশিটি সংস্থার সমন্বয়ে গঠিত সংযুক্ত সংস্কৃতি পরিষদের সদস্যদের সমবেত অনুমতিক্রমে আমি রবীন্দ্রসদনের পরিচালন-ব্যবস্থা কেমনভাবে নির্ধারিত হবে, সেই বিষয়ে পরামর্শ দেবার জন্যে পশ্চিম-বঙ্গের বর্তমান শিক্ষামন্ত্রী জ্যোতি ভট্টাচার্যের আমন্ত্রণ গ্রহণ করেছি।........ আমাদের মনে রাখা প্রয়োজন, রবীন্দ্রসদনকে জাতীয় নাট্যশালায় পরিণত করতে হলে রাজ্য বিধানসভায় একটি বিল আনতে হবে এবং পর্যায়ক্রমিক আলোচনার পরে অধিকাংশের ভোটে বিলটি গৃহীত হবার পরে রাজ্যবিধানপরিষদেও অনুরূপভাবে গৃহীত হলে রাজ্যপালের অনুমতিক্রমের দ্বারা বিলটি একটি অ্যাক্টে পরিণত হলে জাতীয় নাট্যশালা প্রতিষ্ঠা সম্ভব হবে।

পরবর্তী সংখ্যায় আমরা এই আলোচনার ওপর যবনিকাপাত করব আপাততের মতো রঙ্গনাট্যসাহিত্য সম্মেলনের ষষ্ঠ ও সমাপ্তি অধিবেশনে পশুপতি চট্টোপাধ্যায়ের বক্তৃতা এবং এ ব্যাপারে আমাদের সামগ্রিক মন্তব্য পেশ করে।

হীরেন নাগ পরিচালিত সুয়োরাণীর সাধ চিত্রের নায়িকা সুমিতা সান্যাল। ফটো : অমৃত

অজিত গঙ্গোপাধ্যায় পরিচালিত প্রতিদান চিত্রে কালীপদ চক্রবর্তী

চিত্রসমালোচনা

খেয়া (বাঙলা) : রূপছায়া চিত্র-এর নিবেদন; ৩,৬৪৬·৬৩ মিটার দীর্ঘ এবং ১২ রীলে সম্পূর্ণ; প্রযোজনা : শ্যামল মিত্র; চিত্রনাট্য ও পরিচালনা : রূপক; কাহিনী : নীতা সেন; সঙ্গীত পরিচালনা : শ্যামল মিত্র; গীত-রচনা : গৌরীপ্রসন্ন মজুমদার; চিত্রগ্রহণ : দিলীপরঞ্জন মুখোপাধ্যায়; শব্দানুলেখন : বাণী দত্ত (অন্তর্দৃশ্য) এবং ইন্দু অধিকারী (বহির্দৃশ্য); সঙ্গীতানুলেখন ও শব্দ পুনর্যোজনা : শ্যামসুন্দর ঘোষ; শিল্প নির্দেশনা : সুধীর খাঁ; সম্পাদনা : অনিল সরকার; নেপথ্য কণ্ঠসঙ্গীত : হেমন্ত মুখোপাধ্যায়, শ্যামল মিত্র ও নীতা সেন; রূপায়ণ : মাধবী মুখোপাধ্যায়, গীতা দে, কবিতা সরকার, আশা দেবী, অনুপকুমার, বঙ্কিম ঘোষ, তরুণকুমার, বিকাশ রায়, প্রল্হাদ মুখোপাধ্যায়, হারাধন মুখোপাধ্যায়, জানু বন্দ্যোপাধ্যায়, জ্ঞানেশ মুখোপাধ্যায়, দিলীপ রায়, বচান ঘোষ প্রভৃতি। রূপছায়া

পিকচার্স-এর পরিবেশনায় গেল শুক্রবার, ২৮এ জুলাই থেকে বসুশ্রী, বীণা, পূর্ণশ্রী, আলোছায়া এবং অপরাপর চিত্রগৃহে দেখানো হচ্ছে।

ছোটভাই বিপ্রদাসকে লেখাপড়া শিখিয়ে মানুষ করবার প্রতিজ্ঞা নিয়েছিল সুরদাস ও দ্বিজদাস; শুধু তাই নয়, পাছে তাদের প্রতিজ্ঞার বাধার সৃষ্টি হয়, সেই ভয়ে তারা নিজেদের রাখে অকৃতদার। নারীবিবর্জিত সংসারে বাস করতে করতে তারা এমনই নারীবিদ্বেষী হয়ে ওঠে যে, তাদের বাড়ীতে স্ত্রীদেবতার পর্যন্ত প্রবেশ নিষেধ। ছোটভাই বিপ্র যখন ইঞ্জিনীয়ারিং পাশ করে বাড়ী ফিরল, তাদের আনন্দে ভাগ নেবার জন্যে তারা গ্রামের পুরুষদেরই মিষ্টি খাবার জন্যে ডেকে আনল, কিন্তু কোনো মেয়েকে তারা এ আনন্দের ভাগ দিল না। তাদের প্রাথমিক আপত্তি সত্ত্বেও গ্রামের কেশবকাকার মধ্যস্থতায় বিপ্র যখন কলকাতায় কোনো ইঞ্জিনীয়ারিং প্রতিষ্ঠানে চাকরী করতে গেল, তখন বড় দু'ভাই বারংবার করে তাকে নিষেধ করলেন, কোনোও স্ত্রীলোকের সান্নিধ্যে আসতে বা তার সঙ্গে বাক্যালাপ পর্যন্ত করতে। কিন্তু কিছুদিনের অদর্শনে কাতর হয়ে তাঁরা যখন ছোটোভাইয়ের আপিসে এসে সবিস্ময়ে দেখলেন, বিপ্র এক নারীর (আপিসের লেডী টাইপিস্ট) সঙ্গে কথায় মত্ত, তখন ভাইয়ের শত কাকুতি-মিনতি উপেক্ষা করে তাঁরা তাকে ঘাড়ে ধরে টেনে নিয়ে গেলেন তাঁদের নন্দীগ্রামে। ব্যস, বিপ্রর কলকাতার কাজ খতম। শুরু হল তার গ্রামসেবার কাজ। তার সেই কেশবকাকা নদীর অপর পারে মোহনপুরে একটি স্বাস্থ্যকেন্দ্র প্রতিষ্ঠা করবেন, সে সেই বাড়ীর নক্সা তৈরী করল, তার নির্মাণকার্য তদারক করল। গ্রামের মোহন মাঝি খেয়া নৌকা বেয়ে নদী পারাপার করে বহুদিন ধরে। সে একদিন নদীর ধার থেকে কুড়িয়ে পাওয়া একটি বাচ্চা মেয়েকে সঁপে দিয়ে গেল বিপ্রর হাতে। দাদাদের কাছ থেকে বিপ্র তাকে লুকিয়ে রাখতে পারল না; দাদারা রেগে কুরুক্ষেত্র করলেন। হোলোই বা ছোট; একটা মেয়েকে বাড়ীতে স্থান দেওয়া! দাদাদের রাগের অন্য কারণও ছিল। তাঁরা তার কোষ্ঠীতে দেখেছেন, যৌবনে বিপ্রর জীবনে আসবে একটি ম্লেচ্ছ মহিলা ও একটি বাচ্চা মেয়ে। কাজেই সেই কোষ্ঠীর ফল সম্ভবত ফলতে শুরু করেছে। স্বপ্নাদেশে ঐ বাচ্চা মেয়েটিকে পাওয়া গেছে বলে বিপ্র মেয়েটিকে কাছে রাখতে পেল। কিন্তু যেদিন স্বাস্থ্যকেন্দ্রের নবনিযুক্ত ডাক্তার মিস স্বাতী দেবী দুর্ঘটনার ফলে প্রায় খঞ্জ অবস্থায় বিপ্রর ওপর ভর করে সুরদাস ও দ্বিজদাসের চোখের সামনে উপস্থিত হলেন, তখন তাঁরা এহেন কুদৃশ্য দেখা থেকে অব্যাহতি পাবার জন্যে চোখ ত বুজলেনই, উপরন্তু মনে মনে গুনলেন প্রমাদ। এদিকে স্বাস্থ্যকেন্দ্র চালু হতে গ্রামের হাতুড়ে ডাক্তার বিনোদ পালের গেল পসার কমে; সে কয়েকজন দুর্বৃত্তের সহায়তায় স্বাতীকে একেবারে জগৎ থেকে সরিয়ে দেবার জন্যে বদ্ধপরিকর হল। কিন্তু সে-কথা জানতে পেরে বিনোদের স্ত্রী নলিনী স্থির থাকতে পারে না; সে ছুটে যায় স্বাতীকে বাঁচাবার জন্যে। এই পরিস্থিতির সমাপ্তি হল কেমন করে এবং কি অবস্থায় সুরদাস ও দ্বিজদাস তাদের আজন্মের সংস্কার ত্যাগ করে স্বাতীকে তাদের গৃহলক্ষ্মী হবার জন্যে আহ্বান জানালেন, তাই নিয়েই ছবির শেষাংশ রচিত।

নারীকে দৃষ্টিপথের বাইরে রেখে জীবনের পথে চলা সত্যিই সম্ভব কিনা, তা বলা কঠিন। কিন্তু 'খেয়া'র সুরদাস ও দ্বিজদাসের স্ত্রীলোক থেকে শত হস্ত দূরে' থাকবার নিদারুণ প্রয়াসই ছবিটির প্রথমার্ধকে করে তুলেছে জনসাধারণের পক্ষে অতিমাত্রায় উপভোগ্য। ইঞ্জিনীয়ারিং প্রতিষ্ঠানের লেডী টাইপিস্টের সান্নিধ্য থেকে জোর করে টেনে নিয়ে যাওয়া থেকে শুরু করে দর্শকদের হাসি ক্রমেই উত্তাল হয়ে ওঠে। স্বাতীর বিপ্রর ওপর ভর করে প্রবেশ করা, পূজাগৃহে সহসা লক্ষ্মীমূর্তির আবিষ্কার ইত্যাদি পরিস্থিতি সমন্বিত প্রথমার্ধে দর্শক ছবিটির মধ্যে পেয়েছে মূলত হাসির খোরাক। দ্বিতীয়ার্ধ কিন্তু হাতুড়ে ডাক্তার বিনোদ পালের চক্রান্তের ফলে ঘটনাপ্রধান এবং কিছুটা উত্তেজনাপূর্ণ হয়ে উঠলেও প্রধান উপজীব্য হচ্ছে নারী-বিদ্বেষী ভ্রাতৃদ্বয়ের মানসিকতার পরিবর্তন এবং এই দিকটিই দর্শকের মধ্যে যথেষ্ট আবেগ সঞ্চার করে তাকে অভিভূত করতে সমর্থ হত। বিনোদ পালের ষড়যন্ত্রটি অধিকন্তু হয়েছে বলেই মনে হয়।

অভিনয়ে সবথেকে বেশী দৃষ্টি আকর্ষণ করেছেন বড়ভাই সুরদাসের ভূমিকায় বঙ্কিম ঘোষ। অসাধারণ নাট-নৈপুণ্য প্রদর্শন করে তিনি ভূমিকাটিকে আশ্চর্য উপভোগ্য করে তুলেছেন। তাঁর সঙ্গে সুন্দর সহযোগিতা করেছেন মেজভাই দ্বিজদাসের ভূমিকায় তরুণকুমার। ছবিটিতে তাঁদের নারী সম্পর্কে অভিব্যক্তি এবং উক্তি, বিভিন্ন পরিস্থিতিতে তাঁদের দুজনের প্রতিক্রিয়া দর্শককে করেছে রীতিমত অভিভূত,—তুলেছে প্রেক্ষাগৃহে হাসির ফোয়ারা। দ্বিতীয়ার্ধে সুরদাসের মানসিকতার পরিবর্তনও চমৎকারভাবে পরিস্ফুট

হয়েছে বঙ্কিম ঘোষের অভিনয়ের মাধ্যমে। ছোটভাই এবং ছবির নায়ক বিপ্রদাস হচ্ছে অনেকটা নিষ্ক্রিয় বা প্যাসিভ চরিত্র। এই চরিত্রে অনুপকুমার প্রথমটা নারীর সান্নিধ্যে সংকোচ এবং পরে স্বাভাবিকভাবেই নারীর প্রতি ভালোবাসার আকর্ষণ অনুভব—দুইই দক্ষভাবে প্রকাশ করেছেন। নায়িকা স্বাতীর চরিত্রে মাধবী মুখোপাধ্যায় তাঁর সহজাত নাট্যনৈপুণ্য প্রকাশের বিশেষ সুযোগ পাননি; তবে ছবিতে তাঁর উপস্থিতিই একটি বিশেষ আকর্ষণ। ননী চাকরের ভূমিকায় ভানু বন্দ্যোপাধ্যায় তাঁর স্বভাবসিদ্ধভাবে দর্শকদের পুলকিত করেছেন। হাতুড়ে ডাক্তারের ভূমিকায় বিকাশ রায় একটি ক্রুর চরিত্রকে অতিসহজেই চিত্রিত করেছেন। অপরাপর ভূমিকায় প্রসাদ মুখোপাধ্যায় (কেশবকাকা), হারাধন মুখোপাধ্যায় (ইঞ্জিনীয়ারিং প্রতিষ্ঠানের মালিক এবং স্বাতীর কাকা), জ্ঞানেশ মুখোপাধ্যায় (মোহন মাঝি), দিলীপ রায় (হারানো মেয়ে মায়ার বাবা), গীতা দে (বিনোদ ডাক্তারের স্ত্রী নলিনী), কবিতা সরকার (হারানো মেয়ের মা মালতী) এবং শিশুশিল্পী বুচান ঘোষ (মায়া) উল্লেখ্য অভিনয় করেছেন।

ছবির কলাকৌশলের বিভিন্ন বিভাগের কাজ একটি মধ্যমান রক্ষা করেছে। আলোকচিত্রগ্রহণের কাজ অসাধারণের পর্যায়ে পৌঁছোবার সুযোগই পায়নি এই ছবিতে। শব্দানুলেখনও ত্রুটিহীন নয়। ছবির মধ্যে নন্দীগ্রাম ও মোহনপুর যে নদীর দুই পারে অবস্থিত, এটা ঠিকভাবে বোঝানো হয়নি এবং এ-ত্রুটি নিশ্চয়ই চিত্রনাট্যের। ছবির তিনখানি গান সুগীত হলেও কাহিনীর অত্যাজ্য অংশরূপে প্রতিষ্ঠিত হতে পারেনি।

রূপছায়া নিবেদিত "খেয়া" প্রথমাংশে বিচিত্র হাসির ছবি এবং দ্বিতীয়াংশে উত্তেজনা এবং আবেগেভরা।

—নান্দীকর

কলকাতা

'প্রস্তর স্বাক্ষর' চিত্রের শুভমুক্তি

আশুতোষ মুখোপাধ্যায় রচিত জনপ্রিয় উপন্যাস 'শিলাপটে লেখা' অবলম্বনে 'প্রস্তর স্বাক্ষর' চিত্রটি এ সপ্তাহের ৪ঠা আগষ্ট থেকে রাধা, পূর্ণ, অরুণা প্রভৃতি চিত্রগৃহে মুক্তিলাভ করছে। সলিল দত্ত পরিচালিত ছায়াছবি প্রতিষ্ঠানের এই চিত্রে রূপদান করেছেন সৌমিত্র চট্টোপাধ্যায়, সন্ধ্যা রায়, বিকাশ রায়, অনুপকুমার, দিলীপ রায়, গীতালি রায়, তরুণকুমার, জহর রায়, ভানু বন্দ্যোপাধ্যায় ও বনানী চৌধুরী। এস, বি, ফিল্মস ছবিটির পরিবেশক।

'আনন্দ সংবাদ' চিত্রে উত্তমকুমার ও রাজকাপুর

প্রিয়া ফিল্মসের আগামী ছবি 'আনন্দ সংবাদ' চিত্রের দুটি প্রধান চরিত্রে উত্তমকুমার ও রাজকাপুর সম্প্রতি অভিনয়ের জন্য মনোনীত হয়েছেন। ছবিটি পরিচালনা করবেন বম্বের হৃষীকেশ মুখোপাধ্যায়। এ ছবির প্রযোজক হলেন অসীম দত্ত।

মুক্তিপ্রতীক্ষিত 'পরিশোধ' চিত্র

বিভূতিভূষণ মুখোপাধ্যায় রচিত ইকনমিক প্রোডাকসন্সের 'পরিশোধ' চিত্রটি বর্তমানে মুক্তিপ্রতীক্ষিত। অর্ধেন্দু সেন পরিচালিত এ ছবির প্রধান চরিত্রে রূপদান করেছেন সৌমিত্র চট্টোপাধ্যায়, মাধবী মুখোপাধ্যায়, সুলতা চৌধুরী, দিলীপ রায়, তরুণকুমার, জহর রায় ও মলিনা দেবী। সঙ্গীতপরিচালনায় রয়েছেন হেমন্ত মুখোপাধ্যায়।

'চিড়িয়াখানা'র চিত্রগ্রহণ

সত্যজিৎ রায় পরিচালিত স্টার প্রোডাকসন্সের রহস্য-চিত্র 'চিড়িয়াখানা'র চিত্রগ্রহণ সম্প্রতি শুরু হয়েছে নিউ থিয়েটার্স স্টুডিওয়। দীর্ঘ অসুস্থতার পর উত্তমকুমার এই ছবিতেই প্রথম কাজ বর্তমানে শুরু করেছেন। শরদিন্দু বন্দ্যোপাধ্যায় রচিত এ কাহিনীর মুখ্যচরিত্রে অভিনয় করছেন উত্তমকুমার, সুশীল মজুমদার, জহর গাঙ্গুলী, শৈলেন মুখোপাধ্যায়, শুভেন্দু চট্টোপাধ্যায়, প্রসাদ মুখোপাধ্যায়, বঙ্কিম ঘোষ, শ্যামল ঘোষাল, কণিকা মজুমদার, গীতালি রায়, সুব্রতা চট্টোপাধ্যায় ও সুধীরা রায়।

'লালবাঈ' চিত্রের শুভমহরৎ

জয়দেব চক্রবর্তী ও শঙ্কর রায়চৌধুরীর প্রযোজনায় জয়শঙ্কর প্রোডাকসন্স-এর পতাকাতলে রমাপদ চৌধুরীর 'লালবাঈ' চিত্রায়িত হচ্ছে। গত ২৮শে জুলাই ক্যালকাটা মুভিটোন স্টুডিয়োতে ছবিটির শুভমহরৎ উৎসব অনুষ্ঠিত হল। অনুষ্ঠানে পৌরোহিত্য করেন যশস্বী কথাসাহিত্যিক তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায় এবং ক্ল্যাপস্টিক দেন কথাশিল্পী রমাপদ চৌধুরী। ছবিটি পরিচালনা করবেন চিত্ত বসু। মহরৎ শিল্পী সাবিত্রী চট্টোপাধ্যায় 'চন্দ্রপ্রভা'-র চরিত্রে রূপ দেবেন।

'মিস্ প্রিয়ংবদা' মুক্তিপ্রতীক্ষিত

সুরঞ্জনা পরিবেশিত ইউ. টি-র হাসির ছবি 'মিস্ প্রিয়ংবদা' উত্তরা, পূরবী, উজ্জ্বলায় পরবর্তী আকর্ষণ হিসেবে চিহ্নিত। রবি বসু ও দুষ্মন্ত চৌধুরী পরিচালিত এই ছবিতে বিভিন্ন চরিত্রে রূপদান করেছেন ভানু বন্দ্যোপাধ্যায়, লিলি চক্রবর্তী, তরুণকুমার, জহর রায়, হরিধন, অজিত চ্যাটার্জি, অমর বিশ্বাস, নৃপতি চ্যাটার্জি শীতল ব্যানার্জি, শ্যাম লাহা, দীপিকা দাস, শিখা ভট্টাচার্য, রাজলক্ষ্মী দেবী তপতী ঘোষ, প্রেমাংশু বসু, দ্বিজু ভাওয়াল, মণি শ্রীমানী কিরণ কুমার, সৌরেন প্রভৃতি। সুধীর সেন ও আজাদ রহমানের সুরে গান গেয়েছেন প্রতিমা বন্দ্যোপাধ্যায়, মানবেন্দ্র মুখোপাধ্যায়, আরতি মুখোপাধ্যায়। গান লিখেছেন শঙ্কর ভট্টাচার্য।

বোম্বাই

অশোককুমারের নতুন ভূমিকা

অশোককুমার এই প্রথম চিত্রপরিচালনার নতুন ভূমিকা গ্রহণ করতে চলেছেন। অভিনয় ছাড়াও তিনি ছবিটি প্রযোজনা ও পরিচালনা করবেন। আগামী মাসে ছবিটির শুভসূচনা অনুষ্ঠিত হবে বলে জানা গেল।

জীতেন্দ্র-নন্দার নতুন ছবি 'জীবন-সাথী'

ডিপাল প্রোডাকসন্সের নতুন ছবি 'জীবন সাথী' চিত্রে পুনরায় জীতেন্দ্র-নন্দা নায়কনায়িকার ভূমিকায় মনোনীত হয়েছেন। ছবিটি পরিচালনা করবেন সুরোজ প্রকাশ। কল্যাণজী-আনন্দজী সুরকৃত এ ছবির অন্যান্য শিল্পীদের মধ্যে রয়েছেন শশিকলা, ললিতা পাওয়ার ও ধুমল।

গুরু দত্ত ফিল্মসের 'শিকার'

গুরু দত্ত ফিল্মসের নতুন ছবি 'শিকার'-এর অন্তর্দৃশ্য সম্প্রতি গুরু দত্ত স্টুডিওয়

গ্রহণ করলেন পরিচালক আত্মারাম। ধ্রুব চ্যাটার্জি রচিত এ কাহিনীর মুখ্য চরিত্রে অভিনয় করছেন ধর্মেন্দ্র, আশা পারেখ, সঞ্জীব কুমার, হেলেন, রমেশ দেও, মনমোহন কৃষ্ণ ও মুকুলা। শংকর-জয়কিষণ ছবিটির সংগীত-পরিচালক।

বিশ্বজিৎ-মালা সিনহার নতুন ছবি 'আধো আধো মে'

হৃষীকেশ মুখোপাধ্যায়ের নতুন ছবি 'আধো আধো মে'র নায়ক-নায়িকা চরিত্রে বিশ্বজিৎ ও মালা সিনহা নির্বাচিত হয়েছেন। এই রঙিন ছবির অন্যান্য ভূমিকায় অভিনয় করবেন দেবেন বর্মা, বিজয়া চৌধুরী, ডেভিড, রাজমেহরা ও অভি ভট্টাচার্য। রাহুল দেব বর্মণ ছবিটির সংগীত-পরিচালনা করবেন।

।। সানাই ।।

নিঃসীম অন্ধকারের নির্জনতায় যখন সানাই বাজে তখন মনে হয় হৃদয়ের কোন্ এক অব্যক্ত বেদনা যেন গুমরে গুমরে কেঁদে উঠছে, আর সানাইয়ের সুরে সেই কান্না অবিশ্রান্ত ঝরে পড়ছে। এই বেদনা-ঘন সুরমূর্ছনা রূপলাভ করেছে সম্প্রতি নর্থ ক্যালকাটা ড্রামাটিক ক্লাব প্রযোজিত সঞ্জয় রচিত 'সানাই' নাটকে।। এ এক বিয়োগান্ত নাটক, চলমান জীবনের করুণতম বিদায় মুহূর্তে যে সুরের বিস্তার, সেই পথেই এ নাটক চলেছে এক আর্ত অনুভূতির পেলবতায়। স্বভাবতঃই আবেগের তীব্রতা আর সুরের মায়া নাটকের বাস্তব ঘটনার মধ্যে দিয়ে এগিয়ে যাওয়ার গতিকে মাঝে মাঝে প্রতিহত করেছে। তাই নাটকীয় মুহূর্তসৃষ্টি যতোটা আবেগসমৃদ্ধ হয়ে উঠেছে, ততোটা নাটকীয় ঘাত-প্রতিঘাতে মুখর হয়ে ওঠেনি। কিন্তু দর্শকের মনকে এ নাটকের বেদনা একেবারে আচ্ছন্ন করে রেখেছিল, এ-কথা স্বীকার করতেই হবে।

বিষাদ-বেদনার নাটক 'সানাই'-এর মঞ্চ রূপ দিতে 'নর্থ ক্যালকাটা ড্রামাটিক ক্লাবের' শিল্পীরা আন্তরিক নিষ্ঠার পরিচয় দিয়েছেন। সংঘবদ্ধ অভিনয়ের বলিষ্ঠতা দিয়ে এই আবেগপ্রধান নাটকটিকে অনেকাংশে যুক্তিনির্ভর করে তুলতে চেষ্টা করেছেন। নির্দেশক রামনারায়ণ অধিকারীর এ বিষয়ে আরো সচেতন হওয়া উচিত ছিল। হিমাংশু সোমের পল্টন্য চরিত্রে রূপদান মোটামুটি সার্থক। চরিত্রটির গভীরে শিল্পী প্রবেশ করতে পেরেছেন বলে মনে হয়। স্মৃতিময়, 'মিত্তির' ও 'রাই' চরিত্রে বিজন দাস, তপন মুখোপাধ্যায়, কল্পনা ভট্টাচার্যের অভিনয় উল্লেখযোগ্য।

অন্যান্য চরিত্রে রূপদান করেছেন স্বপন-কুমার মুখোপাধ্যায়, সরোজকুমার দাস, ভোলানাথ দে, মধুসূদন লাহিড়ী, নিরঞ্জন ভট্টাচার্য, সমীরকুমার ঘোষ, সুনীল সামন্ত, অরুণকুমার পালধি, সুব্রত ঘোষ, মঞ্জুশ্রী রায়চৌধুরী। দ্বিজেন গুপ্তের সুরসৃষ্টি নাটকের প্রতিটি মুহূর্তের বেদনাকে মূর্ত করে তুলতে যথেষ্ট সাহায্য করেছে।

।। বকুলতলা পি এল ক্যাম্প ।।

বিচিত্রা নাট্য সংস্থার শিল্পীবৃন্দ সম্প্রতি মুক্ত অঙ্গন মঞ্চে অভিনয় করেন নারায়ণ সান্যাল রচিত বকুলতলা পি এল ক্যাম্প নাটক। দেশবিভাগের পর যে সব বাস্তুহারা এদেশে এসে ক্যাম্পে আশ্রয় নিয়েছিল তাদেরই হাসি-কান্না সুখ-দুঃখের সংঘাতে গড়ে উঠেছে এই নাটক। যে সমস্যা এ নাটকে রূপায়িত হয়েছে তাকে হয়তো বহুদিন আগের কোন ঘটনা বলে মনে হবে, কিন্তু নাট্যকার ঘটনার বিস্তার আর চরিত্র উপস্থাপনা এমনভাবে করেছেন যাতে করে অতি আধুনিক এক পরিবেশন সৃষ্টি হয়েছে।

বকুলতলা পি এল ক্যাম্পের মঞ্চ রূপায়ণে কোন জাকজমকের আশ্রয় নেওয়া হয়নি; আলোক সম্পাতেও কোন চাকচিক্য ছিল না। অত্যন্ত সাধারণভাবে উপস্থাপিত হয়েছে এ নাটক। মাঝে মাঝে কয়েকটি সাংকেতিক মুহূর্ত সৃষ্টি করে নাটকের গতিকে একটা সুষ্ঠু পরিণতির দিকে এগিয়ে নিয়ে যাবার চেষ্টা করা হয়েছে। উন্নত ধরনের টিমওয়ার্ক এই নাট্য-প্রযোজনাকে এক অসাধারণ বৈশিষ্ট্য দিতে পেরেছে। বিচিত্রার শিল্পীবৃন্দের প্রচেষ্টা এ-দিক দিয়ে অভিনন্দনযোগ্য।

অভিনয়ের দিকে প্রথমেই দৃষ্টি আকর্ষণ করে মঞ্জুলা ভট্টাচার্যের অভিনয়। কমলা চরিত্রের বেদনাত্মক রূপ তাঁর অভি-

চিত্ত বোস পরিচালিত **লালবাই** চিত্রের মহরতে সাবিত্রী চট্টোপাধ্যায় ও তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়। ফটো : অমৃত
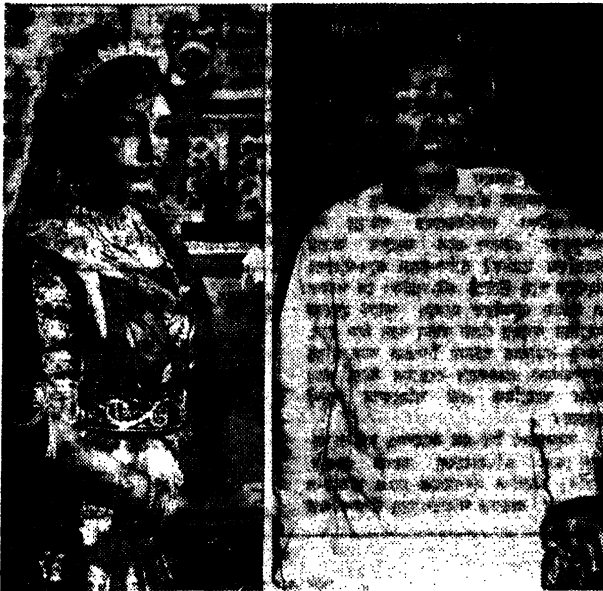
নয়ে আশ্চর্য সুন্দরভাবে প্রতিফলিত হয়েছে। নির্দেশক বিমল দেবের "বড় খোকা"র চরিত্রচিত্রণ উল্লেখযোগ্য। অন্যান্য চরিত্রে ভালো অভিনয় করেন চুণী চট্টোপাধ্যায়, খগেশ চক্রবর্তী, বাদল সমাদ্দার, বিমল বন্দ্যোপাধ্যায়, কমল মজুমদার, শচীন বসু, সমীর মিত্র, তরুণ মিত্র, বিবেক সারথী চৌধুরী, বিকাশ বসু, বিভাস দাশগুপ্ত, সন্তু চক্রবর্তী, সুনীল বসু ও সন্দীপ মিত্র।

।। রূপকার শিল্পীগোষ্ঠী ।।

রাণাঘাটের রূপকার শিল্পীগোষ্ঠী স্থানীয় রবীন্দ্রভবন মঞ্চে সম্প্রতি রবীন্দ্রনাথের 'শেষরক্ষা' নাটক পরিবেশন করেছেন। দলগত অভিনয়গুণে নাটকের মধ্যে যে নির্মল কৌতুকরস আছে তা উজ্জ্বল হয়ে উঠেছে। গোপাল মল্লিকের নির্দেশনায় নিষ্ঠার ছাপ আছে এবং তাতে নাটকের গতি শেষপর্যন্ত অব্যাহতই থেকেছে। অজিত বন্দ্যোপাধ্যায়ের গদাই, বিশ্বনাথ বসুর বিনোদ, বিপাশা সিংহের ইন্দুমতী, মঞ্জু দাসের ক্ষান্তমণি, গোপাল মল্লিকের চন্দ্রকান্ত উল্লেখযোগ্য চরিত্রচিত্রণ। অন্যান্য চরিত্রে সুঅভিনয় করেন তপতী নাগ, দীপিকা দাস, মণীন্দ্র গুপ্ত, দুলাল কুণ্ডু, প্রশান্ত মুখোপাধ্যায়, দেবদাস ঘোষ, বাপী ভট্টাচার্য, গোবিন্দ রায়চৌধুরী।

।। হাওড়া পার্সেল রিক্রিয়েশন ক্লাব ।।

কোন ক্লাসিক নাটকের প্রযোজনায় নিখুঁত অভিনয় ও শিল্পীদের চরিত্রোপলব্ধির গভীরতা থাকা বিশেষভাবে প্রয়োজন। যদিও একথা সব নাটকেরই সাফল্যের মানদণ্ড, তবুও ক্লাসিক নাটক বলতে আমরা বুঝি সেই নাটক যা যুগের সীমা পেরিয়ে জনগণের মনে একটা স্বতন্ত্র আবেদন সৃষ্টি করে। এই নাটকের প্রতিটি চরিত্রের রূপায়ণ সম্পর্কে মানুষের মনে একটা ধারণা আছে, তা ব্যাহত হোলে শুধু ঐতিহ্যানুরাগই বিপর্যস্ত হয় না, নাটকের যথার্থ গতিও অব্যাহত থাকে না। দ্বিজেন্দ্রলাল রায়ের শাহ্‌জাহান নাটক ক্লাসিক সৃষ্টির সম্মান পেয়েছে। প্রখ্যাত শিল্পী সমবয়ে বহু রাত্রি অভিনীত এই নাটক প্রতিটি বাঙালীর কাছে অতি পরিচিত। তাই এর অভিনয়রীতির সম্পর্কে যুগক্রান্ত স্থির বিশ্বাস ভাষা পেয়েছে। সম্প্রতি হাওড়া পার্সেল রিক্রিয়েশন ক্লাবের 'শাহ্‌জাহান' নাট্যপ্রযোজনা দেখে বহুবার মনে হয়েছে এ নাটক ক্লাসিকের আঙ্গিকে পরিবেশিত হোতে বাধা পড়ছে। সংঘবদ্ধ অভিনয়ে মর্মান্তিকভাবে শৈথিল্য চোখে পড়েছে এবং প্রতিটি চরিত্রের শিল্পীদের উপলব্ধি এমন একটা সীমায় পৌঁছতে পারেনি যেখান থেকে বলা যেতে পারে এই ক্লাসিক নাট্যপ্রযোজনা সার্থক। তবু সঙ্গে সঙ্গে এ-কথাও বলবো আর কিছুদিন অনুশীলনে মগ্ন থাকলে এ প্রযোজনা অন্ততঃ ক্লাসিক নাটকের মহিমাকে ক্ষুণ্ণ করতো না।

নাটকের শুরুতে তাজমহলের দিকে শাহ্‌জাহানের তাকিয়ে থাকা নাটকের গতি ও চরিত্রের গভীরতার দিক দিয়ে সার্থক। কিন্তু নেপথ্য থেকে শাহ্‌জাহান কাহিনীর বহু প্রচার ও অমরত্বের কথা উচ্চকণ্ঠে ঘোষণা করার কোন উপযোগিতা আছে বলে মনে করি না। তাজমহলের দিকে উদাস দৃষ্টি মেলে তাকিয়ে থাকা, ও যন্ত্রণায় দীর্ঘশ্বাস ফেলার মধ্যে যে গভীরতা থাকতো বাণী পাঠে তা ক্ষুণ্ণ হয়েছে। অভিনয়ের দিক থেকে সুবোধ রায়চৌধুরীর ঔরংজীব মন্দ নয়। কিন্তু এই চরিত্রে মুখের কথার বিন্যাস আর চোখের ভঙ্গিমার মধ্যে যে দুস্তর ব্যবধান তা বোধ হয় সব সময় শিল্পীর অভিনয়ে মূর্ত হয়ে উঠতে পারেনি। তবুও বলতে হয় আত্যন্তিক নিষ্ঠা আর স্থিরপ্রত্যয়ের সঙ্গে তিনিই অভিনয় করেছেন। শাহ্‌জাহানের ভূমিকায় ধীরেন বন্দ্যোপাধ্যায় মঞ্চকে মোটেই স্পর্শ করতে পারেননি, এতো দ্রুত গতিতে অভিনয় এই চরিত্রের যন্ত্রণা প্রকাশের পক্ষে মোটেই যুক্তিযুক্ত নয়। হতাশ করেছেন জাহানারা চরিত্রে প্রবীণা অভিনেত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। মোরাদ, মহম্মদ ও সোলেমান চরিত্রে বীরেন গুহ, অসীম ঘোষ, অরবিন্দ বন্দ্যোপাধ্যায় আমাদের নিরাশ করেছেন। ঠিক একইভাবে দিলদার চরিত্রের সূক্ষ্মতা অজিত ভাদুড়ীর অভিনয়ে স্পষ্ট হয়নি। প্রতিমা পালের পিয়ারা সুন্দর, প্রাণচঞ্চল, প্রণব পালের সুজা উল্লেখযোগ্য। কেশব বন্দ্যোপাধ্যায়ের দিলদার চরিত্রের অভিনয় অসহ্য। তাঁর স উচ্চারণ সম্পর্কে নির্দেশককে আরো অনেক বেশী সচেতন হওয়া উচিত ছিল।

সুবোধ রায়চৌধুরী নির্দেশিত এই নাটকের অন্যান্য ভূমিকায় অভিনয় করেন শঙ্কর ঘোষ, মঞ্জু মিত্র, বিপদবরণ রায়, দ্বিজেন ঘোষ, শক্তিপদ রায়, স্মৃতি মজুমদার, ভবেশ বেরা, অতুল দেব, রবীন ধর, গণেশ সরকার, মোহন ঘোষ, গৌরী বন্দ্যোপাধ্যায়, অনামিকা রায়।

সব্যসাচীর মিনিস্টার

সব্যসাচী শিল্পীগোষ্ঠী তাঁদের নতুন প্রযোজনা বহুল আলোচিত নাটক 'মিনিস্টার' নিয়ে মঞ্চে অবতীর্ণ হচ্ছেন আগামী শুক্রবার ৪ঠা আগস্ট সন্ধ্যা ৭টায় থিয়েটার সেন্টার মঞ্চে। বুলগেরিয়ান নাটক 'গোলেমানভ' অনুসরণে এটিকে বাংলায় রূপান্তরিত করেছেন শ্রীজ্ঞানেশ মুখোপাধ্যায়। নাটক নির্দেশনা দিলীপ মজুমদারের। মঞ্চ-শিল্পী সিধু ভট্টাচার্য। নাটকটির বিভিন্নাংশে অভিনয় করবেন সর্বশ্রী কল্যাণী অধিকারী, সত্যা পাল, মীনা সেন, অঞ্জনা মল্লিক, বীরেন দত্ত, সচ্চিদানন্দ মুখোপাধ্যায়, শ্যামল নাগ, হিতেন মুস্তাফী, শঙ্কর বসাক, নির্মল পোদ্দার, অরুণ ঘোষ, অশোক চক্রবর্তী, সিধু ভট্টাচার্য ও দিলীপ মজুমদার।

।। জি এম্‌স্ অফিস (গার্ডেনরীচ) রিক্রিয়েশন ।।

সম্প্রতি দক্ষিণ-পূর্ব রেলপথের জি এমস অফিস (গার্ডেনরীচ) রিক্রিয়েশন ক্লাবের সভ্যবৃন্দ বীরু মুখোপাধ্যায়ের মঞ্চসফল নাটক 'বন্দর' অভিনয় করেছেন। এই নাট্যপ্রযোজনায় আগের অভিনয় মান অক্ষুণ্ণ থেকেছে এবং বলা যেতে পারে শিল্পীদের অভিনয়গত বলিষ্ঠতা এখানে হয়েছে আরো

মুখর। প্রয়োগ-পরিকল্পনায় বাসুদেব ভট্টাচার্য অসাধারণ বৈশিষ্ট্য চিহ্নিত করতে পেরেছেন এবং তাঁর নির্দেশনায় সূক্ষ্ম শিল্পবোধের এক ব্যঞ্জনাময় রূপ প্রকাশ পেয়েছে। প্রতিটি শিল্পী আন্তরিক নিষ্ঠার সংগে অভিনয় করে চরিত্রগুলোকে মঞ্চে প্রাণবন্ত করে তুলেছেন।

সুপ্রযোজিত এ নাটকে যাঁরা অংশগ্রহণ করেছিলেন তাঁরা হলেন ভোলা চৌধুরী, অনিল সান্যাল, নীতিশ বাগচী, হরি-নারায়ণ চক্রবর্তী, দিলীপ ভদ্র, শিবনাথ ভদ, সুশীল মুখোপাধ্যায়, কাঞ্চন ঘোষ, কমলা বসু, শিশির ঘোষ, পুতুল চক্রবর্তী, কমলা বন্দ্যোপাধ্যায়, ইরা মিত্র প্রভৃতি।

বিবিধ সংবাদ

ম্যাগসেসে পুরস্কারে সম্মানিত সত্যজিৎ রায়

সংবাদে প্রকাশ, ম্যাগসেসে ফাউন্ডেশন সংস্থা চলচ্চিত্র-পরিচালক সত্যজিৎ রায়কে তাঁর শিল্পকৃতির জন্য ম্যাগসেসে পুরস্কারে

সত্যজিৎ রায়

সম্মানিত করবেন বলে সিদ্ধান্ত নিয়েছেন। আগামী ৫ই আগস্ট এই পুরস্কার সরকারী-ভাবে ঘোষিত হবে।

শ্রীরায় তাঁর শিল্পকৃতির মাধ্যমে সাধারণ মানুষের প্রতি যে মমত্ববোধ এবং সহানু-ভূতির পরিচয় দিয়ে এসেছেন তারই পরি-প্রেক্ষিতে এই বিশেষ পুরস্কারটি বিবেচিত হয়েছে।

ইতিপূর্বে এই ম্যাগসেসে পুরস্কারে ধন্য হয়েছেন আচার্য বিনোবা ভাবে, জয়প্রকাশ নারায়ণ এবং সাংবাদিক অমিতাভ চৌধুরী। এই পুরস্কারের অর্থমূল্য দশ হাজার মার্কিন ডলার।

সংগীত শিল্পী চন্দ্রাণী মুখোপাধ্যায়

শিল্পী শ্রীচন্দ্রানী মুখোপাধ্যায় বিভিন্ন অনুষ্ঠানে সংগীত পরিবেশন করে ইতিমধ্যে
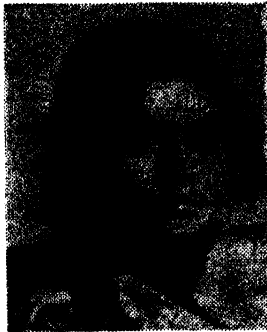
চন্দ্রাণী মুখোপাধ্যায়

বেশ সুনাম অর্জন করেছেন। তার সুন্দর কণ্ঠ শ্রোতৃমণ্ডলীকে অভিভূত করে। সম্প্রতি তার দুটি আধুনিক গান রেকর্ড হয়ে বেরিয়েছে হিজ মাস্টার্স ভয়েস থেকে। সলিল চৌধুরীর সুরে গাওয়া গান দুটি হোল : 'যমুনা ধীরে বহনা...' ও 'যায় যদি যাক না...'। শ্রীমতী চন্দ্রানীর কণ্ঠের সংগে প্রখ্যাত গায়িকা লতা মুঙ্গেশকরের কণ্ঠের একটি অপূর্ব সাদৃশ্য লক্ষ্য করা যায়। এই অল্প বয়সে সংগীত পরিবেশনে তিনি যে মৌলিকত্বের পরিচয় দিয়েছেন, তা সচরাচর লক্ষ্য করা যায় না। সাধনার পথ বিচ্যুতি না ঘটলে শ্রীমতী মুখোপাধ্যায়ের ভবিষ্যৎ জীবন যে বিশিষ্টতায় চিহ্নিত হবে তা নিঃসন্দেহে বলা যায়।

সুরসভার 'বর্ষামঙ্গল'

গত ২১শে জুলাই পরাশর রোডস্থিত রবিতীর্থ ভবনে সুরসভার শিল্পীবৃন্দ রথীন চৌধুরীর পরিচালনায় "বর্ষামঙ্গল" গীতালেখ্য পরিবেশন করেন। সংগীতে অংশ নেন শ্যামলী দে সরকার, রঞ্জিতা বন্দ্যো-পাধ্যায়, তনিমা মুখোপাধ্যায়, কবিতা গুহ-ঠাকুরতা, মধুছন্দা বসু, হাসি দত্ত, ইন্দ্রাণী চট্টোপাধ্যায়, আরতি বসাক, দীপা দত্ত, মৃন্ময়ী মন্ডল, দীপালি চৌধুরী, শ্রীপর্ণা ঘোষদস্তিদার, চন্দ্রা মুখোপাধ্যায়, স্বর্ণা সান্যাল, রথীন চৌধুরী ও কিশোর নন্দী। অনুষ্ঠানের সবকটি গানই সুগীত। সমবেত সংগীতগুলির পরিবেশনায়ও যথেষ্ট নিষ্ঠার পরিচয় পাওয়া গেল।

মূকাভিনেতা শ্রীকালীনাথের ভ্রাম্যমাণ 'মূক-মেলা'

গত ৩০শে জুলাই, মূকাভিনেতা শ্রীকাশীনাথের চিত্র ও আলোকচিত্রের মাধ্যমে ভ্রাম্যমাণ ('মূক-মেলা'র) মূকাভিনয় প্রদর্শনীর সমাপ্তি দিবস পালিত হল। এবং 'মূক-মেলা'র দুটি শেষ প্রদর্শনী, ঐদিন সকাল ৮টা থেকে ৯টা পর্যন্ত হাওড়া স্টেশনের কাছে এবং বেলা ৯-৩০ থেকে ১০-৩০টা পর্যন্ত শিয়ালদহ স্টেশনের কাছে অনুষ্ঠিত হয়।

সায়ান্স-ফিকশান সিনে ক্লাব "ওয়ার অভ দি ওয়ার্ল্ডস"

এচ জি ওয়েলস ১৮৯৮ সালে তাঁর ক্লাসিক বহুবিক্রীত বিজ্ঞানসুবাসিত উপ-ন্যাস ওয়ার অভ দি ওয়ার্ল্ডস (গ্রহে গ্রহে যুদ্ধ) লিখে পৃথিবীর মানুষকে সচকিত করে তোলেন। সেই কাহিনী দিয়ে সিনেমা দর্শকদের শিহরিত করে তোলার জন্য রঙিন ফিল্ম "ওয়ার অভ দি ওয়ার্ল্ডস" উঠেছে। প্যারামাউন্টের জর্জ পাল প্রযোজিত এ ফিল্মে মঙ্গলগ্রহীদের পৃথিবী হামলার বিভীষিকা দেখানো হয়েছে। নির্মম অমঙ্গল-ময় মগদস্যুর মতো এরা মানুষকে আক্রমণ করেছে, তাদের চলার পথে সবকিছু লুঠ-পাট ধ্বংসবিধ্বস্ত করে গেছে। জগছাড়া এই জীবগুলোকে মানুষ বাগে আনার যে চেষ্টা করেছে, তার কয়েকটি দৃশ্য ফিল্মে এমনভাবে তোলা হয়েছে, যা বহুদিনের সিনেমা দেখার গভীর তৃপ্তি দেবে।

এই বিখ্যাত ফিল্মটির একটি নূতন সংশোধিত প্রিন্ট কলকাতার লাইটহাউস সিনেমায় আগামী ১৫ই আগস্ট সকালে

মস্কো চলচ্চিত্র উৎসবে প্রদর্শিত **জোসায়া** চিত্রে পোলিশ অভিনেত্রী পোলা রাক্সা

কেবলমাত্র সায়ান্স-ফিকশ্যান সিনে ক্লাবের সদস্যদের জন্য দেখানো হবে।

দুই মহল

আগামী ৮ই আগস্ট সন্ধ্যা ৬টায় মিনার্ভা থিয়েটারে ইউনাইটেড ব্যাংক অফ ইন্ডিয়া (বড়বাজার শাখা) রিক্রেয়েশন ক্লাব কর্তৃক জোছন দস্তিদারের 'দুই মহল' নাটক অভিনীত হবে। পরিচালনার দায়িত্ব নিয়েছেন শ্রীশিশির চক্রবর্তী।

আড়াল সংস্থার অনুষ্ঠান

রবীন্দ্রোত্তর যুগে নতুন নৃত্যনাট্য রচনা, সংগীত রচনা, নৃত্য পরিকল্পনা ও নবতর সুর সংযোজনার প্রচেষ্টা বিরল। 'আড়াল' সংস্থা গত ১১ই জুলাই মহাজাতি সদনে এমন একটি নৃত্যনাট্য 'ফসল' মঞ্চস্থ করেছেন। নৃত্যনাট্যটির সামগ্রিক পরিকল্পনা ও সুর সংযোজনা করেছেন তরুণ সংগীত শিল্পী তাপস বন্দ্যোপাধ্যায়। এই বলিষ্ঠ নৃত্যনাট্যটির পরিকল্পনায় তাঁর উদ্যোগ ও প্রচেষ্টা সত্যি প্রশংসনীয়।

খরার পরিপ্রেক্ষিতে রূপক নৃত্যনাট্য 'ফসল' মৌলিক ও মানবিক আবেদন সমৃদ্ধ। নাট্যরচনা ও সংগীতরচনায় কৃতিত্ব দেখিয়েছেন অমিতাভ চক্রবর্তী ও স্বরাজ বসু। নৃত্যপরিচালনায় কৃতিত্ব দেখিয়েছেন মায়া চট্টোপাধ্যায়। নৃত্য, সংগীত ও সংলাপে অংশ গ্রহণ করেছেন কৃষ্ণা রায়, শিপ্রা ঘোষ, মায়া চট্টোপাধ্যায়, আরতী বসাক, তনিমা মুখোপাধ্যায়, উমা মুখোপাধ্যায়, মঙ্গলা মুখোপাধ্যায়, ক্ষমা মুখোপাধ্যায়, ভারতী বসাক, পৃথা সামন্ত, চন্দ্রা সাহা, নীপা সাহা, তাপস বন্দ্যোপাধ্যায়, রীতা হালদার, স্বপ্না মুখোপাধ্যায়, ভোলানাথ দাস, তপতী বন্দ্যোপাধ্যায়, রাজকুমার চট্টোপাধ্যায় ও সুকুমার সরকার। এই সঙ্গেই মঞ্চস্থ হয় সুকুমার সরকারের নাটক 'আত্মপ্রকাশ'। এটি জটিল মনস্তত্ত্বে ভরা মোটামুটি ভাল নাটক। স্বরাজ বসুর নির্দেশনা প্রশংসনীয়। অভিনয়ে স্বরাজ বসু, সুকুমার সরকার, পৃথ্বীশ মুখোপাধ্যায়, অমিতাভ চক্রবর্তী, গোপা বন্দ্যোপাধ্যায় কৃতিত্বের পরিচয় দিয়েছেন। আবহ সংগীত রচনায় 'কম্বোডিয়ান গ্রুফ' প্রশংসার দাবী রাখে।

বিহার আর্ট থিয়েটার

গত ১১ই জুন সন্ধ্যায় বিহার আর্ট থিয়েটারের বিখ্যাত হিন্দী নাটক 'বহুরূপী' (হিন্দী) পাটনার রবীন্দ্রভবনে দুর্ভিক্ষ পীড়িতদের সাহায্যার্থে মঞ্চস্থ হয়।

'বহুরূপী' নাটকটির অভিনয়ে ৩৪০: টাকা বিহার রিলিফ কমিটি সংগ্রহ করেন এব পাটনার বাহিরে অন্যান্য শহরে রিলিফ কমিটির অর্থসংগ্রহের জন্য অভিনয়ের ব্যবস্থা করা হয়েছে।

মস্কো চলচ্চিত্র উৎসবের ফলাফল

এবারের মস্কো চলচ্চিত্র উৎসবে যুগ্মভাবে সর্বোচ্চ পুরস্কার পেয়েছে সোভিয়েট চিত্র 'দি জার্নালিস্ট' এবং বুলগেরিয়ান চিত্র 'ডিভিয়েশান'। শ্রেষ্ঠ অভিনেতার পুরস্কারে সম্মানিত হয়েছেন পল স্কফিল্ড 'এ ম্যান ফর অল সিজিনস' চিত্রে। শ্রেষ্ঠ অভিনেত্রীর পুরস্কার যুগ্মভাবে পেয়েছেন স্যান্ডি ডেনিস ('আপ দি ডাউন স্টেয়ারসে' চিত্রে) এবং গ্রুনেট মলভি ('স্টম্পা ফলস ইন লাভ' চিত্রে)।

এছাড়া ভারতীয় চিত্র "তিসরী কসম" উৎসবে প্রশংসিত হয়। ভারতীয় প্রতিনিধিদের মধ্যে এ উৎসবে উপস্থিত ছিলেন রাজকাপুর, ওয়াহিদা রেহমান ও মুকেশ। শিশুচলচ্চিত্র উৎসবের বিচারক হিসেবে শ্রীমতী নার্গিসও উপস্থিত থাকেন।

জার্নালিস্ট চিত্রে সার্গেই গেরাসিমভ

গানের জলসা

খরাত্রাণে ইয়ুথ পাপেট্ থিয়েটার

২১শে এবং ২২শে জুলাই ইয়ুথ পাপেট থিয়েটারের তরুণ শিল্পীগোষ্ঠী আয়োজিত, নৃত্যগীত ও নাট্যানুষ্ঠান অভিনন্দনযোগ্য এই কারণে যে, আহৃত অর্থ প্রধানমন্ত্রীর খরাত্রাণ তহবিলে আর্ত-মানুষের সেবায় নিবেদিত। কিশোর দলের এই উদ্যম অসার্থক হয়নি।

দুদিনের অনুষ্ঠানে এঁরা যথাক্রমে 'আলিবাবা' ও 'দুষ্ট শেয়াল' মঞ্চস্থ করেন। 'ইন্ডিয়া ইজ দি হোম্ অফ দি পাপেট. প্লে' মন্তব্য করেছিলেন এক প্রাচ্যভাবানুরাগী জার্মান নাট্যবিদ্।

বাংলাদেশে পুতুলনাচ এক স্থূল ও অসুন্দর রূপ বোধহয় এই পুত্তলিকা নৃত্যেরই এক ধারা।

কেরালায় এই পৌত্তলিকা-নাটকের এক সূক্ষ্মসুন্দর রূপায়ণ ঘটেছিল। রং ও রূপের রূপসম্মত সমন্বয় দেখা গিয়েছে ওঁদের স্বনির্মিত সুন্দর মূর্তিগুলিতে। এই মূর্তিগুলির গতিবেগ নিয়ন্ত্রিত হোতো লম্বা সরু ছড়ি দিয়ে।

ভারতের এই প্রাচীন শিল্পকর্মের প্রবর্তন ও উন্নয়নে আত্মনিয়োগ করে পাপেট থিয়েটার তারুণ্যের স্বাভাবিক কর্মক্ষমতা ও উদ্দীপনাকে মহৎ কাজেই ব্যয় করছেন। রাবার, কাষ্ঠখণ্ড নির্মিত পুত্তলিকাগুলি রঙের সমন্বয়ে জীবন্ত করা হয়েছে। উপযুক্ত সংগীত ও শব্দযোজনে এঁদের বক্তব্য ফুটে উঠেছে। পুতুল তৈরী, সংগীত ও শব্দসৃষ্টির জন্য প্রশংসার দাবী করতে পারেন ইয়ুথ পাপেট রিসার্চ ইউনিট, শৈলেন মুখার্জি, অবনী কর্মকার এবং সুরেন প্রসাদ। সুরেন চক্রবর্তীর পরিচালনা যথাযথ।

শিশুদের সত্যিকারের আনন্দের উৎস হিসাবে এই প্রতিষ্ঠানের মূল্য কম নয়। কচিকাচ কণ্ঠের কলহাসি ও উল্লাসে মুখরিত প্রেক্ষাগৃহই তার প্রমাণ।

সেনী সংগীত সমাজ

সেনী সংগীত সমাজের অধিবেশন বসেছিল এবার ৬৫ নং কর্ণওয়ালিশ স্ট্রীটে।

শুরু হোলো শ্রীজগন্নাথ মুখোপাধ্যায়ের ...পদ দিয়ে। ইনি আসর উন্মোচন করলেন ...ন ও ছায়ানট রাগে, রাধিকা গোস্বামী ও ...ভট্ট রচিত দুটি ধ্রুপদ সংগীত দিয়ে। মুখোপাধ্যায়ের কণ্ঠস্বরে ধ্রুপদের উপযুক্ত গাম্ভীর্য আছে. বিস্তার পদ্ধতিও ...সম্মত। সংগীতচয়নও রুচির পরিচয় ছিল। অনুষ্ঠান সমাপ্ত করলেন অনন্তলাল বন্দ্যোপাধ্যায়ের রচিত 'জয়বাণী কানাড়া' দিয়ে। চৌতাল, সুরফাকতাল, ধামার ও ঝাঁপতালে এর সংগে যথাযোগ্য পাখোয়াজ সংগত করেছেন শ্রীগোপাল প্রামাণিক।

এই আসরে খেয়াল গেয়ে শোনালেন শ্রীশম্ভু ভট্টাচার্য। রাগ মিঞাকিমল্লার। চাপা জোয়ারীর কণ্ঠস্বরে তানের কাজ ভালই। বিস্তারের অংগ কিছু দুর্বল। লয়ের সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম কাজ না থাকলেও দখল আছে।

অন্যান্য অনুষ্ঠানের মধ্যে মালকোষ রাগে খেয়াল গাইলেন শ্রীগোপাল দে ও কৃষ্ণকিশোর ঘোষ। তবলায় ছিলেন সমীর চ্যাটার্জি।

সভাপতিত্ব করেছিলেন পি জি রাণাডে। সুবিজ্ঞাত নয় অথচ মোটামুটি এক সংগীত-মানের অধিকারী নির্মীয়মান শিল্পী-গোষ্ঠীর এই আসর সুষ্ঠু প্রযোজনার গুণে বেশ উপভোগ্যই হয়ে উঠেছিল। নামী শিল্পী ছাড়াও সংগীতের আহ্বান করা যায় এবং শিল্পীদের সত্যিকারের শিক্ষা থাকলে তা শ্রোতাদের আনন্দ দিতে পারে। এই পরিপ্রেক্ষিতে বিচার করলে এই সান্ধ্য-আসরের মূল্য খুঁজে পাওয়া সহজ হয়।

সেনী সংগীত সংগম

আগের সংখ্যায় (১১ই শ্রাবণ) প্রকাশিত গানের জলসায় সংগীত সংগম নামে শ্রীবীরেন্দ্রকিশোর রায়চৌধুরীর শিক্ষাধীনে এক নবসৃষ্ট সংগীত প্রতিষ্ঠানের সংবাদ প্রকাশিত হয়েছে। সম্প্রতি শ্রীরায়চৌধুরী আমাদের জানিয়েছেন যে, অনিবার্য কারণ-বশত সংগীত সংগম নামটির পরিবর্তন করে 'সেনী সংগীত সংগম' নাম করা হয়েছে।

ব্রজেন্দ্রকিশোর সংগীত সম্মেলন

ব্রজেন্দ্রকিশোর সংগীত সম্মেলনের মাসিক অধিবেশন অনুষ্ঠিত হয় তাঁরই পুত্র সংগীতবিদ ও শিল্পী কুমার বীরেন্দ্র-কিশোর রায়চৌধুরীর বালিগঞ্জ সার্কুলার রোডস্থ ভবনে।

এখানে আমরা সচরাচর সম্মেলন ও জলসায় শুনতে পাওয়া যায় না, এইরকম এক অতি জানা অথচ নতুন শিল্পীর কণ্ঠসংগীত শোনবার সুযোগ পেয়েছি। ইনি হলেন দিল্লীবাসী শ্রীমতী শোভনা নায়ার। সেখানকার রেডিও স্টেশনে দায়িত্বপূর্ণ পদে আসীন। ইনি গাইলেন শ্যামকল্যাণ। আগ্রা ঘরানার গায়কী ও বৈশিষ্ট্য এর ক্রমবিস্তার ও তানে সুবিশ্লেষিত। তবে আস্থায়ী অংগে বোলতান সরগম ও তানের সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম যেসব কাজ শোনা গেল অন্তরা অংগে তার কিছু যেন অভাব। এখানে তিনি বিস্তারের চেয়ে তানের ওপরই জোর দিয়েছেন বেশী। তবে ছুটতানের পরই তাঁর সমে ফেরার ভংগীটি খুব শিল্পীজনোচিত। শ্রীমতী নায়ারের শিক্ষা আছে, রাগাবয়ব ও গতি সম্বন্ধে সুস্পষ্ট ধারণা আছে, তাই আংশিকভাবে বৈচিত্র্যের অভাব থাকলেও সামগ্রিকভাবে তাঁর গান শ্রোতাদের তৃপ্তি দিতে পেরেছে।

এ আসরের বিস্ময়কর আনন্দানুষ্ঠান হলো শ্রীমতী নায়ারের ছ' বছরের শিশুপুত্র শ্রীমান রাহুল নায়ারের কথক নৃত্য। এই শিশুশিল্পী কোনো গুরুর কাছে শিক্ষা পাননি, নিয়মিত রেওয়াজও করেন না। অথচ পাখোয়াজের সকল রকম দুরূহ তালের সংগে অত্যন্ত নির্ভুল ও সুন্দরভাবে পরন, চরন ও ভাও প্রদর্শন করলেন। ৪৫ মাত্রার চক্রধার পরিক্রমণান্তে সুদক্ষ ও সুশিক্ষিত শিল্পীর মত ঋজু ও সপ্রতিভ ভঙ্গীতে দাঁড়ানো সকলের অকৃপণ প্রশংসা আদায় করে ছেড়েছে।

আসর সমাপ্ত হয় কুমার বীরেন্দ্র-কিশোর রায়চৌধুরীর সুরশৃঙ্গার দিয়ে। সেনী ঘরানার শুদ্ধ আঙ্গিকে ধ্রুপদী রীতিতে ইনি 'মালেগোরা' বাজালেন। এঁর বাজনার বৈশিষ্ট্য হচ্ছে ইনি অনুষ্ঠান দীর্ঘপ্রলম্বিত করেন না। স্বল্প ও সীমিত পরিসরের মধ্যে সকল অংগ পরিচ্ছন্ন সুন্দর রূপায়ণ ঘটিয়ে বিশ্লেষিত রাগ ও রীতির সংগে শ্রোতাদের পরিচয় ঘটিয়ে দেন। বাজনার মধ্যে তাঁর সংস্কৃতি বিদগ্ধ মনটি পরিব্যাপ্ত হয়েছে।

জলসাঘর

সম্প্রতি নবজাত প্রতিষ্ঠান জলসা-ঘরের দ্বিতীয় অনুষ্ঠান হয়ে গেল ক্রীক রোতে। একক শিল্পী শ্রীবলরাম পাঠক সেতারে গৌরীশংকর রাগ বাজিয়ে শোনালেন। রাগটি ইতিপূর্বে শুনেছি বলে মনে পড়ে না। শংকরা রাগের মেজাজ থাকায় অন্তরা অংগের তীব্র সৌন্দর্য খুব উপভোগ্য হয়েছে।

শ্রীপাঠক বহুদিন ধরে একনিষ্ঠভাবে বাজাচ্ছেন। মীড়ের বহুধা অনুশীলনে ইনি সূক্ষ্ম কারুকার্যমণ্ডিত মধুর ভাবকে অনায়াসদক্ষতায় পরিস্ফুট করতে পারেন। দক্ষিণ হস্তের বাজ কিছু মৃদু হলেও বাম হস্তের দক্ষতা এঁর অনন্যসাধারণ। সকল সেতারীর মধ্যেই এ যুগের শীর্ষ-স্থানীয় সেতারশিল্পীদের কিছু না কিছু ছাপ থাকেই। কিন্তু সকলের পদ্ধতিকে গ্রহণ করেও ইনি নিজস্ব একটি বাদনশৈলী আয়ত্ত করেছেন যা গীতিকাব্যধর্মী খণ্ড-সৌন্দর্যে চিত্তহারা।

কিষন মহারাজের সুযোগ্য শিষ্য অমিল পালিতের রেওয়াজী হাতের বোলের সংগতে ছন্দের কাজ জমে উঠেছিল। এইরকম একক আসরে যেকোনো শিল্পীকে তাঁর বৈশিষ্ট্যে প্রকাশিত দেখবার সুযোগ পাওয়া যায় এবং তাঁর সংগীতচিন্তার সূত্রটিও অনুধাবন করা যায়। এখানেই এর মূল্য।

১৯৬৭ সালের তৃতীয় বিভাগের ক্যালকাটা ফুটবল লীগ চ্যাম্পিয়ান টাউনক্লাব।

খেলাধুলা

দর্শক

ইংল্যান্ড সফরে ভারতীয় স্কুল ক্রিকেট দল

সফরের উদ্বোধনী খেলায় ভারতীয় স্কুল ক্রিকেট দল ১৪৪ রানে হ্যাম্পসায়ার স্কুল দলকে পরাজিত করেছে।

ভারতীয় স্কুল দল : ২২৪ রান (৫ উইকেটে ডিক্লেঃ। এস এম এইচ কিরমানি নট-আউট ১০৪ এবং অজিত নায়াক নট-আউট ৫০ রান)

হ্যাম্পসায়ার স্কুল দল : ৮০ রান (রিচার্ডসন ২৫ রান। দীপংকর সরকার ৩৮ রানে ৫ উইকেট)

কিরমানি ১২৪ মিনিটের খেলায় তাঁর নটআউট ১০৪ রানে ১৭টা বাউণ্ডারী করেন। ৬ষ্ঠ উইকেটের জুটিতে কিরমানি এবং অধিনায়ক অজিত নায়াক বিপক্ষের বোলিং শক্তিকে কচুকাটা করেছিলেন। নায়াক ৫০ রান করে অপরাজিত থাকেন। ভারতীয় স্কুল দল ২২৪ রানের মাথায় (৫ উইকেটে) প্রথম ইনিংসের সমাপ্তি ঘোষণা করে। একঘণ্টার খেলায় হ্যাম্পসায়ার দলের ৭টা উইকেট পড়ে মাত্র ৩৬ রান উঠেছিল। শেষের খেলোয়াড়রা দলের পতনরোধের কিছুটা চেষ্টা করলেও ৮০ রানের মাথায় তাদের ইনিংস শেষ হয়।

ডিউক অব নরফোকের মাঠে অনুষ্ঠিত সফরের দ্বিতীয় খেলায় ভারতীয় স্কুল ক্রিকেট দল ৮ উইকেটে সাসেক্স স্কুল ক্রিকেট দলকে পরাজিত করে। সাসেক্স দলের প্রথম ইনিংসে ১৩৫ রাণ উঠেছিল। খেলায় তিন ঘন্টা সময় হাতে পেয়ে ভারতীয় স্কুল ক্রিকেট দল ২ উইকেট খুইয়ে জয়লাভের প্রয়োজনীয় ১৩৬ রাণের থেকে অতিরিক্ত ২ রাণ অর্থাৎ মোট ১৩৮ রাণ সংগ্রহ করেছিল।

সাসেক্স স্কুল : ১৩৫ রাণ (কে ক্যানন ৩১ রাণ। যশবীর সিং ৪১ রাণে ৬ উইকেট)।

ভারতীয় স্কুল : ১৩৮ রান (২ উইকেটে। লক্ষণ সিং নট আউট ৫৪ এবং কিরমাণি নট আউট ৩৩ রাণ)।

ভারতীয় স্কুল বনাম কেন্ট স্কুল দলের দু দিনব্যাপী খেলাটি ড্র যায়। ভারতীয় স্কুল ক্রিকেট দল অল্পের জন্যে জয়লাভ থেকে বঞ্চিত হয়। ভারতীয় স্কুল দল প্রথম ইনিংসে ২৬৬ রাণ সংগ্রহ করেছিল। কেন্ট স্কুল দল প্রথম ইনিংসে ৮১ এবং দ্বিতীয় ইনিংসে ২৪৮ রাণ সংগ্রহ করে। ভারতীয় স্কুল দল ভিজে মাঠে খুব তাড়াতাড়ি চারটে উইকেট খুইয়ে বাধ্য হয়ে খেলা ড্র করার দিকে মন দেয়। তাদের দ্বিতীয় ইনিংসের ৩৫ রাণের মাথায় (৪ উইকেটে) খেলাটি শেষ হয়। জয়লাভের জন্যে ভারতীয় স্কুল দলের ৭২ রাণের প্রয়োজন ছিলণ

ইংল্যান্ড সফরের চতুর্থ খেলায় ভারতীয় স্কুল ক্রিকেট দল বিশেষ উত্তেজনার মধ্যে ২ উইকেটে ওল্ড হুইট গফ্‌টিয়ান্স দলকে পরাজিত করে। তাদের এই জয় বিশেষ উল্লেখযোগ্য এই কারণে যে ইংল্যাণ্ডের প্রাক্তন টেস্ট খেলোয়াড় সুব্বা রাও সমেত বয়স্ক খেলোয়াড়দের বিপক্ষে খেলতে হয়েছিল। ওল্ড হুইটগিফ্‌টিয়ান্স দল প্রথম ইনিংসের ৫ উইকেট খুইয়ে ২১৪ রাণের মাথায় সমাপ্তি ঘোষণা করে। ভারতীয় স্কুল ক্রিকেট দল তিন ঘন্টার মত খেলার সময় হাতে পেয়ে খেলা ভাঙার নির্দিষ্ট সময়ের পাঁচ মিনিট আগে জয়লাভের প্রয়োজনীয় রাণ পূর্ণ করে। নিখুঁত ফিল্ডিং এবং আক্রমণাত্মক ব্যাটিংয়ে ভারতীয় স্কুল দলটি দর্শকদের ভূয়সী প্রশংসা লাভ করে।

ওল্ড হুইটগিফ্‌টিয়ান্স : ২১৪ রাণ (৫ উইকেটে ডিক্লেয়ার্ড। সুব্বা রাও ৮১ এবং আরস্কট নট আউট ৮৫ রাণ)।

ভারতীয় স্কুল দল : ২১৭ রাণ (৮ উইকেটে। কিরমানি ৬৩ রাণ)।

ডেভিস কাপ

১৯৬৭ সালের আন্তর্জাতিক ডেভিস কাপ লন টেনিস প্রতিযোগিতার আঞ্চলিক পর্যায়ের খেলা এশিয়ান জোন ফাইনাল বাদে শেষ হয়েছে। ইউরোপীয়ন জোনের 'এ' গ্রুপের ফাইনালে রাশিয়ার বিপক্ষে স্পেন এবং "বি" গ্রুপের ফাইনালে ব্রেজিলের বিপক্ষে দক্ষিণ আফ্রিকা জয়ী হয়ে মূল প্রতিযোগিতার ইণ্টার-জোন সেমি-ফাইনালে খেলবার যোগ্যতা অর্জন করেছে। গত বছর ব্রেজিল ইণ্টার-জোন ফাইনালে ভারতবর্ষের কাছে ২—৩ খেলায় পরাজিত হয়েছিল। ইণ্টার-জোন সেমি-ফাইনালের একদিকে স্পেন এবং ইকোয়েডার (আমেরিকান জোন বিজয়ী)

লবে এবং অপরদিকের। সেমি-ফাইনালে ক্ষিণ আফ্রিকার সঙ্গে খেলবে এশিয়ান চান বিজয়ী দেশ। এশিয়ান জোনের াইনালে উঠেছে ভারতবর্ষ এবং জাপান।

ইউরোপীয়ান জোন

১৯৬৭ সালের প্রতিযোগিতায় ইউ- াপীয়ন জোনের 'এ' গ্রুপে এবং 'বি' গ্রুপে ়টি করে দেশ খেলেছিল। মোট ৮টি হাই দেশের মধ্যে 'বি' গ্রুপে ছিল চারটি হাই দেশ—ব্রেজিল (১নং), ফ্রান্স (৪নং), ক্ষণ আফ্রিকা (৫নং) এবং ইতালী (৮নং)। " গ্রুপের ফাইনালে ৫নং বাছাই দক্ষিণ ফ্রিকার কাছে ১নং বাছাই ব্রেজিলের চনীয় পরাজয় (০—৫ খেলায়) রীতিমত ত্যাশিত ঘটনা। দক্ষিণ আফ্রিকার এই াট সাফল্যের মূলে ছিলেন অধুনা ক্ষণ আফ্রিকাবাসী অস্ট্রেলিয়ার প্রখ্যাত লায়াড় বব্ হিউইট। ইউরোপীয়ন নের 'এ' গ্রুপেও ছিল চারটি বাছাই দেশ শ্চিম জার্মানী (২নং), স্পেন (৩নং), বৃটেন (৬নং) এবং চেকোশ্লোভাকিয়া ং)। ফাইনালে ৩নং বাছাই স্পেনের হ অবাছাই রাশিয়া শেষ পর্যন্ত জিত হয়।

আমেরিকান জোন

আমেরিকান জোনের ফাইনালে য়েডারের কাছে আমেরিকার পরাজয় রের প্রতিযোগিতায় সব থেকে উল্লেখ- বিস্ময়কর ঘটনা। এই আমেরিকা সময়ে কি শক্তিশালী দেশই না ছিল! ন্ত মাত্র চারটি দেশ ডেভিস কাপ হয়েছে—অস্ট্রেলিয়া (২১বার), রিকা (১৯বার), গ্রেটবৃটেন (৯বার) ফ্রান্স (৬বার)। দ্বিতীয় যুদ্ধোত্তর- র ২১ বছরের চ্যালেঞ্জ রাউন্ড অর্থাৎ লে (১৯৪৬-৬৬) অস্ট্রেলিয়া এবং রিকা উপর্যুপরি ১৪ বছর (১৯৪৬- পরস্পর প্রতিদ্বন্দ্বিতা করে লিয়া ৮বার এবং আমেরিকা ৬বার মধ্যে উপর্যুপরি জয় ৪বার—১৯৪৬- ডেভিস কাপ জয়ী হয়। পরবর্তী ৮ ১৯৬০-৬৭) আমেরিকা মাত্র দু'বার ৩-৬৪) চ্যালেঞ্জ রাউন্ডে খেলে র (১৯৬৩) ডেভিস কাপ পায়। ৬ বছরের প্রতিযোগিতায় রকা দু'বার নিজের আঞ্চলিক তেই চ্যাম্পিয়ান হতে পারেনি— ং সালে আমেরিকান জোনের সেমি- লে ২—৩ খেলায় মেক্সিকোর কাছে ১৯৬৭ সালের আমেরিকান জোন লে ২—৩ খেলায় ইকোয়েডারের কাছে ত হয়।

ক্যারিংটন ক্রিকেট ট্রফি

র্ডস মাঠে আয়োজিত ক্যারিংটন উইকেট ক্রিকেট প্রতিযোগিতার ল ওয়েস্ট ইণ্ডিজের প্রখ্যাত টেস্ট অধিনায়ক এবং বিশ্বশ্রেষ্ঠ চৌকশ াড় গারফিল্ড সোবার্স এসেক্স ক্রিকেট দলের ব্রেন এডমিডেজকে করে ৫০০ পাউন্ড পুরস্কার জয় । প্রতিযোগিতায় মোট পাঁচ রাউন্ড খেলে সোবার্স মাত্র একবার আউট হন। কোয়ার্টার ফাইনালে সোবার্স গত বছরের বিজয়ী ফ্রেড টিটমাসকে (মিডল- সেক্স) পরাজিত করেছিলেন।

এ-বছরের প্রতিযোগিতায় যোগদানকারী খেলোয়াড়দের মধ্যে উল্লেখযোগ্য নাম—গার- ফিল্ড সোবার্স, রোহন কানহাই, ব্রায়ান ক্লোজ (ইংল্যান্ডের অধিনায়ক), হানিফ মহম্মদ (পাকিস্থানের অধিনায়ক) এবং ফ্রেড টিটমাস।
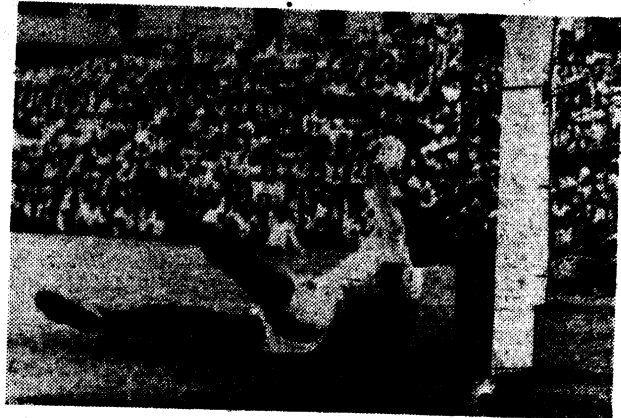
ইডেন উদ্যানে আয়োজিত প্রথম বিভাগের ফুটবল লীগ খেলায় মোহনবাগানের বিপক্ষে মহমেডান স্পোর্টিংয়ের জয়সূচক গোল। ফটো : অমৃত

ভারতীয় ক্রিকেট দলের পূর্ব আফ্রিকা সফর

ভারতীয় ক্রিকেট দল ১৯৬৭ সালের ইংল্যান্ড সফর শেষ করে পূর্ব আফ্রিকা অভিমুখে যাত্রা করেছে। তারা পূর্ব আফ্রিকায় চার সপ্তাহের সফরে ৯টি খেলায় অংশ গ্রহণ করবে। ভারতীয় ক্রিকেট দলের দিলীপ সরদেশাই এবং সুব্রত গুহ শারীরিক আঘাতের দরুণ পূর্ব আফ্রিকা সফরে দলের সঙ্গে না গিয়ে স্বদেশে ফিরে এসেছেন।

এশিয়ান সুটিং প্রতিযোগিতা

জাপানে আয়োজিত প্রথম এশিয়ান সুটিং প্রতিযোগিতায় মোট ১৮টি অনুষ্ঠানের মধ্যে জাপান ১১টি অনুষ্ঠানে স্বর্ণ পদক জয় করে বিরাট সাফল্যের পরিচয় দিয়েছে। এশিয়া মহাদেশের অন্তর্ভুক্ত দেশ ছাড়া বিশেষ আমন্ত্রণে অস্ট্রেলিয়ার প্রতিনিধিরা যোগদান করেছিলেন। তবে তাঁরা পদক জয়ের অধিকারী ছিলেন না।

পদক জয়ের চূড়ান্ত তালিকা

	স্বর্ণ	রৌপ্য	ব্রোঞ্জ
জাপান	১১	৬	৮
দঃ কোরিয়া	৩	৭	১
ফিলিপাইন	২	০	২
তাইওয়ান	২	২	৩
ইস্রায়েল	১	২	২
তাইল্যাণ্ড	০	১	২

প্রথম বিভাগের ফুটবল লীগ

গত সপ্তাহে (জুলাই ২৪—৩০) প্রথম বিভাগের ক্যালকাটা ফুটবল লীগ প্রতি- যোগিতায় যে ১৫টি খেলা হয়েছে তার সংক্ষিপ্ত ফলাফল : জয়-পরাজয়ের নিষ্পত্তি ১১ এবং খেলা ড্র ৪।

গত বছরের লীগ চ্যাম্পিয়ান ইস্ট- বেঙ্গল ক্লাব আলোচ্য সপ্তাহে তিনটে খেলে ৫ পয়েন্ট সংগ্রহ করেছে। তারা ১—০ গোলে ইস্টার্ণ রেলওয়ে এবং ৩—০ গোলে এরি- য়ান্সকে পরাজিত করে। কিন্তু কালীঘাটের বিপক্ষে তাদের খেলা ১—১ গোলে ড্র যায়। বর্তমানে তারা লীগ তালিকার শীর্ষ স্থানে আছে—২২টা খেলায় ৩৭ পয়েন্ট। লীগের তৃতীয় স্থান অধিকারী বি এন আর এ সপ্তাহে দুটো খেলে ২ পয়েন্ট পেয়েছে। তারা বাটার সঙ্গে গোলশূন্যভাবে এবং রাজস্থানের সঙ্গে ১—১ গোলে খেলা ড্র করে। বি এন রেলওয়ের ২২টা খেলায় ৩২ পয়েন্ট দাঁড়িয়েছে।

মহমেডান স্পোর্টিং ক্লাব লীগের গুরুত্ব- পূর্ণ খেলায় মোহনবাগানকে ১-০ গোলে পরাজিত করে ১৯টা খেলায় ৩৩ পয়েন্ট সংগ্রহ করার সূত্রে লীগ তালিকার দ্বিতীয় স্থানে উঠেছে। একমাত্র তারাই খেলাতে এখনও অপরাজিত আছে। গত বছরের রানার্স-আপ মোহনবাগান ২০টা খেলায় ২৮ পয়েন্ট পেয়ে বর্তমানে ৪র্থ স্থানে আছে।

তৃতীয় বিভাগের ফুটবল লীগ

১৯৬৭ সালের তৃতীয় বিভাগের ক্যালকাটা ফুটবল লীগ প্রতিযোগিতায় টাউন ক্লাব ২৮ পয়েন্ট সংগ্রহ করার সূত্রে লীগ চ্যাম্পিয়ান আখ্যা লাভ করেছে। ভ্রাতৃসংঘ ২৬ পয়েন্ট পেয়ে রানার্স-আপ হয়েছে। বর্তমানে কলকাতার ময়দানে টাউন ক্লাবই প্রাচীনতম ফুটবল ক্লাব। প্রায় দশ বছর আগে তারা দ্বিতীয় বিভাগ থেকে তৃতীয় বিভাগে নেমে ছিল।

এ পরাজয় কেন?

কমল ভট্টাচার্য

"ভারতীয় ক্রিকেট মুর্দাবাদ"—এই বলে এখানকার ক্রীড়ারসিকরা যদি "শ্লোগান" তোলেন এবং ভারতীয় অধিনায়ককে সবাই মিলে যদি "ঘেরাও" করেন তাহলে তার উত্তরে তিনি কি কিছু বলতে পারবেন? তিনি ইতিমধ্যে বলেছেন. এবং ভবিষ্যতে বলবেনও। দলের ব্যর্থতার জন্যে তাঁকেই জবাবদিহি করতে হবে। এটাই স্বাভাবিক। এটা এমন কিছু নতুন কথা নয়। শুধু হার নয়, গো'হার হেরে যাঁরা চরম ব্যর্থতার পরিচয় দেন, তাঁদের ভাগ্যে এমন লাঞ্ছনা-গঞ্জনা আসে বৈকি। এ ক্ষেত্রে খেলোয়াড় এবং কর্তৃপক্ষ কেউ বাদ পড়েন না।

ভাবছিলাম অনেক কথাই। বিশাল ভারতে ক্রিকেটের একি দুরবস্থা। ক্রিকেট যে খেলতাম সে কথা বলতে লজ্জা করে। গাড়িতে পাশাপাশি বসেছিলেন আমার এক সাহিত্যিক বন্ধু। আমার আফসোসের কথা বোধ করি তাঁর কানে পৌঁছেছিল। তিনি বাধা দিয়ে বললেন—"লজ্জা, কিসের লজ্জা।" মুখটা বিকৃতি করে বললেন তিনি—"এত লজ্জা-ঘেন্নার আছেই বা কি! ক্রিকেট ভারতীয়দের কাছে হুজুগমাত্র। এটা আমার গল্পের কাল্পনিক কথা নয়। একেবারে বাস্তব, ধ্রুব সত্য। বলতে পার, আমাদের দেশে গড়পড়তায় প্রত্যেক পরিবারে কটা ছেলে ক্রিকেট খেলে? এদেশে আবার ক্রিকেটের উন্নতি আশা কর।"

অন্যমনস্কভাবেই বলে উঠলাম—"কিন্তু এর উপায়?" বন্ধুবর একটুও থামলেন না। বললেন: "দ্যাখ ভাই, খেলার অতশত বুঝি না। তবে এটাও ঠিক, ক্রিকেট খেলা তেমন দুর্বোধ্যও নয়, যতটা তোমরা বলে থাক।" বেশ মুন্সিয়ানার চালে সাহিত্যিক বন্ধু বললেন—"কর্তৃপক্ষরাই দায়ী বেশী। তাঁরা যে নির্বুদ্ধিতার পরিচয় দিয়েছেন তাতে এই রকমই কিছু অঘটন ঘটবে সেটা বুঝে নিতে একটুও কষ্ট হয়নি।"

বললাম—"যেমন।"

বন্ধু মুচকি হেসে বললেন: "খুব সোজা কথা। সবাই বলছে। আমিও বলছি। এইতো সেদিনই কার কাছে যেন শুনলাম।" একটু ভেবে নিয়ে বন্ধু আবার সুরু করলেন—"কতকগুলো আনকোরা ছেলে বিভিন্ন রাজ্য থেকে ধরে এনে রাতারাতি পাঠান হল দেশান্তরে—ভারত থেকে ইংল্যান্ড। এই দুই দেশের ব্যবধান অনেক। কিন্তু রাত পোহাতেই তাঁরা পেঁছলেন গন্তব্যস্থানে যেখানে তাপের মাত্রা ৩৬ ডিগ্রি। অর্থাৎ রাতারাতি দৌড়ঝাঁপ করে গরমে এক 'গা ঘেমে স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলবার আগেই খেলোয়াড়েরা সেখানে ঠাণ্ডায় জমে গেলেন। আপাতমস্তক গরম জামায় ঢেকে ঠাণ্ডা আটকান গেল বটে তবে তাঁরা আবহাওয়ার সঙ্গে মানিয়ে নিতে পারলেন না। ফলে পায়ে আর পিঠে 'ক্রাম' সর্দি-কাশি, জ্বরজারি ইত্যাদি ইত্যাদি। কিন্তু সেই নিয়ে খেলতে হল। আর সে খেলার পরিণাম এরচেয়ে ভাল আর বেশী কি আশা কর।"

আমার সাহিত্যিক বন্ধুটি এতক্ষণে মুখ বন্ধ করলেন। তাঁর কথা শুনতে শুনতে আমারও বাক রুদ্ধ হয়ে গেল। অবাক হয়েই বললাম: "আমাকে তুমি . সত্যিই বোকা বানালে। ঠিক এই কথাই আমি বলতে চাইছিলাম।"

কথা শুনে বন্ধুবর হেসে উঠলেন। হাতের আঙ্গুল উঁচিয়ে বললেন—"দেখলে ত তোমার কথাই তোমায় শোনালাম। কি আশ্চর্য ভুলো মন তোমার! কিছুদিন আগে তুমি ঠিক এই কথাগুলোই আমায় বলনি। এখন সে কথা মনে পড়ল।"

এবার আর ভুল হয়নি। লেখার তাগিদে লিখতে বসেই সব কথা মনে পড়ল। কাজেই আমাদের আলোচনার বাকি অংশটুকুও এই ফাঁকে শেষ করেনি।

ভারতীয় দল ইংল্যান্ডে রাতারাতি না পৌঁছে জল পথে গেলে অনেক ধকল বাঁচত। নবাগত খেলোয়াড়েরা পরস্পরের মধ্যে বোঝা-পড়ারও সময় পেতেন। বাংলা-বোম্বাই-মাদ্রাজ-দিল্লী সব পাশাপাশি রাজ্য নয়। কাজেই হাত বাড়িয়ে বন্ধুত্ব করা যায়, তবে এত অল্প সময়ে মনের কথা জানা যায় না। কি করেই বা সম্ভব। বিভিন্ন রাজ্যের খেলোয়াড়দের চিন্তাধারা, জীবনধারা, আচার-ব্যবহারের মধ্যে যে প্রচুর ব্যবধান। সেই কারণে দলের "টিম-স্পিরিট" বাড়াতে খেলোয়াড়দের মেলামেশার প্রয়োজন। এমন কি দল গড়তে তাঁরা একটা ক্যাম্পের ব্যবস্থাও করেননি। ক্যাম্প করার সার্থকতা যথেষ্ট। কেন না ছেলেরা নিয়মানুবর্তিতার মধ্যে শরীর গড়ে নিতে পারে। আমার মনে হয়, ইংল্যান্ড সফরে আমাদের খেলোয়াড়দের স্বাস্থ্য যথোপযুক্ত ছিল না। ক্যাম্প গড়ার অর্থে শুধু খেলোয়াড়দের একসাথে খেলা নয়, উপযুক্ত শিক্ষকের অধীনে শিক্ষা লাভ করা। যেমনটি হয়েছিল স্কুল ক্রিকেট দলের ইংল্যান্ড সফরে যাবার আগে। অর্থাৎ প্রাক্তন টেস্ট ক্রিকেটের হেমু অধিকারীর তত্ত্বাবধানে ছেলেরা যেমন শিক্ষা লাভ করেছে ঠিক তেমনি।

শুধু ক্যাম্প গড়া নয়, খেলোয়াড়দের পরস্পরের মধ্যে মৈত্রী স্থাপনও নয়। এমন কিছু আছে যা আমরা দেখেও দেখি না, শুনেও শুনি না। ইংল্যান্ড-অস্ট্রেলিয়ার টেস্ট ক্রিকেটের কথাই বলি। খেলায় কে হারে, কে জেতে। মরণপণ যুদ্ধ আর কি! হামেশাই তারা খেলছে—বহুদিন, বহুকাল ধরে। কিন্তু তাতেও কি তাদের স্বস্তি আছে? সফরের এক বছর আগে বিশেষজ্ঞ পাঠান হয় নির্দিষ্ট জায়গাগুলিতে। তাঁর কাজ ঘুরে-ফিরে দেখা—মাঠ, দেশের আবহাওয়া এমন কি বিদেশের খেলোয়াড়দেরও। এই সব খবর নোট করে এনে কর্তৃপক্ষদের হাতে পেশ করা হয়। অনেক পরীক্ষা-নিরীক্ষার পরই ত তারা দল গড়ার কাজে হাত দেন।

এত কষ্ট কি আমাদের সয়! সময়ই কোথায়? কিন্তু সর্বনাশা ইংল্যান্ডের আ[বহা]ওয়া কি কারুর ধার ধারে। মরণফা[দ] বিছান ছিল টেস্ট ম্যাচের মাঠে। সে ফাঁদে [পা] দিয়ে ভারতীয় খেলোয়াড়দের হয়রানির অ[ন্ত] ছিল না। অথচ গাল খেতে তারাই। খেলোয়াড়দের প্রতি অহেতুক কোন গঞ্জ[না] বর্ষণ করতে আমার বিবেকে বাধে।

প্রতিকূল অবস্থার কথা ভেবেই বো[ধ] করি ভারতীয় টেস্ট ক্রিকেটের বিজয় মার্চে[ন্ট] নিজের বাড়ির আঙ্গিনায় নানা ধরনে[র] উইকেট গড়ে অনুশীলনের ব্যবস্থা রাখতেন। হার্ড এন্ড ফাস্ট উইকেট, ডেড্ উইকেট এ[বং] অপরটি স্লো—ভিজে উইকেট। খেলোয়া[ড়] বন্ধুদের আমন্ত্রণ করে এই ধরনের বি[ভি]... উইকেটে নিয়মিত খেলতেন।

বলা হয়নি, আমার মতে ক্যাম্প গড়[ার] উপযুক্ত মাঠ হল ইডেন গার্ডেন। এই মা[ঠে] সুইং অনেকক্ষণ চলে। মাঠে স্পিনও ধরে। ফিল্ডিংয়েরও কোন অসুবিধা নে[ই]। তা ছাড়া ইচ্ছামত পীচও গড়ে নেওয়া যা[য়]। ইডেন গার্ডেনই একমাত্র মাঠ যার স[ঙ্গে] ইংল্যান্ডের যে কোন মাঠের কিছুটা মি[ল] আছে। সেখানে সুইং অনেকক্ষণ চলে। তা[ছাড়া] সীম বোলাররা ১৩০ থেকে ১৬০ র[ান] পর্যন্ত—যে কোন সময়ে সুইং করাতে পা[রে]। ভারতীয় খেলোয়াড়রা সুইং খেলায় বি[শা]রদ নয়। বিশেষ করে শেষের দিকের ব্যা[ট্স]ম্যানদের সুইং বল খেলার অভ্যাস একেবা[রে] নেই। তার প্রমাণ. এক ইনিংসে ছ'জন ব্যা[ট্স]ম্যানই উইকেট-কীপারের হাতে ক্যাচ [তুলে] দিয়েছেন।

ক্রিকেট সফরে ম্যানেজারের দায়িত্বও [কম] নয়। সদ্য অবসরপ্রাপ্ত টেস্ট ক্রিকেটা[রের] হাতে এই দায়িত্ব থাকা ভাল। কারণ [তাঁর] সঙ্গে দলের বাকি খেলোয়াড়দের সম্প[র্ক] এখনও ছিন্ন হয়নি। শুধু হৃদ্যতা[ই নয়,] খেলোয়াড়দের ওপর তাঁর কিছুটা আধি[পত্য] থাকে এবং তিনি শ্রদ্ধার পাত্র। সু[তরাং] তিনিই সবদিক সামলাতে পারবেন। কো[নটা] ভাল, কোনটা মন্দ, খেলার ভেতরে এমন[কি] বাইরেও যাঁর সজাগ দৃষ্টি থাকবে তি[নিই] হবেন আদর্শ ম্যানেজার। ছেলেমানু[ষের] লোভ সবদিকেই। হাত বাড়ালে যে[খানে] সবকিছু মেলে, খুশিমত যেখানে [খাওয়া-দাওয়া] গাওয়া যায়, বাহারী রংয়ের পানী[য়ের] যেখানে অবাধ ব্যবস্থা এবং ইসারায় যে[খানে] বিলাসিতার ছোঁয়া আনে সেখানে স্ব[াস্থ্যরক্ষার] দরকার বৈকি। কিন্তু যদি তা সাম[লাতে] অতি সন্ন্যাসীর দরকার হয় তাহলে গৌ[ড়]... গাজন নিশ্চয়ই নষ্ট হবে।

এই জন্যেই বিশ্বের সর্বত্র খেলোয়া[ড়দের] নিয়মানুবর্তিতা এবং চরিত্রের গঠন[ে] সবাই খুব ব্যস্ত। আর এইজন্যেই কা[র্য] পরিচালনার ভার মিলিটারীর হাতে। [সফরে] থাকাকালীন খেলোয়াড়েরা খেলা ছাড়া কোন চিন্তা মনে আনতে পারবে না। ব্যতিক্রম হলেই শাস্তি।

গলদ আমাদের গোড়াতেই। দোষ-ত্রুটি এর চেয়ে বেশী বুঝিয়ে বলার মত সোজা পথ আমি খুঁজে পেলাম না। তাই আমাকে ঘুরিয়ে নাক দেখানর মত অন্য পথ ধরতে হল। আর তারজন্যেই আমাকে কতকগুলো দৃষ্টান্তের অবতারণা করতে হল।

শুধু ভাল খেলোয়াড় নয়, ভাল অধিনায়ক বলে স্যার ডোনাল্ড ব্রাডম্যানের খুব নামডাক ছিল। ইংল্যান্ড সফরে এসে ব্রাডম্যান একবার এক প্রেস রিপোর্টারের হাতে বিব্রত হন। হোটেলে বিশ্রামরত ব্রাডম্যানকে দেখে রিপোর্টারটি এগিয়ে এসে প্রশ্ন করলেন—"ব্যাপার কি, আপনি একা! আপনার খেলোয়াড়েরা সব কোথায় গেল? রাত ত কম হয়নি?" আমতা আমতা করে ব্রাডম্যান বললেন—"ভয়ের অবশ্য কারণ নেই। কেন না খেলোয়াড়দের সঙ্গে আমি ম্যাকেবকে পাঠিয়েছি। ওদের সামলাতে ম্যাকেব একাই একশ।" ব্রাডম্যানের উত্তরের কথা শুনে রিপোর্টার আর কথা বাড়ায়নি।

ইংল্যান্ড সফরের প্রারম্ভে অস্ট্রেলিয়ার হেন অধিনায়কও একবার মাথায় হাত দিয়ে বসলেন। খেলোয়াড়দের আব্দার দেখে অস্থির হলেন। আব্দারটা আর কিছুই নয়, সফরে অধিনায়কের স্ত্রীকে নিতে হবে। তাঁদের উদ্দেশ্য খারাপ ছিল না। ব্রাডম্যানের ভাল খেলার পেছনে স্ত্রীর অনেক হাত ছিল। কথায় ব্রাডম্যান বেঁকে বসলেন। এতদিনের নিয়মকে তিনি অগ্রাহ্য করবেন কেমন করে। স্ত্রীর প্রেরণা পেলে তিনি ভাল খেলবেন এ কথা অনস্বীকার্য। কিন্তু তাই বলে নিয়মবিরুদ্ধ কাজ কেমন করে করবেন তিনি। এদিকে খেলোয়াড়েরাও নাছোড়বান্দা। ব্রাডম্যান খেলোয়াড়দের বুঝিয়ে বললেন—"দ্যাখ হে অধিনায়কের দায়িত্ব অনেক। দেশের সম্মান ইজ্জত রক্ষার ভার তারই উপর। কোন মোহের বশবর্তী হয়ে মূর্খের মত কাজ করা উচিত নয়।" সমস্যাটা যে কি সেটা বুঝতে ব্রাডম্যানের বাকি ছিল কি? সেটা জানতেন বলেই কোন মতেই তিনি রাজী হননি।

ওয়েস্ট ইন্ডিজের খেলোয়াড়রা শীতপ্রধান দেশে সুরাপানে ডুবে থাকবে এ আর এমন আশ্চর্য কথা কি! দলের অধিনায়ক ফ্রাঙ্কী ওরেল ইংল্যান্ড সফরে এসে দলের নবাগত খেলোয়াড়দের নিয়ে বড়ই ফ্যাসাদে পড়লেন। যদিও তিনি জানতেন তাঁর দলের শক্তি ইংল্যান্ডের পক্ষে যথেষ্ট তবুও তিনি ইংল্যান্ডের প্রতিকূল আবহাওয়াকে বড় ভয় পান। তারওপর দলের খেলোয়াড়েরা যদি অন্য পথ ধরেন তাহলে সুযোগ হাত-ছাড়া হয়।

শেষ পর্যন্ত কথাটা পাড়লেন ফ্রাঙ্কী ওরেল। দলের খেলোয়াড়দের ডেকে বললেন—"শুনেছ, শেষ পর্যন্ত আমিও বেসামাল হয়ে পড়েছি। এখুনি বাঁচাও। খেলোয়াড়রা ফ্রাঙ্কীকে খুব ভালবাসেন। কাজেই তাঁর যখন বিপদ তখন আর কথা কি। সবাই হামলে উঠে বলল—"ব্যাপারটা খুলে বলুন, আমরা নিশ্চয়ই সাধ্যমত সাহায্য করব।" ফ্রাঙ্কী কি যেন ভাবলেন, তাঁর চোখ জোড়ায় দুষ্ট-হাসি খেলে গেল। খুব বিপদে পড়েছেন এই ভাব দেখিয়ে রুমালে মুখ মুছতে মুছতে বললেন—"কিছু মনে করো না। মদে আমায় পেয়ে বসেছে। এযে সামলান দায়। অথচ একথা তোমরা স্বীকার করবে মদ না খেলে আমি নিশ্চয়ই ভাল খেলব।" খেলোয়াড়েরা সমস্বরে বলে উঠলেন—"অবশ্যই। অবশ্যই।"

"তাহলে এক কাজ কর না। মদের হাত থেকে বাঁচাও। আমি তোমাদেরই সঙ্গে থাকব। কি পারবে না?" ফ্রাঙ্কী একবার তাকালেন খেলোয়াড়দের দিকে। দেখলেন তাঁর কথায় বেশ কাজ হয়েছে। সবাই বেশ উৎকণ্ঠায় পড়েছেন। সবাই চিন্তায় আকুল।

ফ্রাঙ্কী বললেন—"আর একটা কাজ করলে কেমন হয়। সপ্তাহে তিনবার অন্তত আমরা সবাই মিলে রাত্তিরে ডিনার খাই না কেন? আলোচনা এবং কথাবার্তার মধ্যে টেস্ট খেলার ভাল-মন্দর কথাও বলতে পারি।" সবাই রাজী তাতে। ফ্রাঙ্কী যাতে খুশী হন সেই কাজই করবেন তাঁরা। খেলোয়াড়রা প্রতিশ্রুতি দিয়ে ফ্রাঙ্কীর কাছ থেকে বিদায় নিলেন।

ফ্রাঙ্কী একাই ফাঁকা ঘরে খুব একচোট হেসে নিলেন। ঘন ঘন সিগারেটের টান দিয়ে তিনি আবার চিন্তায় ডুবে গেলেন।

ফুটবলের শ্রেষ্ঠাংশে

চুণী গোস্বামী

(মোহনবাগান)

রাত দুপুরে একদল লোক এসে হৈ-চৈ র সারা হোটেলটার ঘুম ভাঙিয়ে দিল, তাই জেগে উঠলাম। কি ব্যাপার মাঝরাতে, ডাকাত পড়লো নাকি?

জবাব মিললো পরেরদিন সকালে। এর্ণাকুলাম থেকে জনত্রিশেক লোক এসেছেন খেলা দেখতে। কোথায় এর্ণাকুলাম আর কোথায় কালিকট! খেলা দেখার এত সখ? আগতরা সবিনয়ে জানালেন—'আসলে খেলা দেখতে আসিনি, এসেছি চুণী গোস্বামীকে দেখতে।'

ঘটনাটা বাড়িয়ে বলা নয় একটুও। তাই চুণী সবার প্রিয়, শুধু দক্ষিণে নয়, পূর্ব এবং পশ্চিম ভারতের যেখানেই গেছি, দেখেছি চুণীর অসামান্য জনপ্রিয়তা। তার জন্য হাজার হাজার লোক মাঠে ভীড় করেন, না খেললে মুখ কালো করে বসে থাকেন। যুদ্ধোত্তর পর্বে আমেদ—সাত্তার দল থেকে অবসর গ্রহণের পর তাঁদের স্থানে এসে দাঁড়ালেন চুণী-বলরাম। এর দুজনের মধ্যে কে শ্রেষ্ঠ তা নিয়ে তর্ক থাক।

চুণীর পায়ে বল 'কথা' বলে। বল আয়ত্তে রাখা, পাস করা, লক্ষ্যাস্থির রেখে বিদ্যুৎ বেগে সট্ নেওয়া প্রভৃতি প্রকরণগত নৈপুণ্যে সাম্প্রতিক ফুটবলের আসরে চুণী অতুলনীয়। সযত্ন অধিগত গুণাবলীর সূত্রে খেলোয়াড়-জীবনে আকাঙ্ক্ষিত, সম্ভাব্য সমস্ত সম্মান, যাবতীয় স্বীকৃতি, শ্রদ্ধা, স্নেহ ও ভালবাসা দেশবাসীর কাছ থেকে তিনি পেয়েছেন। জাতীয় ও আন্তর্জাতিক ক্রীড়াক্ষেত্রে চুণীর নেতৃত্বের নজীর অসামান্য। প্রাক্-ওলিম্পিক, এশীয় কাপ, এশীয় ক্রীড়া এবং মারদেকা ফুটবলে ভারতের অধিনায়কত্ব করেছেন তিনি। চুণী ব্যতীত আর কোন ভারতীয় খেলোয়াড়ের জীবনে ইতিপূর্বে এহেন সম্মান আর আসেনি। বিশ্ববিদ্যালয় ফুটবলেও চুণী এক অস্পর্শিত রেকর্ডের অধিকারী। ১৯৫৭ সালে বেরেলীতে আয়োজিত নিখিল ভারত বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিযোগিতায় অধিনায়ক চুণী সবশুদ্ধ গোল করেছিলেন সতেরটি ঃ আলিগড়ের বিরুদ্ধে ডবল হ্যাটট্রিক! ভারতের প্রতিনিধিত্ব করার সৌভাগ্য সুরু হয়েছিল এর এক বছর আগেই। সে প্রসঙ্গে পরে আসছি।

কৈশোরেই চুণী সার্থক ভবিষ্যতের সুস্পষ্ট ইঙ্গিত রেখেছিলেন। সে দিনটি আমার আজ মনে আছে। টিপ্‌টিপ্ করে বৃষ্টি পড়ছে। ময়দানে বিশ্ববিদ্যালয় তাঁবুতে বসে আছি। পাশের ঘরে আশুতোষ কলেজের খেলোয়াড়েরা পোষাক পাল্টাচ্ছেন। চুণীর ফুটবল গুরু মোহনবাগান ক্লাবের শ্রদ্ধেয় বলাইদাস চট্টোপাধ্যায়

আমার বললেন : 'বাচ্চা একটি ছেলেকে দেখাচ্ছি, সামনের বছর মোহনবাগানে খেলবে। কৈ রে এদিকে আয়।' লাজুক-লাজুক একটি ছেলে এসে সামনে দাঁড়ালো। এই সেই চুণী। ভারতীয় ফুটবলে চুণীর ভূমিকা যেমন উজ্জ্বল, তেমনই দীর্ঘ। তার বিস্তৃত আলোচনা এখানে অসম্ভব; তাই সংক্ষেপে সেই হিসেব রাখার পূর্বে সাম্প্রতিক ফুটবল সম্পর্কে তাঁর অভিজ্ঞতা-লব্ধ কয়েকটি মতামত রাখছি :

'ক্রীড়ামানের উন্নতিকল্পে প্রতিযোগিতার ক্ষেত্রকে সত্যিকারের প্রতিদ্বন্দ্বিতামূলক করে গড়ে তুলতে হবে। অনুপ্রেরণাবিহীন খেলাধূলোর পেছনে পণ্ডশ্রম না করে খেলোয়াড়দের সামনে এনে দিতে হবে সুস্থ পরিবেশ। খেলার সংখ্যা হ্রাস বাঞ্ছনীয়। সার্থক খেলোয়াড় হতে গেলে চাই সুনিয়ন্ত্রিত ক্লান্তিহীন অনুশীলন; নিষ্ঠা ও মূলগত নৈপুণ্য। প্রকরণগত প্রয়োগ ও বিন্যাস হবে খেলোয়াড়দের দৈহিক সামর্থকে ঘিরে। এর বিকল্প কিছু নেই।'

সংক্ষেপে ফুটবল জীবন

১৯৫৪ সালে মোহনবাগানে যোগদান। দলের অধিনায়ক ১৯৬০ সাল থেকে। ১৯৫৫ সাল থেকে রাজ্য দলে মনোনীত। ১৯৬০ সাল থেকে অধিনায়ক। ১৯৫৫, ১৯৫৮, ১৯৫৯ ও ১৯৬২ সালে সন্তোষ ট্রফি বিজয়ী দলের অন্যতম খেলোয়াড়। ১৯৫৬ সাল থেকে জাতীয় দলভুক্ত। ১৯৬২ সাল থেকে ভারতীয় দলের অধিনায়ক। ১৯৫৬ সালে মোহনবাগান দলের এবং ১৯৫৭ সালে ভারতীয় দলের প্রতিনিধিরূপে দূরপ্রাচ্য সফর। ১৯৫৮ সালে টোকিওতে তৃতীয় এশীয় ক্রীড়ায় যোগদান। সম্মিলিত বিশ্ববিদ্যালয় ফুটবল দলের অধিনায়করূপে কাবুল সফর (জাসান উৎসব)। ১৯৫৯ সালে প্রাক্ ওলিম্পিক ফুটবল প্রতিযোগিতায় (কাবুলে) ও মারদেকায় অংশ গ্রহণ। ১৯৬০ সালে প্রাক্ অলিম্পিক ফুটবলে ইন্দোনেশিয়ার বিরুদ্ধে উভয় পর্বে অংশ গ্রহণ। ১৯৬০ সালে রোম অলিম্পিকে ফুটবলে মূল প্রতিযোগিতায় যোগদান। ১৯৬১ সালে কেনিয়া, উগাণ্ডা ও ট্যাংগানিকা সফরে মোহনবাগানের অধিনায়ক। ১৯৬২ সালে জাকার্তা ক্রীড়ায় ফুটবল চ্যাম্পিয়ন ভারতীয় দলের নেতা। ১৯৬৩ সালে প্রাক অলিম্পিকে সিংহলের বিরুদ্ধে ভারতের অধিনায়ক। ১৯৬৪ সালে তেল আবিবে আয়োজিত এশীয় কাপ ফুটবলে ভারতের দলনেতা; প্রাক ওলিম্পিক ফুটবল উপলক্ষে ইরাণের বিরুদ্ধে উভয় পর্বে (তেহরাণ ও কলকাতা) ভারতীয় দলের নেতা। ১৯৬৪ সালে অর্জুন পুরস্কার লাভ। ১৯৬২ ও ১৯৬৪ সালে এশিয়ার এবং স্বদেশে ১৯৫৮ সালে ভেটারেন্স ফুটবল ক্লাব প্রদত্ত সেরা খেলোয়াড়রূপে চিহ্নিত। ১৯৬৫ সালে ভারত সফরকারী রুশ দলের বিরুদ্ধে তিনটি টেস্টম্যাচেই অংশ গ্রহণ এবং এক্ষেত্রেও জাতীয় দলের সেরা খেলোয়াড় বিবেচিত। চেক ও যুগোশ্লাভ দলের বিরুদ্ধে আই এফ এ ও মোহনবাগানের প্রতিনিধিত্ব। পরপর চতুর্থবার কলকাতা সিনিয়র ডিভিসন লীগ বিজয়ী ও উপর্যুপরি তৃতীয়বার ডুরাণ্ড-বিজয়ী—মোহনবাগানের সার্থক অধিনায়ক। ইংলণ্ডের রাণী এলিজাবেথের ভারত সফরকালে কলকাতার রাজভবনে বিশেষ আমন্ত্রিত অতিথিরূপে উপস্থিত ও রাণীর সঙ্গে পরিচিতি।

শুধু ফুটবলেই নয়, ক্রিকেটেও চুণীর পাকা হাত। বিশ্ববিদ্যালয়, রঞ্জি ট্রফি, পূর্বাঞ্চল এবং সর্ব ভারতীয় দলেও তিনি সগৌরবে খেলেছেন। মূলতঃ বোলার, কিন্তু ব্যাটিংও উপেক্ষণীয় নন। গত বছর ইন্দোরে ওয়েস্ট ইণ্ডিজ দলের বিরুদ্ধে মধ্য-পূর্বাঞ্চলের হয়ে খেলে দু ইনিংসে কম করে আটটি উইকেট পেয়েছেন, রাণ করেছেন তিরিশ, ক্যাচ লুফেছেন দুটি; অনবদ্য সে দুটি ক্যাচ। ১৯৫২ সালে বাংলা স্কুল দলে এবং পরবর্তী পর্বে ১৯৫৮ সালে সর্বভারতীয় বিশ্ববিদ্যালয় ক্রিকেটে অধিনায়করূপে চুণীকে দেখে আসছি। ১৯৬২ সাল থেকে রঞ্জি ট্রফিতেও বাংলার প্রতিনিধিত্ব করছেন তিনি।

আদি বাড়ী ময়মনসিংহে হোলেও, চুণীর জন্ম কলকাতায়, ১৯৩৮ সালের ১৫ই জানুয়ারী। পোষাকী নাম সুবিমল। বি এস সি পাশ, চাকরী—ষ্টেট ব্যাঙ্কের অফিসার। লেখাপড়া তীর্থপতি স্কুল এবং আশুতোষ কলেজে। বাবা শ্রীপ্রমথনাথ গোস্বামী, মা শ্রীযুক্তা মণিমালা দেবী। বড় ভাই মানিকও কলকাতার ফুটবল মহলে সুপরিচিত। বাকী দুটি ভাইও ফুটবল-ক্রিকেট খেলেন। মা বাবা, ভাই, স্ত্রী বাসন্তী এবং ছেলে সুদীপ্তকে নিয়ে চুণীর সুখের সংসার।

কাজল মুখার্জি
(ইষ্টার্ণ রেল)

আমেদ-সত্তারের পর, বলরাম-চুণী, কিন্তু তারপর? এ প্রশ্নের উত্তর দিতে হলে ভাবতে হবে। প্রকৃতপক্ষে বলরাম এবং চুণীর যোগ্য উত্তরসূরী রূপে এখন পর্যন্ত

কেউ এসে পাদপ্রদীপের সামনে দাঁড়ান নি তবু এরই মধ্যে ভরসা কাজল মুখার্জি। খেলার পেছনে নিষ্ঠা আছে, চিন্তা আছে আছে পরিচ্ছন্নতা, পারিপাট্য।

শ্রীতেজেশ সোমের (বাঘাবাবু) নিজের হাতে গড়া ইষ্টার্ণ রেলের এই কাজল। পোষাকী নাম অসীম কাজল, মাঠে এসে অসীমত্ব মুছে গেছে। ইনসাইড, আউটসাইড এবং হাফ ব্যাক এই তিন জায়গাতেই সমান দাপটে, সমান নৈপুণ্যে খেলতে পারেন —উদ্যমী ও পরিশ্রমী কাজল। কাজলের জন্ম কলকাতার এণ্টালীতে ১৯৪৩ সালের নভেম্বর মাসে। বাবা-ঠাকুর্দার আদি বাড়ী ছিল পদ্মারপারে—ঢাকায়। কাজল কখনও পদ্মা দেখেনি, দেখেনি ঢাকাও। বর্তমানে ঢাকুরিয়ার বাসিন্দা। দ্বারকানাথ বিদ্যাপীঠে পড়ার সময় ফুটবলের হাতেখড়ি সেলিমপুর বয়েজ ক্লাবের শ্রীঅমর গুপ্তের কাছে।

ফুটবলের স্বীকৃত আসরে প্রথম আবির্ভাব ১৯৫৮ সালে দিল্লীতে জাতীয় স্কুল ক্রীড়ায়। বাংলা স্কুল সেবার ফুটবলে রাণার্স-আপ; পরের বছর আগরতলায় একই প্রতিযোগিতায় খেলার সূত্রে কাজল অনেকের চোখে রং ধরালেন। শ্রীবলাইদাস চট্টোপাধ্যায় এগিয়ে এসে কাজলকে নিয়ে গেলেন মোহনবাগান জুনিয়র দলে। ১৯৫৯-৬০ সালে নিয়মিত পাওয়ার লীগে খেললেন মোহনবাগান ক্লাবের হয়ে। পরের বছর টেনে নিলেন বাঘাদা ইষ্টার্ণ রেলে, প্রদীপের দীপ্তিতে কাজলের পূর্ণ প্রকাশ ঘটলো, প্রতিভার স্পর্শে কাজল উৎসাহিত, উজ্জীবিত হলেন। ১৯৬১ সাল থেকে ১৯৬৪ পর্যন্ত ইষ্টার্ণ রেলে খেলার পর ১৯৬৫ সালে যোগ দিলেন মোহনবাগানে। মোহনবাগান সে বছরের লীগ চ্যাম্পিয়ন ও ডুরাণ্ড বিজয়ী। আই এফ এ শীল্ড ও রোভার্স কাপে রাণার্স-আপ।

আন্তর্জাতিক ফুটবলে কাজল প্রথম খেলেছেন ১৯৬৩ সালে পেনাংয়ে এশীয় যুব ফুটবল প্রতিযোগিতায়। পরের বছর তেল আবিবে এশীয় কাপ এবং কলকাতা-তেহরাণে ইরাণের বিরুদ্ধে প্রাক অলিম্পিক ফুটবলে ভারতীয় দলের প্রতিনিধিত্ব করেছেন কাজল মুখার্জি। ১৯৬৪, ১৯৬৫ ও ১৯৬৬ সালে কুয়ালালামপুরে উপর্যুপরি তিন বছর মারদেকা ফুটবল প্রতিযোগিতায়ও কাজল ছিলেন ভারতীয় দলের অন্যতম প্রতিনিধি। জাতীয় ফুটবলে রেলওয়ের হয়ে খেলেছেন মাদ্রাজে সর্বপ্রথম ১৯৬৪ সালে। পরের বছর গোহাটিতেও। রেল সেবারের চ্যাম্পিয়ন। বাংলা রাণার্স-আপ।

প্রশান্ত সিংহ
(ইষ্টবেঙ্গল)

পাকা জহুরী শ্রীবাঘা সোমের রত্ন চিনতে ভুল হয়নি। টালা পার্কে খেলা দেখে বাঘাবাবু অনেক প্রত্যাশা নিয়ে প্রশান্তকে নিয়ে এলেন ইষ্টার্ণ রেলওয়ের

ফুটবল খেলার ডেরায়। ক্রেম ব্রাউন ইনস্টিটিউটের মাঠে। ১৯৫৫ সালের ঘটনা এটি।

দু-বছর ধরে বাঘাবাবু ওকে মনের মত করে গড়লেন, তারপর ১৯৫৭ সালে নিয়ে এলেন কলকাতা ময়দানে— গায়ে ইস্টার্ণ রেলের জামা চাপিয়ে। আজকের ইস্টবেঙ্গলের অধিনায়ক প্রশান্ত সিংহ হাওড়া পার্কে ইস্টার্ণ রেলের বিরুদ্ধে সে খেলাটি জীবনে হয়তো ভুলতে পারবেন না। প্রশান্ত সিংহের আজ সর্বভারতীয় পরিচিতি। পরিচিতি জাতীয় ও আন্তর্জাতিক ফুটবলের আসরে। হাফ ব্যাকে খেলতে অভ্যস্ত হলেও প্রয়োজনবোধে ইনসাইডের কাজও চালিয়ে যেতে পারেন সমান নৈপুণ্যে। কলকাতার মাঠে প্রশান্তর মত অতো নিখুঁত 'রিসিভিং' অনেকেরই নেই। তার ওপর দু-পায়ে সমান সট, জায়গা রেখে খেলার মূল গতিকে আক্রমণাত্মক পথে টেনে আনতেও প্রশান্তর ভূমিকা লক্ষ্যণীয়। আচমকা দূর থেকে লম্বা সট নিয়ে কতবার প্রতিদ্বন্দ্বী গোলরক্ষককে বিপদের মুখে ফেলে দিয়েছেন, তার কি সংখ্যা আছে? মোহনবাগানের প্লাটিনাম জুবিলী উৎসবে হাতাবানিয়ার বিরুদ্ধে এবং এই সেদিন লীগের প্রথম পর্বের খেলায় মোহনবাগানের বিরুদ্ধে প্রশান্তর গোল দুটি অনেকেরই চোখের সামনে ভাসছে এখনও।

প্রশান্তর জন্ম ১৯৩৮ সালের ৫ই ডিসেম্বর, বেলগাছিয়ায়। পড়াশুনা মনোহর একাডেমী ও সিটি কমার্সে। আদি বাড়ী পূর্ব বাংলার, ফরিদপুর জেলার মাদারীপুরে। ১৯৫৯ সাল থেকে ১৯৬২ সাল পর্যন্ত প্রশান্ত জাতীয় রেল ফুটবল প্রতিযোগিতায় খেলেছেন। জাতীয় ফুটবলে প্রথম আবির্ভাব ১৯৫৯ সালে। শুধু ভারতে নয়, আন্তর্জাতিক ফুটবলের আসরেও প্রশান্ত ভারতের প্রতিনিধিত্ব করেছেন একাধিকবার। ১৯৬২ সালে জাকার্তায় অনুষ্ঠিত 'ঝটিকাবিক্ষুব্ধ' এশীয় ক্রীড়ায়, ১৯৬৩ সালে সিংহলের বিরুদ্ধে প্রাক-অলিম্পিক পর্বে, তেল আবিবে অনুষ্ঠিত এশীয় কাপে, একাধিকবার মারদেকা ফুটবলে প্রশান্ত সগৌরবে ভারতের রক্ষণব্যূহ আগলেছেন। প্রশান্ত এখন ভারতীয় ফুটবল দলের অন্যতম শক্ত খুঁটি। প্রশান্তর আর এক জ্ঞাতি-ভাই মোহনবাগানের সুশীল সিংহ, কনিষ্ঠ খেলেছেন উয়াড়ীতে। রিজার্ভ ব্যাংক অব ইন্ডিয়ার কর্মী প্রশান্ত এবার ইস্টবেঙ্গলের অধিনায়ক। এবং তারই সূত্রে এক বিরাট দায়িত্ব কাঁধে নিয়ে চলেছেন তিনি। কিন্তু সবচেয়ে আশ্চর্য এই গুরু দায়িত্বের মাঝখানেও, জয়-পরাজয়, সাফল্যে-ব্যর্থতায় প্রশান্তর মুখে প্রশান্ত হাসিটি লেগেই রয়েছে। সার্থক নাম প্রশান্ত।

অরুণ ঘোষ

(বি এন আর)

সবাই তাজ্জব বনে গেলেন, খবরটা সত্যি তো? ইস্টবেঙ্গল ক্লাব তাঁবুতে সোরগোল উঠলো, অরুণ অলিম্পিক দলে নির্বাচিত হয়েছেন, অরুণ রোমে যাবেন।

খবরটা মিথ্যে ছিল না, রহিম সাহেব বাজিয়ে বাজিয়ে, হাজার পরীক্ষা করে অরুণ

ঘোষকে ভারতীয় দলে নেওয়ার সুপারিশ করে ছিলেন। পরলোকগত কোচ রহিম সাহেবের কথা বোলতে বোলতে অরুণ ঘোষের চোখ আজও ঝাপসা হয়ে আসে।

দুরন্ত ঝড়ের বেগে ভারতীয় ফুটবলে অরুণের আবির্ভাব আর আবির্ভাবের সঙ্গে সঙ্গেই আসর মাৎ। অরুণ খেলেন স্টপারের জায়গায়, রাইট ব্যাকেও সমান দাপট। প্রতিপক্ষের পা থেকে বল কেড়ে নেওয়া, হেড করা, জায়গা আগলানো এবং সর্বোপরি নিজের ওপর অগাধ বিশ্বাস অরুণকে আজ ভারতীয় ফুটবলের শ্রেষ্ঠাংশে তুলে ধরেছে। ১৯৪১ সালের ৭ই জুন হাওড়ায় অরুণের জন্ম। লেখাপড়া শিবপুর দীনবন্ধু স্কুল ও কলেজে। ছেলেবেলায় ফুটবলের হাতেখড়ি হয়েছিল শালিমার ইউনাইটেড ক্লাবে। এই সময় চোখে পড়লেন প্রখ্যাত ফুটবল খেলোয়াড় শ্রীদাশু মিত্রের। ১৯৫৪ থেকে ১৯৫৮ সাল পর্যন্ত অরুণ খেললেন সিনিয়র ডিভিসন হাওড়া ইউনিয়নের পক্ষে। ১৯৫৮ সালে কাবুলে জাসান উৎসবে চুণীর নেতৃত্বে ভারতীয় বিশ্ববিদ্যালয় ফুটবল দলের স্টপার হিসেবে খেলেন। পরের বছর খ্যাতকীর্তি শ্রীশৈলেন মান্না নিয়ে এলেন মোহনবাগানে। এই বছর লীগ বা আই এফ এ শীল্ডে না খেললেও অরুণ ডুরাণ্ডে জয়ী মোহনবাগানেরই হয়ে খেলেছিলেন। ১৯৬০ সালে এলেন ইস্টবেঙ্গলে। সেবার ইস্টবেঙ্গল ডুরাণ্ড এবং ডি সি এমে জয়ী এবং রোভার্সে রানার্স-আপ হয়। কিছুদিন পরেই এলো অরুণের ভাগ্যে সেই অসামান্য সম্মান। রোম অলিম্পিকে (১৯৬০) ভারতীয় দলে নির্বাচিত হলেন তিনি। ১৯৬১ সালে লীগ ও শীল্ড বিজয়ী ইস্টবেঙ্গল দলে খেলেছিলেন। আন্তঃ বিশ্ববিদ্যালয় ফুটবলে খেলেছেন ১৯৫৭, ১৯৫৮ ও ১৯৫৯ সালে। শেষের দুবার দলের অধিনায়ক ছিলেন অরুণ ঘোষ। ১৯৬০ সালে কালিকটে জাতীয় ফুটবলে প্রথম আবির্ভাবেই অরুণ কেরলবাসীর মন কেড়েছিলেন। ১৯৬১ সালে ভারতীয় দলের হয়ে মারদেকা, ১৯৬২ সালে জাকার্তায় এশীয় ক্রীড়া (ভারত চ্যাম্পিয়ন), ১৯৬৩ প্রাক অলিম্পিকে সিংহলের বিরুদ্ধে, ১৯৬৪ সালে ঐ একই প্রতিযোগিতায় ইরাণের সঙ্গে উভয় পর্বে প্রশংসার সঙ্গে খেলেছেন অরুণ ঘোষ। এই বছর তেল আবিবে এশীয় কাপেও তিনি ভারতীয় দলের অন্যতম সদস্য ছিলেন। কিছুদিন পরেই গৌহাটিতে অরুণের রেল দল সন্তোষ ট্রফি পেল গৌহাটির নেহরু-স্টেডিয়ামে। ১৯৬৫ এবং ১৯৬৬ সালে মারদেকা ফুটবলের আসরেও ডাক পড়লো তাঁর। গত বছর আই এফ এ-র ব্রহ্ম সফরে অরুণ ঘোষ ছিলেন দল-নায়ক। এই সফর শেষ হতে না হতেই গেলেন ব্যাংকক এশীয় ক্রীড়ায়। অরুণের খেলোয়াড়জীবনের সবচেয়ে স্মরণীয় মুহূর্ত এসেছিল ১৯৬৫ সালে যখন রাষ্ট্রপতি ডঃ সর্বপল্লী রাধাকৃষ্ণনের কাছ থেকে সকৃতজ্ঞচিত্তে অর্জুন পুরস্কারটি নিয়েছিলেন তিনি।

—বিপুল বন্দ্যোপাধ্যায়

চিরশ্রী বিশী চক্রবর্তী

"মেয়েরা দুই জাতের কোন কোন পণ্ডিতের কাছে এমন কথা শুনেছি। এক জাত প্রধানতঃ মা, আর এক জাত প্রিয়া। ঋতুর সঙ্গে তুলনা করা যায় যদি মা হলেন বর্ষা ঋতু, জলদান করেন ফলদান করেন...। আর প্রিয়া বসন্ত ঋতু। গভীর তার রহস্য, মধুর তার মায়ামন্ত্র।"...

রবীন্দ্র-নিরূপিত নারীসত্তার এই বিশিষ্ট সংজ্ঞা জীবন থেকে সাহিত্যের ক্ষেত্রে সমানভাবে প্রযোজ্য। তিনি নিজেও এই বিশিষ্ট সংজ্ঞাকে অনুসরণ করেছেন "মায়ার খেলা" (১৮৮৮ খৃঃ) থেকে দুইবোন (১৯৩৩ খৃঃ) পর্যন্ত। 'শান্তা' ও 'প্রমদা'—নামকরণের মধ্যেই তাদের ব্যক্তি বৈশিষ্ট্যকে প্রকাশ করেছে। বহুকাল পর্যন্ত পরস্পর-বিরোধী দুই নারীচরিত্রকে একই সঙ্গে পাশাপাশি উপস্থাপিত করা হয়েছে। আবার 'রাত্রে ও প্রভাতে' কবিতায় একই নারীর দুই ভিন্নরূপের বন্দনাও গীত হয়েছে। অর্থাৎ এই নারীবৈশিষ্ট্য কখনও ভিন্নদেহে আবার কখনও স্থানকালভেদে একই দেহে বিচিত্ররূপে প্রকাশিত। বস্তুতঃ নারী এখানে ব্যক্তি নয় একটি বিদেহী আইডিয়া মাত্র। স্বামীরূপে পুরুষকে কেন্দ্র করেই যার তুষ্টি ও পুষ্টি। সীতা সম্পর্কিত বিশেষণটি স্বভাবতঃই এখানে আমাদের স্মরণে আসে—'ছায়েবানুগতাপতিম্ মেরুমর্কপ্রভা যথা'। প্রাচীন ভারতীয় নারী বলতে আমাদের ধারণাও এর মধ্যেই সীমায়িত। নারীকে আমরা দেখেছি বিধাতানির্বাচিত এক শক্তিধর—সর্বঅধিকারপ্রাপ্ত — মহান —জীবন-মণ্ডলীর মনোরঞ্জনের অধিকার-মাত্র লাভে-ধন্যা-অধীনার ভূমিকায়। কখনো পতি-সঙ্গিনী রঙ্গিণীরূপে। কখনো পতিদত্ত পুত্র পালয়িত্রীর কর্তব্যকর্মের মধ্যেই তার যতটুকু ব্যক্তিবৈশিষ্ট্য প্রকাশমান। এছাড়া কোনরকম স্বকীয়তা ও স্বাধীনতায় তার অধিকার তৎকালীন সমাজের পক্ষে অসুবিধাজনক বলে ছিল অস্বীকৃত। এগুলি আমাদের স্বকপোলকল্পিত আত্মনিন্দা নয়, মনুর বিধানে এর প্রত্যক্ষ প্রমাণ মিলবে। অপরপক্ষে স্মরণযোগ্য যে অন্যদিকে পুরুষের পরিচয় কেবল স্বামী কিংবা পিতা হিসাবেই সমাপ্ত নয়, বস্তুতঃ সেই পরিচয়টুকুই যৎসামান্য। মধ্যযুগ পর্যন্ত ভারতীয় নারীর মোটামুটি এই-ই বাস্তব ছবি। ব্যতিক্রম নেই তা নয়, তবে তা প্রথাবদ্ধ নিয়মকেই সমর্থন করে। প্রাচীন যুগের সাবিত্রী, মধ্যযুগের বেহুলা—প্রচলিত সমাজবিধির যাবতীয় শাসন নতশিরে মেনে-না-নেবার সাহস দেখিয়েছেন। তবে তাঁদের সেই বিদ্রোহের মূলে তাঁদের স্বামী। মৃত্যুর সঙ্গে মুখোমুখি করে, কোথাও দেবসমাজে লাস্যনৃত্যের মূলে তাঁরা ছিনিয়ে এনেছেন তাঁদের প্রেমের একমাত্র অবলম্বনকে। আর সম্ভবতঃ এই কারণেই সমাজ পরোক্ষভাবে তাঁদের এই নিরাপদ-বিদ্রোহটুকুকে স্বীকৃতি দিয়েছে।

মহাভারতের দ্রৌপদীই দেখি একমাত্র নারী যিনি তাঁর আত্মাবমাননায়, বীর্যবান পঞ্চস্বামীর নিষ্ক্রিয়তার পরিতাপে, রোষে আত্মহারা। নারী-অপমানের প্রতিক্রিয়ায় হিংসা-লোভ-অত্যাচারের ইন্ধনে জ্বলে উঠেছে কুরুক্ষেত্রের এই মহাদাবানল। যজ্ঞ-সমুত্থিতা যাজ্ঞসেনীর উন্মুক্ত বেণী কুটিল কেশরাশি সেই যুগসন্ধ্যার আকাশে করাল কৃষ্ণমেঘ। রামায়ণেও সীতাহরণ মুখ্য ঘটনা, বলতে পারি আলম্বনবিভাব। কিন্তু কার্যতঃ সীতা নারী হিসাবে এখানে উপেক্ষিতা। রাম-রাবণের যুদ্ধ বস্তুতঃ ব্যক্তিমর্যাদার লড়াইয়ে পরিণত হয়েছে। তাই জয়পরাজয় মীমাংসার শেষে সীতাকে জনসমক্ষে অগ্নি-পরীক্ষার অসম্মান মাথা পেতে নিতে হয়। প্রজারঞ্জনের জন্য সীতা পরিত্যাগের কাহিনী সগৌরবে জাতীয় চরিত্রকে পরিপুষ্ট করে। ভারতীয় সাহিত্যের সংখ্যাগরিষ্ঠ নারীর প্রতিনিধি এই বৈদেহী সীতা। ধৈর্য, ত্যাগ, তিতিক্ষার এক মূর্তিমতী বিগ্রহ। প্রয়োজনবোধে কখনও তিনি দেবীরূপে পূজিতা, কখনও সামান্য মানবীবোধে লাঞ্ছিতা। কখনোই তাঁর মুখে প্রতিবাদের ভাষা ফোটেনি, বড়জোর আত্মনাশের প্রার্থনা ছাড়া।

ভারতের নারীঐতিহ্যের এই পটভূমিকায় রবীন্দ্রনাথের নারীচরিত্রের আলোচনাই আমাদের উদ্দেশ্য। এজন্য রবীন্দ্রনাথের বিশিষ্ট কয়েকটি কাহিনী ও নারীচরিত্রকে এখানে গ্রহণ করা হচ্ছে। প্রথম যুগের রচনায় দেখি প্রাখর্যহীন প্রেম-তত্ত্বে রচিত স্নিগ্ধ কাহিনীগুলিকে. সেখানে কোন নারীই ব্যক্তি নয়, শ্রেণীবিশেষের প্রতিনিধি। এই যুগের প্রথম বলিষ্ঠ প্রতিবাদ পৌরুষ-সাধিকা চিত্রাঙ্গদা। স্বরূপে যে প্রত্যাখ্যাতা, ভিক্ষা-প্রাপ্ত সৌন্দর্য-গুণ্ঠনে তাকে আত্মদান করতে হয়েছে। একদিকে মুখর-কামনা, অন্যদিকে রাজকন্যার আভিজাত্যসম্ভূত আত্মগ্লানি—চিত্রাঙ্গদার চরিত্রের এই দ্বন্দ্ব-সংকুলতা তাকে অনন্যসাধারণ মহিমা দিয়েছে। অবশেষে সে আত্মপ্রকাশ করেছে—ভোগী, মদন-পদানত পরাজিত অর্জুনের কাছে নয়, তার চিরবাঞ্ছিত বীর গাণ্ডিবীর কাছে। রাজেন্দ্রনন্দিনী চিত্রাঙ্গদার এই ব্যক্তিত্বসমুদ্ভাসিত আত্মপরিচয় নারীর নতুন মূল্যকে এই প্রথম স্বীকৃতি দিল।

'আমি চিত্রাঙ্গদা—রাজেন্দ্রনন্দিনী,
নহি দেবী, নহি সামান্যা নারী।
পূজা করি মোরে রাখিবে ঊর্ধ্বে সে নহি,
হেলা করি মোরে রাখিবে পিছে সে নহি,
যদি পার্শ্বে রাখো মোরে সংকটে সম্পদে
সম্মতি দাও যদি কঠিনব্রতে সহায় হতে
পাবে তবে তুমি চিনিতে মোরে।'

নারীর এই 'কোষবিমুক্ত কৃপাণলতা' রূপের অনন্য ব্যক্তিত্বের অন্তরে জেগে উঠেছে রবীন্দ্রসাহিত্যের তৃতীয়া নারী। স্বপরিচয়-লব্ধা এরপর সহসা উপলব্ধি করেছে—'আমি নারী আমি মহিয়সী।' 'চিত্রাঙ্গদায়' তৃতীয়া নারী এই পদক্ষেপ অকুণ্ঠিত নয়। 'নারীর ললিত লোভনলীলা' স্বপ্নে তাকে জয়লাভ করে তবে স্বাধিকারে প্রতিষ্ঠিত হতে হয়েছে। সেখানেই তার প্রকৃত গৌরব—দৈবায়ত্ত ধনে ঋণী নয় সে।

তৃতীয়া নারীর আবির্ভাব ঘটলো। কিন্তু তার পরবর্তীরূপে সহজে স্বীকৃত হল না। ফলে চললো নানাবিধ পরীক্ষা-নিরীক্ষা। প্রজাপতির নির্বন্ধের (১৯০৮) শৈলবালাকে তার এক পর্যায় মনে করা চলতে পারে। বিদ্যা তার বৈধব্যের শূন্যস্থান পূর্ণ করে রেখেছে। এমনকি শেষে শামলা-চাপকান এঁটে তাকে পুরুষবেশে পুরুষ-সভাসভায় উপস্থিত হতেও হয়েছে। উদ্দেশ্য যাইহোক না কেন এটাকে আমরা একধরনের "এক্সপেরিমেন্ট" বলতে পারি। কিন্তু শেষ পর্যন্ত তাকেও দেখা গেছে কর্তব্যশেষে ঠাকুরঘরে দরজা দিতে। রাণীগিরির শেষে দেবীরাণীর প্রফুল্লে রূপান্তর আর কি! এটা কোন স্থায়ী পরিচয় নয়।

গোরার ললিতা (১৯১০) দুর্লভ নারীব্যক্তিত্বের একটি বাস্তব উদাহরণ। 'আপনভাগ্য জয় করিবার অধিকার'কে সে সবলে অর্জন করেছে। অপেক্ষাকৃত আলোক-প্রাপ্ত ব্রাহ্মসমাজের কন্যা হলেও তার আত্মমর্যাদাশীল ব্যক্তিত্বের নিঃশব্দ প্রতিবাদের প্রকাশ, নিঃসম্পর্কিত যুবক বিনয়ের সঙ্গে জাহাজে কলকাতা যাত্রা ইত্যাদি পানুবাবুর মতো রক্ষণশীল সভ্যকে বিস্ময়বিমূঢ় আর কটুক্তিমুখর করে তুলেছিল। কোনপ্রকার হীনত্বমূলক বন্ধনকেই সে স্বীকার করেনি, তার প্রিয়জনকেও করতে দেয়নি। ফলে আধিপত্যপ্রয়াসী ব্রাহ্মসমাজের অন্ধ-গ্রাস থেকে সে নির্দ্বিধায় নিজেকে সরিয়ে এনেছে। এই কারণেই গোরা-বিনয়ের প্রগাঢ় বন্ধুত্বকে প্রভুত্বস্বীকার কল্পনায় বিনয়কে গোরার মোহপাশমুক্ত করতে চেয়েছে। এমনকি ললিতাকে গ্রহণমানসে বিনয় যখন

ব্রাহ্মসমাজের কর্তৃত্ব মেনে নিতে সম্মত, তখন সেই স্বয়ং তার প্রতিবন্ধকতা করেছে। ঊনবিংশ শতকের বিদুষী কন্যা জীবিকার মানসে নয়, ধনীগৃহের কর্মহীন আত্ম-বিনাশের থেকে উদ্ধারের জন্যে, জ্ঞান বিতরণের জন্য স্কুল খুলেছে। "মেয়েমানুষ হয়ে জন্মেছি বলেই কি নিজের মনখানাকে নিয়ে ঘরের মধ্যে আছাড় খেতে থাকবো? পৃথিবীর কোন কাজেই লাগবো না।" ঘরপোষা বাঙালীর মেয়ে নিজের গৃহ-আঙিনার বাইরের বিশাল পৃথিবী সম্বন্ধে সচেতন হয়ে উঠছে। ললিতাচরিত্রে তারই ইঙ্গিত। ললিতা দুর্লভিতা কিনা জানি না, কিন্তু রবীন্দ্রসাহিত্যেও ললিতা দুর্লভা।

ললিতার পরবর্তী উল্লেখযোগ্য পদক্ষেপ—স্ত্রীর পত্র (১৯১৪) ও পয়লা নম্বর (১৯২০) এ মৃণাল ও অনিলায়। ছোটগল্পে নিখুঁত ছোট্ট কাহিনী, ছোট্ট চরিত্র, কিন্তু অসামান্য তার পরিচয়। মৃণাল নারীর প্রকৃত অসম্মানের রূপ দেখেছে অসহায়া আশ্রিতা রূপহীনা বিন্দুর মধ্যে। এই বিন্দুর মৃত্যুতে তার সংসারসম্পর্কিত মোহপাশ গেছে নিঃশেষে ছিন্ন হয়ে। সংসারে নারীর প্রকৃত স্থান সম্বন্ধে তার আর কোন মিথ্যা কাব্যাদর্শ টেকেনি। তাই তার মেজবৌ পরিচয়ের ওপরে আর কোন পরিচয় আছে কিনা তাই সে খুঁজতে গেছে। লিখেছে দীর্ঘ চিঠি—

..."আমি তোমাদের মেজবৌ। আজ পনেরো বছর পরে এই সমুদ্রের ধারে দাঁড়িয়ে জানতে পেরেছি, আমার জগৎ ও জগদীশ্বরের সঙ্গে আমার অন্য সম্বন্ধও আছে। তাই আজ সাহস করে এই চিঠিখানি লিখছি—এ তোমাদের মেজবৌ-এর চিঠি নয়।...

...তোমাদের অভ্যাসের অন্ধকারে আমায় ঢেকে রেখে দিয়েছিলে। আজ বাইরে এসে দেখি আমার গৌরব রাখবার আর জায়গা নেই।

তুমি ভাবছো আমি মরতে যাচ্ছি—ভয় নেই অমন পুরনো ঠাট্টা তোমাদের সঙ্গে আমি করবো না। মীরাবাঈ তো আমারই মতো মেয়েমানুষ ছিল—তার শিকলও তো কম ভারি ছিল না। তাকে তো বাঁচবার জন্যে মরতে হয়নি। মীরাবাঈ তার গানে বলেছিলো; ছাড়ুক বাপ, ছাড়ুক মা, ছাড়ুক যে যেখানে আছে। মীরা কিন্তু লেগেই রইল প্রভু—তার যা হবার তা হোক।' এই লেগে থাকাই তো বেঁচে থাকা।

আমিও বাঁচবো। আমিও বাঁচলুম।

তোমাদের চরণতলাশ্রয়চ্ছিন্ন

মৃণাল।"

পয়লা নম্বরের অনিলা পণ্ডিতম্মন্য উদাসীন স্বামীর আত্ম-অচেতন নিষ্ঠুর অবহেলাকে শেষদিন পর্যন্ত মেনে নিয়ে চলতে পারেনি। ছোটভাইয়ের অকালমৃত্যু তার জীবনকে বন্ধনমুক্ত নৌকার মত অনির্দেশ্য স্রোতে ভাসিয়ে নিয়ে গেছে। সেই অজ্ঞাত পথযাত্রার সাথী বলে সে কাউকে মানেনি। তার স্বামীকে নয়, তার ভক্ত পূজারীকে নয়। একই কাগজের দুই খণ্ডে একই অক্ষরের নৈর্ব্যক্তিক ভাষায় সংক্ষিপ্ত বিদায়চিহ্ন সে রেখে গেছে তাদের দুজনের কাছেই, সমানভাবে।

দুই কাহিনীর দুটি চরিত্রের একটা প্রত্যক্ষ দৃষ্ট বাস্তব সম-সাদৃশ্য আছে। দুই চরিত্রে অবশ্য প্রভেদ থাকাই স্বাভাবিক। মৃণাল সংগ্রামী, প্রতিবাদ-অকুণ্ঠ। অনিলা

স্বচ্ছন্দচারী, সংযুক্তমনা। কিন্তু দুজনের পথই চলেছে সমান্তরাল। পরিচিত সংসার আর পরিজন ছেড়ে অনির্দিষ্ট বিশাল জগতের দিকে। লেখক অন্যত্র বলেছেন—“স্ত্রী আফিম খেয়ে, গলায় দড়ি দিয়ে মরলে সেও বোঝা যায়। কিন্তু তাই বলে স্বামীকে একেবারে বাদ দিয়ে স্ত্রী নিজের জোরে থাকবে এটাকে মৌতির মা স্পর্ধা বলেই মনে করে।” বস্তুতঃ এদের দুজনের প্রতিবাদে ভাষা এই উপযুক্ত স্পর্ধা প্রকাশেরই ভাষা।

যোগাযোগের ‘কুমুদিনী’ (১৯২৯) এদের থেকে ভিন্নজাতীয় চরিত্র। তার জন্মক্ষণ মধ্যযুগ আর আধুনিক যুগসন্ধি। তার শিক্ষা আর প্রকৃতিতে সেই দুই ভিন্ন-যুগের আলোছায়া। দাদার কাছে সে এস্রাজ শেখে, বন্দুক পরিষ্কার করে, ইংরাজী বাংলা লেখাপড়ার সঙ্গে বাজী ধরে দাবাও খেলে। কিন্তু তার মনের গণ্ডিতে এখনও আছে ব্রতপূজাপার্বণে অচলা নিষ্ঠা। ঠাকুরের পায়ে ফুল ফেলে ভাগ্যগণনা ও ভবিষ্যৎ নির্ধারণ। মনের এক কোটিতে মায়ের সতীত্ব আর পতিনিষ্ঠার পুণ্যছায়া, অন্য কোটিতে আধুনিক শিক্ষার প্রভাব স্বাধীনচিন্তার বিকাশ। স্বামীর ধনজয়ত্ব, দাম্ভিকতা, কর্কশ পৌরুষ আর সম্মানজ্ঞানহীনতা কুমুকে কেবলি দূরে ঠেলে দিয়েছে। তার অন্তরের অর্ঘ্য অন্তর দিয়ে গ্রহণ করবার উপযুক্ততা তার স্বামী মধুসূদন অর্জন করতে সক্ষম হয়নি। অভিজাত কন্যা কুমুদিনীর আন্তর-শুচিতা আর সহজ সম্ভ্রমের পাশে মধুসূদন নিজেকে কেবলি হীনপ্রভ দেখেছে, তারই হীনমন্যতার প্রত্যক্ষ বিকাশ এই রূঢ় দাম্ভিকতা ও ধনমত্ততা। মনের নাগাল না পেয়ে শেষে দেহের নাগাল ধরে কুমুকে অধিকার করতে চাইল সে। উত্ত্যক্ত কুমুদিনীর শেষ আশ্রয় দাদা বিপ্রদাসের রোগশয্যার পাশ থেকে যখন তাকে শেষবার চলে যেতে হল, তখন সে বলে গেছে—

“এমন কিছু আছে, যা ছেলের জন্যও খোওয়ানো যায় না। আমি ওদের বড়বউ, তার কি কোন মানে আছে, আমি যদি কুমু না হই।”

নারীর পূর্ণতার পার্থিব বিকাশের চরম রূপ বলে আমরা মাতৃত্বকে মেনে নিয়ে-ছিলাম। সে মাতৃত্ব প্রার্থিত বা প্রথাগত যাই হোক না কেন। মাতৃত্বের ঊর্ধ্বে আর কিছু থাকতে পারে একথা ভাবতেও আমরা সাহস করিনি। ‘গৃহিণী সচিব সখী’র সংজ্ঞায় যারা দাসীকেও যোগ করেছে, তাদেরই কৃপা-ভিক্ষুরা বলে এসেছে—“মন্ত্র পড়ে স্ত্রী যে কেনা হয়েই গেছে। সাতপাক যেদিন ঘোরা হ'ল সেদিন সে যে দেহেমনে বাঁধা পড়লো। তার তো পালাবার জো রইল না। এ বাঁধন যে মরণের বাড়া। মেয়ে হয়ে যখন জন্মেছি তখন এ জন্মের মতো, মেয়ের ভাগ্য তো আর কিছুতে উজিয়ে ফেরানো যাবে না।” কিন্তু সেই রজনীগন্ধার মত পেলব, নূরনগরের দীঘির মত শান্ত মেয়েটি অচঞ্চল মহিমায় অনুত্তেজিত কণ্ঠে বলে গেল নারীর নতুন মূল্যবোধের আদিপাঠ। জায়া বা জননীর সামাজিক পদ যদি অবাঞ্ছিত হয় তবে তাকে মেনে নিতেই হবে এমন অনুশাসন দূর অন্তর্হিত।

উদাহরণ বাড়িয়ে লাভ নেই—সর্বশেষে আমরা রবীন্দ্রনাথের অন্যতম শেষ রচনা ল্যাবোরেটরীর ‘সোহিনী’কে (১৯৪০) উপস্থাপিত করছি। কুমুদিনী প্রেমহীন সতীত্ব-সংস্কার ও অবাঞ্ছিত-মাতৃত্বের দায়িত্বকে অস্বীকার করেছিল। সোহিনী সমাজ-প্রচল সতীত্বনিষ্ঠা ও প্রচলিত নীতিবোধকেও পদে পদে লঙ্ঘন করে গেছে। সে তার একমাত্র প্রেমিক তথা স্বামীর আদর্শবাদের কাছে পূর্ণ আত্মনিবেদিত। তার একদা-পতিত জীবনের উদ্ধারকর্তা আত্মভোলা জ্ঞানসাধকের পত্নীত্বের মর্যাদা তার জীবনের কেন্দ্রীভূত কৃতজ্ঞতা ও ভালবাসার উৎস। সেই জ্ঞানসাধকের সাধন-পীঠ ল্যাবোরেটরীটি তার কাছে তার স্বামীর প্রতীক। এই ল্যাবোরেটরির তিলমাত্র শুচিতাহানি তারপক্ষে অসহনীয়। সে পাঞ্জাবিনী, কিন্তু স্বদেশ স্বভাবার ঊর্ধ্বে তার দেশকালানিরপেক্ষ প্রেম। এই পার্থিব স্মৃতির অপার্থিব আদর্শায়নের পথে, ল্যাবোরেটরির উন্নয়নের জন্য তার একমাত্র কন্যা নীলাকে কখনও প্রলোভন হিসাবে তুলে ধরেছে আবার কখনও প্রতিবন্ধক বিশ্বাসে রূঢ়হস্তে অপসারিত করেছে। এজন্য সে প্রচলিত ন্যায়নীতির প্রতিটি পাঠকেই অবজ্ঞা করে গেছে। প্রচলিত সমাজে সোহিনীর এই নীতিহীন নীতি, তার এই স্থিরলক্ষ্য অথচ ভ্রান্তপথের সমর্থন পাবে না কোথাও। তবু বলা যায়—জীবন জটিল, আধুনিক জীবন জটিলতর। সাধারণ গজফিতে অনন্যসাধারণকে পরিমাপ করতে গিয়ে কেবল ভ্রান্তির সৃষ্টি করবে। মুক্ত মনের কাছে এ আবেদন নতুন।

এখন চিত্রাঙ্গদা থেকে যে দীর্ঘ পঞ্চাশ বৎসরের ইতিহাস এখানে মেলে ধরা হল তার পর্যালোচনা করে সহজেই একটি বিবর্তনসূত্রে পাওয়া যায়। উনিশ শতকের যে বাংলাদেশের সাধারণ মেয়ে বলেছে—

‘কাঁদিতেই শুধু জানি
জানি এলিয়ে পড়তে পায়ে’—

একদিন তারও জীবনে এসেছে—“ঝড়ের ডাক, বন্যার ডাক, পাঁজরের উপর আছাড় খাওয়া মরণসাগরের ডাক”, ভাসিয়ে নিয়ে এসেছে তাকে চিরকালীন পরাধীন চিন্তার বাঁধাঘাট থেকে। কবি তাকে নতুন নামে সম্বোধন করেছেন—“হে নারী, হে আত্মার সঙ্গিনী!” নব পরিচয়লব্ধা বলেছে ডেকে—

“কভু তারে দিব না ভুলিতে
মোর দৃপ্ত কঠিনতা,
বিনম্র দীনতা
সম্মানের যোগ্য নহে তার।

ফেলে দেব আচ্ছাদন দুর্বল লজ্জার।” দীর্ঘকালের মানসিক জাড্যের আবরণ-উন্মোচনে বেরিয়ে আসে ঘোমটা-খসা নারী। কিন্তু বিদ্রোহিনীও এখানে রক্তকেশিনী নয়। সাধারণ্যে বাহবার লোভে লোকলোচন-লোভা করে জনচিত্তমুগ্ধতার উপাদানে কবি [illegible] সত্য মর্যাদা প্রতিষ্ঠিত করবার [illegible] দীপ্ত—

“প্রাণ তার [illegible] পাখা—
মেলিল দিনের বক্ষে তাঁর অতৃপ্তিতে
দুঃসহ দীপ্তিতে।”

তথাপি, এই দুঃসহ দীপ্তির মাঝে কেবল ভাঙ্গনই নয়, কল্যাণের শ্যামস্পর্শও অগোচর থাকে না। তবে সে কল্যাণের আদর্শ ভিন্ন এই যা। তৃতীয়া নারীর সেইটেই হল জাগরণসূত্র।

চিত্রাঙ্গদার আত্মমর্যাদা অচেতনত্ব থেকে সুদৃঢ় ব্যক্তিত্বে দীপ্যমান পদার্পণে এই ইতিহাসের সূত্রপাত। লতিকা কেবল মর্যাদাসচেতনই নয়, সে মর্যাদারক্ষার জন্য সংগ্রামী মনোভাবাপন্ন। মৃণাল ও অনিলা-ঘরপোষা স্ত্রী-ত্বের ক্ষুদ্র খোলস থেকে বৃহত্তর জগতে নূতন জন্ম নিয়েছে। আর সেজন্য কারও হস্তাবলম্বের অপেক্ষায় রাখেনি। কুমুদিনী সাবেকী পত্নীত্বই নয়, প্রেমহীন পত্নীত্বেরও ফলশ্রুতি বাধ্যতামূলক মাতৃত্বের দায়িত্বকে বস্তুতঃ অস্বীকার করেছে। পরম প্রেম ও বৃহৎ আদর্শের জন্য ক্ষুদ্র প্রচলিত সতীত্ব-সংস্কার ও ন্যায়নীতিকে পদদলিত করতে সোহিনী দ্বিধা করেনি। তার সমস্ত জীবনই প্রচলিত নীতিবোধের প্রতি সদম্ভ প্রতিবাদ। আপাতচক্ষে একথা সত্য হলেও—

‘যার ধন তিনি ওই পরম সন্তোষে অপার স্নেহের হাসি হাসিছেন বসে।’

সুতরাং দেখা যাচ্ছে কবিনির্দেশিত জায়াজননীবৃন্দের সূত্রকে কবি নিজেই অতিক্রম করে গেছেন। যেখানে পুরুষচালিত সমাজের প্রয়োজনবোধের ঊর্ধ্বে নারীর মানবীসত্তা, যেখানে দেশকালের ঊর্ধ্বে তার পরিমাপ, যেখানে তার সমস্ত জীবন প্রয়োজন-অপ্রয়োজনের প্রশ্নেই সীমায়িত নয়। সেখানে সে প্রশ্ন তুলেছে—“আমি ওদের বাড়ীর বড়বউ, তার কি কোন মানে আছে, আমি যদি কুমু না হই।”

এই সহানুভূতির চেতনার রঙেই সাধারণ মেয়ে মালতী হয়ে উঠল অনন্যা। ‘আত্মার মোহিনী’রূপে কবির আহ্বানেই নারী জানালে “আমি নারী, আমি মহীয়সী। তাই তখন বাঁশীর সুরের দূরত্ব থেকে অজানা ঘরপোষা পাঠিকারা বাল্মীকির প্রথম রাগিণীর মতো উদ্‌ভাসিত হয়ে উঠে কবিকে অনন্য জানালে—“ওগো, বাঁশীওয়ালা, বাজাও তোমার বাঁশী, শুনি আমার নতুন নাম!”

কবির এই নতুন নামের আহ্বানেই সৃষ্টি হয়েছে বাংলার অঙ্গনার নতুন পরিচয়। এই নারীই রবীন্দ্রকাব্যের “তৃতীয়া নারী”।

।। কুড়ি ।।

সন্ধ্যার সময় ও'দের নিজেদের বৈঠক বসেছিল, ছাতের ওপর মাদুর সতরঞ্চি পেতে। ও'রা দুই জা, সুরবালা, রেবা; পাশের বাড়ি থেকে রেবার এক বন্ধু অসীমা। তমালও ছিল। সবার গল্পের সুযোগে কখন এসে একপাশে চুপিসাড়ে বসে পড়েছে। বিকালের কথাবার্তা নিয়েই চর্বিত-চর্বণ হচ্ছিল। সুরবালা বেশ চালিয়ে নিয়ে এসেছেন, তবে শেষকালটা কাঁচিয়ে ফেলতে যাচ্ছিলেন—বেটাছেলেদের এসবের মধ্যে চিনতে আছে? তাহলেই কোন্ মেয়ে—কি রকম মেয়ে—এদিকে রঙ্গঠানদিদি যখন রয়েছেন—দেখছেনই উল্টেপাল্টে—

অপর্ণা বলে উঠলেন—"এই যে এসেও গেছেন। অনেকদিন বাঁচবে ঠানদি, তোমারই নাম হচ্ছিল এখুনি। নাৎজামাই এসেছেন।"

"সে গন্ধ পেয়েই বোঝাপড়া করবার জন্যে ছুটে এসেছি, নৈলে আজ আবার যেমন পূর্ণিমের জন্যে বাতটা..."

—হাঁটু ধরে সিঁড়ি বেয়ে উঠে আসতে আসতে মুখটা একটু কু'চকে উঠল। তারপরেই রেবার ওপর নজর পড়ে যেতে থমকে দাঁড়িয়ে বললেন——"এই যে, তুই কখন এলি রেবা?"

"এসেছি অনেকক্ষণ, নাৎজামাইয়ের অনেক আগেই। তবে আমার গায়ে তো নাৎজামাইয়ের মতন কস্তুরী-হরিণের গন্ধ নেই যে টের পাবে।"

"থাকবে কোথা থেকে? নাতনীরা সে সব গন্ধ ঐদিকেই বিলিয়ে দিয়ে ব'সে থাকে।... ঝগড়ার কথা থাক্, তোকে আমি চাইছিলামই রেবা, বিশেষ দরকার আছে।"

তমালের বন্ধুমহলে সুপারলেটিভ্ ঝাড়বার অনেক বারুদ সংগ্রহ হয়েছে আজ, আরও কিছু সংগ্রহের লোভেই বসে ছিল. রঙ্গময়ী আসতে নজর পড়ায় উঠিয়ে দিলেন হেমাঙ্গিনী। বললেন—"যাও তমু, এবার তোমার মাস্টারমশাই আসবেন।"

তাতে ক্ষতি হবে না তমালের। মাথা ধরায় মাস্টারমশাইকে সরিয়ে দিয়ে পাশের ঘরে এসে বই নিয়ে বসবে—মাথা ধরা সত্ত্বেও ভালো মেয়ে হয়ে। তবু ততক্ষণে যে অনেক বারুদ হাতছাড়া হয়ে যাবে সেই শোকে ঠোঁট দুটো ওপর দিকে ঠেলে আস্তে আস্তে নেমে গেল।

রঙ্গময়ী এসে বসতে রেবা প্রশ্ন করলেন—"দরকারটা কি ঠানদি, চিঠি লিখতে যাচ্ছিলে যে?"

"হোমের মেয়েগুলো এক উদ্ভুটে হুজুগ তুলেছে, দোলের দিনটা এবার ডায়মণ্ডহারবারে গিয়ে কাটাবে। ডায়মণ্ড-হারবারের নাম শুনে আমার মুখ দিয়ে বেরিয়ে গেল—তা যাবি তো যা না, আমাদের রেবা রয়েছে সেখানে, বর মুন্সেফ, লিখে দিচ্ছি রেবাকে..."

হঠাৎ সবাইকে গম্ভীর হয়ে যেতে দেখে, একটু অপ্রতিভভাবেই থেমে গেলেন, সবার মুখের ওপর দিয়ে নজর ঘুরিয়ে এনে প্রশ্ন করলেন—"কেন, ভুল করলাম?"

সবাই এ-ওর মুখের দিকে চাইল শুধু এত স্পষ্ট একটা ভুল যে রঙ্গময়ী করে বসবেন, না দেখিয়ে দিলে ধরতেও পারবে না, সবাই যেন হতভম্ব হয়ে কথা খ'ুজে পাচ্ছে না। শেষে রেবার বন্ধু অসীমা মাথা নীচু করে সতরঞ্চিতে দাগ কাটতে কাটতে স্খলিত কণ্ঠে বললেন—"এতগুলি মেয়ে—পরের বাড়ি গিয়ে দোলখেলা......"

"কিরে রেবা, তাই?"

"না...তুমি যদি দিয়ে থাক কথা..."—রেবা মানানসই করে বলবার জন্য কথা খ'ুজছিলেন, রঙ্গময়ী চটেই উঠলেন বেশ। বিরোধিতা পান না কারুর কাছ থেকে, ধাক্কাটুকু বেশ লেগেছে, পান বেরিয়েছে মুখে ঠেলে দোক্তার টিপ ছ'ুড়ে দিয়ে বললেন—"ঠানদিদির কি ভীমরতি হয়েছে—জিজ্ঞেস করি?—যে, একরাশ আইবুড়ো মেয়ে পরের বাড়িতে নিয়ে গিয়ে সেখানে বিন্দাবন লীলা করবে। থাক, যাবে না, ঘাট হয়েছে বলে।"

সবার দিক থেকে মুখটা ঘুরিয়ে নিলেন। পান মুখে দিলেও চিবোন বন্ধ ডান গালটা একটু ফুলে থেকে মুখটা আরও থমথমে হয়ে রইল।

এক সময় হেমাঙ্গিনীই অগ্রসর হয়ে বললেন—"ব্যাপারটা কি তাহলে বলো না।"

"বলতে দিবি তবে তো বলবে লোকে বাছা—'মুখ নাড়া দিয়ে উঠলেন রঙ্গময়ী—"গা-জ্বালানে কথা যে!"

আবার সাধ্যসাধনা করে যা জানা গেল তা এই যে, 'করুণাময়ী হোম'-এর মেয়েরা দোল খেলেই না এরকম বলতে গেলে। একটা

কারণ, বাইরে বাইরে যা সবাই জানে, তা এই যে মেয়েগুলো সব ভালো, হাসি-তামাসা নিয়ে থাক্, কিন্তু নিছক মেয়েদের মেস বলেই দোলের হুল্লোড় বাজিটা করে না। তবে আরও ভেতরের কথা, কমলা যোগ দেন না ব'লে। তারচেয়েও ভেতরের কথা এই যে, যোগ না-দেওয়াটার সংগে ও'র জীবনের ট্রাজেডির একটা নিগূঢ় সম্বন্ধ আছে বলেই মনে করে সবাই। মেয়েদের মনই। কিছু না জানুক, তবু কি ক'রে যেন বুঝতে পারে।

বিরত থেকে নিজেদের মনের শ্রদ্ধা জানায় সেই অজানা ট্রাজেডির প্রতি।

তবে একেবারে যে বাদ দেয় পর্বটা এমনও নয়। সকালে পিচকিরি আর রং-গোলা নিয়ে মাতামাতি করাটাই দেয় বাদ; বিকালে বয়স আর জ্যেষ্ঠা-কনিষ্ঠার সম্বন্ধ ধ'রে একে অন্যের পায়ে বা কপালে ফাগ ছোঁয়ায় প্রণামে-আশীর্বাদ অনুষ্ঠানটিকে শুচি-স্নিগ্ধ ক'রে তোলে।

রঙ্গময়ীর হাসির রস ছড়িয়ে কথা বলা অভ্যাস, পদে-পদেই হাসি ছলকে ছলকে ওঠে, কিন্তু এ যা বলে গেলেন তাতে শুধু একটি গাঢ় করুণ রসেরই প্রবাহ অবচ্ছন্ন মন্থর গতিতে বয়ে গেল। এত চপল উনি নিজে, এবয়সেও যেন প্রজাপতির মতো রঙিন পাখনা কাঁপিয়ে উড়ে বেড়াচ্ছেন, কিন্তু কমলার কথাতে এলেই ওর মনটি হঠাৎ পরম শ্রদ্ধায় যেন আসে নুয়ে, যতই না কিছু না-জানুন।

ছোঁয়াচ লাগে সবার মনেই, খোলা ছাতের হাওয়াটি যেন মন্থর হয়ে যায়; একটা নিস্তব্ধতা চেপে কিছুক্ষণ।

কমলার প্রসঙ্গ শেষ হলে আরও জানা গেল, যেমন খেলে না দোল, তেমনি দিনটা ওরা অন্যভাবে উপভোগ্য করে তোলে। কলকাতার মাতুনির মধ্যে থেকে সরে যায় বাইরে কোথাও কোন নির্জন জায়গায়, অন্তত দাপাদাপি যেখানে কম হওয়ার কথা। বেশ কিছুদিন আগে থেকেই ওদের হয় ঠিক।

এবার সুষমা ওর বাড়ির কয়েকজনের সংগে বড়দিনে ডায়মণ্ডহারবারে পিকনিকে গিয়েছিল, সেই এসে হুজুগটা তুলেছে।

সবটুকু বলে গিয়ে একটা পান বের ক'রে মুখে দিলেন, বললেন—"হেমা, দে তোর জর্দাটা একবার দেখি।"

হেমাঙ্গিনী খুব অন্যমনস্ক হয়ে মুখ ঘুরিয়ে বসেছিলেন, রঙ্গময়ী তাগাদা দিলেন—"কানে গেল না? তোকেই বলছি হেমা—জর্দার ডিবেটা।"

"এই যে।" —বলে বাড়িয়ে দিলেন ডিবেটা। একটু যেন ঘোরের মধ্যে থেকে প্রশ্ন করলেন—"তা কমলার ব্যাপারটা কি—ঠানদিদি...সেটা..."

"নাও, ও এখন সেইখানেই পড়ে আছে।...কি তা কি করে জানব? চাপা মেয়ে. ভাঙে কি কারুর কাছে?..."

রাত হয়েছে খানিকটা, রেবার বন্ধুটি বিদায় নিয়ে উঠে গেলেন। রেবাও কাল চলে যাবেন, গল্প করতে করতে ওকে নীচে পর্যন্ত এগিয়ে দিতে গিয়ে যে ছেদটুকু পড়ল, এদিকে তাতে কমলার প্রসঙ্গটা ঐ পর্যন্ত রয়ে গেল। রঙ্গময়ী শুধু একসময় হেমাঙ্গিনীকে জর্দার ডিবেটা ফিরিয়ে দিয়ে বললেন—"জিনিসটে বেশ ভালো রে।"

উনি ফিরে এলে রঙ্গময়ীই প্রশ্ন করলেন—"তাহলে রেবা, কি বলিস? পারবি একটু জায়গা দিতে? একেবারে তো গঙ্গার ধারে গিয়ে উঠতে পারে না।"

জর্দা চাওয়াটাই শান্তির সূচনা, রেবা উৎসাহিত হয়েই বললেন—"আমার তো সেই যাকে বলে—হাংলা ভাত খাবি, না, পাত পাতব কোথায়! তাহলে আমিও একটা কথা বলি?"

"বল্না। যা স্পিরিট্যাম্প করে দিয়েছিলি সবাই! বড়মুখ করে নাকি বলতে গেলাম তাদের..."

"আমার তো চারখানা বড় বড় ঘর, দুটি প্রাণী। একেবারে গঙ্গার ধারে গিয়ে উঠবে কেন, এক কাজ করুক না, যদি রাজি হয়..."

"কি?"

হেমাঙ্গিনীর দিকে চেয়ে বললেন—"আমি বলছিলাম বড় বৌদি, দোলের দিনই কেন?—পথেঘাটে তো চারিদিকেই নোংরামি সেদিন,—অতগুলো মেয়ে একসঙ্গে যাচ্ছে, তার চেয়ে আগের রাত্তিরেই ওরা সেখানে গিয়ে উঠুক না, সকালে একেবারে স্নানটান সেরে..."

মন্দ কি? যার খুশি সে গঙ্গায়ই স্নান সারুক..." রঙ্গময়ীই উত্তর দিলেন।

রেবা বললেন—"সে আমি নিশ্চিন্ত আছি। কলকাতার মেয়ে, এক একটা ঢেউয়ের বহর দেখলেই স্নানের সাধ মিটে যাবে। বাগবাজারের বাঁধানো ঘাটের গঙ্গা কিনা।......তাহলে, রাজি হলে আরও একটু সুবিধে করে দিতে পারি। কত কটি মেয়ে?"

"মেম্বার তো এখন আটজনই; তবে সে-সময় কেউ কেউ তো বাড়িও চলে যায় দোল খেলার জন্যে। তন্দ্রা থাকে না, ওর দিদি পূর্ণিমার কাছে চলে যায় প্রত্যেক বারেই। আদুও বাড়ি চলে যায়, সুষমাও বাড়িই যাবে বলছিল একবার যখন হয়ে এসেছে ডায়মণ্ডহারবার থেকে। মোটামুটি জন পাঁচেক ধরে রাখ।'

"এই পাঁচজন। তারপর..."

মুখে একটু হাসি ফুটিয়ে হেমাঙ্গিনীর দিকে চাইতে উনি শিউরে উঠলেন—"আমি! ঐ বাচ্চাদের দলে?"

রেবা হাসি-হাসি দৃষ্টি রঙ্গময়ীর দিকে ফেরালেন—

"দ্যাখো আবার আমার দিকে চায়!"—চোখ কপালে তুললেন রঙ্গময়ী।

"শুনছ বৌদি কচিদের দলে যেতে নারাজ..."

"তাই বুড়িকে ধরে টানু! কচি সেজে থাকে, তার সাজা পেতে হবে তো! না, পাগলামি ছাড় রেবা। বলে কী অন্যায়ই করেছি যে!"

ঠিক হোল, গিয়েই অফিসের টুরের স্টেশনকারটো চাইয়ে রাখবেন রেবা। সুরবালা-অপর্ণা শুদ্ধ সবাই একটা রাত কাটিয়ে পরদিন সন্ধ্যায় ফিরে আসবেন।

"তাহলে তমাল? মানবে সে?"—অপর্ণা প্রশ্ন করলেন। ভালোবাসেন মেয়েটাকে।

হেমাঙ্গিনী বললেন—"আবার তমাল কেন? বড় আস্কারা দিস—ইস্কুলের মেয়ে না?"

।। একুশ ।।

সেদিন ঐ পর্যন্তই রইল। তবে হুজুগের ডালপালা গজায়, দিন পনের যে সময় রইল তাতে আরও একটু বাড়ল দলটা; একটু বৈচিত্র্যও এল।

একদিন বৈঠকের মধ্যেই অপর্ণা বললেন—"আমার খাওয়াটা আর হোল না দেখছি। তমালটা বড় বায়না ধরেছে। আমাকেই যে কেন ধরে! জানে ক্ষমতা নেই।"

হেমাঙ্গিনী বললেন—"এ আমি সেদিনই টের পেয়েছিলাম।"

তমালও তালিকাভুক্ত হোল।

এরপর একদিন ছোট বৈঠকের কথা; শুধু রঙ্গময়ী, হেমাঙ্গিনী আর সুরবালা রয়েছেন। এটা ওটা নিয়ে আলতোভাবে কথাবার্তা হচ্ছে। রঞ্জন যে বিবাহ করতে চায় না এটা এ বাড়িতে একটা স্থায়ী আলোচনার বিষয়। যখন অন্য কিছু থাকে না, এটেই প্রায় এসে পড়ে। একটা রহস্য থাকায় প্রচুর কল্পনার অবকাশ থাকে বলে বিশেষ করে রঙ্গময়ী থাকলে জমে ভালো. কিন্তু আজ তিনি থেকে থেকে অন্যমনস্ক হয়ে পড়ায় মাঝে মাঝে এলিয়ে যাচ্ছে। হেমাঙ্গিনী সুরবালা দুজনেই টুকলেন কথার। "কৈ?...কোথায়? ...যাঃ।"—বলে কাটিয়ে যাচ্ছিলেন রঙ্গময়ী, তারপর একবার হেসেই ফেললেন; বললেন—"নেহাৎই যখন ছাড়বি নে, তাহলে শোন আমি একটা কাণ্ড করে বসেছি—'হোম'-এর আদুটাকেও টেনেছি দলে..."

"এ আর এমন কাণ্ড কি? আদু যেতে রাজি হলে সে তো ভালোই;...হুল্লোড়ে আছে...জমবে ভালো।"—দুজনেই বলে উঠলেন ও'রা।

"একটা কথা ফেললাম সবার মধ্যে, তা বুঝে নেয় বুদ্ধি করে তো চলে...আদু যেতে রাজি হোল তো মাথা কিনলে আমার!"

"তবে!"—বিস্মিতই হলেন দুজনে।

"তোর ছেলেটাও যাবে।"—প্রশ্ন নয়, অনুমতি চাওয়া নয়, যেন নিজের অকাট্য বিধান দিয়ে পান-দোক্তা মুখে ফেলে গম্ভীর-ভাবে চিবোতে লাগলেন।

বেশ হতভম্বই হয়ে গেছেন দুজনে. কিছুক্ষণ চুপচাপই গেল, তারপর সুরবালা একটু মগ্ন কণ্ঠেই প্রশ্ন করলেন—"বলেছে তোমায় সন্দু?"

—স্বরটা একটু রুদ্ধও।

"বলবার মতন, বা পাকেপ্রকারে জানাবার মতন ছেলে ধরেছিলি গর্ভে—জিজ্ঞেস করি?"

বেশ একটু ধমকের সুরেই বলা অনুযোগটার মধ্যে কি ছিল, একটু চুপ করে থেকে দুজনেই হেসে ফেঁপে উঠলেন। তারই মধ্যে সুরবালা বললেন—"কোনদিকে যে যায় লোকে! ছেলে সেইরকম হোলেই ভালো হোত?"

"তাহলে এনে বসিয়ে রেখেছিস কেন সম্রাট ক'রে তুলতে?"

"তা যাবে, তুমি যখন ঠিক করেছ। বেশি মেলামেশা না করলেই হোল..."

"সেরকম ছেলে গর্ভে ধরতে পেরেছ?" সুরবালার কথার ওপরই এমন ব্যঙ্গের স্বরে বলে উঠলেন হেমাঙ্গিনী যে সুরবালা তো বটেই, রঙ্গময়ীও উঠলেন হেসে।

বার কয়েক মুখের পানটা চিবিয়ে উঠে গিয়ে পিক ফেলে এসে গম্ভীরভাবেই বললেন—"বাজে কথা থাক। ছেলে বেলেল্লাপনা করবার মতন নয়; সবাই রয়েছি, আর সে ভয় নেই। চলুক না একটু। ঘরের মধ্যে দেখছি, দুজনেই চাপা, বুঝতে দিচ্ছে না। দেখাই যাক না, খোলামেলায় ছেড়ে, ভাবটা কি?" একটা এক্সপেরিমেন্ট—তোদের দাদু যেমন বলে কথায় কথায়,—কখনও নুন ছাড়ছে তো কখনও তেল, বুড়ো হাড়ে কোনটা লেগে যায়—যাচাই করে দেখা আর কি..."

পুতুল-খেলার বয়স শেষ পর্যন্ত বিবাহ সংক্রান্ত সবকিছুই মেয়েদের সবচেয়ে বড় খেলা; আর্দ্রা-সন্দীপও এসে পড়ল তালিকার মধ্যে।

একেবারে বেরুবার দিন আরও একটি নূতন সংযোজন হোল দলটিতে। খাকি স্টেশন-কারের সঙ্গে রেবার স্বামী অনন্ত নিজের গাড়িটা করে এসে উপস্থিত হলেন।

রঞ্জন বারান্দায় দাঁড়িয়ে ছিল, প্রশ্ন করল—"আপনি যে! যঃ পলায়তি স জীবতি নাকি?"

"আমি ছুটে এলাম তোমার জন্যে!"—যেন সময়ের অভাবেই ঠাট্টার দিকে না গিয়ে নামতে নামতে ভ্রূ-কুঁচকে বললেন—"একেবারে লাস্ট্ মোমেন্টে শুনলাম তুমিই আসছ না। অথচ আমি নিশ্চিন্দি আছি, দোল-পালানোর দল যখন, তখন রঞ্জন আছেই, হয়তো লীড্ করেই নিয়েই আসছে।

...নাও আর কথা নয়, গেট রেডি। ওই জন্যে আমি নিজেই চলে এলাম, ভাবলাম, ধরে না নিয়ে এলে আসবে না। হোয়াট্ এ জোক! হ্যামলেট্ উইথ হ্যামলেটস্ পার্ট্ লেফট আউট! হোলী খেলবে না। দেশ ছেড়ে পালাচ্ছে তা তোমার চেয়ে আন্হোলী (unholy) তো কেউ নেই..."

কোর্টেও ঐরকম; উকিল-মোক্তারকে বেশি কথা বলে সময় নষ্ট করতে দেন না, নিজেই সব সময়টা আত্মসাৎ ক'রে এইরকম দ্রুত লয়ে বকে গিয়ে রায় দিয়ে দেন। অভ্যাস হয়ে গেছে, কোর্টের বাইরেও এই রীতি চলে।

"নাও, তোয়ের হয়ে নাও। দেখি ওদিকে আবার কি অবস্থা। আবার 'করুণাময়ী হোম' থেকে মেয়েদের তুলে নিতে হবে।...অমন করে দাঁড়িয়ে আছে! নাও, ভাববার সময় আছে আর?"

ভেতরে চলে গেলেন।

অভিযানটা হোল ভালোই, তবে ঠিক প্ল্যান মতো হোল না। সবাইকে কুড়িয়ে বাড়িয়ে নিয়ে আসতে একটু রাত হয়ে গেল। গঙ্গার ধারেই বাসাটা, মাঝখান দিয়ে কাকদ্বীপের রাস্তাটা চলে গেছে। পাঁচ-ঢালা, প্রশস্ত, উঁচু: রাস্তা আর বাঁধ—দুটোর কাজই করে। বাসা থেকে এদিকে একটু তফাতে হলেও ওদিকে গঙ্গা একরকম ছুঁয়েই সোজা দক্ষিণে চলে গেছে। নদীও এখানে কলকাতার নদীর প্রায় তিনগুণ, সারা বাংলায় এমন একটা রাজপথ আর নেই।

রাত হয়ে গিয়েছিল, খানিকটা ক্লান্তও সবাই। তবে মুখহাত ধুয়ে সবাই খানিকটা ঘুরে এলেন রাস্তার ওপর থেকে। আকাশে প্রায় পূর্ণিমার চাঁদ, মুক্ত হাওয়ার গঙ্গাবক্ষে যে ঢেউগুলো উঠেছে, কলকাতার গঙ্গার ঢেউগুলো তাদের কাছে শিশু। ওপারের তীরভূমি প্রায় নজরেই আসে না, তাতে একটা রহস্য সৃষ্টি ক'রে আরও যেন অপরূপ করে তুলেছে পরিবেশটুকু।

সবার কাছেই নূতন। মনটা একেবারে অভিভূত হয়ে অন্য জগতে গিয়ে পড়েছে সবারই। ফিরি ফিরি করেও ফিরতে আরও অনেকখানি রাত হয়ে গেল। আহারাদি সেরে শয্যা আশ্রয় করলেন সবাই।

ও'দের প্ল্যান ছিল সকালে গঙ্গার ধারে গিয়ে পিকনিক করা। কিন্তু যতটা পারা যায়

শেষ খেয়া

ফটো : রেখা সেন

দেখে নেওয়া, ঘুরে নেওয়াটাই এত লোভনীয় হয়ে উঠেছে যে, ওটা একেবারেই ছেড়ে দিল সবাই। একদিনের অতিথি হয়ে এসে নিজেরাই রান্না করে খায়, এটা অন্তত আর দেবার মনঃপূত ছিলও না। ও-আয়োজন ঠাকুর-চাকরের হাতে ছেড়ে দিয়ে; দুখানা গাড়ি করে ও'রা ভোরেই বেরিয়ে পড়লেন। দোলের মাতুনি শুরু হওয়ার আগেই ও'রা শহরটুকু আগে দেখে নিলেন। ছবির মতো ছোট শহরটির একদিকে গঙ্গা আর মাঝে এক জায়গায় তার সঙ্গে লক্-গেট দিয়ে যুক্ত প্রশস্ত হ্রদের তীরে তীরে গড়ে উঠেছে বসতি, উঠছেও। প্রথম দিকে এইদিকটা সেরে ও'রা কাকদ্বীপের রাস্তা ধরে দক্ষিণে বহুদূরে গেলেন চলে। এও যেন আর এক ছবি, কোন এক নিপুণ শিল্পীর হাতে আঁকা, আকাশ থেকে দুলছে। ডানদিকে নদী, মাঝে মাঝে এগিয়ে আসছে, মাঝে মাঝে যাচ্ছে সরে। বাঁদিকে টানা সবুজ মাঠ, মাঝে মাঝে ঘন সন্নিবিষ্ট বৃক্ষরাজির মধ্যে গ্রাম, মেঠো পথ সর্পিল গতিতে গ্রামের কোল থেকে চলে এসে সরকারী সড়কে উঠেছে। যেতে যেতেই পথে সূর্যোদয় হোল, আকাশ রং-আধারের পাত্র উজাড় করে দিল নীচের মাঠ-ঘাট আর কূলহারা জলরাশির ওপর।

সবাই নিশ্চুপ একরকম, রঙ্গময়ীও। শুধু মেয়েদের গাড়ি থেকে নাবার সময় বললেন—"নাৎজামাইকে যে কী বকশিস করব ভেবে পাচ্ছি না।"

হেমাঙ্গিনী বললেন—"মাঝে মাঝে এসে থাকনা ঠানদিদি, তাহলেই নাৎজামাইয়ের বকশিস হবে।"

নেমেও সামনের দিকে দৃষ্টি ফেলে তাকিয়ে ছিলেন রঙ্গময়ী, কথাটা যেন কানেই গেল না। তারপর সবশেষে যখন রেবা নামছেন, ও'কে অনন্তর সঙ্গে জড়িয়ে নিয়ে, নিজের কথার জের ধরেই বললেন—"কেন, এই তো সব বকশিসের সেরা বকশিস দেওয়া হয়ে গেছে।"

উচ্ছ্বাসে রাঙা মুখখানি আরও রাঙা হয়ে উঠল রেবার। বললেন—"হোল আরম্ভ আবার রঙ্গঠানদির!"

ঐ পর্যন্তই। অনুভূতি পূর্ণতায় সবারই যেন একটা আবিষ্ট ভাব।

তবু রঙ্গময়ীর মনের একটা কোণ খালিই রয়ে গেল। সুরবালাও, কতকটা হেমাঙ্গিনীরও। তবে সবচেয়ে বেশি রঙ্গময়ীর। সমস্ত প্ল্যানটা তো ও'রই রচনা। ঐ আর্দ্রা-সন্দীপের দিকটা। ঘোরাঘুরির সময়ই না হয় আলাদা দুজনে, কিন্তু সমস্ত দিনটাই তো নয়। বাড়িতে যতক্ষণ ততক্ষণ মেলামেশার সুযোগ যথেষ্টই হয়েছে, ছড়ানো বাড়ি, বাইরেও বেশ খানিকটা বাগান। কথাও হয়েছে সবার সঙ্গে সবার, প্রয়োজনে-অপ্রয়োজনে; কিন্তু অপ্রয়োজন বা ঔদাসীন্যের ছদ্মবেশে একান্ত প্রয়োজনের জন্য ওরই মধ্যে কয়েকটা মুহূর্ত বের করে নেওয়া,—সন্দীপ-আর্দ্রার মধ্যে যা আশা করেছিলেন, তার চিহ্নমাত্র দেখতে পেলেন না। খুব সূক্ষ্ম, সতর্ক দৃষ্টি রেখেও।

কৃত্রিম প্রচেষ্টাতেও ডাক্তারেরা হৃদপিণ্ডের ক্রিয়া ফিরিয়ে আনে। সে-ডাক্তারিও করেছিলেন রঙ্গময়ী। খাওয়া-দাওয়া হয়ে গেলে একটু বিশ্রামের পর তাস পাড়ালেন। বললেন—"আদু এমন বড় দল, আয়না বসি একটু।"

উল্টো-উল্টি বসালেনও দুজনকে। জমেও আসছিল রেষারেষি, মনের রসায়নে বিরাগ থেকেই তো অনুরাগ,—এই সময় রঞ্জন কোথায় ছিল, এসে বলল—"একি সন্দীপ, এমন একটা জায়গাও তোমায় বেরসিকের মতো তাসে আটকে রাখতে পারলে? উঠ, কী একটা একটা স্পট্ আবিষ্কার করেছি আমি দেখে আসবে চলো; মোটরে ক'রে।"

"যাবে না ও তুই যা।" ধমকে উঠলেন রঙ্গময়ী। বললেন—"বালাই, বেরসিক হতে যাবে কেন? এখানেও অনেক রস আছে ওর।"

—কথাটা বলার সঙ্গে চকিতেই দুজনের ওপরই নজর গিয়েও পড়ল ও'র। আর্দ্রা মাত্র একটু হাসল ঠোঁট টিপে, আরও কয়েকজনের মতো; সন্দীপের মুখটা রাঙা হয়ে উঠল। কিন্তু তার মধ্যে ঈপ্সিত বস্তুটি যেন খুঁজে পেলেন না রঙ্গময়ী; মনে হোল, অতিরিক্ত লাজুক ছেলে, কার কথা ঠেলে কার কথা রাখে এ উভয় সংকটেই ওর মুখের সমস্ত রক্ত ওপরে ঠেলে তুলেছে। ও'র কথা শুনেই নয়। নাঃ। ছেলেটা যেন সব চিকিৎসার বাইরে।

(ক্রমশঃ)

প্রমীলা

ইচ্ছা থাকলে

সেদিন এক বন্ধুর সঙ্গে দেখা। এক-
ঙ্গে স্কুল-কলেজে পড়াশোনা করেছি,
ারপর বিচ্ছেদ। কর্মক্ষেত্রে কে কোথায়
বচ্ছিন্ন হয়ে পড়েছি। ইচ্ছে থাকলেও হদিশ
াওয়া যায় নি। কোন তরফ থেকে সেরকম
চষ্টা যে করা হয় নি তা নয়। দুজনের
ম্বন্ধও আস্তে আস্তে ফিকে হয়ে
াসছিল। পুরোপুরি ফিকে হওয়ার আগেই
াই দেখা, একে দেখা না বলে সাক্ষাৎকার
লাই ভাল। উদ্যোগ ছিল আমার এবং
্রয়োজনে। নামটা চেনা চেনা মনে হচ্ছিল।
সটা চেপেই গিয়েছিলাম। এরকম তো হামে-
াই হয়। তবু মফস্বল শহরে মহিলা
রিচালিত সমবায় বিপণি সম্বন্ধে বেশ
াগ্রহ ছিল। তাই নিজেই গা করে ওদের
সম্বন্ধে উৎসাহ দেখিয়ে চিঠি দিলাম। উত্তর
আসতে দেরী হল না। চিঠির স্বাক্ষরটা
আবার মনে ছোট্ট ঢেউ তুললো। সঙ্গে সঙ্গে
স্থিরপ্রত্যয় হয়ে গেলাম, এ আমার সেই
সহপাঠী বন্ধু হতে পারে না। ও তো কোন
অফিসের জাঁদরেল অফিসার

আশা-নিরাশায় দুলতে দুলতে যাত্রা
করলাম যদি বন্ধুত্বের পরিচয় স্পষ্ট হয়ে
পড়ে। পেঁছানোর সঙ্গে সঙ্গে যিনি
অভ্যর্থনা করতে হাসিমুখে এগিয়ে এলেন
তাঁকে চিনতে আমার একটুকু কষ্টও হল না।
সেও আমাকে দিব্যি চিনতে পারল। দুজনেই
হেসে খুন। সম্প্রতি চিঠিপত্রের আদান-
প্রদান করেছি। কেউ কাউকে চিনতে পারে
নি। সাক্ষাৎ না হলে নতুন করে পরিচয়ও
হত না।

অনেকদিনের জমা কথার বোঝা কিছুটা
হাল্কা করে এবার সমবায় বিপণি সম্বন্ধে
আগ্রহ প্রকাশ করতেই বন্ধু বলল, মেয়েদের
জন্য চারদিকেই তো অনেককিছু হচ্ছে।
আমরা কজনও ভাবলুম বসে না থেকে এতে
হাত লাগাই না কেন। যেমন কথা তেমনি
কাজ। অফিসের কাজে তো অনেক দিনই
ইস্তফা দিয়েছি। এ ব্যাপারে নতুন উৎসাহ
পেলাম। আমার উৎসাহের প্রাবল্য দেখে
সবাই ধরে-বেঁধে আমার ওপরই সব দায়িত্ব
গছিয়ে দিল। সামান্যভাবে সুরু। আজ
অবস্থা ফিরেছে। তাঁত, টেলারিং, এম্ব্রয়ডারী,
আচার, পাঁপড়, হাতপাখা সবই আমরা তৈরী
করি। আর সেগুলি বিক্রি করার জন্যই এই
সেলিং সেন্টার। সবই আমরা নিজেরা
করেছি। সাহায্য অবশ্য সকলের কাছ থেকেই
পেয়েছি। বন্ধু থামল। তৃপ্তিতে ওর সারা
মুখ ভরে গেছে।

সবকিছু খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে দেখলাম।
বন্ধুটির সংগঠন শক্তিতে মুগ্ধ না হয়ে উপায়
নেই। কম-বেশী সত্তরটি মেয়ের হাতের
কাজের শোভায় বিক্রয়কেন্দ্রটি উজ্জ্বল হয়ে
আছে। এর সঙ্গে আছে আবার নিত্য-
প্রয়োজনীয় নানা দ্রব্যসম্ভার। বিক্রয়কেন্দ্রটিও
একদিক থেকে স্বয়ংসম্পূর্ণ। এত সবের
মূলে আমার বন্ধুটি—কথাটা ভেবে সত্যি
গর্ব হচ্ছিল। নিজেদের জিনিস বিক্রির জন্য
অপরের মুখ চেয়ে না থেকে নিজেরাই
ব্যবস্থা করে নিয়েছে। যা করতে অনেকেই
হিমসিম খেয়ে যায়।

ফেরার পথে বন্ধুকে প্রাণভরে অভি-
নন্দন জানিয়ে বললাম, তোর এই সমবায়
বিপণির দৌলতে পুরনো বন্ধুত্ব ফিরলাই
হলো। বন্ধু হাসল। বলল, তবুও আমার
মত অনেক মেয়েদের সামাজিক উন্নতির এই
বৃহৎ কর্মে হাত লাগাচ্ছেন না এটাই যা
দুঃখ।

●

খেলাধুলার পর দেহচর্যা

যে সব মেয়েরা খেলাধুলো কিম্বা ব্যায়াম
রেন, অনেক সময় তাদের দেহের চামড়া
বং রঙ মলিন হয়ে যায়। সেজন্য অনেকে
য়ে খেলাধুলোর পক্ষপাতী নয়, কিন্তু
ামার মনে হয় খেলাধুলো বন্ধ করার দরকার
ক? তার থেকে যদি কোন প্রতিকার থাকে
ারই শরণাপন্ন হয়ে খেলাধুলো করুন।

খেলাধুলোর ঠিক আগে কিম্বা পরে
খ ধোয়া উচিত নয় বরং অল্পক্ষণ পরে
খটি ধুয়ে ক্রীম ব্যবহার করা ভাল অথবা
কটু অলিভ অয়েল। যাঁদের গায়ের চামড়া
লা, তাঁরা যদি কোন লোসন ব্যবহার করে
লতে নামেন ভাল হয়, এমন কি
্যান্ডসের পক্ষেও ভাল। যদি ইচ্ছে করেন
ব খেলার পরে লোসনটা মুছেও ফেলতে
রেন। রোদের বিরুদ্ধে চামড়াকে রক্ষা করা
য়োজন, বিশেষ করে মেয়েদের।। কারুর
মড়ার পক্ষে ক্রীম বা পাউডার-এর পরিবর্তে
উডার জাতীয় লিকুইড ব্যবহার করতে
রেন। যাঁদের চামড়া তেলা তাঁরা ভ্রাইলিপ
নসিল ব্যবহার করবেন। টেনিশ খেলার
র যদি কাঁধে কোন ব্যথা শুরু হয় তাহলে
ারণ ভিনিগারের সঙ্গে নুন মিশিয়ে
লিশ করতে পারেন। যদি ব্যথা খুব বেশী
তবে গরম জলে স্পঞ্জ করে নিয়ে তারপর
নিগার ও নুনের ম্যাসেজ করতে পারেন।
বা কিছুক্ষণের জন্য হাতের চেটো ও তলা
নিগারে ডুবিয়ে রাখতে পারেন। পরে
শ্য শুকনো কাপড়ে মুছে ফেলবেন। যদি
গলফ কিম্বা এ জাতীয় কোন খেলার সময়
হাতটা শক্ত ভাব মনে হয় তবে গাঁটগুলোতে
গরম অলিভ অয়েল আস্তে আস্তে ঘসে
দেবেন। তাতেও যদি ভাল না হয় তবে পাকা
ট্যমাটোর রস ব্যবহার করবেন। বিকেলে যদি
খেলার পর গরম জলে নিয়মিত স্নান করেন
তাহলে বেশ আরাম বোধ করবেন। পায়ে
চলার প্রতিযোগিতার আগে বেশ করে নুন
দিয়ে গরম জলে পা দুখানি ধুয়ে ফেলবেন।
তারপর ভাল করে শুকনো কাপড়ে বেশ করে
মুছে যখন চামড়া নরম হয়ে আসবে তখন
পায়ের গোড়ালির তলায় গাঁটে গাঁটে স্পিরিট
দিয়ে তারপর বোরিক পাউডার ঘসে দিলে
ভাল হয়। তাহলে চলার পর পা আর গরম
মনে হবে না। যদি ফোস্কা পড়ার সম্ভাবনা
থাকে তবে মোজার গোড়ালির মধ্যে এবং
জুতোর গোড়ালীর মধ্যে একখানি নরম
ধরনের সাবান ঘসে দেবেন। কারণ ভিজে
ভিজে থাকলে আর ফোস্কা হবে না। তাছাড়া
হাটবার সময় সর্বদাই মোজা ব্যবহার করে
হাটলে ভাল হয়।

এ তো গেল যাঁরা খেলাধুলো করছেন
তাঁদের দেহচর্চার কথা। কিন্তু দেহচর্চার
নিয়মিত একটি তালিকা আমি এখানে
জানিয়ে দিচ্ছি। জানি, যাঁরা কর্মব্যস্ত
গৃহিণী তাঁরা সকাল থেকে রাত পর্যন্ত এমন
একটুও সময় পান না যখন নিশ্চিন্তে বসে
দেহচর্চা করবেন। কিন্তু আমি যদি বলি,
ঘরের কাজ যেমন সুগৃহিণীরা সপ্তাহের
সাতটি দিন ভাগ করে নেন, যেমন, আজ যদি
রান্নাঘর ঝাড়া-মোছা করেন তবে কালকের
জন্য থাকবে শোবার ঘর পরিষ্কার করা,
পরশু হয়তো বসবার ঘর ইত্যাদি — ঠিক
তেমনিভাবে দেহচর্চা বা সৌন্দর্যচর্চাও ভাগ
করে ফেলুন না। নিজের ইচ্ছামত অবসর
বুঝে কোন দিন বা চুল, কোন দিন বা মুখ,
কোন দিন হাত, আবার কোন দিন পায়ের
যত্ন। তারই একটি ছোট্ট তালিকা দিচ্ছি, ইচ্ছা-
মত অদল-বদল করে নিতে পারেন।

সোমবার—চুলের যত্ন করুন। এ কথা বলছি না যে, আর কোনদিন চুলের যত্ন করবেন না। সোমবার একটু বিশেষভাবে যত্ন নেবেন। মাথা স্যাম্পু করুন।

মঙ্গলবার—হাতের ও নখের যত্ন করুন। হাতে বেশ করে ক্রীম মেখে মুছে ফেলে সাবান ও গরম জলে ধুয়ে ফেলবেন। হাতের আঙুলগুলো নারকেল বা অলিভ অয়েল অল্প গরম করে মুছে নেবেন। বেশ গোল করে নখ ফাইল দিয়ে ঘসে সরু কাঠিতে তুলো জড়িয়ে হাইড্রোজেন পেরকসাইড দিয়ে নখের নীচেটা পরিষ্কার করে নেবেন।

বুধবার—আপনার দেহসৌষ্ঠবের দিকে একটু নজর দিন। রোজই সামান্য ব্যায়াম করে যাবেন কিন্তু বুধবারে বেশ একটু বেশী খেলাধুলো বা বেশী দূর হেঁটে সারা সপ্তাহের জন্য শরীরটাকে ঝরঝরে করে রাখুন। সঙ্গে সঙ্গে

শরীরের অতিরিক্ত মেদ বা পশমিও ঝেড়ে ফেলতে পারবেন। ইচ্ছে করলে কিছু এপসম সল্ট গরম জলে দিয়ে গা-হাত ধুতে পারেন তাতে মেদ কমে যাবে।

বৃহস্পতিবার—মুখের সৌন্দর্যচর্চা করুন। একবার আয়নার সামনে দাঁড়িয়ে দেখবেন আপনার মুখের কোথায় ও কি বিশেষ দৃষ্টির দরকার যেটা দৈনন্দিন গতানুগতিক প্রসাধনের মধ্যে চোখে পড়ে না।

শুক্রবার—আপনার পা দুখানিকে ঘসে-মেজে ঝকঝকে করে নিন। যদি ক্লান্ত চরণে অনেক বেশী পরিশ্রম করতে হয় তবে সামান্য গরম জলে নুন দিয়ে পা ডুবিয়ে রাখবেন। অল্পক্ষণ পরেই পা বেশ নরম ও স্বাচ্ছন্দগতি হয়ে যাবে। যদি সম্ভব হয় তবে হাতের মত পায়ের আঙুলেও গরম অলিভ অয়েলে ডুবিয়ে নেবেন।

শনিবার—দৃষ্টি দিন চোখের দিকে। চোখের চার পাশে বেশ করে ঘসে ঘসে ক্রীম লাগাবেন। তারপর মুছে ফেলে কয়েক ফোঁটা গোলাপ জল অথবা ডাক্তারের পরামর্শ অনুযায়ী কোন লোসনও ব্যবহার করতে পারবেন।

রবিবারে থাকবে পরিপাটি ঝরঝরে সাজপোষাক করে সন্ধ্যেবেলা বেড়াতে যাওয়ার পালা, এতে শরীর স্বাস্থ্য ও মন সবই সুস্থ ও সবল হয়ে উঠবে।

যে মেয়ে নিজেকে ভালবাসে সে মেয়ে স্বাস্থ্য ও সৌন্দর্যের প্রতি লক্ষ্য রাখবেন বৈকি! স্বাস্থ্য ও সৌন্দর্যচর্চা ঠিক বিলাসিতা নয়। তাই আজকের মেয়েকে নানা কাজকর্মের ফাঁকে নিজের সৌন্দর্যকে বজায় রাখতে হবে।

—বেলা দে

শিক্ষা—সমাধান, না সমস্যা

বর্তমান অর্থনৈতিক পরিবেশে দাঁড়িয়ে সকল নারীর মনেই নানারকম সমস্যা দেখা দিয়েছে। তাদের মনে এই প্রশ্নও উঠেছে শিক্ষা সমাধানের পথ বলে দেয়, না সমস্যা আরো বাড়ায়! বিগত যুগে নারী ছিলো অন্তঃপুরবাসিনী। বাইরের জগত ছিলো তাদের কাছে একেবারেই অজানা, অচেনা। ঘর-সংসারের কাজের মাঝেই তারা ব্যাপৃত থাকতো। দেশে তখন অর্থনৈতিক অবস্থার অবনতি ঘটেনি এত। রোজগারের ভার ছিলো শুধু পুরুষেরই উপর। সেজন্য নারীশিক্ষার বিশেষ প্রয়োজন ছিলো না। বাল্যবিবাহ প্রথা অনুযায়ী খেলনা-পুতুল নিয়ে খেলা করতে করতেই মেয়েরা যেতো শ্বশুরবাড়ী। কিন্তু ক্রমশঃ দেখা গেলো এই প্রথার কিছু অসুবিধা রয়েছে। অনেক ক্ষেত্রেই মেয়েরা শ্বশুরবাড়ী গিয়ে নির্যাতিত হচ্ছে, নয়তো হচ্ছে বাল-বিধবা। এই নিদারুণ পরিস্থিতি থেকে মুক্তি পাবার জন্য পরবর্তী যুগের মেয়েদের স্বাবলম্বী হবার স্পৃহা জাগলো। লেখাপড়া শেখার আগ্রহ দেখা দিলো তাদের মনে। পাশ্চাত্য-প্রভাবও সে-সময় দেশে দেখা দিয়েছিলো—স্থাপিত হয়েছিলো মেয়েদের স্কুল। আজকের 'নিবেদিতা স্কুল' ভগিনী নিবেদিতার তত্ত্বাবধানে শুরু হয়েছিলো সেই সময়। বাংলার বিখ্যাত ব্যক্তিরাও চেয়েছিলেন শিক্ষার প্রসার। ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর মহাশয়ের উৎসাহে বীটন্ সাহেবের নামেই স্থাপিত হয়েছিলো 'বেথুন কলেজ'। নারীশিক্ষার প্রচলন ক্রমশঃ বিস্তৃত হলো। মেয়েরাও পাশ করলো বি-এ, এম-এ। শ্রীমতী চন্দ্রমুখী বসু, শ্রীমতী কাদম্বিনী গাঙ্গুলীর নাম কে না জানে। এঁরাই হলেন আধুনিক নারী-প্রগতির পথ-প্রদর্শক। সেই যুগে মেয়েরা লেখাপড়া শিখে পাশ করতো বটে কিন্তু শিক্ষা সমাপনান্তে তাদের রোজগারের চিন্তা এত ব্যাপক ছিলো না।

নারী যেদিন পুরুষের সঙ্গে সমান যোগ্যতা অর্জন করল, সেদিন হয়তো নারী বহু-আকাঙ্ক্ষিত স্বাধীনতা লাভ করলো, কিন্তু তারই সঙ্গে এলো স্বাবলম্বী হওয়ার প্রশ্ন। অনেক ক্ষেত্রেই, সংসার-তরীটি যখন অর্থনৈতিক ঢেউয়ের চাপে বেসামাল হয়ে পড়ে, তখন শিক্ষিতা স্ত্রীকে হাল ধরতে হয়। শুধুমাত্র স্বামীর রোজগার সেই সংসারের পক্ষে যথেষ্ট নয়। আবার কখনো বা দেখা যায়, অর্থকষ্টে জর্জরিত সংসার-তরীটিকে বেয়ে নিয়ে যেতে হচ্ছে শিক্ষিতা বড় মেয়েটিকে। যেখানে উপার্জনের কথা ওঠে, সেখানে ডিগ্রীর কথা সহজেই মনে জাগে। কারণ, ডিগ্রীর তারতম্য অনুযায়ী উপার্জনের হার ওঠানামা করে। ভালোভাবে বেঁচে থাকতে হলে বেশী উপার্জনের প্রয়োজন। সবারই আগ্রহ থাকে কেমন করে বেশী উপার্জন করবে। তাই একের পর এক বিশ্ববিদ্যালয়ের ডিগ্রী কুড়িয়ে নেবার চেষ্টা চলে অবিরাম। সবার আশা হয়তো সফল হয় না, নানারকম পরিস্থিতির চাপে—তবু যারা সুযোগ পায়, তারা এগিয়ে যায়, যাতে উপার্জনের অংকটা সন্তোষজনক হয়।

কিন্তু শিক্ষা সমাপনান্তে শোনা যায় শুধু একটা কথাই "No Vacancy কারণ, যে অনুপাতে শিক্ষিতার সংখ্যা বাড়ছে, সেই অনুপাতে চাকরী নেই। তাছাড়া মেয়েদের চাকরীর ব্যাপারে নানারকম অসুবিধা। প্রথমতঃ নিরাপত্তার অভাব, সেজন্য অনেকেই বাইরে চাকরী নিতে ভরসা পায় না। চাকরী না পাওয়ার সমস্যাটাকে এড়িয়ে যাবার জন্য অনেকেই কোন প্রফেসনাল লাইন বেছে নেয়, যেমন—মেডিকেল, ল', জার্ণালিজম ইত্যাদি। কিন্তু সেক্ষেত্রেও শিক্ষিতা নারীর তুলনায় চাকরীর আসন-সংখ্যা সীমিত। মেয়েদের মাঝেও তাই এসেছে বেকার সমস্যা। অভিজ্ঞতার মাধ্যমে এইটুকুই সুস্পষ্ট হয়ে উঠেছে, শিক্ষা—সমাধান নয়, এ এক নতুন সমস্যা মেয়েদের কাছে।

—স্নেহলতা ধর

মহিলা বিজ্ঞানী সম্মেলন

সম্প্রতি কেমব্রিজে অনুষ্ঠিত আন্তর্জাতিক মহিলা বিজ্ঞানী ও ইঞ্জিনীয়ার সম্মেলনের উদ্বোধন অনুষ্ঠানে ভারতসহ ৩০টি দেশের ৩৫০ জনের বেশি প্রতিনিধি যোগ দেন।

কেমব্রিজ বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য মিঃ এ এল আর্মিটেজ বলেন, যদিও বর্তমানে ৩০০ মহিলা কেমব্রিজে বিজ্ঞান বিষয়ে পড়াশুনা করছেন, তবু আরও বেশি সংখ্যায় মহিলাদের বিজ্ঞান ও কারিগরি বিদ্যা অধ্যয়নে উৎসাহিত করা প্রয়োজন।

সম্মেলনে যোগদানকারী ভারতীয় প্রতিনিধি দুজন হলেন—ডঃ (শ্রীমতী) কে চন্দ্রশেখর, রীডার ইন জুলজি, মাদ্রাজ বিশ্ববিদ্যালয় ও কুমারী কে কে খুবচান্দানি, ইণ্ডিয়ান ইনষ্টিটিউট অব সায়ান্স, ব্যাঙ্গালোর।

আটদিনব্যাপী এই সম্মেলনের আয়োজন করেছেন ব্রিটেনের অগ্রণী মহিলা সংস্থা উইমেনস ইঞ্জিনীয়ারিং সোসাইটি।

কৃষি ও কারিগরি বিদ্যার প্রয়োগ থেকে মহিলা ইঞ্জিনীয়ারদের প্রশিক্ষণ সকল বিষয়েই নিবন্ধ পাঠ শুনবেন প্রতিনিধিরা। তাঁরা কেমব্রিজের দর্শনীয় বৈজ্ঞানিক আগ্রহের স্থানগুলি পরিদর্শন করবেন এবং পরে ইংলণ্ডও সফর করবেন।

ফ্যাশান

রঙের বাহারে, কাটছাঁটের অভিনবত্বে পোশাক-পরিচ্ছদে যে ছন্দের সৃষ্টি করেন মিউনিখের হাইঞ্জ শুলৎজে-ফারেস, সেরকম আর কেউ পারে না। সারা বিশ্বে তাঁর গুণমুগ্ধ অসংখ্য গ্রাহক আছে। গ্রীষ্মের পোশাক সৃষ্টি করার আগে মরোক্কো ঘুরে এসে আরবী ছাঁদে এমন সব বিচিত্র পোশাক ও সান্ধ্য পরিচ্ছদ প্রবর্তন করেন যে ফ্যাশনের রাজ্যে সেগুলি প্রবল চাঞ্চল্যের সৃষ্টি করে। পোশাক সম্বন্ধে তার নীতি হল 'মান্ধাতা আমলের জবড়জংগ বেশবাসের পরিবর্তে সুন্দর সাদাসিধে টেকসই পোশাক সবচেয়ে শোভনা।' এখানে ছবিতে হাইঞ্জের সৃষ্টি 'টমবয়ড্রেস' দেখতে পাচ্ছেন, ভ্রমণের সময় মেয়েদের পরার জন্যে এই পোশাকটি একটু অসংযত হলেও কার্যতঃ খুবই সুবিধাজনক ও আরামদায়ক।

এখন কিছুদিন পশ্চিম জার্মানীর ফ্যাশানের রাজ্যে 'ডির্নডল' খুব চলবে কারণ সমাজের 'উঁচু মহলে' এর কদর হয়েছে। এবারে বলি 'ডির্নডল' কি। পশ্চিম জার্মানীর আলপাইন অঞ্চলে এই কাপড়ের পোশাক সকলে সবরকম অনুষ্ঠানে পরে। এতোকাল চলছিল দক্ষিণে, কিন্তু এবার উত্তরের লোকদেরও মনে ধরেছে তবে ছাঁট-কাটে অনেক পার্থক্য ঘটেছে এই যা!

গৌরাঙ্গ পরিজন

অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্ত

দুই বাসুদেব
(১৫)

বাসুদেব ঘোষ

গোবিন্দ, মাধব আর বাসুদেব তিন ভাই। তিন ভাইই কীর্তনিয়া। আর এই কীর্তনিয়ারূপেই তারা গৌরাঙ্গের লীলাসঙ্গী।

গোবিন্দ মাধব বাসুদেব তিনভাই।

যাঁ সবার কীর্তনে নাচে চৈতন্য নিতাই।।

গৌড়ীয় ভক্তদের সঙ্গে প্রথমবার তিন ভাই গিয়েছিল নীলাচল। গেয়েছিল, নেচেছিল, প্রভুকে অশেষ সন্তোষ দিয়েছিল। পরের বছর আবার গেল তিন ভাই। প্রভু গোবিন্দকে রেখে মাধব আর বাসুদেবকে বিদায় দিলেন : বললেন, তোমরা নিত্যানন্দের সঙ্গে গৌড়ে ফিরে যাও, নাম প্রচার করো।

বাসুদেব শুধু গায়ক নয়, বাসুদেব পদকর্তা। যে লীলা সে স্বচক্ষে দেখেছে তাই বর্ণনা করেছে। কেবল বিশ্বাস করেছে বৃন্দাবনের কৃষ্ণ আর নবদ্বীপের গৌরাঙ্গ অভিন্ন।

> নীলাচলে শঙ্খচক্রগদাপদ্মধর
> নদীয়া নগরে দণ্ডকমণ্ডলুকর।।
> শ্রীরাধার ভাবে এবে গোরা অবতার
> হরেকৃষ্ণ নাম গৌর করিল প্রচার।।
> বাসুদেব ঘোষ কহে করি জোড় হাত
> যেই গৌর সেই কৃষ্ণ সেই জগন্নাথ।।

পূর্ণিমার চাঁদ উঠেছে আকাশে। চাঁদ দেখে শিশু গোরাচাঁদ কাঁদছে মায়ের কোলে। বলছে, মা চাঁদ দে। শচীমাতা হাত তুলে ডাকছে, আয় চাঁদ আয়। কিন্তু চাঁদ বড় নিষ্ঠুর, আসছে না ধরা দিচ্ছে না। নিমাই কোল থেকে নেমে মাটিতে পড়ে কাঁদছে, কিছুতেই নিবৃত্তি নেই। ঘরে রাধাকৃষ্ণের একখানি পট ছিল, তাই পেড়ে আনল শচী। নে এই ছবি নে। শান্ত করবার জন্যে ছেলের হাতে ছবি দিল। আর, কী আশ্চর্য, ছবি পেয়েই নিমেষে শান্ত হল নিমাই।

> চিত্র পাঞা গোরাচাঁদের মনে বড় সুখ।
> বাসু কহে পটে পহু হের নিজ মুখ।।

ব্রজলীলার অনুসৃতি করেছে বাসুদেব। নিমাইয়ের গোষ্ঠলীলা দানলীলা, এমন কি ব্রজগোপীর ভাব আরোপ করে নাগর-লীলারও বর্ণনা করেছে। কিন্তু প্রত্যক্ষ-দর্শীর সত্যিকারের আন্তরিকতা ফুটেছে সন্ন্যাসলীলার বর্ণনায়।

একেশ্বর বিরলে এসে বসেছে, হরিনাম জপ করছে নিরন্তর। 'সর্ব অবতার শিরোমণি—অকিঞ্চন জনের চিন্তামণি।' আগে দেহে সুগন্ধি চন্দন মাখত, এখন ধুলো বিনে আর কোনো ভূষণ নেই। লক্ষ্মীবিলাস ছেড়ে বৃক্ষতলে বসেছে। বাঁশি ছেড়ে দণ্ড ধরেছে।

> ছাড়ল লখিমীবিলাস।
> কিবা লাখি তরুতলে বাস।।
> ছাড়ল মোহন করে বাঁশী।
> এবে দণ্ড ধরিয়া সন্ন্যাসী।।
> বিভূতি করিয়া প্রেমধন।
> সঙ্গে লই সব আকিঞ্চন।।
> প্রেমজলে করই সিনান।
> কহে বাসু বিদরে পরাণ।।

নিমাইয়ের গৃহত্যাগের বর্ণনা দিচ্ছে বাসুদেব।

শচীর মন্দিরে এসে দুয়ারের কাছে বসল বিষ্ণুপ্রিয়া। ধীরে ধীরে বললে, 'শয়ন-মন্দিরে ছিল, নিশাভাগে কোথা গেল, মোর মুণ্ডে বজর পাড়িয়া।' বধূর মুখের কথা শুনে শচীমাতা আলুথালু বেশে ছুটে এল। 'শীঘ্র করি জ্বালি বাতি, খুঁজিলেন ইতি-উতি, গৌরাঙ্গের উদ্দেশ না পাঞা।' বিষ্ণুপ্রিয়ার হাত ধরে কাঁদতে কাঁদতে পথে এসে ডাকতে লাগল নিমাইকে। একজনকে পথে দেখে শচীমাতা জিজ্ঞেস করল, নিমাইকে দেখেছ? দেখেছি। সে এক সন্ন্যাসীর সঙ্গে হরি বলতে বলতে কাঞ্চন-নগরের দিকে চলেছে।

> সন্ন্যাসীর করে ধরি
> তোমার নিমাই বলে হরি
> দ্বিতীয় বসন নাহি গায়।
> বাসু কহে আহা মরি
> তোমার গৌরাঙ্গ হরি
> পাছে গিয়া মস্তক মুড়ায়।।

'কার বোলে করিলা সন্ন্যাস?' শুনেছি রঘুনাথ যখন বনে গেল, জানকীকে সঙ্গে নিয়ে গেল। কৃষ্ণ যখন মথুরায় গেল, সম্পর্ক একেবারে ছিন্ন করল না, উদ্ধবকে পাঠাল বৃন্দাবন। এ যে তুমি দেশান্তরী হয়ে গেলে। এই যদি তোমার মনে ছিল তুমি গৃহবাস করলে কেন? এখন আমি কী করব, কোথায় যাব, কী আশায় দেহ রাখব?

> এত কহি বিষ্ণুপ্রিয়া
> নিজ অঙ্গ আছাড়িয়া
> ধরণীরে মাগয়ে বিদায়।
> বাসুদেব ঘোষ কহে
> মো সমান পাষাণ নহে
> তবু হিয়া বিদরিয়া যায়।।

শচীমাতা কাঁদছে, আমার সোনার পুতলী গোরাচাঁদ কোথায় গেল, কে তাকে রাখল লুকিয়ে? যে সব ছেড়ে চলে গেল তাকে ছেড়ে আমি বাঁচব কী করে? আমার সমস্ত নদীয়া আঁধার হয়ে গেল। বলো, সে কোথায়? আমিও যোগিনী হয়ে তার সঙ্গ নেব। যে আমাকে গৌরাঙ্গ পাইয়ে দেবে, আমি তার কেনা দাসী হয়ে থাকব।

> যে মোরে মিলিয়া দেয়
> মূল্য দিয়া কিনা লয়
> হইতাম দাসের সে দাসী।
> বাসুদেব ঘোষ ভনে
> শচী কান্দে অকারণে
> জীব লাগি নিমাই সন্ন্যাসী।।

কাঞ্চননগরে, কাটোয়ায়, গঙ্গাতীরে বৃক্ষতলে গৌরাঙ্গসুন্দর বসেছে—'কাঞ্চনের কান্তি জিনি দীপ্ত কলেবর।' গৌরাঙ্গের যে কী অলোকসুন্দর মূর্তি আর কী তার দুর্নিবার আকর্ষণ তাই বোঝাচ্ছে বাসুদেব।

> কাঁখে কুম্ভ করি নারী দাঁড়াইয়া চায়।
> চলিতে না পারে কেহ নড়ি হাতে ধায়।।
> নগরের পুরনারী যতেক যুবতী।
> সতী ছাড়ে নিজ পতি—
> জপ ছাড়ে যতি।।
> কেহ বলে হেন গোরা কোন দেশে ছিল।
> সে দেশে পুরুষ নারী কেমনে বাঁচিল।।

কেউ বলছে, কোন বাপ-মায়ের প্রাণ বধ করে এসেছে, কোন নারীর গলায় পা দিয়ে। আবার বলছে, সে মা ধন্য যে এমন পুত্র পেটে ধরেছে, যে নারী একে পতি বলে পেয়েছিল তার মত ভাগ্যবতী কোথায়? কেউ বলছে এমন সুন্দর যৌবনে কেশ মুণ্ডন কোরো না, নিজের দেশে ফিরে যাও।

কিন্তু প্রভু কী বলছে?

প্রভু বলে আশীর্বাদ কর মাতাপিতা।
সাধ আছে কৃষ্ণপদে বেচি নিজ মাথা।।
প্রভু মস্তক মুণ্ডন করতে চাইলেন।

যে-ই শুনল হাহাকার করে উঠল। কিন্তু প্রভু বিচলিত হলেন না, মধু শীলকে বললেন, আমি গঙ্গা স্নান করে আসি, তুমি আমার মাথা কামিয়ে দেবে। মধু বলে, এমন চাঁচর কেশ কাটতে পারব না। কেন কাটবে? প্রভু বললেন, আমি ভারতীর কাছে সন্ন্যাস নেব, কেশে-বেশে আমার প্রয়োজন নেই।

প্রভু বলে আমি যে ছাড়িব এই ধর্ম।
সন্ন্যাস করিব আমি কেশে নাহি কর্ম।।
কেশেবেশে ধনেজনে কৃষ্ণ নাহি পাই।
সকল তেজিব আমি শুন ওহে নাই।।

মধু বললে, তোমার মাথায় কী করে হাত দেব? তোমার মাথায় হাত দিয়ে আবার কার পা ছোঁব? আমার নিদারুণ অপরাধ হবে। ভাবতেও আমার গা কাঁপছে।

প্রভু বললেন, আমি বলছি তোমাকে আর নিজ বৃত্তি করতে হবে না। তোমাকে কৃষ্ণ আজীবন সুখে রাখবেন, অন্তকালে তোমার বিষ্ণুলোকে গতি হবে।

মধু বললে, গোসাই, আমাকে ভাঁড়িও না, আমি বুঝতে পাচ্ছি তুমিই ব্রহ্মা, তুমিই বিষ্ণু।

মধুশীল বলে গোসাই না ভাঁড়াও মোরে
তুমি ব্রহ্মা, তুমি বিষ্ণু জানিনু অন্তরে।।
যে কৃষ্ণ রাখিবে সুখে সেই কৃষ্ণ তুমি
তব পদ বিষ্ণুলোক কি বা জানি আমি।।
মুড়াবে চাঁচর কেশ হাত দিব মাথে।
কিন্তু প্রভু শ্রীচরণ দেও আগে মাথে।।
মধুর বচনে প্রভু দিলা শিরে পদ
বাসু কহে যার কাছে তুচ্ছ ব্রহ্মপদ।।

'তখন নাপিত আসি, প্রভুর বামেতে বসি, ক্ষুর দিল ও চাঁচর কেশে।' সকলে শোকে উত্তাল হয়ে উঠল। মধুও কাঁদতে লাগল। 'কি হৈল কি হৈল বলে, খুর মোর নাহি চলে, প্রাণ ফাটে বিদরিয়া যায়।' এদিকে 'প্রভুর মুণ্ডন দেখি, কান্দে যত পশুপাখী, আর কান্দে যত শ্রীনিবাসী। বৎস নাহি দুগ্ধ খায়, তৃণদন্তে গাভী ধায়, নেহারে গৌরাঙ্গ মুখ আসি।।'

গৌরাঙ্গকে কেশবভারতী সন্ন্যাস দিল। 'অরুণ দুখানি ফালি, ভারতী দিলেন তুলি, আর দিলা এ ডোর কৌপীন।' তারপর সন্ন্যাস দিয়ে কাঁদতে বসল।

গৌরাঙ্গ সন্ন্যাস দিয়া ভারতী কাঁদিলা।
শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য নাম নিমাইয়েরে দিলা।।
প্রভু কহে গুরু মোর পুরাহ মনসাধ।
কৃষ্ণমতি হউক এই দেও আশীর্বাদ।।
ভারতী কাঁদিয়া বলে মোর গুরু তুমি
আশীর্বাদ কি করিব কৃষ্ণ দেখি আমি।।
ভুবন ভুলাও তুমি সব নাটের গুরু।
রাখিতে লৌকিক মান মোরে কহ গুরু।।
আমার সন্ন্যাস আজি হইল সফল।
বাসু কহে দেখিলাম চরণকমল।।

'কি লাগিয়া দণ্ড ধরে, অরুণ বসন পরে কি লাগিয়া মুড়াইল কেশ। কি লাগিয়া মুখ চাঁদে রাধা রাধা বলি কাঁদে, কি লাগিয়া ছাড়িল নিজ দেশ।।'

কেশবভারতীর থেকে দীক্ষা নিয়ে নদীয়া ছেড়ে শান্তিপুরে এলেন গৌরহরি। অদ্বৈতের গৃহে এসে উঠলেন। শচীমাতা দেখা করতে এল।

'এ মত হৈলে কেনে, শিরে কেশ দেখি হীনে, পরিয়াছে কৌপীন যে বাস। নদীয়ার ভোগ ছাড়ি, মায়েরে অনাথ করি, কার বোলে করিলা সন্ন্যাস।'

নিমাই মায়ের পায়ে দণ্ডবৎ হল, বললে, মা, এ বিধির নির্বন্ধ। এ কেউ খণ্ডাতে পারবে না। তুমি কেঁদো না, মন স্থির কর।

'ইহার লাগিয়া যত, পড়াইলাম ভাগবত এ দুখ কহিব আমি কায়। অনাথিনী করি মোরে, যাবে বাছা দেশান্তরে, বিষ্ণুপ্রিয়ার কি হবে উপায়।। এ ডোর কৌপীন পরি কি লাগিয়া দণ্ড ধরি, ঘরে ঘরে খাবে ভিক্ষা মাগি। জীয়ন্ত থাকিতে মায়, ইহা নাকি সহা যায়, কার বোলে হৈলা বৈরাগী।।'

নিমাই বললে, 'মা, তুমি আমার জন্ম জন্মের মা, আমি তোমার জন্ম-জন্মের পুত্র। তুমিই তো ধ্রুবের জননী হয়ে ছেলেকে বৈরাগ্য দিলে, তুমিই তো কৌশল্যা হয়ে কেঁদে কাঁদলে বনবাসী রামের জন্যে। তারপর কৃষ্ণ যখন মধুপুরে গেল তুমিই তো ঘরে বসে কাঁদলে নন্দরাণী হয়ে। তুমি শোক কোরো না, যখনই তুমি ডাকবে তোমার কাছে চলে আসব। শুধু তুমি আমাকে তোমার চিত্তে সন্নিহিত করো। আর মা, কৃষ্ণভজন করো, কৃষ্ণই সার, সে ছাড়া আর সংসার নেই।'

শচীমাতা শান্ত হলেন। সুদৃষ্টি মেলে সকলের শোক হরণ করলেন প্রভু। তারপর মায়ের অনুমতি নিয়ে চললেন নীলাচলে।

নীলাচলে মন্দিরে প্রেমাবেশে মূর্ছিত হলেন গৌরাঙ্গ। সার্বভৌম গৌরাঙ্গকে ধরে করে গৃহে নিয়ে গেল। দেখল কৃষ্ণের নব অবতার।

এইখানেই বাসুদেবের বর্ণনার শেষ।
গোরা মোরে দয়া না ছাড়িয়।
আপন করিয়া মোরে চরণে রাখিয়।।
তোমার চরণ লাগি সব তেয়াগিলু
শীতল চরণ পাঞা সব না লইলু।।
এ কুলে ও কুলে দুঞি দিলু তিলাঞ্জলি
রাখিয় চরণে মোরে আপনার বলি।।
বাসুদেব ঘোষ বলে চরণে ধরিয়া।
কৃপা করি রাখ মোরে পদছায়া দিয়া।

(১৬)

বাসুদেব দত্ত

বাসুদেব দত্ত মুকুন্দ দত্তের বড় ভাই।

মুকুন্দের মত বাসুদেবও গৌরাঙ্গের সংকীর্তনসঙ্গী, মধুকণ্ঠ গায়ক।

নীলাচলে প্রভু বাসুদেবকে বললেন যদিও তোমার ছোটভাই মুকুন্দ বাল্যকাল হতেই আমার সঙ্গী, তবু তোমাকে দেখে আমার বেশি সুখ হয়।

মুকুন্দ আমার ছোটভাই কে বলে! বাসুদেব আপত্তি করল। বললে, মুকুন্দ আমার আগে তোমার কাছে এসেছে, তোমার সঙ্গ করেছে। সেই চরণপ্রাপ্তিতেই তার পুনর্জন্ম, ভাগবতজন্ম ঘটেছে। সেই জীবনে

সে আমার অগ্রজ। 'ছোট হইয়া মুকুন্দ এবে হইল মোর জ্যেষ্ঠ, তোমার কৃপাপাত্র তাতে সর্বগুণশ্রেষ্ঠ।'

প্রভু বললেন, দাক্ষিণাত্য থেকে তোমার জন্যে দুখানি গ্রন্থ এনেছি।

আমার জন্যে? বাসুদেব কৃতজ্ঞ-কৃতার্থের মত তাকাল সানন্দে।

এই নাও। বাসুদেবের প্রসারিত করপুটে গ্রন্থ দু'খানি রাখলেন গৌরহরি।

একখানি কৃষ্ণকর্ণামৃত, আরেকখানি ব্রহ্মসংহিতা।

বোঝাতে চাইলেন বাসুদেবই বিদ্বান, বাসুদেবই রসবেত্তা।

অন্য বৈষ্ণবেরা প্রত্যেকে সেই বই লিখে নিল। ক্রমে ক্রমে ছড়িয়ে পড়ল বাইরে।

বাসুদেবের পরমবন্ধু শিবানন্দ সেন।

প্রভু-সন্দর্শনে দুজনে একসঙ্গেই গিয়েছিলেন নীলাচল। দুজনেরই হাতে গঙ্গাজলের কলসী।

প্রভু এক কলসী রাখলেন জগন্নাথের স্নানের জন্যে আরেক কলসী নিজের ব্যবহারের জন্যে।

এখন কার কলসী কার সেবায় যায়?

পাছে ভক্তদের মনে আঘাত লাগে প্রভু দু' কলসীর জলই সমান ভাগ করলেন। এক অর্ধেক জগন্নাথের, আরেক অর্ধেক গৌরহরির।

পরিবেশনে অসাম্য ঘটতে দিলেন না।

শিবানন্দকে বললেন, শিবানন্দ, তুমি বাসুদেবের আয়-ব্যয়ের সরখেল হও।

বাসুদেবের কী অবস্থা?

বাসুদেব কিছুই সঞ্চয় করে না। যেদিন যা আসে সেইদিনই তা খরচ করে ফেলে। পরের দিনের জন্যে কিছুই সঞ্চয় করে রাখে না। কিন্তু সে তো গৃহস্থ, সে তো সন্ন্যাসী নয়। তাকে কিছু সঞ্চয় করতে হবে বৈকি। সঞ্চয় না করলে সে কুটুম্বভরণ করবে কী করে? 'গৃহস্থ হয়েন ইঁহো, চাহিয়ে সঞ্চয়। সঞ্চয় না কৈলে কুটুম্ব-ভরণ না হয়।।'

সঞ্চয় থেকেই তো বাসুদেব পরহিত করবে, করবে আত্মীয়সেবা।

বাসুদেব আয়-ব্যয় সম্বন্ধে উদাসীন। সুতরাং শিবানন্দকে বললেন, ভার নিতে, হিসেব রাখতে।

শিবানন্দ রাজি হল।

বাসুদেব বললেন, প্রভু, তোমার কাছে আমার একটি প্রার্থনা আছে।

বলো।

জগৎ-ত্রাণ করতে তোমার অবতরণ। তুমি দয়াময়, তুমিই একমাত্র সমর্থ। 'করিতে সমর্থ তুমি প্রভু দয়াময়, তুমি মনে কর যবে অনায়াসে হয়।'

প্রভু অমৃতস্নিগ্ধ উদারদৃষ্টিতে তাকালেন।

বাসুদেব বললে, জগতের দুঃখ দেখে আমার হৃদয় বিদীর্ণ হয়ে যাচ্ছে। সকল জীবের সমস্ত পাপ তুমি আমাকে দাও, আমি অনন্ত নরকভোগ করি, তার বিনিময়ে সকল জীবের ভবরোগের অবসান হোক।

বাসুদেবের কথা শুনে প্রভুর চিত্ত দ্রবীভূত হল। প্রভু বললেন, তোমার এ প্রার্থনা বিচিত্র নয়। তুমি তো প্রহ্লাদ।

রামচন্দ্রের মন্দির : গুপ্তিপাড়া ফটো : বিল্টু গুপ্ত

আর সকলাকে ত্যাগ করে প্রহ্লাদ নিজের উদ্ধার চায়নি। নিজে বাঁচব আর সকলে ভবসমুদ্রে হাবুডুবু খাবে এ অসম্ভব।

প্রভু আরো বললেন, বাসুদেব, তুমি সর্বজীবের নিস্তার চাইলে। তোমার প্রার্থনা পূর্ণ হোক, বিনা পাপভোগে সকলের উদ্ধার হোক। ভক্ত যা চায় কৃষ্ণ তাই পূর্ণ করেন। ভক্তবাঞ্ছাপূর্তি ছাড়া তাঁর আর কিছু করণীয় নেই। পাপের ফল ভোগ না করিয়েও কৃষ্ণ পাপীকে উদ্ধার করতে সক্ষম, সেক্ষেত্রে অন্যের পাপের ফল তোমাকে দিয়ে ভোগ করাবেন কেন? বাসুদেব, তুমি পরম বৈষ্ণব, পরম বৈষ্ণব যার হিতকামনা করে সেও বৈষ্ণব হয়ে যায়। আর বৈষ্ণবের সমস্ত পাপ কৃষ্ণ দূর করেন।

তুমি যার হিত বাঞ্ছ সে হল বৈষ্ণব।
বৈষ্ণবের পাপ কৃষ্ণ দূর করে সব।।

রথযাত্রায় কীর্তন করল বাসুদেব। ইন্দ্রদ্যুম্ন সরোবরে প্রভুর সঙ্গে জলকেলি।

কুমারহট্টে শিবানন্দের বাড়ির কাছে বাস করতে লাগল বাসুদেব। শিবানন্দকে প্রতিবেশী না করলে সে তার সরখেল হয় কী করে? মহাপ্রভুর নির্দেশ তা হলে

গৌরহরি যখন বাঙলাদেশে এলেন কুমারহট্টে পৌঁছে প্রথম শ্রীবাসের বাড়ি এলেন। সেখান থেকে বেরিয়ে দুইটি পথের সংযোগে এসে দাঁড়ালেন। কয়েক পা ডাইনে গেলে শিবানন্দের বাড়ি, কয়েক পা বাঁয়ে গেলে বাসুদেবের বাড়ি। প্রভু দ্বিধায় পড়লেন, কার বাড়ি আগে যান।

বাসুদেব বললে, আগে শিবানন্দের বাড়ি যান।

বাসুদেবের অনুমতি পেয়ে প্রভু আগে শিবানন্দের বাড়ি গেলেন। পরে বাসুদেবের বাড়িতে উপস্থিত হলেন।

তাঁকে দেখে বাসুদেব, যে সর্বভূতে কৃপালু, যে শুধু চৈতন্যরসে মত্ত, সে কাঁদতে লাগল। প্রভুও কাঁদতে লাগলেন।

বললেন, 'আমার এ শরীর আমার বাসুদেবের। বাসুদেব আমাকে যেখানে বেচবে আমি সেইখানে বিকোব। বাসুদেবের বাতাস যার গায়ে লাগবে তাকে কৃষ্ণ সবসময়ে রক্ষা করবেন। শোনো, বৈষ্ণবমণ্ডল শুনে রাখো, আমার এ দেহ শুধু আমার বাসুদেবের।'

আপনে শ্রীগৌরচন্দ্র বলে বার বার।
এ শরীর বাসুদেব দত্তের আমার।।
দত্ত আমা যথা বেচে তথাই বিকাই।
সত্য সত্য ইহাতে অন্যথা কিছু নাই।।

বাসুদেব দত্তের বাতাস যার গায়।
লাগিয়াছে, তারে কৃষ্ণ রাখিব সদায়।।
সত্য আমি কহি শুন বৈষ্ণবমণ্ডল।
এ দেহ আমার বাসুদেবের কেবল।।

বাসুদেব ছাড়া এত বড় সৌভাগ্য আর কার! সেই একমাত্র গৌরাঙ্গের শরীরের মালিক।

বাসুদেব দত্ত আর যদুনন্দন আচার্য গৌরহরির দুই সেনাপতি। যদুনন্দন রঘুনাথদাস গোস্বামীর দীক্ষাগুরু, বাসুদেবের অনুগৃহীত।

প্রতি বৎসর নীলাচলে গিয়ে প্রভুকে দেখে আসে বাসুদেব। প্রভুর তিরোভাবের দিনেও বাসুদেব নীলাচলে।

আমেরিকায় জনসাধারণের বিনা লাইসেন্সে যে কোন আগ্নেয়াস্ত্র রাখবার অধিকার আছে। এবং নিজ স্বার্থের প্রয়োজনে সে অস্ত্র ব্যবহার করতে এতটুকুও দ্বিধাবোধ করে না আমেরিকানরা। হয়ত খবর পাওয়া গেল শহরের মিউনিসিপ্যালিটি একটি নতুন রাস্তা তৈরি করবার প্রয়োজনে কারো বাড়ীর খানিকটা খালি জমি অধিকার করতে মনস্থ করেছেন। জমির মালিকের আপত্তি আছে তাতে। সেই ব্যক্তি মিউনিসি-প্যালিটির লোকদের বাধা দেবার জন্যে একটি শেরমান ট্যাঙ্ক নিয়ে অপেক্ষা করতে পারেন। হয়ত কারো পাশের বাড়ীর লোকদের সঙ্গে মতের মিল হচ্ছে না। সেক্ষেত্রে উক্ত ভদ্র-লোকই যে ন্যায়সঙ্গত আচরণ করছেন, সে কথাটা ভাল করে বুঝিয়ে দেবার জন্যে হালফ্যাসানের একটি অটোমেটিক রাইফেল হাতে নিয়ে গিয়ে দাঁড়ালেন প্রতিবেশীর দরজায়। দক্ষিণ আমেরিকার ক্ষুদে ক্ষুদে রাজ্যগুলি যাদের রসিকতা করে নাম দেওয়া হয়েছে "বানানা রিপাব্লিকস", তাদের কোন একটির ডিক্টেটর যদি খবর পান যে তাঁকে গদীচ্যুত করবার জন্যে পাশের রাজ্য থেকে একদল লোক আসছে—তাহলে জমির দার হিসেবে তাদের ব্যবহার করবার জন্যে তাড়াতাড়ি ডজন খানেক ভ্যাম্পায়ার জেটের প্রয়োজন হতে পারে এবং সেগুলো পেতে কোন অসুবিধাই হবে না তার।

পাওয়া যায়—সব পাওয়া যায়। পৃথিবীতে একজন মাত্র লোক আছেন, যিনি যে কোন মুহূর্তে যে কোন ব্যক্তি বা রাজ্যের প্রয়োজনীয়, যে কোন অস্ত্রের চাহিদা মেটাতে পারেন। হালফিল্ মডেলের রাইফেল, মেসিনগান, আর্টিলারী, গ্রেনেড, গোলাবারুদ, যে কোন পরিমাণেরই হোক না কেন—টাকা দিলেই বাড়ীর দরজায় এসে ডেলিভারী দিয়ে যাবেন। একটি আমেরিকান প্যাটন ট্যাঙ্ক পাওয়া যাবে আট লক্ষ টাকায়, জেট-বিমান পাওয়া যাবে লাখ তিনেক টাকায়। যদি হাতে টাকা না থাকে তাহলে শ'খানেক টাকা দিলে একটা ফরাসী মেসিন গান পাওয়া যেতে পারে। এসব যার কাছে পাওয়া যায় তাঁর নাম স্যামুয়েল কামিংস ওরফে স্যাম্ কামিংস।

স্যাম্ কামিংসের নাম সম্প্রতি ভারতীয়-দের মনে বেশ চাঞ্চল্যের সৃষ্টি করেছে। কারণ মাত্র কয়েকদিন আগে আমেরিকান সেনেট ফরেইন রিলেশনস্ সাব-কমিটির আন্তর্জাতিক তদন্ত কমিশনের কাছে একটি গুরুত্বপূর্ণ বিবৃতি দিয়েছেন মিঃ কামিংস। ইতিপূর্বে পাক-ভারত যুদ্ধের সময়ে এবং পরেও পাকিস্থানকে বেআইনিভাবে মারণাস্ত্র সরবরাহ করবার অনেকখানি দায়িত্ব তিনি গ্রহণ করেছিলেন। ভারত সরকার এ সম্বন্ধে আপত্তি জানালে আমেরিকান সরকার বেমালুম সে কথা অস্বীকার করে যান কিন্তু সম্প্রতি স্যাম্ কামিংস অনেক গোপনীয় বিষয় ফাঁস করে দিয়েছেন। এবং সে খবর সংবাদপত্রের মারফত ছড়িয়ে পড়েছে সর্বত্র।

আমেরিকার ফিলাডেলফিয়া শহরে এক অবস্থাপন্ন ঘরে ১৯২৮ সালে স্যামের জন্ম। একটু বয়স হলেই বাবা ডেন্ কামিংস্ ছেলেকে এক অভিজাত স্কুলে ভর্তি করে দেন।

স্কুলে তিনি অল্পবয়সেই ডানপিটে ছেলেদের নেতা হয়ে ওঠেন। একদিন বিপক্ষীয় দলের ছেলেদের হাতে মার খেয়ে ছুটে বাড়ী এলেন বাবার রিভলবারটি নিয়ে গিয়ে শত্রুপক্ষকে শায়েস্তা করবার জন্যে। বাড়ী এসে দেখলেন চারিদিকে বিষাদের ছায়া। শুনলেন তাঁদের সর্বনাশ হয়ে গেছে। আমেরিকায় তখন নিদারুন অর্থসংকট শুরু হয়েছে। তীব্র মুদ্রামূল্য হ্রাসের দরুন দেনা মেটাতে গিয়ে বাবা আজ সর্বস্বান্ত হয়ে বাড়ী ফিরেছেন। কয়েকদিনের ভেতর শহরের বসতবাড়ী ছাড়া আর যা কিছু ছিল একে একে সব বিক্রী হয়ে গেল।

একদিন দেখলেন দৈনন্দিন সংসারের খরচ মেটাবার জন্যে তাঁর মা গোপনে বাড়ীর কয়েকটি আগ্নেয়াস্ত্র বিক্রী করে দিচ্ছেন। সেদিনকার ঘটনা তাঁর পরবর্তী জীবনকে যেভাবে প্রভাবিত করেছিল তা আজ পৃথিবীর কাছে বিস্ময়ের বিষয়।

দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের অবসানে, বাধ্যতা-মূলক সামরিক কর্তব্যে নিয়োজিত সময়ের সমাপ্তির পর ওয়াশিংটন বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তি হন কামিংস্। এখানে তিনি সহপাঠী ছাত্রদের ভেতর বিবাদ-বিসম্বাদের সুযোগ নিয়ে পুরোন পিস্তল-রিভলবার ইত্যাদি কেনা-বেচার আনন্দে মেতে ওঠেন। বেশ কিছু টাকা এভাবে তাঁর হাতে এলো। বিশ্ব-বিদ্যালয় থেকে গ্রাজুয়েট হবার পর তাঁর বাপ-মা তাঁকে ইউরোপে পাঠিয়ে দিলেন উচ্চশিক্ষার জন্যে।

ইউরোপে পা দিয়ে তিনি দেখলেন চারিদিকে বেওয়ারিশ স্তূপীকৃত অস্ত্রশস্ত্রের বিপুল সমারোহ। ইউরোপের যে দিকেই তাকান দেখতে পান শুধু পরিত্যক্ত অস্ত্রের বিভিন্ন রূপ। সেদিনই শেষ হয়ে গেল পড়াশুনোর সঙ্গে সম্বন্ধ। বাবা-মাকে না জানিয়ে গোপনে ফিরে এলেন আমেরিকায়। একটি বিখ্যাত অস্ত্র-ব্যবসায়ী প্রতিষ্ঠানের কাছে পুরোন অস্ত্র কেনা-বেচায় বিপুল লাভের প্রলোভন দেখিয়ে, ইউরোপে সেই কোম্পানীর একমাত্র বেচা-কেনার প্রতিনিধি করবার অধিকার অর্জন করলেন। পারিশ্রমিক ঠিক হ'ল সব খরচ বাদ দিয়ে বছরে দু হাজার পাউণ্ড মাইনে এবং মোট বিক্রীর শতকরা এক ভাগের এক-অষ্টমাংশ কমিশন। বেশীদিন নয় মাত্র দু' তিন বছরের ভেতর ইউরোপ-আমেরিকার অস্ত্রজগতের একচ্ছত্র সম্রাট হয়ে দাঁড়ালেন কামিংস্।

স্যামুয়েল কামিংস

কোরিয়ার যুদ্ধের সময়ে পুরোন কোম্পানী ছেড়ে দিয়ে তিনি তাঁর ব্যক্তিগত প্রতিষ্ঠান "ইণ্টারন্যাশনাল আর্মামেণ্ট কোম্পানী", সংক্ষেপে যার নামকরণ হয়েছে "ইণ্টারআর্মকো" প্রতিষ্ঠা করেন। এ সম্পর্কে কামিংস বলেছেন যে, একমাত্র লেটারহেড ছাপানোর মত টাকাই ছিল তাঁর মূলধন। কিন্তু ভেতরকার খবর যাঁরা রাখেন তাঁরা বলেন, সিডনে লারউইন নামে একজন ব্যবসায়ী পঞ্চাশ হাজার পাউণ্ড অর্থ দিয়ে স্যাম্‌কে কোম্পানী প্রতিষ্ঠায় সাহায্য করে-ছিলেন কিন্তু 'ইণ্টারআর্মকো' যখন লাভ করতে শুরু করে স্যাম্ তাঁকে বিতাড়িত করে একলাই মালিক হয়ে বসেন।

বছর দশেকের ভেতর সুইজারল্যাণ্ডের জেনেভায় নিজস্ব ব্যাঙ্ক প্রতিষ্ঠা করতে হল তাঁর টাকা গচ্ছিত রাখবার জন্যে। ইউরোপ, উত্তর ও দক্ষিণ আমেরিকায় বারটি অস্ত্র-তৈয়ারীর কারখানা প্রতিষ্ঠা করলেন। ভার্জিনিয়া শহরের বিভিন্ন নয়টি গুদামে ৫০০,০০০ রাইফেল, ৫০,০০০ মেসিন গান, ৫,০০০ থেকে ১০,০০০ লাইট এবং হেভী আর্টিলারী বন্দুক ইত্যাদি সবসময়ে মজুত থাকে জরুরীকালীন যে কোন অবস্থায় সরবরাহ করবার জন্যে।

দক্ষিণ আমেরিকার প্যারাগুয়া রাজ্যের কুখ্যাত প্রাক্তন ডিক্টেটার ষ্ট্রিজিলোকে মাত্র চব্বিশ ঘণ্টার ভেতর ছাব্বিশটা বৃটিশ ভ্যাম্পায়ার জেট সরবরাহ করেছিলেন। গুয়েটামালার ডিক্টেটার আরবেঞ্জ গুজমেনকে তাঁর বিরুদ্ধে দেশবাসীর বিদ্রোহ দমন করবার জন্যে ছ' ঘণ্টার ভেতর দশ হাজার অটোমেটিক রাইফেল দিয়ে এলেন। পশ্চিম জার্মানীর সামরিক বিভাগকে বিক্রী করলেন ৫০,০০০ এম জি—৪২ লাইট মেসিন গান এবং ফিনল্যাণ্ডকে সরবরাহ করলেন ১০,০০০ স্টেনগান। মজার বিষয়—এ সমস্ত অস্ত্রগুলিই পরাজিত জার্মান সৈন্যরাই নেদারল্যাণ্ডে ফেলে এসেছিল।

ইণ্টারআর্মকোর সবচেয়ে ভাল বাজার হচ্ছে দক্ষিণ আমেরিকার ডিক্টেটারী রাজ্যগুলি আর আফ্রো-এশিয়ার নবজাগ্রত দেশগুলি। পৃথিবী জুড়ে চারটি মাত্র প্রতিষ্ঠান বছরে ১০০০,০০০,০০০ পাউণ্ডেরও বেশী অর্থের সামরিক অস্ত্রাদির প্রধান সরবরাহকারী এবং এর ভেতর শতকরা তিরিশ ভাগেরও বেশী অংশীদার হচ্ছেন স্যাম্ কামিংস্। ব্যক্তিগতভাবে দক্ষিণ আমেরিকার ক্ষুদে ডিক্টেটারগুলির প্রতিই স্যামের দুর্বলতা বেশী। প্রয়োজনে দেউলিয়া ডিক্‌টেটারকে তিনি যৎসামান্য মূল্যে এমনকি ধারেও অস্ত্র দিয়েছেন। তাঁদের ভেতর পেরন, ব্যাতিস্তা এবং ষ্ট্রিজিলোর নাম বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য।

কিউবার সঙ্গে যখন আমেরিকার সম্পর্ক তিক্ত ছিল না, তখন আমেরিকান সরকারের প্রচ্ছন্ন অনুমতি নিয়ে ডাঃ ফিডেল ক্যাস্ট্রোকে প্রচুর অস্ত্রাদি সরবরাহ করেছিলেন স্যাম্। কিন্তু একদিন যখন আমেরিকার সহায়তায় ক্যাস্ট্রোবিরোধী অভিযান শুরু হল তখন সেই বিদ্রোহী দলকে নিঃশেষ করে দিলেন ক্যাস্ট্রো স্যামেরই দেওয়া অস্ত্র দিয়ে। অবশ্য ক্যাস্ট্রোবিরোধী বিদ্রোহীদের অস্ত্রের জোগানও স্যামই দিয়েছিলেন।

মেয়েদের পোশাক-পরিচ্ছদের মতো প্রতিদিনই নিত্যনতুন অস্ত্রের আবিষ্কারের সঙ্গে সঙ্গে চলতি মডেলগুলি বাতিল হচ্ছে ইউরোপ এবং আমেরিকায়। প্রত্যেকটি দেশে স্যামের প্রতিনিধিরা ভেতরকার খবর রাখে এবং সুযোগ-সুবিধা মত সে সব বাতিল অস্ত্রাদি নামমাত্র মূল্যে কিনে নেয়। তারপর ক্ষুধার্ত দেশগুলিতে তার প্রতিনিধিরা সে অস্ত্র বিক্রী করেন বিপুল লাভে।

কিছুদিন আগে ইণ্টারআর্মকোর একটি ঘোষণা পৃথিবীকে হতচকিত করে দেয়। ইণ্টারআর্মকো জানায় যে তাঁরা হালফিল মডেলের রাশিয়ান অস্ত্র সরবরাহ করতে প্রস্তুত। সাধারণত রাশিয়া কিম্বা কমিউনিস্ট কোন দেশ বেসরকারীভাবে নিজেদের অস্ত্র বিক্রী করে না। প্রথমে অবিশ্বাস্য মনে হলেও খোঁজ নিয়ে জানা গেল ইণ্টারআর্মকো সত্যি সত্যিই রাশিয়ান অস্ত্র সরবরাহ করতে পারে। রাশিয়ান অনুসন্ধানে শেষ পর্যন্ত জানা গেল অস্ত্রগুলি ইজরাইলের কাছ থেকে কিনেছে ইণ্টারআর্মকো। ইজরাইল ইজিপ্টের সঙ্গে প্রথম যুদ্ধের সময়ে এই অস্ত্রগুলো দখল করে নিয়েছিল। ইজিপ্ট কিনেছিল ঐ অস্ত্র চেকোশ্লোভাকিয়ার কাছ থেকে। চেকোশ্লোভাকিয়া পেয়েছিল রাশিয়ার কাছ থেকে সাহায্য বাবদ।

সম্প্রতি ইণ্টারআর্মকো একটি বিজ্ঞপ্তি প্রচার করে জানিয়েছেন :

> **"হোয়াই বি আণ্ডার আর্মড? উই হ্যাভ মোর আর্মস্ দ্যান ইন্ ইয়ুজ টু ডে ইন্ দি ইউ, এস, এ অর ইউ, কে। উই সেল্ বেটার অটোমেটিক রাইফেল দ্যান্ এনি থিং ইন্ ইয়ুজ, দি ইউ, এস, এ আর্মি উইল্ হ্যাভ বিফোর ১৯৬৮"।**

এই বিজ্ঞপ্তি থেকেই অনুমান করা কঠিন নয় কতবড় শক্তিশালী এই প্রতিষ্ঠান এবং তার একমাত্র মালিক স্যাম্ কামিংস।

এ ধরনের মানুষ-হত্যার ব্যবসায়ে লিপ্ত থাকার জন্যে তিনি কি কখনও অনুতপ্ত বোধ করেন না—জনৈক সাংবাদিকের এই প্রশ্নের উত্তরে কামিংস্ বলেছিলেন যে রাস্তায় যখন মোটরদুর্ঘটনায় কোন ব্যক্তির মৃত্যু ঘটে তখন তার জন্যে মোটর প্রস্তুতকারক যতটা দায়ী তার চাইতে বেশী কিছু হবার মত কোন কারণই তিনি অনুভব করেন না।

ব্যক্তিগতভাবে যুদ্ধের পক্ষপাতী নন। কারণ যুদ্ধ লাগার মানে তাঁর ব্যবসা বন্ধ হওয়া। যুদ্ধ লাগলে তখন কোন সরকারই আর অস্ত্র বিক্রয় করবে না। তাই তাঁর প্রয়োজন যুদ্ধও নয় শান্তিও নয়—প্রয়োজন অস্বাভাবিক না উত্তেজনার। তাহলে দু' দলকেই অস্ত্র সরবরাহ করবার সুযোগ তাঁর হবে।

ব্যবসায়ের সুবিধার জন্যে আমেরিকা ছেড়ে মণ্টিকার্লোর নাগরিকত্ব অর্জন করে সেখানেই বেশীর ভাগ সময় কাটান তাঁর পরমাসুন্দরী সুইস পত্নী আর্মাকে নিয়ে। মণ্টিকার্লোর একটি কেসিনোর মালিকানা স্বত্বও তিনি কিনেছেন। কিন্তু নিজে কখনও জুয়া খেলেন না। আরো আশ্চর্যের বিষয় বন্দুক, রাইফেল, রিভলবার ইত্যাদির সম্পর্কে তাঁর বিশেষ কোন জ্ঞান নেই।

চল্লিশ বছরের স্যাম্ কামিংস্ আজ মানুষের কাছে বিস্ময় এবং বিভীষিকা। যে কোন মুহূর্তে তাঁর খেয়ালখুশী বা মর্জির কৃপায় যে কোন দেশ বারুদের স্তূপে পরিণত হতে পারে।

পাকিস্থানের সঙ্গে তাঁর প্রত্যক্ষ যোগাযোগ আজ ভারতবর্ষকে বিপন্ন করে তুলেছে। আগামী কয়েক বছরের ভেতর লক্ষ লক্ষ বিভিন্ন ধরনের মারণাস্ত্র ইউরোপ আমেরিকায় বাতিল হয়ে গিয়ে যে সমস্যার সৃষ্টি করবে, তখন ঐ সমস্ত দেশকে স্যামের সাহায্য নিতেই হবে। আর স্যাম্‌ও মনের আনন্দে সে সব অস্ত্র দেশে দেশে বিক্রী করবেন প্রচুর লাভে।

বর্তমানে পাকিস্থান হচ্ছে স্যামের মূল লক্ষ্য। গত কয়েকদিন ধরে মারণাস্ত্র বিক্রী নিয়ে পৃথিবী জুড়ে যে উত্তেজনা এবং আলোচনার সৃষ্টি হয়েছে তার প্রধান নায়ক হচ্ছেন এই স্যামুয়েল কামিংস্ ওরফে স্যাম্ কামিংস্।

বর্ষার রূপ

সঞ্জীবকুমার বসু

বর্ষা অনুপ্রেরণা দিয়েছে কত কবিকে। কত বিরহীকে ক'রেছে ঘরছাড়া, কত ঘরছাড়াকে ক'রেছে গৃহী। কবিরা নানা রূপ দেখেছেন বর্ষার। যিনি যেভাবেই দেখুন না কেন সেভাবেই বর্ষাকে কাব্যের মধ্যে ধরে রেখেছেন তাঁদের অমর লেখনীতে। কবি কালিদাসের "মেঘদূত" এবং কবি জয়দেবের "গীতগোবিন্দে" বর্ষা এক চিরন্তন রূপ নিয়ে উপস্থিত।

এই দুই স্বনামধন্য কবি বর্ষার মেঘের কাছ থেকে যে অনুপ্রেরণা পেয়েছেন, তাই অক্ষয় করে রেখে গেছেন ঐ অমৃতনিষ্যন্দী দুই অমর গ্রন্থে। কবি কালিদাস মেঘকে বিরহের প্রতীক করে বিরহী যক্ষকে দিয়ে তাকে সুদূর অলকায় পাঠাচ্ছেন। মেঘ যক্ষকে আরও পাগল কোরে দিয়েছে। কারণ মেঘ তারই যেন বুকে জমান দুঃখের স্তূপ। এতদিন যা ছিল বুকের মধ্যে চাপা আজ সেই দুঃখই যেন পুঞ্জীভূত মেঘ হয়ে বাইরে বেরিয়ে এসে পাহাড়ের গায়ে ধীরে ধীরে স্তূপীকৃত হয়ে খেলে বেড়াচ্ছে একটা মত্ত হাতীর মত।

আর মেঘদূতে পাই :

তস্মিন্নদ্রৌ কতিচিদবলাবিপ্রযুক্তঃ স কামী।
নীত্বা মাসান কনকবলয়ভ্রংশরিক্তপ্রকোষ্ঠঃ।
আষাঢ়স্য প্রথম দিবসে মেঘমাশ্লিষ্টসানুং,
বপ্রক্রীড়া পরিণতগজ প্রেক্ষণীয়ং দদর্শ।।২
যখন আট মাস কাটলো সে-পাহাড়ে
কান্তাবিরহিত কামুকের,
সোনার কঙ্কন স্খলিত হ'য়ে
তার শূন্য হ'লো মনিবন্ধ।
দেখলো মেঘোদয় ধূমল গিরিতটে—
একদা আষাঢ়ের প্রথম দিনে
বপ্রকেলি করে শোভন গজরাজ
আনত পর্বত গাত্রে'।২

—বর্ষার মেঘ কবির চোখে হাতির সঙ্গে উপস্থিত হয়েছিল। বর্ষাকে এমনি দেখছিলো বাল্মীকি :

বিদ্যুৎপতাকাঃ সবলাকমালাঃ
শৈলেন্দ্রকূটাকৃতিসন্নিকাশাঃ।
গর্জন্তি মেঘাঃ সমুদীর্ণনাদা মত্তা
গজেন্দ্রা ইব সংযুগাস্থাঃ।।

—বিদ্যুৎ পতাকা ও বলাকার মালায় শোভিত গিরিশৃঙ্গাকার মেঘ রণভূমিস্থ মত্ত গজেন্দ্রের ন্যায় গম্ভীর গর্জন করছে।

(রাজশেখর বসু অনূদিত)

ঐ মেঘ বার্তাবাহী হয়ে উড়ে যাবে অলকার পথে। পথে কত প্রেমিকা-প্রেমিকের মনে আশা নিরাশার ঝড় তুলে দিয়ে সে যাচ্ছে সৌন্দর্যের লীলাভূমি দূর অলকায়

যক্ষপ্রিয়ার কাছে। মেঘের সঙ্গে যত বিরহী তাদের মনও যেন ঐ অলকার মত তাদের প্রেমিকার কাছে ছুটে যায়। মেঘ বিরহের প্রতীক। তাই তার এত আদর। কারণ মেঘ এমনই আনন্দদায়ক যে মেঘের দেখা পেলেই ময়ূর-ময়ূরী পেখম তুলে নাচ শুরু করে দিয়ে মেঘকে স্বাগত জানায়।

সন্তপ্তানাং ত্বমসি শরণং;
তৎ পয়োদ প্রিয়ায়াঃ
সন্দেশং মে হর ধনপতিক্রোধবিশ্লেষিতস্য।
গন্তব্যা তে বসতিরলকানাম
যক্ষেশ্বরাণাং
বাহ্যোদ্যানস্থিতহরশিরশ্চন্দ্রিকাধৌত
হর্ম্যা।।৭

প্রিয়ার বাহু থেকে কঠিন বিচ্ছেদ
কুপিত ধনপতি ঘটালেন,
আমার সমাচার, পয়োদ, নিয়ে যাও,
তুমি যে তাপিতের আশ্রয়।
যক্ষপুরে যাবে, অলকা নাম,
তার আছেন উদ্যানে শম্ভু,
সৌধশ্রেণী তার চন্দ্রমৌলির
ললাট-জ্যোৎস্নায় ধৌত।।৭
ত্বামারূঢ়ং পবনপদবীমুদ্গৃহীতালকান্তাঃ
প্রেক্ষিষ্যন্তে পথিকবনিতাঃ
প্রত্যয়াদাশ্বসন্ত্যঃ।
কঃ সন্নদ্ধে বিরহবিধুরাং ত্বয্যুপেক্ষেত জায়াং
ন স্যাদন্যোহপ্যহমিব জনো যঃ
পরাধীনবৃত্তিঃ।।৮

যখন আরোহণ করবে বায়ুপথে,
পথিকবনিতারা অলক তুলে
গভীর প্রত্যয়ে দেখবে তোমাতেই
প্রিয়ের আগমন-আশ্বাস।
আমার মতো নয় যে-জন পরাধীন,
বলোতো সে কি পারে দয়িতার
বিরহভারাতুর ব্যথা না-ক'রে দূর
গগনে তুমি যবে উদিত?
(বুদ্ধদেব বসু অনূদিত)

এই মেঘদূতেই আমরা গোপবেশী ভগবান বিষ্ণুর দুইবার দেখা পেয়েছি ঐ মেঘের মধ্যেই। কারণ নবীন মেঘের রঙকে বিষ্ণুর গায়ের মতই বলা হয় এবং সময়ে সময়ে বিষ্ণুরূপেও তাকে কল্পনা করা হয়ে থাকে। উপনিষদের সময় (যুগ) থেকে ঐ কল্পনা আজও চলে আসছে। মেঘরূপী ভগবান বিষ্ণু তাই ভক্তের কাছে পরম মঙ্গলময়, প্রেমময়, প্রেরণাময়। আবার ঐ মেঘকেই উজ্জয়িনীতে মহাকালের মন্দিরে সন্ধ্যার প্রারম্ভে (গোধূলি লগ্নে) তান্ডব নৃত্যরত শিবের রজত গিরিনিভ বিশাল হাতের উপরে (প্রায় কাঁধের কাছে) রক্তাক্ত গজাসুরের শক্ত কালো চামড়ার মত দেখতে পাই। ঐ মেঘ তখন বীররসের প্রতীক হয়ে শিবের আনন্দদায়ক মূর্তিকে আরও সুন্দর রূপ দিয়েছে। সে গর্জন করলে তা পর্বত গুহায় প্রতিধ্বনিত হয়ে গুরুগম্ভীর মৃদঙ্গ ধ্বনির মত শোনায় আর ঐ গর্জনে শিব সঙ্গীত সম্পূর্ণ হয়। কারণ শিবের ডমরু-ধ্বনি ঐ মেঘের গর্জনেরই মত গম্ভীর ও আনন্দবর্ধক। মেঘ শিব-দুর্গার বড় প্রিয়। কৈলাসে কালো মেঘ আকাশে জমলে পরে তাঁদের আর আনন্দ ধরে না। পার্বতী মুখ লুকান শঙ্করের বুকের মধ্যে আনন্দে। উপনিষদের ভাষায়—"জলরূপী মেঘ একাদশ রুদ্রের এক রুদ্র"। মেঘ এখানে বীররসের প্রতীক হয়ে দেখা দিল। মেঘকে নিয়ে কবি জয়দেব প্রথম প্রেরণা পেলেন কদম্বখণ্ডীর ঘাটে বসে। তিনি ভাবছিলেন কিভাবে এই গীতগোবিন্দের ঘটনা সৃষ্টি করি। চিন্তিত মনে স্নান কোরতে এসে ঘাটের পারে মাথায় তেল মাখতে মাখতে পায়চারি কোরতে লাগলেন। চিন্তিত মনে তাকালেন আকাশের দিকে, আনন্দে দিশেহারা হয়ে গেলেন, দু চোখ ভরে দেখলেন দূরে দিগন্তের তমালবিপিনে জমে ওঠা নবীন মেঘকে। দেখলেন মেঘের বুক চিরে ঝলকে ঝলকে বিদ্যুৎ আকাশের এপার থেকে ওপারে চলে যাচ্ছে। তিনি ঐ মেঘকে দেখলেন শ্যাম-সুন্দরের প্রতীকরূপে, আর বিদ্যুৎ হলেন শ্রীমতী রাধা। রচিত হ'লো গীত-গোবিন্দের প্রথম শ্লোকঃ—

মেঘৈর্মেদুরমম্বরং
বনভুবঃশ্যামমস্তমালদ্রুমৈঃ
নক্তং ভীরুরয়ং ত্বমেব তদিমং রাধে!
গৃহং প্রাপয়।
ইত্থং নন্দনিদেশতশ্চলিতয়োঃ
প্রত্যধ্বকুঞ্জদ্রুমে
রাধামাধবয়োর্জয়ন্তি যমুনা
কূলে রহঃ কেলয়ঃ।।

অর্থাৎ, এই ভীষণ মেঘের প্রভায় শ্যামবর্ণ হয়েছে তমালের বন, মাধব খুব ভয় পেয়ে গেছেন তাই দেখে। এই দুর্যোগের রাত্রে তিনি বাড়ী ফিরবেন একা কি কোরে? রাধে! তুমি শ্যামসুন্দরকে একা যেতে দিও না তাঁকে ঘরে পৌঁছে দাওগে। এই মেঘ-দুর্যোগের রাতে তোমরা ঐ সমস্ত কুঞ্জবন দিয়ে ভীতত্রস্ত হয়ে যখন চলবে আহা! তোমরা যদি ঘরে না যাও হে রাধামাধব! তবে যমুনাতীরে দুর্যোগের রাতে এইভাবে লুকোচুরি খেল, জয় হোক তোমাদের।"

তাই মেঘের প্রকৃত রূপ কবি জয়দেব দেখলেন লীলাময় শ্রীকৃষ্ণের মধ্যে দিয়ে। কদম্বখণ্ডীর ঘাটে অজয় নদীর বুকে কালো মেঘের ছায়া পড়ল, তরতর করে বয়ে যাচ্ছে অজয়। তিনি আনন্দে দিশেহারা হয়ে জলে নেমে ডুব দিলেন। জল থেকে পেলেন তাঁর প্রাণের দেবতা রাধামাধবকে। ঠিক যেন মেঘরূপী কৃষ্ণ আর বিদ্যুৎরূপী শ্রীমতী রাধা। তাঁর কাব্যের প্রেরণা দিতে রূপ ধরে এলেন। একটু পরেই নামল প্রবল বৃষ্টি। জয়দেব ঘরে বসে গীতগোবিন্দের শ্লোক রচনায় আত্মমগ্ন। শ্রীমতী রাধা তখন বিরহকাতরা হয়ে সখীদের জিজ্ঞাসা কোরছেন কতদিন বাদে শ্যামসুন্দর আবার এই নিকুঞ্জ বনে ফিরে আসবেন মথুরা থেকে। সখীরা নানারকমভাবে রাধাকে বোঝাচ্ছেন আর বেশী দিন দেরি নয় এই এলো বলে। এমন সময় আকাশে বর্ষার নবীন মেঘ চারদিক অন্ধকার করে যমুনার উপর দিয়ে তমাল-কুঞ্জের মাথার উপর এসে দাঁড়াল। শ্রীমতী আর থাকতে পারলেন না উন্মাদিনীর মত মেঘকে দুহাত বাড়িয়ে আহ্বান কোরলেন বুকের মধ্যে। তিনি তো মেঘ দেখছেন না, দেখছেন মেঘবর্ণরূপী শ্রীকৃষ্ণকে। শেষে অধীর হয়ে ঐ মেঘরূপী শ্যামকে পাবার জন্য যমুনায় ঝাঁপ দিতে গেলেন। যমুনার কালো জলে মেঘের কালো ছায়া পড়েছে, শ্রীমতী ঐ কালো জলে দেখলেন শ্রীকৃষ্ণের হাসিমাখা মুখ। তখন তাঁর কাছে, তাঁর বিরহতপ্ত হৃদয়ে যেদিকে চান দেখেন সবই কৃষ্ণময়। "যেদিকে ফিরাই আঁখি, তোমা ছাড়া নাহি দেখি।" বর্ষার মেঘ তাই শ্রীমতী রাধার কাছে খুব প্রিয়।

কবি কালিদাস ও কবি জয়দেব দুইজনই মেঘ নিয়ে কাব্য সৃষ্টি কোরেছেন। কালিদাস মেঘকে দূত করেছেন যক্ষের, কিন্তু জয়দেব মেঘকে করেছেন তাঁর কাব্যের নায়ক মেঘ-রূপী ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণও বিদ্যুৎকে নায়িকা শ্রীমতী রাধা। জয়দেব বৈষ্ণব কবি, কালি-দাস বাণীর বরপুত্র। উপমাপ্রয়োগে দুই কবিই প্রায় সমান। অবশ্য সব সময় নয়। এই মেঘ নিয়ে দুই কবিই কাব্য রচনা করে-ছেন। তবে প্রেরণা পেয়েছেন ভিন্ন ভিন্ন মূলে কিন্তু ঐ বর্ষার মেঘ। তাঁদের কাব্যে বর্ষার রূপই বিশেষভাবে ধরা দিয়েছে। দোলা দিয়েছে কত প্রেমিক মনে। আশা-আকাঙ্খার দ্বন্দ্ব চলেছে প্রেমিক-প্রেমিকা-দের। সত্যই বর্ষার কি সুন্দর মাধুর্য। বর্ষার মেঘ আকাশে জমতে দেখলে মনে এমনিতেই হু হু করে ওঠে। কি যেন নাই, কেন নাই, বড় নিঃসঙ্গ একা মনে হয়।

মেঘের রূপ সত্যই তুলনাহীন। মেঘ তো বিশ্বস্রষ্টারই এক অপূর্ব সৃষ্টি। বিরহীর পক্ষে বর্ষার মেঘ বড় কষ্টদায়ক। মেঘদূত আর গীতগোবিন্দ পড়লেই তা বেশ বোঝা যায়। বিরহীর প্রতি সহানুভূতি এনে দেয়।

তাই বর্ষার রূপ এই দুই মহাকবির লেখনীতে এত সুন্দরভাবে ধরা দিয়েছে। এক-জন মানুষকে বিরহে কাঁদিয়েছেন, নায়ক করেছেন, আর একজনের কাব্যের নায়ক স্বয়ং ভগবান নিজেই। মেঘদূত মানুষের মনকে মর্ত থেকে উড়িয়ে নিয়ে যায় স্বর্গের কাছে অলকায়। আর গীতগোবিন্দে মনকে নিয়ে যায় শ্রীবৃন্দাবনের এক লীলাকুঞ্জে শ্রীরাধামাধবের চরণ-কমলের কাছে। সে চরণ স্পর্শে নিজের মন পবিত্র হয়। কাব্য পড়া হয় সার্থক। আমরা ভগবানের যুগল মিলনের মধুর প্রেমময় ছবি দেখতে পাই, চোখ সার্থক হয়। এই দুই কাব্যই তুলনাহীন। তাই এই দুই কবিও অমর।

পারিজাত মজুমদার

(পূর্ব প্রকাশিতের পর)

(৫)

শীত চলে গেছে।

হিমালয়ের কোলে কোলে এসেছে মার্চ, নতুন জীবনের ইসারা নিয়ে।

বনে বনে মরা গাছের ডাল ছেয়ে এসেছে অজস্র কাঁচ সবুজ পাতা, অগণ্য নতুন ফুলের কুঁড়ি। স্বচ্ছন্দ সুনীল আকাশ থেকে ঝরছে হলুদ আলোর বৃষ্টি। সেই স্বর্ণাধারের নীচে গা পেতে দিয়ে স্নান করছে সমস্ত পৃথিবী।

আজকের এই শহরের চেহারা দেখলে কে বলবে একদিন এখানে শীত এসেছিল।

পথে পথে টুরিস্টের ভিড়। তারা হাসছে, খেলছে, বেরাচ্ছে ক্যামেরা হাতে নিয়ে। চারদিক চেয়ে বার বার বলছে—

"ওঃ হাউ বিউটিফুল! হাউ বিউটিফুল।"

এই জন্যেই বোধহয় বসন্তকে বলে ঋতুরাজ। ঋতুর রাজাই বটে। কি আশ্চর্য রাঙিন প্রাণবন্যা সে আজ এনেছে পাথুরে হিমালয়ের অঙ্গে অঙ্গে!

পথের ধারের মিশনারী গার্লস স্কুলের স্কুলের ভিতর থেকে ভেসে আসছে বিলিতী বাজনার ঝঙ্কার—শুনলেই বোঝা যায় নাচের বাজনা। মেয়েরা বোধহয় আসন্ন কোনো উৎসবের জন্যে নাচের মহড়া দিচ্ছে।

সেখানে যেদিকে তাকাও—মানুষের কিংবা প্রকৃতির রাজ্যে—সর্বত্র সেই উৎসবের সুর, এক নবীন প্রাণের উন্মাদনা। সে উন্মাদনার ছোঁয়া আমার প্রাণেও লাগলো।

"আরে, বোসসাহেব যে! এদিকে কি মনে করে?"

হঠাৎ দেখা হয়ে গেল হিরণ্ময় চ্যাটার্জীর সঙ্গে।

হিরণ্ময় চ্যাটার্জীর সঙ্গে আমার পরিচয় মাত্র একদিনের। তাও অফিসে। কিন্তু ওর কথা বলার ধরণটাই এমন যে মনে হয় যেন অনেকদিনের অন্তরঙ্গতা।

ফার্ণিচারের বিরাট ব্যবসা ওর। টাকা-পয়সার অভাব নেই। কিন্তু সে অনুপাতে অহঙ্কার প্রকাশ পায় না ওর ব্যবহারে। হয়তো ব্যবসায়ী বলেই মিষ্টি ব্যবহার আর কথাবার্তাটা একেবারে রপ্ত করে নিয়েছে।

"এদিকে কি অফিসের কাজে নাকি?"

জিজ্ঞেস করলো হিরণ্ময়।

"না না। আজ শনিবার, তাতে আবার ডিরেক্টর এগারোটার সময়েই চলে গেছেন, সুতরাং বারোটা বাজতেই অফিস একেবারে ফাঁকা।...তাই ভাবলুম শহরটা একটু ঘুরেফিরে দেখি।"

"দেখছেন তো, কিরকম পরিবর্তন? জানুয়ারীতে আপনাকে বলিনি যে এপ্রিল-মে-তে এই শহরটাকে চেনাই যাবে না?"

"পরিবর্তন বলে পরিবর্তন! এ যে সেই ভিখিরীর মেয়ের রাজরাণী হওয়ার মতন!"

"আসুন, ভিতরে আসুন।"

বাড়ীর সংলগ্ন বাগানের প্রান্তে দাঁড়িয়ে আমায় আহ্বান করলো হিরণ্ময়।

"আজ থাক্, আরেকদিন আসবো।"

"আরেকদিন তো আসবেনই। আরেকদিন কেন, আরো অনেকদিন আসবেন। যখনি সময় পাবেন তখনি। কিন্তু তাই বলে আজকের আসাটা বাদ যাবে কেন? বাড়ীর সামনে এসেও চলে যাবেন, তাও কি হয়?"

আমাকে প্রায় জোর করেই বাগানের ভিতরে নিয়ে গেল হিরণ্ময়।

"গাছের গোড়ায় গোড়ায় ওগুলো কি, বলুন তো?"

"ওগুলো? ওগুলো তো ফার্ন।"

"ফার্ন? ছেলেবেলায় স্কুলের বইতে পড়েছিলুম, এখন মনে পড়ল, ফার্ন তো অপুষ্পক উদ্ভিদ, তাই না?"

"ঠিকই বলেছেন। ফার্নের ফুল হয় না। কিন্তু দেখতে ভালো বলে অনেকেই লাগায়।"

"আমি অবশ্য ফার্ন চিনতুম না এর আগে। তবে এখন মনে পড়ছে এখানকার অনেক জায়গাতেই এরকম চারা দেখেছি।"

"গাছপালা সম্বন্ধে আপনার ইন্টারেস্ট আছে দেখছি!'

খুশী হল হিরণ্ময়। কিন্তু তারপরেই অনুযোগ করলো "আচ্ছা, আপনার সঙ্গে পরিচয় তো হয়েছে মাস দুয়েক হল, আমার ঠিকানাও আপনাকে দিয়েছিলুম,

তা এর মধ্যে একবারও কি এদিকে আসতে পারতেন না আপনি?"

"আজ তো এলুম।"

"একে কি আসা বলে? এদিক দিয়ে চলে যাচ্ছিলেন, আমি দেখতে পেয়ে ধরে আনলুম।"

"আপনিই বা আমার বাসায় ক'বার গেছেন?"

হেসে উঠলুম আমি।

"আপনার ঠিকানা আপনি আমায় দিয়েছিলেন কি? দিলে নিশ্চয়ই যেতুম।"

হিরণ্ময়ের কথায় লজ্জা পেলুম। সত্যিই তো! আমার ঠিকানা তো ওকে দিইনি। "আমার বাসায় আসবেন" এমন কথাও বলিনি।

নিজের ত্রুটি সংশোধন করে নিলুম।

হিরন্ময় আমাকে ঘুরিয়েফিরিয়ে ওর বাগান দেখাতে লাগলো।

ওর নিজের হাতে তৈরী বাগান। কথায়-বার্তায় বোঝা যায় বাগানটার ওপর ওর গভীর মমতা। আপন সন্তানের ওপর যেমন হয়, অনেকটা তেমনি।

হবেই তো। এই গাছপালাগুলিকে ও যে আপন হাতে লালন-পালন করেছে, ওদের ভালোমন্দ নিয়ে মাথা ঘামিয়েছে, ঠিক যেমন শিল্পী তার নিজের শিল্প-সৃষ্টি সম্পর্কে করে।

আমি বাগানের প্রশংসা করাতে হিরণ্ময় খুব খুশী হল। বললে, "আপনার দেখছি সৌন্দর্যকে দেখবার চোখ আছে। আমার এক শালী এসেছে কলকাতা থেকে, সে আবার একজন আর্টিস্ট। তার আঁকা ছবি দেখলে আপনার হয়তো ভালো লাগবে। আলাপ করবেন তার সঙ্গে?"

'নিশ্চয়। একথা আবার জিজ্ঞেস করতে হয়।?'

বাড়ীর ভিতরে আমায় নিয়ে গেল হিরণ্ময়।

ড্রইংরুমে কয়েকখানি ছবি রয়েছে দেয়ালে টাঙানো।

'এসব আমার শালীর আঁকা। আপনি ছবি দেখুন, আমি ততক্ষণ খুকুকে ডেকে আনছি।' বলে হিরণ্ময় ঘর থেকে বেরিয়ে গেল।

খুকু! মেয়েটির ডাকনাম তবে খুকু! কিন্তু ওর ভালো নাম কি?...আচ্ছা, ওই ছবিগুলোর গায়ে লেখা নেই কি?

একটা ছবির দিকে এগিয়ে গেলুম।

ছবিখানার নাম 'ঝড়'। এক গ্রাম্য পথের ঝঞ্ঝাবিক্ষুব্ধ মূর্তি। লাল ধুলোয় ধুলোয় ছেয়ে গেছে চারদিক্, পথের ধারের গাছ-পালা, ঝোপঝাপ, বাঁশবন সব নুয়ে পড়ছে একদিকে ঝড়ের টানে। পথের ওপর চলন্ত দুয়েকটি মানুষ ভীতত্রস্ত হয়ে ছুটলে আশ্রয়ের সন্ধানে।

ভারী বাস্তব আর জীবন্ত ছবি। সত্যিই ভালো লাগলো।

ছবিটার নীচের দিকে এককোণে ছোট্ট ছোট্ট করে লেখা, 'অর্চনা'।

অর্চনা! বেশ নামটি তো! আঁকার হাতটিও বেশ।

আরেকখানি ছবির দিকে এগিয়ে গেলুম।

এ ছবিখানির নাম 'নির্ঝরের স্বপ্ন-ভঙ্গ'। উত্তুঙ্গ পর্বতের গভীর গোপন গুহার মুখ থেকে বেরিয়ে আসছে জলস্রোত —দুধারে ঝুঁকে থাকা ভয়াবহ, বিশাল বিশাল শিলার ছায়ায় মসৃণ হয়ে যাওয়া পাষাণপথের গা বেয়ে প্রচন্ডবেগে নামছে লাফ দিয়ে অনেক নীচুতে—চারদিকে উৎক্ষিপ্ত শুভ্র জলকণার মেঘ সৃষ্টি করে। নীচে অপেক্ষাকৃত প্রশস্ত ক্ষেত্র পেয়ে ঝর্ণা যেখানে অনেকটা হ্রদের মত সৃষ্টি করে তারপর আবার নদীর রূপ ধারণ করে নেমে গেছে সমতলের দিকে, সেখানে জলের ধারে ধারে বিছানো নুড়িগুলি আঁকা নয়, সত্যিকারের। ছোট ছোট অনেক নুড়ি লগানো আছে ছবিটার গায়ে। দূর থেকে চিক্‌চিক্ করছে।

এমনটি এর আগে আর কখনো দেখিনি। ছবিকে বাস্তবানুগ করে তোলার জন্যেই কি এই প্রচেষ্টা?

'ছবিতে একেবারে তন্ময় হয়ে গেছেন যে?'

হিরণ্ময়ের কন্ঠস্বরে আমার চমক ভাঙলো। আর সঙ্গে সঙ্গেই চোখে পড়লো আরেকজনকে।

মাখনের মত গায়ের রঙ্। শ্যাম্পু-করা চুল মাথার ওপরে তুলে উঁচু খোঁপা বাঁধা। চোখ দুটি এত বেশী টানা যে সচরাচর এমন দেখা যায় না।

"এই আমার স্ত্রীর মাসতুতো বোন শ্রীমতী অর্চনা। আর এই হচ্ছেন মিঃ স্মরজিৎ বোস, ইনি—'

'ও'র পরিচয় তো আপনার কাছে আগেই পেয়েছি।' হিরণ্ময়ের বাক্যস্রোতে বাধা দিয়ে হাসলো অর্চনা—প্রথমে হিরণ্ময়ের দিকে, তারপরে আমার দিকে তাকিয়ে। সঙ্গে সঙ্গেই ওর দীঘল চোখ দুটির প্রসন্ন দৃষ্টিতে আমার সমস্ত সত্তাকে অভিষিক্ত করে নমস্কার করলো দু'হাত তুলে।

প্রতিনমস্কার করে আমি বললুম, 'আপনার পরিচয়ও আমি পেয়েছি। আপনি একজন গিফ্‌টেড্ আর্টিস্ট!"

'বাব্বাঃ! শুধু আর্টিস্ট নয়, আবার গিফ্‌টেড্‌ও? এত কথা বুঝি বলছেন জামাইবাবুর মুখে ঝাল খেয়ে?'

'কারো মুখে ঝাল খাবার দরকার কি? আপনার প্রতিভার একাধিক সাক্ষী তো টাঙিয়ে রেখেছেন এই ঘরেরই দেয়ালে!'

আমার কথায় অর্চনা লজ্জা পেলো। কিন্তু খুশীও হল।

হিরণ্ময় বললে, 'এ আর ক'টা ছবি দেখছেন! ওর ঘরে চলুন। দেখবেন ছবির পাহাড় করে রেখেছে। সবসময় ঐ আঁকা নিয়েই পরে আছে। ওর ঘরের দিকে আমরা তো ভয়েই যাই না। কি জানি, যদি কন্‌সেন্‌ট্রেশন্ নষ্ট হয়, যদি শিল্পীর ধ্যানভঙ্গ হয়!'

'এখন তবে ও'কে নিয়ে এলেন কি করে?' জিজ্ঞেস করলুম।

'আরে এখন তো ও কাজ করছিল না তাই। স্নান করে খেয়েদেয়ে একটু বিশ্রাম নিচ্ছিলো।'

'আপনার এই 'নির্ঝরের স্বপ্নভঙ্গ' ছবিটি কিন্তু আমার খুব ভালো লেগেছে।' অর্চনার দিকে ফিরে আমি বললুম।

'ধন্যবাদ।...অনেকদিন থেকে শখ ছিলো, কবিগুরুর 'নির্ঝরের স্বপ্নভঙ্গ' কবিতার ভাবটিকে রূপ দেবো আমার তুলিতে। হিমালয়ে বেড়াতে গিয়ে সে সুযোগ পেয়ে গেলুম।'

'চলো বাগানে গিয়ে বসি। রোদ্দুরটা পাওয়া যাবে। চলুন।' বললো হিরণ্ময়।

বাগানের একাংশে খানকয়েক বেতের চেয়ার পাতা—একখানি ছোট বেতের টেবিলকে ঘিরে। সেদিকে যেতে যেতে হিরণ্ময় যোগ করলে, 'এই অর্চনার সঙ্গে যদি কোনোদিন বেড়াতে যান না, তবে আপনার এক শিক্ষা হবে। সারাক্ষণ আপনাকে স্রেফ্ বোবা সেজে বসে থাকতে হবে। রঙ্-তুলি কাগজ-ক্যাম্‌ভাস নিয়ে বেরোবে, কোথাও একটা কিছু সুন্দর দৃশ্য দেখেছে কি ব্যস্, বসে গেল ছবি আঁকতে। তখন যে সঙ্গে থাকে তার অবস্থা কি হয় বুঝে দেখুন।'

'শিল্পী হতে হলে অমনটিই তো হওয়া প্রয়োজন।' বললুম আমি অর্চনার দিকে তাকিয়ে, 'সাধকের একাগ্রতা থাকলে তবেই তো বড় আর্টিস্ট্ হওয়া যায়।'

'আপনি মশাই স্তুতিবিদ্যাটা ভালো শিখেছেন তো!'

চোখ মট্‌কে হাসলো হিরণ্ময়।

'এখন কি খেতে ইচ্ছে করছে বলুন দেখি?'—চেয়ারে আসন গ্রহণ করতে করতে অর্চনা বললে—'গরম কফি, না ঠান্ডা শরবৎ?'

"ঠান্ডা শরবৎ!" চটপট জবাব আমার।

'বসুন তবে। আমি নিয়ে আসছি।'

অর্চনা উঠে যেতে হিরণ্ময় অবাক্ হল। আমার দিকে চেয়ে বললে, 'আপনার ভাগ্য খুব ভালো দেখছি। আমি এখুনি ভাবছিলুম আপনাকে কি খেতে দেয়া যায়। কিন্তু আমার বলার অপেক্ষা না রেখেই অর্চনা যে নিজে থেকে আপনাকে আপ্যায়ন করছে, এ সত্যিই আশ্চর্য ব্যাপার। এমন তো ও সচরাচর কাউকে করে না।'

কথাটা শুনে নিজের মনে রীতিমত গর্ববোধ হল। আমি তবে অর্চনার কাছে যেকোনো-একজন নই। আমি স্বতন্ত্র, আমি বিশেষ!...

অল্পক্ষণ বাদেই অর্চনা এল। দু'হাতে দুটো ফ্রুট্-জুস্-এর বোতল।

ওর পিছন পিছন আসছে বাড়ীর চাকর। হাতে ট্রে নিয়ে। ট্রের উপর সাজানো গোটা তিনেক কাচের গ্লাস্, একটা বড় চিনেমাটির পট্, আর খানতিনেক ডিশে সাজানো কাজুনাট্‌স্, কিস্‌মিস্, কেক, আর কিছু ক্রীম্‌রোল্।

পটের ঢাক্‌না খুলে তার থেকে বরফ-দেয়া ঘোলের শরবৎ গ্লাসগুলোতে ঢাললো অর্চনা। তারপরে ঘোলের সঙ্গে ফ্রুট-জুস্ মিশিয়ে দিলো। ট্রের উপর

ক সূত্র তুলে নিয়ে ডুবিয়ে দিলো প্লাসে সে, দ্'টো করে।

'আজ যে তুমি স্বয়ং অন্নপূর্ণা হয়ে ছ দেখছি!'

হাসলো হিরণ্ময়, 'আমাদের কি ভাগ্য!'

'আপনি এত পিছনে লাগেন কেন নে তো আমার?'

'দেখলেন তো?' আমাকে সাক্ষী লো হিরণ্ময়, 'ভালো কথা বললেও দ! পিছনে লাগার মত কোনো কথা ছি আমি?'

কোনো জবাব না দিয়ে হাসতে লমে আমি।

বেশ লাগছে। আমি আজ এদের তে এই প্রথম অতিথি হয়েছি। কিন্তু অল্প সময়ের মধ্যেই আমায় যেন পনার করে নিচ্ছে এরা। আহ্বান করছে য়া বিবাদের মধ্যস্থতা করতে।

'নিন্, থাম।' ডিশ্ এগিয়ে দিলো না আমার দিকে।

'আপনার কপাল দেখে সত্যিই হিংসে ছ বোসসাহেব্।' কপট গাম্ভীর্যে মন্তব্য লো হিরণ্ময়।

'আহা, আপনাকে যেন আর কেউ বার এগিয়ে দেয় না, তাই না?' সরব তবাদ অর্চনার।

'দেয়, কিন্তু কোনো প্রতিভাময়ী ল্পী দেয় না।'

'প্রতিভাময়ী শিল্পীর হাতে কি লাদা মধ্ আছে?' হেসে উঠলো অর্চনা।

'নেই? আপনি কি বলেন?' আমার কে ফিরলো হিরণ্ময়।

'নিশ্চয় আছে।' জোর দিয়ে বললুম মি, যিনি অসাধারণ, যিনি অনন্যা, কে দেখতে পাওয়াই মানুষের জীবনে কটা বিরাট ঘটনা। আবার এমন মানুষের দের সেবা যদি পাওয়া যায় সে তো কটা—'

'হয়েছে, হয়েছে, থামুন।'

আমাকে থামিয়ে দিলো অর্চনা।

থামিয়ে দিলো বটে, কিন্তু আমার খে নিজের প্রশস্তি শুনে অখুশী হয়েছে লে মনে হল না।

আরো খানিক গল্পগুজবের পর রণ্ময় বললে, 'আবার কবে আসছেন, নে।'

'তার আগে বলুন আপনারা কবে মার বাসায় আসছেন।'

'আমরা তো সবসময়েই রাজী। কবে বন আপনার সুবিধে হবে বলুন, সময়েই গিয়ে আমরা হাজির হবো।'

'তাহলে সামনের রোববার আসুন, কালবেলা। লাঞ্চটা আমার ওখানেই রবেন। আপনাদের বাড়ীর সকলেরই মন্ত্রণ রইলো।'

'রোববার? রোববার কি করে হবে? দিন যে আমরা দূরের একটা গ্রামে চ্ছি।' বলে উঠলো অর্চনা।

'দূরের গ্রামে? আপনার ভাগ্য ভালো নতে হবে। মাস কদিন এসেই অনেক গা ঘুরেছো! আর আমি—আমি তো

এখানে এসেছি বেশ কয়েক মাস হল, কিন্তু এখনো পর্যন্ত কিছুই প্রায় দেখা হয়ে ওঠেনি।'

'ইচ্ছে থাকলে দেখা হত ঠিকই। আজকাল তো যাতায়াতের কোনো কষ্টই নেই, সব জায়গাতেই গাড়ী যায়।'

'সংগী-সাথী না পেলে কি কোথাও যেতে ভালো লাগে? আমার জানশোনা কোনো পার্টিকে তো বেড়াতে যেতে দেখলুম না কোথাও—এসে থেকে। এই প্রথম আপনারা যাচ্ছেন, আমার চেনাশোনা লোকদের মধ্যে।'

'তাহলে, আমাদের সঙ্গে চলুন না আপনি?'—বললে হিরণ্ময়, ঐ গ্রামটার মন্দিরের সিচুয়েশনটা সত্যিই ভারী সুন্দর। চারদিকে এমন সব গাছ-গাছালি আর ফুল আছে, যা আপনি কখনো দেখেননি। মন্দিরের পাশ দিয়েই আবার একটা ঝর্ণা নেমেছে। অনেকে সেখানে স্নান-তর্পণ করে। ঝর্ণার ধারটায় বেশ বড় বড় পাথর আছে—সেখানে বসে স্বচ্ছন্দে স্নান করা যায়।'

'চলুন না আমাদের সঙ্গে?' অনুরোধ ঝরলো অর্চনার গলায়।

আমি তো একপায়ে খাড়া।

বেড়ানোও হবে, অর্চনার সঙ্গে পরিচয়টাকে আরো নিবিড় করে তোলার সুযোগও পাওয়া যাবে।

কিন্তু নিজের গরজটা ঠিক দেখাতে নেই। তাই বিবেচনা করার ভঙ্গিতে বললুম, 'আপনাদের প্রোগ্রামটা কিরকম শুনি?'

'আমাদের প্রোগ্রাম্ হচ্ছে— সকাল পাঁচটায় এখান থেকে স্টার্ট্ করবো। ওখানে দুপুরের খাওয়া সেরে তারপর আরো দু'চারটে জায়গা ঘুরবো। সন্ধ্যে নাগাদ বাড়ী ফিরবো।'

'আরো দু'চারটে জায়গা বলতে কি?'

'বৌদ্ধ প্যাগোডা আছে একটা। সেখানে অনেক মূর্তি আছে, তাছাড়া আছে অনেক পুরোনো বইয়ের পান্ডুলিপি। একটা চমৎকার লেকও আছে কাছাকাছি। পথে যেতে একটা পোল্ট্রিও পড়বে। সেখানেও কিছু দেখার আছে।'

'হুঁ'। গম্ভীরভাবে বললুম আমি।

'ওসব হুঁ-টু নয়। আপনি আমাদের সঙ্গে যাচ্ছেন, বুঝলেন।'

কথায় জোর দিলো হিরণ্ময়।

'হ্যাঁ হ্যাঁ, উনি যাচ্ছেন। দ্যাট্স ডিসাইডেড্।'

বললো অর্চনা। তারপর হঠাৎ উঠে পড়লো।

'কি ব্যাপার, উঠে পড়লেন যে?'

জিজ্ঞেস করলুম আমি।

'একটু বেড়াতে বেরোবো এবার।' বললো ও।

'কোথায়?'

'এই একটু এদিক সেদিক ঘুরবো আর কি।'

চলুন একসংগেই বেরোনো যাক। আমিও এবার বাসায় ফিরবো।'

উঠে পড়লুম আমি।

গেট পর্যন্ত আমাদের এগিয়ে দিলো হিরণ্ময়।

তারপর—আমরা শুধু দুজন।

শুধু দুজন চলছি পাশাপাশি।

অর্চনা বলে চলেছে ওর জীবনের উচ্চাকাঙ্ক্ষার কথা। ও বড় আর্টিস্ট হতে চায়। যেতে চায় ইংল্যান্ড, আমেরিকা, ইউরোপ। জানতে চায় বিদেশী অঙ্কনের ধারা। তারপর ভারতীয় আর অভারতীয় রীতির সংমিশ্রণে আর নিজের উদ্ভাবনী শক্তির সাহায্যে গড়ে তুলতে চায় নতুন এক নিজস্ব অংকন-পদ্ধতি।

ওকে উৎসাহ দিচ্ছি আমি। কিন্তু সেই সঙ্গে একথাও মনে হচ্ছে—ও অন্য এক পৃথিবীর মানুষ। ও অসামান্যা, ও বিশেষ। আর আমি?

আমি চিত্রকর নই, সাহিত্যিক নই, সংগীতজ্ঞ নই। আমি একজন সামান্য, সাধারণ মানুষ!

তবু, তবু ও আমাকে টানছে। যেমন করে টানে দূরআকাশের উজ্জ্বল নক্ষত্র-লোক, এই ছোট্ট মাটির পৃথিবীটাকে।

ওর চোখে, ওর কথাবার্তায়, ওর কণ্ঠ-স্বরে কি এক অদ্ভুত মাদকতা আছে। তাকে উপেক্ষা করা যায় না।

অনেক—অনেকক্ষণ ওর সঙ্গে ঘুরলুম আমি, শহরের সীমানা ছাড়িয়ে নির্জন পথে পথে—বেলাশেষের আলোয় রঙিন ঝর্ণার ধারে ধারে—পাখির কাকলি-মুখর শ্যামল বনানীর তলায় তলায়। তারপর, ওকে শহরের ভিতর বাজারের কাছাকাছি পৌঁছে দিয়ে—বাসার পথ ধরলুম।

বাংলোয় পৌঁছে দেখতে পেলুম নিমাকে।

আমার দেরী দেখে ও অবাক হয়েছে, বুঝতে পারলুম ওর চোখের চাওয়ায়। অন্য শনিবারগুলোতে আমি অফিস ছুটি হতেই বাসায় ফিরি, তারপর ওরই সঙ্গে বেড়াতে

বার হই। কোনদিন পথে পথে ঘুরি, কোনদিন বা সিনেমায় যাই। কিন্তু আজ তার ব্যতিক্রম ঘটলো।

কিন্তু কোন কৈফিয়ৎ নিমা দাবী করল না।

রোজকার মত চা-জলখাবার নিয়ে এসে রাখল আমার সামনে।

আমার সামনে দিয়ে ও ঘোরাফেরা করছে। কাজ করছে। ওকে লক্ষ্য করছি আমি। আর মনে মনে আরেকজনের সঙ্গে তুলনা করছি বারবার।

এই নিমা—একে কি করে এতদিন ভাল লাগতে পেরেছিল আমার? এই বন-জঙ্গলের মধ্যে বাস করতে করতে কি আমার রুচি, আমার সৌন্দর্যবোধ সব হারিয়ে ফেলেছিলুম আমি? কি করে পেরেছিলুম চক্ষুলজ্জার মাথা খেয়ে এরই সঙ্গে হোটেলে খেতে, সিনেমা যেতে? একে কি মানুষ বলে গণ্য করা যায়? শিক্ষা নেই, রুচি নেই, কালচার নেই, ভাল করে কথা বলতে পর্যন্ত জানে না। আর রূপ? সেকথা আর না বলাই ভাল। ওর মধ্যে কি মাধুর্য পেয়েছিলুম আমি এত দিন? শুধু ফর্সা রং আর দোহারা স্বাস্থ্য থাকলেই কি কেউ সুন্দরী হয়?

রূপ কাকে বলে আজ জেনেছি। দেখেছি একজনকে—যার দিকে চেয়ে মনে হয় অজন্তা-ইলোরার ভাস্কর্য জীবন্ত মূর্তি ধরে যেন উঠে এসেছে অতীতের গর্ভ থেকে! যার কথা ভাবতে গিয়ে মন কেবলই বলে উঠছে—কি আশ্চর্য! এরই পথ চেয়ে এতদিন বসেছিলুম! যদি আজ হিমালয়ের কোলে এর পদচিহ্ন না পড়ত, তবে আমার এবারের বসন্ত ব্যর্থ হত! একে অভিনন্দন জানাবার জন্যেই যেন আজ আকাশ-ধরণী এমন করে সেজেছে, এমন অকুণ্ঠ অজস্রতায় ফুটেছে শতসহস্র ফুল পাহাড়ের গায়ে গায়ে—দীর্ঘ, সর্পিল বনপথের ধারে ধারে...

আজ নিমার সঙ্গে কথা বলতে পর্যন্ত ভালো লাগছে না।

ওর দু-একটা কথার জবাব দিলুম কি দিলুম না। নীরবে ও ওর কাজ শেষ করলো। তারপর রোজকার মত বিদায় নিয়ে চলে গেল।

যাবার সময় ওর মুখে কি বিষাদের ছায়া ছিলো?

(ছয়)

ঠাকুরের নাম আদিনাথ। যে পাহাড়ের ওপর গ্রামখানা তার নাম আদিনাথপুর।

এসব অঞ্চলের অধিবাসীদের দেওয়া অন্য কোনো নাম আছে কিনা কে জানে।

সে যাই হোক, যে লোক এই গিরিশৃঙ্গ-চূড়াটিকে বেছেছিল মন্দির গড়ার জন্যে, তার কিন্তু সত্যিই কবিদৃষ্টি ছিল। আশপাশের অন্যান্য গিরিশৃঙ্গ থেকে উঁচু, অপরূপ বনানী ঘেরা এই পাহাড়ী গ্রামটির বেশ একটি স্বতন্ত্র্য আছে। এর মাথায় দাঁড়ালে কাঞ্চন-জঙ্ঘা আর মহাকাল স্পষ্ট দেখা যায়, এমনকি বহুদূরের ধূসরগম্ভীর এভারেস্টও।

বহুদিনের পুরোনো, শ্বেতপাথরের মন্দির। তবু, অনেক ঝড়-জলের দাপট সয়েও এখনো আপন মহিমায় অটুট। পুরোহিত আছেন নিয়মিত পূজাপাঠ আর মন্দিরের রক্ষণাবেক্ষণের জন্যে। এখনো উৎসবে পূজাপার্বণে এখানে লোক জমায়েত হয় যথেষ্ট। আজও তো অনেক লোক এসেছে দেখছি।

মন্দিরে ঢোকবার মুখেই একটি ছোট দোকান। সেখানে এক মধ্যবয়সী পাহাড়ী স্ত্রীলোক বসেছে একদিকে ফুলের ঝুড়ি আরেক দিকে ফলের টুকরি, বারকোশে সাজানো কিছু মিষ্টি, আর গোটাকয়েক ধূপকাঠির বাক্স নিয়ে। অর্থাৎ পূজার সব কিছু আয়োজনই রয়েছে। যাত্রীদের কোন অসুবিধে হবে না।

"আমি যখন প্রথম এখানে এসেছিলাম," চারদিকে চোখ বুলিয়ে নিয়ে হিরন্ময় বললে, "তখন পায়ে হেঁটে এসেছিলুম। আর এখন তো—দেখতেই পাচ্ছেন কতো ডেভেলপড হয়েছে। ঐ যে জলের কলটা দেখছেন, ওটাও তখন ছিল না। তবে লোকজন যে কম আসতো তা নয়।"

"সব কিছুই বেশ ভালো দেখছি।" উত্তর দিলুম আমি, "শুধু একটা চায়ের স্টল থাকলেই আর কিছু বলার ছিল না।"

"চায়ের জন্যে ভাবনা নেই, আমাদের সঙ্গেই আছে। ব্রেকফাস্ট লাঞ্চ সব ব্যবস্থা একবারে কমপ্লীট।"

"শেষ রাত থেকে উঠে দিদি সব গোছ-গাছ করেছেন।" অর্চনাও যোগ দিল এবার, এমন কি মিন্টু-রিন্টুর জন্যে দুধ পর্যন্ত বোতল ভরে আনা হয়েছে। ওরা তো চা খায় না।"

মিন্টু আর রিন্টু হিরন্ময়ের দুই ছেলে, বছর আট-দশের মধ্যে ওদের বয়েস। এর আগে ওদের দেখি নি আমি। আজই প্রথম দেখছি।

"আসুন, এবার চা-টা খেয়ে নেয়া যাক।" ডাক দিলেন হিরন্ময়ের স্ত্রী।

বেশ একটা কুঞ্জবনের মধ্যে বসা গেল সবাই মিলে। চারধারে পাখীর ডাকা-ডাকিতে কান পাতবার জো নেই। এমনকি মাথার ওপর গাছের ঘন ডালপালার মধ্যেও ঝটাপটি লাগিয়েছে কতকগুলো পাখী।

"এখানে একটা চালাঘর বেঁধে বাস করতে পারলে বেশ হয়, না স্মরজিৎবাবু?" বললো অর্চনা, "এমনি জায়গাকেই বোধহয় বলে তপোবন! এসব জায়গাতেই বোধহয় সাধুরা বাস করতো আগে।"

হিরন্ময় বললে—"আগে কেন, এখনো তো দু-চারজন সাধু আছেন এই পাহাড়ে। তোমরা তো জীপে এলে, তাই দেখতে পেলে না। পায়ে-হাঁটা পথ আছে অন্য দিক দিয়ে, তারই কাছাকাছি গুহায় থাকেন ও'রা। তবে মৌনী, কারও সঙ্গে কথা বলেন না।"

বড় ফ্লাস্ক থেকে গরম চা ঢেলে সবাইকে বিতরণ করছেন হিরন্ময়ের স্ত্রী। সেই সঙ্গে বিস্কুট, মাখন-লাগানো রুটি আর মরিচ-মাখানো ডিমের পোচ। চমৎকার বন্দোবস্ত।

খেতে খেতে অর্চনা বললে, "ঝর্ণার শব্দ শোনা যাচ্ছে দেখুন, ঝর-ঝর ঝর্-ঝর্..."

"খেয়েদেয়ে, মন্দির দেখে, ঝর্ণার ধারে গিয়ে বসবো। কি বলেন বোসসাহেব?" হিরন্ময় কথাটা ছুঁড়ে দিল আমার দিকে।

"সেই ভালো।"

চা-পর্ব শেষ হলে পর আদিনাথের মন্দিরে প্রবেশ করা গেল। হিন্ময়ের স্ত্রী পুজো দিলেন। আমরা প্রত্যেকে একটি করে ধূপকাঠি জ্বালিয়ে দিলুম ঠাকুরের সামনে।

বিশ্বাস থাক আর না থাক, এগুলো করতে ভালো লাগে। ভালো লাগে ঠান্ডা শ্বেত-পাথরের মেঝেয় পা ছড়িয়ে বসতে। কেমন একটা শীতল শান্তির স্পর্শ লাগে মনে। বেশীর ভাগ দেবালয়ই লোকালয় থেকে দূরে—প্রাকৃতিক সৌন্দর্যের লীলাভূমিতে প্রতিষ্ঠিত। হয়ত এইজন্যেই মন্দির-প্রাঙ্গণে এসে দাঁড়ালে প্রাণ জুড়ায়। পূজা-অনুষ্ঠানের মধ্যেও আছে একটি শুচিস্নিগ্ধ শিল্পসৌন্দর্য। তা আমাদের মুগ্ধ করে সংসারের কোলাহল আর দুশ্চিন্তা থেকে মনকে দেয় ক্ষণিক মুক্তি।

মন্দির দর্শন আর প্রদক্ষিণ করে আমরা এসে বসলুম ঝর্ণার ধারে।

অনেকগুলি জলধারা নামছে পাশাপাশি বিভিন্ন পথ বেয়ে। মাঝখানের ধারাটিই দেখবার মত। ঝমঝম শব্দ তুলে প্রচণ্ড বেগে নামছে প্রকাণ্ড শিলার ওপর দিয়ে লাফ খেয়ে, চারদিকে উৎক্ষিপ্ত শাদা জলকণার কুয়াশা সৃষ্টি করে। চোখ বুজে কান পাতলে মনে হয় যেন বৃষ্টি হচ্ছে খুব জোরে—আকাশ প্লাবিত করে শতসহস্র ধারায়। আশপাশ দিয়ে নেমেছে আরও কয়েকটি জলস্রোত, কিন্তু সেগুলি সবই বেশ শীর্ণ। শুধু তাই নয়, সেগুলি নামছে অনেক আঁকা-বাঁকা পথ বেয়ে, তাই সেগুলিতে তেমন জোর নেই।

এখান থেকে দেখতে পাচ্ছি খানিকটা নীচে ঝর্ণার ধারে দু-তিনটে খাল মত জায়গায় জল জমে ছোট ছোট কুণ্ড সৃষ্টি হয়েছে। প্রশস্ত শিলার ওপর বসে সেই কুণ্ডের জলে স্নান করছে জনকয়েক লোক। কেউ কেউবা আঁজলা ভরে জল নিয়ে মন্ত্র পড়ছে বিড়বিড় করে। অদূরে বনের ছায়ায় পাথরে-গড়া উনুনে শুকনো পাতা আর কাঠকুটো জ্বালিয়ে রান্না করছে গোটাকয়েক দল।

"প্রথমবার যখন এসেছিলুম," — সেই দিকে তাকিয়ে হিরন্ময় বললে—"মনে আছে আমরাও অমনি চান করেছিলুম ঝর্ণার জলে, ঐখানে খিচুড়ি রান্না করে খেয়েছিলুম।"

"আচ্ছা, ঐ যে ফুলওয়ালীকে দেখলেন, ওকে দেখেছিলেন তখন?"

"ফুলওয়ালী তখনো ছিল একজন, তবে সে এই কিনা কে জানে। চেহারা-টেহারা অত মনে নেই। তবে মনে আছে, তখন ঐ চালাঘরটা ছিল না। এমনিই দোরের মুখে পথের ওপর বসে থাকত একজন ফুল-ওয়ালী।"

আমরা সবাই গল্প করছি, এরই মধ্যে খন যে অর্চনা উঠে গেছে এখান থেকে, ক্ষ্যই করি নি। হঠাৎ খেয়াল হতেই এদিক-দিক তাকালুম। দেখি খানিক দূরে রালা একটা জায়গায় বসে ও কাগজ পেন্সিল বার করে কিসের স্কেচ করছে।

মিনিট কয়েক বাদে আমিও উঠে ড়লুম। এদিক-ওদিক খানিক ঘোরাফেরা রে অর্চনার পিছনে গিয়ে দাঁড়ালুম।

দেখি, ঝর্ণার একটা স্কেচ করছে ও।

"বাঃ, এত অল্পসময়ের মধ্যে এমন ৎকার একটা স্কেচ করে ফেললেন!" বলে লুম আমি।

অর্চনা চমকে মুখ তুললো, "ওমা, পনি কখন এলেন?"

"এইমাত্র। কোন অপরাধ করেছি কি?"

"না না, কি যে বলেন।"

কথায় কথায় সকাল গড়িয়ে দুপুরে । হিরন্ময় স্নান করল ঝর্ণার জলে। রা শুধু হাত-মুখ ধুয়েই সারলুম। পর, দুপুরের খাওয়া সেরে, শুয়ে লুম ঘাসের ওপরেই।

ওপরে — গাছপালার ফাঁকে ফাঁকে রো টুকরো নীল আকাশ দেখা যায়। দিকে রঙিন ফুলের মেলা। ক্রমে দিনের কমে এল। বিকেল যখন প্রায় হয়-হয় আমরা আবার জীপে চড়ে বসলুম।

পথে যেতে পড়ে বৌদ্ধ মন্দির। নে গাড়ী থামলো।

বিরাট বিরাট সব পেতলের মূর্তি— কর শ্রীজ্ঞান আর অন্যান্য বৌদ্ধ দের। আর হাতে লেখা পুঁথি যে কত সীমা সংখ্যা নেই। থাকে থাকে সাজান সব কতকাল ধরে, অতি যতনে। লের গায়েও খোদাই করা আছে টকের বাণী। কিন্তু আমাদের কাছে বোধ্য।

মন্দিরের কাছাকাছি একটা লেক— কাটা। সেখানে যেতে যেতেই সন্ধ্যা ।

আজ আর পোলাট্টি দেখা হবে না। বাড়ী ফেরা যাক।"

হরন্ময় বললো।

পোলাট্টি না দেখা হোক। তার জন্যে নেই। জীবনের সবচেয়ে বড় সুযোগ আমি পেয়েছি। অর্চনার সঙ্গে একান্ত সুযোগ।

হরন্ময় যখন আমায় নামিয়ে দিল বাসার পাশে, তখন ওদের কাছে নিলুম আবার দেখা করার কথা আর সে কথা আমি রাখলুম।

নের পর দিন অর্চনার সঙ্গে ঘুরতে এখানে সেখানে। তার সঙ্গে পরিচয় এগিয়ে চললো দ্রুতগতিতে। আমায় পছন্দ করে খুবই, একথা আমার দেরী হল না। এখন শুধু মুহূর্তটির প্রতীক্ষা। শুধু শেষ জানা বাকী।

কে নিমাকে অসহ্য লাগছে ক্রমশ। র অতীত কর্মের জীবন্ত সাক্ষী, আমার এক মুহূর্তের ভুলের নিঃশব্দ, মূর্ত অভিযোগ।

ওর ঐকান্তিক সেবাযত্ন, প্রতিদিন আমার বাসায় ফেরার জন্যে ওর একাগ্র প্রতীক্ষা, ওর নিষ্ঠা, আন্তরিকতা—সবই আজকাল অসহ্য হয়ে উঠেছে আমার কাছে। কেন, কেন ও আমার বিবেককে বাঁধতে চাইছে এভাবে?

এরই মধ্যে একদিন হিরন্ময়ের বাড়ীর সকলকে নিমন্ত্রণ করলুম। সেদিনই হিরন্ময়কে বললুম, আমায় সে যেন একজন চাকর খুঁজে দেয়।

"লোক তো আপনার রয়েছে।" বললো ও, "ওকে দিয়ে কি সুবিধে হচ্ছে না?"

"না, ওর নিজেরই অসুবিধে আছে। ও আর এখানে কাজ করতে পারবে না বলেছে।" নির্জলা মিথ্যা বললুম আমি।

"ও।"

সত্যি সত্যিই কদিনের মধ্যে আমায় একটি চাকর জোগাড় করে দিল হিরন্ময়।

কিন্তু ওকে নিয়োগ করার আগে নিমাকে সরাতে হবে তো।

নিমাকে সরাতে হবে। যে করেই হোক, সরাতে হবে। ওর প্রত্যাশাকে আর বাড়তে দেয়া উচিত নয়। অবশ্য, ওর প্রতি একেবারে নির্মম হবো না ঠিক করেছি। কিছু বাড়তি টাকা ওকে দেবো। এ মাসের মাইনে ছাড়াও, গোটা পঞ্চাশেক টাকা ওকে দেবো। ওর কৌমার্যের দাম।

মনকে শক্ত করে নিয়ে ওকে ডাকলুম, একদিন সকালবেলা।

"নিমা, শোনো।"

"যাই বাবু।"

ও এসে দাঁড়ালো আমার সামনে।

ভারী তাজা দেখাচ্ছে তো আজ ওকে। একটু যেন বেশী পরিচ্ছন্নও। খোঁপায় গোঁজা বুনফুলের থোকা উঁকি দিচ্ছে মাথার পিছন দিক থেকে। আজ কি একটু বিশেষ পারিপাট্য রয়েছে ওর সাজসজ্জায়?

হাসি হাসি মুখ ওর। কেমন যেন অকারণ খুশী ওর চোখেমুখে। মনে হচ্ছে আজ সকালবেলা আমার এই ডাকের মধ্যে কোন শুভ সম্ভাবনার ইঙ্গিত পেয়েছে ও। বোধহয় ভেবেছে, ওর সৌন্দর্য আজ আবার জাগিয়েছে আমার মনকে, ওর এই সেজেগুজে আসা সার্থক হয়েছে।

যাই ভেবে থাকুক, বিদায় ওকে দিতেই হবে।

গম্ভীর হল আমার মুখ তারপর কাট কথা বার হল আমার গলা থেকে, "দেখো নিমা, আজ সন্ধ্যে থেকে আর তোমার আসার দরকার নেই।"

কথাটা ও বুঝতেই পারলো না বোধ-হয়। ফ্যাল ফ্যাল করে চেয়ে রইলো আমার দিকে।

"ঘরের কাজের জন্যে আমি অন্য লোক ঠিক করেছি। তোমায় আর আসতে হবে না।" ভাবলেশহীন গলায় বলে গেলুম আমি, "এই তোমার এ মাসের মাইনে, আর এই বাড়তি পঞ্চাশ টাকা তোমায় দিচ্ছি।"

টাকাটা টেবিলের ওপর রাখলুম।

নিমার মুখের হাসি মিলিয়ে গেছে। অন্য কোন ভাবের অভিব্যক্তিও দেখছি না সেখানে। মনে হচ্ছে যেন একটা পাথরের মুখ চেয়ে আছে আমার দিকে — স্থির, নির্নিমেষ দৃষ্টিতে।

ঐ অপলক, অর্থহীন দৃষ্টি সহ্য করতে পারলুম না আমি মুখ ফিরিয়ে নিলুম।

খানিক পরে শুনতে পেলুম ওর চাপা গলা—

"আমার জাত ভাইরা বলেছিল! বলেছিল, বাঙ্গালীবাবু কখনো পাহাড়ী আয়াকে ভালবাসতে পারে না। বোসবাবু তোমাকে নিয়ে শুধু ফুর্তি করতে চান, আর কিছু নয়! কিন্তু আমি বিশ্বাস করি নি। সব জেনেও মোহন আমায় বিয়ে করতে চেয়েছিল, তবু আমি রাজী হই নি!"

পরমুহূর্তেই হুহু করে কেঁদে উঠল নিমা। ওর ঐ কান্নার সামনে দাঁড়াতে পারলুম না আমি। পালিয়ে এলুম শোবার ঘরে।

আধ ঘণ্টা খানেক বাদে বেরিয়ে এসে দেখি, নিমা চলে গেছে। আমার দেয়া টাকা যেমনকার তেমনি পড়ে আছে টেবিলের ওপর।

আমার দায় নিজের ঘাড়ে নিয়ে চলে গেছে ও—আমাকে সম্পূর্ণ মুক্তি দিয়ে।

ভারাক্রান্ত মন নিয়ে অফিসে গেলুম। কাজ করলুম যন্ত্রের মত। ছুটি হতেই ট্যাক্সি ধরে চললুম হিরন্ময়ের বাড়ীর দিকে।

আজ ওখানেই আমার একমাত্র শান্তি আর সান্ত্বনা। অনিশ্চয়তা আর সহ্য করতে পারছি না আমি। আমাকে জানতেই হবে, জানতেই হবে অর্চনার মন। এবং আশা আছে, তা জানবার পর আমাকে অনুতাপ করতে হবে না।

অর্চনার ভালোবাসা যদি পাই, সেই পবিত্র প্রেমের ছোঁয়ায় আমার সকল পাপ পুণ্য হয়ে উঠবে। আমার সমস্ত অতীতকে মুছে ফেলবো আমি।

কয়েক মিনিটের মধ্যেই হিরন্ময়ের বাড়ী পৌঁছে গেলুম আমি।

আজ হিরন্ময় বাড়ী নেই, বাইরে গেছে কি একটা কাজে। কিন্তু অভ্যর্থনার কোন ত্রুটি হল না।

ড্রইংরুমে এসে দেখি আরও একটি লোক বসে আছে আগে থেকেই। লোকটি হচ্ছে আমারই অফিস-কলীগ বিষ্ণুপদ শর্মা।

"আরে বোসসাহেব যে! হেঁ হেঁ হেঁ হেঁ......"

গা-জ্বালানো অদ্ভুত হাসি লোকটার। অসহ্য ওর চিবিয়ে কথা বলার ধরণ। রাজ্যের লোকের হাঁড়ির খবর সংগ্রহ করা আর তা সর্বত্র প্রচার করাই হচ্ছে ওর একমাত্র ডাইভার্সন্। অফিসের লোকে তাই ওর নাম দিয়েছে 'ইন্ডিয়া গেজেট'। কেউবা আবার বলে, 'রয়টার'।

"আপনি কি হিরন্ময়বাবুর কাছেই এসেছিলেন নাকি?" বললো বিষ্ণুপদ শর্মা, "আমিও তাই এসেছিলুম। এসে শুনি উনি তো নেই। তাই আমি চলে যাচ্ছি। আপনিও কি যাবেন নাকি? তাহলে একসঙ্গেই বেরোনো যাবে।"

"না, আমার একটু দরকার আছে। পরে যাবো।"

"ও তা ভালো, তা ভালো। ......ইয়ে অর্চনা দেবীর আঁকা ছবি দেখেছেন নাকি? উনি তো খুব ভালো আঁকেন।"

"দেখেছি।"

আরো দু'চারটে কথা বললো বিষ্ণুপদ। কিন্তু কাটা কাটা জবাব পেয়ে আর অগ্রসর হল না। হেঁ হেঁ করে আরেক গাল হাসি হেসে বিদায় নিলো।

"এঁর সঙ্গে হিরন্ময়বাবুর পরিচয় হল কবে থেকে?" জিজ্ঞেস করলুম অর্চনাকে।

"তা তো জানি না। তবে উনি তো মাঝেমাঝেই আসেন এখানে।"

মাঝেমাঝেই আসেন। তবে নিশ্চয় আমার সম্পর্কে কোনো খবরই এদের দিতে বাকী রাখেননি। শুধু খবর কেন, খবরের চাইতে অনেকবেশীই নিশ্চয় সরবরাহ করেছেন।

কিন্তু তাই যদি হয়, অর্চনার ব্যবহারে তো কোনো বিরূপতা লক্ষ্য করিনি আমি! নিমা আর আমাকে নিয়ে যে গুজব লোকে রটায় তা যদি বিষ্ণুপদর মারফৎ ওর কাছে পৌঁছতো, তবে কি ও এত সহজ স্বচ্ছন্দ হতে পারতো আমার সঙ্গে? হিরন্ময়ই কি এমন অনায়াসে ওকে ছেড়ে দিতো আমার সঙ্গে বেড়াতে? অথচ বিষ্ণুপদর মত লোক এখানে এসেছে, আমার সঙ্গে এদের পারচয়ের কথা জেনেছে, এবং তারপরেও আমার কেচ্ছা করেনি, এও যে অসম্ভব অবিশ্বাস্য!

"নতুন একটা ছবি এঁকেছি, দেখবেন?" বললো অর্চনা।

"দেখবো বৈকি। আনুন।"

উঠে গিয়ে একখানা বড় ছবি নিয়ে এল অর্চনা। ছবির নাম নীচে লেখা, "হিমালয়ে বসন্ত"।

ছবিটা চমৎকার হয়েছে। বেশ অনেকক্ষণ ধরে দেখতে ইচ্ছে করে।

চাকর রামু এসে ঘরে ঢুকলো, চায়ের ট্রে হাতে নিয়ে।

চেয়ে দেখলুম, চায়ের সঙ্গে ডিমের পোচ্ও রয়েছে। একটা দুটো নয়, বোধহয় গোটা ছয়েক হবে।

"এত পোচ্?"

অবাক হলুম আমি।

"ওতো কিছুই নয়। এখানকার স্কুলের ছেলেমেয়েরাও দেখি চার-পাঁচটা পোচ্ একসঙ্গে খায়। আর আপনি তো একজন বলিষ্ঠ যুবক।"

পোচ্-এর প্লেটটা আমার দিকে এগিয়ে দিলো অর্চনা।

"তিনটে আপনার, তিনটে আমার। আসুন ভাগ করে খাই।" চায়ের কাপ-এর প্লেটে তিনটে পোচ্ তুলে দিলুম ওর জন্যে।

"ওমা, আমি এখনি খেয়েছি যে!" বলে উঠলো ও, "আর খেলে মরে যাবো। এ সবগুলোই আপনার জন্যে। আপনি খান। অফিস্ থেকে আসছেন, খিদে পায়নি?"

পীড়াপীড়ি করতে লাগলো ও। সব ক'টা পোচ্ই আমাকে খাইয়ে ছাড়লো।

চা-পর্ব শেষ হলে পর অর্চনা আর আমি এসে বসলুম বাগানে—একটা চেরীগাছের ছায়ায় বেতের চেয়ার পেতে।

মাথার ওপর চাঁদ উঠেছে। ত্রয়োদশীর চাঁদ।

চাঁদের আলো আর গাছের ছায়া লুকোচুরি খেলছে মাটিতে, চেয়ারের হাতলে, আমাদের গায়ে।

দু'চারটে কথার পর বেশ কিছুক্ষণ চুপ করে আছি আমরা। বাতাসে অর্চনার শ্যাম্পু-করা চুল উড়ছে। ওকে দেখাচ্ছে যেন একটু অন্যমনা।

মনে হল, এবার আমার সেই প্রতীক্ষিত মুহূর্ত এসেছে। যা বলবার, এখনি বলে ফেলতে হবে।

সাহস সঞ্চয় করে আমি বলতে শুরু করলুম, "অর্চনা, হয়তো বিষ্ণুপদবাবুর কাছে আমার সম্পর্কে তোমরা অনেক কথা শুনেছ। কিন্তু—"

অর্চনা বাধা দিয়ে বললো, "বিষ্ণুপদবাবু যাই বলে থাকুন, তাতে কি যায় আসে? তাতে আপনার প্রতি আমাদের মনোভাবের কোনো পরিবর্তন ঘটেনি। অনেক লোকের নামেই অনেক নিন্দে রটে। তা কখনো সত্যি, কখনো বা সত্যি নয়। কিন্তু সেটা তো বড় কথা নয়। বড় কথা হচ্ছে মানুষের সম্পর্কে শুচিবাইগ্রস্ত মনোভাব নিয়ে না চলা। দোষগুণে নিয়ে মানুষ মানুষ। তাকে স্বীকৃতি দিতে হলে তার সবটাকেই দেয়া চাই। শুধু গুণে বাছতে গেলে মানুষের আধখানাকে স্বীকৃতি দেয়া হয় মাত্র। ত্রুটিহীন পুরো মানুষ পৃথিবীতে কোথাও কখনো মেলেনি, মিলবে না।"

"এত, এত উদার তুমি, অর্চনা! আ[illegible] বাঁচালে! তুমি যথার্থই শিল্পী!" বললুম মনে মনে, "কি ভার যে তুমি আজ নামিয়ে দিলে আমার বুকের ওপর থেকে, তুমি জান না...কিন্তু—তোমাকে ভালোবাসি বলেই—আমার জীবনের সব কথা তোমার কাছে নিজের মুখে খুলে বলতে হবে আমায়। না বললে চলবে না!"

বলবো, সব বলবো। সব! কিন্তু তার আগে বলবো, তোমাকে আমি ভালোবাসি।

চেয়ার ছেড়ে উঠে দাঁড়িয়ে কাঁপা গলায় আমি বললুম, "তুমি সত্যি অতুলনীয়া! তাই তো তোমাকে আমি—তোমাকে আমি ভালোবাসি, অর্চনা!"

"কি ব্যাপার, হঠাৎ এত এক্সাইটেড হয়ে উঠলেন কেন?" তীব্র বিরক্তি ঝরে পড়লো অর্চনার গলায়।

"আমি যে তোমাকে ভালোবাসি।"

অসহায়ের মত বললুম আমি।

"বাসেন তো বাসেন।" বিরক্তি সংবরণ করে নিয়ে এবার উচ্চ তীক্ষ্ণ কণ্ঠে হেসে উঠলো ও, "বসুন, বসুন, আপনাকে যে দেখি মধ্যযুগের নাইটদের মত দেখাচ্ছে! অন্যদিন তো আপনাকে বেশ সেন অ্যান্ড সোবার মনে হয়, আজ হঠাৎ কি হল? ড্রিংক্ টিংক্ করেছেন নাকি?"

অর্চনার ব্যঙ্গভরা হাসি আর কথা এক তীক্ষ্ণ ছুরির ফলার মত মুহূর্তে দু'ফাঁক করে ফেলে দিলো আমার মোহ-পর্দাটাকে!

নিজেকে একটা ক্লাউন্ মনে হল নিজের কাছেই। মনে হল: "আমি ভালোবাসি"—এর চাইতে হাস্যকর কথা আর কখনো কোথাও উচ্চারিত হয়নি এ পৃথিবীতে।

"আমার অনেক পুরুষ-বন্ধু আছেন।" হয়তো আমাকে আরো স্পষ্ট করে বোঝাবার জন্যেই বললো অর্চনা, "আপনি তাঁদের মধ্যে অন্যতম। আমি সকলের সঙ্গেই বেশ আন্তরিকভাবে মিশি। তাঁদের ব্যক্তিগত জীবন নিয়ে আমার কোনো মাথাব্যথা নেই। আমার মর্যাদা যতক্ষণ তাঁরা রাখবেন, আমিও ততক্ষণ তাঁদের মর্যাদা রাখবো। এবিষয়ে জামাইবাবুও আমার সঙ্গে একমত। কিন্তু ইমোশনাল্ ইমোশন্ আমরা পছন্দ করি না।"

আর কোনো কথা বলতে পারলুম না [আ]মি। বলবার প্রবৃত্তিও ছিলো না।

"চলুন ঘরে যাই। জুলি অ্যানড্রিউর [রে]কর্ড শুনবেন?"—কয়েক মিনিটের [নী]রবতার পর পর বললো অর্চনা।

'থাক্। আজ চলি। শরীরটা ভালো [লাগ]ছে না।' উঠে দাঁড়ালুম আমি [চেয়া]র ছেড়ে।

'আচ্ছা, আসুন।'

আমার সংগে সংগে কিছুদূর এগিয়ে [এল] অর্চনা, তারপর সাধা মিঠে গলায় [বল]লো—'উইশ্ ইউ এ হ্যাপি নাইট!'

এই যন্ত্রণাদায়ক পশ্চিমী ভদ্রতার [কো]নো উত্তর দিতে আজ আর প্রবৃত্তি [হল] না আমার।

বাংলোয় যখন ফিরলুম তখন সাড়ে [আ]টা বেজে গেছে।

হিরণ্ময়ের ঠিক্-করে-দেয়া চাকরটি [কাজ] করবে কাল সকাল থেকে। আজ [রাতে]র খাওয়াটা তাই আমার হোটেলেই [সেরে] আসার কথা। কিন্তু সেকথা আমার [মনে]ই ছিল না।

খিদের বোধটাই নেই যেন। সমস্ত মন জুড়ে শুধু একটা অবসাদ। [অব]সাদ।

শোবার ঘরে ঢুকতেই চোখে পড়লো [খা]টের মাথার কাছে টিপয়ের ওপর কাচের [গ্লা]সে নিমার সাজানো ফুলের তোড়া। তোড়া কালকের। আজ আর নতুন ফুলে [তা] সাজানোর সুযোগ ও পায়নি।

যেখানে যেদিকে চাই, সর্বত্র ওর হাতের স্পর্শ।

রান্নাঘরে গেলুম। সেখানেও দেখি সবকিছু ঝকঝক তকতক করছে। দু-একখানা বাসন মেঝেতে নামানো হয়েছিল, সে আর তোলা হয়নি। যেমনকার তেমনি পড়ে আছে।

বাইরে বাগানে এসে দাঁড়ালুম। মনে হল নিমা যেন আমার সামনেই ঘোরাফেরা করছে, আমি তা অনুভব করছি কিন্তু চোখ দিয়ে দেখতে পাচ্ছি না।

আজ নয়। কাল নয়। পরশু নয়। কোনো—কোনো দিনই নয়। কোনোদিনই আর তাকে দেখতে পাবো না আমি এই বাগানের বেড়ার ধারে।

অফিস্ থেকে ফিরে আমি প্রায়ই অন্যমনে ঘুরি এই পাহাড়ের নির্জন পথের ওপর দিয়ে—বার্চ, সীডার আর ঝাউ-গাছের তলায় তলায়। প্রতিটি বাঁকের কাছে গিয়েই মনে হয়, এইবার, এই মোড়টা ফিরলেই দেখতে পাবো নিমাকে। দেখবো সে কাঠ কুড়োচ্ছে ঝরাপাতার রাশির ওপর বসে। ঠিক্ সেই প্রথমদিনের মত।

আমি তার সামনে গিয়ে দাঁড়াবো। সে আমার দিকে মুখ তুলে হাসবে।

'গাছের ডাল কুড়োচ্ছো, ওদিয়ে কি হবে?'

'সামনেই শীত আসছে যে! তখন আগুন করতে হবে তো রোজ রাতে। তাই এখন থেকে কাঠ কুড়িয়ে রাখছি!'

'সামনেই শীত কি গো? এখন বসন্ত, এর পরে তো গ্রীষ্ম তারপর বর্ষা। তারপরে শরৎ হেমন্ত, তারপর শীত। ঠাট্টা করছো নাকি?'

হি হি হি করে হেসে গড়িয়ে পড়বে ও। বলবে—

'প্রথমদিন ঠিক্ ওই কথা বলিনি? তখন তো অক্টোবর মাস ছিল'!'

'ও, দুষ্টুমি করছো আমার সংগে?'—

কই, কেউ তো কোথাও নেই।

এই তো সেই দেবদারুতলা। ও তো আসেনি।

আজও এল না।

কাল আসবে হয়তো।

হয়তো আসবে না।

এই দেবদারুতলা এমনি শূন্যই থাকবে। এপথে আর তার পদচিহ্ন পড়বে না কোনোদিন।

নিঃসংগ পাহাড়ী পথের ওপর দিয়ে লুটিয়ে লুটিয়ে ভেসে আসছে বসন্তের ব্যাকুল বাতাসে মর্মরিত অরণ্যের গভীর দীর্ঘশ্বাস।

এখানে আর কেউ নেই। এই নির্জন পাহাড়ের কোলে—গাঢ়-গম্ভীর ছায়ামেলা দীর্ঘ বার্চবনের মাঝখানে—আবার আমি একা।

আমি একা।

(শেষ)

(প্রশ্ন)

১। পৃথিবীর মধ্যে সর্বপ্রথম কোন্ [দেশে] কিভাবে কোন্ সনে গণতন্ত্র [প্রতি]ষ্ঠিত হয়?

২। রাষ্ট্রদূত, হাই-কমিশনার ও চার্জ-[দ্য-অ্য]াফেয়ার্স—এ'দের কাজ ও পার্থক্য কি?

৩। কলকাতায় "জাস্টিস অব পীস" কি-[ভাবে] এবং কবে প্রতিষ্ঠিত হয়? ঐ পদের [কাজ] কি কি?

৪। ভারতের "মেট্রোপলিটন" অর্থ কি? [এ] পর্যন্ত যাঁরা হয়েছেন, ধারাবাহিক-[ভাবে] তাঁদের নাম জানতে চাই।

৫। কলকাতাতে মোট কত সিনেমা হল [আছে]? তার মধ্যে কোন্টি সর্ববৃহৎ ও [কোন]টি প্রাচীনটি কবে স্থাপিত? কটা [...] আছে?

৬। নেতাজী আই-সি-এস পাশ করার [পর ক]ি চাকুরী পেয়েছিলেন?

৭। পুরো নাম জানতে চাইঃ—

(ক) তথ্য ও বেতার মন্ত্রী—শ্রী কে কে শাহ,

(খ) উপ-রাষ্ট্রপতি—শ্রী ভি ভি গিরি,

(গ) সহঃ-স্পীকার—শ্রী আর কে খাদিলকার

(ঘ) প্রধান সেনাপতি—
শ্রী পি সি কুমারমঙ্গলম

(উত্তর)

৭ম বর্ষ ১১শ সংখ্যা অমৃত সাপ্তাহিক পত্রিকাতে "জানাতে পারেন বিভাগে" প্রকাশিত কতকগুলি প্রশ্নের উত্তরে জানাচ্ছি যে, (১) বৃটেনে ৫৪টি অক্ষর সহযোগে একটি স্টেশনের নাম আছে। স্টেশনটির নাম হচ্ছে "LLANFAIRPWLLGWYLLGOG ERYCHWYRNDROBWLLLLAN TSILIOGOGOGOCH".

(২)—পৃথিবীতে মোট কত রকমের ভাষা আছে তা সঠিক বলা কঠিন। প্রায় নয় বছর আগে আমেরিকার এক অধ্যাপক (কালবার্ট) গবেষণা করে বলেছেন যে, পৃথিবীতে কম-পক্ষে ৩৪২৪ রকমের ভাষা আছে। কমপক্ষে ১০ লক্ষ লোকে বলে ও লেখে এমন ভাষা পৃথিবীতে ১৩৫টি আছে। (৩)—তোতলামি সারে। জিভের নীচে একখণ্ড সিসে নিয়ে তারপর এক বৎসর দিনের মধ্যে ১০ বার সজোরে বক্তৃতা করে যেতে হবে সজোরে কথা বলে নিজের মতামত স্থাপনের চেষ্টা করে যেতে হবে, তাতে তোতলামি সেরে ওঠবার ৮৫ শতাংশ আশা থাকে এই সংগে অভিজ্ঞ চিকিৎসক দেখানো দরকার। কবিতা সুর করে পড়ে যেতে হবে, (তাতে প্রাথমিক অসুবিধা হলেও পরে আর হবে না।)। (৪)—বর্তমানে বাংলা আধুনিক গানের শ্রেষ্ঠ গায়ক হচ্ছেন সর্বজন শ্রদ্ধেয় গায়ক হেমন্ত-কুমার মুখোপাধ্যায়। (৮) বর্তমানে পৃথিবীর মোট জনসংখ্যা প্রায় পৌনে তিনশ' কোটি। প্রথম স্থানে লাল-চীন, দ্বিতীয় ভারতবর্ষ, তৃতীয় সোভিয়েট রাশিয়া। (৯)—এপর্যন্ত ভারতকে বৈদেশিক ঋণ মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রই দিয়েছে বেশী। (১০)—যে খেলোয়াড় সব-দিকের খেলাতেই চরম উৎকর্ষতা লাভ করেন তাকেই চৌকস খেলোয়াড় বলা হয়ে থাকে। (১১)—পৃথিবী বিখ্যাত ক্রিকেট ও ফুট-বলের মাঠ হচ্ছে লণ্ডনের ওয়েম্বলী স্টেডিয়াম, ব্রেজিলের সাওপাওলোর স্টেডিয়াম, ইডেন গার্ডেন, লর্ডসের ক্রিকেট মাঠ, ব্রিস-বেনের ক্রিকেট মাঠ প্রভৃতি। (১২)—অধ্যাপক রোয়েন্টগেন, অধ্যাপক অ্যালবার্ট আইনস্টাইন (Inventor of the Reletivity), বিক্রম সারাভাই (মহাজাগতিক রশ্মি সম্বন্ধে নতুন করে আলোকপাত।), অধ্যাপক ল্যাণ্ডাউ (শব্দ সম্বন্ধে নতুন মতবাদ দিয়েছেন।) অধ্যাপক হয়েল (হয়েল নারলিকার মতবাদ দিয়েছেন।) এ'দের নামই করা যেতে পারে শ্রেষ্ঠ পদার্থ-বিজ্ঞানী হিসেবে। (১৩)—অস্ত্রোপচার করবার সময় রোগীর জ্ঞান লোপ করবার জন্য ক্লোরোফর্ম ব্যাপকভাবে ব্যবহার করা হয়ে থাকে। ক্লোরোফর্ম ১৮৪৮ সালে এডিনবার্গের ডাক্তার সিমপ্সেন আবিষ্কার করেন্। ক্লোরোফর্ম ইথারে দ্রবণীয়।

রাহুল বর্মণ,
আগরতলা (ত্রিপুরা)।

পুলকেশ দে সরকার

পার্সোনালিটি

হাতের কাছে আলনা থেকে বুস সার্টটা টেনে গায়ে দিয়ে বুঝল ওটা ওর নয়, সম্ভবত বড় ছেলের। হাতের ছোঁয়ায় টের পেল বোতাম আছে, পট-পট করে ছিঁড়ে ফেলল ওগুলো সিঁড়ে বেয়ে নামতে নামতে। বুস-সার্টের সামনেটা খোলা পেয়ে দুদিকে বাইরের হাওয়ায় ফৎ-ফৎ ক'রে উড়তে লাগল। নীচে একটা ময়লা গেঞ্জি—ফুটো-ফাটা। পরণে গেঞ্জির সংগে মানানসই পায়জামা। পায়ের কাছটা কেমন ফেটে ফেটে গেছে—তাই নয়—রাবার ফোমের ক্ষয়ে যাওয়া জুতোর ফটফটানিতে পায়জামার সাদা আকাশে অসংখ্য কালো তারকাচিহ্ন।

ওর হাঁটবার ধরণই এই। ওর মানে শ্যামলের। শ্যামল বরখাস্তগীরের। মাথায় একগোছা কাঁচা-পাকা অবিন্যস্ত চুল, দাঁড়ি-গোঁফও তেমনি খোঁচা খোঁচা—এবং তারই মধ্যে বঙ্কিম হাসি।

বেশী করে হাসলেই ইটে-রঙপানা দাঁত-গুলো বেরিয়ে পড়ে। আহা, ওতে অন্নপ্রাশনের অবশেষ চিহ্নও হয়তো নিরেট হ'য়ে আছে; বেড-টি থেকে রাতের তাম্বুল চর্বণ অবধি জলকল্লোলের অবকাশ নেই, মার্জনার কোনো কথাই ওঠে না। ধরা-বাঁধা নিয়মে ঘর' দেয় না বলে নিতান্ত অন্তরের তাগাদ না হলে কলম্বর-মুখো হয় না; গালগুলো খরাজ ফাটা জমিদারীর মতো অথবা পাহাড়িয়া বুড়ীর মুখমন্ডলে বহু শীতের বলিরেখার মতো আনুদিক চিত্রাঙ্কন।

শ্যামল বরখাস্তগীর। এ-পাড়ায় চেনে না এমন কেউ নেই, কিন্তু সবাই একটু তফাতে চলে। ওর রসিকতা আপ্যায়নের বিষম জ্বালা।

সিঁড়ি দিয়ে ফটর ফটর ক'রে নেমে রাস্তায় পড়লে একবার চারদিকে চোখ বুলিয়ে নেয়। একমাত্র শ্রোতা শ্রীতাপিয়া। তাকে প্রায় রোজই একবার ক'রে বলে : আমি বেরোলেই সবাই অমন তাকিয়ে থাকে কেন বলতো তাপি?

তাপিয়াও প্রায় রোজই এক কথা বলে: পাগল মনে করে বোধহয়!

শ্যামল বরখাস্তগীর অবশ্য এক জবাব রোজ দেয় না, তবে জবাবের রকম একই। তাপিয়া যদি প্রায়-রোজকার উত্তর দিয়েই তার কাজে চলে না যায়, আর যদি একরকম মুখোমুখি বসেই কাজ করতে থাকে তো শ্যামল তাপিয়ার দিকে ঐ কি একটা ভঙ্গীতে চোখ, ঠোঁট, কপাল নাচিয়ে বলে—পার্সোনালিটি—

তাপিয়া যদি এর পরও ওর দিকে তাকিয়ে থাকে তো বলে, ও তুমি বুঝবে না।

তাপিয়া যদি তবু আর কোনো কাজে চলে না যায়, এবং আবার তাকায় তো বলে, বাংলায় যেন কি বলে, হ্যাঁরে, বলে বড় মেজ সেজ ছোট ছেলেমেয়েদের উদ্দেশে হাঁক দেয়। একটা জবাবও যদি না আসে, নিজেই ব'লে ওঠে, মনে পড়েছে—ব্যক্তিত্ব, কি ল্যাপ' মেমারি! যেমন ইংরেজী তেমন বাংলা। বলে ইঁটে-রঙপানা দাঁতগুলো বের করে হাসতে থাকে, কষের যে গোটাচারেক দাঁত গেছে তাও বে-আড়াল হ'য়ে যায়।

পার্সোনালিটি—দ্যাটস দী ওয়ার্ড (মানে ওয়ার্ড), বলে চারমিনারের পোড়া টুকরোটায় ঝাঁকি মারে। পা-র্সো-না-লি-টি, ইয়েস! বুঝলে তাপি, এজন্য পোষাকের দরকার নেই, সাজের দরকার নেই, ন্যাংটা হয়েই যাও না কেন—!

তাপিয়া বলে, আঃ, কি করো, ছেলে-মেয়েরা আছে না—?

আবার ইটেরঙপানা দাঁতগুলো দর্শন দেয় এবং একটুও বিব্রত লজ্জিত না হয়ে শ্যামল বলে, সাইকলজি...ওরা জানে ওরা জানে। ওরা জানে পার্সোনালিটি এমনই জিনিস। বলতে হয় না, আপনিই তাক লেগে যায়।

তাপিয়া উঠে যায় দেখে শ্যামল বর-খাস্তগীরও উঠে পড়ে। তাপিয়ার দিকেই খানিকটা এগিয়ে গিয়ে বলে, বেরোলে দোরের কুকুরটা পর্যন্ত থমকে দাঁড়ায়। দু-ফুটপাথের লোক থাকে তাকিয়ে। যায় যায়, কে যায়? পার্সোনালিটি।

তাপিয়া মুক্ত হবার জন্য বলে, তা বেরোও না একটু।

শ্যামল একটা তাচ্ছিল্যের হাসি দিয়ে বলে, এ-হে-হে, এ বড় রেয়ার জিনিস, রেয়ারলি বেরোতে হয়, তবে তো—!

বলে বটে কিন্তু বেরোয়। মাঝে মাঝে বিব্রত দিয়ে বেরোয় এবং চারদিকটায় একবার নজর ফেলে, তাচ্ছিল্যের বাঁকা হাসিটা না-কামানো মুখে ওঠানামা করে। পায়ের ক্ষয়ে যাওয়া ফোমের স্লিপারজোড়া ফট-ফট আওয়াজ তোলে, ছেঁড়া জা পাৎলুন ফৎ-ফৎ করে, সিগারেট-ধরা হাত দোলে, মুখের কাছে ওঠে আর নামে।

ঊটি চাই; সিগারেটটা চাই। বি ব্রহ্মান্ড চুলোয় যাক, সংসার অচল হো ঊটি চাই! ওর নাম এ্যারিস্টোক্র্যাসি লোকের মুখের ওপর জলন্ত সিগারে সিগন্যালের মতো তুলে নামিয়ে সারগর্ভ ক সব বলতে হয়। যতরকম স্টাইল ক'রে প স্মোক কর। দুটো আঙুলের চাপে ঠো লাগাও কি হুঁকোর মতো টানো কি নাক দিয়ে ধোঁয়াই ছাড়ো এবং ঐ ধোঁ সামনের লোকের গায়ে মুখে কিম্বা, কুণ্ড পাকিয়ে আকাশপানেই ছাড়ো—স্টাইল চাই নইলে হা-ভাতের মতো সিগারেট টানা আ ইতরামি একই জিনিস।

সুতরাং, মূর্তিমান পার্সোনালি শ্যামল ওরফে শ্যামল বরখাস্তগীর এ্যারিস্টো ক্র্যাসীর প্রতীক চিহ্ন সিগারেট একটা হাতে না-ধরা ঠোঁট-দাঁতের চাপে থাকেই এবং বাইরে বেরোতে গেলে থাকবই। সিগারেটের ধোঁয়া মাঝে মাঝে চোখ কুঁচকে নিতে হয় এবংসে ভঙ্গীটিও কিন্তু অ্যারিস্টোক্রেসীর অবিচ্ছে অংশ।

এসবই জানা আছে শ্যামল বরখাস্ত গীরের। এবং এও জানা আছে ঊটি যদি চাই, তো ঊটির মূল্যও চাই। যার বাংলা মানে পয়সা। এ পয়সা যদি তার ছেঁড়া পকেটে না থাকে তো স্ত্রী-কন্যার রোজগারে হাত বাড়াতেই হয়। কিন্তু এ একরকম ঘরে ছিনতাই—পুলিশের এক্তিয়ারের বাইরে!

শ্যামল বরখাস্তগীর তাও জানে। ম মানতে চায় না অপরের বাঁধা রোজগারে পয়সা ফুরোতে পারে। তাই কিছু জোর জুলুম ও বিনা পরোয়ানায় তল্লাসীও চলে অনেক সময় তাতেও কোনো ফল হয় না "nothing incriminating found."

...পার্সোনালিটি

অথচ "রেস্ত" নেই, অ্যারিস্টোক্র্যাসির প্রতীক চিহ্ন বাড়ন্ত, এমন অবস্থায় বেরোনো পার্সোনালিটির পক্ষে অসম্ভব।

হায়, এমন একটা "অসম্ভব পরিস্থিতির"ও সৃষ্টি হয়। পার্সোনালিটি কাম অ্যারিস্টোক্রেসীর সংকট। সভ্যতার সংকটের চাইতে কিছু কম নয়। ক্লাস নেশা।

শেষটায় জয় হয় এই ক্লাসেরই। তল্লাসীর উদ্যম শূন্যে ফল লিখে দিলে মেজাজ বৈশাখের দাহভাণ্ড মাথায় নাচে।

শ্যামল খাস্তগীরেরও যেহেতু মাথা আছে সেই হেতু ঐ পাত্রটা এখানেও নাচল, কবন্ধের নিয়ম মুণ্ডে খাটে না। তাই শ্যামল ওরফে শ্যামল খাস্তগীর তল্লাসী করতে করতে আজ আর কালের দুটো খবরের কাগজ দখল করল এবং বগলে চেপে রেখে সেলুলার পানিসমেণ্ট দিতে লাগল। কি একটা কোম্পানীর একটা ছোটোখাটো প্রপ্যাগ্যাণ্ডা প্যাম্ফলেট, সেটাও নিল। রান্নাঘরে কার দুটো পুরোনো খাতাও পাওয়া গেল।

সব কটি জবর-দখল করে হাতের কাছে আলনা থেকে টান মারল একটা জামা। গায়ে দিয়ে ক্ষণিক উপলব্ধি হল ওটা বড়ছেলের। তার বিশেষ পরিচয় ছিল বোতামগুলোর অটুট অস্তিত্বে। সিঁড়ি দিয়ে নামতে নামতে ওগুলোর অনস্তিত্ব ঘোষিত হল। তারপর ভেতরের ছেঁড়া-নোংরা গেঞ্জির পটভূমিকায় বুসসার্টটার দুটো টেক্সটাইল ডানা ফৎফৎ করে উড়তে লাগল।

ফুটপাথে পা দিয়ে একবার তাকাতেই হল চারদিকে। অভ্রান্ত অভ্যাসের কাজ। কিন্তু সংগে সংগে উপলব্ধি হল অ্যারিস্টো-ক্র্যাসীর অভাব। অ্যারিস্টোক্র্যাসীর অভাবে পার্সোনালিটির আসে আভরণহীনতা। হাতের কাগজগুলোর দোলানি বাড়ল; পার্সোনালিটির আর দৃষ্টিপাত ঘটে না কোথাও।

একেবারে সোজা বাউণ্ডারী। এ গলিটার মুখ যেখানে গিয়ে মিশেছে বড় রাস্তায়। এক হিটে বল গড়িয়ে এল এইখানে। অনেক দিনের জানা দোকান। "পুরানো...গজ...ক্রিয়'র দোকান, বাংলা দশ আনা, ইংরিজী বারো আনা। ভেতরের পার্সোনালিটিটা ফোঁস ফোঁস করছে, কিন্তু অন্দুদ্‌গীরণের উপায় নেই, অ্যারিস্টোক্র্যাসী অ্যাব্‌সেণ্ট। কাগজ ক'খানাই এগিয়ে ধরতে হ'ল কায়দা করে। বাম দিকে দোকান, সম্মুখপানে দৃষ্টি, বাঁ হাতে এগিয়ে ধরল কাগজ ক'খানা শ্যামল বরখাস্তগীর।

দোকান বাঁ দিকে না হলেও ডান হাতে এগিয়ে ধরত না শ্যামল বরখাস্তগীর। কাউকে দিতে বা কারও কাছ থেকে নিতে ডান হাতটাই বাড়ানো উচিত এমন বিধিবদ্ধ রীতি অনুসরণে তার বরাবরকার প্রবল অনীহা। ডান হাত বাঁ হাত আবার কী! এবং পার্সোনালিটির অ্যারিস্টোক্র্যাসী রাখতে হয়তো বাঁ হাতের দাক্ষিণ্যই ঠিক। ওর সমপর্যায়ের কেউ আছে বলে স্বীকার করে না শ্যামল বরখাস্তগীর।

পুরোনো কাগজ বিক্রীর দোকানদার অবশ্যই অ্যারিস্টোক্র্যাসীর দাবি করে না।

কুকুরটা পর্যন্ত থমকে দাঁড়ায়

সে ডান হাত বাড়িয়েই নিল ওগুলো। নিয়ে বলল, এত কম?

পার্সোনালিটিতে লাগল। বলল, যা দিয়েছি তাই নাও।

দোকানদারেরও অভিমান আছে। কিন্তু সে তা চেপে গেল। ওজন মতো দাম এগিয়ে ধরল। শ্যামল বাঁ হাতেই পয়সা ক'টা গ্রহণ করে চোখ বুলিয়ে দেখল। এত কম? দোকানদারের মুখে হাসি ফুটল। কিন্তু কিছু বলল না।

এত কম? শ্যামল বরখাস্তগীর পুনরাবৃত্তি করল। দুটো সিগারেটও যে হচ্ছে না। অ্যা—?

দোকানদার বলতে চেষ্টা করল, তা—

শ্যামল বরখাস্তগীর শোনেনি। বলল, অ্যা? দুটো সি—!

দোকানদার সহৃদয়ে বলল, একটা বিড়ি নেবেন।

পার্সোনালিটি-অ্যারিস্টোক্র্যাসী তীব্র আহত হল। অভ্যাসটি হাই সেন্স ইজ পুরোনো কাগজ কিনুনেওয়ালা। দুখের সিগারেটটাও নেই যে, সেই অভিজাতরা আস্ফালন করে প্রতিবাদ করবে। অথচ এতে দুটো সিগারেটও হয় না। অনেকক্ষণ নেশাও হচ্ছে না, ভেতরে স্টীম নেই। এগিয়ে ধরা বিড়িটা ক্রমশঃই সুন্দরী হয়ে উঠছে, নিদারুণ আকর্ষণ করে চলেছে। One bird in hand.......... ঝোপের দুটো পাখী থাক। শ্যামল বরখাস্তগীর ছোঁ মেরে বিড়িটা নিয়ে বলল, আগুন?

হোক বিড়ি—দেশলাই সংযোগে বিড়িটা পার্সোনালিটিসম্মত কায়দাতেই ধরালো শ্যামল বরখাস্তগীর। তারপর রাইট অ্যাবাউট টার্ন করে ঘরমুখো। হাতের চাপে রয়েছে বিড়িটা, কিন্তু সিগারেটও তো হতে পারে। ওরা কি সবাই তাকিয়ে দেখছে? দেখুক—পার্সোনালিটিওয়ালা শ্যামল বরখাস্তগীর যা করবে তাই অ্যারিস্টোক্র্যাসী।

...একটা বিড়ি নেবেন

পুরনো পাতা

ইন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়

মান

"প্রাণ অতি তুচ্ছ গণি, প্রাণাধিক মান।" হে রাম, এমন কুশিক্ষাও কি আর আছে! এমন ভ্রমপূর্ণ কথাও লোকে উপদেশস্থলে বলে! কোথায় অমূল্য, অতুল্য, পরম যত্নের, পরম সমাদরের প্রাণ—আর কোথায় ছেঁড়া ন্যাকড়ার মান। ছি ছি! প্রাণের কাছে ধনের কাছে, মানের কথা কি তুলিতে আছে?

যেমন গামছা-ধুতি, ছড়ি-ছাতি, তেমনি মান;—দাম দিলেই পথে ঘাটে, হাটে মাঠে যত চাই, ততই পাই। তাই যে খুব দরে চড়া, দাম কড়া তাহাও নয়; টাকা কড়ির ত কথাই নাই, একটু ভাণের বদলেই মান পাওয়া যাইতে পারে। "আপনার মান আপনার ঠাঁই"—কেবল যার যত্ন নাই, সাধ নাই, ইচ্ছা নাই, তারই মান নাই। নহিলে মানের জন্য আবার ভাবনা?

হারাধন মান হারাইয়াছে, আর হারাধনের মুখ দেখাইবার যো নাই; হয়, ইহা স্বার্থপর শঠের কথা। নয়, বুদ্ধিহীন ঘটের কথা; যাহারই হউক, ভদ্রলোকের অগ্রাহ্য, শুনিবার যোগ্যই নহে। কিছু পাইয়া, কিম্বা কিছু পাইবার আশায় যদি হারাধন এই অকিঞ্চিৎকর মান দুদিনের তরে হারাইয়া থাকে, তাহাতে ক্ষতিটা এমন কি হইল? আজি মান গিয়াছে। আবার কাল মান হইবে; তরে আর মুখ দেখান বন্ধ হইতে গেল কেন? জুতার সুখতলা হারাইলে ত কেহ বলে না যে, না ভাই তুমি সুখতলা হারাইয়াছ, তোমার আর লোকের সম্মুখে বাহির হওয়া উচিত হয় না। সুখতলার অভাবে তবু পায়ে লাগে। আর মানের অভাবে?—কৈ আহারেরও ব্যাঘাত নাই, নিদ্রারও বিঘ্ন নাই।

শঠের কথা বলিতেছিলাম, আর নিকট নির্বোধের কথা বলিতেছিলাম। ইহারা বলে, মান গেলেই সব গেল। খাঁটি জানিবে, বুদ্ধিশুদ্ধি থাকিতেও যে-ব্যক্তি এমন কথা বলে, সে বড় সহজ লোক নয়। হয় সে মানের দালাল, খরিদ্দার জুটিলেই তার লাভ, নয় ত সে কোন্ দালালের হাতে পড়িয়া আপনি ঠকিয়া এখন বারেন্দ্রাগিরি ধরিয়াছে, তোমাকেও ঠকাইয়া আপনার পর্যায়ে বসাইবার—ভুক্তভোগী করিবার চেষ্টায় আছে। তাই বলিতেছি, ইহারা স্বার্থপর শঠ, ইহাদের কথায় ভুলিও না, ঠকের কাছে ঠকিও না। যাহাতে মানের দর বাড়ে, মানের কদর বাড়ে, তাই করাই ইহাদের বৃত্তি-ব্যবসা। আর নির্বোধের কথা ছাড়িয়া দাও, ইহারা কবির দলের দিন-মজুরির দোয়ার, গান বুঝুক আর নাই বুঝুক, প্রাণপণে চেঁচাইয়া দিলেই ইহারা বাহাদুরি মনে করে।

ডার্বিন বলিলেন—বানরের বংশেই ক্রমে মানুষ হয়। নির্বোধের দল ধুয়া ধরিয়া বলিতে লাগিল—ঐ কথাই ঠিক, আমরা দেখিয়াছি। আমাদের সাক্ষাৎ বাবা বানর ছিলেন। তাই বলিতেছি, নির্বোধের কথা ছাড়িয়া দাও। তাহাদিগকে যাহা ধরাইয়া দিবে, তাহাই তাহারা ধরিবে। এই এতকাল কেহ বলে নাই, আমি আজি নূতন বলিতেছি—মান নিতান্ত অপদার্থ সামগ্রী, দেখিও আভাস পাইবামাত্র কাকের পালের কলরবের (১) মত এখন ঐ রবই শুনিতে পাইবে—মান অতি অপদার্থ সামগ্রী।

ফলে শঠের কাছে সাবধান। কি রাজদ্বারে, কি কারাগারে, ইহারা সর্বত্রই আছে, সেই পঞ্চমের উপর গলা চড়াইয়া ডাকিতেছে—চাই মা-ন, বড় মান, খুব মান, সম্মান। ডাকুক, তায় ভুলিও না, তোমার সর্বস্ব কাড়িয়া লইবার ফিকির। তমঃসুকে লিখিয়া তোমার কাছে কেহ কর্জ করিতে আসিলে তোমাকে "মহামহিম শ্রীল শ্রীযুক্ত—" সম্বোধন করে, তুমি তখন মনে করিতেছ, সে ব্যক্তির অপমান, আর তোমার সম্মান, উভয়েরই সীমা নাই। কিন্তু তোমার লাভ—কাগজ, তাহার টাকা। বল দেখি, কে ঠকিল? বল দেখি, মান ভাল, না অপমান ভাল? তাই বলিতেছি যে, যে টাকা কয়টি রাখিয়া দিতে পারিলে, তোমার সংবৎসরের অন্নচিন্তা কমিবে, মান কিনিতে যেন তাহা হাতছাড়া করিও না; বুঝিলে ত? তোপ (২) মারিলেও না। আপনি বাঁচিলে হাজার তোপ। সেইরূপ আখর (৩) দিয়া বলিলেও ভুলিও না। কীর্তন গাইবার সময় আখর দেয়, মন ভুলাইবার জন্য; তাহা ত জান? আমার কথা না শুনিলে আখেরে কাঁদিতে হইবে।

মান যে কত সুলভ, মান যে আপনার হাতে, সেটা একটু দেখাইয়া দিই; নহিলে তোমার হৃদয়ঙ্গম হইবে না। চেয়েচিন্তে একটু লম্বা কোঁচা, পায়ে মোজা, ফর্সা জামা আর ভৃত্য শ্যামা—সঙ্গে করিয়া যেখানে যাইবে, সেইখানেই তোমার মান। তুমি আপনাকে আপনি বাবু বলিলে বাবু, বাহাদুর বলিলে বাহাদুর, রাজা বলিলে রাজা; তাহাতে তোমার অন্য বাবুগিরি চাই না, কাজে বাহাদুরি চাই না, সত্যিকার প্রজার পুরী চাই না। চাই কি, ভাল মানুষকে ভেড়া করিয়া তুমি দশ টাকা নগদও হস্তগত করিতে পার। আবার সেই টাকাতে কত ইয়ার, কত ডিয়ার লইয়া কত বালাখানায় টপ্পা গেয়ে, কি পথের খানায় ধাক্কা খেয়ে কত কারখানাই তুমি করিতে পার। জঘন্য নগণ্য জীব, তবু সকলেই তোমার নাম করিবে, সেও ত মান। আর যদি সে সময়ে সম্মান নাই হইল তাহাতেই বা কি?

তোমার নেশা ছুটিলে, চোখ ফুটিলে, দেখিতে পাইবে, তুমি যে ছিলে, সেই; মোদ্দা জামাটা যেন সদা পাটভাঙ্গা হয়। ধোপাকে ভার দিও, সে দুটি পয়সায় তোমার সঙ্গদোষ, চরিত্রদোষ, সকল দোষ ধুইয়া দিয়া তোমার পুরাতন মান ইস্তিরির জোরে খাড়া করিয়া দিবে; তোমার সেই নিখুঁত নিভাঁজ নির্মল মান লইয়া আবার তুমি চৌঘুড়ি হাঁকাইয়া, চোখ রাঙ্গাইয়া, বুক ফুলাইয়া চলিয়া যাইবে, কেহ পাশে আসিলে চাবুক দিয়া আবার তুমি বাহবা লইবে। মান ত ধোপার হাতে, আর ধোপা ত দু'পয়সার চাকর! মানের জন্য আবার ভাবনা?

বাঙ্গলাদেশে কেহ ইতিহাস লেখে না, কেহ ইতিহাস পড়েও না; সেটার প্রতি কখনও লক্ষ্য করিয়াছ? আমি বোধ করি, এ বড় সুবুদ্ধির বন্দোবস্ত। ইতিহাসে পুরাতন কথা লেখা থাকে, কাজ কি বাপু সে কথায়? এখন এই উপস্থিত মুহূর্তে আমার যদি গাড়িজুড়ি, চেইন ঘড়ি, হুইপ ছড়ি, চশমা দাড়ি, সমস্তই থাকে, তাহা হইলে কাল আমার কি ছিল, আমিই বা কে ছিলাম

পরবর্তী সংখ্যায়

কোলদের নৃত্য ও বিবাহ
সঞ্জীবচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়

---

১ কাকগুলো কি গরু? যে, কাকের পাল বলা হইল? আমাদের মোধু রসিকের ভাষার বাঁধুনী যেমন, ন্যায়শাস্ত্রের বাঁধুনীটা তেমন নয়। —পঞ্চানন্দ

(২) দানের পরিবর্তে সরকার হইতে নির্ধারিত তোপের সম্মান পাইলেও।

(৩) আখর—আক্ষরিক সম্মান, যথা—সি-আই-ই ইত্যাদি।

—সে খোঁজ-খবরে দরকার কি? বাস্তবিক দরকার কিছুই নাই; আর দরকার যাহাতে নাই, বাঙ্গালীও তাহাতে নাই। বাঙ্গালী ত অজ্ঞান নয়। "ভূতে পশ্যন্তি বর্বরাঃ"—যে জাতির ইষ্টমন্ত্র, সে কি কখনও অজ্ঞান হয়?

বাস্তবিক মানের জন্য ভাবিতে নাই। মান তোমারও নয়, মান আমারও নয়; মান যায়ও না। ফল কথা, মান মানীর, যখন যাহার মানে দরকার, তখনই তার মান। মানের সঙ্গে যখন চিরন্তনের বাঁধা সম্বন্ধ কাহারও নাই, তখন মানের জন্য প্রাণ দেওয়া, ধন দেওয়া দূরে থাকুক, এমন যে ফক্কিকার জিনিস ফাঁকি, তাহাও সকল সময়ে দিতে নাই। কালেভদ্রে ফাঁকি দিয়া, কি দুটা মিছা কহিয়া যদি মান পাওয়া যায়, ক্ষতি নাই। কিন্তু ঐ বসু।

স্ত্রী-স্বাধীনতা

কামিনীসুন্দরী বসু বিকাল বেলায় আফিস হইতে বাসায় আসিলেন। বৈঠকখানার বারান্ডায় একখানা চেয়ারে পা ঝুলাইয়া বসিলেন। তামাক সাজা ছিল, মেনকা খানসামানী আলবোলার নলটা কামিনী বসুর হাতে তুলিয়া দিল; তিনি মৃদুমন্দভাবে টানিতে লাগিলেন। এদিকে মেনকা সেই অবসরে জুতাজোড়াটি মোজাজোড়াটি খুলিয়া লইল। চটীজুতা পরাইয়া দিল, গাউনের বন্ধছন্দ খুলিয়া দিল, দিয়া শাড়ীখানি হাতে করিয়া সসম্ভ্রমে একপাশে সরিয়া দাঁড়াইয়া রহিল।

তামাকের আশ মিটিলে, কামিনীসুন্দরী বসু উঠিয়া দাঁড়াইলেন। শাড়ীখানি মেনকা বাড়াইয়া দিল, তিনি গাউন ছাড়িয়া শাড়ী পরিলেন। অন্দরের এক ছোঁড়া চাকর সেই সময়ে সম্মুখের উঠান দিয়া পুকুরের ঘাটে একটা গেলাস ধুইতে যাইতেছিল, কামিনীসুন্দরীকে দেখিয়া কোঁচার আঁচলটা মাথায় টানিয়া দিয়া মাথা হেঁট করিয়া চলিয়া গেল।

ক্ষণকাল পরেই মুখহাত ধুইয়া কামিনীসুন্দরী বসু অন্দরে প্রবেশ করিলেন। কামিনীসুন্দরীর যৎসামান্য বাহির-ফটকা রাগ ছিল। তা থাকুক, কিন্তু পরিবারের প্রতি তাহার অযত্ন ছিল না। আফিসের এবং রোজগারের টাকার অধিকাংশই বাটীর ভিতর দিয়া দিতেন, আর সেই সময়ে দুটা হাসগল্প করিয়া দিবসের অবসাদ নষ্ট এবং অর্ধাঙ্গের মন তুষ্ট করিতেন। পিঞ্জরাবদ্ধ বিহঙ্গ তাহাতেই আহ্লাদে অধীর।

কামিনীসুন্দরীর পরিবার একহারা, গৌরবর্ণ, দিব্য ফুটফুটে ছোকরাটি। তাঁহার সুন্দর ভ্রমরকৃষ্ণ গোঁফ রেখাঙ্কের অবস্থা ছাড়াইয়াছে বটে, কিন্তু এখনও লতাইয়া পড়ে নাই। হরিতালের কল্যাণে গালপাট্টা প্রকট হইতে পারে নাই। মাথায় আলবার্ট কাটা টেড়ি, কোঁচাব কাপড়ে অর্ধাবৃত। পরিবারের নাম ভৈরব দাস, কিন্তু কামিনীসুন্দরী আদর করিয়া তাহাকে ভয়ী বলিয়া ডাকেন। ভয়ী—কামিনীসুন্দরী বসুর দ্বিতীয় পক্ষের সংসার।

দ্বিতীয় পক্ষের পরিবার সচরাচর যেমন প্রবল হয়, মুখর হয়, প্রগল্ভ হয়, ভৈরব সেরূপ নহেন। কামিনীসুন্দরী বসুর প্রথম পক্ষের এক কন্যা আছেন, কিন্তু ভৈরবের ব্যবহারে সেটি যে সপত্নীর কন্যা তাহা কেহ বুঝিয়া উঠিতে পারে না,—ভৈরব এমনি শান্ত, এমনি সংস্বভাব, এমনি স্নেহময়। এহেন ভৈরবকে কামিনীসুন্দরী বসু ভালবাসিবেন, ইহাতে আশ্চর্য কি? অদ্য দশ অঙ্গুলে দশটা হীরার আংটি, হাতে চাঁড়, বালা, গলায় চিক, কোমরে সোনার চন্দ্রহার, আরও (নাম জানি না) কত কি অলঙ্কার সুকোমল শরীরের নানা অঙ্গে পরিয়া, জলখাবারের থালা সম্মুখে সাজাইয়া রাখিয়া ভৈরব বসিয়া আছেন, এমন সময়ে কামিনীসুন্দরী হাসিতে হাসিতে সেই স্থানে উপস্থিত হইলেন। আসনে বসিয়া কামিনীসুন্দরী বসু বলিলেন,—"কি ভয়ি! আজ যে বড় বাহার দেখ্‌চি! শরীরটে বাঁধ দিয়েছে, প্রাণটা কেড়ে নিয়েচ, এখন কি নেবে?"

ভৈরব ঈষৎ লজ্জিত হইয়া, মৃদু হাস্যে ভুবন ভুলাইয়া ধীরে ধীরে বলিলেন,—"প্রাণনাথানি! আমার বাহার ত তোমারই নিমিত্তে। আমায় যতদিন তুমি ভালবাসিবে, যতদিন তোমার অনুগ্রহ থাকিবে, ততদিনই আমার বাহার। এখন সাহস আছে, ভালবাস, তাই এ বাহারও আছে; বারণ কর, আর বাহারও করিব না।" এই কথা বলিতে বলিতে ভৈরবের চক্ষু যেন ছলছল করিয়া আসিল।

কামিনীসুন্দরী তখনও আহারে প্রবৃত্ত হন নাই। তাড়াতাড়ি ভৈরবের মুখচুম্বন করিয়া বলিলেন,—"ছি ছি ভয়ি! আমি কি তোমার মনে কষ্ট দিতে ও-কথা বল্লাম? রোজ রোজ, এমনি সাজগোজ দেখি না সেইজন্যেই রহস্য করে একটা কথা বল্লাম। তুমি আমার উপর রাগ করলে?"

পত্নীর সোহাগে কোন্ সাধুপতির মন না গলিয়া যায়? ভৈরব পরিহাসের স্বর অবলম্বন করিয়া বলিলেন,—"তোমার মন বুঝিবার জন্য অমন করিলাম, তাহাও বুঝিলে না। আজ ও-বাড়ীর দাদা একবার দেখা করতে চেয়েচেন, তাই মনে করেছি যে, তুমি যদি বল, তবে একবার তাঁর সঙ্গে দেখাটা করে আসি।"

কামিনীসুন্দরী বসুর ইচ্ছা নয় যে, এমন সময়ে ভৈরব কোথাও যান। তিনি ভৈরবকে ভালবাসিতেন বটে, কিন্তু সে-ভালবাসায় ঈর্ষা ছিল না, এমন কথা আমরা বলিতে প্রস্তুত নহি। ভৈরবের কথার উত্তর না দিয়া কামিনীসুন্দরী বসু বলিলেন,—"তোমাদের বৌয়ের স্বভাবটা বড় খারাপ হোয়ে যাচ্ছে। সেদিন মন্দাকিনীর বাড়ী নিমন্ত্রণে গিয়ে কি ঢলাঢলিটে না করলে? আবার শুনচি যে, মেচোবাজারে জীবনকৃষ্ণের বাড়ীও যাতায়াত আরম্ভ করেচে, কেউ কেউ বলে, তাকে বাঁধা রেখেচে। সত্যমিথ্যা ভগবান জানেন।" অদ্য সন্ধ্যার পর জীবনকৃষ্ণের বাড়ীতে কামিনীসুন্দরী বসু এবং তাঁহার ইয়ারিণীদের মজলিস হইবার কথা আছে, ভৈরবকে তাহা আর বলিলেন না। হয়ত পাছে ভৈরব আপন দাদার মুখে কিছু ইঙ্গিত পায়, সে ভয়েও তিনি কথা চাপিয়া গেলেন।

তাহাতে কিন্তু ভৈরব দাস বুঝিলেন না। দাদার সঙ্গে দেখা করিবার জন্য একটু পীড়াপীড়ি আরম্ভ করিয়া দিলেন।

পূর্বেই বলিয়াছি, কামিনীসুন্দরী বসুর মনে ঈর্ষা ছিল; কেন, বলা যায় না। কিন্তু আজ সেই ঈর্ষা সন্দেহে পরিণত হইল। ভাল করিয়া জল খাওয়াও হইল না, একটা বিশেষ কথা আছে বলিয়া ওজর করিয়া কামিনীসুন্দরী বসু তাড়াতাড়ি বাহিরবাটীতে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। তিনি আসিবার সময় ভৈরবের জলধারা ভৈরবের কপোলদেশে প্রতিবিম্ব করিতেছে দেখিয়া আসিলেন; তাহাতে চিত্ত আরও উদ্‌ভ্রান্ত হইল।

পাট-প্রকোষ্ঠে বসিয়া কামিনীসুন্দরী বসু অনেক চিন্তা করিতে লাগিলেন; কিন্তু চিন্তার অবসান না হইয়া বাহুল্যই হইতে লাগিল। তখন সেই খানসামানী মেনকাকে ডাকিলেন। মেনকা মনের গতিজানিত, সুরাপূর্ণ ডিকান্টার, গেলাস, জল, বরফ সম্মুখে রাখিয়া দিয়া কথাটি না কহিয়া আবার ঘর হইতে বাহির হইয়া গেল। দুষ্টলোকে বলে, মদ আনিবার সময়ে মেনকা এক গণ্ডূষ আপন গলায় না দিয়া আনিত না এবং গন্ধের আশঙ্কাতেই কথা কহিত না। কিন্তু সে দুষ্ট লোকের কথা। যেকালে পুরুষেরা স্বাধীন ছিল, তখন বাবুদের খানসামারও ঐ অপবাদ শুনা যাইত।

দুই গেলাস মদ ক্রমে ক্রমে কামিনীসুন্দরী বসুর উদরে পড়িল। তাহার পর নিজ গুণে নিজ মূর্তি ধরিয়া দুই গেলাসই তাঁহার মাথায় গিয়া উঠিল।

তখন কামিনীসুন্দরী বসু কয়েকবার দীর্ঘশ্বাস ছাড়িয়া, তাহার পর দন্তে দন্ত ঘর্ষণ করিয়া তথা হইতে উঠিয়া গেলেন। যাইবার সময় "জীবনকৃষ্ণ নাচে ভাল" এই কথাকয়টি অর্ধস্ফুট স্বরে তাহার মুখ হইতে বিনির্গত হইল।

চল পাঠিকে! কামিনীসুন্দরী বসুর সঙ্গে সঙ্গে আমরাও যাই (উচ্ছন্নে?)।

টুকরো ছবি

সূক্ষ্ম বিচার

গঙ্গারাম মণ্ডল শুদ্ধ কৃষিকার্যের দ্বারা দশটাকার সঙ্গতি করিয়াছিল। তাহার বাড়ী রাত্রিতে ডাকাইত পড়িল। গঙ্গারামের পিতামহের আমলের এক মস্ত কাতান ছিল; সাহসে ভর করিয়া গঙ্গারাম দ্বার খুলিয়া বাহির হইল। ডাকাইতদের সম্মুখে গিয়া পড়িল। দুইজনকে গুরুতর আঘাত করিল; শেষে একাই দলকে-দল ভাগড়া করিল।

পরদিন পুলিশের ইন্‌স্পেক্‌টার জমাদার কন্‌স্টেবল প্রভৃতি আসিল। গঙ্গারামের নিকট চতুর্বিধ ভোজন লইল। ষোড়শোপচারে

পুজা লইল। জখমি দুইজনের নিকট অপর ডাকাইত কয়েকজনের সন্ধান লইল, ডাকাইত ধরিল। শেষে ডাকাইত, জখমি, গঙ্গারাম মণ্ডল প্রভৃতি চালান দিল।

মাজেস্টর সাহেব ডাকাইতদের দাওরা সোপর্দ করিলেন; গঙ্গারামকে পঞ্চাশ টাকা পুরস্কারের হুকুম দিলেন।

কিয়ৎক্ষণ পরে গঙ্গারামকে সাহেব জিজ্ঞাসা—"গঙ্গারাম! কিসেয়ার সোইট টুমি মারিয়াছিল সেই ডেকয়েট এঃ?"

গঙ্গা। "ধর্মাবতার! এই কাতান দে।"

মাজে। "পাইয়াছে টুমি লাইসেন্স ইহা টরওয়ালার নিমিট্টি?"

গঙ্গা। "ধর্মাবতার! আমরা চাষীরেওৎ আমাদের ত লাইসেনি নেই।"

মাজে। "টুমি হাটিয়ার রাখে, হাটিয়ার বহন করে, কিন্টু লাইসেন্স লয় না। টোমার ডুই সটো টাকা জোরমানা, আওর শ্রমসহিট টিন মাহিনা, না ডে, আর টিন মাহিনা।"

গঙ্গারাম সন্তুষ্ট হইল। কৃতজ্ঞতার বেগে তাহার গণ্ড বহিয়া আনন্দাশ্রু প্রবাহিত হইল।

প্রশ্নোত্তর—১।

প্রশ্ন। বলো দেখি বুড়রা বেশী দিন বাঁচে কেন?

উত্তর। যাহারা অল্পবয়সে মরে, তাহারা বৃদ্ধাবস্থা প্রাপ্ত হয় না বলিয়া।

প্রশ্ন। যদি তোমার কৃত প্রতিজ্ঞা ভঙ্গ হয়, তবে কি করিবে?

উত্তর। আর একটি ঠিক সেইরূপে প্রতিজ্ঞা করিয়া তাহার স্থান পূরণ করিব।

প্রশ্ন। সহজে কাহারও বুদ্ধিপরীক্ষা করিবার উপায় কি?

উত্তর। তাহার সম্মুখে তাহাকে বোকা বলা। কাণাকে কাণা বললে রাগ করে, যাহার চক্ষু আছে, সে করে না।

প্রশ্ন। একটি রূপার ঘড়ীকে মদের বোতল কিরূপে করা যায়?

উত্তর। ঘড়িটা বাঁধা দিলেই টাকা, শুঁড়িকে টাকা দিলেই বোতল-ভরা মদ।

প্রশ্ন। তোমার পরিচিত কোনও পাঁচজন লোকের মধ্যে কে কে তোমার আগে মরিবে বলিতে পার? এ-প্রশ্নের উত্তর দিতে তোমার যত ইচ্ছা সময় পাইতে পার।

উত্তর। হাঁ, তাহা হইলে পারি। যেমন যেমন দেখিব, তেমনি তেমনি বলিয়া দিব।

প্রশ্ন। ব্রহ্ম এবং ব্রহ্মায় প্রভেদ কি?

উত্তর। ব্রহ্ম—নিরাকার; ব্রহ্মা—সাকার।

প্রশ্নোত্তর—২।

প্রশ্ন। স্থাবর ও অস্থাবর সম্পত্তি কাহাকে বলে?

উত্তর। ঘড়ি; চলিলেই অস্থাবর, না চলিলেই স্থাবর।

প্রশ্ন। (গ্রন্থকারকে বন্ধু) কেমন হে, তোমার বই কাটছে কেমন?

উত্তর। উই আর ইঁদুরে—বিলক্ষণ।

প্রশ্ন। মানুষের চলা বন্ধ হয় কখন?

উত্তর। মানুষ যখন মাটী হয়।

প্রশ্নোত্তর—৩।

প্রশ্ন। "সাহিত্যসভা" কাহাকে বলে?

উত্তর। একটা বয়াটে ছেলে; পড়াশুনায় মন নাই, আব্দারটুকু বিলক্ষণ; চিঠিপত্র ছাপাইয়া দরখাস্ত করে, ভিক্ষা করে, অভিনন্দন দেয়, শেষে ধরা পড়ে।

প্রশ্নোত্তর—৪।

প্রশ্ন। কে সর্বাপেক্ষা লগ্নমুহূর্ত ঠিক গণনা করিতে পারে?

উত্তর। পাওনাদার; তাহাকে যখন আসিতে বলিবে, সে ঠিক তখনই আসিয়া উপস্থিত।

প্রশ্ন। সর্বাপেক্ষা উত্তম বাগ্মী কে?

উত্তর। যুবতীর চক্ষের জল।

হিসাবী লোক।

বারাসাতের ভুলু মাস্টার গাঁজা খায়, কিন্তু খুব হিসাবী লোক। লালুবাবুর বৈঠকখানায় বসিয়া ভুলু মাস্টার একদিন শুনিল যে, কলিকাতায় গাঁজা বড় শস্তা।

দিনদুই পরে ভুলু মাস্টার আবার লালুবাবুর বৈঠকখানায় উপস্থিত। গল্পের প্রসঙ্গে বলিয়া ফেলিল "যথার্থ কথা, কলিকাতায় গাঁজা খুব শস্তা; দু আনায় যাহা আনিয়াছি, এখানে দশ পয়সাতেও তত পাওয়া যায় না।"

একজন জিজ্ঞাসা করিল,—"তুমি গিয়াছিলে নাকি?"

ভুলু—"ভাই না গিয়ে কি রোজ রোজ ঠকিব? একখানি ফিরতি গাড়ী পেয়েছিলাম; সবে বারো আনা ভাড়া। আসবার সময় কিছু বেশী পড়েছিল—পাঁচ সিকা। কিন্তু বল্লে বিশ্বাস করবে না, আট পয়সায় এই এত গাঁজা।"

মাতাল বাটীয়া নয়।

নিশিকান্ত প্রায় নিশীথ অতীতে, আরক্ত লোচনে টল-বিটল চরণে বাটীতে আসিতেন। সেদিন কিছু অতিরিক্ত সেবন হইয়াছিল, বিলম্বও অতিরিক্ত হইয়াছিল, ভোরের বেলা ভোর হয়ে উপস্থিত। গৃহিণী শশব্যস্ত; রুটির ঢাকা খুলতে যান এমন সময়ে ঘড়ি বাজিতে লাগিল, নিশিকান্ত গণিতে লাগিল—টং এক; টাং এক; টং—এ-এক; টাং এ-এ এক। ঘড়িটে এমন হল কেন? চারিবার একটা বাজিল যে?

পরোপকারের নিমিত্তই সাধুর জীবন।

হাকিম—তুমি চুরি করিয়াছ?

আসামী—আজ্ঞে হাঁ।

হাকিম—কেন চুরি করিলে?

আসামী—আজ্ঞে, আপনাদেরই ভয়ে।

হাকিম—আমাদের ভয়ে চুরি! সে কি?

আসামী—আজ্ঞে, এই আমরা যদি চুরিটা আসটা বন্ধ করি, আপনার চাকরি থাকবে না, তা হলেই আপনারা এই ব্যবসা ধরবেন, আমরাও মারা যাব, ব্যবসাটাও মাটী হবে!

হাকিম আর প্রশ্ন না করিয়া রায় লিখিতে লাগিলেন।

যেমন শিক্ষা তেমনি পরীক্ষা।

আই—হ্যাঁ লা শেষে কুল মজালি? এ-লজ্জা রাখব কোথা?

নাতনী—(ঈষৎ কান্নার সুরে) তুই যে একদিন বলেছিলি, না মজলে কুল মিষ্টি হয় না।

প্রেম সম্ভাষণ

স্বামী—(কবিতা লেখেন) বিধুমুখি, তোমায় না দেখিলে দশদিক আমার অন্ধকার বোধহয়।

স্ত্রী—কেন, চোখের মাথা খেয়েছ নাকি?

দিব্যজ্ঞান।

সিধুবাবু মাতাল হইয়া রাস্তার উপর পড়িয়াছিলেন; সঙ্গে তাঁহার ইয়ার নিধুবাবু ছিলেন, অনেক যত্ন করিয়া হাত ধরিয়া তুলিবার চেষ্টা করিতে লাগিলেন।

নিধু বলিলেন—ওঠো ওঠো, মাটীতে পড়ে কেন? লোকে দেখলে বলবে কি?

সিধু উত্তর করিলেন—"বাবা, [illegible] অনুরোধ, জন্মভূমির মায়া আমি পরিত্যাগ করতে পারব না। 'জননী জন্মভূমিশ্চ স্বর্গাদপি গরীয়সী'। যার যা বলতে হয় বলুক, অহঙ্কার করে মাথা তুলে আর আমি চলব না।"

সৎপথের কণ্টক।

ধর্মোপদেষ্টা বলিলেন—সাধু পথে থাকিয়া শাক-অন্নে জীবনধারণ করিতে হয়, সেও ভালো; কিন্তু চুরি ডাকাইতি করিয়া ঐশ্বর্য হইলেও তাহা অগ্রাহ্য। তবে তোমরা কেন কাজে লিপ্ত হইবে?

শ্রোতাদের মধ্যে রঘু ডাকাতও ছিল, দণ্ডায়মান হইয়া জোড়হস্তে বলিল,—শুধু ট্যাক্‌সের দায়ে। চোর-ডাকাতের খাজনা দিতে হয় না। টেক্‌সও লাগে না।

উপমায় কলঙ্ক।

প্রিয়ে! তোমার মুখ-শশী যখন মনোমধ্যে উদিত হয়, তখন আমাতে আর আমি থাকি না।

"কেন ভাই! আমার গালে কি এতই মেচেতা?"

প্রণয়ী দম্পতী।

ব্রাহ্ম স্বামী।—"মনে করে শেষের সেদিন ভয়ঙ্কর।"

ব্রাহ্মিকা স্ত্রী।—"কেন, তুমি ত বিধবা-বিবাহের বিরোধী নও।"

অমৃত পাবলিশার্স প্রাইভেট লিঃ-এর পক্ষে শ্রীসুপ্রিয় সরকার কর্তৃক পত্রিকা প্রেস, ১৪, আনন্দ চ্যাটার্জি লেন, কলিকাতা—৩ হইতে মুদ্রিত ও তৎকর্তৃক ১১।১, আনন্দ চ্যাটার্জি লেন, কলিকাতা—৩ হইতে প্রকাশিত।

৭ম বর্ষ
২য় খণ্ড

অমৃত

১৫শ সংখ্যা
মূল্য
৪০ পয়সা

Friday 11th August, 1967. শুক্রবার, ২৫শে শ্রাবণ, ১৩৭৪ 40 Paise

সূচীপত্র

পৃষ্ঠা	বিষয়		লেখক
৮৪	চিঠিপত্র		
৮৫	সম্পাদকীয়		
৮৬	প্রতিধ্বনি		
৮৮	জীবন	(কবিতা)	—শ্রীমানস রায়চৌধুরী
৮৮	চিরসুন্দরের সাধনায়	(কবিতা)	—শ্রীহরেন্দ্রনাথ সিংহ
৮৯	পৃথিবীর বয়স	(বড় গল্প)	—শ্রীমিহির আচার্য
৯৫	১৫ই আগস্ট—১৯৬৬-'৬৭		—শ্রীযোগনাথ মুখোপাধ্যায়
৯৮	সাহিত্য ও সংস্কৃতি		
১০০	সূর্য কাঁদলে সোনা	(উপন্যাস)	—শ্রীপ্রেমেন্দ্র মিত্র
১০৭	দেশেবিদেশে		
১০৮	বৈষয়িক প্রসঙ্গ		
১০৮	ব্যঙ্গচিত্র		—শ্রীকাফী খাঁ
১১০	মস্কো ফিল্ম ফেস্টিভ্যাল		—শ্রীদিলীপ মালাকার
১১৩	প্রেক্ষাগৃহ		
১২৩	খেলাধুলা		—শ্রীদর্শক
১২৫	কেন এই পশ্চাৎগামিতা ?		—শ্রীশঙ্করবিজয় মিত্র
১২৭	ফুটবলের শ্রেষ্ঠাংশে		—শ্রীবিপুল বন্দ্যোপাধ্যায়
১২৯	আধুনিক	(উপন্যাস)	—শ্রীবিভূতিভূষণ মুখোপাধ্যায়
১৩২	জানাতে পারেন		
১৩৩	গৌরাঙ্গ-পরিজন		—শ্রীঅচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্ত
১৩৫	অঙ্গনা		—শ্রীপ্রমীলা
১৩৭	আমার কাল আমার দেশ	(স্মৃতিচারণ)	—শ্রীসুধীরচন্দ্র সরকার
১৩৯	বিজ্ঞানের কথা		—শ্রীশুভঙ্কর
১৪১	বাঁশবন আমক কোকেন		—শ্রীবনবিহারী মোদক
১৪৭	রেখাচিত্র		—শ্রীপুলকেশ দে সরকার
১৪৯	রহস্যময়ী জাহ্নবী		—শ্রীদেবীপ্রসাদ বন্দ্যোপাধ্যায়
১৫৫	মরণ আমার মরণ		—শ্রীসমর পাল
১৫৬	সাত-পাঁচ		—শ্রীচন্দ্রশেখর মুখোপাধ্যায়
১৫৭	পুরনো পাতা : কোলেদের নৃত্য ও বিবাহ		—সঞ্জীবচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়

স্বপ্ন বিশ্লেষণ প্রসঙ্গে

বিগত ৩০-৬-৬৭ তারিখের 'অমৃত' পত্রিকায় স্বপ্ন-বিশ্লেষণ—প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য' নামে আমার যে প্রবন্ধটি প্রকাশিত হয়েছিল, সে সম্পর্কে দু'টি আলোচনা আমার দৃষ্টি আকর্ষণ করেছে। (অমৃত, ২৮-৭-৬৭) আমি প্রথমেই পত্রলেখক শ্রীসন্তোষকৃষ্ণ গুপ্ত ও শ্রীকালীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়কে এই আলোচনার জন্যে আন্তরিক ধন্যবাদ জ্ঞাপন করছি। শ্রীযুক্ত সন্তোষকৃষ্ণ গুপ্ত মহাশয় যে প্রশ্নের অবতারণা করেছেন, সে সম্পর্কে আমার কিছু বক্তব্য আছে।

শ্রীযুক্ত সন্তোষ গুপ্ত মহাশয় লিখেছেন, 'স্বপ্ন সম্বন্ধে অবচেতন মনের ক্রিয়া প্রতিটি ক্ষেত্রে বিশ্বাস্য নয়। কারও কারও ক্ষেত্রে স্বপ্নের একটি দৈবিক শক্তি কাজ করে।' দৃষ্টান্তস্বরূপ তিনি লিখেছেন—(১) আমি স্বপ্নে দু'টি দুরারোগ্য ভেষজ পেয়েছি পর পর ছ' মাস অন্তর। প্রত্যেকটি ভেষজই শিবকর্তৃক প্রদত্ত।

(২) বৃত্তি পরীক্ষা যেদিন দিতে যাব, তার পূর্বে রাত্রে উক্ত পরীক্ষার ফলাফল সংবলিত ইংরেজিতে টাইপ করা একটি কাগজ স্বপ্নে আমার হাতে আপনা আপনি এসে যায়। এতে যারা পরীক্ষায় প্রথম ও দ্বিতীয় স্থান অধিকার করেছে, তাদের নাম ছিল। পরীক্ষার ফল বের হলে দেখা গেল, পূর্বদৃষ্ট স্বপ্ন সত্যে পরিণত হয়েছে।

আমি আমার প্রবন্ধে এ কথার উল্লেখ করেছি যে, স্বপ্ন-সম্পর্কে সকল রহস্য পাশ্চাত্য মনোবিজ্ঞানীরা আজও উদ্ঘাটন করতে পারেন নি। স্বপ্নে ভেষজ-প্রাপ্তির বা অনাগত ঘটনা প্রত্যক্ষ করার কোনো সঙ্গত কারণ মনস্বী ফ্রয়েড নির্দেশ করতে পারেন নি। স্বপ্নে ঔষধ-প্রাপ্তি সম্পর্কে মনীষী গিরীন্দ্রশেখর বসু লিখেছেন, তাকে কিছুতেই সন্তোষজনক ব্যাখ্যা বলা চলে না। অবশ্য, স্বপ্নে যে কখনও ভাবী ঘটনার পূর্বগামিনী ছায়া আমরা প্রত্যক্ষ করি, মনস্বী ইয়ং তা স্বীকার করেন। এ প্রসঙ্গে আমি My Experiments with Time গ্রন্থের লেখকের অভিজ্ঞতার কথাও বলেছি। বঙ্কিমচন্দ্রের বিষবৃক্ষে কুন্দনন্দিনীর স্বপ্নের কথাও এ প্রসঙ্গে আমাদের স্মরণ হয়। আমি লিখেছি, স্বপ্নকালে আমাদের পঞ্চ ইন্দ্রিয়ের ক্রিয়া স্তব্ধ হয়ে যায়, তখন বহির্জগৎ আমাদের মনকে বিক্ষিপ্ত করে না, কিন্তু তখনো শ্বাস-প্রশ্বাস ক্রিয়া ও নাড়ীর স্পন্দনের ন্যায় ত্রিগুণের ক্রিয়াও চলতে থাকে। যদি কখনও স্বপ্নকালে আমাদের সত্ত্বগুণ প্রবল হয়, তা হলে, সহসা আমরা দেশ ও কালের সীমাকে অতিক্রম করি, আর তখনই আমরা অনাগত ঘটনাকে প্রত্যক্ষ করি। এ ব্যাখ্যা আধুনিক বৈজ্ঞানিকদের মনঃপূত না হলেও ভারতের প্রাচীন ঋষিদের অনুমোদিত।

স্বপ্নে যে অনেক অলৌকিক ঘটনা ঘটে, মহর্ষি পতঞ্জলি তা স্বীকার করেছেন। স্বপ্নে ভেষজ-প্রাপ্তি এরূপ একটি অলৌকিক ঘটনা (occult phenomenon)। আমরা বিশ্বাস করি, পরা মনোবিদ্যা বা para-psychology এ বিষয়ে একদিন আলোক-সম্পাত করবে। এ যুগের অনেক মনোবিজ্ঞানী সেক্সপীয়ারের সঙ্গে স্বীকার করেন—

'There are more things in Heaven and Earth than are dreamt of in your Philosophy'

এ বিষয়ে মহর্ষি পতঞ্জলির একটি সূত্রও আমি উদ্ধৃত করেছি—'স্বপ্ননিদ্রাজ্ঞানাবলম্বনম্বা'। এ বিষয়ে যোগশাস্ত্র-সম্মত ব্যাখ্যা। এই—আমাদের আকূতি যেখানে আন্তরিক, সেখানে দেবতা বা মহাপুরুষই আমাদের প্রার্থনা শোনেন। তাই আমাদের স্বপ্নাবস্থায় আমরা কোনো দেবতা বা বিদেহী আত্মার কৃপা প্রাপ্ত হই। অবশ্য, এ ব্যাখ্যা শুনে অনেক বৈজ্ঞানিক উপহাস করবেন, কিন্তু যোগীরা বলেন, এটা হচ্ছে যোগজ প্রত্যক্ষের রাজ্য, এ রাজ্যে আমাদের ইন্দ্রিয়সমূহের কোনো প্রবেশাধিকার নেই।

পরিশেষে বক্তব্য, যেখানে স্বপ্নে অলৌকিক ঘটনা ঘটে, সেখানেও অবচেতন বা অচেতন মনের প্রভাব অস্বীকার করা যায় না। লেখকের নিজের উক্তি থেকেই জানা যায়, স্বপ্নে ভেষজ-প্রাপ্তির পূর্বে তিনি প্রতিবেশী দু'টি রোগী সম্পর্কে বিশেষ চিন্তিত ছিলেন। তাই তাঁর অচেতন মনে এরূপ আকাঙ্ক্ষা হয়তো ছিল যে, যদি কোনো দেবতা বা মহাপুরুষ কৃপা করে দুরারোগ্য ব্যাধির ঔষধ প্রদান করেন, তবে তিনি তাঁর প্রতিবেশীদের রোগমুক্ত করতে পারেন। আবার লেখক যদিও সচেতনভাবে শিবের ধ্যান করেন নি, তথাপি হয়তো শিবের প্রতি তাঁর অচেতন মনে একটা আকর্ষণ বা ভীতির ভাব সঞ্চিত ছিল। অবশ্যি, যেটা এখন মনের নির্জ্ঞান স্তরে চলে গেছে, সেটা হয়তো একদিন ছিল মনের প্রাক্-চেতন স্তরে (in the pre-conscious)। আমাদের মনের অচেতন স্তরের সন্ধান পেতে হলে কিন্তু কোনো মনঃ-সমীক্ষকের আশ্রয় গ্রহণ করা কর্তব্য।

—ত্রিপুরাশঙ্কর সেন,
কলকাতা

আত্মবিস্মৃত জাতির ইতিহাস

আপনাদের (৭ম বর্ষ, ১ম খণ্ড, ৯ম সংখ্যায় শুক্রবার ১৫ই আষাঢ়) "অমৃত"তে প্রকাশিত শ্রীঅভয়ঙ্করের ধারাবাহিক রচনা সাহিত্য ও সংস্কৃতির মাধ্যমে 'আত্মবিস্মৃত জাতির ইতিহাস' সমালোচনাটি বিশেষ মূল্যবান ও একান্ত সময়োপযোগী হয়েছে। ডাঃ নীহাররঞ্জন রায়ের বাঙালীর ইতিহাস একটি অবিস্মরণীয় গ্রন্থ। তার উপর ভিত্তি করে জ্যোৎস্না সিংহরায় প্রকাশ করেছেন তাঁর সংক্ষেপিত বাঙালীর ইতিহাস। এই বইটিকে কেন্দ্র করে শ্রীঅভয়ঙ্কর সুন্দরভাবে সমালোচনা করেছেন বাঙালীর আশা-আকাঙ্ক্ষা ও ভবিষ্যতের ভাবনাকে। বাঙালী যে আজ একটি আত্মবিস্মৃত জাতি একথা বললে যদিও আমাদের মনে আঘাত লাগে—তথাপি এটা সত্য। এই বাংলা দেশেই জন্মগ্রহণ করেছিলেন শ্রীগৌরাঙ্গ, শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ, স্বামী বিবেকানন্দ, রবীন্দ্রনাথ, বঙ্কিমচন্দ্র, সুরেন্দ্রনাথ, দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন, দেশপ্রিয় যতীন্দ্রমোহন, দেশগৌরব সুভাষ এবং এইরকম বহু বহু মনীষী—যাঁরা অতুলনীয়। এই বাংলা দেশেই না একদিন ক্ষুদিরাম, বাঘা যতীনের মত ছেলেকে বুকে স্থান দিয়েছিল। কিন্তু আজ বাঙালী মানুষ হিসাবে হারিয়ে ফেলেছে তাদের গৌরবময় ঐতিহ্যকে। আজ বাঙালী পিছিয়ে রয়েছে সবাকার পিছনে। হারিয়ে ফেলেছে তার ইতিহাস। ভারতবর্ষের জাতীয় জীবনে বাঙালীর অবদান ভুলবার নয়। কিন্তু সে বাংলাও নেই—সে বাঙালীও নেই। একদিন উদাত্ত কণ্ঠে মহামতী গোখলে ঘোষণা করেছিলেন

"What Bengal thinks to day—India will think it to-morow."

সেদিন কোথায় গেল বাংলার ও বাঙালীর ইতিহাসের পৃষ্ঠা থেকে সে গৌরবময় দিনগুলি মুছে গেছে। সেদিন কি আর ফিরে আসবে। এইজন্যই আজ বিশেষ করে প্রয়োজন হয়ে পড়েছে বাঙালীর ঐতিহ্য, সভ্যতা ও সংস্কৃতির ইতিহাস জানবার।

স্বাধীনতালাভের কিছুদিন পরই সর্দার বল্লভভাই প্যাটেলের ভাষণের থেকে কিছু অংশ উদ্ধৃত করে আমার আজকের এই বক্তব্য শেষ করব।

"India took her first dip of patriotisim from the political leaders of Bengal and how can we forget today the suffering that Bengal has suffered in recent times................

......how can we forget the August 16 direct action day and the agonies of Noakhali where Mahatma Gandhi took his pledge of Do or Die and eventually died for that cause..........

....It's upto us to forget everything till Bengal is strong and takes it rightful place where it led the whole of India; because if Bengal lags behind, if Bengal is lame and lacerated, India will not rise."

আমাদের প্রিয় নেতা সর্দারজীর এই দৃঢ় ভাবণের কথা ভারতবাসী যেন কখনও না বিস্মৃত হন।

কালীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়
কলকাতা : ৩৯

পঁচিশ বছর আগে

উনিশশো বিয়াল্লিশ সালের ৯ আগস্ট ভারতবর্ষের স্বাধীনতা সংগ্রামের ইতিহাসে এক স্মরণীয় দিন। বৃটিশ শাসনের বিরুদ্ধে দীর্ঘকাল ধরে যে-সংগ্রাম চলছিল, বিয়াল্লিশ সালে এসে তা চরম রূপ নেয়। মহাত্মা গান্ধীর নেতৃত্বে ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রামীরা সেদিন ইংরেজ সাম্রাজ্যবাদীদের চরম পত্র দিয়েছিল, কুইট ইন্ডিয়া, ভারত ছাড়! এই ঘোষণার সঙ্গে সঙ্গে প্রথম সারির নেতাদের বন্দী করা হয়েছিল। ইংরেজ ভেবেছিল যে, এতেই আন্দোলন ঠান্ডা হয়ে যাবে। ভারত ছাড় প্রস্তাব কাগজের পাতাতেই থাকবে সীমাবদ্ধ। বেয়নেটের জোরে যেমন শাসন চলছিল তেমনি চলবে।

ইংরেজের হিসেবে ভুল হয়েছিল। সারা দুনিয়ায় চলছে তখন মহাযুদ্ধ। একদিকে ফ্যাসিস্ট জার্মানী, ইতালী আর জাপান। অন্যদিকে স্বাধীনতা ও গণতন্ত্র রক্ষার জন্য সোভিয়েট ইউনিয়ন, চীন, আমেরিকা, ইংলন্ড, ফ্রান্স প্রভৃতি শক্তির মহামৈত্রী। ভারতবর্ষ স্বাধীনতা ও গণতন্ত্রের পক্ষে সর্বশক্তি দিয়ে যুদ্ধ করতে রাজী ছিল, কিন্তু তারা ইংরেজের কাছে দাবী জানিয়েছিল, ভারতবর্ষেও ক্ষমতা হস্তান্তর করতে হবে জনগণের কাছে। ইংরেজের তল্পীবাহক হয়ে ভারতের জনগণ যুদ্ধক্ষেত্রে প্রাণ দিতে রাজী নয়।

সাম্রাজ্যবাদী ইংরেজ নিজের দেশের স্বাধীনতার জন্য জীবনপণ সংগ্রাম করলেও ভারতবর্ষকে তার আকাঙ্ক্ষিত স্বাধীনতার প্রতিশ্রুতি দিতে রাজী হয়নি। তার ফলেই নিরস্ত্র ভারতবাসী বিদ্রোহ করেছিল অত্যাচারী পরশাসনের বিরুদ্ধে। বিয়াল্লিশের আগস্ট সেই বিদ্রোহের আগুনে প্রদীপ্ত। শত শহীদের রক্তে রঞ্জিত আগস্টের স্মরণ দিবস প্রত্যেক ভারতবাসীর কাছেই পুণ্য পবিত্র। পঁচিশ বছর পর এই দিনটি ভারতের সর্বত্র উদ্‌যাপিত হচ্ছে স্বাধীনতা সংগ্রামীদের প্রতি শ্রদ্ধাজ্ঞাপনের জন্য এবং কষ্টার্জিত স্বাধীনতা রক্ষার সংকল্প ঘোষণার জন্য। এ প্রসঙ্গে স্মরণীয় নেতাজী সুভাষচন্দ্রের আজাদ হিন্দ বাহিনীর বীরত্বপূর্ণ সংগ্রামের কাহিনী। ভারতের অভ্যন্তরে যখন 'ভারত ছাড়' আন্দোলন পুরোদমে চলছিল তখন ভারতের বাইরে নেতাজী সুভাষচন্দ্র গড়ে তুলেছিলেন স্বাধীনতা লাভের জন্য এক সশস্ত্র বাহিনী। সামান্য সম্বল নিয়ে প্রতিকূল পরিবেশে হিন্দু-মুসলিমের ঐক্যবদ্ধ প্রতিজ্ঞায় গঠিত এই বাহিনী মণিপুর পর্যন্ত এসে পৌঁছেছিল। সে বাহিনী শেষ পর্যন্ত সামরিক দিক দিয়ে জয়লাভ করতে পারেনি, কিন্তু তার জ্বলন্ত দেশপ্রেমের আগুনে সারা ভারত প্রজ্জ্বলিত হয়ে উঠেছিল। বৃটিশ সাম্রাজ্যবাদকে ভারতের মাটি থেকে বিতাড়নের শেষ ধাক্কা দিয়েছিল আজাদ হিন্দ ফৌজ। ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রামের ইতিহাসে বিয়াল্লিশের সংগ্রাম এবং আজাদ হিন্দ বাহিনীর সংগ্রাম অবিস্মরণীয় অধ্যায় রচনা করে গেছে।

পশ্চিমবাংলার যিনি মুখ্যমন্ত্রী তিনি নিজে ছিলেন বিয়াল্লিশের সংগ্রামের এক দুর্ধর্ষ নায়ক। মেদিনীপুরে যে পাল্টা সরকার গঠন করে ইংরেজের প্রবল শক্তির বিরুদ্ধে বিদ্রোহের জয়পতাকা উড্ডীন করা হয়েছিল শ্রীঅজয়কুমার মুখোপাধ্যায় ছিলেন তার সর্বাধিনায়ক। সেদিন মুখ্যমন্ত্রী সাংবাদিকদের কাছে পঁচিশ বছর আগেকার আগুন-ঝরা দিনগুলির কথা যখন বলছিলেন তখন তাঁর কণ্ঠ অশ্রুরুদ্ধ হয়ে এসেছিল শহীদদের আত্মদানের স্মৃতিচারণায়। তিনি বলেছিলেন বীরাঙ্গনা মাতঙ্গিনী হাজরার অপূর্ব বীরত্বের কথা। সাধারণ চাষীর ঘরের বিধবা মেয়ে। বৃদ্ধ বয়সেও তাঁর দেশপ্রেমের অগ্নিশিখায় মেদিনীপুরের সাধারণ মানুষের মন প্রজ্জ্বলিত হয়েছিল। তাঁরা প্রাণ দিয়েছিলেন কিন্তু অত্যাচারী শাসকদের কাছে নতিস্বীকার করেননি।

আজ সেই শহীদদের আমরা স্মরণ করি। স্মরণ করি চট্টগ্রামের বীর বিপ্লবীদের, স্মরণ করি বিনয়-বাদল-দীনেশকে। যুগে যুগে এই অসমসাহসী তরুণের দল আত্মদান করে গেছেন ভারতবর্ষের স্বাধীনতার জন্য। তাঁদের জীবনসাধনা ব্যর্থ হয়নি। মৃত্যুর সাগরপারে তাঁরা আজ অমর। তাঁরা সংগ্রাম করে গেছেন, কিন্তু সংগ্রামের শেষ দেখে যেতে পারেননি। স্বাধীন ভারতের মানুষের মহান কর্তব্য হ'ল সেই বীর শহীদের স্মৃতি থেকে আগামীদিনের সংকল্পের প্রেরণা গ্রহণ করা। যাঁদের আত্মদানে আমরা স্বাধীনতা লাভ করেছি তাঁদের স্মৃতিরক্ষা তখনি সার্থক হবে যখন এই স্বাধীনতার প্রতিশ্রুতি সমাজের সর্বস্তরের মানুষের জীবনে সফল হবে।

পঁচিশ বছর আগে যে-উন্মাদনা, আন্তরিকতা ও স্বার্থত্যাগ ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রামকে মহনীয় করে তুলেছিল, আজ পঁচিশ বছর পর স্বাধীন ভারতের নাগরিকদের আত্মঅবলোকন করে দেখতে হবে যে, আমরা সেই স্বপ্নকে সার্থক করে তুলতে পেরেছি কিনা। শহীদ দিবস শুধুমাত্র অনুষ্ঠান পালনের দিবস নয়। এক-একটি দিন এক-একটি বিশেষ তাৎপর্য নিয়ে আসে আমাদের কাছে। আজকের দিনের তাৎপর্য হল নিঃস্বার্থ সেবার, আত্মদানের এবং সংগ্রামের সংকল্প গ্রহণের। ভারতের বর্তমান দুর্দশা যে কোনো আত্মমর্যাদাসম্পন্ন নাগরিককেই বিচলিত না করে পারে না। এখন তাই নতুনতর সংগ্রামের আহ্বান এসেছে ভারতীয়দের কাছে। সে সংগ্রাম মানুষের দুঃখমোচনের সংগ্রাম। বিয়াল্লিশের শহীদরা যে আদর্শের জন্য আত্মদান করে গেছেন, আজকের ভারতীয় নাগরিকরা যেন তা বাস্তবে রূপায়িত করার জন্য সংকল্প গ্রহণ করেন। এটাই হল আজকের দিনের আহ্বান।

গান তখনই রচনা করে আমাদের গেয়ে শোনালেন। অনেক রাতে তবে ছাড়া পেলাম। [প্রগতি ।। রবীন্দ্র-নজরুল সংখ্যা, ১৩৭৪]

প্রাণীদের জীবন-সমস্যা ও সমাধান

বিজয় সেন

প্রাণীজগতকে নিরামিষাশী ও মাংসাশী এই দুই ভাগে ভাগ করা যায়। নিরামিষাশীদের কাছে খাদ্য সংগ্রহ করা খুব একটা বড় সমস্যা নয়। প্রকৃতি তাদের সাহায্য করে। কিন্তু মাংসাশীদের নির্ভর করতে হয় প্রাণী-জগতের উপর। এদের শিকারগুলোও আত্মরক্ষার্থে সদাই সতর্ক থাকে। তাই খাদ্য সংগ্রহ মাংসাশীদের কাছে নিঃসন্দেহে একটি বড় সমস্যা। কিন্তু না খেয়েও তো ওরা মরতে পারে না। তাই শিকার ধরার জন্য ওরা নানা পদ্ধতি অবলম্বন করে। এই সব পন্থা বিশেষভাবে পরিলক্ষিত হয় তাদের শিকার খোঁজা, ধরা, হত্যা করার মধ্যে।

শিকারী জন্তু শিকারের অবস্থান জানতে পারে ওদের তীক্ষ্ণ দৃষ্টিশক্তি, শ্রবণশক্তি ও ঘ্রাণশক্তি দিয়ে। কোন কোন প্রাণী, যেমন শকুন, চিল, পেঁচা ইত্যাদি শত শত ফুট দূর থেকে ওদের অতি ক্ষুদ্র শিকারের সন্ধান পেয়ে থাকে।

বিশেষ লক্ষণীয় হলো, দ্রুত ধাবমান শিকারের উপর দূরে হতে শিকারীর অতর্কিত আক্রমণ। খুব কম ক্ষেত্রেই লক্ষ্যভ্রষ্ট হয়।

শিকারের চালচলন বিশেষে শিকারী জন্তু আবার রূঢ়প্রকৃতি ধারণ করে। যখন শিকার শিকারীকে দেখে লুকাতে চেষ্টা করে, তখন শিকারী মাটি খুঁড়তে, জোরে নিঃশ্বাস নিতে আরম্ভ করে। এরকম চলতে থাকে যতক্ষণ না শিকারী তার শিকারের সন্ধান পায়। এই সব উপায় বিশেষ করে মাকড়সা, সাপ, বিড়াল ও রাজপাখীর মধ্যে দেখা যায়। তবে প্রত্যেক প্রাণীকেই শিকার ধরার প্রথম অবস্থাতে খুব শান্ত ও সতর্ক থাকতে দেখা যায়। মাকড়সাকে শিকার ধরার প্রথম অবস্থায় দেখা যায় যে ওরা অতি শান্তভাবে কোনায় দাঁড়িয়ে জাল বুনছে। যখন কোন শিকার তার এই ফাঁদে পড়ে জালে বসে মাকড়সা অতর্কিতে আক্রমণ করে। বিড়াল শিকার দেখে ঘরের কোণে চুপ করে বসে থাকে, নিতান্ত ভিজে বিড়াল সেজে। যখনই কোন ইঁদুর বা পোকামাকড় তার অস্তিত্বকে অগ্রাহ্য করে চলতে থাকে, তখনই বিড়াল তাকে আক্রমণ করে বসে। সাপ নিজেকে গুটিয়ে বসে থাকে শিকারের আশায়। যখন শিকারের সন্ধান পায়, তখন সে নিজের গলাটি দ্রুত বের করে শিকারকে ধরে ফেলে। বহুরূপী-গিরগিটী ও ব্যাং শিকার ধরে তাঁদের লম্বা জিবের সাহায্যে। এক্ষেত্রে এদের জিবের গতি ও লক্ষ্যভেদ বিশেষ লক্ষণীয়।

পাপ-পুণ্য

প্রেমেন্দ্র মিত্র

মানুষ যেখানে এক ও একা, আর যেখানে সে অনেক ও বিচিত্র, এই দুই এর বিরোধ আর সামঞ্জস্যের ভেতর দিয়ে এক অশেষ বিকাশ বিবর্তনের সহায়ক নীতিধর্মের সূত্র খুঁজে বার করবার চেষ্টাই সার্থক পাপ-পুণ্য বিচার। ধর্ম রাষ্ট্র সমাজ সব কিছু ছাড়িয়ে এ বিচার শেষ পর্যন্ত তাই একান্ত ব্যক্তিগত। আমরা প্রত্যেকে ইচ্ছার অনিচ্ছার সামাজিক রীতি-নীতি রাষ্ট্রীয় বিধি-নিষেধ ও ধর্মের আচার অনুষ্ঠান সংস্কার যথাসাধ্য মেনে চলি, কিন্তু নিজের জীবনে নির্মল সত্যের আলোয় অস্তিত্বের সার্থকতার দিক দিয়ে পাপপুণ্যের চরম মীমাংসা খুঁজি শুধু নিজের জন্যে। সেই সন্ধানে সাহিত্য আমাদের সাথী।

(বৈতানিক ১২ঃ মে ১৯৬৭)

বাংলা ছবির নারী চরিত্র

অসীম সোম

বাংলা চলচ্চিত্র গোড়ার যুগ থেকে সাহিত্যনির্ভর। উপায় ছিল না; বিগত শতাব্দী থেকে আধুনিক বাঙ্গালী সংস্কৃতির প্রবাহে সাহিত্যেরই ছিল অগ্রণী ভূমিকা। বঙ্কিমচন্দ্রের কাল থেকে বাংলা সাহিত্যে যে আদর্শবাদ ও সমাজচেতনা কথাবস্তু ও চরিত্রের মাধ্যমে তা স্বাভাবিকভাবেই চলচ্চিত্রেও বর্তেছে। তাই বাংলা সিনেমা অনেককাল সত্যিকারের এই শিল্পমাধ্যমের চরিত্র ও কলাতন্ত্র খুঁজে না পাক তার বিষয়বস্তু, কাহিনীর আবেদন সাধারণত নিম্ন মানের ছিল না। বরং বলা চলে মহৎ ভাব, আদর্শ ও প্রেম, ত্যাগ ও তিতিক্ষা অপরিমিত উচ্ছ্বাসের সঙ্গে প্রকাশ করা হত। সাহিত্যের কথাবস্তু থেকে উপকরণ সংগ্রহ করায় ক্ষতি ছিল না বরং তাতে লাভই হয়ে থাকে। ত্রুটি ছিল বিচারে ভাবালুতা ও পলায়নবৃত্তি, পরিবেশ রচনা ও চরিত্রবিশ্লেষণে স্থূলতা, প্রকাশরীতিতে চলচ্চিত্র ভাষা ও শৈলীর অভাব। 'পথের পাঁচালীর সার্থকতা ও গৌরব সেই অভাব-মোচনে। এ বিষয়ের ব্যাখ্যা অবশ্য আমাদের বর্তমান প্রবন্ধের আলোচ্য নয়। যাই হোক একথা অনস্বীকার্য বাংলা ছবি তার গোড়ার যুগ থেকে মূলত সামাজিক বিষয় নিয়ে কাজ করেছে—আর কিছু না হোক মূল পটভূমিতে সমাজবাস্তব—অনেক ক্ষেত্রেই উঁকি দিয়ে গেছে, গভীরতা, সূক্ষ্মতা, মূল্যনিষ্ঠা, সম্পর্কে বিচারের বিশ্লেষণধর্মী ইত্যাদির যতো অভাবই থাক। সাহিত্যের মাল-মসলা নিয়ে কারবার বন্ধ করার কোন কারণ নেই। শুধু প্রয়োজন প্রকাশভঙ্গীর চলচ্চিত্রধর্মিতার এবং একেবার চলচ্চিত্রের শৈলী ও আঙ্গিকে নর-নারীর জীবন ও সম্পর্কের নিখুঁত পরিবেশনঃ তার মন ও পরিবেশের নানা বিভঙ্গের বিশ্লেষণ কিংবা একটা বক্তব্য বা জীবনদর্শনের। মোটামুটি-ভাবে বলা চলে বিষয়-ভাবনা ও গুরুত্ব আরোপের দিক থেকে বাংলা ছবির ক্ষেত্রে বলিষ্ঠ পুরুষ চরিত্রের চেয়ে পেলব নারী-চরিত্রের প্রতিই যেন দৃষ্টিপাত একটু বেশি।

(চিত্রভাষ ।। জুন ১৯৬৭)

নজরুল প্রসঙ্গে

ভবানী মুখোপাধ্যায়

আমরা প্রথম ১৯২৬-এ কাজীকে চাক্ষুষ দেখলুম ওয়াই, এম, সি, এ, হলে অনুষ্ঠিত এক ছাত্রসভায়! মনে আছে, কাজী সেদিন স্বকণ্ঠে "কাণ্ডারী হুঁশিয়ার" গানটি গেয়েছিলেন। আমাদের সারা দেহে কাঁটা দিয়ে উঠল। এরপর ১৯২৮ খৃষ্টাব্দে যখন "কল্লোলে" লিখতে শুরু করেছি, কল্লোলের বন্ধুদের সঙ্গে অন্তরঙ্গতা হয়েছে তখন কাজীকে আরো কাছ থেকে দেখলুম। প্রথম পরিচয়েই আলাপ জমে গেল। তখন আর কাজীর সেই "অগ্নিবীণার" প্রথম সংস্করণের চেহারা নেই, মাথার চুল কমে এসেছে, মেদ বৃদ্ধি হয়েছে, কিন্তু কি প্রাণখোলা হাসি, কি দরাজ দিল—হাতে টাকা থাকলে ত' কথাই নেই, না থাকলেও কাজীদা সকলকে আপ্যায়িত করছেন; তারপর আছে নানা ধরনের রসিকতা, কথার বুনানী আর অট্টহাস্য। এখন আর কাউকে হাসতে দেখি না, অথচ তখনকার দিনে কল্লোলের অফিসে বা অন্য কোথাও দু-চারজন সাহিত্যিক বন্ধু জমলে যে নির্দোষ হৈ-হল্লা চলত তার আর তুলনা মেলে না।

একদিন ট্যামার লেনে মেগাফোন কোম্পানীর কাজে কাজী আছেন, আমাদের কি একটা দরকার ছিল, প্রবোধ সান্যাল এবং আমি; সঙ্গে হয়ত আর কেউ ছিলেন। তখন সেই বিচিত্র বাড়ির দোতলার এক খুপরি ঘরে গিয়ে উঠলাম, দেখি গলদঘর্ম হয়ে কাজীদা একটা নতুন গানের সুর দিচ্ছেন। সামনে পিকদানী হ্যান্ডেল ভাঙা চায়ের কাপ, তবলা ইত্যাদি। আমরা পৌঁছতেই পড়ে রইল হাতের কাজ, হাসি-ঠাট্টা আরম্ভ হল, ফরমায়েস-মাফিক করেকটি গান শোনা গেল, চা এল, পান এল; সেইদিনই কাজীদা ইনকাম ট্যাক্সের ওপর এক অপূর্ব হাসির

বেশীর ভাগ ক্ষেত্রেই দেখা যায় যে প্রাণীরা শিকার ধরার সঙ্গে সঙ্গেই তাকে মেরে ফেলে খেতে সুরু করে দেয়। কোন কোন ক্ষেত্রে এর ব্যতিক্রমও দেখা যায়। যেমন বিড়াল জাতীয় কোন জন্তু যদি পাখী শিকার করে থাকে, তবে দেখা যায় যে, বিড়াল যতই ক্ষুধিত হোক না কেন, পাখীর পাখনা না ছাড়িয়ে সে কখনো শিকারকে মুখে দেবে না। গিনিপিগ জাতীয় জন্তুরা ফলের খোসা না ছাড়িয়ে কখনো মুখে দেয় না। আবার দেখা যায় যে Cray-fish (এক জাতীয় গলদা চিংড়িকে) ভোঁদড়েরা শক্ত খোসাসমেত খেয়ে ফেলে। তেমনি "Thrush" বা গায়কপক্ষী শামুকের শক্ত আবরণটিকে ছাড়িয়ে কেবল নরম অংশটুকুই আহার করে। বেজীরা ডিম খুব পছন্দ করে কিন্তু ওদের ছোট মুখের সাহায্যে ওরা ডিম ভাঙতে পারে না। সুতরাং বেজী সামনের পায়ের সাহায্যে ডিমকে ধরে পাথরে আছাড় মারে। ডিম ভেঙে গেলে খায়।

(বিজ্ঞান বার্তা।।এপ্রিল ৮ই মে ১৯৬৭)

আর কোনোখানে

লীলা মজুমদার

হাজারিবাগেও একজন আশ্চর্য মানুষের সঙ্গে দেখা হল। তাঁর নাম কামিনী রায়, বয়স হয়েছে, নিরাভরণ বিধবার সাজের মধ্যে দিয়ে একরকম তেজ বেরুচ্ছে। তাঁর রুগ্ন ছেলেকে নিয়ে, আমাদের বাড়ির কাছেই চমরুবাগ্ বলে একটা সাদা বাড়িতে থাকতেন। টেবিলে, ডেস্কে, টেবিলের টানার রাশি রাশি কবিতা, কবে কোন পত্রিকায় বেরিয়েছে কিংবা মোটা একটা খাতায় লেখা অপ্রকাশিত কবিতা, সেগুলি এখন বাছাই হচ্ছে, পুস্তকাকারে প্রকাশিত হবে। শুনলাম বইয়ের নাম হবে "দীপ ও ধূপ।" কি করে যে আমিও ঐ রাশি রাশি কবিতা বাছাইয়ের কাজে ডুবে গেলাম মনে নেই। নেশার মতো লেগে গেল। মাঝে মাঝে কামিনী রায় আমাদের কবিতা পড়ে শোনাতেন। মাইক্রোস্কোপের মধ্যে দিয়ে দেখা একবিন্দু জলের বিষয়ে একটা কবিতা শুনলাম। তার পদগুলির কিছুই মনে নেই, কিন্তু রোমাঞ্চটুকু এখনো মনে লেগে আছে।

ইংরাজীতে একটা বড় ভালো কথা আছে— **Awareness** যে গুণ না থাকলে শিল্পীর শিল্পসৃষ্টি হয় না। এগুণ হল এক ধরণের সূক্ষ্ম সচেতনতা যা সাধারণ লোকের হয়তো চোখেও পড়ে না, তাই দেখে অন্তরের মধ্যে থেকে সাড়া দেওয়া, কামিনী রায়ের মধ্যে সেই জিনিস চিনতে পারলাম। বাস্তবিক অমন মেয়ে এদেশে বিরল। তাছাড়া সাহিত্যপ্রতিভার সঙ্গে তীক্ষ্নবুদ্ধির সমাবেশ খুব বেশি দেখা যায় না।

এর কয়েক বছর পরে, ১৯৩১ সালের শেষে, রবীন্দ্রনাথের সত্তর বৎসর পূর্তি উৎসবে যাঁরা শ্রদ্ধার্ঘ্য দান করেছিলেন, তাঁদের মধ্যে কামিনী রায় ছিলেন অগ্রণী। আমি সে সভায় উপস্থিত ছিলাম। বার বার মনে হয়েছিল এই জনতার দৃষ্টির সামনে সজ্জিত মণ্ডপের উপরে সাদা গরদপরা এই মানুষটির আসল পরিবেশ এ নয়। সেই যে হাজারিবাগে দেখেছিলাম, সাদা বাড়ির নিচু বারান্দায় বেতের চেয়ারে বসে, দিনান্তের শেষ সূর্যালোকটুকুকে ধরে রেখে, হাতেলেখা কবিতার খাতা থেকে গম্ভীর কণ্ঠে পড়ছেন, দূরে নীল বনানীর রেখা আস্তে আস্তে অন্ধকারের সঙ্গে মিলিয়ে যাচ্ছে, আর পড়া সম্ভব হচ্ছে না— সেই ছিল তাঁর আসল পরিবেশ।

[কথাসাহিত্য ।। আষাঢ়, ১৩৭৪]

জীবন ॥

মানস রায়চৌধুরী

ঘোড়ার পিঠে বিশ্রামের ছলনা এই চলমানতা
জীবন নাকি অন্য নামে ডাকতে হলো তাকে?
মাঠের মধ্যে মাঠ রয়েছে শেষের মধ্যে শুরু
কাকে আমি যে মন্ত্র শেখাই কে যে আমার গুরু
সেই প্রশ্নের মীমাংসা চাই হাজার রকম ডাকে
বুকের ভিতর প্রতিধ্বনি ভাঙছে নির্জনতা।

কাউকে আমার নেই প্রয়োজন ঘোড়া আমার ঘোড়া
তা-ও চাইনি পরিবর্ত স্বেচ্ছাচারী ওড়া
মেঘের মধ্যে ত্যাগের মধ্যে। সাধ্যাতীত পাখা
গুটিয়ে রেখে আলস্য এই ঘোড়ার পিঠে জীবন
দোদুল্যমান তুলার স্থিতি অস্থিরতার সাম্য
কোথায় অচেল কেশপুঞ্জে ছায়া পরাচ্ছে রিবন
রঙ মেলানো বিশাল শূন্য পেরিয়ে কোথায় থামব!

চলমানতায় এই যে থামা, এই যে সহিষ্ণুতা
সব কিছুকে বদলে দিয়ে রিফুকর্মের সুতা
জুড়ছে জীবন ফাঁক ভরছে অলৌকিক সূচে
কখন যে কার ফুটছে সিঁদুর কারো কপাল মুছে
বৈধব্যের শুভ্রতা ছায়, ঘুমের মধ্যে অস্থিরতার ঘোড়া
দীর্ঘ দুপুর ছুটিয়ে বেড়ায়—এই বিশ্রাম আছে জীবনজোড়া।

চিরসুন্দরের সাধনায় ॥

হরেন্দ্রনাথ সিংহ

হে অতীতকাল স্রোতে কোথা চলে যাও—
এ রহস্য চিরদিন অজ্ঞাত গোপন,
অনন্ত চলার পথে জনম জনম;
কত কি বিচিত্র রঙে মায়ায় ভুলাও।
স্নেহ প্রীতি ভালবাসা চকিতে বিলাও—
রেখে গেলে যৌবনের স্মৃতির স্বপন,
তোমারি বিহনে ব্যর্থ সাত্ত্বিক জীবন;
পাথেয় দিয়েছ যাহা পাবো না কোথাও।

যাদের সৌন্দর্যে প্রেমে হয়েছি মোহিত,
নয়নে নয়নে প্রাণে ছিল একদিন।
বার্ধক্যে জরায় শোকে তারা উপনীত,
অধরে অমিয় হাসি অতীতে বিলীন।

সুন্দরের সাধনায় বিলুপ্ত বাসনা,
মনের যৌবন লভে চেতনা প্রেরণা।
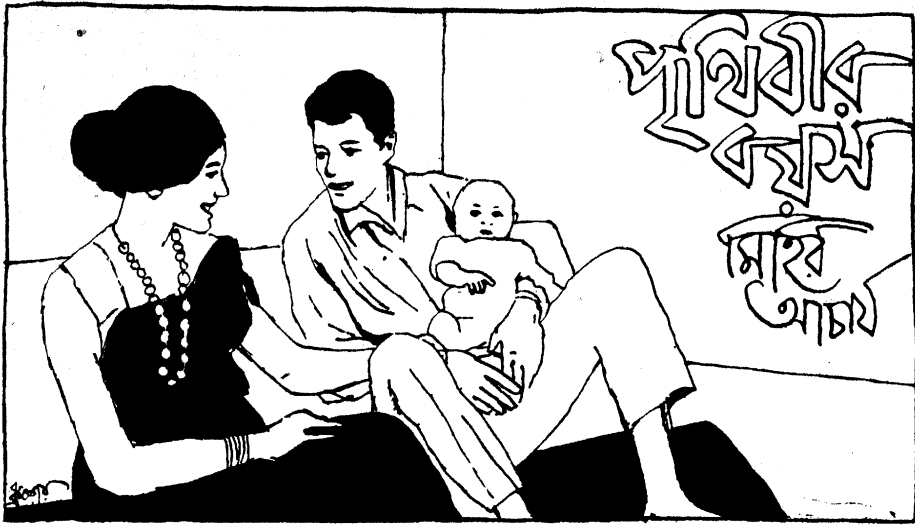
হাসপাতালের প্রচণ্ড তাগাদার জন্যে বকুলকে বাড়ি আনবার ব্যবস্থা করতে হল।

এই সময়ে মা-হওয়ার মরশুম। কোন বেড খালি নেই। বাড়তি বেড দিয়ে, এমন কি বারান্দার মেঝেয় বিছানা করে দিয়েও কুলোচ্ছেনা। অথচ যাঁরা আসছেন তাঁদের ফিরিয়ে দেয়াটাও অকর্তব্য।

তাছাড়া প্রসূতি এবং শিশু দুজনেই চমৎকার সুস্থ। বাড়িতে প্রিয়জনের সান্নিধ্যে থাকতে পারলে তাড়াতাড়ি দুর্বলতাকে কাটিয়ে উঠতে পারবে। হাসপাতাল থেকে কিছু প্রেসক্রিপশন করে দেয়া হল।

আপিস থেকে কিছু অগ্রিম জোগাড় করল সুধন্য। হাসপাতালে যাবার মুখে শাশুড়িকে তুলে নিল বাড়ি থেকে। আগের দিনই ছাড়পত্রের ব্যবস্থা করা ছিল। ইনভ্যালিড চেয়ারে লিফটে নামল বকুল। ওকে অতিশয় ক্লান্ত ও আতুর দেখাচ্ছে। অস্বাভাবিক ফ্যাকাশে মুখে ছেঁড়া ছেঁড়া হাসির আভা ছিল। মার কোলে ব্যাণ্ডেজের মতন জড়ানো শিশু। আরামে ঘুম দিচ্ছে।

ট্যাক্সি আসতেই বকুলকে আস্তে আস্তে গাড়িতে তুলে দেয়া হল। মাও উঠলেন। প্রার্থীদের বকশিশ মেটাতে খুচরো পাঁচ টাকা বেরিয়ে গেল সুধন্যর।

ট্যাক্সি হাসপাতালের পাঁচিল পেরিয়ে রাজপথে নামল।

মা বললেন, 'জানিস খুকি, একেবারে বাপের আদল পেয়েছে।'

বকুল পাকামো গলায় বললে, 'এখনো কিছু বলা যায় না।'

মা হাসলেন। 'সুধন্যর খোকা পছন্দ হয়েছে তো?'

সুধন্য পিছনে ঘাড় ফেরাল না। সে যেন হঠাৎ ড্রাইভারকে দিকনির্দেশ করতে ব্যস্ত হয়ে উঠল। বস্তুত সুধন্যর কেমন লজ্জা করছিল। হঠাৎ একটা অপ্রস্তুত-পিতৃত্ব যেন তার ওপর চাপিয়ে দেয়া হয়েছে। এবং সুধন্যর মনে হল সম্পূর্ণ অপরিচিত একটা সরল গার্হস্থ্যরস তাকে অজান্তে ভিজিয়ে দিচ্ছে।

'তোকে বলছিলাম, কিছুদিন না হয় আমার কাছেই থাকতিস। তোরা দুজনেই ছেলেমানুষ...' মা বললেন : 'সারা রাত বাচ্চার জন্যে জাগতে হলে তোর শরীর খারাপ হয়ে যাবে খুকি। তারপর সুধন্যর আপিস আছে, কেইবা রান্নাবান্না করবে...'

বকুল বললে, 'না মা। দেখো ঠিক চলে যাবে।'

মা বললেন, 'তোর বাবা অবশ্য বলছিল আমাকে তোদের কাছে থাকতে।'

বকুল বললে, 'বাবার কষ্ট হবে।'

'আমি একটা ব্যবস্থা করেছি। ওদের খাইয়ে-দাইয়ে রাত্তিরে নীলুকে নিয়ে তোর ওখানে চলে আসব।'

'তাহলে তো ভালোই হয়।'

সুধন্যও যেন স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলল।

'কী জানিস রাত্তিরটাই হচ্ছে অসুবিধের। তুই তো এখন পাগলের মতন ঘুমোবি। আর না ঘুমোলেও চলবে কেন। ছুটি তো বেশি দিন পাবি নে। আমি বুড়ো মানুষ এমনিতেই রাত্তিরে ঘুম হয় না, তোর ছেলেকে না হয় রাত জেগে পাহারা দেবো।'

মা পরিপাটি করে বিছানা করে ছিলেন।

বকুলের ইচ্ছে ছিল বসে থাকবার।

মা বললেন, 'অত ধকল সইবে না বাছা। শুয়ে পড়।'

বকুল শুয়ে পড়ল। বাচ্চাকে ওর পাশে শোয়ানো হল।

মা এবার সুধন্যকে বললেন, 'এই বেলা তোমাকে কেনাকাটা সারতে হবে।'

সুধন্য যেন কাজ পেয়ে বাঁচল। বাইরে না বেরুলে তার সিগারেট খাওয়া হচ্ছিল না।

'কী আনতে হবে বলুন?'

'গজ দুয়েক অয়েল ক্লথ, আর একটা ফিডার, আছে বটে একটা, হঠাৎ ভেঙে গেলে কী হবে? আর, বাচ্চাদের মশারি। বকুল, আর কিছু লাগবে?'

'না। ফুড তো এখনো আছে।'

'তাহলে—' মার হঠাৎ মনে পড়ল : 'আর, গ্রাইপ-ওয়াটার নিয়ে রাখো। ভিটামিন কী ডাক্তারবাবু এখন খাওয়াতে বলেছেন? ওটা পরে হলেও চলবে।'

সুধন্যর বকুলের ওপর চোখ পড়তে দেখল : বকুল ওকে জিভ দেখাচ্ছে তার মানে কেমন জব্দ এবার বোঝো। সুধন্য গম্ভীর হয়ে গেল।

রাস্তায় বেরিয়ে প্রথম এক কাপ চা খেতে ইচ্ছে করল। তাড়াতাড়ি কিছু নেই। চায়ের কাপ মুখে নিয়ে আরাম করে সিগারেট ধরাল সুধন্য।

আশ্চর্য, আমি কী সত্যিই পিতা বনে গেছি! কিন্তু এর কোন গৌরব তো আমাকে অন্য কিছু করে তুলছে না। এই কেনাকাটি করার ব্যাপারেও সে ভিন্ন কোন স্বাদ অনুভব করছে না। বরং শাশুড়ির সামনে এই কেনা-কাটিগুলো তাকে কর্তামির সুযোগ দেবে। তাঁর মেয়ে যে একেবারে অমানুষ দিগম্বরের হাতে পড়ে নি, সেটাও বোঝানো যাবে।

কিন্তু এ জাতীয় বুদ্ধিমান চিন্তাও সুধন্যকে স্বস্তি দিল না। আসলে তার ভেতরে একটা অন্যায়বোধ তাকে সংকুচিত করে রাখছিল, যেন সবাই জানে এই অন্যায়টা, কেউ কারুর কাছে প্রকাশ করছে না, অথচ বিবেক নামক জাগ্রতচক্ষু পদার্থটা প্রহরীর মতন দাঁড়িয়ে। যেন ওই অয়েলক্লথ আর ফিডার দিয়ে সে বিবেককে চাপা দেবার চেষ্ট করছে।

বস্তুত অপরাধবোধটা কিসের? সুধন্য নিজের কাছে প্রশ্ন করল। পিতৃত্ব বিষয়ে কেমন একটা শারীরিকতার প্রসঙ্গ যুক্ত রয়েছে। অবশ্য ব্যাপারটা সকলেরই জানা।

তবু...। বকুল হাসপাতালে থাকার সময় নিঃসঙ্গ শয্যায় শুয়ে শুয়ে সুধন্য এ নিয়ে অনেকবার ভেবেছে, আর আশ্চর্য হয়েছে। এই পিতৃত্ব তার মনকে আচ্ছন্ন করতে পারে নি। এমন কি তার মনের আকৃতিতে কোন পরিবর্তনের সুরও সে বোধ করে নি। তাহলে পিতৃত্ব কী মনোজগতের কোন ব্যাপার নয়!

অতিরিক্ত বেলা করে সুধন্য ঘর্মাক্ত অবস্থায় বাড়ি ফিরল।

বকুল বললে, 'নিউ মার্কেটে গিয়েছিলে বুঝি?'

মানে! সুধন্য ওর এ ধরনের প্রশ্নে কেমন হয়ে গেল। তারপর বকুলের চোখের দিকে তাকাল। 'ও ঠাট্টা হচ্ছে?'

'কটা বেজেছে খেয়াল আছে?'

'ঘড়ি দেখে কাজ-করার অভ্যেস আমার নেই।' সুধন্য বিরক্ত হল।

'মা চলে গেছেন। আমার একলা বুঝি ভাল লাগে?'

'আমি কী জানি মা চলে যাবেন।'

'জানলে বুঝি তাড়াতাড়ি ফিরতে। বিশ্রাম করে চান করো। মা রান্না সেরে গেছেন। তোমার জন্যে অপেক্ষা করে করে আমাকে খেয়ে নিতে হল।'

সুধন্য পা ছড়িয়ে বকুলের কাছে এসে বসল।

বকুল মুখ টিপে বললে, 'মতলব কী?'

'কিছু না। এমনি।'

'বাবু খুব বেকায়দায় পড়লে মনে হচ্ছে—'

'কেন?'

'এই ভাগিদার এসে জুটল। আর আমাকে পাচ্ছ না।'

সুধন্য বললে, 'তার মানে আমাকে আর তোমার দরকার নেই, এই তো?'

'নেই-ই তো। যেমন বোকা! এত তাড়াতাড়ি আমাকে এই অবস্থায় ফেলতে কে বলেছিল? যেন স্টেশনে ট্রেন এসে গেছে, এখুনিই উঠতে হবে...'

'দোষটা বুঝি আমার?'

'না আমার। কেন বই-পত্তর পড়তে পারো নি, দু-একজন ডাক্তারের পরামর্শ নিতে পারো নি? এমন আনাড়িরাম।'

'এই, কী হচ্ছে?'

'বেশ করছি।'

বকুল সুধন্যর চুলে আঙুল বুলোতে লাগল। 'আমাকে হাসপাতালে পাঠিয়ে কী রকম কাটল একা-একা বিরহ-শয়ন পাতি—'

সুধন্য বললে, 'রাত্রে ঘুম হয় নি।'

'আহা।' বকুল হাসল। 'এই ওঠো বেলা হয়েছে। চান করো।'

'ভাল লাগছে না।' সুধন্য বিছানায় কুঁড়েমি করতে লাগল।

কাঁথা মুড়ি দেয়া নবজাতক এবার তারস্বরে জানান দিল।

সুধন্য দেখল বকুল উঠে বসেছে। পাশ থেকে বকুলের মুখটা এবার ভাঙাচোরা দেখাচ্ছে। বকুল কী রোগা হয়েছে। বকুল বাচ্চাকে কোলে তুলে নিয়েছে। চোখ পিট পিট করছে নবজাতক। বকুল জামার বোতাম খুলল। বাচ্চা খাবে এখন।

'এই, যাও, এবার চান করো।' বকুল তাগাদা দিল।

'দেখছি।'

'অসভ্য।'

বিকেলবেলা কাঁধে ব্যাগ ঝুলিয়ে অনিমাদি এসে হাজির।

'আচ্ছা ছোটলোক তো তুই! আমি হাসপাতালে গিয়ে বোকা বনে গেছি।'

বকুল বললে, 'ওরা তাড়াতাড়ি ছেড়ে দিল।'

'একেবারে ম্যাডোনা হয়ে বসে আছিস। মহারাজ কোথায়?

'বাইরে চা আনতে গেছে—'

অনিমাদি ব্যাগ উজাড় করে টুকিটাকি স্টেশনারি বার করে রাখল। বেবী পাউডার, সাবান, কাজল। আর, কয়েকটি ফ্রক।

শিশু ভোলানাথ সদ্য ঘুম থেকে উঠে চোখ পিট-পিট করছিল।

অনিমাদি বাচ্চাকে ট্যাঁকে তুলে নিল।

'ইশ, কী ঘেমেছে। তোর যদি একটু খেয়াল থাকে। জানিস ঘাম বসে গেলে অসুখ করে।'

অনিমাদি নিপুণ হাতে বাচ্চাকে নিরাবরণ করল। তারপর ঘামগুলো মুছিয়ে দিল। এর পর পাউডারের কৌটো খুলে বাচ্চাকে ভস্ম মাখা সন্ন্যাসী করে ফেলল। চিত করে, উপুড় করে। যেন এক খেলায় মেতে উঠেছে।

বকুল হাসল। 'বাবা,, এত পারো তুমি।'

অনিমাদি বললে, 'চুপ কর। আর তোওয়াজ করতে হবে না।'

অনিমাদি ইতিমধ্যে বাচ্চাকে নতুন ফ্রক পরিয়ে দিয়েছে। তারপর কাজল বের করে ওর চোখে টানটান করে এঁকে দিল। কপালে একটি কাজলের টিপ।

'দ্যাখ, এবার ভোলানাথকে কেমন মানিয়েছে।'

বকুল বললে, 'তুমিই একে নিয়ে যাও। আমি একটু ঘুমিয়ে বাঁচি।'

'দিতে পারবি?' অনিমাদি হাসল। 'বুক টনটন করবে যখন—'

সুধন্য কখন এসে দরজায় আটকে ছিল।

অনিমাদি বললে, 'আসুন মশায় আসুন।'

বকুল বললে, 'অনিমাদির জন্যে খাবার নিয়ে এসো।'

অনিমাদি ধমকে উঠল। 'তুই থাম তো। তোকে ব্যস্ত হতে হবে না। আপনি বসুন মশায়।'

অনিমাদি চা ভাগ করে দিল।

সুধন্য বোকার মতন মুখ করে চায়ে চুমুক দিয়ে চলল। এখন তার কিছু করার নেই। এখন অনিমাদি আর বকুলের প্রমীলা-রাজত্ব। এবং এক শিশু-সম্রাটকে উপলক্ষ্য করে ওরা যেন রাজকীয় উৎসবে মেতে উঠেছে। সুধন্য নিজেকে আগন্তুক বোধ করল।

সুধন্য ঘর থেকে বেরিয়ে এল ভেতরের বারান্দায়। পেঁপে গাছে একটা নিঃসঙ্গ কাক। সুধন্য সিগারেট ধরাল। এক এক সময়ে নিজেকে এমন কেন মনে হয়, নিরাশ্রয়, নিরালম্ব, মাতৃহীন অনাথের মতন।

ঘরের দরজা পার হয়ে অনিমাদির কণ্ঠস্বর ভেসে আসছে, বকুলের হাসি। যেন সুধন্যর নির্ভার চেতনায় শার্শিতে অস্পষ্ট বৃষ্টির শব্দ।

(দুই)

সুধন্য দিন দিন কেমন খিটখিটে হয়ে পড়ছে। একটা বিষাদ গম্বুজের মতন তার মনের ভেতরে বিরক্তি জমিয়ে তুলেছে। সেদিন অকারণে তার সহকর্মীর সঙ্গে ঝগড়া করে বসল। পরে অবশ্য অনুতপ্ত হয়েছে সে, কিন্তু আচরণটা তো কালি হয়ে রইল।

হঠাৎ এই বিশ্রী মেজাজের কারণটা কী! নিয়মমত বাজার করে, শাশুড়ি রান্না করে রাখেন, খেয়ে-দেয়ে আপিসে বেরিয়ে যায়। সারা সকাল নিরবকাশে কাটে। বাজার স্নান এবং আহারের সময়গত বরাদ্দগুলি নির্দিষ্ট। তারপর বিকেল গড়িয়ে বাড়িতে ফেরা, চা-পান ইত্যাদি করে উঠতে উঠতে শাশুড়ি আসেন, রাতের রান্নার ব্যবস্থা করেন। তারপর আরো রাত হয়, ভেতরের বারান্দায় তার শয্যা রচনা। ঘুম আসে না। ঘরে মা ও বকুলের শিশু পরিচর্যার গুঞ্জন। গরম তেলের উগ্র গন্ধ নাকে এসে লাগে। ঘরের দরজাটা এই সময়ে ভেজানো।

সুধন্যর ঘুম আসে না। সব মিলিয়ে তার ওপর কেমন যেন একটা অত্যাচার মনে হয়। আর, ওই ভেজানো দরজাটা যেন একটা নিশ্চল অদৃষ্টের মত্য তাকে ব্যঙ্গ করে।

অথচ, এগুলি সবই স্বাভাবিক। এই নয় যে কেউ তাকে অবহেলা করছে।

তবু কেমন যেন একটা বিরক্তি, হতাশা এবং বিষাদ তাকে গ্রাস করে। এবং মনে হয় সব কিছু তার কাছে অসহ্য হয়ে উঠছে!

সমস্ত রাগ জমা হয়ে উঠছে বকুলের ওপর। যেন বকুলই এর জন্যে দায়ী, যেন এর পিছনে বকুলের অকারণ বাড়াবাড়ি আছে। সে কী একবারও সুধন্যর কথা ভাবে। এই অন্ধকার বারান্দার শয্যায় সুধন্যর কেমন করে রাত কাটে। সুধন্যর কোন কিছু প্রয়োজন থাকতে পারে কিনা।

আমার জলতেষ্টা পেয়েছে, সুধন্য নিজের মনেই বলে : কেন মানুষের জলতেষ্টা পেতে পারে না! তারপর এই যে আপিসে অ্যাডভান্স নেবার জন্যে এক মাসেই হুট করে অতগুলো টাকা কেটে নিল! কোথা থেকে টাকা আসে, বকুল কী সে সব চিন্তার কথা মনে রেখেছে! কী দায় পড়েছে সুধন্যর একা এত বোঝা মাথায় নিয়ে দিন চালানোর। একটু সহানুভূতি, সান্ত্বনা কী সংসারে কারুর কাছে আশা করতে পারে না সুধন্য!

সারা সকাল কথা বলবার সময় হয় না। বিকেলে গা জোড়া ক্লান্তি জুড়োতে-জুড়োতে সন্ধ্যা নামে, শাশুড়ি আসেন। আর সুধন্য যেন মলাটবন্ধ বইয়ের মতন স্থির হয়ে যায়। কত কথা কলরব করে ওঠে, বলতে পারে না। এমন কতকগুলো কথা আছে যা তৃতীয় পক্ষের উপস্থিতিতে বলা যায় না। এমন কথা যেগুলি লজ্জায়

দুঃখের গ্লানির, যা কেবল অন্তরঙ্গ-সৌহার্দে বাঙময় হয়ে ওঠে।

আমি বকুলকে সেই অন্তরঙ্গ মুহূর্তে পাচ্ছিনে, সুধন্য আপন মনে বলে ওঠে। এবং এবার যেন সচেতনভাবে তার বিরক্তির কারণটা সে খুঁজে পায়। কিন্তু, বিশ্বাস হয় না। সত্যিই কী সেই কোমল-স্নিগ্ধ অবকাশ নেই। আছে। হয়তো বকুলের সে সব কথা শোনবার আগ্রহ আজ আর অবশিষ্ট নেই। যেন সেই অন্তরঙ্গ সৌহার্দ'ই মরে গেছে। মরে গেছে, সুধন্য আস্তে আস্তে উচ্চারণ করল : ওই এক ফোঁটা শিশু...

সুধন্য কী অবশেষে তার আত্মজকেই ঈর্ষা করছে! হঠাৎ অন্ধকারে গালে চড় এসে পড়ার মতন সুধন্য আহাম্মক বনে গেল। সুধন্য, তুমি মূর্খ, সে নিজেকেই শোনাল : বকুল তারই, উপহার দেয়া সন্তানের রক্ষণা-বেক্ষণ করছে। সেও তো নিজের ব্যক্তিগত সুখ-সুবিধে দেখছে না। তার সন্তানকে যত্ন করা তো তাকেই যত্ন-করা।

এবম্বিধ উচ্চাঙ্গের জ্ঞানের জগৎ যে সুধন্যর আয়ত্তের বাইরে তা নয়, কিন্তু এই জ্ঞানও তাকে আশ্রয় দিতে পারে না। তার এখন বিশ্বাস হচ্ছে বুদ্ধি সব সময় হৃদয়ের ক্ষতে মলমের কাজ করতে পারে না।

কখন এক সময় নিজের অদৃষ্টকে ধিক্কার দিতে দিতে ক্লান্তশ্রান্ত সুধন্য ঘুমকেই একমাত্র অবলম্বন করে তুলছিল, হঠাৎ ঘোর কেটে গেল।

'এই, একটু সরে শো...' চাপা ঠান্ডা গলায় কানের কছে ফিসফিস করে উঠল বকুল।

রাত্রি যেন নিশ্ছিদ্র অন্ধকার সহকারে নেমেছে। আর পৃথিবীর মানুষ ঘুমে-বোঝাই নৌকোর নিথর আরোহী। ঘরের দরজাটা ভেজানো, আর সেখানে অন্ধকার পুঞ্জীভূত হয়ে উঠেছে।

সুধন্য পাশ ফিরে সরে গেল।

'একটুও ভাল লাগছিল না, হঠাৎ ঘুম ভেঙে দেখলাম তুমি পাশে নেই...' নিশি-পাওয়া গলায় জড়িয়ে-জড়িয়ে বললে বকুল।

সুধন্য বললে, 'তোমার শরীর খারাপ হবে। কেন উঠে এলে।'

বকুল কোন কথা বললে না। ওর মাথাটা ঘন হয়ে সুধন্যর বুকের ওপর উত্তাপের আলো হয়ে ফুটে রইল।

সুধন্য বললে, 'মা জানতে পারবেন।'

'না। ওরা দুজনেই খুব ঘুমোচ্ছে।'

সুধন্য ওর বুকে বকুলের হৃৎপিন্ডের আওয়াজ শুনতে পাচ্ছে। সুধন্য হঠাৎ শক্ত এক জোড়া বাহু দিয়ে বকুলকে আঁকড়ে ধরল।

বকুল বিড়বিড় করে বললে, 'জানি তোমার খুব কষ্ট হচ্ছে। আমিও তো সুখ পাইনে। অমন মুখ করে থেকো না লক্ষ্মীটি! আমার ওপর রাগ করো না।'

সুধন্যর সারা দিনের বিরক্তি গুমটগুলো যেন ঠান্ডা বরফ হয়ে গলতে শুরু করল।

রাত্রি দীর্ঘ থেকে দীর্ঘতর হচ্ছে।

বকুল বললে, 'এবার ঘুমোও। আমি যাই।'

আলুথালু বেশবাস সংযত করে বকুল উঠে দাঁড়াল। নিঃশব্দে ভেজানো দরজা খুলে ঘরের ভেতরে অদৃশ্য হয়ে গেল।

বকুল চলে-যাবার পরও ওর অস্তিত্ব উত্তাপ-সৌরভ হয়ে সুধন্যর চেতনাকে জড়িয়ে রইল। এই অনুভূতি সুধন্যকে নতুন এক স্বাদে উত্তীর্ণ করল। আশ্চর্য, এই উত্তাপ আর সৌরভের অভাবেই কী তার মেজাজ বিশ্রী তেতো হয়ে উঠেছিল। এই উত্তাপ, এই সৌরভগুলিই তাকে উদগ্র করে তুলেছিল। এখনো যেন সেই উত্তাপ-সুরভি তাকে আবিষ্ট করে রেখেছে। বকুলের শরীরের কী নিজস্ব কোন গন্ধ আছে, ওর উত্তাপের কী ভিন্ন ভাষা আছে। এরই নাম কী অন্তরঙ্গতা। নাকি, সুপ্ত কোন যৌন-কাতরতা। কিন্তু, কই, বকুল এতক্ষণ ছিল, কোন উত্তেজনা তো তাকে খরতর করে তোলে নি। ইচ্ছাগুলো মুঠো মুঠো আনন্দ হয়ে তার শরীরে প্রকাশিত হয়েছিল, কিন্তু

উত্তাপ-সৌরভের ভাসমান আনন্দের বাইরে যেতে পারে নি।

আমি প্রশান্ত ছিলাম, গাঢ় আনন্দে পরিপূর্ণ হয়ে উঠেছিলাম, সুধন্য উচ্চারণ করল : আমার বিষাদ, হতাশা, বিরক্তি—ঝরে ঝরে পড়ছিল।

সুধন্য যেন নতুন করে উপলব্ধি করল : এই উত্তাপ, এই সৌরভগুলিই জীবনের পক্ষে অত্যন্ত প্রয়োজনীয়। বোধহয় এগুলিই অন্তরঙ্গতার প্রতীক।

আর, এখন অনেক বিষয় সুধন্য পরিচ্ছন্নভাবে ভাবতে পারছে। বকুল, তাদের সন্তান এবং সে, একটি সম্মিলিত সত্তা, কারুকে বাদ দিয়ে ভাবা যায় না।

এই মুহূর্তে সুধন্য যেন দ্বিতীয়বার বকুলের প্রেমে পড়ে গেল। মনে হল বকুল এখন অনেক বেশী বিশ্বাসী, আত্মীয়, এবং তার আত্মার দোসর হয়ে গেছে। তাদের সন্তানই এই অভিন্নতা রচনা করে দিয়েছে। যেন বকুল সঘোষণায় প্রকাশ করছে : দ্যাখো তোমাকেই আমি আমার সমস্ত সত্তা দিয়ে গ্রহণ করেছি, লালন করেছি, পালন করেছি। কারণ আমার ভেতরের ভালবাসাকে তুমি জন্ম দিয়েছ।

শেষবারের মতন গভীর নিদ্রায় তলিয়ে যাবার আগে সুধন্য পাশ ফিরে অস্ফুটে গুঞ্জন করে উঠল : 'বকুল-ব-কু-ল...'

(তিন)

বেবিফুডের সন্ধানে এ দোকান-সে দোকান ঘুরে হতাশ হয়ে যখন বাসস্টপে দাঁড়িয়ে আহত অপমানিতের মতন ধুঁকছে, এই সময় হঠাৎ ফিয়াট গাড়িটা ফুটপাথ ঘেঁসে সুধন্যর পাশে থমকে দাঁড়াল।

'এই সুধন্য, এখানে দাঁড়িয়ে কী করছ?'

সুধন্য তাকিয়ে দেখল রজত।

'কী ব্যাপার, একেবারে ডুমুরের ফুল হয়ে গেছ। দেখা-সাক্ষাৎ করো না, এ্যাঁ?'

সুধন্যর অপমানিত মেজাজটা যেন বারুদের মতন জ্বলে উঠল। বললে, 'তোমাকে কী এক টিন বেবিফুডের জন্যে কলকাতার রাস্তায় হন্যে হয়ে ঘুরতে হয়!'

রজত হাসল। 'ফুড কী দোকানে-দোকানে ঘুরলে পাওয়া যায়, ব্রাদার?'

'যায় না তাতো দেখতেই পাচ্ছি। সব কী তোমার গুদোমে তুলে রেখেছে?

'না-না। আমি ফুডের কারবার করিনে। কটা দরকার বলো না, আমি জোগাড় করে দিচ্ছি। গাড়িতে উঠে এসো।'

সুধন্য নিরুপায় হয়ে গাড়িতে উঠে বসল।

'তারপর—ছেলে হয়েছে? কই, খবর দাওনি তো?' রজত বললে।

'এটা কী একটা খবর যে দিতে হবে?'

'আফটার অল, উই আর ফ্রেন্ডস। ফ্রেন্ডশিপ ইজ দি ওয়াইন অব লাইফ—কে বলেছিল কথাটা?

সুধন্য বললে, 'জানিনে।'

রজত হাসল। 'গোল্ডস্মিথ।......নাও, সিগ্রেট খাও। বাই দি বাই, সেই যে তোমার আসার কথা ছিল, কই এলে না তো? টাকার জোগাড় হয়ে গিয়েছিল বোধহয়?'

'হ্যাঁ। আর দরকার হল না।'

'বাঁচিয়েছ।' রজত হাসল। 'কী জানো, এই সমাজে স্বচ্ছল হওয়াটাও একটা মস্ত অসুবিধে। চারদিকে এত অভাব-অভিযোগ, সহানুভূতি না হলে চলে না। বিশেষত বন্ধু, আত্মীয় পরিজন—'

সুধন্য বললে, 'ব্যবসা কেমন চলছে?'

'চলে যাচ্ছে। ব্রেবোর্ণ রোডে একটা শো-রুম করেছি। আর একটা ধর্মতলায়—তোমার হাতে বিশ্বাসী লোক আছে? বুঝলে বিশ্বাসী লোক পাওয়াই আজকের দিনে প্রধান সমস্যা। চারদিকে এত ফ্রাসট্রেশন যে কোনো ক্রিয়েটিভ কাজ করতে ভরসা পাওয়া যায় না। অরগানাইজেশন, লিডারশিপ, সব উদ্যমই মানুষ খুইয়ে বসেছে। সেইজন্যে এই বাঙ্গালী জাতটার কোনো উন্নতি হল না।'

সুধন্য বন্ধুর বাগ্মিতায় বিরক্তবোধ করছিল। কেবল ওর উপকারিতার জন্যেই বিরক্তি চেপে বললে, 'বিশ্বাসী বলতে তুমি কী বোঝো? মানে, যে তোমার খোসামুদী করবে, এই তো?'

রজত হাসল। 'তোমার অনেক পরিবর্তন হয়েছে দেখছি।'

সুধন্য মাথা নেড়ে বললে, 'কী জানো, বিশ্বাসের ব্যাপারটা সমানে-সমানে না হলে টেঁকে না।'

'আচ্ছা: তুমি আপিসে কত মাইনে পাচ্ছ? ধরো যদি তার দ্বিগুণ পাও?'

'তোমার ব্যবসায়? না ভাই, আমি এসব বিষয়ে ভীষণ অজ্ঞ।'

রজত ফুটপাথ ঘেঁসে বড় স্টেশনারি দোকানটার সামনে গাড়ি দাঁড় করাল।

'এসো। তোমার ফুডের ব্যবস্থা করি।'

রজতের পিছনে সুধন্য দোকানে পা দিল।

কাউন্টারে দাঁড়িয়ে রজত সেলসম্যানকে জিজ্ঞেস করল : 'মজুমদার কোথায়? একটু খবর দিন।'

মজুমদার সহাস্যমুখে ছুটে এলেন। 'মিস্টার চৌধুরী?'

রজত হাসল। 'আমার একটা ফুড চাই। ভালো বেবীফুড।'

'স্যার, আপনি ফুড কী করবেন? বড় না ছোটো? দেখছি। কোম্পানী একদম সাপ্লাই করছে না।'

একটু পরে ওরা দুজনে ফুড নিয়ে বেরিয়ে এল।

রজত বললে, 'চলো। কাজ তো হল। কফি খাওয়া যাক।'

সুধন্য আপত্তি করল: 'না ভাই, দেরি হয়ে যাচ্ছে।'

রজতের কাছে আপত্তি টিকল না।

রাত হয়ে গেল বাড়ি ফিরতে।

ঘরে ঢুকতেই বকুলের মুখ কেমন অস্বাভাবিক গম্ভীর থমথমে। ওর কোলে শিশু কাঁথায় জড়ানো।

'মা আসেননি?'

বকুল উত্তর করল না।

সুধন্য অস্বস্তিবোধ করতে লাগল।

'কী হয়েছে?'

বকুল কঠিন গলায় এবার জবাব দিল: 'তবু ভালো এতক্ষণ বাইরে, কাটিয়ে এসে মনে পড়ল আমাদের কথা।'

সুধন্যর রাগ হওয়া স্বাভাবিক। 'বাজারের অবস্থা জানো? জানো, এক টিন ফুড পেতে কী প্রাণান্তর পরিশ্রম হয়?'

বকুল বললে, 'ভাগ্যিস। একটা অজুহাত খুঁজে বার করলে।'

'কী বলছ তুমি।'

'না কী আর বলব। বললেই বা শুনছে কে। মা আজকে আসতে পারবেন না। এদিকে আমি একা ছেলে নিয়ে—কী করি, কাকে খবর দিই। বাচ্চার গায়ে হাত দিয়ে দ্যাখো। জ্বরে গা পুড়ে যাচ্ছে।'

'সে কি।' সুধন্য হঠাৎ অসহায় বোধ করল। 'কখন জ্বর হল? তাহলে কী ডাক্তার নিয়ে আসব?'

'আমি কী জানি। তোমার ছেলে। তুমি যা ভালো বোঝো তাই করবে।'

'বারে, আমি কী ডাক্তার নাকি? আমি কী বুঝব?'

সুধন্য তখুনি জুতো পায়ে বেরুচ্ছিল।

বকুল আটকাল ওকে: 'থাক। এখন আর দরদ দেখাতে হবে না। তোমাকে তো আর পেটে ধরতে হয়নি। নীলু ডাক্তার ডেকে এনেছে, ওষুধও এসেছে।'

সুধনা স্বস্তির নিশ্বাস ফেলল। বস্তুত সারাদিনের পর বাড়িতে পা দিয়েই ডাক্তার-বদ্যি করার ব্যাপারে তার কোনো রকম উৎসাহ ছিল না। এমন কি তার নিজের সন্তানের অসুখ সম্পর্কেও কোনো উদ্বেগ ছিল না। ছেলেপিলেদের তো অসুখ হবেই, আবার সেরেও যায়। বকুলের এ ব্যাপারে অতিরিক্ত বাড়াবাড়ি আছে। কিন্তু এই সামান্য বিষয় নিয়ে বকুলের পা বাধিয়ে কলহের কী মানে হয়। তার বাইরে থাকাটা কী বাচ্চার অসুখের কারণ। না হয় রজতের সঙ্গে একপাত্র কফি খেয়েছে। কিন্তু সে যে অত বড় উপকারটা করল, সেকথা তো মনে রাখতে হবে। অবশ্য রজতের উপকারের কথা বকুলকে বলা যাবে না। তার ধনী বন্ধুদের সম্পর্কে ওর মনোভাবটা পীড়াদায়ক।

সুধন্য জামা-কাপড় ছেড়ে পাজামা পরে বকুলের কাছে বসল।

'জ্বর কত এখন?'

বকুল বললে, কী করে বলব? বাড়িতে থার্মোমিটার আছে?'

সুধন্য বললে, 'তাহলে কালকেই একটা কিনতে হয়।'

'টাকা পেয়েছ বুঝি?'

'একটা থার্মোমিটার কিনতে কত টাকা লাগে।'

টাকার ব্যাপারে বকুলের কটাক্ষের ভঙ্গি ওর ভালো লাগে না। বকুল আগে এরকম ছিল না। সুধন্য দীর্ঘশ্বাস ফেলল। সে কি ক্রমশ হতাশ হচ্ছে তার স্বামিত্ব, পিতৃত্ব সম্পর্কে। কিংবা এগুলি বকুলের ছদ্মবেশী অভিযোগ। সুধন্যর মস্তিষ্কে পুরনো চিন্তাটা আবার থইথই করতে থাকে এবং সে নিঃসঙ্গ বেদনাবোধ করে। এই জটিলতা

এত হোঁচট কেন, আর অকালজোড়া এই ক্লেদ-গ্লানি-যন্ত্রণা।

'চা খেয়েছ?'

'অ্যাঁ?' সুধন্য যেন চমকে উঠল। 'না, চা খাব না।'

'কী, রাগ হল বুঝি?' বকুল হাসল ওর দিকে চেয়ে।

'না। দরকার নেই।'

'আহা, যাও না কেতলি করে নিয়ে এসো। আমার চা না খেয়ে মাথা ধরেছে।'

'যাচ্ছি।' সুধন্য ছেলের কোমরে হাত ছোঁয়াল।

বকুল বললে, 'কোমরে বুঝি জ্বর দেখে? তুমি কিছু না জেনে কী করে এত বড় হলে, বাবা হলে, বুঝিনে।'

সুধন্য গম্ভীর গলায় বললে, 'হ্যাঁ। বড় হওয়াটাই দোষ হয়ে গেছে।'

'একেবারে আনাড়ি।' বকুল মুখ টিপে হাসল। 'যাও তো আগে চা নিয়ে এসো। জ্বরটা এখন কম মনে হচ্ছে। ঘামছে।'

কেতলি হাতে চা নিয়ে ফিরতে ফিরতে সুধন্য আবার ভাবেঃ বকুলের এই ধরনের অর্থহীন মেজাজের কারণটা কী। অকারণ এবং অন্যায় জেনেও সে কেন তার সঙ্গে এমন আচরণ করে। আমার দুশ্চিন্তাকে ওর মতো প্রদর্শন করতে পারিনে বলে! বাচ্চার অসুখ শুনে আমি কিছু নাটকীয় করলে ওর ভালো লাগত! একটা শিশু বড় হলে বস্তু তো নয়, ছোটোখাটো কত অসুখ করবে, এগুলি তো প্রকৃতিকে আয়ত্ত করবার জন্যে যুদ্ধ! ভালো একটা যুক্তি পেয়েছে ভেবে সুধন্য বুদ্ধিমানের মতন হাসল।

বকুল বাচ্চাকে বিছানায় শুইয়ে দিল। 'কাল একবার আমার ইস্কুলে যাবে। আর এক হপ্তা ছুটি বাড়িয়ে নিতে হবে।'

সুধন্য সিগারেট ধরাল।

বকুল বললে, 'এরপর ইস্কুলে জয়েন করলে যে বাচ্চার কী হবে, ভাবতেই পারিনে। ইস্কুলে যাবার পথে মার কাছে রেখে যেতে হবে। কচি বাচ্চা রেখে মায়েরা যে কী করে চাকরি করতে যায়, জানিনে।'

সুধন্য হাসল। 'চাকরি ছেড়ে দাও।'

বকুল বললে, 'তাহলেই ষোলকলা পূর্ণ হয়। এখুনি তো ঝগড়া শুরু হয়েছে, চাকরি ছেড়ে দিলে দুবেলা ঝগড়া করব।'

সুধন্য বললে, 'ঝগড়া করা যার স্বভাব সে সব সময়েই ঝগড়া করবে।'

'স্বভাব নয়, অভাব বলো। সারাদিন বাড়িতে বন্দী থেকে তোমার ছেলের দাসী-বাঁদি হব। ঝগড়া তো আপনিতেই হবে।'

'মেয়েরা একবার স্বাধীন রোজগারের স্বাদ পেলে......'

'থামো। কী আমার পুরুষমানুষ রে।' বকুল ধমক দিয়ে উঠলঃ 'শোনো। বাচ্চার কাছে একটু বোসো। আমি ভাত চাপিয়ে দিয়ে আসি।'

সুধন্য বাচ্চাকে আগলে বসল। জ্বরের ধমকে কী টসটসে লাল দেখাচ্ছে মুখটা। চোখ দুটো বোজা। সুধন্যর মনে হল বাচ্চা অনেকক্ষণ ধরে ঘুমিয়ে আছে। আর, এখন ওর শরীরের দিকে তাকিয়ে থাকতে-থাকতে কেমন একটা আ-শঙ্কা তাকে ছিমছিম করে দিচ্ছে। কাঁথার স্তূপের আড়ালে ওর ছোট্ট হৃৎপিণ্ডটুকু কী ওঠানামা করছে। সুধন্য একবার ওর বুকে হাত রাখল। ওর এইভাবে নিঃসাড়ে পড়ে থাকা বিশ্রী লাগছে তার। এর চেয়ে ও যদি জাগত, ওর অস্তিত্বটা নড়াচড়ায় এবং চিৎকারে স্পষ্ট হয়ে উঠত। ও কখন জাগবে, কখন কাঁদবে, এরকম একটা সোৎসুক প্রতীক্ষায় খরতর হয়ে ওঠে সুধন্য।

'ওরকম কাঠ হয়ে বসে আছো কেন?'

'ও কতক্ষণ ঘুমোচ্ছে? জাগিয়ে দিই ওকে?'

'না, জাগাবে না। ডাক্তারবাবু ঘুমের ওষুধ দিয়েছেন—'

'একটুও ভালো লাগছে না। বাচ্চারা ঘুমিয়ে থাকলে খুব বিশ্রী লাগে।'

'তাহলে কেন ঝগড়া করি বুঝতে পারছ তো? সারা সন্ধ্যা ও এমন করে ঘুমোচ্ছিল, আমি ওকে নিয়ে একা বসে আছি।'

'ও কী খাবে?'

'আমাকেই খাবে। গ্লুকোজের জল দিয়েছিলাম, বাবুর পছন্দ নয়।'

'এই, কাল মধু নিয়ে আসব?'

'মধু। ওইটুকু বাচ্চার কী মধু সইবে? জ্বর ছাড়ুক, ডাক্তারবাবুকে জিজ্ঞেস করব।'

'মা এলেন না কেন আজ?'

'বাবার শরীরটা খারাপ হয়েছে। মাও যে কোনদিন অসুখে পড়েন। আমার জন্যে তো কম ধকল যাচ্ছে না ওঁর।'

অনেক রাত হয়েছে। বাইরে এক পশলা বৃষ্টি হয়ে গেছে।

বকুল বাচ্চাকে রাত্রির ওষুধ খাইয়ে কখন ঘুমে কাদার মতন গলে পড়েছে। ওর ক্লান্ত শরীরকে দেখে এখন কষ্ট হল সুধন্যর। বেচারী ঘুমের সঙ্গে প্রচুর লড়াই করে শেষ পর্যন্ত হেরে গেছে। মশারির খাঁচার ভেতরে বাচ্চাটা কী পাথরের মতনই ঘুমোচ্ছে। সুধন্য মশারির ওপর চোখ রাখল। তারপর হাত গলিয়ে বাচ্চার কপালে হাত রাখল। জ্বর কমে এসেছে। কপাল ঘামে টসটসে করছে। ঘাম মুছিয়ে দিয়ে চুলে আলতো হাত বুলোল সে। তারপর হৃৎপিণ্ডের ধুকপুকুনি লক্ষ্য করল। সুধন্য আবার বললঃ বাচ্চারা ঘুমিয়ে থাকলে ভীষণ বিশ্রী লাগে, ভয় করে।

রাত বাড়ছে। আর, সমস্ত ঘরটা এখন ভয়াবহ রকমের নিশ্চুপ। ওইখানে বকুলের ঘুমে-গলা শরীর, আর নিঃসাড় বাচ্চা। সুধন্যর চেতনা যেন ভারি হয়ে আসে। চোখ জ্বালা করে। এবং কিছুতেই আজ আর তার চোখে ঘুমের বাষ্প নেই। সুধন্যর মনে হল সে এক গম্ভীর গির্জাঘরে শুয়ে আছে, এমন একটা ধ্রুবপদী ভাব তার চিত্তকে অবগাহিত করছে। সুধন্য যেন অনেক উন্নত, পবিত্র হয়ে পড়েছে। এবং একটা অধিকারের গৌরববোধ তাকে বৃহৎ করে তুলেছে। এই স্ত্রীলোকটি আমার, এই শিশুটি আমার—যেন রাত্রির মসীমাখা ষড়-যন্ত্রের হাত থেকে এদের রক্ষা করবার জন্যে সে অতন্দ্র বিবেক। স্থির পাথরের মতন স্থির বসে রইল সুধন্য।

কে কাশল? বকুল। ঠোঁট ফাঁক করে এতক্ষণ ঘুমোচ্ছে। তাই বোধহয় গলা শুকিয়ে গেছে। ওকে কী পাশ ফিরে শুতে বলবে? না, তাহলে ও জেগে উঠতে পারে। আর, জেগে উঠলে ও ঘুমোবে না কিছুতেই।

মশারির খাঁচার ওপর আবার চোখ রাখল। বাচ্চাটা একটু নড়ছে কী।

নানান প্রাসঙ্গিক-অপ্রাসঙ্গিক চিন্তার জালে কাতর সুধন্য বোধহয় নিদ্রাতুর হয়ে পড়েছিল। হঠাৎ ঘুম ভেঙে গেল বকুলের ধড়ফড় করে জেগে ওঠায়।

'দেখেছ কেমন মা আমি কখন ঘুমিয়ে পড়েছি। আমাকে জাগিয়ে দাওনি কেন?'

সুধন্য বললে, 'তুমি উঠে পড়লে কেন। আমি তো জেগে আছি।'

বকুলের চুলগুলো খোলা, চোখ ঘুমে স্ফীত এবং আচ্ছন্ন। বসে বসেও মাতালের মতন টলছে সে।

'অনেকক্ষণ জেগে আছ তুমি, না ইশ, আমি কী ভীষণ স্বার্থপর। দাও, এবার শুয়ে পড়ো। তুমি রাত জাগতে পারো? পেরেছ কোনোদিন?' বকুল হাসল।

বকুল বাচ্চার মশারি তুলে ওর গায়ের জ্বর দেখল। 'এখন জ্বর নেই মনে হচ্ছে। ছোটোদের জ্বর হলে এমন খারাপ লাগে। কষ্টের কথা বলতে পারে না তো।'

সুধন্য বালিশে মাথা দিয়ে চোখ খুলে পড়ে রইল। এখন যেন সে অনেক নিরাপত্তা বোধ করছে। বকুল জেগে আছে এইটেই তার আস্থা ফিরিয়ে আনে।

এবং কখন একসময় সে নিশ্চিন্ত হয়ে ঘুমিয়ে পড়ে।

(চার)

আজ বকুলকে ইস্কুলে যোগদান করতে হবে।

নীলুকে সঙ্গী করে মা এসেছেন। বকুল আর সুধন্য বেরিয়ে গেলে বাচ্চাকে নিয়ে মা ওবাড়ি চলে যাবেন।

বকুল ঝুড়িতে ফিডার-ফুড চিনির কৌটো গুছিয়ে রেখেছে। বাচ্চার জামা-কাঁথা ইত্যাদি মা দরকার মতন নিয়ে যাবেন। প্রথম দিন তো, বাচ্চা কাঁদতে পারে। যদিও দিদিমণির কাছে থাকা ওর অভ্যেস হয়ে গেছে। তবু শিশুর মেজাজ, বলা যায় না। বকুল যত তাড়াতাড়ি পারে ফেরার চেষ্টা করবে।

বস্তুত বকুলের মনটাও খুঁতখুঁত করছে। কিন্তু উপায় কী। চাকরি তো রাখতে হবে।

একটু আগে সুধন্যর সঙ্গে কী একটা ছোট্ট বিষয়ে কথা কাটাকাটি হয়ে গেছে। অন্যদিন হলে হত না। বাচ্চাকে কয়েক ঘন্টা ছেড়ে-যাওয়ার অসুবিধেটাই বকুলের মেজাজ নষ্ট হওয়ার কারণ।

সুধন্য গম্ভীর মুখে বাড়ি থেকে বেরিয়ে গেল। কারণ তাকে দশটার মধ্যে আপিসে পৌঁছতে হবে। বকুলের ইস্কুল এগারোটায়, তার পরে বেরুলেও চলবে।

অন্য দিন এই সময়ে নাওয়া-খাওয়ার পর বাচ্চা ঘুমিয়ে পড়ে। কিন্তু আজ আর ওর চোখে ঘুম নেই। মার বাইরে যাবার ব্যাপারটা সে বুঝেছে কিনা, কে জানে। ব্যাগ কাঁধে বেরুবার মুখে শিশু তারস্বরে কান্না জুড়ে দিল। দিদিমণিও ওকে থামাতে পারেন না।

বকুল নিরুপায় হয়ে বাচ্চাকে কোলে তুলে নিতে গেল। শাড়ির ভাঁজ গেল। যাক। ব্লাউজের বোতাম খুলে ভেতরের খাটো জামাটাকে আলগা করে ওকে বুকের দুধ দিতে হল। তারপর বাচ্চা ঘুমোলে বকুল ওকে মার কোলে চালান করে দিল।

বকুল আর দেরি করল না। জামা-কাপড় একটু ভদ্রস্থ করে জুতো পরল।

মা হেসে বললেন, 'এই তো শুরু। এখন কত বায়না করবে।'

একদিকে এই পিছুটান অন্যদিকে ইস্কুলে যাবার তাড়ায় দ্বিধাবিভক্ত, কেমন উদভ্রান্তের মতন রাস্তায় নেমে হন-হন করে এগোতে লাগল বকুল। তারপর রাস্তায় এই প্রচণ্ড ভিড়, বাসের অশ্লীল ঠাসাঠাসি, ঘর্মাক্ত অবসন্ন ইস্কুল-প্রাঙ্গণে পা দিল। অনিমাদি আজ আসেনি। অন্য দু-একজন সহকর্মীর সঙ্গে কথা বলতে-বলতে বকুল একটু ধাতস্থ হল। তারপর ক্লাশ। অসংখ্য শিশুদের দুষ্টুমি, হইহই-এ সব কিছু ভুলে গিয়ে বকুল দিদিমণি বনে গেল। কিন্তু সত্যিই কী ভুলতে পারল! বাচ্চাটা কাঁদছে কিনা। মার কাছে তারস্বরে বায়না ঘোষণা করছে কিনা। বকুল অন্যমনস্ক হয়ে যায়। তারপর টিফিনের ঘণ্টা গড়িয়ে আসে। আর, টিচারস-রুমে পা দিতেই লক্ষ্মীদি কানের কাছে কী ফিসফিস করে বললেন।

বকুল অপ্রস্তুত হয়ে নিজের দিকে তাকাল। এতক্ষণ তার লক্ষ্য পড়েনি। বুক দুটো ভিজে গিয়ে জামাটাকে জবজবে করে তুলেছে। বুকের কাছে শাড়িটাও স্যাঁতসেঁতে হয়ে উঠেছে।

বকুল আর দেরি না করে বাথরুমের দিকে পা বাড়াল।

শেষের দিকে ঘণ্টাগুলো যেন অনেক দীর্ঘ বোধ হল বকুলের। তারপর ছুটি হতেই তাড়া খাওয়া জীববিশেষের মতন ছুটতে লাগল বকুল।

মার ওখানে পৌঁছেই শুনল একটু আগে সুধন্য আর নীলু বাচ্চাকে বাড়িতে নিয়ে গেছে।

মা বলেন, 'বোস। খেয়ে দেয়ে যা।'

বকুল বললে, 'না।'

বাড়ির দিকে হাঁটতে হাঁটতে বকুল আবার ভয়ংকর বিরক্ত হল। তোমার এত ওস্তাদি করার কী দরকার! ছিল, মার কাছে ছিল, বেশ ছিল। কথায় বলে নাঃ মার চেয়ে যার দরদ বেশি......। প্রবাদ বাক্যটি শেষ না করে বিরক্তির মধ্যেও হাসল বকুল। আসলে সোজা-পথে নিজের বাড়িতে না গিয়ে যে অযথা মার এখানে আসতে হল, পরিশ্রম হয় না! আর, তারপর সুধন্যর তো এত তাড়াতাড়ি আপিস থেকে ফেরার কথা নয়। নিশ্চয়ই বলে-কয়ে কেটে পড়েছে।

বকুল আশ্বস্ত হচ্ছে। তাহলে বোঝা যাচ্ছে ছেলে কান্নাকাটি করেনি। সে—ই অকারণ ব্যস্ত হয়েছে। ছেলে যেন আর কারুর হয় না, বকুল নিজেকেই ধমকাল।

নিঃশব্দে দরজা পেরিয়ে বাড়িতে পা দেল বকুল।

আর, কী আশ্চর্য, সুধন্য ছেলেকে কোলে নিয়ে পিতামহ ব্রহ্মার মতন বসে রয়েছে। এবং খুঁটিয়ে, খুঁটিয়ে শিশুর মুখ লক্ষ্য করছে চিত্রকরের অনুসন্ধিৎসায়।

সামনে মুখ তুলে বকুলকে দেখে অনাদ্যান্ত লজ্জায় যেন ভেসে গেল সুধন্য।

'এই যে। নাও—ছেলে নাও।'

বকুল কাঁধ থেকে ব্যাগ খশিয়ে রাখল।

'আপিস পালিয়েছ?'

'না। কাজ হয়ে গিয়েছিল। তাই ভাবলাম......' সুধন্য লজ্জাকে আবৃত করতে পারছে না।

'তুমি তাড়াতাড়ি ফিরবে জানলে আর একটু আড্ডা দিয়ে আসতাম—'

'আহা। খুব জোর দেখাচ্ছ মনে হচ্ছে।'

'বয়ে গেছে আমার তাড়াতাড়ি ফিরতে।' বকুল তোয়ালে হাতে বেরিয়ে গেল।

বকুল ফিরে এসে জিজ্ঞেস করলঃ 'নীলু কোথায়? চা খেয়েছ?'

সুধন্য মাথা নাড়ল।

'দাঁড়াও। চায়ের জল চাপিয়ে আসি।'

বারান্দায় বকুলের কর্মব্যস্ততা দেখা গেল। বহুদিন পরে গুণ-গুণ করে কী একটা গান গাইছে সে। 'আজ জ্যোৎস্না রাতে সবাই গেছে বনে।' সুধন্য চেঁচাল ঃ 'এই জ্যোৎস্না-রাতে শিগগির করো।'

বকুল উত্তর করল না।

বিকেলের নরম আলোয় চারদিক ভরে গেছে।

বাচ্চাটা চোখ পিটপিট করছে। সুধন্য ওর মুখের দিকে তাকিয়ে রইল।

বকুল চা নিয়ে এল।

'হঠাৎ মার কাছ থেকে ওকে নিয়ে এলে কেন? যদি আমার ফিরতে দেরি হত।'

সুধন্য বললে, 'বাড়িতেই আগে এসে-ছিলাম। তারপর এমন খালি-খালি লাগল...'

'আচ্ছা?' বকুল এবার বাচ্চাকে কোলে তুলে নিল।

সুধন্য জিজ্ঞেস করলঃ 'ইস্কুলের খবর ভালো তো?'

বকুল বললে, 'ছাই। দু মাসের মাইনের কোনো দেখা নেই।'

'সেটা তো তোমার অভ্যেস হয়ে গেছে।'

বকুল বললে, 'হুঁ।'

বকুল সুধন্যর দিকে পাশ ফিরে জামার বোতাম খুলল। বাচ্চাকে বুকের কাছে টেনে নিল। 'বাঁচলাম। এমন কষ্ট হচ্ছিল।'

সুধন্য সিগারেট ধরাল।

'কাল ইস্কুলে যাবে?'

'না গেলে চলবে? খাওয়াবে কে?'

জবাবটা জানা ছিল সুধন্যর। কিন্তু ওর মুখে এমন স্পষ্ট করে শুনতে ইচ্ছে হয় না। সুধন্যর মনে হয় বকুলের স্বভাবে একটা অর্থমনস্কতার দিক আছে। বড় বেশি সমস্ত বিষয়ে আর্থিকতার বিষয়টি জড়িয়ে দেখে। মেয়েদের কাছে এ জিনিস ভালো লাগে না। কেমন যেন সুধন্যকে ছোটো করে দেখা হয়। যেন সুধন্যর নিজস্ব একটি অহংকারের এলাকায় হস্তক্ষেপ করছে বকুল।

বকুল জিজ্ঞেস করলঃ 'নীলু কোথায় গেল বলো তো?'

সুধন্য বললে, 'বোধহয় বাড়ি চলে গেছে।'

'এই—তোমাদের আপিসে জিজ্ঞেস করে দেখো না, ভালো সর্ষের তেল না হলে চলছে না। বাচ্চাকে মাখাতে পারছিনে।'

'দেখব।'

'অনিমাদি বলছিল অলিভ অয়েল মাখাতে। যা দাম।'

বকুল এবার বাচ্চাকে বিছানায় শুইয়ে দিল।

'তোমার গেঞ্জিটা ভীষণ ময়লা হয়েছে। কাল একটা গেঞ্জি কিনবে, বুঝলে?'

'চলে যাচ্ছে।'

'না। যাবে না। কাল ময়লা গেঞ্জিটা কেচে দেবো।' বকুল উঠে দাঁড়ালঃ 'এই—শোনো ইস্কুলে ওদের একদিন খাওয়াতে হবে, ওঁরা একেবারে ছিঁড়ে খেয়েছে।'

সুধন্য বললে, 'অ্যাঁ। কেন?'

'কেন আবার? ওরা একটু আনন্দ করবে না?'

'কালীঘাটের প্রসাদ এনে তো বাচ্চার মুখে ভাত করানো যায়—'

'থাম।' বকুল ধমক দিয়ে উঠলঃ 'রেজিস্ট্রি করে বিয়ে করেছ খরচা হয়নি। ছেলের বেলায় অত সস্তায় সারলে লোকে ছাড়বে কেন! তাছাড়া অনিমাদি সেদিন ঘাড়ে করে বয়ে এনে বাচ্চার জন্যে অত জিনিস দিয়ে গেল! লক্ষ্মীদি তো এখন থেকেই পশমের কোট বুনছেন।'

'তাহলে তো আমার বন্ধুদেরও বলতে হয়। রজত সেদিন বলছিল......'

'আবার রজত!'

'না-না। ও নিজে থেকেই বলছিল একদিন এসে বাচ্চার ফোটো তুলে দিয়ে যাবে। ওর মুভি ক্যামেরা আছে।'

বকুল বললে, 'তুমি ছেলের বাপ। যাকে ইচ্ছে নিমন্ত্রণ করবে। আমার কী বলবার আছে।'

সুধন্য অপ্রস্তুতের গলায় বললে, 'তুমি রজতকে একেবারে দেখতে পারো না।'

বকুল হাসল। 'আমি দেখিইনি, কী করে বলব।'

'বড়লোকের ছেলে তো ওরকমই হয়।'

'কে জানে। হয় বোধহয়।' বকুল গুন-গুন করতে করতে ঘর থেকে বেরিয়ে গেল।

সুধন্য বোকার মতন মুখ করে সিগারেট ধরাল।

(ক্রমশঃ)

স্বাধীনতার বিশ বছর

যোগনাথ মুখোপাধ্যায়

স্বাধীনতার বিশ বছর পূর্ণ হল। ১৯৪৭ সালের ১৫ই আগস্টের সেই উন্মাদনাময় মুহূর্তগুলি আজও ভারতবাসীর স্মৃতিতে প্রোজ্জ্বল, মনে হয় যেন মাত্র সেদিনের ঘটনা। কিন্তু দীর্ঘ দুটি দশক অতিক্রান্ত হয়েছে তারপর আজ এই সময়ের ব্যবধানে অগণিত সংকটের সম্মুখীন হতে হয়েছে ভারতের জনগণকে।

কাশ্মীরের স্বাধীনতা রক্ষা করতে দুবার পাকিস্তানের বিরুদ্ধে অস্ত্রধারণ করতে হয়েছে, উত্তর সীমান্তে প্রায় ত্রিশ হাজার বর্গমাইল ভূখণ্ডের উপর চীনের জবরদখলের অবসান ঘটাতে আরও কঠোর সংগ্রামে অবতীর্ণ হতে হয়েছে। অস্ত্রের সাহায্যেই পর্তুগীজ সাম্রাজ্যের কবল থেকে ছিনিয়ে আনতে হয়েছে ভারতভূমির অবিচ্ছেদ্য অংশ গোয়া, দমন, দিউ। পাক-চীন বৈরিতার আজও অবসান ঘটে নি, তার উপর দেশের অভ্যন্তরে বিবিধ বৈরী শক্তির সঙ্গে মোকাবিলা করতে হচ্ছে। এই সব রাজনৈতিক প্রতিকূলতার সঙ্গে সঙ্গে এসেছে প্রকৃতির বিরূপতাজনিত খাদ্যসংকট, শিল্প-ব্যবসায়ে মন্দার ফলে অর্থনৈতিক সংকট, বিপর্যয়কর লোকাধিক্য সংকট — ভারতের লোকসংখ্যা ইতিমধ্যে অর্ধশত কোটি অতিক্রম করেছে।

কিন্তু এই যুদ্ধ ও জাতীয় সংহতি-বিরোধী তৎপরতা, খরা, দুর্ভিক্ষ ও গণ-বিস্ফোরণই স্বাধীন ভারতের ইতিহাসের সার কথা নয়। প্রতিটি সংকটের সম্মুখেই ভারত দৃঢ়তা, গভীর আত্মবিশ্বাস ও সমগ্র সামর্থ্য নিয়ে অবতীর্ণ হয়েছে এবং এই সংকট জয়ের সংগ্রামেও এই বিশাল ও সুমহান জাতির সাফল্য কম নয়। স্বাধীনতার দিন মাত্র নয়টি পূর্ণ ও দুটি খণ্ডিত প্রদেশের শাসন দায়িত্ব ভারতের কেন্দ্রীয় সরকার লাভ করেছিলেন। তারপর বিগত দুই দশকে ভারতের অঙ্গীভূত হয়েছে প্রায় সাড়ে চারশত দেশীয় রাজ্য, ফরাসী উপনিবেশ মাহে, কারিকল, পণ্ডিচেরী, চন্দননগর, পর্তুগীজ উপনিবেশ গোয়া, দমন, দিউ, দাদরা-নগরহাভেলী। কাশ্মীর থেকে কুমারিকা, কচ্ছ থেকে কোহিমা পর্যন্ত অখণ্ড অবিচ্ছেদ্য ভারতে বিস্তৃত হয়েছে ভারতীয় জনগণের সার্বভৌম শাসন। ভারতের ইতিহাসে এ এক অভূতপূর্ব ঘটনা।

বৈষয়িক উন্নয়নেও ভারতের অসমসাহসিক প্রয়াস অব্যাহত থেকেছে। তিনটি পঞ্চবার্ষিক জাতীয় যোজনার কাজ শেষ হয়েছে, এখন চলেছে চতুর্থ যোজনার রূপায়ণের উদ্যোগ আয়োজন। প্রথম পঞ্চবার্ষিক যোজনার কাজ চলে ১৯৫০-৫১ থেকে ১৯৫৫-৫৬ সাল পর্যন্ত এবং ঐ যোজনায় ব্যয় হয় ১৯৬১ কোটি টাকা। ঐ যোজনায় খাদ্য ও কাঁচা মাল উৎপাদন বৃদ্ধির উপর বেশী জোর দেওয়া হয় এবং সেজন্য
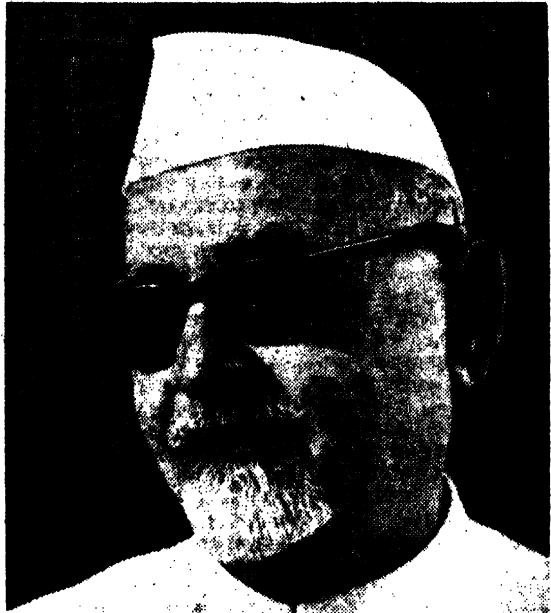
নতুন রাষ্ট্রপতি ডঃ জাকির হোসেন

কৃষি সেচ বিদ্যুৎ উৎপাদন প্রভৃতির জন্য যোজনায় বরাদ্দ অর্থের অধিকাংশ ব্যয় করা হয়। সরকারী হিসাবে, প্রথম যোজনার শেষে জাতীয় আয় বৃদ্ধি প্রায় যোজনা শুরুর বছর থেকে ১৮·৪ শতাংশ বেশী। কৃষির উৎপাদন বৃদ্ধি পায় ২২ শতাংশ, শিল্পের উৎপাদন ৩৯ শতাংশ। মূলধনী পণ্যের উৎপাদন বৃদ্ধি পায় ৭০ শতাংশ ও ভোগ্যপণ্যের ৩৪ শতাংশ। তবু প্রথম যোজনায় বেসরকারী উদ্যোগ যতটা সফল হয়, সরকারী উদ্যোগ ততটা সাফল্য লাভ করে না।

দ্বিতীয় যোজনার লক্ষ্য ছিল জাতীয় আয় আরও বৃদ্ধি করে দেশের জীবনযাত্রার মানের উল্লেখযোগ্য উন্নতি ঘটানো: মূল ও গুরু শিল্পের দিকে বিশেষ দৃষ্টি রেখে ব্যাপক শিল্পায়ণ; কাজের সুযোগ বৃদ্ধি এবং আয় ও সম্পদের বৈষম্য হ্রাস। প্রথম যোজনায় যেমন কৃষি অগ্রাধিকার পায়, দ্বিতীয় যোজনায় তেমনি শিল্পকে অগ্রাধিকার দেওয়া হয়। শিল্প, খনি, পরিবহন যোগাযোগ প্রভৃতির উন্নয়নকল্পে দ্বিতীয় যোজনায় পরিকল্পিত ব্যয়ের অর্ধেক বরাদ্দ করা হয়। দ্বিতীয় যোজনায় ব্যয় হয় ৪৬,৭২০ কোটি টাকা। ১৯৫৬ সালের ১লা এপ্রিল তার কাজ শুরু হয়ে চলে ১৯৬১ সালের ৩১শে মার্চ পর্যন্ত। ঐ সময়ের ব্যবধানে জাতীয় আয় বৃদ্ধি পায় ২০ শতাংশ, শিল্পোৎপাদন ৪০ শতাংশ ও কৃষি উৎপাদন প্রায় বিশ শতাংশ। দেশের ইস্পাত উৎপাদন ক্ষমতা হয় ৪৫ লক্ষ টন, বিদ্যুৎ উৎপাদন প্রায় আড়াই গুণ বৃদ্ধি পায়, রেলের পরিবহন শক্তি দশ বছর আগের চেয়ে পঞ্চাশ শতাংশ বেড়ে যায়।

প্রথম দুটি জাতীয় যোজনা মিলিয়ে দশ বছরে দেশের কৃষি উৎপাদন বাড়ে ৪৬ শতাংশ, শিল্পোৎপাদন প্রায় ৯৫ শতাংশ, জাতীয় আয় প্রায় ৪৩ শতাংশ এবং মাথাপিছু আয় ১৮ শতাংশ।

তৃতীয় যোজনার কাজ শুরু হয় ১৯৬১ সালের এপ্রিল মাসে। এই যোজনার মূল লক্ষ্য ছিল প্রতি বছর পাঁচ শতাংশ জাতীয় আয় বৃদ্ধি; খাদ্যে স্বয়ংসম্পূর্ণতা অর্জন এবং শিল্প ও রপ্তানী বাণিজ্যের কাঁচা মালের অভাব পূরণ; ইস্পাত, রাসায়নিক, জ্বালানি ও বিদ্যুৎ শিল্পের আরও উন্নয়ন ও প্রসার; দেশের জনশক্তির পূর্ণ সদ্ব্যবহার। সরকারী ও বেসরকারী উদ্যোগে তৃতীয় যোজনায় মোট ৪৮৫০ কোটি টাকা ব্যয়ের প্রস্তাব করা হয়।

তৃতীয় যোজনার শেষে যোজনকারদের আশা ছিল, জাতীয় আয় বাড়বে ৩০ শতাংশ, কৃষি উৎপাদন বাড়বে ২৬ শতাংশ,

শিল্প উৎপাদন বাড়বে ৬১ শতাংশ ও মাথা-পিছু আয় বাড়বে ১৭ শতাংশ—বছরে ৩৩০ টাকা থেকে ৩৮৫ টাকা।

তৃতীয় যোজনার হিসাব-নিকাশ এখনও সম্পূর্ণ হয় নি। কিন্তু এ বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই যে, তৃতীয় যোজনা তার লক্ষ্যে উপনীত হতে পারে নি। তার কারণ তৃতীয় যোজনা কালের পাঁচ বছরে ভারতকে যে সব রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক ও প্রাকৃতিক দুর্যোগের সম্মুখীন হতে হয়েছে ভারতের ইতিহাসে তা প্রায় অভূতপূর্ব ঘটনা। তৃতীয় যোজনাকালেই ভারতকে প্রথমে চীন ও পরে পাকিস্তানের বিশ্বাসঘাতকতাপূর্ণ আক্রমণের মোকাবিলা করতে হয়। যার জন্য ভারতকে নিরুপায় হয়ে কয়েক শত কোটি টাকা প্রতিরক্ষা ব্যয় বৃদ্ধি করতে হয়। ফলে জাতীয় অর্থনীতিতে অসহনীয় চাপ পড়ে, মুদ্রাস্ফীতি অপ্রতিরোধ্য হয়, পণ্যমূল্য দুর্নিবার গতিতে বেড়ে চলে, বিদেশী ঋণের বোঝাও পর্বত প্রমাণ হতে থাকে। এ সবের জন্য আন্তর্জাতিক বাজারে টাকার দাম হ্রাস পায়, যার জন্য মুদ্রামূল্য হ্রাস অনিবার্য হয়ে পড়ে। শিল্পে, কৃষিক্ষেত্রে, পণ্যের বাজারে সর্বত্র মন্দার ভাব দেখা দেয়।

এই অর্থনৈতিক সংকটকে আরও তীব্র করে তোলে দারুণ খাদ্যসংকট। পর পর দু বছর অনাবৃষ্টিতে বিহার, উত্তর প্রদেশ, মধ্য-প্রদেশ, পশ্চিমবঙ্গ ও উড়িষ্যার বিরাট এলাকার ফসল সম্পূর্ণ নষ্ট হয়ে যায়। ফলে এই কটি রাজ্যের লক্ষ লক্ষ লোক বিপন্ন হয়ে পড়ে। সরকারী সাহায্য ছাড়া, তাদের বাঁচার কোন পথ খোলা থাকে না। এজন্য রাষ্ট্রীয় কর্মকর্তাদের অনেক উন্নয়নমূলক কাজ স্থগিত রেখে খাদ্যসংকট মোকাবিলার কাজকে অগ্রাধিকার দিতে হয়। বিভিন্ন রাজ্যের শহর গ্রামে বিধিবদ্ধ রেশন ব্যবস্থা চালু করা হয়। কিন্তু প্রয়োজনীয় সরবরাহের অভাবে বহু স্থানেই রেশনে প্রতিশ্রুত পরিমাণের যোগান দেওয়া সম্ভব হয় না। ইতিমধ্যে পাকিস্তানের সঙ্গে যুদ্ধ খাদ্যসংকটকে আরও মারাত্মক করে তোলে।"

কলকাতায় প্রথম রেশন চালু হওয়ার সময় প্রত্যেককে হাজার গ্রাম চাল ও আয়োজিত গ্রাম গম দেওয়ার ব্যবস্থা হয়। কিন্তু পাকিস্তানের সঙ্গে সংঘর্ষ শুরু হলে গমের পরিমাণ কমিয়ে আটশ গ্রাম করা হয়। পরে সরবরাহের অভাবে চালের পরিমাণও কমিয়ে পাঁচশ গ্রাম করে দেওয়া হয়। একবার ঐ ন্যূনতম পরিমাণও সরবরাহ করা সম্ভব হয় না। রেশনবহির্ভূত এলাকাগুলিতেও খাদ্য-সঙ্কট তীব্র হতে থাকে।

শুধু বাংলা নয়, কেরল, গুজরাট, রাজস্থান, উত্তর প্রদেশ, মধ্যপ্রদেশ, বিহার প্রভৃতি রাজ্যগুলিতেও খাদ্যের দাবীতে বিক্ষোভ ব্যাপক আকার ধারণ করে। এই রকম অনিশ্চয়তা ও অশান্তির মধ্যে ভারতের চতুর্থ সাধারণ নির্বাচন এগিয়ে আসে। মুদ্রামূল্য হ্রাস, পণ্যমূল্য বৃদ্ধি, অত্যাবশ্যকীয় দ্রব্যের দুষ্প্রাপ্যতা, শিল্পে মন্দা ও ব্যাপক খাদ্য-সংকটের মাঝে শাসক দল কংগ্রেস চতুর্থ বারের জন্য নির্বাচিত হওয়ার দাবী নিয়ে নির্বাচক মণ্ডলীর সম্মুখে উপস্থিত হন। সুতরাং নির্বাচনের ফলাফল নিয়ে নানা জল্পনা-কল্পনা শুরু হয় এবং কংগ্রেসের সার্বিক সাফল্যে অনেকেই সন্দেহ প্রকাশ করেন।

কিন্তু নির্বাচনের ফলাফলের মাধ্যমে জনমতের যে রায় প্রকাশ পায়, কংগ্রেসের তীব্রতম বিরোধীর পক্ষেও তা কল্পনা করা সম্ভব ছিল না। ভারতের সতেরোটি অঙ্গ-রাজ্যের মধ্যে একমাত্র নাগাভূমি ছাড়া সর্বত্র নির্বাচন হয়। ষোলটি অঙ্গরাজ্যের মধ্যে আসাম, মধ্যপ্রদেশ, হরিয়ানা, জম্মু ও কাশ্মীর, গুজরাট, মহারাষ্ট্র, মহীশূর ও অন্ধ্রপ্রদেশে কংগ্রেস দল একক সংখ্যা-গরিষ্ঠতা লাভ করেন। সে কারণে ঐ কটি রাজ্যেই কংগ্রেস দল মন্ত্রিসভা গঠন করেন। রাজস্থান ও উত্তর প্রদেশে প্রায় অর্ধেক আসনে জয়ী হওয়ার দাবীতে কংগ্রেসই প্রথম মন্ত্রিসভা গঠনের সুযোগ পান। আর পশ্চিমবঙ্গ, বিহার ও পাঞ্জাবে কংগ্রেস প্রতি-দ্বন্দ্বী সবকটি দল অপেক্ষা অধিক আসন লাভ করলেও বিরোধী দলগুলির মিলিত শক্তির তুলনায় অনেক পেছিয়ে থাকেন। সে কারণে উল্লিখিত তিনটি রাজ্যে কংগ্রেস বেশ শক্তিশালী দলরূপেই বিরোধী দলের ভূমিকায় অবতীর্ণ হন। কংগ্রেসের শোচনীয় পরাজয় ঘটে উড়িষ্যা, মাদ্রাজ ও কেরলে। সুতরাং শেষোক্ত তিনটি রাজ্যেও অকংগ্রেসী শাসন কায়েম হয়। অর্থাৎ নির্বাচনের অব্যবহিত পরে ষোলটি রাজ্যের মধ্যে দশটি রাজ্যে কংগ্রেস ও ছয়টি রাজ্যে অকংগ্রেস দলগুলি ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত হন। ভারতের অঙ্গ-রাজ্যগুলি পুনর্গঠিত ও সমশ্রেণীভুক্ত হওয়ার পর একমাত্র দক্ষিণ প্রান্তীয় রাজ্য কেরল ছাড়া আর কোথাও কখনো অকংগ্রেসী শাসন কায়েম হয় নি। সুতরাং চতুর্থ নির্বাচন যে ভারতীয় গণতন্ত্রে বৈপ্লবিক পরিবর্তন আনে সে বিষয়ে কোন সন্দেহ

রাউরকেল্লা সার তৈরির কারখানা
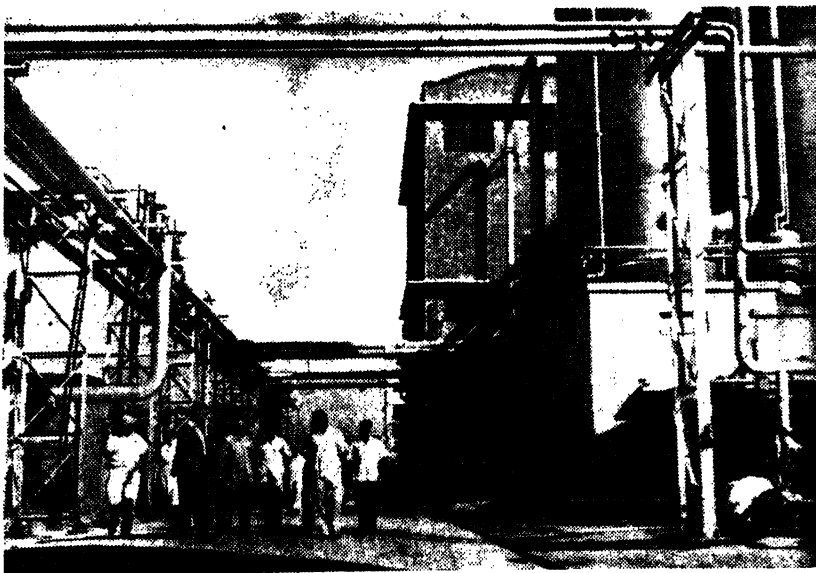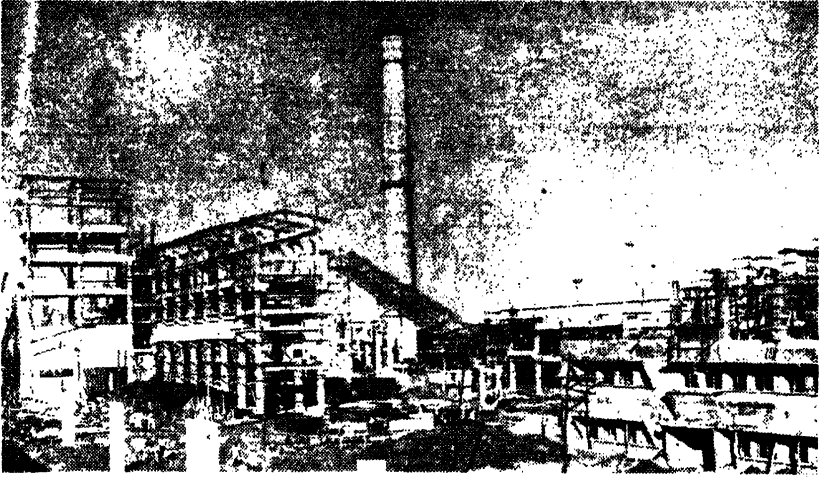
ভিলাই ইস্পাত কারখানা

নেই। তবু কংগ্রেসের পক্ষ থেকে দাবী জানান হয় যে, বহু রাজ্যে নির্বাচনী ফলাফল কংগ্রেসের অনুকূল হলেও একমাত্র মাদ্রাজ ছাড়া আর কোন রাজ্যে একটি অকংগ্রেসী দলের পক্ষে বিধানসভার অর্ধেকের বেশী আসন লাভ করা সম্ভব হয় নি। সেখানে বিধানসভার ২৩৫টি আসনের মধ্যে ডি এম কে দল ১৩৮ আসনে জয়লাভ করেন। কেরলে ১৩৩টি আসনের মধ্যে কংগ্রেস এবার মাত্র ৯টি আসনে জয়ী হয়েছেন, কিন্তু অপর কোন দলই ঐ রাজ্যে একক সংখ্যাগরিষ্ঠতা লাভ করেন নি। বৃহত্তম রাজনৈতিক দল মার্ক্সবাদী কম্যুনিষ্ট পার্টি অন্য সব রাজনৈতিক দল, এমন কি মুশ্লিম লীগের মত সাম্প্রদায়িক দলের সঙ্গেও নির্বাচনী আঁতাত করে ৫২টি আসনে জয়ী হয়েছেন। আর কংগ্রেস মাত্র ৯টি আসনে জয়ী হলেও সমগ্র কেরল রাজ্যের ৩৫ শতাংশ ভোট লাভ করেছেন, যে শতাংশ হার মার্কসবাদী কম্যুনিষ্ট দলের চেয়েও বেশী। উড়িষ্যায় ১৪১টি আসনের মধ্যে কংগ্রেস মাত্র ২৯টিতে জয়ী হয়েছেন, কিন্তু সে রাজ্যের বৃহত্তম দল স্বতন্ত্র পার্টিও ৪৯টির বেশী আসনে জয়ী হতে পারেন নি, সে কারণে তাঁদের জনকংগ্রেস দলের সঙ্গে কোয়ালিশন করতে হয়েছে। কেন্দ্রে কংগ্রেস দলের সংখ্যাগরিষ্ঠতা পূর্বের তুলনায় অনেক হ্রাস পেলেও অক্ষুন্ন থাকে, সে কারণে কেন্দ্রে যথাপূর্ব কংগ্রেস শাসনই বহাল থাকে।

নির্বাচনী ফলাফল কংগ্রেসের অনুকূল না হওয়ার জন্য দেশের পরিস্থিতি যত না দায়ী তার চেয়ে বেশী দায়ী দলীয় অন্তর্দ্বন্দ্ব। এই দ্বন্দ্ব নির্বাচনের পরেও অব্যাহত থাকে যার ফলে কয়েকটি রাজ্যে কংগ্রেসী মন্ত্রিসভা গঠন করা সত্ত্বেও অনতিবিলম্বে ভেঙে পড়ে। উত্তর প্রদেশে শ্রীচন্দ্রভানু গুপ্তের নেতৃত্বে গঠিত কংগ্রেসী মন্ত্রিসভা পক্ষকালের মধ্যে ভেঙে পড়ল শ্রীচরণ সিং-এর বিদ্রোহে। তারপর শ্রীচরণ সিং-এর নেতৃত্বেই গঠিত হল সর্বদলীয় অকংগ্রেসী মন্ত্রিসভা। সম্প্রতি চরণ সিং মন্ত্রিসভার বিরুদ্ধে অনাস্থা প্রস্তাব এনেছিলেন কংগ্রেস দল, কিন্তু তা ২০ ভোটের ব্যবধানে বাতিল হয়ে যায়। একইভাবে হরিয়ানা রাজ্য কংগ্রেসের হাতছাড়া হয়। এই অন্তর্দ্বন্দ্বের শেষ বলি মধ্যপ্রদেশ। মধ্যপ্রদেশে এবারের নির্বাচনে বেশ সন্তোষজনক সংখ্যাগরিষ্ঠতা কংগ্রেস দল লাভ করেছিল। কিন্তু হঠাৎ ছত্রিশজন কংগ্রেস সদস্য রাতারাতি দলত্যাগ করায় মুহূর্তের মধ্যে সে রাজ্যে কংগ্রেসী শাসনের অবসান ঘটে। এইভাবে ভারতের বৃহত্তম রাজ্যটিও কংগ্রেসের হাতছাড়া হয়ে যায়। এখন মোটামুটি হিসাবে ভারতের রাজ্যগুলির মাত্র ৩৬ শতাংশ কংগ্রেসের শাসনাধীন এবং অকংগ্রেসী শাসন কায়েম হয়েছে অবশিষ্ট ৬৪ শতাংশ স্থানে।

উপপ্রধানমন্ত্রী মোরারজী দেশাই সম্প্রতি মাদ্রাজে এক জনসভায় বলেন, গণতন্ত্রী রাষ্ট্রে ক্ষমতার হাত বদল কোন অভিনব ঘটনা নয়। কংগ্রেস একটানা বিশ বছর দেশ শাসন করেছেন বলেই জনগণ এবার একটা পরিবর্তন চেয়েছেন। এতে কংগ্রেসের বিচলিত হওয়ার কিছু নেই।

এবারের নির্বাচনের এটি একটি বড় বৈশিষ্ট্য যে, ভারতের সবকটি উল্লেখযোগ্য রাজনৈতিক দলই কোন না কোন রাজ্যে শাসন ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত হওয়ার সুযোগ লাভ করেছেন। স্বতন্ত্র, জনসংঘ, দুই কম্যুনিষ্ট পার্টি, সংযুক্ত সোস্যালিষ্ট পার্টি, প্রজা-সমাজতন্ত্রী দল, ডি এম কে, আর এস পি, ফরোয়ার্ড ব্লক—কেউ বঞ্চিত হয় নি দেশ শাসনের সুযোগ থেকে। পশ্চিমবঙ্গে যুক্তফ্রন্ট সরকার গঠিত হয়েছে ১৪টি রাজনৈতিক দল ও কিছু সংখ্যক নির্দলীয় সদস্যের সমর্থনে। কেরলের যুক্তফ্রন্ট সরকারে আছে সাতটি রাজনৈতিক দল। অকংগ্রেসী রাজ্যগুলির মধ্যে একমাত্র মাদ্রাজে কোয়ালিশন মন্ত্রিসভা নেই।

চতুর্থ নির্বাচনোত্তর ভারতের আর একটি উল্লেখযোগ্য ঘটনা হল ভারতের রাষ্ট্রপতি পদে একজন সংখ্যালঘুর নির্বাচন। ভারত যে প্রকৃত গণতন্ত্রী ও ধর্মনিরপেক্ষ রাষ্ট্র তা প্রমাণ হয়েছে রাষ্ট্রপতি ডঃ জাকির হোসেনের নির্বাচনী সাফল্যে। রাষ্ট্রপতি পদে কংগ্রেস দলের প্রার্থী ছিলেন তিনি আর অকংগ্রেসী দলগুলির প্রার্থী ভারতের তৎকালীন প্রধান বিচারপতি শ্রী কে সুব্বারাও। প্রার্থী মনোনীত হওয়ার পর শ্রীসুব্বারাও প্রতিদ্বন্দ্বিতার উদ্দেশ্যে প্রধান বিচারপতির পদে ইস্তফা দেন। রাষ্ট্রপতি নির্বাচনে ডঃ জাকির হোসেন আশাতীত সাফল্য লাভ করেন। পশ্চিমবঙ্গ, উত্তর প্রদেশ ও পাঞ্জাবে অকংগ্রেসী শাসন কায়েম থাকা সত্ত্বেও ডঃ হোসেন ঐ রাজ্যগুলিতে বিধানসভার অধিকাংশ সদস্যের সমর্থন লাভ করেন।

স্বাধীনতার বিংশতিতমবর্ষে চতুর্থ সাধারণ নির্বাচন জাতির সম্মুখে এক উজ্জ্বল সুদূরপ্রসারী সম্ভাবনার দ্বার উন্মুক্ত করে দিয়েছে। দীর্ঘ এক দলীয় শাসনের অবসান ঘটার সঙ্গে সঙ্গে দেশের সব দল ও মত রাষ্ট্র গঠনের কাজে হাত লাগানোর সুযোগ লাভ করেছে। এখনও হয়ত সম্পূর্ণ সহযোগিতার মনোভাব গড়ে ওঠে নি, অবিশ্বাস দূর হয়নি পরস্পরের প্রতি। কিন্তু এ উপলব্ধিটা ক্রমে দৃঢ় মূল হচ্ছে যে, কাউকে বাদ দিয়ে কারও পক্ষে চলা সম্ভব নয়। সমৃদ্ধ শক্তিশালী দেশ গড়ে তোলার জন্য সবাইকে আজ একজোট হয়ে রাষ্ট্রীয় রথের দাঁড়িতে হাত লাগাতে হবে।

পাঠকের বৈঠক

ছেলেভুলানো পড়া

সম্প্রতি দুজন প্রখ্যাত স্তম্ভলেখক 'আনন্দ' এবং 'নাগরিক' 'শিশু সাহিত্যের পুরস্কার' এবং 'একালের শিশুসাহিত্য' বিষয়ে দুটি নিবন্ধ লিখেছেন। (স্তম্ভ কথাটিতে রবীন্দ্রনাথের আপত্তি ছিল কিন্তু columnist এর কোন ভাল প্রতিশব্দ গড়ে ওঠেনি বলেই স্তম্ভলেখক লিখতে হল)। বলাবাহুল্য উভয় নিবন্ধই যথেষ্ট চিন্তার খোরাক নিয়ে উপস্থিত হয়েছে। আমাদের শিশু সাহিত্য বিভাগটি ইদানীং কিঞ্চিৎ অবহেলিত মনে হয়। লেখকদের নিশ্চয়ই অভাব নেই, অভাব উৎসাহী প্রকাশকের। 'সিটি বুক সোসাইটি', 'ইউ রায় অ্যান্ড সন্স', 'ভট্টাচার্য অ্যান্ড সন্স', 'আশুতোষ ধর অ্যান্ড সন্স' প্রভৃতি একদা শিশু সাহিত্য প্রচারে যথেষ্ট সহায়তা করেছেন। পরবর্তী কালে এম সি সরকার অ্যান্ড সন্স 'মৌচাক' পত্রিকা প্রকাশ করেন সুধীরচন্দ্র সরকারের সম্পাদনায় এবং কিছু কিছু ছোটদের বই প্রকাশ করেছেন। শিশির পাব্লিসিং হাউসও শিশু সাহিত্য প্রচারে যথেষ্ট অগ্রণী হয়েছিলেন।

বাংলা শিশু সাহিত্যে 'সন্দেশে'র যেমন একটি বিশিষ্ট ভূমিকা আছে তেমনই মৌচাকের ভূমিকাও গুরুত্বপূর্ণ। 'সন্দেশে' রবীন্দ্রনাথ, উপেন্দ্রকিশোর, কুলদারঞ্জন, সুকুমার রায়, সুখলতা রাও, সুবিনয় রায় প্রভৃতি ছোটদের জন্য অজস্র লিখেছেন। জগদানন্দ রায়ের বিজ্ঞানের কথাও আমাদের শৈশবে অতিশয় মধুর মনে হত। কুলদারঞ্জন দেশী ও বিদেশী পৌরাণিক কাহিনী যেমন সরসভাবে পরিবেশন করেছেন তেমনই আশ্চর্য ছিল তাঁর অনূদিত 'আশ্চর্য দ্বীপ'। সীতা দেবী ও শান্তা দেবীর 'হিন্দুস্থানী উপকথা' একটি মূল্যবান ছেলেভুলানো গ্রন্থ। নবকৃষ্ণ ভট্টাচার্য 'টুকটুকে রামায়ণ' লিখেছিলেন, এই অপূর্ব ছোট্ট রামায়ণটি ইদানীং পাওয়া যায় না। সত্যচরণ চক্রবর্তী ধ্রুব, প্রহ্লাদ প্রভৃতির গল্প লিখেছিলেন। বোধহয় অনুবাদ করেছিলেন 'দগোবার্ট'। এ ছাড়া ভট্টাচার্য অ্যান্ড সন্স তিন আনা দামে দেশ বিখ্যাত মনীষীদের জীবনী প্রকাশিত করতেন। মনমোহন রায়ের গ্রন্থগুলিও আজ পাওয়া যায় না।

বটতলা থেকেও কিছু কিছু ছেলেভুলানো রং-চং-এ বই প্রকাশিত হয়েছে নিছক ব্যবসায়িক উদ্দেশ্যে। কিন্তু এই সব গ্রন্থের দাম ছিল অতিশয় সুলভ।

'মৌচাক' প্রকাশিত হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে শিশু সাহিত্যের অঙ্গনে আবির্ভূত হলেন অবনীন্দ্রনাথ, হেমেন্দ্রকুমার, সৌরীন্দ্রমোহন, প্রেমাঙ্কুর, সত্যেন্দ্র দত্ত, নরেন্দ্র দেব, কিরণধন চট্টোপাধ্যায় প্রভৃতি। পরবর্তী কালে অন্নদাশংকর, প্রেমেন্দ্র, অচিন্ত্যকুমার, বুদ্ধদেব বসু, মনোজ বসু, বিমল মিত্র, শিবরাম চক্রবর্তী, নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়, মহাশ্বেতা দেবী প্রভৃতি অনেক লেখক-লেখিকা 'মৌচাকে' লিখেছেন। মৌচাক সম্পাদক খ্যাতিমান লেখকদের দিয়ে 'মৌচাকে' শিশুদের জন্য অনেক রকমের লেখা প্রকাশ করেছেন। কিছু কাল ধরে 'মৌচাক' শিশু সাহিত্যের জন্য একটা বাৎসরিক পুরস্কারও দিয়ে আসছেন।

বাংলা সাহিত্যের শিশুরঞ্জন রচনার যাদুকর হিসাবে দক্ষিণারঞ্জন অবিস্মরণীয়। তাঁর 'ঠাকুরমার ঝুলি' ও 'দাদামশায়ের থলে' বাঙালী ছেলে ও বুড়োর কাছে সমান আদরের।

শিশির পাব্লিসিং হাউস এক টাকা মূল্যের একটি সিরিজ করেছিলেন। এই বিভাগে দেশ-বিদেশের ইতিহাস ও বিজ্ঞান বিষয়ে একটি গ্রন্থ প্রতি মাসে প্রকাশিত হত। তাঁদের প্রকাশিত দীনেশচন্দ্র সেন রচিত 'সাঁঝের ভোগ' আজও আমাদের মনে একটা ছাপ রেখেছে। শিশির পাব্লিসিং টলস্টয়ের গল্প এবং বৌদ্ধ জাতকের কিছু কিছু গল্প নিয়ে অনেকগুলি ছোট ছোট গ্রন্থ প্রকাশ করেন।

সিগনেট প্রেস বাংলার প্রকাশন ব্যবস্থার মোড় ঘুরিয়ে দিয়েছিলেন। বই শুধু ছাপলেই হয় না, তাকে ছাপার মত ছাপতে হয় এবং তার প্রচার করারও প্রয়োজন একথা জানতেন সিগনেটের কর্তৃপক্ষরা। তাঁরা অবনীন্দ্রনাথ, সুকুমার রায়, লীলা মজুমদার প্রভৃতির অনেক রচনা প্রকাশ করলেন আর ছোটদের জন্য প্রকাশ করলেন 'আম আটির ভেঁপু'।

একথা সকলেই স্বীকার করবেন যে, এই সব প্রকাশকদের প্রচেষ্টা নিষ্ফল হয় নি। শিশু সাহিত্যের যে চাহিদা আছে তার প্রমাণ 'দেব সাহিত্য কুটির'। এই প্রকাশন সংস্থা মুখ্যতঃ ছোটদের জন্যই পুস্তক প্রকাশ করে থাকেন। ব্যবসায়িক সিদ্ধির কথা উল্লেখ করার প্রয়োজন নেই; কারণ তা স্বপ্রকাশ।

এ ছাড়া কয়েকটি ছোটখাটো প্রতিষ্ঠানও সম্প্রতি অগ্রণী হয়ে এসেছেন, এঁরা প্রকাশ করছেন 'রোশনাই' ও 'ঝিলিমিলি' ও 'আগামী' নামক ছোটদের মাসিকপত্র। প্রতিটি পত্রিকা সুসম্পাদিত এবং এঁদের প্রতিষ্ঠান থেকে প্রকাশিত গ্রন্থাবলীও বিশেষ আকর্ষণমূলক।

আমাদের বক্তব্য কেউ যদি কেবলমাত্র ছোটদের জন্যই গ্রন্থ প্রকাশে উদ্যোগী হন তাহলে ব্যবসায়গত সাফল্যের সম্ভাবনা প্রচুর।

সারা ভারতবর্ষের মধ্যে বাংলা দেশের মত শিশুতোষ গ্রন্থ আর কোথাও প্রকাশিত হয় নি। অন্য সব প্রদেশে হিন্দী মাধ্যমে কিছু কিছু গ্রন্থ আছে, আর যদি কিন্ডারগার্টেন প্রসাদাৎ কিঞ্চিৎ ইংরাজী শিক্ষা হয়ে থাকে তাহলে তার জন্য পড়ে আছে ইংরাজী ভাষায় প্রকাশিত অজস্র গ্রন্থসম্ভার। যারা হিন্দী বা অন্য কোন আঞ্চলিক ভাষা শিখেছে তারা উপকথা বা রামায়ণ মহাভারতের গল্প পাঠ করে। হিন্দী শিশু সাহিত্যের নমুনায় দেখা গেল যে, শতকরা পঞ্চাশখানি গ্রন্থ ইংরাজী অনুবাদ। ইংরাজী শিশু সাহিত্যের ক্লাসিক গ্রন্থ বা বিখ্যাত কাহিনীর সংক্ষিপ্ত বিবরণ। এই সঙ্গে তুলনায় বাংলা শিশু সাহিত্যের মান ও মুদ্রণ অনেক উন্নত। বাংলা শিশু সাহিত্যে বৈচিত্র্যও অনেক বেশী।

শিশু সাহিত্যের জন্য গ্রন্থাভাব কেন হয় তার উত্তরে কেউ কেউ বলেন পাঠকের অভাব। একথা ঠিক নয়, শিশু সাহিত্যের পাঠক শুধু শিশুরাই নয়, অনেক মধ্যবয়সী এবং বৃদ্ধরাও শিশু সাহিত্য পড়ে আনন্দ পান। তেমন তেমন বই হাতে পেলে ছেলে-বুড়ো সবাই গোগ্রাসে গেলে। হিন্দী ভাষায় প্রকাশিত 'চাঁদমামা' নামক পত্রিকাটিতে অনেক রূপকথার কাহিনী প্রকাশিত হয়। এই মাসিকটির প্রচার সংখ্যা সর্বাধিক।

ইদানীং কালে আমাদের সামাজিক জীবনেরও অনেক পরিবর্তন ঘটেছে। আগেকার কালে স্কুলপাঠ্য গ্রন্থ ছাড়া অন্য গ্রন্থ হাতে দেখলে শিক্ষক বা অভিভাবকরা ক্ষেপে উঠতেন। এখন অভিভাবক ও আত্মীয়-বর্গ ছেলেভুলানো গ্রন্থ জন্মদিন বা অন্য পর্বদিনে উপহার দিয়ে থাকেন।

একথা সত্য যে, অন্য দেশে ছোটদের জন্য প্রকাশিত গ্রন্থ সংখ্যা প্রচুর। ওদেশে লুই ক্যারল, স্টিভেনসন, ব্যারী, ব্যালানটাইন, কাপ্তেন ম্যারিয়াট, মার্ক টোয়াইন, জন মেসফিল্ড, এ এ মিলনে, কেনেথ গ্রেহাম, হিউ লফটিং প্রভৃতির রচনা ছোট-বড় সকলেই পড়ে থাকেন।

হান্স এন্ডারসন বা গ্রীন ভ্রাতৃদ্বয়ের গল্প কার না মনোহরণ করে? হান্স ক্রিশ্চিয়ান এনডারসনের কাহিনী যেন সর্বকালের। জুল ভার্নের 'বেলুনে পাঁচ সপ্তাহ', 'আশী দিনে ভূ-প্রদক্ষিণ', 'চন্দ্রালোকে যাত্রা' প্রভৃতি গ্রন্থগুলি অনুবাদ করেছিলেন রাজেন্দ্রলাল আচার্য। এক কালে এই গ্রন্থগুলির বিশেষ সমাদর ছিল। এই সব গ্রন্থও ইদানীং পাওয়া যায় না।

রামায়ণ, মহাভারত, পঞ্চতন্ত্র, জাতক, ছোটদের জন্য অপূর্ব উপাদানে পরিপূর্ণ।

বাইবেল বা শেকসপীয়রও সব দেশের ছোটদের মন ভোলায়।

তবে আজ ওদেশের শিশুরা শুধুমাত্র চার্লস ল্যামের ওপর নির্ভর করে বসে নেই! বর্তমান কালের লেখকবৃন্দ বর্ধমান বালক-বালিকার যে ব্যক্তিগত রুচি থাকা সম্ভব তা স্বীকার করেন। তাদের রুচির অনুযায়ী গ্রন্থ লিখতে হবে। শিশুরা যে বর্ধমান এই ধারণা যদি মনে থাকে তাহলে শিশু সাহিত্যও থাকবে না। শিশুরা এখন আর ভ্রূণ মাত্র নয়, তারা যথেষ্ট সাবালক, তাদের নিজস্ব কল্পনার জগৎ আছে, নিজস্ব আগ্রহ, অনাসক্তি এবং রুচি বা অরুচি আছে।

গ্রীক ও রোমান সভ্যতা ছোটদের বড় হয়ে ওঠার জন্য কোন প্রস্তুতির প্রয়োজন আছে মনে করেন নি। ঊনবিংশ শতাব্দীতে মিসেস সেরউডের 'হিস্টরি অব দি ফেয়ার চাইল্ড ফ্যামিলী' প্রকাশিত হয়েছিল—ছোটদের অন্তরে নরকের বীভৎস আতঙ্ক সৃষ্টি করার উদ্দেশ্যে। কিন্তু ঊনবিংশ শতকের শেষাংশে আবির্ভূত হলেন লুই ক্যারল, স্টীভেনসন প্রভৃতি। 'টম ব্রাউনস স্কুল ডেজ' থেকে আজকের শিশু উপন্যাস 'স্টলবী' নিঃসন্দেহে বিচিত্র ক্রমবিকাশ। আমাদের শৈশবে বাংলা দেশেও ছোটদের জন্য অনেক সুন্দর উপন্যাস রচিত হয়েছে।

কিছুকাল আগে ইংরাজী ভাষায় বিখ্যাত ভারতীয় লেখক আর কে নারায়ণ লিখেছেন 'সোয়ামী অ্যান্ড হিজ ফ্রেন্ডস'। গ্রন্থটি ছোট-বড় সকল বয়সের মানুষেরই পঠিতব্য। এই সূত্রে ধনগোপাল মুখোপাধ্যায়ের কথা মনে পড়ে। তাঁর 'গে নেক' 'করী দি এলিফ্যান্ট' আজ হয়ত বিস্মৃত-প্রায়। কিন্তু 'গে নেকে'র বঙ্গানুবাদ 'চিত্র-গ্রীব' বোধহয় আজও পাওয়া যায়।

বাংলা দেশে একটি শিশু সাহিত্য পরিষদ আছে। দুখানি বাংলা সংবাদপত্রের ছোটদের পৃষ্ঠা আলো করে আছেন 'মৌমাছি' আর 'স্বপনবুড়ো'। ছেলে-মেয়েরা অবহেলিত নয়। তবে মনে হয় আরো অনেক করার আছে, আরো অনেক কিছু। কিন্তু আমাদের সব কাজে আওয়াজ প্রচুর আয়োজন কম। তাই চিলড্রেন্স বুক ট্রাস্ট যেন কল্পলোকের বস্তু হয়ে আছে।

—অভয়ঙ্কর

সাহিত্য প্রতিযোগিতায় ভারতীয় কিশোরী ॥

লণ্ডনের "হ্যাম্পস্টেড আর্টস ফেস্টিভ্যাল" কর্তৃক আয়োজিত শিশু-সাহিত্য প্রতিযোগিতায় কুমারী শর্মিষ্ঠা প্যাটেল এ বৎসর তৃতীয় স্থান অধিকার করেছেন। লণ্ডনের প্রখ্যাত ভারতীয় ব্যবসায়ী শ্রীপ্রফুল্ল প্যাটেলের সে ভগ্নী। তার বয়স এখন মাত্র তের বৎসর। হ্যাম্পস্টেডের 'সেই মেরী ও কার্নাট্রি স্কুলের' সে এখনও ছাত্রী। কিন্তু এর মধ্যেই সে ফ্রেঞ্চ, ল্যাটিন, জার্মান ভাষায় বেশ দক্ষতা অর্জন করে ফেলেছে। নৃত্য এবং ছবি আঁকাতেও সে বেশ পারদর্শী। লণ্ডনের "নব-বলা" নামক সাংস্কৃতিক প্রতিষ্ঠানে সে নিয়মিত নৃত্য পরিবেশন করে। সম্প্রতি তার একটি ছবিও তার স্কুলের প্রদর্শনীতে স্থান পায়। তার পিতামাতা উগাণ্ডিতে বাসবাস করেন।

কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের পুরস্কার প্রদান ॥

এ বছর কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের "জগত্তারিণী" স্বর্ণপদকটি লাভ করেছেন প্রখ্যাত ঔপন্যাসিক শ্রীবলাইচাঁদ মুখোপাধ্যায় (বনফুল)। প্রতি দুই বৎসর অন্তর সাহিত্য বা বিজ্ঞানের ক্ষেত্রে মৌলিক অবদানের জন্য এই পুরস্কারটি দেওয়া হয়। এর আগে এই পুরস্কারটি যাঁরা পেয়েছিলেন, তাঁদের মধ্যে ছিলেন রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় প্রমুখ সাহিত্যিকবৃন্দ।

"স্যার দেবপ্রসাদ সর্বাধিকারী" পদকটি লাভ করেন পশ্চিম জার্মানীর প্রখ্যাত বিজ্ঞান-অধ্যাপক শ্রীডবলু আইসেনবার্জ। এই পুরস্কারটিও প্রতি দুই বৎসর অন্তর একজন প্রখ্যাত বৈজ্ঞানিককে দেওয়া হয়। এই পুরস্কারটিরও প্রাপক-সূচীতে অধ্যাপক সি, ভি, রমন, মাদাম জুলিও কুরী প্রমুখের নাম আছে।

"সরোজিনী বসু পদকটি" পেয়েছেন শ্রীচিন্তাহরণ চক্রবর্তী। বাংলা ভাষা ও সাহিত্যে মৌলিক গবেষণার জন্য এই পুরস্কারটি প্রদান করা হয়। "লীলা পুরস্কার" লাভ করেছেন প্রখ্যাত মহিলা ঔপন্যাসিক শ্রীমতী প্রতিভা বসু। বাংলা সাহিত্যে কোনও মহিলা সাহিত্যিকের শ্রেষ্ঠ অবদানের জন্য এই পুরস্কারটি দেওয়া হয়। "শরৎচন্দ্র পদক" লাভ করেছেন প্রবীণ সাহিত্যিক অন্নদাশংকর রায় ও শরদিন্দু বন্দ্যোপাধ্যায় যুগ্মভাবে।

একটি উল্লেখযোগ্য গ্রন্থ ॥

শ্রী বি, এন, চক্রবর্তীর নাম সুপরিচিত। ভারতীয় সিভিল সার্ভিসের প্রবীণ সদস্য হিসেবে তিনি বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ কাজে ও রাষ্ট্রসংঘে তাঁর যোগ্যতার এবং কৃতিত্বের অসাধারণ পরিচয় রেখেছেন। বিভিন্ন সময়ে তাঁর যে সব প্রবন্ধ প্রকাশিত হয়েছে, সম্প্রতি সেগুলি সংকলিত করে তিনি একটি গ্রন্থ প্রকাশ করেছেন। গ্রন্থটির নাম "ইণ্ডিয়া স্পিকস টু আমেরিকা"। এগারোটি অধ্যায়ে গ্রন্থটি বিভক্ত। এই গ্রন্থের সবচেয়ে আকর্ষণ অধ্যায়গুলি হল, সেখানে লেখক ভারতের পররাষ্ট্র-নীতি এবং অর্থনৈতিক নীতির আলোচনা করেছেন। এর মধ্যে 'কাশ্মীর, শান্তিপূর্ণ সহঅবস্থান' "পাকিস্থানকে যুদ্ধের সামগ্রী সাহায্য" ইত্যাদি কয়েকটি অধ্যায় তত্ত্ব এবং তথ্যের দিক থেকে খুবই উল্লেখযোগ্য হয়ে উঠেছে। রাজনীতি এবং সমাজনীতি বিশ্লেষণে যাঁরা আগ্রহী, তাঁদের কাছে গ্রন্থটি অপরিহার্য।

ছোট পত্র-পত্রিকার সমস্যা ॥

গত ৭ই এপ্রিল কলকাতার রেণেসাঁস হলে বাংলা ছোট পত্র-পত্রিকার সমস্যা আলোচনার জন্য বিভিন্ন পত্র-পত্রিকার প্রতিনিধিদের এক সভা অনুষ্ঠিত হয়। এই এই সভায় পৌরোহিত্য করেন শ্রী কিরণশঙ্কর সেনগুপ্ত। সভার অন্যতম আহ্বায়ক শ্রী অরুণ ভট্টাচার্য এই সভা আহ্বানের উদ্দেশ্য বর্ণনা করতে গিয়ে বলেন—"বাংলা দেশের শিল্প-সাহিত্য বিষয়ক লিটল ম্যাগাজিনগুলি এখন এক ভীষণ সংকটের সম্মুখীন। এই সংকট প্রধানত বিজ্ঞাপন, বিক্রয় ও ডাক-মাশুল সংক্রান্ত। লিটল ম্যাগাজিনগুলি বিক্রয়ের বা প্রচারের জন্য কোনও ভাল ব্যবস্থা নেই। বড় বড় এজেন্টরা এই সব পত্রিকাগুলি বিক্রয়ে তেমন আগ্রহী নন, এমন কি বিক্রী হলেও সব সময় তাঁদের কাছ থেকে দাম পাওয়া যায় না। বিজ্ঞাপনদাতারা এই সব পত্রিকায়

বিজ্ঞাপন দেন না। কিছু কিছু সরকারী বিজ্ঞাপনই ছিল এদের সম্বল। কিন্তু সম্প্রতি পশ্চিমবঙ্গ সরকার তিন বৎসর না হলে কোনও পত্রিকায় বিজ্ঞাপন দেবেন না, বলে জানিয়েছেন। এতে পত্র-পত্রিকার অবস্থা আরও অসহায় হয়ে উঠেছে। মাসিক পত্রিকা পর্যন্ত ডাক-মাশুল কনসেশন পাওয়া যায়। ত্রিমাসিক বা ষৈমাসিক পত্রিকা এই সুযোগ থেকে বঞ্চিত। এই সব বিষয় আলোচনার জন্যই এই সভা।" পরিশেষে তিনি আরও বলেন, "শিল্প-সাহিত্যের পরীক্ষা-নিরীক্ষা এবং সাহিত্যের মান ছোট পত্র-পত্রিকাগুলিই রক্ষা করে। যদি এই সব পত্রিকা ক্রমাগত বন্ধ হয়ে যায়, তবে দেশের চিন্তাজগতে প্রচণ্ড অরাজকতা সৃষ্টি হবে।" বিভিন্ন প্রতিনিধিরা এই আলোচনায় অংশগ্রহণ করেন এবং কয়েকটি সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন। সিদ্ধান্ত-গুলি হল—(ক) ছোট পত্র-পত্রিকা বিক্রয়ের জন্য নিজেদের কোনও এজেন্সী গড়ে তোলার চেষ্টা করা। (খ) পারস্পরিক বিজ্ঞাপন আদান-প্রদানের ব্যবস্থা করা। (গ) ছোট পত্রিকায় বিজ্ঞাপন দিন—এই বিষয়ে কিছু আলোচনা প্রকাশ করা। (ঘ) একটি স্থায়ী সাময়িক পত্রিকা সঙ্ঘ গঠন করা এবং (ঙ) সরকারী বিজ্ঞাপন সম্বন্ধে আলোচনার জন্য প্রচারমন্ত্রীর সঙ্গে সাক্ষাৎ করা।

মহাভারতের রুশ অনুবাদকের মৃত্যু

বিশিষ্ট সোভিয়েত পণ্ডিত ও তুর্কমেনীয় বিজ্ঞান আকাদেমির সদস্য বোরিস স্মির্নোফ ৭৫ বছর বয়সে আশখাবাদে মারা গিয়েছেন।

অধ্যাপক স্মির্নোফ জীবনের ৫০ বছরেরও অধিককাল নিয়োজিত করেছিলেন সমাজের সেবায়, রোগের বিরুদ্ধে সংগ্রামে ও চিকিৎসাবিজ্ঞানের উন্নয়নে। পেশায় চিকিৎসক অধ্যাপক স্মির্নোফ বিদেশে ভারতীয় মহাকাব্য মহাভারতের অনুবাদক হিসাবেই অধিকতর পরিচিত ছিলেন।

তিনি মূল সংস্কৃত থেকে রুশ ভাষায় ২০ হাজারেরও বেশি শ্লোকের আক্ষরিক ও সাহিত্যিক অনুবাদ করেন নয়টি পৃথক পৃথক পুস্তকে। বইগুলিতে লেখকের টীকা, পরিশিষ্ট ও গ্রন্থবিবরণী সম্বলিত ভূমিকা দেওয়া আছে। জীবনের বহু বছর ধরে একাজ করলেও অধ্যাপক স্মির্নোফ এজন্য কোন পারিশ্রমিক গ্রহণে অস্বীকৃতি জানান।

গত দশ বছর ধরে গুরুতরভাবে পীড়িত থাকা সত্ত্বেও বোরিস স্মির্নোফ অনুবাদের কাজ ছেড়ে দেননি। প্রধানত শুয়ে শুয়ে তিনি কাজ করতেন। হাঁটু দুটি পড়াশোনার ডেস্কের কাজ করত।

বোরিস স্মির্নোফ অর্ডার অব লেনিন ও সম্মানসূচক ব্যাজ, "১৯৪১-৪৫ সনের দেশপ্রেমিক মহাযুদ্ধের সময় গৌরবজনক শ্রমের জন্য" পদক এবং তুর্কমেন প্রজাতন্ত্রের সর্বোচ্চ সোভিয়েতের সভাপতির-মণ্ডলীর বিভিন্ন ডিপ্লোমা পুরস্কার পেয়েছিলেন।

জেমস্ বস্‌ওয়েলের জীবন চরিত ॥

জেমস্ বস্‌ওয়েল অষ্টাদশ শতাব্দীর ইংলণ্ডের এক অনন্যসাধারণ ব্যক্তিত্ব। তাঁর চরিত্রের দুঃসাহস ও মহত্ত্বের জন্য তিনি দীর্ঘকাল মানুষের মনে স্মরণীয় হয়ে থাকবেন। অতি অল্পবয়সেই, স্বভাবত এই মানবপ্রীতি ও মহানুভবতা, তাঁকে পৃথিবীর শ্রেষ্ঠতম ব্যক্তিদের সান্নিধ্যে আনতে সক্ষম হয়েছিলো। মাত্র ২৪ বছর বয়সেই বস্‌ওয়েল ফার্নিতে ভলতেয়ারের সান্নিধ্যলাভ করেছিলেন। সে সময়ই এক বিতর্কিত মুহূর্তে রুশোর সঙ্গে তাঁর সাক্ষাৎ লাভ ঘটে। এ ছাড়া ইওরোপের বেশ কিছু বাঘা লেখকের সঙ্গেও এতো অল্পবয়সেই তাঁর প্রীতির সম্পর্ক গড়ে ওঠে। মানুষের প্রতি ভালবাসা ও জ্ঞানের পিপাসা বস্‌ওয়েলকে সকলের কাছে এতো সহজে বরণীয় করে তুলেছে।

বস্‌ওয়েলের সমগ্র জীবনচরিতই অভিনব। কিন্তু সবচেয়ে আগ্রহ সঞ্চার করে তাঁর জীবনের সূচনা পর্বটি বা কৈশোর-যৌবনের সন্ধিক্ষণ। এই সন্ধিক্ষণের উপর নির্ভর করেই সম্প্রতি ফেডরিক এ. পটল্ বস্‌ওয়েলের একটি জীবনীগ্রন্থ রচনা করেছেন। বইটির নাম: "জেমস বস্‌ওয়েল: দি আরলি ইয়ার্স : ১৭৪০-১৭৬৯"। বইটি উল্লেখযোগ্য প্রধানত দুটি কারণে। এক, জেমস্ বস্‌ওয়েলের জীবনচরিত ব্যক্তিত্ব জাগরণের উপযোগী। দ্বিতীয়ত, এর রচনাকার ফেডরিক হচ্ছেন বৃটেনের অন্যতম বস্‌ওয়েল-বিশেষজ্ঞ পণ্ডিত। দীর্ঘকাল তিনি বস্‌ওয়েলের জীবন ও সাধনা নিয়ে গবেষণা করেছেন। বইটিকে শুধুমাত্র জীবন-চরিত বল্লেই চলে না—এ যেন, "মোর দ্যান এ বায়গ্রফি অব ইম্পর্টেন্স।"

যোসেফ অ্যাগ্নেনের উপন্যাস ॥

যোসেফ অ্যাগ্নেন ১৯৬৬ সালের নোবেল পুরস্কারের সম্মানে বিশ্ববন্দিত হয়েছেন—একথা সকলেরই জানা, বলা যেতে পারে, অ্যাগ্নেন এবং নেলি স্যাখস্-এর এই অন্যতম শ্রেষ্ঠ পুরস্কারপ্রাপ্তির পরই ইহুদী সাহিত্য বিশ্বের সর্বত্র বিশেষ আগ্রহের কারণ হয়ে উঠেছে। বিশেষত ঔপন্যাসিক হিসেবে অ্যাগ্নেনের প্রতি সকলেই খুব কৌতূহলী। সম্প্রতি তাঁর একটি উপন্যাস হিব্রু ভাষা থেকে ইংরেজীতে অনূদিত হয়েছে। বইটির নাম: "ইন দি হার্ট অব দি সীজ"। অনুবাদ করেছেন আই. এম. ল্যাস্ক।

আলোচ্য উপন্যাসটির কাহিনী অত্যন্ত সাধারণ। একদল ওয়েফেরারস্‌দের নিয়ে এর কাহিনীবস্তু গড়ে উঠেছে। গ্যালিসিয়া থেকে প্যালেস্টাইনের ভ্রমণ পথে এদের ভ্রমণের উদ্দীপনা ও নির্লজ্জ আকাঙ্ক্ষা বিভিন্ন চরিত্রের কথোপকথনের মাধ্যমে পরিবেশিত হয়েছে। এবং এদের পথপ্রদর্শক হচ্ছেন এক সন্ন্যাসী অ্যাগ্নেনের সেই "হোলিল্যাণ্ডের স্বপ্ন এখানেও অপরিবর্তিত। অ্যাগ্নেন ঈশ্বর সম্পর্কে তাই বলেছেন "হোলি ওয়ান অ্যান্ড ব্লেসেডে।" একজন সমালোচক মন্তব্য করেছেন: "বইটির অনুবাদের ভাষা যেন স্থানে স্থানে বাইবেলের প্যারোডি।" আরেকজনের মতে "১২৮ পৃষ্ঠার বইটিতে অ্যাগ্নেন যেন ফেবল-এর কাহিনী শোনাতে বসেছেন। রূপকথার আতিশয্য এবং নীতি ও ন্যায়ধর্ম উপন্যাসটিতে যতোটা স্থান পেয়েছে, বাস্তব জীবনের সংঘাতময় চিত্রের যেন ততটাই অভাব।

মস্কোয় আন্তর্জাতিক গ্রন্থ-মেলা ॥

মস্কোয় গত ৩রা থেকে ২৫শে জুলাই এক আন্তর্জাতিক গ্রন্থ-মেলা অনুষ্ঠিত হয়ে গেল।

বিশ্বের বিভিন্ন ভাষার চিরায়ত ও আধুনিক সাহিত্যের সহস্র সহস্র সুদৃশ্য, সুঅলংকৃত, সুন্দর ছাপা ও বাঁধাই বইগুলি মস্কোর সোকোলিনিকি পার্কের প্রদর্শনীতে শোভা পায়।

এ উপলক্ষে আয়োজিত আন্তর্জাতিক গ্রন্থ প্রতিযোগিতার ফলাফল ঘোষণা করা হয়। জার্মান গণতান্ত্রিক প্রজাতন্ত্রে পুস্তক প্রকাশন সংস্থা কর্তৃক প্রকাশিত বহু খণ্ডে "বিশ্ব-ইতিহাস" গ্রন্থটি প্রথম শ্রেণীর প্রথম ডিপ্লোমা লাভ করে। অন্যান্য পুরস্কার-বিজয়ী দেশগুলির মধ্যে রয়েছে চেকোশ্লোভাকিয়া, হাংগেরী, বুলগেরিয়া ও সোভিয়েত ইউনিয়ন। সোভিয়েত ইউনিয়ন থেকে প্রকাশিত ৫০ খণ্ডের ভি. আই. লেনিনের সম্পূর্ণ রচনাবলী এক বিশেষ ডিপ্লোমা লাভ করে।

এই আন্তর্জাতিক প্রদর্শনীতে বিগত ৫০ বছরের মধ্যে সোভিয়েত ইউনিয়নে গ্রন্থ প্রকাশনার এক রূপরেখা ফুটে ওঠে। এই সময়ের মধ্যে সোভিয়েত ইউনিয়নে ২ কোটি গ্রন্থ সর্বমোট ৩ হাজার কোটি কপি প্রকাশিত ও প্রচারিত হয়েছে। প্রদর্শনীতে মার্কস, এংগেলস, লেনিনের রচনাবলী বিশেষ স্থান অধিকার করে। এ ছাড়া থাকে সর্বাধুনিক বিজ্ঞান, রাজনীতি

ও প্রযুক্তি বিজ্ঞানমূলক গ্রন্থাদি। "অকটোবর মহাবিপ্লবের ৫০তম বার্ষিকী" উপলক্ষে প্রকাশিত বিশেষ গ্রন্থাদির প্রদর্শিত হয়। উল্লেখযোগ্য যে, সোভিয়েত বিজ্ঞান ও প্রযুক্তিবিদ্যার পাঠ্যপুস্তকসমূহ বিদেশের বহু বিশ্ববিদ্যালয়ের পাঠ্যসূচীর এখন অন্তর্ভুক্ত হয়েছে। এর মধ্যে ভারতীয় বিশ্ববিদ্যালয়গুলিও রয়েছে।

প্রদর্শনীতে সোভিয়েত কথা-সাহিত্য, কবিতা, নাটক ও সাহিত্য সমালোচনা বিষয়ক গ্রন্থ বিভাগটি যথেষ্ট আকর্ষণীয় ছিল। "৫০তম বার্ষিকী" উপলক্ষে প্রকাশিত সোভিয়েত ও বিশ্বের চিরায়ত ও আধুনিক সাহিত্য-গ্রন্থাদির বিশেষ সংস্করণগুলিও প্রদর্শিত হয়। ২০০ খণ্ডের "বিশ্ব-সাহিত্য" গ্রন্থমালার প্রথম খণ্ডটি এই প্রদর্শনীকালেই প্রকাশিত হয়।

প্রদর্শনীতে শিশু-সাহিত্যের জন্য এক বিশেষ বিভাগ থাকে। সোভিয়েত শিশু-সাহিত্য প্রকাশনালয় থেকে শিশু ও কিশোরদের জন্য প্রকাশিত বইয়ের সংখ্যা ১০০ কোটিরও বেশি। একমাত্র চলতি বছরেই সোভিয়েত প্রকাশনালয়গুলি থেকে প্রকাশিত সাহিত্য গ্রন্থাদি ১৬-২ কোটি সংখ্যক কপি প্রচারিত হয়েছে।

আন্তর্জাতিক গ্রন্থ-মেলায় যোগদানকারী অন্যান্য দেশগুলির মধ্যে বুলগেরিয়া, হাংগেরী, জি, ডি, আর, কিউবা, মংগোলিয়া, পোল্যান্ড, রুমানিয়া, চেকোশ্লোভাকিয়া ও যুগোশ্লাভিয়ার নাম উল্লেখযোগ্য।

সেতুবন্ধ: বাঙালী জীবনের নতুন আলেখ্য

'সেতুবন্ধ' কথাশিল্পী শ্রীমনোজ বসুর সাম্প্রতিকতম গ্রন্থ। উপন্যাসটি অমৃতে ধারাবাহিকভাবে প্রকাশিত হয়েছিল। সে-সময়ে পাঠক-সমাজের বিপুল অভিনন্দন লাভ করেছিলেন শ্রীবসু।

এক সাধারণ ঘরের মেয়ে পূর্ণিমা। অতিসাধারণ তার জীবন। কোন উচ্চাশা ছিল না। ছিল না দশজনের মধ্যে একজন হয়ে ওঠবার আকাঙ্ক্ষা। কিন্তু ঘটনা তার জীবনকে বয়ে নিয়ে বেড়াল বিচিত্র প্রবাহে। নিছক বর জোটাবার জন্য তাকে ভর্তি করা হয়েছিল কলেজে। কোন ফল হোল না তাতে। পিতা তারণকৃষ্ণ মেয়েকে চাকরি করতে দেবেন না। কিন্তু সেই মেয়েকে অবস্থা-বিপাকে চাকরি নিতে হোল। স্কুল-মিসট্রেস থেকে রিসেপসনিস্ট। পূর্ণিমা বলে, "মেয়েদের একালে শুধু গৃহস্থালী সামলেই চলবে না, একলা পুরুষের রোজগারে চলার দিন শেষ হয়ে যাচ্ছে। ক্ষমতা আছে যখন, কেনই বা পরাশ্রয়ী হয়ে থাকব।"—সেই মেয়ে হোল স্টেনো। সংসার দায়িত্ব নিয়ে ছোট-ভাইকে ডাক্তার করে তোলে। বড়বোনের দায়িত্ব এসে পড়েছে ঘাড়ে। এসেছে স্বাতী, পিতৃবন্ধু পূর্ণ মুখুজ্যে, শিশির, আরও বহু বিচিত্র চরিত্র। এরা প্রত্যেকেই বর্তমান সমাজেরই মানুষ এক-একজন বিচিত্রতর সব সমস্যার জালে জড়িয়ে কাহিনীকে করে তুলেছে আকর্ষণীয়। সংসারের জটিলতায় এবং নানারকম অসত্য প্রচারে বিব্রত হয় পূর্ণিমা। কিন্তু সমগ্র কাহিনীর মধ্যমণি হোল পূর্ণিমা। তার জীবন হোল কঠোর দায়িত্ব ও কর্তব্যবোধে ভরা। শিশিরের সঙ্গে বিবাহ এবং কুমকুমের সান্নিধ্য পূর্ণিমার জীবনকে নতুন পথ দেখায়। পূর্ণিমা যে-ঘটনার মধ্য দিয়ে কুমকুমকে তুলে নেয় নিজের বুকে, কাহিনী সমাপ্তিকে তা চরম আকর্ষণীয় করে তুলেছে।

শ্রীমনোজ বসুর গল্পের বিষয় বৈচিত্র্যময়। মুক্তোর মত উজ্জ্বল পরিপূর্ণ কাহিনী, বিচিত্র পটভূমি, বিচিত্রতর কিছু মানুষ এবং চমকপ্রদ সব ঘটনা। এসবে উল্লেখযোগ্য ঘটনা হোল লেখকের বাস্তব জীবনের ঘটনাবলী পর্যবেক্ষণের অতিনিপুণ দক্ষতা। বাংলাদেশের নদনদী গ্রাম থেকে শহর-জীবনের বিচিত্রতা তাঁর গল্পকে সমৃদ্ধ করেছে। পুরোপুরি বাঙালীমনের অধিকারী

শ্রীমনোজ বসু

এই কথা-সাহিত্যিকের রচনায় বাস্তব-জীবন-প্রীতির এক আশ্চর্যসুন্দর প্রকাশ লক্ষণীয়।

কল্পনা অপেক্ষা বাস্তবজীবনকে তিনি ভালবাসেন বেশী। প্রকরণগত বৈশিষ্ট্যে ভাষার স্বাভাবিক প্রবাহে তিনি সমকালীন সাহিত্যসেবীদের মধ্য বিশিষ্টতায় চিহ্নিত। সমকালকে ছাড়িয়ে তিনি অতীতের প্রতি মোহাবিষ্ট হননি। মানুষের অনেক কাছের মানুষ বলেই তাঁর এত জনপ্রিয়তা।

সাম্প্রতিক উপন্যাসগুলিতে শ্রীবসুর চিন্তা বিস্তার বিশেষভাবে লক্ষণীয়। আজকের জীবনের বিচিত্রদিক, জীবনধারণের সমস্যা, আন্দোলন, প্রেম, বিবাহ, শিক্ষা, রাজনীতি ও অর্থনৈতিক জীবন নানানভাবে যুক্ত হয়েছে তাঁর কাহিনীতে। বিশেষ করে সাম্প্রতিক উপন্যাস 'সেতুবন্ধে' তার প্রকাশ ঘটেছে সবথেকে সার্থকভাবে। রক্ষণশীল পরিবার থেকে চাকুরীক্ষেত্রে মেয়েদের এগিয়ে আসবার চিত্রটি নিপুণভাবে তুলে ধরা হয়েছে।

'সেতুবন্ধে' পূর্ণিমা-শিশিরের জীবনকে যেভাবে চিত্রিত করা হয়েছে, তার মধ্যেই শ্রীবসুর অনন্যসাধারণ চরিত্রচিত্রণ ক্ষমতার পরিচয় মেলে। ছোট ছোট ঘটনা, টুকরো সংলাপের মধ্যদিয়ে তাদের জীবনের বাস্তব দিকটিকে তিনি সুন্দরভাবে ফুটিয়ে তুলেছেন। বিশেষ করে কুমকুমের প্রতি পূর্ণিমার আকর্ষণ এবং তার অভিনয় পাঠককে মুগ্ধ করে রাখে।

শ্রীবসুর জলজঙ্গল, বৃষ্টি বৃষ্টি, আমার ফাঁসি হোল, নিশিকুটুম্ব, রক্তের বদলে রক্ত, বন কেটে বসত, মানুষ গড়ার কারিগর প্রভৃতি সার্থক উপন্যাসগুলিতে আর একটি উল্লেখ-যোগ্য সংযোজন 'সেতুবন্ধ'। তবে এখানে যেন তিনি আরও বেশী সার্থক, আরও জীবন্ত। এমন বহু ঘটনা তিনি উল্লেখ করেছেন, যা সচরাচর বাংলা-সাহিত্যে দেখা যায় না।

সেতুবন্ধ (উপন্যাস)—মনোজ বসু। আনন্দ পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড, ৫, চিন্তামণি দাস লেন, কলকাতা-৯। দাম বার টাকা।

বিচিত্র স্বাদের কয়েকটি গ্রন্থ

কবি জীবন দত্ত কবিতার আসরে নবাগত নন। যদিও আলোচ্য কাব্যগ্রন্থটি তাঁর প্রথম প্রকাশিত গ্রন্থ তবু কবিতাগুলি পাঠ করে মনে হয় তিনি কবিতা রচনায় স্বচ্ছন্দ। কবিতার বহিরঙ্গ ও অন্তরঙ্গে যে বিশেষ নির্মাণ কবিতাকে বৈশিষ্ট্যময় করে তুলতে পারে আলোচ্য কবির কবিতায় সম্পূর্ণত তা সংরক্ষিত না হলে কবিতাগুলির সহজ সুর, অন্তর্গত বাস্তব-ভাবনা কবিকে বুঝতে সহায়তা করে। জীবনের নিয়ত প্রতিকূলতার মধ্যে থেকে কবি ক্রমপরিবর্তমান দৃশ্যপট লক্ষ্য করে বলেছেন, "চৈত্রের এ ঝরাপাতা মৃত্যুর প্রাঙ্গণে। গেয়ে যায় নতুনের নীরব বন্দনা" (প্রত্যাশা) জীবনের অজস্র অসহায়তা ও নৈরাশ্যের মধ্যেও কবির বাসনা—

'আহা, যদি একটি ফুল ফোটাতে পারতাম।' (যদি পারতাম)

জীবন দত্তের কবিতা : (কাব্যগ্রন্থ) শ্রীপ্রকাশনী।। সি ৪০ সুলেখা পার্ক, কলিঃ-৩২। দাম : এক টাকা।

পরমাপ্রকৃতি শ্রীশ্রীসারদা মাতার জীবন-কাহিনী নিয়ে রচিত বর্তমান 'যুগমাতা সারদামণি' গ্রন্থটি পাঠকদের ভালই লাগবে। আন্তরিকতা ও শ্রদ্ধার সঙ্গে সারদামণির জীবন কথাকে লেখক প্রাঞ্জল ভাষায় লিপিবদ্ধ করেছেন।

যুগমাতা সারদামণি : (জীবনী) সুধাংশুবিকাশ দেবশর্মা। প্রতিমা পুস্তক; ১৩ কলেজ রো; কলিঃ-৯। দাম—২ টাকা।

●

ভাল চাকুরে সনৎ মুখার্জি বাড়ির ইচ্ছানুসারে বিয়ে করেছিল। কিন্তু কিছুদিন পর সে তার বৌকে আর ভালবাসতে পারেনি এবং তার মধ্যে আর কোন আকর্ষণও খুঁজে পায়নি। অতঃপর তারই অফিসের লেডি-টাইপিস্ট রীতা মল্লিকের প্রতি সে আকর্ষণ বোধ করে। রীতার জীবনেও অনেক দুর্যোগ এসে ভীড় করে আছে। রীতাকে যে চায় সেই বিনোদবাবু সনৎকে খুন করতে চায়। কিন্তু তার আগেই হঠাৎ একদিন সনৎ খুন হয়। সেই খুন রহস্যের সন্ধান করতে গিয়ে ডিটেক্‌টিভ ও পুলিশ সকলেই হিমসিম খেতে থাকে এবং শেষ পর্যন্ত খুনি ধরা পড়ে। 'তিন তরঙ্গে'র এটাই মূল কাহিনী। রহস্য উপন্যাসের উপাদানে রচিত এই গ্রন্থটি পাঠকরা উপভোগ করতে পারবেন হয়তো।

তিন তরঙ্গ : (উপন্যাস) : অনিল চক্রবর্তী। ভি লাইট বুক কোং; ১৭৩।৩, বিধান সরণি, কলিঃ-৬। দাম ৩·৫০ পঃ।

●

রবীন্দ্রসাহিত্যকে নিয়ে এযাবৎ বহু আলোচনা হয়েছে এবং অনেক গ্রন্থও রচিত হয়েছে। আলোচ্য গ্রন্থটি রবীন্দ্র-সাহিত্যের বিভিন্ন বিষয় ও দিক ইত্যাদি নিয়ে লেখা দশটি সুখপাঠ্য প্রবন্ধের সংকলন। লেখক যেমন যত্ন করে রবীন্দ্র-সাহিত্য অনুধ্যান করেছেন, তেমনি নিজস্ব মননের আলোকে প্রতিটি ক্ষেত্রে তিনি একটি দৃঢ় প্রত্যয়ে পৌঁছেছেন। যা সাধারণত এই জাতীয় অন্যান্য রচনায় বিরলদৃষ্ট। পণ্ডিত ব্যক্তিদের বহু পরিচিত ও পঠিত পুরনো বক্তব্য উদ্ধৃত না করে লেখক নিজস্ব উপলব্ধি সার্থকভাবে যুক্তিসহ উপস্থিত করেছেন।

কাব্যে অপরাজিতা : (আলোচনা) : অবনীমোহন চট্টোপাধ্যায়; নব-ভারত পাবলিশার্স ; ৭২ মহাত্মা গান্ধী রোড : কলিকাতা—৯। দাম—২·৫০ পঃ।

●

তিনটি রসোত্তীর্ণ একাংক নাটকের সংকলন "শ্রেষ্ঠ পুরস্কার"। শ্রেষ্ঠ পুরস্কার শঙ্খচূড় ও আমাদের কাশ্মীর—এই তিনটি একাংকিকাই শুধু সুখপাঠ্য নয়, সফল অভিনয়ের সম্ভাবনাপূর্ণ।

শ্রেষ্ঠ পুরস্কার : (নাটক) প্রশান্ত ঘোষ ; প্রতিমা পুস্তক ; ১৩ কলেজ রো ; কলিঃ-৯। দাম—তিন টাকা।

কিশোর-কিশোরীর কাহিনী

বাংলা সাহিত্যে শিশু ও কিশোরদের জন্য ইদানীং তেমন উপযুক্ত গল্প কবিতা বেশী দেখা যায় না। অ্যাডভেঞ্চার ও ডিটেকটিভ গল্পের নামে যে জাতীয় গ্রন্থাদি প্রচলিত তার মধ্যে না আছে জমাট কাহিনী না আছে নীতিগত কোন আদর্শের অভি-ব্যক্তি। অথচ জাতীয় জীবন গঠনে এই বিভাগে উপযুক্ত রচনা প্রকাশের প্রয়োজন সর্বাধিক। 'মৌচাক' পত্রিকা যেকালে প্রতিষ্ঠিত হয় সেই সময় 'ভারতী' দলের শক্তিমান সাহিত্যিকবৃন্দ ছোটদের জন্য গল্প কবিতা লেখার জন্য এগিয়ে এসে-ছিলেন। ফলে সৌরীন্দ্রমোহন, মণিলাল, প্রেমাঙ্কুর, হেমেন্দ্রকুমার, সত্যেন দত্ত, নরেন্দ্র দেব প্রভৃতি সাহিত্যিকরা অজস্র গল্প ও কবিতা ছোটদের জন্য লিখেছেন। তাঁদের পরবর্তীরাও সেই পথ অনুসরণ করেছেন। কিন্তু বর্তমানে যেন এই সূত্রটি ক্ষীণ হয়ে আসছে। সরেশ্বর সেনের কয়েকটি রচনা বিভিন্ন সাময়িকপত্রে প্রকাশিত হতে দেখেছি। গ্রন্থাকারে বোধ করি 'রক্ত তিলক' তাঁর প্রথমতম গ্রন্থ। তিনি বলেছেন—"পূর্ণ কৈশোরে আর কৈশোর-যৌবনের সন্ধিক্ষণে কিশোর-কিশোরীদের মানসপটে যে আলোছায়া খেলে তারই পটভূমিকায় রচিত এই গল্পগুলি। লেখকের বক্তব্য অতিশয় স্পষ্ট, তিনি গল্পগুলি কিশোর-কিশোরীদের মনস্তত্ত্বের দিক থেকে শুধু লেখেন নি, এগুলিতে তাদের সমস্যা এবং সংশয় বিষয়েও ইঙ্গিত দিয়েছেন। গল্প-গুলির মধ্যে আছে বলিষ্ঠ কল্পনার পরিচয়। যে আঙ্গিক তিনি ব্যবহার করেছেন তা কিশোর-কিশোরীদের যোগ্য। নির্বিষ গল্পের ফটিক মামা চরিত্রটি অবিস্মরণীয়। যিনি সর্বদা ছেলেদের পিছনে লাগতেন সেই ছেলেরাই তাঁর জন্য উদ্বিগ্ন শেষের মুহূর্তে। ছোটকাকার প্রতি অনিতার ক্রোধ এবং ছোটকাকার ব্যাখ্যা, 'নাম আলেখ্য' গল্পের সমর, পীতাম্বর স্মৃতি গল্পের একলব্য দাদু প্রভৃতি চরিত্রগুলি সজীব হয়ে ফুটে উঠেছে। শিল্পদর্শন ও রক্ত তিলক গল্প দুটির মধ্যে লেখকের সংবেদনশীল মনের পরিচয় পাওয়া যায়। সুস্থ জীবন-বোধের একটা ইঙ্গিত কাহিনীগুলিতে ছড়ানো। বর্তমান অশান্ত কালের পটভূমিতে বাস্তব জীবনের সামান্য কয়েকটি ছোটখাট ঘটনাকে রেখায়িত করে সরেশ্বর সেন বিশেষ শক্তি ও লিপিকুশলতার পরিচয় দান করে-ছেন। ছোটদের মহলে এই সচিত্র গল্প-গ্রন্থটি যে যথাযোগ্য সমাদর লাভ করবে, সে বিষয়ে সন্দেহ নেই। গ্রন্থটির ছাপা ও বহুবর্ণের প্রচ্ছদটি মনোরম।

রক্ত তিলক : (কিশোর কাহিনী) — সরেশ্বর সেন প্রণীত। প্রকাশক : নয়া প্রকাশ। ২০৬, বিধান সরণী।

সংকলন ও পত্র-পত্রিকা

আধুনিক কবিতা এবং কবিতা বিষয়ক আলোচনার ত্রৈমাসিক পত্রিকা "অনুভব" স্বীয় বৈশিষ্ট্যে বিদগ্ধজনের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছে। সম্পাদক শ্রীগৌরাঙ্গ ভৌমিকের সুযোগ্য সম্পাদনায় বর্তমান সংখ্যায় লিখেছেন : রাম বসু, শঙ্খ ঘোষ, পরিমল চক্রবর্তী, বিশ্ববন্ধু ভট্টাচার্য, কালীকৃষ্ণ গুহ, শংকর চট্টোপাধ্যায়, সামসুল হক, শান্তি লাহিড়ী, অলোকরঞ্জন দাশগুপ্ত, দেবী-প্রসাদ বন্দ্যোপাধ্যায়, শংকরানন্দ মুখো-পাধ্যায়, মলয়শংকর দাশগুপ্ত, শংকর দে, অঞ্জন কর, কুমার মুখোপাধ্যায়, বিজয়কুমার দত্ত, অমরেন্দ্র চক্রবর্তী, সমরেন্দ্র সেনগুপ্ত, জয়ন্ত বন্দ্যোপাধ্যায়, রবীন্দ্র গুহ, তপনলাল ধর, জয়ন্তকুমার, সুনীল বন্দ্যোপাধ্যায় এবং আরো অনেকে। ১৯ পন্ডিতিয়া টেরেস, কলকাতা—২৯ থেকে প্রকাশিত এই পত্রিকাটির দাম এক টাকা।

তস্য তস্য অথবা সূর্য কাঁদলে সোনা

প্রেমেন্দ্র মিত্র

(পূর্ব প্রকাশিতের পর)

নাম তার ইণ্ডিয়া! গর্বভরে বলেছিলেন সানসেদো,—একদিন অ্যাডমিরাল কলম্বাস এই দেশ খুঁজতেই অকূল সাগরে পাড়ি দিয়েছিলেন এবং এই ভ্রান্ত ধারণা নিয়েই জীবনের শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেছিলেন যে ইণ্ডিয়া যার অংশ সেই এশিয়া মহাদেশের পূর্ব উপকূলই তিনি আবিষ্কার করেছেন। সে দেশ আবিষ্কারের গৌরব কিন্তু তাঁর বা আমাদের দেশের কারুর অর্থাৎ কোনো এসপানিওলে-র প্রাপ্য হয়নি সে গৌরব পেয়েছে পোর্তুগীজ ভাস্কো-দা-গামা। সেই ভাস্কো দা গামার আবিষ্কৃত সমুদ্রপথে সে দেশ থেকে আশ্চর্য এক মানুষকে পোর্তুগীজদের জাহাজে এদেশে ক্রীতদাস হিসাবে এনে বিক্রী করা হয়। ভাগ্যক্রমে এক ক্রীতদাসের বাজারে তাঁকে দেখে আমার গভীর কৌতূহল ও শ্রদ্ধা জাগে। বৃদ্ধ দুর্বল মানুষ ক্রীতদাস হিসাবে তাঁকে খাটিয়ে নেবার সুযোগ নেই বললেই হয়। অত্যন্ত সুলভেই তাই তাঁকে কিনে আমি মুক্তি দিই।

ক্রীতদাসকে আপনি মুক্তি দেন! ভেতরে ভেতরে অভিভূত হলেও বাইরে একটু অপ্রসন্ন বিস্ময়ের ভান করেছিলেন ঘনরাম।

পারলে দিই! কিন্তু কতটুকু আর আমার ক্ষমতা! কোনরকম আস্ফালন না করেই বলেছিলেন কাপিতান সানসেদো,—স্বাধীনভাবে তাঁকে নিজের দেশেই ফেরৎ পাঠাতে পারব এই আশা করেছিলাম। কিন্তু তিনি নিজেই আমার সে চেষ্টা করতে মানা করেছিলেন। বলেছিলেন, এই দেশেই তাঁর মাটি কেনা আছে। সে নিয়তি খণ্ডাবার চেষ্টা বৃথা। জীবনের শেষ কটা দিন আমার মেদেলীন শহরের বাড়িতেই তিনি কাটান। তাঁর আশ্চর্য গণনার বিদ্যা সামান্য একটুমাত্র শেখবার সুযোগ আমি পেয়েছিলাম। তাঁর কাছেই শুনি তাঁদের দেশে জ্যোতিষের নামও সামুদ্রিক বিদ্যা।

সানসেদোর প্রতি প্রথম থেকেই ঘনরামের মনে একটা শ্রদ্ধা ও অনুরাগ জেগেছিল। আরো বর্ধিত শ্রদ্ধা নিয়ে ঘনরাম জিজ্ঞাসা করেছিলেন। নিজের সম্বন্ধে কিছু কি তিনি বলে গিয়েছেন।

না, কিছুই বলেন নি। শুধু দুটি নির্দেশ তিনি দিয়ে গিয়েছিলেন। প্রথম তাঁর মৃত্যুর পর শবদেহ আমি যেন দাহ করবার ব্যবস্থা করি। আর তা যদি সম্ভব না হয় তাহলে সমুদ্রের জলে যেন তা ভাসিয়ে দিই। প্রতিবেশীদের সংস্কারের বিরুদ্ধে শহর বা গ্রামাঞ্চলে দাহ করা আমার পক্ষে সম্ভব হয়নি। আমি এসপানিয়া থেকে ফার্নান্দিনা যাবার পথে এই জাহাজ থেকেই তাঁর দেহ সমুদ্রের জলে ভাসিয়ে দিই। তাঁর দ্বিতীয় নির্দেশ ছিল তাঁর একটি নিজের হাতে লেখা লিপি তাঁর দেশে পোঁছে দেওয়া। পোঁছে দেবার জন্যে আমায় উদ্বিগ্ন বা ব্যস্ত হতে নিষেধ করে তিনি শুধু ধৈর্য ধরে অপেক্ষা করতে বলেছিলেন। বলেছিলেন, তাঁর এ অন্তিম লিপি যথাস্থানে পোঁছে দেবার ভার নিতে একদিন একজন নিজে থেকেই এসে দেখা দেবে। আজ পর্যন্ত কেউ, অবশ্য আসেনি।

কিছুটা সান্ত্বনার সুরে, ভবিষ্যতে হয়ত আসবে বলে অতি কষ্টে নিজেকে সংবরণ করে ঘনরাম নিজের পূর্বের প্রশ্নেই ফিরে গিয়েছিলেন।

জিজ্ঞাসা করেছিলেন,—এখন আমার ভাগ্যলিপিতে আর কি দেখছেন, বলুন।

আর,—বলতে গিয়ে নীরব হয়ে সানসেদোর মুখ হঠাৎ অত্যন্ত বিষণ্ণ গম্ভীর হয়ে উঠেছিল।

কি! চুপ করে গেলেন কেন, বলুন! দাবী করেছিলেন ঘনরাম।

কোন গণনাই নির্ভুল হতে পারে না। একটু যেন মাপ চেয়ে নেওয়ার ভঙ্গিতে বলেছিলেন সানসেদো,—আমার ত নয়ই। তাই যা বলছি তা ধ্রুব সত্য বলে ধরে নেবেন না। আমার নিজেরই শোনাতে মন চাইছে না।

তবু অসঙ্কোচে বলুন। জেদ ধরে বলেছিলেন, ঘনরাম—ভাগ্যের সঙ্গে আমার অনেক দিনের লড়াই। তার চোরা চক্রান্তগুলো আগে থাকতে জানলে বরং কিছু সুবিধেই হতে পারে।

আপনার সমস্ত ভবিষ্যৎ স্পষ্ট করে দেখা আমার বিদ্যার বাইরে। ধীরে ধীরে

বলেছিলেন সানসেদো—আমি আবছা আলো-ছায়ায় সেখানে যা দেখতে পাচ্ছি তাতে চোখ ধাঁধাবার মত আশ্চর্য সাফল্যই বেশী। অন্ধকার খাদে আর উজ্জ্বল চূড়ায় নামা-ওঠার হতাশা উল্লাসে দোলানো বিচিত্র আপনার জীবন। অজানা নিরুদ্দেশে আপনাকে পাড়ি দিতে হবে, রক্তের নদী বইবে আপনার সামনে, সোনায় বাঁধানো পথ দিয়ে আপনি হাঁটবেন, আপনাকে বরমাল্য দেবে এক রাজকুমারী, এমন এক অচিন রহস্যের দেশে পৃথিবীর কেউ আজো যা জানে না, কিন্তু তার আগে, তার আগে—

সানসেদো আবার দ্বিধাভরে থেমেছিলেন। কিন্তু ঘনরাম তাঁকে থামতে দেন নি।

তার আগে কি বলুন! ঈষৎ তীব্র স্বরে বলেছিলেন।

তার আগে আমার গণনায় ভাগ্যের অবিশ্বাস্য নিষ্ঠুরতম আঘাতে আপনাকে একেবারে অতলে তলিয়ে যেতে দেখছি। দেখছি অমঙ্গলের একটা ভয়ংকর কালো ছায়া গাঢ় হয়ে আপনার জীবনে নামছে।

সানসেদো আর কিছু বলতে পারেন নি। একটা চাপা হাসির হিল্লোল দমকা হাওয়ার মত কামরাটায় ভারি আবহাওয়ার গাম্ভীর্যে একটা ঝাপটা দিয়েই থেমে গেছল।

ও' তিয়েন'-এর পর 'সিয়েন্তো মুচো' শুনে ঘনরাম মুখ ফিরিয়ে দেখেছিলেন সেনোরা আনা যেন ভুল করে ঘরে ঢুকে পড়ার লজ্জায় থমকে থেমে গেছে।

অত্যন্ত দুঃখিত বলে দ্বিধাভরে থামলেও সেনোরা আনার ঘর ছেড়ে চলে যাবার কোন লক্ষণ দেখা যায় নি।

খুব যেন জরুরী একটা কথা বলতে এসে বাইরের লোকের উপস্থিতিতে সেটা তিয়েন বলে যাঁকে কাকার মর্যাদায় প্রতিষ্ঠিত করেছে তাঁকে বলবে কিনা ঠিক করতে পারছে না।

একবার সানসেদো আর একবার তাঁর নিজের দিকে আনাকে চঞ্চলভাবে তাকাতে দেখে ঘনরাম নিজেই উঠে পড়ে ঘর থেকে বিদায় নিতে চেয়েছেন।

না, না, সেকি আপনার ত এখনো খাওয়াই হয়নি! আপত্তি করতে বাধ্য হয়েছেন সানসেদো।

এর পরও সেনোরা আনা ঘরে দাঁড়িয়ে থাকাতে পরিচয় না করিয়ে দিয়েও পারেননি।

এটি আমার সোব্রিনা সেনোরা আনা! বলেছেন সানসেদো,—নিজের ভাগনী না হলেও তারচেয়ে কম কিছু নয়। আর ইনি হলেন সেনর দাস।

আনা শুধু এইটুকুর জন্যেই অপেক্ষা করছিল বোধহয়। পরিচয়ের পর প্রথম যথাবিহিত সৌজন্য বিনিময়টুকু সারতে না সারতেই উচ্ছ্বসিত হয়ে বলেছে,—ও'র নাম আমি জানি। আজ ও'র খেলাও দুবার উঁকি দিয়ে দেখেছি তিয়েন! জাহাজে এখন সকলের মুখে ত' শুধু ও'রই কথা!

ঘনরাম সত্যিই একটু অস্বস্তি বোধ করেছেন এ উচ্ছ্বাসে। সেটা কাটাবার জন্যে ঠাট্টার সুরে বলেছেন, জুয়া খেলায় বাহাদুরী দেখিয়ে একটা মস্ত কীর্তি রেখেছি তাহলে!

জুয়াখেলার বাহাদুরী কেন! আনা প্রতিবাদ করেছে, তিয়েনই বলুন না, হারজিৎ এমন সমানভাবে নেওয়ার মত জুয়াড়ী ক'জন উনি জীবনে দেখেছেন!

তা বেশী দেখিনি বটে! —স্বীকার করেছেন সানসেদো।

এ প্রসঙ্গ তাঁর সামনে চলতে দিতে ঘনরাম আর চান নি। এবার খাবার প্লেট সরিয়ে রেখে উঠে পড়ে বলেছেন,—আমার খাওয়া হয়ে গেছে কাপিতান। আপনারা যদি অনুমতী করেন আমি যেতে পারি এখন।

কেন, আপনি যাবেন কেন! আনা এর মধ্যেই সহজ হয়ে গেছে বহুদিনের পরিচিতের মত।

কিছু একটা কথা আপনার তিয়েনকে বোধহয় বলবার ছিল। স্মরণ করিয়ে দিয়েছেন ঘনরাম,—আপনাকে ঘরে ঢুকতে দেখে অন্ততঃ তাই মনে হয়েছিল।

হ্যা, কি বলতে এসেছিলে আনা? সানসেদোও জিজ্ঞাসা করেছেন—এ'র সামনে বলতে যদি বাধা না থাকে ত বলো।

না, ও'র সামনে বাধা কি! আনা ঘনরামকে যেন অন্তরঙ্গের মধ্যে ধরে বলেছে,—আমি একটা ষড়যন্ত্রের কথা ভেবেছি। তাই হাসতে হাসতে ঢুকছিলাম।

ষড়যন্ত্রের কথা ভেবে হাসতে হাসতে আসছিলে! সানসেদো বিমূঢ়ভাবে আনার দিকে তাকিয়েছেন।

হ্যাঁ ষড়যন্ত্র। আনা উচ্ছ্বসিত ভাবে বলেছে,—শোনোই না ষড়যন্ত্রটা তুমিও খুশি হয়ে হাসবে।

সেনোরা আনা কৌতুক হিসেবেই ষড়যন্ত্র কথাটা ব্যবহার করেছিল। তখন ঘনরামের জীবনে সেটা কৌতুক নয় সত্যিকার ষড়যন্ত্রই হয়ে দাঁড়াবে কে আর পেরেছিল ভাবতে!

এ ষড়যন্ত্র কিন্তু কোনো মানুষের নয়। ঘনরামের বিরুদ্ধে যত হিংস্র আক্রোশই মনের ভেতর পুষে রাখুক, সোরাবিয়া এ ষড়যন্ত্রের একটা অসহায় ঘুঁটি মাত্র।

এ ষড়যন্ত্র স্বয়ং নিয়তির।

কৌতুক হিসাবে সাজানো একটা ছেলে-খেলার চক্রান্ত নিয়তির নির্মম শঠতায় ছাড়া অমন বিফল বিকৃত হয়ে ঘনরামের জীবনকে চরম অপমান লাঞ্ছনা গ্লানির অতলে ডুবিয়ে আবার অকূলে ভাসিয়ে দিতে পারত না।

ঘনরামকে আর যেখানেই হোক ১৫২১-এ নতুন মহাদেশের সবচেয়ে জঘন্য অস্বাস্থ্যকর উপনিবেশে অন্ততঃ দেখা যাবার কথা নয়। সানসেদোর ভবিষ্যৎ গণনার প্রথম দিকটা অন্ততঃ হাতে হাতে তাঁর ফলেছে এ বিষয়ে সন্দেহ নেই। শেষের দিকটা ফলবার কথা এ উপনিবেশে বন্দী হয়ে ভাবাও বাতুলতা।

এ উপনিবেশের জমকালো ও গালভরা নাম কিন্তু কাস্তিল্‌লা দেল অরো অর্থাৎ সোনার কাস্তিল। এ উপনিবেশের শাসন-কর্তা হলেন ডন পেড্রো আরিয়াস দে আভিলা, ওরফে পেড্রারিয়াস।

যেমন নীচ স্বার্থপর তেমনি হিংসুক পরশ্রীকাতর মানুষটা। সে যুগে এসপানিয়াতে সবচেয়ে যাতে কাজ হত সেই খানদানি বংশে বিয়ের জোরেই তিনি একটা নতুন উপনিবেশের শাসকের মত সম্মান ও দায়িত্বের পদ পেয়েছিলেন। যাকে তাকে ত' আর তিনি বিয়ে করেন নি, ক্যাথলিক ইসাবেলা বলে সারা ইওরোপ যাকে জানে, তাঁরই বান্ধবী মোআ-র মারুনেস, বিখ্যাত ডোনা বিয়াত্রিজ দে বোবাদিল্লার মেয়ে তাঁর ঘরণী। এসপানিয়ার সম্মান প্রতিপত্তির চূড়ায় ওঠবার সিঁড়িই হল এই। মেক্সিকো বিজেতা কর্টেজ যৌবনে নিচু ঘরে বিয়ে করে যত সুখীই হয়ে থাকুন এই সিঁড়ির সুবিধা না পাওয়ার দরুণই তাঁর যোগ্য সম্মানশিখরে উঠতে পারেন নি। তার জন্যে কর্টেজ-এর মনে দারুণ আফশোষ ছিল বলেও অনেক ঐতিহাসিকের ধারণা। মেক্সিকো বিজয়ের শেষে স্পেনের শাসন যখন সেখানে বিস্তৃত তখন সে দেশের হর্তাকর্তা কর্টেজের পাশে তাঁর সহধর্মিণী-রূপে সম্মানের অংশ নিতে এসে কর্টেজ-এর স্ত্রী যখন তিন মাসের মধ্যেই মারা যান তখন কর্টেজ নিজের সামাজিক উন্নতির পথ পরিষ্কার করবার জন্যে তাঁকে সরিয়েছেন এমন গুজবও শোনা গেছল।

সামাজিক সম্পর্কের জোরেই অত বড় উচ্চ পদ পেলেও এবং স্বভাবচরিত্রে নীচ স্বার্থপর ঈর্ষাকাতর হলেও তখনকার এসপানিওল অর্থাৎ স্পেনের মানুষের বিশেষ চরিত্র লক্ষণটি পেড্রারিয়াস-এর মধ্যেও ছিল।

নতুন মহাদেশ আবিষ্কৃত হবার পর থেকে সমস্ত ইওরোপের যৌবনই তখন অস্থির চঞ্চল। স্পেন ও পোর্টুগ্যালে উদ্দাম বেপরোয়া উদ্দীপনা আর চাঞ্চল্য সবচেয়ে বেশী।

পোর্টুগ্যাল আর স্পেনই নৌবিদ্যায় তখন অন্যদের তুলনায় বেশী অগ্রসর। সময়ের মাপ আরো সূক্ষ্ম হয়েছে তখন, তার ওপর চুম্বক-কম্পাস নির্ভুল দিকনির্ণয়ের শক্তি দিয়ে নাবিকদের আত্মবিশ্বাস বহুগুণ বাড়িয়ে দিয়েছে। ধুকধুকে প্রাণ হাতে নিয়ে সমুদ্রের কূল ঘেঁষে যারা জাহাজ চালাত অকূল দরিয়ায় পাড়ি দেবার মত তাদের এখন বুকের পাটা।

পোর্টুগ্যাল ও স্পেন এ অগ্রগতির পুরোভাগে থেকে কিছুকাল আগেও যা কল্পনাতীত ছিল সেই অসাধ্য সাধন করেছে।

আফ্রিকার কূল ধরে ধরে গুটি গুটি এগিয়ে দক্ষিণের দিকে একটা অন্তরীপ থেকে আরেকটা অন্তরীপ পর্যন্ত নিজেদের দৌড় বাড়াতে যাদের প্রায় গোটা শতাব্দীটা লেগে গিয়েছিল, সেই পোর্টুগ্যালের এক দুঃসাহসী নাবিক ডিয়াজ প্রথম আফ্রিকার দক্ষিণের শেষ অন্তরীপ ঘুরে নতুন সমুদ্রে পৌঁছোবার কীর্তি রাখলেন। আমরা সে অন্তরীপের নাম উত্তমাশা বলে জানি। কিন্তু ডিয়াজ এ অন্তরীপে উত্তম আশা করবার মত কিছু পান নি। ঝড়-তুফানে নাজেহাল হয়ে তিনি এর নাম ঝোড়ো অন্তরীপই রেখেছিলেন। পোর্তুগ্যালের রাজা দ্বিতীয় জন-এর কিন্তু দূরদৃষ্টি ছিল

অনেক বেশী। তিনিই অন্তরীপের নতুন নামকরণ করেছিলেন উত্তমাশা। তাঁর নামকরণ যে সার্থক ভাস্কো দা গামা আফ্রিকার দক্ষিণ অন্তরীপ ঘুরে ইওরোপের আকুল স্বপ্নের ইণ্ডিয়া অর্থাৎ আমাদের ভারতবর্ষে পৌঁছোনতেই তা প্রমাণ হয়।

যে লক্ষ্যের দিকে একাগ্র হয়ে পোর্তুগ্যাল আফ্রিকার দক্ষিণ দিকে দুঃসাহসভরে এগিয়ে গেছে, সেই একই লক্ষ্যের টানে কলম্বস স্পেনের হয়ে নতুন এক মহাদেশ আবিষ্কার করে ফেলেছেন পোর্টুগ্যালের আগেই।

সে লক্ষ্য হল ইণ্ডিয়া। প্রাচ্য দেশ বলতে তখন ইণ্ডিয়াই আগে বোঝায়। সেই ইণ্ডিয়াই কল্পনাতীত ঐশ্বর্যের দেশ, সোনা রুপো হীরে মুক্তো সুগন্ধী আতর আর চন্দন, অপরূপ সব মশলা আর তার চেয়ে অপরূপ সব বয়নশিল্পের নিদর্শন।

এই ইণ্ডিয়ায় পৌঁছোবার পথ আবিষ্কার করতে পারাতেই জীবনের চরম সার্থকতা, তারচেয়ে বড় আকাঙ্ক্ষা স্পেন পোর্টুগ্যালের কোনো ভদ্রসন্তান কাবালিয়েরোর তখন নেই।

কিন্তু পোর্টুগ্যাল সেখানে যাবার পথ খুঁজেছে আফ্রিকার দক্ষিণ দিয়ে, পৃথিবী গোলাকার জেনে কলম্বস তাকে বেড় দিয়ে উল্টো দিক থেকে সেখানে পৌঁছোবার চেষ্টা করেছেন কেন?

আর কি পথ ছিল না ইণ্ডিয়ায় যাবার?

ছিল আরো সহজ সংক্ষিপ্ত পথ, কিন্তু মেয়ার নস্‌ট্রম অর্থাৎ মধ্যোপসাগরে সে পথে ধনপ্রাণ বাঁচানো অনিশ্চিৎ করে তুলেছে মরক্কো আর আলজিরিয়ার মুরে বোম্বেটেরা। সে সমুদ্রের পূর্বদিকের মুখও আবার মিশর আরবের জোড় সুয়েজ দিয়ে বন্ধ। তারপরও আছে দুরন্ত আরব সাগর-সদাগরেরা, যারা একহাতে বাণিজ্য করে আরেক হাতে লুটতরাজ।

তাই ইণ্ডিয়ায় পৌঁছোবার নিরাপদ রাস্তা চাই।

সে রাস্তার খোঁজে বেরিয়ে কলম্বস মাঝপথে যা পেয়েছেন সে দেশের সঠিক পরিচয় তখনও গাঢ় রহস্যে ঢাকা।

বিরাট একটা অজানা বিস্তৃতির ওপরকার দুর্ভেদ্য যবনিকা এখানে সেখানে সামান্য একটু উঁকি দেবার মত ওঠানো গেছে মাত্র।

কিন্তু যবনিকা যেটুকু উঠেছে তাতেই উত্তেজনার বন্যা বইয়ে দিয়েছে দুঃসাহসীদের রক্তে।

স্পেনে নিজেকে পুরুষ বলে যারা গর্ব করে তারা সবাই তখন দুঃসাহসী, সবারই মন অবিশ্বাস্য যশ আর ঐশ্বর্য জয়ের স্বপ্নে বিভোর।

তাদের এ স্বপ্ন দেখবার কারণও নেই তা নয়।

আবিষ্কারের পর জয় করে প্রথম উপনিবেশ পাতা হয়েছে হিসপানিওলায়, ফার্নানডিনায়, মানে কিউবায়।

তারপর হার্নানদেজ দে কর্দোভা, বাহামা দ্বীপ থেকে সেখানকার আদিবাসী ক্রীতদাস ধরে আনতে গিয়ে ঝড় তুফানে ছিটকে আশাতীত এক অজানা রাজ্যে পৌঁছে তাদের

বাড়িঘর চাষবাস মিহি কাপড়ের সৌখিন বেশভূষা আর গয়নার সোনাদানা দেখে অবাক হয়েছেন। কান শুনতে ধান শুনে সেখানকার লোকের মুখের টেক্‌টেটানকে য়ুকাটান নাম দিয়ে তিনি কিউবায় ফিরে নতুন দেশের ঐশ্বর্যের চোখ-কপালে তোলা গল্প করেছেন।

এক আবিষ্কার আরেক অভিযানকে ঠেলা দিয়েছে।

য়ুকাটানের পর কর্টেজের কীর্তি মেক্সিকো জয়।

উদ্দাম উত্তেজনার ঢেউ তখন এই সব দৃষ্টান্তে নতুন মহাদেশের সমস্ত পূর্ব উপকূলের তীরে ধাক্কা দিচ্ছে।

সামনে অজানা মহাদেশ প্রসারিত। কিন্তু তারই ভেতর কোথাও আছে সেই প্রণালী যা আতলান্তিক থেকে ইণ্ডিয়ার পশ্চিম তীরে গিয়ে নামবার সমুদ্রে পৌঁছে দেবে।

মেক্সিকো স্পেনের পদানত হয়েছে ১৫২৩-তে। তার অনেক আগেই ১৫১১ খৃষ্টাব্দে ভাস্কো নুনিয়েজ-দে-বালবোয়া আশ্চর্য এক দেশের কিংবদন্তী শুনেছেন।

এসপানিওলরা সবাই সোনা বলতে পাগল এ ব্যাপারটা তখনও নতুন মহাদেশের নিজস্ব অধিবাসীদের কাছে অদ্ভুত লাগে। তাদেরই একজন বালবোয়াকে সে অবিশ্বাস্য দেশের কথা শুনিয়েছে।

আগে যে জঘন্য অস্বাস্থ্যকর উপনিবেশের কথা বলেছি বালবোয়া তখন পেড্রারিয়াসের অধীন সেই কাস্তিললা দে অরো মানে সোনার কাস্তিলের নরকে থাকেন।

কাস্তিললা দে অরো যে উত্তর আর দক্ষিণ আমেরিকার যোজক মাত্র তা তখনও ঔপনিবেশিকদের অজানা।

শাসক পেড্রারিয়াস-এর প্রতিনিধি হিসেবে বালবোয়া আদিম অধিবাসীদের কাছে সংগ্রহ করা কিছু সোনা ওজন করাচ্ছিলেন। সেখানে স্থানীয় একজন সর্দার ছিল উপস্থিত। বিস্ময়ে কৌতুকে সোনা ওজনের এ অনুষ্ঠান দেখতে দেখতে হেসে উঠে দাঁড়ি-পাল্লায় একটা চাপড় দিয়ে সে সমস্ত সোনা মাটিতে ছড়িয়ে দেয়; তারপর মুখ বেঁকিয়ে বলে,—এই জিনিসের ওপর তোমাদের এমন লোভ যে হিতাহিত কাণ্ডজ্ঞান পর্যন্ত খুইয়ে পাগলের মত হন্যে হয়ে ছুটে বেড়াচ্ছ! এমন দেশের খোঁজ আমি দিতে পারি যেখানে সোনার থালা বাটিতে ছাড়া কেউ খায় না, তোমাদের কাছে লোহা যা সেখানে সোনা তারই মত সস্তা। সেখানে সূর্য কাঁদলে সোনা ঝরে।

সূর্য কাঁদলে সোনার দেশ হয়ত আজগুবি কিংবদন্তী মাত্র। অমন অনেক আজগুবি কল্পনাই ত তখনকার অভিযাত্রীরা এই রহস্যময় মহাদেশ সম্বন্ধে করেছে, অল্পবিস্তর বিশ্বাসও করেছে অদ্ভুত অবিশ্বাস্য সব আরব্যোপন্যাসকে হার মানানো কাহিনী।

মেয়েরাই যেখানে যোদ্ধা সেই বীরনারী আমাজনদের কথায় তারা খুব অবিশ্বাসের কিছু পায়নি, শুনেছে পাটাগোনিয়ার দানব জাতির কথা, আর সেই এলডোরাডোর বিবরণ শুনে উত্তেজিত হয়ে উঠেছে যেখানে সোনার কণা সমুদ্রের বালির মত ছড়িয়ে থাকে, আর নদীতে জাল ফেললে পাখীর ডিমের মত সোনার ডেলার ভারে জাল টেনে তোলা শক্ত হয়।

সূর্য কাঁদলে সোনার দেশ সত্যে মিথ্যায় বাস্তবে কল্পনায় মেশানো তেমনি কিছু হওয়া অসম্ভব নয়।

কিন্তু কাহিনী যারা শোনায় তারাও সে দেশের সঠিক হদিস দিতে পারে কই!

রহস্য-যবনিকার আড়াল থেকে মাঝে মাঝে বিহ্বল-করা একটা অস্পষ্ট হাতছানি শুধু অস্থির করে তোলে।

এই হাতছানির ডাকেই বালবোয়া সূর্য কাঁদলে সোনা ঝরায় দেশের কাহিনী শোনার কিছু পরেই কাস্তিললা দে অরো-র পচা জলাবাদার সাপখোপ মশা পোকা মাকড়ের ভ্যাপসা নরক থেকে ডারিয়েন যোজকের মেরুদণ্ডের মত পর্বতপ্রাকার ডিঙিয়ে গেছলেন পরম দুঃসাহসে।

পাহাড় ডিঙিয়ে যা তিনি দেখেছিলেন তা তাঁর সমস্ত কল্পনার অতীত।

সমস্ত অস্ত্রশস্ত্রসমেত যোদ্ধার পোশাকেই তিনি ঝাঁপিয়ে গিয়ে পড়েছিলেন সামনের ফেনায়িত তরঙ্গ-ফনা-তোলা নীল জলের বিস্তৃতিতে। পাগলের মত চিৎকার করে বলেছিলেন,—যতদূর এ অজানা সমুদ্র ছড়িয়ে আছে ততদূর পর্যন্ত দেশ মহাদেশ থেকে দ্বীপবিন্দু সমেত সব কিছুর ওপর কাস্তিলের মহামান্য নৃপতির একচ্ছত্র অধিকার আমি ঘোষণা করলাম।

দিগন্ত পর্যন্ত প্রসারিত দেখেও সে নীল জলধির বিরাটত্ব তিনি তখন বোধহয় অনুমান করতেও পারেন নি।

সেই অসীম জলরাশি প্রশান্ত মহাসাগরের। সময়টা বোধহয় ১৫১৪-র কিছু পূর্বে।

মানুষের সভ্যজগৎ সমবেত ও সচেতন-ভাবে সেই প্রথম এক অজানা মহাসমুদ্রের সন্ধান পেল।

যোজকের অপর পারে এই মহাসমুদ্রের তীরেই বালবোয়া রূপকথার সব অবিশ্বাস্য সোনার দেশের আরো কিছু কিছু বিবরণ পান। সে দেশের পশু পাখি ফল ফসলও নাকি অদ্ভুত। সেখানকার প্রধান একটি প্রাণীর ছবি তাঁকে এঁকে কেউ দেখায়। ইওরোপ এশিয়ার কোন প্রাণীর সঙ্গে মিল তার কিছু হয়ত থাকলেও তা একেবারে স্বতন্ত্র।

এ দেশ কি শুধু এখনকার অজ্ঞ অধিবাসীদের কল্পনাতেই আছে!

যদি কল্পনারই হয় তবু বালবোয়া নিজে একবার তা যাচাই করে দেখবেন।

সুদৃঢ় সংকল্প আর গভীর আশা নিয়ে বালবোয়া তাঁর হর্তাকর্তা সোনার কাস্তিলের শাসক পেড্রারিয়াস-এর রাজধানী ডারিয়েন-এ ফিরে যান। তাঁর সব সংকল্প ব্যর্থ সব আশা চূর্ণ হয়ে যায় পেড্রারিয়াস-এর নীচ পরশ্রী-কাতরতায় আর সঙ্কীর্ণতায়। পেড্রারিয়াস নতুন রাজ্য আবিষ্কারের গৌরব নিতে চায়, নিতে চায় সেখানে যা পাওয়া যায় সে সম্পদের সিংহভাগ, কিন্তু আর কারুর এমন কি অভিযানের সমস্ত দুর্ভোগ দায়িত্ব নিয়ে নির্বাসন বন্দীত্ব এমন কি মৃত্যু পর্যন্ত বরণ করতে যে প্রস্তুত, তার বিন্দুমাত্র সাধুবাদ সহ্য করতে পারবে না।

শাসকের সমর্থন ও অনুমতি ছাড়া কোনো অভিযান পরিচালনা করা অসম্ভব। এসপানিয়া-র সম্রাট অনেক 'দূরে অস্ত'। ডারিয়েন-এ তাঁর প্রতিনিধি পেড্রারিয়াস।

বালবোয়া দিনের পর দিন বৃথাই তাঁর অনুমতির জন্যে অপেক্ষা করেছেন। ইতিমধ্যে বালবোয়ার যুগান্তকারী আবিষ্কারের মূল্য পেড্রারিয়াস যে সম্পূর্ণ অস্বীকার করেছেন তা নয়। নতুন মহাসমুদ্রে আবিষ্কারের অভিযান চালাবার সুবিধার জন্যেই ১৫১৯-এ বালবোয়ারই পরামর্শ অনুসারে ডারিয়েন থেকে রাজধানী পশ্চিমের সমুদ্রকূলে পানামায় সরিয়ে নিয়ে আসা হয়েছে। সেখান থেকে নতুন অজানা দেশ, বিশেষ করে সেই ভারত-মুখী প্রণালী খোঁজার উদ্দেশ্যে জাহাজ সাজিয়েও বেরিয়েছেন অভিযাত্রীরা, কিন্তু সব অভিযানেরই মুখ উত্তরে। উত্তরে যোজকের ভেরাগুয়া, কোস্টারিকা, নাইকারগুয়া প্রভৃতি পর পর আবিষ্কৃত ও অধিকৃত হয়েছে।

শুধু দক্ষিণে কোন অভিযান যায়নি।

বালবোয়া অন্যায় অবিচারে আশাভঙ্গের বেদনায় নিরুপায় হতাশায় ভেতরে ভেতরে জর্জর হয়ে একদিন মৃত্যুবরণ করেছেন।

'সূর্য কাঁদলে সোনা-র দেশ' আবিষ্কারের ভাগ্য তাঁর হয়নি।

(ক্রমশঃ)

দেশে বিদেশে

দীর্ঘ, উত্তপ্ত গ্রীষ্ম

এই গ্রীষ্মের মত এত দীর্ঘ ও উত্তপ্ত গ্রীষ্ম আমেরিকায় আগে আর আসেনি। এবং তাপ বাড়তে বাড়তে একসময় সেখানে দাবানল জ্বলে উঠেছে।

দাবানল বইকি। নিগ্রো বিক্ষোভ ও হাঙ্গামা আমেরিকায় নতুন নয়, সর্বদা অহিংসও নয়। কিন্তু এবারে হাঙ্গামা যে ব্যাপক ও ভয়াবহ রূপ নিতে পারে তা শ্বেতাঙ্গ আমেরিকার, এমনকি কৃষ্ণাঙ্গ আমেরিকারও কল্পনার বাইরে ছিল।

অন্তত গোটা কুড়ি শহর এই দাবানলের আগুনে জ্বলেছে, পুড়েছে, বিধ্বস্ত হয়েছে। রাস্তায় রাস্তায় দোকান-পাট পুড়ে ছাই হয়ে গেছে। লুঠ হয়ে গেছে দোকানের জিনিস-পত্র। ঘন-কালো ধোঁয়ার কুন্ডলীতে জনপদ-গুলি যেন যুদ্ধক্ষেত্র। আর সেই ব্যাপক ধ্বংসলীলার মধ্যে উন্মত্ত নিগ্রোদের সঙ্গে চলেছে সশস্ত্র পুলিশের সম্মুখ কিংবা গেরিলা লড়াই। তার সাক্ষী ছিল রাস্তায় রাস্তায় এধারে-ওধারে ছড়ানো মৃতদেহগুলি।

এই হাঙ্গামার একটা চরম রূপ দেখা গিয়েছিল নেওয়ার্কে। নেওয়ার্কের মেয়র বলেছিলেন : "মনে হচ্ছে যেন দুটি দেশ পরস্পর যুদ্ধ করছে।" তারপর ডেট্রয়টে। একমাত্র ডেট্রয়টেই মারা গিয়েছিল ৪১ জন। ক্ষতি হয়েছিল প্রায় ৫০ কোটি ডলার। ১৯৬৫ সালের আগস্ট মাসে লসএঞ্জেলেসের ওয়াটস পাড়ায় যে বিধ্বংসী দাঙ্গা-হাঙ্গামা হয়েছিল, তাতেও ক্ষতির পরিমাণ এত ছিল না।

অর্থাৎ বর্তমান নিগ্রো হাঙ্গামার দুটি চরিত্র অত্যন্ত স্পষ্টভাবে প্রকাশিত : এক, এর ব্যাপকতা, এবং দুই, এর সংহিংস উন্মত্ততা। এই দুটি বৈশিষ্ট্যের ভেতর থেকেই আমরা তৃতীয় আরেকটি বৈশিষ্ট্যের পরিচয় পাই যা আরো গভীর উদ্বেগের কথা।

সেটা হল : এই আন্দোলনের পরি-চালনায় নরমপন্থী নেতৃত্বের প্রায় সম্পূর্ণ অনুপস্থিতি। বিখ্যাত মন্টগেমারী বাস বয়কট আন্দোলনের ভেতর দিয়ে মার্টিন লুথার কিং প্রমুখের যে নেতৃত্ব সাম্প্রতিককালে নিগ্রো বিকাশের অপ্রতিদ্বন্দ্বী শক্তি হিসেবে প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল এবং যারা বিশ্বাস করে রাজপথের হিংসার দ্বারা নয়, আদালতের রায়ের দ্বারাই নিশ্চিতভাবে নিগ্রোদের ভাগ্যের পরিবর্তন করা যেতে পারে, সেই নেতৃত্ব আজ দুর্বলকণ্ঠ।

তার বদলে যে নেতৃত্ব আজ ক্ষমতা দখল করেছে তারা 'কৃষ্ণাঙ্গ শক্তি'র পূজারী।

লোকমান্য তিলকের মৃত্যু-বার্ষিকী উপলক্ষে তাঁর প্রতি শ্রদ্ধা নিবেদনের পরে নয়াদিল্লীর তিলকমার্গে অবস্থিত লোকমান্য তিলকের প্রতিমূর্তির সম্মুখে দণ্ডায়মান রাষ্ট্রপতি ডঃ জাকির হোসেন, স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী শ্রীচ্যবন ও লোকসভার ডেপুটি স্পীকার শ্রীআর কে খাদিলকার।

তাদের মতবাদ হল আদালত কিংবা আর কেউ নিগ্রোদের হাতে অধিকার তুলে দেবে না, সে অধিকার নিগ্রোদের নিজেদের গায়ের জোরে আদায় করে নিতে হবে। এবং সে অধিকার আদায়ের সময় এসেছে। সম্প্রতি এই 'কৃষ্ণাঙ্গ শক্তি'র উদ্গাতাদের এক সম্মেলন বসেছিল। সেখান থেকে অত্যন্ত জোরালো ভাষায় এই দাবী তোলা হয়েছিল, সাদা ও কালো'র ভিত্তিতে আমেরিকাকে দুভাগ করতে হবে। এই উগ্রপন্থীদের যিনি অন্যতম নেতা সেই স্টোক্লি কারমাইকেল আমেরিকার শহরে শহরে গেরিলা বাহিনী গড়ে তোলার জন্যে নিগ্রোদের কাছে আহ্বান জানিয়েছেন।

উগ্রপন্থীদের এই প্রাধান্য আমেরিকার পক্ষে অত্যন্ত উদ্বেগজনক। কারণ সন্ত্রাসবাদ যদি একবার আরম্ভ হয় তবে কোথায় গিয়ে শেষ হবে বলা মুস্কিল। হাঙ্গামার কারণ ও তার প্রতিকার খুঁজে বার করার জন্যে প্রেসিডেন্ট জনসন একটি কমিশন নিয়োগ করেছেন। এই কমিশন প্রশ্নটিকে কিভাবে দেখেন সেটা জানা যাবে এক বছর পরে যখন তাঁরা রিপোর্ট পেশ করবেন। তবে কমিশন এই কথা মনে রাখলে ভালো করবেন যে, নিগ্রো স্বাধিকার প্রতিষ্ঠার ব্যাপারে সাধারণ-ভাবে সরকারের শৈথিল্য ও বিশেষভাবে শ্বেতাঙ্গ সমাজের অনুদারতাই আজ নিগ্রোদের অসহিষ্ণু করে তুলেছে। এই অসহিষ্ণুতা কিছুতেই দূর করা যাবে না যদি আজকের আমেরিকার সবচেয়ে বড় সামাজিক সমস্যাকে সরকার জরুরী ভিত্তিতে না দেখেন।

দলত্যাগের সমস্যা

মধ্যপ্রদেশে শ্রীদ্বারকাপ্রসাদ মিশ্রের কংগ্রেস সরকারের পতনের পর যে প্রশ্নটা কংগ্রেস ও কংগ্রেস-বিরোধী সমস্ত মহলের মনের মধ্যে আন্দোলিত হচ্ছে সেটা হল : নির্বাচিত সদস্যদের ইচ্ছামত এক দল থেকে অন্য দলে যাওয়া-আসা নিয়ন্ত্রণ করা যায় কিনা।

মধ্যপ্রদেশ হল তৃতীয় রাজ্য যেখানে দলত্যাগের ফলে সরকারের বদল হল। অন্য দুটি রাজ্য হচ্ছে হরিয়ানা ও উত্তরপ্রদেশ। নির্বাচনের পর এই তিনটি রাজ্যেই কংগ্রেসী সরকার প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল, তিনটি রাজ্যেই এখন কংগ্রেস-বিরোধী সরকার প্রতিষ্ঠিত হয়েছে।

স্বভাবতই এর প্রতিক্রিয়া অন্যান্য রাজ্যেও দেখা দেবে। যেখানে সম্ভব কংগ্রেসীরা বিরোধীদের দল ভাঙ্গিয়ে সরকারের পতন

ঘটাবার চেষ্টা করতে পারে (কিছু কিছু চেষ্টা ইতিমধ্যেই দেখা গেছে)। তেমনি বিরোধীরাও সম্ভাব্য স্থানে কংগ্রেস সরকারের পতন ঘটাবার জন্যে উৎসাহিত হ'তে পারে।

এর নীট ফল গণতন্ত্রের পক্ষে মোটেই কল্যাণকর নয়। দল ভাঙাভাঙির ফলে যদি যে-কোন সময় সরকারের পতনের সম্ভাবনা থাকে এবং পতন ঘটে, তাহলে প্রশাসনিক স্থায়িত্ব কখনই আসতে পারে না। তাছাড়া এর দ্বারা নির্বাচকমণ্ডলীর প্রতিও চরম অবিচার করা হয়। এবং এর ফলে সুস্থ রাজনীতির বদলে নোংরা দলাদলিটাই প্রধান হয়ে দাঁড়ায়।

হয়েছেও তাই। হরিয়ানায় কিংবা উত্তর প্রদেশে কিংবা মধ্যপ্রদেশে যাঁরা দলত্যাগ করে কংগ্রেস সরকারের পতন ঘটিয়েছেন, তাঁরা কোন আদর্শের দ্বারা পরিচালিত হননি। স্বার্থের রেষারেষিই ছিল তাঁদের কংগ্রেস-বিরোধিতার প্রধান কারণ। এবং তাঁদের সমর্থনে এই তিনটি রাজ্যে যে বিরোধী সরকার প্রতিষ্ঠিত হয়েছে তাতে সিংহভাগ নিয়েছেন এই দলত্যাগীরাই। একে স্বার্থের সমঝোতা ছাড়া আর কিভাবে ব্যাখ্যা করা যায়?

এই ব্যাপারের যদি কিছু প্রতিকার করা না যায় তাহলে কোন নির্বাচিত সরকারই কোনদিন নিরাপদ বোধ করতে পারবেন না। সরকারের কাজ করার পক্ষে এটা মস্তবড় বাধা। গণতন্ত্রের স্বার্থেই এই বাধা দূর করা প্রয়োজন।

বিভিন্ন মহল থেকে এইজন্যে জন-প্রতিনিধিত্ব আইন সংশোধন করার দাবী উঠেছে, যাতে কেউ দলত্যাগ করতে চাইলে যেন তাঁকে আবার নির্বাচকমণ্ডলীর কাছ থেকে নতুন করে রায় নিতে হয়, অর্থাৎ নতুন করে নির্বাচিত হয়ে আসতে হয়।

অন্তত একটা সময়সীমা বেঁধে দেওয়া যেতে পারে এই বলে যে, কোন সদস্য দু' বছর কি তিন বছরের আগে এক দল ছেড়ে অন্য দলে যেতে পারবে না। এইভাবেও দলত্যাগের কুফল অনেকখানি এড়ানো যেতে পারে।

অর্থনৈতিক মন্দা প্রসঙ্গে

দেশের অর্থনীতিতে কিছুদিন যাবত যে একটা মন্দার ভাব দেখা দিয়েছে সম্প্রতি কংগ্রেস পার্লামেণ্টারী পার্টিতে তাই নিয়ে আলোচনা শুরু হয়েছে। প্রথম দিনের আলোচনায় স্থির হয়েছে যে কেন্দ্রীয় অর্থনীতি সংক্রান্ত বিভিন্ন দপ্তরের ছ'জন মন্ত্রী এবং শিল্প, কৃষি প্রভৃতি বিষয়ে অভিজ্ঞ আরো পাঁচজন সদস্য মিলে এই সম্পর্কে একটি নোট তৈরী করবেন এবং এই নোটের ভিত্তিতে দলের বৈঠকে আবার আলোচনা শুরু হবে।

বর্তমান মন্দার প্রকৃতি ও হেতু সম্পর্কে দেশের অর্থনীতিকরা একমত নন। কিছুদিন আগে লোকসভায় আলোচনা প্রসঙ্গে অর্থমন্ত্রী শ্রীদেশাই দেশের বর্তমান আর্থনৈতিক অবস্থাকে মন্দার পরিবর্তে 'তৎপরতার অভাব' বলে বর্ণনা করেছেন। তাঁর মতে, অর্থনীতি কিছুদিন জোর কদমে এগোবার পর বাজারে এইরকম একটা শৈথিল্য আসে।

বর্তমান অবস্থার নামকরণ নিয়ে অর্থনীতিকদের মধ্যে যতখানি মতভেদই থাক না কেন, তার লক্ষণগুলো দেশের অর্থনীতিতে এমনভাবে পরিব্যাপ্ত যে সে সম্পর্কে কোনো মতভেদ থাকা যুক্তিযুক্ত নয়। গত কয়েক বছর ধরে দেশে পণ্যের মূল্যমান এতো দ্রুত বৃদ্ধি পেয়ে চলেছে যাতে মানুষের ক্রয়ক্ষমতা শুধু দিন দিন হ্রাস পাচ্ছে না. সঞ্চয়ের সামর্থ্যও লোপ পাচ্ছে। ১৯৬৬-৬৭ সালে দেশে গড়পড়তা সামগ্রিক পাইকারী মূল্যের সূচক পূর্ব বছরের ১৬৫·১ থেকে বেড়ে একেবারে ১৯১·০-তে পৌঁছোয় অর্থাৎ ১৫·৭ শতাংশ বৃদ্ধি পায়। অপরপক্ষে ১৯৬৬-৬৭ সালে জাতীয় আয় থেকে সঞ্চয়ের হার ছিলো ১০ শতাংশের সামান্য বেশী, চলতি বছরে তা হ্রাস পেয়েছে ৮ শতাংশে। জনসাধারণের ক্রয় ও সঞ্চয় ক্ষমতার এই

প্রমীলার রাজত্ব
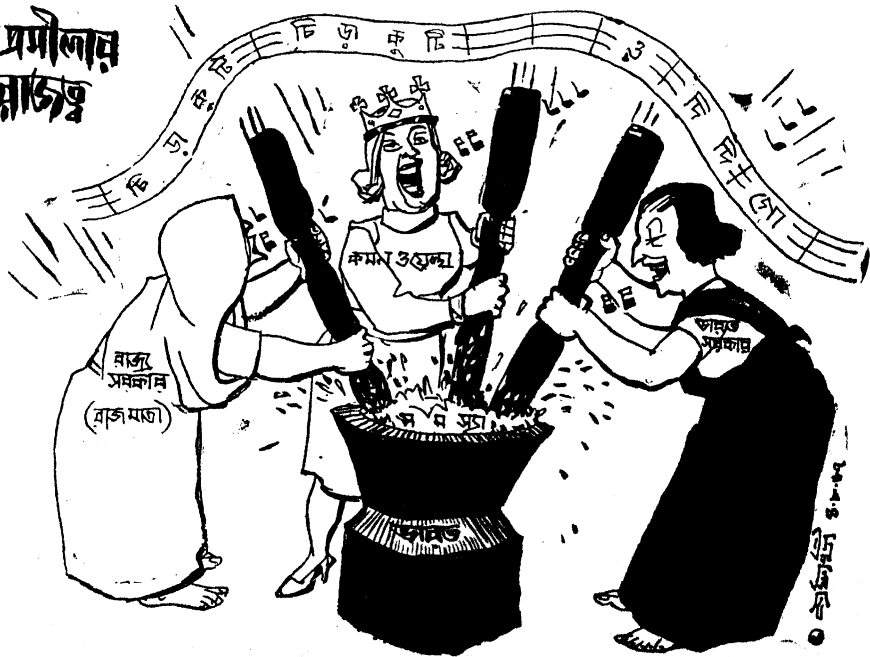
অধোগতি দেশের অর্থনীতির ওপর এমন একটা ছাপ ফেলেছে যা ব্যবসা-বাণিজ্যে মন্দার আকারে দেখা দিয়েছে। দেশের অর্থনীতি কৃষিভিত্তিক বলে গত দু' বছরের খরা তাকে আরো বিপর্যস্ত করে তুলেছে। খাদ্যমূল্যের অস্বাভাবিক বৃদ্ধি যেমন দেশের জনসাধারণের ক্রয়ক্ষমতাকে একেবারে সর্বনিম্ন স্তরে নামিয়ে নিয়ে এসেছে তেমনি দেশজ কৃষিজাত কাঁচামালের অভাবেও বহু শিল্পকে হাত গোটাতে হয়েছে। ফলে একদিকে যেমন দেশের বিস্তীর্ণ অঞ্চলে গুরুতর খাদ্যাভাব এমনকি দুর্ভিক্ষাবস্থা দেখা দিয়েছে তেমনি শিল্পক্ষেত্রেও কারখানা বন্ধ, ছাঁটাই, লে অফ প্রভৃতি দেখা দিয়ে উৎপাদনক্ষেত্রে অশান্তি ও অনিশ্চয়তার ভাব এনে ফেলেছে।

একথা অনস্বীকার্য যে খরা প্রভৃতি প্রাকৃতিক বিপর্যয়ই এর জন্য একমাত্র দায়ী নয়। ১৯৬৫-৬৬ এবং '৬৬-'৬৭ এই দুটো বছরই দেশ খরার প্রকোপে পড়ে। কিন্তু দেশের অর্থনৈতিক মন্দগতি অতিপ্রকাশ হয়ে পড়ে তারো অনেক আগে। সম্প্রতি তৃতীয় পরিকল্পনার সামগ্রিক ফলের এক রিপোর্ট লোকসভায় পেশ করা হয়। এই রিপোর্ট অসম্পূর্ণ হলেও পূর্ণাঙ্গ রিপোর্টেও এর নৈরাশ্যজনক ফল সম্পর্কে ভিন্নরূপ সিদ্ধান্ত হওয়ার কোনো সম্ভাবনা নেই। পরিকল্পনার গোড়ায় মাথাপিছু আয়-বৃদ্ধির লক্ষ্য ছিলো বছরে ৩·২ শতাংশ। কিন্তু পরিকল্পনার প্রথম চার বছরে আমাদের মাথাপিছু আয় বৃদ্ধি পায় মাত্র ১·৮ শতাংশ হিসেবে। পরিকল্পনার সূচনা থেকে এই সময়কালের মধ্যে মূল্যস্ফীতি যেভাবে অব্যাহতগতিতে এগিয়েছে তাতে এই আয়-বৃদ্ধিরও কতটুকু অংশ প্রকৃত আয়রূপে জনসাধারণ উপভোগ করতে পেরেছে তাও সহজেই অনুধাবন করা যেতে পারে। কিন্তু এইখানেই শেষ নয়। পরিকল্পনার শেষ বছরে দেশের অর্থনীতি ক্ষেত্রে এমন গুরুতর বিপর্যয় ঘটেছে যাতে এক বছরেই মাথাপিছু আয় ৬·৮ শতাংশ কমে গেছে। পরিকল্পনার প্রথম চার বছরে লক্ষ্য ও আয়ত্তের মধ্যে গুরুতর ফারাকের কারণ হিসেবে প্রথমত দেখানো হয়েছে ২·৪ শতাংশ হারে জনসংখ্যা বৃদ্ধি। দ্বিতীয়ত পরিকল্পনার প্রথম তিন বছরে কৃষি উৎপাদনে মন্দা, যার ফলে সরবরাহ ব্যবস্থা বিঘ্নিত হয়ে অর্থনৈতিক অবস্থাকে জটিল করে তোলে।

কিন্তু এক্ষেত্রে উল্লেখনীয় যে খরা দেখা দেয় ১৯৬৫-৬৬ সালে অর্থাৎ আলোচ্য পরিকল্পনার শেষ বৎসরে। পাকিস্থানের সঙ্গে যুদ্ধও ঘটে এই বৎসরে যার ফলে শিল্পোৎপাদন কিছুটা ক্ষুণ্ণ হয় এবং সরকারের ব্যয়নীতিতেও পরিবর্তন সাধনের প্রয়োজন হয়। কিন্তু তার আগে বন্যা, খরা বা এমন কোনো অবস্থা দেখা দেয়নি (একমাত্র চীনের সঙ্গে স্বল্পকালীন সীমান্ত সংঘর্ষ ছাড়া) যার জন্য প্রকৃতিকে দায়ী করা যেতে পারে। এবং প্রকৃতি যদি তার দায়িত্ব এড়ায় তাহলে স্বভাবতই পরিকল্পনার রচয়িতা এবং রাষ্ট্রের অর্থনৈতিক কর্ণধারদের এই ব্যাপারে দায়িত্ব কতখানি সেই প্রশ্ন উঠবে। দেশের অর্থনৈতিক অবস্থাকে জোরদার করতে হলে শিল্প ও কৃষিতে লগ্নী উত্তরোত্তর বৃদ্ধি যেমন একটা বড় লক্ষ্য হওয়া উচিত, তেমনি মানুষের ক্রয়-ক্ষমতার প্রসারও একান্ত প্রয়োজনীয়। কিন্তু সরকারের করনীতি মানুষের সঞ্চয় ও ক্রয়-ক্ষমতাকে এমনভাবে হ্রাস করে ফেলছে যে উৎপাদন ক্ষেত্রে তার ক্ষতিকর প্রভাব অতি দ্রুত প্রকট হয়ে উঠছে। পরোক্ষ কর দ্বারা আমাদের দেশে দ্রব্যের মূল্যস্ফীতিতে কিভাবে সহায়তা করা হয় তার গোটাকয়েক দৃষ্টান্ত এখানে দেওয়া যেতে পারে। কারখানা থেকে দেশলাই পাইকারী যে মূল্যে ছাড়া হয় উৎপাদন শুল্ক ও অন্যান্য করের ফলে তার মূল্য ১৪০ শতাংশ বৃদ্ধি পায়। এমনিভাবে রেয়ন সুতার মূল্য ৪৭ শতাংশ, সুতীবস্ত্র ২০ শতাংশ, মোটর স্পিরিট ৩১৩ শতাংশ, সিমেন্ট ৪৪ শতাংশ, চিনি ৪২ শতাংশ, চা ৩৫ শতাংশ, অ্যালুমিনিয়াম ৩৬ শতাংশ, সিগারেট ৯৫ থেকে ১৩৫ শতাংশ ও কয়লা ২৫ থেকে ৩০ শতাংশ বৃদ্ধি পায়। প্রত্যক্ষ করের ক্ষেত্রেও বৃদ্ধি এই রকম দ্রুত ঊর্ধ্বমুখী। ১৯৫০-৫১ সাল থেকে ১৯৬৬-৬৭ সালের মধ্যে ব্যক্তিগত আয়কর ১১২ শতাংশ বৃদ্ধি পেয়েছে। কোম্পানী করের বৃদ্ধি হয়েছে এই সময়কালের মধ্যে ৭৬·৩ শতাংশ। ব্যক্তিগত আয়কর অস্বাভাবিকভাবে বেড়ে যাবার ফলে একদিকে মানুষের যেমন সঞ্চয়সামর্থ্য কমে গিয়েছে তেমনি লগ্নীর বাজারেও তার গুরুতর প্রতিক্রিয়া দেখা দিয়েছে। অপরপক্ষে উৎপাদনের ওপরে ক্রমাগত কর চাপানোর ফলে দ্রব্যমূল্য এমন পর্যায়ে গিয়ে পৌঁছোচ্ছে যখন তা মানুষের ক্রয়ক্ষমতার মধ্যে আর সীমাবদ্ধ থাকছে না।

আমাদের দেশে এখন এই বিচিত্র অর্থ-নৈতিক অবস্থাই দেখা দিয়েছে যখন ব্যবসা-বাণিজ্যে একটা ব্যাপক মন্দা সত্ত্বেও দ্রব্যের উচ্চমূল্যকে কোনভাবে নিম্নগতি করা সম্ভব হচ্ছে না। অর্থনীতির এই অস্বাভাবিক অবস্থার জন্য সরকারের ব্যয় ও করনীতি কতখানি দায়ী তা আজ নতুনভাবে বিবেচনা করা দরকার। বলা বাহুল্য, নতুন অর্থমন্ত্রীর বাজেটেও এইদিক থেকে নতুন কোনো চিন্তার আভাস নেই। আমাদের সম্পদ অতিমাত্রায় সীমিত, কাজেই তার ব্যবহারেও কোনপ্রকার ত্রুটি বা অসম্পূর্ণতা থাকা উচিত নয়। এবং এই ব্যবহার অন্ততপক্ষে বর্তমানে হওয়া দরকার একমাত্র উৎপাদনের কাজে। সরকারের বাৎসরিক আয়ব্যয়ই হোক, আর পরিকল্পনার ব্যয়ই হোক, যা উৎপাদন-বৃদ্ধির কাজে আসবে না তা সম্পূর্ণরূপে বর্জন করতে হবে। অর্থমন্ত্রী শ্রীদেশাই ঘাটতি ব্যয়ের বিরুদ্ধে যে জেহাদ ঘোষণা করেছেন তা একান্তভাবে অভিনন্দনযোগ্য। কারণ এর ফলে কেন্দ্র ও রাজ্যগুলি তাদের

জীবন্ত অস্ত্রাগার : দক্ষিণ ভিয়েৎনামের বিয়েন হোয়ায় এই মার্কিণ হেলিকপ্টার গোলন্দাজটি ৪০ মিলিমিটারের বোমার মালা পরে তাঁর হেলিকপ্টারের দিকে যাচ্ছেন।

সীমাবদ্ধ সম্পদকে এমন কোনো কাজে বা প্রকল্পে লগ্নী করার সুযোগ পাবে না যা বর্তমানের দৃষ্টিতে অপ্রয়োজনীয়। কিছুটা আশার কথা, সরকারের পরিকল্পনা দপ্তরে সাম্প্রতিক পরিবর্তন দ্বারা একটা নতুন চিন্তার আভাস পাওয়া যাচ্ছে। যদি এই আভাস সার্থক হয় এবং পরিকল্পনাকে কার্যকরী করার দায়িত্ব যাঁদের হাতে তাঁরা একে রূপদানের জন্য প্রকৃতই সচেষ্ট হন তা হলেই দেশের অর্থনীতিকে হয়তো বিপর্যয়ের পথ থেকে ফেরানো সম্ভব হবে।

মস্কো ফিল্ম ফেস্টিভ্যাল

দিলীপ মালাকার

'এ ম্যান ফর অল্ সিজন্'-এর নায়ক পল স্কোফিল্ড

মস্কোর আন্তর্জাতিক ফিল্ম ফেস্টিভ্যাল মস্কো নগরীর মতনই বিরাট ও স্থূলকায়। একই সময়ে তিনটে ফিল্ম ফেস্টিভ্যাল। পূর্ণ দৈর্ঘ্যের ছবির প্রতিযোগিতা ক্রেমলিন প্যালাস হলে। পাইওনিয়ার হলে শিশু চলচ্চিত্র প্রতিযোগিতা এবং ডকুমেন্টারি ছবির উৎসব অন্যত্র। পনের দিনের উৎসব। এক ক্রেমলিন প্যালাস হলে দিনে চারটে করে ছবি। বাকী দুটো উৎসবের কথা না বলাই ভাল। ক্রেমলিনের আশেপাশেই ভীড় ও ব্যস্ততা। উৎসবের অতিথিদের ভীড় প্রচন্ড।

বছরের মধ্যে ন' মাসই ঠান্ডায় কাবু মস্কোবাসী। মাত্র তিন মাস গরম। গ্রীষ্মকালটাকে মস্কোবাসীরা চাটনির মতন চেটে উপভোগ করে। বিদেশী ট্যুরিস্ট কিছু কিছু আজকাল আসছে মস্কোর গ্রীষ্মে। কিন্তু বিরাট সোভিয়েট ইউনিয়নের বিভিন্ন রাজ্যের ট্যুরিস্টে ছেয়ে যায় মস্কো। ক্রেমলিনের রেড স্কোয়ারে দাঁড়ালে দেখা যাবে মফস্বলের ট্যুরিস্টের ভীড়। এইক্ষেত্রে ফেস্টিভ্যাল উপলক্ষে বিদেশী চিত্রতারকাদের আবির্ভাব। সুতরাং আন্দাজেই মালুম হবে ফেস্টিভ্যাল কীরকম জমেছিল। বহু তরুণ-তরুণী এ বালখিল্যের দল সকাল আটটা থেকে রাত বারটা পর্যন্ত মস্কোভা হোটেলের দোরগোড়ায় দাঁড়িয়ে থাকত অটোগ্রাফের আশায়। কোনো খ্যাতনামা চিত্রতারকা একবার গাড়ী থেকে নামলেই জোঁকের মতন কিলবিল করে সিনেমা ফ্যানের দল আক্রমণ করত। আর সিনেমা তারকার সংখ্যা অল্প ছিল না। সবশুদ্ধ তিনশত হবে। তবে এর সবাই সিনেমা আকাশের উজ্জ্বল জ্যোতিষ্ক নয়। অনেক নির্জীব ও অচেনা তারকার ভীড় ছিল। উঠতি তারকাদের নিয়ে জনতা বেশী মাথা ঘামাত না। বরং উঠতি তারকারা সাংবাদিকদের পেছন নিত। সিনেমা যতবড় শিল্পই হোক না কেন এর অনেকখানি কৃতকার্যতা

বহু পুরস্কারপ্রাপ্ত ভিয়েৎনাম ছবির একটি দৃশ্য

নির্ভর করে প্রচারকার্যের ওপর। সংবাদপত্র, রেডিও ও টেলিভিশন হল তার মাধ্যম। সুতরাং উত্তত্তি তায়কাদের এইসব প্রতিষ্ঠানের সাংবাদিকদের সাহায্য কামনা একান্ত প্রার্থনীয়।

রুশ বিপ্লবের পঞ্চাশ বছর পূর্ণ হল এবছর। তাই সোভিয়েত ইউনিয়নের সর্বত্র দেখা যাবে উৎসবের আয়োজন। ফিল্ম ফেস্টিভ্যালেও তার ছাপ দেখা গেছে। অন্যান্য বছরের তুলনায় এ বছর নিমন্ত্রিতের সংখ্যা ছিল অনেক বেশী। সবশুদ্ধ দেড়হাজার নিমন্ত্রিত অতিথির মধ্যে তিনশ ছিল সাংবাদিক। ফিল্ম ফেস্টিভ্যালের ছবির প্রতিযোগিতা ছাড়াও ছিল পঞ্চাশ বছরের রুশ সিনেমা শিল্পের ওপর সিম্পোসিয়াম বা আলোচনা।

রুশদের ব্যাপারই আলাদা। ক্রেমলিন প্যালাস অব কংগ্রেস হলে ছ হাজার বসবার আসন। সেখানে মুক্ত প্রতিযোগিতার ছবি দেখান হয়। নিমন্ত্রিত অতিথিদের অধিকাংশকে রাখা হয় মস্কোভা হোটেলে। প্রায় হাজারখানেক অতিথি ওই হোটেলে থেকেছে। ওই হোটেলেই সব। খাওয়া-দাওয়া, ব্যাঙ্ক, পোস্টঅফিস, বাজার-দোকান, ফেস্টিভ্যালের অফিস, রেডিও-টেলিভিশন, নাচ-গানের আড্ডা। বাকী অতিথিদের রাখা হয় নবনির্মিত 'রোশিয়া হোটেলে'। এটির নির্মাণকার্য সম্পূর্ণ হয়নি। অকটোবরের আগেই শেষ হবে। সবশুদ্ধ ছ'হাজার লোককে রাখা যাবে এই হোটেলে। আমরা এই হোটেলে ছিলাম। এই দুটো হোটেল ও ক্রেমলিনে টিলেবয়দের শিল্পগুলো যেন মিলেছে শেষ মোহনায়। ক্রেমলিন ও তার আশেপাশে একই [illegible]।

[illegible] বছরগুলো [illegible] তার [illegible] জীবনের [illegible] ফেলে এই উৎসবে। [illegible] প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণ করে তিপ্পান্নটি রাষ্ট্র। মোট চল্লিশটি ছবি প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণ করে। বাকী ছবিগুলো ছিল প্রতিযোগিতার বাইরে। ছবির সংখ্যা যেমন অনেক তেমনি পুরস্কারের সংখ্যাও বিশটির ওপর। ১৯৬৫ সালের তুলনায় এবার একটু কম পুরস্কার দেওয়া হয়। কাউকে নিরাশ করা হয় না মস্কো উৎসবে। একটি পুরস্কার বা মানপত্র নিসেনপক্ষে দেওয়া হয়ে থাকে। যেমন পেয়েছেন ভারতের চিত্রতারকা রাজ কাপুর। তাঁর ছবি 'তিসরি কসম' কোনো পুরস্কার পায়নি বটে কিন্তু মস্কো ফেস্টিভ্যালের কর্তৃপক্ষ রাজকাপুরকে একটি বিশেষ ডিপ্লোমা দিয়েছে ফেস্টিভ্যালে অংশগ্রহণ করার জন্যে।

পুরস্কার বিতরণ সম্পর্কে সবাই কিন্তু একমত নন। ১৯৬৫ সালের মতনই প্রথম পুরস্কার ভাগ করে দেওয়া হয় হাঙ্গারী ও রাশিয়ার মধ্যে। তবে সমালোচকদের মতে হাঙ্গারিয়ান ছবিটি একলাই প্রথম পুরস্কার পাওয়ার যোগ্য। রুশ ছবিটা সাংবাদিকের পেশা ও জীবন নিয়ে তোলা। রুশ ছবি 'জার্নালিস্ট' পুরস্কার পাওয়ায় সাংবাদিকরা খুশী। কিন্তু চিত্র-সমালোচকরা নয়। যাই হোক হাঙ্গারিয়ান ছবি 'ফাদার'-এর কাহিনী, অভিনয় ও পরিচালনা সবদিকে শ্রেষ্ঠ। বুদাপেস্তের এক ডাক্তারের জীবনাবসান হয় যুদ্ধের শেষে। তার একমাত্র ছেলে যুদ্ধোত্তর হাঙ্গেরীর নতুন সমাজজীবনের মধ্যে বড় হতে থাকে। ছেলেটির সব সময়ে মনে হত যেন তার বাবা সর্বদাই তার হাত ধরে তাকে এগিয়ে নিয়ে যায়। পিতার অদৃশ্য টানে সে বড় হতে থাকলেও যখন যৌবনে পা দিল সে তখন তার জীবনে পরিবর্তন শুরু হয়ে গেছে। একটি মেয়ের প্রেমের টানে সে পরিবর্তন শুরু। ফটোগ্রাফি ও টেকনিকে এ ছবি শ্রেষ্ঠত্বের দাবী রাখে।

মস্কো ফেস্টিভ্যালে একটি আশ্চর্য ঘটনা লক্ষ্য করেছি। ভারতীয় ছবি 'তিসরি কসম' ও পাকিস্তানের 'দি ডিসগ্রেসড' ছবির সঙ্গে গরুর গাড়ীর চালকের জীবনই প্রধান। এমন সাদৃশ্য সচরাচর দেখা যায় না। ফলে সহজেই মালুম হবে যে, ভারত ও পাকিস্তানের সমাজজীবনের সমস্যা একই। গত বিশ বছরে তার কোন ইতরবিশেষ পরিবর্তন হয় নি। দুই দেশের মধ্যে লড়াই হলেও আসল সমস্যাগুলো চাপা থেকে গেছে। পাকিস্তান ছবিটার কাহিনী ভাল কিন্তু অভিনয় ও টেকনিকে বম্বের ১৯৪০ সালের ছবির মতন। এ ধরনের ছবি ফেস্টিভ্যালে নির্বাচিত হয় রাজনৈতিক কারণে। পাকিস্তানের প্রতি হঠাৎ সোভিয়েট সরকারের নরম ও নতুন দৃষ্টির ফলে যে নতুন সখ্যতা গড়ে উঠছে এটি তার একটি ধাপ মাত্র।

মস্কো ফেস্টিভালের সোস্যালিস্ট দেশগুলি ছাড়া অন্যান্য দেশকেও পুরস্কার দেওয়া হয়। সম্ভবত এবার লাতিন আমে-

রুশ ছবি 'দি জর্নালিস্ট'-এর নায়ক-নায়িকা

রিকার দিকেও দৃষ্টি দেওয়া হয়েছে। পেরুর 'নো স্টার্স ইন দি সেলভা'কে তাই দেওয়া হয় একটি স্বর্ণপদক। চেকোশ্লোভাকিয়ার 'রোম্যান্স ফর ডি বিগল'কে দেওয়া হয় স্বর্ণপদক।

শ্রেষ্ঠ অভিনেতার পুরস্কার সম্বন্ধে কারুর কোন আপত্তি নেই। এটি সুপাত্রেই দেওয়া হয়েছে। বৃটিশ ছবি 'এ ম্যান ফর অল সিজন'-এর প্রধান নায়ক মিঃ স্কোফিল্ড পেয়েছেন এই পুরস্কার। শ্রেষ্ঠ অভিনেত্রীর পুরস্কার দেওয়া হয় দুজনকে। মার্কিন ছবি 'আপ দি ডাউনস্টেয়ারকেস'-এর নায়িকা স্যান্ডি ডেনিশ এবং সুইডিশ ছবি 'প্রিন্সেস'-এর নায়িকা গ্রুনেট মলভিং পেয়েছেন যুগ্ম পুরস্কার।

রৌপ্যপদক দেওয়া হয় পোল্যান্ডের যুদ্ধমূলক ছবি 'ভেস্টার প্লাট'কে। শ্রেষ্ঠ কমেডি ছবির জন্য আরেকটি রৌপ্যপদক দেওয়া হয় ইতালির 'অপারেশন সেন্ট জেনারো'কে। আরেকটি রৌপ্যপদক যুগ্মভাবে দেওয়া হয় জাপানের 'দি বিগ হোয়াইট টাওয়ার' ও যুগোশ্লাভিয়ার 'দি ওয়ার্ড' ছবিকে। বৃটিশ 'এ ম্যান ফর অল সিজন' ছবির ডিরেক্টর মিঃ ফ্রেড জিনেম্যানকে দেওয়া হয় জুরীদের বিশেষ ডিপ্লোমা।

ডকুমেন্টারী ছবির প্রতিযোগিতায় প্রথম পুরস্কার লাভ করে ভিয়েৎনামের দুটো ছবি 'গেরিলা কুকি' ও 'অ্যাট দি গেট অব দি উইন্ড'। রৌপ্যপদক দেওয়া হয় হল্যান্ডের 'ভয়েস অব ওয়াটার'কে। রুশ ডকুমেন্টারি ছবি 'দি স্টোরি অব এ রাশিয়ান মাদার' পেয়েছে আরেকটি রৌপ্যপদক। আরও দুটো রৌপ্যপদক দেওয়া হয় ভিয়েৎনামের ওপর তোলা

মস্কোর ভারতীয় দূতাবাসে আয়োজিত সম্বর্ধনাসভায় রাজকাপুর

স্পিটবার ছবি 'হানর টুজভোত' ও বৃটেনের 'প্রাইভেট লাইফ অব এ কিংফিশার'কে। ডিপ্লোমা দেওয়া হয় কানাডা ও আয়ারল্যান্ডকে।

শিশুচলচ্চিত্র উৎসবে জুরীদের মধ্যে ছিলেন ভারতের তারকা নার্গিস। এই প্রতিযোগিতায় প্রথম বা স্বর্ণপদক দেওয়া হয় জাপানের 'দি লিটল রানওয়ে' ছবিটাকে। দ্বিতীয় বা রৌপ্য পুরস্কার দেওয়া হয় হাঙ্গারির 'ইনফ্যান্টাইল ডিজঅর্ডার'কে। আরও দুটো রৌপ্য পুরস্কার দেওয়া হয় রাশিয়ার 'দি মিট্রেন' ও মার্কিনদের 'স্কেটার-ভেটার' ছবিকে। তিনটি ডিপ্লোমা দেওয়া হয় যুগোশ্লাভিয়া, সুইডেনকে।

বেসরকারী পুরস্কার দেওয়া হয় আরও সতেরোটি মূল প্রতিযোগিতার ছবিগুলোকে। এর মধ্যে রুশ সিনেমা পত্রিকার তিনটি পুরস্কার, শান্তি কমিটি, সমালোচকদের বিভিন্ন সংস্থা, সাংবাদিকদের পুরস্কার ইত্যাদি ছিল। এইসব পুরস্কারের মধ্যে পেয়েছে মেক্সিকো, আলজেরিয়া, পূর্ব জার্মানী, ফ্রান্স, তিউনিশিয়া, বেলজিয়াম, ভিয়েৎনাম আবার তিনবার, রাশিয়া, হাঙ্গারি, যুগোশ্লাভিয়া, জাপান, বুলগেরিয়া। এগুলো হল ঢালাও পুরস্কার। কয়েকটি দেশ ছাড়া কেউই নিরাশ হয়ে ঘরে ফেরে নি। সবার হাতেই একটা না একটা পুরস্কার বা মানপত্র ছিল।

আমন চিত্রে সায়রাবানু

প্রেক্ষাগৃহ

আজকের কথা

পশ্চিমবঙ্গে জাতীয় নাট্যশালা সম্পর্কে ধ্যানধারণা (৬)

বিশ্বরূপা নাট্য উন্নয়ন পরিকল্পনা পরিষদ আয়োজিত নবম বার্ষিক বঙ্গনাট্য-সাহিত্য সম্মেলনের ষষ্ঠ বা সমাপ্তি অধিবেশনে 'জাতীয় নাট্যশালার সংজ্ঞা নির্ধারণ এবং রবীন্দ্রসদনের গঠন ও কর্ম-সূচী' বিষয়ে শেষতম বক্তা হিসেবে রবীন্দ্র-ভারতী বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক ও নাট্যসমালোচক পশুপতি চট্টোপাধ্যায় বলেন: অস্বীকার করবার উপায় নেই যে, মূলগত ঐক্য সত্ত্বেও ভারত ইউনিয়নের বিভিন্ন রাজ্যগুলির অধিবাসীদের ভাষা, আচার-ব্যবহার ও সংস্কৃতির মধ্যে লক্ষ্যণীয় পার্থক্য রয়েছে। নাটকরচনা, প্রযোজনা এবং অভিনয়ের ক্ষেত্রেও এই বৈষম্য দৃষ্টিগোচর হয়। কাজেই জাতীয় নাট্যশালা বিষয়ক পরিকল্পনা প্রধানত রাজ্যনির্ভর হওয়া উচিত। যদিও বিভিন্ন রাজ্যের জাতীয় নাট্যশালাগুলির মধ্যে যোগসূত্র স্থাপন, তাদের আর্থিক এবং অপরাপর সাধারণ সমস্যার সমাধান, বহির্ভারতের সঙ্গে তাদের আদান-প্রদান ও যোগাযোগ ব্যবস্থা কিংবা কোনোও আন্তর্জাতিক নাট্যসংস্থা বা নাট্য-সম্মেলনের সঙ্গে ভারতীয় নাট্যশালাগুলির সম্পর্ক স্থাপন প্রভৃতি কার্যের উদ্দেশ্যে একটি সর্বভারতীয় কেন্দ্রীয় পরিষদ বা Central Council স্থাপনের প্রয়োজনীয়তা অনস্বীকার্য।

জাতীয় নাট্যশালা কোনোও একটি আদর্শ রঙ্গালয় মাত্র নয়; এটি হচ্ছে একটি রাজ্যের নাট্যানুশীলনের উদ্দেশ্যে স্থাপিত একটি জাতীয় প্রতিষ্ঠান। এই অর্থে পশ্চিম-বঙ্গের নাট্যসাধনার তীর্থভূমি কলকাতা শহরের 'রবীন্দ্রসদন' গৃহটি হবে এই রাজ্যের জাতীয় নাট্যশালার প্রধান কর্মকেন্দ্র—রবীন্দ্রসদনটিই জাতীয় নাট্যশালা নয়। আমাদের জাতীয় নাট্যশালা হবে আমাদের [illegible] নাট্যপ্রযোজনা, অভিনয় প্রভৃতি নাট্য-বিষয়ক সকল কর্মপ্রচেষ্টা এবং আশা-আকাঙ্ক্ষার প্রতীক ও প্রতিভূ। রাজ্যের নাট্য-শিল্পের সামগ্রিক উন্নয়ন হবে এর লক্ষ্যবস্তু।

সমাজতান্ত্রিক ধাঁচের গণতান্ত্রিক আদর্শে হবে আমাদের জাতীয় নাট্যশালার প্রতিষ্ঠা।

এই নাট্যশালায় থাকবে একটি সাধারণ পর্ষদ বা General Council। এই পর্ষদ যতদূর সম্ভব প্রতিনিধিত্বমূলক হবে; এতে থাকবেন বিভিন্ন নাট্যপ্রতিষ্ঠান, নাট্যকার-সংঘ, বিশ্ববিদ্যালয়, নাট্যসমালোচক, নাট্যকলাবিদ, নাট্যশিল্পী ও কলাকুশলী, নাট্যরসিক, সরকারের শিক্ষা ও সংস্কৃতি বিভাগ প্রভৃতি থেকে নাটক এবং অভিনয়ের প্রতি মমতাবিশিষ্ট সকল স্তরের প্রতিনিধি। সাধারণ পর্ষদের সদস্যসংখ্যা হবে অন্ততপক্ষে একশোজন। এবং এর আয়ুষ্কাল হওয়া উচিত তিন থেকে পাঁচ বছর। এই সাধারণ পর্ষদ আবার নির্বাচন করবেন একটি পরিচালনা পর্ষদ; তাই পর্ষদের সদস্য সংখ্যা দশের বেশী না হওয়াই ভালো। এই পরিচালনা পর্ষদ জাতীয় নাট্যশালার দৈনন্দিন পরিচালনব্যবস্থার জন্যে দায়ী থাকবেন। এই পর্ষদ এক বছরের জন্যে কয়েকজনকে জাতীয় শিল্পী এবং আরও কয়েকজনকে রাষ্ট্রশিল্পী রূপে নিয়োগ করবেন এবং তাঁদের উপযুক্ত সম্মানদক্ষিণা দেবেন। এই শিল্পীদের মধ্যে থাকবেন অভিনেতা, অভিনেত্রী, মঞ্চকলাকুশলী, গায়ক-গায়িকা ও বাদ্যযন্ত্রী। এই নির্বাচিত জাতীয় ও রাষ্ট্র শিল্পীরা তাঁদের মধ্যে থেকে একজনকে পরিচালক-প্রযোজক নির্বাচিত করবেন। এই পরিচালক-প্রযোজক নাটক নির্বাচন থেকে শুরু করে ভূমিকাবন্টন, প্রযোজনার আঙ্গিক, আলোকপ্রক্ষেপণ পরিকল্পনা, অভিনয়ধারানির্ণয় প্রভৃতি সকল বিষয়ের জন্যে দায়ী থাকবেন। এক বছরের জন্যে নির্বাচিত শিল্পীরা অন্তত চারখানি নাটক অভিনয় করবেন এবং প্রতিটি নাটক অন্তত ২০।২৫ রাত্রি অভিনীত হবার ব্যবস্থা থাকবে। নির্বাচিত শিল্পীদের মধ্যে যদি কেউ কেউ সাধারণ রঙ্গালয়ের সঙ্গে যুক্ত থাকেন, তাহলে তাঁদের যাতে কোনো-রকম অসুবিধা না হয়, সেদিকে লক্ষ্য রেখে এই নাটকগুলি সাধারণ রঙ্গালয়ের অভিনয়-দিনগুলি বাদ দিয়ে অভিনীত হবে।

জাতীয় নাট্যশালা গঠিত এই বিশেষ দলটির অভিনয়ের জন্যে নির্ধারিত আশি থেকে একশো দিন ব্যতীত বছরের অপর দুশো পঁয়ষট্টি থেকে দুশো পঁচাশি দিন উন্নত ও প্রতিষ্ঠাসম্পন্ন নাট্য, নৃত্য ও গানের সম্প্রদায়, অন্য রাজ্য থেকে আগত লব্ধপ্রতিষ্ঠ সাংস্কৃতিক প্রতিষ্ঠান, বিদেশাগত নাট্য-নৃত্য-গীতি সম্প্রদায় প্রভৃতির অনুষ্ঠানের জন্যে উন্মুক্ত থাকবে। শুধু তাই নয়, আমাদের নাট্যপ্রতিষ্ঠানগুলি যাতে বিবিধ পরীক্ষা-নিরীক্ষার সুযোগ পায়, তারও ব্যবস্থা করবেন জাতীয় নাট্যশালা।

জাতীয় নাট্যশালার যথাযথ পরিচালনার জন্যে রাজ্য ও কেন্দ্রীয় সরকারের তহবিল থেকে বাৎসরিক অর্থ বরাদ্দ করতে হবে এবং এই অর্থের পরিমাণ বৎসরে অন্তত দশ লাখ টাকার কম হলে চলবে না। জাতীয় নাট্যশালা পরিচালিত নাট্যাভিনয়গুলি যাতে নাট্যামোদী দর্শকরা নামমাত্র দর্শনী দিয়ে দেখবার সুযোগ পান, তার ব্যবস্থা রাখতে হবে। আমাদের রাজ্যের সাংস্কৃতিক সম্প্রদায়গুলিও যাতে স্বল্পব্যয়ে অভিনয় করতে পারে, তারও ব্যবস্থা রাখতে হবে। সরকারের দায় জাতীয় নাট্যশালা পরিচালনার জন্যে যথোপযুক্ত অর্থ যোগানো এবং সেই অর্থ যাতে অন্যায়ভাবে অপচয় না হয়, তার প্রতি দৃষ্টি রাখা। কিন্তু জাতীয় নাট্যশালা আসলে হবে একটি সম্পূর্ণ স্বয়ংশাসিত সংস্থা।

রবীন্দ্রভারতী বিশ্ববিদ্যালয় ও পশ্চিমবঙ্গ সঙ্গীতনাটক আকাদামির যৌথ উদ্যোগে অনুষ্ঠিত জাতীয় রঙ্গালয় সংক্রান্ত আলোচনাচক্রে এবং নবম বার্ষিক বঙ্গ নাট্য-সাহিত্য সম্মেলনে 'জাতীয় নাট্যশালার সংজ্ঞা নির্ধারণ এবং রবীন্দ্রসদনের গঠন ও কর্মসূচী' বিষয়ে প্রদত্ত বক্তৃতাগুলি পর্যালোচনা করলে স্পষ্টই দেখতে পাওয়া যায় যে, অধিকাংশ বক্তারই মতে জাতীয় রঙ্গালয় হচ্ছে এমন একটি জাতীয় প্রতিষ্ঠান যা হবে পশ্চিমবঙ্গের সামগ্রিক নাট্যানুশীলনের পরিচালনকেন্দ্র. এই প্রতিষ্ঠানটি হবে গণতন্ত্রসম্মত উপায়ে নির্বাচিত প্রতিনিধিদের দ্বারা গঠিত এবং যদিও এই প্রতিষ্ঠানের ব্যয়ভার রাজ্য ও কেন্দ্রীয় সরকার যুক্তভাবে বহন করবেন, তবুও প্রতিষ্ঠানটি হবে সরকারী নিয়ন্ত্রণবিমুক্ত সম্পূর্ণ স্বয়ংশাসিত সংস্থা। বরোদা বিশ্ববিদ্যালয়ের নাট্যবিভাগের অধ্যক্ষ ঠিকই বলেছেন: এই জাতীয় নাট্যশালা হবে জনগণের জন্যে জনগণ দ্বারা পরিচালিত—theatre for the people and of the people. বক্তাদেরমতে রবীন্দ্রসদন হবে জাতীয় নাট্যশালার মূল কর্মকেন্দ্র। এই রবীন্দ্রসদন হবে যে কোনোও মঞ্চানুষ্ঠানের—সে নাট্যাভিনয়ই হোক, নৃত্যাভিনয়ই হোক বা সংগীতপরিবেশনই হোক—পক্ষে আধুনিকতম ব্যবস্থাসমন্বিত এবং এখানে থাকবে নাট্যপ্রচেষ্টা সম্পর্কীয় সকলরকম পরীক্ষা-নিরীক্ষার ব্যবস্থা অর্থাৎ দিগিন বন্দ্যোপাধ্যায়ের ভাষায় একটি ল্যাবোরেটারী থিয়েটার। জাতীয় নাট্যশালা সংস্থায় থাকবে একটি নিজস্ব নাট্যাভিনয়ের দল; এই দল গঠিত হবে বাংলাদেশের পেশাদারী এবং অপেশাদারী নাট্য-সংস্থাগুলি থেকে নির্বাচিত গুণী অভিনেতা, অভিনেত্রী, মঞ্চ-কলাকুশলী ও নেপথ্যকর্মী, গায়ক-গায়িকা এবং বাদ্যযন্ত্রীরা। এই দল রবীন্দ্রসদন মঞ্চে উপস্থাপিত করবেন এমন সব নতুন নাটক, যা আমাদের জাতীয় চেতনাকে উদ্বুদ্ধ করবে, ভারতের বিভিন্ন রাজ্যের মধ্যে একটি ভাবগত ঐক্য বা ইমোশানাল ইনটিগ্রেশন গড়ে তোলার সহায়ক হবে। এমনভাবে এঁরা নাট্যানুষ্ঠান করবেন, যা আমাদের নাট্য-সংস্থাগুলির সামনে একটি আদর্শ তুলে ধরতে পারে। এরই সঙ্গে এঁরা আমাদের বাংলা ও সংস্কৃত নাটকগুলি, ভারতের বিভিন্ন রাজ্যের ও ভারতের বাইরের বিভিন্ন দেশের সুখ্যাত নাটকগুলির বঙ্গানুবাদও মঞ্চস্থ করবার ব্যবস্থা করবেন। ভারতের বিভিন্ন রাজ্যের জাতীয় রঙ্গালয়গুলির মধ্যে আদান-প্রদানের ভিতর দিয়ে যাতে একটা দৃঢ় যোগসূত্র গঠিত হয়, তার জন্যে একটি সর্বভারতীয় কেন্দ্রীয় সংস্থার প্রয়োজনীয়তাও বক্তারা উপলব্ধি করেছেন। রাসবিহারী সরকার আমাদের জাতীয় রঙ্গালয়ের কাজ যাতে সুষ্ঠুভাবে সম্পন্ন হতে পারে, তারই জন্যে সরকারের একটি সাংস্কৃতিক দপ্তর প্রতিষ্ঠা করার জন্যে সম্প্রতি দাবি জানিয়েছেন। তিনি আরও চেয়েছেন, এই সাংস্কৃতিক দপ্তরের ওপর বাংলার গ্রামে গ্রামে, মহকুমায় মহকুমায় নাট্যআন্দোলন চালু করা এবং উন্নয়নের ব্যবস্থা করার ভার থাকবে।

অধিকাংশ বক্তার সঙ্গে আমাদের মতের সমর্থন জানিয়েও আমাদের একটি জিজ্ঞাস্য থেকে যায়। আধুনিক ব্যবস্থাসমন্বিত রবীন্দ্রসদনে জাতীয় নাট্যশালার অধীনে যে নাট্যাভিনয়ের প্রস্তাব আমরা করছি, তাতে পশ্চিমবঙ্গের কোনো ঐতিহ্যবাহী বৈশিষ্ট্য দৃষ্টিগোচর হবে কিনা? আমাদের কথা ছেড়ে দিয়ে বিদেশী—মার্কিন, রুশ, জার্মান, ইতালীয়, ফরাসী, ইংরেজ, জাপানী—দর্শক এই অভিনয় দেখে কোনো নতুন অভিজ্ঞতা লাভ করতে পারবে কি? না, তার মনে হবে, পশ্চিমা রীতিরই একটি সুন্দর অনুকরণ মাত্র? জাপান তার 'না' বা 'কবুকি' ধারার অভিনয়কে আমেরিকার প্রত্যক্ষ প্রভাব সত্ত্বেও গর্বের সঙ্গে অনুসরণ করে চলেছে,

রাশিয়া বা ফ্রান্স তার ব্যালে রীতিকে অক্ষুন্ন রেখেছে, মস্কো আর্ট থিয়েটার আজও স্টানিসল্যাভিস্কি প্রদর্শিত পথেই অগ্রসর হচ্ছে. জার্মানীতে বার্টোল্ট ব্রেখট-এর অভিনয়পদ্ধতিও যেমন অনুসৃত হচ্ছে, তেমনই আবার ম্যাক্স রাইনহার্ট, ওস্কার কাউফম্যান, ম্যাক্স লিটম্যান, লিওপোল্ড জেসনার প্রভৃতির প্রদর্শিত পন্থাও সমানভাবে আদৃত। কিন্তু আমরা আমাদের প'চানব্বই বছরের সাধারণ রঙ্গালয় মারফত কোনো বিশেষ ঐতিহ্য গড়ে তুলতে পেরেছি কি? মার্কিন মুলুকে তিক্ত অভিজ্ঞতার পরে নাট্যাচার্য শিশিরকুমারের মন ফিরেছিল আমাদের যাত্রার দিকে। যদিও আজকের দিনে যাত্রার কি রূপ হবে, এ সম্পর্কে তিনি কোনো সঠিক সিদ্ধান্তে পৌঁছুতে পারেননি এবং এ নিয়ে তাঁকে পরীক্ষা-নিরীক্ষা করতেও দেখা যায়নি, তবু তাঁকে প্রায়ই জোরগলায় বলতে শোনা গেছে, জগৎসভায় বাঙালীর নিজস্ব অভিনয়কলার সমুজ্জ্বল নিদর্শন হবে যাত্রাভিনয়। ডঃ আশুতোষ ভট্টাচার্যও এই যাত্রা, কবিগান, পাঁচালীর প্রতি অঙ্গুলিসংকেত করেছেন এবং মনোজ বসুও সতর্কবাণী উচ্চারণ করে বলেছেন: আমাদের অভিনয়ের মধ্যে বাংলার রূপ যেন দেখতে পাওয়া যায়। জাতীয় নাট্যশালার দাবিদারদের দৃষ্টি আমরা এই প্রশ্নের দিকে আকর্ষণ করছি ঘড়িকে পিছন দিকে চালানো যায় না জেনেও।

চিত্রসমালোচনা

প্রস্তর স্বাক্ষর (বাংলা): ছায়াছবি প্রতিষ্ঠান-এর নিবেদন; ৩,৮৭০·৬৬ মিটার দীর্ঘ এবং ১৪ রীলে সম্পূর্ণ; চিত্রনাট্য, পরিচালনা ও প্রযোজনা: সলিল দত্ত; কাহিনী: আশুতোষ মুখোপাধ্যায়; সংগীত-পরিচালনা: রবীন চট্টোপাধ্যায়; গীতরচনা: প্রণব রায় ও পুলক বন্দ্যোপাধ্যায়; চিত্রগ্রহণ: বিজয় ঘোষ; শব্দানুলেখন: সৌমেন চট্টোপাধ্যায়, অতুল চট্টোপাধ্যায় এবং ইন্দু অধিকারী; সংগীতানুলেখন ও শব্দপুনর্যোজনা: সত্যেন চট্টোপাধ্যায়; শিল্পনির্দেশনা: সত্যেন রায়চৌধুরী; সম্পাদনা: বৈদ্যনাথ চট্টোপাধ্যায়; নেপথ্য কণ্ঠসংগীত: সন্ধ্যা মুখোপাধ্যায়, আরতি মুখোপাধ্যায় ও সিপ্রা বসু; রূপায়ণ: সৌমিত্র চট্টোপাধ্যায়, বিকাশ রায়, অনুপকুমার, দিলীপ রায়, তরুণকুমার, ভানু বন্দ্যোপাধ্যায়, জহর রায়, মাস্টার অরিন্দম, সন্ধ্যা রায়, গীতালি রায়, বনানী চৌধুরী, গীতা দে, অজন্তা কর প্রভৃতি। এস বি ফিল্মস-এর পরিবেশনায় গেল শুক্রবার, ৪ঠা আগস্ট থেকে রাধা, পূর্ণ অরুণা এবং অন্যান্য চিত্রগৃহে মুক্তিলাভ করেছে।

'শিলাপটে লেখা' হচ্ছে সুপ্রতিষ্ঠিত কথাশিল্পী আশুতোষ মুখোপাধ্যায়ের একটি বহুপঠিত উপভোগ্য রচনা। এই রচনার একটি বিস্তৃত অংশকে অবলম্বন করে প্রযোজক-পরিচালক সলিল দত্ত তাঁর 'প্রস্তর স্বাক্ষর' ছবির চিত্রনাট্য রচনা করেছেন। ছবির পর্দায় 'প্রস্তর স্বাক্ষর'-এর কাহিনী একটি নিটোল রূপ পরিগ্রহ করেছে, যার প্রধান উপজীব্য হচ্ছে সাসপেন্স ও রোমান্স। মেঘ ক্ষণিকের চিরদিবসের সূর্য; সত্য একদিন প্রকাশ পাবেই পাবে; পরের আত্মসাৎ-করা সম্পত্তি চিরদিন ভোগ করা চলে না, একদিন না একদিন ফিরিয়ে দিতেই হয়—এই হচ্ছে কাহিনীটির বক্তব্য। যে অশিক্ষিত সাতকড়ি চট্টোপাধ্যায় একদিন ছিল পাহাড় অঞ্চলের মালিক সমরেন্দ্র কাঞ্জিলালের কর্মচারী মাত্র, দুর্ঘটনায় মালিকের অকালমৃত্যুর পরে তিনিই হয়ে বসলেন সেই অঞ্চলের দোর্দণ্ডপ্রতাপ মহাজন ও মালিক। সবে তিনি তাঁর প্রতিপত্তিকে প্রতিষ্ঠিত করতে ব্যস্ত, এমন সময় তাঁর বিদুষী স্ত্রী কুন্তলা সাঁওতালী কামিন মহুনামতীর সঙ্গে তাঁর অবৈধ গোপন সম্পর্ক কল্পনা করে দুই ছেলে বিজিত ও সুজিতকে সঙ্গে নিয়ে স্থানান্তরে গমন করেন। দীর্ঘদিন বাদে তাঁর প্রতিষ্ঠানের ম্যানেজার রূপে তিনি যাকে নিযুক্ত করলেন, কিছুদিন যেতে না যেতেই প্রকাশ পেল সে হচ্ছে তাঁর ভূতপূর্ব মালিকেরই সন্তান বিনয়েন্দু কাঞ্জিলাল। তবে কি সে তার পিতার সম্পত্তি ফিরিয়ে নিতে এসেছে? বিনয়েন্দু পরিষ্কার তাঁকে জানাল, এমন কোনো কুঅভিপ্রায় তার নেই, সে এসেছে তার বাল্যের প্রিয়ভূমিতে তার জীবনটাকে কাটিয়ে দিতে। কিন্তু দুই ছেলে এবং তাদের কনিষ্ঠ এক কন্যা জয়ন্তীকে নিয়ে দীর্ঘ বাইশ বছর পরে কুন্তলা আবার তাঁর কাছে ফিরে এল কেন? ওরা কি চায়? ভাবনা-চিন্তায় কড়িবাবুর—সাতকড়ি চট্টোপাধ্যায়ের ব্লাডপ্রেসার গেল বেড়ে। তার ওপর বড়ো ছেলে বিজিতের কামিন মেয়ে ফুলচির ওপর আসক্তি কড়িবাবুকে তাঁর ব্যবসার স্থায়িত্ব সম্পর্কে চিন্তিত করে তুলল; বিজিতই সকলকে ডিঙিয়ে তাঁর ব্যবসার হাল ধরেছিল কিনা।, —বিদুষী জয়ন্তীর একদিকে বুদ্ধিদীপ্ত সুদর্শন বিনয়, অপর দিকে তার বাবার ব্যবসা। —কড়িবাবু এবং জয়ন্তীর ভাবনা-চিন্তার সমাধান কেমন করে
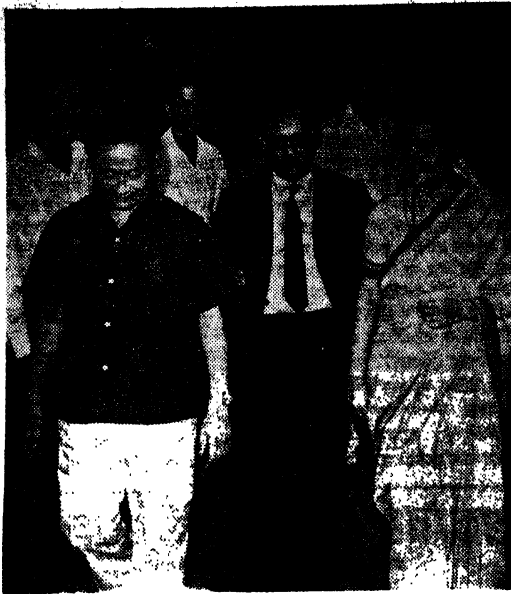
প্রধানমন্ত্রী শ্রীমতী ইন্দিরা গান্ধী সম্প্রতি দিল্লীতে ভারত সরকারের ফিল্মস্ ডিভিসনের অডিটোরিয়ামে পঃ বঃ সরকার কর্তৃক প্রযোজিত 'গ্লিম্পসেস্ অফ ওয়েস্ট বেঙ্গল' এবং 'ক্যালকাটা' তথ্যচিত্রদুটি দেখতে গেলে পশ্চিমবঙ্গের উপজাতি কল্যাণমন্ত্রী শ্রীদেওপ্রকাশ রাই এবং উন্নয়ন কমিশনার শ্রীসুনীল বন্দ্যোপাধ্যায় প্রধানমন্ত্রীকে অভ্যর্থনা করে নিয়ে যাচ্ছেন।

হল, ক্ষণিকের মেঘ কেটে গিয়ে চিরদিবসের সূর্য কেমন করে স্বমহিমায় প্রতিষ্ঠিত হল, তাই নিয়েই ছবির শেষাংশ রচিত।

জামসেদপুরের নিকটবর্তী গরুমহিষানীর পাহাড়ী অঞ্চলের প্রাকৃতিক দৃশ্য 'প্রস্তর স্বাক্ষর' ছবিটির একটি বিশিষ্ট সম্পদ। পাহাড়ে বিস্ফোরণ ঘটানো, পাহাড় কেটে পাথর সংগ্রহ করা ইত্যাদি দৃশ্য ছবিটিতে একটি বাস্তব পরিবেশের সৃষ্টি করেছে। এরই সঙ্গে অপর দিকে আছে পাহাড়ী ঝর্ণা এবং কলিপক্ক চাঁদের আলোর রোমান্টিক পরিবেশ। এই দুই বিপরীতমুখী পরিবেশের সংমিশ্রণে ছবিটি দর্শকসাধারণের কাছে আকর্ষণীয় হয়ে উঠেছে।

'প্রস্তর স্বাক্ষর'-এর রোমান্টিক নায়ক বিনয়েন্দ্র হলেও এর মুখ্য ভূমিকা হচ্ছে সাতকড়ি চট্টোপাধ্যায় ওরফে কড়িবাবু এবং এই ভূমিকায় অবিস্মরণীয় অভিনয় করেছেন বিকাশ রায়। কর্মঠ, তীক্ষ্ণধী, সুচতুর, দোর্দণ্ডপ্রতাপ কড়িবাবু যেদিন জানলেন তাঁর সর্বনিযুক্ত ম্যানেজারই হচ্ছে তাঁর পাপার্জিত সম্পত্তির যথার্থ মালিক, সেদিন—সেই মুহূর্ত থেকে তিনি কেমন বদলে গেলেন, তাঁর প্রতাপ, তেজ, উদ্যোগ কেমন আশ্চর্যভাবে অন্তর্হিত হয়ে তিনি অশক্ত 'প্রেসারের' রোগী হয়ে পড়লেন, ওরই মধ্যে জয়ন্তী ও বিনয়েন্দ্রের সান্নিধ্য তাঁকে কেমন একটু ছোট্ট তৃপ্তির স্বাদ এনে দেয়, এ সবই মূর্ত হয়ে উঠেছে তাঁর নাট্যনৈপুণ্য গুণে। বিকাশ রায়ের অভিনয় ছবিটির নিঃসন্দেহে শ্রেষ্ঠ আকর্ষণ। রোমান্টিক নায়ক বিনয়েন্দ্র রূপে সৌমিত্র চট্টোপাধ্যায় চরিত্রটির অন্তঃকরণের ঐশ্বর্যকে ব্যক্ত করেছেন। কড়িবাবুর বড়ো ছেলে বিজিতের দাম্ভিকতা, বন্য নারী সম্পর্কিত দুর্বলতা ও ভীরুতা পরিস্ফুট হয়ে উঠেছে দিলীপ রায়ের অভিনয়ের মাধ্যমে। বিলাতফেরতাভিলাষী ছোটছেলে সুজিতের চরিত্রে অনুপকুমার তাঁর স্বভাবসিদ্ধ সু-অভিনয় করেছেন। রোমান্টিক নায়িকা জয়ন্তী বেশে সন্ধ্যা রায়ের অভিনয় সহজ ও সাবলীল। কড়িবাবুর বিদুষী স্ত্রী কুন্তলার ভূমিকায় বনানী চৌধুরী চরিত্রোচিত ব্যক্তিত্ব দেখিয়েছেন। অপরাপর ভূমিকায় তরুণকুমার (মুকুট বুড়ো), ভানু বন্দ্যোপাধ্যায় (গয়া চাকর), জহর রায় (হরিপদ চক্রবর্তী), গীতা দে (ময়নামতী) ও গীতালি রায় (ফুলচি) উল্লেখ্য অভিনয় করেছেন।

ছবির কলাকৌশলের বিভিন্ন বিভাগের কাজ প্রশংসনীয়। বহির্দৃশ্য এবং অন্তর্দৃশ্য—উভয় অংশেরই চিত্রগ্রহণ দক্ষতার পরিচায়ক। শব্দানুলেখনে বিশেষ করে বহির্দৃশ্যে সমতা ও স্পষ্টতার দিকে লক্ষ্য রাখা হয়েছে। শিল্পনির্দেশনা বাস্তবধর্মী। ছবিতে তিনটি গান আছে; এদের মধ্যে প্রয়োজনীয় তৃতীয়খানির ভাষা ও সুর আদৌ সাঁওতাল মেয়ের মুখে শোভা পায় না। আবহসংগীত, বিশেষ করে টাইটেল সংগীত প্রশংসনীয়। গরুমহিষানীর প্রাকৃতিক দৃশ্যে তোলা 'প্রস্তর স্বাক্ষর' বিকাশ রায়ের অবিস্মরণীয় অভিনয়সমৃদ্ধ হয়ে জনসাধারণের আদরণীয় হবে। —নান্দীকর

'আমন' চিত্রের শুভমুক্তি

মোহনকুমার প্রযোজিত ও পরিচালিত রঙিন চিত্র আমন ১১ই আগস্ট থেকে সোসাইটি, ওরিয়েন্ট, মেনকা, খান্না ও শহরতলির বিভিন্ন চিত্রগৃহে মুক্তিলাভ করছে। বিশ্বশান্তির পটভূমিতে গৃহীত এই মিষ্টিমধুর কাহিনী চিত্রে রূপদান করেছেন রাজেন্দ্রকুমার, সায়রাবানু, বলরাজ সাহানি, চেতন আনন্দ, ওম প্রকাশ, লর্ড বারট্রান্ড রাসেল, চাঁদ উসমানি, সজ্জন ও মুদুলা। সংগীত পরিচালনা করেছেন শংকর-জয়কিষণ।

আগামী সপ্তাহে 'মিস প্রিয়ংবদা'

ইউনাইটেড টেকনিসিয়ান্সের মিস প্রিয়ংবদা আগামী সপ্তাহের ১৮ আগস্ট থেকে উত্তরা, পূরবী, উজ্জ্বলা প্রভৃতি প্রেক্ষাগৃহে মুক্তিলাভ করবে। রবি বসু ও দুষ্মন্ত চৌধুরী পরিচালিত এই কৌতুক প্রেমের প্রহসন চিত্রে অভিনয় করেছেন লিলি চক্রবর্তী, তরুণকুমার, ভানু বন্দ্যোপাধ্যায়, জহর রায়, নৃপতি চট্টোপাধ্যায়, অজিত চট্টোপাধ্যায়, দীপিকা দাস ও তপতী ঘোষ। সুরসৃষ্টি করেছেন সুধীর সেন ও আজাদ। সুরঞ্জনা ছবিটির পরিবেশক।

অরুন্ধতী দেবীর পরবর্তী ছবি 'মেঘ'

অভিনেত্রী-পরিচালিকা অরুন্ধতী দেবীর প্রথম ছবি ছুটির অসাধারণ সাফল্যের পর সম্প্রতি দ্বিতীয় ছবিটির পরিকল্পনা গ্রহণ করা হয়েছে। স্বর্গীয় শিকারের

এ ছবিটির নাম 'অন্তরা'। বনফুলের এ কাহিনীর চিত্রনাট্য রচনা এবং সংগীত পরিচালনা ছাড়াও নায়িকা চরিত্রে রূপদান করবেন অরুন্ধতী দেবী। একটি বিশিষ্ট চরিত্রে অশোককুমারের অভিনয় করার কথা আছে।

সলিল দত্ত-র নতুন ছবি 'অপরিচিত'

সদ্য মুক্তিপ্রাপ্ত 'প্রস্তর স্বাক্ষর' চিত্রের পর পরিচালক সলিল দত্ত যে নতুন ছবিটি পরিচালনা করছেন তার নাম 'অপরিচিত'। সমরেশ বসু রচিত এ কাহিনীর প্রধান কয়েকটি চরিত্রে মনোনীত হয়েছেন উত্তমকুমার, সৌমিত্র চট্টোপাধ্যায়, সন্ধ্যা রায়, অপর্ণা সেন, বিকাশ রায়, হারাধন বন্দ্যোপাধ্যায় ও বনানী চৌধুরী।

পদ্মাবতী জয়দেব-এর সংগীত গ্রহণ :

৭ ও ৮ আগস্ট টেকনিসিয়ান স্টুডিওতে সান সাইন পিকচার্সের ভক্তিমূলক চিত্র "পদ্মাবতী জয়দেব"-এর গান গৃহীত হয়েছে সংগীত পরিচালক বিজন পালের পরিচালনায়। গান গেয়েছেন মান্না দে ও তরুণ ব্যানার্জি। পরের সপ্তাহে ১৩ ও ১৪ আগস্ট রেকর্ড করা হবে আরতি মুখোপাধ্যায় ও ধনঞ্জয় ভট্টাচার্য-এর গান। ছবিখানি আসছে সেপ্টেম্বরে মুক্তিলাভ করবে বলে জানা গেল। লাইফ পিকচার্স প্রাঃ লিঃএর পরিবেশক।

প্রযোজিকা অসীমা ভট্টাচার্যের বলিষ্ঠতম প্রচেষ্টা 'চৌরঙ্গী'র চিত্রগ্রহণ সেপ্টেম্বরের দ্বিতীয়ার্ধে শুরু

উত্তমকুমারের অসুস্থতার জন্য অন্যান্য ছবির সঙ্গে প্রযোজিকা অসীমা ভট্টাচার্যের বলিষ্ঠতম দুঃসাহসিক প্রচেষ্টা 'চৌরঙ্গী'র সুটিংও মুলতুবী ছিল। এটি পম্পি ফিল্মস-এর দ্বিতীয় নিবেদন। বিবরণে প্রকাশ, এ ছবিটির চিত্রগ্রহণও শুরু হচ্ছে সেপ্টেম্বরের দ্বিতীয়ার্ধে উত্তমকুমারকে নিয়ে। তিনি স্বতঃপ্রবৃত্ত হয়ে প্রযোজিকা শ্রীমতী ভট্টাচার্যকে সেপ্টেম্বর থেকে প্রতি মাসে নিয়মিত শুটিং করবেন বলে আশা দিয়েছেন।

কাহিনীর সঙ্গে সঙ্গতিরক্ষার্থে এঁরা চিত্রগ্রহণের স্থান নির্বাচন করেছেন গ্র্যান্ড হোটেল, যেখানে চৌরঙ্গীর কাহিনীবিস্তার এবং পুরো ছবির শুটিং এখানেই হবে। এটা নিঃসন্দেহে বাংলা তথা ভারতীয় চিত্র-শিল্পে প্রথম।

শংকর-এর আলোড়নসৃষ্টিকারী সর্বাধিক জনপ্রিয় উপন্যাস অবলম্বনে ছবির চিত্রনাট্য রচনা ও পরিচালনা করেছেন অগ্রগামী গোষ্ঠী। বিভিন্ন চরিত্রে এ পর্যন্ত যাঁরা নির্বাচিত হয়েছেন তাঁদের মধ্যে উত্তমকুমার, বিশ্বজিৎ, মাধবী মুখোপাধ্যায়, শুভেন্দু চট্টোপাধ্যায়, দীপ্তি রায়, তরুণকুমার, ভানু বন্দ্যোপাধ্যায়, জহর রায়, শ্যামল ঘোষাল, উৎপল দত্ত, হারাধন বন্দ্যোপাধ্যায়, চারুপ্রকাশ ঘোষ অন্যতম।

অপরিচিত :

বিচিত্র একটি মানুষ হঠাৎ এসে উদয় হয়েছিল সমাজের একটি বিশেষ শ্রেণীর জীবনের [illegible] চরিত্র [illegible]-চিন্তা তার

মহাবিপ্লবী অরবিন্দ চিত্রের সংগীতগ্রহণানুষ্ঠানে শিল্পী আরতি মুখোপাধ্যায়, হেমন্ত মুখোপাধ্যায়, দিলীপ রায়, কালী বন্দ্যোপাধ্যায়, দীপক দাস, সুনীলবরণ, দীপক গুপ্ত ও শমিতা বিশ্বাস। ফটো : অমৃত

আচার-ব্যবহার এতই স্বতন্ত্র যে, তাকে এদের নিতান্তই অপরিচিত বলে মনে হয়। কিন্তু 'অপরিচিত', শুধু একটি মানুষের কাহিনী নয়। আজকের মানুষের জীবনে যে জিজ্ঞাসা যে সংশয় যে দ্বন্দ্ব, হৃদয়াবেগের গতিপথে যে ধূসর কুয়াশা, তা দীর্ণ করে এগিয়ে যাওয়ার একটি অভিনব তীব্র নাটক। কাহিনী রচনা করেছেন সমরেশ বসু।

আর ডি প্রোডাকসন্সের হয়ে ছবিটি পরিচালনা করছেন সলিল দত্ত।

রোগমুক্তির পর এই প্রথম উত্তমকুমার এই ছবিতে একটি ভিন্নধরনের চরিত্রে আত্মপ্রকাশ করছেন।

'অপরিচিত' ছবির অপরাপর চরিত্র রূপায়ণে আছেন সৌমিত্র চট্টোপাধ্যায়, সন্ধ্যা রায়, অপর্ণা দাশগুপ্তা (সেন), বিকাশ রায়, বনানী চৌধুরী, হারাধন বন্দ্যোপাধ্যায় ও দিলীপ রায়।

'অপরিচিত' চিত্রের সংগীত পরিচালনা করছেন রবীন চট্টোপাধ্যায়।

ভি, শান্তারামের 'বুঁদ যো বন গয়ি মোতি'

প্রযোজক-পরিচালক ভি. শান্তারাম তাঁর নতুন ছবি **'বুঁদ যো বন গয়ি মোতি'**র শেষ পর্যায়ের চিত্রগ্রহণ বর্তমানে শুরু করেছেন রাজকমল স্টুডিওয়। ছবির প্রধান চরিত্রে রূপদান করছেন মমতাজ, জীতেন্দ্র, আসাশদীপ, বৈশালী, নানা পালসিকর ও ললিতা পাওয়ার। সতীশ ভাটিয়া ছবিটির সুরকার।

'ইন্তেজার' চিত্রের শুভ মহরৎ

আর এম আর্টস প্রোডাকসন্সের **'ইন্তেজার'** চিত্রের শুভ মহরৎ সম্প্রতি ফেমাস সিনে ল্যাবরেটরীতে অনুষ্ঠিত হল সংগীত গ্রহণের মাধ্যমে। সংগীত পরিচালনা করলেন

শঙ্কর-জয়কিষণ এবং কণ্ঠদান করেন মহম্মদ রফি। এ ছবির নায়ক-নায়িকা চরিত্রে মনোনীত হয়েছেন মনোজকুমার ও আশা পারেখ। ছবিটির পরিচালক হলেন সামেল।

বাপ্পি সোনি পরিচালিত 'ব্রহ্মচারী'

পরিচালক বাপ্পি সোনি জি, পি, সিপ্পির রঙিন ছবি 'ব্রহ্মচারী'র সম্পূর্ণ চিত্রগ্রহণ বর্তমানে আর কে স্টুডিওয় শেষ করলেন। শঙ্কর-জয়কিষণ সুরকৃত এ ছবিতে অভিনয় করেছেন শাম্মি কাপুর, রাজশ্রী, প্রাণ, মমতাজ, জগদীপ, ধুমল ও মোহন চোটি।

সুরজপ্রকাশ পরিচালিত 'বচন'

পরিচালক সুরজপ্রকাশ তাঁর নতুন রঙিন ছবি 'বচন'র চিত্রগ্রহণ সম্প্রতি রূপতারা স্টুডিওয় শুরু করেছেন। ছবির মুখ্য চরিত্রে অভিনয় করছেন শশি কাপুর, ভিমি, প্রেম চোপরা, নাসির হোসেন, কে এন সিং, কমল কাপুর, সুলচনা ও রাজেন্দ্রনাথ। শঙ্কর-জয়কিষণ ছবিটির সুরকার।

হাওড়া যুব মিলনী

সম্প্রতি হাওড়া যুব মিলনীর শিল্পীবৃন্দ সংস্থার প্রথম বার্ষিক উৎসব উপলক্ষে দুটি ভিন্নরসের ছোট নাটক মঞ্চস্থ করেন। এই নাট্য প্রযোজনায় শিল্পীদের আন্তরিক নিষ্ঠা এবং সার্থক অনুশীলনের ছাপ আছে। নাটক দুটি হোল নীরেন সেনের সূর্যাচল ও দ্বিতীয় নাটক শৈলেন গুহ নিয়োগীর ক্লু। বসন্ত স্মৃতি ভবন মঞ্চে পরিবেশিত এ নাটক দুটিতে অংশ গ্রহণ করেন স্বপন বন্দ্যোপাধ্যায়, সুনীল বটব্যাল, অজিত দে, বিশ্বনাথ বাগ, খগেন্দ্রনাথ ঘোষ, দিবাকর ফৌজদার, বংশী চক্রবর্তী, জয়দেব চক্রবর্তী, গোপাল গোস্বামী, চন্দ্রলেখা চক্রবর্তী, শিশির চক্রবর্তী, বিশ্বনাথ ধাড়া, শংকর ঘোষ।

নাটুকে পাগল

নাটুকে পাগল নামক একটি নাট্যগোষ্ঠী সম্প্রতি বেলুড় রবিতীর্থ মঞ্চে রবীন্দ্রনাথের গুপ্তধন গল্পের নাট্যরূপ পরিবেশন করেন। নাট্যরূপ দিয়েছেন রামপদ চট্টোপাধ্যায়। নাট্যনির্দেশনায় ছিলেন বিজন মজুমদার ও দেবরঞ্জন বসু মল্লিক। সামগ্রিক অভিনয় শিল্পীবৃন্দের প্রচেষ্টায় প্রাণবন্ত হয়ে ওঠে। নাটকের প্রধান চরিত্র মৃত্যুঞ্জয়ের ভূমিকায় আশ্চর্য অভিনয় প্রতিভার স্বাক্ষর রাখেন দেবরঞ্জন বসু মল্লিক। অন্য কয়েকটি চরিত্রে নৈপুণ্যের নজীর রাখেন দিলীপ ভট্টাচার্য, বিজন মজুমদার, ফণীন্দ্র মালাকার, রামচন্দ্র মোদক। অরুণ রায়ের আলোক-সম্পাতে বৈশিষ্ট্য চিহ্নিত হয়েছে; চিত্ত বসু মল্লিক ও অজিত চট্টোপাধ্যায়ের গাওয়া গানগুলোও বৈশিষ্ট্যের দাবী রাখে।

স্বাধীনতা দিবসে 'এক পেয়ালা কফি':

১৯৬০ সালে ধনঞ্জয় বৈরাগীর মঞ্চখ্যাত নাটক 'এক পেয়ালা কফি' দীর্ঘকালব্যাপী দর্শকমনে স্থায়ী প্রভাব বিস্তার করেছিল। সেই রহস্যঘন নাটক অগণন দর্শকের বিশেষ অনুরোধে আগামী একবিংশতম স্বাধীনতা দিবসে বেলা ৩টা ও সন্ধ্যা ৬-৩০ টায় বিশ্বরূপায় অভিনীত হবে। তরুণ রায় পরিচালিত এই নাটকের প্রধান চরিত্রে অবতীর্ণ হবেন দীপান্বিতা রায়, রবীন মজুমদার এবং নাট্যপরিচালক স্বয়ং।

স্বর্ণা

গত ২৩শে জুলাই সন্ধ্যায় প্রতাপ মেমোরিয়াল হলে আগামীর শিল্পীবৃন্দ শৈলেশ গুহ নিয়োগীর জনপ্রিয় নাটক স্বর্ণা মঞ্চস্থ করেন। জগৎ মজুমদারের নির্দেশনায় নাট্যাভিনয় মোটামুটিভাবে দর্শকবৃন্দকে পরিতৃপ্ত করেছে। অভিনয়ে অংশগ্রহণ করেন দেবকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়, শৈলেন আঢ্য, অনামিকা রায়, অজিত চ্যাটার্জী, নিপা পাত্র, বিশ্বনাথ বসু, বিকাশ সেন, কুমার রথীন্দ্র, রঞ্জিত মণ্ডল, সূর্য সিং, গোরা বন্দ্যোপাধ্যায়, প্রদীপ চৌধুরী, উমেশ আঢ্য, দেবব্রত মুস্তাফী, কল্যাণ কর্মকার, জগৎ মজুমদার। আলোক-সম্পাত ও সঙ্গীতপরিচালনায় শিবনাথ ব্যানার্জী, গোপাল পাত্র, তপন দে কৃতিত্বের পরিচয় দেন।

নাট্য প্রতিযোগিতা

প্রতি বছরের মতো এবারেও বেহালার অহীন্দ্র মঞ্চে একাংক ও পূর্ণাঙ্গ নাটকের প্রতিযোগিতা হবে। নাম তালিকাভুক্ত করার শেষ তারিখ: ২০শে আগস্ট। বিশদ বিবরণ নিম্নলিখিত ঠিকানা থেকে পাওয়া যাবে—সম্পাদক, অহীন্দ্র মঞ্চ, ১৮, সৌরীন রায় রোড, বেহালা, কলিকাতা-৩৪।

সংগঠনী শিল্পীগোষ্ঠী

বর্তমান নাট্যানুশীলনের অগ্রগতির ওপর আলোকসম্পাত করলে দেখা যাবে যে বাংলা নাটক আজ বিষয়বস্তুর ক্ষেত্রে নতুন সম্ভাবনার স্বাক্ষর রাখছে। নাটক শুধু বাস্তব সমস্যার কথাই সোচ্চারে ঘোষণা করছে না, মূর্ত করে তুলছে সেই সব তত্ত্ব বা চিন্তা যা মাঝে মাঝে সংগ্রামী মানুষকে আকুল করে তোলে। প্রখ্যাত নাট্যকার ধনঞ্জয় বৈরাগীর বিদেহী এই প্রসঙ্গে স্মরণীয়। পারলৌকিক তত্ত্বের উপর প্রতিষ্ঠিত এই নাটকের অভিনয় সম্প্রতি কাশীপুরে অভিনয় করলেন সংগঠনী শিল্পীগোষ্ঠী। নাটকটি থিয়েটার সেন্টারে নিয়মিত অভিনয় হয়। এই প্রথম বোধ হয় বাইরে অভিনীত হোল।

বিদেহী নিঃসন্দেহে বাংলা নাট্য-রচনার ক্ষেত্রে একটা বলিষ্ঠ সৃষ্টি। মৃত্যুর পরেও কি আত্মার কোন অস্তিত্ব থাকে? এবং যদি থাকে এবং প্রাপ্তির গভীরতা জীবনে যদি না মেলে তাহোলে কি আবার অশরীরী রূপ

জার্মান গণতান্ত্রিক প্রজাতন্ত্রের চলচ্চিত্রোৎসবের উদ্বোধন।

নিয়ে ফিরে আসতে পারে? এই গূঢ় প্রশ্নের উত্তর দিয়েছে এই নাটক। একটি মেয়ে যে বুকভরা অতৃপ্ত কামনা নিয়ে মৃত্যুতে বিলীন হয়েছিল, সে আবার ফিরে এসেছে তার জীবন জুড়ে কেন হতাশার অন্ধকার নেমে এসেছিল তার উত্তর চাইতে এবং সে সম্পর্কে অভিযোগ জানাতে। এই বিদেহী আত্মার মঞ্চে আবির্ভাবের সংগে সংগে একটা অদ্ভুত শিহরন জাগে এবং এই শিহরন ঘটনার সূত্র ধরে এক সুষ্ঠু পরিণতিতে গিয়ে মিলেছে। কোন জায়গাতেই দর্শকের মন থেকে শিহরনের স্পন্দন মুছে যায়নি।

এই ধরনের নাটককে মঞ্চে পরিবেশন করতে হোলে আলো ও আবহসংগীতের একটা অপূর্ব সমন্বয় প্রয়োজন। বলতে কোন দ্বিধা নেই **সংগঠনী শিল্পীগোষ্ঠীর** নাট্যপ্রযোজনায় আলোছায়ার কাজ সুন্দর-রূপে ফুটে উঠেছে। তপন রায় নির্দেশনায় অতি-আধুনিক নাট্যাঙ্গিক ব্যবহার করেছেন এবং তাঁর প্রয়োগ পরিকল্পনায় সূক্ষ্ম মানসিকতার পরিচয় স্পষ্ট হয়ে উঠেছে। আলো, আবহ-সংগীতের সমন্বয় রচনায় কৃতিত্ব দেখান জিতেন দাস ও কানাইলাল চট্টোপাধ্যায়।

শিল্পীদের অভিনয় চরিত্রোপযোগী এবং প্রতিটি চরিত্রই সুঅভিনীত। সুকুমার সুর **প্রতুল** চরিত্রের অন্তর্দ্বন্দ্ব, ভাবসংঘর্ষ চমৎকারভাবে ফুটিয়ে তুলেছেন। **মুরারী মাস্টারের** চরিত্র পি কে রায়ের অভিনয়ে প্রাণ পেয়েছে, তাঁর সংলাপ বলার সংগী চমৎকার। **পাকড়াশী** চরিত্রটিকে তারাপদ রায় অভিনয়ে মূর্ত করে তুলতে পারেননি। অন্যান্য চরিত্রে সুঅভিনয় করেন—অশ্বিনী চট্টোপাধ্যায়, রেখা সাহা, সলিল দাস, হর-শংকর দত্ত, অতীন সরকার, অঞ্জলি ভট্টাচার্য, শিবপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায়।

জ্যোতির্ময় ইনস্টিটিউট

অনিলবরণ দত্তের মঞ্চ সফল নাটক **স্মৃতিটুকু** কিছুদিন আগে পরিবেশন করলেন **জ্যোতির্ময় ইনস্টিটিউটের** শিল্পীবৃন্দ। ঘাত-প্রতিঘাত সমৃদ্ধ এই নাটকের আবেদন সামগ্রিক অভিনয়ের মধ্য দিয়ে সবটাই স্পষ্ট হয়ে উঠেছে এবং এর জন্য নাট্যনির্দেশক প্রভাত লাহিড়ীরই কৃতিত্ব সর্বাধিক। নির্দেশনায় তাঁর উন্নত ধরনের শিল্পবোধ চিহ্নিত হয়েছে। সত্যি কথা বলতে কি, আলো, আবহসংগীত, দৃশ্যসজ্জার একটা ঐক্যসূত্র এমনভাবে গ্রোথিত হয়েছে, যাতে নাটকের কাহিনী অসাধারণ গতি পেয়েছে। মঞ্চে যাঁরা চরিত্রগুলোকে অভিব্যক্তি দিয়ে সুন্দর করে তোলেন তাঁরা হোলেন গোবিন্দ বন্দোপাধ্যায়, ননী দাস, সুধীর রায়, সুধাময় চট্টোপাধ্যায়, নভোজিৎ ঘোষ, রবি দাস, সন্তোষ সরকার, কুনাল গুপ্ত, হরিপদ দাস, সলিল দেব, পবিত্র রাউত, প্রভাত লাহিড়ী, বেবী মুখোপাধ্যায়, মীনা বসু, সুজাতা গঙ্গোপাধ্যায়।

রূপভাস্বর

সম্প্রতি **রূপভাস্বর** নাট্যসংস্থার শিল্পীবৃন্দ মুক্তঅংগনে শৈলেন মুখোপাধ্যায়ের **অন্ধ-পৃথিবী** নাটক অভিনয় করলেন। শচীন বসুর নির্দেশনায় এই নাট্যাভিনয় সবার মনে ছাপ রাখে। নাটকটির বিভিন্ন ভূমিকায় যাঁরা অভিনয় করেছেন তাঁরা হোলেন শচীন বসু, মিহির সরকার, রবীন মজুমদার, ভোলা বসু, তিমির গুহ, মলয় লাহা, অসিত ঘোষ, রামকুমার ঘোষ, নগেন দলুই, নৃপেন সমাদ্দার, ভারতী চৌধুরী, মন্তু রায়চৌধুরী, প্রীতি দে, রিতা নাগ।

নাট্য প্রতিযোগিতার ফলাফল

সম্প্রতি মেখলিগঞ্জ **নৃপেন্দ্রনারায়ণ ক্লাব** আয়োজিত একাংকিকা অভিনয় প্রতিযোগিতার ফলাফল প্রকাশিত হয়েছে। কোচবিহার, জলপাইগুড়ি, আলিপুরদুয়ার, ধামারহাট প্রভৃতি জায়গার বহু নাট্যগোষ্ঠী এই প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণ করেছিল। দেবব্রত মুখোপাধ্যায় (তাহার নামটি রঞ্জনা) শ্রেষ্ঠ অভিনেতা নির্বাচিত হয়েছেন এবং দ্বিতীয় শ্রেষ্ঠ অভিনেতার মর্যাদা পেয়েছেন রবি ঘোষ (বন্দবন্দ)। শ্রেষ্ঠ অভিনেত্রী: কল্যাণী মিত্র (বন্দবন্দ) ও পূরবী নন্দী (তাহার নামটি রঞ্জনা)। শ্রেষ্ঠ শিশু শিল্পী: কাকলি বর্ধন (কালো মাটির কান্না) ও কান্তা চক্রবর্তী (বিরাট গুহ)। শ্রেষ্ঠ পরিচালক: কল্যাণী মিত্র (বন্দবন্দ)।

রূপারেখ

রূপারেখ সংস্থার শিল্পীবৃন্দ জোনাকীর কান্নার সফল প্রযোজনার পর এবার যে নাটকটি নিয়ে মহড়া চালাচ্ছেন, তার নাম হোল **বন্দরের কাল**। নাটকটি রচনা করেছেন প্রবীর চক্রবর্তী। নির্দেশনায় আছেন নিখিল রায়।

চরিত্রহীন

সম্প্রতি হাওড়া বার লাইব্রেরী রিক্রিয়েশন ক্লাবের শিল্পীবৃন্দ ই আর রঙ্গমঞ্চে শরৎচন্দ্রের **চরিত্রহীন** নাটক সাফল্যের সাথে মঞ্চস্থ করেছেন। সুধামাধব চট্টোপাধ্যায়ের বৈশিষ্ট্যচিহ্নিত নির্দেশনায় নাটকটি সবারই দৃষ্টি আকর্ষণ করে। সেদিনকার অভিনয়ে সবচেয়ে বেশী প্রশংসা পান অনিল চট্টো-

রঙমহল-এ অনুষ্ঠিত এক সভায় মুখ্যমন্ত্রী শ্রীঅজয় মুখোপাধ্যায় শ্রীতুষার-কান্তি ঘোষের কাছ থেকে একটি ১০০১, টাকার চেক গ্রহণ করছেন। শিশিরকুমার ইনস্টিটিউট-এর পক্ষ থেকে মুখ্যমন্ত্রীর ত্রাণ তহবিলে এই টাকা দেওয়া হয়।

পাধ্যায়, প্রফুল্ল রায়, সুজিত কর, চিত্তরঞ্জন বন্দ্যোপাধ্যায়, আমজাদ আলী, সরোজ বন্দ্যোপাধ্যায়।

এক পেয়ালা কফি

সম্প্রতি বিশ্বরূপা রঙ্গমঞ্চে রাজ্য শিক্ষা বিভাগের কর্মীবৃন্দের সংস্থা কলিকাতা **কৃষ্টি সংসদের** পঞ্চদশ বার্ষিকী অনুষ্ঠান হয়ে গেলো। এই উপলক্ষে সংসদ সদস্যরা ধনঞ্জয় বৈরাগীর রহস্যঘন নাটক **এক পেয়ালা কফি** মঞ্চস্থ করেন। নাটকের প্রতিটি মুহূর্তে যে সাসপেন্স লুকানো আছে। শিল্পীদের আন্তর অভিনয়ে তা ধীরে ধীরে ব্যাপ্তি পেয়েছে। নাট্যনির্দেশনায় বৈশিষ্ট্যের ছাপ রাখেন শ্রীগণেশ। বিভিন্ন ভূমিকায় অংশ নেন—বিকাশকুমার বসু, দুলালচন্দ্র দাস, কমলকৃষ্ণ ঘোষ, শুভেন্দুনারায়ণ ভট্টাচার্য, প্রভাতকিরণ সরকার, বিমান ঘোষ, জগদানন্দ পাল, প্রতাপচন্দ্র দাশগুপ্ত, অমূল্যনারায়ণ পোদ্দার, ইরা মিত্র, গীতা রায়।

চতুর্যাম

চতুর্যাম নাট্যসংস্থা ঢাকুরিয়া এন্ড্রুজ স্কুলে দুদিনব্যাপী এক নাট্যোৎসবের আয়োজন করেছেন। নাট্যোৎসব অনুষ্ঠিত হবে আগামী ১২ই এবং ১৩ই আগস্ট। এই নাট্যোৎসবে **ঝড়, পণরক্ষা, দিনান্ত** ও **আগন্তুক** অভিনীত হবে। নাটকগুলোর কয়েকটি বিশেষ চরিত্রে অংশ নেবেন সন্তু ঘোষ, দেবব্রত গঙ্গোপাধ্যায়, তাপস রায়, স্বপ্না সেন, চিত্রলেখা ভট্টাচার্য। নাট্য-নির্দেশনায় থাকবেন সুজিতকুমার দাস।

অবকাশ-এর নাট্যাভিনয়

'অবকাশ' দক্ষিণ কলকাতার একটি নতুন নাট্যসংস্থা। এই সংস্থা গত ২৩ জুলাই সরলা মেমোরিয়াল হলে প্রশান্ত চৌধুরীর প্রত্যাবর্তন নাটক নিয়ে প্রথম উপস্থিত হয়েছেন। নাটকটি পরিচালনা করেন শ্রীধীরেন্দ্রনাথ চক্রবর্তী। সামগ্রিক অভিনয় খুব একটা উন্নতমানের হয়নি। প্রতিটি শিল্পীর অনুশীলনের অভাব বর্তমান। পরিচালকের নির্দেশনা, মঞ্চ-পরিকল্পনা ও আলোক-সম্পাতের দূরদর্শিতার অভাবে দানা বেঁধে উঠতে পারেনি। অনেকক্ষেত্রে অভিনেতা-অভিনেত্রীর অভিনয় মূক অভিনয়ের সমিল হয়েছে। এটা বহুলাংশে প্রেক্ষাগৃহ ও শিল্পীর অসতর্কতার জন্য হয়েছে। উল্লেখযোগ্য অভিনয় করেন। চিত্তরঞ্জন দাস (জনার্দন), পবিত্র মিত্র (দুলাল) সুখেন্দু চৌধুরী (খেতু), অমিয় গাঙ্গুলী (চরণ), অনিল মিত্র (কেদার), শীতল মাথার্জি (সুব্রত), ধীরেন সিংহ (লক্ষ্মণ), মণিকা ঘোষ (মাঙাবৌ) কৃষ্ণা ব্যানার্জি (মালতী) কবি-গানের দৃশ্যটি একটি হাস্যকর দৃশ্যে পরিণত হয়। এ বিষয়ে পরিচালকের লক্ষ্য রাখা উচিত ছিল।

রূপরঞ্জা

প্রখ্যাত নাট্যসংস্থা **রূপরঞ্জা পণরক্ষা** নাটকটি সাফল্যের সঙ্গে অভিনীত করার পর নতুন নাটক শ্রীঅখিল মুখোপাধ্যায়ের **ইতি থেকে ইতিহাস** অভিনয়ের জন্য প্রস্তুতির পথে। নির্দেশনায়—দিগ্বিজয়।

বিবিধ সংবাদ

জার্মান গণতান্ত্রিক প্রজাতন্ত্রের চলচ্চিত্র উৎসব

রবিবার, ৩০-এ জুলাই, সন্ধ্যায় অ্যাকাডেমী অব ফাইন আর্টস প্রেক্ষাগৃহে সিনে সেন্ট্রাল কলিকাতা আয়োজিত চলচ্চিত্র উৎসবে জার্মান গণতান্ত্রিক প্রজাতন্ত্রের কলিকাতার বাণিজ্যপ্রতিনিধি মিঃ আন্দ্রে রেডার ভারত ও জার্মান গণতান্ত্রিক প্রজাতন্ত্রের মধ্যে ঘনিষ্ঠ সহযোগিতার কথা উল্লেখ করে আশা প্রকাশ করেন যে, এই চলচ্চিত্র উৎসব দুই দেশের মৈত্রী বন্ধনে সহায়ক হবে। অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন শ্রীমধু বসু। চারটি ছবি 'আন্ডার ডগ' 'স্নো হোয়াইট', 'কোল্ড হার্ট' ও 'লিসি' এবং অ্যানেলি এবং অ্যান্ড্রু থোর্নডাইক নির্দেশিত বিখ্যাত তথ্যচিত্র 'ইউ অ্যান্ড ইওর পল' প্রদর্শিত হয়েছে।

শিশু চলচ্চিত্র পর্ষদের আগামী উৎসব:

শিশু চলচ্চিত্র পর্ষৎ আয়োজিত ষষ্ঠ আন্তর্জাতিক শিশু চলচ্চিত্র উৎসব এবং শিশু উৎসব ও পূর্বে নির্ধারিত ১ আগস্টের পরিবর্তে আসচে ১৪ নভেম্বর, ১৯৬৭, থেকে শুরু হবে এবং সমগ্র পূর্ব-ভারত জুড়ে ২১ জানুয়ারী পর্যন্ত অনুষ্ঠিত হবে। উৎসবে বিভিন্ন সূত্র থেকে পৃথিবীর সেরা শিশুচিত্রের যে সংগ্রহ আমরা করেছি, সেই সব চিত্র এসে পৌঁছুতে আরো কিছুদিন সময় লাগবে বলে খবর এসেছে। এবারকার চলচ্চিত্র উৎসবকে যে প্রতিনিধিত্বমূলক চরিত্র দেওয়ার চেষ্টা হচ্ছে, তাতে প্রস্তুতিতেই আরো কয়েক মাস সময় লাগবে, চলচ্চিত্রের বিস্তৃততর প্রদর্শনব্যবস্থা ধরাশিষ্ট বাংলা, বিহারের ছেলেমেয়েদের কথা ভেবেই বর্তমানে স্থগিত করা হলো। ছেলেমেয়েদের যোগদানের ব্যাপকতম স্বার্থের জন্য তারিখের এই পরিবর্তন। উৎসবের প্রস্তুতির অঙ্গ হিসাবেই আসচে কয়েক মাস ধরে সভ্যশ্রেণীভুক্ত বিদ্যালয়গুলির ছাত্র-ছাত্রীদের জন্য বিশেষ চলচ্চিত্রানুষ্ঠানের আয়োজন করা হবে, প্রয়োজন বোধে বিদ্যালয়গৃহেই। সভ্য-শ্রেণীভুক্ত বিদ্যালয় ও সংগঠনসমূহকে শিশু চলচ্চিত্র পর্ষদের (৫বি, ৮ রবীন্দ্র সরোবর স্টেডিয়াম কলিকাতা-২৯, ফোন নং ৪৬-৮৭৯১) সঙ্গে যোগাযোগ করতে অনুরোধ করা হচ্ছে।

জন্মাষ্টমী উপলক্ষে সারারাত্রি অভিনয়:

জন্মাষ্টমী উপলক্ষে সারারাত্রি অভিনয়ের রেওয়াজ বহুকাল থেকেই এদেশে প্রচলিত ছিল এবং আজও আছে।

বিশ্বরূপায় তিনটি সর্বকালের শ্রেষ্ঠ নাটকের অভিনয় পরিবেশন করে সারারাত্রি জাগরণের আয়োজন করেছেন 'দার্শনিক' সম্প্রদায়। এ তিনটি নাটকের প্রথমটি 'সাজাহান'। অগণন দর্শকের লিখিত অনুরোধে নটশেখর নরেশ মিত্র সাজাহান রূপে আবার দর্শকদের সামনে উপস্থিত হবেন। নটশেখরের পাশে থাকবেন জাহানারারূপী নাট্যাধিরাজ্ঞী মলিনা দেবী। দ্বিতীয় নাটক হিসাবে এঁরা বেছে নিয়েছেন রীতিমত নাটক। এবং তৃতীয় নাটক আলিবাবা। ফতিমারূপে অবিভূর্ত হবেন নাট্যাধিরাজ্ঞী মলিনা দেবী। আবদাল্লা ও মর্জিনাকে মঞ্চ রূপায়িত করবে যথাক্রমে লীলাবতী ও গীতশ্রী দেবী।

পি, সি, সরকারের ইন্দ্রজাল প্রদর্শনীর একটি দৃশ্য

পি, সি, সরকার ও তাঁর ইন্দ্রজাল

যাদুসম্রাট পি, সি সরকার তাঁর ইন্দ্রজাল নিয়ে আগামী ১১ই আগস্ট শুক্রবার সন্ধ্যা সাড়ে ছয়টায় আবার অবতীর্ণ হচ্ছেন। ইন্দ্রজালে অনেক নূতন নূতন খেলা সন্নিবিষ্ট হয়েছে। কামানের মধ্যে একটি মেয়েকে ভর্তি করে তাতে আওয়াজ করে একটা জ্বলন্ত বিজলী বাতির বাক্সের মধ্যে প্রতিষ্ঠা করাবেন। তা ছাড়া শূন্যে ভাসমান মোটর। একটি মেয়ের হাত-পা এবং গলা ছয় ফুট দূরে নিয়ে 'ইলাষ্টিক লেডী' খেলা দেখাবেন।

শিল্পীবৃন্দের সপ্তম বার্ষিক অনুষ্ঠান

উত্তর কলিকাতার সাংস্কৃতিক প্রতিষ্ঠান 'শিল্পীবৃন্দের' সপ্তম-বার্ষিক অনুষ্ঠানের আয়োজন হয় গত ৩১শে জুলাই মহাজাতি সদনে। এই অনুষ্ঠানে রবীন্দ্রনাথের 'শ্যামা' নৃত্যনাট্যটি সাফল্যের সঙ্গে মঞ্চস্থ হয়। নৃত্যকলার সুষ্ঠু প্রয়োগ, কণ্ঠসংগীতের সুষম ব্যবহার এর ব্যঞ্জনায় প্রকাশ। নৃত্য-পরিচালক শ্রীশঙ্কর ভট্টাচার্য ও সঙ্গীত পরিচালক শ্রীহরেন গুহর নতুন দৃষ্টিভঙ্গীর ফলে নৃত্যনাট্যটি সাফল্য লাভ করে। শঙ্কর ভট্টাচার্যের নৃত্যাভিনয়ে বজ্রসেন (কণ্ঠে হরেন গুহ) এখানে মূর্ত। শ্যামার (কণ্ঠে, গোপা বসু), কোটাল, উত্তীয় ও প্রধানা সখীর ভূমিকায় যথাক্রমে শুভ্রা মুখার্জি, শমিত চ্যাটার্জি, কেকা গাঙ্গুলী ও দীপ্তি সাহার নৃত্য বিশেষ প্রশংসার যোগ্য। নৃত্যে অন্যান্য ভূমিকায় শুক্লা ঘোষ, রত্না লাহা, মণিকা দেব ও কল্যাণী রায় এবং সংগীতে অরুণ গুপ্ত, অশোক পাল, ভোলানাথ দাস, শিখা গুহ, রীতা হালদার, অনিতা মুখার্জি, শুভা ঘোষাল ও সুমিতা মুখার্জি উচ্চমানের পরিচয় দিয়েছেন। সপ্তম বার্ষিক এই অনুষ্ঠানের সূচনা হয় শ্রীকাশীনাথের মূকাভিনয়ে।

গ্রেট সুশীলের ইন্দ্রজাল

সম্প্রতি হাজারিবাগে শিশুচক্রের (জুনিয়র) বাৎসরিক পুরস্কার বিতরণ উৎসব উপলক্ষে বিশেষভাবে নির্মিত রঙ্গমঞ্চে ইন্দ্রজাল প্রদর্শন করলেন যাদুকর দি গ্রেট সুশীল। উপস্থাপনার অভিনবত্বে গ্রেট সুশীলের প্রতিটি খেলাই প্রতিভার পরিচয় বহন করে। ভারতের মন্দির, [illegible] দূত, মিশরের [illegible] শূন্যে-ভাসমান বালিকা, বৈদ্যুতিক করাত দ্বারা একটি বালিকা খণ্ডন খেলাগুলি উল্লেখ্য।

শিশু-স্বর্গ

আগামী রবিবার মহাজাতি সদনে শিশু-স্বর্গের আনন্দ উৎসব প্রতিবারের মত সকাল ৯টাতেই বসবে সদনের সেমিনার হলে। 'নতুন প্রতিভা' পর্যায়ে বারোজন শিশু-শিল্পীর অনুষ্ঠান ছাড়াও মূকাভিনয়, হরবোলা, নাটক, ম্যাজিক আর চলচ্চিত্র প্রদর্শিত হবে। ছোটদের আঁকা ছবির প্রদর্শনীরও ব্যবস্থা থাকবে মহাজাতি সদনে।

স্বাধীনতা দিবসেও (১৫ই আগস্ট) একটি বিশেষ অনুষ্ঠানের ব্যবস্থা হয়েছে, বেলা ৩টা থেকে। সেদিন শুধু চলচ্চিত্র প্রদর্শিত হবে।

সন্ধানী ফিল্ম সোসাইটির উদ্বোধন

সন্ধানী ফিল্ম সোসাইটির উদ্বোধন গত ৩০শে জুলাই অনুষ্ঠিত হয়েছে। উদ্বোধনী ভাষণে শ্রীঋত্বিক ঘটক, বাংলাদেশে ফিল্ম সোসাইটির মাধ্যমে উচ্চ আঙ্গিকের এবং উচ্চমানের ছবি তৈরি করার সম্ভাবনার কথা বলেন। শ্রীমতি বিজয়া মুলে এবং শ্রীমতি সুপ্রিয়া দাশগুপ্তা অনুষ্ঠানের সাফল্য কামনা করেন। এই উপলক্ষে একটি হাঙ্গেরিয়ান ছবি 'স্কাইলার্ক' প্রদর্শিত হয়।

আগামী ২০শে এবং ২৭শে আগস্ট তিনটি চেক ছবি প্রদর্শিত হবে।

কিশোর কল্যাণ পরিষদ আয়োজিত সপ্তদশ

বার্ষিক প্রতিযোগিতা

পরিষদের সপ্তদশ প্রতিষ্ঠা বার্ষিকী উপলক্ষে আবৃত্তি, বক্তৃতা (সুভাষচন্দ্রের 'তরুণের স্বপ্ন' থেকে আমি যে প্রেরণ পেয়েছি।) রবীন্দ্রসংগীত, নজরুল গীতি, খেয়াল, রবীন্দ্রসংগীত অবলম্বনে নৃত্য, প্রবন্ধ (আমার চোখে ভগিনী নিবেদিতা), চিত্রাঙ্কন (বাংলা গ্রাম) বিষয়ে প্রতিযোগিতার আয়োজন করা হয়েছে। প্রবন্ধ ও চিত্রাঙ্কন প্রতিযোগিতায় নির্দিষ্ট দিনে পরিষদের নির্ধারিত স্থানে এসে প্রবন্ধ লিখতে ও ছবি আঁকতে হবে। ১৭ বছর পর্যন্ত ছেলে-মেয়েরা এই প্রতিযোগিতায় যোগদান করতে পারবে। প্রতি বিষয়ে প্রবেশ ফি ৭৫ পয়সা এবং তিনটি পুরস্কার। যোগদানের শেষ তারিখ ৩১ আগস্ট। বিস্তারিত বিবরণ ২২ টেগোর ক্যাসল স্ট্রীট কলিকাতা—৬ এই ঠিকানায় পরিষদের মূলকেন্দ্রে জানা যাবে।

হাজারিবাগ

হাজারিবাগের চন্দ্রপুরা তাপবিদ্যুৎ কেন্দ্রের মহিলা সমিতি সম্প্রতি স্থানীয় ওয়েলফেয়ার সেন্টার মঞ্চে রবীন্দ্রনাথের 'গৃহপ্রবেশ' নাটক মঞ্চস্থ করেন। বিহার খরা অঞ্চলের সাহায্যার্থে এই নাট্যাভিনয়ের আয়োজন করা হয়। নাট্যনির্দেশনার দায়িত্ব বহন করেন সমিতি সম্পাদিকা বেলা গোস্বামী। পুরুষ ও স্ত্রী উভয় চরিত্রে অভিনয়েই এখানকার স্থানীয় মহিলারা নৈপুণ্যের পরিচয় রাখেন। ডলি দস্তরায়ের ডাক্তার, সুলেখা বসুর যতীন, পুতুল আইনের অখিল, অনিমা দত্তের মুন্সীর মাসি, আরতি মুখোপাধ্যায়ের মণি, সান্ত্বনা মুখোপাধ্যায়ের হিমি এবং প্রতিবেশী রূপে বিভা ভট্টাচার্য, কবিতা চৌধুরী ও মীরা তালুকদারের অভিনয় নাট্যানুরাগীদের মুগ্ধ করেছে।

রজনীগন্ধা

বারাসতের প্রখ্যাত সাংস্কৃতিক সংস্থা 'রজনীগন্ধা' সম্প্রতি একটি সুন্দর অনুষ্ঠানের আয়োজন করেন। এই অনুষ্ঠানে সংগীত, আবৃত্তি, যন্ত্রসংগীত প্রভৃতি অন্তর্ভুক্ত ছিল। সংগীতে অংশ নেন বেতার-

[illegible] বন্দ্যোপাধ্যায়   দেবদাস বন্দ্যোপাধ্যায়

শিল্পী দেবদাস বন্দ্যোপাধ্যায় ও তাঁর স্ত্রী রেবা বন্দ্যোপাধ্যায়, কাজল দত্ত, শান্তি গাঙ্গুলী। বিশেষ করে শ্রীবন্দ্যোপাধ্যায় ও তাঁর স্ত্রীর কণ্ঠসংগীত সমবেত শ্রোতাদের বিমুগ্ধ করে রেখেছিল। সুললিতকণ্ঠে আবৃত্তি করে শোনান সৌমেন চ্যাটার্জি।

খেলাধুলা

দর্শক

ইংল্যান্ড বনাম পাকিস্তান

প্রথম টেস্ট ম্যাচ

ইংল্যান্ড : ৩৬৯ রান (কেন ব্যারিংটন ১৪৮, টম গ্রেভনী ৮১ এবং বেসিল ডি' ওলিভেরা ৫৯ রান। মুস্তাক ২২ রানে ৩, সেলিম ৭৪ রানে ৩ এবং আশিফ ৭৬ রানে ৩ উইকেট) ও ২৪১ রান (৯ উইকেটে ডিক্লেয়ার্ড। বেসিল ডি'ওলিভেরা ৮১ রান),

পাকিস্তান : ৩৫৪ রান (হানিফ মহম্মদ নট আউট ১৮৭ রান এবং আশিফ ইকবাল ৭৬ রান। হিগস ৮১ রানে ৩, স্নো ১২০ রানে ৩ এবং ইলিংওয়ার্থ ৪৮ রানে ২ উইকেট)। ও ৮৮ রান (৩ উইকেটে)।

প্রথম দিন (জুলাই ২৭) :
ইংল্যান্ড প্রথম ইনিংসের ২ উইকেট খুইয়ে ২৮২ রান সংগ্রহ করে। কেন ব্যারিংটন ১৪৭ রান এবং টম গ্রেভনী ৮১ রান করে অপরাজিত থাকেন।

দ্বিতীয় দিন (জুলাই ২৮) :
ইংল্যান্ডের প্রথম ইনিংস ৩৬৯ রানের মাথায় শেষ হয়। বাকি সময়ের খেলায় পাকিস্তানের প্রথম ইনিংসের ৪ উইকেট পড়ে ৭৮ রান ওঠে। তাদের খেলায় অপরাজিত থাকেন হানিফ মহম্মদ (২৮ রান) এবং নাশিমুল গনি (২ রান)।

তৃতীয় দিন (জুলাই ২৯) :
পাকিস্তানের প্রথম ইনিংসে ২০৩ রান দাঁড়ায় (৭ উইকেটে)। খেলায় হানিফ মহম্মদ ১০২ রান এবং আশিফ ইকবাল ৫৬ রান সংগ্রহ করে অপরাজিত থাকেন।

চতুর্থ দিন (জুলাই ৩১) :
পাকিস্তানের প্রথম ইনিংস ৩৫৪ রানের মাথায় শেষ হলে খেলার বাকি সময়ে ইংল্যান্ড দ্বিতীয় ইনিংসের ৪ উইকেট খুইয়ে ১৩১ রান সংগ্রহ করে।

পঞ্চম দিন (আগষ্ট ১) :
ইংল্যান্ড ২৪১ রানের (৯ উইকেটে) মাথায় দ্বিতীয় ইনিংসের খেলার সমাপ্তি ঘোষণা করে। পাকিস্তানের দ্বিতীয় ইনিংসের ৮৮ রানের (৩ উইকেটে) মাথায় খেলাটি শেষ হয়।

লর্ডস মাঠে আয়োজিত ইংল্যান্ড বনাম পাকিস্তানের টেস্ট খেলাটি অমীমাংসিতভাবে শেষ হয়েছে। এই খেলাটি ছিল এই দুই দেশের চতুর্থ টেস্ট সিরিজের প্রথম টেস্ট খেলা।

ইংল্যান্ডের অধিনায়ক ব্রায়ান ক্লোজ টসে জয়ী হয়ে প্রথম ব্যাট করার দান নেন। প্রথম দিনের খেলায় ইংল্যান্ডের ২টো উইকেট পড়ে ২৮২ রান দাঁড়ায়। খেলার সূচনা কিন্তু সুবিধার হয়নি—৫ রানের মাথায় ১ম এবং ৮২ রানের মাথায় ২য় উইকেট পড়ে যায়। লাঞ্চের ১২ মিনিট আগে ২য় উইকেট পড়লে ব্যারিংটনের সঙ্গে গ্রেভনী খেলতে নামেন এবং এই তৃতীয় উইকেটের জুটিই খেলার মোড় ঘুরিয়ে দেন। তৃতীয় উইকেটের জুটিতে এঁরা ২০৩ রান সংগ্রহ করে অপরাজিত থাকেন। লাঞ্চের সময় ইংল্যান্ডের ছিল ১০১ রান (২ উইকেটে), চা-পানের সময় ২০১ রান (২ উইকেটে) এবং প্রথম দিনের খেলার শেষে ২৮২ রান (২ উইকেটে)। প্রথম দিনের খেলায় অপরাজিত থাকেন ব্যারিংটন (১৪৭; এবং গ্রেভনী (৮১)। ব্যারিংটনের এই সেঞ্চুরীটি হল তাঁর টেস্ট খেলোয়াড়-জীবনের সপ্তদশ সেঞ্চুরী—পাকিস্তানের বিপক্ষে দ্বিতীয় এবং লর্ডস মাঠে আয়োজিত টেস্ট খেলায় তাঁর এই প্রথম সেঞ্চুরী। পাকিস্তানের বিপক্ষে আলোচ্য টেস্ট খেলায় ব্যারিংটন যখন ৭৮ রান সংগ্রহ করেন তখন টেস্ট ক্রিকেটে তাঁর ৬০০০ রান পূর্ণ হয়। ব্যারিংটনকে নিয়ে মাত্র ৬ জন খেলোয়াড় টেস্ট ক্রিকেটে ৬ হাজার বা তার বেশী রান করেছেন। অপর পাঁচজন হলেন—ইংল্যান্ডের ওয়ালী হ্যামন্ড (৮৫টি টেস্টে ৭২৪৯ রান), অস্ট্রেলিয়ার স্যার ডোনাল্ড ব্র্যাডম্যান (৫২টি টেস্টে ৬৯৯৬ রান), ইংল্যান্ডের স্যার লিওনার্ড হাটন (৭৯টি টেস্টে ৬৯৭১ রান), ইংল্যান্ডের কলিন কাউড্রে (৯০টি টেস্টে ৬৩০৫ রান) এবং অস্ট্রেলিয়ার নীল হার্ভে (৭৯টি টেস্টে ৬১৪৯ রান)।

দ্বিতীয় দিনের খেলায় ১২টা উইকেট পড়েছিল—ইংল্যান্ডের ৮টা এবং পাকিস্তানের ৪টে। দ্বিতীয় দিনে লাঞ্চের আগেই ইংল্যান্ড মাত্র ১০ রানের বিনিময়ে তাদের আরও ৫টা উইকেট খুইয়েছিল। ইংল্যান্ড ২৮২ রানের (২ উইকেটে) পুঁজি নিয়ে খেলা সুরু করে। কিন্তু মাত্র ১৫ মিনিটের খেলায় স্কোর বোর্ডে দেখা গেল ২৮৭ রান (৬ উইকেটে)। পাকিস্তানের বোলারদের পক্ষে নিঃসন্দেহে এক বিরাট সাফল্য। কিন্তু ৮ম উইকেটের জুটি ডি'ওলিভেরা এবং হিগস ইংল্যান্ডের এই ভাঙনের মুখে দৃঢ়তার সঙ্গে খেলে অতি মূল্যবান ৬০ রান সংগ্রহ করেছিলেন। ডি'ওলিভেরা ৫৯ রান করেন। তবে ভাগ্যদেবী তাঁর পক্ষে ছিলেন। কারণ স্কোর বোর্ডে তাঁর যখন মাত্র ৫ রান এবং দলের ২৯৭ রান সে সময় সৈয়দ আমেদ তাঁর "ক্যাচ" মাটিতে ফেলে দেন।

দ্বিতীয় দিনের ১৫০ মিনিটের খেলায় মাত্র ৮৭ রানের বিনিময়ে ইংল্যান্ডের বাকি ৮টা উইকেট পড়ে গেলে তাদের প্রথম ইনিংসের খেলা শেষ হয়।

মুস্তাক মহম্মদ খেলার এক-সময়ে ১১টা বল দিয়ে মাত্র ১ রানে ৩টে উইকেট পান। প্রথম ইনিংসের খেলায় তাঁর বোলিং পরিসংখ্যান দাঁড়ায় ২২ রানে ৩টে উইকেট। খেলার এক-সময়ে পরিসংখ্যান ছিল আলতাফের ১৭ রানে ৩ এবং আশিফের ৮ রানে ২টো উইকেট।

পাকিস্তান প্রথম ইনিংস খেলতে নেমে ৪ উইকেট খুইয়ে ৭৮ রান সংগ্রহ করেছিল।

ব্যারিংটন ৩০৮ মিনিট খেলে তাঁর ১৪৮ রানে ১৭টা বাউন্ডারী করেছিলেন। অপরদিকে ২২৩ মিনিটের খেলায় গ্রেভনীর ৮১ রানে ছিল ১১টা বাউন্ডারী।

তৃতীয় দিনে চা-পানের পর আলোর অভাবে খেলা বেশীক্ষণ হয়নি। এইদিনে পাকিস্তান ৩ উইকেট খুইয়ে পূর্বদিনের ৭৮ রানের (৪ উইকেটে) সঙ্গে ১৫৫ রান যোগ করে। রান দাঁড়ায় ২৩৩ (৭ উইকেটে)। এক-সময়ে পাকিস্তান দারুণ সংকটের মধ্যে পড়েছিল—মাত্র ৯৯ রানের মাথায় ৬ষ্ঠ উইকেটের পতন। দলের এই সংকটকালে অধিনায়ক হানিফ মহম্মদ পরিত্রাতার ভূমিকা নিয়ে দলের পতন রোধ করেন। লাঞ্চের সময় পাকিস্তানের রান ছিল ১৩৪ (৬ উইকেটে)। হানিফ ৬১ রান করে অপরাজিত ছিলেন। চা-পানের সময় রান দাঁড়ায় ২১৩ (৭ উইকেটে)। খেলায় অপরাজিত ছিলেন হানিফ মহম্মদ (৯২ রান) এবং আশিফ ইকবাল (৪৬ রান)। তৃতীয় দিনের খেলার শেষে হানিফ ১০২ এবং আশিফ ইকবাল ৫৬ রান করে নট আউট থাকেন। টেস্ট ক্রিকেটে হানিফের এই নিয়ে দ্বাদশ-সেঞ্চুরী—ইংল্যান্ডের বিপক্ষে তৃতীয় এবং ইংল্যান্ডের মাটিতে প্রথম টেস্ট সেঞ্চুরী।

চতুর্থদিনে ৩৫৪ রানের মাথায় পাকিস্তানের প্রথম ইনিংস শেষ হলে তারা ইংল্যান্ডের প্রথম ইনিংসের ৩৬৯ রানের থেকে মাত্র ১৫ রানের পিছনে পড়ে। পাকিস্তানের শেষের চার উইকেটে দলের ২৫৫ রান উঠেছিল। লর্ডস মাঠের এই প্রথম টেস্ট খেলার নায়ক হানিফ মহম্মদ ১৮৭ রান করে অপরাজিত থাকেন। ইংল্যান্ড বনাম পাকিস্তানের টেস্ট ক্রিকেটে হানিফের এই নট আউট ১৮৭ রানই উভয় দলের পক্ষে এক ইনিংসের খেলায় ব্যক্তিগত সর্বোচ্চ রানের রেকর্ড। তাঁর এই নট আউট ১৮৭ রান তুলতে ৯ ঘণ্টার কিছু বেশী সময় লেগেছিল। বাউণ্ডারী করেছিলেন ২১টা। চতুর্থ দিনের বাকি সময়ে ইংল্যান্ড দ্বিতীয় ইনিংসের ৪টে উইকেট খুইয়ে ১৩১ রান তুলেছিল।

পঞ্চম অর্থাৎ খেলার শেষদিনে ইংল্যান্ড যখন ২৪১ রানের (৯ উইকেটে) মাথায় দ্বিতীয় ইনিংসের সমাপ্তি ঘোষণা করে তখন আর ২১০ মিনিট খেলার সময় ছিল। এই অবস্থায় পাকিস্তানের জয়লাভের জন্য প্রয়োজন ছিল ২৫৭ রানের অর্থাৎ ঘণ্টায় ৭৪ রান। পাকিস্তান কিন্তু জয়লাভের উদ্দেশ্য নিয়ে দ্বিতীয় ইনিংস খেলেনি। এব্যাপারে তাদের দোষারোপ করা বাতুলতা। খেলা ভাঙ্গার নির্দিষ্ট সময়ে স্কোর বোর্ডে দেখা গেল পাকিস্তানের ৮৮ রান ৩ উইকেটে পড়ে।

প্রথম বিভাগের ফুটবল লীগ

গত সপ্তাহে (জুলাই ৩১—আগষ্ট ৬) অনুষ্ঠিত প্রথম বিভাগের ফুটবল লীগ প্রতিযোগিতার ১৪টি খেলার সংক্ষিপ্ত ফলা-

প্রথম বিভাগের ফুটবল লীগ প্রতিযোগিতায় মোহনবাগান বনাম মহমেডান স্পোর্টিং দলের খেলার একটি দৃশ্য। খেলায় মহমেডান স্পোর্টিং ১—০ গোলে জয়ী হয়।
ফটো : অমৃত

ফল : ১০টি খেলায় জয়-পরাজয়ের নিষ্পত্তি, ৩টি খেলা ড্র এবং প্রবল বৃষ্টিপাতের ফলে মোহনবাগান বনাম ইষ্টবেঙ্গল দলের খেলা পরিত্যক্ত।

গত বছরের লীগ চ্যাম্পিয়ান ইষ্টবেঙ্গল ক্লাব ১—০ গোলে উয়াড়ী দলকে পরাজিত করে। কিন্তু মোহনবাগানের বিপক্ষে তাদের গুরুত্বপূর্ণ খেলাটি প্রথমার্ধের খেলার পর বৃষ্টির দরুণ পরিত্যক্ত হয়। কোন পক্ষেই গোল হয়নি। লীগের তালিকায় ইষ্টবেঙ্গল দলের বর্তমান স্থান শীর্ষদেশে—২৩টা খেলায় ৩৯ পয়েন্ট। অপরদিকে লীগের দ্বিতীয় স্থান অধিকারী মহমেডান স্পোর্টিং দলের ২১টা খেলায় ৩৬ পয়েন্ট। আলোচ্য সপ্তাহে তারা ৩—০ গোলে খিদিরপুর দলকে পরাজিত করে। কিন্তু এরিয়ান্সের বিপক্ষে খেলা ড্র (০—০) করে একটি মূল্যবান পয়েন্ট নষ্ট করেছে। খেলায় অঘটন ঘটাতে এরিয়ান্সের জুড়ি নেই। বি এন আর ২—০ গোলে হাওড়া ইউনিয়ন এবং ২—০ গোলে ইষ্টার্ণ রেলওয়ে দলকে পরাজিত করে তালিকায় তাদের তৃতীয় স্থান ঠিক রেখেছে—২৪টা খেলায় ৩৬ পয়েন্ট। গত বছরের রাণার্স আপ মোহনবাগান আলোচ্য সপ্তাহে ৬—০ গোলে জর্জ টেলিগ্রাফ দলকে পরাজিত করে চতুর্থ স্থানে আছে—২১টা খেলায় ৩০ পয়েন্ট।

যদি কোন অঘটন না ঘটে, তাহলে লীগ চ্যাম্পিয়ানশীপের মীমাংসা ইষ্টবেঙ্গল এবং মহমেডান স্পোর্টিং দলের খেলাতেই হবে।

প্রথম বিভাগের ফুটবল লীগ এবং আই এফ এ শীল্ড খেলার চূড়ান্ত পর্যায়ে দীর্ঘদিন মোহনবাগান এবং ইষ্টবেঙ্গল দলের যে প্রতিদ্বন্দ্বিতা চলছিল এবার তার ব্যতিক্রম হল। ইষ্টবেঙ্গল এবং মহমেডান দলের তুলনায় বেশী খ্যাতনামা খেলোয়াড় দলভুক্ত করেও মোহনবাগানের এ বছরের চরম ব্যর্থতার প্রধান কারণ হল ত্রুটিযুক্ত ক্রীড়া-পদ্ধতি এবং খেলোয়াড়দের মধ্যে বুঝাপড়ার অভাব।

ইংল্যান্ড সফরে ভারতীয় স্কুল ক্রিকেট দল

ওভালে আয়োজিত ভারতীয় স্কুল ক্রিকেট দল বনাম লণ্ডন স্কুল ক্রিকেট দলের দুদিনব্যাপী খেলাটি ড্র গেছে। খেলার শেষ দিনে ভারতীয় স্কুল দলের দ্বিতীয় ইনিংসের ১৭ রানের (২ উইকেটে) মাথায় যখন খেলাটি শেষ হয়, তখন তাদের জয়লাভের জন্যে ৯৭ রানের প্রয়োজন ছিল এবং হাতে ৮টা উইকেট জমা ছিল। এই খেলায় ১৫ বছরের খেলোয়াড় লক্ষ্মণ সিংয়ের নট আউট ১১৭ রান বিশেষ উল্লেখযোগ্য।

লণ্ডন স্কুল : ১৬৮ রান (সরকার ৩৮ রানে ৫ উইকেট) এবং ১৭৪ রান (৩ উইকেটে ডিক্লেঃ ওয়েন টমাস নট আউট ১০৩ রান)।

ভারতীয় স্কুল : ২২৮ রান (লক্ষ্মণ সিং নট আউট ১১৭ রান) ও ১৭ রান (২ উইকেটে)।

একদিনের খেলায় ভারতীয় স্কুল দল ৯৭ রানে ইণ্ডিয়ান জিমখানা ক্লাবকে পরাজিত করে। প্রথম ইনিংসের খেলায় ভারতীয় স্কুল দল মাত্র দু উইকেটের বিনিময়ে ২১৫ রান সংগ্রহ করে খেলার সমাপ্তি ঘোষণা করেছিল।

ভারতীয় স্কুল : ২১৫ রান (২ উইকেটে ডিক্লেঃ। মহীন্দর অমরনাথ নট আউট ৭৮ এবং রাজা মুখার্জি ৫৮ রান)।

ইণ্ডিয়ান জিমখানা : ১১৮ রান (সিশোদিয়া ৪২ রান। নায়াক ২৫ রানে ৩, সরকার ৩৪ রানে ২, অরুণকুমার ১৫ রানে ২ এবং ইন্দর রাজ ৬ রানে ২ উইকেট।

ভারতীয় স্কুল ক্রিকেট দল বনাম মিডলসেক্স গ্রামার স্কুল দলের খেলাটি অমীমাংসিত থেকে গেছে। যশবীর সিং ৫৬ রানে ৭টা উইকেট নিয়ে বোলিংয়ে অসাধারণ সাফল্যের পরিচয় দেন। ভারতীয় স্কুল ক্রিকেট দলের প্রথম ইনিংসের ১২৬ রানের (৪ উইকেটে) মাথায় খেলাটি শেষ হয়। তখনও তাদের হাতে ৬টা উইকেট জমা ছিল এবং জয়লাভের জন্যে ৫৮ রানের প্রয়োজন ছিল।

মিডলসেক্স স্কুল : ১৮৩ রান (সি জনসন ৪১ রান। যশবীর সিং ৫৬ রানে ৭ এবং সরকার ৩০ রানে ২ উইকেট)।

ভারতীয় স্কুল : ১২৬ রান (৪ উইকেটে; লক্ষ্মণ সিং ৪০। এণ্ডারসন ৩০ রানে ২ উইকেট)।

কেন এই পশ্চাৎগামিতা

শংকরবিজয় মিত্র

সম্প্রতি ইংল্যান্ডের কাছে ভারতের শোচনীয় পরাজয়ের পর ক্রীড়াজগতে এক সমালোচনার সুরে ধ্বনিত হচ্ছে। তিনটে টেস্টের প্রত্যেকটাতে ভারতীয় দল ব্যর্থতার পরিচয় দেওয়াতে এটা খুবই স্বভাবিক। এ ব্যর্থতার উৎস কোথায় এ সম্পর্কেও নানা অভিমত শোনা যাচ্ছে। সবচেয়ে বড় কথা, যে প্রশিক্ষণ ও দৃঢ়সংকল্প নিয়ে আন্তর্জাতিক প্রতিযোগিতায় অবতীর্ণ হতে হয় সেই প্রশিক্ষণ ও দৃঢ় সংকল্প কি আমরা সংগে নিয়ে যাই? আমাদের কর্তাব্যক্তিরা কি ভারতের মর্যাদার কথা সবসময় স্মরণে রেখে কাজে এগোন? দেশের প্রতি গভীর কর্তব্যবোধ, ক্রীড়ামান অক্ষুন্ন রাখার প্রতি তীব্র সচেতনতা ও উপযুক্ত প্রশিক্ষণ দিয়ে মান উন্নত করার জন্য আন্তরিক প্রচেষ্টা কি তাঁদের আছে? আজ প্রতিটি ক্রীড়ানুরাগীর মনে এই প্রশ্নই দেখা দিয়েছে যে, ভারতের মত বিশাল দেশে প্রতিভার অভাব থাকতে পারে না এবং নেইও, তবু কেন আমরা সর্বক্ষেত্রে ব্যর্থতার পরিচয় দিচ্ছি। শুধু ক্রিকেট নয় ক্রীড়াক্ষেত্রের দিকে দিকে এই ধরনের ব্যর্থতা আজ অসহনীয় হয়ে উঠেছে।

অ্যাথলেটিকসের ক্ষেত্রেও ভারতের উন্নতির কোন লক্ষণই দেখা যায় না। স্বাধীনতার পর বিশ বছরেও আমরা এই বিষয়ে সমুন্নতির কোন স্বাক্ষর রাখতে পেরেছি মনে হয় না। বিশ্ব ওলিম্পিক প্রতিযোগিতার অনুষ্ঠানে একমাত্র হকি ছাড়া ভারত আর কোন বিষয়ে বিশেষতঃ ব্যক্তিগত কৃতিত্বের ক্ষেত্রে কোন স্থান সংগ্রহ করতে পারে নি। ১৯৬৮ সালে আমেরিকার মেক্সিকো শহরে ওলিম্পিক অনুষ্ঠানের জন্য দেশে দেশে জোর প্রস্তুতি চলেছে। কবির ভাষায় বলতে গেলে হেমচন্দ্রের সেই অমর পংক্তিটি মনে পড়ে — 'ভারত শুধুই ঘুমায়ে রয়'।

দৌড়-ঝাঁপ প্রভৃতি বিভিন্ন বিষয়ে তরুণ প্রতিভার অন্বেষণ ও আবিষ্কারে আমরা মোটেই উদ্যোগী নই। বড় বড় শহরে বিভিন্ন ক্রীড়া সংস্থার মাধ্যমে যে সব অ্যাথলিট প্রতিযোগিতামূলক অনুষ্ঠানে কৃতিত্ব দেখায় তাদের উপর দৃষ্টি নিবদ্ধ রেখেই আমাদের কর্তারা তাঁদের কর্তব্য সম্পন্ন করেন। তাতেও নানা জটিল আবর্তের সৃষ্টি করে কর্তাদের প্রিয়ভাজন অ্যাথলিটদের নির্বাচন করা হয়, নিছক যোগ্যতার বিচারে নির্বাচন হলেও বা হয়ত উন্নততর ফলাফল দেখা যেত। এর ফলে যোগ্য ও সমর্থ তরুণেরা বিশ্ব প্রতিযোগিতায় দেশের সুনাম রক্ষায় তাদের যোগ্যতা দেখাবার সুযোগ থেকে বঞ্চিত হয়। তাদের সুযোগ করে দিয়ে উপযুক্ত প্রশিক্ষণে বিশ্বমানে উন্নত করে তুলে ধরবার মত না করতে পারলে ভারতের স্বপ্ন কোনদিন সফল হবে বলে মনে হয় না।

স্বাধীনতার বিশ বছরে একটি মাত্র অ্যাথলিট কিছুটা আশা জাগিয়ে তুলেছিলেন, তিনি হলেন উড়ন্ত শিখ দৌড়বীর মিলখা সিং। ১৯৬০ সালে রোম ওলিম্পিকে চারশো মিটার দৌড়ে তিনি চতুর্থ স্থান পেয়েছিলেন। তাঁর দৌড়ের সময়টা পূর্বেকার বিশ্ব রেকর্ড অতিক্রম করেছিল। তা সত্ত্বেও তিনি স্থান পেলেন চতুর্থ। এর থেকে বোঝা যায় প্রতি চার বছরে বিশ্বের বিভিন্ন দেশে অ্যাথলিটরা কঠোর সাধনায় এত এগিয়ে যাচ্ছেন যে, প্রতি ওলিম্পিকেই নতুন নতুন রেকর্ড হচ্ছে। তার সঙ্গে তাল রেখে ভারতকেও অগ্রসর হতে হবে, কোন ঢিলে-ঢালা ব্যবস্থা আজকের বিশ্বে স্থান করে নেওয়া একেবারে স্বপ্নেরও অগোচর।

বিশ্বের ক্রীড়ামান আজ অনেক এগিয়ে গেছে। রকেটের যুগের সঙ্গে পাল্লা দিয়েই যেন অ্যাথলিটরা তৈরী হচ্ছেন। চার মিনিটের কম সময়ে মাইল দৌড়, দশ সেকেণ্ডের কম সময়ে শত মিটার দৌড়, উচ্চ লম্ফনে সাত ফুট এবং পোলভল্টে পনেরো ফুট অতিক্রম করা এককালে দুঃসাধ্য বলে গণ্য হত। আজ সেখানে চার মিনিট থেকে মাইল দৌড়ে সময় কমিয়ে ফেলেছেন অ্যাথলিটরা। এখন তাঁরা তিন মিনিট পঞ্চাশ সেকেণ্ডের মধ্যে মাইল দৌড়ানোর লক্ষ্যে এসেছেন।। সম্প্রতি আমেরিকার তরুণ উনিশ বছরের জিম রেউন তিন মিনিট একান্ন দশমিক তিন সেকেণ্ডে এক মাইল দৌড়ে বিশ্ব রেকর্ড স্থাপন করে চাঞ্চল্যের সৃষ্টি করেছেন।

এই তরুণটির অভাবনীয় সাফল্যে ইতিহাসটুকু পর্যালোচনা করলে দেখা যায় ক্রীড়াজগতে অজ্ঞাত প্রতিভাকে নিয়ে উপযুক্ত প্রশিক্ষণে তাকে বিশ্ব পর্যায়ে আনার জন্য আমেরিকার ব্যবস্থা কত সহজ ও সুষ্ঠ। হাইস্কুলের ছাত্র জিমের দৌড় দেখে স্কুলের কোচ তার বিশেষ ট্রেণিং-এর জন্যে সুপারিশ করেন এবং তাঁরই বিশেষ শিক্ষায় জিম তিন মিনিট ৫৯ সেকেণ্ডে মাইল দৌড়িয়ে মার্কিন স্কুল ছাত্রদের পূর্ব রেকর্ড গুঁড়িয়ে দেন। ১৯৬৪ সালে মাত্র সতেরো বছর বয়সে রেউন টোকিও ওলিম্পিকে ১৫০০ মিটার দৌড়ে বিশেষ সুবিধা করতে পারেন নি। টোকিও থেকে ফিরে এসে ছেলেটি কঠোর সাধনায় নিজেকে নিমগ্ন করে এবং ১৯৬৬ সালের ৪ঠা জুন তারিখে ক্যালিফোর্ণিয়ার কম্পটনে তিন মিনিট তিপ্পান্ন দশমিক সাত সেকেণ্ডে এক মাইল দৌড়িয়ে বিশ্ব রেকর্ডের একের দশ সেকেণ্ডের মধ্যে তাঁর সময়কে এনে ফেলেন। তারপর ১৯৬৬ সালে জুলাই মাসে তিন মিনিট একান্ন দশমিক তিন সেকেণ্ডে এই দৌড় সম্পন্ন করে উনিশ বছর বয়সে আজ তিনি হলেন বিশ্ব রেকর্ডের অধিকারী। সম্প্রতি তিনি এই রেকর্ডেরও উন্নতি ঘটিয়েছেন তিন মিনিট একান্ন দশমিক এক সেকেণ্ডের মধ্যে দৌড়িয়ে।

কিন্তু রেউন বা তাঁর শিক্ষক এতেও তুষ্ট নন। এই রেকর্ডকে অতিক্রম করার জন্যে জিমের সাধনার শেষ নেই। প্রতিদিন ভোর পাঁচটায় উঠে তিনি ছ' মাইল পথ হাঁটেন, বিকেলে কয়েক মাইল পথ দৌড়ান। সপ্তাহে হেঁটে বা দৌড়ে মোট তিনি ৮০

মাইল পথ অতিক্রম করেন। মেক্সিকো ওলিম্পিক কি জিমের এই সাধনার স্বীকৃতি না দিয়ে পারে? সেখানেও তাঁকে তুল্যমূল্য প্রতিযোগীদের সঙ্গে যুঝতে হবে। কেনিয়ার মাইল দৌড়বীর কিপ চোক কাইনো এই দৌড়ে একজন প্রবল প্রতিদ্বন্দ্বী। টোকিও ওলিম্পিকে তিনি বিশ্বের বিস্ময় সৃষ্টি করেছিলেন। বৃটেনের এলাম সিম্পসন, অস্ট্রেলিয়ার রণ ক্লার্কও কম কৃতিত্বের অধিকারী নন। তাঁদেরও এই প্রতিযোগিতার বাইরে ধরা চলে না। তাঁরা সকলেই এই বিশেষ দৌড়ের জন্যে সাধনা করছেন এবং প্রতিটি দেশও প্রস্তুতি নিচ্ছে।

সাম্প্রতিক কালে দৌড়ঝাঁপ ও সাঁতারে তারুণ্যের জয় সূচিত হয়েছে। বিশ বছরের নীচেই এই সাফল্যে আজ তারুণ্যের জয়গান ধ্বনিত হচ্ছে। এক মাইল দৌড়েই দেখা যায় রিম ছাড়াও অস্ট্রেলিয়ার আর ইলিয়ট বিশ বছর বয়সে জয়ী হয়েছিলেন। আমেরিকার গেরি লিণ্ডেন আঠারো বছর বয়সে টোকিও ওলিম্পিকে তিন মাইল দৌড়ে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করেন। গত বছর তিনি তিন মাইল বিজয়ী রণ ক্লার্কের চেয়ে মাত্র তিন দশমিক পাঁচ সেকেণ্ড সময় বেশি নিয়েছেন। বৃটিশ সট নিক্ষেপণকারীদের মধ্যে সপ্তদশ বর্ষীয় জিওফ কেপস যে শক্তির পরিচয় দিয়েছেন তাতে তাঁর সম্ভাবনাও সমুজ্জ্বল। ৫২ ফুট ১ ইঞ্চি নিক্ষেপ করে তিনি বৃটেনের ক্রীড়া-মহলে এই আশার সঞ্চার করেছেন যে, তাঁর পক্ষে এই মরশুমের মধ্যেই ৫৫ ফুট লক্ষ্যে পৌঁছান অসম্ভব কিছু নয়।

মেয়েদের মধ্যেও বৃটেনের বিংশবর্ষীয়া তরুণী লিণ্ডা ইয়োননোলেস উচ্চ লম্ফনে ৬ ফুট ডিঙিয়ে ওলিম্পিকের স্বর্ণপদক এনে দেবেন বলেও আশা করছেন অনেকে। যদিও গত বছরের শেষাশেষি তিনি সাড়ে পাঁচ ফুটেরও বেশী ডিঙোতে পারেন নি। তবু তাঁর কোচ এবং কর্তারা ওলিম্পিক জয়ের আশা রাখেন এবং সেইভাবেই লিণ্ডাকে তৈরী করা হচ্ছে। হয়ত এই আশার মূলে তার ষোল বছর বয়সের সাফল্যটাই বড় হয়ে দেখা দিয়েছে। কারণ ১৯৬২ সালে বেলগ্রেডে ইউরোপীয় প্রতিযোগিতায় লিণ্ডা পাঁচ ফুট আট পূর্ণ একের আট ইঞ্চি ডিঙিয়ে অশেষ কৃতিত্বের পরিচয় দিয়েছিলেন। সাঁতারেও বিশের উনো (কম) বছরগুলিতেই সাফল্যের জোয়ার। জাপান, অস্ট্রেলিয়া ও আমেরিকার সাঁতারু ছেলে-মেয়েরা প্রতি বছরই নতুন নতুন রেকর্ড করে চমক লাগাচ্ছে এবং তাদের বিশ্ব প্রতিযোগী হিসাবে তৈরী করবার জন্যে তাদের দেশে প্রশিক্ষণ থেকে নানারকম ব্যবস্থার কোন কার্পণ্যই নেই।

ওলিম্পিকের প্রস্তুতি হিসাবে তরুণ ও নতুন প্রতিভার সন্ধানে ও উৎসাহদানে আমেরিকায় সদ্য-সদ্য প্যান আমেরিকান প্রতিযোগিতা শুরু হল। আবার লস এঞ্জেলেস বিভিন্ন দেশের প্রতিযোগীদের ডেকে শক্তিপরীক্ষারও আয়োজন করা হচ্ছে। বৃটেনেও এ্যামেচার অ্যাথলেটিক এসোসিয়েশনের উদ্যোগে এমনিতর অনুষ্ঠানের ব্যবস্থা হয়েছে। জাপানে এই আগস্ট মাসে আন্তর্জাতিক বিশ্ববিদ্যালয় ক্রীড়া অনুষ্ঠান হতে চলেছে। ইতালী তার ফুটবল দলকে বিশেষ শিক্ষাগ্রহণের জন্যে ইংলণ্ডে পাঠিয়েছে। এইভাবে বিশ্বের বিভিন্ন দেশ ওলিম্পিকের জন্য প্রস্তুতি নিতে তৎপর হয়ে উঠেছে।

ভারতে এই ধরণের প্রস্তুতির কোন সংবাদই আমরা পাচ্ছি না। দেশের তরুণদের উপযুক্তভাবে আমরা ব্যবহার করতে পারছি না। যে সম্পদ আমাদের গৌরব বাড়াতে পারে তার প্রতি অবহেলা যেন আমাদের মজ্জাগত হয়ে দাঁড়িয়েছে।

অ্যাথলেটিকসে সবচেয়ে মজার কথা এই যে, এর বিষয়বৈচিত্র্য যেমন, তেমনি বিষয় অনুযায়ী অ্যাথলিটের বহুমুখী শক্তি ও সামর্থ্যের প্রয়োজন। প্রশিক্ষণ ও কৌশল শিক্ষা দিয়ে অ্যাথলিটের ব্যক্তিগত যোগ্যতা বাড়ান যায়, তার স্বাভাবিক প্রবণতাকে সহায়তা করা যায় এবং কুশলী কোচদের সেটাই হল প্রধান কাজ। আমাদের দেশেও প্রতিভার অভাব নেই। ক্রীড়ার প্রতি সহজ আকর্ষণ যেমন আছে, তেমনি তাতে তৈরী হবার প্রবৃত্তিও প্রতিটি তরুণের মধ্যে সঞ্চিত রয়েছে। যোগ্য ব্যক্তিটিকে খুঁজে বের করে তাকে গড়ে তোলার উপরে সাফল্য নির্ভরশীল। প্রতিটি দেশ সেই পথেই এগিয়ে গিয়ে নব নব ক্ষেত্রে সাফল্যের নিদর্শন রেখে যাচ্ছে। সেখানে ভারতের পশ্চাৎগামিতা অত্যন্ত বেদনাদায়ক। এ নিয়ে আলোচনা ও সমালোচনার শেষ নেই তবু আলস্য ও আত্মতুষ্টির জগদ্দল পাথর কিছুতেই সরান যাচ্ছে না। কয়েক বছর আগে পাতিয়ালায় ন্যাশন্যাল ইন্সটিটিউট অফ স্পোর্টস গঠিত হয়েছে এই মহৎ উদ্দেশ্য নিয়ে যে, এখান থেকে শিক্ষক তৈরী করা হবে যাঁরা বিভিন্ন ক্রীড়াক্ষেত্রে তরুণদের প্রশিক্ষণ দিয়ে প্রতিভাস্ফুরণে সহায়তা করবেন। তা থেকে দেশ কতটা উপকৃত হয়েছে আমরা এখনও তা জানতে পারি নি। ও দিকে গোয়ালিয়রে লক্ষ্মীবাঈ শারীর ও শিক্ষা কলেজ। শারীর শিক্ষার শিক্ষক গড়ে তোলা হয় এখানে। কিন্তু এই সীমিত আদর্শের মধ্যে আবদ্ধ না রেখে এই কলেজটিকেও বৃহত্তর উদ্দেশ্য নিয়ে পরিচালিত করতে পারলে বিভিন্ন ক্রীড়া বিষয়ে আমরা কোচের অভাব পূরণ করতে পারি কিন্তু সেই গঠনমূলক দৃষ্টিভঙ্গী ও আন্তরিক প্রচেষ্টা কোথায়?

আসল কাজের চেয়ে আমাদের দেশে বহিরঙ্গ ও জাঁকজমকপূর্ণ বানের প্রাধান্য পীড়াদায়ক হয়ে উঠেছে। ক্রীড়ামানের উন্নয়ন ও ক্রীড়াজগতে বিভিন্ন কার্যাবলী সুষ্ঠুভাবে পরিচালনার জন্য তৈরী করা হয়েছে ইণ্ডিয়ান ওলিম্পিক এসোসিয়েশন। তাকে পরামর্শ ও তদারকীর জন্য রয়েছে স্পোর্টস কাউন্সিল। এ ছাড়া ছোটখাট সংস্থারও অভাব নেই। কিন্তু এই সমস্ত সংস্থার কর্তব্য শুধু কর্মকর্তা নির্বাচন এবং লোকদেখান অনুষ্ঠানের মধ্যে পর্যবসিত। দেশের মর্যাদার কথা তাঁদের মনের মধ্যে স্থান পায় বলে মনে হয় না। বিভিন্ন সংস্থায় কর্তৃত্ব নিয়ে যে সভাসমিতি, যে দ্বন্দ্ব দেখা যায় তাতে দেশের স্বার্থের কথা অনেক তলায় চাপা পড়ে থাকে। শক্ত হাতে এই নীচতলা থেকে দেশের স্বার্থ ও দেশের মর্যাদাকে উপরে টেনে তুলে আন্তরিকতার আগুনে তাকে উত্তপ্ত করতে হবে, তবেই ভারত বিশ্বের ক্রীড়াক্ষেত্রে স্বীয় কৃতিত্বের গৌরব প্রতিষ্ঠায় সমর্থ হবে। এ কাজের দুটো দিকের প্রতি একসঙ্গে দৃষ্টি দেওয়া আবশ্যক। একদিকে ক্রীড়া-দপ্তরগুলির সুষ্ঠু সংগঠন ও যোগ্য পারচালনা, আর একদিকে সত্যিকার প্রতিভার সন্ধান ও তার বিকাশের সহায়তা দান।

যোগ্য প্রতিভার অনুসন্ধানে দৃষ্টিটি শুধু শহর অঞ্চলে সীমাবদ্ধ রাখলে চলবে না। যেমন চলেনি বিশ্বের আর কোথাও। পল্লী-প্রধান ভারতে পল্লীগ্রামগুলোতে অনুসন্ধান চালাতে হবে। শারীরিক সামর্থ্যের প্রতিযোগিতাসমূহের জন্য শক্তিধর লোকের সন্ধান করতে হবে। ভারতের বিভিন্ন উপজাতি, আদিবাসী ও পাহাড়িয়া জাতির মধ্যে কতকগুলি বিষয়ে সহজাত প্রতিভা দেখতে পাওয়া যায়—বর্শা ছোঁড়া, তীর-ধনুক ছোঁড়া, দূরপাল্লার দৌড় বা ভ্রমণে এদের স্বাভাবিক প্রবণতা আছে। ঘষে-মেজে তাঁদের বর্শা ছোঁড়া, হ্যামার থ্রো, সট্‌পুট্‌ বা ডিসকাস থ্রো প্রভৃতি বিষয়ের উপযোগী করে তৈরী করা সহজ। আবার দূরপাল্লা বা অল্পপাল্লার দৌড়, উচ্চ বা দীর্ঘ লম্ফনেও তাদের কৃতী এ্যাথলিট হবার যোগ্যতা রয়েছে বলেই মনে হয়।

ভারত রাষ্ট্রের কর্ণধাররা যদি এদিকে তৎপর হন এবং ক্রীড়া সংস্থাগুলিকে এদিকে অগ্রণী হবার জন্যে যদি নির্দেশ দেন তাহলে আমরা এমন বহু প্রতিভার সন্ধান পেতে পারি যারা বিশ্ব প্রতিযোগিতার ক্ষেত্রে ভারতের গৌরব ও মর্যাদা প্রতিষ্ঠিত করতে সক্ষম হবে।

ফুটবলের শ্রেষ্ঠাংশে

থঙ্গরাজ
(ইস্টবেঙ্গল)

অনেক চড়াই ডিঙিয়ে ডাকবাংলোয় যখন পৌঁছলাম রাত তখন আটটা। আলোয় আলোয় মালবার উপকূলবর্তী পশ্চিমঘাট পর্বতমালার কোলে ছোট্ট বাড়ীটি ঝলমল করছে, উৎসবের বন্যা বইছে যেন।

উৎসবের যোগ্য মুহূর্তই বটে। মাত্র ঘণ্টা কয়েক আগে কালিকট মিউনিসিপ্যাল স্টেডিয়ামে পঞ্চাশ হাজার লোকের সামনে সার্ভিসেস পুনরনুষ্ঠিত ফাইনালে বাঙলাকে এক গোলে হারিয়ে সর্বপ্রথম সন্তোষ ট্রফি পেয়েছে। বারান্দার মস্তবড়ো একটা টেবলে সে ট্রফি ঘিরে দাঁড়িয়ে রয়েছেন স্কোয়াড্রন লীডার কারমারকার, মেজর সিনহা, জনার্দন, এথিরাজ, মমতাজ, বিরথা সিং, শার্মান থাপা এবং সবার পেছনে সলজ্জভঙ্গিতে আর একজন—ইস্পাতকঠিন, দীর্ঘদেহী পিটার থঙ্গরাজ। বিজয়ী দলের সার্থক অধিনায়ক ভারতীয় জওয়ান থঙ্গরাজ। পানাহার চলছিল পুরোদমে। সঙ্গের অন্য বন্ধু-বান্ধবরা যে ভীড়ের মধ্যে কোথায় সটকে পড়লেন কে জানে। বহুক্ষণ বাদে দেখি বারান্দায় থঙ্গরাজ, রেফারী প্রভাতঅরুণ সোম, নটরাজন এবং আমি ছাড়া আর কেউ নেই। থঙ্গরাজকে সেই সুযোগে একেবারে কাছ থেকে দেখলাম—যে থঙ্গরাজ গত দুদিন ধরে বাঙলার সামনে এক দুর্লঙ্ঘ্য, দুরপনেয় বাধা গড়ে তুলেছিলেন। গোলের যেদিকেই সট সেদিকেই থঙ্গরাজের প্রসারিত দীর্ঘ-বাহু সেখানে।

পিটার থঙ্গরাজ ভারতীয় ফুটবলে বহু-বিশ্রুত, প্রতিষ্ঠিত নাম। তাঁর সিংহথাবাকে ফাঁকি দিয়ে গোল করা রীতিমত দুঃসাধ্য ব্যাপার। গোল যিনি করতে পারেন, তিনি সত্যিই বাহাদুর। ওপরের বল ধরা থঙ্গরাজের জুড়ি আজ ভারতে নেই, তবে গড়ানো সটে মাঝে-মাঝে তিনি ভেঙে পড়েন। হাত দিয়ে ছুঁড়ে বল মাঝমাঠে ফেলেন হরবখৎ, হাই সট প্রতিদ্বন্দ্বী গোলের সামনে গিয়ে পড়ে। সহযোগীরা তাই প্রায়ই বলেন—"থঙ্গরাজ দলের ষষ্ঠ ফরওয়ার্ড!"

কিন্তু তিনি যে একদিন ভারতের সেরা গোলরক্ষক হবেন একথা কেই বা ভেবেছিলেন? খেলতেন মাদ্রাজ রেজিমেণ্টাল সেণ্টারের সেণ্টার ফরওয়ার্ড। হঠাৎ একদিন খেলার মাঝপথে দলের গোলরক্ষক চোট খেয়ে মাঠ ছাড়লেন। গোলে কে খেলবেন তখন? সেনা দলের কোচ মেজর বিলিজি থঙ্গরাজকে পিছিয়ে নিয়ে গেলেন। অনভ্যস্ত জায়গায় চমৎকার খেললেন তিনি। খেলার শেষে মেজর বিলিজি এবং কর্ণেল রাজরত্নম থঙ্গরাজকে বললেন: "গোলেই প্র্যাকটিস করো, আর ফরওয়ার্ডে গিয়ে কাজ নেই।"

মানতেই হোল সে কথা, হাজার হোক কর্ণেল সাহেবের হুকুম। থঙ্গরাজ তখন মাদ্রাজ রেজিমেণ্টাল সেণ্টারের সঙ্গে সংযুক্ত। সেই যে এক নম্বর জামা গায়ে চাপলো—আর ছাড়লো না! এই সেনা দলে খেলার সময় থেকেই থঙ্গরাজের সর্বভারতীয় তথা আন্ত-র্জাতিক স্বীকৃতি এলো। সে স্বীকৃতি এখনও অব্যাহত। ভারতীয় ফুটবল দলে প্রথম নামটি থঙ্গরাজেরই। দলের বাকী দশজন খেলোয়াড়রা থঙ্গরাজ পেছনে থাকলে অনেকটা নিশ্চিন্ত।

১৯৩৫ সালের ২৪শে জানুয়ারী দক্ষিণ ভারতের হায়দরাবাদে থঙ্গরাজের জন্ম। বড়-ভাই রামস্বামীও হায়দরাবাদের নামকরা খেলোয়াড় ছিলেন একদিন। আশ্চর্য মানুষ এই রামস্বামী। হায়দরাবাদে অনুষ্ঠিত বিগত জাতীয় ফুটবল প্রতিযোগিতার সময়ে তাঁকে কাছ থেকে দেখেছি, সংস্পর্শে এসেছি। অনুষ্ঠানের মুখ্য ঘোষক ছিলেন তিনি। খেলার আগে প্রত্যেকদিনই সংশ্লিষ্ট দলের খেলেয়াড়দের নাম এবং পরিচিতি রাখা হোত দর্শকদের কাছে মাইকের মাধ্যমে। সবার কথাই বোলতেন। কোন্ খেলোয়াড় মারদেকা খেলেছেন, এশীয় ক্রীড়ায় যোগ দিয়েছেন, যোগ দিয়েছেন এশীয় কাপে বা বিশ্ব ওলিম্পিকে। বোলতেন না শুধু ছোট-ভাই থঙ্গরাজের কথা। লোকে জিজ্ঞেস করলে সবিনয়ে জানাতেন: "নিজের ছোটভাইয়ের ঢাক নিজেই পেটাবো?"

দীর্ঘ অনুশীলন ও অধ্যবসায়ের ফলে ১৯৫৫ সালে মাদ্রাজ রেজিমেণ্টাল সেণ্টারের পিটার থঙ্গরাজ সর্বভারতীয় স্বীকৃতি পেলেন। এই বছর চতুর্দলীয় ফুটবল উপলক্ষে ভারতের হয়ে খেলতে গেলেন ঢাকায়। ১৯৫৬ সালে মেলবোর্ন অলিম্পিকে থঙ্গরাজ ছিলেন ভারতের পহেলা নম্বর গোলরক্ষক। ১৯৫৭ সালে ভারতীয় দলের দূরপ্রাচ্য সফরেও বাদ গেলেন না। ১৯৫৮ সালে টোকিও এশীয় ক্রীড়া, ১৯৫৯ সালে প্রাক ওলিম্পিকে আফগানীস্থান ও ইন্দো-নেশিয়ার বিরুদ্ধে, এশীয় কাপ ও মারদেকা ফুটবলেও থঙ্গরাজ ছিলেন ভারতীয় রক্ষণ-ভাগের সবচেয়ে নির্ভরযোগ্য খেলোয়াড়। পরের বছর রোম বিশ্ব ওলিম্পিক। সেখানেও ভারতীয় গোলরক্ষক থঙ্গরাজ।

১৯৬১ সালে মারদেকা, ১৯৬২ সালে জাকার্তায় এশীয় ক্রীড়া, ১৯৬৩ সালে সিংহল ও ইরানের বিরুদ্ধে প্রাক-ওলিম্পিক, ১৯৬৪ সালে ইস্রাইলে এশীয় কাপ এবং ১৯৬৬ সালে ব্যাংককে এশীয় ক্রীড়ারও ভারতীয় দলে প্রথম নামটি ছিল এই থঙ্গরাজের। ১৯৬৬ সালে আই এফ এ একাদশের ব্রহ্ম সফরেও তাঁর ডাক পড়েছিল। ১৯৬৭ সালে থঙ্গরাজ এশীয় অলস্টার দলেও স্থান পেয়েছিলেন।

বাঙলায় এসে থঙ্গরাজ খেলেছেন ১৯৬১-৬২ সালে মহামেডান স্পোর্টিংয়ে, ১৯৬৩ ও ১৯৬৪ সালে মোহনবাগানে এবং ১৯৬৫ সাল থেকে ইস্টবেঙ্গলে। থঙ্গরাজ বর্তমানে চাকরী করেন রেলওয়ে ইলেকট্রি-ফিকেশনে। এখানে খেলার সূত্রে এ বছর তাঁরই ওপর দেওয়া হয়েছিল জাতীয় ফুটবলের আসরে রেল দলের নেতৃত্ব। এক-কালের সৈনিক থঙ্গরাজ সে দায়িত্ব সার্থক-ভাবেই বহন করেছেন। সাক্ষী তার হায়দরা-বাদ লালবাহাদুর স্টেডিয়ামের চল্লিশ হাজার মানুষ।

নঈম
(ইস্টবেঙ্গল)

রহিম সাহেব ঠিকই চিনেছিলেন, বুঝেছিলেন ছেলেটির মধ্যে প্রতিভা লুকিয়ে রয়েছে। ভারতবিশ্রুত পরলোকগত জনাব এস এ রহিমের অনুমান মিথ্যে হয়নি—নঈম আজ জাতীয় ফুটবলের শ্রেষ্ঠাংশে পেঁৗছে গেছেন। ভারতীয় দলে নঈমের আসন পাকা। কলকাতার মাঠে ইস্টবেঙ্গল ক্লাবের স্টপার তিনি, জাতীয় দলে রাইটব্যাক।

শান্ত মেজাজ, অসাধারণ পজিসন জ্ঞান, লম্বা সট্, ট্যাকলিং নৈপুণ্যে অন্ধ্রের সৈয়দ নঈমুদ্দিন এখন কলকাতায় তো বটেই, সারা ভারতের সেরা ব্যাক। ব্যাকের তিনটি জায়গাতেই কলকাতার মাঠে তিনি প্রায় দুর্ভেদ্য। অসাধারণ আত্মপ্রত্যয়, অনন্যসাধারণ দম নঈমের। বাংলা তথা ভারতীয় ফুটবলের আসরে নঈমের এখন বিরাট ছায়া। নঈম সর্বজনপ্রিয়, অজাতশত্রু। কলকাতায় প্রথম বছর খেলতে এসেই ভেটারেন্স ক্লাব তাঁকে স্বীকৃতি দিলেন মরসুমের (১৯৬৬) সেরা খেলোয়াড়। এ এক অসাধারণ গৌরব। খেলার মাঠে, মাঠের বাইরে নঈমকে কেউ কোনদিন জোরে কথা বলতে শুনেছেন বলে মনে হয় না। ফুটবল নিয়ে আছেন, ফুটবলই ধ্যানজ্ঞান, তারই সাধনা চলছে অতন্দ্রভাবে।

চব্বিশ বছরের লম্বা, চওড়া, সুদর্শন যুবক নঈম ফুটবল ঘরানারই মানুষ। বাবা সৈয়দ বসিরুদ্দিন সাহেব ছিলেন ব্যাঙ্গালোরের সুখ্যাত সেন্টার ফরওয়ার্ড। ছেলেবেলায় আব্বাজানের কাছে ফুটবলের কত গল্পই না শুনেছেন তিনি, এক-একটি রূপকথা যেন! কৈশোর পেরিয়ে যৌবনে পা দিতেই এনায়েতুল্লা খান কাছে ডেকে নিলেন। মাজাঘষা চললো, পরবর্তী পর্ব কাটলো রহিম সাহেবের স্নেহচ্ছায়ায়। নঈমের লেখাপড়া জামিস্থান, চাদ্দরমাঠ স্কুলে এবং ভি ভি কলেজে। বি-এ পর্যন্ত পড়েছেন কিন্তু ফুটবলের পরীক্ষায় ব্যস্ত থাকায় বিশ্ববিদ্যালয়ের পরীক্ষায় আর বসা হয়নি।

১৯৫৭ থেকে ১৯৫৯—এই তিন বছর নঈম যথাক্রমে কাঁচড়াপাড়া, দিল্লী এবং বোম্বাইয়ে জাতীয় স্কুল ক্রীড়ায় অন্ধ্রের প্রতিনিধিত্ব করেছেন। ১৯৬৫ সালে ওসমানিয়ার হয়ে খেলেছেন আন্তঃ বিশ্ববিদ্যালয় ফুটবলে। হায়দরাবাদে খেলতেন ইসলামিয়া ওল্ড বয়েজ ও হায়দরাবাদ আর্সেনেলে। নঈমের জাতীয় ফুটবলে প্রথম আবির্ভাব ১৯৬০ সালে অন্ধ্রের হয়ে। পরের বছর অন্ধ্র পুলিশের হয়ে ভারত সফরকারী রুশ ফুটবল দলের বিরুদ্ধে খেললেন নঈম। সেদিন ফুটবলের বড় আসরে সকলেরই দৃষ্টি আকর্ষণ করলেন তিনি। ১৯৬২ সালে জার্মান দলের বিরুদ্ধেও নঈমের ভূমিকা ছিল সমান উজ্জ্বল। ১৯৬৩ সালে পেনাংয়ে আয়োজিত এশীয় যুব ফুটবলে তিনি ভারতের নেতৃত্ব করেন। ১৯৬৪ সালে ইরানের বিরুদ্ধে প্রাক ওলিম্পিকে এবং ভারত সফরকারী রুশ দলের বিরুদ্ধে তিন-তিনটি টেস্ট ম্যাচেও ভারতের রাইটব্যাক ছিলেন নঈম। ইস্রাইলে আয়োজিত এশীয় কাপেও নঈমের ডাক পড়েছিল। পরবর্তী পর্বে ব্যাংককে পঞ্চম এশীয় ক্রীড়ায় তিনি ছিলেন জাতীয় দলের রাইটব্যাক। মারদেকা ফুটবল প্রতিযোগিতায় খেলেছেন এ পর্যন্ত দুবার।

নঈম যখন খ্যাতির শিখরে তখন এলেন কলকাতায় ইস্টবেঙ্গলের হয়ে খেলতে, ১৯৬৬ সালে। আবির্ভাবের সঙ্গে সঙ্গেই বিপুল সম্বর্ধনা। অল্প কদিনেই বাংলাকে ভালবেসে ফেলেছেন নঈম, বাংলা বোঝেন মোটামুটি, একটু একটু বলতেও পারেন। শেখায় আগ্রহও প্রচুর। এ বছর গোড়ার দিকে হায়দরাবাদে জাতীয় ফুটবলের আসরে বাংলার স্টপার নঈমের বাংলা এবং বাঙালী প্রীতির নজীর পেয়েছি পদে পদে। বাংলার সুখে সুখী, বাংলার দুঃখে সমান দুঃখী নঈম।

সুকুমার সমাজপতি

(মোহনবাগান)

"আমাদের কালীঘাটের বাড়ীর বৈঠকখানায় সকাল-সন্ধ্যায় জমজমাট আড্ডা বসতো। সেই আড্ডায় শুধু ফুটবল নিয়েই আলোচনা, কলরব। বাবা, কাকা, পাড়া-পড়সী সবাই যখন ফুটবল নিয়ে মাততেন, ঘড়ির কাঁটার দিকে নজর থাকত না। গুটি গুটি আমিও সেখানে মাঝে-মাঝে বাবার জারি করা ১৪৪ ধারা অমান্য করে এক কোণে হাজির হতাম, গোগ্রাসে গিলতাম সে কথা। শুনতাম আর ভাবতাম—ইস্, আমিও যদি বড় হয়ে মস্তবড় খেলোয়াড় হতে পারি! মাঝে মাঝে ঘুম হোত না রাত্তিরে, শুধু চিন্তা কি করে কলকাতার মাঠে বড় খেলোয়াড় হওয়া যায়।"

স্টেট ব্যাংকের কলকাতার পার্ক স্ট্রীট অঞ্চলের অফিসে বসে ষ্টাফ-অফিসার সুকুমার সমাজপতি নিজের শৈশবের কথা বলছিলেন। সুকুমার বাংলা তথা ভারতীয় ফুটবল মহলে একটি উজ্জ্বল নাম। সবাই ডাকেন "সমাজ" বলে। সুকুমারের বাবা কালীপদবাবু ছিলেন সেকালের ময়দানে নাম-করা খেলোয়াড়। জন, যোশেফ এবং আপ্পা-রাওয়ের সঙ্গে একই সময়ে কালীঘাটে খেলতেন তিনি। পিতার যোগ্য সন্তান সুকুমার। ফুটবল জীবনের উজ্জ্বল মুহূর্তে সুকুমারের ছিল হরিণের মত ক্ষিপ্রগতি, পায়ে ছিল দুরন্ত সট্। সেন্টার করতেন নিখুঁত, বোলে বোলে প্রতিপক্ষের আগলানো ব্যূহ ভাঙ্গতেন। এই নৈপুণ্যের সূত্রেই সর্বভারতীয় ফুটবল আসরে সুকুমারের পরিচিতি।

সুকুমার সমাজপতির আদি বাড়ী পূর্ববঙ্গের ফরিদপুর জেলার কোটালী-পাড়ার পশ্চিমপাড়ে। জন্ম ১৯৪১ সালের ৩রা জুলাই পাটনার মামাবাড়ীতে। দীর্ঘ ৭৫ বছর ধরে সমাজপতি পরিবার কলকাতার বাসিন্দা। কালীঘাট থেকে এখন নতুন বাড়ী করে উঠে গেছেন গড়িয়ায়। সুকুমারের লেখাপড়া সুরু হয় সাউথ সুবার্বন (মেন) স্কুলে এবং পরবর্তী পর্বে আশুতোষ ও ল' কলেজে। আই এস-সির পর আশুতোষ কলেজ থেকেই সসম্মানে বি-এ পাশ করেছেন তিনি। ফুটবল সুরু করেন কালীঘাট পারাপিচুয়াল ক্লাবে (পারাপিচুয়াল সেবার (১৯৫৩) কম করে ২৭টি জুনিয়র প্রতিযোগিতায় বিজয়ীর সম্মান লাভ করেছিল)। ১৯৫৫ সালে বাবা-কাকার হাত ধরে ময়দানে এলেন তৃতীয় ডিভিসন লীগে ইয়ংবেঙ্গলের হয়ে খেলতে। ১৯৫৭ সালে ইয়ংবেঙ্গল চ্যাম্পিয়ন হোল। পরের বছরও ইয়ংবেঙ্গলেই খেললেন। ১৯৫৯ সালে এরিয়ান ডেকে নিয়ে গেল। খ্যাতি হোল ময়দানে। সেখান থেকে এক বছরের জন্য মোহনবাগানে। তারপর ১৯৬১ সাল থেকে ১৯৬৬ সাল পর্যন্ত একটানা ইস্টবেঙ্গলে। ১৯৬৪ ও ১৯৬৫ সালে ইস্টবেঙ্গলের অধিনায়ক ছিলেন সুকুমার। ১৯৫৭ থেকে ১৯৬৩ সাল পর্যন্ত আন্তঃ কলেজ লীগ, হেরম্ব মৈত্র শীল্ড, ইলিয়ট শীল্ড এবং আন্তঃ বিশ্ববিদ্যালয় ফুটবলে সুনামের সঙ্গে খেলেছেন তিনি। ১৯৫৯ (রাণার্স আপ), ১৯৬০ (চ্যাম্পিয়ন), ১৯৬২, ১৯৬৩ (চ্যাম্পিয়ন) সালে আন্তঃ বিশ্ববিদ্যালয় ফুটবলে কলকাতার প্রতিনিধিত্ব করেন। ১৯৬২ এবং ১৯৬৩ সালে তিনি বিশ্ববিদ্যালয় দলের অধিনায়ক ছিলেন। জাতীয় ফুটবলে প্রথম আবির্ভাব ১৯৬০ সালে, কালিকটে। তারপর ১৯৬১ (বোম্বাই), ১৯৬৩ (মাদ্রাজ, ও ১৯৬৪ (গৌহাটি) সালেও প্রতিনিধিত্বে ছেদ পড়েনি। গৌহাটির আসরে যেবার বাংলা ফাইনালে হেরে গেল সুকুমার সেবার রাজ্য দলের নেতৃত্ব করেছিলেন।

সুকুমার সমাজপতি ভারতের প্রতিনিধিত্ব করেছেন ১৯৬১ সালে মারদেকায়, ১৯৬৩ সালে সিংহলের বিরুদ্ধে, ১৯৬৪ সালে ইরানের বিরুদ্ধে প্রাক-ওলিম্পিকের খেলায় এবং ইস্রাইলে এশীয় কাপে। স্বদেশে ১৯৬২ সালে জার্মানীর স্টুটগার্ডের বিরুদ্ধে, ১৯৪৬ সালে তাতাবানিয়ার বিরুদ্ধে এবং ১৯৬৫ চেক দলের বিরুদ্ধে খেলেছেন সমাজপতি। প্রথম ও শেষবার আই এফ-এর হয়ে এবং ১৯৬৪ সালে ইস্ট বেঙ্গলের পক্ষে।

একমাত্র ফুটবল গুণেই গুণী নন সুকুমার, সুকুমার ভাল গাইয়েও। অনেক ক্লান্ত সন্ধ্যায় সুকুমারের ভরাট গলায় অনেক গান শুনেছি। সে গানের ভেতর সব চেয়ে ভাল লেগেছে তাঁর উদাস কণ্ঠে গাওয়া "আমার সাধ না মিটিল, আশা না পুরিল।

—বিপুল বন্দ্যোপাধ্যায়

।। বাইশ ।।

এর সব রাগটা গিয়ে পড়ল রঞ্জনেরই ওপর।

ঘুরে বেড়ানোর সময় সন্দীপ আর ও এক গাড়িতে তো রয়েছেই, গাড়ি-ছাড়া হয়েও যে সময়টা তাতেও টেনেটেনে রেখেছে ওকে। সর্বদাই সে জপাচ্ছে নিজের দল বাড়াবার জন্য (নিজে আইবুড়ো, এ সন্দেহটা আছেই রঙ্গময়ীর)—এখন হয়তো নাও হতে পারে, তবে যখনই দেখ, দুজন একসঙ্গে, নয় ঘুরে বেড়াচ্ছে, না হয় আকাশের দিকে চেয়ে কোথাও বসে আছে।

মনের বিরক্তিটুকু এক সময় প্রকাশ হয়েও পড়ল সুরবালার কাছে। ও'র পর সুরবালার দৃষ্টিই বেশি সন্ধানী। এমন একটা জায়গায় রঞ্জন যে ও'র ছেলের ওপর বেশি ভর করবে এ সন্দেহটা আছেই, একবার ওরা দুজনে বাগানের এক জায়গায় ঘাসের ওপরই বসে আকাশের দিকে চেয়ে আছে চুপ করে, উনি একটু আড়ালে ডেকে নিয়ে গিয়ে দেখিয়ে বললেন—"ঐ দ্যাখো ঠানদি, জানি এমন জায়গায় ও সন্দুকে আরও বেশি করে পেয়ে বসবেই।"

দেখে দেখে ঠোঁট দুটি ধীরে ধীরে একটু কুঞ্চিত হয়ে এল রঙ্গময়ীর, বললেন—সত্যিই পেয়ে বসা বাপু! একটা কিছু করা দরকার হয়ে পড়েছে যেন, সামনে অমাবস্যাটা আসছে, মনে করিয়ে দিবি।"

—তুক-তাকের ভালো দিন।

সেইদিনই আর একবার আড়াল থেকে খা গেল রঞ্জনকে। এবার অন্য এক দৃশ্য-পর্বে, সম্পূর্ণ অপ্রত্যাশিত অন্য একজনের সঙ্গে। এবার দেখালেনও সুরবালা নয়, হেমাঙ্গিনী।

যে উদ্দেশ্য নিয়ে রঙ্গময়ীর আজকের অভিযানের রচনা, তার সঙ্গে হেমাঙ্গিনীরও মনের খানিকটা যোগ আছে; কিন্তু রঙ্গময়ী আর সুরবালার সতর্ক দৃষ্টি যখন সন্দীপ-আর্দ্রাকে অনুসরণ করে ফিরছে, হেমাঙ্গিনীর দৃষ্টি তখন অন্য একজনে নিবন্ধ; কমলা। যখন দেখছেন সামনে, তখন যেমন স্মৃতির আলোড়নে ভ্রূকুটি কুঞ্চিত হয়ে উঠেছে, যখন উনি সামনে নেই তখন স্মৃতির অতলেই সাঁতার দিয়ে ফেরা—কোথায় যেন দেখা—কার সঙ্গে যেন—কি পরিবেশে। মনটা আরও জিজ্ঞাসু হয়ে উঠেছে এই জন্য যে কমলার ভাবটাও আজ অন্যরকম বেশ খানিকটা। হেমাঙ্গিনী "করুণাময়ী হোম"-এ আরও একবার গেছেন রঙ্গময়ীর সঙ্গে, কমলার সম্বন্ধে প্রথম দিনই যে কৌতূহলটা জেগেছিল সেটা আরও সজাগ হয়ে উঠেছে। দেখেছেন, একটি বিষণ্ণতার ছায়া ঘিরে থাকলেও কমলা কৌতুকময়ীই, হাস্যময়ীই। মেসের আর সবার মতো অতটা নয় অবশ্য, বয়স এবং আসন খানিকটা প্রভেদ এনে দেয়ই, তবু, শুধু অতগুলি মেয়ে নিয়ে মেসের যে একটা লঘু চপল আবহাওয়া তার মধ্যে মোটেই বেমানান নয়। অন্তত অনভিজ্ঞ চোখে ধরা পড়বার মতো নয়।

আজ বেশ খানিকটা অন্যরকম। বেশ বিষণ্ণ, খানিকটা সন্ত্রস্তও। মেসে যেটা ছিল, স্বভাবে সহজ, আজ যেন ধরা পড়বার ভয়েই সে-ভাবটাকে ধরে থাকবার জন্য একটা সুকঠিন প্রয়াস করতে হচ্ছে কমলাকে সর্বক্ষণ; এ-উদ্যমে যেন ক্লান্ত অবসন্ন হয়েই মাঝে মাঝে কোথাও চুপটি করে রয়েছেন বসে। অবশ্য সতর্ক বলেই হেমাঙ্গিনীর চোখে পড়েছে ধরা। আর সবাই আছে নিজেদের নিয়ে ব্যস্ত; যা অভিনব, স্থূল, রঙে-আলোয় সুস্পষ্ট তাতেই লিপ্ত সবার মন; এর মধ্যে কোথায় কিসের একটা অতি সূক্ষ্ম আঁচড় পড়ছে সেদিকে একেবারেই কোনও খেয়াল নেই।

পিকনিক না হলেও, বিকালে সবার পিকনিকের জায়গাটা ঘুরে আসবার প্রোগ্রাম ছিল। শহর থেকে খানিকটা দক্ষিণে গিয়ে নদীটা ডাইনে ঘুরে অনেকটা ভেতরের দিকে চলে গেছে। একটা চড়া-ই, তবে অনেক পুরনো, এখন স্থায়ী ডাঙাই হয়ে গেছে। সরকারী সড়ক থেকে অনেকটা নীচুতে, একটা কাঁচা রাস্তা নেমে গেছে। সেটা ধরে গেলে প্রায় মাইল দুই পরে পুরনো লাইট-হাউস। এরপর রাস্তাটা ঘুরে গ্রামাঞ্চলে গেছে চলে।

সম্প্রতি যদিও আস্তে আস্তে শহরের ছোঁয়াচ লাগছে, তবু মুক্ত বন্য-প্রকৃতিটা একেবারে নষ্ট হয়ে যায়নি। বেশ খানিকটা গেলে তীরভূমি, বালুচর, বনঝাউ আর নানারকম লতাগুল্মে আদিম রূপটা ধরে রেখেছে, সামনেই দিগন্ত-বিস্তৃত গঙ্গা।

এখানে আসার সঙ্গে সঙ্গেই জল-স্থল-আকাশের বিরাট মুক্তির মধ্যে সবার পায়ের জড়তা গেল ঘুচে, মনের সব বন্ধন গেল খুলে। প্রথমটা চলল ফাগখেলা, রাস্তা থেকে বেশ খানিকটা দূরে একেবারে নদীর ধারে গিয়ে। ফাগ দেওয়া-দেওয়িটি এখানেই

অনেকটা নিরুচ্ছ্বাস, মেসে আরও সংযত-ভাবেই সেরে নিত সবাই, এখানে খানিকটা দুরন্তই হয়ে উঠল, শুধু ফাগ বুলিয়ে দেওয়াই নয়, ছোড়াছুড়িও। দোল সত্যিই দোলা লাগিয়েছে মনে। নদীর তীর হয়ে উঠল কলহাস্যে মুখর, আকাশ রঙের কুয়াশায় লাল হয়ে উঠল।

বেশ কিছুক্ষণ ধরে। এই অভিযান-টুকুতে অন্য সব অফিসারদের বাড়ি থেকে আরও দু'খানা মোটরে করে আরও কিছু মেয়ে জুটে দলটি বেশ পুষ্ট হয়েছে, সব মিলিয়ে জনা বাইশ; ফাগ খেলা সাঙ্গ হলে সবাই ছড়িয়ে পড়ল সমস্ত জায়গাটায়। যার যেদিকে খুশি। দু'জনে, তিনজনে, চারজনে। নূতন সখ্য হয়েছে, সঙ্গিনী বেছে নিয়ে ছড়িয়ে পড়ল সবাই। ফাগের রঙে, বিচিত্র শাড়ির রঙে তীরভূমিটুকুকে যেন যাদুকাটি বুলিয়ে একটা পুষ্পিত কাননে রূপান্তরিত করে দিল। নীরব নয়, কূজিত কানন; সেই কলহাস্যটা টুকরা-টুকরা কলতান হয়ে চারিদিকে পড়েছে ছড়িয়ে।

অবশ্য, যা বয়স আর পদমর্যাদার জন্য স্বাভাবিক, রঙ্গময়ী আর হেমাঙ্গিনী রইলেন খানিকটা একান্তেই। রঙ্গময়ীকে নিয়ে ওরা খানিকটা হুড়াহুড়ি করলই, ফাগ নিয়ে লাগালই, তারপর এ পালা শেষ হলে ওঁরা দু'জনেও আলাদা হয়ে পড়লেন। ওঁদের পরের দলটি হোল পাঁচজন সমবয়সীদের নিয়ে,—সুরবালা, অপর্ণা, রেবা আর কাছারির দু'জন জুনিয়ার অফিসারের গৃহিণী।

নীচের হোলি শান্ত হয়ে এলে ওপরের হোলি গেল শুরু হয়ে। দু'দিন আগে বৃষ্টি হয়ে গেছে, আকাশের গায়ে মেঘের টুকরা লেগেছিল এখানে-ওখানে, সূর্য পশ্চিম দিগন্তে নেমে এলে সেগুলো অজস্র রঙে উঠল রেঙে। এই সময় সাগর থেকে দক্ষিণে হাওয়াটা জোর হয়ে ওঠে। নদীর ঢেউগুলো হঠাৎ দ্বিগুণ—চতুর্গুণ হয়ে গোলা রং গায়ে মেখে উচ্ছল কলতানের সঙ্গে এ-ওর ঘাড়ে লুটিয়ে সমস্ত জায়গাটাকে মুখর করে তুলল।

রঙ্গময়ী আর হেমাঙ্গিনী চলেছিলেন একটা দিক ধরে গল্প করতে করতে। প্রধানত সন্দীপের কথা নিয়েই; ওঁদের সেই সমস্যা। আজ কমলা পর্যন্ত সম্পূর্ণ মুক্ত থাকতে পারেন নি। নিজের ইচ্ছা না থাক, সবার টানে অনিচ্ছাটাকে খানিকটা নিতেই হয়েছে মানিয়ে। নায়ক না হলেও জোড়ে শুধু রঞ্জন আর সন্দীপ। অবশ্য অল্পগুলি মেয়ের মধ্যে দুটি মাত্র পুরুষ—অনন্ত আসেন নি—ওদের নিয়ে মাতনে নামত না কেউই। হন্দ কপালে একটু ফাগ ছুঁয়ে দিয়েই নিরস্ত হোত, খেলার চেয়ে সৌজন্য হিসাবেই, কিন্তু ওরা দূরে দূরেই রয়ে গেল। রঞ্জন ঘেঁষবে না জানাই, ও যা চায় না তার সঙ্গে কোন কালেই রফা করতে পারে না। তবে সন্দীপকে একটু পাবেন আশা ছিল রঙ্গময়ীর, ইচ্ছা ছিল একবার দেখা,—আর সবার সঙ্গে আদ্রা এসে ওর কপালে ফাগ বুলিয়ে দিচ্ছে। আশা ছিল জেনে নিতে পারবেন দু'জনের মন। অব্যক্তের আড়ালে যেটুকু ব্যক্ত তাকে চিনে নেওয়ার ক্ষমতা আছে ওঁর।

একটা দুর্লভ সুযোগ নষ্টই হয়ে গেল।

কোথায় গেল সন্দীপটা? রঞ্জন তবু বার দুইতিন নজরে পড়েছে, দূরে দূরে, সন্দীপ যেন বাতাসে মিলিয়ে গেল।

তমালকে লাগিয়ে রেখেছিলাম। খোঁজ পেলে যেন জানায়। ওঁরা গল্প করতে করতে এগিয়ে যাচ্ছেন, হঠাৎ পেছনে তমালের চাপা আওয়াজ—"ওগো, শীগ্গির ওদিকটায় চলো তোমরা, পেয়েছি!"

জোর কথা আরও জোরদার করবার জন্য কোমরে আঁচলটা জড়ানোই থাকে সবক্ষণ একটু ঝুঁকেও পড়েছে সামনে।

চমকেই উঠলেন দু'জনে, রঙ্গময়ী প্রশ্ন করলেন—"কি পেয়েছিস লো?"

"তুমি যা বলেছিলে—সন্দুদা! —খুঁজে, খুঁজে, খুঁজে একেবারে সেইখানে! —পাড় ভেঙে নেমে গেছে, তার আড়ালে—একেবারে দেখবার উপায় নেই! —নোটবই আর কলম হাতে করে আকাশের দিকে চেয়ে—উস্! কি ভয়ঙ্কর কবি মানুষ! —দেখবে চলো একবারটি!..."

'যা যাঃ, তুই দেখ গে যা! কবি! পোড়া-কপাল!" —ধমক দিয়ে থামিয়ে দিলেন রঙ্গময়ী বিরক্তিতে নাকমুখ কুঞ্চিত করে। বোধহয় এতক্ষণ ফাঁক পাচ্ছিলেন না, বা উপযুক্ত বাক্যই জোগাচ্ছিল না।

এরপর খানিকটা নীরবেই এগিয়ে চললেন দু'জনে। একসময় রঙ্গময়ীই একটু দাঁড়িয়ে পড়ে বললেন—"এবার না হয় ফিরবি? আর বালি ঠেলে চলতে পারছি না।"

সামনে গঙ্গার তীর ঘেঁষে একটা বেশ ঘন ঝোপ, বনঝাউ আর কী একটা লতায় মিলে, লতাটা বড় বড় সাদা ফুলে বোঝাই হয়ে রয়েছে। এইটেই লক্ষ্য করে যাচ্ছিলেন ওঁরা, হেমাঙ্গিনী বললেন—"আর এইটুকু যাবে না? কলকাতায় তো এলব......"

"তুই যা বাছা।" বিরক্তির খানিকটা কণ্ঠে লেগেই রয়েছে। বললেন—"তুই তো আবার কাঁথর পিসিই। আমি বরং ততক্ষণ এইখানে একটু বসি। খোঁড়া পা আর টেনে নিয়ে যেতে পারি না বালির ওপর দিয়ে।"

পাশেই একটা বালির অল্প উঁচু ঢিলার ওপর বসে পড়লেন। "আমি এই এক্ষুনি এলুম ঠানদি"—বলে এগিয়ে গেলেন হেমাঙ্গিনী।

শ' দুয়েক গজ দূরে। একেবারে নির্জন জায়গা। উঁচু তীরভূমির নীচেই একটা বেশ বড় চড়া সামনে অর্ধচন্দ্রাকারে নেমে গেছে বলে ঢেউয়ের আওয়াজও ক্ষীণ। খুবই মনোরম জায়গাটি, সন্ধ্যা নেমে আসছে, তবু আর একটু, আর একটু করে মনকে যেন ঠেলতে ঠেলতেই এগিয়ে গেলেন। তারপর একেবারে কাছাকাছি গিয়ে সমস্ত শরীরের রক্ত যেন হিম হয়ে গেল হেমাঙ্গিনীর। ঝোপের ওদিকে, খুব মিহি মেয়েলী গলায় একটানা একটা কান্না। যেন ভূতের ভয়েই পা দু'টো অসাড় হয়ে গিয়ে কি করবেন ভেবে পাচ্ছেন না, এমন সময় কানে গেল—"চুপ করো কমল, চুপ করো। কেন, এই বা মন্দ কি? থাকি না দু'জনে এইভাবেই এ-জন্মটা।"

রঞ্জনেরই গলা, কোন সন্দেহই নেই হেমাঙ্গিনীর। তারপর খুব সন্তর্পণে ঝোপের একটুখানি দু'হাত দিয়ে চিরে দেখলেনও। ওরা দু'জনেই গঙ্গার দিকে মুখ করে পাশাপাশিই বসে রয়েছে।

॥ তেইশ ॥

এইটুকু হেঁটে আসতেই কয়েক ক্রোশ হাঁটার অবসাদে দেহমন ছেয়ে গেল হেমাঙ্গিনীর। রঙ্গময়ী বললেন—"গেছে তো পা আরও ধরে? যা গোঁয়ার্তুমি করে, ওদিকটা যে আরও বালি। বোস্, জিরিয়ে নে একটু।"

বসতেই যাচ্ছিলেন হেমাঙ্গিনী, তারপর খেয়াল হোল ওরাও এবার আসবে বেরিয়ে, সন্ধ্যা নেমে আসছে; অপ্রতিভই হয়ে পড়বে সামনা-সামনি হয়ে গিয়ে। বললেন—"না, ঠানদি, বসলে আর উঠতে পারব না, তারচেয়ে এক ঝোঁকে বেরিয়ে যাই চলো। ওঠো তুমিও।"

সেদিন আর একান্তে পাওয়ার উপায় ছিল না রঙ্গময়ীকে। তারপরও ক'টা দিন কেটে গেল; আদৌ ওঁর কানে কথাটা তোলা ঠিক হবে কিনা বুঝে উঠতে পারছেন না। তারপর বলতে চাওয়া না-চাওয়ার প্রশ্নই রইল না আর। রঙ্গময়ীকে বলে একটা পরামর্শ করা অত্যাবশ্যকই হয়ে পড়ল একরকম।

স্বভাবতই এখন সন্দীপকে ছেড়ে হেমাঙ্গিনীর সেই সন্ধানী দৃষ্টিটা গিয়ে পড়েছে রঞ্জনের ওপর। রঞ্জনের বিবাহ না করার ব্যাপারটা একটা পারিবারিক সমস্যা অনেকদিন থেকেই, তার চাবিকাঠিটা হাতে এসেছে, কিন্তু কিভাবে ব্যবহার করবেন বুঝতে পারছেন না। অমন যে খেয়ালী ছেলে, নিজের আইডিয়াগুলো নিয়ে বেপরোয়াভাবে কাটিয়ে দিচ্ছে, ডায়মণ্ডহারবার থেকে আসবার পর একেবারে নিঝুম মেরে গেছে। এ থেকে এইটেই মনে হয়, ওরা

র নিজের অদৃষ্টকে মেনে নিয়ে এতদিন কাছাকাছি থেকেও পরস্পরকে দূরে গেছে। তারপর একরকম দৈবযোগেই মণ্ডহারবারে একেবারে এত কাছাকাছি, একটি উৎসব উপলক্ষ্যে, এমন মুগ্ধ বেশে, আর সংযম রাখতে পারেনি দের।

আবার হয়ে যেতেও পারে তো ঠিক, াঙ্গিনী ভাবেন। রঙ্গময়ীকে বলার প্রশ্ন এক-পা এগোন তো দু'পা পেছিয়ে সন। এই করেই সাত-আট দিন কেটেও । তারপর যখন মনে হোল অনেকটা লেছে রঞ্জন, সে ভাবটা আসছে আস্তে স্ত কেটে, সেই সময় একদিন রঙ্গময়ী াতে এসে বললেন—"একবার 'হোম'-এ নাৎবৌ, সরো যাবে? কমলার শরীরটা ক ক'দিন থেকে খারাপ যাচ্ছে।"

"কমলার!" একেবারে আঁৎকে উঠলেন াঙ্গিনী, প্রশ্ন করলেন—"কেন? কি ছে? কবে থেকে বল তো?......"

"তুই যে একেবারে ওরকম করে ল?"—একটু বিস্মিত হয়েই চাইলেন ময়ী, তবে লঘুভাবেই নিলেন, ও'র মনে াক্রিয়াটা অন্যভাবে হয়েছে। সমবেদনার ট নরম হয়ে কণ্ঠস্বরও একটু নেমে ছে, বললেন—"তা সত্যিই ঐ রকম র শুনলে, বড্ড ভালো মেয়ে; এক একজন ন হয় না—দেখলেই মন টেনে নেয়?... তেমন কিছু নয়। সেদিন খানিকটা াল গেল না? ওর পক্ষে ধকোলই বলতে বৈকি, থাকে না তো এসবে—তাইতেই অসুখে পড়ে যায়। আমি শুনে তরশু য়েছিলাম। তখন ভালোই অনেকটা— নিয়েছিল, কাল ইস্কুলে যাওয়ার কথা— লাম একবার দেখে আসি...সুরো বাড়ি ?..."

ওপরে হলঘরে একটা শোফায় বসে যাচ্ছেন, পাশের ঘরেই হেমাঙ্গিনী য়ার জন্য প্রস্তুত হচ্ছিলেন, বললেন— সে আর মেজবৌ ছেলেদের সঙ্গে নমা দেখতে গেছে।"

—বলতে বলতেই বেরিয়ে এলেন। ও'কে সিঁড়ি দিয়ে নামতে নামতে বললেন— মিও ক'দিন থেকে যাব যাব ভাবছি। করছিলাম বলে পাঠাব তোমায়।..."

রঙ্গময়ী গাড়ি নিয়ে এসেছেন, গিয়ে লন দুজনে।

বিকেল হয়ে গিয়েছিল, মেসের সবাই গেছে। নীচে আর্দ্রার সঙ্গে দেখা হতে াঙ্গিনীই আগে প্রশ্ন করলেন—"তোমাদের াদি কেমন আছেন আজ? এসেছেন ল থেকে?"

"ভালোই আছেন। আসুন। হ্যাঁ, ইস্কুল ক আজ দু' পিরিয়ড আগেই এসেছেন।"

"আগে কেন?"—দুজনেই প্রশ্ন করলেন ড়ি দিয়ে উঠতে উঠতে। ততক্ষণে আর র সঙ্গে কমলা বারান্দায় বেরিয়ে ছেন। বললেন—"আসুন ঠানদিদি!...... নিও এসেছেন! কী সৌভাগ্য!"

হয়তো হেমাঙ্গিনীর চোখের ভুল, সেদিনকার অভিজ্ঞতার জন্যই, ও'র মনে হোল ও'র দিকে চেয়ে একটু হেসে কথাটুকু বলতে একটা অদ্ভুত দীপ্তি ফুটে উঠল কমলার চোখ দুটিতে। খুব একজন আপনজনকে অপ্রত্যাশিতভাবে দেখলে যেমন হয়। আরও ঠিকভাবে বলতে গেলে, একটা হঠাৎ-উল্লাস উল্লসিতভাবে প্রকাশ না পেয়ে শুধু চোখ দিয়ে ঠিকরে পড়লে যেমন হয়।

বললেন—"হ্যাঁ ভাই, এলাম দেখতে। শুনলাম অসুখে পড়ে গিয়েছিলে ওখান থেকে এসে। আছ কেমন এখন?"

"দেখছেনই তো বেশ আছি। দু'দিন থেকে ইস্কুলেও যাচ্ছি।" সেইভাবে একটু হেসেই দিলেন উত্তর। ভেতরে এসে পড়েছেন সবাই, রঙ্গময়ী বসতে বসতে একটু ধমকের টোনেই বললেন—"আজ শুনলাম সকাল-সকাল ছুটি নিয়ে এসেছিস। না, আদিখ্যাতা নয়। দু'দিন ছুটি নে, পরশু রবিবার আছে, তিনদিন হবে, সামলে যাবি।"

"তা তো গেলাম, কিন্তু করব কি একলা মেসে পড়ে থেকে?" —সেইরকম হেসেই প্রশ্ন করলেন কমলা।

"করবি আবার কি—কাহিল শরীর। ...বেশ তো, না ভালো লাগে আমার ওখানে চলে আসবি। না হয় হেমাদের বাড়ি, কখনও তো যাসনিও..."

শোনার সঙ্গে সঙ্গেই হেমাঙ্গিনীর দৃষ্টিটা আপনিই গিয়ে পড়ল কমলার মুখের ওপর; অমন হাসি-হাসি মুখের সমস্ত আলো কে যেন এক ফুৎকারে নিভিয়ে দিলে। অত সপ্রতিভ, উপস্থিত-বুদ্ধি মেয়ে, সেকেন্ড কয়েক একেবারেই কোন কথা জোগাল না। তারপর ভেতরটা যাতে প্রকাশ না পেয়ে যায় তার জন্য যেন প্রাণপণ চেষ্টা করে বের করলেন দুটো কথা, একটু হাসির চেষ্টা করেই বললেন—"যাব যে, দিদিই বা কবে এলেন?......এতদিন রয়েছি সবাই......"

এর উত্তরটা আরও ঢের সহজ, অন্তত সৌজন্য হিসাবেও দরকার ছিল, অর্থাৎ আসুক না কমলা এবার, হেমাঙ্গিনী এসেছেন, আর তো পথ খুলেছে। কিন্তু হাজার চেষ্টা করেও মুখ দিয়ে বের করতে পারলেন না হেমাঙ্গিনী।

উনি যেন বাঁচলেন, চেষ্টার মধ্যেই যখন পতিতপাবন এসে বলল—"চা হয়ে গেছে। কিছু খাবারও তোয়ের করতে হবে, থাকগে, কাজ নেই?"

ওর ঐরকম অপ্রস্তুতে ফেলা কথা; রাগও ধরে, আবার হাসিও পায়। চাপা হাসিতে সবাই মুখ গোঁজ করে নিয়েছে, রঙ্গময়ী বললেন—"ঠিকই বলেছে তো। ...না, তুই শুধু চা নিয়ে আয়।"

কমলা কি বলতে যাচ্ছিলেন, তার আগে আর্দ্রাই বলে উঠল—"না, না, সে কি! আমি না তোদের খাবার করতে বলে দিয়ে এলাম!"

"ওটা তারই ইসেরা ছেল?"

"হ্যাঁ—হ্যাঁ—হ্যাঁ, তারই ইসারা, বুদ্ধির ঢেঁকি!" —জ্বালাতন হয়ে লজ্জাটাকে স্পষ্টই করে দিল আর্দ্রা; একটু নাকি সুর টেনেই অনুযোগ করল—"ওকে সরাও কমলাদি, নৈলে মেস ছাড়তে হবে।"

সেদিন পতিতপাবনই যা অল্প একটু হাসি ফোটাল সবার ঠোঁটে, মেসের কৌতুকোজ্জ্বল আবহাওয়া ঐখানেই গেল শেষ হয়ে। একটু স্তিমিত, খণ্ডিত আলাপ-আলোচনা যা হোক তা যেন কমলাকে ঘিরেই, যদিও বা একটু এদিক-ওদিকের কথা এসে পড়ে তো তাও যেন কি করে কমলাতে ঠোক্কর খেয়ে এলিয়ে যায়। স্বভাবতই ডায়মন্ডহারবারের কথাটা উঠতে আর সবার সঙ্গে কমলাও একটু উৎসাহিত হয়ে যোগ দিতে যাবেন, রঙ্গময়ী বললেন—"কিন্তু তোকে তো বাছা দেখতেই পেলে না কেউ, না হেমা?"

দুজনেই কেমন একটু গুটিয়ে গেলেন, ওদিকে হেমাঙ্গিনী এদিকে কমলা। কমলা অবশ্য নিলেন সামলে, তবে একটু দেরি হোল। বললেন—"আমার শরীরটা আগের দিন থেকেই একটু খারাপ ছিল।"

"বলতে হয়!" —রঙ্গময়ী বললেন।

"বলিনি, তাহলেই তো যাওয়া বন্ধ হোত সবার। কমলাদিকে নিয়ে তো বাড়াবাড়িই সবার—তেমন কিছু হোক না হোক..."

"না, কিছু তো হয় না!" —একটু পান-দোক্তা নিলেন রঙ্গময়ী। তারপর যেন হঠাৎ মনে পড়েছে এইভাবে বললেন—"হ্যাঁ, বেশ হয়েছে, এই তো হেমাও রয়েছে। তুই বরং এক কাজ কর, সুরোর বাড়ি থেকে বেড়িয়ে আয় দিন কতক—পাহাড়ে জায়গা জলহাওয়া ভালো। ...কি বলিস রে হেমা?"

অত্যন্ত অন্যমনস্ক হয়ে পড়েছেন হেমাঙ্গিনী, আর একবার ঠুকতে হোল রঙ্গময়ীকে—"তোকেই বলছি নাৎবৌ"

"ও, হ্যাঁ, ঠাকুরঝিদের ওখানটা? বেশ ভালো জায়গা বৈকি..."

—শেষ করবার আগেই কথাটা যেন মুখে মিলিয়ে গেল।

ফিরে আসতে আসতে রঙ্গময়ী কথাটা তুললেন। প্রশ্ন করলেন—"আজ তোর হয়েছে কি নাৎবৌ? কমলাকে তোদের বাড়ি বেড়াতে আসবার কথা বললাম, সায় পেলাম না তোর কাছে। শেষে, ওটুকু শুধরে নেওয়ার জন্যেই সুরোর বাড়ির কথা তুললাম, তা একই ভাব। এমন অপ্রস্তুতে পড়ে যেতে হোল দু'বারই।"

গাড়িটা হেমাঙ্গিনীদের বাড়ির কাছে এসে গেছে, ও'কে নামিয়ে দিয়ে যাবে, উনি বললেন—"চলো, তোমাদের ছাতের ওপর গিয়ে একটু বসিগে ঠানদিদি। গরম, তাছাড়া একটা কথা বলব বলব মনে করছি ক'দিন থেকে!"

(ক্রমশঃ)

(প্রশ্ন)

ভারতরত্ন কোন্ বৎসর থেকে দেওয়া শুরু হয়েছে? কে কে আজ পর্যন্ত এই পুরস্কারে সম্মানিত হয়েছেন?

চিত্তরঞ্জন ঘোষ
কেয়াশটোলা, মেদিনীপুর।

(উত্তর)

গত ১১শ সংখ্যায় শ্রীমলয় সেন যে তিনজন কবি ও নাট্যকার সম্বন্ধে জানতে চেয়েছেন, সে সম্বন্ধে সংক্ষেপে কিছু জানাই :—

(ক) **জাঁ কক্‌তো** (১৮৮৯-১৯৬৩)—ইনি বিংশ শতাব্দীর ফরাসী শিল্প-সাহিত্য জগতের অন্যতম দিকপাল। এ শতাব্দীর গোড়ার দিকে ফরাসী দেশে যে অতীন্দ্রিয়বাদী বা surrealistic কাব্যধারার আবির্ভাব হয় ইনি তার অন্যতম প্রধান কবি ও প্রবক্তা ছিলেন। শিল্পসাহিত্যের বিভিন্ন শাখায় কক্‌তো তাঁর উজ্জ্বল ব্যক্তিত্বের স্বাক্ষর রেখে গেছেন। কবি, ঔপন্যাসিক, নাট্যকার, প্রাবন্ধিক, সমালোচক, চিত্রশিল্পী, চলচ্চিত্র-পরিচালক, নাট্যপরিচালক, অভিনেতা, সঙ্গীতজ্ঞ—এই সব বহু বিচিত্র পরিচয়ের মধ্যে কোনটি তাঁর শ্রেষ্ঠ পরিচয় সে সম্বন্ধে ঐক্যমত প্রতিষ্ঠিত হয়নি। অতি সাম্প্রতিককালে অনেকের মতে, মনোযোগ আকর্ষণের দাবী রাখলেও কবি হিসেবে কক্‌তো খুব সার্থক নন এবং নাট্যকার ও ঔপন্যাসিক কক্‌তোই শ্রেষ্ঠ। তবু নাটক ও উপন্যাসে তাঁর বিশিষ্ট কবিসত্তাই প্রখর হোয়ে উঠেছে। তাঁর চলচ্চিত্র, চিত্রশিল্প, ভাস্কর্য সর্বত্রই কবি কক্‌তোর উপস্থিতি প্রচন্ডভাবে অনুভূত হয়। নাটকে প্রাচীন পৌরাণিক কাহিনীকে আধুনিক তাৎপর্যে মন্ডিত করে কক্‌তো এ শতাব্দীর নাটকে এক নবধারার সূত্রপাত কোরেছেন। গ্রীক পুরাণের 'ওয়েদিপাউস' কাহিনী (সোফোক্লেসও যা নিয়ে নাটক লিখেছেন) অবলম্বনে রচিত তাঁর "The Infernal Machine" নাটকটি স্মরণীয়।

(খ) **সের্গেই ইয়েসেনিন** (১৮৯৮-১৯২৫)—এই শতকের গোড়ার দিকে অক্‌টোবর সমাজতান্ত্রিক বিপ্লবের পূর্বে ও পরে প্রায় দু' দশক ধ'রে রুশ কাব্যজগত বিভিন্ন কাব্যধারার আন্দোলনে প্রাণচঞ্চল ছিলো। রুশ কবিতার ইতিহাসে এই কালটি বিশেষ উল্লেখযোগ্য। এই সময়ের পাঁচজন কবি, অনেক কবির মধ্যে বিশেষ কোরে রুশকাব্যে চিরস্মরণীয় হোয়ে আছেন : ভ্লাদিমির মায়াকোভস্কি, আন্না আখমাতোভা, বোরিস পাস্তেরনাক, সের্গেই ইয়েসেনিন ও আলেকজান্দার ব্লক। এ যুগের futurism বা ভবিষ্যবাদী কাব্য-আন্দোলনের যেমন মায়াকোভস্কি, symbolism বা প্রতীকীবাদের যেমন ব্লক, imagism বা চিত্রকল্পবাদ আন্দোলনের প্রাণপুরুষ তেমনি ইয়েসেনিন। এঁর কবিতা সহজ সরল প্রাণবন্ত ভাষায় স্বতঃস্ফূর্ত আবেগময় চিত্রকল্পে বিদগ্ধ-অবিদগ্ধ নির্বিশেষে সকল পাঠকের মনকেই নাড়া দেয়। ইংরেজ-আমেরিকান imagist কবিদের সঙ্গে এঁর মূলগত প্রভেদ লক্ষণীয়। গ্রামের ছেলে ইয়েসেনিন আমৃত্যু ছিলেন গ্রামজীবনের প্রেমে বাঁধা। গ্রাম ছেড়ে শহরে এসে তিনি একদিনের জন্যেও স্বস্তি পাননি। রুশদেশের অপরূপ পল্লীপ্রকৃতি, রুশপল্লীর ছন্দময় জীবনযাত্রা ও চাষীজীবনের তিনি অবিস্মরণীয় রূপকার। তাঁর কবিতা futurist কবিদের মতো বিপ্লবমুখর না হোলেও মহান রুশবিপ্লবের ওপর তাঁর শ্রদ্ধা ও আস্থা ছিলো। শেষে ইনি উন্মাদ হোয়ে যান ও আত্মহত্যা করেন। আজো রুশদেশে তিনি খুব জনপ্রিয়।

(গ) **বের্টল্ট ব্রেশ্‌ট্**—এ শতাব্দীর সবশ্রেষ্ঠ নাট্যকার ও অন্যতম শ্রেষ্ঠ কবি। অনেকের মতে সেক্‌পীয়রের পর এতবড় নাট্যকার ও তত্ত্ববিদ আর কেউ আসেননি। ১৮৯৮ সালের ১০ই ফেব্রুয়ারী জার্মানীর কৃষ্ণঅরণ্য অঞ্চলে অগস্‌বুর্গ শহরে এক বিরাট শিল্পপতির ঘরে তাঁর জন্ম হয়। কিন্তু ঐশ্বর্যের দাম্ভিকতা ও অমানুষিকতায় হাঁফিয়ে উঠে আঠারো বছর বয়সে তিনি বাড়ী থেকে পালান। তাঁর আত্মজীবনীমূলক কবিতার ভাষায় :

"I left my class and joined the common people." ঐ সময় থেকে শুরু হয় তাঁর বিচিত্র পথপরিক্রম। সঙ্গে সঙ্গে ভবঘুরে জীবনে চোলতে থাকে অবিরাম গান, কবিতা, নাটক, গল্প লেখা। পথে-প্রান্তরে কারখানার-বস্তিতে লক্ষ লক্ষ শোষিত সর্বহারাদের মাঝে খুঁজতে থাকেন মানুষের মুক্তি ও ভবিষ্যতের প্রশ্ন। মার্কসীয় দ্বন্দ্বমূলক বস্তুবাদী দর্শনে বিশ্বাসী হোয়ে ওঠেন ব্রেশ্‌ট্ এবং কমিউনিস্ট পার্টির সক্রিয় রাজনীতিতে অংশগ্রহণ করেন। হিটলারের অত্যাচারে তাঁকে জার্মানী ছাড়তে হয়। দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের পর পূর্ব জার্মানীতে ফিরে আসেন এবং বার্লিন শহরে তাঁর মনের মতো একটি নাটুকে দল ও নাট্যশালা (শিফবাউডারডেম থিয়েটার) গ'ড়ে তোলেন। তাঁর দল 'বার্লিনের আঙ্গিক'। এবার তাঁর নিজস্ব নাট্যরীতি, প্রয়োগপদ্ধতি ও নাট্যাদর্শ যা "এপিক থিয়েটার" নামে বিশ্বখ্যাত—জগতের সামনে তুলে ধরে। ব্রেশ্‌ট তাঁর নাটক ও থিয়েটারকে ব্যবহার কোরে গেছেন শোষণমুক্ত সমাজতান্ত্রিক সমাজগঠনে মেহনতি সর্বহারা শ্রেণীর হাতিয়ার হিসেবে। তাঁর নাট্যাদর্শ ও নাট্যচিন্তা এ শতাব্দীতে সবচেয়ে বেশি আলোড়ন তুলেছে। তাঁর বলিষ্ঠ প্রত্যয়নিষ্ঠ কবিতাবলী এ শতকের প্রগতিশীল কাব্যগোষ্ঠীর শ্রেষ্ঠ কবির মর্যাদা তাঁকে দিয়েছে। শিল্প-সাহিত্য-দর্শন-রাজনীতির বিশাল ক্ষেত্র জুড়ে রয়েছেন এ শতাব্দীর বিস্ময়কর মহা-প্রতিভা বের্টল্ট ব্রেশ্‌ট—একাধারে কবি, নাট্যকার, ঔপন্যাসিক, গল্পকার, নাট্য-পরিচালক, নাট্যতাত্ত্বিক, চলচ্চিত্রকার, দার্শনিক, রাজনীতিবিদ, অভিনেতা, সঙ্গীতজ্ঞ, নন্দনতাত্ত্বিক। ১৯৫৬ সালের ১৪ই অগাস্ট বার্লিনে তাঁর মৃত্যু হয়।

মলয়বাবু জানতে চেয়েছেন ব্রেশ্‌টের কোনো নাটক বাংলায় অনুবাদ হোয়েছে কিনা। এ সম্বন্ধে আমার যেটুকু জানা আছে জানাই :

বাংলায় ব্রেশ্‌ট্-অনুবাদের প্রথম কৃতিত্ব ঋত্বিক ঘটকের। ১৩৭১ সালের শারদীয় 'উত্তরকালে' প্রকাশিত হয় তাঁর অনুবাদ করা "গ্যালিলিও চরিত"। এটি Desmond Vessey-র ইংরাজি অনুবাদ "Life of Galileo" থেকে অনূদিত। এখন এটি গ্রন্থাকারে প্রকাশিত হোয়েছে। শ্রীঘটককৃত "Causasian Circle"এর অনুবাদ বর্তমানে পত্রিকা গন্ধর্ব-য় ধারাবাহিকভাবে প্রকাশিত হোচ্ছে। এটিও ইংরেজি অনুবাদ থেকে অনুবাদ করা।

বাংলায় ব্রেশ্‌টের সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য ও সার্থক অনুবাদক বিখ্যাত নাট্যকার-পরিচালক উৎপল দত্ত। এদেশে ব্রেশ্‌ট-চর্চার প্রতিষ্ঠান 'ভারতের ব্রেশ্‌ট সমিতি'র (কার্যালয় : ৫৩, এস. আর দাশ রোড। কলি-২৬) তিনি প্রধান উদ্যোক্তা। মূল জার্মান ভাষা থেকে ব্রেশ্‌টের বিখ্যাত নাটক—১৮৭১ সালের পারী কমিউন সম্বন্ধে লেখা—"ডী টাগে ডের কমুনে" "নয়া জমানা" নামে শ্রীউৎপল দত্ত-কৃত অনুবাদে ভারতের ব্রেশ্‌ট সমিতি' থেকে প্রকাশিত হোয়েছে। সারা বিশ্বে এ নাটকের অনুবাদ এই প্রথম। ১৩৭৩ সালের শারদীয় 'থিয়েটার'-এ প্রকাশিত হোয়েছে শ্রীদত্তের অনুবাদে (মূল জার্মান থেকে) ব্রেশ্‌টের ডী মাসনামে'র অনুবাদ 'সমাধান'। ভারতের ব্রেশ্‌ট সমিতির মুখপত্র "এপিক থিয়েটার"-এর প্রথম ও দ্বিতীয় সংখ্যায় প্রকাশিত হোয়েছে "মাদার কারেজ" নাটকের শ্রীদত্তকৃত রূপান্তর "হিম্মৎবাঈ", ঐ পত্রিকায় গোর্কীর 'মা' উপন্যাসের ব্রেশ্‌টকৃত নাট্যরূপের বাংলা অনুবাদও কোরেছেন উৎপল দত্ত। "গন্ধর্ব"-এর ব্রেশ্‌ট সংখ্যা (১৩৭২)-এ বিষ্ণু বসুর ইংরেজি অনুবাদ থেকে অনুবাদ করা "মাদার কারেজ" প্রকাশিত হোয়েছে। সাপ্তাহিক বসুমতীতে ধারাবাহিকভাবে অশোক সেনের অনুবাদে "St. John of the Stockyards" প্রকাশিত হোয়েছে। এছাড়া সৌমিত্র চট্টোপাধ্যায়ের "Rule & Exception"-এর বাংলা 'রূপান্তর' 'চলাচল' গোষ্ঠী কর্তৃক অভিনীত হোয়েছে, কোথাও প্রকাশিত হোয়েছে কিনা জানি না।

অনিরুদ্ধ সরকার,
কলি-৩৩।

দুই চন্দ্রশেখর

(১৭)

চন্দ্রশেখর আচার্যরত্ন।

চন্দ্রশেখরের আদিনিবাস শ্রীহট্টে। গৌরাঙ্গ-আবির্ভাবের আগে থেকেই নবদ্বীপের বাসিন্দে।

শচীদেবীর বোনের সঙ্গে বিবাহ হয়। সেই সম্পর্কে চন্দ্রশেখর গৌরাঙ্গের মেসোমশাই।

গৌরাঙ্গের যখন আবির্ভাব হল তখন ত্রিজগতে উল্লাস উঠল। অদ্বৈত সপ্রেমে হুঙ্কার ছাড়ল, হরিদাস নৃত্যকীর্তন সুরু করল। চন্দ্রশেখর গঙ্গাস্নান করে আনন্দের প্রাবল্যে দান করতে লাগল। চন্দ্রগ্রহণের দান নয়, চন্দ্রাবতরণের দান। 'নদীয়া উদয়গিরি, পূর্ণচন্দ্র গৌরহরি, কৃপা করি হইল উদয়।'

জন্মের পর যে-সব জাতকর্ম বিধেয়, চন্দ্রশেখর আর শ্রীবাসই তা জগন্নাথকে দিয়ে সম্পন্ন করাল। যে সব প্রতিবেশিনী শিশুকে দেখতে এল তাদের তেলসিঁদুর দিয়ে অভ্যর্থনা করার ভার পড়ল মাসির উপর। মাসির সঙ্গে মিলল এসে মালিনী, শ্রীবাসের স্ত্রী।

গৌরাঙ্গের বাল্যলীলার প্রত্যক্ষদ্রষ্টা চন্দ্রশেখর। মেসো হলে কী হবে, গৌরাঙ্গের দাস্যপ্রেমে আত্মহারা। দাস্যপ্রেমের তাৎপর্য কী? শুধু সেবা-বাসনা। 'কৃষ্ণপ্রেমের এই এক অপূর্ব প্রভাব। গুরু সম লঘুকে করায় দাস্যভাব ॥'

চন্দ্রশেখরের ঘরে গৌরাঙ্গ নৃত্যাভিনয় করবেন—চলো দেখবে চলো। দৃশ্যে-অঙ্কে বাংলা ভাষায় সেই প্রথম নৃত্যনাট্য। আর, আশ্চর্যের আশ্চর্য, প্রভু রমণী সাজবেন।

রমণী সাজবেন?

হ্যাঁ, প্রকৃতি সাজবেন। চিৎশক্তির প্রতিমা হবেন।

ভালো করে বুঝিয়ে বলো।

দুর্গা হবেন লক্ষ্মী হবেন রুক্মিণী হবেন রাধা হবেন। ভগবানের অন্তরঙ্গ-স্বরূপশক্তিকেই চিৎ-শক্তি বলে। দুর্গা লক্ষ্মী রাধা রুক্মিণী সবই সেই চিৎ-শক্তির বিলাস-বৈচিত্রী।

যে জিতেন্দ্রিয় সেই শুধু এই নৃত্যনাট্য দেখতে পাবে। প্রভু আদেশ করলেন।

আমার তাহলে যাওয়া হবে না। বললে অদ্বৈত। আমি ইন্দ্রিয় জয় করেছি এ আমি বলি কী করে?

আমারও সেই কথা। শ্রীবাসও নিবৃত্ত হল।

তোমরা যদি না যাও, তাহলে আর নৃত্যনাট্য কেন? প্রভু আশ্বাস দিলেন। যাও, তোমাদের কোনো চিন্তা নেই। তোমরা আজ মহাযোগেশ্বর হয়ে যাবে, আমাকে দেখে কারু মোহ জন্মাবে না।

তাহলে চলো যাই সকলে। নির্ভয়ে। নির্মোহে।

শচীদেবী বিষ্ণুপ্রিয়াকে নিয়ে গেলেন। আর আর বৈষ্ণবদের পরিবারবর্গও উপস্থিত হল।

কে কী সাজবে বলে দাও।

প্রভু বললেন, আমি রাধা সাজব, গদাধর ললিতা সাজবে, নিত্যানন্দ আমার বড়াই হবে। হরিদাস কোতোয়াল সাজবে আর শ্রীবাস সাজবে নারদ।

আর আমি কী সাজব? জিজ্ঞেস করল অদ্বৈত।

তুমি কী না সাজবে? তুমিই তো সমস্ত। তুমি কৃষ্ণ সাজবে।

সাজাবে কে?

সাজাবে বুদ্ধিমন্ত আর সদাশিব।

গান গাইবে কে?

গান গাইবে মুকুন্দ।

চন্দ্রশেখর তার বাড়ির অঙ্গনে প্রকাণ্ড চাঁদোয়া টাঙিয়েছে। শয্যা বিছিয়েছে। দীপ-সজ্জারও ত্রুটি রাখেনি। সন্ধ্যের পর সুরু হবে নৃত্য-নাট্য।

তার গৃহের কী ভাগ্য! এখানে প্রভু তাঁর মহিমা প্রকাশ করবেন। শুধু গৃহের নয়, তার নিজের কী ভাগ্য! স্বচক্ষে সে দেখবে সেই মহিমা।

হে রঙ্গভূমি, তুমি আজ বৃন্দাবন হও। হরিদাস রঙ্গস্থলকে প্রণাম করল।

কোন্ দৃশ্যে কার কী বক্তব্য, কিছু শেখাতে হবে না। কিছু মুখস্থ লাগবে না। প্রভুর শক্তিতে বাক্য আপনা-আপনি স্ফুরিত হবে।

কে তুমি? কে একজন জিজ্ঞেস করল।

আমি বৈকুণ্ঠের কোটাল।

কী করো তুমি?

আমি শুধু কৃষ্ণ বলে হাঁক দিই। নিদ্রিত জগৎকে জাগিয়ে দিই। সতর্ক করি। নির্ভয় করি।

এ আবার কে এল? কাঁধে বীণা, হাতে কুশ আর কমণ্ডলু, এক বুক দাড়ি, সারা গায়ে চন্দনের ফোঁটা। কে তুমি?

আমি নারদ। বললে শ্রীবাস।

তুমি এসেছ কেন?

কৃষ্ণকে খুঁজতে এসেছি। বললে নারদ, বৈকুণ্ঠে গিয়ে দেখলাম কৃষ্ণ নেই, সমস্ত বৈকুণ্ঠ খাঁ খাঁ করছে। জিজ্ঞেস করলাম, কৃষ্ণ কোথায়? উত্তরে শুনলাম কৃষ্ণ নদীয়ায় গিয়েছে। তাই এসেছি এখানে।

শচীদেবী মালিনীকে জিজ্ঞেস করলে, এই কি তোমার পণ্ডিত?

কী জানি, চিনতে পারছি না। নারদ বলেই তো মনে হচ্ছে।

অদ্বৈতকে কে চিনবে? পঞ্চাশের বেশি বয়স, এখন দেখাচ্ছে পনেরো বছরের কিশোর। অদ্বৈত কোথায়? এ যে কৃষ্ণ।

কৃষ্ণকে দেখে পুরনারীরা উলু দিয়ে উঠল, পুরুষ দর্শকেরা হরিধ্বনি দিল।

স্ত্রীবেশে সাজানো হচ্ছে প্রভুকে। তাঁর হাতে কঙ্কণ দিতেই তাঁর রুক্মিণীর আবেশ হল। তিনি অধোমুখে চোখের জল ফেলছেন আর সেই সঙ্গে সিক্ত মৃত্তিকায় নখ দিয়ে কৃষ্ণকে প্রেমপত্র লিখছেন।

তারপর রুক্মিণীভাব অন্তর্হিত হয়ে জাগল রাধাভাব।

রাধাভাবেই প্রভু রঙ্গস্থলে আবির্ভূত হলেন।

এ ভুবনমোহিনী কে? শচীমাতাও চিনতে পারছে না। আর বিষ্ণুপ্রিয়া কী দেখছে কী ভাবছে তা বিষ্ণুপ্রিয়াই জানে।

তারপর প্রভু জগৎজননীর ভাব ধরলেন। ভগবতী মহামায়া হয়ে বসলেন বিষ্ণুখট্টায়। সকলকে পুত্রভাব দিলেন। দিলেন স্তন-সুধা। 'মাতৃভাবে বিশ্বম্ভর সভারে ধরিয়া: স্তন পান করায়েন পরম স্নিগ্ধ হৈয়া ॥'

কমলা পার্বতী দয়া মহানারায়ণী
আপনে হইলা প্রভু জগতজননী ।।
সত্য করিলেন প্রভু আপনার গীতা
আমি পিতা, পিতামহ, আমি ধাতা, মাতা ॥

সে রাত্রিও প্রভাত হল। সবাই কাঁদতে লাগল, রাত, তুমি কেন পোহালে? 'কেহ বোলে, আরে রাত্রি, কেন পোহাইলা? হেন রসে কেনে কৃষ্ণ, বঞ্চিত করিলা?'

সে রাত শেষ হয়ে যাবার পরও দিনে-রাতে চন্দ্রশেখরের বাড়ি আলো হয়ে রইল। প্রভু এ বাড়ি ছেড়ে চলে গিয়েছেন, তবু তাঁর জ্যোতি ম্লান হচ্ছে না।

যে আসে সে চন্দ্রশেখরকে জিজ্ঞেস করে, এ কিসের আলো, কিসের তেজ?

চন্দ্রশেখর বলে, প্রভু যে এসেছিলেন, নৃত্যনাট্য করেছিলেন তাঁর ছটা।

আরেকদিন মুরারি গুপ্তের বাড়িতে গিয়ে প্রভু বলতে লাগলেন, মধু দাও, আমাকে মধু দাও।

নিত্যানন্দ গঙ্গাজল দিল প্রভুকে। মধু-জ্ঞানে প্রভু সেই জল খেলেন।

চন্দ্রশেখর জিজ্ঞেস করলে, এ তোমার কী ভাব?

আমি আর তোমাদের কৃষ্ণ নই। আমি বলরাম। মধুপ্রিয় বলরাম। রুপোর পাহাড় বলরাম।

চন্দ্রশেখর দেখল সোনার লাঙল কাঁধে নিয়ে বলরাম দাঁড়িয়ে আছে।

গয়ায় যাবার সময় শচীমাতা চন্দ্রশেখরকেই পাঠাল নিমাইয়ের অভিভাবক করে। সন্ন্যাসগ্রহণের কথাও নিমাই চন্দ্রশেখরের কাছ থেকে গোপন করল না। আর চন্দ্রশেখরই কাটোয়ায় নিমাইয়ের সন্ন্যাসগ্রহণ-কালীন কৃত্যাদি সম্পন্ন করান।

তারপর লিখল এই সুমধুর পদ:

কণেক রহিয়া চলিয়া উঠিয়া
পণ্ডিত জগদানন্দ।
প্রবেশি নগরে দেখে ঘরে ঘরে
লোক সব নিরানন্দ॥
না মেলে পসার না করে আহার
কারো মুখে নাহি হাসি।
নগরে নাগরী কান্দয়ে গুমরি
থাকলে বিরলে বসি॥
দেখিয়া নগর ঠাকুরের ঘর
প্রবেশ করিল যাই।
আধমরা হেন ভূমে অচেতন
পড়িয়া আছেন আই॥
প্রভুর রমণী মেহ অনাথিনী
প্রভুরে হইয়া হারা
পড়িয়া আছেন মলিন বসন
মুদল নয়ানে ধারা॥

সন্ন্যাসের পর প্রভু যমুনা ভেবে গঙ্গাতীরে এসে দাঁড়ালেন। চন্দ্রশেখর ছুটল অদ্বৈতকে খবর দিতে। শুধু শান্তিপুরে নয়, নবদ্বীপে গেল, দাঁড়াল শচীমাতার দুয়ারে। চলো শান্তিপুরে চলো, তোমার সন্ন্যাসী পুত্রকে দেখতে পাবে।

এত দুঃখের সংবাদ বহন করবার দায় চন্দ্রশেখরের।

চন্দ্রশেখর বাশর সোসর
বিষয়বিষেতে রত।
গৌরাঙ্গ চরিত পরম অমৃত
তাহাতে না লয় চিত॥

প্রতি বছর রথের সময় প্রভুর দর্শনের জন্যে নীলাচলে যায় চন্দ্রশেখর। কখনো কখনো স্ত্রীকে সঙ্গে নিয়ে যায়। চলো দেখে আসি আনন্দনিকেতনকে।

(১৮)

চন্দ্রশেখর বৈদ্য

জাতিতে বৈদ্য, কাশীবাসী। শুধু লিখন-বৃত্তির উপর নির্ভর করে জীবিকানির্বাহ করে।

বৈদান্তিক সন্ন্যাসীর দল কাশীতে তখন মায়াবাদ প্রচার করছে। ষড়দর্শনের ব্যাখ্যায় মত্ত হয়েছে। ভক্তির নাম-গন্ধও রাখেনি কোথাও।

চন্দ্রশেখর বৈষ্ণব। তার বন্ধু তপন মিশ্র। তারা দুইজনে একত্র হয়ে বসে কৃষ্ণকথা বলে আর আনন্দ করে।

বৃন্দাবনের পথে প্রভু কাশী এসেছেন, উঠেছেন তপন মিশ্রের বাড়িতে।

ভিক্ষা-শেষে প্রভু বিশ্রাম করছেন আর তপনের ছেলে রঘুনাথ তাঁর পদসেবা করছে। চন্দ্রশেখর দেখা করতে এল।

চন্দ্রশেখর প্রভুর পায়ে কেঁদে পড়ল। বললে, প্রভু, কাশী আর ভালো লাগে না। শুধু কর্মফলে এখানে পড়ে আছি।

কেন, কাশী কি দোষ করল?

এখানে মায়া-ব্রহ্ম ছাড়া আর শব্দ নেই। দিন-রাত শুধু ষড়দর্শনের ব্যাখ্যা। যেখানে কৃষ্ণ নেই, ভক্তি নেই, প্রেম নেই—তাই সুখও নেই। তা ছাড়া—

কী তাছাড়া?

তা ছাড়া শুধু তোমার নিন্দা। সন্ন্যাসীরা শুধু তোমার নিন্দা করে বেড়াচ্ছে। এ আর সহ্য করতে পারছি না।

প্রভু শুধু মৃদু-মৃদু হাসতে লাগলেন। তুমি এইখানে কিছুদিন থাকো।

থাকব।

কিন্তু ভিক্ষা করবে আমার ঘরে। বললে তপন মিশ্র।

তাই করব।

ভক্তবশে স্বীকার করলেন প্রভু।

এক মারাঠি ব্রাহ্মণ এসে হাজির। নাম শুনে এসেছে, কিন্তু দেখতে এমনি চমৎকার হবে ভাবতে পারেনি।

আপনাকে নিমন্ত্রণ করতে এলাম। বললে ব্রাহ্মণ।

এ ব্রাহ্মণ কৃষ্ণবিমুখ। মায়াবাদী সন্ন্যাসীদের সঙ্গ করে। কে জানে কজন অমন সন্ন্যাসীকেও নিমন্ত্রণ করে বসল! যারা কৃষ্ণবিমুখ তাদের সঙ্গ করতে প্রভু সম্মত নন।

বললেন, আমার নিমন্ত্রণ তপনের ঘরে পাকা হয়ে রয়েছে।

দশদিন প্রভু থাকলেন কাশীতে, চন্দ্রশেখরের গৃহে। পরে চলে গেলেন বৃন্দাবন।

বৃন্দাবন থেকে যখন ফিরছেন, পৌঁচেছেন কাশী, চন্দ্রশেখর স্বপ্ন দেখল প্রভু তার ঘরে এসেছেন।

ভোর হতে না হতেই চন্দ্রশেখর গ্রামের বাইরে এসে প্রভুর প্রতীক্ষা করতে লাগল। প্রভুকে ধরে আর যেন কেউ নিয়ে যেতে না পারে।

প্রভুকে দেখতে পেয়েই চন্দ্রশেখর তাঁর পায়ে পড়ল। বাড়িতে নিয়ে গেল হাত ধরে। খবর পেয়ে ছুটে এল তপন মিশ্র। এল পরমানন্দ কীর্তনিয়া। শুরু হল কৃষ্ণকীর্তন।

চন্দ্রশেখরকে বললেন, দেখ তো দরজায় একজন বৈষ্ণব এসে বসেছেন, তাঁকে ভিতরে ডেকে নিয়ে এস।

চন্দ্রশেখর ঘরের বাইরে এসে তাকাল, কোনো বৈষ্ণব দেখতে পেল না।

দরজায় কোনো বৈষ্ণব নেই।

তবে কে আছে?

একজন দরবেশ বসে আছে। মুখে গোঁফ-দাড়ি, গায়ে ভোটকম্বল ও হাতে করোয়া'।

ঐ দরবেশকেই ডেকে আনো।

ডাক শুনে দরবেশ অঙ্গনে এসে দাঁড়াল।

তাকে দেখে প্রভু ছুটে এসে আলিঙ্গন করলেন।

আমাকে ছুঁয়ো না, আমাকে ছুঁয়ো না। দরবেশ চাইল মুক্ত হতে।

তোমাকে ছোঁব না? তোমাকে না ছুঁলে পবিত্র হব কী করে?

চন্দ্রশেখর তো বিমূঢ়, হতবাক।

প্রভু কহে তোমা স্পর্শি পবিত্র হইতে।
ভক্তি বলে পার তুমি ব্রহ্মাণ্ড শোধিতে॥

প্রভু তাকে হাত ধরে এনে বসালেন। নিজের হাতে মুছে দিতে লাগলেন গায়ের ধুলো। জিজ্ঞেস করলেন, কী কষ্টে পালিয়ে এলে?

আমি পালালাম কোথা, তুমিই তো উদ্ধার করে আনলে।

প্রভু তপন আর চন্দ্রশেখরকে কাছে ডাকলেন। বললেন, ইনিই সনাতন গোস্বামী, হুসেন শার প্রধানমন্ত্রী। কৃষ্ণ এঁকে রৌরব নরক থেকে উদ্ধার করে এনেছেন, তাঁর পরিচর্যা করো। তপন, একে ক্ষৌরকারের কাছে নিয়ে যাও, এঁকে ভদ্র করো, আর চন্দ্রশেখর তুমি এঁকে গঙ্গাস্নান করিয়ে একখানা বস্ত্র দাও।

স্নানান্তে চন্দ্রশেখর সনাতনকে একখানা নতুন বস্ত্র দিল।

সনাতন নতুন বস্ত্র নিল না। বললে, আমাকে একখানা পুরোনো ধুতি দাও। তাকেই ছিন্ন করে আমি কৌপীন ও বহির্বাস বানাব।

তারপর যেদিন বৈদান্তিক সন্ন্যাসীদের গর্বপর্বত চূর্ণ করলেন প্রভু, সকলকে কৃষ্ণনাম প্রসাদ দান করলেন, সন্ন্যাসীরাও কৃষ্ণ-কৃষ্ণ বলতে লাগল তখন চন্দ্রশেখর ভবনে সে কী আনন্দ! আগে অভিনিন্দন ছিল, এখন ওদের অভিনন্দন! 'বেদময় মূর্তি তুমি সাক্ষাৎ নারায়ণ। ক্ষম অপরাধ পূর্বে যে কৈনু নিন্দন।'

চন্দ্রশেখরভবনে সারারাত কীর্তন হল। ছিল চন্দ্রশেখর, তপন, তপনের ছেলে রঘু, পরমানন্দ কীর্তনিয়া আর বলভদ্র ভট্টাচার্য। এ কী, সেই মারাঠি ব্রাহ্মণও কীর্তনে গলা মিলিয়েছে।

তারপরে প্রভু বললেন, কাশী ছেড়ে এবার নীলাচলে যাব।

চন্দ্রশেখর বললে, আমি তোমার সঙ্গে যাব।

আরো সকলে চাইল সঙ্গী হতে।

প্রভু বললেন, না, আমি একা যাব।

সান্ত্বনাবাক্যে সকলকে নিবৃত্ত করলেন প্রভু। তোমরা কাশীতেই থাকো। কাশীতেই ভক্তির সৌরভ ছড়াও।

বৃন্দাবনে যাচ্ছে জগদানন্দ, তার সঙ্গে চন্দ্রশেখর দেখা করল। প্রভু কেমন আছেন? ভালো আছেন তো?

তারপর যখন শুনল রঘু নীলাচলে যাচ্ছে তাকে চন্দ্রশেখর বললে, প্রভুকে আমার দণ্ডবৎ দিও। বোলো আমি কাশীতেই আছি।

(ক্রমশঃ)

প্রমীলা

ইণ্টিরেয়র ডেকরেশন

শিল্পশ্রী আবার আমন্ত্রণ জানিয়েছে। এবং যথারীতি স্ব-কৃত বৈশিষ্ট্যের উজ্জ্বলতা নিয়ে। প্রতিবার যেমন এবারও তেমনি। স্বাতন্ত্র্য এবং উজ্জ্বলতার পাশা-পাশি অবস্থান। রুচির বৈশিষ্ট্যে ছিমছাম প্রদর্শনীর সর্বাঙ্গে নতুন আমেজ এবং মধুর আবেশ। বেশ ভাল লাগছিল। অনেকটা মোহাবিষ্ট হয়ে সমস্ত জিনিষটা ঘুরে-ফিরে দেখছিলাম। পরিসর সামান্য—একখানা মাত্র ঘর। কিন্তু সাজানোর নৈপুণ্যে তা হয়ে উঠেছে অসামান্য। 'ইণ্টিরেয়র ডেকরেশন' ছিল শিল্পশ্রীর এবারকার প্রদর্শনীর বিষয়-বস্তু। ঘর সাজানোর চমৎকার নিদর্শন। সাধারণ-অসাধারণে উপকরণ রয়েছে মিলিয়ে মিশিয়ে। সামান্য চট দিয়ে ঘরের আকর্ষণ কতো বাড়ানো যায় না দেখলে বিশ্বাস করা শক্ত। রঙ-বেরঙের চটের পর্দা দিয়ে ঘরের অঙ্গবিন্যাস এবং আলোর মাধুর্য অপরূপ হয়ে উঠেছে। শুধু পর্দা কেন ঘরের প্রবেশদ্বারে চটের কাজ সকলকেই নতুনত্বের আস্বাদ এনে দিচ্ছে। তারপর চটের সোফা এবং চটের গদী আঁটা চেয়ারগুলির শিল্পসুরভিতে ক্রেতা ও দর্শকদের টেনে রাখছিল। সামান্য বস্তু কিন্তু অসাধারণ তার আকর্ষণ। সুন্দর টেবিলটা বেশ মানান-সই।

ধনী-নির্ধন নির্বিশেষে সবাই চায় ঘর সাজাতে। কিন্তু সবাই পেরে ওঠে না। সাধ সকলেরই আছে, সবাই পেরে ওঠে না। এটাই যা সমস্যা। এতে অনেকেই অর্থের দিকটা নজর করতে পারেন। অর্থ ছাড়া আর একটা জিনিষ আছে এবং সেটাই এক্ষেত্রে বড়। অর্থাৎ সাজাতে জানা চাই। এখানে অর্থের প্রশ্নটা গৌণ হয়ে পড়ে। সামান্য চট শিল্পীর মনের পরশে কত সুন্দর হতে পারে এবং গৃহসজ্জায় কি অসামান্য ভূমিকা নিতে পারে নিজের চোখে না দেখলে বিশ্বাস করা যায় না। এদিকটা লক্ষ্য রেখেই শিল্পশ্রীর কর্ণধার শ্রীমতী মীরা চৌধুরী এবার এই 'ইণ্টিরেয়র ডেকরেশন'-এর ব্যবস্থা করেছেন।

চট নিয়ে শ্রীমতী চৌধুরীর এই পরীক্ষা-নিরীক্ষা নতুন কিছু নয়। ইতিপূর্বে তিনি 'হোম ফার্ণিসিং ইন জুট' নামে একটি প্রদর্শনীর আয়োজন করেছিলেন। সে প্রদর্শনী রসিকজনের কৌতূহলী দৃষ্টি আকর্ষণ করেছিল। গৃহসজ্জা এবং নিত্য-ব্যবহারে চটের প্রয়োজনীয়তা সম্পর্কে প্রথম বোধহয় তিনিই দৃষ্টি দেন। ভ্যানিটি ব্যাগ প্রভৃতি নানা জিনিষ চটের সাজে বেশ সুন্দর দেখায়। সেদিন থেকেই তিনি ভেবে এসেছেন এই সাধারণ উপকরণ দিয়ে ঘর সাজানোর কথা। যাতে ঘরে এসে বাইরের লোকজন গৃহস্বামী এবং সর্বোপরি গৃহ-কর্ত্রীর রুচিহীনতার পরিচয় নিয়ে না যেতে পারে। বরং তৃপ্ত মনেই যেন ফিরে যেতে পারে। এবারকার প্রদর্শনীতে তিনি তার সার্থক রূপ দিয়েছেন। এছাড়া নানা জিনিষে প্রদর্শনীটি বেশ জম-জমাট। দেশের বিভিন্ন জায়গা থেকে নানারকম হাতের কাজ প্রদর্শনীটিকে আরো আকর্ষণীয় করেছে। ব্রাশ মেটালের কত রকমারি জিনিষ। রুটি হাওয়ার সংস্পর্শে এলে ঠাণ্ডা হয়ে যাবে। তাকে নরম রাখার জন্য ঢাকনাওলা সুন্দর পাত্র, তরকারি এবং ভাত রাখার পাত্রগুলিও সহজেই নজর কাড়ে। তবে ঢাকনাগুলি সম্পর্কে ও'র কিছু আইডিয়া আছে। এগুলির আকর্ষণ আরো বাড়াতে হবে। সে সম্পর্কেও অবশ্য তিনি ভাবছেন। মৃন্ময় পুতুলগুলি ঘরের শোভা বাড়িয়েছে আরো। ঘরের আলোকসজ্জা স্নিগ্ধতায় মনোরম। ধাতব ঢাকনাগুলিকে সুন্দরভাবে
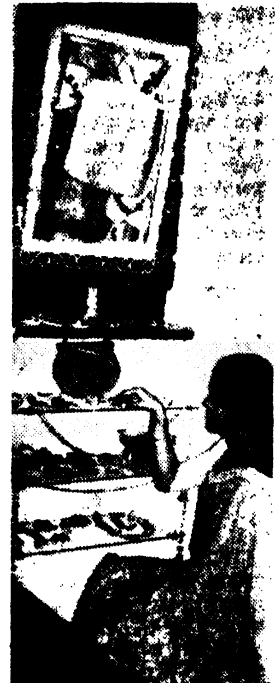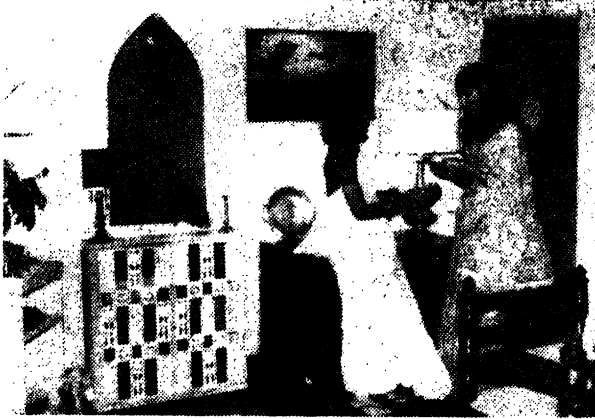
সাজিয়ে অপূর্ব আলোর মায়াজাল সৃষ্টি করেছেন। বড় বড় শেডের আলোগুলি চাহিদার আধিক্যেই জনপ্রিয়তা প্রমাণ করে। সেই আলোগুলির স্ট্যান্ডের কারুকার্য দেখবার মত।

প্রদর্শনী দেখা শেষ করে শ্রীমতী চৌধুরীর সংগে কথা বলছিলাম। তিনি বললেন, ইতিপূর্বে সমস্ত প্রদর্শনীর ব্যবস্থা আমি নিজেই করেছি। এবার প্রদর্শনীর ব্যাপারে সাহায্য করেছেন শ্রীসলিল সেন। ইন্টেরিয়র ডেকোরেশনে ইতিমধ্যে তিনি বেশ সুনাম অর্জন করেছেন। প্রদর্শনী ছাড়াও তিনি এখন আমার অন্যতম সহযোগী।

১৯৪৪ সালে শিল্পশ্রীর প্রতিষ্ঠা। তারপরই শুরু হয়েছে উত্তরণের ইতিহাস। নানা উত্তরণের মধ্য দিয়ে শ্রীমতী চৌধুরী আজও অক্লান্ত। বয়সের ভারকে পুরোপুরি অস্বীকার করে তিনি কাজ করে চলেছেন। সম্প্রতি আবার একটা প্ল্যান মাথায় এসেছে। সরকারী সহায়তায় একটি কো-অপারেটিভ হ্যান্ডিক্রাফটস সেন্টারের পত্তন। বোধহয় পরিকল্পনা বাস্তবে রূপায়িত হতে দেরী হবে না।

প্রদর্শনী দেখতে এসে এসব তথ্যও জানা হয়ে গেল। সবশেষে তিনি জিগ্যেস করলেন, 'প্রদর্শনী কেমন লাগলো?' সহসা মুখে উত্তর আসেনি, মৃদু হেসেছিলাম মাত্র। প্রদর্শনী দেখে মুগ্ধ হয়ে গিয়েছিলাম। তাই মুখে জবাব জোগায়নি। ভাল জিনিষের স্বভাব-বৈশিষ্ট্যই মানুষকে মূক করে দেওয়া। আমারও হয়তো সেই অবস্থাই হয়েছিল।

সমান অধিকার

গত ১ আগস্ট লন্ডনে এক মহিলা সম্মেলনে রাজকুমারী আলেকজেন্ড্রা বলেন, সংসারের দায়-দায়িত্ব অনেক, সেইসব দায়-দায়িত্ব পালন করে বাইরের কাজ-কর্ম সম্পর্কে আগ্রহ জাগিয়ে রাখা সত্যই একটা কঠিন ব্যাপার।

তিনি ইন্টারন্যাশনাল অ্যালায়েন্স অব উইমেন-এর ২১তম ত্রিবার্ষিক কংগ্রেসের উদ্বোধন করার সময়ে এই কথাগুলি বলেন। ভারত সমেত ৪২টি দেশের ৬০টি মহিলা সংগঠনের ২০০ প্রতিনিধি এই সম্মেলনে যোগদান করেছেন।

রাজকুমারী আলেকজেন্ড্রা বলেন, 'মেয়েরা তাঁদের কর্মক্ষমতার পূর্ণ পরিচয় দিতে পারেন তখনই যখন তাঁরা সমান সুযোগ পাচ্ছেন, সমান শিক্ষা, ট্রেণিং এবং পেশা গ্রহণ করতে পারছেন। মানবজাতির সেবার জন্য আজও প্রয়োজন আছে শ্রেষ্ঠ প্রতিভার এবং এই সেবার দায়িত্ব নিতে পারেন যাঁরা উপযুক্ত ট্রেণিং পেয়েছেন।'

দশ দিনের এই সম্মেলনের মূল বিষয় হল 'হিউম্যান রাইটস—নিউ সোস্যাল প্যাটার্নস'। সম্মেলনটি অনুষ্ঠিত হচ্ছে উইম্বলডনের সাউথল্যান্ডস কলেজ অব এডুকেশনে। ব্রিটিশ সংগঠকদের একজন মুখপাত্র সম্মেলনের উদ্বোধনের আগে বলেন: 'অর্থনৈতিক উন্নয়ন সম্পর্কে সাম্প্রতিক প্রচেষ্টা মানবজাতির শক্তির উৎস-সমূহের পূর্ণ ব্যবহারের মূল্য কতখানি তা বুঝতে সাহায্য করেছে। সমাজের প্যাটার্নই আজ পরিবর্তিত হতে চলেছে। মেয়েদের গার্হস্থ্য কাজকর্ম যেমন করতে হচ্ছে তেমনই করতে হচ্ছে বাইরের নানা রকমের কাজ অর্থ উপার্জনের জন্য। সমাজের এই নতুন প্যাটার্ণের পরিপ্রেক্ষিতেই মানবিক অধিকারের প্রয়োগ আমরা আলোচনা করে দেখব, আমরা বিষয়টি বিশেষভাবে আলোচনা করে দেখব নারীর মর্যাদা প্রসঙ্গে।'

ইন্টারন্যাশনাল অ্যালায়েন্স অব উইমেন প্রতিষ্ঠিত হয় ১৯০২ সালে। প্রথম দিকে নারীর রাজনৈতিক অধিকার ও সর্বক্ষেত্রে সমান অধিকার লাভ সম্পর্কেই কাজ সীমাবদ্ধ ছিল। প্রতিষ্ঠানটি নারীদের সুনাগরিক হিসাবে কর্তব্য পালনের, জনজীবনকে প্রভাবিত করার এবং বিশ্বশান্তির ক্ষেত্রে আন্তর্জাতিক সহযোগিতার রীতিনীতিতে উৎসাহ জুগিয়ে থাকে।
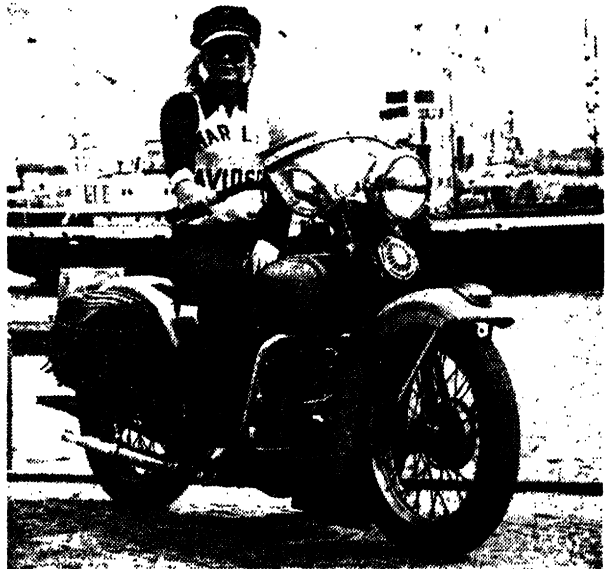
১৯৩৩ সালের তৈরি পাঁচশো পাউন্ড ওজনের এই মোটরসাইকেলটি চড়ে শ্রীমতী ক্রিস্টেল যখন রাস্তায় বেরোন, তার বিরাট গর্জনে রাস্তার লোক শশব্যস্ত হয়ে ওঠে।

সুধীরচন্দ্র সরকার

(পূর্ব প্রকাশিতের পর)

কলেজে পড়ার সময় একটি দিনের কথা সহজে ভুলতে পারব না। সেটা হল ১৯১৩ সালের একটি দিন।

খবর বেরুল রবীন্দ্রনাথ 'নোবেল' প্রাইজ পেয়েছেন 'গীতাঞ্জলি' লিখে! একজন ভারতীয় বলে নয় একজন বাঙালীর এই অভূতপূর্ব সম্মান যে আমাদের জাতীয় গৌরব, এ আর কাউকে বলে বোঝাতে হল না। স্বতঃস্ফূর্ত আনন্দে সমগ্র বাঙালী জাতির অন্তর ভরে উঠল। খালি মনে হতে লাগল কবে গিয়ে সেই বিরাট মনীষীর শ্রীচরণ দর্শন করে আসব। একদিন সে সুযোগ ঘটে গেল।

সঙ্গীও কয়েকজন জুটে গেল। বেশ কয়েকজন মিলে হৈহৈ করতে করতে আমরা বোলপুরে গেলাম। আমাদের দলে ছিল প্রেমাঙ্কুর আতর্থী, চারু বন্দ্যোপাধ্যায়, ও চারু রায়। গিয়ে উঠলাম 'গেস্ট হাউসে'।

ভোর সাড়ে চারটায় সময়—তখনও আমাদের ভালো করে ঘুম ভাঙেনি। চারু বন্দ্যোপাধ্যায় এসে আমাকে ঘুম থেকে তুলে দিয়ে বললেন, এই, যদি গুরুদেবের কবিতা পাঠ শুনতে চান তো চলে আসুন।

আমার চোখে তখন ঘুম জড়িয়ে রয়েছে। বললাম, এত ভোরে?

চারু বন্দ্যোপাধ্যায় বললেন, হ্যাঁ—হ্যাঁ। ভারতের ঋষিদের সামগান শুনতে এবং দেখতে চান তো উঠে আসুন, এ সুযোগ জীবনে বার বার আসে না।

আমরা সকলে উঠে গেলাম চারুবাবুর সঙ্গে। গিয়ে দেখি, সত্যিই সেটা একটা স্মরণীয় দৃশ্য। কয়েকটি আশ্রমের ছাত্রীকে ডেকে নিয়ে নিজের রচনা পড়ে শোনাচ্ছেন গুরুদেব। বাইরে তখনও অন্ধকার, দূর-দিগন্তে উষার অবগুন্ঠন-উন্মোচনের আভাস পাওয়া যাচ্ছে। মাথার উপরে শুকতারাটি জ্বলজ্বল করছে। ঘর অন্ধকার। মধ্যে একটি সেজবাতির নীচে বসে গুরুদেব তাঁর উদাত্ত সুরেলা কণ্ঠে কবিতা পাঠ করে চলেছেন আর সঙ্গে সঙ্গে বুঝিয়ে দিচ্ছেন। এ অভিজ্ঞতা এবং অনুভূতি মনের মধ্যে চিরকাল সঞ্চয় করে রাখার মত।

আমরা সবাই বসলাম সেখানে নিঃশব্দে। বহুক্ষণ পর গুরুদেব যখন তাঁর পাঠ শেষ করলেন, তখন সোনালি রোদে ঘর ভরে গিয়েছে।

১৯১৫ সালে রিপন কলেজ (বর্তমান সুরেন্দ্রনাথ কলেজ) থেকে আমি বি-এ পাশ করি। সে সময় আমাদের কলেজের অধ্যক্ষ ছিলেন রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী। 'পুরাতন কথা'র লেখক বিপিনবিহারী গুপ্ত আমাদের অধ্যাপক ছিলেন। রামেন্দ্রসুন্দর অবশ্য আমাদের কোনো ক্লাসই নিতেন না।

বি-এ পাশ করার পর আমার ঝোঁক হল একটা ছাপাখানা শুরু করার, কিন্তু এজন্যে তো টাকার দরকার। বাবাকে এ কথাটা বলতেই বাবা রাজী হয়ে গেলেন এবং তাঁর অনুমতি নিয়ে আমি আমহার্স্ট স্ট্রীটে 'মডার্ন ইণ্ডিয়া প্রেস' নাম দিয়ে একটি ছাপাখানা আরম্ভ করে দিলাম। আর সেই সঙ্গে ল' কলেজে আইন পড়াও চলতে লাগল। কিন্তু কিছুদিন পরে দেখা গেল যে ল' কলেজে পড়া আর ছাপাখানা দেখাশোনা করা, দুটো কাজ একসঙ্গে চালানো আমার পক্ষে সম্ভব হচ্ছে না, দুদিকেই অসুবিধে হতে লাগল।

এর মধ্যে বাবা রায়বাহাদুর এম, সি, সরকার এণ্ড সন্স নামে একটি পুস্তকালয় প্রতিষ্ঠা করেছিলেন, সে ভারও আমার ওপরেই এসে পড়ল। ছাপাখানা, দোকান এবং ল' কলেজে আইন পড়া এই তিনটি কাজে হাবুডুবু খেতে লাগলাম। দোকানে পিতার নামের সঙ্গে 'রায় বাহাদুর' যুক্ত হওয়ার কারণ হলো যে পিতৃদেব এই সময় এই উপাধি লাভ করেন। আমি তখন বাধ্য হয়ে ছাপাখানা দেখা এবং আইন পড়া দুটোই স্থগিত রেখে একমাত্র দোকানের পরিচালনাতেই মন দিলাম। আমাদের দোকানটি তখন ৯০।২এ হ্যারিসন রোড থেকে ৭৫।১।১ হ্যারিসন রোডে (কলেজ স্ট্রীট জংশনে) ওয়াই, এম, সি, এ বিল্ডিং-এ উঠে এল। সেই থেকে সম্পূর্ণ দোকানের ভার আমার ওপরই আজ পর্যন্ত রয়ে গেছে।

আমরা যখন কলেজের ছাত্র—অর্থাৎ ১৯১০-১৪ সালে তখন ব্রাহ্মধর্মের নামডাক তরুণ মনের ওপর যথেষ্ট প্রভাব বিস্তার করেছিল। তারপর কলেজ ছাড়বার পরও সে প্রভাবটা শিগ্গীর কাটিয়ে উঠতে পারিনি। তারপর আমার প্রিয় বন্ধুদের মধ্যে অনেকেই ছিল ব্রাহ্ম—যেমন অমল হোম, প্রেমাঙ্কুর আতর্থী, কেদার চট্টোপাধ্যায়, প্রভাত গঙ্গোপাধ্যায় প্রভৃতি।

এঁদের সঙ্গে প্রায়ই যেতাম সাধারণ ব্রাহ্ম সমাজে গান শুনতে। খুব ভাল লাগত সে পরিবেশটি। এই সময় একটি মেয়ের সঙ্গে আলাপ হয় আমার। মেয়েটিকে আমার এত ভালো লেগে গেল যে ঠিক করলাম তাকেই বিয়ে করব। তাতে যদি ধর্মত্যাগ করে ব্রাহ্মধর্ম গ্রহণ করতে হয় তাতেও কোনো আপত্তি নেই।

মনের যখন এইরকম অবস্থা তখন বাবা কি রকম করে ব্যাপারটা টের পেলেন। মুখে কিছু বললেন না বটে, কারণ তিনি ছিলেন অত্যন্ত স্বল্পভাষী—কিন্তু তলে তলে আমার বিয়ে ঠিক করে বসলেন। বাবার বিরুদ্ধে আমরা কোনকালেই কেউ কোনো কথা বলতে পারিনি—এ ক্ষেত্রেও পারলাম না। বাবার ঠিক-করা মেয়েকেই বিবাহ করলাম। প্রথমে খুব মন ক্ষুণ্ণ হলেও পরে কিন্তু বাবার নির্বাচিত মেয়েটিই আমার জীবনে এনে দিয়েছিল সুখ, শান্তি এবং সমৃদ্ধি।

আমার বিবাহ হয় পাবনায় ১৯১৫ সালে। আমার বয়স তখন ২৩, আর আমার স্ত্রীর বয়স সাড়ে তের। আমার স্ত্রীর প্রথমে নাম ছিল যোগমায়া। এঁর বাবা অর্থাৎ আমার শ্বশুরমশায় ছিলেন আসামের 'একস্ট্রা অ্যাসিস্ট্যান্ট কমিশনার' অর্থাৎ সোজা কথায় বাংলাদেশে যাকে বলা হয় ডেপুটী ম্যাজিস্ট্রেট।

যোগমায়া নামটি কিন্তু আমার দিদি অর্থাৎ কাদম্বিনী দেবীর কেন জানি না, পছন্দ হল না—তিনি নাম দিলেন সুলেখা এবং এই নামটিই বরাবর রয়ে গেল। যোগমায়া নামটি ক্রমশ বিস্মৃতির গর্ভে লীন হয়ে গেল।

তখনকার দিনের হিসেবে লেখাপড়া তিনি ভালই জানতেন, তবে অঙ্কটা তিনি সত্যিই ভাল জানতেন—বাড়ীর ছোট ছোট ছেলেদের নিজেই অঙ্ক দেখাতেন। সত্যিকার সহধর্মিণী বলতে যা বোঝায় সুলেখা ছিলেন আমার তাই। সাড়ে তের বছর বয়সে তিনি আমাদের সংসারে আসেন। সেই থেকে তাঁর জীবনের শেষদিন পর্যন্ত আমার কাছ ছাড়া তিনি কোথাও থাকেননি। পিত্রালয়ে পর্যন্ত অত্যন্ত প্রয়োজন না হলে কখনও যেতেন না। সকল রকম বিপদআপদে তিনি আমার সাহায্য করতেন এবং পাশে এসে দাঁড়াতেন। আমার প্রতি তাঁর ভালবাসা যে কি গভীর ছিল তার পরিচয় আমি পেয়েছি একাধিকবার। কতবার দেখেছি সাংসারিক বা ব্যবসায়িক কোন কোন বিষয়ে আমার মন যখন অত্যন্ত বিক্ষুব্ধ এবং উত্তেজিত, তখন সুলেখার সাহচর্য, সান্ত্বনা ও সহানুভূতি আমাকে দিয়েছে নতুন প্রেরণা ও নতুন মনোবল। তাঁর ভালবাসার মধ্যে উচ্ছ্বাস ছিল না, ছিল না প্রগল্ভতা—কিন্তু ছিল একটি শান্ত সুন্দর কল্যাণী রূপ যা অপরিসীম স্নেহ ও মমতায় পূর্ণ করে রেখেছিল আমাদের বিবাহিত জীবনের ৪৩টি বছর।

১৯৫৮ সালে যখন তাঁকে কঠিন ব্যাধিতে আক্রমণ করল, তখন আমি হয়ে গেলাম দিশেহারা। আপ্রাণ চেষ্টা করলাম—যেমন করে হোক, যেভাবে হোক, সুলেখাকে বাঁচিয়ে তুলতেই হবে। কিন্তু বহু চেষ্টা করেও ওঁকে ধরে রাখা গেল না। মহাকালের চিরন্তন আহ্বানে তাঁকে সাড়া দিতেই হলো।

নন্দোদার অন্তরটি ছিল অত্যন্ত কোমল। তাঁর কাছে কোন লোক, আত্মীয় অনাত্মীয় সেই হোক, কিছু চাইলে তিনি ফিরিয়ে দিতে পারতেন না। এমনি ছোটখাটো দান-ধ্যান তাঁর অনেক ছিল। কত লোককে যে সে টাকাকড়ি দিয়েছিলেন তিনি তা আমারো জানা ছিল না। তাঁর মৃত্যুর পর অবশ্য অনেকে আমাকে সে টাকা ফেরৎ দিতে এসেছিল, কিন্তু আমি তাঁর স্মৃতির অবমাননা করিনি। আমি তাদের বলেছিলাম —যদি সত্যিই কারুর ঋণ শোধ করার ইচ্ছে থাকে তবে এই টাকাটা যেন কোন কল্যাণকর প্রতিষ্ঠানে দিয়ে দেয়।

আমার নন্দা রায়বাহাদুর সুবোধচন্দ্র মজুমদার ছিলেন হাইকোর্টের স্পেশাল রেজিস্ট্রার, পরে হন ছোট আদালতের হাকিম। অন্যের লেখা আইন পুস্তকগুলি ইনি নতুন করে সম্পাদনা করে পরিবর্তন, পরিমার্জন ও পরিবর্ধন করে পুনর্মুদ্রণ করেন। নিজের প্রকাশনা সংস্থার মাধ্যমে। তিনি নিজেও কয়েকখানি আইন পুস্তক লিখেছিলেন। সাংসারিক ব্যাপার নিয়ে তাঁর সঙ্গে আমার একবার দারুণ মনোমালিন্য হয় এবং ব্যাপারটা প্রায় আদালত পর্যন্ত গড়ায় আর কি! কিন্তু পরে নিজেদের মধ্যেই একটা আপোষ-মীমাংসা হয়ে গেল। আর এই আপোষটা সম্ভব হয়েছিল রামকৃষ্ণ মিশনের গণেন্দ্রনাথ ব্রহ্মচারী মহারাজের মধ্যস্থতায়।

বেশ কিছুদিন থেকেই নন্দা চক্ষুরোগে কষ্ট পাচ্ছিলেন—শেষে তিনি ঠিক করলেন যে বিলেতে গিয়ে চোখ অপারেশন করবেন। আমি দেখলাম, এ একটা মস্ত সুযোগ বিদেশ ভ্রমণের। আর এদিকে তখন আমাদের মধ্যে বিরোধের মেঘ কেটে গিয়ে আবার সৌহার্দ্য ফিরে এসেছে। আমিও এই সুযোগটা ছেড়ে না দিয়ে ভিড়ে গেলাম নন্দার সঙ্গে। পরে এই বিলাত ভ্রমণ সম্বন্ধে কিছু বলব।

চোখ অপারেশন তাঁর সেখানে ভালই হলো। তিনি দেশে ফিরে এলেন। তারপর গত বৎসর তিনি লোকান্তর গমন করেছেন। মৃত্যুকালে তাঁর বয়স হয়েছিল প্রায় আশী বছর। তিনি সুসাহিত্যিক ও রাজনীতিবিদ ছিলেন এবং জীবনের শেষদিন পর্যন্ত এইসব বিষয়ে আগ্রহ প্রকাশ করে গেছেন।

১৯১৪-১৮ সালে প্রথম মহাযুদ্ধের সময় থেকেই আমার মনে হয় বাংলা পুস্তক ব্যবসায়ের নতুন অধ্যায়ের শুরু হয়। সেই ধারাই এখনও বজায় আছে এবং ১৯৪৭ সালে ভারত স্বাধীনতালাভের পর থেকে আরও স্ফীত হয়েছে।

এর পর ১৯২৯ সালে হ্যারিসন রোড থেকে দোকান প্রেসিডেন্সী কলেজের সামনে অ্যালবার্ট হলের নীচে উঠে আসে। এই ঘরটি কি করে পাই সে সম্বন্ধে কয়েকটা কথা বলা দরকার।

অ্যালবার্ট হলের নীচে যে ঘরটি আমরা পেয়েছিলাম তা ছিল একজন প্রচুর বিত্তশালী প্রকাশকের। তাঁদের দোকানটা দেনার জন্য বন্ধক ছিল এলাহাবাদ ব্যাঙ্কের কাছে। কিন্তু রাজশেখর বসু মহাশয়ের জামাতা অমরনাথ পালিতের সাহায্যে এলাহাবাদ ব্যাঙ্কের কাছ থেকে ৮০০ টাকায় প্রথমে ঐ ঘরের যাবতীয় আসবাবপত্র কিনে নিই। কিন্তু ঘরের দখল পেলাম না। কয়েকজন প্রভাব ও বিত্তশালী পুস্তক-ব্যবসায়ীর জন্য অ্যালবার্ট ইন্সটি-টিউটের কর্তৃপক্ষ ঘরটির দখল আমাদের দিতে রাজী না হওয়ায় আমি তখন সুভাষচন্দ্র বসু ও সুরেশচন্দ্র মজুমদারের শরণাপন্ন হই। সুরেশবাবু ভার নিয়েছিলেন যে যেমন করে হোক তিনি সুভাষবাবুকে বলে এই ঘরটি আমাদের পাইয়ে দেবেন। সুভাষবাবু এই ইনস্টিটিউটের একজন ট্রাস্টী ছিলেন। ট্রাস্টিদের একটি মিটিং-এ ঘরটি আমাদের দেওয়া হবে কিনা এ সম্পর্কে বেশ জোরালো আলোচনা হয়। সেদিন সুভাষবাবু সারাদিনই অনেকগুলি সভার কাজে অত্যন্ত ব্যস্ত থাকায় তিনি যখন এই সভায় এসে পৌঁছুলেন তখন ট্রাস্টিদের এই মিটিং প্রায় শেষ হয়-হয়। তিনি এসে আমাদের পক্ষে ভোট দিয়ে দোকানঘরটি আমাদের দেওয়ার ব্যবস্থা করে দিলেন। তাঁর ভোটটি না পেলে কিন্তু দোকানঘরটি আমাদের পক্ষে পাওয়া খুব মুস্কিল হতো। ১৯২৯ সাল থেকে ১৯৩৯ সাল অবদি এই ঘরে থাকার পর কতকগুলি অনিবার্য কারণের জন্য আমরা বঙ্কিম চাটুজ্যে স্ট্রীটের এই বর্তমান ঘরটিতে উঠে আসি। আমরা প্রথমে শুধু আইনের পুস্তকাবলীরই প্রকাশক ছিলাম। তারপর শরৎচন্দ্র, চারুচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়, মহেশ সোমদত্তের বিশুদ্ধ বাংলা উপন্যাস প্রকাশ করি। তারপর ১৯৩৩ সাল থেকে পুরোপুরি বাংলা পুস্তকপ্রকাশক হিসাবে পরিচিতি লাভ করি।

প্রথম মহাযুদ্ধ শেষ হবার কয়েক বছরের মধ্যে প্রবাসী, ভারতবর্ষ, ভারতী, সাহিত্য, মানসী ও মর্মবাণী, যমুনা ইত্যাদি কয়েকটি শ্রেষ্ঠ মাসিক পত্রিকার আসর খুব জমে উঠেছিল। সাহিত্যক্ষেত্রে তখন শরৎবাবু এসে গেছেন, অনুরূপা দেবী 'সাহিত্য-সম্রাজ্ঞী' হয়েছেন। আর নিরুপমা দেবী, জলধর সেন, চারুচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়, সৌরীন্দ্রমোহন মুখোপাধ্যায়, প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায়, হেমেন্দ্রকুমার রায়, নরেশচন্দ্র সেনগুপ্ত প্রভৃতি সাহিত্যিক হিসাবেও যেমন খ্যাতিলাভ করেছেন, আর এঁরা বাংলা উপন্যাসজগতের আসরও বেশ জমিয়ে তুলেছেন। কিন্তু এত নাম উল্লেখ করা সত্ত্বেও উপন্যাসের প্রচার আজকালকার মত এত বিস্তৃতি লাভ করেনি।

নামজাদা লেখকদের উপন্যাসই হাজার কপির বেশী ছাপা হতো না। পাঁচশো কপি বই কাটতেই সময় লাগত কয়েক মাস, তারপর অবশিষ্ট সংখ্যা বিক্রি হতে বেশ কিছুদিন সময় লাগত। কারণ শিক্ষিতের সংখ্যাও তখন যেমন কম ছিল তেমনি বই-কিনে-পড়া পাঠকের সংখ্যা ছিল ততোধিক কম। সেইজন্য এক-একজন লেখকের পুস্তকের সংস্করণ হতে বেশ সময় লাগত। তখন কোনো বই-এর দাম ৩।৩৷৷৹ হলেই খুব বেশী মনে হতো। বিক্রি না হবার ভয়ে প্রকাশকরা বেশী দামের বই প্রকাশ করতে সাহসী হতেন না। আমার মনে আছে যে শরৎচন্দ্রের 'চরিত্রহীন'-এর প্রকাশক ছিলাম আমরাই এবং এইরকম একখানি সুবৃহৎ পুস্তকের দাম তিন টাকা হবে কি সাড়ে তিন টাকা হবে এই নিয়ে শরৎবাবুর সঙ্গে আমাকে দীর্ঘদিন ধরে আলোচনা করতে হয়েছিল।

বর্তমানে একখানা উপন্যাসের দাম এসে ঠেকেছে ৩০্ টাকায়। শুধু উপন্যাস কেন, অন্যান্য বিষয়ের বই-এর দামও খুব বেড়েছে। অবশ্য এখন পুস্তকপ্রকাশের নানাবিধ খরচ, যেমন ছাপা, বাঁধাই, কাগজ, ব্লক সব জিনিসেরই দাম আগের থেকে বহুগুণে বৃদ্ধি পেয়েছে। তার উপর মুদ্রামূল্য হ্রাসও একটি কারণ। ফলে এখন অনেক বই বেরুচ্ছে যা খুব ভাল এবং চটকদার হওয়া সত্ত্বেও সাধারণ ইচ্ছুক পাঠকের ক্রয়ক্ষমতার বাইরে চলে গিয়েছে। তবে একটা সুখের বিষয় যে বর্তমানে লাইব্রেরীর সংখ্যা অনেক বেড়েছে এবং সেই সঙ্গে বেশী দামের বইয়ের চাহিদাও বেড়েছে। তাই দ্বিতীয় যুদ্ধ ও স্বাধীনতাপ্রাপ্তির পর আজকাল দেখতে পাই, পুস্তকপ্রকাশক বা সাহিত্যিকদের জীবন-যাত্রা উচ্চমানে গিয়ে ঠেকেছে।

(ক্রমশঃ)

শুভংকর

বিজ্ঞানে একটি নতুন দিগন্ত : বায়ো ইঞ্জিনীয়ারিং

বিজ্ঞানের দ্রুত প্রগতির ফলে আজ ভৌগোলিক সীমারেখা যেমন সংকুচিত হয়ে আসছে, বিজ্ঞানের বিভিন্ন শাখার স্বাতন্ত্র্যের গণ্ডীও তেমনি বিলীন হতে চলেছে। এক সময় পদার্থবিজ্ঞান, রসায়ন, জীববিজ্ঞান, চিকিৎসাবিজ্ঞান, যন্ত্রবিজ্ঞান ইত্যাদি নিজেদের স্বাতন্ত্র্য রক্ষা করে চলত এবং তাদের মধ্যে যোগসূত্র তেমন খুঁজে পাওয়া যেত না। কিন্তু আজ বিজ্ঞানের বিভিন্ন শাখা পরস্পর-নির্ভরশীল। তার ফলে চিকিৎসা ও জীববিজ্ঞানের ক্ষেত্রে যন্ত্রবিজ্ঞানের একটি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকার সম্ভাবনা দেখা দিয়েছে।

আমরা কথায় বলি 'দেহযন্ত্র'। বস্তুত মানুষের দেহ যন্ত্রের মতই কাজ করে। মানুষের বিবিধ অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের ক্রিয়াকলাপ যান্ত্রিক কলাকৌশলের অনুরূপ। যান্ত্রিক রীতিনীতির সঙ্গে মানুষের দেহযন্ত্রের কার্যকলাপের এই সাদৃশ্য আবিষ্কার কিন্তু আজকের মানুষের নয়। বহু শতাব্দী পূর্বেই লিও দ্য ভিঞ্চি প্রমুখ মনীষীরা এই অভিনব বৈশিষ্ট্যের সন্ধান পেয়েছিলেন। ভিঞ্চি ছিলেন একাধারে চিত্রশিল্পী, যন্ত্রবিদ, জীববিজ্ঞানী তথা দার্শনিক। প্রাচীন ভারতের মনীষীরাও বৈচিত্র্যের মধ্যে ঐক্যের সন্ধান করেছিলেন। অ্যারিস্টটল (খৃঃ পূঃ ৩৮৪—৩২৭) জীবের চলৎশক্তি সম্পর্কে বিশেষভাবে চিন্তা করেছিলেন এবং জ্যামিতিকভাবে এই কার্যকলাপ বিশ্লেষণের চেষ্টা করেন। তবে এ বিষয়ে প্রকৃত গবেষণা করেন সর্বপ্রথম লিও দা ভিঞ্চি (১৪৫২—১৫১৯) এবং তাঁর 'মানবদেহের নথিপত্র' শীর্ষক গবেষণা নিবন্ধে তা লিপিবদ্ধ করে যান। এর পর ভার্জোলিয়াশ বৈজ্ঞানিকভাবে সর্বপ্রথম মানুষের দেহ ব্যবচ্ছেদ করেন। তিনি আধুনিক অঙ্গ-ব্যবচ্ছেদবিদ্যা ও শারীরবৃত্তের প্রতিষ্ঠাতা এবং ১৫৪৩ খৃষ্টাব্দে প্রকাশিত মানবদেহের গঠন সংক্রান্ত তাঁর গবেষণা বিজ্ঞানের ক্ষেত্রে একটি নতুন অধ্যায় রচনা করেছিল। এর পর সপ্তদশ শতাব্দীতে আমরা ফলিত রসায়ন ও ফলিত পদার্থবিদ্যার অভ্যুদয় দেখতে পাই। ফলিত রসায়নবিদেরা মনে করতেন, মানবদেহের যাবতীয় কার্যকলাপ রাসায়নিক পদ্ধতিতে নিয়ন্ত্রিত হয়। পক্ষান্তরে ফলিত পদার্থবিদদের ধারণা ছিল, সমস্ত শারীরতাত্ত্বিক কার্যকলাপ হচ্ছে পদার্থবিদ্যার নিয়মাবলীর ফলশ্রুতি। শেষোক্ত দলের গিয়োভানি বোরেলি পেশীর লিভার-সদৃশ ক্রিয়ার প্রথম ব্যাখ্যাতা। রক্তসংবহনের আবিষ্কর্তা বৃটিশ চিকিৎসাবিজ্ঞানী উইলিয়াম হার্ভে জীববিজ্ঞানের ক্ষেত্রে গতিসূত্রের প্রবর্তন করেন। ঊনবিংশ শতাব্দীর প্রথমার্ধে ফরাসী শারীরবিজ্ঞানী জর্জ কিউভিয়ার সর্বপ্রথম মানবদেহের অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের গঠন ও ক্রিয়াকলাপের মধ্যে সম্পর্ক নির্ণয়ের চেষ্টা করেন। ১৮৫৯ খৃষ্টাব্দে চার্লস ডারউইন তাঁর যুগান্তকারী গবেষণা-গ্রন্থ 'প্রজাতির উৎপত্তি' প্রকাশ করেন। তিনি প্রমাণ করতে চেষ্টা করেন, উন্নততর ক্রিয়াকলাপ সম্পাদনের জন্যে প্রাণীদেহের গঠন পরিবর্তিত ও রূপান্তরিত হয়। এইভাবে তিনি তাঁর 'বিবর্তনবাদ' প্রতিষ্ঠা করেন। পদার্থবিজ্ঞানের ক্ষেত্রে এই তত্ত্বের অন্তর্নিহিত ধারণার প্রতিফলন দেখা যায়, যেখানে কোন উপকরণ, পদ্ধতি, যন্ত্র বা ডিজাইন উন্নততর সংশ্লিষ্ট বিষয়সমূহের দ্বারা বিবর্তিত হয়ে থাকে। বর্তমান যুগে আমরা দেখতে পাচ্ছি, পদার্থবিজ্ঞানী, রসায়নবিদ, যন্ত্রবিদ ও চিকিৎসকেরা জীব ও জড়ের মধ্যে গূঢ় সম্পর্ক অনুসন্ধানের জন্যে হাতে হাত মিলিয়েছেন। তার ফলে জীব-রসায়ন ও জীব-পদার্থবিদ্যার উদ্ভব হয়েছে এবং সাম্প্রতিককালে জীব-যন্ত্রবিদ্যা ও জীব-কারুবিদ্যার অভ্যুদয় হয়েছে।
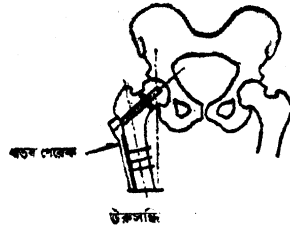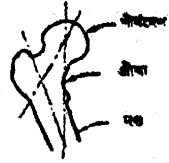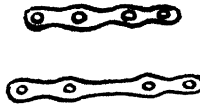
ঊরুসন্ধি

নিতম্ব - অস্থি ভঙ্গ সংস্কার

নিতম্ব - অস্থি

অস্থি - সংস্কারের জন্য ব্যবহৃত শেরম্যান প্লেট ও স্ক্রু

নিতম্ব - অস্থির শীর্ষদেশের ধাতব প্রতিস্থাপন

এখন দেখা যাক, জীব-যন্ত্রবিদ্যা ও জীব-বলবিদ্যা বলতে কি বোঝায়? যন্ত্রবিজ্ঞানের প্রণালী অবলম্বনে প্রাণীদেহ ও তার অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের পর্যালোচনাই হচ্ছে এই দুটি নবোদ্ভাবিত যন্ত্রবিদ্যার কার্যক্রম।

এখানে আমাদের আলোচনা শুধু মানবদেহ ও তার অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের মধ্যে সীমিত রাখা হবে।

অনেক দিক থেকে মানুষের দেহকে যান্ত্রিক অবয়বের সঙ্গে তুলনা করা যেতে পারে। মানুষের কংকাল হচ্ছে এমন একটি কাঠামো, যার ওপর রক্ত-মাংসের সমাবেশে দেহ গড়ে ওঠে। ঘরবাড়ীর কাঠামোর সঙ্গে কংকালের তুলনা করলে দেখা যাবে, মেরুদণ্ড হচ্ছে স্তম্ভের মত, ঘাড়ের হাড় ও পাঁজর হচ্ছে ঘরবাড়ীর কড়িকাঠ আর পায়ের হাড় হচ্ছে মাটিতে ভার বহনের মাধ্যম। এ ছাড়া আমাদের দেহ পারিপার্শ্বিকের সঙ্গে যান্ত্রিক কাঠামোর মত একইভাবে প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি করে। কাঠামোর অংশগুলি যেমন বল সঞ্চালন করে, আমাদের দেহের পেশীগুলিও তেমনিভাবে করে থাকে। তবে মানুষের দেহের ক্ষেত্রে এ সমস্তই হচ্ছে অধিকতর

জটিল ও সংবেদনশীল। তাছাড়া, কাঠামোর মত মানুষের দেহ ইচ্ছামাফিক নির্দেশ দিয়ে গড়ে তোলা যায় না। মানুষের দেহবৈশিষ্ট্যের চাবিকাঠি রয়েছে প্রকৃতির হাতে। মানুষের দেহের একটি উল্লেখযোগ্য বৈশিষ্ট্য হল দেহের ভারসাম্য রক্ষা। মানুষই একমাত্র প্রাণী যে দুটি পায়ের ওপর ভর দিয়ে ভারসাম্য না হারিয়ে সোজাভাবে দাঁড়িয়ে থাকতে ও চলাফেরা করতে পারে।

মানবদেহের কাঠামোগত আচরণ দুটি উদাহরণের সাহায্যে ব্যাখ্যা করা যেতে পারে ঃ (১) মেরুদণ্ডের ওপর ভারের প্রতিক্রিয়া। কোন কাঠামোর স্তম্ভের ওপর ভারী ওজন চাপালে যে রকম প্রতিক্রিয়া হয় মানুষের মেরুদণ্ডের ওপর ভারের প্রতিক্রিয়াও প্রায় সেই রকম। মেরুদণ্ডের ওপর ভারের প্রতিক্রিয়া নানা কারণে হতে পারে, তার মধ্যে প্রধান হচ্ছে ত্বরণজনিত প্রতিক্রিয়া। বিমান যখন দ্রুতগতিতে চলে, তখন ত্বরণজনিত প্রতিক্রিয়া বিশেষভাবে অনুভূত হয়। দ্রুতগতিতে ধাবমান বিমান থেকে সংকটকালে চালক যখন বেরিয়ে আসার চেষ্টা করেন, তখন তাঁর মেরুদণ্ড ভেঙে যায়। যদিও ক্ষণকালের জন্যে এই প্রতিক্রিয়া মানবদেহে অনুভূত হয়, কিন্তু তার ফল হয় মারাত্মক। (২) কঙ্কাল-পেশীর আচরণ মানবদেহের পেশীসমূহ টান-উপাদানের মত কাজ করে এবং পেশীর ক্ষেত্রে কাঠামোতত্ত্বের মূল সূত্রগুলি (যেমন পয়সন্ ক্রিয়া, হুক্স্ সূত্র) প্রায় একইভাবে প্রযোজ্য হয়। ১৯৬২ সালে বিজ্ঞানী নিউবার পেশীর স্থিতিস্থাপকতা ইত্যাদি আচরণ ব্যাখ্যা করার জন্যে গুরুত্বপূর্ণ তত্ত্বগত গবেষণা করেন। তার ফলে যান্ত্রিক প্রতিক্রিয়ার সঙ্গে মানুষের পেশীর আচরণের অনেকখানি সৌসাদৃশ্য উপলব্ধি করা গেছে। একক পেশীর ওপর সম্পাদিত রামজের পরীক্ষার দ্বারা নিউবারের তত্ত্ব সমর্থিত হয়েছে।

এখন পর্যন্ত পেশীর আচরণ সংক্রান্ত গবেষণা একক পেশীর ক্ষেত্রেই সীমিত আছে। কিন্তু জীবন্ত মানুষের দেহে কোন পেশীই এককভাবে কাজ করে না। এমন কি পেশীর সরলতম সঞ্চালনও একাধিক পেশীর যৌথ ক্রিয়ায় সম্পাদিত হয়ে থাকে, যদিও অনেকগুলির ক্রিয়া সহজে বা দেওয়া যায়। আংশিক পক্ষাঘাতের ক্ষেত্রে এই ব্যাপারটি স্পষ্টতত উপলব্ধি করা যায়। এক্ষেত্রে পক্ষাঘাতগ্রস্ত পেশীর ক্রিয়া অক্ষত অবস্থায় পেশীগুলির দ্বারা সম্পূর্ণভাবে সাধিত হয়ে থাকে। তাহলে প্রশ্ন ওঠে, জীবন্ত-উপকরণে এই অপচয় কেন? যন্ত্রবিদদের মতে এর একমাত্র ব্যাখ্যা হচ্ছে, আঘাতের বিরুদ্ধে নিরাপত্তা বিধানের এটিই প্রাকৃতিক উপায়। কিন্তু এটি সাধারণ নিয়ম হলেও দেহের সর্বত্র এই নিয়ম একভাবে খাটে না, কিছু তারতম্য ঘটে। এ থেকে উপলব্ধি করা যায়, মানুষের দেহকে আমরা যতটা ত্রুটিমুক্ত মনে করি আসলে ততটা নয়।

বর্তমান যুগ মূলত যান্ত্রিক যুগ। এই যুগে যন্ত্র ও মানুষের সম্পর্ক ঘিরে নানা সমস্যা দেখা দিয়েছে। যন্ত্র সম্পর্কে মানুষের দেহ দুভাবে সাড়া দিয়ে থাকে। একটা হচ্ছে কম্পনজনিত, এবং অপরটি আঘাতজনিত। যন্ত্র সৃষ্ট শব্দ ও কম্পনের দ্বারা অনেক সময় হৃৎপিণ্ড ও টিস্যু ক্ষতিগ্রস্ত হয়। দ্বিতীয় ক্ষেত্র অর্থাৎ দুর্ঘটনার ফলে আঘাতের ক্ষেত্রে যন্ত্রবিদেরা চিকিৎসকদের প্রভূত সাহায্য করতে পারেন। অস্থি সংস্কার বা প্রতিস্থাপন যাই হোক না কেন, কাঠামো হিসাবে দেহ সম্পর্কে একটা প্রাথমিক জ্ঞান একান্ত প্রয়োজনীয়। যেখানে পথে-ঘাটে দুর্ঘটনার হার খুবই বেশী, সেখানে দুর্ঘটনাগ্রস্তদের কষ্ট লাঘবের জন্যে শল্যচিকিৎসক ও যন্ত্রবিদদের পারস্পরিক সহযোগিতা বিশেষ প্রয়োজন।

এই ব্যাপারে যন্ত্রবিদেরা কিভাবে সাহায্য করতে পারেন তা একটি উদাহরণ দিলে সহজে বোঝা যাবে। বয়স্ক লোকেদের মধ্যে নিতম্ব-অস্থির গ্রীবাভঙ্গ প্রায়ই ঘটে। আজকাল এই ধরনের অস্থিভঙ্গ ধাতব পেরেকের সাহায্যে সংস্কার করা হয়। এখানে পেরেক দুটি কাজ সম্পাদন করে। প্রথমত নিতম্ব-অস্থির আলগা শীর্ষদেহকে অবশিষ্টাংশের সঙ্গে এঁটে রাখে। দ্বিতীয়ত নিতম্ব-অস্থির গ্রীবার পরিবর্তে বলসঞ্চালক হিসাবে কাজ করে, যতদিন পর্যন্ত না অস্থিভঙ্গ জুড়ে যায়। কি ধরনের পেরেক প্রস্তুত করা হবে তা স্থির করতে হলে নিতম্ব-অস্থির গ্রীবা বাহিত ও উরু-সন্ধি সঞ্চালিত বলসমূহের বিষয় আগে চিন্তা করতে হবে। এই উরু-সন্ধি যন্ত্রবিদদের সুপরিচিত 'বল ও সকেট' সন্ধি ছাড়া আর কিছুই নয়। কাজেই এ বিষয়ে যন্ত্রবিদদের সহযোগিতা বিশেষভাবে অনুভূত হয়।

মানুষের দেহাভ্যন্তরে অস্থি-ভঙ্গ সংস্কারের যে ধাতব দ্রব্য ব্যবহার করা হয় তা এমন উপাদানে প্রস্তুত হওয়া উচিত যা হবে দেহজ তরল, টিস্যু, পেশী ও অস্থির প্রতি চুম্বকত্বহীন, বিদ্যুৎহীন ও মরিচাবিহীন। এক্ষেত্রে নিষ্কলঙ্ক ইস্পাত এবং কোবাল্ট-ক্রোমিয়াম-মলিবডিনাম মিশ্র ধাতু সবচেয়ে উপযোগী বলে দেখা গেছে। তবে ইস্পাতের একটা অসুবিধা হচ্ছে ওজনে ভারী এবং সেজন্যে দেহের মধ্যে বয়ে নিয়ে বেড়ান অস্বস্তিকর। ইস্পাতের পরিবর্তে 'অ্যাক্রিলিক' জাতীয় হাল্কা উপাদান ব্যবহার করা যায় কিনা তা নিয়ে এখন গবেষণা চলছে। ধাতব দ্রব্য ছাড়া বিশেষ ধরনের আঠাও অস্থি-ভঙ্গ সংস্কারে ব্যবহার করা যেতে পারে।

মানবদেহের রোগদুষ্ট বা ক্ষতিগ্রস্ত অংশের সংস্কার অপেক্ষা তার প্রতিস্থাপন নিয়েই শল্যচিকিৎসকেরা এখন বেশী মাথা ঘামাচ্ছেন। যন্ত্রের মত মানুষের দেহেও এক বিকল্প অংশ (স্পেয়ার পার্টস) ব্যবহার করা যেতে পারে তার প্রথম প্রমাণ পাওয়া যায় কৃত্রিম দাঁতের ব্যবহারে। কিন্তু এখন দাঁত ছাড়িয়ে দেহের অন্যান্য অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের ক্ষেত্রেও পরীক্ষা-নিরীক্ষা চলছে। যে সব যন্ত্রবিদেরা মানুষের অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের প্রতিস্থাপক অংশের পরিকল্পনা ও প্রস্তুতের চেষ্টা করছেন, তাঁদের কাছে বড় সমস্যা হল মানুষের দেহের ক্রিয়াকলাপ যান্ত্রিকরূপে কি করে যথাযথ বিকল্প গড়ে তোলা যায়। উপযুক্ত উপকরণ, বাস্তবধর্মী কারু জ্ঞান এবং বিকল্প অংশের ক্ষুদ্ররূপ নির্মাণের অক্ষমতার দরুণ এতদিন পর্যন্ত এই সমস্যার প্রকৃত সমাধান হয় নি।

কিন্তু এখন অবস্থার পরিবর্তন ঘটেছে। বহুবিধ সংশ্লেষিত উপাদান এখন সহজলভ্য হয়েছে এবং প্রযুক্তিবিদ্যারও প্রভূত উন্নতি হয়েছে। তার ফলে আজ শল্যচিকিৎসক ও জীব-যন্ত্রবিদেরা মানুষের অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের হুবহু বিকল্প নির্মাণে সমর্থ হয়েছেন। আকার ও কার্যকারিতার দিক থেকে স্বাভাবিক অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের সঙ্গে এই বিকল্প অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের সৌসাদৃশ্য এত নিবিড় যে, অধিকাংশ ক্ষেত্রে মানবদেহের যথাস্থানে সেগুলিকে প্রতিস্থাপন করা যায়। একবার প্রতিস্থাপনের পর আর কোন সমস্যা দেখা যায়না, স্বাভাবিকভাবেই কাজ চলতে থাকে। এই ধরনের বিকল্প অঙ্গপ্রত্যঙ্গ এখন বহু নির্মিত হয়েছে, যেমন ধাতব বা মৃন্ময় নিতম্ব-অস্থি, ড্যাক্রন ধমনী, প্লাস্টিক নেত্রগোলক ও অচ্ছোদ পটল, সিলিকোন রাবারের হৃৎপিণ্ড-কপাটক ও শ্বাসনালী, প্লাস্টিক হৃদ-পাম্প, কানের তরুণাস্থি ও কণ্ডরা।

চিকিৎসাবিজ্ঞানের ক্ষেত্রে বায়ো-ইঞ্জিনীয়ারিং বা জীব-যন্ত্রবিদ্যা যে অচিরে একটি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা গ্রহণ করবে তা আজ নিঃসন্দেহে বলা যায়। ইতিমধ্যে ইউরোপ ও আমেরিকায় এ বিষয়ে বহুদূর কাজ এগিয়ে গেছে। আমাদের দেশে বায়ো-ইঞ্জিনীয়ারিং কথাটি সবেমাত্র শোনা যাচ্ছে। বিশ্ববিদ্যালয়ের পাঠক্রমে এই বিষয়টি এখনও স্থান লাভ করতে পারে নি এবং এদেশে এ বিষয়ে কেউ গবেষণা করছেন বলে শোনা যায় নি। সম্প্রতি জনৈক তরুণ বাঙালী ইঞ্জিনীয়ার শ্রীসিদ্ধার্থ গঙ্গোপাধ্যায়ের সঙ্গে আলাপ হল, যিনি এ বিষয় নিয়ে মাথা ঘামাচ্ছেন এবং এদেশে বায়ো-ইঞ্জিনীয়ারিং সম্ভাবনা সম্পর্কে যিনি বিশেষ আশাবাদী। তাঁর কাছ থেকে এ বিষয়ে অনেক তথ্য আমরা জানতে পেরেছি। অস্থি-ভঙ্গ সংস্কারের কাজে ব্যবহৃত ধাতব পেরেক ও অন্যান্য উপকরণ দিল্লীতে একটি প্রতিষ্ঠান নির্মাণ করছেন এবং সরকারী ও বেসরকারী স্তরে অধিকাংশ অস্থি-চিকিৎসক তা ব্যবহার করেন। পুণায় স্থাপিত কৃত্রিম অঙ্গ কেন্দ্রে কৃত্রিম অঙ্গ-প্রত্যঙ্গাদি নির্মিত হয়। গোড়ার দিকে শুধুমাত্র সামরিক বিভাগের চাহিদা মেটাবার জন্যে এখানকার উপকরণ সরবরাহ করা হত। এখন বেসামরিক প্রয়োজনেও এঁরা কৃত্রিম অঙ্গপ্রত্যঙ্গ সরবরাহ করে থাকেন। সম্প্রতি কলকাতায় সুখলাল করনানী হাসপাতালে (পূর্বতন পি জি হাসপাতাল) একটি কৃত্রিম অঙ্গ প্রতিস্থাপন এবং ব্যবহারশিক্ষণ কেন্দ্র প্রতিষ্ঠার প্রস্তাব হয়েছে।

বীভৎস মাদক কোকেন

বনবিহারী মোদক

বহুদিন আগেকার কথা। বিশ্ববন্দিত
॥বিজ্ঞানী ফ্রয়েড তখনও স্বাধীন
ৎসা-ব্যবসা সুরু করেননি। ১৮৮৪
নর দুর্যোগময়ী এক শীতের সন্ধ্যায়
জন রোগী এল তাঁদের ক্লিনিকে।
রক্টার সেইনার্ট সাহেব তখন পানপাত্র
নে নিয়ে ভিতরের একটা কোঠায় একটু
য়শ করছিলেন। লোকটির সঙ্গে কথা
বার জন্যে অগত্যা ফ্রয়েডকেই সামনে
নয়ে আসতে হল।

দেখে কিন্তু রোগী বলে মোটেই মনে
না। রোদে পোড়া তামাটে রং; গাঁট্টা-
ট্টা চেহারা; সবল ও কর্কশ দুখানা
নবহুল হাত। চোয়াড়ে ও কর্কশ কথা-
র্তা। ফ্রয়েড অচিরেই বুঝলেন—লোকটি
বক, জাতে স্প্যানিয়ার্ড।

—'কি অসুখ?'

—'শরীরের ভেতরে ভয়ানক বালি ঢুকে
য়েচে, কর্তা।'

ফ্রয়েড চমকে উঠলেন। তীক্ষ্ম ও
াগ্র হয়ে উঠল তাঁর পর্যবেক্ষণ।

—'বালি ঢুকে গিয়েছে! সে কি! কি
র ঢুকল?'

—'ঐ শয়তান কোর্ডার কাজ, কর্তা।
ব মারপিট হয়েছিল তো......দিইচি
লাকে আচ্ছা করে......শুওরের বাচ্চারা
মাকে অজ্ঞান কোরে, চড়ায় ওপরে পাথরের
ঙ্গ বেঁধে, ভেগেছিল জাহাজ নিয়ে।'

—'বালি ঢুকল কি করে?'

—'ঢুকবে না? কত জায়গায় কেটে
য়েছিল! বালির ওপরে আমাকে ঠেসে
র শালারা আমাকে পাথর চাপা দিতে
য়েছিল যে। তখন তো জ্ঞান ছিল না
মার, নইলে—' ক্ষতের দাগগুলো ফ্রয়েড
রীক্ষা করে দেখলেন।

—'এ তো বহুদিন আগেকার কাটা।
লি কি এতদিন থাকতে পারে '

—'আরে ম'লো যা—।' খেঁকিয়ে উঠল
াকটা। 'বলছি এখনও বালি রয়েচে,
তরে নড়ে-চড়ে বেড়ায়। মাত্তর তো এই
ত জুলাইয়ের ব্যাপার...'

—'নড়ে-চড়ে বেড়ায়!' ফ্রয়েডের
ৌতূহল এইবার চরমে ওঠে।' কি রকম
াধহয়?'

—'আরে, এ-শালা তো দেখছি ঘোড়া'র
াক্তার!' (পরে কর্কশকন্ঠে মুখ ভেংচে)
করকম আবার বোধ হবে? মনে হয়—পোকা
ড়ে বেড়াচ্ছে।'

চিকিৎসাবিজ্ঞানের গবেষণায় সমর্পিত
াণ এই মহাসাধককে, বর্বর এই লোকটির
গছ থেকে অতঃপর আর কি কি গালাগাল
সদিন হজম করতে হয়েছিল, তার
বস্তারিত ইতিবৃত্ত আজ আর জানবার
উপায় নেই। ইতিহাস আজ শুধু এই তথ্য-
টুকুই স্মরণ রেখেছে যে—মানব-মনীষার
সত্যসন্ধানী ধ্যানদৃষ্টি, কোকেনের মাদক
গুণের বিচিত্রতম একটি লক্ষণের উপর
সেদিনই সর্বপ্রথম আলোকসম্পাত করতে
পেরেছিল। চিকিৎসাবিদ্যা তথা সমাজ-
বিজ্ঞানের মহামূল্যবান এই আবিষ্কারের
সঙ্গে জড়িয়ে রয়েছে স্বল্পজ্ঞাত আরেকজন
জ্ঞানতাপসের নাম—তিনি কার্ল কোলার।
এঁদের শ্রম ও অনুসন্ধিৎসার ফলশ্রুতি
হিসেবেই, উনিশ শতকের শেষ পাদ থেকে,
অস্ত্রোপচারের পূর্বে রোগীর দেহের শুধু
অংগ বিশেষকে অসাড় করার উপযোগী
অ্যানাস্থেটিক হিসেবে, অজ্ঞাতপূর্ব এই
মাদকটির বহুল ব্যবহার আরম্ভ হয়েছিল।

এ-বস্তুটি ব্যবহারের ভয়াবহ পরিণাম
সম্পর্কে নিঃসন্দেহ হতে, চিকিৎসাবিজ্ঞানের
আরও বহুদিন লেগেছিল। অদৃষ্টের নিষ্ঠুর
পরিহাসের মতো, ততদিনে কোকেন ইউ-
রোপের সর্বত্র অপরাধীদের পাতালপুরীতে
তার সমাদরের আসনটি পাকা করে নিয়েছে!
সে-ইতিবৃত্ত উপন্যাসের চেয়ে রোমাঞ্চকর।
এখন সেকথা থাক।

॥২॥

রূপবৈচিত্র্যময়ী বিরাট মহাদেশ দক্ষিণ
আমেরিকার বিরাট ভূখন্ডের পশ্চিমাংশে,
কালজয়ী মহিমায় অটল গাম্ভীর্য নিয়ে
দাঁড়িয়ে রয়েছে বিশ্বের প্রাচীনতম শৈল-
প্রাকার—আণ্ডিজ। সুদূরবিস্তারী এই
আগ্নেয় গিরিমালার সানুদেশে, পাঁচ হাজার
থেকে বারো হাজার ফিট পর্যন্ত উচ্চতায়,
শ্যামচিক্কণ শোভাময় একরকম ঝাঁকড়া গাছ
আপনি অজস্র দেখতে পাবেন। গাছটি
গুল্মজাতীয়, প্রায় আট ফিট উঁচু; ফ্ল্যাক্স
বা লাইনাম নামক যে জাতের গাছ থেকে
তন্তু পাওয়া যায়, দেখতে ঠিক তারই
মতো। ব্ল্যাকথর্ন বুশ নামক যে গুল্মটি
পাশ্চাত্যের পাহাড়ী জংলা জায়গায় সর্বত্র
দেখা যায়, চেহারায় তার সঙ্গেও এ গাছটির
বেশ মিল আছে। স্প্যানিশ ভাষায়
এর নাম 'কুইকুআ কোকা' ১; ইংরেজীতে
শুধু 'কোকা'। বহুল প্রচলিত পানীয়
কোকো-র সঙ্গে কিন্তু এই গাছ বা মাদকটির
কোনো সম্পর্ক নেই। উদ্ভিদ-বিজ্ঞানে এর
নাম Erythroxylum Coca। ডালপালা-
গুলো সব সোজা সোজা হয় বলে,
কোকাগাছ ভারি সুন্দর দেখায়।

এই গাছের পাতা দিয়েই তৈরী হয়
কোকেন। অতএব পাতাগুলোর একটু পরিচয়
নেওয়া যাক। বছরে তিনবার করে এ-গাছে
নতুন পাতা আসে। পাতাগুলো ডিম্বাকৃতি;
পাতলা; রং সতেজ সবুজ, অথচ চকচকে
নয়; ধারগুলো খাঁজকাটা। এ-পাতার
বৈশিষ্ট্য হল— ডাঁটিটার দু-পাশে লম্বালম্বি
দুটো বাঁকানো শিরা এবং তার মধ্যে ছোট্ট
একটা আব। শুকিয়ে যাবার পরও পাতা-
গুলো কুঁকড়ে যায় না, উপরের পিঠটা ঘন
সবুজই থাকে, উল্টো পিঠটা হয় ধূসর-
সবুজ। চায়ের গন্ধের মতো, কোকাপাতারও
বেশ একটা উগ্র ঘ্রাণ আছে। মুখে নিয়ে
চিবুলে ঝাল লাগে, মুখের ভেতরটা গরম
বোধহয়, বেশ আরাম লাগে।

কোকাগাছে পীতাভ সাদা রঙের ছোট্ট
ছোট্ট ফুল ধরে। ফুলগুলোর বোঁটা ছোট,
পাপড়ি থাকে পাঁচটা করে। থোকা থোকা
ফুল ফোটে। ফুলে ফুলে গাছগুলো প্রায়
ঢেকে যায়; পাহাড়ের তরাইয়ের দিগন্ত-
ছোঁয়া ক্রম-নিম্ন অঞ্চলে একমাত্র এই ফুলের
বর্ণ-সমারোহ ছাড়া আর কিছুই তখন চোখে
পড়ে না। শেষ হেমন্তের ম্লান ধূসর সন্ধ্যা
এদের মৃদু ঝাঁঝালো গন্ধে তখন ভারী হয়ে
ওঠে। বেশীক্ষণ এই বনে হেঁটে বেড়ালে,
মাথাটা আপনার ঝিমঝিম করতে থাকবে;
কিন্তু খারাপ লাগবে না, মনে বেশ একটা
অকারণ ফুর্তির আমেজই অনুভব করবেন।

সপ্তাহ পাঁচেকের মধ্যেই ফুলের মেলা
শেষ হয়ে, আসে ফল। বৈচি, ফলসা বা
বেত ফলের আকারের রাঙা টুকটুকে ফলের
অজস্রতায়, বনে বনে তখন সুরু হয় নতুন
আরেক রঙের খেলা। আশ্চর্য এই যে, কোকা-
ফল বিষাক্ত বা অপকারী নয় তবু মানুষে
কিন্তু এ ফল খায় না; খায় শুধু বনের
পশু-পাখী আর পাহাড়ী র‍্যাটল সাপ।
কোকার ফলই নাকি এই সব পাহাড়ী
সাপের প্রিয়তম ডেলিকেসি!

উষ্ণ ও আর্দ্র আবহাওয়াতেই এ গাছ
ভাল হয়। কিন্তু মজা এই যে উৎকৃষ্টতর
কোকেন বেশী পরিমাণে পাওয়া যায়,
অপেক্ষাকৃত শুষ্ক আবহাওয়াযুক্ত জায়গার
গাছ থেকে। এবিষয়ে গাঁজাগাছের সঙ্গে
কোকাগাছের মিলটা লক্ষ্য করবার মতো।

পাতাগুলো যখন দুমড়োলেই ভেঙে
যায়, তখনই ধরে নেওয়া হয় যে, এইবার
ওগুলো কোকেন তৈরীর উপযুক্ত পুষ্ট
হয়েছে। পুষ্ট পাতা বেছে বেছে তুলে এনে,
পুরু ও খসখসে পশমী কাপড়ের ওপর
পাতলা করে সেগুলো বিছিয়ে, উপর্যুপরি
কয়েকদিন রোদে দিয়ে পাতাগুলো ভাল করে
শুকিয়ে নেওয়া হয়। এরপর আর যাতে
এগুলোতে আর্দ্রতা না লাগে, সেদিকে দৃষ্টি

১ রেড-ইন্ডিয়ানদের আদিবাসী-ভাষা
থেকেই শব্দটি স্প্যানিশ ভাষায় গৃহীত
হয়েছে। রেড-ইন্ডিয়ানদের ভাষায় 'কুই-
কুঅ' শব্দের আক্ষরিক অর্থ হল—
'দেববংশীয় রাজপুত্র' বা 'প্রধান'। উপ-
জাতিদের একটি শাখার নামও 'কুই-
কুআ'। আবার, বিশেষ একটি উপজাতীয়
'বুলি'ও এই 'কুইকুআ' নামেই আখ্যাত।
গাছের নামের সঙ্গে এ শব্দটির প্রয়োগ
কি অন্য গাছের তুলনায় কোকাগাছের
শ্রেষ্ঠত্ব বোঝানোর জন্যেই?

সতর্ক দৃষ্টি রাখতে হয়। ঠিক পরিমাণ মতো পুষ্ট পাতা, সঠিক মাত্রায় শুকোতে না পারলে, সে পাতা থেকে উৎপাদিত কোকেন ধরবাদ হয়ে যাওয়ার আশংকা থাকে। বলা-বাহুল্য সব জাতের কোকার পাতাতেও ভাল কোকেন হয় না। এগুলো সমস্ত সঠিকভাবে নির্ধারণের ওপরেই উৎপাদিত কোকেনের গুণাগুণ নির্ভর করে।

শুকনো পাতা গুলো এইবার রাসায়নিক প্রক্রিয়ায়, ভাপে সিদ্ধ কোরে মণ্ড বানানো হয়। সেই মণ্ড বিশ্লিষ্ট কোরে, অকেজো অংশ বাদ দিয়ে, মূল যে নির্যাসটুকু পাওয়া যায়, সেইটে জমাট বাঁধিয়েই কোকেন তৈরী হয়। সাদা রঙের অত্যন্ত মিহি গুঁড়োর আকারে এগুলো বাজারে ছাড়া হয়। চোরা উৎপাদকরা গোপনে যে সব কোকেন তৈরী করে, সেগুলো সাধারণত অত ধপধপে সাদা ও মিহি গুঁড়ো হয় না। ঈষৎ পীতাভ-কালচে ও অমসৃণ কোকেন, আধুনিক বৈজ্ঞানিক যন্ত্রপাতির সহায়তা ছাড়াই, আদিম প্রথায় গোপনে তৈরী হয়েছে বলে ধরে নেওয়া হয়।

গাছের চাষ কোরে, পাতা শুকিয়ে, তারপর কোকেন তৈরী করার এই প্রক্রিয়া যে আয়াসসাধ্য, ব্যয়বহুল ও সময়সাপেক্ষ—তা তো দেখাই গেল। কিন্তু, বিজ্ঞান কি এসব অসুবিধের কোনো সুরাহা করতে পারত না?

যে নীলকররা এত অত্যাচার উৎপীড়ন কোরেও এদেশের চাষীদের নীল চাষে বাধ্য করত, তাদের সে ফলাও ব্যবসা হঠাৎ উঠে গেল কেন? আমরা জানি—রাসায়নিক পদ্ধতিতে অনেক সস্তায় নীল তৈরী আরম্ভ হল বলেই, গাছের চাষ প্রভৃতি অসুবিধেজনক পদ্ধতির আর দরকার থাকেনি। কোকেন উৎপাদনকে সহজসাধ্য করার অনুরূপ প্রচেষ্টাও বিজ্ঞানীরা যথেষ্টই করেছিলেন।

এখানে পাঠক মনে একটা প্রশ্ন জাগতে পারে। অপকারী এই মাদকটা সহজে তৈরীর জন্যে বিজ্ঞানীরা এত চেষ্টা কেন করতে গেলেন? এর কারণ ছিল দুটো :

১। অস্ত্রোপচারের সময় রোগীর দেহের শুধু অংগ বিশেষকে অসাড় করার উপযোগী একমাত্র অ্যানাস্থেটিক হিসেবেই বিজ্ঞানীমহলে তখন কোকেনের সমাদর। এর অপকারি দিকটা প্রথমে অজ্ঞাতই ছিল, পরেও অনেকদিন পর্যন্ত সেগুলো উপেক্ষাই করা হত। গবেষণাতেও তাই উৎসাহের কোনো অভাব ঘটেনি।

২। অপকারি দিকটা যখন সুস্পষ্টরূপে জানা গেল, তখনকার পরীক্ষা-নিরীক্ষাগুলো হয়েছিল, দোষমুক্ত বিকল্প কোনো অ্যানাস্থেটিক আবিষ্কারের জন্যে।

যাক সেকথা। পরীক্ষার ফল কি হল, সেটাই বলি। রাসায়নিক বিশ্লেষণে দেখা গেল—এটি একটি যৌগিক বস্তু। এর রাসায়নিক গঠন-বিন্যাস জ্ঞাত হওয়ার পর থেকেই বিজ্ঞানীরা তাঁদের গবেষণাগারে কৃত্রিম কোকেন তৈরীর জন্যে উঠে পড়ে লাগলেন। কিন্তু ফল হল উল্টো। সব শুদ্ধ ২৮ মণ উপকরণ নিয়ে, একাদিক্রমে ১৭টি বিভিন্ন ক্রিয়া-বিক্রিয়া ঘটানোর পর পাওয়া গেল মাত্র কোয়ার্টার আউন্স কোকেন! অতএব গাছের চাষ কোরে কোকেন তৈরীই সুলভ বলে প্রমাণিত হল এবং সেই রীতিই বহাল থেকে গেল।

কৃত্রিম কোকেন সুলভে তৈরী করা গেল না বটে, তবে এসব পরীক্ষা-নিরীক্ষা একেবারে বৃথাও গেল না। এর থেকে লাভ হল দুটি :

(ক) কয়েক হাজার রাসায়নিক যৌগিক বস্তু প্রস্তুত ও পরীক্ষার পর প্রমাণিত হল—'নোভোকেন' ও 'প্যার্কেন' নামক মাত্র দুটি ওষুধই কোকেনের চেয়ে বেশী কার্যকর, অথচ অপেক্ষাকৃত কম অপকারী।

(খ) সুনিশ্চিতভাবে জানা গেল যে—কোকেনের অণুর গঠন বিন্যাসে মাত্র চারটি বর্গের পরমাণুই অপরিহার্য। অন্য গ্রুপ-গুলো সহায়ক বটে, তবে অপরিহার্য নয়। এই তথ্যটি, অ্যানাস্থেটিক আবিষ্কারের পরবর্তী সব গবেষণার দিগদর্শক হয়ে রইল। কালক্রমে, ঠিক অনুরূপ রাসায়নিক গঠন-সমন্বিত আরেকটি মাদকও আবিষ্কৃত হয়ে গেল। স্বল্পজ্ঞাত এই কৃত্রিম মাদকটির নাম 'একগোনাইন'।

॥ ৩ ॥

সারা পৃথিবীতে মোট যত কোকেন তৈরী হয়, তার প্রায় সাত-দশমাংশই পাওয়া যায় দক্ষিণ আমেরিকার মাত্র দুটি দেশ থেকে। সে দেশ দুটি হল—পেরু ও বলিভিয়া। এরপরেই নাম করা যেতে পারে ইন্দোনেশিয়ার। আরও বহু দেশেই এর চাষ হয়ে থাকে। বস্তুত নিরক্ষীয় অঞ্চলের যে সব পার্বত্য বনভূমিতে বছরে অন্তত কিছু বৃষ্টিপাত হয়, সেখানেই কোকাগাছ জন্মানো সম্ভব।

কোনো মাদক সম্পর্কে আলোচনা করতে গেলে, সে বস্তুটির ব্যবহার কবে ও কিভাবে প্রথম আরম্ভ হয়েছিল, সেটা নির্ণয়েরও প্রয়োজনীয়তা আছে। কোকেন সম্পর্কে এই সব তথ্য যতটুকু নির্ণীত হয়েছে, তা থেকে জানা যায় 'ইনকা' নামক যে সুপ্রাচীন জাতিটি সেই সুদূর অতীতেই পেরুতে বিস্ময়কর ও সুসমৃদ্ধ একটি সভ্যতার পত্তন করেছিল, মাদক হিসেবে কোকাগাছের পাতা সর্বপ্রথম ব্যবহৃত হয়েছিল তাদেরই সমাজে।

কিন্তু একটা কথা এখানে ভেবে দেখবার আছে। ইনকারা ছিল বহিরাগত। বারো শতকের শেষাশেষি এবং তেরো শতকের প্রারম্ভ নাগাদ, ভাগ্যান্বেষীর মতোই তারা পেরুতে এসে বসতি স্থাপন করে। আদি-বাসী যে রেড-ইন্ডিয়ানদের ওপর ক্রমে তারা প্রভুত্ব বিস্তার করল, সেই ইন্ডিয়ানরাও কিন্তু একেবারে অসভ্য ছিল না। বস্তুত তাদেরও নিজস্ব এবং বৈশিষ্ট্যপূর্ণ একটি সভ্যতা স্মরণাতীতকাল থেকেই বিদ্যমান ছিল। কোকেন ব্যবহারের প্রথম সূচনা নির্ণয় করতে গিয়ে, পণ্ডিতরা ইনকারদেরই আদি ব্যবহারকারী বলে অভিমত প্রকাশ করলেন। কেন না, এদের আগমনের পূর্ববর্তীকালে কোকাপাতা ব্যবহারের কোনো প্রমাণ তাঁরা পাননি।

এখন প্রশ্ন হচ্ছে এই যে, ইনকারা বহিরা-গত ছিল বটে, কিন্তু কোকাগাছগুলো তো আর বিদেশ থেকে এনে লাগানো হয়নি। উদ্ভিদ-বিজ্ঞান দৃঢ়নিশ্চয় যে, আন্দিজের সানুদেশ ও সিয়েরা অঞ্চলই হল এ গাছের আদি জন্মভূমি। ভিন্নতর উদ্ভিদ পরিবেষ্টিত সুদূর কোনো দেশ থেকে নতুন দেশে এসে, নবাগত সেই জনগোষ্ঠীর পক্ষে নতুন খাদ্যাভ্যাস গ্রহণ করতে বেশ কিছুদিন সময় লেগেছিল নিশ্চয়ই! নতুন দেশের আদি অধিবাসীরা যে খাদ্য খায়, নবাগতরাও সচরাচর সেইগুলোই অভ্যেস করে নিতে চেষ্টা করে। মাদক সম্পর্কেও ঐ একই কথা। ওদেশের আদিবাসী ইন্ডিয়ান-সমাজে কোকা-পাতা খাওয়ার রেওয়াজ যদি আদপেই না থাকত, তাহলে অত্যল্পদিনেই ইনকাদের মধ্যে ওটা বহু ব্যাপ্ত হতে পারত কি? অজানা-অচেনা একটা জংলা গাছের পাতায় যে মাদকগুণ আছে, এটা আবিষ্কার করতেই তো ওদের বহু বছর কেটে যেত। আরও পরে দু-চারজন সে মাদক ব্যবহার সুরু করত। বিশাল জনসমাজের সকল স্তরে পরিব্যাপ্ত হতে, সে মাদকের লাগত আরও দু-এক শতাব্দী। কাজেই, সম্ভাব্যতার বিচারে, ইনকাদেরই কোকাপাতার প্রথম ব্যবহারকারী বলে মেনে নেওয়াটা খুব যুক্তিসহ হয় কি?

এছাড়া আরও একটি কথা আছে। অনুন্নত ও স্বল্পোন্নত জনগোষ্ঠী, তাদের ধারে কাছের সহজলভ্য উদ্ভিদ থেকে যেমন আহার্য সংগ্রহ করে; গাছের গুণ বুঝে, বিশেষ কোনো কোনো গাছকে তেমনি আবার মাদক হিসেবেও সাদরে বরণ করে নেয়। এ সত্য দেশ-কাল নির্বিশেষে সর্বত্রই পরীক্ষিত ও প্রমাণিত হয়েছে। আন্দিজের সানুদেশে বসবাসকারী যে প্রাচীন রেড-ইন্ডিয়ানরা বিশাল বিশাল শিল্প-স্থাপত্যের বিস্ময়কর নির্মাণকুশলতায় আজও আমাদের শ্রদ্ধা

উদ্রেক করে, শুধু তারাই যে পূর্বোক্ত ঐ সত্যের ব্যতিক্রম ছিল তাই বা ভাবি কি করে?

আদিবাসী এই রেড-ইণ্ডিয়ানদের পরবর্তী উত্তরপুরুষ এবং ইনকাদের সংগে এদের রক্ত-সংমিশ্রণে জাত সঙ্কর ইণ্ডিয়ানরাও যে বহু শতাব্দী যাবৎ কোকার পাতা ব্যবহার করে আসছে—সে সম্বন্ধে কিন্তু বিশেষজ্ঞরাও একমত। তবুও, ইনকাদের আগমনের আগেও যে প্রাচীন রেড-ইণ্ডিয়ান সমাজে এ মাদক পরিচিত ছিল— সেবিষয়ে ওঁরা তাদের মনের সন্দেহ দূর করতে পারেন না!

আগেকার দিনে, কোকাপাতা ব্যবহার-কারীরা অনেক সময় সেটার সঙ্গে ছাই, চূণাপাথর মিশিয়েও চিবিয়ে খেত। প্রসঙ্গত একটি কথা মনে পড়ে। এদেশেরপ্রৌঢ়ারা অনেক সময় দাঁতে যে গুল ব্যবহার করেন, তাতেও অনেক ক্ষেত্রে ছাই মেশানো হয়ে থাকে। শুধু এইটি বলেই নয়; পশ্চাৎপদ জনসমাজে যেখানেই, যে রকমেরই উদ্ভিজ্জ মাদক খাওয়া হোক না কেন, খোঁজ করলেই দেখা যাবে—তার অনেকগুলোরই একটা অপরিহার্য অনুপান হল এই ছাই! কিন্তু কেন? এত জিনিস থাকতে, ছাই দেয় কেন? নেশার আমেজ পাবার উদ্দেশ্যেই যেখানে মাদকের ব্যবহার, মাদক-শক্তিকে কম-জোর ও দিকে করার জন্যে; ফালতু আরেকটা জিনিস সেখানে কেন মেশায়? একটু চিন্তা করলেই বোঝা যাবে, এর কারণ হল তিনটে:

(১) ছাই, এমনকি চূণাপাথরেও ক্ষার-জাতীয় উপাদান বর্তমান—এটা আমরা সবাই জানি। মূল মাদকের সঙ্গে সংযুক্ত হলে, ক্ষারটা নেশার কারকতাকে সামঞ্জস্য করতে সহায়ক হয়।

(২) কড়া মাদকদ্রব্য দীর্ঘদিন অবিমিশ্র অবস্থায় মুখ-বিবরে নিলে, মুখে ক্ষত হওয়া অবশ্যম্ভাবী। ক্ষতিকর এই প্রখরতাটাকে কিছুটা সহনীয় করার উদ্দেশ্যেও ছাই, অথবা ক্ষেত্রবিশেষে চূণ (যেমন খৈনীর বেলায়) মেশানো হয়ে থাকে।

(৩) মাদকটা পয়সার কেনা জিনিস। ছাই মেশালে তার পরিমাণটাও কিছু বাড়ে। ফলে, খরচ হয় কম অথচ নেশাও জমে ভালো।

আগের আলোচনাতেই আবার ফিরে আসা যাক। ইনকারা এবং রেড-ইণ্ডিয়ানরা যে কোকেন খেত, সেটা তো সন্দেহাতীত। কিন্তু শুধুমাত্র নেশার উদ্দেশ্যেই কি এ-মাদকটি তখন ব্যবহৃত হত? নিশ্চয়ই তা নয়। কঠোর শারীরিক শ্রম, দীর্ঘপথ পায়ে হাঁটার দুরপনেয় অবসাদ, ক্ষুধা-তৃষ্ণা প্রভৃতির কষ্ট লাঘব করার জন্যেই এই মাদকটি তখন তারা ব্যবহার করত। অবশ্য নিছক ফুর্তির উদ্দেশ্যেও যে তারা কোকেন খেত না কখনো তা হলফ করে বলা চলে না।

কোকেনের বিস্তৃতির ইতিবৃত্তটা কিন্তু এর সূচনার চেয়েও অনেক বেশী রোমাঞ্চকর। শৈলসানুর বহিঃসম্প্রবমুক্ত নিস্তরঙ্গ জীবনে, বেশ শান্তিতেই ছিল পেরুবাসীরা। বিনা-মেঘে হঠাৎ এল ঝড়; সুরু হল ওলোট-পালোট। ধূমকেতুর মতো অশুভের সংকেত নিয়ে, অকস্মাৎ যেন সাগর-ফুঁড়ে উঠে এল দুর্ধর্ষ ও লোলুপ বোম্বেটে, স্প্যানিয়ার্ডরা। অতলান্তিক পাড়ি দিয়ে এই স্পেনীয় নাবিক-দল, ফ্রান্সিস্কো পিজারোর নেতৃত্বে প্রথম যেদিন পেরুর পশ্চিম উপকূলে এসে হাজির হল, ১৫৩২ সালের সেই ভয়ংকর দিনটির কথা, আতংকবিহ্বল বেদনার সংগে, ইতিহাস আজও স্মরণ রেখেছে।

তারপর আর কথাবার্তা নেই। লুঠ-তরাজের সংগে সংগেই সুরু হয়ে গেল নির্বিচার নরহত্যার নির্মম পাশবিকতা। শুধু তাল তাল সোনা অপহরণ করেই ওরা ক্ষান্ত হল না; আদিবাসীদের নেশার আমেজ দেখে, কোকেনের লোভেও ওরা হন্যে হয়ে উঠল। কেউ কখনো দেখেনি, জানে না, নামও শোনেনি, দিব্যি অভিনব একটা নেশা তো! অতএব, যে যেখানে পাও, ছলে-বলে-কৌশলে ওটাও হাতাতে ভুলো না। ইতিহাসের ভাগ্য-নিয়ন্তা মহাকাল বোধহয় সেদিন মুখ টিপে হেসেছিলেন।

প্রথম উৎসাহের অতি-প্রাবল্যে, দিন-কতকের মধ্যেই ওরা কোকেনের ভক্ত হয়ে উঠল; দেশে ফেরার সময়ও এটা সংগে নিতে ভুলল না। তারপর নিজেদের সমাজে ফিরে আসা মাত্রই আরম্ভ হল ইয়ার-বক্সীদের কাছে এই আজব নেশার কেরামতি দেখানো এবং বাহাদুরি নেওয়া। সে সব ভাই-বেরাদররাও অচিরেই এ রসের রসিক হয়ে উঠল। মাত্র এক দশকেরও কম সময়ে, স্পেন ও পোর্তুগালের প্রায় প্রতিটি বন্দর হয়ে উঠল কোকেন বেচা-কেনার জম-জমাট এক-একটি ঘাঁটি! বলা বাহুল্য, সরবরাহটা আসতে থাকল পেরু থেকেই।

চোরাকারবারীদের সাংকেতিক পরি-ভাষায় এখন কোকেনকে বলে 'স্নো'। একমাত্র রঙের শুভ্রতা ছাড়া অন্য কোনো বিষয়েই এ-জিনিস দুটির মধ্যে মিল নেই বলে মনে হয়। আসলে, একটা মিল কিন্তু আমাদের দৃষ্টি এড়িয়ে যায়; সেটা হল—বিস্তৃতি ও ব্যাপ্তির অবিশ্বাস্য দ্রুতগতি। গিরিশিখর থেকে গড়িয়ে-নামা বরফের ঢেলা যেমন ক্রমেই বৃহদায়তন হয়ে ওঠে, কিছুদূর নেমেই সেটা যেমন বিধ্বংসী হিমবাহের রূপ ধরে, আলোচ্য নেশাটির বিস্তৃতিও ছিল ঠিক তেমনই চমকপ্রদ! প্রথমে শুধু নাবিকদের মধ্যে, কিছুদিনের মধ্যেই স্বভাব-দুর্বৃত্তদের প্রতিটি গুপ্ত গোষ্ঠীতে, অনতিপরেই বস্তীবাসীদের সমাজে, এইভাবে ঠিক হিমবাহের মতোই অমোঘ ও সর্ববিধ্বংসী হয়ে দাঁড়িয়েছিল, মারাত্মক এই নেশাটির দ্রুত বিস্তার।

চিকিৎসাবিজ্ঞান ও রাষ্ট্রীয় শাসনব্যবস্থা একে রুখতে পারার আগেই, কোকেন হয়ে দাঁড়িয়েছিল সমাজের সর্বস্তরে বহু-ব্যাপ্ত এবং অসংখ্য অপরাধের গোপন পরি-পোষক। তারপর কালক্রমে এল মহা-যুদ্ধোত্তর ইয়োরোপে সর্বব্যাপী নৈতিক ভাঙন; নৈরাশ্যতাড়িত উন্মার্গগামী যুব-সমাজের মধ্যেও কোকেন বসল শিকড় গেড়ে। আজ আর শুধু ইয়োরোপ নয়, সমগ্র বিশ্বই আজ এ-মাদকের বিষক্রিয়ায় জর্জরিত; সমাজের নীতি-বিধায়কেরা সর্বত্রই আজ এর সর্বব্যাপী কুপ্রভাবে আতঙ্কিত।

॥ ৪ ॥

ব্যবহার পদ্ধতির বৈচিত্র্যের জন্যেও; বিশ্বের মাদকসভায় কোকেন বেশ একটা বৈশিষ্ট্যপূর্ণ আসন দাবী করতে পারে। প্রধানত পাঁচরকমভাবে কোকেন ব্যবহারের কথা জানা যায়। সেগুলো হল:

ক। নস্যির মতো নাকে টানা

খ। গলাধঃকরণ

গ] পানের সঙ্গে গ্রহণ
ঘ। মাড়ীতে প্রলেপ
ঙ। ইঞ্জেকশনরূপে গ্রহণ

ক] শুনতে অবিশ্বাস্য মনে হলেও নস্যির মতো নাকে টানাটাই নাকি মাদক-রূপে কোকেন ব্যবহারের আদিমতম প্রক্রিয়া। প্রচীন ইনকো-রা এ-নেশা এই ভাবেই করত। কোকাপাতা চিবিয়ে খেয়ে নেশা করার পদ্ধতিটাও অবশ্য তাদের অজানা ছিল না। এখন কিন্তু নাকে টানার রেওয়াজ খুবই কম; সামান্য যা আছে, সেটাও প্রধানত লাতিন আমেরিকাতেই সীমাবদ্ধ বলে অনুমিত হয়।

খ] গুঁড়োটা জিভে ঢেলে, টাক্‌রার সঙ্গে ঘষে খাওয়াটাই, কোকেন ব্যবহারের সর্বাধিক প্রচলিত রীতি। এটা মুখে নেওয়া মাত্রই পিপারমিন্টের মতো একটা ঠান্ডা ঝাঁঝ অনুভূত হয়, স্যাকারিনের মতো ঈষৎ মিষ্টি-ঘেঁষা তীব্র তিতো লাগে এবং ক্ষণপরেই মুখটা গরম হয়ে ওঠে। রসটা মুখে ছড়িয়ে পড়া এবং আল্‌জিভে লাগার বিশ সেকেন্ডের মধ্যেই নেশার আমেজ অনুভূত হতে থাকে, কান দিয়ে গরম বাষ্প বেরুচ্ছে বলে মনে হয়। শেষোক্ত অনুভূতিটা অবশ্য পাঁড় কোকেনখোরদের বেলায় প্রায় হয় না বললেই চলে; কিছুদিন ব্যবহারের পরই তাদের অনুভূতিটা ক্রমে ভোঁতা হয়ে আসে।

নেশামাত্রেরই 'খোঁয়ারী ভাঙা'-র সময় (অর্থাৎ নেশার সর্বশেষ রেশটুকুও যখন মিলিয়ে যায়) অস্বাচ্ছন্দ্য ও অবসাদ অনুভূত হয়। কোকেনও এ-নিয়মের ব্যতিক্রম নয়। সেসময় 'মাথাটার ভেতরে যেন কিছুই নেই, একদম ফাঁকা'—এই রকম একটা অনুভূতি হয়। মুখেও কেমন একটা বদখৎ স্বাদের রেশ লেগে থাকে, ঢোক গিলতে পারা যায় না। খুব ঘন-কোরে জাল দেওয়া খাঁটি গোরুর দুধ মাত্রাতিরিক্ত চিনিসহ খেয়ে, জল না খেলে বা মুখ না ধুলে, অনেকক্ষণ পরে মুখটা যেরকম বিশ্রী লাগে, কোকেন গেলার পরে ঠিক সেইরকমই বোধ হয়। বিশেষজ্ঞদের লেখায় যদিও এটাকে 'ধাতব' স্বাদ বলেই বর্ণনা করা হয়েছে; তথাপি, বর্তমান প্রবন্ধকারের কিন্তু ঠিক ঐ-রকমই বোধ হয়েছিল, ধাতব মনে হয়নি।

গ] গলাধঃকরণের প্রক্রিয়াকে 'সর্বাধিক প্রচলিত' বলে উল্লেখ করেছি বটে, তবে এদেশের নেশাসক্তরা কিন্তু এর উল্লেখ্য ব্যতিক্রম। ভারতীয় কোকেনখোরদের প্রায় ৭০ শতাংশেরও বেশী লোক, এটা খায় পানের সঙ্গে। পানের অন্য বহুরকম মশলার মতো, কোকেনও এদেশে প্রায় পানের মশলাই হয়ে দাঁড়িয়েছে—একথা বললে অত্যুক্তি হয় না। এদেশে কোকেনের এই বিশেষ ব্যবহার রীতির কারণ অনুসন্ধান করলে দেখা যাবে :

।।১।। পানের সঙ্গে কোকেনের সম্মিলনটাকে একেবারে রাজযোটক বলা চলে। কোকেনের নিজস্ব মাদকতাটা এতে একটুও হ্রাস পায় না, পরন্তু পানের সৌখিনতাটাও পুরোপুরি বজায় থাকে। কোকেনদেওয়া পান একটু চিবুলেই, দেহ-মনে দিব্যি একটা চনমনে ভাব জাগে, মেজাজটাও অকারণ ফুর্তিতে বেশ ডগমগ হয়ে ওঠে।

।।২।। নিষিদ্ধ মাদকের চোরাই বিক্রিটা খুব সহজসাধ্য কাজ নয়। খিলি পানের দোকানের মাধ্যমে কোকেন চালালে পুলিশের চোখে যত সহজে ধুলো দেওয়া যায়, তত মওকা আর কোথায়, কিভাবে মিলবে?

।।৩।। ক্রেতা নেশা করতে চায় বটে, তা বলে বেশী ঝঞ্ঝাটে সে জড়িয়ে পড়তে নারাজ। দিব্যি প্রকাশ্যে বুক ফুলিয়ে পানের দোকানে গেলেন; খিলিটা হাতে নিয়েই টুপ্‌ করে মুখে চালান করে দিলেন; ব্যস্‌, নিশ্চিন্ত। পুলিশ তো কোন্‌ ছার, শিবের বাবারও সাধ্যি নেই, অর্ধচর্বিত সেই পান মুখবিবর থেকে টেনে বের কোরে, রাসায়নিক বিশ্লেষণ কোরে, তারপর সাক্ষি-সাবুদসহ আদালতে গিয়ে সেসব প্রমাণ করতে পারে! অতএব, কোকেনরসিক ক্রেতাদেরও এতে পোয়াবারো।

যে রীতিতে এতগুলো সুবিধে, সেটা যে অনেকের পক্ষেই লোভনীয় হবে—এতে আর অবাক হবার কি আছে? শুধু একটা কথা এপ্রসঙ্গে স্মরণ রাখতে হবে—কোকেনের এই বিশেষ ব্যবহারটি কিন্তু একমাত্র ভারতবর্ষ ও ব্রহ্মদেশ ছাড়া আর কোথাও বিশেষ দেখা যায় না।

ঘ] আঙুলের ডগায় কোকেনের গুঁড়ো নিয়ে, মাড়ীতে ঘষে ঘষে প্রলেপ লাগানোর প্রথাটা সচরাচর জেল-ঘুঘু স্বভাবদুর্বৃত্ত ও ও অপরাধীদের মধ্যেই ব্যাপকভাবে প্রচলিত দেখা যায়। এভাবে ঘন ঘন কোকেন ব্যবহারের ফলে, তাদের মাড়ী ও ঠোঁটের গোড়াগুলোতে সবসময়েই প্রায় ঘায়ের মত প্রদাহ বা ইন্‌ফ্লেমেশন থাকে। এতেও যাদের শানায় না, তারা ব্লেড বা ছুরি দিয়ে মাড়ীগুলো আঁচড়ে, আর উপরে কোকেন ডলে। এর ফলে, গুঁড়োগুলো মুখে নেওয়ামাত্রই নেশার আমেজ আসে, মৌতাতটাও বেশ জমজমাট হয়।

ঙ] হাইপোডার্মিক সিরিঞ্জের সাহায্যে তরল কোকেন ইঞ্জেকশনরূপে গ্রহণের রীতিটা সাধারণত উচ্চকোটির লোকদের মধ্যেই বেশী দেখা যায়। পাশ্চাত্যের অবস্থাপন্ন বিলাসীরাই এই পদ্ধতির বড় পৃষ্ঠপোষক। এ-রীতির মস্ত একটা সুবিধে হল এই যে—ওষুধ প্রস্তুতকারক বিখ্যাত কোম্পানীগুলোর ট্রেড্‌-নেম্‌ ও লেবেল-আঁটা শিশিতে কোকেন-নির্যাস পুরে নিয়ে, প্রকাশ্যে যত্র-তত্র ঘুরে বেড়ালেও, আর কেউ সেটাকে তরল কোকেন বলে ভাবতেই পারে না।

।। ৫ ।।

মানবদেহে কোকেনের ক্রিয়াটা কিরকম এবং কী-ভাবে সেগুলো ঘটে—সংক্ষেপে সেটাও এবার দেখে নিই আসুন।

শ্লৈষ্মিক ঝিল্লিগুলো দিয়ে, কোকেন সহজেই শরীরের মধ্যে মিশে যায় এবং স্নায়ুকেন্দ্রকে প্রভাবিত করে। প্রথমে উদ্দীপিত হয় মগজের বহিঃস্তর বা কর্টেক্স। এর ফলে, মানসিক শক্তিগুলো সাময়িকভাবে বেড়ে যায় এবং অবসাদবোধও দূর হয়। কোকেন গিলে খেলে, পাকস্থলীটা স্থানিকভাবে অসাড় হয়ে পড়ে, ফলে ক্ষুধা-তৃষ্ণা অনুভূত হয় না। এ-মাদকটি বেশী মাত্রায় গ্রহণ করলে, মেরুদন্ডটাও উদ্দীপিত হয়ে ওঠে; ফলে অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ ও পেশীসমূহের আক্ষেপ বা

শিকার
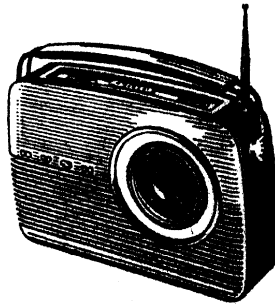
ফটো : মানসরঞ্জন কুন্ডুচৌধুরী

খেঁচুনি দেখা দেওয়ার সম্ভাবনা ঘটে। এই উদ্দীপনার পরেই সমগ্র স্নায়ুমন্ডলে নেমে আসে নিস্তেজ অবসন্নতা; এর ফলে শ্বাসক্রিয়া বন্ধ হয়ে মৃত্যু ঘটাও বিচিত্র নয়।

নেশার চরম অবস্থায় এ-মাদকের ক্রিয়াটা হয় হৃদপিণ্ডের ওপর। শিরা ও ধমনীর রক্তপ্রবাহে আসে অচলাবস্থা। তখন নেশাখোরটির সংজ্ঞা লোপ পায়; স্তিমিত হৃদস্পন্দনও ক্রমে থেমে আসে।

কোকেনখোরের শরীরে বাহিক লক্ষণও অনেকগুলোই দেখতে পাওয়া যায়। নীচের মাঢ়ী এবং ঠোঁট, এমনকি জিভেও ফুলো ফুলো লাল ক্ষত থাকে। বস্তুত পাঁড় নেশারুদের মুখের ভেতরটা সমস্তই টকটকে লাল দেখায়। নিজের অজ্ঞাতসারেই সে চোখ মিটমিট করে; দূরের জিনিস দেখবার সময় চোখ দুটো তার আপনা থেকেই কুঁচকে ছোট হয়ে আসে। কোষ্ঠ-কাঠিন্যটা হয়ে দাঁড়ায় সারাজীবনের নিত্য-সাথী। হাত-পায়ের (বিশেষ করে পায়ের) নখগুলো উল্টোভাবে ওপরের দিকে বেঁকে উঠতে থাকে। মুখের (এবং গাত্রত্বকেরও) মসৃণতাও নষ্ট হয়ে যায়।

এ-নেশার মানসিক প্রতিক্রিয়াগুলোও হয় বিদঘুটে ধরনের। নেশার প্রথম আমেজটার সময়, অহেতুক সুখানুভূতির একটা ভ্রান্তি, নেশাখোরের মনকে সুখ-স্বর্গের সপ্তমে তুলে একেবারে মশগুল করে রাখে। নিজের কাজ সম্পর্কে সে নিজেই তখন বাহাদুরী করতে থাকে। ভাল কাজ কোরে সে যেমন বাহবা কুড়োতে চায়, ঠিক তেমনি আবার দুষ্কর্ম বা অহেতুক বলপ্রয়োগের দ্বারাও সে অন্যের সপ্রশংস মনোযোগ ও স্বীকৃতি অর্জনের দুঃসাহস করে। আহ্লাদের এই ডগমগ অবস্থাটা কিন্তু বেশক্ষণ স্থায়ী হয় না—দড়জোর এইটুকুই। উল্লাসের ঘোরটা কাটতে না কাটতেই আসে বিষন্নতাবোধ, - মৃত্যুচিন্তা, ক্রমাগত অশুভ সঙ্কেত আর বিপদের ছায়া দেখার আতঙ্কবিহ্বলতা। তারপরেই সুরু হয় আবোল-তাবোল প্রলাপ। সবশেষে অচৈতন্য অবস্থা, অতিস্তিমিত হৃদস্পন্দন, হয়ত বা অমোঘ মৃত্যু!

অনেকদিন ধরে যারা নিয়মিত এ-বিষ খাচ্ছে, আরও উদ্ভট কয়েকটি মনোবিকার তাদের মধ্যে লক্ষ্য করা যায়। বেচারীরা সর্বক্ষণই ভাবে—তাদের শরীরে, চামড়ার নীচে যেন বালি রয়েছে; খুব ছোট্ট ছোট্ট পোকা যেন সর্বাঙ্গে হেঁটে হেঁটে বেড়াচ্ছে! রুক্ষ ও খসখসে শরীরটাকে ওরা ক্রমাগতই ঝাড়ে, মোছে; চুলকোয়। কিন্তু হায়, অস্তিত্বহীন সেই মনের বালি বা পোকা কোনোদিনই আর যায় না। দয়া পরবশ হয়ে কেউ যদি ওদের ভুল ভেঙে দিতে চায়; যদি বলে যে—বালি বা পোকা কিছু নেই, তবুও ওরা তা বিশ্বাস করে না; খেঁকিয়ে উঠে সেই শুভানুধ্যায়ীকেও ওরা তখন তেড়ে মারতে যায়। অবসন্ন হয়ে, শেষে আবার হাউ হাউ করে ডুকরে কেঁদে ওঠে; নিজেকে অভিশাপ দেয়।

করুণ এই অবস্থার মধ্যে ওরা শরীর ঝাড়া-মোছা করে বটে, কিন্তু অদৃষ্টের পরিহাস এই যে, স্নান ওরা মোটেই করতে চায় না। শুধু শরীর নয়, পোশাক এবং পরিবেশের পরিচ্ছন্নতা সম্পর্কেও কোকেন-সেবীর এই মাত্রাতিরিক্ত ঔদাসীন্য, আজও চিকিৎসাবিদ্যা তথা মনোবিজ্ঞানেরও বিরাট একটা অমীমাংসিত হেঁয়ালী হয়ে রয়েছে। এত করুণ ও শোচনীয় পরিণতি, বিশ্ব-ব্রহ্মাণ্ডের আর কোনো নেশাতেই দেখা যায় না।

কোকেন-রোগীর দুঃখময় পরিণামের কথা এইখানে শেষ করতে পারলেই বোধহয় ভাল হত। কিন্তু তার উপায় নেই। দুঃখ-বেদনাকে এড়াতে চাইলে, জীবনের সামগ্রিক পরিচয় যেমন অনায়ত্তই থেকে যায়, মাদক-সম্পর্কিত বিজ্ঞান-ভিত্তিক আলোচনাকে অসম্পূর্ণ রাখলেও ঠিক তাই-ই হয়। পুরনো নেশাখোরদের জীবনে, কোকেন আরও একটি আশ্চর্য ভয়াবহ রোগ এনে দেয়; তার নাম—'সাইনকোপ'। দৃষ্টিশক্তি ও শ্রবণশক্তির এই ভয়ঙ্কর বিভ্রম, ওদের শেষ জীবনের বিষাদময় পরিণতিকে আরও করুণ ও মর্মান্তিক করে তোলে। পড়তে গেলে, শব্দমধ্যস্থিত এক বা একাধিক অক্ষর ওরা বিলুপ্ত দেখে; এমনকি বাক্য-মধ্যস্থিত দু-একটি শব্দও এ-রোগী আদৌ দেখতে পায় না। কানে শুনবার সময়ও, শব্দের কোনো কোনো ধ্বনি ওদের কানে ধরা পড়ে না; বাক্যের মাঝের এক-আধটি কথাও ওদের অশ্রুতই থেকে যায়! নেশার বিষক্রিয়া যতই বাড়তে থাকে, এ-রোগের প্রকোপও ততই বাড়ে; হাজার চিকিৎসাও শেষে আর কোনো সুফল আনতে পারে না। অসহিষ্ণু ও খিটখিটে মেজাজ নিয়ে, সমস্ত পৃথিবীটাকেই তখন ওরা সন্দিগ্ধ অবিশ্বাসের চোখে দেখে; ভাবে—সবাই বুঝি কোনো কথা গোপন করছে, বিশ্বশুদ্ধ লোক বুঝি ওদেরই সর্বনাশের ভয়ঙ্কর এক ষড়যন্ত্রে লিপ্ত।

এ-নেশার আরেকটি উল্লেখযোগ্য বৈশিষ্ট্য হল—অতি অল্পদিন ব্যবহারেই মানুষ এতে আসক্ত হয়ে পড়ে। মাত্র হপ্তাদুয়েক যে কোকেন খেয়েছে, সে-অভাগাও আর এর নাগপাশ থকে নিজেকে মুক্ত করতে পারে না।

অপকারিতার ফিরিস্তি তো যথেষ্টই হল, কিন্তু উপকারিতা? এ-সংসারে কোনো কিছুই বোধহয় অবিমিশ্র মন্দ হতে পারে না। কাজেই সামান্য কিছু উপকারিতা এ-মাদকটিরও আছে বৈকি।

অস্ত্রোপচারের আগে, রোগীর দেহের বিশেষ কোনো অঙ্গকে অসাড় করার উপযোগী একমাত্র অ্যানাস্থেটিক হিসেবে, সে যুগে

কোকেন মানুষের রোগ-নিরাময়ে যথেষ্টই আনুকূল্য করেছে। চোখ, কান, নাক ও গলার অপারেশনে, কোকেনই ছিল ব্যাধি-ক্লিষ্ট মানুষের পরমতম বন্ধু। পরবর্তী-কালে, যন্ত্রণা উপশমের কিছু কিছু পেন্-রিলিভার ওষুধ তৈরীতেও এই কোকেনই অন্যতম একটি উপাদান হিসেবে সাদরে ব্যবহৃত হয়েছে। হোমিওপ্যাথিতেও মহোপকারী একটি ওষুধ হিসেবে কোকেন আজও লক্ষ লক্ষ রোগজর্জর মানুষের জীবনে শান্তি আনে।

॥ ৬ ॥

নিষিদ্ধ মাদকমাত্রই চোরাকারবারের লাভজনক পণ্য। এর মধ্যেও আবার সবচেয়ে মওকার মাল হল কোকেন। এ-বস্তুটির আকৃতিটাই এমন সুবিধেজনক যে, যে-কোনোভাবে, যে-কোনো জিনিসের সঙ্গে এটা লুকিয়ে রাখা, প্যাক করা, লেন-দেন করা, এমনকি পার্শেল করাতেও কোনো বেগ পেতে হয় না। অন্য অনেক মাদকের মতো, কোকেনের চোরাকারবারও তাই দুনিয়াব্যাপী সুবিস্তৃত ফলাও একটা ব্যবসা।

বছর এগারো আগেকার কথা। বোম্বাইয়ের আবগারী শুল্ক কর্তৃপক্ষ হঠাৎ সেদিন একেবারে তাজ্জব বনে গেলেন। হান্ট্‌লে অ্যান্ড পামার্সের সুন্দর উপহারোপযোগী প্যাকিংয়ে, বিস্কুটের একটা পার্শেল-বাক্স থেকে বেরুলো প্রায় পৌনে সাত হাজার টাকা দামের বিশুদ্ধ কোকেন! ছোট্ট ছোট্ট কেকের আকারে, বেশ পরিপাটিভাবে সাজানো; দেখতে অবিকল পাবনা-অঞ্চলের সেই একদা-বিখ্যাত সন্দেশ রাঘবশাহী'র মতো! জি পিও-তে খোঁজ নিয়ে জানা গেল—"হ্যাঁ, এরকম প্যাকেট তো বহু বছর যাবৎ হাজারে হাজারে আসছে। খুব ভালো বিস্কুট কিনা, এদেশের সৌখীন ধনী-মানীরা এটা তাই খুবই পছন্দ করেন। অনেকের নামেই তো আসে। পুণার শ্রীঅমুক, নাসিকের শ্রীঅমুক......"। হতবুদ্ধি হয়ে, আবগারী বিভাগের দশ হাজারী একজন বড় কর্তা হন্তদন্ত হয়ে ছুটলেন বিলেতে। হান্ট্‌লে অ্যান্ড পামার্স জানাল—ভারতে এরকম খুচরো পার্শেলে মাল পাঠানো তারা তো বহু বছর আগেই সম্পূর্ণ বন্ধ করে দিয়েছে। স্কট্‌ল্যান্ড ইয়ার্ডের বড় কর্তারা গোঁফ চুমড়ে বললেন—"হুম্। এই প্যাকিং-এর দিকে এতদিনে বুঝি আপনাদের নজর পড়ল? তা, মালগুলো পুড়িয়ে ফেলেছেন তো?"

—"আজ্ঞে না; বাজেয়াপ্ত কোরে গুদোমে ঢুকিয়ে রাখা হয়েছে। পরীক্ষা-টরীক্ষা হবে, এক্সিবিট হিসেবে আদালতেও তো পেশ করতে হবে......"

"হুম্। তা, দেখুন, কিছু মনে করবেন না। আপনাদের বাজেয়াপ্তর গুদোম থেকে পাচার হয়ে আবগারী মাল আবার দেশ-বিদেশে ছড়িয়ে যায় কিনা; তাই বলছিলাম; মানে, কিছু মনে করবেন না।"

• • •

বড়বাজারে খুব চটকদার যে সব পানের দোকান আছে, তার বিশেষ বিশেষ কয়েকটিতে সন্ধ্যার দিকে গিয়ে, এদিক-ওদিকে না তাকিয়ে, লাল রং-এর একখানা দু-টাকার নোট এগিয়ে দিন। গম্ভীর গলায় শুধু বলুন—"দুটো স্পেশাল"। ব্যাস্। দোকানদার তড়িৎ-গতিতে অন্য জায়গা থেকে আপনাকে দু-খিলি পান বের করে দেবে। বিনা বাক্যব্যয়ে মুখে পুরে, চিবুতে চিবুতে চলে যান। খবরদার, ফেরৎ পয়সা চাইবেন না, বা অন্য কোনো কথাও বলবেন না কিন্তু। একটু চিবুনোর পরই টের পাবেন—সে পান কী চীজ্; পল্লী-গীতিতে কেন পান দিয়ে বিদেশী বন্ধুকে "গুণ্" করতে চাওয়া হয়।

এরকম বহু আট-ঘাটই কোকেন-রসিকদের জানা আছে। তবে এদেরই নাটের গুরু মনে করলে ভুল করা হবে। লোকচক্ষু, এমনকি পুলিশীচক্ষুরও আড়ালে আরেক শ্রেণীর পরম কুশলী তালেবর ব্যক্তি থাকেন, যাঁরা আরও গভীর জলের মাছ। ধনে, মানে, প্রতিপত্তিতে এঁরা সমাজের মাথাস্বরূপ। সুসংগঠিত গোপন দল নিয়ে, দুনিয়াব্যাপী এদের জাল ছড়ানো। রাষ্ট্রশক্তির সঙ্গেও এরা পাঞ্জা কষার হিম্মৎ রাখে। আন্তর্মহাদেশীয় চোরাই-চালানের কাজে বিস্ময়কর ধূর্ততা, দক্ষতা ও সংগঠনকুশলতা নিয়ে, এরা আজ মানবসভ্যতার সবচেয়ে দুর্জয় শত্রু হয়ে দাঁড়িয়েছে। বহুভাবে, প্রতিনিয়ত এদের আঘাত হানা হচ্ছে। কিন্তু এই পাপ-চক্রকে সম্পূর্ণ নির্মূল করাটা কোনো দিনই সম্ভব হবে কিনা সন্দেহ।

কোকেনের চোরা লেন-দেন সবচেয়ে বেশী হয় লাতিন আমেরিকা ও দূরপ্রাচ্যে। এর পরেই হল মধ্যপ্রাচ্য ও আরব দেশগুলোর স্থান। এককভাবে নাম করতে হলে, বলতে হয়, ব্রহ্মদেশই হল কোকেন চোরাকারবারের বৃহত্তম ঘাঁটি। বস্তুত সারা পৃথিবীর সমস্ত বড় বড় আন্তর্জাতিক বন্দরেই পাচারকারীদের শক্তিশালী সংগঠন বিদ্যমান।

॥ ৭ ॥

ভয়ঙ্কর বিষক্রিয়ায় আজও যে-মাদকটি সমগ্র মানবসমাজের স্বাস্থ্য ও শান্তি নষ্ট করছে, তার সম্পর্কে কিছুই কি আমাদের করবার নেই? গুরুত্বপূর্ণ এই প্রশ্নের মুখোমুখি দাঁড়িয়ে, সমাধানের পথ খুঁজতে চাইলে দেখা যাবে—পথ মাত্র দুটি :

১) কোকেন-জর্জর নেশাসক্তদের চিকিৎসা ও পুনর্বাসন।

২) কোকেনের উৎপাদন ও চোরাচালান সম্পূর্ণ নির্মূল করা।

চিকিৎসা ও পুনর্বাসনের দিকটাই আগে দেখা যাক। প্রথমেই স্বীকার করা ভাল যে, এসম্পর্কে সুপরিকল্পিত কোনো প্রচেষ্টা আমাদের দেশে প্রায় হয়নি বললেই চলে। অগত্যা পাশ্চাত্যের দৃষ্টান্তই হবে আমাদের একমাত্র আলোচ্য।

ক্রমনিম্ন মাত্রায় মেথাডোন প্রভৃতি ওষুধ প্রয়োগ কোরে, ওসব দেশে নেশাসক্তের দেহে কোকেনের বিষক্রিয়া ধীরে ধীরে কমিয়ে আনা হয়। এর সঙ্গেই চলতে থাকে মনস্তাত্ত্বিক চিকিৎসা বা সাইকো-থেরাপি। এতে, মাদকটির প্রতি আসক্তি ও নির্ভরতার ভাব থেকে, রোগী নিজেই ক্রমে তার মনকে মুক্ত করতে সক্ষম হয়। এর পরেই দরকার হয় অকুপেশানাল থেরাপি বা বৃত্তি-নিযুক্তি চিকিৎসা। একাধারে সৃজনাত্মক কাজ সম্পাদনের আত্মতৃপ্তি ও আয়—মাদকজর্জর সেই হতভাগ্য লোকগুলো এ-চিকিৎসায় দুটোই পেতে থাকে। তারাও যে সমাজ-দেহের সুস্থ একটি অঙ্গ—এই প্রত্যয়ও ক্রমেই তারা উপলব্ধি করতে পারে। তখনই করা হয় ওদের পুনর্বাসনের সুব্যবস্থা। নিজের শ্রমের দ্বারা, সৎপথে অর্জিত আয়ের সাহায্যে, তখন তারা আবার তাদের সুখী জীবন গড়ে তুলবার সুযোগ পায়। ধীরে ধীরে নিঃশেষে মুছে যায় ওদের বিগত-জীবনের সমস্ত গ্লানি; সুখী, সুস্থ মানুষের মতো আবার ওরা বুক ভরে নিঃশ্বাস টেনে বাঁচে।

সমাজ-কল্যাণের এরকম সুপরিকল্পিত ও বাস্তব কর্মপন্থা, এ দুর্ভাগা দেশে কোনোদিন কি সার্থকভাবে কার্যকর হবে? দীর্ঘদিন যাবৎ অত্যন্ত ধৈর্যসহকারে ও নিষ্ঠাপূর্ণভাবে চালাতে না পারলে, এ-প্রয়াস ষোল আনাই ব্যর্থ হয়ে যায়। তবে, এত নৈরাশ্যের মধ্যেও, অন্তত একটা আশা আমরা পোষণ করতে পারি। দীর্ঘদিন ব্যবহারের কুফলস্বরূপ, মানুষের দেহযন্ত্র অন্য অনেক মাদকের উপর অসহায়ভাবে নির্ভরশীল হয়ে পড়ে। চিকিৎসাবিজ্ঞান আশ্বাস নিয়ে বলছে—কোকেনের বেলায় নাকি এটা হয় না; শরীরাভ্যন্তরে এর প্রয়োজন বা অপরিহার্যতা সৃষ্ট হয় না। নিষ্কলুষ সমাজ গঠনের স্বপ্ন নিয়ে, অবিচল প্রত্যয়ে যাঁরা কাজ করে যেতে চান, এটাও তাঁদের পক্ষে কম ভরসার কথা নয়।

সবশেষে, উৎপাদন ও চোরাচালান বন্ধের সমস্যা। বহুদিনের বহুমুখী ব্যর্থতায় এটা নিঃসন্দেহে প্রমাণিত হয়েছে যে, উৎপাদন সম্পূর্ণ বন্ধ করতে না পারলে, চোরাকারবারীদের সম্পর্কে হাজার কঠোর ব্যবস্থা অবলম্বন করেও বিশেষ ফল হবে না। শুধু রাষ্ট্রশক্তির শাসনযন্ত্রের পক্ষে, সুকঠিন এই দুষ্পদায়িত্বের পূর্ণ উদ্‌যাপন অসম্ভব। একমাত্র, জাগ্রত মানবচৈতন্যের সর্বাত্মক প্রয়াস ছাড়া, এ-বিষের হাত থেকে মুক্তিলাভের আশা ভুল। চৈতন্যের সেই মহাজাগরণের শুভলগ্ন কি এখনও আসবে না?

পুলকেশ দে সরকার

আবার বরখাস্তগীর

সযত্নে পাট করা কোঁচা নয়, যেটা দুলছে সেটা কোমরে কোন রকমে আঁটা ধুতিরই একটা কোনা। ঠিক দুলছে নয়, ঝুলছে এবং চলার পথ ঝেঁটিয়ে চলেছে; তাই কোনাটুক সঞ্চিত ময়লায় বিবর্ণ। ধুতি পরার মধ্যেও শ্যামল বরখাস্তগীরের বিশেষ টাচ আছে। কোমর-নিতম্বে দো-ফেরতা। আর তারই ফলশ্রুতি ঐ ঝুলন—সম্মার্জনী ভূমিকায় অবতীর্ণ। ধুতি পরনে অনভ্যাসও তেমন তেমন বঙ্গবাসীর অ্যারিস্টোক্রেসী। শ্যামল বরখাস্তগীর সেই অনভ্যস্ত বঙ্গবাসীদের জ্যান্ত প্রতিভূ।

শ্যামল বরখাস্তগীর ধুতি বড় একটা পরেই না। আকস্মিক খেয়ালে আলনা থেকে

টেনে নিয়ে ঐ রকম করে পরে। কোঁচা তো নয়ই, কাছাও নয়। হয়তো বা কোন একসূত্রে টেনে রাখা। এই ধুতির ওপর সব রকম চলে—হাঐ সার্ট, বি-ক্লাশ কয়েদীর মতো মোটা দাগ-কাটা বুস (যা পরে নাকি সাহেবরা রাতে শোয়), নয়তো পাঞ্জাবি।

ঠিক এক্ষুনি সে দো-ফেরতা কাপড়ের ওপর যে জামাটা গায়ে তুলছে সেটা পাঞ্জাবি বটে। তবে শ্যামলাই রীতি অনুসারে নির্বোতাম। আর কাঁধের কাছ থেকে ওপর পিঠ অবধি টেনে ছেঁড়া। ছেঁড়াটুকু ল্যাপেলের মতো অথবা গরমে তাতা কুকুরের বের করা জিভের মতো হাওয়ায় নড়ছে।

কোথায় যেন যাবে। ট্যাক্সির অপেক্ষায় সিগারেট ফুঁকছে, একটার পর আর একটা। দো-ফেরতা পরা-কাপড়ের কোমরের কাছটা ঐ এক ধরনের দুটো হাত দুপাশে ঢুকিয়ে অপেক্ষা করছে, আর সিগারেট পুড়ছে দুই ঠোঁটের কন্ট্রোলে।

কিন্তু ট্যাক্সি আর পাওয়া যায় না। যা আসে তাতে লোক ভর্তি, ছুটে বেরিয়ে যায়; নয়তো লাল ন্যাকড়ায় মিটার জড়ানো; নতুবা গ্যারাজ কি ডিফেকটিভ। অথবা শ্যামল খাস্তগীরের অপাঙ্গে একবার তাকাতে তাকাতে থামিয়েও থস করে স্পীড দিয়ে দেয়। শ্যামল দগ্ধ সিগারেট নিয়ে হস্ত আস্ফালনেরও অবকাশ পায় না। শ্যামলের কাছে এসব বড্ড ওদের বাড়াবাড়ি বলে মনে হয়।

ট্যাক্সি পাওয়া দুর্ঘট হল তো! কিন্তু শ্যামল বরখাস্তগীরের বরাবরই ধারণা পথের ধারে এমনি দাঁড়িয়ে থাকলে ট্যাক্সি এসে আপনিই থামবে ওর পাশে। ওরা লোক চেনে। হ্যাঁ ট্যাক্সি চড়নেবালা আদমি বটে। আর সে তো ট্যাক্সি ছাড়া চলেইনি অনেক-দিন। এখনও চলে না। তবে—তবে যাই হোক, ট্যাক্সিওয়ালাদের চেনা উচিত শ্যামল বরখাস্তগীরকে।

তিন নম্বর সিগারেটটাও যখন শেষ হয় হয়—শেষটায় ট্যাক্সিতে উঠে যদি ধরাবার মতো ট্যাকে না থাকে এই আতঙ্কে শ্যামল তখন কিছু অস্থির হয়ে উঠল। সে কিছুতেই ভাবতে পারে না তার চাইতে ব্যস্ত লোক কেউ আছে অথবা ট্যাক্সির প্রয়োজন তার চাইতে আর কারও বেশী জরুরী হতে পারে। সকলের ট্যাক্সি চড়ার অধিকারও সে স্বীকার করে না। ট্যাক্সি চড়বার লেজিটিমেট রাইট শুধু তাদেরই আছে যাদের গাড়ী আছে অথবা ওন ইয়োর ওন কারের ক্ষমতা রাখে। শ্যামল বরখাস্তগীরের পরিভাষা মতো ইতরের চাইতেও একটা ছোটো শব্দ আছে সেই তারা যদি ট্যাক্সিতে চড়ে তো ট্যাক্সির জাত গেল।

শ্যামল বরখাস্তগীরের ক্ষোভ হল। লোকগুলো দূরে থেকে তাকে দেখছে, অথচ ছুটে গিয়ে একটা ট্যাক্সি নিয়ে আসছে না। পকেটে হাত পড়ল। খুব বেশী দূরে যাবার মতো পয়সা নেই। তবু আজ ট্যাক্সি না চড়লেই নয়।

কিন্তু ট্যাক্সি পাওয়া গেল না। সময় গড়িয়ে গেলে শ্যামল বরখাস্তগীরের কোনো

হেরফেরেই হবার কথা নয়, কোনো নির্দিষ্ট জায়গায় যাবার সত্যিকার তাগিদও নেই। তাগিদ ওর নিজের।

বেপরোয়া হয়ে একটা রিক্সাকেই ইসারা করে ডাকল শ্যামল বরখাস্তগীর। রিক্সা-ওয়ালারা বেশীর ভাগই গোবেচারা ভালো মানুষ; সব মানুষকেই বিশ্বাস করে, সব কিছুই বয়ে নিয়ে যায়। লোহা-লক্কড় বা কাঁচা মাংসই কি, মাতাল-বদমাসই কি। দারুণ সিকিউলার, কোনো জাতবিচার নেই, একেবারে নির্বিচার। হাতীর মতো অবয়ব হলেও রাজী, কাচ্চাবাচ্চা মিলিয়ে আধ ডজন হলেও রাজী। এমন দৃশ্য ওদের কাছে অসাধারণ নয় যে, প্রথম দুজন বসে; তাদের কোলে দুজন, আবার তাদের কোলে দুজন, মোট ছজন। সব সময় ছুটতে পারে না। ছজনের ভাড়া ছ'গুণও হয় না, ঐ দুজনার ভাড়া, বলতে গেলে একজনেরই, অর্থাৎ একটা রিক্সার, বাকী সব ফাউ।

ওরা যে কোনো ইসারার অপেক্ষায় থাকে, ইসারা পেলে আর কথা নেই, পাঁড় মরি করে 'বাবুর' কাছে এসে পড়ে। হয়তো একটা খালি লোহার আলমারী, নয়তো
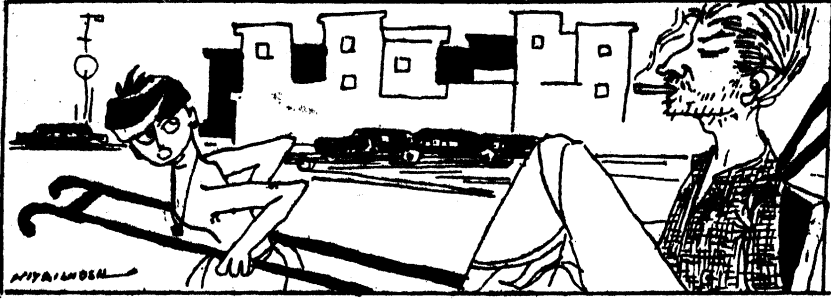
একটা কাঁচা কাঠের তক্তপোষই। ঝাড়া হাত-পা একলা মানুষও পাওয়া যায়। যেমন পাওয়া গেল এখন। শ্যামল বরখাস্তগীরের প্রকৃতি ওর অজানা, কারো প্রকৃতি নিয়ে ওদের কারবারও নয়, চার হাত-পাওলা একটা মানুষ হলেই হল। সওয়ারী, ব্যস আর কথা নেই।

শ্যামল বরখাস্তগীর একজন সওয়ারী। সুতরাং, সে এসে দাঁড়ালো শ্যামল বরখাস্তগীরের কাছাকাছি, যতটা কাছে দাঁড়ানো যায়। বর্ষা হলে বাবুরা একেবারে দোর গোড়ায় ঘেঁষে লাগাতে বলে রিক্সা; তাই লাগায়। সুতরাং—।

শ্যামল বরখাস্তগীর ঠোঁট থেকে জ্বলন্ত সিগারেটটা নিয়ে সেটিই আস্ফালন করে বলল, এই, যাবি? যায়ে গা?

প্রশ্নটা বাহুল্য। কিন্তু কোনো বাবু এ প্রশ্ন করলে একমাত্র এই উত্তরই হতে পারেঃ কাঁহা বাবু?

শ্যামল বরখাস্তগীরের কাছে এমন উত্তর জিজ্ঞাসা অবমাননাকর। ভাড়া দেব বাবু, এর আবার কাঁহা কি?

সে আবার দগ্ধ সিগারেটটা হাতে নিয়ে ঝাঁকি মারল, জাহান্নমে, গোল্লায়, নরককে কি বলিস তোরা? কাঁহা! চলো জাহান্নমে। বলে, নামানো রিক্সায় চেপে বসল শ্যামল বরখাস্তগীর।

রিক্সাওয়ালা গমনোদ্যত হয়ে বলল, কিধার বাবু?

শ্যামল বরখাস্তগীর বলল, বলেছি তো সিধা জাহান্নমে।

রিক্সাওয়ালা বুঝল, আর বাৎচিত ভাল নয়। সে সিধাপথে চলতে লাগল। আধার ডাইনে-বাঁয়ে জিগগেস করে নিলেই হবে।

শ্যামল বরখাস্তগীর খুব স্টাইল করে বসল রিক্সায়, মাঝখানে প্রায় সবটা আসন জুড়ে। মোড়ানো বাঁ-হাঁটুর ওপরে ডান পাটা তুলে রাখল, তারপর দুটো হাতে রিক্সার দুপাশ আঁকড়ে ধরল, সিগারেট রইল ঠোঁটের চাপে।

শ্যামল বরখাস্তগীর হঠাৎ জিগগেস করল, এই, দেখো, কেইসা সানায়া হামকো?

রিক্সাওয়ালার পেছন দিকে তাকাবার অবকাশ নেই, কথাটাও ঠিক বুঝল না, তবু একবার পেছনে সওয়ারীর দিকে তাকালো—

আচ্ছা দেখাতা?

রিক্সাওয়ালা একটু হাসল, আপ্যায়নের হাসি। হিন্দীতেই বলল, আপনারা বড় আদমি, আপনাদের খারাপ দেখাবে কেন বাবু?

শ্যামল বরখাস্তগীর খুশি হল, বলল, বড় আদমির মতো দেখাচ্ছে? সত্যি। ঝুট বলছ না তো?

রিক্সাওয়ালা রিক্সা টানতে টানতেই বলল, ঝুট কেন বলব, বাবু? আপনারা তো বড় আদমিই।

আগে যে ওর ওপর বিরক্তি জন্মেছিল শ্যামল বরখাস্তগীরের মনে, তা উবে গেল। তারপর শুধু 'ডাহিনা বাঁয়া' 'ডাহিনা বাঁয়া' করতে করতে রিক্সাওয়ালা দেখল তারা যে জায়গা থেকে সুরু করেছিল সেই জায়গায় ফিরে এসেছে। রিক্সাওয়ালারা সচরাচর কিছুতেই বিস্মিত হয় না, কিন্তু শ্যামল বরখাস্তগীরের আচরণে হল। ওদের কিছু বলার রীতি নেই, তাই বলল না কিছু, কপাল আর গায়ের কিছু কিছু ঘাম নোংরা গামছাটা দিয়ে মুছতে লাগল।

শ্যামল বরখাস্তগীর একটা সিকি ওর দিকে বাগিয়ে ধরল। অত্যন্ত বিব্রত রিক্সাওয়ালা তার আপন মাতৃভাষায় বলল, এ কি দিচ্ছেন, বাবু?

কেন, কম হল? পাল্টা প্রশ্ন করল শ্যামল বরখাস্তগীর। আজ পর্যন্ত কোন রিক্সাওয়ালা এমন প্রশ্ন করে নি আমাকে। যা দিয়েছি সেলাম জানিয়ে নিয়েছে।

রিক্সাওয়ালা বাবুকে বিরক্ত দেখে মিনতি করে বলল, দেখিয়ে কেৎনা ঘুমায়া—এক সিকি দিচ্ছেন?

শ্যামল বরখাস্তগীর বলল, হ্যাঁ, আরও কত চাস? জানিস ট্যাক্সিই আমি চাড়ি, রিক্সা চড়বার মত ছোট আমি নই। তুই তো বললি, আমি বড় আদমি।

রিক্সাওয়ালা বলল, বড়বাবু তো বটেই; আপনিই মেহেরবাণী করে ভেবে দেখুন, এত ঘুরে এক সিকি?

কোথাও তো যাই নিরে!

রিক্সাওয়ালা বলল, সে আপনার মর্জি, আমি তো আপনাকে যেখানে যেতে চান নিতে তৈয়ার ছিলাম।

আউর এক আনা দেগা?

রিক্সাওয়ালা ক্রমশই হতাশ ও বিরক্ত হয়ে উঠছিল। সে বলল, বারো আনা থেকে এক পয়সা কম নেব না বাবু।

শ্যামল বরখাস্তগীর আবার চটে গেল, বলিস কি? বারো আনা? এক সঙ্গে কখনো দেখেছিস বারো আনা? বারো আনা তো ট্যাক্সি!

রিক্সাওয়ালা বলল, এ তো ট্যাক্সি নয় রিকসা বাবু।

কলকাতায় যেমন হয়, বাবু-রিক্সাওয়ালার একরার দেখে ও শুনে এক এক করে অনেকেই দাঁড়িয়ে গেল। তখন রিক্সাওয়ালা ওদের কাছেই আবেদন জানাতে শুরু করল। শ্যামল বরখাস্তগীর তর্ক ছাড়ে না, রিক্সাওয়ালাও দাবী ছাড়ে না। তখন শ্যামল বরখাস্তগীর রিক্সার ওপর আনা ছয়েক পয়সা ফেলে চলে যায় দেখে রিক্সাওয়ালা লাফিয়ে তার পিছু নিল। এই বাবু, ভাড়া না দিয়ে কোথায় যাচ্ছেন?

বেশ ভিড় জমে উঠল এবং কলকাতায় যেমন হয়, অনেকেই ব্যাপারটা জানতে চাইল, বাবু কোথাও থামে নি শুনে বিস্মিত হল, যারা ওকে এ পাড়ায় চেনে তারা অধিবাসী নয়; তারা সবাই ওকে বলল, রিক্সায় চেপেছেন, ভাড়া নিয়ে গরীব মানুষের সঙ্গে ঝঞ্ঝাট করছেন কেন মশাই?

শ্যামল বরখাস্তগীর বলল, সে আমার সঙ্গে ওর, আপনারা কেন?

ভিড়ের লোকেরা বলল, বেশ, ওর সংগেই চুকিয়ে ফেলুন। কিন্তু শ্যামল বরখাস্তগীরের একটা যে প্রেস্টিজ আছে একথা এই ভিড়ের একটা লোকও কি জানে না, চেনে না তাকে?

ভিড় থেকে নানা রকমের মন্তব্য হতে লাগল—মন্তব্যগুলো আদৌ গৌরবের নয়।

শ্যামল বরখাস্তগীর তার পকেটে যত পয়সা ছিল সব বের করে রিক্সাটায় ঢেলে দিয়ে ভিড়ের বাইরে এসে বাড়ীমুখো হল: রিক্সাওয়ালা ও ভিড়ের কেউ কেউ গুনে দেখে সর্বসাকুল্যে আজকালকার ৮২টি পয়সা আছে। কেউ কেউ বলল, নিয়ে নে সব। রিক্সাওয়ালা বলল, না না বাবুসব, ঐ বাবু গোঁসা হয়েছেন। সে ঐ বাড়তি সাতটা পয়সা নিয়ে শ্যামল বরখাস্তগীরের পেছনে ছুটল। নাগাল পেয়ে পয়সা সাতটা ওর হাতে দিতে চাইল। 'ছোট লোক পেয়েছিস', ক্রুদ্ধদৃষ্টিতে একথা বলে শ্যামল বরখাস্তগীর পয়সাগুলো সামনের দিকেই ছুঁড়ে ফেলে দিল।

তামাসা যারা দেখছিল তারা আর এগোলো না। রিক্সাওয়ালাও তার রিকসামুখো ফিরল। শ্যামল বরখাস্তগীর সামান্য এদিক-ওদিক তাকিয়ে ছুঁড়ে ফেলা পয়সাকটা চট করে কুড়িয়ে নিয়েই পকেটে রাখল। একটু নর্দমার নোংরা লেগেছে। তা লাগুক।

রহস্যময়ী ভালুকী

দেবীপ্রসাদ বন্দ্যোপাধ্যায়

জঙ্গলের পথ ঘুরতে ঘুরতে এক বাঘিনী দৈবাৎ গ্রামের ধারে এসে পড়েছিল। সেই সময় একটা ছাগলছানার ডাকে বাঘিনী আকৃষ্ট হয়ে দাঁড়িয়ে পড়ে। এদিকে মা-হারিয়ে ছাগলছানাটা বাঘিনীর সামনেই হঠাৎ এসে হাজির হয়। সে বাঘিনী কখনও দেখেনি—বাঘিনীর শান্ত চোখের দিকে তাকিয়ে 'ব্যা' করে ডেকে ওঠে। খাদ্য-খাদকের সম্বন্ধ, বাঘিনীটা হয়তো এক্ষুণি এসে ওর নরম টুঁটি কামড়ে ধরবে। কিন্তু তা তো হলই না, বরং মা-হারা ছাগল-ছানাটাই এগিয়ে গিয়ে ওর নাকে নাক ঘষতে লাগলো। বাঘিনী চোখ পিট্‌পিট্ করতে করতে মুখ ঘুরিয়ে জঙ্গলে ফিরে গিয়েছিল। আফশোষ হয়—রাইফেল ফেলে এমন দৃশ্য যদি কেউ ক্যামেরায় ধরে রাখতো! বিখ্যাত শিকারী অপত্য-স্নেহের সেই ভীষণ সুন্দর দৃশ্য জীবনের শেষদিন পর্যন্ত মনের নিরালা কোণে সযত্নে লালন করতেন।

সেবার শিকারের সন্ধানে পুরণাগড়ে গিয়ে যে ঘটনার সম্মুখীন হয়েছিলাম তারও চমৎকারিত্ব কিছু কম নয়—অবাক হবারই মত। ঘটনাটা একটা বাচ্চাওয়ালী ভালুকীকে নিয়ে। ঘটনার রাত্রে আমার রাইফেল থেকে যে গুলী ছুটে গিয়েছিল, সে ওকে মারবার জন্য নয়, দৈবাৎই ছুটে গিয়েছিল।

সন্ধ্যার আবছা অন্ধকারে যখন ডাক-বাংলোর সামনে বাস থেকে নেমে পড়লাম তখন সেখানে কোন লোকজন ছিল না। তখনকার দিনে এ রাস্তায় মাত্র দুখানি বাস যাতায়াত করতো—অনুগুল থেকে টিকেরপাড়া ঘাট পর্যন্ত। আমায় নামিয়ে দিয়ে বাস ধুলো উড়িয়ে চলে গেল টিকেরপাড়া ঘাটের দিকে। দীর্ঘসময় একভাবে বসে থাকার দরুণ আমার পায়ে ঝিঁ-ঝিঁ ধরে গিয়েছিল। ভারী পা দুটো টেনে বিছানাপত্তর নিয়ে বাংলোর

বারান্দায় এসে দাঁড়াতেই বাংলোর মালী কোথা থেকে ছুটে এল।

বাংলোটা পি, ডবলিউ, ডি-র—এই সময় একজন বড় অফিসারের আসার কথা ছিল। মালীও আমায় সেই অফিসারই ভাবলো; কিন্তু আমি যখন বেচারার ভুল ভেঙে দিয়ে বললাম—আমি একজন শিকারী, জঙ্গল রিজার্ভ করে দর্শনের জন্য এসেছি আর এখানেই থাকবো। তখন বেচারা হাত-জোড় করে জানাল—সাহেব হঠাৎ এসে পড়ে যদি গোঁসা করে তাহলে গরীবের চাকরী চলে যাবে। অথচ এ অন্ধকারে আমি পরদেশী লোক আর কোথাই বা যাব। এ জঙ্গলের দেশে আর দ্বিতীয় আশ্রয়ের জায়গা নেই। তখন বেচারী অনেক ভেবেচিন্তে মাথা চুলকে বললো—রসুই ঘরের পাশে একটা খালি ঘর আছে। আমার যদি আপত্তি না থাকে তো এখুনি সে ঘর খুলে দিতে পারে। অগত্যা সেই ঘরই দখল করে প্রথমে দরজা-জানলা-গুলো দেখে নিলাম। আমার একার পক্ষে যথেষ্ট। কয়েক মিনিটের মধ্যেই মালী হ্যারিকেন ও খাটিয়া এনে আমার বিছানা পেতে দিল। রাতের খাবার আমার সঙ্গেই ছিল—সুতরাং কাঁচা রসদ যা সঙ্গে এনে-ছিলাম ওর হাতেই তুলে দিলাম; সকাল থেকেই ও সব ব্যবস্থা করে দেবে। সময়টা ছিল শীতকাল। ঠান্ডা জলে মুখ-হাত ধুয়ে কম্বল-মুড়ি দিয়ে বসে যখন আরাম করে সিগারেট ধরিয়েছি তখন গুটি গুটি করে কয়েকজন স্থানীয় বাসিন্দা নমস্কার জানিয়ে এসে বসলো। জঙ্গলের ধারের গ্রামে কোন শিকারী এসে পেঁাছলে খবরটা সঙ্গে সঙ্গে ছড়িয়ে পড়ে, দেখলাম কথাটা মিথ্যে নয়। ওদের কাছে জঙ্গলের জীব-জন্তুর সম্বন্ধে খোঁজ-খবর নিতে লাগলাম। এরকম খবর কিন্তু সবসময়েই সত্যি হয় না—অভিজ্ঞ শিকারীরা এই কথাবার্তার মধ্য থেকেই খাঁটি খবর বেছে নিতে পারেন। এই দলের মধ্যে রানার ও ফরেস্ট-গার্ড ছিল। লোকদুটিকে আমার হাতে রাখা দরকার—কারণ শিকারে এদের কাছ থেকে অনেক প্রয়োজনীয় খবর পাওয়া যায়।

ওরা একটার পর একটা অনেক রোমাঞ্চ-কর আর আজগুবী গল্প শোনাতে লাগলো; কিন্তু শেষকালে রাণার যে ঘটনাটি শোনাল তা যদি সত্যি হয় তাহলে এবার আমার অবাক হবার পালা। রাণার কিন্তু ঘটনার সত্যতা সম্বন্ধে শপথ পর্যন্ত করে বসলো, এমনকি চাক্ষুষ প্রমাণের জন্য আমায় ঘটনার জায়গায় নিয়ে যেতেও রাজী হল। রাণারের কাহিনী শুনে আমি সত্যই বিস্ময়বোধ করছিলাম, এবং কেন করছিলাম এখন সেই গল্পই আপনাদের শোনাব—ও আগে ভদ্রকের দেবাগির অঞ্চলে কাজ করতো, পুরণাগড়ে এসে রাণারের চাকরী নিয়েছে সে আজ অনেকদিনের কথা। পুরণাগড়ের রাস্তায় তখন বাস চলতো না। ওর কাজই হল অন্ধকার থাকতেই উঠে চিঠির আলাদা আলাদা থলিগুলো নিয়ে দূরের গ্রামের ডাকঘরে পেঁাছে দেওয়া। আবার সেখান থেকে ডাক সংগ্রহ করে বড় ডাকঘরে জমা দেওয়া। সুতরাং জঙ্গলের সহজ আর সংক্ষিপ্ত পথগুলো ছিল ওর নখ-দর্পণে। বহুবার যাতায়াত করায় চোখ বন্ধ করেই ও পথ চলতে পারতো। জঙ্গলের পথে চলতে চলতে কত জন্তু-জানোয়ার দেখেছে। এমনকি বাঘের সামনেও কতবার পড়েছে—কিন্তু কখনও কোন বিপদ হয়নি। এ অঞ্চলে তখন কোন মানুষখেকো বাঘের উৎপাত ছিল না। মানুষখেকোর উৎপাতে তখনকার দিনে প্রায়ই ডাকবিলি বন্ধ হয়ে থাকতো। বাঘের ভয়ে মানুষজন জঙ্গলের পথ মাড়াতো না। কালা-হান্ডি ও অন্যান্য অঞ্চলে কত রাণার যে বাঘের পেটে গেছে তার কোন হিসাব নেই। রাণারের সঙ্গে শিকারীরা পর্যন্ত ডাক নিয়ে ছুটতো জঙ্গলের পথে মানুষখেকো মারবার জন্য। সেরকম ঘটনা আজকাল বড়একটা শোনা যায় না। ডাকবিলির ব্যবস্থার উন্নতি হয়েছে আর বাঘের উপদ্রবও অনেক কমে গিয়েছে।

পুরণাগড়ের জঙ্গলে যেসব জানোয়ার বাস করতো ভোররাত্রে রাণারের লন্ঠনের আলোয় প্রায়ই থমকে দাঁড়িয়ে পথ করে দিত। রাণার বলতো ওদের সঙ্গে আমার চেনা-পরিচয় হয়ে গিয়েছিল। একা জঙ্গলের মধ্যে যাতায়াত করতে ওর কোনদিন ভয় করেনি। কিন্তু সেদিন যা ঘটলো তেমন আর কখনও ঘটে নি। এতদিন ভয় পাইনি বলে সুযোগ বুঝে ভয় তখন আমায় যেন পিষে মারছিল। যথারীতি মেল-ব্যাগ বাঁ হাতে মুঠি করে পিঠে ফেলে ডান হাতে বল্লম ও হ্যারিকেন লন্ঠনটা ঝুলিয়ে হন্‌হন্‌ করে চলেছি, তখন রাত শেষ হতে আর বিশেষ দেরী নেই—অনেক দূর থেকে বন-মোরগের ভাঙা ডাক শুনতে পাচ্ছিলাম। আমার যাত্রাটাই খারাপ ছিল। নূতন কেনা বিড়ির বান্ডিলটাই ফেলে এসেছি। পকেট হাতড়ে পুরানো একটা বিড়ি বার করে সবে ধরিয়েছি—এমন সময় প্রকান্ড একটা সম্বর হুড়মুড় করে আমার পাশ দিয়ে পাহাড়ে উঠে গেল। আচমকা এসে পড়ে সম্বরটা নিজেও ভয় পেল আর আমাকেও খুব একচোট ভয় পাইয়ে দিয়ে গেল। তখন জঙ্গলের মধ্যে অনেকটা পথ এসে গেছি। এমন সময় সামনের একটা ঝোপ দুলে উঠলো। ভোর হয়ে আসছে বনের জন্তু-জানোয়ার তাড়াতাড়ি বাসায় ফিরে যাচ্ছে, সুতরাং ভয় পাওয়ার মত কিছুই তেমন ঘটেনি—লন্ঠনের আলোটা উঁচু করে তুলে একইভাবে এগিয়ে যেতে গিয়েই থমকে দাঁড়িয়ে গেলাম। কালো মত ওটা কি? তখনও জন্তুটাকে ভাল করে দেখতে পাইনি; ভয়ে আমার বুকের মধ্যে গুরগুর করে উঠলো। জন্তুটা যখন ঝোপের আড়াল থেকে বেরিয়ে এল তখন আমার পা-দুটো এত ভারী হয়ে উঠেছিল যে পালাবার কোন শক্তিই যেন ছিল না। ভীষণ আতঙ্কে আমি থরথর করে কাঁপতে লাগলাম, আমার চোখের সামনেই একটা প্রকান্ড ভালুক পায়ে-চলা পথটা জুড়ে ঠিক মানুষের মতই সামনের দু'পা তুলে উঠে দাঁড়াল। লন্ঠনের আলোয় ওর লাল চোখদুটো চক্‌চক্‌ করছিল। ভালুক তখনও গর্জন করে তেড়ে আসেনি। আমাদের দেশের মানুষ বাঘের চেয়ে ভালুককেই বেশী ভয় পায়, এক্ষুনি ছুটে এসে ছিঁড়ে ফেলবে—আর রক্ষা নেই, ভয়ে আমার সর্বাঙ্গ হিম হয়ে যেতে লাগলো। হঠাৎ কি খেয়াল হল—যেমন করেই হোক ওর হাত থেকে বাঁচতেই হবে, যেই ভাবা অমনি সঙ্গে সঙ্গে পাশের নীচু জঙ্গলে লাফিয়ে নেমে পড়লাম আর প্রাণপণে দৌড়তে লাগলাম। কোথা থেকে যে এমন শক্তি এল কিছুই বুঝতে পারলাম না—সবই মালিকের কৃপা! অনেক ঘুরে 'মানিকজুড়িতে' যখন এসে পেঁাছলাম তখন আমার অবস্থা অত্যন্ত শোচনীয়, দম নিতে পারছিলাম না, মাথা বোঁ-বোঁ করে ঘুরেছ, আর তৃষ্ণায় বুকের ছাতি যেন ফেটে যাচ্ছে। কোনরকমে সাধু-বাবার আশ্রমে টলতে টলতে এসে দরজায় ধাক্কা দিলাম। গুরুর দয়া—ভালুকটা আমায় কিন্তু তাড়া করেনি—ঝোপটার কাছেই দাঁড়িয়ে ছিল। সাধু-বাবার ঘরে এসে কোন্‌-গতিকে এক গ্লাস জল চাইলাম। তখন আমার কথা বলার মত অবস্থা ছিল না। জল খেয়ে একটু সুস্থির হবার পর সব ঘটনা খুলে ওঁকে শোনালাম। সব শুনে সাধুবাবা চিন্তা করতে লাগলেন, তাঁর মুখে যথেষ্ট উদ্বেগের চিহ্ন ছিল। গম্ভীর গলায় বললেন, আমি পুরনো পথটা ছেড়ে যেন অন্য পথে যাতা-য়াত করি। সাধুবাবার কথামত পাঁচ-ছয়দিন করলামও তাই, অর্থাৎ যে ঘুরপথটা দিয়ে সেদিন 'মাণিকজুড়ি' এসেছিলাম সেই পথটাই ব্যবহার করতে লাগলাম। কিছুদিন যাওয়ার পর ভাবলুম অযথাই এতটা পরিশ্রম করছি। ভালুক কি আজও আমার জন্য সেখানে বসে আছে। দৈবাৎই সেদিন হয়তো সামনে পড়ে গিয়েছিল। যাই হোক্‌, সাধুবাবাকে কিছু না জানিয়েই ঠিক করলাম আগামীকাল থেকে আবার পুরনো পথেই হাঁটা শুরু করবো।

পরের রাত্রে পথের সেই সন্ধিস্থলে এসে পুরনো পথেই পা বাড়ালাম। যতই মুখে বলি না কেন দেখা যাক কি হয়—মনে মনে কিন্তু যথেষ্টই ভয় ছিল, বুকের ভিতরটা দড়াম্‌ দড়াম্‌ করছিল—পালাবার জন্য সবসময়ই তৈরী ছিলাম। ভালুকটা সে রাত্রে তাড়া করেনি বলেই হয়তো এত তাড়াতাড়ি সাহস ফিরে এসেছিল। যতই এগুতে লাগলাম ততই দুর্ভাবনা বেড়ে যেতে লাগলো—ভালুক তাড়া করলে ওর সঙ্গে এঁটে উঠতে পারব কিনা! শেষপর্যন্ত উঁচু জায়গাটায় উঠে আসতেই আমার ঘাম ছুটে গিয়েছিল। দ্বিতীয় কদম ফেলার পরও যখন জঙ্গল নড়ে উঠলো না, তখন আলো উঁচু করে ধরতেই কোথা থেকে হুড়মুড় করে ভালুকটা ছুটে এল। এতই আচমকা ভালুকটা বেরিয়ে এসেছিল যে আমি লাফাবার কথা ভুলেই গিয়েছিলাম। অত্যন্ত আশ্চর্য হয়ে দেখলাম ভালুক সোজা আমায় জড়িয়ে না ধরে পর্বোক্ত জায়গায় আগের মতনই পথরোধ করে দাঁড়াল। ভালুকটাকে মাত্র কয়েকটা মুহূর্ত দেখেছিলাম। তারপরেই পড়ি কি মরি করে নীচের জঙ্গলে নেমে এসেছিলাম। এবারেও ভালুক তাড়া করেনি। ভয়ে সাধু-বাবার আশ্রমে আর ঢুকতে সাহস করিনি।

...নরকমে প্রাণে বেঁচে গিয়েছিলাম। একটা ...া থেকে পেট ভরে জল খেয়ে সাধুবাবার ...দশ্যে প্রণাম করে এগিয়ে গিয়েছিলাম। ...রের গভীর বিশ্বাস—ভালুকটা জঙ্গলের ...রণ জন্তু নয়, এর পিছনে অন্য কিছু ...ছে। অনেক রাত হয়ে পড়ায় ওরা বিদায় ...য় চলে গেলে আমি রাতের আহার সেরে ...রায় খিল দিয়ে শুয়ে পড়লাম।

নূতন জায়গায় এসে সহজে ঘুম এল ... বাংলোটা একেবারে জঙ্গলের ধারেই— ...টা রাতচরা পাখী অনেকক্ষণ একটানা ...চ্ছিল—কুক্-কুক্-কুক্। ডাকটা থেমে ...তই একটা সম্বর পাহাড় থেকে ডাকতে ...তে নেমে গেল। সম্বরটা চলে যাওয়ার ...ই সব চুপচাপ, গভীর নৈশ-স্তব্ধতায় ...ব রইলাম। কোথাও আর এতটুকু সাড়া ...দ নেই। রাণারের অদ্ভুত গল্পটার কথা ...নর মধ্যে ঘুরতে লাগলো। ভালুকটার ...চরণ সত্যই অদ্ভুত। জঙ্গলের সাধারণ ...তু নয়—এর পিছনে অন্য কিছু আছে, ...শ্চয়ই আছে, তা নাহলে আক্রমণোদ্যত ...লুক শুধু পথরোধ করেই দাঁড়ায় কেন, ...ড়াও করে না, বন্যপ্রাণীর বিচিত্র মতি-...তর কতটুকুই বা আমাদের জানা আছে! ...ণ্যজগতের রহস্যের গোপনদ্বারে কী ...জানা বিস্ময় অপেক্ষা করে আছে—কে ...নে! বন্য জীবজন্তুর মধ্যে ভালুক অত্যন্ত ...তিহলী, ভীষণ শক্তিশালী কিন্তু দারুণ ...ভীস—ভয় পেলেই মারাত্মক আক্রমণ করে ...স। ভালুকের আক্রমণ থেকে ফিরে এসেছে ...ন মানুষ আমি দেখেছি—সে মুখ সভ্য-...াজে ভয়ের উদ্রেক করে, বীভৎস ক্ষতের ...গ কোনদিনই মিলিয়ে যায় না। ভালুক ...ক্রমণ করে সুবিধা করতে পারলেই চোখ ...পাড়িয়ে নেয়, আক্রান্ত বা ভয় না পেলে ...থ-ভালুক সচরাচর দৌড়ে গিয়ে আক্রমণ ...রে না। মত্ত-মাতালের মত হেলেদুলে খাদ্যের ...ধানে চলে যায়। কিন্তু হিমালয়ের ভালুক ... ব্রাউন-ভালুক হিংস্র এবং মাংসাশী বাঘের ...তই শিকারের সন্ধান করে। মরা জীবজন্তু ...মন কি মানুষের মৃতদেহ ভক্ষণ করতে ...স্তত করে না। শ্লথ (কালো) ভালুকের ...ভ্যাচার, উড়িষ্যা, মধ্যপ্রদেশ ও মাদ্রাজে ...শেষভাবে দেখা যায়। উত্তর-বিহারের ...পাল সীমান্তের বিকনাটোরীতেও যথেষ্ট ...থ ভালুক দেখা যায়। আমি যখন ...কনাটেরীতে একটা বাঘিনীর সন্ধানে ...নের পর দিন ঘুরে বেড়াচ্ছি, সেই সময় ...চমকা একটা ভালুকের সামনে পড়ে গিয়ে-...লাম। ভালুকটা ভয় পেয়ে তেড়ে আসতেই ...ি করে রাইফেলটা সামনে তুলে ধরলাম। ...লুকটাকে মারার মতলব ছিল না। কিন্তু ...লুকটা যেভাবে তেড়ে এল তাতে প্রাণ ...চাতে হলে ওকে তৎক্ষণাৎ গুলী করতে ...য়। ট্রিগার চাপতে যাব এমন সময় ভালুকটা ...ঠাৎ থেমে গিয়ে ঠিক মানুষের মত দুপায়ে ...ড়িয়ে উঠেই আঁক করে একটা শব্দ করে ...ঠলো। তারপরেই ঘুরে চার পায়ে নেমেই ...নজঙ্গলের মধ্য দিয়ে তীরবেগে দৌড়তে ...াগলো। শেষপর্যন্ত ভালুকটাকে গুলী ...রতে হল না বলে অদৃষ্টকে ধন্যবাদ দিলাম। ...ন্তু ভালুকটা আক্রমণের সময় যেরকম বীভৎসমুখে গর্জন করে উঠেছিল তাতেই আমার পিলে চমকে গিয়েছিল। ভালুকের কালো লোমের কম্বল ভেদ করে বাঘের থাবার নখ পর্যন্ত পৌঁছয় না অসম্ভব ঘন-লোমের আবরণে ছোট ছোট লাল চোখদুটো কুৎ-কুৎ করে যে মত্ত-চাহনি মেলে থাকে—তাতে আছে অনেক দুষ্টবুদ্ধি আর কত বিচিত্র রঙ্গ-রস। আমরা পোষা নাচিয়ে ভালুকের কৌতুক দেখেছি—তার ঘন ঘন জবর হওয়াও দেখেছি, কিন্তু বুনো ভালুকের সঙ্গে মধু নিয়ে ঢলা-ঢলি করিনি—কাহিনীটা খুবই মজার, এই ফাঁকে শুনিয়ে রাখি।

বিকনাটোরীতে শিকারে এসে এক ভদ্র-লোকের সঙ্গে আলাপ হয়েছিল। ভদ্রলোক রেলে চাকরী করেন। তখনকার দিনে বিকনা-টোরী দস্তুরমত জঙ্গুলে জায়গা। সন্ধ্যার পর প্ল্যাটফরমে বাঘ ঘুরে বেড়ায়, সীমান্তের ওপারের পাহাড় থেকে হাতির ডাক শোনা যায়। আর আড়ালে আড়ালে চিতার ফ্যাঁচ্-ফ্যাঁচানি তো নিত্য কাহিনী। ভদ্রলোকের ফ্যামিলি কোন গতিকে রাত্রি কাটিয়ে দুর্গা-দুর্গা বলে ট্রেনে চেপে সোজা নারকাটিয়া-গঞ্জ। সেই থেকে ওঁর ফ্যামিলি থাকে নার-কাটিয়াগঞ্জে। আর তিনি চাকরীর দায়ায় একা রাত কাটান বিকনাটোরীর কোয়ার্টারে। ছুটিছাটা পেলেই নারকাটিয়াগঞ্জে ফিরে আসেন। এমনি দিন কাটছিল তাঁর। বেচারা শিকারী নয়, তাই বনের বাঘ-ভালুকের ডাক্ ওঁর ভাল লাগতো না—বৈচিত্র্যহীন জীবন। এইরকম হয়—ভগবান শিকারীগুলোকে বসিয়ে রাখেন খাসশহরের চৌমাথায়, আর এঁর মত লোকেরাই চাকরীর ধান্দায় এসে পড়েন শিকারের রাজ্যে। যাই হোক—কিং অব দি কিংসের বিরুদ্ধে তো আপীল নেই, অন্যান্য দিনের মত সেদিনও ছুটি কাটিয়ে তিনি নারকাটিয়াগঞ্জ থেকে ফিরে আস-ছিলেন। এমন সময় ওঁর পিসীমা এক-কাঁদি পাকা কলা বেঁধে দিলেন—একেবারে গাছপাকা। ভুর-ভুর গন্ধে ট্রেনের কামরা মাৎ হয়েছিল। কোর্টারের ফিরে এসেই তাড়াতাড়ি কাঁদিটা জানলার ধারে টেবিলে সাবধানে রেখে—রাতের খাওয়া সেরে তাড়াতাড়ি শুয়ে পড়েছিলেন। সারাদিন হৈ-হুল্লোড়ে শরীরটা ক্লান্তই বোধ হচ্ছিল। তখন গ্রীষ্মকাল, জানলা দিয়ে ফুরফুরে হাওয়া আসছিল। এ-লাইনের এইটাই শেষ কোয়ার্টার। ঘরটার গা থেকেই পাতলা ঝোপ-ঝাড় শুরু হয়ে বর্ষার জল বওয়া ভাঙাচোরা ঢালু জমির উপর দিয়ে দূরের ঘন বনে মিশে গেছে। জানলার ধারে দাঁড়িয়ে শাল-মহুয়া আর বুনো ঝোপ-ঝাড় দেখতে দেখতেই সময় কেটে যায়। তিনিও প্রথম এসে মুগ্ধ হয়ে জঙ্গলের শোভা দেখতেন আর কবিতার লাইনগুলো মনে মনে আওড়াতেন। সেসব দিন তখন পুরনো হয়ে গেছে। তাঁর চোখে তন্দ্রা নেমে এল—জঙ্গলের কত অদ্ভুত শব্দ শুনতে শুনতেই রোজ ঘুম আসে।

হঠাৎ যেন মনে হল জানালাটা বন্ধ হয়ে গেছে, হাওয়া বন্ধ হয়ে যেতেই তাঁর এইরকম মনে হয়েছিল। তখন চোখ ঘুমে ভেঙে এসেছে। জানলা খোলার জন্য আর উঠতে ইচ্ছা হল না। পাশ ফিরে শুতে গিয়েই বুঝতে পারলেন—না জানালা খোলাই আছে। তাহলে হাওয়া বন্ধ হয়ে গেছে, কিন্তু এতক্ষণ ঘরে চাঁদের আলো আসছিল। জানালা যদি খোলাই থাকবে তা'হলে ঘর এত অন্ধকার হয়ে আছে কেন! আকাশে মেঘ জমেছে নাকি। একবার চোখ মেলে দেখার চেষ্টা করলেন। দেখতে গিয়েই ওর মাথায় যেন আকাশ ভেঙে পড়লো। ভীষণ চমকে উঠে দেখলেন জানালার কাছে কালো মত কি যেন একটা নড়ছে। মুহূর্তে তন্দ্রা ছুটে গেল। ধড়মড়িয়ে উঠে ভাল করে দেখেই ওঁর ধাত ছেড়ে যাওয়ার মত অবস্থা হল। শরীরের সমস্ত রক্ত যেন মুহূর্তে জল হয়ে অসাড় করে ফেললো। একটুও নড়া-চড়ার ক্ষমতা রইল না। ভয়ে আড়ষ্ট হয়ে শুধু বসে রইলেন, আর ওঁর সমস্ত মুখ বেয়ে দরদর করে ঘাম গড়াতে লাগলো। বুকের ভিতরটা দড়াম-দড়াম করে যেন ফেটে যাচ্ছে। শুকনো-গলা দিয়ে ততোধিক শুকনো জিভটা যেন গলার মধ্যে কোথায় গিয়ে শ্বাস-রুদ্ধ করে মেরে ফেলায়

মতলব করছে। এ অবস্থায় কি করা উচিত ও'র মাথায় এল না। সব বুদ্ধিই যেন মুহূর্তে লোপ পেয়ে গেল। একটা প্রকান্ড ভালুক জানালায় দাঁড়িয়ে থাবা বাড়িয়ে পাকা-কলার কাঁদিটা ধরবার চেষ্টা করছে। কিন্তু কাঁদিটা ওর নাগালের বাইরে থাকায়, থাবা বাড়িয়ে এমন লোলুপ হয়ে চেয়ে রয়েছে। কাঁদিটা ওর থাবার মাত্র আধ-হাত দূরেই ছিল। ভালুকটা ক্রমশই অধীর আগ্রহে থাবা ছুঁড়তে লাগলো। আর ওর বড় বড় নখগুলো টেবিলের উপর হাঁচোড়-পাঁচড় করে যে শব্দ করতে লাগলো তাতেই দাঁতে-দাঁত লেগে তাঁর জ্ঞান হারাবার উপক্রম হয়েছিল। ঘরে আর দ্বিতীয় মানুষ নেই অথচ অপলকা জানালায় থাবা উঁচিয়ে আছে বিরাট বন-মানুষ। হৈ-হল্লা করা তো দূরে থাক গলা দিয়ে কোন স্বরই বের হল না। সে যে কী অব্যক্ত যাতনা তা বোঝান যায় না।

ভদ্রলোকের অবস্থা এদিকে ক্রমশই সঙ্গীন হয়ে উঠলো। ঘরের দরজা খুলে

......পাকা কলার কাঁদিটা ধরবার চেষ্টা করছে।

পালাতেও সাহস হচ্ছে না, প্ল্যাটফরমে বাঘ পায়চারি করছে। অথচ ঘরে বসে এ দৃশ্য আর সহ্য করতে পারা যাচ্ছে না। সমস্ত স্নায়ুযন্ত্র বিকল হয়ে তখন একটা জড়-পদার্থে পরিণত হয়েছে। নাকের ডগায় মারাত্মক ভালুক পিসীমার দেওয়া কদলী দেখে ক্রমশই তেতে উঠছে। ওর দীর্ঘ-তীক্ষ্ন নখের টেবিল খামচানর শব্দ যতই তীব্র থেকে তীব্রতর হয়ে উঠতে লাগলো, ততই দম্ বন্ধ হয়ে হৃদপিন্ডখানা পাঁজরা খুলে ঠিক্‌রে বেরিয়ে যাওয়ার উপক্রম হল। এই সময় সমস্ত শক্তি জড় করে একবার প্রাণপণে

তিনি চেঁচিয়ে উঠলেন—এই! কিন্তু সে শব্দ তাঁর নিজের কানেই ভালমত পেঁছল না। ভালুকের শ্রবণ-শক্তি অত্যন্ত তীক্ষ্ন—ও বেচারা কত জোর শুনলো অনুমান করা সহজ। আবার একবার চিৎকার করে ধমক্ দেওয়ার চেষ্টা করতেই এমন তোতলামি পেয়ে বসলো যে জিহবার দ্বারা কোনরূপ শব্দই তৈরী করা সম্ভব হল না। অতিরিক্ত উত্তেজনায় মাথার মধ্যে কেমন যেন সব গোল-মাল হয়ে যেতে লাগলো। ভদ্রলোকের বিহবল দৃষ্টি সামনে তখনও ভালুক সমানে তার আস্ফালন চালিয়ে যাচ্ছিল।

হঠাৎ তার মনে পড়লো—দেওয়ালের কোণে একটা লাঠি দাঁড় করান আছে। কিন্তু ভয় হল সামান্য লাঠি হাতে অতবড় ভালুকের সামনে রুখে দাঁড়াতে। এ সামান্য যষ্টি ওই বিশাল বপুর সামনে বড়ই অকিঞ্চিৎকর। ভালুক কিন্তু তখনও পিসীমার পাকা কলার

ঝোঁকেই ছিল—শেষে কি হিতে বিপরীত হবে! এমন সময় বুদ্ধি খুলে গেল—আগুনকে সব প্রাণীই ভয় পায়! খাটিয়ার নীচে একটা লম্ফ ছিল—বালিশের তলা থেকে দিয়াশালাই নিয়ে ফস্ করে জেলেই লম্ফটা তুলে ধরলেন। আর যায় কোথা—অতবড় যে ভালুকটা ভয় দেখিয়ে এতক্ষণ ধরে ভদ্র-লোকের হৃদপিন্ডখানা শুকিয়ে একেবারে আমসী করে এনেছিল; নিজেই তখন আঁক-আঁক করে জঙ্গল তোলপাড় করে ছুটতে লাগলো প্রাণের দায়ে। জঙ্গলের শুকনো পাতার উপর তার হুটোপাটির শব্দ আর ভয়

পাওয়া পরিত্রাহি চিৎকার অনেকক্ষণ ধরে শোনা গেল। আর যখন কোন সাড়া-শব্দ রইল না—তখন তিনি চুপি চুপি উঠে জানালায় ছিট্‌কিনি বন্ধ করে দিলেন। একটু গরম অবশ্য হবে, কিন্তু অমন আতঙ্কের হাত থেকে রেহাই পাওয়া গেল। একটু দম নিয়ে ভদ্র-লোক বললেন, তাল-পাখা নিয়ে জোরে-জোরে হাওয়া করতে লাগলাম—মানে তখন আমি ঘেমে উঠেছি। বুকের উত্থান-পতন যখন আবার স্বাভাবিক হয়ে এল, হাতের মুঠো খুলে দেখলাম আমার বিপদভঞ্জনকে। পঁয়তাল্লিশ বছর বয়স হয়ে গেল মশাই, দেশলাইকে এমন চোখে আর কোনদিন দেখিনি। খুবই সত্যি কথা—রাইফেল উঁচিয়ে ধরলেও ভালুক তেড়ে আসবে কিন্তু আগুনের সামনে কোন জীবই ঘেঁষবে না। ঘরের মধ্যে মানুষ দেখেও ভালুকটা একটুও ঘাবড়ায়নি। পিসীমার কলার গন্ধেই ও এমন মেতে উঠেছিল যে অন্য বিপদকে গ্রাহ্যই করেনি। ভালুক যথেষ্ট একগুঁয়ে কিন্তু ভীতুও কম নয়। আর মগজের দিক থেকে এতবড় প্রাণীটা একটু বোকা বোকা মতন। আর একবার যা ঘটেছিল সে তুলনায় এ ঘটনা তো কিছুই নয়—

সময়টা শীতকাল—ডিসেম্বরের মাঝামাঝি—হোম-সিগন্যালের কি একটা গন্ডগোল হয়েছিল, ঠিক-ঠাক করে দিয়ে যন্ত্রপাতি নিয়ে মিস্ত্রি দুজন ফিরে আসছিল, এমন সময় কতকগুলো মৌমাছি ওদের কানের পাশ দিয়ে বাঁ-বোঁ করে জঙ্গলে উড়ে গেল। ওরা মৌমাছির গতিপথ লক্ষ্য করে থমকে দাঁড়িয়ে পড়ল আর দেখতে দেখতে ওদের চোখদুটো বড় হয়ে উঠলো। ওরা অত কৌতূহল নিয়ে যে জিনিসটা আবিষ্কার করেছিল তাই নিয়েই বর্তমান কাহিনীর শুরু। ওরা দেখলো মৌমাছিরা মস্তবড় একটা মৌচাকে গিয়ে বসলো. চাকটা রাস্তার ধারেই ছিল। লোকদুটো তৎক্ষণাৎ রেললাইন থেকে নেমে গাছতলায় হাজির হল; একটা মোটা বুনো গাছে মস্তবড় চাকটা ঝুলছিল—এতবড় চাক্ ওরা জীবনে দেখেনি। চাক্‌টাতে কত মধু আছে আন্দাজ করে হিসাব করল, শহরে গিয়ে বেচতে পারলে মোটা পয়সা পাওয়া যাবে। দুটো পয়সার আওয়াজে ওদের কান তখন ভরে উঠেছে। রাতের অন্ধ-কারে এসে চাক্‌টা চুপিসাড়ে পেড়ে নিয়ে যাবে মতলব করে—ওরা পরস্পর শপথ করলো কথাটা যেন আর পাঁচকান না হয়; বখরা বাড়লে ওদের আর থাকবে কি! সারাদিন ধরে ওরা মতলব করেছিল—কেমন করে চাক্‌টা পেড়ে নিয়ে আসবে। সমস্ত সরঞ্জাম যোগাড় করে ওরা রাতের অন্ধকারের অপেক্ষায় ছটফট করতে লাগলো।

দেখতে দেখতে অন্ধকার হয়ে এল। বিকমাটোরীর ছোট স্টেশন অনেক আগেই নিঝুম হয়ে গিয়েছিল। কোয়ার্টারের অনেক আলোই তখন নিভে গেছে। ওরা নিঃশব্দেই রওনা হয়ে পড়লো। গাছ থেকে মৌচাক পড়ে যাতে নষ্ট না হয় সেইজন্য অক্ষত অবস্থায় চাক্ নামাবার জন্য বুদ্ধি করে একটা বড় ড্রাম্ যোগাড় করেছিল আর দড়ির ফাঁস

য় ড্রাম নামিয়ে দেওয়ারও কোন ছুটি ন। চাক্ ভাঙবার জন্য ধারালো ার সঙ্গে একটা লাঠিতে কাপড় বেঁধে িসিন ভিজিয়ে রেখেছিল মশাল হিসাবে র করবার জন্য। আলোও হবে আবার াউ করে মশালটা জ্বলতে থাকলে াছিরাও ভয়ে পালাবে। যে লোকটা গাছে মৌচাক ভাঙবে সে একটা কম্বল জড়িয়ে নিয়েছিল; মৌমাছির হুলের কম্বল ফুঁড়ে গায়ে বিঁধবে না। এত াস্ত ক'রে ওরা যখন গাছতলায় এসে ল—তখন বন্য জন্তু-জানোয়ারের ভয়ে গা ছমছম করছিল। ওদের মধ্যে যে র সে গাছতলায় দাঁড়িয়ে রইল। আর ার কোমরে ড্রামের দড়ি গুঁজে ছুরি াল হাতে গাছের প্রথম দো-গলায় ব্দ উঠে পড়লো। ভাঙা জ্যোৎস্নায় দেখলো চাক্‌টা যেন অসম্ভব বড় হয়ে । জুনিয়র সিনিয়রকে ফিস্‌ফিস্ বললো—চাক্‌টা এরই মধ্যে ডবল হয়ে গছে। সিনিয়র এ অঞ্চলে অনেকদিন কাজেই অভিজ্ঞের সুরে জবাব দিল— ় অঞ্চলের মৌমাছিরা তোর মত কুঁড়ে ারা খুবই তাড়াতাড়ি মধু সংগ্রহ করে তি চাক্ ডবল করে দিতে পারে।

জুনিয়ারের কেমন যেন খট্‌কা , পাহাড়ি মৌমাছিরা যতই তৎপর না কেন—এক বেলাতেই তা ব'লে চাক্ করে ফেলবে! ওর বিস্ময় আর কাটতে া, কেবলই ইতস্ততঃ করে, নীচের তাড়া দেয়—তুই সবে এসেছিস, কিই । দেখলি—আমি এর থেকেও বড় চাক । এক-একটা চাক্ চার-পাঁচজনেও পারে না, নে তাড়াতাড়ি কর—বলে দিল। মশাল হাতে নিয়ে জুনিয়র ীরে চাকের দিকে এগিয়ে চললো, ওর মনের ধোঁকা কাটলো না—একে- ই একেবারে ডবল, এমন খবর ও শোনেনি। জঙ্গলে অপদেবতার বাস— ীরটা একবার শিউরে উঠলো, দানোয় া তো? সারা দিনটাই গভীর উত্তে- কেটেছে, কিছু বাড়তি টাকা-পয়সার যেন ক্রমেই মিলিয়ে যেতে লাগলো।

আর এতটুকু উৎসাহ ছিল না। ায় চাক্ ডবল হওয়া সম্ভব কিনা— ন্তাটাই ওর মনে দুলতে লাগলো। রাতের জঙ্গলে একা দাঁড়িয়ে থাকতে বোধ করছিল। বিপদ-আপদের কথা য় না। কিন্তু হতভাগাটা এত দেরী কেন, আচ্ছা বেকুব লোক তো? এসব টপট সেরে ফেলতে হয়—দেরী করা তো পাঁচরকম ঝামেলা ডেকে আনা, ত কি হয়—তার কিছু কি ঠিক অস্থির হয়ে নীচের সঙ্গী জিজ্ঞ ু করে একটা শব্দ করলো। জুনিয়র ততক্ষণে প্রায় চাক্‌টার কাছে এসে পড়েছে; দেশলাই জেলে ফস্ করে মশালটা ধরিয়েই চাক্‌টার গায়ে ঠেসে ধরল। আর যায় কোথায়, সঙ্গে সঙ্গেই বিরাট কালো চাক্‌টা বিকট্ চিৎকার করে জুনিয়রের ঘাড়ের উপর পড়লো। লক্ষ লক্ষ মৌমাছি তখন ভন্‌ভন্ করছে, সেই প্রচন্ড ধাক্কা সামলাতে না পেরে বেচারা জুনিয়ার টাল খেয়ে নীচের দিকে গড়িয়ে গেল। হাতের গাছে গাছের কোন ডাল্ না পেয়ে পতনোন্মুখ জুনিয়ার শেষপর্যন্ত চাক্‌টাকেই আঁকড়ে ধরল প্রাণপণে। হাতের মশালটা অনেক আগেই ছিটকে নীচে পড়ে গিয়েছিল। কি-যে হো'ল বোঝবার আগেই মাটিতে সশব্দে আছাড় খেয়ে পড়ল। মাটির সংস্পর্শে আসতে জুনিয়ারের হুঁস হল। এত উঁচু থেকে পড়েও তার লাগেনি। নরম চাক্‌টার উপর পড়েই এখন গড়াতে গড়াতে গাছটার গোড়ায় এসে ঠেকেছে। কম্বল থেকে মুখ বার করবার আগেই শুনলো আঁক-আঁক করে ভীষণ চেঁচাতে চেঁচাতে একটা ভালুক প্রাণের দায়ে বনময় ছোটাছুটি করছে। ভালুকটার পরিত্রাহি চিৎকারে সে সভয়ে ঝোপের ধারে ঘাপটি মেরে পড়ে রইল; আর এইসময় গোটাকতক মৌমাছি চাক্ ভাঙার আক্রোশে ওকে প্রাণপণে হুল্ ফোটাতে লাগলো। বেচারা ভালুকের ভয়ে দাঁতে-দাঁত দিয়ে সে অসম্ভব যন্ত্রণা সবই সহ্য করলো।

সিনিয়র এতক্ষণ মাটিতে দাঁড়িয়ে মৌমাছির গুন্‌গুন্ শব্দ শুনছিল, মশালটা পড়ে যেতেই এক লাফে ঝোপের আড়ালে লুকিয়ে পড়লো। ওর চোখের সামনেই সশব্দে যে জিনিসটা পড়লো তা দেখেই ওর চক্ষুস্থির হয়ে গিয়েছিল। কম্বল জড়ান সঙ্গীত নীচ থেকে একটা মস্ত কালো ভালুক ঠেলে বেরিয়ে এসে প্রাণের দায়ে চেঁচাতে-চেঁচাতে জঙ্গল তোলপাড় করতে লাগলো, ভালুকটা কোন দিকে পালাবে ঠিক করতে না পেরে দিশেহারার মত সারা জঙ্গলই ছোটাছুটি করে বেড়াতে লাগলো। সিনিয়রের অভিজ্ঞতায় এ জিনিষ ছিল না—ও হক্‌চকিয়ে অনেকক্ষণ বসে রইল, ভেবে পেল না— ভালুক ঐ অবস্থায় এল কি করে! ওর চোখের সামনেই জুনিয়র ভালুকের গলা জড়িয়ে গাছ থেকে নেমে এসেছে, এমন অদ্ভুত কান্ড ঘটতে পারে চোখে না দেখলে ও বিশ্বাসই করতো না। এমন সময়ে জুনিয়ারের ডুকরে কান্নার শব্দ শুনে তাড়াতাড়ি উঠে এল। তখন জঙ্গলের সব হট্টগোল থেমে আবার স্বাভাবিক প্রশান্ত-গাম্ভীর্য ফিরে এসেছে।

মৌমাছি কামড়ে ওর মুখটা অসম্ভব ফুলে উঠেছিল, বেচারা কাঁদো-কাঁদো গলায় সিনিয়রকে বললো—চাক্ ডবল হওয়া দেখেই সন্দেহ হয়েছিল, নিশ্চয় দানোয় পেয়েছে! সে রাত্রের ঘটনা ওরা নিঃশব্দে চেপে যাওয়ারই চেষ্টা করেছিল; কিন্তু জুনিয়ারের ফুলে-ঢোল হওয়া মুখটাই সব কথা ফাঁস করে দিয়েছিল। বেচারারা ডবল্ চাকের আশায় লোভ করতে গিয়ে খুব শিক্ষা পেয়েছিল; আর মধুলোভী ভালুকের শিক্ষাটাই কি কিছু কম হয়েছিল—বেচারা মধুর নেশায় জুনিয়ারের গলা জড়াজড়ি করে যে মাতামাতি করলো সে কথাই কি ও সহজে ভুলবে!

পরের দিন সকালে যখন ঘুম ভাঙলো— পুরণাগড়ে সেইটাই আমার প্রথম প্রভাত,—

তখন অনেক বেলা হয়ে গিয়েছিল, মালী এর মধ্যেই দু'বার চা নিয়ে ফিরে গেছে। তাড়াতাড়ি মুখ ধুয়ে আসতেই সেই একই চা তৃতীয়বার গরম হয়ে আমার সামনে এসে হাজির হল; কালো, তিক্ত গরম পানীয়টুকু নির্বিবাদে গলায় ঢেলে দিয়ে যখন সিগারেট ধরাচ্ছিলাম তখনই দেখলাম ফরেস্ট-গার্ড অনেক দূর থেকে হন্‌হন্‌ করে আসছে। বেচারা একরাত্রের পরিচয়ে আমার ভক্ত হয়ে পড়েছিল, রাণার ফিরবে সেই তিনটার সময়। শীতের অলস বেলায় অরণ্যময় পাহাড়ের কোলে রোদ্দটুকু ছেড়ে যেতে ইচ্ছা করছিল না। ফরেস্ট-গার্ড আমার পাশে এসে গলার মাফ্‌লার খুলে হাওয়া খেতে লাগলো। কিছুক্ষণ পরে একটা সিগারেট ধরিয়ে বললো—নুন-মাটির ধারে যদি বসতে ইচ্ছা হয় তা'হলে একটা ভাল জায়গার সন্ধান এনেছে, একটু ইতস্ততঃ করে বললো—খবরটা যেন প্রকাশ না হয়—আমরা দু'জনে বিকালে চুপিচুপি রওনা হয়ে যাবো। বুঝতে পারলাম ফরেস্ট-গার্ড হিসাবে ওর কোথায় বাধছে। আমি ওকে এই আত্মগ্লানি থেকে মুক্তি দেওয়ার জন্য বললাম, শিকার এখন থাক্‌, আমি কিছুদিন নিরালায় বিশ্রাম করবো। পুরুণাগড়ে তখন কোন বাঘের খবর ছিল না, পুরুণা-কোট অথবা মাঝিপাড়ার দিকে যেতে পারলে বাঘের সন্ধান পাওয়া যেতে পারে। আমি ঠিক করলাম, কয়েকদিন নির্জনে অরণ্যবাস করে বাড়ী ফিরবার সময় মানিক-জুড়ি হয়ে যাব, রাণারের অদ্ভুত-ভালুকের খবর নিয়ে যেতে হবে। কেন জানি না—এমন ঘটনা আমায় ভীষণভাবে আকর্ষণ করে। পুরুণা-গড়ে কয়েকটা রাত কাটাবার পর আর ভাল লাগছিল না, মানিকজুড়ির ভালুকের ব্যাপারটা জানবার জন্য ব্যস্ত হয়ে উঠলাম—

গঙ্গাকে আমি আগেই ঠিক করে রেখে-ছিলাম—ও আমার বিছানা আর ব্যাগ বয়ে নিয়ে যাবে। রাণার যখন আমায় ঘুম থেকে তুলে দিল তখন রাত তিনটে, তাড়াতাড়ি তৈরী হয়ে রওনা দিলাম—প্রচন্ড শীতে আমরা তিনটি প্রাণী গুটিগুটি করে জঙ্গলের পথে উঠে আসতে লাগলাম। শিশির-ভেজা ঝোপ-ঝাড়ে আমাদের জামা-কাপড় ভিজে যেতে লাগলো, রাতের শেষ প্রহর, বন্য জন্তুজানোয়ারের ফিরে যাওয়ার সময়। সুতরাং যথেষ্ট সাবধানে পথ চলতে হচ্ছিল। আচমকা বিপদের সম্ভাবনা সব সময়ই ছিল—বিশেষ ক'রে দুজন নিরস্ত্র-লোকের দায়িত্ব তখন আমার উপর। কোর্লাপেং পাহাড়ের বাইসন মাঝে মাঝে এধারে চরতে আসে। রাইফেলটাকে তৈরী রেখেছিলাম আচম্‌কা শিঙের ঝটকার হাত থেকে বাঁচবার জন্য। জঙ্গলের সরু পায়ে-চলা পথ দিয়ে রাণার লন্ঠনহাতে আগে আগে যাচ্ছিল, ওর পিছনেই ছিল গঙ্গা, আর সবার শেষে উদ্যত রাইফেল হাতে আমি। জঙ্গলের ঝোপ-ঝাড়ের সরু-সরু ডাল-পালাগুলো আমাদের শরীরের উপর দিয়ে পিছলিয়ে স'রে যাবার সময় সপ্‌সপ্‌ আওয়াজ হচ্ছিল। অনেকটা বাইসনের বাঁশ-ঝাড়ের কঞ্চির পাতা খেয়ে ছেড়ে দেওয়ার সময় যেমন আওয়াজ হয়।

উঁচু জমিটার মাথায় উঠে এ'সে চার-ধারটা একবার ভাল করে দেখে নিয়ে আবার হাঁটা আরম্ভ করলাম। এইখানেই সেদিন রাণারের সঙ্গে সম্বরটার দেখা হয়েছিল। আর অল্প একটু হাঁটলেই পথের সেই সন্ধিস্থলে এসে পৌঁছাব। ভালুক-রহস্যের কিনারা ওখানেই হবে। রাণারের অভিজ্ঞতার উপর এতটা ভরসা করা হয়তো ঠিক হয়নি। ভালুক কি আজও ওখানে আছে? এমন সময় রাণার আঙুল বাড়িয়ে পথের সেই সন্ধিস্থলটা দেখিয়ে দিল। সোজা রাস্তাটা লম্বা-ঘাস-বনের মধ্য দিয়ে উপরের জঙ্গলে চলে গেছে—আর নীচের রাস্তাটা চার-পাঁচ ফুট হঠাৎ নেমে বাঁদিকে ঘুরে গেছে। ভালুক দেখার পর রাণার এই ঘুরপথটা দিয়েই যাতায়াত ক'রে, এ-তে ওকে আধ মাইলের মত পথ বেশী হাঁটতে হয়—দুটো পথই শেষপর্যন্ত গিয়ে মানিকজুড়িতে পৌঁচেছে।

খুব সন্তর্পণে পথ দুটোর সন্ধিস্থলে পৌঁছে রাণারকে চুপি-চুপি বললাম, আলোটা খুব জোর করে দিতে। আমি রাই-ফেলের সেফটী খুলে ট্রিগারে আঙুল রেখে তৈরী হয়ে থাকলাম—যদি ভালুকটা হঠাৎ আক্রমণ করে বসে। কয়েকটা মুহূর্ত রুদ্ধ-শ্বাসে অপেক্ষা করলাম, তখনও ভালুকটার অস্তিত্ব বোঝা যাচ্ছিল না; ভাবলাম—এতদিনে নিশ্চয়ই পালিয়ে গেছে, আমারই ভুল হয়েছে এমন একটা আজগুবি গল্প শুনে ছুটে আসা। রাণারের পাংশুবর্ণ মুখের দিকে তাকিয়ে যেই আর এক পা বাড়িয়েছি—অমনি প্রচন্ডবেগে জঙ্গল দুলিয়ে ভালুকটা এসে হাজির হল। মিশ্‌কালো বিরাট লোমশ জন্তুটা পথ-জুড়ে দাঁড়িয়ে উঠতেই গঙ্গার মাথা থেকে ছিটকে ভারী ব্যাগটা আচম্‌কা আমার ঘাড়ে এসে পড়লো। আমি ভীষণ ভয় পেয়ে ব্যাগশুদ্ধ পাশের [illegible] হুমড়ি খেয়ে পড়ে গেলাম। আর সেই সময়েই ট্রিগারে চাপ পড়ে গুলিটা বেরিয়ে গেল। ৪৫০।৪০০ বোরের রাইফেলটার ভীষণ আওয়াজে জঙ্গলটা যেন চম্‌কে উঠলো। আর পাহাড়ে পাহাড়ে গুম্‌গুম্‌ করে তার প্রতিধ্বনি হ'তে লাগলো। ব্যাগটা কাঁধ থেকে সরিয়ে যখন আবার উঠে দাঁড়ালাম ভালুকটা ততক্ষণে অদৃশ্য হয়ে গেছে। গুলিটা ভালুকের গায়ে লাগলো না আকাশে উঠে গেছে বুঝতে পারলাম না। তক্ষুণি ভালুকের কোন চিৎকার শুনতে পাইনি, অনেক দূর থেকে তার জঙ্গল ভেঙে পালিয়ে যাওয়ার সময় দু'বার ভয়ার্ত চিৎকার কানে এসেছিল। ব্যাগটা আচম্‌কা ঘাড়ে পড়ে যাওয়ায় আমি অত্যন্ত ঘাবড়ে গিয়েছিলাম, আট-দশ হাত দূরে অতবড় ভালুকের সামনে রাইফেল্‌ উঁচিয়ে কর্তব্য ঠিক করে নিচ্ছি এমন সময় ঘাড়ে ওইরকম একটা বোঝা আচম্‌কা পড়লে অবশ্যই ঘাবড়াবার কথা।

গঙ্গা ও রাণার নীচের পথটা থেকে উঠে এলে বললাম, গুলিটা ভালুকের গায়ে বোধহয় লাগেনি। ব্যাগটা পড়ে যাওয়ায় আচম্‌কা ফায়ার হয়ে গেছে। ভালুকটার ছুটে আসা দেখে গঙ্গা এত ভয় পেয়েছিল যে লাফাবার সময় ব্যাগটা ওর মাথা থেকে ছিট্‌কে যায়—আর ওর দেখাদেখি রাণারও লাফিয়ে পড়ে। ওরা তখনও ভয়ে শিউরে শিউরে উঠছিল। নিরস্ত্র-অবস্থায় আমিও বোধহয় এইরকমই করতাম। যাই হোক্‌—ভালুকটা পালিয়ে গেলে, আর কোন ভয় নাই। আমরা লন্ঠনের আলোয় ধীরে ধীরে এগিয়ে গিয়েই ভীষণ চমকে উঠলাম, ভালুকটা যেখানে দাঁড়িয়ে ছিল তার পাঁচ-ছয় কদম পিছনেই একটা বিরাট খাদ। রাণার জানাল—এই সেদিনও ওখানে কোন খাদ ছিল না। লম্বা ঘাসেঢাকা পথটার মধ্যখানে কোন কারণে একটা ধ্বস নেমে গিয়ে মৃত্যু-গহ্বর সৃষ্টি করেছিল। আচম্‌কা যে কোন লোক ওই গহ্বরে পড়ে হাত-পা ভেঙে বসতো। লম্বা-ঘাসের আড়ালে হঠাৎ কিছুই বোঝবার উপায় ছিল না। ভাল করে দেখতে গিয়েই নজরে পড়লো একটা ভালুকীর বাচ্চার মৃত দেহ। মৃতদেহ অনেকদিনের পুরনো—মর বাচ্চাটা তখনও শুকিয়ে কাঠ হয়ে গেছে। বাচ্চাটা কি কারণে মরেছে তখন জানার আর কোন উপায় ছিল না। বাচ্চাওয়ালী ভালুক কত সাংঘাতিক—তার জিঘাংসা কত ভয়াব ভুক্তভোগী ছাড়া কল্পনাও করা যায় না। মৃ বাচ্চার শোকে ভালুকী দিনের পর দিন এ মৃত্যু-গহ্বরে পাহারা দিয়েছে, হঠাৎ সৃ হওয়া খাদটার অস্তিত্ব কেউই জানতো ন কোন পথিককেই সে এ পথ মাড়াতে দেয়নি সে কি শুধু মায়া না পথিকের নিছক প্র বাঁচাবার জন্যই, না এর পিছনে আর কে রহস্য আছে! হয়তো বাচ্চাটা খাদে পা মারা গেছে। তাই কি ভালুকী-মা মৃ পথ আগলে ছিল এমনকরে এতদিন! ব পশুর মধ্যে এ প্রেরণা কি সম্ভব? রহস্যা ভালুকীর রহস্য হয়তো সঠিক জানা য না। আমি আশা করলাম—রাইফে পথ আগলে ছিল এমনকরে এতদিন! গুলিটা আকাশেই উঠে গেছে।

মরণ আমার মরণ

সমর পাল

।। ১ ।।

ুদীর্ঘ জীবনকালে আত্মীয়স্বজন ও
়ান্ধব পরিবৃত বিস্তীর্ণ রবীন্দ্র-
বারে বারে "মৃত্যু ব্যাধের মত প্রবেশ
ছে" এবং তার অব্যর্থ শরসন্ধানে যে
াণ হতায়ু হয়েছেন, কালে অথবা
ল তার একটা সংক্ষিপ্ত তালিকা নীচে
।

াতা সারদা দেবী (মৃত্যুকাল ১৮৭৫),
ায়া কাদম্বরী দেবী (১৮৮৪), ভ্রাতু-
বলেন্দ্রনাথ (১৮৯৯), স্ত্রী মৃণালিনী
(১৯০২), মেজ মেয়ে রেণুকা
৩), পিতা মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ
৫), পুত্র শমীন্দ্রনাথ (১৯০৭), ভ্রাতা
দ্রনাথ (১৯১৫), বড় মেয়ে মাধুরীলতা
৮), ভগ্নী সৌদামিনী দেবী
০), মেজদা সত্যেন্দ্রনাথ (১৯২৩),
দ্বিজেন্দ্রনাথ (১৯২৬), দৌহিত্র
ন্দ্রনাথ (১৯৩২), গগনেন্দ্রনাথ
৮)। এ ছাড়া অগণিত নিকট আত্মীয়
অন্যান্য যাঁরা কবির সান্নিধ্যে এসে-
় তাঁদের মৃত্যুও কবি মনে গভীর
াত করে।

।। ২ ।।

াইরের এই সব মৃত্যুর অভিঘাত
ভাবে আলোড়িত করে কবিহৃদয়ে।
বহিঃপ্রকাশ ঘটেছে কাব্যে, সমগ্র
ত্যে। প্রসঙ্গতঃ বলে রাখা ভাল যে,
দৃষ্টিতে জীবন ও মৃত্যু একই উৎস
উৎসারিত—একই সত্তার দ্বৈত প্রকাশ।
তে সূচনা, অপরটিতে সমাপ্তি।

রবীন্দ্রনাথের মৃত্যু সম্বন্ধে ধারণা
ব্ধি করতে হলে বাহ্যিক মৃত্যুর ঘটনা
জীবনে কি ভাবান্তর এনেছিল এবং
প্রকাশ কিভাবে ঘটেছে তাঁর কাব্যে ও
ত্য তাও লক্ষ্য করতে হবে। অর্থাৎ
মৃত্যু-ভাবনা ব্যক্তিগত বেদনাজাত হয়েও
করে সার্বভৌম রূপ লাভ করল তাও
ত হবে। এই প্রসঙ্গে স্বতঃই এসে যায়
দুঃখবাদতত্ত্ব।

।। ৩ ।।

কবির 'ধর্ম' প্রবন্ধমালায় উল্লেখনীয়
হল 'দুঃখ'। সংহতভাবে দুঃখের তত্ত্ব
করেছেন এখানে। বলেছেন—"জগৎ-
রের বিধান সম্বন্ধে যখনই আমরা
য়া দেখিতে যাই তখনই এ বিশ্বরাজ্যে
কেন আছে, এই প্রশ্নই সকলের চেয়ে
দিগকে সংশয়ে আন্দোলিত করিয়া
আমরা কেহ বা তাহাকে মানবপিতা-
আদিম পাপের শাস্তি বলিয়া থাকি,
কেহ বা তাহাকে জন্মান্তরের কর্মফল বলিয়া
জানি। কিন্তু তাহাতে দুঃখ তো দুঃখই
থাকিয়া যায়।...দুঃখের তত্ত্ব আর সৃষ্টির
তত্ত্ব যে একেবারে একসঙ্গে বাঁধা। কারণ
অপূর্ণতাই তো দুঃখ এবং সৃষ্টিই যে
অপূর্ণ।"

সুতরাং যাকে আমরা আপাতদুঃখ-
ব্যঞ্জক বলে মনে করি তাই পরিণামে আনন্দে
পরিসমাপ্ত। কারণ এই অপূর্ণ দুঃখই
পূর্ণের আনন্দ হয়ে দেখা দেবে। আর তা
ছাড়া দুঃখের অনলে দগ্ধ হয়ে না উঠলে
আনন্দের সোনা বিশুদ্ধ হবে কেন। সেকথা
তিনি ঐ প্রবন্ধেই বলেছেন। তাই দুঃখের
দেবতাকে উদার আহ্বান জানাতে কবি ব্যগ্র
হয়ে ওঠেন।

"দুঃখের বেশে এসেছ বলে
তোমারে নাহি ডরিব হে।
যেখানে ব্যথা তোমারে সেথা
নিবিড় করে ধরিব হে।"

দুঃখের মধ্যেই যে দুঃখের দেবতা বিরাজ
করেন এই বৈষ্ণবী বিশ্বাস কবির মধ্যে
সহজাত। দুঃখের বিষই পরিণামে আনন্দ-
ধারায় অমৃতময় হয়ে ওঠে।

কবির দুঃখবাদের আলোকে তাঁর মৃত্যু-
ভাবনাকে দেখতে পাব। এখানে দুঃখের স্থলে
মৃত্যু এবং আনন্দের স্থলে জীবন বসিয়ে
দিলেই উত্তর মিলে যাবে। কারণ মৃত্যু ও
দুঃখ সম্বন্ধে কবির উপলব্ধি শেষ পর্যন্ত
একই চিন্তা সাগর সঙ্গমে মিলিত হয়েছে।

।। ৪ ।।

কিশোর বয়স থেকে আরম্ভ করে
জীবনের প্রায় শেষ দিন পর্যন্ত কবির মৃত্যু-
বিষয়ক বহু কবিতার ধারা উর্মিমুখর হয়ে
প্রবাহিত। তারই সমান্তরালে মৃত্যু সম্বন্ধে
কবির নানা ধারণা অন্যান্য রচনায় সুস্পষ্ট
হয়ে উঠেছে। এই ধারা অনুসরণে কবির
মৃত্যুভাবনা সম্বন্ধে একটা বিবর্তন লক্ষ্য
করা যায়। এই বিবর্তন অবশ্য তাঁর অন্যান্য
ধারণাতেও আছে। কিশোর বয়সের রচনায়
স্বভাবতই গভীরতা প্রত্যাশা করা যায় না।
অবশ্য অপেক্ষাকৃত পরিণত বয়সের রচনাতেও
যে সব সময় গভীর অভিজ্ঞতার ছাপ থাকে
এমনও নয়। মৃত্যু সম্বন্ধে কবির ধারণার
মূল্যায়ন করতে হলে 'খেয়া' কাব্যটিকে
রবীন্দ্রসরণীর একটি উল্লেখযোগ্য মাইল-
স্টোন হিসেবে গ্রহণ করতে হবে। খেয়া
পর্বের পূর্বে কবির মৃত্যুভাবনার সঙ্গে
খেয়া কাব্যোত্তর ভাবনার পরিবর্তন লক্ষণীয়।
অতঃপর তাঁর ধারণা যুগপৎ গভীর ও
স্বকীয় হয়ে ওঠে।

প্রাক খেয়া যুগের রচনায় কবি মৃত্যুকে
আলঙ্কারিকের দৃষ্টিতে দেখেছেন। প্রথম
বয়সের এই সব রচনায় কবির মৃত্যু সম্পর্কিত
আধ্যাত্মিক অনুভূতি প্রগাঢ় নয়। ভানু-
সিংহের পদাবলীতে তিনি রাধার দৃষ্টিতে
মৃত্যুকে দেখেছেন শ্যামের মত। বলেছেন—
"মরণরে তুঁহু মম শ্যাম সমান।" এটি একটি
সুন্দর অলঙ্কার সমন্বিত ধ্বনিব্যঞ্জনায়
প্রকাশ। কিন্তু অধ্যাত্মরসসিঞ্চিত নয়। কিম্বা
মৃত্যুর গভীর অনুভূতিও এর মধ্যে প্রকাশ
পায় নি। ধ্বনি ও প্রতিধ্বনি তরঙ্গ কল্লোলেই
এর পরিসমাপ্তি। পাঠকের হৃদয়ে গভীর
অনুভূতির আঘাত নেই। বস্তুত 'খেয়া' কাব্য
রচনার পূর্ব পর্যন্ত কবি এইভাবে
আলংকারিকের দৃষ্টিতেই মৃত্যুকে দেখতে
যেন অভ্যস্ত ছিলেন। সেকথা কবিও নির্দ্বিধায়
স্বীকার করেছেন তাঁর জীবনস্মৃতিতে—
"কিন্তু আমার চব্বিশ বছর বয়সের সময়
মৃত্যুর সঙ্গে যে-পরিচয় হইল তাহা স্থায়ী
পরিচয়। তাহা তাহার পরবর্তী প্রত্যেক
বিচ্ছেদ শোকের সঙ্গে মিলিয়া অশ্রুর মালা
দীর্ঘ করিয়া গাঁথিয়া চলিয়াছে। শিশু বয়সের
লঘুজীবন বড়ো বড়ো মৃত্যুকেও অনায়াসেই
পাশ কাটাইয়া ছুটিয়া যায়, কিন্তু অধিক
বয়সে মৃত্যুকে অত সহজে ফাঁকি দিয়া
এড়াইয়া চলিবার পথ নাই।" (মৃত্যুশোক)
কবি বলেছেন চব্বিশ বছর বয়সের সময় থেকে
তিনি মৃত্যুকে নতুনভাবে উপলব্ধি করেছেন।
কিন্তু তাঁর চল্লিশ বছর বয়সকে অর্থাৎ
খেয়ার কবিতাগুলি রচনার সময়কে এর
সীমারেখা হিসেবে ধরাই যুক্তিযুক্ত হবে।

'সোনার তরী'র 'প্রতীক্ষা' কবিতায় কবি
ভানুসিংহের পদাবলীর শ্যাম ও রাধাকে
বর ও বধূ বেশে সাজিয়েছেন। আরও পরে
লেখা 'উৎসর্গ' কাব্যের 'অত চুপি চুপি কেন
কথা কও' কবিতাটি আলংকারিকের দৃষ্টিতে
মৃত্যুকে দর্শন ছাড়া আর কিছুই নয়।
সেখানে আবার বর ও বধূ পার্বতী
পরমেশ্বরে রূপান্তরিত। জীবন ও মৃত্যুর
এই সম্পর্ক শ্যাম ও রাধা, বর ও বধূ অথবা
উমা ও মহেশ্বর যাই হোক না কেন সবই
নিছক অলংকার—কবির কল্পনাবিলাস মাত্র।
একই বস্তুর দ্বিবিধ প্রকাশ। এ বিষয়ে আরও
গভীর ও ব্যাপক ধারণা লাভ করেন তিনি
আরও পরে—'বলাকা' পর্বে। কবি বুঝলেন
জীবনকে উপলব্ধির জন্যই মৃত্যুর প্রয়োজন।
মরণের মধ্যেই আছে মহাকালের চিরকালের
বাঁচার ইঙ্গিত। মৃত্যুর মধ্যে দিয়েই মানব-
জীবনের ধারা নবায়িত হয়ে ওঠে—'মৃত্যু ওঠে
প্রাণ হয়ে ঝলকে ঝলকে।' মৃত্যু যদি না
থাকত তবে—'উচ্ছিয়া উঠিবে বিশ্ব পুঞ্জ পুঞ্জ
বস্তুর পর্বতে'।

।। ৫ ।।

তাই আনন্দ ও দুঃখ যেমন একটি
অপরটির পূর্ণতা, তেমনি মৃত্যুও জীবনের

পরিপূর্ণতা। বৈচিত্র্যময় জীবনে মানুষ যেমন নানা অভিজ্ঞতায় জীবন পূর্ণ করে, তেমনি আরও ব্যাপক দৃষ্টিতে দেখলে বোঝা যায় যে মানুষ জন্মচক্রের তথা মৃত্যুচক্রের আবর্তনের দ্বারা জীবনকে পূর্ণ হতে পূর্ণতর করে চলেছে। মৃত্যু পরিপূর্ণ জীবনে উত্তরণের পথে সোপান মাত্র। সুতরাং দুঃখকে যেমন বিড়ম্বনা বলা যায় না, তেমনি মৃত্যুও আপাত শোকাবহ হলেও আনন্দনিস্যন্দী। তাই মৃত্যু জীবনে অম্লমধুর। মৃত্যুও জীবন। উভয়েই জীবনে তুল্যমূল্য। আমাদের দেশের সাধক এই অবস্থাকেই বলেছেন 'জীবন-মুক্তি'। কবিও এই অবস্থাকে উদ্দেশ্য করে বলেছেন—'হে মহাজীবন, হে মহামরণ'। 'ডাকঘরের' অমলের মৃত্যু এই রকমের জীবন-মুক্তি। এই ধারণায় কবি ভারতের প্রাচীন অধ্যাত্মসাধকদের সঙ্গে একাত্ম।

মৃত্যু সম্বন্ধে কবির ধারণা আরও পরিণত নিরলংকার ও অধ্যাত্মবাসিত হয়ে ওঠে তাঁর শেষ জীবনে রচিত 'প্রান্তিক', 'রোগশয্যায়', 'আরোগ্য', 'জন্মদিনে' ও 'শেষ লেখা' প্রভৃতি কাব্যগ্রন্থগুলিতে। যেমন—

(১) "বুঝি, এই এক জন্ম মোর
নব নব জন্মসূত্রে গাঁথা।"
(রোগশয্যায়, ২৩)

(২) "এ জীবনে সুন্দরের পেয়েছি মধুর
আশীর্বাদ
মানুষের প্রীতিপাত্রে পাই তাঁরি সুধার
আস্বাদ।
দুঃসহ দুঃখের দিনে
অক্ষত অপরাজিত আত্মারে লয়েছি
আমি চিনে।
আসন্ন মৃত্যুর ছায়া যেদিন করেছি অনুভব
সেদিন ভয়ের হাতে হয়নি দুর্বল
পরাভব।"
(আরোগ্য, ২১)

(৩) "জ্বলন্ত শিখা মৃত্যু পরাইল মোরে
জীবনের পশ্চিমসীমায়।
আলোকে তাহার দেখা দিল
অখন্ড জীবন, যাহে জন্মমৃত্যু এক
হয়ে আছে।"
(জন্মদিনে, ৮)

মৃত্যুবিষয়ে কবির সর্বশ্রেষ্ঠ প্রজ্ঞালাভ ঘটে মৃত্যুর প্রায় এক বছর পূর্বে লেখা এই কটি চরণে—

"রাহুর মতন মৃত্যু
শুধু ফেলে ছায়া,
পারে না করিতে গ্রাস জীবনের
স্বর্গীয় অমৃত
জড়ের কবলে
একথা নিশ্চিত মনে জানি।
....
সবকিছু চলিয়াছে নিরন্তর
পরিবর্তবেগে
সেই তো কালের ধর্ম।
মৃত্যু দেখা দেয় এসে একান্তই
অপরিবর্তনে
এ বিশ্বে তাই সে সত্য নহে
একথা নিশ্চিত মনে জানি।"
(শেষ লেখা, ২)

আমরাও একথা নিশ্চিত মনে জানি যে কবির এই গভীর প্রত্যয় গভীর অভিজ্ঞতা-সঞ্জাত। এ দৃষ্টি প্রথম জীবনের ধ্বনি-চিত্র-গীতিময়ী প্রকাশ নয়—এ দৃষ্টি আলঙ্কারিকের দৃষ্টি নয়। কবির একান্ত ব্যক্তিগত অধ্যাত্ম-অনুভূতির বাঙ্ময় প্রকাশ।

সাত-পাঁচ

চন্দ্রশেখর মুখোপাধ্যায়

পাঁচটি ইন্দ্রিয়ের অধীশ্বর আমরা, পৃথিবীর রূপ-রস-গন্ধ আমাদের কাছে হাজির করে এরাই। এদের মধ্যে একটির অভাবই আমাদের বিব্রত ও বিষণ্ণ করে তোলে। কিন্তু শিবের ত্রিনয়নের মত পঞ্চেন্দ্রিয়ের ওপরে একটি সূক্ষ্ম ইন্দ্রিয়ের অস্তিত্ব আমরা অল্পাধিকতর অনুভব করে থাকি যদিও তার কার্যকলাপ বাস্তবনির্ভর বলা চলে না। বর্তমান নিবন্ধে আমাদের এই ষষ্ঠ ইন্দ্রিয়ের ক্ষমতা সম্পর্কেই কিছু আলোচনা করা হচ্ছে, যদিও গোড়াতেই বলে রাখা ভাল এই ক্ষমতা পরীক্ষিত সত্য হলেও তা বুদ্ধির অগম্য।

বিজ্ঞানীরা আমাদের এই অদৃশ্য ক্ষমতার উৎস সন্ধানে স্বভাবতই তৎপর। মস্তিষ্কের কোন কোষে আমাদের এই ক্ষমতার কেন্দ্রটির অবস্থান তা এখন পর্যন্ত নিরূপিত না হলেও তাঁরা এই ক্ষমতার বাস্তব সত্যকে নিরূপণ করার জন্য প্রয়াস চালিয়ে যাচ্ছেন।

ধরুন যদি কোন মহিলা কোন হারানো জিনিস অবলীলাক্রমে সন্ধান করে বার করে দিতে পারেন, তাহলে তাঁর সেই ক্ষমতাকে কিভাবে ব্যাখ্যা করা যায়। চক্ষু, কর্ণ, নাসিকা, জিহ্বা বা ত্বক এর সবকটির বাইরে কি সেই অদৃশ্য ইন্দ্রিয় যা তাঁকে সাহায্য করে এক মাইল দূরে সমুদ্র উপকূলে পড়ে যাওয়া অলঙ্কারটির সঠিক অবস্থান নির্দেশ করে দিতে। আমরা জানি মানুষের চেয়ে নিম্নতর শ্রেণীর প্রাণীদের ক্ষেত্রে দেখার বা শোনার ক্ষমতা অপেক্ষাকৃত বেশি। মানুষ যে শব্দ শুনতে পায় না, সেই সূক্ষ্ম ধ্বনি-তরঙ্গ পশুপাখীদের কানে সহজে যায়। একটা পোষা কুকুরকে কোন অপরিচিত জায়গায় ছেড়ে দিয়ে আসা হলেও আমাদের ধারণা সে শুধু তার ঘ্রাণশক্তির ওপর নির্ভর করে চলে আসে তার প্রভুর গৃহে। তা তার ফিরে আসার পথে যে কোন বাধাই থাক না কেন। কিন্তু বিজ্ঞানীদের মতে এই ফিরে আসার ব্যাপারে কৃতিত্বটুকু সবটাই কুকুরের ঘ্রাণেন্দ্রিয়ের নয়, এছাড়াও একটা স্বতন্ত্র কোন ক্ষমতা তার স্বভাবে বর্তমান। এই স্বতন্ত্র স্বভাবটাই আমাদের আলোচ্য ষষ্ঠেন্দ্রিয়ের কার্যকলাপে প্রকাশ পায়।

প্রাণীবিদরা এসম্বন্ধে অনুসন্ধান করে দেখলেন যে, পশুপাখি কীট-পতঙ্গ যে উড়ে বেড়ায় বা চলাচল করে তার সবটাই তাদের চোখের ওপর নির্ভর করে নয়। উদাহরণ হিসাবে তাঁরা দেখালেন অন্ধকার জলের তলাতেও একটা মাছের সঙ্গে অন্য মাছের ধাক্কা যেমন লাগে না, তেমনি জলের ওপরে সামান্যতম শব্দে জলের বুকে মৃদু আলোড়ন হলে মাছেরা দ্রুত ছুটে পালায়। এই সূক্ষ্ম অনুভূতির ক্ষমতা পঞ্চেন্দ্রিয়ের মোটামুটি ক্ষমতার চেয়ে বেশি সূক্ষ্ম ও ব্যাপক।

পশুপাখিদের এই সূক্ষ্ম ক্ষমতা যখন বর্তমান, তখন প্রাণীজগতের সেরা বলে মানুষের বাড়তি কিছু ক্ষমতা তো থাকবেই। চক্ষু কর্ণ নাসিকা জিহ্বা ত্বকের সাহায্য ছাড়াও আমাদের স্নায়ুমন্ডলী তাই বাড়তি কিছু অনুভব করে থাকে। উত্তাপ, ওজন ও ভারসাম্যবোধ, অন্ধকারেও কঠিন বস্তুর অবস্থিতি নিরূপণ (অন্ধদের এই অনুভূতি চক্ষুষ্মানদের চেয়ে বেশি) ইত্যাদি আমাদের অদৃশ্য অনুভূতি শক্তি।

কিন্তু সবচেয়ে রহস্যজনক হল আমাদের কান ছাড়া ত্বক দিয়ে শোনার ক্ষমতা। যে ধ্বনিতরঙ্গ আমাদের শ্রুতির বাইরে তা ত্বকের সাহায্যেই আমরা অনায়াসে শুনতে পারি।

বাস্তব অভিজ্ঞতায় আমাদের সকলেরই কোন বিষয়ে যে সহজাত জ্ঞান জন্মায় তাই আমাদের এই ক্ষমতার সৃষ্টি করে থাকে বলে চিকিৎসাবিজ্ঞানীরা কেউ কেউ অনুমান করেন। অভিজ্ঞ চিকিৎসকরা যেভাবে রোগীকে মুহূর্তমাত্র দেখে রোগীর অবস্থা বুঝতে পারেন, তেমনিভাবে জীবনে পোড়খাওয়া কোন কোন মানুষ অপরিচিতের সঙ্গে সামান্য সাক্ষাৎকারে সেই মানুষটির চরিত্র উপলব্ধি করতে পারেন। কিন্তু কোন অনভিজ্ঞ ব্যক্তি যখন কোন দুর্বোধ্য ক্ষমতায় কোনকিছু সম্ভব করে তোলে, তখনই বিজ্ঞানীরা বিস্মিত হন। আমাদের মস্তিষ্কের দুটি অংশের (থালামাস ও কোর্টেক্স) মধ্যে উত্তরাধিকারসূত্রে পাওয়া থালামাসেই এই ষষ্ঠ ইন্দ্রিয় ক্ষমতা বিরাজমান কিনা এই সন্দেহে তাঁরা অনুসন্ধানে ব্যাপৃত হয়ে রয়েছেন। তবে হয়ত এমনদিন আসবে পঞ্চ ইন্দ্রিয়ের জায়গায় আর একটি ইন্দ্রিয়ের নাম আমরা যোগ করতে পারব সুনিশ্চিত ব্যাখ্যায়।

সঞ্জীবচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়

একদিন সন্ধ্যার পর চিক-পর্দা ফেলিয়া ...তে একা বসিয়া সাহেবী ঢঙ্গে কুক্কুরী ...া ক্রীড়া করিতেছি, এমত সময় একজন আসিয়া বাহির হইতে আমায় ডাকিল, সাহেব", আমার সর্বশরীর জ্বলিয়া ...ল। এখন হাসি পায়, কিন্তু তখন বড়ই হইয়াছিল। রাগ হইবার অনেক কারণও . কারণ নং এক এই যে, আমি মান্য ..., আমাকে ডাকিবার সাধ্য কাহার? ...ম যাঁহার অধীন, অথবা যিনি আমা ...পেক্ষা অতি প্রধান, কিম্বা যিনি আমার ...য আত্মীয়, কেবল তিনিই আমাকে ...তে পারেন। অন্য লোকে "শুনুন" ...লে সহ্য হয় না।

কারণ নং দুই যে, আমাকে "খাঁ সাহেব" ...য়াছে, বরং "খাঁ বাহাদুর" বলিলে কতক ... করিতে পারিতাম, ভাবিতাম, হয়ত ...টা আমাকে মুছলমান বিবেচনা ...য়াছে, কিন্তু পদের অগৌরব করে নাই। "সাহেব" অর্থে যাহাই হউক, ব্যবহারে ... আমাদের "বোস মহাশয় বা ... মহাশয়" অপেক্ষা অধিক মান্যের ...ধ নহে। হারম্যান কোম্পানী ...র কাপড় সেলাই করে, ফরাসী ... বাহার জুতা সেলাই হয়, ...কে "বোস মহাশয় বা দাস মহাশয়" ...লে সহ্য হইবে কেন? "বাবু মহাশয়" ...লেও মন উঠে না। অতএব স্থির ...লাম, এ ব্যক্তি যেই হউক, আমাকে তুচ্ছ ...য়াছে, আমাকে অপমান করিয়াছে।

সেই মুহূর্তে তাহাকে ইহার বিশেষ ফল পাইতে হইত, কিন্তু "হারামজাদ্ ...জাত" প্রভৃতি সাহেবস্বভাবসুলভ ... ব্যতীত আর তাহাকে কিছুই দিই ... এই আমার বাহাদুরি। বোধ হয়, সে ... বড় শীত পড়িয়াছিল, তাহাই তাঁবুর ...য়ে যাইতে সাহস করি নাই। আগন্তুক ... খাইয়া আর কোন উত্তর করিল না, ...হয় চলিয়া গেল। আমি চিরকাল জানি, ...ালি খায়, সে হয় ভয়ে মিনতি করে, ... গালি অকারণ দেওয়া হইয়াছে প্রতিপন্ন ...ার নিমিত্ত তর্ক করে। তাহা কিছুই ...ায়, আমি ভাবিলাম, এ ব্যক্তি চমৎকার ...। সেও হয়ত আমাকে ভাবিল ...কার লোক।" নাম জানে না, পদ জানে ...ক বলিয়া ডাকিবে তাহা জানে না। ...াং দেশীয় প্রথা অনুসারে সম্ভ্রম করিয়া "সাহেব" বলিয়া ডাকিয়াছে, তাহার ... যে "হারামজাদ" বলিয়া গালি দেয়, ...কে "চমৎকার লোক" ব্যতীত আর কি বলিবে?

দণ্ডেক পরে আমার "খানসামাবাবু" তাঁবুর দ্বারে আসিয়া ঈষৎ কণ্ঠকণ্ডুয়ন শব্দ দ্বারা আপনার আগমনবার্তা জানাইল। আমার তখনও রাগ আছে, "খানসামাবাবু"ও তাহা জানিত, এইজন্য কলিকা-হস্তে তাঁবুতে প্রবেশ করিল, কিন্তু অগ্রসর হইল না, দ্বারের নিকট দাঁড়াইয়া, অতি গম্ভীর-ভাবে কলিকায় ফুঁ দিতে লাগিল, আমি তাহার মুখের প্রতি চাহিয়া ভাবিতেছি, কতক্ষণে কলিকা অলবোলায় বসাইয়া দিবে. এমন সময়ে দ্বারের পার্শ্বে কি নড়িল, চাহিয়া দেখিলাম সেদিকে কিছুই নাই, কেবল নীল আকাশে নক্ষত্র জ্বলিতেছে। তাহার পরেই দেখি, দুইটি অস্পষ্ট মনুষ্য-মূর্তি দাঁড়াইয়া আছে। টেবিলের বাতি সরাইলাম, আলোক তাহাদের আগে পড়িল। দেখিলাম, একটি বৃদ্ধ আবক্ষ শ্বেতশ্মশ্রুতে পরিশোভিত, মাথায় প্রকাণ্ড পাগড়ি, তাহার পার্শ্বে একটি স্ত্রীলোক বোধ হয় যেন যুবতী। আমি তাহাদের প্রতি চাহিবামাত্র উভয়ে দ্বারের নিকট অগ্রসর হইয়া যোড়-হস্তে নতশিরে আমায় সেলাম করিয়া দাঁড়াইল। যুবতীর মুখ দেখিয়া বোধ হইল যেন বড় ভয় পাইয়াছে, অথচ ওষ্ঠে ঈষৎ হাসি আছে। তাহার যুগ্ম ভ্রূ দেখিয়া আমার মনে হইল যেন, অতি উর্ধ্বে নীল আকাশে কোন বৃহৎ পক্ষী পক্ষ বিস্তার করিয়া ভাসিতেছে। আমি অনিমিষ লোচনে সুন্দরী দেখিতে লাগিলাম; কেন আসিয়াছে, কোথায় বাড়ী, একথা তখন মনে আসিল না। আমি কেবল তাহার রূপ দেখিতে লাগিলাম, তাহাকে দেখিয়াই প্রথমে একটি রূপবতী পক্ষিণী মনে পড়িল। গেঙ্গোখালি 'মোহনায়' যেখানে ইংরেজেরা প্রথম উপনিবেশ স্থাপন করেন, সেইখানে অপরাহ্নে বন্দুক স্কন্ধে পক্ষী শিকার করিতে গিয়াছিলাম, তথায় কোন বৃক্ষের শুষ্কডালে একটি ক্ষুদ্র পক্ষী অতি বিষণ্ণভাবে বসিয়াছিল, আমি তাহার সম্মুখে গিয়া দাঁড়াইলাম, আমায় দেখিয়া পক্ষী উড়িল না, মাথা হেলাইয়া আমায় দেখিতে লাগিল। ভাবিলাম, "জঙ্গলী পাখী হয়ত কখন মানুষ দেখে নাই, দেখিলে বিশ্বাসঘাতককে চিনিত।" চিনাইবার নিমিত্ত আমি হাসিয়া বন্দুক তুলিলাম, তবু পক্ষী উড়িল না, বুক পাতিয়া আমার মুখ প্রতি চাহিয়া রহিল। আমি অপ্রতিভ হইলাম, তখন ধীরে ধীরে বন্দুক নামাইয়া অনিমিষ লোচনে পক্ষীকে দেখিতে লাগিলাম। তাহার কি আশ্চর্য রূপ! সেই পক্ষিণীতে যে রূপরাশি দেখিয়াছিলাম, এই যুবতীকে ঠিক তাহাই দেখিলাম। আমি কখন কবির চক্ষে রূপ দেখি নাই, চিরকাল বালকের মত রূপ দেখিয়া থাকি, এই জন্য আমি যাহা দেখি, তাহা অন্যকে বুঝাইতে পারি না। রূপ যে কি জিনিস, রূপের আকার কি, শরীরের কেমন কোন স্থানে তাহার বাসা, এ সকল বার্তা আমাদের বঙ্গ কবিরা বিশেষ জানেন, এই জন্য তাঁহারা অঙ্গ বাছিয়া বাছিয়া বর্ণনা করিতে পারেন, দুর্ভাগ্যবশতঃ আমি তাহা পারি না। তাহার কারণ, আমি কখন অঙ্গ বাছিয়া রূপ তল্লাস করি নাই। আমি যে প্রকারে রূপ দেখি, নির্লজ্জ হইয়া তাহা বলিতে পারি। একবার আমি দুই বৎসরের একটি শিশু গৃহে রাখিয়া বিদেশে গিয়াছিলাম শিশুকে সর্বদাই মনে হইত, তাহার ন্যায় রূপ আর কাহারও দেখিতে পাইতাম না। অনেক দিনের পর একটি ছাগ-শিশুতে সেই রূপরাশি দেখিয়া আহ্লাদে তাহাকে বুকে করিয়াছিলাম। আমার সেই চক্ষু! আমি রূপরাশির কি বুঝিব? তথাপি যুবতীকে দেখিতে লাগিলাম।

বাল্যকালে আমার মনে হইত যে, ভূত-প্রেত যে প্রকার নিজে দেহহীন, অন্যের দেহ আবির্ভাবে বিকাশ পায়, রূপও সেই প্রকার অন্য দেহ অবলম্বন করিয়া প্রকাশ পায়. কিন্তু প্রভেদ এই যে, ভূতের আশ্রয় কেবল মনুষ্য, বিশেষতঃ মানবী; কিন্তু বৃক্ষ, পল্লব, নদ ও নদী প্রভৃতি সকলেই রূপ আশ্রয় করে। যুবতীতে যে রূপ, লতায় সেই রূপ, নদীতেও সেই রূপ. পৃথিবীতেও সেই রূপ, ছাগেও সেই রূপ; সুতরাং রূপ এক; তবে পাত্রভেদ। আমি পাত্র দেখিয়া ভুলি না; দেহ দেখিয়া ভুলি না; ভুলি কেবল রূপে। সে রূপ লতায় থাক অথবা যুবতীতে থাক, আমার মনের চক্ষে তাহার কোন প্রভেদ দেখি না। অনেকের এই প্রকার রুচি-বিকার আছে। যাহারা বলেন, যুবতীর দেহ দেখিয়া ভুলিয়াছেন, তাঁহাদের মিথ্যা কথা।

আমি যুবতীকে দেখিতেছি, এমত সময় আমার খানসামাবাবু বলিল, "এরা নাই, এরাই তখন খাঁসাহেব বলিয়া ডাকিয়াছিল।" শুনিবা মাত্র আবার রাগ পূর্বমত গর্জিয়া উঠিল, চীৎকার করিয়া আমি তাহাদের তাড়াইয়া দিলাম। সেই অবধি আর তাহাদের কথা কেহ আমায় বলে নাই। পরদিবস অপ-রাহ্নে দেখি, এক বটতলায় ছোট বড় কতক-গুলি স্ত্রীলোক বসিয়া আছে; নিকটে দুই-একটা বেতো ঘোড়া চরিতেছে; জিজ্ঞাসা করায় জানিলাম, তাহারাও "নাই"; বায় লাঘব করিবার নিমিত্ত তাহারা পঞ্চাম্রো দিয়া যাইতেছে। এই সময় পূর্বরাত্রের নাইকে আমার স্মরণ হইল, তাহার গীত শুনিব মনে করিয়া তাহাকে ডাকিতে পাঠাইলাম। কিন্তু লোক ফিরিয়া আসিয়া বলিল, অতি প্রত্যূষে সে চলিয়া গিয়াছে। আমি আর কোন কথা কহিলাম না দেখিয়া একজন রাজ-পুত প্রতিবাসী বলিল, "সে কাঁদিয়া গিয়াছে।"

আ। কেন?

প্র। এই জঙ্গল দিয়া আসিতে-আসিতে তাহার সঙ্গীরা সকলে মরিয়াছে, মাত্র একজন বৃদ্ধ সঙ্গে ছিল, 'খরচা'ও ফুরাইয়াছে। দুই দিন উপবাস করিয়াছে, আরও কতদিন উপবাস করিতে হয় বলা যায় না। এ জঙ্গল-পাহাড় মধ্যে কোথা ভিক্ষা পাইবে? আপনার নিকট ভিক্ষার নিমিত্ত আসিয়াছিল, আপনিও ভিক্ষা দেন নাই।

একথা শুনিয়া আমার কষ্ট হইল তাহার বিপদ কতক অনুভব করিতে পারিলাম, নিজে সেই অবস্থায় পড়িলে কি যন্ত্রণা পাইতাম, তাহা কল্পনা করিতে লাগিলাম। জঙ্গলে অন্নাভাব, আর অপার নদীতে নৌকাডুবি একই প্রকার। আমি তাহাকে অনায়াসে দুই-পাঁচ টাকা দিতে পারিতাম, তাহাতে নিজের কোন ক্ষতি হইত না, অথচ সে রক্ষা পাইত। আমি তাহাকে উদ্ধার করিলাম না, তাড়াইয়া দিলাম; এ নিষ্ঠুরতার ফল একদিন আমায় অবশ্য পাইতে হইবে, এরূপ কথা আমার সর্বদা মনে হইত। দুই-চারি দিনের পর একটি সাহেবের সহিত আমার দেখা হইল। তিনি দশ ক্রোশ দূরে একা থাকিতেন, গল্প করিবার নিমিত্ত মধ্যে মধ্যে আমার তাঁবুতে আসিতেন। গল্প করিতে করিতে আমি তাঁহাকে যুবতীর কথা বলিলাম। তিনি কিয়ৎক্ষণ রহস্য করিলেন, তাহার পর বলিলেন, "আমি স্ত্রীলোকটির কথা শুনিয়াছি; সে এ জঙ্গল অতিক্রম করিতে পারে নাই, পথেই মরিয়াছে।" একথা সত্যই হউক বা মিথ্যাই হউক, আমার বড়ই কষ্ট হইল; আমি কেবল অহঙ্কারের চাতুরীতে পাওয়া 'খাঁসাহেব' কথায় চটিয়াছিলাম। তখন জানিতাম না যে, একদিন আপনার অহঙ্কারে আপনি হাসিব।

সাহেবকে বিদায় দিয়া অপরাহ্নে যুবতীর কথা ভাবিতে ভাবিতে পাহাড়ের দিকে যাইতেছিলাম, পথিমধ্যে কতকগুলি কোলকন্যার সহিত সাক্ষাৎ হইল, তাহারা 'দাড়ি' হইতে জল তুলিতেছিল। এই অঞ্চলে জলাশয় একেবারে নাই, নদী শীতকালে একেবারে শুষ্কপ্রায় হইয়া যায়, সুতরাং গ্রাম্য-লোকেরা এক-এক স্থানে পাতকুয়ার আকারে ক্ষুদ্র খাদ খনন করে—তাহা দুই হাতের অধিক গভীর করিতে হয় না।—সেই খাদে জল ক্রমে ক্রমে চুঁইয়া জমে। আট-দশ কলস তুলিলে আর কিছু থাকে না, আবার জল ক্রমে আসিয়া জমে। এই ক্ষুদ্র খাদগুলিকে দাড়ি বলে।

কোলকন্যারা আমাকে দেখিয়া দাঁড়াইল। তাহাদের মধ্যে একটি লম্বোদরী—সর্বাপেক্ষা বয়োজ্যেষ্ঠা মাথায় পূর্ণ কলস দুই হস্তে ধরিয়া হাস্যমুখে আমায় বলিল, "রাত্রে নাচ দেখিতে আসিবেন?" আমি মাথা হেলাইয়া স্বীকার করিলাম, অমনি সকলে হাসিয়া উঠিল। কোলের যুবতীরা যত হাসে, তত নাচে, বোধ হয় পৃথিবীতে আর কোন জাতির কন্যারা তত হাসিতে নাচিতে পারে না; আমাদের দুরন্ত ছেলেরা তাহার শতাংশ পারে না।

সন্ধ্যার পর আমি নৃত্য দেখিতে গেলাম। গ্রামের প্রান্তভাগে এক বটবৃক্ষতলে গ্রামস্থ যুবারা সমুদয়ই আসিয়া একত্র হইয়াছে। তাহারা 'খোপা' বাঁধিয়াছে, তাহাতে দুই-তিনখানি কাঠের 'চিরুনী' সাজাইয়াছে। কেহ মাদল আনিয়াছে, কেহ বা লম্বা লাঠি আনিয়াছে, রিক্ত হস্তে কেহই আসে না।। বয়সের দোষে সকলেরই দেহ চঞ্চল, সকলেই নানা ভঙ্গীতে আপন আপন বলবীর্য দেখাইতেছে। বৃদ্ধেরা বৃক্ষমূলে উচ্চ মৃন্ময় মঞ্চের উপর জড়বৎ বসিয়া আছে, তাহাদের জানু প্রায় স্কন্ধ ছাড়াইয়াছে, তাহারা বসিয়া নানা ভঙ্গীতে কেবল ওষ্ঠক্রীড়া করিতেছে। আমি গিয়া তাহাদের পার্শ্বে বসিলাম।

এই সময় দলে দলে গ্রামস্থ যুবতীরা আসিয়া জমিতে লাগিল; তাহারা আসিয়াই যুবাদিগের প্রতি উপহাস আরম্ভ করিল, সঙ্গে সঙ্গে বড় হাসির ঘটা পড়িয়া গেল। উপহাস আমি কিছুই বুঝিতে পারিলাম না; কেবল অনুভবে স্থির করিলাম যে, যুবারা ঠকিয়া গেল, ঠকিবার কথা, যুবা দশ-বারটি, কিন্তু যুবতীরা প্রায় চল্লিশজন, হাসিলে হাইলণ্ডের পল্টন ঠকে।

হাস্য-উপহাস্য শেষ হইলে নৃত্যের উদ্যোগ আরম্ভ হইল। যুবতী সকলে হাত ধরাধরি করিয়া অর্ধচন্দ্রাকৃতি রেখা বিন্যাস করিয়া দাঁড়াইল। দেখিতে বড় চমৎকার হইল। সকলগুলিই সমউচ্চ, সকলগুলিই পাথুরে কাল; সকলেরই অনাবৃত দেহ, সকলের সেই অনাবৃত বক্ষে আরসি ধুক-ধুকি চন্দ্র-কিরণে এক-একবার জ্বলিয়া উঠিতেছে। আবার সকলের মাথায় বনপুষ্প, কর্ণে বন-পুষ্প, ওষ্ঠে হাসি। সকলেই আহ্লাদে পরি-পূর্ণ, আহ্লাদে চঞ্চল, যেন তেজপুঞ্জ অশ্বের ন্যায় সকলেই দেহ বেগ সংযম করিতেছে।

সম্মুখে যুবারা দাঁড়াইয়া, যুবাদের পশ্চাতে মৃন্ময় মঞ্চোপরি বৃদ্ধেরা এবং তৎসঙ্গে এই নরাধম। বৃদ্ধেরা ইঙ্গিত করিলে যুবাদের দলে মাদল মাজিল। অমনি যুবতীদের দেহ যেন শিহরিয়া উঠিল। যদি দেহের কোলাহল থাকে, তবে যুবতীদের দেহে সেই কোলাহল পড়িয়া গেল, পরেই তাহারা নৃত্য আরম্ভ করিল। তাহাদের নৃত্য আমাদের চক্ষে নূতন, তাহারা তালে-তালে পা ফেলিতেছে, অথচ কেহ চলে না, দোলে না, টলে না। যে যেখানে দাঁড়াইয়াছিল, সে সেইখানেই দাঁড়াইয়া তালে-তালে পা ফেলিতে লাগিল, তাহাদের মাথার ফুলগুলি নাচিতে লাগিল, বুকের ধুকধুকি দুলিতে লাগিল। নৃত্য আরম্ভ হইলে পর একজন বৃদ্ধ মঞ্চ হইতে কম্পিতকণ্ঠে একটি গীতের 'মহড়া' আরম্ভ করিল, অমনি যুবারা সেই গীত উচ্চৈঃস্বরে গাহিয়া উঠিল। সঙ্গে সঙ্গে যুবতীরা তীব্রতানে 'ধুয়া' ধরিল। যুবতীদের সুরের ঢেউ নিকটের পাহাড়ে গিয়া লাগিতে লাগিল। আমার তখন স্পষ্ট বোধ হইতে লাগিল, যেন সুর কখন পাহাড়ের মূল পর্যন্ত, কখন বা পাহাড়ের বক্ষ পর্যন্ত গিয়া ঠেকিতেছে। তাল পাহাড়ে ঠেকা অনেকের নিকট রহস্যের কথা, কিন্তু আমার নিকট তাহা নহে, আমার লেখা পড়িতে গেলে এরূপ প্রলাপবাক্য মধ্যে মধ্যে সহ্য করিতে হইবে।

যুবতীরা তালে তালে নাচিতেছে, তাহাদের মাথার বনফুল সেই সঙ্গে উঠিতেছে-নামিতেছে, আবার সেই ফুলের দুটি একটি ঝরিয়া তাহাদের স্কন্ধে পড়িতেছে। শীতকাল, নিকটে দুই-তিন স্থানে হু-হু করিয়া অগ্নি জ্বলিতেছে, অগ্নির আলোকে নর্তকীদের বর্ণ আরও কাল দেখাইতেছে; তাহারা তালে তালে নাচিতেছে, নাচিতে নাচিতে ফুলের পাপড়ির ন্যায় সকলে এক-একবার 'চিতিয়া' পড়িতেছে, আকাশ হইতে চন্দ্র তাহা দেখিয়া হাসিতেছে, আর বটমূলের অন্ধকারে বসিয়া আমি হাসিতেছি।

নৃত্যের শেষ পর্যন্ত থাকিতে পারিলাম না; বড় শীত অধিকক্ষণ থাকা গেল না।

কোলের নৃত্য সম্বন্ধে যৎকিঞ্চিৎ বলা হইয়াছে, এবার তাহাদের বিবাহের পরিচয় দিতে ইচ্ছা হইতেছে। কোলের অনেক শাখা আছে। আমার স্মরণ নাই, বোধ হয় যেন উরাও, মুণ্ডা, খেরওয়ার এবং দোসাদ এই চারি জাতি তাহাদের মধ্যে প্রধান। ইহার এক জাতির বিবাহে আমি বরযাত্রী হইয়া কতক দূর গিয়াছিলাম। বরকর্তা আমার পাল্কী লইয়া গেল, কিন্তু আমায় নিমন্ত্রণ করিল না; ভাবিলাম—না করুক, আমি রবাহূত যাইব। সেই অভিপ্রায়ে অপরাহ্নে পথে দাঁড়াইয়া থাকিলাম। কিছুক্ষণ পরে দেখি, পাল্‌কীতে বর আসিতেছে। সঙ্গে দশ-বার জন পুরুষ আর পাঁচ-ছয়জন যুবতী, যুবতীরাও বরযাত্রী। পুরুষেরা আমায় কেহই ডাকিল না, স্ত্রীলোকের চক্ষুলজ্জা আছে, তাহারা হাসিয়া আমায় ডাকিল, আমিও হাসিয়া তাহাদের সঙ্গে চলিলাম, কিন্তু অধিক-দূর যাইতে পারিলাম না; তাহার যেরূপ বুক ফুলাইয়া, মুখ তুলিয়া, বায়ু ঠেলিয়া মহা-দম্ভে চলিতেছিল, আমি দুর্বল বাঙ্গালী, আমার সে দম্ভ, সে শক্তি কোথায়? সুতরাং কতক দূরে গিয়া পিছাইলাম; তাহারা তাহা লক্ষ্য করিল না; হয়ত দেখিয়াও দেখিল না; আমি বাঁচিলাম। তখন পথপ্রান্তে এক প্রস্তর-স্তূপে বসিয়া ঘর্ম মুছিতে লাগিলাম। তাহাদিগকে সেপাই বলিলাম, সিদ্ধেশ্বরীর পাল বলিলাম, আরও কত কি বলিলাম। আর একবার বহু পূর্বে এইরূপ গালি দিয়াছিলাম। একদিন বেলা দুই প্রহরের সময় টিটাগড়ের বাগানে 'লসিংটন লজ' হইতে গজেন্দ্রগমনে আমি আসিতেছিলাম—তখন রেলওয়ে ছিল না, সুতরাং এখনকার মত বেগে পথ চলা বাঙ্গালীর মধ্যে বড় ফেসন হয় নাই—আসিতে আসিতে পশ্চাতে একটা অল্প অল্প টক্ টক্ শব্দ শুনিতে পাইলাম। ফিরিয়া দেখি, গভর্ণর জেনেরল কাউন্সলের অমুক মেম্বারের কলকন্যা একা আসিতেছেন। আমি তখন বালক, ষোড়শ বৎসরের অধিক আমার বয়স নহে, সুতরাং বয়সের মত স্থির করলাম, স্ত্রীলোকের নিকট পিছাইয়া পড়া হইবে না; অতএব যথাসাধ্য চলিতে লাগিলাম। হয়ত যুবতীও তাহা বুঝিলেন। আর একটু অধিক বয়স হইলে এদিকে তাঁহার মন যাইত না। তিনি নিজে অল্পবয়স্কা, আমার অপেক্ষা কিঞ্চিৎ মাত্র বয়োজ্যেষ্ঠা, সুতরাং এই উপলক্ষে যাইচ

ার আমোদ তাঁহার মনে আসা সম্ভব। জন্য একটু যেন তিনি জোরে বাহিতে ালেন। দেখিতে দেখিতে পশ্চিমে মেঘের আমাকে ছাড়াইয়া গেলেন, যেন সেই । একটু 'দুয়ো' দিয়া গেলেন—অবশ্য । মনে মনে, তাঁহার ওষ্ঠপ্রান্তে একটু । ছিল, তাহাই বলিতেছি। আমি লজ্জিত । নিকটস্থ উপকূলে বসিয়া সুন্দরীদের । রাগ করিয়া নানা কথা বলিতে ালাম। যাহারা এত জোরে পথ চলে, ারা আবার কোমলাঙ্গী? খোষা- ারা বলে, তাহাদের অলকদাম সরাইবার ান্ত বায়ু ধীরে ধীরে বহে। কলাগাছে আর সিমুল গাছে সমীরণ?

সে সকল রাগের কথা এখন থাক, যে া, সেই রাগে। কোলের কথা হইতেছিল। াদের সকল জাতির মধ্যে একরূপ বিবাহ । এক জাতি কোল আছে, তাহারা ও কি, কি তাহা স্মরণ নাই, তাহাদের হপ্রথা অতি পুরাতন। তাদের প্রত্যেক র প্রান্তে একখানি করিয়া বড় ঘর ।। সেই ঘরে সন্ধ্যার পরে একে একে র সমুদয় কুমারীরা আসিয়া উপস্থিত সেই ঘর তাহাদের ডিপো। বিবাহ- া হইলে আর তাহারা পিতৃগৃহে যাপন করিতে চায় না। সকলে উপস্থিত শয়ন করিলে গ্রামের অবিবাহিত া ক্রমে ক্রমে সকলে সেই ঘরের নিকটে ায়া রসিকতা আরম্ভ করে, কেহ গীত কেহ নৃত্য করে, কেহ বা রহস্য করে। ুমারীর বিবাহের সময় হয় নাই, সে ধ নিদ্রা যায়। কিন্তু যাহাদের সময় স্থিত, তাহারা বসন্তকালের পক্ষিণীর অনিমেষলোচনে সেই নৃত্য দেখিতে , একাগ্রচিত্তে সেই গীত শুনিতে । হয়ত থাকিতে না পারিয়া শেষ । উত্তর দেয়, কেহ বা গালি পর্যন্তও গালি আর ঠাট্টা উভয়ে প্রভেদ অল্প, ব যুবতীর মুখ-নিগর্ত হইলে । কানে উভয়ই সুধাবর্ষণ। কুমারীরা আরম্ভ করিলে কুমারেরা আনন্দে া উঠে।

এইরূপে প্রতি রাত্রে কুমার-কুমারীর াতুরী হইতে থাকে। শেষ তাহাদের প্রণয় উপস্থিত হয়। প্রণয় কথাটি নহে। কোলেরা প্রেম-প্রীতির বড় । রাখে না। মনোনীত কথাটি ঠিক। হাস্য উপহাসের পর পরস্পর মনোনীত , সঙ্গী, সঙ্গিনীরা তাহা কানাকানি ত থাকে। ক্রমে গ্রামে রাষ্ট্র হইয়া পড়ে। কথা শুনিয়া উভয় পক্ষের পিতৃকুল ন হইতে থাকে। সাবধানতা অন্য । নহে। কুমারীর আত্মীয়-বন্ধুরা বড় াশ কাটে, তীর-ধনুক সংগ্রহ করে, স্ত্রে শান দেয়। আর অনবরত কুমারের য়-বন্ধুকে গালি দিতে থাকে। চীৎকার আস্ফালনের সীমা থাকে না। আবার উভয় পক্ষে গোপনে গোপনে ের আয়োজনও আরম্ভ করে।

শষ একদিন অপরাহ্নে কুমারী হাসি- মুখে বেশবিন্যাস করিতে বসে। সকলে ঘিরিয়া চারি পার্শ্বে দাঁড়ায়। হয়ত ভগিনী বন হইতে নূতন ফুল আনিয়া মাথায় পরাইয়া দেয়, বেশবিন্যাস হইলে কুমারী উঠিয়া গাগরি লইয়া একা জল আনিতে যায়। অন্যদিনের মত নহে, এদিনে ধীরে ধীরে যায়, তবু মাথায় গাগরি টলে। বনের ধারে জল, যেন কতই দূরে! কুমারী যাইতেছে আর অনিমেষলোচনে বনের দিকে চাহিতেছে। চাহিতে চাহিতে বনের দুই একটি ডাল দুলিয়া উঠিল, তাহার পর এক নবযুবা সখা সুবলের মত লাফাইতে লাফাইতে সেই বন হইতে বহির্গত হইল। সঙ্গে সঙ্গে হয়ত দুটা চারিটা ভ্রমরও ছুটিয়া আসিল। কোল-কুমারীর মাথা হইতে গাগরি পড়িয়া গেল। কুমারীকে বুকে ধরিয়া যুবা অমনি ছুটিল। কুমারী সুতরাং এ অবস্থায় চীৎকার করিতে বাধ্য। চীৎকারও সে করিতে লাগিল। হাত-পাও আছড়াইল এবং চড়টাচাপড়টাও যুবককে মারিল, নতুবা ভাল দেখায় না। কুমারীর চীৎকারে তাহার আত্মীয়েরা "মার মার" রবে আসিয়া পড়িল। যুবার আত্মীয়েরাও নিকটে এখানে সেখানে লুকাইয়াছিল, তাহারাও বাহির হইয়া পথ-রোধ করিল। শেষ যুদ্ধ আরম্ভ হইল। যুদ্ধ রুক্মিণী হরণের যাত্রার মত, সকলের তীর আকাশমুখী। কিন্তু শুনিয়াছি, দুই-একবার না কি সত্য-সত্যই মাথা ফাটাফাটিও হইয়া গিয়াছে। যাহাই হউক, শেষ যুদ্ধের পর আপোষ হইয়া যায় এবং তৎক্ষণাৎ উভয় পক্ষ একত্র আহার করিতে বসে।

এইরূপ কন্যা হরণ করাই তাহাদের বিবাহ, আর স্বতন্ত্র কোন মন্ত্রতন্ত্র নাই। আমাদের শাস্ত্রে এই বিবাহকে আসুরিক বিবাহ বলে। এক সময় পৃথিবীর সর্বত্র এই বিবাহ প্রচলিত ছিল। আমাদের দেশে, স্ত্রী-আচারের সময় বরের পৃষ্ঠে বাউটি-বেষ্টিত নানা ওজনের করকমল যে সংস্পর্শ হয়, তাহাও এই মারপিট প্রথার অবশেষে। হিন্দুস্থান অঞ্চলে বর-কন্যার মাসী-পিসী একত্র জুটিয়া নানা ভঙ্গীতে, নানা ছন্দে, মেছুয়াবাজারের ভাষায় পরস্পরকে যে গালি দিবার রীতি আছে, তাহাও এই মারপিট প্রথার নূতন সংস্কার। ইংরেজদের বরকন্যা গির্জা হইতে বাড়ীতে উঠিবার সময় পুষ্প-বৃষ্টির ন্যায় তাহাদের অঙ্গে যে জুতাবৃষ্টি হয়, তাহাও এই পূর্ব-প্রথার অন্তর্গত।

কোলদের উৎসব সর্বাপেক্ষা বিবাহে। তদুপলক্ষে ব্যয়ও বিস্তর। আট টাকা, দশ টাকা, কখন কখন পনর টাকা পর্যন্ত ব্যয় হয়। বাঙ্গালীর পক্ষে ইহা অতি সামান্য। কিন্তু বন্যের পক্ষে অতিরিক্ত। এত টাকা তাহারা কোথায় পাইবে? তাহাদের এক পয়সা সঞ্চয় নাই, কোন উপার্জনও নাই, সুতরাং ব্যয় নির্বাহ করিবার নিমিত্ত কর্জ করিতে হয়। দুই-চারি গ্রাম অন্তর একজন করিয়া হিন্দুস্থানী মহাজন বাস করে, তাহারাই কর্জ দেয়। এই হিন্দুস্থানীরা মহাজন, কি মহাপিশাচ, সে বিষয়ে আমার বিশেষ সন্দেহ আছে। তাহাদের নিকট একবার কর্জ করিলে আর উদ্ধার নাই। যে একবার পাঁচ টাকা মাত্র কর্জ করিল, সে সেইদিন হইতে আপন গৃহে আর কিছুই লইয়া যাইতে পাইবে না, যাহা উপার্জন করিবে, তাহা মহাজনকে আনিয়া দিতে হইবে। খাতকের ভূমিতে দুই মণ কার্পাস, কি চারি মণ যব জন্মিয়াছে, মহাজনের গৃহে তাহা আনীত হইবে, তিনি তাহা ওজন করিবেন, পরীক্ষা করিবেন, কত কি করিবেন, শেষ হিসাব করিয়া বলিবেন যে, আসল পাঁচ টাকার মধ্যে এই কার্পাসে কেবল এক টাকা শোধ গেল, আর চারি টাকা বাকি থাকিল। খাতক "যে আজ্ঞা" বলিয়া চলিয়া যায়। কিন্তু সমুদয় লইল। খাতক হিসাব জানে না, এক হইতে দশ গণনা করিতে পারে না, সকলের উপর তাহার সম্পূর্ণ বিশ্বাস। মহাজন যে অন্যায় করিবে, ইহা তাহার বুদ্ধিতে আইসে না। সুতরাং, মহাজনের জালে বদ্ধ হইল। তাহার পর পরিবার আহার পায় না, আবার মহাজনের নিকট খোরাকী কর্জ করা আবশ্যক, সুতরাং খাতক জন্মের মত মহাজনের নিকট বিক্রীত হইল। যাহা সে উপার্জন করিবে, তাহা মহাজনের। মহাজন তাহাকে কেবল যৎসামান্য খোরাকী দিবে। এই তাহার এ জন্মের বন্দোবস্ত।

কেহ কেহ এই উপলক্ষে "সামকনামা" লিখিয়া দেয়। সামকনামা অর্থাৎ দাসখত। যে ইহা লিখিয়া দিল, সে রীতিমত গোলাম হইল। মহাজন গোলামকে কেবল আহার দেয়, গোলাম বিনা-বেতনে তাঁহার সমুদয় কর্ম করে, চাষ করে, মোট বহে, সর্বত্র সঙ্গে যায়। আপনার সংসারের সঙ্গে আর তাহার কোন সম্বন্ধ থাকে না। সংসারও তাহাদের অন্নাভাবে শীঘ্রই লোপ পায়।

কোলদের এই দুর্দশা অতি সাধারণ। তাহাদের কেবল এক উপায় আছে—পলায়ন। অনেকেই পলাইয়া রক্ষা পায়। যে না পলাইল, সে জন্মের মত মহাজনের নিকট বিক্রীত থাকিল।

পুত্রের বিবাহ দিতে গিয়া কেবল কোলের জীবনযাত্রা বৃথা হয় এমত নহে, আমাদের বাঙ্গালীর মধ্যে অনেকের দুর্দশা পুত্রের বিবাহ উপলক্ষে অথবা পিতৃ-মাতৃ-শ্রাদ্ধ উপলক্ষে। সকলেই মনে মনে জানেন, আমি বড়লোক, আমি "ধুমধাম" না করিলে লোকে আমার নিন্দা করিবে। সুতরাং কর্জ করিয়া সেই বড়লোকত্ব রক্ষা করেন, তাহার

যে আসুরিক বিবাহের পরিচয় দিলাম, তাহা Exagamy নহে। কেন না, ইহা স্বজাতি বিবাহ।

প্রকৃতির রূপ ফটো : অমিতেশ বন্দ্যোপাধ্যায়

পর যথাসর্বস্ব বিক্রয় করিয়া সে কর্জ হইতে উদ্ধার হওয়া ভার হয়। প্রায় দেখা যায় "আমি ধনবান" বলিয়া প্রথমে অভিমান জন্মিলে শেষ দারিদ্র্যদশায় জীবন শেষ করিতে হয়।

কোলেরা সকলেই বিবাহ করে। বাঙ্গলা শস্যশালিনী, এখানে অল্পেই গুজরান চলে, তাই বাঙ্গালীর বিবাহ এত সাধারণ। কিন্তু পালামৌ অঞ্চলে সম্পূর্ণ অন্নাভাব, সেখানে বিবাহ এরূপ সাধারণ কেন, তদ্বিষয়ে সমাজতত্ত্ববিদেরা কি বলেন জানি না। কিন্তু বোধ হয়, হিন্দুস্থানী মহাজনেরা তথায় বাস করিবার পূর্বে কোলদের এত অন্নাভাব ছিল না। তাহাই বিবাহ সাধারণ হইয়াছিল। এক্ষণে মহাজনেরা তাহাদের সর্বস্ব লয়। তাহাদের অন্নাভাব হইয়াছে, সুতরাং বিবাহ আর পূর্বমত সাধারণ থাকিবে না বলিয়া বোধ হয়।

কোলের সমাজ এক্ষণে যে অবস্থায় আছে দেখা যায়, তাহাতে সেখানে মহাজনের আবশ্যক নাই। যদি হিন্দুস্থানী সভ্যতা তথায় প্রবিষ্ট না হইত, তাহা হইলে অদ্যাপি কোলের মধ্যে ঋণের প্রথা উৎপত্তি হইত না। ঋণের সময় হয় নাই। ঋণ উন্নত সমাজের সৃষ্টি। কোলদিগের মধ্যে সে উন্নতির বিলম্ব আছে। সমাজের স্বভাবতঃ যে অবস্থা হয় নাই, কৃত্রিম উপায়ে সে অবস্থা ঘটাইতে গেলে, অথবা সভ্য দেশের নিয়মাদি অসময়ে অসভ্য দেশে প্রবিষ্ট করাইতে গেলে, ফল ভাল হয় না। আমাদের বাঙ্গালায় এ কথার অনেক পরিচয় পাওয়া যাইতেছে। এক সময়ে ইহুদী মহাজনেরা ঋণ দানের সভ্য নিয়ম অসভ্য বিলাতে প্রবেশ করাইয়া অনেক অনিষ্ট ঘটাইয়াছিল। এক্ষণে হিন্দুস্থানী মহাজনেরা কোলদের সেইরূপ অনিষ্ট ঘটাইতেছে।

কোলের নববধূ আমি কখন দেখি নাই। কুমারী এক রাত্রের মধ্যে নববধূ! দেখিতে আশ্চর্য! বাঙ্গালায় দুরন্ত ছুঁড়ীরা ধূলা-খেলা করিয়া বেড়াইতেছে, ভাইকে পিটাইতেছে, পরের গোরুকে গাল দিতেছে, পাড়ায় ভালথাকীদের সঙ্গে কোন্দল করিতেছে , বিবাহের কথা উঠিলে ছুঁড়ী গালি দিয়া পালাইতেছে। তাহার পর এক রাত্রে ভাবান্তর। বিবাহের পরদিন প্রাতে আর সে পূর্বমত দুরন্ত ছুঁড়ী নাই। এক রাত্রে তাহার আশ্চর্য পরিবর্তন হইয়া গিয়াছে। আমি একটি এইরূপ নববধূ দেখিয়াছি। তাহার পরিচয় দিতে ইচ্ছা হয়।

বিবাহের রাত্রি আমোদে গেল। পরদিন প্রাতে উঠিয়া নববধূ ছোট ভাইকে আদর করিল, নিকটে মা ছিলেন, নববধূ মা'র মুখ প্রতি একবার চাহিল। মা'র চক্ষে জল আসিল। নববধূ মুখাবনত করিল, কাঁদিল না। তাহার পর ধীরে ধীরে এক নির্জন স্থানে গিয়া দ্বারে মাথা রাখিয়া অন্যমনস্কে দাঁড়াইয়া শিশিরসিক্ত সামিয়ানার প্রতি চাহিয়া রহিল। সামিয়ানা হইতে টোপে টোপে উঠানে শিশির পড়িতেছে। সামিয়ানা হইতে উঠানের দিকে তাহার দৃষ্টি গেল। উঠানের এখানে সেখানে পূর্বরাত্রের উচ্ছিষ্ট পড়িয়া রহিয়াছে। রাত্রের কথা নববধূর মনে হইল। কত আলো! কত বাদ্য! কত লোক! কত কলরব! যেন স্বপ্ন! এখন সেখানে ভাঙ্গা ভাঁড়, ছেঁড়া পাতা। নববধূর সেই-দিকে দৃষ্টি গেল। একটি দুর্বলা কুক্কুরী—নবপ্রসূতি—পেটের জ্বালায় শুষ্কপত্রে ভগ্ন-ভাণ্ডে আহার খুঁজিতেছে, নববধূর চক্ষে জল আসিল। জল মুছিয়া নববধূ ধীরে ধীরে মাতৃকক্ষে গিয়া লুচি আনিয়া কুক্কুরীকে দিল। এই সময় নববধূর পিতা অন্দরে আসিতেছিলেন, কুক্কুরীভোজন দেখিয়া একটু হাসিলেন। নববধূ আর পূর্বমত দৌড়িয়া পিতার কাছে গেল না, অধোমুখে দাঁড়াইয়া রহিল। পিতা বলিলেন, "ব্রাহ্মণভোজনের পর কুক্কুর-ভোজনই হইয়া থাকে, রাত্রে তাহা হইয়া গিয়াছে। অদ্য আবার এ কেন মা?" নববধূ কথা কহিল না! কহিলে হয়ত বলিত, "এই কুক্কুরী সংসারী!"

পূর্বে বলিয়াছি, নববধূ লুচি আনিতে যাইবার সময় ধীরে ধীরে গিয়াছিল, আর দুইদিন পূর্বে হইলে দৌড়িয়া যাইত। যখন সেই ঘরে গেল, তখন দেখিল, মাতার সম্মুখে কতকগুলি লুচি-সন্দেশ রহিয়াছে। নববধূ জিজ্ঞাসা করিল, "মা! লুচি নেব?" মাতা লুচিগুলি হাতে তুলিয়া দিয়া বলিলেন, "কেন মা আজ চাহিয়া নিলে? যাহা তোমার ইচ্ছা তুমি আপনি লও, ছড়াও, ফেলিয়া দাও, নষ্ট কর, কখন কাহাকেও ত জিজ্ঞাসা করিয়া লও না? আজ কেন মা চাহিয়া নিলে? তবে সত্যই আজ থেকে কি তুমি পর হলে, আমায় পর ভাবিলে?" এই বলিয়া মা কাঁদিতে লাগিলেন। নববধূ বলিল, "না মা! আমি বলি, বুঝি কার জন্যে রেখেছ?" নববধূ হয়ত মনে করিল, পূর্বে আমায় "তুই" বলিতে, আজ কেন তবে আমায় "তুমি" বলিয়া কথা কহিতেছ?

নববধূর পরিবর্তন সকলের নিকট স্পষ্ট নহে সত্য, কিন্তু যিনি অনুধাবন করিয়াছেন, তিনিই বুঝিতে পারিয়াছেন যে, পরিবর্তন অতি আশ্চর্য! এক রাত্রের বলিয়া আশ্চর্য! নববধূর মুখশ্রী এক রাত্রে একটু গম্ভীর হয়, অথচ তাহাতে একটু আহ্লাদের আভাসও থাকে। তদ্ব্যতীত যেন একটু সাবধান, একটু নম্র, একটু সঙ্কুচিত বলিয়া বোধ হয়। ঠিক যেন শেষ রাত্রের পদ্ম। বালিকা কি বুঝিল যে, মনের এই পরিবর্তন হঠাৎ এক রাত্রের মধ্যে হইল?

অমৃত পাবলিশার্স প্রাইভেট লিঃ-এর পক্ষে শ্রীসুপ্রিয় সরকার কর্তৃক পত্রিকা প্রেস, ১৪, আনন্দ চ্যাটার্জি লেন, কলিকাতা—৩ হইতে মুদ্রিত ও তাঁহাকর্তৃক ১১।১, আনন্দ চ্যাটার্জি লেন, কলিকাতা—৩ হইতে প্রকাশিত।

৭ম বর্ষ

২য় খণ্ড

১৬শ সংখ্যা

মূল্য

৪০ পয়সা

Friday 18th August, 1967. শুক্রবার, ১লা ভাদ্র, ১৩৭৪ 40 Paise

পৃষ্ঠা	বিষয়		লেখক
১৬৪	চিঠিপত্র		
১৬৫	সম্পাদকীয়		
১৬৬	প্রতিধ্বনি		
১৬৮	পোস্টমর্টেম	(কবিতা)	—শ্রীঅরুণ ভট্টাচার্য
১৬৮	অনুভব	(কবিতা)	—শ্রীআশিস সান্যাল
১৬৯	সারিক-বংশ		—শ্রীঅজয় হোম
১৭৫	পৃথিবীর বয়স	(বড় গল্প)	—শ্রীমিহির আচার্য
১৮১	ল্যাংস্টন হিউজ		—শ্রীগণেশ বসু
১৮৩	সাহিত্য ও সংস্কৃতি		
১৮৪	বিমল মিত্র ও বাঙলা উপন্যাসের ক্রান্তিকাল		—শ্রীকৌটিল্য সান্যাল
১৯১	সূর্য কাঁদলে সোনা	(উপন্যাস)	—শ্রীপ্রেমেন্দ্র মিত্র
১৯৫	দেশেবিদেশে		
১৯৬	ব্যঙ্গচিত্র		—শ্রীকাফী খাঁ
১৯৬	বৈষয়িক প্রসঙ্গ		
১৯৮	প্রেক্ষাগৃহ		
২০৭	গানের জলসা		
২০৮	খেলাধুলা		—শ্রীদর্শক
২১০	লর্ডসে স্মরণীয় টেস্ট ক্রিকেট		—শ্রীক্ষেত্রনাথ রায়
২১২	ফুটবলের শ্রেষ্ঠাংশে		—শ্রীবিপুল বন্দ্যোপাধ্যায়
২১৪	মোটর দৌড়ের বিভীষিকা		—শ্রীতপন বাগচী
২১৭	আধুনিক	(উপন্যাস)	—শ্রীবিভূতিভূষণ মুখোপাধ্যায়
২২১	অংগনা		—শ্রীপ্রমীলা
২২৩	গৌরাঙ্গ-পরিজন		—শ্রীঅচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্ত
২২৫	আমার কাজ আমার দেশ		—শ্রীসুধীরচন্দ্র সরকার
২২৭	পারমাণবিক শক্তি		—শ্রীরঞ্জিত বন্দ্যোপাধ্যায়
২৩৫	রেখাচিত্র		—শ্রীপুলকেশ দে সরকার
২৩৭	পুরণো পাতা : যুদ্ধ ও সন্ধি		—সুরেন্দ্রনাথ মজুমদার
২৩৯	জানাতে পারেন		

প্রচ্ছদ : শ্রীস্বপন রায়

শ্রীসত্যজিৎ রায়ের 'ম্যাগসেসে' পুরস্কার লাভ

প্রখ্যাত চিত্র-পরিচালক শ্রীযুক্ত সত্যজিৎ রায় মহাশয়ের 'ম্যাগসেসে' পুরস্কার লাভের সংবাদে অতীব আনন্দিত হয়েছি। তাঁর মত অসাধারণ প্রতিভাশালী ব্যক্তিকে এই পুরস্কার দেওয়া সত্যিই যথোপযুক্ত এবং সুবিবেচিত হয়েছে। এ জন্য আমি "ম্যাগসেসে ফাউণ্ডেশন সংস্থাকে" অসংখ্য ধন্যবাদ জানাই। যদিও শ্রীরায়ের নিকট এরূপ আন্তর্জাতিক পুরস্কার লাভ এই প্রথম নয় তবুও বলব এই পুরস্কারের গুরুত্ব যথেষ্ট। এই পুরস্কার তাঁর কোন একটি বিশেষ শিল্প-কর্মের স্বীকৃতিস্বরূপ নয় বা কোন একটি বিশেষ কার্যের কৃতিত্বের জন্য নয়—এ তাঁর মহান শিল্পকৃতির তথা সাহিত্য ও শিল্পের মাধ্যমে মানবতাবোধ-এর জন্য।

তাঁর এই সম্মানের জন্য শুধু আমি কেন, সমগ্র বাঙালী জাতি তথা সমগ্র ভারতবাসীই আজ গৌরবান্বিত। বিশেষ করে বাঙালীরা আজ তাঁর জন্য খুবই গর্বিত। তাঁর এই পুরস্কার লাভ আর একবার প্রমাণ করে দিল যে, বাঙালীরা আজও মরে নি। বরং একের পর এক তাঁরা আবার তাঁদের অতীত গৌরব এবং বিশ্বের মধ্যে নিজেদের আসন পুনরুদ্ধার করে চলেছেন।

আমাদের সুপরিচিত এবং আপনজন শ্রীযুক্ত রায়কে তাঁর এই সম্মান লাভের অবসরে অকুণ্ঠ অভিনন্দন জানাই এবং ভবিষ্যতে তাঁর আরও উন্নতি ও সফলতা কামনা করি।

শংকরপ্রসাদ চৌধুরী
ঝরিয়া, বিহার

মারণাস্ত্রের ব্যবসা

১৮ই শ্রাবণ '৭৪ অমৃতে প্রকাশিত শ্রীযুক্ত সত্যব্রত দে মহাশয়ের উক্ত প্রবন্ধটি পাঠ করে মারণাস্ত্রের ব্যবসাদার মিঃ স্যামুয়েল কামিংস সম্বন্ধে অনেক তথ্যই জানতে পারলাম। লেখককে এই জন্য ধন্যবাদ জানাচ্ছি। ইয়োরোপ-আমেরিকা অস্ত্রজগতের একচ্ছত্র সম্রাট হলেও মিঃ কামিংসের ব্যক্তিগত জীবনের যে ছবি লেখক তুলে ধরেছেন তাতে আমি কিন্তু উক্ত ব্যবসায়ীটিকে বিস্ময় বা বিভীষিকা বলে ভাবতে পারছি না। কারণ ব্যক্তিগতভাবে তিনি দেখছি যুদ্ধের বিরোধী। ব্যবসার কাছে শত্রু-মিত্র ভেদাভেদ নেই এই নীতির উপর ভিত্তি করেই তিনি ও তাঁর সংস্থা জোগান দিচ্ছে মারণাস্ত্র। ঠিক এই দিক দিয়ে বিচার করলে মিঃ কামিংসের উক্তিটি—রাস্তায় মোটর দুর্ঘটনার মৃত্যুর জন্য মোটরপ্রস্তুতকারক যতটা দায়ী, তার চাইতে বেশী কিছু দায়ী মনে হয় না এই নরঘাতী ব্যবসায়ে—খুবই স্পষ্ট। আসলে প্রত্যক্ষে অস্ত্র ছাড়াও পরোক্ষে মানুষ হত্যার ব্যবসায় লিপ্ত হয়ে বিপুল অর্থ সম্পদের মালিকানা কি আরো অনেকেই অর্জন করেন নি?

এ ছাড়াও যাদের কাছে বুলেটের দাম বাটারের চাইতেও বেশী, এবং যারা মনে করে গান-ব্যারেলের মুখের থেকেই শান্তির বাণী উচ্চারণ সম্ভব—তাঁরা অবশ্য চিরদিনই চাইবে নতুন নতুন মারণাস্ত্রের আবিষ্কার ও প্রয়োগে বিরুদ্ধবাদীদের ঘায়েল করতে। যতদিন এই মতবাদের লড়াই আছে, ততো দিন অস্ত্র প্রতিযোগিতাও সমান তালে চলবে। আর এটা তো ঠিকই কথা যে, কবে, কখন আর কোথায় যুদ্ধের দাবানল জ্বলে ওঠে তার যখন কোন ঠিক নেই তখন এই আজকের অস্ত্রব্যবসায়ীর অস্ত্রই যে বুমেরাং হয়ে তাঁকে এবং তাঁর দলবলকেই আঘাত হানবে না সেই নিশ্চয়তাই বা কোথায়?

এ কথাটা তাই আজকে আর মিঃ কামিংসের উদ্দেশ্যে নয়, যারা নিজেদের ব্যক্তিগত সুখ-স্বাচ্ছন্দ্যের জন্য একমাত্র ব্যবসায়িক স্বার্থে এবং নিতান্ত রাজনৈতিক দাবা খেলায় মত্ত হয়ে প্রত্যক্ষে ও পরোক্ষে অসংখ্য মৃত্যুর কারণ হচ্ছে তাদের ক্ষেত্রেও সমান প্রযোজ্য। স্যাম কামিংসের মত এরাও কী মানুষের কাছে বিস্ময় ও বিভীষিকা নয়?

চিত্তরঞ্জন কর্মকার
কলকাতা—৩২

আমারে এ আঁধারে প্রসংগে

(১)

'অমৃত' পত্রিকায় ধারাবাহিক প্রকাশিত শ্রীকল্যাণকুমার বসুর রচনা কবি অতুলপ্রসাদের জীবনী 'আমারে এ আঁধারে' নিয়মিত পাঠ করে শেষ করলাম। লেখকের রচনানৈপুণ্যে কবির জীবনী এতদূর আকর্ষণীয় হয়েছে যে, এজন্য লেখককে স্বতঃস্ফূর্ত ধন্যবাদ জানিয়ে অকুণ্ঠিত চিত্তে বলতে পারি তাঁর লেখা কবিজীবনী 'আমার এ আঁধারে' বঙ্গ সাহিত্যে স্থায়ী আসন লাভ করবে। আমরা এতদিন অতুলপ্রসাদকে প্রথম শ্রেণীর একজন ব্যারিস্টার ও প্রখ্যাত গীতি-রচয়িতা কবি বলেই জানতাম, কিন্তু কল্যাণবাবু তাঁর লেখায় যেরূপ কবি অতুলপ্রসাদের স্বদেশপ্রীতি, মানবিকতাবোধ, কর্তব্যনিষ্ঠা ও নিরহংকার চরিত্রের বিভিন্ন দিক যেভাবে বিশ্লেষণ করে আমাদের দেখিয়েছেন তাতে অতুলপ্রসাদের চরিত্র স্বমহিমায় উজ্জ্বল হয়ে উঠেছে। কল্যাণবাবু কবি-জীবনের শেষ অধ্যায়ে অতুলপ্রসাদের অভিভাষণ প্রসংগে এক জায়গায় লিখেছেন—"হাফিজের অনেক কবিতা ঈশ্বরচন্দ্র অনুবাদ করেছেন অথবা তা অবলম্বন করে কবিতা লিখেছেন। 'কাঁটা হেরি ক্ষান্ত ক্ষান্ত কেন .কমল তুলিতে, দুঃখ বিনা সুখ লাভ হয় কি মহীতে' ওঁরি তর্জমা অথচ একথা দুটি সকল বাঙালীর কণ্ঠেই শুনতে পাওয়া যায়।" এখানে একটু ভুল আছে। একথা দুটি সেনহাটী নিবাসী কবিবর কৃষ্ণচন্দ্র মজুমদারের রচনা। তাঁর অমর কাব্যগ্রন্থ 'সদ্ভাব শতকে' এ কবিতা সন্নিবিষ্ট আছে। লেখকের এবং পাঠকদের অবগতির জন্য একথা উত্থাপন করলাম।

অমিয়কুমার সেন
জননগরী, আগরপাড়া

(২)

'আমারে এ আঁধারে' শিরোনামায় কবি অতুলপ্রসাদের জীবন-বৃত্তান্ত পাঠকসমাজে এমন সুন্দরভাবে পরিবেশন করার জন্য লেখক শ্রীকল্যাণকুমার বসু মহাশয়কে আমার আন্তরিক অভিনন্দন জানাই। আমাদের মত অনেকে অতুলপ্রসাদকে শুধু গীতিকার, সুরকার বলেই জানতেন। যদিও গীতিরচনা ও সুরসংযোজনা তাঁর প্রসিদ্ধির কেন্দ্রশক্তি তথাপি তাঁর ব্যক্তিত্বের অপর দিকগুলো যে সমভাবেই আকর্ষণীয় এ কথা অজানা থেকে যেতো বর্তমান লেখক না লিখলে।

এই রচনায় অতুলপ্রসাদের বিদ্যানুশীলন, ন্যায়-নিষ্ঠা, স্বজন-বাৎসল্য, সংগঠনশীলতা, স্বদেশপ্রীতি, মানবপ্রীতি, সংবেদনশীলতা এবং সর্বোপরি সৌন্দর্যানুরাগী স্বতঃস্ফূর্ত কবি-মনের পরিচয় পেলাম। কবি প্রবাসে মানুষের হৃদয় জয় করে বাঙালী হিসাবে বাংলার গৌরব বৃদ্ধি করেছেন। চায়নাগের "হেমন্ত নিবাস" সেই গৌরব স্মৃতিকে অক্ষয় করে রাখবে।

লেখকের লক্ষ্য ছিল কবির কথা বলা। কিন্তু পার্শ্ব-পরিজন চরিত্রের মাধ্যমেও বহু কথা অজ্ঞাতসারে বলা হয়েছে।

আজ পাঠকমন কবির প্রতি সহানুভূতিশীল, লেখকের সাফল্য এইখানে। কবির উদ্দেশ্যে আমার প্রণাম জানাই।

মনতোষ বিশ্বাস
লণ্ডন।

(৩)

"অমৃত" পত্রিকায় শ্রীকল্যাণকুমার বসু রচিত "আমারে এ আঁধারে" শীর্ষক রচনাটিতে শ্রীঅতুলপ্রসাদের যে জীবনী ধারাবাহিকভাবে সম্প্রতি প্রকাশিত হয়েছে তাতে একস্থানে উল্লিখিত আছে যে বিদেশে শ্রীঅতুলপ্রসাদের দুই যমজ পুত্র জন্মালে, তিনি ও তাঁর স্ত্রী শ্রীমতী হেমকুসুমদেবী পুত্রদ্বয়ের নাম ছন্দ মিলিয়ে রাখলেন দিলীপকুমার সেন ও নিলীপকুমার সেন, পরবর্তী বহু সংখ্যায় শ্রীদিলীপকুমার সেনের উল্লেখ আছে কিন্তু শ্রীনিলীপ-কুমারের আর কোথাও উল্লেখ নেই। শ্রীনিলীপকুমার সেন সম্বন্ধে কিছু জানার জন্য আমি অত্যন্ত কৌতূহলী। এ বিষয়ে জানতে পারলে উপকৃত হবো।

নীলিমা সোম
এলাহাবাদ

অমৃত

স্বাধীনতার বিশ বৎসর ঃ

এ সপ্তাহে ভারতের স্বাধীনতালাভের বিংশতি বার্ষিক উৎসব উদযাপিত হয়েছে। ১৫ আগস্ট ১৯৪৭ সাল ভারতের ইতিহাসে একটি স্মরণীয় দিন। বহু আত্মত্যাগের বিনিময়ে অর্জিত এই স্বাধীনতার জন্য দেশবাসীর গর্বের অন্ত নেই। 'জগৎসভায় ভারত আবার শ্রেষ্ঠ আসন লবে' বাংলা দেশের কবি এই গান গেয়ে নিদ্রিত জাতির ঘুম ভাঙাতে চেয়েছিলেন। স্বাধীনতার জন্য প্রথম সচেতন আকাঙ্ক্ষা বাংলা দেশের সাহিত্যে, শিল্পে ও সাংবাদিকতায় আত্মপ্রকাশ করেছিল ঊনবিংশ শতাব্দীর গোড়ার দিকেই যখন ভারতের অন্যান্য প্রান্তে সেই চেতনা ছিল সুপ্ত। তারপর দীর্ঘকাল ধরে চলেছে সেই চেতনাকে সারাভারতে ছড়িয়ে দেবার প্রচেষ্টা। বঙ্কিমচন্দ্র, দীনবন্ধু মিত্র, রবীন্দ্রনাথ ও তাঁদের সমসাময়িক সাহিত্যিক ও দ্রষ্টাগণ সুস্পষ্টভাষায় পরশাসিত ভারতবর্ষের বেদনাকে রূপ দিয়েছিলেন। বাঙলার বুদ্ধিজীবীরা সেই প্রেরণায় উদ্বুদ্ধ হয়ে ঝাঁপিয়ে পড়েছিলেন স্বাধীনতার সংগ্রামে।

স্বাধীনতা উৎসবের দিনে আমাদের প্রথম কর্তব্য সেই মৃত্যুঞ্জয়ী শহীদদের স্মরণ করা। কী মূল্যে দিয়ে আমরা স্বাধীনতা অর্জন করেছি, এই লক্ষ্যে উপনীত হবার জন্য কত প্রাণ বিসর্জিত হয়েছে এ যুগের ও আগামী যুগের দেশবাসীদের কাছে সেই সত্য যেন চিরজাগ্রত থাকে। স্বাধীনতাকে প্রাণ দিয়ে রক্ষা করার সংকল্প তখনি সুদৃঢ় হবে যখন আমাদের দেশবাসীর চোখের সামনে উজ্জ্বল হয়ে থাকবে অতীতের সেই আত্মদানের রক্তরাঙা ইতিহাস। পূর্বসূরীদের প্রতি প্রণিপাত জানিয়েই শুরু হয় আগামী দিনের যাত্রা। স্বাধীনতার বার্ষিকী উৎসবে আমাদের বিনম্র শ্রদ্ধাজ্ঞাপন করি তাঁদের প্রতি যাঁদের আত্মত্যাগের বিনিময়ে আমরা স্বাধীন জাতি হিসাবে জগৎসভায় হৃতমর্যাদা পুনরুদ্ধার করতে সক্ষম হয়েছি।

এই বিশ বৎসরের মধ্যে জাতির মহান নেতাদের অনেকেই অন্তর্হিত হয়েছেন। নতুন প্রজন্মের নেতারা এগিয়ে এসেছেন রাষ্ট্র-তরণীর হাল ধরার জন্য। বেদনার সঙ্গে বলতে হয়, যে-আশা ও আকাঙ্ক্ষা নিয়ে স্বাধীনতা দিবসের প্রথম সূর্যোদয় হয়েছিল, আজ তার আলো অনেকখানি স্তিমিত। জওহরলাল নেহরুর নেতৃত্বে দেশে রাজনৈতিক স্থায়িত্ব এসেছিল। উন্নয়ন পরিকল্পনার মাধ্যমে তিনি দেশের অর্থনৈতিক অগ্রগতির ভিত্তি স্থাপন করে গেছেন। নানাদিকে অগ্রগতির সূচনাও হয়েছিল। কিন্তু তাঁর মৃত্যুর পর নানাবিধ সমস্যা আবার মাথা চাড়া দিয়ে উঠেছে। এই সমস্যাগুলো তিনি সমাধান করে যেতে পারেন নি। কিন্তু তাঁর বিরাট ব্যক্তিত্ব ও অকপট দেশপ্রেমের আলোকে এতদিন সমস্তকিছুই উদ্ভাসিত ছিল। আজ সেই আলোক অপসারিত হবার ফলে হতাশার অন্ধকার যেন বড় বেশি ঘন হয়ে দেখা দিয়েছে।

এই বিশ বৎসরে গণতান্ত্রিক পরীক্ষায় ভারত সার্থকভাবে উত্তীর্ণ হয়েছে। আজ কেন্দ্রে ও রাজ্যসমূহে বিভিন্ন দলীয় শাসন প্রবর্তিত। তা সত্ত্বেও দেশের ঐক্য নষ্ট হয়নি। শাসনকার্যেও কোন বিশৃঙ্খলা দেখা দেয় নি। কিন্তু সবচেয়ে সঙ্কট দেখা দিয়েছে অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে। সারা দেশে দেখা দিয়েছে বৈষয়িক মন্দা। উন্নয়ন পরিকল্পনাসমূহ প্রত্যাশিত সম্পদ উৎপাদন করতে পারে নি। যে-সম্পদ উৎপন্ন হয়েছে তার বন্টনও সুষম হয় নি। বৃষ্টি-নির্ভর কৃষিকর্ম খরার আক্রমণে বানচাল হয়ে গেছে। জনসংখ্যা বৃদ্ধির সঙ্গে তাল দিয়ে কর্মসংস্থান ও খাদ্য পরিমাণ না বাড়াতে পারায় সমাজে দেখা দিয়েছে এক অস্থিরতা। এইগুলিই এবারের স্বাধীনতা দিবসের উৎসবকে ভারাক্রান্ত করে রেখেছিল। অবশ্য প্রত্যেক জাতির জীবনেই কোন না কোন সময়ে এই ধরনের সংকট আসে। তাকে উত্তীর্ণ হয়ে যেতে হয় সামনের দিকে। আমাদের এই বিশ্বাস আছে যে, বর্তমান সঙ্কট সাময়িক। দুঃখের দিনে সকলে সমভাগী হয়ে বাস করতে জানলে দুঃখ জয় করা যায়। সমষ্টিগতভাবে সেই কর্তব্য আমরা যাতে পালন করতে পারি সেদিকে নেতাদের দৃষ্টি দেওয়া কর্তব্য।

বৈদেশিক ক্ষেত্রে আমাদের মিত্র যেমন আছে বৈরীভাবাপন্ন রাষ্ট্রও তেমনি আছে। কিন্তু ভারতবর্ষ এই দিক থেকে সৌভাগ্যবান যে, পৃথিবীর অধিকাংশ দেশ তার প্রতি মৈত্রী ও সহযোগিতার হাত প্রসারিত করে দিয়েছে। আমাদের খাদ্যসঙ্কটের দিনেও সাহায্য ও সহযোগিতা থেকে আমরা বঞ্চিত হই নি। কিন্তু স্বাধীনতা রক্ষার একমাত্র উপায় সর্ববিষয়ে আত্মনির্ভরশীলতা অর্জন। বিশেষত খাদ্য ও প্রতিরক্ষা বিষয়ে স্বনির্ভরশীলতা না থাকলে স্বাধীনতা যে কোন সময়ে বিপন্ন হতে পারে। বার বার ঘা খেয়ে এই চেতনা আমাদের হয়েছে যে, নিজের শক্তিই আসল শক্তি। এর জন্য প্রয়োজন দেশের আভ্যন্তর সমস্যার সমাধান করে সামাজিক শান্তি ও শৃঙ্খলা প্রতিষ্ঠা করা। অসন্তোষ ও অশান্তি থাকলে এত বড় দেশের খাদ্য সমস্যার ও প্রতিরক্ষা সমস্যার স্বনির্ভরশীল হওয়া অসম্ভব। স্বাধীনতা রক্ষা করতে হলে জাতীয় ঐক্য যেমন প্রয়োজন, সেই ঐক্যকে সুদৃঢ় করতে হলে সামাজিক ন্যায়বিচার ও অর্থনৈতিক উন্নয়নও তেমনি ত্বরান্বিত করা দরকার। বিশ বৎসর পরেও এই কথাগুলি দেশনেতাদের স্মরণ করিয়ে দিতে হচ্ছে, এটা দুঃখের। স্বাধীনতা ও গণতন্ত্রের কোন বিকল্প নেই বলেই একে রক্ষা করার জন্য আমাদের সদাসতর্ক থাকতে হবে।

রবীন্দ্রনাথের জন্মদিনে

অশোক মিত্র

রবীন্দ্রনাথের সম্বন্ধে আমরা যখনই চিন্তা করি, আলোচনা করি, সর্বপ্রথমই আমরা স্মরণ করি তাঁর কাব্য, উপন্যাস, ছোটগল্প, ছবি, নাটক, পত্রাবলী দার্শনিক প্রবন্ধাবলীর। এবং সচরাচর সেখানেই আমাদের আলোচনা শেষ হয়। কচিৎ আমরা আলোচনা করি তাঁর বিরাট স্বচ্ছন্দাশ্রয়ী, আক্রমণাত্মক রচনাবলীর,—বিরাট প্রবল, অক্ষয় স্রোতের মতো যা সারাজীবন ধরে তাঁর লেখনী বেয়ে প্রবাহিত হয়েছে। যাতে পাই প্রবলতম ক্রোধ, এমন কি বিদ্বেষ, ব্যথা, শ্লেষ, অসহিষ্ণুতা, দেশপ্রেম, জ্ঞান তৃষ্ণা, অস্থিরতা, আশা, নিরাশা, অবজ্ঞা, আঘাত। ভুলে যাই দীর্ঘ ষাট বছর ধরে এমন কোনও দৈনন্দিন, সামাজিক, রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক, রাষ্ট্রিক, ব্যবসায়িক সমস্যা তাঁর চোখ বা লেখনী এড়ায় নি, যার উপর তিনি তাঁর বিচারবুদ্ধি, সমবেদনা বা বিরাগ সম্যকভাবে প্রয়োগ করেন নি।

এই বিরাট রচনাবলীর নামাবলী শুধু যদি পড়ে যাই তা হলেই আমাদের স্বীকার করতে এক মুহূর্ত দেরি হবে না যে রবীন্দ্রনাথ হাতির দাঁতের মিনারে বাস করতেন এ ধারণা শুধু যে নিতান্ত মিথ্যা তা নয় আজকের দিনের লেখকের পক্ষে সে ধারণা আঁকড়ে বসে থাকা প্রবল আত্ম-বঞ্চনার সামিল। এই ধারণা বাংলাদেশের সর্বশ্রেষ্ঠ সন্তানের প্রতি নির্বোধ অবমাননা এবং আমাদের ক্লৈব্যের সাফাই মাত্র, কারণ রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর তাঁর দীর্ঘ জীবনে কোনও দিন মুহূর্তের জন্যে আমার এ কাজ নয়, আমার মাথা-ব্যথার প্রয়োজন নেই, বলে সাময়িক কোন সমস্যা থেকে মুখ ফিরিয়ে, হাত গুটিয়ে বসে থাকার কোন ছুতো খোঁজেন নি। কখনও অজুহাত দিয়ে বলেন নি আমার কাজ রচনা এবং সৃষ্টি, সমাজসংস্কার, আর্থিক উন্নতি, রাষ্ট্রিক স্বাধীনতা, বা শিক্ষার বিপ্লব নয়।

[একক ॥ বৈশাখ-জ্যৈষ্ঠ ॥ ১৩৭৪]

●

পশ্চিম বাঙলার পুতুল

আশীষ বসু

ভারতবর্ষের পুরোনো পুতুলগুলির নিদর্শন আমরা দেখেছি মহেঞ্জোদারো, হরপ্পা, কুল্লি, ঝোব প্রভৃতিতে। তেমনি পশ্চিম বাঙলাতেও বেড়াচাঁপা, তমলুক বা হরিনারায়ণপুরের পুরাবস্তুর মধ্যে আবিষ্কৃত পুতুলগুলির কথাও উল্লেখ না করে উপায় নেই। এগুলিও আপন স্বরূপে আপনি ধন্য। এগুলি বেশীর ভাগই আঙুলের চাপ দিয়ে গড়া পুতুল এবং এর জন্য কোনও ছাঁচ ব্যবহার করা হয় নি। পোড়ানো পুতুলই বেশী। এগুলির চোখ ও গায়ের অলংকার আলাদা করে তৈরী করে পরে জোড়া দেওয়া হয়েছে দেখা যায়। বাঁকুড়া জেলার পুস্করনা (বা পোখরনা) অঞ্চলে ছাঁচে তৈরী পুতুলও পাওয়া গিয়েছে এবং তা আনুমানিক শুঙ্গ রাজাদের আমলের তৈরী বলা হয়ে থাকে। এ-ছাড়াও দিনাজপুর জেলার বানগড় ও ২৪-পরগণার চন্দ্রকেতুগড়ে অনেক পুরোনো পুতুল পাওয়া গেছে। কালিদাসের অভিজ্ঞান-শকুন্তলমের একটি দৃশ্যে শকুন্তলার শিশুপুত্রের একটি মাটির তৈরী ময়ূর নিয়ে খেলা করবার দৃশ্য আছে। এ থেকেই মনে করা যেতে পারে যে পুতুলশিল্পটি কতো পুরাতন। খৃষ্টীয় প্রথম থেকে তৃতীয় শতাব্দী অবধি উত্তর ভারতের বিস্তৃত অঞ্চল জুড়ে ছিল কুষাণ সাম্রাজ্য। এই সাম্রাজ্যের প্রধান কেন্দ্র মথুরা এবং উত্তর ভারতের বারাণসী, শ্রাবস্তী, কৌশম্বী প্রভৃতি স্থানে প্রাপ্ত পুতুলগুলির সঙ্গে ঐ সময়কার বাঙলাদেশের পুতুলেরও যথেষ্ট সাদৃশ্য পাওয়া গেছে। পাল ও সেন রাজাদের আমলকে বাঙলার সুবর্ণ যোগ বলা যেতে পারে। এই সময়ে পুতুল বলে না মনে হলেও কয়েকটি বিশিষ্ট মূর্তি পাওয়া গেছে, বিশেষ করে সম্রাট ধর্মপালের সময়ের। এর মধ্যে কয়েকটি মূর্তি পাথরের।

দেব দেবীর মূর্তি এক সময়ে বেত ও বাঁশের সাহায্যে তৈরী হয়েছে, পরে ধাতুর আবিষ্কারের সঙ্গে সঙ্গে তার রূপান্তর ঘটেছে। এই প্রসঙ্গে পশ্চিম বাংলার ঢোকরা কামারদের কাজের কথা বলতে পারি। বর্ধমান জেলার ঘুসকরা-দরিয়াপুর, বাঁকুড়া জেলার নতুনচটি, মটগোদা ইত্যাদি অঞ্চলে ও মেদিনীপুরের কয়েকটি জায়গাতেও এই জাতীয় ঢোকরা কামারদের বাস আছে বলে শুনেছি। ঘুষকরা ও নতুনচটির কাজ বাজারে পাওয়া যায়। পৃথিবীর প্রাচীনতম ঢালাই পদ্ধতি Cire-Perder casting বা মোম গলানো পিতলের ঢালাই কাজ এই ঢোকরা কাজের সমগোত্রীয়।

[গ্রামীণ ॥ পঞ্চম বর্ষ ঃ চতুর্থ সংখ্যা]

কাব্যের স্বরূপ

প্রবাসজীবন চৌধুরী

কাব্যের স্বরূপনির্ণয়ে অনেকে কাব্যের শব্দপ্রয়োগ কৌশলকে আশ্রয় করেছেন। ধ্বনিবাদীরা যেমন ধ্বনিকার আনন্দবর্ধন মনে করেন যে শব্দ এমন রূপে কাব্যে প্রয়োগ করা হয় যে তাদের বাচ্যার্থের মধ্য দিয়ে এবং তাকে ছাড়িয়ে একটি ব্যঞ্জনার্থ প্রকাশিত হয়, যা কাব্যের প্রধান অর্থ হয়ে চিত্তকে একটি চমৎকারিতার আস্বাদ দেয়। শরীরের লাবণ্য যেমন শরীরের অবয়ব দ্বারাই প্রকাশিত হয়েও, তা শরীরকে অতিক্রম করে একটি স্বতন্ত্র ভাববস্তুরূপে প্রতিভাত হয় কাব্যের ধ্বনিকে সেইভাবেই বুঝতে হবে। এখন এই চমৎকারিত্বের মূলে আছে শব্দের এইরূপ ব্যঞ্জনাশক্তি, বিশুদ্ধ ধ্বনিবাদ তাই বলে। কিন্তু আনন্দ-বর্ধন নিজেই স্বীকার করেছেন যে, ধ্বনিত অর্থ তিন প্রকার—বস্তুমাত্র, অলংকার এবং রসাদি এবং এদের মধ্যে রসধ্বনিই শ্রেষ্ঠ—কাব্যের পরমার্থ। এখন কাব্যের এই ভালো-মন্দের বিচার যদি কেবল ধ্বনির ভালো-মন্দের বিচারে না হয়ে অন্যকিছুর সাহায্যে হয় তা হলেই ধ্বনিকে আর 'কাব্যের আত্মা' বলা যায় না। সুতরাং ধ্বনিকার তাঁর 'কাব্যস্যাত্মা ধ্বনি-রীতি' সূত্রের যথার্থ মূল্য দেন নি। বাস্তবিক বিচারেও দেখা যায় যে যদিও ভাবকে রসে উন্নীত করতে হলে—অর্থাৎ কাব্যানন্দের উপযোগীরূপে প্রকাশ করতে হলে—শব্দের বাচ্যার্থের চেয়ে তাদের ব্যঞ্জনার্থেরই বেশি সাহায্য নিতে হয় তবুও এই রসই সেই কাব্যানন্দের স্বরূপ, শব্দের ব্যঞ্জনা ব্যাপারটি নয়। ব্যঞ্জনা ব্যাপার একটি বিশেষ ধরণের আনন্দ দেয় বটে তবে তা কাব্যানন্দের সমগোত্রীয় হয় না এবং এই আনন্দ অনেক রচনায় থাকলেও তা যথার্থ কাব্য বলে বিবেচিত হয় না বরং কেবল শব্দপ্রয়োগের কৌশল হিসাবেই প্রশংসা লাভ করে থাকে। যেখানে কোনো ভাবের প্রকাশ মুখ্য নয়—বরং কোনো বক্তব্য বিষয়, সংবাদ বা আদেশ প্রদানই মুখ্য—সেখানে রচনা কাব্যপদবাচ্য নয়। ...কাব্য আমোদ বা কলা-কৌশলের ব্যাপার নয়, বরং গভীর অনুভূতি ও রসোপলব্ধির বস্তু—যার দ্বারা রসিক-চিত্ত ভাবের সত্য-রূপটিকে এবং সেই সঙ্গে আপন চৈতন্য-স্বরূপকে আস্বাদ করে। গভীর রসসৃষ্টি সম্ভব হয় শব্দের ধ্বনির মাধ্যমেই। কারণ কোনো ভাবকে পরিস্ফুট করতে হলে শুধু তার উল্লেখে কোনো কাজ হয় না, তাকে তার অন্তর্গত সঞ্চারী ভাব ও উপযুক্ত বিভাব ও অনুভাব সাহায্যে প্রকাশ করতে হবে এবং এখানে শব্দার্থ দ্বারা কেবল সেই সকল বস্তু ও ভাবগুলিরই প্রকাশ সম্ভব—যারা কাব্যের সেই মুখ্য বা স্থায়ী ভাবটিকে জাগরিত করে এবং প্রাণপূর্ণ করে তোলে। যথা, শৃঙ্গার রসের বেলায় শব্দার্থ দ্বারা কোনো নায়ক বা নায়িকার সাধ-বাসনা আশা-নিরাশা হর্ষ-বিষাদ আকাঙ্ক্ষা-বিতৃষ্ণা প্রভৃতি সঞ্চারী ভাবগুলিকে প্রকাশ করা যায় কিছু এগুলির নাম নিয়ে আর কিছু স্থলে

কাল ও নায়ক-নায়িকার পরিপার্শ্বিক অনুষঙ্গের হাব-ভাব হাস্য-লাস্য ও অশ্রু-বর্ষণ প্রভৃতির বর্ণনা দিয়ে—যা ঐ ভাব-গুলিরই দ্যোতক। সুতরাং শব্দের ধ্বনি রস-সৃষ্টির পক্ষে অত্যাবশ্যক। কিন্তু তাই বলে ধ্বনিকে কাব্যের আত্মা বললে ভুল হয়, কারণ রসই কাব্যের আত্মা এবং ধ্বনি তার কায়া মাত্র। ধ্বনি যদি রসসৃষ্টির উপায় না হয়ে অন্য কাজে ব্যবহৃত হয় তাহলে সে রচনা কাব্য হয় না—কুশল রচনার নিদর্শন হিসাবেই গণ্য হয়।

[বিশ্বভারতী পত্রিকা ॥ বৈশাখ-আষাঢ় ১৩৭৪]

●

সতীদাহ

সুধাকর চট্টোপাধ্যায়

দার্শনিকরা একটা কথা প্রায়ই বলে থাকেন। প্রকৃতির নিয়ম হল, খারাপ জিনিস কিছুদিন অবধি টিকে থাকে, তারপর তাকে বিদায় নিতে হয়। আইনের ক্ষেত্রে সতীদাহকে বিদায় নিতে হল লর্ড উইলিয়াম বেনটিক-এর সময়ে। ৪ঠা ডিসেম্বর ১৮২৯ সালের ১৭নং আইনধারা (রেগুলেশন) মারফৎ সতীদাহ আইনতঃ অসিদ্ধ বলে ঘোষণা করা হল। পন্ডিতরা কিন্তু এর পূর্বে ঐ প্রচেষ্টাকে বানচাল করবার অনেক চেষ্টাই করেছিলেন। তাঁরা ঋগ্বেদের একটি শ্লোককে বিকৃত করে "অগ্রে" শব্দটির জায়গায় "অগ্নে" শব্দটি বসিয়ে দেখাবার চেষ্টা করলেন যে এ প্রথা বেদ সমর্থিত। বিদেশী শাসকের এতে হাত দেওয়ার কোনও অধিকার নেই। যাই হোক, সব ঝুঁকি মাথায় নিয়ে সরকার এ আইন পাশ করলেন। পরে অনুরূপ আইন বোম্বাই এবং মাদ্রাজ প্রেসিডেন্সিতে পাশ করা হয়। আইনের দিক দিয়ে অন্ততঃ বৃটিশরাজ আমাদের পরাধীনতার নাগপাশে বাঁধলেও কুসংস্কারের নাগপাশ থেকে মুক্ত করবার প্রয়াসী হয়েছিলেন। এই প্রথা কি ভয়াবহ আকার ধারণ করেছিল তা আমরা বুঝি যখন দেখি যে ১৮১৮ সালে তদানীন্তন বাংলাদেশে (অর্থাৎ বাংলা, বিহার, উড়িষ্যা এবং উত্তর বিহারের খানিকটা) ৮৩৯ জন সতী হয়েছিলেন। সবাই কি এঁরা স্ব-ইচ্ছায় চিতায় আরোহণ করেছিলেন?

যাই হোক, গোঁড়া সমাজবাদীরা এই আইনের বিরুদ্ধে প্রিভি-কাউন্সিল-এ দরখাস্ত পাঠান। একটা জিনিস লক্ষ্য করতে হবে যে এই দরখাস্তে অতিকষ্টে তাঁরা মাত্র ৮০০টি সই জোগাড় করতে পেরে-ছিলেন। এথেকেই বোঝা যাচ্ছে যে সাধারণ মানুষ এ প্রথার বিরুদ্ধে ছিলেন। প্রথাটিকে জাগিয়ে রেখেছিলেন মুষ্টিমেয় কয়েকজন। রাজা রামমোহন রায় ইংলন্ডে গিয়ে কাউন্সিল-এর সামনে ঐ আইনের স্বপক্ষে তাঁর যুক্তি পেশ করেন। দরখাস্তগুলি নাকচ হয়ে যায়। কিন্তু এর পরেও নেটিভ স্টেটগুলিতে বিশেষ করে রাজস্থানে এ প্রথা কিছুটা চলতে থাকে। ক্রমে ক্রমে বৃটিশ সরকার দেশীয় রাজাদের উপর প্রভাব বিস্তার করেন এবং ধীরে ধীরে এ প্রথার অবসান হয়।

ধর্মীয় সংস্কারের মধ্যে একটা মাদকতা আছে। মুখে আমরা যতই যুক্তিতর্ক দিই, মনে মনে বিশ্বাস করি যে আমাদের স্বর্গের চাবিকাঠি এখানেই। শিক্ষিতরাও ভবিষ্যৎ উন্নতির আশায় পুজো ইত্যাদি দিয়ে থাকেন, যদিও মুখে বলেন যে এটা কুসংস্কার ছাড়া আর কিছু নয়। এদিকে তাকালে দেখব আমাদের মধ্যে সবসময়ে দুটি মানুষ কাজ করছে। একদিকে তাই গোঁড়ারা সাংখ্য-বেদান্তের বুলি আউড়েছেন, অন্য-দিকে স্মৃতির জঞ্জাল বুকে চেপে ধরেছেন। কুমারিলভট্টের লেখা পড়লে বোঝা যায় যে তিনি কত পন্ডিত, কত উদার এবং আবার কত গোঁড়া। এখনও আইন ফাঁকি দিয়ে দু'এক জায়গায় সতীদাহ হয়। হবেই, এ রোধ করা যাবে না। ভবিষ্যতের দিকে আমরা চেয়ে থাকব ধর্মের ক্ষেত্রে কুসংস্কার উৎপাটনের জন্য। কারণ, এখনও আমরা সংস্কারের দাস, প্রায়ই পাঁজিটা খুলে দেখি।

[চতুষ্কোণ ।। জ্যৈষ্ঠ ১৩৭৪]

পোস্টমর্টেম ॥ অরুণ ভট্টাচার্য

তার শরীরটাকে পোস্টমর্টেম করা হোল।

চিতায় তোলবার আগে আমি পাগলের মত
চিৎকার করে উঠলুম:
আমাকে ওর দেহটা ফিরিয়ে দাও।
আগুনের শিখা হাওয়ায় হাওয়ায়
বিদ্রূপ করে উঠলো।

স্বপ্ন দেখলুম, সার্জন আমাকে
বাঁ চোখের মণিটা উপহার দিয়েছেন
আর ডান হাতের তর্জনী।

আমি শ্মশানের নীচে গঙ্গার জলে
পা ডুবিয়ে বসে থাকলুম
শুকতারাকে একলা দেখবো বলে।

অনুভব ॥ আশিস সান্যাল

একই পৃথিবীতে আজও বেঁচে আছি আমরা দুজনে,
অথচ তোমার মুখ নির্ভয়ে দেখি না;
রোজ রাতে তারা ফোটে। সজনে ফুলের গন্ধে সমস্ত প্রান্তর
প্রত্যাশায় জেগে ওঠে। তোমার প্রতিমা
উজ্জ্বল বর্ষণ ছুঁয়ে কেন তবে হেঁটে যায় দূর অন্ধকারে?
একবার নিভে গেলে কে তাকে আবার
প্রণয়ে জ্বালাতে চায়? অথবা প্রণয়
কাছে পেয়ে হারাবার মতো এক স্নিগ্ধতায়
চিরজীবী তোমার মহিমা।

এ কোন দুর্লভ স্মৃতি? প্রতিদিন পেয়ে হারাবার
বিষম এ কোন দৃশ্য? এ কোন আঁধারে
নির্মেঘ সাম্রাজ্য চেয়ে শুধুই তোমার
অবিরল প্রতিধ্বনি। যেদিকে তাকাই
ব্যাপক জলের শব্দ। জল শুধু জলের ভেতরে।
ভালোবাসা, কার নাম নেব?

একই পৃথিবীতে আজও বেঁচে আছি আমরা দুজনে।
অথচ তোমার থেকে বহুদূরে আমার মোহনা
নিরুপায় প্রবাহিত। তুমি কোন স্খলিত বিজনে
দ্বিধাহীন জেগে আছো। বুকের মাধুরী
ভোরের বৃষ্টির মতো উন্মোচিত। হে প্রথম দৈবত নীলিমা—
একই পৃথিবীতে আজও বেঁচে আছি আমরা দুজনে
অথচ তোমার মুখ নির্ভয়ে দেখি না।

সারিক-বংশ

শালিক

একটু অন্যমনস্ক হয়ে তাকিয়ে আছি জানলার ভিতর দিয়ে বাইরে গাছপালার মাথা টপকে দিগন্তের দিকে। জানলার পাল্লায় এসে বসল একটা পাখি। লক্ষ্য করি নি তাকে। তাকিয়ে আছি দূরে। রেল লাইনের উপর দিয়ে চলেছে দ্রুতগতির ইলেক্ট্রিক ট্রেন। হয় কৃষ্ণনগর না হয় কল্যাণী লোকাল।

আর-একটি উড়ে এসে জানলায় বসতে তখন পাখি দুটোর দিকে নজর পড়ল। স্ত্রী-পুরুষ একই রকম দেখতে। অভিজ্ঞতা না থাকলে লিঙ্গভেদ করা সহজ নয়। বসার ভঙ্গিমায় হাবেভাবে ব্যক্তিত্বে কেবলমাত্র প্রকাশ পায় কে স্ত্রী কে পুরুষ। নচেৎ নয়। পরে যে এল সে হল স্ত্রী-পাখি।

পুরুষটির মেজাজ বেশ কড়া। সঙ্গিনীর আসতে দেরি হওয়ার জন্যে প্রচন্ড বকুনি শুরু করে দিল। কান ঝালাপালা হবার যোগাড়। স্পষ্ট শুনলাম পাখিটা যেন বলছে—ক্যাঁ—কট-কট ক্যাঁ-কট......পাপাঁচ মাঁপচ... কি খাস? কোথা যাস? পোকা খাস?

অজয় হোম

চ্যাঁপ চ্যাঁপ চ্যাঁপ (গা ফোলান)। তারপর মিষ্টিসুরে 'পিড়িং' বলে 'ফুরৎ' আওয়াজ (শুনলাম দূরে ছাই) করে উড়ে গেল। স্ত্রী-পাখিটি কিছুটা যেন লজ্জিত হয়ে বোকার মতো এদিক ওদিক বার দুই তাকিয়ে সঙ্গী যেদিকে উড়ে গেছে সেইদিকে ধাওয়া করল।

কাক চিল চড়াই-এর পর যদি আর কোনো পাখি মানুষের খুব কাছাকাছি গা-লাগোয়াভাবে বাস করে তা হল এই যষ্টিসাদি বা দন্ডচারী বর্গের অন্তর্গত সারিক-বংশের কলহপ্রিয়দের প্রজাতি 'শালিক' বা 'ভাট-শালিক'। হিন্দিতে—ময়না বা দেশী ময়না। ইংরেজী— Common Myna। ময়না বললেই যে পাখি আমাদের চোখে ভাসে ইংরাজি বা হিন্দিভাষীর কাছে তা হল এক বিশেষ ধরনের ময়না। শুধু 'ময়না' নয়।

শালিক লম্বায় ৯ ইঞ্চি। মাথা গলা এবং বুকের উপরের অংশ চকচকে কালো। বাকি পালক চকোলেট-পিঙ্গল। উপরের দিকে এই গাঢ় রঙ ক্রমে ফিকে হয়ে তলপেটে এসে হয়েছে সাদা। ওড়ার বড়ো পালকগুলি গাঢ় পাটকিলে কয়েকটার মাঝখান আবার সাদা। ওড়ার সময় পালকের এই সাদা অংশ খুব ভালো দেখা যায়। লেজ কালচে, ঈষৎ গোল-কার কিন্তু লেজের দুধারের গোটা কতক পালকের প্রান্ত সাদা। চোখের মণি বা কণীনিকা লালচে-পিঙ্গল, তার মাঝে সাদার ছোট-একটা ছিট। চঞ্চু, চোখের নিচে এবং পিছনে পালকহীন ত্বক উজ্জ্বল হলুদ। পা হলদে, নখরের রঙ শিঙের ন্যায়।

বাসস্থান—ভারত, দুই পাকিস্থান ও ব্রহ্ম-দেশ। ৮ থেকে ৯ হাজার ফিট উচ্চতার মধ্যে ভারতের অতি সাধারণ একটি পাখি। সিংহলে যে উপজাত দেখা যায় তার গায়ের

শালিক

রঙ আরও বেশি গাঢ়। দক্ষিণ আফ্রিকা, মরিশাস, নিউজিল্যান্ড প্রভৃতি দেশে শালিক চালান দেওয়া হয়েছিল খেতের পোকামাকড় ধ্বংস করার জন্যে। খবর পাওয়া যায় সেখান-কার আবহাওয়ায় নিজেদের খাপ খাইয়ে শস্য-খেতের কিছু উপকার করলেও সামগ্রিক ফল ভালো হয় নি। কলহপ্রিয় বলে স্থানীয় কয়েকটি বিভিন্ন জাতীয় দুষ্প্রাপ্য পাখির জীবনসংশয় করে অবলুপ্তির পথে ঠেলে দিয়েছে।

খাদ্য—কোনো বাছবিচার নেই। যা পায় তাই খায়। দেখা যায় রান্নাঘরের আবর্জনা অর্থাৎ আস্তাকুঁড় থেকেও খুঁটে খাচ্ছে আবার ফলপাকুড়, ধান-গম ইত্যাদি শস্য, সব রকমের কীটপতঙ্গ—ফড়িং ঝিঁঝিঁপোকা শুঁয়োপোকা—কিছুতেই আপত্তি নেই। এমনকি পচাধসা মাংসও। একেবারে 'সুবোধ বালক'। গরু-মহিষ যেখানে চরছে সেখানেও দেখা যায় গোটা কয়েক শালিক পায়ে পায়ে ঘুরছে দু একটা পোকা বা পতঙ্গ নজরে পড়লেই কপ্ করে ধরে খাচ্ছে।

যেখানে মানুষ সেখানেই শালিক। তা জনসমুদ্রের শহরেই হোক বা নির্জন জংলী গ্রামই হোক। হাজার ধৃষ্টতা বা সাহস দেখালেও পাতিকাকের তবু একটা বিবেকের পরিচয় পাওয়া যায়, তার অসৎ কর্মের জন্যে সে সদাই শঙ্কিত থাকে। কিন্তু শালিকের সেসবের বালাই নেই। সব কাজেই তার মধ্যে একটা আত্মবিশ্বাস ফুটে ওঠে। তার কাজের বিরুদ্ধে কেউ বাধা দিলে রুখে দাঁড়াতে বিন্দুমাত্র পিছপাও হয় না। সাপ নেউল বা বাজ জাতীয় পাখি দেখলে সে চত্বরে যত শালিক আছে সব একজোট হয়ে এমন চেঁচামেচি শুরু করে দেয় পাড়াপড়শির তখন জানতে বাকি থাকে না যে একটা কিছু অঘটন ঘটতে চলেছে। এরূপ সমবেত উচ্চ কলরবে জানান দেওয়ার ফলে বহু সাপ মানুষের হাতে প্রাণ হারিয়েছে।

সাধারণতঃ জোড়ায় বাস করে এবং পরস্পরের মধ্যে খুব ভাব বা সম্প্রীতি। এক-সঙ্গে পায়ে পা মিলিয়ে বা জোড় পায়ে লাফিয়ে চলছে, খুঁটে খাচ্ছে, মাঝে মাঝে পরস্পরের গা চুলকিয়ে দিয়ে আদর জানাচ্ছে। হাবেভাবে খুবই সন্তোষ ফুটে উঠছে নানা রকম মৃদু শব্দে বা কথোপকথনে। পর-মুহূর্তে দেখা যায় দুজনের মধ্যে লেগে গেছে তুলকালাম।

কর্কশ ও মিষ্টি দু' রকমই ডাক পরপর শোনা যায়—কীকি-কীকি-কীকি, চাররর্-চাররর্, রাড্রিয়ে। রাড্রেয়া, কোক্-কোক্-কোক্, প্রেইক্-প্রেইক্, টুই—টুই। ঝগড়ার সময় কতরকম যে আওয়াজ করে তার ঠিক নেই। মাথা নেড়ে, মাথা ঝাঁকিয়ে, মাথাটা সঙ্গী বা সঙ্গিনীর দিকে বাড়িয়ে দিয়ে বকে চলে। আবার দেখেছি, মাঠে বা বাড়ির আনাচে কানাচে চরে খাচ্ছে, কোনো কারণে বিরক্তবোধ বা সন্দেহজনক পরিস্থিতি বুঝলে সঙ্গে সঙ্গে শঙ্কার আওয়াজ তুলতে।

কোনো বাড়িতে বা বাড়ির হাতায় এক বা দু'জোড়া শালিকের বাসভূমি বা চরার জায়গা হলে সেখানে অপর কোনো শালিকের প্রবেশ নিষেধ। খুব কড়া পাহারা। কেউ এলেই চেঁচামেচি মারপিট লেগে যায়।

গ্রামের কোনো বিশেষ গাছে একদল শালিকের রাত্রিবাসের স্থান হলে তাদের সম-বেত কলরব বা ঐকতানে সকাল সন্ধ্যে চতু-র্দিক বেশ মাতিয়ে রাখে। যেসব গাছে দলবন্ধ হয়ে রাত্রিবাস করে সেখানে শুধু ওরাই থাকে না, পাতিকাক টিয়া প্রভৃতি অন্যান্য পাখির বাসাও। সূর্য ওঠার পরেই জোড়ায়, চার, ছয় কখনও বা আরও বেশির দলে বিভিন্ন দিকে তাদের খাদ্যান্বেষণ ভূমির উদ্দেশ্যে যাত্রা করে। কেউ কেউ আবার কাছে পিঠেই থাকে।

হাঁটতে পারে বেশ। প্রতিটি পদক্ষেপে মাথা দুলিয়ে হাঁটার একটা অদ্ভুত কায়দা আছে। যেন একজন কেউকেটা, খুব বিজ্ঞ এবং ভারিক্কি। আবার চড়াই পাখির মতো জোড় পায়ে লাফিয়ে চলে। ওড়ে একটা নির্দিষ্ট গতিভঙ্গি ও দ্রুততার সঙ্গে এবং বেশ দ্রুতই।

অনেককেই শালিক পুষতে দেখেছি। খুব সহজেই পোষ মানে এবং শেখালে বেশ কথা বলে। যোগীন্দ্রনাথ সরকারের 'হাসি-খুসির'র ২য় ভাগে যদিও আছে বৈশাখ মাসে যে ছানা তিনি পুষেছিলেন চৈত্র মাসে 'ফুরুৎ করে উড়ে গেল বনে', তা ঠিক নয়। ছেলেবেলায় পাখিপোষায় যখন হাতেখড়ি হয় তখন শালিকও পুষেছি। 'হাসিখুসি'র দৌলতে ভয় ছিল চৈত্র মাস হলেই বুঝি পালাবে। কিন্তু দেখলাম ভয় অমূলক। ওটা শুধু কবিতাই। একবার একটা এমন পোষ মেনেছিল যে কথা তো বলতই, নানারকম শব্দেরও নকল করতো এবং সর্বদা কুকুরের মতো পায়ে পায়ে ঘুরে বেড়াতো।

শালিক বাসা বাঁধে বাড়ির আনাচে কানাচে, আলসে বা কার্নিসের তলায়, দেও-য়াল বা কুয়োর ভিতরে গর্তে এবং গাছে। ছোট ঝোপ ও লতানে গাছে এবং চিল, পাতি-কাক বা কাঠবিড়ালীর পরিত্যক্ত বাসাতেও বাঁধতে দেখা যায়। পাড়াগাঁয়ে অনেক বাড়ির দেওয়ালের গায়ে মাটির ভাণ্ড। হাঁড়ি বা কলসী বেঁধে ঝুলিয়ে রাখা হয় যাতে শালিক এসে বাসা বাঁধতে পারে। শ্রীরামচন্দ্রের এক হাতে নাকি শালিক। ঠিক জানিনে, হয়তো সেই কারণেই শালিকের এতো খাতির বা তার প্রতি ভক্তের মমতা।

বাসার নেই কোনো ছিরিছাঁদ, তেমনি নেই এমন কোনো বস্তু। শুকনো ঘাস, খড়, কাঠ, পালক, যতরকম আবর্জনা—ময়লা কাগজ, ছেঁড়া নেকড়া, দড়ির টুকরো, এমনকি সাপের খোলসের অংশও।

প্রজননের সময় এপ্রিল থেকে অগাস্ট। একই বছরে পরপর দুবারও ডিম পাড়তে দেখা যায়। স্ত্রী-পুরুষ দুজনেই মিলেমিশে বাসা বাঁধে, ডিমে তা দিয়ে বাচ্চা প্রতিপালন করে। ৪ থেকে ৫টি ডিম সাধারণতঃ পাড়ে। কখনও ৩টি কখনও ৬টিও পাড়তে দেখা গেছে। ডিম লম্বাটে, খোসা শক্ত ও চকচকে। রঙের তফাৎ হয়—ফিকে নীল থেকে আকাশী-নীল বা সবজে নীল। ডিমের উপর কোনো দাগ নেই। ডিমের মাপ—লম্বায় ১·২০, চওড়ায় ০·৮৬ ইঞ্চি।

বাংলাদেশে এবং ভারতের অন্যান্য স্থানে আরও কয়েক জাতের শালিক দেখা যায়—

১। গাং-শালিক বা রামশালিক। হিন্দি—গঙ্গা ময়না। ইংরেজি— Bank Myna ।

লম্বায় সাড়ে ৮ ইঞ্চি। শালিকের চেয়ে একটু ছোটো। স্ত্রী-পুরুষ একরকম দেখতে। মাথার চাঁদি এবং দুপাশ কালো। বাকি দেহের পালক নীলচে-ধূসর কেবল তল-পেটের মাঝের পালক ফিকে-জরদ। ডানা কালো ; বাইরের ওড়ার পালকে সাদাটে জর-দের ছোপ। লেজ গোলাকার, প্রান্তদেশে জরদের চিহ্ন। কণীনিকা পাটকিলে-টকটকে লাল। চঞ্চু ময়লাটে লালচে-হলুদ। চোখের নিচে এবং পিছনে পালকহীন ত্বক ইঁট-লাল। পা নিষ্প্রভ হলুদ।

বাসস্থান—পশ্চিম বাংলা, উত্তর-ভারত থেকে দক্ষিণে বোম্বাই, মধ্যভারত, ওড়িষ্যা পর্যন্ত এবং পাকিস্থান। পুরোপুরি সম-তলের পাখি। বড়ো জোর ৩ হাজার ফিট উঁচু পর্যন্ত দেখা যায়। স্থানীয় পাখি মধ্যে মধ্যে খাদ্যান্বেষণে অল্প দূরে ভ্রমণ করে।

গাং-শালিকের খাওয়াদাওয়া ও স্বভাব প্রায় ভাটশালিকের মতোই। সময়ে সময়ে এক-সঙ্গেই চরতে দেখা যায়। চাষের খেত বা মাঠের ধারে বাজারে ময়লা-আবর্জনার কাছে বা গরু মহিষ চরার জায়গায় দেখা গেলেও নদীর ভাঙন-পাড়, দীঘির ধার কিংবা পুরোনো ইঁটের পাঁজার জন্যে সৃষ্ট মজা-জলের কিনারায় অর্থাৎ জলের ধার বেশি পছন্দ করে। শালিক অপেক্ষা এদের সামাজিক জীবন আরও নিবিড়। কেবল চরার সময় একসঙ্গে হয় না, বাসাও বাঁধে দলবদ্ধ হয়ে।

নদীর উঁচু মাটির পাড়ে বা বাঁধের খাড়া দিকে গর্ত করে বাসা বানায়। কয়েকদল আবার পরিত্যক্ত কুয়োর ভিতরে বা ইঁটের পাঁজার মধ্যে সুড়ঙ্গ বানিয়ে বাস করে। সুড়ঙ্গ শেষে ৩ ইঞ্চি ব্যাসে ডিম পাড়ার স্থান বা প্রসূতি-সদন। এই সুড়ঙ্গ সাত-আট ফিট পর্যন্ত লম্বায় হয় এবং নানা গলিঘুঁজি থাকে যাতে সবাই সবার সঙ্গে যোগাযোগ রাখতে কোনো অসুবিধে বোধ না করে। রীতিমতো কলোনি বন্দোবস্ত।

সেদিন নজরে পড়ল পার্ক সার্কাস রেল স্টেশনের ধারে চার নম্বর পুলের গায়ে গর্ত করে একদল গাং-শালিক বাসা বেঁধেছে। একটু দূরেই 'ঝিলান' বা জলা। পুলের

তলায় রেল লাইনের ধারে ছোট্ট বাজার, নাম 'আল্লা ভরোসা হাট'। সুতরাং খাদ্যেরও অভাব নেই।

প্রজননের সময় মে থেকে অগাস্ট। বাসার ভিতরে বিছায় পালক, শুকনো ঘাস এবং সরু শিকড়। কখনও কখনও সাপের খোলসের টুকরো। ডিম একটু বেঁটে, খোসা শক্ত এবং চকচকে। ডিমের উপর কোনো ছোপ বা ছিট নেই। রঙ হালকা আকাশী-নীল বা সবজে-নীল তবে ভাটশালিকের চেয়ে একটু গাঢ়। ডিমের মাপ—লম্বায় ১·০৫, চওড়ায় ০·৮২ ইঞ্চি।

২। ঝুন্টসারি পদের অন্তর্ভুক্ত প্রজাতি—ঝুন্ট-শালিক। হিন্দি—ঝোট ময়না বা জংলি ময়না। ইংরেজি—Jungle Myna।

লম্বায় ৯ ইঞ্চি। স্ত্রী-পুরুষ দেখতে একই রকম। সমস্ত মাথা কালো। দেহের উপরের পালক ছাই-ধূসর পাটকিলে। ডানা কালো; ওড়ার পালকের আগায় সাদা ছোপ। লেজ গোলাকর, শেষ প্রান্তে সাদা দাগ। তলার পালক গাঢ় ধূসর-পাটকলে, লেজের তলা সাদাটে। কণীনিকা গাঢ় হলদে। চঞ্চুর গোড়া নীলচে-কালো, আগা কমলা-হলুদ। পা কমলা-হলদে। নাকের ঠিক উপরে একগুচ্ছ খাড়া সরু পালক। যার জন্যে নাম ঝুঁটিধারী-শালিক বা ঝুন্ট-শালিক।

বাসস্থান—হিমালয়ের পাদদেশের নিম্নাংশে ৭ হাজার ফিট উচ্চতা পর্যন্ত, উত্তরে হাজারা থেকে আসাম, ব্রহ্ম, থাইদেশ এবং মালয়েশিয়া। নিম্নবঙ্গ, ছোটনাগপুর অঞ্চল থেকে বুন্দেলখন্ড ও রায়পুর পর্যন্ত। একটি উপজাতিকে দেখা যায় ভারতের দক্ষিণাংশে কেপ কমোরিন পর্যন্ত। তার দেহে পাটকিলের অংশ বেশি; কণীনিকা নীলচে-সাদা।

খাদ্য—বাছবিচারহীন। তাছাড়া বট পিপুল ইত্যাদির ফল এবং ফুলের মধু।
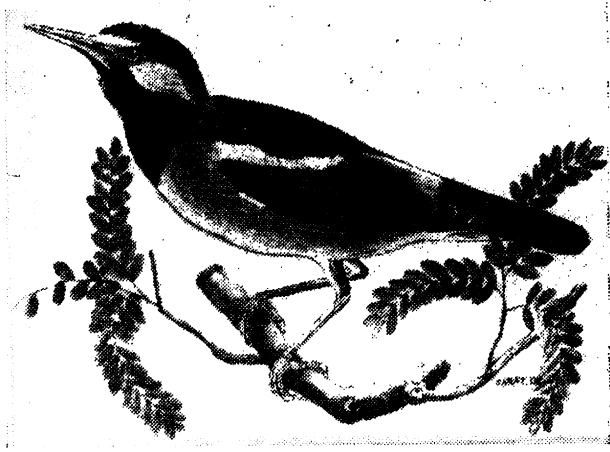
গো-শালিক

জঙ্গলেরই পাখি। মধ্যে মধ্যে শালিক বা ভাটশালিকের সঙ্গে জঙ্গলের ধারে মানুষের গৃহকোণের আশেপাশে চরতে নজরে পড়ে। বিশেষতঃ প্রজননের সময় যখন জোড়ে জোড়ে দলবদ্ধ হয়ে খাদ্যের খোঁজে চরে বেড়ায়। একটু বিপদের আভাস পেলে তক্ষুনি গাছের ডালে উড়ে গিয়ে বসে। আচারে-ব্যবহারে চালচলনে শালিকের সঙ্গে সাদৃশ্য থাকলেও তাদের মতো মোটেই সাহসী নয়। অমনভাবে সর্বভুকও নয়। ডাকের তফাৎ আছে। কিক্-কিক্, কোক্-কোক্ ইত্যাদি ডাক ছাড়াও মৃদুস্বরে মিষ্টি ডাকও শোনা যায়।

সাধারণতঃ উচু গাছে এবং বেশ উঁচুতে গাছের গায়ে কাঠঠোক্রার পরিত্যক্ত গর্তের মধ্যে এদের বাসা। ঝোপঝাড় জঙ্গলের মধ্যে ভগ্নদশাগ্রস্ত অট্টালিকায় এবং পুরোনো ভাঙা বাড়ির দেওয়ালের গর্তেও বাসা দেখা যায়। সরু ডাল, শিকড়, শুকনো ঘাস, পালক, শেওলা, নেকড়া ইত্যাদি দিয়ে গর্তের ভিতর বাসার আস্তরণ। সব সময় দলবদ্ধ হয়ে বাস করে এবং বাসা বাঁধে।

প্রজননের সময় ফেব্রুয়ারি থেকে জুলাই। তবে এপ্রিলেই বেশি ডিম পাড়তে দেখা যায়। ৩ থেকে ৪টি ডিম পাড়ে। কখনও বা ৫টি। ডিম বেশ লম্বাটে, খোসা শক্ত এবং চকচকে। রঙের তারতম্য আছে। মাখনতোলা দুধ রঙ থেকে ফিকে নীল বা সবজে-নীল এবং ছোপহীন। ডিমের মাপ—লম্বায় ১·২০, চওড়ায় ০·৮৩ ইঞ্চি।

৩। শবলসারিদের অন্তর্ভুক্ত প্রজাতি—গো-শালিক।

হিন্দি—আবলকা ময়না। ইংরেজি Pied Myna।

লম্বায় ৯ ইঞ্চি। মাথা ও গলা কালো। চঞ্চুর গোড়া থেকে চোখের উপর দিয়ে ঘাড় পর্যন্ত একটা সাদা টান। উপরের পালক, ডানা এবং লেজ কালো বা কালচে বাদামী। কোমরের কাছে এবং ঘাড়ের তলা থেকে ডানার উপর দিয়ে সাদা টান চলে গেছে। বাকি তলার সমস্ত পালক সাদা তার উপর খুব ফিকে লালচে আভা। কণীনিকা ফিকে হলদে, চোখের পাতা এবং চোখের পাশে পালকহীন ত্বক কমলা। চঞ্চুর গোড়ার অর্ধেক গাঢ় কমলা, বাকিটা সাদা। পা ফিকে হলুদ, নখরে শিংয়ের রঙ। স্ত্রী-পুরুষ একই রকম দেখতে।

বাসস্থান—ভারতের সর্বত্র এবং ব্রহ্ম থেকে জাভা। সব রঙই একটু ফিকে এমন এক উপজাতিকে দেখা যায় পূর্ব-পাকিস্তান,

ময়না
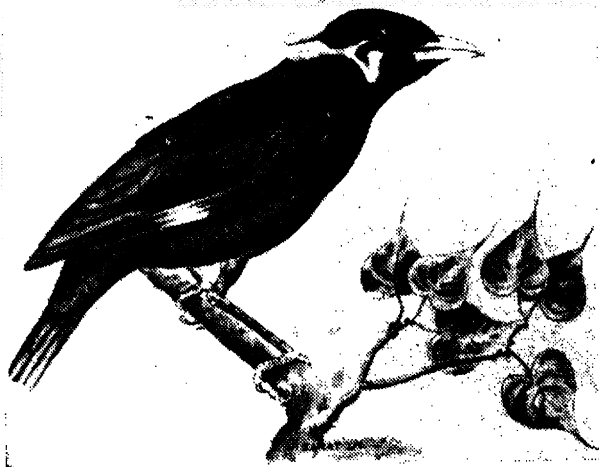
আসাম থেকে পাঞ্জাবের লুধিয়ানা, সেখানে থেকে দাক্ষিণাত্যে হায়দ্রাবাদ, ওড়িষ্যা, বিহার এবং পশ্চিমবঙ্গে।

খাদ্য—প্রধানতঃ কীটপতঙ্গ। ফড়িং ঝিঁঝিঁপোকা মাঠে চরতে চরতে ধরে খায়। ঘাসের গোড়ায় খোঁজে নানাবিধ পোকামাকড়। ছোট ফলও খুব প্রিয়। শস্য নষ্ট করতে ওস্তাদ।

গো-শালিককে দেখা যায় ভাতশালিকের মতো খেতের ধারে মাঠেঘাটে দল বেঁধে চরতে। চারদিকের আবহাওয়া একটু মন্দ দেখলেই উড়ে গিয়ে বসে গাছের ডালে। ভাতশালিকের সঙ্গে তফাৎ কেবল এরা ঝোঁড়ের ভিতর ঢোকে না, জানলায় বসে না। মানুষের বসতির কাছে বাস করলেও একটু খোলা জায়গা পছন্দ করে।

দল বেঁধে বাসা বাঁধে মাঠের মধ্যে দাঁড়িয়ে থাকা ৮ থেকে ৩০ ফিটের ভিতর আম জাম বা ওই ধরনের গাছের উপরে। এদের দল ছোটো বড়ো দুইই হয়। সাধারণতঃ ৮ থেকে ১০ এক একটা দলে। আবার কখনও জোড়ায় চরে বেড়াতে দেখা যায়।

বাসার কোনো ছিরিছাঁদ নেই। গোলাকার। উপকরণ—খড় ঘাস কাঠি শিকড় ছেঁড়া নেকড়া ইত্যাদি। মাঝে মাঝে দেখা যায় বাসা থেকে ছেঁড়া নেকড়া ঝুলতে। বাসার ঠিক মাঝে ডিম পাড়ার জায়গাটায় পালক বা নরম ঘাসের আস্তরণ দেয়। গাছের ফোকরে বা দেয়ালের গর্তে বাসা বাঁধে খুব কচিৎ।

গো-শালিকও খুব পোষ মানে এবং কথা বলতে শেখালে দু'চারটে কথাও বলে। এমনি গলার আওয়াজ মিষ্টি। একটু উচ্চগ্রামে ডাকে। মাংসের রঙ মুরগীর মত সাদা। সুতরাং, খেতেও খুব খারাপ নয়।

প্রজননের সময় মার্চ থেকে সেপ্টেম্বর। সাধারণতঃ ৪ থেকে ৫টি ডিম পাড়ে, কখনও বা ৬টি। ছোপহীন ফিকে আকাশী-নীল রঙ। ডিমের মাপ—লম্বায় ১·১০, চওড়ায় ০·৮২ ইঞ্চি।

৪। তৈলপকদের অন্তর্গত প্রজাতি—তেলে-শালিক। হিন্দি—তেলিয়া ময়না। ইংরেজি—Starling।

লম্বায় ৯ ইঞ্চি। তেলতেলা কালো। প্রতিটি লম্বাটে ধরনের পালকের আগায় সাদাটে ছিট। তার জন্যে মাথা ঘাড় ও বুক ছিটছিটে দেখায়। ডানা এবং লেজ পাটকিলে কিন্তু ওদের ধার ভেলভেট কালো। পুরুষের কর্ণীনিকা গাঢ় পিঙ্গল, স্ত্রীর ফিকে হলদে। চঞ্চু পাটকিলে, তলার চঞ্চুতে একটু হলুদ জব।

ইওরোপ, আফ্রিকা ও এশিয়ার পাখি। শীতকালে পরিযায়ী (মাইগ্রেট) হয়ে ভারতের সমতলে নামে। দেখা যায় অক্টোবর থেকে মার্চ মাসের মধ্যে। উত্তরবঙ্গে একটু বেশি চোখে পড়ে। শীতকালে বিহারে পূর্ণিয়ার কাছে এক জঙ্গলে ৮-১০টার এক ঝাঁকের দর্শন পেয়েছিলাম। চালানি হয়ে কলকাতার নিউমার্কেটে, রথের হাটে, শ্যামবাজার-হাতি-

তেলে শালিক

বাগানের বাজারে বিক্রির জন্যে বেপারীরা আনে।

আচারে-ব্যবহারে আমাদের শালিক। সবসময়ে দলবদ্ধ হয়ে বাস করে।

ভারত ও তৎসংলগ্ন স্থানে ৪টি উপজাতিকে দেখা যায়। প্রথমটি বাসা বাঁধে পশ্চিম পাকিস্তানের সিন্ধু প্রদেশে। আকারো ছোটো। দ্বিতীয়টি বাঁধে কাশ্মীরের উপত্যকায়। তৃতীয়টি বাসা বাঁধে ইয়ারকন্দ অঞ্চলে। আকারে সর্বাপেক্ষা বৃহৎ। শীতকালে পরিযায়ী হয়ে আসে

বামুন শালিক

আফগানিস্থান, পশ্চিম পাকিস্তান, কাশ্মীর, পাঞ্জাব এবং যুক্তপ্রদেশে। চতুর্থটির দেশ সাইবেরিয়ায়। পরিযায়ী হয়ে শীতকালে ভারতের সমতলে নামে—ভারতের উত্তর-পশ্চিমাংশ থেকে পশ্চিমবঙ্গে এবং দক্ষিণে বরোদা পর্যন্ত।

৫। শংকরাদের অন্তর্গত প্রজাতি—বামুন-শালিক। কোথাও কোথাও "মুঙ্গের পাওয়ে" বলে। হিন্দি—বামানি ময়না।

দেশী-পাওয়ে

ইংরেজি— Brahminy বা Black-Headed Myna।

লম্বায় ৮ ইঞ্চি। মাথা এবং মাথার উপর লম্বা ঝাঁকড়া ঝুঁটি কালো। মাথার দু'পাশ, ঘাড় এবং তলার সব পালক জরদ, কেবল জানু এবং লেজের তলায় সাদা ছোপ। ঘাড়, গলা ও বুকের পালক সরু এবং লম্বাটে। উপরের বাকি পালক এবং ডানার ওড়ার বড়ো পালকগুলি কালো। লেজ গোল এবং পাটকিলে, কেবল মাঝের কয়েকটা পালকের একটু চওড়া সাদা পটি। কর্ণীনিকা ফিকে সবুজ। চঞ্চুর গোড়া নীল, মধ্যে সবুজ, ডগা হলুদ। পা উজ্জ্বল হলুদ।

বাসস্থান—ভারত, চার সাড়ে চার হাজার ফিট উচ্চতার মধ্যে। নিম্নবঙ্গে একটু জংলা জায়গায় এদের দেখা যায়।

খাদ্য—অন্যান্য শালিকের মতোই সর্বভূক।

বামুন-শালিক বা মুঙ্গের পাওয়ে পছন্দ করে একটু খোলামেলা, প্রচুর চাষবাস ও গাছগাছড়া যেখানে আছে সেই স্থান। মানুষের খুব কাছাকাছি আসে না, যদিও বাগানে গাঁয়ে এবং বাংলাদেশের ছোটো শহরে মানুষের বসতির কাছে বিচরণ করে। মানুষের অস্তিত্ব যে আছে তা তাদের ভাব দেখে মনে হয় সেটা তারা যেন স্বীকার করতে চায় না। অর্থাৎ, মানুষ সম্বন্ধে মোটেই সচেতন নয়। সম্পূর্ণ উদাসীন। একটু ভিজে স্যাঁতসেঁতে মাঠ, খেত বা জায়গা পছন্দ করে বেশি। কখনও কখনও অন্যান্য শালিকের সঙ্গে এক সঙ্গে চরতে কিংবা জোড়ে, ছোটো দলে বা কখনও সঙ্গীহীন একাকী মাটি থেকে খুঁটে খাচ্ছে দেখা যায়। মাটিতে ঘোরাফেরা করলেও গাছে গাছেই থাকতে ভালোবাসে।

বাসা বাঁধে মাটি থেকে ১৫ থেকে ৩০ ফিট উচ্চতার মধ্যে গাছের ফোকরে। দক্ষিণ ভারতে বাড়ির ছাদে গর্তের ভিতর বাসা বানায়। ফোকর বা গর্তের আস্তরণ বিছায় পালক, শুকনো ঘাস, পাতা, পশম বা রেশম জাতীয় নরম জিনিস দিয়ে। গাছের ডালে বাক্স বা হাঁড়ি বেঁধে দিলে তার মধ্যে বাসা বানাতে খুব পছন্দ করে।

গানের গলা খুব মিষ্টি। অন্যান্য পাখির ডাক এবং গানও নকল করতে পারে অতি সহজে। খুব পোষ মানে।

প্রজননের সময় মে থেকে অগাস্ট। ৩ থেকে ৫টি লম্বাটে, শক্ত খোসা, অল্প চকচকে ফিকে নীলচে ছোপহীন ডিম পাড়ে। ডিমের মাপ—লম্বায় ০·৯৭, চওড়ায় ০·৭৫ ইঞ্চি।

দেশী-পাওয়ে

অফিসে আমাদের বিভাগটা পাঁচতলায়। তারই একটা জানলার কাছে, জানলাটাকে ছাড়িয়ে অল্প উঠেছে একটা নারকেল গাছ। শীতের শেষে কদিন ধরেই রোজ বিকেলে এক জোড়া পাখি এসে বসছে তার উপরে। বেশ ছিমছাম ছোট্ট চেহারা।

বহু বছর আগে পাখিটাকে যখন প্রথম খি শ্যামবাজারে-হাতিবাগানের হাটে, তখন ম শুনি দেশী-পাওয়ে। পাওয়ে নামটা নে ভাবি হিন্দি কোনো নামের বাংলা পভ্রংশ বুঝি। অথবা হিন্দি-বাংলায় কই নাম। বাংলায় অনেক পাখির নাম ছে। পাখিওয়ালারা খদ্দের বা জিজ্ঞাসুকে বলে সেই নামটাই চলে। বাড়ি ফিরে ই খুলে দেখেছি হিন্দিতে বলে পাবই বা াওই। বাংলাতে অতিরিক্ত দেশী শব্দটা বহার হয়েছে। আরও ভাবলাম ব্রাহ্মন-ালিক যার অপর নাম মুখের পাওয়ে তারই াতি বলে দেশী কথাটা এসেছে। কিন্তু াবই বা পাওয়ে কথাটার উৎপত্তি কোথা েকে?

পাখিটাকে প্রথমে শংকরাদের অর্থাৎ মদন-শালিকগোষ্ঠীর মধ্যে ধরা হয়। পরে ক্ষিতত্ত্ববিদরা শরভীদের মধ্যে ধরেন। র্তমানে ফেলা হয়েছে তৈলপকদের অর্থাৎ চলে-শালিক বা স্টার্লিংগোষ্ঠীর মধ্যে।

মনের মধ্যে পাওয়ে নামটা নিয়ে একটা চখচ ভাব ছিল বহুদিন ধরে। বৈজ্ঞানিক লাতিন নামের প্রতিশব্দ সংস্কৃতে পান্তরিত করতে গিয়ে দৃষ্টি পড়ল তঞ্জল মহাভাষ্য-এর একটি সূত্রে (৩-২-৪)—"শংকরা নাম পরিব্রাজিকা, শংকরা াম শকুনিকা তাচ্ছীলা চ"। শংকরা নাম নিত্য ভ্রমণকারী ভিক্ষুণী আর শংকরা ামে যে পাখি তারা একই স্বভাবের।

কেন পাওয়ে নাম তা এখন পরিষ্কার য়ে গেল। পরিব্রাজিকা প্রাকৃতে পব্বাইআ, ার থেকে হিন্দি পবই এবং বাংলার াওয়ে। পাখিটার ছিমছাম চেহারায় যে াত্রবর্ণ তা ময়লা রঙের কাষায় বস্ত্রেরই নুরূপ এবং সচকিতা ভিক্ষুণীর ভাব রিস্ফুট।

তৈলপকদের অন্তর্ভুক্ত প্রজাতি দেশী-াওয়ের ইংরেজি নাম— Grey-Headed lyna।

লম্বায় সাড়ে ৭ ইঞ্চি। দেহের উপরের ালক রুপোলি-ধূসর তার উপর অল্প াটকিলের আভা। মাথা ও ঘাড়ের পালক রু লম্বাটে এবং আগায় একটু সাদার ছোঁয়াচ। ডানা কালচে। ওড়ার পালকের গায় ও ধারে রুপোলি-ধূসর। লেজ কালচে, গায় একটু চওড়া লালচে ভাব। লেজের াঝের কয়েকটি পালক রুপোলি-ধূসর। লার সমস্ত পালক লালচে, চিবুক এবং লায় খুব ফিকে তার মধ্যে সাদাটে-ধূসরের াঁচড়। কণীনিকা ফিকে নীল। চঞ্চুর গোড়ায় নীল, মধ্যে সবুজ, ডগা হলদে। পা পাটকিলে-হলদে।

বাসস্থান—ভারতের সর্বত্র সমতল ভূমিতে; আন্দামান ও নিকোবর দ্বীপপুঞ্জ, পূর্ব পাকিস্তান থেকে ব্রহ্ম, থাইদেশ ও মালয়েশিয়া। সিংহলে দেখা যায় না। একটি উপজাতির মাথা সাদা। তাকে দেখা যায় ভারতের পশ্চিম উপকূলে, বেলগাঁও থেকে কেরেলা। সাদামাথা - পাওয়েকে শীতকালে রাঁচি এবং মেদিনীপুর অঞ্চলে দেখা যায়। ব্রহ্মদেশে যে উপজাতি তার ডানা সাদা।

খাদ্য—কীটপতঙ্গ, বট পিপুল ইত্যাদি নানাবিধ ছোটো ফল, মন্দার ও শিমুল ফুলের মধু।

দেশী-পাওয়ে অন্যান্য শালিকগোষ্ঠীর মতো মানুষের কাছাকাছি একদম আসে না। একটু লাজুক প্রকৃতিরও। গাছের মগডালে থাকতে ভালোবাসে সেই জন্যে সহজে দৃষ্টি-পথে পড়ে না। মন্দার ও শিমুলের ফুল যখন ফোটে তখন এক গাছের মাথা থেকে আর-এক গাছের মাথায় জোড়ায় বা ছোটো দলে পরস্পরকে তাড়া করে বেড়ায়। কদাচিৎ মাটিতে নামে। খাবার সময় একটু হৈ-চৈ বা কিচির-মিচির না করে খেতে পারে না। এমনিতে ক্যাচ ক্যাচ করে কিন্তু মিষ্টি সুরেলা গলা আছে। সে কারণে অনেক সৌখিন লোককে পুষতে দেখা যায়। কাঁধে করে যে পাখিওয়ালারা কলকাতার রাস্তায় পাখি ফিরি করে তাদের খাঁচাতেও দু' একটি দেশী-পাওয়ে প্রায়ই দেখা যায়।

২০ থেকে ৫০ ফিটের মধ্যে বড়ো গাছের ফোকরে বাসা। চারিদিকে গাছ মাঝখানে ফাঁকা জায়গায় একটি কি দুটি বড়ো গাছ, সে ধরনের বড়ো গাছে বাসা বাঁধতে এরা ভালোবাসে। এমনিতে গাছে ফোকর হয়েছে বা পরিত্যক্ত বসন্তবৌরির গর্তে বাসা বেঁধে থাকে। কখনও দেখা যায় পুরোনো বুড়ো বা মরা গাছের গায়ে কোনো কারণে একটু ছোটো গর্ত হয়েছে সেটাকে ঠুকরে বাড়িয়ে তার মধ্যে বাসা করতে। বাসার আস্তরণ ঘাস ও সবুজ নরম পাতা। বাসা বানায় স্ত্রী-পুরুষ দুজনে মিলে কিন্তু তা দিয়ে ডিম ফোটায় শুধু স্ত্রী-পাখি।

প্রজননের সময় মার্চ থেকে জুন। একটু লম্বাটে দাগহীন ফিকে নীল রঙের ৩ থেকে ৫টি ডিম পাড়ে। ডিমের মাপ—লম্বায় ০.৯৫, চওড়ায় ০.৭০ ইঞ্চি।

ময়না

১৯৬২ সালের গোড়া। চতুর্থ টেস্ট ম্যাচ ইংল্যান্ডের বিরুদ্ধে ইডেনে। সিজন টিকিট শুধু লাইন দিতে হয়, আর সে-লাইনও বিরাট। আগের ৩টি টেস্টেই ড্র। অথচ ভারতের জেতা উচিত ছিল। একটাতে ফলো অন করিয়েও ড্র, আর একটায় নিশ্চিত জয় কিন্তু বৃষ্টি বাদ সাধল। এখন আশা নিরাশার দোলায় ক্রিকেটপিপাসু কলকাতার দর্শক লাইনে দাঁড়িয়ে।

লাইন চলেছে অত্যন্ত মন্থরগতিতে। হঠাৎ উঁচু এক দেবদারু গাছের মাথায় দৃষ্টি গিয়ে আটকে গেল। কলকাতার বুকে অভূতপূর্ব দৃশ্য। রোদ ঝলমল শীতের সকাল। একটি পাখি দেবদারুর খুব উঁচু ডালে বসে নিশ্চিন্তে গাত্রমার্জনা অর্থাৎ প্রসাধন করছে। নিচে অগণিত জনতার প্রতি কোনো ভ্রূক্ষেপ নেই। কুচকুচে কালো গায়ে রোদ পড়ে আভা ঠিকরে পড়ছে। হলদে ঠোঁট আর পা। ডানায় সাদার ছোপ। চোখের পিছনে এবং ঘাড়ে হলদে ঝালর।

বুঝলাম এক খাঁচার পাখি কোনো কারণে মুক্তি পেয়ে ভুলে যাওয়া স্বাধীনতার স্বাদ উপভোগ করছে। এ পরিবেশে খাস কলকাতার বুকে এ জাতের পাখির বসবাস নয়। তবু দেখে বড়ো আনন্দ পেলাম। শুভ চিহ্ন। সঙ্গীদের বললাম, এই টেস্ট ম্যাচ আমরা জিতব। এবং পরেরটাও জিতব। আমার মন্তব্যটা একটু জোরে হয়ে পড়েছিল। অচেনা কয়েকজন বলে

ঝুঁট-শালিক

উঠলেন—কেরে আমার গণক ঠাকুর? কোথা থেকে এলেন রে?...শুনতে হল অনেক বিদ্রূপ, অনেক বাক্যবাণ। কিন্তু ভাগ্যের এমন পরিহাস চতুর্থ টেস্টতো জিতলামই, মাদ্রাজে পঞ্চম তাও জিতলাম।

ইডেনের সকালে ভাগ্য পরিবর্তনের শুভ সূচনা যে পাখির মাধ্যমে দেখেছিলাম সংস্কৃত সাহিত্যে তার উল্লেখ পাই মদন-সারিকা নামে। রোপণাকা পদের অন্তর্গত প্রজাতি—ময়না। হিন্দিতে—পাহাড়ি ময়না। কারণ, শুধু ময়না বলতে তারা এবং ইংরেজরা শালিককে বোঝে। ইংরেজি—Grackle বা Hill Myna।

লম্বায় ১০ ইঞ্চি। দেহের সমস্ত পালক কুচকুচে কালো, তার উপর সবুজ ও বেগুনির আভা। কেবল ডানার বড়ো পালকগুলির কয়েকটির মাঝামাঝি সাদা। ডানা না মেললে সব সময় দেখাও যায় না। চঞ্চু কমলা-লাল, অগ্রভাগে একটু হলুদের ছোঁয়াচ। পা কমলা-হলদে; নখর কালচে পাটকিলে। চোখের তলা ও পিছন দিয়ে ঘুরে ঘাড়ের উপর পালকহীন ত্বক উজ্জ্বল হলুদ। এই নরম চামড়া এক-এক উপজাতির রঙের উজ্জ্বলতায় এবং আকারে ভিন্ন ভিন্ন। যেগুলির গাঢ় ও উজ্জ্বল তাদের সোনা-কানী এবং যাদের ফিকে তাদের রুপো-কানী বলে।

বাসস্থান—ভারত, সিংহল, ব্রহ্ম, মালয়, সুমাত্রা, জাভা এবং বোর্ণিও। সাধারণতঃ ভারতে ৫টি উপজাতিতে ময়নাকে ভাগ করা হয়। প্রথম উপজাতি—হিমালয়ের পাদ-দেশে এক থেকে দু'হাজার ফিটের মধ্যে কুমায়ুন থেকে আসাম ও পূর্ব-পাকিস্তান। এদের ঘাড়ের উপর ঝালর চওড়া ও বড়ো ঠিক যেন দুটো জিভ। চোখের তলা ও চোখের পিছনের ঝালরের মাঝে যে ফাঁক তার পালক ছোটো এবং সরু, ঝালরের প্রান্তে গিয়ে পৌঁছয় নি। দ্বিতীয় উপ-জাতি—পশ্চিমঘাটের উত্তর কানাড়া থেকে সমগ্র দক্ষিণে ৫ হাজার ফিট উচ্চতা পর্যন্ত এবং সিংহলের নিম্নভূমি। আকারে ছোটো, চঞ্চুও ক্ষুদ্র। ঝালর খুবই সরু এবং ঘাড়ের উপর উঠে গিয়ে জিভ দুটো সিকি ইঞ্চির মতন লম্বা হয়েছে। চোখের নিচে ঝালরের ফাঁকের পালক বেশ বড়ো এবং তা প্রান্তদেশ ছুঁয়েছে। তৃতীয় উপজাতি—সম্বলপুর থেকে মেদিনীপুর এবং সেখান থেকে মধ্য-প্রদেশের বস্তার পর্যন্ত। এদের ঘাড়ের ঝালরে জিভ একদম নেই। দ্বিতীয় উপ-জাতির চেয়ে আকারে ছোটো এবং চঞ্চু বেঁটে। চতুর্থ উপজাতি—আন্দামান ও নিকোবর। কলকাতার বাজারে এই জাতটার চালান আসে বেশি। পঞ্চম উপজাতি—সিংহল—এদের চোখের নিচে অর্থাৎ দু'গালে ঝালর নেই, আছে ঘাড়ের উপর। সেটা বেশ লম্বাটে। আগে কেবল সিংহলের পার্বত্য অঞ্চলেই দেখা যেত, বর্তমানে জঙ্গল অনেক কেটে পরিষ্কার করাতে দ্বিতীয় উপজাতির সংগে নিম্নভূমিতে পাশাপাশি বাস করে।

গাং-শালিক

খাদ্য—কীটপতঙ্গ, নানাবিধ ছোটোবড়ো ফল যা গাছের উপরে বসে পাওয়া যায়। শূন্যে উড়ে উড়ন্ত উই বা পিঁপড়ে ধরনের পতঙ্গ ধরে খায়। শিমুল, রক্তমাদার প্রভৃতি ফুলের মধুর প্রতি খুব আসক্তি। পোষা-ময়না ফল পোকা বা মাংসের টুকরো ছাড়াও ভাত ও ছাতু খুব পছন্দ করে।

ভারতে যত পাখি কথা বলতে পারে, তার মধ্যে ময়না হচ্ছে শ্রেষ্ঠ। অদ্ভুত নকল করার ক্ষমতা। মানুষের হাসি, কান্না, হাঁচি ও কাশির অবিকল নকল এমন করে তা অন্য কোনো পাখির পক্ষে অসম্ভব। এজন্যে যাঁরা পাখি পোষেন তাঁদের বড়ো প্রিয় এই পাখি। আলিপুরের চিড়িয়াখানায় একটা ময়না ছিল, সে এমন মিষ্টি করে ও ময়না বলতো যে কী বলব। ময়না তুমি কাঁদছ বললেই সে উঁ-উ করে ছোটো ছেলের কান্নারও নকল করতো। বিদেশেও এ পাখির চাহিদা খুব বেশি। এমনিতে বেশ জোরে শব্দ করে ডাকে। মুক্ত অবস্থায় নানারকম স্বর শোনা যায়। কখনো কর্কশ, কখনও সরু গলায় চিৎকার, কখনও বা বেশ সুরেলা, আবার চ্যা-চ্যা করেও ডাকে।

ঘন অথবা পাতলা জঙ্গলে গাছে গাছেই ময়না বিচরণ করে। চা কফি ইত্যাদি খেতের ধারের গাছেও দেখা যায়। প্রজননের সময় ছাড়া এরা সাধারণতঃ ছোটো বা বড়ো দলে বিচরণ করে। গাছের মগডালই এদের প্রিয়, কোনো কিছুতে আকৃষ্ট হলে তবেই তারা নিচের দিকের ডালে নামে অনুসন্ধানের জন্যে। মধ্যে মধ্যে মাটিতেও নামে। কিন্তু তাঁদের হাঁটাটা বংশানুযায়ী নয়, চড়াই-এর মতো জোড় পায়ে লাফিয়ে চলে। ওড়ে দ্রুতগতিতে এবং সোজাসুজি। ওড়ার সময় ডানার ঝাপটে একটা ধাতব শব্দ নিঃসারিত হয়।

ময়না বাসা বাঁধে মরা ডুংগুরে গাছে, যে গাছে মানুষের চড়া খুব বিপজ্জনক। গাছটা একটু ফাঁকা জায়গায় বা খেতের ধারে হলেই পছন্দ। মাটি থেকে ২০—৭০ ফিটের মধ্যে গাছের কাণ্ডে গর্তের ভিতর অল্প ঘাস, পালক, পাতা ও গাছের ছালের নরম টুকরো দিয়ে আস্তরণ বিছায়। গাছের গায়ে গর্তটি ময়না নিজেই বানায়।

প্রজননের সময় মার্চ থেকে অক্টোবর। গাঢ় নীলের উপর লালচে-পাটকিলে বা চকোলেটের ছোপ ও ছিটের ২ থেকে ৩টি ডিম পাড়ে। ডিমের খোসা অল্প চকচকে। ডিমের মাপ—লম্বায় ১·৩০, চওড়ায় ০·৯০ ইঞ্চি।

(পূর্ব প্রকাশিতের পর)

(পাঁচ)

মাইনে নিয়ে তাড়াতাড়ি বাড়ি ফিরবে ক করেছিল। পথে মনে পড়ে গেল রকেল তেল ফুরিয়েছে। বোধহয় একটা পস্টও কিনতে হবে। আরও টুকিটাকি য়োজনীয় জিনিস। বকুল নেমে পড়ল ট্রাম কে।

আর, কী আশ্চর্য, ট্রাম স্টপে দাঁড়িয়ে ধন্য। দৈবাৎ যোগাযোগ। অকারণেই জনের মুখ লাল হয়ে উঠল।

'কী ব্যাপার, অভিসারে নাকি?' সুধন্য গিয়ে এসে জিজ্ঞেস করল।

বকুল বললে, 'অসভ্য।'

সুধন্য বললে, 'ভারি মজা হল, তাই ?'

'মজা আবার কী!'

সুধন্য হাসল। 'কোনদিকে যাবে?'

'মার্কেটে যাব। তুমি?'

'ট্রামের অপেক্ষায় দাঁড়িয়ে আছি। াগাস ট্রামটা আগে এসে পড়েনি।'

'কেন? কী হত?'

'তোমার সঙ্গে দেখা হত না। এমন রামান্টিক বিকেল তো অনেকদিন পাওয়া য় না।'

'হ্যাংলামো এখনও গেল না।'

'গেলে খুশি হতে?'

'চুপ। চলো। দাঁড়িয়ে নাটক করতে হবে া।'

ওরা রাস্তা পার হল।

'মনে আছে কতদিন এইভাবে ট্রাম স্টপে অপেক্ষা করতাম তোমার জন্যে?'

'খুব কৃতার্থ করেছ।'

'একদিন খুব দেরি হল আমার পৌঁছুতে। আর তুমি প্রচণ্ড বর্ষায় ভিজছিলে...'

'বেশ করেছি। ভিজব তোমার কী।'

'সেদিন কিন্তু তুমি প্রচণ্ড ঝগড়া করেছিলে।'

'না। করব না। একলা একটা মেয়ে রাস্তায় ভিজছে। লোকে কী ভাববে।'

'আচ্ছাঃ এখন যদি তেমনি করে বৃষ্টি নেমে আসে?'

'না মশায়, ভিজতে পারব না। ছেলের অসুখ করবে।'

'এই, এই রেস্তোরার কথা মনে আছে?'

'চুপ। ফাজিল কোথাকার।'

'মনে আছে, একদিন বেয়ারাটা, কেবল কেবিনে ঢুকে বিরক্ত করছে? আর তুমি ভয় পেয়ে বলছঃ চলো, চলে যাই। কী রকম ম্যানেজ করেছিলাম?'

'ছাই। একবার চা খাচ্ছ, একবার কোল্ড ড্রিংক, তারপর ব্যাগ খালি, হাঁটতে হাঁটতে বাড়ি ফেরা?'

'চুপ করো।'

'এই—চলো না—'

'কী?'

'আমার ভীষণ তেষ্টা পেয়েছে—'

'এই, না। বেয়ারাগুলো আমাদের চিনে ফেলবে।'

সুধন্য বকুলকে একরকম জোর করে কেবিনে এনে বসাল।

বেয়ারা পরদা টেনে দিয়ে গেল।

বকুল ফিসফিস করে বললে, 'আবার পরদা টানছে কেন?'

'কী করে বুঝবে আমরা স্বামী-স্ত্রী? তোমাকে পরস্ত্রীও ভাবতে পারে।'

বকুল বললে, 'থাক। বীরত্ব জানা আছে।'

বেয়ারা অর্ডার নিতে এল।

সুধন্য বললে, 'কী, মাটন স্যান্ডউইচ খাবে?'

বকুল বললে, 'শুধু চা হলেই তো হয়।'

'না।'

বেয়ারা স্যান্ডউইচ আর চায়ের অর্ডার নিয়ে অন্তর্হিত হল।

সুধন্য সিগারেট ধরাল।

'তারপর?'

'তারপর আবার কী?'

'আচ্ছাঃ তখন এত রেস্তোরার খরচ জুটত কী করে বলতো?'

'আহা, খেতাম তো চা।'

'তাই বুঝি।' সুধন্য হাসল।

'দ্যাখো অন্যমনস্কের মতন কথা বোলো না।'

সুধন্য হাসল।

'মনে আছে কতদিন বকুনি খেয়েছ এর জন্যে? আমি পাগলের মতন কথা বলে যাচ্ছি আর তুমি অন্যমনস্ক হয়ে সিগারেট খেয়ে যাচ্ছ।'

সুধন্য নিঃশব্দে হাসল।

'তোমার স্বভাব একটুও বদলায়নি। এই সরে বোসো, বেয়ারা আসবে। তোমার চালাকি সব জানি।'

'না, ব্যাপারটা কী জানো—(বেয়ারা এল) তুমি যখন অনর্গল বকে যেতে তখন তোমাকে একটা আশ্চর্য পাখির মতন লাগত...'

'পাখি!'

'আর তখন কেবল মাথার মধ্যে একটা মতলবই ঘুরপাক খেত।'

'তাই বুঝি মাঝপথে আমার কথাগুলো ভেঙেচুরে দিয়ে, আমাকে আলুথালু করে—'

সুধন্যা হাসল। 'ঠিক মনে আছে তো তোমার।'

'আবার, অসভ্য—'

'এই, মা, কী ছেলেমানুষি হচ্ছে!'

বেয়ারা পরদা সরিয়ে চা দিয়ে গেল।

সুধন্যা চায়ে চুমুক দিল।

'মনে আছে, একদিন সকালে দুজনে চান করে বেরিয়ে টো-টো করে ঘুরলাম ময়দানে, তারপর তোমার স্যান্ডাল ছিঁড়ল, কী রাগ আমার ওপর, যেন আমিই ছিঁড়ে দিয়েছি তোমার চটিটা।'

'কী রকম হাঁটিয়েছিলে মনে আছে?'

'কিন্তু মুচি অবশেষে আমিই আবিষ্কার করি।'

'তা করেছ।'

'এবং এই রেস্তোরাঁতে বসেই আমরা দুপুরের খাবার খাই।'

'হ্যাঁ। আর আমার মার কাছে মিথ্যে বলতে-বলতে প্রাণান্ত।'

সুধন্যা হাসল।

বকুল বললে, 'খবরদার। ছোটোলোকের মতন হাসবে না।'

সুধন্যা তবু হাসল।

'আমার মতন নিরীহ মেয়ে পেয়ে খুব অত্যাচার চালিয়েছ। আবার বাবুর কী রাগ। পান থেকে চুন খসলেই...'

সুধন্যা গম্ভীর গলায় বললে, 'যে রাগ করে না সে ভালোবাসে না।'

'আহা, কী—ত্রিকালজ্ঞ ঋষি। চলো, এবার উঠবে তো?'

'দাঁড়াও। বিল নিয়ে আসুক।' সুধন্যা হাসল: 'তখন খুব রাগতে পারতাম, তাই না?'

বকুল ভ্যাঙচালো: 'আহা, জানেন না যেন। পশুর মতন তুমি আমার গায়ে হাত তুলেছিলে মনে আছে?'

সুধন্যা বললে, 'ইশ। তাইতো মনে পড়ছে ব্যাপারটা। আচ্ছা, ঠিক কী হয়েছিল?'

'কী আবার? তোমার কাছে পৌঁছতে দেরি করেছিলাম। আমার বন্ধু শীলা, অনেকদিন পর দেখা, আটকে দিয়েছিল, তারপর ও যখন কিছুতেই ছাড়ল না, ওকে নিয়েই তোমার কাছে এসেছিলাম। এই অপরাধ!'

'হ্যাঁ। এবার মনে পড়ছে।' সুধন্যা হাসল: 'কিন্তু কেন অমন রেগে উঠেছিলাম, বলো তো?'

'কেন আবার? রাগলে আমাকে বেশি শাস্তি দেয়া যায়।'

'তাই কি?'

'হ্যাঁ। তোমার মূল্যবান সময় নষ্ট হচ্ছিল। আমাকে নির্জনে পাওয়া যাচ্ছিল না...'

'সবই যখন জানো তখন আমার রাগের কারণ তৈরি করেছিলে কেন?'

'আমি বুঝি শীলাকে ডেকে এনেছিলাম?'

'না, তা নয়। কিন্তু জানো তো সময়গুলো আমাদের কী কষ্ট করে উপার্জন করতে হত।'

'তা শীলা বুঝবে, না কেউ বুঝবে। শুধু শুধু ভুল বোঝাবুঝি সৃষ্টি করা, আর ওদের মনে কষ্ট দেয়া।'

ওরা বেরিয়ে এল রেস্তোরাঁ থেকে।

বকুল তাড়া দিল: 'যথেষ্ট দেরি করে দিলে। মা কী ভাববে।'

সুধন্যা বললে, 'কেনাকাটা করবে না?'

'আজ থাক। ভয়ানক দেরি হয়ে গেছে।'

'এসো। একটা রিকশা করি।'

'এবার সত্যিই আমি রাগ করব। কোনো কান্ডজ্ঞান নেই তোমার।'

বকুলের পিছনে বাসে উঠে পড়ল সুধন্যা।

মা বললেন, 'তোদের দুজনেরি এত দেরি দেখে চিন্তা হচ্ছিল...'

বকুল বললে, 'হ্যাঁ একটু আটকে পড়েছিলাম। খোকা কাঁদছিল নাকি?'

মা হাসলেন। 'না। কাঁদেনি।'

'সকালে সর্দি-সর্দি দেখে গিয়েছিলাম, জ্বরটর হয়নি তো, মা?'

"না। এখন ভালোই আছে। কচি ছেলেদের সর্দিকাশি তো হবেই। বড়দেরই হচ্ছে। কেমন পচা গরম পড়েছে। বোস, তোদের জন্যে চা করি।'

বকুল বললে, 'না মা, এখন চা খাব না। সারাদিনে এতবার চা খেয়েছি।'

মা রাত হবার আগেই চলে গেলেন।

সুধন্যা বাচ্চার কাছে বসে ছিল। তারপর হঠাৎ ভয় পেয়ে সে ডাকল: 'দ্যাখো বাচ্চা কেমন করছে।'

বকুল বাথরুম থেকে হেঁটে এল। 'কী হয়েছে?'

'এই দ্যাখো কেমন হেঁচকি তুলছে।'

বকুল হাসল। 'ও কিছু নয়। বাচ্চাদের অমন হয়।'

'হয় বুঝি?' সুধন্যা আশ্বস্ত হল।

'ওর একটা ওজন নিতে পারলে ভালো হত।'

'ওজন কী হবে?'

'ঠিকমতো বাড়ছে কিনা দেখতে হবে না?'

'এপাড়ায় তো ওজন নেই মনে হচ্ছে।'

'ডাক্তারখানায় আছে। কাল তাড়াতাড়ি ফিরলে নিয়ে যাব।' বকুল রান্না করতে বেরিয়ে গেল।

সুধন্যা বাচ্চার পাশে শুয়ে পড়ল।

'এই, শুনছ?' সুধন্যা আবার ডাকল।

'আমি আসতে পারছিনে। কী বলছ বলো?' বকুল বাইরে থেকে সাড়া দিল।

'বাচ্চার সামনের দিকে চুল হচ্ছে না কেন বলো তো?'

'বোধহয় টাক পড়বে।'

'যা। বাচ্চাদের টাক হয় নাকি? নাপিত ডেকে ওর মাথা মুড়িয়ে দেবো?'

'একে তো নারকেল-মাথা। যা দেখাবে।'

'দেখেছ ওর হাতে-পায়ে কী নখ হয়েছে?'

'কাল কেটে দেবো।'

সুধন্যা আর দরকারি কথা খুঁজে না-পেয়ে হাঁপিয়ে উঠল।

তারপর আরো রাত হল।

রাতের বাকি কাজ সেরে বকুল ফিরল।

'ঘুমিয়ে পড়েছ?'

সুধন্যা উত্তর করল না।

বকুল ঘরের দরজা বন্ধ করল। এই সময়টুকু তার প্রসাধনের জন্যে। বাচ্চা অঘোরে ঘুমোচ্ছে। বকুল দিনান্তের শুকনো কেশরাশি নিয়ে ব্যস্ত হল। চিরুনি দিয়ে চুলের জট ছড়াল। তারপর বিনুনি কেটে আলগা একটা খোঁপা বানিয়ে নিল। মুখটা খসখসে লাগছে। আঙুলে ক্রিম নিয়ে ঘষল। তারপরও অনেকক্ষণ জানালার নীচে দাঁড়িয়ে রইল। একটা উদগত হাই-কে হাতের পাতা দিয়ে আটকাবার ব্যর্থ চেষ্টা করল।

আলো নিবিয়ে দিয়ে বিছানায় এগিয়ে এল বকুল।

'এই, ঘুমিয়েছ নাকি?' আবার হাই তুলল বকুল।

পাশেশোয়া মানুষটা হঠাৎ ঘুমের ঘোরেই পাশ ফিরল, আর বকুল আজ, এই রাত্রে ওকে আর ফিরিয়ে দিল না।

(ছয়)

সিগারেট ফুরিয়ে যাবার কারণেই বোধকরি এই রাত্রে একবার বাইরে যাবার তাড়া বোধ করল সুধন্যা। রাত দশটাও হবে না, অথচ ক্লান্ত হয়ে বাচ্চার পাশে অনেকক্ষণ বকুল ঘুমে কাদার মতন গলে পড়েছে।

সুধন্যর ঘুম আসেনি। আর, ওদের মের চিত্রটা দেখে তার কেমন বিরক্তি গেল। এবং এই বিরক্তি কাটাবার জন্যেই তর থেকে ধূমপানের ইচ্ছেটা প্রবল হয়ে ঠল। অথচ প্যাকেটে একটি সিগারেটও বশিষ্ট নেই। এমন ভুল তার হয় না।

এখন বকুলকে জাগিয়ে যে বাইরে যাবে র উপায় নেই।

অগত্যা দরজায় তালা দিয়ে সুধন্য স্তায় নেমে পড়ল।

মোড়ের দোকানে সিগারেট কিনে তখুনি ন ফিরতে পারত। কিন্তু বাইরের এই রাত্রি ই সুপ্ত গৃহকোণ থেকে অধিক আকর্ষণীয় াধ হল।

সুধন্য সিগারেট ধরিয়ে ধীর পায়ে টিতে লাগল।

এবং এখন এই মুহূর্তে হঠাৎ তার মূহ পারিপার্শ্বিকতাকেই অসহায় অসাড় াগল। যেন স্বাধীনতার ইচ্ছেটাও নিহত য়েছে। বস্তুত কতকগুলি অভ্যাসের সমষ্টি ার জীবনবোধকে আচ্ছন্ন করে রেখেছে। নজেকে মনে হল অভ্যাসের রুটিনে-বাঁধা কটা নির্ভুল ছক। সে চোখ বুজে এই কে নিত্য দাগা বুলোচ্ছে। সকালে উঠে চা াওয়া বাজার করা থেকে সন্ধ্যেয় আপিস থকে বাড়ি ফেরা এবং যা যা দৃশ্যগুলি র পর দেখে যেতে হবে সব মুখস্থ। এই াড়ি-ঘর, বকুল এবং শিশু—কাউকেও আর জ্ঞানে উপলব্ধি করতে হয় না, তারা তার স্তিত্বে শূন্য হয়ে গেছে।

অথচ, এই স্বাভাবিক, এই হয়ে থাকে। র নাম সংসার। এইভাবেই মানুষ বাঁচে। দনন্দিন জীবনধারণের মতনই প্রাচীন এবং বাভাবিক।

তবে মাঝে মাঝে কেন এই ক্লান্তি। একঘেয়েমির জন্যেই কী। সুধন্য কী বৈচিত্র্যের আকাঙ্ক্ষা করে। বৈচিত্র্য! সুধন্য াবে। আমি কী অসুখী, নিজেকে প্রশ্ন রে। না। আমি কী সুখী? আগের প্রশ্নের তন জোর কোনো উত্তর পায় না। তারপর ুখের একটি সংজ্ঞা গড়বার চেষ্টা করে। কুল সুখ, কারণ বকুলকে সে আকাঙ্ক্ষা করেছে। শিশু সুখ, কারণ বকুল সুধন্যর ভালোবাসাকেই রক্তে গ্রহণ করেছে। তাহলে ধন্য তুমি কেন সুখী নয়! আমি সুখী, আমি সুখী......সুধন্য মন্ত্রের মতন উচ্চারণ করে। কিন্তু, তবুও সে কোনো জোর পায় না। বোধহয়, সুধন্য ভাবেঃ সুখ একটা ক্রিয়া, নিজস্ব একটা উদ্যম। তবে কী সুধন্য সে উদ্যম পায় না!

আর রোজ সকালে উঠে কী আপিস থেকে ফেরবার সময় আশা করে, নতুন কিছু একটা হোক। যা রোজ ঘটে না।

কিন্তু নতুন কিছুই হয় না। এমনকি ফেরার পথে গোপন অনেক বাসনা চেষ্টার অভাবেই ফুরিয়ে যায়। সুধন্য বেশ বুঝেছে আজ আর নতুন কিছু ঘটাবার সাধ্য তার আর নেই। এবং একেক সময় হঠাৎ নতুন যা ঘটছে সেখানে তার সক্রিয় ভূমিকা নেই, যেন অন্যের কৃপা করে দেয়া কিছু নতুনত্ব। ফলত, সারাদিন বয়ে-আনা ইচ্ছেগুলো যখন মুমূর্ষু হঠাৎ অন্যের করুণায় সেগুলো দপ করে জ্বলে উঠছে। কিন্তু এই দুর্লভ ঘটনাগুলি কদাচিৎ ঘটে।

উভয়ের মাঝখানে এই তৃতীয় অস্তিত্বটি না এলে পরস্পরের ইচ্ছের কাছে তারা সহজেই ধরা পড়ত। কিন্তু, আজ এই খর্ব অস্তিত্বটুকু পর্বতপ্রমাণ ব্যবধান রচনা করে দিয়েছে। এবং বকুলকে পেতে হলে এই অস্তিত্বকে স্বীকার করেই পেতে হবে।

আশ্চর্য, বকুলের কাছে এই নতুন অস্তিত্ববোধের আলাদা কোনো পীড়ন নেই। সে যেন এই হতে জন্মেছে। যেন এরি জন্যে সে অপেক্ষা করছিল। অথচ, প্রথমে এই দুর্ঘটনায় সে-ই আপত্তি জানিয়েছিল, সুধন্যর মনে পড়ে। নাকি, এই আপত্তিটুকু তার ছলনা।

সুধন্যর মনের বাসনাগুলো জমে-জমে পাথর হয়ে যাচ্ছে। এবং বকুল তার খবর রাখে না, কোনো দায়ও বহন করে না।

তাহলে কী আমি পরিপূর্ণ পিতা হতে পারিনি, সুধন্য নিজেকেই জিজ্ঞাসা করে। বকুল নারীত্ব খসিয়ে স্বাভাবিকভাবেই মা হয়ে গেছে। ওর এই মাতৃত্ববোধ সুধন্যর চৈতন্যে এক বাধা। আজ বকুলকে মাতৃত্বের বাইরে টেনে এনে গ্রহণ করা যাবে না।

একেক সময়ে মনে হয় বকুল শীতল প্রকৃতির মেয়ে। কিন্তু এ ধারণাও পাকা হয় না। কারণ বকুলের কল্যাণে উপার্জন-করা মুহূর্তগুলি তেমন প্রমাণ দেয় না।

এর অর্থ কী সুধন্যর স্বভাবেই এক-ধরনের যৌন-বিহ্বলতা আছে। যৌন-বিহ্বলতা—শব্দটা অত্যন্ত গম্ভীর এবং কুশলী ঠেকল ওর কানে। এও কী এক জাতীয় অভ্যাসের দাসত্ব। নিজেকেই কেমন বোকা-বোকা লাগল। কিন্তু নিজের সম্পর্কে এই অভিযোগ স্বীকার করে না সুধন্য। দিনের সব সময়টা তো এই যৌনতা তাকে আবিল করে রাখে না। আপিসে হাজারো কাজে, সহকর্মীদের সঙ্গে গল্পে, কখনোই তো সে এই চেতনাকে বহন করে না। আরও দশজনের মতনই সে একটি পূর্ণাঙ্গ মানুষ।

অবশ্য অন্য লোকের দাম্পত্য-সম্পর্কের খবর সে রাখে না। তারা কিভাবে জীবনের সবদিক রক্ষা করে চলে জানা নেই।

সুধন্য দরজার তালা খুলে ভেতরে ঢুকল।

ঘরে পা দিয়ে ভেতরের দৃশ্যে তার চিন্তাগুলো আবার জড়সড় হয়ে গেল। বকুল আলুথালু অসাবধানে একইভাবে ঘুমে গলে রয়েছে। কী-বিশ্রী দেখাচ্ছে ওকে। নোংরা, অপরিচ্ছন্ন। আর ঘরময় একটা তেজালো গন্ধ ভারি হয়ে আটকে রয়েছে। বোধহয় ভিজে-ওঠা কাঁথার দুর্গন্ধ। ভিজে কাঁথা-গুলো বিছানার পায়ের দিকে জড়ো-করা।

সুধন্য বকুল কী জুঁইফুলের গন্ধ আকাঙ্ক্ষা করছিল। সে গন্ধগুলো অনেকদিন মরে গেছে। বোধহয় আর কোনোদিন সে-গন্ধ ফিরে পাবে না সুধন্য।

সুধন্য এক গ্লাস জল গড়িয়ে খেল।

আলোটা কী এবার নিবিয়ে দেবে। ঘুম আসছে না। অথচ আলো জ্বালিয়ে রাখবারও সাহস পাচ্ছে না। যদি কখনও বকুল জেগে ওঠে। তাহলে সুধন্যর মার-খাওয়া মুখ দেখে প্রশ্ন করবে। সুধন্যর সে-লজ্জা সহ্য হবে না।

সুধন্য আলো নিবিয়ে দিল।

অন্ধকারটা একটা ভারি মলিন কম্বলের মতন তাকে আষ্টেপৃষ্ঠে জড়িয়ে ধরল। সুধন্য কাপুরুষের মতন সতর্কে শয্যার দিকে গুঁড়ি মেরে এল।

(সাত)

রাত্রি করে সুধন্যকে ফিরতে দেখে বকুল জিজ্ঞেস করলঃ 'এতক্ষণ কোথায় ছিলে?'

সুধন্য জামা খুলতে খুলতে বললে, 'সিনেমায় গিয়েছিলাম।'

'সিনেমা।' বকুল অবাক হলঃ 'আপিস থেকে সোজা সিনেমা।'

'কেন? অন্যায় কিছু করেছি? জবাব-দিহি করতে হবে?'

বকুল চুপ করে গেল।

আর সুধন্য পুনর্বার নিবন্ত বারুদের মতন দমে গেল। যেন তার এই প্রচণ্ড বিদ্রোহের ভূমিকাটা মাঠে মারা গেল। বোবার

শব্দ নেই। এরচেয়ে যদি বকুল কিছু কথা কাটাকাটি করত, ঝগড়া করত, তাহলে মেজাজটা খুলত।

কিন্তু বকুল কোনো দিকে মনোযোগ না দিয়ে বাচ্চার ভিজে ইজেরটা ছাড়াল, তারপর কাঁথা পালটে ওকে শুইয়ে দিল।

সুধন্য সিগারেট ধরাল। পুনরায় মুখ বেঁকিয়ে বললে, 'এবার থেকে এরকমই হবে।'

বকুল জানতে চাইল: 'কী রকম?'

'ফিরতে দেরি হবে।'

'আচ্ছা।' বকুল উঠে বারান্দায় চলে গেল।

'শোনো—চা খাব না।'

বকুল উত্তর করল না।

সুধন্য নিস্পৃহ দার্শনিকের মতন বসে রইল।

বকুল ঘরে ঢুকে বললে, 'বাড়িঅলা এসেছিলেন।'

সুধন্য বললে, 'তার আমি কী করব। ভাড়া দিতে দেরি হবে।'

'ও'র বাড়িতে নাতির অন্নপ্রাশন, তাই...'

'নিমন্ত্রণ করে গেছেন?'

'বোধহয় পরে করবেন।'

'তার মানে ভাড়ার সঙ্গে মাশুলও দিতে হবে।'

বকুল বললে, 'বাচ্চার ফুড ফুরিয়েছে, কালই আনতে হবে—'

সুধন্য কঠিন গলায় জবাব দিল: 'তার জন্যে দিন পনেরো আগে নোটিশ দেয়ার দরকার। তোমাকে কতবার বলেছি চাইলেই ফুড পাওয়া যায় না।'

বকুল বললে, 'তোমাকে সেদিন বলেছিলাম—'

'তা কী করব। আমি তো শ্রুতিধর নই। আজ বেরোবার সময় বলোনি কেন?'

'মনে ছিল না।'

'এখন মনে পড়ে কী লাভ হল।' সুধন্য আবার উঠে জামা গায়ে দিল।

'আবার কোথায় বেরোচ্ছ?'

'আমার শ্রাদ্ধের আয়োজন করতে।' হঠাৎ সাহস করে বকুলের ওপর চোখ রাখতে ভীষণভাবে বেইজ্জত হয়ে পড়ল সুধন্য। 'আরে, এ কী হচ্ছে।'

বকুল মুখ ফেরাল না। শক্ত করে জানালার গরাদ ধরে রইল। চোখ দিয়ে অনর্গল জল ঝরে পড়ছে, দাঁত দিয়ে ঠোঁট কামড়ে রয়েছে। থিরথির করে কাঁপছে ওর শরীর।

'এই, কী হচ্ছে। কে এসে পড়বে।' সুধন্য এই অপ্রত্যাশিত অবস্থায় কী করবে বুঝতে পারে না। 'শুনছ, কান্না থামাও। শোনো, আর কখনো তোমার সঙ্গে এমন ব্যবহার করব না। লক্ষ্মী বকুল।'

বকুল অশ্রুবিকৃত স্বরে বললে, 'আমাকে শাস্তি দাও, আঘাত করো আমি কিছু বলব না। কিন্তু একফোঁটা শিশুকে খোঁটা দিলে সে আমার সহ্য হবে না—'

সুধন্য বিপন্ন গলায় বললে, 'আহা, একে খোঁটা দিলাম কখন। এই, কান্না থামাও, যা যদি এসে পড়েন।'

বকুল বললে, 'আসুন। দেখুন।'

'না। কী ভাববেন।'

'তুমি ব্যস্ত হয়ো না। কান্নার দাগ আপনিতেই মুছে যাবে। কান্নারও তো শেষ আছে। চলো। রাত হয়েছে। তোমার খিদেও পেয়েছে। সারাদিন কিছুই খাওনি।'

ওরা খেতে বসল।

বকুল বললে 'বাড়ি করো। শরীর খারাপ কোরো না।'

সুধনা নীরবে খেতে লাগল।

'তুমি আজকাল এমন রাগ করছ, আমার ভয় করে। রাগ করে বাইরে থাকলে তো আমি নাগাল পাব না। রাগ করেছ সেটা আমি না বুঝতে পারলে রাগের মানে কী। আগে তুমি এমন করতে না।' বকুলকে অনেক শান্ত, নিরীহ দেখাচ্ছে: 'এই যে রাগ করে সারাদিন খেলে না তাতে আমার কী উপকার হল।'

সুধন্য কোনো উত্তর করল না।

বকুল আবার বললে, 'না, তুমি রাগ করেছ বলে যে তোমাকে আমি ভুল বুঝছি তা নয়। জানি: এই রাগগুলোই তোমার ভালোবাসা। আমি বুঝতে পারি তোমাকে যতটুকু সার্ভিস দেয়ার দরকার আমি তা পারিনে। তার অর্থ এই নয় যে আমি দিতে চাইনে, আমার শক্তি-সামর্থ্যে কুলোচ্ছে না।'

সুধন্য এবারও চুপ।

'তোমাকে একটা রুটি দিই।' বকুল একটু ঝুঁকে বললে, 'আমাকে এত বুঝেও তুমি যদি এমন করো, আমার খুব খারাপ লাগে। কেন বোঝো না, তোমাকে অবহেলা করে আমার কী লাভ।'

সুধন্য খাওয়া শেষ করে উঠে পড়ল।

ঘরে ফিরে এসে তার অপরিসীম ক্লান্তি বোধ হতে লাগল। মনে হল সে যেন দেহে-মনে ফতুর হয়ে যাচ্ছে। একটা গুরুতর মনঃপীড়া তাকে আতুর করে রাখল। নিজেকে কলংকিত, বিধ্বস্ত বোধ হতে লাগল। আমি ছোটো হয়ে গেছি, সুধন্য গভীর নিশ্বাস ফেলে ভাবল। বকুল তার কল্পিত রাগের কারণগুলি বুঝতে পেরেছে। সে কারণগুলি বিশ্লেষণ করতে বসলে সুধন্য হতাশা বোধ করে। এবং সমস্ত বিষয়টিই লজ্জাকর ঠেকে। সমস্ত অভিযোগ সুধন্যর দৃষ্টিভঙ্গিতে রচনা করা। অথচ সে কোনোদিন বকুলের দৃষ্টিভঙ্গিতে সেগুলি যাচাই করেনি। বকুলেরও কিছু বলবার থাকতে পারে, সেও তেমনি প্রচুর অভিযোগ হানতে পারে। বস্তুত সুধন্য বকুলের দেহ-মনের কথা চেষ্টা করে ভাবেনি। মা হওয়ার পর বকুলের একটা টনিক খাওয়ার কথা ছিল, দু-এক বোতলের পর সে-টনিক আর কেনা হয়নি। অর্থাভাবের কারণটা অবশ্যই রয়েছে। কিন্তু কোনোদিন ওর শরীরের খবরে তার মাথাব্যথা হয়নি। এই নয় যে বকুল অভিযোগ করেছে। কিন্তু স্বামী হিসেবে তার একটা দায়িত্ব আছে। সুধন্য কী সে দায়িত্ব পালন করেছে? করেনি।

সুধন্য দ্বিধান্বিত হল। তাহলে কী সত্যিই বকুলকে সে ভালোবাসে না। সুধন্যর সংশয় জাগে। ভালোবাসা কী! সুধন্য তাহলে কী ভালোবাসে? ভালোবাসায় [illegible] কী বকুলগুলি পরস্পরকে কাছে টেনে রেখেছে। বকুলের চোখ-মুখ, সর্বশরীর তার সামনে দুলে ওঠে। এবং আশ্চর্য, আলাপের প্রথম দিন থেকে বকুলের পরিচ্ছন্ন সুস্পষ্ট মেয়েলি শরীরটাই তার চেতনায় গেঁথে গিয়েছিল। এই নয় যে বকুল সুন্দরী। কিন্তু ওর চোখের ঘন পল্লব, লম্বা গ্রীবা, ঠোঁটের ধনুক, এবং ভারি স্তন, তার কাছে আনন্দ ও উত্তেজনার প্রেরণা জুগিয়েছিল। সুধন্য এগুলি স্বীকার করতে লজ্জা করে না। কারণ এগুলির মাধ্যমেই বকুলের মনের আলো উত্তাপ-স্পন্দন-সুরভি ছড়াত। বকুলের শরীর এখনো তেমন আছে। কিন্তু সে-শরীর পরিণত হয়ে ফুল থেকে ফল হয়ে আরো প্রগাঢ় হয়েছে। বকুল আরো সুন্দর হয়েছে, আরো পরিচ্ছন্ন। এবং কেন জানি ওর আকর্ষণ আরো তীব্র হয়ে উঠেছে সুধন্যর কাছে।

বকুল কী জানে না সুধন্যর অস্তিত্বের কাছে সে এখন কত অপরিহার্য। এই তীব্রতা বকুলই বাড়িয়েছে। ওর কল্যাণে-পাওয়া সেই সকল সান্নিধ্যের মুহূর্তগুলিতে সে কী সুধনার প্রজ্জ্বলন্ত বাসনাগুলিকে ধরতে পারে না!

এর নাম কী লোভ, প্রবৃত্তিবিশেষের দাসত্ব, সুধন্য আবার প্রকাণ্ড ধাঁধার ভেতরে আটকে পড়ে। কিন্তু একে বাদ দিয়ে জীবনের আর কী আছে। বেঁচে থাকার উদ্দেশ্যই হচ্ছে আনন্দে অবগাহন। জীবন-ধারণ ক্রমশ একটা বোঝার মতন জীবনকে নীরস এবং রুক্ষ করে তুলেছে। এর থেকে মুক্তি চাই, এই দেহ-মনের সীমা ভেঙে অসীম আনন্দকে নিকিয়ে নিতে চাই: সুধন্য ভাবে: বাইরের এই রুক্ষ পৃথিবীটা ধীরে ধীরে সমস্ত দরজা বন্ধ করে দিচ্ছে, আর ক্রমশ নিষ্পিষ্ট, কোণঠাসা হয়ে পড়ছি। এমন একটা জায়গা দরকার যেখানে সে পরিপূর্ণ জীবন্ত মানুষ হতে পারবে, যেখানে তার সর্বপ্রকারের মুক্তি। বকুল সেই আশ্রয়, সেই বিশ্বাস, যে যুগ্মসত্তায় বাইরের পাঁচিলগুলো ভেঙে গুঁড়িয়ে পড়ে। এমনভাবে মনুষ্যের সর্বাঙ্গীণ আত্মপ্রকাশ আর কখনো ঘটে না।

বকুলের আহ্বানে সুধন্যর চিন্তাগুলো ছিঁড়েখুঁড়ে গেল।

'জল না খেয়ে উঠে পড়েছ। জল নাও।'

সুধন্য ঢকঢক করে জল খেল।

বকুল জিজ্ঞেস করল: 'কাল তোমাদের ছুটি?'

'কেন?'

'জগদ্ধাত্রী পুজো।'

'না। আমাদের ছুটি নেই।'

বকুল ঝিনুক-বাটি নিয়ে বাচ্চাকে খাওয়াতে বসল।

'আজ তোমার জন্যে ওর খেতে দেরি হয়ে গেল।'

সুধন্য বললে, 'কেন?'

'তুমি ফিরছ না। বুঝতে পারিনি কত রাত্তির হয়েছে।'

সুধন্য সিগারেট ধরাল।

বকুল বললে, 'কী সিনেমা দেখবে?'

'মেট্রোতে। হিচককের বই।'

'বাচ্চার একটা দাঁত উঠেছে, দেখেছ ?'

সুধন্যা ওর পাকা গিন্নির মতন দুধ খাওয়ানো দেখছিল।

'মা বলছিলেন, এখনো ওর একটা নামকরণ হল না...'

সুধন্যা এবার আস্তে হাসল। 'নামের এখন দরকার কী। ইস্কুলে ভরতি করার সময় দরকার হবে।'

'তোমার মতন কুঁড়ে দুটো দেখিনি। একটা ভালো নামও ভেবে উঠতে পারলে না।'

'একদিন তো দুজনে ভাবতে বসেছিলাম। আমি যা বলি কোনোটাই তোমার পছন্দ নয়।'

'ছাই। পছন্দ হবে কেন? কষ্ট করেছি আমি, তোমার কী, একটা যাতা নাম দিয়েই খালাস। দেখ তো অনিমাদি ছেলের কী সুন্দর নাম রেখেছে।'

'তাহলে অনিমাদিকেই বলো—'

'মা অবশ্য ওকে শানু বলে ডাকেন।'

'শানু। মানে কী হল?'

'মানে আবার কী। শুনতে মিষ্টি হলেই হল।'

'দেখো আবার পিঁপড়ে না ধরে যা মিষ্টি...'

বকুল বাচ্চাকে বিছানায় শুইয়ে দিল।

তারপর উঠে এল জানালার ধারে। তার নিত্যকার কেশপরিচর্যা।

সুধন্যা বিছানায় আরাম করে হাত-পা ছড়িয়ে শুল।

বকুল বললে, 'মনে হচ্ছে ঘুমের আয়োজন করছ।'

সুধন্যা বললো, 'আজ্ঞে হ্যাঁ। কাল অফিস আছে।'

'বা-বা।' বকুল ভ্রূ নাচালো। 'আবার হেসে আছে। যেন আমরা তোমাদের ছুটি কেটে নিয়েছি।' বকুল বিছানার দিকে এগোল। 'এই, সত্যি তোমার ঘুম পেয়েছে? এই...'

'বিরক্ত কোরো না। ঘুমোতে দাও।'

'আমার একটুও ঘুম পায়নি।'

'দয়া করে আলোটা নিবিয়ে দাও। আমার চোখে লাগছে।'

না না। অন্ধকারে আমি ভূতের মতন বসে থাকতে পারব না।'

বাইরে রাত্রির রাস্তা দিয়ে ফেরিঅলা হেঁকে গেল: 'বেলফুল...'

'এই, বেলফুল কিনে দেবে? বকুল ওর গলা জড়িয়ে চটুল ভঙ্গিতে বললো।

'ইয়ারকি হচ্ছে? সরে শোও।'

ও ভুলে গিয়েছিলাম, তুমি আমার পতি পরম গুরু।'

'সরে শোও। আর আলোটা নিবিয়ে দাও।'

বকুল ওর বুকে মুখ ঘষতে লাগল। তারপর নাক দিয়ে বললো, 'একটু পাউডার মেখে আসতে পারলে না? কী বিশ্রী ঘামের গন্ধ।'

সুধন্য বললে, 'জীবন অনুশাসন করছ। যত ভালো হবে না।'

'কী, জানো? ও আমার অভ্যেস আছে।'

'আচ্ছা, কী চাও তুমি? কেন এমন করছ?'

'চাই। তোমাকে। আমার এই যৌবন ঘৃত-প্রদীপ জ্বালিয়ে দেবতার পায়ে নিবেদন করতে চাই।'

'ঘুষ দিতে চাও?'

'হ্যাঁ। প্রভু। আমার আর কী ঐশ্বর্য আছে। গ্রহণ করে দাসীকে কৃতার্থ করুন।'

বাচ্চাটা ট্যাঁ করে উঠল।

বকুল হেসে উঠল। 'দেখলে তো শুভ কাজে কত ব্যাঘাত।'

বকুল বাচ্চাকে বুকে টেনে নিল। ক্ষুদে রাক্ষস সর্বগ্রাসী হাঁ দিয়ে মাকে আত্মসাৎ করল।

সুধন্য উঠে বাইরে গেল। ফিরে এসে দেখল বকুল বাচ্চাকে বিছানায় আবার শুইয়ে দিয়েছে। সুধন্য ঘরের দরজা বন্ধ করে আলো নিবিয়ে দিল।

(আট)

মাসের শেষদিনগুলিতে অন্ধকার নিরেট হয়ে আসে। সারা মাস অংক করে-করে শেষের দিকে শূন্য হিসেব করতে হয়। আর, সর্বগ্রাসী দাঁত-বার-করা অভাবের সামনে যেন অক্ষম হয়ে যায় সুধন্য। দিনের পর দিন বাজারে আগুন লেগে যাবতীয় প্রয়োজনীয় জিনিস খাক হয়ে যায়। সুধন্য কয়েক বছরেও এমন বাজার দেখেনি। তাদের মতন ছাপোষা লোক কী করে সংসার চালায়। তারা কী দড়ির খেলা জানে!

রোজগার বাড়াতে হবে। রজতের কাছে কয়েকবার যাবার ইচ্ছে হয়েছিল। পারেনি। কেমন যেন ওর সঙ্গে মেলে না। মনে হয় ও ওর সমস্যাগুলো বুঝতে পারে না, পারলেও পাশ কাটিয়ে যাবার কৌশল জানে।

একটা জিনিস লক্ষ্য করেছে সুধন্য এই বীভৎস বাজারের অবস্থাতেও কোনো জিনিস পড়ে থাকে না। যত দাম হাঁকুক, জিনিস সব বিক্রী হয়ে যায়। তাহলে দেশের আর্থিক পরিস্থিতি খারাপ কোথায়।

আমি কী বড়লোক হতে চাই, সুধন্য নিজেকে প্রশ্ন করল: না, তা নয়। তাহলে প্রথম থেকেই তাকে বড় চিন্তা করতে হত। বোধহয় প্রত্যেক মানুষের হাতে নিজস্ব একটি দর্পণ থাকে, সেই দর্পণেই তার জীবন-আকৃতি ধরা পড়ে। সুধন্যার দর্পণটি ছোটো। বড়লোক হওয়ার চাইতে সে একটি সুন্দর সুখের ছবি দেখেছিল। সে সুখের জন্যে আর অন্যদিকে মনোযোগ দেয়া সম্ভব হয়নি।

বকুল সেই সুখের প্রতিকৃতি। এবং সে যখন এই বকুল-নামক সুখের পিছনে জীবন ব্যয় করেছে সেই সময় রজত আর পূর্ণেন্দু ক্লাইভ স্ট্রীট আর ডালহৌসির পুকুরে পরম ধৈর্যে ছিপ নিয়ে বসেছে।

আশ্চর্য, এই দারিদ্র্যের বোধ বকুলকে পীড়ন করে না। হয় সে একে মেনে নিয়েছে অথবা প্রতিবাদের আগ্রহই নষ্ট হয়ে গেছে। বকুলের সঙ্গে এ বিষয়ে অনেকবার তর্ক হয়েছে। ও হেসে উড়িয়ে দিয়েছে। বলে: 'আমাদের তো তবু কিছু আছে, অনেকের তাও নেই।' এ-যুক্তি ব্যর্থ মানুষের, সুধন্যার ভালো লাগেনি। বস্তুত বিয়ের পর বকুলের জন্যে এক জোড়া শাড়িও সে কিনে দিতে পারেনি। ইচ্ছেগুলো বহুবার হৃদয়ের মধ্যে ঘুমিয়ে পড়েছে। বকুল অবশ্য উড়িয়ে
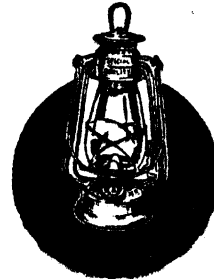
দেবার ভঙ্গিতে বলেঃ 'থাক! তোমাকে আর স্বামীগিরি ফলাতে হবে না। তুমি নিজে কোনোদিন শাড়ি-কাপড় কেনাকেটা করেছ? মশায়, আমি তো আর নগ্ন হয়ে বেরোচ্ছি না।' সুধন্য মন খারাপ করেছে, আর ওই মন-খারাপ-করাটাকেই সে তার পৌরুষের সান্ত্বনা হিসেবে মনে করেছে। বকুল কিছু চায় না এইটেই যেন তার আশ্বস্ত হবার কারণ। কিন্তু খুব খারাপ লাগে যখন বকুল কারুর বিয়েটিয়েতে আটপৌরে শাড়ি পরে বেরোয়। মধ্যবিত্ত মেয়েদের ঘরেও অন্তত একখানা মুর্শিদাবাদী সিল্ক থাকে। বকুলের নেই। এমন কি বিয়ের রেজিস্ট্রেশনের দিনেও সে একখানা কোরা তাঁতের শাড়ি পরে গিয়েছিল। বকুল কতবার তাকে বুঝিয়েছেঃ 'অভাব আছে সেটা তো অস্বীকার করা যাবে না। দিনের পর দিন আরো হয়তো খারাপ অবস্থায় পড়তে হবে। কিন্তু এসব কথা ভেবে আমাদের যেটুকু সুখ-শান্তি আছে তাকে নষ্ট করে কী লাভ।' সুধন্য মুখ গোঁজ করে বলেঃ 'অভাবের চেতনাটুকু হারিয়ে গেলে তাকে দূর করবার চেষ্টাও নষ্ট হবে।' বকুল বলেঃ 'চিন্তা করে তুমি অভাব দূর করতে পারো? পারো না। তাহলে যেটুকু শান্তি আছে তাই আঁকড়ে ধরিনে কেন? আমার তুমি আছ, খোকন আছে, অনেকের যে তাও নেই।' বকুলের সঙ্গে তর্ক করা বৃথা। হয় সে ছেলেমানুষ নতুবা পাগল।

কিন্তু, সুধন্যর অক্ষম স্বামিত্ব ধিক্কৃত হয়। সুধন্য হীনমন্যতা বোধ করে। বকুল খুনসুটি করে, খেপায়। বলেঃ 'কী আমার স্বামী রে! আমি তোমাকে কখনোই স্বামী ভাবিনে। তুমি আমার সুধন্য, আমার প্রেমিক, আমার সঙ্গী, আমার বন্ধু। ব্যাস, তাহলে তো আর তোমার কোনো দায় নেই?' তারপর ওকে আলুথালু করে দিয়ে শান্ত গলায় বলেঃ 'দ্যাখো মহারাজ, আজকাল আর মেয়েরা স্বামী চায় না, কারণ মা-ঠাকুমার কাল থেকে অনেক স্বামী তারা দেখেছে। সংসারটা যখন একার নয় তখন স্বামী নামক জীবটির ওপর কেন বোঝা চাপিয়ে দেবো? স্বামীর হাতে তো আলাদিনের প্রদীপ নেই। কাজেই কপালগুণে যে পুরুষটিকে পেয়েছি তারি সঙ্গে কাঁধ মিলিয়ে সংসারে খাটতে চাই। অবশ্য ভাগ্যে থাকলে হাজার টাকা রোজগারের স্বামী জুটতে পারত, কিন্তু কে বলতে পারে সেখানে হয়তো দাসী-বাঁদি হয়ে জীবন কাটাতে হত।'

সুধন্য বলেঃ 'আমরা না হয় বুঝতে পারলাম। কিন্তু খোকন, সে মেনে নেবে কেন?'

বকুল হেসে বলেঃ 'নেবে। না মানে চেষ্টা করুক। আমরা এর বেশি পারিনি বলে নিশ্চয়ই বাপ-মাকে দোষারোপ করবে না।'

সুধন্য চুপ করে যায়। কিন্তু চোখের থেকে পুরু অন্ধকারটা দূরে হয় না। আর গভীর ভাবে চিন্তা করতে করতে তার একসময় মনে হয়ঃ এই মানুষের জীবন। দুঃখের কাঁথায় ফুল-তোলা। আশ্চর্য, এই দুঃখগুলি বিয়ের আগেও ছিল, কিন্তু তখন এগুলি এক জাতীয় রোমান্সের জন্ম দিত। কিন্তু এখন দুঃখগুলি বৃহৎ হয়েছে, বিশদ হয়েছে। এবং একা যা সহনীয় ছিল এখন সংসারের আবর্তে তা দুঃসহ লাগে। যেহেতু দাম্পত্য একটা দায়িত্ববোধ। এই দায়িত্ব পুরুষেরই।

বকুলকে একথা বললে সে নির্ঘাত উড়িয়ে দেবে। বলবেঃ 'আগুন যখন জ্বলে তখন পুরুষ-মেয়ে বলে কী কাউকে রেহাই দেয়।'

সুধন্য অগত্যা বকুলকে না জানিয়েই সন্ধ্যেয় একটি টিউশানি জোগাড় করে নিল। সপ্তাহে তিন দিন। যা তিরিশ টাকা পাওয়া যায়, সংসারের অনেক স্বাচ্ছন্দ্য।

বকুল যেদিন জানতে পারল প্রচুর রাগ করল। কিন্তু সুধন্যর মনের কথা ভেবেই সে আর কিছু বললে না। অধিকন্তু খুশি হল বাজে চিন্তা করে মন খারাপ করবার অবকাশ সুধন্য কম পাবে।

ব্যান্ডেজ-বাঁধা জীবন খুঁড়িয়ে এগিয়ে চলে।

এবং নিশ্চয়ই এই জীবন সুন্দর নয়। একটা ঊর্ধ্বশ্বাস উত্তেজনার ঘোরে সুধন্য দৌড়ে চলে। দৌড়নোর একটা সুবিধে এই পিছনের ভয়গুলো জড় হয়ে গোল পাকাতে পারে না। সন্ধ্যে উৎরে অবশচেতনায় ক্লান্ত হয়ে বাড়ি ফেরে সুধন্য। তারপর রাত্রে পাথরের মতন ঘুম।

আর, ওর এই ঘুমন্ত মুখের আকৃতি দেখে মায়া হয় বকুলের; যেন জননীর মতন এই অবুঝ, একরোখা, জেদী সন্তানটিকে সর্বশরীর দিয়ে আগলে রাখবার ইচ্ছে হয়।

কিন্তু বেশিদিন এই সস্নেহ ভাবটি বজায় থাকে না বকুলের।

সুধন্য সমস্ত জীবনধারণটাকে জীবন-ধারণের অন্ধকূপে আটকে রেখে কেবল আর্থিকতাকে একরোখা প্রশ্রয় দিতে লাগল। তার সমূহ চিন্তা বর্তুল টাকার আকার নিয়ে অন্য-সম্পর্ককে ঢেকে ফেলেছে। আপিসে যাচ্ছে কাপড়ের ব্যাগ নিয়ে, তেলের শিশি নিয়ে। আর, রাস্তার এখানে-সেখানে তেলের খবর, চিনির খবর পেলে, আপিস যাওয়া মাথায় থাক, লাইনে দাঁড়িয়ে সংগ্রহ করছে। এবং বাড়িতে ফিরে যেন কলম্বাসের আমেরিকা আবিষ্কারের মতন তার সগৌরব ব্যাখ্যান। প্রথম-প্রথম ওর এই ওস্তাদিগুলি মন দিয়ে শুনেছে বকুল। কিন্তু ক্রমান্বয়ে যখন এইগুলিই তার কাছে সানন্দ আলোচনার প্রধান বিষয়বস্তু হয়ে উঠল তখন আঘাত পেয়েছে বকুল। কারণ এই সমস্ত অভিযান স্থায়ী আন্তরিক বিশ্বাসের গলায় বলে ওঠে সুধন্য। এইগুলিই তার কাছে সত্য এবং স্বাভাবিক।

বকুল কখনোই এ চায়নি। কারণ স্বভাবত ভীরু, দুর্বল, শান্তিপ্রিয় সুধন্যকে সহজ চেনাব্যক্তি মনে হয়। কিন্তু ইদানীং তার এই ভীরুতা ঢাকবার জন্যে যে-উৎসাহে সে মেতে উঠেছে সেগুলোও একধরনের ভীরুতা বইকি। দেশে আরো দশটা অভাবী মানুষ আছে, তাদেরও সংসার করতে হয়। এই দশজন মানুষের ভাগ্য থেকে নিজেদের আলাদা করে দেখবার কোনো মানে নেই। সুধন্য কেন সে কথাটা বোঝে না। না-বুঝে সে যেন জীবনধারণের বিষয়টা নিয়ে কেমন জুয়োখেলায় মেতে উঠেছে। ভয় হয় এই নেশা তাকে অস্বাভাবিক খ্যাপাটে করে তুলবে।

বকুল অবশেষে গম্ভীর হয়ে গেল।

সুধন্য এই গাম্ভীর্যের কারণ অনুধাবন না করে নিজের আনন্দে এক নাগাড়ে বকে চলল। এক শিশি তেল সংগ্রহ করতে কী ধরনের কসরত করতে হয়েছে, ঘটনাস্থলে মজাদার কী ঘটনা ঘটেছে, ইত্যাদি বর্ণনা-প্রসঙ্গে তার অনুমাত্র ক্লান্তি নেই।

বকুল মুখ বুজে চা নিয়ে আসে।

চায়ের কাপ হাতে নিয়ে সুধন্য তখনো গোপন প্রেমালাপের ভঙ্গিতে বলেঃ 'জানো, কাল বেনেপুকুর বাজারে মুগের ডাল দেবে খবর পেয়েছি। খুব ভোরে আমি বেরিয়ে যাব।'

বকুল বলে : 'চা ঠান্ডা হয়ে গেল।'

'হ্যাঁ। এই যে।' সুধন্য শব্দ করে চায়ে চুমুক দেয়ঃ 'এই কলকাতা শহরে সব জিনিসই পাওয়া যায়। কেবল ঠিক-ঠিক খবর-রাখা। আমাদের আপিসের বেয়ারা নিরাপদ, সেই চুপিচুপি খবরটা দিলে আমাকে।'

বকুল রান্না করতে চলে গেল।

রাত্রের কাজ সেরে বকুল যখন বিছানায় উঠে এল, অবাক হল। সুধন্য আজ ঘুমোয়নি।

হঠাৎ পাশ ফিরে সুধন্য বকুলের সান্নিধ্যে ঘন হয়ে এল।

বকুল বললে, 'না।'

'কী হল?' সুধন্যর কণ্ঠস্বর মোটা ও ফাঁসা শোনাল।

'ভাল লাগছে না।'

'ধ্যেৎ।'

বকুলের ভালো-না-লাগাকে দুহাতে সরিয়ে দিয়ে সুধন্য পরিচিত অভ্যাসের সোপানগুলি অতিক্রম করে চলল।

বকুল দাঁতে-দাঁত এঁটে পড়ে আছে। তার চোখ ফেটে যেন জ্বালা করছে। এবং আকণ্ঠ ঘৃণার মতন একটা অনুভূতিতে সে কুঁকড়ে কাঠ হয়ে গেছে।

অনেক রাত্রে বাচ্চাকে স্তন দিতে দিতে বকুল অপমানিতা মানবীর মতন নিঃশব্দে কাঁদছিল। (আগামী বারে সমাপ্য)

ল্যাংস্টন হিউজ

গণেশ বসু

কালো মানুষের কালো হয়ে জন্মাবার গর্ব নিয়ে এই শতকেই যে নতুন ধরনের নিগ্রো আন্দোলন শুরু হয়েছিল, তার প্রথম সারিতে সব সময়েই হাজির ছিলেন ল্যাংস্টন হিউজ। সেই নিগ্রো অগ্রগতির এই প্রতীক সম্প্রতি বিদায় নিয়েছেন। বয়স হয়েছিল মাত্র ৬৫ বছর।

প্রখ্যাত কবি-সমালোচক স্টার্লিং ব্রাউন একবার বলেছিলেন, নিগ্রোদের জীবনের অভিজ্ঞতা নিয়ে নিগ্রো লেখকেরা যে সাহিত্য সৃষ্টি করেন তা নানা দিক থেকেই বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ এবং বৈচিত্র্যময়। একে সব সময়েই আলাদা দৃষ্টিকোণ থেকে যাচাই করা দরকার। সামাজিক বাস্তব অবস্থার এমন উজ্জ্বল ছবি নিশ্চয়ই আর কোন সাহিত্যে তেমন নেই। ল্যাংস্টন হিউজের রচনা এই উক্তির সার্থক নজির।

সত্যি কথা বলতে নিগ্রো নবজাগরণ শুরু হয় একটি কবিতার বই বেরুনোর সঙ্গে সঙ্গে। সেটা ১৯২২ সাল। ক্লড ম্যাককে প্রকাশ করলেন 'হারলেম শ্যাডো'স। এর মধ্যেকার তিনটি সনেট দারুণ প্রভাব ফেলল নিগ্রোদের উপর। 'যদি আমরা মারা যাই', 'হোয়াইট হাউসেস' এবং 'লিংগারদের প্রতি' নিয়ে এল নতুন চিন্তার খোরাক, চাঞ্চল্য দেখা গেল নিগ্রোদের সঙ্গে সঙ্গে সাদা মানুষগুলোর মধ্যে। হাওয়া বদল হতে শুরু করল। কেমন যেন ওলোট পালোট হয়ে যেতে লাগল সব। নতুন খাতে বইতে শুরু করল নিগ্রো সাহিত্য। যখন এই চিন্তার তরঙ্গে গোটা মার্কিনী সমাজ দারুণ আলোড়িত, ঠিক সেই সময়ে আসরে হাজির হলেন ল্যাংস্টন হিউজ। সেটা ১৯২৬ সাল। বের করলেন কার্ল ভ্যান ভেসটনের একটি সুচিন্তিত মূল্যবান ভূমিকা সম্বলিত কাব্য-গ্রন্থ। দি ওয়েরি ব্লু। প্রথম আবির্ভাবেই দিলেন সকলকে হকচকিয়ে। ঘোর কাটতে না কাটতেই বোঝা গেল ল্যাংস্টনের হাতে তলোয়ারের মত ঝলসে উঠেছে লেখনী।

বড় বিচিত্র জীবনের অধিকারী ল্যাংস্টন হিউজ। জন্মেছিলেন ১৯০২ সালের ১লা ফেব্রুয়ারী মিশৌরি রাজ্যের জপলিন শহরে। তাঁর মা ছিলেন স্কুল শিক্ষিকা আর বাবা কাজ করতেন একটি ছোটখাট দোকানে। কিন্তু তাঁদের জীবন কোন দিনই সুখের হয় নি। তাঁর বাবা ও মার মধ্যে সম্পর্কে দেখা দিল ফাটল ধরেছিল। নানারকম ঝুট-ঝামেলা আর অবিশ্বাস মাথা চাড়া দিচ্ছিল প্রায় রোজই। ফলে একদিন তাঁদের দাঁড়াতে হল বিচ্ছেদের মুখোমুখি। ছাড়াছাড়ি হয়ে গেল মহা ফাঁপরে পড়লেন কিশোর ল্যাংস্টন হিউজ। দোটানার ভেতরে থেকে নিজেকে সামলে দিতে পারলেন না। চলে এলেন বাবার কাছে মেক্সিকোতে। সেটা ১৯১৯ সাল। এখানে বলে রাখা ভাল, ছোটবেলা থেকেই কবিতা লেখার নেশা চেপেছিল তাঁর। একজন নিগ্রো প্রেমিক শ্বেতাঙ্গ কবি কার্ল স্যান্ডবার্গের অনুকরণে তাঁর সাহিত্যচর্চা চলছিল। স্কুল ম্যাগাজিনে বেরিয়েছিল গোটা কয়েক কবিতা। এর পর কেটে গেল বেশ কিছু-কাল। অবশেষে একদিন তাঁর বাবা অনেক কষ্ট সহ্য করেও ছেলেকে লেখাপড়া শিখতে উৎসাহ দিলেন। নিউইয়র্ক সিটির কলম্বিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তি করিয়ে দিলেন একটি বছর খরচ জোটালেন বাবা। কিন্তু ছেলের মন আর তা চাইল না। পয়সার ধান্ধা এল মাথায়। কাজ খুঁজতে লাগলেন। গোটা নিউইয়র্ক শহরটা চষে ফেললেন। কিন্তু কোন সুরাহা হল না। এর পর একদিন পাড়ি জমালেন আটলান্টিক মহাসাগরে, আফ্রিকার উদ্দেশে। জাহাজে খালাসীর কাজ নিয়েই শুরু হল তাঁর নতুন জীবন। জাহাজটি নানা জায়গা ঘুরতে ঘুরতে এসে ভিড়ল প্যারিসে। সেখানে এক হোটেলে এবার বাসন-কোসন ধোওয়ার কাজ করে একটি বছর কাটিয়ে দেন

ল্যাংস্টন হিউজ

অনায়াসে। এবং বাড়ি ফেরার আগে কয়েক মাস ইতালিতেও কাটিয়ে এলেন। দেশে ফিরে ওয়াশিংটনের ওয়ার্ডম্যান পার্ক হোটেলে পরিচারকের কাজ করলেন কিছু দিন। এই সময়েই তাঁর ভাগ্য খুলে গেল। সেখানে এক রাতে খেতে এলেন আমেরিকার প্রখ্যাত বর্ষীয়ান কবি লিন্ডসে। হিউজের উপরই ভার পড়ল তাঁর টেবিলে খাবার-দাবার সরবরাহের। অগত্যা অনামী তরুণ কবি হিউজের মনে এল—সঙ্গে সঙ্গে সংকোচও এসেছিল—কয়েকটি কবিতা এই কবির হাতে তুলে দিলে কেমন হয়। হিউজ খাবারের প্লেটের পাশে তাঁর তিনটি কবিতা রেখে এলেন। বর্ষীয়ান কবি লিন্ডসে এই তরুণ লেখকের কবিতা পড়ে মুগ্ধ হলেন এবং ঐ রাতেই একটি সাহিত্যের আসরে কবিতা তিনটি পড়ে শোনালেন। পরদিন সকাল-বেলার খবরের কাগজে হৈ-চৈ পড়ে গেল। লিন্ডসের এক নতুন কবি আবিষ্কারের কাহিনী ফলাও করে প্রচার করা হল।

হিউজের নাম চারদিকে ছড়িয়ে পড়ল। এ **১৯২৪ সালেরই কথা।**

মিঃ হিউজ এ প্রসঙ্গে বলেন, সাহিত্যের আসরে আসন পাবার জন্যে আমার খুব একটা সংগ্রাম করতে হয় নি। এ বিষয়ে আমি ভাগ্যবান।

সে বছরেই তাঁর 'দি ওয়েরি ব্লু' বেরোয়। ফলে ব্যক্তিগত জীবনেও তিনি কিছু লাভ করলেন। এক ধনী মহিলার সঙ্গে তাঁর পরিচয় হল। ধীরে ধীরে সেই আলাপ ঘনিষ্ঠতর হয়ে উঠল। হিউজের মুখে শুনলেন তাঁর ফেলে-আসা জীবনের করুণ ইতিহাস। এ'রই দৌলতে তিনি আবার কলেজে ঢুকলেন। পেনসিলভ্যানিয়ার লিঙ্কন বিশ্ববিদ্যালয় থেকে স্নাতক হলেন ১৯২৯ সালে। শুরু হল

এরপর লেখক হিসেবে নতুন জীবনযাপন। বলা বাহুল্য দ্বিতীয়বার কলেজে পড়বার জন্যে লিণ্ডসের উপদেশ খুব কাজ করেছিল।

তার পরেই চলল নিত্য নতুন সৃষ্টি গল্প, উপন্যাস, কবিতা। নট উই দাউট লাফটার; দি ওয়েজ অব হোয়াইট ফক্স; শেক্সপীয়র ইন হার্লেম; এবং জে সি বি সিম্পল নামে জনৈক ব্যক্তিকে প্রধান নায়ক করে তিনখানি উপন্যাসের মত কালজয়ী সাহিত্য রচিত হল। দি ফার্স্ট বুক অব জাজ; দি ফার্স্ট বুক অব ওয়েস্ট ইণ্ডিজ, দি ফার্স্ট বুক অব আফ্রিকা নামে শিশুদের জন্যেও বহু গ্রন্থ রচনা করলেন। তারপর তৈরি হল—ফেমাস নিগ্রো মিউজিক মেকারস এবং ফেমাস নিগ্রো হিরোজ অব আমেরিকা নামে কয়েকটি জীবনী গ্রন্থ। এছাড়া পোয়েট্রি অব দি নিগ্রোজ (১৯৪৬-১৯৪৯), অ্যান আফ্রিকান ট্রেজারি, পোয়েমস ফ্রম ব্ল্যাক আফ্রিকা নামে কয়েকটি কাব্য সংকলনও তিনি সম্পাদনা করেন।

নিগ্রোদের নিয়ে বিশ বছর ধরে তিনি নানা লেখা লিখেছেন এবং ১৯৫০ সাল থেকে নিগ্রোদের সংবাদপত্র শিকাগো ডিফেণ্ডারের তিনি ছিলেন নিয়মিত লেখক। অতি সম্প্রতি ১৯৬৫ সালে তিনি বহুল প্রচারিত নিউইয়র্ক পোস্ট-পত্রিকাতেও লিখতেন।

কবি হিউজ কখনো সাংবাদিক হিসাবে কখনো বা চিত্তবিনোদনের ইচ্ছায় নানা দেশে ঘুরে বেড়িয়েছেন। কিউবা, হাইতি, আফ্রিকার নানা দেশ, সোভিয়েট ইউনিয়ন এবং অন্যান্য দেশ তিনি সফর করেছেন। আফ্রিকায় তিনি কয়েকবারই গিয়েছিলেন। তাছাড়া আমেরিকার নানা কলেজে তিনি বক্তৃতা দিয়ে বেড়িয়েছেন, স্প্যানিশ এবং ফ্রেঞ্চ গ্রন্থেরও করেছেন অসংখ্য ইংরেজী অনুবাদ। তারে তাঁর লেখা কুড়িটিরও বেশি বই অনুদিত হয়েছে নানা ভাষায়।

রঙ্গমঞ্চের প্রতিও হিউজের আকর্ষণ ছিল প্রচুর এবং নাট্যকার হিসাবেও তিনি পেয়েছিলেন বিশেষ সম্মান। তিনি তাঁর কয়েকটি উপন্যাসকে নাট্যরূপ দিয়ে গেছেন। এই সব নাটকের মধ্যে সিম্পলি হেভেনলি, মুলাটো, নুতানাটা এবং ব্ল্যাক নেটিভিটি বিশেষ উল্লেখ্য। সিম্পলি হেভেনলি তাঁর অবিস্মরণীয় চরিত্রসৃষ্টি সিম্পলকে নিয়ে লেখা। মুলাটো নাটকটি ১৯৫৩ সালে নিউইয়র্ক শহরে সাফল্যের সঙ্গে অভিনীত হয় এবং ব্ল্যাক নেটিভিটি নাটকটি ১৯৬২ সালে বিশেষ খ্যাতি পায়। এ বছরে প্রকাশিত দি বেস্ট শর্ট স্টোরিজ অব নিগ্রো রাইটার্স তাঁর শেষ সাহিত্য কীর্তি। দি প্যান্থার অ্যাণ্ড দি ল্যাস নামে হিউজের আর একটি কাব্যগ্রন্থ অবশ্য এখনো বেরোয়নি।

'আমেরিকা নিগ্রো জীবনকে রূপ দিতেই আমি কলম ধরেছি।' কথাগুলি লিখেছিলেন 'বিশ শতকের লেখকে'র কাছে লেখা এক চিঠিতে। সত্যি কথা বলতে, স্বাধিকার প্রতিষ্ঠার জন্যে হিউজ লড়াই করে এসেছেন বরাবর। কিন্তু তাঁর কবিকণ্ঠ সব সময়েই যে সোচ্চার হয়েছে এমন কথা হলফ করে বলা যায় না। বরং তিনি শিল্পে গভীর আস্থা রেখে অন্তরঙ্গভাবে স্বজাতির ক্ষোভ প্রকাশ করেছেন কখনো সোজাসুজি কখনো ব্যঙ্গ-বিদ্রূপে ঘুরিয়ে পেঁচিয়ে। এদিক থেকে তাঁর কু-ক্লুকস কবিতাটি স্মরণীয়।

তিনি যেমন সাহিত্যের ক্ষেত্রে তেমনি আমেরিকায় নিগ্রো আন্দোলনেও প্রায় একই মনোভাব পোষণ করতেন। তাই একবার বলেছিলেন, 'আমরা যে তরুণ নিগ্রো শিল্পীরা আজ সৃষ্টি করে চলেছি, আমরা চেয়েছি আমাদের এই স্বতন্ত্র কালো সত্তাকে নির্ভয়ে ও সগর্বে প্রকাশ করতে।......আমরা মন্দির গড়ছি আগামী দিনের জন্যে আর আমরা বেশ মজবুত করেই সে মন্দির গড়ব। আমরা পাহাড়ের চূড়ার উপর দাঁড়িয়ে আছি। কেননা আমরা নিজেদের মধ্যে স্বাধীন।' কবিতায় তিনি ফর্মের পরীক্ষা-নিরীক্ষার বদলে নানা ছন্দের কারিকুরিতে বক্তব্য তুলে ধরতেই বেশি আগ্রহী। ফলে কখনো কখনো ঈপ্সিত ব্যঞ্জনা না ফুটে উঠলেও বক্তব্যে তা ঢাকা পড়ে যায়। আগেই বলেছি সহজ করেই নিজের কথা বলতে তিনি অভ্যস্ত। 'বর্ডার লাইন' নামে কবিতাটি তার উজ্জ্বল প্রমাণ। কবি বলেছেন:

ভাবতে ভাবতে কেমন অবাক হতাম,
এমন তরো বাঁচা আর মৃত্যুকে নিয়ে
আমার চিন্তায় তখন জটিলতা।

এখন বুঝতে পারি এদের দুরন্ত
অশ্রু আর কান্নায়
সেই বিভেদের আস্বাদ।

এবং এই নিকট আর দূর
আমায় অবাক করত, এখন
সে সব বিস্মৃত, কেননা
দূর তো কোথাও নেই, কোথাও ...

পার্থিব মৈত্র

নেকড়ের কবলে

ক্যাবিনেট মিশন প্ল্যান প্রত্যাখ্যান হল, ই প্ল্যানকে সঞ্জীবিত করার জন্য কেউ ষ্টা করলেন না। এর কিছু পরেই লর্ড উন্টব্যাটেন ছুটলেন লণ্ডনে, তিনি একটা স্তাব পকেটে নিয়ে গিয়েছিলেন, বৃটিশ ্যাবিনেট মাউন্টব্যাটেনের সেই প্রস্তাব যেন ুফে নিলেন। আজ, ঘটনা থেকে অনেক ূরে দাঁড়িয়ে, অনেক নতুন তথ্য এবং পারি- ার্শ্বিক ঘটনার বিচারে আমার মনে হয়, র্ড মাউন্টব্যাটেনের এই পরিকল্পনার জনক ্তিনি একা নন। ভারতীয় কোনো কোনো ামলা বিশেষত ভি পি মেনন জাতীয় ্-একজন মাউন্টব্যাটেনের প্রিয় রাজ- র্মচারীর উর্বর মস্তিষ্কে এই পরিকল্পনার ম্ভব হয়ে থাকবে। এলান ক্যাম্পবেল নসন প্রণীত 'এ মিশন উইথ মাউন্টব্যাটেন' ারা পাঠ করেছেন তাঁরাই জানেন দিনে- াতে সব সময়েই লর্ড মাউন্টব্যাটেন ভি শকে ডাকতেন, তাঁর মতামত জানতে াইতেন। দক্ষিণ ভারতীয় কূটবুদ্ধি এই ্ন থ্রি প্ল্যানের সর্বাঙ্গে মাখানো।

৩০শে মে ১৯৪৭, লর্ড মাউন্টব্যাটেন ণ্ডন থেকে ফিরে এলেন। ২রা জুন ারিখে কংগ্রেস ও মুশ্লিম লীগের ্নেতৃবৃন্দের সঙ্গে তিনি পরামর্শ করলেন বং ভারতের স্বাধীনতার মূল্য হিসাবে ারতবিভাগ স্বীকৃত হল। এই পরিকল্পনা ্রকাশিত হওয়ার পর ভারতের জাতীয় ংহতির সব আশা বিদূরিত হল।

শ্রমিক দলের দ্বারা গঠিত বৃটিশ রকার ভারতবর্ষের সর্বনাশ সাধন করলেন টিশের কায়েমী স্বার্থ আরো দৃঢ়ভাবে ায়েম রাখার জন্য, আর তাঁদের প্রলোভনে ুললেন ভারতের সেদিনের অগ্রগণ্য জন- ায়কবৃন্দ। ভারতবর্ষ কমনওয়েলথের অন্ত- ্ভুক্ত থাকবে এমন আশাও শ্রমিক দলের রকারের মনে ছিল। মুশ্লিম লীগের াতৃত্বে চালিত নবগঠিত মুশ্লিম রাষ্ট্রও মনওয়েলথের ভাবে থাকবে। স্বাধীনতা ংগ্রামে কংগ্রেস বৃটিশবিরোধী ছিল আর ্শ্লিম লীগপন্থীরা বরাবরই বৃটিশ- ্বার্থের অনুকূল কাজ করেছেন। সুতরাং াদের প্রাপ্য বখশিস তাঁদের দেওয়া দরকার। াই লর্ড মাউন্টব্যাটেনের ভারতবিভাগের ্রস্তাব তাঁরা খুশিমনে গ্রহণ করেছিলেন।

কংগ্রেস ওয়ার্কিং কমিটি ৩রা জুন ১৯৪৭ তারিখে একটি বৈঠকে নতুন প্রস্তাব বিবেচনা করলেন। এই বৈঠকে উত্তর-পশ্চিম সীমান্তের ভবিষ্যৎ সম্পর্কে আলোচনা হল। খান আবদুল গফফর খান এবং তাঁর অনুচরবর্গ সর্বদা কংগ্রেসকে সমর্থন করেছেন এবং মুশ্লিম লীগের বিরোধিতা করেছেন।

মহম্মদ আলি জিন্না থেকে শুরু করে মুশ্লিম লীগের সব ছোট-বড় কর্তাই খান ভ্রাতৃদ্বয়কে তাঁদের চিরশত্রু মনে করতেন। উত্তর-পশ্চিম সীমান্তে কংগ্রেস সরকার গঠিত হয়েছিল এই দুই দেশপ্রেমিক ভ্রাতৃ-দ্বয়ের চেষ্টায়, তা তাঁরা ভোলেন নি। তখন লীগের তরফ থেকে প্রচণ্ড বাধা এসেছিল তবু বাদশা খান অটল ছিলেন। দেশবিভাগ হলে খান ভ্রাতৃদ্বয়ের অবস্থা হবে ভীষণ সংকটময়। তখন স্বদেশপ্রেমিকতার অপরাধে তাঁরা মুশ্লিম লীগের হাতে চরম শাস্তি পেতে পারেন আর তাঁদের নেতৃত্বে গঠিত খুদাই খিদমদগার দলটির অস্তিত্ব বিলুপ্ত হবে।

এই সব ঘটনা সবিস্তারে বর্ণিত আছে মৌলনা আবুল কালাম আজাদের "ইণ্ডিয়া উইনস ফ্রীডম" নামক গ্রন্থে। তিনি লিখেছেন :

> "I have already said that Gandhiji's conversion to the Mountbatten Plan had been a cause of surprise and regret to me. He now spoke in the Working Committee in favour of partition. As I had already had an inkling into his mind, this did not take me by surprise, but one can imagine the reaction of Khan Abdul Gaffar Khan. He was stunned and for several minutes he could not utter a word."

খান আবদুল গফফর খান তাঁর ওয়ার্কিং কমিটিকে স্মরণ করিয়ে দিলেন যে, তাঁরা চিরদিন কংগ্রেস-সমর্থক, এখন কংগ্রেস যদি তাঁদের বর্জন করেন তাহলে সীমান্ত প্রদেশের অবস্থা হবে ভয়ংকর। তাঁদের শত্রুরা বলবে যে, যতদিন প্রয়োজন ছিল কংগ্রেস তাঁদের

খান আবদুল গফফার খান

হাতে রেখে এখন তাঁরা মুশ্লিম লীগের সঙ্গে বোঝাপড়া করছেন। মৌলনা আজাদের ভাষায়—

> "Khan Abdul Gaffar Khan repeatedly said that the Frontier would regard this as an act of treachery if the Congress now threw the Khudai Khitmadgar to the wolves."

মৌলনা আজাদের এই উক্তি থেকে মনে হয়, গান্ধীজীর প্রাক্তন একান্ত সচিব প্যারেলাল এই দেশপ্রেমিকের জীবনের যে বিয়োগান্ত কাহিনী লিখেছেন তার নাম দিয়েছেন "Thrown To The Wolves—A. .l Gaffar"। এই গ্রন্থটি প্রকাশ করেছেন কলকাতার বিখ্যাত প্রকাশন সংস্থা ইস্টলাইট বুক হাউস। গ্রন্থটি প্রকাশে যে ভারতের অন্যপ্রান্তের প্রকাশকরা আগ্রহান্বিত হন নি তা লক্ষ্যণীয়।

গান্ধীজী ওয়ার্কিং কমিটিতে সীমান্ত গান্ধীর এবম্বিধ বিলাপ শুনে আশ্বাস দিলেন যে, মাউন্টব্যাটেনের সঙ্গে এই বিষয়ে আলাপ করে যা হয় ব্যবস্থা করা যাবে। অনেকের স্মরণ থাকতে পারে যে, মাউন্টব্যাটেন দম্পতির সঙ্গে তখন ভারতীয় নেতৃবর্গের প্রীতির সম্পর্ক স্থাপিত হয়েছে। গান্ধীজীর আলাপাচারের ফলে মাউন্টব্যাটেন জিন্নাকে বললেন একটু দেখতে। জিন্না বললেন গফফর খানের সঙ্গে দেখা করার বাসনা রইল। কিন্তু ঐ পর্যন্ত, কংগ্রেস যখন দেশবিভাগ মেনে নিয়েছে তখন আর খোদাই খিদমদগারদের কে তোয়াক্কা রাখে।

খান আবদুল গফফর খান ভারতের জাতীয় সংগ্রামের ইতিহাসে এক উপকথার নায়ক। খান ভ্রাতৃদ্বয়কে ভারতের জনসাধারণ কোনোদিনই বিস্মৃত হতে পারবে না। তার প্রমাণ প্যারেলাল রচিত এই গ্রন্থ। প্যারেলাল ১৯৫৬-র জুলাই মাসে এক সপ্তাহের জন্য কাবুলে সীমান্ত গান্ধীর সান্নিধ্যে কাটালেন। গান্ধীজীর আশ্রমে বাদশা খানের অনেক দিন কেটেছে। স্বভাবতই প্যারেলালের উপস্থিতিতে সেইসব অতীত স্মৃতি তাঁর স্মরণে এসেছে।

গান্ধীজীর প্রতি বাদশা খানের শ্রদ্ধা আজও অবিচল। ১৯৪৭-এর ৩০শে জুলাই দুই গান্ধীর মধ্যে শেষ সাক্ষাৎকার ঘটে। ১৯৬৪-র ডিসেম্বর মাসে তিনি প্যারেলালকে এক পত্রে লিখেছেন—মহাত্মাজী জীবিত থাকলে তাঁদের ভুলে যেতেন না কিন্তু সমগ্র ভারতবর্ষ তাঁদের ভুলেছে, এই দুর্ভাগ্য তাঁর অন্তরকে দহন করছে। তিনি বলেছেন :

> "What saddens me is that while we shrank from no sacrifice for the sake of India's independence the Congress on attaining forsook us They gave themselves up to enjoyment while ere left to suffer alone. We are still dubbed 'Hindus'.. This was unbecoming of the Congress."

বাদশা খানের এই উক্তির উত্তরে কিছুই বলার নেই। খান ভ্রাতৃদ্বয় চেয়েছিলেন যে, উত্তর-পশ্চিম সীমান্তের যে অংশ এখন পাকিস্তানভুক্ত এবং যেখানকার কথাভাষা পোস্তু তার নামকরণ হোক পাখতুনিস্তান। বৃটিশ কখনই অবশ্য এই প্রস্তাবে রাজী হত না, তবে পাকিস্তান সরকার গুরুত্ব দিয়ে বিচার করতে পারতেন উপযুক্ত চাপ সৃষ্টি করলে।

বাদশা খানকে অবিভক্ত ভারতের জেলে পনেরো বছর কাটাতে হয়েছে। তারপর পাকিস্তান জেলে কেটেছে সুদীর্ঘ কাল. কঠিন ব্যাধির মধ্যেও ডাক্তার পর্যন্ত পাওয়া যায় নি। তবে কিছু ভারতীয় বন্ধু তাঁকে মাঝে মাঝে দেখে গেছেন—মোরারজী দেশাই, কমলনয়ন বাজাজ, অমিয়নাথ বসু, প্যারেলাল, এম এল সোনধী প্রভৃতি।

বাদশা খানের পিতৃদেব ছিলেন ধর্মপ্রাণ মুসলমান। তিনি মাথায় করে খাদ্যদ্রব্য প্রতি দিন লঙ্গরখানায় নিয়ে যেতেন। শিশু আবদুল গফফর খান পিতাকে প্রশ্ন করেন যে, এত চাকর-বাকর থাকতে তুমি কেন নিজে রোজ এ সব নিয়ে যাও। এর জবাবে তাঁর পিতা বলেছিলেন ওরা যে খোদার অতিথি, তাই আমাকে খোদার খিদমত করতে হয়। এই থেকেই হয়ত যৌবনে পেঁছে বাদশা খান তাঁর প্রতিষ্ঠানের খুদাই খিদমদগার নামকরণ করেছিলেন।

ধর্ম সম্পর্কে বাদশা খান বলেছেন—

> "It is my inmost conviction that Islam is Amal, Vaqueen, Muhabat (work, faith and love) and without this the Musalman is sounding brass and thinkling cymbals."

মুশ্লিম লীগের নীতি তাই বাদশা খান কোনোদিনই গ্রহণ করতে পারেন নি।

বাদশা খান কমলনয়ন বাজাজের কাছে দুঃখপ্রকাশ করে বলেছেন—

> "The Congress leaders had assured us that they would never accept partition—but they accepted it. They could have given us notice in advance and told us to fend for ourselves. But they left us completely in the lurch. I was in Delhi at that time but no body whispered a word to me."

সুখের বিষয় আজ বাদশা খান আফগানিস্তানের আতিথ্য লাভ করেছেন আর কোনোদিনই তিনি আফগান সম্রাটের আতিথ্য ত্যাগ করে ভারত-পাকিস্তানে ফিরে আসবেন না।

প্যারেলালের গ্রন্থটি তাই বিশেষ মূল্যবান। সুগভীর শ্রদ্ধায় তিনি গ্রন্থটি রচনা করেছেন আর ইস্টলাইটও সেই শ্রদ্ধা নিয়ে গ্রন্থটি প্রকাশ করেছেন।

THROWN TO THE WOLVES—ABDUL GAFFAR :: By PAYRELAL Published by Eastlight Book House, 20, Strand Road; Calcutta. Price 10/-.

—অভয়ঙ্কর

পরলোকে পাঞ্জাবী লেখক ॥

প্রখ্যাত পাঞ্জাবী লেখক, অধ্যাপক রাম লাভ্য গত রবিবার তাঁর কলকাতা বাসভবনে পরলোকগমন করেছেন। মৃত্যুকালে তাঁর বয়স হয়েছিল মাত্র ৬০ বৎসর। মোগার ডি এন কলেজের তিনি ছিলেন ইতিহাস বিভাগের অধ্যাপক। এছাড়াও তিনি আর্যসমাজ ও পাঞ্জাবী বিরাদরীর সদস্য ছিলেন। পাঞ্জাবী সাহিত্যেও তাঁর অবদান উল্লেখ্য। পাঞ্জাবী ভাষায় প্রকাশিত বিভিন্ন পত্র-পত্রিকায় অজস্র রচনা প্রকাশিত হয়েছে।

শেক্সপীয়র উৎসব ॥

গত ১ ও ২ আগস্ট, শেক্সপীয়র চতুর্থ শত-বার্ষিক সমিতির উদ্যোগে শেক্সপীয়র উৎসব পালিত হয়। এই উৎসবে পৌরোহিত্য করেন শ্রীফণিভূষণ চক্রবর্তী। উৎসব সমিতির সম্পাদক শ্রীনন্দগোপাল সেনগুপ্ত এই সমিতির সম্পাদকীয় বিবরণ পাঠ করেন। তিনি বলেন, "শেক্সপীয়রের চতুর্থ শত-বার্ষিক উৎসব উপলক্ষে এই সমিতি গঠিত হয়। সেই উৎসবের বিবরণ বিভিন্ন পত্র পত্রিকায় প্রকাশিত হয়। শেক্সপীয়রের জন্মভূমির বাইরে যত জায়গায় এই উৎসব পালিত হয়েছে, তার মধ্যে এই উৎসবটি সর্বপ্রধান। বর্তমান উৎসবটি আসলে তারই সমাপ্তি উৎসব।" সভাপতির ভাষণে শ্রীচক্রবর্তী শেক্সপীয়রের প্রতি শ্রদ্ধা নিবেদন করে বলেন, "এই সমাপ্তি উৎসবে শেক্সপীয়রের সঙ্গে রবীন্দ্র বন্দনার আয়োজন করা হয়েছে দেখে অনেকে প্রশ্ন তুলেছেন। এ প্রশ্ন ওঠা স্বাভাবিক। তবে এ ব্যাপারে আমাদের একটা কৈফিয়ত আছে। যখন কোন অভিভাবককে আমরা প্রণাম জানাই, তখন তার পাশে যখন কোনও অভিভাবক স্থানীয় ব্যক্তি থাকেন, তাকেও প্রণাম জানাই। রবীন্দ্র বন্দনার আয়োজন এ কারণেই করা হয়েছে।" তিনি শেক্সপীয়রের রচনার আরও অনুবাদের জন্য লেখকদের কাছে আবেদন জানান। শ্রীসুকোমলকান্তি ঘোষ, এই সমিতিকে একটি স্থায়ী সমিতি করবার জন্য আবেদন জানান। শ্রীকৃষ্ণ ধরও ভাষণ দেন।

এই অনুষ্ঠানে দুটি নাটকেরও অভিনয় হয়। প্রথম দিন ঐকতান গোষ্ঠীর উদ্যোগে ম্যাকবেথ নাটকটি মূল ইংরেজীতে অভিনীত হয়। নাটকটির অভিনয় খুবই উল্লেখযোগ্য হয়। বিশেষ করে ম্যাকবেথের ভূমিকায় তার ব্যানার্জি ব্যাঙ্কোর ভূমিকায় দীপঙ্কর দা গুপ্ত এবং ম্যালকমের ভূমিকায় পরশু

...খার্জির অভিনয় সকলের দৃষ্টি আকর্ষণ করে। লেডী ম্যাকবেথের ভূমিকায় নির্মৌদিদ-দাসের অভিনয়টি তেমন সার্থক হতে পারেনি। অন্যান্য যাঁরা অভিনয়ে কৃতিত্বের পরিচয় দেন, তাদের মধ্যে চন্ডী দে, হীরেন মিত্র, কমলেশ মিত্র, রাম চৌধুরী, সলিল ভট্টাচার্যের নাম উল্লেখ্য। মঞ্চসজ্জা রূপায়ণে সলিল ভট্টাচার্য, শান্ত রায়চৌধুরী ও নিরোদ রায় কৃতিত্বের পরিচয় দেন। দ্বিতীয় দিনে রবীন্দ্রনাথের ক্ষুধিত পাষাণ নাটকটিও সাফল্যের সঙ্গে অভিনীত হয়।

তরুণ কবির কবিতা-গ্রন্থ ॥

কত হবে তার বয়স? খুব জোর সতেরো। কিন্তু এর মধ্যেই ইংরেজীতে কবিতা লিখে যথেষ্ট সুনাম অর্জন করেছে। সম্প্রতি তাঁর 'মাই ওয়ার্ল্ড অব ফ্যান্টাসী' নামক একটি গ্রন্থ প্রকাশিত হয়েছে। এই গ্রন্থে সংকলিত কবিতাগুলি বিশ্লেষণ করলে হয়ত দেখা যাবে এতে গভীরতার অভাব আছে অনেক। হয়ত কবিত্বশক্তিও কম। কিন্তু তবু একদিক থেকে গ্রন্থটি সাধারণের দৃষ্টি আকর্ষণ করবে।

গ্রন্থটির ভূমিকা লিখেছেন প্রখ্যাত সাহিত্যিক শ্রীকে এম মুন্সী। তিনি আশা করেছেন, লেখিকা ভবিষ্যতে সাহিত্য ক্ষেত্রে নিজের স্থান অধিকার করে নিতে সমর্থ হবেন। গ্রন্থটি প্রকাশ করেছেন বোম্বাইয়ের 'পপুলার প্রকাশণ সংস্থা'।

পাকিস্থানে রবীন্দ্রসংগীত বন্ধের প্রতিবাদে ॥

গত ৩ আগস্ট বৃহস্পতিবার, কলকাতার শিল্পী-সাহিত্যিক ও সংস্কৃতিসেবীদের এক সমাবেশে পূর্ব বাংলায় রবীন্দ্রসংগীত বন্ধের জন্য পাক সরকার যে আদেশ জারী করেন, তার বিরুদ্ধে তীব্র প্রতিবাদ জানান হয়। ইন্ডিয়ান এসোসিয়েশন হলে অনুষ্ঠিত এই সভায় পৌরোহিত্য করেন প্রখ্যাত ঔপন্যাসিক তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়। তিনি তাঁর ভাষণে বলেন, "পূর্ব ও পশ্চিম বাংলার ভাষা ও সংস্কৃতির বিভাজন অসম্ভব। রবীন্দ্রনাথ তাঁর একাধিক গল্পে এবং কবিতায় পূর্ব বাংলার প্রকৃতি ও মানুষের চিত্র অঙ্কন করেছেন। পূর্ব বাংলার মানুষের সঙ্গে পশ্চিম বাংলার মানুষের সাংস্কৃতিক বন্ধনের সূত্রপাত এখানেই। আজ রাজনৈতিকভাবে বাংলা দেশ বিভক্ত বলে, জোর করে রবীন্দ্রনাথকে পূর্ব বাংলায় বন্ধ করে দেওয়া যাবে না।" তিনি পাক সরকারের এই সিদ্ধান্তকে "রাজনৈতিক দাবা খেলা" হিসেবে উল্লেখ করেন। তিনি আরও বলেন, "বাংলা বিভাগের পর থেকেই পাক সরকার খুব চতুরভাবে উভয় বাংলার সাংস্কৃতিক বন্ধনকে ছিন্ন করবার চেষ্টা করে চলেছেন। এর জন্য পশ্চিম বাংলাতেও সক্রিয় আন্দোলন গড়ে তোলা প্রয়োজন। পূর্ব বাংলা থেকে প্রকাশিত গ্রন্থ, পত্র-পত্রিকা যাতে পশ্চিম বাংলায় আসতে পারে, তার ব্যবস্থা করা দরকার।

শ্রীঅন্নদাশঙ্কর রায় বলেন, "রবীন্দ্রসংগীত বন্ধ করবার জন্য পাক সরকারের বর্তমান সিদ্ধান্ত, প্রকৃতপক্ষে পূর্ব বাংলার সংস্কৃতিকে কণ্ঠরোধ করছে। অথচ পূর্ব বাংলার সাধারণ মানুষ সংগ্রাম করেছে গণতন্ত্রের জন্য। পাক সরকারের এই সিদ্ধান্তের যথার্থ প্রতিবাদ তখনই পশ্চিম বাংলা থেকে হতে পারে, যখন পশ্চিম বাংলার সাধারণ মানুষ আরও বেশী পরিমাণে পূর্ব বাংলার সাহিত্য পাঠ করবে।"

শ্রীমনোজ বসু তাঁর ভাষণে ভাষা আন্দোলনে নিহত শহীদদের কথা স্মরণ করেন। তিনি আশা করেন যে, এবারেও পূর্ব বাংলার সাধারণ মানুষ সরকারকে এই সিদ্ধান্ত পরিবর্তন করতে বাধ্য করাবে।

সভায় পাক সরকারের এই সিদ্ধান্তের বিরুদ্ধে সর্বসম্মতিক্রমে একটি প্রস্তাব গৃহীত হয়। প্রস্তাবের সমর্থনে সর্বশ্রী প্রেমেন্দ্র মিত্র, সুকোমলকান্তি ঘোষ, কৃষ্ণধর, কুমারেশ ঘোষ, মণীন্দ্র রায়, প্রতাপচন্দ্র চন্দ্র প্রমুখ ভাষণ দেন। সভাটি রাইটার্স গিল্ডের উদ্যোগে অনুষ্ঠিত হয়।

সংস্কৃতে রাসোৎসব ॥

রামলীলা নিয়ে সংস্কৃতে অজস্র শ্লোক রচিত হয়েছে। সম্প্রতি এ রকম ২২০টি শ্লোক এক সঙ্গে সংকলিত করেছেন শ্রীরাঘবন পিল্লাই। এই শ্লোকগুলিতে গোপীদের সঙ্গে শ্রীকৃষ্ণের লীলা, শ্রীকৃষ্ণের দেহরূপ, বংশীবাদন ইত্যাদি বিভিন্ন প্রসঙ্গ বর্ণিত হয়েছে। তবে প্রতিটি শ্লোকই শ্রীমদ্ভাগবতের , পঞ্চম অধ্যায় অবলম্বনে রচিত। যাঁরা এ বিষয়ে আগ্রহী এবং যাঁরা কৃষ্ণ গবেষণায় নিযুক্ত, তাঁদের কাছে গ্রন্থটি অপরিহার্য। গ্রন্থটি প্রকাশিত হয়েছে ত্রিবান্দ্রম থেকে।

আজকের লেখক ॥

সম্প্রতি প্রখ্যাত প্রকাশনা সংস্থা পেঙ্গুইন ইউরোপ আমেরিকা, এশিয়া, আফ্রিকা প্রভৃতি দেশের নতুন ও প্রতিভাবান লেখকদের পরিচিত করানোর জন্য রাইটিং টুডে নামক কয়েকটি অভিনব সংকলনগ্রন্থ প্রণয়নের পরিকল্পনা নিয়েছেন। তরুণ লেখক হিসেবে যাঁরা প্রতিষ্ঠাকামী, ভবিষ্যতের সম্ভাবনাময় সেইসব সমসাময়িক তরুণদের পাঠকসমক্ষে তুলে ধরাই এঁদের উদ্দেশ্য। সুসম্পাদিত প্রতিটি খণ্ডই হালের চলতি সাহিত্যের নির্দেশিকা গ্রন্থের কাজ করবে। প্রথম ৪টি খণ্ড সম্প্রতি প্রকাশিত হয়েছে। দি নিউ রাইটিং ইন দি ইউ এস এ, আফ্রিকান রাইটিং টুডে, জার্মান রাইটিং টুডে ইটালিয়ান রাইটিং টুডে প্রভৃতি তার মধ্যে উল্লেখযোগ্য। শীঘ্রই প্রকাশিত হবে রাইটিং টুডে ইন ল্যাটিন আমেরিকা, রাইটিং টুডে ইন সাউথ-আফ্রিকা, রাইটিং টুডে ইন ফ্রান্স রাইটিং টুডে ইন পোল্যান্ড। নির্ভরযোগ্য সূত্রে জানা গেছে এই সিরিজে রাইটিং টুডে ইন ইন্ডিয়া এবং রাইটিং টুডে ইন পাকিস্তানও অচিরে প্রকাশিত হবে।

কবিতার অনুবাদ ও পল সেলভার ॥

পল সেলভার দীর্ঘদিন কবিতার অনুবাদ বিষয়ে গবেষণা করেছেন। নিজে একজন কৃতী অনুবাদক। কবিতার অনুবাদ নিয়ে বিগত কয়েক দশকে তিনি বহু মনোজ্ঞ আলোচনার সূত্রপাত করেছিলেন। সম্প্রতি সে বিষয়ে তিনি একটি বই লিখেছেন। নাম : দি আর্ট অব্ ট্রানস্লেটিং পোয়েট্রি। অনুবাদের সুবিধা-অসুবিধা নিয়ে যাঁরা মাথা ঘামান আলোচ্য বইটি তাঁদের কাছে আদরণীয় হবে, সন্দেহ নেই।

বইটি সংক্ষিপ্ত কিন্তু জরুরী ও পান্ডিত্যপূর্ণ। এতে সেলভার কবিতার অনুবাদের সংজ্ঞা ও কর্তব্য বিষয়ে নিজের ও অন্যান্য পন্ডিতদের তথ্যপূর্ণ ইতিহাস লিপিবদ্ধ করেছেন। কবিতাকে অনুবাদের মাধ্যমে সঠিক ফর্ম-এ আনা, ভাষান্তরিত করা এবং নির্দিষ্ট ছন্দে অনুসরণ করার অসুবিধা তিনি স্বীকার করেছেন। অবশ্য তাঁর আলোচনায় বিষয়বস্তু ইংরেজী, জার্মানী ও ফরাসী কবিতা। অসংখ্য অনুবাদকর্মের উদাহরণ আছে বইটিতে—এমনকি কবি দান্তের চেক কবিতার দুষ্প্রাপ্য অনুবাদও।

কবিতার অনুবাদের সংজ্ঞা রাখতে গিয়ে তিনি প্রখ্যাত অনুবাদক টাইট্লারের এসে অন দি প্রিন্সিপলস্ অব ট্রানস্লেশন (১৭৯০)-এর পূর্ববর্তী ও পরবর্তী অনুবাদধারার উদ্ধৃতিও দিয়েছেন। জি এস লিউস ১৮৫৫তে অনুবাদ সম্পর্কে বলেন : অনুবাদ হুবহু রিপ্রোডাকশান নয়, অনেকটাই তা হবে অ্যাপ্রক্সিমেশান। কবিতার ভাষা হচ্ছে পার্টস অব দি অরগ্যানিক হোল...'। ব্রাউনিং মনে করেন : কবিতার অনুবাদ সম্পূর্ণত লিটারাল হওয়া বাঞ্ছনীয় এবং তা মূলকে অনুসরণ করবে।' সেলভার মনে করেন ঠিক এই নিয়মে অনুবাদ করলে অনুবাদক নিজেই একজন কবির পর্যায়ে উপনীত হন।

কবিতার অনুবাদের পক্ষে প্রধান অসুবিধার জন্য সেলভার মূল কবিতার ছন্দ ও মাত্রাসমতাকে দায়ী করেছেন। অনুবাদের সময় ছন্দকে হুবহু রাখা অসম্ভব—তাই তার রূপান্তর অবশ্যম্ভাবী।

সুতরাং দেখা যাচ্ছে থিয়োরী যাই হোক্ না কেন কার্যক্ষেত্রে অত্যন্ত সরল, সাধারণ এবং সবচেয়ে সহজ ছন্দোবদ্ধ রোমান্টিক কবিতারই ভালো অনুবাদ সম্ভব। উরসুলা

ক্লিমেন হপকিন্সের সনেট অনুবাদ করেছেন কিন্তু সেই স্প্রাং রিদম্ বা অন্তর্নিহিত অর্থ অধিকাংশ কবিতাতেই পাশ কাটিয়ে গেছে। সেলভার মনে করেন গদ্যছন্দ তবু তুলনায় অনুবাদের পক্ষে সহজতর। শ্লেগেলের শেক্সপীয়রের কবিতার অনুবাদ এ প্রসঙ্গে স্মরণীয়। এক্ষেত্রে পেঙ্গুইন স্টাইল-কেও সেলভার সমর্থন করেছেন। এ সব ক্ষেত্রে অনুবাদক মূলভাষা থেকে গদ্যাকারে কবিতাটিকে অনুবাদ করে সাজাতে পারেন। তবে মূল কবিতাটি আরেক পৃষ্ঠায় রাখতে হবে, যাতে পাঠক মূলভাষার কবিতার সঙ্গে অনুবাদের অসুবিধা বা তারতম্য খুঁজে পান।

সিলভিয়া উইলকিনসনের নতুন উপন্যাস ॥

মার্কিন সাহিত্যের মহিলা ঔপন্যাসিক হিসেবে সিলভিয়া উইলকিনসন্ প্রভূত জনপ্রিয়তা অর্জন করেছেন। তাঁর উপন্যাসের প্রধান গুণ তা সমকালকে চিত্রিত করে। ভাষা বা বিশ্লেষণ সৌকর্য তাঁর উপন্যাসের আরেক বৈশিষ্ট্য।

সম্প্রতি বেরিয়েছে তাঁর নবতম উপন্যাস অন্ অন্ দি নর্থ সাইড। আমেরিকার শহরতলীর এক গ্রাম এর পটভূমি। ক্যারি এর প্রধান চরিত্র—কৃষককন্যা এবং এ হোয়াইট্ প্রস্টিটিউট্। তার অশিক্ষিত পিতার মৃত্যুতে মায়ের সঙ্গে ক্যারি শহরে চলে আসে। অথচ গ্রামের পরিবেশের জন্য তাঁর ছিল আন্তরিক মমতা। শেষ পর্যন্ত সে আবার গ্রামে নিজেদের কৃষিক্ষেত্রে ফিরে আসে। কেননা সেখানে তার আরেক টান ছিল যৌবনের।

বইটিতে ফ্ল্যাশব্যাকের মাধ্যমে বিশ্লেষণ-পদ্ধতি বিশেষ উল্লেখের দাবী রাখে। ক্যারি চরিত্রটি সমগ্র উপন্যাসটির প্রাণকেন্দ্র হয়ে তার পিতার মৃত্যুর বেদনা ও শৈশব-স্মৃতির জন্য উজ্জ্বল হয়ে থাকবে।

ক্যাসিয়াস ক্লের কাহিনী ॥

বিশ্বের অন্যতম শ্রেষ্ঠ মুষ্টিযোদ্ধা ক্যাসিয়াস ক্লে আজ বহুবিতর্কিত এক ব্যক্তিত্ব। মুষ্টিযুদ্ধের বাইরে ক্যাসিয়াস একজন নিপুণ ক্রীড়াবিদ। তাঁর জীবনের খ্যাতি ও সম্মানের বহু বিচিত্র কাহিনী, ধর্মান্তর গ্রহণ, মানুষ ক্যাসিয়াস, তার প্রণয়-জীবন ও যুদ্ধবিরোধিতা ইত্যাদি নানা বিষয়কে কেন্দ্র করে সম্প্রতি ক্যাসিয়াস ক্লে এই নামে একটি জীবনীমূলক বই রচনা করেছেন জ্যাক অলসন্। বইটি সব মহলেই অসম্ভব জনপ্রিয়তা অর্জন করেছে।

ব্রাডলীর দর্শন চিন্তা

সর্বকালের বরেণ্য ব্রিটিশ দার্শনিক ফ্রান্সিস হার্বার্ট ব্রাডলীর সর্বশ্রেষ্ঠ গ্রন্থটির নাম "অ্যাপিয়ারেন্স অ্যান্ড রিয়ালিটি"। এই গ্রন্থটি ডক্টর কোয়ার্ডের মতে কান্টের পরবর্তীকালের শ্রেষ্ঠতম বস্তু। এই গ্রন্থটি বিশেষ জটিল এবং তত্ত্ববস্তুর বিচারমূলক গ্রন্থাদির যে কোনো ভাষায় অনুবাদ করা কঠিন কর্ম। অনুবাদক স্বয়ং পাশ্চাত্য এবং ভারতীয় দর্শনতত্ত্ব বিষয়ে একজন সুপণ্ডিত ব্যক্তি, অথচ তিনি দর্শনতত্ত্বের অধ্যাপনা করেন না। শাসন বিভাগের দায়িত্বপূর্ণ কর্মে রত শ্রীজিতেন্দ্রচন্দ্র মজুমদার মহাশয় তাই বিশেষ ভাবে অভিনন্দন যোগ্য।

অক্সফোর্ডের ক্ল্যারেনডন প্রেসের অনুমতিক্রমে এই সুবিখ্যাত গ্রন্থটির বঙ্গানুবাদ প্রকাশ করেছেন বিশ্বভারতী। বিশ্বভারতীর প্রচেষ্টায় এমন একখানি মূল্যবান গ্রন্থের অনুবাদ বাংলায় প্রকাশ সম্ভব হল, নতুবা এই অনুবাদ হয়ত অন্য কোন প্রকাশক উৎসাহিত হয়ে প্রকাশ করতে সাহসী হতেন না। এই গ্রন্থের পূর্বাভাষ রচনা করেছেন পাটনা বিশ্ববিদ্যালয়ের ভূতপূর্ব দর্শন অধ্যাপক খ্যাতিমান পণ্ডিত ধীরেন্দ্রমোহন দত্ত। অনুবাদকের পরিচয় প্রসঙ্গে তিনি বলেছেন—'আমরা বিহারে ছাত্রজীবন থেকে এ পর্যন্ত প্রায় পঁয়ত্রিশ বৎসর লক্ষ্য করেছি, অন্য কাজের সঙ্গে দর্শনের প্রতি তাঁর অনুরাগ অব্যাহত ভাবে চলেছে।"

অনুবাদক ভূমিকা প্রসঙ্গে বলেছেন—"ব্রাডলীর দর্শন আমাদের টানে। যে-বিশ্বাসকে ব্রাডলীর বিচার ও বুদ্ধি সমর্থন করে সে-বিশ্বাস ভারতীয়দের বহু যুগের বিশ্বাস। শ্রীরামকৃষ্ণ বলতেন 'আমি নিত্য লীলা দুইই লই। তিনিই অখণ্ড সচ্চিদানন্দ, তিনিই আবার জীবজগৎ হয়েছেন। জড় আবার কি? সবই চৈতন্য। তিনিই সব হয়েছেন। কোনোখানে বেশী প্রকাশ, কোনোখানে কম প্রকাশ!

অনুবাদক নিজ মনের কলুষও মল পরিষ্কার করবার উদ্দেশ্যে এই কাজে হাত দিয়েছিলেন এবং তিনি তাঁর নিজস্ব জ্ঞান মত অনুবাদ বা মর্মানুবাদ করেছেন। এই গ্রন্থ তাই আক্ষরিক অনুবাদ নয় আবার মৌলিক রচনাও নয়।

ব্রাডলীর 'অ্যাপিয়ারেন্স অ্যান্ড রিয়্যালেটি'র বঙ্গানুবাদ 'অবভাস ও তত্ত্ব বস্তু বিচার' এই কারণে একটি স্বয়ংসম্পূর্ণ মূল গ্রন্থের স্বাদ বহণ করে এনেছে। ব্রাডলীর রচনা থেকে যদি মনে বল, উৎসাহ ও অভয় লাভ করেন তাহলেই অনুবাদকের শ্রম সার্থক হবে এই তাঁর আশা। এই গ্রন্থের এক অংশে অবভাসতত্ত্বের আলোচনা আছে আর অন্যভাগে আছে তত্ত্ববস্তুর আলোচনা। প্রতীয়মান ও আপাতসত্য সংক্রান্ত পরিচ্ছেদগুলির সংক্ষেপিত সারানুবাদ ব্রাডলীর ভাষায় দেওয়ার চেষ্টা আছে। তারপর চতুর্দশ অধ্যায় থেকে একবিংশ অধ্যায় পর্যন্ত বিস্তারিত সারাংশ দেওয়া আছে। দ্বাবিংশ অধ্যায় থেকে লেখক ব্রাডলীর রচনার ভাব ও অর্থ অক্ষুন্ন রাখার চেষ্টা করেছেন।

দার্শনিক ব্রাডলীর দর্শনচিন্তা এদেশের বৌদ্ধ দার্শনিক নাগার্জুনের 'মাধ্যমিক কারিকা' অথবা শ্রীহর্ষের 'খণ্ডন-খণ্ড-খাদ্যের' সমতুল। ডঃ ধীরেন্দ্রমোহন দত্তের মতে "এইগুলি সকল প্রচলিত মতের সিদ্ধান্তের ও ধারণার সূক্ষ্ম বিশ্লেষণ ও নির্মমখণ্ডন আবার অন্যদিকে অনেকটা আমাদের অদ্বৈত দর্শনের মত শুদ্ধ অপরোক্ষ অনুভূতির ভিত্তিতে এক অখণ্ড চিৎসত্তার স্থাপনের অভিনব প্রয়াস।"

ব্রাডলীর দর্শন ভারতীয় পাঠকের কাছে বিশেষ সমাদরযোগ্য। তত্ত্বজিজ্ঞাসুর কাছে এত সহজে মাতৃভাষার মাধ্যমে এই জাতীয় দুরূহ অথচ সূক্ষ্ম তত্ত্বের আলোচনা লাভ করা বিশেষ সৌভাগ্যের বিষয়। দার্শনিক নিজস্ব ভঙ্গীতে পরম সত্য এবং পরমতত্ত্বের সন্ধানে প্রয়াসী। প্রচলিত ধ্যান ধারণার বাঁধা পথে বিচরণ করা তাঁদের ধর্ম নয়। তাই তাঁদের সাধনলব্ধ পরাজ্ঞানের পরিচয় লাভ করা দর্শনপ্রেমী পাঠকের কাছে এক পরম সম্পদ। অনুবাদক জিতেন্দ্রচন্দ্র মজুমদার সাহিত্যে এক স্মরণীয় স্বাক্ষর রেখেছেন 'অবভাস ও তত্ত্ববস্তু বিচারে'র এই অনুবাদের মাধ্যমে।

অবভাস ও তত্ত্ববস্তু বিচার— মূল রচনা ঃ ফ্রান্সিস হার্বার্ট ব্রাডলী। বঙ্গানুবাদ—জিতেন্দ্রচন্দ্র মজুমদার। প্রকাশক—বিশ্বভারতী গ্রন্থন বিভাগ কর্তৃক ৫নং দ্বারকানাথ ঠাকুর লেন—কলিকাতা—৭ কর্তৃক প্রকাশিত ।। দাম —আট টাকা মাত্র ।।

দু'জন মহিলা কবি

শ্রীমতী রাজলক্ষ্মী দেবী ইতিমধ্যেই কবিতাপাঠকমহলে অতি সুপরিচিত নাম। তাঁর কবিতায় একটি বিশিষ্টতা আছে—পড়লে বেদনা ও আনন্দ উভয়ই পাশাপাশি এসে দাঁড়ায়। এক অপরূপ সারল্য ও সর্ব-বিষয়ে গভীর মমতা তাঁর কবিতার মধ্যে অমোঘ স্বাদ নিয়ে ছড়িয়ে থাকে। এত ভালো প্রেম, বিরহ, স্মৃতিচারণার কবিতা সম্প্রতি বাংলা ভাষায় খুব বেশি লেখা হয় নি। 'মেয়েটি', 'তোমাদের চোখ', 'সন্তানেরা', 'জন্মদিনে, শিশুকে' প্রভৃতি কবিতা যেমন জননীকে মনে পড়িয়ে দেয়, তেমনি 'অতীত', 'যখন আমরা হাসতাম', 'সর্বনাম' প্রভৃতি পুরনো যৌবনের দিনগুলিকে স্মরণ করায়। নানা ছন্দেরও তিনি পরীক্ষা করেছেন। একটি সসম্ভ্রম পরিচ্ছন্নতা তাঁর কবিতার প্রসাদগুণের সঙ্গেই জড়িয়ে থাকে। রাজলক্ষ্মী দেবীর কবিতা পড়ে ভালো লাগে, কবিতাগুলি একজন শক্তিমতী আধুনিক কবির বলে, কোথাও মেয়েলী ব্যাপার নেই। পুরুষ কবিরাও অনেকে মেয়েলী হয়। অনেকে সব কবিকে দু ভাগে ভাগ করেন, পুরুষ আর নারীতে। রাজলক্ষ্মী দেবী প্রথম বর্গের মধ্যেই পড়বেন। 'ভাব ভাব কদমের ফুল' তাঁর দ্বিতীয় কাব্যগ্রন্থ। রাজলক্ষ্মী দেবী কি সুন্দরভাবে কবিতার বইখানির পরিচিতি উৎসর্গপত্রেই দিয়েছেন, 'কৃষ্ণনগরের যশোদা পুতুল/পেয়ালার তলানির শেষে আলপনা/মানুষের মুখ/অরণ্য/উত্তাল পশ্চিমের হাওয়া/কুঁড়ির ভিতরে ক্রন্দনশীল সুরভি/এদের উদ্দেশে।'

'আমার প্রভুর জন্য' বিজয়া দাশগুপ্তের প্রথম কাব্যগ্রন্থ। কবিতার আসরে ইনি নবাগতা। কিন্তু কবিতাগুলি পাঠের পর এই কথা বলা চলে যে, ইনি প্রতিশ্রুতিসম্পন্ন কবি।

আলোচ্য গ্রন্থটিতে কবির অভিব্যক্তি প্রধানত দুই বিপরীতধর্মী বিশ্বাসে বিধৃত। এক অংশে তাঁর কাব্যভাবনা গুরুতর বিষয়কে আশ্রয় করেছে, অন্য অংশে তিনি অপেক্ষাকৃত ভাবতরল। তবে বিষয়ের গুরুত্ব আর তার শিল্পময় প্রকাশ দুটি স্বতন্ত্র ব্যাপার। এই দুয়ের সমন্বয়ের অভাব এই স্তরের কবিতা-গুলিতে দুর্লক্ষ্য নয়। আবার যেখানেই তিনি ভাবতারল্যের দ্বারা চালিত হয়েছেন সেখানেই তাঁর কবিতাগুলি এক ধরনের সংবেদনার দৃষ্টান্ত রাখে। মনে হয়, কবির কাব্যভাবনার এই দুই বিপরীতধর্মী অন্ত-র্বিরোধ তাঁকে ভবিষ্যতে একটি স্থির বৃত্তের কাছে সংহত করে আনবে।

'তুমি কণ্ঠস্বর', 'মীরাদি', 'পাখি', 'পদ্মা' প্রভৃতি কবিতা কবির আন্তরিক অনুভূতির গুণে ভাবতরল হয়েও কবিত্বময়।

ভাব ভাব কদমের ফুল : (কবিতা) রাজলক্ষ্মী দেবী। কৃত্তিবাস প্রকাশনী, কলিকাতা : ২৮। দাম : তিন টাকা।

আমার প্রভুর জন্য : (কবিতা)—বিজয়া দাশগুপ্ত। কৃত্তিবাস প্রকাশনী। ৩২।২, যোগীপাড়া রোড। কলিঃ-২৮। দাম : দু টাকা।

মোহনানন্দ জীবনকথা

শ্রীশ্রীমোহনানন্দ ব্রহ্মচারী মহারাজের দিব্য জীবনকথা সর্বজনউপযোগী করে রচনা করেছেন সন্ন্যাসিনী আশাপুরী। মোহনানন্দজীর লীলামাধুর্য এত সুন্দর-ভাবে ফুটিয়ে তোলা হয়েছে, এবং এমন চিত্তাকর্ষকভাবে বর্ণনা করা হয়েছে যে, ধর্মপিপাসু পাঠকমাত্রেই গ্রন্থপাঠের পর ভক্তিরসে আপ্লুত হবেন। এই অদ্বৈতবাদী ব্রহ্মচারী মহারাজ বর্তমান ভারতে ধর্ম-জগতের বিশিষ্ট মহাপুরুষ। শিষ্যার চোখে তাঁর চরিত্রের যে অপূর্ব চিত্রণ ঘটেছে তা সমাদৃত হবে। লেখিকার বর্ণনাভঙ্গী ও ভাষা খুবই আকর্ষণীয়।

পরমপুরুষ শ্রীশ্রীমোহনানন্দ ব্রহ্মচারী : (জীবনী) — সন্ন্যাসিনী আশাপুরী। মোহন প্রকাশনী। ২৫।১ ডাঃ রাজেন্দ্র রোড, কলকাতা—২। দাম : তিন টাকা।

প্রেমের পথ

প্রেম কেবল দেহজ, না দেহাতীত কোন সূক্ষ্ম অনুভূতির ব্যাপার তা' নিয়ে তিন-বন্ধুতে মিলে আলোচনাক্রমে তিনটি পৃথক অভিজ্ঞতা নিয়ে পরস্পর স্ব-মতে অবিচল থেকে সর্বজনগ্রাহ্য একটি সিদ্ধান্ত গ্রহণ করতে অপারগ হয়ে উঠল এবং তিনজনেই নিজের নিজের মতামতকে প্রতিষ্ঠা দেবার জন্য যুক্তি হিসেবে তিনটি কাহিনীর অবতারণা করে। সেই আখ্যানত্রয়ই এই গ্রন্থের উপজীব্য।

অরুণ-বরুণ আখ্যানে দেখা গেল নারীর সঙ্গে পুরুষের যে প্রেম তার মূলে কাম। যৌন তৃষ্ণার তৃপ্তিই তার লক্ষ্য। রাণীকে নিয়ে অরুণ ও বরুণের কাম চরিতার্থতার তীব্রতাই তার ভিত্তি। দ্বিতীয় কাহিনীর নায়ক অনিমেষ। সে বিবাহিত, স্ত্রী বর্তমান। সেই অবস্থায় তার বাল্যসখি চন্দ্রা এল তার সামনে লোভের আকর্ষণ নিয়ে। সেই আকর্ষণকে সে শেষপর্যন্ত সংবরণ করলো। তৃতীয় কাহিনী তৈরী হয়েছে একজন বিখ্যাত সঙ্গীত-শিল্পী বংশীরাম চক্রবর্তীকে নিয়ে। এখানে প্রেম দেহাতীত ও কামজয়ী। তিনটি কাহিনী শেষ হবার পর প্রথম আখ্যানের অন্যতম নায়ক বরুণের আবির্ভাব—সন্ন্যাসী-বেশে। তিনি উপসংহারে মূল বিতর্কের অবসান ঘটালেন। বললেন : দেহগত কামনার পথ বেয়েই প্রেমের শীর্ষে পৌঁছনো যায়। একটি অসম্পূর্ণ কাহিনীর মাধ্যমে।

১০৭ পৃষ্ঠার এই গ্রন্থটি পাঠকদের ভাল লাগবে বলে বিশ্বাস। গ্রন্থটি সুখপাঠ্য ও উপভোগ্য।

তিন বিন্দু : (উপন্যাস) স্বরাজ বন্দ্যো-পাধ্যায়। অরুণিমা পাবলিশার্স, ১৫, বেনিয়াটোলা লেন। কলিঃ-৯। দাম—২·৫০ পয়সা।

সংকলন ও পত্র-পত্রিকা

উত্তর স্বাক্ষর পত্রিকাটি এরই মধ্যে বিভিন্ন সুধীজনের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছে। বর্তমান সংখ্যায় লিখেছেন আশিস সান্যাল, যোগব্রত চক্রবর্তী, সুনীল মজুমদার, সোমেন ঘোষ, রঞ্জিত মুখোপাধ্যায়, অনিল কর্মকার, শৈলেশচন্দ্র দে, সোমেন্দ্রনারায়ণ চৌধুরী ও আরো অনেকে।

উত্তর স্বাক্ষর : (২য় বর্ষ, ১ম সংখ্যা)—সম্পাদক : বিশ্বনাথ সরকার। ৪৮।৪, চণ্ডী ঘোষ রোড কলিঃ-৪০। দাম : এক টাকা।

কিশোরদের উপযোগী গ্রন্থ

আধুনিক সায়ান্স-ফিকশ্যান সাহি-ত্যের স্রষ্টা জুল ভর্ন। তাঁর প্রথম উপন্যাস প্রকাশিত হয় ১৮৬২ সালে। কিন্তু তারও আগে কল্প-সাহিত্য পর্যায়ে যে সব রচনা প্রকাশ পায়, তার মধ্যে উল্লেখযোগ্য হল "ফ্র্যাঙ্কেন-স্টাইন"। ফরাসী ভাষায় অনূদিত কয়েকটি জার্মান ভূতের গল্প পড়ে ভূতুড়ে গল্প লেখার আগ্রহ হয় কবি শেলি, বায়রন এবং মিসেস শেলির। তাই ১৮১৮ সালে মেরি শেলির লেখনীতে রচিত হয় "ফ্র্যাঙ্কেনস্টাইন"।

এই ধ্রুপদী কাহিনীর মূলতত্ত্ব নিয়ে বিস্তর বিজ্ঞানভিত্তিক কাহিনী রচিত হয়েছে। কিন্তু "ফ্র্যাঙ্কেনস্টাইন" আজও বয়স-নির্বিশেষে সবার মনেই সাড়া জাগায়। আলোচ্য গ্রন্থটি মূল কাহিনীর পূর্ণাঙ্গ অনুবাদ নয়। চিত্ররূপ এবং উপন্যাসের সংমিশ্রণ এবং সেই কারণেই উপভোগ্য।

মূলত ছোটদের জন্যে অনূদিত হলেও কাহিনীটি সবারই ভালো লাগবে।

ফ্র্যাঙ্কেনস্টাইন (উপন্যাস) সুনীলকুমার গঙ্গোপাধ্যায়। অরুণা প্রকাশনী, ৭, যুগলকিশোর দাস লেন, কলকাতা ৬। দাম দু টাকা পঞ্চাশ পয়সা।

বিমল মিত্র ও বাঙলা উপন্যাসের ক্রান্তিকাল

কৌটিল্য সান্যাল

সম্প্রতি ভারতবর্ষের নানা ভাষার পত্র-পত্রিকায় বাংলা-ভাষার জনৈক লেখকের সাহিত্যকৃতি নিয়ে প্রচুর আলোচনা ও প্রবন্ধাদি প্রকাশিত হয়েছে। ইতিপূর্বে সর্ব-ভারতীয় ক্ষেত্রে আর কোন লেখক সম্পর্কে এ ধরনের আলোচনা হয়েছে কিনা সন্দেহ। এই বহু আলোচিত লেখক হচ্ছেন, বাংলাদেশের বিশিষ্ট সাহিত্যিক বিমল মিত্র। উদাহরণস্বরূপ মালয়লাম ভাষায় 'জনযুগম' সাপ্তাহিক-এর (১৯৬৪, নভেম্বর) একটি সংখ্যায় প্রকাশিত প্রবন্ধ, আমেদাবাদ থেকে প্রকাশিত 'গ্রন্থ' নামক মাসিক পত্রিকায় বিমল মিত্র ও তাঁর প্রখ্যাত গ্রন্থ 'সাহেব-বিবি-গোলাম' সম্বন্ধে দীর্ঘ নিবন্ধ, বোম্বাই থেকে প্রকাশিত হিন্দী 'ধর্মযুগ' সাপ্তাহিকে তাঁর সম্পর্কে একটি জ্ঞানগর্ভ সমালোচনা, 'নাগপুর টাইমস' নামক ইংরেজী পত্রিকায় মহারাষ্ট্রীয় লেখক শান্তারাম কর্তৃক শ্রীযুক্ত মিত্রের সঙ্গে সাক্ষাৎকারের বিবরণ, জব্বল-পুর-রায়পুর থেকে প্রকাশিত হিন্দী দৈনিক 'যুগধর্ম'র রবিবাসরীয় সাহিত্য পর্যায়ে রঞ্জন ত্রিবেদী লিখিত মনোজ্ঞ আলোচনা প্রভৃতির নাম করা যায়। এতদ্ব্যতীত পাটনার ইংরেজী দৈনিক 'দি সার্চলাইট'-এর (১৯৬৬, ১৬ই অক্টোবর) সম্পাদক কর্তৃক লিখিত সুদীর্ঘ প্রবন্ধ A memorable Novel বিশেষ উল্লেখযোগ্য। এই স্বীকৃতির অন্যতম কারণ যে ভারতের বিভিন্ন ভাষায় তাঁর গ্রন্থসমূহের ভাষান্তর ও সর্বদৈশিক পাঠক-পাঠিকার মনোহরণ, একথা অবিসংবাদী সত্য।

প্রকৃতপক্ষে বাংলা উপন্যাসের প্রচলিত ধারায় বিমল মিত্র একটি কক্ষচ্যুত জ্যোতিষ্ক বিশেষ। এই জ্যোতিষ্কের ঔজ্জ্বল্য তাঁর রচনায় যেমন আজ আর অপ্রকট নয়, কক্ষচ্যুতির দৃষ্টান্তও অলক্ষ্য নয়। বিংশ শতকের সূচনায় প্রেক্ষিতরূপে যখন সক্রিয় রয়েছে 'no plot fiction'-এর সোচ্চার ঘোষণা, চরিত্রের অন্তর্গূঢ় রূপায়ণের জন্য যখন পাশ্চাত্য সাহিত্যে chain of conciousness-এর প্রবর্তনা মহামারীর আকারে ছড়িয়ে পড়তে শুরু করেছে—এমন কি, বাংলা সাহিত্য যখন নবজাতক উপন্যাসকে বিদায় সম্ভাষণ জানিয়ে যুদ্ধ-পরবর্তীকালে রম্যরচনা নামধেয় এক-শ্রেণীর রচনার অন্তরালে উপন্যাসের যুগকে নিশ্চিহ্ন করতে চেয়েছে, তখন বিমল মিত্রের আবির্ভাব চকিত, সন্দেহ নেই। কারণ বিমল মিত্র রম্যরচনার জবালা নিয়ে বাংলা সাহিত্যে আবির্ভূত নন, তাঁর সঠিক পরিচয় তিনি ঔপন্যাসিক। উপন্যাস রচনায় plot -কে বিসর্জন দেবার কথা তিনি চিন্তা করেননি—তাঁর ভূমিকা একান্তভাবেই প্রাচ্য গল্প-কথকের ভূমিকা। যেমন করে আমরা একদা আলাদিনের আশ্চর্য প্রদীপের গল্প শুনেছি, যেমন করে অতন্দ্র চোখে মায় জাগিয়েছে আরব্য-রজনীর গল্প, ত্রৈলোক্য-নাথের বৈঠকী আসর যেমন একদিন সূচনা করেছে পরশুরামকে, কেদার চাটুজ্যের আবির্ভাব—'আই কেদার চাটুজ্যে, নো জু-গার্ডেন'—সেই সূত্র ধরেই বিমল মিত্রের আবির্ভাব। ঠিক সেই বৈঠকী ভঙ্গী, আরাম-কেদারায় বসে মৃদু আরামের সৌজন্যে নয়, এ গল্প একেবারে টানা ফরাসে বসে আসর জাকিয়ে তোলা গল্প-কথকের অনির্বাণ আকর্ষণে শুনতে হয়। চরিত্রগুলিও তেমনি জীবন্ত, সাক্ষাৎ-প্রতিম। ভাষাতেও কোন মার-প্যাঁচ নেই—সহজ, সরল বাংলা ভাষা; অথচ কি আশ্চর্য তার ঋজুতা এবং কি বিশাল বিস্তৃত তার ভাবপ্রকাশের ক্ষমতা। Jane Austen -এর মতই বিমল মিত্রও যেন তাঁর ভাষা প্রয়োগে প্রমাণ করেছেন খুব সহজ করে লিখতে পারাটাই সাহিত্য-সংসারে সর্বাপেক্ষা কঠিন ব্যাপার।

সার্থক উপন্যাসের চরিত্র অথবা আখ্যান কোন্‌টি প্রধান ভূমিকায় অধিষ্ঠান করছে, এ সম্বন্ধে তর্কবিতর্ক নিতান্ত কম হয়নি। পাশ্চাত্য সাহিত্য-সমালোচনার আদিগুরু আরিস্টটল এ নিয়ে রীতিমত চিন্তায় পড়ে-ছিলেন। বাংলা সাহিত্যে স্বাভাবিকভাবেই আখ্যানের প্রতি অতিরিক্ত আগ্রহ প্রথম পর্বের উপন্যাসে দেখা যায়। শরৎচন্দ্র কিন্তু চরিত্র পরিস্ফুটনেই অধিকতর আগ্রহী ছিলেন। তাঁর বিবিধ চিঠিপত্রে এ সম্বন্ধে সুস্পষ্ট উল্লেখও আছে।

বিমল মিত্রের উপন্যাসের চরিত্রগুলি সুস্পষ্ট ও জীবন্ত। কিন্তু লেখকের কৃতিত্ব এই যে, তাতে ঘটনার অনিবার্যতা এবং তীব্রতা লেখক কোথাও ক্ষুন্ন করেন নি। আসলে, ঘটনাক্রম ও চরিত্রের বিবর্তন বিমল মিত্রের রচনায় আশ্চর্যভাবে একে অন্যের পরিপূরক। এটি পৃথিবীর সাহিত্যের যে-কোন লেখকের পক্ষে মহৎ প্রতিভার পরিচায়ক। কারণ প্রথিতযশা সাহিত্য-স্রষ্টা-গণও এই সঙ্কট মুহূর্তে একটিকে আশ্রয় করতে গিয়ে, অন্যটিকে দুর্বল করে ফেলেছেন, এমন দৃষ্টান্তের অভাব নেই। টলস্টয়ের 'এ্যানা কারেনিনা'র ঘটনাগত দৈন্য এবং চরিত্রের আত্যন্তিক আন্তর্দ্বন্দ্ব প্রকাশের দৃষ্টান্ত প্রসঙ্গত উল্লেখ করা যেতে পারে।

এই ঘটনাক্রমকে বিমল মিত্র সঠিক মূল্য দিতে পেরেছেন আধুনিক যুগের ঔপন্যাসিক হয়েও। মহৎ ঔপন্যাসিকের জীবন-নিষ্ঠায় তিনি যে কতটা সার্থক তার পরিচয় আছে প্রত্যেকটি রচনার মধ্যে। ইংরেজীতে একটি প্রচলিত কৌতুক আছে, 'In fiction everything is true except names and dates; in history nothing is true except names and dates'. জীবন-পর্যবেক্ষণের অক্লান্ত শক্তিতে সেই জীবন-দর্শন এবং তার সত্য-দর্শন বিমল মিত্রের বৈশিষ্ট্য। তাই একদিন তাঁর প্রথম দিককার চাঞ্চল্যকর উপন্যাস সম্বন্ধে যে প্রতিবাদ ধ্বনিত হয়েছিল—যাকে মনে করা হয়েছিল, তারাশংকর বন্দ্যোপাধ্যায়ের সেই ক্ষয়িষ্ণু জমিদার গোষ্ঠীর জীবন-চিত্রণ ধারারই অনুরূপ, তা স্থায়ী হয়নি। প্রতিবাদের ক্ষীণকণ্ঠ ছাপিয়ে উচ্চারিত হয়েছিল ইন্দিরা দেবী চৌধুরাণী, অমল হোম প্রভৃতি সাহিত্যরসবোদ্ধাদের সযৌক্তিক উচ্ছ্বাস।

ইন্দিরা দেবী লিখেছিলেন, 'বোধহয় বই-এর মুখপাতটা প্রথম থেকেই যে আমার ভাল লেগেছিল, তার কারণ জোড়াসাঁকোর মহর্ষি ভবনের সঙ্গে বড়-বাড়ির চেহারায় অনেকটা মিল পেয়েছিল।' অমল হোম মহাশয়ও বলেছিলেন ঠিক একই কথা, 'আপনি যে যুগের কথায় আপনার উপন্যাস

গাঁথিয়াছেন, সে যুগের অনেকটা ১৯০২ হইতে আমার দেখা ও জানা।.. তাই আমি দ্বিধাহীন প্রত্যয়ে আপনার সৃষ্ট মানুষগুলিকে আমার একান্ত পরিচিত বলিয়া গ্রহণ করিয়া যে বিপুল আনন্দলাভ করিয়াছি তাহা আপনাকে না জানাইয়া পারিতেছি না।'

কিন্তু 'সাহেব বিবি গোলাম' তো জীবনের এক খণ্ডাংশ মাত্র। পরবর্তী রচনা পর্যায়ে বিমল মিত্র প্রমাণ করে দিয়েছেন তাঁর এই জীবন-বীক্ষা কতদূর পূর্ণতা লাভ করতে সক্ষম। আধুনিক বাংলার দুশো বছরের ইতিহাস এবং তার অন্তর্লীন প্রাণ-স্পন্দন বিমল মিত্রের চারটি উপন্যাসে সম্পূর্ণ। 'সাহেব বিবি গোলাম' সহ এগুলির নাম 'বেগম মেরী বিশ্বাস', 'কড়ি দিয়ে কিনলাম' এবং 'একক দশক শতক'।

ভারতবর্ষের স্বাধীনতা-সূর্য ১৭৫৭ সালে অস্ত গিয়েছিল বৃটিশ সরকারের সাম্রাজ্য বিস্তারের ফলস্বরূপ। সেই অষ্টাদশ শতাব্দীর মধ্যভাগ থেকে হাল বিংশ শতাব্দীর দ্বিতীয় দশক পর্যন্ত সেই পরাধীনতার গ্লানি আমাদের ভারতীয় জীবনকে নানাভাবে পর্যুদস্ত করেছিল। পশ্চিমের যন্ত্রসভ্যতার ঝড় এসে ভারতের সমাজ-জীবনে কেবলমাত্র যে আলোড়ন সৃষ্টি করেছিল তা নয়, পতন-অভ্যুদয়ের নানা বন্ধুর পথ-পরিক্রমায় তার যেমন ক্ষতি হয়েছিল, তেমনি উপকারও হয়েছিল প্রচুর। নবাব সিরাজদ্দৌলার অন্যায় পতনের মধ্যে যেমন অশ্রুপাত ছিল বটে, কিন্তু আনন্দোচ্ছ্বাসও কম ছিল না। সেই দুর্যোগ আর দুর্বিপাকের অন্ধকারাচ্ছন্ন যুগকে নিয়েই শ্রীযুক্ত মিত্র লিখেছেন 'বেগম মেরী বিশ্বাস'।

এই 'বেগম মেরী বিশ্বাস'ই হল লেখকের প্রধান উপন্যাস-চতুষ্টয়ের প্রথম পর্ব। যদিও এই গ্রন্থখানি প্রকাশিত হয়েছে সর্বশেষে, তথাচ যুগচিহ্ন হিসাবে এই সিরিজের প্রথম গ্রন্থ হিসাবে এইখানিকেই ধরা যায়। ১৭৫৭ সালের সেই ভারতবর্ষ কেমন করে ইংরেজ অধিকারের সিঁড়ি বেয়ে পরাধীনতার শৃঙ্খলে আবদ্ধ হল, সেই কাহিনীর খুঁটিনাটি ইতি-পূর্বে আর কারো উপন্যাসে এমনভাবে ব্যক্ত হয়নি। ইংরেজ আমলের এই তামিস্রাচ্ছন্ন দিনগুলির তলায় একদিন হঠাৎ দেখা দিল প্রভাত-সূর্যের অরুণাভা। ...১৮৮৫ সালে জন্ম হল ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেসের। সেই দিন থেকে শুরু করে যেদিন ভারতবর্ষের রাজধানী কলকাতা থেকে দিল্লীতে অপসারিত হল, সেই ১৯১২ সাল পর্যন্ত 'সাহেব বিবি গোলাম'-এর বিষয়বস্তু। তারপর এল এক চূড়ান্ত সংগ্রামের যুগ। একদিকে মানুষের দুর্দশা আর একদিকে বৃটিশশক্তির পাশব অত্যাচার, সঙ্গে সঙ্গে ভারতবর্ষে মানুষের উদগ্র স্বাধীনতার স্পৃহা—সব মিলিয়ে দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের পরমুহূর্তে ভারতের স্বাধীনতা-প্রাপ্তি। 'কড়ি দিয়ে কিনলাম' উপন্যাসের সেখানেই পরিসমাপ্তি। তারপর দেখি তাঁর গ্রন্থ 'একক দশক শতক'-এ। উত্তর-স্বাধীনতা যুগের ভারতের সে এক অন্য মূর্তি। জাতীয় কংগ্রেসে সুযোগ-সন্ধানীদের ভিড়, ক্ষমতালোভীদের অন্যায় তৎপরতা, দেশ-সেবকের লাইসেন্স, পারমিট প্রভৃতি নিয়ে কাড়াকাড়ি এবং শেষ পর্যন্ত বিভিন্ন দলাদলির সন্ধিকালে প্রতিবেশী শত্রু চীনের সশস্ত্র আক্রমণ।

অর্থাৎ এই গ্রন্থচতুষ্টয়ের মাধ্যমে দুশো বছরের পথ-পরিক্রমার বাস্তব রূপ প্রতি-ফলিত করেছেন কুশলী ঔপন্যাসিক এবং সমাজ-বীক্ষা ও জীবন-দর্শনের দিক থেকে সম্ভবত বাংলা সাহিত্যের একমাত্র সার্থক social historian বলেও নিজেকে প্রতিষ্ঠা করছেন।

ইতিহাসের দিকে লেখকের এই পূর্ণ দৃষ্টি থাকা সত্ত্বেও তাঁর কোন আখ্যানেই আড়ষ্টতা নেই, ছন্দপতন নেই, তত্ত্ব-প্রচারের প্রবণতা নেই। প্রতিটি আখ্যানের আকর্ষণই সুতীব্র এবং সর্বত্রই চরিত্র-চিত্রণের সঙ্গে ঘনিষ্ঠভাবে সম্পৃক্ত—চরিত্রগুলি আশ্চর্য সজীব। মৌলিকতা এদের একটি বিশেষ গুণ। এছাড়া নারী-চরিত্রগুলির মধ্যেই তাঁর প্রধানত বৈশিষ্ট্য পরিলক্ষিত হয়।

এ সম্পর্কে শ্রীযুক্ত শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় বলেছেন, 'সর্বাপেক্ষা চমকপ্রদ আবিষ্ক্রিয়া নারী চরিত্রের মধ্যে উদাহৃত। অভিজাত বংশের সমস্ত ব্যাধিগ্রস্ত বিকার নারী সত্তায় এক সূক্ষ্ম প্রতিক্রিয়ায়, এক উদাসীন জীবন নির্লিপ্ততায় এক সর্বস্বপণ জুয়াড়ী মনোবৃত্তিতে, এক দুর্নিরীক্ষ্য চারিত্রিক অবক্ষয়ে রূপায়িত হইয়াছে।'

বিমল মিত্রের ভাষার অনন্যতার কথাও অবশ্যস্বীকার্য। এ ভাষা আশ্চর্যভাবে সরল, অথচ ঋজু ও প্রশান্ত। তাঁর প্রকৃত জন-প্রিয়তার এক সুনিশ্চিত কারণ এই ভাষা। এ সম্বন্ধে বিভিন্ন সমালোচক মুক্তকণ্ঠ। অমল হোম একদা বিস্মিত হয়ে বলেছিলেন, 'এমন ঝরঝরে বাংলা, খাঁটি বাংলা কতদিন পড়ি নাই। ভাষাটাকে বাঁকাইয়া, দুমড়াইয়া ইংরেজী বাক্য-রীতির বাংলা প্রাপ্ত করিয়া যে কৃত্রিম ভাষায় রচনা করিয়া আধুনিক বাংলা লেখকের অনেকেই আত্ম-'রজনে' রঞ্জিত, তাহার পাশে আপনার রচনা মরু-প্রান্তরে মৌসুমী হাওয়ার মত। আপনার কলম সোনার।' বিমল মিত্রের এই ভাষা সম্পর্কে পাটনা থেকে প্রকাশিত ইংরেজী পত্রিকা 'The Search Light' একবার লিখেছিলেন,—

> 'He is a master of Bengali prose There are few in Bengal now who can write such an easy but forceful prose'.

একেবারে সাম্প্রতিকতম পর্বে শ্রীযুক্ত মিত্র এক আশ্চর্য পরিণতি খুঁজে পেয়েছেন তাঁর উপন্যাসে এবং সেটিই তাঁকে পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ ঔপন্যাসিকের শ্রেণীতে স্থান দিয়েছে। এই পরিণতির কথা উল্লেখ করে ডঃ শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় বলেছেন,

> 'This is truly a novel with a third dimention ...... with this novel, modern Bengali fiction may be said to have stepped into a new sense of life values or a new world of cosmic proportions'

('কড়ি দিয়ে কিনলাম' প্রসঙ্গে ১৯৪৬ সালের 'অমৃতবাজার পত্রিকা'র পুজা-সংখ্যায় প্রকাশিত)।

এই প্রশংসা বিমল মিত্রের প্রাপ্য ছিল। প্রশংসা অবশ্য তিনি কম পাননি, নিন্দা ও প্রশংসা সমহারেই তাঁর ভাগ্যে জুটেছে। নিন্দার ক্ষেত্রে সমালোচক আত্মভ্রষ্ট হয়েছেন, কিন্তু ইন্দিরা দেবীর মত মহীয়সী মহিলা বলেছেন, 'আমার মনে হয় এই বইয়ের জন্য (সাহেব বিবি গোলাম) লেখকের নোবেল পুরস্কার পাওয়া উচিত, কিংবা তার অনুরূপ স্বদেশী কিছু।'

এই স্বল্প পরিসরের মধ্যে আলোচ্য লেখকের আশ্চর্যসুন্দর গল্প ও প্রবন্ধ সাহিত্যের সর্বাঙ্গীন আলোচনা এবং প্রতিভার মূল্যায়ণ যে সম্ভব নয়, তা সহজেই অনুমেয়। অনাগত কাল এ সম্বন্ধে যাথার্থ্য প্রকাশ করবে।

রকমারী পছন্দসই
১২৫ টাকা থেকে উর্দ্ধমূল্যের
রেডিও এবং ট্রানজিষ্টর
মডেল
টি বি ০৮১৬
মডেল
টি বি ০৫৮১
মডেল
টি বি ০৫৭৯
মডেল
টি বি ০৫০৯
মডেল টিএ/টি ইউ ০৭৭৭
মডেল টিএ ০৯২৬
মডেল টিএ/টিইউ ০২০২
মডেল টিএ/টিইউ ০৭৭৬
মডেল টিএ/টিইউ ০৮২৪
মডেল টিএ ০৩৬৬
আজই আপনার বন্ধু মারফি বিক্রেতার কাছে এগুলি দেখুন।
murphy মারফি গৃহকে আনন্দমুখর রাখে!
Murphy sets the standand
NAS 61424
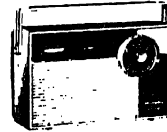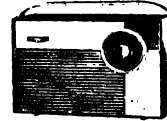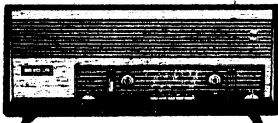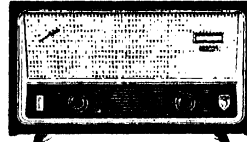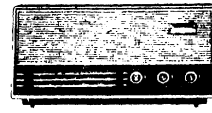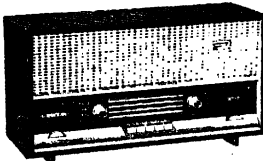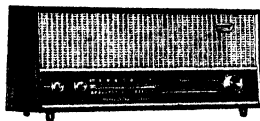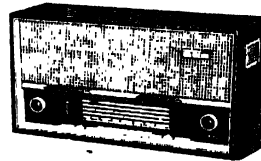
তস্য তস্য অথবা সূর্য কাঁদলে সোনা

প্রেমেন্দ্র মিত্র

(পর্ব প্রকাশিতের পর)

সে সৌভাগ্য হয়েছে তিনজনের মিলিত একটি দলের।

এ তিনজনের দুজন রাস্তায় কুড়িয়ে পাওয়া অনাথ শিশু হিসেবে বেশীর ভাগ ইগ্লেসিয়া অর্থাৎ স্থানীয় গির্জার কৃপা করুণাতেই মানুষ। দুজনেই এঁরা নিরক্ষর মূর্খ। একজন দেশে গাঁয়ে শুয়োর চরাতেন, আরেকজন কি করতেন সঠিক জানা না গেলেও ওর চেয়ে সম্মানের কিছু যে করতেন না সে বিষয়ে সন্দেহ নেই।

অজানা দেশ আবিষ্কারের অভিযাত্রী হওয়া জোয়ান তরুণদেরই কাজ। কিন্তু যাঁদের কথা বলেছি তাঁরা দুজনে যখন প্রথম অভিযানে রওনা হন তখন দুজনেরই বয়স পঞ্চাশ ছাড়িয়ে গেছে।

আধবুড়ো এই দুই নিরক্ষর ভাগ্যান্বেষীর পয়সার জোরও ছিল না। তাঁদের অভিযানের খরচ বইবার ভার দলের তৃতীয় যে জন নিয়েছেন তিনি হলেন একজন এসপানিওল ধর্মযাজক; পানামায় ভাইকারের কাজ করেন। তার আগে ডারিয়েন-এর গির্জায় গুরুমশাই ছিলেন ছাত্র পড়াবার।

এত টাকা তিনি পেলেন কোথায়?

আসলে টাকা তাঁরও নিজের নয়। তিনি আরেকজনের প্রতিনিধি হয়ে টাকাটা দিয়েছেন মাত্র।

কি নামে এঁরা সবাই পরিচিত?

তখনকার সেই ছোট উপনিবেশের জগতেও গ্রাহ্য করবার মত নাম কারুর নয়।

নেপথ্য থেকে যিনি সমস্ত ঝুঁকি নিয়ে টাকা দিয়েছেন সেই আসল মহাজনের নাম লাইসেনসিয়েট গাসপের দে এসপিনা। যাঁর মারফৎ টাকাটা দেওয়া হয়েছে তিনি হলেন হার্নাণ্ডো দে লুকে. দুই দুঃসাহসী আধবুড়ো অভিযাত্রীদের মধ্যে একজনের নাম দীয়েগো দে আলমাগরো আর অন্যজনের ফ্রান্সিসকো পিজারো। মূর্খ নিরক্ষর অনাথ গির্জার দয়ায়-মানুষ পিজারোই যেখানে তাঁর জন্ম স্পেনের সেই ট্রুকসিল্লো শহরে যৌবন পর্যন্ত শুয়োর চড়াতেন।

১৫২২ সালে কিন্তু তিনি পানামার রাস্তায় ঘাটে যাদের ছড়াছড়ি নতুন মহাদেশে ভাগ্যান্বেষণে আসা সেই বাউন্ডুলেদের একজন।

তাদেরই একজন বটে কিন্তু কিছু বিশেষত্বের পরিচয় ইতিমধ্যেই তিনি দিয়েছেন। ১৫১০-এ নতুন মহাদেশের পথে ঘাটে সোনা ছড়ানো গুজব শুনে ও বিশ্বাস করে আরো অনেকের মত দেশ ছেড়ে তিনি অকূলে ঝাঁপ দিয়ে প্রথম হিসপানিওলায় এসে ঠেকেছিলেন। সেখান থেকে সোনার কাস্তিলের নরকে। কিন্তু এখানে অসামান্য অথচ চরম হতভাগ্য বালবোয়ার সঙ্গে পিজারোর যোগাযোগ হয়। বালবোয়ার সঙ্গেই ইওরোপের মানুষ হিসেবে প্রথম প্রশান্ত মহাসাগর দেখার সৌভাগ্য তাঁর হয়। তারপর বালবোয়ার অকাল মৃত্যুর পর ১৫১৫ খৃষ্টাব্দে আর একবার যোজকের পর্বতপ্রাকার ডিঙিয়ে মোরালেস নামে একজন সঙ্গীকে নিয়ে তিনি সমুদ্রকূলের আদিম অধিবাসীদের কাছে দক্ষিণের রহস্য-রাজ্যের আরো কিছু খবর সংগ্রহ করে আনেন।

১৫২২-এ পাসকুয়াল দে আন্দাগোয়া নামে আরেকজন অধিনায়কের নেতৃত্বে বালবোয়া যতদূর পর্যন্ত পৌঁছেছিলেন সেই পুয়ের্তো দে পিনিয়াসের বেশী অগ্রসর হতে না পারলেও 'সূর্য কাঁদলে সোনার' দেশের আরো বিস্তারিত বিবরণ নিয়ে এসে প্রচার করেন।

পানামা শহরের হাওয়ায় তখন সেই আশ্চর্য দেশ খুঁজতে বার হওয়ায় ব্যাকুল উত্তেজনা। পথেঘাটে সকলের মুখে ওই বিষয়ে ছাড়া আলোচনা নেই।

কিন্তু ঘনরামও ত' তখন ওই সোনার কাস্তিলের নরকে কোথাও না কোথাও আছেন!

হ্যাঁ আছেন! ১৫২১-এ ভাগ্য ও সত্যিকার সমুদ্রের ঝড় তুফানের প্রচণ্ড ঢেউ তাঁকে নিয়ে কিছুকাল লোফালুফি করে এই পানামা যোজকেই আছড়ে ফেলে দিয়ে গেছল।

এখানে পানামায় যার বাড়িতে তিনি আশ্রয় পেয়েছেন তার নাম আমরা একবার শুনেছি। তিনি মোরালেস। পিজারোর সঙ্গে ১৫১৫-তে তিনি পশ্চিমের অসীম মহা-সমুদ্র দেখে এসেছেন।

তাঁর কাছে কাজ করতে করতে ঘনরাম সেই নতুন আবিষ্কৃত মহাসমুদ্র আর তার কূলে কোথাও যা এখনো নিজেকে লুকিয়ে রেখেছে সেই বাস্তব স্বর্ণলঙ্কার কথা শুনেছেন।

কলকাতা ফটো : সুনীলচন্দ্র পোদ্দার

১৫২২-এ পিজারো যখন তাঁর অভিযানের স্বপ্ন সার্থক হওয়া সম্বন্ধে কোনো আশাই রাখেন না, ঘনরাম তখনো ওই পানামা শহরেই আছেন।

পিজারোর সঙ্গে পথেঘাটে তাঁর দেখা হয়। দেখা হয় মোরালেস-এর বাড়িতে।

পিজারো সেখানে যান। তাঁর সঙ্গে একটু বেঁটেখাটো শক্তসামর্থ্য আরেকজন আসেন। তখনো একটা চোখ অসাধ্য সাধনের ব্রতে তাঁকে নৈবেদ্য দিতে হয়নি। দেখতে পিজারোর মত সুপুরুষ না হলেও কিছুক্ষণ লক্ষ্য করলেই তাঁর সরল প্রাণখোলা চরিত্র ভালো লাগে। ইনিই পিজারোর বন্ধু দীয়েগো দে আলমাগরো।

পিজারো আর আলমাগরো মোরালেস-এর সঙ্গে একত্র হলেই অবশ্য যে দেশের রাস্তাঘাট সোনায় বাঁধানো, আর সোনার বাসন ছাড়া কেউ যেখানে অন্য কিছু ব্যবহার করে না সেই দেশে অভিযানের আয়োজন কেমন করে করা যায় তারই আলোচনা করেন।

কিন্তু সে আলোচনা যেন বামন হয়ে চাঁদ পাড়বার ফন্দির আলোচনার মত।

এ অভিযান সাজানো মানে চারটিখানি কথা ত' নয়। ছোটখাটো হলেও অন্ততঃ দুটো জাহাজ নিয়ে পাড়ি দিতেই হবে। কোথায় পাবেন সে জাহাজ কেনবার বা তৈরী করাবার খরচ, দুটি জাহাজের রসদ যোগাড় করার সমস্যা আছে তারপর আর সেই সঙ্গে প্রায় শ'খানেক মাঝিমাল্লা সৈনিক।

এমনিতেই দেনার দায়ে তাঁদের চুলের টিকি পর্যন্ত বাঁধা। এত খরচের টাকা, সুতরাং তাঁদের বেচলেও জুটবে না।

পিজারো তবু বলেন যে যেমন করে হোক অস্ত্রশস্ত্র গুলিবারুদ বন্দুকের খরচটা তিনি দিতে পারবেন। আলমাগরো জানান যে দুটি জাহাজে প্রয়োজনীয় রসদ বোঝাই করবার ভার নিতে তিনি প্রস্তুত।

কিন্তু লাগাম যাতে লাগাবেন সে ঘোড়া কোথায়? আসল যা দরকার সেই জাহাজ আসছে কোথা থেকে!

হঠাৎ পিজারো একদিন তাঁর বাসায় একটা চিঠি পান। অজানা কে একজন লিখেছে তাঁকে উদ্দেশ করে।

পিজারো পড়তে জানেন না। চিঠি পড়াতে তাঁকে মোরালেসের কাছেই আসতে হয়েছে।

মোরালেস চিঠি পড়ে যা জানিয়েছেন তাতে অবাক হবারই কথা।

কে একজন অপরিচিত হিতৈষী পিজারোকে জানিয়েছে যে পানামার বন্দরে একটা জাহাজ খুলে রাখা অবস্থায় আছে। ভাস্কো নুনিয়েজ দে বালবোয়া নিজের ব্যবহারের জন্যে এ জাহাজটি তৈরী করিয়ে-ছিলেন। 'সূর্য কাঁদলে সোনার দেশেই' এ জাহাজ নিয়ে অভিযান করার বাসনা তাঁর ছিল। সে বাসনা তাঁর পূর্ণ হয়নি। খুলে রাখা জাহাজটা বেশ সস্তা দরে পাওয়া যেতে পারে। সেটা জুড়ে নিয়ে ব্যবহারের যোগ্য করাও শক্ত নয়। পিজারো ও তাঁর বন্ধু এ জাহাজটার খোঁজ নিয়ে দেখুন না!

চিঠির তলায় কোন নাম সই নেই। কে লিখল তাহলে এ চিঠি! তাঁদের ভাবনা ভাববার এত মাথাব্যথা কার? তাঁদের ভেতরকার এত কথা আর কেউ জানলই বা কি করে?

তার ওপর বালবোয়া-র নিজের জন্যে তৈরী জাহাজটার ওই অবস্থার খবর ত' তাঁরা নিজেরাই রাখেন না! কাস্তিল কি মাদ্রিদের মত একটা বিরাট কিছু শহর নয়। অল্পবিস্তর সকলকেই সকলে এখানে চেনে। এত হুঁশিয়ার এবং তাঁদের হিতৈষী কারুর কথা পিজারোর কি মোরালেস কেউই মনে করতে পারেন না।

তাজ্জবের ওপর তাজ্জব। খানিক বাদে মোরালেস-এর খোঁজে যিনি সেখানে এসে উপস্থিত হন, তাঁকে দেখে পিজারো ও মোরালেস দুজনেই একেবারে হতভম্ব।

স্বয়ং পানামার ভাইকার হার্নান্ডো দে লুকে তাঁদের খোঁজে এখানে এসেছেন। তিনিও এসেছেন এক অচেনা বন্ধুর চিঠি পেয়ে। চিঠিতে তাঁকে মোরালেসের বাড়িতে অতি অবশ্য সেদিন সকালে একবার দেখা করতে অনুরোধ করা হয়েছে। দেখা করলে তাঁর নিজের যাতে বিশেষ উৎসাহ হতে পারে এমন একটি ব্যাপারের কথা তিনি জানতে পারবেন। অত্যন্ত দুঃসাধ্য ও দুঃসাহসিক একটি উদ্যোগ হয়ত তাঁরই সাহায্যে সার্থক হয়ে উঠতে পারে।

কি সে ব্যাপার আর উদ্যোগ দে লুকে-কে জিজ্ঞাসা করে তা জানতে হয়নি।

দুটি চিঠির লেখা মিলিয়ে দেখতে গিয়ে দুটি যে এক হাতের লেখা তা বোঝা গেছে। ভাইকার দে লুকে-কে পিজারোর সঙ্গে দেখা করানোর চেষ্টার উদ্দেশ্যটাও বোঝা গেছে।

তাঁদের বিস্মিত উত্তেজিত আলোচনার মধ্যে আলামাগ্রো এসে পড়েছেন। তিনিও সব শুনে এ চিঠি কে পাঠাতে পারে ঠিক করতে পারেন নি।

চিঠি যেই পাঠিয়ে থাক তার উদ্দেশ্য সফলই হয়েছে।

মোরালেস-এর বাড়িতে ভবিষ্যতের তিন অংশীদারের যোগাযোগ ও আলোচনার সূত্রপাত হয়েছে সেদিন থেকেই।

মোরালেস খুশি মনে সকলের জন্যে পানীয় আনবার হুকুম দিয়েছেন।

পানীয় এনে যে সসম্ভ্রমে সকলকে

পরিবেশন করেছে তার দিকে কে আর নজর দিয়েছে!

নজর এক-আধবার পড়লেও তাকে ঘনরাম বলে চিনবে কে! যে অচেনা হিতৈষীর চিঠি তাদের এইভাবে একত্র করেছে তা যে তাদের সামনে যথাবিহিত মাথা নুইয়ে দাঁড়ানো একজন ক্রীতদাসের লেখা তা আর তারা কি করে কল্পনা করবেন!

ক্রীতদাস! ঘনরাম দাস ক্রীতদাস।—এবার শ্রীঘনশ্যামকে বাধা দিয়ে মস্তক যাঁর মর্মরের মত মসৃণ সেই শিবপদবাবুই তীক্ষ্ণ স্বরে তাঁর সংশয় প্রকাশ করেছেন,—তা কি করে হয়!

হ্যাঁ, মেদভারে হস্তীর মত বিপুল সদাপ্রসন্ন ভবতারণবাবুও তাঁকে সমর্থন করে বলেছেন,—সেই সেনোরা আনা মজা করে ষড়যন্ত্রের মতলব নিয়ে আসার পর কোথায় কি যে হ'ল কিছুই ত জানতে পারলাম না। সেনোরা আনা কিসের ষড়যন্ত্রের কথা বলেছিল, তাতে হলই বা কি, কি এমন ভাগ্যের কারসাজিতে কিভাবে ঘনরাম আবার সেই ক্রীতদাস হয়ে পানামার মত জায়গায় এসে ছিটকে পড়ল কিছুই ত জানতে পারলাম না।

পারবেন! সবই জানতে পারবেন! —দাসমশাই উদারভাবে আশ্বাস দিলেন,—কিন্তু তার জন্যে ধৈর্য ধরে একটু অপেক্ষা করতে হবে, অপেক্ষা করতে হবে সূর্যের উত্তরায়ণের পর তিনদিনের বহ্নিহীন ব্রত পালন করে 'রেমীর' উৎসবে মহাশিখরের সুবর্ণ তৃণ প্যাজোনাল নিয়ে কোরিকাঞ্চার স্বর্ণময় মন্দিরে রামধনু উপাসনার শেষে ফেরার পথে গিরিশীর্ষবাসী জ্যোতির্বিদ্যায় অগ্রগণ্য নুইস্কা জাতির রাজকুমারীর নীচ পৈশাচিক চক্রান্তে অপহৃতা হয়ে আবার আশ্চর্যভাবে উদ্ধার পাওয়া, আর সেই সূত্রে রাজপ্রতিনিধি পানামার শাসক পেড্রারিয়াসের পাঞ্জা নিয়ে আসা মার্কুইস গঞ্জালেস সোলিস-এর বিচিত্র প্রেত-দর্শনের অভিজ্ঞতা অবধি।

এর পর কারুর মুখে কিছুক্ষণ আর কোন কথা নেই। মর্মর-মসৃণ শিরোদেশের শিবপদবাবু পর্যন্ত তাঁর ঘূর্ণায়মান মাথাটাকে স্থির করবার চেষ্টা করছেন। কুম্ভের মত উদরদেশ যাঁর স্ফীত সেই ভোজনবিলাসী রামশরণবাবু ত আগেই হাল ছেড়ে দিয়ে আত্মসমর্পণ করে বললেন,—না মশাই, আমি ধৈর্য ধরে থাকতেই প্রস্তুত। এক চক্কর যা ঠেলা পেয়েছি তাতেই মাথাটার মধ্যে একটা ঘূর্ণি চলছে। এর ওপর আর এক পাক দিলে একেবারে কাৎ হয়ে পড়ব।

শিবপদবাবু সামান্য একটু প্রতিবাদের চেষ্টা করলেন তবু।

বললেন,—এত যে লম্বা ফিরিস্তি দিয়ে গেলেন উনি, তা মনে করে কেউ রাখতে পারে!

মনে রাখবার আপনার খুব প্রয়োজন আছে কি! হেসে বললেন দাসমশাই,—আমিই ত আছি তার জন্যে। যথাসময়ে সবই ঠিক মনে করিয়ে দেব। আর তাতে যদি শান্তি না পান একটা খাতা-পেন্সিল নিয়ে আসবেন টুকে রাখার জন্যে।

খোঁচাটা হয়ত ইচ্ছে করে দেওয়া নয়। কিন্তু শিবপদবাবু একটু পাল্টা খোঁচাই দিলেন। টুকে রাখব? কেন আমাদের কি পরীক্ষা দিতে হবে নাকি!

না, দিতে হবে কেন, তার বদলে নিতেও পারেন! একটু হেসেই বললেন দাসমশাই,—ঘনরাম দাসকে একটু বেকাদায় যদি চেপে ধরতে পারেন তাই বা মন্দ কি? সোরাবিয়া থেকে মারকুইস সোলিস এমন কি স্বয়ং পিজারো পর্যন্ত সেই চেষ্টাই করেছিল। কিন্তু সে পরের কথা। আপাততঃ তাঁকে মোরালেসের বাড়িতে ক্রীতদাস হিসেবে দেখেই আমাদের উঠতে হবে।

শ্রীঘনশ্যাম দাস আসর ভেঙে উঠলেন। তাঁর সঙ্গে আর সবাই।

রাত বেশ হয়েছে। সরোবরের তীরে-তীরে মসলা মুড়ির মাহাত্ম্য আর তেমন ঘন-ঘন ঘোষিত হচ্ছে না। আইসক্রীম ফেরিওয়ালাও অদৃশ্য।

আমাদের পরিচিত কর্নোর সভা ভাঙবার পরই একটা ঝিঁঝি হঠাৎ একটানা তীব্র বর্ষণ ধ্বনিতে সকলকে চমকে দিলে।

এতক্ষণ দাসমশাই-এর জন্যেই সে যেন সাড়া দিতে সাহস করে নি।

১৫২১-এ যোজকের নতুন সরিয়ে-আনা রাজধানী পানামায় পিজারো আর আলামাগ্রোর বন্ধু মোরালেসের বাড়িতে ঘনরামকে ক্রীতদাস হয়ে থাকতে আমরা দেখেছি,—পরের দিন সরোবরের সান্ধ্যসভায় শুরু করলেন শ্রীঘনশ্যাম দাস,—আর 'সূর্য কাঁদলে সোনা'-র দেশের সন্ধানে যাবার জন্যে যারা ব্যাকুল, তাদের একত্র মিলিয়ে পাথেয় সংগ্রহের উপযুক্ত ভূমিকা তৈরী করার ব্যাপারে তাঁর নেপথ্য হাত যে আছে তা অনুমান করা আমাদের ভুল হয়নি।

পিজারো আর আলামাগ্রোর স্বপ্ন সার্থক হবার সম্ভাবনা ক্রমশ উজ্জ্বল হয়ে উঠেছে। কিন্তু তাঁরা নিজেরাই বিস্মিত হয়েছেন অপ্রত্যাশিতভাবে নানাদিক থেকে ভাগ্য তাদের ওপর অনুকূল হয়ে ওঠায়।

ভাইকার হার্নান্ডো দে লুকে তাঁদের দুই বন্ধুর প্রস্তাব শুনে সে বিষয়ে কিছু করা সম্ভব কিনা চেষ্টা করে দেখবেন বলে আশ্বাস দিয়ে গেছলেন। কিন্তু তাঁর দিক থেকে কয়েকমাস কোনো সাড়াই পাওয়া যায়নি।

আসলে ভাইকার দে লুকে খুব প্রাণখুলে কোনো আশ্বাস তাদের দেননি। এ-অভিযানের পরিকল্পনা যা শুনেছেন, তাতে তেমন কিছু উৎসাহবোধ করার বদলে তিনি তার সাফল্য সম্বন্ধে সন্দিহানই হয়েছেন। পিজারো আর আলামাগ্রোর এ-রকম অভিযান চালাবার যোগ্যতা সম্বন্ধে সংশয় জেগেছে তাঁর মনে। যত উৎসাহীই হোক দু'জন প্রায়-বুড়ো, সম্পূর্ণ নিরক্ষর বাউন্ডুলে ছাড়া ত তারা কিছু নয়। তাছাড়া আরো একটা কথা ভাবতে হয়েছে দে লুকেকে। নতুন মহাদেশ আবিষ্কৃত হবার পর থেকে আশাতীত অনেক কিছু আবিষ্কৃত হয়েছে সত্যিই, কিন্তু কল্পনাবিলাসী কিংবদন্তী যে আশা জাগিয়েছে, তার একশটার মধ্যে একটাও পূর্ণ হয়েছে কিনা সন্দেহ। বেশীর ভাগ ক্ষেত্রে লুব্ধ করে টেনে এনে মরীচিকার মতই আশ্চর্য সব দেশের ঘোষিত ঐশ্বর্যের সমারোহ হাওয়ায় মিলিয়ে গেছে।

দুঃসাহসী বেপরোয়া ভাগ্যান্বেষীরা না হোক, তাদের অভিযানের খরচ যারা জোগায়, ভবিষ্যৎ লাভের আশায়, সেই মহাজনেরা অন্ততঃ একটু সাবধান হয়ে হাত গুটিয়ে নিয়েছে তাই।

এ মহাজনীর কারবারে লাভ হলে অঢেল হয় বটে, কিন্তু লোকসানের ঝক্কিও দারুণ। প্রথমত, অভিযান সফল হলেও

কতদিনে হবে তার কোন ঠিকই নেই। এক-দু'বছর নয়, পাঁচ-দশ বছর লাভ দূরের কথা, যাদের ভরসায় টাকা খাটানো, তাদের মুখই হয়ত দেখতে পাওয়া যাবে না। বেঁচে-বর্তেই তারা না থাকতে পারে। তখন যা-কিছু তাদের জন্যে ঢালা হয়েছে, সবই জলাঞ্জলি। তাদের আরম্ভ করা অভিযান হয়ত সফল হবে, কিন্তু ভিন্ন লোকের হাতে। তারা আমলই দেবে না আর কারুর সঙ্গে আগেকার কোন চুক্তিকে।

ফল হাতে পেয়ে গাছ পোঁতার দাবী-দারকে তারা মানবে কেন?

এত ঝক্কি সত্ত্বেও কল্পনার সোনার আশায় সত্যিকার সোনা প্রায় বিলিয়ে দেবার মত মহাজন তখন দু'-চারজন ছিল। তা না থাকলে নতুন মহাদেশের রহস্য-যবনিকা দিকে দিকে কতদিনে গুটিয়ে তোলা হত কে জানে! অন্তত আবিষ্কৃত হবার মাত্র ত্রিশ বছরের মধ্যে সেই পাল-তোলা জাহাজের যুগে এই বিরাট অজানা মহাদেশের উত্তরের ল্যাব্রাডর থেকে দক্ষিণের শেষ বিন্দু টেরা ডেল ফুয়েগো পর্যন্ত উদ্ঘাটিত হয়ে ১৫২১-এ স্পেনের পতাকা বয়ে পোর্টুগীজ নাবিক ম্যাগেলানের পক্ষে পশ্চিম সমুদ্রে যাবার সেই পরমবাঞ্ছিত প্রণালী খুঁজে পাওয়া সম্ভব হত না।

তেমনি এক মহাজন একদিন হঠাৎ দে লুকের কাছে নিজে থেকে এসেছেন। কি আলাপ তাঁদের মধ্যে হয়েছে তা বলা যায় না কিন্তু পিজারো আর আলামাগ্রো নিবিড় অন্ধকারে হঠাৎ আলোর দেখা দেখতে পেয়েছেন।

দে লুকে তাঁদের অভিযানের বিস্তারিত পরিকল্পনা ছক দেখাতে বলেছেন।

খরচা কি তাহলে সত্যি পাওয়া যাবে? দেবেন দে লুকে সে টাকা।—ব্যাকুলভাবে জিজ্ঞাসা করেছেন পিজারো আর আলামাগ্রো।

হ্যাঁ, পরিকল্পনা বিচার করে তারপর টাকার ব্যবস্থাও হতেও পারে। ভাসা ভাসা-ভাবে বলেছেন দে লুকে। স্পষ্ট কোনো আশ্বাস দেননি।

দেবেন কোথা থেকে! আশ্বাস দেবার আসল মালিক ত তিনি ন'ন। তবে পরি-কল্পনাটা সত্যিই খোলা মন নিয়ে তিনি বিচার করে দেখবেন। তাঁর সে বুদ্ধি-বিচক্ষণতা আর সাধুতার সুনাম ইতিমধ্যেই পানামায় অনেকের কাছে পৌঁছেছে।

কিন্তু বিচার করবেন কার হয়ে! নেপথ্য থেকে সত্যিকার চাবিকাঠি নাড়বার এই মানুষটি কে

ইচ্ছে করেই যিনি নিজেকে নেপথ্যে আড়াল করে রাখেন তিনি কি নিজে থেকেই এই ব্যাপারে হঠাৎ আকৃষ্ট হয়ে বিস্তারিত সন্ধানের উদ্যোগ করলেন?

তা যদি না হয়, তাহলে তাঁর গোপন পরিচয় খুঁজে বার করে কে তাঁর কৌতূহল এইটুকু পর্যন্ত উসকে দিল? দিলই বা কি ভাবে!

তা জানবার উপায় নেই। তবে মানুষটির নাম ইতিহাসের অগোচরেই থেকে যায় নি। ঐতিহাসিকেরা তাঁকেও স্মরণীয় করে রেখেছেন। নাম তাঁর গ্যাস্পার দে এস্পিনোসা। শুধু নেপথ্য থেকে অভিযানের খরচাই তিনি যোগান নি, একদিন সুর্য কাঁদলে সোনার দেশে তাঁকে সশরীরে উপস্থিত থাকতেও দেখা গেছে। কিন্তু সে ঘটনা তখন ভবিষ্যতের অন্ধকার গর্ভে বিলীন।

পিজারো আর আলামাগ্রো তখন তাঁদের পরিকল্পনাটা ছকে ফেলছেন। কিন্তু দুজনেই ত' সমান পণ্ডিত। মুখে মুখে ছকলেই ত' হবে না, তা' কাগজে কলমে তোলা চাই।

সেই কাজটা মোরালেসের বাড়িতেই হয়েছে। সন্ধ্যে সকাল দুবেলা তিন বন্ধুর বৈঠক বসেছে, সব কিছু ভেবেচিন্তে স্থির করে লিখে ফেলবার জন্যে। আলোচনা করেছেন সবাই আর লেখার কাজটা করেছেন মোরালেস।

নিজে প্রত্যেক দিনের লেখা পরের দিন পড়িয়ে শুনিয়েছেন মোরালেস, দরকার মত নতুন কিছু সংশোধন করবার জন্যে।

নিজের লেখা পড়তে গিয়েই কিন্তু অবাক হয়েছেন এক একদিন। সম্ভব হলে অভিযান কোন্ সময় নাগাদ শুরু করবেন আগের দিন আলোচনা করে তা লেখা হয়েছিল বলেই সকলের ধারণা। নভেম্বর মাসই উপযুক্ত সময় বলে তাঁরা ঠিক করে-ছিলেন। কিন্তু পড়তে গিয়ে নভেম্বর মাসটা কাটা দেখে প্রথমটা বেশ একটু ধোঁকাই লেগেছে। লেখাটা কখন কাটলেন মনে করতে পারেন নি। তেমন কিছু গুরুত্ব অবশ্য এ ব্যাপারে সেদিন দেন নি। নিজেই ভুলে কখন কেটেছেন এখন মনে নেই, এই-রকমই ধরে নিয়েছেন।

পরের বার কিন্তু বেশ একটু হতভম্বই হয়েছেন নিজের লেখা পড়তে গিয়ে। এ দেশের আদিম অধিবাসীদের কাছে আবছা যে সব বিবরণ এ পর্যন্ত সংগৃহীত হয়েছে তার অধিকাংশতেই পানামার যোজক ছাড়িয়ে দক্ষিণ মুখে পুয়েতো দে পিনাস-এর পর কিছুটা অগ্রসর হলে বীরু নামে একটি নদী পাবার কথা জানানো আছে।

এই 'বীরু' নদীর নাগাল পেলেই তাঁদের সন্ধান সহজ হয়ে যাবে বলে তিন বন্ধুই মনে করেছেন। মোরালেস কাগজে লিখে-ছিলেনও তাই।

লিখেছিলেন—বীরু নদী আমাদের লক্ষ্য। তার স্রোত বেয়েই রহস্য-রাজ্যের সন্ধান আমরা পাব।

পড়তে গিয়ে দেখেন, দ্বিতীয় সেণ্টেন্স-এর আগে 'হয়ত' শব্দটা বসানো। হাতের লেখাটা হুবহু তাঁরই কিন্তু এ কথা লিখেছেন বলে তিনি স্মরণ করতেই পারেন না।

ওই একটা শব্দে সমস্ত বাক্যটার অর্থ একেবারে বদলে গেছে। সেটা দাঁড়িয়েছে, বীরু নদী আমাদের লক্ষ্য। হয়ত তার স্রোত বেয়েই রহস্য-রাজ্যের সন্ধান আমরা পাব।

এ 'হয়ত' শব্দ বসিয়ে তাঁদের বিশ্বাসকে অমন দুর্বল করে দেখানো ত তাঁদের পক্ষে অসম্ভব! ভুলেও মোরালেস তা করতে পারেন না।

তাহলে আর কেউ কি তাঁর এ লেখার ওপর কলম চালাচ্ছে!

কিন্তু কে তা চালাতে পারে, আর চালাবেই বা কেন?

মোরালেস বয়সে পিজারো আর আলামা-গ্রোর প্রায় সমান হলেও নানা রোগে ভুগে বড় বেশী ভেঙে পড়ে অথর্ব হয়ে গেছেন। তা না হলে পিজারোর অভিযানের শুধু পরিকল্পনা করেই তিনি ক্ষান্ত থাকতেন না।

ভাঙা শরীর নিয়েও মোরালেস কিন্তু স্পেনে ফিরে যান নি। শরীর অক্ষম হলেও অজানা মহাদেশের মোহে তাঁর মন এখনও আচ্ছন্ন। সেই দেশে উত্তেজনার উৎস-মুখেই তিনি জীবনটা কাটিয়ে যেতে চান।

প্রায় একলাই তিনি পানামায় একটি বাসা নিয়ে থাকেন। পানামার দপ্তরখানায় তাঁর এক দূরসম্পর্কের ভাইপো কাজ করে। সে মাঝে মাঝে কাকার সঙ্গে দেখা করে যায় মাত্র। তাঁকে দেখাশোনা আর তাঁর ফাই-ফরমাস খাটার কাজ এক ক্রীতদাসই করে।

অসম্ভব হলেও, তাঁর সেই ভাইপো পেড্রো কোন সময়ে এসে তাঁকে না পেয়ে কাগজগুলোর ওপর কলমবাজি করেছে এইটুকু মাত্র ভাবা যেতে পারে।

পেড্রো এসেছিল কিনা জানবার জন্যে তাই তিনি ক্রীতদাসকে ডাক দেন।

একবার দু'বার তিনবার ডাকেও তার কিন্তু সাড়া পাওয়া যায় না।

'গানাদা' বলে বেশ গরম হয়ে আর একবার ডেকে মোরালেস উঠে পড়েন।

না মোরালেসের ক্রীতদাস গানাদার কোন পাত্তা পাওয়া যায় না। বাড়িতে সে নেই। একদিন খোঁজ-খবরের পর জানা যায় পানামা শহরেই সে নেই।

হঠাৎ লোকটা গেল কোথায়? কোন্ স্পর্ধায় সে যায়!

পিজারো বন্ধুকে ক্রীতদাসের পালানোটা সরকারী দপ্তরে জানিয়ে রাখতে বলেন, ধরতে পারলে যাতে ঠাণ্ডা করে দেয় মার দিয়ে।

মোরালেস হেসে বলেন,—কি জানাবো দপ্তরে! ও ক আমার সত্যিকার নিজের কেনা ক্রীতদাস। তোমরা হয়ত খেয়াল করোনি, মাত্র বছর দুয়েক লোকটি আমার কাছে কাজ করছে। আমার আগের ক্রীতদাস মারা যাবার পর লোক খুঁজছিলাম। হঠাৎ একদিন নিজে থেকেই এসে জানালে সে ক্রীতদাস। কিউবা থেকে পালিয়ে এসেছে গরু ভেড়ার জাহাজে লুকিয়ে। নামও বললে গানাদা। জানালে আমার কাছে গোলাম হয়ে থাকতে চায়। পালিয়ে-আসা ক্রীতদাস নতুন মহাদেশে অগুনতি আছে। নিজে থেকে তার সে কথা স্বীকার করাতেই অবাক হলাম। কেউ তা করে বলে আমার জানা নেই। কিউবায় গোলামদের ওপর অধিকাংশ মনিবের বাড়িতে অকথ্য অত্যাচার হয় আমি জানি। লোকটাকে দেখে পছন্দ হওয়ায় তাই এক কথায় নিয়ে নিলাম। সেজন্যে আফশোষ করতে হয়নি কখনো। একদিনের জন্যে তার এতটুকু গাফিলি কি বেচাল দেখি নি। আজ যদি নিজের খুশিতেই চলে গিয়ে থাকে আমার নালিশ করবার কিছু নেই।

(ক্রমশঃ)

দেশে বিদেশে

গুজরাটেও বিপদ

মধ্যপ্রদেশের পর গুজরাটও কি কংগ্রেসের হাতছাড়া হতে যাচ্ছে?

সেদিন আমেদাবাদে বিধানসভার ভিতরে কংগ্রেস দলের সামনে এই উদ্বেগজনক প্রশ্ন এসে দেখা দিয়েছিল।

প্রশ্নোত্তরের পর বিরোধী দলের নেতা শ্রীভাইলাভাই প্যাটেল (স্বতন্ত্র) দাঁড়িয়ে উঠে স্পীকারকে বললেন, শ্রীশম্ভুভাই প্যাটেলের আসনটি কংগ্রেসপক্ষ থেকে সরিয়ে এনে বিরোধীপক্ষের মধ্যে নির্দিষ্ট করে দেওয়া হোক, কেননা, শ্রীশম্ভুভাই প্যাটেল কংগ্রেস থেকে পদত্যাগ করে বিরোধীপক্ষে যোগ দিয়েছেন।

স্পীকার বললেন, তিনি শ্রীশম্ভুভাই প্যাটেলের কাছ থেকে খবর পেয়েছেন যে, শ্রীপ্যাটেল কংগ্রেস দল ছেড়ে দিয়েছেন। শ্রীপ্যাটেল একটি বিবৃতি দিয়ে বলেছেন যে, তিনি কংগ্রেসের নীতি ও কর্মসূচীর সঙ্গে একমত নন বলেই কংগ্রেস ছেড়েছেন।

শ্রীশম্ভুভাই প্যাটেলের এইভাবে দল-বদলের ফলে গুজরাট বিধানসভায় কংগ্রেস দলের সদস্য সংখ্যা দাঁড়াল স্পীকারকে নিয়ে ৮৬। বিধানসভায় মোট আসনের সংখ্যা ১৬৮। বৃহত্তম বিরোধী দল স্বতন্ত্র দলে আছেন ৬৬ জন।

গুজরাটের কংগ্রেস মহলের এই উদ্বেগের ছায়া দিল্লীতেও গিয়ে পৌঁছেছে বলে সংবাদ পাওয়া গেছে। সেখানকার সংবাদ হচ্ছে, গুজরাট বিধানসভার অন্ততঃ আরও তিনজন কংগ্রেস সদস্যের উপর দলত্যাগ করে বিরোধীপক্ষে যোগ দেওয়ার জন্য চাপ রয়েছে। এই প্রসঙ্গে এমনকি বরদার মহারাজা ফতে সিং গায়কোয়াড়ের নামও শোনা যাচ্ছে—যদিও তিনি প্রকাশ্য বিবৃতি দিয়েই বলেছেন যে, তিনি কংগ্রেস দল ত্যাগ করবেন না।

বরদার মহারাজা সম্পর্কে এই ধরনের সংবাদের অন্য একটি পরিপ্রেক্ষিত রয়েছে। সেটা হচ্ছে এই যে, প্রাক্তন সামন্ত রাজাদের ব্যক্তিগত তহবিল বন্ধ করে দেওয়া হবে বলে কংগ্রেস মহলে যে কথাবার্তা চলছে তা কংগ্রেসের ভিতরকার প্রাক্তন রাজা-মহারাজাদের বিচলিত করে তুলেছে। বরদার মহারাজা সম্প্রতি যখন দিল্লীতে গিয়েছিলেন তখন তাঁর সঙ্গে কংগ্রেস নেতাদের এ বিষয়ে কথাবার্তা হয়েছে বলে প্রকাশ। আরও প্রকাশ, মহারাজা কংগ্রেসের উপর মহল থেকে এই ভরসা পেয়ে এসেছেন যে, রাজা-মহারাজাদের ব্যক্তিগত তহবিল বন্ধ করে দেওয়ার প্রস্তাব সম্পর্কে আপাততঃ আর কিছু করা হবে না। এই আশ্বাস দেওয়ার সময় গুজরাটে কংগ্রেস দলের সম্ভাব্য সংকটের কথাটা নেতাদের মনের মধ্যে থাকতে পারে।

সন্ত তুলসীদাসের জন্ম-জয়ন্তী উপলক্ষে কলকাতা যুবক সংঘের উদ্যোগে মহাজাতি সদনে আয়োজিত সভায় শ্রীরামলগন সিং বক্তৃতা দিচ্ছেন। পাশে শ্রীএম জালান, অনুষ্ঠানের সভাপতি শ্রীতরুণকান্তি ঘোষ ও শ্রীকিশোরীলাল ঢনঢনিয়াকে দেখা যাচ্ছে।

এর আগে গুজরাটে কংগ্রেস দল আর একটা ঘা খেয়েছে সেখানকার প্রস্তাবিত বিশ্ববিদ্যালয়টি রাজকোটে স্থাপিত হবে, না ভবনগরে সেই বিতর্কে।

ইতিমধ্যে ঐ রাজ্যে কংগ্রেস ও বিরোধী পক্ষ থেকে পারস্পরিক অভিযোগ তোলা হচ্ছে যে, দল ভাঙাবার জন্য নানারকম চাপ সৃষ্টি করা হচ্ছে ও প্রলোভন দেওয়া হচ্ছে। কংগ্রেস দলের চীফ হুইপ শ্রীইন্দুভাই প্যাটেল বলেছেন যে, স্বতন্ত্র পার্টি "লোভনীয় প্রস্তাব" দিয়ে বিধানসভার কংগ্রেস সদস্যদের ভাঙিয়ে নেওয়ার চেষ্টা করছেন। তিনি বলেছেন যে, এই উদ্দেশ্যে মন্ত্রিত্বের প্রলোভন দেখান হচ্ছে, এমনকি টাকাও ছড়াবার চেষ্টা করা হচ্ছে। কিন্তু "কংগ্রেস সদস্যরা এইসব প্রস্তাব দৃঢ়তার সঙ্গে প্রত্যাখ্যান করেছেন এবং দলের প্রতি তাঁদের আনুগত্য প্রকাশ করেছেন।"

অপরপক্ষে, গুজরাটের স্বতন্ত্র দলের সাধারণ সম্পাদক শ্রীনরেন্দ্র সিং জালা বলেছেন যে, কংগ্রেস দলকে ক্ষমতায় রাখার জন্য কংগ্রেসকর্মীদের ও বিধানসভার সদস্যদের আত্মীয়বর্গকে গাড়ী বোঝাই করে আমেদাবাদে আনা হয়েছে। গত ৮ই আগস্ট তারিখে বিধানসভার স্পীকার বিধানসভায় বলেছেন, স্বতন্ত্র দলের তিনজন সদস্য তাঁর কাছে লিখিত অভিযোগ পেশ করে জানিয়েছেন যে, কংগ্রেস সদস্যরা তাঁদের ভয় দেখাচ্ছেন।

এইসব টানাপোড়েনের পরিণতিতে গুজরাটে শ্রীহিতেন্দ্র দেশাইয়ের মন্ত্রিসভার যদি পতন ঘটে তাহলে কংগ্রেসের পক্ষে সেটা একটা বড় রকমের বিপর্যয় হবে। এই ধরনের একটা বিপর্যয় এমনকি কেন্দ্রেও কংগ্রেস সরকারের স্থায়িত্ব সম্পর্কে একটা গভীর সংশয়ের সৃষ্টি করতে পারে বলে কেউ কেউ অনুমান করছেন।

আমেরিকার শহরে দাঙ্গা

যদিও মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের বিভিন্ন শহর থেকে এখনও বর্ণবিদ্বেষজনিত দাঙ্গা-হাঙ্গামার খবর আসছে তথাপি ডেট্রয়েটের প্রচণ্ড তাণ্ডবের পর এখন অবস্থা অপেক্ষাকৃত শান্ত হয়েছে বলে মনে হচ্ছে।

এই অবসরে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে এইসব দাঙ্গাহাঙ্গামার ব্যাপকতা ও গম্ভীরতা, এগুলির পিছনের কারণ ও প্রতিকারের উপায় সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনা শুরু হয়েছে।

প্রাথমিক হিসাবেই দেখা যাচ্ছে যে, এই বৎসরের "দীর্ঘ, তপ্ত গ্রীষ্মে" আমেরিকার শহরগুলিতে ইতিমধ্যেই অন্যান্য বৎসরের তুলনায় অনেক গভীরতর ক্ষতের সৃষ্টি হয়েছে। ১৯৬৪ সালে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের ৮টি শহরে হাঙ্গামা হয়েছিল, ৮ জন মারা

গিয়েছিল এবং ১০৫৬ জন জখম হয়েছিল, ১৯৬৫ সালে হাঙ্গামা হয়েছিল ওয়াটস ও শিকাগোতে, মারা গিয়েছিল ৩৫ জন ও জখম হয়েছিল ১০৮০ জন। ১৯৬৬ সালে ১৮টি অঞ্চলে দাঙ্গাহাঙ্গামার মৃত্যু হয়েছিল ১২ জনের আর জখম হয়েছিল ৩৬৬ জন। আর এই বৎসর দাঙ্গা হয়ে গেছে ইতিমধ্যেই ৩১টি শহরে, মারা গেছে ৮৬ জন, আহত হয়েছে ২০৫৬ জন।

এইসব দাঙ্গাহাঙ্গামার কারণ সম্পর্কে অনুসন্ধান করার জন্য প্রেসিডেণ্ট জনসন ইলিনয়-এর গভর্নর অটো কার্ণারের সভাপতিত্বে যে কমিটি গঠন করেছেন সেই কমিটির কাজ ইতিমধ্যে শুরু হয়েছে।

আমেরিকার সংবাদপত্রগুলি এই বিষয়ে প্রায় একমত যে, এবারকার দাঙ্গাহাঙ্গামা-গুলিকে নিছক শাদা-কালোর দাঙ্গা বললে ভুল করা হবে। তাঁদের মতে, এটা হচ্ছে আমেরিকার প্রাচুর্যের সমাজে যারা দরিদ্র, যারা বঞ্চিত তাদের ক্ষোভের প্রকাশ। প্রমাণ হিসাবে উল্লেখ করা হয়েছে যে, এবারকার দাঙ্গায় অনেক শাদা-চামড়ার গরীব লোককেও নিগ্রোদের সঙ্গে মিশে দোকানপত্র লুঠ করতে দেখা গেছে। অনেক সময় নিগ্রো লুণ্ঠনকারীরাই দরিদ্র শ্বেতাঙ্গদের এই লুঠতরাজে যোগ দিতে আমন্ত্রণ করে এনেছে।

ভাইস প্রেসিডেণ্ট হুবার্ট হামফ্রি বোস্টনে ও ডেট্রয়েটে বলেছেন যে, গরীব নিগ্রোদের জন্য যেটুকু করা দরকার সেটুকু অত্যন্ত ধীরে ধীরে করা হচ্ছে এবং নিগ্রো বস্তী-গুলির উন্নতিসাধনের কাজও বিশেষ অগ্রসর হচ্ছে না।

একদিকে যখন শাদা-কালোর সমস্যাটাকে মূলতঃ দারিদ্র্য দূরীকরণের সমস্যার সংগে জড়িত করে দেখাবার চেষ্টা হচ্ছে তখন আর একদিকে বিপরীত প্রতিক্রিয়াও দেখা দিচ্ছে।

মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্রের আইনসভার ভিতরে ও বাইরে শ্বেতাঙ্গমহল থেকে প্রশ্ন তোলা হচ্ছে, দাঙ্গার মূলে যদি দারিদ্র্যই আসল কারণ হয় তাহলে কোন শহরে দারিদ্র্য দূরীকরণের কর্মসূচী অনুযায়ী ব্যয় করার আগে হাঙ্গামা না হয়ে এই বাবদ বহু অর্থ-ব্যয় করার পর এই হাঙ্গামা বাধছে কেন?

ভাইস প্রেসিডেণ্ট হামফ্রির সঙ্গে একমত হওয়া দূরের কথা, কোন কোন শ্বেতাঙ্গ মহল থেকে সম্পূর্ণ উল্টো কথাও বলা হচ্ছে! যেমন সাউথ ক্যারোলাইনার স্টম থারমণ্ড বলেছেন যে, এইসব হাঙ্গামার জন্য দায়ী হল "কম্যুনিজম, মিথ্যা অনুকম্পা, আইন অমান্য, আদালতের রায় ও দুষ্টপ্রবৃত্তি।"

বিভিন্ন শহর থেকে আতঙ্কিত শ্বেতাঙ্গরা তাঁদের এলাকা থেকে নির্বাচিত আইনসভার সদস্যদের কাছে পত্র লিখছেন তাঁদের রক্ষার জন্য বিশেষ ব্যবস্থা অবলম্বন করার আবেদন জানিয়ে। এইসব আতঙ্কিত পত্রের একটা ফল ইতিমধ্যেই দেখা গেছে। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের বিভিন্ন শহরের পৌর সভাগুলিকে দাঙ্গা নিবারণের উন্নততর ব্যবস্থা গ্রহণে সাহায্য করার জন্য মার্কিন প্রতিনিধিসভার ৩০ কোটি ডলার ব্যয় মঞ্জুর করার একটি প্রস্তাব এসেছে।

ওয়াশিংটনের হাওয়া যেদিকে যাচ্ছে তা দেখে মনে হচ্ছে, ১৯৬৭ সালের এইসব দাঙ্গাহাঙ্গামার নিগ্রোদের দারিদ্র্য দূরীকরণের জন্য বলিষ্ঠতর কর্মসূচী গ্রহণের পরিবর্তে এখন যে কর্মসূচী রয়েছে সেটাকে আরও সঙ্কুচিত করে দেওয়ার উদ্দেশ্যে আইনসভায় যুক্তরাষ্ট্রীয় সরকারের উপর পাল্টা চাপ আসতে পারে।

মন্দা থেকে আত্মরক্ষা

ইংরেজী অর্থনৈতিক পরিভাষায় যাকে বলা হয় "রিসেশন", অর্থাৎ পশ্চাদগামিতা, ভারতীয় অর্থনীতি ইদানীং তার কবলে গিয়ে পড়েছে। সোজা কথায়, ভারতীয় অর্থ-নীতিতে বর্তমানে মন্দা চলছে। এই নিয়ে সরকারী পরিকল্পনাকারীরা এবং বেসরকারী ব্যবসায়ী-শিল্পপতিরা নিদারুণ উদ্বিগ্ন।

সাধারণভাবে সেই অর্থনীতিক পরি-স্থিতিকে পশ্চাদগামী বলা হয়, যে পরি-স্থিতিতে চাহিদা হ্রাস পায়, তার ফলে উৎপাদন কমে যায়, তার ফলে কর্মী উদ্বৃত্ত ও ছাটাই হয়, তার ফলে অর্থনৈতিক জীবন-যাত্রা পিছিয়ে পড়ে। সাধারণত পশ্চাদগামী অবস্থার সঙ্গে সঙ্গে দামও অলাভজনক-ভাবে কমতে থাকে।

সেদিক থেকে ভারতীয় অর্থনীতির বর্তমান মন্দা অবস্থাকে খাঁটি অর্থে রিসেশন বলা যাবে কিনা সন্দেহ। কারণ কল-কারখানার উৎপাদনে ভাটা পড়লেও তার কারণ শুধু চাহিদার হ্রাস নয়। চাহিদার

ার অতি-উৎপাদনও এই মন্দার কারণ। মালের অভাবে কারখানার কাজকর্ম । পড়াও এর কারণ। শিল্পক্ষেত্রে ওখলা সৃষ্টির ফলে কারখানা বন্ধ াও খুব বড় না হলেও অন্যতম কারণ।

পশ্চিমবঙ্গ থেকে একটি দৃষ্টান্ত দিয়ে কথার প্রমাণ করা যায়। পশ্চিমবঙ্গে ়ত ৩৬টি কল-কারখানা বন্ধ হয়ে গেছে তার ফলে প্রায় ৩০ হাজার কর্মী চ্যুত হয়েছেন। কিন্তু চাহিদার অভাবের বন্ধ হয়েছে এর মাত্র একটি ক্ষুদ্র । বেশ কয়েকটি কারখানা বন্ধ হয়েছে মালের অভাবের দরুণ। এবং কয়েকটি হয়েছে ঘেরাও ইত্যাদি আন্দোলনের ।

কাজেই যদিও মন্দা অবস্থা চলছে ঃ জিনিসপত্রের দাম যে কমছে তা নয়। তা দিনের পর দিন বেড়েই চলেছে। ং বিরাট এবং ক্রমবর্ধমান একটা চাহিদা র মধ্যে এখনও রয়েছে। এই চাহিদা যে অর্থনীতির বিকাশের পক্ষে মহামূল্য বিশেষ।

এই অবস্থার প্রতিকারের জন্যে বতই প্রয়োজন যুক্তিসঙ্গত দামে পর্যাপ্ত াল সরবরাহ এবং শিল্পক্ষেত্রে মোটা- একটা শান্তিপূর্ণ অবস্থা রক্ষা করা। যেহেতু চাহিদার অভাবটাও একটা এবং কোন কোন ক্ষেত্রে, বিশেষ করে ীয়ারিং শিল্পের ক্ষেত্রে একটা বড় সেই জন্যে ভবিষ্যৎ বিনিয়োগের র্কও সতর্ক দৃষ্টি রাখা দরকার।

বিনিয়োগের ব্যাপারটা অত্যন্ত গুরুত্ব- । কোন পরিকল্পনা করে বিনিয়োগ না ফলে এক একটি ক্ষেত্রে প্রয়োজনের রক্ত মূলধন নিযুক্ত হয়েছে আবার ও প্রয়োজনের তুলনায় কম। যেখানে নের অতিরিক্ত মূলধন নিযুক্ত নই দেখা দিয়েছে অতি-উৎপাদন। বস্থায় সাধারণ মানুষের লাভ হবার কিন্তু তা হচ্ছে না, কারণ যে যে । অতি-উৎপাদনজনিত সমস্যা দেখা ছ সেগুলি নিত্যব্যবহার্য জিনিসের সংশ্লিষ্ট নয়।

ই সঙ্গে যুক্ত হয়েছে সরকারী কাজ- মন্দা। অর্থনীতি শাস্ত্রে বলে, মুখী অর্থনীতিকে সম্মুখমুখী করার ম উপায় হল সরকারী উদ্যোগে নতুন ী প্রকল্প চালু করা ও বর্তমান গুলির সম্প্রসারণ করা। কারণ এর বিপুল পরিমাণ চাহিদার সৃষ্টি হয়। ভারতের আর্থিক অবস্থা যে রকম ায় তাতে এই পথে সমস্যা সমাধান াচ্ছে না। বর্তমানে যে চাহিদা-হ্রাসের না হচ্ছে তার উৎপত্তি প্রধানত এই ।

সুতরাং 'রিসেশন' দূর করার জন্যে আরো দুটি পথের নির্দেশ পাওয়া গেল। এক, শিল্পে নতুন অর্থ বিনিয়োগে অত্যন্ত সতর্কতা অবলম্বন করতে হবে, দুই, সরকারী কাজকর্মের প্রসার ঘটাতে হবে।

গত ৬ আগস্ট কংগ্রেসের সংসদীয় দল এক বৈঠকে সরকারী ক্রয় বাড়াবার জন্যে জোরদার সুপারিশ করেছিলেন।

অবশ্য আরো অনেক কিছু করা দরকার। যে-কথা ভারতীয় বণিক সঙ্ঘ সমিতি সম্প্রতি একটি রিপোর্টে বলেছেন। সমিতির মতে রেল ওয়াগনের ও বিদ্যুৎশক্তির ঘাটতির দরুণ শিল্পের কাজকর্ম ব্যাহত হচ্ছে, এই দুটি ঘাটতি মেটাতে হবে। বিশেষ বিশেষ ক্ষেত্রে শুল্ক কর কমাতে হবে। কোম্পানীর ওপর ধার্য করের হার কমাতে হবে। ব্যাঙ্কের সুদের হার কমাতে হবে। রিজার্ভ ব্যাঙ্কের ঋণদান নীতি উদারতর করতে হবে। উৎপাদকের ব্যবহারের জিনিস, যেমন মেশিন ও মেশিন-তৈরীর যন্ত্রপাতি কেনার দাম পরে শোধ দেবার ব্যবস্থা করে দিতে হবে। মূল্য নিয়ন্ত্রণ, শিল্প লাইসেন্স প্রভৃতি অনাবশ্যক ও বিরক্তিকর নিয়ম-কানুন তুলে নিতে হবে। ইত্যাদি।

উৎপাদকের আর্থিক অবস্থা যাতে ভাল থাকে, যাতে পুনর্নিয়োগের মত অর্থ তার হাতে থাকে, সেজন্যে এই ব্যবস্থাগুলি নিশ্চয়ই নেওয়া দরকার।

কিন্তু সবচেয়ে প্রথমে প্রয়োজন চাহিদা সৃষ্টি। সরকারী কাজকর্মের প্রসারের দ্বারা এটা করা যেতে পারে। অবশ্য এ কাজ এখনই সম্ভব কিনা জানি না, তবে যতটুকু সম্ভাবনা আছে তাকে এখনই কাজে লাগানো উচিত।

সেই সঙ্গে দেশের ভিতরে ইতিমধ্যেই যে বিপুল চাহিদা রয়েছে এবং যে চাহিদা প্রতিদিন সৃষ্টি হচ্ছে তার সুযোগ পুরো- পুরি নেওয়া উচিত। এইখানেই বিনিয়োগ নিয়ন্ত্রণের প্রশ্ন ওঠে। বিনিয়োগ যাতে বিশেষ কয়েকটি ক্ষেত্রে গিয়ে জড়ো না হয়, তা যাতে সমস্ত ক্ষেত্রে, বিশেষ করে নিত্য- ব্যবহার্য জিনিসের ক্ষেত্রে সমানভাবে বণ্টিত হয় তা দেখতে হবে সরকারকেই। তাতে শিল্পের মন্দাভাব কাটবে এবং জনসাধারণও উপকৃত হবে। রপ্তানী বাণিজ্য বৃদ্ধির আশা আপাতত লোপ পেয়েছে। সুতরাং আভ্যন্তরীণ বাজারের ওপর ভরসা করেই 'রিসেশন' ঠেকাবার কথা আমাদের ভাবতে হবে। আর তাই মূলধনের যুক্তিসঙ্গত বিনিয়োগও অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ।

প্রেক্ষাগৃহ

চিত্র-সমালোচনা

আমন (হিন্দী) : এমকে প্রোডাকসন্স-এর নিবেদন; ৪,৭৫১·৫৩ মিটার দীর্ঘ এবং ১৮ রীলে সম্পূর্ণ ; প্রযোজনা ও পরিচালনা : মোহনকুমার ; কাহিনী ও চিত্রনাট্য : রঞ্জন বসু ; সংলাপ : সর্দার সৈলানী ; সংগীতপরিচালনা : শঙ্কর জয়কিষণ; গীতিরচনা : হসরৎ জয়পুরী ও শৈলেন্দ্র; হিরোসিমা প্রদর্শনশালার গীতিরচনা : প্রেম ধাওয়াল; চিত্রগ্রহণপরিচালনা : রাধু কর্মকার ; চিত্রগ্রহণ : সুশীল রায় ; শব্দানুলেখন : জর্জ ডিক্রুজ এবং এ কে পারমার; সংগীতানুলেখন : মীনু কাত্রাক ও মঙ্গেশ দেশাই ; শব্দপুনর্যোজনা : মঙ্গেশ দেশাই ; শিল্পনির্দেশনা : সুধেন্দু রায় ; সম্পাদনা : প্রতাপ দাভে ; নৃত্য-পরিচালনা : সত্যনারায়ণ ; নেপথ্য কণ্ঠ-সংগীত : লতা মঙ্গেশকর ও মোহম্মদ রফী; রূপায়ণ : রাজেন্দ্রকুমার, বলরাজ সাহনী চেতন আনন্দ, ওমপ্রকাশ, সুন্দর, সুরেশ, সজ্জন, ব্রহ্ম ভরদ্বাজ, ডাঃ সি সি চ্যাং, ডাঃ চেং হ্যাং চাউ, চিন হাই, চুংভীন. নেন ফা, ফাস্যাং, চ্যাং চি, চেন তা, ফুংচিয়া, লী ইয়াং, সায়রা বানু, চাঁদ ওসমানী, মৃদুলা, দয়া দেবী, বেবী কবিতা ওবেরয়, ক্যাবারে নৃত্যশিল্পী মেরী লোজেফ ও আর্নেস সেলফোর্স এবং লর্ড বার্ট্রান্ড রাসেল। অমরজ্যোতি পিকচার্স-এর পরিবেশনায় গেল ১১ই আগস্ট, শুক্রবার সোসাইটি, ও রয়েল্ট, মেনকা, খান্না, কালিকা, ইস্টার্লী এবং অপরাপর চিত্রগৃহে মুক্তিলাভ করেছে।

"আমন" কথাটির বাংলা অর্থ হচ্ছে শান্তি। বিজ্ঞানের কল্যাণে আমাদের পৃথিবী আদান-প্রদান ও গমনাগমনের দিক দিয়ে যতই ছোট হয়ে আসছে মানুষ যতই পরস্পরের মুখোমুখি এসে দাঁড়াচ্ছে, মানুষের প্রতি মানুষের অবিশ্বাস যেন ততই বেড়ে চলেছে। ১৯৪৫ সালের ৬ই আগস্ট বেলা ৮-১৫ মিনিটে জাপানের হিরোসিমা শহরে পারমাণবিক বোমা নিক্ষেপ ক'রে মানুষ যেদিন এক মুহূর্তে এক লক্ষ নিরীহ লোকের মৃত্যু এবং একটি শহরের সমগ্র বাসিন্দাদের জীবনে তেজষ্ক্রিয়তার অভিশাপের কারণ হয়ে পড়ল, সেইদিন থেকে মানুষের প্রতি মানুষের বিশ্বাস ভেঙে চুরমার হয়ে গেছে। ১৯৪৫-এর পারমাণবিক বিস্ফোরণের তেজষ্ক্রিয়তাজনিত ব্যাধিতে চিরজীবনের জন্যে পঙ্গু হয়ে পড়েছে, এমন নরনারীকে ভর্তি হাসপাতাল আজও হিরোসিমার বুকে দাঁড়িয়ে রয়েছে। পারমাণবিক তেজষ্ক্রিয়তার ভয়ে শঙ্কিত আজ পৃথিবীর নরনারী। মানুষের মন থেকে এই শংকাকে চিরকালের জন্যে দূর করবার সংকল্প আজ জেগেছে বহু চিকিৎসা-বিজ্ঞানীরই মনে।

মিস্ প্রিয়ংবদা চিত্রে লিলি চক্রবর্তী

এমকে প্রোডাকসন্স-এর সুদীর্ঘ ইস্টম্যানকলারে তোলা ছবি "আমন"-এর নায়ক ডাঃ গৌতমের মনেও এই মহৎ সংকল্প দানা বেঁধে উঠেছিল। তাই বিলাতে উচ্চতর ডাক্তারী পরীক্ষায় সসম্মানে উত্তীর্ণ হবার পরে বর্তমান জগতের শ্রেষ্ঠ দার্শনিক মহামতি বার্ট্রান্ড রাসেলের আশীর্বাণী বহন ক'রে সে গিয়ে উপস্থিত হ'ল হিরোশিমার মিচিকো মেমোরিয়াল হাসপাতালে পারমাণবিক তেজষ্ক্রিয়তা দ্বারা আক্রান্ত রোগীদের রোগমুক্ত করবার অভিপ্রায় নিয়ে। আপ্রাণ গবেষণার ফলে ডাঃ গৌতম এমন এক ঔষধ আবিষ্কার করতে সক্ষম হ'ল, যা আণবিক রশ্মি দ্বারা আক্রান্ত রোগীদের নিরাময় ক'রে তোলার পক্ষে বিশেষ সহায়ক হবে ব'লে স্বীকৃত হ'ল এবং চিকিৎসা-বিজ্ঞানীরা সানন্দে আশা করতে লাগলেন, অতিশীঘ্রই ডাঃ গৌতম অসাধ্য-সাধনে সক্ষম হবে। ঠিক এই সময়েই সংবাদ এল, পরীক্ষামূলক পারমাণবিক বিস্ফোরণের ফলে উত্তর প্রশান্ত মহাসাগরের একটি ছোট দ্বীপের অধিবাসী ধীবরদের জীবন সংশয়াপন্ন হয়েছে। ঐ দ্বীপের উপর তখনও তেজষ্ক্রিয় মেঘ পুঞ্জীভূত হয়ে রয়েছে এবং তা যে-কোনও মুহূর্তে বিদীর্ণ হয়ে তেজষ্ক্রিয় বারিধারার পতন ঘটাতে পারে, এই সাবধানবাণী উপেক্ষা ক'রেও ডাঃ গৌতম একটি ছোট উদ্ধারকারী দল নিয়ে একটি বিশেষ ধরণের জলযানে চেপে সেই ধীবরদের উদ্ধার করতে গেল এবং নিতান্ত দৈব-দুর্বিপাকে শেষ পর্যন্ত তেজষ্ক্রিয় ধারাবর্ষণের বিপদ থেকে নিজেকে রক্ষা করতে পারল না। ফলে সে প্রথমে তার দৃষ্টি এবং পরে জীবন হারাতে বাধ্য হল। পারমাণবিক তেজষ্ক্রিয়তার বিরুদ্ধে উৎসর্গীকৃত প্রাণ ডাঃ গৌতমের জয়গানে আকাশ-বাতাস মুখর হয়ে উঠল।

এই কাহিনীর সঙ্গে জড়িয়ে আছে ডাঃ গৌতমের ব্যক্তিগত জীবনের কাহিনী। সেখানে সে প্রেমিক ; ঐ মিচিকো মেমোরিয়াল হাসপাতালেরই প্রতিষ্ঠাতার একমাত্র বিদুষী, সর্বগুণান্বিতা, সুন্দরী কন্যা মিনোভার প্রণয়াস্পদ। দু'জনের মধ্যে বিবাহ হবার সব কথাবার্তা যখন স্থির হয়ে গেছে সেই সময়েই এল ডাঃ গৌতমের জীবনে বিপদ

ঘনিয়ে। চরম মুহূর্তে জাপানী মেয়ে মিনোড়া ডাঃ গৌতমের হাত থেকেই নিজের সিঁথিতে সিঁদুর পরে নিল ও ডাঃ গৌতমের শেষনিশ্বাস ত্যাগের পরে শ্বেতশুভ্র বসনে নিজেকে মণ্ডিত করে তার মৃতদেহের সঙ্গে এল ভারতবর্ষে পরলোকগত গৌতমের প্রৌঢ় পিতার সান্নিধ্যে তার বাকী জীবন কাটিয়ে দেবার অভিপ্রায়ে।

প্রযোজক পরিচালক মোহনকুমারের মহৎ উদ্দেশ্যের প্রতি সাধুবাদ জানাই। পারমাণবিক তেজস্ক্রিয়তার বিভীষিকা সম্পর্কে দর্শক-সমাজকে সজাগ করবার জন্যে তিনি "আমন" ছবির মধ্যে যে-সব দৃশ্যের অবতারণা করেছেন, যে-সব পরিস্থিতির সৃষ্টি করেছেন এবং যে-সব মানবিক আবেদনপূর্ণ সংলাপ বিভিন্ন চরিত্রের মুখ দিয়ে বলিয়েছেন, তার জন্যে আমরা তাঁকে সাধুবাদ জানাব শতমুখে। শান্তির বাণী প্রচারের তাঁর এই সুমহান চেষ্টাকে আন্তরিকভাবে অভিনন্দিত করবেন সকলেই। কিন্তু তাঁর এই প্রচেষ্টা একেবারেই নিষ্কলুষ হ'তে পারত, যদি জাপানী মেয়ে মিনোড়ার সঙ্গে ডাঃ গৌতমের প্রেমের দৃশ্যগুলিকে চিরাচরিত বোম্বাই ঢংয়ে না ক'রে চরিত্র দু'টির বিশেষত্বব্যঞ্জক রূপে চিত্রিত হ'ত। বোম্বাইমার্কা হিন্দী ছবিতে দেখা নায়ক-নায়িকার প্রেম দেওয়া-নেওয়ার দৃশ্যগুলির পুনরাবৃত্তি ছবিখানির মর্যাদাকে যে বহুল পরিমাণে ক্ষুণ্ণ করেছে, অত্যন্ত দুঃখের সঙ্গেই একথা স্বীকার করতে হচ্ছে। এ-ছাড়া ডাঃ গৌতমের মৃত্যু-কালীন বক্তব্য পেশের এবং পালাম বিমান-বন্দর থেকে ইণ্ডিয়া গেট পর্যন্ত তার মৃতদেহ নীত হওয়ার দৃশ্য দু'টি যে অযথা দীর্ঘায়িত হয়েছে, তাও বলা প্রয়োজন।

"আমন" ছবির মধ্যে সবচেয়ে প্রশংসনীয় হচ্ছে এর বিরাট ও বাস্তব দৃশ্য-পরিকল্পনা ও দৃশ্য-সজ্জা। ছবিটিতে প্রেমের দৃশ্যগুলি না থাকলে আমরা হয়ত মনেই রাখতে পারতুম না যে, আমরা কোনো কাহিনীচিত্র দেখছি, বাস্তব ঘটনা প্রত্যক্ষ করছি না। ছবির প্রায় আরম্ভভাগেই মনীষী বার্ট্রাণ্ড রাসেলের সঙ্গে নায়ক ডাক্তার গৌতমের কথোপকথন ছবিটিকে বাস্তবের পর্যায়ে উন্নীত করতে অনেকখানি সাহায্য করে। হিরোসিমা মিউজিয়মের দৃশ্যগুলিও এই ব্যাপারে অনেকখানি সহায়ক। পারমাণবিক বোমা বিস্ফোরণের দৃশ্যগুলিও অত্যন্ত বাস্তব পরিবেশের সৃষ্টি করেছে।

ডাঃ গৌতমরূপে রাজেন্দ্রকুমার অপরূপ: যে নিষ্ঠার সঙ্গে তিনি ডাক্তারের ভূমিকাটিকে চরিত্রিত করেছেন, যে-দরদের সঙ্গে তিনি তাঁর মানব-প্রেমিকতাকে ভাষা দিয়েছেন, তার তুলনা হয় না। কিন্তু প্রেমিক গৌতমরূপে তিনি অত্যন্ত সাধারণ হ'তে বাধ্য হয়েছেন। গৌতমের এই দুটো দিক পরস্পরের সঙ্গে মিলে যেতে পারেনি। জাপানী মেয়ে মিনোড়া বেশে সায়রা বানু ডাঃ গৌতমের প্রেমগর্বে গর্বিতা রূপটি সুন্দরভাবে তুলে ধরেছেন। ছবিতে বলা হয়েছে, মিনোড়া শান্তিনিকেতনের ছাত্রীরূপে ভারতীয় সংস্কৃতির সঙ্গে ঘনিষ্ঠভাবে পরিচিত। বলা-বাহুল্য, চিত্রনাট্যকার ও পরিচালক ছবির ভিতর কোথাও মিনোড়ার সে-পরিচয় দিতে অসমর্থ হয়েছেন। নায়ক-নায়িকার দুই পিতার ভূমিকায় যথাক্রমে বলরাজ সাহনী ও চেতন আনন্দ নিজেদের নাট-নৈপুণ্য প্রকাশের অতি পরিমিত সুযোগ পেয়েছেন। মহামতি বার্ট্রাণ্ড রাসেলকে তাঁর নিজ রূপেই চলচ্চিত্রে দেখা এবং তাঁর মুখের শান্তিবাণী শোনা যে-কোনো দর্শকই তাঁর জীবনের একটি পরম সৌভাগ্য ব'লে বিবেচনা করবেন। কয়েকটি রোগিণী ও রোগীরূপে দয়া দেবী, চাঁদ ওসমানী, বেবী কবিতা ওবরেয়, সজ্জন এবং ওমপ্রকাশ (ইনি আর একটু সংযত হ'তে পারতেন) স্মরণীয় অভিনয় করেছেন। হাসপাতালের বড়ো ডাক্তারের ভূমিকায় সুরেশের অভিনয় দরদ ও ব্যক্তিত্বপূর্ণ। ডাঃ গৌতমের লণ্ডনস্থ বাঙালী বন্ধুটি চমৎকার।

ছবির কলা-কৌশলের বিভিন্ন বিভাগের কাজ অত্যন্ত উচ্চ পর্যায়ের। বিশেষ ক'রে, কি বহির্দৃশ্য, কি বিরাট সেট, কি অত্যন্ত নিকট ক্লোজ-আপ, প্রতিটি শটেই রঙীন চিত্রগ্রহণ বৈশিষ্ট্যপূর্ণ ও দক্ষতার পরিচায়ক। দৃশ্য-পরিকল্পনা যে অত্যন্ত বস্তুতব ও শিল্পসম্মত, সে-কথা আগেই বলা হয়েছে। কিন্তু গানের সুর-যোজনায় শঙ্কর জয়-কিষণের কাছে যে চিত্রোপযোগী অভিনবত্ব আশা করেছিলুম, তা আমরা আদৌ পাইনি। বরং আবহসঙ্গীত রচনায় তাঁরা ঘটনার ভাবানুসরণে কৃতিত্বের পরিচয় দিয়েছেন। প্রসঙ্গত, ক্যাবারে নৃত্যশিল্পীদ্বয়—মেরী জোজেফ এবং আর্নেস সেলফোর্স আমাদের অকুণ্ঠ প্রশংসা দাবি করতে পারেন। অত্যন্ত সুরুচিসঙ্গত নৃত্যভঙ্গিমা প্রদর্শন ক'রে তাঁরা দর্শকমাত্রকেই মোহিত করেছেন। ভারতীয় ছবিতে এ-ধরণের নৃত্য এই প্রথম।

মোহনকুমার প্রযোজিত ও পরিচালিত ইস্টম্যানকলারে তোলা সুদীর্ঘ চিত্র "আমন" বিশ্বে শান্তিস্থাপনের প্রয়োজনীয়তার প্রতি অঙ্গুলিনির্দেশক একটি সুমহান প্রয়াস-রূপে অভিনন্দিত হবে।

—নান্দীকর

এস এম প্রোডাকসন্সের 'অনন্ত বাসর'

এস এম প্রোডাকসন্সের প্রথম প্রয়াস 'অনন্ত বাসর'-এর শুভ মহরৎ সম্প্রতি টেকনিসিয়ান্স স্টুডিওয় সম্পন্ন হল সঙ্গীত গ্রহণের মাধ্যমে। সঙ্গীত পরিচালক ভি, বালসারার পরিচালনায় কণ্ঠদান করেন প্রতিমা বন্দ্যোপাধ্যায় ও মানবেন্দ্র মুখোপাধ্যায়। দুর্গেশ শর্মাচার্য রচিত এ কাহিনী-চিত্রে অভিনয় করছেন অজয় গাঙ্গুলী, জ্যোৎস্না বিশ্বাস, তরুণকুমার, অসিতবরণ, জহর রায়, সুব্রতা চট্টোপাধ্যায়, পদ্মা দেবী ও রবি ঘোষ। ছবিটি পরিচালনা করছেন ইন্দ্রজিৎ।

ক্যাপিটাল ফিল্মসের 'দুরন্ত চড়াই'

সমরেশ বসু রচিত ক্যাপিটাল ফিল্মসের 'দুরন্ত চড়াই' পরিচালনা করছেন জগন্নাথ চট্টোপাধ্যায়। ছবিটির সম্পূর্ণ চিত্রগ্রহণ সমাপ্তপ্রায়। শ্যামল মিত্র সুরকৃত এ ছবির মুখ্য অংশে অভিনয় করেছেন মাধবী মুখোপাধ্যায়, অনুপকুমার, দিলীপ রায়, সৌমেন চক্রবর্তী, সবিতা চট্টোপাধ্যায় ও বিকাশ রায়।

ট্রায়ো ফিল্মসের 'ছোট্ট জিজ্ঞাসা'

বিশ্বজিৎ প্রযোজিত ও অভিনীত ট্রায়ো ফিল্মসের 'ছোট্ট জিজ্ঞাসা' বর্তমানে মুক্তি-প্রতীক্ষিত। গৌরীপ্রসন্ন রচিত এ কাহিনীর মুখ্য চরিত্রে অভিনয় করেছেন বিশ্বজিৎ, মাধবী মুখোপাধ্যায়, প্রসেনজিৎ, অনুপকুমার হারাধন বন্দ্যোপাধ্যায়, জ্ঞানেশ মুখোপাধ্যায় গীতা দে। সঙ্গীত পরিচালনায় রয়েছেন নচিকেতা ঘোষ।

এ কে বি ফিল্মসের 'মহাবিপ্লবী অরবিন্দ'

এ কে ব্যানার্জি প্রযোজিত 'মহাবিপ্লবী অরবিন্দ' চিত্রের নিয়মিত চিত্রগ্রহণ বর্তমানে সুসম্পন্ন করছেন পরিচালক দীপক গুপ্ত। সম্প্রতি হেমন্ত মুখোপাধ্যায়ের পরিচালনায় এ ছবির বেশ কয়েকটি উল্লেখযোগ্য গান গৃহীত হয়েছে। ছবির নাম-ভূমিকায় অভিনয় করেছেন দিলীপ রায়। এছাড়া অন্যান্য বিশিষ্ট চরিত্রে রয়েছেন রবীন বন্দ্যোপাধ্যায়, শেখর চট্টোপাধ্যায়, নির্মল ঘোষ, শমিতা বিশ্বাস, সুব্রতা চট্টোপাধ্যায়, পদ্মা দেবী প্রভৃতি।

প্রশান্ত চট্টোপাধ্যায় পরিচালিত **বিষপাথর** চিত্রে রবি ঘোষ ও রমা দাস। ক্যামেরায় দীপক দাস। ফটো : অমৃত

মুক্তিপ্রতীক্ষায় 'পান্না'

নবগঠিত চিত্রসংগঠন সংস্থা প্রথম যে ছবিটি পরিবেশন করছেন তার নাম 'পান্না'। তিনটি কিশোর-কিশোরীর অভূতপূর্ব অভিযানকে কেন্দ্র করে চমকপ্রদ এই কাহিনীর বিস্তার ঘটেছে। বাঙলা দেশের গ্রামে, জঙ্গলে, পাহাড়ে ও নদীর খাঁড়িতে দীর্ঘ সময়, বহু অর্থব্যয় এবং বহু আয়াস স্বীকার করে এ ছবির কাজ সমাপ্ত হয়েছে।'

নামভূমিকায় প্রতিভাধর নবাগত বালক অভিনেতা শ্রীমান রমাপ্রসাদের বিস্ময়কর অভিনয় এ ছবির এক বিশেষ আকর্ষণ। চিত্রজগতে খ্যাত কুমারী কৃষ্ণকলি এবং তরুণকুমারের অভিনয়প্রতিভার স্বাক্ষরও পাওয়া যাবে এ ছবিতে।

অন্যান্য ভূমিকায় যাঁরা আছেন তাঁদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য পঙ্কজ মিত্র, অর্ধেন্দু মুখোপাধ্যায়, শিখা ভট্টাচার্য, মণি শ্রীমানী, নিভাননী দেবী প্রভৃতি এবং একটি বিশিষ্ট ধরনের চরিত্রে অবতীর্ণ হয়েছেন শম্ভু মিত্র।

এই বিচিত্র সুন্দর কাহিনীর নির্দেশনা করেছেন অমিত মৈত্র। চিত্রগ্রহণ, সঙ্গীত-পরিচালনা ও শিল্পনির্দেশনায় আছেন যথাক্রমে বিশু চক্রবর্তী, ভি বালসারা ও সুনীল সরকার। চিত্রটি পরিবেশন করছেন ডি, লাক্স।

মুক্তিপ্রতীক্ষিত 'দুষ্টু প্রজাপতি'

শ্যাম চক্রবর্তী পরিচালিত ললিত চিত্রমের 'দুষ্টু প্রজাপতি' শীঘ্রই মিনার, বিজলী, ছবিঘর প্রভৃতি চিত্রগৃহে মুক্তিলাভ করবে। বিধায়ক ভট্টাচার্য রচিত এই কাহিনীর প্রধান চরিত্রে অংশ গ্রহণ করেছেন কিশোরকুমার, তনুজা, সবিতা চট্টোপাধ্যায়, তরুণকুমার, অসীমকুমার, ভারতী দেবী পদ্মা দেবী ও চন্দ্রিমা ভাদুড়ী। সুরসৃষ্টি করেছেন হেমন্ত মুখোপাধ্যায়।

প্রতিদান

এম বি প্রোডাকসন্স নিবেদিত 'প্রতিদান' ছবিটি সেপ্টেম্বরের প্রথম সপ্তাহে উত্তরা, পূরবী, উজ্জ্বলায় মুক্তি পাবে বলে জানা গেছে। ভ্রাতৃপ্রেমের এক আবেগ-মধুর আখ্যান অবলম্বনে ছবির কাহিনী, চিত্রনাট্য ও পরিচালনা করেছেন 'মুখুজ্জে পরিবার' এবং 'উত্তর পুরুষ'-খ্যাত অজিত গঙ্গোপাধ্যায় এবং সুরারোপ করেছেন শৈলেন মুখোপাধ্যায়।

বিভিন্ন চরিত্রে অভিনয় করেছেন কালী

পান্না চিত্রে গঙ্গাপদ বসু ও সাবিত্রী চট্টোপাধ্যায়

বন্দ্যোপাধ্যায়, অনিল চট্টোপাধ্যায়, কাজল গুপ্ত, জহর গঙ্গোপাধ্যায়, মলিনা দেবী, অনুভা গুপ্তা, রমা গুহঠাকুরতা, জহর রায়, কালী চক্রবর্তী, সত্য বন্দ্যোপাধ্যায়, সুখেন দাস, পঞ্চানন ভট্টাচার্য, গীতা দে, সুশীল চক্রবর্তী এবং নবাগতা সুচেতা বন্দ্যোপাধ্যায়।

চিত্রগ্রহণ ও সম্পাদনায় আছেন দীনেন গুপ্ত ও বৈদ্যনাথ চট্টোপাধ্যায়।

ছবিটি দেবালী পিকচার্সের পরিবেশনায় মুক্তিলাভ করবে।

ছায়ারূপা নিবেদিত 'প্রথম বসন্ত'

শ্রীমতী প্রতিভা বসু রচিত ছায়ারূপার 'প্রথম বসন্ত' বর্তমানে পরিচালনা করছেন নির্মল মিত্র। কাহিনীর প্রধান চরিত্রগুলিতে, রূপদান করছেন মাধবী মুখোপাধ্যায়, অনিল চট্টোপাধ্যায়, অঞ্জনা ভৌমিক, শুভেন্দু চট্টোপাধ্যায়, রীণা ঘোষ, অজয় গাঙ্গুলী, পাহাড়ী সান্যাল, ছায়া দেবী ও বিকাশ রায়। রবীন চট্টোপাধ্যায় ছবিটির সুরকার।

● পিপাসা

অনিন্দ্য চিত্রম্-এর পরীক্ষামূলক প্রচেষ্টা 'পিপাসা'। এই ছবির গল্প লিখেছেন বাঙলা দেশেরই একজন প্রখ্যাত চরিত্রাভিনেতা 'উদভ্রান্ত' ছদ্মনামের আড়ালে। চিত্রনাট্য রচনা করেছেন প্রখ্যাত নাট্যকার দেবনারায়ণ গুপ্ত, পরিচালনার দায়িত্ব গ্রহণ করেছেন প্রশান্ত সরকার, সঙ্গীত-পরিচালনা চিত্রগ্রহণ, সম্পাদনা ও শিল্পনির্দেশনার ভার নিয়েছেন যথাক্রমে রবীন চট্টোপাধ্যায়, বিনয় ঘোষ, অর্ধেন্দু চট্টোপাধ্যায় ও রামচন্দ্র সিন্ধে।

বিভিন্ন ভূমিকায় থাকবেন সন্ধ্যারাণী, অসিতবরণ, মাধবী মুখোপাধ্যায়, অনিল চট্টোপাধ্যায়, তরুণকুমার, জ্ঞানেশ মুখো-[illegible]ময় শঙ্কর, নবাগত সুকুমার ঘোষ এবং [illegible]ক ও বধির একটি চরিত্রে অবতীর্ণ হয়েছেন বালিকাবধূ-খ্যাত [illegible] বন্দ্যোপাধ্যায়। পরিবেশনার দায়িত্বগ্রহণ করেছেন ফিল্ম ডিল।

কাবুলীওয়ালার বিস্ময়

শহরের এক অ্যাংলো ইন্ডিয়ান পাড়ায় সত্যজিৎ রায় তাঁর 'চিড়িয়াখানা' ছবির চিত্রগ্রহণ করছিলেন। গোয়েন্দারূপী ব্যোমকেশ চরিত্রে কাবুলীওয়ালার ছদ্মবেশ ধারণ করেছিলেন উত্তমকুমার। জনৈক কাবুলীওয়ালা হঠাৎ এসে উত্তমকুমারকে তার নিজের ভাষায় নানারূপ প্রশ্ন করতে শুরু করল এবং জনৈক বাঙালী শিল্পী যে ঐ সাজে অভিনয় করছেন, তা সে কিছুতেই মানতে চাইল না। তার ধারণা, এই নিখুঁত চেহারা, চলাফেরা, বাহ্যিক অভিব্যক্তি এ নিশ্চয়ই তার দেশের লোক।

হরেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য প্রযোজিত স্টার প্রোডাকসন্সের 'চিড়িয়াখানা' ছবির শেষ-পর্যায়ের চিত্রগ্রহণ চলছে। আসছে শারদীয়ার শ্রেষ্ঠতম আকর্ষণরূপে ছবিখানি দর্শকদের অভিবাদন জানাবে।

আর. ডি. বনশলের আগামী কয়েকটি বাংলা চিত্র প্রয়াস

প্রযোজক-পরিবেশক আর. ডি. বনশল তাঁর আগামী কয়েকটি বাংলা চিত্র প্রয়াসের পরিকল্পনা গ্রহণ করেছেন। সম্প্রতি রবীন্দ্রনাথের **'ঘরে-বাইরে'** কাহিনীর চিত্রস্বত্ব ক্রয় করেছেন। এছাড়া **'মলঙ্কজ'** এবং **'নাচন হাটির জন সাহেব'** কাহিনী দুটি চলচ্চিত্রে রূপ দেবার পরিকল্পনাও নেওয়া হয়েছে।

বর্তমানে এ সংস্থার নতুন ছবি **'চৈতালির'** কাজ চলেছে। ছবিটি পরিচালনা করছেন সুধীর মুখোপাধ্যায়। ইতিমধ্যে ছবির সঙ্গীত গৃহীত হয়েছে। সঙ্গীত পরিচালনা করেছেন শচীনদেব বর্মণ। দুটি প্রধান চরিত্রে রূপদান করেছেন উত্তমকুমার ও তনুজা।

কিশোর সাহুর পরবর্তী ছবি 'পুষ্পাঞ্জলি'

প্রযোজক-পরিচালক কিশোর সাহু তাঁর মুক্তিপ্রাপ্ত 'হরে কাঁচ কি চুড়িয়াঁ' ছবির পর বর্তমানে যে নতুন ছবিটির পরিকল্পনা গ্রহণ করেছেন তার নাম 'পুষ্পাঞ্জলি'।

এ-ছবির নায়ক-নায়িকা চরিত্রে মনোনীত হয়েছেন সঞ্জয় ও নয়না সাহু। এ-ছাড়া এই রঙিন ছবির একটি কৌতুক-চরিত্রে অভিনয় করবেন মেহমুদ। সুর-সৃষ্টির দায়িত্ব নিয়েছেন লক্ষ্মীকান্ত-প্যারেলাল

কব কোন অউর কহাঁ'? ছিত্রের শুভ মহরৎ

সম্প্রতি রূপতারা স্টুডিওয় পরিচালক অর্জুন হিঙ্গোরা তাঁর নতুন ছবি 'কব, কোন অউর কহাঁ'?-র শুভ মহরৎ সুসম্পন্ন করেন। এ ছবির মুখ্য চরিত্রে রয়েছেন ধর্মেন্দর, …বতা, ধুমল, অসিত সেন, মোহন চোটি, …গণ, হেলেন ও নবাগতা আশু। সঙ্গীত পরিচালনা করছেন কল্যাণজী-আনন্দজী।

…ক্তি সামন্ত পরিচালিত 'পাগলা কাহি' কা'

শক্তি সামন্ত পরিচালিত মার্স এণ্ড …ভজের রঙ্গীন ছবি 'পাগলা কাহি' কা'-র …টি গান সম্প্রতি গ্রহণ করলেন সঙ্গীত পরিচালক শঙ্কর-জয়কিষণ। কন্ঠদান করেন …তা মঙ্গেশকর ও মহম্মদ রফি। ছবির …শিষ্ট চরিত্রে রূপদান করছেন শাম্মি ও …পুর, আশা পারেখ, প্রেম চোপরা, …নমোহন কৃষ্ণ ও হেলেন।

…প্রন্স' চিত্রে বৈজয়ন্তীমালা

…লেখ ট্যানডন পরিচালিত রঙ্গীন ছবি …প্রিন্স'-র শেষ চিত্রগ্রহণ সম্প্রতি শুরু হয়েছে …মাস স্টুডিওয়। প্রধান চরিত্রে অংশ গ্রহণ …রেছেন বৈজয়ন্তীমালা, শাম্পি কাপুর, …ডিভ, লীলা চিটনিস, অজিত, প্রভীন …ধুরী, সুন্দর ও সাপ্রু। এ-ছবির সুরকার …কর-জয়কিষণ।

…সীমা' চিত্রের শুভ মহরৎ

পরিচালক সুরজপ্রকাশ তাঁর নতুন …ঙগন ছবি 'সীমা'র শুভ মহরৎ গত ১লা …গস্ট রূপতারা স্টুডিওয় উদযাপন করেন। …রৎ-শিল্পী হিসেবে উপস্থিত ছিলেন …নাকুমারী ও রাজেশ খান্না। এছাড়া একটি …শিষ্ট চরিত্রে মনোনীত শর্মিলা ঠাকুর। …ল্যাণজী-আনন্দজী ছবিটির সুরকার।

নাম নেই

সাম্প্রতিক বাংলা নাট্য রচনায় ক্ষেত্রে …শ মৈত্রের 'নাম নেই' এক উল্লেখযোগ্য …ষ্ট। বর্তমান যুগ-জীবনের আসল …রূপকে এ নাটকে উদ্ঘাটিত করা হয়েছে, …বাকের আড়ালে, কথার মায়াজালে যে …টা লুকিয়ে আছে, নাট্যকার অতি সচেতন …ক্ষ্য বাস্তব বুদ্ধি দিয়ে তাকে স্পষ্ট …লায় মূর্ত করে তুলেছেন। স্বরূপ …টনের সূত্র ধরে হৃদয়যন্ত্রণার যে আত্ম-…শ তাও ভাষা পেয়েছে এই নাট্যসৃষ্টিতে।

বাস্তব জীবননিষ্ঠ নাটকটি সম্প্রতি …ভিনয় করলেন 'সরকার ফুটওয়্যার রিক্রি-…ন ক্লাবে'র শিল্পিবৃন্দ। বলতে কোন …ধা নেই প্রয়োগ পরিকল্পনার অভিনবত্বে …বলিষ্ঠ অভিনয়-নৈপুণ্যে সেদিনকার …প্রেক্ষক নাট্যানুরাগীদের আন্তর স্বীকৃতি পেয়েছে। এমন সুষ্ঠু নাট্য-প্রযোজনা খুব বেশী চোখে পড়ে না।

নাটকটির আঙ্গিক অন্যান্য নাটকের মতো গতানুগতিক নয়। নাট্যনির্দেশক দীপক রায় এ বিষয়ে পূর্ণ সচেতন থেকে প্রয়োগ-কর্মে স্বাতন্ত্র আনতে চেষ্টা করেছেন। তাঁর এই প্রচেষ্টায় আন্তরিক নিষ্ঠা ও সূক্ষ্ম রুচিবোধের ছাপ আছে। আঙ্গিক পরি-কল্পনায় যে নতুনত্বের আস্বাদ, অভিনয়-রীতিতেও তার আভাস পরিস্ফুট হয়েছে।

প্রতিটি শিল্পীই যে অসাধারণ অভিনয় করেছেন একথা বলা যায় না। কয়েকজনের অভিনয়ে কিছু শৈথিল্য লক্ষ্য করা গেছে, কিন্তু সামগ্রিক অভিনয়ের মধ্যে সংঘবদ্ধতায় এ ত্রুটি ঢাকা পড়েছে। প্রথম থেকে শেষ পর্যন্ত নাটকীয় গতি অব্যাহত ছিল। যে সব শিল্পী নাটকের গতিকে আকাঙ্ক্ষিত সীমায় নিয়ে যেতে পেরেছেন তাঁদের মধ্যে প্রথমেই নাম করতে হবে মিলন সর-কারের। মাতাল 'ডেভিড' চরিত্রের হৃদয়-যন্ত্রণাকে আশ্চর্য সংযমের সঙ্গে মঞ্চে মূর্ত করে তুলতে পেরেছেন। বিনয় সরকারের 'শম্ভু' ও অসিত ভট্টাচার্যের 'অসীম' উল্লেখ-যোগ্য সৃষ্টি। চরিত্র দুটির মর্মকথা এই দুই শিল্পী নৈপুণ্যের সঙ্গে তুলে ধরতে পেরেছেন। 'পরিচালকে'র ভূমিকায় বিমল সেনগুপ্তের অভিনয়ে প্রথম প্রথম একটু জড়তা ছিল, শেষের দিকে অবশ্য শিল্পী সে দুর্বলতা কাটিয়ে উঠতে পেরেছেন। নাটকের একই মাত্র স্ত্রী-চরিত্র 'সুষমা'র ভূমিকায় কল্পনা ভট্টাচার্য সুন্দর অভিনয় করেছেন। চরিত্রটির অন্তর্নিহিত রূপ তাঁর অভিনয়ে স্পষ্ট হয়ে উঠেছে। 'রত্নেশ্বর' চরিত্রের ওপরই নাট্য-কৌতূহল কেন্দ্রীভূত ছিল, শ্যামল দাশগুপ্ত এই চরিত্রাভিনয়ে প্রথম থেকে শেষ পর্যন্ত এই কৌতূহলকে রক্ষা করে গেছেন। নাটকের কৌতুককর মুহূর্তগুলোকে প্রাণবন্ত করে রাখেন তমাল পাল (শ্যামাকান্ত), অরুণ সাহা (সত্যেন), দিলীপ চক্রবর্তী (কার্তিক)।

দৃশ্যের অন্তরালে

একজন বিখ্যাত ব্রিটিশ আলোকচিত্র-শিল্পীর স্মৃতিমূলক রচনা প্রকাশিত হবে আগামী সংখ্যা থেকে। মেরিলিন মনরো টাইরন পাওয়ার, সোফিয়া লোরেন, জিনো লোলে ব্রিজিডা, ময়রা শেয়ারার, মারলিন ডিয়েট্রিচ, অ্যানিটা এগবার্গ, আভা গার্ডেনার, আরো কয়েকজনের সচিত্র চিত্রণ থাকবে এই রচনায়।

'সেই তিমিরে' ও 'সাজাহান'

সম্প্রতি কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের ঐশ্লামিক ইতিহাস ও সংস্কৃতি বিভাগের প্রাক্তন ও বর্তমান ছাত্র-ছাত্রীরা দু'টি নাটকের অভিনয় করলেন 'রংমহল' মঞ্চে। নাটক দু'টির নাম হোল 'সেই তিমিরে' ও 'সাজাহান'। দু'টি নাটকের শিল্পিবৃন্দ উন্নতমানের অভি-নয় প্রতিভার স্বাক্ষর রাখতে পেরেছেন।

অমন চিত্রে সায়রা বানু ও রাজেন্দ্রকুমার

প্রথম নাটকটিতে অভিনয় করেন শুধু ছাত্রী-বৃন্দ। অংশগ্রহণ করেছিলেন সুলেখা দে, সুচিত্রা ভট্টাচার্য, কেয়া চক্রবর্তী, সুলতা শেঠ, লক্ষ্মী সাধুখাঁ, প্রণতি দাস, কৃষ্ণা রায়, মিনু দত্ত। দ্বিতীয় নাটকে অভিনয় করেন প্রমথ পালিত, চিত্রা মুখোপাধ্যায়, মনোজিত দত্ত, জয়ন্তী রায়, তাপস বন্দ্যোপাধ্যায়, মিনতি মণ্ডল, বিদ্যাবতী রায়, নমিতা বাগচী, শ্যামকৃষ্ণ দাস, দিলীপ সাহা, মানবেন্দ্র রায়চৌধুরী, অচলেন্দু মণ্ডল।

বিধানপল্লী ব্যায়ামাগার

সম্প্রতি গাড়িয়া বিধানপল্লী ব্যায়ামাগারের শিল্পী সদস্যরা তাঁদের বার্ষিক প্রীতি-সম্মেলন উপলক্ষে ছোট দুটি নাটক মঞ্চস্থ করেন। নাটক দু'টির নাম হোল 'স্কুল-বোর্ডিং' ও 'গৌড়েশ্বর'। দু'টি নাটক সার্থকতার সঙ্গে পরিচালনা করেন অরূপ-কান্তি। শিল্পীদের আন্তরিক নিষ্ঠায় সেদিনকার অভিনয় প্রাণবন্ত হয়ে উঠেছিল। বিভিন্ন চরিত্রে রূপদান করেছিলেন—চিত্ত-রঞ্জন ভট্টাচার্য, স্বপন মুখোপাধ্যায়, অসীম চক্রবর্তী, অঞ্জন দাস, বাপী সিংহ, দেবাশীষ মুখোপাধ্যায়, শ্যামল সেনমজুমদার, তপন মুখোপাধ্যায়, কমল ঘোষাল, সমর দাস, সুধাংশু গুহ, রথীন্দ্র ভৌমিক, হারাণ দত্ত, কানু দে, অসিত চক্রবর্তী।

মিশরকুমারী

'উত্তরণ' নাট্যসংস্থার শিল্পীবৃন্দ সম্প্রতি শ্যামাপ্রসাদ রঙ্গমঞ্চে অভিনয় করেন 'মিশর-কুমারী'। চরিত্রানুগ অভিনয়ের জন্য এই সংস্থার শিল্পীবৃন্দ সবারই প্রশংসা পাবেন। বিশেষভাবে কৃতিত্বের পরিচয় দেন প্রণব

রকার, রথীন সরকার, সুস্মিতা দে, চৈতালী ায়, সন্ধ্যা রায়, রবীন চট্টোপাধ্যায়, দীপঙ্কর ত্ত, অসীম ঘোষ।

দর্পণ-এর আগামী নাটক 'স্ফুলিঙ্গ'

১৯শে আগস্ট সন্ধ্যায় [illegible] দর্পণ নাট্যগোষ্ঠী তাঁদের ১৩শ বার্ষিকী অনুষ্ঠান উপলক্ষে প্রতাপ মেমোরিয়াল হলে দুটি একাংক নাটিকা পরিবেশন করবেন। প্রথম নাটিকা 'বিদ্যাসাগর', রচনা ডঃ বিভূতি মুখোপাধ্যায়, অপরটি 'স্ফুলিঙ্গ' রচনা রজিত সেন। দুটি নাটকেরই পরিচালনা ও আবহ-সংগীতের দায়িত্ব নিয়েছেন যথাক্রমে রজিত সেন ও রঞ্জন মিত্র।

"দুই মহল"

গত ৮ই আগস্ট সন্ধ্যায় ইউনাইটেড ব্যাংক অফ ইণ্ডিয়া (বড়বাজার) শাখা তাঁদের প্রথম নাট্য প্রচেষ্টায় সুদক্ষ পরিচালক শিশির চক্রবর্তীর নির্দেশনায় জোছন দস্তিদারের 'দুই মহল' নাটকটি সাফল্যের সঙ্গে অভিনয় করেন। সুষ্ঠু পরিচালনা ও অভিনয় গুণে প্রতিটি শিল্পীই নিজ-নিজ চরিত্র রূপায়ণে বিশেষ দক্ষতার পরিচয় দিয়েছেন। অভিনয়ের দিক থেকে বিচারে লালুয়ার ভূমিকায় মানিক চক্রবর্তীর স্থান সর্বাগ্রে। এঁর অভিনয় এক কথায় অনবদ্য। এছাড়াও সাবলীল ও স্বাভাবিক অভিনয় করেন অরুণ সর্বজ্ঞ, বিদ্যোৎ সেন, তুষার দাস, প্রসূন প্রামাণিক, কিশলয় গুহরায়, দিলীপ গঙ্গোপাধ্যায়, নিশীথ চট্টোপাধ্যায় ও মিস পালন। নাটকটির শিল্পী পরিচিতি পরিকল্পনা একদিকে যেমন সুন্দর ও অপর দিকে ভয়াবহ। শিশির চক্রবর্তীর এই প্রয়োগ পরিকল্পনা অভিনবত্বের ছাপ রাখে দর্শক মনে। আলোকসম্পাত ত্রুটিপূর্ণ। আবহসংগীত প্রশংসনীয়।

কথক-এর আগামী নাটক 'বাউল রাজা'

রঞ্জিত সেন রচিত 'বাউল রাজার' কাহিনী অবলম্বনে কথক (টালীগঞ্জ) আগামী ২০শে আগষ্ট সকাল ১০টায় নিউএম্পায়ারে তাহাদের পরবর্তী আকর্ষণীয় সংগীতমুখর নাটক 'বাউল রাজা' মঞ্চস্থ করবেন। বাউল রাজার চরিত্রে রূপদান করবেন চিত্র ও সুখ্যাত শিল্পী সুখেন দাস। নাটকটির পরিচালনায় ও সংগীত পরিচালনায় আছেন যথাক্রমে বলাই সেন ও চিত্তপ্রিয় মুখোপাধ্যায়। অন্যান্য চরিত্রে রূপদান করবেন সর্বশ্রী সাধন সেন, রসরাজ চক্রবর্তী, প্রশান্ত রায়, বিপাশা গোস্বামী ও আরো অনেকে।

শিলিগুড়ি

সম্প্রতি শিলিগুড়ি সুভাষ স্পোর্টিং ক্লাবের শিল্পীবৃন্দ পরীক্ষামূলক একটি নাটকের অভিনয় করে নাট্যানুরাগীদের অকুণ্ঠ প্রশংসা অর্জন করেছেন। নাটকটির নাম হোল 'শুরুতেই শেষ'। অভিনীত হয় স্থানীয় 'সম্মিলনী রংগমঞ্চে'। বিষয়বস্তু ও বক্তব্যের গভীরতায় নাটকটি সবারই দৃষ্টি আকর্ষণ করে। নাট্য-প্রযোজনায় প্রয়োগ পরিকল্পনার অভিনবত্ব এবং অভিনয়ের নিষ্ঠতা চিহ্নিত হয়। প্রতিটি শিল্পীই চরিত্রের অতলে ডুবে যেতে পেরেছেন বলে সামগ্রিক অভিনয় প্রাণবন্ত হয়ে ওঠে। বিশেষভাবে সৌমেন চক্রবর্তী, গৌরী বর্মন অভিনয় প্রতিভায় উজ্জ্বল অতি সুন্দরভাবে প্রকাশ করতে পেরেছেন।

[illegible]

[illegible] ক্লাবের পরিচালনায় দুদিনব্যাপী এক নাট্যোৎসব অনুষ্ঠিত হয়। দুদিন অভিনীত হয় পালাক্রমে নাটক 'দীপ আজও জ্বলে' ও 'অংশীদার'। নাট্য-নির্দেশনায় নিষ্ঠার পরিচয় রাখেন সনৎ মিত্র। দুদিনকার নাট্য-প্রযোজনাই সমবেত দর্শকমণ্ডলীকে আকৃষ্ট করে।

মুক্ত অংগনে রংগসভার দালিয়া

আগামী ২৩ আগস্ট বুধবার সন্ধ্যা ৭টায় দক্ষিণ কলিকাতার সুপ্রতিষ্ঠিত নাট্য সংস্থা রংগসভা তাঁদের সুপ্রশংসিত 'দালিয়া' (রবীন্দ্রনাথের গল্প অবলম্বনে) নাটকটি আবার মুক্ত-অংগনে মঞ্চস্থ করছেন। এবারের নাটকের প্রধান চরিত্রলিপিতে রয়েছেন—নাম-ভূমিকায় দিলীপ রায়। এছাড়া ভোলা বসু, পান্না দত্ত, পরিতোষ রায়, সুতপা ভট্টাচার্য ও দোলনচাঁপা দাশগুপ্ত। নাটক ও নির্দেশনায় রয়েছেন পীযূষ বসু।

দিল্লী

সম্প্রতি রাজধানীর অন্যতম নাট্যসংস্থা 'শনিচক্র' টাউন হলে 'ঠগ' নাটকটি পরপর দুদিন অভিনয় করলেন। নাট্য নির্দেশনায় ছিলেন অজিত দত্ত ও অমরেশ মুখোপাধ্যায়। অভিনয়ে কৃতিত্বের পরিচয় দেন গায়ত্রী পাল, জয়ন্ত দাস, অলোক কর, উৎপল মুখোপাধ্যায়, হরি বসু, অজয় চট্টোপাধ্যায়, সুশান্ত দাস, শিবশঙ্কর সরকার, কানাই মুখোপাধ্যায়।

[illegible]

সম্প্রতি [illegible] প্রতিষ্ঠা-দিবস উপলক্ষে [illegible] শিল্পী সমবায় মঞ্চস্থ করলেন [illegible] নাটক। দলগত অভিনয়ে [illegible] বৈশিষ্ট্য ধরা পড়েছে। তাদের অভিনয়ের জন্য প্রশংসা পাবেন মিত্রা চট্টোপাধ্যায়, দিলীপ বন্দ্যোপাধ্যায়, দিলীপ চৌধুরী, সুজিত মিত্র, অমল মুখোপাধ্যায়, দেব ঘোষ। নাট্য নির্দেশনা ও মঞ্চ পরিকল্পনায় ছিলেন দিলীপ বন্দ্যোপাধ্যায়, শঙ্কর দাস।

প্রবাসী

কুলটির প্রখ্যাত নাট্যগোষ্ঠী 'প্রবাসী'র শিল্পিবৃন্দ আগামী মাসে মুক্ত অংগনে মঞ্চস্থ করবেন মোহিত চট্টোপাধ্যায়ের 'কণ্ঠনালীতে সূর্য'। নাট্য নির্দেশনায় থাকবেন তপন রায়।

গিরিশ নাট্য সংসদ-এর নাট্যোৎসব

গত ২৮শে ও ২৯শে জুলাই উত্তর কলিকাতার নববৃন্দাবন মন্দিরে গিরিশ নাট্যসংসদ কর্তৃক মহাকবি গিরিশচন্দ্রের "জনা" এবং শ্রীব্রজেন্দ্রকুমার দে, মহাশয়ের "রাজা দেবিদাস" নাটক সাফল্যের সঙ্গে অভিনীত হয়। ইতিপূর্বেই এই সংস্থাটি যাত্রাভিনয়ের ক্ষেত্রে যথেষ্ট সুনাম অর্জন করেছেন। এই নতুন দুটি নাটকের সুষ্ঠু

শিশিরকুমার ইনস্টিটিউটের মানময়ী গার্লস স্কুল নাটকে শৈলেন মুখোপাধ্যায়, প্রভাতকান্তি ঘোষ ও শিখা ভট্টাচার্য

অভিনয়ে এ'দের দক্ষতা আবার প্রমাণিত হয়। "জনা" একটি দুরূহ নাটক, এর অভিনয় বহুকাল হয়নি এই নাটকটি সুন্দরভাবে অভিনয় করে সংসদের সভ্যগণ একদিকে যেমন মহাকবির প্রতি শ্রদ্ধা জ্ঞাপন করেছেন অন্যদিকে তাঁদের শিল্পকুশলতার পরিচয় দিয়েছেন। প্রয়োগে, উপস্থাপনে এ'রা অভিনবত্বের দাবী রাখেন। 'রাজা দেবিদাস' নাটকটির অভিনয় সহস্র সহস্র দর্শককে মুগ্ধ করে। দলগত সংহতি এবং প্রথম থেকে শেষ অবধি ঘাতপ্রতিঘাতে নাটকটি সকলকে তন্ময় করে রাখে। জনা নাটকটি পরিচালনা করেন শ্রীসতীশ দত্ত এবং শ্রীধীরেন চক্রবর্তী সঙ্গীত-পরিচালনা করেন শ্রীহরিদাস মুখার্জি ও শ্রীগোপালচন্দ্র গোস্বামী রাজা দেবিদাস পরিচালনা করেন শ্রীসমীর ব্যানার্জি ও সঙ্গীত-পরিচালনায় ছিলেন শ্রীহরি ভট্টাচার্য।

শিশিরকুমার ইনস্টিটিউটের 'মানময়ী গার্লস স্কুল

শিশিরকুমার ইনস্টিটিউট সংস্থার সভ্যবৃন্দ গত ৪ঠা আগস্ট রংমহল রংগমঞ্চে মুখ্যমন্ত্রীর ত্রাণ তহবিলে সাহায্যার্থে স্বর্গত রবীন্দ্রনাথ মৈত্রের 'মানময়ী গার্লস স্কুল' নাটকটি সাফল্যের সঙ্গে অভিনয় করেন। উদ্বোধন সঙ্গীত পরিবেশন করেন প্রখ্যাত শিল্পী শ্রীমৃণাল চক্রবর্তী।

বিভিন্ন চরিত্রে দোষ-ত্রুটি থাকলেও দলগত অভিনয়ে সামগ্রিকভাবে নৈপুণ্যের পরিচয় পাওয়া গেছে। কয়েকটি নাটকীয় মুহূর্ত সত্যি প্রশংসনীয়। নায়ক চরিত্রে মানসের ভূমিকায় শ্রীপ্রভাতকান্তি ঘোষের অভিনয় স্বতস্ফূর্ত। রাজেন বাড়ড়ীর ভূমিকায় শ্রীমুকুলকান্তি ঘোষ যোগ্যতার পরিচয় দিয়েছেন। তিনি হাস্যরসের মাধ্যমে দর্শকদের অকুণ্ঠ প্রশংসা অর্জন করেন। স্ত্রী-চরিত্রে নীহারিকা, মানময়ী ও চপলার ভূমিকায় যথাক্রমে শ্রীমতী শিখা ভট্টাচার্য, শ্রীমতী চিত্রিতা মণ্ডল ও শ্রীমতী রত্না ঘোষাল সুন্দর অভিনয় করেন। বিশেষত নবাগতা শিল্পী হিসেবে শ্রীমতী ঘোষাল বলিষ্ঠতার পরিচয় দিয়েছেন। এছাড়া দামোদর (জমিদার) চরিত্রে শ্রীশৈলেন মুখোপাধ্যায়, হারানিধি (ভৃত্য) চরিত্রে শ্রীমণি বিশ্বাস এবং বৈকুণ্ঠ সরকার চরিত্রে শ্রীসুশীল মুখোপাধ্যায়ের অভিনয় দর্শকদের আনন্দদান দান করে। ফাণ'ণ্ডেজ চরিত্রটি শ্রীশেখর সুর তেমন ফুটিয়ে তুলতে পারেন নি। নাট্য ও সঙ্গীত পরিচালনার গুরুদায়িত্ব বহন করেন সুরকার শ্রীনির্মল ভট্টাচার্য। আবহ-সঙ্গীত পরিচালনা করেন শ্রীসলিল মিত্র ও সহ-শিল্পিবৃন্দ।

শিল্পতীর্থ

উত্তর কলকাতার নাট্যসংস্থা 'শিল্পীতীর্থ' মুক্তঅঙ্গনে আগামী ১লা সেপ্টেম্বর সন্ধ্যায় 'ধন্বন্তরি ক্লিনিকস' নাটক অভিনয় করবেন। নাটকটি রচনা করেছেন 'নিরঙ্কুশ' নির্দেশনায় দায়িত্ব নিয়েছেন সত্যেন মুখোপাধ্যায়।

গিরিশ নাট্য প্রতিযোগিতা

বিশ্বরূপা নাট্যোন্নয়ন পরিকল্পনা পরিষদ আয়োজিত ষষ্ঠবার্ষিক গিরিশ নাট্য-প্রতিযোগিতায় (একাংক) যোগদানের শেষ তারিখ নির্ধারিত হয়েছে ১লা সেপ্টেম্বর। প্রতিযোগিতায় যোগদানের আবেদনপত্র বিশ্বরূপায় পাওয়া যাবে।

"নাটকীয়"-এর

"শিশির ভাদুড়ী স্মৃতি শীল্ড" লাভ

গত ৮ই ও ৯ই আগস্ট কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় ছাত্র সংসদ আয়োজিত একাংক নাটক প্রতিযোগিতায় (আন্তর্বিভাগ) বাংলা সাহিত্য বিভাগের 'নাটকীয়' প্রথম স্থান অধিকার করে। দশ মিনিটের এই [illegible] নাটকটি রচনা ও পরিচালনা করেন শ্রীসু[illegible] চক্রবর্তী। অভিনয়ে ছিলেন সর্বশ্রী শিবাজী গুপ্ত, শুভেন্দু বিশ্বাস, ইন্দ্রাণী নাগ, বিনয় মাহাতো, চন্ডীসাধন কোলে, শিবশঙ্কর দত্ত, রমেশ রায় ও সুদীপ্ত চক্রবর্তী। আবহসঙ্গীতে সহায়তা করেন শ্রীসোমেন ঘোষ। 'শিশির ভাদুড়ী স্মৃতি শীল্ড' এর প্রথম পুরস্কার লাভ করেছে নাটকটি।

আগামী নাটক

'পণ্ডলিখা নাট্যদলে'র শিল্পীবৃন্দ আগামী ৯ই সেপ্টেম্বর সন্ধ্যায় প্রতাপ মেমোরিয়াল হলে অভিনয় করবেন দিলীপ পাইন রচিত 'বাঁচতে চাই' নাটক। দুরন্ত জীবনসংগ্রামে পর্যুদস্ত হয়েও মানুষ বাঁচতে চায়। এই বেঁচে থাকার অবিশ্রান্ত কামনাকে ঘিরে গড়ে উঠেছে এই নাটক।

দিল্লীতে নান্দীকারের নাটক

কলকাতার নান্দীকার নাট্যসংস্থা 'নাট্যকারের সন্ধানে ছ'টি চরিত্র' ও 'শের আফগান' নাটক দু'টি নিয়ে আগস্ট মাসের শেষ ভাগে দিল্লী যাচ্ছেন। আগামী ২৪শে থেকে ২৭শে আগস্ট আইফ্যাকস হলে এই দুটি নাটকের মোট পাঁচটি অভিনয় হবে।

নায়িকা বিদায়

একটি অভাবিত রঙ্গরসের নাটক নিয়ে আগামী ১১ই সেপ্টেম্বর মিনার্ভা মঞ্চে কল্পতরু সংস্থা অবতীর্ণ হচ্ছেন। নাটকটির নাম 'নায়িকা বিদায়'। রচয়িতা ও নির্দেশক বসন্ত ভট্টাচার্য। আটচল্লিশ ঘণ্টা হরতালে যখন কলকাতার জনজীবন বিপর্যস্ত সেই সময়ে এক অখ্যাত চিরকুমারদের মেস বাড়ীতে এসে হাজির হল তন্বী নায়িকা অঞ্জলি। ভিন্ন বয়সের বিভিন্ন চরিত্রের মধ্যে আলোড়ন আনল সে। ফলে এলো এক বিপর্যয় এবং সবশেষে এক কৌতুককর মুহূর্তের মুখোমুখি হয়ে যবনিকাপাত হল নাটকের। কৌতুকাশ্রয়ী এ নাটকটিতে অংশগ্রহণ করবেন রাজকুমার বসু, সাধন দত্ত, হিতব্রত সাহা, বসন্ত ভট্টাচার্য বিশ্বনাথ বসাক, শম্ভু দাঁ, নীতিশ সান্যাল, সুশীল নন্দন, প্রদ্যুৎ রায়, অরুণ চক্রবর্তী, পুলক সেন, কাজল বর্ধন ও নমিতা দাস।

উষার্বিকী

সম্প্রতি কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের অ্যানসিয়েন্ট হিস্ট্রী অ্যান্ড কালচার

বিভাগের প্রাক্তন ছাত্র-ছাত্রীরা মহাজাতি সদনে সুশীল মুখোপাধ্যায়ের রঙ্গরসের নাটক 'উপবার্ষিকী' মঞ্চস্থ করেন। গুরু-গম্ভীর পটভূমিকার নেপথ্যে হাল্কা হাসির যে ফল্গুধারা নাটকটিতে লুকানো আছে শিল্পীবৃন্দের মরমী অভিনয়ে তা স্বতোৎসারিত হয়েছে। দীপক বসু নাট্য-নির্দেশনায় নিষ্ঠার পরিচয় দিতে পেরেছেন এবং অনেক মুহূর্তেই তাঁর উন্নত ধরনের শিল্পবোধের আভাস চিহ্নিত হয়েছে।

অভিনয়ের দিক থেকে তরুণ বিশ্বাস নেপাল চরিত্রে বৈশিষ্ট্যের স্বাক্ষর রাখেন। রমা চক্রবর্তীর স্বর্ণময়ী একটা উল্লেখযোগ্য সৃষ্টি। দীপক বসুর ভোম্বল, গোপাল বসুর জগৎ, গোরাচাঁদ দে-র বিশ্বরূপও উল্লেখযোগ্য চরিত্রচিত্রণ। অন্যান্য চরিত্রে সার্থক অভিনয় করেন প্রবীর বন্দ্যোপাধ্যায়, হৃষিকেশ কাড়ার, সুধীর ভট্টাচার্য, আদি-নাথ বৈদ্য, বিশ্বনাথ ভট্টাচার্য, স্বপন সর-কার, কালিপদ মাইতি, সুচেতা দাস, স্বপ্না চক্রবর্তী।

আনন্দবাজার পত্রিকা রিক্রিয়েশন ক্লাব

গত ১৮ই জুলাই 'স্টার' রঙ্গমঞ্চে 'আনন্দবাজার রিক্রিয়েশন ক্লাবে'র সভ্যবৃন্দ দ্বিজেন্দ্রলালের 'চন্দ্রগুপ্ত' নাটক সাফল্যের সঙ্গে অভিনয় করেন। নাটকটি আন্তরিক নিষ্ঠার সঙ্গে পরিচালনা করেন শশাঙ্ক ভট্টাচার্য। নাটকের সংঘবদ্ধ অভিনয় সবারই দৃষ্টি আকর্ষণ করে। বিভিন্ন ভূমিকায় অংশ নেন—অমরেশ ভট্টাচার্য, পাঁচুগোপাল বসু, বিনয়কৃষ্ণ ভৌমিক, অসিতকুমার দত্ত, তারা-শঙ্কর রায়, মুকুল চক্রবর্তী, কৃষ্ণকুমার ঘোষ, সুরেন্দ্রনাথ দাসকর্মকার, শঙ্করনাথ নন্দী, নির্মলেন্দু দাশগুপ্ত, অমর সেন, শম্ভু বসু, বিদ্যুৎ ভট্টাচার্য, সবিতা মুখো-পাধ্যায়, গীতা প্রধান, চন্ডী কর, প্রতিমা পাল, রত্না চট্টোপাধ্যায়।

নতুন নাটক 'সানাই'

গত ১৪ই জুলাই নর্থ ক্যালকাটা ড্রামাটিক ক্লাবের সভ্যরা শ্রীসঞ্জয়ের বিয়োগান্ত নাটক সানাই মঞ্চস্থ করেন মিনার্ভা মঞ্চে বাৎসরিক উৎসব উপলক্ষে।

নাট্যবস্তু পরিচ্ছন্ন এবং আবেগসমৃদ্ধ। প্রধান চরিত্রগুলি মানসম্পন্ন যদিও আরো পরিবর্তন ও পরিবর্জনের অপেক্ষা রাখে।

নায়ক পলাশের চরিত্রে হিমাংশু সোম প্রাণহীন। কার্তিক চরিত্রে নিরঞ্জন ভট্টাচার্য অনবদ্য। স্মৃতিময়—বিজন দাস, মিত্তির—তপন মুখার্জির অভিনয় প্রশংসনীয়। সংগীত-পরিচালক দ্বিজেন গুপ্তের কণ্ঠে গানগুলি ভালো হয়েছে। পরিচালক রামনারায়ণ অধিকারী অভিনবত্বের স্বাক্ষর রেখেছেন।

মৌসুমী

সম্প্রতি জামসেদপুরে জীবনবীমা কর্ম-চারীদের নাট্যসংস্থা 'মৌসুমী' স্থানীয় মিলনী রঙ্গমঞ্চে ছবি বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'চোর' নাটক সাফল্যের সঙ্গে অভিনয় করেন। কয়েকটি চরিত্রে সুঅভিনয় করেন ভারতী দে, গীতা মুখোপাধ্যায়, রাখন দাস, অরুণ মুখোপাধ্যায়, সুব্রত সমগুপ্ত।

বিবিধ সংবাদ

'শ্রাবণ-সন্ধ্যা'—অভিযানের ঘরোয়া অনুষ্ঠান

গত ৬ই আগস্টের বর্ষণমুখর সন্ধ্যায় 'অভিযান' পত্রিকা গোষ্ঠীর উদ্যোগে জাস্টিস দ্বারকানাথ রোডের কার্যালয়ে 'শ্রাবণ-সন্ধ্যা' ডক্টর শীলা মুখোপাধ্যায়ের সভানেত্রীত্বে অনুষ্ঠিত হয়। ঐ অনুষ্ঠানে ছোটদের মধ্যে থেকে রবীন্দ্রনাথের কালোপযোগী কবিতা আবৃত্তি করে সকলকে আনন্দ দেয় পাপিয়া মুখার্জি, বিজন চক্রবর্তী, শম্পা মুখো-পাধ্যায় ও মহালয়া চট্টোপাধ্যায়। এরপর 'আজ শ্রাবণের আমন্ত্রণে' রবীন্দ্র-সংগীতটি পরিবেশন করেন শৈলেন কুন্ডু। রবীন্দ্রনাথের 'বর্ষামঙ্গল', 'বর্ষার দিনে', ও 'মেঘদূত' আবৃত্তি করে শোনান সুদীপ বন্দ্যোপাধ্যায়, মানিক ঘোষাল, ও স্বপন বন্দ্যোপাধ্যায়। রবীন্দ্র-সগীতের আসরে উপস্থিত সকলকে গান শুনিয়েছেন লিলি চট্টোপাধ্যায়, শীলা মুখোপাধ্যায় ও শিউলি চট্টোপাধ্যায়। 'মেঘ-দূত' কালিদাস ও রবীন্দ্রনাথ নামে এক আকর্ষণীয় স্বরচিত রচনা পাঠ করে শোনান পিনাকীরঞ্জন চক্রবর্তী। সবশেষে অসীমকৃষ্ণ দেব, অমিতাভ বটব্যাল ও মল্লিনাথ মুখো-পাধ্যায়ের রবীন্দ্র সংগীতের সুরে যুগপৎ ইলেকট্রিক গীটার বাদন অনুষ্ঠানটিকে হৃদয়-গ্রাহী করে তোলে।

সোস্যাল এন্টারপ্রাইজের "ক্ষুধিত পাষাণ"

৪ঠা আগস্ট মহাজাতি সদনে সোস্যাল এন্টারপ্রাইজের সভ্য-শিল্পীরা রবীন্দ্রনাথের "ক্ষুধিত পাষাণ" পরিবেশন করলেন। প্রস্তাবনা

শিশিরকুমার ইনস্টিটিউটের মানময়ী গার্লস স্কুল নাটকে শৈলেন মুখোপাধ্যায়, প্রভাতকান্তি ঘোষ ও শিখা ভট্টাচার্য

অভিনয়ে এ'দের দক্ষতা আবার প্রমাণিত হয়। "জনা" একটি দুরূহ নাটক, এর অভিনয় বহুকাল হয়নি এই নাটকটি সুন্দরভাবে অভিনয় করে সংসদের সভ্যগণ একদিকে যেমন মহাকবির প্রতি শ্রদ্ধা জ্ঞাপন করেছেন অন্যদিকে তাঁদের শিল্পকুশলতার পরিচয় দিয়েছেন। প্রয়োগে, উপস্থাপনে এ'রা অভিনবত্বের দাবী রাখেন। 'রাজা দেবিদাস' নাটকটির অভিনয় সহস্র সহস্র দর্শককে মুগ্ধ করে। দলগত সংহতি এবং প্রথম থেকে শেষ অবধি ঘাতপ্রতিঘাতে নাটকটি সকলকে তন্ময় করে রাখে। জনা নাটকটি পরিচালনা করেন শ্রীসতীশ দত্ত এবং শ্রীধীরেন চক্রবর্তী সঙ্গীত-পরিচালনা করেন শ্রীহরিদাস মুখার্জি ও শ্রীগোপালচন্দ্র গোস্বামী রাজা দেবিদাস পরিচালনা করেন শ্রীসমীর ব্যানার্জি ও সঙ্গীত-পরিচালনায় ছিলেন শ্রীহরি ভট্টাচার্য।

শিশিরকুমার ইনস্টিটিউটের 'মানময়ী গার্লস স্কুল

শিশিরকুমার ইনস্টিটিউট সংস্থার সভ্যবৃন্দ গত ৪ঠা আগস্ট রংমহল রংগমঞ্চে মুখ্যমন্ত্রীর ত্রাণ তহবিলে সাহায্যার্থে স্বর্গত রবীন্দ্রনাথ মৈত্রের 'মানময়ী গার্লস স্কুল' নাটকটি সাফল্যের সঙ্গে অভিনয় করেন। উদ্বোধন সঙ্গীত পরিবেশন করেন প্রখ্যাত শিল্পী শ্রীমৃণাল চক্রবর্তী।

বিভিন্ন চরিত্রে দোষ-ত্রুটি থাকলেও দলগত অভিনয়ে সামগ্রিকভাবে নৈপুণ্যের পরিচয় পাওয়া গেছে। কয়েকটি নাটকীয় মুহূর্তে সত্যি প্রশংসনীয়। নায়ক চরিত্রে মানসের ভূমিকায় শ্রীপ্রভাতকান্তি ঘোষের অভিনয় স্বতস্ফূর্ত। রাজেন বাড়ুয্যের ভূমিকায় শ্রীমুকুলকান্তি ঘোষ যোগ্যতার পরিচয় দিয়েছেন। তিনি হাস্যরসের মাধ্যমে দর্শকদের অকুণ্ঠ প্রশংসা অর্জন করেন। স্ত্রী-চরিত্রে নীহারিকা, মানময়ী ও চপলার ভূমিকায় যথাক্রমে শ্রীমতী শিখা ভট্টাচার্য, শ্রীমতী চিত্রিতা মণ্ডল ও শ্রীমতী রত্না ঘোষাল সুন্দর অভিনয় করেন। বিশেষত নবাগতা শিল্পী হিসেবে শ্রীমতী ঘোষাল বলিষ্ঠতার পরিচয় দিয়েছেন। এছাড়া দামোদর (জমিদার) চরিত্রে শ্রীশৈলেন মুখোপাধ্যায়, হারানিধি (ভৃত্য) চরিত্রে শ্রীমণি বিশ্বাস এবং বৈকুণ্ঠ সরকার চরিত্রে শ্রীসুশীল মুখোপাধ্যায়ের অভিনয় দর্শকদের আনন্দদান করে। ফার্নাণ্ডেজ চরিত্রটি শ্রীশেখর সুর তেমন ফুটিয়ে তুলতে পারেন নি। নাট্য ও সঙ্গীত পরিচালনার গুরুদায়িত্ব বহন করেন সুরকার শ্রীনির্মল ভট্টাচার্য। আবহ-সঙ্গীত পরিচালনা করেন শ্রীসলিল মিত্র ও সহশিল্পিবৃন্দ।

শিল্পতীর্থ

উত্তর কলকাতার নাট্যসংস্থা 'শিল্পীতীর্থ' মুক্তঅঙ্গনে আগামী ১লা সেপ্টেম্বর সন্ধ্যায় 'ধন্বন্তরি ক্লিনিক্স' নাটক অভিনয় করবেন। নাটকটি রচনা করেছেন 'নিরঙ্কুশ' নির্দেশনায় দায়িত্ব নিয়েছেন সত্যেন মুখোপাধ্যায়।

গিরিশ নাট্য প্রতিযোগিতা

বিশ্বরূপা নাট্যোন্নয়ন পরিকল্পনা পরিষদ আয়োজিত ষষ্ঠবার্ষিক গিরিশ নাট্য-প্রতিযোগিতায় (একাংক) যোগদানের শেষ তারিখ নির্ধারিত হয়েছে ১লা সেপ্টেম্বর। প্রতিযোগিতায় যোগদানের আবেদনপত্র বিশ্বরূপায় পাওয়া যাবে।

"নাটকীয়"-এর

'শিশির ভাদুড়ী স্মৃতি শীল্ড' লাভ

গত ৮ই ও ৯ই আগস্ট কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় ছাত্র সংসদ আয়োজিত একাংক নাটক প্রতিযোগিতায় (আন্তর্বিভাগ) বাংলা সাহিত্য বিভাগের 'নাটকীয়' প্রথম স্থান অধিকার করে। দশ মিনিটের এই [illegible] নাটকটি রচনা ও পরিচালনা করেন শ্রীসু[illegible] চক্রবর্তী। অভিনয়ে ছিলেন সর্বশ্রী [illegible] গুপ্ত, শুভেন্দু বিশ্বাস, ইন্দ্রাণী নাগ, বিনয় মাহাতো, চন্ডীসাধন কোলে, শিবশঙ্কর দত্ত, রমেশ রায় ও সুদীপ্ত চক্রবর্তী। আবহসঙ্গীতে সহায়তা করেন শ্রীসোমেন ঘোষ। 'শিশির ভাদুড়ী স্মৃতি শীল্ড' এর প্রথম পুরস্কার লাভ করেছে নাটকটি।

আগামী নাটক

'পঞ্জলিখা নাট্যদলে'র শিল্পীবৃন্দ আগামী ৯ই সেপ্টেম্বর সন্ধ্যায় প্রতাপ মেমোরিয়াল হলে অভিনয় করবেন দিলীপ পাইন রচিত 'বাঁচতে চাই' নাটক। দুরন্ত জীবনসংগ্রামে পর্যুদস্ত হয়েও মানুষ বাঁচতে চায়। এই বেঁচে থাকার অবিশ্রান্ত কামনাকে ঘিরে গড়ে উঠেছে এই নাটক।

দিল্লীতে নান্দীকারের নাটক

কলকাতার নান্দীকার নাট্যসংস্থা 'নাট্যকারের সন্ধানে ছ'টি চরিত্র' ও 'শের আফগান' নাটক দু'টি নিয়ে আগস্ট মাসের শেষ ভাগে দিল্লী যাচ্ছেন। আগামী ২৪শে থেকে ২৭শে আগস্ট আইফ্যাক্স হলে এই দুটি নাটকের মোট পাঁচটি অভিনয় হবে।

নায়িকা বিদায়

একটি অভাবিত রঙ্গরসের নাটক নিয়ে আগামী ১১ই সেপ্টেম্বর মিনার্ভা মঞ্চে কল্পতরু সংস্থা অবতীর্ণ হচ্ছেন। নাটকটির নাম 'নায়িকা বিদায়'। রচয়িতা ও নির্দেশক বসন্ত ভট্টাচার্য। আটচল্লিশ ঘন্টা হরতালে যখন কলকাতার জনজীবন বিপর্যস্ত সেই সময়ে এক অখ্যাত চিরকুমারদের মেস বাড়ীতে এসে হাজির হল তন্বী নায়িকা অঞ্জলি। ভিন্ন বয়সের বিভিন্ন চরিত্রের মধ্যে আলোড়ন আনল সে। ফলে এলো এক বিপর্যয় এবং সবশেষে এক কৌতুককর মুহূর্তের মুখোমুখি হয়ে যবনিকাপাত হল নাটকের। কৌতুকাশ্রয়ী এ নাটকটিতে অংশগ্রহণ করবেন রাজকুমার বসু, সাধন দত্ত, হিতব্রত সাহা, বসন্ত ভট্টাচার্য বিশ্বনাথ বসাক, শম্ভু দাঁ, নীতিশ সান্যাল, সুশীল নন্দন, প্রদ্যুৎ রায়, অরুণ চক্রবর্তী, পুলক সেন, কাজল বর্ধন ও নমিতা দাস।

উত্তরাধিকারী

সম্প্রতি কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের অ্যানসিয়েন্ট হিস্ট্রি অ্যান্ড কালচার

ভাগের প্রাক্তন ছাত্র-ছাত্রীরা মহাজাতি
নে সুশীল মুখোপাধ্যায়ের রঙ্গরসের
ক 'উদবাধিকী' মঞ্চস্থ করেন। গুরু-
ভীর পটভূমিকার নেপথ্যে হাল্কা হাসির
ফল্গুধারা নাটকটিতে লুকানো আছে
শিল্পীবৃন্দের মরমী অভিনয়ে তা
তোৎসারিত হয়েছে। দীপক বসু নাট্য-
র্দেশনায় নিষ্ঠার পরিচয় দিতে পেরেছেন
ং অনেক মুহূর্তেই তাঁর উন্নত ধরনের
সপবোধের আভাস চিহ্নিত হয়েছে।

অভিনয়ের দিক থেকে তরুণ বিশ্বাস
পাল চরিত্রে বৈশিষ্ট্যের স্বাক্ষর রাখেন।
। চক্রবর্তীর স্বর্ণময়ী একটা উল্লেখযোগ্য
ষ্ট। দীপক বসুর ভোম্বল, গোপাল
রুর জগৎ, গোরাচাঁদ দে-র বিশ্বরূপও
ল্লেখযোগ্য চরিত্রচিত্রণ। অন্যান্য চরিত্রে
র্থক অভিনয় করেন প্রবীর বন্দ্যোপাধ্যায়,
ষকেশ কাড়ার, সুধীর ভট্টাচার্য, অদি-
। বৈদ্য, বিশ্বনাথ ভট্টাচার্য, স্বপন সর-
র, কালিপদ মাইতি, সুচেতা দাস, স্বপ্না
বর্তী।

আনন্দবাজার পত্রিকা রিক্রিয়েশন ক্লাব

গত ১৮ই জুলাই 'স্টার' রঙ্গমঞ্চে
নন্দবাজার রিক্রিয়েশন ক্লাবের সভ্যবৃন্দ
জেন্দ্রলালের 'চন্দ্রগুপ্ত' নাটক সাফল্যের
গে অভিনয় করেন। নাটকটি আন্তরিক
ষ্ঠার সঙ্গে পরিচালনা করেন শশাঙ্ক
চার্য। নাটকের সংঘবদ্ধ অভিনয় সবারই
ষ্ট আকর্ষণ করে। বিভিন্ন ভূমিকায় অংশ
—অমরেশ ভট্টাচার্য, পাঁচুগোপাল বসু,
য়কৃষ্ণ ভৌমিক, অসিতকুমার দত্ত, তারা-
কর রায়, মুকুল চক্রবর্তী, কৃষ্ণকুমার ঘোষ,
রেন্দ্রনাথ দাসকর্মকার, শঙ্করনাথ নন্দী,
র্লেন্দু দাশগুপ্ত, অমর সেন, শম্ভু
, বিদ্যুৎ ভট্টাচার্য, সবিতা মুখো-
ধ্যায়, গীতা প্রধান, চন্ডী কর, প্রতিমা
ল, রত্না চট্টোপাধ্যায়।

নতুন নাটক 'সানাই'

গত ১৪ই জুলাই নর্থ ক্যালকাটা
নাটক ক্লাবের সভ্যরা শ্রীসঞ্জয়ের
য়াগান্ত নাটক সানাই মঞ্চস্থ করেন
সার্ভা মঞ্চে বাৎসরিক উৎসব উপলক্ষে।

নাট্যবস্তু পরিচ্ছন্ন এবং আবেগসমৃদ্ধ।
ান চরিত্রগুলি মানসম্পন্ন যদিও আরো
রবর্তন ও পরিবর্জনের অপেক্ষা রাখে।

নায়ক পলাশের চরিত্রে হিমাংশু সোম
গহীন। কার্তিক চরিত্রে নিরঞ্জন ভট্টাচার্য
বদ্য। স্মৃতিময়—বিজন দাস, মিত্তির—
ন মুখার্জির অভিনয় প্রশংসনীয়।
গীত-পরিচালক দ্বিজেন গুপ্তের কণ্ঠে
গুলি ভালো হয়েছে। পরিচালক
নারায়ণ অধিকারী অভিনবত্বের স্বাক্ষর
খেছেন।

মৌসুমী

সম্প্রতি জামসেদপুরের জীবনবীমা কর্ম-
ীদের নাট্যসংস্থা 'মৌসুমী' স্থানীয়
ল্পনী' রঙ্গমঞ্চে ছবি বন্দ্যোপাধ্যায়ের
র' নাটক সাফল্যের সঙ্গে অভিনয়
রন। কয়েকটি চরিত্রে সুঅভিনয়
রন ভারতী দে, গীতা মুখোপাধ্যায়,
ল দাস, অরুণ মুখোপাধ্যায়, সুব্রত
নগুপ্ত।

বিবিধ সংবাদ

'শ্রাবণ-সন্ধ্যা'—অভিযানের ছোটো অনুষ্ঠান

গত ৬ই আগস্টের বর্ষণমুখর সন্ধ্যায় 'অভিযান' পত্রিকা গোষ্ঠীর উদ্যোগে জাস্টিস দ্বারকানাথ রোডের কার্যালয়ে 'শ্রাবণ-সন্ধ্যা' ডক্টর শীলা মুখোপাধ্যায়ের সভানেত্রীত্বে অনুষ্ঠিত হয়। ঐ অনুষ্ঠানে ছোটদের মধ্যে থেকে রবীন্দ্রনাথের কালোপযোগী কবিতা আবৃত্তি করে সকলকে আনন্দ দেয় পাপিয়া মুখার্জি, বিজন চক্রবর্তী, শম্পা মুখোপাধ্যায় ও মহালয়া চট্টোপাধ্যায়। এরপর 'আজ শ্রাবণের আমন্ত্রণে' রবীন্দ্র-সংগীতটি পরিবেশন করেন শৈলেন কুন্ডু। রবীন্দ্রনাথের 'বর্ষামঙ্গল', 'বর্ষার দিনে', ও 'মেঘদূত' আবৃত্তি করে শোনান সুদীপ বন্দ্যোপাধ্যায়, মানিক ঘোষাল, ও স্বপন বন্দ্যোপাধ্যায়। রবীন্দ্র-সংগীতের আসরে উপস্থিত সকলকে গান শুনিয়েছেন লিলি চট্টোপাধ্যায়, শীলা মুখোপাধ্যায় ও শিউলি চট্টোপাধ্যায়। 'মেঘদূত' কালিদাস ও রবীন্দ্রনাথ নামে এক আকর্ষণীয় স্বরচিত রচনা পাঠ করে শোনান পিনাকীরঞ্জন চক্রবর্তী। সবশেষে অসীমকৃষ্ণ দেব, অমিতাভ বটব্যাল ও মল্লিনাথ মুখোপাধ্যায়ের রবীন্দ্র সংগীতের সুরে যুগপৎ ইলেকট্রিক গীটার বাদন অনুষ্ঠানটিকে হৃদয়গ্রাহী করে তোলে।

সোস্যাল এন্টারপ্রাইজের "ক্ষুধিত পাষাণ"

৪ঠা আগস্ট মহাজাতি সদনে সোস্যাল এন্টারপ্রাইজের সভ্য-শিল্পীরা রবীন্দ্রনাথের "ক্ষুধিত পাষাণ" পরিবেশন করলেন। প্রথমমা

ক্ষুধিত পাষাণে গণেশ সিংহ ও ভারতী মজুমদার

সংগীত, এবং সংঘবদ্ধ অভিনয়ে সকলেই নিপুণতা দেখিয়েছেন। সুন্দর 'টিমওয়ার্ক'। সমগ্র অভিনয়ের মান প্রযোজক-পরিচালক গণেশ সিংহ একাই উঁচুতে তুলে ধরেছিলেন দক্ষতার সঙ্গে, এর মধ্যে ইরাণী সুন্দরীর ভূমিকায় ভারতী মজুমদার প্রতিশ্রুতির সম্ভাবনা দেখিয়েছেন। নায়ক ট্যাক্স-কালেক্টর ও ইরাণী যুবকের ভূমিকায় গণেশ সিংহের অভিনয় জীবন্ত।

কত্থক নৃত্যে মায়া চ্যাটার্জির নাম বহুদিন মনে থাকবে। অন্যান্য ভূমিকায় বেদুইন দস্যুরূপে শম্ভু ভট্টাচার্য, মেহের-আলী, প্রভাত ঘোষ, করিম খাঁ, চিন্ময় ঘোষ দূতী—ডালিয়া মুখোপাধ্যায় ও সুলতান—সাধন গুহকে ভালো লাগল। কাজী সব্য-সাচীর গ্রন্থনা এক সম্পদ। সাগর সেনের নেপথ্য-কণ্ঠ সুন্দর। কমলেশ মৈত্রের ঐকতান ভালোই, তবে আরও সুসবদ্ধ ও মৃদু হ'লে যেন ভালো হোত। আলোক সম্পাতে অনিল সাহা এর মূল সুরটি ধরতে পারেননি, তাই দিন-রাত্রির প্রাকৃত ও অপ্রাকৃত পরিবেশ খাপছাড়া মনে হয়েছে মাঝে মাঝে।

অনুষ্ঠানের প্রারম্ভে সংস্থার সভাপতি শ্রীদক্ষিণারঞ্জন বসু সকলকে ধন্যবাদ জানিয়ে সোস্যাল এন্টারপ্রাইজের উদ্দেশ্য ও কর্মধারা ব্যাখ্যা করেন। পরে শ্রীকার্তিক বসু, সম্পাদকের দক্ষ থেকে দারুণ দুর্যোগের মধ্যেও দর্শকদের উপস্থিতির জন্য কৃতজ্ঞতা জানান।

"নৈবেদ্য-নৃত্যে" 'রাধিকার মানভঞ্জন'

গত ৩০শে জুলাই প্রতাপ মেমোরিয়াল হলে প্রগতিশীল নাট্যসংস্থা 'সিনে আর্ট সোসাইটি'র প্রথমবর্ষ পূর্তি উৎসব অনুষ্ঠিত হয়। ওই অনুষ্ঠানে "রাধিকার মানভঞ্জন" নৈবেদ্য-নৃত্যানুষ্ঠানটি সাফল্যের সঙ্গে অভিনীত হয়। নৃত্যকলার সুষ্ঠু প্রয়োগ, কণ্ঠ-সঙ্গীত ও যন্ত্রসঙ্গীতের সুষম ব্যবহারে এর ব্যঞ্জনার প্রকাশ।

জয়ন্তী মুখার্জির (রাধিকা) নৃত্য এবং শুভ্রা দত্ত'র কণ্ঠে গাওয়া গান 'রাধা'কে বিশিষ্ট করে তুলেছে। সঙ্গীতের সঙ্গে নৃত্যের এই অপূর্ব সমন্বয়ের বুঝি তুলনা হয় না। ওই সঙ্গে তারক চন্দ্রের কণ্ঠ এবং সন্দীপ ব্যানার্জির নৃত্যাভিনয়ে শ্রীকৃষ্ণও এখানে মূর্ত। রাধিকার সহচরীরূপে এদিন নৃত্যাংশে যোগ দিয়েছিলেন লক্ষ্মীমণি। এ'র সঙ্গে কণ্ঠে সহযোগিতা করেন, ভারতী চৌধুরী। যন্ত্র-সংগীতে ছিলেন— শ্রীকাশী-নাথ (বাঁশের বাঁশী), মিঃ মান্টু (সেতার) শান্তি মুখার্জি (তবলা)।

বলা বাহুল্য নৃত্যশিল্পী সন্দীপ মুখার্জি পরিকল্পিত 'রাধিকার মানভঞ্জন' নৈবেদ্য-নৃত্য ও 'সোনমণি' সাংস্কৃতিক পরিষদের শিল্পীবৃন্দের পরিচালনায় অনুষ্ঠানটি সার্বিক সৌষ্ঠব সেদিন সকল দর্শকের হৃদয় জয় করে নিয়েছিল।

সবশেষে 'সিনে আর্ট সোসাইটি'র সভ্যবৃন্দ কর্তৃক অনিলবরণ দত্তের "স্বীকৃতি" নাটকটি সাফল্যের সঙ্গে মঞ্চস্থ হয়।

বাৎসরিক উৎসব

গত শনিবার, ১২ই আগস্ট সন্ধ্যায় সরকারপাড়া স্পোর্টিং ক্লাবের বাৎসরিক উৎসব অনুষ্ঠিত হয়ে গেল সংঘের নিজস্ব মঞ্চে।

সংঘের সদস্যগণ কর্তৃক সমবেত উদ্বোধন সঙ্গীতের পর স্থানীয় 'নিক্কণ' শিল্পীগোষ্ঠী 'ক্রন্দসী' নৃত্যনাট্য পরিবেশন করেন। কালীপদ ভট্টাচার্যের সম্পাদনায় ও গ্রন্থনায় এই নৃত্যনাট্যটি উপভোগ্য হয়েছিল। সঙ্গীতে ও নৃত্যে অংশ গ্রহণ করেন যথাক্রমে নিখিল বোস, কৃষ্ণা ভট্টাচার্য, রত্না দেবদাস, মৈত্রেয়ী, সীমা, কেকা, বুলবুল প্রভৃতি ও কৃষ্ণা মুখোপাধ্যায়, মন্দিরা বসু, অর্চনা, গোপা, টুটুন মুনি, মুনমুনা, টুকলু প্রভৃতি।

সবশেষে ঐ দিনের অনুষ্ঠানের অন্যতম এক বিশেষ আকর্ষণ ছিল সরকারপাড়া স্পোর্টিং ক্লাবের প্রযোজনায় বিমল রায়ের 'অভিনয়' নাট্যাভিনয়। তরুণ ঘোষ নির্দেশিত এই রহস্যমূলক নাটকটি দর্শকদের আগাগোড়া অভিভূত করতে সক্ষম হয়েছিল। নাটকটির বিভিন্ন চরিত্রে সার্থক রূপ দিয়েছেন সুখেন্দু সরকার, তরুণ ঘোষ, দুলাল ঘোষ, অসিত রক্ষিত, পার্থ ভট্টাচার্য ও দিলীপ সরকার।

সমগ্র অনুষ্ঠানটিকে সুষ্ঠুভাবে পরিচালনা করেছেন আলো সরকার, পূর্ণেন্দু সরকার, তৃপ্তি সরকার, মুক্তি সরকার, সলীল ঘোষ প্রভৃতি।

সাধনা সম্মিলনীর বার্ষিক অনুষ্ঠান

'সাধনা সম্মিলনী'র সভ্যগণ সম্প্রতি তাঁদের সংঘের বার্ষিক উৎসব উদযাপন করলেন সংঘের নিজস্ব মাঠে। এক মনোজ্ঞ বিচিত্রানুষ্ঠানের পর সভ্যরা বিধায়ক ভট্টাচার্যের 'বিশ বছর আগে' নাটকটি মঞ্চস্থ করেন।

দীপক, প্রদীপ, মনোহর, দুঃখদহন ও যদুপতির ভূমিকায় যথাক্রমে সিতাংশু ব্যানার্জী, স্বপন মুখার্জী, দীপঙ্কর সরকার, আশিষ সেনগুপ্ত ও সলিল মুখার্জীর অভিনয় উল্লেখযোগ্য। অন্যান্য ভূমিকায় সুঅভিনয় করেন রবীন গুই, শম্ভু পাল, গোরা বীট ও মলয় দেব। নাট্য নির্দেশনার দায়িত্ব সার্থকভাবে পালন করেছেন পরিচালক শ্রীপ্রভাত গৌতম।

ঐদিনের অনুষ্ঠানে সভাপতি ও প্রধান অতিথিরূপে উপস্থিত ছিলেন শ্রীকিরণ মৈত্র ও শ্রীশিবনাথ মজুমদার।

ানের জলসা

ভবানীপুর সংগীত সমাজে ধ্রুপদী আসর

ভবানীপুর সঙ্গীত সমাজের দুই
্যাপী সঙ্গীতোৎসবের প্রথম সন্ধ্যায়
ধ্রুপদের আসর। কণ্ঠসঙ্গীতের আসরে
্রহণ করেন প্রধান ধ্রুপদী শ্রীজয়কৃষ্ণ
ল। এঁর অনুষ্ঠানে বিষ্ণুপুর, রামপুর
ঘরাণার গায়নশৈলীই প্রদর্শিত হয়।
শিক্ষার্থী, ধ্রুপদানুরাগী উভয় প্রকার
ার পক্ষেই এই অনুষ্ঠান উপ-
। হয়েছে। রামপুর ঘরাণার পদ্ধতিতে
য়া' রাগে আলাপ শেষে চৌতালে
গেয়ে শোনালেন। এরপর সাদরা
ম 'মেঘ' রাগে এবং ধামারে দরবারী
া। রামপুর ঘরাণায় প্রথমার্ধ পরি-
নর পর বিষ্ণুপুর ঘরাণায় 'ছায়া' নিয়ে
ঠান সমাপ্ত হোল। উভয় ঘরাণার
াক, শৈলী ও স্বরশ্রুতি অতিশুদ্ধ
াম্ভীর্য ও ধ্রুপদের অনুকূল।

পরের আসর যন্ত্রসংগীতের। শিল্পী
বীরেন্দ্রকিশোর রায় চৌধুরী। ইনি
মিয়া-মল্লারে আলাপ চৌতালে তার-
এবং ঝাঁপতালে ধুরিয়ামল্লার
লন। সেনী ঘরাণার শিল্পীর বীণ
ন্দেহে সেনী ঘরাণার প্রামাণ্য বিস্তার-
র উজ্জ্বল নিদর্শন। কিন্তু বিশেষ
থর দাবী রাখে কুমারজীর রবাববাদ্য।
এখনও অপ্রচলিত পর্যায়ে পড়ে না।
ময় হলেও বীণ-বাদক এখনও
ন। কিন্তু রবাব আজকাল শোনাই
না। এই লুপ্তপ্রায় যন্ত্রকে পুনঃপ্রচলন
জন্য শ্রীরায়চৌধুরীর আন্তরিক
া অত্যন্ত শ্রদ্ধেয়। 'খাম্বাজ' রাগে
বশিত 'তেওড়া' অত্যন্ত চিত্রগ্রাহী
পাখোয়াজের বোলের সংগে 'রবাবী'
। ছন্দগত মিলন—আসর জমিয়ে
র সহায়ক।

ুটি অনুষ্ঠানেই যোগ্যতার সঙ্গে
য়াজ সংগত করেন শ্রীরাজীবলোচন

●

নউএম্পায়ারে "স্পাইস"এর অনুষ্ঠান

Spice (Society for the Promo-
ion of International Exchange)
উদ্যোক্তারা সম্প্রতি নিউ এম্পায়ারে ৩
্যাপী এক বিচিত্রানুষ্ঠানের আয়োজন
।

শ্রীমতী দীপালি নাগের পরিচালনায়
ত ভজনের পর শ্রীমতী নাগ পরি-
ত মল্লার রাগভিত্তিতে কত্থক ভারত-
এবং মণিপুরী আঙ্গিকে নৃত্যা-
ন। এছাড়াও ইন্দ্রনীল ভট্টাচার্যর

সেতার, চিত্রেশ দাসের কত্থক-নৃত্য এই
অনুষ্ঠানসূচী অন্তর্ভুক্ত ছিল। সর্বশেষ
অনুষ্ঠান দুটি শ্রীজ্ঞানপ্রকাশ ঘোষ পরি-
কল্পিত ও পরিবেশিত Vocal
ensembli ও "Rhythm Fantasy."।

ভারতীয় সংগীত-সংসদে পণ্ডিত যশরাজ

দীর্ঘ পাঁচ বৎসর অনুপস্থিতির পর
ভারতীয় সঙ্গীত-সংসদে পণ্ডিত মণিরামের
শিষ্য পণ্ডিত যশরাজের একক কণ্ঠসঙ্গীতের
আসর সত্যিই চিত্তাকর্ষক।

এই তরুণ শিল্পী বয়সে তরুণ হলেও
সঙ্গীতবোধ পরিণত, মেজাজী। চাঞ্চল্য
এবং অতিরঞ্জনবর্জিত তাঁর পরিবেশিত
সংগীতের শুদ্ধ রাগাবয়ব এক শুচিসুন্দর
পরিবেশ রচনা করেছে।

বর্ষণমুখর সন্ধ্যায় 'মিঞাকিমল্লার'
দিয়ে অনুষ্ঠানসূচনা অত্যন্ত শিল্পসুন্দর,
বিশেষ শিল্পীর কণ্ঠ অত্যন্ত সুরেলা
হওয়ায় শ্রোতাদের সহজেই আকৃষ্ট করতে
পেরেছে। যেখান থেকে পঞ্চমের স্রুতিতে
পৌঁছে কোমল গান্ধারের সজল স্পর্শ
সিঞ্চিত করে সুরে পৌঁছানর আবেগ বর্ষার
উচ্ছল রূপাবেশ সৃষ্টি করেছে। মিঞা-
মল্লারের পর পূরিয়া, বাগেশ্রী কানাড়া ও
মধুকোষে ক্রমাগ্রসরের রীতি আমীর খাঁকে
স্মরণ করিয়ে দিয়েছে। বিভিন্ন ভাব ও
অনুবেগের রাগ পরিবেশন কোনো অতর্কিত
বা অসামঞ্জস্য ঘটিয়ে রসহানি ঘটায় নি।
বিভিন্ন 'মুড' এক অপূর্ব সুর-সংহতিতে
কেন্দ্রীভূত।

পণ্ডিত যশরাজ 'মেওয়াতী' ঘরাণার
শিল্পী। এই ধরনের নাম পূর্বে কখনও
শুনেছি বলে মনে পড়ে না। তবে শুনে মনে
হোলো এই গায়কী 'কিরাণা' ঘরাণারই শাখা-
বিশেষ। শিল্পী 'মীরখান্দ তানের ওপর
মনোনিবেশ করায় বৈচিত্র্যের অভাব কিছু
ঘটেছে এবং ওজনও কম। কিন্তু সুরের
সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম কাজ ও শিল্পীর কণ্ঠমাধুর্য
এ ক্ষতি পূরণ করেছে। পণ্ডিত লক্ষ্মী-
নারায়ণের তবলাসঙ্গত সুন্দর।
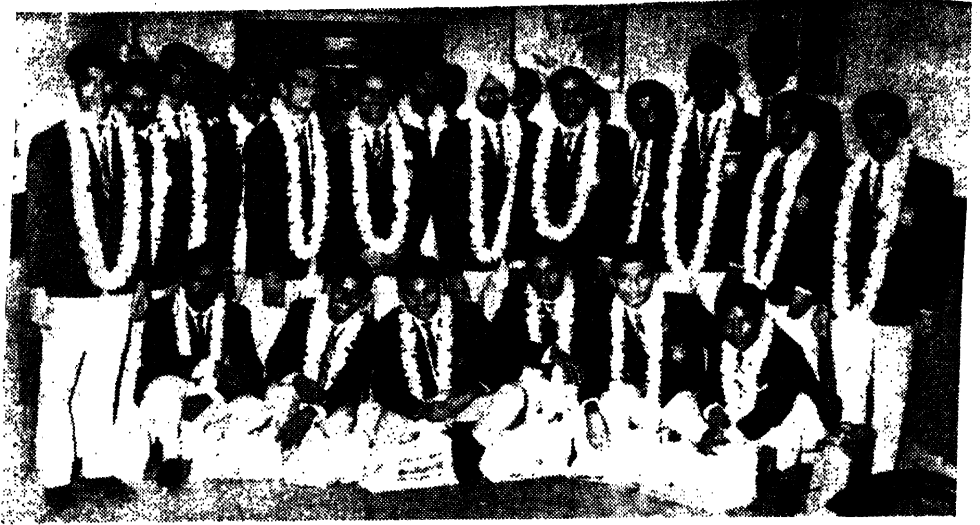
১৯৬৭ সালের মারদেকা ফুটবল প্রতিযোগিতায় ভারতীয় ফুটবল দলের নির্বাচিত সভ্যগণ। ফটো : অমৃত

দর্শক

মারদেকা ফুটবল প্রতিযোগিতা

কোয়ালালামপুরে মালয়েশিয়ার স্বাধীনতা দিবসের উৎসব উপলক্ষে আয়োজিত দশম মারদেকা ফুটবল প্রতিযোগিতায় মোট ১১টি দেশ এবার অংশ গ্রহণ করেছে। এই ১৯৬৭ সালের প্রতিযোগিতায় পশ্চিম অস্ট্রেলিয়ার প্রথম যোগদানের ফলে প্রতিযোগিতার গুরুত্ব যথেষ্ট বৃদ্ধি পেয়েছে। এখন দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার খুদে বিশ্ব-ফুটবল প্রতিযোগিতা বলা যায়। প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণকারী ১১টি দেশকে দুটি গ্রুপে ভাগ করা হয়েছে। এ গ্রুপে খেলছে ৬টি দেশ—দক্ষিণ ভিয়েৎনাম, (গত বছরের বিজয়ী), ভারতবর্ষ, পশ্চিম অস্ট্রেলিয়া, হংকং, মালয়েশিয়া এবং তাইল্যান্ড। অপরদিকের বি গ্রুপে এই ৫টি দেশ আছে—ব্রহ্মদেশ (গত বছরের রানার্সআপ এবং এশিয়ান ফুটবল চ্যাম্পিয়ান), তাইওয়ান, ইন্দোনেশিয়া, দক্ষিণ কোরিয়া এবং সিঙ্গাপুর। প্রথমে প্রতিযোগিতার খেলা হবে লীগ প্রথায় এবং দুই গ্রুপের চ্যাম্পিয়ান দেশ সেমি-ফাইনালে পরস্পর খেলবে। এই প্রতিযোগিতার ফাইনালের বিজয়ী দলকে সুদৃশ্য টুঙ্কু আবদুল রহমান ট্রফি দিয়ে পুরস্কৃত করা হয়। গত বছর ভারতবর্ষ প্রতিযোগিতায় তৃতীয় স্থান পেয়েছিল।

ভারতীয় ফুটবল দল

ভারতীয় ফুটবল দলে নির্বাচিত ১৭ জন খেলোয়াড়ের মধ্যে বাংলা দেশের আছেন ১১ জন—জার্নেল সিং (অধিনায়ক), পিটার থঙ্গরাজ, সি মুস্তাফা, বিদ্যুৎ মজুমদার, নঈম, অরুময়, অশোক চ্যাটার্জি, হাবিব, চন্দ্রপ্রসাদ, আলতাফ এবং জন ; রেলওয়ে দল থেকে ৩ জন—অরুণ ঘোষ (সহ অধিনায়ক), কাজল মুখার্জি এবং কল্যাণ টিকে ; এম গ্রসিয়াস (মহারাষ্ট্র), রামকৃষ্ণ (কেরালা) এবং ইন্দর সিং (পাঞ্জাব)।

ভারতবর্ষ বনাম কেনিয়া

প্রথম টেস্ট-ম্যাচ

পূর্ব আফ্রিকার নাইরোবির ইন্ডিয়ান জিমখানা মাঠে আয়োজিত ভারতবর্ষ বনাম কেনিয়া দলের বে-সরকারী প্রথম টেস্ট ক্রিকেট খেলাটি দর্শকদের বিক্ষোভে ভণ্ডুল হয়ে যায়। তৃতীয় অর্থাৎ শেষ দিনের খেলা ভাঙ্গার নির্দিষ্ট সময়ের কয়েক মিনিট আগে প্রায় দু'হাজার দর্শক কেনিয়ার দ্বিতীয় ইনিংসের সমাপ্তি ঘোষণার দাবিতে মাঠে নেমে পড়েন! এই সময়ে কেনিয়া দলের দ্বিতীয় ইনিংসের রান ছিল ২৭৭ (৭ উইকেটে) এবং তারা ভারতবর্ষের প্রথম ইনিংসের ৪২৪ রানের (৫ উইকেটে ডিক্লেয়ার্ড) থেকে ৯৪ রানে অগ্রগামী ছিল। দর্শকদের দাবী ছিল পাতৌদির খেলা দেখা।

প্রথম দিনের খেলায় ২৪১ রানের মাথায় কেনিয়া দলের প্রথম ইনিংস শেষ হলে ভারতবর্ষ এক উইকেট খুইয়ে ৫২ রান সংগ্রহ করেছিল। কেনিয়ার জবাহির মাত্র ৪ রানের জন্যে সেঞ্চুরী করতে পারেননি! কেনিয়ার প্রথম ইনিংসের ৬১ রানের মাথায় ৫ম উইকেট পড়ে যায়। শেষ পর্যন্ত শেষ দিকের খেলোয়াড়রা দলের মুখরক্ষা করেন। বেদী ৬৬ রানে ৫ এবং প্রসন্ন ৪৭ রানে ৩টি উইকেট পান।

দ্বিতীয় দিনে ৪২৪ রানের (৫ উইকেটে) মাথায় ভারতবর্ষ প্রথম ইনিংসের খেলার সমাপ্তি ঘোষণা করে। দ্বিতীয় উইকেটের জুটিতে ওপনিং ব্যাটসম্যান কুন্দরন এবং ন্যাটা খেলোয়াড় অজিত ওয়াদেকার ২০৬ রান সংগ্রহ করেছিলেন। ওয়াদেকার ১৬০ মিনিটে তাঁর সেঞ্চুরী রান পূর্ণ করেন। অপরদিকে তাঁর জুটি কুন্দরনের সেঞ্চুরী রান পূর্ণ করতে ১৯৫ মিনিট সময় লেগেছিল। ওয়াদেকারের ১৭৯ রানে ছিল ১৯টা বাউন্ডারী এবং ৩টি ওভার বাউন্ডারী। কেনিয়া দ্বিতীয় দিনের বাকি সময়ের খেলায় কোন উইকেট না-খুইয়ে ৩৩ রান সংগ্রহ করেছিল। কেনিয়ার দ্বিতীয় ইনিংসের খেলার সূচনাও সুবিধার হয়নি—৯৬ রানের মাথায় ৪র্থ উইকেট পড়ে যায়। কিন্তু ৬ষ্ঠ উইকেটের জুটিতে জবাহির এবং সুদ ভারতীয় বোলিংকে বিন্দুমাত্র ভ্রুক্ষেপ না করে ১০৩ রান সংগ্রহ করেন। প্রথম ইনিংসে জবাহির ৯৬ রান তুলে অল্পের জন্যে সেঞ্চুরী করতে পারেন নি। দ্বিতীয় ইনিংসে তিনি ১৭৫ মিনিটে তাঁর ১৩৪ রান করেছিলেন!

কেনিয়া : ২৪১ রান (জবাহির ৯৬ এবং প্রিঙ্গলে নট-আউট ৫২ রান। বেদী ৬৬ রানে ৫ এবং প্রসন্ন ৪৭ রানে ৩ উইকেট)।

ও ২৭৭ রান (৭ উইকেটে। জবাহির ১৩৪ রান। মোহল ৫৬ রানে ৪ উইকেট)।

ভারতবর্ষ : ৪২৪ রান (৫ উইকেটে ডিক্লেয়ার্ড। ওয়াদেকার ১৭৯ এবং কুন্দরন ১০০ রান)।

পশ্চিম জার্মান টেনিস প্রতিযোগিতা

১৯৬৭ সালের পশ্চিম জার্মান টেনিস প্রতিযোগিতায় বর্তমান বিশ্বের খ্যাতনামা খেলোয়াড়রা অংশ গ্রহণ করেছিলেন।

পুরুষ বিভাগের ফাইনালে অস্ট্রেলিয়ার এমার্সন স্ট্রেট সেটে স্পেনের ম্যানুয়েল সান্তানাকে পরাজিত করেন। এমার্সন ৬৫ সালে এবং সান্তানা ১৯৬৬ সালে উইম্বলেডন সিঙ্গলস খেতাব জয়ী হয়েছিলেন। ১৯৬৭ সালের উইম্বলেডন চ্যাম্পিয়ান জন নিউকম্ব (অস্ট্রেলিয়া) কোয়ার্টার ফাইনালে ৭-৯, ২-৬ ও ... গেমে অস্ট্রেলিয়ার বব হিউইটের (বর্তমানে আফ্রিকার অধিবাসী) কাছে অপ্রত্যাশিতভাবে পরাজিত হন।

ফাইনাল খেলা

পুরুষদের সিঙ্গলস : রয় এমার্সন (অস্ট্রেলিয়া) ৬-৪, ৬-৩ ও ৬-১ গেমে ম্যানুয়েল সান্তানাকে (স্পেন) পরাজিত করেন।

মহিলাদের সিঙ্গলস : এফ দুরে (ফ্রান্স) ৬-৪ ও ৬-৪ গেমে লেসলী টার্নারকে (অস্ট্রেলিয়া) পরাজিত করেন।

মহিলাদের ডাবলস : লেসলী টার্নার এবং জুডী টেগার্ট (অস্ট্রেলিয়া) ৮-৬ ও ৮-১ গেমে এ বছরের ফ্রেঞ্চ খেতাব বিজয়িনী দুরে (ফ্রান্স) এবং গেল শেরিফকে (অস্ট্রেলিয়া) পরাজিত করেন।

মিক্সড ডাবলস : গেল শেরিফ (অস্ট্রেলিয়া) এবং টম ওকার (হল্যান্ড) ৬-৩ ও ৬-২ গেমে এডা বুডিং (জার্মানী) এবং স্ট্যান স্মিথকে (আমেরিকা) পরাজিত করেন।

ইংল্যান্ড সফরে ভারতীয় স্কুল ক্রিকেট দল

ভারতীয় স্কুল : ৩৮৭ রান (৫ উইকেটে ডিক্লেয়ার্ড। রাজা মুখার্জি ১০৫, সুরেন্দ্র অমরনাথ নট আউট ১০১ এবং লক্ষণ সিং ৮২ রান)।

ল্যাঙ্কাশায়ার স্কুল : ৭৪ রান (সরকার ... রানে ৬ এবং ভুটা ২৩ রানে ... উইকেট)।

... ২ রান (৭ উইকেটে। ল্যাঙ্কবেরী ... রান। সরকার ৫৩ রানে ... উইকেট)।

...টলে ভারতীয় স্কুল বনাম ল্যাঙ্কাস্টার-স্কুল ক্রিকেট দলের দুদিনের খেলাটি ...সিত থেকে যায়।

ভারতীয় স্কুল দল প্রথম ব্যাট করার ...য় প্রথম ইনিংসের ৩৮৭ রানের (...কেটে) মাথায় খেলার সমাপ্তি ঘোষণা করে দ্বিতীয় দিনে মাত্র ৭৪ রানের বিপক্ষের প্রথম ইনিংসের খেলা ... দেয়। দীপঙ্কর সরকার মাত্র ... ৬টা উইকেট পান। ল্যাঙ্কাস্টারসায়ার দল ৩১৩ রানের পিছনে পড়ে ফলো-অন করে। তাদের অসমাপ্ত দ্বিতীয় ইনিংসের ২০২ রানের মাথায় (৭ উইকেটে) খেলাটি শেষ হয়। সরকার দ্বিতীয় ইনিংসের খেলায় ৫৩ রানে ৩টে উইকেট পান—দুই ইনিংসে ৭১ রানে ৯টা। রাজা মুখার্জি ২৬৫ মিনিট খেলে সেঞ্চুরী করেন। অপরদিকে সুরেন্দ্র অমরনাথ ১০০ মিনিটে তাঁর ১০১ রান (১৮টা বাউন্ডারীসহ) পূর্ণ করেন।

লর্ডস মাঠে আয়োজিত একদিনের খেলায় ভারতীয় স্কুল দল ৫ উইকেটে জয়ী হয়। তবে জয়লাভের প্রয়োজনীয় রান পূর্ণ হয়েছিল খেলার শেষ বলে। খেলার শেষ ওভারের মাত্র ২টি বল দিতে বাকি, এদিকে ভারতীয় স্কুল ক্রিকেট দলের জয়লাভের জন্যে এই দুটি বল খেলে ৯ রান প্রয়োজন। খেলার শেষ ওভারের এই শেষ দুটি বলে সুরীন্দর অমরনাথ দুটি ওভার-বাউন্ডারী মেরে এম সি সি স্কুল দলের বিপক্ষে ভারতীয় দলকে জয়যুক্ত করেন।

প্যান আমেরিকান গেমস

১৯৬৭ সালের পনেরদিনব্যাপী প্যান-আমেরিকান গেমসে আমেরিকা ১৭১টি স্বর্ণপদকের মধ্যে মোট ১২০টি স্বর্ণপদক সংগ্রহ করার সূত্রে পশ্চিম গোলার্ধের খেলাধুলার আসরে শ্রেষ্ঠত্বের পরিচয় দিয়েছে। কানাডা ১২টি স্বর্ণ-পদক জয়ী হয়ে দ্বিতীয় স্থান এবং ব্রেজিল ১১টি স্বর্ণ-পদক পেয়ে তৃতীয় স্থান লাভ করেছে।

কানাডার উইনিপেগে আয়োজিত এই প্যান-আমেরিকান ক্রীড়ানুষ্ঠানে ৩৬টি দেশ অংশ গ্রহণ করেছিল। প্রায় পনের দিনের অনুষ্ঠানে ৪০০,০০০ হাজার দর্শকের কাছ থেকে ১০০০,০০০ ডলারের বেশী দর্শনী বাবদ সংগৃহীত হয়। দর্শক এবং দর্শনীর দিক থেকে নতুন রেকর্ড। ১৯৫৯ সালে চিকাগোতে অনুষ্ঠিত প্যান-আমেরিকান ক্রীড়ানুষ্ঠানেও এবারের মত আমেরিকা রেকর্ড সংখ্যক (১২০টি) স্বর্ণপদক জয়ী হয়েছিল। এবার আমেরিকার ১২০টি স্বর্ণপদকের মধ্যে উল্লেখযোগ্য স্বর্ণপদক আছে সুইমিং এবং ডাইভিংয়ের ২৮টি (৩৩টির মধ্যে), এ্যাথলেটিক্সের ৩০টি (৩৫টির মধ্যে), কুস্তির ৮টি (৮টির মধ্যে), সুটিংয়ের ১১টি (১২টির মধ্যে), রোয়িংয়ের ৬টি (৭টির মধ্যে) এবং জিমন্যাস্টিকসের ১০টি (১৪টির মধ্যে)। দলগত অনুষ্ঠানে আমেরিকার উল্লেখযোগ্য স্বর্ণপদক জয় পুরুষ ও মহিলাদের ভলিবল, পুরুষদের বাস্কেটবল, ওয়াটারপোলো এবং 'বেসবল অনুষ্ঠানে। ফুটবলে স্বর্ণপদক জয়ী হয়েছে মেক্সিকো।

অলিম্পিক গেমসের অনুকরণে প্রতি চতুর্থ বছরে প্যান-আমেরিকান ক্রীড়ানুষ্ঠানের আসর বসে। সেই হিসাবে পরবর্তী আসর বসবে ১৯৭১ সালে কলম্বিয়ার ক্যালি শহরে।

চূড়ান্ত পদক তালিকা

১ম আমেরিকা—২২৭টি (স্বর্ণ ১২০, রৌপ্য ৬৩ ও ব্রোঞ্জ ৪৪), ২য় কানাডা—৫৮টি (স্বর্ণ ১২, রৌপ্য ৩ ও ব্রোঞ্জ ৪৩), ৩য় কিউবা—৪৫টি (স্বর্ণ ৮, রৌপ্য ১৪ ও ব্রোঞ্জ ২৩), ৪র্থ মেক্সিকো ৪৩টি (স্বর্ণ ৫, রৌপ্য ১৪ ও ব্রোঞ্জ ২৪)।

প্রথম বিভাগের ফুটবল লীগ

গত সপ্তাহে (আগস্ট ৭—১২) অনুষ্ঠিত প্রথম বিভাগের ক্যালকাটা ফুটবল লীগ প্রতিযোগিতায় ১৪টি খেলার সংক্ষিপ্ত ফলাফল : ১২টি খেলায় জয়-পরাজয়ের নিষ্পত্তি এবং ২টি খেলা ড্র। ইস্টবেঙ্গল-রাজস্থানের খেলায় রাজস্থান দল তাদের পূর্ব ঘোষণা অনুযায়ী মাঠে উপস্থিত হয়নি।

গত বছরের লীগ চ্যাম্পিয়ান এবং এবছরের লীগ-তালিকার শীর্ষস্থান অধিকারী ইস্টবেঙ্গল দল আলোচ্য সপ্তাহে মাত্র একটা ম্যাচ খেলেছে—বালী প্রতিভার বিপক্ষে ১-০ গোলে জয়। ফলে বর্তমানে তাদের ৪১ পয়েন্ট দাঁড়িয়েছে ২৪টা খেলায়। অপরদিকে লীগ তালিকার দ্বিতীয় স্থান অধিকারী মহমেডান স্পোর্টিং দল ৩-১ গোলে স্পোর্টিং ইউনিয়ন এবং ১-০ গোলে উয়াড়ী দলকে পরাজিত করেছে—২৩টা খেলায় ৪০ পয়েন্ট। গত বছরের রানার্স-আপ মোহনবাগান আলোচ্য সপ্তাহে খিদিরপুরকে ৩-২ গোলে, বাটা স্পোর্টস ক্লাবকে ৫-০ গোলে এবং এরিয়ান্সকে ২-১ গোলে পরাজিত করে তৃতীয় স্থানে উঠেছে। বর্তমানে মোহনবাগানের ২৪টা খেলায় ৩৬ পয়েন্ট দাঁড়িয়েছে। বি এন আর দল ০-৪ গোলে স্পোর্টিং ইউনিয়নের কাছে পরাজিত হয়ে লীগ তালিকার তৃতীয় স্থান থেকে চতুর্থ স্থানে নেমে গেছে—২৫টা খেলায় ৩৬ পয়েন্ট। আন্তঃ রেলওয়ে ফুটবল টুর্নামেন্টে যোগদানের দরুণ বি এন আর এবং ইস্টার্ণ রেলওয়ে আলোচ্য সপ্তাহে তাদের দ্বিতীয় বিভাগের টিম নিয়ে খেলেছে। ফলে বি এন রেলওয়ে ০-৪ গোলে স্পোর্টিং ইউনিয়নের কাছে এবং ইস্টার্ণ রেলওয়ে ০-১ গোলে বালী প্রতিভা এবং ০-১ গোলে কালীঘাট দলের কাছে পরাজয় বরণ করেছে।

আগামী কয়েক সপ্তাহে কলকাতার প্রথম বিভাগের ফুটবল লীগ খেলায় দর্শক সমাগম কম হতে পারে। কারণ মালয়েশিয়ার মারদেকা ফুটবল প্রতিযোগিতায় যোগদানের উদ্দেশ্যে কলকাতার ১৪জন খ্যাতনামা খেলোয়াড় ভারতীয় ফুটবল দলের সঙ্গে চলে গেছেন। এই ১৪জন খেলোয়াড়দের মধ্যে আছেন মোহনবাগানের ৫জন, ইস্টবেঙ্গল এবং মহমেডান স্পোর্টিং দলের ৩জন করে, বি এন রেলদলের ২জন এবং ইস্টার্ণ রেল দলের একজন।
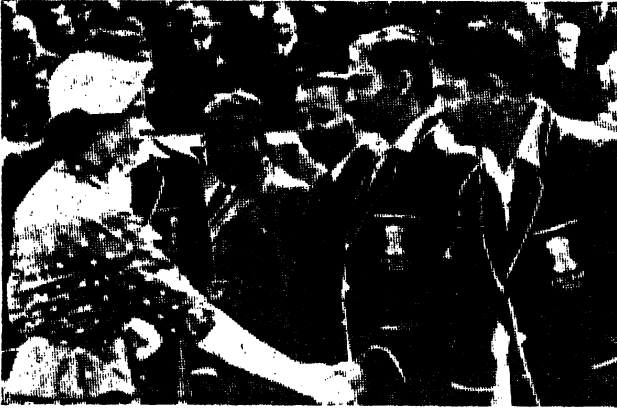
১৯৫২ সালে ইংল্যান্ডের বিপক্ষে লর্ডস মাঠের দ্বিতীয় টেস্টে ভিনু মানকাদের অনন্য ক্রীড়া-চাতুর্যের স্বীকৃতি—রাণী এলিজাবেথের অভিনন্দন।

লর্ডসে স্মরণীয় টেস্ট ক্রিকেট

ক্ষেত্রনাথ রায়

ক্রিকেটের পুণ্যভূমি ইংল্যান্ডের ঐতিহাসিক লর্ডস মাঠ। এখানেই ভারতবর্ষ বনাম ইংল্যান্ডের প্রথম সরকারী টেস্ট খেলার আসর বসেছিল ১৯৩২ সালের ২৫শে জুন। এই সূত্রে আন্তর্জাতিক সরকারী টেস্ট ক্রিকেট খেলার আসরে ভারতবর্ষের প্রথম আবির্ভাব। সুতরাং এই দিনটি ভারতীয় খেলাধুলোর ইতিহাসে উজ্জ্বল লাল বড় বড় হরফে উৎকীর্ণ থাকবে। রাজনৈতিক দিক থেকেও এই টেস্ট খেলাটির গুরুত্ব যথেষ্ট ছিল। এই সময়ে ভারতবর্ষ ছিল ইংরেজদেরই শাসনাধীন দেশ। ক্রিকেট আবার ইংরেজদের জাতীয় খেলা। সুতরাং তাদেরই শাসনাধীন কোন একটি দেশ টেস্ট ক্রিকেট খেলার আসরে ইংরেজ জাতিকে শক্তি পরীক্ষায় আহ্বান জানালে তারা তা সানন্দে গ্রহণ করবে এরকম খেলোয়াড়সুলভ মনোবৃত্তি ইংরেজ জাতির একসময়ে ছিল না। ভারতবর্ষকে দীর্ঘদিন অপেক্ষা করতে হয়েছিল। ১৯৩২ সালের আগে ভারতীয় ক্রিকেট দল তিনবার ইংল্যান্ড সফরে যায়—১৮৮৬ ও ১৮৮৮ সালে পার্শি দল এবং ১৯১১ সালে মহারাজা পাতিয়ালার ক্রিকেট দল। অপরদিকে ইংল্যান্ড থেকেও ভারতবর্ষের মাটিতে ক্রিকেট খেলতে এসেছিল ১৮৮৯-৯০ সালে জি এফ ভার্ননের দল, ১৮৯৩-৯৪ সালে লর্ড হকের দল, ১৯০২-৩ সালে অক্সফোর্ড ইউনিভারসিটি অথেনটিক্স দল এবং ১৯২৬-২৭ সালের মরসুমে আন্তর্জাতিক ক্রিকেট খেলার আসরে সর্বময় নিয়ন্ত্রণ সংস্থা এম সি সি দল। কিন্তু এইসব সফরে টেস্ট ক্রিকেট খেলার কোন ব্যবস্থাই ছিল না। বলা হত, টেস্ট ক্রিকেট খেলার মত ভারতীয় ক্রিকেট দলের যোগ্যতা নেই। কিন্তু এদিকে খাস ইংল্যান্ডের মাটিতে এক প্রলয় কাণ্ড ঘটে যায়। নওনগরের জামসাহেব রঞ্জিৎ সিংজী কেম্ব্রিজ বিশ্ববিদ্যালয় এবং সাসেক্স কাউন্টি ক্রিকেট দলের পক্ষে ক্রিকেট খেলে ইংল্যান্ডের ক্রিকেট মহলে এক বিরাট আলোড়ন এনে দেন। তাঁর ক্রিকেট খেলার পদ্ধতি ছিল সম্পূর্ণ নিজস্ব; ইংল্যান্ডের মাটিতে কলেজের শিক্ষা এবং

ভিনু মানকাদ
লর্ডস মাঠের নায়ক

ক্রিকেট খেলার চর্চা, অথচ তাঁর খেলায় সেখানের কোন ছাপ ছিল না। তিনি ছিলেন বহুপ্রশংসিত দর্শনীয় লেগ গ্ল্যান্সের উদ্ভাবক। অতি অল্প সময়ের মধ্যে রঞ্জিৎ সিংজী ইংল্যান্ডের মাঠে-ময়দানে খ্যাতনামা ইংরেজ ক্রিকেট খেলোয়াড়ের মতই সমান জনপ্রিয়তা লাভ করেন। ইংল্যান্ডের টেস্ট ক্রিকেট দলের নির্বাচকমণ্ডলী তাঁর খেলা এবং জনপ্রিয়তাকে উপেক্ষা না করে ইংল্যান্ড দলে সাদরে তাঁকে নির্বাচিত করেন। টেস্ট ক্রিকেটে রঞ্জিৎসিংজী তাঁর যোগ্যতার যে পরিচয় দেন তারই ফলে ভারতীয় ক্রিকেট খেলা সম্পর্কে ইংল্যান্ডের ক্রিকেট মহলের পূর্ব ধারণার পরিবর্তন ঘটে। রঞ্জিৎসিংজীর খেলার মাধ্যমেই ভারতবর্ষ টেস্ট ক্রিকেট খেলায় ইংল্যান্ডের কাছে স্বীকৃতি লাভ করে। এদিকে রঞ্জিৎসিংজীর আন্তর্জাতিক খ্যাতি ক্রিকেট খেলায় ভারতবর্ষকে বিপুলভাবে অনুপ্রাণিত করে। সুতরাং ভারতীয় ক্রিকেট তাঁর কাছে অনেক বেশী ঋণী। আমাদের দুর্ভাগ্য যে, টেস্ট ক্রিকেট খেলা থেকে অবসর নেওয়ার ফলে তাঁকে আমরা ভারতীয় টেস্ট ক্রিকেট দলে কোনদিন পাইনি।

১৯৩২ সালের ২৫শে জুন, লর্ডস মাঠে ইংল্যান্ডের বিপক্ষে ভারতবর্ষের প্রথম সরকারী টেস্ট খেলার উদ্বোধন হয়। অপরদিকে এই খেলাটি ছিল ইংল্যান্ডের ১৯৩তম টেস্ট খেলা। সুতরাং টেস্ট ক্রিকেট খেলায় ভারতবর্ষের থেকে ইংল্যান্ড ছিল অনেক বেশী শক্তিশালী এবং অভিজ্ঞ। তার ওপর লর্ডস মাঠের ঘরোয়া পরিবেশ ইংল্যান্ডের অন্যতম সহায়ক ছিল। ইংল্যান্ডের অধিনায়ক ডগলাস জার্ডিন টসে জয়ী হয়ে ইয়র্কসায়ার কাউন্টি দলের হার্বার্ট সাটক্লিফ এবং পি হোমসকে ব্যাট করতে পাঠান। এই দুজনের সম্বন্ধে ক্রীড়ামোদীদের খুব উচ্চ ধারণা ছিল। কারণ এই টেস্ট খেলার মাত্র কয়েকদিন আগে এসেক্স কাউন্টি দলের বিপক্ষে প্রথম উইকেটের জুটিতে এঁরা ৫৫৫ রান সংগ্রহ করে প্রথম শ্রেণীর খেলায় যে-কোন উইকেটের জুটিতে সর্বাধিক রানের বিশ্বরেকর্ড করেছিলেন। মহম্মদ নিসার ইংল্যান্ডের বিপক্ষে এই প্রথম টেস্ট খেলার উদ্বোধন করেন, এবং তাঁরই দ্বিতীয় ওভারের খেলায় সাটক্লিফ নিজস্ব ৩ রানের মাথায় বোল্ড আউট হন। সাটক্লিফের প্রথম উইকেট জুটি পি হোমসের একই অবস্থা দাঁড়ায়। হোমসের নিজস্ব রান মাত্র ৬—এই অবস্থায় নিসার তাঁকে বোল্ড আউট করে প্যাভিলিয়ানে ফেরৎ পাঠিয়ে দেন। এরপর ভারতীয় বোলারদের উচিত শিক্ষা দেওয়ার দৃঢ় সংকল্পে খেলতে নেমে প্রখ্যাত ফ্র্যাংক উলী ৯ রান করে রান আউট হন। ইংল্যান্ডের জমার ঘরে তখন মাত্র ১৯ রান, এদিকে বাঘা বাঘা তিনজন ব্যাটসম্যান আউট। লর্ডস মাঠের বিশ হাজার দর্শক টেস্ট ক্রিকেটে নবাগত ভারতীয় খেলোয়াড়দের ভেল্কিতে স্বদেশের শোচনীয় দুর্দশা দেখে হতবাক।

শেষপর্যন্ত চতুর্থ উইকেটের জুটিতে ওয়াল্টার হ্যামন্ড (৩৫ রান) এবং অধিনায়ক ডগলাস জার্ডিন (৭৯ রান) ৮২ রান সংগ্রহ করে দলের পতন রোধ করেন। অপরদিকে লেসলী এমস ৬৫ রান করে ইংল্যান্ডের মোট রান (২৫৯) ভদ্র অবস্থায় নিয়ে আসেন। প্রথম দিনেই ইংল্যান্ডের প্রথম ইনিংস ২৫৯ রানের মাথায় শেষ

। ভারতবর্ষের পক্ষে নিসার ৯৩ রানে অমর সিং ৭৫ রানে ২ এবং নাইডু ৪০ ২টো উইকেট পান। ভারতবর্ষের ৩০ র মাথায় (কোন উইকেট না পড়ে) দিনের খেলা শেষ হয়। সুতরাং ল্যর দিক থেকে প্রথম দিনের খেলাটি ভারতবর্ষেরই।

দ্বিতীয় দিনের লাঞ্চের সময় ভারত- । রান দাঁড়ায় ১৫৩ (৪ উইকেটে)। লাঞ্চের পরবর্তী এক ঘন্টার খেলায় বর্ষের প্রথম ইনিংস ১৮৯ রানে হয়। ফলে ইংল্যান্ড প্রথম ইনিংসের । ৭০ রানে এগিয়ে যায়। ভারতবর্ষের য়ক খোঁড়া হাতে ৮০ মিনিট খেলে পক্ষে সর্বোচ্চ ৪০ রান করেন। জয়- । উদ্দেশ্যে দ্বিতীয় ইনিংসে ইংল্যান্ড রানের মাথায় (৮ উইকেটে) খেলার ত ঘোষণা করে। দ্বিতীয় ইনিংসে ন্ডর উল্লেখযোগ্য রান জার্ডিনের উট ৮৫, পেন্টারের ৫৪ এবং রবিন্সের ান। দলের মাত্র ৬৭ রানের মাথায় উইকেট পড়ে যায়। শেষপর্যন্ত ৫ম টের জুটিতে জার্ডিন এবং পেন্টার ান সংগ্রহ করে দলের পতন রোধ জাহাঙ্গীর খাঁ ৬০ রানে ৪ এবং ং ৮৪ রানে ২টি উইকেট পান।

রতবর্ষ ৩৪৫ রানের পিছনে পড়ে । ইনিংস খেলতে নামে। আহত হাত অধিনায়ক নাইডু ১০ রান করে আউট াজির আলি পায়ের মাংসপেশীর টান খলে ৬ রান করেছিলেন, ১০৮ মাথায় ভারতবর্ষের ৬ষ্ঠ এবং ৭ম পড়ে যায়। দলের এই শোচনীয় । লাল সিংয়ের সঙ্গে অমর সিং ৮ম র জুটি বেঁধে দৃঢ়তার সঙ্গে ঙ্গীতে খেলেছিলেন। এই ৮ম র জুটি লাল সিং (২৯ রান) এবং ং ঝড়ের গতিতে ৪০ মিনিটে ১৪ রান সংগ্রহ করেছিলেন। অমর র সর্বোচ্চ ৫১ রান তুলেছিলেন। র্ষের দ্বিতীয় ইনিংস ১৮৭ রানের শেষ হলে ইংল্যান্ড ১৫৮ রানে ।। কিন্তু ভারতবর্ষের এ পরাজয় র হয়নি, নানা ধরনের প্রতিকূল র মধ্যে ভারতবর্ষকে শক্তিশালী র বিপক্ষে এই প্রথম টেস্ট ম্যাচ হয়েছিল—বিদেশের অনভ্যস্ত টসে পরাজয় এবং দলের সেরা ব্যাটসম্যানকে (নাইডু, নাজির এবং পালিয়া) গুরুতর আহত খেলতে হয়েছিল। সর্বোপরি টেস্ট খেলায় ইংল্যান্ডের বিরাট ঐতিহ্য। র বিপক্ষে উদ্বোধনী টেস্ট খেলায় অস্ট্রেলিয়া জয়ী হয়েছিল (১৮৭৭ মেলবোর্নে ৪৫ রানে)। পরবর্তী- ল্যান্ডের বিপক্ষে উদ্বোধনী টেস্ট নমে দক্ষিণ আফ্রিকা ৮ উইকেটে সালে দক্ষিণ আফ্রিকায়), ওয়েস্ট ১ক ইনিংস ও ৫৮ রানে (১৯২৮ র্ডস মাঠে), নিউজিল্যান্ড ৮

কর্ণেল সি কে নাইডু
টেস্ট ক্রিকেটে ভারতবর্ষের
প্রথম অধিনায়ক

উইকেটে (১৯৩০ সালে নিউজিল্যান্ডে) এবং ভারতবর্ষ ১৫৮ রানে (১৯৩২ সালে লর্ডস মাঠে) পরাজয় বরণ করে।

ইংল্যান্ডের বিপক্ষে ১৯৫২ সালের লর্ডস মাঠের দ্বিতীয় টেস্ট খেলাটি ভারতীয় খেলোয়াড় ভিনু মানকাদের অসাধারণ সাফল্যের স্মরণে তাঁর নামেই উৎসর্গীকৃত হয়েছে। তাছাড়া লর্ডস মাঠের স্মরণীয় টেস্ট ক্রিকেট খেলার ক্ষুদ্র তালিকায় এই খেলাটি উল্লেখযোগ্য স্থান পেয়েছে

মহম্মদ নিসার

এবং তা একমাত্র মানকাদের কৃতিত ক্রীড়ানৈপুণ্যের জন্যেই সম্ভব হয়েছে। ১৯৫২ সালের ইংল্যান্ড সফরে ভারতবর্ষ লিডসের প্রথম টেস্ট খেলায় ইংল্যান্ডের কাছে শোচনীয়ভাবে ৭ উইকেটে হেরে যায়। মানকাদকে বাদ দিয়েই ১৯৫২ সালের ইংল্যান্ড সফরে ভারতীয় দল গঠন করা হয়েছিল। মানকাদ এই সফরের সময় ল্যাঙ্কাসায়ার লীগে হেসলিংডেন ক্লাবের পক্ষে খেলছিলেন। ভারতীয় দলের

অমর সিং

শোচনীয় অবস্থা দেখে কর্মকর্তারা শেষ- পর্যন্ত তাঁর শরণাপন্ন হলেন। ভারতীয় ক্রিকেটের এই সঙ্কটকালে মানকাদ ভারতীয় ক্রিকেট কন্ট্রোল বোর্ডের কর্মকর্তাদের সঙ্গে তাঁর পূর্বের তিক্ত অভিজ্ঞতা মন থেকে মুছে ফেলেন এবং আর্থিক ক্ষতি স্বীকার করে সরাসরি লর্ডস মাঠে ছুটে আসেন। মানকাদের এ এক মহান হৃদয়বত্তার পরিচয়। ভারতীয় দলের অধিনায়ক বিজয় হাজারে টসে জয়ী হলে মানকাদ এবং পঙ্কজ রায় প্রথম ইনিংসের উদ্বোধন করতে নেমে প্রথম উইকেটের জুটিতে ১০৬ রান সংগ্রহ করেন। লাঞ্চের পর মানকাদ তাঁর নিজস্ব ৭২ রানের মাথায় আউট হন। তাঁর বিদায়ের সঙ্গে সঙ্গে ভারতবর্ষের খেলার ভাঙ্গন ধরে এবং ২৩৫ রানের মাথায় ভারতবর্ষের প্রথম ইনিংসের খেলা শেষ হয়। ইংল্যান্ড তাদের প্রথম ইনিংসের খেলায় যে ৫৩৭ রান সংগ্রহ করেছিল তার মধ্যে হাটনের ১৫০ রান এবং উইকেট- কিপার গডফ্রে ইভান্সের ১০৪ রান উল্লেখ- যোগ্য। অল্পের জন্যে ইভান্স লাঞ্চের আগে "সেঞ্চুরী" করার গৌরব থেকে বঞ্চিত হন। ৬ষ্ঠ উইকেটের জুটিতে ইভান্স এবং গ্রেভনী দলের ১৫৯ রান সংগ্রহ করেছিলেন। ইংল্যান্ডের প্রথম ইনিংসে মানকাদের বোলিং পরিসংখ্যান ছিল—ওভার ৭৩, মেডেন ২৪ এবং ১৯৬ রানে ৫টা উইকেট। দীর্ঘ সময় বল দিয়ে মানকাদ দ্বিতীয় ইনিংসে ৪½ ঘন্টা ব্যাট করে ব্যক্তিগত ১৮৪ রান করেন। দ্বিতীয় ইনিংসে দলের মোট রান ছিল ৩৭৮। মানকাদের এই ১৮৪ রানে ছিল ১৯টা বাউন্ডারী এবং একটা ওভার- বাউন্ডারী এবং তাঁর এই ১৮৪ রানই যে-কোন দেশের বিপক্ষে টেস্ট ক্রিকেটের এক ইনিংসে ভারতবর্ষের ব্যক্তিগত সর্বোচ্চ রানের রেকর্ড হয়। ইংল্যান্ড শেষপর্যন্ত দ্বিতীয় ইনিংসের দুটো উইকেট খুইয়ে জয়লাভের প্রয়োজনীয় ৭৯ রান তুলে ৮ উইকেটে জয়ী হলেও খেলার শেষে দর্শকরা কিন্তু মানকাদের উদ্দেশ্যেই জয়ধ্বনি করেন।

ফুটবলের শ্রেষ্ঠাংশে

সি মুস্তাফা

(মহঃ স্পোর্টিং)

হাজী সাহেবের বেজায় আপত্তি, ছেলেকে তিনি দূরে যেতে দেবেন না, কিছুতেই না। কিন্তু এনায়েৎ মিঞাও নাছোড়বান্দা, হাজী সাহেবের ছেলেটিকে তার চাই-ই-চাই।

সাধ্য সাধনা চললো অনেকদিন ধরে। ছেলে অভিমানে মুখ ফুলিয়ে থাকে, বাবা থাকেন পাথরের মত ঠাণ্ডা হয়ে। দিন যায়, দিন আসে। পৃথিবীর রং বদলায়, মানুষের মনও। আরব সাগর উপকূলে কান্নানোরের এলাচ বাগানে ফুল ফোটে, অনাগত দিনের সোনালী স্বপ্ন দেখে মালাবারের মানুষ।

সেই স্বপ্ন নিয়েই বাংলায় এসেছিলেন মহামেডান স্পোর্টিংয়ের গোলরক্ষক মুস্তাফা। মুস্তাফার স্বপ্ন সার্থক হয়েছে। ভারতীয় ফুটবলে মুস্তাফা আজ এক স্বর্ণাক্ষরী নাম। রোগা ছিপছিপে চেহারা, বুদ্ধিদীপ্ত দুটি চোখে সাহসের স্বাক্ষর। নিরলস সাধনায় মুস্তাফা দেহমনকে নিখুঁত করে গড়ে তুলেছেন। বোঝাই যায় না, বল ধরছেন, কি গাছ থেকে ফুল তুলছেন। অসাধারণ পজিসন জ্ঞান, চিতার মত চটপটে। নীচু কিংবা উঁচু যেখান থেকেই বল আসুক না কেন, সে বলে মুস্তাফাকে হার মানানো রীতিমত কষ্টকর।

১৯৪৫ সালে কেরালার কান্নানোর শহরে মুস্তাফার জন্ম এক ধনী ব্যবসায়ী পরিবারে। তাঁর বাবা চেয়েছিলেন ছেলে বড় হয়ে তাঁর ব্যবসা দেখবে। কিন্তু ছেলে ব্যবসার দিকের গেলই না, পড়ে রইলো ফুটবল নিয়ে।

কান্নানোর মিউনিসিপ্যাল হাইস্কুলে পড়ার সময়ে নজরে পড়লেন তিনি কোচ শ্রীভাস্করনের। মুস্তাফাকে গড়তে লাগলেন তিনি। মুস্তাফা ফুটবল খেলতে সুরু করেছিলেন সেন্টার ফরোয়ার্ডে। সেখান থেকে ব্যাকে এবং শেষ পর্যন্ত গোলে। মুস্তাফাকে ১৯৬১ সালে প্রথম যখন দেখি তখন তিনি ষোল বছরের বাচ্চা ছেলে। কিন্তু এত অল্পবয়সেই কেরালা ফুটবল এসোসিয়েশনের নির্বাচকমণ্ডলী পরম আস্থা ভরে মুস্তাফার হাতে তুলে দিয়েছিলেন রাজ্য দলের গোলরক্ষকের কঠিন দায়িত্ব। অবশ্য এর আগেও স্কুল পর্যায়ের খেলায় মুস্তাফা রাজ্য দলের প্রতিনিধিত্ব করেছিলেন দিল্লীতে জাতীয় স্কুল ক্রীড়ায় ১৯৫৭-৫৮ সালে। পরের বছর ব্রাদার্স ক্লাবের হয়ে রোভার্স কাপেও বাচ্চা ছেলে মুস্তাফাকে খেলতে দেখা গেছে। ১৯৬২ সাল জার্মান ফুটবল দল স্টুটগার্টের বিরুদ্ধে মুস্তাফা একেবারে সর্বভারতীয় খ্যাতি পেলেন, ডাক পড়লো তাঁর এশীয় ক্রীড়ায় ট্রায়ালে। এনায়েৎ সাহেব মুস্তাফাকে কলকাতায় খেলতে নিয়ে এলেন ১৯৬৩ সালে, মহামেডান স্পোর্টিং ক্লাবে খেলেন তিনি। ১৯৬৪ সাল থেকে তিনি বাংলার অন্যতম গোলরক্ষক। ভারতীয় দলে থঙ্গরাজের পরেই মুস্তাফার স্থান। ১৯৬৬ সালে তিনি সর্বপ্রথম বিদেশে যান কুয়ালালামপুরে -- মারদেকা ফুটবল প্রতিযোগিতা উপলক্ষে এবং আই এফ এ-র প্রতিনিধিরূপে ব্রহ্ম সফরে।

মুস্তাফা লেখাপড়া করেছেন কলকাতার সেন্ট জেভিয়ার্স কলেজে। ব্যবসায়ীর ছেলে মুস্তাফা, বাণিজ্য বিভাগের ছাত্র। সেন্ট-জেভিয়ার্সে পড়ার সময় ১৯৬৫ সালে আন্তঃবিশ্ববিদ্যালয় ফুটবলের আসরে তিনি কলকাতার প্রতিনিধিত্ব করেছেন। ১৯৬৬ সালে কুয়ালালামপুর থেকে ফিরে এসে ব্যাঙ্কক এশীয় ক্রীড়ানুষ্ঠানে যোগদান করেন।

সাক্ষাৎকারের কাহিনী যখন লিখছি মুস্তাফা তখন অনেক অনেক দূরে—মালয়েশিয়ার রাজধানী কুয়ালালামপুরে, ভারতীয় ফুটবল দলের অন্যতম প্রতিনিধিরূপে। কান্নানোর থেকে—কুয়ালালামপুর, বহুৎ বহুৎ দূর!

অশোক চ্যাটার্জি

(মোহনবাগান)

কি দুরন্ত ছেলেরে বাবা! সকাল থেকে রাত দুপুর পর্যন্ত বাড়ী মাথায় করে রেখেছে। দিনরাত খেলা আর খেলা। স্কুল থেকে এসে দুটো নাকে-মুখে গুঁজে আবার সেই বল পেটানো। বাড়ীর লোক অস্থির, পাড়ার লোক অস্থির।

দুরন্ত এই ছেলেটির নাম অশোক। মোহনবাগান তথা ভারতের ছটফটে সেন্টার ফরোয়ার্ড অশোক চ্যাটার্জি। মাঠে অশোকের উপস্থিতির অর্থ প্রতিদ্বন্দ্বী স্টপারের কঠিন

পরীক্ষা। ক্ষিপ্র, সপ্রতিভ অশোকের উপস্থিতি স্টপারের ভিৎ নড়িয়ে দেয়; তাঁর আচমকা সটে প্রতিদ্বন্দ্বী গোলরক্ষককে দিশেহারা হতে হয়। বাঘা বাঘা স্টপারেরা গোড়ার দিকে অশোককে নজর না দিয়ে বহু ক্ষেত্রেই নিজেদের পরাজয় ডেকে এনেছেন। হঠাৎ এক অগোছালো, আত্মসন্তুষ্ট মুহূর্তে ছোঁ মেরে বল কেড়ে নিয়ে কতবার যে অশোক তাঁদের বিপর্যয়ের মুখে ঠেলে দিয়েছেন তার কি ইয়ত্তা আছে?

ছোটখাটো চেহারা অশোকের কিন্তু এইটুকু চেহারার মধ্যে লুকিয়ে রয়েছে স্টীম-ইঞ্জিনের মত অফুরন্ত দম। দুটি পায়েই সট্ আছে, হেডিং, ড্রিবলিং এবং বল দেওয়া-নেওয়াও অশোকের নৈপুণ্য সর্বজনস্বীকৃত। ভুল-ত্রুটি এখনও সবটুকু শোধরায়নি কিন্তু সর্বশ্রী বলাইদাস চট্টোপাধ্যায়, শৈলেন মান্না, অরুণ সিংহের মাজাঘষায় এবং ভারত-বিশ্রুত চুনী গোস্বামীর সাহচর্যে অশোক এখন নিটোল প্রত্যয়ে গড়া প্রায়-সম্পূর্ণ এক সেন্টার ফরোয়ার্ড এবং সেই গুণের স্বীকৃতিতেই তিনি অজ জাতীয় দলের অন্যতম প্রতিনিধি। কলকাতা, দিল্লী, বোম্বাইয়ের বিভিন্ন ফুটবলের আসরে অশোক এখন সর্বজনপরিচিত। ভারতসফরকারী বিভিন্ন বৈদেশিক দলের বিরুদ্ধেও অশোক তাঁর ক্রীড়াকৃতির সুস্পষ্ট স্বাক্ষর রেখেছেন। মোহনবাগান ক্লাবের প্লাটিনাম জয়ন্তী উপলক্ষে তাতাবানিয়ার বিরুদ্ধে অশোক মনোরঞ্জন করেছেন নিজ সমর্থকদের তো বটেই, তাতাবানিয়ারও।

১৯৪৩ সালে হাওড়ায় জন্মগ্রহণ করেন অশোক। স্কুলের পড়াশুনা হাওড়া বিবেকানন্দ ইনস্টিটিউশনে এবং পরবর্তী-পর্বে সুরেন্দ্রনাথ কলেজে। স্কুলে পড়ার সময় ১৯৫৮-৫৯ সালে সর্বভারতীয় স্কুল-ক্রীড়ার আসরে বাংলার প্রতিনিধিত্ব করার সময় থেকেই কলকাতার মাঠের সঙ্গে তাঁর পরিচয় হাওড়া ইউনিয়নের মাধ্যমে। ১৯৬০ সাল পর্যন্ত হাওড়া ইউনিয়নের পক্ষে খেলে

১৯৬১ সালে যোগ দেন মোহনবাগানে। তারপর থেকে আজ পর্যন্ত আর দল পাল্টান নি। সুরেন্দ্রনাথ কলেজের ছাত্র হিসেবে আন্তঃ বিশ্ববিদ্যালয় ফুটবলের আসরেও খেলেছেন অশোক কলকাতার প্রতিনিধি হয়ে। ১৯৬৩ সালে পেনাংয়ে অনুষ্ঠিত এশীয় যুব ফুটবল প্রতিযোগিতার মাধ্যমে অশোক সর্বপ্রথম জাতীয় পর্যায়ের স্বীকৃতি লাভ করেছেন। এর আগের বছর জুনিয়র জাতীয় ফুটবলে বাংলার অন্যতম খেলোয়াড় ছিলেন তিনি।

সন্তোষ ট্রফিতে প্রথম সুযোগ পেয়েছিলেন গৌহাটির বিগত অনুষ্ঠানে। সেবার সুকুমার সমাজপতি অধিনায়ক। অশোকের পাশে ছিলেন পরিমল দে অরুময় ও অমল চক্রবর্তী। রেলের কাছে ফাইনালে সেবার হেরে গেলেও গৌহাটির নেহরু স্টেডিয়ামে অশোক ও অসুস্থ পরিমল সেদিন আপ্রাণ চেষ্টা করেছিলেন বাংলার মান বাঁচাতে।

শুধু রাজ্য দলের নয়, সর্বভারতীয় দলের প্রতিনিধিত্ব করার সুযোগও অশোক পেয়েছেন একাধিকবার। জাতীয় দলের প্রতিনিধি হয়েই দ্বিতীয়বার কুয়ালালামপুরে পৌঁছে গেছেন অশোক মারদেকার আসরে।

বিক্রমাদিত্য দেবনাথ

(মোহনবাগান)

রুমমেটরা বলেন—ছিটগ্রস্ত ; হোস্টেলের চাকর-বাকররা বলে—বাবু মানুষ নয়, দ্যাবতা।' দুপক্ষেরই অবশ্য বলার যথেষ্ট কারণ আছে। ডিসেম্বরের হাড়কাঁপানো শীত। লেপ-কম্বল চাপিয়েও হোস্টেলের ছেলেদের কাঁপুনির শেষ নেই। হঠাৎ পাগলাবাবু বিছানা ছেড়ে ধড়মড় করে উঠে বাইরে বেরিয়ে এসে দাঁড়ালেন চাকরদের ঘরের সামনে। বুড়ো চাকরটা যেখানে ছেঁড়া একটা কাঁথায় আপাদমস্তক চাপিয়ে হি-হি করে কাঁপছে সেখানে। হঠাৎ কি ভেবে নিজের রুমে ফিরে গিয়ে নিয়ে এলেন নিজের দামী লেপখানা, চাপিয়ে দিলেন বুড়ো চাকরটির গায়ে। বুড়ো তো হতভম্ব! বাবু এ কি করছে? নিজে গায়ে দেবে কি? কিন্তু বাবুর কুছ পরোয়া নেই ভাব। বিছানার তোষকটা টেনে নিয়ে সেটার তলাতেই শুয়ে পড়লেন। রুমমেটরা লেপের ফাঁক থেকে আবার ফোঁড়ন কাটলেন—'ছিট'।

স্কটিশ হোস্টেলের সেই পাগলাবাবু—বিক্রমাদিত্য দেবনাথ, যার নাম আজ কলকাতার মাঠে ছড়িয়ে পড়েছে। কিন্তু নাম হোলে কি হবে, ক্লাব ম্যাচে বহুৎ বহুৎ হাততালি পেলেও ভারতীয় দলের খেলোয়াড় হিসেবে স্বীকৃতি মেলেনি এখনও। কারণ সাধারণ মানুষের অজ্ঞাত, পরিস্থিতি রীতিমত রহস্যজনক। অথচ দেবনাথ তাঁর যোগ্যতা বহু ক্ষেত্রেই প্রমাণ করেছেন। কিন্তু দল

গঠনের সময় কর্মকর্তারা সযত্নে বাদ রেখেছেন মোহনবাগানের রাইট ব্যাক বিক্রমাদিত্য দেবনাথের নামটি। নিটোল স্বাস্থ্যের অধিকারী দেবনাথ, বিচক্ষণতা এবং দৃঢ়তা অসাধারণ। পায়ে লম্বা সট্, ট্যাকলিং নিখুঁত, মাথায় বলে দেবনাথকে পরাস্ত করা রীতিমত কঠিন। ডানদিক থেকে এগিয়ে গিয়ে বিপক্ষের গোলের মুখে বল ফেলে দিতে দেবনাথের মত তৎপর খেলোয়াড় হালফিল কলকাতার মাঠে নেই বললেই হয়। এইতো সেদিন ইস্টবেঙ্গলের বিরুদ্ধে লীগের প্রথম পর্বের খেলায় এইভাবেই মোহনবাগানের প্রথম এবং একমাত্র গোলটি করলেন দেবনাথ, কিন্তু এরকম গোলের যোগ্য পুরস্কার তিনি পেয়েছেন কি? দেবনাথের চোখে তাই এখন বিস্ময় আর নৈরাশ্যের বিরাট ছায়া।

দস্তুরমত চোট্ খেয়ে খেয়ে দেবনাথ আজ এতদূর এগিয়ে এসেছেন। শৈশব থেকেই দেবনাথ মাতৃহারা। দেবনাথের কথায় "মা চলে যাওয়ার পরই জীবনে দুঃখ সুরু হেল, সুরু হোল উপেক্ষা আর বঞ্চনার পালা। তীরে এসে তরী ডোবার পালা।"

১৯৩৯ সালের ২৫শে এপ্রিল খুলনা জেলার বুধহাটায় বিক্রমাদিত্য দেবনাথের জন্ম। বুধহাটা হাইস্কুল থেকে স্কুল ফাইনাল পাশ করে দেবনাথ ভর্তি হলেন বসিরহাট কলেজে এবং পরবর্তী পর্বে কলকাতার স্কটিশ চার্চ কলেজে। ১৯৫৭ সালে স্কটিশ থেকে বি-এ পাশ করে ঐশ্লামিক ইতিহাস এবং আইন পড়ার জন্য ভর্তি হয়েছিলেন কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে ও সুরেন্দ্রনাথ কলেজে। কিন্তু নানা কারণে এম-এ বা ল' কোনটারই পরীক্ষা দেওয়া হয়ে ওঠেনি।

কতকটা নাটকীয় পরিস্থিতির মধ্য দিয়েই বিক্রম রাইট ব্যাকে খেলা সুরু করেছিলেন। বিক্রম খেলতেন রাইট আউটে আর দাদা রাইট ব্যাকে। একদিন খেলার মাঝখানে দাদার পায়ের হাড় ভাঙলো। ছোটভাই দেবনাথ এসে দাঁড়ালেন দাদার জায়গাটিতে। স্কুল এবং কলেজেও ঐ রাইট ব্যাক, পরবর্তী পর্বে কলকাতার মাঠেও ঐ একই জায়গায়। ১৯৫৭, ১৯৫৮, ১৯৫৯ সালে আন্তঃবিশ্ববিদ্যালয় ফুটবল প্রতিযোগিতায় দেবনাথ কলকাতা দলের প্রতিনিধিত্ব করেন। কলকাতার মাঠে লীগ ফুটবলে প্রথম আবির্ভাব ১৯৫৫ সালে বেনেটোলার হয়ে। পরের বছরও বেনেটোলায়। ১৯৫৭-৫৮ স্পোর্টিং ইউনিয়নে, ১৯৫৯ সালে ইস্টার্ণ রেলে, ১৯৬০ সালে খিদিরপুরে, ১৯৬১ থেকে ১৯৬৩ ইস্টবেঙ্গল ক্লাবে, ১৯৬৪ এবং ১৯৬৫ সালে অপরাজিত লীগ চ্যাম্পিয়ন মোহনবাগানে, ১৯৬৬ সালে লীগ ও শীল্ড বিজয়ী ইস্টবেঙ্গলে এবং ১৯৬৭ সালে আবার মোহনবাগান ক্লাবে। জাতীয় ফুটবলে বাংলার প্রতিনিধিত্ব করেছেন ১৯৬১, ১৯৬৩, ১৯৬৪, ১৯৬৫ ও ১৯৬৬ সালে। ১৯৬৬ সালে ব্রহ্ম সফরে গেছেন আই এফ এ দলের হয়ে। স্বদেশে ১৯৬১ সালে স্টুটগার্ট এবং ১৯৬৫ সালে তাতাবানিয়া ও চেক দলের বিরুদ্ধে খেলেছেন।

কিন্তু উজ্জ্বল ও দক্ষতার এতো দীর্ঘ নজীর থাকতেও বিক্রমাদিত্যের আন্তর্জাতিক স্বীকৃতি মেলেনি। বিক্রমের জীবনে এর চেয়ে বড় বিস্ময় আর কিছু নেই।

—বিপুল বন্দ্যোপাধ্যায়
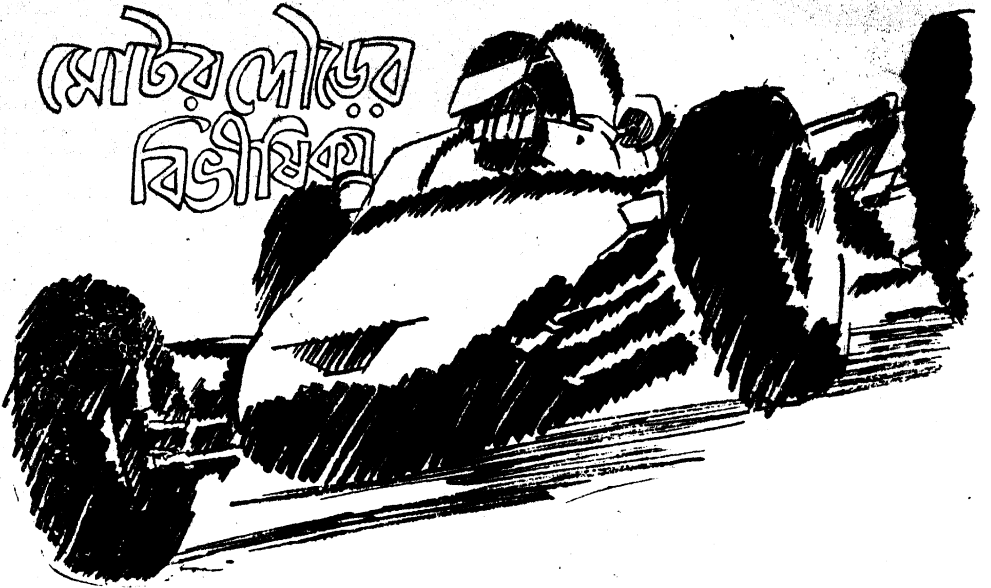
তপন বাগচী

খেলাধুলোর ক্ষেত্রে যতরকম দৌড় প্রতিযোগিতা আছে, তার মধ্যে মনে হয় মোটরগাড়ির দৌড় প্রতিযোগিতা সবচেয়ে বিপজ্জনক অথচ দারুণ রোমাঞ্চকর। এই বিশাল পৃথিবীর নানা জায়গায় মোটরগাড়ির দৌড় প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠিত হয়, আর সেই-সব অনুষ্ঠানে যে সকল দুর্ঘটনা ঘটে তার অনেক সংবাদই আমরা খবরের কাগজে দেখতে পাই। গাড়ির চালকেরা তাঁদের অভিষ্টসিদ্ধির পথে গাড়ির গতি ক্রমাগত এমনভাবে বাড়াতে থাকেন, যে গাড়ির গতি নিয়ন্ত্রণ করা অনেক সময়েই তাঁদের আয়ত্তের বাইরে চলে যায়। ফলে যে কোন মুহূর্তে পরিস্থিতি বিপজ্জনক হয়ে উঠতে পারে, হয়ও তাই। তবে প্রতিযোগিতায় অংশ-গ্রহণকারী গাড়ির চালকদের বাহবা জানাতে হয় তাঁদের দুঃসাহসিকতার জন্য।

অনেকের মতে যে প্রতিযোগিতায় জীবন-হানির সম্ভাবনা সবচেয়ে বেশি তার অস্তিত্ব বিলুপ্ত করে দেওয়াই ভাল। কিন্তু যেহেতু অ্যাডভেঞ্চার বা দুঃসাহসিকতা মানুষের মজ্জাগত বৈশিষ্ট্য, তাই এর জনপ্রিয়তা কিছু মাত্র কমেনি, হাজার বিরোধিতা সত্ত্বেও এখনও পৃথিবীর নানা জায়গায় অনুষ্ঠিত হয় মোটর দৌড় প্রতিযোগিতা। শোচনীয় দুর্ঘটনার আশঙ্কার দরুণই ফরাসী সরকার ১৯৫৫ সালে শুধু ফ্রান্সের শ্রেষ্ঠ দিনের অন্যতম শ্রেষ্ঠ মোটর দৌড় প্রতিযোগিতা **'Vingt Quarate Heures du Mans'** নিষিদ্ধ করে দিয়েছিলেন। এখনও সেই প্রতিযোগিতার শোচনীয় দুর্ঘটনার কথা স্মরণ করলে প্রত্যক্ষদর্শীরা শিউরে ওঠেন।

উক্ত প্রতিযোগিতার সংক্ষিপ্ত নাম হল 'লেম্যানস'। বছরের পর বছর এই প্রতিযোগিতার আকর্ষণ বৃদ্ধি পেত। পৃথিবী-বিখ্যাত মোটরচালকেরা এতে অংশগ্রহণ করতেন। এই প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণকারী গাড়িগুলির গতি ঘন্টায় ১৫০ মাইল থেকে ১৮০ মাইল উঠত, গাড়ি অপর একটি গাড়িকে গতির মুখে বিপজ্জনকভাবে অতিক্রম করত, একটু এদিক-ওদিক হলেই দুর্ঘটনার আশঙ্কা।

ফ্রান্সের সার্দে নামক একটি জায়গায় এই প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠিত হত, ৮·৩৬ মাইল পরিধিবিশিষ্ট ক্ষেত্র এই প্রতি-যোগিতার সীমানা ছিল। এর মেয়াদ ছিল ২৪ ঘন্টা। এই সময়ের মধ্যে উক্ত পরিধি-বিশিষ্ট ক্ষেত্র যিনি যত বেশিবার অতিক্রম করতে পারবেন তিনিই হবেন প্রথম।

এই প্রতিযোগিতাটি শেষবারের মত অনুষ্ঠিত হয় ওই ১৯৫৫ সালের ১১ই জুন। ফ্রান্সের নানা জায়গা থেকে অত্যুৎসাহী দর্শকেরা এই প্রতিযোগিতা দেখবার জন্য সার্দেতে ভিড় জমিয়েছিলেন। দর্শকদের নিরাপত্তার জন্য প্রতিযোগিতা ক্ষেত্রের দুই ধারে মাটির বাঁধ দিয়ে দেওয়া হয়েছিল যাতে দুরন্ত গতির গাড়িগুলি ভিড়ের মধ্যে না পড়ে। বাঁধের অপর দিক থেকে দর্শকদের দেখার ব্যবস্থা করা হয়েছিল।

ঠিক বেলা চারটের সময়ে এই প্রতি-যোগিতা শুরু হয়েছিল। বেলা তিনটে তিরিশ মিনিট থেকেই প্রতিযোগীরা তাদের প্রস্তুতিপর্ব সম্পন্ন করছিলেন। সেই বছরে এই প্রতিযোগিতার সেরা আকর্ষণ ছিল বৃটেন, জার্মানী ও ইতালীর মধ্যে সম্মানের লড়াই। কে জিতবে? তাই নিয়ে দর্শকদের মধ্যে আলোচনার অন্ত ছিল না। কারণ সেই সময়ের বিশ্ববিখ্যাত চালকেরা যথা—ফ্যাঞ্জিয়ো, মস ১৯৫১ ও ১৯৫৩ সালের বিজয়ী জাগুয়ার গাড়ির চালক হথোর্ণ, লুইগি ক্যাস্টেলোটস, ফ্রান্সের শ্রেষ্ঠ চালক মরিস ট্রিগান্ট্রিগন্যান্ট, এরা ছাড়াও ছিলেন পেরী লেভে যিনি ১৯৫২ সালের প্রতি-যোগিতায় শেষমুহূর্তের এক ঘন্টা আগে পুরোভাগে ছিলেন, জয় প্রায় হাতের মুঠোয় এসে গিয়েছিল, কিন্তু বরাত খারাপ তাঁর, ঠিক ওই মুহূর্তে তাঁর গাড়ির ইঞ্জিন বেঁকে বসল। তাই সুনিশ্চিত জয় হাতের মুঠো থেকে গেল বেরিয়ে। স্বভাবতই এই কারণে দর্শকদের সহানুভূতি লেভের ওপরই পড়ে-ছিল, তাঁদের অধিকাংশেরই বাসনা ছিল ১৯৫৫ সালের বিজয়ী লেভেই যেন হয়। তবে প্রতিদ্বন্দ্বিতা বেশ ক্ষুরধার হবে এ সম্বন্ধে সবাই নিঃসন্দেহ ছিল।

শুরু হবার দশ মিনিট আগে অর্থাৎ ৩-৫০ মিনিটে গাড়িগুলির মেশিন বন্ধ করার নির্দেশ দেওয়া হয়েছিল। পাঁচ মিনিট আগে প্রতিযোগীরা তাঁদের গাড়িগুলি যেখানে ছিল তার বিপরীত দিকে অঙ্কিত একটি সাদা বৃত্তের মধ্যে সারিবদ্ধভাবে দাঁড়িয়ে সূচনার সংকেতের অপেক্ষায় ছিলেন।

ষাটজন প্রতিযোগীকে ঠিক বেলা চারটের সময়ে শুরু করার নির্দেশ দেওয়া হয়েছিল; একের পর এক গাড়ির মেশিন-গুলি সচল হয়ে উঠল। প্রথম ধাপেই ক্যাস্টেলোটিসের 'ফেরারী' গাড়ি এগিয়ে গেল, ক্যাস্টেলোটিসকে অনুসরণ করতে লাগলেন

গালিওসিস ও মাইক হথোর্ণ। সূচনার থম ধাপেই ক্যাস্টেলোটিস অবিশ্বাস্য তগতিতে গাড়ি চালিয়েছিলেন ঘণ্টায় প্রায় ১২ মাইল বেগে, প্রথম ধাপটি তিনি ৪ মিনিট ৩৯ সেকেণ্ডে সম্পন্ন করেছিলেন। বতীয় ধাপটি আরও কম সময়ে ক্যাস্টে-ােটিস সম্পন্ন করেছিলেন মাত্র ৪ মিনিট ৬ সেকেণ্ডে। এইভাবে তিনি তাঁর রবর্তী প্রতিযোগী হথোর্ণের চেয়ে ৯ কেণ্ড এগিয়েছিলেন, হথোর্ণের পরে লেন যথাক্রমে ম্যাগলিওলিস ও জুয়ান ঞ্জিয়ো। পঞ্চম ধাপে ফ্যাঞ্জিয়ো পূর্ববর্তী পের সময়ের রেকর্ড ভেঙে দিলেন; তিনি টায় ১১৯ মাইল বেগে পঞ্চম ধাপটি তক্রম করেছিলেন। শুরু হবার এক ঘণ্টা র অর্থাৎ বেলা ৫টার পর প্রতিযোগিতা রও তীব্রতর হল, প্রায় সমানে সমানে াই চলতে লাগল। কখনও এ হয় প্রথম নিও সে হয় প্রথম। মোটরদৌড়ের তহাসে এ এক তীব্র লড়াই। জুয়ান ঞ্জিয়ো ও মাইক হথোর্ণ সবাইকে পিছনে লে এগিয়ে গেলেন। এক একটি ধাপ গেকার চেয়ে কম সময়ে সম্পন্ন হতে াল। ফ্যাঞ্জিয়ো বিশ ধাপটি সম্পন্ন করে-ছলেন ৪ মিনিট ৮·৮ সেকেণ্ডে ও বাইশ াটি ৪ মিনিট ৮ সেকেণ্ডে এদিকে হথোর্ণ ধাপটি ঘণ্টায় ১২২·৩৯৩ মাইল বেগে নয়ে ৪ মিনিট ৬·৬ সেকেণ্ড। ঞ্জিয়োও কমতি যাচ্ছিলেন না, এক সময়ে গাড়ির গতি ঘণ্টায় ১৮১ মাইল পর্যন্ত াছিল।

দু ঘণ্টা পরে অর্থাৎ সন্ধ্যা ছটার সময়ে র্ণ ও ফ্যাঞ্জিয়ো ক্যাস্টেলোটিসের চেয়ে ৫৮ সেকেণ্ডে এগিয়েছিলেন, প্রায় ছটা রশ মিনিটের সময়ে হথোর্ণ সবাইকে নে ফেলে এগিয়ে গিয়েছিলেন। এই য় হথোর্ণ তেল নেবার জন্য গাড়িটাকে য়েছিলেন ও তাঁর সহযোগী চালক ভার বুয়েবকে গাড়ির স্টিয়ারিং তুলে । এর পর হথোর্ণ ও বুয়েবের গাড়ি ড ও ম্যাকলিনকে পেছনে ফেলে ডান ঘোরবার জন্য বুয়েব হাত তুলে ত জানিয়েছিলেন।

এর পরেই ঘটে গেল মোটর দৌড়ের হাসে এক দুর্ভাগ্যজনক শোচনীয় টনা। বুয়েব গাড়িটিকে ডান দিকে াবার কয়েক সেকেণ্ড পরেই চোখের ফেলতে না ফেলতেই অর্থাৎ কেউ বোঝবার আগেই দুর্ঘটনাটি ঘটে ছিল। সম্বন্ধে সঠিক কেউ কিছু বলতে লন না, নানাজনের নানামত এই াগান্তিক দৃশ্য সকলকে শোকে মুহ্যমান ছল। দুর্ঘটনাতে আশীজন লোক মারা ছিল ও একশজনেরও বেশি লোক হয়েছিলেন।

তবে অধিকাংশের মতে দুর্ঘটনার কারণ হল যে, বুয়েব যখন তাঁর গাড়িটিকে ডান দিকে ঘুরিয়েছিলেন সেই সময়ে ম্যাকলীন, বুয়েবের গাড়ির পেছনে ছিলেন, তিনি তাঁর গাড়ির গতি নিয়ন্ত্রণ করতে না পারার দরুণ ম্যাকলীনের গাড়ি ও দর্শকদের নিরাপত্তার জন্য যে মাটির বাঁধটি দেওয়া হয়েছিল এই দুটির মধ্যে যতটুকু ফাঁক ছিল তার মধ্যে লেভে ম্যাকলনকে পাশ কাটাতে গিয়ে ঢুকে পড়েছিলেন। উল্লেখযোগ্য যে, ফাঁকটি একটি গাড়ি যাবার পক্ষে যথেষ্ট চওড়া ছিল না। এর ফলে যা হবার হল। লেভের গাড়ির সঙ্গে ম্যাকলীনের গাড়ির সংঘর্ষ হল। লেভের মার্সিডিজ গাড়িটি ভেঙে চুরমার হয়ে গেল, গাড়ির চাকাগুলি ও কিছু অংশ ছিটকে দর্শকদের মধ্যে পড়ল, আর কিছু অংশ মাটির বাঁধের ওপর পড়েছিল এবং সেই বাঁধের ওপর যে অংশগুলি পড়েছিল সেগুলিতে আগুন ধরে বিস্ফোরণ ঘটেছিল। বিস্ফোরণের ফলে কিছু লোক আহত ও নিহত হয়েছিলেন। লেভে মাথা বাঁচিয়ে গাড়ির ককপিট থেকে ছিটকে বেরিয়ে এসে-ছিলেন, কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে মারা যান। এদিকে ম্যাকলীনের গাড়িটি মাটি থেকে প্রায় কয়েক ফুট ওপরে ধাক্কার চোটে হাবপাক খাচ্ছিল, শেষপর্যন্ত গাড়ির ভগ্ন অংশ-গুলি বাঁধের কিনারে যে পুলিশ, ফটোগ্রাফার ও প্রতিযোগিতার একজন কর্তৃপক্ষ দাঁড়িয়ে-ছিলেন তাঁদের ওপরে গিয়ে পড়ে, ফলে তাঁরা সঙ্গে সঙ্গে মারা যান। এত দ্রুত সেগুলি তাঁদের ওপর পড়েছিল যে তাঁরা সরে যাবার সময় পর্যন্ত পান নি। ম্যাকলীন ওই পরিস্থিতির মধ্যেও গাড়ি থেকে বাঁধের ওপর লাফিয়ে পড়ে জীবনরক্ষা করেছিলেন। জুয়ান ফ্যাঞ্জিয়োও ওই দুর্ঘটনার কবলে পড়তেন তিনি খুব বুদ্ধিবলে এগিয়ে গেলেন, রাস্তায় বিস্তৃতভাবে ছড়ানো গাড়ির ভগ্ন অংশগুলিকে সুনিপুণভাবে পাশ কাটিয়ে তিনি হথোর্ণের গাড়িটাকে অনু-সরণ করলেন।

হথোর্ণ দুর্ঘটনায় বিভ্রান্ত ও আতঙ্কিত হয়ে গাড়ি চালানো বন্ধ করতে চাইলেন, কিন্তু কর্তৃপক্ষ তাকে নিষেধ করেছিলেন। তাঁর সহযোগী চালক বুয়েব এই প্রতি-যোগিতায় নবাগত হলেও খুব কৃতিত্বের সঙ্গে চালাচ্ছিলেন। ওদিকে ফ্যাঞ্জিয়ো তাঁর গাড়ি চালাবার ভার মসের হাতে তুলে দেন।

অনেকের মতে দুর্ঘটনার পরেই প্রতি-যোগিতা বন্ধ করে দেওয়া উচিত ছিল কিন্তু থামান হয় নি এই কারণে যে দুর্ঘটনার পর হাজার হাজার লোক দুর্ঘটনাস্থলের আশে-পাশে জড়ো হয়েছিলেন। তাঁদের মধ্যে অনেকে হয়ত গাড়ি চলার রাস্তার ওপর ভিড় জমাতে পারত। ফলে পেছন দিকে যে সব দ্রুতগতিসম্পন্ন গাড়িগুলি আসছিল সেইগুলি দর্শকদের ভিড়ের ওপর পড়ার সম্ভাবনা খুবই বেশী ছিল। সম্ভবতঃ দুর্ঘটনা আরও বিস্তৃত হত। এই দুর্ঘটনা দর্শকদের কাছে এক রাত্রের দুঃস্বপ্নের মত মনে হয়েছিল। তাঁরা চাইছিলেন কখন এর অবসান ঘটবে।

এই দুর্ঘটনার পরেই প্রতিযোগিতার আকর্ষণ অনেকটা কমে যায়। অনেক গাড়ির চালক প্রতিযোগিতার ক্ষেত্র থেকে সরে গেলেন। প্রতিযোগিতার অন্যতম প্রতিযোগী-দ্বয় মার্সিডিজ গাড়ির ম্যানেজার হেৰ অল-ফ্রেডকে তাঁর স্বদেশ স্টুটগার্ড থেকে কর্তৃপক্ষরা নির্দেশ দিলেন দুর্ঘটনায় দরুণ আহত ও নিহতদের বন্ধুবান্ধব ও আত্মীয়-স্বজনদের প্রতি সমবেদনার নিদর্শন স্বরূপ প্রতিযোগিতা থেকে সরে যেতে। উল্লেখযোগ্য ওই গাড়ি দুটি রাত্র দুটোর সময়ে প্রতি-যোগিতা থেকে প্রত্যাহার করা হয়, সেই সময়ে গাড়ি দুটি প্রথম ও তৃতীয় স্থান অধিকার করছিল। প্রথম স্থানাধিকারী গাড়ির চালকেরা ছিলেন ফ্যাঞ্জিয়ো ও মস।

দুর্ঘটনার ছ ঘণ্টা পরে হথোর্ণ ও বুয়েবের জাগুয়ার গাড়িটি প্রথম স্থান অধিকার করছিল, তাঁরা তাঁদের নিকটতম প্রতিদ্বন্দ্বীর থেকে পাঁচ ধাপ এগিয়েছিলেন। পরের দিন প্রভাতী সংবাদপত্র থেকে দুর্ঘটনার বিস্তৃত বিবরণ সকলে পেলেন। এর ফলে আকর্ষণ আরও হ্রাস পেল ও প্রতিযোগিতা নামেমাত্র অনুষ্ঠিত হতে লাগল। দর্শকেরা সমস্ত রকম সম্বর্ধনা অনুষ্ঠান বাতিল করে দিলেন। গাড়ির সংখ্যা আরও কম গেল। শেষ মুহূর্তে হথোর্ণ তাঁর সহকারী চালক বুয়েবের কাছ থেকে আবার গাড়ি চালাবার ভার নিলেন। শেষপর্যন্ত ওই হথোর্ণই ১৯৫৫ সালের লেম্যান প্রতিযোগিতার প্রথম স্থান অধিকার করেছিলেন, আর দ্বিতীয় স্থান অধিকার করেছিলেন অস্টিন মার্টিন গাড়ির চালকদ্বয় কলিন্স ও ফ্রেরি এইভাবে বিভীষিকাময় ২৪ ঘণ্টাব্যাপী মোটর দৌড় প্রতযোগিতার অবসান ঘটল।

দুর্ঘটনার কারণ সম্বন্ধে ফরাসী সরকার এক পূর্ণ তদন্তের নির্দেশ দিয়েছিলেন। তদন্তের ফলে জানা গিয়েছিল যে, ব্যক্তিগত-ভাবে কেউ এই দুর্ঘটনার জন্য দায়ী ছিলেন না। অনেক উদ্ভূত অসাধারণ ঘটনার সমন্বয়ে এই দুর্ঘটনা ঘটেছিল। উল্লেখযোগ্য যে, প্রতিযোগিতা শুরু হবার আগে অনেক প্রতিযোগী গাড়ি চালাবার রাস্তাটর সংকীর্ণতার জন্য অভিযোগ তুলেছিলেন, কিন্তু প্রতিযোগিতার কর্তৃপক্ষরা তাতে কর্ণপাত করেন নি। ফরাসী সরকার এই প্রতিযোগিতা যাতে আর অনুষ্ঠিত না হয় তার জন্যে এক নিষেধাজ্ঞা জারী করেছিলেন।

বরবর্ণিনী

গয়া

মনোমোহিনী

নতুন দীর্ঘাকার
আধারে
নতুন ফর্মুলায়
মিহি-মৃদুল ট্যাল্‌কম

সুবাসিত ট্যাল্‌কম প্রস্তুতকারক
গয়া
প্যারিস
লণ্ডন
নিউইয়র্ক
AGC-5 BEN

(চব্বিশ)
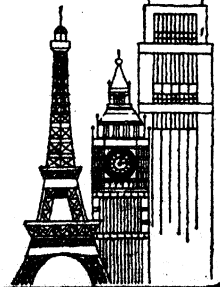
মাদুর-সতরঞ্চি বিছিয়ে বসলেন দুজনে ছাতের একটু একান্তে। হেমাঙ্গিনী বললেন—'তোমার মনে আছে ঠানদিদি—একদিন ওইরকম মেস থেকে এসে তোমায় নামিয়ে দেওয়ার সময় একটা কথা বলতে গিয়ে থেমে যাই? তুমি জিজ্ঞেস করতে বলি—একটু ভালো করে মনে করে নিই, পরে বলব।'

'হ্যাঁ, হ্যাঁ, আছে মনে।'—আগ্রহের সঙ্গে উত্তর করলেন রঙ্গময়ী। প্রশ্ন করলেন—'তা কি বল দিকিন ব্যাপারটা? করব করব করে আমারও আর জিজ্ঞেস করা হয়নি।'

'ঐ কমলার কথা ঠানদিদি; করুণাময়ী হোম-এর।'

'কমলার কথা! কেন? কি কথা? কি করেছে কমলা?...'

একসঙ্গে প্রশ্ন করে ভীত দৃষ্টিতে চেয়ে রইলেন হেমাঙ্গিনীর মুখের দিকে। আশংকাটা আরও যেন না প্রকাশ করে পারলেন না—'ওরই হেফাজতে এতগুলি মেয়ে...'

'না, সে ধরনের কিছু নয়...'

'তবে?'

'আমি তো মেসে যাইনি কখনও, তাই সেদিন ওকে দেখে মনে হোল কোথায় যেন কবে দেখেছি ওকে। কিছুতেই মনে করতে পারছিলাম না, তবে তারই মধ্যে এই রকম একটা—কি করে যে বোঝাই তোমায়? —এই রকম একটা ধোঁয়াটে কথা মনে আসছিল যে, যেভাবে দেখা সেটা যেন...তার মধ্যে যেন কি একটা গলদ ছিল। সেদিন থেকে কথাটা মনের মধ্যে খচখচ করছে, তারপর তোমার সঙ্গে যে দুদিন যাই সেটা ঐ জন্যেই, ভালো করে দেখলে যদি মনে পড়ে। কোনমতেই আনতে পারছিলাম না মনে, তারপর সেদিন ডায়মণ্ডহারবারে গিয়ে দিনের মতন সব পরিষ্কার হয়ে গেল।

আগে তোমার সেই আগের দিনের কথাটাই বলি।

তা প্রায় ছ-সাত বছরের কথা হবে, নৈলে হয়তো থাকত মনে। মেজোঠাকুরপোর কিছুদিন হোল বিয়ে হয়েছে, অপর্ণাকে নিয়ে আমরা কজন ভিক্টোরিয়া মেমোরিয়াল দেখতে গেছি। সন্ধ্যা হব-হব, ঘুরতে-ঘুরতে আমার মনে হোল একঝাড় কলাফুলের পাশে রঞ্জনঠাকুরপো যেন একটি মেয়ের সঙ্গে বসে গল্প করছে। দলের সঙ্গে রয়েছি, তার ওপর ওরকম একটা ব্যাপার দেখলেই তো মনটা ধাক্কা খেয়ে কি রকম হয়ে যায়, একটু ঘুরিয়ে নিয়েছিলাম মুখটা, তারপর দুপা এগিয়ে আবার মুখ ফিরিয়ে দেখতে পেলাম না ওদের; বেশ বড় কলাফুলের ঝাড়, সরে গেছে আড়ালে...'

'আর কেউ দেখেনি?' —রঙ্গময়ী প্রশ্ন করলেন।

হেমাঙ্গিনী বললেন—'না', খুব সম্ভব দেখেনি। সূর্য অস্ত যাচ্ছে, মেজোঠাকুরপো মেমোরিয়ালের ওপরে রাঙা আলো এসে পড়ে যে বাহার খুলেছে সেইটে দেখাচ্ছে সবাইকে, ঠিক এই সময় আমার নজরটা গিয়ে পড়ে ওদিকে। এক ঝলকে দেখা, তবু আজ যে বুঝছি কমলাই তাও ঐ জন্যেই, ওদের দুজনের মুখেও ডুবন্ত সূর্যের আলোটা এসে পড়েছে।

মেজঠাকুরপোর বিয়েটা পাত্রী খুঁজতে খুঁজতে দেরি হয়ে যায় জানই। তাই রঞ্জনঠাকুরপোর বিয়ের কথা তার কিছুদিন পরই একটু তাড়াতাড়িই উঠল। ও রাজি হোল না। আমার খুব খারাপ লেগেছিল ঠানদি।' তারপর ভেবে দেখলাম—এমন আর খারাপ কি? এসব তো চলছেই আজকাল। তোমার বড় নাতিকে বলি। উনিও একটু ঘুরিয়ে কথাটা পৌঁছে দেন ঠাকুরপোর কানে—যদি কোন মেয়ে ওর পছন্দ হয়ে থাকে তো ওঁরা না হয় সেইখানেই চেষ্টা করেন। ঠাকুরপো রাজি তো হোলই না, ভাঙলও না কি বৃত্তান্ত। এই করতে করতে মা মারা গেলেন, দিনকতক চাপাই পড়ে গেল বিয়ের কথা। তারপর আবার যখন উঠলও, ঠাকুরপোর সেই একভাব। এই কাণ্ড চলছে, তুমিও জান। বাড়ির সবাই একটা ধাঁধায়

পড়ে রয়েছি, বিশেষ করে আমি আর তোমার বড় নাতি যারা নাকি খানিকটা জানি। বেশ তো, যদি কাউকে পছন্দ হতো তাকে করুক না বিয়ে। একেবারে কোন ক্ষ কাড়ে না, একি বিপদ! তারপর ভারমন্ড-হারবারে সেদিন দেখে বুঝলাম এমন চার না হওয়ার উপায় নেই। কমলা যে কায়েতের মেয়ে সেটা তো মেসে যাওয়ার পর টের পেলাম।

'কোথায় দেখলি তুই? বাড়িতে সবাই একসঙ্গে; বেড়াতে বেরুলে আলাদা আলাদা গাড়িতে।' —অন্যমনস্কভাবে প্রশ্ন করলেন রঙ্গময়ী।

'দেখলাম বিকেলে গঙ্গার ধারে, প্রায় সন্ধ্যে যখন হয়ে এসেছে। সেই যে শেষের দিকে দুজনে গল্প করতে করতে যাচ্ছি, তুমি পা ভেঙে গিয়ে বসে পড়লে, আমি খানিকটা এগিয়ে গেলাম—গিয়ে দেখি ঝোপটার ওদিকে দুজনে পাশাপাশি বসে আছে। কমলা কাঁদছিল, ঠাকুরপো বলছে—মন্দ কি, এই করেই কাটিয়ে দিই এসো না— কি হবে ঠানদিদি!' হেমাঙ্গিনী চুপ করলেন। রঙ্গময়ী কোন উত্তর না দিয়ে সামনের দিকে রইলেন চেয়ে।

'তারপর থেকেই তুমি লক্ষ্য করেছ কিনা জানি না, আমার নজর তো ওদের দিকেই—দেখে এসেছি যেন মুষড়ে রয়েছে দুজনে। এও লক্ষ্য করে দেখলাম—ঠাকুরপোর পায়ে ফাগ। অথচ যখন এরা ফাগ দেওয়া-দেওয়ি করছে তখন কাউকেই দিতে দেয়নি, এও জানি।'

'কমলের মুখে, চুলে?'—প্রশ্ন করলেন রঙ্গময়ী। মনটা অন্য কোথায়।

হেমাঙ্গিনী বললেন—'দিয়েছিল সবাই ফাগের টিপ। ভুরুর মাঝখানে একটু করে। কপালে, চুলে ও সিঁথিতে চারজি, সেখানেও কেউ। আমি যখন ওকে শেষ দেখি তখন ফাগের কোনও দাগ নেই।...তবে একটা জিনিস চোখে পড়েছিল—বাড়িতে এসে সরে সরে গিয়ে কেঁদেছে। জল মুছে-নেওয়া ভিজে চোখ করেকবারই নজরে পড়ল। একবার একলা আর একেবারে সামনাসামনি পড়ে যেতে, আমার মুখ দিয়ে বেরিয়েও গেল—'তোমার চোখ ভিজে কেন কমল?' তখনই আবার নিজেই নিলাম সামলে—'বালি উড়ে পড়েছে নিশ্চয় গঙ্গার ধারে, কিম্বা ফাগই।'

'তাই হবে'—বলে সরে গেল তাড়াতাড়ি। তারপর আমায় এড়িয়েই গেছে।

তারপরে তো দেখলেই কলকাতায় ফিরে আসার সঙ্গে সঙ্গেই অসুখে পড়ে গেল।

'...কী উপায় হবে ঠানদি?'

'কিসের কি উপায়?' —ক্রমেই বেশি করে অনামনস্ক হয়ে পড়েছেন রঙ্গময়ী।

'কায়েতের মেয়ে তো, সেটা জানা ছিল না আগে...'

'ও, হ্যাঁ, তাও তো বটে, যখন...'

—প্রত্যাশা নিয়ে একটু চেয়ে রইলেন হেমাঙ্গিনী, তারপর প্রশ্ন করলেন—'কী যেন বলতে যাচ্ছিলে শেষ করলে না তো?'

'না, বলছিলাম—কায়েতের ঘরে জন্মাবার পাপ করেছে, ভুগবে কে?'

বিমূঢ়ভাবে চেয়ে রইলেন হেমাঙ্গিনী ওর মুখের দিকে। অন্ধকার নেমে এসেছে ছাতে, বুঝতে পারছেন না, ব্যঙ্গ, না ব্যঙ্গের ভাষায় টেনেই বলছেন কমলার দিকে। আশ্চর্য লাগছে রঙ্গময়ীকে আজ।

একটু চুপ করে থেকে বললেন—'কায়েৎ না হোলে তো কোন বাধাই ছিল না, বলো? আমরা তো রাজিই ছিলাম।'

'কায়েৎ হয়েই বা তোদের কি ক্ষেতিতে হচ্ছে?'

'সে কি! কায়েৎ—আমরা ব্রাহ্মণ! ......

'কিন্তু তোর এত মাথাব্যথা কেন তাই নিয়ে? কায়েৎ হলেও ও তো ব্রাহ্মণের ঘরে এসে তাদের জাতকুল নষ্ট করছে না। তোদের ঠাকুরপোও তো বেশ সুবোধ-শান্ত ছেলে। দেখোই যায় না আজকাল ওরকম।'

এবার ব্যঙ্গের মুখ রঞ্জনের দিকে; স্পষ্ট। একেবারে যেন উভয় সংকটে পড়ে গেছেন হেমাঙ্গিনী, রঙ্গময়ীর এরূপটা একেবারেই নতুন। অনুতপ্ত হয়ে পড়েছেন, কথাটা যেন ওঁর কাছে না তোলাই ছিল ভালো।

তবু, একটা ব্যাপারে আবার সংশয়টা একটু অন্যদিকেও চলল। এবারে কথাগুলো বলার সঙ্গে রঙ্গময়ীর মুখে একটু যেন হাসির আভাস দেখা দিয়েছে। হতে পারে ওঁর এটা বলাই, ঠিক উল্টো তর্ক করে তামাশা দেখছেন। অনেক রকমই তো আছে ওঁর। আবার পানও বের করেছেন ভিবে থেকে। ছেড়েই দিতে গিয়ে আবার ধরে রইলেন প্রসঙ্গটা। এবার বরং একটু সাহসের সঙ্গেই আরম্ভ করলেন, তামাসা হয়তো আঘাত দিয়ে ভেঙে দেবেন।

বললেন—'না, ঠানদিদি তুমি যেন ওকালতি করতে বসেছ, কমলার হয়েই। এদিকে আমাদের অবস্থাটা...'

(পঁচিশ)

রঙ্গময়ী যেন ধাপে ধাপে নিজের স্বরূপে আসছেন নেমে। পান নিয়ে দোক্তা ফেলে দিলেন মুখে। হাসিটা আরও একটু স্পষ্ট করে নিয়ে; তারই মধ্যে কতকটা জ্বালাতন হয়ে ওঠার ভাব ফুটিয়ে বললেন—'দ্যাখো কান্ড! যতই চাইছি না ভিড়তে। কাগজ নথিপত্র কিছুই হাতে নেই, তবু বলবে ওকালতি করছি! ... বেশ, তাহলে তাই করি আয়, ওকালতির তো সত্যি মিথ্যে নেই, বরং সবই মিথ্যে! আয়, তুই-তোদের দিকে, আমি কমলের দিকে। খুন করে লোকে উকিল পাচ্ছে, কায়েৎ হয়েই পাবেন না কেন? ...দ্যাখো তো জ্বালা, একটা বাজে কথা নিয়ে!... '

বেশ ভালো করেই হাসতে হাসতে উঠে গিয়ে পানের পিক ফেলে এসে আবার গুছিয়ে বসলেন। একটু 'রণং দেহি' ভঙ্গিতেই, তবে হাসতে হাসতেই। বললেন—'কি বলছিলি, বল।'

বলব আর কি? বলছিলাম, এমনি তো আমাদের আপত্তি ছিল না। তবে কায়েতের মেয়ে, জাতকুল নিয়ে কথা......'

'কার জাত-কুলের কথা বলছেন ধর্মাবতার!'—ওকালতি টোনে প্রশ্ন করলেন রঙ্গময়ী। হাসি কি গাম্ভীর্য বোঝা শক্ত তরল অন্ধকারে।

হেমাঙ্গিনী অতিরিক্ত বিস্ময়ের সঙ্গে উত্তর করলেন—'কেন, ঠাকুরপো—বামনের ঘরের ছেলে তো।'

'আর আমি যদি বলি কমলারই জাত যাবে?'

'কমলার!!'

'হ্যাঁ কমলারই বৈকি। কেন নয় আমায় বুঝিয়ে দে। 'করুণাময়ী হোম'-এ ওদের অখাদ্য-কুখাদ্য একেবারে ত্রিসীমানার মধ্যে আসবার হুকুম নেই, আমরা বামনেরাই যে-গুলোকে অখাদ্য-কুখাদ্য বেশি করে খুঁজে—

আবার ওদের মধ্যেও এদিকে বেশি
ক—মাছ, মাংস, ডিম—কিছু নয় একেবারে
বিধবার আচার নিয়ে থাকে। অবশ্য
পরা নয়, একাদশী করাও নয়, কেনই
করতে যাবে? তবে শুদ্ধাচারে ও
ও হিন্দু বিধবার চেয়ে যে কম নয়—
আমি জানি। আর তোদের ঠাকুরপো,
াড়ার ভট্‌চাজ্জিমশাই, না? ত্রিসন্ধ্যে না
....'

'অত দেখতে গেলে তো......'

হেমাঙ্গিনী বিমর্ষ কণ্ঠে আরম্ভ করতে যাচ্ছিলেন, রূপাময়ী মুখের কথা কেড়ে নিয়ে বললেন—'স্বীকার করি—অত বাছতে গেলে সারা বাংলা দেশটায় বামনই খুঁজে পাওয়া যাবে না; তবু একেবারে অখাদ্য-কুখাদ্য আর বামনের ঘরের সাধারণ আচারগুলো তো বাঁচিয়ে চলছে অনেকে এখনও। মজুমের কোনটা আছে?—হোটেলে-রেস্টুরেন্টে যায় না? দুপুরের খাওয়াটা অফিসের ক্যান্টিন—না —কি বলে তাতেই সারা হয় না?—সেখানে কোন জিনিসটা বাদ যাচ্ছে?......আচ্ছা, বলতো, তোর বাবা তারকেশ্বরের জাত আছে? সেদিন ছেলেকে নিয়ে গিয়ে যে চুল দিয়ে বাবার পেটের-অসুখের ব্যবস্থা করে এলি?'

—একেবারে খিলখিল করে হেসে উঠলেন রূপাময়ী, যেন একটা হাসির কথা না তুলে,

ইমামবারা—হুগলী ফটো : বিল্টু গুপ্ত

অন্ততপক্ষে গম্ভীর কথাও হেসে না বলতে পারলে বাঁচেন না।

'বাবা তারকেশ্বরের জাত !!'—অপরাধের ভয়ে শিউরে উঠে রঙ্গময়ীর দিকে চেয়ে রইলেন হেমাঙ্গিনী ; আজ ওঁকে বুঝেই উঠতে পারছে না। হাত দুটো যেন আপনিই যুক্ত হয়ে কপালে গিয়ে উঠল। বললেন—'কী বলছ তুমি ঠানদি !'

'বলছি ঠিকই।......অপরাধ নিও না বাবা, বলাচ্ছ তাই বলতে হচ্ছে।'—ও'র হাত-দুটোও কপালে গিয়ে উঠল। হেমাঙ্গিনীর মনে হোল, হাসিরও তোড়ে যেমন মাঝে মাঝে হয় ও'র চোখদুটোও যেন জলের রেখায় হঠাৎ একটু চিকচিক করে উঠল। কিন্তু ঐ পর্যন্ত। রঙ্গময়ী এক সুরে বলে চললেন—

'কেন, চোখের সামনে এই মাস কয়েকের মধ্যে অতবড় কান্ডটা হয়ে গেল, দেখলি, এখন নেকী সাজছিস ?

'কী কান্ড ?'

'জানার্দন চৌধুরীর ছেলেটা বিলেত থেকে ফিরে এসে ফিরিঙ্গিপাড়ার একটা ট্যাঁসের মেয়েকে বিয়ে করলে না ?—সেখানে নাকি লব্, না, কি চুলো হয়েছিল ওদের। বাপ খুব রোয়াব দেখিয়ে আলাদাও করে রাখলে ছেলেকে। কিন্তু কদিন তা বল্ ? সেই বউ-ছেলে আবার ঘরে তুলে নিতে হোল না ?'

'শুনেছি নাকি মেয়েটা বামনের ঘরের। ওর ঠাকুরদাদাই কেরেস্থান হয়েছিল—তখন নাকি জাত খোয়াবার খুব একটা ঢো চলছে'—বিহ্বলভাবে আস্তে আস্তে বললেন হেমাঙ্গিনী।

'বাবা তারকেশ্বরের ভাগ্যি !......কিন্তু জিজ্ঞেস করি, যিশুখিষ্টের কলমা আর জর্দান, না, দোস্তান কি বলে তার জলটা তো রয়েছে মেয়েটার পেটে, সে সব যাবে কোথায় ?'

'কিন্তু এতে বাবা তারকেশ্বর করবেন কি ? তাঁর দোষটা কোথায় ? তাঁর জাত গেছে যে বলছ ?'

—সেই রকম ফ্যালফ্যাল করে চেয়েই প্রশ্ন করলেন হেমাঙ্গিনী। রঙ্গময়ী বললেন—'কিন্তু মতিগতিটা দিলে কে ? তার জন্যে ভুগতে হবে না ? এখন মেয়েটার আবার তিনপুরুষের চাপা ভক্তি কোটালের বানের মতন ঠেলে এসেছে। ছেলেটাকে ভাঙিয়েছে, গেল শিবরাত্রিতে দুজনে মোটরে ক'রে গঙ্গায় জল বয়ে নিয়ে গিয়ে বাবার মাথায় ঢেলে এল। এবার... '

ছেড়ে দিয়ে আর একবার খিলখিল করে হেসে উঠে বললেন—'এবার আবার মা দুর্গার জাত-কুল খাবে ঠিক করছে......'

'কি করে ?'—আতঙ্কে চোখ দুটো বড় বড় হয়ে উঠেছে হেমাঙ্গিনীর। রঙ্গময়ী হাসিতে-গম্ভীর্যে মিশিয়ে বললেন—'অবিশ্যি বরেরই জাত রইল না তো কনের জাত থাকবে কোথা থেকে, তবু লোক দেখিয়ে ঘটা ক'রে মারবে জাত তাঁর এবার। জনার্দন চৌধুরী ঠিক করেছে এবার দুর্গাপুজো করবে। লোক খাওয়াবেও শুনেছি। ক'জন না যায় বসে বসে দেখব এবার।'

'এতে উনি আর কি করবেন ?'—নিরুপায় দুর্বল কারুর হয়ে যেন ওকালতি করছেন হেমাঙ্গিনী।

রঙ্গময়ী বললেন—'কেন, পছন্দ না থাকে তো মুখে রক্ত উঠিয়ে তো মারতে পারেন। অপরাধই যদি তো সেবার ক্ষেমীর ছেলেটা এর চেয়ে কি বেশি অপরাধ করেছিল যে, অমন করে—বিধবার একটিমাত্র ছেলে ...'

হঠাৎ দেবতার বিধান নিয়ে মানুষের সেই এক চিরন্তন প্রশ্ন মুখটাকে কঠিন করে দিল, সামনের দিকে দৃষ্টি তুলে যেন অজ্ঞেয়ের সঙ্গে মুখোমুখি হয়ে বসেছেন রঙ্গময়ী।

একটু চুপ করে থেকেই হেমাঙ্গিনী প্রশ্ন করলেন—'কি হবে ঠানদিদি ? তুমিও যেন ওদের দিকেই—অথচ তোমার ওপর কত যে ভরসা......'

অনেকক্ষণ একভাবেই সামনের দিকে রইলেন চেয়ে রঙ্গময়ী। তারপর যেন পরম বিশ্বাসে, পূর্ণ আত্ম-সমর্পণে মুখের সেই কঠিন ভাবটা আস্তে আস্তে এল মিলিয়ে ; ও'র স্বভাবের সব লঘুতাও। বললেন—'আমি অবিশ্যি ঘটকালি করতে যাব না বোন, সেখানে সব ঘটনার ঘটক নিজে রয়েছেন, সেখানে গিয়ে দাঁড়াবার আমার আস্পদ্দাই বা কতটুকু ? তবে আমি হত্যারকান্ড হ'তে যাব না। সে তো আরও বড় আস্পদ্দাই।...... মেয়েটার মুখের দিকে যেন চাওয়া যায় না। চল্, একটা এমন বাজে কথা এসে পড়ল যে! ......'

(ক্রমশঃ)

প্রমীলা

...তিভেদ উচ্ছেদ

...তিভেদের বিরুদ্ধে আমাদের জেহাদ ...র নয় ...বা কোন নতুন প্রতিজ্ঞাপত্রে ...ও নয়। কিন্তু প্রসঙ্গটি উত্থাপনের সঙ্গে আমাদের মধ্যে একটি মরণ-পণ ...ঝাঁঝালো গন্ধ ছড়ায়। চোখের ...নড়বড়ে সমাজের অস্তিত্বটা তখন ...হয়ে ওঠে। দোমড়ানো-মোচড়ানো এই ...কে ছেঁড়া কাঁথার মত একটানে ছুঁড়ে ...দিই। তারপর নতুন সমাজ গঠনের ...পনা তৈরিতে সমস্ত মন-প্রাণ ঢেলে ...ই। দিব্যদ্যুতিতে সে সমাজ ভাস্বর—...চদ তো দূরের কথা, কোনরকম ...তার স্থানই সেখানে নেই। সবাই ...স্বাধীন, মুক্ত—অপ্রশস্ত নিয়ম-...র প্রাচীর সগর্বে মাথা উঁচু করে ...র প্রতিটি প্রচেষ্টা তথা আন্তরিক বাসনাকে প্রতিহত করছে না। সংস্কারমুক্ত সমাজের সেই প্রচ্ছদে মানুষ নামক জীবেরাও অদ্ভুতভাবে নিজেদের মানিয়ে নিয়েছে। পরিবর্তিত আবহাওয়ার সঙ্গে সামঞ্জস্য বিধানের ব্যাপারে মানুষ বোধহয় তুলনা-রহিত। সামাজিক সংস্কারের ধ্বজাবাহী রক্তচক্ষু, বিকৃত আসন এবং ভয়াল দর্শন সমন্বিত মানুষগুলি যাদুমন্ত্রে পরিবর্তিত হয়ে গেছে। এমন নিরীহ গোবেচারী মানবেতিহাসে ইতিপূর্বে দেখা যায়নি। সমাজের চেহারাই আমূল বদলে গেছে। ব্যষ্টির কথা বাদ দিয়ে সমষ্টির চিন্তায় ব্যাপৃত। সবাই ভাবছে বৃহৎ মানবগোষ্ঠীর কথা। আমরা বৃহৎ মানব সমাজেরই পরি-বারভুক্ত-বিচ্ছিন্ন কিছু নয়, একথাটার সঙ্গে এদের পরিচিতি দীর্ঘদিনের। অথচ ভাবতে অবাক লাগে যে, এই কথাটা আমাদের চেতনার ভিতর দিয়ে মর্মে প্রবেশ করানোর জন্য কত মনীষীর জীবন পাত হয়ে গেছে। তবু সিদ্ধিলাভ হয়নি।

যাদুমন্ত্রে পরিবর্তিত হওয়া সমাজ আবার যাদুমন্ত্রেই অদৃশ্য হয়ে যায়। বাস্তব পৃথিবীর ঠোক্করে আমাদের চেতনা ফিরে আসে। ধুলো ঝেড়ে উঠে বসে চোখ রগড়ে দেখি যে পারিপার্শ্বিক একইরকম আছে—পরিবর্তন কোথাও নেই। সংকীর্ণতার বিন্দু-মাত্র উর্ধে আমরা ওঠতে পারিনি—মানসিকতার দিক থেকেও একই রকম আছি। প্রগতির দুর্গতি অনেক। কোথাও তার ব্যতিক্রম নেই। প্রগতি এবং প্রগতিশীল চিন্তা সংস্কারের প্রাচীরে ঘা খেয়ে খেয়ে মাথা কুটে মরছে।

তপশীলী জাতি ও উপজাতি উন্নয়ন কমিশনারের রিপোর্ট নিয়ে সম্প্রতি লোক-সভা বিতর্কমুখর। সবাই নানা কথা ভাবছেন এবং বলছেন। চিন্তার ক্ষেত্রে অগ্রগতি অনেকের কথায়ই প্রতিফলিত। কেউ কেউ প্রস্তাব করেছেন, জাতিভেদ প্রথা ভেঙ্গে ফেলার জন্য অসবর্ণ বিবাহে উৎসাহ দেওয়া উচিত। প্রস্তাব অতি উত্তম কিন্তু প্রস্তা-বকরা একবার ভেবে দেখলেন না এজন্য কত শ্রম প্রায় ব্যর্থতায় পর্যবসিত হয়েছে। কারণ প্রশ্নটা যেখানে হৃদয়ের সেখানে আইনের চোখ রাঙানি অর্থহীন। তাই আইন প্রণয়ন করে ক্ষান্ত না হয়ে নতুনভাবে পরিস্থিতির মোকাবিলা করতে হবে। মানুষের প্রয়োজনেই যে সামাজিক আইন সেকথাটা আমাদের বুঝতে হবে। তাহলেই সমস্যার বন্ধ দ্বার খুলে যাবে—নতুন আলোর ঝলকানি আমাদের অভিনন্দিত করবে।

স্বাধীন ভারতে নারী ও শিশু

ফুলরেণু গুহ

[কেন্দ্রীয় সমাজ উন্নয়ন ও কল্যাণ দপ্তরের রাষ্ট্রমন্ত্রী]

...শের নারী ও শিশুদের প্রতি যথেষ্ট ...যোগ্য মনোযোগ না দিয়ে কোনো রাষ্ট্রই তার সত্যিকারের ভিত্তি ভাল-...ড়ে তুলতে পারে না। কারণ নারী ...ই জাতির ভিত্তি গঠন করছে।

...রতের সংবিধানের মুখবন্ধেই বলা ...যে, এই সংবিধান অন্যান্য বিষয়ের ...দেশের সমস্ত নাগরিকদের জন্যে ...ক ও আর্থিক সুবিচার, প্রত্যেকের ...সমাজ-সম্মান, সুযোগ এবং মর্যাদা ...সংকল্প ঘোষণা করেছে। এছাড়া ...নের ডিরেকটিভ প্রিন্সিপলস অফ ...পলিসিতে বিশেষভাবে জোর দিয়ে ...য়েছে যে সমাজের অন্যান্য দুর্বল ...হ শিশু ও নারীকে রক্ষা করবার ...বশেষ ব্যবস্থা অবলম্বন করতে হবে।

...ধীনতালাভের অনেক আগেই দেশের ...বুঝেছিলেন যে, নারীমুক্তি সহ ...সংস্কারই হচ্ছে দেশের রাজনৈতিক ...পূর্বসর্ত। এ বিষয়ে অত্যন্ত ...ন অবস্থায় অগ্রগামীর কাজ ...রাজা রামমোহন রায়, কেশব-...ন, এম জি রাণাডে, রমাবাঈ এবং ...অনেকে।

...তীয় নারীজাতির মুক্তির কাজে ...প্রেরণা যোগালেন গান্ধীজী। তাঁর ...অসংখ্য ভারতীয় নারী দেশের ...তা সংগ্রামে এগিয়ে এসেছিলেন এবং জাতীয় পুনর্গঠনের অন্যান্য কাজে অংশগ্রহণ করেছিলেন।

স্বাধীনতালাভের সঙ্গে সঙ্গে পাকিস্থান থেকে আগত সহায় সম্বলহীন নারীদের সমস্যা ছাড়াও দেশকে নারীমুক্তির বিরাট সমস্যার সম্মুখীন হতে হয়েছে। সমগ্র জাতির পুনর্জন্ম তার নারীজাতির পুন-র্জন্মের সঙ্গে একসূত্রে গ্রথিত।

তখন স্ত্রীজাতির স্বাধীনতা সমস্যা মূলগতভাবে ভেবে দেখবার প্রয়োজন দেখা দিল। এক্ষেত্রে স্বেচ্ছাসেবী প্রতিষ্ঠানগুলির প্রয়োজনীয়তা স্বীকৃত হলো। এ বিষয়ে সরকারের যে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রয়েছে তা বিন্দুমাত্র কমিয়ে না দেখে প্রথম পরিকল্পনার প্রথমদিকে স্বেচ্ছাসেবী প্রতিষ্ঠানগুলিকে এই দায়িত্ব গ্রহণের ভার দেয়ার সিদ্ধান্ত নেয়া হলো। এটাও বোঝা গেল যে, এমন অসংখ্য কল্যাণমূলক কর্মসূচী রয়েছে যা স্বেচ্ছা-সেবী সংস্থার সীমিত অর্থ ও উদ্যোগের উপর পরোপুরিভাবে ফেলে রাখা যায় না।

এই পরিকল্পনাকালে স্বেচ্ছাসেবী সমাজ কল্যাণ সংস্থাগুলিকে উন্নত ও শক্তিশালী করার জন্যে, সমাজকল্যাণের তাদের কার্য-ক্ষেত্র প্রসারিত করার জন্য এবং নতুন কর্ম-সূচী ও প্রকল্পগুলি চালাবার মঞ্জুরী হিসাবে চার কোটি টাকা সাহায্য দেয়া হলো।

দেশের প্রতিটি জেলায় প্রথম পঞ্চ বার্ষিকী পরিকল্পনাকালে কল্যাণমূলক উন্নয়ন প্রকল্প চালু করা হয়েছিল। প্রত্যেকটি প্রকল্পের আওতায় রয়েছে বেশ কিছু গ্রাম। বিভিন্ন সংস্থার কেন্দ্রীয় সমাজ কল্যাণ বোর্ডের মাধ্যমে সরকার সাহায্যদান করেন। এই সংস্থাগুলির মধ্যে ছশো হলো নারী কল্যাণ সংস্থা, দেড়শো অক্ষম ব্যক্তি এবং শিশু অপরাধীর জন্য এবং ৭২৬টি সংস্থা সাধারণ কল্যাণমূলক কাজে নিরত।

এর ফলে সম্বলহীনা নারী ও বিধবা-দের জন্য কয়েকটি সংস্থা ও সংশোধনী এবং অন্যান্য সংস্থাগুলি থেকে আগত নারীদের জন্য হস্টেল নির্মাণ করে কার্যক্ষেত্র আরো প্রসারিত করবার সুযোগ এ সংস্থা-গুলিকে দেয়া হয়েছিল। গ্রামসেবিকা ও ধাত্রীদের শিক্ষাদানের ব্যাপক কর্মসূচীও গ্রহণ করা হয়েছিল।

প্রথম পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনাকালে অবলম্বিত ব্যাপক কর্মসূচীর একটি গুরুত্ব-পূর্ণ সাফল্য হলো এই যে, এই কর্মসূচী লোকের মধ্যে সবদিক থেকে একটা আত্মোন্নতির আন্তরিক ইচ্ছা এবং ক্রমবর্ধমান আগ্রহ সৃষ্টি করেছে।

পরবর্তী পরিকল্পনাকালে সমাজ কল্যাণ খাতে অধিকতর ব্যয়-বরাদ্দ মঞ্জুর করা হয়ে-ছিল। দ্বিতীয় পরিকল্পনাকালে সমাজ-কল্যাণের জন্যে পনের কোটি টাকা ধার্য করা হয়েছিল।

এই সমাজকল্যাণ কর্মসূচী কতটা সাফল্যলাভ করেছে তা এই কর্মসূচীতে

সংগ্রহকারী স্বেচ্ছাসেবক ও স্বেচ্ছাসেবী সংস্থাগুলির সংখ্যা থেকে জানা যেতে পারে। দ্বিতীয় পরিকল্পনাকালে স্বেচ্ছাসেবী সংস্থাগুলি ২ হাজার ৮০০ থেকে বেড়ে ৬ হাজার হয়েছে। নারীকল্যাণ কার্যে নিযুক্ত সংস্থাগুলির সংখ্যা ৬০০ থেকে বেড়ে ২ হাজার ৯০০ হয়েছে। শিশুকল্যাণ কার্যে নিযুক্ত সংস্থাগুলির সংখ্যা প্রথম পরিকল্পনাকালের ৫৯১ থেকে দ্বিতীয় পরিকল্পনাকালে ২ হাজার ৪০০ হয়েছে। দ্বিতীয় পরিকল্পনার অন্যান্য সাফল্য হচ্ছে ৭৫টি শহর সমষ্টি কেন্দ্র, মেয়েদের আয়ের জন্যে ২১টি উৎপাদন কেন্দ্র এবং শহরাঞ্চলের জন্যে ৪২টি নৈশ আশ্রম স্থাপন।

সংক্ষিপ্ত পাঠ্যক্রমের মাধ্যমে পরবর্তী বৃত্তি শিক্ষা ও কর্ম-সংস্থানের জন্যে বেশ কিছু সংখ্যক বয়স্কা মহিলা ন্যূনতম শিক্ষা গ্রহণে সমর্থ হয়েছিলেন। কল্যাণমূলক উন্নয়ন প্রকল্পগুলির সংখ্যা উল্লেখযোগ্যভাবে বাড়ানো হয়েছিল। এগুলি পরিচালনার ভার দেয়া হয়েছিল মহিলা মণ্ডলগুলির হাতে। কেন্দ্রীয় সাহায্যে সারাদেশে এই মহিলা-মণ্ডলগুলি গড়ে উঠেছে। এই বছরের ৩০শে মার্চ পর্যন্ত হিসাবানুযায়ী দেশে ২৩৪২টি সমাজকল্যাণ কেন্দ্র কাজ করছে। ১ কোটি ২২ লক্ষ লোকের ২১ হাজার গ্রাম *এই কেন্দ্রগুলির আওতায় এসেছে। এই কেন্দ্রগুলি থেকে সাহায্য প্রাপ্তদের সংখ্যা* ১০ লক্ষ ৬৪ হাজার।

তৃতীয় পরিকল্পনাকালে সমাজকল্যাণ কর্মসূচীর যথেষ্ট অগ্রগতি ঘটে। বিশেষ করে স্বাস্থ্যনিবাস কেয়ার হোম, অভ্যর্থনা কেন্দ্র ও পতিতাবৃত্তি নিরোধ আইন অনুযায়ী উদ্ধার-গৃহ নির্মাণের ক্ষেত্রে এই অগ্রগতি বিশেষভাবে লক্ষ্য করা যায়।

সামাজিক অর্থনৈতিক কর্মসূচীর ক্ষেত্রে শহরাঞ্চলে আধা শহরাঞ্চলের এবং গ্রামাঞ্চলে দেশলাই কারখানাসহ নানারকম ক্ষুদ্র-শিল্প কারখানা স্থাপন করা হয়েছে। এগুলিতে অনেক দরিদ্র মহিলার কর্ম-সংস্থান হয়েছে।

শিশুদের জন্যে কল্যাণমূলক কর্মসূচী ছাড়া সমাজকল্যাণ কর্মসূচী সম্পূর্ণ হতে পারে না। শিশুদের ক্ষেত্রে সর্বাধিক গুরুত্বপূর্ণ হচ্ছে শিক্ষা সমস্যা। শিক্ষা হচ্ছে রাজ্যগুলির নিজস্ব বিষয়। সুতরাং শিক্ষার সমস্যা মূলত রাজ্যগুলির ভাববার বিষয়। সাধারণত প্রাথমিক শিক্ষার কর্মসূচীতে যেসব বিষয় থাকে না সেসব ক্ষেত্রেই সমাজকল্যাণ দপ্তরের কাজ। শিশুদের জন্য যে সমস্ত সমাজকল্যাণ প্রকল্প রয়েছে তার মধ্যে আছে শিশু জন্মের পূর্বে ও পরে যত্ন নেয়া, তাদের রোগমুক্ত করা, সামাজিক স্বাস্থ্য ব্যবস্থা করা এবং নিউট্রিশনের প্রকল্প।

ছয় বছর পর্যন্ত বয়সের ছেলেমেয়েদের সর্বাঙ্গীন উন্নতি ঘটাবার জন্য রাজ্য সরকারগুলির পরিচালনায় একটি প্রকল্পের সঙ্গে সাহায্য দেন কেন্দ্রীয় সরকার। ত্রিশ হাজার শিশু রয়েছে এমন একটি সমষ্টি উন্নয়ন ব্লকে সমন্বয়ী প্রদর্শনী প্রকল্প কাজ করছে। তৃতীয় পরিকল্পনাকালে এগুলিতে চল্লিশ হাজার টাকা ব্যয় করা হয়েছে।

স্কুলে ভর্তির পূর্বে শিশুকল্যাণের অগ্রগতির জন্য আজকাল অনেক জায়গায় চিলড্রেন হোম গড়ে উঠেছে। স্কুলে যায় না এমন শিশুদের যত্নের জন্য কর্মীদের শিক্ষণের দরকার হয়। ১৯৬১-৬২ সালে বালসেবিকাদের জন্য একটি কর্মসূচী গ্রহণ করা হয়।

শহর ও গ্রামাঞ্চলে স্বেচ্ছাসেবী সংস্থাগুলি শিক্ষণের কর্মসূচী গ্রহণ করা হয়ে থাকে। শহরাঞ্চলে তৃতীয় পরিকল্পনাকালে এক হাজার ৩৬১ জন বালসেবিকাকে শিক্ষাদান করা হয়েছে। এর মধ্যে ১৭ হাজার ১২৮ জন কাজ পেয়েছেন। ১৯৬৬ সালে ৩১ ডিসেম্বর পর্যন্ত ৫৫৭ জন বালসেবিকা এই শিক্ষণ গ্রহণ করেছেন। এই শিক্ষাদানের জন্য প্রায় সতের লক্ষ টাকা ব্যয় হয়েছে।

তৃতীয় পরিকল্পনাকালে বিভিন্ন সমাজকল্যাণ কাজে স্বেচ্ছাসেবী প্রতিষ্ঠানগুলিকে ১ কোটি ৪ লক্ষ ৯৭ হাজার টাকা সাহায্য দেওয়া হয়েছে।

তাছাড়া তৃতীয় পরিকল্পনাকালে নিম্ন আয়ভুক্ত পরিবারের ত্রিশ হাজার ৫০০ *শিশুর জন্য ৬১০টি হলিডে ক্যাম্প চালানো হয়েছে।*

এগারো থেকে চোদ্দ বছর বয়সী ছেলেমেয়েরা যারা আর্থিক ও অন্যান্য অবস্থার দরুন সাধারণ শিক্ষা গ্রহণ রাখতে বাধ্য হয়, তাদের বৃত্তিশিক্ষার জন্য একটি প্রকল্প রচিত হয়েছে। ১৯৬৩ সালের আগস্ট মাসে এই প্রকল্পটি রচিত হয়। এ পর্যন্ত সাতটি কেন্দ্র স্থাপিত হয়েছে এবং এগুলি তিন হাজার ছাত্রকে শিক্ষা দেবে।

কেন্দ্রীয় শিশু অপরাধ আইনের অনুরূপ শিশু অপরাধ আইন অনুযায়ী বিভিন্ন রাজ্যে শিশু অপরাধ সমস্যা সমাধান করা হয়। রাজ্যগুলি কয়েকটি বিশেষ ধরনের স্কুলে এবং চিলড্রেন হোমসের মাধ্যমে এবং অন্যান্যভাবে এ অপরাধ নিবারণের ব্যবস্থা গ্রহণ করেছে। শিশু অপরাধ নিবারণের জন্য তৃতীয় পরিকল্পনায় ১ কোটি ৪৮ লক্ষ টাকা ব্যয় করা হয়েছিল।

দৈহিক ও মানসিক দিক থেকে অক্ষম ছেলেমেয়েদের শিক্ষা ও প্রতিষ্ঠাদানের প্রকল্পেও সরকার আগ্রহী। দেরাদুনের সেন্ট্রাল ব্রেইল প্রেস অন্ধ ছেলেমেয়েদের শিক্ষার জন্যে ২৪০টি বই বের করেছে। তৃতীয় পরিকল্পনায় এই খাতে খর্চ করা হয়েছিল ১ কোটি টাকা। বর্তমানে সরকারি বিশেষ কর্ম-সংস্থান সংস্থা প্রায় ৪ হাজার দৈহিক দিক থেকে অক্ষম লোকদের কাজ দিয়েছে।

অন্ধদের শিক্ষার জন্যে কয়েকটি শিক্ষক শিক্ষাকেন্দ্র দিল্লী, বম্বে, নরেন্দ্রপুর (পশ্চিমবঙ্গ) ও অন্যান্য জায়গায় কাজ করছে। তৃতীয় পরিকল্পনায় ১ হাজার ৮৭৬ জন অন্ধ ও বধির ও অন্যান্যভাবে দৈহিক দিক থেকে অক্ষম ছাত্রদের বৃত্তি দেয়া হয়েছে।

গ্রামাঞ্চলের নারী ও শিশুদের জন্যে পরিবার ও শিশুকল্যাণের কর্মসূচী চতুর্থ পরিকল্পনার সর্বাপেক্ষা বৃহৎ কর্মসূচী।

প্রথমদিকে ১৭টি শিশুকল্যাণ প্রদর্শন প্রকল্প ও ৩৩টি কল্যাণ সম্প্রসারণ প্রকল্প ১৯৬৭-৬৮ সালের নতুন শিশু ও পরিবার কল্যাণ প্রকল্পে পরিবর্তিত করা হবে।

অনুন্নত সম্প্রদায়ের উন্নতিকল্পেও কর্মসূচী গ্রহণ করা হয়েছে। এর মধ্যে রয়েছে আশ্রম স্কুল, সংস্কার কেন্দ্র ও চিলড্রেন হোম। তৃতীয় পরিকল্পনায় বিভিন্ন রাজ্যে ১৮৬টি আশ্রম বিদ্যালয় চালু করা হয়। ১ লক্ষ ৯০ হাজার ১৪৪ জন ছাত্র-ছাত্রীকে দুপুরে স্কুলে খাবার দেয়া হয়েছে। চার লক্ষ ৬৪ হাজার ৯৭৫ জন ছাত্র-ছাত্রীদের বই ও অন্যান্য জিনিসপত্র দেয়া হয়েছে।

এ পর্যন্ত সমাজকল্যাণ ক্ষেত্রে যা করা হয়েছে তা ভারতের মত বিরাট দেশে অপ্রতুল মনে হওয়া স্বাভাবিক। তাই পরিস্থিতি দাবী করছে, সমাজের বিত্তশালী সম্প্রদায় যেন পরিস্থিতির মোকাবিলার জন্যে অগ্রসর হন।

এম্ব্রয়ডারী প্রদর্শনী

এম্ব্রয়ডারীর সমাদর সর্বত্র। এর সত্যতা উপলব্ধি করা গেল সম্প্রতি অনুষ্ঠিত এক প্রদর্শনীতে। প্রদর্শনীর আয়োজন করেছিল জওহরী দেবী বিড়লা ইনস্টিট্যুট অব হোম সায়্যান্স। উচ্চমানের এম্ব্রয়ডারী এই প্রদর্শনীকে বিশেষ মর্যাদাদান করে।

বিখ্যাত "অ্যাঙ্কর" এম্ব্রয়ডারী সুতোর প্রস্তুতকারক কোটস্-এর উদ্যোগে সারা দেশে অনুষ্ঠিত হয় 'অ্যাঙ্কর এম্ব্রয়ডারী কণ্টেস্ট', গত বছরে অনুষ্ঠিত এই প্রতিযোগিতায় আশানুরূপ সাড়া মেলে। দেশের বিভিন্ন অংশ থেকে এবং বিভিন্ন বয়সের ১০,৮৬৭ জন প্রতিযোগী এতে অংশ গ্রহণ করে। কোন বাধা-নিষেধ না থাকায় প্রতিযোগিতায় অনেক দক্ষতাপূর্ণ এম্ব্রয়ডারী প্রতিযোগিতায় স্থান লাভ করে। অনেক এম্ব্রয়ডারী ঠিক শিল্পীর আঁকা ছবির মত মনে হচ্ছিল। বিচারকমণ্ডলী এম্ব্রয়ডারীর আকর্ষণ, গুণগত উৎকর্ষ, রঙ ও ভাবনার সংমিশ্রণ এবং শিল্পীর স্বাতন্ত্র্য বিচার করে দেখেন।

এই প্রদর্শনীতে সেই সব পুরস্কৃত এম্ব্রয়ডারী স্থান পেয়েছে। পুরস্কারের মূল্য ছিল দশ হাজার টাকা। এম্ব্রয়ডারী ভারতের ঐতিহ্যময় শিল্প। হাতের কাজই ছিল আমাদের গৌরব, বিশেষভাবে লক্ষ্য করা যায়। কিন্তু মেশিনে এম্ব্রয়ডারীর জনপ্রিয় আবেদন আমাদের মত অনেকেরই আকর্ষণ করেছিল।

ভারতে এম্ব্রয়ডারীর পুনরুজ্জীবনে এই প্রদর্শনী প্রয়োজনীয় সন্দেহ নেই এবং এই উৎসাহ শিল্পীদের আরও প্রেরণা যোগাবে।

শ্রীধর, শুক্লাম্বর ও বক্রেশ্বর

(১৯)

শ্রীধর পণ্ডিত

নবদ্বীপের একান্তে দরিদ্র ব্রাহ্মণ শ্রীধর পণ্ডিতের বাসা, শঙ্খবণিক ও তন্তুবায়দের পাড়া ছাড়িয়ে। কলা থোড়, মোচা, পাতা ও খোলা বেচে জীবিকা নির্বাহ করে। যা উপার্জন করে, তার আধেক ব্যয় করে গঙ্গাপূজায়, বাকি আধেক সংসারে।

সবাই তার নাম রেখেছে খোলা-বেচা শ্রীধর।

এক কথার লোক। একদরের বেপারি। যে জিনিসের যে দাম বলে দেবে, তার আর নড়চড় নেই। নিতে হয় নাও নয়তো পথ দেখ।

দরিদ্র, কিন্তু ভক্তিধনে ধনী। অনেক রাত পর্যন্ত হরিনাম করে। 'দীর্ঘল-আহ্বানে' ডাকে। পাষণ্ডী প্রতিবেশীরা প্রতিবাদ করে, খিদের জ্বালায় ওর না হয় ঘুম আসে না, তাই বলে চেঁচিয়ে আমাদের ঘুম মাটি করে কোন্ হিসেবে?

হিসেবের ধার ধারে না শ্রীধর। সে নিজের আনন্দে থাকে।

বাজারে ডালা সাজিয়ে বসেছে শ্রীধর, নিমাই এসে জিজ্ঞেস করল, দাম কত?

শ্রীধর দাম বললে।

যা দাম বললে তার আধেক দিতে চাইল নিমাই।

কম হবে না। শ্রীধরের এক কথা।

নিশ্চয়ই হবে। নিমাই ডালা থেকে পাতা-খোলা তুলে নিল।

জোর করে ফের কেড়ে নিল শ্রীধর। বললে, 'কম দামে ছাড়তে পারব না।'

তোমার তো অনেক টাকা আছে, আমার হাতের জিনিস কাড়ো কেন?

আমাকে মাপ করো ঠাকুর। তুমি আর কোথাও দেখ। সেখানে সস্তায় পাবে।

আমি তো শুধু জিনিস নিই না, আমি জোগানদারকেও নিই। নিমাই হাসল, বললে, তুমি আমাকে চিনতে পাচ্ছ না, না?

চঞ্চল, উদ্ধত এক বালক, তাকে চেনবার কী আছে?

শোনো। বললে নিমাই, তুমি প্রত্যহ যে গঙ্গার পূজো করো আমি তার বাবা।

হরি হরি। দু কানে আঙুল দিল শ্রীধর।

এই দুরন্তের জন্যে এপথে ওঠা যাবে না। শ্রীধর অসহায়ের মত বললে, তোমাকে অর্ধমূল্যে দিতে পারব না, কিছু না হয় বিনামূল্যে দেব।

বিনামূল্যে দেবে?

হ্যাঁ, একখণ্ড খোলা ও একখণ্ড থোড় রোজ তোমাকে দেব বিনামূল্যে।

তবে আর কথা কী! তবে আর বিবাদ কিসের?

সেই থেকে শ্রীধরের খোলায় ভাত খায় নিমাই।

এখন জল খাওয়াও।

কাজী দমনের দিন নগরসংকীর্তনে বেরিয়ে অবশেষে শ্রীধরের ঘরে এসে হাজির হলেন প্রভু।

ভাঙা ঘর, চালে জায়গায়-জায়গায় ফাঁক, দুরজায় একটা লোহার জলপাত্র পড়ে আছে।

ভাঙা পাত্র, চোরের কাছেও মূল্যহীন।

পরমানন্দে সেই পাত্রের জল খেলেন গৌরাঙ্গ।

শ্রীধর হায়-হায় করে উঠল। এ কী সর্বনাশ! এ যে আমাকে সংহার করতে আমার ঘরে এল।

প্রভু বললেন, ভক্তের জল খেয়ে আজ আমার শরীর শুদ্ধ হল। কৃষ্ণের চরণে ভক্তি জাগল। দাম্ভিকের স্বর্ণপাত্রের জলে তৃষ্ণা যায় না, ভক্তের লোহপাত্রের জলেই শরীর শীতল হয়।

দন্তে তৃণ ধরে কাঁদতে লাগল শ্রীধর। তুমি কী জল খেলে?

এ আমি ভক্তের জল খেলাম। খেলাম শুদ্ধামৃত। 'পরমার্থে বৈষ্ণবের সকল নির্মল।' তুমি ভক্ত, তোমার সমস্ত শুচিস্নিগ্ধ।

ধনে জনে পাণ্ডিত্যে কৃষ্ণেরে নাহি পাই।
কেবল ভক্তির বশ চৈতন্য গোসাঁঞি।।

নগরভ্রমণে বেরিয়ে এই শ্রীধরকেই একদিন জিজ্ঞেস করেছিলেন প্রভু, এত যে হরি-হরি করছ, তোমার অন্নবস্ত্রের দুঃখ তো গেল না।

দুঃখ? শ্রীধর যেন অবাক হল। দুঃখ কোথায়? উপবাস তো আর করছি না, আর ছোট হোক বড় হোক, কাপড়ও তো পরছি।

তোমার কাপড়ে তো গিঁট-দেওয়া, আর তোমার ঘরের ঐ চাল দেখ, খড় নেই।

তা হোক। তবু দুঃখ বলে মানতে চায় না শ্রীধর। বললে, রত্নঘরে রাজার দিন কাটে, গাছের উপরে পাখির দিন কাটে। আমার দিনও কেটে যাচ্ছে।

কিন্তু তোমার তো অনেক ধনরত্ন লুকোনো আছে।

শ্রীধর হাসল। বললে, আমি খোলা বেচে খাই, আমার আবার ধনরত্ন।

তোমার লুকোনো পোঁতা ধনের কথা আমি সকলকে বলে দেব। তখন টের পাবে।

সে ধন ভক্তি। বিনামূল্যে আস্বাদন।

মহাপ্রকাশের দিন গৌরসিংহ আদেশ করলেন, শ্রীধরকে নিয়ে এস।

কয়েকজন ভক্ত ছুটল তার সন্ধানে। কোথায় শ্রীধর?

অর্ধপথে উচ্চনাদ হরিনাম শুনতে পেল। ঐ, ঐ শ্রীধরের কণ্ঠস্বর। শব্দ লক্ষ্য করে সবাই গিয়ে ধরলে শ্রীধরকে। চলো চলো প্রভু তোমাকে ডেকেছেন। তুমি প্রভুকে দেখবে আর আমরা তোমাকে স্পর্শ করে কৃতার্থ হব।

প্রভু ডেকেছেন শুনে প্রেমাবেশে শ্রীধর মূর্ছিত হল।

তাকে ধরাধরি করে নিয়ে এল ভক্তেরা।

এস এস শ্রীধর। প্রভু শ্রীধরকে ব্যাকুল হয়ে আহ্বান করলেন। তুমি আমার বিস্তর আরাধনা করেছ। বহু জন্ম আমার প্রেমে ব্যয় করেছ। এ-জন্মেও আমার অনেক সেবা করলে। তোমার খোলায় তোমারই হাতের দ্রব্য নিত্য আহার করলাম। তুমি আমার রূপ দেখ।

শ্রীধর দেখল তমালশ্যামল বর্ণে অঙ্গ, হাতে বাঁশি, দক্ষিণে বলরাম দাঁড়িয়ে। কমলা হাতে তাম্বুল দিচ্ছে, মহাফণী ছত্র ধরেছে মাথার উপর। দেবতারা স্তুতি করছে।

শ্রীধর মূর্ছিত হয়ে পড়ল।

প্রভু বললেন, শ্রীধর, ওঠো, আমার স্তব করো।

শ্রীধর চেতনা পেয়ে উঠল। বললে, আমি স্তুতি করি আমার এমন শক্তি কোথায়?

তোমার বাক্যই আমার স্তুতি।

প্রভুর কৃপায় সরস্বতী শ্রীধরের রসনায় এসে বসল। শ্রীধর স্তুতি করতে লাগল।

প্রভু বললেন, শ্রীধর, বর চাও। তোমাকে আজ আমি অষ্টসিদ্ধি দেব।

তুমি আমাকে আরো ফাঁকি দেবে? কিন্তু, না, আর না, আর আমাকে ভোলাতে পারবে না।

প্রভু বললেন, আমার দর্শন ব্যর্থ হবার নয়। তোমাকে বর চাইতেই হবে। যা চাইবে তাই পাবে।

যদি নাই ছাড়বে, তবে দাও। যে ব্রাহ্মণ আমার খোলাপাতা কেড়ে নিয়েছিল, সেই আমার জন্ম-জন্মান্তরের প্রভু হোক। যে ব্রাহ্মণ আমার সঙ্গে ঝগড়া করত তার পদযুগলই আমার আশ্রয় হোক। শ্রীধর দুই বাহু তুলে কাঁদতে লাগল।

প্রভু বললেন, তোমাকে এক মহারাজ্যের রাজা করে যাব।

আমি আর কিছুই চাই না। এমনি জন্মে যেন চিরদিন তোমার নামগান করতে পারি।

দাস্যযোগে তুমি আমার এই প্রকাশ দেখলে। তোমাকে আমি বেদগোপ্য ভক্তি দিলাম।

নবদ্বীপ ছাড়বার আগের দিন প্রভুকে শ্রীধর একটি লাউ এনে দিল। আর কে এক ভক্ত দুধ নিয়ে এল।

কত দিন ধরে শ্রীধরের লাউ খাবার সাধ গৌরহরির। ও নিয়ে আগে আগে কত তাদের ঝগড়া হয়েছে।

এখন আর বিবাদ নেই। এখন শুধু নৈবেদ্য আর প্রসাদ।

প্রসন্ন হয়ে প্রভু মাকে বললেন, মা, দুধ-লাউ পাক করে দাও।

সন্ন্যাস নেবার পর প্রভু শান্তিপুরে ফিরলে শ্রীধর গেল দেখা করতে। তারপর প্রভু নীলাচলে গেলে, নীলাচলে।

(২০)

শুক্লাম্বর ব্রহ্মচারী

নবদ্বীপের গরিব ব্রাহ্মণ শুক্লাম্বর। ভিক্ষে করে দিন চালায়। কিন্তু অহর্নিশ কৃষ্ণ-কৃষ্ণ বলে। যখন ভিক্ষে করে তখনো কৃষ্ণ-কৃষ্ণ।

ভিক্ষে করে যা পায়, তা দিবসান্তে বাড়ি ফিরে রান্না করে। প্রস্তুত খাদ্য কৃষ্ণকে নিবেদন করে দিয়ে তার প্রসাদ নেয়।

কৃষ্ণানন্দের প্রসাদে দারিদ্র্য জানতেও পারে না।

গৌরাঙ্গের প্রতিবেশী শুক্লাম্বর। কৃষ্ণ-ভক্ত বলেই তার প্রতি গৌরাঙ্গের নিবিড় অনুরাগ।

ঝুলি কাঁধে শুক্লাম্বর ভিক্ষেয় বেরিয়েছে, প্রভু তাকে ডাকলেন।

এস এস। তোমার দেওয়া জিনিসই আমার আদরের আহার। এই বলে প্রভু শুক্লাম্বরের ঝুলির মধ্যে হাত ঢুকিয়ে মুঠো মুঠো চাল বের করে খেতে লাগলেন।

কী সর্বনাশ! শুক্লাম্বর মাথায় হাত দিল। এ চালের মধ্যে যে বিস্তর খুদকণা রয়েছে।

প্রভু বললেন, তোমার খুদকণাই আমার লোভনীয় খাদ্য। দ্বারকায়ও আমি এমনি তোমার ঝুলি থেকে খুদ কেড়ে নিয়ে খেয়েছি। জন্ম জন্ম তুমিই আমার প্রেম-সেবক। তোমার হৃদয়েই আমার বিহার। তোমার ভোজনেই আমার ভোজন। তোমার ভিক্ষাতেই আমার পর্যটন। প্রেমভক্তি বিলোতে আমি এসেছি, আমি তোমাকে দিলাম সেই প্রেমভক্তি।

গয়া থেকে ফিরে প্রভু সকলকে এই শুক্লাম্বরের বাড়িতেই সমবেত হতে বলে-ছিলেন। সান্ধ্যকীর্তন, নগরকীর্তন, জগাই-মাধাই উদ্ধার সমস্ত ঘটনাতেই শুক্লাম্বর প্রভুর লীলাসঙ্গী।

একদিন প্রভু বললেন, শুক্লাম্বর, তোমার রান্নাকরা অন্ন খেতে ইচ্ছে করছে।

দারুণ কুণ্ঠিত হয়ে শুক্লাম্বর বললে, তুমি কী বলছ! আমি এক পতিত ভিক্ষুক, অপবিত্র, আমার রান্না তুমি খাবে কী।

আমি অতশত জানি না। তুমি বাড়ি গিয়ে কৃষ্ণের নৈবেদ্য প্রস্তুত করো, আমি মধ্যাহ্নে গিয়ে খাব।

ভীত শুক্লাম্বর ভক্তদের কাছে পরামর্শ চাইল, কী করা।

কী আবার করা! প্রভুর যখন ইচ্ছে হয়েছে শুক্লাম্বরকে রান্না করতেই হবে। ভক্তের কাছ থেকে চেয়ে নিয়ে খাওয়াই তো ভগবানের স্বভাব। তবে যদি খুব ভয় লাগে বোঝ, আলগোছে রান্না কোরো।

ভিক্ষায় পাওয়া চাল ও গর্ভথোড় সিদ্ধ করল শুক্লাম্বর। আর বলতে লাগল কৃষ্ণ গোবিন্দ গোপাল বনমালী।

ভক্ত-অন্নে জগন্মাতা রমা প্রসন্ন দৃষ্টিপাত করলেন।

গঙ্গাস্নান করে এসে প্রভু আসনে বসলেন। কৃষ্ণে নিবেদন করে দিয়ে অন্নে হাত দিলেন।

খেতে খেতে বললেন, এমন সুস্বাদু অন্ন আর কোনোদিন খাইনি। আর কী সুন্দর এই গর্ভথোড়! আলগোছে এত ভালো রান্না কী করে করলে।

শুধু ভক্তির রসস্পর্শে সমস্ত ব্যঞ্জন সুস্বাদু হয়ে উঠেছে।

শুক্লাম্বরের ঘরেই বিশ্রাম করলেন গৌরাঙ্গ।

বিজয়দাস সেখানে উপস্থিত ছিল— 'আঁখরিয়া' বিজয়। সে প্রভুকে অনেক পুঁথি স্বহস্তে নকল করে দিয়েছে। তার হাতের লেখা মুক্তোর মত। রত্নাক্ষরে লেখে বলে গৌরহরি তার নাম দিয়েছেন রত্নবাহু।

শয়ান প্রভুর পাশে বিজয় বসে ছিল। প্রভু তার গায়ে হাত রাখলেন।

চকিতে বিজয়ের ভাবান্তর ঘটল। দেখল রত্ন-আভরণে সজ্জিত হয়ে এক দীর্ঘাঙ্গ জ্যোতির্ময় পুরুষ শুয়ে আছে।

বিজয় চেঁচিয়ে উঠতে যাচ্ছিল প্রভু তার মুখে হাত চাপা দিলেন। বললেন, যতদিন আমি এখানে আছি কাউকে কিছু বোলো না।

কিন্তু কে শোনে কার কথা। বিজয় পরমানন্দে হুংকার দিয়ে উঠল। সঙ্গে সঙ্গেই পড়ে গেল মূর্ছিত হয়ে।

সবাই বুঝল বিজয় কোনো বৈভবদর্শন করেছে।

প্রভু জিজ্ঞেস করলেন, হঠাৎ বিজয় হুংকার করে উঠল কেন? ওর কী হল?

কে জানে কী হল।

বিজয়ের গঙ্গার প্রতি অনুরাগ, এ বুঝি গঙ্গার প্রভাব। কিংবা, প্রভু বললেন, শুক্লাম্বরের ঘরে কৃষ্ণের অধিষ্ঠান, সেই কৃষ্ণকেই দেখল নাকি!

বিজয়ের গায়ে আবার হাত রাখলেন প্রভু।

বিজয় চেতনা পেল কিন্তু সাত দিন পর্যন্ত জড়প্রায় হয়ে রইল।

শুধু শুক্লাম্বরের গৃহ বলেই প্রভু এই রঙ্গ করলেন।

চন্দ্রশেখরের ঘরে নৃত্য-নাট্যের সময় শুক্লাম্বরও অভিনয় করল। সে সাজল নারদের শিষ্য।

নীলাচলে প্রভুর সঙ্গে সাক্ষাৎ করতে গেল। সঙ্গে আঁখরিয়া বিজয়।

(২১)

বক্রেশ্বর পণ্ডিত

নৃত্য কীর্তনের অবিচ্ছেদ্য অঙ্গ, আর গৌরাঙ্গের নৃত্যসঙ্গী বক্রেশ্বর। ত্রিবেণীর কাছে গুপ্তিপাড়ায় জন্ম। অকৃতদার।

মুকুন্দের যেমন অহোরাত্র নামকীর্তন, বক্রেশ্বরের তেমনি একভাবে চব্বিশ প্রহরের নৃত্য।

দুয়েতেই প্রভু আনন্দিত।

একদিন প্রভুর পা ধরে বক্রেশ্বর বললে, তুমি আমাকে দশ হাজার গন্ধর্ব জোগাড় করে দাও। ওরা গান করবে আর আমি নাচব। তবেই আমার পরিপূর্ণ সুখ হবে।

প্রভু বললেন, তুমি আমার এক পাখা। আরেক পাখা পেলে আমি আকাশে উড়তে পারতাম।

শুধু মর্তলোকে নয় যেতে পারতাম সুরলোকে। চৌদ্দভুবন ঘুরতে পারতাম।

কুলিয়ার দেবানন্দ পণ্ডিত ভক্তিহীন, মোক্ষাকাঙ্ক্ষী। ভাগবত পড়ায় বটে, কিন্তু ভক্তি বোঝে না। গৌরহরির ভগবত্তায়ও সে অবিশ্বাসী। সন্ন্যাস নিয়ে প্রভু নীলাচলে চলে গেলেন, তবুও না।

তখন একদিন তার গৃহে বক্রেশ্বর অতিথি হল। কৃষ্ণপ্রেমবিগ্রহ বিহ্বল বক্রেশ্বর।

বললে, দেবানন্দ, তোমাকে আজ আমার নাচ দেখাব। দেখবে?

বক্রেশ্বরের দিকে মুগ্ধ চোখে তাকিয়ে রইল দেবানন্দ। দেখব।

প্রেমাবেশে নৃত্য করতে লাগল বক্রেশ্বর। অশ্রু, কম্প, স্বেদ, হাস্য, পুলক, হুংকার, বৈবর্ণ্য ও আনন্দমূর্ছা। সমস্ত নৃত্যসম্পদ প্রস্ফুট হল তার শরীরে। দেবা-নন্দ চমৎকার মানল। এমন দীপ্তি এমন আকুলতা এমন আনন্দ সে দেখেনি কোনো-দিন।

শুধু একাকী দেখে তৃপ্তি নেই, লোক-জন ডাকতে লাগল দেবানন্দ। এমনটি কোনো-দিন কেউ দেখেনি।

নাচতে নাচতে ঢলে পড়ে যাচ্ছে বক্রেশ্বর, দেবানন্দ দু হাত বাড়িয়ে তাকে ধরে ফেলছে। টেনে নিচ্ছে নিজের কোলের মধ্যে। আর সবচেয়ে আশ্চর্য, বক্রেশ্বরের গায়ের ধুলো মাখছে নিজের শরীরে।

আর যায় কোথা! ভক্তধূলির স্পর্শে দেবানন্দের মনে ভক্তি জাগল।

শুধু ভক্তিই জাগল না, চৈতন্যে বিশ্বাস জাগল। তার কুবুদ্ধির বিনাশ হল।

আর সমস্ত বক্রেশ্বরের প্রভাবে। আর সে প্রভাবও তো গৌরাঙ্গেরই প্রসাদ। 'কৃষ্ণ-সেবা হৈতেও বৈষ্ণবসেবা বড়।' ভক্তসেবাতেই নিশ্চিত সিদ্ধি।

শ্রীক্ষেত্রেও প্রভুর সঙ্গে নৃত্য করেছে বক্রেশ্বর। মন্দিরে বেড়াকীর্তনে বক্রেশ্বরই অগ্রণী। উদ্যাননৃত্যেও প্রভুর সে একক সহচর।

বক্রেশ্বর অপরিহার্য। নীলাচলেই সে থেকে গেল প্রভুর সঙ্গে। (ক্রমশঃ)

(পূর্ব প্রকাশিতের পর)

আগেই বলেছি যে পূর্বে যে কোন পুস্তকের মুদ্রণ-সংখ্যা হাজার কপির বেশী উঠত না, এখন কিন্তু যে-কোন উপন্যাস দুই তিন বা তারও বেশী হাজারে ছাপা হয় এবং বিক্রিও হয়ে যায় খুব অল্পসময়ের মধ্যে। এর থেকে বেশ বোঝা যায় যে বাংলা বইয়ের চাহিদা বেশ বেড়েছে। আর শুধু তাই নয়, গল্প উপন্যাস ছাড়া এত বিভিন্ন ধরণের অজস্র বই বাজারে বেরুচ্ছে যে আমরা দেখে অবাক হই।

যেমন ধরুন সাহিত্য-আলোচনা, ইতিহাস, জীবনী, দর্শন, ভ্রমণ, শিকার-কাহিনী, রম্য-রচনা, ছেলেদের বই, নাটক, নাট্যালোচনা, সিনেমা, রঙ্গমঞ্চ সম্বন্ধে বহু বই আছে। এক রবীন্দ্রনাথ সম্বন্ধেই যে কত বই আছে তার ঠিক নেই—তাঁর কাব্য, তাঁর দর্শন, তাঁর বহুমুখী প্রতিভা সম্বন্ধে অজস্র বই আছে। তেমনি আছে অন্যান্য মনীষীদের প্রতিভা সম্বন্ধে নানা আলোচনা। এসব মৌলিক রচনা ছাড়াও আছে বিরাট অনুবাদ সাহিত্য। পৃথিবীর প্রায় সমস্ত সাহিত্যিকেরই কিছু-না-কিছু রচনা বাংলায় অনুদিত হয়েছে। কত বিচিত্র ও বিভিন্ন ধরনের প্রবন্ধ পুস্তক প্রকাশিত হয়ে ছাত্রদের এবং রসিকসমাজের চাহিদা মেটাচ্ছে। দেশের বর্তমান শিক্ষা-ব্যবস্থায় ছাত্রদের কাছে পরীক্ষার সুবিধার জন্য এইসব পুস্তক অপরিহার্য।

এখন একটা প্রশ্ন উঠতে পারে যে কোন্ ধরনের বই বাংলাদেশে বেশী চলে? এ প্রশ্নের উত্তর দেওয়া খুবই কঠিন। তবে আমার অভিজ্ঞতা থেকে বলতে পারি যে প্রথমে উপন্যাস, জীবন-চরিত, ভ্রমণ-কাহিনী, ধর্মসংক্রান্ত পুস্তকই বেশী চলে। তবে সব দেশেই এটা স্বীকার্য যে প্রকাশক এবং লেখক সবথেকে অধিক অর্থ পান স্কুল-পাঠ্য

শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়

সুধীরচন্দ্র সরকার

বই থেকে। বাংলাদেশেও এ নিয়মের ব্যতিক্রম নেই।

আমাদের দেশে ১৯১৪-১৬ সালে ম্যাট্রিক পরীক্ষার্থীর সংখ্যা ছিল ২৫ থেকে ৩০ হাজার। এখন সম্প্রতি স্কুল ফাইনাল এবং হায়ার সেকেণ্ডারী ছাত্রদের সংখ্যা দাঁড়িয়ে গেছে প্রায় দেড় লক্ষ। সেই পরিমাণে প্রকাশকরা ছাত্রদের চাহিদা মেটাতে পারছেন না। আমি হিসাব করে দেখেছি, ভালো পুস্তকপ্রকাশক অন্তত ৪৮ খানা স্কুল বই প্রতি বৎসরে প্রকাশ করেন এবং প্রতি বই ৫০০০ কপি করে ছাপানো হয় বলে ধরলেও প্রকাশক ও গ্রন্থকার যে কি পরিমাণ লাভবান হন তা সহজেই বোঝা যায়।

অবশ্য কিছুটা বই-ছাপার লভ্যাংশ এখন আস্তে আস্তে সরকারের হাতে চলে আসছে। তাঁরা নিজেরাই সস্তায় পুস্তক প্রকাশ করে প্রকাশকদের লভ্যাংশ কিছুটা নিয়ে নেওয়ায় পুস্তকব্যবসার ক্ষতি হচ্ছে। এর জন্যে দায়ী কারা সেটা বলা মুস্কিল। তবে পাঠ্যসূচী অনুসারে টেক্সট্ বুক কমিটি উঠে যাওয়ায় যে কোনো প্রতিষ্ঠান পাঠ্যপুস্তক প্রকাশ করে বিভিন্ন বিদ্যালয়ে পাঠ্য হিসাবে নির্বাচন করতে পারেন।

সকলেই জানেন ভারত ও রাজ্য সরকার-গুলি শিশুপাঠ্য পুস্তকগুলিকে জাতীয়-করণ করতে চেষ্টা করছেন এবং ভারতীয় সংবিধানে অবৈতনিক শিশুশিক্ষা বাধ্যতা-মূলকভাবে প্রবর্তনার ধারা সন্নিবিষ্ট আছে। এই ব্যাপারেই বোধহয় তাঁরা দ্রুত অগ্রসর হচ্ছেন। এতে দেশে ক্ষতি অথবা লাভ হচ্ছে কিনা সেটা অবশ্য বিবেচ্য।

তারপর আর একটা কথা। ভারত সরকারের অদ্ভুত আমদানি-রপ্তানির নিয়ম-কানুনের জন্য বেশকিছু বই বিদেশ থেকে সস্তায় আসতে শুরু করেছে। এতে আমাদের প্রকাশন-ব্যবসা ক্ষতিগ্রস্ত হতে চলেছে। দেখা গেছে, সব দেশেই স্কুল ও কলেজ বই পুস্তক-ব্যবসায়ের মেরুদণ্ড। আমাদের দেশেও তাই। তবে অবসর সময়ে এইসব পাঠ্যপুস্তক প্রকাশকেরা ছিটেফোঁটাভাবে বাংলা সাধারণ পুস্তক প্রকাশ করে প্রকৃত সাহিত্যের পোষণ করছেন। এটা আস্তে আস্তে দেখা যাচ্ছে যে পুস্তক-প্রকাশন

ক্ষেত্রে কয়েকজন ব্যবসায়ী কেবল বাংলা-সাহিত্যেরই ব্যবসা করে বেশ শক্তিশালী হয়ে প্রকৃত সাহিত্যেরই পৃষ্ঠপোষকতা করছেন—এটা খুব সুখের কথা।

যাঁরা কেবল বাংলা সাহিত্য নিয়ে কারবার করেন তাঁদেরও দু' একটা সংকটের কথা উল্লেখ করা দরকার। সাহিত্যিকদের অর্থের চাহিদা মেটাতে গিয়ে অনেকসময় তাঁদের বেশ ক্ষতিগ্রস্ত হতে হয়। সাহিত্যিকদের ন্যায্য প্রাপ্য সম্পর্কে বিদেশে ও এদেশে নীতির অনেক প্রভেদ, এবং তুলনামূলকভাবে দেখতে গেলে কার ক্ষতি হচ্ছে সেটা বিবেচনার ভার পাঠকসাধারণের ওপর দেওয়া ভালো। অবশ্য এটা মানতেই হবে যে আমাদের শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় বা ওদেশের জর্জ বার্নার্ড শ' যে টাকা প্রকাশকের কাছে দাবী করতে পারেন অন্য কোনো লেখক তা পারেন না।

আর একটা কথা এখানে বলা দরকার। সম্প্রতি আমি বিদেশ থেকে যা দেখে এসেছি তা হল এই যে চলচ্চিত্র থেকে সব দেশের লেখকরাই অনেক টাকা পেয়ে থাকেন। এতে বিদেশী প্রকাশকদের কাছে একটি নতুন দ্বার উন্মুক্ত হয়েছে (কারণ তাঁরাই চেষ্টা করে নতুন গ্রন্থকারদের প্রচার করেছেন। তাঁরা আশা করেন এইসব বই সিনেমা হলে তাঁরাও অর্থলাভ করবেন।) কিন্তু আমাদের দেশে এখনকার প্রকাশকরা পুস্তকের চিত্র-স্বত্ব থেকে কোনো অংশই পান না। পাশ্চাত্য দেশের প্রকাশকরা বলেন, তাঁদের প্রচেষ্টায় যখন পুস্তকটি সুখ্যাতি অর্জন করল এবং সেইজন্যই চিত্রনির্মাতাদের নজরে পড়ে চলচ্চিত্র রূপ দেওয়া সম্ভব হল, তখন লভ্যাংশের সামান্যকিছু অংশ তাঁরা পাবেন না কেন? জার্মানীতে আমি নিজের চোখে এই ব্যবস্থা দেখে এসেছি। সুতরাং আমাদের দেশেও কোনো লেখকের গল্পের চলচ্চিত্রের স্বত্ব বিক্রয়ের সময় প্রকাশকের একটা অংশ থাকা উচিত।

পুস্তকপ্রকাশনা ক্ষেত্রে নেমে বাংলা-দেশের সব সাহিত্যিকের সঙ্গেই বেশ ঘনিষ্ঠভাবে মেশবার সুযোগ পেলাম। তাঁদের মধ্যে কয়েকজনের সম্বন্ধে আমার কিছু বলা দরকার। প্রথমেই আরম্ভ করি বাংলার অপরাজেয় কথাশিল্পী শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় মহাশয়কে নিয়ে।

শরৎচন্দ্রের সঙ্গে প্রথম আলাপ কি করে হয়েছিল সে কথা আগেই বলেছি। এই নিয়ে আমাদের বন্ধুমহলে বেশ কিছুদিন হাস্য-রসের খোরাক জুগিয়েছিল।

যাই হোক, এই সময় থেকে শরৎবাবুর সঙ্গে আমাদের বন্ধুত্ব ক্রমেই ঘনীভূত হয়ে এল। শেষে এমন এক পর্যায়ে দাঁড়ালো যে প্রতিদিনই তাঁর সঙ্গে গল্প, আড্ডা ও নানা-রকম আলাপ-আলোচনা চলতে লাগল 'যমুনা' অফিসেই। তিনি কিন্তু কখনও একলা আসতেন না, তাঁর নিত্যসহচর ভেলু কুকুর তাঁর সঙ্গ কোনদিন ছাড়তো না। শরৎবাবুর সঙ্গে আমাদের আন্তরিকতা খুবই অবশ্য বেড়ে গেল, কিন্তু তিনি নিজে এর মধ্যে খুব দোটানায় পড়ে গেলেন 'ভারতবর্ষ' ও 'যমুনা'য়।

সেই সময় কেবলমাত্র 'ভারতবর্ষ' প্রকাশিত হয়েছে। 'ভারতবর্ষে'র প্রধান কর্ণধার তখন শরৎবাবুর বিশেষ বন্ধু প্রমথনাথ ভট্টাচার্য। তিনি ক্রমে ক্রমে শরৎবাবুকে 'ভারতবর্ষে'র দিকে টেনে নিয়ে গেলেন। 'ভারতবর্ষে'র অর্থবলের কাছে 'যমুনা'র অর্থবল ভেসে গেল। আমার যতদূর মনে পড়ে 'ভারতবর্ষে' শরৎবাবুর প্রথম যে উপন্যাসখানি প্রকাশিত হলো তার নাম হলো 'বিরাজবৌ'।

এই গোলযোগের মধ্যে আমিও অন্যভাবে শরৎবাবুর সঙ্গে পুস্তকপ্রকাশনের ব্যাপারে জড়িত হলাম। সাহিত্যিক বন্ধুরা আমাকে বিশেষভাবে পীড়াপীড়ি করতে লাগলেন যে এই সময় শরৎবাবুর যে সমস্ত লেখা বিভিন্ন কাগজে বেরিয়েছে তা আমাকে পুস্তকাকারে একত্রিত করে প্রকাশ করতে হবে। এই ব্যাপারে আমার প্রথমেই মত দেওয়াটা একটু মুস্কিল হয়ে পড়ল। কয়েকটা বাধার সম্মুখীন হতে হল আমাকে।

প্রথমত, আমরা তো শুধুই তখন আইন-সংক্রান্ত পুস্তকের প্রকাশক, বাংলা বইয়ের ক্ষেত্রে তখনো সম্পূর্ণ অপরিচিত। প্রধান চিন্তা হলো যে বাংলা বই ছেপে ক্ষতিগ্রস্ত হবো কিনা। তখনকার দিনে শরৎবাবুর পুস্তকপ্রকাশেও যথেষ্ট ঝুঁকি ছিল, কারণ সাহিত্য-জগতে তিনি তখন নবাগত। তাঁর লেখা আমাদের খুব ভাল লাগলেও সাধারণ পাঠকের কাছে কিরকম চাহিদা হবে তা আমরা মোটেই ধারণা করতে পারিনি। তা না হলে সামান্য কয়েক হাজার টাকা দিলে পরে তাঁর সেই সময় লিখিত সমস্ত বইয়ের 'কপিরাইট' পাওয়া যেতো। অবশ্য এই ধরনের দুষ্ট পরিকল্পনাই বলুন আর ব্যবসাদারী বুদ্ধিই বলুন, আমার মাথায় কোনদিন আসেনি, কারণ আমার মনে আছে, পরবর্তী জীবনে কয়েকটি পুস্তকের 'কপি-রাইট' কিনে পরে আবার সেই 'কপিরাইট' গ্রন্থকারদের ফিরিয়ে দিয়েছিলুম।

দ্বিতীয় কারণ হলো রেঙ্গুনে শরৎচন্দ্রের প্রত্যাবর্তন। শরৎচন্দ্র জানালেন যে তিনি খুব শিগগীর রেঙ্গুন ফিরে যাবেন। তাঁর কাছে বই ছাপবার অনুমতি নিতে হলে তা রেঙ্গুন যাত্রার আগেই নিতে হবে।

সেই সময় আমাদের কোন এক আত্মীয়ের বাড়ীতে এক বিবাহের অনুষ্ঠান ছিল। এই উপলক্ষ্যে বিবাহের পরে স্টার থিয়েটারে একটি অভিনয়ের অনুষ্ঠান হয়। এই অভিনয় দেখার জন্যে আমি শরৎবাবুকে আমন্ত্রণ করি। শরৎবাবু সেই আমন্ত্রণ গ্রহণ করলেন এবং অভিনয়-শেষে রাত দুটোর পর আমাদের শিবনারায়ণ দাস লেনস্থ বাড়ীতেই বাকী রাতটুকু কাটালেন।

পরদিন ভোরবেলায় শরৎচন্দ্রের নিদ্রা তখন সবেমাত্র ভেঙেছে, এমন সময় 'যমুনা' সম্পাদক ফণীন্দ্রনাথ পাল আমাদের বাড়ীতে এলেন। তারপর অনেক আলাপ-আলোচনার পর শরৎচন্দ্রের ছয়খানি পুস্তকের প্রথম সংস্করণ প্রকাশের ভার আমরা পেলাম। এই বইগুলি হলো: চন্দ্রনাথ, নারীর মূল্য, পরিণীতা, নিষ্কৃতি, বৈকুণ্ঠের উইল ও চরিত্রহীন। যতদূর মনে পড়ে মাত্র ৬০০ টাকায় (তাও ২।৩ খেপে) অগ্রিম দিয়ে এই চুক্তি এইখানেই সম্পন্ন হয়। চুক্তিতে লেখা ছিল প্রত্যেক বইয়ের প্রথম সংস্করণ এক হাজার কপি পর্যন্ত আমরা ছাপতে পারবো। তারপর যখন এ-সংস্করণ নিঃশেষ হয়ে যাবে, তখন এর পুনর্মুদ্রণ গ্রন্থকারের ইচ্ছাধীন। তাছাড়া রয়ালটির দিক থেকেও তাঁর যা প্রাপ্য ছিল, তাও তাঁকে দিয়ে দেওয়া হয় বিক্রয়ের সঙ্গে সঙ্গে।

এর ফলে হলো কি, অন্য একজন প্রতিপত্তিশালী প্রকাশক আমাদের এ-সৌভাগ্য সহ্য করতে পারলেন না। কারণ, শরৎবাবুর বইগুলি প্রকাশের সঙ্গে সঙ্গে তাঁর জনপ্রিয়তা ও পুস্তকগুলির চাহিদা হু-হু করে বেড়ে গেল। তখন এই প্রকাশক-মশাই শরৎবাবুর সঙ্গে যোগাযোগ করে পরবর্তী সংস্করণ প্রকাশ করে ফেললেন অনেকক্ষেত্রে আমাদের প্রথম সংস্করণ নিঃশেষিত হবার আগেই, এবং ভবিষ্যতে যাতে তাঁর গ্রন্থাবলীর একচ্ছত্র প্রকাশক হতে পারেন, সেজন্য আমাদের কাছ থেকে প্রকাশিত বইগুলি ক্ষেপে ক্ষেপে বহু কপি কিনে নিলেন।

শরৎবাবুর সঙ্গে আমাদের যেরূপ ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক ছিল, তাতে তাঁর গ্রন্থাবলী আমাদের প্রকাশন-সংস্থা থেকে প্রকাশিত হবে এইরূপ একটি বিশ্বাস আমাদের ছিল এবং তিনিও অন্যরকম কিছু ভাবেননি। শরৎবাবুর প্রকাশন-ব্যবসার আইনকানুন সম্বন্ধে বিশেষ জানা ছিল না সে-সময়। ইচ্ছা করলে আমরা কৌশলে এমনভাবে চুক্তি করে নিতে পারতাম যাতে বইগুলির প্রকাশন-স্বত্ব চিরকালের জন্য আমাদেরই থাকে। কিন্তু আমাদের সুদীর্ঘ প্রকাশন-ব্যবসায়ে কোনদিন কারু কাছ থেকে অন্যায়ভাবে সুযোগ-সুবিধা নেবার চেষ্টা করিনি, সেজন্য সেদিনও কোনরকম নীতি-বিগর্হিত পন্থা অবলম্বন করিনি।

এই সমস্ত বই-এর প্রথম প্রকাশন ব্যাপারে শরৎবাবুর সঙ্গে আমার সম্বন্ধ একটু ক্ষীণ হলেও সম্পূর্ণ ছিন্ন হয়ে যায়নি তার পরিচয় পাওয়া যায় যখন তিনি 'বসুমতী'-তে 'জাগরণ' নামে একটা উপন্যাস লিখতে শুরু করেন। আমি তখন সে-বইটি প্রকাশ করার ব্যাপারে আগ্রহ প্রকাশ করায় তিনি রাজী হয়ে যান। আমিও সঙ্গে সঙ্গে এক হাজার টাকা অগ্রিম দিয়ে বইটির প্রকাশন-স্বত্ব ক্রয় করি। কিন্তু দুর্ভাগ্যবশতঃ উপন্যাসটি তিনি শেষ করতে না পারায় টাকাটা আমায় পরে ফিরিয়ে দিয়েছিলেন।

(ক্রমশঃ)

পারমাণবিক শক্তি

রঞ্জিত বন্দ্যোপাধ্যায়

ছোটবেলায় আমার চেহারাটা খুব রোগা ছিল। তাই একবার শখ হয়েছিল ব্যায়াম-ট্যায়াম করে শরীরটাকে একটু মজবুত করে নিতে। মতলবটা জানতে পেরে কলেজের এক বন্ধু এসে একদিন প্রচুর উপদেশ দিল এই বিষয়ে। কিছুদিন পরে ইউরোপের একজন বিখ্যাত ব্যায়ামবীরের একটি বইও সে আমার হাতে তুলে দিয়ে গেল। বইটা খুলে দেখি প্রথম দুটো পরিচ্ছেদ শুধু মনুষ্যদেহের বিশদ বর্ণনায় ভর্তি। মানুষের শরীরে ক'টা হাড় আছে, রক্ত কোন পথে চলাচল করে, ফুসফুসের প্রয়োজনীয়তা কি, ইত্যাদি আরো বিস্তর বস্তুর উল্লেখ সেখানে ছিল। দু-চারটে পাতা উল্টে বইটা আমি একপাশে সরিয়ে রেখে দিলাম কিছুক্ষণ পরেই। দৈহিক শক্তি অর্জন করতে হলে যদি দেহের প্রত্যেকটি প্রত্যঙ্গের খবরা-খবর রাখতে হয়, তাহলে আমার কাজ নেই তাতে। আর তাছাড়া, তাই যদি করতে পারতাম তাহলে সোজাসুজি ডাক্তারীটা পাশ করে নিতে আপত্তিটা কোথায় ছিল। তাতে অন্ততঃ দুটো পয়সা আসত ঘরে। সুতরাং সেই বইটা আর খোলা হয়নি এবং ব্যায়াম করার প্রশ্নটাও সেই সঙ্গে চাপা পড়ে যায়। ফলে, এখনো আমার চেহারাটা সেই ছোটবেলার মতো রোগাই থেকে গেছে।

কিন্তু অনেকদিন পরে আজ ভেবে দেখছি যে ইউরোপের সেই বিখ্যাত ব্যায়ামবীর মোটেই অন্যায় কথা বলেননি। দৈহিক শক্তি অর্জন করতে হলে দেহের কাঠামোর একটা স্পষ্ট ধারণা গোড়াতেই প্রয়োজন। পারমাণবিক শক্তির ক্ষেত্রেও এই জিনিসটা প্রযোজ্য। তবে একটা পার্থক্য আছে। দৈহিক শক্তি অর্জন করতে হলে দেহের কাঠামোটা অক্ষত রেখে সেটাকে আরো দৃঢ় এবং মজবুত করা দরকার। কিন্তু পারমাণবিক শক্তি পেতে হলে পরমাণুর কাঠামো ভেঙে ফেলতে হয়। প্রচণ্ড শক্তি লুকিয়ে রয়েছে ওর অভ্যন্তরে। কাঠামো চূর্ণ করে সেটাকে বার করে আনতে হবে বাইরে। আর সেইজন্যেই পরমাণুর প্রত্যেকটি হাড় পাঁজরার অবস্থান আরো সঠিকভাবে জানা দরকার আমাদের। না হলে, পরমাণু আমরা কিছুতেই ভাঙতে পারব না, ঠিক যেমন রোববারের বাজারে কসাইদের মতো দ্রুত মাংস কেটে বিক্রি করতে পারব না—ছাগলের অ্যানাটমি জানা না থাকার জন্যে।

সুতরাং পরমাণুর অ্যানাটমি অনুসন্ধানের পথে পা বাড়ানো যাক এবার। এপথে প্রধান অন্তরায় হচ্ছে পরমাণুর আকৃতি। জিনিসটা এতই অসম্ভব রকমের ক্ষুদ্র যে এ বিষয়ে চিন্তা করতে গেলে মাথাটা কেমন যেন গোলমাল হয়ে যায়। তখন প্রয়োজন হয় ঘন ঘন জল খাবার। কিন্তু জল খেতে খেতেও চিন্তাটা থেকে যায় মনের মধ্যে। প্রশ্ন জাগে, এই যে এক গেলাস জল মুখের কাছে নিয়ে এসেছি, এর মধ্যে ক'টা পরমাণু আছে? বিজ্ঞানীরা জবাব দেবেন যে, আমাদের এই বিশাল পৃথিবীর সাত সমুদ্র এবং তের নদীর সমগ্র জল সংগ্রহ করে যে বিপুল সংখ্যক গেলাস আমরা জলে ভর্তি করতে পারব, তার চেয়ে বহুগুণ বেশী পরমাণু নাকি ঐ একটি গেলাসের মধ্যেই বর্তমান রয়েছে! প্রকৃতপক্ষে 'পরমাণু' কথাটা লিখতে আমাদের যতখানি জায়গা লাগে তার মধ্যে প্রায় দশ কোটি পরমাণু পর পর সাজিয়ে একটা লাইন করে বসিয়ে দেয়া যায়! এ থেকে বোঝা যাচ্ছে যে এই পরমাণু জিনিসটা কি অভদ্র রকমের ক্ষুদ্র। এমন কোনও অনুবীক্ষণ যন্ত্র আজ পর্যন্ত আবিষ্কৃত হয়নি যার সাহায্যে এদের স্বচক্ষে দেখা সম্ভব।

সুতরাং স্বভাবতই সন্দেহ জাগে এদের অস্তিত্বে। যাকে চোখে দেখা যায় না, এমন কি সর্বাপেক্ষা শক্তিশালী অনুবীক্ষণ যন্ত্রও যার কাছে পরাজিত, সেটা সত্যিই যে আছে একথা আমরা বলি কি করে?

আজ থেকে প্রায় দেড়শ বছর আগে বিজ্ঞানীরা এই পরমাণু-মতবাদ প্রথম উপস্থাপন করেছিলেন। তারপরে বিজ্ঞানের এই বিশিষ্ট শাখায় এ যাবৎকাল যে সমস্ত পরীক্ষা-নিরীক্ষা এবং গবেষণা করা হয়েছে এবং যে সব ফল পাওয়া গেছে, তা থেকে পরমাণুর অস্তিত্ব সম্বন্ধে সন্দেহ করার এখন আর কোনও অবকাশ নেই। কিন্তু এর চেয়ে আরো প্রত্যক্ষ এবং মর্মান্তিক প্রমাণ হচ্ছে সেই হিরোশিমা এবং নাগাসাকি শহরের হতভাগ্য লক্ষাধিক লোকের মৃতদেহ যাঁরা নিহত হয়েছিলেন ১৯৪৫ সালের আগস্ট মাসে—মানুষের ওপর মানুষের তৈরী প্রথম পরমাণবিক বোমার বিস্ফোরণে।

অস্তিত্ব সম্বন্ধে নিঃসন্দেহ হবার পর দ্বিতীয় যে প্রশ্নটা মাথা তুলে দাঁড়ায় সেটা হচ্ছে, এই অতি ক্ষুদ্রাকৃতি পদার্থগুলির পরিমাপের প্রণালী। আমাদের হিসেব অনুযায়ী যেখানে দশ কোটি পরমাণু মাত্র এক সেন্টিমিটার দৈর্ঘ্যের মধ্যে গাদাগাদি করে অবস্থান করছে সেখানে তাদের ভিন্ন ভিন্ন ভাবে পরিমাপ করার প্রচেষ্টা প্রায় পাগলামির পর্যায়েই পড়ে না কি? অবশ্য একটা সহজ উপায় হচ্ছে আলোকচিত্র তুলে নেয়া। কিন্তু এ ক্ষেত্রে সেখানেও সফলতা লাভ করা দুরূহ, কারণ আমাদের সাধারণ আলোক, এমন কি অতিবেগুনী আলোকের তরঙ্গদৈর্ঘ্যও এই পরমাণু এবং তাদের অন্তর্বর্তী দূরত্বের তুলনায় অতিবৃহৎ। সুতরাং এখানে ব্যবহার করতে হবে আরো কয়েক হাজার ভাগ হ্রস্ব তরঙ্গদৈর্ঘ্যের আলোক, অর্থাৎ রঞ্জনরশ্মি। কিন্তু রঞ্জন-রশ্মি প্রায় যে কোনও পদার্থের মধ্যে দিয়ে সোজা বেরিয়ে যায়। প্রতিসরণ (রিফ্র্যাকশন) যা হয়, তা অতি সামান্য। এই বিশেষ গুণটি এবং সেই সঙ্গে তার তীব্র মর্মভেদী ক্ষমতার জন্যে শল্যচিকিৎসায় রঞ্জন-রশ্মির এত সমাদর। কিন্তু এখানে রঞ্জন-রশ্মির এই বিশেষ গুণটিই তার একটা প্রধান দোষ হয়ে দাঁড়াচ্ছে এখন। প্রয়োজনীয় পরিমাণ প্রতিসরণের অভাবে কোনও লেন্স অথবা অনুবীক্ষণ যন্ত্র কার্যকর হয় না, যার ফলে পরমাণুর আলোকচিত্র অত্যন্ত অস্পষ্ট হয়ে যায়। অর্থাৎ, ব্যাপারটা এখন এই দাঁড়াচ্ছে যে—রঞ্জন-রশ্মি ব্যতিরেকে পরমাণুর আলোকচিত্র গ্রহণ করা অসম্ভব, আবার রঞ্জন-রশ্মি ব্যবহার করলে আলোকচিত্র প্রায় পাওয়াই যাচ্ছে না। সাহিত্যজগতে এই জাতীয় একটা পাপচক্রের (ভিসিয়াস সারকেল) সাক্ষাৎ প্রায় সব দেশেই পাওয়া যায়, যেমন—বিখ্যাত সাহিত্যিক না হলে লেখা ছাপা হয় না, আবার লেখা ছাপা না হলে বিখ্যাত সাহিত্যিক হবার উপায় নেই। কিন্তু অতীতে অনেক বিখ্যাত সাহিত্যিক সৃষ্ট হয়েছেন এবং এখনো হচ্ছেন। সুতরাং, পাপচক্র আপাতদৃষ্টিতে দুর্ভেদ্য মনে হলেও, একটা উপায় শেষ পর্যন্ত বেরিয়ে পড়ে ঠিকই। পরমাণুর ক্ষেত্রে এই উপায়টি উদ্ভাবন করেছিলেন বৃটিশ পদার্থবিদ ডবলিউ এল ব্র্যাগ। রঞ্জন-রশ্মির সাহায্যেই তিনি পরমাণুর একাধিক আলোকচিত্র তুললেন, তবে বিভিন্ন কোণ থেকে। চিত্রগুলি পৃথক পৃথকরূপে অবশ্য অত্যন্ত অস্পষ্ট হল। কিন্তু সেগুলি এনলার্জ করার পর তিনি এমনভাবে সংযোজন করলেন যে খুবই চমৎকার ফল পাওয়া গেল। এইভাবে রঞ্জন-রশ্মির সাহায্যে বিভিন্ন কোণ থেকে আলোকচিত্র তুলে জোড়া লাগানো জিনিসটা শেষপর্যন্ত কেমন দাঁড়ায় তার একটা আভাস ১নং চিত্রে পাওয়া যাবে। এখানে একটি হেকস্যামেথিল-বেনজিন-এর অণুর (মলিকিউল) ছবি দেখানো হয়েছে। এই অণুর মধ্যে বারোটি কারবন পরমাণু (অ্যাটম) এবং আঠারটি হাইড্রোজেন পরমাণু থাকে। অন্দরমহলের ছ'টি কারবন পরমাণু একটি গোলাকার পরিধি সৃষ্টি করেছে। এই পরিধির বাইরে বাকি ছ'টি কারবন পরমাণুকেও চিত্রে দেখা যাচ্ছে। কিন্তু অত্যন্ত হাল্কা হওয়ার দরুন অবশিষ্ট আঠারটি হাইড্রোজেন পরমাণুর কোনও ছাপ চিত্রে পরিস্ফুট হয়নি। অবশ্য কারবন পরমাণুগুলিকেও আমরা আদপেই দেখতে পেতাম না, যদি না সংযোজন করার পূর্বে পৃথক পৃথক চিত্রগুলিকে প্রায় আঠার কোটি গুণ বৃদ্ধি করা হত!

এতক্ষণে তাহলে পরমাণুর অস্তিত্ব সম্বন্ধে নিশ্চিন্ত হওয়া গেল এবং তাদের আকৃতিরও একটা পরিষ্কার ধারণা পাওয়া গেল। এবার আমাদের আসল কাজে হাত দিতে হবে। এই অতি ক্ষুদ্রাকৃতি পদার্থগুলির অভ্যন্তরে আবার আরো ক্ষুদ্রতর কিছু আছে কি না, এবং যদি থাকে তাহলে সেগুলির স্বরূপ কি? এই প্রশ্নের উত্তর না দিতে পারলে পরমাণু বিচূর্ণ করে

শক্তি অর্জন করা সম্ভব নয়, যেটা আমরা আগেই দেখেছি।

(২)

পরমাণুর দেহে প্রথম অস্ত্রোপচারের সম্মানও একজন বৃটিশ বৈজ্ঞানিকেরই প্রাপ্য। তিনি হচ্ছেন সার জে জে থমসন। ক্যাথোড রশ্মি নিয়ে গবেষণা করতে করতে ১৮৯৫ খৃষ্টাব্দে তিনি আবিষ্কার করেন ইলেকট্রন। এই ইলেকট্রনের ভরও তিনি নির্ণয় করতে সক্ষম হন। থমসনের হিসেব অনুযায়ী ইলেকট্রন কণাগুলি সর্বাপেক্ষা হাল্কা হাইড্রোজেন পরমাণুর চেয়েও ১৮৩৭ ভাগ হাল্কা।

কিন্তু হাইড্রোজেনে পরমাণুর ভর কত? আকৃতি নিয়ে আলোচনা করার সময়ে আমরা দেখে ছিলাম যে এক সেন্টিমিটার স্থানের মধ্যে দশ কোটি পরমাণ, পর পর লাইন করে বসিয়ে দেয়া সম্ভব। অর্থাৎ পরমাণুর ব্যাস এক সেন্টিমেটারের দশ কোটি ভাগ মাত্র। অবশ্য, সব পরমাণুই যে সমান আয়তনের, তা নয়। তবে পার্থক্যটা নগণ্য। কিন্তু ভরের বেলায় এই পার্থক্যটা অবহেলা করা যায় না। এক বস্তুর পরমাণু আর এক বস্তুর পরমাণুর চেয়ে দু' গুণ তিন গুণ চার গুণ, এমন কি আড়াই শ' গুণ পর্যন্ত ভারী হতে পারে। কিন্তু যেহেতু সব জিনিসের পরমাণুই আয়তনে প্রায় সমান, এটা তাহলে স্পষ্টই বোঝা যাচ্ছে যে পরমাণুর অভ্যন্তরে আরো ক্ষুদ্রতর যে পদার্থগুলি রয়েছে সেগুলিই পরমাণুর ওজন এবং অন্যান্য গুণাগুণ নির্ধারণ করে—যেমন, ক্লাশের ফার্স্ট বয় এবং লাস্ট বয়, দুজনের মাথা আয়তনে প্রায় সমান হলেও, আভ্যন্তরিক ঘি-জাতীয় পদার্থের তারতম্যের প্রভাবে একজন ক্লাশের পর ক্লাশ ডিঙিয়ে চলে যায় প্রতি বছর বৃত্তি পেয়ে পেয়ে এবং আর একজন ভিত্তি স্থাপন করে একই ক্লাশে জীবনযাপন করে চিরকাল।

সুতরাং পরমাণুর ভেতরের জিনিসগুলিই আসল। এর মধ্যে ইতিমধ্যে আমরা সন্ধান পেয়েছি ইলেকট্রনের। বিজ্ঞানজগতে তারপর পদার্পণ করে প্রোটন। ইলেকট্রন হাইড্রোজেন পরমাণুর চেয়ে প্রায় দু হাজার ভাগ হাল্কা হলেও, প্রোটনকে মাপজোখ করে দেখা গেল যে এটি হাইড্রোজেনের সমানই ভারী। সুতরাং হাইড্রোজেন পরমাণুর আভ্যন্তরিক চেহারাটা সহজেই নির্ণীত হয়ে গেল—একটি প্রোটন এবং একটি ইলেকট্রন। দুটি অথবা দুই-এর বেশী প্রোটন থাকতে পারে না, কারণ মাত্র একটি প্রোটনই সমগ্র পরমাণুটির ভরের সমান হয়ে যাচ্ছে। অবশ্য, ইলেকট্রনের ভরটা আমরা এখানে হিসেবের মধ্যে ধরছি না যেহেতু সেটা প্রোটনের দু হাজার ভাগের প্রায় এক ভাগ মাত্র। সেইজন্যে একটি ইলেকট্রনকে হাইড্রোজেন পরমাণুর অভ্যন্তরে প্রবেশ করার অনুমতিপত্র দেয়া হয়েছিল। কিন্তু একটি ইলেকট্রনকে এই বিশেষ সুবিধেটা দেয়া মাত্রই অন্যান্য ইলেকট্রনেরা সমবেত-কণ্ঠে বিক্ষোভ শুরু করে দিল—আমরাই বা কেন হাইড্রোজেনের ভেতরে যেতে পারব না? সমগ্র পরমাণুটির ভর বৃদ্ধি পেয়ে যাবে, এই যুক্তি দেখিয়ে আপনি ওদের শান্ত করতে পারবেন না, কারণ ওরা বলবে, যখন দু হাজার ভাগের এক ভাগ গণনার মধ্যে ধরা হয়নি তখন পাঁচ ভাগ, দশ ভাগ, এমন কি পঞ্চাশ ভাগও অবহেলা করা যেতে পারে অনায়াসে। কথাটা সত্যি। ভর-এর তেমন একটা রকমফের হবে না। সুতরাং আপনি হয়তো দয়াপরবশ হয়ে ভাববেন, আহা, যেতে চাইছে, যাক না—এবং গোটা পঞ্চাশেক ইলেকট্রনকে ভেতরে যাবার অনুমতি দিয়ে দেবেন। কিন্তু পরমুহূর্তেই একটা প্রচণ্ড শক খেয়ে যাবেন আপনি—এবং শকটা হবে বৈদ্যুতিক।

এই ইলেকট্রনগুলি ওজনে নিতান্ত হাল্কা হলে কি হবে, বৈদ্যুতিক চার্জের দিক থেকে এরা প্রোটনের সমানই। অর্থাৎ একটি প্রোটনের বৈদ্যুতিক চার্জের মাত্রা যদি এক ধরা হয়, তাহলে একটি ইলেকট্রনেরও তাই হবে। তবে ইলেকট্রনের চার্জ ঋণাত্মক (নেগেটিভ) এবং প্রোটনের ধনাত্মক (পজিটিভ)। দুই-এ মিলে কাটাকুটি করে সমগ্র পরমাণুটিকে চার্জশূন্য করে রাখে। কিন্তু ইলেকট্রনের (অথবা প্রোটনের) সংখ্যাধিক্য হয়ে গেলেই পরমাণুর মধ্যে চার্জ উৎপন্ন হবে আর সেইজন্যেই একটির বেশী ইলেকট্রনকে হাইড্রোজেনের ভেতরে প্রবেশ করতে দেয়া চলে না, কারণ পরমাণু সাধারণভাবে উদাসীনই (নিউট্রাল) থাকতে চায়।

এখন তাহলে হাইড্রোজেন পরমাণুর গঠন সম্বন্ধে একেবারে নিশ্চিন্ত হওয়া গেল—একটি প্রোটন এবং একটি ইলেকট্রন।

এবার পরবর্তী মৌলিক পদার্থ (এলিমেন্ট) হিলিয়াম-এর ভেতরে কি আছে, দেখা যাক। হিলিয়ামের ভর হাইড্রোজেনের চার গুণ। সুতরাং স্বভাবতই এর অভ্যন্তরে চারটি প্রোটন থাকবে (একটি প্রোটনের ভর একটি হাইড্রোজেন পরমাণুর সমান, যেটা আমরা একটু আগেই দেখলাম), এবং এই চারটি প্রোটনের চার মাত্রা ধনাত্মক চার্জকে সামলাতে চারটি ইলেকট্রনেরও প্রয়োজন হবে। অতএব নিয়ম অনুযায়ী হিলিয়ামের গঠন হক, অন্ততঃ হওয়া উচিত—চারটি প্রোটন এবং চারটি ইলেকট্রন। কিন্তু নিয়মটা হিলিয়াম মানল না। গবেষণাগারে পরীক্ষা করে দেখা গেল যে হিলিয়ামের মধ্যে রয়েছে মাত্র দুটি প্রোটন এবং দুটি ইলেকট্রন।

অবশ্য হিলিয়াম যে একইরকম একটা বেয়াদপি করবে সেটা ভালো কথা, কারণ একটি মাত্র জিনিস পরীক্ষা করে কোনও নিয়ম প্রতিষ্ঠিত করা যায় না। খুব বেশী না হলেও, অন্ততঃ পাঁচ-সাতটা বস্তু ঘাঁটাঘাঁটি করা দরকার। যাই হোক, এখানে নিয়মের গলদটা খুঁজে বার করলেন রাদারফোর্ড। বস্তুতঃ, পরমাণুবিজ্ঞানের যে আজ এতখানি উন্নতি হয়েছে তার মূলে রয়েছে রাদারফোর্ডের যুগান্তকারী অবদান, এবং সেই সঙ্গে ডেনমার্কের বৈজ্ঞানিক নীলস্ বোরের অমূল্য গবেষণা। ইউরোপের দুটি ভিন্নদেশের এই দুই দিকপাল বিজ্ঞানীর মধ্যে হৃদ্যতাও ছিল যথেষ্ট। রাদারফোর্ডের পুরো নাম ছিল 'আর্নেস্ট রাদারফোর্ড'। নীলস্ বোর তাঁর পুত্রের নাম রাখলেন আর্নেস্ট, যাতে এই হৃদ্যতাটা চিরস্থায়ী হয়। যাই হোক পরমাণু-বিজ্ঞানীদের হৃদয়ের কাহিনী ছেড়ে পরমাণুর হৃদয়েই ফিরে আসা যাক আবার।

পরমাণুর অভ্যন্তরে ইলেকট্রন এবং প্রোটনের অস্তিত্ব এবং তাদের ভর নির্ণয় করবার পর জে জে থমসন ১৯০৪ সালে পরমাণুর একটা নমুনা (মডেল) খাড়া করলেন যেটা দেখতে অনেকটা তরমুজের মতো হল। তরমুজের মধ্যে শাঁসটা সমানভাবে ছড়িয়ে সমস্ত স্থানটা অধিকার করে থাকে এবং বিচিগুলি এই শাঁসের মাঝখানে ভেসে বেড়ায় এদিক ওদিক। থমসনের মতে ইলেকট্রনগুলি এইরকম এদিক ওদিক ভেসে বেড়ায় এবং প্রোটনগুলি দু হাজার গুণ ভারী হওয়ার দরুণ, তরমুজের শাঁসের মতো সমানভাবে ছড়িয়ে পরমাণুর অভ্যন্তরে সমস্ত স্থানটাই প্রায় অধিকার করে থাকে।

থমসনের প্রস্তাবিত নমুনাটি কতদূর সত্যি সেটাই যাচাই করার উদ্দেশ্যে ১৯১১ সালে রাদারফোর্ড একটি এক্সপেরিমেন্ট করলেন। পরমাণুবিজ্ঞানের এই বিখ্যাত এক্সপেরিমেন্টটির নাম আলফা কণিকা বিক্ষেপণ (স্ক্যাটারিং অফ আলফা পার্টিকলস)। আলফা কণিকা জিনিসটা আসলে কি, সেটা পরে আমরা বিশদভাবে দেখব। আপাততঃ শুধু এইটুকু জেনে রাখলেই চলবে যে এগুলি হচ্ছে অত্যন্ত বেগবান ধনাত্মক চার্জবাহী কণিকা, এবং ওজনে প্রোটনের প্রায় চারগুণ।

এবার আমাদের একবার আফ্রিকার গভীর জঙ্গলে ঘুরে আসতে হবে, না হলে রাদারফোর্ডের এক্সপেরিমেন্টের মর্মটা ঠিক উপলব্ধি করা যাবে না। সেই গভীর বনের মধ্যে একপাল হাতী মনের আনন্দে ঘুরে বেড়াচ্ছে। বন যখন, তখন মশাও নিশ্চয় থাকবে। মশারাও বনের আনন্দে বনের মধ্যে ভেসে বেড়াচ্ছে সেখানে খুশী। এই মশাগুলি হচ্ছে থমসনের ইলেকট্রন, এবং ঐ বিশাল হাতীগুলি প্রোটন। অবশ্য হাতীরা মশার চেয়ে দু' হাজার গুণের (প্রোটন ইলেকট্রনের ভরের অনুপাত) অনেক বেশী ভারী, কিন্তু তা হলেও এদের দিয়ে আমাদের কাজ বেশ ভালভাবেই চলে যাবে। এবার আরো প্রকাণ্ড একদল হাতী বাইরে থেকে লাইন করে বনের মধ্যে ছুটে এল সবেগে। এই আগন্তুক হাতীর দলটি হল রাদারফোর্ডের আলফা কণিকা স্রোত। মশার দল এই নবাগত হাতীদের কিছুই করতে পারবে না। হাতীরাও ঐ ক্ষুদ্র প্রাণীদের মোটেই গ্রাহ্য করবে না, কারণ মশার সঙ্গে ধাক্কা লাগলে মশার যাই হোক না কেন, হাতীর কিছুই হবে না। কিন্তু হাতীর সঙ্গে হাতীর ধাক্কা লাগলে দুজনেরই আহত হবার সম্ভাবনা রয়েছে বিশেষ. একজন যখন সবেগে ছুটে আসছে। রাদারফোর্ডের

হাতীর দলটা তাই বনের মধ্যে একটা থম্পসনের হাতীর সামনে পড়লেই একটু পাশ কাটিয়ে যাবে, যাতে সজোরে ধাক্কাটা না লাগে। কিন্তু নমুনা অনুযায়ী থম্পসনের হাতী বনের প্রায় সর্বত্রই ছড়িয়ে রয়েছে। অবশ্য, থম্পসনের হাতীগুলো আকারে প্রায় ...ার ভাগ ছোট। সেইভাবে রাদারফোর্ডের হাতীরা শুধু সামান্য একটু বেঁকে যাবে, ...জনে যখন অতি কাছাকাছি এসে পড়বে। ইলেকট্রনের গন্ডী পেরিয়ে পরমাণুর মধ্যে প্রবেশ করার পর আলফা কণিকাগুলিও ঠিক এইভাবে সামান্য একটু পাশ কাটিয়ে যাবে আভ্যন্তরিক প্রোটনের সামনে পড়লেই। অবশ্য, ভয়টা এখানে আহত হবার জন্যে নয়। যেহেতু আলফা কণিকা এবং প্রোটন দুজনেই ধনাত্মক চার্জবাহী, তাদের মধ্যে একটা বিকর্ষণ (রিপালশন) স্বভাবতই সৃষ্টি হবে যার ফলে আগন্তুক আলফা কণিকাগুলি পথ পরিবর্তন করে চারদিকে বিক্ষিপ্ত (স্ক্যাটারিং) হয়ে পড়বে।

কিন্তু অ্যালিউমিনিয়াম (প্রোটন সংখ্যা ...র)-এর মধ্যে দিয়ে আলফা কণিকা স্রোত ...ঠিয়ে রাদারফোর্ড বার বার পরীক্ষা করে ...খলেন যে যতটা সরে যাওয়া উচিত, আলফা কণিকাগুলি তার চেয়ে অনেক বেশী ...রিমাণে বিক্ষিপ্ত হয়ে যাচ্ছে। এমন কি, ...নও কোনও ক্ষেত্রে তারা একেবারে ...ল্টোদিকে ফিরে আসছে ধাক্কা খেয়ে। ...মনটা কেন হচ্ছে, সেটা অনুসন্ধানের ...র্বে আমাদের মনে রাখতে হবে যে আলফা কণিকা প্রোটনের চেয়ে প্রায় চারগুণ ...রী। এই ভারী জিনিসটাকে এতখানি ...্যুত করা নিশ্চয় একটি মাত্র প্রোটনের ...রা সম্ভব নয়। সুতরাং রাদারফোর্ড ...ন্ত করলেন যে, অ্যালিউমিনিয়ামের ...রটি প্রোটনের মধ্যে দেশাত্মবোধ জেগেছে। ...র আর দলাদলি করে তরমুজের শাঁসের ...সব জায়গায় ছড়িয়ে নেই। ঐক্যবদ্ধ ...ঐ তেরটি প্রোটন এখন পরমাণুর ...স্থলেই অবস্থান করছে, আর ঐ তেরটি ...টনের সমবেত তের মাত্রা ধনাত্মক চার্জের ...াবেই আলফা কণিকাগুলি বিক্ষিপ্ত হয়ে ...চ্ছে অতখানি করে। তাছাড়া, এই ...ক্ষেপণটা প্রত্যেকটি আলফা কণিকার ...ত্রে কিন্তু হচ্ছে না। যেগুলি কেন্দ্রের ...ত কাছাকাছি এসে পড়ছে তারাই ছিটকে ...ল যাচ্ছে শুধু। সুতরাং প্রোটনগুলি ...মাণুর কেন্দ্রস্থলেই অবস্থান করছে ...ঃসন্দেহে। আবার কোলম্ব-এর বৈদ্যুতিক ...-এর নিয়ম অনুযায়ী হিসেব করলে দেখা ...য় যে, আপতিত আলফা কণিকার এত-...ন বিচ্যুতির জন্যে পরমাণুর অভ্যন্তরে ...স্ত ধনাত্মক বৈদ্যুতিক চার্জ (সুতরাং সব ...টি প্রোটন) মাত্র এক সেন্টিমিটারের লক্ষ ...গের কোটি ভাগ ব্যাসবিশিষ্ট গোলকের ...ধ্য অবস্থিত থাকা দরকার! কিন্তু আমরা ...খেছিলাম যে পরমাণুর ব্যাস এক সেন্টি-...টারের দশ কোটি ভাগ মাত্র। সুতরাং, ...টই দেখা যাচ্ছে যে, কেন্দ্রস্থিত প্রোটন-...ষ্টি সমগ্র পরমাণুর চেয়ে প্রায় দশ হাজার ...গ ছোট!

এ যেন একটা ক্ষুদ্রতার প্রতিযোগিতা চলছে! কে কত ছোট হতে পারে। যে পরমাণু চোখে দেখা যায় না, সর্বাপেক্ষা শক্তিশালী অণুবীক্ষণ যন্ত্রও যার কাছে পরাজিত, সেই পরমাণুর চেয়েও দশ হাজার ভাগ ছোট! তাহলে পরমাণুর কেন্দ্রটি কতটুকু?

কিন্তু এই অতি ক্ষুদ্র কেন্দ্রের মধ্যেই পুঞ্জীভূত হয়ে রয়েছে পরমাণুর সমস্ত ভর, কারণ বাইরের ইলেকট্রনগুলি ওজনে নেহাৎই নগণ্য। আর অন্তর্বর্তী এই দশ হাজার গুণ স্থানটা একেবারে শূন্য।

এই হচ্ছে রাদারফোর্ডের পরমাণুর নমুনা। কেন্দ্রস্থলে সবক'টি প্রোটন গাদা-গাদি করে রয়েছে আর বাইরের দিকে সমান সংখ্যক ইলেকট্রন বৃত্ত অথবা উপবৃত্তাকারে (ইলিপটিক্যাল) ঘুরে বেড়াচ্ছে, এবং পর-মাণুর যাবতীয় ভর ঐ কেন্দ্রটির (নিউ-ক্লিয়াস)-এর মধ্যে পুঞ্জীভূত হয়ে রয়েছে। অবশিষ্ট সমস্তটা একটা বিশাল শূন্য-স্থান।

এই নমুনাটা প্রায় পুরোপুরিই আমাদের সৌরমন্ডলের সঙ্গে মিলে যাচ্ছে। সূর্য এখানে কেন্দ্রধর এবং গ্রহগুলো ইলেকট্রন। সূর্যের ভর সমগ্র সৌরমন্ডলের ভরের শতকরা ৯৯ দশমিক ৮৭ ভাগ। কেন্দ্রধরের ভর সমগ্র পরমাণুর ভরের শত-করা ৯৯ দশমিক ৯৭ ভাগ। আবার গ্রহ-গুলির ব্যাস তাদের পারস্পরিক দূরত্বের তুলনায় কয়েক হাজার ভাগ ছোট। অর্থাৎ, অন্তর্বর্তী কয়েক হাজার গুণ স্থানটা শূন্য—ঠিক যে জিনিসটা পরমাণুর অভ্যন্তরে রাদারফোর্ড লক্ষ্য করেছিলেন।

অতিবৃহৎ সৌরমন্ডলের সঙ্গে অতি-ক্ষুদ্র পরমাণুর এই সাদৃশ্যটা সত্যিই আশ্চর্যজনক! কিন্তু বিস্ময়ের ভাবটা কেটে যায় যখন আমরা বিশ্বাস করি যে এই মহাবিশ্বের সবকিছুই একই হাতের তৈরী। সেইজন্যে, থম্পসন পরিকল্পিত পরমাণুর নমুনাটা যে ভুল এবং রাদারফোর্ডের নমুনাটাই যে অভ্রান্ত, তার স্বপক্ষে বিজ্ঞানের বিভিন্ন এক্সপেরিমেন্ট করে এবং শক্ত শক্ত অঙ্ক কষে যে সমস্ত প্রমাণ খাড়া করা হয়েছে, তার চেয়ে অনেক বেশী শক্তি-শালী যুক্তি বোধহয় সৌরমন্ডলের সঙ্গে এই বিস্ময়কর সাদৃশ্যটা। সবই একই হাতের তৈরী।

পরমাণুর আভ্যন্তরিক কাঠামোটা তাহলে এখন সন্দেহাতীতরূপে পাওয়া গেল। কেন্দ্রস্থলে সবক'টি প্রোটন গাদাগাদি করে রয়েছে এবং বাইরে ঘুরছে সমান সংখ্যক ইলেকট্রন। এবার আমরা সেই হিলিয়াম পরমাণুর গলদটা কোথায় ছিল, সেটা অনায়াসেই বার করে ফেলতে পারব।

আমরা দেখেছিলাম যে হিলিয়ামের ভর হাইড্রোজেনের চারগুণ। সুতরাং চারটি প্রোটন এর মধ্যে থাকবে ওজনটা ঠিক রাখার জন্যে—এই ছিল আমাদের সিদ্ধান্ত। কিন্তু এখন রাদারফোর্ডের নমুনা অনুযায়ী এই চারটি প্রোটনকে কেন্দ্রস্থলে একেবারে গাদাগাদি করে অতিস্বল্প পরিমাণ স্থানের মধ্যে অবস্থান করতে হবে।

কিন্তু প্রশ্নটা হচ্ছে, প্রোটনরা এই আদেশটি মানবে কেন? প্রত্যেকটি প্রোটনের ওজন সমান এবং প্রত্যেকটি প্রোটনের মধ্যেই এক মাত্রা করে ধনাত্মক চার্জ বর্তমান রয়েছে। আমরা জানি যে একই ধরনের চার্জ (এখানে ধনাত্মক) বিকর্ষণের সৃষ্টি করে। যেখানে বিকর্ষণ, সেখানে একসঙ্গে থাকার প্রশ্নই ওঠে না। কিন্তু রাদারফোর্ডের নমুনা (যেটা আমরা দেখলাম সবদিক থেকেই অভ্রান্ত) অনুযায়ী প্রোটনগুলিকে শুধু যে একসঙ্গে থাকতে হবে, তাই নয়। অত্যন্ত স্বল্পপরিসর স্থানের মধ্যে গাদাগাদি করে অবস্থান করতে হবে। তাহলে?

এই সমস্যা সমাধানের একটা সোজা উপায় হচ্ছে কেন্দ্রস্থিত প্রত্যেকটি প্রোটনের সঙ্গে কতকগুলি করে ইলেকট্রন জুড়ে দেয়া। ইলেকট্রনের নেগেটিভ চার্জের প্রভাবে ধনাত্মক চার্জযুক্ত প্রোটনগুলি আকৃষ্ট হয়ে সুবোধ বালকের মতো যথাস্থানে থাকবে। তাছাড়া, যেহেতু ইলেকট্রনের ভর নগণ্য, এই অতিরিক্ত ইলেকট্রনগুলির অনুপ্রবেশের ফলে হিলিয়াম পরমাণুর সামগ্রিক ভরের তেমন একটা কোনও তারতম্য ঘটবে না।

কিন্তু এই যুক্তি খাটল না, কারণ সামগ্রিক ভরের পরিবর্তন না ঘটলেও, এই আগন্তুক ইলেকট্রনগুলি বৈদ্যুতিক চার্জ প্রচুর বাড়িয়ে দেবে যার ফলে পরমাণুটির সামগ্রিক চার্জ ঋণাত্মক হয়ে যাবে। এটা সম্ভব নয়, কারণ পরমাণু সর্বদা উদাসীনই থাকতে চায়।

সুতরাং ডাক পড়ল এমন ধরনের জিনিসের যার সামগ্রিক চার্জের হ্রাস বৃদ্ধি করবে না। প্রোটনগুলিকে কেন্দ্রস্থলে ঐক্যবদ্ধ করে রাখবে, আবার তাদের সঙ্গে মিলেমিশে সমগ্র পরমাণুটির ভরেরও কোনও পরিবর্তন ঘটাবে না। এইরকম একটি অব-পারমাণবিক কণিকা (সাবঅ্যাটমিক পার্টিকল) কল্পনা করে রাদারফোর্ড তাঁর পরমাণু সংগঠন তত্ত্ব (রাদারফোর্ডস থিয়োরী অফ অ্যাটমিক স্ট্রাকচার) পেশ করেন, যার ফলে মৌলিক পদার্থের পরমাণুর আভ্যন্তরিক সংগঠনের সমস্ত সমস্যার সুন্দর সমাধান হয়ে যায়। কিন্তু কল্পনা করা এক, আর হাতকলমে তার অস্তিত্ব প্রমাণ করা অন্য জিনিস। তাই খোঁজ খোঁজ পড়ে গেল। সবাই মিলে খুঁজতে শুরু করে দিলেন রাদারফোর্ডের এই অত্যাশ্চর্য কণিকা যার মধ্যে একাধারে এতগুলি গুণ বর্তমান রয়েছে। শেষপর্যন্ত বৈজ্ঞানিক স্যাডউইক এটি আবিষ্কার করেন ১৯৩২ সালে।

১৯৩২ সালে? রাদারফোর্ড এ-সম্বন্ধে প্রথম এক্সপেরিমেন্ট করেছিলেন—তাঁর সেই বিখ্যাত আলফা কণিকা এক্সপেরিমেন্ট—১৯১১ সালে, এবং ১৯২০ সালের মধ্যেই রাদারফোর্ড ঘোষণা করে দিয়েছিলেন যে এইরকম একটি কণিকার অস্তিত্ব থাকতেই হবে পরমাণুর অভ্যন্তরে। কিন্তু সেটা গবেষণাগারে ধরা পড়ল ১৯৩২ সালে,
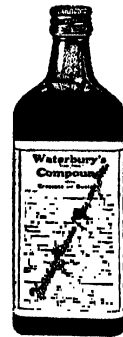
...ং সুদীর্ঘ বারো বছর লেগে গেল জিনিসটা আবিষ্কার করতে! এত দেরী হল সেটা বুঝতে হলে আফ্রিকার সেই ...ীর বন থেকে আমাদের ফিরে আসতে ... এবার কলকাতার বিধানসভায়। ...ানে তখন একটা জোরালো বিতর্ক ...ছে, ধরা যাক, খাদ্যনীতির ওপর। ...কার পক্ষের সদস্যগণ সজোরে বক্তৃতা ... যাচ্ছেন খাদ্যনীতির ওপর। ...রাধীরাও কম যান না। তাঁরা প্রতিবাদ ... চলেছেন সমানে এবং সশব্দে। একদল ...ছেন স্বপক্ষে এবং আর একদল বিপক্ষে। ...ই হচ্ছেন যথাক্রমে প্রোটন ও ইলেকট্রন। ...দের অতি সহজেই চেনা যায়, কারণ হয় ... বক্তৃতা করছেন নয়তো টেবিল চাপড়ে ...নাহ অথবা বাধা দিচ্ছেন। কিন্তু আরো ... সদস্য এই বিধানসভাতেই উপস্থিত ...ছেন যাঁরা—কিছুই করছেন না। ...তাও দিচ্ছেন না, টেবিলও চাপড়াচ্ছেন চুপচাপ বসে আছেন নিজেদের চেয়ারে। ... এঁদের সন্ধান পেতে দেরী হয়। ডামা-...লের মাঝখানে এঁরা চাপা পড়ে যান, ... এঁরা নীরব। কোন কিছুতেই এঁদের ...াহ নেই। খাদ্যনীতি, এমনকি খাদ্য না ...লেও বোধহয় এঁরা বিচলিত হবেন না। ... সম্পূর্ণ উদাসীন, এবং এঁরাই হচ্ছেন ...রফোর্ডের সেই কল্পিত কণিকা। ...ূর্ণ উদাসীন বলেই এদের সন্ধান পেতে সময় লেগেছিল সাডউইকের।

এই নতুন কণিকাগুলির নাম দেয়া হল ...ট্রন। এদের কোনও চার্জ নেই, সুতরাং ...ৈতিক দিক থেকে এরা উদাসীন ...ট্র্যাল—আর সেইজন্যেই নামকরণ হল ...ট্রন)। চার্জ না থাকলেও, ওজনে কিন্তু ... গেল যে এরা প্রোটনের সমানই। নিউট্রনকে রাদারফোর্ড তারপর একেবারে ...ণুর কেন্দ্রে অধিষ্ঠিত করে দিলেন, আর ...এই সব জটিলতা দূর হয়ে গেল। ...য়ামের কেন্দ্রে রাদারফোর্ড সরবরাহ ...লেন দুটো নিউট্রন, এবং আমাদের পূর্বেকার চারটে প্রোটন থেকে দুটো ...য় নিলেন। অর্থাৎ, হিলিয়ামের কেন্দ্র-... রইল এখন দুটো প্রোটন এবং দুটো ...ন মাত্র। নিউট্রনে কোনও চার্জ নেই ... প্রোটনে এক মাত্রা করে ধনাত্মক চার্জ ...ন। সুতরাং একটি প্রোটন অনায়াসে ... নিউট্রনকে আঁকড়ে ধরে রইল। ...ীয় প্রোটনটিও তক্ষুনি মহাজনপন্থা ...রণ করে দ্বিতীয় নিউট্রনটির সঙ্গে ...ড়া বাঁধল। এইভাবে নিউট্রন-প্রোটন ...বেঁধে ওরা কেন্দ্রস্থলে বসবাস করতে ... করে দিল মহানন্দে। প্রোটনগুলি ... আর বহির্মুখী নয়, নিউট্রনের ...। তাছাড়া, ভরের দিক থেকেও হিলি... ... কোনও তারতম্য হল না, কারণ ...স্থিত দুটি প্রোটন এবং দুটি নিউট্রন হিলিয়ামকে যথাযথ হাইড্রোজেনের ...ণই ভারী করে তুলল। আবার, সমগ্র ...দুটিই চার্জশূন্যই রইল, যেহেতু ...নের কোন চার্জ নেই এবং কেন্দ্রের প্রোটনের দুই মাত্রা ধনাত্মক চার্জ

বাইরের ঘূর্ণায়মান দুটি ইলেকট্রনের দুই মাত্রা ঋণাত্মক চার্জকে সামলে নিচ্ছে।

সুতরাং সমস্ত সমস্যার সুন্দর সমাধান হয়ে গেল। এইভাবে কেন্দ্রের মধ্যে নিউট্রন সরবরাহ করে করে রাদারফোর্ড বিভিন্ন মৌলিক পদার্থের পরমাণুর কাঠামোর সঠিক চিত্রটা ফুটিয়ে তুললেন, যার ওপর নির্ভর করে ভবিষ্যতের বিজ্ঞানীরা এগিয়ে যেতে সক্ষম হলেন নিঃশঙ্কচিত্তে।

একমাত্র শুধু হাইড্রোজেনের মধ্যেই কোনও নিউট্রন অনুপ্রবেশ করাবার প্রয়োজন হল না। মহাবিশ্বের এই সর্বাপেক্ষা হাল্কা পদার্থটি তাই আজো অদ্বিতীয়।

অবশ্য, ইলেকট্রন প্রোটন এবং নিউট্রন ছাড়াও আরও অনেক অবপারমাণবিক কণিকা এ পর্যন্ত আবিষ্কৃত হয়েছে, এবং হচ্ছেও। এদের মধ্যে আছে পজিট্রন মেসন অ্যান্টিপ্রোটন, নিউট্রিনো ইত্যাদি আরো প্রায় কুড়িটি। কিন্তু এতসব জানার দরকার আমাদের নেই। তাছাড়া, এই সমস্ত কণিকার অধিকাংশই ক্ষণস্থায়ী। সুপ্রতিষ্ঠ তিনটি কণিকা, ইলেকট্রন, প্রোটন এবং নিউট্রন দিয়ে পরমাণু কিভাবে গঠিত হয়েছে তার একটা সুস্পষ্ট ধারণা—যেটা আমরা রাদারফোর্ডের তত্ত্ব থেকে পেলাম—থাকলেই পরমাণু বিচূর্ণ করে পারমাণবিক শক্তি সংগ্রহ করা সম্ভব।

(৩)

কিন্তু কোনও পরিকল্পনায় হাত দেবার পূর্বে ফল সম্বন্ধে নিশ্চিত হওয়া দরকার, নাহলে এককাঁড়ি টাকা খরচ করে এবং দিনের পর দিন ভূতের মতো খেটে পরিণামে হয়তো মাথার চুল ছিঁড়তে হবে শুধু। আমরা যে সেই গোড়া থেকে বলে আসছি, পরমাণু বিচূর্ণ করে প্রচুর শক্তি অর্জন করা সম্ভব, এ-সম্বন্ধে আমরা এতখানি নিশ্চিত হলাম কি করে? পরমাণুর মধ্যে যে বিপুল শক্তি-ভাণ্ডার লুক্কায়িত রয়েছে, সে খবরটা আমাদের কানে কে পৌঁছে দিল?

এই সংবাদটি আমরা পেলাম দুটি বিভিন্ন উৎস থেকে। তাদের মধ্যে একজন হচ্ছেন সর্বকালের শ্রেষ্ঠ বৈজ্ঞানিক আলবার্ট আইনস্টাইন এবং দ্বিতীয়টি হচ্ছে একটা পদার্থ—রেডিওঅ্যাকটিভ পদার্থ।

বছর পাঁচেক আগে যখন আগরতলায় ছিলাম তখন সেখানে এক ভদ্রলোক একটি নতুন রেডিও সেট কেনেন। জিনিসটা কিনে অবধি তিনি খুব হৈ-চৈ শুরু করে দিলেন। একে ডাকছেন ওকে ডাকছেন, চাবি ঘুরিয়ে-ঘুরিয়ে গান-বাজনা শোনাচ্ছেন, দ্রুত পায়ে হাঁটাহাঁটি করছেন, লম্বা-লম্বা বাঁশ জোগাড় করে ছাদের ওপর এরিয়াল খাটাচ্ছেন, ইত্যাদি। দেখে-শুনে পাড়া-পড়শীরা বলল, রেডিওটা কেনার পর থেকেই ভদ্রলোক রেডিওঅ্যাকটিভ হয়ে গেছেন।

কিন্তু আমরা যে রেডিওঅ্যাকটিভ পদার্থের কথা বলছি, তার অর্থ অন্য। এর জন্যে কোনও রেডিও কেনার প্রয়োজন হয় না। রেডিও সেটের সঙ্গেও এর কোনও সম্পর্ক নেই। কিন্তু সেই যে সেই নিউট্রন কণাগুলি রাদারফোর্ড ঢুকিয়ে দিয়েছিলেন পরমাণুর অভ্যন্তরে তাদের সঙ্গে এর একটা সম্পর্ক রয়েছে।

হাইড্রোজেন পরমাণুর মধ্যে কোনও নিউট্রন নেই, কারণ সেখানে প্রোটন রয়েছে মাত্র একটি। কিন্তু প্রোটনের সংখ্যা একাধিক হয়ে গেলেই তাদের ঐক্যবদ্ধ করে রাখতে ডাক পড়ে নিউট্রনের, যেমন হিলিয়ামের ক্ষেত্রে আমরা দেখেছিলাম দুটি নিউট্রন কেন্দ্রস্থিত দুটি প্রোটনকে সামলাচ্ছে। এর ঠিক পরের মৌলিক পদার্থটি হচ্ছে লিথিয়াম। এর মধ্যে আছে তিনটে প্রোটন এবং তাদের সামলাতে প্রয়োজন হয়েছে তিনটি নিউ-ট্রনের। প্রসঙ্গত উল্লেখ করে রাখা যেতে পারে যে, হাইড্রোজেন এবং হিলিয়াম গ্যাস হলেও, লিথিয়াম কিন্তু একটা কঠিন পদার্থ। অর্থাৎ একটি মাত্র প্রোটন বৃদ্ধি পাওয়াতেই গ্যাস থেকে একেবারে কঠিন পদার্থে রূপান্তরিত হয়ে গেল জিনিসটা। এর পরে, আর একটু ওপরে উঠে আমরা দেখতে পাই যে কারবনের মধ্যে রয়েছে ছ'টা প্রোটন এবং ছ'টা নিউট্রন, নাইট্রোজেনের মধ্যে সাতটা করে, অক্সিজেনের মধ্যে আটটা করে, নিয়ন-এর মধ্যে দশটা করে, সালফারের মধ্যে ষোলটা করে, এবং ক্যালসিয়াম পরমাণুর অভ্যন্তরে কুড়িটা প্রোটনকে সামলাচ্ছে কুড়িটা নিউট্রন।

কিন্তু আমাদের ভুলে গেলে চলবে না যে, ওজনে প্রোটনের সমান হলেও নিউট্রনের অঙ্গে কোনও চার্জ নেই। ইলেকট্রনের মত যদি নিউট্রনেরও এক মাত্রা করে ঋণাত্মক চার্জ থাকত তাহলে অবশ্য অবস্থাটা অন্য রকম হত। কিন্তু সেটা না থাকার দরুণ প্রোটনকে ধরে রাখার ক্ষমতাটা এই চার্জ-শূন্য নিউট্রনের সীমাবদ্ধ। সেইজন্যে পরমাণুর মধ্যে প্রোটনের সংখ্যা কুড়ির বেশী হয়ে গেলেই তখন আর সমানসংখ্যক নিউট্রন দিয়ে কাজ চলে না। যেমন, লোহার মধ্যে আছে ছাব্বিশটা প্রোটন। কিন্তু তাদের ধরে রাখতে ছাব্বিশটা নিউট্রনই যথেষ্ট নয়। অন্ততঃ আটাশটা চাই। অর্থাৎ, দুটো বেশী। তামার পরমাণু, যার মধ্যে রয়েছে উনত্রিশটা প্রোটন সেখানে প্রয়োজন হয় অন্ততঃ চৌত্রিশটা নিউট্রনের, অর্থাৎ পাঁচটা বেশী। এইভাবে প্রোটনের সংখ্যা যত বেড়ে যায় অর্থাৎ পদার্থ যত ভারী হতে থাকে, পরমাণুকে সুপ্রতিষ্ঠ (স্টেবল) করে রাখার জন্যে প্রয়োজনীয় অতিরিক্ত নিউট্রনের সংখ্যাও বাড়তে থাকে তত। আরো দু-একটা দৃষ্টান্ত নেয়া যাক। টিনের প্রোটন সংখ্যা পঞ্চাশ। এখানে প্রয়োজন অন্ততঃ বাষট্টিটা নিউট্রন, অর্থাৎ অতিরিক্ত বারোটা। সোনার প্রোটন সংখ্যা উনআশি। এখানে ডাক পড়ে অন্ততঃ অতিরিক্ত বারোটা নিউ-ট্রনের। পারা সোনার চেয়েও ভারী। সেখানে রয়েছে আশিটা প্রোটন এবং তাদের সামলাতে প্রয়োজন হয় একশ কুড়িটা নিউট্রন অর্থাৎ অতিরিক্ত চল্লিশটা। এইভাবে অবস্থাটা ক্রমেই শোচনীয় হতে থাকে এবং

আমরা যখন আমাদের দৈনন্দিন জীবনের সবচেয়ে ভারী পদার্থ সীসায় গিয়ে পৌঁছুই তখন দেখা যায় সীসার বিরাশিটি প্রোটনকে সামলাতে প্রয়োজন হয় একশ' বাইশ থেকে একশ' ছাব্বিশটা নিউট্রনের।

কিন্তু এর পরে নিউট্রন দিয়ে আর কাজ চলে না। নিউট্রনের ক্ষমতা এইখানেই শেষ হয়ে যায়। অর্থাৎ কোনও জিনিসের মধ্যে প্রোটনের সংখ্যা যখন বিরাশির বেশী হয়ে যায়—সোজা ভাষায় যাকে বলা যেতে পারে, জিনিসটা যখন সীসের চেয়েও ভারী হয়ে যায়—তখন আর তাকে কিছুতেই সুপ্রতিষ্ঠ করে রাখা যায় না। এই সব অতিভারী পদার্থের পরমাণুর কেন্দ্রস্থলে যতই নিউট্রন সরবরাহ করা যাক না কেন, তাদের পরমাণু কখনোই সুপ্রতিষ্ঠ হবে না। পরমাণুর কাঠামো ভেঙে পড়বে। কিন্তু এর জন্যে কোনও রূপ বিস্ফোরণ ঘটে না। পরমাণুর কাঠামোটা খুব ধীরে-ধীরে নীরবে ভাঙতে থাকে ক্রমাগত।

এই সব অতিভারী অপ্রতিষ্ঠ (আন-স্টেবল) পদার্থগুলিকেই বলা হয় তেজস্ক্রিয় (রেডিওঅ্যাকটিভ) পদার্থ।

১৮৯৬ সালে প্রথম তেজস্ক্রিয় পদার্থ আবিষ্কার করেন ফরাসী বৈজ্ঞানিক বেকারেল। এই পদার্থটির নাম ইউরেনিয়াম এবং এইটেই হচ্ছে সবচেয়ে ভারী প্রাকৃতিক মৌলিক পদার্থ। এর পর অবশ্য আরো কয়েকটি তেজস্ক্রিয় পদার্থের সন্ধান পাওয়া গেছে এবং হয়ত আরো যাবে। এদের মধ্যে সবচেয়ে বিখ্যাত হচ্ছে মাদাম কুরী আবিষ্কৃত রেডিয়াম।

আভ্যন্তরীণ পরমাণু ক্রমাগত গুঁড়িয়ে যাওয়ার জন্যে এই অপ্রতিষ্ঠ তেজস্ক্রিয় পদার্থ-গুলির মধ্যে থেকে একরকম তেজ নির্গত হতে থাকে সর্বদা। ইউরেনিয়ামের সামনে চুম্বক রেখে পরীক্ষা করে রাদারফোর্ড দেখলেন যে, তিন রকম রশ্মি আসছে সেখান থেকে। এই রশ্মিগুলির নাম দেয়া হল গ্রীক বর্ণমালার প্রথম তিনটে অক্ষরের সঙ্গে মিলিয়ে—আলফা রশ্মি, বিটা রশ্মি এবং গামা রশ্মি।

আলফা রশ্মির সঙ্গে আমরা আগেই পরিচিত হয়েছিলাম রাদারফোর্ডের সেই বিখ্যাত এক্সপেরিমেন্টের সময়। ইউরেনিয়াম থেকে নির্গত এই আলফা রশ্মিগুলি পরীক্ষা করে দেখা গেছে যে, ওদের মধ্যে রয়েছে দুটি প্রোটন এবং দুটি নিউট্রন। কিন্তু হাইড্রোজেনের ঠিক পরের সেই মৌলিক পদার্থ হিলিয়ামের মধ্যেও এই-রকম দুটি প্রোটন এবং নিউট্রন ঐক্যবদ্ধ হয়ে কেন্দ্রস্থলে অবস্থান করে, আমরা দেখেছিলাম। অর্থাৎ, আলফা কণিকা এবং হিলিয়াম কেন্দ্রধরের মধ্যে কোনওই পার্থক্য নেই। কিন্তু আলফা কণিকা ইউরেনিয়াম থেকে নির্গত হচ্ছে। অর্থাৎ, একটি মৌলিক পদার্থ ইউরেনিয়ামের অভ্যন্তরে রয়েছে আর একটি মৌলিক পদার্থ হিলিয়াম—অনেকটা বাজার থেকে গোটা মাছ কিনে এনে বাড়ীতে *কাটার সময় মাঝে-মাঝে যেমন দু-একটা ছোট মাছের সন্ধান পাওয়া যায় তার পেটের মধ্যে, সেই রকম।*

মৌলিক পদার্থের মধ্যে সেই পদার্থ ছাড়া আর কিছুই যে থাকতে পারে না, বিজ্ঞানীদের অনেকদিনের এই প্রতিষ্ঠিত ধারণাটা ভেঙে দিল আলফা কণিকা। আসলে প্রত্যেকটি পদার্থই হচ্ছে শুধু কতকগুলি প্রোটন ইলেকট্রন এবং নিউট্রনের সমষ্টি মাত্র।—আর কিছুই নয়। যে কোনও পদার্থকে যে কোনও পদার্থে রূপান্তরিত করা যায় এই অবপারমাণবিক কণিকাগুলির হ্রাস বৃদ্ধি করে। পারা থেকে একটি মাত্র প্রোটন সরিয়ে নিলেই সেটা সোনা হয়ে যায়। কোথায় থার্মমিটারের মধ্যে চকচকে মত একটি তরল পদার্থ পারা, আর কোথায় কন্যাদায়গ্রস্ত পিতাদের চিরকালের দুশ্চিন্তা গহনার দোকানের বহুমূল্য সোনা! অথচ তফাৎ শুধু একটি মাত্র প্রোটনের। কিন্তু এই একটি মাত্র প্রোটনকে কেন্দ্রচ্যুত করা যে কতখানি দুঃসাধ্য কাজ তার কিছুটা আভাস আমরা একটু পরেই পাব।

বিজ্ঞানীরা তারপর আলফা কণিকা স্রোতের বেগ পরিমাপ করলেন। দেখা গেল যে, এগুলি প্রায় সেকেণ্ডে ১৮৬০০ মাইল বেগে বেরিয়ে আসছে ইউরেনিয়ামের ভেতর থেকে, অর্থাৎ আলোকের দশ ভাগ বেগে। বিটা কণিকাগুলি (এরা ইলেকট্রন ছাড়া আর কিছুই নয়) নির্গত হচ্ছে আরো নয় গুণ বেগে, অর্থাৎ আলোকের শতকরা নব্বই ভাগ বেগে। গামা রশ্মি অবশ্য পূর্বোক্ত দুটির মত কোনও কণিকা স্রোত নয়। এটি হচ্ছে অত্যন্ত শক্তিশালী এক-রকম আলোকরশ্মি এবং এর বেগ, সুতরাং, আলোকের সমান। অর্থাৎ সেকেণ্ডে ১৮৬০০০ মাইলই হবে।

এখন, এই যে প্রচন্ড বেগে তিন রকম রশ্মি বেরিয়ে আসছে ইউরেনিয়াম থেকে, এর শক্তিটা সরবরাহ করছে কে? আমরা দেখেছি যে, একটা মোটরকে ঘন্টায় সামান্য পঞ্চাশ মাইল বেগে চালাতে হলে কি পরিমাণ শক্তির প্রয়োজন হয়। গ্যালন গ্যালন পেট্রোল পুড়িয়ে তাপশক্তি উৎপন্ন করে সেটাতে গতিশক্তিতে রূপান্তরিত কবার পরই মোটর চলে। সেই তুলনায় ইউ-রেনিয়ামের মধ্যে থেকে রশ্মিগুলি নির্গত হচ্ছে হাজার হাজার গুণ বেগে। কিন্তু তাদের চালাচ্ছে কে? পেট্রোল অথবা কয়লা কিছুই পুড়ছে না এখানে। শক্তিটা তাহলে আসছে কোথা থেকে!

বিজ্ঞানীরা বিস্মিত হয়ে গেলেন তেজস্ক্রিয় পদার্থের এই অভিনব আচরণে। আর শুধু যে এক-আধ ঘন্টার ব্যাপার, তা নয়। দিনের পর দিন মাসের পর মাস বছরের পর বছর, এমন কি শতাব্দীর পর শতাব্দী ইউরেনিয়াম বিকিরণ করে চলেছে এই তিন রকম রশ্মি অবিশ্রান্তভাবে! এ যেন আকাশ থেকে টপাটপ টাকা পড়ার মত, শূন্য থেকে উৎপন্ন হচ্ছে শক্তি! বিজ্ঞানীরা তাই বিস্মিত হয়ে গেলেন, কারণ বহুকালের *পরীক্ষিত এবং প্রতিষ্ঠিত মতবাদ হচ্ছে-শক্তি উৎপন্ন অথবা ধ্বংস করা যায় না।* একটা শক্তিকে অন্য জাতীয় শক্তিতে রূপান্তরিত করা যায়, যেমন তাপ শক্তি গতি শক্তিতে রূপান্তরিত হয়ে মোটর রেল স্টীমার ইত্যাদি চালাচ্ছে, অথবা বৈদ্যুতিক শক্তি প্রথমে তাপ শক্তি এবং পরে আলোক শক্তিতে রূপান্তরিত হয়ে অন্ধকারে আমাদের পথ দেখাচ্ছে। কিন্তু একটা কিছু করতে হবে এর জন্যে। শক্তি আম গাছ থেকে টপ করে পড়বে না কোনও দিন। বস্তুও সেই রকম। একটা বস্তুকে, যেমন এক টুকরো কাঠ, পুড়িয়ে ছাই ধোঁয়া ইত্যাদিতে রূপান্তরিত করা যায়, কিন্তু কাঠের ঐ টুকরোটিকে শূন্য থেকে উৎপন্ন করা যাবে না কোনও দিন। এবং বস্তু ও শক্তির যদি এই হয় রীতিগীতি, তাহলে ইউরেনিয়ামের মধ্যে ঐ বিপুল পরিমাণ শক্তিটা আসছে কোথা থেকে?

এ প্রশ্নের উত্তর দিলেন আইনস্টাইন। সেটা ছিল ১৯০৫ সাল। আইনস্টাইন তখন আপেক্ষিক তত্ত্ব নিয়ে গবেষণা করছিলেন। তিনি বললেন—শক্তি এবং বস্তু অভিন্ন। একটি দ্বিতীয়টির দ্বিতীয় রূপ মাত্র। অর্থাৎ বস্তুকে শক্তিতে রূপান্তরিত করা যায় এবং শক্তিকে বস্তুতে। আর এই শক্তি এবং বস্তুর সমন্বয়টিকেই উৎপন্ন অথবা ধ্বংস করা অসম্ভব। কিন্তু আমরা যদি শক্তি এবং বস্তুকে পৃথক চোখে দেখি, তাহলে তাদের উৎপন্ন অথবা ধ্বংস করা সম্ভব। আর—আইনস্টাইন বললেন — ঠিক সেই জিনিসটাই ঘটে যাচ্ছে ইউরেনিয়ামের মধ্যে নিরন্তর। একটি করে পরমাণু গুঁড়িয়ে যাচ্ছে আর বিপুল পরিমাণ শক্তি উৎপন্ন হচ্ছে প্রতি মুহূর্তে। আইনস্টাইনের হিসেব অনুযায়ী এই শক্তিটা হচ্ছে, বিলুপ্ত বস্তুর ভরকে আলোকের বেগ দিয়ে গুণ করে আবার আলোকের বেগ দিয়ে গুণ করলে যা হয়, তাই। কিন্তু আলোকের বেগ (সেকেণ্ডে ১৮৬০০০ মাইল) জিনিসটা একাই এত বিশাল যে তার বর্গ করলে তো আর রক্ষে নেই! সেইজন্যে যৎসামান্য বস্তুও বিপুল পরিমাণ শক্তি উৎপন্ন করতে সক্ষম। ফলে, ইউরেনিয়ামের নগণ্য একটা পরমাণুই হয়ে উঠছে দৈত্যের মত বলশালী! আবার, ওদিকে সমগ্র ইউরেনিয়ামের তুলনায় তার একটা পরমাণু আকারে এতই অকিঞ্চিৎকর যে, একটা গেল কি এল, সেটা কারুর চোখে পড়ে না। কিন্তু আইনস্টাইনের দিব্যদৃষ্টিতে ধরা পড়ে গেল ঠিক। তাই বৈজ্ঞানিকদের কাছে তেজস্ক্রিয়তা একটা ম্যাজিকের মত মনে হচ্ছিল, যতক্ষণ পর্যন্ত না আইনস্টাইন তাঁদের বুঝিয়ে দিলেন সমস্ত ব্যাপারটা।

তেজস্ক্রিয় পদার্থের এই স্বরূপটা জানার পর আমাদের এখন আর সন্দেহ করার কিছুই রইল না। পরমাণুর মধ্যে শুধু যে শক্তি লুকিয়ে রয়েছে তাই নয়, কি পরিমাণ শক্তি এবং ঠিক কোথায় সেটা অবস্থান করছে, তাও আমরা জানতে পারলাম। এবং সবচেয়ে বড় কথা হচ্ছে

পরমাণু গুঁড়িয়ে যে শক্তি উৎপন্ন করা সম্ভব, সেটা আমরা চোখের সামনেই দেখতে পাচ্ছি। সুতরাং এখন বাকী রইল শুধু পরমাণুটিকে গুঁড়িয়ে ফেলা।

(৪)

সাধারণ হাতুড়ি দিয়ে উনুন ধরাবার কয়লা ভাঙা যায়, সুপুরি টুকরো করা চলে, আবার পেরেক ঠুকতেও হাতুড়ির ডাক পড়ে। কিন্তু বস্তু এর চেয়েও ক্ষুদ্র হয়ে গেলে, সাধারণ হাতুড়ি দিয়ে কাজ চলে না। তখন প্রয়োজন হয় বিশেষ ধরনের হাতুড়ির যার হাতল ছোট এবং মাথাটা হয় অতি সূক্ষ্ম, যাতে করে আঘাতটা চারদিকে বিক্ষিপ্ত না হয়ে গিয়ে নির্দিষ্ট বিন্দু-পরিমাণ স্থানটিতেই পড়ে। পরমাণু ভাঙতেও তাই আমাদের এইরকমই একটা বিশেষ ধরনের অস্ত্র চাই কারণ পরমাণু জিনিসটা আমরা দেখেছি, অসম্ভব রকমের ক্ষুদ্র। এক মিলিমিটার বর্গ স্থানের মধ্যেই প্রায় একশ' লক্ষ কোটি পরমাণু বসবাস করে। সুতরাং হাতুড়ির মাথা আমরা যতই সরু করি না কেন আঘাতটা কোটি কোটি পরমাণুর ওপরে ছড়িয়ে পড়বে নিশ্চয়। ফলে কাজ কিছুই হবে না। তাছাড়া হাতুড়ি অতি ক্ষুদ্র হয়ে যাওয়ার দরুণ, বেশী জোরে আঘাত করাও সম্ভব হবে না। অতএব হাতুড়ি দিয়ে কাজ চলবে না। আমাদের চাই অন্য ধরনের অস্ত্র।

এই অস্ত্রের স্বরূপটা কি হবে, একবার মনে করে দেখে নেয়া যাক। আইনস্টাইন আমাদের বলেছিলেন যে, শক্তি পেতে হলে বস্তুকে বিচূর্ণ করতে হবে। কিন্তু পরমাণুর মধ্যে যা কিছু বস্তু (সুতরাং ভর) আছে, সেটা পুঞ্জীভূত হয়ে রয়েছে ঐ কেন্দ্রধরের মধ্যে। পরমাণুর বাইরের দিকে যে ইলেকট্রনিক ঘুরে বেড়াচ্ছে সেগুলি ওজনে বহাংই নগণ্য।

সুতরাং আমাদের অস্ত্রের প্রথম প্রয়োজনীয়তা হচ্ছে, তার আকার কেন্দ্রধরের সঙ্গে তুলনীয় হবে, এবং তারপর সেটা অতি দ্রুতবেগে ছুটে এসে কেন্দ্রধরকে আঘাত করবে।

সৌভাগ্যবশতঃ ঠিক এইরকম একটি অস্ত্র আমাদের হাতের কাছেই রয়েছে, এবং সেটা হচ্ছে তেজষ্ক্রিয় পদার্থ থেকে নির্গত আলফা এবং বিটা কণিকা স্রোত। আমরা দেখেছি যে, আলফা কণিকা আলোকের শতকরা প্রায় দশ ভাগ বেগে এবং বিটা কণিকা প্রায় নব্বুই ভাগ বেগে নির্গত হচ্ছে। অর্থাৎ আলফা কণিকা অসম্ভব রকমের দ্রুতবেগে (সেকেন্ডে প্রায় ১৮৬০০ মাইল) ধাবিত হলেও বিটা কণিকা আরো ন'গুণ বেগে ছুটেছে। কিন্তু বিটা কণিকা গুলি ইলেকট্রন ছাড়া আর কিছুই নয়, (সেটা আমরা আগেই দেখেছি) সবচেয়ে হাল্কা হাইড্রোজেন কেন্দ্রধরের চেয়েও প্রায় দু হাজার ভাগ হাল্কা। তুলো সে যত জোরেই ছুটে আসুক না কেন, লোহাকে আঘাত করলে লোহার কিছুই হবে না। সুতরাং বিটা কণিকা বাতিল হয়ে গেল। রইল শুধু আলফা।

একটি ধাতুনির্মিত পাত্রের মধ্যে কিছুটা ইউরেনিয়াম রেখে পাত্রটি চারদিক থেকে বন্ধ করে দেওয়া হল। অবশ্য একটি দেয়ালে ছোট্ট একটা ফুটো ছিল। সেই ছিদ্রপথে নির্গত আলফা কণিকা স্রোতটিকে নাইট্রোজেনের ওপর আপতিত করা হল। দেখা গেল নাইট্রোজেন বিভক্ত হয়ে দুটি নতুন পদার্থ সৃষ্টি করেছে!

এইটেই হচ্ছে সর্বপ্রথম মৌলিক পদার্থ যেটা মানুষ অন্য একটি মৌলিক পদার্থের পেট চিরে বার করে আনল। একটি মৌলিক পদার্থ পরিবর্তিত হল আর একটিতে। মানুষের বহুদিনের স্বপ্ন হল সার্থক। রাদারফোর্ড তাঁর এক্সপেরিমেন্টের ফল ঘোষণা করলেন ১৯১৯ সালে।

নাইট্রোজেনকে বিভক্ত করে কিভাবে দুটি বিভিন্ন মৌলিক পদার্থ রাদারফোর্ড তৈরী করলেন, সেটা আমরা সামান্য একটু হিসেব কষে দেখে নিতে পারি। আমরা দেখেছিলাম যে, নাইট্রোজেনের কেন্দ্রস্থলে রয়েছে সাতটা প্রোটন এবং সাতটা নিউট্রন। যে আলফা কণিকাগুলি নাইট্রোজেনকে আঘাত করার জন্যে রাদারফোর্ড নিক্ষেপ করেছিলেন তাদের মধ্যে, আমরা দেখেছি, হিলিয়ামের কেন্দ্রধরের ন্যায় দুটি করে প্রোটন এবং নিউট্রন ছিল। এই দুটি নিউট্রন এবং প্রোটন নাইট্রোজেনের কেন্দ্রের মধ্যে পড়ে নতুন একটা কেন্দ্রধরের সৃষ্টি করল, যার ভেতরে রইল মোট ন'টি প্রোটন এবং ন'টি নিউট্রন। কিন্তু এই নতুন কেন্দ্রধরটি অপ্রতিষ্ঠ (আনস্টেবল)। সুতরাং অচিরেই একটি প্রোটন এখান থেকে বিচ্যুত হয়ে গেল। তখন রইল শুধু আটটি প্রোটন এবং ন'টি নিউট্রন। এই কেন্দ্রধরটি সুপ্রতিষ্ঠ (স্টেবল)। সুতরাং আর কোনও পরিবর্তন হল না, এবং আমরা পেলাম—একদিকে শুধু একটি মাত্র প্রোটন এবং অন্যদিকে আটটি প্রোটন এবং ন'টি নিউট্রন বিশিষ্ট নতুন একটি পদার্থ।

আমরা জানি যে, অক্সিজেনের মধ্যে আছে আটটি প্রোটন এবং আটটি নিউট্রন, কিন্তু এই নতুন পদার্থটির মধ্যে রয়েছে একটি নিউট্রন অতিরিক্ত। সুতরাং এটি অক্সিজেনেরই অন্য একটি রূপ। যখন দুটি পদার্থের মধ্যে সমানসংখ্যক প্রোটন থাকে কিন্তু পার্থক্যটা হয় শুধু নিউট্রনের সংখ্যায়, তাদের বলা হয় সমঘর (আইসোটোপ)। সমঘরের সম্বন্ধে কিছুটা ধারণা এখন থেকেই থাকা ভাল, কারণ ইউরেনিয়াম বিচূর্ণ করার সময় এই জ্ঞানটা আমাদের কাজে লাগবে। একই পদার্থের দুটি সমঘরের পার্থক্য দেখাবার জন্যে তাদের কেন্দ্রস্থিত প্রোটন এবং নিউট্রনের সংখ্যাটা যোগ করে (এই যোগফলটিকে বলা হয় ভর সংখ্যা—ম্যাস নামবার) তাদের নামের পরে লেখা হয়, যেমন এখানে হবে অক্সিজেন-১৬ এবং অক্সিজেন-১৭। সুতরাং আমরা নাইট্রোজেনকে আলফা কণিকা দিয়ে আঘাত করে পেলাম, অক্সিজেন-১৭ এবং হাইড্রোজেন-১।

কিন্তু ব্যাপারটা যতটা মনে হচ্ছে আসলে ততটা সোজা মোটেই নয়। প্রথমতঃ, আলফা কণিক খুবই দামী জিনিস, কারণ ইউরেনিয়াম থোরিয়াম ইত্যাদি তেজষ্ক্রিয় পদার্থ পৃথিবীতে খুব অল্পই পাওয়া যায়। তার ওপর, এই স্বল্পপরিমাণ বস্তুর প্রায় সমস্তটাই অকাজে ব্যয় হয়ে যাচ্ছে কারণ—প্রতি তিন লক্ষ আলফা কণিকার মধ্যে মাত্র একটি লক্ষ্যভেদ করতে সমর্থ হয়! অবশিষ্ট সমস্ত নাইট্রোজেন কেন্দ্রধরের পাশ কাটিয়ে বেরিয়ে যায়। অবশ্য, এক গ্রাম মাত্র ইউরেনিয়ামের মধ্যে প্রতি সেকেন্ডে কয়েক হাজার করে পরমাণু গুঁড়িয়ে গিয়ে প্রচুর আলফা কণিকা উৎপন্ন হচ্ছে। কিন্তু তা সত্ত্বেও, যদি তিন লক্ষ বন্দুকের গুলি লক্ষ্যভ্রষ্ট হবার পর মাত্র একটি করে কৃতকার্য হয়, তাহলে লোকসানের অংকটা কিছুতেই অবহেলা করা যায় না।

এত অধিক সংখ্যক গুলি লক্ষ্যভ্রষ্ট হবার কারণটা অবশ্য আমরা আগেই দেখেছিলাম রাদারফোর্ডের সেই বিখ্যাত আলফা কণিকা বিক্ষেপণ এক্সপেরিমেন্টের সময়, এবং সেই কারণটা হচ্ছে—বিকর্ষণ। নাইট্রোজেনের কেন্দ্রধরের সাত মাত্রা ধনাত্মক চার্জ এবং আলফা কণিকার দু মাত্রা ধনাত্মক চার্জ-এর মধ্যে যে বিকর্ষণটা সৃষ্টি হচ্ছে, সেইটেই আলফা কণিকাগুলিকে সোজাসুজি গিয়ে নাইট্রোজেনের কেন্দ্রধরে আঘাত করতে বাধা দিচ্ছে। ব্যাপারটা আরো প্রকট হয়ে উঠল অপেক্ষাকৃত ভারী বস্তুর ওপর আলফা কণিকাস্রোত যখন নিক্ষিপ্ত হল। ভারী বস্তুর কেন্দ্রস্থলে প্রোটনের সংখ্যা অধিক, সুতরাং ধনাত্মক চার্জের মাত্রাও সেখানে বেশী। ফলে, আলফা কণিকার দু'মাত্রা ধনাত্মক চার্জের ওপর বিকর্ষণটা অপেক্ষাকৃত জোরালো হয়ে উঠল তখন। কিন্তু তা সত্ত্বেও রাদারফোর্ডের গবেষণাগারে দেখা গেল যে দু-একটা আলফা কণিকা তখনো লক্ষ্যভেদ করতে সমর্থ হচ্ছে, কারণ আলফা কণিকার বিশাল বেগের কাছে বিকর্ষণ মাঝে-মধ্যে পরাস্ত হয়ে যাচ্ছে। সেইজন্যে ১৯১৯ সালে নাইট্রোজেন বিদীর্ণ করার পর ১৯১৬ সালের মধ্যে রাদারফোর্ডের সহকর্মীরা আরো প্রায় দশটা মৌলিক পদার্থ রূপান্তরিত করতে সমর্থ হলেন, এবং নাইট্রোজেনের মতো প্রতি ক্ষেত্রেই দেখা গেল যে কেন্দ্রধর আলফা কণিকাটিকে গ্রাস করে নিয়ে একটি করে প্রোটন মুক্ত করে দিচ্ছে। এইভাবে ফসফরাস (চার্জ ১৫) সালফার (চার্জ ১৬) ক্লোরিন (চার্জ ১৭), এমন কি আরগন (চার্জ ১৮) পর্যন্ত বিদীর্ণ করা গেল। তারপর পোটাসিয়াম (চার্জ ১৯)-এর বেলায় বহুকষ্টে অতি অল্পসংখ্যক আলফা কণিকা কেন্দ্রে পৌঁছুতে সমর্থ হল। কিন্তু তারপর আর কিছুই হল না। এইখানেই পূর্ণচ্ছেদ। বস্তু যখন পোটাসিয়ামের

চেয়ে ভারী হয়ে গেল তখন কেন্দ্রধরের সমবেত চার্জ থেকে উৎপন্ন বিকর্ষণটা আলফা কণিকায় বিশাল বেগকে সম্পূর্ণ পরাস্ত করে দিল। একটি কণিকাও আর কেন্দ্রে আঘাত করতে সমর্থ হল না।

সুতরাং ডাক পড়ল অন্য অস্ত্রের। আলফা কণিকার মধ্যে রয়েছে দুটি প্রোটন, অর্থাৎ দুমাত্রা ধনাত্মক চার্জ। এখন, এই চার্জের মাত্রাটা যদি অর্ধেক করে দেয়া যায় তাহলে বিকর্ষণের পরিমাণটাও অর্ধেক হয়ে যাবে, কারণ দুটি ধনাত্মক (অথবা দুটি ঋণাত্মক) চার্জ দ্বারা উৎপন্ন বিকর্ষণ তাদের গুণফলের অনুপাতিক হয়। অতএব আলফা কণিকার পরিবর্তে যদি আমরা কেবল প্রোটনকেই বন্দুকের গুলি হিসেবে ব্যবহার করি তাহলে হয়তো পোটাসিয়ামের চেয়েও ভারী পদার্থ বিদীর্ণ করা সম্ভব হবে।

পরমাণুর কেন্দ্রধরে প্রোটন এবং নিউট্রন একজোট হয়ে বাসা বেঁধে অবস্থান করে। সেই বন্ধন ছিন্ন করে প্রোটনকে বাইরে বার করে আনা দুঃসাধ্য ব্যাপার। এই বিপদ থেকে উদ্ধার করতে এগিয়ে এল আমাদের— সেই অদ্বিতীয় পদার্থ হাইড্রোজেন। হাইড্রোজেনের অভ্যন্তরে রয়েছে মাত্র একটি প্রোটন। নিউট্রন সেখানে অনুপস্থিত। বাইরে চক্রাকারে ঘুরছে কেবল একটি ইলেকট্রন। এই ইলেকট্রনটিকে খসিয়ে দিতে পারলেই আমরা বিশুদ্ধ প্রোটন পেয়ে যেতে পারি অনায়াসে।

ইলেকট্রনকে বিচ্ছিন্ন করা কিন্তু প্রোটনের মতো দুঃসাধ্য কাজ নয়, কারণ ইলেকট্রন—বিশেষ করে বাইরের দিকের ইলেকট্রনগুলি—পরমাণুর সঙ্গে তেমন একটা দৃঢ়ভাবে আবদ্ধ থাকে না। এক-টুকরো সিল্কের কাপড় দিয়ে যদি একটা কাঁচের রডকে কিছুক্ষণ ঘষা যায় তাহলে সেই কাঁচের রডটির মধ্যে ধনাত্মক বৈদ্যুতিক চার্জ সৃষ্টি হয় (ছোট ছোট কাগজের টুকরো তখন ঐ রডটি টেনে নিতে পারে)। কারণ ঐ ঘর্ষণের ফলে রড থেকে কতক-গুলি ইলেকট্রন (কিন্তু প্রোটন নয়) কাপড়ের মধ্যে চলে যায় এবং সঙ্গে সঙ্গে ঋণাত্মক চার্জ হ্রাস পেয়ে গিয়ে ধনাত্মক চার্জকেই রডের মধ্যে প্রাধান্য বিস্তার করবার সুবিধে করে দেয়। সুতরাং দেখা যাচ্ছে যে ইলেকট্রন খসিয়ে নেয়া খুব একটা শক্ত কাজ নয়, এবং হাইড্রোজেন পরমাণু থেকে ইলেকট্রনের খোসা ছাড়িয়ে ছাড়িয়ে আমরা প্রচুর প্রোটন সংগ্রহ করতে পারি এইভাবে।

কিন্তু মুশকিলটা দেখা দিল এর পরের ধাপে। আলফা কণিকার মধ্যে সহজাত একটা প্রচণ্ড বেগ ছিল যেটা প্রোটনের মধ্যে নেই। এই মন্থরগতি প্রোটনকে এখন প্রচণ্ড বেগে ছোটাবে কে? শেষপর্যন্ত বৈদ্যুতিক চার্জ দিয়েই সমস্যার সমাধান করা হল। এক স্থানে যদি অনেক ইলেকট্রন জড় করা যায় (ইলেকট্রন খসিয়ে আনা সহজ, যেটা আমরা একটু আগেই দেখলাম) তাহলে সেখানে একটা অত্যন্ত শক্তিশালী ঋণাত্মক চার্জের এলাকা সৃষ্টি হবে এবং সেই অঞ্চলে কোনও প্রোটন (অর্থাৎ, ধনাত্মক চার্জ) প্রবেশ করলে সেটা অত্যন্ত বেগে ঐ ঋণাত্মক এলাকার কেন্দ্রস্থলে স্বভাবতই ছুটতে শুরু করবে। এইভাবে অতি বেগবান প্রোটন কণিকা স্রোত সৃষ্টি করে রাদার-ফোর্ডের গবেষণাগারে লিথিয়াম-৭ (তিনটি প্রোটন এবং চারটে নিউট্রন) কে বিদীর্ণ করা হল ১৯৩২ সালে। বিদীর্ণ করে অবশ্য তেমন একটা কিছু হাতি-ঘোড়া পাওয়া গেল না কারণ লিথিয়াম-এর তিনটে প্রোটন এবং চারটে নিউট্রনের সঙ্গে নিক্ষিপ্ত প্রোটনটি মিশে গিয়ে দুটি করে আলফা কণিকা (দুটি প্রোটন এবং দুটি নিউট্রন) সৃষ্টি করল শুধু। কিন্তু তা হলেও, এই এক্সপেরিমেন্টটি অত্যন্ত তাৎপর্যপূর্ণ কারণ এই পারমাণবিক বিক্রিয়ার আগাগোড়া সমস্ত কিছুই মানুষের নিজের হাতের তৈরি, এমন কি ছুঁড়ে মারার বন্দুকের গুলিটি পর্যন্ত!

এই ছুঁড়ে মারার বন্দুকের গুলিকে কি করে আরো বেগবান করা যায়, সেই চিন্তা তারপর পেয়ে বসল বিজ্ঞানীদের। জন্ম নিল সাইক্লোট্রন বিটাট্রন কসমোট্রন ইত্যাদি অতি বিরাট শক্তিশালী যন্ত্রসমূহ যেখানে, আমাদের বাড়ীতে সাধারণত যে বৈদ্যুতিক চার্জ ব্যবহৃত হয় তার চেয়ে লক্ষ গুণ বেশী চার্জ উৎপন্ন করা হল।

সবই তো হল, কিন্তু সেই শক্তির কি হল? সেই বিরাট পারমাণবিক শক্তি যার অপেক্ষায় আমরা বসে রয়েছি সেই সকাল থেকে?

এই শক্তি পেতে হলে অবপারমাণবিক কণা দিয়ে পরমাণুর কেন্দ্রধরে আঘাত করতে হবে সজোরে। সেই আঘাত হানতে আমরা সক্ষম হয়েছি, কিন্তু লক্ষ লক্ষ গুলি লক্ষ্যভ্রষ্ট হয়ে যাচ্ছে। অথচ এই অব-পারমাণবিক কণিকাগুলিকে প্রয়োজনীয় বেগে ধাবিত করতে এদিকে আমাদের প্রচুর শক্তি ব্যয় হয়ে যাচ্ছে। অর্থাৎ, অনেক বেশী দিয়ে আমরা যাচ্ছি সামান্য। কিন্তু এই লোকসানের কারবার তো আমরা চাইনি। অবশ্য একেবারে বিনা মূলধনে যে ব্যবসা করব, তাও বলছি না। শক্তি ব্যয় করতে প্রস্তুত আছি আমরা, এমন কি প্রচুর শক্তি—কিন্তু পরিবর্তে চাই আরো প্রচুর শক্তি। কিন্তু সেটা হচ্ছে না যেহেতু লক্ষ লক্ষ গুলি লক্ষ্যভ্রষ্ট হয়ে যাচ্ছে ক্রমাগত, এবং এর মূলে রয়েছে এই নিক্ষিপ্ত অবপারমাণবিক কণিকাগুলির বৈদ্যুতিক চার্জ। অবশ্য আলফা কণিকার পরিবর্তে প্রোটন ব্যবহার করে চার্জের মাত্রা অর্ধেক নামিয়ে এনে অনেকটা সুফল পাওয়া গিয়েছিল। কিন্তু তা হলেও, যতক্ষণ নিক্ষিপ্ত কণিকাগুলি চার্জযুক্ত থাকছে, এই বিরাট লোকসানের হাত থেকে মুক্তি পাওয়া অসম্ভব।

সুতরাং স্বভাবতই বৈজ্ঞানিকদের দৃষ্টি গিয়ে পড়ল সেই নিউট্রনের ওপর যার অংগে কোনও চার্জ নেই অথচ কেন্দ্রধরে আঘাত করে প্রত্যাশিত ফল পাওয়ার জন্যে দেহে ওজন রয়েছে যথেষ্ট। তাছাড়া নিউট্রনকে পূর্বোক্ত দুটি বন্দুকের গুলির মতো প্রচণ্ড বেগে ছুঁড়তেও হচ্ছে না, কারণ চার্জশূন্য হওয়ার দরুণ পরমাণুর বাইরের দিকে ঘূর্ণায়মান ঋণাত্মক চার্জবিশিষ্ট ইলেকট্রন, অথবা কেন্দ্রস্থিত ধনাত্মক চার্জ-যুক্ত প্রোটন, কেউই তাকে বাধা দেবে না। অর্থাৎ গোড়াতেই এখানে প্রচুর মূলধন নিয়োগ করে আমাদের ব্যবসায়ে নামতে হচ্ছে না, প্রোটনের ক্ষেত্রে যেমনটি করতে হয়ে-ছিল। অতি সাধারণ গতিসম্পন্ন নিউট্রনই অনায়াসে পরমাণুর কেন্দ্রে সোজা চলে যেতে পারে।

কিন্তু নিউট্রনের এই বিশেষ গুণটিই আবার তার একটা প্রধান দোষ হয়ে দাঁড়াল এবং রঞ্জনরশ্মি ব্যবহার করে পরমাণুর আলোকচিত্র গ্রহণ করার সময় যেমন হয়ে-ছিল, আমাদের আবার সেইরকম একটা পাপচক্রের সম্মুখীন হতে হচ্ছে এখন। কারণ যে মুহূর্তে কোনও নিউট্রন কোনও কেন্দ্র-ধর থেকে কোনও উপায়ে বিচ্ছিন্ন হয়ে বাইরে বেরিয়ে এসে একা একা ঘুরে বেড়ায়, অমনি তাকে আর একটা কেন্দ্রধর টপ করে গ্রাস করে ফেলে—অনেকটা রাতের বেলায় মেয়েদের অন্ধকার রাস্তায় সহসা নিঃসঙ্গ অবস্থায় পড়ে গেলে যা হয়, তাই। সুতরাং বর্তমান পাপচক্রটা তাহলে এই দাঁড়াচ্ছে যে, বাইরে থেকে নিউট্রন নিক্ষেপ করে কেন্দ্র-স্থলে আঘাত হানতে পারলে সুফল পাওয়ার সম্ভাবনা খুবই উজ্জ্বল, কিন্তু কেন্দ্রের বাইরে বিচ্ছিন্ন নিউট্রনের সাক্ষাৎ পাওয়া প্রায় অসম্ভব। এই পাপচক্র ভেদ করার একমাত্র পন্থা হচ্ছে কৃত্রিম উপায়ে কেন্দ্র থেকে নিউট্রনকে বিচ্ছিন্ন করে বাইরে নিয়ে আসা। কিন্তু তার জন্যে আবার আমাদের কেন্দ্রস্থলে নিক্ষেপ করতে হবে সেই আলফা কণিকা অথবা প্রচণ্ড বেগবান প্রোটন কণিকা যেগুলির লক্ষ্যভেদের ক্ষমতা অত্যন্ত সীমা-বদ্ধ বলে বাতিল করে দিয়ে আমরা নিউট্রনকেই আমাদের বন্দুকের নতুন গুলি হিসেবে ব্যবহার করার সাব্যস্ত করেছিলাম। অর্থাৎ একটা পাপচক্র ভেদ করতে গিয়ে আমরা আর একটা বড়রকমের পাপচক্রের সম্মুখে এসে পড়লাম এখন! এই পাপ-চক্রটিকে চূর্ণ করে শেষপর্যন্ত কিভাবে নিউট্রনকেই কেন্দ্রধরের ওপর নিক্ষেপ করে প্রচুর পারমাণবিক শক্তি অর্জন করা হল, সেটা এবার আমরা দেখব। কিন্তু তার আগে মৌলিক পদার্থের তালিকাটিকে আর একবার বিভক্ত করার প্রয়োজন দেখা দিচ্ছে।

(আগামী সংখ্যায় শেষ হবে)

পুলকেশ দে সরকার

লোকপ্রিয় তমাল মুখুজ্জে

জনপ্রিয়তার জ্বালায় তমালবাবুর এখন
|লাই পালাই অবস্থা হয়ে দাঁড়িয়েছে।
লত স্বকর্মফল সন্দেহ নেই, কিন্তু তাকে
হ্যাতিরিক্ত বাড়-বাড়ন্ত করে দিয়েছে পাড়ার
:লেরা। ফলে, মুদ্রাস্ফীতির মতো এর
ীতিও ঘটল নিদারুণ। কোন্ রন্ধ্রপথে
। একে সংকুচিত করে আনা যায়, তমালবাবু
।র দিক নির্ণয় ক'রে উঠতে পারছেন না।
টা পদে পদে স্ত্রীর খোঁটার মতোই ও'কে
িভষ্ঠ ক'রে চলেছে। অথচ স্ত্রীকে ছাড়ানোর
:তা একে এড়ানোও কঠিন হয়ে পড়েছে।

একটা মুহূর্তও যেন এ নিয়ে ভাববার
:রসং নেই তমালবাবুর। কেননা, ভাবতে
|লেই নাসা-সীমান্তে ভ্রূ জোড়া কুঞ্চিত
য়ে আসে, জোড়া ঠোঁটের ফাটলে সদন্ত
চাঁক যায় মিলিয়ে, আর অমনি যেন সন্ধ্যায়
|কাশে তারা ফুটে ওঠবার মতো মুখের
ন্ডলে পুরোনো বসন্তের দাগগুলো ফুটে
:ঠ। ফলে, এমন রূপ-লাবণ্য নিয়ে আর
ই হোক লোকপ্রিয় হওয়া যায় না।

সুতরাং, যতটুকু দাঁত না দেখিয়ে পারা
য়, ততটুকু হাসির খেলা রাখতেই হয়,
খতে হয় ভ্রূ জোড়া প্রসারিত ক'রে এবং
দের আড়ালে বসন্তের দাগগুলো।

এবং বলেছি লোকপ্রিয়তা সৃষ্টির মূলে
ানি নিজেই। বাড়ীতে যে মার-কাট
বস্থাই হোক, বাইরে পদার্পণ হ'লে আর
ন্তার নেই; ভূমন্ডলের মতো মুখমণ্ডলে
দের আলো বাঁধ ভেঙ্গে পড়ে। সকাল-
লা' বাজারের থলে হাতে বেরিয়ে যার
ঙ্গই দেখা হোক কিছু কথা বলতেই হয়।
ফটু দূরে দিয়ে গেলে ঠোঁটের ফাটলে
খের ইসারায় হাসির আভাস, অর্থাৎ,
মি আপনাকে কিন্তু এড়িয়ে যাইনি,
:খেছি এবং দেখে খুশি হয়েছি স্বীকার
াছি, ধরে নিচ্ছি সব ভালো।

কিন্তু একেবারে নাগালের মধ্যে পড়ে
:লে এত সংক্ষেপে কর্তব্য সম্পন্ন করা যায়
। একটা দিশী-বিলাতী হাইব্রিড
রের প্রাতঃকৃত্য সারবার জন্য বেরিয়েছে।
তকান্তবাবু, কুকুরের পেছনে পেছনে শেকল
। চলেছেন, কুকুর মহাশয়ের চলার গতি
হু দ্রুত, তার অপ্রতিরোধ্য বেগ রতি-
তবাবু অনুসৃত গতিতে বেগ এনে
য়েছে। রতিকান্তবাবুর এটি অন্যতম
াকর্মপদ্ধতি। এরপর সময় পাবেন তো
ার যাবেন, নইলে আর কাউকে পাঠাবেন।

কুকুর প্রায় তমালবাবুর গায়ে এসে
ড়ছিল আর কি। কিন্তু রাগ করলে চলবে
। রতিকান্তবাবুর কুকুর, সুতরাং খুশি
তই হবে। লোকপ্রিয় তমালবাবু তাই
রের অসদাচরণে কিছুমাত্র বিব্রত না হয়ে
লেন, বেশ স্মার্ট হয়েছে তো কুকুরটা—?
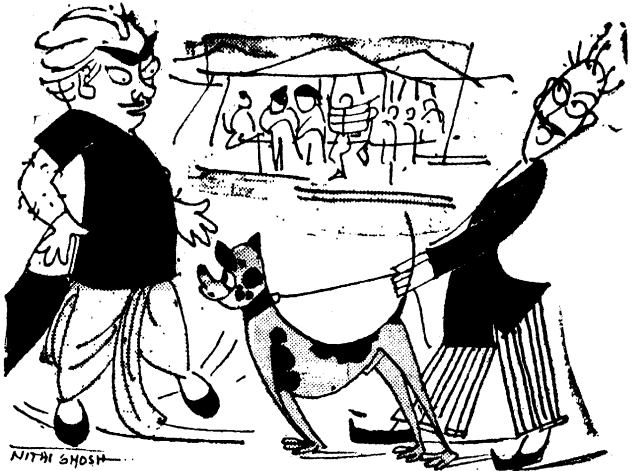
কুকুর কথাটা গাল, তাই প্রতিবাদ করে ঐ চারপেয়ে জীবটির মালিক রতিকান্তবাবু বললেন, ট্যালি আমাদের বেশ ভালো ব্রীডের কিনা- -!

তমালবাবু নিজেকে সামলে নিয়ে বললেন, হ্যাঁ, শুনেছি হাইব্রিড—।

রতিকান্তবাবু তড়িৎ আবার প্রতিবাদ করে বললেন, হাইব্রিড নয়, হাই-ব্রীড!

লোকপ্রিয় তমালবাবু স্বীকৃতিসূচক উচ্ছ্বাস প্রকাশ করে বললেন, ও, ট্যালি নামটিও বেশ, মানে কি?

রতিকান্তবাবু গম্ভীরভাবে বললেন, একটা ইংরিজী নাম। বলে ক্লাশ টেন অবধি পড়া বংশাধিকারে নিযুক্ত এল-ডি ক্লার্ক রতিকান্তবাবু কুকুরটার দিকে সগর্ব দৃষ্টিপাত করলেন। কুকুর তখন দাঁড়িয়ে পড়েছে।

এমন সময় বিপুল হালদার দুধের পাত্রটি নিয়ে পাশ কাটিয়ে যান দেখে লোকপ্রিয় তমালবাবু ও'কেও কথার ব'ড়শিতে গেঁথে ফেললেন: বেশ মর্নিং ডিউটি হয়েছে সত্যি, খাটালে গিয়ে—!

বিপুল হালদার বললেন, জোলো দুধ গলা দিয়ে যেতে চায় না, সুতরাং, কাছে দাঁড়িয়ে—!

লোকপ্রিয় তমালবাবু এমন একটি সৎ-কাজের এবং স্ট্রিক্‌ট প্রিন্সিপলের মানুষের কথায় সায় দিয়ে বললেন, নিশ্চয়ই, নিশ্চয়ই, খাঁটি পেলে—!

নইলে সবই তো ভেজাল বলে বিপুল হালদার তার বিরাট বপু নিয়ে হাঁফাতে হাঁফাতে এগিয়ে গেলেন। খাঁটি দুধ যে কত ফলপ্রদ তা তাঁর বিপুলায়তনেই প্রমাণ। গো-জাতি যে উপকারী জন্তু ও'কে দেখলে এবিষয়ে কোনো সংশয় থাকে না। আহা, গরু যদি গরু না হোত তবে এই দেহভার রক্ষা করা মারাত্মক বিড়ম্বনা হয়ে পড়ত বিপুল হালদারের। তবে গো-রক্ষার অভিভাবক আছে মেলাই, যারা বাছুর মেরে বিচুলীর ঠকানো গোবৎস্য নিয়ে খাটাল চালায়, তবু যে বিপুল হালদার একরকম দুধের বাঁটে মুখ লাগিয়ে নির্ভেজাল প্রাণরক্ষী তরলিকা আহরণ করতে পারছেন, এও কম কৃতিত্বের কথা নয় বিপুল হালদারের পক্ষে।

কিন্তু এ নিয়ে ভাববার অবকাশ নেই, পল্টু আসছে দুটি বোতল নিয়ে গবর্মেণ্ট ডিপোয় দুধ আনতে যাবে বলে। সকালবেলায় আসল ঘুম ছেড়ে ও উঠতে চায়নি। আসল তাগিদটা মায়ের চায়ের, একরকম বেড-টিই বলা যায়। বাড়ীতে যদি রাত থাকতে ওঠা বেতনভুক পরিচারক থাকে, মুখ না ধুয়েই ঘৎ ঘৎ করে, আঃ কি আরাম—!তাই পল্টুকে তাঁর তোলার তাগিদ আর পল্টুরও ঘুমঘোরে পথ-পরিক্রমা।

এই পোটেন্সিয়াল ভদ্রলোকের সঙ্গেও দুটো কথা কইতে হয় লোকপ্রিয় তমাল-বাবুকে। কি গো পল্টুবাবু, দুধ আনতে ছুটেছ?

বলাই বাহুল্য তবু এই প্রশ্নই করতে হয়।

পল্টু যেতে যেতেই বলল, হ্যাঁ।

লোকপ্রিয় তমালবাবু বললেন, বেশ, বেশ।

এও বাহুল্য। তবু লোকপ্রিয় তমাল-বাবুর দিক থেকে এই অযাচিত অনুমোদন, সমর্থন ও সম্মতি তাৎপর্যময়, অন্তত, তমালবাবুর উন্মুক্ত হৃদয়খানি আত্মপ্রসাদে সিঞ্চিত হবার জন্য এর বড় প্রয়োজন।

কয়েক পা এগিয়েই চোখে পড়ে এক রিক্‌সাওয়ালা হাইড্রেন্টের ঘোলা জল দিয়ে রিক্‌সাটা ধুয়ে ফেলেছে, এখন প্লাস্টিক সীটা সওয়ারীর বসবার গদীটা ধুতে লেগেছে। লোকপ্রিয় তমালবাবু শুধু যে ভদ্রলোকপ্রিয় হতে চান তা নয়, জনগণপ্রিয়ও হতে চান। এই রিক্‌সাওয়ালা সেই জনগণের এক সাক্ষাৎ প্রতিভূ—মেহনতী জনতা।

কারে, কেয়া কর রহা?

রিক্‌সাওয়ালা কিছু না বলে সীটটা ধুতে লাগল। লোকপ্রিয় তমালবাবু বললেন, কমসেকম আচ্ছা পানিসে সীট তো ধো লেও।

রিক্‌সাওয়ালাই জানে, ঘোলা জলে ধুলেও যেমন আপত্তি। খাবার জলে ধুতে গেলেও একগাদা স্নানার্থী পানার্থী হা হা করে তেড়ে আসবে। তাই সে একথার জবাব দিল না। তমালবাবুও খানিকটা বাজারের

পথে এগিয়ে গেলেন, মনের ময়দানে আবার খানিকটা আত্মপ্রসাদের হাওয়া বয়ে গেল এই মনে করে যে, বেশ খানিকটা সময় ম্যাস কণ্টাক্‌ট্‌ করা গেল।

বাঁধা মুদী। লোকপ্রিয় তমালবাবুর সর্বদা সন্দেহ লোকটি বাজার-ছাড়া দর নেয়, কিন্তু ওকে খোলাখুলি সেকথা বলতে পারে না। হয়তো এড়িয়ে আর এক পথেও যাওয়া যায়। ধার বাকী তো নয়। আজকে নগদ কালকে ধার, কিন্তু ধার চেয়ে লজ্জা দেবেন না। একেবারে ফ্রেমে-কাঁচে বাঁধা লোক-নীতি। তবু ছাড়া দায়। শুধু ওর কাছে নয়, ওর মারফৎ আরও অনেকের কাছে হয়তো অপ্রিয় হতে হবে।

লোকপ্রিয় তমালবাবু মনের অসন্তোষ চেপে এবং মুখে লোকপ্রিয় হাসির রেখা টেনে তেলের শিশিটা নামিয়ে দিলেন দোকানে, মুখে বললেন, আর দু'শো ডাল।

তারপর দাঁড়ালো এসে সেই ভীড়ে—যেখানে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে ছোট ছোট কাপে চায়ে চুমুক ও তুফান তুলেছে জনতা। ফুটপাথের খানিকটা আর রসিকবাবুর দাওয়ার খানিকটায় অবৈধ অনুপ্রবেশ করে চায়ের দোকান খুলেছে হলধর জানা। কোন-মতে বসা যায়, দেয়ালে কাপের সারি, তোলা উনুনের ওপর টিনপাত্রে নিশিদিন জল গরম চলছে, রাত চারটেয় ধরানো উনুন। বাজার যাবার পথে এক চুমুক এবং তারপরও আছে।

হলধরের চা নাকি টেস্টফুল এবং সস্তা। কিন্তু এ রাস্তায় আরও হলধর আছে এবং তারাও অনেকেরই চেনা, কিন্তু লোকপ্রিয় তমালবাবু এই হলধরকেই ধরেছেন। তার কারণও দুটি: এক, বাজার যাবার পথে এটিই ফার্স্ট; দুই, পাশের অসিত সান্যালদের রক-বৈঠক এটিকে পেট্রোনাইজ করে থাকে; তিন, এই রক-বৈঠকটি ভারি ডিমোক্রাটিক, যার-যা মত আছে দিতে পারে এবং তার দু' একজন সমর্থকও পাওয়া যায়।

লোকপ্রিয় তমালবাবুকে এ রক-বৈঠকের সবাই চেনে। সবাই কথা বলে এমন নয়, কিন্তু রক-বৈঠকে সর্বদাই উত্তেজিত বিতর্কে শ্রোতা ও বক্তার ভূমিকায় লোকপ্রিয় তমাল মুচ্ছুদ্দিও অবতীর্ণ হয়েছেন মাঝে মাঝে সুতরাং, মুখচেনা তো বটেই বাকচেনাও হয়েছেন লোকপ্রিয় তমালবাবু। তাই হলধরের ঐ এক কাপ টেস্টফুল চা নিয়ে বাজারে যাবার নৌকো ভিড়োতে হয় অসিত সান্যালের রক-বৈঠকেও। চিনুক চিনুক, আরও ভালো করে চিনুক ওরা লোকপ্রিয় তমাল মুচ্ছুদ্দিকে। ও'র আড়ালে আরও আলাপ হবে নিশ্চয়ই ও'কে নিয়ে। ও'র স্লেটকাট চেহারা নিয়ে, মাথার চুল নিয়ে, চোখ নিয়ে, নাক নিয়ে, ও'র চলা-বলা নিয়ে। লোকপ্রিয় তমালবাবু মনে মনে বেশ একটা বিতর্ক সভারও সৃষ্টি করেন এবং দিব্যচক্ষে দেখতে পান: বিষয়—লোকপ্রিয় তমাল মুচ্ছুদ্দি। দুই পক্ষ; প্রবল পক্ষ দুর্বল পক্ষ। লোকটা কে হে? লোকটা নয়, ভদ্রলোক। জেন্টলম্যান। কেমন যেন একটু ইয়ে না? না তো, বেশ ইন্টেলিজেন্ট, থপরটপর রাখে।

এমনি করে নৌকো ভিড়োতে ভিড়োতে বাজার। সেখানেই কি রেহাই আছে?

মাছওয়ালারা চারদিক থেকে সোরগোল তোলে লোকপ্রিয় তমাল মুচ্ছুদ্দিকে ওরা সবাই চায়—অনেক দিনের পুরোনো খদ্দের—সব মাছ-ওলার নাম জানেন লোকপ্রিয় তমালবাবু—নাম ধরে ডাকেন। কাকে ছেড়ে কার কাছে যাবেন, এদিকে পয়সারও টানাটানি—সাত টাকার মাছ ছেড়ে চার টাকার দিকে ঝুঁকতে ইচ্ছে—কিন্তু হাঁকাহাঁকিতে অস্থিরচিত্ত। শেষ পর্যন্ত একটা জায়গা থেকেই ঝুপ করে নিতে হয়. সাত টাকার মাছ কি রোজ খাওয়া যায়?

আলুর দোকানে, পটলের দোকানে, ঝিঙের দোকানে পেঁয়াজ ডাল লঙ্কা, পান সুপুরির দোকানে এমনি সব বাঁধা ব্যবস্থা, একটু হস্‌কেছেন কি অমনি কৈফিয়ৎ। কিন্তু চমৎকার ম্যানেজ করে চলেছেন লোকপ্রিয় তমাল মুচ্ছুদ্দি। একজনের কাছে নিয়ে, বাকীজনকে হাসিতে ভুলিয়ে। কবে একদিন রিক্‌সায় চড়েছিলেন, সেই রিক্‌সা-ওয়ালারাও ঠুনঠুন করে ডাকে। ওদের দিকেও একবার হাসিমুখে দৃষ্টিপাত করতে হয়।

পথে, পথের পাশে, কাছে দূরে একটা পিঁপড়ে কেও এড়িয়ে যাবার জো নেই। কেউ না মনে করে লোকপ্রিয় তমাল মুচ্ছুদ্দি ওকে অবহেলা করছে। সুতরাং, উজান-ভাঁটি দু' পিঠেই চলতে হয় হাসির নৌকো ভিড়োতে ভিড়োতে।

কিন্তু বাড়ীতে এসেই ধাক্‌কা।

কি ছাই-পাঁশ এনেছ, বলে গর্জে ওঠেন তমাল-গিন্নী এবং তারপরই বহুশ্রুত নায়েগ্রা প্রপাতের বিবরণমতো-তিক্ত-গিন্নীসুলভ খাস-ঘরোয়া বাক্যের ধারা বিদ্ধ করতে থাকে লোকপ্রিয় তমালবাবুকে। অভ্যস্ত হাসিটা প্রয়োগ করতে গিয়েও ছিপি আঁটা পড়ে। অনর্গল বর্ষণের মধ্যে কথা বলার সুযোগ মেলে না।

বাড়ীর দরজায় অর্গল পড়লে আর একটা জগতের সৃষ্টি হয়। এ জগতে হাসি নেই, আছে মর্মস্পর্শী বাক্যের ইটপাথর আর কর্ণভেদী নিনাদ। কিন্তু ঐ ঝড়-বাত্যার মধ্যে বাইরের কড়া নাড়ার শব্দে কেঁপে উঠলে লোকপ্রিয় তমাল মুচ্ছুদ্দিকে বিশ্বজয়ের মধ্যেও মরুবিজয়ের কেতন ওড়াতে হয়। মুখে একটু অভ্যস্ত হাসি টেনে আনতে হয়, বলা যায় না, কে এল।

আজকেও হ'ল, একবার নয় কয়েকবার। লোকপ্রিয় তমালবাবু বাড়ীতে 'ইন' থাকতে দু'বার, তাঁর অনুপস্থিতিতে দুপুরে বিকেলে আরও দু'বার। প্রথম দু'বার হাতে হাতে বিলি হল; দুপুর-বিকেলে পিয়ন মারফৎ।

সবশুদ্ধ একদিনকার টোটাল চার-বিয়ের নেমন্তন্ন পত্র। সন্ধ্যেবেলা চারখানা একসঙ্গে এগিয়ে ধরে তমাল-গিন্নী কিছু কথা বেশ জোর দিয়েই বললেন, যার অনেক-খানিই মার্জনাতীত ও অনুল্লেখ্য। মার্জনার যেটুকু উল্লেখযোগ্য তা হচ্ছে এই যে, এবার অঙ্গবাস পরিত্যাগ করে খাদ্য-প্রার্থনায় হাত দিয়ে থাকতে হবে।

লোকপ্রিয় তমাল মুচ্ছুদ্দি চমকে উঠে শুনলেন: এক একখানা শাড়ীর দাম—মানে একেবারে সাধারণ শাড়ী—২০ টাকা করে—জান? এই জানোটা যেন দানোর মতো তমালবাবুর বুকে হাতুড়ি মেরে জান নেবার উপক্রম করেছিল। আর যদি পক্ষাঘাত না হয় তবু এই চারখানিই লোকপ্রিয় তমালবাবুর প্রাণান্ত ঘটাবার পক্ষে যথেষ্ট। সর্বসাকুল্যে তিনশ টাকার মধ্যে ৮০ টাকার একটা থাবল শাইলকের মাংস তুলে নেবার মতোই হবে।

তমাল-গিন্নী উপসংহার না টেনে আরও বলে গেলেন, কেবল তো বিয়ে নয়, অন্ন-প্রাশন, জন্মতিথি ও হাজার রকম তোমার গিয়ে শ্রাদ্ধ আছে।

লোকপ্রিয় তমালবাবুর কানটা ভরে গেছল—স্যাচুরেশন পয়েন্ট, আর যাবার রাস্তা নেই।

তমাল-গিন্নী তবু ছাড়লেন না—বাও বাইরে বেরোলেই আবার এর তার সঙ্গে হি হি হো হো করে হাসো—কি যেন বলে পপুলার। নাও, এবার ঐটিই ল্যাবেঞ্চুস করে চোষো।

লোকপ্রিয় তমালবাবু উপলব্ধি করলেন, একটা কড়া প্রতিবাদ দরকার। কিন্তু কথা বেরোলো না। অথচ—!

১

বিনোদচন্দ্র সরমা সুন্দরীকে লইয়া নির্বিঘ্নে দিনযাপন করিতেছিলেন। হঠাৎ অগ্রজ অতুলচন্দ্র সস্ত্রীক পৈত্রিক ভিটায় আসিয়া উপস্থিত হইলেন। অতুলচন্দ্রের স্ত্রী সুবালা বড়বৌ। বিনোদচন্দ্রের স্ত্রী সরমা মেজবৌ। ঈশ্বরের কৃপায় বিনোদচন্দ্রের একটি পুত্রসন্তান হইয়াছিল এবং সেই কৃপা ঘনীভূত হইয়া উত্তরোত্তর বিনোদের সুখবৃদ্ধি করিতেছিল। বিনোদের পুত্র অধর এইবার এণ্ট্রেন্স পাশ করিবে।

অতুলচন্দ্রের উপর ঈশ্বরের কৃপা কন্যারূপে বর্ষিত হইয়াছিল। অতুলচন্দ্রের গতিক দেখিয়া ভয় হইয়াছিল যে, এবংবিধ কৃপাবারি বর্ষণ স্থগিত না হইয়া বরং বর্ধিত হইবে। গগনে মেঘের পুনঃসঞ্চার দেখিয়া অতুলচন্দ্র স্থির করিয়াছিলেন যে, পৈত্রিক-ভদ্রাসন সমান অংশে বিভাগ করিয়া লইয়া প্রথম কন্যার বিবাহের ব্যয়নির্বাহ করিবেন।

অতুলচন্দ্র উত্তর-পশ্চিমে একটা ব্যাঙ্কে কর্ম করিতেন। বিনোদচন্দ্র গুড়ের ব্যবসায় করিতেন।

বড়বৌ কখন মেজবৌকে দেখেন নাই। সরমা অতি সমাদরে বড়বৌ ঠাকুরাণীর অভ্যর্থনা করিল। বড়বৌ অতি সাবধানে তাহা গ্রহণ করিয়া মেজবৌকে বাধিত করিলেন। অতুলচন্দ্র বিনোদের গুড়ের ব্যবসায়ের উন্নতির উপর লক্ষ্য করিয়া পরমানন্দ লাভ করিলেন, এবং বিনোদচন্দ্র অগ্রজের ক্ষীণ শরীর লক্ষ্য করিয়া দুঃখ প্রকাশ করিল।

বিনোদচন্দ্রের পুত্র অধর সকলকে যথাবিহিত প্রণামপুরঃসর আপ্যায়িত করিয়া সেবায় নিযুক্ত হইল। অতুলচন্দ্রের কন্যা পুঁটি পিতৃব্যের গুড়ের কারখানা দেখিবার নিমিত্ত বহির্বাটিতে গেল।

একটু অবসর পাইলে বিনোদ রন্ধনশালায় পত্নীর নিকট গিয়া বলিল, "দাদা কেন আসিয়াছেন, জান?"

সরমা একটু হাসিয়া বলিল, "পৈত্রিক ভদ্রাসন বিভাগ করিতে।"

বিনোদ ভাবিল, "সরমা কি বুদ্ধিমতী!"

সরমা ভাবিল, "বিনোদ কি বোকা!"

সমস্ত দিনের পরিশ্রমের পর উভয় পক্ষ নিদ্রাভিভূত হইয়া পড়িল।

২

পরদিন প্রত্যূষে অতুলচন্দ্র তাঁহার নির্দিষ্ট কামরায় সহধর্মিণী সুবালার সহিত পরামর্শ নামক [illegible] রত হইলেন।

সেই সুন্দর ভদ্রাসন, বড় বড় কামরা সুসজ্জিত শয্যা, বৃহৎ উদ্যান বিস্তীর্ণ জলাশয়, গরু-বাছুরের পাল, সুবালা সমস্ত লক্ষ্য করিয়াছিল। ইহার মধ্যে কতটা পৈত্রিক সম্পত্তি এবং কতটা বিনোদের নিজের সঞ্চিত, তাহা অতুলচন্দ্র জ্ঞাত ছিলেন না। বহু বৎসর পূর্ব্বে পিতার মৃত্যুর পরে অতুলচন্দ্র একবার মাত্র বাড়ী আসিয়াছিলেন; তখন কনিষ্ঠ বিনোদ স্কুলে পড়িত পিতৃহীন সহোদরকে মাতার হস্তে সমর্পণ করিয়া অতুলচন্দ্র কর্ম্মস্থলে চলিয়া গিয়াছিলেন। তখন কয়টা গরু ছিল এবং পুষ্করিণীটা কত বড় ছিল এবং আমবাগানটা কতদূর অগ্রসর হইয়াছিল, কিংবা বহির্বাটিতে কয়টা কামরা ছিল, এবং পুষ্করিণীর উত্তরাংশের তালগাছ কয়টা জন্মিয়াছিল কিনা তাহা তিনি লক্ষ্য করিয়া দেখেন নাই। পাঁচ বৎসর পূর্ব্বে মাতা কাশীতে দেহত্যাগ করেন, তখন সেখানে বিনোদের সহিত অগ্রজের সাক্ষাৎ হয়। বিনোদ বলিয়াছিল, "দাদা, এবার বাড়ীটার কি হইবে?" অতুলচন্দ্র বলিয়াছিলেন,—"ওসব ভাবনা তোমার করিতে হইবে না।"

সুবালা বলিল, "তুমি এতদিন উপার্জ্জন করিয়া কি ছাই করিয়াছ? তুমি কাঙ্গাল, আর এরা নবাবের মত সমস্ত বিষয়টা অধিকার করিয়া বসিয়া আছে?" অতুলচন্দ্র। "এখন উপায়? ইহার মধ্যে আমার কতখানি ভাগ, তাহা ত নির্দ্ধারণ করা শক্ত উপরন্তু একটা গুড়ের কারখানা করিয়া বিষয়টা জটিল করিয়া ফেলিয়াছে।"

সুবালা। "তুমি চিরকালই হতভাগা থাকিয়া যাইবে। এবিষয় সমস্ত তোমার। তুমি চুল চিরিয়া হিসাব করিয়া লও, নচেৎ তোমার সহিত আমার ইহজন্মে সম্বন্ধ নাই।"

৩

অতুলচন্দ্র গৃহিণীর ন্যায়সঙ্গত বিচারে ইহা স্পষ্ট বুঝিতে পারিলেন যে, পৈত্রিক ভদ্রাসন ও স্থাবর সম্পত্তি ক্রমে ক্রমে দৃঢ়ভাবে কনিষ্ঠের হস্তগত হইয়াছে। তাহার উদ্ধার করা সহজ কথা নয়। তজ্জন্য কাঠখড় চাহি, উকিলের পরামর্শ চাহি এবং একবার সাহস করিয়া কর্ম্মক্ষেত্রে অবতীর্ণ হওয়া চাহি। অতুলচন্দ্র একবার ভাবিলেন যে, "ইহাতে বিনোদের মত কি?" হয়ত পরিষ্কারভাবে বুঝাইয়া দিলে বিনোদ অর্দ্ধেকটা অনায়াসে ছাড়িয়া দিতে পারে। কিন্তু তাহা ছাড়া সম্ভব নহে, কেননা, বিনোদ নিজে পরিশ্রম করিয়া সম্পত্তিটা বর্দ্ধিত করিয়াছে। ইহাই তাহার সম্পূর্ণ চালাকী।

ক্রমেই অতুলচন্দ্র ব্যাপারটার গুরুত্ব অনুভব করিয়া অস্থির হইয়া পড়িলেন। সেই অস্থিরতা ক্রমে ঘোরতর ঝটিকারূপে মস্তকে বহিতে লাগিল। সহজ কথায়, অতুলচন্দ্র রাগিয়া উঠিলেন এবং ক্রোধান্ধ হইয়া হিতাহিত জ্ঞান হইতে অনেকদূরে গিয়া পড়িলেন।

ক্রমে গৃহিণী ও কর্তা উভয়ে যুদ্ধস্থলে অবতীর্ণ হইলেন। যেমন গুপ্ত পরামর্শ একটা প্রথা, তেমনি আড়ি পাতিয়া শুনাও একটা প্রথা আত্মরক্ষার্থ ইহা অনেকস্থলে উপকারে আসে। অতুলচন্দ্রের পরামর্শ সরমার দাসী গদার মা অতি পরিষ্কারভাবে কান পাতিয়া শুনিয়াছিল। গদার মা পুরুষানুক্রমে (স্ত্রী বিভাগে) এই ব্যবসায় করিয়া আসিতেছিল সুতরাং অনিচ্ছাসত্ত্বেও তাহাকে কান পাতিয়া ফেলিতে হইয়াছিল।

গদার মা বিনোদকে পুত্রের ন্যায় ভালবাসিত এবং গদার মৃত্যুর পর বিনোদের বাড়ীতে আর চুরি করিত না। এইরূপে স্নেহপাশে বদ্ধ হইয়া গদার মা কর্ত্তব্যানুষ্ঠান করিতে ত্রুটি করিল না। কথাটা বিনোদের কানে উঠিল এবং কালক্রমে অর্দ্ধঘন্টার মধ্যেই সরমার কানে গেল এবং কান হইতে মরমে প্রবেশ করিল।

সেই শান্তির উদ্যানে একটা বেতর ঝড় বহিল। পাড়ার বন্ধুবর্গ তাহার লক্ষণ বুঝিল।

৪

সকলে লক্ষ্য করিয়া দেখিল, অতুলচন্দ্র পাড়ার হৃষীকেশ ভট্টাচার্য ও ভজহরি মোক্তারের সহিত প্রত্যুষে গঙ্গাস্নানে গেলেন। হৃষীকেশ ভট্টাচার্য ইতিপূর্ব্বে গুড়ের কারবারে কর্মচারী ছিলেন। তহবিল আত্মসাৎ করিয়া বিতাড়িত হইয়াছিলেন। সকলে লক্ষ্য করিয়া দেখিল যে, বেলা দশটা বাজিয়া গেল, অথচ কেহ ঘাট হইতে প্রত্যাবর্তন করিল না।

সরমা বড়বৌকে জিজ্ঞাসা করিল, "দিদি, তুমি আজ দুধ কিনিতে দিয়াছ কেন? আমাদের গরুর যথেষ্ট দুধ হয় ত?"

বড়বৌ গম্ভীরভাবে বলিলেন, "এ-সংসারে কার দুধ কে খায়? পুঁটির অল্প দুধে কুলায় না, আর আমার ইচ্ছা নাই তোমাদের দুধ লইয়া পুঁটিকে খাওয়াই। আমরা কয়দিন আছি মাত্র, তার জন্য এত কথা কেন?"

ইত্যবসরে পুঁটি অধরের হাত ধরিয়া বাগানে আম পাড়িতেছিল, তাহা দেখিয়া বড়বৌ ধীর পাদবিক্ষেপে কন্যার নিকট অগ্রসর হইলেন এবং কোন কারণ ব্যক্ত না করিয়া পুঁটির পৃষ্ঠে ক্রোধের উচ্ছ্বাসটা প্রচুরভাবে ঝাড়িয়া দিলেন। পুঁটি মুখব্যাদন করিয়া কাঁদিল এবং অধর ত্রাসে দৌড় দিয়া পুষ্করিণীর পাড়টা পার হইয়া গেল।

গদার মা জিজ্ঞাসা করিল, "আহা! মেয়েটাকে অত মারা কেন?"

সুবালা। মেয়েটা ত আর তোমাদের নয় যে, তোমরা বসিয়া বসিয়া তার মাথাটা খাইবে। তুমি নিজের কাজে যাও।

তৎপরে পুঁটির উপর যথাবিধি নীতিবাক্য প্রয়োগ করিয়া এবং অতবড় ডাগর মেয়ের অতবড় ছেলের সঙ্গে হাস্য-তামাসা করা অবৈধ তাহা বুঝাইয়া দিয়া বড়বৌ পুনরায় খাস কামরায় প্রবেশ করিলেন।

বেলা দ্বিপ্রহরে অতুলচন্দ্র বাটীতে ফিরিয়া আসিলেন। সুবালা জিজ্ঞাসা করিল, "পরামর্শ স্থির হল?"

অতুলচন্দ্র। হাঁ, উকিলের পরামর্শে বুঝিতে পারিলাম যে, গুড়ের কারখানা ছাড়া অন্যান্য সম্পত্তির পুরা অর্দ্ধেক আমার।

৫

সুবালা তাহাতে সন্তুষ্ট হইলেন না। গুড়ের কারবার স্বতন্ত্র হইলেও, জমিটার অর্দ্ধেক যায় কোথা? তাঁহার বোধ হইল যে, সকলে মিলিয়া তাঁহাকে ফাঁকি দিতেছে। এই অন্যায় অনুষ্ঠানে এবং পুঁটির দশা ভাবিয়া তিনি কাঁদিয়া ফেলিলেন। অতুলচন্দ্র ব্যথিতচিত্তে অনেক আশ্বাসবাক্য প্রয়োগ করিতে লাগিলেন।

বিনোদ হঠাৎ দশটার গাড়ীতে কলিকাতায় চলিয়া গেল। বিনোদ একখানা টেলিগ্রাম পাইয়াছিল। তাহার মর্ম কি, কেহ জানিত না।

সেই অভিনব সংবাদ পাড়ায় রাষ্ট্র হওয়াতে সকলে বলিল, বিনোদ কলিকাতায় কৌন্সিলের পরামর্শ লইতে গিয়াছে।

কৌন্সিলের পরামর্শ! কি! এতবড় আস্পর্দ্ধা! কার খাইয়া বিনোদ বড়মানুষ? অগ্রজ অতুলচন্দ্র জ্বলিয়া রুদ্রমূর্তি হইলেন, এবং উচ্চৈঃস্বরে ডাকিয়া কহিলেন, "ওর গুড়ের কারখানায় আগুন লাগাইয়া দে!"

হৃষীকেশ ভট্টাচার্য আসিয়া কহিল "উহা অপেক্ষা সোজা উপায় আছে। এ-ভদ্রাসন ত আপনারই ইচ্ছা করিলে আপনি নিজের তালা লাগাইয়া রাখিতে পারেন। আপনি সকলকে বলিয়া দিন যে, আপনারই টাকা লইয়া এ-কারবার চলিয়াছিল এবং আপনিই ইহার পুরা লাভের দাবীদার!"

এ-কথা সুবালার বড় ভাল লাগিল এবং তৎক্ষণাৎ গ্রামস্থ ভদ্রলোকের সমক্ষে অগ্রজ অতুলচন্দ্র বিহিতভাবে সপ্রমাণ করিলেন যে, চতুর্দশ বৎসর ধরিয়া এলাহাবাদ হইতে এই গুড়ের কারবারের মূলধন ও খরচা তিনি দিয়া আসিতেছেন।

সকলে বলিল, "ঠিক। আপনিই এ-লাভের সম্পূর্ণ মালিক। আমরা জানি, বিনোদবাবু গুড়ের কারবার হইতে দশ হাজার টাকা লাভ করিয়াছেন এবং তৎসমস্ত তাঁহার স্ত্রী-ধনে পরিণত করিয়াছেন।"

বড়বৌ স্বামীকে ডাকিয়া বলিলেন, "তাহা হইলে পৈত্রিক সম্পত্তি বিনোদ কিছুই পাইতে পারে না, কেননা, তাহার অর্দ্ধাংশের দাম প্রায় দশ হাজার টাকা। এখনই গুড়ের কারখানা দখল কর ও বাটী হইতে উহাদের তাড়াইয়া দাও।"

৬

বাড়ী হইতে তাড়াইবার কথা সরমার কানে গেল। সরমা দীর্ঘনিশ্বাস ত্যাগ করিয়া বাক্স গুছাইল, এবং অধরকে ডাকিয়া হাত ধরিয়া কাঁদিতে লাগিল।

অধর বলিল, "মা, আমরা যাব কোথা? উনি কি ইচ্ছা করিলে আমাদের বাড়ী হইতে তাড়াইতে পারেন?"

সরমা বলিল, "বাবা, উহারা গুরুজন, পিতার সমান। আমাদের শান্তভাবে চলিয়া যাওয়া ভাল।"

অধর পুরাতন ও নূতন বহিগুলি, পুরাতন ও নূতন কাপড়গুলি একে একে গুছাইতে লাগিল। গদার মা ছুটিয়া গ্রামে গেল এবং তাহার আত্মীয়স্বজনকে ডাকিয়া বাগানের পাকা আম ও বাটীর পুরাতন বাসনগুলি সুবিধা বুঝিয়া একে একে সরাইতে লাগিল।

সন্ধ্যার পরে বিনোদ কলিকাতা হইতে ফিরিল। তখন সরমা ঘাটে বসিয়া।

বিনোদ ধীরে ধীরে সরমার নিকট গিয়া বসিল। বিনোদ বলিল, "সরমা, আমাদের সর্বনাশ হইয়াছে।"

সরমা বলিল, "কিসের সর্বনাশ?"

বিনোদ। গুড়ের কারবারে আমার পাঁচ হাজার টাকা লোকসান হইয়াছে এবং আরও পাঁচ হাজার টাকার দাবী করিয়া পাওনাদারগণ আমার ও দাদার অন্যান্য সম্পত্তি ক্রোক করাইবার জন্য দরখাস্ত দিয়াছে। তাহারা দাদাকেও জড়াইয়াছে। দাদাকে না জড়াইলে তাহারা ভদ্রাসন বেচিতে পারিবে না।

সরমা আকাশের দিক চাহিল এবং পুনর্ব্বার স্বামীর হাত ধরিয়া বলিল, "এখন উপায়?"

বিনোদ। উপায় কেবল এই যে, দাদাকে প্রমাণ করিতে হইবে, তাঁহার সহিত গুড়ের কারবারের কোনও সম্বন্ধ ছিল না এবং ভদ্রাসনে আমার কোনও অধিকার নাই। আমি এখন তোমাকে ও অধরকে লইয়া পথের ভিখারী। বাকি কেবল দাদার অনুগ্রহ।

৭

সন্ধ্যা গিয়া যেমন প্রভাত হয়, তাহাই হইল। সরমার চক্ষুর জল শিশিরের সহিত শুকাইল। বিনোদ গ্রামের মান্যগণ্য জমিদার

জ্ঞানদাবাবুর বাটীতে স্ত্রী-পুত্রকে রাখিবার বন্দোবস্ত করিতে গেলেন।

বেলা দশটার সময় গুড়ের কারখানায় তালা পড়িয়া গেল, এবং বড়বাবুর তরফে লোক খাড়া হইল। তাহার দাপটে কারখানার কর্ম্মচারিগণ ভাগিয়া গেল। অপরাহ্নে সদরাল্লার আদালত হইতে নাজীরসাহেব ক্রোকী পরওয়ানা লইয়া রঙ্গস্থলে উপনীত হইলেন। অতুলচন্দ্র ক্রোধে গর্জ্জিয়া বলিলেন, "ওসব চালাকি আমি জানি, ঐ গুড়ের কারখানা আমার, কেবল আমার, ইহাতে বিনোদের কোনও অংশ নাই। গ্রামস্থ লোক সকলেই সাক্ষী।" সকলে বলিল, "হাঁ, ইহা ঠিক।"

নাজীরসাহেব ঈষৎ হাসিয়া বলিলেন, "সেই কথাই ঠিক। তবে প্রমাণের প্রয়োজন নাই।"

বিনোদ দূরে হইতে হাঁপাইতে হাঁপাইতে দৌড়িয়া আসিল এবং বলিল, "নাজীর-সাহেব! ইহাতে দাদার কোনও অংশ নাই। আমি প্রমাণ করিব। আমার দায়ে দাদার সম্পত্তি ক্রোক হইতে পারে না।"

গ্রামের ভজহরি মোক্তার কথাটা শুনিয়া একটু বিস্মিত হইলেন। তিনি জিজ্ঞাসা করিলেন, "এটা কিসের ক্রোক?" নাজীর পরওয়ানা পাঠ করিয়া শুনাইলেন যে, ইহাতে বিনোদ ও অতুলচন্দ্রের বিরুদ্ধে পাঁচ হাজার টাকার দাবী দিয়া বিনোদের পাওনা-দারগণ উভয়ের স্থাবর ও অস্থাবর সম্পত্তি ক্রোক করাইতেছেন। তাহার পর মুচি ঢাকে কাঠি দিল। গ্রামস্থ লোক কাণ্ডটা বুঝিল। অতুলচন্দ্র হঠাৎ মূর্চ্ছিত হইয়া পড়িলেন।

সকলে বলিল, "উঁহাকে তুলিয়া লইয়া যাও। ইনি নিজের জালে নিজেই পড়িয়া গিয়াছেন।"

ধীর নিস্তব্ধ নিশি। অতুলচন্দ্র প্রকৃতিস্থ হইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "বিনোদ এখন উপায়? আমার হাতে এক হাজার টাকাও যে নাই।"

বিনোদ সরমার নিকট গেল। সরমার মুখের জ্যোতি অপরের মুখে আসিয়াছিল। সরমার সম্মুখে আবার কত শান্তির আশা, কত সুখের ছবি একে একে নৃত্য করিতে-ছিল। সরমা নিজের পুরানো বাক্স হইতে গহনাগুলি বাহির করিয়া ধীরে ধীরে স্বামীর হস্তে দিল এবং স্বামীর মুখে চুম্বন করিয়া বলিল, "এগুলি বট্‌ঠাকুরের পায়ে রাখিয়া দাও।"

সেই আত্মত্যাগ বড়বৌর হৃদয়ে ছুরিকার ন্যায় বিঁধিল। বড়বৌ আসিয়া সরমাকে কোলে লইলেন, এবং না-জানি কোন্ সনাতন স্বর্গীয় বিধিনানুসারে তাঁহার চক্ষু হইতে অশ্রু বর্ষিত হইল। পরদিন প্রত্যূষে উভয় ভ্রাতা গহনার পুঁটলিটি লইয়া জ্ঞানদা-বাবুর নিকট গিয়া গহনাগুলি বন্ধক রাখিয়া পাঁচ হাজার টাকা লইয়া আসিলেন এবং পাওনাদারগণকে সন্তুষ্ট করিলেন।

কিন্তু আশ্চর্য্যের বিষয় এই যে, বিষয় ভাগ হইল না। গুড়ের কারবারও বন্ধ হইল না; বরং তিন বৎসরের মধ্যে উভয়ের দশ হাজার টাকা লাভ হইল। আরও আশ্চর্য্যের বিষয় এই যে, পুঁটির বিবাহ জ্ঞানদাবাবুর পুত্রের সহিত ঘটা করিয়া হইয়া গেল। বিবাহসভায় জ্ঞানদাবাবু সরমা দেবীর গহনাগুলি অতি আদরে পুত্রবধূকে পরাইয়া দিলেন এবং সকলকে বলিলেন, "এ যাঁহার গহনা, আমার পুত্রবধূ যেন তাঁহারই মত হয়।"

(প্রশ্ন)

১। এপর্যন্ত কে কে রবীন্দ্র পুরস্কার পেয়েছেন?

২। রবীন্দ্রনাথের প্রথম প্রকাশিত কবিতা কোনটি?

উমাপ্রসাদ সেনগুপ্ত
ঝরিয়া, ধানবাদ।

●

১। সত্যজিৎ রায়ের সংক্ষিপ্ত জীবনী জানতে চাই।

২। নেতাজী সুভাষচন্দ্র বসু লিখিত ইংরেজি ও বাঙলা বইগুলির নাম কি?

৩। স্বামী বিবেকানন্দ লিখিত সংস্কৃত গ্রন্থাবলী সংকলন বইটির নাম ও ঠিকানা জানতে চাই।

সন্তোষকৃষ্ণ গুপ্ত
ধুরনআ
জেলা রাঁচি।

●

(উত্তর)

[illegible] প্রথম খন্ডের ত্রয়োদশ সংখ্যায় শ্রীমতী গীতা সাহার প্রশ্নের উত্তরে জানাই যে প্রথম সংখ্যা অমৃতে রাজশেখর বসু, হুমায়ুন কবীর, কেদারনাথ চট্টো-পাধ্যায়, অন্নদাশংকর রায় বিমলচন্দ্র সিংহ, মণীশ ঘটক, শরদিন্দু বন্দ্যোপাধ্যায়, অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্ত, কাজল সেন, প্রবোধকুমার সান্যাল, অনিন্দ্য রায়, মনোজ বসু, পশুপতি ভট্টাচার্য, অয়স্কান্ত, বিশ্বরাজ, তীর্থংকর—এই কয়েকজন সাহিত্যিকের রচনা প্রকাশিত হয়েছিল। ১৮৬৮ শকাব্দের ২৯ বৈশাখ ও ১৯৬১ খৃঃ ১২ মে এই সংখ্যাটি প্রকাশিত হয়।

প্রচেতা চক্রবর্তী
ও
স্মৃতি চক্রবর্তী
কাহিলীপাড়া, গৌহাটি-১৬, আসাম।

●

গত ১৩ই শ্রাবণের 'অমৃতে' 'জানাতে পারেন' বিভাগে অমল সরকার ও সোনালী সেনের প্রশ্নের অংশবিশেষের উত্তরে জানাচ্ছি, যে, সোডাওয়াটারে কার্বন-ডাই-অক্সাইড গ্যাস মেশানো হয়। কার্বন-ডাই-অক্সাইডকে অতিরিক্ত চাপে জলে দ্রবীভূত করা যায়। এইভাবেই সোডা ওয়াটার তৈরী করা হয়। তাই ঢাকনা খুললেই আর চাপ থাকে না, এবং বুদ্বুদের সৃষ্টি করে সশব্দে অতিরিক্ত কার্বন-ডাই-অক্সাইড বেরিয়ে যায়।

অলকরঞ্জন বসুচৌধুরী
জামশেদপুর-১।

●

গত ১২শ সংখ্যায় প্রকাশিত শ্রীসুরজিৎ রায়ের প্রশ্নের উত্তরে জানাই যে, স্বনামধন্য রুশ চলচ্চিত্রকার সের্গেই আইজেনস্টাইন সর্বসমেত সাতটি চিত্রচালনা সম্পূর্ণ করে গেছেন। ইংরেজি টাইটেল অনুযায়ী ছবিগুলি :

(১) স্ট্রাইক (১৯২৪); (২) ব্যাটলশিপ পটেমকিন (১৯২৫); (৩) অক্টোবর (১৯২৭); (৪) দ্য জেনারেল লাইন বা দ্য ওল্ড অ্যান্ড দ্য নিউ (১৯৩০); (৫) আলেকজান্ডার নেভস্কি (১৯৩৮); (৬) ইভান দ্য টেরিবল্—প্রথম পর্ব (১৯৪৪); (৭) ইভান দ্য টেরিবল—দ্বিতীয় পর্ব (১৯৪৬)। এছাড়া ১৯৩১-৩২ সালে আইজেনস্টাইন মেক্সিকোয় "Que Viva Mexico" তোলার সময় মাঝপথে তদানীন্তন মেক্সিকো সরকারের নির্দেশে ছবিটি অসমাপ্ত রাখতে বাধ্য হন। পরবর্তী-কালে খ্যাতনামা ব্রিটিশ চলচ্চিত্রবিদ শ্রীমতী মেরী সীটন (ইংরেজি ভাষায় আইজেন-স্টাইনের প্রামাণ্য জীবনীগ্রন্থ "Sergei Eisenstein" -এর লেখিকা) ছবিটি সমাপ্ত করেন।

অনিরুদ্ধ সরকার,
কলি—৪৩।

●

অমৃতের ৭ম বর্ষ ১০ম সংখ্যায় সুদীপ্তা রায় আমাদের দেশের কয়েকজন মহীয়সী মহিলার বিষয় জানতে চেয়েছেন। তাঁদের সংক্ষিপ্ত পরিচয় দেবার চেষ্টা করলাম।

কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের ইতিহাসে মেয়েদের মধ্যে যাঁরা সর্বপ্রথম গ্র্যাজুয়েট হন তাঁরা হলেন চন্দ্রমুখী বসু ও কাদম্বিনী গংগোপাধ্যায়। কাদম্বিনী জন্ম গ্রহণ করেন ১৮৬২ খৃষ্টাব্দে। এঁর পিতার নাম ব্রজ-

কিশোর বসু। ১৮৭৯ খৃষ্টাব্দে ইনি কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে সর্বপ্রথম প্রবেশিকা পরীক্ষায় উত্তীর্ণা হন। এর আগে বিশ্ববিদ্যালয় কোন মহিলাকে প্রবেশিকা পরীক্ষা দানের অনুমতি দেননি। পরে তিনি বেথুন কলেজ থেকে এফ-এ পাশ করেন। এই সময় ইংরেজ সরকার মেয়েদের উচ্চশিক্ষা দেবার পক্ষপাতী ছিল না। কয়েকজন বিশিষ্ট ব্যক্তির চেষ্টায় তিনি ১৮৮৩ খৃষ্টাব্দে বি-এ পাশ করেন।

বি-এ পাস করবার পর দ্বারিকানাথ গঙ্গোপাধ্যায়-এর সঙ্গে তাঁর বিবাহ হয়। বিবাহের পর তিনি মেডিক্যাল কলেজে ভর্তি হন। সেখানে পাঁচ বৎসর শিক্ষা গ্রহণ করবার পর ইংলণ্ডে যান ১৮৯২ খৃষ্টাব্দে। বিলাতে শিক্ষা গ্রহণ করে ১৮৯৩ সালে কলকাতায় ফিরে লেডি ডাফরিন কলেজে যোগ দেন।

ভারতীয় কংগ্রেসের ইতিহাসে ইনিই প্রথম মহিলা বক্তা। ইনি ১৮৯০ খৃষ্টাব্দের কলকাতায় জাতীয় কংগ্রেসে অন্যতমা নারী প্রতিনিধি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন।

১৯৩২ খৃষ্টাব্দে এই স্বনামধন্যা মহিলার কর্মময় জীবনের অবসান হয়।

প্রসন্নময়ী দেবী মহিলা কবি হিসাবে পরিচিতা। মাত্র বারো বৎসর বয়সে তাঁর লেখা 'আধ আধ ভাষিণী' কাব্যগ্রন্থ প্রকাশিত হয়। ১৪ আশ্বিন ১২৬৪ বঙ্গাব্দে ইনি জন্ম গ্রহণ করেন। পিতা দুর্গাদাস চৌধুরী। আমাদের ভারতের ভূতপূর্ব স্থলবাহিনীর প্রধান অধ্যক্ষ জেনারেল জে এন চৌধুরী এ'রই ভ্রাতুষ্পুত্র। বিদগ্ধ কবি, সাহিত্যিক ও সবুজপত্র সম্পাদক প্রমথ চৌধুরী ও স্যার আশুতোষ চৌধুরীর ভগিনী ইনি।

এ'র জীবন কিন্তু বড় দুঃখময়। মাত্র দশ বৎসর বয়সে কৃষ্ণকুমার বাগচীর সঙ্গে এ'র বিবাহ হয়। বিবাহের দু' বৎসর পরে কৃষ্ণকুমার পাগল হয়ে যান। তখন প্রসন্নময়ী পিতার সহায়তায় ইংরেজ শিক্ষয়িত্রীর কাছে গান গাইতে শেখেন ও লেখা-পড়া আরম্ভ করেন।

মানসী ও মর্মবাণী, মাতৃমন্দির ও ভারতবর্ষ প্রভৃতি সাময়িক পত্রিকার নিয়মিত লেখিকা ছিলেন প্রসন্নময়ী। এ'র অন্যান্য রচনার মধ্যে বনলতা ও নীহারিকা (দুই খণ্ড) নামে কাব্যগ্রন্থ ও অশোকা, পূর্ব কথা, আর্যাবর্ত ইত্যাদি উপন্যাসের নাম উল্লেখযোগ্য।

২৫শে নভেম্বর ১৯৩৯ খৃষ্টাব্দে প্রসন্নময়ী দেবীর মৃত্যু হয়।

কৃষ্ণকুমার বাগচী ও প্রসন্নময়ী দেবীর একমাত্র মেয়ে প্রিয়ম্বদা দেবী। ইনি জন্ম-গ্রহণ করেন ১৮৭১ খৃষ্টাব্দে। ১৮৯২ খৃষ্টাব্দে ইনি বেথুন কলেজ থেকে বি-এ পাস করেন আর ঐ বৎসরই তারাদাস বন্দ্যোপাধ্যায়ের সঙ্গে পরিণয় হয়।

মায়ের মত ইনি জীবনে বহু আঘাত পান। অকালে স্বামী ও একমাত্র পুত্রকে হারিয়ে ১৯১৫ খৃষ্টাব্দে ব্রহ্ম বালিকা বিদ্যালয়ে শিক্ষয়িত্রীর কাজ শুরু করেন। প্রিয়ম্বদার নামও বাংলা সাহিত্যে কবি হিসাবেই সমধিক পরিচিত। রেণু, তারা, পত্রলেখা, অংশু, চম্পা ও পাটল, অনাথ ইত্যাদির নাম করা যেতে পারে। ১৩৪১ বঙ্গাব্দে এ'র মৃত্যু হয়।

দক্ষিণেশ্বরের কালী বাড়ির প্রতিষ্ঠাত্রী হিসাবেই রাণী রাসমণির নাম মনে আসে। কিন্তু এই মন্দির প্রতিষ্ঠা করতে রাসমণি তৎকালীন বঙ্গীয় ব্রাহ্মণ পণ্ডিত সমাজের কাছ থেকে প্রচুর বাধা পেয়েছিলেন। পরে অবশ্য শ্রীরামকৃষ্ণ দেবের বড় দাদা রামকুমার চট্টোপাধ্যায় শাস্ত্র বাক্য উদ্ধৃত করে বলেন শূদ্র জাতিরও মন্দির প্রতিষ্ঠা করবার অধিকার আছে। মন্দির প্রতিষ্ঠা হলে রামকুমারই এর প্রথম পুরোহিত হন ও পরে শ্রীরামকৃষ্ণ দেব পুরোহিত নিযুক্ত হন।

এই মহীয়সী মহিলা ১১ আশ্বিন ১২০০ বঙ্গাব্দে ২৪ পরগণা জেলার হালি-শহরের নিকটবর্তী এক গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। পিতার নাম হরেকৃষ্ণ দাস। কলকাতার রাজচন্দ্র দাসের সঙ্গে এ'র বিবাহ হয়। ইনি ছিলেন রাজচন্দ্রের তৃতীয়া স্ত্রী। ১৮৩৬ খৃষ্টাব্দে রাজচন্দ্রের মৃত্যু হলে বিপুল সম্পত্তির অধিকারিণী হন। শুধু দানশীলতার জন্যই নয় আপন তেজস্বিতার জন্যও ইনি প্রসিদ্ধা ছিলেন। ইংরেজ সরকারের অন্যায়ের বিরুদ্ধে অনেকবার প্রতিবাদ করেছেন। বহু তীর্থ স্থানে আজও এ'র দান চিরস্থায়ী হয়ে আছে। দুর্ভিক্ষের সময় ইনি মুক্তহস্তে দান করেছেন।

১৯ ফেব্রুয়ারী ১৮৬১ খৃষ্টাব্দে এই প্রাতঃস্মরণীয়া মহিলার মৃত্যু হয়।

সুধীরকুমার কুণ্ডু
ঘূর্ণিঘাট লেন,
ডাকঘর—কৃষ্ণনগর,
জিলা—নদীয়া।

●

গত ২৮ আষাঢ়, ১৩৭৪ সংখ্যায় 'অমৃত'য় শ্রীশিশির কবিরাজ ও গীতা ও পরিমল বিশ্বাসের প্রশ্নের উত্তরে শ্রীমতী রত্না ঘোষ যে কথা লিখেছেন, তাতে কিছু ভুল আছে।

শিশির কবিরাজের প্রশ্নের উত্তরে শ্রীমতী ঘোষ জানিয়েছেন এক ওভারে ২১ রানই সর্বোচ্চ রান এব বার্নেস ২০ ও ব্র্যাডম্যান ১ করেছেন।

কিন্তু এক ওভারে সর্বোচ্চ রান ৩৪। ইংল্যাণ্ডের বিপক্ষে অস্ট্রেলিয়ার জন ব্র্যাড-ম্যান ৩৪ রান (৬, ৬, ৪, ৬, ৬, ৬) করেছেন।

গীতা ও পরিমল বিশ্বাসের প্রশ্নের উত্তরে শ্রীমতী ঘোষের ভুল ধরিয়ে সংশোধনী তথ্য পেশ করছি—১৮৮২ সালে ওভাল মাঠে ২৯ আগস্ট তারিখে ইংল্যাণ্ড ও অস্ট্রেলিয়ার এক টেস্টের নাটকীয় পরি-সমাপ্তিতে অ্যাসেজের উৎপত্তি। শ্রীমতী ঘোষ লিখেছেন খেলাটি হয়েছে মেলবোর্ণে। শ্রীমতী ঘোষ আরও লিখেছেন অ্যাসেজ উৎপত্তিতে একদল মহিলা অংশ গ্রহণ করেন। এটিও ভুল। অ্যাসেজের ঘটনার পরের দিন লণ্ডনের Sporting Times এ কালো বর্ডারে যে খবরটি বেরিয়েছিল তা গীতা ও পরিমল বিশ্বাসের জ্ঞাতার্থে উদ্ধৃত করছি:—

> In affectionate remembrance of
> ENGLISH CRICKET
> which died at the Oval, August 29th, 1882, deeply lamented by a large circle of sorrowing friends and acquaintances.
> R. I. P.
> N.B.—The body will be cremated and the Ashes taken to Australia.

এবার গীতা ও পরিমল বিশ্বাসের ৫নং প্রশ্নের উত্তরে জানাচ্ছি যে—লণ্ডনের ওয়েম্বলী স্টেডিয়াম সবচেয়ে বড়। এখানে এক লক্ষ লোক বসে খেলা দেখতে পারে।

সুকান্ত রায়
টালিগঞ্জ, কলিকাতা-৪০।

●

৭ম বর্ষ ১১শ সংখ্যায় প্রকাশিত নৃপেন্দ্রকান্তি ঘোষ, কার্তিক রায়, পঞ্চানন প্রামাণিক এর প্রশ্নের উত্তরে জানাই যে, ক্লোরোফরম্ আবিষ্কার করেন লাইবেগ্ ১৮৩১, বিশুদ্ধ ক্লোরোফরম্ চেতনানাশক হিসাবে, শিল্পে, তৈলের দ্রবক হিসাবে ব্যবহৃত হয়। ইথার এর মধ্যে আছে কার্বন, হাইড্রোজেন, অক্সিজেন, আর ক্লোরোফরম্-এর মধ্যে আছে কার্বন, হাইড্রোজেন, ক্লোরিন।

বিজয়কুমার সামন্ত
তমলুক
মেদিনীপুর

অমৃত পাবলিশার্স প্রাইভেট লিঃ-এর পক্ষে শ্রীসুপ্রিয় সরকার কর্তৃক পত্রিকা প্রেস, ১৪, আনন্দ চ্যাটার্জি লেন, কলিকাতা—৩ হইতে মুদ্রিত ও তৎকর্তৃক ১১।১, আনন্দ চ্যাটার্জি লেন, কলিকাতা—৩ হইতে প্রকাশিত।

সর্ব্বশ্রেষ্ঠ বাংলা মাসিক পত্রিকা

"Galpa-Bharati is a landmark in Bengal's New creative emergence". Dr. Amiya Chakravarty

আষাঢ় ১৩৭৪ থেকে ২৩তম বর্ষ সুরু হয়েছে

সুনির্বাচিত গল্প - উপন্যাস - ভ্রমণ কাহিনী - রম্যরচনা - প্রবন্ধ - জীবনী প্রভৃতির সঙ্গে গল্প-ভারতীর যে নতুন ফীচারগুলি বাংলা মাসিক সাহিত্যে অনাস্বাদিতপূর্ণ অভিনবত্ব এনেছে; অন্তরীক্ষে (সমসাময়িক জীবনের কার্টুন), ভাববার কথা, ব্যাপার যা চলছে (সমসাময়িক ঘটনার উপর তিক্ত-মধুর টিপ্পনি), চলতি দুনিয়া (বিশ্বের বিচিত্র সংবাদ সংগ্রহ), নাট্যমঞ্চ, ছায়াবাণী মেয়ে মজলিস, গুপ্তচর কাহিনী, খেলাধুলা।

লেখকগোষ্ঠীতে আছেন শ্রেষ্ঠ লেখক লেখিকার সঙ্গে
প্রতিশ্রুতিসম্পন্ন নবীন লেখক সম্প্রদায়।

আষাঢ়, শ্রাবণ, ভাদ্র সংখ্যার কয়েকটি বিশেষ আকর্ষণ—

নিদারুণ খাদ্য সংকটের সমাধানে মহিলা মজলিশ বিভাগে অভিজাত মহিলা সমাজ নিয়মিত বিকল্প ও পরিপূরক খাদ্য সম্বন্ধে লিখছেন। ঘরে ঘরে এই অতি-প্রয়োজনীয় লেখাগুলি অবশ্য পাঠ্য। নূতন পাঠকবর্গের সুবিধার জন্য অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্তের রসঘন ধারাবাহিক উপন্যাস 'বন্যা কন্যা'র পূর্ব প্রকাশিত অংশের সংক্ষিপ্ত-সার প্রতি মাসেই প্রকাশিত হচ্ছে। ভারতের জাতীয়তাবোধের সূচনা করে এবং কিভাবে হ'ল—সেই সম্পর্কে দুষ্প্রাপ্য তথ্যের সচিত্র ও আকর্ষণীয় সন্নিবেশ। নাট্যমঞ্চ বিভাগে বহু নতুন নতুন ইতিকথা, স্মৃতিকথা ও চিন্তাগর্ব প্রবন্ধের সমাবেশ ও নাট্যসংস্থাদের কর্মপ্রচেষ্টার বিবরণ। ছায়াবাণী বিভাগে সারা পৃথিবীর সিনেমা-সমাচার ও নটনটীদের জীবনী ও তাঁদের শিল্পকৃতির পরিচয়। প্রতি সংখ্যা সম-সাময়িক জীবনের কার্টুন।

এ ছাড়া সুনির্বাচিত ছোট-বড় পাঁচ-ছয়টি গল্প। সর্বোপরি প্রতি মাসে নতুন-তর ও অতি আকর্ষণীয় ফিচার।

এরকম সর্বসুন্দর, উপভোগ্য ও সুখপাঠ্য মাসিক পত্রিকা আপনি ইতিপূর্বে পড়েন নি।

সর্বত্র সম্প্রতি এজেন্ট আবশ্যক।

প্রতি সংখ্যা এক টাকা। **গল্প-ভারতী** বার্ষিক সডাক পনেরো টাকা।

২৭৯বি, চিত্তরঞ্জন এভিনিউ, কলিকাতা-৬

৭ম বর্ষ
২য় খণ্ড

১৭শ সংখ্যা
মূল্য
৪০ পয়সা

Friday 25th August 1967. শুক্রবার, ৮ই ভাদ্র, ১৩৭৪ 40 Paise

সূচীপত্র

পৃষ্ঠা	বিষয়		লেখক
২৪৪	চিঠিপত্র		—
২৪৫	সম্পাদকীয়		—
২৪৬	প্রতিধ্বনি		—
২৪৮	এখন তার হাতেই সব	(কবিতা)	—শ্রীশক্তি চট্টোপাধ্যায়
২৪৮	সম্রাট	(কবিতা)	—শ্রীশান্তনু দাস
২৪৯	আরব-ইস্রাইল যুদ্ধের পটভূমিকা		—শ্রীকমল চৌধুরী
২৫৩	ঢেউগুলি	(গল্প)	—শ্রীসুধাংশু ঘোষ
২৫৮	সাহিত্য ও সংস্কৃতি		
২৬৩	সূর্য কাঁদলে সোনা	(উপন্যাস)	—শ্রীপ্রেমেন্দ্র মিত্র
২৬৬	একজন বিস্মৃত বাঙালী		—শ্রীসুজিত মুখোপাধ্যায়
২৬৭	দেশেবিদেশে		
২৬৮	ব্যঙ্গচিত্র		—শ্রীকাফী খাঁ
২৬৯	বৈষয়িক প্রসঙ্গ		
২৭০	বিজ্ঞানের কথা		—শ্রীশুভঙ্কর
২৭৩	প্রেক্ষাগৃহ		
২৮১	দৃশ্যের অন্তরালে		—জ্যাক কার্ডিফ
২৮৪	খেলাধূলা		—শ্রীদর্শক
২৮৭	ফুটবল প্রসঙ্গ		—শ্রীকমল ভট্টাচার্য
২৮৮	ফুটবলের শ্রেষ্ঠাংশে		—শ্রীবিপুল বন্দ্যোপাধ্যায়
২৯১	আধুনিক	(উপন্যাস)	—শ্রীবিভূতিভূষণ মুখোপাধ্যায়
২৯৪	অঙ্গনা		—শ্রীপ্রমীলা
২৯৭	আমার কাল আমার দেশ	(স্মৃতিচারণ)	—শ্রীসুধীরচন্দ্র সরকার
২৯৯	গৌরাঙ্গ-পরিজন		—শ্রীঅচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্ত
৩০১	পৃথিবীর বয়স	(বড় গল্প)	—শ্রীমিহির আচার্য
৩০৮	রেখাচিত্র		—শ্রীপুলকেশ দে সরকার
৩০৯	জানাতে পারেন		
৩১০	পারমাণবিক শক্তি		—শ্রীরঞ্জিত বন্দ্যোপাধ্যায়
৩১৭	পুরনো পাতা : প্রাচ্য প্রসাধনকলা		—বলেন্দ্রনাথ ঠাকুর
৩১৯	প্রদর্শনী-পরিক্রমা		শ্রীচিত্ররসিক

বীভৎস মাদক প্রসঙ্গে

অমৃত পত্রিকার পঞ্চদশ সংখ্যায় প্রকাশিত শ্রীবনবিহারী মোদকের 'বীভৎস মাদক কোকেন' জ্ঞাতব্য তথ্যে বিশেষ তৃপ্তি-দায়ক। কোকেন নিশ্চয়ই বীভৎস এবং নাম থেকেই তা মনে হওয়া খুবই স্বাভাবিক। মানুষের নেশার আর অন্ত নেই। তীব্র এবং বিষাক্ত জিনিস মানুষের স্বাভাবিক আকর্ষণ, তাই প্রায় দেখা যায়, নেশাখোর নেশার তীব্রতাবৃদ্ধির জন্য ক্রমাগত অধিকতর বীভৎসতার কাছে আত্মসমর্পণ করে। কারণ, সাধারণ বস্তুতে তখন আর শানায় না। প্রয়োজন হয়ে পড়ে অধিকতর তেজী মাদক-দ্রব্য। ক্রমে ক্রমে মানুষের নেশার ভাঁড়ারে জমা পড়ে নতুন নতুন মাদকদ্রব্যের—অবশ্যই উগ্রতায় তারা পূর্ববর্তীকে ছাড়িয়ে যায়।

মানুষ নেশা শুরু করে সাধারণভাবে কিন্তু পরিণতি হয়ে দাঁড়ায় মারাত্মক। শখের ঘোরে যা একদিন রঙীন আমেজ সৃষ্টি করেছিল—প্রলুব্ধ করেছিল, ক্রমে তাই হয়ে দাঁড়ায় প্রাণঘাতী। শখ তখন আর ওই দুটি অক্ষরের মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকে না—সীমা ছাড়িয়ে অসীমের সখ্যতায় সে তখন নিজেকে বাঁধা দিয়ে বসে থাকে। তার ঝামেলা পোয়াতে গিয়ে প্রাণান্তকর পরিচ্ছেদ। 'শ্যাম রাখি নয় কুল রাখি' অবস্থা। শখ তখন নেশায় দাঁড়িয়েছে। 'মরিয়া না মরে রাম এ কেমন বৈরী'—নেশা ছেড়েও ছাড়ে না। ক্রমশ উগ্র হয়। সাধারণ বস্তু ছেড়ে তখন অসাধারণের মোহ পেয়ে বসে। তার ফলেই সৃষ্টি হয় এইসব চণ্ডাল মাদক-দ্রব্যের—আফিং, গাঁজা, চণ্ডু, চরস, কোকেন প্রভৃতির। জমিয়ে নেশা করা চাই—নেশার ঘোর যেন সহসা ফিকে হয়ে না আসে। নেশায় মানুষ ডুবে থাকে। তখন সে সম্পূর্ণ-ভাবে নেশার বশ। নিজের ইচ্ছাশক্তি বলতে কিছুই থাকে না। নিজের ক্ষমতায় চলা-ফেরা কথা কওয়া এবং কাজ করার শক্তি তার লুপ্ত হয়ে যায়। বিবেক-জ্ঞান বর্জিত হয়ে সে অনেক সময় মানুষ নামের অযোগ্য হয়ে পড়ে অর্থাৎ পশু পদবাচ্য। এহেন নেশার মহত্তম সাকরেদ হচ্ছে কোকেন। কোকেনের ইতিবৃত্ত লেখক তুলে ধরেছেন এই প্রবন্ধে। সেই সঙ্গে তিনি কোকেনের প্রলয়ঙ্করী ভূমিকার কথাও আলোচনা করেছেন। লেখককে ধন্যবাদ।

অমল রায়
রামপুরহাট

নেতাজী প্রসঙ্গে

শ্রীযুত অভয়ঙ্করকে অকুণ্ঠ ধন্যবাদ জানাই তাঁর মননশীল ও সুচিন্তিত আলো-চনা "নেতাজী প্রসঙ্গে"র জন্য। (অমৃত ১১ই ও ১৮ই শ্রাবণ)। নেতাজী সম্বন্ধে নতুন তথ্য-সম্বলিত যে সমস্ত গ্রন্থ প্রকাশিত হয়ে থাকে—তার উপর ভিত্তি করে শ্রীঅভয়ঙ্কর ভারতের অজেয়, বিপ্লবী ও মহান নেতা সম্পর্কে যে সুন্দর বিশ্লেষণ করেন তা অনবদ্য। আলোচক সুন্দরভাবে ফুটিয়ে তোলেন নেতাজীর চিরসুন্দর ইমেজটিকে। যে ইতিহাস নেতাজী সৃষ্টি করেছিলেন সেই সময়কার দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ায় ও বিশেষ করে জাপানে—তা অতুলনীয়। এই বীর বিপ্লবীর তুলনা মেলে না। জগতের ইতিহাসের অন্যান্য বীর বিপ্লবীদের ইতিহাস আলোচনা করলে—এই সুমহান ও চিরসুন্দর পুরুষ নেতাজীকে সর্বপ্রথম সারিতে বসাতে হয়। যে কোন দেশেরই বিপ্লবী নেতারা তাঁদের নিজের দেশের মধ্যেই বিপ্লব ঘটিয়েছেন। কিন্তু নেতাজী যে ইতিহাস রচনা করেছেন—তার নজীর ইতিহাসের পৃষ্ঠায় বিরল। তাই নেতাজী সম্বন্ধে প্রবীণ বিপ্লবী নেতা রাসবিহারী বসু উদাত্ত কণ্ঠে বলেছেন—

> "I have brought you this present Subhas Chandra Bose who needs no introduction to you, to India or to the world. He symbolises all that is best, noblest, and most daring and most dynamic in the youth of India"

নেতাজীর জীবনের শেষ অধ্যায়টি—আজও সম্পূর্ণভাবে কেউই লিখতে পারেন নি। এই অধ্যায়টি সম্পূর্ণভাবে লেখবার পক্ষে প্রয়োজনীয় materials এখানে সেখানে ছড়ানো রয়েছে। সেগুলি সমস্ত সংগ্রহের প্রয়োজন। অনেক সময় দেখতে পাই—যে নেতাজী সম্বন্ধে অনেক ভুল, ভ্রান্ত এবং অসূয়া প্রযুক্ত তথ্য প্রকাশিত হয়—এটা উদ্দেশ্য প্রণোদিত বা অন্য কিছু কিনা তা জানি না। তবে মনে-প্রাণে অনুভব করি যে, এটা হতে দেওয়া উচিত নয়। এবং এইসব লেখকদের দৃষ্টি-ভঙ্গিমার আমূল পরিবর্তন দরকার। নেতাজীকে সামগ্রিকভাবে অনুধাবন করবার বা জানবার আজও আমরা ভালোমত চেষ্টা করিনি। মনে হয়—নেতাজীর সমগ্র জীবনের বিশেষ করে নেতাজীর জীবনের শেষ অধ্যায় উদ্ঘাটন-কল্পে আমাদের জাতীয় সরকার একটি উপযুক্ত ও স্বাধীন মনোভাবাপন্ন বোর্ড গঠন করে নেতাজীর বৈচিত্র্যময় জীবনের যাতে প্রকৃত সন্ধান পাওয়া যায় তার চেষ্টা করতে পারেন, এসম্বন্ধে আমরা আজও কোন প্রকৃত চেষ্টা করিনি। সেজন্যই দেখতে পাই যে, কোন পুস্তকই নেতাজী জীবনের সামগ্রিক চিত্র আমাদের সামনে তুলে ধরতে পারে না।

কালীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়
কলিকাতা—৩৯

পোষাক বিবর্তন প্রসঙ্গে

অমৃত পত্রিকার একাধিক সংখ্যায় পোষাক বিবর্তন শীর্ষক আলোচনা পড়ে আনন্দিত হলাম। এর মধ্যে বেশীর ভাগই হোল উগ্র আধুনিকাদের নগ্ন পোষাকের আলোচনা। বর্তমানে এই আলোচনা বিশেষ প্রয়োজনীয়।

একসময় সমাজে নারীর সম্মান খুবই উঁচুতে ছিল, আজ তাঁদের অবস্থা কোন পথে তা 'অমৃতে' প্রকাশিত বিভিন্ন আলোচনা থেকে সহজেই বোঝা যায়।

এখানে আমি রত্না দেবীর রচনার একাংশ উদ্ধৃত না করে পারছি না। তিনি লিখেছেন (অমৃত, ৭ম বর্ষ, ৮ম সংখ্যা, ৬২৪ পৃঃ) "আমি অনেক সময় লক্ষ্য করেছি, রাস্তায় চলার সময় পুরুষেরা রাস্তার নারীদের প্রতি একবার তাঁদের সুতীক্ষ্ণ দৃষ্টি বুলিয়ে যান। বেশীর ভাগ সময় দেখা গেছে এদের বয়স ছোট ভাইয়ের চেয়েও কম। অথচ সে দৃষ্টিতে থাকে ঘৃণ্য লালসা আর লোলুপতার ভরা।" আর এজন্য তিনি দায়ী করেছেন ঐ লজ্জাহীনা উগ্র-আধুনিকা গোষ্ঠীকে। আমিও তাঁর উক্তিতে একমত—শুধু আমি কেন গোটা সমাজও রত্না দেবীর পক্ষে।

যে মহিলারা একদিন জগজ্জননীর অংশ জ্ঞানে নিজেদের শুদ্ধ ও সংভাবে রুচিসম্মত পোষাক-আশাকের মাধ্যমে জীবন যাপন করে মাতৃত্বকে ফুটিয়ে তুলে সম্মানের আসনে প্রতিষ্ঠিত ছিলেন, (এখনো প্রকৃত মায়েরা সে আসনে অধিষ্ঠিতা আছেন) সেদিন কিন্তু এমনি ব্যাপক স্কুল-কলেজের মাধ্যমে স্ত্রী-শিক্ষায় তাঁরা পার-দর্শিনী ছিলেন না। তাইতো সেদিন সমাজের ছিলো এক অভাবনীয় অভাব। সমাজ সেদিন ভেবেছিলো পুরুষের ন্যায় মহিলাদেরও যদি শিক্ষায় এগিয়ে নিয়ে যাওয়া সম্ভব হতো তাহলে তাঁরা তাঁদের আদর্শ সারা দুনিয়ার বুকে দৃঢ় হতে দৃঢ়তররূপে প্রকাশ করতে সক্ষম হতেন। তাইতো স্ত্রী-শিক্ষা প্রসারের জন্য বহুমুখী প্রচেষ্টা করেছেন তৎকালীন আদর্শ স্থানীয় মহিলা নেতৃবৃন্দ ও আদর্শ-বান দেশ-নায়কেরা। কিন্তু তাঁরা ও সমাজ আশা করেনি এই স্ত্রী-শিক্ষার ফল এমনি বিরূপ ভাবে আত্মপ্রকাশ করবে গড়ে উঠবে উগ্র আধুনিকা বলে একটি গোষ্ঠী। মায়ের জাতি ভুলে যাবেন তাঁদের মাতৃত্বের দাবী, দেবী-মূর্তির পরিবর্তে তাঁরা সমাজের বুকে অবতীর্ণা হবেন ঘৃণা ও লালসার আকর-রূপে! মা ভগ্নীর আভরণ ত্যাগ করে তাঁরা এসে দাঁড়াবেন ঠুঁটো জগন্নাথ মার্কা (যা অনুকরণেরও অতীত) নগ্ন-প্রায় আধুনিকা বেশে।

যে মার্জিত সাজ-পোষাকে সজ্জিতা নারী-মূর্তি দর্শনে শ্রদ্ধায় মন ভরে ওঠে, সেই মার্জিত রুচিসম্মত সাজ-পোষাককে সজ্জিতাদের দেখে অর্ধনগ্ন আধুনিকারা মুখ টিপে হাসতেও দ্বিধা করে না। নিজেরা তো এই নগ্নতায় গা ভাসিয়ে দিয়েছে।

বিভিন্ন প্রবন্ধের মাধ্যমে লেখক-লেখিকারা এর প্রতিকারেরও পথ নির্দেশ করেছেন। বিশেষ করে এই নগ্নতার প্রশিক্ষণ যাঁরা পেয়েছেন এবং পেতে চলেছেন সেইসব উগ্র আধুনিকাদের কাছে। ঐ ঘৃণ্য পথ ত্যাগ করে পবিত্র পথে ফিরে আসতে তাঁদের অনুরোধ জানান হয়েছে। কিন্তু বেশীরভাগ ক্ষেত্রে দেখা যায় চরম ভুলের মধ্যে যারা হাবুডুবু খায় তারা ঐ ভুলকে ত্যাগ করতে চায় না।

ভৈরবানন্দ রায়।
কলকাতা—৫৭।

ভাষার প্রশ্ন নিয়ে

ভাষা নিয়ে আমাদের দুর্ভোগ ও দুশ্চিন্তা এখনো শেষ হয়নি। হিন্দী বনাম ইংরেজির দ্বন্দ্ব এমন এক পর্যায়ে গিয়ে পৌঁছেছিল যে কেন্দ্রীয় সরকারের পক্ষে অহিন্দীভাষীদের সংশয় দূর করার জন্য প্রতিশ্রুতি দেওয়া ছাড়া কোনো উপায় ছিল না। জওহরলাল নেহরুর সময়ে বহুবার এই ধরনের প্রতিশ্রুতি দেওয়া হয়েছিল যা সংসদের কার্যবিবরণীতে লিপিবদ্ধ আছে। অহিন্দীভাষীরা চাইছেন যে, সরকারী ভাষা হিসাবে হিন্দীর সঙ্গে ইংরেজির সহাবস্থান এবং সমমর্যাদায় প্রচলনের জন্য পরলোকগত নেহরুজীর প্রদত্ত প্রতিশ্রুতি বিধিবদ্ধ করা হোক। কারণ, আইনানুগ ব্যবস্থা ছাড়া প্রতিশ্রুতি অর্থহীন হয়ে পড়বে। ভাষা যখন একটা জরুরী বিষয় এবং তার সঙ্গে বিভিন্ন প্রান্তের ভারতীয় ভাষাভাষীদের আবেগ, আসক্তি এবং নিবিড় সম্পর্ক বর্তমান তখন এই প্রশ্নটি অমীমাংসিত রাখা কোনোরকমেই যুক্তিযুক্ত হবে না।

পরলোকগত লালবাহাদুর শাস্ত্রী এই বিপদের কথা জানতেন। তাই দক্ষিণ ভারতে প্রবল হিন্দী-বিরোধী আন্দোলন হবার পরেই তিনি প্রকাশ্যে ঘোষণা করেছিলেন যে, ইংরেজির প্রচলন বন্ধ করার কোনো ইচ্ছা সরকারের নেই। এবিষয়ে নেহরুজী যা যা প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন তা গ্রথিত করে একটি আইন প্রণয়ন করা হবে। ইতিমধ্যে লালবাহাদুরজী মারা গেলেন। তাঁর স্থলাভিষিক্ত হলেন শ্রীমতী ইন্দিরা গান্ধী। সংসদের এই অধিবেশনেই ভাষাবিষয়ক বিলটি পেশ করার কথা ছিল। শ্রীমতী গান্ধী এ বিষয়ে হিন্দীপন্থী ও অহিন্দীপন্থী সকলের সঙ্গেই অনেক আলোচনা ও পরামর্শ করেছেন। কিন্তু শেষ মুহূর্তে জানা গেল যে, প্রস্তাবিত বিলটি সংসদের বর্তমান অধিবেশনে তোলা হবে না। ঠিক এমন আশঙ্কাই আমরা করছিলাম। ভাষা নিয়ে কংগ্রেস পার্টির পক্ষে কোনো বিতর্কের মধ্যে প্রবেশ করা বর্তমান সময়ে খুবই কঠিন। কারণ, প্রবল হিন্দী লবী সারা উত্তর ভারতে কংগ্রেসকে নির্বাচনে নাকানি-চুবানি খাইয়েছে। বলতে গেলে রাজস্থান ছাড়া বাকী সবক'টা হিন্দীভাষী রাজ্যই বর্তমানে কংগ্রেসের হাতছাড়া। সুতরাং হিন্দীভাষীরা চটে যেতে পারে এমন কোনো বিল সংসদে পেশ করা কংগ্রেসের পক্ষে কঠিন। কিন্তু অহিন্দীভাষী অঞ্চলেও কংগ্রেসের অনুগামীর সংখ্যা খুব বেশি নেই। তবু মহারাষ্ট্র, গুজরাট, অন্ধ্র, মহীশূরের মতো চারটি গণনীয় রাজ্য কংগ্রেসের অনুকূলে। সুতরাং হাতছাড়া হিন্দী এলাকার ভয়ে কি সরকার তার অনুগামী অহিন্দী এলাকারও বিরাগভাজন হবেন?

হিন্দীপন্থীরা গোড়া থেকেই ভাষার প্রশ্নটিকে এমন জটিল করে তুলেছেন। যখন সংবিধান রচিত হয়েছিল তখনকার দেশের মানুষের মানসিক অবস্থা এবং বর্তমান সামাজিক অস্থিরতার মধ্যে আকাশপাতাল তফাৎ। তখনও দেশবরেণ্য নায়কেরা সব জীবিত। তাঁদের মুখের কথাতেই অনেক বিতর্কের অবসান হয়ে যেত। কিন্তু আজ সর্বভারতীয় সংগঠন হিসেবে কংগ্রেস ক্ষীণবল। রাজ্যগুলির মধ্যে পারস্পরিক সহযোগিতার মনোভাব আর তেমন প্রবল নয়। জাতীয় সংহতির জন্য যত চেষ্টাই করা হোক না কেন, তা এখনও দূর অস্ত্। এই পরিপ্রেক্ষিতে ভারতের ভাষার প্রশ্নের পুনর্বিচার একান্ত কাম্য। এমন কোনো কাজ আমরা করতে পারি না যার ফলে আমাদের ঐক্য ও সংহতি বিপন্ন হয়। অথচ সরকারী ভাষা কী হবে সে-প্রশ্নও এমনভাবে অমীমাংসিত রাখা যায় না। হিন্দীপন্থীরা স্বভাবতই চাইছেন না যে, তাঁদের ভাষার প্রাধান্য হ্রাস পাক। হিন্দী এলাকায় অনেক নামকরা রাজনৈতিক নেতা 'ইংরেজি হঠাও'কে একটি অবশ্যকর্ম বলে গ্রহণ করেছেন। ইংরেজি হঠাও বললেই তাকে হঠানো যাবে না। বিশাল ভারতবর্ষের অধিকাংশ অধিবাসীই অহিন্দীভাষী। তাঁরা চাইছেন ইংরেজির প্রয়োজন যতদিন না ফুরোয় ততদিন হিন্দীর পাশাপাশি ইংরেজিকে সরকারী ভাষার সমান মর্যাদায় রাখা হোক। ইতিমধ্যে যদি হিন্দীর প্রচলন বাড়ে এবং ইংরেজির প্রয়োজন আর না থাকে তখন হিন্দী তার যোগ্য স্থান অধিকার করে নিতে পারে। এই যুক্তিতে ভাষাবিষয়ক বিল আনার কোনো অসুবিধা আছে বলে আমরা মনে করি না।

কেন্দ্রীয় সরকার আশঙ্কা করছেন যে, এই বিল আনলে ভোটাভুটিতে একটা বিপর্যয় হতে পারে। ভাষার বিষয়ে ভোটাভুটি কি অপরিহার্য? এই প্রশ্নটি কি আমরা 'কনসেনসাস' নিয়ে মীমাংসা করতে পারি না? ভোটের জোরে একবার হিন্দীকে রাষ্ট্রভাষা করে এই বিপদ আমরা ডেকে এনেছি। আবার যদি হিন্দীপ্রেমীরা ভোটের জোরে কোনো মীমাংসার সূত্র প্রত্যাখ্যান করে দেন তাহলে সারা দেশের পক্ষেই হবে তা দুর্দিন। কারণ, বিভিন্ন জাতির ইতিহাসে দেখা গেছে যে, ভাষার প্রশ্নে কেউ তার স্বাধিকার ছাড়তে রাজী নয়। হিন্দীপ্রেমীরা এই সহজ সত্যটি যদি না বোঝেন তাহলে তাঁরা শুধু অহিন্দীভাষীদেরই ক্ষতি করবেন না, নিজেদের ভবিষ্যৎও বিপন্ন করবেন।

প্রতিভাধর পরিচালক রোমান পোলানস্কী

অমিয় সান্যাল

বিংশ শতাব্দির এই যুগসন্ধিক্ষণে দাঁড়িয়ে দেখা যাচ্ছে সাহিত্য শিল্প আর নাটকে 'আঙ্গিক কুশলতার অসামান্য প্রকাশ ধ্বনিত। সেই মুহূর্তেই আবির্ভূত হয়েছেন পোলানস্কী। কারণ মনের আনাচে-কানাচে তাঁরও ঘুরে বেড়াচ্ছিলো প্রচুর কলাকৌশলের ফন্দী-ফিকির, যার প্রকাশ ছিলো অনিবার্য'। মানুষের বর্ণ-বৈষম্য পোলানস্কীর মনক্ষুন্ন হয়ে গিয়েছিল। কারণ ও'র ধারণা, 'বর্ণে কি বা আসে যায় যদি মানুষ মানুষকে চিনতে চায়?'

নিজস্ব কর্মসাধনায় উনি দৃঢ়ভিত্তিক আর স্বয়ংসম্পূর্ণ।

রোমান পোলানস্কী আজ পর্যন্ত শর্ট আর ফিচার, ছোট আর পূর্ণ দৈর্ঘ্য ছবি যে কটি পরিচালনা করেছেন তার একটি সংক্ষিপ্ত তালিকা দেওয়া হ'ল।

শর্ট ছবি—আর পূর্ণ দৈর্ঘ্য বা ফিচার ছবির পরিচয়।

সাল—১৯৫৫। এই বছরের প্রথমার্ধেই শুরু করেন 'রোয়ার দা বাইক' (অসম্পূর্ণ) রঙীন ছবি। ১৯৫৭—রজাবিজেনী-জ্যাবাডিই, ব্রেক আপ দা ডান্স, ১৯৫৮—টু মেন অ্যাণ্ড এ ওয়ার ড্রোব, ১৯৫৯—হোয়েন অ্যাঞ্জেলাস ফল দা ল্যাম্প, ১৯৬১—লে গ্রস এত লা ম্যাগ্রী ও ১৯৬২ ম্যামালস।

ফিচার ছবি—১৯৬২—নাইফ ইন দা ওয়াটার বা দা ইয়াং লাভারস। ১৯৬৩—এ রিভার অফ ডায়মণ্ডস, ১৯৬৫—রিপালসন, ১৯৬৬—কাল্ ডে সাক ও দা ভ্যামপায়ার কীলারস্।

(রূপম ।। ১৫ আগস্ট ।। ১৯৬৭)

স্যামুয়েল যোসেফ অ্যাগনন

চিত্তরঞ্জন বন্দ্যোপাধ্যায়

অ্যাগনন হিব্রু সাহিত্যের শ্রেষ্ঠ কথা-শিল্পী। তাঁর চরিত্রচিত্রণের পদ্ধতি, কাহিনী-বয়নের রীতি এবং গভীর নীতিবোধ হিব্রু কথাসাহিত্যে নবযুগ এনেছে। দরিদ্র ঘৃণিত ইহুদী নর-নারীকে তিনি যেরূপ মর্যাদা দিয়েছেন পূর্বের সেরূপ কেউ দেয় নি। দরিদ্রের মধ্যেও যে অন্তরের সম্পদ আছে, তার উপর অ্যাগনন বারবার জোর দিয়েছেন।

অ্যাগননের ক্রমবর্ধমান জনপ্রিয়তার কারণ, তিনি এক জায়গায় স্থির হয়ে নেই, সময় এবং নব-নব অভিজ্ঞতার সঙ্গে সঙ্গে তাঁর শিল্প-সাধনা নতুন নতুন পথ নিয়েছে। লেখকজীবনের প্রথম পর্বে অ্যাগননের গল্প ছিল বাইবেলের প্যারাবেল-এর আধুনিক সংস্করণ, অথবা, লোকমুখে প্রচলিত উপকথার সমধর্মী। সকল রচনায় মধ্যে ঈশ্বরানুরক্তি ও ধর্মে আসক্তি ছিল দ্বিধাহীন।

প্রথম বিশ্বযুদ্ধের প্রায় এক যুগ পরে জন্মভূমি গ্যালিসিয়ার বিধ্বস্ত রূপ প্রত্যক্ষ করে অ্যাগননের চিন্তাধারা পরিবর্তন হল। যে বাড়ীতে তাঁর জন্ম হয়েছিল, যেখানে পড়েছেন, যেখানে কত আনন্দময় সময় কেটেছে, সে সব জায়গা আর চেনা যায় না'। এই বেদনাময় অভিজ্ঞতা রূপায়িত করলেন 'এক রাতের অতিথি' নামক উপন্যাসে। বিধ্বস্ত গ্যালিসিয়া শুধু তাঁর মধুর শৈশব-স্মৃতি ধ্বংস করে নি সমগ্র ইহুদি জাতির বিপর্যয়ের ইঙ্গিত রয়েছে এর মধ্যে। উপন্যাসে কতগুলি পঙ্গু চরিত্র এনে লেখক এই ইঙ্গিতকে অর্থময় করে তুলেছেন। শহরের গেট দিয়ে প্রথম ঢুকতেই যে পাহারা-ওয়ালার সঙ্গে দেখা সে বিকলাঙ্গ।

'এক রাতের অতিথি' থেকেই অ্যাগননের রচনায় একটি নতুন বাঁক লক্ষ্য করা যায়। পরবর্তী রচনার ঈশ্বরানুরক্তি-সঞ্জাত সহজ আনন্দের ছটা অনেকটা ম্লান হয়ে পড়েছে। এর ফলে তাঁর রচনা হয়েছে অধিকতর জীবন-ঘনিষ্ঠ। কিন্তু তাই বলে অ্যাগননকে আধুনিক অর্থে বাস্তববাদী লেখকও বলা চলে না। বাস্তবের কঠোরতাকে তিনি হুবহু পাঠকের নিকট তুলে ধরতে চেষ্টা করেন নি। তাঁর পাত্র-পাত্রীর বাস্তব জীবন অস্পষ্ট কুয়াশায় আচ্ছন্ন, সেই কুয়াশা ভেদ করে প্রকৃত জীবনকে উপলব্ধি করা যায়, প্রত্যক্ষ করা যায় না। অনাদর জীবনের দুঃখ-দুর্দশার জন্য অ্যাগনন নিয়তিকে দায়ী করেন নি, পাত্র-পাত্রীরা গভীর কুয়াশায় আচ্ছন্ন হয়ে পথ খুঁজে বেড়াচ্ছে, প্রকৃত পথের সন্ধান না পাওয়াতেই তাদের জীবনের যত সমস্যা ও বেদনা।

(বিচিত্রা ।। ফাল্গুন-চৈত্র ।। ১৩৭৩)

বেঙ্গলী থিয়েটার

রঞ্জিৎকুমার চট্টোপাধ্যায়

বাংলার আনন্দের ভোগে যাত্রা পাঁচালি প্রভৃতি প্রাচীন প্রমোদোপকরণের চল ছিল যখন, ঠিক কবি, তরজা, হাফ-আখড়াইয়ের সমাদর, ঠিক সেই যুগে একদিন ইংরেজী ভাষার 'ক্যালকাটা গেজেট' পত্রে 'বেঙ্গলী থিয়েটার' শিরোনামাযুক্ত একটি বিজ্ঞাপন প্রকাশিত হোল। জানা গেল, ২৫নং ডোমতলায় (আধুনিক এজরা স্ট্রীটে) একটি ইংরেজী নাটক জনৈক বিদেশী কর্তৃক বাংলায় রূপান্তরিত হয়ে বাঙালী নটনটীদের দ্বারা অভিনীত হবে। বিলেতি কায়দায় পিকচার-ফ্রেম স্টেজসমন্বিত প্রথম বাঙালী নাট্যশালা এইভাবে তৈরী হয়ে গেল। অভিনীত হোল প্রথম বাংলা নাটক। উদ্বোধন রজনী ২৭শে নভেম্বর ১৭৯৫। টিকিট : বক্স ও গ্যালারি আট ও চার টাকা।

এরও অনেক পরে। একুশটি বছর অতিক্রম করে তারপর এসেছে সন ১৮১৭। নব্য সংস্কৃতির দিকচিহ্ন 'হিন্দু কলেজে'র আবির্ভাব ঘটেছে। মহারাণীর দেশের লোক কালচারাল কনকোয়েস্টের নেশায় সঙ্গে করে আনতে ভোলে নি আপন দেশের সাহিত্য-রীতিকে। 'শেকসপীয়র' এসেছেন। এসেছে থিয়েটার। কলকাতার সাহেবদের নাট্যশালায় নব্য নেটিভবাবুরা ইংরেজী নাটকের অভিনয় দেখে দেখে উদ্দীপ্ত হলেন। ইংরেজী জানা ইয়ং বেঙ্গল কর্তৃক 'জুলিয়াস সীজারের' অংশবিশেষ মূলে ভাষাতেই অভিনীত হোল। প্রমথকুমার ঠাকুর তাঁদের অধিনায়ক। 'বেঙ্গলী থিয়েটারের' দ্বিতীয় পর্যায়ের সূত্রপাত এই। ১৭৯৫ থেকে প্রায় ৪০ বছর সরে আসবার পর।

তারপর নানা ঘাত-প্রতিঘাত। নাট্য আন্দোলনের উন্নতশির পতাকাটি একদিন দেখা গেল বেলগাছিয়ায়। পাইকপাড়ার রাজাদের বাগানবাড়ির অভ্যন্তরে অনুকূল বায়ু লেগে চঞ্চল। মাইকেলের বাংলা নাটক 'শর্মিষ্ঠা' ১৮৫৯ সালের শেষপাদে সেখানে অভিনীত হোল। বাংলা সাহিত্যরচনার ক্ষেত্রে মধুসূদনের দৃপ্ত পদক্ষেপ আঁকা হয়ে গেল বাংলা রঙ্গমঞ্চের পাদপ্রদীপের ম্লান আলোক-প্রভায়। বিদ্যাসাগর বাংলা গদ্যের জটিলতা ভেঙেছিলেন। উনি মোড় ঘোরালেন বাংলা নাটকের রচনাধারাকে। অনুসরণ করলেন বিদেশী কাঠামো। তিনি বললেন : সংস্কৃতের দাসত্ব বন্ধন থেকে মাতৃভাষাকে মুক্তি দিতে আমি চাই। আমি তাঁদের জন্যে লিখি, যাঁরা আমারই মতো পাশ্চাত্যের ভাবধারা ও চিন্তায় অবগাহন করেছেন। মাইকেল রচিত বহু নাটকের মধ্যে বিশেষ করে সমসাময়িক সমাজ-মানসকে লক্ষ্য করে লিখিত ব্যঙ্গ নাটকগুলি আজও 'বেঙ্গলী থিয়েটারে' অপাঙক্তেয় নয়।

(বৈতানিক ।। মে ১৯৬৭)

প্রথম স্বাধীনতা যুদ্ধের পটভূমিকা

শ্যামল সেনগুপ্ত

আজ থেকে প্রায় একশো দশ বছর আগেকার কথা। এখনকার মত তখনো দেশের চারিদিকে যাওয়া-আসার সুযোগ সুবিধা হয়নি। রাণীগঞ্জ পর্যন্ত রেললাইন সবে খোলা হয়েছে, নির্দিষ্টসংখ্যক দু'একটি গাড়ী সেই পথ দিয়ে যাতা-য়াত করে। জলপথের প্রধান যানবাহন ছিল নৌকা। স্থলপথে উটের পিঠে, আর নয়ত ঘোষ বা গরুর গাড়ী অথবা ঘোড়ার পিঠে যাতায়াত করতে হতো। মধ্যবিত্ত-ঘরের লোকেরা সাধারণতঃ হেঁটেই দশ-বিশ ক্রোশ পাড়ি দিত। এই রকম দেশের

অবস্থায় নানা দ্বন্দ্বমন্থ মনের মধ্যে এক সুকঠিন সংকল্প নিয়ে ইংরেজ কোম্পানীর ভারতজোড়া সাম্রাজ্যে একই সংগে বিপ্লবের আগুন জ্বালাবার ইন্ধন তৈরি করতে থাকেন বছরের পর বছর ধরে। দেশব্যাপী এই আন্দোলন গড়ে তোলার জন্য নানা-সাহেব অদ্ভুত এক উপায় অবলম্বন করে-ছিলেন। সভা নেই, কোনরকম বক্তৃতা বা হৈ-চৈ নেই অথচ বাংলা থেকে পেশোয়ার পর্যন্ত বিস্তীর্ণ বিশাল দেশের জনসাধারণ এবং ইংরেজের সুরক্ষিত সিপাহী ব্যারাকের মধ্যে হিন্দু-মুসলমান নির্বিশেষে বিপ্লবের মূলবীজ বপন করার জন্য নানাসাহেব সংকেত বা প্রতীক হিসাবে ব্যবহার করে-ছিলেন দুটি অতি সাধারণ বস্তু। সেই দুটি একটি হলো অতি সাধারণ-ঘরে তৈরি চাপাটি, আর দ্বিতীয়টি হলো লালপদ্ম।

আটার তৈরি ছোট একখানি থালার মতো এক ইঞ্চি পুরু এই চাপাটি যখন যে গ্রামে এসে পৌঁছাত সেই গ্রামবাসী তাঁদের নিজেদের মনে করতো ভাগ্যবান। কে পাঠাল—জানবার দরকার নেই, তবে যখন এসেছে, তার মানেই কোম্পানীর রাজত্ব শেষ হয়ে এসেছে!......অতি সাধারণ একখানি হাতে-গড়া চাপাটি সংকেতের মধ্য দিয়ে সরল গ্রামবাসীকে দীক্ষা দেয় বিপ্লবের মন্ত্রে।

এই চাপাটি গ্রামের মোড়লের কাছে বহন করে আনেন পাশের গ্রামের মোড়ল অথবা চৌকিদার। দিক-নির্দেশের মতো সেই চাপাটি গ্রামের মোড়লের কাছে এসে পৌঁছান মাত্রই গ্রামবাসী এসে ভীড় করে মোড়লের বাড়ীতে। মোড়ল সেই চাপাটি ভেঙ্গে ভেঙ্গে প্রসাদের মতো বিলিয়ে দেয় তাদের মধ্যে, গ্রামবাসী তা গ্রহণ করে ধন্য হয় আর মনে মনে অনুভব করে বিপ্লবের বাণী।......সেই গ্রামের মোড়ল ঠিক ঐভাবে তার একটি চাপাটি তৈরি করে দিয়ে আসে তার পাশের গ্রামের মোড়লের হাতে।

নতুন কোনো অঞ্চলে এই চাপাটি এসে পৌঁছবার আগেই শুভাগমন হয় নবাগত কোনো সন্ন্যাসী অথবা বাউল কিংবা জ্যোতিষীর। এঁরা নানাসাহেবেরই প্রেরিত লোক, ঘুরে বেড়ান দেশ থেকে দেশান্তরে আর স্থানীয় অধিবাসীদের শোনান ইংরেজের অত্যাচারের পাপের কথা। জ্যোতিষী ভবিষ্যদ্বাণী করেন কোম্পানীর রাজত্ব শেষ হওয়ার সময় এসেছে, ১৭৫৭ সালের ওদের রাজত্ব শুরু হয়েছে, তার শেষ হবে একশো বছর পূর্ণ হলে অর্থাৎ ১৮৫৭ সালে। আর বাউল গান গেয়ে যান—দেশবাসীকে জাগতে হবে, হাতে হাত মিলিয়ে ধুলোয় মিশিয়ে দিতে হবে কোম্পানীর রাজত্ব, চাপাটি আসবে সেই ধ্বংসের পরোয়ানা নিয়ে। এর পরেই এসে পৌঁছায় সেই চাপাটি। চাপাটি আসার অনেক আগেই এঁরা তার পথ প্রস্তুত করেন তারপর চাপাটি আসামাত্রই তাঁদের কাজ শেষ! এর পরে আর কথা নেই, আন্দোলন নেই, চাপাটি নিজেই তার কাজ করে চলেছে, ঘুরে চলেছে এমনিভাবে গ্রামের পর গ্রাম, জেলার পর জেলা, পরগণার পর পরগণা চাপাটি গ্রামে পৌঁছান মাত্রই সারা অঞ্চলে সে কি চাঞ্চল্য। প্রসাদের মত কণিকামাত্র গ্রহণ করে গ্রামবাসী আর সঙ্গে সংগে তাদের অন্তরে জেগে ওঠে ইংরেজের প্রতি প্রচণ্ড বিদ্বেষ, উদ্বেল হয়ে ওঠে দেশাত্মবোধের প্রবাহ! বিপ্লবের আগুনে দীক্ষিত হয় নিরীহ গ্রামবাসী।

[অরিন্দম ।। স্বাধীনতা সংখ্যা ।। ১৯৬৭]

এখন তার হাতেই সব ॥

শক্তি চট্টোপাধ্যায়

বুকে হেঁটে পৌঁছেছি নদীর কাছে বরাবর।
বাকি পথ আরোগ্যের পর স্বাস্থ্য-ফেরার মতন দুরূহ;
চতুর্দিকে কতো সাবলীল গাছপালা, ইন্দ্রিয়-ছোঁয়া নীলবর্ণ
আমি তাদের কেউ নই।
পুজোর মূর্তি, সাষ্টাঙ্গ, মধ্যে শয়ান—
ঘরের ভিতরে যেমন মানুষ নির্জন, তেমনি আমি।
রাখা-ঢাকা গল্প আছে; তোমাদের কাছে
বলবো বলেই এতোদূরে এসেছি—
নদী, তুমিও কান দিও।

কথায় বলে, কাঁঠাল তুমি গাছের গায়ে ঠেস্ দিয়ে দাঁড়াও কেন?
সবাই তোমাকে দেখছে—
এক এক সময় এই দেখ্নাইপনায় ছেয়ে যায় মেঘের মতন
বাসনার ঘর-গেরস্থালি
পকেট থেকে মুদ্রা, তাগা-তাবিজ, মাংসপেশী, দৌড়-ঝাঁপ—
দেখাতে-দেখাতে
ম্যাজিকঅলার কাছে যেমন মনের মানুষ
সে তেমনি এসে বললো : থামলে কেন?
আরো কি আছে দেখাও আমাকে—যা যা আছে সব দেখাও।

এখন তার হাতেই সবকিছু—ফেরৎ-ফেরতা বলতে নেই,
বাকি যা আছে, তা তো দেখতেই পাচ্ছো নদী, তুমিও—
একবারটি ওপারে যাবো!

সম্রাট ॥

শান্তনু দাস

তারপর.......
বিশাল প্রান্তর জুড়ে গতানুগতিক
আভরণে সামন্ত রাজার মতো শিঙা ফুঁকে মিছিল উধাও হলে
পাঁচিলের পাশে আমি নিঃশব্দে দাঁড়াই :

অন্ধকারে কেউ কোথা নেই
বিশাল ভামিনী একা নিশ্চিন্ত জাজিমে,
হিসেব বাজার মুদি রেশনের থলি
প্রেমিকা শয়তান কিম্বা লুব্ধ ফুলঅলি
সকাল-জানলায় কোন পবিত্র বালিসে মাথা রাখে,
এবং পাঁচালী যথা সুরু হবে ধীরে
যেমন যথার্থ ঘটে পৃথিবীর নীড়ে
অথর্ব প্রহরে
যেমন দোকানী ভাঙা হাটে ঝাঁপ বন্ধে পুনর্বার খোলার প্রস্তুতি :

স্নায়ুতন্ত্রী অবশ অবশতম হলে
ফুসফুসে নিঃশ্বাস শব্দ করে ওঠে
উত্তুঙ্গ চূড়ায় আমি পৌঁছোলে কখন

দম্ভিল মেঘের মতো শব্দ ভেঙে আসে
'........নেমে এসো,
ওপারে নীরন্ধ্রকাল অনিশ্চিত নদী
পারাপারে ভগ্ন সাঁকো বেমক্কা আড়াল হয়ে আছে :

এদিকে জীবন আর নীতি সনাতন
গুরুমশায়ের মত
চাবুক উঁচিয়ে বলে—
অবাধ্য বেকুফ এখনো সময় বুঝি আছে
নামবার সিঁড়িটুকু দিয়ে
এখনো পাঁচিল থেকে সোজা নেমে এসো
প্রতিধ্বনি শব্দময় হয়
নেমে এসো...... নেমে এসো........ :

পুবের আকাশ
তান্ত্রিক সাধুর চোখ রক্তজবা কুসুমের মতো
আঙুল উঁচোলে দেখি
কখন নিশ্চল ঋজু একাকী সম্রাট
উত্তুঙ্গ পাঁচিলে আমি দাঁড়িয়ে রয়েছি।

আরব-ইসরাইল যুদ্ধের পটভূমিকা

কমল চৌধুরী

সংযুক্ত আরব সাধারণতন্ত্রের প্রধানমন্ত্রী নাসের

অ-ঐতিহাসিক তথ্যের ভিত্তিতে দাবী করা হয়ে থাকে, প্যালেস্টাইন ছিল ইহুদী-দের বাসভূমি। সেখান থেকে তাড়িয়ে দেওয়ায় বিভিন্ন দেশে গিয়ে তারা আশ্রয় নিতে বাধ্য হয়েছিল। বাইবেলের গাথা থেকে উল্লিখিত প্রমাণকে যুক্তিসহ স্বীকার করা অসম্ভব। ইহুদীদের অন্যতম পূর্বপুরুষ মোজেস ইহুদীদের মুক্ত করে জেরিকোতে নিয়ে যান। এই জেরিকো বর্তমান ইসরাইল রাষ্ট্রের বা প্যালেস্টাইনের ধারে কাছে নয়। খৃষ্ট জন্মের অন্তত এক হাজার বছর আগে প্যালেস্টাইনে যে ইহুদীদের বাস ছিল না তার ঐতিহাসিক প্রমাণ আছে। এই অঞ্চলটি তখন ছিল মিশরের অধীন। এখানকার দুর্ধর্ষ অধিবাসী ফিলিস্টাইনরা ছিল প্রবল ইহুদী বিদ্বেষী। পুরাণ বা গাথায় উল্লিখিত বিবরণের ভিত্তিতে কোন দাবী স্থাপন গ্রহণযোগ্য হতে পারে না। তাহলে ভারতও তার ভূমি অধিকারকে পূর্ব ও মধ্য এশিয়ায় অনেকখানি বিস্তৃত করতে পারে।

বারটি ইহুদী উপজাতি ত্রয়োদশ শতকে প্যালেস্টাইনে মিশরের অনুকূল্যে আধিপত্য করত। ৫৮৭ খৃঃ পূঃ তারা বিতাড়িত হওয়ার পর পুনরায় এখানে কর্তৃত্ব করলেও ১৩৫ খৃঃ তাদের আধিপত্য সম্পূর্ণ বিনষ্ট হয়ে যায়। ১৯১৮ খৃঃ সুদীর্ঘ কয়েক বৎসর পর প্যালেস্টাইনে ইহুদীদের দাবী পুনঃ-উত্থাপিত হয়।

পৃথিবীতে ইহুদীদের মোট সংখ্যা হোল এক কোটি ষাট লক্ষ। এর মধ্যে ষাট লক্ষের বাস আমেরিকায়। রাশিয়ায় বাস করে পঁচিশ লক্ষ। পশ্চিম ইউরোপে ত্রিশ লক্ষ। পৃথিবীর অন্যান্য রাষ্ট্রে আরও বেশ কিছু সংখ্যক বাস করে। ইহুদীরা একজাতি বলে যে দাবী করা হয়ে থাকে, তাও ভ্রান্ত। কারণ এদের নানান শ্রেণী ও সম্প্রদায় বিশেষভাবে লক্ষ্যণীয়।

ইসরাইল রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার পূর্বে আরব অঞ্চলে মাত্র চল্লিশ হাজার ইহুদী বাস করত। আরবদের সংখ্যা ছিল পনের লক্ষ। দুটি জাতির মধ্যে সম্প্রীতি ছিল অটুট। কোন বিদ্বেষ বা সংঘর্ষ ছিল না। প্রথম বিশ্বযুদ্ধের পর বাইরের দেশ থেকে ইহুদীরা প্যালেস্টাইন অঞ্চলে এসে জমায়েত হোতে থাকে। আরবদের জমি কিনে নিতে থাকে তারা। ফলে বিরাট সংখ্যক আরব বাস্তুচ্যুত হয়ে পড়ে। অথচ এই আরবই ইহুদীদের সঙ্গে পরম বন্ধুর মত ব্যবহার করে এসেছে এতদিন। এমন কি দূর অতীতে, বিতাড়িত ইহুদীদের প্যালেস্টাইনে এনে জায়গা করে দিয়েছিল আরবরাই—তার ঐতিহাসিক প্রমাণ আছে।

প্রথম বিশ্বযুদ্ধের পর লয়েড জর্জ বলেছিলেন, 'প্যালেস্টাইনে ইহুদী বাসভূমি হোল সুয়েজ খাল সম্পর্কে নিরাপত্তার ব্যবস্থা।' তাই আরব নৃপতি ও জন-সাধারণকে অসন্তুষ্ট করে ইসরাইল রাষ্ট্র সৃষ্টির পেছনে ছিল নবজাগ্রত আরব জাতীয়তাবোধকে প্রতিরোধ এবং এই অঞ্চলে পশ্চিমী রাষ্ট্রের স্বার্থ সংরক্ষণ। তাই আমেরিকার ইহুদী সম্প্রদায় ইসরাইল রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠাকে স্বাগত জানিয়েছিল বিপুলভাবে। তবে আরব অঞ্চলের ইহুদীরা এ ব্যাপারে বিশেষ উৎসাহ প্রকাশ করেনি।

কিন্তু দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পর অবস্থার অনেক পরিবর্তন ঘটে। ইহুদীদের ওপর হিটলারের অমানুষিক অত্যাচার বিশ্ব-ব্যাপী সমবেদনার সঞ্চার করে। তখন বৃটেন বা আমেরিকার বিত্তশালী ইহুদীরা নিজেদের দেশে নির্যাতিত ইহুদীদের জায়গা দিতে পারল না। অথচ নির্যাতিত-দের প্রতি করুণায় তারা তখন উচ্ছ্বলিত। তাই অত্যাচারিত ইহুদীদের জন্য জায়গা নির্দিষ্ট হোল প্যালেস্টাইনে। আরবভূমিতে ইহুদীদের বসতি না দিয়ে বৃটেন বা আমেরিকায় সহজেই স্থান দেওয়া যেত। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পর প্যালেস্টাইনে ইহুদীদের সংখ্যা ভয়ংকরভাবে বেড়ে যেতে থাকে। তাদের স্থান করে দিতে হোল আরবদের। ইহুদীদের সংখ্যাবৃদ্ধিতে আরবরা নিজেদের অবস্থা বুঝতে পারল। তারা বুঝতে পারল, আমেরিকার ও বৃটেনের ইহুদী সম্প্রদায়ের অর্থানুকূল্যে তাদের জমি নেওয়া হচ্ছে। ক্রমশঃ তাদের মধ্যে ইহুদী বিদ্বেষ দানা বাঁধতে থাকে। তা এক সময় সাম্প্রদায়িকতার রূপ নেয় এবং বীভৎস দাঙ্গার সৃষ্টি করে।

তাই দশ-বার লক্ষ আরবকে উদ্বাস্তু হোতে হয়েছে। বিভিন্ন আরব রাষ্ট্রে আজ তারা জীবনযাপন করছে অসহায়ভাবে। আরবদের তাড়ান হয়েছে অনেক ক্ষেত্রে চরম অত্যাচার ও নৃশংসতার পথে। বহু সংখ্যক আরবকে হত্যা করা হয়েছে, সম্পত্তি লুঠ
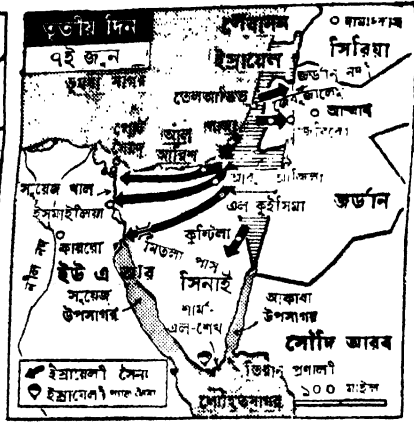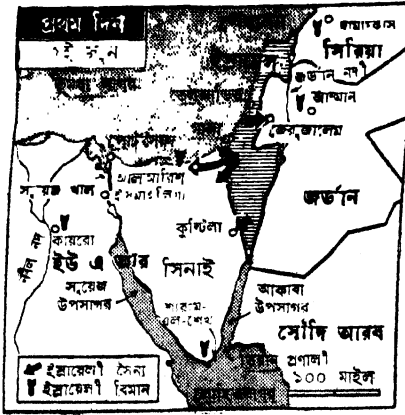
করা হয়েছে। ভয়ে পালিয়ে গেছে আরবরা। ইসরাইলে আরবদের এক-তৃতীয়াংশ ভূমি কেড়ে নেওয়া হয়েছে এইভাবে। আরবদের মূল্যবান সম্পত্তি ব্যবসা-বাণিজ্য বিনা ক্ষতি-পূরণে দখল করে নেওয়া হয়েছে।

আরব উদ্বাস্তুদের শতকরা আশীজনই নিরক্ষর-কৃষক, শ্রমিক শ্রেণীর লোক, বাকি অংশ হোল ব্যবসায়ী, কারিগর এবং স্বল্প শিক্ষিত কর্মী। এরা আশ্রয় নিয়েছিল গাজা অঞ্চল, জর্ডন, সিরিয়া, লেবাননে। মিশর, সৌদি আরব, ইরাক ও পারস্যে চলে যায় কেউ কেউ। শিক্ষিত এবং ব্যবসায়ী শ্রেণীর লোকেরা বিভিন্ন স্থানে বসতি স্থাপন করলেও শতকরা আশিভাগই ভাগ্যের হাতে ছেড়ে দেয় নিজেদের জীবনকে। ১৯৬৩ খৃঃ একটি হিসাব থেকে জানা যায় যে গাজা এলাকায় ২ লক্ষ ৭৯ হাজার, জরডনে ৬ লক্ষ ৫৪ হাজার, লেবাননে ১ লক্ষ ৪৯ হাজার, সিরিয়ায় ১ লক্ষ ২৬ হাজার উদ্বাস্তু স্থান করে নেয়। কিন্তু এই সমস্ত রাষ্ট্রে অনুর্বর জমির পরিমাণই বেশী। ফলে উদ্বাস্তুদের একমাত্র রাষ্ট্রসংঘের সাপ্তাহিক রেশনের ওপর নির্ভর করেই বেঁচে থাকতে হোচ্ছে।

প্যালেস্টাইনের বাস্তুচ্যুত আরবদের শোচনীয় দুরবস্থার জন্য ইসরাইলই মূলত দায়ী—একথা কোন আরব রাষ্ট্রই ভুলতে পারে না। বর্তমান যুদ্ধের আগে প্যালেস্টাইনের বাস্তুচ্যুত ব্যক্তির সংখ্যা হল দশ লক্ষাধিক। এদের বেশীর ভাগই অল্প বয়স্ক। বর্তমান যুদ্ধে জর্ডন নদীর পশ্চিমতীর থেকে অন্তত দুই লক্ষ আরবকে নানাভাবে তাড়িয়ে দেওয়া হয়েছে। মধ্যপ্রাচ্যে স্থায়ী অশান্তির মূল কারণ হয়ে দাঁড়িয়েছে উদ্বাস্তু সমস্যা। এই উদ্বাস্তুদের মধ্য থেকে যে প্যালেস্টাইন মুক্তি ফৌজ গঠিত হয়েছে ইসরাইল ধ্বংস না করা পর্যন্ত তাদের সংগ্রামের বিরাম নেই। আরব রাষ্ট্রগোষ্ঠী আছে তাদের পিছনে। আজ তারা বিপর্যস্ত বিতাড়িত হলেও আগুন যেন আরো জ্বলবার মুখে। ইসরাইলী ঔদ্ধত্য আগ্নেয়-গিরির আগুন নিয়ে যে খেলায় মেতেছে তার পরিণতি ভয়ংকর। কারণ যে কোন মুহূর্তে আবার যুদ্ধ সুরু হয়ে যেতে পারে। এবং এবার যুদ্ধ আরম্ভ হলে তার পরিধি আরও বিস্তৃত হবে।

১৯৪৭ খৃঃ রাষ্ট্রসংঘ মার্কিনী প্রস্তাব অনুযায়ী প্যালেস্টাইনকে দুভাগ করে ইসরাইল রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার প্রস্তাব অনুমোদিত হয়। রাষ্ট্রপতি রুজভেল্ট এই রাষ্ট্র গঠনের বিরোধী ছিলেন; তখন মহাত্মা গান্ধী নতুন রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠায় প্রবল আপত্তি জানিয়েছিলেন। রাষ্ট্রসংঘে ভারত প্রস্তাবের বিরুদ্ধে ভোট দিয়েছিল।

রাষ্ট্রসংঘ পুরোন প্যালেস্টাইন শহরকে দুভাগ করে—আরব প্যালেস্টাইন ও ইসরাইল রাষ্ট্র। ৭,৯৯৩ বর্গ মাইল এলাকায় প্রতিষ্ঠিত হয় ইহুদী রাষ্ট্র। আরব রাষ্ট্রগুলি রাষ্ট্রসংঘের এই ব্যবস্থাকে অস্বীকার করে। রাষ্ট্রসংঘের সিদ্ধান্ত অনুযায়ী ১৯৪৮ খৃঃ ১৫ মে সার্বভৌম ইহুদী রাষ্ট্র ঘোষিত হয়। এই দিনেই প্যালেস্টাইনকে আরব দেশ রাখবার উদ্দেশ্যে আরব লীগ (মিশর-জর্ডন-ইরাক) নবগঠিত ইসরাইল রাষ্ট্র আক্রমণ করে। যুদ্ধ প্রথমদিকে চলেছিল থেমে থেমে। শেষদিকে নাগেভ অঞ্চলে তিন মাস প্রচণ্ড যুদ্ধ চলে। রাষ্ট্রসংঘের প্রতিনিধি র‍্যালফ বুনসের মধ্যস্থতায় ১৯৪৯ খৃঃ ফেব্রুয়ারী মাসে যুদ্ধ বন্ধ হয়। আরব প্যালেস্টাইনকে মিশর, জর্ডন ও ইসরাইল ভাগ করে নেয় নিজেদের মধ্যে। কিন্তু সীমান্ত অমীমাংসিতই থেকে যায়।

পশ্চিম এশিয়ায় পরবর্তীকালের গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা মিশর থেকে রাজা ফারুকের বিতাড়ন। রাষ্ট্রক্ষমতা হাতে নেয় বিপ্লবী পরিষদ। নতুন সরকারের নীতি ও কর্মপদ্ধতিতে পশ্চিমী রাষ্ট্রগুলি আতঙ্কিত হোল। মিশর সৈয়দ বন্দর ও সুয়েজ থেকে বৃটিশ সৈন্য অপসারণের জন্য বৃটেনের ওপর চাপ সৃষ্টি করতে থাকে। সামরিক বাহিনীকে ব্রিটিশ প্রভাব থেকে মুক্ত করা হয়। ১৯৫৪ খৃঃ বৃটেন ও মিশরের মধ্যে এক চুক্তি হয় সৈন্য অপসারণ সম্পর্কে। ইসরাইল তাতে প্রবল প্রতিবাদ জানায়। এই সময়ে মিশর তার সৈন্যবাহিনী নতুন করে গড়ছিল। ফলে প্রচুর অস্ত্রশস্ত্রের প্রয়োজন হয়ে পড়ে। মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্র থেকে সে অস্ত্র কিনতে চাইলে, আমেরিকা সর্ত আরোপ করে, মিশরকে বাগদাদ চুক্তিতে যোগ দিতে হবে। ফলে মিশর ১৯৫৫ খৃঃ চেকোশ্লোভাকিয়ার সঙ্গে এক অস্ত্র ক্রয় চুক্তিতে স্বাক্ষর করে। আমেরিকা ও ব্রিটেন তার ওপর ক্ষিপ্ত হোল। তারপর মিশর আসওয়ান বাঁধ নির্মাণ করে নীল নদীর অববাহিকায় চাষের জন্য উদগ্রীব হয়ে ওঠে। বিশ্বব্যাংক, বৃটেন ও আমেরিকা থেকে সাহায্যের প্রতিশ্রুতি পায় মিশর। প্রথমে আমেরিকা সাহায্য দিতে চায়নি। সে সাহায্যের বিনিময়ে চেয়েছিল মিশরের আভ্যন্তরীণ এবং পররাষ্ট্র ব্যাপারে হস্তক্ষেপ করতে। মিশর অ-রাজী হওয়ায় মার্কিণ শক্তি সাহায্য দিতে ইতস্তত করেছিল। কিন্তু প্রতিশ্রুতি দেওয়ার কয়েক মাস বাদেই বৃটেন ও আমেরিকা অর্থ সাহায্য দিতে অস্বীকার করে বসে। মার্কিণ পত্রিকাগুলি একে তখন ডালেস সাহেবের 'বুঝে শুনে ঝুঁকি নেওয়া' বলে অভিহিত করে এবং এই মার্কিন ব্রিটিশ 'কুটনৈতিক দেউলিয়াপনার' কারণ হিসাবে তারাই দেখিয়েছিলেন যে এর পেছনে আছেঃ চেকোশ্লোভাকিয়ার কাছ থেকে অস্ত্র কেনা, সোভিয়েত যুক্তরাষ্ট্রের সঙ্গে মিশরের ক্রমবর্ধমান মৈত্রী সম্পর্ক, বান্দুং সম্মেলনে প্রেসিডেন্ট নাসেরের এক গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা গ্রহণ, লোকায়ত্ত প্রজাতান্ত্রিক চীনকে স্বীকৃতিদান, আলজিরিয়ার মুক্তি সংগ্রাম সমর্থন, ভারতের নেহরু ও যুগোশ্লাভিয়ার টিটোর সঙ্গে ক্রমবর্ধমান ঘনিষ্ঠতা এই সব কিছুর জন্যে মিশর সরকারের বিরুদ্ধে যুক্তরাষ্ট্রের ও বৃটেনের ক্রোধ। তার ওপর আবার মিশর সুয়েজ খালকে রাষ্ট্রায়ত্ত করে নেয়। আসোয়ান বাঁধ নির্মাণের দায়িত্ব নেয় সোভিয়েত যুক্তরাষ্ট্র। সুয়েজ খাল জাতীয়করণ এবং আসোয়ান বাঁধে সোভিয়েত সাহায্য পশ্চিমী শক্তিগুলিকে ক্ষিপ্ত করে তুলল। বিশেষ করে সুয়েজ খাল তাদের

অত্যন্ত প্রয়োজনীয় পথ। কোটি কোটি টাকার তেল, অন্যান্য দ্রব্যাদি জাহাজে বয়ে নিয়ে যাওয়া হয় এই পথে। তাই সুয়েজ-খাল আন্তর্জাতিক বাণিজ্যের অপরিহার্য অঙ্গ। বর্তমান যুদ্ধে ইসরাইলের পক্ষে মার্কিন ও ব্রিটিশ বিমান বহরের অংশ গ্রহণ এবং প্রত্যক্ষ সাহায্যদানের জন্য এবং সুয়েজ খালে জাহাজের ওপর ইসরাইলের আক্রমণের জন্য সংযুক্ত আরব সাধারণতন্ত্রের সুপ্রীম কম্যান্ড গত ৬ জুন সুয়েজখাল বন্ধ করে দিয়েছেন। এই কৃত্রিম জলপথ ১৯৫৬ খৃঃ মিশর সরকার রাষ্ট্রায়ত্ত করে নেয়। তার জন্য মিশর সুয়েজ কোম্পানীকে দু কোটি আশি লক্ষ পাউন্ড ক্ষতিপূরণ দেয়। নাসের রাষ্ট্রসংঘকে জানিয়ে দিয়েছেন যে যেহেতু তারা ইসরাইলের সঙ্গে যুদ্ধরত সেহেতু ইসরাইলের পতাকাবাহী কোন জাহাজ বা ইসরাইলগামী কোন জাহাজকে এই পথে যেতে দেওয়া হবে না। এই জলপথ বন্ধ থাকায় কেবলমাত্র মিশরেরই ক্ষতি হচ্ছে না, পৃথিবীর প্রায় সমস্ত রাষ্ট্রই এর ফলে ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছে। আজ বহু অসুবিধা থাকা সত্ত্বেও নিজের সার্বভৌমত্ব রক্ষার জন্য সংযুক্ত আরব সাধারণতন্ত্রকে সুয়েজ খাল বন্ধ করে দিতে হয়েছে। আন্তর্জাতিক চুক্তি অনুযায়ী যুদ্ধের সময় এই খাল থাকবে নিরপেক্ষ। কিন্তু সমস্ত যুদ্ধের সময়ই পশ্চিমী শক্তি এই খালকে নিজেদের প্রয়োজনে ব্যবহার করেছে। ১৯৫৬ খৃঃ তারা বোমা ফেলে জাহাজ ডুবিয়ে সুয়েজ খালে জাহাজ চলাচল বন্ধ করে দেয়।

পশ্চিমী শক্তির প্ররোচনায় ইসরাইল মিশর আক্রমণ করে বসে। বৃটেন ও ফ্রান্স ছিল তার অন্যতম সহযোগী। সিনাই উপদ্বীপ সুয়েজ ও আকাবা উপসাগরের মধ্যে অবস্থিত গুরুত্বপূর্ণ এলাকা। উপত্যকার দক্ষিণ বিন্দুতে অবস্থিত শারম-এল-শেখ তিরান প্রণালী প্রহরারত। ১৯৫৬ খৃঃ পর্যন্ত ছিল মিশরের কর্তৃত্বে। সুয়েজ সঙ্কটের সময় মিশর এই পথ দিয়ে ইসরাইলী আইলাথ বন্দরে যাওয়া বন্ধ করে দেয়। বৃটেন ও ফ্রান্স এগিয়ে আসে নিজেদের কর্তৃত্ব পুনরুদ্ধারে। এই সময় তাদের বিমান মিশর ও সুয়েজের ওপর প্রচণ্ড বোমা বর্ষণ করে। আর আধুনিক অস্ত্রে সুসজ্জিত ইসরাইলী বাহিনী সিনাইয়ে আশাতীত সাফল্য লাভ করে। প্রচণ্ড যুদ্ধের পর শারম-এল-শেখ দখল করে। চারমাস এই ঘাঁটি তাদের হাতে ছিল। রাষ্ট্রসংঘবাহিনী আসবার পর ইসরাইলীরা এখান থেকে সরে যায়। সে সময় সোভিয়েত প্রধানমন্ত্রী বুলগানিন পশ্চিমী শক্তিজোটের এই বীভৎস আক্রমণ অবিলম্বে বন্ধের নির্দেশ দেন, অন্যথায় তাদের ধ্বংস অনিবার্য। তাঁর এই হুমকিতে এবং রাষ্ট্রসংঘের হস্তক্ষেপে ১৯৫৬ খৃঃ ২ নভেম্বর এই যুদ্ধবিরতি ঘটে। উভয় দেশের সৈন্যদলই নিজেদের এলাকায় ফিরে যায়। তবে গাজা অঞ্চল থেকে ইসরাইলী সৈন্য অপসারণে যথেষ্ট বেগ পেতে হয়েছিল। দু দেশের মধ্যবর্তী ১১৭ মাইল দীর্ঘ সীমান্তে শান্তিরক্ষার দায়িত্বভার ন্যস্ত হয় রাষ্ট্রসংঘের জরুরী বাহিনীর ওপর। ইসরাইল তার সীমান্তে কোন রাষ্ট্রসংঘ সৈন্যকে প্রবেশ করতে দেয়নি। বিগত দশ বৎসর ধরে এই বাহিনী মোতায়েন ছিল মিশরীয় এলাকায়। এই যুদ্ধে ইসরাইলের সামরিক বা রাজনৈতিক কোন লাভই হয়নি।

এরপর দশ বৎসর ধরে মিশর সিনাই-এ পরাজয়ের কোন প্রতিশোধ নেয়নি। কিন্তু উভয় দেশের সীমান্তে উত্তেজনা মাঝে মাঝে চরমে উঠেছিলো। সম্প্রতিকালে ইসরাইল-সিরিয়া ও ইসরাইল-জর্ডন সীমান্তে সংঘর্ষ প্রায় দৈনন্দিন ব্যাপার হয়ে দাঁড়িয়েছিল। সমস্ত সীমান্তে যুদ্ধাবস্থা বজায় রাখার ওপর ইসরাইল প্রথম থেকেই নজর রেখে-ছিল। বিশেষ করে গত ৭ এপ্রিল দুখানা সিরীয়ান মিগ-২১ বিমান ইসরাইলীরা ভূপাতিত করে। তারপর অবস্থা চরম রূপ নেয়। সিরিয়া-ইসরাইল সীমান্তে সংঘর্ষ ছড়িয়ে পড়তে থাকে। ইসরাইলের প্রধান-মন্ত্রী ঘোষণা করেন যতক্ষণ পর্যন্ত দামাস্কাস দখল না হচ্ছে, ততক্ষণ ধবে তাদের সংগ্রাম চলবে। প্রেসিডেন্ট নাসের ঘোষণা করেন, যদি সিরিয়া আক্রান্ত হয় তবে সংযুক্ত আরব সাধারণতন্ত্র তার সমস্ত শক্তি দিয়ে ইসরাইলের ধ্বংস সাধনে এগিয়ে যাবে। ইতিমধ্যে মার্কিন ষষ্ঠ নৌবহর এসে আবির্ভূত হয়েছে আরব দরিয়ায়। উত্তেজনা আরও বেড়ে গেল। ইসরাইলের নেতৃবৃন্দ সিরিয়ার বিরুদ্ধে ক্রমাগত যুদ্ধের হুমকি দিতে থাকেন। প্রেসিডেন্ট নাসের অনুমান করেন ইসরাইল কর্তৃক সিরিয়া ১৭ মে নাগাদ আক্রান্ত হতে পারে। এই সম্ভাবনার প্রতি লক্ষ্য রেখে ১৫ মে কায়রো থেকে

ইস্রায়েল-সংযুক্ত আরব সাধারণতন্ত্রের সীমান্ত অভিমুখে সংযুক্ত আরবের ট্যাঙ্কবাহিনী। পথে সিনাই মরুভূমিতে পেট্রল নেওয়া হচ্ছে।
—রেডিও ফটো

বিপুল সংখ্যক সৈন্য ইসরাইল সীমান্ত অভিমুখে অগ্রসর হতে থাকে। সিনাইয়ে আরব সাধারণতন্ত্রের মূল যুদ্ধ ঘাঁটি স্থাপিত হোল।

সংযুক্ত আরব সাধারণতন্ত্র তার সীমান্ত থেকে রাষ্ট্রসংঘের জরুরী বাহিনী সরিয়ে নেওয়ার অনুরোধ জানায় ১৭ মে। পশ্চিম এশিয়ার আকাশে যুদ্ধের কালো মেঘ আরো ঘন হয়ে এল। অবস্থা গুরুতর আকার ধারণ করায় রাষ্ট্রসংঘের জেনারেল সেক্রেটারী কায়রো ছুটে গেলেন। কিন্তু প্রেসিডেন্ট নাসের তার সিদ্ধান্তে অটল থাকায় সেক্রেটারীকে শুধু হাতে ফিরে যেতে হোল। অবশেষে তিনি রাষ্ট্রসংঘ বাহিনী সরিয়ে নেওয়ার নির্দেশ দেন।

রাষ্ট্রসংঘ বাহিনীর পরিত্যক্ত স্থানে এগিয়ে আসে প্যালেস্টাইন মুক্তি সংগ্রামের সৈনিকেরা। তাদের পিছনে সংযুক্ত আরব সাধারণতন্ত্রের সৈন্যবাহিনী। প্রেসিডেন্ট নাসের এবার এমন একটি ঘোষণা করলেন যা যুদ্ধের সম্ভাবনাকে আরও ত্বরান্বিত করল। তিনি আকাবা উপসাগর ও টিরান প্রণালী ইসরাইলীরা ব্যবহার করতে পারবে না, ঘোষণা করলেন। এই জলপথেই ইসরাইলের বিখ্যাত আইলাত বন্দর। বিভিন্ন তৈলবাহী জাহাজ আইলাথ বন্দরে যায় এই জলপথে। এই বন্দর দিয়েই ইসরাইল এশিয়া ও পূর্ব আফ্রিকার সঙ্গে বাণিজ্য করে থাকে। তাছাড়া ১৯৫৬ খৃঃ যুদ্ধবিরতির সর্ত-স্বরূপ ইসরাইল এই জলপথ ব্যবহারের অধিকার লাভ করে। ইসরাইলের প্রধানমন্ত্রী এই অবরোধকে আক্রমণাত্মক এবং প্রেসিডেন্ট জনসন একে বে-আইনী ঘটনা বলে ঘোষণা করেন।

যুদ্ধের সাজ-সাজ রবের সঙ্গে গোলা-গুলির আওয়াজ শোনা যেতে থাকে। গাজা এলাকায় ২৪ মে রাত্রে ইসরাইলী ও আরব সৈন্যদের মধ্যে তুমুল গুলি বিনিময় ঘটে। ২৬ মে আকাবা উপসাগরের মুখে আরব সাধারণতন্ত্র দুটি ইসরাইলী মিরেজ জঙ্গী বিমান আক্রমণ করে। ২৯ মে মিশরীয় সৈন্যদের সঙ্গে ইসরাইলীদের প্রায় ৪০ মিনিটব্যাপী মর্টার ও মেসিনগানে আক্রমণ চলে। একটি মার্কিনী জাহাজ আকাবা উপ-সাগরের অবরোধ ভাঙবার চেষ্টা করলে সংযুক্ত আরব সাধারণতন্ত্রের একটি যুদ্ধ জাহাজ থেকে ঐ জাহাজটি লক্ষ্য করে সতর্কতামূলক গুলি চালান হয়। ১ জুন জর্ডন সীমান্তে একটি ইসরাইলী বিমান গুলিবিদ্ধ হয়। ২ জুন সিরিয়া-ইসরাইল সীমান্ত সংঘর্ষে দুজন ইসরাইলী ও একজন সিরীয় সৈন্য নিহত হয়।

৫ জুন ভোরবেলায় মিশরের নীল নদের ব-দ্বীপ এলাকার ২৫টি সামরিক ও বে-সামরিক বিমান ঘাঁটিতে ইসরাইলের জঙ্গী বিমানের এক বিরাট বহর বোমা, কামানের গোলা এবং রকেট নিক্ষেপ করে। তারা এমন নিখুঁত সংবাদের ওপর নির্ভর করে বোমাবর্ষণ করে যে বিমানঘাঁটির বাইরে অবস্থিত কোন নকল বিমানের (ডামিপ্লেন) ওপর তারা বোমাবর্ষণ করেনি। সংযুক্ত আরব সাধারণতন্ত্রের বিমানবহরের বিপুল ক্ষতি হোল। রোমের একটি সংবাদপত্রে এ সম্পর্কে বলা হয়েছে যে আরব সাধারণতন্ত্রের সৈন্য বাহিনীর খুঁটিনাটি সংবাদ ও পরিকল্পনা সি-আই-এর সহায়তায় ইসরাইল সংগ্রহ করে। বিভিন্ন আরব রাষ্ট্রে নিযুক্ত পশ্চিম জার্মাণ কারিগরি বিশেষজ্ঞদের সহায়তায় এই তথ্য সংগৃহীত হয়েছিল। তারপর বিমান আক্রমণের মত হঠাৎ ইসরাইল পদাতিক ও সাঁজোয়া বাহিনী নিয়ে চতুর্মুখ অভিযান চালায় সিনাই-এ। ভূমধ্যসাগরের তীর বরাবর সৈন্যরা উত্তরে সুয়েজখালের দিকে অগ্রসর হয়। মত অঞ্চলে বীর তাশনা এবং তওাফক লক্ষ্য করে দুটি অভিযান চলে। সর্বদক্ষিণে আকাবা উপসাগরের তীর ধরে একটি বাহিনী অগ্রসর হয়ে শারম-এল-শেখে পৌঁছে টিরান প্রণালী অবরোধ মুক্ত করে। কিন্তু আরব ট্যাঙ্কবাহিনী আকাশপথে কোন বিমান সাহায্য পায়নি। একমাত্র ট্যাঙ্ক ও পদাতিক বাহিনীর পক্ষে যুদ্ধ আয়ত্তে রাখা ছিল অসম্ভব। কারণ ইসরাইলী বিমান বহরের হামলায় তখন ক্রমশ তারা সুয়েজের দিকে সরে যাচ্ছিল। যদিও প্রথম দিকে সংযুক্ত আরব এবং জর্ডন বাহিনী ইসরাইলী এলাকার কোথাও কোথাও ঢুকে পড়েছিল, কিন্তু বেশীক্ষণ তা করায়ত্ত রাখা সম্ভব হয়নি। চতুর্থ দিনে আল-জিরিয়ার মিগ জঙ্গী বিমান সাহায্যের জন্য এগিয়ে এলে আল আরিশ ও ভূমধ্যসাগর অঞ্চলে দুপক্ষে তুমুল লড়াই চলে। কিন্তু তখন মিশরীয় বাহিনী—ক্রমশ সুয়েজের দিকে সরে যাচ্ছিল। ইসরাইলী বিমানের আক্রমণে বহু মিশরীয় সৈন্য বিনষ্ট হয়ে যায়। কিন্তু পশ্চিমী সমর সাংবাদিক জানান যে এই বিস্তীর্ণ অঞ্চলের যুদ্ধে বীর আরবীয় সৈন্যদের হাতে ইসরাইলের ক্ষতির পরিমাণও সামান্য নয়।

তিন দিনের যুদ্ধে জর্ডনের প্রায় আঠার হাজার সৈন্য বিনষ্ট হয়। এর মূলে ছিল ইসরাইলীদের নাপাম বোমা ব্যবহার। জর্ডন নদীর পশ্চিম তীরে বিস্তীর্ণ অঞ্চল ইসরাইলীদের হাতে চলে যায়। জর্ডন অস্ত্র সংবরণের আহ্বানে সাড়া দেয়।

জর্ডন ও সংযুক্ত আরবের যুদ্ধ সমাপ্তির দুদিন পরেও ইসরাইলঃ সিরিয়ায় যুদ্ধ চলে। সিরিয়া-ইসরাইল সীমান্তবর্তী পাহাড় অঞ্চল ইসরাইলরা দখল করে নেয়। এটি সিরিয়ার একটি মূল্যবান যুদ্ধ ঘাঁটি ছিল। সিরিয়ার অনেক অংশ ইসরাইলের হাতে চলে যায়। সিরিয়া আক্রমণ এবং তার সামরিক শক্তি এবং রাষ্ট্র কর্তৃত্ব বিনষ্ট করাই ছিল ইসরাইলের লক্ষ্য।

আমি কাঞ্চনজঙ্ঘা বেয়ে নেমে এসেছি। তরঙ্গায়িত ঢাল বেয়ে অবশেষে নেমে এসেছি সমতলে। শীতার্ত পশ্চাদ্‌ভূমি পার হয়ে, তৃণলতার আস্তরণ ছুঁয়ে আমি চলে এসেছি। সেখানে দুঃসহ শীত ছিল, ঋজু গাছের সার আর পাহাড়ের দেওয়ালের ঘেরা-টোপ ছিল। বছরের ন'মাস কাটিয়েছি সেখানে, টিকে থাকার ঝামেলা সহ্য করেছি। এখন আমার তিন মাসের শীতের ছুটি। তিনমাস পরে আবার পশ্চাদ্‌ভূমিতে ফিরে যাব, আবার ঘেরাটোপে ঢাকব একতাল কাদামাটির অস্তিত্ব। শীতার্ত কর্মস্থলের একঘেয়েমি, ক্লান্তি পেছনে রেখে সমতলে নেমে এসেছি একটু উত্তাপ পাব বলে, একটা কোন নতুনের দরজা খুলে যাবে ভেবেছি, বারবার যেমন ভাবি। এই সমতলের বস্তুত এই নগরের শীত আমার কাছে কিছুই না। একটি মাত্র সুতোর জামায় অবলীলায় চলে যাবার কথা। অথচ এই সমতলের এই নগরের দোতলার ঘরেও আজ রাত্তিরে দুঃসহ শীত। দেওয়াল এবং বিশেষত মেঝে থেকে উৎ-সারিত শীত আমার চামড়া কেটে হাড় ছুঁয়ে যাচ্ছে।

আমি, অমিতেশ দত্তগুপ্ত, এমন হবে বুঝিনি। চরাচরে এমন শীত প্রবাহিত জানতাম না। তথাপি, মনতেই হবে, সম-তলের ঈষৎ ঠাণ্ডায় এমন শীতানুভবের কারণ আমার পুরোপুরি অজানা নয়। আগেও তো শীতের ছুটিতে সমতলে নেমে এসে এমন হয়েছে।

অমিতেশের এবংবিধ অনুভবের অন্যতম কারণ তার সামনেই ছিল। কোমর সমান উঁচু কাল রঙের দেরাজের গায়ে চেয়ারটা টেনে এনে বসেছে। গোলাপী কাগজে লেখা অনেক কালের একখানা চিঠির ছেঁড়া টুকরো-গুলো সামনে সাজান। ঠিক ঠিক সাজালে পুরো চিঠিখানা পাওয়া যায়, পড়া যায় অনায়াসে। অমিতেশের বাবার হাতের লেখায় জটিলতা ছিল না, অক্ষরগুলো স্পষ্ট। এত স্পষ্ট না হলে বরং ভাল ছিল।

এখন মাঝরাত্তির, শুধু এই ঘরে আলো জ্বলছে। পুরোন ভারী আসবাব দখল করে। চলাফেরার জায়গা প্রায় নেই। একটা দেয়ালে অমিতেশের মা'র যৌবনের তৈলচিত্র। স্নিগ্ধ ঘনপক্ষ্ম চোখ, গাল থেকে এখনো আলোর গোলাপী রঙ বিচ্ছুরিত, তবু দুর্জ্ঞেয় রূপের অহঙ্কার অথবা গর্ব নেই। অন্য তিনটি দেয়াল শাদা, কোন ছবি অথবা ক্যালেণ্ডার ঝুলছে না। মা'র তৈলচিত্রের পাশে অমিতেশ তার বাবার ছবিটা ভাবছিল, যার সূক্ষ্ম গোঁফ, ঈষৎ কুঞ্চিত পেছনে টেনে আঁচড়ান চুলের মধ্যে মাথার ডানদিকে সিঁথির অস্পষ্ট আভাস, উদ্ভাসিত চোখ মনের অনিবার্য আয়না। ছবিটা সহজে মনে এল, যদিও দেয়ালে তার কোন ছবি নেই।

গোলাপী কাগজের চিঠির টুকরো সামনে রেখে, মা'র স্নিগ্ধ চোখের দিকে তাকিয়ে বাবার মুখের আদল ভাবতে ভাবতে দেরাজের ওপর রাখা অমিতেশের হাতের আঙুলগুলো কুঁকড়ে মুঠো হয়ে আসছিল। তখনই আবার আঙুলগুলো শিথিল হল। গোলাপী কাগজের টুকরোগুলো বড় পুরোন, আঙুলের মৃদু আঘাতেই ভেঙে যায়।

এই ঘর সারা বছর বন্ধ থাকে। আজই খোলা হয়েছে। পুরোন জিনিসপত্রে ঠাসা বলে কেমন একটা বিচিত্র গন্ধ আসছে। এই দশ বছরে অমিতেশ ছুটিতে এলে কয়েকবার মাত্র ঘরটা খোলা হয়েছে। প্রত্যেক বছর অমিতেশ আসে না। একদা মা'র শোবার ঘর ছিল এটা, এখন অমিতেশের জন্য নির্দিষ্ট। দোতলার আর দুখানা ঘরে তাদের দুটো ছেলেমেয়ে নিয়ে অনিমেষ আর প্রীতি থাকে। ওদিকটা অন্ধকার, কোন সাড়াশব্দ নেই,

নিশ্চয়ই ঘুমোচ্ছে। এই মাঝরাত্তিরে অকারণে কারও জেগে থাকবার কথা নয়।

এই দোতলা বাড়ির যুগ্ম মালিক অমিতেশ আর তার জ্যাঠতুতো ভাই অনিমেষ তার থেকে সামান্য বড় যেমন একদা অমিতেশের বাবা এবং জ্যাঠামশাই এই বাড়ির মালিক ছিলেন। একতলার চারখানা ঘরেই দোকান, ভাড়া দেওয়া হয়েছে এখন বন্ধ, সাড়াশব্দ নেই। দোতলায় তিনখানা ঘর ছাড়া একফালি ছাত, পশ্চিমের জানলা দিয়ে তাকালে অমিতেশ দেখতে পায়। এখন দূরে থেকে রাস্তার একটু আলো এসে পড়েছে ছাতে।

দেয়ালে মা'র ছবির দিকে অমিতেশ চোখ ফেরাল। কোনদিন বুঝতে পারেনি ওই মহিলা মধ্যযৌবনে এক রাত্তিরে সুস্থ শরীরে ঘুমোতে গিয়ে আর কেন জাগল না। তখন অমিতেশ একতলার ঘরে থাকত। ভোরবেলায় ডাক্তার এসেছিল, পাড়া থেকে নয়, দূর থেকে বাবার বন্ধু ডাক্তার।

স্নিগ্ধ চোখে আলতো করে মেশান গোলাপী ঠোঁটে কোথায় এত যন্ত্রণা লুকোন ছিল মালুম হয় না। অথচ আত্মহত্যার তাগিদ অবশ্যই ভয়ংকর তীব্র হওয়া দরকার।

খুট করে একটা শব্দ হল। প্রীতি বেরিয়ে এসে স্নানের ঘরের দিকে চলে গেল। খানিক পরে ঘরে ফিরবার সময় চোখেমুখে ঠান্ডা জল, জানলায় একটু দাঁড়াল। চোখ বড় করে, ঠোঁটে কেমন মোচড় দিয়ে বলে গেল, এখনো জেগে আছ!

ক্ষিপ্র হাতে খবরের কাগজ দিয়ে অমিতেশ গোলাপী চিঠির টুকরোগুলো ঢাকল। শুধু হাসল একটু বোকার মতন।

প্রীতি এবাড়ির বউ হবে প্রথমে কেউ ভাবেনি। আত্মীয়তার জন্য দুই পরিবারের মধ্যে যাওয়া-আসা ছিল। তারপর প্রীতি যখন প্রথম নিজের শাড়ি পরল এবং অমিতেশ ও অনিমেষের নাকের ছায়ায় কটাক্ষে রোঁয়া কালচে হয়ে উঠল, দুজনেরই দৃষ্টি পড়ল তার ওপর। সেইসব দিনে অমিতেশের প্রতি প্রীতির পক্ষপাতিত্ব প্রকট ছিল। দুই প্রতিদ্বন্দ্বীর মধ্যে অমিতেশের মনে কখনো হেরে যাবার ভয় স্থান পায়নি। তার আত্মবিশ্বাস বেশি ছিল এবং প্রীতির মনোভাব বিষয়ে সুনিশ্চিত প্রত্যয় জন্মেছিল। সেই কারণে তখন প্রশান্তি ছিল অমিতেশের আচরণে, অনিমেষের মতন যখন তখন খেপে ওঠার প্রবণতা দেখায়নি। তবু ইদানীং এই মধ্যযৌবনে যে কঠিন অসুখ তাকে শীতার্ত পশ্চাদ্‌ভূমিতে টেনে নিয়ে গিয়ে আবার সমতলের উত্তাপে নামায়, যে-অসুখ তাকে শাণিত বাসনার উত্তরঙ্গ ক্ষণকালের চূড়োয় ছুঁড়ে দিয়ে তখনই আবার বাসনাহীনতার, নিথাদ ঔদাসীন্যের স্থির অতলে ডোবায়, তার জীবাণু তখনই হয়ত তার শরীরমনে প্রবেশ করেছিল। নাহলে বড়দির বিয়ের উৎসবের রাত্তিরে অমন হবে কেন? সেই রাত্তিরে অনিমেষ নির্জনে ঘনিষ্ঠ হয়ে প্রীতির কাঁধে হাত রেখেছিল। ওটুকুতেই প্রীতি জ্বলতে জ্বলতে ছিটকে এসে অমিতেষের কাছে নালিশ জানিয়েছিল। যেন অনিমেষ তার সব পবিত্রতা নষ্ট করেছে, যেন অনিমেষকে খুন না করলে তার শান্তি হবে না। সেই উত্তরঙ্গ ক্ষণকালে অমিতেশেরও মনে হয়েছিল, অনিমেষকে খুন না করলে স্বস্তি নেই। এবং তখনই আবার টানটান ইচ্ছের সুতো ঢিলে হয়ে গিয়েছিল।

এসে অমিতেষের কাছে নালিশ জানিয়েছিল...

সেই অসুখের জন্যই তো চরাচরে শীত প্রবাহিত।

বড়দির বিয়ের উৎসবের চার-পাঁচদিন পরে অনেকের সঙ্গে থিয়েটার দেখতে গিয়ে প্রীতি বেশ কূটকৌশলে ঠিক অমিতেশের পাশে বসেছিল। ঘর অন্ধকার হলে, আলোকিত মঞ্চে নাটক জমে উঠলে প্রীতি হাত রাখল অমিতেশের কাঁধে। একটুক্ষণের জন্য রোমাঞ্চিত হল অমিতেশ, অন্ধকার পাতলা হয়ে এলেও দুঃসাহসী হাতে প্রীতির মাথার পেছনের চুল মুঠো করে ধরল। চুলের টানে প্রীতির বেণীতে জড়ান রজনীগন্ধার ছোট-মালাটা অমিতেশের কাঁধ ছুঁয়ে যেতেই হাত গুটিয়ে আনল নিজের কোলের ওপর। ততক্ষণে মুহূর্তের চূড়ো থেকে অনেক নিচে গড়িয়ে পড়েছে। মনে হল, প্রীতি তার হাত সরিয়ে নিচ্ছে না কেন, একবার বাইরে থেকে ঘুরে এলে কেমন হয়?

তখন থেকেই হয়ত অমিতেশের মনে বাসনা ও বাসনাহীনতা অভিন্নহৃদয়। মা'র সুস্থ শরীরে ঘুমোতে গিয়ে আর না জাগা এবং বাবার লেখা গোলাপী চিঠি শুধু সেই অসুখের তীব্রতা বাড়িয়েছে।

রাত্তির বাড়ছে,—ঠিক বাড়ছে না, শেষ হয়ে আসছে,—শীত বাড়ছে। দেয়ালে মা'র তৈলচিত্র পনের বছর ধরে একই রকম, একই মুখের আদল, একই নরম স্নিগ্ধ দৃষ্টি। শেষের দিকে ঘনঘন বাপের বাড়ি যেত, অনেকদিন থাকত। কোথায় যন্ত্রণা লুকোন ছিল, ওই ছবিতে খুঁজে পাওয়া যাবে না। ওঘর থেকে কোন সাড়াশব্দ আসছে না। অনিমেষ ও প্রীতি ছেলেমেয়ে নিয়ে ঘুমে মগ্ন। পশ্চিমের জানলা দিয়ে এক ফালি ছাত দেখা যায়। দূর থেকে রাস্তার মৃদু আলো এসে পড়েছে।

জন-দশেক মিলে একদিন পিকনিক করতে গিয়েছিল। তখন মা নেই, তার মৃত্যুর আকস্মিকতার আঘাত থিতিয়ে গেছে, কিন্তু বাবা জ্যাঠাইমা জ্যাঠামশাই তখন বেঁচে। ব্যবসার প্রয়োজনে জ্যাঠামশাই একটা স্টেশন-ওয়্যাগন কিনেছিলেন। জন-দশেক সেটায় চেপে পিকনিক করতে গিয়েছিল। যশোর রোড থেকে বাঁয়ে নেমে বাগান, ভাঙা দেয়াল, পুকুরের বাঁধান সিঁড়িতে ফাটল, জংলা গাছ-গাছালির মধ্যে কিছু কুলীন ফুলের চারা। গ্রামটার নাম কাকস্বর, একটু অসাধারণ বলে এখনো ভোলেনি। চাষীদের কয়েকটা ছেলে আদুড় গায়ে একটু দূরে রান্নার গন্ধে এসে দাঁড়িয়েছিল। মাংসের মস্ত কড়াইটার দিকে চোখ রেখে তারাই বলেছিল গ্রামের নাম। অমিতেশ এলোমেলো কাজ করছিল, অসংলগ্ন কথা বলছিল। আলুর খোসা ছাড়াতে গিয়ে বাঁ হাতের বুড়ো আঙুল থেকে কয়েক ফোঁটা রক্ত পড়ল। এক সময় হঠাৎ উঠে গিয়ে ফাটল-ধরা সিঁড়ি বেয়ে পুরোন পুকুরে নেমে টুপ করে ডুব দিল। যতক্ষণ পারল মিশে রইল কাদামাটির সঙ্গে। ঠান্ডা, শব্দ নেই, আলোয় উদ্ভাসিত নয়, কারও মুখ দেখতে হয় না, কারও কথা শুনতে হয় না। মনে হল, অল্প সময়ের এক আশ্চর্য আরাম অনেকদিন থেকে জলের তলায় তার জন্য অপেক্ষা করছিল।

আসলে প্রচুর অনিচ্ছা নিয়ে পিকনিকের বাগানে গিয়েছিল অমিতেশ। কারও মুখ দেখবার, কাউকে নিজের মুখ দেখাবার এতটুকু ইচ্ছে ছিল না। শুধু দলে পড়ে যেতে হয়েছিল। পিকনিকের দিন-দুই আগে মা'র শোবার ঘরে কোমর-সমান উঁচু কাল দেরাজের একটা ঠান্ডা চোরখুপরিতে গোলাপী চিঠির টুকরোগুলো আবিষ্কার করেছিল। ঠিকঠিক সাজিয়ে পড়েছিল বাবার লেখা স্পষ্ট অক্ষরগুলো। তখন থেকে অজস্র প্রশ্নের খোঁচায় যার সবকটি পুরোপুরি নতুন নয় অমিতেশ দাপাচ্ছিল। সেই পিকনিকের দু'দিন আগে থেকে তার অসুখের বাড়াবাড়ি শুরু।

পুরী থেকে বাবা ওই চিঠি লিখেছিল জ্যাঠাইমাকে। ব্যবসার প্রয়োজনে দু' সপ্তাহ পুরীতে থেকে যেতে হয়েছিল। দু' সপ্তাহ সেই মহিলার সান্নিধ্য না পাওয়ার মর্মান্তিক কষ্টের কথা এবং একমাত্র যার জন্য বেঁচে থাকার মানে খুঁজে পেয়েছিল তার কাছে কাজ সেরে তাড়াতাড়ি ফিরে আসার দৃঢ়-সংকল্পের কথা বাবা লিখেছিল গোলাপী কাগজে। মা হয়ত তখন বাপের বাড়ি ছিল খামের ওপর হয়ত অন্য কাউকে দিয়ে নাম-ঠিকানা লিখিয়ে নিয়েছিল, তবু প্রচুর দুঃসাহস ছিল সেই উদ্ভাসিতচোখ লোকটার

মা'র শোবার ঘরের দেরাজে ওই চিঠি কেমন করে এল, কে ছিঁড়েছে গোলাপী কাগজ, মা কি কোনভাবে পেয়ে পরে তার সর্বনাশের দলিল লুকিয়ে রেখেছিল অথবা বাবাই কি রেখেছিল যাতে মা কোনদিন দেখতে পায়, এমনকি হতে পারে না যে জ্যাঠাইমা নিজেই সগর্বে ওই চিঠি মা'র হাতে তুলে দিয়ে বলেছিল—এই দ্যাখ তোর সর্বনাশ হয়েছে, তুই আর কেন বেঁচে আছিস? ঘুমোতে যাবার আগে মা কি জানত আর জাগবে না? নরম স্নিগ্ধ চোখ মা'র তৈলচিত্রটি করেছিল কোন আঁকিয়ে।

পুরোন পুকুর থেকে ফাটল-ধরা সিঁড়ি বেয়ে পেছনে জলের দাগ রেখে উঠে এসে অমিতেশ দেখেছিল আরও দুজনের সঙ্গে প্রীতি রান্নায় ব্যস্ত। অনিমেষরা তাস নিয়ে বসেছে। একজন বলল, ব্লাইন্ড। আর একজন কিছু কঠিন গলায় বলল, শো। পাশে পাশে দেশলাইয়ের কাঠির স্তূপ, পয়সা নয়, নিষ্পাপ জুয়ো। শাড়ির ওপর তোয়ালে জড়িয়ে নিয়েছিল প্রীতি। অমিতেশের শীত শীত করছিল, এগিয়ে গিয়ে তোয়ালেটা চাইল।

তোয়ালে দিয়ে ভিজে চুল ঘষছিল, তখনই সেই দুর্ঘটনা। এলোমেলো হাওয়ায় প্রীতির আঁচল উড়ে গিয়ে আগুন ছুঁয়েছিল। দুপুরের দমকা বাতাস একটুক্ষণের মধ্যে কড়া মাড় দেওয়া মিহি শাড়িতে আগুন ছড়িয়ে দিল। প্রীতি দাপাদাপি করছিল, অন্য মেয়েদুটি কান্নার মতন চিৎকার তুলল। ভিজে ভিজে তোয়ালে হাতে দাঁড়িয়ে কী করছিল এখন অমিতেশের মনে পড়ে না। অবশ্য তাকে বিশেষ সময় না দিয়ে অনিমেষ সবার আগে তাসের আসর থেকে লাফিয়ে এল, টান মেরে জ্বলন্ত শাড়ি খুলে নিয়ে প্রীতিকে ঘাসের ওপর গড়িয়ে দিল লাটাইয়ের মতন।

প্রীতির কয়েক জায়গায় এবং অনিমেষের হাতেও আঁচ লেগেছিল, ওষুধ দিয়ে ব্যান্ডেজ করে রাখতে হয়েছিল দু'তিন দিন। পিকনিক লন্ডভন্ড হয়ে গেল অমিতেশের দিকে প্রীতি কেমন নতুনভাবে তাকাচ্ছিল। তার দৃষ্টি থেকে চোখ সরিয়ে এনে অমিতেশ শুধু দেখছিল ঘাসের ওপর শাড়িপোড় খানিকটা কালচে ছাই।

গোলাপী চিঠির টুকরো সযত্নে দেরাজের চোরখুপরিতে লুকিয়ে রেখে অমিতেশ ঘরের স্বল্পপরিসরে একটু পায়চারি করল। বিছানার দিকে তাকিয়ে দেখল চাদরটা কয়েক জায়গায় কুঁচকে আছে। ঘুমুবে বলে শুয়েছিল বালিশের এই পাশটা মাথার চাপে বসে আছে, এইদিকে কাত হয়ে দেরজাটার দিকে তাকিয়ে শুয়েছিল। ঘরের দেয়ালে নতুন চুন শূন্য, শাদা শুধু একদিকে মা'র ছবি। ছবিটার তলায় খানিক দাঁড়িয়ে মনে হল, সিগারেটের ধোঁয়ায় কাচ ভিজে উঠেছে। আঙুল বুলিয়ে দেখল দাগ দাগ পড়ছে। তবে কাচের ওপর ধুলো-ময়লা নেই। সম্ভবত প্রীতি নিজেই পরিষ্কার করেছে।

আবার খুট করে শব্দ হওয়ায় ঘুরে দাঁড়িয়ে দেখল প্রীতি বেরিয়ে এদিকে না তাকিয়ে এক চিলতে ছাতটার দিকে চলে যাচ্ছে। আলসের ওপর হাত রেখে রাস্তার দিকে মুখ করে দাঁড়াল। পশ্চিমের জানলা দিয়ে পিঠ, কাঁধ এবং গালের একপাশ অস্পষ্ট দেখা যায়। পশ্চিমের জানলা দিয়ে উত্তরের হাওয়া কিছু আসছে, তথাপি মনে হল, শীত কম। এতক্ষণ দেয়াল এবং বিশেষত মেঝে থেকে উৎসারিত যে-শীত তার চামড়া কেটে হাড় ছুঁয়ে যাচ্ছিল তার সঙ্গে এক অস্বাভাবিক উষ্ণতা মিশেছে। পাহাড় এবং ঝাউ গাছের সারের ঘেরাটোপে যার বছরের ন'মাস কেটেছে তার গায়ে এই সামান্য শীত লাগবার কথা নয়। অথবা হয়ত জাগো নাটুকে দৃশ্যে শীত থাকেই না। প্রীতিও শুধু আঁচলটা ভাল করে জড়িয়ে নিয়েছে। প্রীতি এমন বারবার বাইরে আসছে কেন। প্রায় যেন গরম লাগছিল গেঞ্জির তলায় হয়ত ঘামের বিন্দুও মিলতে পারে। অমিতেশের আবহাওয়া বড় দ্রুত বদলায় গা থেকে কম্বলটা বিছানায় নামিয়ে রেখে বেশ তাড়াতাড়ি পা ফেলে ছাতে চলে এল।

এগিয়ে গিয়ে আলসেয় হাত রাখতে প্রীতি অবশ্যই বুঝতে পারল, অমিতেশ এসে দাঁড়িয়েছে। তবু ফিরল না, রাস্তার দিকেই মুখ রেখে বলল ঘুমোতে পারছ না কেন?

অমিতেশ ঘুমোতে পারছে কি পারছে না তা নিয়ে প্রীতির ভাববার দরকার ছিল না। শীতের মাঝরাত্তির পার হয়ে যাবার পর ঘরের বাইরে এসে অমিতেশের জানলার সামনে ছাতের আলসে ধরে কেন দাঁড়িয়েছে। ঘুমোলেও অনিমেষ প্রতি রাত্রিতে নিশ্চয়ই একবার করে মরে যায় না। অনিমেষকে তেমন স্থূল ভাবার কোন যুক্তি নেই। তবু মনে হল, অন্তত খানিক সময় অনিমেষের অস্তিত্ব ভুলে থাকাই স্বাভাবিক অমিতেশের পক্ষেও। অমিতেশ ঢেউ খুঁজছিল উত্তাল তরঙ্গমালা। প্রীতির মতো ঠোঁটে মোচড় দিয়ে বলল, তুমিও তো দেখছি ঘুমোচ্ছ না।

—আমার মাথার যন্ত্রণা। আমার ঘুম কম। দেখলে তো খানিক আগে এই ঠান্ডায় মাথায় চোখে মুখে জল দিয়ে এলাম। প্রীতি কথা বলতে বলতে খুক করে একটু কাসল কিনা ঠিক শোনা গেল না। ডান চোখের কোণ দিয়ে অমিতেশকে হয়ত এক-একবার দেখে নিচ্ছিল মুখ তখনো রাস্তার দিকে ফেরান।

খুব কাছে কোন শব্দ ছিল না, পাড়ার কুকুরগুলো ঘুমিয়েছে। ছাতে কৃপণ আলো, উত্তরের হাওয়া কিছুই ঠান্ডা নয়। অমিতেশ

দ্রুত মহূর্তের তীক্ষ্ন চূড়োয় উঠছিল। বলল, তুমি যা-ই বল প্রীতি, তোমার খুব সাহস।

তখনই প্রীতি ঘুরে দাঁড়াল, সোজাসুজি অমিতেশের মুখের দিকে তাকিয়ে ষড়যন্ত্র করার মতো চাপা গলায় বলল আমার শাশুড়ির সাহস কিছু কম ছিল না।

এমন ভঙ্গিতে কথাগুলো বলল প্রীতি যেন ভুলে গেছে সে দুটো ছেলেমেয়ের মা, তারা ঘুমের মধ্যেও তাকে খুঁজতে পারে, অন্তত ছোটটি ডাকতেও পারে। প্রীতি যেন ভুলে গেছে, তার শরীর আর তরঙ্গমালা নয়।

হিংস্র আঙুলে প্রীতির আগোছাল চুল আঁকড়ে ধরে অমিতেশ প্রায় চেঁচিয়ে উঠল, কী জান, কী জান তুমি?

—দেরাজের চিঠির টুকরো আমি পড়েছি। তাছাড়া ওই চিঠি পড়বার আগেই আমি সব জানতাম।

বিচিত্র হেসে অমিতেশের আঙুল থেকে অবলীলায় চুল ছাড়িয়ে নিয়ে প্রীতি সরে দাঁড়াল। চুল ঠিক ছাড়িয়ে নিতে হল না, অমিতেশের আঙুলে আর হিংস্রতা ছিল না, শিথিল হয়ে গিয়েছিল হাত। অমিতেশ বুঝতে পারছিল কেউ তাকে চূড়ো থেকে টেনে নামিয়ে অতলে ডোবাচ্ছে।

ছাত থেকে ঘরে ফিরে যাবার সময় প্রীতি বলে গেল, ঘুমোতে যাও।

উত্তরের হাওয়ায় আবার ঠাণ্ডার মিশেল টের পাচ্ছিল। মাথার ওপরে ধোঁয়াটে মেঘ ছাড়া আর কিছু নেই। প্রীতি ঘরে গিয়ে ভেতর থেকে দরজা বন্ধ করে দিয়েছে। সামনের বাড়ির বারান্দায় ঝোলান একখানা কাপড় উড়ে উড়ে নৌকোর পাল হয়ে যাচ্ছিল। একা আলসেয় পিঠ রেখে দাঁড়ান অমিতেশ ছাড়া কোথাও আর কিছু আছে মনে হয় না। পায়ের তলায় লম্বাটে ছাতটা কোন অপরিচিত জন্তুর বিবর্ণ মৃতদেহের মতো টানটান হয়ে পড়ে আছে।

বিছানায় ফিরে এসে অমিতেশ থুতনি পর্যন্ত কম্বল টেনে নিল। পশ্চিমের জানলা বন্ধ, ঘর অন্ধকার দেয়ালে মা'র ছবি দেখা যাচ্ছে না। সকাল হতে অনেক বাকি। নড়াচড়া থামিয়ে চোখ বুজে থাকতে থাকতে মাঝে মাঝে ঘুমিয়ে পড়ছিল। স্বপ্ন দেখছিল অসংলগ্ন ছেঁড়াছেঁড়া, সাধারণত যেমন হয়। একটা স্বপ্নে অমিতেশ শৈশবের কিছু স্বাদ পেল, ঠিক শৈশবে ফিরে গেল না। স্বপ্নে তার হালকা শরীর হাওয়ায় ভেসে ভেসে শুধু নিচের দিকে নামছিল। অনেক গভীরে নামলে কেউ তাকে আলতো করে শুইয়ে দিল। যেখানে শুয়েছে বড় নরম, শীত নেই, তার চুলে কার পালকের মতো আঙুল, একজোড়া স্নিগ্ধ চোখ তার নিজের ঘুমন্ত মুখের আয়না। ঘুম ভেঙে গেলে মনে হল স্বপ্নের চোখের সঙ্গে দেয়ালে টাঙান তৈলচিত্রের চোখের কোথাও মিল আছে।

দুপুরে পর্যন্ত ছটফট করে কাটাল অমিতেশ। তারপরই বেরিয়ে গেল। পুরী চলে যাবে, পাহাড় থেকে এসে নেমে যাবে সমুদ্রতীরে। সকালে প্রীতির হাত থেকে চায়ের কাপ নিতে এবং দুপুরে সবার সঙ্গে খেতে বসে খুব অস্বস্তি হচ্ছিল। পুরীতে কোন হোটেলে গিয়ে উঠবে, এখানে এই বাড়িতে তিন মাসের ছুটি কাটান অসম্ভব। দুপুরের মধ্যে মন ঠিক করে বাড়ি থেকে বেরিয়ে গেল।

রিজার্ভেশন কাউণ্টারের সামনে জন-কুড়ি লোকের পেছনে দাঁড়িয়ে অমিতেশ বড় ফুল্ল হয়ে উঠছিল, নীল ও সবুজের মাঝামাঝি বিচিত্র রঙের জলে শাদা ফেনার ঢেউগুলো তাকে নতুন কিছু পেয়ে যাওয়ার লোভ দেখাচ্ছিল। কেন যে পাহাড় থেকে সোজা সমুদ্রতীরে চলে যায়নি, কেন যে পুরোন জিনিস ঠাসা ঘরের গন্ধ ধরার কাল দেরাজের গোলাপী চিঠি তাকে টানল ভেবে পেল না। জল ছাড়া এমনকি তরঙ্গায়িত বালির বিস্তারও লোভ দেখাচ্ছিল। অথচ দাঁড়িয়ে থাকতে থাকতে আধঘণ্টার মধ্যেই সমুদ্রতীর বিষয়ে ভাবনা উচ্চতম চূড়োয় উঠেই আবার শিথিল হয়ে গেল। বরং একটির পর একটি সফেন ঢেউ-এর খ্যাপা জন্তুর মতন গোঙাতে গোঙাতে শায়িত তীরভূমির ওপর আছড়ে পড়া অসহ্য, প্রায় অশ্লীল, মনে হল। আধ ঘণ্টায় তিন চার পার বেশি এগোতে পারেনি। কাউণ্টারটা অত্যন্ত দূরে, অমিতেশ আলগোছে লাইন থেকে বেরিয়ে রাস্তায় এসে দাঁড়াল।

ঠিক তখন খুবই আকস্মিকভাবে সলিলের কথা মনে পড়ল। একদা সলিল তার ঘনিষ্ঠতম ছিল। অন্তত দু বছর দেখা নেই। কাছেই তো সলিলের অফিস। অমিতেশ নতুন করে পায়ে জোর পেল, হাঁটছিল খুশীখুশী মেজাজে। অবশ্য তাড়াতাড়ি এগোতে পারছিল না, রাস্তায় খুব ভিড়। এমন সময় এত ভিড় কেন, আশ্চর্য লাগছিল।

সলিলের সঙ্গে দেখা হয়ে গেল তার অফিসের দরজায়, অজস্র লোকের সঙ্গে বেরিয়ে আসছিল। ভাল হল, চারতলায় উঠতে হল না, স্লিপ দিতে হল না। অনেক লোকের মধ্যেও সলিলের ওপর সহজেই চোখ পড়ল তার চেয়ারার বিশিষ্টতার জন্য। চোখাচোখি হতে সলিল কনুইয়ের খোঁচায় পথ করে এগিয়ে এল। সলিলের উচ্চতা, অত্যন্ত পরিপাটি পোশাক এত লোকের মধ্যে তাকে স্বাতন্ত্র্য দিয়েছে, অমিতেশ লক্ষ্য করছিল।

অমিতেশের কাঁধে হাত রেখে হাঁটতে হাঁটতে সলিল বলছিল, আর এক মিনিট পরে এলে দেখা হত না। আজ দুটোয় প্রায় সব অফিস বন্ধ হয়ে যাওয়ার কী একটা কারণের কথা যেন সলিল বলছিল। তাই হঠাৎ দুপুরের পর আজ এত লোক রাস্তায় নেমে এসেছে। কাঁধে হাত রেখে পাশাপাশি চলা যায় না। সলিলের কথা অমিতেশ ভাল করে শুনছিল না, বারবার অপরিচিতের অঙ্গ ছুঁয়ে মনে হচ্ছিল, রাত্তিরে না ঘুমিয়ে এখন এই হঠাৎ জোয়ারে ঝাঁপ দিয়েছে।

ঘষা কাচের দরজা ঠেলে এমন একটা রেস্টরাণ্টের মধ্যে নিয়ে গেল সলিল যেখানে শীতগ্রীষ্মে একই আবহাওয়া। ঠাণ্ডা নেই, ইচ্ছে করলে কোট খুলে রাখা যায়। বাইরের কিছু দেখা যায় না, বাইরের শব্দ আসে সামান্য। সব থেকে যাবার মতন, বড় চুপচাপ। সন্ধ্যেয় নিশ্চয়ই সঙ্গীত চলে, যন্ত্রপাতি রয়েছে।

একা একা তুই আছিস তোফা। পাহাড়ী টাহাড়ী জুটিয়েছিস? আমার আর নতুন খবর কী বল? ছেলেটা সায়েন্স গ্রুপে যাবে না হিউম্যানিটিজ, বুঝতে পারছি না। ওর ঝোঁক হিউম্যানিটিজের দিকে, কিন্তু ওসবের তো আজকাল কোন দাম নেই। তাছাড়া সমস্যা মেয়েটাকে নিয়ে। বাড়ির কাছে ভাল স্কুল কোথায়? ওটাকে ভরতি করা দারুণ ঝামেলা। তার ওপর অফিসে আমাদের অবস্থা জানিস তো। কেরানীবাবুরা বিষ-চোখে দ্যাখে, বসরা শাসায়। মাঝখানে পড়ে আমার মতন খুদে অফিসারদের হাল বড় খারাপ। সলিল মস্ত একটা প্লাস্টিকের পোশাকপরা পুতুলের মত বসে একটানা কথা বলছিল।

অমিতেশের কফি ঠাণ্ডা হয়ে যাচ্ছিল। তুই এমন চুপ করে আছিস কেন? সলিল এতক্ষণে বুঝেছে, সে একাই কথা বলছে।

সলিল সিগারেট খায় না, অমিতেশের ফুরিয়েছে। সিগারেট নিয়ে আসি, বলে অমিতেশ উঠে দাঁড়াল।

বস্ না, আনিয়ে দিচ্ছি।

না না, আমি নিজেই আনছি। আসলে বাইরে যাবার জোরাল ইচ্ছে খানিক সময় ধরে অমিতেশ চাপছিল।

ছায়া ছায়া ঘরের ঘষা কাচের দরজা ঠেলে অমিতেশ বাইরের উজ্জ্বল আলোয় এসে দাঁড়াল। শীতের ঝকঝকে রোদ্দুর। বাকী অফিসগুলো হয়ত আড়াইটেয় বন্ধ হয়েছে, রাস্তায় ভিড় আরও বেশি, এখন ভরা জোয়ার। কাছেই সিগারেটের দোকান নেই, সামনে এগোলে নিশ্চয়ই পাওয়া যাবে। আস্তে হাঁটা যায় না, অন্যদের থেকে তাড়াতাড়িও না, থেমে থাকা অসম্ভব, সর্বজনীন নাচের মতন। এই শহরের হালচাল ইদানীং দ্রুত বদলাচ্ছে। প্রাত্যহিক যোগাযোগ না থাকায় ফাঁকফোকর আয়ত্তের বাইরে চলে যাচ্ছে। খেলোয়াড়ী ক্ষিপ্রতায় পাশ কাটিয়ে এগোতে পারছিল না অন্য দুচারজন যেমন করছিল। বস্তুত অমিতেশের পাশ কাটানর ইচ্ছে মোটেই প্রবল ছিল না। এমন অবলীলায় অঙ্গে অঙ্গ মেলাতে পারার সুখে চোখ প্রায় বুজে আসছিল।

অন্যদের পায়ে পর পর কয়েকটা ঠোক্কর

খেয়ে অমিতেশ দাঁড়িয়ে পড়ল। বুঝতে পারল, একতলা দোতলা বাস, ট্রাম, মোটর ইত্যাদি এবং হঠাৎ ছাড়া পাওয়া অগুনতি লোকের বিচিত্র ধ্বনিতরঙ্গে সে গলা মিলিয়ে দিয়েছিল। কী বলছিল, কাকে বলছিল, মনে এল না, কিন্তু চুপ করে যাবার পরও নিজের গলার শেষ কয়েকটা দুর্বোধ্য শব্দ কানে আঘাত করছিল। রোদ্দুর হাওয়া ভিড় গর্জন চিৎকার তীব্রতার উচ্চতম বিন্দুতে কেঁপে কেঁপে ক্রমান্বয়ে মিলিয়ে যাচ্ছিল। উত্তরঙ্গ ক্ষণকালের চূড়ো থেকে আবার নেমে আসছিল অমিতেশ। হঠাৎ দাঁড়িয়ে পড়ায় চাপ আসছিল দুপাশ এবং পেছন থেকে। ক্লান্তি টের পাচ্ছিল, মনে পড়ল রাত্তিরে ঘুম হয় নি। বাঁয়ে একটা সরু গলি। সেদিকে প্রায় দৌড় দিল।

গলিও শূন্য নয়, তবে ভিড় নেই। সিগারেটের দোকানের তলায় একটা চায়ের দোকান, সামনে বেঞ্চ পাতা, খালি। অমিতেশ একপাশে বসল। কফিতে দুতিনবার মাত্র ঠোঁট জিভ ছুঁইয়েছিল। এখন চা চাইল এক ভাঁড়। ভিড় ঠেলে সলিলের কাছে ফিরে যাবার জোর খুঁজে পাচ্ছিল না। একটু আগেই ঢেউ খুঁজছিল, কিন্তু ঠিক কী চাই কোনদিন তো সুনিশ্চিতরূপে জেনে নেওয়া সম্ভব না। বরং এখন ভাবছিল, খ্যাপা ঢেউগুলোর অনেক তলায়, যেখানে কাউকে নিজের মুখ দেখাতে হয় না এবং অন্য কারও মুখ দেখতে হয় না, স্রোতহীন স্থির জলে ডুবে গিয়ে সরকাদা ছুঁয়ে থাকা বড় আরাম।

সাহিত্য ও সংস্কৃতি

জোফানীর ছবি

চিত্রশিল্প কিংবা চিত্রশিল্পীরা সাধারণতঃ এই স্তম্ভের আলোচনার আওতায় পড়ে না, কারণ এই পৃষ্ঠা সাহিত্য ও সাহিত্যকারদের জন্য। কিন্তু এমন অনেক শিল্পী আছেন যাঁদের আঁকা ছবি কিংবা যাঁদের বৈচিত্র্যময় জীবনকথা সাহিত্যের বিষয়বস্তু। জোফানীর কাহিনীর সঙ্গে সাহিত্যের সম্পর্ক অতিকাছাকাছি। কলকাতার প্রাচীন ইতিহাস আজ বাংলা উপন্যাসের একটা প্রধান উপজীব্য হয়ে উঠেছে। তাই হয়ত জোফানীর জীবনকে ঘিরে কোনো উপন্যাস রচিত হতে পারে।

বিগত ১৩ই আগস্টের 'সানডে স্টেটসম্যান' পত্রিকায় বিখ্যাত চিত্রশিল্পী ডেসমন্ড ডোইগের ৫৫তম রেখাচিত্র "ওলড সেন্ট জন" প্রকাশিত হয়েছে। এই গির্জায় কলকাতার প্রথম অ্যাংলিক্যান বিশপের অভিষেক উৎসব অনুষ্ঠিত হয়। কলকাতার ময়দানব জব চার্নক ও তাঁর হিন্দু স্ত্রীর কবর এই গির্জায় আছে, কুখ্যাত হলওয়েল মনুমেন্ট এইখানে ঠাঁই পেয়েছে। ডেসমন্ড ডোইগ তাঁর সংক্ষিপ্ত বিবরণে অনেক কথার মধ্যে জোফানীর সেই বিখ্যাত ছবিখানির উল্লেখ করে বলেছেন—

"Over a simple wooden side altar hangs the Zoffany "Last Supper," a painting considered to be the artist's masterpiece. Many are the tales associated with it. A high ranking gentleman about town whom Zoffany hated is portrayed as Judas. The artist's wife, apparently, was model for the beloved disciple John. Other versions of this story exist. The painting showing signs of age, could do with restoration."

এই অল্প কথায় অনেক কথাই বলা হয়েছে, এবং ছবিখানি যে নষ্ট হওয়ার উপক্রম একথাও জানা যাচ্ছে। রয়্যাল আকাদেমিসিয়ানের আঁকা এই ছবিখানি কলকাতার রসিক শিল্পীসমাজ সচেষ্ট হলে হয়ত সংরক্ষণ করতে পারেন।

১৭৮৭ খ্রীষ্টাব্দে সেন্ট জনস্‌ চার্চের নির্মাণকার্য প্রায় শেষ হয়ে এসেছিল, সেই বছরই রয়্যাল আকাদেমিসিয়ান জন জোফানীর 'লাস্ট সাপার' তৈলচিত্রটি আঁকা শেষ হয়, তিনি তাঁর আঁকা ছবিখানি গির্জায় উপহার দিলেন।

রয়্যাল আকাদেমির প্রথম যুগের শিল্পী জন জোফানীর জীবনেতিহাস বিচিত্র। ইংলন্ড তাঁকে ছাড়তে হয় বাধ্য হয়ে, বন্ধু ও পরিচিতদের মুখাকৃতির সাদৃশ্য নিজের তুলিতে ফুটিয়ে তোলা জোফানীর একটা বদ অভ্যাসে দাঁড়ায়, বিনানুমতিতে এভাবে ছবি আঁকায় স্বভাবতই চারদিকে একটা অসন্তোষের সৃষ্টি হল। ছবিগুলি আবার এমন হত যে অনুকৃত ব্যক্তিবিশেষ তাতে বিশেষ অখুশী হতেন। যেমন শয়তানের ছবি আঁকতে গিয়ে শহরের মেয়রের মুখখানা এঁকে দিলেন, এই অবস্থায় কে আর খুশী হতে পারে। ফলে ইংলন্ড ত্যাগ করতে হল।

১৭৮১ খ্রীষ্টাব্দে ভারতে পৌঁছে লক্ষ্ণৌর এক খামখেয়ালী নবাব সাহেবের দরবারে শিল্পী হিসাবে যোগ দিলেন। জোফানী জাতীয় মানুষ নবাবের ছিল অতি প্রিয়। তাই জোফানী কয়েক বছরেই নবাব পরিবারের সবারের ছবি এঁকে প্রচুর অর্থলাভ করলেন।

ক্লড মার্টিন ছিলেন একজন সামরিক দালাল শ্রেণীর লোক, তাঁর কাজ ছিল ব্যবসা করা, টাকা ধার দেওয়া, নানাবিধ দুঃসাহসিক কাজকর্ম করা। নবাবকেও তিনি টাকা ধার দিতেন। ক্লড মার্টিনের অনেক ছবি জোফানী এঁকেছিলেন এবং উভয়ের মধ্যে ঘনিষ্ঠ বন্ধুত্ব গড়ে উঠেছিল। জোফানীর আঁকা ক্লড মার্টিনের রক্ষিতার ছবিটি নাকি অপূর্ব হয়েছিল।

১৭৮৭ খ্রীষ্টাব্দে নবাব দরবার ত্যাগ করে জোফানী চলে এলেন কলকাতায়। তখন নতুন শহর সবে গড়ে উঠছে। সেই বছরের একখানি পঞ্জিকায় জোফানীর পরিচয় হিসাবে লেখা আছে "আর্টিস্ট অ্যান্ড পোর্টেট পেইন্টার"।

এই ১৭৮৭ খ্রীষ্টাব্দেই 'লাস্ট সাপার' ছবিখানি আঁকা হয়। ১৭৮৭ খ্রীষ্টাব্দের ১২ই এপ্রিল তারিখের 'ক্যালকাটা গেজেটে' লেখা হয় :

"We hear that Mr. Zoffany is employed in painting a large historical picture—"The Last Supper": he has already made considerable progress in the work, which promises to equal any production which has yet appeared from the brush of this able artist, and with that spirit of liberality for which he has ever been distinguished, we understand he means to present it to the public as an alter-piece for the new Church."

সুতরাং এই শিল্পকর্মটি চার্চ কর্তৃপক্ষ সকৃতজ্ঞচিত্তে গ্রহণ করলেন। শিল্পীকে কিছু অর্থমূল্য দেওয়ার বাসনা ছিল, সামর্থ্য ছিল না তাই তাঁরা ধন্যবাদ জানিয়ে একটি চিঠি দিলেন। এই চার্চের যখন যথারীতি উদ্বোধন হল এবং জোফানীর আঁকা ছবিখানি চার্চের অঙ্গ অলঙ্কৃত করল তখন এই চিঠিখানি ভীষণ উত্তেজনা সৃষ্টি করে। কারণ, দেখা গেল যে চার্চের উপাসক সম্প্রদায়ের অনেকের আদর্শ নিয়ে ছবিটির মুখ্য পাত্রদের আঁকা হয়েছে। বিশেষ করে যীশু, সেন্ট জন, এবং জুডাস ইসকারিয়টকে সহজেই চেনা যায়। যীশুকে আঁকা হয়েছে গ্রীক পাদ্রী ফাদার পার্থেনিওকে আদর্শ করে, এই পুরোহিতটি সারা কলকাতায় তাঁর সদাশয়তা এবং সৎকর্মের জন্য প্রখ্যাত ছিলেন। সেন্ট জনকে আঁকা হয়েছিল মিঃ ব্লাকেয়ার নামক একজন খ্যাতনামা ম্যাজিস্ট্রেটকে আদর্শ করে, এঁর নামেই ব্লাকেয়ার স্কোয়ার এখনও হয়ত আছে। আর জুডাস ইসকারিয়ট হলেন কলকাতার একজন পুরোন বাসিন্দা। তাঁর নাম তুল্লো। তাঁর কাজ ছিল নীলাম করা। অন্যান্যরা তেমন খ্যাতির অধিকারী নন।

কলকাতা সমাজে আন্দোলন শুরু হল, কি কেলেংকারীই না করেছেন জোফানী, কিন্তু জোফানী অবিচল। বরং কয়েক বছর পরে, ইংলন্ডের ব্রেণ্টফোর্ড চার্চের কর্তৃপক্ষরা তাঁকে যখন আর একখানি ছবি আঁকার আমন্ত্রণ জানালেন তখনও তিনি ঐ একই কান্ড করলেন। তিনি এইবারও আঁকলেন 'লাস্ট সাপার'—আর এইবারও বন্ধু ও প্রতিবেশীদের আদর্শ করে ছবিখানি আঁকলেন।

দু'খানি ছবিই আজো অক্ষত আছে, একখানি ব্রেণ্টফোর্ডের সেণ্ট জর্জেস চার্চে আর অপরটি এই কলকাতা শহরের সেণ্ট জন চার্চে, গার্স্টন প্লেসের পিছনে, চার্চ লেন দিয়ে প্রবেশ করতে হয়।

ছবিখানি নষ্ট হয়ে আসছে, একটু চেষ্টা করলে ছবিখানি হয়ত আরও কিছুকাল অতিক্রম করে বেঁচে থাকবে। একজন রয়্যাল আকাদেমীর শিল্পীর আঁকা ছবি এই শহরের সম্পদ।

বেদীর বামদিকে ছবিখানি টাঙানো আছে, প্রায় ৮"×৮" ফুট আকারের বিরাট ছবি। গিল্টের ফ্রেমে আঁটা। সামনেই জুডাস, একেবারে এ যুগের সিনেমার ভিলেন। মুখখানি শয়তানিতে বোঝাই। মাথায় কোঁকড়ানো লাল চুল, লাল দাড়ি তার চুলও কোঁকড়ানো। প্রায় সব শিল্পীরাই জুডাসের চুল লাল রঙে এঁকেছেন।

আজ জোফানী বিস্মৃতপ্রায়। কিন্তু শিল্পী হিসাবে জোফানীর শক্তিমত্তার পরিচয় ছড়ানো আছে এই ছবিখানিতে। জোফানীর জীবনে আর একটি উল্লেখযোগ্য ঘটনা ঘটেছিল। ইংলন্ডে ফেরার পথে এক নির্জন দ্বীপে ও'দের জাহাজ ডুবি হয়। বুভুক্ষা থেকে প্রাণ পাওয়ার জন্য লটারী করে এক-একজনকে খাওয়া হবে স্থির, জনৈক তরুণ নাবিকের নাম লটারীতে ওঠে, এবং তাকে সবাই ভক্ষণ করেন। জোফানী বোধহয় একমাত্র নরখাদক রয়্যাল আকাদেমির শিল্পী। এই বিশেষণ আর কারো নেই নিশ্চয়ই।

—[illegible]
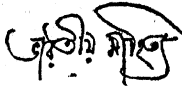
সংস্কৃত সাহিত্যের ইংরেজি অনুবাদ ॥

'কুলার্ণবতন্ত্র' সংস্কৃত সাহিত্যের একটি অমূল্য সম্পদ। সম্প্রতি এর ইংরেজি অনুবাদ প্রকাশ করেছেন মাদ্রাজের 'গণেশ এন্ড কোং' নামক প্রকাশন সংস্থা। গ্রন্থটি অনুবাদ করেছেন জন উড রুফি ও এম পি পন্ডিত। এই গ্রন্থে শাক্ত সাধনার কুলদের পরিচয় বিধৃত। 'কুল' কথাটির অর্থ 'শক্তি' এবং অকুল কথাটির অর্থ 'শিব'। এই শাক্ত এবং শিবের লীলাময় প্রকাশই বর্ণিত হয়েছে 'কুলার্ণব'এ। এই গ্রন্থটি মোট ১৭টি অধ্যায়ে বিভক্ত। জন উড রুফির একটি সুচিন্তিত ভূমিকাও অনূদিত গ্রন্থটির পূর্বে যুক্ত হয়েছে। গ্রন্থটির একদিকে মূল সংস্কৃত শ্লোক রোমান লিপিতে মুদ্রিত আছে। শ্রীএম পি পন্ডিত প্রথম এগারটি অধ্যায় অনুবাদ করেছেন। তিনি অবশ্য অনুবাদ করতে গিয়ে অনেক জটিলতা এড়িয়ে গেছেন। তবু যেখানে যেখানে প্রয়োজন, তিনি বিবিধ টীকা দিয়েছেন। বইটি শাক্ত সাহিত্য নিয়ে যাঁরা গবেষণা করছেন, তাঁদের কাছে অপরিহার্য বলে মনে হবে।

একটি তামিল গ্রন্থ ॥

তামিল ভাষার প্রাচীন সাহিত্যের ইতিহাসে 'শিলাপ্পাদিম'এর অবদান খুবই উল্লেখযোগ্য। গ্রন্থটিকে বলা যায় কাব্যোপন্যাস। কবিতার সহজ ছন্দে একটি উপন্যাসের কাহিনী এখানে বিধৃত হয়েছে। অনেকে মনে করেন, খৃষ্টের জন্মের প্রায় শত বৎসর পূর্বে এই গ্রন্থটি রচিত। এত দীর্ঘ দিন আগে, এই ধরনের রচনা দেখে সত্যই আশ্চর্যান্বিত হতে হয়। যাই হোক, এই গ্রন্থটির সম্প্রতি একটি ইংরেজি অনুবাদ প্রকাশিত হয়েছে। প্রকাশ করেছেন নিউইয়র্কের 'নিউ ডাইরেকশন' প্রকাশন সংস্থা। অনুবাদ করেছেন এলান ডানিলুে।

এই গ্রন্থটির পূর্বেও একটি ইংরেজি অনুবাদ প্রকাশিত হয়েছে। প্রখ্যাত ভারততত্ত্ববিদ পন্ডিত স্বামীনাথ আয়ার ১৯৩৯ সালে তামিলে গ্রন্থটি সম্পাদনা করে প্রকাশ করেন। তখনই গ্রন্থটির অনুবাদ করেছিলেন রামচন্দ্র দীক্ষিত এবং প্রকাশ করেন 'অকসফোর্ড ইউনিভার্সিটি প্রেস'। তখন থেকেই অবশ্য ভারতে এবং বিদেশে গ্রন্থটি সম্বন্ধে নানা আলোচনার সূত্রপাত হয়। আলোচ্য গ্রন্থের অনুবাদক অবশ্য ভূমিকায় লিখেছেন— 'আমি তামিল সাহিত্যের প্রাচীন ইতিহাস পড়ছিলাম। সঙ্গীতের প্রতি ছিল আমার আগ্রহ। এভাবেই একদিন এই গ্রন্থটির সন্ধান পাই এবং গ্রন্থটি আমাকে এত মুগ্ধ করে যে, আমি সংগে সংগে তার অনুবাদ করতে বসি।' তিনি আরও দাবী করেছেন যে, এই গ্রন্থে বিভিন্ন সঙ্গীতের তাল-লয় সম্বন্ধে যে ব্যাখ্যা করা হয়েছে, তা সম্পূর্ণ তার নিজ সিদ্ধান্তের উপর নির্ভর করে। কিন্তু এই সিদ্ধান্তও কোন মনগড়া সিদ্ধান্ত নয়। প্রাচীন ভারতীয় সাহিত্য পাঠ করে, তিনি এইসব নামকরণ করেছেন। এই গ্রন্থটি ভারতীয় জীবন ও সংস্কৃতিরও অমূল্য সম্পদ। অন্যান্য ভারতীয় ভাষাতেও গ্রন্থটির অনুবাদের বিশেষ প্রয়োজন আছে। অনুবাদক এই গ্রন্থটি অনুবাদের জন্য সকলের ধন্যবাদ অর্জন করবেন।

যুগোশ্লাভ ভাষায় বাংলা সাহিত্য ॥

বাংলা সাহিত্য সম্পর্কে ইদানিং পৃথিবীর বিভিন্ন দেশের যথেষ্ট আগ্রহের সৃষ্টি হয়েছে। 'যুগোশ্লাভ গেজেট' পত্রিকার বিদেশী সাহিত্য বিভাগে বাংলা ভাষার উপর বেশ কটি প্রবন্ধ প্রকাশিত হয়েছে। এই সবকটি প্রবন্ধই লিখেছেন যুগোশ্লাভের প্রখ্যাত তরুণ লেখক টস্কভো কুলনভিক। তিনি যে সমস্ত প্রবন্ধ লিখেছেন তার মধ্যে একটি রবীন্দ্রনাথের উপর এবং অন্য একটি আধুনিক বাংলা কবিতার উপর। এছাড়াও বাংলা চলচ্চিত্র এবং সত্যজিৎ রায়ের উপরও তাঁর একটি রচনা প্রকাশিত হয়েছে। তিনি আধুনিক বাঙালী কবিদের কবিতাও যুগোশ্লাভ ভাষায় অনুবাদ করেছেন। যাঁদের কবিতা এ পর্যন্ত অনূদিত হয়েছে, তাঁদের মধ্যে প্রেমেন্দ্র মিত্র, সুভাষ মুখোপাধ্যায়, মণীন্দ্র রায়, আশিস সান্যাল, মৃণাল দত্ত ও গণেশ বসুর নাম উল্লেখ্য। যুগোশ্লাভ ভাষায় বাংলা কবিতার একটি পূর্ণাঙ্গ সংকলন প্রকাশ করবার ইচ্ছাও তাঁর আছে।

হিন্দী পত্রিকার বিশেষ সংখ্যা ॥

সাম্প্রতিক হিন্দি সাহিত্য আন্দোলনে শ্রীনামবর সিং সম্পাদিত ত্রৈমাসিক আলোচনা পত্রিকাটির অবদান খুবই উল্লেখযোগ্য। দিল্লি থেকে প্রকাশিত এই পত্রিকাটিতে সাহিত্য ও শিল্প বিষয়ক যেসব প্রবন্ধ প্রকাশিত হয়, যেকোনও সাহিত্যরসিকের কাছেই তা মূল্যবান। সম্প্রতি পত্রিকাটির একটি বিশেষ সংখ্যা প্রকাশিত হয়েছে। এর প্রধান আকর্ষণ 'নির্বাচনোত্তর ভারতবর্ষ' নামক একটি সংকলন। কোনও রাজনীতিকের মতামত নয়— সাহিত্যিক এবং শিল্পী কিভাবে এই পরিবর্তিত অবস্থার মোকাবিলা করছেন, তারই পরিচয় ফুটে উঠেছে এতে। এই বিশেষ আলোচনায় যাঁরা অংশ গ্রহণ করেছেন, তাঁদের মধ্যে আছেন—সর্বশ্রী রামবিলাস শর্মা, রমেশকুন্তল মেধ, শিবপ্রসাদ সিংহ, বিদ্যানিবাস মিশ্র, রাজকমল চৌধুরী, বিষ্ণু প্রভাকর, ভগবতীচরণ বর্মা, অমৃতলাল নাগর, মন্মথনাথ গুপ্ত, রাজেন্দ্র অবস্থি, ওমপ্রকাশ দীপক ও হাজারিপ্রসাদ দ্বিবেদী। আলোচকদের নাম থেকেই দেখা যাচ্ছে, এঁরা কেউই কোন বিশেষ গোষ্ঠীর সদস্য নন। ফলে এতে বিভিন্ন মতাদর্শী সাহিত্যিকদের মতামত বর্তমান পরিস্থিতির উপর ফুটে উঠেছে। এছাড়াও এই আলোচনায় অংশ গ্রহণ করে শ্রীরাজকমল চৌধুরী যে প্রবন্ধটি লিখেছেন, শোনা যায়, এটিই তাঁর সর্বশেষ রচনা। কঠিন রোগাক্রান্ত অবস্থায় এই তরুণ লেখকের মতামত সুন্দরভাবে ফুটে উঠেছে তাঁর 'অপ্রত্যাশিত কুছ ভি নহি' প্রবন্ধে। অন্যান্য যেসব রচনা সংখ্যাটির আকর্ষণ বৃদ্ধি করেছে, তার মধ্যে তরুণ কবি অশোক বাজপেয়ী লিখিত, 'আজ কে সাহিত্য মে আক্রমকতা', রবীন্দ্রনাথ শ্রীবাস্তব লিখিত, 'সাহিত্য বিশ্লেষণ কা সংঘটনাত্মক দৃষ্টিকোণ', মলয়জ লিখিত, 'কবিতা মে অর্থ আউর মূল্য : এক বিশ্লেষণ', নির্মল বর্মা লিখিত, 'পরম্পরা পরায়াপন আউর প্রতিবদ্ধতা', নেমিচন্দ্র জৈন লিখিত, 'হিন্দি সাহিত্য কা ঘুঁফলা পরিদৃশ্য', প্রয়াগ শুক্ল লিখিত, 'অনুভব অউর এহসাস কে বীচ', বিজয়মোহন সিংহ, নই কহানী কা সর্বেক্ষণ' প্রভৃতি প্রবন্ধগুলি উল্লেখযোগ্য।

কোন্ডা ভেংকটাপ্পায়ার আত্মজীবনী ॥

অন্ধ্রের প্রখ্যাত নেতা কোন্ডা ভেঙ্কটাপ্পায়ার আত্মজীবনীটি সম্প্রতি তেলেগু ভাষায় একটা আলোড়ন সৃষ্টি করেছে। দুই খন্ডে এই আত্মজীবনীটি সম্পূর্ণ। ১৮৬৬ সালে ভেংকটাপ্পায়ার জন্ম হয়। সাধারণ মধ্যবিত্ত জীবনেই তাঁর জন্ম। তাঁর ছাত্র ও শিক্ষাজীবন খুবই গৌরবময়। তিনি আইনশাস্ত্রে স্নাতক উপাধি লাভ করে এই ব্যবসায় নিজেকে নিযুক্ত করেন। এই সময়েই তিনি সামাজিক আন্দোলনে গান্ধীর নেতৃত্বে যখন সমগ্র ভারতে বৃটিশ-বিরোধী আন্দোলন ছড়িয়ে পড়ে, তখন তিনিও সেই আন্দোলনে ঝাঁপিয়ে পড়েন। বলা যায়, অন্ধ্রের জাতীয় আন্দোলনের তিনিই জনক। গ্রামে গ্রামে খদ্দর ও কুটির-শিল্পের প্রসারের জন্য তিনি বক্তৃতা দিয়ে বেড়ান এবং গ্রামবাসীদের এ ব্যাপারে উৎসাহিত করতে থাকেন। অস্পৃশ্যতা দূরীকরণের জন্যও তাঁর অবদান স্মরণীয়। অন্ধ্রের এই জাতীয় নেতার আত্মজীবনীতে অনেক অকথিত কাহিনী প্রকাশিত হয়েছে। বাইরের সংগ্রামক্ষুব্ধ এই মানুষটির অন্তরতম হৃদয়ের অনেক কাহিনীও ফুটে উঠেছে এর মধ্যে। যাঁরা ভারতবর্ষের স্বাধীনতা আন্দোলন সম্বন্ধে জানতে ইচ্ছুক, তাঁদের কাছে গ্রন্থটি অপরিহার্য। তবে সাধারণেরও গ্রন্থটি ভাল লাগবে— কারণ এতে অনেক ভঙ্গীমা সহজ ও সুন্দর

ভাবে বর্ণনা করা হয়েছে। তেলেগু সাহিত্যেরও একটি মূল্যবান সংযোজন এই গ্রন্থটি।

ভারত-সোভিয়েত পাঠ্যপুস্তক চুক্তি অভিনন্দিত ॥

মাদ্রাজের নিউ সেঞ্চুরি বুক হাউস কর্তৃক আয়োজিত এক সবর্ধনা অনুষ্ঠানে বক্তৃতা প্রসঙ্গে 'মেঝদুনরোদনায়া কনিগা'র উপ-সভাপতি এ বেলোস তোৎস্কি বলেছেন : 'আমরা জ্ঞান সম্প্রসারণের ও অন্যান্য দেশের পুস্তক ব্যবসায়ীদের সঙ্গে অভিজ্ঞতা বিনিময়ের ব্রত পালনের চেষ্টা করে যাচ্ছি।'

প্রকাশন বিভাগের প্রধান আই জি জনোফ ও দিল্লীস্থিত সোভিয়েত যুক্তরাষ্ট্রের বাণিজ্য প্রতিনিধিমন্ডলীর এ সিদরোফ'-এর পক্ষ থেকে উদ্যোক্তাদের ধন্যবাদ জানিয়ে তিনি বলেন, জাতীয় নির্মাণকর্মের স্বার্থে দেশে উপনীত উন্নয়নশীল দেশগুলির কারিগরি জ্ঞানের বিপুল প্রয়োজনীয়তা রয়েছে। তিনি বলেন, পাঠ্যপুস্তক প্রকাশ সম্পর্কে ভারত-সোভিয়েত চুক্তি সাংস্কৃতিক সহযোগিতার পথে এক উল্লেখযোগ্য ঘটনা। যুক্ত উদ্যোগে পাঁচলক্ষ কপি কলেজ পাঠ্য-পুস্তক প্রকাশিত ও ভারতে বন্টিত হয়েছে। সোভিয়েত যুক্তরাষ্ট্রে বছরে সত্তর হাজারেরও উপর বই প্রকাশিত হচ্ছে—এগুলির মোট মুদ্রণ সংখ্যা ১৩০ কোটি।

সোভিয়েত অতিথিদের স্বাগত জানিয়ে নিউ সেঞ্চুরি বুক হাউসের সভাপতি শ্রীভি সুব্বিয়া ভারতের পুস্তক ব্যবসাকে সোভিয়েত পুস্তক ব্যবসা যে অকুণ্ঠ সাহায্য করছে তার প্রশংসা করেন।

অনুষ্ঠানের সভাপতি শ্রীমোহনকুমার মঙ্গলম পুস্তক ব্যবসার ক্ষেত্রে সহযোগিতার উল্লেখ করেন। অনুষ্ঠানে প্রকাশক, পুস্তক বিক্রেতা ও গ্রন্থকারগণ উপস্থিত ছিলেন।

আর কে নারায়ণের ডি-লিট উপাধি লাভ ॥

আন্তর্জাতিক খ্যাতিসম্পন্ন ভারতীয় উপন্যাসিক, শ্রীআর কে নারায়ণ আগামী ৩০ আগস্ট একটি বিশেষ অনুষ্ঠানে লীডস বিশ্ববিদ্যালয় থেকে ডি-লিট উপাধি গ্রহণ করবেন।

এই বছর মে মাসে লীডসে শ্রীনারায়ণের এই উপাধি গ্রহণের কথা ছিল, কিন্তু সে সময় তিনি আসতে পারেন নি।

ব্রিটেনে তাঁর যেসব উপন্যাস অত্যন্ত জনপ্রিয়তা লাভ করেছে তাদের মধ্যে রয়েছে 'মিঃ সম্পৎ' 'দি ব্যাচিলর অব আর্টস' এবং 'ওয়েটিং ফর দি মহাত্মা'।

বিদেশী সাহিত্য
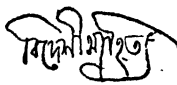
উনিশ শতকের অপ্রধান কবিবৃন্দ ॥

ইংরেজী সাহিত্যের উনিশ শতক প্রতিভাবান কবিদের দ্বারা সমৃদ্ধ। প্রতিভার গুণানুসারে এই যুগের কবিদের তাই দুটি ভাগে ভাগ করা চলে—প্রধান কবিগোষ্ঠী এবং অপ্রধান কবিগোষ্ঠী।

অপ্রধান কবিদের মধ্যে যাঁরা পড়েন তাঁদের কবিতা নিয়ে সম্প্রতি কবি অডেনের সম্পাদনায় একটি সংকলন গ্রন্থ প্রকাশিত হয়েছে। নাম : "নাইনটিনথ সেঞ্চুরি মাইনর পোয়েটস্"। ব্লেক, ওয়ার্ডস্বার্থ, কোলরিজ, বায়রন, শেলী, কীটস, টেনিসন, ব্রাউনিং, আর্নল্ড, স্যুইনবার্ন, হপকিন্স, কিপলিং প্রভৃতি হচ্ছেন প্রধান বা "মেজর পোয়েটস"। কাজেই এঁরা ছাড়াও উনিশ শতকের আর যে সব খ্যাতিমান ও প্রতিভাবান কবি আছেন তাঁদের নিয়েই "মাইনর পোয়েটস্" গোষ্ঠী নির্বাচিত হয়েছে।

কিন্তু সম্পাদকের ভূমিকায় তুলনামূলকভাবে অডেন দেখাতে চেয়েছেন যে এই প্রধানদের মধ্যে কেউ কেউ, তাঁর মতে, দুয়েকজন প্রধান কবির চেয়ে কম শক্তিশালী নন।

প্রধানত ১৮০০ থেকে ১৯০০ সালের কবিদের কবিতাই এতে অন্তর্ভুক্ত। এবং যাদের অনেকেরই জন্ম ১৭৭০ থেকে ১৮৭০-এর মধ্যে। ক্র্যাবকে সংকলনে নেওয়া হয়নি কেননা তাঁর জন্ম আরো আগে। কিন্তু টমাস হার্ডিকে সংকলনভুক্ত করা হয়েছে, কেননা, ১৯০০ সালের পরে এগুলি ছাপা হলেও এগুলির রচনাকাল তার অনেক আগে। কিন্তু কবি ফিডজেরাল্ডের "রুবায়েৎ" অনুবাদ কবিতা কেন এতে নেওয়া হল তা বোঝা গেল না।

বইটির বৈশিষ্ট্য আরো একটি কারণে। উনিশ শতকের অপ্রধান কবিদের নিয়ে প্রথম সংকলন "অকসফোর্ড বুক অব নাইনটিনথ সেঞ্চুরি ভার্স" (১৯৬৪) সম্পাদনা করেছেন জন হেওয়ার্ড। উক্ত সংকলনে কবিরা ছিলেন সংখ্যায় ৭০ জন। অডেনের সংকলনের অন্তর্ভুক্ত হয়েছেন ৮০ জন কবি। তার মধ্যে আবার "কমন পোয়েটস" বলতে মোট ৪৫ জনকে পাওয়া যাচ্ছে। আবার এঁদের কবিতা নির্বাচনের ব্যাপারেও আকাশপাতাল পার্থক্য। এই পরস্পর বৈপরীত্যের জন্য অডেনের সংকলনটি সকলেরই কাছে আগ্রহ সঞ্চার করবে। তবে বইটির মুদ্রণপ্রমাদ আশাতীতভাবে দুঃখজনক। এমিলি ব্রণ্টির 'my couch lay in a ruined hall' কবিতাটির উল্লেখ আছে পংক্তি-সূচিতে অথচ এই রকমের একটি চরণও তাঁর নির্বাচিত কবিতাবলীতে নেই। কবি ক্লেয়ারের "ব্যাজার" নামের কবিতাটি সম্পূর্ণ বলে চিহ্নিত কিন্তু সংকলনে তার অংশমাত্র ছাপা হয়েছে।

রেমন্ড কুইনোর উপন্যাস ॥

রেমন্ড কুইনো প্রচলিত নিয়মে উপন্যাস লেখেন না। উপন্যাস বলতে সাধারণভাবে আমরা যা বুঝি কুইনোর রীতি তা নয়। তাঁর বইয়ের নীচে তাই প্রকাশকের মন্তব্য লেখা থাকে 'এ সর্ট অব নভেল।' এই বিদগ্ধ রীতির জন্য ফরাসীদের কাছে ইনি একজন বিদ্রোহী লেখক। কাহিনী, বাস্তবতা, ঘটনার বিবরণ ইত্যাদি তাঁর কাছে 'পুরাতন, সুতরাং বর্জনীয়'। কেউ কেউ তাঁকে বলেছেন সার্থক স্যুররিয়্যালিস্টদের অন্যতম। সম্প্রতি বেরিয়েছে তাঁর অভিনব রীতির উপন্যাস : 'বিটুইন ব্লু অ্যান্ড ব্লু'। মূল ফরাসী ভাষা থেকে এটি অনুবাদ করেছেন বারবারা রিট। বইটির অনুবাদ প্রায় অসম্ভব—কারণ এর রহস্যময় রীতি। কিন্তু বারবারা রিটের অনুবাদের প্রাঞ্জলতা ও আন্তরিক শ্রম যেন গ্রন্থের মূল প্রাণকেন্দ্রটি স্পর্শ ক'রে যায়।

কুইনোর দুর্নাম আছে, যে তিনি সমালোচকের ধরা-ছোঁয়ার বাইরে। প্রতি পদে তাঁর ভাষা ও রীতির অর্থ বুঝতে সমালোচকরা হিমসিম। বিব্রত। অথচ তাঁর রচনা যে উচ্চস্তরের তা প্রত্যেকেই স্বীকার করেছেন। কারো কারো মতে লুই আরাগঁর 'লে পেসান দ্য প্যারী'-র পর এটি অন্যতম শ্রেষ্ঠ স্যুররিয়্যালিস্ট উপন্যাস। অনুবাদের গুণ এর অতিন্দ্রীয় জগৎকে স্পর্শ করায়।

শেক্সপীয়র এনসাইক্লোপিডিয়া

মহাকবি শেক্সপীয়রের সাহিত্য ও জীবন সম্পর্কে বিভিন্ন ধরনের বই বেরিয়েছে। কিন্তু শেক্সপীয়র এনসাইক্লোপিডিয়ার পরিকল্পনা সম্ভবত সবচেয়ে অভিনব। শেক্সপীয়র বিষয়ে যাঁদেরই আগ্রহ এই একটিমাত্র গ্রন্থে তার যে-কোন বিষয় যেকোন তথ্য জানতে পাওয়ার সুযোগ আছে। বিশেষত সাধারণ পাঠকদের পক্ষে এইরকম একটি বই অত্যাবশ্যক ও গুরুত্বপূর্ণ। কবির জীবন ও সাহিত্য সম্পর্কেও নানা তথ্য এই নির্দেশিকায় সহজলভ্য। বিশেষত তাঁর নাটক সম্পর্কে ধারাবাহিক আলোচনায় বিদগ্ধ মহলের ক্রম-পরিবর্তিত মতামতের ইতিহাসটি চমকপ্রদ।

বইটির নাম : 'এ শেক্সপিয়র এনসাইক্লোপিডিয়া'। সম্পাদন করেছেন ও, জে, ক্যাম্পবেল এবং ই, জি, কুইন্।

জেন্ বাওয়েলসের রচনা সংগ্রহ ॥

জেন বাওয়েলসের রচনার সঙ্গে অনেকেরই পরিচয় আছে। প্রধানত ঔপন্যাসিক হিসেবে খ্যাতি অর্জন করলেও নাট্যরচনা ও ছোটগল্পের জন্যও তিনি স্মরণীয় হয়ে থাকবেন। এঁর কাহিনীগুলো

ও রচনারীতিতে এমন এক বৈশিষ্ট্য আছে যা প্রায় বিরলদৃষ্টান্ত বলা চলে। ট্রুম্যান কপোট তার সম্পর্কে উক্তি করেছিলেন : 'এই মহিলার প্রতি আমার একমাত্র অভিযোগ যে তিনি কখনই প্রচলিত ধারায় লেখেন না। তাঁর বিদগ্ধ কৌতুকপ্রবণতা ও জীবনের প্রতি গভীর অন্তর্দৃষ্টি আমাকে বিস্মিত করে।'

সম্প্রতি বাওয়েলসের কয়েকটি রচনার একটি সংগ্রহ গ্রন্থ বেরিয়েছে। নাম 'কালেক্টেড্ ওয়র্কস্ অব জেন বাও-য়েলস্'। এই বইটিতে বাওয়েলসের রচনারীতি ও বৈশিষ্ট্য বিষয়ে একটি মননশীল ভূমিকা লিখেছেন ট্রুম্যান কপোট। এতে একটি উপন্যাস 'দি সিরিয়াস লেডিজ', একটি নাটক 'ইন দি সামার হাউস', ও ছোটগল্প 'প্লেন প্লেজারস্' প্রভৃতি সংকলিত হয়েছে।

কবি ডিলর্ডের নতুন কাব্যগ্রন্থ ॥

আর, এইচ, ডিলার্ডের সম্প্রতিকালে প্রকাশিত কাব্যগ্রন্থ 'দি ডে আই স্টপ্‌ড ড্রিমিং অ্যাবাউট বারবারা স্টিল' প্রভৃত জনপ্রিয়তা অর্জন করেছে। ডিলার্ডের কবিতার সঙ্গে যাঁদেরই কিছুমাত্র পরিচয় আছে তাঁরা জানেন তাঁর কবিতায় এক ধরনের তীক্ষ্ম কৌতুক ও ব্যঙ্গ থাকে। আলোচ্য বইটিতে প্রধানত দুধরণের কবিতা স্থান পেয়েছে। কৌতুকের মাধ্যমে সমকালীন সমাজমানসকে বিচার করা ও কিছু আন্তরিক প্রেমের কবিতা। কৌতুক-প্রবণ বা 'কমিক পোয়েট্রি' হলেও ডিলার্ডের ভাবনা কিন্তু গুরুতর। এই পর্যায়ে 'দি রয়্যাল লাইব্রেরী', 'দি উইন্টার প্যালেস' এবং 'আউট অব সাইট, আউট অব মাইন্ড' প্রভৃতি কবিতা সবিশেষ উল্লেখযোগ্য। জীবনকে এইরকম পরিহাসচ্ছলে পর্যালোচনা করলেও এই কবিতাগুলির অন্তর্নিহিত স্পন্দন, সরস অভিব্যক্তির ফলে, পাঠকের সঙ্গে আত্মীয়তা সৃষ্টি করে।

প্রেমের কবিতাগুলো যেন অনেকটাই প্রেমপত্রের মতো নিবিড়। বিশেষত 'অ্যামোরেস্তি' নামক কবিতাটির রচনানৈপুণ্য বৈচিত্র্যময়। প্রেম সম্পর্কে তাঁর নতুন চিন্তা ও মূল্যায়নের প্রসঙ্গগুলি অনেকেরই মনে বিতর্কের সৃষ্টি করবে।

এস্থার ফোর্বস-এর পরলোকগমন

প্রখ্যাত মহিলা কথাশিল্পী এস্থার ফোর্বস্ গত ১২ আগস্ট পরলোকগমন করেছেন। মৃত্যুকালে তাঁর বয়স হয়েছিল ৭৬ বছর।

১৯৪৩ সালে ফোর্বস্ সাহিত্যের জন্য পুলিৎজার পুরস্কার পেয়েছিলেন। আমেরিকার ঔপনিবেশিক অঞ্চলগুলি তাঁর উপন্যাসের অন্যতম বস্তু ছিল। যে গ্রন্থটির জন্য তাঁকে পুলিৎজার পুরস্কারে সম্মানিত করা হয়েছিল তার নাম 'পল রিভিয়ার অ্যান্ড্ দি ওয়ার্লড্ হি লিভস্ ইন্'।

ছেঁড়া তার, হারানো সুর

বুদ্ধদেব বসু বাংলা সাহিত্যে একটি অবিস্মরণীয় নাম। গল্প, কবিতা ও প্রবন্ধের ক্ষেত্রে তিনি এক আশ্চর্য বৈচিত্র্য সৃষ্টি করেছেন। যে-সব সাহিত্যশিল্পী বাংলা সাহিত্যে য়ুরোপীয় ভঙ্গি ও আঙ্গিকের আমদানি করেছেন তিনি তাঁদের অন্যতম। ১৯৩২-এ তাঁর 'এ'রা ওরা এবং আরো অনেকে' যখন প্রকাশিত হয় তখন চারদিকে একটা সাড়া জেগেছিল। ১৯৩২-এ বুদ্ধদেব বসুর সুস্পষ্ট এবং সাহসিক উক্তি অনেকের পক্ষে হজম করা কঠিন ছিল, তাই বুদ্ধদেব বসুর এই উপন্যাস এবং অচিন্ত্যকুমারের "বিবাহের চেয়ে বড়ো" "প্রাচীর ও প্রান্তর" এবং প্রবোধ-কুমারের "দুই আর দুয়ে চার" প্রায় একই সঙ্গে বাজেয়াপ্ত করা হল শ্লীলতা-বিরোধী বিষয়বস্তুর দায়ে। এই সব গ্রন্থই আজ আবার অবাধে প্রচারিত হচ্ছে, তার অর্থ যে রুচির পরিবর্তন ঘটেছে। যা সহজ এবং স্বাভাবিক তার বস্তুনিষ্ঠ প্রকাশ রীতি-বিরুদ্ধ নয় এই নীতি আজ স্বীকৃতিলাভ করেছে। ১৯৩৩ খৃষ্টাব্দে প্রকাশিত প্রকাশিত হয়েছিল বুদ্ধদেব বসুর "যেদিন ফুটল কমল"—এই উপন্যাসটি যৌবনের জাগরণের এক কাব্যধর্মী অভিব্যক্তি। শ্রীলতা ও পার্থপ্রতিম আজ পরিচিত নায়ক-নায়িকাদের অন্যতম। তাদের মধ্যে অনাদি-কালের নরনারীর মানসিকতার পরিচয় প্রকাশিত। এর পর তিনি লিখেছেন, "হে বিজয়ী বীর", "ধূসর গোধূলি"। "ধূসর গোধূলি" বাংলা উপন্যাসে এক বিশিষ্ট পথ-চিহ্ন। মায়া ও নীলকন্ঠের দ্বিধা ও দ্বন্দ্ব তরুণ বুদ্ধদেব বসু সেদিন এক আশ্চর্য আঙ্গিকে বিধৃত করেছিলেন। "একদা তুমি প্রিয়ে" উপন্যাসে বুদ্ধদেব বসু মনস্তাত্ত্বিক বিশ্লেষণের আর একটি পথ-নির্দেশ করলেন। ১৯৪২-এ প্রকাশিত "কালো হাওয়া" আর ১৯৪৯ খৃষ্টাব্দে "তিথিডোর" বুদ্ধ-দেব বসুর শিল্পমানসের আরেক দিক উদ্ঘাটিত করল। বাস্তবতার রুক্ষ রূপকে বলিষ্ঠ তুলিতে এঁকে তিনি সাহিত্য-পাঠকের মনে আর এক চমক সৃষ্টি করলেন। এর পরবর্তীকালে বুদ্ধদেবের রচনায় এই বস্তুনিষ্ঠ অভিব্যক্তিই প্রধান হয়ে উঠেছে। লেখকের কবিমানস ও সূক্ষ্ম বিচারবোধ আধুনিক জীবনের জটিলতাকে নিখুঁতভাবে প্রকাশ করতে সাহায্য করেছে। বাংলা উপন্যাসের ক্ষেত্রে মুষ্টিমেয় কয়েকজন লেখক এই বিশিষ্ট শক্তির অধিকারী, তাঁদের রচনা তাই একবার মাত্র এক নিঃশ্বাসে পড়ে শেষ করা যায় না, অনেকখানি সময় ধরে তার রেশ মনে থাকে। অনেক চিন্তার খোরাক এই জাতীয় উপন্যাসে থাকে যা ছকবাঁধা উপন্যাসে বিরল।

উপন্যাসের পাত্রপাত্রীকে রক্তমাংসের রূপদানে বুদ্ধদেব বসুর দক্ষতা অপরিসীম। বুদ্ধদেব একবার লিখেছেন—"খুব সম্ভবত আমি স্বাভাবিক গল্পলেখক নই। আমার উদ্ভাবনী শক্তি দুর্বল, ঘটনার চাইতে বর্ণনার দিকে আমার ঝোঁক, নাটকীয়তার চাইতে স্বগতোক্তির দিকে, উত্তেজনার চাইতে

শ্রীবুদ্ধদেব বসু

মনস্তত্ত্বের দিকে। এমন গল্প আমি কমই লিখেছি যার গল্পাবেশ মুখে বলে দেয়া যায় না। এমন গল্প লিখেছি যাকে গল্পা-কারে প্রবন্ধ বললে দোষ হয় না। পাত্রপাত্রীর আলাপে-আলোচনায় মনের অব্যক্ত চিন্তা-ধারায় অনেক পাতা ভরিয়েছি।"

বুদ্ধদেব বসুর এমনই একখানি মনন-শীল উপন্যাস "রাত ভরে বৃষ্টি"। উপন্যাসটি গত বছর পুজোর সময় যখন একটি সাময়িক-পত্রে প্রকাশিত হয়, তখন পাঠকমহলে এক চাঞ্চল্যের সৃষ্টি হয় লেখকের স্পষ্টভাষণের। সাহসিকতার পরিচয় পেয়ে যাঁরা সহজ, সরল উপন্যাসে অভ্যস্ত, তাঁরা চমকে উঠেছেন। মালতী মুখোপাধ্যায় নয়নাংশুর স্ত্রী। আকস্মিক প্রবল বর্ষণে পথঘাট প্লাবিত হয়ে গেল। বাড়িতে এসেছিল জয়ন্ত নয়নাংশুর বন্ধু কি একটা কাজে।

নন্দনাংশু বাড়ি নেই। দশটা সাড়ে দশটা পর্যন্ত বৃষ্টি আর থামে না, এমন সময় জয়ন্ত এসেছিল শোবার ঘরে সিগারেটের সন্ধানে, কিন্তু সামনে মালতীকে পেয়ে সে তার ডাকনাম ধরে অনুরাগ ভরে তাকে জড়িয়ে ধরলো, তারপর যা অনিবার্য তা ঘটে গেল। এই ঘটনার পর মুহূর্তে অবশ্য নন্দনাংশু ফিরে এসেছে। স্বাভাবিক ব্যবহারই করেছে তার সঙ্গে, পিসিমা কেমন আছে প্রশ্ন করেছে। তারপর একই ঘরে অন্ধকারে স্বামী-স্ত্রী দুজনেই জেগে আছে, ঘুম নেই। *জয়ন্তর সঙ্গে দৈহিক সংসর্গের চারঘন্টা পরে বিছানায় শুয়ে মালতী ভাবছে পারিপার্শ্বিক ঘটনাপ্রবাহের কথা। স্বামী হয়ত ভাবছেন যে এ ঘটনা আরো অনেক ঘটেছে মালতীর মনে এই চিন্তা জেগেছে, কিন্তু আগে থেকে ঘনিষ্ঠতা হলেও ঘটনা ঘটেছে মাত্র চারঘন্টা আগে, স্বামীকে ইদানীং তার* ভালো লাগে না, ভালো লাগে না তার বেঁটে বেঁটে আঙুল। স্বামী চেয়েছিল স্ত্রীকে, পুরোপুরি দখল করতে চেয়েছিল। তখন মালতীও মুগ্ধ ছিল স্বামীর অসামান্য ভালোবাসায়। তারপর মাঝে মাঝে তর্ক সুরু হয়। তাই স্বামীর কাছে বিছানায় শুয়ে মালতী মনে মনে বলছে—"শুয়ে শুয়ে তোমাকে ভালোবাসছি জয়ন্ত।' ও-পাশে স্বামীও ভাবছে শিকলে বাঁধা কুকুরের মতো আমাদের শরীর, মন তাকে টেনে নিয়ে যায়। আমি হাজার হোক ওর স্বামী। জয়ন্তর কথা ভাবছে, তাকে দোষ দিতে পারছে না। শরীরে-শরীরে বিদ্যুৎ আর বয়না, মিস্ত্রী এসেও আর বিদ্যুৎ আনতে পারবে না, পাওয়ার হাউস ফতুর। *মালতী ভাবে, যার সঙ্গে আমার শরীর মেলে না, মন মেলে না, তার সঙ্গে লোকদেখানোর জন্য তার সঙ্গে শুকনো একটা কাঠামো আঁকড়ে একসঙ্গে— আর কতকাল বাঁচতে হবে—! শেষ পর্যন্ত এই লোক দেখানো অস্তিত্বটুকু থেকে যায়, তবে ছেঁড়া তার আর জোড়া লাগে না, হারানো সুর ফিরে পাওয়া যায় না।*

বুদ্ধদেব বসু একটা নতুন দিকের কথা বলেছেন, যা এর আগে কেউ বলেন নি, অথচ বলার সময় অতিক্রান্ত। জোড়াতালি দিয়ে কত কসরৎ করে আমরা জীবনটা আঁকড়ে আছি। ভিতরটা শূন্য, একটা ফাঁপা বেলুনের ওপর দাঁড়িয়ে। শামিয়ানা বেঁধে মুখে হাসি টেনে ছেলেমেয়ের বিবাহসভায় বরের বাপ কিংবা কনের মা সেজে দাঁড়ালেও অন্তরের অন্তরালে একটা অন্য জগৎ, অন্য আকৃতি। এ যুগের বলিষ্ঠ লেখক বুদ্ধদেব বসু দ্বিধাহীন-চিত্তে সেই ইঙ্গিত রেখেছেন তাঁর এই আশ্চর্য শিল্পকর্ম "রাত ভরে বৃষ্টি" উপন্যাসে।

গ্রন্থটির ছাপা এবং প্রচ্ছদ পরিচ্ছন্ন।

রাত ভরে বৃষ্টি : (উপন্যাস)—বুদ্ধদেব বসু। প্রকাশক : এম, সি, সরকার অ্যান্ড সনস্ (প্রা) লিঃ।। ১৪, বঙ্কিম চাটুজ্যে স্ট্রীট—কলিকাতা-১২।। দাম —পাঁচ টাকা মাত্র।।

রবীন্দ্রনাথের রাজা

রবীন্দ্রনাথের 'রাজা' রূপক-সাংকেতিক নাটক। তাঁর নাটকগুলির মধ্যে এটি অনেক স্বতন্ত্র। তাছাড়া 'রাজা' রবীন্দ্রসাহিত্যের একটি বিশিষ্ট সম্পদ। এই নাটকটি নিয়ে অসংখ্য আলোচনা হয়েছে নানা মত অবলম্বনে। রবীন্দ্রনাথের সাহিত্যচিন্তার সঙ্গে অধ্যাত্মভাবনার যোগ ছিল প্রথম থেকেই। 'রাজা' নাটকে এই অধ্যাত্মভাবনার সুস্পষ্ট প্রকাশ ঘটেছে। রবীন্দ্রনাথের সমগ্র সাহিত্যসাধনায় এই নাটকখানির অসামান্য স্থান অস্বীকার করা যায় না।

'রাজা' নাটকখানি বিস্তৃত পটভূমিকায় আলোচনা করেছেন তরুণ অধ্যাপক শ্রীসুবোধ ভট্টাচার্য। প্রয়োজনীয় তথ্য এবং যুক্তি দিয়ে তিনি স্বীয় বক্তব্যকে প্রকাশ করেছেন। বিভিন্ন মতামত তুলে ধরে তাদের বিচার করেছেন এবং নিজস্ব বক্তব্যের মৌলিকত্ব প্রমাণের প্রয়াস পেয়েছেন। শ্রীভট্টাচার্য 'রাজা' নাটকের সামগ্রিক আলোচনা করেছেন কয়েকটি বিভিন্ন পরিচ্ছেদে। রবীন্দ্রনাটকের সাধারণ পরিচয়, ভাববস্তু, রাজা নাটকের কাহিনী, রাজা কোন শ্রেণীর নাটক? রাজা নাটকের উৎস, চরিত্রবিচার (রাজা, সুদর্শনা, সুরঙ্গমা, ঠাকুরদা, কাঞ্চীরাজ ও সুবর্ণ), রাজা কি গীতাঞ্জলির নাট্যরূপ? নাটকীয় কলা-কৌশল, রাজা নাটকের গান এবং রাজা নাটকের ভাষা—এগুলিই হোল গ্রন্থকারের আলোচ্য বিষয়। নাটক সম্পর্কে উৎসাহী পাঠক এই গ্রন্থখানি পাঠে উপকৃত হবেন।

রবীন্দ্রনাথের রাজা (আলোচনা)—সুবোধ ভট্টাচার্য। সাহিত্য প্রকাশ। ৪৭।২ রমেশচন্দ্রপ্রসাদ মজুমদার লেন, হাওড়া। দাম : চার টাকা।

দুটি সংকলন

বাংলা দেশের তরুণতম কবিগণ কেমন লিখছেন, কবিতা পাঠকদের সে বিষয়ে বিস্তৃত ধারণা হয়তো এখনও গড়ে ওঠে নি। তবু কোন কোন স্বতন্ত্র কণ্ঠস্বর বিশিষ্ট হয়ে ধরা পড়ছে মনে হয়। 'আজকের কবিতা' ১৯৩৭ থেকে ১৯৪৭ পর্যন্ত যাদের জন্ম, সেই তরুণতম তেত্রিশজন কবির কবিতা সঙ্কলন। কোন কোন কবির একাধিক কবিতাও এতে আছে। রত্নেশ্বর হাজরা, চিন্ময় গুহ ঠাকুরতা, পরেশ মণ্ডল, পবিত্র মুখোপাধ্যায়, গণেশ বসু, শান্তনু দাস, মৃণাল দত্ত প্রভৃতি কবিদের কবিতা এতে উল্লেখযোগ্য। কিন্তু আশিস সান্যাল, করুণাসিন্ধু দে, অনন্ত দাশ প্রভৃতি অনেক কবির কবিতা এতে নেই। আরো একটু প্রতিনিধি-স্থানীয় হলে বইখানি ভাল হত। তবু প্রচেষ্টা হিসাবে সম্পাদক ধন্যবাদার্হ।

●

বাংলাদেশে এখন সবচেয়ে বেশী যা লেখা হচ্ছে তা কবিতা। কিন্তু না কিন্তু নতুন কবির আবির্ভাব প্রায়ই লক্ষ্য করা যায়। শ্রীসত্যব্রত রায় বেশ কয়েকজন নতুন, একেবারে অপরিচিত, কবিদের কবিতা একত্র করে একটি সংকলনগ্রন্থ প্রকাশ করেছেন। এ প্রচেষ্টা যে অভিনন্দনযোগ্য তাতে সন্দেহ নেই। নতুন হলেও অনেক কবির মধ্যেই কবিতা রচনার সহজ স্বচ্ছন্দ্য গতি লক্ষ্য করা গেছে। অন্তত একথা বলা যায় যে সংকলিত কবিদের এই সর্বপ্রথম আত্মপ্রকাশ কারো কারো কবিত্বের সম্ভাবনাকে ভবিষ্যতে সার্থক করতে পারলে 'যাত্রা হল শুরু'র সার্থকতা থাকবে।

আজকের কবিতা : (কাব্যসংকলন) : সম্পাদনা : প্রভাত চৌধুরী। সাম্প্রতিক প্রকাশনী, ৪২বি, প্রিয়নাথ মল্লিক রোড, কলি:-২৬। দাম : দু টাকা।

যাত্রা হল সুরু : সম্পাদনা : সত্যব্রত রায়।। সপ্তর্ষি পাবলিকেশনস্। সোদপুর, ২৪ পরগনা। দাম : চার টাকা।

ষাটের দশকের একজন কবি

মঞ্জুষ দাশগুপ্তের কবিতা অত্যন্ত সহজ সরল ভঙ্গিতে লেখা। চালাকি নেই, অহেতুক শব্দবিভ্রান্তি নেই। ছন্দের ভাঙাগড়া, পরীক্ষা-নিরীক্ষা নিয়েও তিনি তেমন মাথা ঘামান না। তার চেয়ে, কবিতায় ভাব-প্রকাশের প্রচলিত পদ্ধতি ও শান্তিপূর্ণভাবে নিজের খুশিমত কবিতা লিখে যাওয়াতেই তাঁর আনন্দ। বাস্তব দুঃখ, নিঃসঙ্গতা, প্রেমে ব্যর্থতা, ঐশ্বরিক উপলব্ধি, মৃত্যুচেতনা ইত্যাদি ব্যাপার তাঁর কবিতাগুলিতে কখনো উঁকি মারলেও সেগুলি দাগহীন ক্ষতের মতো। আসলে কবি মঞ্জুষ স্বপ্ন দেখতেই বেশী ভালবাসেন। কল্পনায় বর্তমান থেকে 'অন্য বনভূমি'তে প্রস্থান করতে চান। অবশ্য কেন, তার কোন সদুত্তর বা পশ্চাৎভূমি খুঁজে পাওয়া যায় না। তবু কবি বাস্তব পৃথিবী থেকে 'রোদ্দুরের স্নানরেখা ধরে/ছায়াময় বনপথে দূর হতে আরো কিছু দূরে' (ভ্রমণ) যাবার পক্ষপাতী। এই ভ্রমণ যে শেষ পর্যন্ত তাঁকে কোথায় নিয়ে যাচ্ছে তার কিছু ইঙ্গিত পেলে আশ্বস্ত হওয়া যেত। লেখকের ছন্দের হাত ভালো, শব্দপ্রয়োগে আছে স্বাচ্ছন্দ্য, দুয়েকটি চিত্রকল্পও মন্দ নয়।

অন্য বনভূমি : (কবিতা)—মঞ্জুষ দাশগুপ্ত। বাংলা কবিতা প্রকাশনী। ১৮, পদ্মপুকুর রোড, কলি-২০। দাম : তিন টাকা।

তস্য তস্য অথবা সূর্য্য কাঁদলে সোনা

প্রেমেন্দ্র মিত্র

(পূর্ব প্রকাশিতের পর)

মোরালেস নালিশ করেন নি কোথাও। কিন্তু তাঁর অত গুণের ক্রীতদাসের হঠাৎ তাঁকে ছেড়ে যাওয়ার কোন কারণও খুঁজে পান নি। তাঁর কাছে কোনরকম দুর্ব্যবহার সে ত পায় নি। লোকটির নিজস্ব একটা আত্মমর্যাদাবোধই ছিল। তাকে কোন বিষয়ে সামান্য একটু ভর্ৎসনাও করবার প্রয়োজন কখনো হয় নি। অতিরিক্ত পরিশ্রমও তাকে দিয়ে কখনো করিয়েছেন এমন নয়। নামে ক্রীতদাস হলেও বাড়ির লোকের মতই তাকে দেখেছেন। তার এভাবে চলে যাওয়া সত্যিই একেবারে দুর্বোধ্য। যা আগে ভাবতে পারেন নি সেরকম কোনো রহস্য লোকটির মধ্যে ছিল নাকি মোরালেসের এতদিনে ক্ষীণ একটা সন্দেহ জাগে।

ঘনরামের হঠাৎ চলে যাওয়ার কারণ খুঁজে পাওয়া সত্যিই একটু কঠিন। মোরালেসের বাড়ির বৈঠকে লেখা পরি-কল্পনা গোপনে সংশোধন করে তা ধরা পড়বার ভয়েই কি ঘনরামকে পালাতে হয়।

কারণটা খুব বিশ্বাসযোগ্য মনে হয় না এই জন্যে যে তাঁকে মোরালেস বা আর কেউ ঘুণাক্ষরেও সন্দেহ করেন নি। ধরা পড়বার অত ভয় থাকলে ওরকম কাজ তিনি করতে যেতেন কি!

নেহাৎ অহেতুক খেয়াল যদি না হয় তাহলে পানামা শহরে সম্মানিত এক অতিথি দম্পতির আসার সঙ্গে ঘনরামের নিরুদ্দেশ হওয়ার কোন সম্পর্ক থাকা কি সম্ভব?

পানামায় গভর্নরের অতিথি হয়ে সত্যিই তখন কিছুদিনের জন্যে কেওকেটাদের একজন সস্ত্রীক এসেছেন বটে।

কিন্তু মার্কুইস গঞ্জালেস সোলিস আর তাঁর স্ত্রী যে মহলের লোক মোরালেস কি তাঁর বন্ধুরাই সেখানে কল্কে পান না। মোরালেসের ক্রীতদাসের সঙ্গে ওই রাজা-গজাদের কি সম্পর্ক থাকতে পারে?

সম্পর্ক কিছু না থাকুক গভর্নরের শাদা ঘোড়ার জুড়ি গাড়িতে পানামার বাজারের রাস্তা দিয়ে যেতে যেতে একদিন সকালে মার্শনেস-কে হঠাৎ চমকে উঠতে দেখা গেছে।

কি হল? —স্ত্রীর অকারণ চমকটা লক্ষ্য করে জিজ্ঞাসা করেছেন মার্কুইস গঞ্জালেস সোলিস।

কিছু নয় বলে মার্শনেশ কথাটা চাপা দিয়েছেন। মুখে আর কিছু না বললেও মার্কুইস কিন্তু স্ত্রীর কৈফিয়তে সন্তুষ্ট হন নি। দিন তিনেক বাদে একদিন মার্শনেসকে কি খেয়ালে, অনেক আগেই বেরিয়ে পড়তে দেখা গেছে গাড়ি ডাকিয়ে।

গভর্নরের রাজকীয় অতিথিশালায় স্বামীর ও স্ত্রীর ঘর পাশাপাশি। মার্কুইস যথাসময়ে তৈরী হয়ে স্ত্রীর ঘরে এসে কাউকে দেখতে পান নি। মার্শনেস-এর পরিচারিকার কাছে খোঁজ নিয়ে স্ত্রীর অনেক আগে একা বেরিয়ে যাওয়ার খবর জানতে পেরেছেন।

মার্শনেস কি কিছু বলে গেছেন!

হ্যাঁ, পানামা বন্দরের দিকটা দেখতে যাচ্ছেন এ কথা জানাতে বলে দিয়েছেন।

মার্কুইস-এর ত এই ছেলেখেলার বন্দর দেখবার কোন আগ্রহ নেই। তাই তাঁকে ডেকে বিরক্ত না করে মার্শনেস একাই গেছেন।

কেউ দেখলে মার্কুইস বিরক্ত না হয়ে খুশিই হয়েছেন মনে করত তাঁর মুখের হাসি দেখে। হাসিটা শুধু সামান্য একটু বাঁকা।

সম্মানিত অতিথিযুগলের জন্যে বরাদ্দ করে রাখা পানামার হর্তাকর্তা ডন পেড্রো আরিয়াস দে আভিলা ওরফে পেড্রারিয়াসের দুধের মত শাদা ঘোড়ার জুড়ি গাড়িটাকে পানামা বন্দরের দিকে যেতে সেদিন সকালে সত্যিই দেখা গেছে। গাড়িতে মার্শনেসই শুধু নেই।

একলা ঘোড়ায় চেপে বেরিয়ে মার্কুইস গঞ্জালেস সোলিস শহর থেকে বন্দরে যাবার নির্জন পথেই মার্শনেসকে সেদিন দেখতে পেয়ে যেন চমকে গেছেন।

সে কি তুমি এখানে দাঁড়িয়ে! তুমি গাড়ি নিয়ে বন্দর দেখতে গেছ শুনলাম!

হ্যাঁ তাই যাব ভেবেছিলাম।—সুন্দরী মার্শনেশ বিন্দুমাত্র অপ্রতিভ না হয়ে বলেছেন,—হঠাৎ এই নির্জন জায়গাটায় নেমে একটু হাঁটতে ইচ্ছে হল।

হ্যাঁ চমৎকার জায়গা নামতে ইচ্ছে হবার মত! মার্কুইস স্বীকার করেছেন, এদিকে জলাটায় একটু পচা দুর্গন্ধ আর কাঁচা রাস্তাটা একটু এবড়ো-খেবড়ো। কিন্তু প্রাকৃতিক সৌন্দর্যের জন্যে ওরকম একটু আধটু খুঁত অনায়াসে সহ্য করা যায়। আর

নিজে না যাও গাড়িটাকে পাঠিয়ে খুব ভালো করেছ। ঘোড়াগুলো বন্দর ঘুরে ত আসবে! ওই যে ফিরছে দেখছি।

গাড়িটা ফিরে এসে কাছে দাঁড়ালে সহিস এসে দরজা খোলার পর ঘোড়া থেকে লাফ দিয়ে নেমে নিখুঁত আদবকায়দায় স্ত্রীকে হাত ধরে ভেতরে বসিয়ে দিয়ে আবার ঘোড়ায় চেপে গাড়ির পাশাপাশি যেতে যেতে যেন তুচ্ছ অবান্তর একটা কথা জানিয়েছেন মার্কুইস।

বলেছেন,—তুমি অত সকাল সকাল বেরিয়ে গেছ দেখে আমিও একটা কাজ সেরে ফেললাম ওই অবসরে।

যে প্রশ্নটা এবার আসা উচিত তার জন্যে সামান্য কয়েক মুহূর্ত সময় দিয়েছেন মার্কুইস গঞ্জালেস সোলিস।

মার্শানেস সে প্রশ্ন করেন নি। সামনের দিকে চেয়ে কিসের ভাবনায় যেন তিনি অন্যমনস্ক।

মার্কুইস নিজে থেকেই আবার নির্লিপ্ত তাচ্ছিল্যের সঙ্গে বলেছেন,—দপ্তরে গিয়ে পালিয়ে-আসা গোলামটাকে রাস্তায় যেন দেখেছি মনে হওয়ার কথা জানিয়ে এলাম। পরিচয়, চেহারার বর্ণনা দিয়ে নামটা যেন দাস ছিল তাও বলে এসেছি। গভর্নরের অতিথির মান রাখতে কোথায় কার কাছে গোলামটা আছে ওরা ঠিক খুঁজে বার করবে। গোলামদের সব খবর লেখা একটা পাকা খাতাই ওদের আছে।

মার্শানেসকে আগেকার মতই অন্যমনস্ক মনে হয়েছে। মুখটা একটু ফেরান নি, এমন কি একটা শব্দও তাঁর মুখে শোনা যায় নি।

গাড়িটা শুধু একটা গর্তের মধ্যে পড়েই বোধহয় একটু লাফিয়ে উঠেছে। মার্শানেস কেঁপে উঠেছেন নিশ্চয় তাতেই।

ঘনরাম দাসকে গভর্নরের মাননীয় অতিথি মার্কুইস গঞ্জালেস দে সোলিস-এর মত লোকের পানামার পুলিশকে দিয়ে খোঁজাবার এত গরজ কিসের?

গভর্নরের অতিথির সম্মান রাখতে পুলিশ চেষ্টার ত্রুটি অবশ্য করেনি কিন্তু মার্কুইসের বর্ণনার সঙ্গে মেলে এমন কারুর সন্ধান পায় নি। তাদের পাকা খাতাতেও নামটা না থাক ওরকম কোন ক্রীতদাসের বিবরণ নেই। থাকার কথাও নয়, কারণ ঘনরাম মোরালেসের কাছে নিজে থেকে এসে যখন কাজ নিয়েছেন মোরালেস পলাতক বলেই তার খবর দপ্তরে জানান নি। ঘনরাম নিরুদ্দেশ হবার পরও আগেকার মতই নীরব থেকেছেন। সুতরাং নেহাৎ সামনা-সামনি কেউ ধরিয়ে না দিলে পুলিশের পক্ষে ঘনরামের পাত্তা পাওয়া অসম্ভব।

হাতে হাতে কেউ ধরিয়ে দেবে এই ভয়েই কি ঘনরামকে একবেলার মধ্যে পানামা থেকে অমন নিরুদ্দেশ হতে হয়?

সামনাসামনি যে তাঁকে চিনে নির্জন একটি রাস্তায় দাঁড় করায় সে অবশ্য পুলিশকে জানাবার ভয়ই দেখিয়েছিল!

বলেছিল,—নিয়তিকে এড়িয়ে পালান যায় না, বুঝেছ. আমার চোখকেও ফাঁকি দিতে। বলো এখন কি করব? পুলিশকে এখনই সব জানানো আমার উচিত নয় কি?

পুলিশের কাছে ধরা পড়বার ভয় ঘনরামের জবাবে তখন খুব প্রকাশ কিন্তু পায় নি।

গোলামের পক্ষে অত্যন্ত অশোভনভাবে সোজা মার্শানেসের মুখের দিকে তাকিয়ে তিনি বলেছিলেন,—উচিত কাজ করতে হবে আপনি পেছপাও হয়েছেন মার্শানেস!

মার্শানেস! আপনি! —হেসে উঠেছিল মার্শানেস।

মার্শানেস বলেই ত' আরো আপনি। তাছাড়া তুমি বলার ঘনিষ্ঠতা কোনদিন আপনার সঙ্গে ছিল বলে'ত মনে করতে পারছি না।—ঘনরামের মুখের হাসির দরুণই কথাটা তেমন তিক্ত মনে হয় নি।

চার হাজার মাইল দূরে চার মিনিটের দেখায় এসব কথা কাটাকাটির সময় নেই দাস। —হঠাৎ গম্ভীর হয়ে তীব্র স্বরে বলেছিল মার্শানেস,—ভাগ্য যখন তোমায় আবার আমার হাতের মুঠোয় এনে দিয়েছে তখন আর আমি তোমায় ছাড়ব না এটুকু জেনে রাখো। অপরাধের জন্যে মাপ চেয়ে কান্নাকাটি করার মেয়ে আমি নই। আমার জন্যে তোমার যদি অশেষ দুর্গতি হয়ে থাকে তোমার জন্যেও আমি তারচেয়ে কম দুঃখ পাই নি।

একটু থেমে ঘনরামের চোখের দৃষ্টিটা লক্ষ্য করে আরো যেন জ্বলে উঠে মার্শানেস বলেছিল, এই ঐশ্বর্য এই বিলাস এই নাম এই সম্মান সৌভাগ্য এই যদি আমার সুখ বলে মনে করতাম তাহলে একটা ক্রীতদাসের সঙ্গে গোপনে কথা বলবার জন্যে—যা আমার নেই সেই লজ্জার কথা বলছি না,—অপরের মানসম্মান, নিজের অহংকার সব বিসর্জন দিয়ে এখানে ভিখিরীর মত দাঁড়িয়ে থাকতাম না। শোনো দাস তোমাকে আমার চাই। তুমি আমার জন্যে যা সয়েছ তার চেয়ে অনেক বেশী আমি সহ্য করতে প্রস্তুত। এ নতুন মহাদেশ বিরাট, বিশাল, সম্পূর্ণ অজানা। এখানে যদি আমরা স্বেচ্ছায় হারিয়ে যেতে চাই তাহলে সমুদ্রের বালির চড়ায় দুটো চিনির দানার মত কেউ আমাদের খুঁজে পাবে না কোনদিন। আমরা হারিয়েই যাবো সেই রকম। আজই সন্ধ্যায় তুমি তৈরী হয়ে আসবে। এখানে নয়।

বন্দরে যাবার নাম করে গাড়িটা সেখানে পাঠিয়ে তোমার জন্যে আমি এখানে নেমে দাঁড়িয়ে আছি। এখান দিয়েই বাজার থেকে তুমি ফেরো লক্ষ্য করেছি দুদিন। আজ তোমার বাজারে যাবার আগেই তাই আরো ভোরে এসে অপেক্ষা করছি এই ক'টা কথা বলব বলে। ভালো করে কথাগুলো শুনে নাও।

বন্দর থেকে নিকারাগুয়া-র নতুন উপনিবেশে কাল ভোরে একটা ব্রিগ্যান-টাইন যাচ্ছে। গভর্নরের গাড়ির কোচোয়ানকে বখশিস দিয়ে যেন আমাদের একজন অনুচরকে সস্ত্রীক সে জাহাজে পাঠাবার ব্যবস্থা ভাড়া দিয়ে করিয়ে রেখেছি। নিকারাগুয়া থেকে কোস্টা-রিকা কি ভেরাগুয়া যেখানে খুশি আমরা গিয়ে বাসা বাঁধতে পারব। কেউ আমাদের বাধা দিতে পারবে না।

আজ দুপুরে মার্কুইস গভর্নরের সঙ্গে শিকারে যাচ্ছে। আমার ওপর এর মধ্যেই তার সন্দেহ হয়েছে কিন্তু সন্দেহ যতই হোক আমার সব কিছু বিসর্জন দিয়ে এ অকূলে ঝাঁপ দেওয়ার কথা তার মত মানুষ ভাবতেই পারবে না। তাই আজ সটান আমাদের অতিথিশালায় তুমি আসবে সন্ধ্যার পর। তোমার আমার সব ব্যবস্থা আমি করে রাখব। যাও, আর এখানে দাঁড়িয়ে কথা বলতে সাহস হয় না। শুধু কথা দিয়ে যাও সন্ধ্যায় ঠিক আসবে!

ঘনরামের চোখের দৃষ্টি কেমন অতল হয়ে উঠেছিল। শান্ত গম্ভীর স্বরে

বলেছিলেন,—এতবড় সৌভাগ্য আমি পায়ে ঠেলতে পারি'

তাহলে এখনই গিয়ে তৈরী হও। গাঢ় স্বরে বলেছিল মার্শনেস,—সারাজীবনের পাওয়ার আশা না থাকলে এতদিন বাদে এইটুকু পেয়ে নিজেই তোমায় ঠেলে সরিয়ে দিতে পারতাম না।

আর কিছু না বলে ঘনরাম বাজারের দিকেই চলে গিয়েছিলেন।

মার্কুইস গঞ্জালেস সোলিস কিছুক্ষণ বাদে ঘোড়ায় চেপে এসে স্ত্রীকে এইখানেই পেয়ে কি বলেছিলেন আমরা জানি।

মার্কুইস আর যাই বুঝে ফেলে থাকুন, মার্শনেস যে বাজারে এক কশাই-এর দোকানে চাকতে একবার ঘনরামকে দেখবার পর থেকে তার গতিবিধির অতখানি খবর নিয়ে তার সঙ্গে সত্যি সত্যিই দেখা করতে সাহস করেছে আর দেখা হওয়ার আগেই অত বড় একটা দুঃসাহসিক ফন্দি সফল করবার নিখুঁত ব্যবস্থা করে ফেলেছে, এতখানি কল্পনা করতেও পারেন নি।

নিশ্চিন্তভাবেই গভর্নর পেড্রারিয়াসের সঙ্গে নতুন মহাদেশের যা কুমীর সেই কেম্যান শিকারে বেরিয়ে গেছেন।

তার মানে!—ঘনশ্যাম দাস একটু দম নেবার জন্যে থামতেই জিজ্ঞাসা করেছেন মেদভারে বিপুল ভবতারণবাবু,—ঘনরাম ওই নিকারাগুয়ায় যাবার জাহাজে ওই মার্শনেস-এর সঙ্গেই পালিয়ে যান বলে পানামায় আর তাঁর পাত্তা পাওয়া যায় না!

এইটুকু আর বুঝতে পারেন নি!—কুম্ভের মত উদরদেশ যাঁর স্ফীত সেই রামশরণবাবু বিস্ময় প্রকাশ করলেন ভবতারণবাবুর সরলতায়,—ঘনরাম নিজেই কি বলেছিলেন, মনে নেই? এত বড় সৌভাগ্য কি আমি পায়ে ঠেলতে পারি।

হ্যাঁ ঠিক ঠিক! ভোজনবিলাসী রামশরণবাবুর বিচক্ষণতা স্বীকার করে বেশ একটু গর্বভরে বলেছেন,—আমি কিন্তু ওই ছুঁড়িটা কে বুঝে ফেলেছি!

ভাষা! ভাষা সামলান, ভবতারণবাবু! শিবপদবাবু সাবধান করেছেন,—কাকে কি বলছেন! উনি মার্শনেস সে খেয়াল আছে! মার্শনেস কি মার্কুইস-এর মর্যাদা কত ধাপ ওপরে তা জানেন কিছু? আর্ল আর ডিউকের মাঝামাঝি।

তার মানে পদ্মভূষণ গোছের! সরল-ভাবে বলেছেন যাঁর উদরদেশ কুম্ভকে লজ্জা দেয় সেই রামশরণবাবু,—ওই পদ্মশ্রী আর পদ্মবিভূষণের মাঝখানে।

না, না ওসব শূন্যলোকের ত্রিশঙ্কু গোছের কিছু নয়। শিবপদবাবু ব্যাখ্যা করে বোঝাবার এ সুযোগ ছাড়েন নি,—তখনকার দিনে বেশ শাঁসালো না হলে ওই আর্ল, মার্কুইস, ডিউক আর মার্শনেস ড্যাচেস কেউ হত না। বনেদী বড় ঘর বড় ঘরোয়ানা, অগাধ বিষয়সম্পত্তি, নিদেনপক্ষে দেশের মানে সম্রাটের জন্যে দারুণ কোনো কীর্তির জন্যেই এ সম্মান সম্রাট অনুগ্রহ করে বিতরণ করতেন।

মার্কুইস গঞ্জালেস দে সোলিস এইরকম একটা মস্ত কেউ না হলে ওই বয়সে ও খেতাব পেতেন না। বয়স ত যা শুনলাম তাতে খুব বেশী মনে হচ্ছে না। তবে হ্যাঁ পৈতৃক খেতাব হতে পারে!

দাসমশাই নীরবে ঈষৎ হাস্যকুঞ্চিত মুখে সভাসদদের আলোচনা শুনছিলেন, এবার নিজের টীকা যোগ করে বলেছেন,—না, পৈতৃক নয়, স্বোপার্জিত খেতাব। স্বয়ং সম্রাট পঞ্চম চার্লসের কাছেই পাওয়া। তাও স্পেনে নয় ইটালীতে। সম্রাট নিজের দেশ স্পেনের চেয়ে যেখানে থাকাটা বেশী পছন্দ করতেন আর একটু ফাঁক পেলেই হুট্ করে গিয়ে হাজির হতেন। সম্রাটের মেজাজ মর্জি তখন একটু বেশী খুশি ছিল। পাভিয়ার যুদ্ধে তাঁর জন্মশত্রু ফ্রান্সের রাজাকে শুধু হারান নি, বন্দী পর্যন্ত করেছেন। সেই সঙ্গে জার্মানীর সিংহাসনও তাঁর অধিকারে এসেছে। অনেকেরই ধারণা সম্রাটকে এই দিলদরিয়া মেজাজে ইটালীতে গিয়ে ধরার কৌশলেই গঞ্জালেস আর্লগিরি ডিঙিয়ে একেবারে মার্কুইস হয়ে ওঠেন। শুধু যে সম্রাট নিজে খোশমেজাজে ছিলেন তা নয়, তাঁর সাঙ্গপাঙ্গদের মধ্যে বিজ্ঞ বিচক্ষণ মন্ত্রী বা সভাসদদের কেউও ছিলেন না। হাতের কাছে উল্টে দেখবার মত দপ্তরের কাগজপত্র নেই, তার ওপর খাইয়ে দাইয়ে তোয়াজ করে বশ-করা সম্রাটের খোশামুদে মোসায়েবদের সুপারিশে সম্রাট ঝোঁকের মাথায় উদার হয়ে দরাজ হাতে অতবড় খেতাবটা দিয়ে ফেলেছেন। সত্যি কথা বলতে গেলে নতুন মহাদেশ সম্বন্ধে তখন বিশেষ কিছুই তিনি খবর রাখেন না, রাখার প্রয়োজনও বোধ করেননি।

অত হাঁকডাক সত্ত্বেও নতুন মহাদেশ থেকে যা এপর্যন্ত পেয়েছেন, আশাটা বড় বেশী ফাঁপানো ছিল বলেই তা আহামরি কিছু নয় বলে মনে হয়েছে। কোর্টেজ মেক্সিকো জয় করে যা পাঠাচ্ছেন, তাতে তবু নতুন মহাদেশের একটু যা মান বেঁচেছে। নইলে স্পেন ফ্রান্স জার্মানী আর ইতালীর অধিকার নিয়ে ইওরোপই তাঁর কাছে ঢের দামী। খানিকটা খোশ মেজাজে আর কিছুটা হেলায় ছেদ্দায় অনুগ্রহটা বাড়াবাড়ি হয়ে যাচ্ছে কিনা তিনি খেয়ালই করেননি। ভাবতেই পারেননি যে, একদিন তাঁর খেয়ালের ফলে কোথাকার জল কোথায় পর্যন্ত গড়াবে, আর তার কেলেঙ্কারী মুছে ফেলতে সরকারী মহাফেজখানার ঘাড়ে দুর্বো গজাবার অবস্থা হবে কতখানি।

কিন্তু ওই কি বলে,—মনের মত সম্বোধনটা কোনরকমে একেবারে জিভের ডগায় রুখে দিয়ে ভবতারণবাবু বলেছেন,—ওই মার্শনেস মেয়েটাকে কিছু বোঝা গেল না কিন্তু। যাই হোক সময়মত ঘনরামকে ঠেলে বিদেয় করে দিয়েছিল এই ভাগ্যি। নইলে ওই মার্কুইস গঞ্জালেস একবার হাতে পেলে জ্যান্ত ছাল ছাড়িয়ে নিত বলেই ত মনে হয়।

সত্যি জ্যান্ত ছাল ছাড়িয়ে নিতে চেয়েছিল কিন্তু মার্কুইস নয়, আরেকজন।—বলেছেন শ্রীঘনশ্যাম দাস,—আর মার্শনেস সাবধান করে না দিলেও ধরা দেবার জন্যে ঘনরাম ওখানে দাঁড়িয়ে থাকতেন না। কারণ মার্কুইস আর মার্শনেসকে এর আগেই দেখে তিনি চিনে রেখেছেন। মার্শনেস যেদিন বাজার দিয়ে গাড়ি চালিয়ে যেতে যেতে ঘনরামকে দেখেন, সেদিন অবশ্য নয়।

তখনও পর্যন্ত পানামার গভর্নরের মাননীয় অতিথি আসবার গুজব তিনি রাস্তায় বাজারে শুনেছেন মাত্র। বিদেশবিভুঁয়ে ছোট জায়গায় যেমন হয় মার্কুইস গঞ্জালেস দে সোলিস সম্বন্ধে অতিরঞ্জিত কিছু গল্পও তখন পানামায় চাউর হয়েছে। মস্ত নাকি তিনি বীর। ফ্রান্সের রাজার সঙ্গে যুদ্ধে, না কর্টেজের সঙ্গে মেক্সিকো অভিযানে অসাধারণ বীরত্ব দেখিয়ে সম্রাটকে একেবারে মুগ্ধ করে হঠাৎ এই খেতাব পেয়েছেন।

(ক্রমশঃ)

বিদেশে রবীন্দ্র-আলোচনা :
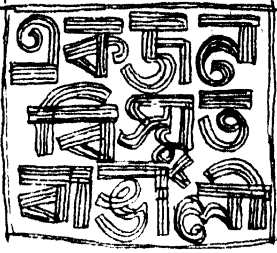
সুজিত মুখোপাধ্যায়

উনিশশো তের সালের নভেম্বর মাসে নোবেল পুরস্কার পেয়ে এক স্বল্পপরিচিত ভারতীয় কবি বিশ্বজোড়া বিস্ময় ও কৌতূহলের কারণ হয়ে দাঁড়ান। কিন্তু এই উল্লেখযোগ্য ঘটনার আগেই অন্তত তিনজন সাহিত্যিক ও সাহিত্যবোদ্ধা ইংলন্ড ও আমেরিকার পাঠকসমাজের সঙ্গে রবীন্দ্রনাথের পরিচয় ঘটাবার চেষ্টা করেছিলেন। এই তিনজনের মধ্যে ডব্লিউ, বি, ইয়েটস ও এজরা পাউণ্ডের নাম সুবিদিত, রবীন্দ্রনাথকে পাশ্চাত্য জগতের সামনে তুলে ধরার প্রায় সবটা কৃতিত্ব এ'দের দুজনকেই দেওয়া হয়। কিন্তু তৃতীয় ব্যক্তি একজন প্রবাসী বাঙালী, যাঁর নাম রবীন্দ্রসাহিত্য অনুরাগী সমাজেও এখন বিস্মৃতপ্রায়।

এজরা পাউণ্ড এবং ইয়েটসের মত সার্থক শিল্পীদের সঙ্গে এক প্রসঙ্গে স্বল্পখ্যাত প্রবাসী সাংবাদিক বসন্তকুমার রায়ের নাম করা অসংগত মনে হতে পারে। কিন্তু অন্তত মার্কিন দেশের পটভূমিকায় রবীন্দ্রনাথের খ্যাতির ইতিহাসে শ্রীযুক্ত রায়ের গুরুত্ব কিছু কম নয়। রবীন্দ্রনাথ সম্বন্ধে প্রবন্ধ লিখে, তাঁর লেখা অনুবাদ করে, তাঁর জীবনী রচনা করে, নানাভাবে শ্রীযুক্ত রায় কবির নাম যে যুগে আমেরিকার জনসাধারণের সামনে তুলে ধরেছিলেন তখনও রবীন্দ্রনাথ বিশ্ববিখ্যাত হননি। পরবর্তীকালে আমেরিকায় রবীন্দ্রনাথের খ্যাতির মূলে শ্রীযুক্ত রায়ের অবদানের পরিমাণ বা মূল্য নির্ধারণ করা দূরে থাক, আজ পর্যন্ত কোনো রবীন্দ্রোৎসাহী সমালোচক তাঁর জীবন সম্বন্ধেও কোনো তত্ত্বানুসন্ধান করেছেন বলে জানা যায় না। ১৯৪৯ সালের ৫ই জুন নিউইয়র্ক শহরে শ্রীযুক্ত রায়ের মৃত্যু হয়।

তিনি আমেরিকায় সাংবাদিকতা করে জীবিকা নির্বাহ করতেন, এ ছাড়া বসন্তকুমার রায়ের জীবন সম্বন্ধে বিশদভাবে কোনো তথ্য পাওয়া দুষ্কর। নিউইয়র্ক টাইমস-এর (৮ই জুন, ১৯৪৯) শোকসংবাদের বিজ্ঞপ্তি থেকে প্রকাশ যে উড়িষ্যায় এক ব্রাহ্মণবংশে তাঁর জন্ম। তিনি ১৯১০ সালে আমেরিকা গিয়ে উইসকনসিন বিশ্ববিদ্যালয় থেকে স্নাতক উপাধি লাভ করে সেখানেই শিক্ষকতা আরম্ভ করেন। পরে শিকাগো থেকে প্রকাশিত **Open Court** নামক পত্রিকাতে তিনি কিছুদিন "Current Thoughts in the Orient" শীর্ষক একটি বিভাগ পরিচালনা করেন। তৎকালীন Friends of Freedom for India আন্দোলনের সঙ্গে তাঁর ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ ছিল এবং অনেকদিন ধরে তিনি আমেরিকায় ভারতবর্ষের স্বাধীনতা সম্বন্ধে বিভিন্ন পত্রিকায় প্রবন্ধ প্রকাশ করেন।

সে যুগে রবীন্দ্রনাথের লেখা নিয়ে ইংলন্ড ও আমেরিকায় বেশ কিছু আলোচনা চলছিল—কিন্তু সেই সব টীকাকারদের মধ্যে একমাত্র বসন্তকুমার রায়ই মূল বাংলা ভাষায় রবীন্দ্রনাথের রচনার সঙ্গে পরিচিত ছিলেন। রবীন্দ্রনাথ যে জাতির জীবন ও সংস্কৃতির পটভূমিকায় তাঁর সাহিত্য সৃষ্টি করেন সেই দেশ ও জাতি সম্বন্ধে প্রত্যক্ষ জ্ঞানও শ্রীযুক্ত রায় ছাড়া অন্য কোনো সমালোচকের ছিল না। প্রথম থেকেই পাশ্চাত্য জগতে রবীন্দ্রনাথের আধ্যাত্মিক কবিরূপে খ্যাতি। কিন্তু বসন্তকুমার রায় বার বার রবীন্দ্রনাথের কবিতার অন্যান্য রূপ ইংরাজীভাষী পাঠককে মনে করিয়ে দেন। নিজে কবির দেশবাসী হওয়াতে এ বিষয়ে তাঁর ইয়েটস ও পাউণ্ডের চেয়ে অনেক বেশী সুবিধা ছিল, এবং তাঁর মতামতকে কিছুকাল বিদেশে যথেষ্ট মূল্য দেওয়া হয়। ১৯১৫ সালে রবীন্দ্রনাথ সম্বন্ধে তাঁর বই, **Rabindranath Tagore : The man and His poetry** নিউইয়র্ক থেকে প্রকাশিত হয়। প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই আর্নেস্ট রীহ্স (Ernest Rhys) এর লেখা রবীন্দ্রজীবনী লন্ডন থেকে প্রকাশিত হয়, **Rabindranath Tagore: A Biographical Study**। তখনকার সাময়িক পত্র-পত্রিকায় স্বভাবতঃই বইদুটির তুলনামূলক সমালোচনা হয়। লেখক রবীন্দ্রনাথের স্বজাতীয়, শুধুমাত্র এই কারণেই কোনো কোনো মার্কিন সমালোচক শ্রীযুক্ত রায়ের বইটিকে অধিক নির্ভরযোগ্য বলে বিচার করেন।

বিংশ শতাব্দীর প্রথম দিকে বাংলাদেশে অন্যান্য মননশীল যুবকের মত বসন্তকুমার রায়ও রবীন্দ্রনাথের দ্বারা নিশ্চয়ই প্রভাবান্বিত হয়েছিলেন। কিন্তু বিদেশ যাবার আগে রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে তাঁর ব্যক্তিগত সংযোগ ছিল কি না, এবং থাকলেও কতটা, তার প্রমাণ সহজে পাওয়া যায় না। তবে ১৯১৩ সালে আমেরিকায় কবির সঙ্গে তাঁর সাক্ষাৎকারের বিবরণ শ্রীযুক্ত রায় পূর্বোল্লিখিত বইটিতে দিয়েছেন। তখন রথীন্দ্রনাথ ঠাকুর ইলিনয় রাজ্যের আরবানা (Urbana Ill) শহরে কৃষি বিদ্যালয়ের ছাত্র। তাঁর আবাসে শ্রীযুক্ত রায় রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে দেখা করেন এবং রবীন্দ্রনাথের ইংরাজী অনুবাদের ভবিষ্যত সম্বন্ধে আলোচনা হয়।

এই সাক্ষাৎকারের অল্পদিনের মধ্যেই তিনি রবীন্দ্রনাথ সম্বন্ধে তাঁর প্রথম নিবন্ধ, "India's Greatest Living Poet" **Open Court** পত্রিকায় জুলাই ১৯১৩ সংখ্যায় প্রকাশিত হয়। ততদিনে হয়ত **The Gardener** নামক কবিতা সংগ্রহ আমেরিকান পাঠকের হাতে পৌঁছেছে, কারণ শ্রীযুক্ত রায় তাঁর নিবন্ধে রবীন্দ্রকাব্যের বিকাশ আলোচনা করে লিখেছেন যে রবীন্দ্রনাথ যৌবনে রোমান্টিক প্রেমমুগ্ধ কবি ছিলেন, কিন্তু ব্যক্তিগত জীবনে কিছু শোক ও দুর্ঘটনা ভোগের পর ব্যথা, বেদনা ও নিরাশার মধ্য দিয়ে অবশেষে ঈশ্বরপ্রেমের কবিরূপে উত্তীর্ণ হয়েছেন। শ্রীযুক্ত রায় আরো বলেন যে কবির স্বদেশে তাঁর পাঠকের সংখ্যা প্রচুর, কিন্তু তার চেয়েও ঢের বেশি-সংখ্যক লোক তাঁর গানের সঙ্গে পরিচিত।

রবীন্দ্রনাথের নোবেল পুরস্কার পাবার পর শ্রীযুক্ত রায়ও তাঁর বাংলা ভাষা জ্ঞানকে নানাপ্রকার উপায়ে প্রয়োগ করতে আরম্ভ করেন। অল্প সময়ের মধ্যেই তিনি অনেকগুলি সময়োপযোগী অনুবাদ প্রকাশে সফল হন। 'প্রবাসী'তে প্রকাশিত রবীন্দ্রনাথের ইয়েটস সম্বন্ধে বাংলা প্রবন্ধ শ্রীযুক্ত রায়ের দ্বারা অনূদিত হয়ে "A Hindu on the Celtic Spirit" নামে **Review of Reviews** (January, 1914)'এ প্রকাশিত হয়। রবীন্দ্রনাথের আরেকটি বাংলা প্রবন্ধ অনুবাদ করে তিনি "Oriental and Occidental Music" নাম দিয়ে **Harpiro Weekly** (April 11, 1914)-তে প্রকাশ করেন। "East and West" শীর্ষক একটি অনূদিত কবিতা **Independent** (October 2, 1916) পত্রিকায় ও "Bepin Babu, the victim of Jealousy" নামক একটি ছোটগল্পের অনুবাদ **Boston Post** (December 10, 1916)'এ প্রকাশিত হয়।

রবীন্দ্র-আলোচক হিসাবে শ্রীযুক্ত রায়ের বৃহত্তম প্রচেষ্টা রবীন্দ্রনাথের জীবনী যার উল্লেখ আগে করা হয়েছে। এই বইটি প্রধানত পূর্বে প্রকাশিত তিনটি প্রবন্ধের সমন্বয়। এই প্রবন্ধগুলির মধ্যে একটি বহুলাংশে 'জীবনস্মৃতি'র উপর ভিত্তি করে লেখা রচনা "The Personality of Tagore" (Yale Review, April 1914) দ্বিতীয় প্রবন্ধটির শীর্ষ "Tagore and His Model School at Bolpur" (Independent, August 3, 1913) — এতে শান্তিনিকেতনের উদ্দেশ্য ও দিনচর্যা সম্বন্ধে তথ্যবহুল বিবরণ আছে। তৃতীয়টির নাম "Tagore — An Oriental Estimate" (Bookman March 1915); এখানে তিনি রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে তাঁর পূর্বসূরীদের সম্বন্ধ নির্ধারণ করে ভারতীয় পরম্পরার মধ্যে কবিকে বিচার করার চেষ্টা করেছেন। এ ছাড়া এই গ্রন্থে শ্রীযুক্ত রায় আরো অনেক ঘটনা ও বহু কবিতার অনুবাদ অন্তর্ভূক্ত করেন।

মার্কিন সমালোচকরা অনেকেই এই বইটিকে প্রামাণ্য বলে মেনে নেন, কারণ গ্রন্থকার কবির স্বদেশবাসী। Independent পত্রিকা (June 14, 1915) শ্রীযুক্ত রায়ের লেখার মধ্যে সনাতন প্রাচ্যের দৃষ্টিভঙ্গী খুঁজে পান কিন্তু **Nation** পত্রিকা (June 17, 1915) মন্তব্য করেন যে জীবনীকার হিসাবে বসন্তকুমার রায় সুযোগ্য হতে পারেন, কিন্তু সাহিত্যসমালোচক হিসাবে তিনি নেহাৎই অপটু।

কেন্দ্রীয় শিক্ষামন্ত্রী ডঃ ত্রিগুণা সেন মহাজাতি সদনে নেতাজী ও রবীন্দ্রনাথের মর্মরমূর্তির আবরণ উন্মোচন করেছেন।

আশ্চর্যজনক দ্বি-চিন্তা

ভাষার প্রশ্নে দেশে, সরকারী ও বেসরকারী উভয় ক্ষেত্রেই, একটা আশ্চর্যজনক দ্বি-চিন্তা দেখা যাচ্ছে।

ইংরেজীকে সহযোগী সরকারী ভাষা হিসেবে বজায় রাখার প্রশ্নে যাঁরা সরমুখী হয়ে ওঠেন, তাঁরাই আবার ইংরেজীর বদলে আঞ্চলিক ভাষায় উচ্চশিক্ষা দেবার প্রস্তাবে উত্তেজিত।

এর মাঝখানে কেন্দ্রীয় সরকার বিচিত্র রকম দ্বিধাগ্রস্ত। উগ্র হিন্দীওয়ালাদের চাপে তাঁরা ইংরেজি বজায় রাখা সম্পর্কে পরলোকগত নেহরুর প্রতিশ্রুতিকে বিধিবদ্ধ রূপ দিতে দেরী করছেন, অন্যদিকে আঞ্চলিক ভাষাগুলিকে শিক্ষার মাধ্যম করার ব্যাপারে কোন সময়-সীমা বেঁধে দিতেও তাঁরা রাজী হচ্ছেন না।

এটা দেখা গেছে ভাষা সংক্রান্ত সাম্প্রতিক কয়েকটি প্রস্তাব ও আলোচনার মধ্যে। গত ১৮ আগস্ট কংগ্রেস পার্লামেন্টারী পার্টির বৈঠকে সদস্যগণ যদিও স্বীকার করেন যে, অহিন্দীভাষী এলাকায় হিন্দী জোর করে চাপিয়ে দেওয়া উচিত হবে না, তবু ইংরেজিকে সহযোগী ভাষা হিসেবে বজায় রাখার প্রশ্নে তীব্র মতবিরোধ দেখা দিয়েছিল। এই মতবিরোধের শিকার হয়েছিলেন কেন্দ্রীয় সরকার। এর ফল : সংসদের এবারের অধিবেশনও ইংরেজির মর্যাদা বিধিবদ্ধ করার জন্যে ভাষা বিল উত্থাপন করা হল না।

অন্য দিকে আঞ্চলিক ভাষাগুলিকে বিশ্ববিদ্যালয় স্তর পর্যন্ত শিক্ষার মাধ্যম করার প্রস্তাবটি যখন নীতিগতভাবে গৃহীত হয়ে গেছে, তখনও ইংরেজি বদলের জন্যে কোন সময়-সীমা বেঁধে দিতে তাঁরা চান না। সংসদের একটি প্রতিনিধি দলের কাছে গত ১৭ আগস্ট প্রধানমন্ত্রী শ্রীমতী গান্ধী পরিষ্কার এই কথাই বলেছেন। একই সঙ্গে তিনি অবশ্য একথাও বলেছেন যে, ইংরেজিকে 'চিরকালের জন্যে' শিক্ষার মাধ্যম হিসেবে রাখা সম্ভব নয়। তবু কত কালের জন্যে রাখা যেতে পারে সেটা তিনি বলতে রাজী নন।

উক্ত প্রতিনিধি দল প্রধানমন্ত্রীর কাছে গিয়েছিলেন এই আর্জি নিয়ে যে, শিক্ষা-ক্ষেত্রে ইংরেজিকে তার ন্যায্য আসন থেকে বঞ্চিত করতে পারে এমন কোন সংস্কার দ্রুত গ্রহণ করা উচিত নয়। তাঁদের বক্তব্য : ইংরেজি এখন ভারতে নিজস্ব শক্তিতেই কায়েম হয়েছে, তাছাড়া বিভিন্ন রাজ্যকে এই ভাষা এক সূত্রে গেঁথে রেখেছে। আর এই ভাষার মাধ্যমে ছাত্ররা বিভিন্ন বিষয়ে বিশেষ জ্ঞান লাভ করছে। সুতরাং অন্তত বিশ্ব-বিদ্যালয়ের পর্যায়ে ইংরেজির ক্ষেত্র অবারিত রাখা উচিত।

সরকারের এই দ্বি-চিন্তার ফলে শিক্ষা-ক্ষেত্রে একটা অনিশ্চয়তার সৃষ্টি হয়েছে। ইংরেজি সম্পর্কে কোন সুনির্দিষ্ট সিদ্ধান্ত গৃহীত না হওয়ায় দেশে ইংরেজির মান ক্রমশ অবনত হচ্ছে। আর আঞ্চলিক ভাষার ভবিষ্যৎ অনিশ্চিত রাখায় সাধারণভাবে এই ভাষাগুলির উন্নতি ব্যাহত হচ্ছে এবং পরি-বর্তনের জন্যে প্রয়োজনীয় সংস্কার সাধন ও পাঠ্যপুস্তক ইত্যাদি লেখার ব্যাপারেও কোন তাগিদ দেখা যাচ্ছে না। এদিকে সহযোগী সরকারী ভাষার প্রশ্নে ইংরেজি সম্পর্কে বিধিবদ্ধ আশ্বাস দিতে দেরী করায় হিন্দী ও অহিন্দীভাষী রাজ্যগুলির মধ্যে অবিশ্বাস ও বিরোধের মাত্রা বেড়েই চলেছে।

চীনের গৃহযুদ্ধ

লাল চীনে মাও সে-তুংয়ের সমর্থক ও বিরোধীদের মধ্যে যে গৃহযুদ্ধ চলছে, মাও-বিরোধী সৈন্যদল ক্যান্টনের বিমান বন্দরটি দখল করে নিলে তা একটা চরম আকার ধারণ করে। ক্যান্টনে দু' পক্ষের মধ্যে প্রচন্ড লড়াই চলছে।

এই বিদ্রোহ দমন করবার জন্যে প্রতি-রক্ষা মন্ত্রী মার্শাল লিন পিয়াও দু' দল সৈন্যকে ক্যান্টনে পাঠিয়েছেন। উভয় পক্ষে বিপুল সংখ্যক হতাহতের খবর পাওয়া গিয়েছে।

লড়াই পরে কোয়াংটুং প্রদেশের অন্যত্রও ছড়িয়ে পড়ে। পিকিংয়ের উদ্বিগ্ন কর্তৃপক্ষ হাংগামার মোকাবিলা করার জন্যে হাজার হাজার সৈন্য কোয়াংটুং প্রদেশে পাঠাচ্ছেন। কিন্তু তাতেও কোন লাভ হয় নি। প্রাধান্য

এখনো মাও-বিরোধীদের হাতেই রয়েছে। এত দূর রয়েছে যে, চীনা প্রধানমন্ত্রী মিঃ চৌ এন-লাইকে দু'পক্ষের মধ্যে একটা আপোষের জন্যে চেষ্টা করতে হয়েছিল। তাঁর সে চেষ্টা ব্যর্থ হয়েছে।

সর্বশেষ খবরে জানা যায়, ক্যান্টন ও কোয়াংটুং প্রদেশের অবস্থা আয়ত্তের সম্পূর্ণ বাইরে। বিদ্রোহ কিভাবে শেষ হবে সেটা বলা মুস্কিল। কিন্তু একথা ঠিক যে, বিদ্রোহীরা মাও সে-তুংয়ের ক্ষমতার দুর্গে একটা প্রচণ্ড আঘাত হানতে সক্ষম হয়েছেন।

ক্যান্টনে বিদ্রোহ যেরকম প্রচণ্ডতা লাভ করেছে তা থেকে দুটি জিনিস প্রমাণিত হয় : এক, বিদ্রোহীরা এখন আগের চাইতে অনেক বেশী সঙ্ঘবদ্ধ ও শক্তিশালী, এবং দুই, মাও-পন্থীদের পক্ষে পরিস্থিতির ওপর কর্তৃত্ব রাখা ক্রমশ কঠিন হয়ে পড়ছে।

চীনে ক্ষমতার লড়াইয়ের চূড়ান্ত ফয়সালার ওপর এই দুটি বিষয়ের প্রভাব নিশ্চয়ই পড়বে।

চিনি বিনিয়ন্ত্রণ

শতকরা ৬০

কিছুকাল যাবৎ ভারতবর্ষের চিনির কলওয়ালাদের পক্ষ থেকে দাবী উঠছিল যে, চিনির উপর সরকারী নিয়ন্ত্রণ তুলে দেওয়া হোক। তাঁদের যুক্তি ছিল যে, আখের ফলন কম হওয়ায় ও দর বেড়ে যাওয়ায় এবং চিনির দর সরকারীভাবে বাঁধা থাকলেও গুড় ও খন্ডসারির দর বাঁধা না থাকায় চিনির কলওয়ালারা প্রয়োজনমত আখ পাচ্ছেন না, যাঁরা গুড় ও খন্ডসারি তৈরী করেন তাঁরা অপেক্ষাকৃত ভাল দর দিয়ে বাজার থেকে আখ টেনে নিচ্ছেন।

ভারতবর্ষের চিনিশিল্পে যে সংকট দেখা দিয়েছে এবং এই সংকট নিরসনের জন্য যে কিছু করা দরকার সেটা স্পষ্ট হয়ে উঠছিল। চিনির উৎপাদন ক্রমশঃ কমে যাচ্ছিল, চড়া দামের জন্য বিদেশের বাজারে প্রতিযোগিতায় এঁটে উঠতে না পেরে ভারতীয় চিনির রপ্তানী বাণিজ্য মার খাচ্ছিল। কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে এটাও বোঝা যাচ্ছিল যে, চিনির মূল্য ও বন্টনের উপর সরকারী নিয়ন্ত্রণ তুলে দিলে এক সংকটের বদলে আর এক সংকট দেখা দিতে পারে—অর্থাৎ চিনির দাম অত্যধিক বেড়ে গিয়ে আয়ত্তের বাইরে চলে যেতে পারে।

দুই দিক বিবেচনা করে ভারত সরকার চিনির আংশিক বিনিয়ন্ত্রণের সিদ্ধান্ত করেছেন। গত ১৬ আগষ্ট রাজ্যসভায় খাদ্যমন্ত্রী শ্রীজগজীবন রাম যে ঘোষণা করেছেন তাতে, প্রকৃতপক্ষে, পাশাপাশি দুটি পৃথক চিনির বাজার রাখার ব্যবস্থা করা হল। নিয়ন্ত্রিত বাজারে সরকার চিনির দাম বেঁধে দেবেন, সেই বাঁধা দামে লেভি করে চিনি কলগুলির উৎপাদনের একটা অংশ নিজেরা খরিদ করে নেবেন এবং বাঁধা দামে সরবরাহ করে ঘরসংসারের জন্য প্রয়োজনীয় চিনির চাহিদা পূরণ করবেন। উৎপাদনের অবশিষ্ট অংশের উপর সরকারী নিয়ন্ত্রণ থাকবে না, ব্যবসায়িক প্রয়োজনে যাঁরা চাইবেন তাঁরা এই নিয়ন্ত্রণ-মুক্ত চিনি মিলের নির্ধারিত দামে কিনতে পারবেন।

আরও বিশদভাবে বলতে গেলে চিনি সম্পর্কে এই নূতন সরকারী নীতির নির্দেশগুলি হচ্ছে—(১) আখের ন্যূনতম দাম বাড়িয়ে ২ টাকা ১২ পয়সার স্থলে ২ টাকা ৭৫ পয়সা করা হবে। (২) চিনির উৎপাদন শুল্ক কুইণ্টল পিছু ৮ টাকা ৩৫ পয়সা কমিয়ে দেওয়া হবে। (৩) গত ১৯৬৬ সালের ১লা অকটোবর থেকে আগামী ১৯৬৭ সালের ৩০শে সেপ্টেম্বর পর্যন্ত চিনি কলগুলিতে যে পরিমাণ চিনি উৎপন্ন হবে তার শতকরা ৬০ ভাগের সম-পরিমাণ চিনি গবর্নমেন্ট কলগুলির আগামী ১৯৬৭ সালের ১লা অকটোবর থেকে ১৯৬৮ সালের ৩০শে সেপ্টেম্বর পর্যন্ত এক বৎসরের উৎপাদন থেকে লেভির দ্বারা সংগ্রহ করবেন এবং তার জন্য একটা নির্দিষ্ট হারে মূল্য দেবেন।

আর কত কাল রইবো বসে

চাল আনতে দিল্লী গেছে!

জাপানের পররাষ্ট্র মন্ত্রী মিঃ তাকেও মিকি ১৬ই আগষ্ট টোকিওর ইম্পিরিয়েল হোটেলে এক ভোজসভার আয়োজন করেন। এর আগে তিনি ও, ভারতের উপ-প্রধানমন্ত্রী শ্রীমোরারজী দেশাই (ডানে) পরস্পরের স্বাস্থ্য কামনা করছেন।

(৪) আখের যে নিম্নতম মূল্য ধার্য করা হবে তার ভিত্তিতে এবং চিনির উৎপাদন শুল্কে যে ছাড় দেওয়া হবে সেটা গণনা করে চিনির লেভি মূল্য স্থির করা হবে। (৫) লেভির বাইরের চিনি ভারতবর্ষের যে কোন জায়গায় খোলা বাজারে বিক্রী করা চলবে। (৬) যে সব কারখানায় ১৯৬৬ সালের ১লা অক্টোবর থেকে ১৯৬৭ সালের ৩০শে সেপ্টেম্বরের মধ্যে উৎপন্ন চিনির ৮০ শতাংশের বেশী চিনি আগামী মরশুমে (অর্থাৎ ১৯৬৭ সালের ১লা অক্টোবর থেকে ১৯৬৮ সালের ৩০শে সেপ্টেম্বরের মধ্যে) উৎপন্ন হবে তাদের ঐ অতিরিক্ত উৎপাদনের উপর উৎপাদন শুল্কের অর্ধেক ছাড় দেওয়া হবে। (৭) চিনির রপ্তানী, বিশেষ করে যে সব অঞ্চল থেকে ভাল দাম পাওয়া যায় সে সব অঞ্চলে রপ্তানী বজায় রাখার চেষ্টা করা হবে।

এই নূতন আংশিক বিনিয়ন্ত্রণের সমর্থনে কেন্দ্রীয় খাদ্যমন্ত্রী বলেছেন যে, চিনির উৎপাদন যে "মারাত্মকভাবে" হ্রাস পাচ্ছে সেটা রোধ করা এবং সঙ্গে সঙ্গে চিনি ব্যবহারকারীদের স্বার্থরক্ষা করাই এই নীতির উদ্দেশ্য।

কিন্তু শ্রীজগজীবন রাম রাজ্যসভায় এই নীতি ঘোষণা করার সঙ্গে সঙ্গেই প্রশ্ন উঠেছে, চিনির বন্টনের উপর নিয়ন্ত্রণ কতকটা ছেড়ে দেওয়ার পর সরকার এর বাজার দাম আয়ত্তে রাখতে পারবেন কিনা।

শ্রীরাম অবশ্য আশ্বাস দিয়েছেন যে, খোলাবাজারে যে চিনি পাওয়া যাবে তার দাম "সামান্য" বাড়লেও সরকার গৃহস্থদের যে চিনি যোগাবেন সেটা এখনকার দামেই বা "অল্প কিছু বেশী" দামে দেওয়া হবে। শ্রীরাম এই ভরসা দিচ্ছেন দুটি বিষয় বিবেচনা করেঃ—(১) ১৯৬৬-৬৭ সালের মরশুমে চিনি কলগুলির উৎপাদনের পরিমাণ ২২ লক্ষ মেট্রিক টনে দাঁড়াবে বলে অনুমান করা হচ্ছে। নূতন নীতি চালু হওয়ার পরও এই উৎপাদনের ৬০ শতাংশ অর্থাৎ ১৩ লক্ষ ২০ হাজার মেট্রিক টন চিনি লেভির মারফৎ সরকারের হাতে আসবে এবং সেটা এখনকার মতই নিয়ন্ত্রিত দামে বন্টন করা হবে। (২) যদিও আখের নিম্নতম দাম বাড়িয়ে দেওয়ার ফলে চিনি কলগুলির পড়তা খরচ কতকটা চড়বে তবু অন্যদিকে উৎপাদন শুল্ক কমিয়ে দেওয়ায় সেই বাড়তি খরচ পুষিয়ে যাবে।

কিন্তু, স্পষ্টতঃই খাদ্যমন্ত্রীর এই আশ্বাস সকলকে সন্তুষ্ট করতে পারে নি। রাজ্যসভায় কংগ্রেস ও বিরোধী পক্ষ থেকে প্রায় সমস্বরেই বলা হয়েছে, খাদ্যমন্ত্রী চিনি কলওয়ালাদের কাছে নতিস্বীকার করে চিনি ব্যবহারকারীদের স্বার্থ বলি দিয়েছেন।

মহারাষ্ট্র সমবায় চিনিকল ফেডারেশনের ম্যানেজিং ডিরেক্টর শ্রীএস এন আচার্য অবশ্য বলেছেন যে, উৎপাদন শুল্ক কুইন্টল পিছু ৮ টাকা ৩৫ পয়সা কমিয়ে দেওয়ায় নিয়ন্ত্রিত মূল্য ঠিক রাখা যাবে।

কিন্তু অন্ততঃ খোলা বাজারে চিনির দাম যে বাড়বে এটা প্রায় অবধারিত। কেননা, চিনি কলগুলিকে চাহিদামত আখ সংগ্রহ করতে হলে এবং এই ব্যাপারে গুড় ও খণ্ডসারি শিল্পের সঙ্গে পাল্লা দিতে হলে আখের জন্য নির্ধারিত নিম্নতম মূল্যের চেয়ে অনেক বেশী দাম দিতে হবে। অথচ, যেহেতু আখের নিম্নতম মূল্যের ভিত্তিতে সরকারী নিয়ন্ত্রিত মূল্য স্থির করা হবে এবং এই মূল্যে সরকারকে লেভি দিতে হবে সেহেতু এই বাবদ চিনির কলগুলিকে যে লোকসান দিতে হবে সেই লোকসান নিয়ন্ত্রণমুক্ত চিনির দামের উপর দিয়ে পুষিয়ে নিতে হবে। ১৯৬৬-৬৭ সালের মরশুমে উৎপন্ন চিনির শতকরা ৮০ ভাগের অতিরিক্ত পরিমাণ চিনি কোন কলে উৎপন্ন হলে সেই অতিরিক্ত উৎপাদনের উপর উৎপাদন শুল্কের অর্ধেক ছাড় দেওয়া হবে বলে যে সুবিধা ঘোষণা করা হয়েছে সেই সুবিধা কোন কাজে লাগবে কিনা সন্দেহ। কারণ, শ্রীরাম নিজেই যে হিসাব দিয়েছেন তাতে দেখা যাচ্ছে, এইবারকার মরশুমে যেখানে ২২ লক্ষ মেট্রিক টন চিনি উৎপন্ন হয়েছে সে স্থলে আগামী মরশুমে ১৭ লক্ষ মেট্রিক টন অর্থাৎ এই মরশুমের ৮০ শতাংশের সামান্য বেশী চিনি উৎপন্ন হবে।

এই আংশিক বিনিয়ন্ত্রণের ফলে চিনির উৎপাদন বাড়বে, এই আশা সম্পর্কেও প্রশ্ন উঠছে। প্রথমতঃ, আখের নিম্নতম মূল্য বাড়িয়ে দেওয়ার ফলে উৎসাহিত হয়ে চাষীরা আখের চাষ বাড়িয়ে দেবেন, তার আর সময় নেই। দ্বিতীয়তঃ, ভারতীয় চিনি কল সমিতির প্রাক্তন সভাপতি শ্রীএম আর শেরওয়ানি বলেছেন যে, আখের দাম মণ প্রতি কম করে চার টাকা না দিলে চিনি কলগুলির পক্ষে আখ সংগ্রহ করা সম্ভব হবে না। ভারতীয় চিনি কল সমিতির উত্তর প্রদেশ শাখার সভাপতি শ্রীভি এইচ ডালমিয়া বলেছেন যে, আখ সংগ্রহ করতে হলে চিনির কলগুলিকে মণকরা চার টাকা থেকে ৪॥ টাকা দাম দিতে হবে।

এর আগে ১৯৫০-৫১ এবং ১৯৫১-৫২ সালে চিনির উপর নিয়ন্ত্রণ এইভাবে অংশতঃ তুলে নেওয়া হয়েছিল এবং চিনির বাজারের অবস্থার উন্নতি হওয়ায় ১৯৫২-৫৩ সালে চিনির নিয়ন্ত্রণ কার্যতঃ তুলে নেওয়া হয়েছিল। কিন্তু সেই উন্নতি স্থায়ী হয় নি।

বিজ্ঞানের কথা

শুভংকর

স্মৃতিবিভ্রংশ ও তার কারণ

আকস্মিক দুর্ঘটনায় মাথায় প্রচণ্ড আঘাত লাগলে আমাদের স্মৃতিশক্তি সংগে সংগে লোপ পায়। দুর্ঘটনার কয়েক মুহূর্ত আগে যেসব ঘটনা ঘটেছিল তার স্মৃতি আমরা অধিকাংশ ক্ষেত্রে ভুলে যাই। এর কারণ কি? আমরা যেসব জিনিস দেখি, শুনি যা করি তার স্মৃতি আমাদের মস্তিষ্কে জমা হয়। তাই যেসব ঘটনার স্মৃতি যথাযথভাবে মস্তিষ্কে জমা হতে পারেনি, মাথায় আঘাত লাগলে তার স্মৃতিই সহজে লোপ পায়।

স্মৃতিশক্তির প্রকৃতি সম্পর্কে দুটি তত্ত্ব প্রধানত প্রচলিত। একটি তত্ত্ব হল, যখন আমরা কোনো কিছু শিখি, তখন আমাদের মস্তিষ্কে কয়েকটি স্নায়ুকোষের মধ্যে নতুন এক ধরণের বৈদ্যুতিক প্রবাহের বর্তনী রচিত হয়। পরবর্তীকালে যখন মস্তিষ্কের সেই অংশে কোনো উদ্দীপনা প্রেরিত হয়, তখন তা সেই কোষগুচ্ছের মধ্যে একটি বর্তনী সঞ্চার করে। অপর তত্ত্ব হল, যখন আমরা কোনো কিছু আয়ত্ত করি, তখন মস্তিষ্কে যে পরিবর্তন ঘটে তা প্রত্যেকটি স্নায়ুকোষের মধ্যেই ঘটে থাকে। অর্থাৎ এই দ্বিতীয় তত্ত্ব অনুযায়ী স্নায়ুগুচ্ছের বর্তনীর মধ্যে কোনো পরিবর্তন ঘটে না।

সম্প্রতি ব্রিটিশ রোগতত্ত্ববিদ ডঃ কেন্ডাল ডিক্‌সন স্মৃতিশক্তির প্রকৃতি সম্পর্কে একটি নতুন তত্ত্ব পেশ করেছেন। যার সাহায্যে স্মৃতিবিভ্রংশের ব্যাখ্যা দেওয়া যায়। মস্তিষ্কের প্রতিটি স্নায়ুকোষের মধ্যে একটি কেন্দ্রীয় নিউক্লিয়াস আছে, যার মধ্যে সৃষ্টি সূত্র (জেনেটিক কোড) গঠিত এবং যা কোষের পরিবর্তন নিয়ন্ত্রণ করে। প্রোটিন
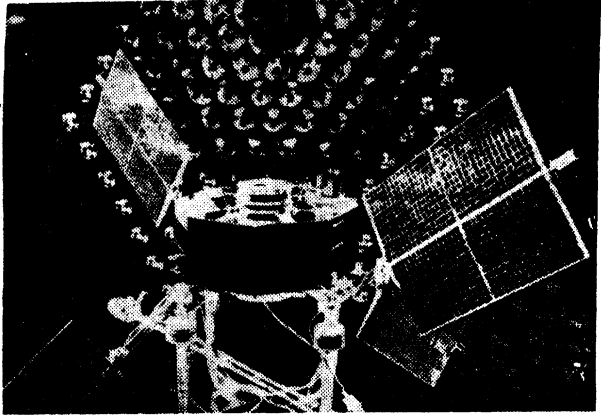
মহাজাগতিক ও ছায়াপথের শক্তি নিরূপনের জন্যে মহাশূন্যে প্রেরিত মহাকাশযান, সূর্যের দ্বারা এর কক্ষপথ নিয়ন্ত্রিত হয়।

সমন্বিত কেন্দ্রীনের চারধারে থাকে স্নেহপদার্থ গঠিত কোষঝিল্লী। ডিক্‌সনের তত্ত্ব অনুযায়ী, যখন কোনো বৈদ্যুতিক উত্তেজনা কোষঝিল্লীতে উপস্থিত হয়, তখন স্নেহপদার্থের স্তরেই প্রকৃতপক্ষে পরিবর্তন ঘটে। কারণ বৈদ্যুতিক আধারের পরিবর্তনে স্নেহপদার্থের গঠনই বিশেষভাবে প্রভাবান্বিত হয়। যখন এই পরিবর্তন ঘটে, তখন ঝিল্লীর অপরাংশের অর্থাৎ প্রোটিন অংশেরও পরিবর্তন সাধিত হয়। কারণ স্নেহপদার্থ ও প্রোটিন একে অন্যের ওপর নির্ভরশীল। স্নেহপদার্থে যখন পরিবর্তন ঘটে, তখন পরিবর্তিত অবস্থায় স্নেহপদার্থ আগেকার প্রোটিন অংশের সংগে খাপ খাইয়ে থাকতে পারে না। পূর্বেকার অংশীদারকে পরিহার করে তা নতুন এক প্রোটিন অংশের সংগে মিলিত হয়। বিভিন্ন ধরণের প্রোটিনে কোষ পূর্ণ থাকে। নতুন স্নেহঅংশের সংগে যে প্রোটিন অংশই স্বাভাবিকভাবে পরিবর্তিত স্নেহ-অংশের প্রতি আকৃষ্ট হয়।

নতুন তত্ত্বের মূল কথা হচ্ছে কোষে একটা 'প্রোটিন-বিচ্ছেদ' ঘটে। সৃষ্টি সূত্রের যে অংশ নির্দিষ্ট প্রোটিনের সৃষ্টি মূলত নিয়ন্ত্রণ করে কোষে স্বাধীনভাবে ভাসমান প্রোটিনের উপস্থিতির দরুণ কাজ করতে পারে না। কারণ কোষে ভাসমান প্রোটিন আরও প্রোটিনের সৃষ্টি প্রতিরোধ করে। কিন্তু যেই একবার সেই প্রোটিন স্নেহাংশের প্রতি আকৃষ্ট হয়ে সরে যায়, তখন সেই নির্দিষ্ট প্রোটিনের সংশ্লেষণ ক্রিয়ার ধারার পরিবর্তন ঘটে। নতুন প্রোটিনের সৃষ্টি হয় এবং যখন এই নবসৃষ্ট প্রোটিন কোষ-ঝিল্লীতে পৌঁছয় তখন মূল প্রণালী বিপরীত ধারায় অনুসৃত হতে থাকে। নির্দিষ্ট বৈদ্যুতিক প্রবাহে সৃষ্ট প্রোটিনের সংগে মিলিত হবার এক অভিনব ধরণের স্নেহপদার্থের স্তরের ওপর নবসৃষ্ট প্রোটিন প্রভাব বিস্তার করে। এই ভাবে একটা চক্র রচিত হয়, যা নির্দিষ্ট বৈদ্যুতিক আধান গ্রহণের পক্ষে অনুকূল কোষ-ঝিল্লী নিরবচ্ছিন্নভাবে সৃষ্টি করে যায়। ডঃ ডিক্‌সনের মতে এটিই হচ্ছে স্মৃতিশক্তির ভৌত ভিত্তি।

নতুন ঝিল্লী গঠনের সময় এবং নতুন প্রোটিন সৃষ্টির জন্যে সৃষ্টসূত্র উত্তেজিত হবার আগে প্রচণ্ড আঘাতে মাথায় যদি আঘাত লাগে, তা হলে স্মৃতিশক্তি একেবারে লোপ পেতে পারে। কারণ তখন স্মৃতিশক্তি মস্তিষ্কে কোনো স্থায়ী রেখাপাত করতে পারেনি। কিন্তু একবার যখন সৃষ্টি-সূত্র যথেষ্ট উত্তেজিত হয়ে যায় তখন আঘাতে প্রণালীর কোনো পরিবর্তন ঘটে না এবং তার ফলে কোষ-ঝিল্লী অন্যান্য বার্তা অপেক্ষা একপ্রকার বার্তা সহজে গ্রহণ করে। অতি সাম্প্রতিক ঘটনা আমরা আঘাতের ফলে কেন ভুলে যাই—ডিক্‌সনের তত্ত্ব অনুযায়ী এই হল তার ব্যাখ্যা।

ডিক্‌সনের স্মৃতিতত্ত্বের একটি গুরুত্বপূর্ণ বৈশিষ্ট হচ্ছে এই যে, যখন আমরা কোনো কিছু শিখি তখন এই তত্ত্ব অনুযায়ী কোনো নতুন অণুর সৃষ্টি হয় না। এই প্রণালীর প্রথম অংশ হচ্ছে, কোষ-ঝিল্লীর স্নেহাংশ স্তরের একটি নতুন গঠন সৃষ্টি। এই স্নেহাংশ স্তর তার সম্পূরক হিসাবে কোষে ইতোমধ্যে বিদ্যমান কোনো প্রোটিনকে বেছে নেয় এবং এই নির্বাচন পর্বের প্রারম্ভিক ব্যবস্থা সৃষ্টি-সূত্রেই নিহিত থাকে। যেসব বৈদ্যুতিক উত্তেজনা মস্তিষ্কে এসে স্নেহাংশের ওপর তার ক্রিয়ার দ্বারা কোনো সম্পূরক প্রোটিন প্রস্তুত করতে অক্ষম তারা স্মৃতি, চিন্তা বা অনুভূতি কোনো কিছুই সৃষ্টি করতে পারে না। গণিত, সংগীত বা কবিপ্রতিভা যে কেবল

শিক্ষার মধ্য দিয়ে অর্জন করা যায় না, ডিকসনের মতে তার কারণই হল এই। এক দিক থেকে বলা যায়, প্রতিভা জিনিসটা মানুষের জন্ম থেকেই তার মস্তিষ্কের কোষে সুপ্ত হয়ে থাকে এবং উপযুক্ত মুহূর্তে অনুকূল প্রেরণার যাদুস্পর্শে তার বিকাশ ঘটে।

আগ্নেয়গিরি পর্যবেক্ষণের স্বয়ংক্রিয় ব্যবস্থা

স্মরণাতীতকাল থেকে আগ্নেয়গিরি মানুষের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছে। পম্পাই শহরের ওপর ভিসুভিয়াসের প্রলয়ঙ্কর অগ্ন্যুৎপাতের পর থেকে আগ্নেয়গিরির কার্যকলাপ পর্যবেক্ষণের জন্যে বিজ্ঞানীরা বিশেষ মনোনিবেশ করেছেন। কিন্তু এখনও আগ্নেয়গিরি সম্পর্কে অনেক কিছু জানার বাকী আছে। আগ্নেয়গিরির কিভাবে উৎপত্তি হয়? বিভিন্ন আগ্নেয়গিরির মধ্যে কোনো তারতম্য আছে কিনা? আগ্নেয়গিরির শক্তি কি মানুষের কোনো কাজে লাগানো যেতে পারে? এই ধরণের বহু সমস্যা সমাধানের চেষ্টা বিজ্ঞানীরা আজ করছেন।

এই বিষয়ে সোভিয়েত রাশিয়ার কামচাৎকা আগ্নেয়গিরি পর্যবেক্ষণের কাজ বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। এই কাজে আগ্নেয়গিরি গবেষণাকেন্দ্রের ভূপদার্থবিদ, চুম্বকতত্ত্ববিদ, ভূকম্পবিদ, ভূবিজ্ঞানী এবং রসায়নবিজ্ঞানীরা একযোগে হাত মিলিয়েছেন। আগ্নেয়গিরি সম্পর্কে বিশদ তথ্য সংগ্রহের জন্যে তাঁরা পর্বতের শিখরে আরোহণ করেছেন এবং তার গর্ভেও নেমেছেন। এই গবেষণার বিপজ্জনক অংশের কাজের ভার যন্ত্রের ওপর কি অর্পণ করা যায়? অগ্ন্যুদ্গার নথিভুক্ত ও নিয়ন্ত্রণ করার জন্যে আগ্নেয়গিরি জ্বালামুখে ও গর্ভে যন্ত্র স্থাপনের প্রস্তাব এই কেন্দ্রের বিজ্ঞানীরা করেছেন। বিশেষজ্ঞরা এক মৌলিক যন্ত্রব্যবস্থার পরিকল্পনা করেন। পরীক্ষাগারে পরীক্ষা-নিরীক্ষার পর এই সূক্ষ্ম যন্ত্র আগ্নেয়গিরির জ্বালামুখে স্থাপন করা হয়। তিন বছর ধরে এই যন্ত্রপাতির প্রস্তুতি ও সমাবেশ চলে। আগ্নেয়গিরির শ্বাসক্রিয়া'র তাপমাত্রা পরিমাপের জন্যে 'সেন্ডার' নামে একটি যন্ত্র জ্বালামুখের ভেতরে স্থাপন করা হয়। সেন্ডার সংগৃহীত তথ্য গ্রহণ করবে অপর একটি যন্ত্র সাংকেতিক ভাষায় নথিভুক্ত করে রাখে এবং 'অ্যান্টিনা'র সাহায্যে তা প্রচার করে। গবেষণাকেন্দ্রে রক্ষিত গ্রাহক-যন্ত্র সেই বার্তা গ্রহণ করে। এই ভাবে কামচাৎকার আগ্নেয়গিরির অগ্ন্যুদ্গার সম্পর্কে পূর্বাভাষ প্রচারের প্রথম স্বয়ংক্রিয় কেন্দ্র স্থাপিত হয়েছে। প্রতি দু ঘণ্টা অন্তর প্রেরক ও গ্রাহক যন্ত্র স্বয়ংক্রিয় ভাবে আগ্নেয়গিরি সম্পর্কিত তথ্য প্রচার ও গ্রহণ করে তার অবস্থা বিজ্ঞানীদের জানিয়ে দেয়। প্রয়োজন হলে গবেষণাকেন্দ্র থেকে সরাসরি ভাবে আগ্নেয়গিরির ওপর অবস্থিত স্বয়ংক্রিয় যন্ত্রব্যবস্থাকে চালু করে আগ্নেয়গিরির 'মেজাজ' সম্পর্কে ওয়াকিবহাল হওয়া যেতে পারে।

কামচাৎকায় অবস্থিত আগ্নেয়গিরি পর্যবেক্ষণের স্বয়ংক্রিয় কেন্দ্র—বিশ্বে সর্বপ্রথম।

গবেষণাগারের সালোক সংশ্লেষ প্রক্রিয়া সংগঠন

সালোক সংশ্লেষ প্রক্রিয়ার মাধ্যমে বৃক্ষ, লতাগুল্মাদি সূর্যকিরণ, বাতাস ও জল থেকে শক্তি আহরণ করে তাকে শর্করা, শ্বেতসার, স্নেহপদার্থ ও প্রোটিন ইত্যাদি তাদের প্রয়োজনীয় খাদ্যে রূপান্তরিত করে। সালোক সংশ্লেষ সংঘটিত হয় উদ্ভিদের দেহকোষের অভ্যন্তরস্থ ক্লোরোপ্লাস্টে। এই ক্লোরোপ্লাস্টের অন্যতম উপাদান হল ক্লোরোফিল, যার জন্যে উদ্ভিদের বর্ণ হয় সবুজ।

সাম্প্রতিক দুজন মার্কিন রসায়নবিজ্ঞানী ডঃ জন বাসহ্যাম এবং ডঃ আর জেনসেন গবেষণাগারে এত অল্পসময়ের মধ্যে সালোক-সংশ্লেষ প্রক্রিয়া সংগঠন করেছেন, যা একমাত্র হরিৎবর্ণ উদ্ভিদে প্রাকৃতিক প্রক্রিয়ার মাধ্যমে ছাড়া আর কখনও সম্ভব হয়নি। গবেষণাগারে এই প্রক্রিয়া সংঘটনে যে সময় লেগেছে তার চেয়ে ৬৫ শতাং[illegible] দ্রুততর সময়ে উদ্ভিদে এই প্রক্রিয়া সংঘটি[illegible] হয়। তবুও বিজ্ঞানীমহল এই কাজটি[illegible] বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ মনে করেন। কারণ এর মাধ্যমে হয়তো একদিন মানুষ সালোক সংশ্লেষ প্রক্রিয়াকে সম্পূর্ণরূপে আয়ত্তাধীন করতে পারবে।

এই গবেষণার ফলে সালোক সংশ্লেষ[illegible] অত্যন্ত জটিল প্রাকৃতিক প্রক্রিয়া সম্পর্কে মানুষের জ্ঞান বৃদ্ধিই সম্ভবপর হবে না, এর মাধ্যমে ভবিষ্যতে মানুষের অশেষ কল্যাণ হবার সম্ভাবনাও রয়েছে। উদাহরণস্বরূপ বলা হয়, সালোক সংশ্লেষ প্রক্রিয়া সুসংহত করতে পারলে তার মাধ্যমে অধিক পরিমাণ স্নেহজাতীয় পদার্থ ও প্রোটিনের সন্ধান হওয়া সম্ভব। আবার এর মাধ্যমে লতা-গুল্মকেও মানুষের খাদ্যোপযোগী করে তোলা যেতে পারে।
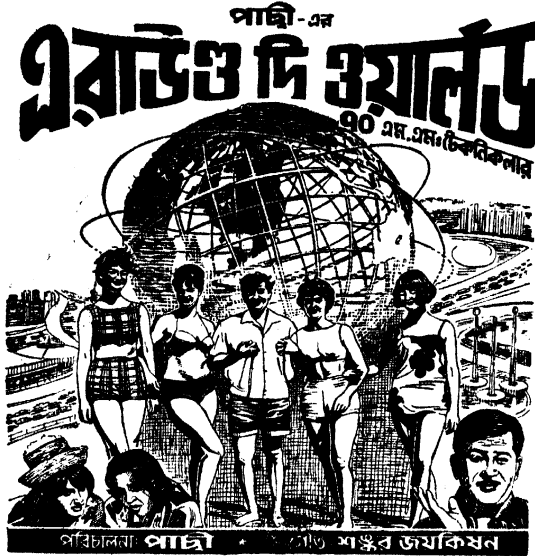
প্রেক্ষাগৃহে

চিত্র সমালোচনা :

মিস প্রিয়ংবদা (বাঙলা) : ইউনাইটেড টেক-নিসিয়ান্স-এর নিবেদন; ১২ রীলে সম্পূর্ণ। প্রযোজনা : পুরুষোত্তমদাস হালওয়াসিয়া প্রমুখ কয়েকজন; পরিচালনা : রবি বসু ও দুষ্মন্ত চৌধুরী; কাহিনী, চিত্রনাট্য ও সংলাপ : দুষ্মন্ত চৌধুরী; সঙ্গীত-পরিচালনা : সুবীর সেন এবং আহ্লাদ রহমান; গীতরচনা : শঙ্কর ভট্টাচার্য; চিত্র-গ্রহণ : সুবোধ বন্দ্যোপাধ্যায়; শব্দানুলেখন : সোমেন চট্টোপাধ্যায়, অনিল দাসগুপ্ত ও জে. ডি. ইরানী; সঙ্গীতানুলেখন ও শব্দ-পুনর্যোজনা : সত্যেন চট্টোপাধ্যায়; শিল্প-নির্দেশনা : গোপী সেন; সম্পাদনা : সুধীন্দ্র পাল; নেপথ্য কণ্ঠসঙ্গীত : মানবেন্দ্র মুখোপাধ্যায়, প্রতিমা বন্দ্যোপাধ্যায় এবং আরতি মুখোপাধ্যায়; রূপায়ণে : ভানু বন্দ্যোপাধ্যায়, হরিধন মুখোপাধ্যায়, তরুণ-কুমার, জহর রায়, অজিত চট্টোপাধ্যায়, নৃপতি চট্টোপাধ্যায়, শ্যাম লাহা, শীতল বন্দ্যোপাধ্যায়, দিবজু ভাওয়াল, প্রেমাংশু বসু, অমর বিশ্বাস, লিলি চক্রবর্তী দীপিকা দাস, শিখা ভট্টাচার্য, তপতী ঘোষ, রাজলক্ষ্মী প্রভৃতি। সুরঞ্জনার পরিবেশনায় গেল ১৮ই আগস্ট, শুক্রবার উত্তরা, পূরবী, উজ্জ্বলা এবং অন্যান্য চিত্রগৃহে মুক্তিলাভ করেছে।

"মিস প্রিয়ংবদা" একটি হাসির ছবি। এবং হাসির ছবির মধ্যে কোনো যুক্তি থাকে না, স্বাভাবিকতা অস্বাভাবিকতার বিচার থাকে না এবং সাধারণ গুরুগম্ভীর বা নাটকীয় কাহিনীচিত্রে যে-রকম সঙ্গতিপূর্ণ পরিস্থিতি ইত্যাদি একান্তভাবে আশা করা হয়, সে-সবও এতে অনুপস্থিত থাকে। হাসির ছবির গঠনকারীদের কর্মপদ্ধতি একটিমাত্র উদ্দেশ্য দ্বারা চালিত হয়ে থাকে এবং তা হচ্ছে দর্শকদের যেন-তেন-প্রকারে হাসানো। আলোচ্য "মিস প্রিয়ংবদা" ছবি-খানিও দর্শকদের হাসিয়েছে—বারে বারেই হাসিয়েছে এবং অনেক সময়ে বেদম হাসিয়েছে। নার্স মিস্ প্রিয়ংবদারূপী ভানু বন্দ্যোপাধ্যায়ের কাছে প্রৌঢ় পতিতপাবনবেশী হরিধন মুখোপাধ্যায় প্রেম নিবেদন করছেন এবং শেষ পর্যন্ত তাকে বিয়ে করে সুখী জীবনযাপন করবার আশায় নিজের ভাগ্নী ডলিকে তার প্রেমাস্পদ বিল্টুর সঙ্গে বিয়ে হতে দিতে রাজী হয়ে বাড়ীতে জোড়া বিয়ের ধুম লাগিয়ে দিলেন, এতে না হাসবে কে? কিন্তু এরই সঙ্গে আরও হাসির ফাউ যোগাবার জন্যে পাশের বাড়ীর মেয়ের প্রতি প্রেমের কয়েকটি দৃষ্টান্তের অবতারণ (হাফ-কবি বিগলিত বন্দ্যোপাধ্যায় এবং চাকর-ড্রাইভার-প্রাইভেট সেক্রেটারী ভোমলার লোভাতুর হওয়ার দৃশ্যাগুলি) এবং ডলিকে পতিতপাবনের মর্জি অনুযায়ী বিয়ে করতে বাধ্য করার জন্যে ধিনিকেষ্টকে আমদানী

অ্যার.উন্ড দি ওয়ার্ল্ড' চিত্রে রাজকুমার ও রাজশ্রী

করে কাহিনীকার ছবিটিকে যথার্থই 'উন্মত্ত প্রহসন'-এ পরিণত করেছেন। প্রথম থেকে শেষ, এই প্রহসন-চিত্রটি দেখে দর্শকরা উন্মত্ত হবেন, না উন্মত্ত দর্শকরাই এই প্রহসন-চিত্রটি দেখবেন কিংবা উন্মত্ত সংগঠ-কারীরাই এই প্রহসন-চিত্রটির জন্মদান করেছেন।

অভিনয়ের কথা বলতে গেলে বলতে হয়, হরিধন মুখোপাধ্যায়, ভানু বন্দ্যোপাধ্যায়, জহর রায়, অজিত চট্টোপাধ্যায়, তরুণকুমার, মিলি চক্রবর্তী, দীপিকা দাস, রাজলক্ষ্মী প্রভৃতি শিল্পী 'নজেদের নাটনৈপুণ্য গুণে বাঙলার চলচ্চিত্রজগতে সুপ্রতিষ্ঠিত। চিত্র-কাহিনী তাদের যখন যেটুকু সুযোগ দেয়, তার সদ্ব্যবহার করতে তাঁরা কোনোদিনই কসুর করেন না এবং এ-ছবিতেও করেননি। কাহিনীর বিন্যাস সুপরিকল্পিত হলে, হাস্যোদ্রেককারী পরিস্থিতিগুলি সুবিন্যস্ত হলে, সংলাপগুলি সুরচিত ও স্পষ্টভাবে রেকর্ড-করা হলে এবং শিল্পীদের প্রকাশিত ভাবভঙ্গীগুলি ঠিকভাবে চিত্রায়িত হলে এঁদের সমগ্র অভিনয়ে ছবি সার্থক হয়ে ওঠে। কিন্তু এর জন্যে প্রয়োজন চলচ্চিত্র সৃষ্টি সম্পর্কে ওয়াকিবহাল পরিচালকের। এই পরিচালনার কাজটাই বর্তমান ছবিতে সবচেয়ে দুর্বল মনে হয়, ছবিটিতে কোনো পরিচালকই নেই; অভিনেতারা যা-মন চেয়েছে, তাই করে গেছেন।

ছবির কলাকৌশলের বিভিন্ন বিভাগের মধ্যে চিত্রগ্রহণ আমাদের রীতিমত হতাশ করেছে। হাসির ছবি সাধারণত ঝকঝকে চকচকে হয়; এ-ছবি তার বিপরীত; ময়লা কালো ছোপ ছবির সারা অংগে। ছবির পরিচয়লিপিতেও (টাইটেল কার্ডে) কোনো একটি পরিকল্পিত রীতি অনুসৃত হয়নি। শব্দানুলেখনও নিখুঁত নয়; বহু সংলাপই শ্রুতিগ্রাহ্য হয়নি; অবশ্য এ-ব্যাপারে শিল্পীদের দায়িত্বও অনস্বীকার্য। দৃশ্য-সংস্থাপনার কাজটি কিন্তু মোটের ওপর সুন্দর। ছবিতে দুখানি গান আছে। 'আমি খুঁজে মরি যারে' গানটিতে সুরের অভিনবত্ব লক্ষণীয়। টাইটেল মিউজিক এবং গানের সঙ্গত-সংগীতকে মাঝে মাঝে থামিয়ে দেওয়ার মধ্যে যে-নতুনত্ব সৃষ্টির প্রয়াস করা হয়েছে, তা' ছবির ছন্দ ও রসকে ব্যাহতই করেছে।

ইউনাইটেড টেকনিসিয়ান্স-এর "মিস প্রিয়ংবদা" সর্বাংশে একটি ব্যর্থ ছবি।

—নান্দীকর

কলকাতা

'এরাউন্ড দি ওয়ার্ল্ড' চিত্রের শুভমুক্তি

প্রযোজক ও পরিচালক পাচুর টেকনিকলার ও ৭০ মিলিমিটারের 'এরাউন্ড দি ওয়ার্ল্ড' ছবিটি এ সপ্তাহের শুক্রবার অর্থাৎ ২৫ আগস্ট থেকে জ্যোতি, প্রিয়া, দর্পণা প্রভৃতি চিত্রগৃহে মুক্তিলাভ করছে। এটির বিশেষত্ব হল পৃথিবীর নানা স্থানে চিত্রায়িত ভারতের প্রথম ৭০ এম-এম-এ নির্মিত ছবি। তাছাড়া জনপ্রিয় রাজকাপুর এ-ছবির নায়ক। নায়িকার চরিত্রে রয়েছেন রাজশ্রী। শংকর-জয়কিষণ ছবিটির সুরকার

চলচ্চিত্রের মহরৎ

স্বাধীনতা দিবস উপলক্ষে গত ১৫ আগস্ট কয়েকটি বাংলা ছবির মহরৎ বিভিন্ন স্টুডিওয় অনুষ্ঠিত হল। এক এক করে নতুন ছবিগুলোর নাম বলছি।

শেষ থেকে শুরু

সত্য বন্দ্যোপাধ্যায় পরিচালিত ও অভিনীত ইংগিত শিল্পীগোষ্ঠীর 'শেষ থেকে শুরু' একটি জনপ্রিয় নাটক। নাটকটি ইদানিংকালে খুবই জনপ্রীতি লাভ করেছে। মূলত এটি হাসির নাটক। বর্তমানে এটি চলচ্চিত্রে রূপ নিচ্ছে। গত ১৫ আগস্ট ক্যালকাটা মুভিটোন স্টুডিওয় এ ছবির মহরৎ সাড়ম্বরে পালিত হল। মহরতের শুভ উদ্বোধন করেন উত্তমকুমার। ছবির প্রধান চরিত্রাবলীতে ইংগিত-এর শিল্পীবৃন্দ ছাড়াও সবিতাব্রত দত্ত ও ভানু বন্দ্যোপাধ্যায় অভিনয় করবেন। ছবিটির পরিচালনের দায়িত্ব নিয়েছেন চিত্রসাথী। সংগীত পরিচালনা করবেন অনিল বাগচী ও নচিকেতা ঘোষ। ছবিটির প্রযোজক সাহা চিত্রপীঠ।

'দুষ্মন্ত শকুন্তলার' শুভ মহরৎ

গত ১৯শে আগস্ট ইন্দ্রপুরী স্টুডিওয় মহাকবি কালিদাস রচিত অমর গীতিকাব্য 'দুষ্মন্ত শকুন্তলার' শুভমহরৎ অনুষ্ঠানের মাধ্যমে ছবির চিত্রগ্রহণ শুরু হয়। এ বি এম প্রোডাকসন্সের এই প্রেমোপাখ্যান এর প্রধান দুই চরিত্রে অভিনয় করছেন দুজন সর্বভারতীয় শিল্পী অভি ভট্টাচার্য ও অনিতা গুহ। বীরেন্দ্রকৃষ্ণ ভদ্র চিত্রনাট্যায়িত 'দুষ্মন্ত-শকুন্তলা'র চিত্রগ্রহণ ও পরিচালনার দায়িত্ব নিয়েছেন বিভূতি চক্রবর্তী। কালীপদ সেন সুরারোপিত চিত্রের কর্মাধ্যক্ষ সম্পাদনা, ব্যবস্থাপনা ও শিল্পনির্দেশে আছেন যথাক্রমে মোহন বিশ্বাস, অজিত দাস, অনিল সাহা ও সুনীল সরকার।

মাস্টার-দা

ভারতের স্বাধীনতাসংগ্রামের অন্যতম বিপ্লবী সূর্য সেনের জীবনী অবলম্বনে নির্মিত 'মাস্টার-দা' ছবিটির শুভ মহরৎ গত ১৫ অগাস্ট সংগীতগ্রহণের মাধ্যমে পালিত হয়। সংগীত পরিচালক হৃতু মুখোপাধ্যায়ের সুরারোপে কণ্ঠদান করেন ধনঞ্জয় ভট্টাচার্য এবং মাধুরী চট্টোপাধ্যায়। চিত্র-পরিচালনার ভার নিয়েছেন 'বিশ্বকর্মা' ছদ্মনামের অন্তরালে অভিজ্ঞ কলাকুশলীবৃন্দ

অন্ধ পৃথিবী

সুজাতা প্রোডাকসন্সের 'অন্ধ পৃথিবী' ছবির শুভ মহরৎ স্বাধীনতা দিবসে অনুষ্ঠিত হয়। সংগীত পরিচালনার দায়িত্ব নিয়েছেন মানবেন্দ্র মুখোপাধ্যায়। ছবিটি পরিচালনা করবেন চিত্ত বসু। চিত্রনাট্য রচনা করেছেন মণি বর্মা। ছবিটির পরিবেশনায় আছে অনুরাধা মুভীজ।

অশোককুমারের আত্মজীবনী

অশোককুমার বর্তমানে আত্মজীবনী লিখছেন। তাঁর দীর্ঘ তিরিশ বছরের অভিনেতা জীবনের বিচিত্র অভিজ্ঞতার কথা এতে স্থান পাবে। এই আত্মস্মৃতিচারণের মধ্যে ভারতীয় চলচ্চিত্রে একটা পূর্ণাঙ্গ ইতিহাসের সন্ধান পাওয়া যাবে। অশোককুমার এই মূল্যবান স্মৃতি-চারণ গ্রন্থে নবাগতদের কয়েকটি উপদেশ তাঁর অভিজ্ঞতা থেকে বর্ণনা করেছেন। নতুন অভিনেতা ও অভিনেত্রীর পক্ষে উপদেশগুলো খুবই মূল্যবান। তাঁর আত্ম-জীবনীতে সে দশটি উপদেশ স্থান পেয়েছে তা হল : (১) যে কোন চরিত্রই গ্রহণ কর না কেন, তা 'চ্যালেঞ্জ' হিসেবে নেবে, (২) নিজের অভিনয়ের সমালোচনা নিজেই করবে, (৩) প্রতিদিনের জীবনে যেসব চরিত্র তোমার চোখে পড়বে তা খুঁটিয়ে দেখ। তোমার অভিনীত চরিত্রের মধ্যে তাদের তুমি খুঁজে পাবে, (৪) ছবিতে নিজের ব্যক্তিত্ব এবং স্বাভাবিকতাকে ফুটিয়ে তুলতে চেষ্টা করবে, (৫) দলগত অভিনয়ের ওপর লক্ষ্য রেখে সহ-শিল্পীকে অভিনয়ে সাহায্য করবে। কারণ, প্রত্যেক শিল্পীর পরিপূর্ণতার মধ্যে সফলতা নির্ভর করে, (৬) চলচ্চিত্র শাখার সব বিভাগের কাজ

সম্পর্কে ধারণা থাকা দরকার, (৭) সর্বদা হাসিমুখে থাকবে। শিল্পী হতে হলে তোমাকে সুন্দর হতে হবে, ভালভাবে হাসতে হবে, (৮) সৎ ব্যবহারের ওপর সুসম্পর্ক গড়ে ওঠে। ভাল ব্যবহার করলে তোমার মর্যাদা বাড়বে, (৯) আত্মগরিমায় নিজেকে জড়িয়ে না ফেলে সর্বদা বিনয়ী হবে, (১০) জনসাধারণের মধ্যে নিজেকে বিলিয়ে দেবে না, কারণ বারবার যার দর্শন মেলে তার জনপ্রিয়তা কমে যায়।

উল্লিখিত গুণাবলী যাঁর মধ্যে আছে তিনিই আদর্শ শিল্পী। তিনিই মহান নায়ক।

সায়রা বানুর স্বামী-ভাগ্যে ধন

কথায় বলে স্ত্রী-ভাগ্যে ধন। কিন্তু সায়রা বানুর বেলায় ঠিক তার উল্টো। দিলীপকুমারকে বিয়ে করার পর সায়রার এখন স্বামী-ভাগ্যে ধন লাভ হয়েছে। ওর ভাগ্য এখন তুঙ্গে। প্রচুর ছবিতে ও কাজ করছে। দিলীপকুমারের সঙ্গে তো সায়রা অভিনয় করছেই, বরং অন্যান্য জনপ্রিয় নায়কের সঙ্গেও তার অনেক ছবির কাজ বর্তমানে চলেছে। সায়রা অভিনীত ছবিগুলোর নাম হল : 'দিওয়ানা' (নায়ক রাজকাপুর), 'ঝুক গয়া আশমান' (নায়ক রাজেন্দ্রকুমার), সাগিদ' (নায়ক জয় মুখার্জি) ও 'পড়োশান'।

নায়িকা রোমান্সের অবসান কি?

বর্তমানে নায়িকা-রোমান্সের তেমন গুঞ্জন বোম্বাই চিত্রজগতে শোনা যাচ্ছে কি? অথচ বছরখানেক আগেও বৈজয়ন্তীকে নিয়ে বেশ রোমান্সের গুঞ্জন উঠেছিল। নায়ক ছিলেন দিলীপকুমার। কিন্তু হঠাৎ সায়রা বানুকে বিয়ে করে সে গুঞ্জন থেমে গেছে। বৈজয়ন্তী এখন ডাঃ বালীর বাগদত্তা হয়েছেন।

শর্মিলা ঠাকুর এবং শাম্মি কাপুরের রোমান্স ছাই-চাপা পড়ল। ক্রিকেট-নায়ক নবাব মনসুর আলির আগমনে শর্মিলা এখন আয়েষা সুলতানা। বেচারা শাম্মি এখন মমতাজ রোমান্সে মাতোয়ারা।

মীনাকুমারীর রোমান্স কি এখনও ধর্মেন্দ্রের ভালবাসা স্রোতে ভাসমান? না শূন্যে দোদুল্যমান। হয়তো মীনাকুমারী ধর্মেন্দ্র বুঝতে পারছেন না।

এদিক থেকে ওয়াহিদা রেহমানকে বোঝা দায়। রোমান্সের ব্যাপারে তিনি যেন রহস্যময়ী। পরিচালক বিজয় আনন্দর কি কোন দুর্বলতা আছে ওয়াহিদার প্রতি?

এসব ব্যাপারে সবচেয়ে চালাক মেয়ে মালা সিনহা। মোহগ্রস্ত রোমান্সে মালা যেন বিশ্বাসী নয়। তাই চট করে আজও কোন নায়ককে সে মন-প্রাণ সঁপে দেয়নি।

তাহলে অপেক্ষা করা যাক নতুন বছরে নায়িকা-রোমান্সের নামাবলীতে কার নাম আগে আসে।
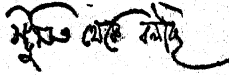
ব্যাচেলার বাণীব্রত চৌধুরী যে কোনদিন বিয়ে করতে পারে, তা স্বপ্নেও কেউ ভাবতে পারেনি। কিন্তু ব্যাপারটা সত্যি। বাণীব্রত বিয়ে করতে বাধ্য হচ্ছে তারই অফিসের পার্সোন্যাল এ্যাসিস্টেণ্ট শেলী মিত্রকে। এ-বিয়ের অবশ্য পূর্বরাগঘটিত কোন ব্যাপার নেই। হঠাৎ-ই বলা যেতে পারে, একেবারে নাটকীয় ক্লাইমেক্স।

তবে এর পেছনে প্রাণান্তকর এক ইতিহাস আছে। এবং বলতে গেলে তারই নায়ক হিসেবে আমাদের অফিস-বস বাণীব্রত চৌধুরীকে জড়িয়ে পড়তে হয়েছিল। আসলে এ-বিয়েটা হবার কথা ছিল অফিসের সহকর্মী জয়ন্তের সঙ্গে। তাইবা বলি কি করে, সবাই জানত, টাইপিস্ট মল্লিকার সঙ্গেই জয়ন্তর বিয়ে হবে। কিন্তু ঘটনাচক্রে এক শোচনীয় ভুল বোঝাবুঝির ব্যাপার নিয়ে শঙ্কর রাতারাতি মল্লিকার বদলে শেলীকেই পাত্রী হিসেবে নির্বাচিত করে ফেলল।

অথচ বিচিত্র মেয়ে এই শেলী মিত্র। এক কথায় যাকে বলে পুরোপুরি একটা 'দেহসর্বস্ব সোসাইটি গার্ল'। জীবনকে সে উপভোগ করতে চায় স্রেফ দেহের জোরেই। তার ধারণা, এই দেহের পরিবর্তেই সে তার ন্যায্য মূল্য আদায় করে নিতে পারবে।

ঠিক এর বিপরীত হল মল্লিকা। সন্ধ্যার তারার মত শান্ত আর স্নিগ্ধ। লজ্জা-জড়ানো ফুলের মত নিষ্পাপ একটা মেয়ে। কালো ডাগর চোখে সলজ্জ মধুর স্বপ্নভরা দৃষ্টি। সারা মুখখানায় স্নিগ্ধতায় জড়ানো। বড় মায়াময়। মোহনীয় ওর প্রভাব; নিবিড় ওর আকর্ষণ।

মল্লিকার এই আকর্ষণে বাঁধা পড়ল জয়ন্ত। নারীর চোখ পুরুষের চোখের ভাষা চেনে। মুহূর্তে দুজনের দৃষ্টি হারিয়ে গেল পরস্পরের মধ্যে। ওরা দুজন দুজনকে নিবিড় করে ভালবাসল। তিল তিল করে গড়ে উঠল ওদের জীবনের যত স্বপ্নসৌধ। ওরা ঘর বাঁধার স্বপ্ন দেখল। এদের এই অন্তরঙ্গতা দেখে মনে মনে শেলী মিত্র প্রতিহিংসায় জ্বলে উঠেছিল। কিন্তু সবচেয়ে খুশি হয়েছিল সোমনাথ।

অফিসের সবচেয়ে উচ্ছল প্রাণচঞ্চল ছেলে এই সোমনাথ। একসঙ্গে মল্লিকা আর জয়ন্তকে দেখলেই ও উৎসাহভরে চেঁচিয়ে উঠত—এই যে দাদার, চালিয়ে যাও। শুধু মাঝে মাঝে এই গরীব ব্রাহ্মণকে মিষ্টিটিষ্টি খাইয়ে দিও—এই আমিই সব ম্যানেজ করে দেবো।

দেখতে দেখতে গোটা অফিসটা মুখর হয়ে উঠল, শুধু শেলী ছাড়া। আর বাণীব্রতর ব্যাপারটা ঠিক বোঝা যেত না।

চিত্ত বসু পরিচালিত "অন্ধ পৃথিবী"র মহমহরতে দীপ্তি রায়, সন্ধ্যারাণী পাহাড়ী সান্যাল, সহকারী পরিচালক এবং পুলক বন্দ্যোপাধ্যায়। ফটো : অমৃত

মল্লিকার সম্বন্ধে তার মনোভাবটা আগা-গোড়াই কেমন যেন রহস্যময় বলে মনে হত। হয়ত জয়ন্ত মল্লিকাকে নিয়ে সিনেমায় যাবে ঠিক করেছে, অমনি অফিস ছুটির সময় বাণীব্রতর চেম্বারে মল্লিকার ডাক পড়েছে। ঘণ্টার পর ঘণ্টা জরুরী চিঠির নোট নিয়েছে! শেষে অপেক্ষা করে করে জয়ন্ত একাই ফিরে গেছে।

আশ্চর্য! এর জন্য কোনদিনই এতটুকু লজ্জিত বা অনুতপ্ত হয়নি মল্লিকা। বরং জয়ন্তর অভিমান লক্ষ্য করে সে অনুযোগ করে বলত—ভারী তো সিনেমা, ছবি তো আর পালিয়ে যাচ্ছে না। ও দুদিন পরে হলেও চলবে। জয়ন্ত কিন্তু রাগ সামলাতে পারত না। বলত—তা চলবে, তবে ওটাও বরং মিঃ চৌধুরীর সঙ্গেই দেখে নিও। উচ্ছ্বসিত হাসিতে ফেটে পড়ে জয়ন্তকে আরও রাগাবার জন্য মল্লিকা জবাব দিত—বেশ, এবার থেকে তাই দেখব। কেন, তোমার হিংসে হয় নাকি?

ঠিক হিংসে না হলেও এ-ব্যাপারে জয়ন্ত একেবারে নিশ্চিন্ত হতে পারেনি। কারণ লক্ষ্য করে ও দেখেছে, শুধু অফিসেই নয়, মল্লিকাদের বাড়িতেও মিঃ চৌধুরী যাতায়াত করতেন। কিন্তু এই ঘনিষ্ঠতার কোন অর্থই জয়ন্ত খুঁজে পেত না। মিঃ চৌধুরীর সঙ্গে মল্লিকার কি সম্পর্ক তা-ও বুঝতে পারত না। ভেবেছিল মল্লিকাকেই এ-প্রশ্ন করবে। কিন্তু তার আগেই একদিন ছুটির দিনে মিঃ চৌধুরীর সঙ্গে দেখা করতে গিয়ে তাঁর ঘরের ভেতর যা দৃশ্য জয়ন্ত দেখলে, তাতে করে প্রচণ্ড ভূমি-কম্পের মত সে কেঁপে উঠল। জয়ন্ত দেখল, মিঃ চৌধুরীর কোলে মাথা রেখে তাঁরই বিছানায় শুয়ে আছে মল্লিকা। নিশ্চিন্ত আরামে, একান্ত নির্ভরতায়। আর মিঃ চৌধুরী তাকে মাথায় হাত বুলিয়ে আদর করছেন একান্তভাবে।

সঙ্গে সঙ্গেই জয়ন্ত চলে আসে। ভাবে, এই তার মল্লিকা! এই তার পরিচয়! যাকে নিয়ে সে ভবিষ্যতে ঘর বাঁধার স্বপ্ন দেখে-ছিল, এই তার সত্যিকারের রূপ! মল্লিকা ভ্রষ্টা। মল্লিকা প্রতারক। ঝড়ের মত বেরিয়ে গেল জয়ন্ত। মুহূর্তে মনস্থির করে ফেলল জয়ন্ত। শেলীর সঙ্গে দেখা করেই সোজা-সুজি বলল—মল্লিকার পরিবর্তে তোমাকেই আমি বিয়ে করতে চাই। রাজী থাক তো বল।

শেলী এক কথায় রাজী হয়ে গেল। এই তো সে চেয়েছিল।

অথচ মল্লিকা কোন পাপ করেনি। জয়ন্ত তাকে ভুল বুঝল। মিঃ চৌধুরীর কাছে জয়ন্তরই প্রমোশনের দাবী নিয়ে মল্লিকা এসেছিল দেখা করতে। কিন্তু যখন শুনল তা সম্ভব নয়, তখন হঠাৎ নিরাশায় মাথা ঘুরে সে পড়ে গেল। এই দৃশ্য দেখেই জয়ন্তর প্রবল সন্দেহের সূত্রপাত। এবং শেলীর সঙ্গে তার এই সিদ্ধান্ত।

এভিনবরা যাত্রার প্রাক্কালে ছবিটির পরিচালক অরুন্ধতী দেবী। ফটো : অমৃত

পরদিন অফিসে গিয়েই বাণীব্রত চৌধুরী অবাক। দুটো চিঠি। একখানা জয়ন্ত ও শেলীর বিয়ের নিমন্ত্রণপত্র। অন্যটা মল্লিকার পদত্যাগপত্র। বাণীব্রত সঙ্গে সঙ্গে যেন চেঁচিয়ে ওঠে—অসম্ভব। এ কখনো হতে পারে না। নিশ্চয়ই মল্লিকাকে ভুল বুঝেছে জয়ন্ত।

শেষ মুহূর্তে বাণীব্রত মল্লিকাকে বাঁচাবার জন্য শেলীর সঙ্গে দেখা করে জয়ন্তকে ফিরিয়ে দিতে অনুরোধ জানাল। কিন্তু শেলী কিছুতেই রাজী হতে চায় না। অনেক শূন্যতার মরুভূমি পার হয়ে আজ সে পূর্ণ জলাশয়ের সামনে এসে দাঁড়িয়েছে। একি তৃষ্ণা না মিটিয়ে ফিরে যাবে! জয়ন্তকে কি ও . মুক্তি দেবে? মল্লিকার সঙ্গে মিঃ চৌধুরীরই বা কি সম্পর্ক?

এইসব প্রশ্নের উত্তর রয়েছে 'তিন অধ্যায়' কাহিনীতে। এটির কাহিনীকার শৈলেশ দে। বর্তমানে এ-কাহিনীটির চলচ্চিত্ররূপ দিচ্ছেন পরিচালক মঙ্গল চক্র-বর্তী। সংক্ষিপ্ত কাহিনীটি চিত্রনাট্যে বিস্তারিত রূপ নিচ্ছে। ছবির পর্দায় এই রহস্যময় কাহিনীর সব তথ্যই জানা যাবে। বর্তমানে ছবির চিত্রগ্রহণের কাজ চলেছে ইন্দ্রপুরী স্টুডিওয়। মুখ্য চরিত্রে অভিনয় করছেন বাণীব্রত—উত্তমকুমার, শেলী মিত্র—সুপ্রিয়া দেবী, জয়ন্ত—অজয় গাঙ্গুলী ও সোমনাথ—অনুপকুমার।

এছাড়া পার্শ্বচরিত্রে অভিনয় করছেন বিকাশ রায়, জহর রায়, ছায়া দেবী বঙ্কিম ঘোষ, রবীন মজুমদার, সুপর্ণা সেন, প্রতিমা চক্রবর্তী, বিদিশা চৌধুরী, মিশ্রা দত্ত, ইন্দিরা দে, জ্যোৎস্না ব্যানার্জি ও মীরা চাটার্জি।

গোপেন মল্লিক সুরকৃত এ-ছবিটির পরিবেশক হল অপ্সরা ফিল্মস।

অনামিকা কলা সঙ্গম-এর উদ্যোগে দিল্লীর 'থ্রি আর্টস্ ক্লাব'-এর অভিনয় :

প্রযোজক আর, এম, কাউল এবং পরি-চালক-নাট্যকার-অভিনেতা রমেশ মেহতার নেতৃত্বে দিল্লীর প্রথিতযশা নাট্যসংস্থা 'থ্রি আর্টস্ ক্লাব' অনামিকা কলা সঙ্গম-এর আহ্বানে গেল ১৩ই, ১৪ই এবং ১৫ই আগস্ট স্থানীয় হিন্দী হাই স্কুলে "উলঝান" ও "বড়ে আদমী" মঞ্চস্থ করেছিলেন। দুটি অভিনয়ের মাধ্যমেই এই সংস্থার দৃশ্য-সংস্থাপনা, মঞ্চসজ্জা, অভিনয়রীতি প্রভৃতির একটি সুস্পষ্ট বৈশিষ্ট্য লক্ষ্য করা যায়। চব্বিশ বছরব্যাপী একনিষ্ঠ অনুশীলনের ফলে এই নাট্যসংস্থাটি একটি সুপরিকল্পিত প্রয়োগরীতি অবলম্বনে নিজেকে একটি নাটসম্মত স্বাতন্ত্র্য দিতে সমর্থ হয়েছে।

রমেশ মেহতা রচিত 'উলঝান' (জটিল) নাটকটিতে পি, জি, উডহাউস-এর 'জিভস্'-

কাহিনীর ছায়াপাত হয়েছে। নায়ক বেনারসী দাস এর পিওন নারায়ণ সিং 'জন্স্'-এর হিন্দী সংস্করণ। অবস্থার চেয়ে উন্নত পর্যায়ের লোক হিসেবে নিজেকে জাহির করবার উদগ্র বাসনা সময় সময় মানুষকে ছোটখাট মিথ্যার আশ্রয় গ্রহণ করা থেকে শুরু করে কোন্ বিপর্যয়ের মুখে ঠেলে নিয়ে যায়, তারই একটি মজাদার কাহিনী হচ্ছে 'উল্‌ঝান'। এতে নারায়ণ সিংয়ের ভূমিকায় রমেশ মেহতার অসামান্য নাট-নৈপুণ্যই সবচেয়ে উপভোগ্য বস্তু। এর পরেই বাড়ীওয়ালী জানকীরূপে দেশী কমলেশ্বর সকলের দৃষ্টি আকর্ষণ করে-ছিলেন; তাঁর স্থূল বপুর সঙ্গে বাচন এবং অংগভংগী বারংবার আমাদের রাজলক্ষ্মী দেবীর অভিনয়ের কথা স্মরণ করিয়ে দিচ্ছিল। নায়ক বেনারসী দাসের ভূমিকায় ভূষণ শেঠির অভিনয় বেশ পরিচ্ছন্ন ও মার্জিত। নায়িকা শকুন্তলা সুদ-এর চরিত্রে মাদুলে সহদেব অত্যন্ত সহজ ও স্বচ্ছন্দ। বেনারসীর পিতা প্রভুদয়ালরূপে ওম সুগুনাব অত্যন্ত সাবলীল ও প্রাণবন্ত। অপরাপর ভূমিকায় এম, এল, আনন্দ (প্রাণনাথ), ওম শর্মা (জুম্মা খাঁ), মদনগোপাল (নেকচাঁদ) এবং এন, খান্না (সীতারাম) প্রভৃতি উল্লেখ্য চরিত্রসৃষ্টি করেছেন। বাড়ীওয়ালীর কন্যা 'পান্ডোরা' মঞ্চে প্রদর্শিত আবির্ভাব সম্পর্কে দর্শকদের মনে নাটকের শুরু থেকেই একটি আগ্রহ সৃষ্টি একটি অভিনব নাট্যকৌশল বলে অভিনন্দিত হবে।

'বড়ে আদমী'র রচয়িতার নাম দেওয়া হয়নি। কারণ এখানিও একটি বিখ্যাত বিদেশী নাটকের ছায়া অবলম্বনে রচিত। আমরা বাঙলা মঞ্চে ও চলচ্চিত্রে এই নাটকের সমগোত্রীয়দের দেখেছি। মিশনারী শিক্ষা-প্রতিষ্ঠানে পড়া ছেলেমেয়ের কল্যাণে প্রাত্যহিক জীবনযাত্রায় ইংরেজ হয়ে ওঠবার উদগ্র বাসনা বাপমাকেও পেয়ে বসে; বিশেষ যখন ছেলে ও মেয়ে ধনীর মেয়ে ও ছেলের প্রেমে পড়ে তাদের বিবাহ করবার জন্যে পণ করে বসে তখন বাপমায়ের পক্ষে নিজেদের অত্যাধুনিক প্রতিপন্ন করা ছাড়া গত্যন্তর থাকে না। কিন্তু বেলুন ফুলতে ফুলতে যখন হঠাৎ ফেঁসে গিয়ে চুপসে যায়, তখন হঠাৎই আবিষ্কার হয় যে, অপর পক্ষদের অবস্থাও তথৈবচ। বর্তমান সমাজের এই ব্যাধিটিই হাস্যরসের ভিতর দিয়ে উপস্থাপিত করা হয়েছে 'বড়ে আদমী'র মাধ্যমে।

পশ্চিমা আদবকায়দা বিষয়ে অনুশীলন-রত মিঠাইওয়ালা আগরওয়ালের মুখ্য ভূমিকায় রমেশ মেহতা চরিত্রের সঙ্গে একাত্ম হয়ে গিয়েছিলেন। আগরওয়াল-স্ত্রীরূপে মোহিনী মাথুর ভঙ্গী ও বাচনে চরিত্রটিকে মূর্ত করে তুলেছিলেন; আয়াবেশে তাঁর অভিনয় অতুলনীয়। ধনী দ্বারকাপ্রসাদ ও তাঁর স্ত্রী সুশীলার চরিত্রে যথাক্রমে প্রাণনাথ ও দেশী কমলেশ্বর ধনগর্বিত রূপটি সুন্দর ফুটিয়ে তুলেছিলেন। রাজাসাহেব রূপে ও. পি, শর্মাকে মানিয়েছিল চমৎকার। রোমান্টিক চরিত্র চারটি ইন্দ্রা-অশোক ও [illegible] যথাক্রমে মৃদুল সহদেব,

নলদময়ন্তী চিত্রে দীপিকা দাস।

ফটো : অমৃত

ভূষণ শেঠি, কমলা ও প্রেম সক্সেনা সুষ্ঠুভাবে তাঁদের দায়িত্ব পালন করেছিলেন। অপরাপর ভূমিকা যথাযথ।

'উল্‌ঝান' ও 'বড়ে আদমী'—এই দুটি হিন্দী নাট্যানুষ্ঠান সম্পর্কেই বলা যায়, বিভিন্ন শিল্পীর আগমন নিষ্ক্রমণ, মঞ্চে অবস্থান ও স্থানপরিবর্তনের মধ্যে এমন সুন্দর, স্বাভাবিক ও দ্রুত অর্থপ্রধান সমন্বয়সাধন (location প্রধান co-ordination) বাঙলা রঙ্গমঞ্চেও আমরা কদাচিৎ দেখেছি। মঞ্চের এক স্থান থেকে আর এক স্থানে তির্যকভাবে যেতে যেতে একজন শিল্পী আর একজনের দিকে কোনো জিনিস ছুঁড়ে দিল, আর অপর ব্যক্তিও সহজেই সেটা লুফে নিল; অথচ মনে হয়, এটি আদান-প্রদান অত্যন্ত স্বাভাবিকভাবেই ঘটল। প্রত্যেকটি শিল্পীই, বিশেষ করে পুরুষেরা সব সময়েই এমন তৎপর ও সপ্রতিভ যে, দেখলে অবাক লাগে। আমাদের বাঙলা রঙ্গমঞ্চের পরিচালকরা এদিকে নজর দিলে উপকৃত হবেন।

যাযাবর

কাহিনীবিন্যাস আর বহু সংঘাত-সমৃদ্ধ ঘটনার চমকপ্রদ সমাবেশে প্রশান্ত চৌধুরীর 'লাল পাথর' নাটক নাট্যানু-রাগীর কাছে যে আকর্ষণীয় এতে কোন সন্দেহ নেই। 'যাযাবর' নাট্যগোষ্ঠী এই নাটকটি সম্প্রতি বিশ্বরূপায় অভিনয় করলেন। শিল্পীদের অভিনয়নৈপুণ্যের ওপরেই এই নাটকের প্রতিষ্ঠা, বিশেষ কোন সূক্ষ্ম আংগিক ও নতুনতর প্রয়োগপরি-কল্পনার প্রয়োজন এতে হয় বলে মনে হয় না। 'যাযাবরের' শিল্পীবৃন্দ এ সত্যকে উপলব্ধি করতে পেরেছিলেন বলেই তাঁদের এই নাট্যপ্রযোজনা সার্থক হয়েছে। প্রতিটি শিল্পীই চরিত্রের অতলে ডুবে গিয়ে চেষ্টা করেছেন তাদের মর্মকথাকে প্রকাশ করতে। স্বতঃস্ফূর্তভাবে প্রকাশের এই চেষ্টা মাঝে মাঝে দর্শককে অভিভূত করেছে। চরিত্রের সংগে শিল্পীদের নিবিড় পরিচিতির ব্যাপারে নাট্যনির্দেশক সুনীতকুমার দাসের নিষ্ঠা আর শিল্পবোধের গভীরতাও জড়িয়ে আছে।

নাটকের প্রায় প্রতিটি দৃশ্যই সু-অভিনীত। সংঘাতমুখর এই নাটকের অভিনয় কখনো স্তিমিত হয়েছে বলে মনে হয় না। নাটকীয় গতিকে শেষ পর্যন্ত অব্যাহত রাখায় শিল্পীদের সংঘবদ্ধ প্রচেষ্টা অভিনন্দনযোগ্য। কয়েকটি চরিত্রে সুঅভিনয় করেছেন—শ্যামলকুমার ঘোষ, তরুণ সেনগুপ্ত, বাসুদেব দাস, সুনীত-কুমার দাস, বিশ্বনাথ ঘোষ, জয়দেব ঘোষ, স্বদেশরঞ্জন দাস, গোপালচন্দ্র ভড়, শ্রীধর

বিজলী প্রেক্ষাগৃহে অনুষ্ঠিত ছবিটি চিত্রের সুবর্ণজয়ন্তী উৎসবে শ্রীতুষারকান্তি ঘোষ, তপন সিংহ এবং ছবির পরিচালক অরুন্ধতী দেবী। ফটো : অমৃত

চট্টোপাধ্যায়, নীলু দাশগুপ্ত, মৃত্যুঞ্জয় চট্টোপাধ্যায়, কেষ্ট দে, শিপ্রা সাহা, তাপসী মুখার্জী, সুনন্দা বসু।

'লৌহপ্রাচীর'

সম্প্রতি হাওড়া জাতীয় সংঘের শিল্পীবৃন্দ ইস্টার্ণ রেলওয়ে মঞ্চে অভিনয় করলেন। অনিলবরণ দত্তের 'লৌহপ্রাচীর' নাটক। রাজনৈতিক ক্রিয়াকৌশলের পটভূমিকায় নাটকটি রচিত হওয়ার জন্য বক্তব্যধর্মিতার প্রাবল্য এতে লক্ষণীয়। দলীয় স্বার্থ রাখতে গিয়ে দেশের স্বাভাবিক অবস্থা কিভাবে বিপর্যস্ত হয়, এ নাটকে সে ছবি আছে। বক্তব্যাশ্রয়ী এ নাটকের নির্দেশনায় বীরেশ্বর মুখোপাধ্যায় আন্তরিক নিষ্ঠা আর যোগ্যতার নিদর্শন রেখেছেন। শিল্পীবৃন্দের প্রাণবন্ত অভিনয়ে নাট্যকৌতূহল শেষ পর্যন্ত অটুট থেকেছে। অভিনয়ের ব্যাপারে যাঁরা প্রশংসার দাবী রাখেন তাঁরা হোলেন শিবনাথ সরকার, শম্ভু বন্দ্যোপাধ্যায়, বীরেশ্বর মুখোপাধ্যায়।

'বিশ বছর আগে'

ম্যাকলিন ব্যারী কোল ডিপার্টমেন্ট রিক্রিয়েশন ক্লাবের সভ্যবৃন্দ সম্প্রতি স্টার রঙ্গমঞ্চে 'বিশ বছর আগে' নাটক মঞ্চস্থ করেছেন। কালিদাস বসু নাট্যপরিচালনায় নৈপুণ্যের নজীর রাখেন। শিল্পীবৃন্দের চরিত্রোপযোগী অভিনয় দর্শকদের তৃপ্তি দিয়েছে। অভিনয়ে দক্ষতার স্বাক্ষর রাখেন সতোন মুখোপাধ্যায়, রমেশ দাস, শৈলেন দাস, সলিল ঠাকুর, বিমল মুখোপাধ্যায়, গীতা দে, বাসন্তী চট্টোপাধ্যায়, মণিকা ঘোষ, জয়শ্রী সরকার।

চাকদহ

জোনাকী সাংস্কৃতিক সংস্থার শিল্পীবৃন্দ সম্প্রতি একটি সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের আসরে 'সমাধান' ও 'শপথ নিলাম' নামে দুটি একাঙ্কিকা পরিবেশন করেছেন। নাটক দুটির রচয়িতা বিপদভঞ্জন ভট্টাচার্য, জীব গোস্বামী। নাট্যনির্দেশনার ব্যাপারে ভূমিকা ভট্টাচার্য সূক্ষ্ম শিল্পবোধের পরিচয় দিতে পেরেছেন। নাটক দুটিতে উল্লেখযোগ্য অভিনয় করেন শ্যামল কর্মকার, ভূমিকা ভট্টাচার্য, সমীর কর ও অমল কর। সমগ্র অনুষ্ঠানটির আয়োজন করেন কাঁঠালপল্লী যুব সংস্থা।

ব্যারাকপুর

'নাট্যলোকে'র শিল্পীরা সম্প্রতি রবীন্দ্রনাথ চক্রবর্তীর 'নাজমা হোসেন' মঞ্চস্থ করলেন। সামগ্রিক অভিনয় সবারই প্রশংসা পেয়েছে। নাট্যনির্দেশনায় অজিতপ্রকাশ দক্ষতার পরিচয় রাখতে পেরেছেন। ভালো অভিনয় যাঁরা করেছেন তাঁরা হোলেন গোকুলেশ পাল, দীনু তরফদার, অজিত গঙ্গোপাধ্যায়, দাশরথি মন্ডল, দয়াময় পাল, তারা চট্টোপাধ্যায়, বেচারাম মন্ডল, স্বপ্না দত্ত, প্রতিমা বন্দ্যোপাধ্যায়।

পুরুলিয়া

সম্প্রতি 'বীণাপাণি এ্যামেচার ক্লাব' পুরুলিয়া জেলা খরাক্লিষ্ট অঞ্চলের সাহায্যার্থে 'পদ্মা নদীর ঝড়' নাটক মঞ্চস্থ করেছেন। সংঘবদ্ধ অভিনয়ে শিল্পীবৃন্দের আন্তরিক নিষ্ঠার ছাপ ছিল। নাট্যনির্দেশনার দায়িত্ব সার্থকভাবে পালন পালন করেছেন মদনমোহন।

'পাহাড়ী ফুল'

বারাসতের প্রখ্যাত নাট্যসংস্থা 'রজনীগন্ধার' শিল্পীবৃন্দ সম্প্রতি শৈলেন গুহনিয়োগীর 'পাহাড়ী ফুল' নাটক মঞ্চস্থ করেছেন। এই নাট্যপ্রযোজনায় সংস্থার পূর্বগৌরব অক্ষুণ্ণ থেকেছে। নাট্যনির্দেশনায় দক্ষতার নিদর্শন রাখেন শ্রীজ্ঞান গাঙ্গুলী, অনেক মুহূর্তে তাঁর সূক্ষ্ম শিল্পচিন্তা নাট্যানুরাগীদের বিস্মিত করেছে।

অভিনয়ে যাঁদের নাম সর্বাগ্রে উল্লেখযোগ্য তাঁরা হোলেন সৌমেন চ্যাটার্জী (জং সিং), রাণু রায় (রূপা), দিলীপ মৌলিক (অশোক), জ্ঞান গাঙ্গুলী (ডাক্তার), শ্যামল বিশ্বাস (শঙ্কর)। অন্যান্য চরিত্রে অভিনয় করেন শক্তি গাঙ্গুলী, শ্যামল গাঙ্গুলী, বিবেক চ্যাটার্জী, সুবোধ রায়চৌধুরী, বিশ্বনাথ ভট্টাচার্য, মণি নন্দী, খুকু ভট্টাচার্য। আলোকসম্পাত ও আবহসংগীত সবসময়ে নাটকের গতির সঙ্গে তাল রাখতে পারেনি।

প্ল্যানমাস্টার

'প্রতিভা নাট্যগোষ্ঠী' বিমল রায়ের হাসির নাটক 'প্ল্যানমাস্টার' আবার নিয়মিত অভিনয় করবেন বলে জানা গেছে। নিয়মিত অভিনয় পরিক্রমার প্রথম অভিনয় পরিবেশিত হবে আগামী ১০ই সেপ্টেম্বর সকাল ১০টায় 'বিশ্বরূপা'র মঞ্চে। নাট্যকার স্বয়ং নাট্যনির্দেশনার দায়িত্ব বহন করবেন।

'সূর্যের রং লাল'

'প্রাচীতীর্থে'র শিল্পীবৃন্দ আগামী নাট্যপহার হিসাবে মঞ্চস্থ করবেন রঞ্জিত সাহা রচিত 'সূর্যের রং লাল' নাটক। আগামী ২৭শে আগস্ট সন্ধ্যা ৭টায় প্রতাপ মেমোরিয়াল মঞ্চে এ অভিনয় পরিবেশিত হবে। নাট্যনির্দেশনার দায়িত্ব নিয়েছেন অমল কর।

'নায়িকা বিদায়'

'কল্পতরু'র আগামী নাট্যপ্রযোজনার নাম 'নায়িকা বিদায়'। বসন্ত ভট্টাচার্যের রঙ্গরসের এই নাটকটি আগামী মাসে মিনার্ভায় অভিনীত হবে।

নবরূপার পরবর্তী নাটক 'শঙ্খবিষ'

দাগ নাটকের নিয়মিত অভিনয়ের পর 'নবরূপা' জ্যোতু বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'শঙ্খবিষ' নাটকটি প্রযোজনা করবেন। নাটকের প্রস্তুতি পর্বের প্রথমাংশের কাজ দ্রুততরগতিতে এগিয়ে চলেছে। অন্য নাটকগুলির মত এবারও উপরোক্ত নাটকটির নির্দেশনার দায়িত্ব নিয়েছেন শ্রীবিজয় মুখার্জি।

শিল্পীতীর্থের প্রযোজনায় 'ধন্বন্তরী ক্লিনিকস' ও 'রসাভাষ'

আগামী ১লা সেপ্টেম্বর, শুক্রবার, মুক্তঅঙ্গন রঙ্গমঞ্চে উত্তর কলকাতার 'শিল্পীতীর্থ' নাট্যসংস্থা কর্তৃক 'নিরঙ্কুশ' রচিত 'ধন্বন্তরী ক্লিনিকস' এবং অভিজিত রচিত 'রসাভাষ' অভিনীত হবে। নাটকদ্বয়ের নির্দেশনায় আছেন সতোন মুখোপাধ্যায়। প্রধান নাট্যোপদেষ্টা মহেন্দ্র গুপ্ত।

শিল্পীতীর্থের প্রযোজনায় সারারাত্রব্যাপী অভিনয়

শিল্পীতীর্থের প্রযোজনায় আগামী ২৮শে আগস্ট, ১৯৬৭, সোমবার, জন্মাষ্টমী উপলক্ষে 'কালিকা' মঞ্চে সারারাত্রব্যাপী অভিনয় অনুষ্ঠান আয়োজিত হয়েছে। উক্ত অনুষ্ঠানে (ক) কর্ণার্জুন, (খ) দুর্গেশনন্দিনী, (গ) গোবরগণেশ এন্ড কোং, (ঘ) মীরাবাঈ এই চারটি নাটক অভিনীত হবে। নাটকগুলি নির্দেশনা এবং কর্ণ, ওসমান ও রাণাকুম্ভ চরিত্রে অভিনয় করবেন মহেন্দ্র গুপ্ত। অন্যান্য

চরিত্রে অভিনয় করবেন সন্তোষ সিংহ, রবীন মজুমদার, মণি শ্রীমানী, ছন্দা দেবী, লতিকা দাশগুপ্তা, প্রতিমা পাল, রাণু রায়, দেবেন গাঙ্গুলী, গোপী চক্রবর্তী, নীরেন ভদ্র, ইন্দ্রজিৎ বন্দ্যোপাধ্যায়, নিরঞ্জন ভট্টাচার্য, সত্যেন মুখোপাধ্যায়, অসীম গুহ, হেমন্ত হাজরা, বিশ্বনাথ পাল, শ্রীমল বাপী প্রভৃতি শিল্পীরা।

'জনযুদ্ধ'

কলকাতার বিশিষ্ট নাট্যসংস্থা পথিক তাঁদের নতুন নাটক 'জনযুদ্ধ' মঞ্চস্থ করলেন মিনার্ভায় গত ১৪ই আগস্ট। সমকালের সমস্যা এ নাটকের মূল কাহিনী এবং উপকাহিনীকে রক্তাক্ত করেছে--দ্রুত বিদ্রোহের মুখে এগিয়ে নিয়ে গিয়েছে? 'বিপ্লব' পত্রিকার দিকটিকে আরও জোর দিয়ে ফুটিয়ে তুললে অভিনয়ের উদ্দেশ্য কাম্য সাফল্য এনে দিতে পারত?

এই শ্রেণীর নাটকে 'টিমওয়ার্ক'-এর সুষ্ঠুরূপে প্রয়োজন। এর প্রতি পরিচালক রমেশ চট্টোপাধ্যায়ে তীক্ষ্ণদৃষ্টি আগাগোড়া ছিল। একক এবং গোষ্ঠীগত অভিনয়ে সুরেন্দ্রনাথ মিত্র, মণি শ্রীমানী, শিবনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, সুনীল সুর, সনৎ বসু, কান্তিময় রায়চৌধুরী, রবীন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় ইন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, কমল রায়চৌধুরী, সান্ত্বনা ঘোষ প্রমুখের নৈপুণ্যে চোখে পড়ে। আলো এবং সঙ্গীতের কাজ প্রশংসনীয়।

চিত্তরঞ্জন 'কৌশিকী' নাট্যসংস্থার প্রথম প্রয়াস

পশ্চিম বাংলার পুরুলিয়া ও বাঁকুড়া জেলার অভাবগ্রস্ত জনগণের সাহায্যার্থে চিত্তরঞ্জনের 'কৌশিকী' সম্প্রদায় গত ১২ই আগস্ট স্থানীয় বাসন্তী ইনস্টিটিউট মঞ্চে তাঁদের প্রথম নাটক 'স্বপ্ন সম্ভবা' মঞ্চস্থ করেন। নাটকটি রচনা ও পরিচালনা করেছেন গোষ্ঠীর অন্যতম সদস্য শ্রীতমাল দাস। অভিনয়ে। অংশগ্রহণ করেন সর্বশ্রী বটুক ভট্টাচার্য, দীপেন চট্টোপাধ্যায়, আশিস দে, সমর সিনহা, দিলীপ দাশগুপ্ত, অনিল দে, বেবী সরকার ও কল্যাণী ঘোষাল। আলোক-সম্পাত ও আবহসঙ্গীত প্রশংসনীয়। সামান্য কিছু ভুলত্রুটি থাকা সত্ত্বেও নাটকটি যথেষ্ট পরিমাণে উপভোগ্য হয়েছে। প্রথম প্রচেষ্টা হিসাবে এই অনুষ্ঠানের জন্য 'কৌশিকী' অভিনন্দনযোগ্য।

কুমারটুলী বিদ্যার্থী সংঘ

গত ৬ই আগস্ট কুমারটুলী বিদ্যার্থী সংঘ কর্তৃক 'দুই মহল' নাটকটি প্রভূত সাফল্যের সঙ্গে অভিনীত হয়। শক্তিকুমার চট্টোপাধ্যায়ের সুদক্ষ পরিচালনার গুণে নাটকটি প্রাণবন্ত হয়ে ওঠে। বিশেষ করে লালুয়ার চরিত্রাভিনেতা শ্যামল রায়চৌধুরীর অভিনয় সকলকে মুগ্ধ করে। অন্যান্য চরিত্রে ছিলেন—সুপর্ণা চ্যাটার্জি, তপন গোস্বামী, মঙ্গল ভট্টাচার্য প্রভৃতি।

'বহ্নিশিখা'

কাশীপুর গান এন্ড শেল ফ্যাক্টরীর টুল রুমস রিক্রিয়েশন ক্লাবের সভ্যবৃন্দ কর্তৃক ডাঃ নীহাররঞ্জন গুপ্তের বহু-অভিনীত 'বহ্নিশিখা' গত ১৬ই আগস্ট রঙমহল থিয়েটারে অভিনীত হয়। পরিচালনার ত্রুটির জন্য অনেকক্ষেত্রে নাটকটি প্রাণহীন হয়ে পড়ে তবে কয়েকটি চরিত্রের বলিষ্ঠ রূপদানে নাটকটি মোটামুটি সাফল্যলাভ করে। উল্লেখযোগ্য চরিত্রে রূপদান করেন প্রতিমা চক্রবর্তী, অসীম সেনগুপ্ত, বলরাম মুখার্জি। পরিচালনা করেন অরুণ সেনগুপ্ত।

দরবেশ

'দরবেশ' নাট্যসংস্থার শিল্পীরা সম্প্রতি 'মুক্তঅঙ্গনে' অভিনয় করলেন 'ডিউটি'। রবীন্দ্রনাথের ছোটগল্প 'ডিটেকটিভ' অবলম্বনে এই নাটক রচনা করেছেন বিনয় লাহিড়ী এবং নাট্যনির্দেশনার দায়িত্বও নিয়েছিলেন তিনি। সুসংবদ্ধ অভিনয় ও যুগ্ম প্রয়োগ পরিকল্পনার জন্য এ নাট্য-প্রযোজনা সবারই দৃষ্টি আকর্ষণ করেছে। মানিক সরকার, বিশ্বনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, ফকিরদাস কুমার, শিখা ভট্টাচার্য, সুস্মিতা দে অভিনয়ে কৃতিত্ব প্রদর্শন করেন।

সত্য মারা গেছে

'পাঁশকুড়া' অস্থায়ী সংঘের শিল্পীরা সম্প্রতি স্থানীয় মুক্তঅঙ্গন মঞ্চে 'সত্য মারা গেছে' নাটকটি অভিনয় করলেন। পরিবেশনের নতুনত্বে নাটকটির অভিনয় সবাইকে মুগ্ধ করেছে। পূর্ণ সামন্ত, তপন রায়, রবি রায়, কল্পনা সামন্ত, ঝুনু দাস, অজিত দাস, চিত্ত দাস, শরৎ তেওয়াড়ী, সোহিনী ঘোষ প্রভৃতি এই নাটকের উল্লেখযোগ্য শিল্পী। নাট্য-নির্দেশনায় আন্তরিক নিষ্ঠার স্বাক্ষর রাখেন রঞ্জন দাস।

'ছুটি' ও 'তাসের দেশ'

সম্প্রতি সুরমন্দিরের (নাকতলা) পঞ্চম বার্ষিক উৎসব উপলক্ষে দুটি সুন্দর নাট্যানুষ্ঠানের আয়োজন করা হয় রবীন্দ্র স্টেডিয়াম হলে। নাটক দুটি ছিল রবীন্দ্রনাথের, প্রথম নাটিকা 'ছুটি'র নাট্যরূপ, আর দ্বিতীয় রূপনাট্য 'তাসের দেশ'। দুটি নাটকই সাফল্যের সঙ্গে অভিনীত হয়। এই দুটি নাটকের কয়েকটি ভূমিকায় মঞ্চাভিনয় করেন কৃষ্ণা দে, কল্যাণী চক্রবর্তী শান্তা চক্রবর্তী, রূপা চক্রবর্তী, শিল্পী ধর, সর্বাণী কর্মকার, শাশ্বতী জানা, কৃষ্ণা ঘোষ, মিতা রায়চৌধুরী, সুস্মিতা জানা, শাশ্বতী দাশগুপ্ত।

'ছুটি' গল্পের নাট্যরূপ ও নির্দেশনার দায়িত্ব নেন সুনীল দাশগুপ্ত ও 'তাসের দেশ' নির্দেশনায় ছিলেন সৌমেন ঘোষ ও সুনীল দাশগুপ্ত। সঙ্গীত পরিচালনা ও নৃত্য পরিচালনা করেন সৌরেন রায়, সৌমেন ঘোষ ও সৌমেন রায়চৌধুরী। মঞ্চসজ্জায় শিশু-শিল্পী সৌমিত্র জানা নাট্যানুরাগীদের অকুণ্ঠ প্রশংসা অর্জন করেছে।

'মেঘে ঢাকা তারা'

সম্প্রতি শ্যামবাজার স্টেট ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়া রিক্রিয়েশন ক্লাবের সদস্যরা 'স্টার' রঙ্গমঞ্চে অভিনয় করলেন শক্তিপদ রাজগুরুর 'মেঘে ঢাকা তারা'। প্রভাত গৌতমের নির্দেশনায় এই নাটকের বিভিন্ন ভূমিকায় অভিনয় করেন যামিনী মিত্র, বীরেন্দ্র দত্ত, সলিল বিশ্বাস, বিশ্বপতি সেন, ভোলানাথ ভড়, মঞ্জুলা মুখার্জী, লতিকা দাশগুপ্ত, কল্পনা ভট্টাচার্য।

উদয়ন সংঘের দুটি নাটক

গত ১৭ই জুন বরাহনগরের 'উদয়ন সংঘের' প্রযোজনায় দু'টি নাট্যাভিনয় মঞ্চস্থ হল বিহারীলাল পাল স্ট্রীটস্থ সংঘের নিজস্ব ময়দানে। ছোট ছোট ছেলেরা করলো 'ডাকঘর' আর ছোট ছোট মেয়েরা 'রামের সুমতি'।

প্রথম নাটকে অমল, মাধব দত্ত ও ঠাকুরদার ভূমিকায় যথাক্রমে দীনেন্দ্র ব্যানার্জী, প্রদীপ অধিকারী ও জগদীশ দালাল সুঅভিনয় করেন। নাটকটি পরিচালনা করেন সন্তোষ লোধ।

দ্বিতীয় নাটকে রাম, নারায়ণী ও শ্যামলালের চরিত্রে অঞ্জনা মুখার্জী, শুক্লা মুখার্জী ও শুক্লা রায়চৌধুরীর অভিনয় উল্লেখযোগ্য। অন্যান্য ভূমিকায় ছিলেন সুপ্রিয়া ঘোষ, কৃষ্ণা গুপ্তা প্রভৃতি। নাট্য-নির্দেশনায় অপর্ণা মুখার্জী কৃতিত্বের দাবী রাখেন।

বিবিধ সংবাদ

সায়ান্স-ফিকশ্যন সিনে ক্লাব

লাইটহাউস সিনেমায় গত ১৫ই আগস্ট সকালে একবিশেষ প্রদর্শনীতে সায়ান্স-ফিকশ্যন সিনে ক্লাবের সহস্রাধিক সদস্য এইচ জি ওয়েলসের 'ওয়ার অভ দি ওয়ার্লডস' বিখ্যাত ফিল্মটি দেখেন। লাইটহাউসের মতন শ্রেষ্ঠ সিনেমা হলে কোলকাতার কোন সিনে ক্লাবের বিশেষ অনুষ্ঠান এই প্রথম। অনুষ্ঠানে সপরিবারে উপস্থিত ছিলেন ক্লাব-সভাপতি ম্যাগসেসে পুরস্কার-বিজয়ী পদ্মভূষণ সত্যজিৎ রায়, সাহিত্য আকাদেমী পুরস্কার বিজয়ী মনোজ বসু, পশ্চিমবঙ্গের ড্রাগ কন্ট্রোলার ডাঃ বিভূতি সরকার, চিত্র-সাংবাদিক নির্মলকুমার ঘোষ, হাঙ্গারীর বাণিজ্যদূত, অভিনেতা পাহাড়ী সান্যাল ও চারুপ্রকাশ ঘোষ প্রভৃতি বহু বিশিষ্ট অতিথিবর্গ।

ইস্টার্ণ সিনে কো-অপারেটিভ

বাংলার সর্বশ্রেষ্ঠ ঔপন্যাসিক তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায় রচিত দেবকীকুমার বসুর যুগান্তকারী সঙ্গীতমুখর চিত্রসৃষ্টি 'কবি' বহুদিন পর আবার দক্ষিণ কলিকাতার 'ইন্দিরা সিনেমা' হলে জন্মাষ্টমী উপলক্ষে আগামী ২৮শে আগস্ট সকাল ১০ ঘটিকায় প্রদর্শিত হবে। ইস্টার্ণ সিনে কো-অপারেটিভ সর্বসাধারণের জন্য এই প্রদর্শনীর বন্দোবস্ত করেছেন।

গীতালির মাসিক সংগীতোৎসব

ললিত মিত্র লেন শ্যামবাজার কলিকাতাস্থিত প্রখ্যাত সংগীতায়তন গীতালির ষষ্ঠ মাসিক সঙ্গীতোৎসব সম্প্রতি সাফল্যের সঙ্গে অনুষ্ঠিত হয়। অনুষ্ঠানে কণ্ঠসংগীতে গীতালির অধ্যাপিকা শ্রীমতী শান্তা সাহা গৌড়মল্লার ও কলাবতী রাগ পরিবেশনে শ্রোতাগণের প্রশংসা অর্জন করেন। অনুষ্ঠানে হারমোনিয়াম সহযোগিতা করেন গীতালির অধ্যক্ষ পঙ্কজ সাহা। পরে নিতাই রায়

গীতালির মাসিক আসরে শ্রীমতী শান্তা সাহা সংগীত পরিবেশন করছেন।

সেতারে 'জয়-জয়ন্তী' ও 'কিরবাণী' পরিবেশন করেন। তবলা সংগতে ছিলেন প্রণব মুখোপাধ্যায়।

পশ্চিমবঙ্গ সংগীতশিল্পী সংসদ

পশ্চিমবাংলার সংগীতশিল্পিগণ বহু দিনের আকাঙ্ক্ষিত নিজস্ব একটি প্রতিষ্ঠান সম্প্রতি গড়ে তুলতে সক্ষম হয়েছেন। এই নব-প্রতিষ্ঠিত প্রতিষ্ঠানটির নামকরণ হয়েছে 'পশ্চিমবঙ্গ সংগীতশিল্পী সংসদ'। যে কোন পেশাদার কন্ঠসংগীত-শিল্পী সংগীত-পরিচালক, মূকাভিনেতা, নৃত্যবিদ, হাস্য-কৌতুকশিল্পী, যন্ত্রসংগীতশিল্পী এবং গীতিকার প্রভৃতি এই সংসদের সভ্য অথবা সভ্যা হতে পারেন।

প্রতিটি প্রতিষ্ঠানের সাফল্যের মূলে রয়েছে সদস্যদের ঐকান্তিক প্রচেষ্টা এবং মিলিত শক্তি। সুতরাং এই নবজাত প্রতিষ্ঠানটিকে পুষ্ট করে তোলার জন্য প্রতিটি শিল্পীর সহযোগিতা কাম্য এবং সেটি প্রাথমিকভাবে সম্ভব এই সংসদের সদস্য হয়ে এর সাংগঠনিক শক্তিকে বৃদ্ধি করা।

তাই প্রতিটি সংগীতশিল্পীর নিকট একান্ত আবেদন তাঁরা যেন সংসদের কার্যালয়ে উপস্থিত হয়ে নিজেকে সদস্যভুক্ত করে নেন।

ফিল্ম ইনস্টিটিউট অব ইণ্ডিয়ার পঞ্চম সমাবর্তন উৎসব :

আসচে রবিবার, ২৭এ আগস্ট বৈকাল পাঁচটায় ফিল্ম ইনস্টিটিউট অব ইণ্ডিয়ার পঞ্চম সমাবর্তন উৎসব অনুষ্ঠিত হবে। কেন্দ্রীয় তথ্য ও বেতারমন্ত্রী কে কে, শাহ উপাধিপত্র বিবতরণ করবেন।

মঞ্চাভিনয়ে সি এন টি-র শিশু-শিল্পিবৃন্দ

শিশুদের নাচ-গান ও অন্যান্য শিল্প-কলার মাধ্যমে নির্মল আনন্দ দেবার জন্য চিলড্রেন্স নভেল থিয়েটার কলকাতা ও বাইরে নানা জায়গায় মুখোশ নাটক মঞ্চস্থ করে আসছে। মধ্যবিত্ত ও নিম্নমধ্যবিত্ত পরিবারের ছেলে-মেয়েরা যাতে অভিনয় করবার এবং দেখবার সুযোগ পায়, সে-উদ্দেশ্য নিয়ে সি এন টি গড়ে তোলা হয়। হাজার হাজার শিশুদর্শকদের সামান্য দক্ষিণায় নাটক দেখবার সুযোগ-সুবিধা করে দেবার উদ্দেশ্যে শীঘ্রই কলকাতার কোন একটি মঞ্চে প্রতি রোববার কর্তৃপক্ষ নিয়মিত অভিনয়ের ব্যবস্থা করবেন। যে-কোন শিশু অভিনয়ে যোগদান করতে পারবে।

পরলোকে সুধীরেন্দ্র সান্যাল :

গেল শুক্রবার, ১৮ই আগস্ট, বিগত যুগের শ্রেষ্ঠ চলচ্চিত্র-প্রচারবিদ সুধীরেন্দ্র সান্যাল পরলোকগমন করেছেন। আইন পরীক্ষায় সাফল্যের সহিত উত্তীর্ণ হয়েও তিনি চলচ্চিত্রের সঙ্গে নিজেকে যুক্ত করেন জীবনের প্রথম থেকেই এবং শুরুতে ফিল্মল্যাণ্ড, খেয়ালী, চিত্রপঞ্জী, দীপালি প্রভৃতি বিভিন্ন পত্রপত্রিকার মাধ্যমে একজন বিশিষ্ট চলচ্চিত্র সাংবাদিকরূপে খ্যাতিলাভ করবার পরে নিউ থিয়েটার্সের প্রথম যুগেই এই প্রতিষ্ঠানের প্রচারবিদের পদে আসীন হন এবং চলচ্চিত্র-প্রচারকে একটি মর্যাদামণ্ডিত শিল্পকর্মে উন্নীত করেন। ব্যক্তিগত জীবনে তিনি অমায়িক, পরিহাসপ্রিয় ও বন্ধুবৎসল ছিলেন। শুধু বিপত্নীকই ছিলেন না, তাঁর দুই প্রিয় পুত্র—সৌমেন্দ্র ও দীপ্তেন্দ্রও তাঁর জীবিতকালেই অকালে মৃত্যুমুখে পতিত হয়। ১৯০৭ সালের ৫ই ফেব্রুয়ারী তিনি পুঁটিয়ার জমিদার বংশে জন্মগ্রহণ করেন। মৃত্যুকালে তাঁর এক পুত্রবধূ, এক পৌত্র এবং এক পৌত্রীকে তিনি বর্তমান রেখে গেছেন।

ছবি বিশ্বাসের স্মৃতিতে শিশু ভবন

গত ১৬ই জুলাই বারাসত ছোট জাগুলিয়ায় পরলোকগত শিল্পী ছবি বিশ্বাসের ৬৫তম জন্মদিবস পালন করা হয়। এই উপলক্ষে ছবিবাবুর পৈত্রিক বাড়ীতে শিশুদের জন্য একটি নাচগান, অভিনয়, ছবি আঁকা ও খেলাধুলোর আসর স্থাপিত হয়। শিল্পীর নিজস্ব এবং বিশ্বাস পরিবারের প্রাচীন সংগ্রহসম্ভার নিয়ে একটি স্থায়ী প্রদর্শনীরও উদ্বোধন করা হয়েছে এই অনুষ্ঠানে পৌরোহিত্য করেন পশ্চিমবঙ্গ সরকারের মন্ত্রী মাননীয় শ্রীনিরঞ্জন সেন। বিশেষ অতিথিরূপে ছবি স্মৃতিবাসরে উপস্থিত ছিলেন সব পেয়েছির আসরের স্বপনবুড়ো, বারাসতের মহকুমা শাসক শ্রী এম, আর, ভৌমিক, ব্লক ডেভেলাপমেণ্ট অফিসার শ্রীবিজয়গোপাল মিত্রঠাকুর প্রভৃতি।

গ্রামের মেয়েদের মধ্যে শিক্ষা বিস্তারে উৎসাহ দেবার জন্য বিশ্বাস পরিবারের মহিলারা "ছবি স্মৃতি পুরস্কার" বাবদ ৫০৲ টাকা দিয়েছেন কুমারী নীলিমা ঘোষকে। নীলিমা গত স্কুল ফাইনাল পরীক্ষায় এই গ্রামের মেয়েদের মধ্যে প্রথম স্থান অধিকারিণী। এখন থেকে প্রতি বছরই এই পুরস্কার দেওয়া হবে।

সান্ধ্য আসরে নাচগান, খেলাধুলো, অভিনয় ও ব্রতচারী প্রদর্শনী উপস্থিত দর্শকবৃন্দকে মুগ্ধ করেছে। বিভিন্ন বিষয়ে অংশগ্রহণ করে প্রশংসা পেয়েছে জাতীয় যুব সংঘ, মুকুল বীথি, যোগেশ বিদ্যা-মন্দির, বারাসত ক্লাব এবং ছোট জাগুলিয়া হাইস্কুল।

নিউ এম্পায়ারে পি সি সরকারের ইন্দ্রজাল

দু বছর পর কলকাতার দর্শকদের সামনে উপস্থিত হয়েছেন যাদুসম্রাট পি সি সরকার গত ১১ই আগস্ট থেকে নিউ এম্পায়ারে। সরকারের ইন্দ্রজালে এবার বেশ কিছু নতুন খেলা যুক্ত হয়েছে। যেমন, বাদক-সহ পিয়ানো উধাও, একটি মেয়ে জ্বলন্ত কামানের মুখ থেকে ইলেকট্রিক বাল্বে প্রবেশ, মিশরের ভাসমান মমির খেলা, 'পতঙ্গের প্রেম' এই নতুন খেলাগুলির চমক ও উপ-স্থাপন দুই-ই এবারের ইন্দ্রজালের বিশিষ্ট আকর্ষণ বলে অবশ্য গণ্য হবে। তাছাড়া আছে তাঁর অবিস্মরণীয় খেলাগুলি ইলেকট্রিক করাতে তরুণী দ্বিখণ্ডিতকরণ, ওয়াটার অফ ইণ্ডিয়া, ইন দি এ্যানিমল্স কিংডম, এক্স-রে আইজ প্রভৃতি বহু প্রশংসিত শ্রেষ্ঠ খেলাগুলি। সুসজ্জিত মঞ্চ, বিচিত্র দৃশ্যসজ্জা, আলোকসম্পাত, আবহসংগীত সব কিছুই যেন নতুনত্বে ভরা এবারের যাদু প্রদর্শনে।

যাদুসম্রাট পি, সি, সরকার প্রদর্শিত নিউ এম্পায়ার মঞ্চে কামানের গোলা

জ্যাক কার্ডিফ

মেরিলিন মনরো

আমি অনেক বড়ো বড়ো অভিনেতা-অভিনেত্রীকে নিয়ে ছবি তোলার কাজ করেছি। তাঁদের কেউ কেউ আজ মৃত। কিন্তু আজো আমার মনে তাঁদের স্মৃতি তেমনি উজ্জ্বল হয়ে আছে, কোনদিনই ম্লান হবে না। তাঁদের মৃত্যু নেই আমার কাছে। তাঁদের স্মৃতি আমার সবচেয়ে প্রিয় সম্পদ।

মেরিলিন মনরোর বাড়ি গেছি। কিন্তু সে বাড়িতে ঢোকা কি সহজ। বাকিংহাম প্যালেসে তবু চেষ্টা করলে ঢোকা যায়, কিন্তু মেরিলিন মনরোর বাড়িতে নয়। মেরিলিনের সঙ্গে দেখা করবার জন্যে স্পেশাল পাশ এনেছিলাম আমি। প্রায় আধ ডজন পাহারাদার খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে পাশটিকে পরীক্ষা করে তবে ভেতরে যাবার অনুমতি দিল আমাকে। অথচ ইংলন্ডে মেরিলিনের প্রথম যে ছবি তোলা হবে আমিই তার ক্যামেরাম্যান! সেই আমারই এই অবস্থা! মনে মনে চটে গেলাম খুব। কে না চটবে!

মেরিলিন আর তাঁর নাট্যকার স্বামী আর্থার মিলার ভাড়া নিয়েছেন বাড়িটা। যতদিন ধরে ছবির কাজ চলবে ততদিন সে বাড়িতে থাকবেন তাঁরা। ছবির নাম 'ঘুমন্ত রাজকুমার'। পরিচালনা করবেন স্যার লরেন্স অলিভিয়ার।

বাড়িতে ঢুকেছি। মেজাজ রীতিমতো খারাপ।

মেরিলিন ঘুমুচ্ছে তখনো। বেলা তখন দশটা! প্রায় আধ ঘণ্টা বসে থাকতে হল আমাকে। বসে বসে গল্প করছিলাম মিঃ মিলারের সঙ্গে। বেলা যখন সাড়ে দশটা মেরিলিন এলো। ড্রেসিং গাউন পরা, খালি পা। চোখ রগড়াচ্ছে দু হাত দিয়ে।

আমার সমস্ত বিরক্তি মুহূর্তে মিলিয়ে গেল। নিখুঁত সৌন্দর্য! যেন বছর বারো বয়সের নিষ্পাপ শিশু একটি!

আমি যে বসে আছি দেখতে পায় নি মেরিলিন। সোজা গিয়ে গলা জড়িয়ে ধরল আর্থারের।

আর্থার লজ্জা পেয়ে বলল, 'আরে আরে, কি করছ! বাইরের লোক রয়েছে যে!'

আর্থার পরিচয় করিয়ে দিল আমাদের। মেরিলিন তখনো আর্থারের গায়ে হেলান দিয়ে দাঁড়িয়ে আছে, চোখে স্বপ্নের ছায়া জড়ানো। বলল, 'সত্যি কি ভাগ্য আমার! পৃথিবীর সবচেয়ে বড়ো ফোটোগ্রাফার আমার ছবি তুলবে!'

সেইদিনই স্টুডিওতে পরীক্ষামূলকভাবে ছবি তোলা হল মেরিলিনের। আমি সারাক্ষণ যতদূর সম্ভব ভদ্র ব্যবহার করলাম

বিখ্যাত ব্রিটিশ আলোকচিত্রশিল্পী জ্যাক কার্ডিফের সান্নিধ্যে এসেছিলেন এমন কয়েকজন অভিনেতা-অভিনেত্রীর সম্পর্কে তাঁর মনোরম স্মৃতি-কথা। দরদ দিয়ে লেখা এই রচনায় মেরিলিন মনরো, সোফিয়া লোরেন, ময়রা শেয়ারর, মারলিন ডিয়েট্রিচ, আভা গার্ডেনার, টাইরন পাওয়ার, অ্যানিটা এগবার্গ, রোজানো ব্রাজি এবং আরো কয়েকজনের জীবনের কয়েকটি স্মরণীয় মুহূর্ত জীবন্ত হয়ে উঠেছে।

তার সঙ্গে। মেরিলিনের এর আগের ছবি 'বাস স্টপের' পরিচালক স্যার লরেন্সকে সাবধান করে দিয়ে চিঠি দিয়েছিলেন এ সম্বন্ধে।

'ভুলেও কখনো খারাপ ব্যবহার করবেন না মেরিলিনের সঙ্গে, যা-ই ঘটুক না কেন', লিখেছিলেন তিনি, 'করলে সপ্তাহের পর সপ্তাহ ধরে হয়ত আপনার ছবির কাজ বন্ধ করে বসে থাকতে হতে পারে। কড়া কথা একেবারে সহ্য করতে পারে না মেরিলিন, এমন কি শরীর পর্যন্ত খারাপ হয়ে যেতে পারে ওর।'

মেরিলিনের শৈশব কেটেছে অনাথ আশ্রমে। প্রথম জীবনে খুবই দারিদ্র্যের মধ্যে, দুঃখে কষ্টে দিন কেটেছে তার। হলিউডে এসেও প্রথম কিছুকাল খুব দুঃখের মধ্য দিয়েই গেছে। তখনো পর্যন্ত অখ্যাত, অজ্ঞাত ছিল মেরিলিন মনরো। এইসব কারণেই তার স্পর্শকাতরতা এতো বেশি। একটু গলা চড়িয়ে কথা বললেই নার্ভাস হয়ে পড়ে সে।

স্টুডিওতে ছবি তোলার সময় একদিন মেরিলিনের দুঃখের অতীত সম্বন্ধে একটু আঁচ পেয়েছিলাম আমি। শাদা পোষাক পরেছিল মেরিলিন। অপূর্ব দেখাচ্ছিল। হাত দু'খানি কোলের ওপর রাখা ছিল। দেখে অবাক হলাম—হাত দু'খানি কর্কশ, কঠিন, রং টকটকে লাল।

'হাতে একটু রং লাগালে বোধহয় ভালো হতো। রঙিন ফিল্ম তো, হাতের লাল রং ফুটে উঠবে নইলে।' খুব সাবধানে শান্ত গলায় বললাম আমি। আমার ভয় ছিল, মেরিলিন হয়ত চটে যাবে আমার কথা শুনে। হয়ত জল এসে যাবে চোখে, হয়ত চলেই যাবে 'সেট' ছেড়ে।

মেরিলিন কিন্তু একটুও অপ্রস্তুত হল না, চটল না। বলল, 'হ্যাঁ, ঠিকই বলেছেন। হাত দুটোতে রং লাগান দরকার। বাচ্চা বয়সে যখন অনাথ আশ্রমে থাকতাম তখন

ঘরের মেঝে ব্রাশ দিয়ে ঘষে ঘষে পরিষ্কার করতে হত আমাকে। এ তারই স্মৃতি।'

এ মেয়ে সম্বন্ধে সহানুভূতি না জেগে পারে না। অনেক দুঃখ কষ্টের মধ্য দিয়ে মানুষ হয়েছে মেরিলিন, তারপর বিশ্ব-বিখ্যাত অভিনেত্রী হয়েছে সে। কিন্তু তবু অতীত জীবন সম্বন্ধে কথা বলতে এতটুকু সংকোচ হতে দেখি নি কখনো, বর্তমানকে সম্পূর্ণ ভুলে গিয়ে সে সব কথা বলতে পারত।

প্রথম জীবনে লেখাপড়া বিশেষ শিখতে পারে নি মেরিলিন কিন্তু পরবর্তী জীবনে সে অভাব পূরণ করেছিল সে। আমার সংগে পরিচয় হবার কিছুকাল পরে মেরিলিনকে ডিলান টমাসের একখানা কবিতার বই উপহার দিয়েছিলাম আমি। বইখানা পেয়ে উচ্ছ্বসিত হয়ে উঠল মেরিলিন। লক্ষ্য করলাম, ছবি তোলার ফাঁকে ফাঁকে 'সেটে'র এক কোণে বসে গভীর মনোযোগ দিয়ে বইখানা পড়ছে সে।

আর্থার মিলারকে গভীরভাবে ভালো-বাসত মেরিলিন। চিন্তার জগতে মিলার ছিল তার প্রধান নির্ভর। মানুষের মন সম্বন্ধে তার কৌতূহল ছিল অপরিসীম। কিন্তু নিজের জীবনে দেহই শত্রু হল তার। সে চেয়েছিল দেহ নয়, অভিনয় দিয়ে মুগ্ধ করতে; কিন্তু হয়েছিল তার বিপরীত। তার শরীরের সুন্দর সুঠাম গড়নই বিখ্যাত করেছিল তাকে। অবশ্য 'ঘুমন্ত রাজকুমার' তার বাসনা পূর্ণ করেছিল।

মেরিলিনের মেজাজ প্রায় প্রতি মুহূর্তে পাল্টাতো। ফলে তার সংগে কাজ করা খুব একটা সহজ ব্যাপার ছিল না। অসীম ধৈর্য স্যার লরেন্স অলিভিয়ারের, তাই তিনি পেরেছিলেন। আমি বার বার মাথা নুইয়েছি তার ধৈর্যের কাছে। তাঁর অবস্থাটা একবার কল্পনা করুন। মেরিলিন যে শুধু ছবির নায়িকা তাই নয়, ছবিটি তৈরিও করাচ্ছিল মেরিলিনেরই কোম্পানি—'মনরো ইংক।' সুতরাং মেরিলিন স্যার লরেন্সের নিয়োগকর্তাও বটে। তাছাড়া স্যার লরেন্স নিজেও অভিনয় করছেন সেই ছবিতে। অবশ্য এ সব বাদ দিলেও মেরিলিন একাই যে কোন পরিচালককে ঘায়েল করার পক্ষে যথেষ্ট। বিপদ আরো ছিল, স্যার লরেন্স তা জানতেন না।

মেরিলিনের স্বপ্ন ছিল, বড় অভিনেত্রী হবে। তার জন্যে অভিনয়ের যে রীতি সে বেছে নিয়েছিল সে রীতিতে পৃথিবীর অতি সাধারণ সব জিনিসকে অনুকরণ করতে শেখান হয়। যেমন ধরুন, একটা কোন সুন্দর ভাবনা ভাবছেন তার অভিনয় করতে হলে অনুকরণ করতে হবে গাছকে।

'ঘুমন্ত রাজকুমারে' ভালো অভিনয় করবার জন্যে উঠেপড়ে লেগেছিল মেরিলিন। এমন কি নিউ ইয়র্ক থেকে তার অভিনয়-শিক্ষককে পর্যন্ত নিয়ে এসে-ছিল সঙ্গে করে। বলাই বাহুল্য যে স্টুডিয়োর কেউ-ই এটা পছন্দ করেন নি। অভিনয় সম্বন্ধে স্যার লরেন্সের নির্দেশ মন দিয়ে শুনত মেরিলিন, কিন্তু তার পরেই চলে যেত তার শিক্ষকের কাছে সে সম্বন্ধে আলোচনা করতে। সুতরাং তার অভিনয় পরিচালনা করছিলেন দুজন।

মেরিলিনের শিক্ষক তাকে কি পরামর্শ দিতেন আমি জানি না। তবে একটা বড় দৃশ্যের শুটিং শুরু হবার আগে, কে নাকি শুনেছে, মেরিলিনের শিক্ষক তাকে বলছেন, 'শান্ত হয়ে একটা কোন জিনিসের কথা ভাবো। কোকোকোলার কথা ভাবো, ফ্র্যাংক সিনাত্রার কথা ভাবো!'

এমন অবস্থার মধ্যে পড়লে স্যার লরেন্স কেন তাঁর চেয়ে অনেক নিচু তলার যে কোন পরিচালকও ক্ষেপে যেতেন। কিন্তু আশ্চর্য মানুষ স্যার লরেন্স। একটা শব্দ করেন নি, একটু বিরক্তি প্রকাশ করেন নি কখনো। অত্যন্ত ভদ্র ব্যবহার করেছেন মেরিলিনের সঙ্গে, শান্ত কন্ঠে কথা বলেছেন এবং সব বাধা অতিক্রম করে মেরিলিনকে দিয়ে সার্থক অভিনয় করিয়েছেন। অসীম ধৈর্য নিয়ে মেরিলিনের সঙ্গে কাজ করেছেন তিনি, মানুষ সম্বন্ধে মেরিলিনের ভয়কে অশ্রদ্ধা করেন নি কখনো। আমি নিজেও মেরিলিন সম্বন্ধে সেই একই পন্থা অনুসরণ করতাম, সেটের মধ্যে ও বাইরেও।

দোকান-বাজার করতে বেরুলেই লোক-জন এসে ঘিরে ধরত মেরিলিনকে। তাই নিয়ে মেরিলিন অভিযোগ করছিল একদিন। 'এক কাজ করুন', মেরিলিনকে পরামর্শ দিলাম আমি, 'পুরোনো বর্ষাতি কিনুন একটা আর সেই সঙ্গে খুব সস্তা দামের জুতো আর মোজা ব্যবহার করুন। মাথায় পরচুলা লাগান। দেখবেন কেউ চিনতে পারবে না আপনাকে।'

মেরিলিনের মনে ধরল কথাটা। পরের দিন দেখি তার মুখে-চোখে খুশি উপচে পড়ছে। চোখে কালো চশমা আর টকটকে লাল রংয়ের টুপি মাথায়।

বলল, 'দেখেছেন কি রকম সেজেছি? এবার আর কারো সাধ্য নেই আমাকে চিনবে।'

প্রায় চিৎকার করে উঠলাম আমি। বললাম, 'করেছেন কি! বন্ড স্ট্রীটে বাজার করতে গিয়ে দেখুন একবার। ঐ টুপি দেখেই লোকজন পেছন পেছন ছুটবে আপনার। প্রত্যেকেরই কৌতূহল হবে মহিলাটি কে দেখবার জন্যে। আগের চেয়ে আরো বেশি নজরে পড়বেন আপনি।'

মেরিলিন তাকাল আমার দিকে। কেমন যেন হতভম্ভ হয়ে গেল। সেই একই দৃষ্টিতে টুপিটার দিকে তাকাল একবার। টুপিটার কোথায় দোষ যেন বুঝতে পারছে না। এই হচ্ছে আসল মেরিলিন,—খেয়ালী অথচ যাকে ভালো না বেসে পারা যায় না।

* * *

আমার খুব ঘনিষ্ঠ বন্ধু ছিল টাইরন পাওয়ার। বাচ্চা ছেলেদের মতো আমরা পরস্পর পরস্পরের জিনিসপত্র ধার করতাম—সার্ট, মোজা, ফিল্ম। টাইরনের জিনিসকে আমার নিজের মনে করতাম আমি, আমার জিনিসকে টাইরন তার নিজের মনে করত।

টাইরন বিয়ে করল। কিন্তু বিয়ে করলেই ভেঙে যাবে এমন বন্ধুত্ব নয় আমাদের। আমরা তখন মরক্কোতে ছবির শুটিং করছি। ছবির নাম 'কালো গোলাপ'। টাইরন ওর স্ত্রী লিন্ডাকে নিয়ে এসে হাজির। আমরা সবাই মিলে হৈ-হৈ করলাম খুব।

আমরা যেখানে শুটিং করছিলাম সে জায়গাটা এতো বিশ্রী যে বলার নয়। একটা মাটির বাড়িতে থাকতাম আমরা। যে ঘরে আমি শুতাম সে ঘরের এক কোণে একটা পাখি এসে বাসা বেঁধেছিল। ভোর চারটে বাজতেই ডাকতে শুরু করত পাখিটা। ফলে আমারও ঘুম ভেঙে যেত। এতো ভালো এলার্ম ঘড়ি বোধহয় সারা দুনিয়ায় নেই। সূর্য ওঠার সঙ্গে সঙ্গেই ক্যামেরার কাজ শুরু করতে হত আমাকে। পাখিটার কাছে তাই খুব কৃতজ্ঞ ছিলাম আমি।

যেমন প্রচন্ড ঝড় হত সেখানে তেমনি হত গরম। লিন্ডা কিন্তু কেয়ারই করত না সে সব। রোমের সবচেয়ে বড় দর্জির তৈরি হ্রস্বতম পোষাক পরে চারদিকে ঘুরে বেড়াত সে। চারদিকে ধু-ধু করছে মরুভূমি আর তার মধ্যে এই দৃশ্য। আমার দলের লোকজনেরা প্রায় খাবি খেতে থাকত। তার চোখের হালকা সবুজ আর চলা-ফেরার আশ্চর্যসুন্দর ভঙ্গিতে দেবীপ্রতিমার মতো দেখাত তাকে।

প্রতিদিন খাবার সময় হলে ঘন্টা বাজাত লিন্ডা। প্লেট হাতে নিয়ে সবাই এসে দাঁড়াত একে একে। লিন্ডা খাবার তুলে দিত তাদের প্লেটে। যেন তার জীবনে

জ্যাক কার্ডিফ একটি ছবির দৃশ্যগ্রহণের পূর্বে মেকআপ ম্যানের দৃষ্টি আকর্ষণ করছেন ইনগ্রিড বার্গম্যানের চোখের দিকে

এর চেয়ে বড় আনন্দের কাজ আর কিছু ছিল না।

টাইরন আর লিন্ডা কিছুদিন পরে ফিরে গেল আমেরিকায়। আমি লন্ডনে ফিরলাম। একদিন হঠাৎ টেলিগ্রাম এলো টাইরনের কাছ থেকে। ওরা তিনজন মিলে প্রীতি জানিয়েছে আমাকে। বুঝলাম লিন্ডা মা হতে চলেছে। টাইরন তার নিজস্ব কায়দায় সেই কথাটা জানবার জন্যেই টেলিগ্রাম করেছে।

মনে পড়ছে টাইরনের ছেলে হবে বলে আশা করেছিলাম আমি। হয়ত টাইরনের মতই হবে দেখতে, ওর মতই মোটা ভ্রূ থাকবে।

ছবি তোলার সময় প্রচন্ড রোদ মুখে নিয়ে অথবা আর্ক ল্যাম্পের তীব্র আলোর সামনে চোখ পিটপিট না করে দাঁড়িয়ে থাকতে পারত একমাত্র টাইরনই। হয়ত তার মোটা ভ্রূ রোদ বা আলোর সেই তীব্র তেজ থেকে রক্ষা করত তার চোখকে।

খুব ভাল অভিনেতা ছিল টাইরন। কিন্তু ভাল অভিনেতারাও মাঝে মাঝে নিজেদের অভিনয়ের মান ঠিক রাখতে পারে না। টাইরনেরও তাই হয়েছিল একবার। ছবির পরিচালক ছিলেন হেনরি হ্যাথওয়ে। একটা দৃশ্যে টাইরনের অভিনয় কিছুতেই ঠিক হচ্ছে না। সে দৃশ্যে টাইরনকে রাজমুকুট পরান হবে। সুতরাং আবেগে উজ্জ্বল হয়ে উঠতে হবে তার চোখ। কিন্তু টাইরন তা পারছে না। আমি আর হেনরি তো প্রমাদ গুণলাম। কি করা যায়। এ সব ক্ষেত্রে অভিনেতা-অভিনেত্রীদের অনুপ্রাণিত করবার কতগুলো কায়দা আবিষ্কার করেছিলাম আমরা দুজন। টাইরনের ওপর তারই একটি প্রয়োগ করলাম।

হেনরি ইশারা করতেই মিথ্যে ঝগড়া শুরু করে দিলাম আমরা। উপলক্ষ্য একটা আলো। হেনরির অভিযোগ আলোটা ঠিক-ভাবে বসান হয় নি। আমি বললাম, কিছু ভুল হয় নি, ঠিকই হয়েছে।

হেনরি ভীষণ চটে যাবার ভান করে বলল, 'না ঠিক হয় নি। সরিয়ে দাও আলোটা। ছবির পরিচালক আমি; আমি যা বলব তা-ই হবে।'

'এ সব ব্যাপার আমি তোমার চেয়ে অনেক বেশি বুঝি,' জবাব দিলাম আমি, 'আমি বলছি, আলোটা যেখানে আছে সেখানেই থাকবে।'

আমরা যখন ঝগড়া করছি টাইরন তখন পোষাক পরে ছবি তোলার জন্যে তৈরি হয়ে বসে আছে। আমরা লক্ষ্য করছি টাইরনের আইরিশ মেজাজ ধীরে ধীরে চড়ছে। ও নিশ্চয়ই মনে মনে খুব বিরক্ত হয়ে ভাবছে, 'আমি বসে রয়েছি সাজ-পোষাক পরে, ছবি কি রকম হবে তাই নিয়ে দুশ্চিন্তায় অস্থির হয়ে আছে মন আর ওরা দুজন কিনা একটা সামান্য ব্যাপার নিয়ে মেয়েদের মতো ঝগড়া শুরু করে দিয়েছে!'

অবশেষে আর সহ্য করতে পারল না টাইরন। চিৎকার করে উঠল, 'তোমরা কি ঝগড়া বন্ধ করে কাজটা করবে দয়া করে!'

লক্ষ্য করলাম, চোখ জ্বলছে টাইরনের, বুক ওঠানামা করছে।

হেনরি ইশারা করল আমাকে। ক্যামেরা চালু হল আবার। আমরা জানতাম—কাজের প্রয়োজনেই জানতে হয়েছিল আমাদের—কেউ এরকম ভীষণ রেগে গেলে তার রক্তের চাপ স্বাভাবিক অবস্থায় ফিরে আসতে প্রায় পাঁচ মিনিট সময় নেয়। আমার কাজের পক্ষে পাঁচ মিনিট যথেষ্ট সময়। ছবি তোলা হল। টাইরনের মাথায় মুকুট পরান হচ্ছে এবং সেই সম্মান যেন অভিভূত করে ফেলেছে তাকে। চোখ উজ্জ্বল হয়ে উঠেছে, বুক কাঁপছে। সত্যিই চমৎকার হয়েছিল সেই দৃশ্যের ছবিগুলো। অথচ আমরা তো তার পড়ন্ত রাগের ছবি তুলেছিলাম মাত্র।

দর্শক

এশিয়ান টেবল টেনিস প্রতিযোগিতা

সিঙ্গাপুরে আয়োজিত অষ্টম এশিয়ান টেবল টেনিস প্রতিযোগিতার মোট সাতটি খেতাবের মধ্যে জাপান এই ৬টি খেতাব জয়ী হয়ে বিরাট সাফল্যের পরিচয় দিয়েছে—পুরুষ ও মহিলাদের দলগত বিভাগের দুটি এবং ব্যক্তিগত বিভাগের চারটি খেতাব (পুরুষদের সিংগলস ও ডাবলস, মহিলাদের ডাবলস এবং মিক্সড ডাবলস)। মহিলাদের সিংগলস খেতাব পেয়েছে কোরিয়া।

এই নিয়ে আটবারের প্রতিযোগিতার জাপান উপর্যুপরি তিনবার পুরুষদের দলগত বিভাগের পুরস্কার বরোদা কাপ এবং উপর্যুপরি তিনবার মহিলাদের দলগত বিভাগের পুরস্কার কমলা রামনুজন কাপ জয়ী হল। এ পর্যন্ত জাপান পাঁচবার করে বরোদা এবং রামনুজন কাপ পেয়ে উভয় বিভাগেই সর্বাধিকবার কাপ জয়ের রেকর্ড করেছে।

প্রতিযোগিতার মোট সাতটি অনুষ্ঠানের ফাইনালে মাত্র এই দুটি দেশ খেলেছিল—জাপান এবং দক্ষিণ কোরিয়া। তবে জাপানের প্রাধান্যই উল্লেখযোগ্য। জাপান পুরুষ ও মহিলাদের দলগত বিভাগের ফাইনালে দক্ষিণ কোরিয়ার সঙ্গে খেলেছিল এবং ব্যক্তিগত বিভাগের মোট পাঁচটি অনুষ্ঠানের মধ্যে চারটি অনুষ্ঠানে—পুরুষদের সিংগলস ও ডাবলস, মহিলাদের ডাবলস এবং মিক্সড ডাবলসের ফাইনালে কেবল জাপানের খেলোয়াড়রাই পরস্পর খেলেছিলেন। একমাত্র মহিলাদের সিংগলস ফাইনালে জাপানের খেলোয়াড় উঠতে পারেননি, সেখানে দুজনই ছিলেন দক্ষিণ কোরিয়ার।

ফাইনাল খেলা

দলগত চ্যাম্পিয়ানসীপ

পুরুষ বিভাগ (বরোদা কাপ) : জাপান ৩—২ খেলায় দক্ষিণ কোরিয়াকে পরাজিত করে।

মহিলা বিভাগ (কমলা রামনুজন কাপ) : জাপান ৩—২ খেলায় দক্ষিণ কোরিয়াকে পরাজিত করে।

ব্যক্তিগত বিভাগ

পুরুষদের সিংগলস : বিশ্ব চ্যাম্পিয়ান নবুহিকো হাসেগাওয়া (জাপান) ২১—১৭, ২১—১৬, ৯—২১ ও ২১—১০ পয়েন্টে মুসুরু কোনোকে (জাপান) পরাজিত করেন।

মহিলাদের সিংগলস : উন কি সুক (কোরিয়া) ২১—১৯, ১১—২১, ১০—২১, ২১—১৮ ও ২১—১৮ পয়েন্টে চোই জাঙ্গ সুককে (কোরিয়া) পরাজিত করেন।

পুরুষদের ডাবলস : মিটচুরু কোনো এবং সিগিয়ো ইটো (জাপান) ২১—২২, ২১—১৮ ও ২১—১৭ পয়েন্টে নবুহিকো হাসেগাওয়া এবং হাজিমি কাগিমোটোকে (জাপান) পরাজিত করেন।

মহিলাদের ডাবলস : সাচিকো মোরিসাওয়া এবং ফাইকো হিরোতা (জাপান) ২২—২০, ২০—২২, ১৭—২১, ২১—১৭ ও ২১—১২ পয়েন্টে আকিকো নাগাতা এবং জুনিক আউ-জোকিকে (জাপান) পরাজিত করেন।

মিক্সড ডাবলস : টেটসু ইমোই এবং মিকো হিরানো (জাপান) ১৪—২১, ২১—১৯, ২১—১৯ ও ২২—২০ পয়েন্টে আকিকো নাগাতা এবং নবুহিকো হাসেগাওয়াকে (জাপান) পরাজিত করেন।

ইংল্যান্ড বনাম পাকিস্তান

দ্বিতীয় টেস্ট ক্রিকেট

পাকিস্তান : ১৪০ রান (সৈয়দ আমেদ ৬৪ রান। হিগস ৩৫ রানে ৪ এবং আরনোল্ড ৩৫ রানে ৩ উইকেট)
ও ১১৪ রান (সৈয়দ আমেদ ৬৮ রান। আন্ডারউড ৫২ রানে ৫, হিগস ৮ রানে ২ এবং টিটমাস ৩৬ রানে ২ উইকেট)

ইংল্যান্ড : ২৫২ রান (৮ উইকেটে ডিক্লেয়ার্ড। কেন ব্যারিংটন নটআউট ১০৯ এবং টম গ্রেভেনী ক্লোজ ৪১ রান। আসিফ ৭২ রানে ২ এবং নিয়াজ ৭২ রানে ২ উইকেট)
ও ৩ রান (কোন উইকেট না পড়ে)

প্রথম দিন (আগস্ট ১০) :
পাকিস্তানের প্রথম ইনিংস ১৪০ রানের মাথায় শেষ হলে ইংল্যান্ড বাকি সময়ের খেলায় প্রথম ইনিংসের কোন উইকেট না খুইয়ে ৪ রান সংগ্রহ করে।

দ্বিতীয় দিন (আগস্ট ১১) :
ইংল্যান্ডের প্রথম ইনিংসের ৪ উইকেট পড়ে ১১৯ রান দাঁড়ায়। বৃষ্টির দরুণ পুরো সময় খেলা হয়নি।

তৃতীয় দিন (আগস্ট ১২) :
ইংল্যান্ডের প্রথম ইনিংসের খেলায় ২৫২ রান দাঁড়ায় (৮ উইকেটে)। দুটো উইকেট হাতে নিয়ে ইংল্যান্ড ১১২ রানে অগ্রগামী হয়।

চতুর্থ দিন (আগস্ট ১৪) :
বৃষ্টির দরুণ খেলা আরম্ভই হয়নি।

পঞ্চম দিন (আগস্ট ১৫) :
ইংল্যান্ড ব্যাট করতে না নেমে তৃতীয় দিনের ২৫২ রানের মাথায় (৮ উইকেটে) প্রথম ইনিংসের খেলার সমাপ্তি ঘোষণা করে। পাকিস্তানের দ্বিতীয় ইনিংস মাত্র ১১৪ রানের মাথায় শেষ হলে ইংল্যান্ড দ্বিতীয় ইনিংসের কোন উইকেট না খুইয়ে জয়লাভের প্রয়োজনীয় ৩ রান তুলে ১০ উইকেটে জয়ী হয়।

ট্রেন্ট ব্রিজ (নটিংহাম) মাঠে অনুষ্ঠিত ইংল্যান্ড বনাম পাকিস্তানের দ্বিতীয় টেস্ট খেলায় ইংল্যান্ড ১০ উইকেটে জয়ী হয়ে ১৯৬৭ সালের টেস্ট সিরিজে ১—০ খেলায় অগ্রগামী হয়েছে। এই সিরিজের লর্ডস মাঠের প্রথম টেস্ট ড্র গেছে। সুতরাং তৃতীয় অর্থাৎ শেষ টেস্ট খেলার ফলাফল যদি অমীমাংসিতই থাকে তাহলেও ইংল্যান্ড 'রাবার' জয়ী হবে। পাকিস্তানের বিপক্ষে এই দ্বিতীয় টেস্টে ইংল্যান্ডের জয়লাভ নিঃসন্দেহে খেলায় নাটকীয় সমাপ্তি বলা যায়। প্রথম তিনদিনে খেলার সাড়ে পাঁচঘণ্টা সময় বৃষ্টির জন্যে ধুয়ে যায় এবং একই কারণে চতুর্থ দিনে খেলা আরম্ভ করাই সম্ভব হয়নি। শেষ দিনে প্রথম ইনিংসে ইংল্যান্ড ব্যাট করতে নামেনি; তৃতীয় দিনের ২৫২ রানের (৮ উইকেটে) মাথায় তারা প্রথম ইনিংসের সমাপ্তি ঘোষণা করে। এই সময়ে ইংল্যান্ড প্রথম ইনিংসের খেলায় ১১২ রানে এগিয়ে ছিল এবং হাতে খেলার সময় ছিল মাত্র একদিনের। সুতরাং খেলায় নিশ্চিত জয়-পরাজয় সম্পর্কে অনেকেই হাল ছেড়ে দিয়েছিলেন। অপর দিকে বৃষ্টিতে খেলা ভণ্ডুল হওয়ার সম্ভাবনাও কম ছিল না। শেষ ভরসা ছিল অঘটন ঘটনা। শেষ পর্যন্ত তাই ঘটলো। পঞ্চম অর্থাৎ শেষ দিনের লাঞ্চের সময় পাকিস্তানের রান ছিল ৭১—চারটে উইকেট পড়ে। লাঞ্চের ঠিক আগে প্রথম টেস্ট খেলার নায়ক হানিফ মহম্মদ তাঁর মাত্র ৪ রানের মাথায় আউট হন। লাঞ্চের পর ইংল্যান্ডের লেফটআর্ম স্পিনার ডেরেক আন্ডারউড মাত্র ১০ ওভার বল দিয়ে ২৩ রানের বিনিময়ে ৫টা উইকেট নিয়ে ইংল্যান্ডকে জয়যুক্ত করেন। মাত্র ১১৪ রানের মাথায় পাকিস্তানের দ্বিতীয় ইনিংস শেষ হলে ইংল্যান্ড জয়লাভের প্রয়োজনীয় মাত্র ৩ রান তুলতে দ্বিতীয় ইনিংস খেলতে নামে। লাঞ্চের পর পাকিস্তানের দ্বিতীয় ইনিংস মাত্র একঘণ্টা দশ মিনিট টিকেছিল। সুতরাং খেলা ভাঙার নির্দিষ্ট সময়ের দুঘণ্টা আগেই খেলায় জয়-পরাজয়ের নিষ্পত্তি হয়। গত পাঁচ বছরে এবং হানিফ মহম্মদের নেতৃত্বে দশটি টেস্ট খেলায় পাকিস্তানের এই প্রথম পরাজয়।

মুষলধারে বৃষ্টিপাত এবং আলোর অভাবে প্রথম দিনে পুরো সময় খেলা হয় নি। ইংল্যান্ডের পক্ষে নবাগত টেস্ট খেলোয়াড় ছিলেন পেস বোলার জিওফ আরনল্ড এবং উইকেটকিপার এ্যালান নট। পাকিস্তান টসে জয়ী হয়ে প্রথম ব্যাট করার দান নিয়ে মোটেই সুবিধা করতে পারে নি। লাঞ্চের সময় তাদের রান দাঁড়ায় ৬৯ (৩ উইকেটে) এবং চা-পানের সময় ১৪০ (৮ উইকেটে)। দলের ১০৪ রানের মাথায় ৫ম উইকেট পড়েছিল। পাকিস্তানের অতি-নির্ভরশীল ব্যাটসম্যান অধিনায়ক হানিফ মহম্মদ তাঁর মাত্র ১৬ রানের মাথায় আন্ডারউডের বল খেলতে গিয়ে টিটমাসের হাতে 'ক্যাচ' তুলে আউট হন। দলের তখন ১১৬ রান—এদিকে ৬ষ্ঠ উইকেটের পতন। ১৪০ রানের মাথায় পাকিস্তানের প্রথম ইনিংসে

শেষ হলে বাকী সময়ে প্রথম ইনিংসে কোন উইকেট না খুইয়ে ইংল্যান্ড ৪ রান সংগ্রহ করেছিল।

দ্বিতীয় দিনের খেলার সময়ে বজ্রধ্বনি-সহ প্রচণ্ড ঝড়-বৃষ্টি হয়। দমকল বাহিনীর সাহায্যে হাজার হাজার গ্যালন জল খেলার মাঠ থেকে নিষ্কাশন করতে হয়েছিল। বৃষ্টি এবং আলোর অভাবে প্রায় ২ ঘণ্টা ৪৫ মিনিটের মত খেলার সময় বাতিল হয়। লাঞ্চের সময় কোন উইকেট না পড়ে ইংল্যাণ্ডের ১৮ রান দাঁড়ায়। দ্বিতীয় দিনে ইংল্যাণ্ডের ৪ উইকেট পড়ে ১১৯ রান উঠেছিল। অপরাজিত ছিলেন ব্যারিংটন (৩৪ রান) এবং ক্লোজ (১৬ রান)।

তৃতীয় দিনেও আবহাওয়ার অবস্থা একই ছিল। খেলার মাঠ এবং প্যাভিলিয়ান—এই দুই দিকে খেলোয়াড় এবং আম্পায়ারদের অনেকবার ছুটোছুটি করতে হয়েছিল। খেলোয়াড়দের সঙ্গে যেন জলাধিপ বরুণদেবও পরম উৎসাহের সঙ্গে ক্রিকেট খেলতে নেমেছিলেন। চা-পানের সময় ইংল্যাণ্ডের রান দাঁড়ায় ২০২ (৫ উইকেটে) এবং তৃতীয় দিনের খেলার শেষে ২৫২ (৮ উইকেটে)। কেন ব্যারিংটন ১০৯ রান করে অপরাজিত থাকেন। ট্রেন্ট ব্রিজ মাঠের টেস্টে ব্যারিংটনের এই প্রথম সেঞ্চুরী—অপর দিকে তাঁর টেস্ট খেলোয়াড়-জীবনে ১৮তম সেঞ্চুরী। সুদীর্ঘ ৬ ঘন্টা ২৪ মিনিট ব্যাট করে ব্যারিংটন তাঁর এই ১০৯ রান সংগ্রহ করেছিলেন—বাউন্ডারী মেরেছিলেন মাত্র পাঁচটা। ইংল্যাণ্ড অত্যন্ত সতর্কতার সঙ্গে উইকেট রক্ষা করে খেলেছিল—সামান্যও ঝুঁকি নেয় নি। তৃতীয় দিনের খেলার শেষে হিসাব নিয়ে দেখা গেল, তিন দিনে সাড়ে পাঁচ ঘন্টার মত খেলার নির্দিষ্ট সময় বৃষ্টির কবলে গেছে, অর্থাৎ খেলা হয় নি।

চতুর্থ দিনে বৃষ্টির দরুণ খেলা আরম্ভই হয় নি। খেলার এই অবস্থায় অনেকেই খরচের খাতায় এই দ্বিতীয় টেস্ট খেলাটি লিখে দিয়েছিলেন, অর্থাৎ পঞ্চম দিনে বৃষ্টির দরুণ খেলা হয় পরিত্যক্ত হবে অথবা খেলা হলেও ফলাফল অমীমাংসিত থেকে যাবে। যাঁরা অঘটন ঘটনায় বিশ্বাসী তাঁরা কিন্তু হাল ছাড়েন নি।

পঞ্চম দিনে প্রথম ইনিংসের খেলায় ইংল্যাণ্ড ব্যাট করতে আর নামে নি। তৃতীয় দিনের খেলার শেষে তাদের যে ২৫২ রান (৮ উইকেটে) দাঁড়িয়েছিল তার উপরই প্রথম ইনিংসের সমাপ্তি ঘোষণা করেন অধিনায়ক ব্রায়ান ক্লোজ। ইংল্যাণ্ডের লেফট আর্ম স্পিন বোলার ডেরেক আন্ডারউড দলকে জয়লাভের পথে সুপ্রতিষ্ঠিত করেন। শেষ দিনের খেলার এক সময়ে তাঁর বোলিং পরিসংখ্যান ছিল ১০ ওভারে মাত্র ২৩ রান দিয়ে ৫টা উইকেট। দ্বিতীয় ইনিংসের খেলায় তাঁর চূড়ান্ত পরিসংখ্যান দাঁড়ায় ৫২ রানে ৫টা উইকেট। পঞ্চম দিনের খেলা ভাঙ্গার নির্দিষ্ট সময়ের প্রায় দু ঘন্টা আগে ইংল্যাণ্ড জয়লাভের প্রয়োজনীয় ৩ রান সংগ্রহ করে ১০ উইকেটে জয়ী হয়।

প্রথম বিভাগের ফুটবল লীগ

গত সপ্তাহে (আগস্ট ১৪-১৯) অনুষ্ঠিত প্রথম বিভাগের ক্যালকাটা ফুটবল লীগ প্রতিযোগিতার ৯টি খেলার সংক্ষিপ্ত ফলাফল : ৭টি খেলায় জয়-পরাজয়ের নিষ্পত্তি এবং ২টি খেলা ড্র।

গত বছরের লীগ চ্যাম্পিয়ান ইস্টবেঙ্গল দল আলোচ্য সপ্তাহে ১—০ গোলে খিদিরপুর এবং ২—০ গোলে স্পোর্টিং ইউনিয়নকে পরাজিত করে ২৭টি খেলায় ৪৭ পয়েন্ট সংগ্রহ করার সূত্রে লীগ তালিকার প্রথম স্থানে আছে। তাদের আর একটা খেলা বাকি (মোহনবাগানের বিপক্ষে তাদের যে খেলাটি বৃষ্টির দরুণ পরিত্যক্ত হয়েছিল)। অপরদিকে লীগ তালিকার দ্বিতীয় স্থান অধিকারী মহমেডান স্পোর্টিং আলোচ্য সপ্তাহে ২—০ গোলে কালীঘাট এবং ২—০ গোলে খিদিরপুর দলকে পরাজিত করেছে। ২৬টা খেলায় তাদের ৪৬ পয়েন্ট দাঁড়িয়েছে—ইস্টবেঙ্গল দলের থেকে একটা কম খেলে বর্তমানে এক পয়েন্টের ব্যবধানে দ্বিতীয় স্থানে আছে। মহমেডান স্পোর্টিং দলের আর দুটো খেলা বাকি—দুই রেল দলের (বি এন আর এবং ইস্টার্ণ রেল) সঙ্গে। লীগ চ্যাম্পিয়ানসীপের লড়াই এখন এই দুই দলের মধ্যেই সীমাবদ্ধ। একমাত্র মহমেডান দলই এখনও খেলায় অপরাজিত আছে।

ফুটবল প্রসঙ্গ

কমল ভট্টাচার্য

প্রতিদ্বন্দ্বিতায় অংশ নেওয়াটাই বড় । অলিম্পিকের সেই আপ্তবাক্যটি রা পুরোপুরি মেনে চলেছি। আজ নয়, দিন ধরে। ভারতীয় দলের মারদেকা খেলতে যাওয়ার ব্যাপারটা হল নকটা তাই। জয়লাভের জন্যে নয়। সার স্ট্যান্ডার্ড বাড়াবার জন্যেও নয়। ধু সৌজন্যরক্ষার জন্যেই ভারতীয় দল লম্বা সফরে পাড়ি দিয়েছে। কোন-মে দল গড়ে ঠেলে পাঠিয়ে দিয়ে মুখ রা করা। সে মুখে চুনকালি মাখলেও কিবা সে যায়। যত এসে যায় খেলোয়াড়দের। পবাদ ত' তাঁদেরই প্রাপ্য। এত সাজগোজ রে তাঁদের পাঠান হল কি জন্যে। কত র্থও ব্যয় হল। সবটাই অপব্যয়, পণ্ডশ্রম। দের দিয়ে কি হবে? এমনই ধারণা কলের।

ঠিক তাই। কর্তৃপক্ষরা নির্বিকার চিত্তে সাজা খেলোয়াড়দের দিকে আঙুল াড়িয়ে দিয়ে বলবেন—মারতে হয় মার। াখতে হয় রাখ। আমরা বাবা নাচার। এত করেও মন পেলাম না। এত আর ওষুধ নয় গিলিয়ে দোব। যত সব 'ডাল-হেডেড'। সত্যিই ত' লজ্জায় কি তাঁরা মাথা তুলতে পারছেন। তাঁদের এত চেষ্টাতেও ভারতীয় ফুটবলের উন্নতি হল না। একটা ট্রফিও হাতে করে তারা তুলে ধরল না। তবে আশার কথা, ভারতীয় দল আশার অতিরিক্ত ভাল খেলছে। তবে তার মানে এই নয় যে, আমাদের আহ্লাদে আটখানা হতে হবে। এ খেলার পরিপ্রেক্ষিতে আমি কিছু বলতে চাই না। তবে ভবিষ্যতের জন্যে আমরা কি আরও সাবধান হতে পারি না।

এই হল তাদের কথা। যাঁরা প্রতিটি খেলার কলকাঠি নাড়ছেন। উঠতে বসতে যাঁরা নানান পরিকল্পনার কথা মুখে শুধু উচ্চারণ করছেন। কিন্তু তাঁদের প্ল্যান এবং প্রোগ্রেসের হিসেব কাগজে-কলমেই রয়ে গেল। কাজে আর কতটুকু।

মারদেকায় যাবার প্রস্তুতি নিয়ে কর্তৃপক্ষের দিনে-রাতে ঘুম ছিল না। হাতে পড়ে আছে কলকাতার মাঠের লীগ ম্যাচ। খেলোয়াড় বলতে সবই তাঁদের। তাঁদেরই ত' যত মাথাব্যথা। সবদিক সামাল দিতে হবে ত'। তারই মধ্যে মারদেকা। ঠিক হল ক্যাম্প এবং অনুশীলন হবে। অনু-শীলনী খেলাও হল। হঠাৎ টিমও তৈরী হল। ক্যাম্পের ব্যাপারটা হাস্যাস্পদ ছাড়া আর কিছুই নয়। দলের নিয়মিত খেলো-য়াড়েরাও অনেকেই ক্যাম্পে যোগদান করেননি। কলকাতার মাঠের বহু নুর্য-চন্দ্রেরা তাঁদের দলের খেলা নিয়ে এত ব্যস্ত যে, মারদেকা সফরের ব্যাপারটা তাঁদের কাছে নেহাৎই বেড়িয়ে আসার মত।

এ ব্যাপারে বলার ছিল। যেখানে দল বলতে কিছু নেই, সেখানে কোন প্রতি-যোগিতায় যোগদানের দরকার কি? তবু বুঝতাম যদি এঁরা কতকগুলি আনকোরা খেলোয়াড়দের পাঠাচ্ছেন অভিজ্ঞতা সঞ্চয়ের জন্যে। অন্ততঃ সৌজন্যরক্ষার ব্যাপারে সেটা কাজের কাজ হত। কিন্তু বর্ষীয়ান খেলোয়াড়দের পাঠিয়ে কি লাভ হল? হার যেখানে অবধারিত। আশা যেখানে সীমিত সেখানে বহ্বারম্ভের কি দরকার? ঐ গাল-ভরা খেলোয়াড়দের নাম নিয়ে সেখানে কি কোন চমক সৃষ্টি করবে? প্রমাণ হাতে-নাতে পড়ে রয়েছে। ভারতীয় দলের তরুণ খেলোয়াড় প্রসিয়াস-এর চমকপ্রদ খেলা। এ প্রসঙ্গে একটা কথা মনে পড়ে গেল। কিছুদিন আগে প্রাক্তন ফুটবল-খেলোয়াড় করুণা ভাচার্যের সঙ্গে ফুটবলের খেলার মান নিয়ে আলোচনা করেছিলাম। সেদিন আমার বক্তব্য বিষয় ছিল, জাতীয় প্রতি-যোগিতায় বাংলার অবনতির কারণ কি। করুণা ভট্টাচার্য কোনরকম সঙ্কোচ না করেই বলেছিলেন—সার্ভিসেস দলের জয়ের মূলে ছিল প্রকৃত সাধনা এবং নিষ্ঠা। মিলিটারীদের চালচলনের মধ্যে রয়েছে নিয়মানুবর্তিতা। যেটা খেলার সবচেয়ে বড় জিনিস। বাংলার কেন, ভারতীয় সব রাজ্যের মধ্যে তারা যে শ্রেষ্ঠত্বের পরিচয় দিয়েছে তার কারণ হল সেইটাই। তাদের খেলায় কোন চমক সৃষ্টি হয়নি বটে, তবে যেটা ছিল সেটা নেহাৎই উপেক্ষা করার মত নয়। দলের ঐক্যতাবোধই তাদের জয় এনে দিয়েছিল, সে বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই। কথাটা খুব খাঁটি। স্বীকার করতে বাধা হচ্ছে সে দৃষ্টান্তের আর এক নজির দেখে। হেমু অধিকারীর পরিচালনায় ইংল্যান্ড সফরে ভারতীয় স্কুল ক্রিকেট দল যে আশা ও উদ্দীপনা সৃষ্টি করেছে, তা দশমুখে প্রশংসা করার মত। শুধু এ ব্যবস্থা আমাদের দেশেই নেই। বিশ্বের প্রতিটি দেশের খেলাধুলার ভার রয়েছে মিলিটারীর হাতে। এটা কি খুব শক্ত কাজ? তবে বারবার এই ভুল হচ্ছে কেন? তার চেয়ে অংশ না নেওয়াই হত ভাল। তাতে লজ্জা কম হত। অন্ততঃ ভাল করে গড়া-পেটার কাজে মনপ্রাণ সমর্পণ করবার সময় পাওয়া যেত। যেমন পাকিস্থান করেছে।

ফুটবল প্রসঙ্গে শেষ কথা বললেন উমাপতি কুমার। বাংলা তথা ভারতীয় ফুটবলের অন্যতম প্রাক্তন খেলোয়াড়। আজ থেকে পঞ্চাশ বছর আগে কলকাতার মাঠে তিনি আসর জমিয়ে রেখেছিলেন। আজও ফুটবল খেলায় ইনসাইড ফরো-য়ার্ডের কোন নিখুঁত থুরু পাশ দেখলে উচ্ছ্বাসভরে বলে উঠি— 'দ্যাখ ঠিক যেন কুমারবাবুর থুরু পাশ।' কুড়ি বছর ধরে তিনি খেলেছেন। আর আজও তিনি খেলার মাঠে নিয়মিত দর্শক। একবার প্রশ্ন করে-ছিলাম কুমারবাবুকে —'খেলার পদ্ধ ত আজকাল অনেক বদলে গেছে। বিশ্বের খেলার পদ্ধতির সঙ্গে সামঞ্জস্য রেখে আমাদের চলতে হচ্ছে। কিন্তু তাতে কি খেলার কোনও উন্নতি হয়েছে?' বৃদ্ধ মানুষটি একবার কি যেন ভাবলেন। তার-পর খুব আস্তে গুছিয়ে বললেন—'বলা শক্ত। আমাদের দেশে তেমন শক্তিশালী দল কোথায়? আগেকার দিনে দু'একটা স্থানীয় দল ছাড়া বাকিগুলো সব ছিল বিদেশী-দল। তারা খুবই দুর্ধর্ষ ছিল। সেইসব দলের বিরুদ্ধে পাল্লা দিয়ে খেলেছি। কিন্তু আজ ভারতে তেমন শক্তিশালী দল কোথায়? তাই বাইরের আন্তর্জাতিক খেলায় আমাদের বিপর্যয় খুব বেশী করে চোখে পড়ে। কাজেই উন্নতি যে কি ধরনের হয়েছে তা অনুমান করা শক্ত নয়।' আমাকে চুপ ক'রে থাকতে দেখে কুমারবাবু বললেন— 'ব্যাপারটা আরও খুলে বলি। আজকালকার খেলোয়াড়েরা যেন যন্ত্রের মত খেলে তাই না? ব্যক্তিগত চাতুর্যের বড় অভাব। আধুনিক পদ্ধতি আমরা এখনও ঠিক রপ্ত করতে পারিনি। রোজ রোজ পদ্ধতি বদলাচ্ছে আর তাই নিয়েই আমরা হিমসিম খাচ্ছি। ব্যক্তিগত নৈপুণ্য দেখাবার অবকাশ কোথায়? যে কোন পদ্ধতি রপ্ত করতে গেলে খুব কম করে ৪।৫ বছর সময় লাগেই।' কুমারবাবুর কথায় সায় দিয়ে বললাম, 'ফুটবল জগতে আমরা বহুদিন আছি। কিন্তু আজও যদি কোন উন্নতির পরিচয় না মেলে তাহলে সেটা দুঃখের কথা। কুমারবাবু আমতা আমতা করে বললেন— 'বুঝি না অসুবিধেটা কোথায়? এই দেখ না, আমার জায়গায় অন্ততঃ ৫।৬টি ভাল খেলোয়াড় ছিল। কিন্তু আমি ভাই আমার জায়গা সহজে ছেড়ে দিইনি। রীতিমত রেসারেসি চলত।'

বলা হয়নি, কুমারবাবু একটানা খেলে গেছেন ১৯১৬ সাল থেকে ১৯৩৬ সাল পর্যন্ত। আর আজকের অবস্থাটা হল ঠিক উল্টো। একজনের জায়গায় আর একজনকে হাজির করতে রীতিমত হিমসিম খেতে হয়। ভাবের বশেই বলে উঠলাম—'আজ ত কোন কিছুরই অভাব নেই। নানান টুর্ণামেণ্ট নানান প্রতিযোগিতা। কত ট্রফি, কত উপহার। অতি সহজেই যখন এগুলো পাওয়া যায় তখন অতিপরিশ্রমের প্রয়োজন কি?' কুমারবাবু ঐ কথায় কেন জানি না লজ্জা পেলেন। মাথা নীচু করে বললেন— 'হ্যাঁ ভাই, অনেক কষ্ট করেও বিশ বছর ধরে খেলেও তেমন নামকরা প্রথম শ্রেণীর টুর্ণামেণ্ট জিততে পারিনি।' দেখলাম কুমারবাবুর মুখে মিটিমিটি হাসি। কিন্তু হঠাৎ তিনি গম্ভীর হলেন। উদাসনয়নে বললেন, 'একি খালি পা, তায় প্রাকৃতিক দুর্যোগ। মিলিটারীর সঙ্গে জলমাঠে পাল্লা দেওয়ার সাধ্য কোথায়? বড় দুরবস্থায় আমাদের দিন কেটেছে।" বললাম—'সে সমস্যা মেটাবার কি কোন উপায় তখন হাতে ছিল না?' কুমারবাবুর মুখে চোখে বিরক্তির ভাব ফুটে উঠল। বেশ জোর গলায় বললেন—'শুধু বুট পায়ে দিয়ে খেলতে শিখেছি বলেই যে সে সমস্যা আজ মিটেছে

তা নয়। আমরা যে সময়ে ফুটবল খেলি সেটা কি উপযুক্ত সময়? ফুটবল সুরু হয় প্রচন্ড তাপে, বৈশাখ জ্যৈষ্ঠের অসহ্য গরমে। মাঝের সময়টা তবু ভাল। গুঁড়িগুঁড়ি বৃষ্টি পড়ে, ঠান্ডা হাওয়াতে খেলতে মন্দ লাগে না। কিন্তু শেষ সময়টা ভয়ঙ্কর। এমন অবস্থায় ফুটবল খেলা চলে না। বরং ওয়াটারপোলো খেলা জমে ভাল। অথচ আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে কোথাও এই ধরণের মাঠে ফুটবল খেলা হয় বলে আমার জানা নেই। আমরা কেন এই ব্যবস্থার পরিবর্তন করছি না। তার ওপর সপ্তাহে প্রতিটি খেলোয়াড়ের তিনটি করে ম্যাচ খেলতে হচ্ছে। এটা কি সম্ভব? এমন কোন কথা আছে যে ঠিক এই সময়ে ফুটবল খেলতে হবেই?'

কুমারবাবু বলে চললেন 'এই ধরনা একে এই প্রচন্ড গরম, ৫০ মিনিটের জায়গায় ৭০ মিনিট খেলা হচ্ছে এবং প্রতিটি খেলোয়াড়কে এই ৭০ মিনিট খেলা ছাড়া কলেজ এবং অফিসের পক্ষেও খেলতে হয়। তাহলে সত্যিকারের খেলা এদের কাছ থেকে কি করে আশা করি। অথচ শোনা যায় অন্য দেশের খেলোয়াড়রা সপ্তাহে একটি করে সত্যিকারের ম্যাচ খেলে আর বাকি দিনগুলো অনুশীলন করে।'

বললাম, 'কুমারবাবু আপনার সব কথাগুলো শোনবার মত। কিন্তু একটা কথা কিছুতেই ভুলতে পারছি না। বিশেষকরে সেটা আজকের ছেলেদের কাছে শিক্ষার বিষয়। ঐ যে বললেন কুড়ি বছর একনাগাড়ে খেলেছেন এবং আপনার জায়গায় বহু প্রতিভাবান খেলোয়াড় ছিলেন যাঁরা আপনারই জন্যে খেলতে পারেননি। আপনি বলতে পারেন এই কুড়ি বছর ধরে কি করে আপনার স্বাস্থ্য বজায় রেখেছিলেন?'

আমার কথা শুনে কুমারবাবু আবার লজ্জায় পড়লেন। উঠে দাঁড়িয়ে পড়ে তাঁর বক্তব্য পথে চলতে চলতেই সেরে নিলেন। বললেন—'আমাদের সময় প্রত্যেক খেলোয়াড়দেরই তাদের কাছে দলের স্বার্থটা এবং দলের প্রতি ভালবাসা এত প্রকট ছিল যার জন্য আমাদের সবসময়ে নিজের স্বাস্থ্যটাকে বজায় রাখতে হয়েছিল। আমরা সব-সময় সজাগ ছিলাম। আমি ভাল খেললে আমার দল জিতবে। খেলার মাঠে এইটাই ছিল আমাদের উদ্দেশ্য।"

ফুটবলের শ্রেষ্ঠাংশে

চন্দ্রেশ্বরপ্রসাদ
(মোহনবাগান)

জন পঞ্চাশেক ছেলে নিয়ে পাটনায় ফুটবল শিবির গড়েছিলেন বিখ্যাত খেলোয়াড় ও কোচ কিট্টু। এ'দের মধ্যে দুজন তাঁর বিশেষ নজরে পড়েছিলেন। প্রথমজন জোহা (বর্তমানে মহামেডান স্পোর্টিংয়ে খেলছেন) এবং অপরজন মোহনবাগানের চন্দ্রেশ্বরপ্রসাদ সিং। শক্ত সমর্থ লম্বা চওড়া চেহারা প্রসাদের। পরিশ্রমে সর্বদাই উৎসাহী। অফুরন্ত দম, জায়গা আগলে বিপক্ষের ফরোয়ার্ডদের ঠুঁটো জগন্নাথ করে রাখতে প্রসাদের খুব বেশি জুড়ি নেই। স্টপারের খেলোয়ার প্রসাদ কিন্তু প্রয়োজনে রাইটব্যাক, রাইটহাফ, লেফটব্যাক এবং লেফটহাফের জায়গাতেও কাজ চালিয়ে নিতে পারেন সমান তাল ঠুকে।

বিভিন্ন জায়গায় খেলা সম্পর্কে প্রসাদের বক্তব্যঃ "মনের জোর, দৈহিক সক্ষমতা এবং একটু চিন্তাশক্তি থাকলে সব জায়গায়ই কাজ চালিয়ে নেওয়া যায়। সবচেয়ে বড় কথা—ঝুঁকি নিতে হবে, মেহনত করতে হবে; ফাঁকির পথে পা বাড়ালে নিজেকেই বেকায়দায় পড়ে বেকুফ বনতে হয়।

"চার ব্যাক প্রথায় খেলা ছাড়া আজকের দিনে আর কোন বিকল্প নেই, কিন্তু সেই প্রথা অনুসরণে সবচেয়ে যে বড় মূলধন দম, তা আমাদের অনেকেরই নেই। আক্রমণের সময় এগিয়ে গেলে প্রতিপক্ষ উল্টো আঘাত হানলে আমরা ঠিকমত পিছিয়ে পড়ে জায়গা আগলাতে পারি না। বলা বাহুল্য এই দুর্বলতার জন্য দলের বিপর্যয় ঘটে। আর আজকের দিনে গড়ের মাঠে প্রিয় দলের বিপর্যয় ঘটলে তো রক্ষা নেই।"

পাটনার এক বর্ধিষ্ণু পরিবারে চন্দ্রেশ্বরপ্রসাদের জন্ম ১৯৪৪ সালে। নরা হাইস্কুল থেকে স্কুল ফাইনাল পরীক্ষা পাশ করে চন্দ্রেশ্বরপ্রসাদ ভর্তি হয়েছিলেন পাটনা ন্যাশনাল কলেজে। কিন্তু পড়াশুনা বেশি দূর হয়নি ফুটবল এবং পারিবারিক ব্যবসার জন্য। ১৯৫৯ সাল থেকে প্রসাদ খেলতে সুরু করেন পাটনা ফুটবল ক্লাবে। ১৯৬১ সাল পর্যন্ত এই পাটনা ফুটবল ক্লাবেই খেলেছেন। ১৯৬২ সালে যোগ দেন জামশেদপুরে ইণ্ডিয়ান টিউবে। ১৯৬০ সাল থেকে ১৯৬৪ সাল পর্যন্ত জাতীয় ফুটবলের বিভিন্ন আসরে বিহারের হয়ে প্রতিনিধিত্ব করার পর চন্দ্রেশ্বরপ্রসাদ এলেন কলকাতায় সিনিয়র ডিভিসনের বি এন আর দলের স্টপারের ভূমিকায়। ১৯৬৫ সাল থেকে নিরবচ্ছিন্নভাবে খেললেন বাংলা দলের

হয়ে। বি এন আর দলে এক বছর খেলে পরের বছর ইস্টবেঙ্গল ক্লাবে চলে যান প্রসাদ। কিন্তু সে শুধু একটি বছরের জন্যই। ইস্টবেঙ্গল থেকে চলে আসেন মোহনবাগানে। শেষোক্ত দলের হয়ে লীগ, শীল্ড, রোভার্স ও ডুরান্ডের প্রতিটি আসরে প্রসাদ অসাধারণ ক্রীড়াকৃতির স্বাক্ষর রেখেছেন।

আন্তর্জাতিক ফুটবলের আসরের সঙ্গে পরিচয় ঘটেছে প্রসাদের ১৯৬৪ সালে। জাপানের টোকিও মহানগরীতে আয়োজিত এশীয় যুব ফুটবল প্রতিযোগিতায় চন্দ্রেশ্বরপ্রসাদ ছিলেন ভারতীয় দলের অধিনায়ক। পরবর্তী পর্বে মালয়েশিয়ার মারদেকায় এবং ব্যাঙ্ককের পঞ্চম এশীয় ক্রীড়ানুষ্ঠানেও চন্দ্রেশ্বরপ্রসাদকে বাদ দিয়ে ভারতীয় দল গঠন করা সম্ভব হয়নি। ভারতীয় ফুটবল দলের অন্যতম খেলোয়াড়রূপে কিট্টুর সেই নজরেপড়া ছেলে চন্দ্রেশ্বরপ্রসাদ এই মুহূর্তে কুয়ালালামপুরে।

রাম বাহাদুর
(ইস্টবেঙ্গল)

"কলকাত্তা যানু পড়ছ, গুহসাহাব হেরণু মাঙদাইছ।" কথাটা শুনে গুর্খা যুবক একেবারে কিংকর্তব্যবিমূঢ় হয়ে পড়লেন। দেরাদুন নয়, দিল্লী নয়, একেবারে কলকাত্তা চলো।

"অথচ এ ডাক উপেক্ষা করাও যায় না, কেননা আর কেউ নয়, ডাক দিয়েছেন বীরবাহাদুর নিজে, তাই কলকাতায় আমায় আসতেই হোল।" দক্ষিণ কলকাতার ডোভার লেনের মেসবাড়ীতে নিজের বিছানার ওপর বসে বসে রামবাহাদুর নিজের গাওগাঁ মুলুককে আসার ভেতরকার কাহিনীটুকু বলছিলেন আমাকে। বাইরে তখন গা ছেড়ে বৃষ্টি নেমেছে।

ভারতীয় ফুটবলে আজ রামবাহাদুর নতুন করে পরিচিতির অপেক্ষা রাখেন না। সর্বজনস্নেহধন্য এক সার্থক খেলোয়াড় রামবাহাদুর। চলায়, বলায়, ওঠায়, বসায়, মাঠের বাইরে-ভেতরে এক আদর্শ খেলোয়াড় এই গাড়োয়ালী যুবক রামবাহাদুর। হাফব্যাকে খেলেন। খেলেন বুদ্ধি দিয়ে, চিন্তা দিয়ে, দৈহিক শক্তির অপ্রয়োজনীয় প্রয়োগ নেই একবিন্দু। পরিচ্ছন্ন ক্রীড়ারীতির এক উজ্জ্বল উদাহরণ রামবাহাদুর। খেলার মাঠে রামবাহাদুরকে কেউ কোনদিন ফাউল করতে দেখেছেন, এমন কথা কেউই বলতে পারবেন না। নিখুঁত পজিশন জ্ঞান, অফুরন্ত দম, অসাধারণ দৃঢ়তা, অননুকরণীয় প্রতিভার অধীশ্বর তিনি। ফুটবলের এতো ঐশ্বর্য থাকা সত্ত্বেও অহঙ্কার নেই এতটুকু। বিনয়নম্র, শান্ত পুরুষ রামবাহাদুর।

১৯৩৭ সালের ১৫ই ফেব্রুয়ারী
াদুনে রামবাহাদুরের জন্ম। জীবনে বহু
. বহু সম্মান পেয়েছেন ফুটবলের সূত্রে
; এখনো ফুটবলকে আঁকড়ে আছেন শুধু
াকে মন-প্রাণ দিয়ে ভালবাসেন বলে।
ানে ঘর-সংসার সব তুচ্ছ।

রামবাহাদুরের ফুটবলের হাতেখড়ি
াদুন ফরেস্ট হায়ার সেকেন্ডারী স্কুলে।
ারশিক্ষক শ্রীলালবাহাদুর গুরুংয়ের
হ। প্রথমে স্কুলে বি টিমে খেলতেন
ু বি টিম থেকে এ টিমে উঠে আসতে
ী সময় লাগলো না প্রতিভাধর রাম-
াদুরের। এরপর আন্তঃ স্কুল ফুটবলে
র্থা মিলিটারী স্কুলের সংগে খেলায়
লের চোখে পড়লেন। ১৯৫১ সালে
নাইনে পড়ার সময় দেরাদুন জুবিলান্ট
ডেকে নিয়ে গেল লীগ খেলতে—ছোট্ট ছেলে
বাহাদুরকে নিখিল ভারত মোহন্ত ফুট-
প্রতিযোগিতায়।

ইতিমধ্যে বাবা রাজবীর ছেত্রী সামরিক
নীর কেরানীর পদ থেকে অবসর
েন। সংসারে অভাব দেখা দিল। বাড়ী
ে খেলার মাঠ অনেক দূরে। কখনও
কলে, কখনও বা হেঁটেই মেরে দিতেন
মাইল পথ রামবাহাদুর। সেসব স্মৃতি
ও রামবাহাদুরের মনে আছে।

১৯৫৩ সালে ওগিলভি ফুটবল খেলতে
ন বিজয় ক্যান্টনমেন্টের হয়ে আজ
। সেমিফাইনালে হেরে গেল বিজয়
টনমেন্ট, কিন্তু হারের মাঝখানে সকলের
র পড়ে রইলেন রামবাহাদুর। হার
ছল করাচী স্পোর্টিংয়ের কাছে। তি
আর-এর হাফ সেন্টার ফরওয়ার্ড জি ডি
(গোগী) তখন বিজয় ক্যান্টনমেন্টের
ে খেলতেন। প্রসংগতঃ উল্লেখ করা যেতে
। রামবাহাদুর শুধু ফুটবল নয় হকি
ক্রিকেটেও সমান উৎসাহী খেলোয়াড়।
খেলতেন দেরাদুনে খালসা স্পোর্টিং
ক্রিকেট ইয়ংস্টার স্পোর্টিংয়ে। ডোরাই-
ের কাছে ক্রিকেট শিখেছিলেন। ১৯৫৫
বাম ও বীরবাহাদুর চাকরী নিলেন
দুন অর্ডন্যান্স কারখানায়। পরের বছর
সি এম ট্রফিতে ইস্টবেংগলের বিরুদ্ধে
য় ক্যান্টনমেন্টের হয়ে খেলার পরদিনই
াহাদুর তাঁকে ইস্টবেংগলের পক্ষ থেকে
ত্রণ জানালেন।

১৯৫৭ সালে কলকাতায় ইস্টবেংগলের
খেলতে নতুন পরিবেশে অসুবিধা
কিছুটা। কিন্তু রামবাহাদুরের ভাষায়
ইসী দেশ, ঐশী বেশ।' তাই সবকিছু
ে নিতে দেরী হোল না। ইস্টবেংগলের
জমজমাট দল, আমেদ, ধনরাজ, সি
ঘটক, ডাঃ কুমার দলে খেলছেন।
০ সালে রামবাহাদুরের নেতৃত্বে ইস্ট-
ল ডি সি এম ট্রফি পেল। ১৯৫৯ ও
০ সালে ভেটারেন্স ক্লাব রামবাহাদুরকে
র দু বছর 'সেরা খেলোয়াড়ের'
ান্য সম্মান দিলেন।

দেরাদুনের গোর্খা যুবক রামবাহাদুর
াষ ট্রফিতে বাঙলার প্রতিনিধিত্ব করেছেন
৮, ১৯৫৯ (চ্যাম্পিয়ান), ১৯৬১ এবং
২ (চ্যাম্পিয়ন) সালে। ১৯৫৮ সালে

ভারতীয় দলের হয়ে ব্রহ্ম সফর করেন। পরের বছর প্রাক ওলিম্পিকে আফগানিস্থান ও ইন্দোনেশিয়ার বিরুদ্ধে এবং ১৯৬০ সালে রোম ওলিম্পিকে ভারতের লেফট হাফব্যাকের দায়িত্ব পড়েছিল রামবাহাদুরের ওপরই। ১৯৬১ সালে মারদেকা সফরেও বাদ পড়েন নি। ১৯৬২ সালে জাকার্তায় এশীয় ক্রীড়ায় চ্যাম্পিয়ন ভারতের পক্ষে, ১৯৬৪ সালে প্রাক ওলিম্পিকে ইরাণের বিরুদ্ধে এবং ইস্রাইলে আয়োজিত এশীয় কাপে ভারতের প্রতিনিধিত্বের পর আন্ত-র্জাতিক ক্রীড়াক্ষেত্র থেকে সরে এসেছেন রামবাহাদুর।

অনেকক্ষণ ধরে আত্মস্মৃতিচারণ করছিলেন তিনি। রামবাহাদুর বললেন ঃ "বাঙলায় এসে প্রত্যাশার অনেক বেশী পেয়েছি। এতো আমি চাইনি, পাবো যে স্বপ্নেও ভাবিনি। আর কিছু আমি চাইও না। শুধু চাই, এই ইস্টবেংগল ক্লাবের পতাকাটি বুকে নিয়ে ফুটবলের অঙ্গন থেকে বিদায় নিতে। ইস্টবেংগল আমার ধ্যান, জ্ঞান। ইস্টবেংগল আমার কৈশোরের স্বপ্ন, যৌবনের লীলাভূমি, বার্ধক্যের বারাণসী।"

অসীম মৌলিক

(ইস্টবেংগল)

বোম্বে মেল ছাড়ার পহেলা ঘণ্টা পড়ে গেছে, হাওড়া স্টেশনের পাঁচনম্বর প্লাটফর্মে যাত্রীদের ব্যস্ততার শেষ নেই। এমন সময় দুম্ করে প্লাটফর্মের সবকটা আলো ফিউজ হয়ে গেল। চারদিকে হৈ হৈ চিৎকার—

কয়েক সেকেন্ড মাত্র। মই ঠেলতে ঠেলতে সেই ভীড়ের মধ্যে নীলরংয়ের উর্দিগায়ে লম্বাচওড়া একটি জোয়ান ছেলে হাজির হলেন; মিনিটখানেকের ভেতর আঁধার কেটে গেল, আলোয় আলোয় হেসে উঠলো সারা চত্বর। সেদিন সন্ধ্যায় হাওড়া স্টেশন প্লাটফর্মে যে ছেলেটি আলোর বন্যা এনেছিলেন তাঁর নাম অসীমানন্দ মৌলিক। কলকাতা ময়দানেও এসে দাঁড়িয়েছিলেন একমাঠ আলো নিয়ে, অনেক প্রতিশ্রুতি, অনেক সম্ভাবনার ইঙ্গিত নিয়ে। সে আজ বছর সাতেক আগের কথা।

সাধারণ মধ্যবিত্ত ঘরের ছেলে অসীম। সংসার চলতো জোড়াতালি দিয়ে। বাবা স্মরজিৎবাবু যতদিন বেঁচেছিলেন ততদিন যদিও বা কোনরকমে ঠেকা দিয়ে দিন চলতো, তাঁর মৃত্যুর পর দারিদ্র্য চরমে উঠলো। চার ভাই, তিনটি বোন এবং বিধবা মাকে নিয়ে অসীম অকূল পাথারে পড়লেন। কতই বা বয়েস তখন অসীমের। উপায়ান্তর না দেখে রেলের চাকরী নিয়ে চলে গেলেন গয়ায়। ছোট্ট ছেলে কিন্তু কাজ বড্ড পরি-শ্রমের। লোকো শেডে ইঞ্জিনের ক্লিনার। এমনি করে ইঞ্জিনের এবং সংসারের দুটো চাকাই ঘোরাতে লাগলেন অসীম। তারপর কালের চাকা ঘোরার সংগে সংগে অসীমের ভাগ্যের চাকাও ঘুরেছে। সংসারের দারিদ্র্য ঘুচেছে, ভাল চাকরীতে প্রতিষ্ঠিত হয়েছেন অসীম।

ফুটবল মাঠে অসীমের বলদৃপ্ত ভূমিকা যিনি না দেখেছেন তাঁকে বোঝান মুস্কিল। রক্তমাংসের গড়া মানুষমাত্রেই ভুল করে, ভুল করে না সাধারণতঃ মেসিন, কিন্তু সে মেসিনও তো এক একদিন বিকল হয়। অসীমও হয়ত মাঝে মাঝে ভুল করেন, হয়ত কখনও কখনও সমর্থকদের প্রত্যাশা কড়ায়-গণ্ডায় মেটাতে পারেন না, সেজন্য অসীমের দুঃখের অন্ত নেই। আবার যেদিন প্রত্যাশার চাইতেও বেশী সাফল্য দুহাত ভরে উপহার দেন সমর্থকদের সেদিনও আনন্দে বা গর্বে আত্মহারা হন না অসীম। সাফল্য ও ব্যর্থতায় সংযত ভূমিকা। দুটি পায়ে সমান সট, স্টীম ইঞ্জিনের মত ড্যাস আর দম, চমৎকার হেডিং এবং পজিসনজ্ঞান অসীমকে আজ নির্ভর-প্রত্যয়ী করে তুলেছে। এই আত্মপ্রত্যয়ের মূলধনে সমৃদ্ধ হয়ে কতবার যে তিনি অবিশ্বাস্য, অপ্রত্যাশিত ও অবিস্মরণীয় ঘটনার নায়কের ভূমিকা নিয়েছেন, তার কি ইয়ত্তা আছে? তাই এফ এ শীল্ডে হায়-দরাবাদের বিরুদ্ধে জ্বলন্ত গোলার মত দুটি সটে দুটি গোল, ১৯৬৫ সালের বিলম্বিত শীল্ড ফাইনালে মোহনবাগানের বিরুদ্ধে সেই দর্শনীয় গোল, এবারের লীগে মহমেডানের বিরুদ্ধে প্রথম খেলায় দূর থেকে বাঁ পায়ের সটের সেই গোলটি কি এত সহজেই ভোলবার? এক একটি গোল, এক একখানি পটে আঁকা ছবি যেন।

১৯৪২ সালের ৪ঠা নভেম্বর কলকাতায় অসীমের জন্ম। আদি বাড়ী যশোহর জেলার ঝিনাইদহের খাড়িখালি গ্রামে। লেখাপড়া করেছেন পার্ক ইনস্টিট্যুসন ও শ্যামবাজার বিদ্যাসাগর স্কুলে। এই বিদ্যাসাগর স্কুল থেকেই স্কুল ফাইনাল পাশ করেছেন অসীম। কলেজ—বিদ্যাসাগর। ময়দানে এসেছিলেন তৃতীয় ডিভিসনের এলবার্টের হয়ে। স্কুলে পড়ার সময় আন্তঃ স্কুল এবং কলেজে পড়ার সময় ১৯৬৫ সালে আন্তঃ বিশ্ব-বিদ্যালয় ফুটবলে কলকাতার প্রতিনিধিত্ব করেছেন কুরুক্ষেত্রে। কলকাতা সেবারের

চ্যাম্পিয়ান। এলবার্টে খেলার সময় উত্তর কলকাতার অনেকেই, বিশেষত সর্বশ্রী জীবন কুন্ডু (খেলাঘর) এবং রামসুন্দরবাবু অসীমকে নানাভাবে সাহায্য না করলে অসীম আজ ফুটবলের শ্রেষ্ঠাংশে এসে দাঁড়াতে পারতেন কিনা সন্দেহ। এ'দের সাহায্যের জন্য তাঁর কৃতজ্ঞতার অন্ত নেই। কি না দিয়েছেন এ'রা? জামা, কাপড়, ফুটবল বুট, ওষুধপত্তর, মায় ভাল পুষ্টিকর খাবারদাবার পর্যন্ত।

১৯৬১ সালে প্রথম ডিভিসনে হাত ধরে নিয়ে এসেন এরিয়ানের অভয়বাবু। নন্টু মিত্র এবং শচীন হালদার গড়েপিটে অসীমের গায়ে তুলে দিলেন সেন্টার ফরওয়ার্ডের ন' নম্বরের জামাটি। সে বছর অনেকগুলি গোল করলেন এবং তারই স্বীকৃতিতে জাতীয় ফুটবলে (বাঙ্গালোর) বাঙলা দলে স্থান পেলেন। ১৯৬৩ সালে সর্বশ্রী মন্টু বসু ও তারাপদ গুহ টেনে নিলেন অসীমকে ইস্টবেঙ্গলে। এখানে মাজাঘষা চললো ল্যাংচাবাবু এবং অমল দত্তের হাতে। ইস্টবেঙ্গল সেবার লীগ, শীল্ডে কিছু পেল না, শুধু রোভার্স কাপে রানার্স আপ হোল। পরের বছরও লীগে রানার্স আপ, ডুরান্ড ফাইনালে মোহনবাগানের বিরুদ্ধে পেনাল্টি "মিস" করলেন অসীম, সেক্ষেত্রেও ইস্টবেঙ্গল রানার্স-আপ। পরের বছর এর বদলা নিলেন অসীম আই এফ এ শীল্ডের বিলম্বিত ফাইনালে শেষমুহূর্তে জার্নাইলকে 'রং ফুটে' ফেলে ইস্টবেঙ্গলের জয়সূচক গোল দিয়ে। ১৯৬৬ সালে এলেন মোহনবাগানে কিন্তু পাটনায় প্রদর্শনী ম্যাচে হাঁটুতে চোট লাগায়—মরসুমটা প্রায় বসে বসেই কেটে যায় অসীমের।

স্টেট ব্যাঙ্কের কর্মচারী অসীম মৌলিক সন্তোষ ট্রফিতে বাঙ্গালার প্রতিনিধি করেছেন ১৯৬২ ও ১৯৬৬ সালে এবং রেলওয়ের পক্ষে খেলেছেন ১৯৬৩, ১৯৬৪ (চ্যাম্পিয়ন) এবং ১৯৬৫ সালে। ১৯৬৪ এবং ১৯৬৫ সালে মারদেকা ফুটবলে ভারতের সেন্টার ফরওয়ার্ড ছিলেন অসীম। হাঙ্গেরী, চেকোশ্লোভাকিয়া এবং রুশ ফুটবল দলের বিরুদ্ধে কলকাতায় আই এফ এ একাদশের হয়ে খেলার সৌভাগ্যও হয়েছে তাঁর।

বাঙলা দেশের ফুটবলে খ্যাতির উচ্চশিখরে উঠেছেন আজ অসীম মৌলিক। নিরলস অনুশীলন, ধৈর্য, নিষ্ঠা ও আত্মবিশ্বাসই তাঁকে এই ভূমিকায় এনে দিয়েছে। শৈশব, কৈশোর ও প্রাক-যৌবনের আর্থিক অসচ্ছলতাকে ইস্পাতকঠিন মনোবলে উপেক্ষা করেছিলেন, সে মনোবল অসীমের আজও অটুট, আজও নিটোল।

নানজাপ্পা পাপান্না
(মহঃ স্পোর্টিং)

হাঁ হাঁ করে উঠলেন নিজের নামের বানান দেখে ; নামটা লিখেছিলাম আমি নিজে —"পাপ্পানা"।

"কলকাতায় সবাই নাম উচ্চারণ করে ভুল, লেখে ভুল। আমার নাম পপান্না, পাপ্পানা নয়।" লোয়ার সার্কুলার রোডের মহমেডান স্পোর্টিং ক্লাব মেসে নিজের বিছানার ওপর বসে পাপান্না নিজের নামের সঠিক বানান ও উচ্চারণ বোঝাচ্ছিলেন আমায়। হালফিল কলকাতার বহুরূপী ময়দানে পাপান্না একটি মস্তবড় নাম। মহমেডান দলের আক্রমণভাগের সবচেয়ে শানানো তলোয়ার, রক্ষণভাগ ভেঙে খানখান করে গোলের পর গোল বানাতে এবারে পাপান্নার জুড়ি নেই। ক্ষিপ্র গতিবেগ, দুপায়ে জোরালো সট, "হেড" এবং সর্বোপরি প্রচন্ড "ড্যাস" তাঁকে স্থানীয় ফুটবলের শ্রেষ্ঠাংশে এনে দিয়েছে। পাপান্নাই এখন মহামেডানের মুখ্য নায়ক—সেন্টার ফরওয়ার্ড।

দক্ষিণী ফুটবল ঘরানার মানুষ পাপান্নার জন্ম ১৯৪৬ সালের জুন মাসে মহীশুর রাজ্যের হেমিজেতে। শিক্ষা বালভয় হাইস্কুলে। এখান থেকেই তিনি ম্যাট্রিকুলেশন পাশ করেছেন। দুঃখ আর দারিদ্র্যের আগুনে পোড়া পাপান্না মাকে হারিয়েছিলেন একেবারে শৈশবে কিন্তু বাবা নানজাপ্পা এবং বড় বোনেরা মার অভাব বুঝতে দেন নি পাপান্নাকে। সমস্ত দুঃখ-কষ্ট থেকে আগলে রেখেছেন ; মাতৃহারা পাপান্নার শত আবদার রক্ষা করেছেন।

কিন্তু তবু মাকে মনে পড়তো পাপান্নার, মায়ের যে বিকল্প নেই। গুমরে গুমরে কাঁদতো পাপান্না, কে'দে কে'দে ঘুমিয়ে পড়তো দুধের ছেলে। জেগে উঠে আবার কান্না। ভোলাবার জন্য বাবা নানজাপ্পা একদিন একটা ছোট্ট বল কিনে এনে দিলেন, বড় বল কোত্থেকেই বা দেবেন—তিনি সামান্য প্রাইভেট বাস ড্রাইভার। ছেলের মুখে হাসি ফুটে উঠলো। সেই ছোটবল নিয়ে মাতোয়ারা পাপান্না আর তাঁর বড় ভাই রামানা (মহমেডান স্পোর্টিংয়ের রাইট আউট)।

এমনি করে তাঁর জীবনে ফুটবল খেলার শুরু। স্কুলের খেলায় নাম ছড়িয়ে পড়লো বাঙ্গালোরে। ১৯৬৩ সালে মহীশুর কে

আর মিলস দল টেনে নিলেন পাপান্নাকে, সেই বছরই খেলেন এলাহাবাদে জুনিয়র জাতীয় ফুটবলে। দিল্লী ও মহীশুর সেবছর যুগ্ম-চ্যাম্পিয়ন। পরের বছর মহীশুর, অন্ধ্র, কেরালা ও মাদ্রাজের মধ্যে চতুর্দলীয় ফুটবল প্রতিযোগিতায়ও স্ব-রাজ্যের প্রতিনিধিত্ব করলেন সেন্টার ফরওয়ার্ড হিসেবে। খেলা হয়েছিল কেরলের ক্যানানোরে। ফাইনালে টসে হেরে যায় পাপান্নার দল—মহীশুর। ১৯৬৪ সালে মাদ্রাজে আয়োজিত জাতীয় ফুটবলে পাপান্নাকে সর্বাগ্রে বেছে নিলেন মহীশুর ফুটবল এসোসিয়েশনের তৎকালীন সম্পাদক শ্রী এন আর মূর্তি। ১৯৬৫ সালেও রাজ্য দলে মনোনয়ন পেয়েছিলেন কিন্তু সাংগঠনিক গন্ডগোলে মহীশুর সে বছর গৌহাটিতে খেলার সুযোগই পেল না। এই ১৯৬৫ সালে প্রখ্যাত ফুটবল খেলোয়াড় রহিম সাহেব পাপান্নাকে নিয়ে এলেন মহমেডান স্পোর্টিংয়ে। ১৯৬৬ সালে খেলেন বাঙ্গালোর সি আই এল দলে। ১৯৬৭ সালে আবার ফিরে এসেছেন কলকাতায় নিজের পুরোন দল মহমেডান স্পোর্টিংয়ে। শুধু কলকাতায় নয় দিল্লী, বোম্বাই, পাটনা, কটক ও গৌহাটিতে ডুরান্ড, রোভার্স, শ্রীকৃষ্ণ গোল্ড কাপ, কলিঙ্গ কাপ এবং বরদলৈ ট্রফি প্রতিযোগিতার সূত্রেও পাপান্না বিপুল-সংখ্যক দর্শকের মনোরঞ্জন করেছেন।

মহীশুরের সেরা কোচ বাসারের নিজের হাতে গড়া ফুটবল খেলোয়াড় পাপান্না। তাঁর নির্দেশমত কৈশোর থেকে পাপান্না সেন্টার ফরওয়ার্ডেই খেলে আসছেন। লাজুক ছেলে পাপান্নার নিজের কথায় বলতে গেলে বলতে হয়, "আমার খেলায় যদি কিছু ভাল থাকে, তার ষোল আনা কৃতিত্ব কোচ বাসার। সেটুকু ত্রুটি, সেটুকুর জন্য দায়ী একমাত্র আমিই, কেননা গুরুজী যা বলেছেন, যা বাৎলেছেন, আমি আজও তা পুরো রপ্ত করতে পারিনি।"

—বিপুল বন্দ্যোপাধ্যায়

।। ছাব্বিশ ।।

এরপরই এমন একটা ঘটনা এসে পড়ল ার জন্য রঞ্জন-কমলা নিয়ে সমস্যা কয়েক-দনের জন্য রঙ্গময়ী আর হেমাঙ্গিনীর মন থকে একেবারে সরে না গেলেও বেশ ানিকটা ফিকা হয়ে রইল। ঘটনাটির নায়কা াাদ্রা, সুতরাং সুরবালারও টান পড়ল। াখানে আর্দ্রার একটু পূর্বপরিচয় াাবশ্যক হয়ে পড়ে, কমলার কাছে যেমন ুনেলেন রঙ্গময়ী একদিন ওঁকে নিজের াড়িতে ডেকে এনে সব কথা জানিয়ে।

কমলার মতো আর্দ্রার বাড়িও যে ুগলীতে এবং দুটি পরিবার পরস্পরের াতিবেশী এটুকু জানতেন রঙ্গময়ী। এর বশি জানবার প্রয়োজনও হয়নি আগে, সখানে প্রতিবেশী হলেও কমলাও কখনও াারিচয়টা এর বেশি বাড়তে দেননি। সেদিন াব শুনে গিয়ে এও মনে হোল রঙ্গময়ীর য প্রসঙ্গটা ওদিকমুখো হলেই যেন ইচ্ছে ারেই এড়িয়ে এড়িয়ে গেছেন উনি। খুব ুক্ষমভাবেই, তখন কৌতূহলের কিছু ছিল া, খেয়ালও করেননি রঙ্গময়ী।

মোটামুটি বেশ একটি সম্পন্ন গৃহস্থ রেরই মেয়ে আর্দ্রা। তবে, অল্পবয়সেই াকটা ট্রাজেডি এসে পড়ে জীবনে এবং শেষ াবধি এমন অবস্থা দাঁড়ায় যে, বাড়ি ছেড়ে াখানে চলে আসতে হয় তাকে। এমন কিছু ুতন ব্যাপার নয়, নিত্য হচ্ছেও.

যখন বছর-পনের বয়স তখন ওর মা ারা যান এবং বছর-খানেকের মধ্যেই পিতা িবতীয় দারপরিগ্রহ করেন। প্রথম পক্ষের দুই সন্তান, আর্দ্রা আর ওর একটি ভাই, নাম গৌতম, তখন বয়স নয় বছর। যেমন সাধারণতঃ হয়ে থাকে, দুটিতেই সৎমায়ের বিষ-নজরে পড়ে যায় এবং কালক্রমে পিতাও তার প্রভাবে পড়ে কতকটা নিরুপায় হয়ে পড়ায় সৎমায়ের বিদ্বেষ এবং বাপের অবহেলায় পড়ে দুই ভাই-বোনের জীবন দুর্বিষহ হয়ে পড়তে থাকে।

বছর-তিনেক এইরকম অবস্থার মধ্যে কাটিয়ে আর্দ্রা যখন স্কুলের পরীক্ষা শেষ করে কলেজে প্রবেশ করেছে, সে সময় ক্রমে তার অবস্থা অতিষ্ঠ হয়ে এসেছে। আর্দ্রার প্রকৃতিটা বরাবর এইরকম; আমুদে, খানিকটা বেপরোয়াই; সৎমার দুর্ব্যবহার, বাপের অবহেলা তেমন গায়ে না মেখে একরকম কাটিয়ে যাচ্ছিল নিজের তালে, শেষের দিকে অসহ্য হয়ে এল। বয়স হয়েছে, দেখতে সুশ্রী, তার সঙ্গে স্বভাবের এদিকটা জড়িয়ে কুটিল বিষোদ্গার শুরু করেছে ওর সৎমা, এই সময় বাবাকে রাজি করে কমলা ওকে 'করুণাময়ী হোম'-এ নিয়ে এসে কলেজে ভর্তি করে দিলেন। এখানে একটা পরীক্ষা শেষ করে যখন বি-এ ক্লাসের প্রথম বর্ষ শেষ করছে, সে-সময় ওর বাবা হঠাৎ মারা গেলেন। খরচটা তিনিই জোগাচ্ছিলেন, একটা যে সংকট অবস্থা এসে পড়ল, সেটা কমলাই সামলে দিলেন; প্রথমটা নিজেই সমস্ত ভার বহন করে, তারপর একটা টুইশন জোগাড় করে দিয়ে এবং পর বৎসর বি-এ পাশ করলে ও'র স্কুলে নীচের দিকে একটা চাকরি জোগাড় করে দিয়ে। হুগলীর সঙ্গে ওর সম্পর্ক প্রায় ছিলই না। পিতার মৃত্যুর পর সৎমায়ের বাপের বাড়ির আধিপত্য এসে পড়তে ভাইটিকেও সরিয়ে নিয়ে একটা হোস্টেলে রেখে পড়াতে হচ্ছে। সে এখন কলেজের প্রথম সোপানে। আজ পর্যন্ত মোটামুটি এই ইতিহাস আর্দ্রার। এরপর ভবিষ্যতের স্বপ্ন আছে।

সে-স্বপ্ন ওর ভাইটিকে ঘিরে, ওকে মানুষ করে তুলতে হবে। এ-ধরনের ছেলেমেয়ে যারা বুকের জোরে ঢেউ কাটিয়ে এগিয়ে যেতে পারে, তারা স্বপ্ন দেখে বর্ণাঢ্য। এ-মাইনেতে সে-স্বপ্ন সার্থক হওয়ার নয়। সুতরাং নূতন দিগন্ত খুঁজতে হয়।

জয়া আর সুষমার দৃষ্টান্তই ওকে লুব্ধ করে বেশি। দুজনেই রাজ্য সরকারের দপ্তরে কর্মচারিনী, রাইটার্স বিল্ডিংস-এ। জয়া স্টেনো, সুষমা হিসাব বিভাগে। ভালো মাইনে, ভালো ভবিষ্যৎ। এ-বয়সের উৎসাহ তায় ভাইটির চিন্তা আরও উদ্দীপিতই করে সেটাকে, আর্দ্রা দুদিকেই করবে চেষ্টা; আগেই শর্টহ্যান্ড টাইপ-রাইটিঙের কোর্সটা শেষ করল, কাছেই একটা রাত্রি-ক্লাসের সুবিধা পেয়ে। এইবার চাকরি খোঁজার সঙ্গে ওদিকে এ্যাকাউন্টস আর করস্পনডেন্সটা আরম্ভ করবে, এই সময় একদিন ঘটনাটুকু ঘটল। যার উল্লেখ গোড়াতেই করা হয়েছে।

সেদিন সকাল থেকেই ভাবটা অন্যরকম আর্দ্রার, চিন্তিত, বিমর্ষ, থেকে থেকে অন্যমনস্ক হয়ে পড়ছে, যেরকম ওকে কখনই দেখা যায় না। প্রশ্ন করলে একটু সজাগ হয়ে ওঠে

একটা উত্তর দিয়ে কাটিয়ে দেয়—না, আছে ভালোই; না, স্কুলে কিছু হয়নি—ঠাট্টার উত্তর ঠাট্টাতেও দিয়েছে—হ্যাঁ, পড়েছে বৈকি প্রেমে; কোথায় কি রকম সেসব সন্ধান দিয়ে খাল কেটে কুমীর ঢোকাব শেষে!...

এরপর কিছুক্ষণ সতর্ক থাকে, তারপরেই আবার অন্যমনস্ক হয়ে পড়ছে।

আসলে ভাবান্তরটা শুরু হয়েছে কাল বাত্রি থেকে। তবে কারুর টের পাওয়ার সম্ভাবনা ছিল না। একজন সহকর্মিণীর বিবাহে কাল ওর আর কমলার নিমন্ত্রণ ছিল, ফিরল রাত করে। দ্যাখে, অভিজাত খামের ওপর আর্জেন্ট ছাপ মারা একটা চিঠি পেপার ওয়েটের নীচে চাপা রয়েছে।

খানিকটা প্রত্যাশিত চিঠিই। তবু আড়ম্বরের বেশে এসেও কি করে সবার দৃষ্টি এড়িয়ে গেছে ঠিক বুঝল না আর্দ্রা। সম্ভবত কারুর তাড়াহুড়া করে বেরুবার মুখে পতিত-পাবন ঠিকানা পাড়িয়ে নিয়ে রেখে দিয়েছে টেবিলে। মনে পড়ে গেল আজ মীনাক্ষীর তিনদিনের ছুটি নিয়ে বাড়ি যাওয়ার কথা ছিল।...কাল পতিতপাবনকে জিজ্ঞেস করলেই হবে।

মেসের একমাত্র সিংগল্ সীটের ছোট ঘরটা ওকেই দেওয়া, রাত জেগে পড়াশুনা করতে হয় বলে কমলার ব্যবস্থা. আগে এই কারণেই দীপ্তির দখলে ছিল।

চিঠিটা প্রত্যাশিত এই জন্য যে, কয়েক-দিন আগে আর্দ্রা একটা সওদাগরী অফিসে চাকরির জন্য দরখাস্ত করেছিল, এটা নিশ্চয় সেই সম্বন্ধেই হবে। দোরটা বন্ধ করে খামটা আস্তে আস্তে ছিঁড়ল। পরদিনই বেলা তিনটার সময় সাক্ষাৎকারের জন্য ডেকেছে।

সেই থেকেই মনটা অতিরিক্ত চঞ্চল হয়ে রয়েছে ভেতরে ভেতরে। অনেকগুলো কারণ আছে তার—

চাকরিটা যেমন লোভনীয়, তেমনি আবার একটা সংশয়ও জাগায় মনে। খুব যে একটা নাম-করা অফিস এমন নয়, মনে হয় কোন বম্বের দিকের কোম্পানী, তবু একটা স্টেনো-গ্রাফারের পদের জন্য গোড়াতেই দিচ্ছে দুশো পঁচাত্তর। উঠবে সাড়ে চারশ পর্যন্ত। বিজ্ঞাপনে ফটো পাঠাবার কথা ছিল দরখাস্তের সঙ্গে, আর বয়স, বিবাহিত কি অবিবাহিত।

দোমনা হয়েই দরখাস্ত করেছিল আর্দ্রা, ভাইটি পড়াশুনায় ভালো, তাকে এগিয়ে দিতে হলে এ আয়ে কুলাবে না; কিন্তু এখন যাবে কিনা সাক্ষাৎকারে ঠিক বুঝতে পারছে না। আরও বিচলিত করেছে ওকে খামের ওপর 'Urgent' ছাপটা। একটা তাড়াহুড়ার ভাব এনে গুছিয়ে চিন্তা করবার অবসর দিচ্ছে না।

রাত্রে ঘুম হোল না ভালো। তারপর সকাল থেকে এইভাবে চলছে।...বলবে এক-বার কমলাকে?...মানাই করবেন নিশ্চয়, তার সঙ্গে ওঁকে না জিজ্ঞেস করে ফটোসুদ্ধ এরকম দরখাস্ত কেন করতে গেল সে-কথাও উঠবে।...তার চেয়ে আসুকই না একবার ঘুরে, কাজ নেওয়া-না-নেওয়া অন্তত সেটা তো ওর হাতেই।

সময়টা মন্দ নয়। স্কুলে গিয়ে শেষের দিকে ছুটি নিয়ে একেবারে ওদিক থেকে চলে গেলেই হবে। না, কাজ নেয় তো কেউ টেরও পাবে না ব্যাপারটা। যদি নেয়ই কাজ, তখন-কার কথা তখন।

।। সাতাশ ।।

কাজটা পেয়ে গেছে, সে সম্বন্ধে অবশ্য কমই সন্দেহ ছিল আর্দ্রার; নিয়েছেও ওর মনে হচ্ছে কে যেন অলক্ষে থেকে ওর হাতে তুলেই দিয়েছে, যার জন্য কাল রাত্রি থেকে আজ সকাল-দুপুর পর্যন্ত সেই যে বিষণ্নভাব সেটা কেটে গিয়ে আবার সেই কৌতুকময়ী আর্দ্রা এসেছে ফিরে।

বিকাল গড়িয়ে প্রায় ছ'টার কাছাকাছি হয়েছে। প্রায় সকলেই আফিস-কলেজ-স্কুল থেকে এসে গেছে, কমলার ঘরে জটলা চলছে।

তন্দ্রা এইমাত্র এল। বাথরুম থেকে গা ধুয়ে একটা তোয়ালেয় মুখ মুছতে মুছতে বেরিয়ে আসছিল, দ্যাখে একটি যুবতী উঠানে এসে প্রবেশ করল। বেশি বয়স নয়, তন্দ্রা মেসে সবচেয়ে ছোট, নিতান্ত ওর মতো নয়, সুষমা, জয়া এদের মতো হবে। সিঁথির সিঁদুরটির ওপরই আগে নজর পড়ে একটু রগরগে, গোলা সিঁদুরের মতো, ভুরুর মাঝখানেও একটি বেশ বড় ফোঁটা।

তোয়ালেটা মুখে চেপেই সপ্রশ্ন দৃষ্টিতে চেয়েছে তন্দ্রা, যুবতীই বলল—"আমি হচ্ছি আর্দ্রার দিদি, আছে সে বাড়িতে?"

"আপনি আসুন ওপরে—হয়তো আছেন!"—বলে তন্দ্রা দুটো করে ধাপ এক-সঙ্গে উঠে দুড়দুড় করে ওপরে চলে গিয়ে একটু চাপা গলায় খবরটা দিল—"আদুদির দিদি!"

ওরা এসে বারান্দায় সিঁড়ির সামনে দাঁড়িয়েছে, যুবতীটিও উঠে এল. কমলাই অভ্যর্থনা করলেন—"আসুন। আদুর দিদি তা সে কখনও তো বলেনি।...আসুন উঠে..."

দুহাতের আঁজলায় মুখ ঢেকে হেসে একেবারে কুঁজো হয়ে গেল আর্দ্রা, একটু দোল খেয়ে সোজা হয়ে ওঠে, হাসতে হাসতেই বলল—"পোড়া কপাল! নেই দিদি বলবে কী করে?"

কমলারই প্রথমে একটু কথা কইবার মতো অবস্থা হোল, বললেন—"মরণ!... আদুই?"

তারপরেই চারিদিক থেকে প্রশ্ন আর মন্তব্যের বৃষ্টি—

"তা একি রঙ্গ!...সকালে এক চেহারা, বিকেলে এক!...সবচেয়ে কপালে সিঁদুর কেন?...কোথাও পার্ট করে এলি নাকি?... তাও যে পারে না ও এমন নয়!..."

কমলা যেন ভাষা খুঁজে পাচ্ছিলেন না; হাতের ইসারায় সবাইকে থামিয়ে দিয়ে বললেন—"সত্যিই তো! রঙ্গ করবি, তার একটা সীমা থাকবে তো, সিঁদুর কেন কপালে?"

"বিয়ে হলে সিঁদুর থাকবে না কপালে? হিঁদুর মেয়ে..."

"বিয়ে!"—কমলার সঙ্গে আবার সবাই চিৎকার করে উঠল। কমলা বললেন—"তুই বলা নেই কওয়া নেই, খামোকা বিয়ে করে এলি কোথায়?"

প্রশ্নের বাণ ছুটল।—দুপুরে বিয়ে! রেজিস্টারি নাকি?...

জয়া বলল—"মর যা খুশি তাই করে ভাই, কিন্তু বর কোথায়?"

"থাম্, এতগুলো সোদা মেয়ের মধ্যে নিয়ে আসি তাকে। দোষ নিও না কমলাদি, এই হন্যে-হয়ে-পড়াগুলোকে বলছি...। তা একি অবিচার? বিয়ের কনে, একটু ডেকে যে আদর-অভ্যর্থনা করবে—পর হয়ে গেলেও এই মেসেরই মেয়ে তো..."

ধাঁধায় পড়েই ভুল হয়ে যাচ্ছে। কমলা বললেন—"আয়, উঠে আয়।"

ঘরের দিকে এগুতে এগুতেই বললেন— "মাথার কি ঠিক থাকতে দিয়েছিস?—একটা মেয়ে—সকালে মুখ গোমড়া করে বেরুল, যেন দিদিমার গঙ্গাযাত্রা করাতে যাচ্ছে, বিকেলে এল, কপালে খড়দার গোঁসাই ঠাকরুণের মতন এককপাল সিঁদুর!.."

ড্রয়ার খুলে একটা টাকা বের করে তন্দ্রাকে বললেন—"পতিতপাবনকে একটা হাঁক দে দিকিন।"

নিরুপা উঠে পড়ে বলল—"থাক, ও হতভাগাকে আর এ-আসরে ডেকে এনে কাজ নেই। আমি দিয়ে আসছি। নোন্‌তা মিষ্টি দু-ই তো?"

"আর আমরা? সব হাঁ করে দেখব কমলাদি?"

সুষমা মুখ ভার করে বলল—"একে তো বিয়ে হোল না..."

"তোদের তামাসা, আর এদিকে আমার মাথা গুলিয়ে যাচ্ছে।"

—ড্রয়ার থেকে আরও দুটো টাকা বের করে নিরুপার হাতে দিয়ে আর্দ্রার দিকে চেয়ে বললেন—"আগে তোর কাহিনী বল, উদ্ভট কাণ্ড যত!"

সবাই ঘেঁষাঘেঁষি হয়ে বসেছে, আর্দ্রা বলল—"তুমি গোমড়া মুখ নিয়ে সকালে বেরুবার কথা বললে কমলাদি', তখন আমাতে কি আর আমি আছি? নতুন চাকরি—এক-রকম চিঠি পেয়ে গেছি, তা কোথায় যে..."

"নতুন চাকরি!...তা এই যে বললি বিয়ে!...চাকরি তো কপালে সিঁদুর কেন?" —কমলার সঙ্গে আরও সবাই জড়াজড়ি করে প্রশ্ন করে উঠল। আর্দ্রার হাতটা আপনিই গিয়ে কপালে উঠল। একবার দেখে নিয়ে

বলল—"দাঁড়ান, একবার নীচে থেকে মুখ-হাত ধুয়ে আসি কমলাদি। কার কথার যে কী জবাব দোব..."

মিনিট কয়েক পরে যখন উঠে এল, জলে-গোলা সিঁদুরে সিঁথির চুল খানিকটা ল্যালচে হয়ে থাকলেও রেখাটা ভালোভাবেই উঠে গেছে। নজর পড়তেই কমলা বিস্ময়ের সঙ্গে একটু ধমকের সুরেই বললেন—"তোর হেঁয়ালির যে অন্ত নেই লো। করেছিস বিয়ে—রেজেস্টারি হোক, যাই হোক—আবার সিঁদুরটা মুছতে কে বলেছে তোকে?"

"আঃ, হেঁয়ালি পরিষ্কারও করতে দেবেন না, উলটে বকুনি।"

মুখটা আবার ভালো করে আঁচলে পরিষ্কার করে নিয়ে ওঁর সামনাসামনি বসে বলল—

"একটা দরখাস্ত করে দিয়েছিলাম কমলাদি, লোভে পড়ে তোমাদের না জিজ্ঞেস করেই। কোন বন্দেওলার ফার্ম। স্টেনোগ্রাফারের পোস্ট। দুশো পঁচাত্তর টাকা মাইনে...শিউরো না, শিউরোবার এখন ঢের বাকি আছে—ফটো চেয়েছে, কুমারী কি বিবাহিতা সে-প্রশ্নও ছিল, তারপরে ইন্টারভিউয়ের আর্জেন্ট চিঠি। একেবারে খোদ কর্তার সঙ্গে—ভাবনায় মুখ কালো করে বেরুতে হয় কিনা, তুমিই বলো না..."

"ভয়ানক রিস্ক নিয়েছ কিন্তু।"—সুষমা হাঁ করে শুনতে শুনতে বলল।

"সেইজন্যেই ব্যাপারটা এইরকম দাঁড়ালও কমলাদি। তিনটের সময় ইন্টারভিউ। ঠিক করেছিলাম, শেষের ক'টা পিরিয়াড ছুটি নিয়ে ওখান থেকেই চলে যাব, তারপর মনে হোল, না, একবার কালীঘাটটা ঘুরে আসি সব রিস্ক মার ওপর চাপিয়ে, তাঁকে একটু জানিয়ে দিয়ে। তা মা যেন হুংকার করে জেগে উঠলেন। স্কুলে দুটো পিরিয়াড সেরে সকাল-সকালই চলে গেলাম। জুতো পরে রয়েছি, কোথায় রাখব, আমি আর ও রিস্ক না নিয়ে নীচে দাঁড়িয়েই প্রণামটা সেরে নিচ্ছি, হঠাৎ মনে হোল, কে যেন পেছন থেকে সিঁথির মাঝামাঝি ক'টা আঙুলে চেপে টেনে দিল। এক সেকেন্ডের ব্যাপার, তখুনি মাথা তুলে দেখি, ও কমলাদি, মা যেন ওপরে উঠলাম না দেখে নিজেই মন্দির থেকে নেমে এসেছেন। লাল শাড়ি-পরা, এলো চুল, গলায় রুদ্রাক্ষের মালা, হাতে সিঁদুর-মাখানো ত্রিশূল। কিছু বুঝে ওঠবার আগে হৈ-চৈও আরম্ভ হয়ে গেল। সধবা-বিধবা-কুমারী মিলিয়ে আর একটি দল—বড় ঘরেরই মনে হোল—চাকরের জিম্মায় জুতো ছেড়ে রেখে ওপরে যাওয়ার ব্যবস্থা করছিল—যেন ঝাঁপিয়ে পড়ে এলোধাবাড়ি কপালে সিঁদুরের হাত টেনে দিতে লাগল। এক বুলি মুখে—'মার কাছে এসেছে, কপালে সিঁদুর নেই!' প্রথমটা হকচকিয়ে গিয়ে মারমুখো হয়ে উঠেছে সবাই—সধবা-বিধবা-কুমারী কিছুই তো বাছেনি—আমিও কপালে হাত দিয়ে দাঁতমুখ খিঁচিয়ে এগুতে যাব—গায়ে আগুন ধরে গেছে তো—সবাই ছুটে এসে পড়ল—'দেখছেন পাগল মানুষ, ওকে মারধোর করা চলে? মার স্থান, ওতে দোষ লাগে না—যার রাখবার নয়, আদি গঙ্গার জলে ধুয়ে ফেলুন গে।'...পাগলীর অবশ্য ভ্রূক্ষেপ নেই, যারা যারা বোঝাতে এসেছে, লাফিয়ে লাফিয়ে তাদেরও কপালে লেপে দিতে যায়—হাসি-বকাবকিতে একটা রীতিমতো হুল্লোড় পড়ে গেছে, আমি আস্তে আস্তে বেরিয়ে এলাম। আদি গঙ্গায় ধোব কি, পাকা ব্যবস্থা, তেলের সঙ্গে গোলা সিঁদুর, জল হাত পড়লে আরও লেবড়েই যাবে। চাকরি তো মাথায় উঠল, এ-অবস্থায় বাসায় ফিরব কি করে, সেই এক সমস্যা হয়ে দাঁড়াল। এমনি পথ চলতেও কেমন একটা অস্বস্তি বোধ হচ্ছে, অনভ্যেসের ফোঁটা তো, শেষে একটা বুদ্ধি জুগিয়ে গেল কমলাদি, একটা ছোট মণিহারীর দোকানের সামনে দিয়ে আসতে আসতে। একটা ছোট গোল আরশি কিনে নিলাম, তারপর ওদিক থেকে সরে এসে একটা ট্যাক্সির ওপর উঠে বসে বাসার ঠিকানা দিয়ে দিলাম। ঠিক করলাম, পথে যেতে যেতে রুমালে মুছে নোব, রুমালে না কুলোয় শাড়ি দিয়েই।

খানিকটা এগিয়ে এসে আরশিটা নীচু করে ধরে রুমালটা আঙুলে জড়িয়ে মুছতে যাব, হঠাৎ আর একটা বুদ্ধি জুটে গেল। এবার দুর্বুদ্ধিই বলতে হয়। দরকার কি সিঁদুর মুছে? মেসেই বা ফিরে যাই কেন? এইভাবেই আফিসে গিয়ে দেখি না অবস্থাটা কিরকম দাঁড়ায়। নকুব না কমলাদি, এই-ভাবের বিজ্ঞাপন দেয়, কেমন একটা কৌতূহলও হচ্ছিল, দেখাই যাক না। দিনদুপুর, ভয়ের তো কিছু নেই। শ্যামবাজারের পাঁচ-মাথা পেরিয়ে বাগবাজারে ঢুকবে, আবার ঘোরাতে বললাম ট্যাক্সি। বেলা আড়াইটের সময় আফিসের সামনে পৌঁছে ভাড়া চুকিয়ে লিফটে করে চারতলায় উঠে গেলাম।"

"ঐ একধাবড়া সিঁদুর কপালে নিয়ে!"—সবাই হতবাক হয়ে গেছে, তার মধ্যে থেকে প্রশ্ন করল জয়া।

"এক ধাবড়া আর কোথায় কমলাদি?"—সাক্ষী মানলে আর্দ্রা মুখটা তুলে। বলল—"তখন তো আরশি ধরে মুছে মুছে পাৎলা করে এনেছি।"

সুষমা একটু যেন বেশি হতবুদ্ধি হয়ে গেছে, বলল—"রাস্তার ধারে কোন কল বা টিউবওয়েলে ওটুকুও ধুয়ে ফেলতে পারতিস না ট্যাক্সি দাঁড় করিয়ে?"

"হ্যাঁ, আর ভিড় জমে যাক—পোড়ারমুখি বরের সঙ্গে ঝগড়া করে সিঁথির সিঁদুর মুছে বিধবা সাজছে!"—ঘুরে মুখ-ঝামটা দিয়ে উঠল আর্দ্রা, কমলার দিকে চেয়ে নাকি-সুরে অনুযোগ করল—"এখন এমন কথার উত্তর দিতে হলে কি করে এগুই বল ত?"

একটা চাপা হাসি উঠেছে ওর উত্তর দেওয়ার ভঙ্গিতে, কমলাও বাদ যাননি, বললেন—"চুপ কর না তোরা। তুই বল্।"

"একেবারে মিহি, আধুনিক, আছে কি নেই—সেরকমটা আর করলাম না। ভতক্ষণে একটা মতলবও এঁটে ফেলেছি..."

"মতলবটা?"—মীনাক্ষী প্রশ্ন করল।

"একটা প্রোটেক্শানই তো, কি বল কমলাদি? একটু জানান দেওয়া থাকে সেই ভালো না?"

লিফ্‌ট থেকে নেমেই একটা করিডোর পেরিয়ে একটা বড় হলঘর। তার শেষের দিকে একটা চেম্বার, বাইরে টুলে একটা উর্দিপরা আর্দালিকে বসে থাকতে দেখে মনে হোল ঐটেই বড় সায়েবের আস্তানা। কিছু কিছু ইণ্টারভিউ তো দেওয়া হয়ে গেল এর মধ্যে, জানা আছে, আর বাধে না। হলঘরের একধারে কেরানীরাই বসে কাজ করছে..."

"থেমে থেমে যাচ্ছে তাদের হাত..." সুষমা টুকে দিল।

আর্দ্রা আবার অনুযোগ করল—"দ্যাখো কমলাদি!...না, আমি বন্ধ করলাম বাপু। বেশ হোল, চা-খাবারও এসে গেছে।"

(ক্রমশঃ)

দুর্বলতার রন্ধ্রপথে

দু'পক্ষই অভিযোগ তুলেছিল। কাজেই হট্টগোলটা জমেছিল বেশ। মজা উপভোগ করার জন্য একদল প্রস্তুত হয়েই ছিল। তারা আড়ালে-আবডালে মুখ টিপে হাসল আর অবসর সময়টুকু রসালো আলোচনায় সরস করে তুলতে চেষ্টার ত্রুটি রাখলো না' এরাই সংখ্যায় বেশি। আবার একদল বেশ বেদনার্ত মনে হলো। সুখের সংসারে এমন একটা অশান্তির উৎপাত সহজে মেনে নিতে তাদের মন চাইছিল না। সমস্ত ঘটনার একটা সুষ্ঠু সমাধান তারা মনে মনে কামনা করেছিল। এরা সংখ্যাল্প হলেও আন্তরিকতায় যথেষ্ট সমৃদ্ধ ছিল।

হিতাকাঙ্ক্ষীর দল উদ্যোগী হয়েও ঘটনাপ্রবাহের মূল সূত্র অনুধাবন করতে পারেনি। গোড়ায় গলদ ছিল নিশ্চয়ই, কিন্তু গলদের হদিশ করা হয়ে উঠলো মহা-সমস্যা। অনেকেই বললেন, অত হাতড়ে কোন দরকার নেই। কোন রকমে চাপাচুপি দিয়ে শান্তি ফিরিয়ে আন। কিন্তু শান্তি বস্তুটা অত সহজলভ্য নয় কোনদিনই। তাই কথায় কথায় শান্তি প্রতিষ্ঠিত হয় না। একপক্ষ চুপ করে তো অন্যদিক ফুঁসে ওঠে। পৃথিবীর চিরাচরিত নিয়মানুযায়ী কেউ খাটো হতে রাজী নয়। হার স্বীকার করা কারো ঠিকুজী কোষ্ঠীতে লেখা থাকে না। সবাই তাই সমান সতেজ এবং উদ্বেল। দাবী এবং বক্তব্যের সমর্থনে জোরালো বক্তব্য রাখছে। নিজের দাবী থেকে কেউ এক চুল পিছু হঠতে প্রস্তুত নয় বরং নিজের অধিকার সীমাকে যদি আর একটু সম্প্রসারিত করা যায় সেদিকে সবাই সজাগ। সকলেই সকলের দুর্বলতা ধরতে ব্যস্ত।

সংসার থেকে শুরু করে পৃথিবীর বৃহত্তর রঙ্গপটে এই একই জিনিষের আবর্তন চলছে। কেউ জানতে পারছে না, দুর্বলতার কোন রন্ধ্রপথে শান্তির বিনিময়ে অশান্তির আমদানি ঘটছে। অনেকেই চাইছে শান্তি ফিরে আসুক, কিন্তু সামগ্রিক-তার অভাবে সে চেষ্টা দানা বাঁধতে পারছে না। আবার অশান্তি বস্তুটার সংগে অনেকেই বেশ সুপরিচিত হয়ে উঠেছে। তাই সহসা তার সংগ পরিত্যাগ করা সম্ভব হয়ে ওঠে না। এটা যেন অনেকখানি সংস্কারে দাঁড়িয়ে গেছে। কিন্তু সংস্কারটা ভালোর দিকে না গিয়ে মন্দের দিকে ঝুঁকছে এবং ক্রমশঃ আমরা ভালোমন্দের পার্থক্য সম্পর্কে বিচারবুদ্ধি হারিয়ে ফেলছি। তাই অশান্তি আজ আমাদের নিত্য সঙ্গী। এই অশান্তিতে একদল হাততালি দিয়ে আনন্দ প্রকাশ করে আবার একদল হা-হুতাশ করে।

শান্তির বিনিময়ে অশান্তি রোধ করার ব্যাপারে মেয়েদের দায়িত্ব সর্বাধিক। সবাই শান্তিতে থাকতে চায়—এই সহজ কথাটার সংগে যদি অপরের প্রতি সহানুভূতি এবং মমত্ববোধ সঞ্চারিত হয়, তাহলে আর কোন সমস্যা থাকে না। পৃথিবীতে চলার পথে ত্রুটির ঘায়ে ক্ষতবিক্ষত হওয়ার সম্ভাবনা খুবই। কিন্তু একে অপরের অভিজ্ঞতায় এই ত্রুটিটুকু কাটিয়ে যাতে পূর্ণতা পায়, সে চেষ্টাই আন্তরিকতার স্বাক্ষর সুস্পষ্ট হয়ে উঠবে।

—প্রমীলা

নন্দাঘুণ্টি অভিযান

গাড়োয়াল হিমালয়ের সবচেয়ে উঁচু পর্বত নন্দাদেবী (২৫৬৪৫ ফুট)। তুষার-শুভ্র নন্দাদেবী সম্রাজ্ঞীর মহিমায় উন্নত শিরে বিরাজমানা। তার চারদিকে প্রহরা-রত অনেক শৃঙ্গ। দক্ষিণদিকে রয়েছে ত্রিশূল (২৩৩৬০), মৃগথুনি (২২৪৯০), মাইতোকলি (২২৩২০) আর নন্দাঘুণ্টি (২০৭০০)। উচ্চতায় অনেকের চাইতেই ছোট, কিন্তু পর্বতের উচ্চতাই তার মান নির্ণয়ের একমাত্র মাপকাঠি নয়। নন্দাঘুণ্টির প্রতিরোধ ক্ষমতা অসামান্য। এর বিপদ কম, কিন্তু প্রতিবন্ধকতা কম নয়।

এই শিখরে এ পর্যন্ত চারটি অভিযান হয়েছে। তার মধ্যে তিনটি বিদেশী এবং একটি ভারতীয় তথা বাংলার এবং এটাই একমাত্র সফল অভিযান। ১৯৪৪ সালে এই শিখরে সর্বপ্রথম অভিযান হয়, কিন্তু হিমালয়ের হিংস্র আবহাওয়া নিষ্ঠুরভাবে অভিযাত্রী দলকে ফিরিয়ে দেয়। ১৯৪৭ সালে হয়েছিল একটি সুইস অভিযান। বাঘা বাঘা পর্বতারোহী ছিলেন এই দলে। আন্দ্রে রক, রেনে ডিটার্ট, আলফ্রেড সুটার, আলেক্স গ্র্যাডেন, ছিলেন একজন মহিলা—মিসেস লোহ্নার আর ছিলেন এভারেস্ট বিজয়ী তেনজিং (তখনও শেরপা তেনজিং)। এই অভিযানের কাহিনী আন্দ্রে রক-এর বিবরণ থেকে জানা যায়। রক এবং ডিটার্ট ছিলেন সামিট পার্টিতে। যাত্রাও করে-ছিলেন শিখর অভিমুখে। চূড়ার কাছা-কাছি যখন পৌঁছালেন, তখন ঘন কুয়াশায় চারদিক ঢেকে গেল। প্রাণ বিপন্ন করেও ওরা উঠতে লাগলেন এবং একটা জায়গা পর্যন্ত পৌঁছে ভাবলেন এটা নিশ্চয়ই

নন্দাঘুণ্টি অভিযাত্রীদল : বামদিক থেকে দাঁড়িয়ে : শীলা ঘোষ, স্বপ্না নন্দী, স্বপ্না মিত্র, ইন্দিরা বিশ্বাস। বামদিক থেকে বসে : লক্ষ্মী পাল, দীপিকা সিংহ (নেতা), অসীমা হালদার

চূড়া। তারপর নেমে এলেন। সুতরাং ওরা সত্যিই শিখর জয় করেছিলেন কিনা, সে বিষয়ে যথেষ্ট সন্দেহ রয়েছে। রক নিজেও নিশ্চয় করে কিছু লেখেননি.........

And finally, at midday, we reach what we thought must be the summit for, although visibility was practically nil..........

অতঃপর ১৯৬০ সালে সুকুমার রায়ের নেতৃত্বে বাঙ্গালী তরুণদের প্রথম অভিযান নন্দাঘুণ্টিতেই। দলে ছিলেন বিশ্বদেব বিশ্বাস, ধ্রুব মজুমদার, নিমাই বসু, মদন মণ্ডল ও দিলীপ বন্দ্যোপাধ্যায়। প্রথম বেসরকারী অভিযানের এই দুঃসাহসী নও-জোয়ানদের কাছে নন্দাঘুণ্টি সর্বপ্রথম সম্পূর্ণভাবে পরাজিত হয়। সুতরাং এদিক দিয়ে বাংলার পর্বতারোহণ ইতিহাসে নন্দা-ঘুণ্টির গুরুত্ব অপরিসীম।

অনেকেই প্রশ্ন করছেন,—নন্দাঘুণ্টি তো একবার জয় করা হয়েছে আবার কেন? নিজেদের পক্ষে অনেক যুক্তি। কিন্তু সে সব বাদ দিয়ে একটা কথাই বলতে পারি,

নন্দাঘুণ্টির সঙ্গে বাংলাদেশের পর্বতারোহী মাত্রেরই যে ঐতিহাসিক এবং আত্মিক সম্পর্ক আছে, তাকে আমরা অস্বীকার করতে পারিনি। এই শিখরের আকর্ষণ তাই আমাদের কাছে দুর্নিবার। কিংবা বলা যেতে পারে মিসেস জোহ্নার যা পারেননি। আমরা তা পারবই। বাংলাদেশের এক মেয়ে সমগ্র এশিয়ার মেয়েদের মধ্যে প্রথম দুরন্ত ইংলিশ চ্যানেল পার হয়েছিলেন, তবু আজও আমাদের 'ঘরকুনো' অপবাদ ঘোচেনি। শুনতে পাই, আমরা বাঙ্গালী মেয়েরা নাকি 'সৃষ্টিছাড়া' জীব। কিন্তু আমার বক্তব্য, পৃথিবীর অন্যান্য দেশের মেয়েরা যে যে কাজে কৃতিত্ব দেখিয়েছেন, সমপরিমাণ সুযোগ সুবিধা পেলে আমরাও তা দেখাতে পারি। নন্দাঘুণ্টি সম্পর্কে শিপটন বলেছেন, "এই পর্বতে আরোহণ কষ্টসাধ্য", হিলারি বলেছেন 'দুঃসাধ্য', তবুও নন্দাঘুণ্টিকেই আমরা বেছে নিলাম হৃদয়ের স্বতঃস্ফূর্ত প্রেরণায়। নন্দাঘুণ্টি রিক্ত হাতে আমাদের নিশ্চয়ই ফিরিয়ে দেবে না। এই শিখর আমাদের কাছে শুধুমাত্র চ্যালেঞ্জই নয়, আরো অনেক কিছু।........

সংঘবদ্ধ প্রচেষ্টার ফলেই আমাদের এই সংগঠন। এক পথে একই উদ্দেশ্যে এক মন-প্রাণ। আমাদের এই সংস্থার নাম দেওয়া হয়েছে পথিকৃৎ (২১৯, নেতাজী সুভাষচন্দ্র বসু রোড, কলিঃ-৪৭)। জানিনে বাংলাদেশের মেয়েদের সামনে এ পথে আমরা আলো জ্বালাতে পারবো কিনা, তবু একথা নিশ্চয় করে বলতে পারি **চেষ্টার ত্রুটি হবে না।**

পথিকৃৎ-এর এই দলে প্রাথমিকভাবে নাম রয়েছে আমাদের দশজনের। দীপালি সিংহ (দলনেত্রী)), অসীমা হালদার, সুদীপ্তা সেনগুপ্ত, সুজয়া গুহ, স্বপ্না মিত্র, স্বপ্না নন্দী, শীলা ঘোষ, শান্তা ভট্টাচার্য, লক্ষ্মী পাল এবং আমার। আমাদের মধ্য থেকে শারীরিক দক্ষতা এবং কর্মকুশলতার তারতম্য বিচারে এই অভিযানের পক্ষে যাঁরা অপরিহার্য বলে বিবেচিত হবেন, তেমনই আটজন যাত্রা করবেন নন্দাঘুণ্টি অভিমুখে। সঙ্গে থাকবেন একজন শেরপা। সদস্যরা সকলেই দার্জিলিংয়ের হিমালয়ান মাউণ্টেনীয়ারিং ইনস্টিটিউট থেকে ট্রেনিংপ্রাপ্ত। দুজনের আছে এ্যাডভান্স ট্রেনিং এবং বাকি সকলের বেসিক। সুজয়া গুহ বিবাহিতা এবং ঘোরতর সংসারী। কিন্তু পাহাড় তাকেও আকর্ষণ করে মাঝে মাঝে তাকে ঘরছাড়া করে। অন্যান্য সকলেই ছাত্রী। কেউ কলেজের, কেউ বিশ্ববিদ্যালয়ের।

যে কোন অভিযান সংগঠন কঠিন সমস্যা-সংকুল পরিকল্পনা। সমস্যার দিক দিয়ে প্রথমেই মনে পড়ছে প্রয়োজনীয় টাকার কথা। অভিযান শুরু হওয়ার কথা অক্টোবরের আট তারিখে। কিন্তু আমাদের সংগ্রহশালায় এখনও কিছুই এসে পৌছায়নি। উপযুক্ত সাজ-সরঞ্জাম না পেলে যাওয়া সম্ভব নয়, কিন্তু টাকা না হলে তা সংগ্রহ করাও অসম্ভব। আমাদের তহবিলে সদস্য চাঁদা পাঁচ টাকা ছাড়া কিছুই নেই। কিন্তু বাজেট যা হয়েছে তাতে দেখা যাচ্ছে প্রায় ত্রিশ হাজার টাকা প্রয়োজন। কয়েকটি বিশেষ বিশেষ প্রতিষ্ঠান আমাদের প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন। কিন্তু প্রয়োজনের তুলনায় তা সামান্য। তবুও আমরা চিন্তিত নই। হাতে আমাদের মাত্র দেড় মাস সময়, তা সত্ত্বেও মনে হয় যে, সমস্ত সংস্থার কাছে কাছে আমরা অর্থ সাহায্যের জন্য কোন আবেদন পৌঁছে দিতে পারিনি, পৌঁছে দিলে তাঁরা নিশ্চয়ই প্রয়োজনীয় অর্থ, সাজ-সরঞ্জাম এবং অন্যান্য জিনিষপত্র দিয়ে আমাদের এই অভিযানকে সর্বাঙ্গ-সুন্দর করে তুলতে উৎসাহী হবেন। বাংলাদেশের প্রথম মহিলা পর্বত অভিযাত্রী দলের আবেদন সমগ্র মহিলা সমাজের কাছেও।

হয়তো অনেকেই দেশের সংকটময় পরিস্থিতির কথা তুলবেন। কিন্তু 'এ সংকট কোনদিন ছিল না,' এমন কথাওতো আমরা কেউ বলতে পারি না। দেশ সংকটে জর্জরিত হলেও কিছু করতে চাওয়ার মনটা তো আজও আমাদের মরে যায়নি, যাচ্ছে না—সেটাই আশার কথা। কেউ হয়তো বলবেন, "মেয়েগুলোকে সুখে থাকতে ভূতে কিলোচ্ছে।" হয়তো প্রশ্ন করবেন, 'আত্মীয়-পরিজন, প্রিয় পরিবেশ, লেখাপড়া, পুজোর আনন্দ, শহরের মায়াময়-মোহময় আবেষ্টনীর আরাম ছেড়ে শরীরকে কষ্ট দিয়ে পাহাড়ে চড়তে যাওয়ার দরকারটা কি বাপু?'—এ প্রশ্নের উত্তর আমাদের কারোরই জানা নেই। এর পিছনে যে কী প্রবলতম প্রেরণা, তা বোঝাবার ভাষাও আমার নেই। যাঁরা আমাদের এই দুরূহ কাজে ব্রতী হওয়ার জন্য আনন্দিত হবেন, উৎসাহ-উদ্দীপনায় আমাদের ভরিয়ে তুলবেন তাঁরা যদি কৌতূহলী হয়ে আমাদের জিজ্ঞাসা করেন, পারবে তো তোমরা? তাঁদের কাছে আমাদের বক্তব্য, মনোবল আমাদের অটুট, দেহও সুস্থ, সকলেই পরিশ্রমী এবং আপন গুরুদায়িত্ব সম্পর্কে সকলেই সচেতন। দেশবাসীর আশীর্বাদ ও শুভেচ্ছায় আমরা সুস্থ থাকলে এবং আবহাওয়া যদি অনুকূলে থাকে, তাহলে জয়ী আমরা হবোই।

—ইন্দিরা বিশ্বাস

লো-কাট

সেদিন আমার এক বান্ধবী এসে প্রায় চোখ-মুখ লাল করে বলল—আচ্ছা! এই গায়ে পড়া পুরুষ মানুষগুলোকে নিয়ে কি করা যায় বলতো! লোকটাকে দুচক্ষে দেখতে পারি না! অবশ্য কাজের খাতিরে কাছাকাছি যেতেই হয়! কিন্তু কি বিশ্রী চাউনি! যেন শরীরের ভেতর পর্যন্ত দেখে নিচ্ছে! আর একটু সুযোগ পেলেই তো...!

আমি এবার ভাল করে তার দিকে একবার চেয়ে দেখলাম। এই কথাগুলো সত্যিই সে ঘেন্না করে বলছে না ওর কথার মধ্যে আত্মগরিমা প্রচ্ছন্ন রয়েছে।

ওর দিকে তাকাতেই আমার মনে হল ঐ দৃষ্টির আমন্ত্রণ তার স্বেচ্ছাকৃত। লোলুপ দৃষ্টিই তার কাম্য না হলে সে ঐরকম পোষাক পরে! যে পোষাক দেখে আমি মেয়ে হয়েও তার দিকে তাকাতে পারছি না তাহলে পুরুষ তাকে কেন পুজো করবে। সে তাকে তার কামনার উপচার মনে করতে পেরেছে বলেই অমন কলুষিত দৃষ্টিতে দেখেছে! শ্রদ্ধার পাত্রী হতে হলে সব প্রথমে যে নিজেকে শ্রদ্ধা করতে হয়, এই কথাটুকু কি করে বান্ধবীকে বোঝাই! সমস্ত শরীর এভাবে অনাবৃত করে কি নিজেকেই অসম্মান করা হয় না।

এক ভদ্রমহিলা বাসে উঠেছেন, বসার স্থান সাধারণ নিয়মেই নেই। হাত উঁচু করে রড ধরেছেন। অত্যন্ত অপরিচ্ছন্নভাবে ঊর্ধাঙ্গের অর্ধেকখানি একেবারে প্রকট হয়ে উঠেছে। শাড়ীর আঁচল তাঁর হাতে। আঁটো জামার কল্যাণে পিনদ্ধ বুক, বাকি শিথিল শরীরের প্রত্যেকটি মাংসপেশী উৎকটভাবে প্রকটিত। সকলের দৃষ্টি ঘুরে ঘুরে এসব নিষিদ্ধ স্থান ছুঁয়ে আসছেই। দোষ দেওয়া যায় কাকে! অমন ধারা বগল কাটা পেটকাটা জামা না পরে একটু সুষ্ঠু ধরনের বেশ ভাল ফিটিং-এর একটি ব্লাউজ পরে শাড়ীর আঁচলটি পিন দিয়ে কাঁধের ওপর আটকে নিলে আর নিজেকেও এমন করে বিস্রস্ত হতে হয় না, আর প্রায় বিবস্ত্রা নারী দেখে সকলেই যে ঋষ্যশৃঙ্গ মুনি হয়ে যাবেন এমন বাতুলতা আশা করা যায় না।

সেদিন এক ভদ্রমহিলার স্থূলে অঙ্গের পিঠের ওপর দেখলাম মাত্র এক ফালি রেশমের ফাঁস। হাতার তো বালাই-ই নেই। রাজস্থানী মেয়েরা এই ধরনের পিঠে জোড় বাঁধা চোলি পরে। কিন্তু তাদের দেহের সৌষ্ঠবের কথা আমি আর লিখে কতটুকু বোঝাতে পারব! তাছাড়া তারা মস্ত এক উড়নী দিয়ে পিঠ ঢাকে। এদের চোলির হাতা হয় বেশ লম্বা আর টাইট বুকের কাছে থাকে রুমাল কাট আর পেছনে রেশমের ফাঁস। কারণ উড়নীতে পিঠ থাকে ঢাকা। কিন্তু এই মহিলাটির দেহে কোথাও কোন নাইকো বাঁকা-চোরা। তাঁর দেহ কি অমনি চোলিতে সাজিয়ে চলা-ফেরা করার উপযুক্ত।

জামার হাতায় বদলে ফিতে আর পেট ছাড়িয়ে ঝুলে গিয়ে একেবারে বুকে উঠেছে এমনই লো-কাট ব্লাউজ কি গিয়ে শেষে একেবারে টপলেস-এ দাঁড়াবে। তারপর এভাবে খদম শরীর নিয়ে তাহলে কি শেষ পর্যন্ত একেবারে আদম আর ইভ-এর যুগে ফিরে যেতে হবে। সেটাই কি শেষ পরিণতি!

তার চেয়ে গরমের দিনে না হয় অল্প ছোট আর একটু ঢিলে হাতের বেশ নীচু ঝুলের ব্লাউজ পরে আঁচলটি দিয়ে পিঠ ঢেকে চললে আদপেই কোন পুরুষের চোখে অমন লোলুপ দৃষ্টি ফুটবে না।

এখন শাড়ী পরা হয় অনেকটা অজন্তার সুন্দরী বা সেকালের দেব-দেবীদের ধরনে, অমনি করে নাইয়ের নীচে নামিয়ে আর আঁট করে। কিন্তু সেই নিবিবন্ধ পরার মত কোমরের গড়ন কই। রামায়ণে সীতার রূপ বর্ণনায় আছে—মুঠিতে ধরিতে পার সীতার কাকালি। সুতরাং বনবাসের কালে তাঁকে বল্কলবাসেও অপূর্ব মনোহারিণী লাগত, না হলে আর লঙ্কেশ্বরের কবলে পড়তে হয়। কিন্তু প্যাঁকাঠির মত রোগা দেহ অথচ ফ্যাসানের জনাই ফ্যাসান করে অমনি ধারা শাড়ী পরলে কতটা কুশ্রী দেখায় সে যাঁরা দেখেছেন তাঁরাই উপলব্ধি করতে পারেন! সবচেয়ে প্রথমে প্রয়োজন দেহ-সৌষ্ঠব! না হলে নিজের দেহের দৈন্য আরও বেশী করে প্রকাশ করা হয়। আর অমনি রোগা শরীরে লো-কাট ব্লাউজ কেমন মানায় সে কথা তো ছেড়েই দিলাম।

কিশোরীরা জিনস পরে, পরে টাইট সালোয়ার কামিজ, এখানেও সেই একই কথা! এই পোষাকে তাদের কি পরিমাণ উগ্র দেখায় সেটা তারা নিজেরা ঠিক উপলব্ধি করতে পারে না। এখানে অভিভাবকদের এগিয়ে আসতে হবে। নিজেরা রুচিপূর্ণ-ভাবে পোষাক পরে তারপর তাঁদের রুচিতে ওদের নিয়ে যেতে হবে। আর বিজাতীয় পোষাকই যদি পরবে তাহলে মুসলমান মেয়েদের গারারা আর আঁটো কামিজ দোষ করল কি? এই পোষাকটিতে বড় সুন্দর কমনীয়তা আছে। ঠিক মত ম্যাচ করে অমনি সাটিনের গারারা আর বেনারসী বা লেসের কামিজ পরে সঙ্গে দোপাট্টা নিয়ে যে কোন পার্টি বা সিনেমায় যাওয়া যায়। চুড়িদার পাজামারও খুব প্রচলন দেখি—এর সঙ্গে কাশ্মিরী ছাঁদের ঢিলা কামিজটি মন্দ নয়! ছোট্ট মেয়েরা এর সঙ্গে ঘেরদার ফ্রক পরলেও বেশ খানদানি ব্যাপার হয়। যাঁরা কিশোরী নন অথচ অতি আধুনিক তাদের যদি বিদেশী পোষাকে রুচি থাকে তবে মাড়োয়ারের পেশোয়াজ বেছে নিন। এর সঙ্গে এলবোটাইপ আর কোমর অবধি ঝুলের টাইট কামিজ পরুন। পেশোয়াজটি হবে জরীর পাড়ের চমকদার তার সঙ্গে রঙ মেলান কামিজ। মাড়োয়ারী ঢং-এ চুন্নী না নিয়ে যদি বেনারসী স্ট্রোল গায় দেন চমৎকার মানাবে। এর সঙ্গে পায়ে দিন হিল উঁচু নকাদার জুতো আর কানে পরুন ঝাড়। ফুলের মালা জড়িয়ে চুলের হেয়ার ডু যেমন ইচ্ছে করতে পারেন। এই পোষাকে একটা আলাদা বৈশিষ্ট্য আর আভিজাত্যের ছাপ ফুটে উঠবে আপনার দেহে।

কিন্তু সবচেয়ে বেশী নারীত্বের মাধুর্য ফোটায় শাড়ী। তাই আজ দেশে বিদেশে সর্বত্র এই শাড়ীর কদর। আমাদের ভারতীয় মেয়েদের শাড়ী একটি গর্বের বস্তু। তবে তার পরিধান রীতিই হল প্রধান। স্বাস্থ্যবতী মেয়েদের অমন আঁটো শাড়ী তবু মন্দ লাগে না, বেশ একটু লম্বাও দেখায়। মুসলমান মেয়েদের বোরখাঢাকা শরীরের নীচে শুধুমাত্র পা দুটি কম মনোযোগ আকর্ষণ করে না।

উত্তর তিরিশদের লো-কাট ব্লাউজ আর চড়া প্রসাধন বড় দৃষ্টিকটু। তাঁরা কি মনে করেন গা ঢাকা জামা আর সুষ্ঠু পোষাক পরলেই পুরুষের চোখে তাঁরা মা-মাসীর বা বড়জোর দিদির পর্যায়ে চলে যাবেন। তোমায় প্রিয়া হবে এসো বাণী বলে কোন পুরুষের চোখ বোধহয় আর তাঁদের আমন্ত্রণ জানাবে না। কিন্তু এই ধারণা অত্যন্ত ভুল। মেয়েরা যেমন পুরুষ ভালবাসে না ভালবাসে পৌরুষ! ঠিক তেমনি পুরুষের প্রিয় হল নারী নয়, নারীত্ব। তারা ঐ বিস্রস্তবাসাকে নর্মসহচরীর পর্যায়ে ঠেলে রেখে হাত বাড়াবে অমনি একটি শালীনতাপূর্ণ ভব্যার দিকেই!

সবচেয়ে প্রথমে মনে রাখতে হবে যে আমরা মহিলা। সাজ-পোষাকের উদ্দেশ্য হবে আমাদের নারীত্বকে বিকশিত করা। এই নারীত্বের কামনায় মণিপুর রাজকুমারী চিত্রাঙ্গদাও একদা অনঙ্গ দেবের শরণাপন্ন হয়েছিলেন। সুতরাং এই নারীসুলভ লাবণ্য যাতে চলায় বলায় বেশে-বাসে ব্যাহত না হয় সেদিকেই থাকবে আমাদের প্রধান লক্ষ্য তবেই তা হবে সরুচির পরিচয়। ওদেশের দর্জিরা মেয়েদের শরীরের ঢেউ-গুলি ফুটিয়ে তোলার ভার নেয় কিন্তু এদেশে আমাদের নিজেদেরই যে বিষয় সচেতন হতে হবে।

নারী-পুরুষ নির্বিশেষে সৌন্দর্যের পূজারী; কিন্তু নারী সেই সৌন্দর্যের আধার। দেশে-বিদেশে আবহমানকাল ধরে নারী তার রূপের পূজো পেয়ে এসেছে। আজও সৌন্দর্য নিয়ে জয়-জয়কার চলেছে। নারীর লাবণ্যময় সুকুমার দেহ হল সেই সৌন্দর্যের উপচার। ফিতে দিয়ে মেপে কি সেই অনাবিল সৌন্দর্যের পরিমাপ হয়? এই সুন্দর মোহরূপের বিকাশ হয় দেহ সঞ্চালনের সৌকর্যে। একটি ফুলেভরা গাছ হাওয়ার হিল্লোলে ডালপালা নেড়ে দুলছে তবেই না সে নয়নমনোহর! তেমনি সঞ্চারিণী পল্লবিনী করে দেহলতাকে আগে গড়ে তুলুন তারপর রুচিপূর্ণ প্রসাধনে আর পোষাকে মন দিন। পুরুষ তখন সম্ভ্রমপূর্ণ দৃষ্টি তুলে ধরবেই!
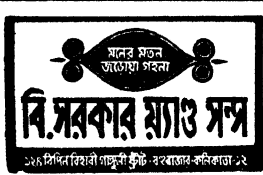
—আভা পাকড়াশী

সুধীরচন্দ্র সরকার

(পূর্ব প্রকাশিতের পর)

এই সময় আর একটি ঘটনার কথা বলি। তখন 'বঙ্গবাণী'তে শরৎবাবুর 'পথের দাবী' ধারাবাহিকভাবে ছাপা শুরু হয়েছে। 'পথের দাবী'র প্রকাশন-স্বত্ব আমি গ্রহণ করব এই শর্তে আমি তাঁকে এক হাজার টাকা অগ্রিম দিয়ে আসি। শরৎচন্দ্র সানন্দে এই অর্থ গ্রহণ করলেন এবং স্বত্বটি আমাকেই দিতে রাজী হলেন। কিন্তু 'বঙ্গবাণী'তে অনেকখানি প্রকাশিত হবার পর দেখা গেল যে, বইখানির কোনো কোনো স্থানে বৃটিশ গভর্নমেণ্টের বিরুদ্ধে কঠোর উক্তি প্রয়োগ করা হয়েছে। (এ-বিষয়ে রবীন্দ্রনাথের মন্তব্য দ্রষ্টব্য)। আমরা তখন বৃটিশ গভর্নমেণ্টের অধীনস্থ প্রজা। এইসব কঠোর উক্তি রাজদ্রোহিতার পর্যায়ে পড়ে এবং বৃটিশ গভর্নমেণ্ট কখনই তা সহ্য করবেন না। আমার দৃঢ় বিশ্বাস হল যে, তাঁরা সে বই-এর প্রচার বন্ধ করবেনই, উপরন্তু প্রকাশকও কারারুদ্ধ হবেন। আমার জেলে যাবার ভীতি থাকাতে শরৎবাবুকে আমি অনুরোধ করেছিলাম কয়েকটি অংশ সামান্য অদলবদল করে দিতে। শরৎবাবু আমার এ-অনুরোধে রাজী হলেন না। তখন বাধ্য হয়ে 'পথের দাবী' প্রকাশ করার ইচ্ছায় জলাঞ্জলি দিয়ে আমি তাঁকে বললাম, তিনি যেন এর প্রকাশন-স্বত্ব অন্য কাউকে দিয়ে দেন। এইভাবে 'পথের দাবী' হস্তান্তরিত হলো—শরৎবাবু অবশ্য টাকা আমায় ফিরিয়ে দিয়েছিলেন।

তবে শেষপর্যন্ত আমার ধারণাই ঠিক হলো। পুস্তকাকারে 'পথের দাবী' প্রকাশিত হওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই বইখানি বৃটিশ সরকার বাজেয়াপ্ত করে দিলেন এবং সমস্ত মুদ্রিত কপিগুলি হস্তগত করলেন। প্রকাশকদের অবশ্য শ্রীঘর দর্শন করতে হয়নি—হয়ত তাঁরা সম্মানিত ও বিত্তশালী ছিলেন বলে। আমরা শুনেছি যে, নিষিদ্ধ 'পথের দাবী' বই গোপনে গোপনে বৃটিশ সরকারের চক্ষুর অন্তরালে ১৭।১৮ টাকা করে এক-এক কপি বিক্রী হয়েছে। স্বাধীনতার পর অবশ্য এ-নিষেধাজ্ঞা উঠিয়ে নেওয়া হয় এবং আমরাই পরে 'পথের দাবী'র ৮।৯টি সংস্করণ করেছি।

'চরিত্রহীন' প্রকাশ সম্বন্ধে অনেকের ভুল ধারণা আছে—সে-বিষয়ে এখানে কিছু বলা দরকার মনে করি। ১৩২০ বঙ্গাব্দের কার্তিক থেকে চৈত্র ও ১৩২১ বঙ্গাব্দে 'যমুনা'য় আংশিকভাবে 'চরিত্রহীন' প্রকাশিত হয়। পরে সম্পূর্ণ গ্রন্থাকারে ১১ই নভেম্বর ১৯১৭ (কার্তিক, ১৩২৪ বঙ্গাব্দ) আমরা প্রকাশ করি। যে পর্যন্ত 'যমুনা'তে 'চরিত্রহীন' প্রকাশিত হয়েছিল, সে পর্যন্ত মুদ্রণ করা কষ্টসাধ্য ব্যাপার হয়নি। তারপর শেষটুকু আদায় করতে আমার দু'বছর সময় লেগেছিল। সেটা বোধহয় ১৯১৭ সাল হবে। শরৎবাবু থাকতেন হাওড়ায়। প্রায় প্রতি রবিবার 'চরিত্রহীনে'র কপি আদায় করতে আমায় যেতে হতো। আমার সঙ্গে থাকতেন আমার সাহিত্যিক বন্ধু প্রভাত গঙ্গোপাধ্যায়।

এই সময় একদিন একটি মজার ঘটনা ঘটেছিল।

সেদিন আমি একলাই গেছি হাওড়ায় শরৎবাবুর কাছ থেকে 'কপি' আনতে। আমাকে দেখে শরৎবাবুর প্রিয় কুকুর ভেলু এমন তেড়ে এল যে, আমি প্রাণভয়ে চেয়ারটাকে তক্তপোষের উপর তুলে হাত-পা গুটিয়ে চেয়ারের উপর বসে আছি। এদিকে চৌকির নীচে ভেলু প্রাণপণ শক্তিতে চিৎকার করে চলেছে। খালি মনে হচ্ছে—এই বুঝি কামড়ালো। ভেলু যে পরিমাণ চিৎকার করছে, আমি তার থেকেও গলাটা আরও একটু চড়িয়ে শরৎবাবুকে ডেকে চলেছি. তিনি তাড়াতাড়ি বেরিয়ে এসে ভেলুকে নিরস্ত করে আমায় আশ্বস্ত করলেন।

লেখা সম্বন্ধে যাঁরাই শরৎবাবুর নিকটস্থ হয়েছেন, তাঁরাই জানেন, তাঁর কাছ থেকে লেখা আদায় করা কিরকম দুষ্কর ছিল। আমরা কোন কোন রবিবার মাত্র একটি স্লিপ নিয়ে চলে এসেছি। এইভাবে প্রায় দু' বছর ধরে 'চরিত্রহীনে'র লেখা শেষ হলে বই প্রকাশিত হয়। এই সম্বন্ধে আর একটা কথাও লেখা দরকার বলে মনে করি। 'চরিত্রহীন' ছাপা প্রায় শেষ হয়ে এসেছে, এমন সময় বই-এর কি দাম হবে তাই নিয়ে শরৎবাবুর সঙ্গে প্রায়ই আমার তর্কাতর্কি হতো। তর্কটা এমন কিছুই নয়—বইএর দাম তিন টাকা হবে, না সাড়ে তিন টাকা হবে! শেষ-পর্যন্ত তিন টাকাই ধার্য হলো। আজকের দিনে অবশ্য বাংলা বইএর দাম তুলনামূলকভাবে বিচার করলে অবাক হয়ে যেতে হয়। এখন তো বাংলা উপন্যাসের দাম বারো টাকা থেকে ওঠানামা করছে ত্রিশ টাকা পর্যন্ত; কিন্তু আজ থেকে প্রায় ৫০ বছর আগে সামান্য আট আনা বাড়ানো-কমানো নিয়ে কি যন্ত্রণা ভোগ করতে হয়েছিল, তা এখনকার পাঠক-পাঠিকা ও প্রকাশকদের বোঝা সম্ভবপর নয়।

১৩৪৪ বঙ্গাব্দে মুদ্রিত ৫ম সংস্করণে শরৎচন্দ্র নিজে লিখেছিলেন :

"চরিত্রহীনের গোড়ার অর্ধেকটা লিখেছিলাম অল্পবয়সে। তারপরে ওটা ছিল পড়ে। শেষ করার কথা মনেও ছিল না, প্রয়োজনও হয়নি। প্রয়োজন হলো বহুকাল পরে। শেষ করতে গিয়ে দেখতে পেলাম বাল্যরচনার আতিশয্য ঢুকেচে ওর নানা স্থানে, নানা আকারে, অথচ সংস্কারের সময় ছিল না—ঐভাবেই ওটা রয়ে গেল। বর্তমান সংস্করণে গল্পের পরিবর্তন না করে সেইগুলিই যথাসাধ্য সংশোধন করে দিলাম।"

'চরিত্রহীনে'র প্রথম পাণ্ডুলিপি সবটাই আগুনে পুড়ে যায়। রেঙ্গুন থেকে ২২এ ১৯১২ তারিখে শরৎচন্দ্রের বাল্যবন্ধু প্রমথনাথ ভট্টাচার্যকে লেখেন, "আগুনে পুড়িয়াছে আমার সমস্তই। লাইব্রেরী এবং চরিত্রহীন উপন্যাসের manuscript.... আবার শুরু করিব। এখন উৎসাহ পাই না। 'চরিত্রহীন' ৫০০ পাতায় প্রায় শেষ হইয়াছিল—সবই গেল।"

'চরিত্রহীন' গ্রন্থাকারে প্রকাশের পূর্বে শরৎচন্দ্র উপন্যাসটি নতুন করে লিখছিলেন। গ্রন্থাকারে প্রকাশের সময় আমাকে বেশ অসুবিধায় পড়তে হয়। 'যমুনা'য় যখন 'চরিত্রহীন' প্রকাশ শুরু হয়, তখন শরৎচন্দ্র 'যমুনা'র সঙ্গে সম্পর্ক ত্যাগ করেন। ধারাবাহিকভাবে আর কোথাও প্রকাশিত হয়নি। আমি সম্পূর্ণ পাণ্ডুলিপি না পেয়ে মুদ্রণ শুরু করায় অসুবিধায় পড়ি। কপির অভাবে ছাপা প্রায়ই স্থগিত রাখতে হতো। যতদূর মনে পড়ে, তখন 'চরিত্রহীন' ছাপা হয়েছিল কুন্তলীন প্রেসে। আমি শরৎচন্দ্রকে চিঠি লিখলে তিনি ১৯১৫ খৃষ্টাব্দের ডিসেম্বরে উত্তরে জানান : "কাল রাত্রে তোমার পত্র পাইলাম। বিলম্ব যে হইতেছে এবং তাহাতে যে ক্ষতি হইতেছে সে কি জানি না? তার প্রায় অধিকাংশই নূতন করিয়া লিখিতে হইতেছে। যদি দু'-এক মাস দেরী হয় হোক সে ভালো, কিন্তু পাছে এমন করিয়া শুরু করিয়া খারাপ হইয়া যায়, সেই আমার ভয়..."

১৩২৪ সালে গ্রন্থকারে প্রকাশিত হবার পর 'চরিত্রহীনের' যে কত চাহিদা, তা প্রথমদিনই প্রকাশ পায়, প্রথম দিনই সাড়ে চারশ' কপি বই বিক্রি হয়ে যায়—এ-কথা স্বর্গত সুসাহিত্যিক হেমেন্দ্রকুমার অন্যত্র লিখেছিলেন। হেমেন্দ্রবাবু আরও লিখেছেন, দ্বিজেন্দ্রলাল রায় মৃত্যুর পূর্বে 'ভারতবর্ষে'র সম্পাদক হওয়ার সময় শরৎচন্দ্রকে 'ভারতবর্ষে'র নিয়মিত লেখকরূপে পেতে আগ্রহ প্রকাশ করেন। শরৎচন্দ্রের বাল্যবন্ধু প্রমথনাথ ভট্টাচার্য দ্বিজেন্দ্রলালকে 'চরিত্রহীনে'র পাণ্ডুলিপি পড়তে দেন। অশ্লীলতার জন্য তিনি 'ভারতবর্ষে' 'চরিত্রহীন' প্রকাশ করতে

রাজী হলেন না। 'চরিত্রহীন' বাতিল হয়ে ফিরে আসে এবং পরে 'যমুনা'য় বেরুতে আরম্ভ করে।

শরৎচন্দ্রের যুগে অনেক নীতিবাগীশের দল তাঁর লেখাকে অশ্লীল বলে অভিহিত করেছিলেন এবং এ-লেখা সকলকে পড়তে নিষেধ করতেন। অথচ তুলনা করলে বোঝা যাবে এই অশ্লীলতা বাংলা-সাহিত্যে আজ-কাল কোথায় গিয়ে ঠেকেছে!

শরৎচন্দ্রের লেখা পাণ্ডুলিপি দেখলে মনে হতো যে, লেখা খুব কষ্টকল্পিত, সহজ ও সরল নয়। কারণ, যদিও হাতের লেখা খুব সুস্পষ্ট এবং সুন্দর ছিল, তবু লেখায় ভীষণ কাটাকুটি এবং অদল-বদল থাকতো; কিন্তু পাঠোদ্ধার করা যেতো অনায়াসেই। শরৎচন্দ্র খুব শৌখিন লেখক ছিলেন বলে কাগজ ও কলম সবসময় প্রথম শ্রেণীর থাকত।

কালীবাবু ১০ই মে ১৯১৩ সালে শরৎচন্দ্রকে একটি চিঠিতে লিখেছিলেন :

'চরিত্রহীন' যাতে 'যমুনা'য় বার হয়, তাই আমার আন্তরিক ইচ্ছা এবং ঈশ্বরের ইচ্ছায় তাই হবে। নিশ্চিন্ত হোন। তবে শুনিতেছি ওটাতে মেসের ঝি থাকাতে রুচি নিয়ে হয়ত একটু খিটিমিটি বাধিবে। তা বাধুক। লোকে যতই কেন নিন্দা করুক না, যারা যত বেশী নিন্দা করিবে, তারা তত বেশী পড়িবে। ওটা ভাল হোক, মন্দ হোক, একবার পড়িতে আরম্ভ করিলে পড়িতেই হইবে। যারা বোঝে না, যারা আর্ট-এর ধার ধারে না, তারা হয়ত নিন্দা করবে। কিন্তু নিন্দা করলেও কাজ হবে। তবে ওটা psychology এবং analysis সম্বন্ধে যে খুব ভাল, তাতে সন্দেহই নেই। এবং ওটা সম্পূর্ণ Scientific Ethical Novel! এখন টের পাওয়া যাচ্ছে না।"

শরৎচন্দ্র একখানি চিঠিতে প্রমথনাথকে লেখেন : সুরেনমামা ও জনৈক প্রকাশক এ-বইটি immoral বলেছেন এটি নাকি কোনো পত্রিকাই প্রকাশ করতে পারে না।

শরৎচন্দ্র এক জায়গায় (সাহিত্য-সম্ভার ১১শ খণ্ড, ৪১৬ পৃষ্ঠা) লিখেছেন : এটা চরিত্রহীনের লেখা চরিত্রহীন—তোমাদের সুরুচির দলের মধ্যে গিয়ে বড়ই বিব্রত হয়ে পড়বে—তাছাড়া অত্যন্ত অশোভন দেখাবে।

হায়! মেসের ঝি সাবিত্রী! আজকালকার দিনে তোমার স্থান অনেক উচ্চঘরের নারীরাই নিয়েছে। আমাদের দোকান থেকে চরিত্রহীন প্রকাশের পর থেকে আমরা অশ্লীল প্রকাশক বলে খ্যাতিলাভ করলাম। আরও কয়েকটি অশ্লীল বই সেই সময়ে আমাদের দোকান থেকে প্রকাশিত হয়েছিল, যেমন পাঁচকড়িবাবুর প্রাচীর ও প্রান্তর, বেদে, শুভ্রা প্রভৃতি। সেই সময় এই সকল বই সাধারণ কলেজ ও স্কুল পাঠাগারে রাখা হতো না। আর আজকালকার দিনে?

আমরা শরৎবাবুর প্রথম যে ছয়খানি বই প্রকাশ করেছিলাম তার শেষ বই হলো "নারীর মূল্য।" এই বইখানি প্রকাশে অসম্ভব দেরী হয়েছিলো। শেষে শরৎবাবু নিজেই এই দেরীর জন্য কৈফিয়ৎ দিতে আমার নামে দিয়ে একটি ভূমিকা লিখে দিয়েছিলেন। দুঃখের বিষয় আমাদের প্রকাশকগণ এমন চমৎকার ব্যবসাবুদ্ধিসম্পন্ন যে তাঁরা ধরতেই পারলেন না যে ভূমিকাটি শরৎবাবুর নিজের লেখা—আমার নাম দিয়ে ছাপা হয়েছে মাত্র। আমার কলম দিয়ে এ লেখা বেরোতেই পারে না। ফলে পরবর্তী একাধিক সংস্করণে এই ভূমিকাটি প্রকাশকরা বাদ দিয়ে দিয়েছেন।

ভূমিকাটি ছিল এই—পাঠক-পাঠিকাদের অবগতির জন্যে নিম্নে উদ্ধৃত হল :

"১৩২০ সালের 'যমুনা' মাসিক পত্রে 'নারীর মূল্য' প্রবন্ধগুলি ধারাবাহিকরূপে যখন প্রকাশিত হয়, তখন আমরা এগুলি গ্রন্থাকারে ছাপিবার অনুমতি লাভ করি।

কি মনে করিয়া যে শরৎবাবু তখন আত্মগোপন করিয়া শ্রীমতী অনিলা দেবীর ছদ্মনাম গ্রহণ করিয়াছিলেন সে তিনিই জানেন, তবে তাঁহার ইচ্ছা ছিল এমনি আরও কয়েকটি 'মূল্য' লিখিয়া 'দ্বাদশ মূল্য' নাম দিয়া পরে যখন গ্রন্থ ছাপা হইবে, তখন তাহা নিজের নামেই বাহির করিবেন। তারপরে এই দীর্ঘ দশ বৎসর কাটিয়া গেল, না লিখিলেন তিনি আর কোনো মূল্য, না হইতে পাইল 'দ্বাদশ মূল্য' ছাপা। আমরা গিয়া বলি, মশায়, আপনার দ্বাদশ মূল্য আপনারই থাক, পারেন ত' আগামী জন্মে লিখিবেন, কিন্তু যে 'মূল্য' আপাততঃ হাতে পাইয়াছি, তাহার সদ্ব্যবহার করি। তিনি বলেন, না হে থাক, এ আর বই করিয়া কাজ নাই। কিন্তু কারণ কিছুই বলেন না। এমনি করিয়া দিন কাটিতেছিল, অথচ তাঁহার মতের পরিবর্তন হইয়াছে, তাহাও নয়। আমাদের শুধু মনে হয়, তখনকার কালে নারীরা নিজেদের অধিকার সম্বন্ধে কথা কহিতে শিখে নাই বলিয়াই এ কাজ তিনি করিয়াছিলেন। কিন্তু এখন কাগজে কাগজে ইঁহাদের দাবী-দাওয়ার প্রাবল্য ও পরাক্রান্ত নিবন্ধাদি দর্শন করিয়া এই বৃদ্ধ গ্রন্থকার ভয় পাইয়া গেছেন। তবে এ কেবল আমাদের অনুমান, সত্য নাও হইতে পারে। কিন্তু এ কথা ঠিক যে, এ বই ছাপাইবার তাঁহার প্রবৃত্তি ছিল না। তাঁহার ইচ্ছার বিরুদ্ধে ইহা প্রকাশ করিয়া ভাল করিয়াছি, কি মন্দ করিয়াছি, তাহা পাঠক বলিতে পারেন। আমাদের ত' মনে হয় মন্দ করি নাই। কিন্তু ইহার যত কিছু দায়িত্ব সে আমাদেরই।"

'নারীর মূল্য' পুস্তকাকারে ১৩৩০ বঙ্গাব্দের চৈত্র মাসে প্রকাশিত হয় এবং লেখক হিসাবে শরৎচন্দ্রের নিজের নামই থাকে। পূর্বে 'যমুনা'য় ধারাবাহিকভাবে প্রকাশিত হওয়ার সময় তাঁর ভগিনী অনিলা দেবীর নাম ছিল এই রচনাগুলির লেখিকা হিসাবে। 'যমুনা'য় 'নারীর মূল্য' প্রকাশিত হয় বৈশাখ, আষাঢ়, ভাদ্র ও আশ্বিন সংখ্যায়।

আমাদের প্রকাশিত ছয়খানি বই-এর যখন যেটির প্রথম সংস্করণ ফুরোতে লাগল, তখনই অন্য প্রকাশক সে বই-এর নতুন সংস্করণ প্রকাশ করতে লাগলেন। তাঁর সব বই আমাদের প্রকাশনার আওতার বাইরে চলে যাওয়ায় তাঁর সঙ্গে আমার যোগাযোগ-টাও ক্ষীণ হয়ে উঠল। কিন্তু তাঁর সঙ্গে আমার অন্তরঙ্গতা আবার ফিরে এল তাঁর মৃত্যুর সময়।

আমি তখন দক্ষিণ কলকাতায় দেশপ্রিয় পার্কের কাছে বাড়ী করে বাস করতে সুরু করেছি। শরৎবাবুর বাড়ীও আমার বাড়ীর কাছেই—প্রায় আধ মাইলের মধ্যে। তিনি বিরাট বাড়ী তৈরী করেছিলেন অশ্বিনী দত্ত রোডে। শরৎচন্দ্রের মাতুল সুরেন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায় দুদিন আমার বাড়ীতে এসেছিলেন আমাকে শরৎবাবুর কাছে নিয়ে যাবার জন্যে। এই দু'দিনই আমি বাড়ীতে না থাকায় তিনি ফিরে যান। তৃতীয় দিন আমাকে আমার বাড়ীতে এসে পাকড়াও করেন রাত্রি প্রায় সাড়ে ন'টার সময়। ব্যাপারটা কি জিজ্ঞেস করায় তিনি তখন কিছু বললেন না, শুধু বললেন : চল না, তোমাকে একবার ডেকেছে।

দীর্ঘদিন পরে দেখা। তাঁর চেহারাটি দেখা মাত্রই আঁতকে উঠলাম, বললাম : আপনার চেহারাটা তো ভাল দেখাচ্ছে না—কি চেহারা হয়েছে আপনার!

এমন সময় পিছন দিক থেকে আমার পিঠের উপর একটি বেশ ভারী কিল পড়ল। চমকে ফিরে দেখি সেটি শরৎবাবুর মাতুলের ইঙ্গিত। অর্থাৎ আমি যেন ও'র সামনে ও'র শরীরের বিষয় কিছু না বলি, তাহলে উনি বেশী মাত্রায় বিচলিত হয়ে পড়বেন।

ভাল করে লক্ষ্য করে দেখলাম যে তাঁর চেহারায় আগের মত সে দীপ্তি নেই—কিরকম যেন বিবর্ণ, ম্লান দেখাচ্ছে। বেশ মনে হয় মৃত্যুর ছায়া যেন তাঁকে ঘিরে রয়েছে। ম্লান হেসে তিনি আমাকে মামুলি দু'এক কথার পর প্রস্তাব করলেন হাজার-খানেক টাকা তাঁকে দিতে হবে। কারণ তিনি জানালেন ডাঃ কুমুদশঙ্কর রায় কোন এক নার্সিং হোমে তাঁর অপারেশনের ব্যবস্থা করেছেন এবং অস্ত্রোপচার করবেন বিখ্যাত সার্জন ডাঃ ললিত বন্দ্যোপাধ্যায়। এই টাকাটি তাঁর বিশেষ প্রয়োজন এই চিকিৎসার জন্য। শরৎবাবু নিজে আমায় বললেন যে সুস্থ হয়ে ফিরে এসে একখানি উপন্যাস লিখে তিনি আমায় এ টাকা শোধ করে দেবেন।

তাঁর এ অবস্থায় আমি আর কোনো রকম চিন্তা না করে দু'একদিনের মধ্যে তাঁকে এ টাকাটা হাতে দিয়ে এলাম। এর কয়েকদিন পরে তাঁকে নার্সিং হোমে নিয়ে যাওয়া হয় এবং দিন কুড়ি পরে তাঁর দেহে অস্ত্রোপচার হয়। এই অস্ত্রোপচারের ফলে তাঁর রোগ নিরাময় হওয়া দূরে থাকুক, দিন দিন তাঁর অবস্থার অবনতি ঘটতে লাগল এবং একদিন তিনি এ পৃথিবীর মায়া কাটিয়ে অমৃতলোকের উদ্দেশ্যে যাত্রা করলেন। ([illegible])

গৌরাঙ্গ পরিজন

অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্ত

দামোদর শঙ্কর পরমেশ্বর

(২২)

দামোদর পণ্ডিত

নবদ্বীপের এক দরিদ্র ব্রাহ্মণ। বাসনা-হীন, নিরপেক্ষ ও উদাসীন। প্রভুর নীলাচল অভিযানের এক সহযাত্রী।

ছোট ভাইয়ের নাম শঙ্কর।

প্রভু দামোদরকে বললেন, তোমাদের দু-ভাইয়ের উপরেই আমার প্রীতি আছে। তোমার উপর আমার সগৌরব প্রীতি আর শঙ্করের প্রতি আমার প্রীতি বিশুদ্ধ, নিঃসংকোচ। সেখানে কোনো গৌরববুদ্ধি নেই।

দামোদর বললে, তাহলে এখন থেকে তোমার কৃপায় শঙ্কর আমার বড় ভাই হয়ে গেল। 'দামোদর কহে—শঙ্কর ছোট আমা হইতে। এবে আমার বড় ভাই তোমার কৃপাতে।।'

দামোদরের গৌরববুদ্ধি না হয়ে যায় না। দামোদরের এমন প্রচণ্ড প্রেম যে সে স্বয়ং প্রভুকেও শাসন করে। বাক্যদণ্ড দিতে দ্বিধা করে না।

একটি ওড়িয়া ব্রাহ্মণকুমার প্রভুর কাছে রোজ আসে। পিতৃহীন, তাই বুঝি স্নেহের কাঙাল। স্বভাবটি নম্র, দেখতেও সুকুমার। প্রভুও তাকে স্নেহ করেন আর সেই স্নেহই তাকে তাঁর কোলের কাছে টেনে আনে। 'যাহাঁ প্রীতি তাহাঁ আইসে—বালকের রীত।'

কিন্তু দামোদরের কাছে তা ভালো লাগে না।

তুমি আর এখানে এস না। বালককে নিষেধ করে দামোদর।

বালক সে কথায় কান দেয় না। প্রভু যে তার প্রাণ। তাঁকে না দেখে যে সে থাকতে পারে না। তাই বারেবারে চলে আসে।

একদিন দামোদরের অসহ্য লাগল। সে প্রভুকেই গেল শাসন করতে।

অন্যের বেলায় তো খুব উপদেশ দিতে পারো, কিন্তু নিজের বেলায় কী!

প্রভু সবিস্ময়ে দামোদরের দিকে তাকালেন।

পরকে উপদেশ দিতে গোসাই খুব পণ্ডিত, দামোদর বিদ্রূপ করে উঠল, অথচ নিজের বেলায় গোসাইয়ের খোঁজ নেই। এবার বেরুবে গোসাইগিরি।

কেন, কী হল? প্রভুর বিস্ময় আরো দারুণ।

তুমি জানো না এই ছেলেটা কে?

কে!

ও এক বিধবার ছেলে। বিধবা যদিও সতীসাধ্বী তপস্বিনী, তার এক দোষ আছে।

প্রভু স্তব্ধ হয়ে রইলেন।

'বিধবা সুন্দরী, তার উপরে যুবতী। আর তুমিও পরম সুন্দর যুবক। বিধবার ছেলের সঙ্গে তোমার মাখামাখি দেখে লোকে যে কানাকানি করবে? সে কলঙ্ক-কথন তুমি রোধ করতে পারবে? সুখর জগতের মুখ পার আচ্ছ দিতে?'

নতমুখে বসে রইলেন প্রভু।

অবশ্য তুমি স্বতন্ত্র ঈশ্বর, যা ইচ্ছে তুমি তাই করতে পারো, কিন্তু লোকের মুখ তুমি চাপা দেবে কী করে? নিজে তুমি এত বড় পণ্ডিত, নিজেই নিজের আচরণবিধি দেখ না বিচার করে। লোকের কানাঘুষোর সুযোগ করে দেওয়া কি ঠিক হচ্ছে?

একেই বলে নিরপেক্ষতা। একেই বলে অন্তরঙ্গ প্রেম। অমঙ্গলের আশঙ্কায় যে প্রেম শাসন করতে পর্যন্ত কুণ্ঠিত হয় না।

প্রভু মুখ তুলে হাসলেন। অন্তরে তাঁর প্রচণ্ড সন্তোষ। এই বাক্যদণ্ড যে তাঁরই অভিপ্রেত। পরোক্ষে লোকশিক্ষা।

প্রভু বললেন, দামোদর, তুমি নবদ্বীপে যাও, আমার মাকে গিয়ে দেখ। দেখ সেখানে কোনো ত্রুটি হচ্ছে কিনা। তুমি যেমন আমাকে শাসন করলে দেখ সেখানেও কোনো শাসনের কারণ আছে কিনা।

দামোদর এক কথায় রাজি হয়ে গেল।

মাকে বোলো তাঁর জন্যেই আমি তোমাকে তাঁর কাছে পাঠাচ্ছি। তুমি নিরন্তর তাঁকে আমার কথা শুনিয়ো। বোলো আমি সুখে আছি। তাহলেই তিনি সুখে থাকবেন। 'মোর সুখকথা কহি সুখ দিহ তাঁরে।' আর শোনো, সেই গোপন কথাটি তাঁকে স্মরণ করিয়ে দিও।

কী গোপন কথা?

আমি বার-বার তাঁর কাছে যাই, তাঁর হাতের রান্না খেয়ে আসি। সেই মাঘী-সংক্রান্তির মা কত পিঠে-পায়েস রাঁধল, কত অন্ন-ব্যঞ্জন, আমি সব খেয়ে নিলাম। মা ভাবলেন, নিমাই তো নীলাচলে, সে এখানে এসে খায় কী করে—তবে আমি বুঝি স্বপ্ন দেখছি। পাক-পাত্র যখন খালি তখন বুঝি আমি কৃষ্ণেরই ভোগ লাগাইনি। অমনি আবার দেখলেন পাকপাত্র আগের মতই ভর্তি হয়ে আছে। তখন আবার ভোগ লাগালেন। আমি আবার গিয়ে ভোজনে বসলাম। তুমি মাকে বোলো। এ স্বপ্ন নয়, এ আমার প্রত্যক্ষ আবির্ভাব। বোলো তাঁর আদেশেই আমি নীলাচলে আছি আর তাঁর বাৎসল্যের আকর্ষণেই তাঁর কাছে উপস্থিত হচ্ছি বার-বার।

নবদ্বীপ থেকে ঘুরে এলে দামোদরকে প্রভু জিজ্ঞেস করলেন, মাকে কেমন দেখে এলে? তাঁর কি বিষ্ণুভক্তি আছে?

দামোদর ক্ষেপে গেল। বললে, এ তুমি কী বললে? আইয়ের ভক্তি আছে কিনা? তোমার যে বিষ্ণুভক্তি সেও তো আইয়েরই অনুগ্রহ। বিষ্ণুভক্তির যদি কোনো মূর্তি দেখতে চাও, আই-ই তো সেই মূর্তি।

দামোদর, তুমি আজ আমাকে কিনে নিলে। আমারই মনের কথা তোমার মুখে

আজ শুনতে পেলাম। আমার সমস্ত ভক্তি-সম্পত্তি আমার মার কাছ থেকেই পাওয়া। তুমি যাও, তুমিই আজ থেকে আমার মায়ের রক্ষণাবেক্ষণ কোরো।

শচীদেবী দেন রাখতে বিষ্ণুপ্রিয়ার খবরাখবর করে দামোদর। যদিও বিষ্ণুপ্রিয়া কারু মুখালোকী নয়—'জন্মাবধি স্বপনেও যেঁহো নাহি দেখে সূর্যের কিরণ'— তবু প্রভুর ইচ্ছায় দামোদর বিষ্ণুপ্রিয়ার জন্যে নিত্য গঙ্গাজল তুলে এনে দেয়।

সে গঙ্গাজলে মিশিয়ে দেয় তার অনাবিল সেবা-সুধা।

(২৩)

শঙ্কর পণ্ডিত

দামোদরের ছোট ভাই। প্রভুর 'পাদোপধান'—পায়ের বালিশ।

নবদ্বীপ লীলায় প্রভুর কিছু সাহচর্য করলেও শঙ্কর আসলে নীলাচলে প্রভুর সেবাসঙ্গী। শঙ্করের প্রতি প্রভুর বিশুদ্ধ প্রীতি, তাতে কোনো সঙ্কোচ নেই, কোনো বারণ-অবরণ নেই।

প্রভু বলছেন, শঙ্করকেই আমার কাছে রাখো। ওর কাছেই আমি অকুণ্ঠ। 'শুদ্ধ কেবল প্রেম ইহার উপর। অতএব মোর সঙ্গে রাখহ শঙ্কর।'

নীলাচলে মহাপ্রভুর আগমন থেকে তিরোভাব পর্যন্ত শঙ্কর প্রভুর সেবা করেছে। উৎসবে ভক্তদের খাওয়াবার সময় কাশীশ্বর জগদানন্দের সঙ্গে একযোগে পরিবেশন করেছে। কখনো বা ঘরভাতে নিমন্ত্রণ করে খাইয়েছে প্রভুকে।

কিন্তু তার আসল কাজ হচ্ছে প্রভুর পদসেবা। 'সাহজিক প্রেমপাত্র তুমার শঙ্কর।'

প্রভু গম্ভীরাতে শুয়ে আছেন, দ্বারপ্রান্তে স্বরূপ আর গোবিন্দ ঘুমুচ্ছে। রাধার আবেশে প্রভু উদ্বেলিত হয়েছেন, জেগে উঠে বসে নামকীর্তন সুরু করেছেন—স্বরূপ আর গোবিন্দ যেমনি ঘুমিয়ে ছিল তেমনি ঘুমিয়েই রইল, প্রভুর কী অবস্থা কিছুই জানতে পেল না।

কৃষ্ণবিরহে ব্যাকুল হয়ে শয্যা ছেড়ে উঠে পড়লেন প্রভু। ইচ্ছে হল কৃষ্ণকে অন্বেষণ করবার জন্যে এই নিকুঞ্জমন্দির থেকে বেরিয়ে পড়ি।

কিন্তু দ্বার খুঁজে পেলেন না। গম্ভীরার প্রাচীরে মুখ ঘষতে লাগলেন।

মুখে-গালে অনেক ক্ষত হল। ক্ষতস্থান থেকে রক্ত ঝরতে লাগল।

প্রভুর আর্তনাদে জেগে উঠল স্বরূপ-গোবিন্দ।

এ তুমি কী করেছ? তোমার মুখ এমনি কেটে গেল কী করে? আলো জেললে দেখে স্বরূপ-গোবিন্দ হাহাকার করে উঠল।

প্রভু বললেন, কৃষ্ণ-বিরহে আমি অস্থির হয়ে উঠেছিলাম, ঘরের মধ্যে টিকতে পারছিলাম না। মনে হল কৃষ্ণ বাইরে আছে তাই তাড়াতাড়ি বাইরে বেরুবার জন্যে ছুটলাম। অন্ধকারে দরজা খুঁজে পেলাম না। যেদিকেই ছুটি সেদিকেই দেয়াল। দেয়ালের সঙ্গে বারে-বারে মুখ ঘষে যেতে লাগল। সেই ঘষা খেয়েই এত ঘা, আর ঘা থেকেই রক্ত।

সবাই বুঝল প্রভুর এই দিব্যোন্মাদের অবস্থা। না আছে বাহ্যজ্ঞান, না আছে দেহস্মৃতি। কিন্তু তাঁর শ্রীঅঙ্গের কষ্ট তো দু-চোখে দেখতে পারি না।

এর প্রতিকার কী?

এর প্রতিকার শঙ্কর। শঙ্করকে প্রভুর পায়ের তলায় শোয়ানো যাক। শঙ্করই হবে তাঁর রাত্রির প্রহরী।

কিন্তু প্রভু কি রাজি হবেন?

তখন সবাই প্রভুকে গিয়ে ধরল। গম্ভীরার মধ্যে আপনার পায়ের কাছটিতে শঙ্কর শোবে।

প্রভু শঙ্করকে প্রত্যাখ্যান করতে পারলেন না। কে না জানে তার সম্পর্কেই প্রভুর কোনো সঙ্কোচ নেই।

প্রভুর পদতলে শঙ্কর তার শয্যা পাতল। আর শঙ্করের গায়ের উপর প্রভু তাঁর পা প্রসারিত করে দিলেন।

বিদুরের ঘরে ভোজন করে কৃষ্ণও অমনি বিদুরের কোলে পা মেলে দিয়ে ঘুমিয়েছিলেন। বিদুর যেমন কৃষ্ণের তেমনি শঙ্কর গৌরাঙ্গের পাদোপধান।

প্রভু শুলে শঙ্কর বসে বসে তাঁর পা টেপে। যখন দেখে প্রভুর ঘুম এসে গেছে তখন সে নিজে শোবার কথা চিন্তা করে।

প্রভু দেখেন শঙ্কর খালি গায়ে ঘুমুচ্ছে। শীতের প্রতিও তার কোনো ভ্রূক্ষেপ নেই। প্রভু তখন তাঁর গায়ের কাঁথাখানি শঙ্করের গায়ের উপর ধীরে বিছিয়ে দেন। শঙ্কর টের পায় না।

কিন্তু মোটমাট তার ঘুম খুব পাতলা। একটুতেই সে উঠে পড়ে। উঠে পড়েই সে আবার প্রভুর পা টিপতে থাকে।

তবু যখন তিনি কাঁথাখানি বিছিয়ে দিয়েছেন তখন যদি টের পেয়েও সে ওঠে পারে কি। শরীরে প্রভুর বিস্তীর্যমান বাৎসল্যটুকু উপভোগ করছে।

শঙ্করের পাহারা এড়িয়ে প্রভু আর বাইরে বেরুতে পারেন না। তাঁর কমল-কোমল মুখখানি যেমন অম্লান তেমনি অম্লানই থাকে।

> নিরন্তর ঘুমায় শঙ্কর শীঘ্রচেতন।
> বসি পাদ চাপি করে রাত্রি-জাগরণ।।
> তার ভয়ে নারে প্রভু বাহিরে যাইতে।
> তার ভয়ে নারে ভিত্তো মুখাব্জ ঘষিতে।।

প্রভুর তিরোভাবের পরেও কিছুদিন বেঁচে ছিল শঙ্কর। দু হাত বাড়িয়ে প্রভু আবার কবে তাকে তাঁর চরণতলে টেনে নিলেন কেউ জানে না।

(২৪)

পরমেশ্বর মোদক

'আমি পরমেশ্বর।' কে একজন প্রভুর পায়ে পড়ল দণ্ডবৎ হয়ে।

প্রভু তাকে অনায়াসে চিনতে পারলেন। নবদ্বীপের ময়রা, তাঁদের বাড়ির কাছেই তার ঘর। বাল্যকালে তার ঘরে কত গিয়েছে নিমাই, দুধ-গুড় দিয়ে তৈরি কী সুন্দর মোয়া খেয়ে এসেছে। সেই টানে সেই সুদূর নবদ্বীপ থেকে চলে এসেছে নীলাচলে। দেখে আসি আমার সেই নিমাই কেমন আজ গৌরহরি হয়েছেন!

পরমেশ্বরের ছেলের নাম মুকুন্দ। তাও প্রভুর মনে আছে।

প্রভু পরমেশ্বরকে দেখে খুব খুশি হলেন। বললেন, 'পরমেশ্বর! ভালো আছ তো? তুমি এসেছ, খুব ভালো করেছ।'

পরমেশ্বর বললে, 'মুকুন্দের মাকেও সঙ্গে এনেছি।'

শোনামাত্রই প্রভু সংকুচিত হয়ে গেলেন। স্ত্রীলোকের নাম পর্যন্ত সন্ন্যাসীর শুনতে নেই। কিন্তু সংকুচিত হলেও প্রভু বাইরে তা প্রকাশ করলেন না। কত কষ্ট করে কত দূর থেকে এসেছে। আর প্রভুর প্রতি পরমেশ্বরের কী অকপট স্নেহ!

পরমেশ্বর সরল, চতুরতার ধার ধারে না, তাই সে তার স্ত্রীর কথাও বললে—মুকুন্দের মা-ও এসেছে। সন্ন্যাসীর কাছে স্ত্রীলোকের প্রসঙ্গ তোলা যে উচিত নয় তার সে বিবেচনা নেই। সে বাকপটুতা জানে না, জানে না রেখে-ঢেকে ওজন করে কথা কহিতে। মুকুন্দের মা যে এসেছে এ তো আর মিথ্যে নয়। আর এসেছে প্রভুর প্রতি প্রীতিপ্রেরিত হয়ে।

প্রভু তার অন্তরের ভাবটুকুর খবর পেলেন। যেখানে শুধু সরলতা আর স্নেহ সেখানে প্রভু আর সঙ্কোচে থাকেন কী করে?

প্রভু অন্তরে আনন্দিত হলেন।

> 'প্রশ্রয়-পাগল—শুদ্ধবৈদগ্ধী না জানে।
> অন্তরে সুখী হৈলা প্রভু তার সেই গুণে।'

(ক্রমশঃ)
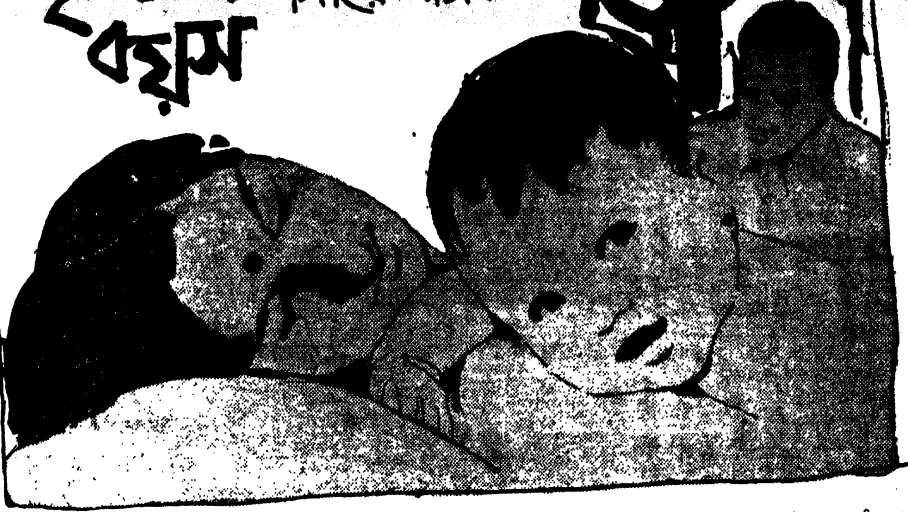
(পূর্ব প্রকাশিতের পর)

(নয়)

অনিমাদি সেদিন ছুটির পর ওকে একলা পেয়ে জিজ্ঞেস করল : 'হ্যাঁরে, কী হয়েছে তোর? কিছুদিন থেকে দেখছি কেমন শুকিয়ে যাচ্ছিস।'

বকুল হাসল। 'যা। কী হবে আমার? ভালোই তো আছি।'

'আমাকে রাগাসনে, বকুল। কী হয়েছে সত্যি করে বল? যদি না বলিস আমি তোর বরকে গিয়ে জিজ্ঞেস করব।'

বকুল একটু থেমে বললে, 'আচ্ছা অনিমাদি, তুমি হাঁপিয়ে ওঠো না?'

'কেন? হাঁপিয়ে উঠব কেন?'

'কী জানি, আমি তো হাঁপিয়ে উঠছি। আর পারছিনে।'

অনিমাদি সন্দেহের গলায় জিজ্ঞেস করল: 'এই, কী হয়েছে, সুধন্যর সঙ্গে ঝগড়া করছিস?'

বকুল হাসল। 'না, ঝগড়া করব কেন? সময় কোথায়?'

'মানে?'

'ও আজকাল ভীষণ ব্যস্ত থাকে, একেবারে সময় পায় না।'

'কেন? তোর কর্তা কী করপোরেশনের ইলেকশেনে দাঁড়াচ্ছেন? বাবা, কী কাজের মানুষ।' অনিমাদি হাসল।

'না, ঠাট্টা নয় ভাই। আজকাল ওকে দেখলে তুমিও চিনতে পারবে না। আমাদের সুখে রাখবার চিন্তায় ওর ঘুম নেই।' তারপর দু-একটি উদাহরণ, দিল বকুল: 'দ্যাখো, ওর মনোভাবটা, আমরা যেন ওকে দুবেলা তাড়া দিচ্ছি চাল-ডাল-তেলের জন্যে। ওর এই মরিয়া ঝোঁকটা নিয়ত আমাকে কাঁটা হয়ে বিঁধছে।

অনিমাদি নিশ্বাস ছেড়ে বললে, 'ও এই কথা। আমি ভাবি...'

বকুল উত্তেজিত হয়ে বললে, 'না-না অনিমাদি, তুমি বুঝবে না। বাইরের লোক ওর এই কাজ-কর্মগুলো দেখলে কী মনে করে? ভাববে বউটার জন্যেই মানুষটা এমন হয়ে যাচ্ছে। আমি তো ওকে বলিনি, ভাবতেও পারিনে কোনো মানুষ এইভাবে ডাল-তেলের জন্যে এমন হন্যে হয়ে দিন-রাত ঘুরবে।'

অনিমাদি বললে, 'একথা তো ওকে বুঝিয়ে বললেই পারিস।'

'না, ও শোনে না। আমি রাগ করলেও বোঝে না। ও হয়তো মনে করে আমার রাগগুলো বানানো। অথচ ও নিজের ক্ষতি করছে। চাকরিতে যাওয়াটাও ওর গৌণ হয়ে পড়ছে। আমার ভয় হয় ওর সহকর্মীরাই ওকে ভুল বুঝে এড়িয়ে চলেছে, ওর এই সুযোগ-সন্ধানী মনোভাব ওকে দশজনের কাছে অপ্রিয় করে তুলছে। আমার দুঃখ কী জানো অনিমাদি, ও আমাকে খুবই ভালোবাসে, কিন্তু আমাকে বোঝে না।'

অনিমাদি বললে, 'তুই মিছে ভাবছিস। তোদের খুব ভালোবাসে বলেই সে করছে।'

বকুল বললে, 'না অনিমাদি। ওর ভালোবাসাটা এখন জিনিস সংগ্রহের নেশায় পাগল হয়ে গেছে। তুমি ভাবতে পারো এর জন্যে সে যার তার কাছে টাকা ধার করতে বসেছে। এমন কি চড়া সুদে আপিসের দারোয়ানের কাছেও।'

অনিমাদি বললে, 'দ্যাখ, একা মানুষটাকে দোষ দিয়ে কী হবে। মুখপোড়া বাজারটা যা হয়েছে, আজ এ জিনিস পাওয়া যাচ্ছে, কাল সে জিনিস উধাও, সংসারী লোকগুলো পাগল হয়ে যাচ্ছে। হয়তো সুধন্য বেশি সাবধানী।'

বকুল মুখ গোঁজ করে বললে, 'তুমি কোনো মানুষকে খারাপ ভাবতে পারো না।'

অনিমাদি হাসল। 'কেন ভাবব? মানুষ তো আসলে খারাপ নয়, খারাপ করছে তাকে পরিবেশ।'

বকুল বললে, 'এখন চলি। দেরি হয়ে গেছে।'

'রবিবার তোর ওখানে যাব।'

বকুল ঘাড় নাড়াল, তারপর দ্রুতগতি বাসস্টপের দিকে এগিয়ে গেল।

মার কাছ থেকে বাচ্চাকে দখল নিয়ে বাড়ি ফিরল বকুল।

ছেলেটা ভীষণ চঞ্চল হয়েছে। হামা দিয়ে মেজেময় ঘুরে বেড়ায়। আর, অস্ফুট মা আওয়াজও ফুটেছে ওর মুখে। শব্দটা যেন তার খেলা, খুশি মতন মা-মা করে রেকর্ড বাজিয়ে চলেছে। ওর জ্বালায় জিনিসপত্তর নীচে রাখবার উপায় নেই। এরি মধ্যে গোটা কয়েক প্লেট আর কাচের গ্লাস ভেঙেছে। সেদিন ক্রিমের শিশিটা খুলে এক খাবলা মুখে পুরে দিয়েছে। ভাগ্যিস অন্য কিছু খায়নি। সব সময় চোখে চোখে

রাখতে হয়। ওর ইচ্ছে না হলে ওকে কোলে রাখে সাধ্যি কার।

উপস্থিত এখন রুটিনমতন মাকে আঁকড়ে ধরে রয়েছে। বকুল বাড়িতে ফিরলেই দাসাকে আর সামলানো দায়। বকুলের বাইরের জামা-কাপড় ছাড়বার পর্যন্ত সময় দিতে সে রাজি নয়। ওই অবস্থায় বকুলকে বসে পড়তে হয়। আর সদ্য-ওঠা কয়েকটা দাঁত দিয়ে সে মাকে কামড়ে অস্থির করে দেয়। অত্যাচার কী একরকম! মার বুকের ওপরই এপাশ-ওপাশ করে, পা আছড়ায়, মুখের কাজটা একটু সময়ও বিশ্রাম পায় না।

বাইরে বিকেলের আলো মরে এসেছে।

কখন বাচ্চাকে বুকে নিয়ে বকুল ক্লান্তিতে ঘুমিয়ে পড়েছে।

সুধনার ডাকে ঘুম ভাঙল। বাচ্চা কোল থেকে গড়িয়ে দেয়ালের কাছে পা ছুঁড়ছে।

'কতক্ষণ এসেছ?'

'অনেকক্ষণ।'

কেমন একটা গন্ধ নাকে আসছে। ফুলের দোকানের পাশ দিয়ে হেঁটে গেলে যে গন্ধ। বকুল ফিরে তাকাল।

একটা কাচের গ্লাসের জলে রজনী-গন্ধার গুচ্ছ।

অবাক হয়ে সুধনার চোখে চোখ রাখল।

সুধন্য লজ্জায় কাঁটা হয়ে বললে, 'সস্তায় পেলাম—'

বকুল যেন পুরনো গানের কলি এইমাত্র খুঁজে পেল। হাসল। 'আমি ভুলে গিয়েছিলাম...'

সুধন্যও হাসল। 'আমার মনে ছিল।'

'আমার বয়েস বাড়ছে, কিছুতেই ভুলতে দেবে না—'

'একবার ভুলে গিয়েছিলাম, বলে কম শাস্তি দিয়েছিলে আমাকে।'

বকুল বললে, 'তুমি কিছুই ভোলো না দেখছি।'

সুধন্য বললে, 'না।'

বকুল ওকে কাছে ডাকল। 'তুমি আমাকে আগের মতনই ভালোবাসো।'

সুধন্য হাসল। 'কেন? তোমার সন্দেহ ছিল?'

'বা, আমি পুরনো হয়ে গেছি না?'

'বিয়ের আগেই তো হয়েছিলে।' সুধন্য হাসল ফের: 'চার বছর প্রেমপর্ব, তারপর এইতো সেদিন বিয়ে করলাম। সব মিলিয়ে .....'

বকুল ওর গালে হাত বুলোল। 'দাড়ি কামাওনি। ভীষণ নোংরা হচ্ছ তুমি।'

সুধন্য হাসল শুধু।

বকুল বললে, 'ভীষণ রোগা হয়ে যাচ্ছ তুমি। গলার হাড় বেরিয়ে পড়েছে। অনেক-দিন ওজন দাওনি।'

'না। আমার কিচ্ছু হয়নি।'

'এই, শোনো, একটা কথা রাখবে, আমাকে ছুঁয়ে বলো। উঁহু, মাথা নাড়লেই চলবে না।'

'কী, বলো?'

'অতো খাটাখাটুনি তোমার চলবে না। বলো, কথা দাও। এই তেল, এই ডাল নিয়ে আর ছুটোছুটি করবে না।'

সুধন্য হাসল। 'ছুটোছুটি আবার কখন করি। ফাঁকতি সময় পেলে—'

'রক্ষা করো। তোমাকে আর বাড়তি সময় খুঁজতে হবে না। বাড়ি চলে এসো।'

সুধন্য বললে, 'কেউ তোমার কাছে লাগিয়েছে বুঝি?'

বকুল বললে, 'দূর। কে লাগাবে। আমার নিজের চোখকান খোলা নেই?'

সুধন্য একটু থেমে বললে, 'সত্যিই বলেছ। ইদানীং যেন কেমন খোঁধ চেপে গিয়েছিল। একেক সময় মনে হচ্ছিল এসব আমার কাজ নয়। কেমন নিজেকে নোংরা লাগে।'

'তবে করছিলে কেন? যা তোমাকে মানায় না।'

'বলতে পারো এক জাতীয় বোকামি। নিজেকে শক্তিমান ভাবা। যেন জীবনযাত্রা যতই জটিল হোক না কেন আমি একা তার সমাধান করতে পারি। আমার একেক সময় মনে হত আমি আর মানুষ নেই, নেংটি ইঁদুর হয়ে যাচ্ছি। তোমার অভিমানকে এতদিন প্রশ্রয় ভেবেছি। আমি এমন কোনো কাজের কথা ভাবতেই পারিনে যাকে তুমি সম্মান করো না। বাইরে যে যা ভাবুক, ঘরে তুমি যদি আমাকে ছোটো ভাবো তাহলে আমার আর কোথাও আশ্রয় নেই।'

বকুল তর্জনী তুলে বললে, 'মনে থাকে যেন। আমিই তোমার শেষ আশ্রয়।'

সুধন্য হাসল। 'থাকবে।'

'এবার মাইনে পেলে তুমি ধার শোধ করে দেবে।'

'আচ্ছা। আচ্ছা।'

বকুল ঘন গলায় ফিসফিস করে বললে, 'আমাকে কষ্ট দিও না। দ্যাখো না আমার ওপর বিশ্বাস রেখে। আমি আরো কত দিতে পারি।'

বকুল উঠে গিয়ে বাচ্চাকে বিছানায় শুইয়ে দিল।

বারান্দায় ওর মামার ব্যস্ততার সাড়া পাওয়া গেল। বকুল তার প্রিয় গানের কলি গাইছে। 'আজ জ্যোৎস্না-রাতে সবাই গেছে বনে।'

সুধন্য সিগারেট ধরাল। যেন দীর্ঘদিন যুদ্ধ করে এবার তার শান্তি। দেহ থেকে রণঅস্ত্রগুলি খুলে ফেলে দিয়ে এখন সে সহজ, সাবলীল হতে পেরেছে।

আমি এতদিনও বকুলকে বুঝতে পারিনি, স্বগত উচ্চারণ করল সুধন্য: অথচ আমার এই কাজগুলি ওকে আমার কাছ থেকে দূরে সরিয়ে নিয়ে যাচ্ছিল। ও আমাকে ঘৃণা করছিল।

সুধন্য শিউরে উঠল।

বাইরে রাত্রির কোলাহল মুছে এল।

রুদ্ধদ্বার ঘরটি এখন সংসার থেকে বিচ্ছিন্ন, নিরলম্ব।

রজনীগন্ধার সুবাস ঘরময় থইথই করছে।

সুধনার এই রাত্রে অকস্মাৎ মনে হল এই ঘরটা একটা তীব্র আবেগের তোড়ে তাকে উদভ্রান্ত করে দেবে। সুধন্য কাঁপছে, সর্বশরীর শীত-লাগার মতন হিলহিল করে দুলছে। সুধন্যর গলার ভেতরটা শুকনো, শ্বাসগ্রহণে কষ্ট হচ্ছে। সুধন্যর পুনরায় মনে হল সে তলিয়ে যাচ্ছে এই গন্ধের জগতে। সুধন্য যেন তার অস্তিত্বে অনুভব করল নরম স্নিগ্ধ আলো, বিচ্ছিন্ন গলিত সোনার মুদ্রা হয়ে তাকে অলংকৃত করছে। যেন শরতের শিউলিভেজা কুঞ্জের নাড়া-খাওয়া ডালপালা থেকে ঝুরঝুর করে শিশির ঝরে পড়ছে।

সুধন্য চোখ খুলল। ঘরটা আলোয় ভরে রয়েছে।

বকুল আলো নিবোয়নি ইচ্ছে করেই।

বকুলের কালো চোখের তারা মণির মতন স্থির জ্বলছে। ওর পাতলা বাঁকানো ঠোঁটে আগুনের পুলক। ঢেউয়ে ফুলে-ফেঁপে-ওঠা পাল-তোলা নৌকোর মতন ওর দেহটা এখন অপূর্ব বেগবতী। সুধন্য অসহ্য এক বিস্ময়ের সামনে স্তব্ধ হয়ে গেছে।

সুধন্য ধড়মড় করে আলো নিবোতে গেল।

বকুল ওকে উঠতে দিল না। 'থাক। আজ আমার জন্মদিন।'

(দশ)

দাম্পত্যজীবনে একেকটি রাত্রি আসে যার স্বাদ ভোলা যায় না। যেমন বকুলের জন্মদিন উদ্‌যাপনের রাত্রিটি। প্রত্যহের বিবর্ণ দিনের পাতা থেকে হঠাৎ খসে-পড়া একটা সতেজ সবুজ ভিন্নতর অনুভূতি। এখনো চেতনায় ঘন আনন্দ হয়ে জড়িয়ে রয়েছে। অথচ, সুধন্য এই আনন্দের আকৃতিকে বিশ্লেষণ করতে পারে না। এই পুরনো দেহ, কতকগুলি ইন্দ্রিয়ের চালিকা-শক্তির দ্বারাই এই আনন্দ লাভ করা গেছে। গত রাত্রির আসরে অপূর্ব দরবারী কানাড়া পরিবেশনা করে পরের দিন যেমন ওস্তাদজির বিস্ময় জাগে, সুধনার তেমন মনে হল। নাকি, এটা তার অতিরিক্ত আগ্রহের ফল। যৌনতার বিষয়ে তার একটি তীক্ষ্ণ মনোযোগ রয়েছে। তাহলে, সুধন্য ভাবে: ওই আনন্দগুলি তার বানানো! তাহলে সমস্ত উচ্চাঙ্গ-সংগীতই তো নিয়মে-বাঁধা, ব্যক্তিগত শিল্পীর স্বাধীন নৈপুণ্য কোথায়! তা নয়, শিল্পী নিজস্ব প্রতিভায় সংগীতকে সৃষ্টি করেন। সুধন্য আশ্বস্ত হয়: তাহলে ওই আনন্দ সৃজন-শক্তি, সে স্রষ্টার মতনই তাকে নির্মাণ করেছে। এবং তার কতকগুলি স্থূলে ইন্দ্রিয়ের সাহায্যে। বস্তুত তার এই দাম্পত্যজীবনে এমন আনন্দের সম্ভোগ ইতিপূর্বে ঘটেনি। হয়তো পুরনো ইন্দ্রিয়ের দাসত্ব-ধারণাটাই আনন্দের কুঁড়িকে বিনষ্ট করেছে। বকুলের ভূমিকাকেও সে খাটো করে দ্যাখে না। কারণ সেও হয়তো জানত না গত রাত্রির আসরে ওস্তাদজির সাধনা এমন উৎরে যাবে। বস্তুত শিল্পীর মতনই এ বিষয়টি অচেতন আর্টের পর্যায়ে উঠে গেছে। বোধহয় নতুন সৃষ্টি এইভাবেই শিল্পীকে অত আনন্দলোকে টেনে নিয়ে যায়।

আমার চিন্তাগুলি কী শারীরিকতার সীমানা ঘেঁষে চলেছে, সুধন্য ভাবে: কিন্তু এখন তো আমি মন দিয়ে ভাবছি। যদি শারীরিকতার সীমাবদ্ধ থাকত তাহলে মনকে স্পর্শ করতে পারত না। আমার বোধ, অনুভূতির স্বাদ তো মনই গ্রহণ করে।

সুধন্য বিছানার পাশ ফেরে।

রাজপথে ভোরের প্রথম ট্রামের শব্দ দৌড়ে গেল।

বকুল এখনো ঘুমোচ্ছে। বিস্রস্ত বেশ-বাসে ছড়ানো গীতি-কবিতার মতন সে পড়ে রয়েছে। ওর মাথা বালিশ থেকে স্খলিত, চুলগুলো এলোমেলো, উসকো। সিঁথির সিঁদুরের গুঁড়ো গড়িয়ে পড়েছে নাকে, ঈষৎ লাল ঠোঁট দুটো শুকনো, খসখসে, গায়ের বসন কোমরে তালগোল পাকিয়ে জমে আছে। ওর পায়ের আলতাও চোখে পড়ে।

বকুল পাগলের মতন ঘুমোচ্ছে।

সুধন্যার ওকে স্পর্শ করতে ইচ্ছে করল। ওর কাছে সরে আসতে ঘুমঘোরে বকুল ওকে আঁকড়ে ধরল। সুধন্য ওর দেহকে পর্যবেক্ষণ করতে লাগল। যেমন করে ওস্তাদজি গত রাত্রির জাদু-করা বীণা-যন্ত্রটিকে দেখে।

এবং এখন এই মুহূর্তে সুধন্যকে প্রশ্ন করলে সে জোর গলায় ঘোষণা করত: সে সুখী। সুখের চেহারা এক, কিন্তু কখন কোন পথে তা ধরা পড়ে, কেউ জানে না।

বকুলের শরীর নড়ে উঠল।

'এই—'

'ভীষণ ঘুম পাচ্ছে।' বকুল পাশ ফিরে সুধন্যকে শক্ত করে ধরে রাখল।

'এই—'

'উঁ—' বকুল মাথাটা সুধন্যর বুকে রেখে চুপ করে রইল।

'বকুল—'

'চুপ। ছোটোলোক কোথাকার। মনে নেই কাল রাত্রে কী করেছ আমাকে নিয়ে।'

'আমি। না তুমি?'

'তাইতো। আমাকে নির্লজ্জ, বেহায়া করে তুলে...'

'বা, আমি—'

'চুপ। সর্বনাশ কিছু হয়ে গেলে বুঝবে মজা।'

'সর্বনাশ।'

'আহা, সাধুপুরুষ।'

'আলো থাক। আজ আমার জন্মদিন, কে বলেছিল?'

'বেশ করেছি। হাজারবার বলব। তোমার কী।'

'সকাল হয়েছে।' সুধন্য হাসল।

'হোক। আমি এখন উঠতে পারব না। কেন একদিন তুমি আমাকে চা করে খাওয়াতে পারো না।'

সুধন্য বললে, 'আমাকে আটকে রাখলে আমি উঠব কী করে।'

বকুল বললে, 'তাহলে উঠে কাজ নেই। শোও।'

'তারপর তো ছোটোলোক বলবে।'

'বলব। ছোটোলোক— ছোটোলোক— ছোটোলোক—'

সুধন্য চুপ করে রইল।

'এই—' বকুল ডাকল।

'কী?'

'না। কিছু না।'

সুধন্য বললে, 'পাগল।'

'এই—আজ চিড়িয়াখানায় যাবে?'

'চিড়িয়াখানা!'

'আমার সঙ্গে কোথাও যেতে হলে অমনি মাথায় বাজ পড়ে।'

'তাই বলে আর কী যাবার জায়গা নেই?'

'কোথায়? কাশ্মীরে নিয়ে যাবে?' বকুল বকবক করে চলল: 'তোমরা পুরুষেরা অমনিই। নিজের সুখটাই ষোলআনা। আমরা মেয়েরা সহ্য করি বলে তাই।' বকুল হঠাৎ মুখ তুলে হাসল। 'পাগলের মতন কী বলছি বলো তো? মরণ আর কী।'

সুধন্য হাসল।

বকুল গম্ভীর গলায় বললে, 'হাসছ কেন?'

সুধন্য বললে, 'হাসি পেলে কী করব।'

'কেন? কাঁদবে।'

'কোন দুঃখে।'

'এই দুঃখে।' বকুল কামড়ে দিল ওর মণিবন্ধ।

'উঃ। দাঁড়াও দেখাচ্ছি।'

'এই, এই, খোকা উঠে পড়বে।'

'উঠুক। দেখুক ওর মায়ের দশা।'

'জেগে উঠলে মারবে তোমাকে।'

'ও-ও বড় হলে ওর বউকে মারবে।'

'এই, অসভ্য, দিনের বেলায়—'

সুধন্য ওকে শাস্তি দিতে ছাড়ে না।

'বুড়ো বয়েসে এখন অ আ ক খ শিখেছ?' বকুল হাসল: "খোকন হয়ে যাবার পর। এই, এই—আমাকে কী স্প্রিং-এর পুতুল পেয়েছ? হাড়গোড় ভেঙে দেবে?'

'কথা বোলো না।'

'কেন গীতাপাঠ করছ? কথা বলবে না, যা খুশি অত্যাচার করবে—'

সুধন্য বিড়বিড় করে কী বলবার চেষ্টা করল, বোঝা গেল না। গত রাত্রির আনন্দের হ্রদে শিখাটা এখন দিনের আলোয় শাদা পুষ্পের মতন ফুটে রয়েছে। সুধন্যার সম্পূর্ণ দেহটা যেন সহস্রমুখ ইন্দ্রিয়ের দীপাবলিতে জ্বলছে। গতরাত্রি থেকে বাসনার পাত্রটি কেমন বার-বার উচ্ছ্বসিত হয়ে উঠছে। এই নিরাবরণ দিনের আলোয় এই সমস্ত ইচ্ছে নিষেধের প্রাচীরে দম আটকে ছিল, যেন একটা অনিয়ম। এবং এই নিষেধ ও অনিয়মগুলো ঠেলে ফেলতে-ফেলতে অগ্রসর হবার এই ঝোঁক, তাকে তীব্রতর আস্বাদ দিচ্ছে।

বকুল একটা বলিষ্ঠ ইচ্ছার বাণে নিহত মৃতকল্প পড়ে রয়েছে।

বকুল যখন চা নিয়ে এল তখন ঘর ভরতি রোদ, সুধন্য নিশ্চিন্ত মনে ঘুমোচ্ছে।

(এগারো)

সুধন্যর শরীরটা কিছুদিন থেকে ভালো যাচ্ছিল না। কেমন অকারণ নার্ভাস বোধ করে। এবং কেমন ভেতর থেকে একটা সাহসের অভাব তাকে ঠাণ্ডারক্ত করে রাখে। অসুখের লক্ষণটা প্রথমদিন প্রকাশ হয়েছিল আপিসে অফিসারের টেবিলের সামনে। কাজে ভুলচুক হয়, মানুষ তো। কিন্তু হঠাৎ চিৎকার করে উঠে যখন অফিসার তার এই কাজের ত্রুটির মধ্যে দুর্নীতির অভিযোগ তুললেন তখন আত্মসম্মানে উদ্বুদ্ধ হয়ে ওঠবার পরিবর্তে সে কেমন হিম হয়ে গেল। দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়েই তার মনে হল বুকের রক্তগুলো কেমন জমাট বেঁধে যাচ্ছে। আর সে নিশ্বাস নিতে পারছে না। বুকের ভেতরে কেমন একটা ব্যথা। সুধন্যার মনে হল সে মরে যাচ্ছে। অফিসারের চেম্বার থেকে হেঁটে বাইরে আসতে তার ভীষণ কষ্ট হচ্ছিল। টেবিলে অনেকক্ষণ ঝিম মেরে বসে ছিল। কিন্তু দমবন্ধ ভাবটা তাকে পীড়িত করে তুলছিল। সে কষ্ট বোধ করছিল। তারপর বেরিয়ে এসে সে করিডরে চলাফেরা করছিল। একবার পেট মোচড় দিয়ে ওঠায় বাথরুমেও গিয়েছিল। চোখে-মুখে ঘাড়ে জল ছিটিয়েছিল। কিন্তু তবু মরে-যাওয়ার অনুভূতিটা তার দূর হয়নি। তারপর একসময় নিচে নেমে সে কেয়ার-টেকারের ঘরে খাটিয়ায় শুয়ে পড়েছিল। বোধহয় ঘণ্টাখানেক ঘুমিয়ে উঠে সে আরাম বোধ করেছিল।

সুধন্য এই অসুস্থতার ব্যাপারটা সে কিছুতেই বুঝে উঠতে পারছিল না। অপমানের বিরুদ্ধে সে কিছু আপত্তি করতে না-পেরেই কী তার স্নায়ুকেন্দ্র খানখান হয়ে গেছে। কিন্তু সত্যি তো সে কোনো দুর্নীতি করেনি।

তাহলে কেন তার এই মানসিক দুর্বলতা এল। তবে কী সে ভেতরে ভেতরে অসুস্থ হয়ে পড়েছিল। এবং শারীরিক দুর্বলতার জন্যেই...।

সেদিন সে আপিসের ডাক্তারকে দেখিয়েছে। আশ্চর্য, ডাক্তার তার অসুখকে গ্রাহ্যই করলেন না। তাকে একটা টনিক লিখে দিলেন। পেটের জন্যে।

তার পেটে কী হয়েছে? ডাক্তার জিজ্ঞাসা করলে ধমকান: আপনি ডাক্তার না আমি ডাক্তার? এই টনিকটা খান একমাস।

অগত্যা টনিক সংগ্রহ করতে হল।

আর, সেদিন বকুল প্রথম অসুখের কথাটা জানতে পারল।

'কতদিন এমন হয়েছে?'

সুধন্য বললে। সেদিন অফিসারের চেম্বারের সেই অনুভূতির ব্যাপারটাও বললে।

'তোমাকে বোঝাতে পারব না, আমার বুকে একটা ব্যথা, আর মনে হল আমি মরে যাচ্ছি—'

বকুল বললে, 'ভালো ডাক্তার দেখানো দরকার।'

'আমার আপিসের ডাক্তার তো পেটের জন্যে ওষুধ দিয়েছেন।'

'পেটের জন্যে?'

'কী জানি, আমি যত বলছি নার্ভের গোলমাল, উনি শোনেন না।'

'কিন্তু দমবন্ধ হয়ে আসছিল, সেটা কী?'

'সেইটেই তো ভাবনা। থ্রম্বোসিস-ট্রম্বোসিস কিনা—'

বকুল বললে, 'কালই চলো। বড় ডাক্তার দেখাবে।'

সুধন্য বললে, 'কাল নয়। মাইনে পাই আগে।'

কল্পিত মৃত্যু-চিন্তার গাঢ় বিষাদ সুধন্যার জীবনচেতনাকে গ্রাস করে রাখল। এক

সপ্তাহ আপিস থেকে ছুটি নিয়ে সে বাড়িতে শুয়ে রইল। আর, এই শয্যাশায়ী অবস্থায় সে যেন অনেক নিরাপত্তা বোধ করতে লাগল। জেগে থাকলে, চলাফেরা করলে শ্বাসরোধী ভাবটা তাকে চেপে ধরে। কেবল নিদ্রার মধ্যে সে আরাম খুঁজে পায়। নিশ্ছিদ্র ঘুম যে আসে তা নয়, তবে ওই আচ্ছন্নের ভেতরেও সমস্ত অস্তিত্বকে নির্ভার এবং বহনযোগ্য বলে অনুভব করে। আসলে সে যতক্ষণ জেগে থাকে তার চৈতন্য সজ্ঞানে গুরুভারের মতন তাকে নিষ্পিষ্ট করে রাখে। ওই ভাবটা যেন তার নিজের নয়, যেন বাইরে থেকে চাপিয়ে-দেয়া। অথচ তাকে অস্বীকার করবারও সামর্থ্য নেই।

নিজের মনকে চিরে দেখবার কৌতূহল হয় সুধন্যর। বস্তুত এই ভারটি কী! সাংসারিক দায়িত্ববোধ? কিন্তু সত্যিই কী এ নিয়ে সে অতিরিক্ত চিন্তিত? সুধন্য বুঝতে পারে না। আরো দশজন সংসারী মানুষের চেয়ে সে কী এবিষয়ে অধিক উদ্বিগ্ন! যদি তাই হয়, তাহলে সে চাপ সহ্য করবার শক্তিই বা তার খরচ হয়ে যাবে কেন। নাকি, এটা তার স্বভাবের বাড়াবাড়ি।

সুধন্যর পিছনের কয়েকটি মাসের কথা মনে পড়ে। সেই উদ্‌ভ্রান্ত দিনগুলি রাত-গুলি। সে কী বড় বেশি পরিশ্রম করেছে। তার সাধ্যের বাইরে। তাই কী শেষ পর্যন্ত তার চূড়ান্ত প্রতিশোধ নিচ্ছে। স্নায়ুকেন্দ্র অতিরিক্ত টানাহেঁচড়ায় ছিঁড়ে খুঁড়ে গেছে।

সে এতদিন বুঝতে পারেনি ভেতরে-ভেতরে সে কী রকম জীর্ণ হয়ে পড়েছিল। অফিসারের অপমানটুকু না-পেলে তার রোগ এইভাবে বাইরে প্রকাশ পেত না। এখনও সেই অনুভূতিটা সে ভুলতে পারে না। কেমন যেন ভেতরের রক্তগুলো কাঁপছিল। সমস্ত শরীর শীত-লাগার মতন কাঁটা দিয়ে উঠেছিল।

যতক্ষণ জেগে থাকা যায় আতংকের মতন অনুভূতিটা তাকে আর্ত করে রাখে।

ইস, এ কদিন কী পাগলের মতন সে ঘুমিয়েছে, বকুল বলেছে। দুজনের এক-সঙ্গে কামাই করবার উপায় নেই, তাই বকুল ইস্কুলে গেছে অশান্ত মনে। আর, ফিরে এসেও দেখেছে সুধন্য ঘুমোচ্ছে তো ঘুমোচ্ছেই। ভাগ্যিস শানু এখন বড় হয়েছে, বাবাকে বিশেষ জ্বালাতন করে না। খেলনা থাকলেই সে আপন মনে খেলা করে। ঘুম পেলে নিজেই ঘুমিয়ে পড়ে।

সুধন্য একেবারে বাড়ি থেকে বেরুনো বন্ধ করে দিয়েছে। কোনোদিন বকুলের তাড়ায় কাছের পার্ক থেকে সন্ধ্যেবেলায় ঘুরে আসে। তখন শানুকে নিয়ে যেতে ভালোবাসে। ওই একফোঁটা শানু যেন তার কাছে অনেক ভরসা। শানু এখন স্পষ্ট 'বাবা' বলে, ওই ডাকটা অনেক আশ্বাস আনে।

যে কেউ এখন সুধন্যকে দেখলে বুঝতে পারবে মানুষটা ভীষণ ভয় পেয়েছে। সুধন্যও স্বীকার করে, সে ভয় পেয়েছে। ট্রামে-বাসে একা উঠতে তার ভয় করে। এমন কি আপিস-বাড়ির চেহারাটার কথা ভেবেও তার ভয় হয়। ভয়টা ভাঙবার চেষ্টায় মাইনের দিন আপিসের দিকে এগিয়েও সে ফিরে এসেছে। শেষ পর্যন্ত এক সহকর্মীকে অথরিটি দিয়ে সে মাইনের টাকা সংগ্রহ করেছে।

এই সমস্ত পরিচিত জিনিস তাকে কীভাবে ভয় দেখাতে পারে, এইটে ভেবেই সুধন্য বিস্মিত হয়। কেউ বিশ্বাস করবে না। কিন্তু সত্যিই তার ভয় করে।

একমাত্র নির্ভয় বুঝি তার এই বাড়ি। বকুল আর শানু।

একেক সময় মনে হয় যদি সংসার নিয়ে অন্য কোথাও চলে যেতে পারত। সেখানে ট্রাম নেই বাস নেই, নেই গোমড়ামুখো আপিসবাড়িটা।

সুধন্যর এই ধারণা জেগেছে যে কোনো রকমে বাইরের এই পরিবেশ পালটাতে পারলে সে আবার স্বাভাবিক সুস্থ হয়ে উঠবে।

বকুল বলে: 'চলে যাওয়া তো মুখের কথা নয়। কোথায় যাবে শুনি?'

সুধন্য বলে: 'বাইরে কোথাও একটা চাকরি জোগাড় করতে পারলে...'

'যেখানে যাবে সেখানেই এই অবস্থা হবে। পালিয়ে যাবার রাস্তা নেই।'

সুধন্য চিন্তিত হয়ে পড়ে।

আরও অবাক হল যখন নামকরা ডাক্তার তাকে অন্যমনস্ক দেখে রায় দিলেন: 'আপনার কিছু হয়নি।'

'তাহলে আমার এমন হচ্ছে কেন?'

'সিটি লাইফের প্রতিক্রিয়া আপনার ভেতরে স্তূপীকৃত হয়ে উঠছে। ট্রামে-বাসে রাস্তায়-দোকানে-বাজারে প্রতিনিয়ত যে অনিশ্চয়তা এবং নিরাপত্তার অভাব, মানুষের মানসিক স্থৈর্যকে প্রতিমুহূর্তে নষ্ট করে দিচ্ছে। নাগরিক মানুষ উদ্বেগ-ম্যানিয়ায় ভুগছে। একে যদি অসুখই নাম দিই, তাহলে প্রত্যেকটি মানুষ কম-বেশি এই অসুখে পীড়িত হচ্ছে।'

'তাহলে আমি কী করব?' সুধন্য হতাশ হয়ে বললে।

ডাক্তার বললেন, 'মানসিক স্থৈর্যের জন্যে আমি আপনাকে আপাতত একটা ট্যাবলেট

লিখে দিচ্ছি। কিন্তু ওষুধকে অভ্যেসে পরিণত করবেন না।'

'আমাকে ট্রামে-বাসে চাপতে হবে, আপিসে যেতে হবে—'

'মনে জোর আনুন, বাইরের পরিবেশটাকে সহজ করে নিন অথবা অস্বীকার করুন।' ডাক্তার দার্শনিকতার ভঙ্গিতে বললেন, 'য়ু আর অ্যান আরবান ম্যান, নাগরিকতার দাম আপনাকে দিতে হবে বইকি।'

সুধন্য মুখ বেজার করে ডাক্তারের চেম্বার থেকে বেরিয়ে এল।

(বারো)

বকুল বললে, 'তুমি এইভাবে ভেঙে পড়লে আমাদের কী হবে।'

সুধন্য বললে, 'আমি চেষ্টা করছি। দ্যাখো না আগের থেকে ভালো হয়ে গেছি আমি। মাঝে কেমন ঘাবড়ে গিয়েছিলাম, ওইভাবে মৃত্যুবোধ ঘাড়ে চেপে বসলে কী কেউ ঠিক থাকতে পারে।'

'অনিমাদিদের ঘাটশিলায় বাড়ি আছে। আমাকে বলছিল। ছুটি নিয়ে যাবে কয়েকদিন?'

'না। এখন ছুটি পাওয়া যাবে না।'

'তাহলে রবিবারে ছুটির দিনগুলোতে কাছেপিঠে কোথাও বেরিয়ে যাই। সকালে বেরিয়ে সন্ধ্যায় ফিরে আসব।'

'কোথায়?'

'ধরো ডায়মন্ডহারবার কিংবা ব্যান্ডেল চার্চ, কী হালিশহর—'

'তা মন্দ হয় না।'

কিছুদিন চলল এই ছোটোখাটো ভ্রমণগুলো। এ-এক নতুন অভিজ্ঞতা। বাচ্চা কাঁধে ট্রেনে ওঠা, চলমান গাড়ি, অসংখ্য যাত্রী, সরব কোলাহল, সব কিছুর সঙ্গে মিশে একাকার হয়ে যেতে-পারার নিশ্চিন্ত-আনন্দ। তারপর ডায়মন্ডহারবারে বাঁধা-রাস্তা ধরে নিচে অগাধ হুগলি নদীর জলময় গতিশীল জীবনযাত্রা। ব্যান্ডেল চার্চে নদীর দ্বীপময় আর এক আকৃতি। হালিশহরে শান্ত গঙ্গা আর রামপ্রসাদের কথিত মন্দির ও সাধনাস্থান।

সারা দিন বাইরে কাটিয়ে সন্ধ্যা ডিঙিয়ে গৃহকোণে ফিরে-আসা, মনটা তাজা হয়ে ওঠে। শানু সারাদিনে দেখা নতুন অভিজ্ঞতাগুলো মুখস্তের মতন বলে যায়। সেগুলো শুনতে-শুনতে চা খেতে খেতে বারান্দায় বকুলের রান্নার হাল্কা উদাম—সব মিলিয়ে গানের সুরের মতন সুধন্যকে ভরিয়ে রাখে। আর, গ্লানিময় চিন্তাগুলোকে দূরে সরিয়ে রেখে সুধন্য সতেজ হয়ে ওঠে।

খাওয়া পর্ব চুকলে রাত গড়িয়ে আসে। সুধন্য দীর্ঘদিন পরে আরাম করে সিগারেট ধরাল।

জানালার বাইরে শীতের পাঁশুটে আকাশ। ঘন কুয়াশা পড়েছে।

রাতের পাট চুকিয়ে বকুল ঘরে এল।

'কী, মহাশয়, এখনো ঘুমোননি যে।'

বকুল হাসল।

যেন দীর্ঘকাল পরে স্বাভাবিক আকাঙ্ক্ষা নিয়ে সুধন্য বকুলের দিকে তাকাল। জানালার ফ্রেমে এখন বকুলের দেহটা আটকানো। বকুল অভ্যস্ত হাতে কেশচর্চা শুরু করল। ওর চুলের গন্ধ ভুর-ভুর করে নাকে এসে লাগছে। বকুল মুখে ক্রিম ঘষল। তারপর ওর বাইরের জামাটা ছেড়ে ফেলল। ভেতরের বডিসটা এখন সাদা ব্যান্ডেজের মতন দেখা যাচ্ছে। পিছন থেকে ওর কাঁধ থেকে সুধন্যর মনে হল বকুলের শরীরটা এখন ভারি হয়েছে। বকুল বডিসটা খুলে ফেলে আর একটা জামা পরল। অন্যমনস্কে ও বোতাম লাগাচ্ছে, তার শব্দ। তারপর সে শাড়িটাকে গায়ে জড়িয়ে নিল।

এই সমস্ত দৃশ্য কিছু নতুন নয়, কিন্তু সুধন্যর মনে হল সে নতুন করে দেখছে। তার মৃত্যুচিন্তার গাঢ় বিষাদগুলো সরিয়ে সে জীবন্ত আগ্রহ নিয়ে এই দৃশ্যের অংশভুক্ত হতে পারছে। তাহলে কী আবার সে সুস্থতার উষ্ণতাকে ফিরে পাচ্ছে।

সুধন্য চমকে উঠল। বকুল তার দিকে কোমল ভঙ্গিতে তাকিয়ে আছে। চোখে চোখ পড়তে দুজনেই হাসল।

বকুল বললে, 'জল খাবে?'

'হু'—'

'এই নাও—'

'হাসছ কেন?'

'বাবা, হাসতেও দোষ।'

'শুধু শুধু হাসি।'

'আলো নিবিয়ে দিই? বকুল আলো নিবিয়ে দিল। 'আজকে ঠান্ডাটা বেশ কম, তাই না?'

সুধন্য উত্তর করল না।

বকুল বিছানায় উঠে এল। আঃ।

বকুলের শরীরের গন্ধ। চুলের গন্ধ।

'কালকে আপিসে যাব ভাবছি—' সুধন্য আস্তে বললে।

'তোমার তো ছুটি এখনো ফুরোয়নি।'

'না, বাড়িতে বসে বসে হাঁপিয়ে উঠছি।'

'সেই ভালো। কোত্থেকে একটা ঠান্ডা আসছে বলো তো?' বকুল লেপের মধ্যে আরো একটু ঘনিষ্ঠ হয়ে এল। 'বেশ। শীত করছে।'

'একটুও ঘুম আসছে না।' সুধন্য বললে।

বকুল বললে, 'ভেড়া গোনো—'

'সত্যি, ভেড়া গুনলে ঘুম হয়?'

'লোকে তো বলে। উঁহু, না, শরীর খারাপ হবে। তুমি অসুস্থ।'

'ধেৎ।' সুধন্য সরে এল। 'আর শরীরের কথা ভাবব না।'

'আচ্ছা? তাহলে সব বানানো রোগ? কেবল আদর নেয়া, তাই না?'

সুধন্য বিড়বিড় করে কী বললে, বোঝা গেল না।

বকুল হাসল। 'ব্যস্ততা দেখে মনে হচ্ছে কালই তোমার বিয়ে হয়েছে। আমি মরে গেলে কী করবে তুমি?'

'কেন মরবে কেন?'

'মানুষ কী চিরকাল বেঁচে থাকে?'

'আমাকে ভয় দেখাচ্ছ? না, দাম বাড়াচ্ছ?'

'ইচ্ছে করলেই কী আর দাম বাড়াতে পারব? তাছাড়া তুমি অসুস্থ লোক, তোমার ওপর করুণাও তো করতে হবে।'

'তোমরা, মেয়েরা কেবল আমাদের করুণাই করো, তাই না?'

'তাছাড়া কী?'

'জানো তোমাদের যখন আমরা ঘরে আনি, একটা চাকরি করার জন্যেই কিনে আনি।'

'বাবা, কী আমার বীরপুরুষ রে। সেদিন পর্যন্ত ভয়ে কাঠ হয়েছিলে...' বকুল ফুলে ফুলে হাসতে লাগল।

সুধন্যর মনে হল সে সমুদ্রের ব্রেকারে পড়েছে, আর সেই উদ্ধত গর্জমান ঢেউগুলোকে কায়দা করতে সে হাঁপিয়ে উঠছে। ঢেউয়ের নাগরদোলায় সেও আন্দোলিত হচ্ছে, বারবার ফেনশীর্ষ ঢেউগুলো তুলোর মতন তটভূমিতে ভেঙে ছিটিয়ে পড়ছে। সুধন্য যেন মৃত্যুর শীতল আহ্বান থেকে সদ্য জীবনের প্রাণদায়ী তরঙ্গে উত্তীর্ণ হয়েছে। এবং এইমাত্র মৃত অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের মতন ইতস্তত ছড়ানো তার অস্থিগুলো দানা বেঁধে স্ফটিকের মতন দৃঢ় সংগ্রথিত হয়েছে।

বকুল ফিসফিস করে বললে, 'কে বলবে তুমি এক ছেলের বাপ...'

সুধন্য কী বললে বোঝা গেল না।

'আচ্ছা, বিয়ের আগে মেয়ে একা কী করে কাটাতে?'

'দূর, তখন কী কিছু জানতাম। কেবল কথার ওস্তাদি।'

'এখন কী করে জানলে?'

'কচু কাটতে কাটতে ডাকাত হয়।'

'অসভ্য।'

সুধন্য কিছু উত্তর করল না। তার মনে হল বাইরে থেকে চাপানো যে গুরুভার বোঝাটা তাকে ন্যুব্জ করে রেখেছিল সেই বোঝাটাকে সে এখন অনায়াসে বহন করতে পারছে। সে যেন নতুন করে জানল জীবন মানেই একটা বোঝা, কেবল মানুষই সেই ভারকে বহন করতে পারে। মানুষ তো আর শূন্যচারী পাখি নয়, মাটির শেকলে বাঁধা। আমার যদি দায়িত্ব না থাকে তাহলে আমার অস্তিত্বটাই পানসে লাগে, সুধন্য বুদ্ধিমানের মতন চিন্তা করল: আমি তাহলে এতদিন অমূলক ভয় পাচ্ছিলাম, আমার ব্যক্তিত্ব, অহমবোধ ভেঙে চুরমার হয়ে যাচ্ছিল। কেন? না আমি ভয় পাচ্ছিলাম। অথচ আমি একা নই, ওরা আছে, বকুল, শানু...। ওদের আমি আলাদা করে দেখছিলাম এবং তার ফলেই আমার সংগ্রাম নিঃসঙ্গ এবং অর্থহীন হয়ে উঠছিল।

সুধন্য সশব্দে হেসে উঠল।

বকুল রাগ করে ওকে ঠেলে ফেলে দিল।

'তোমার ইচ্ছেগুলো একেবারে শিশুদের মতন।' বকুল বললে, 'কেন? পড়াশোনা করতে পারো না? এককালে তো খুব বই পড়তে।'

সুধন্য বললে, 'আমাকে বিদগ্ধ হতে বলছ? বাড়িটাকে কলেজ স্ট্রীট কফি হাউস করে তুলতে বলছ?'

'তার চেয়ে বলো না কেন আমার কাছ

থেকে ঐ চাকরি ছাড়া আর কিছু চাও না তুমি ?'

'তা নয়।' সুধন্য হাসল ঃ 'আজকাল আর কিছু লেখা হচ্ছে না।'

'কী যে বলো ? তাহলে মাসে মাসে এত বই বেরুচ্ছে কী করে ?'

'সব বাজে।'

'তুমি পড়েছ ?'

'পত্রিকার বিজ্ঞাপন দেখেছি।'

'তোমার ভুল ধারণা। বেশ, কালকে তোমাকে একটা বই এনে দেবো।'

'ঘুম না-পেলে পড়ব।' সুধন্য পাশ ফিরল।

'তুমি বড় বাজে বকছ, ঘুম পেয়েছে, ঘুমোও।'

'তথাস্তু।'

(তেরো)

দীর্ঘদিন পরে সুধন্য ভাবে এই জীবনের কোনো পরিকল্পনা আছে কী। এই নিপাট গার্হস্থ্যধর্মের পর আর কী আছে। দুজনের চাকরিতে টালমাটাল সংসার চলে যাচ্ছে। প্রচুর অভাব আর অসুবিধের মধ্যেও শানু সতেজে বেড়ে উঠছে।

তারপর ? তারপর কী। তারা বুড়ো হবে, শানু যৌবন পাবে। এই জীবন।

আশেপাশে আরো দশজন বন্ধু-বান্ধব সহকর্মী, ওরা কী ভাবে, কী করে। কেউ টাকা জমায়, কেউ জমি কেনে, বাড়ি-করার স্বপ্ন দ্যাখে। ওদের উচ্চাকাঙ্ক্ষা আছে, জীবনকে ওরা শক্ত পাথরের বেদীর মতন বেঁধে ফেলতে চায়। টাকা জমানোর বিষয়টা সুধন্যর অদ্ভুত লাগে। এই সামান্য মাইনেয় কী করে উদ্বৃত্ত টাকা থাকে। পাঁচ হাজার টাকার একটা ইনস্যুওরেন্স করেছিল মেসে থাকতে, কয়েক বছর প্রিমিয়াম দেবার পর আপাতত ওটা বন্ধ আছে। জমি কেনা ও বাড়ি করার শৌখিনতা তার মনে কোনোদিন জাগেনি।

অথচ ওরা বলেঃ ভবিষ্যৎ আছে। ওরা ভবিষ্যৎ নিয়ে অধিক ব্যস্ত। তার মানে বর্তমানের কোনো সমস্যা নেই তাদের কাছে।

সুধন্য ভাবতেই পারে না। তার চিন্তাগুলো বর্তমানের বাইরে এক পাও এগোয় না।

বকুলের একটা হিসেবের খাতা আছে বোধহয়। সংসারটাকে সে হিসেবের পাতায় বেঁধে রেখেছে। সুধন্য জানে না ও কীভাবে হিসেব রাখে। বা, হিসেব রেখেও ওর কী সুরাহা হয়। দুধের হিসেব, ধোপার হিসেব, আর কী কী হিসেব আছে ওর সেই জানে।

বস্তুত বকুল ভবিষ্যৎ নিয়ে কোনোদিন বাড়াবাড়ি করেনি। অভাববোধগুলি তাকে কাঁটার মতন বেঁধে ঠিক, কিন্তু সে নিয়ে কোনোদিন উঃ আঃ বকুল করেনি। ওর মনের গড়নটাই যেন আলাদা। তবে একটা বিলাসিতা আছে শানুর ক্ষেত্রে। কোথা থেকে সে কাটা কাপড় জোগাড় করে, আর জোড়াতালি দিয়ে শানুর আশ্চর্য রকমের জামা বানায়। নিজের রঙচটা ব্লাউসটা কাঁধের কাছে ফেঁসে গেছে, তার লক্ষ্য নেই।

প্রসঙ্গ উত্থাপন করলে বকুল ধমকে দেয়ঃ 'বুড়ো বয়েসে এই সব ব্যাপারে আর মাথা নাইবা ঘামালে। আমার সাজগোজ তুমি ভালোবাসো জানতে পারলে তোমাকে আজ আর বলতে হত না।'

'তার মানে, আমি তোমাকে বাড়িতে কাঙালীর মতন থাকতে বলেছি ? ছেঁড়া ন্যাকড়া পরে ?'

'অন্তত এ নিয়ে তোমাকে কোনোদিন মনোযোগ দিতে দেখিনি।'

'তাই বুঝি আমাকে এখন শাস্তি-দেয়া ? আমার অক্ষমতার...'

'চালাকি কোরো না মশায়। অক্ষমতা তোমার কোথায় আমি জানি।'

'তাহলে যা ইচ্ছে করো।'

'একশোবার করব। বাঁড়িতে পটের বিবি হয়ে সেজে থাকতে পারব না।'

সুধন্যর উৎসাহ নিবে যায়। আসলে এ ব্যাপারে সত্যিই যে তার কোনো আগ্রহ আছে তা নয়। নিজের বা পরের জামাকাপড় সম্পর্কে তার কোনোদিন কোনো কৌতূহল নেই। বোধ হয় কয়েক বছর আগে শখ করে একবার স্যুট বানিয়েছিল, দিনকতক পরেও ছিল, তারপর আর ভালো লাগেনি। বস্তুত, তার চলাফেরায় কোনোদিন স্মার্টনেস ছিল না, একটু ঢিলেঢালা ভাব, ধুতিতেই মানায়। ধুতি আর পাঞ্জাবি।

কিন্তু তাই বলে বকুলের সাজগোজে সে অনাগ্রহী একথা কী করে বললে সে। মেয়েদের পরিচ্ছন্ন সাজগোজ বেশ ভালোই লাগে।

সুধন্যর অন্যমনস্ক স্বভাবের গুণে বিষয়টি চাপা পড়ে।

আবার জীবনের নির্দিষ্ট পরিকল্পনার কথা ভাবে সে। 'পরিকল্পনা' শব্দটা আজকাল বহুব্যবহৃত। কী, পরিবার পরিকল্পনা, স্বল্প সঞ্চয় পরিকল্পনা, পাঁচশালা পরিকল্পনা... কিন্তু এতসব পরিকল্পনার মধ্যে রোজগার বাড়ানোর পরিকল্পনাটা কোথায় ! তার মতন একজন সৎ লোক উদয়াস্ত পরিশ্রম করতে রাজি, যদি রোজগার বাড়ে। তার মনে পড়ে ঃ এককালে সব কুড়িয়ে বাড়িয়ে একশো পাঁচ টাকায় সে আপিসে ঢুকেছিল, এখন দশ টাকা পাঁচ টাকা বাড়তে-বাড়তে সেটা মাত্র দুশো টাকা ছুঁয়েছে। এতেও দিন পনেরোর বেশি চলে না। এরচেয়েও হয়তো কম রোজগার করে অনেকে, জানা নেই তারা কী করে সংসার চালায়।

তাহলে একটা কথা বোঝা গেল, সুধন্য ভাবে ঃ এইভাবেই জীবন কাটিয়ে যেতে হবে। এই অভাব-অনটনকে সঙ্গী করে। সারা জীবন বেঁচে-থাকা মানে অভাবের সঙ্গে সন্ধি অথবা যুদ্ধ করা। এই সন্ধি বা সংগ্রাম তার মৃত্যুতেই শেষ হবে না, তার ছেলে শানু এগুলির সঙ্গে বোঝাপড়া করবে।

এইটেই তাহলে ছক। এই অভাব, অভাবের সঙ্গে সন্ধি অথবা সংগ্রাম, এই যৌনতা, সন্তানস্নেহে, রোগ-শোক-মৃত্যু এরি নাম সংসার, গার্হস্থ্য।

এই সকল চিন্তা সুধন্যকে বুদ্ধিমান করল। কিন্তু কোনো সমাধানের সূত্র এনে দিল না।

সুধন্য ভাবল, তাহলে আমরা একটা পাইকারি আদর্শহীনতার মধ্যে বাস করছি এবং জীবনেরও কোনো পরিকল্পনা নেই। সবেগে ঘোষণা করল ঃ আমরা দেউলে মানব গোষ্ঠী। নিঃস্ব, রিক্ত।

এবং শানু, তার বংশধর রক্তে এই অনুর্বর আদর্শহীনতাকেই বহন করে যাবে। সেও একদিন পড়বে 'লেখাপড়া করে যেই গাড়িঘোড়া চড়ে সেই' যেমন সে একদিন মুখস্থ করেছিল। (তারপর একদা এই প্রবচনকে সার্থক করতে ট্রাম-বাসের কন্ডাক্টারই হবে।)

বকুল বললে, 'চা খাও।'

'হ্যাঁ। এইযে।'

'আবার কী ভাবতে আরম্ভ করলে ?'

'না। কিছু নয়।'

'দেখো শরীর খারাপ কোরো না যেন।'

সুধন্য হাসল শুধু। শরীর! বকুল এখনো ছেলেমানুষ। ওকে কী বলবে একবার তার জীবনবিষয়ক চিন্তাগুলো। তাদের এই ভালোবাসা, এই দাম্পত্য, সন্তান—এগুলিকে যোগ করে দেখলে শূন্যতার গহ্বর বেরিয়ে পড়ে। বোধকরি এগুলিকে এক করে দেখবার অভ্যেস নেই বলে খণ্ড খণ্ড বস্তুগুলো ধরা পড়ে না। দিনের পর দিন কতকগুলি অভ্যাসের ঘর্ষণে তারা দীর্ণ হবে, তারপর......।

সুধন্য চারদিকে একটা বন্ধন অনুভব করে। কিন্তু বন্ধনটার কোনো তাৎপর্য আবিষ্কার করতে পারে না। জন্মের পর থেকেই মানুষ বন্দী, এই বন্ধনগুলো সে নিজেই জড়িয়েছে, সংসারের সঙ্গে, রক্তের সঙ্গে। এবং এই বন্ধনই একটি পারিবারিক আকৃতি গড়ে তুলেছে। পরিবার একটি অস্তিত্ববোধ। অথচ একটি মধুর মিথ্যে। এবং বাঁচতে গেলে এই মিথ্যের সঙ্গে সন্ধি করা ছাড়া উপায় নেই। কিংবা হয়তো এই মিথ্যাকে জানে বলেই মানুষ এই ভয় থেকে পরিত্রাণের জন্যে পরস্পরের কাছে আশ্রয়ের আগুন খোঁজে। কিন্তু বস্তুত মানুষ কাকে আশ্রয় দিতে পারে! বকুল তাকে আশ্রয় ভাবে, সে বকুলকে। হাসি পায়। সুধন্য প্রাকৃতিক নিয়মে নিছক একটি পুরুষ ছাড়া কিছু নয়। যেমন বকুল স্ত্রীলোক। এবং এর জন্যে কাউকে নিজস্ব কোনো উদ্যম করতে

হয়নি। বকুল যে এ-সত্যটা জানে না তা নয়। পুরুষ বলেই সুধন্যার অতিরিক্ত কোনো ক্ষমতা নেই যা বকুল ঈর্ষা করতে পারে। সমাজ নামক যন্ত্রটার চোখে পুরুষ নারীর ভেদাভেদ নেই।

কিন্তু চিন্তা তো একটা নয়। তাই সুধন্যার মতন মানুষের এই সকল চিন্তা একটা বোঝার মতন তাকে পীড়িত করে রাখে। যেন কাগজে কলমে সে একটা লক্ষ টাকার হিসেব মিলিয়েছে, অথচ লক্ষ টাকাই সে জীবনে দ্যাখেনি। তাহলে এই সকল চিন্তা সুধন্যার মাথায় আসার মানে কী। এ নিয়ে সে মোটা কেতাব লিখতে পারে, প্রকাশক পাওয়া যাবে না, যেহেতু ক্রেতা নেই।

তথাপি চিন্তাগুলো তাকে বিষণ্ণ করে রাখে বইকি। এবং কাউকেই সে এই চিন্তার ভাগ দিতে পারে না। হয় তাকে পাগল ভাববে, অথবা সকলেই এ বিষয় জানে।

অগত্যা সুধন্য মুখ বুজে আপিস করে, বাড়ি ফিরে, সংসারধর্ম পালন করে।

এবং সুধন্য চাক-বা-না-চাক পৃথিবীর বয়েস বাড়ে।

শানুর হাত ধরে ওকে স্কুলে ভর্তি করবার জন্যে বেরিয়ে পড়ে।

বাইরে তখন প্রচণ্ড রোদ। ট্রামবাসে মরিয়া ভিড়।

এবং শানুর হাঁটতে কষ্ট হলে ওকে কোলে করবার কথাও ভাবতে হল সুধন্যকে।

—শেষ—

পুলকেশ দে সরকার

প্রোফেসর পি সি সি

ছেলেরা বলে পি সি সি। পি সি সি'র ক্লাশ। কলেজে ইংরিজীর হেড অব দি ডিপার্টমেণ্ট। পি সি সি—বাস, ছেলেরা এই জানে; আর কিছু জানার দরকারও করে না। এই—পি সি সি'র আজ ক্লাশ ক'টায় রে? পি সি সি'র ক্লাশ আছে আজ?

অনেকটা ট্রামে ফোর্টিন নাইণ্টিথ্রি, টু টু ওয়ান সিক্স, অথবা এই ফার্স্ট ক্লাশ, এই সেকেণ্ড ক্লাশের মতো: ড্রাইভার-কণ্ডাক্টরের নামের দরকার নেই ' তেমনি পি সি সি আর তাঁর ক্লাশ। ঐ যথেষ্ট।

আসলে প্রতুলচন্দ্র চৌধুরী; ইংরিজীতে এম-এ ফার্স্ট ক্লাশ হবার পর থেকে পরিচয়-সূত্রে প্রেটুল চাণ্ডার চাড্রি। অবশ্য এ. নামটা চলে অন্যান্য ইঙ্গ-বঙ্গ এলিট সম্প্রদায়ের সংস্পর্শে এলে এবং আসেনও, আসতে হয়, বিশেষত 'মেরিকানদের সঙ্গে তো বটেই।

কিন্তু ছেলেদের কাছে পি সি সি। কলেজে এমনি আরও 'আর ডি' আছেন, 'বি বি সি' আছেন 'এ বি সি' আছেন, 'জি বি এস' আছেন—নানা বিষয়ের প্রোফেসর ও লেকচারার' ছেলেদের কাছে সবাই প্রোফেসর, লেকচারার প্রোফেসর কিনা এ প্রশ্ন অবান্তর তাদের কাছে। ওদের কাছে 'জি বি এস' আর, 'বি বি সি'র মধ্যে কোনো পার্থক্য নেই।

কিন্তু পি সি সি দস্তুরমতো প্রোফেসর; কলেজে ইংরাজীর হেড অব দি ডিপার্টমেণ্ট। চুল পাকেনি কিন্তু সিনিয়ার, চোখে হাল্কা চশমা আছে কিন্তু সিনিয়ার, বেঁটে খাটো মানুষটি কিন্তু সিনিয়ার, ঢোলাহাতা পাঞ্জাবীটা সামলে-সুমলে চলেন কিন্তু সিনিয়ার—আজ বিশ বছর কাজ করছেন এই কলেজে; ইচ্ছে করলেই জুনিয়ারদের 'তুমি' বলতে পারেন; বলেনও। তবে সুবিধে এই, বেশীর ভাগ সময়ই তিনি ইংরিজীতে কথা বলেন, এমনকি প্রোফেসর পি সি সি'র ক্রমিক সংখ্যানুসারে তৃতীয় মিসেস চাড্রি বলেন, তাঁর স্বামী নাকি স্বপ্নও ইংরিজীতে দেখেন।

হ্যাঁ, বলা ভালো কেননা, এও প্রোফেসর চাড্রির একটা কৃতিত্বই বলতে হবে, তাঁর গৃহ কখনো গৃহমুচাতে—শূন্য হয়নি। প্রথমটি বিধিমতো মারা গেছেন, দ্বিতীয়টি চলে গেছেন, তৃতীয়টি ঐ কলেজেরই ছাত্রী—ক্লাশ থেকে চাড্রিগৃহে গৃহিণীর অনার্স পেয়েছেন। এবং তাঁর কাছেই একথা শোনা যে, প্রোফেসর even dreams in English সুতরাং, 'ইউ' দিয়েই জুনিয়ারদের সঙ্গে বাক্যালাপ হয় বেশী; বাকীটা তৃতীয় পুরুষে।

আর একটা বরমাল্যও দিতে হয় প্রোফেসর চাড্রি বা ছেলেরা যাঁকে বলেন পি সি সি—তাঁকে। এই যে এত ইংরিজী ইংরিজী ভাব এবং এই যে আজকাল স্যুটের সর্বজনীনতা—লক্ষ্য করে দেখবেন পাগলেও আজকাল স্যুট পরে কেননা, দাতাদের ঘরে আজ ধুতি দুর্লভ—তা সত্ত্বেও তিনি স্যু, ট্রাউজার সার্ট, কোট, টাই কিছু পরেন না, কখনো পারেন নি—অন্ প্রিন্সিপ্‌ল্‌স। কিন্তু তিনি যে প্রোফেসর চাড্রি তার একমাত্র নিদর্শন ইয়া বড় এক বর্মী চুরুট। সর্বক্ষণ ওটা ফ্যাক্টরীর বয়লারের মতো জ্বলে আর ধোঁয়া ছাড়ে। পি সি সি ওরফে চাড্রি। পায়ে নরম চামড়ার নিউকাট, পরনে কোমরে কোঁচা গোজা সম্ভবত খদ্দরই অথবা কোর্স মিল ধুতি, গায়ে ঢলঢলে ঢিলেহাতা পাঞ্জাবী; কৃষ্ণাঙ্গ বলিষ্ঠ হ্রস্বকায় মানুষটির ফাঁক-করা মুখে বয়লারের চিমনিস্বরূপ ইয়া বড় এক বর্মী চুরুট; প্রোফেসর চাড্রির নির্ভুল পরিচয়।

ছেলেদের কথায় কান পাতলে শোনা যায়, ছেলেরা পি সি সি'র ক্লাশে যতটা না পার্সেণ্টেজের জন্য বা বিদ্যার্জনের জন্য যায় তার চাইতে বেশী যায় কৌতুক দেখতে। বলে আর হাসে। বলে, পি সি সি পড়ান না, নাচেন:

"Et tu, Brute! Then fall, Caesar!" দেখেছিস্, একটি ছেলে বলে, তখন যেন স্যরের চোখ দুটো বেরিয়ে আসতে চায়। ওর কথা কেড়ে নিয়ে আর একটি ছেলে বলে, আর এমনি ভাব করেন যেন পড়ে মরবেন আর কি' কিন্তু তারপরই চেঁচিয়ে—

Liberty! Freedom! Tyranny is dead! এবং খানিকটা দৌড়ে গিয়ে চীৎকার করে বলেন,

Run hence, cry it about the streets কাকে যেন নির্দেশ দেন—

Some to the common pulpits, and cry out

Liberty, freedom, and enfranchisement! আর একটি ছেলে বলে, তারপর সেই-যে এণ্টনির পুনরাগমন। স্যর বইটাকে কাঁধে ফেলেন মুখস্থ তো আছেই, বইটা হচ্ছে সিজারের দেহ—

Friends, Romans, countrymen, lend me your ears;

I come to bury Caesar, not to praise him

ছেলেরা বলে আর হাসে; হাসে আর বলে। আর ক্লাশে অসাধারণ পরিশ্রমের পর পি সি সি যখন বাইরে আসেন তখন মাথাটা ঝিমঝিম করতে থাকে, সর্বদেহে ক্লান্তি; কিন্তু তেমনি চারদিকে একটা বিস্ময়ের সৃষ্টি করে — শেক্সপীয়ার — শেক্সপীয়ার। ফাঁকির ব্যাপার নয়, রীতিমত পরিশ্রমের ব্যাপার; খেটেখুটে ছাত্র পড়াতে হয়। জুলিয়াস সিজার—শেক্সপীয়ার, কতকালের, কিন্তু কত কাছের। অনেক খেটেখুটে একেবারে চাক্ষুষ করে তোলেন প্রোফেসর চাড্রি।

সর্বদাই কেমন একটা সম্মোহিত অবস্থায় থাকেন প্রোফেসর চাড্রি, ছেলেরা যাঁকে বলে পি সি সি। রাস্তা দিয়ে চলেন, বাড়ী ফেরেন, বাড়ীতে অবস্থান করেন, কিন্তু তিনি যেন তাঁর সঙ্গে থাকেন না! কখন প্রথমা বিগত হ'লেন, দ্বিতীয়া প্রস্থান করলেন এবং তৃতীয়া এলেন, কিছুই যেন স্মরণে থাকে না; মনে করতে পারেন না প্রথমা কখনও সন্তানসম্ভবা হ'য়েছিলেন কিনা, দ্বিতীয়া পুত্রার্থে কর্তব্য সমাধা করেছেন কিনা এবং তৃতীয়ার 'অবদানের' সংখ্যা কত। এসব সাংসারিক হিসেব রাখেন তৃতীয়াই—যিনি বর্তমানা। নিজে বই নিয়ে থাকেন, কলেজে পড়ান, চারদিকে অতীত-বর্তমান ছাত্রে ছাত্রময়; কিন্তু আত্মজ বা আত্মজা একবচন না বহুবচন এবং সে বা তারা লেখাপড়ার কোন সিঁড়িতে বিরাজমান বা মানা, তা ভুলে ভুলে যান। পাড়ার লোকেরা হয়তো হিসেব রাখেন এবং মাঝে মাঝে বলাবলি ক'রে থাকেন, এমন পণ্ডিতের ঘরে—! আর বলেন না, দেয়ালের শুধু নয় বায়ুতরঙ্গেরও কান আছে, ওদের কানে পেঁাছোলে আর রক্ষে নেই, ওদের সত্যিকারের দলবদ্ধ 'ক্লাব' আছে, লঘুগুরু নির্বিচারে মাথায় দুন্দুভি বাজিয়ে যাবে। আর সত্যিই তো, আমার ছেলে আমার ছেলে, তোমার ছেলে তোমার ছেলে, কে কার এক্তিয়ারে আছে হ্যা?

সুতরাং, এ পাড়ায় বেশ কয়েক বছর কেটে গেলেও প্রোফেসর চাড্রি সোজা কলেজে যান ভাড়া বাড়ী থেকে, সোজা ভাড়া বাড়ীতে ফেরেন—এবং যতটা সম্ভব

স্তার মাঝখান দিয়ে। ও'র ধারণা, এই বিশ্বব্রহ্মাণ্ডই একটা কলেজ, উনি তার অধ্যাপক, ছেলেরা যেমন দু'পাশে কেটে গিয়ে পথ করে, রাজ্যের লোকও তাই করে। উনি কাউকেই ঠিক চেনেন না বটে; কিন্তু তাঁকে চেনে সবাই। এইভাবেই তিনি যাতায়াত করে আসছেন—তা, আজ হ'ল বেশ কয়েক বছর।

ছেলেমেয়েদের তিনি হিসেব রাখেন বটে, কিন্তু কালক্রমে তারা বড় হয়েছে এবং পাড়ার বে-পাড়ার ছেলেমেয়েদের সংগে বেশ ঘনিষ্ঠ কামারাডারিও গড়ে তুলেছে; হস্তর পরিবার। বাপ-মাকে একবেলা কদিন না দেখলেও চলে, বন্ধু-বিহনে জীবন দুর্বিষহ। এক বন্ধু যদি স্কুল বা পাঠ্য বর্জন করে তো আর এক বন্ধুরও স্কুল পাঠ্য ছাড়বার জন্য প্রাণটা আকুলি-বিকুলি করে। তারপর দোঁহে মিলে অবাধ সময় কাটাবার বিচিত্র প্রোগ্রাম রচনা করা হয় ন্যাটাদের রকে নয়তো পান-দোকানের মাঝখানি ছায়ায়।

সেদিন একটু ছিরছিরে বৃষ্টি হতেই পথচারীদের রাস্তায় 'ক্যাম্বিস' বল (আসলে যা হ'চ্ছে টেনিস বল) খেলার প্রোগ্রাম ঠিক হয়ে গেল; ছিরছিরে বৃষ্টিতে মোহনবাগান-মেহামেডান খেলাটা জমে ভালো। 'ক্যাম্বিস' হলেও ওরা সবাই সিরিয়াস চুনী গোস্বামী। কিন্তু খেলা জমে উঠতেই ছিরছিরে বৃষ্টিটা ধরে গেল। রাস্তায় পথচারীদের আর গাড়ী-সাইকেল-ভটভটির আনাগোনাও সুরু হ'য়ে গেল। কিন্তু মোহনবাগান মেহামেডানকে গোল দেয় দেয়, অজয় বসু থাকলে ধারাবিবরণী দিতে পারত, খেলা খুব জমে উঠেছে, খেলোয়াড়রা দিগ্বিদিক জ্ঞানশূন্য, পথচারী গাড়ী কিছু আর মানতে মন চায় না।

এদিকে ওপ্রান্ত থেকে আসছিলেন প্রোফেসর চাড্ডি, যেমন আসেন তেমনি আসছিলেন, রাস্তার মাঝখান দিয়েই এবং তেমনি মাথার মধ্যে Tomorrow — Tomorrow and Tomorrow-র ঝিম-ঝিমানি: আসছিলেন, এমন সময় চুনী গোস্বামীর নির্ভুল সট এসে লাগল তাঁর ডান হাতটায় বুলেটের মতো। প্রোফেসর চাড্ডি প্রথমে চমকে বললেন, উঃ, তারপর ঐ আঘাতের রক্ত উঠল মাথায়, চনচনে, দাঁড়িয়ে ক্লাশের ছাত্রদের উদ্দেশে বললেন, Boys !

তারপর এক কথা দু'কথা। কয়েকটি ছেলে ঘিরে ফেলল প্রোফেসর চাড্ডিকে। দু'টি একটি ছেলে চিনতে পেরে পিছিয়েও গেল; কিন্তু তখনও ওরা ছুটে ছুটে আসছে। গোলরক্ষার দায়িত্বে অবিচল এদিককার 'গোলকি' এতক্ষণ নড়েনি, সামান্য একটু তকরারের পরই আবার খেলা হবে এই আশায় ও গোলরক্ষা করছে; ও নিশ্চিত জানে, ওদের ক্লাবই সব মজুত করে দেবে, বিরোধ করবে কার এমন স্পর্ধা? কিন্তু যাঃ, জ্বালালে তো, কচুপোড়া খেলে যা, সেও ওদিককার হৈ-হুল্লোড়ের সংগে তাল রেখে কে রে মাইরি —কে রে—শা—কে রে মাইরি, ব'লে ছুটে গেল, কাছাকাছি এসে প্রায় চোখোচোখি হবার মুখেই অস্ফুটে মুখ থেকে বেরিয়ে গেল : বা—বা।

ইস্—শা—ব'লে পেছনের গোলকি ভীড়ে মিশে গেল।

(প্রশ্ন)

১। ভারতের সবচেয়ে বড় কার্টুনিস্ট কে? তাঁর নিজস্ব কোন কার্টুন পুস্তক আছে কি? ঠিকানা জানতে চাই?

২। বাংলাদেশের শ্রেষ্ঠ কার্টুনিস্টের নাম জানতে চাই? কার্টুন সম্বন্ধে তাঁর কোন গ্রন্থ আছে কি? তাঁর ঠিকানা কি?

৩। ভারতে কি কোন মহিলা কার্টুনিস্ট আছেন? তাঁর নাম?

৪। বাংলা ভাষায় কার্টুন পত্রিকা কি আছে?

শেষপ্রকাশ চক্রবর্তী
কল্পনা চক্রবর্তী
গেন্দ্রপাড়া চা-বাগান
জলপাইগুড়ি।

●

১। ভারতের শ্রেষ্ঠ কুস্তিগীর দারা সিং দেশে-বিদেশে কতগুলি প্রতিযোগিতায় অংশ গ্রহণ করেছিলেন? তাদের ফলাফলই বা কি হয়েছিল।

২। ৪—৫ বৎসর পূর্বে ইনডোরে দারা সিং ও পাকিস্থানী কুস্তিগীর আসলাম (গামা) সংগে অনুষ্ঠিত কুস্তির ফলাফল কি ছিল।

কুমারেশচন্দ্র দে
কাটোয়া, কাছারী রোড
পোঃ কাটোয়া
জেঃ বর্ধমান।

●

১। প্রশান্ত মহাসাগর, আটলান্টিক মহাসাগর এবং ভূমধ্য সাগরের গভীরতা কত?

২। হাওড়া ব্রীজ কত সালে তৈরী হয়েছিল? ব্রীজটি তৈরী করতে কত টাকা খরচ হয়?

শ্যামলী চৌধুরী ও শিপ্রা চৌধুরী
চাকুরিয়া।

●

(উত্তর)

৭ম বর্ষ ১২শ সংখ্যায় প্রকাশিত বিভূতি দাশগুপ্ত মহাশয়ের প্রশ্নের উত্তরে জানাই যে, বাঙলা দেশের সব থেকে প্রাচীন ও বৃহৎ গ্রন্থাগার হচ্ছে, 'ক্যালকাটা পাবলিক লাইব্রেরী।' সর্বপ্রথম এই নামে এই সাধারণ পাঠাগার স্থাপিত হয় ১৮৩৬ খৃষ্টাব্দে। ১৯০২ খৃষ্টাব্দে এটি 'ইম্পিরিয়াল লাইব্রেরীর' সংগে যুক্ত হয়। স্বাধীনতা লাভের পর এর নাম হয়েছে 'ন্যাশনাল লাইব্রেরী।' এটি এখন কলকাতার আলিপুরের বেলভেডিয়ার প্রাসাদে নেওয়া হয়েছে। এখন বাঙলা দেশের বৃহৎ গ্রন্থাগার। বইয়ের সংখ্যা ১১,০০০,০০ প্রায়।

হীরেন্দ্রনাথ দিগপতি
নাগরাকাটা
জলপাইগুড়ি

●

গত ১২শ সংখ্যার পত্রিকাতে গৌহাটিস্থ শ্রীসুরজিত রায়ের ৪ নম্বর প্রশ্নের উত্তরে জানাই যে "কলম্বো পরিকল্পনার জন্ম ১৯৫৬ সনে। দক্ষিণ ও দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়াস্থ দেশসমূহের উন্নতি-সাধনই এই পরিকল্পনার উদ্দেশ্য। মাত্র ৭টি কমনওয়েলথভুক্ত দেশ নিয়ে এই পরিকল্পনার সৃষ্টি হয়। বর্তমান সদস্য সংখ্যা ২২। যেমন—ভারতবর্ষ, পাকিস্তান, সিংহল, বার্মা, ক্যাম্বোডিয়া, মালয়েশিয়া, ইন্দোনেশিয়া, লাওস, নেপাল, উত্তর বোর্ণিও, ফিলিপাইনস্, থাইল্যাণ্ড, আফগানিস্তান, ভিয়েতনাম, মালদ্বীপপুঞ্জ, অস্ট্রেলিয়া, কানাডা, নিউজিল্যাণ্ড, ব্রিটেন প্রভৃতি। এছাড়াও কমনওয়েলথভুক্ত নয় এমন দু'টি দেশ, যেমন—আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্র ও জাপান বর্তমানে এই পরিকল্পনার সদস্য।"

রথীন্দ্র মিত্র, উকীলপাড়া,
জলপাইগুড়ি।

●

৭ম বর্ষ ১২শ সংখ্যায় প্রকাশিত সুরজিৎ রায়ের প্রশ্নের উত্তরে জানাচ্ছি যে, সি, এল, সোলস নামক একজন আমেরিকান ১৮৬৮ খৃঃ টাইপরাইটার আবিষ্কার করেন।

ব্যাপটিস্টা পোর্ট ১৫১৮ খৃঃ ক্যামেরা আবিষ্কার করেন (ফ্রান্স)। ঐ সংখ্যায় প্রকাশিত প্রভাত মান্না মহাশয়ের উত্তরে জানাচ্ছি যে, কলকাতার দক্ষিণে ভাগীরথী নদীর পূর্ব তীরে অবস্থিত এক গন্ডগ্রাম, খৃঃ ১৮শ শতাব্দীর অন্তিমভাগে জেনারেল কিড (Kyd) এইস্থানে জাহাজ নির্মাণের নিমিত্ত গভর্ণমেন্টের ডকইয়ার্ড নির্মাণ করেন, তারই নামানুসারে গ্রামটির খিদিরপুর নামকরণ করা হয়।

আর একটি প্রশ্নের উত্তরে জানাচ্ছি যে, বঙ্গদেশের যে অংশ গংগার পশ্চিমভাগে অবস্থিত সেই অঞ্চলকেই রাঢ় অঞ্চল বলা হয়ে থাকে।

৭ম বর্ষ ১৩শ সংখ্যা অমৃতে জানাতে পারেন বিভাগে প্রকাশিত অমল সরকার ও সোনালী সেনের ২য় প্রশ্নের উত্তরে জানাচ্ছি যে ইংল্যাণ্ডের প্রিস্টলী নামক একজন আবিষ্কারক সোডা ওয়াটারের আবিষ্কার করেন। এতে অতিরিক্ত চাপ প্রয়োগ করে কার্বন ডাই অক্সাইড গ্যাস মিশ্রিত করা হয়।

অচ্যুতানন্দ বেরা,
তমলুক,
মেদিনীপুর।

রঞ্জিত বন্দ্যোপাধ্যায়

(পূর্বে প্রকাশিতের পর)

(৫)

ইতিমধ্যে আমরা মৌলিক পদার্থের তালিকাটিকে কয়েকবার ভাগ করেছিলাম। প্রথম কোপটা পড়েছিল এই তালিকার সর্বপ্রথম পদার্থ হাইড্রোজেনের ওপর। হাইড্রোজেনের কেন্দ্রস্থলে কোনও নিউট্রনের অস্তিত্ব নেই, অবশিষ্ট সমস্ত পদার্থের মধ্যেই আছে। তারপরের কোপটা গিয়ে পড়ল তালিকার কুড়ি নম্বর পদার্থ ক্যালসিয়ামের ওপর যার উঁচুর দিকে সমস্ত পদার্থের মধ্যেই নিউট্রনের সংখ্যা প্রোটনের চেয়ে বেশী। তারপর তেজস্ক্রিয় পদার্থের নিম্নসীমা নির্ধারিত হল তালিকার বিরাশি নম্বর পদার্থ সীসেকে দিয়ে। অবশ্য সীসের নীচের দিকেও কিছু-কিছু তেজস্ক্রিয় পদার্থের সন্ধান পাওয়া যায়, তবে সেখানে তেজস্ক্রিয়তার গতি অতি মন্থর। পরবর্তী বিভাগটা হয়েছিল উনিশ নম্বর পদার্থ পোটাসিয়ামকে নিয়ে যার ওপরের দিকে কোনও পদার্থকেই আর আলফা কণিকা নিক্ষেপ করে বিচূর্ণ করা সম্ভব হয়নি। এবং এখন কোপটা গিয়ে পড়বে সাতচল্লিশ নম্বর পদার্থ রূপোর ওপর।

পারমাণবিক বিক্রিয়ার দিক থেকে তালিকার এই সাতচল্লিশ নম্বর পদার্থ রূপো একটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ স্থান অধিকার করে রয়েছে। আইনস্টাইন আমাদের বলে দিয়েছিলেন যে বস্তু এবং শক্তি অভিন্ন এবং সামান্য পরিমাণ বস্তুকে ঠিকমতো রূপান্তরিত করতে পারলে প্রচুর পরিমাণ শক্তি লাভ করা সম্ভব। এই শক্তিটা পেতে হলে রূপোর ওপরের দিকে, অর্থাৎ রূপোর চেয়ে ভারী সমস্ত বস্তুকে বিদারণ (ফিসন) করতে হবে এবং রূপোর চেয়ে হাল্কা অবশিষ্ট বস্তুগুলিকে সংযোজন (ফিউজন) করতে হবে।

বস্তুর ভর হিসেবে পদ্ধতির এই পার্থক্যটা কেন হচ্ছে, সেটা আমরা মোটামুটি একবার দেখে নিতে পারি। আমরা জানি যে কোনও তরল পদার্থকে একটি পাত্রের মধ্যে রাখলে একেবারে উপরতলার বিন্দুগুলি পৃষ্ঠটান (সারফেস টেনসন)-এর প্রভাবেই যথাস্থানে অবস্থান করে। পরমাণুর কেন্দ্রস্থিত প্রোটন এবং নিউট্রনগুলিকেও আমরা এই রকম পারমাণবিক তরল পদার্থের (অ্যাটমিক ফ্লুইড) বিন্দু হিসেবে ধরে নিতে পারি, এবং তারা যে বাইরের দিকে ছিটকে বেরিয়ে চলে যাচ্ছে না, তার কারণ হচ্ছে এই পৃষ্ঠটানের প্রভাব। কিন্তু আমাদের ভুলে গেলে চলবে না যে পরমাণুর কেন্দ্রধরের প্রায় অর্ধেকটাই প্রোটন এবং তাদের প্রত্যেকের অঙ্গে এক মাত্রা করে ধনাত্মক চার্জ বর্তমান রয়েছে যার ফলে সৃষ্টি হচ্ছে একটি অতি শক্তিশালী বিকর্ষণ। সাধারণ তরল পদার্থের ক্ষেত্রে কিন্তু এই জাতীয় কোনও বিকর্ষণের অস্তিত্ব নেই। তাই সেখানে পৃষ্ঠটানের বলকে কেবল নীচের তলার তরল পদার্থের টানের বিরুদ্ধেই কাজ করতে হয়, কিন্তু পারমাণবিক তরল পদার্থের পৃষ্ঠটানকে অতিরিক্ত এই বিকর্ষণের শক্তিটার বিরুদ্ধেও যুদ্ধ করতে হচ্ছে দিবা-রাত্র। বিকর্ষণ প্রোটনগুলিকে ঠেলা দিয়ে বাইরে পাঠিয়ে দিতে চাইছে এবং পৃষ্ঠটান সেগুলিকে আগলে রাখছে যথাসাধ্য। এই দুই বিপরীত বলের ফলে প্রত্যেকটি বস্তুর কেন্দ্রধরই অপ্রতিষ্ঠ হয়ে যায় এবং তাদের ঠিক মতো আঘাত করতে পারলে প্রচুর শক্তি বেরিয়ে আসবে—যে জিনিসটা আইনস্টাইন বলে দিয়েছিলেন সেই ১৯০৫ সালে।

কিন্তু কেন্দ্রধরের এই অপ্রতিষ্ঠাটা ঠিক কি ধরনের হবে সেটা নির্ভর করছে—কে জিতবে, তার ওপর। পৃষ্ঠটান যদি জয়ী হয় তাহলে স্বভাবতই কেন্দ্রস্থিত কণিকাগুলির মধ্যে জড়াজড়ি করে থাকবার আগ্রহটাই প্রাধান্য লাভ করবে। আবার বিকর্ষণ যদি জয়ী হয় তাহলে তাদের মধ্যে বিচ্ছিন্ন হয়ে যাবার আসক্তিটাই বেশী করে দেখা দেবে। কিন্তু বিকর্ষণ তখনই জয়ী হবে যখন আভ্যন্তরিক ধনাত্মক চার্জ, অর্থাৎ প্রোটনের সংখ্যা, অর্থাৎ বস্তুর ভর বৃদ্ধি পাবে। সুতরাং দেখা যাচ্ছে যে ভারী বস্তুর মধ্যে অপ্রতিষ্ঠাটা হবে বিচ্ছিন্ন হয়ে যাবার দিকে (ফিসন) এবং হাল্কা বস্তুর মধ্যে জোড়া লাগার দিকে (ফিউজন), আর সেইজন্যেই বস্তুর ভর হিসেবে পারমাণবিক বিক্রিয়ার পদ্ধতির মধ্যে এই পার্থক্যটা উদয় হচ্ছে।

১৯৩৯ সালে নীলস বোর এবং হুইলার বিভিন্ন বস্তুর কেন্দ্রধরের মধ্যে এই বিকর্ষণ এবং পৃষ্ঠটানের সাম্যটা সঠিকভাবে হিসেব করে এই সিদ্ধান্তে উপনীত হলেন যে, মৌলিক পদার্থের তালিকায় রূপোর ওপরের দিকে যে পদার্থগুলি রয়েছে সেগুলি প্রধানতঃ অপ্রতিষ্ঠ, এবং তাদের ওপর যথেষ্ট পরিমাণ আঘাত আনতে পারলে কেন্দ্রধর দুই বা ততোধিক খণ্ডে বিদীর্ণ হয়ে গিয়ে প্রচণ্ড শক্তি উন্মুক্ত করে দিতে পারে। অন্যদিকে, দুটি হাল্কা বস্তুর কেন্দ্রধরকে—যাদের সমবেত ভর রূপোর চেয়ে কম—যদি অতি কাছাকাছি নিয়ে আসা যায় তাহলে তারা তৎক্ষনাৎ সংযোজিত হয়ে যাবে এবং তখনো প্রচুর শক্তি বেরিয়ে আসবে বাইরে।

সুতরাং দেখা যাচ্ছে রূপোর ওপরের দিকে পদার্থগুলি বিদারণ এবং নীচেরগুলিকে সংযোজন করে প্রচুর শক্তি পাওয়া যেতে পারে। কিন্তু এটা আমাদের ভুলে গেলে চলবে না যে এই বিদারণ অথবা সংযোজন, কোনওটাই আপনা থেকে শুরু হবে না। শুরু হবার জন্যে আমাদের গোড়াতেই কিছু একটা করতে হবে—একটু টোকা দেয়া, ঠেলে দেয়া, ধাক্কা মারা, কিংবা ঐ রকম একটা কিছু। এইভাবে একবার শুরু হয়ে গেলে, তারপর আমাদের অবশ্য আর কিছুই করতে হবে না। রেলগাড়ীর মতো জিনিসটা তখন আপনিই চলতে থাকবে গড়-গড় করে।

এই ধরনের অপ্রতিষ্ঠ অবস্থার (স্টেট অফ মেটাস্টেবিলিটি) দৃষ্টান্ত আমরা প্রচুর দেখতে পাই আশেপাশে। ছাদের একেবারে শেষ প্রান্তে একটা বড় পথর, রাস্তার মোড়ে দাঁড়ানো পুলিশ সার্জেন্টের কোমরে ঝোলানো পিস্তল, অথবা ধূমপায়ীদের পকেটে ছোট্ট একটি বাক্স। প্রতি ক্ষেত্রেই প্রচুর শক্তি উদগ্রীব হয়ে অপেক্ষা করে রয়েছে মুক্তি পাবার আশায়। কিন্তু ছাদের পাথরটিকে সামান্য একটু ঠেলা না দিলে, পুলিশ সার্জেন্ট তার পিস্তলের ঘোড়ায় আঙ্গুলের ছোঁয়া না লাগালে, অথবা ধূমপায়ী ব্যক্তি সিগারেট ধরাবার জন্যে দেশলাইয়ের কাঠিটা বারুদের ওপর না ঘষলে এই শক্তি বেরিয়ে আসতে পারছে না। পারমাণবিক বিক্রিয়ার দৃষ্টিকোণ থেকে দেখলে সমস্ত মৌলিক পদার্থই হচ্ছে এই রকম অপ্রতিষ্ঠ, যার ফলে গোটা বিশ্বটাই হয়ে দাঁড়াচ্ছে ভয়ংকর রকমের বিস্ফোরক। সামান্য একটা টোকা দিলেই এই বিস্ফোরণ শুরু হয়ে যাবে এবং তখন প্রচণ্ড শক্তি মুক্তি পেয়ে সমস্ত কিছু ধ্বংস করে ফেলবে! অবশিষ্ট থাকবে শুধু রূপো, কারণ আমরা দেখেছি যে রূপোর ক্ষেত্রে বিদারণ বা সংযোজন, কোনওটাই হচ্ছে না। তাই রূপো রূপোই থাকে। রূপোর কোনও রূপান্তর হয় না। তবে সান্ত্বনার কথা এই যে, পারমাণবিক বিক্রিয়া শুরু করবার জন্যে এই প্রাথমিক টোকা বা ধাক্কার (ইনিসিয়াল এক্সাইটমেন্ট) পরিমাণটা একটু অভদ্র রকমের বেশী। না হলে, এই প্রাচীন পৃথিবীর ওপর দিয়ে আজ পর্যন্ত যে ঝড়-ঝাপটা বয়ে গেছে তাতে কোনকালে পারমাণবিক বিক্রিয়া শুরু হয়ে গিয়ে সমস্ত কিছু রূপো হয়ে যেত! অবশ্য প্রথম দৃষ্টিতে এই রৌপ্যময় পৃথিবী এমন একটা কিছু খারাপ মনে হত না, বিশেষ করে যখন প্রত্যেকটি তামার পয়সাই রূপো হয়ে যেত। কিন্তু যখন দেখব যে সোনার গয়নাগুলি পর্যন্ত রূপো হয়ে

হ, তখন? এবং তারপর যখন দেখব যে -বান্ধব মা-বাবা, স্ত্রী-পুত্র, ভাই-বোন, ন কি অমরা নিজেরাও মৃশো হয়ে হ, তখন?

অবশ্য, ভয় নেই। এইরকম বিশ্বব্যাপী স্ফারণ কোনওদিনই ঘটবে না কারণ মাণবিক বিক্রিয়ার জন্যে প্রয়োজনীয় মিক ধাক্কার পরিমাণটা অত্যন্ত অধিক। প্রাথমিক ধাক্কাটা আমরা প্রথমে দিয়ে-লাম আলফা কণিকা নিক্ষেপ করে। রপর চেষ্টা করেছিলাম প্রোটনের মধ্যে সঞ্চার করে কেন্দ্রধরে আঘাত করতে। ং সর্বশেষে, অস্ত্র হিসেবে ব্যবহার করার ন্য কিভাবে নিউট্রন সংগ্রহ করা যেতে রে, সে কথা ভাবতে ভাবতে এসে ড়লাম মৌলিক পদার্থের তালিকার মধ্যে—কটা অন্যমনস্কভাবেই।

এই রকম অন্যমনস্ক হয়ে পথ চলতে তে আমার এক বন্ধুর একবার পকেটমার য় যায়। মনিব্যাগটা পকেট থেকে অদৃশ্য ওয়া মাত্রই কিন্তু বন্ধু সেটা টের পেয়ে য় এবং 'চোর-চোর' বলে চেঁচিয়ে ওঠে ক্ষুনি। ফলে পাকেটমারাটি ধরা পড়ে যায় নিটখানেকের মধ্যেই। তারপর শুরু হয় হার। অমানুষিক প্রহার। কিল চড় ঘুঁষি, মন কি লাথি পর্যন্ত বর্ষিত হতে থাকে রদিক থেকে। মুখ-চোখ ফুলে ঢোল হয়ে ঠল বেচারির। স্থানে স্থানে রক্ত জমে ল। কিছুক্ষণ পরেই নেতিয়ে পড়ল ভাগা পকেটমারটি পথের ওপরেই। নতার ক্রোধ কিন্তু তখনো কমেনি। আরো র্যাতন হয়তো চলত, কিন্তু সেই মুহূর্তে লিশ এসে পড়ায় ক্ষিপ্ত জনতা সংক্ষিপ্ত য়ে গেল ভোজবাজির মতো। বন্ধুর নাম ঠকানা এবং ব্যাগের মধ্যে কত টাকা ছিল, ত্যাদি দরকারী সব সংবাদ সংগ্রহ করে চৈতন্য পকেটমারাটিকে নিয়ে পুলিশ থানায় লে গেল। দিন পনের পরে বন্ধুর ডাক ড়ল কোর্টে। ম্যাজিস্ট্রেটের সামনে হাজির য়ে আসামীর কাঠগড়ার দিকে তাকিয়ে বস্মিত হয়ে গেল বন্ধু। সেই পকেটমারাটি াঁড়িয়ে রয়েছে সম্পূর্ণ সুস্থ শরীরে! খ-চোখ সামান্য একটু ফুলে রয়েছে মাত্র—াস? আর কিছুই নয়। শত হস্তের সমবেত সই অমানুষিক প্রহারের ধকল সে দিন নেরর মধ্যেই কাটিয়ে উঠেছে অনায়াসে!

এর কারণটা অবশ্য একটি চিন্তা করলেই বরিয়ে পড়ে। আঘাতটা ছিল বাইরের। কল চড় ইত্যাদি যা কিছু বর্ষিত হয়েছিল, বই চামড়ার ওপরে। বাইরের এই শত শত আঘাতের মধ্যে কোনওটাই ওর দেহের ন্দরমহলে প্রবেশ করেনি, ঠিক যেমন লক্ষ ক্ষ আলফা কণিকা অথবা প্রোটনের আঘাত পরমাণুর বাইরের দিকেই পড়ে। কেন্দ্রধরে কউ প্রবেশ করতে পারে না। কিন্তু মাঝে মাঝে শোনা যায় যে জনতার প্রহারে পকেটমার মরে গেছে। সেক্ষেত্রে এক-আধটা আঘাত এতই জোরে বর্ষিত হয় যে ভেতরে পর্যন্ত পৌঁছে যায়, যেমন তিন-চা ক্ষ আলফা কণিকা বা প্রোটনের মধ্যে এক আধটা লক্ষ্যভেদ করতে সমর্থ হয়।

কিন্তু এমন আঘাত আছে যেগুলি প্রথম থেকেই ভেতরে ঢুকে যায়, এবং সোজাসুজি হৃদয়ে গিয়ে ধাক্কা মারে। মানুষ তখন মুহূর্তের মধ্যে পাগল হয়ে যায়, এমন কি মৃত্যুও অসম্ভব নয়। বাইরের লোকে কিন্তু এই আঘাত দেখতে পায় না। পকেটমারের মতো শত হস্তে এই আঘাত সশব্দে বর্ষিত হয় না। সে আসে নিঃশব্দচরণে। সামান্য একটা দৃশ্য, এক টুকরো চিঠি কিংবা একটা টেলিগ্রাম—ব্যস, আর কিছুই নয়। আবাল্য বন্ধুর বিশ্বাসঘাতকতা, রান্নাঘরের জানলায় দাঁড়িয়ে অপ্রত্যাশিতভাবে দেখতে পাওয়া বাড়ীর ঝি-এর সঙ্গে স্বামীর ঘনিষ্ঠতা, শরীর খারাপ হওয়ার জন্যে অফিস থেকে অসময়ে বাড়ী ফিরে এসে স্ত্রীর ঘরে পর-পুরুষের দর্শন, দূর দেশ থেকে টেলিগ্রাম বা চিঠির মারফৎ সুযোগ্য পুত্রের অকাল মৃত্যুর সংবাদ, ইত্যাদি। চড়-চাপড় ঘুঁষি অথবা আলফা কণিকা কিংবা প্রোটনের মতো এসব জিনিস দেহের বহিরঙ্গে আঘাত করে না। সাজ-সজ্জা, মাংস-চামড়া, অস্থি-মজ্জা সমস্ত কিছু ভেদ করে সোজা চলে যায় হৃদয়ের মধ্যে নিউট্রনের মতো। তাই তো এই চার্জশূন্য মর্মভেদী নিউট্রনের এত সমাদর পারমাণবিক বিক্রিয়ার গবেষণাগারে!

কিন্তু নিউট্রনকে নিয়ে সবচেয়ে বড় মুস্কিল হচ্ছে—যেটা আমরা আগেই দেখেছি—যে তাকে আলাদা করে পাওয়া যায় না, এবং আলাদা করে পেতে হলে আবার সেই আলফা কণিকা বা প্রোটনের স্মরণ নিতে হয় যাদের লক্ষ্যভেদের ক্ষমতা অত্যন্ত সীমাবদ্ধ।

এই সমস্যার সমাধান করতে বিজ্ঞানীরা চাণক্য নীতির স্মরণ নিলেন। কাঁটা দিয়ে কাঁটা তোলার মতো তাঁরা নিউট্রন দিয়েই নিউট্রন মুক্ত করার চেষ্টা করতে শুরু করলেন। প্রাথমিক নিউট্রনগুলি অবশ্য আলফা কণিকা বা প্রোটন স্রোতের সাহায্যেই সৃষ্টি করা হল। অ্যালউমিনিয়াম—২৭ এর কেন্দ্রধরে আঘাত করলে এইরকম নিউট্রন স্রোত পাওয়া সম্ভব। কিন্তু আর একটা মুস্কিল হচ্ছে এই নিউট্রন স্রোতকে গতি-শীল করা। অবশ্য মন্থরগতি নিউট্রনও পরমাণুর হৃদয়ে প্রবেশ করতে সক্ষম। তবু কিছুটা গতি তো চাই। এই উদ্দেশ্যে ব্যবহার করা হল হাইড্রোজেনের একটি সমঘর (সম-ঘরের কথা কিন্তু ভুলে গেলে চলবে না) ডয়টেরন, অথবা হাইড্রোজেন-২। এর মধ্যে আছে একটি নিউট্রন এবং একটি প্রোটন। শেষোক্তটির জন্যে একে সহজেই গতিশীল করা সম্ভব হল এক জায়গায় প্রচুর ঋণাত্মক বৈদ্যুতিক চার্জ সংগ্রহ করে। এই বেগবান ডয়টেরন যখন কোনও পরমাণুর দিকে ছুটে যায়, তখন কেন্দ্রধরের সমবেত ধনাত্মক চার্জ ডয়টেরনের একমাত্র ধনাত্মক চার্জকে (কারণ প্রোটন শুধু একটি) বিকর্ষণ করে বাইরের দিকে ঠেলে দেবার চেষ্টা করে, কিন্তু ডয়টেরনের একমাত্র চার্জশূন্য নিউট্রনটি সোজা চলে যেতে থাকে ভেতরে। ফলে, কিছুক্ষণের মধ্যেই ডয়টেরনের প্রোটন এবং নিউট্রনের মধ্যে ছাড়াছাড়ি হয়ে যায় এবং আমরা পাই—একটি বিশুদ্ধ অথচ বেগবান নিউট্রন, ঠিক যেমনটি আমরা চেয়েছিলাম।

এইভাবে এবং অন্যান্য উপায়ে নিউট্রন স্রোতকে ধাবিত করা হল পরমাণুর অভ্যন্তরে প্রদেশে। উদ্দেশ্য—এই প্রাথমিক নিউট্রন স্রোতটি পরমাণুর কেন্দ্রধরে আঘাত করে যে কয়টি নিউট্রন মুক্ত করে দেবে সেগুলিই আবার দ্বিতীয় নিউট্রন স্রোত হিসেবে আশপাশের পরমাণুর কেন্দ্রধরে আঘাত করে তৃতীয় নিউট্রন স্রোত সৃষ্টি করবে, এবং সেগুলি করবে চতুর্থ নিউট্রন স্রোত, এবং তারপর পঞ্চম, ইত্যাদি। এইভাবে চলতে থাকবে একটা ধারাবাহিক বিক্রিয়া (চেন রিয়্যাকশন) যার ফলে আহত পদার্থের সমস্ত পরমাণুই অচিরে বিচূর্ণ হয়ে যাবে—ঠিক যেমন একটা কাগজের এক কোণে দেশলাই কাঠি ঠেকালে আগুনের শিখাটা ধাপে ধাপে এগিয়ে গিয়ে সমস্ত কাগজটাই পুড়িয়ে দেয় কিছুক্ষণের মধ্যেই। কিন্তু কাগজের বদলে টুকরোটি যদি কাঠের হয় তাহলে আগুনের শিখাটা আর আপনা থেকে অগ্রসর হবে না এবং তখন আমাদের বার বার দেশলাই কাঠি জ্বালতে হবে। পার-মাণবিক বিক্রিয়ার ক্ষেত্রে এই জিনিসটা হয়, যখন প্রাথমিক নিউট্রন স্রোতটি ধারাবাহিক বিক্রিয়া অব্যাহত রাখতে পারে না। তখন বার বার নিউট্রনের স্রোত বাইরে থেকে পাঠাতে হয় যার ফলে—আমরা আগেই দেখেছি—লাভের চেয়ে নিয়োজিত মূলধন অনেক বেশী হয়ে যায়, যেটা কেউই চায় না।

সুতরাং ঠিক কি পরিবেশে এই ধারা-বাহিক বিক্রিয়ার গতিটা অব্যাহত থাকবে সেটা গোড়াতেই পরীক্ষা করে দেখে নেয়া খুবই দরকার। ধরা যাক, প্রাথমিক স্রোতে আমরা অনেক খরচ-খরচা করে একশটা নিউট্রন পাঠালাম। এই একশটা নিউট্রন যদি মাত্র পঞ্চাশটা নিউট্রন সৃষ্টি করে, তাহলে তৃতীয় স্রোতে উৎপন্ন হবে মাত্র পঁচিশটা এবং দু-চার ধাপ পরেই নিউট্রনের সংখ্যা নগণ্য হয়ে গিয়ে বিক্রিয়া বন্ধ হয়ে যাবে—ঠিক যেমনটি হয়েছিল সেই কাঠের টুকরোর ক্ষেত্রে। কিন্তু প্রাথমিক স্রোতের একশটা নিউট্রন যদি এক সেকেণ্ডের মধ্যেই দুশটা নিউট্রনের জন্ম দেয়, তাহলে তৃতীয় সেকেণ্ডে আমরা পাব চারশটা নিউট্রন, চতুর্থ সেকেণ্ডে আটশটা পঞ্চম সেকেণ্ডে এক হাজার ছশটা এবং এইভাবে চলতে চলতে মাত্র আধ মিনিটের মধ্যেই ১০৭৩৭৪১৮২৪০০, অর্থাৎ দশ হাজার কোটিরও বেশী নিউট্রন (বিশ্বাস না হলে, হিসেব করে দেখে নিন খাতা পেন্সিল নিয়ে) উৎপন্ন হয়ে পদার্থটিকে সম্পূর্ণ বিচূর্ণ করে প্রচণ্ড শক্তি মুক্ত করে দিতে সক্ষম হবে। বাস্তব ক্ষেত্রে কিন্তু আধ মিনিট তো নয়ই, এমন কি আধ সেকেণ্ড সময়ও লাগে না! সেকেণ্ডের লক্ষ ভাগের মধ্যেই দ্বিতীয় স্রোতটি তৈরী হয়ে যায়, এবং সেকেণ্ডের অতি ক্ষুদ্র ভগ্নাংশের মধ্যেই সমস্ত কাণ্ডটা ঘটে যায়।

তাহলে দেখা যাচ্ছে যে প্রাথমিক স্রোতটি যখন তার নিজের সংখ্যার চেয়ে

বেশী নিউট্রন সৃষ্টি করতে পারবে তখনই ধারাবাহিক বিক্রিয়াটি অব্যাহত থাকবে—অন্যথায় নয়। তাই বিজ্ঞানীরা তারপর প্রাথমিক নিউট্রন স্রোত নিক্ষেপ করে বিভিন্ন বস্তুর নিউট্রন উৎপাদন ক্ষমতা পরীক্ষা করে দেখতে লাগলেন। সারা পৃথিবী জুড়ে শুরু হয়ে গেল এক্সপেরিমেন্ট। দেশ-দেশান্তর থেকে খবর আসতে লাগল নব-নব আবিষ্কারের। এই সময়ে, অর্থাৎ ১৯৩০-৪০ দশকে, পরমাণু বিজ্ঞানে গোটা বিশ্ব জুড়ে যে পরিমাণ গবেষণা হয়েছিল তেমন বোধহয় বিজ্ঞানের কোনও শাখায় আজ পর্যন্ত কখনো হয়নি। অবশেষে এল ১৯৩৪ সাল। ইটালী থেকে এনরিকো ফার্মি সংবাদ পাঠালেন তাঁর যুগান্তকারী এক্সপেরিমেন্টের—ইউরেনিয়ামের কেন্দ্রধর গ্রাস করেছে একটি নিউট্রন। মুক্তি পেয়েছে একটি ইলেকট্রন, যার ফলে আগন্তুক নিউট্রনটি প্রোটনে পরিবর্তিত হয়ে ইউরেনিয়ামের প্রোটন সংখ্যা বৃদ্ধি করে নতুন একটি পদার্থ সৃষ্টি করেছে! ৯৩টি প্রোটনযুক্ত এই নতুন পদার্থটির নাম দেয়া হল প্লুটোনিয়াম।

তারপর আরো চার-পাঁচ বছর কেটে গেল অস্বাভাবিক ব্যস্ততার মধ্যে দিয়ে। দিবারাত্র কাজ চলতে লাগল দেশ-দেশান্তরের গবেষণাগারে। এল ১৯৩৮ সাল। এনরিকো ফার্মির প্রদর্শিত পথ অনুসরণ করে হ্যান এবং স্ট্র্যাসম্যান এই বছরের শেষের দিকে এবং জার্মান বৈজ্ঞানিক লাইজ মার্টিনার ও তাঁর ভ্রাতুষ্পুত্র অটো ফ্রিশ ১৯৩৯ সালের গোড়ার দিকে বিশ্ববিখ্যাত ডেনিশ বিজ্ঞানী নীলস বোর-এর সহযোগিতায় ঘন-ঘন আঘাত হানতে লাগলেন ইউরেনিয়ামের কেন্দ্রধরের ওপরে। অবশেষে পরাজিত হল ইউরেনিয়াম সম্পূর্ণরূপে। এবার আর কোনও ছোট ছোট টুকরো নয়—সম্পূর্ণ দুভাগে বিভক্ত হয়ে গেল ইউরেনিয়ামের কেন্দ্রধর!

আর সেই মুহূর্তেই বিশুদ্ধ বিজ্ঞানের গবেষণাগার এবং শান্ত স্তব্ধ ধ্যানগম্ভীর বিজ্ঞানসাধকদের জটিল গণিত এবং পদার্থ-বিজ্ঞানের সূত্র থেকে পরমাণু বিজ্ঞান ছিটকে বেরিয়ে এল রাজনৈতিক রঙ্গমঞ্চের প্রচণ্ড কোলাহলের মধ্যে! দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ তখন সবে শুরু হয়েছে। এই অসম্ভব রকমের বিশাল একটা শক্তির সম্ভাবনা কি শুধুমাত্র বিজ্ঞানীদের, গবেষণাগারের চার দেয়ালের মধ্যে আবদ্ধ রাখা যেতে পারে? সুতরাং উঠে পড়ে লেগে গেলেন আমেরিকার রাজনৈতিক নেতৃবৃন্দ। চারদিকে শুরু হয়ে গেল ব্যস্ততা। আবহাওয়া উত্তপ্ত হয়ে উঠতে লাগল দিনের পর দিন। বেড়ে চলল কোলাহল।

এই কোলাহলের বাইরে এসে আমরা এবার একটু ঠাণ্ডা মাথায় দেখে নিতে পারি ঠিক কি জিনিসটা ঘটেছিল সেই ১৯৩৮-৩৯ সালে যখন ইউরেনিয়ামের কেন্দ্রধর সম্পূর্ণ দুভাগে বিভক্ত হয়ে যায়—যার জন্যে আজ এত কোলাহল।

ইউরেনিয়াম কেন্দ্রধরের দুভাগে বিভক্ত হয়ে যাওয়াটাই, অর্থাৎ এই বিদারণই (ফিসন) যে ধারাবাহিক বিক্রিয়া শুরু করে দিল—সেটা ঠিক কথা নয়। কারণ এই বিভক্ত কেন্দ্রধরের দুটি খণ্ডের মধ্যে তখনো প্রচুর চার্জ বর্তমান ছিল যে জন্যে তারা অন্যান্য কেন্দ্রধরের দিকে আর অগ্রসর হতে পারল না। ফলে, আর কোনও বিদারণ সংঘটিত হল না এবং কিছুক্ষণের মধ্যেই খণ্ড দুটি তাদের সমস্ত তেজ হারিয়ে ফেলে নিশ্চল হয়ে গেল। কিন্তু নিশ্চল হয়ে যাবার আগে—এবং এইটেই হচ্ছে সবচেয়ে বড় কথা, আর এরই জন্যে আজ এত সোরগোল উত্তেজনা এবং কোলাহল—খণ্ড দুটি প্রত্যেকে একটি করে নিউট্রনের জন্ম দিয়ে গেল!

একটা স্প্রিং যখন হঠাৎ ছিঁড়ে দু আধখানা হয়ে যায়, তখন টুকরো দুটি কাঁপতে থাকে। এক্ষেত্রে অনেকটা সেইরকমই হচ্ছে, তবে কম্পনের পরিমাণটা এখানে বহুগুণ বেশী। বিভক্ত হয়ে যাবার পর কেন্দ্রধরের দুটি খণ্ড ভীষণভাবে কাঁপতে থাকে (স্টেট অর্থ ভায়োলেন্ট ভাইব্রেশন) যার ফলে তাদের দেহ থেকে একটা করে নিউট্রন ছিটকে বেরিয়ে আসে। অবশ্য প্রত্যেক ক্ষেত্রেই যে একটা করে নিউট্রন মুক্তি পাচ্ছে, তা নয়। কোনও খণ্ড থেকে হয়তো দু-তিনটে ছিটকে যায়, আবার কোনও খণ্ড হয়তো কিছুই উৎপন্ন করে না। তবে গড়ে, অথবা বলা যেতে পারে পরিসংখ্যানের হিসেবে, একটা করে নিউট্রন বেরিয়ে আসে প্রতি খণ্ড থেকে। অর্থাৎ, প্রাথমিক একটা নিউট্রন সৃষ্টি করছে দুটো নিউট্রন, তারপর সেই দুটো সৃষ্টি করবে চারটে নিউট্রন, ইত্যাদি। সুতরাং ধারাবাহিক বিক্রিয়া চলতে থাকবে এবং নিমেষের মধ্যেই ইউরেনিয়ামের টুকরোটি সম্পূর্ণ বিচূর্ণ হয়ে গিয়ে প্রচণ্ড শক্তি মুক্ত করে দেবে। ঠিক কিভাবে একটি নিউট্রনের আঘাতে দুটি নিউট্রন উৎপন্ন হচ্ছে ইউরেনিয়ামের মধ্যে থেকে, এবং এই আঘাতের ফলে ইউরেনিয়ামেরই বা কি কি পরিবর্তন ঘটছে, তার একটা আভাষ ২ নম্বর চিত্রে দেয়া হয়েছে।

তাহলে এতক্ষণে আমরা পারমাণবিক শক্তি অর্জনের একেবারে দোরগোড়ায় এসে পৌঁছেছি। এবার একটা ইউরেনিয়ামের খণ্ড নিয়ে কাজে নামলেই হয়। কিন্তু ইউরেনিয়ামকে নিয়ে একটা মুস্কিল হচ্ছে যে—

এই মুস্কিলের যেন আর শেষ নেই! একটার পর একটা এসেই যাচ্ছে ক্রমাগত। তাহলে কি পারমাণবিক শক্তি আমরা কোনওদিনই পাব না

ভয় নেই। এইটেই শেষ, এবং এই মুস্কিলের বেড়াটা অতিক্রম করতে পারলেই আমাদের দৌড়ের সমাপ্তি।

মুশকিলটা হচ্ছে এই যে, ইউরেনিয়ামের নমুনাটি বিদারণের পরে উপরোক্ত উপায়ে ধারাবাহিক বিক্রিয়া অব্যাহত রাখতে সক্ষম সেটি হচ্ছে অপেক্ষাকৃত হাল্কা ইউরেনিয়াম-২৩৫। কিন্তু প্রকৃতিতে এই ইউরেনিয়াম-২৩৫ বিশুদ্ধভাবে কখনোই পাওয়া যায় না। এটা সর্বদাই এর একটি সমঘর (সমঘরের কথা মনে আছে নিশ্চয়) ইউরেনিয়াম-২৩৮-এর সঙ্গে মিশে থাকে, এবং শুধু তাই নয়, পরিমাণে এই ভারী ইউরেনিয়াম-২৩৮ (ভারী, যেহেতু এর মধ্যে তিনটি নিউট্রন অতিরিক্ত রয়েছে) অনেক বেশী। প্রাকৃতিক ইউরেনিয়ামে প্রতি ১০০০ পরমাণুর মধ্যে ভারী ইউরেনিয়াম-২৩৮ থাকে ৯৯৩ এবং বাকি মাত্র ৭টি হচ্ছে হাল্কা ইউরেনিয়াম-২৩৫। কিন্তু ইউরেনিয়াম-২৩৮ বিদারণক্ষম (ফিসনেবল) নয়, অথচ এই জিনিসটাই ইউরেনিয়াম-২৩৫-কে জড়িয়ে রয়েছে আষ্টেপৃষ্ঠে। সুতরাং এর উপস্থিতির জন্যে আমাদের ধারাবাহিক বিক্রিয়া চলতে পারবে না, ঠিক যেমন কাঠ ভিজে থাকার দরুণ জ্বলতে চায় না।

তাহলে এখন আমাদের কাছে দুটি পথ খোলা রয়েছে। প্রথমটি হচ্ছে, ভিজে কাঠ থেকে সব জল সরিয়ে নিয়ে কাঠ শুকনো করা। অন্যথায়, ভিজে কাঠের ওপর এমন একটা কিছু জিনিস ছড়িয়ে দেয়া, যার প্রভাবে কাঠের জল আগুনকে আর বাধা দিতে পারবে না।

দুটি উপায়ই কাজে লাগানো হল। তবে কার্যক্ষেত্রে দেখা গেল যে দ্বিতীয় পদ্ধতিটাই বেশী ফলপ্রসূ, কারণ ইউরেনিয়াম-২৩৫ থেকে ইউরেনিয়াম-২৩৮-এর খোসা ছাড়িয়ে নেয়ার কাজটা—ভিজে কাঠ থেকে জল সরিয়ে নেয়ার মতো— সহজ নয়। একই মৌলিক পদার্থের সমঘর বলে একের পৃথকীকরণ করা খুবই দুঃসাধ্য। তবে ধাপে ধাপে পরিশুদ্ধ করে শেষ পর্যন্ত কিছুটা খাঁটি ইউরেনিয়াম-২৩৫ পাওয়া সম্ভব।

কিন্তু এর চেয়ে অনেক সহজ উপায় হচ্ছে ইউরেনিয়াম-২৩৮-কে নাড়াচাড়া না করে শুধু তার প্রভাবটা কমিয়ে দেয়া। এখানে একটা মস্ত বড় সুবিধে প্রকৃতিদেবীই আমাদের দিয়েছেন, এবং সেটা হচ্ছে এই যে—বিদারণের উদ্দেশ্যে প্রাথমিক নিউট্রন স্রোত যখন প্রচণ্ড বেগে ইউরেনিয়ামের ওপর আঘাত করে তখন সেই বেগবান নিউট্রন কণিকাগুলিকে গ্রাস করার ক্ষমতা উভয়-প্রকার ইউরেনিয়ামের সমান হলেও নিউট্রন যখন আস্তে আস্তে চলে তখন হাল্কা

...নিয়াম-২৩৫-ই অপেক্ষাকৃত অনেক ...ক সংখ্যক নিউট্রন ধরে ফেলতে পারে। ...পরিমাণে অনেক বেশী হলেও ইউ-...রাম-২৩৮-এর ভাগে যৎসামান্যই পড়ে। ...াং আমরা যদি কোনও প্রকারে আপাতত ...ন স্রোতের বেগটা স্তিমিত করে দিতে ... তাহলেই আমাদের উদ্দেশ্য সিদ্ধ ... এই উদ্দেশ্যে যে সব পদার্থ ব্যবহার ...হয় তাদের বলে মডারেটর। কারবন ...লিয়াম এবং ভারী জল (যে সব জলের ... মধ্যে হাইড্রোজেন-১-এর পরিবর্তে ... হাইড্রোজেন-২, অর্থাৎ ডয়টেরন, ...) মডারেটর হিসেবে সুন্দর কাজ করে ...এদের মধ্যে যদি প্রাকৃতিক ইউরে-...মের খন্ডগুলি (যার ভেতরে ইউরেনিয়াম-... এবং ইউরেনিয়াম-২৩৫, দুই-ই ...ান আছে) মিশিয়ে দেয়া যায়, তাহলে ...ত ফল পাওয়া যায় অনায়াসে।

...এখন তাহলে সমস্ত বাধাই দূর হয়ে ... পারমাণবিক শক্তি এবার আমাদের ...লের মধ্যে এসে গেছে। শুধু সময় এবং ...গ বুঝে মডারেটর মিশ্রিত ইউরে-...মের বুকে নিউট্রনের স্রোত নিক্ষিপ্ত ...ত পারলেই আমাদের কাজ সমাপ্ত। ...সেই উদ্দেশ্যে সবাই এসে সমবেত ...ন আমেরিকায়। একাধিক বৈজ্ঞানিক ... নিয়ে বিশ্ববিখ্যাত পরমাণু বিজ্ঞানী ...ন্‌বোর ইউরোপ থেকে আমেরিকায় এসে ...াৎ করলেন সর্বকালের শ্রেষ্ঠ বৈজ্ঞানিক ...বার্ট আইনস্টাইনের সঙ্গে। তারপর ...স বোর এই বিষয়ে এনরিকো ফার্মি'র ...ও আলোচনা করলেন। যিনি তখন ...গো বিশ্ববিদ্যালয়ে গবেষণায় ব্যস্ত। ... তখন দ্বিতীয় মহাযুদ্ধে লিপ্ত। ...া এবং বারুদের ধোঁয়ায় আকাশ-বাতাস ...। মৃত্যুর পদক্ষেপ শোনা যাচ্ছে ...। সমস্ত পৃথিবীটাই যেন একটা ...ক বিস্ফোরণের আশঙ্কায় সন্ত্রস্ত! ...ঠিক এমনি সময় কনকনে এক শীতের ... এনরিকো ফার্মি আরো হাজার হাজার ...বিস্ফোরক একটা কাজের উদ্দেশ্যে ...নর হলেন আত্মবিশ্বাসপূর্ণ দৃঢ় পদ-...প। অবশ্য, বিস্ফোরণ তিনি ঘটান নি। ...তত্ত্বাবধানে আমেরিকায় প্রথম সুনিয়ন্ত্রিত ...াণবিক বিক্রিয়া সংঘটিত হয় ১৯৪২ ...র ডিসেম্বর মাসের দু তারিখে ...গো বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রাঙ্গণে।

...কিন্তু ব্যাপারটার এখানেই শেষ হল ... একবার মানুষের রক্তের আস্বাদ পেলে ...কি আর কখনো তার জিব মুখের মধ্যে ... রাখতে পারে? সর্বকালের শ্রেষ্ঠ ...ানিক আলবার্ট আইনস্টাইন চিঠি ...লেন আমেরিকার তৎকালীন প্রেসিডেন্ট ...কলিন - ডি - রুজভেল্টকে। কিন্তু ...তেই কিছু হল না। পারমাণবিক ...য়ার এক্সপেরিমেন্ট চলতেই থাকল। ...শেষে সত্যি-সত্যিই একদিন বিস্ফোরিত ...পারমাণবিক বোমা!

...সেটা ছিল ১৯৪৫ সাল। দিন ১৬ই ...াই। স্থান অ্যালামোগর্ডো, নিউ ...ক্সিকো। সেখানে বিস্ফোরিত হল ...ষের ইতিহাসের প্রথম পারমাণবিক বোমা। এবং এই একটি মাত্র বোমায় যে প্রলয়কান্ড ঘটে গেল, সেটা সত্যিই ভয়াবহ! যেন লক্ষ লক্ষ পুরনো ধরনের বোমা এক সঙ্গে ফাটানো হল সেখানে। বিশাল একটা অগ্নিগোলকের সৃষ্টি হল মুহূর্তে। মধ্যাহ্ন সূর্যের চেয়েও সেটা উজ্জ্বল। তার আভ্যন্তরিক উত্তাপ দশ লক্ষ ডিগ্রীরও অধিক। তারপর সেখান থেকে আলফা ও বিটা কণিকা এবং আরো শক্তিশালী রঞ্জন ও গামা রশ্মি চতুর্দিকে বিক্ষিপ্ত হতে লাগল সবেগে। আশপাশের প্রায় দশ বর্গ-মাইল এলাকা সম্পূর্ণ ধ্বংসস্তূপে পরিণত হয়ে গেল মুহূর্তের মধ্যে!

বৃন্দাবনচন্দ্রের মন্দির : গুপ্তিপাড়া ফটো : বিল্টু গুপ্ত

পারমাণবিক বোমার এই ভীষণ অগ্নি-গোলকটি ঠিক কি ধরনের দেখতে হয়, তার একটা আভাস ৩নং চিত্রে দেয়া হয়েছে।

এর পরের কাহিনী অবশ্য আরো ভয়াবহ এবং মর্মান্তিক। মানুষের ওপর নিক্ষিপ্ত হল মানুষের হাতের তৈরী প্রথম পারমাণবিক বোমা ঠিক তিন সপ্তাহ পরে, ১৯৪৫ সালের আগস্ট মাসের ছ তারিখে হিরোশিমা শহরে। তারপর আর একবার। এবার বিধ্বস্ত হল নাগাশিকি শহর। সব-শুদ্ধ প্রায় দেড় লক্ষ লোক তাঁদের অমূল্য জীবন অকালে বলি দিয়ে বলে দিলেন যে, এই ভয়ঙ্কর অস্ত্র মানুষের ওপর প্রয়োগ করা চলে না। আর তারপরেই বন্ধ হয়ে গেল দ্বিতীয় মহাযুদ্ধ। এবং তারপর এই বাইশ বছরের মধ্যে বিশ্বের আর কোথাও মানুষের ওপর পরীক্ষা করা হয় নি নিউট্রন নিক্ষেপ করে ইউরেনিয়াম বিদারণের ফলাফল।

কিন্তু বিদারণ নিয়েই আমরা ব্যস্ত ছিলাম এতক্ষণ। সেই সংযোজন-এর কথাটা ভুলেই গিয়েছিলাম। এবার দেখতে হবে সেটা।

(৬)

আমরা দেখেছিলাম যে, রূপোর নীচের দিকে মৌলিক পদার্থগুলি থেকে শক্তি পেতে হলে তাদের বিদারণ করলে চলবে না; জোড়া লাগাতে হবে। অর্থাৎ, দুটি বিভিন্ন হাল্কা পদার্থের কেন্দ্রধরকে অতি কাছাকাছি এনে যদি আমরা জুড়ে দিতে পারি তাহলে একটা নতুন পদার্থ সৃষ্টি হবে, এবং সঙ্গে সঙ্গে বিপুল শক্তি বেরিয়ে আসবে।

এই জোড়া লাগানোর পথে প্রাথমিক অন্তরায় হচ্ছে কেন্দ্রের বাইরের দিকের ঘূর্ণায়মান ইলেকট্রনগুলি। আসলে এই ইলেকট্রনগুলিই হচ্ছে কেন্দ্রধরের রক্ষী। বাইরের যাবতীয় আঘাত নিজেদের অঙ্গে নিয়ে এরা কেন্দ্রধরকে রক্ষা করে যাচ্ছে সর্বদা।

পরমাণুর কাঠামো আলোচনার সময় আমরা দেখেছিলাম যে, কেন্দ্রধর সমগ্র পরমাণুটির মাত্র দশ হাজার ভাগ স্থান অধিকার করে থাকে। বাইরে থাকে ইলেক-ট্রনের চক্র। আর অন্তবর্তী এই দশ হাজার গুণ স্থানটা ইলেকট্রন এবং প্রোটনের আয়তনের তুলনায় যেন একটা অনন্ত মহা-শূন্য! এই শূন্য স্থানটিকে ঘিরে রয়েছে ইলেকট্রনের চক্র, যার জন্যে দুটি কেন্দ্রধরের মধ্যে ব্যবধানটা থেকেই যাচ্ছে সর্বদা।

কিন্তু মহাশূন্যের গভীরে এমন অনেক তারা আছে যেখানে তাপাঙ্ক দশ লক্ষ ডিগ্রীরও অধিক! এই প্রচণ্ড উত্তাপের প্রভাবে সেখানকার সমস্ত ইলেকট্রন কেন্দ্র-ধরকে পরিত্যাগ করে চলে গেছে, এবং সেই জন্যে সমগ্র নক্ষত্রটির ব্যাস প্রায় দশ হাজার ভাগ হ্রাস পেয়েছে। আমাদের পৃথিবীর যদি কখনো এই দশা হয় তাহলে এই বিশাল বিশ্ব মাত্র এক মাইল ব্যাস-বিশিষ্ট ক্ষুদ্র একটি গোলকে পরিণত হয়ে যাবে! কিন্তু তখনো সেই অতি ক্ষুদ্র নিষ্পেষিত পৃথিবীর ভর বর্তমান পৃথিবীর সমানই থাকবে, কারণ—আমরা দেখেছি—ইলেকট্রনের ভর কেন্দ্রধরের তুলনায় নগন্য, এবং পরমাণুর যাবতীয় ভর ঐ কেন্দ্রধরের মধ্যেই পুঞ্জীভূত থাকে। অর্থাৎ, তখন পৃথিবীর সাত সমুদ্র তের নদী মাত্র একটি ক্ষুদ্র পুকুরে পরিণত হয়ে যাবে, কিন্তু সেই পুকুরের জল হবে পারার চেয়েও বহু গুণ ভারী, এবং আমরা সকলে পিঁপড়ের আকার ধারণ করলেও আমাদের অঙ্গ-প্রত্যঙ্গগুলি সীসের চেয়েও অনেক ওজনদার হবে!

কিন্তু ভয় নেই। দশ মণ তেলও পুড়বে না, রাধাও নাচবে না। লক্ষ লক্ষ ডিগ্রী সেন্টিগ্রেড তাপাঙ্কর উত্তাপ এই পৃথিবীতে কখনোই সম্ভব হবে না, এবং তাই আমা-দেরও বামনাকৃতি হয়ে সেই ভয়াবহ মৃত্যুর সম্মুখীন হতে হবে না কোন দিন, কারণ ইলেকট্রনগুলি যথাস্থানে থেকে কেন্দ্রধরকে রক্ষা করে যাবে সর্বক্ষণ। আর সেই জন্যেই, দুর্ভাগ্যবশত, এখন কৃত্রিম উপায়ে ইলেক-ট্রনের বেড়া ভেদ করে কেন্দ্রধরগুলি সংযোজন করে পারমাণবিক শক্তি বার করে আনতে হবে আমাদের।

তবে ইলেকট্রনের খোসা ছাড়ানো, বিশেষ করে বাইরের দিকের ইলেকট্রনের, খুব একটা শক্ত কাজ নয়। এই ব্যাপারটা আমরা আগেই দেখেছি, এবং কেন্দ্রধরে আঘাত করার উদ্দেশ্যে যখন প্রোটন স্রোতের প্রয়োজন হয়েছিল তখন হাইড্রোজেন পরমাণু থেকে ইলেকট্রন খসিয়ে নিয়ে আমরা প্রোটন সংগ্রহ করেছিলাম আসলে। সুতরাং দুটি কেন্দ্রধরকে সংযোজন করার সময় তাদের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট ইলেকট্রনগুলি প্রাথমিক অন্তরায় হলেও—প্রধান নয়। প্রধান বিঘ্নটা হচ্ছে কেন্দ্রধরগুলির চার্জ। আমরা দেখেছি যে কেন্দ্রধরে সর্বদা ধনাত্মক চার্জ থাকে, আর সেইজন্যে দুটি কেন্দ্র-ধরকে দু আঙুলে টিপে যতই চেষ্টা করি না কেন, তারা কিছুতেই কাছাকাছি আসবে না। উভয়ের ধনাত্মক চার্জ যে বিকর্ষণটা সৃষ্টি করবে তার ফলে কেন্দ্রধর দুটি সব সময় ছিটকে বাইরের দিকে বেরিয়ে যেতে চাইবে।

এই সমস্যার কিছুটা সমাধান অবশ্য অনায়াসেই করা যেতে পারে সবচেয়ে কম চার্জের কেন্দ্রধর নিয়ে কাজে নামলে, কারণ তখন এই বিঘ্ন সৃষ্টিকারী বিকর্ষণের পরিমাণটা সর্বনিম্ন হয়ে যাবে। কিন্তু কেন্দ্রধরে চার্জের উৎস হচ্ছে প্রোটন, সুতরাং অল্প সংখ্যক প্রোটনযুক্ত কেন্দ্রধর, অর্থাৎ হাল্কা পরমাণু চাই। তাছাড়া হাল্কা পরমাণুর ক্ষেত্রেই — আমরা দেখেছি— সংযোজন সম্ভব, ভারী হলে নয়। সুতরাং সবচেয়ে হাল্কা পদার্থ আমাদের সেই অদ্বিতীয় হাইড্রোজেনেরই ডাক পড়ল স্বভাবত। কিন্তু আমরা দেখেছি যে, চার্জ না বাড়িয়েও পরমাণুকে ভারী করা যায়, কেন্দ্রস্থিত নিউট্রনের সংখ্যা বৃদ্ধি করে—এবং তাদেরই বলে প্রথম পদার্থের সমঘর। হাইড্রোজেনের এই রকম দুটি সমঘর হাইড্রোজেন-২ (ডয়টেরাম) এবং হাইড্রো-জেন-৩ (টাইট্রিয়াম) নেয়া হল। উদ্দেশ্য—এদের জুড়ে হিলিয়াম পরমাণুতে পরি-বর্তিত করে বিপুল শক্তি অর্জন করা।

কোনও একটা কাজে হাত দেবার আগে বুদ্ধিমানের কাজ হচ্ছে, সেখান থেকে কতটা লাভ পাওয়া যেতে পারে সেটা পূর্বাহ্নেই হিসেব করে দেখে নেয়া। যখন আমরা নিউট্রন নিক্ষেপ করে ইউরেনিয়াম বিদারণ করেছিলাম, তখন নিক্ষিপ্ত নিউট্রনের মধ্যে যে শক্তি বর্তমান ছিল তার চেয়ে সাত হাজার গুণ বেশী শক্তি আমরা পেয়েছিলাম বিদারণের পর। কিন্তু এটা ছিল সূচনা মাত্র। তারপর ক্রমবর্ধমান নিউট্রনের জন্মের সঙ্গে সঙ্গে যখন ধারাবাহিক বিক্রিয়া শুরু হয়ে গেল, তখন যে পরিমাণ শক্তি আমরা পেলাম তার একটা হিসেব অবশ্য আইন্স্টাইন বহু দিন আগেই করে রেখেছিলেন আমাদের জন্যে — আলোকের বেগের বর্গ দিয়ে বিলুপ্ত বস্তুর ভরকে গুণ করে। এই শক্তিটা যে অস্বাভাবিক রকমের বেশী সেটা আমরা আগেই দেখেছি। একটা মোটামুটি ধারণা করা যেতে পারে এই থেকে যে, মাত্র এক গ্রাম বিদারণক্ষম বস্তু (চশমা নিয়ে আসতে ভুলে গেলে চল্লিশোর্ধ অধিকাংশ ব্যক্তি যাকে খুঁজে পাবে না।) বিদীর্ণ করলে কুড়ি টন গ্যাসোলিনের (সাধারণ বাড়ীতে যার স্থান সঙ্কুলানই হবে না) জ্বালানী-শক্তি লাভ করা সম্ভব!

এটা হল বিদারণ পদ্ধতির হিসেব। কিন্তু সংযোজনের ক্ষেত্রে আরো অনেক বেশী শক্তি উৎপন্ন হয় কারণ তখন প্রায় সাত গুণ অধিক বস্তু অদৃশ্য হয়ে যায়। তাছাড়া, বিদারণ পদ্ধতিতে কার্যক্ষেত্রে একটা সীমা-বদ্ধতা থাকে যেটা আমরা আগে দেখি নি। বিদারণের জন্যে একটা নির্দিষ্ট আকারের ইউরেনিয়াম খণ্ড দরকার। খণ্ডটি যদি এর চেয়ে ছোট হয় তাহলে অনেক নিউট্রন বাইরে চলে যাবে। ফলে, ধারাবাহিক বিক্রিয়া ব্যাহত হবে। কিন্তু পারমাণবিক বোমার ক্ষেত্রে আবার বেশী বড় ইউরেনিয়াম নেয়া চলে না, কারণ তাহলে বোমার আকার এবং ওজন নিয়ন্ত্রণের বাইরে চলে যাবে। এই জিনিসটাই পারমাণবিক বোমার ক্ষমতা সীমাবদ্ধ করে দিচ্ছে। কার্যক্ষেত্রে কতকগুলি ছোট ছোট টুকরো ইউরেনিয়াম নেয়া হয় যেগুলি আলাদা আলাদা ভাবে ধারাবাহিক বিক্রিয়া চালাতে অক্ষম, কিন্তু সংযুক্ত হলে পারে। এবং সঠিকভাবে বলতে গেলে, —পারমাণবিক বোমা হচ্ছে শুধুমাত্র একটি যান্ত্রিক পদ্ধতি যেখানে এই ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ইউরেনিয়ামের টুকরোগুলিকে প্রাথমিক নিউট্রন স্রোত নিক্ষিপ্ত হবার পরই অতি দ্রুত সংযুক্ত করে দেয়া যেতে পারে।

সুতরাং দেখা গেল যে, ভারী ইউ নিয়াম বিদারণ করে যে বিপুল শক্তি পাও যায়, সেই বিপুল-এর চেয়েও অনেক বে শক্তি হাল্কা হাইড্রোজেন পরমা সংযোজন করে লাভ করা সম্ভব। লাভে বরাদ্দ সম্বন্ধে তহলে নিশ্চিত হওয়া গে এবার নিশ্চিত মনে কাজে হাত দে যেতে পারে।

বিকর্ষণ যাতে সর্বনিম্ন হয় সেজ আমরা সবচেয়ে কম চার্জযুক্ত হাইড্রোজে দুটি সমঘর নিয়ে কাজে নেমেছিলাম। কি বাস্তবে দেখা গেল যে, মাত্র এক মাত্রা চা যুক্ত হাইড্রোজেনের এই দুটি সমঘরই রকম বীর বিক্রমে বাধা দিচ্ছে, তাতে তা জোড়া লাগানো দুঃসাধ্য। তখন একটা চি মনের মধ্যে উদয় হল অনেকের। যে কো দুটি ধাতু—যেমন লোহা এবং তামা—জো লাগাতে হলে আমরা টুকরো দুটো আগুনের ওপর ধরে গলিয়ে নিয়ে তার তাদের জুড়ে ফেলতে পারি অনায়া সাধারণত দুই-তিন হাজার ডিগ্রী তাপাঙ্ক মধ্যেই প্রায় সব ধাতু গলে যায়। সুতরাং এ পদ্ধতিটা প্রয়োগ করে যদি আমরা হাইড্রো জেনের পরমাণু দুটিকে জোড়া দেবার চে করি, তাহলে কেমন হয়?

পারমাণবিক জগতে আমরা এ যাবৎ কা দেখে এলাম, সবই অস্বাভাবিক। আমা সাধারণ জগতের সঙ্গে এর কোনও সামঞ্জ নেই। এখানে সব কিছুই খুব বড়, না হ খুব ছোট। পরমাণুর আকার খুবই ক্ষুদ্র এক সেন্টিমিটার স্থানের মধ্যে প্রায় দ কোটি পরমাণু লাইন করে সাজানো যা কিন্তু এই অতিক্ষুদ্র পরমাণুই আবার তা আভ্যন্তরিক কেন্দ্রধরের চেয়ে দশ হাজ গুণ বড়! ওজনের দিক থেকে এ অসাধারণত্বটা আরো বেশী প্রকট। অনে আগে আমরা একবার হাইড্রোজেন পরমাণু ভর কত, এই প্রশ্নটা তুলেছিলাম। হাইড্রো জেন পরমাণুতে মাত্র একটি প্রোটন আ এবং প্রোটনের ভর হচ্ছে দেড় গ্রামের লক্ষ কোটি ভাগের লক্ষ কোটি ভাগ! কিন্তু এই অতি হাল্কা প্রোটনের ঘনত্ব আবার অসম্ভ রকমের বেশী; যেটা প্রকাশ পেল নীলস বোর এবং হুইলার যখন ১৯৩৯ সাে পারমাণবিক তরল পদার্থের পৃষ্ঠটান পরিমাপ করতে শুরু করলেন, বিভি বস্তুর অন্তর্নিহিত প্রতিষ্ঠার স্বভাব নির্ণয় করার উদ্দেশ্যে। পরীক্ষা করে তাঁ দেখলেন যে, পারমাণবিক তরল পদার্থে ঘনত্ব জলের চেয়ে চব্বিশ কোটিরও লা কোটি গুণ বেশী, এবং এর পৃষ্ঠটান জলে চেয়ে এক লক্ষ কোটিরও কোটি গু বেশী! সুতরাং এই অতি বৃহৎ এবং অ ক্ষুদের রাজত্বে, দুটি পরমাণু গলিয়ে জো লাগাতে গেলে সেই গলনাঙ্কটাও নিশ অস্বাভাবিক রকমের একটা কিছু হবে এবং হলও তাই। দেখা গেল যে, প্রায় এ কোটি ডিগ্রী তাপাঙ্কর উত্তাপ সৃষ্টি কর পারলে তবেই পরমাণু গলিয়ে জো লাগান সম্ভব। আর সেই জন্যেই মহ শূন্যের কোনও কোনও অত্যন্ত উত্ত

নক্ষত্রের মধ্যে সমস্ত কেন্দ্রধর পরস্পরের সংগে সংযুক্ত হয়ে গেছে।

কিন্তু এক কোটি ডিগ্রী সেন্টিগ্রেড? যেখানে মাত্র ছয় হাজার ডিগ্রী তাপাংকেই পৃথিবীর সমস্ত বস্তু বাষ্পে পরিণত হয়ে যায়, যেখানে এক কোটি ডিগ্রী তাপাংক কি করে উৎপন্ন করা সম্ভব? তবে একটা আশার কথা এই যে, এই অতি প্রচন্ড উত্তাপটা মুহূর্তের জন্যে পাওয়া গেলেই পরমাণু দুটি জোড়া লেগে যাবে। তখন বিজ্ঞানীদের দৃষ্টি সেই পারমাণবিক বোমার ওপর গিয়ে পড়ল যেখানে ইউরেনিয়াম বিদীর্ণ হয়ে প্রায় এই রকমই অসম্ভব উত্তাপ সৃষ্টি হচ্ছে কিছুক্ষণের জন্যে।

একটা দৃঢ় আচ্ছাদনের মধ্যে একটি পারমাণবিক বোমার সরঞ্জাম স্থাপিত করে, পাশে একটি পাত্রের ভেতরে ডয়টেরাম এবং ট্রাইটিয়াম রাখা হল। তারপর পারমাণবিক বোমাটি বিস্ফোরণের দ্বারা প্রয়োজনীয় বিপুল পরিমাণ উত্তাপ উৎপন্ন করে ডয়টেরাম এবং ট্রাইটিয়াম গলিয়ে হিলিয়ামে পরিবর্তিত করা হল, এবং এই সংযোজনের ফলে প্রচন্ড শক্তি মুক্তি পেল। মোটামুটি এই হচ্ছে হাইড্রোজেন বোমার কার্যপ্রণালী, এবং এইভাবে নির্মিত প্রথম হাইড্রোজেন বোমাটি বিস্ফোরিত হয়েছিল প্রশান্ত মহাসাগরের বুকে মার্শাল দ্বীপে ১৯৫২ সালের নভেম্বর মাসের প্রথম দিনে, অর্থাৎ প্রথম পারমাণবিক বোমার প্রায় সাত বছর পরে।

আমরা দেখেছি যে, উৎপন্ন শক্তির পরিমাণ বিদারণের চেয়ে সংযোজনের ক্ষেত্রে একাধিক দিক থেকে বেশী। এই লভ্যাংশগুলি যোগ করে দেখা গেছে যে, একটি হাইড্রোজেন বোমা, ১৯৪৫ সালে সেই অভিশপ্ত হিরোশিমা শহরের ওপর নিক্ষিপ্ত পারমাণবিক বোমাটির চেয়ে প্রায় আড়াই হাজার গুণ শক্তিশালী! এই রকম একটি মাত্র বোমা নিউইয়র্ক অথবা লন্ডনের মত সুবৃহৎ শহর সম্পূর্ণভাবে বিধ্বস্ত করে দিতে সক্ষম! তবে সৌভাগ্যবশতঃ, হাইড্রোজেন বোমা এখনো পর্যন্ত মনুষ্য অধ্যুষিত কোনও শহরের ওপর নিক্ষিপ্ত হয় নি। কিন্তু তবুও একজন মানুষ এই হাইড্রোজেন বোমার আঘাতেই নিহত হয়েছিলেন। তিনি হচ্ছেন একজন জাপানী। পেশায় ধীবর। মানুষের ইতিহাসে তিনিই হাইড্রোজেন বোমার প্রথম বলি, এবং আমরা আশা করব যে, তিনিই যেন শেষ বলি হন।

বোমাটা নিক্ষিপ্ত হয়েছিল আমেরিকার উপকূলে পরীক্ষামূলকভাবে। তিনি ছিলেন জাপানে। মাঝখানে ছিল প্রশান্ত মহাসাগরের হাজার হাজার মাইল জলরাশির বিশাল ব্যবধান। কিন্তু তবু তিনি নিহত হলেন। কেন?

আমরা দেখেছি যে, এই পারমাণবিক বোমাগুলি সাধারণ বোমার চেয়ে লক্ষ লক্ষ গুণ শক্তিশালী। অর্থাৎ, লক্ষ লক্ষ সাধারণ বোমা একটা এলাকার ওপর নিক্ষিপ্ত হলে সেখানে যে প্রলয় কান্ডটা ঘটে যায়, মাত্র একটি পারমাণবিক বোম ফেললে ঠিক তাই-ই হবে। কিন্তু এইখানেই কি শেষ? তা নয়। পারমাণবিক বোমার আরো একটা অত্যন্ত বিপজ্জনক দিক আছে, যেটা সাধারণ বোমার মধ্যে অনুপস্থিত। সেটা হচ্ছে—তেজস্ক্রিয় রশ্মি! পারমাণবিক বোমা থেকে বিক্ষিপ্ত এই তেজস্ক্রিয় রশ্মিগুলি, যথা রঞ্জন রশ্মি গামা রশ্মি আলফা কণিকা ইত্যাদি, যে অত্যন্ত শক্তিশালী সেটা আমরা আগেই দেখেছি। এরা মানুষের দেহের ওপর এসে পড়লে, দেহের মধ্যে রক্ত এবং মাংসের কোটি কোটি অনু এবং পরমাণু যথাস্থানে থেকে যে সাম্যটা প্রতিষ্ঠিত করে রেখেছে, সেটা নিমেষে নষ্ট করে দিতে পারে। তখন মানুষ পীড়িত হয়ে পড়ে (রেডিয়েশন সিকনেস)। এই পীড়া গুরুতর হলে মৃত্যুও অসম্ভব নয়, যেমন ঘটেছিল সেই জাপানী ধীবরের ভাগ্যে, হাজার হাজার মাইল পথ মহাসমুদ্রের ওপর দিয়ে ভেসে ভেসে এসে তেজস্ক্রিয় রশ্মিগুলি তাঁর দেহে আপতিত হবার পর। পারমাণবিক বিস্ফোরণ অথবা বিক্রিয়ার এই দিকটা সত্যিই খুব আশঙ্কাজনক, কারণ সমস্ত কান্ডটা ঘটে যাবার অনেক দিন, এমন কি অনেক বছর পরেও এই তেজস্ক্রিয় রশ্মি থেকে উৎপন্ন বিপদটা ভেসে বেড়ায় আকাশে-বাতাসে!

তাহলে শেষ পর্যন্ত আমাদের সকল প্রচেষ্টা সার্থক হল। পারমাণবিক শক্তি আমরা অর্জন করতে পারলাম। এই প্রসংগে এতক্ষণ যে সব আলোচনা আমরা করলাম, সেগুলি কিন্তু একেবারেই মোটামুটি। পরমাণু বিজ্ঞান, বিজ্ঞানের একটি অতি জটিল এবং সবচেয়ে আধুনিক শাখা, কারণ এর জন্ম এবং বিকাশ প্রায় বর্তমান শতাব্দীর মধ্যেই সীমাবদ্ধ। এ বিষয়ে এখনো দেশে দেশে প্রচুর গবেষণা চলছে, এবং চলবে। পরমাণুর আভ্যন্তরিক গঠনপ্রণালী এবং অবপারমাণবিক কণিকাগুলির কার্যকলাপ সম্বন্ধে আরো অনেক তথ্য সংগৃহীত হবে। আরো অনেক রহস্য উদ্ঘাটিত হবে এবং আরো অনেক মতবাদ উপস্থাপিত হবে। এমন কি, যে সব তথ্য ইতিমধ্যে সংগৃহীত হয়ে গেছে সেখানেও মতামতের অনেক পার্থক্য বর্তমান। যেমন, আমাদের আলোচনার সময় আমরা বলেছিলাম যে, চার্জশূন্য নিউট্রনের সংগে আকর্ষণের ফলেই প্রোটন এবং নিউট্রনগুলি ঐক্যবদ্ধ হয়ে কেন্দ্রধরের মধ্যে ঠাসাঠাসি করে অবস্থান করছে। না হলে, শুধু প্রোটনই যদি সেখানে থাকত তাহলে ধনাত্মক চার্জের বিকর্ষণের প্রভাবে সমস্ত প্রোটনগুলি ছিটকে বেরিয়ে যেত বাইরে। কিন্তু এ ছাড়াও আর একটা অনেক অধিক শক্তিশালী বল কেন্দ্রধরকে সুপ্রতিষ্ঠ করে রাখার জন্যে দায়ী, যার উল্লেখ আমরা আগে করি নি। প্রোটন এবং নিউট্রনগুলি যখন অত্যন্ত কাছাকাছি এসে যায় তখনই কেবল এই বলটি কার্যকর হয়। আমরা জানি যে দুটি একই জাতের (ধনাত্মক অথবা ঋণাত্মক) চার্জের মধ্যে বিকর্ষণ সৃষ্টি হয় এবং এই চার্জ দুটি যত কাছাকাছি আসে, এই বিকর্ষণের বলটিও তত বৃদ্ধি পায়। কিন্তু চার্জ দুটি যখন এত কাছাকাছি এসে পড়ে যে, তাদের অন্তবর্তী দূরত্ব এক সেন্টিমিটারের লক্ষ ভাগের কোটি ভাগেরও কম হয়ে যায়, তখন এই বিকর্ষণটা আকর্ষণে পরিবর্তিত হয়ে যায় সহসা। এই জাতীয় বলকে বলা হয় পরিবর্তন বল (এক্সচেঞ্জ ফোর্স) এবং এটা কেন্দ্রধরের মধ্যে নিউট্রন এবং প্রোটনের ভেতরে, এমন কি চার্জশূন্য নিউট্রনদের মধ্যেও ক্রিয়া করে সবাইকে ঐক্যবদ্ধ করে রাখে।

আবার বিদারণের সময় ইউরেনিয়াম যখন নিউট্রনের আঘাতে দু খন্ড হয়ে গেল ১৯৩৮-১৯৩৯ সালে, তখন আমরা বলেছিলাম যে, এই খন্ডদুটি ছিন্ন স্প্রিং-এর মতো ভীষণভাবে কাঁপতে থাকে যার ফলে নিস্তেজ হয়ে যাবার পূর্বে প্রত্যেকে একটি করে নিউট্রনের জন্ম দিয়ে যায়। কিন্তু অনেকের মতে এই দুটি অতিরিক্ত নিউট্রন উৎপন্ন হবার কারণটা অন্য। হাল্কা পদার্থের পরমাণুর সুপ্রতিষ্ঠার জন্যে—আমরা দেখেছিলাম—বেশী অতিরিক্ত (অর্থাৎ প্রোটনের সংখ্যার চেয়ে অতিরিক্ত) নিউট্রনের প্রয়োজন হয় না। কিন্তু পদার্থ যত ভারী হতে থাকে, এই অতিরিক্ত নিউট্রনের সংখ্যাটা ততই বৃদ্ধি পায়। সবচেয়ে ভারী (প্রাকৃতিক পদার্থগুলির মধ্যে অবশ্য) পদার্থ ইউরেনিয়াম—২৩৫-এর কেন্দ্রধরে রয়েছে ১৪৩টি নিউট্রন। কিন্তু বিদারণের পর এই ইউরেনিয়াম তার কোনও নিকটবর্তী সমঘরে পরিবর্তিত হয় না। একেবারে আধখানা হয়ে যায়। এই দুটি অর্ধ খন্ড তখন রূপান্তরিত হয় সম্পূর্ণ ভিন্ন দুটি হাল্কা পদার্থ ক্রিপটন এবং বেরিয়ামে (২নং ছবি), এবং হাল্কা হওয়ার দরুণ এদের আর এত বেশী নিউট্রনের প্রয়োজন তখন হয় না, এবং তাই তারা একটি করে নিউট্রন মুক্ত করে দেয়। অনেকের মতে এইভাবেই নাকি দুটি অতিরিক্ত নিউট্রনের জন্ম হয়, যারা পর্যায়ক্রমে আরো অতিরিক্ত নিউট্রন উৎপন্ন করে ধারাবাহিক বিক্রিয়াটা অব্যাহত রাখে। সুতরাং দেখা যাচ্ছে যে, মতবাদের শেষ নেই, এবং আমাদের এই মোটামুটি আলোচনায় সে সমস্ত অন্তর্ভুক্ত করার অবকাশও নেই।

তবে অতিরিক্ত নিউট্রনের জন্মের কারণটা যাই হোক না কেন, তারা যে জন্মগ্রহণ করছে ঠিকই, এ বিষয়ে কোনও সন্দেহ নেই—কারণ, তা না হলে, আমরা পারমাণবিক অথবা হাইড্রোজেন বোমা বিস্ফোরণ করতে সক্ষম হতাম না আজ পর্যন্ত।

(৭)

কিন্তু বিস্ফোরণের জন্যেই কি আমরা পারমাণবিক শক্তি চেয়েছিলাম? ঘর-বাড়ী, শহর, মানুষের সভ্যতার সমস্ত ফসল নষ্ট করার জন্যেই কি এই পারমাণবিক শক্তির আরাধনা? যুদ্ধে উন্মত্ত হয়ে বোমার পর বোমা নিক্ষেপ করে ধ্বংসের বন্যায় সমস্ত সৃষ্টি বিলুপ্ত করে দেয়াই কি ছিল এই পারমাণবিক শক্তি অর্জনের উদ্দেশ্য? এবং তাই যদি সত্যি হয়, তাহলে এ তো পারমাণবিক শক্তি নয়—এ যে পরম দানবিক শক্তি! এই দানবকে নিয়ন্ত্রণ করতে না পারলে তো পৃথিবীর রক্ষা নেই।

দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের উত্তাপ কোলাহল এবং উত্তেজনা স্তিমিত হয়ে যাবার পর সকলের দৃষ্টি আই বেশী করে এইদিকে

গিয়ে পড়ল। কি করে এই দানবকে নিয়ন্ত্রণ করা যেতে পারে? আমরা দেখেছিলাম যে ইউরেনিয়ামের টুকরোটি যখন প্রয়োজনীয় আকারের চেয়ে ছোট থাকে তখন অধিকাংশ নিউট্রন বাইরে বেরিয়ে যাওয়ার দরুন ধারাবাহিক বিক্রিয়া বন্ধ হয়ে যায়। আবার ইউরেনিয়ামের টুকরো যখন বড় হয়, তখন সমস্ত ইউরেনিয়াম পরমাণু বিদীর্ণ হয়ে গিয়ে প্রচণ্ড বিস্ফোরণ ঘটে যায়। কিন্তু ইউরেনিয়ামের টুকরোটি যদি একেবারে সঠিক আকারের হয় (এক্‌জ্যাক্টলি দি রাইট সাইজ) তাহলে ধারাবাহিক বিক্রিয়াও চলতে থাকবে অথচ বিস্ফোরণও হবে না। অর্থাৎ পারমাণবিক দানবটি আমাদের নিয়ন্ত্রণের মধ্যেই থাকবে—ঠিক যে জিনিসটা আমরা চেয়েছিলাম।

কিন্তু এই সঠিক আকারের ইউরেনিয়াম সংগ্রহ করার ব্যাপারটা প্রথমে শুনতে যতটা মনে হয়, আসলে কিন্তু ততটা সোজা মোটেই নয়—কারণ এটা নিক্ষিপ্ত নিউট্রনের গতির ওপর নির্ভরশীল। বেগবান নিউট্রনের ক্ষেত্রে এই সঠিক আকারটা অনেক বড় হবে, এবং মন্দগতি নিউট্রনের বেলায় ছোট হবে। কিন্তু একবার বিদারণ শুরু হয়ে গেলে, তখন ওর আকার পরিবর্তন করা অসম্ভব। সেইজন্যে নিক্ষিপ্ত নিউট্রনগুলির সংখ্যা এবং গতিবেগ এমনভাবে সংযত করা হয় যাতে নির্দিষ্ট আকারের একটা ইউরেনিয়ামের টুকরো দিয়েই ধারাবাহিক বিক্রিয়া নিয়ন্ত্রাধীনে রাখা যেতে পারে। এই উদ্দেশ্যে ডয়টেরাম কারবন বেরিলিয়াম ইত্যাদি মৌলিক পদার্থ মডারেটর হিসেবে ব্যবহার করা হয়, যেটা আমরা বিদারণের আলোচনার সময়েই দেখেছিলাম। তা ছাড়া, ইউরেনিয়ামের মধ্যে সরু সরু ক্যাডমিয়ামের শলাকা প্রবিষ্ট করে প্রয়োজন হলে উৎপন্ন নিউট্রনের সংখ্যারও হ্রাস বৃদ্ধি করা যেতে পারে।

এইভাবে বিস্ফোরণ না ঘটিয়েও ধারাবাহিক বিক্রিয়া অব্যাহত রাখার উদ্দেশ্যে যে যন্ত্র ব্যবহৃত হয়, তাকে বলে পারমাণবিক চুল্লী (অ্যাটমিক রিয়্যাক্টর)। বস্তুতপক্ষে ১৯৪২ সালের সেই কনকনে শীতের দিনে এনরিকো ফার্মি এইরকমই একটা পারমাণবিক চুল্লী বানিয়েছিলেন শিকাগো বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রাঙ্গণে। এই উদ্দেশ্যে তিনি প্রায় এক লক্ষ পাউণ্ড ইউরেনিয়াম সংগ্রহ করেছিলেন। এই বিরাট ইউরেনিয়াম স্তূপটির নীচে একটা করে কারবন এবং ইউরেনিয়ামের পাত পর পর সাজানো ছিল। স্তূপের মধ্যে একাধিক ছিদ্র খনন করে লম্বা লম্বা ক্যাডমিয়ামের শলাকা প্রবেশ করানো হয়েছিল যেগুলি ওঠা-নামা করে নিউট্রনের সংখ্যা এবং সেই সঙ্গে বিক্রিয়াটি নিয়ন্ত্রিত করে রাখতে সক্ষম হয়েছিলেন এনরিকো ফার্মি। বছরখানেকের মধ্যেই ফার্মির এই পারমাণবিক চুল্লীর প্রভূত উন্নতি সাধন হল এবং বর্তমানে পৃথিবীর বহু দেশেই এই রকম উন্নত ধরনের পারমাণবিক চুল্লীর কারখানা স্থাপিত হয়েছে। আমাদের ভারতবর্ষেও হয়েছে। পারমাণবিক শক্তির সাহায্যে আজকাল শহর এবং গ্রামের জন্যে প্রয়োজনীয় বৈদ্যুতিক শক্তি উৎপন্ন করা হচ্ছে আমেরিকার কোনও কোনও অঞ্চলে। রাশিয়া এবং আমেরিকায় কলকারখানা জাহাজ স্টীমার সাবমেরিন ইত্যাদির জন্যেও এই শক্তি ব্যবহৃত হচ্ছে, যেখানে সম্ভব। কিন্তু আমাদের দৈনন্দিন জীবনের প্রতি ক্ষেত্রে পারমাণবিক শক্তির ব্যবহার বোধহয় কোনদিনই সম্ভব হবে না, পারমাণবিক চুল্লীর ভস্মের তেজস্ক্রিয়তার জন্যে। বাড়ীতে উনুনের ছাই আমরা কাজে লাগাই। বাসন ইত্যাদি পরিষ্কার করতে এই ছাই-এর প্রয়োজন হয়। কিন্তু পারমাণবিক চুল্লীর ভস্ম এভাবে ব্যবহার করা তো যায়ই না, এমন কি এ জিনিসটা যেখানে সেখানে ফেলেও দেয়া যায় না। এই তেজস্ক্রিয় ভস্মগুলিকে অত্যন্ত নিরাপদ স্থানে সমাধিস্থ করাটাই হয়তো সারা পৃথিবী জুড়ে পারমাণবিক শক্তি ব্যবহারের ক্ষেত্রে প্রধান অন্তরায় হয়ে দাঁড়াবে শেষ পর্যন্ত।

যাই হোক, সে হল অনেক পরের কথা। এখন পৃথিবীর বহু দেশেই পারমাণবিক শক্তি এইভাবে শান্তি এবং সমৃদ্ধির পথে নিয়োজিত হচ্ছে। বিগত দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের ভয়াবহ পরিণতি চোখের সামনে দেখে এখন প্রায় সকলেই উপলব্ধি করেছে যে ভবিষ্যতে যদি আবার এইরকম কোনও একটা ব্যাপক যুদ্ধ বাধে এবং সেখানে পারমাণবিক এবং হাইড্রোজেন বোমা বিস্ফোরিত হয় নির্বিচারে, তাহলে হয়তো সমগ্র মনুষ্য জাতিটাই পৃথিবী থেকে বিলুপ্ত হয়ে যাবে চিরতরে! কিন্তু তথাপি শক্তিশালী রাষ্ট্রগুলি এখনো পারমাণবিক বোমা বিস্ফোরণ করে চলেছেন পরীক্ষামূলকভাবে। এমন কি, আমাদের এই শান্তিকামী ভারতবর্ষেও কোনও কোনও মহল থেকে সরকারকে চাপ দেয়া হচ্ছে পারমাণবিক বোমা নির্মাণ করার জন্যে। তাদের মতে এই বিধ্বংসী পারমাণবিক বোমাই নাকি শান্তি প্রতিষ্ঠার ক্ষেত্রে সর্বাপেক্ষা শক্তিশালী অস্ত্র, কারণ প্রতিবেশী রাষ্ট্র যখন জানতে পারবে যে আমাদের ভাণ্ডারে এই ভয়ঙ্কর অস্ত্রটি মজুত রয়েছে, তারা আর কোনওদিন আক্রমণ করতে সাহস করবে না তখন।

এ সব অবশ্য রাজনৈতিক এবং কূটনৈতিক প্রশ্ন এবং হয়তো বিজ্ঞানের আলোচনার বহির্ভূত। কিন্তু রাজনীতির মধ্যে প্রবেশ না করেও এটা নিশ্চয় বলা যেতে পারে যে, পারমাণবিক এবং হাইড্রোজেন বোমার অধিকারী হলেই যে সেগুলি ধ্বংসের কাজে লাগাতে হবে, তার কোনও মানে নেই। অন্ততঃ এমন একজনের কথা আমরা জানি, যাঁর আয়ত্তের মধ্যে এর চেয়ে কোটি কোটি গুণ শক্তিশালী অস্ত্র আছে, কিন্তু তবু তিনি ধ্বংস করছেন না কিছুই। উল্টে, এই মহাশক্তিশালী অস্ত্রগুলিকে তিনি চিরকাল মানুষের কল্যাণের জন্যেই নিয়োগ করে এসেছেন। যাঁর কথা বলছি, তিনি হচ্ছেন—ঈশ্বর।

আমরা দেখেছি যে পারমাণবিক বোমার চেয়ে হাইড্রোজেন বোমা প্রায় আড়াই হাজার গুণ-শক্তিশালী, এবং মাত্র একটি হাইড্রোজেন বোমার আঘাতে একটা গোটা শহর নিশ্চিহ্ন করে দেয়া যায়! কিন্তু বিধ্বস্ত শহরটির তুলনায় নিক্ষিপ্ত হাইড্রোজেন বোমাটি আকারে কতটুকু? কিছুই নয়, নেহাৎই নগণ্য। কিন্তু আমরা যদি বিধ্বস্ত শহরটির মতো বড় একটি হাইড্রোজেন বোমা নির্মাণ করি, তাহলে? তাহলে বোধহয় গোটা পৃথিবীটাই নিশ্চিহ্ন হয়ে যাবে সেই বিশাল হাইড্রোজেন বোমার আঘাতে। আর যদি পৃথিবীর মতো বড় একটা হাইড্রোজেন বোমা বানাই, তাহলে? তাহলে কি যে হবে কল্পনাই করা যায় না। কিন্তু পৃথিবীর চেয়েও প্রায় তের লক্ষ গুণ বড় একটি হাইড্রোজেন বোমা ঈশ্বর নির্মাণ করেছিলেন পৃথিবী সৃষ্টি হবার কোটি কোটি বৎসর পূর্বে। সেখানে প্রতি মুহূর্তে প্রচণ্ড উত্তাপের ফলে লক্ষ লক্ষ হাইড্রোজেন পরমাণু সংযোজিত হয়ে হিলিয়াম সৃষ্টি করছে এবং অকল্পনীয় পরিমাণ শক্তি মুক্তি পাচ্ছে নিরন্তর। এই বিশাল হাইড্রোজেন বোমার সামান্যতম আঘাতে আমাদের পৃথিবী সম্পূর্ণরূপে ধ্বংস হয়ে যেতে পারে। এমন কি এই হাইড্রোজেন বোমাটি যদি কণামাত্র স্থানচ্যুত হয়, তাহলেও অভিকর্ষ এবং উত্তাপের অভাবে অথবা প্রভাবে আমাদের এই পৃথিবী বিলুপ্ত হয়ে যাবে নিমেষে। কিন্তু ঈশ্বর এসব কিছুই করেন নি। তিনি এই বিশাল হাইড্রোজেন বোমাটিকে ন' কোটি মাইল নিরাপদ দূরত্বে রেখে দিয়েছেন চিরকাল এবং এই হাইড্রোজেন বোমাটির তলায় বাস করেই আমরা বেঁচে রয়েছি এতকাল, লেখাপড়া শিখেছি, ঘর-বাড়ী বানিয়েছি, এমন কি এই যে আজ হাইড্রোজেন বোমা নিয়ে এত আলোচনা করছি, তাও মাথার ওপর এই বিশাল হাইড্রোজেন বোমাটির অসীম কৃপাতেই! ঈশ্বরের সৃষ্ট এই অত্যাশ্চর্য উজ্জ্বল হাইড্রোজেন বোমাটিই হচ্ছে শান্তি এবং সমৃদ্ধির পথে পারমাণবিক শক্তি ব্যবহারের উজ্জ্বলতম দৃষ্টান্ত।

এই হাইড্রোজেন বোমাটির নাম—সূর্য

—শেষ—

পুরনো পাতা

বলেন্দ্রনাথ ঠাকুর

কবি যদিও কহিয়াছেন—"কিমিব হি মধুরাণাং মণ্ডনং নাকৃতীনাম্", রূপসীরা কিন্তু এই বচনের উপর নির্ভর করিয়া কল্পনামাত্রাবলম্বনে কবির মনোহরণ অভিসারে বাহির হইতে সম্যক সাহসী হয়েন না। কবিকে তাঁহারা নিতান্তই কল্পনাচারী জানিয়া মনে মনে বলেন, হে কল্পলোকের অতিথি, তুমি আমাদের এই নিরাভরণ তনুলেখায় যতই মনোহারিতা প্রকাশ কর না কেন, আমরা মনে স্থির জানি, কতখানি তুমি এই উৎপলনেত্রে মুগ্ধ আর কতখানিই বা ইহার মধ্যে কজ্জলকালিমার মোহ কতটুকু এই অপাঙ্গভূর স্নিগ্ধ অধর পুটের আকর্ষণ, আর কতখানিই বা তপ্ত লাক্ষারাগের উদ্দীপনা। উৎসাহাবেশে তুমি যাহাই বল, আমাদের প্রতি অঙ্গ তাহার কেয়ূর কঙ্কণ মেখলানূপুরে তোমার অন্তরে মুখরিত হইয়া উঠে, আমাদের যৌবনলাবণ্য বিবিধ রাগরঞ্জিত হইয়া তোমার চিত্তে অনুরাগ উদ্দীপ্ত করিয়া তুলে, তোমার মুগ্ধ দৃষ্টি যেখানে দেখে বাহুক টচরণভঙ্গিমা, আমরা সেইখানেই অনুভব করি কেয়ূরকাঞ্চী—নূপুরলাঞ্ছনা, যে গণ্ডস্থলের তরুণ অরুণিমা তোমাকে একান্ত মুগ্ধ করিয়া রাখে, আমরা বুঝি তাহার কতটুকু এই স্মিতগণ্ডের, কতটুকু বা মোহিনী তুলিকার রাগ-রচনাগত। যুগের গুণে রুচির পরিবর্তন হইয়া থাকিতে পারে, কিন্তু রূপ যেখানে আছে, প্রসাধনের সাধনা সেখানে না থাকিয়া যায় না।

সংস্কৃত কবি, বোধ করি বহুদিনের অভিজ্ঞতায়, আর কিছু না হউক, এই জ্ঞানটুকু লাভ করিয়াছিলেন। সেই জন্য কোন সময়ে মধুরাকৃতীদিগের মনোজ্ঞতাবর্ধন বিষয়ে মণ্ডন-বাহুল্য নিষ্প্রয়োজন বলিলেও অন্তঃপুরের প্রসাধন কক্ষদ্বারে সুবিধা মত অপাঙ্গ-বিক্ষেপ করিয়া আসিতে তিনি কখনও ছাড়েন নাই। এবং প্রসাধন কলাটিকে স্বল্পদিন মধ্যেই বহুতর সৌন্দর্য-সিঞ্চনে তাঁহার কাব্যলোকের অন্তর্ভুক্ত করিয়া লইয়াছেন। কেয়ূর-কঙ্কণ মেখলাহার নূপুর-কুণ্ডল ক্রমে যেন সেই কাব্যলোকেরই অনিবার্য অলঙ্কার হইয়া উঠিয়াছে এবং কজ্জল কুঙ্কুম অলক্তক লোধ্ররজ অগুরু ধূপ প্রভৃতি সেই কল্পলোকবাসিনীদিগের প্রসাধনীকলার প্রধান উপকরণরূপে পরিণত হইয়াছে। নব নব ঋতুপর্যায়ে সেখানকার সুমধ্যমা কৃশাঙ্গীগণের স্থূল সূক্ষ্মাম্বর কখনও কুসুম্ভপত্ররাগে, কখনও বা ঈষৎ বাসন্তী রঙ্গে, তখনও নিবিড় জলদাভ, কখনও কনকচম্পকপ্রভ, ঋতুচিত নানাবর্ণে সুরঞ্জিত হইয়া থাকে, এবং তৎপ্রতি কবির বিশেষ আগ্রহও প্রকাশ পায়। সংস্কৃত কবি এইরূপে, একদিকে "কিমিব হি মধুরাণাং মণ্ডনং নাকৃতীনাম্" ইত্যাদি মনোহর বচনে এবং অন্যদিকে রূপসীগণের নানাবিধ সুশোভন প্রসাধন সংসাধনে, নারী-হৃদয়ে সহজেই সুদৃঢ় প্রতিষ্ঠা লাভ করিয়াছেন। এবং বোধ করি, সাহস করিয়া বলা যায়, কামিনীগণের এরূপ সর্বাঙ্গীণ সেবা আর কোন দেশের কবি এমন সুনিপুণ অবলীলাসহকারে করিয়া উঠিতে পারেন নাই।

নব্যতন্ত্রীরা যদি রাগ না করেন, তাহা হইলে সাহসপূর্বক জিজ্ঞাসা করি যে, যতই নারীপূজক হউন না কেন, আধুনিক পাশ্চাত্য কবি কি কখনও তাঁহাদের সহস্র মুকুরবিম্বিত প্রসাধনভবনদ্বারে নিয়ত উপস্থিত থাকিয়া এরূপ সেবাশীল ধৈর্যের পরিচয় দিতে পারিয়াছেন? আধুনিক বিজ্ঞান নিত্য নূতন আবিষ্কার দ্বারা প্রসাধনবিলাস অনেক বর্ধিত করিয়া তুলিয়াছে এবং আসন মুকুর গৃহসজ্জা দীপালোক প্রভৃতির নানাবিধ উন্নতি সাধন করিয়া ইহাকে অপেক্ষাকৃত সহজ ও অনায়াসসাধ্য করিয়া আনিয়াছে, কিন্তু যে রমণীয় কুহকসঞ্চারে নারীজাতির এই নিত্যকর্ম সেকালে কবিতায় কল্পলোক-লাবণ্যে সমুদ্ভাষিত হইয়া উঠিয়াছিল, সে কুহক, সে মোহময়ী রমণীয়তা এ প্রসাধন-শালায় কোথায়? এবং বোধ করি, এই পাশ্চাত্য অনুসরণেই আমাদের নব্য প্রসাধনশালাও কবির সর্বাঙ্গীণ স্নেহ হইতে বঞ্চিত হইয়াছে। যেখানে বা আধুনিক প্রাচ্য কবির একাং প্রতি একটুকু সানুভব দৃষ্টি নিপতিত হইয়াছে দেখা যায়, সেখানে তিনি সেই সে কালের অন্তঃপুরদ্বারে, পুরাতন উজ্জয়িনীর প্রাসাদবাতায়ন সম্মুখে অথবা তমাল-তরুচ্ছায়ানীল বৃন্দাবনের আভীরকন্যাপরিসেবিত প্রাঙ্গণে গিয়া দণ্ডায়মান হইয়াছেন। নব্যাঙ্গনাগণের বিচিত্রোপকরণ প্রসাধনকলা তাঁহার হৃদয় তাদৃশ মন্থন করিয়া তুলে নাই।

সেকালের প্রসাধনকলায় তবে না জানি কি মোহ ছিল, যাহাতে কবিহৃদয় আকৃষ্ট না হইয়া থাকিতে পারিত না। অথবা কে জানে, সেই বিগতা রূপসীদের রূপযৌবন-ভঙ্গীরই বা কি অমোঘ কুহক ছিল যে, তাঁহাদের পেলব দেহলতার প্রতি স্পন্দনে, বঙ্কিম গ্রীবাভঙ্গে, মৃণালভুজসঞ্চালনে, চারুচরণ বিক্ষেপে এই মনোহর প্রসাধন কলা কাব্যের ছন্দে ঝঙ্কৃত ও পরিপূর্ণ হইয়া উঠিত। উপকরণ ত এখনও বহু আছে—লোধ্ররজ নাই বটে, কিন্তু শ্বেতহস্তচূর্ণিত শুভ্র রজ এখনও সমুদ্রপার হইতে নিত্য আমদানি হইয়া থাকে, অলক্তক পূর্ববৎ ব্যবহৃত না হইলেও তাহার পরিবর্তে নব নব গাঢ় রক্তদ্রাব প্রচলিত হইয়াছে, অগুরু ধূপ না থাক, কিন্তু হেয়ার-ওয়াশের গন্ধও হীন নহে, তবে অভাব কিসের? অলঙ্কার এখনও সেই সুন্দর মণিবন্ধে একান্ত সম্বদ্ধ হইয়া আছে, এখনও হারখচিতনু গ্রীবাদেশ বেষ্টন করিয়া ধরে এবং যৌবনশ্রী চিরদিন যাহা ছিল, সেইরূপই অনিন্দ্যসুন্দর কমনীয়তায় তনুমনপ্রাণ হরণ করিয়া লয়; তবে কবিতার কল্পকাননে এই প্রসাধন বিচিত্র যৌবন-কলা তাহার পূর্ব প্রতিষ্ঠা হইতে বঞ্চিত হয় কেন?

কবিকুলকেও সহসা অপরাধী সাব্যস্ত করিতে প্রবৃত্তি হয় না, মনে হয়, নিশ্চয়ই ইহার মধ্যে এমন কিছু আছে, যাহাতে তাঁহাদের কাব্যমাত্রা পীড়িত করে। হয়ত বর্তমানকালের প্রসাধনকলার মধ্যে, আধুনিক সকল বিষয়েরই মত কোথাও একটি অতি-সচেতন ভঙ্গী প্রকাশ পায়, কোথাও আবরণ মধ্য হইতে সর্বদা সতর্ক চেষ্টায় ক্লিষ্ট মূর্তি-খানি ব্যক্ত হইয়া মনকে বিক্ষিপ্ত ও বিমুখ করিয়া দেয়। কারণ, ইহাতে আর সন্দেহ নাই যে, সে কালে প্রসাধনকলা এখনকার মত এত গোপন ব্যাপারও ছিল না এবং তাহার মধ্যে কোন প্রকার রহস্য-ভেদাশঙ্কা না থাকায় সর্বদা আবরণ রক্ষার দুশ্চিন্তাও ছিল না। নব্য পাশ্চাত্য প্রসাধনকলা সে হিসাবে সর্বদাই সতর্ক ও সন্দিগ্ধ, এবং নানা ছদ্ম-আচ্ছাদনে আত্মগোপন করা তাহার পক্ষে একান্ত আবশ্যক হইয়া পড়ে।

কারণ, তাহার মধ্যে অনেক নিদারুণ দ্বন্দ্ব এবং চেষ্টা, কঠিন পীড়ন এবং নিষ্ঠুরতা প্রচ্ছন্ন আছে, তারা ব্যক্ত হইলে তাহার সমস্ত সৌকুমার্য একেবারেই ব্যর্থ হইয়া যায়। পাশ্চাত্য বেশবন্ধ যাঁহাদের পরিচিত; তাঁহারাই অবগত আছেন যে তাহার বিপুল বাহুল্য কোথাও অসঙ্গতরূপে স্ফীত হইয়া উঠিয়া যেমন স্বভাবকে লঙ্ঘন করে, সেই-রূপ তাহার কঠিন বন্ধন কোথাও নির্দয়-ভাবে নিষ্পিষ্ট হইয়া তনুমধ্যকে তনুতর

করিবার প্রয়াসে প্রাণবায়ু চলাচলের পথ পর্যন্ত প্রায় রুদ্ধ করিয়া দেয়। এই কৃচ্ছ্রসাধন, এই শরীরপীড়ন ও মনের উদ্বেগ, এই অস্বাভাবিক অসঙ্গতি, ইহাই বোধ করি, কবিহৃদয়ের স্নেহধারা হইতে এই প্রসাধনকলাকে বঞ্চিত করিয়াছে। ইহার মধ্যে তপস্যাধনের কঠোরতা সমস্তই আছে, কিন্তু তাহার শান্তিময় উচ্চ লক্ষ্যটুকু কোথাও নাই, যাহাতে হৃদয় তৃপ্তি মানে। কেবলি বন্ধন এবং বেধন, পিন এবং রিবন, কুঞ্চন এবং সম্প্রসারণ, পীড়ন এবং প্রয়াস; কালিদাস যে আনন্দ ‒ পূর্ণতাকে কলার প্রধান লক্ষণ বলিয়া শ করেন, তাহার সম্পূর্ণ অভাব।

আমাদের অন্তঃপুরে প্রসাধন একটি নিত্যকর্মের মধ্যে; এবং আমাদের সকল নিত্যকর্মই যেরূপ ভাবে সম্পাদিত হয়, এই সজ্জাকলাও সেইরূপ বিনা আড়ম্বরে অবাধে সম্পন্ন হইয়া থাকে। তাহার মধ্যে গোপনীয় বড় অধিক নাই এবং তাহা অত্যন্ত গোপনভাবে সমাধাও হয় না। আমাদের রমণীগণ পঙ্ক-কারা-পিচ্ছল হর্ম্যতলে মাদুরটি বিছাইয়া, সম্মুখে দর্পণখানি স্থাপিত করিয়া, কাজললতা ও সিন্দুরের কোটা এবং কেশপাশ বেনীবন্ধনের উপকরণ লইয়া যেখানে বসিয়া কেশবিন্যাস সম্পাদনে নিযুক্ত হয়েন, সে স্থান প্রায়ই গতিবিধির পথপ্রান্ত হইতে প্রচ্ছন্ন নহে, কিন্তু তাহাতে তাঁহাদের কিছু মাত্র বাধা হয় না। নানা সখীসমাগত হাস্যপরিহাস, গল্পগুঞ্জন ও রসালাপ প্রসঙ্গের মধ্যে প্রসাধন ব্যাপার যেন লীলাচ্ছলে সংগঠিত হইয়া ওঠে। ইহার মধ্যে নিত্যকর্মের অভ্যাসটুকু ব্যতীত কোন রূপ দারুণ দুঃসাধ্য সাধন নাই। বেশভূষা যেমন শরীরের কোন অঙ্গকে অতি মাত্র পীড়িত বিকৃত করে না, তেমনি অতি সচেতন চেষ্টা মনকে কোথাও ক্লিষ্ট করিতে থাকে না।

আমাদের প্রসাধনকলা প্রকৃতির সহিতও নানা ভাবে ঘনিষ্ট সম্বন্ধ। এমন কি, পাশ্চাত্য কলার সহিত তুলনায়, ইহাকে প্রকৃতির স্বহস্তরচিত বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। লোধ্ররজই কি, তাম্বুলরাগই ক, কুঙ্কুমলেখাই কি, চন্দনরচনাই কি, সকলই আমাদের প্রকৃতির দান। তাঁহার তরুলতা ফুল ফল পত্র বৃক্ষ নির্যাস হইতে, তাঁহার স্বকীয় প্রসাধন পেটিকা হইতে সঞ্চিত। এমন কি, রূপসীগণের বস্ত্র রঞ্জন করিতে হইলেও আমাদিগকে প্রকৃতির সজ্জাভবন দ্বারে উপস্থিত হইতে হয় এবং ঋতু অনুসারে কখনও কখনও কুসুম্ভ, কখনও শেফালীবৃন্ত, কখনও লটকান, কখনও বা হরিদ্রা, কখনও নীল, কখনও বা বল্কলরস দানে প্রকৃতি আমাদের প্রমদাগণের শাটিকা ও চোলি রঞ্জিত করণে সহায়তা করেন।

পাশ্চাত্য প্রসাধনকলাকেও এ সকল বিষয়ের জন্য যে প্রকৃতির দ্বারস্থ হইতে হয় না, তাহা নহে, কিন্তু প্রকৃতির সেখানে প্রকৃতিস্থ থাকিবার জো নাই। রাসায়নিক প্রক্রিয়া, পেটেন্টের প্যাটা, মকদ্দমার আরজি, ট্রেডমার্কের ছাপ, বিজ্ঞাপনের ঘোষণাপত্রে বল্কলধারিণী বনচারিনীকে আর খুঁজিয়া পাওয়া যায় না। আমাদের প্রসাধনে প্রকৃতির ওপর কোথাও এরূপ জবরদস্তি প্রকাশ পায় নাই; পণ্যশালার মধ্যেও সে আপনার সরল শুচি স্বাতন্ত্র্য রক্ষা করিয়াছে। আমাদের রমনীগণ স্বহস্তেই মুখমন্ডলে লেপন জন্য দুগ্ধ হইতে সরটুকু তুলিয়া রাখেন, রৌদ্রে গোলাপ পাতা শুকাইয়া আমলকী কুটিয়া লইয়া কেশধূপ রচনা করেন, সযত্ন সজ্জিত তাম্বুলরাগে অধর রঞ্জিত করিয়া তৃপ্ত হয়েন, দীপটি জ্বালিয়া তদুপরি কাজললতাখানি ধরিয়া আঁখির অঞ্জন প্রস্তুত করিয়া লয়েন, চন্দনকাষ্ঠ ঘসিয়া লইয়া পত্র রচনা করেন, ইহার মধ্যে কোথাও পেটেন্ট আপিসের কোনও উপদ্রব নাই।

প্রাচ্য প্রসাধনকলার এই যে একটি নিরুদ্বেগ সহজ গার্হস্থ্য ভাব, ইহাতেই ইহা রমণীয় এবং এই ভাবের গুণেই কবিহৃদয়ে ইহা এমন সহজে প্রতিষ্ঠা লাভ করিয়াছে। আমাদের মনে আমাদের প্রমদাগণের চিত্র যেন তাঁহাদের বিচিত্র প্রসাধনের সহিত ঘনিষ্ঠ ভাবে সন্নিবদ্ধ। সিন্দুরের টিপটি, কবরীর বেষ্টনটি, অঞ্চলের প্রান্তটি, অবগুণ্ঠনের পাড়টি, দুইখানি প্রকোষ্ঠ সন্নদ্ধ বলয়কঙ্কন এবং কন্ঠবিলম্বিত চারুহারলতাটি, এমন কি নূপুরের নিক্কণটুকু পর্যন্ত আমাদের অন্তরে কুলকন্যাগণের কমনীয় মূর্তির সহিত একান্ত বিজড়িত। এইগুলি বাদ দিয়া অন্য কোনও নূতন বেশে বোধ করি আমরা তাঁহাদিগকে ঠিক এরূপ ভাবে দেখি না। উচ্চ গোড়ালি সূক্ষ্মাগ্র বিলাতী পাদুকা-নিপীড়িত পদপল্লব আমাদের হৃদয়ের মধ্যে তেমন সুর করিয়া গিয়া পড়ে না। জামায় লজ্জা নিবারণ করে, অতএব তাহার দোষ দিতে পারি না, কিন্তু জ্যাকেটের লজ্জাবাহুল্যে ভূষণ ঘোষণা করে অথচ শ্রী এবং হ্রী রক্ষা করে না। ইহা নিশ্চয় যে, গৃহপ্রাঙ্গণে উৎসব ক্ষেত্রে কোন শুভ অনুষ্ঠানে এই সকল ফ্যাশান-স্ফীতিমার অসঙ্গতি যেন সমধিক পরিস্ফুট হইয়া ওঠে।

কারণ আমাদের সকল শুভ কার্যেই বাহিরে যেমন নহবত না বসিলে নয়, অন্তঃপুরের প্রাঙ্গণতলে সেইরূপ নূপুর কঙ্কণ অঙ্গদ কুন্তল রুণুঝুণু রিণিঝিনি না বাজিলে সকলই শূন্য ও শ্রীহীন। হ্রীসংযতা নারীগণের কলকণ্ঠের পরিবর্তে এই সকল অলঙ্কার শিঞ্জিতেই বাহিরের পুরুষগণ অন্তঃপুরের পরিপূর্ণ আনন্দোৎসবের সংস্পর্শ অনুভব ও উপভোগ করেন। এবং তাঁহাদের অন্তর একটি মনোহর সৌন্দর্যলোকের কল্পনায় পরিপূর্ণ হইয়া ওঠে, যেখানে আনন্দের অবসান নাই এবং কোথাও কোনরূপ অভাবের সূচনা মাত্র নাই। এই ধ্বনি-বৈচিত্র্যের অন্তরালে যে একটি পিনদ্ধনিচোলা নীলাম্বরী পরিহিতা ঈষদবগুন্ঠনবতী কল্যাণীমূর্তি প্রচ্ছন্ন আছে, সেই লক্ষ্মীরূপিণীই আমাদের মনোরাজ্যে অধিষ্ঠাত্রী দেবী; এবং এই চির-স্নেহময়ীর অধিষ্ঠানেই আমাদের গৃহ নিত্যোজ্জ্বল।

কিন্তু আমাদের চিরাগত প্রসাধনকলার মনোহারিতা সম্যক অনুভব করিতে হইলে একবার এই গৃহপ্রাঙ্গণে আসিয়া দন্ডায়মান হওয়া আবশ্যক। এই যে বিরলবস্তু পরিষ্কার পরিপাটি বিচিত্র চিত্রিত চারুচিক্কন গৃহখানি, এই পটভূমির উপরেই আমাদের সহজ শোভন বিচিত্র প্রসাধিত চারু নারীমূর্তি সম্যক ফুটিয়া উঠে। এবং আমাদের কবিগণ হর্ম্যরাজির বাতায়ন ও গবাক্ষ পথ দিয়া সেই মর্মস্থলে উপনীত হইতে পারিয়াছেন বলিয়াই তাঁহাদের কাব্যে নারী-সৌন্দর্য প্রসাধনকলায় এরূপ সমুদ্ভাসিত। কখনও হর্ম্যতলে নিদাঘকাতর আলুলায়িত দেহযষ্টি, প্রখর রবিকরজ্বালায় স্থূলবস্ত্র পরিহার করিয়া সূক্ষ্মাম্বর পরিহিতা, কণ্ঠে লঘু মুক্তাহার, মণিবন্ধে মণিময় বলয়, শ্লথ দেহলতা মেখলাভার বহনেও অক্ষম; কখনও যেদিন ভবনশিখরে ঘনঘটা করিয়া নীল মেঘ নামিয়া আসে, শিখী পুচ্ছ বিস্তারপূর্বক আনন্দে নৃত্য করিতে থাকে, জলদ মেঘমল্লারে গম্ভীর গর্জন করে, ঘননীল চোলীখন্ডোপরি কুসুম্ভরাগ-রক্ত শাটীখানি জড়াইয়া, কর্ণাটছন্দে কবরী বাঁধিয়া, চিবুককুহকে কস্তুরীবিন্দুটুকু নিবদ্ধ করিয়া, বন্ধুজীব অম্বুজ এবং নীল কুসুমের মালা পরিয়া, কর্পূর চন্দন-চর্চিত দেহে সীঁথি কুন্তল-হার-অঙ্গদ কঙ্কণ-কাঞ্চী-মন্ডির মন্ডিতা—বর্ষার মর্ম-মন্দিরে যেন তাহার অধিষ্ঠাত্রী তড়িল্লতা কখনও সুদীর্ঘ শারদ নিশান্তে কাশ-শুভ্রাংশুকা, অগ্রহায়ণে আপক্কশালি-শ্যামলাম্বরা, বসন্তজ্যোৎস্নায় বকুলমালা-ভূষণা। ঋতুতে ঋতুতে প্রকৃতির তরুলতা-পুষ্পপল্লবে যেমন বিচিত্ররাগসঞ্চারে নব নব চাঞ্চল্য অনুভূত হয়, আমাদের স্ত্রীনিকুঞ্জেও সেইরূপ যেন কখনও নীলাম্বরীতে, কখনও কুসুম্ভরক্তবস্ত্রে কখনও বাসন্তীবসনাঞ্চলে প্রকৃতির সেই অন্তরের পুলকরশ্মি বিচিত্র বর্ণচ্ছটায় উদ্ভাসিত হইয়া উঠে।

এমন কি, উৎসব জনতার বেশ-বৈচিত্র্যে দৃষ্টিপাত করিলে মনে হয় যেন শ্রীপঞ্চমী, দোলযাত্রা, জন্মাষ্টমী, কোজাগর পূর্ণিমা, এইগুলি ঋতুচিত প্রসাধনেরই এক একটি আনন্দ-উৎসব।

কিন্তু পাশ্চাত্য ভূমিতে সুন্দরীগণের প্রসাধনবৈচিত্র্য কম নহে, বরং আমাদের তুলনায় বহু গুণে অধিক, সেখানে কেবল যে ঋতুতে ঋতুতে সুন্দরীগণের বেশ পরিবর্তিত হয়, তাহা নহে, দিবসে নিশীথে, মধ্যাহ্নে অপরাহ্নে, চা-পান সময়ে ও ডিনার-আসনে সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র বেশভূষা। এবং সেখানকার সাপ্তাহিক মাসিক সাময়িক অসাময়িক সচিত্র বিচিত্র নানা পথে নিয়ত আন্দোলিত আলোচিত বিজ্ঞাপিত হইয়া এতৎপ্রতি সর্বদা সাধারণের মনোযোগ অত্যন্ত সজাগ করিয়া রাখা হয়।

প্রদর্শনী পরিক্রমা

চিত্ররসিক

শিল্পী সুনীল দাস

শিল্পের কোন একটি মাধ্যমে দক্ষতা অর্জনের পর কোন কোন শিল্পী কখনো কখনো আত্মপ্রকাশের তাগিদে অন্য মাধ্যমের দিকে আকৃষ্ট হয়ে থাকেন। যেমন অনেক খ্যাতনামা সাহিত্যিক চারুশিল্পের দিকে আকৃষ্ট হয়েছেন আবার চিত্রশিল্পী কবিতা রচনায় হাত দিয়েছেন। তবে আগেকার কালে এ ধরনের প্রচেষ্টা অধিকাংশ ক্ষেত্রেই শিল্পীদের ব্যক্তিগত শখ বা খেয়াল হিসেবে দেখা হত এবং শিল্পীরা নিজেও জনসাধারণকে তার চাইতে বেশী কিছু বলে বোঝাবার চেষ্টা করতেন না। অনেক ক্ষেত্রে এঁদের মৃত্যুর পর এঁদের মাধ্যমান্তরে সঞ্চরণের কথা জনসাধারণের দৃষ্টিগোচর হয়েছে। মনস্তাত্ত্বিকরা এই সব নিদর্শনের মধ্যে শিল্পীর মনের খবর নেবার চেষ্টা করেছেন তাঁর ব্যক্তিত্বকে বোঝবার চেষ্টা করেছেন। আমাদের দেশের সাহিত্যিকের চিত্রকলা চর্চার নিদর্শন প্রথম জনসাধারণের সামনে তুলে ধরেন রবীন্দ্রনাথ। আজকে রবীন্দ্রনাথের ব্যক্তিত্বকে বোঝবার অনেকগুলি চাবিকাঠি তাঁর ছবির মধ্যে রাখা রয়েছে। তাছাড়া আমাদের দেশে আধুনিক শিল্পরীতির প্রসার হবার সঙ্গে সঙ্গে রবীন্দ্র-চিত্রকলার নতুন মূল্যায়নের চেষ্টাও হচ্ছে। রবীন্দ্রনাথের প্রদর্শিত পথে যেমন কোন কোন আধুনিক শিল্পী অনুপ্রেরণা লাভ করে থাকতে পারেন তেমনি কোন কোন সাহিত্যিকের পক্ষেও শিল্পচর্চার অনুপ্রেরণা বা সেই শিল্পের প্রদর্শনী আয়োজনের বাসনা হওয়া বিচিত্র নয়। আমাদের দেশে রবীন্দ্রোত্তর যুগে সাহিত্যিকদের মধ্যে তারাশংকর বন্দোপাধ্যায়ই তাঁর নিজের আঁকা ছবির প্রদর্শনী করেছেন। ২৩শে থেকে ২৯শে জুলাই অ্যাকাডেমি অব ফাইন আর্টসে তিনি দ্বিতীয়বার তাঁর চিত্র প্রদর্শনী করলেন। এই প্রদর্শনীর অধিকাংশ ছবিই (এবং একটি কাঠের ভাস্কর্য) তাঁর ইতি-পূর্বে আয়োজিত প্রদর্শনীতে দেখান হয়েছিল তাই নূতনত্বের কোন আকর্ষণ এতে পাওয়া যায় নি। নিসর্গ দৃশ্য, আত্মপ্রতিকৃতি, নিজের উপন্যাসের চরিত্রের রূপ, পাটের দাড়িওয়ালা রবীন্দ্রনাথ, সাঁওতাল জীবন প্রভৃতি নিয়ে ২৭ খানি ছবি এবং একটি প্রাগৈতিহাসিক জন্তুর দারুমূর্তির মধ্যে সাহিত্যিকের 'মনের রূপ বা ব্যক্তিত্বের ছাপ মনস্তাত্ত্বিকরা ধরতে পারবেন বলে আশা করা যায়। মাধ্যম হিসেবে তারাশংকর তৈল-চিত্রকেই বেছে নিয়েছেন। ছবিগুলি কাঁচের ফ্রেমে বাঁধানোর ফলে প্রদর্শনী গৃহে একটা অতি সরল ঔপনাগরিক আবহাওয়ার সৃষ্টি হয়েছিল।

* * *

আজকের বহুসমস্যা প্রপীড়িত শিল্পীদের বহু রকম দাবী-দাওয়ার সমাধান-কল্পে যে দুটি নতুন শিল্পী সংস্থা গঠিত হয়েছে তাদের মধ্যে ওয়েস্ট বেঙ্গল আর্টিস্টস ইউনিয়ন একটি প্রতিশ্রুতি নিয়মিতভাবে পালন করে যাচ্ছেন। এঁরা নিয়মিতভাবে দুটি গ্যালারিতে তরুণ শিল্পীদের শিল্প প্রদর্শনীর আয়োজন করে যাচ্ছেন, এর ফলে দক্ষিণ কলকাতার 'মোনা-লিসা' ও 'চিত্রম্' গ্যালারি দুটি ক্রমে জনপ্রিয় হয়ে উঠছে এবং এখানে দর্শকের সংখ্যা বৃদ্ধি পাচ্ছে। মোনালিসায় ৬ থেকে ১২ই আগস্ট রঞ্জিৎ রায়ের রঙীন ড্রইং এবং ১৩ থেকে ১৬ই আগস্ট দিল্লীর শিল্পী টি সিনহার পেন্টিং, ড্রইং এবং গ্রাফিকসের

শিল্পী রঞ্জিৎ রায়

শিল্পী : তারাশংকর বন্দ্যোপাধ্যায়

শিল্পী সুনন্দা সেনগুপ্ত।

শিল্পী : রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

প্রদর্শনী, আর্ট চিত্রমে ১৩ থেকে ২৩শে আগস্ট শ্রীমতী সুনন্দা সেনগুপ্তের বাটিক শিল্পের প্রদর্শনীর আয়োজন করা হয়।

রঞ্জিৎ রায়ের ১৬ খানি রঙীন ড্রইং-এ প্রধানত অশ্ব এবং বরাহ মূর্তির রূপায়ণ করা হয়েছে। গতি ও শক্তির রূপ ফোটানোর চেষ্টাই প্রধান। রেখা, স্থান বিশেষে আকারের রূপ ফোটানোর চাইতে ক্যালিগ্রাফিক দিকে ঝোঁক দিয়েছে। ৬, ১২ এবং ১৫ নম্বরের ছবিগুলি এ দিক থেকে উল্লেখযোগ্য। তাঁর সাদা-কালোয় আঁকা অন্য ধরনের ছবি, যার মধ্যে কিছুটা মানবিকতার আবেদন আনার চেষ্টা হয়েছে, সেগুলি মন্দ নয়, 'ক্রাইস্ট', 'আদার ওয়ার্ল্ড' প্রভৃতি ছবিগুলির নাম করা যেতে পারে।

টি সিনহা দিল্লীর শিল্পী, এ'র শিক্ষা শান্তিনিকেতনে, পরে লোকশিল্প এবং প্রাচীন ভাস্কর্য দেখতে ইনি ভারত ও নেপালের নানা স্থানে ভ্রমণ করেছেন। বিভিন্ন প্রদর্শনীতে পুরস্কারলাভও করেছেন। কলকাতায় সম্ভবত এই প্রথম তিনি একক প্রদর্শনী করলেন। তাঁর ১৭টি পেন্টিং, ড্রইং এবং গ্রাফিকসের নিদর্শনের মধ্যে তাঁর শান্তিনিকেতনের শিল্প শিক্ষার পটভূমিকা থেকে বর্তমান পরিণতি এই উভয়েরই হদিশ পাওয়া যায়। তাঁর পেন্টিংগুলি বর্ণাঢ্য যেমন মোরগ-মুরগী, লাল গাছ, পেঁচা প্রভৃতি ছবি, একটি প্রতিকৃতি রবীন্দ্রনাথ অনুপ্রেরিত বলা চলে। গ্রাফিকসের মধ্যে তাঁর অনেকখানি পরিণত দক্ষতা দেখা যায়। বিশেষভাবে মুখোশ, নকসা এবং মহাপ্রস্থানের পথে।

শ্রীমতী সুনন্দা সেনগুপ্তা বাড়িতেই অবসর সময়ে বাটিক শিল্পে শিক্ষালাভ করেছেন। বাংলার চিরাচরিত নকশা কিছু অ্যাবস্ট্রাক্ট ডিজাইন এই নিয়ে কয়েকটি সুন্দর শাড়ি, রুমাল ব্লাউজ পীস, ল্যাম্পশেড ইত্যাদি তৈরী করা হয়েছে। দু-তিনটি নব্যভারতীয় প্রথায় প্রথাগত চিত্রও তিনি উপস্থিত করেছেন। শ্রীমতী সেনগুপ্তার কাজে পরিচ্ছন্নতা আছে।

× × ×

৮ থেকে ১৪ই আগস্ট অ্যাকাডেমি অব ফাইন আর্টসের দোতলায় রবীন্দ্র জন্মোৎসব উপলক্ষ্যে রবীন্দ্রনাথের ২৬ খানি ড্রইং ও পেন্টিং-এর প্রদর্শনী করা হয়। মাত্র ২৬ খানি ছবির মধ্যেই রবীন্দ্রনাথের কাজ এবং পদ্ধতির বৈচিত্র্য অনেকখানি দেখা গেল। আত্মপ্রতিকৃতি, কতকগুলি রমণীমূর্তি এবং অন্যান্য ব্যক্তিদের কয়েকটি প্রতিকৃতির মধ্যে তাঁর দৃষ্টিভঙ্গীর বৈচিত্র্য বেশ পরিষ্কারভাবে অনুভব করা যায়। ৯ নম্বরের মুখের অভিব্যক্তি ফোটানোর দক্ষতার মধ্যে কোন অ্যামেচারিশ ভাব নেই। মনোক্রোম ড্রইং থেকে বর্ণাঢ্য ছবির মধ্যে তিনি অবাধে বিচরণ করে বেড়িয়েছেন। নর্তকীর ছবিটি (১৮) এ বাবদে দৃষ্টি আকর্ষণ করে। কয়েকটি নিসর্গ দৃশ্যের মধ্যে তিনি যে বিশেষ মুড এনেছেন (১৬, ৩) তা একাধিকবার দর্শনেও পুরোনো হয় না।

৯ থেকে ১৫ই আগস্ট অ্যাকাডেমির একতলায় অ্যাকাডেমি স্টুডিওর জুনিয়র গ্রুপের সিনিয়র সভ্যদের আঁকা একটি চিত্র-প্রদর্শনী হল। সবশুদ্ধ প্রায় ৫০ খানির মত ল্যান্ডস্কেপ, স্টিল লাইফ, হেড স্টাডি ইত্যাদি ছবির মধ্যে উপস্থাপনের সাবল্য লক্ষ্য করার মত। অনিত সাহার সিটিস্কেপ (৩৯), ডি সুজার ল্যান্ডস্কেপ, মৃন্ময় মুখার্জির জলরঙের কাজগুলি উল্লেখযোগ্য।

× × ×

৯ নম্বর এসপ্লানেড ইস্টের রেফুজি হ্যান্ডিক্র্যাফটের পরিচালিত গ্যালারি—প্রিয়দর্শিনী বেশ কিছু দিন যাবৎ কোন প্রদর্শনীর আয়োজন করে উঠতে পারেন নি। দীর্ঘকাল বাদে এই গ্যালারিটি আবার সক্রিয় হওয়ায় শিল্পী ও শিল্পপ্রেমিকেরা খুশী হবেন। ১৭ থেকে ২৬শে আগস্ট এখানে শান্তিনিকেতনের শিল্পী সৌমিত্র নন্দীর সত্তরটি জলরং প্যাস্টেল ও ড্রইং-এর প্রদর্শনী হচ্ছে। শ্রীনন্দীর ছবিগুলি সাধারণভাবে নিসর্গ দৃশ্যের মধ্যেই প্রধানত আবদ্ধ। মাঝারী সাইজের অনেকগুলি নদীর দৃশ্য বেশ ক্ষিপ্রতার সঙ্গে আঁকা, তবে স্কেচ ভাবটাই প্রধান।

× × ×

আগামী ২৮শে আগস্ট থেকে ৩রা সেপ্টেম্বর পর্যন্ত শিল্পী সুনীল দাসের একটি চিত্র-প্রদর্শনীর আয়োজন হচ্ছে। প্রদর্শনীতে তাঁর গত দশ বছরের শিল্প-সৃষ্টির নিদর্শন থাকবে।

২৯শে আগস্ট থেকে অ্যাকাডেমি অব ফাইন আর্টসে অ্যাকাডেমির গ্রীষ্মকালীন চিত্র ও ভাস্কর্যের প্রদর্শনী হচ্ছে।

৫৪বি মহানির্বাণ রোডে উত্তরঙ্গ শিল্প শিক্ষায়তন প্রায় আট-নয় বছর ধরে ছোট ছেলে-মেয়েদের শিল্প-শিক্ষা দান করে আসছে। মাস ছয়েক হল এটি নতুন করে বাড়াবার চেষ্টা করা হচ্ছে, গত ১৫ই আগস্ট থেকে ২৩শে আগস্ট পর্যন্ত এখানে একটি শিশুদের (এবং অপেক্ষাকৃত বড়দের) চারু ও কারু শিল্পের প্রদর্শনী খোলা হয়েছে। জলরং, মডেলিং, বাটিক প্রভৃতি নানা রকম কাজের নমুনার সঙ্গে প্রতিষ্ঠানের পরিচালক কল্যাণ বসুর কয়েকটি নেপালের তৈলচিত্রও প্রদর্শিত হয়েছে, তার মধ্যে দুটি দৃশ্য মন্দ নয়। ছোট ছেলে-মেয়েদের কয়েকটি ফিগার কম্পোজিশন সারল্যের দরুণ ভাল লাগল।

শিল্পী : টি সিনহা

অমৃত পাবলিশার্স প্রাইভেট লিঃ-এর পক্ষে শ্রীসুপ্রিয় সরকার কর্তৃক পত্রিকা প্রেস, ১৪, আনন্দ চ্যাটার্জি লেন, কলিকাতা—৩ হইতে মুদ্রিত ও তৎকর্তৃক ১১।১, আনন্দ চ্যাটার্জি লেন, কলিকাতা—৩ হইতে প্রকাশিত।

৭ম বর্ষ
২য় খণ্ড

১৮শ সংখ্যা
মূল্য
৪০ পয়সা

Friday, 1st. September 1967. শুক্রবার, ১৫ই ভাদ্র, ১৩৭৪ 40 Paise

সূচীপত্র

পৃষ্ঠা	বিষয়		লেখক
৩২৪	চিঠিপত্র		
৩২৫	সম্পাদকীয়		
৩২৬	প্রতিধ্বনি		
৩২৮	গান	(কবিতা)	—শ্রীযুগান্তর চক্রবর্তী
৩২৮	স্মৃতি-বিস্মৃতি	(কবিতা)	—শ্রীবঙ্কিম গুহ
৩২৯	জন্মাষ্টমী		
৩৩০	নর্থ ব্রিটেনের নায়ক		—শ্রীশৈলেশ সেন
৩৩১	প্রতিধ্বনি শুনি	(গল্প)	—শ্রীচিত্রা সেনগুপ্ত
৩৩৮	সাহিত্য ও সংস্কৃতি		
৩৪৩	সূর্য কাঁদলে সোনা	(উপন্যাস)	—শ্রীপ্রেমেন্দ্র মিত্র
৩৪৫	দেশে-বিদেশে		
৩৪৬	ব্যঙ্গচিত্র		—শ্রীকাফী খাঁ
৩৪৭	বৈষয়িক প্রসঙ্গ		
৩৪৮	গৌরাঙ্গ-পরিজন		—শ্রীঅচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্ত
৩৫১	প্রেক্ষাগৃহ		
৩৫৮	গানের জলসা		
৩৬০	দৃশ্যের অন্তরালে		—শ্রীজ্যাক কার্ডিফ
৩৬৩	খেলাধুলা		—শ্রীদর্শক
৩৬৫	আধুনিক	(উপন্যাস)	—বিভূতিভূষণ মুখোপাধ্যায়
৩৬৯	অঙ্গনা		—[illegible]সা
৩৭২	কোপাই	(গল্প)	—শ্রীআব্দুল আজীদ আল-আমান
৩৭৫	আমার কাল আমার দেশ	(স্মৃতিচারণ)	—শ্রীসুধীরচন্দ্র সরকার
৩৭৭	মন্ডাশিল্পের প্রসঙ্গে		—শ্রীতারাপদ পাল
৩৭৮	জানাতে পারেন		
৩৭৯	প্রেম	(গল্প)	—শ্রীসুমিতা বন্দ্যোপাধ্যায়
৩৮১	পুরনো পাতা : সমুদ্রের জীব		—উপেন্দ্রকিশোর রায়চৌধুরী
৩৮৪	সুরের সুরধুনি		—শ্রীবীরেন্দ্রকিশোর রায়চৌধুরী
৩৮৬	হাসুন হেসে বাঁচুন		—শ্রীশৈল চক্রবর্তী
৩৮৭	শিল্প ও নৈতিকতার পারস্পরিক সম্পর্ক		—শ্রীশ্রীমন্তকুমার জানা
৩৮৯	পুরোন কলকাতার ডাক্তারি		—শ্রীগোপেন্দ্র সরকার
৩৯১	মৃত্যুর আলোয়		—শ্রীসৌমেন দত্ত
৩৯৩	বিচিত্র ক্লাব : বিচিত্র কাহিনী		—শ্রীরাসবিহারী রায়
৩৯৭	ত্রৈমাসিক সূচীপত্র		

বিচিত্র ঘনাদা

ঘনাদার বিচিত্রকথার সঙ্গে আমাদের পরিচয় শুরু হয় শৈশব থেকে। শিশুদের জন্য বিচিত্র-চরিত্র ঘনাদা লৌকিক-অলৌকিক বিরাট অভিজ্ঞতার ঝুলি কাঁধে আসরে হাজির হয়েছে আর তারপর শিশুদের হৃদয় জয় করে নিতে তার বিন্দুমাত্র দেরী হয়নি। বাংলা সাহিত্যের দীন শিশুশাখায় ঘনাদা একটি উজ্জ্বল সংযোজন। শ্রদ্ধেয় সাহিত্যিক শ্রীপ্রেমেন্দ্র মিত্রের সৃষ্টি এই ঘনাদা নিঃসন্দেহে সাহিত্যের ভাণ্ডারকে সমৃদ্ধ করেছে। শিশু সাহিত্যে সকলেরই সমান আগ্রহ। তাই এই চরিত্র সৃষ্টিতেই তিনি আপামর সকলের হৃদয়ে চিরস্থায়ী আসন করে নিয়েছেন।

বিস্ময়ের তবু বাকী ছিল এবং এক্ষেত্রে নিশ্চয়ই 'অমৃত'-এর উদ্যোগ অভিনন্দন-যোগ্য। শুরু থেকেই ঘনাদা পূর্ণ প্রতিভায় শিশু সাহিত্যে কিরণ বিকিরণ করেছে। এই ঘটনা আমাদের অকল্পনীয় ছিল যে, শিশু সাহিত্যের অধীশ্বর সেই ঘনাদা বড়দের আসরেও সমান মৌতাত রচনা করতে সক্ষম হবে। প্রথম পরিচয়েই তাই চমক লেগেছিল যখন গত বছরের পুজো সংখ্যায় ঘনাদা বড়দের জন্য আসর জমালো। শুধু আসর জমানো নয়—একেবারে কিস্তিমাৎ। ঘনাদা আমাদের চমক দিল এবং আসনও নির্দিষ্ট করে নিল। ঘনাদাকে নিয়ে শ্রীপ্রেমেন্দ্র মিত্রের এই আবির্ভাব পাঠকদের অজস্র প্রশংসা কুড়িয়েছে। মহৎ সাহিত্যিকের নজীর তিনি রাখলেন একটি চরিত্রের বিচিত্র প্রকাশনায়।

সেই একই চরিত্রের আরও বিচিত্র প্রকাশ এবার দেখা গেল বর্তমানে অমৃত-এ ধারাবাহিকভাবে প্রকাশিত 'সূর্য কাঁদলে সোনা' উপন্যাসে। ঘনাদা এই উপন্যাসেরও নায়ক। আমাদের সকলের পরিচিত সেই ঘনাদা। চরিত্রচিত্রণের প্রতিভানৈপুণ্যে এবারেও ঘনাদা অদ্বিতীয়। ইতিহাস-বিস্মৃত ক্রীতদাসের অধ্যায়ে প্রবেশ করে এক অনাবিষ্কৃত স্বাদের সন্ধান দিচ্ছে। সে স্বাদ এবং গন্ধ পাঠকজনকে উপহার দেওয়া শ্রীপ্রেমেন্দ্র মিত্রের পক্ষেই সম্ভব এবং তার উত্তম মাধ্যম নিঃসন্দেহেই ঘনাদা। বর্তমানের মোড়কে ঘনাদার অতীত আবিষ্কার আমাদের আগ্রহ বাড়িয়েছে এবং বিরাট প্রত্যাশা নিয়ে আমরা অপেক্ষা করে আছি আরও জানার অপেক্ষায়। বাংলা সাহিত্যে ঘনাদার মহিমার এই ক্রমবিস্তারণ সাগ্রহে গৃহীত হচ্ছে একথা বলতে আজ আর কোন কুণ্ঠা নেই।

ঘনাদার অনবদ্য চরিত্রের এই নব সংস্করণের জন্য শ্রীপ্রেমেন্দ্র মিত্রকে সকলের সঙ্গে আমিও আন্তরিক অভিনন্দন জানাই।

তপনমেষ হালদার
নিউদিল্লী।

মরণ আমার মরণ

আপনাদের 'অমৃত'তে প্রকাশিত (৭ম বর্ষ, ২য় খণ্ড, ১৫শ সংখ্যা শুক্রবার, ২৫ শ্রাবণ) শ্রীযুক্ত সমর পালের 'মরণ আমার মরণ' প্রবন্ধটি পড়ে বহুদিনের সেই বিস্মৃত প্রায় কবিতাটি মনে পড়ে গেল 'মরণ রে তুঁহু মোর শ্যামও সমান।' কবিগুরুর মৃত্যু সম্বন্ধে উপলব্ধির বিষয়—যেটা ফুটে উঠেছে কবিগুরুর বহু কবিতার মাধ্যমে— সুন্দরভাবে সমালোচনা ও বিশ্লেষণ করেছেন প্রবন্ধকার তাঁর উক্ত প্রবন্ধের মাধ্যমে। কবিগুরুর সেই কবিতাটিও সঙ্গে সঙ্গে মনে এসে গেল 'জীবনেরে কে রাখিতে পারে—আকাশের প্রতি তারা ডাকিছে উহারে।' মরণই জীবনের সুন্দর নিশানা দেখিয়ে দেয়। জীবন ও মরণের সন্ধিক্ষণ ও শুভলগ্নের দিনটির কথা আমাদের প্রতিনিয়তই মনে পড়ে। আলোচ্য রচনায় শেষ অংশটি উদ্ধৃত না করে থাকতে পারা যায় না 'তাই আনন্দ ও দুঃখ যেমন একটি অপরটির পূর্ণতা তেমনি মৃত্যুও জীবনের পরিপূর্ণতা। বৈচিত্র্যময় জীবনে মানুষ যেমন নানা অভিজ্ঞতায় জীবন পূর্ণ করে, তেমনি আরও ব্যাপক দৃষ্টিতে দেখলে বোঝা যায় যে মানুষ জন্মচক্রের তথা মৃত্যুচক্রের আবর্তনের দ্বারা জীবনকে পূর্ণ হতে পূর্ণতর করে চলেছে। মৃত্যু পরিপূর্ণ জীবনে উত্তরণের পথে সোপান মাত্র। সুতরাং দুঃখকে যেমন বিড়ম্বনা বলা যায় না, তেমনি মৃত্যুও আপাতত শোকাবহ হলেও আনন্দ নিস্যন্দী। তাই মৃত্যু-জীবনে অম্ল-মধুর। মৃত্যুও জীবন। উভয়েই জীবনে তুল্যমূল্য। আমাদের দেশের সাধক এই অবস্থাকেই উদ্দেশ্য করে বলেছেন 'জীবন-মুক্তি'। কবিও এই অবস্থাকে উদ্দেশ্য করে বলেছেন 'হে মহাজীবন, হে মহামরণ।'

কালীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়
কলিকাতা-৩৯।

সাক্ষাৎকার বিষয়ে

সবিনয় নিবেদন,

আপনাদের চার তারিখের শ্রাবণ সংখ্যা (১৩৭৪) সাপ্তাহিক অমৃতে আমার সঙ্গে সাক্ষাৎকারের যে বিবরণ আপনারা প্রকাশ করেছেন তা দেখে আমি অত্যন্ত বিস্মিত হয়েছি। আমার বিষয়ে যে সমস্ত তথ্য উপস্থিত করা হ'য়েছে তার অধিকাংশই ভুল। প্রথম নম্বর, মনোলীনা এবং মনের ময়ূরে বিভিন্ন সময়ে লেখা দুটি সম্পূর্ণভাবেই আলাদা উপন্যাস। একটি আর একটির চিত্ররূপ নয়। আমার লেখার সঙ্গে যাঁরা একটুও পরিচিত তাঁদের পক্ষে 'মনোলীনা'র চিত্ররূপ 'মনের ময়ূর' বলা অতি অস্বাভাবিক।

দ্বিতীয় নম্বর, 'অন্নদাশংকর, প্রেমেন্দ্র মিত্র বুদ্ধদেব বসু 'এদের আমি শ্রদ্ধা করি' এই কথাগুলো অত্যন্ত অসংবদ্ধ। সারা দেশে শ্রদ্ধেয় ব্যক্তির সংখ্যা নগণ্য নয়। মাঝখান থেকে হঠাৎ এই তিনটি নাম প্রসংগহীনভাবে উচ্চারণ করার কোনো মানে হয় না। তাছাড়া বুদ্ধদেব বসুর সঙ্গে আমার যে সম্পর্ক তাতে তাঁকে শ্রদ্ধা করি কি করি না এ সংবাদ সমারোহ ক'রে অন্যের গোচরীভূত করার নয়।

তৃতীয়, 'এই যে বাড়িঘর দেখছো এ আমার স্বোপার্জিত টাকায় তৈরী' এরকম একটা মূঢ় এবং দাম্ভিক উক্তি যে-কোনো সামান্য বুদ্ধিসম্পন্ন ব্যক্তির পক্ষেই অশোভন বলে মনে হয়।

চতুর্থ, অর্থোপার্জনের জন্যই আমার লেখা' একথাও কোনো লেখক এভাবে বলতে পারে না। যদ্দুর মনে পড়ে আমি বলেছিলাম 'পেশা হিশেবে না নিলে শেষ পর্যন্ত সোখীনভাবে কিছুরই কোনো অস্তিত্ব থাকে না।' এবং একথা আমি আমার সংগীতচর্চা প্রসঙ্গেই উত্থাপন করেছিলাম। বলেছিলাম, গান যদি আমি পেশা হিশেবে গ্রহণ করতাম তা হ'লে লেখার মতো চাহিদা থাকতো এবং চাহিদা থাকলেই ভুলে যাওয়া এতো সহজ হ'তো না।

পঞ্চম, 'আমার বিশেষভাবে প্রিয় লেখক কারা' এই প্রশ্নেরও আমি এই জবাব দিইনি। এই ধরনের কোনো জিজ্ঞাসায় আমার যতো আপত্তি এই ধরনের জবাবে আমার ততোধিক অনাস্থা। হয়তো অনেকের প্রশংসা করেছিলাম।

ষষ্ঠ, 'আমেরিকা প্রবাসকালে আমি প্রথম মোপাসাঁ ও চেকভ পড়েছি' এ সংবাদও ভুল। এঁরা আমার চিরকালের প্রিয় লেখক। এঁদের সঙ্গে অতি অল্পবয়েস থেকেই আমার পরিচয়। আমেরিকা গিয়ে অনেক দিন পরে নতুন ক'রে পড়ে আবার মুগ্ধ হয়েছিলাম।

সপ্তম, মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় বিষয়ে আমার জবানীতে যে রকম সমালোচনা তৈরী করা হ'য়েছে তাতে আমার লজ্জায় মাথা কাটা যাচ্ছে।

অষ্টম, ধর্মযুগ বিনা অনুমতিতে আমার লেখা ছাপেননি।

নমস্কারান্তে বিনীতা প্রতিভা বসু।
২৫।৭।৬৭

আমারে এ আঁধারে প্রসঙ্গে

৭ম বর্ষ, ১৬শ সংখ্যার অমৃত পত্রিকায় 'আমারে এ আঁধারে' প্রসঙ্গে কয়েকটি পত্র প্রকাশিত হয়েছে দেখে তার লেখক হিসেবে আনন্দিত হলাম।

পত্র-লেখিকা শ্রীমতী নীলিমা সান্যাল মহাশয়ার পত্রের উত্তরে জানাই কবিবর অতুলপ্রসাদের যমজ পুত্রের দ্বিতীয়জন দিলীপকুমার বিদেশে জন্মগ্রহণের ৬ মাস পরে মারা যায়। রচনাটির প্রকাশকালে মুদ্রাজনিত ভ্রমের ফলে ওই তথ্যটি বাদ থেকে যায়। পুস্তকাকারে প্রকাশকালে সকল তথ্য সন্নিবিষ্ট করা হবে।

কল্যাণকুমার বসু
কলকাতা—২৯।

অনৈক্যের বিরুদ্ধে সংগ্রাম

ভারতবর্ষের দিকে তাকালে আনন্দিত বা আশ্বস্ত হবার চিত্র খুব বেশি দেখা যাবে না। সারাদেশে চলছে এক চরম অর্থনৈতিক সংকট। তার সঙ্গে যুক্ত হয়েছে খাদ্যাভাব। পশ্চিমবঙ্গের খাদ্যাবস্থা দিনের পর দিন খারাপের দিকে যাচ্ছে। বিধিবদ্ধ রেশন-এলাকায় সপ্তাহে বরাদ্দ চালের যে ছিটেফোঁটা এখনও পাওয়া যাচ্ছে তাও বুঝি যায়। কিন্তু আমাদের আজকের বক্তব্য তা নিয়ে নয়। এ বিষয়ে সব সময়েই আমরা লিখছি। জনসাধারণ নিজেরাও তাঁদের প্রতিদিনের জীবনযাত্রার মধ্য দিয়ে টের পাচ্ছেন। আমরা অন্যদিকে একটু চোখ ফেরাতে বলছি দেশবাসীকে। যে-জাতির এত অন্নকষ্ট, এত অভাব ও আর্থিক অনটন তার পক্ষে একমাত্র ধ্যানজ্ঞান হওয়া দরকার এই সংকট থেকে উদ্ধার পাবার জন্য ঐক্যবদ্ধ প্রচেষ্টা। কিন্তু তার বদলে অনৈক্য ও বিভেদের বিপরীত চিত্রই আমাদের চোখে পড়ছে। এ চিত্র আনন্দের নয়, বিষাদের।

বিহারে সম্প্রতি ভাষা নিয়ে একটা মারাত্মক হাঙ্গামা হয়ে গেছে। উর্দু ভাষাকে দ্বিতীয় সরকারী ভাষা হিসেবে স্বীকৃতি দেওয়া হবে কিনা, এটা হল বিরোধের বিষয়। বিহার সরকার এ সম্পর্কে কোনো সিদ্ধান্ত নেননি। ভাষা সম্পর্কিত প্রস্তাব এসেছে বিরোধী দল থেকে। অথচ একে কেন্দ্র করেই সমাজ-বিরোধীরা দাঙ্গাহাঙ্গামা বাঁধিয়ে ভয়ানক কান্ড ঘটিয়েছে। এর জন্য যে খুনখারাবি চলতে পারে তা জঘন্য চক্রান্তেরই প্রমাণ। বিহারের মানুষের সামনে এখনকার প্রধান সমস্যা ভাষা নয়, খাদ্য ও জীবিকার সংস্থান। কিন্তু যখন ধর্মীয় গোঁড়ামি ও ভাষান্ধতা মানুষকে যুক্তিতর্কের বাইরে নিয়ে গিয়ে উন্মত্ত করে তোলে তখন সে তার নিজের কল্যাণের চেয়ে অপরের অকল্যাণের জন্যই মরিয়া হয়ে ওঠে। এটা আমাদের পক্ষে গভীর লজ্জা ও পরিতাপের বিষয়। ভারতের দুর্দিনের সংকেত বহন করে এনেছে এই ঘটনা। এই ভাষান্ধতা যদি শক্তহাতে দূর করা না যায় তাহলে গোটা জাতিকেই এর জন্য ভুগতে হবে।

আমাদের মনে রাখতে হবে যে বহুভাষী ও বহুধর্মের দেশ আমাদের। এখানে সকল ভাষা ও ধর্মেরই মর্যাদা স্বীকৃত। কোনো একটি ভাষাগোষ্ঠীর সংকীর্ণ মনোভাবকে আমরা প্রশ্রয় দিতে পারি না। কোনো রাজ্যে কোনো সংখ্যালঘুদের ভাষা কতখানি স্বীকৃতি পাবে তা আলোচনার দ্বারা স্থির হবে। কোনো ধর্মীয় বা সাম্প্রদায়িক আবেগের দ্বারা নয়। বিহার সরকারের উচিত ছিল গোড়াতেই এ বিষয়ে সাবধান হওয়া। বিরোধী দলের পক্ষ থেকেও এই সময়ে এমন একটি প্রস্তাব উত্থাপন না করাই উচিত ছিল। এর ফলে ধর্মীয় জিগীর তুলে অসহিষ্ণু ব্যক্তিরা সাধারণ মানুষকে বিভ্রান্ত করার সুযোগ পেয়েছে। তার পরিণামে হয়েছে রক্তপাত। এই ঘটনা থেকে সরকার যেন শিক্ষালাভ করেন।

অন্য ধরনের অসহিষ্ণুতাও দেখা দিচ্ছে প্রাদেশিকতার সংকীর্ণ মনোভাবের বিকৃত প্রকাশে। বোম্বাই শহরে সম্প্রতি শিবসেনা নামে একটি দল ফ্যাসিস্ত কায়দায় অমহারাষ্ট্রীয়দের বিতাড়নের জন্য উঠেপড়ে লেগেছে। তারা বলছে যে, মহারাষ্ট্রে কোনো অমহারাষ্ট্রীয়কে চাকরী-বাকরী দেওয়া চলবে না। মহারাষ্ট্র শুধু মহারাষ্ট্রীয়দের জন্য। গত স্বাধীনতা দিবসে বোম্বাই শহরে শিবসেনাদের সঙ্গে দক্ষিণ ভারতীয়দের সংঘর্ষ হয়। তাতে কিছু লোক আহত হয়েছে। কিন্তু তার চেয়েও বিপজ্জনক ব্যাপার এই যে, শিবসেনাদের উৎপাতের ফলে বোম্বাই শহরে অমহারাষ্ট্রীয় বিশেষত চাকুরীজীবী দক্ষিণী, ফেরিওয়ালা, হোটেলওয়ালা ইত্যাদি সামান্য আয়ের মানুষ নিরাপদ বোধ করছেন না। বোম্বাইয়ের মতো শহরে যদি ভারতবর্ষের এক প্রান্তের মানুষ অবাধে নিজের জীবিকান্বেষণ ও বসবাসের নিরাপত্তা হারিয়ে ফেলে তাহলে এর চেয়ে লজ্জা ও ক্ষোভের বিষয় আর কিছু হতে পারে না। অবশ্য বোম্বাই প্রদেশ কংগ্রেস কমিটি, বিভিন্ন বামপন্থী দল এবং দায়িত্বশীল মারাঠী রাজনৈতিক নেতারা শিবসেনাদের এই বিভ্রান্তিকর আন্দোলনের নিন্দা করেছেন।

এই ঘটনাগুলো ভারতের ঐক্য ও সংহতির বিপদ রূপে দেখা দিয়েছে। সমাজের ভেতরে এই অনৈক্যের বীজ লুক্কায়িত আছে। যে-কোনো অজুহাতে তা মাথা চাড়া দিয়ে ওঠে। সম্প্রতি স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী শ্রীচ্যবন বোম্বাইয়ে শিবসেনাদের নিন্দা করে বলেছেন যে, এতে ভারতের ঐক্যের মূলেই আঘাত করা হচ্ছে। এ ধরনের আরও অনৈক্য ও বিচ্ছিন্নতার সংকট আমাদের দেশের অভ্যন্তরে রয়েছে। এই বিচ্ছিন্নতাবোধ ও বিভেদের মানসিকতাকে শক্তহাতে দূর করতে না পারলে আমাদের রাষ্ট্রীয় ঐক্য ও নিরাপত্তাই বিপন্ন হবে।

ভারতবর্ষের সংবিধানপ্রণেতারা একটি আদর্শ রাষ্ট্রের স্বপ্ন দেখেছিলেন। গত কুড়ি বৎসর ধরে একে রক্ষা করার চেষ্টা চলছে নানা প্রতিকূল অবস্থার সঙ্গে সংগ্রাম করে। সেই সংগ্রাম পূর্ণ সাফল্য অর্জন করতে পারেনি। দেশের নানাস্থানে ঐক্যবিরোধী ও বিভেদপন্থী কার্যকলাপ আমাদের মনে করিয়ে দিচ্ছে যে, সমাজে প্রত্যেক মানুষের জন্য সমানাধিকার অর্জনের সংগ্রাম কত কঠোর, কত নিরবচ্ছিন্ন হওয়া প্রয়োজন। অভ্যন্তর কলহে ও বিভেদে বহু জাতি ধ্বংস হয়েছে। আমরা যেন ইতিহাস থেকে সেই শিক্ষা গ্রহণ করি।

প্রোটিনের উৎস সন্ধানে

সতীন্দ্রকিশোর গোস্বামী

বর্তমান শতাব্দীর অনেকেই (বিশেষ-করে জাপানীরা) মনে করছেন যে, খাদ্য-সংকট মেটানো সম্ভব, যদি প্রচুর পরিমাণ সবুজ অ্যালগির চাষ করা হয়। এই সমস্ত উদ্ভিদ জলাশয়ে ক্ষুদ্র পারে এবং যে সব জায়গায় চাষের কোন প্রশ্নই ওঠে না, যেমন —পর্বতের উপরে, প্রস্তরময় সমতলভূমিতে এবং মরুভূমিতেও জন্মানো যেতে পারে। এরা আলোকসংশ্লেষণ প্রক্রিয়ার সাহায্যে কার্বন ডাই-অক্সাইড ও জল থেকে প্রথমে কার্বোহাইড্রেড তৈরি করে এবং পরে এই কার্বোহাইড্রেট উদ্ভিজ্জ প্রোটিনে রূপান্তরিত হয়।

সুতরাং যদি প্রচুর পরিমাণে এগুলির চাষ করতে হয়, তবে যথেষ্ট কার্বন ডাই-অক্সাইড লাগবে, কিন্তু এই পরিমাণ কার্বন ডাই-অক্সাইড প্রাকৃতিক পরিবেশ থেকে সংগ্রহ করা সম্ভব নয়। সুতরাং কেবলমাত্র এই অ্যালগির উৎপাদন খাদ্যসমস্যা সমাধানে সক্ষম নয়।

সমীক্ষায় দেখা গেছে যে, প্রোটিনের উৎপাদন সবচেয়ে কম এবং চর্বি ও কার্বো-হাইড্রেটের পরিমাণ সবচেয়ে বেশী। সুতরাং, যদি এই পরিমাণ অপ্রয়োজনীয় কার্বো-হাইড্রেটকে প্রোটিনে রূপান্তরিত করা যায়, তবেই প্রোটিনের সমাধান সম্ভব। যেহেতু প্রাণীরা এই রূপান্তরণে সক্ষম নয়, সেহেতু অন্যকোন জীবনের অনুসন্ধান করতে হবে, যারা এই কার্বোহাইড্রেট, অজৈব নাইট্রোজেন ও কিছু লবণ থেকে প্রোটিনের ক্ষুদ্রতম অংশ অ্যামিনো অ্যাসিড তৈরি করতে সক্ষম। অ্যামিনো অ্যাসিড-গুলি যে প্রয়োজনীয় Essential অ্যামিনো অ্যাসিড হবে, তা বলাই বাহুল্য।

...ভারতের প্রোটিন সমস্যা পর্যালোচনা করে নিম্নলিখিত পন্থাগুলি অবলম্বন করাই একমাত্র সমাধান বলে বিবেচনা করা যেতে পারে :—

১। একবেলা ভাত (ফেন না গড়িয়েই) এবং একবেলা রুটি খেতে হবে;

২। সয়াবীনের জল খাওয়া প্রচলন করতে হবে;

৩। শিশুখাদ্য হিসাবে তণ্ডুলজাতীয় মূল খাদ্যের সঙ্গে চীনাবাদাম বা ছোলা, সয়াবীন, গুঁড়া দুধ অথবা মাছের নির্যাস মিশিয়ে খুব উন্নত-ধরণের প্রোটিন খাদ্য প্রস্তুত করবার ব্যাপারে মনোনিবেশ করা যেতে পারে ;

৪। পাউরুটি, আটা ও জল প্রভৃতি খাদ্যের সঙ্গে ঈস্ট মিশিয়ে এদের পুষ্টি-কারিতা আরও বৃদ্ধি করা যেতে পারে;

৫। খাদ্যের বাজারে সামুদ্রিক টাটকা মাছের বহুল প্রচলন না হলে এই মাছ শুকিয়ে গুঁড়া করে অন্যান্য খাদ্যের সঙ্গে মিশিয়ে দেওয়া যেতে পারে।

৬। মাছ, কয়েক প্রকার ডাল, চীনাবাদাম বা ছোলা, সয়াবীন প্রভৃতি খাদ্যের প্রোটিন নিয়ে একপ্রকার প্রোটিন নির্যাস তৈরি করবার চেষ্টা করা যেতে পারে।

[জ্ঞান ও বিজ্ঞান, আগষ্ট ১৯৬৭]

ভারতীয় ঐতিহ্য

হুমায়ুন কবির

সমন্বয়ের যে মনোবৃত্তি ভারতীয় বৈশিষ্ট্য, শঙ্করাচার্যের সমগ্র জীবন তার উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত। হিন্দু এবং বৌদ্ধ মতবাদের দার্শনিক সিদ্ধান্তকে তিনি এক-সূত্রে বাঁধতে চেয়েছিলেন। ব্যবহারিক জীবনে যে আদর্শকে তিনি প্রতিষ্ঠিত করেছেন, তার ফলে তদানীন্তন ভারত-বর্ষের প্রধান দুটি ধর্মসম্প্রদায়ের পারম্পরিক দ্বন্দ্ব নিরসন হয়ে ভারতীয় সমাজের বনিয়াদ দৃঢ়তরভাবে প্রতিষ্ঠিত হল। মনে হয় যে নবাগত ইসলামের দৃষ্টি-ভঙ্গী ও জীবনদর্শনকেও তিনি অস্বীকার করেননি। তার মধ্যে যে সমস্ত বিশ্বাস ও আচার সনাতন হিন্দু চিন্তা-ধারা ও জীবনদৃষ্টির সঙ্গে খাপ খায়, তাদের গ্রহণ করে এক নতুন ও সমৃদ্ধ জীবনদর্শন স্থাপিত করেছেন। তাঁর অদ্বৈতবাদে দ্বিধা নাই, দ্বৈতবাদকে তিনি সমগ্রভাবে বর্জন করেছেন। শ্রুতি বা দৈবদত্ত শাস্ত্রের ভিত্তিতে অদ্বৈতবাদকে প্রতিষ্ঠার চেষ্টা, সনাতন ধর্মের পুন-প্রতিষ্ঠাকেই তাঁর জীবনের ব্রত হিসাবে গ্রহণ এবং তাঁর দৃপ্ত ঘোষণা যে তিনি নিজে নতুন কোন বাণী আনেন নাই বরং সনাতন সত্যকেই নতুন যুগের উপযোগী করে নতুনভাবে প্রকাশ করছেন—এসব কথা স্বভাবতই পদে পদে ইসলামের ধর্মবিশ্বাস ও জীবনদর্শনের কথা মনে করিয়ে দেয়। শংকরাচার্যের জন্মের ঠিক পূর্বে মালাবারে ইসলামের আবির্ভাব ও বিস্তারের কথা মনে রাখলে শংকরমতবাদ এবং ইসলামের মধ্যে এই আশ্চর্য সাদৃশ্যকে আকস্মিক মনে করা কঠিন।

মধ্যযুগের ভারতীয় ধর্মজীবনের ইতিহাস সমন্বয় সাধনের ইতিহাস এবং শঙ্করাচার্য এই সমন্বয় প্রচেষ্টার অগ্রদূত। রামানন্দ এবং কবির, নানক এবং দাদু, চৈতন্য এবং তুকারাম—তাঁরা সকলেই এই সমন্বয় সাধনাকে আরো সমৃদ্ধ করে তুলেছেন। এসমস্ত সাধনায় পুরাতনের সঙ্গে কোথাও ছেদ পড়েনি, পুরাতনকে অস্বীকার করবার কোন চেষ্টা নেই। নূতনকে পুরাতনের সঙ্গে যে সহজ-স্বাচ্ছন্দে একসূত্রে গাঁথা হয়েছে, তার ফলে ভারতবর্ষের ধর্মীয় দৃষ্টিভঙ্গী ও সাধনার ঐক্য ধারাবাহিকতা আজও সমস্ত বিশ্বের বিস্ময় ও শ্রদ্ধা আকর্ষণ করে এবং এই প্রচেষ্টার অগ্রদূত হিসাবে তার গৌরব শঙ্করাচার্যের স্মৃতিকে চিরদিন অমর করে রাখবে।

(চতুরঙ্গ মাঘ-চৈত্র ১৩৭৩)

ভূত দেখিতে কিরূপ

যমদত্ত

ভূতের রঙ খুব কালো, ফরসা ভূতের কথা কখনও কাহারও কাছে শুনি নাই, বা কোন বইয়েও পড়ি নাই। অবশ্য আমি বাংলাদেশের বাঙ্গালী ভূতের কথা বলিতেছি। অন্য দেশে কি হয় বিশেষ জানি না। ভূতের মাথাটা থ্যাবড়া চেপ্টা—অনেকটা ছাঁচি কুমড়ার মতন; কান থেকে নাক অবধি যে মাপ কপাল থেকে দাড়ি যতদূর হয় তাহার চেয়েও ঢের বেশী। আকারে ও প্রকারে 'হাঁড়ির মতন' --চুলের দিকটা দাড়িক দিকের চেয়ে সরু। খোঁচা খোঁচা চুল, ফাঁক ফাঁক বসানো।

চোখ দুটো গোল, ভাঁটার মতন, আর আমাদের মানুষের মতন আঁখি-গোলক সাদা নহে, লাল। নাক থ্যাবড়া, চেপ্টা, এজন্য ভূতেরা বাধ্য হইয়াই নাকিসুরে কথা বলে। কেহ কেহ আবার একদম খ্যাঁদা, দুই-চারিজন আবার গল্লা-খ্যাদা। কান দুটো কুলোর মতন, খুব বড় বড়। মুখ সর্বদাই হাঁ করিয়া আছে, আর দাঁতগুলো মুলোর মতন, কশের দাঁতগুলো আবার বাহির হইয়া পড়িয়াছে। ভূতের রঙ ঘোর কালো হইলেও দাঁতগুলো কিন্তু ধবধবে সাদা।

গলা সরু, হাত-পা খুব লম্বা—ইচ্ছামত ছোট-বড় করিতে পারে, কিন্তু পাকাটির মতন সরু। পাঁচ আঙুলে বড়-বড় নখ, এই নখ দিয়া ছোট ছোট ছেলেমেয়েদের আঁচড়াইয়া দেয়। চড় মারে হাতের চেটো দিয়া, আমাদের মানুষের মতন নহে, চেটোর উল্টা দিক দিয়া, যাহাকে বলে 'বাঁদুরে চড়'। দেহ লিকলিকে সরু। নড়িলে-চড়িলে হাতগুলি খটখট করিয়া আওয়াজ তুলে।

পায়ের পোঁচা পিছন দিকে। ভূত যদি পূর্ব দিকে যায়, পায়ের ছাপ দেখিয়া মনে হইবে যেন পশ্চিম দিকে কেহ গিয়াছে।

......ভূত অন্ধকারে থাকে ও অন্ধকার ভালবাসে। আলো আদৌ সহ্য করিতে পারে না। নিরিবিলি নির্জন স্থান ভালবাসে, গোলমাল আওয়াজ ইহাদের ভাল লাগে না। এই জন্য ভূত চতুর্দশীর দিন ঘরে ঘরে ১৪ প্রদীপ দিতে হয় ও ভুঁই-পটকা ফাটাইতে হয়। আওয়াজ শুনিয়া ও আলো দেখিয়া ভূতেরা পলাইয়া যায়।

ভূতেরা আসশেওড়া গাছে পেত্নীদের সঙ্গে থাকে, একলা একলা নিমগাছ, তাল-গাছের মাথায় থাকিতে ভালবাসে। ব্রহ্মদৈত্যদের ন্যায় ফুলের গাছ, যেমন চাঁপা গাছে, কদম্ব গাছে থাকে না। নারিকেল গাছের মাথায় ভূত থাকে না, কারণ নারিকেল গাছ ব্রাহ্মণ। খেজুর গাছের মাথায় মামদো ভূতেরা থাকে। ভাঙ্গা বাড়িতে অন্ধকার স্যাঁত সেঁতে ঘরেও ভূতেরা থাকে বলিয়া শুনিয়াছি।

(কথা সাহিত্য।। আষাঢ় ১৩৭৪)

বিচ্ছিন্নতা প্রসঙ্গে কিছু বক্তব্য

সুমন্ত বন্দ্যোপাধ্যায়

জন্ম আকস্মিক। রোগ, জরা বা মানসিক বিপর্যয়ে জীবন অভিভূত। সর্বোপরি মৃত্যু অবধারিত। এ নিয়মগুলি অনড়, অলংঘনীয়। এই যুক্তিগ্রাহ্য চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত জেনেও কিছু সময় বা মানুষের প্রতি আবেগ সঞ্চালিত একাত্মবোধের জন্য বেঁচে থাকার লোভ সংবরণ করতে পারি না। বুদ্ধির স্থির নির্দেশের বিরুদ্ধে দাঁড়িয়ে ভাবাবেগের এই লড়াই, মৃত্যু অবশ্যম্ভাবী জেনেও আজীবন মৃত্যুকে ঠেকিয়ে রাখার ব্যর্থ চেষ্টার কি অর্থ? কয়েক মুহূর্তের একাত্মতার আনন্দের জন্য দীর্ঘকালব্যাপী কষ্ট পাওয়ার কি প্রয়োজন?

এর উত্তরে অতীতে ধর্ম থেকে শুরু করে এ যুগের অস্তিত্ববাদী দর্শন (Extentialism) বেঁচে থাকার সমর্থনে নানা আশ্বাস ও যুক্তি উপস্থাপিত করেছেন। আমাদের দেশের হিন্দুধর্মে কর্ম-ফলের কথা শুনি, পুনর্বার জন্মগ্রহণ করে মর্ত্যলোকের কষ্ট যাতে না পেতে হয় তার জন্য ইহজন্ম সার্থক করে তোলার নির্দেশ পাই। বলা বাহুল্য এ যুগের যুক্তিবাদী মনের কাছে এ আশ্বাস উপহাসযোগ্য।

বেঁচে থাকাটা যুক্তিহীন এবং আজীবন কষ্ট পেয়ে শেষপর্যন্ত মৃত্যুর কাছে পরাজয়ের অনিবার্যতা স্বীকার করে নিয়েও কামু (Camus) মনুষ্যজীবনের সংগ্রামের মধ্যে বেঁচে থাকার সমর্থন খুঁজে পেয়েছিলেন। তাঁর সিসিফাস আজীবন বিফলে পাথর টেনেও সন্তুষ্ট এই ভেবে যে তার শাস্তির জন্য সে স্বয়ং দায়ী, তার ভাগ্যের সৃষ্টিকর্তা একমাত্র সে নিজে। তার 'মিথ অভ সিসিফাস'এর শেষ আশ্বাসবাণী "শিখরে আরোহণের সংগ্রাম-ই মানুষকে তৃপ্ত করার পক্ষে যথেষ্ট। সিসিফাস যে সুখী, সেটা আমাদের কল্পনা করে নিতে হবে।"

এটা কিছুটা ব্যক্তির অহংকে সন্তুষ্ট করা, কিছুটা মানুষের বেঁচে থাকার জন্য অন্তর্নিহিত অন্ধসংগ্রামস্পৃহাকে স্বীকার করে নেওয়া। বার-বার পাথর তুলবার জন্য সিসিফাস যখন অবরোহণ করে, তখনই সে সচেতন হবার সুযোগ পায়, নিজের ভাগ্য বিশ্লেষণের অবকাশ পায়। এই আত্ম-সচেতনতার মুহূর্তই কামুর কাছে গুরুত্ব-পূর্ণ। কিন্তু আমাদের প্রশ্ন—যেখানে সচেতনতা বা অজ্ঞানতা উভয়ই শেষ হয় মৃত্যুর সঙ্গে সঙ্গে, কি এসে যায় আত্ম-বিশ্লেষণের ক্ষমতায়। একমাত্র চিন্তার জন্য সাময়িক গর্ব অনুভব করা ছাড়া? যদি এই বুদ্ধির অহঙ্কারই বেঁচে থাকার পক্ষে একমাত্র যুক্তি হয়, আরও অনেকে তো অন্য কিছু সম্পদের অহংকার নিয়ে বেঁচে আছে।

...একাত্মতা যখন চিরস্থায়ী হয় এবং বিচ্ছিন্নতা যখন অবশ্যম্ভাবী, যুক্তি দিয়ে এ সত্যটা যদি উপলব্ধি করি তবে সেই যুক্তির নির্দেশে বিচ্ছিন্নতার চরম প্রকাশ মৃত্যুর দিকে সচেতনভাবে দ্রুত যাত্রাই কি উচিত নয়? মৃত্যুর উদ্দেশ্যে জীবনকে ত্বরান্বিত করাই যুক্তিবাদী মানুষের হয়তো একমাত্র কর্তব্য।

বুদ্ধির এই অমোঘ উপলব্ধি সত্ত্বেও যখন দেখি মানুষ আত্মহত্যা করতে অসম্মত হয় বা ভয় পায়, অথচ প্রেমে হতাশা বা অন্যায় করে ধরা পড়বার ভয়ের মত সাময়িক ভাবাবেগে তাড়িত হয়ে প্রায়শই আত্মঘাতী হচ্ছে, তখন আবার মনে হয় মানুষ পঙ্গু দেবতা: তার চিন্তাশক্তি উচ্চমার্গে বিচরণে সক্ষম, কিন্তু তার কর্মক্ষমতা সে চিন্তা-শক্তির উপযোগী সহচর হয়ে উঠতে পারে নি। তাই বার-বার তার বুদ্ধিবৃত্তি, তুচ্ছ ভাবাবেগের কাছে পরাজিত হয়; চিন্তা, কার্যক্রম থেকে বিচ্ছিন্ন হয়।

বেঁচে থেকে মানুষ বিচ্ছিন্নতাবোধে পীড়িত হচ্ছে। অথচ, বিচ্ছিন্নতার সর্বশ্রেষ্ঠ সোপান, মৃত্যুতে, ব্যক্তি মানুষ স্বেচ্ছায় উপনীত হয়ে এই আত্মপীড়নের ইতি ঘটাতে পারে। কিন্তু কিছু আবেগপ্রবণ অনুরক্তি, কিছু দুরারোগ্য প্রত্যাশার মায়ায় আবদ্ধ মানুষ বুদ্ধির এই অন্তিম নির্দেশ পালনে ভীত। তাই, যদিও সচরাচর বলা হয়ে থাকে মৃত্যুতে জীবনের পরাজয়, আমি মনে করি বেঁচে থাকাটা মানুষের বুদ্ধি-বৃত্তির পরাজয়।

(এক্ষণ।। মে-জুন ১৯৬৭)

গান ॥ যুগান্তর চক্রবর্তী

তোমাকে গানের দেবী মনে হয়, কিন্তু কই তোমার নগ্নতা,
যা ছাড়া পায়ের কাছে বসা ভার, ঊরুর উপর ন্যস্ত মাথা
রাখা ভার।

তুমিতো গানের দেবী,

কিন্তু এনেছিলে কোন গান

সেকি রেখেছিলে মনে? কিছু তার জানে কি স্তব্ধতা?
তোমার বিস্মৃতি,—সেকি তোমার শাস্তির পরিণাম?

তুমি কি গানের দেবী?

কেন পাশে রয়েছ শয়ান?

তোমার মাথার কাঁটা বুকে বেঁধে, দেখি না যে ডানার যুগ্মতা।

আমাকে শোনাতে হবে বলে তুমি শেখ নাই

কোনো প্রিয় গান।

স্মৃতি-বিস্মৃতি ॥ বঙ্কিম গুহ

পাশাপাশি হেঁটে গেছি দীর্ঘপথ দীর্ঘদিন ধরে—
কথার ছিল না অন্ত, তুমি শুধু ছিলে নিরুত্তর;
পলাতক যৌবনের অস্তগামী আলোর প্রহরে
স্মৃতি উত্তোলন ক'রে আত্মঘাতী কামনার শর!

হায়! রাত্রি এতো দীর্ঘ! দিন এত প্রজ্জ্বলিত চিতা
যেন কিছু নেই, যেন শূন্যতার চতুর্দোলা চড়ে
মৃত্যুর শীতল রাজ্যে এসেছি, হে রাত্রির দুহিতা
দুদূর নক্ষত্র তুমি আমি এই মৃতের শহরে।

আমার দুঃখের অশ্রু শিলীভূত তুষারের মতো
দুঃসহ মুহূর্ত, বড়ো দীর্ঘপথ, দেহে ক্লান্তি নামে
মৃত্যু কি দুর্লভ? স্মৃতি দহে সারা অস্তিত্ব সতত
তোমাতে আশ্রিত প্রেম পেল এই শূন্য পরিণামে?

জন্মাষ্টমী

দ্বাপরযুগের শেষে স্বৈরাচারী কংসের অত্যাচারে জননী বসুন্ধরা যখন ক্রন্দনরতা, যখন বহু স্বার্থান্ধ, বলদৃপ্ত ও মদগর্বিত নরপতি ধর্মের আদর্শ থেকে প্রমত্ত, যখন দুর্বৃত্তের পীড়নে সাধুগণ ভীত-সন্ত্রস্ত, যখন ধর্মের গ্লানি ও অধর্মের অভ্যুত্থানে ভক্তহৃদয় রোদনাবিহ্বল, সেই সময়ে ভূ-ভারহরণের জন্যে 'অজন্মা সমজ্জনি' যিনি জন্মরহিত, তিনি আবির্ভূত হলেন। দৈববাণী-শ্রবণে ভীত কংস বসুদেব ও দেবকীকে কারাগারে নিক্ষেপ করেছেন, নিরপরাধ ছয়টি শিশুর শোনিতে হস্ত কলঙ্কিত করেছেন। বসুদেব-পত্নী রোহিনীর গর্ভে বলরামের আবির্ভাব হলেও কংসের অত্যাচারের নিবৃত্তি হয়নি, কিন্তু তাঁর প্রচেষ্টা ব্যর্থ হয়েছে। তারপর ভাদ্র মাসের কৃষ্ণপক্ষের শুভ অষ্টমী তিথিতে কারাগারে এক দিব্য শিশুর আবির্ভাব হোলো। তিমিরাবৃতা দুর্যোগময়ী রজনীতে, মথুরাবাসীরা যখন যোগনিদ্রার প্রভাবে গাঢ় নিদ্রায় মগ্ন সেই সময়ে নন্দ-যশোদার সদ্যোজাতা কন্যা কংসের কারাগারে ও বসুদেব-দেবকীর সদ্যোজাত পুত্র নন্দ-গৃহে আনীত হলো। কংস যখন প্রাণভয়ে আবার শিশু-হত্যায় প্রবৃত্ত, তখন শুনতে পেলেন নিয়তির মতো অমোঘ সেই দৈববাণী—

'তোমারে বধিবে যে
কোথাও বাড়িছে সে'।

শ্রীমদ্‌ভাগবতে কোনো স্থানের উল্লেখ নেই। কিন্তু আমাদের দেশের জনশ্রুতি অনুসারে দৈববাদী হচ্ছে এইরূপ—

'তোমারে বধিবে যে
গোকুলে বাড়িছে সে'।

ভীত কংস মথুরার সকল শিশু-নিধনে প্রবৃত্ত হলেন। কৃষ্ণ-বলরামকে নিধন করার জন্যে তিনি যে সকল কৌশল অবলম্বন করেছিলেন, সকলই ব্যর্থ হোলো। পরে কংসকে নিধন করে শ্রীকৃষ্ণ তাঁর পিতা উগ্রসেনকে মথুরার সিংহাসনে অভিষিক্ত করলেন।

শ্রীকৃষ্ণের দিব্যজন্ম ও কর্মের কথা প্রাপ্ত হওয়া যায় মহাভারতে, বিষ্ণুপুরাণে, শ্রীমদ্‌ভাগবতে ও হরিবংশে।

শ্রীকৃষ্ণের জীবনের ব্রত ধর্মরাজ্য সংস্থাপন। এই উদ্দেশ্যেই তিনি ভীমসেনের দ্বারা দ্বৈরথ যুদ্ধে জরাসন্ধকে বধ করান, শিশুপালকে বহুবার ক্ষমা করেও পরিশেষে ভূভার-হরণের জন্যে স্বয়ং তাঁকে নিধন করেন।

মহাভারতের শ্রীকৃষ্ণ বাহুবলে অদ্বিতীয়, বুদ্ধিনৈপুণ্যে অতুলনীয়, সমরকৌশলে অপরাজেয়, তিনি নিষ্কাম কর্মযোগের আদর্শ, তত্ত্বজ্ঞানী, ধর্মসংস্থাপক। যে সূত্রে সমগ্র মহাভারতের ঘটনাপুঞ্জ গ্রথিত, সে সূত্র হচ্ছে—যতঃ কৃষ্ণস্ততো ধর্মঃ যতো ধর্মস্ততো জয়ঃ। মহাভারতের উপদেশ হচ্ছে—

'অধর্মেনৈধতে তাবৎ ততো ভদ্রাণি প্রশ্যতি।
ততঃ সপত্নান্ জয়তি সমূলস্তু বিনশ্যতি'।।
—অধর্মের দ্বারা মানুষ বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হয়,
অধর্মের দ্বারাই জাগতিক মঙ্গল দর্শন করে।
অধর্মের দ্বারাই শত্রু বিনাশ করে, পরিণামে
অধর্মের দ্বারাই সে সমূলে বিনাশপ্রাপ্ত হয়।

মহাভারতের শ্রীকৃষ্ণ এই শিক্ষাই আমাদের দিয়েছেন।

শুভ জন্মাষ্টমী তিথিতে আমরা ভক্তিনম্রচিত্তে প্রণাম করি ধর্মসংস্থাপনকারী পার্থসারথিকে, প্রণাম করি বৃন্দাবনবিহারী বংশীধারী শ্রীকৃষ্ণকে। যাঁর ঐশ্বর্য অনন্ত, মাধুর্যও অনন্ত, যিনি দুর্বৃত্তের দমনকারী হয়েও অখিলরসামৃতসিন্ধু ও সকল কল্যাণগুণের আকর, তাঁর শ্রীচরণে শরণ গ্রহণ করে বিল্বমংগলের কণ্ঠে কণ্ঠ মিলিয়ে বলি—

'হে দেব, হে দয়িত, হে ভুবনৈকবন্ধো
হে কৃষ্ণ, হে চপল, হে করুণৈকসিন্ধো।
হে নাথ, হে রমণ, হে নয়নাভিরাম,
হা হা কদানুভবিতাসিপদং দৃশোর্মে'।।

শৈলেন সেন

ইংল্যান্ডের বহু রাজা-রাণী প্রধান-মন্ত্রীকে দেশ হয়ত ভুলে যাবে, কিন্তু নর্থ ব্রিটন আর আমার নাম থাকবে চিরকালের জন্য'—সদম্ভে একথা বলেছিলেন অষ্টাদশ শতাব্দীর এক উচ্ছৃংখল যুবক। তাঁর এই উক্তি ভবিষ্যতে সত্য বলেই প্রমাণিত হয়। নর্থ ব্রিটন একখানা মাঝারি সাইজের পুস্তক, লেখকের নাম জন উইল্কস, বইখানা অশ্লীলতার অভিযোগে ইংল্যান্ডে নিষিদ্ধ হয়। কিছুকাল পরেই উইল্কস একটি অশ্লীল কবিতা রচনা করেন, 'অ্যান এসে অন উওম্যান' নামে এই কবিতাটি সারা দেশে তুমুল সোরগোল তুলল। ফলে উইল্কস ইংল্যান্ডে একজন অবাঞ্ছিত ব্যক্তি বলে চিহ্নিত হন এবং বিদেশে নির্বাসন লাভ করেন। উইল্কস তখন পার্লামেন্টের মেম্বর এবং রাজনীতি ক্ষেত্রে একজন নামী মানুষ। পার্লামেন্ট থেকেও তাঁকে বহিষ্কার করে দেওয়া হল. নানা মানুষের ভীড়ে কয়েক বছরের মত হারিয়ে গেল উইল্কসের নাম। নর্থ ব্রিটন এবং উওম্যান কবিতা অবশ্য নিত্যনতুন অশ্লীলতার ভীড়ে হারিয়ে যায় নি। বিদেশে বেশ কিছুকাল কাটিয়ে উইল্কস ১৭৬৮তে দেশে ফিরে এলেন। এরপর থেকেই সারা দেশে তাঁকে নিয়ে যে ঝড় শুরু হয় পৃথিবীর কোনো দেশের রাজনীতির খেলায় বোধহয় তার তুলনা নেই।

দেশব্যাপী সাধারণ নির্বাচনের ঠিক আগে উইল্কস দেশে পৌঁছুলেন, লন্ডন এলাকায় তিনি নির্বাচনপ্রার্থী হয়ে দাঁড়ালেন। শিক্ষিত, সুসভ্য লন্ডনবাসী তাঁর অশ্লীল সাহিত্য এবং উচ্ছৃংখল জীবনের উপযুক্ত সমজদার হবে বলে উইল্কসের মনে বোধহয় তরসা ছিল। কিন্তু তাঁর প্রিয় সিটি অব লন্ডন তাঁকে 'বিমুখ করল। উইল্কস অত্যন্ত শোচনীয়ভাবে হেরে গেলেন। এর পরেই তিনি মিডল-সেক্সে প্রার্থীরূপে দাঁড়াবার সুযোগ পেয়ে গেলেন এবং সর্বাপেক্ষা বেশী ভোট পেয়ে জয়ী হলেন। ঘরে ঘরে সারারাত আলো জ্বালিয়ে রেখে তাঁর জয় উদ্‌যাপন করা হল। উইল্কস তাঁর মনোরম ব্যবহার, বাকচাতুরী এবং বুদ্ধিমত্তা দিয়ে অভূতপূর্ব জনপ্রিয়তা লাভ করতে সমর্থ হলেন। সরকার পক্ষ এতদিন চুপচাপ ছিলেন। এবার তাঁকে গ্রেপ্তার করা হল। বিচারে বিভিন্ন অপরাধে তাঁকে মোট বাইশ মাসের জেল দেওয়া হল।

রাজা তৃতীয় জর্জ এতেও ঠিক সুখী হলেন না। লর্ড নর্থের (চ্যান্সেলার অফ দি এক্সচেকার) কাছে একটি চিঠিতে তিনি উইল্কসকে পার্লামেন্ট থেকে বহিষ্কার করে দেবার জন্য চাপ দিলেন। ক্যাবিনেট অনেক ইতস্তত করে শেষ পর্যন্ত পার্লামেন্টে তাঁর বহিষ্কারের প্রস্তাব আনলেন। বহু তর্ক-বিতর্কের পর প্রস্তাবটি ২১৯—১৩৭ ভোটে গৃহীত হল। এর পর থেকেই সত্যিকারের নাটক শুরু।

পার্লামেন্টে ক্যাবিনেটের প্রস্তাব গ্রহণের সংগে সংগে মিডলসেক্সের ভোটদাতারা এক বিরাট সভা আহ্বান করল। ড্রাম আর বিউগল বাজিয়ে সেখানে উইল্কসকে পুনরায় প্রার্থীরূপে গ্রহণের সংকল্প ঘোষণা করা হল। ভয়ে কেউ আর নির্বাচনে দাঁড়াতেই সাহস করল না। ফলে উইল্কস বিনা প্রতিদ্বন্দ্বিতায় নির্বাচিত হয়ে গেলেন. ইংল্যান্ডের সুদীর্ঘকালের রাজনৈতিক ইতিহাসে এটি একটি অভূতপূর্ব ঘটনা। কমন্স সভা মিডলসেক্স ভোটারদের এবম্বিধ আচরণে বিব্রত হয়ে পড়ল. মান বাঁচানোর জন্য এক প্রস্তাবে কমন্স উইল্কসের নির্বাচন অসিদ্ধ বলে ঘোষণা করল। একবার পার্লামেন্ট থেকে বহিষ্কৃত হওয়ার পরে উইল্কস পুনরায় সেই পার্লামেন্টে নির্বাচিত হওয়ার অযোগ্য বলে কমন্স এক সুদূরপ্রসারী ঐতিহাসিক প্রস্তাব গ্রহণ করল।

উইল্কস তখন আর মাত্র মিডলসেক্স হিরো নন, তিনি ন্যাশনাল হিরো। ইতিমধ্যে নতুন নির্বাচনের সময় এসে গেল. মিডলসেক্স ভোটারদের সংগে কমন্সের এক অদ্ভূত লড়াই শুরু হয়ে গেল। ভোটারবৃন্দ আবার তাঁকে প্রার্থীরূপে মনোনয়নের সংকল্প জ্ঞাপন করল। মন্ত্রিবৃন্দ এবার উইল্কসকে যথাসম্ভব বাধা দেবার জন্য প্রস্তুত হলেন। হেনরি লাটরেল নামে এক-জন ধনী লর্ডপুত্রকে কর্ণওয়াল কেন্দ্র থেকে সরিয়ে এনে উইল্কসের বিরুদ্ধে দাঁড় করানো হল। ভাগ্যলক্ষ্মী উইল্কসের সহায়, লর্ড-তনয় শোচনীয়ভাবে তাঁর কাছে হেরে গেলেন।

লাটরেলের পরাজয় কমন্স মিডল-সেক্সার বিরুদ্ধে নিজের পরাজয়রূপে গ্রহণ করল। এক প্রস্তাবে কমন্স অভিমত প্রকাশ করল যে, উইল্কসের জয় মিডলসেক্স ভোটারদের এক অমার্জনীয় অপরাধ। লাটরেলকে ভোট দেওয়া তাঁদের কর্তব্য ছিল। মিডলসেক্স অধিবাসীরা এর উত্তরে কমন্সের নিকট এক দরখাস্ত পেশ করে উইল্কসকে কমন্সে আসন দেবার জন্য দাবী জানাল। কমন্সসভা এর পরে যে প্রস্তাব গ্রহণ করল তা যেমন হাস্যকর তেমন দুঃসাহসকারী। প্রস্তাবে লাটরেলকে তৎকালীন পার্লামেন্টের নির্বাচিত সদস্য বলে ঘোষণা করা হল।

উইল্কস তখনও জেলে বন্দীদশা যাপন করছেন। তাঁর বিরুদ্ধে কমন্সের অসংগত আচরণে সারা ইংল্যান্ড সরগরম হয়ে উঠল। রাজা তৃতীয় জর্জ এবং মন্ত্রিসভা কিন্তু তাঁদের সিদ্ধান্তে অবিচল রইলেন। সারা দেশে তুমুল আন্দোলন গড়ে উঠল, সরকারের টিঁকে থাকাই সমস্যা হয়ে দাঁড়াল। উইল্কস প্রথমদিকে কেবল মাত্র সাধারণ ভোটারদের সমর্থন পেয়েছিলেন, ক্রমে তিনি বহু খ্যাতনামা ব্যক্তিদের সমর্থন পেতে শুরু করলেন। বিভিন্ন কেন্দ্র থেকে প্রায় ষাট হাজার ভোটার রাজার নিকট এক দরখাস্ত পেশ করে উইল্কসকে তার প্রাপ্য সম্মান দেবার অনুরোধ জানাল। ১৭৭০ সালের ৯ই জানুয়ারীর অধিবেশনে পার্লামেন্টে এই দাবীর উপর বিতর্কের শুরু, ২৬শে জানুয়ারী এই ঐতিহাসিক বিতর্কের অবসান।. সরকার পক্ষ থেকে অত্যন্ত তীব্র ভাষায় উইল্কসের সমর্থকদের আক্রমণ চালানো হল। ভোটে উইল্কসের সমর্থকরা হেরে গেলেন বটে, কিন্তু তাঁরা এবার আগের চাইতে অনেক বেশী সমর্থন পেলেন। সরকার পক্ষ পেলেন ২২৪ ভোট, বিরোধী পক্ষ ১৮০ ভোট। উইল্কসকে কমন্সে বসার অধিকার থেকে আবারও বঞ্চিত করা হল।

১৭৭০-এর এপ্রিলে উইল্কস জেল থেকে ছাড়া পেলেন। পার্লামেন্টে ফিরে যাবার সকল দুরাশা থেকে মুক্ত হয়ে তিনি সিটি পলিটিক্সে মাতলেন, সেখানে অচিরেই তিনি সার্থকতার চূড়ান্ত পর্যায়ে পৌঁছে গেলেন। একে একে অল্ডারম্যান, শেরিফ, লর্ড মেয়র এবং চেম্বারলেন—কোনো কিছুই তাঁর আয়ত্তের বাইরে রইল না। তবু পার্লামেন্টে তাঁর প্রাপ্য অধিকার থেকে বঞ্চনা মাঝে মাঝে তাঁকে বিষণ্ণ করে তুলত।

১৭৭৪ সালে সেই নৈরাশ্যজনক পার্লামেন্টের আয়ু শেষ হয়ে গেল। উইল্কস আবার পূর্ণোদ্যমে রংগমঞ্চে আবির্ভূত হলেন। সারা দেশে তখন তাঁর লক্ষ লক্ষ সমর্থক। নতুন সাধারণ নির্বাচনে আবার সেই মিডলসেক্স। বিনা প্রতিদ্বন্দ্বিতায় নির্বাচিত হয়ে তিনি এবার সারা দেশের অভিনন্দন কুড়োতে কুড়োতে কমন্সে আসন গ্রহণ করলেন।

তাঁর সত্যিকারের সংগ্রামের এখনই শুরু। তাঁকে পার্লামেন্ট থেকে বরখাস্ত করার সেই অপমানসূচক প্রস্তাব কমন্সের রেকর্ডে চিরকালের জন্য খোদিত হয়ে রয়েছে। সকল রেকর্ড থেকে ঐ প্রস্তাব মুছে ফেলার জন্য উইল্কস পার্লামেন্টে আন্দোলন শুরু করলেন। বারংবার তাঁর ভাগ্যে পরাজয় জুটতে লাগল। অবশেষে ১৭৮২ সালের মে মাসে ৬৮ ভোটের ব্যবধানে তিনি তাঁর প্রস্তাব কমন্সে গ্রহণ করাতে সমর্থ হলেন। উইল্কসকে বহিষ্কৃত করার প্রস্তাব এবং তাঁকে বঞ্চিত করে লাটরেলকে জয়ী ঘোষণা করার ইতিহাস পার্লামেন্টের সকল রেকর্ড থেকে মুছে ফেলা হল। এই ঐতিহাসিক সংগ্রামের এখানেই শেষ।

প্রতিধ্বনি শুনি

চিত্রা সেনগুপ্ত

সুধন্যার চোখে এখানের পৃথিবী, জল বাতাস মাটি-সবই নতুন, শুধু নতুন নয়—বিস্ময়। কলকাতা কর্পোরেশনের পড়ে থাকা বড় পাইপগুলোর নিচে নতুন আস্তানার মধ্যে বসে বসে অপলক বিস্ময়ে তাকিয়ে আছে রাতের কলকাতার দিকে। বাইরে ঝির ঝির করে বৃষ্টি পড়ে চলেছে। কত সামান্য বৃষ্টি, কিন্তু এর মধ্যে পথে রীতিমত জল জমে উঠেছে। যাত্রী বোঝাই প্রকাণ্ড দোতলা বাসগুলো হুস্ হুস্ করে দ্রুতবেগে ছুটে চলেছে। বর্ষণসিক্ত পীচ ঢালা রাস্তার বুকে ভারী টায়ারের ঘর্ষণে শব্দ উঠেছে—কিচ্‌কিচ্—কিচ্, কিচ্—। চোখ ধাঁধান নিয়নের উজ্জ্বল আলোয় এত রাত্রেও দোকান-পসার, রাস্তা-ঘাট, বাড়ি-ঘর ঝলমল্ করছে। কেবল রাত বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে সেই বিপুল উদ্দাম জনস্রোত ক্রমেই হাল্কা হয়ে আসছে।

অনেকক্ষণ পর আবার একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে, দূর থেকে দৃষ্টি সরিয়ে এনে সুধন্যা তাকাল পারুলের দিকে। আশ্চর্য! পাইপের মধ্যে এই সামান্য জায়গাটুকুর মধ্যে পানুকে বুকের মধ্যে জড়িয়ে শুয়ে কী করে যে ঘুমোচ্ছে ও কে জানে! আর, পাইপের ওপ্রান্তের খোলা মুখটা দিয়ে বৃষ্টির ঝাপটা এসে কাপড়-চোপড় আর সাংসারিক জিনিস-পত্রের পুঁটলী দুটো জলে ভিজে যাচ্ছে, যদি একটুও হুঁস থাকে পারুলের!

ব্যস্ত হয়ে উঠে সুধন্য তাড়াতাড়ি গায়ে ধাক্কা দিতে দিতে ডাকল,—শুনছিস্, ও বউ ওঠ তো একটু। সব যে ভিজে গেল জলে—হ্যাঁ! কি ঘুম বাবা তোর।

কিন্তু পারুল ঘুমে অচৈতন্য। সারা-দিনের পরিশ্রমে কেমন যেন বেহুঁস হয়ে ঘুমোচ্ছে! পারুলের ওপর গভীর মমতার হঠাৎ মনটা ভরে উঠল সুধন্যার। ওকে আর ডাকাডাকি করে না তুলে নিজেই পুঁটলী

দুটো ভেতরে টেনে নিয়ে এল। বাইরে বৃষ্টির বেগটা যেন হঠাৎ বাড়ল বলে মনে হচ্ছে। ওদিকের খোলা মুখটা দিয়ে বৃষ্টির প্রধান ধারা ঝপ্ ঝপ্ শব্দ তুলে পড়ে চলেছে, দেখতে পাচ্ছে সুধন্য। রাত্রির নীরবতার মধ্যে সার সার পাইপগুলো পড়ে পড়ে ভিজছে। দূরে, রাস্তার লাইটপোস্টের আলোটা আবছা নরম আলো ছড়িয়ে দিচ্ছে পাইপগুলোর মধ্যে। ওপাশের একটা পাইপের মধ্যে কারা যেন নতুন আস্তানা গেড়েছে, মনে হচ্ছে। ভেতরে একটা মোমবাতি জ্বালিয়ে পায়ুলের মত একটা বউ দ্রুত হাতে গেরস্থালি জিনিস-পত্তর একমনে গুছিয়ে নিচ্ছে। হয়ত ওদেরই মত সদ্য গ্রাম ছেড়ে চলে এসেছে এখানে। অন্য পাইপের বাসিন্দারা বোধহয় এতক্ষণে ঘুমের মধ্যে তলিয়ে গেছে—তাই কারো সাড়াশব্দ পাচ্ছে না সুধন্য। কেবল দূরের রাস্তা থেকে মাঝে মাঝে ছুটে চলা ট্রাম বাসের শব্দ ছাড়া আর কোন শব্দ নেই কোন দিকে।

অকারণেই বউটার দিকে অনেকক্ষণ তাকিয়ে রইল সুধন্য। তারপর পিঠের নিচে এটা পুঁটলী ঠেসান দিয়ে নিজেও অবসান্ন দেহটা এলিয়ে দিল। আশ্চর্য। এত মানুষ পাইপের মধ্যে এমন ঘর গেরস্থালি পেতে বাস করে, সচক্ষে না দেখলে বিশ্বাস করতে পারত না ও। এ রকম একটা জগত কল্পনারও বাইরে ছিল সুধন্যর। শেয়ালদা স্টেশন থেকে আসার সময় যে রিক্সা-ওয়ালার দয়ায়, সম্পূর্ণ অপরিচিত এই শহরের বুকে মাথা গোঁজার মত এই আজব আস্তানাটা খুঁজে পেয়েছে, সে ওদের ওখানে এনে নাবিয়ে দিয়ে বলেছিল হিঁয়া বিলকুল তুমহারা মাফিক্ গাঁও ছোড়কার আনেবালা আদমী লোকন রাহাঁতে হ্যায়! তুম ভি ডর মাত, ভাইয়া। তামাম কলকাত্তামে ইস্ মাফিক্ দোসরা কৈ এতনা আচ্ছা বেওয়ারিশ আস্তনা মিলেগী নেহি!

রিক্সাওয়ালা কিছু মিথ্যে বলেনি। এখানে এসে পৌছনর পরই সুধন্য বুঝে নিয়েছে, ও শুধু একাই গ্রাম থেকে পালিয়ে আসতে বাধ্য হয় নি। কত অসংখ্য মানুষই না চোখের জল মুছে গ্রাম ছেড়ে চলে এসেছে, তার ঠিক নেই। ওদের এ অবস্থায় দেখে কে বিশ্বাস করবে, ওদেরও একদিন ঘর-বাড়ি ছিল, সুখের সংসার ছিল। ছিল আশা, স্বপ্ন, ভবিষ্যত। ক্ষেত ছিল, গোলা ভরা ধান ছিল।

আশ্চর্য। সে সব কোথায় গেল আজ? স্বপ্ন না দুঃস্বপ্ন সে সব স্মৃতি? তা না হ'লে কোন অপরাধে, কোন নিষ্ঠুর দেবতার অভিশাপে আজ ওদের ভিখারী হতে হল?

আজ সারাদিন ব্যস্ততার মধ্যে নিজেকে ভুলে ছিল সুধন্য। এখন স্তব্ধ রাত্রির গভীর থেকে যেন ধীরে ধীরে ফেলে আসা গ্রামের স্মৃতি ভেসে উঠছে। মানব পদার্থ যতবারই সে স্মৃতি ভেসে ওঠে ততবারই দুর্বোধ্য একটা অভিমানের সফেন তরঙ্গ বুক তোলপাড় করতে করতে উঠে এসে হঠাৎ গলার কাছে আটকে যায়।। চোখ দুটো জলভারে টলটল করে ওঠে।।

আশ্চর্য। কালও কী ভাবতে পেরেছিল, মাত্র একটি রাতের ব্যবধানে সুধন্যর এতদিনের জীবনের ভাগলটাই এমন করে বদলে যাবে? অবশ্য এমনি একটা আশঙ্কা অনেকদিন থেকেই জেগে উঠেছিল মনের মধ্যে। শুধু একা সুধন্যই নয়, গ্রামের মানুষ মাত্রই সন্ত্রস্ত হয়ে আছে। আজ ও চলে আসতে বাধ্য হয়েছে, কিন্তু যারা মাটির ওপর গভীর মমতায় এখনো গ্রাম আঁকড়ে পড়ে আছে, সুধন্য নিশ্চিত জানে, আজ না হোক দু'দিন পর গ্রামের মায়া ত্যাগ করে সমস্ত চাষী পরিবারকেই এসে মিশে যেতে হবে ধনগর্বিত এই মহানগরীর রাজপথের বুভুক্ষিত মানুষের মিছিলে। সমস্ত সংকোচ, অপমানকে নীলকন্ঠের মত গলাধঃকরণ করে দ্বারে দ্বারে ভিক্ষাপাত্র এগিয়ে ধরে বলতে হবে—আমাদের বাঁচাও! আমরা নিঃস্ব...আমরা বুভুক্ষিত। চিরদিন তোমাদের আমরা বাচিয়েছি। অলক্ষে প্রতিনিয়ত আমরা ধমনীর রক্ত জল করে তোমাদের গড়ে তুলতে সাহায্য করেছি সভ্যতা, কৃষ্টি আর সম্পদের ইমারত! কিন্তু অদৃষ্টের নির্মম পরিহাসে আজ আমরাই ভেঙে পড়েছি। আজ তোমরা আমাদের বাঁচাও। দয়া কর। অনুগৃহীত কর এই মৃত্যুপথ যাত্রী হতভাগ্য মানুষগুলোকে!

উঃ, কী নির্মম এই পৃথিবী! কী ভয়ংকর তার দুর্জ্ঞেয় প্রকৃতি! কত অসহায় জমি-নির্ভর এই অসহায় মানুষগুলোর জীবন। পরপর দু'টি বছরের অনাবৃষ্টিতে সেই ছায়ানিবিড় গ্রামজীবনের বুকে আজ প্রেতের তান্ডব শুরু হয়েছে। শস্য শ্যামলা ধরিত্রী হয়ে উঠেছে মরুভূমির মত রুদ্র-রুক্ষ-কঠিন। কালও বিকেলে সুধন্য নিজের ক্ষেতের ওপর দাঁড়িয়ে অনেকক্ষণ বেদনাহত বিস্ময়ে তাকিয়ে ছিল দূর দিগন্তের দিকে। সারাদিনের প্রচন্ড অগ্নিক্ষরা সেই রক্তপিন্ড সূর্যটা এতক্ষণে ধীরে ধীরে বিদায় নিতে চলেছে পশ্চিম পাটে। আকাশটা যেখানে বহুদূরে উন্মুক্ত প্রান্তরের শেষ সীমানায় হঠাৎ শেষ হয়ে গেছে সেখানে অস্তগামী সূর্যের শেষ আভায় ডানা রাঙিয়ে এক ঝাঁক শকুন চক্রাকারে উড়ে চলেছে। এতদূরে বসেও সমস্ত ছবিটা বেশ এখনো স্পষ্ট দেখতে পাচ্ছে সুধন্য। ওদিকের বাবলা বনে দামাল আগুনে হাওয়া শব শব শব্দ তুলে ঘুরে বেড়াচ্ছে। আরো দূরে শুষ্ক সখীতলী দীঘির পাড়ে মদন বৈরাগীর অন্ধ মোষটা কাঠফাটা তৃষ্ণায় প্রাণান্ত ডেকে চলেছে আঁ আঁ... আঁ... আঁ আঁ—আঁ...আঁ...আঁ!

না, আজও সজল মেঘের কোন চিহ্ন নেই দিগ্বলয়ের কোন প্রান্তে। ভাদ্র শেষ প্রায়—তবু বৃষ্টি নেই এক ফোঁটা। মাটি যেন হাঁ করে তাকিয়ে আছে আকাশের দিকে মুখ করে। গভীর নৈরাশ্যে মনটা ভরে উঠল সুধন্যর। অন্যান্যবার যে সময়ে কাদা থস্‌থসে ক্ষেতের বুকে সবুজের সমারোহ জেগে ওঠে, কচি-কচি ধানের পাতায় বাতাস হিল্লোল তুলে ছোটাছুটি করে, চাষীরা ব্যস্ত সমস্ত পায়ে আলে আলে আনাগোনা করে ফেরে, সুজলা সুফলা সে মাটি এবার হয়ে উঠেছে শুষ্ক রুক্ষ কঠোর। পরপর দু'বছরের খরায়, অনাবাদে দুর্ভিক্ষের নিবিড় ছায়ায় গ্রামের পর গ্রাম যেন মহাশ্মশানের স্তব্ধতায় আচ্ছন্ন হয়ে রয়েছে।

আকাশের দিকে কতদিন তাকিয়ে থাকতে থাকতে কেমন যেন একটা অদ্ভুত ভয়ে বুকটা শুকিয়ে উঠত সুধন্যর। তবু বিশ্বাস করতে মন চাইত না। নিজেকে নিজেই প্রবোধ দিতে চেষ্টা করত, না না অসম্ভব। মাটি কখনো বিরূপ হয় না চাষীদের ওপর। যারা সারা বছর সর্বংসহা ধরিত্রীর সেবা করে পালা পার্বণে ষোড়শোপাচারে আরাধনা করে, ব্রত-যাত্রা পালনের মাধ্যমে মাটি আর মানুষের সম্পর্কটা নিবিড় করে তুলতে চায়, সে ধরিত্রী কখনো মানুষের দিক থেকে মুখ ঘুরিয়ে বসে থাকতে পারে, ভাবতেই পারত না ও।

কিন্তু আশ্চর্য। ঠিক তাই হল। না, আর নয়। অনাহারে নিশ্চিত মৃত্যুর দিকে তাকিয়ে বসে থেকে কোন লাভ নেই। তাড়াতাড়ি আবার নিজের বাড়ির দিকেই পা বাড়াল সুধন্য। আর দেরী নয়। আজকালের মধ্যেই যা হোক কিছু ঠিক করে ফেলা দরকার। এভাবে আর চলে না। এমনিতেই দু'বেলা ভাত খাওয়া অনেকদিন বন্ধ। কিন্তু একবেলা খাওয়াও বন্ধ হয়ে আসার জোগাড় হয়েছে। গ্রামে নাকি কারো ঘরে চাল নেই। চাল খুঁজে বেড়ানই এখন সারাদিনের মস্ত কাজ। হা অদৃষ্ট। তা না হ'লে সামু গড়াই-এর মত জোতদারও বলে কিনা—ঘরে এক দানা চাল নেই! কাল তো গড়াই মশায়ের পা দুটো জড়িয়ে ধরে অনুনয়ে ভেঙে পড়েছিল সুধন্য—বাবুগো, নারাজ হবেন না আমার ওপর মনটাক চাল দেন বাবু। কখনো তো বেইমানী করিনি—।

সামু গড়াই খেরো বাঁধান জাব্দা খাতাটায় কি যেন লিখছিলেন। ঠোঁটের কোণে বিরক্তির চিহ্ন ফুটে উঠল—মনটাক? ভাল বললি বটে? যা যা এখন কাজের সময় বিরক্ত করিস নি। নিজেই খেতে পাচ্ছি না বোলে!

—বাবু, মনটাক না হয়—আধাআধি অন্ততঃ দেন। সুমতা করার সময় না হয় পুরোটাই তুলে দেব আপনার ঘরে।

সামু গড়াই এবার হাসলেন একটু। বল্লেন, এখন চালের দর কত জানিস? তোর একমণে যা হবে, তার পাঁচগুণ এখনই পেতাম যদি চাল থাকত আমার ঘরে। হা-হা-হা-হা-। যা যা বলছি, এখন জ্বালাসনি আমায়। কাজ করতে দে।

অন্যমনস্কের মত মেটো পথ ধরে হন হন করে হাঁটছিল সুধন্য। হঠাৎ মুখোমুখি দেখা হয়ে গেল বুড়ো এবাদৎ চাচার সঙ্গে। ছেলেমেয়েদের হাত ধরে, লটবহর ঘাড়ে করে গাঁ ছেড়ে শহরপানে চলেছে চাচা। বিবিজান একগলা, ঘোমটা তুলে দাঁড়াল এবাদৎ চাচার পেছনে।

সুধন্য বিস্মিত গলায় বল্ল,... তুমি তাহলে চল্লে চাচা? আর দুটোদিন দেখে গেলে হত না?

এবাদৎ মিঁয়ার কণ্ঠস্বরটা একটা অব্যক্ত বেদনায় আবেগে থর থর করে কাঁপছিল। বল, এখনো দেখবার কথা বলছিল সুধন্য? হায় আল্লা, না খেয়ে অবধি যে বাঁচতে পারি না বাপ আমার। বরং আজ চলি। যাবার আগে শুধু বার বার খোদাতালার কাছে মিনতি করে গেলাম আবার যেন ফিরে আসতে পারি গাঁয়ে। আবার যেন ভাই ভাই হয়ে সকলে বাস করতে পারি একসঙ্গে। এই আশমান আর জমিনের মধ্যেই যেন শান্তিতে মরতে পারি।

—কিন্তু চাচা, এত বয়সে, অচেনাদেশে গিয়ে কিছু কী করতে পারবে, ভেবেছ? তাই বলছিলাম যদি মরতে হয়, এস সকলে এখানেই একসঙ্গে মরি। বিবিজান, কথাটা ভাল বলাম কী না—বল?

কিন্তু বিবিজান যেন নিরেট পাথর। সহস্র প্রশ্নতেও ও পাষাণ প্রতিমার মুখে আর কোন উত্তর ফুটবে না। ঘোমটার আড়ালে শ্রাবণের ধারার মত দুচোখ দিয়ে আকুলতা নেমে চলেছে, তা চিরদিন লোক-চক্ষুর অলক্ষ্যেই থেকে যাবে।

এবাদৎ চাচার মুখে এবার অদ্ভুত একটা হাসি ফুটে উঠল। তাড়াতাড়ি ওর কানের কাছে মুখ নিয়ে এসে বল্ল, তোকে তা হলে ভাল খবরটা বলি সুধইন্য। তোমার বিবিজানের এক চাচার ছেলে কাজ করে খিদির-পুর ডকে সে আজই পত্তর লিখেছে আকুল দরিয়ার জাহাজের খালাসীর কাজ নিয়ে যদি নতুন করে ভাসতে পারি—বলেই হো হো করে দিলখোলা হাসিতে ফেটে পড়ল চাচা? তারপর হাসি চেপে বল্ল—তাহলে সাকী একটা কাজও যোগাড় করে দিতে পারে। তা বাপ বল, ভাসতে আর আর বাকী কী? এখানেও ভাসছি, এবার না হয় আকুল দরিয়ায় ভাসব। হো—হো হো—হো। এবাদৎ চাচার হাসি যেন থামতে চায় না।

চাচা আবার সংসারবাহিনী নিয়ে তাড়া-তাড়ি হাটতে শুরু করে দিল। সুধন্য অনেকক্ষণ পেছন থেকে তাকিয়ে রইল। শুকনো এবড়ো-খেবড়ো ডাঙ্গার ওপর দিয়ে টাল সামলাতে সামলাতে হাঁটছে বুড়ো এবাদৎ মিয়া। আশ্চর্য দিলখোলা এই বৃদ্ধটি আজও এত দুঃখের মধ্যেই রসের ছোঁয়াচ পেলে রসিকতা করতে ছাড়ে না; এত প্রাণপ্রাচুর্য যে মানুষের সেই বোধ হয় মৃত্যুকে তফাতে রেখে এত বয়সেও অকুল দরিয়ায় ভেসে বেড়াবার সাহস সঞ্চয় করতে পারে।

মনটা ভীষণ খারাপ নিয়েই বাড়ি ফিরছিল সুধন্য। একে একে গ্রাম ছেড়ে সকলেই চলেছে শহরের দিকে। কে জানে, ওর কপালে কী আছে। যারা চলেছে গ্রাম ছেড়ে তারা আবার কখনো ফিরে আসতে পারবে কিনা গ্রামে, তাই বা কে জানে। গভীর একটা দীর্ঘশ্বাস বেরিয়ে এল ওর বুক থেকে। যাক যাদের ইচ্ছে যাক, কিন্তু প্রাণ থাকতে সুধন্য কখনো গ্রাম ছেড়ে যাবে না। যদি মরতে হয় স্নেহনিবিড় এই গ্রামের মাটিতেই মরবে। সে মৃত্যুতে অনেক শান্তি, অনেক সান্ত্বনা।

বাড়ির কাছাকাছি এসেই একটা করুণ কান্না শুনে থমকে দাঁড়িয়ে পড়ল সুধন্য। উৎকর্ণ হয়ে শুনতে চেষ্টা করল, কোনদিক থেকে ভেসে আসছে কান্নাটা? কে কাঁদছে? কেন কাঁদছে? গত বছরে দাসুঠাকুরের গোমস্ত বৌটা বাঁশ বাগানে গলায় দড়ি দিয়ে মরার পর ওর বুড়ি-মা যেমন ইনিয়ে বিনিয়ে কাঁদত—কান্নাই ঠিক সেই রকম।

একটু পরই ব্যাপারটা বোধগম্য হল ওর কাছে। কাঁদছে আর কেউ নয়—পারুলে। নিতাইয়ের তর্জন গর্জনটাও কানে এল সঙ্গে সঙ্গে না, যেখানে খুশি গিয়ে মর—আমরা তার কী জানি? তবে এই শেষ বলে রাখলাম, তোমার ছেলে যদি ফের আমাদের ঘরে ঢুকে ছেলেদের হাত থেকে ছোঁ মেরে

খর—স্রেফ আছড়ে মেরে ফেলে দোষ—হ্যাঁ, মনে রেখ আমার নাম নেত্য ...হ্যাঁ।

পারুল কাঁদত কাঁদতে কী যেন বলল, শুনতে পেল না সুধন্য। কিন্তু নিতাই আবার কুৎসিৎ চিৎকার করে উঠল, বটে দোষ আমাদের? দাদা আমাদের নিজের পয়সায় মানুষ করেছে—হ্যাঁ। বাঁজ জামটা তো ছিল মোর বাপের —না তোমার বাপের জমি? মবাপেটে যে দেখছি খুব ফুটুনির খৈ ফুটছে এখনো? দাঁড়াও আর দুদিন যাক তখন বুঝবে নিতাইকেও খোসামোদ করতে লাগে কী না?

সুধন্যের রক্তে ততক্ষণে দুরন্ত মাদলের সর্বনাশা বোল উঠছে বেজে ধিতাং ধিতাং ধিতাং—ধিতাং আশ্চর্য মা মরা ছোট দেওর-দের একদিন নিজে হাতে মানুষ করেছে পারুল। কিন্তু তাদের সবচেয়ে দুর্জনে তাকেই এতবড় কথা বলতে একটুও মুখে আটকাল না নিতাইয়ের।

নিতাই রেলের পয়েন্টসম্যান। ছোট ভাই কানাই শহরে রিকসা চালায়। সুধন্যর মত নিছক চাষী নয়, ওর মত নিঃস্ব নয় আজ, তাই নিঃস্ব ভাইয়ের সংসার বেকার হয়ে বেড়ানর চেয়ে ভিন্ন হওয়াই শ্রেয় বোধ করেছে। কিন্তু তা সত্ত্বেও কী ওদের মনের আশ মিটল না? এই যে পর পর দুদিন না খেয়ে রয়েছে ওরা তাতে কী মনে ওদের একটুও দোলা জাগে না? নিজে হলে কী পারত সুধন্য?

অভাব অনটন অশান্তি আর ঝগড়া এখন সংসারে দৈনন্দিনের ব্যাপার হয়ে দাঁড়িয়েছে। যবে থেকে আকাল দেখা দিয়েছে তবে থেকেই ঘরে অশান্তি বাসা বেঁধেছে। অন্য-দিন হলে পারুলকে বুঝিয়ে সুঝিয়ে শান্ত করতে চেষ্টা করত। আর খাঁদেয় পাগল ছেলেটাকে কোলে নিয়ে মাঠে ঘুঘু দেখিয়ে ভুলিয়ে আনত। কিন্তু আজ মনটা ভীষণ খারাপ নিয়েই বাড়ি ফিরেছিল সুধন্য। মনের ভেতরটা সর্বক্ষণ অশান্তির আগুনে জ্বলছিল; হয়ত বা আজকের ঝগড়াটা তেমন কিছুই নয়। অন্তত অঘটন ঘটার মত নতুন কোন কারণ ঘটে নি। রোজের মতই ঝগড়া ওটা। কিন্তু ধূমায়িত আগুনটা হঠাৎ মনের আগুনের ধোঁয়াচ পেয়ে যেন নিমেষে দাউ দাউ করে জ্বলে উঠল। না, অসম্ভব। আর সহ্য করতে পারবে না সুধন্য। অনেক সহ্য করেছে কিন্তু আর নয়। আজ এখানেই এর একটা নিষ্পত্তি হওয়া দরকার। চারিদিক থেকে এত নির্যাতন আর যেন বরদাস্ত হচ্ছে না!

বাকী পথটা এক দৌড়ে ছুটে এসে, উঠানের ওপর থমকে দাঁড়িয়ে গর্জে উঠল— নিতাই। যদি বাপের বেটা হোস আমার সামনে এসে বল কেন তুই ওর বাপ তুলি? হতভাগা রোজ রোজ তোমার এই বাঁদরামী ভাল লাগে না—

আগে নিতাই দাদার সামনে দাঁড়িয়ে মুখ তুলে কথা বলতে পারত না। সম্প্রতি চাকরী পেয়ে আর বিয়ে করে রীতিমত লম্বাকের মত কথাবার্তা বলে। এসময়ে সঙ্গে সমতালে চিৎকার করতে করতে ছিটকে বেরিয়ে এল ঘর থেকে—না, বলবে না! যতবড় মুখ নয় মাগীর, ততবড় কথা। বলে কী না আমরা—

কিন্তু কথাটা আর সম্পূর্ণ করতে পারল না নিতাই। সে ধৈর্যই নেই সুধন্যর। অবশ্য তার দরকার নেই। পারুল সম্বন্ধে ওর এই একটি মন্তব্যই যথেষ্ট। রক্তে সেই দুরন্ত মাদলের সর্বনাশা বোলটা আবার বেজে উঠতেই চকিতে যেন সবকিছু ওলোট-পালোট হয়ে গেল। হাতের লাঠিটা নিমেষে শূন্যে তুলে ধরে সজোরে বসিয়ে দিল নিতাইয়ের মাথায়। আশ্চর্য। একদিন যার কোলে বসে সন্তানের মত মানুষ হয়েছিস আজ দুদিনের মুখ দেখে তাঁকেই এতটা কথা বলতে মুখে বাঁধল না। বেইমান কোথা-কার—

হঠাৎ সমস্ত পৃথিবীটাই যেন পায়ের নিচে ঘূর্ণির মত বন বন করে ঘুরে উঠল কোথা দিয়ে কি যে ঘটে গেল বোঝার আগেই সন্ধ্যার স্তব্ধ আকাশ সচকিত করে তুমুল সোরগোল পড়ে গেল। ভীষণ একটা আর্ত চিৎকার করে নিতাই মাথা ঘুরে মাটিতে লুটিয়ে পড়ল। ফিনকি দিয়ে তাজা রক্তের স্রোত ছুটল। পারুল হাউহাউ করে ঘরের ভেতর থেকে ছুটে এসে নিতাই-য়ের ক্ষতস্থানটা চেপে ধরে সাহায্যের জন্যে আকুল হয়ে উঠল। পাড়ার লোক যে যেখানে ছিল দুড়দাড়িয়ে ছুটে এল।

সুধন্যের বুকের মধ্যে হঠাৎ জাগা দুরন্ত ঝড়টা ততক্ষণে বিশ্বচরাচর লণ্ডভণ্ড করে আবার চকিতে উধাও হয়েছে। মাথায় হাত দিয়ে বসে অপলক চোখে কেবল তাকিয়ে আছে নিতাইয়ের দিকে। যে ভাইকে ছোটবেলা থেকে সন্তানের মমতায় মানুষ করেছে আজ রাগের মাথায় তাকেই নিজে হাতে খুন করে বসল, যেন ভাবতেই পারছে না সুধন্য।

ক্রমে রাত আরো বাড়ল। পঞ্চায়েতের সভা বসল। একেবারে মরেনি নিতাই ঠিকই কিন্তু অবস্থা দাঁড়িয়েছে অত্যন্ত সঙ্গীন। শহরের হাসপাতালে ভর্তি করা ছাড়া কোন উপায় নেই। মুস্কিলটা হল সেখানেই। ব্যাপারটা আর লুকোন যাবে না। পুলিশের কানে যাবেই। আর তখনই সুধন্যকে হত্যা করার চেষ্টার অপরাধে হয়ত গ্রেপ্তার করে নিয়ে যাবে থানায়।

কিন্তু সুধন্যর মত ঠাণ্ডামাথার মানুষ যে এমন একটা কাজ করে বসতে পারে সেটা যেন সকলের কাছেই বিস্ময়ের বিষয়। যে মানুষ সাতচড়ে কথা বলতে জানে না, সে হঠাৎ এমন অঘটন ঘটিয়ে বসল? যেমন করেই হোক ওকেও বাঁচাবার একটা উপায় বার করতেই হবে পঞ্চায়তকে!

সুধন্য সভার এক কোণে মাথা নিচু করে বসে চুপচাপ শুনে যাচ্ছিল সকলের কথাবার্তা। নিজের ওপর ঘেন্নায় অনুশোচনায় মনের ভেতরটা অন্তহীন ক্ষোভে জ্বলছিল। ভাবছিল আর কেন? এ জীবনে অনেক যন্ত্রণাই তো সইল কিন্তু আর নয়। অনেকদিন থেকেই গ্রাম ছেড়ে চলে যাবে যাবে ভাবছিল। কিন্তু কোথায় যেন একটা মমতা লুকিয়ে ছিল। যাই যাই করেও তাই যেতে পারে নি। আজ সেই মমতার বন্ধন যেন হঠাৎ ছিন্ন হয়ে গেল। ভালই হল। এবার আর কোন পিছুটান রইল না। স্বচ্ছন্দে গ্রাম ছেড়ে অনিশ্চিতের পথে পা বাড়াতে পারবে। এখুনি গ্রাম ছেড়ে চলে যাবে, কিন্তু নিতাইকে বাঁচাক ওরা। নতুন যাত্রা শুরু হোক সুধন্যর জীবনে।

কর্পোরেশনের পাইপের মধ্যে ক্লান্ত দেহটা গুটিয়ে শুয়ে, ফেলেআসা জীবনটার কথা ভাবতে ভাবতে বোধহয় তন্দ্রাচ্ছন্নই হয়ে পড়েছিল সুধন্য। তন্দ্রার মধ্যে এতক্ষণ দুঃস্বপ্নের মত দেখতে পাচ্ছিল কালকের ঘটনাটা। হঠাৎ তন্দ্রা ভেঙ্গে ধরমড়িয়ে উঠে বসল। পাইপের দুটো প্রান্ত দিয়ে যতদূর দেখা যায় তাড়াতাড়ি চোখ বুলিয়ে নিয়ে নিশ্চিন্ত হয়ে নিল। না এভাবে ঘুমিয়ে পড়াটা ঠিক হয় নি? বাইরে প্রবল বৃষ্টিটা কখন থেমে গেছে জানতেই পারে নি সুধন্য। দূরে ল্যাম্পপোস্টের আলোটা যেন এখন অনেক নিষ্প্রভ বলে মনে হচ্ছে। পথঘাট সমস্ত ফাঁকা। পাইপের আশপাশগুলো ঠিক গ্রামের মত অসংখ্য ঝিঁঝির ঐকতানে মুখরিত হয়ে রয়েছে। দু'চারটে ব্যাংও ডেকে চলেছে গ্যাঙ্গর—গ্যাঙ্গ—! কোথায় কতদূরে কে জানে একটা রাস্তার কুকুর বিলম্বিত সুরে ডেকে চলেছে—ঘে-উ-উ-উ ঘেউ-উ-উ...। রাত এখন কত অনুমান করতে পারল না সুধন্য।

কলকাতার বুকে সুধন্যর প্রথম রাত্রি এমনি করেই শেষ হয়ে একসময়ে আকাশের পূবকোণে আলোর রেখা ধীরে ধীরে ফুটে উঠল।

পারুল সারাদিন পানুকে আগলে বসে থাকে আস্তানায়। আর সুধন্য বেরোয় অন্নের সংস্থানে। যাবার আগে বার বার সাবধান করে যায়—খুব সাবধানে থাকিস বউ। দেশকাল ভাল নয় এখানের। একটু এদিক-ওদিক হলেই হারিয়ে যাবি মানুষের ভীড়ে।

ক্রমে একদিন গেল। দুদিন গেল। তিনদিন গেল। সপ্তাহ শেষ হল। সময়ের চাকা ধীরে ধীরে ঘুরতে ঘুরতে পুরো একটা মাসই পার হতে চলল। সঙ্গে সঙ্গে তিনটি মানুষের জীবনও যেন বিকল হয়ে এল। কিন্তু এভাবে আর তো চলে না। ভিক্ষে যদিবা কিছু মেলে কিন্তু আহার্য মাত্রেরই আকাশছোঁয়া দরের জন্যে এখানেও অনাহারে মরার অবস্থা। ওর চেয়ে দেশে থাকাই ছিল ভাল।

কথাটা কিছুদিন থেকে সুধন্যও যে না ভাবছে তা নয়। তবু গ্রামে ফিরতে যেন মন চায় না আর। পারুল এক একদিন কথাটা তুললেই বরং খিঁচিয়ে ওঠে সুধন্য- তুই চুপ যা দেখি। তোর যেতে ইচ্ছে হয়—তুই যা। কিন্তু আমি আর ফিরব না গ্রামে।

ধমক খেয়ে পারুলের দু'চোখ জলভারে টলটল করে ওঠে। নিজেরও যে গ্রামে ফিরতে খুব ইচ্ছে তা নয়। নিজের জন্যে ভাবনা করে না। কিন্তু এই যে একটা এতটুকু ছেলে

সারাদিন অনাহারে কাটাচ্ছে তার কথা ভাবলেই মনে হয় মিথ্যে জেদ করে এখানে বসে থাকা উচিত নয়। নিজেদের গ্রামে পরিচিত মানুষদের কাছে চেয়েচিন্তে তবু কোনরকমে বেঁচে থাকা সম্ভব। কিন্তু এখানে কে দেখবে। তাছাড়া চোখের ওপর সুধন্যকেও তো দেখছে, এই এক মাসেই শরীরের কী হাল হয়েছে। সব বুঝেশুনেও এখানে থাকার কী অর্থ, বুঝে উঠতে পারে না পারুল। তাছাড়া নিতাই ঠাকুরপোরই বা কী হল কে জানে? কেমন আছে তাও জানার কোন উপায় নেই। চোদ্দ বছর বয়েসে এ-বাড়ির বউ হয়ে এসে পাঁচ বছর বয়েসের যে শিশুটাকে মায়ের মত স্নেহ ভালবাসা দিয়ে মানুষ করেছে ও, তার ওপর এতটা নির্মম আচরণ করতে পারল কী করে সুধন্য? নিজেদের মধ্যে রাগ অভিমান চলছিল আবার মিটেও যেত। তার মধ্যে এমন মত্ত চণ্ডালের মত রাগ নিয়ে তোমার ঝাঁপিয়ে পড়ার কী দরকার ছিল!

সুধন্যার কাছে ধমক খেয়ে মনের মধ্যে পুঞ্জিভূত অভিমানের জমাট পাথরটা হঠাৎ গলতে শুরু করল পারুলের। সুধন্যকে ভীষণ অবাক করে হঠাৎ ফুঁপিয়ে কেঁদে ফেল্ল—দোহাই তোমার। চলো এবার আমরা দেশে যাই। এখানে আর একদিনও থাকতে ইচ্ছে করে না! তোমায় কিছু বলিনি, কিন্তু জান, বড় ভয় করে। সে কথা আমি কখনো তোমায় বলতে পারব না। শুধু বলছি... শোন...গ্রামে ফিরিয়ে নিয়ে চলো আমাদের।

পারুলের কথা শুনে সুধনা কিছুক্ষণ কিছু না বোঝার দৃষ্টিতে তাকিয়ে থাকে ওর মুখের দিকে। তারপর জিজ্ঞেস করল—বল না ব্যাপারটা কী? তবে তো বুঝব—!

পারুল কিছুক্ষণ চুপ করে থেকে দ্বিধাটাকে কাটিয়ে উঠতে চেষ্টা করল। তারপর শুকনো একটা ঢোক গিলে বল্ল—ঐ যে গো মোটামত বউটা, সেদিন কলতলায় চান করতে গেছি, তা দেখি আমায় দেখে খুব হাসতে লেগেছে—!

তারপর—!

হঠাৎ সুধন্যার কণ্ঠস্বরে আগ্রহের সুর ফুটে উঠতে দেখে সংকোচে আরো আড়ষ্ট হয়ে উঠল পারুলের জিভটা! একটু থেমে আবার শুরু করল, তখন কারণটা বুঝি নি। বিকেলে নিজেই এল আমার সঙ্গে গল্প করতে।

তারপর—!

আরো কয়েকটা শুকনো ঢোক গিলে গলাটা পরিষ্কার করে নিয়ে পারুল আবার শুরু করল,...বউটা তখনো সকালের মত মুখে আঁচল চাপা দিয়ে হাসছিল। বল্ল... সোহাগী না আহ্লাদী...!

আমি আপত্তি করতে বল্ল,...তা নয় তো কী? মানুষটা যে দিন দিন মরতে বসেছে, আমরা চোখের ওপর দেখতে পাচ্ছি, আর তুমি দেখতে পাও না? সকলে কী এমনি করে না খেয়ে শুকিয়ে মরবে? এমনি সোমত্ত মেয়েমানুষ অকেজ হয়ে স্বামীর ঘাড়ে বসে থাকা কী ভাল ভাই। তোমার নিজেরও তো কিছু রোজকার করা উচিত।

পারুল এবার মাথাটা আরো নামিয়ে নিয়ে বল্ল, বল্লাম, কিন্তু উপায় কী বলে দিন আমার। আমি তাই করব।

বউটা হেসে বল্ল—কাজটা এমন কিছু কঠিন নয়। তবে আগে মনটা ঠিক কর। পরে যেন আবার দোষ দিও না বাপু। তারপর একটু থেমে আবার শুরু করল,...আমিও একদিন তোমার মত ঘরের বউ ছিলাম। আজ রাস্তায় এসে দাঁড়িয়েছি। মরতে মরতে বাঁচতে শিখেছি। ঠিক করেছি—তা সে যেমন করেই হোক, বাঁচতেই হবে। কেন মরব সকলকেই বলিও তাই—যদি মরতে হয় সকলকেই মরতে হবে। সকলে বুঝুক, দেহের এক অংশে পচন ধরলে অন্য অংশেও পচন ধরবে।

আরো অনেক কিছুই বলেছিল বউটা। তবু কেন কে জানে, ইংগিতটা স্পষ্ট হয়নি। পারুলের কাছে। তাই, সন্ধ্যের পর সেদিন সেই বউয়ের সঙ্গে এসে দাঁড়াল পেছনের রাস্তার ওপর। কিন্তু ব্যাপারটা চকিতে প্রণিধান করে নিয়েই সভয়ে উর্দ্ধশ্বাসে ছুটে পালিয়ে এসে পানুকে বুকের মধ্যে জড়িয়ে ধরে আকুল কান্নায় ভেঙে পড়েছিল পারুল।

সব শুনে সুধন্য অনেকক্ষণ গুম মেরে বসে রইল। পারুলের কথার কোন উত্তর দিতে পারল না। কিন্তু অনেকদিন পর সেদিন রাত্রে ফেলে আসা গ্রামখানাকে আবার স্বপ্ন দেখল। যেন সারারাত প্রবল বৃষ্টির পর সকালে দিগ্বিদিক আলোকিত করে সূর্য উঠল। সোনালী রোদে ধানের শীষ ঝলমল করে হাসছে। মাঝে মাঝে ব্যস্ত চাষীরা দ্রুত হাতে ঘাষ নিড়িয়ে চলেছে আর খুশীর উচ্ছ্বাসে গান গাইছে। যেন বহুদূর থেকে সে সংগীত ভেসে আসছে সুধনার কানে...ও চাষী ভাই'রে...দ্যাখ ক্ষেতের আলে আলে...সোনালী ধান হাসে... পরানে কি যে খুশীর দোলা জাগে...ও-ও-ও ভাইরে...গড়ি সোনার প্রতিমাখানি...এই সোনার মাটি দিয়ে...!

কি মিষ্টি মধুর সুর। কি অদ্ভুত আবেগ এ সংগীতের মর্মে মর্মে! মাটি জল আকাশ আর মানুষ একাকার হয়ে মিশে আছে গ্রামে। স্বপ্ন দেখছে সুধন্য যেন দুর্ভিক্ষের এতটুকু চিহ্ন নেই সেখানে! অন্যান্যবারের মত এবারও গ্রামের আকাশে বাতাসে শরতের আমেজ লেগেছে। শিউলি ফুটতে শুরু করেছে একটা-দুটো। কাশের দামে দামাল হাওয়া হিল্লোল তুলে ফুটোফুটি শুরু করেছে! নদীর ঘোলাটে জল ধীরে ধীরে আবার সচ্ছতোয়া হবে আসছে। মাঠে মাঠে সোনার ধান গরবিনীর মত মাথা দুলিয়ে হাসছে! বারোয়ারী তলায় প্রতিমার গায়ে রংএ তুলির টান দিচ্ছে শরৎ। পুজোর আর বেশী দেরী নেই। আগমনীর আগমনের সাড়া পড়ে গেছে গ্রামে গ্রামে। ছোট ছোট ছেলেমেয়েরা সারাদিন পথঘাটকে ঘিরে বসে কৌতূহলী চোখে তাকিয়ে বসে আছে মায়ের মুখের দিকে! ঐ যে ঢামের ঢাকে আগমনীর বোল উঠছে...কুড়ুর কুড়ুর ঢ্যাং...ড্যাডাং...ড্যাডাং...ড্যাং...!

সারাবছর অনিশ্চয়তার আশংকা, দুঃখ কষ্ট, রোগ মহামারী প্লাবনের পর সমস্ত গ্রামবাসী আবার মহাপুজোয় মেতে উঠেছে। হরনাথ পণ্ডিত যেন এবারও সন্ধ্যারাত্রির পঞ্চপ্রদীপ হাতে মায়ের আলো-ঝলমল মুখের দিকে তাকিয়ে ভাব-গম্ভীর কণ্ঠে বলছে মাভৈঃ। জয় মা জগদ্ধাত্রী, দশ-প্রহরণ ধারিণী মা দুর্গা, তুমিই আমাদের ভরসা। তুমি সব, তুমি দেখ যেন বছর বছর এমনি করে তোমার আরাধনা করতে পারি—শুধু এই মিনতি জানাই গো তোমার পায়ে। ওরে কে আছিস বাজা শাঁখ, বাজা ঢাক-ঢোল, কাঁসর ঘণ্টা... দ্যাখ মা হাসছেন...শুনেছেন আমাদের কথা...

আঃ কী মধুর স্বপ্ন। ঘুমিয়ে ঘুমিয়ে যেন শুনতে পাচ্ছে সুধন্য ঢাক-ঢোল, কাঁসর-ঘণ্টা, উচ্চকিত শঙ্খরোলে ঠাকুরতলার আকাশ-বাতাস ঘন ঘন মুখরিত হয়ে উঠছে।

ঘুম ভেঙে ধড়মড়িয়ে উঠে বসল সুধন্য অবিশ্বাস্য দৃষ্টিতে চাকতে চারিদিকে দৃষ্টি বুলিয়ে নিল। তা হলে কী সত্যিই স্বপ্ন দেখছিল এতক্ষণ? কিন্তু পুজো-তলার কাঁসর-ঘণ্টার রেশ যে এখনো বাজছে কানে! কিছুক্ষণ স্থির হয়ে বসে কি যেন ভাবল। ঠিকই! আশ্বিন শেষ হতে চলল। গ্রামে থাকলে এতদিনে পুজোর সাড়া জাগত মনে! কিন্তু মন যখন টেনেছে তখন এখানে আর নয়। গ্রামেই ফিরে যাবো আবার! মরতে যদি হয় গ্রামের মাটিতেই শান্তিতে মরবে। এবাদৎ চাচার কথাগুলো মনে পড়ে গল হঠাৎ আমার জন্যে খোদাতালার কাছে প্রার্থনা কর ভাই, যেন আবার ফিরে আসতে পারি গ্রামে। যেন এই আশমান আর জমিনের মাঝে শান্তিতে মরতে পারি।

সেই ভাল। এখানে আর এক মুহূর্ত দেরী করবে না সুধন্য। আজই ট্রেনে চেপে বসবে! কথাটা ভাবতেই অনেকদিন পর ঠোঁটের কোণে হাসির রেখা ফুটে উঠল নিজেই বুঝতে পারল। ঘুমন্ত পারুলের কানের কাছে মুখ নিয়ে গিয়ে তাড়াতাড়ি স্বপ্নের মত ফিস্‌ ফিস্‌ করে বলল, বউ, শুনছিস? রাগ করিস নি, শোন, তোর কথাই ঠিক। চল, গ্রামে ফিরে এবার। এ নিস এখুনি স্বপ্ন দেখলাম, গ্রাম যেন ডাকছে আমাদের। বলছে, আয় চলে আয় এখুনি। আর দেরী করিস নি।

পারুল ঘুম ভেঙে কিছুক্ষণ কিছু না বোঝা চোখে তাকিয়ে রইল সুধন্যর মুখের দিকে! তারপর ওর দুটো হাত জড়িয়ে ধরে সোহাগ ভরে বলে উঠল,—ঠিক! ঠিক বলছ? আজই যাবে তো? সত্যি চলো। এখানে যেন আর একদিনও মন টেঁকছে না আমার।

সকাল থেকেই বাধাছাঁদা শুরু হল! খুশীর উচ্ছ্বাসে দুদিন অনাহারে থেকেও খিদেটাকে পর্যন্ত বেমালুম ভুলে গেল। পানু কেবল ঘ্যান-ঘ্যান করছিল, কিন্তু সুধন্য আগে যেমন ছেলেকে তাঁসদার ভুলোতে মাঠে নিয়ে গিয়ে জুজুবুড়ির গল্প শুনিয়ে

মাথা ঘুরে মাটিতে লুটিয়ে পড়ল

শান্ত করত, তেমনি করে বাইরে থেকে কিছুক্ষণ ঘুরিয়ে নিয়ে এল—আর কেঁদো না পানু। দ্যাখ না আজই আমরা ফিরে যাব গ্রামে। ব্যস তখন যা চাইবে...সব দোব তোমায় খেতে। শুধু আজকের দিনটা চুপটি করে থাক সোনা!

বিকেলে ট্রেন। কিন্তু সেইটুকু সময় যেন তর সয় না ওদের। দুপুরের আগেই বেরিয়ে পড়ল! বিকেলে প্লাটফর্মে ট্রেন এসে ঢুকতেই ছেলে-বউয়ের হাত ধরে সকলের আগেই চেপে বসল সুধন্য! ট্রেন ছাড়তে তখন মাত্র একঘণ্টা বাকী। তারপরই পেছনে ফেলে যাওয়া এই শহরের দূরত্ব যত বেড়ে যাবে, ততই কমে আসবে নিজেদের গ্রামের দূরত্ব! আশ্চর্য, মনে মনে ভাবতেই যেন অদ্ভুত একটা পুলকে ভরে উঠছে মন-প্রাণ! আবার যে কখনো গ্রামে ফিরতে পারবে, আজকের মত এমন করে কোনদিন ভাবতে পারেনি সুধন্য।

দুজনেই চুপচাপ বসে অপলক বিস্ময়ে খোলা জানলা দিয়ে তাকিয়ে আছে বাইরের দিকে! কত অসংখ্য যাত্রী ঐ প্লাটফর্মের ওপর ব্যস্ত-সমস্ত পায়ে চলা ফেরা করে বেড়াচ্ছে, অবাক চোখে দেখছে। একটা ফেরিওয়ালা ওদের চোখের সামনে খাবা-রের বড় হাতে চিৎকার করে ফেরি করে বেড়াচ্ছে। হাতে পয়সা থাকলে পানুকে একটা কিনে দিত! কিন্তু গ্রামে ফেরার আগ্রহে এ দুঃখটাকে দমন করতে চেষ্টা করল পারুল। আর তো মাত্র কয়েক মিনিট বাকী ট্রেন ছাড়তে! তারপরই নিজেদের গ্রামে পৌঁছে গেলে আর ভাবনা কী!

হঠাৎ বজ্রদূতের মত একজন টিকিট চেকার কামরায় উঠে ওদের চোখের সমস্ত আলো যেন এক ফুৎকারে নিভিয়ে দিল— দেখি টিকিট?

বিনা মেঘে বজ্রাঘাতের মত কিছুক্ষণ স্তম্ভিত হয়ে বসে রইল সুধন্য। তারপর যেন সম্বিত ফিরে পেয়ে অনুনয়ে জোড়া হাতে পরল ও—মোরা যে না খেয়ে মরছি হুজুর, টিকিট কেনার পয়সা কোথায় পাব বলে দেন?

টিকিট চেকার ততক্ষণে অন্য যাত্রীদের টিকিট পরীক্ষায় ব্যস্ত হয়ে পড়েছিলেন। তাই বিরক্ত হয়ে উঠলেন—সেটাও আমার বলে দিতে হবে? কোন উপায় নেই আমার দয়া করার—বুঝলে কর্তা। হয় ভাড়া দাও, আর নয়তো এখনো বলছি ভালয় ভালয় নেমে পড় ট্রেন থেকে।

সুধন্য এবার চেকারের পা জড়িয়ে ধরে কেঁদে উঠল, হুজুর, দয়া করুন গরীব চাষীকে। ছেলে-বউ নিয়ে কোথায় দাঁড়াব বলে দিন? বিশ্বাস করুন, মোরা দুদিন না খেয়ে আছি। গ্রামে ফিরতে না পারলে শুকিয়ে মরতে হবে সকলকে। দয়া করুন গো বাবু আমাদের!

হঠাৎ ঢং-ঢং—ঢং-ঢং করে ট্রেন ছাড়ার শব্দ বেজে উঠতেই চেকার আর কোন কথা না বাড়িয়ে সুধনার হাতটা চেপে ধরে গর্জে উঠল এখনো নাববে কীনা বল? যত সব ভণ্ডের দল। চালাকী মারতে জায়গা পাও না? তবু আমার জানতে যদি না কিছু বাকী থাকত!

এক রকম ঠেলতে ঠেলতেই ওদের ট্রেনের কামরা থেকে নামিয়ে দিল টিকিট চেকার। আর সংগে সংগে ওদের বেদনাবিহ্বল দৃষ্টির সামনে দিয়ে ট্রেণটা হুস-হুস শব্দে করে ছুটে চলে গেল ওদের গ্রামের পথে।

হঠাৎ আকুল কান্নায় ভেঙে পড়ল সুধন্য : এ কী হল? কেন এমন হল কিছুতেই যেন ভেবে উঠতে পাচ্ছে না, সমস্ত পৃথিবীটা যেন পায়ের নিচে নিঃসীম বেদনায় থর থর করে কেঁপে চলেছে। এক গলা ঘোমটার আড়ালে নিঃশব্দে ফুঁপিয়ে কাঁদছে পারুল!

কী করে যে টলতে টলতে শেয়ালদা স্টেশন থেকে বাইরে বেরিয়ে এসেছিল ওরা, নিজেরই হুঁস ছিল না সুধন্যর। সর্বগ্রাসী খিদের জ্বালায় পেটের মধ্যে যেন দাউ দাউ করে আগুন জ্বলছে। কান দুটো যেন ভোঁ ভোঁ করছে। হাঁটতে গেলেই পা দুটো টলছে। স্টেশনের বাইরে রাস্তার এক পাশে তিনজনে জড়াজড়ি করে বসে হতভম্বের মত তাকিয়ে রইল চলমান জগতটার দিকে। কত অসংখ্য মানুষ চলেছে পথ দিয়ে? কত ট্রাম বাস লরী ছুটেছে অন্তহীন বেগে। অসংখ্য

উজ্জ্বল আলোর মালা পরে রাতের কলকাতা যেন মোহিনী নারীর সাজে সেজে উঠছে ধীরে ধীরে। কত বিলাস-বৈভব, কত সম্পদ ছড়ান চারিদিকে। আশ্চর্য! তবু এখানেও মানুষ না খেয়ে মরে, ভাবতে পারে না সুধন্য।

অনেকক্ষণ পর যেন সম্বিৎ ফিরে পেল। হুঁস হল পানু কেঁদে কেঁদে কখন ঘুমিয়ে এলিয়ে পড়েছে ওর মার কোলের মধ্যে। খেয়াল হল পারুলের সংগে অনেকক্ষণ কথা বলা হয় নি। কিন্তু কথা বলতে চেষ্টা করতেই গভীর নৈরাশ্যই যেন অননুভূত একটা আবেগে কাঁপিয়ে দিল কণ্ঠস্বরটা—বউ শুনছিস? গ্রামে বোধহয় আর ফেরা হল না আমাদের!

পারুল কোন কথা বলতে পারল না। শুধু ভুলে থাকা কান্নাই আবার দ্বিগুণ বেগে ঝর ঝর করে নেমে এল দু চোখ বেয়ে। নিঃশব্দে মুখটা অন্যদিকে ঘুরিয়ে নিল। আরো কয়েকটা মুহূর্ত এমনি করে কেটে গেল। মনে মনে কী যেন ভেবে নিয়ে হঠাৎ একটু চঞ্চল হয়ে উঠল সুধন্য। তারপর চারিদিকে সন্তর্পণে চোখ বুলিয়ে নিয়ে আবার আস্তে আস্তে ডাকল, বউ!

পারুল নির্লিপ্ত চোখ দুটো তুলে উত্তর দিল, বল?

কিন্তু পারুল উত্তর দেবার আগেই প্রচণ্ড অস্থিরতায় উঠে দাঁড়াল সুধন্য! মনের সংগে অত্যন্ত দ্রুত বোঝাপড়া করে নিল—না, আর ভয় করবে না। কোন বিহ্বলতাও নয়। যেমন করেই হোক গ্রামে ওদের ফিরতেই হবে। অবিশ্বাস্য একটা দৃঢ় প্রত্যয়ে ভরে উঠল মনপ্রাণ। শিরা-উপশিরায় উষ্ণ রক্তের প্রবাহটা হঠাৎ যেন দুরন্ত হয়ে উঠল!

পারুলকে আবার স্টেশনের টিকিট ঘরের সামনে বসিয়ে রেখে বলে গেল, একটু বোস বউ, আমি এখুনি আসছি। কাঁদিস নি। যেমন করেই হোক আজ গ্রামে ফিরবই আমরা!

তারপর দ্রুত পায়ে শেয়ালদার স্টেশনের বাইরে বেরিয়ে এসে জনতার ভীড়ে মিশে গেল সুধন্য। ভীড়ের মধ্যে হন হন করে এগিয়ে চলল। কিন্তু কোথায় টাকা? এই এক মাসে কলকাতাকে ওর ভাল করে জানা হয়ে গেছে! সামান্য কটি টাকা—কিন্তু চারিদিকে ত বিলাস-বৈভব অপচয়ের মধ্যেও জীবন ধারণের মত টাকার সন্ধান আজও পায় নি সুধন্য ঃ তবু আজ ওকে টাকা পেতেই হবে!

একটা খাবারের দোকানের সামনে থমকে দাঁড়িয়ে পড়ল ও! শো কেসের ভেতর থরে থরে সাজান খাবারগুলোর দিকে তাকিয়ে খিদের জ্বালায় পানুর কান্নাটাকে যেন নিজের বুকের মধ্যে অনুভব করল!

সুধন্যর ঠিক সামনেই একজন তরুণী হাতে বই নিয়ে সঙ্গী এক তরুণের সংগে গল্প করতে করতে হাঁটছিল। হঠাৎ কী একটা কথায় তরুণী উল্লাসে খিল খিল করে হেসে উঠল! মেয়েটার গলার হারটা যেন চোখে ঝিলিক দিয়ে উঠল! কোন রকমে ইচ্ছেটাকে দমন করে আবার ভীড় ঠেলে এগিয়ে চলল সুধন্য!

অনেকক্ষণ পর হঠাৎ অভাবিত একটা সুযোগ এসে গেল ওর সামনে! একটি সুবেশা বিবাহিতা তরুণী ট্যাক্সী থেকে নেমে, এক তাড়া নোট বার করে, তার থেকে ভাড়া মিটিয়ে দিল। বাকীগুলো আবার ভ্যানিটি ব্যাগের মধ্যে পুরে হাঁটতে শুরু করে দিল।

এদিকের রাস্তাটা বেশ নির্জন। দোকান-পাটও এদিকে কম—তাই পথও কিছুটা অন্ধকার। সামনে পেছনে চকিতে সতর্ক দৃষ্টি বুলিয়ে নিল সুধন্য। তারপর মেয়েটাকে পেছন থেকে অনুসরণ করে হাঁটতে শুরু করে দিল!

আশ্চর্য! কত তাড়াতাড়ি হাঁটছে মেয়েটা! কিছুতেই যেন নাগাল পাচ্ছে না ও! অথচ এই জায়গাটাই সবচেয়ে নিরালা। দেরী হয়ে গেলে হয়ত দূরের লোকগুলো এসে পড়বে কাছে!

হঠাৎ ছুটতে শুরু করল সুধন্য। মেয়েটার কাছে পৌঁছেই পেছন থেকে এক হ্যাঁচকা টানে হাত থেকে ব্যাগটা ছিনিয়ে নিয়েই আবার উল্টো দিকে ঊর্ধ্বশ্বাসে ছুটতে শুরু করল! সংগে সংগে পেছন থেকে মেয়েটির আর্তচিৎকার আর বহু মানুষের তুমুল সোরগোল ভেসে এল কানে, চোর-চোর...ধর-ধর ওকে, পালাল-পালাল... পুলিশ।

বদ্ধ মুষ্টির মধ্যে টাকাগুলো চেপে ধরে সুধন্য প্রাণপণ বেগে ছুটে চলেছে। পেছনে না তাকিয়েও বেশ বুঝতে পাচ্ছে, একটা বিক্ষুব্ধ জনতা ওকে তাড়া করে ছুটে আসছে। ওদিকের ফুটপাতের লোকেরা হতচকিত দৃষ্টিতে এদিকে তাকিয়ে ব্যাপারটা প্রণিধান করতে চেষ্টা করছে। হঠাৎ একজন বৃদ্ধ ওর সামনে এসে পড়ায় চকিতে পাশ কাটিয়ে ধাক্কা খেতে খেতে সামলে নিল। এক রাশ ইঁট-পাটকেল স্তূপীকৃত করা ছিল রাস্তার ওপর। এক লাফে সেটাকেও টপকে গেল সুধন্য। কিন্তু সামনের বাধা সে আরো দুস্তর! হাঁপাতে হাঁপাতে কেবল ছুটছে আর শংকিত দৃষ্টিতে তাকাচ্ছে চারিদিকে পেছনে তেড়ে আসা উন্মত্ত জনতার হাত থেকে নিস্কৃতি পাওয়া যায় কী না?

পেছন থেকে তখনো বিভীষিকার মত আতঙ্কটা তেড়ে আসছে ওর দিকে—চোর-চোর-ধর ধর...পুলিশ পুলিশ...পালাল... পালাল...পালাল...।

ভীষণ উত্তেজনা আর নিদারুণ ক্লান্তিতে হাঁপাচ্ছে সুধন্য। মনে হচ্ছে আর ছুটতে পারবে না। এখুনি মুখ থুবড়ে পড়ে যাবে রাস্তার ওপর।

অনেকটা পথ চলে এসেছে। আর একটু। আর কিছুক্ষণ ছুটতে পারলে শেয়ালদার বিশাল জনারণ্যে হারিয়ে যেতে পারবে। যেমন করেই হোক সকলের দৃষ্টিতে ফাঁকি দিতেই হবে। পারুল আর পানুকে নিয়ে রাতের ট্রেনেই গ্রামে ফিরতে হবে।

কিন্তু...না। আর বোধহয় তা হল না। এবার ওর সামনে পেছনে দুদিক থেকেই বিক্ষুব্ধ জনতা ছুটে আসছে সুধন্যর দিকে!

এক মুহূর্ত বিহ্বলের মত থমকে দাঁড়িয়ে পড়ল রাস্তার ওপর। তারপরই পাশের গলির মধ্যে ঢুকে পড়ে আবার ছুটতে শুরু করল। এপথ কোথায় গিয়ে মিশেছে, তাও জানে না সুধন্য। শুধু এইটুকুই জানে ওকে পালাতেই হবে। প্রাণপাত করে ছুটতে হবে। ডাইনে বাঁয়ের, সামনে পেছনের সমস্ত বাধা অতিক্রম করে অনন্ত ধাবমান এ মহাকালের স্রোতের বেগে মিশে যেতে হবে ওকে!

পেছনের ক্রুদ্ধ জনতাও ওকে অনুসরণ করে ঢুকে পড়ল গলিতে।

বুকটা হাপরের টানের মত দ্রুত ওঠা-নামা করে চলেছে। বেশ বুঝতে পাচ্ছে, আর ছুটতে পাচ্ছে না। শ্বাস রুদ্ধ হয়ে উঠছে! আর কিছুক্ষণের মধ্যেই পেছনের সেই উত্তেজিত জনতা ধরে ফেলবে সুধন্যকে! তবু প্রাণপণ চেষ্টায় অবিরাম ছুটছে। ওকে যে ছুটতেই হবে, পালাতেই হবে! পারুলকে যে কথা দিয়ে এসেছে সুধন্য, আবার ওদের গ্রামে ফিরিয়ে নিয়ে যাবে! নিশ্চিত আশ্বাস দিয়ে এসেছে, কিছুতেই মরতে দেবে না ওদের! আবার সব ফিরে পাবে ওরা।

আশ্চর্য! সে কী এমনি করে মিথ্যে হয়ে যাবে? স্বপ্নের মত সেই গ্রামখানিতে আর কী কখনো ফেরা হবে না ওদের? সামান্য যে স্বপ্নটাকে বুকে নিয়ে এত দুর্দিনেও বেঁচে ছিল ওরা সে কী চিরদিন শুধু স্বপ্ন হয়েই থেকে যাবে?

পাঠকের বৈঠক

ভারতীয় মুসলমান সমাজ

ভারতবর্ষের একটা বিরাট শরিক তার মুসলিম অধিবাসীবৃন্দ। এই মুসলিম অধিবাসীদের একটা অংশের চাপে একদিন ভারতবর্ষ হিন্দুস্তান ও পাকিস্তানে বিভক্ত হয়েছে। ভারতীয় মুসলমানগণের ঐতিহ্য সুপ্রাচীন। তাঁরা সর্বপ্রথম এসে বসবাস সুরু করেছিলেন ভারতের পশ্চিম উপকূলে যার বর্তমান নাম কেরল প্রদেশ। ক্রমে ক্রমে মালাবার, মাদ্রাজ এবং বঙ্গদেশের দক্ষিণ-পূর্ব অঞ্চলে এবং আরাকানে মুসলিম বসবাসকারির সংখ্যা বৃদ্ধি পায়। বাণিজ্য-সূত্রে একদিন আরবরা ভারতবর্ষে নানাবিধ পণ্য-সামগ্রী পৃথিবীর বিভিন্ন অঞ্চল থেকে নিয়ে আসতেন, নিয়ে যেতেন এখানকার পণ্যসামগ্রী।

মুসলমানগণ ভারতবর্ষে এসেছেন তিনটি পর্যায়ে, তিনটি বিভিন্ন ভূমিকায় তাঁরা এসেছেন। প্রথম পর্বে বণিকের বেশে, দ্বিতীয় পর্বে তাঁরা এসেছেন আক্রমণকারীর রূপে শাণিত অস্ত্র হাতে নিয়ে, আর তৃতীয় পর্বে তাঁরা এসেছেন ইসলামের প্রচারক মিশনারী রূপ ধরে। আরব বণিকরা প্রথম দিকে এসেছেন পশ্চিম উপকূলে ক্যামবে থেকে কেপ কোমোরিণ। ডাঃ তারাচাঁদ তাঁর 'দি ইনফ্লুয়েন্স অব ইসলাম অন ইণ্ডিয়ান কালচার' গ্রন্থে বলেছেন—আরব বণিকবৃন্দ এবং নাবিকরা এদেশে সাদর অভ্যর্থনা লাভ করেছেন। মেয়েদের বিবাহ পর্যন্ত দেওয়া হয়েছে তাঁদের সঙ্গে। তাঁদের মসজিদ প্রতিষ্ঠা করতে দেওয়া হয়েছে এবং ইসলাম ধর্মের প্রচারেও সহায়তা করা হয়েছে। মালাবারের মোপলারা সেই প্রথম যুগের মুসলমানদের বংশাবতংস, তাঁরা এদেশের জামাই হয়ে শেষ পর্যন্ত ঘর-জামাই বনে গিয়েছেন। মোপলা কথাটির উৎপত্তি 'মাপিলা' থেকে, মাপিলার অর্থ—জামাই।

ইসলাম ধর্মের সর্বাধিক প্রতিক্রিয়া অবশ্য ভীষণ উত্তেজনাময় আকার ধারণ করে। ৭১১ খৃস্টাব্দে সতের বছরের ছেলে মহম্মদ বিন কাশেম সিন্ধুদেশ অধিকার করলেন। খৃস্টাব্দ ১১০০ থেকে উত্তর-পশ্চিমাঞ্চল থেকে মুসলিম আক্রমণ একরকম নিত্য-নিয়মিত ব্যাপারে পরিণত হল। তুর্কী, পারসি, মোঙ্গল এবং আফগান এসেছে ঢেউ-এর পর ঢেউ-এর মতো অষ্টাদশ শতাব্দীর মধ্যকাল পর্যন্ত। শেষতম মুসলিম আক্রমণকারীর নাম আহমদ শা দুরাণী। ১৭৬১ খৃস্টাব্দে তিনি মারাঠাদের প্রতি প্রচণ্ড আঘাত হেনেছেন।

অধিকাংশ বিজেতা ছিলেন ধর্ম-সম্প্রসারণের পরিপোষক। তাঁরা তাই তাঁদের অধিকৃত অঞ্চলকে দার-উল-ইসলামের অন্তর্গত মনে করতেন, আর নিজেদের মনে করতেন খালিফের প্রতিনিধি। কাফের নিধন এবং দেব-দেউল নষ্ট করা তাঁদের কাছে একটা মজার খেলা বিশেষ ছিল। তাছাড়া এই কর্মসাধনের ফলে পুণ্যসঞ্চয়ের আশাও ছিল। ১৭৮৫ খৃস্টাব্দেও টিপু সুলতান খালিফের কাছে আবেদন জানিয়েছিলেন যে মহীশূরের সুলতান হিসাবে তাঁকে পাকাপাকিভাবে কায়েম করা হোক। জয়নুল আবেদিন আর সম্রাট আকবর ছিলেন বিরাট ব্যতিক্রম।

তৃতীয় পর্বের মুসলমানরা ছিলেন ধর্মপ্রচারক। ইসলামের গোঁড়া রক্ষণশীল 'উলেমা' ছিল আর শরিয়ৎ-এর টীকাকার 'কাদিস'রা অতিসহজেই শাসকদের কাছে আত্মবিক্রয় করতেন। তাঁরা বলতেন যে, বলপ্রয়োগ করে ধর্মান্তরকরণ করলে একেবারে সশরীরে বেহেস্ত যাওয়ার পথ পরিষ্কার হয়ে যায়। কিন্তু সুফীরা সুলতান বাদশাদের সঙ্গ এড়িয়ে চলার চেষ্টাই করতেন, তাঁদের আস্তানা কাফের অমুসলমানদের জন্যও উন্মুক্ত করে রাখতেন, আর এইভাবেই তাঁরা হাজার হাজার ভারতীয়কে মুসলমানে রূপান্তরিত করলেন।

বাংলা ও আসামের প্রান্তে শাহ জলাল একজন প্রখ্যাত সুফী, তাঁর চেষ্টায় এই-প্রান্তে আজো অসংখ্য মুসলমান। এইরকম আজমীড়ে খাজা মৈনুদ্দিন চিস্তি, দিল্লীর নিজামুদ্দীন আউলিয়া আর দাক্ষিণাত্যে যেসু দারাজ ইসলাম প্রচারে যথেষ্ট গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা গ্রহণ করেছেন।

এই উভয় গোষ্ঠীর জন্য কোরান এবং হাদিসে উপযুক্ত উপদেশ প্রচুর পরিমাণে বর্তমান। সুফীরা বললেন—ধর্মান্তরকরণে কোনো প্রকার জোরজার চলবে না, কারণ, তাঁদের নীতি 'যেদিকে তাকাও সেদিকেই আল্লা'। এই নীতির সঙ্গে একথা খাপ খায়। তাই ধর্মান্তরণে সুফীপন্থা হল—'হৃদয়কে সংযুক্ত করে জুড়তে হবে' (তালিক-ই-কুলুব)।

বর্তমানকালের ভারতবর্ষীয় মুসলমানগণের অধিকাংশ হলেন তাঁদের বংশধর যাঁদের সুফীরা ধর্মান্তরিত করেছিলেন। সুফীদের অনেকগুলি জাতি-গোত্র ভারতবর্ষে বিশেষ প্রতিষ্ঠালাভ করে যথা : চিস্তিয়া, সুহরাবর্দী, এবং কাদিরিয়া।

কিছুসংখ্যক সুফীর মনোভঙ্গী অবশ্য এই সুরের বিপরীত। তাঁদের মধ্যে প্রধানতম হলেন নকসাবন্দীর সেখ আহমদ সরহিন্দি। ইনি তাঁর সমকালীন মুসলমান অভিজাতদের ওপর প্রভাব বিস্তার করে অ-মুসলমান কাফেরদের কোনোমতে প্রশ্রয় না দিতে নির্দেশ দেন। সরহিন্দি ধর্মীয় ঘৃণার বিষবৃক্ষের যে বীজ রোপণ করেন তারই এক বিষময় ফল শিখ-মুসলিম সংঘর্ষ।

ত্রয়োদশ শতাব্দীর সুফীকবি সেখ ফরিদ বলেছিলেন : 'আমি কাঁচি চাই না, আমাকে সূচ দাও, আমি জোড়া দিই, কাটি না।' ভারতবর্ষের মানুষরা দুই শ্রেণীতে বিভক্ত। একদল চান কাটতে অপর দল চান সেলাই করে জুড়তে। কেউ চায় অখণ্ড ভারত, কেউ চায় পাকিস্তান, হিন্দুস্তান, শিখিস্থান, দ্রাবিড়স্থান ইত্যাদি। ভারতবর্ষে ঐশ্লামিক প্রাধান্যের অবসান ঘটলেও আজও সক্রিয় রয়ে গেছেন এই বিভেদীকরণের দল আর সংযোগ-প্রয়াসীরা। যেমন ওহাওবিরা, শাহ ওয়ালি-উল্লা, রায়বেরিলির সৈয়দ আহমেদ, শাহ ইসলাম শহীদ এবং নিসার আলি (চাঁদপুরের তিতুমির)। এই তিতুমির মুসলিমশক্তিকে পুনরায় প্রতিষ্ঠিত করার জন্য প্রাণপণ চেষ্টা করেছেন। আবার একদিকে ছিলেন সার সৈয়দ আহমেদ, মহম্মদ ইকবাল, মহমৎ আলির দল, অন্যদিকে তায়েবজী, হাকিম আজমল খান, ডাঃ আনসারি, মৌলানা আজাদ প্রভৃতি। প্রথম মহাযুদ্ধের পর যে খিলাফৎ আন্দোলন সুরু হয়েছিল তা বিফল হল শুধু এই দুই বিপরীতকে এক-সূত্রে বাঁধার প্রচেষ্টায়।

ভারতে ঐশ্লামিক অভিযানের সাফল্য দিল্লীর দরবারে মুসলমান অধীশ্বর প্রতিষ্ঠিত হওয়ার আরো গভীর হয়ে উঠল। তবে ধর্মান্তরকরণের প্রধান কারণ হল সুফীদের দৃষ্টান্ত এবং প্রচার, আর সওদাগর

ও বণিকদের প্রভাব। সূফী ও সন্তরা ধর্মীয় আচারঅনুষ্ঠানের খুঁটিনাটি বিষয়ে তত সচেতন ছিলেন না, তাঁদের ছিল ভক্তি, অখণ্ড ধর্মবিশ্বাস, আর প্রচলিত বিশ্বাস ও আচারআচরণের প্রতি সহনশীলতা। সওদাগর বা বণিকরা ধর্মের সূক্ষ্মতত্ত্ব সম্বন্ধে তেমন ওয়াকেফহাল ছিলেন না। এইসব কারণে বিভিন্ন প্রান্তের ধর্মান্তরিত মুসলিমদের আচার-আচরণও বিভিন্ন।

জামিয়া মিলিয়ার রেকটর ডাঃ এম মুজিব "দি ইণ্ডিয়ান মুসলিমস" নামক প্রায় ছয়শত পৃষ্ঠায় সম্পূর্ণ এক বিরাট গ্রন্থে এই বিষয়ে বিস্তারিত আলোচনা করেছেন। ইতিহাস সাধারণত 'রাজনৈতিক' নয় 'সাংস্কৃতিক'। ডাঃ মুজিবের গ্রন্থটিতে সম্ভাব্য সকল দৃষ্টিকোণে ভারতীয় মুসলিম-সমাজকে সামগ্রিক ভাবে বিচার করা হয়েছে। গ্রন্থকার তিনটি বিভিন্ন যুগে গ্রন্থটিকে ভাগ করেছেন, প্রথম যুগ, মধ্যযুগ ও আধুনিক যুগ। তবে প্রতিটি ভাগে গোঁড়ামি এবং গোঁড়াদের বিষয়, ধর্মীয় চিন্তা, সমকালীন রাজনীতিবিদ এবং শাসকদের বিষয় আলোচনা আছে।

গ্রন্থটি বহুমুখী এবং একখানি কোষ-গ্রন্থের সমজাতীয় সংহতিবিশিষ্ট। সমালোচকদের পক্ষে এই গ্রন্থটি সংক্ষেপে আলোচনা করা কঠিন। প্রধানতম শ্রেণীগুলির পরিচ্ছন্ন বিবরণ দেওয়া হয়েছে। যথা শরিয়া (ঐস্লামিক পদ্ধতির জীবন, বিশ্বাস, ধর্মীয় আচরণ, ধর্মপালন, সাধারণ এবং ব্যক্তিগত আইন, আচরণ বিধি ইত্যাদি), হাদিথ (ঐতিহ্য), সুন্না (ধর্মগুরুর ক্রিয়া-কাণ্ড), ইকতিহাদ (মতামত), ইজমা (জন-মত)। এছাড়া গ্রন্থকার মুসলিম আইনজীবীর (ফিখহ) বিভিন্ন ধারার মধ্যে পার্থক্য বিচার করেছেন। কোনো একটি বিশেষ মতের অনুসরণ করার নাম তকলিদ আর কোনো মতামত বা বিধানগ্রহণের নাম ফতোয়া। এইসব বিষয়ের হৃদয়গ্রাহী বিবরণের সঙ্গে গ্রন্থকার আলোচনা করেছেন রাজনৈতিক কর্তৃপক্ষের সঙ্গে, সরকারী উলেমা এবং ধর্মপরায়ণ উলেমা ও সুফীদের মধ্যে পারস্পরিক সম্বন্ধ নিয়েও আলোচনা করেছেন।

অনেকের জানা নেই যে, মহম্মদের তিরোধানের দশ বছরের মধ্যেই ভারতে ইসলামের আবির্ভাব ঘটেছে। যেসব অঞ্চলে মুসলমানগণ তাঁদের প্রভাব বিস্তার করেছেন বা যেখানে তাঁরা সংখ্যাগরিষ্ঠ সেইখানে অনেক মুসলিম আচার-আচরণ হিন্দুঘরে প্রবেশ করেছে, আবার হিন্দু আচারও মুসলিমঘরে প্রবেশ করেছে।

ডাঃ মুজিব ভারতীয় মুসলিমদের বিষয়ে যে গ্রন্থটি রচনা করেছেন তার মধ্যে সামগ্রিক ভাবে ভারতীয় মুসলিমসমাজের ইতিহাস বিধৃত করার চেষ্টা হয়েছে। সম্ভবত সেই দিক থেকে তিনিই সর্বপ্রথম পূর্ণাঙ্গ আলোচনাকার। হাণ্টার প্রভৃতি বিদেশী গ্রন্থকারদের রচনা আংশিক এবং তেমন তথ্যসমৃদ্ধ নয়। ডাঃ মুজিব শুধুমাত্র কোনো একটি বিশেষ দিকের ওপর জোর দেননি, তিনি সামাজিক, অর্থনৈতিক, রাজনৈতিক ও ঐতিহাসিক সকল বিষয়ের পূর্ণাঙ্গ বিশ্লেষণ করেছেন এবং সেখানেই তাঁর সার্থকতা।

ডাঃ মুজিব সর্বজনগ্রাহ্য জনপ্রিয়তার মোহ নিয়ে এই গ্রন্থ রচনা করেননি, মোহমুক্ত মন নিয়ে নিজস্ব মতবাদকে সুপ্রতিষ্ঠিত করার দুঃসাহস তাঁর আছে। তাই তার 'দি ইণ্ডিয়ান মুস্লিমস' গ্রন্থে তিনি মুসলমানদের বিচ্ছেদনীতির এক নতুন ধারায় বিশ্লেষণ করেছেন। পূর্বেই বলা হয়েছে যে, আইন, ধর্মতত্ত্ব, মরমীবাদ, সাংস্কৃতিক সাফল্য এবং সমাজ-জীবন সম্পর্কে তিনি প্রথম যুগ থেকে সুরু করে তার ধারাবাহিক ক্রম-বিকাশের পরিচয় দিয়েছেন। প্রতিটি বিষয় তিনি উপযুক্ত তথ্য এবং প্রমাণ সহযোগে বিস্তারিত ভাবে লিখেছেন।

ডাঃ মুজিব অবশ্য বলেছেন যে তাঁর কোনো নিজস্ব মত প্রতিষ্ঠার চেষ্টা নেই, কোনো একটা তত্ত্ব প্রচারেও তিনি আগ্রহী নন, তবে সেই সঙ্গে একথাও বলেছেন :
"the purpose of every analysis should be to discover and create synthesis."

তাঁর সহানুভূতি কোন দিকে তা ধরা সহজ, যেমন আমির খসরুর তিনি প্রশংসা করেছেন। তাঁর হিন্দিপ্রেম ও ভারতপ্রেমের উল্লেখ করেছেন। ডাঃ মুজিব স্বয়ং একজন উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত, সুফীদের মত তাঁর মনের দরজা সদাই উন্মুক্ত, এবং তাঁর বিশ্বাস, তোষামোদ এবং জ্ঞান পাশাপাশি চলে না।

এই সুবিশাল গ্রন্থটির (প্রকাশক : লণ্ডনের জর্জ এ্যালেন অ্যাণ্ড আনউইন)। সম্পর্কে আগামীবারে আরো আলোচনা করা যাবে।

—অভয়ঙ্কর
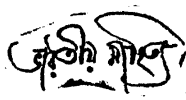
প্রকাশন শিল্প ও পুস্তক ব্যবসায়ের সমস্যা ॥

সম্প্রতি "বঙ্গীয় প্রকাশক ও পুস্তক বিক্রেতা সভা"র পক্ষ থেকে পুস্তক ব্যবসায়ের বর্তমান সমস্যা সম্বন্ধে পশ্চিম বাংলার শিক্ষামন্ত্রী শ্রীজ্যোতিভূষণ ভট্টাচার্যকে একটি মেমোরেন্ডাম দেওয়া হয়। এই মেমোরেন্ডামটি দেওয়া হয় যখন শিক্ষামন্ত্রী উক্ত সংগঠনের কার্যনির্বাহক সমিতির সদস্যদের সঙ্গে একটি সভায় মিলিত হন। এই মেমোরেন্ডামে সরকার ও বোর্ড কর্তৃক পাঠ্যপুস্তক রাষ্ট্রীয়করণ এবং স্বাভাবিক বে-সরকারী উদ্যোগে বই প্রকাশ ও বিক্রয় ব্যবস্থার জন্য সরকারী সাহায্যের দাবী জানান হয়। এ ছাড়াও বিদেশী সরকারের সাহায্যপ্রাপ্ত সস্তা বইয়ের আমদানীর ফলে উচ্চশিক্ষার ক্ষেত্রে পাঠ্য ও টেকনিক্যাল ক্ষেত্রে এ দেশীয় প্রকাশন সংস্থাগুলির যে বিপদ দেখা দিয়েছে, সে সম্বন্ধেও মেমোরেন্ডামে উল্লেখ করা হয়। একটি সমীক্ষায় দেখা গেছে, এই সমস্ত সাহায্যপ্রাপ্ত বই হয় বিদেশ থেকে আমদানী অথবা এদেশীয় ব্যবসাদারদের সহযোগিতায় বিদেশী মূলধনের সাহায্যে প্রকাশ করা হয়। এভাবে যদি পুস্তক প্রকাশন ক্ষেত্রে বিদেশী মূলধন অবাধে ব্যবহৃত হতে থাকে, তাহলে কিছুদিনের মধ্যেই যে এদেশীয় প্রকাশন সংস্থাগুলি সংকটের সম্মুখীন হবেন, তাতে কোনও সন্দেহ নেই। এ রকম একটা অবস্থা কোনও দেশের সরকারই কামনা করবেন না। মেমোরেন্ডামে এর সমাধানের পথ হিসেবে বলা হয়েছে, "সকল প্রকার বিদেশী সাহায্য-প্রাপ্ত বইয়ের আমদানী ও প্রকাশককে নিরুৎসাহ করা প্রয়োজন এবং এই ব্যাপারে সুপ্রতিষ্ঠিত দেশীয় প্রকাশন প্রতিষ্ঠানের উদ্ভব ও প্রসার যাহাতে সম্ভব হয়, তাহার ব্যবস্থা করা দরকার। ইহা কার্যকরী করার জন্য সরকার বিভিন্ন বিশেষজ্ঞ কমিটি প্রতিষ্ঠা করিতে পারেন, এই সকল বিশেষজ্ঞ কমিটি বিভিন্ন বিষয়ের পাঠ্যসূচী রচনা করিবে। নানা দেশ হইতে প্রাপ্ত বইয়ের সাহায্যে আদর্শ পাঠ্যপুস্তকও রচনা করা যাইতে পারে। ভারতীয় প্রকাশকরা সে-ক্ষেত্রে ভারতীয় লেখকদের সাহায্যে ভারতীয় ছাত্রদের উপযোগী পাঠ্যপুস্তক প্রকাশ করিতে পারেন।"

মেমোরেন্ডামে অন্যান্য যে সব সমস্যার কথা বলা হয়েছে, তার মধ্যে—মুদ্রণ কাগজের অত্যধিক মূল্য, ছাপা-বাঁধাইয়ের আধুনিক যন্ত্রপাতির অভাব, বইয়ের উপর অতিরিক্ত ডাকমাশুল, বিদেশে বই রপ্তানির প্রচেষ্টা, গ্রন্থশিল্পকে তপশীলভুক্ত শিল্প হিসেবে গণ্য করা ইত্যাদি বর্তমান গ্রন্থ ব্যবসায় বিভিন্ন সংকটের কথা আছে।

তরুণ কবির প্রথম কবিতাগ্রন্থ ॥

যে সমস্ত তরুণ ভারতীয় ইংরেজী ভাষায় কবিতা লিখে খ্যাতি অর্জন করেছেন, তার মধ্যে শ্রী ও, পি, ভকত অন্যতম। তিনি দিল্লির "দি হিন্দুস্থান টাইমস" পত্রিকার সহ-সম্পাদক। তাঁর রচনা "থট" "দি স্টেটসম্যান", "ইণ্ডিয়ান লিটারেচার", "বেঙ্গলি লিটারেচার" প্রভৃতি পত্র-পত্রিকায় প্রকাশিত হয়েছে। সম্প্রতি প্রকাশিত হয়েছে তাঁর প্রথম কবিতাগ্রন্থ "অ্যানাদার প্ল্যানেট"।

শ্রীভকতের কবিতার প্রথম গুণ সারল্য এবং স্বাভাবিকতা। সাধারণত সারল্য কবিত্ব-শক্তি বিনষ্ট করে। কিন্তু এই গ্রন্থের কবিতা-গুলোতে সারল্য এক অভিনব ব্যঞ্জনার সৃষ্টি করেছে। কবির দৃষ্টিভঙ্গির

স্বচ্ছতাও প্রসঙ্গত উল্লেখ্য। পাঠকের জ্ঞাতার্থে তাঁর "সেপ্টেম্বরের বিকেল" নামক কবিতাটির আংশিক অনুবাদ এখানে উল্লেখ করা যাচ্ছে—

"আমার চারপাশের নিমগাছগুলি
সবুজ এবং উজ্জ্বল,
ধুয়ে দিয়েছে পথের পাশের ধূলিকণাকে।
আন্দোলিত যে বাতাস
তার পাতায় পাতায় রয়েছে সংবাদ,—
এই মেজাজী দিনগুলি
এই বৃষ্টি, উত্তাপ আর রুক্ষতা
একটি নতুন ঋতুর জন্য
শীতলতা আর অপরূপ স্নিগ্ধতার জন্য
তৈরী করছে সেই পথ।"

শ্রীভকতের কবিতার সঙ্গে ষাটের দশকের "ওয়েসলিয়ান" কবিদের একটা সমধর্মিতা লক্ষ্য করা যায়। আশা করা যায়, ভবিষ্যতে ভারতীয় সাহিত্যে তিনি তাঁর নিজস্ব স্থান অধিকার করে নিতে সমর্থ হবেন।

চর্যাপদের ইংরেজি অনুবাদ ॥

ভারতীয় সাহিত্যের পাঠক মাত্রই শুনে খুশী হবেন যে, চর্যাপদের একটি ইংরেজি অনুবাদ সংকলন মাত্র কয়েকদিন হল প্রকাশিত হয়েছে। অনুবাদ করেছেন মেলবোর্ণ বিশ্ববিদ্যালয়ের ভারততত্ত্ব বিভাগের অধ্যাপক শ্রীঅতীন্দ্র মজুমদার। প্রতিটি কবিতা এবং কবির উপর বিস্তৃত আলোচনা আছে এই গ্রন্থটিতে। শ্রীমজুমদার তাঁর এই কাজের জন্য সাহিত্যরসিক পাঠক সমাজের যে অভিনন্দন লাভ করবেন, তাতে কোন সন্দেহ নেই। জানা গেছে তিনি "গীত-গোবিন্দ"রও অনুবাদ করছেন।

তারাশংকরের ডি লিট উপাধি

বাংলা সাহিত্যে অবদানের জন্য তারাশংকর বন্দ্যোপাধ্যায়কে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় ডি-লিট উপাধিতে ভূষিত করবেন বলে সিদ্ধান্ত নিয়েছেন।

সিন্ডিকেটের সভায় ঐ সিদ্ধান্ত মুক্তকণ্ঠভাবে অনুমোদিত হয়। সামনের বছর কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের সমাবর্তন উৎসবে শ্রীবন্দ্যোপাধ্যায়কে এই উপাধি প্রদান করা হবে।

গালিব শতবার্ষিকী ॥

১৯৬৯ সনের ১৪ই ফেব্রুয়ারী ভারতের অন্যতম অনন্যসাধারণ কবি মীর্জা গালিবের মৃত্যুশতবার্ষিকী। এ দিনটি সোভিয়েত যুক্তরাষ্ট্রে ব্যাপকভাবে প্রতিপালিত হবে। সোভিয়েত যুক্তরাষ্ট্রের বিজ্ঞান আকাদেমির এশিয়ার জাতি-সংক্রান্ত ইনস্টিটিউটের প্রাচ্য-সাহিত্য বিভাগ এই শতবার্ষিকী পালনের প্রস্তুতিকার্য শুরু করেছে।

সোভিয়েত যুক্তরাষ্ট্রে গালিবের রচনাবলী অধ্যয়ন ও প্রচার সম্পর্কিত প্রশ্নাদি আলোচনার জন্য সম্প্রতি অনুষ্ঠিত এক প্রস্তুতি সভায় দিল্লী বিশ্ববিদ্যালয়ের উর্দু-ভাষা ও সাহিত্য বিভাগের অধ্যক্ষ অধ্যাপক ফারুকী যোগ দিয়েছিলেন।

প্রস্তাব করা হয়েছে যে, শতবার্ষিকী উদযাপনের অংশ হিসাবে গালিবের রচনাবলী সম্পর্কে সোভিয়েত ও ভারতীয় গবেষকদের একটি নিবন্ধ সংগ্রহ প্রকাশ করা হবে। তাছাড়া, গালিবের রচনাবলীর একটি সংগ্রহ এবং রুশ অনুবাদ সহ উর্দু ও পার্শি ভাষায় তাঁর নির্বাচিত রচনাবলীর একটি সংকলনও প্রকাশ করা হবে।

গালিব ও তাঁর কাব্য সম্পর্কে একটি সেমিনার ও বিজ্ঞানমূলক আলোচনা সম্মেলন অনুষ্ঠানেরও পরিকল্পনা করা হয়েছে।

১৯২৬ সনে সোভিয়েত যুক্তরাষ্ট্রে উর্দু চর্চার অন্যতম পথিকৃৎ ক্রিয়াগিনা কদ্রাতিয়েভকৃত রুশ অনুবাদের মাধ্যমে সোভিয়েত পাঠক-পাঠিকারা গালিবের রচনার সঙ্গে প্রথম পরিচিত হন। কিন্তু গালিবের রচনার সুসমঞ্জস চর্চা শুরু হয় ষষ্ঠ দশকের শেষ দিকে, যখন সোভিয়েত বিজ্ঞান আকাদেমির এশিয়ার জাতি-সংক্রান্ত ইনস্টিটিউটে প্রাচ্য-সাহিত্য বিভাগটি স্থাপিত হয়।

এরিক অলিভিয়ার পুরস্কৃত ॥

হালের ফরাসীভাষী তরুণ ঔপন্যাসিকদের মধ্যে এরিক অলিভিয়ারের নাম সবিশেষ উল্লেখযোগ্য। তাঁর "আই বিলিভ ইন ভ্যাকেশনস্ টু লং' বইটির বেরুনোর সঙ্গে সঙ্গেই অশেষ জনপ্রিয়তা অর্জন করেছিল। সম্প্রতি এ বইটিকে ফরাসী সাহিত্যের অন্যতম পুরস্কার রোজার নিমিয়ার প্রাইজ দ্বারা সম্মানিত করা হয়েছে।

এরিক অলিভিয়ার ফ্রেঞ্চ ব্রডকাস্টিং কোম্পানীর অনুষ্ঠান পরিচালক। "অ্যাকসেন্ট-গ্রেভ" নামক সমালোচনা পত্রিকার প্রতিষ্ঠাতা এবং "ডিফেন্স দ্য অকসিডেন্ট"-এর সম্পাদক হিসেবে সুপরিচিত। অনেকগুলি বইয়েরই তিনি রচয়িতা—এদের মধ্যে "লা শোর্টে" বইটির খ্যাতি আছে।

এবারকার "রোজার নিমিয়ার" প্রাইজের জুরীদের মধ্যে ছিলেন মার্সেল আয়েম, অ্যান্তন ব্লনডিন, পল গীমাড, আঁদ্রে প্যারিনো প্রভৃতি। এ'দের প্রত্যেকেরই মতে "আই বিলিভ ইন ভ্যাকেশনস টু লং" বইটি এরিক অলিভিয়ারের অন্যতম শ্রেষ্ঠ ও শক্তিশালী রচনা।

আন্তর্জাতিক লেখক সম্মেলন ॥

আগামী ৯ই নভেম্বর থেকে ১২ তারিখ পর্যন্ত জার্মানীর ফ্রাঙ্কফুর্ট শহরে একটি আন্তর্জাতিক লেখক সম্মেলন অনুষ্ঠিত হবে। গত বছরের মতো এবারও ইউরোপের বিভিন্ন দেশ থেকে মোট ১২০ জন সাহিত্যসেবী এতে আমন্ত্রিত হয়েছেন। এটি হচ্ছে দ্বিতীয় সম্মেলন।

রাশিয়া, স্ক্যান্ডিনেভিয়া, ফ্রান্স, পোল্যান্ড, চেকোশ্লোভাকিয়া, হাঙ্গেরী হল্যান্ড, যুগোশ্লাভিয়া জার্মানী প্রভৃতি দেশগুলি থেকে প্রতিনিধি কবি ও লেখকেরা তাঁদের অপ্রকাশিত রচনা পড়ে শোনাবেন উপস্থিত সমালোচক ও প্রকাশকদের সামনে। একেবারে হালের তরুণদের সাহিত্যকর্মের জন্য যাতে প্রকাশকরা আগ্রহ প্রকাশ করেন তার জন্য বহু অখ্যাত তরুণকে এই সাহিত্য-পাঠের আসরে সুযোগ দেওয়া হয়েছে' এবং 'দি প্রাইজ ফর রিসেন্ট লিটারেচার' নামে একটি পুরস্কারেরও ব্যবস্থা করা হয়েছে এই উপলক্ষ্যে। গত বছরের নভেম্বরে এই অনুষ্ঠানটির ফলে অনেক তরুণ-লেখকেরই বই প্রকাশকরা প্রকাশ করতে আগ্রহী হয়েছিলেন। বলা বাহুল্য, এবারের সম্মেলনে শ্রেষ্ঠ রচনার জন্য পুরস্কার নির্ধারিত করবেন কয়েকজন তরুণ সমালোচক।

মার্কিন সাহিত্যের সংকলন ॥

মার্কিন সাহিত্য বিষয়ে কিছু জানার জন্য মার্কিন সাহিত্যের কোন সংকলন গ্রন্থ অপরিহার্য। এ কাজটি যেমন দুরূহ তেমনই পরিশ্রমসাধ্য। সম্প্রতি মার্কিন সাহিত্যের একটি দীর্ঘ সংকলন গ্রন্থ প্রকাশিত হয়েছে। এতে ১৮৭০ থেকে ১৯৬৫ পর্যন্ত বিভিন্ন সাহিত্যধারায় ও মৌলিক রচনা স্থান পেয়েছে।

বইটির নাম—'অ্যান অ্যানথলজি : অ্যামেরিকান লিটারেচার ১৮৯০—১৯৬৫'। প্রতিটি বিভাগেই নির্বাচন সুন্দর। কবিতা বিভাগে একদিকে যেমন ফ্রস্ট ও এডুইন রবিনসনের মতো কবি অন্যদিকে কার্ল স্যান্ডবার্গ বা ভেচেল লিন্ডসের মতো সমাজনৈতিক কবিও আছেন। আবার এমিলি ডিকেন্সের থেকে শুরু করে পাউন্ডের কবিতাও এর অন্তর্ভুক্ত। এ ছাড়া কবিতা বিষয়ক আলোচনাও আছে। আর্ভি ব্যাবিট ও পল এলমারের নয়া মানবতাবাদের আলোচনাগুলো এ সংকলনের আরেকটি বৈশিষ্ট্য। তবে উপন্যাস গল্প বা নাটকের বিভাগগুলো যথাযথ পূর্ণতার স্বাদ বহন করে না। কেননা সেক্ষেত্রে রয়েছে পৃষ্ঠা-সংখ্যার সীমা। তাহলেও মোটামুটিভাবে মার্কিন সাহিত্যের একটা পূর্ণতর স্বাদ এতে পাওয়া যায়। বিশেষত, বিশ শতকের সাহিত্যসাধনা এবং সামাজিক ও আধ্যাত্মিক পরিবর্তনশীলতার ধারার রূপটি আলোচ্য সংকলনটির বৈশিষ্ট্য। বইটি প্রকাশ করেছেন ইউরেশিয়া পাবলিশিং হাউস।

পাস্তেরনাক পত্র-সংকলন ॥

প্রখ্যাত সোভিয়েত গ্রন্থকার বোরিস পাস্তেরনাক ১৯৩১ সাল থেকে শুরু করে মৃত্যুর আগে পর্যন্ত তাঁর জর্জিয়ার বন্ধুদের কাছে বহু বিতর্কমূলক চিঠিপত্র লিখেছিলেন। এই চিঠিগুলিতে তিনি স্তালিনবাদী সাহিত্য-রচনার বিরুদ্ধে বহু কথা বলেছেন। তাঁর মতে, স্তালিনের আদর্শে সাহিত্য রচনা করে ভুয়ো খ্যাতি লাভের চেয়ে নামপরিচয়হীন হয়ে থাকাও ভালো।

মার্কিন প্রকাশনা সংস্থা হারকোর্ট ব্রেস আগামী ডিসেম্বরে এই সমস্ত চিঠিগুলিকে নিয়ে একটি পত্র-সংকলন প্রকাশ করছেন। মোট ৬৭টি চিঠি এর অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে বলে জানা গেছে। বইটির নামকরণ করা হয়েছে—"জর্জিয়ার বন্ধুদের লিখিত"। এই চিঠিগুলির আর একটি বৈশিষ্ট্য হলো যে, এগুলির মাধ্যমে স্তালিনের অধীনে সেসময়ের রাশিয়ার শাসনব্যবস্থার সমালোচনা করা হয়েছে।

সাংবাদিক হেমিংওয়ে ॥

হেমিংওয়ের পরিচয় প্রধানত ঔপন্যাসিক হিসেবে। কিন্তু সাংবাদিকতা ছিল তাঁর পেশা। সারাজীবনই তিনি ছিলেন রণাঙ্গনের চুক্তিবদ্ধ সাংবাদিক। আমেরিকা বৃটেনের বিভিন্ন দৈনিক সাপ্তাহিকের জন্য কখনো সংবাদ পরিবেশন কখনো যুদ্ধের বর্ণনামূলক কাহিনী তাঁকে লিখতে হোত। সম্প্রতি হেমিংওয়ের সাংবাদিকতার জীবন ও ব্যক্তিগত কিছু চিঠিপত্রের ভিত্তিতে একটি আত্মজীবনীমূলক গ্রন্থ প্রকাশিত হয়েছে। নাম : 'বাই-লাইন : আর্নেস্ট হেমিংওয়ে'। সম্পাদনা করেছেন উইলিয়াম হোয়াইট। বইটি একদিকে যেমন মানুষ হেমিংওয়ের বিষয়ে আমাদের কৌতূহল উদ্রেক করে তেমনই এর একটি সাহিত্যমূল্যও আছে।

প্রধানত টোরোন্টো স্টার উইকলি, দি টোরোন্টো ডেইলি স্টার, ট্রান্সআটলান্টিক রিভিউ প্রভৃতি পত্রিকার জন্যই হেমিংওয়ে সংবাদ পরিবেশন করতেন। সাংবাদিকতার বিবরণ হলেও রচনাগুলি মানবতার জন্য দরদী লেখকের পরিচয় বহন করে। যেমন, ১৯২২ সালে থ্রেস্-এর উদ্বাস্তুদের নিয়ে পরিবেশিত সংবাদটি মানবতাবোধের গভীর স্পর্শে আন্তরিক।

মোট ৭৭টি সরস নিবন্ধ এবং চিঠিপত্র আলোচ্য সংকলনটিতে স্থান পেয়েছে। বইটির আরেকটি উল্লেখযোগ্য সম্পদ হলো শিকার, মৎস্য শিকার, ষাঁড়ের লড়াই, ছোট-বড় যুদ্ধের বিভিন্ন ঘটনা।

স্মরণযোগ্য গল্প সংগ্রহ

গল্প শোনার অভ্যাস মানুষের কতদিনের, তার কোন ঐতিহাসিক নজির নেই। মানুষ অতীতে গল্প শুনত, এখনও শোনে। এই গল্প শোনা হোল মানুষের আদিমতম প্রবৃত্তি। আর যিনি গল্প বলেন, তিনি অসামান্য ক্ষমতার অধিকারী।

ভালো গল্প লেখা এক দুরূহ ব্যাপার। পাঠক কোথায়, কতটুকু জিনিস গ্রহণ করবে, কি তার অপছন্দ হবে—সেদিকে লক্ষ্য রেখে গল্প লেখা খুবই কষ্টসাধ্য। ইদানিংকালে গল্পকার হিসাবে যাঁরা খ্যাতি অর্জন করেছেন তাঁদের মধ্যে শ্রীগজেন্দ্রকুমার মিত্র একজন। তিনি ঔপন্যাসিক হিসেবেই সমধিক খ্যাত। তবু তাঁর অনেকগুলি ভালো ভাল গল্প বিভিন্ন পত্র-পত্রিকায় প্রকাশিত হয়েছে।

শ্রীগজেন্দ্রকুমার মিত্র

শ্রীমিত্রের গল্প ও উপন্যাস গ্রন্থের সংখ্যা কম নয়। তাঁর বিখ্যাত উপন্যাস 'কলকাতার কাছেই' আকাদেমি পুরস্কার পেয়েছিল। তাঁর সুদীর্ঘ উপন্যাস 'পৌষ ফাল্গুনের পালা' অমৃতে প্রকাশকালে বিপুলভাবে সমাদর লাভ করে। সম্প্রতিকালে তাঁর আরো কয়েকটি গ্রন্থ প্রকাশিত হয়েছে। এর মধ্যে 'তব দক্ষিণ পাণি' গল্প গ্রন্থখানি বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। পাঁচটি ছোট গল্পের একটি সুনির্বাচিত সংকলন 'তব দক্ষিণ পাণি'। ঘটনা বৈচিত্র্যে এবং সংগত ও সার্থক পরিণতিতে প্রতিটি গল্পই আকর্ষণীয় এবং রসোত্তীর্ণ।

সবচেয়ে বেশী মনে রেখাপাত করে গ্রন্থটির দ্বিতীয় গল্প 'তব দক্ষিণ পাণি', যে গল্পটির নামে গ্রন্থটির নামকরণ করা হয়েছে। ভালমন্দে মেশানো একটি সহৃদয় ভাগ্যান্বেষী পাঞ্জাবী যুবক হরিকিষেণ এই গল্পের নায়ক। সামান্য অভিমানের বশে সে জায়গাজমি সব ভাইয়ের নামে লিখে দিয়ে দেশত্যাগ করে ও ঘুরে ফিরে কলকাতায় আসে। এখানে সে প্রচুর অর্থ উপার্জন করে ও বেশ আনন্দ উপভোগের মধ্যে কয়েকটি বছর কাটায়। তারপর দুষ্ট গ্রহের মতো তার জীবনে আসে জোনস, এক জরাগ্রস্ত দুরাচারী অ্যাংলো-ইন্ডিয়ান, প্রার্থী হয়ে এসে যে হরিকিষেণের দিলদরিয়া মনের পরিচয় পায় ও সেইজন্য তাকে পেয়ে বসে। কয়েক শ' টাকার জন্য নিজের মেয়ে লুসীকে সে হরিকিষেণের হাতে উপভোগের জন্য সঁপে দেয়। হরিকিষেণ সেদিন নিজেকে সংযত করতে পারেনি যার ফলে তার জীবনে আসে দারুণ বিপর্যয়, জেল হয় পাঁচ বছর। কিন্তু লুসী ঐ মানুষটিকে চিনতে ভুল করেনি, আর সেইজন্য সব হারিয়েও হরিকিষেণ আবার সব ফিরে পায়। 'এ জন্মের পাওনা'র বিষয়বস্তু নতুন নয়, কিন্তু লেখার মুন্সিয়ানায় গল্পটি অভিনবত্ব লাভ করেছে। মৃত্যুর পর চেতনা-

লাভ করে জয়ন্ত ঘোষালের যে অভিজ্ঞতা হোল তা নিষ্ঠুর হলেও সম্পূর্ণ সত্য। 'ভজনানন্দ' গল্পের নায়ক সাধুর ভেখ ধরে শেষ পর্যন্ত সত্যই সাধু হয়ে গেল এবং তার সেই পরিবর্তন ও পরিণতি খুব সুন্দর ও স্বাভাবিকভাবে ঘটেছে। 'পছন্দ-সই' গল্পটিতে এলাকে কিন্তু অকারণেই বার বার দুর্ভাগ্যের বলি হ'তে হয়েছে। হয়ত এই রকমই হয়, তবু যেন এলার দুর্ভাগ্য মন মেনে নিতে চায় না। 'মানুষের সাধ্য' গল্পের রহস্যময় অলৌকিক শক্তি-সম্পন্ন সন্ন্যাসীর চরিত্রটি মনে গভীর রেখাপাত করে।

পরিচ্ছন্ন সুন্দর প্রচ্ছদপট।

তব দক্ষিণ পাণি (গল্প সংগ্রহ)—গজেন্দ্রকুমার মিত্র। রবীন্দ্র লাইব্রেরী, কলকাতা—১২। দাম আড়াই টাকা।

নতুন কবির কাব্যগ্রন্থ

শ্রীশৈবাল চট্টোপাধ্যায় তরুণতম কবিদের মধ্যে নতুন ধরনের কবিতা রচনায় আগ্রহী। প্রথাবদ্ধ ছন্দের বাইরে, গদ্যস্পন্দনে তিনি কাব্যশরীর রচনা করেছেন, অথচ লিরিকের গুণে কাব্যআত্মা স্পন্দিত। অনেক ক্ষেত্রে অরুণ মিত্রের আঙ্গিক যেমন মনে পড়িয়ে দেয়, তেমনি বিশ্বভাবনার মধ্য দিয়ে তিনি আপনার বিশিষ্টতার স্বাক্ষর রাখতে পেরেছেন।

কবি অরুণকুমার চট্টোপাধ্যায় আলোচ্য কাব্যগ্রন্থটির ভূমিকায় বলেছেন যে, রোমান্টিকতাকে জীবন থেকে দূরে রাখার প্রয়োজন নেই। অর্থাৎ এ গ্রন্থের অন্তর্গত কবিতাগুলি তাঁর ভাষ্য অনুযায়ী 'সেই সুর-সমন্বয়েরই সিমফনি।' কিন্তু কবিতাগুলি পাঠ করে আমরা হতাশ হয়েছি। রোমান্টিকতার যে বিশেষ মায়াঞ্জন থাকলে কবির কল্পনা সুদূরপ্রসারী হতে পারে—কবিতা তাৎক্ষণিক স্পর্শে মায়াময় হয়ে ওঠে—আলোচ্য কবির বেশির ভাগ কবিতাই সেভাবে বেজে ওঠে না। আমাদের বরঞ্চ মনে হয়েছে কবির এখনো সাধনা চালিয়ে যাওয়াই বাঞ্ছনীয়।

চুয়ান্নটি কবিতার সংকলন গ্রন্থ 'পারমিতা'—তরুণ কবির প্রথম প্রচেষ্টা।

কবিতাগুলি সুখপাঠ্য ও সরস। বর্ণনা ও ব্যঞ্জনা রসোত্তীর্ণ। কয়েকটি কবিতা বিশেষ করে ভাল লাগে। যেমন 'হে কাপুরুষ', 'একটি শাস্ত্রীয় সংগীত', 'জ্যামিতিক নয়', 'আত্মপ্রকাশ', 'কুমারীর গর্ভে ব্যাসদেব', 'মাইলষ্টোন', 'হায়নার হাসি', 'ভোর হলে তবু', 'একবার চলে গেলে'।

কলকাতায় বৃষ্টি : (কাব্যগ্রন্থ) : শৈবাল চট্টোপাধ্যায়। সাম্প্রতিক প্রকাশনী, ৪২বি, প্রিয়নাথ মল্লিক রোড, কলকাতা-১৬। দাম : দু টাকা।

আমি একা এবং সে : অরুণকুমার চট্টোপাধ্যায়।। গ্রন্থজগৎ, ১৯ পণ্ডিতিয়া টেরেস, কলি:-২৯। দাম : দু টাকা।

পারমিতা (কাব্য) বিনয় নন্দী। পরিবেশক : সিগনেট বুকশপ; ১২, বঙ্কিম চাটুয্যে স্ট্রীট, কলি—১২। দাম—চার টাকা।

এই জীবনের রঙ্গশালায়

কয়েক বছর আগে বসুমতীর শারদীয় সংখ্যায় একটি অপেক্ষাকৃত অপরিচিত লেখিকার উপন্যাস প্রকাশিত হয়েছে। উপন্যাসটির নাম 'দ্বিতীয় বর্ষণ'। লেখিকার নাম নমিতা চক্রবর্তী। উপন্যাসটি কিন্তু একালের ভাষায় সাড়াজাগানো উপন্যাস। এই উপন্যাসটি সাহিত্যক্ষেত্রে ডঃ নমিতা চক্রবর্তীকে মর্যাদার আসনে প্রতিষ্ঠিত করেছে। ডঃ নমিতা চক্রবর্তী এর আগেও দু-একটি উপন্যাস লিখেছেন এবং প্রশংসিত হয়েছেন, কিন্তু 'দ্বিতীয় বর্ষণে' তাঁর শক্তিমত্তার পরিচয় পাওয়া গেল।

লেখিকা যে জীবনকে ঘনিষ্ঠভাবে দেখেছেন সেই জীবনকেই ফুটিয়ে তোলার চেষ্টা করেছেন। পাঁচকড়ি বন্দ্যোপাধ্যায় ছিলেন শরৎচন্দ্রের মাষ্টার মশাই, তিনি একবার উদীয়মান লেখক শরৎচন্দ্রকে বলেন—'দেখো শরৎ, নিজে যা দেখোনি তা লিখোনা, যা দেখেছ তাই লিখবে।' শরৎচন্দ্র এই কথাটি বার বার বলতেন। ডঃ নমিতা চক্রবর্তীর এই বস্তুনিষ্ঠ উপন্যাস পড়তে গিয়ে শরৎচন্দ্রের ঐ গল্প মনে এলো। লেখিকা মধ্যবিত্তের জীবন দেখেছেন সহানুভূতিভরা দৃষ্টি দিয়ে এবং সেই জীবনের এক মর্মান্তিক কাহিনী এই উপন্যাসের উপজীব্য। গরীব ঘরের ছেলে সিদ্ধার্থ চারপাশে তার বিশ্রী আবহাওয়া। সেই কুৎসিত পরিবেশের মধ্যে মানুষ হয়েও সিদ্ধার্থ কিন্তু সফল হল, পরীক্ষায় পাশ করল। বিলাত থেকে ফিরে এলো ভালোভাবে পাশ করে। এর পরের জীবন কিন্তু অন্য রকম। মাতৃভক্ত গরীব ঘরের ছেলে সিদ্ধার্থ প্রায় রাতারাতি ডবল প্রমোশন পেল উপরতলার সমাজে। একদিন সে চোখ মেলে দেখেছিল তার বাবা-মার দাম্পত্য জীবন। তার আত্মীয়-পরিজনের অবস্থা তার চোখের সামনে ছিল। তাই সিদ্ধার্থ শেষ পর্যন্ত তার তখনকার অবস্থার সঙ্গে খাপ খাইয়ে এক ধনী তনয়াকে বিবাহ করল। রীতিমত উঁচুতলার মানুষ তাঁরা। সে একটা চোখ-ধাঁধানো মরীচিকার মোহে ছুটেছিল। সেখানে অনেক রঙ, অনেক আলো। কিন্তু আলোর নীচে অন্ধকার, রঙের পিছনে জীর্ণতা। এই মলিনতা সহজেই ফুটে ওঠে। ওপরকার চুনকাম খসে পলেস্তারা বেরিয়ে পড়ে। জীবন বিষময় হয়ে পড়ে অচিরে। সব আছে, জলের সমুদ্রে আকন্ঠ ডুবে থেকেও সেই জল পান করার সামর্থ্য নেই, এ আর এক জ্বালা। অনেক পরে শেষ পর্যন্ত প্রকৃত জীবনের রূপ তার চোখে ধরা পড়ে। নায়ক সিদ্ধার্থ প্রায় প্রৌঢ়, তার বয়স চল্লিশ পার হয়েছে; দেবযানী নায়িকার বয়স মাত্র চব্বিশ। কিন্তু দেবযানী ধীরে ধীরে সিদ্ধার্থকে গ্রহণ করেছিল। তার সুগভীর মমতাবোধ, মানসিকতায় পরিবর্তন এবং তার নিবিড় প্রেমময় মনের পরিচয় পেয়ে পাঠককে বিস্মিত হতে হয়। সুদক্ষ লিপিকুশলতায় লেখিকা এই পর্যায় আশ্চর্য সংযমের সঙ্গে বিধৃত করেছেন। বলিষ্ঠ কল্পনা ও তার সাহসিক প্রকাশে লেখিকার শক্তিমত্তার পরিচয় পাওয়া যায়। পার্শ্বচরিত্রাবলী এবং কাহিনীর বিকাশের সহায়ক হিসেবে তাদের আলাপ-চারে লেখিকার পরিকল্পনার বৈশিষ্ট্য ধরা পড়ে। উপন্যাসটি উল্লেখযোগ্য এবং রমণীয়।

দ্বিতীয় বর্ষণ (উপন্যাস)—নমিতা চক্রবর্তী। প্রকাশক: গ্রন্থ প্রকাশ: কলিকাতা-১২। দাম তিন টাকা পঞ্চাশ পয়সা মাত্র।

রহস্য-কাহিনী

নীহাররঞ্জন গুপ্তের এক ভয়ংকর রসের রহস্যঘন কাহিনী 'সীমন্তিনী'। পটভূমিকা পাঁচ পুরুষ আগের, যখন আজকের শিক্ষা ও সংস্কৃতি মানুষের মনকে প্রভাবিত করেনি।

তান্ত্রিক করালীশঙ্কর যৌবনে গৃহত্যাগ করেন দেবী ছিন্নমস্তার হাতের খড়্গের উত্তরাধিকারী হয়ে অনন্ত জীবন ও যৌবনের অধিকারী হওয়ার আকাঙ্ক্ষায়। কিন্তু তাঁর সে আকাঙ্ক্ষা পূরণ হয় না। কারণ, তিনি জানতে পারেন, যে সুলক্ষণা নারীর সঙ্গে অমাবস্যার রাত্রে কালিকা-নৃত্য করলে তাঁর অভীষ্ট লাভ হবে সে নারী তাঁরই ভ্রাতৃবধূ, শিবশঙ্করের স্ত্রী হৈমবতী কিন্তু তাঁর মুখে এই কাহিনী শুনে তান্ত্রিক শিষ্য চন্ডক হৈমবতীর সঙ্গলাভের জন্য উন্মত্ত হয়ে ওঠে। আর তার ফলে যে সর্বনাশা বিপর্যয় ঘটল শিবশঙ্কর ও হৈমবতীর জীবনে তাই নিয়ে এই উপন্যাসের কাহিনী গড়ে উঠেছে।

সীমন্তিনী (উপন্যাস)—নীহাররঞ্জন গুপ্ত। গ্রন্থম—২২।১, বিধান সরণী, কলকাতা—৬। দাম ৬৲ টাকা।

তস্য তস্য অথবা সূর্য কাঁদলে সোনা

প্রেমেন্দ্র মিত্র

(পূর্ব প্রকাশিতের পর)

ফ্রান্সের রাজার সঙ্গে পাভিয়ার যুদ্ধের কথা ঘনরাম কিছু জানেন না, কিন্তু কর্টেজের অভিযানে অতবড় কীর্তি কেউ করলে তাঁর নাম ঘনরামের অজানা থাকবার কথা নয়। গঞ্জালেস দে সোলিস বলে কাউকে তিনি স্মরণ করতে পারেননি।

মার্কুইস কোন্ কীর্তির জোরে এমন হাউই-এর মত উঠেছেন ঘনরাম তা নিয়ে অবশ্য মাথা ঘামাননি. মার্কুইসের পত্নী-ভাগ্যও যে অসাধারণ, তাঁর স্ত্রী মার্শনেস নাকি অপরূপ সুন্দরী. এ-রটনা উনি শুধু কান দিয়ে শুনেছেন মাত্র।

প্রথম দিন গভর্নরের শাদা জোড়া-ঘোড়ায় টানা গাড়ি রাস্তা দিয়ে চলে যাবার পর তাঁর সেদিকে দৃষ্টি পড়েছিল। যে-কসাই-এর কাছে মোরালেসের জন্যে মাংস কিনতে গেছলেন সে-ই আঙুল তুলে একটু উত্তেজিতভাবে বলেছিল—ওই যে গভর্নরের খাস গাড়িতে মার্কুইস আর মার্শনেস যাচ্ছেন।

ঘনরাম তখন সামনের দিকেই ফিরে দাঁড়িয়ে কসাইকে দেবার পেসেটা গুণছিলেন। মুখ তুলে যখন তিনি তাকিয়েছিলেন, তখন গাড়িটা বেশ দূরেই চলে গেছে। মার্কুইস আর মার্শনেস-এর পিঠের দিকই তিনি দেখতে পেয়েছিলেন। না, মার্শনেস-এর ঠিক পিঠ নয়। কারণ, সেই তিনি সবে পেছন দিকে কি যেন দেখে ঘাড় ঘুরিয়ে নিচ্ছেন।

ওই চকিতে ঘুরিয়ে নেওয়া মুখ দেখে ঘনরাম চিনতে কাউকে অবশ্য পারেননি।

চিনেছেন সেইদিনই বিকেলবেলা গাড়িটা আবার বাজার দিয়েই যাবার সময়। গাড়িতে মার্শনেস তখন একা। তিনি যে বেশ উদ্গ্রীব হয়ে রাস্তার পাশের দোকানগুলি লক্ষ্য করতে করতে যাচ্ছেন, তা দূর থেকেই ঘন-রামের নজরে পড়েছে। এবার চিনতে তাঁর দেরী হয়নি।

গাড়িটা তাঁর পাশ দিয়ে পার হয়ে যাবার সময় ইচ্ছে করেই মুখ নিচু করে তিনি হেঁটেছেন। চোখ নিচের দিকে নামানো থাকা সত্ত্বেও মার্শনেস-এর দৃষ্টিটা তিনি যেন সমস্ত শরীরে অনুভব করেছেন।

সে-দৃষ্টির অর্থটা শুধু ঠিকমত বুঝতে পারেননি।

বুঝতে পারলে তিনি কি কিছু করতেন?

আরো বেশী সাবধান হতেন কি?

না, আর সাবধান কি হবেন। মার্কুইস মার্শনেসকে চেনার পর থেকেই তিনি যথেষ্ট হুঁশিয়ার হয়ে গিয়েছিলেন। তাঁদের গাড়ির সামনে আর তারপর পড়েননি একবারও।

তবু মার্শনেস তাঁকে সত্যিই বিস্মিত করে দিয়ে পথের মাঝখানে অপ্রত্যাশিতভাবে ধরেছেন।

মার্শনেস-এর সেদিনকার দৃষ্টিটার ঠিক-মত অর্থ বুঝলে ব্যাপারটা তাঁর কাছে অপ্রত্যাশিত থাকত না, এই যা।

মুখে প্রকাশ করুন বা না করুন এই অপ্রত্যাশিত সাক্ষাৎ আর মার্শনেস-এর নিজের হৃদয় যেন নিরাবরণ করে মেলে ধরা তাঁকে যে গভীরভাবে নাড়া দিয়েছে, ঘনরামের প্রায় অভিভূত আচ্ছন্নের মত বাজার থেকে মোরালেস-এর বাড়িতে ফিরে যাওয়া লক্ষ্য করলেই তা বোঝা যেত।

বাড়িতে ফিরেই চলে যাবার জন্যে তৈরি হতে তাঁর বেশীক্ষণ লাগেনি। কেনই বা লাগবে? সঙ্গে নেবার মত কোন সম্পদ ত ক্রীতদাসের থাকে না। মোরালেস-এর কোন-কিছু নিজের প্রয়োজনে না বলে ঋণ হিসাবেও সঙ্গে নিয়ে যাবেন, ঘনরামের শিরায় সে-রক্ত বয় না।

ছেড়ে যেতে মোরালেস-এর জন্যে একটু বিষণ্ণ সহানুভূতি অনুভব করা ছাড়া তার কোন কষ্টই হয়নি।

১৫২১ খৃষ্টাব্দের একদিন নিজে থেকে যেচে মোরালেস-এর কাছে দাসত্ব স্বীকার করেছিলেন ঘনরাম। ১৫২৩-এর একটি বিশেষ দিনে তিনি নিজেই আবার একেবারে নিঃশব্দে চলে গেছেন।

তাঁর চলে যাওয়ার দিনটি মনে রাখবার মত বিশেষ ঠিকই, কিন্তু কার কাছে?

তাঁর নিজের, ও মার্শনেসের ত বটেই, আর একজনের কাছেও।

সেই বিশেষ দিনটিতে মার্কুইস কিন্তু পানামায় ছিলেন না। সত্যিই সেদিন দুপুরেই গভর্নর পেড্রোরিয়াসের সঙ্গে তিনি শহর থেকে দূরের জংলা জলায় শুধু ও-দেশের কুমীর, কেম্যান বা অ্যালিগেটের নয়, ও-দেশের গুলবাঘা চিতা, জাগুয়ার শিকারে গেছলেন।

ফিরেছিলেন দিনতিনেক বাদে বেশ ক'টা কুমীরের চামড়া আর জাগুয়ারের ছাল নিয়ে।

অতিথিশালায় ঢুকে নিজের কামরায় যাবার পথে সত্যিই বিহ্বল হয়ে তাঁকে দাঁড়িয়ে পড়তে হয়েছিল।

সামনে জঙ্গলের জাগুয়ারের চেয়ে অনেক গুণ হিংস্র আরো এক ভয়ঙ্কর বাঘিনী মূর্তিই যেন দেখেছেন।

প্রায় উন্মাদিনীর মত মার্কুইস-এর কাছে ছুটে এসে তাঁর জামার আস্তিন ধরে প্রায় টেনে ছিঁড়ে ফেলে মার্শনেস তরল আগুনের মত গলায় বলেছেন, এখন তোমার আসবার সময় হল! তিনদিন তুমি বাইরে কাটিয়ে এলে!

দাঁড়ান! দাঁড়ান!—সমস্বরে দাসমশাইকে থামিয়ে বলে উঠলেন শিবপদ আর রামশরণবাবু, তার মানে ঘনরামের সঙ্গে মার্শনেস সেই নিকারাগুয়ার জাহাজে চড়ে পালাননি? তিনি পানামাতেই থেকে গেছেন?

আমি তখনই বলেছিলাম না,—ভবতারণবাবু নিজেকে তারিফ করেছেন,—যে ওই—খুড়ি মার্শনেসকে ঠিক বোঝা যাচ্ছে না। শেষপর্যন্ত পিছিয়ে গেছল ত মেয়েটা।

না, মার্শনেস পিছিয়ে যায়নি!—দাসমশাই রহস্যটা উদ্ঘাটন করে বলেছেন—ঘনরামই কথামত সেদিন সন্ধ্যায় অতিথিশালায় আসেননি। মার্শনেস তখন সাধারণ দরিদ্র এসপানিওল মেয়ের সাজপোশাকে তৈরি হয়ে অপেক্ষা করছেন নিজের ঘরে। নিজের পরিচারিকাকে নির্দেশ দেওয়া আছে কেউ খুঁজতে এলে তাঁদের অনুচরদের মহলে যেন তাকে বসিয়ে রেখে তাঁকে খবর দেওয়া হয়। অনুচরদের বখশিস দিয়ে সেদিন সন্ধ্যার মত ছুটি দেওয়া হয়েছে। স্বয়ং মার্কুইসই শিকারে চলে গেছেন, সুতরাং এ-বদান্যতা অস্বাভাবিক কিছু মনে হবার কথা নয়। সন্ধ্যা উত্তীর্ণ হয়ে প্রহরের পর প্রহর বেড়েছে। গভর্নরের অতিথিশালায় মার্শনেসকে খুঁজতে কেউ আসেনি।

সারারাত জেগে কাটিয়েছেন মার্শনেস, জেগে আর নিজের ঘরে অস্থিরভাবে পায়চারি করে।

সকাল হতে না হতেই কোচোয়ানকে গাড়ি আনতে হুকুম পাঠিয়েছেন।

সে গাড়ি নিয়ে বন্দর পর্যন্ত গেছেন প্রথমেই। খবর নিয়ে জেনেছেন কিছু গোলমালের দরুণ শেষ রাত্রে, মাত্র কিছুক্ষণ আগে সকাল হবার পর সে জাহাজ ছেড়েছে। সে-জাহাজে যাদের যাবার ব্যবস্থা তিনি করিয়েছিলেন, তারা কেউই আসেনি।

না, কেউই না!—কোচোয়ান ভালো করে তাঁর নির্দেশমত জিজ্ঞাসাবাদ করে জেনে এসে খবর দিয়েছে। দুজন যাত্রীর কেউ ভাড়া দিয়ে রাখা সত্ত্বেও জাহাজে আসেনি।

মার্শনেস তারপর আরেক নির্জন পথের ধারে গিয়ে বহুক্ষণ অপেক্ষা করেছেন। সেইখানেই ঘনরামের দেখা পেয়ে আগের দিন সকালে তাঁর ভেবে-রাখা ব্যবস্থার কথা তিনি জানিয়েছিলেন।

সেখানে অপেক্ষা করা বৃথা হয়েছে। এরপর বাজারে গিয়ে ঘুরে আসা নিরর্থক তবু তাই গেছেন। তারপর অপ্রকৃতিস্থের মত গাড়ি নিয়ে সমস্ত পানামা শহর অকারণে ঘুরে বেড়িয়ে গাড়ির সহিস কোচোয়ানকেও একটু ভাবিত করে তুলেছেন।

এছাড়া মার্শনেসের করবারই বা কি আছে? পানামা ছোট শহর, এখনও গোনা-গুনতি তার রাস্তা আর বসতি। কিন্তু সেই শহরের দরজায় দরজায় গিয়ে ধাক্কা দিয়ে একজন ক্রীতদাসের খোঁজ ত তিনি করতে পারেন না।

হ্যাঁ, একটা কাজ পারেন বটে!

কথাটা মনে হওয়ামাত্র মার্শনেস সরকারী কোতোয়ালী দপ্তরে গিয়ে উপস্থিত হয়েছেন।

তাঁকে দেখে স্বয়ং কোতোয়ালও যে ভড়কে গিয়েছেন, তা বলাই বাহুল্য। স্বয়ং গভর্নর পেড্রারিয়াসের চেয়ে বেশী সন্ত্রস্ত খাতির পেয়েছেন মার্শনেস।

কিন্তু মার্শনেস ত খাতির পাবার জন্যে আসেননি। তিনি যে-কারণে এসেছেন, তীব্র জ্বলন্তস্বরে তা জানিয়েছেন।

সমস্ত দপ্তর ভীতত্রস্ত হয়ে তাঁকে জানিয়েছে যে, মার্কুইস একজন দেশ-থেকে পালানো গোলামের খবর আর বর্ণনা দিয়ে গেছেন বটে কিন্তু তিনি যা পরিচয় আর বর্ণনা দিয়েছেন, পানামা শহরে সেরকম কোনো ক্রীতদাসের খোঁজ আপ্রাণ চেষ্টা করেও পাওয়া যায়নি।

পাওয়া যায়নি আপনাদের গাফিলি আর অকর্মণ্যতায়!—মেঝের ওপর জুতোর গোড়ালি ঠুকতে গিয়ে মার্শনেস-এর সুঠাম পায়ের গোছ একটু দেখা গেছে,—একটা গোলামকে সমস্ত বর্ণনা পেয়েও এই এতটুকু পানামা শহর থেকে আপনারা খুঁজে বার করতে পারেন না, তাকে স্পষ্ট আমরা এই শহরের রাস্তায় দেখেছি বলা সত্ত্বেও? পানামা থেকে আপনাদের পাহারা সজাগ থাকলে পালিয়েই বা সে কোথায় যেতে পারে!

নগর-কোতোয়াল নীরব থাকাই শ্রেয়ঃ মনে করেছেন। জানা থাকলে তিনি হয়ত জবাব দিতে পারতেন যে, এই নতুন মহাদেশ অজানা বিরাট বিশাল। এখানে কেউ হারিয়ে যেতে চাইলে সমুদ্রের চড়ায় বালিতে একটা চিনির দানার মত তাকে খুঁজে পাওয়া অসম্ভব।

মার্শনেস-এর সব বকুনি শাসানি শেষ হবার পর দপ্তরের সবাই নিজেরাই ক্রীতদাসের মত নিচু হয়ে জানিয়েছে যে, নেহাৎ পাখি হয়ে উড়ে বা মাছ হয়ে ডুব-সাঁতারে যদি না পালিয়ে গিয়ে থাকে, তাহলে মার্কুইস ও মার্শনেস-এর গোলামকে জ্যান্ত বা মরা তারা দুদিনের মধ্যে হাজির করবেই।

দুদিনের একদিন বাদে মার্কুইস শিকার থেকে ফিরে মার্শনেসের ওই রূপ দেখেছেন।

প্রথমে স্ত্রীর উন্মত্ত প্রলাপের অর্থ কিছু বুঝতে না পেরে একটু পরিহাসের চেষ্টা করেই বলেছেন,—তিনদিনটা বড় বেশি তাড়াতাড়ি কেটে গেল মনে হচ্ছে বুঝি!

থামো!—চাপা গর্জনে মার্শনেসের মধুর কণ্ঠও কর্কশ হয়ে উঠেছে,—এ হাসি-ঠাট্টার ব্যাপার নয়। জানো, তুমি এখানে নেই বলেই সেই শয়তানটা পানামা ছেড়ে পালিয়েছে। তাকে এমন পালাবার সুবিধেই যদি দেবে, তাহলে কি দরকার ছিল দপ্তরে গিয়ে তার কথা জানাবার! কি দরকার ছিল।

প্রথমটা একটু বিমূঢ় হলেও মার্শনেস কার বিষয় নিয়ে ক্ষিপ্ত তা বুঝতে মার্কুইস-এর দেরী হয়নি।

এতক্ষণে ব্যাপারটা মনে মনে উপভোগ করতে শুরু করে মার্কুইস দৃষ্টিতে উপহাসের ঝিলিকটা গোপন না করেই জিজ্ঞাসা করেছেন,—সে-শয়তান যে পালিয়েছে, তা তুমি জানলে কি করে?

জানলাম, জানলাম—মার্শনেস সামান্য একটু থতমত খেয়ে বলেছেন, জানলাম কোতোয়ালী দপ্তরে গিয়ে। তারা এখনো সে-শয়তানের কোনো পাত্তাই পায়নি। চেষ্টাই কিছু করেনি বলে আমার ধারণা।

তাহলে চেষ্টা করলেই পাবে। উদাসীনভাবে বলেছেন মার্কুইস।

কথার খোঁচা বোঝবার মত অবস্থা তখন মার্শনেস-এর নয়। তীব্রস্বরে তিনি বলেছেন,—সেই চেষ্টা তাদের দিয়ে করাতেই হবে। তুমি যদি না পারো ত আমি নিজে গভর্নরকে বলব। যেমন করে হোক সে-বদমাসকে ধরে আনা চাই-ই।

আনলে কি করবে কি?—একটু বাঁকা হাসির সঙ্গে জিজ্ঞাসা করেছেন মার্কুইস।

কি করব!—মার্শনেস যেন যন্ত্রণার মত তীব্র আক্রোশে বলেছেন,—জ্যান্ত তার গায়ের ছাল ছাড়িয়ে নেব নিজের হাতে।

হুঁ, মার্কুইসএর যেন কথাটা মনে ধরেছে,—তাহলে যেগুলো এত কষ্টে শিকার করে আনলাম, সেই কুমীরের চামড়া আর জাগুয়ারের ছালগুলো ত বাতিল করে দিতে হয়।

এ-বিদ্রুপটা বোঝার ওপর শাকের আঁটি হয়েছে। জ্বলন্ত দৃষ্টিতে মার্কুইসের দিকে কয়েক মুহূর্ত তাকিয়ে থেকে মার্শনেস ছুটে আবার তাঁর নিজের কামরায় গিয়ে ঢুকে সশব্দে খিল দিয়েছেন।

কয়েকদিন বাদে গভর্নর পেড্রারিয়াস তাঁর মাননীয় অতিথিদের সসম্মানে বিদায় দিয়েছেন।

কোতোয়ালী দপ্তর দাস নামের কর্ডোভার মুর-রক্ত-মেশানো ক্রীশ্চান হওয়া বংশের অভিজাতদের মত ঈষৎ শ্যামল এক সুপুরুষ ক্রীতদাসের তখনো কোন খোঁজ পায়নি।

(ক্রমশঃ)

দেশে বিদেশে

সূর্যোদয়ের দেশে নূতন বন্ধুর সন্ধানে

ভারতবর্ষের পররাষ্ট্রনীতির মানচিত্রে এতদিন জাপানের যে প্রায় কোনই স্থান ছিল না তার সংগত কারণ ছিল।

প্রথম কারণ হচ্ছে, প্রথমদিকে আমেরিকার অধিকৃত দেশ হিসাবে এবং পরবর্তীকালে আমেরিকার সংগে গাটছড়াবাঁধা দেশ হিসাবে জাপান আন্তর্জাতিক রাজনীতিতে একটা পৃথক সত্তা হিসাবে দীর্ঘকাল নিজেকে খাড়া করতে পারেনি। ফলে অন্যান্য দেশের মত ভারতবর্ষও জাপানের সংগে সম্পর্ক রক্ষার বিশেষ ভিত্তি কি হবে তা নিয়ে মাথা ঘামাবার প্রয়োজন অনুভব করেনি।

দ্বিতীয় কারণ হচ্ছে, গত যুদ্ধের পর জাপান নিজে ইচ্ছা করেই আন্তর্জাতিক কূটনৈতিক ক্ষেত্র থেকে নিজেকে সরিয়ে রেখেছে। পৃথিবীর অন্যান্য দেশের সংগে তার সম্পর্ক সে নিয়ন্ত্রণ করেছে তার বাণিজ্যিক স্বার্থের বিচারে। জাপানের সমগ্র শিল্প-অর্থনীতি দাঁড়িয়ে আছে আমদানীকরা কাঁচা মালের উপর। যেসব দেশ তাকে এইসব কাঁচা মাল যোগায় এবং যেসব দেশে তার শিল্পপণ্য রপ্তানী করতে হয় সেসব দেশের সংগে তার লেনদেনের সম্পর্ক বজায় রাখা এবং এই লেনদেনের পরিধি যথাসম্ভব প্রসারিত করাই জাপানের বৈদেশিক সম্পর্কের প্রধান লক্ষ্য। সারা পৃথিবীটা যুদ্ধোত্তর জাপানের কাছে প্রধানত কেনাবেচার বাজার। এই বাজারের হট্টগোলের যথাসম্ভব বাইরেই সে থাকতে চেয়েছে। সুতরাং আন্তর্জাতিক রাজনীতির আসরে জাপানের দিকে ভারতবর্ষের বা অন্য কোন দেশের নজর এতদিন ভাল করে পড়েনি।

তৃতীয় কারণ হচ্ছে, বিশ্ব রাজনীতির পুরাতন, পরিচিত ছক ভারতবর্ষকে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র, ইংল্যান্ড ও কমনওয়েলথের দেশগুলির দিকে টেনে নিয়ে গেছে। জোটনিরপেক্ষতার চাহিদায় আমাদের পররাষ্ট্রনীতি সোভিয়েট রাশিয়া ও পূর্ব ইউরোপের সমাজতন্ত্রী দেশগুলির দিকে, নাসেরের সংযুক্ত আরব সাধারণতন্ত্র ও টিটোর যুগোশ্লাভিয়ার দিকে আমাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছে। কম্যুনিস্ট চীনের অভ্যুত্থানের পর ভারতবর্ষ চীনের সংগে এশিয়ার নেতৃত্ব ভাগ করে নেওয়ার চেষ্টায় কিছু সময় কাটিয়েছে। পৃথিবীর অন্যান্য উন্নতিকামী দেশগুলির সংগে সমস্বার্থের বন্ধন ভারতবর্ষকে এশিয়া আফ্রিকা এবং কতক পরিমাণে ল্যাটিন আমেরিকার ছোটছোট দেশগুলির দিকেও টেনে নিয়ে গেছে। কিন্তু এশিয়ার দেশ হয়েও যে উন্নত, সামরিক বল না থাকলেও যে অন্যবলে বলীয়ান সেই জাপানের দিকে আমাদের নজর পড়েনি।

এইভাবে দীর্ঘকাল জাপান ভারতবর্ষের আন্তর্জাতিক নীতির পরিকল্পনাকারদের গণনার মধ্যে আসেনি।

কিন্তু ইতিমধ্যে আন্তর্জাতিক রাজনীতির হাওয়া বদল হয়েছে। জাপান আন্তর্জাতিক রাজনীতিতে একটা ভূমিকা গ্রহণ করার জন্য প্রস্তুত হচ্ছে, এমন ইঙ্গিত পাওয়া যাচ্ছে—যদিও সেই ভূমিকাটা কি হবে তা এখনও বোঝা যাচ্ছে না। ঠাণ্ডা লড়াইয়ের দিনের জোটবন্ধনগুলি শিথিল হয়ে আসার পর ফ্রান্স যেমন করে আন্তর্জাতিক রাজনীতিতে তার পৃথক ও বিশিষ্ট সত্তা প্রতিষ্ঠিত করেছে তেমনিভাবে না হলেও, অনেকটা সেভাবে জাপানও যদি আমেরিকার প্রভাববলয়ের বাইরে বেরিয়ে এসে নিজের স্বাতন্ত্র্য প্রকাশ করতে চায় তাহলেও বিস্ময়ের কিছু থাকবে না। অন্যদিকে ভারতবর্ষের পক্ষেও নতুন বন্ধুর সন্ধান করা প্রয়োজন হয়ে পড়েছে। খাদ্যের জন্য তাকে আমেরিকার উপর নির্ভর করতে হচ্ছে, কাশ্মীরের ব্যাপারে সমর্থনের জন্য তাকে সোভিয়েট রাশিয়ার উপর নির্ভর করতে হচ্ছে, পাকিস্থানের বিরুদ্ধে আরব রাষ্ট্রগুলির সমর্থন তার প্রয়োজন অথচ ভারতবর্ষ পশ্চিম এশিয়ার যুদ্ধে আরব রাষ্ট্রগুলিকে সমর্থন করে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের ক্রোধের কারণ হচ্ছে, পাকিস্থানের সংগে সোভিয়েট রাশিয়ার ঘনিষ্ঠতর সম্পর্ক স্থাপনের সম্ভাবনায় সে উদ্বিগ্ন। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র আমাদের প্রতি বিরক্ত; কেননা, আমরা পাকিস্থানী এবং চীনা হামলার বিপদকে অতিরিক্ত করে দেখাবার চেষ্টা করছি। সোভিয়েট রাশিয়া এবং জোটনিরপেক্ষ দুনিয়া আমাদের প্রতি সন্দিগ্ধ; কেননা আমরা পুরোপুরি আমেরিকার খপ্পরে পড়ে গেছি।

এই অবস্থায় ভারতবর্ষ যে নতুন বন্ধুর সন্ধান করবে সেটা স্বাভাবিক।

ভারতের উপপ্রধানমন্ত্রী শ্রীমোরারজী দেশাই সম্প্রতি জাপানে যে সফর করে এলেন সেটা এই দৃষ্টিতেই বিচার্য।

বিদেশী সংবাদপত্রে প্রকাশিত হয়েছিল শ্রীদেশাই নাকি ভারত ও জাপানের 'কোয়ালিশন' গঠনের কথা বলেছেন। শ্রীদেশাই একথা অস্বীকার করে বলেছেন, 'কোয়ালিশন' কথাটি তিনি ব্যবহার করেননি, এই শব্দটি কি করে তাঁর মুখে বসান হল তা তিনি জানেন না। যাই হোক, শ্রীদেশাই ভারত-জাপান কোয়ালিশন গঠনের কথা না বললেও তিনি যে দুই দেশের মধ্যে নিকটতর সম্পর্ক স্থাপনের প্রস্তাব দিয়েছেন একথা তিনি নিজেই বলেছেন।

এই নিকটতর সম্পর্কের ভিত্তি কি হবে সেকথাও শ্রীদেশাই পরিষ্কার করে বলেছেন। তিনি বলেছেন যে, ভারত ও জাপানের সহযোগিতা এশিয়ায় চীনের বিরুদ্ধে একটা 'রক্ষাপ্রাচীর' গড়ে তুলবে। হাইড্রোজেন বোমার বলে বলীয়ান মারমুখী চীন এশিয়ার ছোটখাট দেশগুলির পক্ষে যে বিপদের কারণ হয়ে উঠছে সে বিষয়ে ভারতবর্ষের উদ্বেগে জাপানকে অংশীদার করতে চেয়েছেন শ্রীদেশাই। এখন পর্যন্ত জাপান যে এই বিষয়টি ভারতবর্ষের দৃষ্টি দিয়েই দেখেছে এমন কোন প্রমাণ নেই। চীনের প্রতিবেশী দেশ হওয়া সত্ত্বেও জাপান এখন পর্যন্ত তার

এই প্রতিবেশীর দুর্দান্তপনা সম্পর্কে সেই ধরনের উদ্বেগ দেখায়নি যে ধরনের উদ্বেগ এশিয়ার অন্যান্য কয়েকটি দেশে দেখা গেছে। তার একটা কারণ এই হতে পারে যে, জাপান চীনের সঙ্গে এখনও কলহে প্রবৃত্ত হয়ে এই বিরাট দেশের বাজার হাতছাড়া করতে চায় না।

শ্রীদেশাইয়ের এই সফরের পর জাপান তার ঘরের পাশে চীনা হাইড্রোজেন বোমার বিস্ফোরণ সম্পর্কে কতখানি অবহিত হবে বলা কঠিন। কিন্তু শ্রীদেশাইয়ের চেষ্টা যদি সফলও হয় তাহলেও ভারত ও জাপানের সহযোগিতায় এশিয়ায় চীনের বিরুদ্ধে কি ধরনের 'রক্ষাপ্রাচীর' গড়ে উঠতে পারে?

প্রথমেই এটা স্পষ্ট যে, এই সহযোগিতা কোন একটা সামরিক জোট হতে পারে না। কারণ, অপেক্ষাকৃত ক্ষুদ্র একটা 'আত্মরক্ষী বাহিনী' ছাড়া জাপানের কোন সামরিক শক্তি নেই এবং সংবিধানের ঘোষণার দ্বারা সে অস্ত্রসজ্জার পথ বর্জন করেছে। ভারতবর্ষও কোন সামরিক জোটে যোগ দেবে না বলে প্রতিজ্ঞাবদ্ধ।

সুতরাং, চীনের বিরুদ্ধে জাপানের সঙ্গে ভারতে জোটবন্দীর এই প্রয়াসের তাৎপর্য সামরিক নয়, অন্যবিধ। এশিয়ার সামনে চীন যে বিপদ নিয়ে এসেছে সেটা কেবল সামরিক নয়, অর্থনৈতিক এবং রাজনৈতিকও নয়। ভারতবর্ষ ও চীন ভিন্নধরনের রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক কাঠামোয় কোটি কোটি মানুষের বহু শতাব্দীব্যাপী সঞ্চিত দারিদ্র্য দূর করার চেষ্টা করছে। দুটি ভিন্ন-তন্ত্রের মধ্যে এই প্রতিযোগিতায় ভারতবর্ষের পিছিয়ে পড়ার লক্ষণ দেখা যাচ্ছে। ভারতবর্ষ যদি ব্যর্থ হয় তাহলে এশিয়া ও আফ্রিকার অন্যান্য উন্নতিকামী দেশগুলি গণতন্ত্রের প্রতি আকর্ষণ হারাবে এবং চীনের দিকে ঝুঁকবে। যেহেতু জাপানও নিজেকে গণতন্ত্রের পথে গড়ে তুলেছে এবং যেহেতু এশিয়ার দেশ হওয়া সত্ত্বেও দরিদ্রতর দেশগুলিকে সাহায্য করার উপযুক্ত সংগতি তার আছে সেহেতু সে যদি চীনের বিপদটা এইদিক থেকে উপলব্ধি করে তাহলে সে হয়ত ভারতবর্ষের সাহায্যে আরও কিছুটা অগ্রসর হয়ে আসতে পারবে।

জাপান অবশ্য ভারতবর্ষকে আগে থেকেই ঋণ ও কারিগরী সহযোগিতা দিয়ে সাহায্য করছে। জাপান 'এইড ইণ্ডিয়া' ক্লাবের অন্যতম সদস্যও বটে। কিন্তু জাপানী ঋণের শর্তগুলি অন্যান্য বিদেশী ঋণের সর্তের তুলনায় কঠোরতর, এই ঋণ পরিশোধের মেয়াদ কম এবং সুদের হার চড়া। জাপানী অর্থলগ্নকারীরা ভারতবর্ষের অর্থনৈতিক ভবিষ্যৎ সম্পর্কে এবং এখানে পুঁজি লগ্নী করার ব্যাপারে বিশেষ উৎসাহান্বিত নয়। বাণিজ্যের দিক দিয়ে এখন পর্যন্ত চীন জাপানের কাছে আকরিক লোহা ও অন্যান্য কাঁচা মালের যোগানদার হয়ে আছে, ভারতীয় শিল্পপণ্যের জন্য জাপানে কোন বাজার খোলা যায় কিনা সেই সম্ভাবনা পরীক্ষা করেও দেখা হয়নি।

এই সব কারণে ভারত-জাপান অর্থনৈতিক সহযোগিতার ক্ষেত্র সম্প্রসারিত হচ্ছে না।

শ্রীদেশাইয়ের সফরের পর ভারতের এই পূর্বদেশীয় সম্পদশালী রাষ্ট্রটির সঙ্গে তার সম্পর্ক ঘনিষ্ঠতর হবে কিনা সেটা লক্ষ্য করার বিষয় হবে।

সামনে অন্ধকার

খোলা বাজারে চালের দাম চার টাকার ওপরে, রেশনে বড় জোর দিন সাতেকের খাদ্য মজুত আছে, মফস্বলে আংশিক রেশন ভেঙে পড়বার উপক্রম। পশ্চিমবঙ্গে খাদ্য পরিস্থিতির ভয়াবহতা এ থেকেই বোঝা যাবে।

এরই পরিপ্রেক্ষিতে রাজ্যের একদল মন্ত্রী দিল্লীতে গিয়েছিলেন প্রধানমন্ত্রীর কাছে খাদ্যের জন্যে ধর্ণা দিতে। ধর্ণা শেষ পর্যন্ত দিতে হয়নি। মৌখিক আলোচনার পরেই কেন্দ্রীয় সরকার রাজ্যের ন্যূনতম চাহিদা পূরণের প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন। তাঁরা বলেছেন, আগস্ট মাসের জন্যে সব মিলিয়ে এক লক্ষ ৫ হাজার টন খাদ্যশস্য সরবরাহ করা হবে এবং সেপ্টেম্বর ও অক্টোবরের জন্যে অনুরূপ পরিমাণ খাদ্য দেবার চেষ্টা করা হবে।

এরই পরিপ্রেক্ষিতে গত ২৪শে আগস্ট রাজ্যের সর্বত্র ২৪ ঘন্টাব্যাপী হরতাল পালন করা হয়। হরতালের ঘোষিত প্রধান উদ্দেশ্য ছিল মজুতদার-জোতদার শ্রেণীর বিরুদ্ধে খাদ্যসংকটকে তীব্রতর করার জন্যে প্রতিবাদ জানানো।

এই সুফল ধর্ণা এবং সফল হরতালের পর পশ্চিমবঙ্গের খাদ্য-চিত্র কি রকম দাঁড়িয়েছে? চালের দাম সেই রকমই আছে। মফস্বলের অবস্থা সেই রকমই শোচনীয়। আর রেশন? ২৬ আগস্টের একটি খবরে জানা যাচ্ছে, বিধিবদ্ধ রেশন এলাকায় ইতি-মধ্যেই কর্তিত মাথাপিছু ৫০০ গ্রাম চালের বরাদ্দ কমিয়ে অর্ধেক করা হতে পারে। খাদ্যমন্ত্রী ডঃ প্রফুল্লচন্দ্র ঘোষ জানিয়েছেন, অক্টোবরের পনেরো তারিখ পর্যন্ত অবস্থার উন্নতির কোন আশাই নেই।

এ থেকে যদি জনসাধারণের মনে কোন ব্যাপক নিরাশা দেখা দেয় তবে তার জন্যে দায়ী হবেন রাজ্য সরকার। কারণ তাঁরাই গত কয়েকদিনে এই ধারণার সৃষ্টি করেছেন যে, কেন্দ্রের কাছ থেকে ১ লক্ষ ৫ হাজার টন গম পেলেই তাঁদের সব সমস্যা আপাতত মিটে যাবে।

কিন্তু প্রয়োজনটা আসলে ১ লক্ষ ৫ হাজার টনের নয়, আরো বেশি। রাজ্য সর-কারের তথ্যমন্ত্রী শ্রীসোমনাথ লাহিড়ী জানিয়েছেন, জুন থেকে ডিসেম্বরের মধ্যে অন্তত ৯ লক্ষ ৪৫ হাজার টন গম ও ১ লক্ষ ৪৫ হাজার টন চাল দরকার। এর ভিত্তিতে প্রতি মাসে রাজ্যের প্রয়োজন ১ লক্ষ ৩৭ হাজার টন গম ও কিছু বেশি ২০ হাজার টন চাল। সুতরাং ১ লক্ষ ৫ হাজার টন করে গম মাসে পেলেও মাসে ৩২ হাজার টনের ঘাটতি থেকে যাচ্ছে। এতটা ঘাটতি নিয়ে নিশ্চয়ই সুষ্ঠুভাবে রেশনের চাহিদা মেটানো সম্ভব নয়।

তাছাড়া কেন্দ্রের কাছ থেকে যে এক লক্ষ টন পাওয়া যাবেই তার নিশ্চয়তা নেই। কেন্দ্র আগেই ১ লক্ষ টন বরাদ্দের প্রতি-শ্রুতি দিয়েছিল, কিন্তু মাসে ৮৭ হাজার টনের বেশি আসছিল না। আর চাল পাওয়া যাচ্ছিল মাসে ১৫ হাজার টন। এবং কেন্দ্রীয় খাদ্যমন্ত্রী শ্রীজগজীবন রাম ইতিমধ্যেই রাজ্য সরকারকে জানিয়ে দিয়েছেন যে, হরতালের দরুণ কলকাতা বন্দরের কাজ বন্ধ থাকায় এ মাসে প্রতিশ্রুত ১ লক্ষ ৫ হাজার টন পাঠানো যাবে কিনা সন্দেহ।

এর ওপর রাজ্য সরকারের নিজস্ব ধান-চাল সংগ্রহের অভিযান শোচনীয়ভাবে ব্যর্থ হয়েছে। জুন মাসের মধ্যে ২ লক্ষ টন চাল সংগ্রহের লক্ষ যুক্তফ্রন্ট সরকার ধার্য করে-ছিলেন, কিন্তু আগস্ট মাসের ২২ তারিখ পর্যন্ত মাত্র ১ লক্ষ ৫ হাজার টন সংগ্রহ হয়েছে। এর তুলনায় গত বছর পূর্ববর্তী কংগ্রেস সরকারের নিরাশাব্যঞ্জক সংগ্রহ অভিযানের সময়েও ৫ লক্ষ টন সংগৃহীত হয়েছিল। সুতরাং আভ্যন্তরীণ সংগ্রহ থেকে সংকট ত্রাণের এবং গ্রামাঞ্চলের মানুষকে কিছুটা ভারমুক্ত করার কোন আশাই নেই।

এই ব্যর্থতার কোন সন্তোষজনক ব্যাখ্যা যুক্তফ্রন্ট সরকার দেননি। তাঁরা হর-তাল করেছেন মজুতদার-জোতদারদের বিরুদ্ধে, কিন্তু নিজেদের হাতে শাসন-ক্ষমতা থাকা সত্ত্বেও মজুত খাদ্যশস্য উদ্ধার করে আনতে পারেন নি। তার বদলে তাঁরা সব দোষ কেবল কেন্দ্রীয় সরকারের ওপর চাপিয়ে দিতে চাইছেন, এবং বলছেন, সংগ্রহের পরিমাণ যদি আরো বেশি হত, তাতেও অবস্থার কিছু হেরফের হত না। কারণ এ-বছর রাজ্যের খাদ্য ঘাটতির পরিমাণ ২৪ লক্ষ টন। সুতরাং যদি দু' লক্ষ টনও সংগ্রহ হত এবং কেন্দ্রের কাছ থেকে প্রত্যাশিত মোট ১৫ লক্ষ টন পাওয়া যেত, তাহলেও ৭ লক্ষ টনের ঘাটতি থেকে যেত।

তাছাড়া আরও একটি দুঃসংবাদ আছে। আগে আশা করা হয়েছিল যে, আউস ধানের বিপণনযোগ্য উদ্বৃত্তের অধিকাংশই যদি সংগ্রহ করা যায় তাহলে নতুন আমন ধান না ওঠা পর্যন্ত কোনরকমে সংকট কাটিয়ে ওঠা যাবে। কিন্তু এখন দেখা যাচ্ছে আউসের ফলন ভালো হওয়া সত্ত্বেও আউস সংগ্রহেরও বিশেষ কোন সম্ভাবনা নেই। রাজ্য সরকার ভেবেছিলেন অন্তত ১২ হাজার টন সংগ্রহ করা যাবে। এখন পর্যন্ত তাঁরা সংগ্রহ করেছেন মাত্র ২০০ টন।

খাদ্যমন্ত্রী ডঃ ঘোষ বলেছেন, নদীয়াতে এবার ১ লক্ষ ২০ হাজার টন আউস ধান ফলেছে। এর মধ্যে যদি ১০ হাজার টনও সংগ্রহ করা যায় তাহলেই তিনি খুশি হবেন। কিন্তু এই পরিমাণ সংগ্রহ সম্পর্কেও তিনি সংশয় প্রকাশ করেছেন, কেননা রাজ্য সর-কারের উপযুক্ত ব্যবস্থাপনাই নেই। তাছাড়া পর্যাপ্ত সংখ্যক গুদামের অভাবে সংগৃহীত পরিমাণের অন্তত এক-চতুর্থাংশ অপচয় হবে।

সব মিলিয়ে খাদ্যের ব্যাপারে সামনের দিনগুলিতে ঘোর অন্ধকার ছাড়া আর কিছুই আপাতত নজরে পড়ছে না।

নন্দন-নকুল

(২৫)

নন্দন আচার্য

গৌরাঙ্গের কীর্তনসঙ্গী, নবদ্বীপের **চতুর্ভুজ** পণ্ডিতের **ছেলে**। মহা-ভাগবতোত্তম নন্দন আচার্য। **নইলে** তার ঘরে নিত্যানন্দ অতিথি হয়?

নানা তীর্থ ভ্রমণ **করে** নিত্যানন্দ বৃন্দাবনে এসেছে। বৃন্দাবনে এসে জানতে পেরেছে নবদ্বীপে গৌরচন্দ্র প্রকাশিত হয়েছেন।

তবে আর **এখন বৃন্দাবন** কী, চলো **যাই** নবদ্বীপ।

নবদ্বীপে গিয়ে **প্রথমেই ধরা** দেব না। **লুকিয়ে থাকব**! এমন **কার** ঘর আছে যেখানে দু দণ্ড আশ্রয় পেতে পারি? **ভক্তির পরিবেশে** পেতে পারি চিত্তের **স্নিগ্ধতা**?

পথই পথ দেখিয়ে নিয়ে **এল**। নিয়ে **এল** নন্দন আচার্যের ঘরে।

মহা-অবধূতবেশ, প্রকাণ্ড শরীর, নিত্যানন্দকে দেখে নন্দন অভিভূত হয়ে গেল। বিনয়-বচনে **বললে**, যদি দয়া করে **আমার** ঘরে **ভিক্ষে করেন তো** কৃতার্থ হই।

সেই মনে করেই তো এসেছি। মহা-বদান্য নিত্যানন্দ ঘরে এসে বসল। কোনো **নিমন্ত্রণের** অপেক্ষা করিনি।

এই নন্দন আচার্যের **ঘরেই** নিত্যা-**নন্দের সঙ্গে** গৌরাঙ্গের **সাক্ষাৎকার**।

নবদ্বীপে শিগগিরই এক মহাপুরুষ **আসবেন**। নিত্যানন্দের আসার দু-তিন দিন **আগেই প্রভু** বললেন **ভক্তদের**।

তারপর যেদিন এল তার পরদিন প্রভু **বললেন**, কাল রাতে এক অপরূপ স্বপ্ন **দেখলাম**। দেখলাম এক **তালধ্বজ রথ** আমার দুয়ারে এসে দাঁড়িয়েছে। ডান হাতে ধরা **কাঁধের** উপর বিরাট **স্তম্ভ, বাঁ** হাতে **ধরা কমণ্ডলু**, পরনে নীলাম্বর, **মাথায়ও নীল** কাপড়ের পাগড়ি, এক দীর্ঘায়তদেহ সন্ন্যাসী। আমাকে জিজ্ঞেস করল, এটা কি নিমাই পণ্ডিতের বাড়ি? আমি প্রশ্ন **করলাম**, তুমি কোন মহাজন? **সন্ন্যাসী** হেসে বললে, আমি তোমার ভাই। **আজ** যাই, কাল আমাদের পরিচয় হবে। **বলে প্রভু শ্রীবাস আর** হরিদাসকে আদেশ **করলেন**, দেখ তো কোথাও কোন মহাপুরুষ এসেছে কিনা।

শ্রীবাস আর **হরিদাস** খুঁজতে বেরুল। **কে জানে সংকর্ষণ এল কিনা**।

কোথায় কে মহাপুরুষ সন্ধান পেল না। **গৃহস্থ বৈষ্ণব সকলের** ঘরে গিয়ে দুয়ার নাড়ল, তোমাদের বাড়িতে নতুন কোন অতিথি এসেছে? **সন্ন্যাসীদের** আখড়ায় **গিয়েও খোঁজ করল**, এসেছে কোনো অবধূত? পাষণ্ডীদের বাড়িও বাকি রাখল না। **তোমাদের বাড়িতে কেউ আসে** নি তো **ছদ্মবেশে**?

কোথাও কোনো মহাপুরুষের দেখা পেলাম না।

সব বাড়ি দেখেছ ঘুরে ঘুরে?

তিন **প্রহর** ধরে ঘুরেছি, নদীয়ার কোনো **ঘর আর বাকি** নেই।

প্রভু মনে মনে হাসলেন। নিত্যানন্দ বড় গূঢ় বস্তু। তাকে **সহজে ধরা যায়** না।

প্রভু বললেন, দেখি আমি খুঁজে **পাই** কিনা।

প্রভু খুঁজতে বেরুলেন। ভক্তদলও সঙ্গে **চলল**। মুখে মুখে **ধ্বনি** চলল, **জয় কৃষ্ণ**।

সব বাড়ি ছেড়ে দিয়ে প্রভু সটান নন্দন আচার্যের বাড়িতে গিয়ে উঠলেন। আর— ঠিক, সেইখানেই কে এক পুরুষ-রতন বসে আছে।

হরিদাস আর শ্রীবাস বুঝি তাড়া-তাড়িতে নন্দনের বাড়িটাই ছেড়ে গিয়েছিল। তাদের **এই বিস্মৃতিটুকু** না ঘটলে যে **প্রভুর এই সাক্ষাৎ আবিষ্কার হয়** না।

নন্দনের বাড়ি **বুঝি** এমনি **লুকিয়ে থাকবারই জায়গা**।

আরেকদিন **প্রভু শ্রীবাসের** ভাই রামাই পণ্ডিতকে ডাকলেন। **ঈশ্বর-আবেশে** বল-লেন, তুমি **একবার অদ্বৈতের** বাড়ি যাও। তাকে গিয়ে বলো, যার জন্যে এত কেঁদে-ছিলে, এত উপাসনা ও উপবাস করেছিলে সে প্রকাশিত হয়েছে। সে যেন পুজোর **উপকরণ নিয়ে সস্ত্রীক চলে আসে**।

রামাই হরি-হরি স্মরণ করতে করতে চলল অদ্বৈতের কাছে।

ভক্তিযোগের প্রভাবে অদ্বৈত বুঝতে পেরেছে **রামাই কেন এসেছে**। তাই নিজের থেকেই **বলে উঠল**, আমাকে নেবার জন্যে তোমাকে **পাঠিয়েছে বুঝি**?

সবই **তো** আপনি **জানেন**, তবে চলুন তাড়াতাড়ি।

কিন্তু মানুষের মধ্যে **ঈশ্বর** এসেছে এ মানি কী **করে**? অদ্বৈত আবার নতুন ভঙ্গি নিল : আমার অধ্যাত্মবিজ্ঞান **এমন** কথা বলে না।

মুখে যাই বলুক অদ্বৈত বিধিযোগ্য পুজোর **উপকরণ** নিয়ে **চলল। বললে**, প্রভু যদি আমাকে তাঁর ঐশ্বর্য দেখান তবেই বুঝব তিনি আমার প্রাণধন।

কী ঐশ্বর্য দেখতে চান?

তিনি শুধু আমার মাথায় তাঁর শ্রীচরণ তুলে দেবেন।

কী জানি, রামাই ভাবল, এমন লীলা দেখবার ভাগ্য **করেছি** কিনা।

অদ্বৈত বললে, আমি **নন্দন** আচার্যের বাড়িতে **লুকিয়ে থাকব তুমি প্রভুকে** গিয়ে **বলবে**, আচার্য **এল** না। দেখি **প্রভু** কী **বলেন**।

রামাই এসে **দাঁড়াল প্রভুর সামনে**। তার মুখ খোলবার আগেই **প্রভু** বললেন, অদ্বৈত বুঝি নন্দন আচার্যের বাড়ি **লুকিয়ে** থেকে আমাকে **পরীক্ষা** করতে চাইছে। যাও তাকে এখানে নিয়ে এস। তার মনোবাঞ্ছা পূর্ণ করব।

রামাই আবার গেল অদ্বৈতের কাছে। সব কথা **ব্যক্ত করলে**। আমাকে প্রভু মিথ্যা কথা বলতে দিলেন না। আপনার জারিজুরি ধরে ফেললেন। এবার চলুন, আপনাকে ডেকেছেন প্রভু।

স্তব পড়তে পড়তে অদ্বৈত সস্ত্রীক **চলে** এল।

অশেষ-বিশেষে প্রভুর চরণবন্দনা করল। প্রভু অদ্বৈতের মাথায় পা তুলে দিলেন। 'সর্বভূত অন্তর্যামী শ্রীগৌরাঙ্গ রায়। চরণ তুলিয়া দিলা অদ্বৈত-মাথায়।।'

আরেকবার **প্রভুই** নিজে **লুকোলেন**। সেই লুকোবার **স্থানও** নন্দন আচার্যের বাড়ি।

একদিন প্রভু নৃত্য **করছেন**, তাঁকে ঘিরে **ভক্তদল কীর্তন করছে, কিন্তু** কেন কে **জানে নৃত্যে-কীর্তনে প্রেমানুভব হচ্ছে** না।

কেন **এমন** হচ্ছে? **কেন সমস্ত শুষ্ক লাগছে**? **প্রভু** জিজ্ঞেস করলেন, তবে কি নগরেকীর্তনে কোনো **পাষণ্ডীসম্ভাব হয়েছে**? না কি তোমাদেরই **কারু কাছে কোনো অপরাধ** করে **বসেছি**?

অদ্বৈত বললে, অপরাধ করেছ বৈকি। তুমি সকলকে প্রেম দিলে, **কেবল** আমাকে আর শ্রীবাসকে দিলে না। তাই আমি **তোমার সমস্ত প্রেম শুষে নিয়েছি**।

তবে আমার দেহে যখন প্রেম নেই তখন তো এর প্রাণও নেই। প্রভু গঙ্গার **দিকে ছুটলেন। এ প্রেমহীন দেহ দিয়ে তবে আর কী হবে?**

প্রভু গঙ্গায় ঝাঁপ দিলেন।

নিত্যানন্দ আর হরিদাসও সঙ্গে-সঙ্গে ঝাঁপিয়ে পড়ল। তুলল প্রভুকে। নিত্যানন্দ বললে, ভক্ত অভিমানে কী বলল আর তাইতে তুমি মরতে ছুটলে?

প্রভু বললেন, কাউকে কিছু বোলো না, আমি নন্দন আচার্যের বাড়িতে লুকিয়ে থাকব।

প্রভুর উদ্দেশ না পেয়ে সমস্ত নবদ্বীপ শোকাচ্ছন্ন হল। কারু বাড়িতে হাঁড়ি চড়ল না।

এদিকে প্রভু নন্দন আচার্যের বাড়িতে গিয়ে তার বিষ্ণুখট্টার উপর বসলেন।

নন্দন দেখল প্রভুর বসন সিক্ত। নতুন বস্ত্র এনে দিল। প্রভু শুষ্ক বস্ত্র পরে আবার খাটে বসলেন।

বললেন, নন্দন, তুমি আমাকে লুকিয়ে রাখবে।

এ বড় দুষ্কর কাজ। নন্দন বললে, মানুষের সংসারের মধ্যে তুমি কোথায় লুকোবে? হৃদয়ে পর্যন্ত লুকিয়ে থাকতে পারো না। বারে বারেই বাইরে বেরিয়ে আস। ক্ষীরসিন্ধুই তোমাকে লুকিয়ে রাখতে পারল না আর এ তো মানুষের সমাজ!

সারা রাত কৃষ্ণকথারসে কাটালেন প্রভু। প্রভাতে নন্দনকে বললেন, নন্দন, একলা শ্রীবাসকে ডেকে নিয়ে এস।

শ্রীবাস এসে কাঁদতে লাগল।

অদ্বৈতের খবর বলো।

তার আর খবর কী। কাল থেকে সে উপোস করে আছে।

প্রভু অস্থির হয়ে চললেন অদ্বৈত-সকাশে।

বললেন, অদ্বৈত, ওঠো। আমি বিশ্বম্ভর, তোমার ডাকে তোমার কাছে এসেছি।

মূর্ছাগত অদ্বৈত চোখ চাইল।

প্রভু বললেন, উঠে স্নান করো, খাও। কৃষ্ণ যদি কাউকে দণ্ড দেন, সঙ্গে সঙ্গে তাকে দাস্যও দেন। দণ্ডিত জনই কৃষ্ণদাস হয়ে যায়।

নন্দন আচার্য দেখল, বুঝল, দণ্ডই কৃষ্ণের কৃপা। প্রভু, আমাকে কবে দণ্ড দেবে?

কাজীদমনের দিন কীর্তনের দলের একজন নন্দন আচার্য। রথযাত্রায় প্রভুকে দেখতে নীলচলের যাত্রীও নন্দন আচার্য।

(২৬)

নকুল ব্রহ্মচারী

শ্রীপাট কালনার কাছাকাছি পিয়ারিগঞ্জে নকুলের বাড়ি। আগে নাম ছিল প্রদ্যুম্ন। নৃসিংহের উপাসক। প্রভু তাই তার নাম দিয়েছিলেন নৃসিংহানন্দ।

কালনার অম্বিকায় নকুলের দেহে প্রভুর আবেশ হল।

জীবনিস্তারের তিন উপায়—সাক্ষাৎ-দর্শন, আবির্ভাব আর আবেশ।

নকুলে এই আবেশ উপস্থিত হল।

আবিষ্ট হয়ে গ্রহগ্রস্তের মত নকুল কখনো হাসে, কখনো কাঁদে, কখনো গান করে, কখনো বা নাচে উন্মত্ত হয়ে। প্রভুর মতই তার গায়ের রঙ গৌর হয়ে গেল। সর্বদাই প্রেমাবেশে প্রভুর মত সকলকে কৃষ্ণনাম নিতে বলছে, বলছে নাম ছাড়া আর উপায় নেই। একেবারে ঠিক প্রভুর মতই বাচন-ভাষণ।

দেশের লোক নকুলকে দেখতে ভিড় করল। আর কী আশ্চর্য, যে দেখে সেই প্রেমোন্দাম হয়ে ওঠে।

শিবানন্দ সেনের ইচ্ছে হল পরীক্ষা করে দেখি সত্যিই এ প্রভুর আবেশ কিনা। প্রভু তো সর্বজ্ঞ। সত্যি সত্যি প্রভুর আবেশ হলে নকুলও তো সর্বজ্ঞ হয়ে উঠবে। দেখি আমি লুকিয়ে থাকলে নকুল আমাকে আমার নাম ধরে ডাকতে পারে কিনা। দেখি বলতে পারে কিনা আমার ইষ্টমন্ত্র কী।

লোক আসছে যাচ্ছে জটলা পাকাচ্ছে, এত ভিড় যে সকলে দর্শনও পাচ্ছে না। এমন সময় নকুল বললে, শিবানন্দ দূরে অপেক্ষা করছে, তাকে কেউ গিয়ে ডেকে নিয়ে এস তো।

শিবানন্দ! শিবানন্দ! হাঁকডাক শুরু হয়ে গেল। শিবানন্দ কে? শিবানন্দ কোথায়? তোমাকে ব্রহ্মচারী ডাকছেন।

শিবানন্দ এসে নমস্কার করে নকুলের পাশে বসল হাসিমুখে।

পাশে বসে ভালোই করেছ। বললে নকুল, এখন, তোমার ইষ্টমন্ত্র কী, তাই তোমাকে কানে কানে বলে দিই। চারি অক্ষর গৌরগোপাল মন্ত্রেই তোমার দীক্ষা। কী, ঠিক নয়?

ঠিক। এতক্ষণে শিবানন্দের বিশ্বাস হল।

প্রভু নীলাচল হতে বৃন্দাবন যাচ্ছেন, গৌড়পথে এসেছেন কুলিয়ায়।

মনে মনে পথ তৈরি করছে নকুল, প্রভুর বৃন্দাবনে যাবার পথ। কল্পনায় ছবি আঁকছে।

আগে মণিরত্ন দিয়ে পথ তৈরি করল। সে রত্নবাঁধা পথও বোধহয় প্রভুর পায়ে কঠিন লাগবে। তাই তার উপর নির্বৃন্ত ফুলের শয্যা বিছিয়ে দিল। রাস্তার দু পাশে বকুল গাছ পুঁতে দিল, বকুল গাছের ছায়ায় পথ বেশ শীতল থাকবে। ফুলের গন্ধে বাতাস আমোদ করে বেড়াবে। প্রভুর তত ক্লান্তি লাগবে না। রাস্তার কাছাকাছি কতগুলি পুকুরও কেটে দিল. স্বচ্ছ জল সুধার মত স্বাদু, প্রভু ইচ্ছেমত স্নান-পান করতে পারবেন। আর গাছে গাছে কী সুন্দর পাখির কাকলি, তাতে প্রাণে আনন্দ জাগাবে, উৎসাহ জাগবে। মনে হবে পাখির কণ্ঠেও কৃষ্ণনামের মধু ঝরছে।

কল্পনায় পথ করতে করতে কানাইর-নাটশালা পর্যন্ত এসেই থেমে গেল নকুল। তার বেশি আর মন অগ্রসর হল না।

নকুল বললে, প্রভুর এবার বৃন্দাবন যাওয়া হবে না। তাঁকে কানাইর-নাটশালা থেকেই ফিরতে হবে।

নকুল যা বলল তাই হল। কানাইর-নাটশালা থেকেই প্রভু ফিরে গেলেন।

নকুলে শুধু প্রভুর আবেশই হল না, নকুলের সামনে প্রভুর আবির্ভাবও হল।

শ্রীকান্ত শিবানন্দের ভাগনে, একবার রথযাত্রার অনেক আগেই প্রভুকে দেখবার উৎকণ্ঠায় চলে এসেছে নীলাচলে।

দু মাস থাকবার পর প্রভু তাকে বাংলা দেশে ফিরে যেতে বললেন। বললেন, সবাইকে বলে দিও, এ বছর কেউ যেন না আসে।

কেউ আসবে না? শ্রীকান্তের বুকে যেন ব্যথা বাজল।

না। কেননা আমিই যাব এবার পৌষ মাসে। তোমার মামা শিবানন্দের বাড়িতে উঠব।

সত্যি? শ্রীকান্ত উল্লাস করে উঠল।

সেখানে জগদানন্দ আছে, সে আমার জন্যে রান্না করতে পারবে।

শ্রীকান্ত ফিরে এসে সংবাদ রাষ্ট্র করে দিল। যারা যারা যাবার উদ্যোগ করছিল তারা সবাই স্থির হল।

প্রভু নিজে আসছেন এর মত আর সুখকর কী আছে।

পৌষ মাস পড়তেই শিবানন্দ প্রভুর ভিক্ষার উপাচার সংগ্রহ করতে বসল।

কিন্তু কই, মাস যে কেটে যায়, প্রভু এলেন কই?

শিবানন্দ ম্রিয়মাণ হয়ে রইল। জগদানন্দেরও এক অবস্থা। প্রভু তার হাতের রান্না খেতে চেয়েছিলেন। সে কি তবে রান্না করা ছেড়ে দেবে?

একদিন নকুল এসে হাজির।

এই যে নৃসিংহানন্দ এসেছ। শিবানন্দ সসম্ভ্রমে অভ্যর্থনা করল।

কিন্তু তোমরা নিরানন্দ কেন?

শিবানন্দ বললে তাদের দুঃখের কথা। প্রভু আসবেন বলে এলেন না। খাবেন বলে খেলেন না।

নকুল বললে, চিন্তা করো না। আমি তিনদিনের মধ্যে প্রভুকে এখানে নিয়ে আসব।

দু দিন ধ্যান করার পর নকুল বললে, প্রভু পানিহাটি পর্যন্ত এসেছেন: কাল মধ্যাহ্নে এখানে আসবেন। ভিক্ষের জোগাড় করো। আমি রান্না করব।

বহুতর ব্যঞ্জন পিঠে ক্ষীর পায়েস রান্না করল নকুল।

তিনজনের জন্যে ভোগ সাজাল নকুল। প্রথম জন স্বয়ং প্রভু, দ্বিতীয় জন জগন্নাথ, তৃতীয় জন তার নিজের ইষ্টদেব নৃসিংহ।

তিনজনকে ভোগ সমর্পণ করে আবার ধ্যানে বসল নকুল।

'হাঁ, হাঁ, কী করো? কী করো?' নকুল চেঁচিয়ে উঠল ; 'তুমি তিন থালাই খাও কী করে? জগন্নাথের সঙ্গে তোমার ঐক্য, তুমি না হয় তার ভোগ খেলে, কিন্তু নৃসিংহের ভোগ তুমি খাও কী করে?'

কিন্তু প্রভু আবির্ভূত হয়ে নকুলকে দেখালেন জগন্নাথের সঙ্গে যেমন তাঁর ভেদ নেই, নৃসিংহের সঙ্গেও তেমনি ভেদ নেই।

নকুল তা মনে মনে বুঝল এখন চোখের সামনে প্রত্যক্ষ করল।

তোমার প্রভুর ব্যবহার দেখ। শিবানন্দকে উদ্দেশ করে নকুল বললে, 'আমার নৃসিংহের ভোগও খেয়ে গেল। জগন্নাথেরটা খেয়েছেন তা খান, কিন্তু আমার নৃসিংহেরটা খান কী বলে? আমার নৃসিংহ আজ উপবাসী রইল।'

এ সব কী বলছে নকুল? এ সব কি সে প্রেমাবেশে বলছে? এ সব কি তার কল্পনার কারুকার্য? নইলে শিবানন্দ দেখতে পেল না কেন? জগদানন্দেরই বা কী অপরাধ?

তবু নকুলকে শিবানন্দ অগ্রাহ্য করতে পারল না। নৃসিংহের জন্যে আবার সমস্ত জোগাড় করল। আবার ভোগ লাগাল নকুল।

শিবানন্দের সংশয়ের কথা প্রভু টের পেয়েছেন।

পরের বছর শিবানন্দ যখন নীলাচলে গেল তখন প্রভু বললেন, গত বছর পৌষ মাসে তোমাদের বাড়িতে গিয়ে কী সুন্দর খেলাম! নৃসিংহানন্দ কী সুন্দর রান্না করেছিল! কী সুন্দর খাওয়াল আমাকে!

এতক্ষণে শিবানন্দের সুদৃঢ় বিশ্বাস হল। তার বুঝি মনে হল নকুলের যেমন আতীব্র ভক্তি তার বুঝি তেমন নেই।

সে গিয়ে প্রভুকে দেখে। প্রভু তো কই তার কাছে অবির্ভূত হন না? তার প্রীতির রজ্জু বোধহয় নকুলের মত শক্ত নয়।

(ক্রমশঃ)

প্রেক্ষাগৃহ

আজকের কথা

চলচ্চিত্র-পরিবেশনা ও প্রদর্শনী-ব্যবসায় জাতীয়করণের প্রস্তাব :

সম্প্রতি কেন্দ্রীয় শিক্ষা বিষয়ক পরামর্শ পরিষদের (দি সেণ্ট্রাল অ্যাডভাইসরি বোর্ড অব এডুকেশন-এর) দ্বিতীয় দিনের অধিবেশনে চলচ্চিত্র-পরিবেশনা ও প্রদর্শনী-ব্যবসায়কে সরকারী পরিচালনাধীনে আনবার কথা বলা হয়েছে। দর্শকদের, বিশেষ করে তরুণ-তরুণীদের মনের ওপর চলচ্চিত্রের প্রভাবের কথা বিবেচনা করেই অধ্যাপক এম. ভি. মাথুর চলচ্চিত্রের চরিত্রগঠন সম্পর্কে বক্তৃতাচ্ছলে বলেন যে, এটা করা উচিত বলে তাঁর মনে হয়। কিছু ছবি তরুণ মনের ওপর ক্ষতিকর প্রভাব বিস্তার করে, এ-কথা স্বীকার ক'রে নিয়েও কেন্দ্রীয় শিক্ষামন্ত্রী ডঃ ত্রিগুণা সেন তাঁর শিক্ষা-দপ্তর চলচ্চিত্র-প্রদর্শনীকে কি ভাবে নিয়ন্ত্রিত করতে সক্ষম হ'তে পারে, সে-সম্পর্কে সন্দেহ প্রকাশ করেন এবং এ-ব্যাপারে সদস্যদের মতামত প্রার্থনা করেন। জনৈক সদস্য বলেন, চলচ্চিত্রের সেন্সার (অনুমোদন) ব্যবস্থা শিক্ষা-দপ্তরের অধীনে থাকা উচিত। ডঃ লক্ষ্মণ-স্বামী মুদালিয়ারও চলচ্চিত্রের অতীব ক্ষতিকর প্রভাব সম্বন্ধে বক্তৃতাচ্ছলে বলেন, মাদ্রাজের বহু ছাত্র কলেজের ক্লাস কামাই করে সিনেমা দেখে ব'লে সম্প্রতি রসিকতা ক'রে বলা হয়ে থাকে : Presence by proxy, but attendance at Roxy (উপস্থিতি প্রক্সিতে, হাজির কিন্তু রক্সীতে)।

কিন্তু আমরা বলব, ততটা না তরুণ-তরুণীদের নৈতিক মান রক্ষার জন্যে, চেয়ে ঢের বেশী চলচ্চিত্র-শিল্পের রক্ষা এবং উন্নতির জন্যে চলচ্চিত্রের পরিবেশনা ও প্রদর্শনী-ব্যবসায় দু'টির যত শীঘ্র সম্ভব জাতীয়করণ হওয়া উচিত। কারণ চলচ্চিত্র-শিল্পের যা-কিছু উপার্জন, তা এই দু'টি পথ বেয়েই হয়ে থাকে এবং এ-কথাও কেন্দ্রীয় বা রাজ্যসরকারগুলির নিশ্চয়ই জানা আছে যে, এই শিল্পের উপার্জনের অনেকখানি অংশই পরিবেশক ও চিত্রপ্রদর্শকদের কুক্ষিগত হয়ে থাকে। ছবির টিকিটবিক্রয়লব্ধ অর্থ থেকে প্রমোদকর ও সরকারী সংবাদ ও তথ্যচিত্র প্রদর্শনের ভাড়া দেবার পরে যে পরিমাণ অর্থ উদ্বৃত্ত থাকে, সাধারণত তার শতকরা ষাট থেকে সত্তর ভাগ পরিমাণ অর্থ আত্মসাৎ করেন চিত্রগৃহের মালিকরা। বাকী টাকাটা তাঁরা অর্পণ করেন পরিবেশকের হস্তে। পরিবেশক আবার সেই টাকার কুড়ি থেকে তিরিশ শতাংশ নিজের কমিশন বাবদ কেটে নিয়ে অবশিষ্ট অংশ চিত্রপ্রযোজককে প্রদান করেন। বর্তমানে কয়েকটি ছবি সম্পর্কে হিসেব ক'রে দেখা গেছে যে, টিকিট বিক্রয়ের প্রতি একশো টাকার চোদ্দ কি পনেরোটি টাকা পেয়ে থাকেন চিত্র-

[illegible] [illegible] পরিচালিত বহ্নিশিখা চিত্রের একটি দৃশ্যে অজয় গঙ্গোপাধ্যায় ও সুমিতা সান্যাল। —ফটো : অমৃত

প্রযোজক। অবশ্য এও কাগজে কলমে। কারণ, হামেশাই দেখা যায়, চিত্রপ্রযোজক প্রযোজনার সময়ে পরিবেশকের কাছ থেকে কিছু টাকা অগ্রিম নিয়ে থাকেন। ছবির প্রদর্শনী বাবদ পরিবেশকের ঘরে যখন টাকা আসতে শুরু করে, তখন তিনি তাঁর কমিশন কেটে নেবার পরে প্রযোজকের প্রাপ্য অর্থটি দিয়ে তাঁরই দ্বারা পূর্বে প্রদত্ত সেই অগ্রিম অর্থ পরিশোধ হিসেবে জমা ক'রতে থাকেন। এবং প্রায়ই দেখা যায়, ছবি যদি নিদারুণভাবে জনপ্রিয় না হয়, তাহলে ঐ অগ্রিমটি শোধ হ'তে না হ'তেই ছবির দম ফুরিয়ে যায় অর্থাৎ ছবির প্রদর্শনী বাবদ মাসিক আয় ক্রমে কমতে কমতে একেবারে শূন্যতে এসে দাঁড়ায়। বাঙলা ছবির ক্ষেত্রে এমনও দৃষ্টান্তের অপ্রতুল হবে না যে, ছবির প্রযোজক যখন ছবি তৈরী বাবদ পঞ্চাশ ষাট হাজার টাকা, এমন কি সময়ে সময়ে লক্ষাধিক টাকার ঋণে জড়িয়ে রয়েছেন, ছবির পরিবেশক তখন মাত্র তাঁর প্রাপ্য কমিশন বাবদ দু'লক্ষ টাকা ঘরে তুলেছেন। প্রদর্শকদের কথা না তোলাই ভালো; কারণ তাঁদের খাতায় লোকশানের বাবদ কোনো ঘর কাটা থাকে না।

অথচ অর্থনীতির প্রাথমিক আইন বলে, কোনো ব্যবসায়ে যিনি সবচেয়ে বেশী ঝুঁকি নেন, লাভের বেশীর ভাগ অংশে তাঁরই সবচেয়ে বেশী অধিকার। একটি ছবি তৈরীর ব্যাপারে প্রযোজককে শুধু যে সবচেয়ে বেশী আর্থিক ঝুঁকিই নিতে হয়, তা নয়, সবরকম কাঠখড় পোড়ানো তাঁকেই করতে হয়। একটি চিত্রপ্রযোজনার ঝক্কি যে কতখানি এবং কতরকমের, তা ব'লে বোঝানো

যায় না। কাহিনী-নির্বাচন, চিত্রনাট্যকার, পরিচালক, সঙ্গীত-পরিচালক, গীতিকার, শিল্পী ও বিভিন্ন কলাকুশলী নিয়োগ, পরিবেশক সংগ্রহ, স্টুডিও ও ল্যাবরেটরী নির্বাচন প্রভৃতি থেকে শুরু ক'রে প্রতিদিনের শুটিংয়ের ব্যবস্থা, শিল্পীদের তারিখ নেওয়া ইত্যাদি হাজার ঝামেলা একমাত্র তাঁকেই পোহাতে হয়। সবচেয়ে বড়ো কথা, শিল্পী এবং কলাকুশলীদের মেজাজ-মর্জির প্রতি যথোচিত নজর রেখে তাঁকে কর্তব্য নিরূপণ করতে হয় এবং এ যে কি কঠিন ব্যাপার, তা ভুক্তভোগী ছাড়া অন্য কেউ বুঝতেই পারবেন না। জলের মতো অর্থব্যয় করে ছবি শেষ করবার পরে তাকে সেন্সার কর্তৃপক্ষ কর্তৃক অনুমোদিত করার সঙ্গে সঙ্গে ছবির প্রচার-কার্য সম্পর্কেও তাঁকেই যথারীতি ব্যবস্থা করতে হয়।—কিন্তু অর্থ, সময়, পরিশ্রম ও জীবনীশক্তি অকাতরে ব্যয় করবার পরে যখন তাঁর ছবিখানি মুক্তিলাভ করে, তখন রিলিজ হাউসগুলিকে ভদ্রভাবে সাজানো এবং চিত্র-সাংবাদিকদের আদর-আপ্যায়ন পর্যন্ত তাঁর ছুটোছুটির অন্ত থাকে না। কিন্তু তারপর তিনি আর কেউ নন। হয়ত, রিলিজ হাউস-গুলিতে তিনি 'হাউস ফুল' বোর্ড ঝুলতে বা নিওন-সাইন জ্বলতে দেখে মনে মনে উল্লসিত হতে পারেন, কিন্তু তাঁর আত্মপরিতৃপ্তি ঐ পর্যন্ত। চিত্রগৃহগুলির সম্পর্ক পরিবেশকের সঙ্গে। তারা সাপ্তাহিক 'সেল রিপোর্ট' (টিকিট-বিক্রয়ের বিবরণ) পাঠাবে পরিবেশকের কাছে; আর প্রযোজক পাবে পরিবেশকের কাছ থেকে মাসান্তিক ব্যবসায়িক বিবরণী (বিজনেস রিপোর্ট) পরের মাসের মাঝামাঝি অর্থাৎ ছবির মুক্তির ছহপ্তা পরে প্রযোজক জানতে পারবেন তাঁর ছবি তাঁর ভাগে (প্রোডিউসারের শেয়ারে) কি পরিমাণ টাকা আমদানী করল। এই টাকা অবশ্য তিনি পরিবেশকের কাছ থেকে যে-

শেক্সপীয়রওয়ালা চিত্রে শশী কাপুর

টাকাটা অগ্রিম নিয়েছিলেন, তা আংশিকভাবে পরিশোধ করবে। এবং যতদিন না ঐ অগ্রিম নেওয়া টাকাটা পরিশোধিত হচ্ছে, ততদিন তাঁর হাতে সত্যি সত্যি কোনো টাকা এসে পৌঁছবে না। অথচ প্রথম টাকা তিনিই খরচ করেছেন এবং তাঁর স্কন্ধে হয়ত এখনও পর্যন্ত বেশ কিছু পরিমাণ দেনা ঝুলছে।

ছবির প্রদর্শনী বাবদ টিকিট-বিক্রয়লব্ধ টাকা যাতে ন্যায্যভাবে বণ্টিত হয়, তারই জন্যে পরিবেশন ও প্রদর্শন ব্যবসায়ের জাতীয়করণ হওয়া প্রয়োজন। একখানি ছবির প্রস্তুতির শুরু থেকে মুক্তিলাভের পর পর্যন্ত বিজ্ঞাপন বাবদ ব্যয় পর্যন্ত ছবিসংক্রান্ত প্রতিটি পয়সা যিনি খরচ করবার ভার নেবেন, ছবির আয়ের মাত্র পনেরো শতাংশতেই যদি তাঁকে সন্তুষ্ট থাকতে হয়, তাহলে চিত্রপ্রযোজনার কাজে লোকে অর্থবিনিয়োগই বা করবে কেন এবং চলচ্চিত্রশিল্পের উন্নতিই বা আমরা আশা করি কিসের জোরে? চিত্রপ্রযোজককে ছবির আয়ের অন্তত পঞ্চাশ শতাংশ পেতে দিতেই হবে এবং তারই জন্যে প্রয়োজন চিত্র-গৃহগুলির ও সঙ্গে সঙ্গে পরিবেশন ব্যবসায়ের জাতীয়করণ। সরকার যদি চলচ্চিত্রশিল্পের এই দুটি বিভাগ নিজের হাতে গ্রহণ করেন, তাহলে তাঁরা শুধু চলচ্চিত্রশিল্পকে নিজের পায়ে ভর দিয়ে দাঁড়াতেই সাহায্য করবেন না, জাতীয় সংস্কৃতির শ্রেষ্ঠতম বাহক এই শিল্পটিকে উত্তরোত্তর শ্রীবৃদ্ধির পথে এগিয়ে নিয়ে যেতেও সাহায্য করবেন। কারণ, তখন চিত্র-প্রযোজক মাত্র জনপ্রিয়তার দিকে লক্ষ্য রেখে ছবি তৈরী করার চিন্তা ছেড়ে দিয়ে শৈল্পিক মান উন্নয়নের দিকে দৃষ্টিকে প্রসারিত করতে সমর্থ হবেন।

—নান্দীকর

নতুন নতুন ছবি

এমন এক সময় গেছে যখন সারা বিশ্বের ছায়াছবির জগতে ভারতের স্থান ছিল প্রথম। চলচ্চিত্র নির্মাণের কথা বলছি। কিন্তু বর্তমানে ছবি তৈরীর ব্যাপারে ভারতের স্থান তৃতীয়। প্রথম এবং দ্বিতীয় স্থানে এসে পৌঁছেছে জাপান ও হংকং। তবে সম্প্রতি সরকারী সমীক্ষা থেকে জানা গেছে, ১৯৬৬ সালে ভারতে গড়ে প্রতিদিন একটি করে কাহিনীচিত্র নির্মাণ হয়েছে।

বাংলা ছবির বাজারটা অনেকটা শেয়ার মার্কেটের মত ওঠানামা করে। ব্যবসায়িক সাফল্যের ওপর ছবি নির্মাণের ব্যাপারটা সম্পূর্ণভাবে নির্ভর করতে হয় বলে ছবির অসাফল্যে নতুন ছবির নির্মাণ-হারটা কমে যায়। তবে চলতি বছরে বাংলা ছবির বাজারটা ভালই বলতে হবে। কারণ এ বছরে বেশ কয়েকটি ছবি ব্যবসায়িক সফলতা লাভ করেছে। ফলে চলচ্চিত্র-ব্যবসায়ীরা নতুন নতুন ছবি তৈরীর পরিকল্পনা নিয়ে এগিয়ে আসছেন।

স্টুডিওপাড়ায় এখন জোয়ারের স্রোত বইছে। নতুন নতুন ছবির মেলায় কলকাতার স্টুডিওপাড়া টালিগঞ্জ বেশ রমরমা। নিউ থিয়েটার্স, ক্যালকাটা মুভিটোন, টেকনিসিয়ান্স, ইন্দ্রপুরী আর রাধা ফিল্মস স্টুডিওগুলো আলো ঝলমল। ব্যস্ততাময়।

'সুয়োরাণীর সাধ' দিয়ে শুরু করি। পরিচালক হীরেন নাগ এই নতুন ছবিটির কাজ আরম্ভ করেছেন। কাহিনী রচনা করেছেন আশাপূর্ণা দেবী। বেশ রোমাণ্টিকতার একটা রমণীয় মেজাজ আছে এ কাহিনীতে। ছবিতে নায়ক-নায়িকার চরিত্রে অভিনয় করছেন সৌমিত্র চট্টোপাধ্যায় এবং সুমিতা সান্যাল। পার্শ্বচরিত্রে রয়েছেন অজয় গাঙ্গুলী, বিদ্যা রাও, বিকাশ রায়, বংকিম ঘোষ, জহর রায় ও ছায়া দেবী। পর্দার অন্তরালে অর্থাৎ নেপথ্যে কলাকুশলীদের মধ্যে রয়েছেন আলোকচিত্রগ্রহণে বিশু চক্রবর্তী, শিল্পনির্দেশনায় কার্তিক বসু এবং সঙ্গীতপরিচালনায় সুধীন দাশগুপ্ত। ছবিটি প্রযোজনা করছেন দুলালী চৌধুরী এবং বরুণ মিত্র।

পরিচালক তপন সিংহ নতুন ছবি শুরু করছেন **'আপন জন'**। ইন্দ্র মিত্র রচিত এ কাহিনীর পাত্র-পাত্রী খুবই পরিচিত। আপন জন। আজকের সমাজের বুকে বসা ড্রেন-পাইপ পরা অতি আধুনিক ছেলে থেকে শুরু করে অসহায় অভিভাবকের বাস্তব জীবনের বহু ঘটনা এ কাহিনীতে স্থান পেয়েছে। এখনও ভূমিকালিপি সম্পূর্ণ হয়নি। চিত্রনাট্যের কাজে ব্যস্ত রয়েছেন শ্রীসিংহ। সম্ভবত সেপ্টেম্বর মাসের শেষ থেকে ছবির চিত্রগ্রহণের কাজ আরম্ভ হবে।

পরিশোধ চিত্রে মাধবী মুখোপাধ্যায়

যখন বৃষ্টি এল। নামটা বেশ কাব্যময়। এটি একটি নতুন ছবির নাম। সত্য রায় ছবিটির পরিচালক। কাহিনীকার হলেন রাজকুমার মৈত্র। সঙ্গীতপরিচালনার ভার নিয়েছেন শচীনদেব বর্মণের সুযোগ্য পুত্র রাহুলদেব বর্মণ। এ ছবিতে অভিনয় করবেন মাধবী মুখোপাধ্যায়, অনিল চট্টোপাধ্যায়, বসন্ত চৌধুরী এবং বম্বের জনপ্রিয় কৌতুক-নায়ক মেহমুদ। আলোকচিত্রগ্রহণে রয়েছেন মনীশ দাশগুপ্ত।

ভাদ্র মাসের শেষবর্ষণের পর আসন্ন আশ্বিনের আকাশে মেঘভাঙা রোদ দেখা দিয়েছে। সুতরাং নামের দিক থেকে বেশ একটা নতুনত্ব রয়েছে **'মেঘভাঙা রোদ'** ছবিতে। এই নতুন ছবিটি পরিচালনা করছেন তরুণ পরিচালক অমল দত্ত। ছবিতে অভিনয় করছেন অনিল চট্টোপাধ্যায়, সাবিত্রী চট্টোপাধ্যায়, অজয় গাঙ্গুলী, সতীন্দ্র ভট্টাচার্য, জহর রায়, সুখেন দাশ, গীতা দে ও শিখা ভট্টাচার্য। সঙ্গীত-পরিচালনায় রয়েছেন রবীন চট্টোপাধ্যায়।

সুদক্ষ অভিনেতা জ্ঞানেশ মুখোপাধ্যায় এই প্রথম চিত্রপরিচালনার ভার নিয়েছেন। ছবির নাম **'তিন তরঙ্গ'**। বর্তমানে রাধা ফিল্মস স্টুডিওয় ছবির অন্তর্দৃশ্যের কাজ শুরু হয়েছে। প্রধান চরিত্রাবলীতে অভিনয় করছেন মাধবী মুখোপাধ্যায়, শুভেন্দু চট্টোপাধ্যায়, তরুণকুমার, বিকাশ রায়, দিলীপ রায়, জহর রায়, বঙ্কিম ঘোষ, শেফালী চক্রবর্তী ও জ্ঞানেশ মুখোপাধ্যায়। সলিল চৌধুরী সঙ্গীত-পরিচালনার দায়িত্ব নিয়েছেন।

সম্পূর্ণভাবে কলকাতায় স্টুডিওতে তৈরী আর একটি সর্বভারতীয় 'ওহী লেড়কী'র মুক্তি আসন্ন

প্রহ্লাদ শর্মা প্রযোজিত ও পরিচালিত ফিল্ম সংসার-এর নবতম রহস্যঘন চিত্রোপহার 'ওহী লেড়কী' সেপ্টেম্বরের তৃতীয় সপ্তাহে ওরিয়েন্ট এবং কলকাতা ও শহরতলীর অন্যান্য চিত্রগৃহে মুক্তিলাভ করছে।

ভি বালসারা সুরারোপিত 'ওহী লেড়কী'র ভূমিকালিপিতে আছেন—নাজিমা, সর্বেন্দর, বিপিন গুপ্ত, আশা রজনী, বীরেন চট্টোপাধ্যায়, রাকেশ, জহর রায় এবং ললিতা চট্টোপাধ্যায়।

ফিল্ম ফিনান্স কর্পোরেশনের ঘাটতি

ফিল্ম ফিনান্স কর্পোরেশনের সপ্তম বার্ষিক সাধারণ সভার রিপোর্টে প্রকাশ, ১৯৬৬-৬৭ সালে পাঁচ লক্ষ টাকা ক্ষতি পড়েছে। ছবি নির্মাণের ক্ষেত্রে ফিল্ম ফিনান্স কর্পোরেশনের সরকারী ঋণ সংস্থা চলচ্চিত্রের গুরুদায়িত্ব পালন করে চলেছে। যে সব প্রযোজকরা অর্থাভাবে ছবি নির্মাণ করতে পারেন না তাঁরা সাধারণত এ সংস্থা থেকে অর্থ ঋণ নিয়ে থাকেন। কিন্তু ছবির ব্যবসায়িক অসাফল্যের দরুণ অনেক প্রযোজকরাই যথাসময়ে ঐ ঋণ যথাসময়ে পরিশোধ করতে না পারায় বর্তমানে ১৯৬৬-৬৭ সালে ফিল্ম ফিনান্স কর্পোরেশন পাঁচ লক্ষ টাকা ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে। অথচ এ ধরণের ঋণ সংস্থা চলচ্চিত্র নির্মাণের জন্য অত্যন্ত আবশ্যক। বিশেষ করে পরীক্ষামূলক ছবি তৈরীর ব্যাপারটা একেবারেই বন্ধ হয়ে যাবে যদি এই সরকারী ঋণ থেকে বঞ্চিত হতে হয়।

চলচ্চিত্র ধর্মঘট

মহারাষ্ট্র ও বিহারের সমস্ত প্রেক্ষাগৃহগুলি আগামী ৮ সেপ্টেম্বর থেকে ধর্মঘট পালন করবে বলে খবরে প্রকাশ। এই চলচ্চিত্র ধর্মঘটের কারণ হল প্রমোদকর বৃদ্ধি। দু বছর আগে বিহার সরকার চলচ্চিত্রের প্রমোদকর শতকরা পঞ্চাশভাগ বৃদ্ধি করেছিলেন। বর্তমানে সেই কর পঁচাত্তর ভাগ বৃদ্ধি প্রাপ্ত হয়েছে। কিন্তু বর্তমানে এই পরিমাণ কর দেওয়া সম্ভব

মর বঙ্গে মহারাষ্ট্র ও বিহারের চলচ্চিত্র-প্রদর্শকেরা এই অতিরিক্ত কর থেকে মুক্তি পাবার জন্য অনির্দিষ্টকাল ধর্মঘট চালিয়ে যাবেন বলে সিদ্ধান্ত নিয়েছেন।

এক| একা

বাংলাদেশে নাট্যানিরীক্ষার ক্ষেত্রে 'অনুশীলন সম্প্রদায়'র একটা বৈশিষ্ট্য-চিহ্নিত অবদান যে আছে তা কোনমতেই অস্বীকার করা চলে না, কিন্তু স্বাতন্ত্র্যদীপ্ত কিছু নাট্যপ্রযোজনার পর এই সংস্থার শিল্পীবৃন্দ বেশ কিছুদিন মঞ্চরূপায়ণের ব্যাপারে নিজেদের আন্তর প্রচেষ্টাকে নিয়োজিত করেননি। নাট্যাভিনয়ে এঁদের দীর্ঘ নীরবতা যে বেদনাবোধের সৃষ্টি করেছিল, সম্প্রতি মুক্তঅঙ্গনে পরিবেশিত 'একা একা' নাট্যপ্রযোজনায় তা নতুনত্বের এক বিস্ময়ে রূপলাভ করেছে। অতীতের গৌরব সাম্প্রতিক প্রচেষ্টাতে অটুট থেকেছে এবং সেই মেলবন্ধনে ভাবা পেয়েছে উজ্জ্বল ভবিষ্যতের সম্ভাবনা। 'একা একা' নাটক জাঁ পল সার্ত্রের 'ক্রাইম প্যাশনেল' নাটকের বঙ্গানুবাদ। অনুবাদ করেছেন ধূর্জটি দত্ত ও সুব্রত নন্দী। সার্ত্রের এই নাটক একদিন সারা বিশ্বে আলোড়ন তুলেছিল। এমন একটি নাটকের বঙ্গরূপ মঞ্চস্থ করে 'অনুশীলন সম্প্রদায়' বলিষ্ঠতার পরিচয় দিয়েছেন এবং বাংলা নাট্যাভিনয়ের এক নতুন দিকেরও সন্ধান দিতে পেরেছেন। এই দিক দিয়ে নাট্যানুরাগীর অকুণ্ঠ অভিনন্দন এঁদের প্রাপ্য।

সার্ত্রের এই আলোড়নসৃষ্টিকারী নাটকটি গড়ে উঠেছে সর্বহারাদের আন্দোলনকে কেন্দ্র করে, মধ্য ইউরোপের একটা কাল্পিত স্থানে এই আন্দোলনের যাত্রা শুরু ও বিকাশ। আন্দোলনের নেতা হোয়ে-ডেরারের হত্যারহস্যের সূত্র ধরেই এই নাটকের কাহিনী পরিণতির পথে এগিয়েছে। দলের একটা বিরাট অংশের কাছে হোয়েডে-রার হয়ে দাঁড়িয়েছেন শোধনবাদী, সুতরাং সবাই সংকল্প নিলো তাঁকে হত্যা করতে হবে। দলের সভ্য বড়লোকের ছেলে 'হুগো' নির্বাচিত হোল এই নিষ্ঠুর কাজ সম্পন্ন করার জন্য। এই হত্যাকাহিনীর নিরন্তর সংঘর্ষময়তার ওপরেই 'একা একা' নাটকের প্রতিষ্ঠা। এই নাটকে একদিকে যেমন দলের হৃদয়হীন কিছু ঘটনা স্থান পেয়েছে তেমনি হোয়েডারের প্রচণ্ড আত্ম-বিশ্বাসের কথা বিঘোষিত হয়েছে।

অনুবাদকদ্বয় মূল নাটকের প্রায় হুবহু অনুবাদই করেছেন। সংলাপ, কাহিনী ও পরিবেশ রচনায় খুব একটা দেশীয় আবহাওয়া থাকেনি। নামগুলোকে শুধু বাংলা রূপ দেওয়া হয়েছে, যেমন জেলগা (শিখা), হুগো (বারীন), হোয়েডার (সেক্রেটারী), জেসিকা (প্রীতি)। মূল নাটকের মেজাজ প্রতিটি শিল্পীর অভিনয়ে আশ্চর্য সুন্দরভাবে মূর্ত হয়ে উঠেছে। বনানী ভট্টাচার্য 'শিখা' চরিত্রের অন্তর্দাহকে মঞ্চে দক্ষতার সঙ্গে প্রকাশ করেছেন। মমতা চট্টোপাধ্যায়ের 'প্রীতি' দর্শকের সহানুভূতি পেয়েছেন। স্বচ্ছ, সাবলীল তাঁর অভিনয়। সুব্রত নন্দীর 'বারীন' এক উল্লেখযোগ্য চরিত্রসৃষ্টি, দক্ষ অভিনেতার ছাপ আছে তাঁর অভিনয়ে। 'সেক্রেটারী' চরিত্রে আদিত্য পাল অদ্ভুত সংযম ও নিষ্ঠার পরিচয় রাখতে পেরেছেন। অন্যান্য কয়েকটি চরিত্রে রূপদান করেন—সমীর মুখোপাধ্যায়, ধূর্জটি দত্ত, সুবিমল রায়, অরূপ দত্ত, ননী নাগ, সদাশিব বন্দ্যোপাধ্যায়, হরিদাস কাবাসী, অশোক ঘোষাল। সুব্রত নন্দীর নাট্য-নির্দেশনায় উন্নতধরনের শিল্পচিন্তার স্বাতন্ত্র্য লক্ষ্য করা গেছে।

"উত্তরণ"

আজকের সামাজিক নাটকের দর্শক আন্তরিকভাবে বাস্তবজীবননিষ্ঠ, যুক্তিহীন ঘটনার প্রাবল্য আর হাল্কা উচ্ছ্বাসের জোয়ারে ভাসতে চায় না, মেলোড্রামার ভিত্তিহীন পরিবেশ চায় না সে নিজের চেতনাকে বিলীন করে দিতে। এই মানসিকতার স্বরূপকে সামনে রেখে আজকের নাটক রচনা করা উচিত এবং নাট্যপ্রযোজনার ব্যাপারে এই সত্যের প্রতি স্থিরবিশ্বাস সঞ্চারিত করা উচিত। যখন এর অভাব পরিলক্ষিত হয় তখনই নাট্যানুশীলন এবং নাট্যপ্রচেষ্টা গতানুগতিকতামুক্ত হোতে পারে না। এই নির্মম সত্যটি সেদিন 'রংমহলে' অভিনীত সানন্দে রিক্রিয়েশন ক্লাবের 'উত্তরণ' নাটক দেখে অনুভূত হয়েছে। আশাপূর্ণা দেবীর কাহিনী অবলম্বনে এর নাট্যরূপ দিয়েছে মুক্ত ঘোষ।

চৈতালী নামের একটি মেয়ের জীবনকে কেন্দ্র করে আশাপূর্ণা দেবী একটি প্রায় অদ্ভুতরকমের অবিশ্বাস্য, রোমাঞ্চকর কাহিনীকে বিস্তৃত করেছেন। মরণাপন্ন পিতাকে বাঁচিয়ে তোলার জন্য চৈতালীকে শেষ পর্যন্ত চুরির পথ ধরতে হয় এবং চুরি করতে এসে ধরা পড়ে। কিন্তু গৃহিণী সুলক্ষণা দেবীর অসীম করুণায় তাকে হাজতবাস করতে হয় না। মাতৃস্নেহে সুলক্ষণা দেবী চৈতালীকে নতুন জীবনে উত্তরণের চেষ্টা করতে থাকেন। এদিকে চোরাকারবারীর দল চৈতালীর এই জীবনকে বিপর্যস্ত করতে চেষ্টা করলো। এই দলের একজন আবার চৈতালীর রূপমুগ্ধ হোল। সুলক্ষণা দেবীর ছোটছেলে কৌশিক ইতিমধ্যে ভালোবেসে ফেলেছে চৈতালীকে। তার বড়ছেলেও চৈতালীর প্রতি দুর্বলতা প্রকাশ করলো। এই সব সস্তা ভালোবাসা আর ষড়যন্ত্রের অবিশ্বাস্য ঘটনার ঘনঘটার মধ্যে চৈতালীর বাবা মারা গেলেন। শেষ পর্যন্ত হাসপাতালের নার্স হবে বলে চিঠি লিখে চৈতালী সবার কাছ থেকে বিদায় নেয়।

চিন্তাশীল দর্শক নাটকের এই কাহিনীর বহু অধ্যায়কে যুক্তি দিয়ে গ্রহণ করতে পারেন না। তবুও যে কয়েকটি জায়গায় যা কিছু নাট্যসম্ভাবনা ছিল, একেবারে মূল কাহিনীকে অনুসরণ করার জন্য নাট্যরূপদাতা তা নাটকে আনতে পারেননি। এই নাট্যরূপ চূড়ান্তভাবে আবেগসর্বস্ব অতি সস্তা ধরনের মেলো-ড্রামায় পর্যবসিত হয়েছে। মুক্ত ঘোষের কোন মৌলিকতা নাট্যানুরাগীর দৃষ্টি বোধ হয় আকর্ষণ করতে পারেনি।

এই রকম নাটককে আকর্ষণীয় করে তুলতে গেলে যে অসাধারণ অভিনয়দক্ষতার প্রয়োজন, তারও অভাব পরিলক্ষিত হয়েছে এই নাট্যপ্রযোজনায়। নাট্যনির্দেশকের নিষ্ঠা অল্প কয়েকটি জায়গায় পরিস্ফুট হয়েছে। আলো, আবহসংগীত মোটেই নাটকের উপযোগী হয়ে উঠতে পারেনি। শিল্পীদের অভিনয়ে প্রচুর শৈথিল্য ও চরিত্রোপলব্ধির ব্যর্থতা চোখে পড়েছে। একমাত্র সুলক্ষণা দেবীর মমতাস্নিগ্ধ চরিত্রটিকে যথাযোগ্য-ভাবে উপস্থাপ দিয়েছেন মঞ্জিনা দেবী। নাটকে যা কিছু আকর্ষণ, তা তার অভিনয়েই মূর্ত হয়ে উঠেছে। মুক্ত ঘোষের অভিনয় মোটামুটি কোনরকমে চরিত্রের সাথে তাল মিলিয়ে চলেছে। নায়িকা চরিত্রে শিখা ভট্টাচার্যের অভিনয় সম্পূর্ণভাবে ব্যর্থ হয়েছে। অন্যান্য চরিত্রে অংশ গ্রহণ করেন-রমেন সেন, দীপা হালদার, পঞ্চু দে, সুনীল মালিক, ভানু মল্লিক, তাপস ঘোষ, কল্পনা ভট্টাচার্য।

দশটি বছর
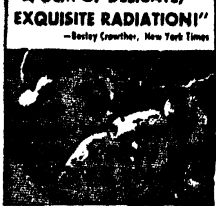
'গান্ধারের'র শিল্পীবৃন্দ সম্প্রতি 'মুক্ত-অঙ্গন' মঞ্চে সমরসেট মমের 'দি লেটার' অবলম্বনে 'দশ টিবছর' নাটক অভিনয় করলেন। শিল্পীদের অভিনয়ে উন্নতমান ও প্রয়োগ পরি-কল্পনায় গভীর শিল্পবোধ মূর্ত হয়ে উঠেছে। নাটকটিতে সুঅভিনয় করেন বঙ্কিম ঘোষ, অমিত মুখোপাধ্যায়, তরুণ মুখো-পাধ্যায়, তরুণ চৌধুরী, অচিন্ত্য চক্রবর্তী, বিবেকসারথী চৌধুরী, ভব রায়, খগেন পাল, ভবরূপ ভট্টাচার্য, গীতা চ্যাটার্জী।

সত্য মারা গেছে

গঙ্গাপদ বসুর ইঙ্গিতধর্মী তত্ত্বমূলক নাটক 'সত্য মারা গেছে' কিছুদিন আগে 'অস্থায়ী সংঘে'র শিল্পীবৃন্দ অভিনয় করলেন। নাটকটির প্রয়োগ-পরিকল্পনায় নির্দেশকের নিষ্ঠা প্রতিফলিত। বিভিন্ন চরিত্রে সার্থক অভিনয় করেন প্রভাতরঞ্জন দাস, অজিতকুমার দাস, শরৎকুমার তেওয়ারী, পূর্ণচন্দ্র সামন্ত, রবি রায়, কল্পনা সামন্ত, সুশীল মহাপাত্র, অমলেন্দু চক্রবর্তী, চিত্ত-রঞ্জন দাস, সুবীরকুমার মহুরী, নিখিলেশ চট্টোপাধ্যায়, বিমলকুমার দাস, শশাঙ্ক আদক।

সংক্রান্তি

সম্প্রতি 'শিল্পায়ন' সংস্থা নেতাজী সুভাষ মঞ্চে বীরু মুখোপাধ্যায়ের মঞ্চসফল নাটক 'সংক্রান্তি' পরিবেশন করেন। নাট্য-নির্দেশনার দায়িত্ব নৈপুণ্যের সঙ্গে পালন করেন বৈদ্যায়ন পাত্র। সুঅভিনীত এ নাটকের বিভিন্ন চরিত্রে অংশ গ্রহণ করে-ছিলেন হরষিত গুপ্ত, জ্ঞানেন্দ্রনারায়ণ লাহিড়ী, নির্মল চক্রবর্তী, মানস আইচ, দীপালি চক্রবর্তী, প্রতিমা চক্রবর্তী, শাশ্বতী রায়, কৃষ্ণদাস সমাদ্দার, ভবানীপ্রসাদ সিন্‌হা, হরিদাস মজুমদার, সুশীল মুখোপাধ্যায়, অভয় সিন্‌হা, মনোরঞ্জন মিত্র, অনিল সাহা, জীবন বন্দ্যোপাধ্যায়, শিবেন্দ্রনাথ দাস, প্রভাত সিন্‌হা, অপর্ণা ভৌমিক।

বৌদির বিয়ে

'বহরমপুর কাজিন কালচারাল কর্ণারে'র শিল্পীবৃন্দ কিছুদিন আগে স্থানীয় বীণাপাণি মঞ্চে প্রথম নাট্য প্রচেষ্টা হিসাবে পরিবেশন করলেন শৈলেন গুহ নিয়োগীর হাস্যমধুর নাটক 'বৌদির বিয়ে'। প্রতিটি শিল্পীর প্রাণবন্ত অভিনয় দর্শক-বৃন্দ উচ্ছ্বসিত হয়ে ওঠে। অভিনয়ে অংশ গ্রহণ করেন—অঞ্জলি রায়, শক্তিরঞ্জন সেন, জয়দেব রায়চৌধুরী, শিবানী সাহা, কালি-দাস রায়, সিদ্ধদেব রায়চৌধুরী, কমল সমাজদার, চিত্তরঞ্জন দাশগুপ্ত, কৃষ্ণগোপাল ঘোষ।

অনর্থ

সম্প্রতি 'স্টার' থিয়েটারে 'অনর্থ' নাটক মঞ্চস্থ করলেন ইউনাইটেড ব্যাঙ্কের পার্ক সার্কাস শাখার কর্মচারিবৃন্দ। নাটকে যে বহু ঘাত-প্রতিঘাত আছে। শিল্পীবৃন্দের সাবলীল অভিনয়ে তা মুখর হয়ে ওঠে। কয়েকটি চরিত্রে অসাধারণ অভিনয়প্রতিভার স্বাক্ষর রাখেন শিপ্রা চক্রবর্তী, শিপ্রা সাহা, বেলা রায়, রাধাশ্যাম বন্দ্যোপাধ্যায়, বিষ্ণু দত্ত, রোহিণী মজুমদার, শ্যামল মৌলিক ও রমেশ ভট্টাচার্য।

আলো হাসি গান

'উদয়াচলে'র শিল্পীবৃন্দ অমর ঘোষ রচিত নাটক 'আলো হাসি গান' থিয়েটার সেন্টার মঞ্চে নিয়মিত অভিনয়ের আয়োজন করেছেন। সপ্তাহে তিনদিন (বৃহস্পতি, শনি, রবিবার) এ অভিনয় অনুষ্ঠিত হবে। নাট্যকার স্বয়ং নির্দেশনার দায়িত্ব বহন করবেন। অভিনয়ে অংশ নেবেন দেবদাস গঙ্গোপাধ্যায়, অনঙ্গ কুণ্ডু, কান্তি গঙ্গো-পাধ্যায়, দুর্লভ মুখোপাধ্যায়, শিশির দে, তারাপদ দাস, শিবু চট্টোপাধ্যায়, কাশীনাথ দত্ত, অনিমা বন্দ্যোপাধ্যায়, জ্যোৎস্না ঘোষ।

কোলকাতা থেকে দূরে

নলহাটী:

সম্প্রতি নলহাটী মিলনী সংঘের প্রতিষ্ঠা দিবস উপলক্ষে এখানকার প্রখ্যাত 'চৈতালী গোষ্ঠী' 'যুগান্তর' নাটক মঞ্চস্থ করেছেন। নাটকটি লিখেছেন হিমাংশু চট্টোপাধ্যায়। নাট্যকার স্বয়ং ও মনোজ ঘোষ নাট্যনির্দেশনার দায়িত্ব বহন করেন। বিভিন্ন চরিত্রে অংশ নেন—ভাস্কর রায়, বিবু দত্ত, প্রলয় রায়, মঙ্গল চট্টোপাধ্যায়, শ্রীমান মানস ও বকুল।

বলাগড়:

সম্প্রতি কুলিয়াপাড়া গ্রামে স্থানীয় যুবকেরা ভৈরবনাথ গঙ্গোপাধ্যায়ের ঐতিহাসিক নাটক 'নাচমহল' মঞ্চস্থ করেন। অভিনয়ে অংশ গ্রহণ করেন ভজহরি মণ্ডল, উদয় মণ্ডল, নিমাই ভট্টাচার্য, কৃষ্ণচন্দ্র নাথ, রণজিৎ কুমার, নারায়ণপদ মল্লিক, হরেকৃষ্ণ বিশ্বাস, পঞ্চানন কোলে, নারায়ণ দাস, গণপতি মণ্ডল, লক্ষ্মণচন্দ্র কোলে, কার্তিক ভৌমিক, নিরাপদ কুমার, ভূপতি মাঝি, ও পূর্ণিমা বন্দ্যোপাধ্যায়।

ডুয়ারস:

ডুয়ারসের তেলিপাড়া চা-বাগানের 'যুবসংঘ' শিল্পীগোষ্ঠী সম্প্রতি তাঁদের প্রথম নাট্যোপহার হিসাবে মঞ্চস্থ করেন অমর গঙ্গোপাধ্যায়ের 'দ্বান্দিক' নাটক। এঁদের এই প্রথম নাট্যপ্রযোজনায় অনেক সম্ভাবনার চিহ্ন

আছে। অরূপকান্তি পালের নির্দেশনায় এই নাটকের অভিনয় সমবেত দর্শকমণ্ডলীকে খুশী করেছে। অভিনয়ে অংশগ্রহণ করেন শঙ্করানন্দ মজুমদার, মলয় দত্ত, সমরেন্দ্র রায়, শিবব্রত বন্দ্যোপাধ্যায়, অসিত নন্দী, সীতা দাস এবং নাট্যনির্দেশক স্বয়ং।

'লৌহকপাট'

'শিল্পশ্রী' সংস্থার শিল্পীরা সম্প্রতি মুক্তাঙ্গন রবীন্দ্রভবনে জরাসন্ধের 'লৌহ-কপাট' মঞ্চস্থ করেন। জরাসন্ধের এই কাহিনীর নাট্যরূপ দেন জ্যোতু বন্দ্যোপাধ্যায়। শিল্পীদের প্রাণবন্ত অভিনয় নাটকের কাহিনীকে প্রতিমুহূর্তে প্রবল উৎকণ্ঠা আর কৌতূহলে ভরিয়ে দিয়েছে। বিশেষ করে কয়েকটি ভূমিকায় অসাধারণ অভিনয়ের জন্য প্রশংসা পাবেন জ্ঞানেশ মুখোপাধ্যায়, গীতা দে, হিমাদ্রী গঙ্গোপাধ্যায়, তপন চট্টোপাধ্যায়, ছন্দম নস্কর, সিদ্ধেশ্বর বন্দ্যোপাধ্যায়, বামনদাস বন্দ্যোপাধ্যায়, অম্বুজ মৌলিক, রত্না ঘোষাল, বলাই মিত্র, দুলাল রায়, শিবদাস গুহ।

মাস্টারদা চিত্রে সংগীতগ্রহণে সংগীত পরিচালক রতু মুখোপাধ্যায়, কিশোর শিল্পী দেবকান্তি ভট্টাচার্য ও ধনঞ্জয় ভট্টাচার্য। ফটো : অমৃত

বিবিধ সংবাদ

অমর পল মুনি:

হলিউড তথা বিশ্ব চলচ্চিত্রের অবিস্মরণীয় জীবনী-চরিত্রাভিনেতা পল মুনি গেল ২৫-এ আগস্ট ক্যালিফোর্ণিয়ার মমটিসিটোর স্বগৃহে একাত্তর বছর বয়সে পরলোকগমন করেছেন।

১৮৯৫ সালে অস্ট্রিয়াতে পল মুনি জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর আসল নাম মুনি ওয়েসেনফ্রান্ড। তিনি তাঁর পেশা শুরু করেন বেহালা বাজিয়ে হিসেবে। কিন্তু কুড়ি বছর বয়স থেকেই তিনি অভিনেতার বৃত্তি গ্রহণ করেন। এবং তা আমেরিকাতে। ১৯১৮ সালে তিনি ইডিস থিয়েটারে যোগ দেন। এরপরে ১৯২৬ সাল পর্যন্ত তিনি ছিলেন নিউইয়র্ক জুয়িস আর্ট থিয়েটারের অন্যতম সদস্য। এই ১৯২৬ সালেই তিনি 'উই আমেরিকানস' নামক নাটকে সর্বপ্রথম ইংরাজী সংলাপ-বলা ভূমিকায় অবতীর্ণ হন। ১৯৩১ সালে অভিনীত 'কাউন্সেলার অ্যাট ল' নাটকে তিনি অভূতপূর্ব সাফল্য লাভ করেন। এরপর থেকে ১৯৩৯ সাল পর্যন্ত তিনি একনাগাড়ে অনেকগুলি হলিউডী চিত্রে অভিনয় করে পৃথিবীর চলচ্চিত্রামোদীদের সামনে চরিত্রাভিনয়ের একটি নবতম আদর্শ প্রতিষ্ঠিত করেন। যে-সব ছবির মুখ্য ভূমিকায় তিনি অভিনয় করেছেন, তাদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য হচ্ছে: দি ভ্যালিয়ান্ট, সেভেন ফেসেস, স্কারফেস, আই অ্যাম এ ফিউজিটিভ ফ্রম এ চেনগ্যাং, ব্লাক ফিউরী, দি গুড আর্থ, দি স্টোরী অব লুই পাস্তুর, লাইফ অব এমিলি জোলা, এ সং টু রিমেমবার এবং ওয়ারেজ। এদের মধ্যে বিশেষ করে দি গুড আর্থ, দি স্টোরী অব লুই পাস্তুর লাইফ অব এমিলি জোলা এবং ওয়ারেজ চিত্রে তাঁর ব্যক্তিত্বপূর্ণ চরিত্রাভিনয় তাঁকে যশের শিখরে প্রতিষ্ঠিত করে। শেষের ছবিখানি লাইট হাউসে চারদিন দেখাবার পরেই ব্রিটিশ সরকারের আদেশে নিষিদ্ধ হয়ে যায়। ভূমিকা ও বয়স অনুযায়ী সাজ-সজ্জার প্রতি তাঁর তীক্ষ্ণ দৃষ্টি ছিল।

পল মুনি ছিলেন জাত অভিনেতা। তিনি চলচ্চিত্র থেকে মঞ্চকেই ভালোবাসতেন বেশী। চলচ্চিত্রের নায়ক-নায়িকাওয়ালা ছবিগুলিকে ভারসাম্যহীন ও প্রত্যয়বর্জিত বলে তিনি অত্যন্ত অপছন্দ করতেন। তিনি অনবরত নতুন ধরণের নাট্যবিভূতিপূর্ণ নাটকের সন্ধানে ঘুরতেন। একই ধরনের চরিত্র তিনি বারে বারে অভিনয় করতে চাইতেন না। এমনও দিন গেছে, যখন নতুন অভিনয়যোগ্য কাহিনীর সন্ধানে তিনি দিনে পাঁচ-ছখানি করে নতুন বই পড়েছেন। তিনি বলতেন, 'যে বই আমার অনুভূতিকে না নাড়া দেয়, সে বইয়ে আমি কিছুতেই অভিনয় করতে পারি না।' ১৯৩৯ সাল পর্যন্ত চলচ্চিত্রে অভিনয় করবার পরে তিনি আবার ব্রডওয়ের রঙ্গমঞ্চে ফিরে গিয়ে 'কে লার্গো' নাটকে অবতীর্ণ হন। মঞ্চে তাঁর পরবর্তী ভূমিকাগুলির মধ্যে ১৯৪৯ সালে লণ্ডনে অভিনীত 'ডেথ অব এ সেলসম্যান'-এ উইলী লোম্যান এবং ১৯৫৫ সালে অভিনীত 'ইনহেরিট দি উইণ্ড' নাটকে হেনরী ড্রামণ্ড-এর চরিত্রাভিনয় স্মরণীয়।

প্রচুর অর্থ উপার্জনের প্রতি তাঁর কোনো রকম ঝোঁক ছিল না। বছরে পঞ্চাশ হাজার পাউণ্ড রোজগার করবার জন্যে কেন তিনি পরিশ্রম করবেন, যখন মাত্র এক হাজার পাউণ্ডেই তাঁর সস্ত্রীক জীবনযাপন বেশ ভালোভাবেই চলতে পারে, এই প্রশ্নের কোনো সদুত্তর তিনি মনের মধ্যে খুঁজে পেতেন না। এবং এইজন্যেই তিনি পঞ্চাশ দশকের শেষাশেষি অভিনয়জগৎ থেকে অবসর গ্রহণ করে তাঁর পল্লীভবনের শান্তিময় পরিবেশে সুখী দিন যাপন করছিলেন।

চরিত্রাভিনেতা রূপে তাঁর পূর্বসূরী এমিল জেনিংস-এর পরেই তাঁর নামই সকলের মনে আসে। জীবনীচিত্রের চরিত্রা-

ভিনয়ে দৈহিক ও মানসিক যন্ত্রণাটিকে অসামান্য নাট্যনৈপুণ্যের সাহায্যে মূর্ত করে তুলতে তিনি ছিলেন অদ্বিতীয় এবং এই কারণেই পৃথিবীর চলচ্চিত্রজগতে তিনি অমর হয়ে থাকবেন। 'লুই পাস্তুর'-এর ভূমিকাভিনয়ের জন্যে তিনি ১৯৩৬ সালের শ্রেষ্ঠ অভিনেতা রূপে 'অ্যাকাডেমী অ্যাওয়ার্ড' লাভ করেন।

জ্যোতি সিনেমায় বিরাট 'ডীপ কার্ভ' প্রক্ষেপণী পর্দা :

পশ্চিমবঙ্গ রাজ্যে জ্যোতি সিনেমাই প্রথম ৭০ মিঃ মিঃ বহুস্বরা প্রক্ষেপণী যন্ত্র (প্রোজেক্টার) বসিয়েছিল, এ-কথা নিশ্চয়ই চিত্ররসিকদের স্মরণ আছে। বর্তমানে জ্যোতির কর্তৃপক্ষ তাঁদের দর্শকদের নবতর আনন্দ-বিধানের জন্যে বিরাট 'ডীপকার্ভ' প্রক্ষেপণ পর্দা খাটিয়েছেন। সাধারণ দৃষ্টিতে আমরা যতখানি একসঙ্গে দেখতে পাই, জ্যোতির এই বিরাট পর্দায় প্রতিফলিত ছবি আমাদের দৃষ্টিকে ততখানিই প্রসারিত হবার সুযোগ দেবে; মনে হবে ছবির ঘটনাস্থলের মাঝে বসে যেন আমরা ঘটনগুলিকে প্রত্যক্ষ করছি। শূন্যোডিগ্রী প্রক্ষেপণী যন্ত্রের সঙ্গে এই 'ডীপকার্ভ' প্রক্ষেপণী পর্দা দর্শককে বিকৃতিশূন্য বাস্তব জগতে নিয়ে গিয়ে ছবিকে বহুগুণে উপভোগ্য ক'রে তুলবে। 'দুনিয়া কী সয়ের' Around the World ছবির প্রদর্শনী থেকেই এই নতুন পর্দা চালু হয়েছে।

সিনে সেন্ট্রাল-এর উদ্যোগে 'পিপিং অন সানডে' :

সিনে সেন্ট্রাল, কলকাতা'র উদ্যোগে আসচে শুক্রবার, ১ সেপ্টেম্বর, সন্ধ্যায় অ্যাকাডেমী অফ ফাইন আর্টস প্রেক্ষাগৃহে প্রখ্যাত জার্মান চিত্র 'পিপস অন সানডে' প্রদর্শিত হবে।

অভিমানী আন্দামান :

শচীন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের যুগান্তকারী সৃষ্টি 'অভিমানী আন্দামান' চলচ্চিত্রে রূপায়িত হচ্ছে। আন্দামানের নয়নাভিরাম পটভূমিকায় সম্পূর্ণ আউটডোরে—ইস্টম্যান কালারে ছবিটি গৃহীত হবে। পরিচালনা করবেন উমাপ্রসাদ মৈত্র। সুরারোপে থাকবেন অভিজিৎ বন্দ্যোপাধ্যায়। পরিবেশনার দায়িত্ব নিয়েছেন ইম্পস ফিল্ম ডিস্ট্রিবিউটর্স।

সবুজ সাথী আসরে ২০তম প্রতিষ্ঠা উৎসব

সবুজ সাথী আসরের ২০তম প্রতিষ্ঠা দিবস উপলক্ষে জোড়াবাজার রাজবাটীর নাট-মন্দির প্রাঙ্গণে গত ১০ আগস্ট থেকে ১৫ আগস্ট পর্যন্ত ছয়দিনব্যাপী বার্ষিক উৎসব পালিত হয়। প্রথম দিনের অনুষ্ঠান ছিলো 'বর্ষা-মঙ্গল', পরিবেশনায় 'শ্যামল ছায়ার' শিল্পীবৃন্দ। সংগীতাংশে ভানু বন্দ্যোপাধ্যায়, প্রণব ভট্টাচার্য, মণিমালা রায়, অনুরাধা সেন, অরবিন্দ বসু, নৃত্যে সেবা রায়, মণিকা দেব, গীতা দত্ত, শম্ভুনাথ ওয়ানী, ব্যঞ্জনায় স্বপন রায়, সংগীত ও সমগ্র অনুষ্ঠানটির পরিচালনা করেন শংকর ... স্টার, দ্বিতীয় দিনে 'দেবকন্যা ...' চলচ্চিত্র প্রদর্শন হয়, তৃতীয় দিনের

অগ্রদূত পরিচালিত কখনো মেঘ চিত্রে উত্তমকুমার।

অনুষ্ঠান সখী ভাই দিবস হিসাবে পালিত হয়। এইদিন গোপীপদ চট্টোপাধ্যায় রচিত 'উৎসব' নাটকটি অভিনয় হয়, প্রথমেই (নরেন্দ্র) পরেশ মল্লিক, (খ্যাদা) গৌতম সেনগুপ্ত, জয়লাল সর্দার) গৌর-নিতাই কুণ্ডু, (শ্রীশ ভট্টাচার্য) কার্তিক মণ্ডল-এর অভিনয় দর্শকদের প্রশংসা লাভ করে। এছাড়া তাপস মল্লিক, অনুপ বাগচী, অমর মল্লিক, আশীষ ব্যানার্জী সুঅভিনয় করেন। নাটকটির সার্থক পরিচালনা করেন 'নতুনদা'। এছাড়াও এই দিনকার সর্বপ্রধান আকর্ষণ ছিলো মূকাভিনয়, পরিবেশন করলেন মূকাভিনেতা বিশ্বনাথ ভট্টাচার্য, কয়েকটি ফিচারের মধ্যে 'পেটুক লোচন' নামক নতুন ফিচারটি ছোট এবং বড় সকলেরই প্রশংসা অর্জন করে। অন্যান্য ফিচারগুলিও প্রশংসনীয়। চতুর্থ দিনের অনুষ্ঠানে বোনেরা অভিনয় করে বিধায়ক ভট্টাচার্য রচিত 'ঝাঁসীর রাণী'। নাটকটি অভিনয়ের দিক হিসাবে এ'দের নাম প্রথমেই উল্লেখযোগ্য (লক্ষ্মীবাঈ) সোনালী নন্দী, (যোধাবাঈ) রেখা দেব, (গঙ্গাবাই) সুরভী নন্দী, (ধীরাবাঈ) সুদীপ্তা নন্দী। অন্যান্য ভূমিকায় সুঅভিনয় করেছেন মীনাক্ষী চক্রবর্তী, অপর্ণা ভৌমিক, সীমা বাগচী, মণিদীপা দত্ত, কুমকুম রায়চৌধুরী, ইরাণী দেব, পূর্ণিমা দাস, এই নাটকটির ও পরিচালনায় ছিলেন 'নতুনদা'। 'উৎসব' এবং 'ঝাঁসীর রাণী' নাটকের সঙ্গীত-পরিচালনা করেন রীণা সেনগুপ্ত—এবং নেপথ্য কণ্ঠ-সংগীতে, অর্পিতা দেব ও রীণা সেনগুপ্তের দ্বৈত সংগীত খুবই সুন্দর, গাইবার গুণে প্রতিটি সংগীত খুবই উপভোগ্য হয়। পঞ্চম দিনের অনুষ্ঠান ছিলো ছায়াচিত্র প্রদর্শন। 'রাহুল' নামক ছায়াচিত্র এইদিন প্রদর্শন হয়। ষষ্ঠ দিনের অনুষ্ঠান ছিলো সমাপ্তি দিবস, এইদিন বিভিন্ন প্রতিযোগিতায় যাঁরা সাফল্য লাভ করে আসরের তরফ থেকে তাঁদের পুরস্কার দেওয়া হয়। অলিরাণী বল্লভ ও সহশিল্পীবৃন্দ যন্ত্রসংগীত পরিবেশন করে পরে উমাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায় রচিত রহস্যঘন নাটক 'বড়ঝরা রাতে' অভিনয় হয়। এতে আসরের বয়স্ক সাথীরা অংশগ্রহণ করে।

গানের জলসা

সুরেশ সংগীত সংসদ

সুরেশ সংগীত সংসদের তৃতীয় অধিবেশনে ওস্তাদ হাফেজ আলি খাঁকে সম্বর্ধনা জ্ঞাপন করে উদ্যোক্তারা সংগীত-রসিকবৃন্দের কৃতজ্ঞতাভাজন হয়েছেন। শারীরিক অক্ষমতা ও বার্ধক্যহেতু ওস্তাদজীকে আজকাল সংগীতের আসরে দেখা যায় না। আজকের যুগের শ্রোতাদের তাঁকে অন্ততঃ 'চোখের দেখা' দেখবার সতৃষ্ণ কৌতূহলও ত মিটল। ওস্তাদজীর সঙ্গে সঙ্গে সংগীতের এক যুগও অতিক্রান্তপ্রায়। বর্তমান যুগ যন্ত্রসংগীতের অস্তায়মান যুগ ও নবীন যুগের এক উজ্জ্বল সন্ধি-লগ্ন এবং বিশেষ করে যন্ত্রসংগীতেরই এক গৌরবোজ্জ্বল অধ্যায়। এই অধ্যায় সৃষ্টিতে আলাউদ্দিন খাঁ, হাফেজ আলি, এনায়েৎ খাঁর অবদান সশ্রদ্ধ চিত্তে স্মরণীয়। আলাউদ্দিন খাঁ ও এনায়েত খাঁর মত গোষ্ঠীগত ঐতিহ্য সৃষ্টি না করলেও আপন বাদনশৈলীতে এক চিত্তহারী মাধুর্যময় সুরসৃষ্টির জন্য ওস্তাদ হাফেজ আলি খাঁর রসঘন ব্যক্তিত্ব তাঁর যুগের শ্রোতাদের চিত্তে এক মধুর স্মৃতির সম্পদরূপে সঞ্চিত ছিল। তাঁকে সম্মান প্রদর্শন করা—মানেই প্রাচীন যুগের প্রতি নবীন যুগের প্রণতিজ্ঞাপন। এদিক দিয়ে বিচার করলেও এই অনুষ্ঠানের একটি বিশেষ মূল্য আছে। এই অনুষ্ঠান উদযাপন কালে শ্রদ্ধানত মস্তকে ধীর চিত্তে কর-জোড়ে উপবেশিত হাফেজ আলি খাঁ সাহেবের নম্র-মধুর ভাবটি বহুদিন মনে থাকবে। সম্বর্ধনার উত্তরে তাঁর ভাষণে স্বতঃস্ফূর্ত কৃতজ্ঞতার সহজ সরল প্রকাশ ঘটে। হৃদয়ের রুদ্ধ বেদনা শতধারে ফেটে-পড়া কথাগুলি 'আমার এই হাতের ভাষা চিরদিনের জন্য স্তব্ধ হয়ে গেছে'—রুদ্ধবাক শ্রোতাদের চোখকে অজান্তেই অশ্রু-সজল করে তুলেছিল। প্রবীণ শ্রোতাদের মানসপটে ভেসে উঠেছিল সেই আনন্দভরা মুহূর্ত-গুলি যখন সরোদ হাতে ধরে ওস্তাদ নিমেষের মধ্যেই তাঁদের মনে রঙিন আলো জেলে দিতেন, কখনও কাম্মোজী কখনও বসন্তের উন্মাদনা সৃষ্টি করে। যৌবনোচ্ছল লগ্নের সেই প্রাণবন্ত সৃষ্টি আজও তাঁদের মনে অনপনেয় হয়ে আছে। প্রসংগক্রমে তিনি মঞ্চে উপবিষ্ট বীরেন্দ্র-কিশোর রায়চৌধুরীর দিকে সস্নেহে দৃষ্টি নিক্ষেপ করে 'খোকা মহারাজের অসাধারণ পাণ্ডিত্য ও বৈদগ্ধের প্রসঙ্গ তুলে মহম্মদ শা, দবীর খাঁ ও তাঁর কাছে ধ্রুপদ বীণ ও সুরশৃংগারে তালিম নেওয়ার দিন-গুলি স্মরণ করলেন—অনবধানবশতঃই নিশ্চয় আলাউদ্দিন খাঁ সাহেবের নামটা বাদ গিয়ে-ছিল। এখানে সংগীতরসিকদের জ্ঞাতার্থে জানানো হচ্ছে গৌরীপুর স্টেটে কুমার বীরেন্দ্রকিশোর শুধুমাত্র আলাউদ্দিন খাঁ সাহেবের কাছে বহুদিন তালিমই গ্রহণ

সুরেশ সংগীত সংসদ কর্তৃক ওস্তাদ হাফিজ আলী খানকে সম্বর্ধনার দৃশ্য।
ফটো : অমৃত

করেননি। একবার আলাউদ্দিন খাঁর গ্রামের এক মসজিদ মেরামতের যাবতীয় উপাদান ব্রজেন্দ্রকিশোর রায়চৌধুরী পাঠিয়ে দিয়ে-ছিলেন। সেই কারণে খাঁ সাহেব নিজেকে রায়চৌধুরী পরিবারের কাছে আজীবন ঋণবদ্ধ জ্ঞানে—নিজে অর্জিত সমস্ত বিদ্যা দান করার প্রতিজ্ঞা গ্রহণ করেন। তাঁর সংগৃহীত সমস্ত গৎ, ধ্রুপদ গান এবং অন্যান্য সমস্তকিছুর স্বরলিপি নিজের হাতে লিখে বহু বছর পূর্বে রেজিস্ট্রি-পোস্টে পাঠিয়ে দিয়েছেন। বীরেনবাবুর লাইব্রেরীতে সেই সমস্ত মূল্যবান সম্পদ সযত্নে সঞ্চিত আছে।

বীরেনবাবু ওস্তাদ কেরামতুল্লা খান ও আলাউদ্দিন খাঁ সাহেবের কাছে রবাব ও সুরশৃঙ্গার তালিম গ্রহণ করেন।

সুরেশ সংগীত সংসদের এবারের বৈশিষ্ট্য হোলো 'মল্লার' রাগের অধিবেশন। কণ্ঠসংগীতের আসরে শ্রীমতী মীরা বন্দ্যো-পাধ্যায় পরিবেশন করলেন সুরদাসী মল্লার ও গৌড়মল্লার। শ্রীমতী বন্দ্যোপাধ্যায়ের উপযুক্ত শিক্ষা, আছে, সাধনা আছে, সাঙ্গীতিক অভিজ্ঞতাও প্রচুর,—তাঁর রাগা-শ্রয়ের যথাযথ বিন্যাস, ভাবরচনা ও তানশৈলীতে তার উজ্জ্বল স্বাক্ষর সুপরি-ব্যাপ্ত। তবে 'বাংলা' ভাষার আধার হিন্দুস্থানী সংগীতের অনুকূল নয়। এ সম্বন্ধে এই সংসদেরই পূর্বতন অধিবেশনে চিন্ময় লাহিড়ী প্রসঙ্গে আমরা আলোচনা করেছি। শ্রীচন্দ্রকুমার চট্টোপাধ্যায়ের তবলা সংগত প্রশংসনীয়। বিশেষ উল্লেখের দাবী রাখে শ্রীমতী বন্দ্যোপাধ্যায়ের ঠুংরী। ওস্তাদ হাফেজ আলি খাঁর সুযোগ্য পুত্র আমজেদ আলি সরোদ বাজালেন মিঞাকি মল্লার রাগে। সুরেলা হাতের টিপ ও সুস্পষ্ট বাজনৈপুণ্যের সমন্বয়ে, এঁর রস-সৃষ্টির ক্ষমতা এই তরুণ বয়সেই এঁকে অসাধারণ জনপ্রিয় করে তুলেছে। আলাপের অঙ্গে মুন্সীয়ানা না থাকলেও কিছু কিছু টুকরো কাজ—যেমন পঞ্চমের পর আলতো-ভাবে কোমল গান্ধারের স্পর্শনান্তে রেখাব স্পর্শ করে সুরে ফিরে আসা খুবই উপ-ভোগ্য। ধামারে গৎ বাজানোর প্রয়াসে প্রশংসনীয় সাহসের পরিচয় ছিল, তবে তারপরণ এবং ধামারের অন্যান্য অঙ্গ বর্জিত ছন্দকে ঠিক ধামার বলা যায় না। তিন-তালের গৎটি রসোত্তীর্ণ। ঝালার অংগ খুবই উপভোগ্য হয়েছে শান্তাপ্রসাদের মত পণ্ডিতজনের তবলা সঙ্গতে।

সব কথা বলা হয়ে গেলেও বাকী থাকে একটা কথা। সুরেশ সংসদের সংগীতানুষ্ঠান বরাবর আনন্দের হয়ে থাকে এবারেও আনন্দেরই হোতো—যদি না সামান্য কয়েকটি ত্রুটি এমন অসামান্য বেদনাদায়ক হয়ে উঠত। এ ত্রুটি হয়ত সংসদ কর্তাদের দায়িত্বের অন্তর্ভুক্ত নয়। তবু না বলে পারছি না—স্মারকগ্রন্থের এক প্রবন্ধে জনৈক লেখক ওস্তাদ হাফেজ আলি খাঁ এবং বিখ্যাত সেতারবাদক স্বর্গত ওস্তাদ এনায়েৎ হুসেন খান সাহেবকে যন্ত্রসংগীতের এই নবযুগ ও চেতনার প্রবর্তক তথা "তন্ত্রকারীর সঙ্গে গায়কী অংগের অভিনব সমাবেশ ঘটিয়ে যন্ত্রসংগীতের ক্ষেত্রে একটি নবযুগের সূচনা করেছেন" বলে উল্লেখ করেছেন।

বিস্মিত হয়েছি দেখে যে যন্ত্রসংগীতের প্রসঙ্গে ওস্তাদ আলাউদ্দিনের মত যুগান্ত-কারী এক বৈপ্লবিক প্রতিভাকে তাঁর মত সংগীতবোদ্ধা বিস্মৃত হলেন কেমন করে? বিশেষ করে গায়কী অংগের প্রসঙ্গে? এক্ষেত্রে আলাউদ্দিনের আলোচনা পরে আসছে। তার আগে প্রশ্ন করি শতাব্দীর পর শতাব্দী ধরে সুবিখ্যাত সানাই বাদক-বৃন্দ কোন অঙ্গে বাজিয়ে এসেছেন? স্বনামধন্য সরোদীয়া বুন্দু খাঁ সারাজীবন-ব্যাপী সাধনায় ব্রতী ছিলেন যে অংগ তাকে কি নামে অভিহিত করা যায়? বীণকার আব্দুল আজিজ খাঁ কোন অঙ্গের

জন্য প্রসিদ্ধ? এবার আসে আলাউদ্দিন খাঁর প্রসঙ্গ। একটা কথা স্মরণীয় আলাউদ্দিন খাঁ শুধুমাত্র সরোদী নয়, তবলা, পাখোয়াজ, ঢোল এবং অন্যান্য বহুবিধ যন্ত্র ও কণ্ঠসঙ্গীতের সঙ্গে সঙ্গে কণ্ঠসঙ্গীত ও বেহালায় (যা মূলত গায়কী অঙ্গেই বাজে) তাঁর অসাধারণ পাণ্ডিত্য গুণীজনস্বীকৃত। এখন প্রশ্ন হচ্ছে গায়কী অঙ্গটা কি? বোল কমিয়ে—কণ্ঠসঙ্গীতের ঢঙের পরিবেশনশৈলীকে 'গায়কী' অঙ্গ বলা হয়। মোগল যুগে—তথা বাদশা আকবর শাহর যুগে বীণবাদক ও রবাবীদের একক অনুষ্ঠান কদাচিৎ প্রস্তুত হোতো। বেশীর ভাগই এঁরা কণ্ঠসঙ্গীত বিশেষ করে ধ্রুপদকে অনুসরণ করে সঙ্গতিয়া হিসাবে বাজাতেন। যন্ত্রসঙ্গীতের বোলের ওপর নজর দেওয়া হয় অনেক পরে। বাহাদুর হোসেন খাঁ—তাঁর শিষ্যদের খেয়ালের বিলম্বিতের অঙ্গ ভেঙ্গে মসিদখানি এবং তেলেনা ভেঙ্গে রেজাখানি গৎ রচনা করে সরোদে বাজাবার শিক্ষা দিয়েছিলেন। এই শিষ্যকুল-শিরোমণি ছিলেন বিখ্যাত সরোদী আহমেদ আলি খাঁ। বহুদিন বাংলাদেশেও তিনি ছিলেন মুক্তাগাছি স্টেটের রাজা জগৎকিশোরের দরবারে। তিনিই আলাউদ্দিন খাঁ সাহেবের প্রথম গুরু। রামপুরে উজীর খাঁর কাছে শিক্ষাগ্রহণ করতে যাবার পূর্বেই—সরোদ বেহালা পাখোয়াজ অন্যান্য তালযন্ত্রে তিনি সুপণ্ডিত হয়ে উঠেছিলেন এবং তদানীন্তন ধ্রুপদী নুলো গোপালের কাছে কণ্ঠসঙ্গীতেও তালিম নিয়েছেন। এই শিক্ষার সঙ্গে উজীর খাঁর ধ্রুপদের শিক্ষা সমন্বয়ে তিনি যন্ত্রসঙ্গীতকে গায়কী অঙ্গে সমৃদ্ধ করেছেন তা শুধু অনন্যসাধারণ নয়, অভূতপূর্বও বটে। কারণ তাঁর আগের যে সব যন্ত্রী যন্ত্রসঙ্গীতে গায়কী অঙ্গ বাজাতেন তার বোল কমিয়ে—গলার কাজ বেশী করতেন—কিন্তু অতগুলি তালযন্ত্রে বিশারদ হওয়ার ফলে আলাউদ্দিন হয়েছিলেন বোলের বাদশা। নানান জটিল বোল সহযোগে সূক্ষ্ম সূক্ষ্ম সুরের কারুকার্য সমৃদ্ধ তাঁর উজ্জ্বল অবদান ত বেশীদিনের কথা নয়, ভুলে যাবারও নয়—গায়কী অঙ্গের শিল্পী এযুগের 'পান্নালাল ঘোষ, রবিশঙ্কর, আলি আকবর ত তাঁরই সৃষ্টি। তবু এ প্রমাদ ঘটল কেমন করে?

রবিতীর্থ প্রযোজিত "শাপ-মোচন"

শুধুমাত্র রূপের তৃষ্ণা অন্তরের শুভ্র মুক্ত দৃষ্টিকে আচ্ছন্ন করে। আপাতদৃষ্টিতে যা অসুন্দর, সুন্দরের সমাগমে তাই ত আলোয় আনন্দে হেসে ওঠে। তখনই মেলে রূপের অতীত অপরূপের দর্শন—সেই পরিপূর্ণতার সঙ্গে মিলনেই সকল অপূর্ণতার বেদনা সার্থক হয়ে ওঠে। "শাপমোচন" নৃত্যনাট্যের মর্মভাব তাই।

রূপের মোহকে জয় করবার জন্য মধুশ্রীকে দুঃখের ব্রত গ্রহণ করতে হোলো কমলিকারূপে। অনেক ক্রন্দন, যন্ত্রণা সয়ে, বেদনা-পাথার পার হয়ে সুন্দরের সঙ্গে ঘটল মিলন, সকল কালো যেন আলো হয়ে উঠল, অপরূপের প্রসাদে।

হিমাংশু সংগীত সম্মেলনের বার্ষিক উৎসবে রবিতীর্থের 'শাপমোচন' অভিনয়ে জয়শ্রী লাহিড়ী ও শক্তি নাগ। ফটো : অমৃত

গল্পাংশ এই নাটকে সামান্যই—আইডিয়াটাই এখানে বড়। কবির এই সুন্দরের ধ্যানকে ছন্দে, গানে, বেদনায়, আনন্দে রূপময় করে তুলেছিলেন রবিতীর্থের শিল্পীরা। শ্রীমতী সুচিত্রা মিত্র ও দ্বিজেন চৌধুরীর সুযোগ্য সংগীতপরিচালনা এবং শক্তি নাগের নৃত্য পরিচালনার সমন্বয়ে।

শ্রীমতী মিত্রের আবেগভরা কণ্ঠে "আমি এলেম তোমার দ্বারে", "যখন এসেছিলে", দেবব্রত বিশ্বাসের বলিষ্ঠ কণ্ঠে "তুমি কি কেবলই ছবি", "মোর বীণা ওঠে কোন সুরে বাজি" "সেদিন দুজনে" গানগুলি নাটকীয় সম্ভাবনার শিল্পসুন্দর প্রকাশ এই নৃত্যনাট্যের বিশেষ সম্পদ। নৃত্যের ছন্দসৌষ্ঠব, সুষমা ও ভাবলালিত্য নিমেষেই মনকে আকর্ষণ করে। "যখন এসেছিলে" গানটির "বুঝেছিলাম অনুমানে এ কণ্ঠহার দিলে কারে"—অংশে ঠোঁটের কোণে তাঁর সলজ্জ গৌরব-মাখা, মিষ্টি হাসির চকিত আলোটুকু আমাদের দৃষ্টি এড়ায়নি। শক্তি নাগের নৃত্যপরিচালনা সুন্দর। কিন্তু অরুণেশ্বরের ভূমিকায় তাঁর সূক্ষ্ম-পরিকল্পনা কিছু স্থূলরুচির পরিচয় ছিল (মুখের একাংশ মসীলিপ্ত করে ভয়াবহ করায়) তা এই মার্জিত-মান অনুষ্ঠানের ছন্দকে কিছু ব্যাহত করেছে। "আজি দখিন দুয়ার খোলা"—শেষের তেহাই-অন্তে তাঁর অন্তর্দান হাস্যকর হয়ে উঠেছে দেহে নৃত্যোপযোগী লঘুতার অভাবে।

কেদারের শিহরণ, পরজের বিহ্বল মীড় রচনায় স্বপ্নময় আবহসংগীত সৃষ্টি করেছিলেন মায়া মিত্র। কনিষ্ক সেনের আলোকপাত ভাবোপযোগী।

বাহাদুর খাঁর সরোদানুষ্ঠান

সম্প্রতি কর্ণওয়ালিশ স্ট্রীটের এক ঘরোয়া আসরে ওস্তাদ বাহাদুর খাঁর সরোদানুষ্ঠান ছোট্টর মধ্যে এক উল্লেখযোগ্য অনুষ্ঠান। ইনি এ আসরে একটি নতুন রাগ পরিবেশন করেন শোভাবতী। খাম্বাজ ঠাটের রাগ—সুরের দিক দিয়ে খুব আকর্ষণীয়। বাহাদুর খাঁর রাগধ্যানের সঙ্গে ছন্দবৈচিত্র্য মিশে তাঁর সাঙ্গীতিক মেজাজটি সুপরিস্ফুট। ডান হাতের বাজের ঝাপটে ও মেজের কঠিন বৈচিত্র্যে এঁর কাছে কম সরোদী দাঁড়াতে পারেন। দুঃখ হয় এঁর মত গুণী শিল্পীও বাংলাদেশের মত সঙ্গীতপ্রেমী দেশে যথাযোগ্য স্বীকৃতি পান নি দেখে।

ওয়েস্ট বেঙগলে অল ইণ্ডিয়া জাম্বোরির সাহায্যকল্পে ভারত স্কাউট গাইডের উদ্যোগ

ভারত স্কাউট ও গাইড পরিচালিত 'অল ইন্ডিয়া জাম্বোরি'র অনুষ্ঠান ১২ই আগস্ট রবীন্দ্রসদনে এক উত্তেজনাপূর্ণ সন্ধ্যা রচনা করেছে।

Browsea দ্বীপের ছোট্ট শিবির থেকে Scouting এবং ঐ একই উৎস থেকে সাথীশব্দ Guiding -এর উৎপত্তি।

এই প্রতিষ্ঠানের স্রষ্টাপ্রদত্ত নাম হোলো জাম্বোরি। কিন্তু প্রাদেশিক সীমার সংকীর্ণ গন্ডী পার হয়ে এই প্রতিষ্ঠান জাতীয় প্রতিষ্ঠানে এবং সর্বশেষ ও সার্থক পরিণতি 'বিশ্ব-জাম্বোরি'তে। প্রতিষ্ঠানটি বিরাট হলেও সভ্যদের মধ্যে একটি পারস্পরিক সখ্যতা, হাস্য-পরিহাসের মাঝ দিয়ে মুক্ত-অংগনে অপূর্ব এক মিলনমেলার সৃষ্টি হয়। এই প্রতিষ্ঠানের শিক্ষার দিকটিও তুচ্ছ করবার মত নয়। সময়ানুবর্তিতা, পারস্পরিক সহায়তা এবং আত্মনির্ভর হবার এতবড় সুযোগ সহজলভ্য নয়। সর্বোপরি ধর্ম, জাতি ও ভাষাগত ব্যবধান-মুক্ত সভ্যদের মধ্যে এক বিশ্বভ্রাতৃত্ব গড়ে উঠে একত্র হয়ে দুর্গতদের সাহায্যে এগিয়ে আসার প্রেরণাও এই প্রতিষ্ঠানের বৈশিষ্ট্য। এই মিলনমেলার মাধ্যমে পুরুষ ও নারী স্কাউটদের যুগ্ম-প্রচেষ্টা সজ্জনের অভিনন্দন দাবী করতে পারে। বিশ্ববাসীকে এই প্রতিষ্ঠানের অংগীভূত হওয়ার আহ্বান জানানো হয়েছে।

এই মহতীব্রতকে সার্থক করে তুলতে প্রথিতনামা সকল শিল্পীই এগিয়ে এসেছেন। হেমন্তকুমার, সুচিত্রা মিত্র, শ্যামল মিত্র, সন্ধ্যা মুখোপাধ্যায়, আরতি মুখোপাধ্যায়, দ্বিজেন মুখোপাধ্যায়, বিমলভূষণ, রুমা গুহঠাকুরতা, কৃষ্ণা চট্টোপাধ্যায়, ইলা বোস, কল্যাণী মুখোপাধ্যায়, অনুভা গুপ্ত, রবি ঘোষ, অজিত চট্টোপাধ্যায়, জহর রায়। জ্ঞানপ্রকাশ ঘোষও রাগপ্রধান ও ভজন গেয়ে অনুষ্ঠানের মর্যাদা বৃদ্ধি করেন। সর্বশেষ অনুষ্ঠান ভি বালসারা ও পার্টির অর্কেস্ট্রা।

পরিশেষে ধন্যবাদার্হ সর্বশ্রী বীরেন্দ্রকৃষ্ণ ভদ্র, বসন্ত চৌধুরী, বিমান ঘোষ, জ্ঞানপ্রকাশ ঘোষ, জে এন মিত্র (ছোটাইবাবু)।

—চিত্রাঙ্গদা

অল ইণ্ডিয়া জাম্বুরীর অনুষ্ঠানে সংগীত পরিবেশন করেন হেমন্ত মুখোপাধ্যায় এবং সুচিত্রা মিত্র।
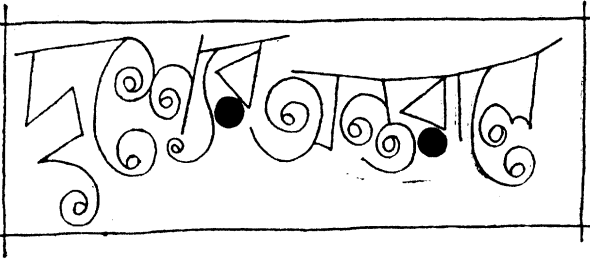
জ্যাক কার্ডিফ

কি যেন একটা আছে মেয়েটির চেহারার মধ্যে। চুলগুলো পাখির বাসা হয়ে আছে, পোশাক-পরিচ্ছদ একেবারে সাধারণ, আধুনিক ফ্যাশনের নামগন্ধ নেই। কিন্তু তবু কেন জানি না মেয়েটি মুগ্ধ করেছিল আমাকে। অথচ আমার হাতে তার একখানা ছবি ছাড়া আর কিছু নেই।

মেয়েটিকে একবার দেখা দরকার, শুধু ছবি দেখে সব কিছু বোঝা যাচ্ছে না। সুতরাং ওর এজেন্টকে ফোন করে বললাম, ওকে পাঠিয়ে দিতে আমার কাছে।

সত্যিই সুন্দরী মেয়েটি। কোথাও খুঁত নেই কোন—খালি ওর নামটা ছাড়া। নাম সোফিয়া স্ক্যাগাজি। এমন সুন্দর একটি মেয়ের নাম স্ক্যাগ্যাজি হতে পারে কে কবে শুনেছে! যাই হোক, নাম নিয়ে একদম মাথা ঘামাইনি আমি। এরোল ফ্লিনকে নিয়ে রোমে এসেছি নতুন প্রতিভার সন্ধানে। মেয়েটির ছবি দেখে মনে হল, আমার উদ্দেশ্য সার্থক হয়েছে।

ছবি তোলা হল মেয়েটির। ছবি দেখতে দেখতে এরোলকে বললাম, 'খুব সস্তায় পাওয়া গেছে কিন্তু। সপ্তাহে মাত্র তিরিশ পাউন্ড মাইনে। আর ঐ মাইনেতেই পাঁচ বছরের কন্ট্রাকট করতে রাজী মেয়েটি। অথচ কি আশ্চর্য সুন্দর চেহারা।

এরোলের কিন্তু খুব একটা মনে ধরেনি মেয়েটি। 'হ্যাঁ, খুবই সুন্দর', বলল এরোল, 'কিন্তু ছবির জগত তো সুন্দরী মেয়েতে ভর্তি। এরও যে ভবিষ্যৎ খুব একটা উজ্জ্বল তা কিন্তু মনে হচ্ছে না আমার।'

বিচারে ভুল করেছিল এরোল। ভুল অবশ্য আমরা সবাই করতে পারি। তারপরে যখন মেয়েটির সংগে দেখা হল আমার তখন সে সপ্তাহে এক হাজার পাউন্ড রোজগার করছে। নিজের নাম পাল্টে করেছে সোফিয়া লোরেন। নেপলস্-এর সবচেয়ে দরিদ্র এলাকার বাসিন্দা ছিল সোফিয়া এবং এই কিছুদিন আগেও আর দশটা মেয়ের মতো ঘুরে বেড়াচ্ছিল রোজগারের ধান্ধায়। খুব অল্পসময়ের মধ্যেই খ্যাতির চূড়ায় উঠে এসেছে সে। অসামান্য সৌন্দর্যই যে তার একমাত্র কারণ তা নয়, সেই সংগে আছে তার প্রতিভা।

সিনেমার পোস্টারে যৌবনের প্রতীক হিসেবে জ্বলজ্বলে রং-এ ছাপা সোফিয়ার ছবি যখন দেখি তখন হাসি পায় আমার। কারণ, সোফিয়ার চরিত্র তার ঠিক বিপরীত। অত্যন্ত মিষ্টি স্বভাবের ভদ্র মেয়ে সে, অল্পবয়সী মেয়েদের মতো সরল। অভিনেত্রী হিসেবে খুবই উঁচু দরের এবং

ভালো অভিনয় করবার জন্যে পরিশ্রমও করে খুব।

সোফিয়াকে নিয়ে একবার ছবি তুলছি। অত্যন্ত আবেগময় দৃশ্য একটি। সেই একই দৃশ্যের ছবি পর পর তিনবার তুলতে হয়েছিল আমাদের। প্রতিবারই সোফিয়া এমন গভীর আবেগ দিয়ে অভিনয় করছিল যে ছবি তোলা শেষ হতেই ভেঙে পড়ছিল কান্নায়। বেশ কয়েক মিনিট পরে কান্না থামলে 'মেক আপ' ঠিক করে নিয়ে সেই একই দৃশ্যে অভিনয় করবে বলে ফের গিয়ে দাঁড়িয়েছে ক্যামেরার সামনে। ইটালীর অভিনয় শিক্ষার এমনই গুণ। প্রতিটি অভিনেতা-অভিনেত্রীকে ওরা কঠোর পরিশ্রম করতে শেখায়। ছবি তোলার কাজ ঘড়ির কাঁটার মতো চলে সেখানে। অভিনেতা-অভিনেত্রীদের খুশি-অখুশি বা মেজাজের কোন প্রশ্নই নেই। ঠিক সময় মত সেটে এসে হাজির হয় সবাই এবং কাজ করে চলে। কোন অভিযোগ নেই কারো মুখে। আবার সেটের বাইরে এসে সবাই স্বাভাবিক মানুষ, বিন্দুমাত্র অহংকার বা ঔদ্ধত্য নেই কারো ব্যবহারে।

একবার মরুভূমিতে একটি দৃশ্যের ছবি তুলতে গিয়ে সোফিয়া যে অসাধ্যসাধন করেছিল তা চিরকাল মনে থাকবে আমার। সোফিয়া স্নান করছে তারই ছবি তোলা হবে। প্রচন্ড শীত। হাওয়া যেন সমস্ত শরীরকে জমিয়ে বরফ করে দিচ্ছে প্রতি মুহূর্তে। প্রতিটি লোক, এমন কি পরিচালক নিজেও গলায় মাফলার জড়িয়ে 'ডাফল' কোট গায়ে কাঁপছে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে। সোফিয়া কিন্তু নির্বিকার। বালতি বালতি জল ঢেলে যাচ্ছে মাথায়। একবারে হয়নি বার কয়েকই তুলতে হয়েছিল সে দৃশ্যের ছবি। একেক বার তোলা হয় আর সোফিয়া দাঁতে দাঁত চেপে বসে থাকে—পরবর্তী শুটিং-এর প্রতীক্ষায়। প্রায় এক ঘন্টা ধরে ছবি তোলার কাজ চলল। কিন্তু একবারও কোন অভিযোগ করল না সোফিয়া। ছবি তোলা শেষ হলে একবার হেসে একটা গরম কোট গায়ে জড়িয়ে নিজের তাঁবুতে চলে গেল সে।

ইটালীর আর একটি সুন্দরী অভিনেত্রী জিনা লোলোব্রিজিডা। সোফিয়া আর জিনাকে সমমানের অভিনেত্রী বলে মনে করি আমি। অবশ্য দুজনের কেউই খুশি হবে না একথা শুনলে। ওরা দুচক্ষে দেখতে পারে না পরস্পরকে। প্রতিদ্বন্দ্বিতা আর প্রচন্ড ইটালিয়ান মেজাজ ছাড়া এর আর বিশেষ কোন কারণ যে আছে তা নয়। সোফিয়ার মতো জিনাও ইটালিতে ডজনখানেক ছবিতে অভিনয় করেছে বছরে এবং ছবি তৈরির সব কিছু শিখে ফেলেছে তার ফলে। ঠিক সময় মতো সেটে আসে জিনা, দায়সারা অভিনয় করে না কখনো। সুতরাং তার জীবনে সার্থকতা তো আসাই উচিত।

নিজের কাজ সম্বন্ধে অত্যন্ত সজাগ জিনা। শুটিং থাকলে সকাল সকাল শুয়ে পড়ে সে। পরদিন যখন সেটে আসে তখন তার শরীর-মন সতেজ, উৎসাহ অফুরন্ত।

সোফিয়া লোরেন

নিজের জীবনের সার্থকতাকে এখনো বিশ্বাস করতে পারে না জিনা। এই সেদিন পর্যন্ত রোমে তার পুরোনো ফ্ল্যাটটা ছাড়ে নি সে। এখন অবশ্য রোমের ঠিক বাইরেই চমৎকার বাড়ি তার, বহু প্রাচীন মূর্তি দিয়ে সুন্দর করে সাজানো।

রোমের সেই ছোট ফ্ল্যাটে জিনার সঙ্গে দেখা করতে যেতাম আমি। সে সব দিনের কথা এখনো পরিষ্কার মনে আছে আমার। ঘরময় ম্যাগাজিন আর ফটোগ্রাফ ছড়িয়ে আছে। তার এক-একটা তুলছে জিনা আর দেখাচ্ছে আমাকে। একটা ম্যাগাজিনের মলাটে রঙিন ছবি ছিল 'জিনার'। সেটা দেখিয়ে জিনা বলল, 'দেখছ? এটা আমার ছবি। লক্ষ লক্ষ লোক দেখতে পাবে আমাকে'

অভিনেতা-অভিনেত্রীদের জীবনে যা কিছু সর্বনাশ বয়ে আনে জিনা যেন সে সব করার জন্যে বদ্ধপরিকর। যেমন স্বামী এবং সন্তান নিয়ে মহাসুখে ঘর-সংসার করছে সে। যুদ্ধের পরে উদ্বাস্তুদের ক্যাম্পে ডাক্তার ছিলেন জিনার স্বামী। এখন জিনার ম্যানেজারের কাজ করছেন।

নিজের সার্থকতা সম্বন্ধে জিনার নিজেরই বিস্ময়ের শেষ নেই। কিন্তু সে সম্বন্ধে কোন অলীক মোহ নেই তার। সে জানে তার মতো অভিনেত্রীদের যৌন আবেদনই যাদের প্রধান সম্বল খ্যাতির আয়ু বড়ো জোর দু বছর। —এটা যে খুবই কমিয়ে বলা সে বিষয়ে কোনই সন্দেহ নেই।

জিনা যে অভিনয়ের ব্যাপারে এতো মনযোগী ছিল তার কারণ তার এই ধারণা। ছবি সম্বন্ধে সব কিছু খুব যত্ন করে শিখেছিল সে। উদ্দেশ্য ভালো অভিনেত্রী হওয়া। রোমে ছবি তুলতে গিয়ে জিনার মতো এমন কঠোর পরিশ্রম করতে আর কোন অভিনেত্রীকে দেখিনি আমি। জিনার ব্যবহারও ছিল খুব মধুর। ছবির কাজ শেষ হলে আমি তাই একটা রুপোর কাপ উপহার দিয়েছিলাম জিনাকে।

জিনা লোলোব্রিজিদা

আর একটি অভিনেত্রীর নিরহংকার ব্যবহার মুগ্ধ করেছিল আমাকে। তার নাম ময়রা শেয়ারার, 'রেড স্যুজ' ছবির নায়িকা।

ছবি তোলা হচ্ছে, ময়রা শেয়ারার এসে হাজির। কিউতে দাঁড়িয়ে ক্যামেরার লোকজনদের জন্য চা এনে দেবে কিনা জানতে চায়। আমি তো অবাক। এ ধরনের অনুরোধ আর কোন অভিনেত্রীকে করতে শুনিনি কখনো।

ময়রা সাধারণ অভিনেত্রীদের মতন মোটেই নয়, বরণ্ড তাদের একেবারে বিপরীত চরিত্রের। ব্যালে নাচের ট্রেনিং-এর ফল এই অহংকারহীনতা। মারগো ফনটেইনও এই একই রকম। দশ বছর বয়স থেকেই ট্রেনিং শুরু হয় ব্যালে নাচিয়েদের এবং সেই ট্রেনিংএর ফলে চরিত্রের আমূল পরিবর্তন হয়ে যায়। নাচের জন্য জীবন উৎসর্গ করে এরা। বাইরের পৃথিবীর সঙ্গে সম্পর্ক প্রায় চুকে যায়। সার্থকতা কখনোই খুব সহজে আসে না এদের জীবনে।

'রেড স্যুজ'-এর শুটিং শুরু করবার আগে কভেন্ট গার্ডেনে গিয়ে ব্যালে নাচের সব কিছু ভালো করে দেখে নিয়েছিলাম আমি। কেননা, 'রেড স্যুজ'-ও ব্যালে নাচের ছবি। তাই মনকে তৈরি করার প্রয়োজন ছিল।

দেখে অবাক হলাম যে মেয়েরা গতরাত্রে নেচেছে স্টেজে তাদেরই আবার সাত-সকালে বিছানা থেকে তুলে সারবন্দী করে 'ড্রিল' করান হচ্ছে। কেউ কালো রঙের ছেঁড়া 'হোস' পরে আছে, কেউ ছেঁড়া পুলওভার চাপিয়েছে হয়ত আবার কেউ পুরনো একফালি নেকড়া জড়িয়ে নিয়েছে মাথায়।

ব্যালে নাচের সমস্ত পরিবেশকে জানাই উদ্দেশ্য ছিল আমার। দেখছি ঘুরে ঘুরে। হঠাৎ নজরে পড়ল একটি মহিলা এসে সবচেয়ে পেছনের সারিতে গিয়ে বসলেন—যারা সবে নাচ শিখতে শুরু করেছে তাদের মধ্যে। মহিলার নাম মার্গো ফনটেন।

এই একই রকমের নিরহংকার চরিত্র ময়রা শেয়ারারের তাই তার সঙ্গে কাজ করে আনন্দ পেয়েছি প্রচুর।

রোজ সকাল সাড়ে আটটায় সেটে আসত সবাই। আমি যেতাম আটটায়। কারণ, আগে গিয়ে সব যন্ত্রপাতি ঠিকঠাক করে নিতাম আমি। রবার্ট হেলপম্যান আর ময়রা শেয়ারার আসতেন আমারও একঘণ্টা আগে।

ময়রা শেয়ারার 'রেড স্যুজে'-ও কিন্তু অভিনয় করতে রাজী হয়নি প্রথমে। কারণ সিনেমাকে নিচুজাতের আর্ট বলে মনে করত সে। ব্যালের মত অভিজাত নয়। ছবির পরিচালক মাইকেল পাওয়েলও ছাড়বার পাত্র নন। ময়রা শেয়ারারকে রাজী করাবার জন্যে উঠেপড়ে লাগলেন তিনি। অবশেষে অনেক চেষ্টার পর রাজী হল ময়রা।

দেখতে বড় সুন্দর ময়রা। লাল রঙের চুল, নীল চোখ। ময়রার সৌন্দর্য প্রায় চমকে দিয়েছিল আমাকে। কিন্তু যে একাগ্রতা নিয়ে নাচ শিখতে হয়েছে তাকে, যে কড়া নিয়মানুবর্তিতার মধ্যে বেড়ে উঠতে হয়েছে—তার ফল সবদিক থেকে ভাল হয়নি। ময়রার সঙ্গে কথা বললে মনে হবে একটি সুসজ্জিত সুন্দরী বুদ্ধিমতী কিন্তু বছর বারো বয়সের মেয়ের সঙ্গে কথা বলছেন! বাইরের জগৎ সম্বন্ধে যেন কোন চেতনাই নেই তার! অথচ ময়রা বিবাহিত এবং সন্তানের মা।

ময়রা অবিশ্যি অনেক পাল্টে গিয়েছিল পরে। আরো সুন্দরী হয়েছিল, আরো বুদ্ধিমতী, জগৎ সম্বন্ধে আরো অনেক বেশি সচেতন। তাছাড়া সিনেমার প্রেমে পড়ে গিয়েছিল ময়রা।

'রেড স্যুজে'-এর স্যুটিং হচ্ছে একদিন। ময়রা নাচছে। অত্যন্ত পরিশ্রম-সাধ্য সে নাচ। নাচ যখন প্রায় অর্ধেকটা হয়ে গেছে তখন হঠাৎ আবিষ্কার করলাম একটা আলো খারাপ হয়ে গেছে। ক্যামেরা বন্ধ করে দিলাম সঙ্গে সঙ্গে। আলোটা কেন খারাপ হল খোঁজ করতে দেখা গেল একজন ইলেকট্রিসিয়ান স্যুটিং-এর কথা বেমালুম ভুলে গিয়ে খবরের কাগজ খুলে রেসের খবর পড়ছিল। এদিকে কাগজে একটা পাতা কখন ঢেকে দিয়েছে আলোটাকে সে জানে না।

ময়রাকে বললাম সবকথা। কোন কথা বলল না সে, বিন্দুমাত্র অভিযোগ করল না। একটু হেসে ফের নতুন করে নাচবার জন্যে তৈরি হল।

বিখ্যাত চিত্রশিল্পী স্যর উইলিয়ম রাসেল ফ্লিন্ট খুব ঘনিষ্ঠ বন্ধু আমার। ময়রার ছবি আঁকবার ভার দেওয়া হল তাকে। ছবি প্রায় যখন শেষ হয়ে এসেছে তখন ময়রা একদিন ইজেলের কাছে এসে দাঁড়াল। ছবির দিকে তাকিয়ে বলল, 'বাঃ, চমৎকার হয়েছে। তবে পা-টা কিন্তু ঠিক আঁকা হয়নি। ব্যালে নাচিয়েরা কখনো ওরকম করে দাঁড়ায় না।'

এ তর্কে কে জিতেছিল জানি না, কিন্তু ছবিটা রয়াল একাডেমিতে খুব প্রশংসা পেয়েছিল। পা নিয়ে কেউ কোন অভিযোগ করেনি। হয়তো নিষ্পাপ নীল চোখ আর ইস্পাত-কঠিন মনের জোরে ময়রাই জিতেছিল শেষ পর্যন্ত।

খেলাধুলা

দর্শক

মারদেকা ফুটবল প্রতিযোগিতা

মালয়েশিয়ার কোয়ালালামপুরে আয়োজিত ১৯৬৭ সালের দশম বার্ষিক মারদেকা ফুটবল প্রতিযোগিতার দক্ষিণ কোরিয়া বনাম ব্রহ্মদেশের ফাইনাল খেলাটি শেষ পর্যন্ত গোলশূন্য অবস্থায় ড্র গেছে। অতিরিক্ত দশ মিনিট সময়েও জয়-পরাজয়ের নিষ্পত্তি হয়নি। ফলে দক্ষিণ কোরিয়া এবং ব্রহ্মদেশকে যুগ্ম-বিজয়ী ঘোষণা করা হয়েছে। এই নিয়ে দক্ষিণ কোরিয়া ৩ বার যুগ্ম-বিজয়ী হল—১৯৬০ সালে মালয়েশিয়া এবং ১৯৬৫ সালে তাইওয়ানের সঙ্গে। ব্রহ্মদেশ ১৯৬৪ সালের ফাইনালে জয়ী হয়েছিল এবং গত বছরে রানার্স-আপ।

মালয়েশিয়ার স্বাধীনতা দিবসের উৎসব উপলক্ষে এই মারদেকা ফুটবল প্রতিযোগিতার আয়োজন, সূচনা ১৯৫৭ সালে। ফাইনাল খেলায় বিজয়ী দলকে সুদৃশ্য টুংকু আবদুল রহমান ট্রফি দ্বারা পুরস্কৃত করা হয়।

১৯৬৭ সালের খেলা

প্রতিযোগিতার লীগ পর্যায়ের খেলায় চ্যাম্পিয়ান এবং রানার্স-আপ হওয়ার সূত্রে 'এ' গ্রুপ থেকে দক্ষিণ ভিয়েৎনাম এবং মালয়েশিয়া এবং অপরদিকে 'বি' গ্রুপ থেকে দক্ষিণ কোরিয়া এবং ব্রহ্মদেশ (গতবারের এশিয়ান চ্যাম্পিয়ান) মূল প্রতিযোগিতার নকআউট পর্যায়ের সেমি-ফাইনালে উঠেছিল। এই চারটি দলের মধ্যে ব্রহ্মদেশ ছাড়া বাকি তিনটি দলই লীগের খেলায় অপরাজিত ছিল। লীগ পর্যায়ের খেলায় এশিয়ান ফুটবল চ্যাম্পিয়ান ব্রহ্মদেশ ০—১ গোলে দক্ষিণ কোরিয়া এবং অপ্রত্যাশিতভাবে ১—২ গোলে তাইওয়ানের কাছে হেরে যায়। একদিকের সেমি-ফাইনালে ব্রহ্মদেশ ৩—০ গোলের ব্যবধানে দক্ষিণ ভিয়েৎনাম দলকে পরাজিত করে গত বছরের পরাজয়ের প্রতিশোধ নেয়। গত বছরের ফাইনালে দক্ষিণ ভিয়েৎনাম ১—০ গোলে ব্রহ্মদেশকে পরাজিত করেছিল। অপরদিকের সেমি-ফাইনালে দক্ষিণ কোরিয়া ৩—১ গোলে মালয়েশিয়াকে পরাজিত করে ব্রহ্মদেশের সঙ্গে ফাইনালে মিলিত হয়।

ভারতবর্ষের খেলা

ভারতবর্ষের দল গঠন দেখে তাদের সম্পর্কে প্রায় সকলেই হাল ছেড়ে দিয়েছিলেন। লীগ পর্যায়ে তাদের পাঁচটি খেলার ফলাফল দাঁড়ায়—জয় ২, ড্র ২ এবং গত বছরের বিজয়ী দক্ষিণ ভিয়েৎনামের কাছে বিতর্কমূলক পেনাল্টি গোলে পরাজয়। এই খেলার প্রথমার্ধ গোলশূন্য ছিল। খেলার ৭৫ মিনিটের মাথায় পেনাল্টি কিক থেকে দক্ষিণ ভিয়েৎনাম গোল দিয়ে জয়ী হয়। ব্রহ্মদেশের রেফারীর এই বিতর্কমূলক পেনাল্টি কিকের নির্দেশে ভারতীয় খেলোয়াড়রা রেফারী এবং মালয়েশিয়ার লাইন্সম্যানকে আবেদন জানিয়ে ব্যর্থ হন। ভারতবর্ষ ৫টা খেলায় ৬ পয়েন্ট সংগ্রহ করার সূত্রে লীগ তালিকায় তৃতীয় স্থান পায়; ফলে নকআউট পর্যায়ের সেমি-ফাইনালে খেলবার যোগ্যতা অর্জন করতে পারেনি। এবারের প্রতিযোগিতায় যোগ্যতার মাপকাঠিতে ভারতবর্ষ ৮ম স্থান পেয়েছে; গত বছর পেয়েছিল ৩য় স্থান; সুতরাং উন্নতির থেকে অবনতিই হয়েছে।

যোগ্যতার ক্রমপর্যায় তালিকা

১ম ও ২য় দক্ষিণ কোরিয়া ও ব্রহ্মদেশ, ৩য় দক্ষিণ ভিয়েৎনাম, ৪র্থ মালয়েশিয়া, ৫ম তাইওয়ান, ৬ষ্ঠ হংকং, ৭ম ইন্দোনেশিয়া, ৮ম ভারতবর্ষ, ৯ম পশ্চিম অস্ট্রেলিয়া, ১০ম সিঙ্গাপুর এবং ১১শ থাইল্যান্ড।

'এ' গ্রুপ

	খে	জ	ড্র	প	স্ব	বি	প
দঃ ভিয়েৎনাম	৫	৪	১	০	১৫	৩	৯
মালয়েশিয়া	৫	৩	২	০	৮	৩	৮
ভারতবর্ষ	৫	২	২	১	৮	৩	৬
হংকং	৫	২	০	৩	৪	১৪	৪
পঃ অস্ট্রেলিয়া	৫	১	০	৪	৮	১৩	২
থাইল্যান্ড	৫	০	১	৪	৪	১১	১

'বি' গ্রুপ

	খে	জ	ড্র	প	স্ব	বি	প
দঃ কোরিয়া	৪	৪	০	০	৯	২	৮
ব্রহ্মদেশ	৪	২	০	২	৯	৩	৪
ইন্দোনেশিয়া	৪	২	০	২	৭	১০	৪
তাইওয়ান	৪	১	১	২	৭	৮	৩
সিঙ্গাপুর	৪	০	১	৩	৪	১৩	১

লীগের খেলা

দক্ষিণ ভিয়েৎনাম: ৫-০ গোলে হংকং, ৫-২ গোলে থাইল্যান্ড, ৩-০ গোলে পশ্চিম অস্ট্রেলিয়া, এবং ১-০ গোলে ভারতবর্ষকে পরাজিত করে। মালয়েশিয়ার বিপক্ষে ১-১ গোলে খেলা ড্র করে 'এ' গ্রুপের তালিকায় শীর্ষ-স্থান পায়।

দক্ষিণ কোরিয়া: ৩-১ গোলে ইন্দোনেশিয়া, ১-০ গোলে ব্রহ্মদেশ, ২-১ গোলে তাইওয়ান এবং ৩-০ গোলে সিঙ্গাপুরকে পরাজিত করে 'বি' গ্রুপের লীগ তালিকায় শীর্ষস্থান পায়।

সেমি-ফাইনাল

ব্রহ্মদেশ ৩ : দক্ষিণ ভিয়েৎনাম ০
দক্ষিণ কোরিয়া ৩ : মালয়েশিয়া ১

ভারতবর্ষের খেলা

থাইল্যান্ডের বিপক্ষে ১-১ গোল, পশ্চিম অস্ট্রেলিয়ার বিপক্ষে ৩-১ গোল, হংকংয়ের বিপক্ষে ৪-০ গোল, মালয়েশিয়ার বিপক্ষে ০-০ গোল এবং দক্ষিণ ভিয়েৎনামের বিপক্ষে ০-১ গোল (একমাত্র পরাজয়)।

ইংল্যান্ড সফরে ভারতীয় স্কুল ক্রিকেট দল

কার্ডিফে আয়োজিত দুদিনব্যাপী খেলায় ভারতীয় স্কুল ক্রিকেট দল এক ইনিংস ও ৯৬ রানে ওয়েলস স্কুল একাদশ দলকে পরাজিত করে বিশেষ কৃতিত্বের পরিচয় দিয়েছে। বৃষ্টি এবং হিমকম্পনে বাতাস সত্ত্বেও ভারতীয় স্কুল দল গরম উৎসাহের সঙ্গে ব্যাট করে প্রথম দিনে ২৯৮ রান তুলে আউট হয়েছিল। প্রথম দিনের খেলার বাকি সময়ে ওয়েলস দল দুই উইকেটের বিনিময়ে মাত্র ৩০ রান সংগ্রহ করেছিল। দ্বিতীয় দিনে ওয়েলস দলের প্রথম ইনিংস ১২৬ এবং দ্বিতীয় ইনিংস মাত্র ৭৬ রানের মাথায় শেষ হয় খেলা ভঙ্গের নির্দিষ্ট সময়ের একঘণ্টা আগে। দীপঙ্কর সরকারের মারাত্মক বোলিংয়ে ওয়েলস দলের এই কাহিল অবস্থা দাঁড়িয়েছিল। সরকার প্রথম ইনিংসে ৩২ রানে ৫ এবং দ্বিতীয় ইনিংসে ১৪ রানে ৪টে উইকেট পেয়েছিলেন।

রাজা মুখার্জি

ভারতীয় স্কুল : ২৯৮ রান (লক্ষণ ৪৭ এবং এম অমরনাথ ৮৩ রান। কিংস্টন ৭৮ রানে ৪ এবং জোন্স ১৯ রানে ৪ উইকেট)

ওয়েলস স্কুল : ১২৬ রান (জে বিভান ৪৩ রান। দীপঙ্কর সরকার ৩২ রানে ৫ এবং কিরমানি ২ রানে ২ উইকেট)

ও ৭৬ রান (কিংস্টন ৩৫ রান। দীপঙ্কর সরকার ১৪ রানে ৪ এবং যশবীর সিং ৪ রানে ৩ উইকেট)

নর্থউইচে আয়োজিত দুদিনের আর এক খেলায় ভারতীয় স্কুল দল এক ইনিংস ও ১৪১ রানে চেসায়ার স্কুল দলকে পরাজিত করে।

এই খেলায় বোলিংয়ে বিশেষ কৃতিত্বের পরিচয় দেন যশবীর সিং—১৯.২ ওভার বলে ২৬ রানের বিনিময়ে ৮ উইকেট।

ভারতীয় স্কুল : ২৫০ রান (লক্ষণ সিং ৫২, এস কিরমানি ৭৬ এবং ইন্দর রাজ ৪৮ রান। মিলনার ২৭ রানে ৮ উইকেট)

চেসায়ার স্কুল : ৪৬ রান (অরুণকুমার ৬ রানে ৪ উইকেট)

ও ৬৩ রান (২½ ঘণ্টায়)

এডিনবার্গে (গ্লাসগো) আয়োজিত তৃতীয় অর্থাৎ ফাইনাল টেস্ট খেলায় ভারতীয় স্কুল ক্রিকেট দল এক ইনিংস ও ৮৫ রানে

স্কটল্যান্ড স্কুল দলকে পরাজিত করে। প্রথম দিনের ৩৯০ মিনিটের খেলায় ভারতীয় স্কুল ক্রিকেট দলের প্রথম ইনিংস ২৭৯ রানের মাথায় শেষ হয়। খেলার বাকি আধঘণ্টা সময়ে স্কটল্যান্ড স্কুল দল এক উইকেট খুইয়ে ১৫ রান সংগ্রহ করেছিল। ভারতীয় স্কুল দলের প্রথম ইনিংসের ২৭৯ রানে লক্ষণ সিংয়ের ১১২ রান ছিল। প্রায় তিন ঘণ্টা খেলে লক্ষণ সিং তাঁর এই ১১২ রানে ১৬টা বাউন্ডারী করেন। লাঞ্চের সময় ভারতীয় স্কুল দলের রান ছিল ১০৪ (১ উইকেটে)। খেলা থেকে লক্ষণ সিংয়ের বিদায়ের পরই ভারতীয় স্কুল দলের রানের গতি খুবই হ্রাস পায়।

দ্বিতীয় দিনে স্কটল্যান্ড দলের প্রথম এবং দ্বিতীয় ইনিংসের খেলা শেষ হয় দু'বারই ৯৭ রানের মাথায়। প্রধানতঃ লেফট আর্ম স্পিন বোলার যশবীর সিংয়ের বোলিংয়ে স্কটল্যান্ড দলকে এই চরম দুর্গতিতে পড়তে হয়েছিল। যশবীর সিং প্রথম ইনিংসে ৬ রানে ৫টা উইকেট এবং দ্বিতীয় ইনিংসে ২০ রানে ৪টে উইকেট অর্থাৎ ২৭ ওভার বল দিয়ে ২৬ রানে ৯টা উইকেট পান। দীপংকর সরকার ৭৪ রানে ৫টা উইকেট পান (২৮ রানে ২ ও ৪৬ রানে ৩ উইকেট)। স্কটল্যান্ডের পক্ষে প্রথম ইনিংসে সর্বোচ্চ রান করেন পার্টে (৩২ রান) এবং দ্বিতীয় ইনিংসে স্টীওয়ার্ট (৩০ রান)।

ভারতীয় স্কুল : ২৭৯ রান (লক্ষণ সিং ১১২ রান। জে আর বক্সটার ৭৬ রানে ৪ উইকেট)

স্কটল্যান্ড স্কুল : ৯৭ রান (পার্টে ৩২ রান। যশবীর সিং ৬ রানে ৫, দীপংকর সরকার ২৮ রানে ২ এবং এম অমরনাথ ১০ রানে ২ উইকেট)

ও ৯৭ রান (স্টিওয়ার্ট ৩০ রান। যশবীর সিং ২০ রানে ৪ এবং দীপংকর সরকার ৪৬ রানে ৩ উইকেট)

এজবাস্টনে (বার্মিংহাম) অনুষ্ঠিত ভারতীয় স্কুল ক্রিকেট দল বনাম ইংল্যান্ড স্কুল একাদশ দলের দ্বিতীয় টেস্ট খেলাটি ড্র গেছে। ভারতীয় স্কুল দল টসে জয়ী হয়ে প্রথমদিনের খেলায় ৭ উইকেট খুইয়ে ৩০১ রান তুলে প্রথম ইনিংসের সমাপ্তি ঘোষণা করে। দলের সর্বোচ্চ ১২৪ রান করেন রাজা মুখার্জি। লাঞ্চের সময় ভারতীয় স্কুল দলের রান ছিল ১০১ (৩ উইকেটে)। খেলার বাকি সময়ে কোন উইকেট না খুইয়ে ইংল্যান্ড স্কুল দল ১২ রান তুলেছিল।

দ্বিতীয় অর্থাৎ শেষ দিনে লাঞ্চের সময় ইংল্যান্ড স্কুল দলের রান দাঁড়ায় ১০০ (৩ উইকেটে)। লাঞ্চের পরবর্তী ৯০ মিনিটে আরও ৪টে উইকেট খুইয়ে ১২১ রান তুলে দলের ২২১ রানের (৭ উইকেটে) মাথায় তারা প্রথম ইনিংসের সমাপ্তি ঘোষণা করে। ফলে ভারতীয় স্কুল দল প্রথম ইনিংসের খেলায় ৮০ রানে এগিয়ে দ্বিতীয় ইনিংস খেলতে নামে এবং ৭৫ মিনিটের খেলায় ৩ উইকেটের বিনিময়ে ৬০ রান তুলে দ্বিতীয় ইনিংসের সমাপ্তি ঘোষণা করে। ইংল্যান্ড স্কুল দলের ১০০ রানের (২ উইকেটে) মাথায় খেলাটি শেষ হয়। জয়লাভের প্রয়োজনীয় ১৪১ রানের থেকে তারা ৪১ রান কম তুলেছিল এবং তাদের হাতে জমা ছিল ৮টা উইকেট।

ভারতীয় স্কুল: ৩০১ রান (৭ উইকেটে ডিক্লেয়ার্ড। রাজা মুখার্জি ১২৪ এবং এস এম এইচ কিরমানি ৬৭ রান। গ্রিফিথ ৬৪ রানে ৪ উইকেট)

ও ৬০ রান (৩ উইকেটে ডিক্লেয়ার্ড)

ইংল্যান্ড স্কুল: ২২১ রান (৭ উইকেটে ডিক্লেয়ার্ড। ডি ক্যামন ৮০ রান। দীপংকর সরকার ৮৪ রানে ৩ এবং যশবীর সিং ৪৬ রানে ২ উইকেট)

ও ১০০ রান (২ উইকেটে। রিলে নট আউট ৪৪ এবং এম জে বয়ার্স ৪৪ রান)

ট্রেন্ট ব্রীজে (নটিংহাম) অনুষ্ঠিত ভারতীয় স্কুল বনাম সম্মিলিত স্কুল দলের (ডার্বিশায়ার এবং নটিংহামশায়ার স্কুল) খেলা অমীমাংসিত থাকে। ভারতীয় দল প্রথম ইনিংসের ১৯৫ রানের মাথায় (১ উইকেটে) খেলার সমাপ্তি ঘোষণা করে। লক্ষণ সিং ব্যক্তিগত ১২৪ রান তুলে ইংল্যান্ড সফরে তাঁর প্রথম সেঞ্চুরী করার গৌরব লাভ করেন। তাঁর এই ১২৪ রানে ছিল ১৮টা বাউন্ডারী—উপর্যুপরি ৬টা। সম্মিলিত স্কুল দলের ১৩৪ রানের (৪ উইকেটে) মাথায় খেলাটি শেষ হয়। বাটলার দলের সর্বোচ্চ ৪৪ রান করে নটআউট থাকেন।

ওয়ার্কিংটনে ভারতীয় স্কুল দল ৭৮ রানে সম্মিলিত নর্দার্ন স্কুল দলকে পরাজিত করে। ভারতীয় স্কুল দলের এই জয়লাভের মূলে ছিল অরুণ কুমারের ব্যাটিং (৬৯ রান) এবং বোলিং (১২·৫ ওভার ও ১০ রানে ৬ উইকেট)। ভারতীয় স্কুল দলের প্রথম ইনিংসে ১৩৭ রান এবং সম্মিলিত স্কুল দলের প্রথম ইনিংসে ৫৯ রান উঠেছিল।

আই এফ এ শীল্ড

১৯৬৭ সালের আই এফ এ শীল্ড প্রতিযোগিতা গত ২৫শে আগস্ট থেকে শুরু হয়েছে। বাটা স্পোর্টস ক্লাব পি বিশ্বাসের হ্যাটট্রিকসহ ৭—২ গোলে ওয়েস্ট বেঙ্গল পুলিশ দলকে পরাজিত করায় প্রতিযোগিতার উদ্বোধন খুবই জাঁকালো হয়েছে। ৪২টি যোগদানকারী দল নিয়ে ১৯৬৭ সালের আই এফ এ শীল্ড খেলার তালিকা তৈরী হয়েছে। এর মধ্যে আছে কলকাতার প্রথম বিভাগের ফুটবল লীগের অন্তর্ভুক্ত ১৫টি দল, দ্বিতীয় বিভাগের ফুটবল লীগের ৪টি দল, ডিস্ট্রিক্ট স্পোর্টস এসোসিয়েশন দল ৫'টি, পশ্চিম বাংলার বাইরের ১৬টি দল এবং বার্নপুর ইউনাইটেড দল। প্রতিযোগিতার প্রথম রাউন্ডের ১৩টি খেলায় ২৬টি দল অংশ গ্রহণ করবে। দ্বিতীয় রাউন্ডের ১২টি খেলায় ১১টি বহিরাগত দল সরাসরি খেলবার যোগ্যতা লাভ করেছে এবং তৃতীয় রাউন্ডে সরাসরি খেলবে ৪টি স্থানীয় দল—গত বছরের বিজয়ী ইস্টবেঙ্গল, গত বছরের রানার্স-আপ বি এন রেলওয়ে, মোহনবাগান এবং মহমেডান স্পোর্টিং। প্রচলিত রীতি উপেক্ষা করে তালিকার একই অর্ধে গত বছরের আই এফ এ শীল্ড বিজয়ী ইস্টবেঙ্গল এবং রানার্স-আপ বি এন রেলওয়ে দলের খেলা দেওয়া হয়েছে। এই দিকেই আছে ইস্টার্ন রেলওয়ে, গত বছরের রোভার্স কাপের রানার্স-আপ ভাস্কো ক্লাব (গোয়া), এ এস সি সাউথ (বাঙ্গালোর) এবং ইন্ডিয়ান এয়ার ফোর্স। তালিকার নিম্নার্ধে উল্লেখযোগ্য দল বলতে—মহমেডান স্পোর্টিং, মোহনবাগান (গত বছরের রোভার্স কাপ বিজয়ী), হায়দরাবাদ একাদশ, পাঞ্জাব পুলিশ, বোম্বাই একাদশ এবং এরিয়ান।

ওয়াটার পোলো প্রতিযোগিতা

কলেজ স্কোয়ার সুইমিং ক্লাব পরিচালিত প্রমথনাথ ও ননীগোপাল স্মৃতি ওয়াটার পোলো প্রতিযোগিতার ফাইনালে বি এন আর ৪—৩ গোলে ন্যাশনাল দলকে পরাজিত করেছে।

(পূর্ব প্রকাশিতের পর)

।। আটাশ ।।

নিজের নিজের প্লেট আর চায়ের কাপ গুছিয়ে নিতে যে সময়টুকু লাগল তাতে মন্তব্যও উঠল কিছু কিছু—

"সত্যিই তুমি মস্তবড় রিস্ক নিয়েছ আদ্রা।.....ভয় নেই, দেখো তোমরা, ও মা কালীই ছিলেন নিশ্চয়।......সাহস আছে তোর আদ্রা, আমার তো শুনেই ভির্মি খাওয়ার মতন হয়েছে।...ইস, ভির্মি যাবে আজকালকার যুগে! তুমি চেকেঞ্জ এখার আমাকেও টেনে নিও আদ্রাদিদি—আমি একেবারে হলের মাঝখানটায় গিয়ে হাঁক দোব—কোই হ্যায়!"

মেয়েটি মাধবী। মোটা শরীর, একটু নকুলে, যদিও কথা কয় কম। এমন করে থিয়েটারি ঢঙে বুক চিতিয়ে বলে উঠল যে হাসির হররা উঠল আবার একটা।

মীনাক্ষী চায়ে চুমুক দিতে দিতে বলল—"অসভ্য!"

কমলা বললেন—"চুপ কর তোরা।.. হ্যাঁ, তারপর?"

"সবাই টেবিলে যে-যার কাজ করছে"—একবার বক্রদৃষ্টিতে চেয়ে নিল আদ্রা মীনাক্ষী-সুষমার দিকে; বলল—"কার কাজ বন্ধ হয়ে গেল, কার চাপা রইল অতটা লক্ষ্য না করে গটগট করে এগিয়ে গেলাম একটা টেবিলের সামনে। বললাম—"আমি মিস্টার চুড়িওয়ালার সঙ্গে দেখা করতে চাই।"

বেশ অবাক হয়েছে। জিজ্ঞেস করলেন—"[illegible]?"

আমি চিঠিটা দেখালাম। পড়ে একবার কপালের দিকে দেখে নিয়ে কি বলতে যাচ্ছিলেন, আর না বলে আর্দালিটাকে ডেকে বললেন—"শাহেব কা চেম্বার।"

আমায় বললেন—"যান ওর সঙ্গে।"

আর্দালি চেম্বারের মধ্যে গিয়ে তৎক্ষণাৎ বেরিয়ে জানাল—ডাক পড়েছে।

আমি স্প্রিঙের দরজা ঠেলে ভেতরে গিয়ে দাঁড়ালাম।

"চক্ষু চড়কগাছ একেবারে!" জয়া টিপ্পনী করল।

আদ্রা বলল—"তা সত্যি কমলাদি, সিনেমা বলো, থিয়েটার বলো, আমি অমন মুখের ভাব কখনও দেখিনি, এত আশ্চর্য হয়ে গেছে, আর......"

"আর এত নিরাশ!"

জয়াই আবার। আদ্রা অনুযোগ করতে কমলা বললেন—"নাঃ, বড্ড বাড়াবাড়ি করছিস জয়া!"

"বাঃ, আর সে বেচারির দুঃখ কেউ বুঝবে না!"

এবার মাথার একটা বেশ ঝাঁকুনি দিয়ে হাত দুটো চিতিয়ে এমন করে বলল যে, আবার একটা হাসির দমক উঠল। আদ্রাও বাদ গেল না, তার মাঝেই আবার আরম্ভ করল—

"বেশ মোটাসোটা, বয়স পঞ্চাশ-পঞ্চান্ন হবে, মুখে ফ্রেঞ্চকাট দাড়ি—পাক ধরেছে দাড়ি-গোঁফে। গায়ে খদ্দরের লম্বা পার্শি-কোট। হ্যাঁ, শৌখীন বৈকি। বেশ ছিমছাম, বুক পকেট থেকে একটা নীল রুমালের কোণ বেরিয়ে রয়েছে। একটা হাল্কা এসেন্সের গন্ধ ছড়িয়ে রয়েছে ঘরটাতে। ভাঙা-ভাঙা বাংলা জানে একটু। সেটা আমি সোজা করে বলে দিচ্ছি। একটু যেন হতভম্ব হয়ে থেকে—

'আপনি?'

"এই চিঠিটা পেয়েছি।"—ইন্টারভিউয়ের চিঠি, বের করে এগিয়ে দিলাম। দেখে নিয়ে চোখ তুলে বলল—"কিন্তু আপনি বিবাহিতা। আমি কুমারী টাইপিস্ট চেয়েছিলাম।"

একটা ঢোক গিলে বলল—"নিঝঞ্ঝাট থাকে, তাতে অফিসের কাজে সুবিধা হয়।"

বললাম—"আমিও একরকম কুমারীই, তাই দরখাস্তটা করে দিয়েছিলাম।"

জিজ্ঞেস করল—"তার মানে?"

"কোর্টে রেজেস্টারি ক'রে বিয়ে। আমরা বাঙালীরা ওটাকে বিয়ের মধ্যে ধরিনা।"

"কী ধড়িবাজ মেয়ে বাবা!"—সুষমা মুখটা গোল করে বলে উঠল। মীনাক্ষী বলল—"আহা, পেঁচিয়ে কাটা বেচারিকে, ক্ষণে আশা, ক্ষণে নিরাশা!"

আদ্রা ঠোঁটে একটু হাসি টিপে নিয়ে বলল—"একটা পেন্সিল তুলে নিয়ে ব্লটিং-প্যাডের ওপর তার মুখটা টিপে ধরল একটু, তারপর আমার চোখ তুলে বলল—"কিন্তু আপনার কপালে তো সিঁদুর রয়েছে।" বললাম—ওটা একটা প্রসাধনমাত্র, পাকা বিবাহের মূল্য নেই ওতে।'

'হাঁ করে চেয়ে রইল মুখের দিকে....."

নিরুপা বলল—"বোধহয় রুজ-লিপস্টিক খুঁজছিল বেচারি, আহা!"

ফটো : পুলিন চক্রবর্তী

"নাঃ, আমি ছেড়ে দিলাম কমলাদি।" হাতদুটো কোলে টেনে নিয়ে চুপ করে বসল আর্দ্রা।

সুষমা বলল—"থাক ওসব, আমি জিজ্ঞেস করছি—তোমার একটু ভয় করছিল না আদুদি? আশ্চর্য!"

জয়া বলল—"তোরও যে অন্যায় রাগ বাছা, বিয়ে করে এলি, বাসর জাগতে পারল না কেউ বর-কনে নিয়ে, দুটো কথা বলেও সাধ মেটাবে না?"

আর্দ্রা একেবারে খিলখিল করে হেসে উঠল। বলল—"যেও না, যেও বরের সঙ্গে বাসর জাগতে। কার কত বুকের পাটা দেখব একবার......"

—বলতে বলতেই দুহাতের আঁজলায় মুখ ঢেকে হাসিতে দুলে দুলে উঠতে লাগল।

কমলা বললেন—"দ্যাখো কী জ্বালা! নিজের কথায় নিজেই হেসে কুটিকুটি—কি ব্যাপার বলবে তো?"

হাসিতে চোখের জল গড়িয়ে পড়েছে, মুছে নিয়ে আবার আরম্ভ করল আর্দ্রা—হাসিটা খুকখুক করে বেরিয়েই পড়েছে মাঝেমাঝে—"বলে ভয় করবে না। ভয়ে পা-দুটো কাঁপছে জুতোর মধ্যে। বোধহয় পড়েই যাই, এইসময় তো ব্যাপারটা হোল। একটু হতভম্ব হয়ে চেয়ে থাকে জিজ্ঞেস করছে—'তা আপনার হাজব্যান্ড কোথায়, কি করেন তিনি?' সত্যি কথা বলতে কি, একটা ধাঁধায় পড়ে গেছি, অতটা তো ঠিক করা ছিল না—ধাঁধায় পড়ে এদিকওদিক চাইছি—যেন লজ্জায় বলতে পারছি না—হঠাৎ হাজ্-ব্যান্ডের ওপর নজর পড়ে গেল। উফ্!—সে যে!"

এবার হেসে একেবারে উল্টে পড়ল আর্দ্রা, সামলাতেও দেরি হোল, তারপর হাসির মধ্যে ভেঙ্গে ভেঙ্গে বলে চলল—"জানলার মধ্যে দিয়ে নীচে চোখ পড়ে গেল কমলাদি—প্রায় দু'শো গজ দূরে একটা বক্‌সিং শেখবার আখড়া—দু'জনে ঘুষোঘুষি করছে, জনছয়েক চারিদিকে দাঁড়িয়ে দেখছে। যারা করছে ঘুষোঘুষি তাদের গাব্দা গাব্দা বক্‌সিং গ্লভ্‌ পরা, একজন ছেলেমানুষই। যাকে দেখিয়ে দিলাম হাজ্‌ব্যান্ড বলে, নিশ্চয় বক্সিংমাস্টার— কালো— গাঁট্টাগোট্টা—এই বুকের ছাতি, এই মাস্‌ল্‌—ঘামে চকচক করছে। শেখাচ্ছেই, তবু অতদূরে থেকেও মনে হচ্ছে চোখদুটো যেন জ্বলছে। মাঝে মাঝে 'হুম্ হুম্' শব্দও আসছে ভেসে, ফটাস্ ফটাস্ করে একএকটা ঘুসির আওয়াজও। মিস্টার চুড়ওয়ালা?—সে যা মুখের চেহারা, ফটো তুলিয়ে বাঁধিয়ে রাখবার মতন কমলাদি! আমি আঙুল দিয়ে দেখিয়ে দিতে সেই যে নজর গেছে ওদিকে, আর ফেরাতে পারছে না।" উফ্!—উফ! মাগো!"

হাসিটা ছড়িয়ে পড়েছে ঘরময়, সেই সঙ্গে—"বলিস কি রে!......তাকে নিজের সোয়ামী বলে চালিয়ে দিলি!......একটু বাধল না তোমার আদুদি?......একি উদ্ভট স্বয়ংবর বাবা!......এত ফিচলেমি তোর পেটে পেটে!......"

কমলাও থামাতে পারছেন না হাসি, কোনরকমে সামলে নিয়ে বললেন—"সত্যিই কী ফিচেল বাবা! ......তারপর?"

"তারপর মুখ ঘুরিয়ে প্রথম কথা—'আপনি দাঁড়িয়ে কেন? বসুন।' "

আবার একটা উৎকট হাসি উঠে, এবার ঢেউয়ের পর ঢেউয়ে ভেঙে পড়তে লাগল। তারই মধ্যে বলে চলল আর্দ্রা—"এরপরই—'কি করেন আপনার স্বামী?' বললাম—'ঐ বক্সিং শেখান—আর ছোরাছুরি—সেটা ঘরের মধ্যেই। জন চল্লিশেক শাকরেদ আছে, তাইতেই চলে যায়, আর—' "

যেন সামলে নিয়ে চুপ করে যেতে জিজ্ঞেস করলেন—"হ্যাঁ, বলুন আর কি বলছিলেন।"

ততক্ষণে বেশ বুদ্ধিও খুলে গেছে; বললাম—"সবটাই তো গোপনীয় স্যার, এমনকি আমি যে ও'র স্ত্রী একথাটাও। আপনি চাকরি দিচ্ছেন—অবিশ্যি, যদি দেন দয়া করে—আপনাকে অসন্তুষ্ট করতে পারি না, তাই......"

আবার দোমনা হয়ে ছেড়ে দিতে দেখে বললে—'আপনি স্বচ্ছন্দে বলুন, এর একটা কথাও বেরুবে না, কথা দিচ্ছি।'

তারপরেই একটু থেমে গিয়ে বলল—"আচ্ছা, আপনি না হয় নাই করলেন চাকরি।'

আপদ সরিয়ে দিতে চায় আর কি। তখন আমার বুদ্ধি বেশ খুলে গেছে। বললাম—"দিতে চান না চাকরি? তাহলে নেমে গিয়ে বলি। উনিই পাঠালেন তো।'

জিজ্ঞেস করলে—"চটে যাবেন?"

একটু আমত-আমতা করে বললাম—"তা চটে যদি যানও তো নেহাৎ তেমন কারণ না ঘটলে অনিষ্ট করেন না কারুর। এক সেই ক্যালকাটা রায়টের সময় যা '

আবার যেন বলতে গিয়ে সামনে নিলাম এইভাবে থেমে যেতে একেবারে ব্যস্ত হয়ে মুখটা এগিয়ে এসে জিজ্ঞেস করল—'হ্যাঁ, রায়টের সময়—কি বলতে যাচ্ছিলেন?'

বললাম সে আরও গোপনীয় স্যার, তবে আপনাকে বলতে বাধা নেই—রায়টের সময় কিছু হাত ময়লা করতে হয়েছিল—উনি একলা শেষ করেছিলেন তিরানব্বুই জন—ছোরা, ঘুষি। তারপর সাকরেদরা আরও. ....'

'তিরানব্বুই!—একলা!' সে যা শিউরে উঠে এক চাপা আওয়াজ কমলাদি!"

আবার হাসিটা ভেঙে পড়েছে, উঠানে রত্নময়ীর গলার আওয়াজ উঠল—"কি ব্যাপার রে বড় নাতনি?—আজ তোদের হাসির বাড়াবাড়ি যেন......"

হাসিটা হঠাৎ চেপে নিয়ে সবাই এ ওর মুখের দিকে চাইল।

পরক্ষণেই—"অজ্ঞ যা ব্যাপার ঠানদি!!"—বলে জয়া ঠেলে উঠতে যাবে, কমলা চোখ পাকিয়ে উঠতে আবার বসে পড়ল।

।। উনত্রিশ ।।

হয়তো চাপা দেওয়ারই ইচ্ছা ছিল কমলার, কিম্বা ধীরেনশেখ ভেবে দেখে যা করবার করবেন, কিন্তু সম্ভব হোল না।

জয়ার সঙ্গে আর্দ্রাও হন্তদন্ত হয়ে উঠে পড়েছিল, একটু থমকে দাঁড়িয়ে—"আমি আসছি এক্ষুনি"—বলে ঘর থেকে বেরিয়ে পড়ে দুড়দুড় করে সিঁড়ি দিয়ে নেমে গেল ও'দের পাশ কাটিয়ে। তিনজনেই এসেছেন—রঙ্গময়ী, হেমাঙ্গিনী, সুরবালা; একটু বিমূঢ়ভাবেই উঠে এসে ঘরে প্রবেশ করলেন। ঘরটা একেবারে স্তব্ধ, কয়েকজনের মুখে একটু চাপা হাসি, তবে কি করবে, কোন্ দিকে চাইবে যেন বুঝতে পারছে না। হুঁশ হোল আগে কমলারই, উঠে এগিয়ে গিয়েছিলেনই, ও'রা উঠে আসতে বললেন—"আসুন ঠানদিদি, মাসিমা, পিসিমা আসুন।"

"কী ব্যাপার রে? ঘর হঠাৎ ঠান্ডা—আদু ওরকম করে নেমে গেল পড়ি-তো-মরি করে......"—প্রশ্ন করলেন রঙ্গময়ী।

"তেমন কিছু নয়।"—একটু অপ্রতিভভাবে হাসলেন কমলা। বললেন—"লেগেই তো আছে একটা না একটা কিছু নিত্যি......"

নিজের বিছানায় হাত দিয়ে মসৃণ করে দিয়ে বললেন—"বসুন। বেশ ক'দিন আসেন নি।"

"এই তো সেদিন হুল্লোড় করে এলাম; মনে করলেই হয়ে ওঠে না তো আসা।...... তা হ্যাঁরে......" বসতে বসতে মুখ তুলে প্রশ্ন করলেন—"আদুর কপালের চুলগুলো। যেন একটু সিঁদুর লাগা মনে হোল? তাড়াতাড়ি নেমে গেল, ঠিক বোঝা গেল না, বিয়ে করে ফেললে নাকি এর মধ্যে?"

—মুখটা একটু শুকিয়েও গেছে। এ'রা দুজনেও যেন একটু নিরাশ হয়ে গিয়ে বসে আছেন। কমলাই একটু সেইভাবে হেসে বললেন—"ও কিছু নয়।......না, বিয়ে কোথায়?......কালীঘাটের সিঁদুর, একটা পাগল্‌লী লাগিয়ে দিয়েছে......"

খুকখুক করে একটা চাপা হাসি উঠল, কয়েকজন মুখ নিল ঘুরিয়ে। রঙ্গময়ী ডিবে থেকে পান বের করে নিয়ে আঙুলে টিপে রেখেছেন, বিমূঢ়ভাবটা কাটতে চাইছে না, বললেন—"একটু ঝেড়ে কাল তো বাছা তা ভালো করে ধুয়েমুছে ফেলবে তো, ব'য়ে বেড়াচ্ছে কেন, আইবুড়ো মেয়ে?"

"ধুয়ে তো ফেলেছে—তবু—পাগলীর তেলেগোলা সিঁদুর তো—তার আগে সেরকম রগরগে......"

—হঠাৎ থেমে গেলেন কমলা।

"না বাপু, তাহলে উঠি, যেন চান না আমরা থাকি। শুনি—"

বেশ একটু বিরক্ত হয়ে গা ঝাড়া দিয়ে উঠে পড়তে যাবেন, কমলা সামনাসামনিই বসে ছিলেন, তাড়াতাড়ি উঠে পড়ে কাঁধে হাত দিলেন—"না, না, উঠলেই হোল? এমন কাণ্ড করে বসে আছে এক......তবে আপনার কাছে লুকোবার কিছু নেই।......ডাক না, আদুকে জয়া......"

"সে আর এসেছে।"—জয়া উত্তর করল।

"তাহলে তুই বল, যেমন শুনলি। আমার আবার অতটা আসে না।"

বললেন শেষপর্যন্ত উনিই।

"ছেলেমানুষীরও একটা সীমা থাকা উচিত"—বলে মন্তব্য করে গোড়ার দিকটা একটানা নিস্তব্ধতার মধ্যেই বলে গেলেন। এরপর মিস্টার চুক্তিওয়ালার সঙ্গে প্রাথমিক কথাবর্তার পর বক্সারকে হঠাৎ দেখতে পেয়ে নিজের স্বামী বলে চালিয়ে দেওয়ার কথা শুনে রঙ্গময়ী একটু চমকে উঠেই প্রশ্ন করলেন—'কি বললে—ওর সোয়ামী!"

গাম্ভীর্য রক্ষা করার চেষ্টায় ঠোঁটদুটো একটু কুঁচকে কুঁচকে উঠল, তারপরেই একেবারে খিলখিল করে হেসে উঠলেন। পানটা হাতে করে উৎকর্ণ হয়ে শুনছিলেন, মুখে গুঁজে দিয়ে হাসতে হাসতেই বললেন—"দুষ্টু বুদ্ধি দেখেছ! কী, না, এমন যার জাঁদরেল সোয়ামী তার আর......উফ্!...... তারপর?"

হেমাঙ্গিনী আর সুরবালাও একটু চাপাচাপিই হেসে উঠেছিলেন, ও'র টিপ্পনীতে খোলাখুলিই যোগ দিলেন। বাকি সবাইও যেন হাতপা আলগা করে দিয়ে বাঁচল—কি হয়, কিভাবে নেন,—যেন সিঁটকে বসেছিল এতক্ষণ। এরপর থেকে থেকেই হাসি কমবেশী করে ছলকে ছলকে উঠতে লাগল—কি করে সামলে গেল আর্দ্রা, ভাঁওতার পর ভাঁওতা দিয়ে।

শেষ হলে কৌটোটা খুলে মুখ নীচু করে একটু বেছে বেছে দোক্তা আঙুলের টিপে তুলে নিলেন রঙ্গময়ী। ঠোঁটে অল্প হাসি লেগে রয়েছে, ঘাড় উল্টে মুখে ফেলে দিয়ে বললেন—"কী ফিচেল বুদ্ধি বাবা! স্রেফ দমবাজির পর দমবাজি দিয়ে বাপের বয়সী লোকটার কাছ থেকে চিঠিটা বের করে নিয়ে এল!! বলিহারি!......তা গেল কোথায়?"

তন্দ্রা উঠে পড়ল। লাজুক একটু ভীতু, ওর উৎকন্ঠাটাই ছিল সবচেয়ে বেশি, মনটা হাল্কাও হয়েছে সেই অনুপাতে, একটু দ্রুতভাবেই বাইরে গিয়ে ডাক দিল—"আদুদি। শীগ্‌গির এসো!......তোমায়......"

আর্দ্রা সিঁড়ির আধাআধি একটা ধাপে একটু গুটিয়ে বসে ছিল গা লুকিয়ে। হাত তুলে থামতে ইসারা করে পা টিপে টিপে নেমে গিয়ে উঠোনের মাঝখান থেকে সাড়া দিল—"আমাকে ডাকছিস?"

একটু পরেই আস্তে আস্তে উঠে এল। রঙ্গময়ী ঘুরে দেখে বললেন—"শোন্।"

কমলার পাশে বসল আর্দ্রা। চুলে সিঁদুরের আভা আর একেবারেই নেই, তবে মুখ লজ্জায়-সঙ্কোচে এত রাঙা হয়ে উঠেছে, যেন সেই সিঁদুরই সারা মুখময় পড়েছে ছড়িয়ে। রঙ্গময়ী একবার মুখের দিকে চেয়ে নিলে বললেন—"তা করেছিস তো করেছিস, অত কিন্তু হওয়ার কি আছে? তবে আমি বলছিলাম......"

সামলে উঠে অনেকটা সহজভাবে ফিরে আসছিল আর্দ্রার, উনি থেমে যেতে একটু প্রতীক্ষা করে প্রশ্ন করল—"কি বলছিলেন ঠানদি, বলুন না......"

"বলছিলাম—জায়গাটা নাকি বড় মিটকেল—যেমন শুনলাম......"

"কিন্তু আমি......কিন্তু আমার...... পরশুই যে গৌতম দেখা করতে এসে বললে—হোস্টেলের ম্যানেজার আর......"

হঠাৎ চোখদুটো ডবডব করে উঠল এবং সঙ্গে সঙ্গেই দুমড়ে প'ড়ে কমলার ঘাড়ে মাথা গুঁজে ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কেঁদে উঠল আর্দ্রা। ওর জীবনের অভাব-অভিযোগ, কাল থেকে নিয়ে যত উৎকণ্ঠা, আজকের এই লজ্জা—সব একসঙ্গে এসে অভিভূত করে ফেলেছে ওকে।

ঘরটা একেবারে অন্যরকম হয়ে গেছে, একটা কুটো পড়লে তার শব্দ শোনা যায়। রংগময়ী উঠে গিয়ে পাশে বসলেন। পিঠে হাত বুলোতে বুলোতে বললেন—"চুপ কর দিদি, চুপ কর। আমি শুধু বলছিলাম, তোর মতন মেয়ে ওরকম একটা জায়গায় কতদিন থাকতে পারবি? যত রংগ নিয়েই থাকিস—চিনি তো! চুপ কর, ওকে ভাবতে আছে? তোর ভাবনা ভাববার কি লোক নেই মনে করেছিস? আমরা রয়েছি তাহলে কি করতে? আর, গোতম তো মানুষ হয়ে এল—আর এই ক'টা বছর মাত্র....."

ফিরে আসতে আসতে গাড়িতে ঐ আলোচনাই হচ্ছিল—

রংগময়ী নিজে তোলেন নি কথা, ও'র ইচ্ছেটা ও'দের দুজনের তরফ থেকে উঠুক। একসময় সুরবালাই জিজ্ঞেস করলেন—",কেমন বুঝছ ঠানদি?"

'কি কেমন বুঝছি?'

সুরবালা একটু চুপ করে যেতে হেমাঙ্গিনী বললেন—'ও বোধ হয় জিজ্ঞেস করছে, চলবে নেওয়া?"

"কিরে, তাই?"—সুরবালার দিকে চেয়ে প্রশ্ন করলেন রংগময়ী। ও'র মৌন দৃষ্টির মধ্যে উত্তরটা পেয়ে বললেন—;'অবিশ্যি, নিতে না চাস, না নিবি। তবে দোষটা কি করেছে এমন?"

'একটু যেন বাড়াবাড়ি করে ফেলেনি?" —হেমাঙ্গিনী প্রশ্ন করলেন।

'হয়তো হয়ে গেছে একটা বাড়াবাড়ি। একে একটু হুল্লোড়বাজ মেয়ে, তার ওপর আমার মনে হয় টাটকাটাটকি ডায়মন্ড-হারবারের রেশটা মন থেকে একেবারে যায়নি। আগে অবিশ্যি অতটা আন্দাজ না করেই একটু একটু করে এগিয়ে গেছে। তারপর বিপদের সামনাসামনি হয়ে দুষ্টু বুদ্ধিটাই যে সুবুদ্ধি হয়ে ওঠেনি তা কি করে বলি?'

"ঐরকম একটা গুন্ডাকে নিজের স্বামী বলা......"

'সতী-অসতীর কথা তুলছিস? আজ-কালকার মেয়ে কত বয়স পর্যন্ত বিয়ে না হয়ে কতকি দেখছে, কতকি ভাবছে মনে মনে—আবার বিয়ে হয়ে গেলে এরাই তো সংসার পেতে বজায় রাখছে সব। আর এতো রংগ করেই বলেছে; এ-বলার আর দাম কি বল?"

একটু চুপচাপই গেল আবার; ও'রা দুজনে কথাগুলো নিয়ে তোল করছেন মনে মনে। একসময় আবার রংগময়ীই বললেন—"কি জানিস দিদি? মেসে এতগুলো মেয়ে একসংগে রয়েছে—কতরকম হুজুগ, কতরকম হুল্লোড়—ভেতরে যার যতই দুঃখ-বেদনা থাক, পড়ে যায়ই এ হুল্লোড়ের মধ্যে—তারপর বিয়ে হলে আর ওসব থাকে না—কত তো দেখলাম!......মনটা যদি খাঁটি রইল—ঐতো দেখলি, একটুতেই ওপরটা চাপা পড়ে ভেতরটা কি করে চোখের জলে বেরিয়ে এল?"

সুরবালা প্রশ্ন করে বসলেন—"ওটা খাঁটি ঠানদি?"

"ও কথা মুখে আনিস নি সুরো, মেয়ে না নিস না নিবি।" ঘুরে একটু চোখ পাকিয়েই উঠলেন রংগময়ী। বললেন—"একটা কথা জেনে রাখিস—যে মেয়ে অমন প্রাণ-খুলে হাসতে-হাসাতে পারে, যে-মেয়ে ভাঁওতা দিয়ে চোখের জল ঠেনে আনতে পারে না।"

একটু কুঁকড়ে গেলেন সুরবালা। আসল কথা, ও'র প্রশ্নগুলো হয় পরীক্ষাই, যত রকম সম্ভব প্রশ্ন করে রংগময়ীর মুখ দিয়ে যাচাই করে নেওয়া। বেশ একটু অপ্রতিভ হয়ে পড়ে বললেন আমতা আমতা করে—"না ঠানদি কেমন যেন ভয় হয় তো—সেই কথাই বলছিলাম, আজকাল যেমন দেখছি চারিদিকে—চেনা যায় না যেন মেয়েদের।"

"সে কথা যদি বললি তো আমারও তাতে সায় আছে। ওটা হয়েছে তোদের একালের সিনেমা-বায়স্কোপের ছুট হয়ে। রাস্তাঘাট, বইয়ের পাতা, দোকানপাট—যেখানেই দেখো নানা ভংগিমেয় শুধু ইষ্টার আর ইষ্টার। তাদের সাজগোজ, তাদের ভাবভংগিই হয়ে দাঁড়িয়েছে যুগের রেওয়াজ। কোন্ মেয়ে—মেয়েই বলো ছেলেই বলো—কোন্ ইষ্টারকে দেবতা করে নিয়ে গড়ে তুলছে নিজেকে বোঝবার কি জো আছে? সেদিক দিয়ে ঠিকই বলেছিস, চেনা শক্ত বৈকি। তবে 'হোম'-এ যে এ-দোষ ঢোকে নি, কমল যতদিন আছে ঢুকতেও পারে না, একথা জোর করেই বলতে পারি। এরা যাই করুক, সরল মনেই করে যায়। বিশেষ করে আদ্দু, তার যে আদি-অন্ত সবটাই...ওই দ্যাখো ভুল, সে কথা যে তোদের বলাই হয় নি, আমি কমলকে একদিন বাড়ি ডেকে নিয়ে আদুর সব কথা শুনলাম যে।"

বাড়ির কাছাকাছি এসে পড়েছেন। কিছু বাজার করবার আছে বলে ড্রাইভারকে একটা ঘুর পথ ধরবার আদেশ করে দিলেন রংগময়ী। এর পর আদুর সব ইতিহাস গেলেন বলে—নিজের পরিশ্রমে ভাইকে মানুষ করে তোলবার কথা পর্যন্ত, যার উল্লেখ করতে চোখ ডবডবিয়ে উঠে আদ্রা অমন করে ভেঙে পড়ল। শেষে মন্তব্যও করলেন—"নিশ্চয় তেমনি একটা কোনও সংকট অবস্থার মধ্যে পড়ে গিয়ে থাকবে, হয়তো টাকা-কড়ির দারুণ অভাব। যার জন্যে হয়তো ভাইয়ের এ কটা মাস চালিয়ে দেওয়া অসম্ভব হয়ে পড়ছে, নৈলে ওর মতন মেয়ে একেবারে অতটা...

"একটা কথা বলব ঠানদি?—ভাবছি তখন থেকে।"—সংকোচের সংগে প্রশ্ন করলেন সুরবালা।

"বল না কি বলবি।"

"বলছিলাম—যদি আমরা কিছু...মানে, যদি ওর ভাইয়ের ব্যবস্থাটাই নিজের হাতে তুলে নিই..."

একটা অতি সূক্ষ্ম হাসিতে ঠোঁট দুটো একটু কুঁচকে উঠল রংগময়ীর। ভ্যানিটি ব্যাগ থেকে পানের ডিবেটা বের করে নিয়ে ও'র মুখের দিকে চেয়ে বললেন—"তুই সত্যিই বড় ছেলেমানুষ রয়ে গেলি সুরো। নিজেই বলে দেখিস না একবার, আসছেই তো বাড়িতে প্রায়ই।"

(ক্রমশঃ)

অঙ্গনা

প্রমীলা

যারা উপেক্ষিত

মেয়েদের যোগ্যতা নতুন স্বীকৃতি পাচ্ছে। এজন্য আমাদের কম শ্রম স্বীকার করতে হয়নি, ত্যাগ তিতিক্ষা ও সহিষ্ণুতার সকল সিঁড়ি ডিঙিয়ে আজ আমরা এই স্বীকৃতির রাজ্যে পৌঁছেছি। এর আঁচ আমাদের স্পর্শ করেনি। আমরা মোটামুটি স্বচ্ছন্দগতি। লঘু ছন্দে, চটুল চরণবিক্ষেপে আমরা সহজ পথে এবং অধিকতর সহজ উপায়ে নিজেদের শীর্ষারোহণের সুযোগসুবিধা ষোলআনা বুঝেসুঝে নিয়েছি। কোথাও ভুলভ্রান্তি হবার সুযোগ পর্যন্ত নেই। চোরাগোপ্তা যে কিছু না হচ্ছে তা নয়। তবে সেগুলো সবই গোপনে—অন্ধকারে। চোরাগোপ্তার সেই বাঁকা পথ সম্বন্ধে আমাদের ক্ষমতা আজও সীমিত। সমাজের বুকে বসে এঁরা নতুন অনুশাসন জারী করেন—অনেকটা ডিক্রিজারীর মত। এই সেদিনও এঁদের প্রতাপ ছিল অখন্ড। এখনও এঁরা সম্পূর্ণ নির্বিষ হয়ে যাননি। সুযোগ পেলেই তাই ছোবলে দেবার চেষ্টা চালিয়ে যেতে কসুর করছেন না। তাঁদের কবল থেকে সমাজকে মুক্ত করতে আমরা এখনও সফল হইনি। সমাজের বুকে বসে এঁরা প্রকাশ্য অভিযান স্থগিত রেখে চোরাগোপ্তার পথ বেছে নিয়েছেন। সঙ্গত কারণেই তাই সমাজের বৃহত্তর অংশ আজকের সুযোগসুবিধার মধ্যে থেকেও সবকিছু থেকে বঞ্চিত হচ্ছে।

কোন মেয়ে যোগ্যতার মাপকাঠিতে উৎরে গেলেই আমরা আনন্দিত হই—তাকে ঘিরে আমাদের জল্পনা-কল্পনার অবধি থাকে না। কিন্তু সেই মুহূর্তে একবার ভেবে দেখি না যে যোগ্যতা থাকা সত্ত্বেও সুযোগ-বঞ্চিত হয়ে কতজন অন্ধকারে ডুবে আছে। তাদের জন্য মনের কোণে বিন্দুমাত্রও সমবেদনাও হয়তো জমা নেই। তারা সম্পূর্ণভাবে আমাদের চিন্তার জগতে অনুপস্থিত। অথচ এই স্বীকৃতি আত্মত্যাগের মহিমায় প্রোজ্জ্বল—অনেক ঝড়ঝঞ্ঝাট সয়ে এই স্বীকৃতি আদায় করে নিতে হয়েছে। সেই তাঁদের চিন্তাকীর্ণ মানসলোকে উপস্থিত ছিল সমগ্র নারীসমাজ। তাঁদেরই পথ বেয়ে চলে আমরা স্বচ্ছন্দে একাংশকে বাদ দিয়ে বসেছি এবং সংখ্যায় তারাই বেশি। আমরা যদি শুধুমাত্র নিজেদের নিয়ে মত্ত থাকি, সকলের কথা না ভাবি তাহলে এর মূল্যও আমাদের দিতে হবে ভীষণভাবে। সে ঋণ শোধ করতে গিয়ে সেদিন আমাদের অন্তরাত্মা হয়তো অস্থির উন্মাদনায় বিদীর্ণ হয়ে যাবে

নারী সেবা সংঘের বার্ষিক প্রদর্শনী

আবার সম্মিলিত চাপে আমাদের অস্তিত্ব হয়তো হারিয়ে-গুঁড়িয়ে নিঃশেষ হয়ে যাবে। সেদিনের প্রতীক্ষায় না থেকে এখনই সতর্কতা অবলম্বন প্রয়োজন। তাহলে বাঁচার পথ খুঁজে পাওয়া যাবে—আর মনের বোঝাও কিছুটা হাল্কা হবে।

মেয়েদের কাজের পরিধি বাড়ছে বিশ্বপ্রগতির সঙ্গে সঙ্গে কলকারখানায় অফিসে-আদালতে জীবনের সর্বপ্রকার কর্মক্ষেত্রে নারী তার স্বীয় কর্মক্ষমতা প্রকাশে তৎপর। কিন্তু সে তার মাতৃত্বের অধিকারকে অস্বীকার করেনি। বর্তমান চিত্রে শিশুসন্তানদের কোলে নিয়ে কয়েকজন মাকে ব্যস্ত থাকতে দেখা যাচ্ছে। এঁরা সকলেই পেট্রোগ্রাদের এক কারখানার কর্মী। কাজের অবসরে এঁরা এসেছেন তাঁদের শিশুদের দেখতে ও পরিচর্যা করতে।

নারী সেবা সংঘের প্রদর্শনী

সুন্দরের সমাবেশ

আলপনা সুন্দর হয়েছিল, এতেই মন মজেছিল। এমন সুন্দর আলপনা অনেক-দিন দেখি নি। সবাই তাই সযত্নে পাশ কাটিয়ে এগুচ্ছি যেন অসতর্ক পদক্ষেপে শিল্পীমন আহত না হয়। ক্রমে ক্রমে এসে দাঁড়ালাম নির্দিষ্ট স্থানে। এতক্ষণ তন্ময় হয়ে শুধু তাকিয়ে আছি। চঞ্চল নয়নে আলপনার সৌন্দর্য নিরীক্ষণ করছি। হঠাৎ চমক ভাঙলো। সামনে দৃষ্টি মেলে ধরতেই নজরে পড়লো আরেক সৌন্দর্য। ঘরের ভেতরে বাইরে সৌন্দর্যের হরেক পশরা। নজর কাড়ার ক্ষমতায় সবাই প্রতিদ্বন্দ্বী। কেউ কাউকে ছেড়ে কথা বলতে রাজী নয়। ঠোঁটের কোণে মৃদু হাসির আমেজ ছড়িয়ে ওদের প্রতিদ্বন্দ্বিতাটুকু লক্ষ্য কর-ছিলাম এমন সময় পার্শ্ববর্তী ভদ্রমহিলা বললেন, 'এখানে যা সাজানো-গোছানো দেখছেন তাই কিন্তু সব নয়, আরও আছে এবং সংখ্যায়ও অনেক বেশি।' 'ওগুলি তো আর প্রতিদ্বন্দ্বিতায় সমগোত্রীয় নয়,' কথাটা মুখ ফসকে বেরিয়ে গেল। ভদ্রমহিলা এক নজর আমার দিকে তাকিয়ে বললেন, 'বাক্স-বন্দী সেই জিনিসগুলি কোনক্রমেই এদের তুলনায় ন্যূন নয়। জিনিসের স্ট্যান্ডার্ড বজায় রাখার ব্যাপারে আমাদের সুনাম আছে আর এদিকে দৃষ্টিও আমাদের সজাগ।'

একটু থামলেন তিনি। তারপর বললেন, 'সব জিনিসের ডিসপ্লে করা আমাদের পক্ষে সম্ভব হচ্ছে না। শুধু জায়গার জন্য, এবার ভদ্রমহিলার কণ্ঠস্বর কি রকম ভার ভার ঠেকলো। আমার কৌতূহলও সংগে সংগে প্রবল হয়ে উঠল। কিন্তু কোন প্রশ্ন করার আগেই ভদ্রমহিলা বললেন, 'জায়গার জন্য এখনো আমাদের প্ল্যানই কার্যকরী হয়ে উঠতে পারছে না।' তখন আমি মনোযোগ দিয়ে বাটিকের শাড়িগুলি দেখছিলাম আর সেই সংগে বাটিকের সেই বুশ শার্টের কাপড়টি। তা সত্ত্বেও কথাটা কানে গেল, জিজ্ঞাসা করলাম, 'আপনাদের আর কি কি পরিকল্পনা আছে?' ভদ্রমহিলা বললেন, 'মেয়েদের শুধু আত্মনির্ভরশীল হলেই চলবে না, দিনকাল বদলেছে, সেদিকে লক্ষ্য রেখে তাদের প্রতিভার বিকাশের আরও রাস্তার হদিশ দিতে হবে, সেজন্য আমাদের প্ল্যান আছে একটি পলিটেকনিক স্কুল চালু করার।' বাচ্চাদের খেলনা আর জামাগুলির কাছে ততক্ষণে বেশ ভিড় জমেছে। সেদিকে তাকিয়ে বাচ্চাদের কচি কচি মুখের উপচে পড়া হাসির আস্বাদ নেবার চেষ্টা কর-ছিলাম। এমন সময় কথাটা কানে যেতেই সজাগ হয়ে উঠলাম। ভদ্রমহিলা কিন্তু বলে চলেছেন, 'সেখানে সিনিয়র এবং জুনিয়র এই দুই বিভাগে পাঠক্রম ভাগ করা থাকবে। সিনিয়র বিভাগে থাকবে ইলেকট্রিক্যাল ও কম্যুনিকেশন ইঞ্জিনীয়ারিং ও অন্যান্য এবং জুনিয়র বিভাগে থাকবে ড্রয়িং ও স্কেচিং, টেক্সটাইল প্রিন্টিং, ফুড টেকনোলজি, বেকারী ও কনফেকশনারী এবং আরও অনেক কিছু।' এই কথার ফাঁকে ততক্ষণে আমার নজর চলে গেছে পাশাপাশি সাজানো ছাপা শাড়ী এবং লেসগুলির দিকে। ওখানে অনেক ক্রেতার ভিড়। লেডিস রুমাল-গুলির চাহিদাও খুব কম নয়। ভদ্রমহিলার কথা কখন শেষ হয়ে গিয়েছিল খেয়াল করি নি। আমার মনের ভাব বুঝতে পেরে তিনি বললেন, 'এ যা দেখছেন সবই মুহূর্তে বিক্রি হয়ে যাবে এবং বাক্সবন্দী সব জিনিসগুলিও।' লজ্জিতভাবে পুরনো কথার খেই ধরে বলি, 'আপনাদের পরিকল্পনা নিশ্চয়ই সার্থক হবে।' উদ্ভাসিত হয়ে ভদ্রমহিলা বললেন, 'তেইশ বছরের একনিষ্ঠ সেবার বিনিময়ে আমাদের এই পরিকল্পনা কি খুব একটা অন্যায় আবদার? আর সকলের জন্যই তো আমাদের পরিকল্পনা, কাউকে বাদ দিয়ে নয়। তাই আমরা সরকার এবং জনগণ সকলেরই সহযোগিতা কামনা করি।'

ঝাউতলাস্থিত 'নারী সেবা সংঘের' বার্ষিক প্রদর্শনীতে গিয়ে ও'দের একজনের

সঙ্গে কথা হচ্ছিল। নিজেদের ভবিষ্যৎ পরিকল্পনার কথা তিনি বললেন এবং সেই সঙ্গে বর্তমানকে নিয়েও নাড়াচাড়া করলেন। রেসিডেন্সিয়াল সিস্টেমে এই সেবা সঙ্ঘ চালু আছে। তবে জায়গা সংকুলান না হওয়ায় কিছু নন-রেসিডেন্সিয়াল ছাত্রীও এখানে শিক্ষালাভ করে। ১৯৪৪ সালে সঙ্ঘের প্রতিষ্ঠা। তারপর তেইশ বছর সমাজসেবার বিস্তৃত অঙ্গনে সঙ্ঘের বলিষ্ঠ পদচারণা। আজ তাই নতুন পদক্ষেপে এ'দের অভিনন্দন প্রাপ্য। সমাজসেবার দিগন্ত বিস্তৃতিতে এ'দের পরিকল্পনা উৎসাহীমাত্রেই সোৎসাহে সমর্থন করবেন, এ প্রত্যাশা সত্যি অন্যায় বা অসঙ্গত নয়—বরং পুরোপুরি সঙ্গত।

নারী সেবা সংঘের প্রদর্শনীতে ছোটদের পোষাক

স্বাস্থ্য ও সৌন্দর্য

আমাদের দেশের মেয়েরা সাধারণতঃ গায়ের রং, মুখ ও কেশের সৌন্দর্যকেই নারীরূপের সবখানি বলে মনে করতেন কিন্তু এখন সমস্ত সুগঠিত না হলে সুন্দরী বলে স্থান পায় না। তাই মনে হয় সর্বাঙ্গ-সুন্দরী হতে গেলে আগে ব্যায়মের সাহায্যে দেহের প্রতিটি অঙ্গকে নিখুঁত করে গড়ে তুলতে হবে। দেহচর্চায় যে নিষ্ঠা, যত্ন চাই একথা আমাদের দেশের মেয়েরা প্রায়ই ভুলে যান। কিন্তু মেয়েদের উচিত বয়সের সঙ্গে সঙ্গেই দেহের প্রতি বিশেষ লক্ষ রাখা। চলা-ফেরায় বসায় দাঁড়ানোয় সবেতেই একটি বাঁধাধরা কায়দা মেনে চলা কর্তব্য—স্টাডি ইয়োর পশচার অলওয়েজ।

সেকালে দড়ি ডিঙ্গানো খেলা ছিল খুব ভাল ব্যবস্থা। একালে যাঁরা সুযোগ পাচ্ছেন তাঁরা খেলুন ব্যাডমিন্টন বা টেনিস এবং সকালে বিকেলে অন্ততঃ আধ ঘন্টা খোলা বাতাসে ছাদে বা খোলা জায়গায় এসে দাঁড়ান।

এখানে কয়েকটি অপ্রিয় কথার উল্লেখ করছি—অতিরিক্ত স্থূলকায়া বা অতিরিক্ত কৃশকায়া নারীসৌন্দর্যের বিরোধী। অথচ কি নারী কি পুরুষ সবাই চান যেন তাকে বেশ স্মার্ট দেখায়। কাজেই দোহারা বা মাঝামাঝি ধরনের স্বাস্থ্যবতী নারীই নিজেকে স্মার্ট মনে করতে পারেন। সাধারণতঃ নারীদেহের পূর্ণবৃদ্ধির বয়স আমি চব্বিশ বছর ধরলাম, এই সময় আদর্শ চেহারা বিশিষ্ট নারীর দৈহিক দৈর্ঘ্য হওয়া উচিত পাঁচ ফুট ছয় ইঞ্চি, ওজন এক মণ পঁচিশ সের—এর দু-তিন সের ওজন কম হলে অসুস্থতার আশঙ্কা নেই কিন্তু বেশী হলে শারীরিক গঠন বা সৌন্দর্যনাশের সম্ভাবনা আছে, এই ওজন অপেক্ষা যাঁদের ওজন বেশী তাঁরা নিঃসন্দেহে স্থূলকায়া, কাজেই সৌন্দর্য বিধানের জন্য প্রত্যেক নারীর উচিত এই ওজনের সঙ্গে সমতা রক্ষা করে চলা—অবশ্য যাঁরা সাধনা করবেন তাঁদেরই আরো দু-চার কথা জানিয়ে দিচ্ছি। এই মেদ কমাবার কয়েকটি সহজ উপায় হচ্ছে স্থূলকায়া নারী প্রতিদিন সূর্যোদয়ের আগে ঘুম থেকে উঠবেন এবং দিনের বেলা কখনো খাওয়ার পর বিছানায় শোবেন না। এ ছাড়া বিশেষ করে দুধ, ঘি ও মাখন একেবারে বর্জনীয়। খাদ্য হিসাবে একবেলা ভাতের পরিবর্তে রুটি অথবা তণ্ডুল জাতীয় খাবার সম্পূর্ণ বাদ দিয়ে শাক-সব্জি ইত্যাদি বেশী করে খাবেন। মাঝে মাঝে উপবাস দেওয়া দরকার। প্রতিদিন এক ছটাক লেবুর রস খেলে ভাল হয়। এইভাবে নিয়মিত থাকলে নিশ্চয়ই উপকার পাবেন।

এবার কৃশতা দূর করবার কয়েকটি কথা বলছি। 'সঞ্চারিণী পল্লবিনী লতেব' এ কথা কবির কাব্যে ভাল লাগে। কিন্তু বাস্তবে পল্লবিনী লতায় দেহধারিণী নারী দেখলে লোকে ভয় পায়! কাজেই দেহের এই ক্ষীণতা যেমন করে হোক সারাতে হবে। পুষ্টিকর খাদ্য কৃশতা দূর করবার প্রধান উপায়। প্রতিদিন সূর্যোদয়ের আগে আধ সের জল খালি পেটে যদি খাওয়া যায় বেশ উপকার হবে। অতিরিক্ত রোগা মেয়েরা বেশী পরিশ্রম করবেন না। তবে মুক্ত বাতাসে বেড়াতে ভুলবেন না। চেয়ারে বা সোফায় বসবার সময় কুণ্ডলী পাকিয়ে এ'কেবে'কে কুঁজো হয়ে বসবেন না। শোবার সময় দেহকে যথাসাধ্য শিথিল করে দেবেন, সারাদিন কাজকর্ম করে যদি রাত্রে ক্লান্তি বোধ করেন তাহলে গরম জলে গা মুছে বিছানায় যাবেন—শোবার আগে যদি সম্ভব হয় এক গেলাস গরম দুধ কিম্বা গরম জল খাবেন এতে সুনিদ্রা হবে এবং স্বাস্থ্যও ভাল থাকবে।

সৌন্দর্য শুধু মুখের হলেই চলবে না। সুন্দর মুখখানির সঙ্গে সুন্দর শরীরের গঠনও চাই, একথা প্রত্যেক মেয়েকেই মানতে হবে। এমন কি সুন্দর দেহের গঠন এবং চলনে সহজ সুন্দর ভঙ্গী থাকলে, মৌখিক সৌন্দর্যের অভাব বোধ হয় না। কাজেই সময় থাকতে সাবধান হতে হবে।

এক কথায় চলাফেরায়, বসা দাঁড়ানোয় নিজের ব্যক্তিত্ব বজায় রাখতে হবে—কখনো কারুর নকল করা ঠিক নয় তবেই স্বাস্থ্য শ্রীতে নিজের দেহকে সুগঠিত ও সুন্দর করে তুলতে পারবেন। হেলথ ইজ ওয়েলথ এ কথাটি আমাদের সব সময় মনে রাখতে হবে। অসুস্থ ও রুগ্ন মন-ধারী দেহ সুন্দর ও সতেজ হতে পারে না। তাই সৌন্দর্য সমাধান ব্রত হল মনের সুখ বজায় রাখা।

—বেলা দে

আবদুল আজীজ আল আমান

ওরা নিঃশব্দে পথ এগুচ্ছে।

চোখে মুখে আতঙ্ক। ভীতির চিহ্ন।

ওমর এল। দুলাল এল। ইয়াসিন এল।

সকাল না হ'তে আবার সবাই এসে জমছে নদীর পাড়ে। হেঁতাল বন ভেঙে, দাঁতন গাছের চারা মাড়িয়ে। এ-পাড়া থেকে, ও-পাড়া থেকে। রায়গাছি থেকে, কন্দপুকুর থেকে। জেলে পাড়ার মালোরা এল, হেকমপুরের শেখেরা এল। পিল পিল করে সবাই এসে জমছে। নদীর পাড়ে এসে থমকে দাঁড়াচ্ছে। জলের দিকে সভয়ে তাকিয়ে কী যেন দেখছে। কী যেন অন্বেষণ করছে।

হ্যাঁ, কোপাই নদীর জল বাড়ছে। পাড়ে দাঁড়িয়ে কান পাতলে মৃদু কলকলানি শোনা যায় এই মাত্র। যেন সরসরানি দিয়ে নদীতে জোয়ার এল। কিন্তু তা' নয়। ভাঁটার টানে এ জল ফিরে যাবে না। বাড়ছে—স্ববেগে এবং নিশ্চিত রূপে বাড়ছে। বাড়ন্তের বেগ বুকে নিয়ে কোপাই ফুলছে: টলমল করছে। যৌবনের মাদকতায় কোপাই এখন হিংস্র।

প্রভাতের আলো এসে নেমেছে কোপাইয়ের বুকে। তাতে কোপাইয়ের রূপ আরো বেড়েছে। যেন শঙ্খিনী রমণী তার উদ্ধত যৌবন উন্মুক্ত করে হাসছে।

দু' পাশের মানুষগুলোকে এখন স্পষ্ট দেখা যাচ্ছে। গ্রামগুলো ভেঙে পড়েছে নদীর পাড়ে। বেলা হ'তে ছেলে-ছোকরার দল এল। বুড়োর দল এল হুঁকো হাতে। তারপর থমকে দাঁড়াল কোপাইয়ের পাড়ে।

কেউ কোন কথা বলছে না। বলতে পারছে না। নিঃশব্দে দাঁড়িয়ে দেখছে কোপাইকে। তাদের সুখ-দুঃখের বন্ধুকে। চেনা কোপাই আজ অচেনা। ভয়ঙ্করী। শঙ্খিনীকে বিশ্বাস নেই। এক হাত গলায়, এক হাত পায়। কখন কী মূর্তি নেবে বোঝা যায় না। বুঝতে পারে না কেউ। তবুও কোপাই আপন। কোপাইকে ওরা ভুলতে পারে না। ঐ যে শঙ্খিনীর নগ্ন যৌবন! রক্তে নেশা ধরায়। মোহ আর মাদকতায় জীবনে নতুন স্বপ্ন নামে। শঙ্খিনী কোপাই তাই বন্ধু। কোপাইকে ওরা ভোলে না।

অথচ জল বাড়ছে। কোপাই ফুলেছে। ঈষৎ শব্দে শ্বাস টেনে উদ্ধত-ফনা শঙ্খচূড় যেন ফোলে। শিকার দেখে সিংহের কেশর যেমন ফোলে। কোপাই তেমনি ফুলে ফুলে যেন শ্বাস ফেলছে।

ওরা অতি দ্রুত বাঁধের দিকে এগুতে থাকল।

ওপারের ঐ লম্বা লোকটা কে বটে! আহাদ বকুল না?

এপার থেকে লম্বা গলায় স্বরে দোলন দিয়ে কানাই ডাকল, আহাদ ভাই-ই-ই-ই-ই।

ঘূরন্ত জলের ওপর দিয়ে বাতাস কেটে কেটে চিকন তীরের মত স্বরটা ওপারে গিয়ে পৌঁছল। উৎকর্ণ আহাদ হাত উঁচু করে জবাব দিল। মাঠে অল্প জল বেড়েছে। ধানের গোড়ায় যেমন মাথা মাথা থাকে। কিন্তু বাড়ছে। ঝিরঝির করে বাড়ছে।

শালা—।

বাড়ন্ত কোপাইয়ের দিকে তাকিয়ে ফুঁসে উঠল কানাই সামন্ত। যেন কোপাই নারী হলে, তার নগ্ন মাদকতাকে এখনই দাহ করত। দাহ করে ভস্ম করত। তারপর বিগত-যৌবনা লোলচর্ম কাঙ্গালিনী বৃদ্ধার মত পথে পথে ঘুরিয়ে মারত।

বাঁধের ফাটলে তখন ঝোর নামতে শুরু করেছে। মাথায় গাঁজলা নিয়ে ঝোরা জল মাঠের পথে ছুটেছে। ফাটল আরো বড় হ'বে। বিস্তারিত হ'বে। তারপর, এক সময় পাষাণী কোপাইয়ের চাপে ধ্বসে যাবে। তখন, তখন......

ওরা সবাই দু'পাশ থেকে বাঁধের ওপর ঝুঁকে পড়ল।

আর ঠিক সেই সময় এল তফজেল শেখ। সেই পরিচিত ভংগীতে। মুখে ত্রিকোনাকার ছোট্ট সুঁচাল দাড়ি। পানের পিকে ঠোঁট রাঙা। কথায় কথায় খুচ্ করে হেসে ফেলে। চোখে একটা ধারাল দৃষ্টি নেচে নেচে খেলা করছে সব সময়। হেসেই বললে, অ বাবাজীরা বুইলে কিনা, বাঁধ ফেলে মাঠে যাও। দু' মুঠো ধান যদি ঘরে ওঠে। খাবে কী সব ভর বছর। আমিও বা খাওয়াব কী! বুইলে কীনা, তৈরী ফসল ডুবলে—

লোকটাকে আমল দিলে না কেউ। কিন্তু কথাগুলো চক্কোর দিয়ে ঘুরছে সবার মগজে। কিছু না কিছু চঞ্চল হয়ে উঠল সবাই। সত্যই তো— সোম্বচ্ছর খাব কী? পাকা ধান ডুবলে, তৈরী ফসল ডুবলে, সুখের কেসমত ডুবলে—

তফজেল শেখ আবার বললে, অ বাবাজীরা—বুড়োর কথা কানে কর, বুইলে কীনা, বাঁধ তো ধ্বসল বলে। আর সে ভাঙনের তোড়ে দাঁড়াবে, তুমি! যাই বাপ—যাও যাও মাঠে যাও, যা' দু' মুঠো ধান ঘরে আসে।

একটু থেকে, তেমনি খুচ্ করে হেসে বললে, বুইলে কীনা— তোমরা পেলে আমি পাব, আর এ অধম পেলে তোমরা। কানাইকে সাক্ষী করেই বললো, নাকী বাবাজী—অ্যাঁ?

চলকী যৌবনে মোচড় খাচ্ছে কোপাই। দেখতে দেখতে রূপ পাল্টাচ্ছে। ফুলছে। পাক খেয়ে খেয়ে ফুলছে। কাল সন্ধ্যেও ঠিক এরূপ ছিল না। রাতেও না। ভোর থেকে, ভ্রষ্টা শঙ্খিনীর মত, কোপাইয়ের এই বাম-মুখী টান। ঘর ফেলবে। ঘর ভাঙবে।

তফজেল চলে যেতে ওরা সবাই মোড়লকে ঘিরে দাঁড়াল। কিন্তু কোন কথা বলল না কানাই সামন্ত। কেবল বিদ্বেষ, ক্রোধ আর সহিংস দৃষ্টিতে ফুলন্ত কোপাইয়ের দিকে তাকিয়ে স্থির হ'য়ে থাকল। দাঁড়িয়েই থাকল।

তখন বাঁধের গায় আরো ঠেল পড়তে আরম্ভ করেছে। আরো জোর পড়ছে। উপরের জল ঘুরছে। ঘুরে ঘুরে ফাটল বড় করে নামছে। ।

দুপুরের ত যা হোক একটা কাণ্ড হ'য়ে যাবে। সকলেই উপলব্ধি করল, এবং সঙ্গে সঙ্গে সন্দিগ্ধ চোখে মোড়লের দিকে তাকাল।

কিন্তু কানাই সামন্ত নীরব। কোন কথা নেই। এই মুহূর্তের কানাই সামন্তকে ঠিক বোঝা যাচ্ছে না। এবং বোঝা যাচ্ছে না বলেই ওরা আরো জটলা পাকাল চারধারে, তাহলে মোড়ল?

আরো কিছুকাল নীরব থাকল সবাই। এই মুহূর্তের নীরবতা এক আশ্চর্য সম্প্রীতি লাভ করেছে। মৃত্যু নিশ্চিত জেনে ঠিক তার আগের মুহূর্তে, কেশরফোলা সিংহের সামনে অসহায় মানুষ যেমন নির্বাক হয়। যারা ফিসফাস করছিল তারা এখন কানাই সামন্তর দুর্বোধ্য মুখের দিকে দৃষ্টি রেখে স্থির হয়েছে।

কয়েক মুহূর্ত সময় কাটতে না কাটতে চমকে উঠে সবাই আকাশের দিকে তাকাল। আকাশের কথা এতক্ষণ ভুলে ছিল সবাই। মাথার উপরে যে একটা অসীম নীলাবরণ রয়েছে সে কথা, মনে রাখার প্রয়োজন ছিল না। এখন হ'ল। একটা নিদারুণ শব্দ হঠাৎ যেন আকাশটাকে ফাটিয়ে চৌচির করে বেরিয়ে আসছে। তারপর ক্রমোচ্চ হ'য়ে দিগদিগন্তে ছড়িয়ে পড়ছে।

সবাই একসঙ্গে আকাশের দিকে তাকাল। পায়ের নীচের একটা বিষাক্ত সরীসৃপ মোচড় খাচ্ছে। তবুও কোপাইয়ের কথা ভুলে ওরা আকাশের দিকে তাকাল। সচকিত হরিণীর মত কান খাড়া করে আকাশের দিকে তাকাল।

হ্যাঁ—আকাশে মেঘ জমছে। দ্রুত জমছে। দূরের আকাশ ঘন হ'য়ে উঠেছে। ছেঁড়া ফোঁড়া মেঘ শুঁড় বাড়িয়ে মাথার উপর এগিয়ে আসছে ক্রমে। দিগন্তের কোলে কালো মেঘের ওপর বিদ্যুতের চাবুক পড়ছে সপাং সপাং। যেন কালো সাপের মুখে বিষাক্ত বাঁকা দাঁত।

কোপাইয়ের ঘোলা জল কালো হ'য়ে উঠছে। কোপাইয়ের মত আকাশেও তাণ্ডবের ইশারা। ঘূরন্ত মেঘে মেঘে বন্যার ডাক। সেই ডাকে কোপাইয়ের ফূর্তি বাড়ছে। যেন সাঙাতের ডাক শুনছে। দ্রুত ছুটছে। উন্মাদিনীর মত তীব্র বেগে, ঊর্ধ্বশ্বাসে।

ঘন প্রলেপে কালো গম্ভীর হয়ে উঠেছে কোপাই। এবং সে গাম্ভীর্য এত প্রবল যেন

এখনই ফুলে, ছাপিয়ে সব বাঁধন ভেঙে মাঠ, ফসল, গ্রাম ডুবিয়ে, ভাসিয়ে, নিশ্চিহ্ন করে দেবে।

বদর, বদর:

মৃত্যু-ভীত নির্জনতাকে ছিঁড়ে ফাটিয়ে চীৎকার করে উঠল ওমর। এ-স্তব্ধতা তাদের ওপর চেপে বসছিল। মুহূর্তে মুহূর্তে বাড়ছিল। এই চীৎকারে জনতা যেন প্রাণ ফিরে পেল।

বদর, বদর!

যেন ডুবন্ত মানুষের দল নিরাপদ আশ্রয়ের সন্ধান পেয়েছে। এমন উল্লাসে চীৎকার করে উঠল সকলে।

বাবা বদর, হেই বদর, পীর গ।

ওমর আবার চেঁচাল। মিনতি জানাল কোপাইয়ের দিকে চেয়ে। রুষ্ট হসনি বাপ, শান্ত হ। সোম্বচ্ছর খাব কী!

মোড়লের দিকে এগিয়ে এল ওমর আলী। আবার সবাই তাকাল কানাইয়ের দিকে। হাই—হোল কী তোর? মুখ খুলবি না?

শাঁ শাঁ আওয়াজ উঠছে যেন।

মৃদুভাবে কানে আসতেই আবার থেমে গেল সকলে। যম আসছে—যম। আকাশ-পাতাল মথিত করে মৃত্যুর পরোয়ানা নিয়ে উড়ে আসছে। এসেই ঝাঁপিয়ে পড়বে। টুঁটি চেপে চেপে ভাসিয়ে দেবে। রেহাই পাবে না কেউ।

শব্দটা ক্রমেই বাড়ছে।

দেখতে দেখতে আকাশ-পৃথিবী এক হয়ে গেল। অন্ধকার। ঘন অন্ধকার। কোপাইটা এখন একটা অতিকায় আদিম কালো সরীসৃপ। মোচড় খেয়ে খেয়ে গজরাচ্ছে। মুখে তার প্রাগৈতিহাসিক ক্রোধ ধূমায়িত হয়ে উঠছে।

বদর, বদর। বাবা বদর। বদর পীর গ।

ওমর চেঁচাল, দা আন, কোদাল-কাটারি-ঝুড়ি। বনবাদাড় সাফ করে বাঁধে ফেল। বাঁধ ভাঙলেই সব্বোনাশ। হাই অনন্ত কাকা—

এতক্ষণে মুখ খুলল কানাই পামন্ত, ঘরাপিছু একটা। আর সব যাও মাঠে। যা ধরে আসে—দু' মুঠো এলেও—

তারপর আবার থেমে গেল। আর কোন কথা বলল না।

বুঝি এমন নির্দেশই চাইছিল সবাই। সবার টান মাঠের দিকে। সোনার ধানে মাঠ উজালা। কেটে ঘরে তুললেই হয়। মাটি মাটি, বোঝা বোঝা। আহা গ—

মাঠের পথে ছুটল সবাই। হেঁতাল বন মাড়িয়ে, খানা-খন্দ ডিঙিয়ে। কাস্তে আন, লাঠি আন। কেটেই আলগা ধান লাঠির দু' পাশে বেঁধে ডাঙায় তুলতে হবে।

আই সামন্ত কাকা, শালা করলি কী। ওমর গায় ধাক্কা দিয়ে চেঁচিয়ে উঠল। ভেড়ার পাল—ছুটল সব মাঠে। বাঁধ সামলাও এবার।

বেগতিক দেখে সামন্তও চেঁচাল, করিস কী—করিস কী। হাই মহম্মদ, হাই বিদু-নাথ—একজন করেও থাকবি ত। নইলে বাঁধ যে—

তাগড়া জোয়ান ক'জনকে টেনে টেনে ফেরাল কানাই। ওমর ধরল ক'জনকে।

তুলসীচরণ ঘাড় নাড়ল, সব গেলে হয় কক্কনো। বাঁধ অক্ষে হ'ল সব অক্ষে। নইলে—

ওমর তার বুড়ো বাপকে পাঠাল মাঠে। সঙ্গে গেল দুই ছেলে আর বৌ। তিনজনে কাটবে—বৌ টেনে টেনে কাঁকালে করে ডাঙায় তুলবে।

সোমথ মেয়ে-বৌরা আজ হেকমপুরের মাঠে।

এক ঝুড়ি মাটি বাঁধের ওপর থেকে নদীতে ফেলতেই রাগ চড়ে গেল ওমরের, কে শালা গাডৗন গরু—পান্তা খেয়ে ভোঁড় হয়েছে শুধু। থাকবে, থাকবে মাটি ওখানে। নদীর গাবা পুরতে পারিস তুই। অ্যাঁ?

লতা-পাতা-বন-জঙ্গল কাটা শুরু হল তারপর। কলাগাছ, সুপারির গাছ, কঞ্চির বোঝা আর এল বট-অশথের ডালপালা। কিন্তু তল পাচ্ছে না কিছু। সব যেন কোথায় যাচ্ছে। ফাটল বড় হচ্ছে ক্রমে। হু হু শব্দে জল নামছে নীচেয়। এ তোড় না থামলে সব যাবে। সব শেষ হবে।

ঢল্‌কী যৌবনে কোপাই উতলা। মোচড় মেরে মেরে ফুলছে আর ফুলছে—কেবলই ফুলছে। মেঘগম্ভীর আকাশ কোপাইয়ের ওপর নুয়ে পড়ছে ক্রমে। যেন চুমো খাবে।

রাম রাম।

তীব্র তীক্ষ্ন আলো জ্বলে উঠলো মাথার ওপর। কানাইয়ের সঙ্গে কণ্ঠ মিলিয়ে তুলসী বললে, অক্ষে কর বাবা—অক্ষে কর। মা কালী, অক্ষে কর—

হুররে মা, হুররে মা—দু'-তিনবার মনে মনে আওড়াল ওমর। এই সময় ঐ ধরনের কী একটা আরবী আয়েত বলতে হয়। শত চেষ্টা করেও ওমর মনে করতে পারল না।

তীব্রতা কেটে গেলে চোখ খুলল সকলে। এবং চোখ খুলেই সামন্ত চেঁচাল, হেই—হেই শালা আপদ। বেরো তুই। তুই থাকলে।

ওমর তাকাল। ঝুড়ি বোঝাই মাটি নিয়ে বাঁধের ওপরে ছিনাথকে উঠতে দেখল। আহা নধরকান্তি—সত্যিই চোখ জুড়োয় দেখলে।

বলো—তাইলে সুবলের মার কী দোষ? নিজের মনকেই প্রশ্ন করল ওমর আলী। আহা, ছোঁড়া যেন কোপাই—দ্যাখ যৌবন কারে কয়।

ততক্ষণে আরো ক'জন ঝাঁপিয়ে পড়েছে ছিনাথের ওপর। বেরো শালা অলুক্ষণে—বেরো। বেরিয়ে যা। তুই থাকলে শালা—

শব্দটা আবার শোনা যাচ্ছে। কত্‌তো—কতও-ও-ও দূরে থেকে। কিন্তু শব্দটা স্পষ্ট। ক্রমেই বাড়ছে। কেবলই বাড়ছে। দমকে দমকে কেঁপে কেঁপে যেন পৃথিবীময় ছড়িয়ে যাচ্ছে।

বাঁধের ওপর থেকে কঞ্চির বোঝাটা নীচেয় ফেলতে ফেলতে জরার্ত চোখে তাকাল বিধুনাথ, তেজ শালা এবার। ভিজে চাবুড়-চুবুড় হ।

কোন আক্রোশ নয়, স্বরে প্রতিহিংসার উত্তাপ নেই—কেবল নিজের মনে বিড়বিড় করল ও। নদীর ধারে বাস, ভাবনা বারো মাস। শালা ভেবে ভেবেই মলাম।

কঞ্চির বোঝা জলে ফেলে দিয়ে ও গামছাটা ঠিক করে বাঁধল। মাথা বাঁচানোর জন্যে আরো অনেকে গামছা বেঁধে নিয়েছে। এবং শেষ হতে না হতেই আকাশ নামল। হুড়মুড় করে ভেঙে পড়ল একেবারে—

সাওতের পরশ পেয়ে কোপাই এখন মাতোয়ারা। এতক্ষণ ঢেউ ছিল না—এবার দোলন লেগেছে। সারা নদী দুলছে। এবং সেই দোলনীর ঢেউ পড়ছে বাঁধে। জল জল।

কেউ কিছু বোঝার আগেই বাঘের মত লাফিয়ে পড়ল ওমর, আই—আই আল্লারা।

সামান্য হোঁচার হুমড়ি খেয়ে মাটির ওপর পড়ে গেল অনন্ত কাকা। আরো অনেক-জনকে ঠেলা দিয়ে বেরিয়ে গেল ওমর, শালারা যেন সব কুড়ুক পাখী। ডা'-ডাগা মুরগী। লড়ে কী লড়ে না। গেল যে সব। চোখের মাথা খেয়েছিস—অ্যাঁ?

বাদলের ঝাপ্‌টা খেয়ে কিছুটা মিইয়ে পড়েছিল সকলে। সামন্ত কাকাও। ওমরের মনটাও শিথিল হয়ে পড়তে চাইছিল। কিন্তু কিন্তু—

আবার দেহ টান টান করে ঝুড়ি-কোদালের পিছনে ছুটল সবাই। হেঁতালের বনে গেল কেউ। বাঁশবনে ছুটল কয়জন।

বাবা বদর, জয় বদর, পীর গ—

বাঘের মত হয়েছে ওমর। সামন্ত কাকাও। বাঁধ দেখছে, কোপাই দেখছে। ফেল মাটি এখানে, কঞ্চির বোঝা ওখানে গাছের ডাল—

কোন বছর যেন! যেন বছর আগের বার। ভাল চাষ হয়েছিল। সারা বছরটা আর ধার-ধোর করতে হয়নি। চলে গেছে। যেন বানে পড়ে গেল। অনাবৃষ্টির বছর। যেতে কেন্তে গেল না। আর এবার—

কোপাইয়ের দিকে তাকিয়ে ওমর আজো দেখেনি। যেন ফেনাজী জুড়েছে। অনাদি ভাসা—সব একসঙ্গে ভাসা। তোর মধ্যে নিপাত হই। দগ্‌দে দগ্‌দে জ্বলছে যেন—অ্যাঁ।

আকাশটা আবার ঝলসে উঠল।

হুর্‌রে মা—হুর্‌রে মা—না, এবারেও মনে করতে পারল না ওমর। ওপাশে তুলসী-চরণ চেঁচাচ্ছে, অক্ষে কর, মা কালী—অক্ষে কর।

চেয়ে-চিন্তে এনে বীজ পাতলাম। জল অবানে মরে যায় আর কী। বাঁকে করে জল বয়ে—অ্যাঁ, দুই অজগরনীর পুকুর থেকে—বাচ্চাদের বাঁচালাম। তা'পরে, তা' পরে—

নাওয়া খাওয়া বাদ দিয়ে শুধু চৌকি দাও। ঐ তফজেল শেখ—দুটো মস্ত শালার ধড়ে। বাঁধবে না—কিছুতেই বাঁধবে না। সেই টাটা রোদে। মাঠে বসে থাক। শালা, অভাব—বাঁধের ওপর থেকে কজনে ছুটে গেল এক-সঙ্গে ধর—ধর আহা, ধর ধর।

ওমরও ছুটে এল। মাটির ওপর থেকে তুলতে তুলতে নিতাইকে বলল, বাপু পারবে না তো দিলে কেন। মাটির ভার। ভার পুরো ঝুড়ি চাপালেই না-হয়।

গোবরের [illegible] ছিল—সামান্য কেটে গেছে। আর কিছু না। উঠে পড়ল নিতাই। বড় হাঁফাচ্ছে।

আহ্‌-কী দুর্দিন গেল। দাঁও পেয়ে মাথায় যেন শিং গজাল। দু'টো শিং। এক কাটি ধান দিলে তিন কাটি দিতে হ'বে। কী না—অভাবের সময় দিচ্ছি।

তফজেলের কথা মনে করল ওমর, আহা আমার দাতাদার—বলে কী, দিলদরিয়া—লিয়ে যা' তোরা, লিয়ে যা। গোলা উজাড় করে দিলুম। লিয়ে যা। কিন্তুক বাবারা—সাবধান, লিখিয়ে যেতে ভুল না। এ বুড়োকে ফাঁকি দিলে মহাপাপ। একেবারে হাবিয়া। আর বাবাজীরা—ঐ তিন গুণ, মনে থাকে যেন। এক পালি লিলে তিন পালি। বুইলে কিনা—তোমাদের জন্যেই আমি—

অজন্মার বছর—কার ঘরেই বা আর ভাত ছিল। হন্যে কুকুরের মত সব গিয়ে লাইন দিল গোলার ধারে—

ফাটলটা কী আরো বাড়ল—অ্যাঁ?

সামন্ত কাক আর ওমর দু'জনেই এক-সঙ্গে ঝুঁকে পড়ল। ঠিক বোঝা যাচ্ছে না। বোধহয় বেড়েছে। হু-হু শব্দে জল ছুটছে মেঠো পথে। আরো দু'এক জায়গা দিয়ে ঝরানি নামছে।

ভীত সন্ত্রস্ত দৃষ্টি নিয়ে সবাই এক-সঙ্গে ফিরে তাকাল। ওপারে দারুণ চীৎকার উঠেছে। একসঙ্গে দল বেঁধে চেঁচাচ্ছে সব। মরণ চীৎকার। মরছে বুঝি—

আহা গ—

কাদপুরের মাঠ গেল, কন্দপুকুর, ঝিনুকে, যদুর আটি—সব মাঠ, সব—সব। হেঁতালখালির মাঠও যাবে কিছু কিছু।

ওপারের বাঁধ ধ্বসল। অতগুলো মানুষ এতক্ষণ ধরে যে সংগ্রাম করছিল তার ইতি হ'ল। চীৎকারটা আস্তে আস্তে মিইয়ে এল। যেন দমকা মশালকে জলের মধ্যে চেপে ধরল কেউ। কিন্তু বাড়ল এপারে—

বদর বদর। বাবা বদর। খাসি দেব—জোড়া খাসি, সিন্নি দোব। ফুল দোব। অ-বদর পীর গ—

দল বেঁধে চেঁচাচ্ছে সব।

তফজেল শেখ এল সেই সময়। বুকে হাত চাপড়াচ্ছে। গেল গেল—সব গেল। নীচের জমি যে সব আমার। অ বাবাজীরা ভাল করে বাঁধ দেখ—খানা করে খাইয়ে দোব। একটা করে গামছা দোব। অ বাবাজীরা—আমার থাকলে তোমরা পাবে। তোমাদের জন্যেই তো আমি—

কিন্তু ওমর রা কড়ছে না। এতক্ষণ পর সে যেন কথা বলতে ভুলে গেল। সত্যিই বাঁধ রাখা যাবে না—অ্যাঁ? নীচের জমিটা ভাসবে—হোক ভাগের জমি। অমন সোনার ফসল গ। অ খোদা—

মাথায় হাত দিয়ে বসে পড়ল ওমর।

কোপাইয়ের বুকে তখন তাণ্ডব চলছে। দোলনে দোলনে নদী উথাল-পাথাল। ঝুপ-ঝাপ করে পাড় ভেঙে পড়ছে এখান-ওখান। কোপাই রে—তোর মাথায় মারি মুড়ো ঝাঁটা। সোম্বচ্ছর খাওয়ালি পরালি ভালবাসালি আর শেষ কালডায়—

সাপ, সাপ। অ ওমর চা'—সাপ।

লাফ দিয়ে সরে গেল ওমর। বড় সাপ—জাত সাপ। কিন্তু ফণা নেই। ছুটে পালাচ্ছে। পালাতে পারলে বাঁচে। তুফানে পড়ে বেচারার বিষ মাথা থেকে লেজে এসে জমেছে।

সরসর করে হেতাল বনের দিকে মিলিয়ে গেল সাপটা। কিন্তু সেই সাপ—

এমনি সাপের মুখে পড়েছিল আর একবার। এ-বারেই। ঐ নীচের জমিটায়—তফজেল শেখের জমি—ভাগের জমি—রুয়ে থেকেই মছিবত। রোয়া ধরে উঠে যখন গোছ হ'ল—লাগল পোকা। ছোট ছোট সবুজ পোকা হাজারে হাজারে। কচি কাঁচ পাতা খেয়ে ঝাঁঝরা করে দিচ্ছে। সরকার থেকে কী ওষুধ দিয়েছে—তাই গুলে দিচ্ছিল গোছে গোছে—পাতায় পাতায়। ঠিক মাঝামাঝি জমিতে দেখা হ'লো যমের সঙ্গে। ইয়া লম্বা—

বাপ্‌রে বলে সরে এসেছিল ওমর। ছোবলটা সাঁই করে পড়ল জলে। কতদূর পর্যন্ত জলের ওপর তেল-তেল কী সব ভেসে গেল।

কোপাইয়ের পাড়ে বসে শিউরে উঠল—ওমর।

তবু তবু—আবার রোয়া খেতে নেমে-ছিল। ওষুধ ছড়িয়ে ছিল। যমের সঙ্গে লড়াই করে ধানের পোকা মেরেছিল। ছেলে-বৌ-বুড়ো বাপ—খাব কী?

মাঠ উজালা সেই সোনার ফসল গ—

সেই শব্দটা আবার শোনা যাচ্ছে না? ঝড় তুফান ভেদ করে, লক্ষ্যভেদী বাণের মত। শোঁ শোঁ করে ছুটে আসছে। তবে কী—

কোপাইয়ের ঘোলা জল ক্রমেই স্ফীত হয়ে উঠছে। ফুলছে। দুলছে। সেই তুফানের উন্মত্ততার ওপর ঘন কালো সন্ধ্যা নামল এক সময়।

দু' দিন, দু-রাত।

অবশেষে ছেঁড়া-ফোঁড়া মেঘ ঠেলে সূর্য উঠল।

দু'দিন দু-রাত যেন যমের সঙ্গে লড়াই করল সকলে। গোসল নেই, খাওয়া নেই। কাদা মেখে সব ভূত হয়েছে। চেনার উপায় নেই। যেন কোন গুহাবাসী আদিম মানুষের দল। অথবা সরীসৃপ। এই কাদা মেখে নদী থেকে উঠে এল।

মেহনতী মানুষেরা এখন ক্লান্ত চোখে তাকিয়ে আছে কোপাইয়ের দিকে। চোখ জ্বলছে না। পরিশ্রান্ত দেহ উত্তেজনা হারিয়ে এখন নিরুত্তাপ। কোপাইও এখন সে আর নগ্ন শঙ্খিনী নয়। আস্তে আস্তে যেন তার স্খলিত বসনটা টেনে নিচ্ছে।

ঝোরা জল এখনও নামছে বাঁধের ফাটল বেয়ে। তবে তার গতি শ্লথ। মাঠ ভাসবে না। ভাসাতে পারবে না।

দু'দিন দু-রাত পর সেই আদিম মানুষের দল বাড়ীর পথে পা বাড়াল।

বাড়ীতে পা দেবার আগেই কান্নাটা শুনতে পেল ওমর। তার বউ কাঁদছে। চাপা গলায় গুমরে গুমরে কাঁদছে।

আরো জোরে পা চালাল ওমর।

বৌয়ের মুখের কাছে বসে বুড়ো বাবা। ছেলে দুটো পাশে দাঁড়িয়ে। বাইরে যেন অনেক লোকের কণ্ঠস্বর।

বাপ বল্‌লে, ধান ফেলে খরা থেকে বাঁচালি, কোপাইয়ের বান থেকে বাঁচালি কিওক বাবা—

অ্যাঁ—

একটা আদিম পশু যেন অস্ফুটে চীৎকার করে উঠল। ওমর যেন সেই বাঘ। কোপাইয়ের পাড়ে হেঁতাল বনের বাঘ।

বাপ বললে, মোরা চারজনে এনে উঠোনে গাদা দিলুম কিন্তুক যম এসে লুটে লিয়ে যাচ্ছে।

আঁই—

সেই অস্ফুট আদিম পশুর ডাক। ধান বওয়া লাঠি নিয়ে ওমর বেরিয়ে এল।

মানুষ না কোন প্রগৈতিহাসিক জীব?

শুকিয়ে ওঠা কাদায় সারা দেহ বিবর্ণ। কেবল চোখ দুটো পিটপিট করছে অঙ্গারের মত।

আঁই—কোন শালারে—

বুইলে বাবাজী, আমি গো। এই ভাগের জমি তো। তা অদ্দেক আমি পাবই। আর পাঁচ আড়ি ধান নিয়ে ছিলে—বুইলে কিনা, তা অদ্দেকটায় পনের আড়ি হবে না। তাই সব লিয়ে যাচ্ছি। আর, বুইলে বাবাজী—ভাগে যারা করে, তারা সব আমার খামারে ধান তোলে কীনা—

আঁই—

একটা আদিম পশুর থাবার ভিতর থেকে যেমন একটা ভয়ার্ত মানুষ পালায়, হেঁতাল বনে পালিয়ে-যাওয়া সেই সাপটার মত, ওমরের লাঠির তলা থেকে পালিয়ে গেল তফজেল শেখ। সেই সাপটার মতই ছোবল তুলতে ভুলে গেছে। ক্ষমতা নেই।

কর্দমাক্ত মানুষের দল সবাই এসে জমল খামারে। অন্তে কাকা, সামন্ত কাকা, আহাদ আলী, ইয়ার বকস—সাঙ্গপাঙ্গ নিয়ে অনেকের ধানই এর ভিতর খামারে এনে তুলেছে তফজেল মিয়া।

লাঠি নিয়ে দাঁড়িয়েই থাকল ওমর আলী, আই শালারা—খবরদার। যে [illegible] লিইচিস ঠিক তাই দিয়ে যাবি—তার একটা দানা কম নয়, বেশীও নয়।

ইয়ার আলী বললে, কতকটা যেন ভয়-ভয় করেই বললে, কিন্তুক শেষ রক্ষে হবে ত?

সেই একরোখা আদিম বন্যজন্তুর মত হুংকার কাটল ওমর আলী, আই বানের মুখ থেকে ধান বাঁচালি না—

অপরাহ্নে গামছা কাঁধে কোপাইয়ের দিকে এগুল ওমর। ইতিমধ্যে অনেকেই এসে জমেছে। কদিনের ধুলো-কাদার খোলসের ভিতর থেকে আবার পরিচ্ছন্ন মানুষেরা বেরিয়ে আসতে চায়। নির্মল আকাশ থেকে অপরাহ্নের কোমল আলো নেমেছে কোপাইয়ের বুকে। কোপাই এখন শান্ত। স্খলিত বসন টেনে সে তার নগ্ন যৌবনকে ঢেকে নিয়েছে। অনন্ত জলরাশি এখন কোমল পায়ে চলা-ফেরা করছে। যেন শান্ত মাতৃরূপ। গামছা হাতে নিয়ে, ধীরে ধীরে কোপাইয়ের জলে নেমে গেল ওমর।

সুধীরচন্দ্র সরকার

(পূর্ব প্রকাশিতের পর)

মৃত্যুর পর তাঁর মৃতদেহ তাঁর বাড়ীতে আনা হলে আমরা সকলে দেখতে গেলাম এবং কেওড়াতলার শ্মশানে নিয়ে যাওয়ার সময় যে বিরাট শোকযাত্রা হয়, আমরা সে শবানুগমনে যোগদান করে শেষবারের মতো শ্রদ্ধা নিবেদন করলাম।

তাঁর মৃত্যুর পরই যেন সারা দেশ সচেতন হয়ে উঠল যে কতবড় সাহিত্যিককে তারা হারিয়েছে। তাঁর মৃত্যুর সঙ্গেই যে তাঁর সঙ্গে আমাদের সম্পর্ক শেষ হল তা নয়, বরং তাঁর সাহিত্য প্রচারের ব্যাপারে এক নতুন ভূমিকা গ্রহণের সৌভাগ্য অর্জন করলাম। এই হাজার টাকার বিনিময়ে বেশ কিছুদিন পরে শরৎবাবুর ছেলেবেলার গল্পগুলি ছাপাবার ব্যবস্থা করি। আমি আগেই বলেছি যে তাঁর 'পথের দাবী' প্রকাশ করার কথা ছিল প্রথমে আমাদেরই, কিন্তু তদানীন্তন ব্রিটিশ সরকারের কোপে পড়ার ভয়ে আমরা তা প্রকাশ করিনি। 'পথের দাবী' প্রকাশিত হবার সঙ্গে সঙ্গে বাজেয়াপ্ত হয়—। দীর্ঘদিন পরে সরকারের রোষমুক্ত হবার পর আমরাই তা পুনরায় প্রকাশ করি এবং বর্তমানে কয়েকটি সংস্করণও হয়ে গেছে। শরৎচন্দ্রের আধুনিক কালের ১৩ খণ্ডে সম্পূর্ণ শোভন সংস্করণ গ্রন্থাবলী আমরাই প্রচার করে আসছি।

শরৎচন্দ্রের মৃত্যুর পর থেকেই যেন তাঁর গ্রন্থের চাহিদা উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পাচ্ছে। তাঁর জীবিতকালে পুস্তকের যে আয় তিনি দেখে গেছেন মৃত্যুর পরে তা এত স্ফীত হবে এ তিনি কল্পনাও করেননি। শুনেছি, তাঁর একটি গল্পের হিন্দি চিত্রস্বত্বের জন্য কিছুদিন আগে প্রায় ত্রিশ হাজার টাকা পাওয়া গিয়েছিল।

সাহিত্যসেবী ও প্রকাশক হিসেবে সুদীর্ঘকাল নিষ্ঠাসহকারে এই ব্যবসায়ে লিপ্ত থাকার দরুণ অন্য যেসব বিখ্যাত মনীষী ও সাহিত্যিকের সঙ্গে ঘনিষ্ঠভাবে পরিচিত হবার সৌভাগ্য লাভ করেছি, তাঁদের মধ্যে রাজশেখর বসু (পরশুরাম) ছিলেন সর্বজনশ্রদ্ধেয় সাহিত্যিক ও পণ্ডিত ব্যক্তি।

রাজশেখরবাবুর সমস্ত বই প্রকাশ করার দরুণ তাঁর অতি নিকট-সান্নিধ্যে থাকা আমার পক্ষে সম্ভবপর হয়েছিল। সেইজন্যে তাঁর সম্বন্ধে দু'চার কথা বলতে পারবো আশা করি।

১৩৩২ সালে রাজশেখরবাবু ও তাঁর ভাইদের গৃহে পার্শীবাগানের 'উৎকেন্দ্রে' মধ্যে মধ্যে যাতায়াত আরম্ভ করেছি। স্বগর্ত ঐতিহাসিক বন্ধুবর ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় আমাকে রাজশেখরবাবুর কাছে প্রথম নিয়ে গিয়ে তাঁর সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দেন। 'উৎকেন্দ্রে'র অন্যান্য সভ্যদের সঙ্গে পরিচয়ও তাঁর মাধ্যমেই হয়। বিখ্যাত চিত্রশিল্পী যতীন্দ্রকুমার সেন সেই সময় 'উৎকেন্দ্রে'র একজন প্রধান কর্ণধার। তিনি আমাদের প্রতিষ্ঠানের হয়ে বহু ছবি এঁকে দিয়েছিলেন।

সকলেই জানেন যে, রাজশেখরবাবুর ছদ্মনাম ছিল পরশুরাম এবং তিনি এই নামেই সমস্ত গল্পের বইগুলি লিখেছিলেন। অবশ্য অন্যান্য গ্রন্থগুলি যেমন—রামায়ণ, মহাভারত, মেঘদূত, চলন্তিকা, লঘুগুরু, বিচিন্তা, চলচ্চিন্তা প্রভৃতি রাজশেখর বসু নামেই প্রকাশিত হয়। যে সময় আমার সঙ্গে তাঁর আলাপ হয়, সেই সময় তাঁর প্রথম বই বেরিয়েছে 'গড্ডলিকা'। কতকগুলি মনোরম রসসমৃদ্ধ গল্পের সমষ্টি এই 'গড্ডলিকা'। এ-হেন বইও একজন ভালো প্রকাশকের অভাবে আশাপ্রদ বিক্রি হয়নি। সেই কারণে তিনি একজন ভালো প্রকাশক খুঁজছিলেন এবং সেই সূত্রেই বন্ধুবর ব্রজেন্দ্রনাথ আমাকে নিয়ে গিয়ে রাজশেখরবাবুর সঙ্গে আলাপ করিয়ে দেন। এবং ক্রমশঃ আমিই তাঁর সমস্ত বই পরে প্রকাশ করি।

পরশুরাম ছদ্মনাম গ্রহণের একটি সুন্দর গল্প আছে। 'গড্ডলিকা'র প্রথম গল্পটি লেখার পর মুদ্রণের পূর্বে তিনি একটি ছদ্মনাম খুঁজছিলেন, কিন্তু ঠিক নিজের পছন্দমত কোনো নাম তিনি খুঁজে পাচ্ছিলেন না। এই সময় পার্ক স্ট্রীটের বিখ্যাত স্বর্ণকার পরশুরাম একদিন তাঁর বাড়ীতে এসে হাজির। হঠাৎ এই নামটাই তাঁর মনে লেগে গেল এবং 'পরশুরাম' ছদ্মনামটিই তিনি গ্রহণ করলেন।

তাঁর প্রথম পুস্তক 'গড্ডলিকা'র প্রকাশক ছিলেন ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়। সেই থেকে পুস্তক বিক্রয়ের ভার আমার হাতে এসে গেল এবং আজ পর্যন্ত তা আমাদের প্রতিষ্ঠানের হাতেই আছে।

রাজশেখরবাবুর পাণ্ডুলিপি যাঁরা দেখেছেন, তাঁরা জানেন যে তা কত পরিষ্কার, পরিচ্ছন্ন ও নিখুঁত। এই ধরণের পরিচ্ছন্ন ও নিখুঁত পাণ্ডুলিপি প্রকাশকদের কাছে শুধু লোভনীয়ই নয়, তা অমূল্য। আমরা রবীন্দ্রনাথের হাতের লেখা দেখেছি—কি পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন ও সুন্দর। পরিচ্ছন্নতার দিক থেকে শরৎচন্দ্র, হেমেন্দ্রকুমার, অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্ত, বুদ্ধদেব বসু, প্রবোধকুমার সান্যাল প্রভৃতির নাম বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। শরৎচন্দ্রের লেখায় অবশ্য মাঝে মাঝে কাটাকুটি থাকলেও, তাঁর লেখা ছিল ছোট ধাঁজের এবং পরিষ্কার, পরিচ্ছন্ন। পড়তে কোনো কষ্ট হতো না।

এইদিক দিয়ে রাজশেখরবাবুর পাণ্ডুলিপি নিয়ে প্রেসে প্রকাশককে কখনো কোনো বিপদে পড়তে বা কোনো অসুবিধার জন্য প্রকাশককে আর গ্রন্থকারের শরণাপন্ন হতে হোত না। তাঁর একখানা বই-এর সমস্ত পাণ্ডুলিপির মধ্যে কাটছাট, পরিবর্তন বা পরিবর্জন একেবারেই দেখা যেতো না। এইরূপ কয়েকটি অপরূপ পাণ্ডুলিপি জাতীয় সম্পদ সংগ্রহ করে রেখে দিয়েছি। পাণ্ডুলিপিতে যদি কোনো কথা কেটে অন্য কথা বসাতে হোত তা হ'লে ছোট টুকরা কাগজে সেই কথাটি লিখে সেই স্থানে বসিয়ে দিতেন। প্রত্যেক গল্প বা পাণ্ডুলিপির সমস্ত শব্দসংখ্যা তিনি সেই সঙ্গে লেখার শেষে লিখে দিতেন। শুধু তাই নয়, প্রত্যেক পাণ্ডুলিপিতে তিনি লিখে দিতেন প্রত্যেক লাইনের মাপ, প্রত্যেক পাতায় লাইন-সংখ্যা, প্রত্যেক লাইনের মধ্যে ফাঁকের মাপ—ইত্যাদি গুনে গেঁথে রাজশেখরবাবু এমনভাবে নিজের কল্পিত হিসাব কষে দিতেন যে তাঁর বই তাঁর একটুও এদিক-ওদিক হোত না বা এক লাইন কম-বেশী হোত না। এ বিষয়ে তাঁর হিসাবপ্রণালী দেখলে অবাক হয়ে যেতে হয়। সমগ্র গ্রন্থখানির মুদ্রণ প্রভৃতিতে যা খরচ পড়ত তা তাঁর হিসাবের সঙ্গে সম্পূর্ণ মিলে যেত। এ-ছাড়া প্রত্যেক পাতা হিসাবে মুদ্রণ-ব্যয় এবং কাগজের মূল্য পর্যন্ত তাঁর হিসাবে ধরা পড়ত।

আর একটি কথা হয়ত অনেকেরই জানা নেই যে, তাঁর বইগুলির প্রচ্ছদপট সব তাঁরই কল্পনাপ্রসূত, এমনকি একটি প্রচ্ছদপট তাঁর নিজেরই অঙ্কিত। বেশীর ভাগ লেখকের মতো তিনি শুধু বইখানি লেখার পরই নিজেকে মুক্তি দিতেন না—তিনি বইকে পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন ও সুশ্রী করবার জন্য যা-কিছু করা দরকার সব সময় তার চেষ্টা করতেন এবং এ-বিষয়ে আমাকে বহুভাবে সাহায্য করতেন।

এজন্য তিনি সবচেয়ে বেশী এবং অকুণ্ঠ প্রশংসা পেয়েছেন প্রেসের কম্পোজিটারদের কাছ থেকে অর্থাৎ যাদের নামে আমরা চালিয়ে থাকি ছাপাখানার ভূত' কথাটা। অনেক লেখকের ধারণা যে প্রেসে কপি' দেবার সময় কোনরকমে লিখে দিলেই হল। অনেক ক্ষেত্রেই দেখা যায় কপি লেখা হয়েছে, কোনো মুদ্রিত কাগজের অপর পৃষ্ঠায় কিংবা ডায়রীর পৃষ্ঠায়, কিছুটা স্পষ্ট, কিছুটা অস্পষ্ট, তারপর কাটাকুটি তো আছেই। আসলে এঁদের বই লেখা হয় প্রথম প্রুফের উপর। এ-বিষয়ে বিলাতী

প্রকাশকদের মুদ্রণ-পদ্ধতি সম্বন্ধে আমি কিছু বলতে চাই।

আমার এক বন্ধু তাঁর কয়েকখানি বই প্রকাশ করেছেন বিলাতী প্রকাশকদের দ্বারা। কথায় কথায় তিনি আমাদের জানালেন যে, প্রথমে তাঁদের কাছে পাণ্ডুলিপি পাঠাতে হয় টাইপ করে। তারপরে সেই প্রকাশকরা মাঝে মাঝে পাণ্ডুলিপির ইংরাজি সংশোধন করে পুরো পাণ্ডুলিপিটি পুনরায় 'টাইপ' করে লেখকের কাছে অনুমোদনের জন্য পাঠিয়ে দিয়েছিলেন। অর্থাৎ প্রেসে যখন কপি দেওয়া হবে, তখন তা সম্পূর্ণ নির্ভুল থাকবে। অনেকের হয়ত জানা নেই যে, বিলাতী বড় বড় প্রকাশকদের দপ্তরে 'রীডার' থাকে। তাদের কাজ হলো প্রাপ্ত পাণ্ডুলিপির সমস্তটা পাঠ করা, পরীক্ষা করা এবং প্রয়োজন হলে ভুল সংশোধন করা। শুনেছিলাম রবীন্দ্রনাথের বিলাতী প্রকাশকের অফিসে সেই সময় ছিলেন বিখ্যাত কবি ও সমালোচক স্টাফোর্ড এ ব্রুক।

যাঁরা রাজশেখরবাবুর প্রুফ সংশোধন করা দেখেছেন, তাঁরা প্রুফগুলির পরিচ্ছন্নতা দেখে অবাক হয়ে গেছেন। প্যারা যোগ করা নেই, এখান থেকে ওখানে লাইন টেনে দেওয়া নেই, লাইন কেটে নতুন লাইন বসানো নেই, এমনকি কোনো শব্দ বদলানো পর্যন্ত নেই। শুধু কম্পোজের সামান্য দুই-একটা ভুল ছাড়া তাঁর প্রুফে আর কোনোরকম কাটাকুটি দেখা যেতো না। কারণ, তাঁর লেখায় বাদ দেবারও কিছুই নেই, যোগ করবারও কিছু নেই। এমন সুন্দর ও নির্ভুলভাবে তিনি তাঁর পাণ্ডুলিপি প্রস্তুত করতেন। পুস্তক মুদ্রণ বা প্রকাশ ব্যাপারে তিনি কখনও হস্তক্ষেপ করতেন না। কেবল তাঁর বই সম্বন্ধে নয়, অন্যান্য সব বিষয়েও তাঁর নিজের মতামত তিনি কোনদিন বড় করে জাহির করেননি।

আমরা সকলেই জানি যে, বাংলা লাইনো উদ্ভাবন-ক্ষেত্রে 'আনন্দবাজারের' সুরেশচন্দ্র মজুমদার প্রচুর সাহায্য করেছিলেন। কিন্তু এটাও আমাদের ভুললে চলবে না যে, এ-বিষয়ে রাজশেখরবাবু ও যতীন্দ্রকুমার সেনের অবদানও বড় কম নয়।

তাঁর চরিত্রের একটা সবচেয়ে বড় গুণ ছিল যে, যার যে-বিষয়ে কৃতিত্ব আছে, সেই বিষয়ের ভার তিনি তার উপরেই ছেড়ে দিতেন। অনেক সময়ে নিজের মতের সঙ্গে অপরের মত না মিললে প্রথমে তিনি সকলকে অনুরোধ করতেন এ-দুটো মতকে বিশেষভাবে বিবেচনা করে দেখবার জন্যে এবং দুটোর মধ্যে যেটা ভালো, সেইটাই গ্রহণ করতে বলতেন; নিজের মতটাকেই যে নিতে হবে এমন দাবী তিনি কখনও করেননি। যার যে-বিষয়ে অভিজ্ঞতা আছে, তার কাছ থেকে তিনি তা শিক্ষার্থীর মতোই জেনে নিতেন।

রাজশেখর বসু

নিয়মানুবর্তিতায় তিনি ছিলেন আদর্শ পুরুষ। তিনি যখন যে-কাজটা করতেন, সে-কাজটা শেষ না করে অন্য কাজের দিকে কখনও মন দিতেন না। এমনকি কোনো লোকের সঙ্গে কোনোদিন হয়ত কোনো আলোচনায় ব্যস্ত আছেন, এমন সময় অন্য কেউ এলে তাঁর সঙ্গে কথাই বলতেন না। আমি দেখেছি, অনেকদিন সকালবেলায় তাঁর বাড়ীতে গেছি, পুস্তক-প্রকাশন ব্যাপারে আলোচনা করছি, এমন সময় কোনো লোক এলে তিনি টেবিলের ওপরে একটি 'নোটিশ' টাঙিয়ে দিতেন—নোটিশে লেখা থাকত 'আমি এখন ব্যস্ত আছি।'

কথা বলতেন খুব কম। তাঁকে হাসতেও যেমন কম দেখা যেত, রাগতেও তেমনি দেখেছি আমরা খুব কম। তিনি বাংলাভাষা সম্বন্ধে এমন একজন authority ছিলেন যেজন্য কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় এবং বাংলা সরকার তাঁকে নূতন শব্দ সৃষ্টি ও পরিভাষা রচনায় উৎসাহিত করতেন।

সাহিত্যিকদের মধ্যে এমন সুশৃঙ্খল পণ্ডিত এবং নিরহংকার লোক আমার নজরে খুব কমই পড়েছেন। বাংলাভাষার সমৃদ্ধিকল্পে তাঁর অবদান চিরকাল বাঙালী সমাজ সশ্রদ্ধচিত্তে স্মরণ করবে।

রাজশেখরবাবুর বিষয় বলতে গেলে তাঁর জামাই অমর পালিতের বিষয় কিছু বলা প্রয়োজন। এঁর কাছে দোকানের ব্যাপারে আমি যথেষ্ট ঋণী। অমরবাবু প্রথম জীবনে মেট্রোপলিট্যান ইনস্টিটিউশনের প্রফেসর ছিলেন। পরে ইনি রাজশেখরবাবুর একমাত্র কন্যাকে বিবাহ করেন। বিবাহের পরে কাশ্রকাটা সোপ ওয়ার্কস নামে একটি বৃহৎ সাবানের কারখানা স্থাপন করেন। কিন্তু নানা কারণবশতঃ এই কারখানা চালাতে না পেরে তিনি এই কারখানা পরে বন্ধ ক'রে দেন।

(ক্রমশঃ)

মণ্ডশিল্পের প্রসঙ্গে

তারাপদ পাল

বহুদিন আগের কথা। কলকাতার আর্ট কলেজ তখনো কলেজ হয়নি। আর্ট স্কুলরূপেই খ্যাত। সেই সময় সেখানকার শিক্ষক-শিল্পীরা মুখোস তৈরীর এক পরিকল্পনা তৈরী করেন। কিন্তু প্রাথমিক পর্বে মুখোস তৈরী কিছুটা বাধা পায়। তারপর মাটি দিয়ে তাঁরা দশটা মুখোস তৈরী করেন। সেগুলি স্কুলের বার্ষিক প্রদর্শনীতেও রাখা হয়। ঐ মুখোসগুলি দেখে জনৈক ইউরোপীয়ান দর্শক সেগুলি কিনতে চান। কিন্তু মাটি দিয়ে তৈরীর জন্য মুখোসগুলি এত ভারী হয়েছিল যে, তিনি শেষপর্যন্ত সেগুলির ওজনের জন্য কিনতে অস্বীকার করেন।

মাটি দিয়ে তৈরী মুখোসের এই অসুবিধার জন্য তাঁরা মুখোস তৈরীর বিকল্প পথের সন্ধান করতে থাকেন এবং শেষপর্যন্ত কাগজের মণ্ড দিয়ে মুখোস তৈরীর সিদ্ধান্ত নেন। কিন্তু মণ্ড তৈরীর পদ্ধতি তখন তাঁদের না জানার জন্য প্রথম দিকে তাঁদের বেশ অসুবিধার সামনাসামনি দাঁড়াতে হয়। তারপর যাহোক করে কাগজের মণ্ড তৈরীর পরও ঝামেলার অবসান হলো না। বিড়ম্বনা দেখা দিল ছাঁচ নিয়ে। কয়েকদিন পরে অবশ্য সে-সমস্যারও সমাধান হয়ে গেল। শেষপর্যন্ত কলকাতার আর্ট কলেজে কাগজের মণ্ডের মুখোস তৈরী হল। দেখতে দেখতে তার জনপ্রিয়তাও বেড়ে গেল।

আজকাল কলকাতার বাজারে কাগজের মণ্ডের তৈরী শিল্পের চাহিদা মোটামুটি দেখা দিয়েছে। বিশেষ করে বিদেশী পর্যটকদের দৌলতে। ভারতের বাইরের বাজারেও এই জাতীয় শিল্পের কদর কম নয়। শিল্পের দিক থেকে এই জিনিসের মূল্যায়ন যেমনই হোক না কেন, ব্যবসায়িক দিক থেকে খুব একটা হেলাফেলার নয়।

একই জিনিস, যা মাটি দিয়ে বা প্যারিস প্লাস্টার দিয়ে তৈরী করা যেতে পারে এবং হয়ও, তাই যখন কাগজের মণ্ড দিয়ে তৈরী হয়, তখন তার ব্যবসায়িক মূল্য বেড়ে যায়। শিল্পের দিক দিয়ে ঐ তিনটি উপকরণ দিয়ে তৈরী শিল্প-দ্রব্যের মূল্য একই পর্যায়ের। কেননা কাগজের মণ্ড দিয়ে তৈরী করলে দ্রব্যগুলি যেমন ওজনের দিক দিয়ে হাল্কা হয়, তেমনি সহজে বহনযোগ্যও হয়। সেই কারণে একই জিনিস মাটি বা প্যারিস প্লাস্টার দিয়ে তৈরী করলে যতটা না বাজারের উপযোগী হয়, তার থেকে বেশী হয় কাগজের মণ্ডের তৈরী হলে। আবার কাগজের মণ্ডের তৈরী হলে যে এ-সবের শৈল্পিক মান বা মূল্য কমে যাবে তাও নয়। গত বছরের নভেম্বর মাসে 'মাক্সল্যাণ্ডের' তৈরী এইরকম মণ্ডশিল্পের কিছু নিদর্শন কলকাতায় প্রদর্শিত হয়েছিল। সেগুলির শিল্পকৃতি নিয়ে দর্শকদের মধ্যে কোন রকমের মতদ্বৈধ দেখা দেয়নি। সকলেই এক বাক্যে কাগজের মণ্ডের তৈরী ঐ সকল শিল্পদ্রব্যকে শিল্পের মর্যাদা দিয়েছেন। বিভিন্ন পত্র-পত্রিকায়ও তাদের শৈল্পিক মান স্বীকৃত হয়েছিল। বিশেষ করে মণ্ডের তৈরী বিভিন্ন রূপ ও রঙের মুখোসগুলি যথেষ্ট খ্যাতি অর্জন করেছিল। সুতরাং শিল্পদ্রব্যগুলির স্বীকৃত শৈল্পিক মান-মর্যাদা বাদ দিলে পরবর্তী পর্যায়ে উপকরণের প্রসঙ্গটি স্বাভাবিকভাবেই এসে পড়ে। এবং সেই সঙ্গে এসে পড়ে তার অর্থনৈতিক বিষয়টি।

ভারতীয় শিল্পের, বিশেষ করে লোকশিল্পের কদর পৃথিবীর প্রায় সর্বত্র বর্তমান। সেইদিক থেকে বিবেচনা করে এই বিষয়টিকে যদি ব্যবসায়িক ভিত্তিতে গ্রহণ করা যায়, তাহলে আমাদের দেশীয় অর্থনীতির ক্ষেত্রে যেমন, তেমনি শিল্পীদের দিক থেকেও যথেষ্ট লাভজনক হতে পারে বলে মনে হয়।

মণ্ডশিল্পের এক হিসেব থেকে আমরা মোটামুটিভাবে দেখেছি যে, মাসে একজন শিল্পী এর থেকে গড়ে সাড়ে তিনশো চারশো টাকা উপায় করতে পারেন। তাও এককভাবে এবং ক্ষুদ্রতম ব্যবসায় হিসেবে। এই জিনিসটিকে কুটিরশিল্পের পর্যায়ে উন্নীত করে একটু বাড়াতে পারলে মাথাপিছু মাসিক আয়ের পরিমাণও বাড়তে পারে। কলকাতাবাসী জনৈক আমেরিকান মহিলা তাঁর দেশে এইরকম মণ্ড তৈরী শিল্পের (কেবল মুখোস) চালান দেন কলকাতা থেকে কিনে। তিনি নিজেই স্বীকার করেছেন যে, এখানকার এইসব মুখোস তিনি এখানে যে-দামে কেনেন, তার আট-দশ গুণ বেশী দামে সেগুলি আমেরিকায় বিক্রী হয়!

প্রসঙ্গত উল্লেখ করা যেতে পারে যে, সাধারণ মানুষের দৈনন্দিন জীবনে এসব শিল্পদ্রব্যের ব্যবহারিক মূল্য তেমন কিছু নেই। তাই কিছুটা সৌখিন ও আর্থিক দিক দিয়ে সমর্থ ব্যক্তিরাই এগুলো পছন্দ করেন এবং কেনেন। ঘর সাজাতে মিউজিয়াম তৈরী করতে কিংবা প্রিয়জনকে উপহার দিতে। সেজন্য এদের দেশীয় বাজার সীমাবদ্ধ। কিন্তু বিদেশী পর্যটকদের দৌলতে এদের বাজার তেমন সংকুচিত নয়। ঠিকমতো সরবরাহ করতে পারলে বিদেশের বাজারে এগুলি থেকে বৈদেশিক মুদ্রা উপার্জন করা যেতে পারে।

কিন্তু লক্ষণীয় বিষয় এই যে, ভারতবর্ষে দু'-একটি রাজ্য বাদ দিলে মণ্ডশিল্পের ব্যাপক ব্যবহার অত্যন্ত কম। ব্যবসায়িক দিক দিয়ে তো প্রায় নেই-ই বললেই চলে। দক্ষিণ ভারতে মণ্ডশিল্পের কিছুটা চল দেখা যায়, তাও লোকশিল্পের অনুষ্ঠানাদির জন্যে। কথাকলি পুতুল, কথাকলি মুখোস ইত্যাদি। দিল্লীর বাজারে কিছু কিছু চল দেখতে পাওয়া যায়। এছাড়া ভারতের বিভিন্ন এলাকায় এবং কলকাতার বাজারে রিলিফ ম্যাপ, শেকসন্যাল অ্যানাটমি ও শো-কেস মডেলের ক্ষেত্রে কাগজের মণ্ডের কিছু ব্যবহার দেখা যায় মাত্র। তাও অত্যন্ত সংকুচিত।

রিলিফ ম্যাপ, রিলিফ ছবি, শেকসন্যাল অ্যানটমি মডেল, শো-কেস মডেল প্রভৃতির ক্ষেত্রে কাগজের মণ্ড ব্যাপকভাবে ব্যবহার করা যেতে পারে। ভারতবর্ষের বাজারেই এগুলি ব্যাপক হারে চলতে পারে। সে সম্ভাবনা আছে প্রচুর পরিমাণে।

শিল্পের দিক থেকে ভারতে ও ভারতের বাইরে যে-সব ভারতীয় শিল্প ও লোকশিল্পের এবং বাংলার মৃৎশিল্পের ব্যাপক চাহিদা রয়েছে এবং চাহিদার সম্ভাবনা আছে, সে-সব শিল্পের ক্ষেত্রেও ব্যাপকভাবে কাগজের মণ্ড ব্যবহার করা যেতে পারে—কেবল মুখোসের মধ্যে সীমাবদ্ধ না রেখেই। শোনা যায় বিদেশের বাজারে আমাদের বাঁকুড়ার ঘোড়ার খুব চাহিদা। সেগুলিও কাগজের মণ্ড দিয়ে তৈরী করা যেতে পারে। কলকাতায় সে-চেষ্টাও অবশ্য চলছে। এছাড়াও আরও অনেক রকম জিনিস আছে। যেমন—পেনহোল্ডার, ডিমের বাক্স, দামী ওষুধের বাক্স, বিভিন্ন ধরনের পুতুল, মূর্তি। বাঁশের চোঙের ফুলদানির গায়ে রিলিফের কাজ। ড্যান্সিং ডল ইত্যাদি।

এসব দিক থেকে 'মাক্সল্যাণ্ডে'র প্রধান শিল্পী শ্রীকৃষ্ণলাল দাস অনেকদূর এগিয়ে গেছেন। নিজের বাড়িতে তিনি মণ্ডশিল্পের একটি ছোটখাট ইণ্ডাস্ট্রিও তৈরী করে ফেলেছেন একক প্রচেষ্টায়। একজন মাত্র সহকারী নিয়ে তিনি নিজেই এ-বিষয়ে গবেষণা ও কাজকর্ম চালিয়ে যাচ্ছেন। কয়েকদিন আগে আমরা তাঁর কারখানা দেখতে গিয়েছিলাম। সেখানে মণ্ডশিল্পের নানা রকমের কাজকর্মের পরীক্ষা-নিরীক্ষা তিনি চালিয়ে চলেছেন। সেইসঙ্গে ব্যবসায়িক ভিত্তিতে মুখোসও তৈরী করে চলেছেন। আর নতুন করে তৈরী করছেন বাঁকুড়ার ঘোড়া। এ'র তৈরী এইসব শিল্পদ্রব্যাদি বাজারে বেশ ভালভাবেই চলে। এবং এ'র লাভও খারাপ হয় না।

'আমি শিল্পী' এই আত্মপ্রসাদ নিয়ে অভুক্ত বেকার থাকা অপেক্ষা নামমাত্র মূলধন নিয়ে এই কাজে নামা যেতে পারে। এবং এর চাহিদা আছে বলেই উপায় কিছু হবেই।

কথাটা খুব সত্যি।

বাতিল খবরের কাগজ বা আর্টপেপার দিয়ে ঘরেই বিনা খরচে কাগজের মণ্ড তৈরী করা যেতে পারে। প্রথমে ঐসব বাতিল ছেঁড়া কাগজ জলে ভিজিয়ে রেখে বা হামানদিস্তায় গুঁড়িয়ে পচিয়ে নিতে হবে। তারপর তাকে চটকিয়ে কাদার দলার মতো করে নিয়ে খরখরে বা যে-কোন অসমান জায়গায় রেখে সেটি নিতে হবে। ঐ কাজ মণ্ডর সঙ্গে হোয়াইটিং বা মডেল ক্লে বা

চামড়া, ফুল লতা, পাতা বা তেঁতুল-বিচির আঠা মিশিয়ে নিতে হবে। সবগুলি একসঙ্গেও লাগানো যেতে পারে। তাদের কোন নির্দিষ্ট মাপ নেই। সুবিধা ও প্রয়োজন মতো লাগালেই হবে। এইভাবে শিল্পদ্রব্য তৈরীর উপযুক্ত মণ্ড তৈরী করে তা দিয়ে বিভিন্ন জিনিস তৈরী করা যায়। খরচ পড়ে না বেশী, পরিশ্রম যেটুকু হয়।

ছাঁচের সাহায্যে কিংবা অন্য কোন সহজ উপায়ে বিভিন্ন শিল্পদ্রব্য তৈরীর পর তাকে প্রয়োজনমতো পালিশ করে রঙের প্রলেপ দিয়ে জন্তু, মুখোস, পুতুল প্রভৃতির মুখোশ সম্পূর্ণ হবে। বলাই বাহুল্য এ-সব করার আগে জিনিসগুলিকে ভাল করে রোদে শুকিয়ে নেওয়া প্রয়োজন।

যাঁরা শিল্পরসিক, তাঁরা গুণ যাচাই করে জিনিসপত্র কেনেন। সুতরাং গতানুগতিক শিল্পসৃষ্টি দীর্ঘদিন চলতে পারে না। তাতে ক্রেতার কৌতূহল নষ্ট হয়ে যায়। শিল্পের মধ্যে যদি ক্রেতার কৌতূহল সৃষ্টি করার ক্ষমতা আরোপ না করা যায়, তবে সেইসব শিল্পদ্রব্যের বিক্রির পরিমাণ স্বাভাবিকভাবেই কমতে থাকবে। যাতে প্রত্যেক ক্রেতাই তাঁর কেনা জিনিসটিকে কিছু পরিমাণেও অন্যগুলির থেকে পৃথক এই তৃপ্তিবোধ করার সুযোগ পান, সেদিকে শিল্পীকে অবশ্যই নজর রাখতে হবে।

এ-বিষয়ে সরকারী উদ্যোগকে জোরদার করা দরকার এবং মণ্ডশিল্পের জন্য একটি শিক্ষাকেন্দ্র স্থাপন করলে মন্দ হয় না। সেখানে শিক্ষানবীশির ব্যবস্থা করে শিল্পী তৈরী করে নেওয়া যেতে পারে। এইভাবে মণ্ডশিল্পের কারখানা করলে বেশ কিছু লোকের জীবিকারও সাশ্রয় হতে পারে। সরকারী শিল্প-সহ বিদ্যালয়ের কারুশিল্প বিভাগে এই বিষয়টিকে অন্তর্ভুক্ত করে মণ্ড-শিল্পের মানোন্নয়ন সহজতর হবে বলে আশা করা যায়।

জানাতে পারেন?

(প্রশ্ন)

১। মুরগীর মাথায় যে ঝুঁটি থাকে, তা মুরগীর ডিম দেবার পর থেকে একপেশে কাত হয়ে যায় কেন? আবার ডিম দেওয়া বন্ধ হলে সোজা হয়ে যায়। —এর কারণ কি?

২। রোগ বা মুরগীর কোন অসুখ করলে মাথার ঝুঁটি কাল হয়ে যায় কেন?

৩। মুরগীর চুন চুন পায়খানা—কিছু না খেয়ে কেবল ঝিমাতে থাকে—এর (অসুখের) কি ঔষধ দয়া করে জানাবেন। আমাদের পক্ষে যা সম্ভব সেইরূপ ঔষধ জানাবেন, কারণ এখানে কোন পশু চিকিৎসালয় নেই।

শেষপ্রকাশ চক্রবর্তী
কল্পনা চক্রবর্তী
গেন্দ্রপাড়া চা-বাগান
পোঃ বানারহাট, জলপাইগুড়ি।

●

(ক) আজ পর্যন্ত চন্দ্রলোকে কি কি বস্তু আবিষ্কৃত হয়েছে?

(খ) মঙ্গল গ্রহে জল ও বায়ু আছে বলে কোন বিজ্ঞানী কিভাবে প্রমাণিত করেছেন?

(গ) বাংলায় কতগুলি হাতে লেখা সাময়িক পত্রিকা চলে এবং সেগুলির নাম কি কি?

(ঘ) বলাকা কাব্যের ইংরাজী অনুবাদ কে করেছেন?

সন্তোষকুমার গুপ্ত
সান্ত্বনাকুমারী গুপ্তা
ডি-টি ১৩৩৩, ধুরুয়া, রাঁচী-৪।

●

১। আমরা যে কথা শুনতে পাই তা কি বায়ুমণ্ডলের ইথারের মাধ্যমে শুনতে পাই? যদি ইথারের মাধ্যমেই শুনতে পাই তবে বেতার বার্তা আমরা খালি কানে শুনতে পাই না কেন?

২। বেতার বার্তার ইথার আর সাধারণভাবে কথা বলার ইথার একই না আলাদা? যদি একই থাকে তবে বেতারবার্তা বেতার যন্ত্রে ধরার সময় সাধারণ খালি মুখের কথাগুলো শুনা যায় না কেন?

৩। বিশ্বের সবচাইতে আকারে ছোট্ট প্রাণী কোন্‌টি?

মোঃ লুৎফর রহমান
পোঃ হলদিবাড়ী, জেলা কোচবিহার।

●

মাইক্রোওয়েভ বলতে কি বোঝায়?

চিন্ময় ও রেবা ঘোষ
প্রফেসর কলোনী
শিলং—১, আসাম।

●

১। ডিনামাইট কিভাবে প্রস্তুত হয় এবং ইলেকট্রো-প্লাটিং কি?

২। সি-প্লেন এবং আব্দাইট কে আবিষ্কার করেন?

৩। চলচ্চিত্র পরিচালনার কোন্ ভারতীয় পরিচালক সবচেয়ে বেশী আন্তর্জাতিক সম্মান লাভ করেছেন?

৪। ভারতে প্রথম টেস্ট ম্যাচ খেলা হয় কোথায়?

নৃপেন্দ্রকান্তি ঘোষ
পঞ্চানন প্রামাণিক
কার্তিকচন্দ্র রায়
পাতিহাল, হাওড়া।

●

নিম্নলিখিত সিনে ক্লাবগুলির ঠিকানা কি?

১। (ক) সিনে আকাদমি,
(খ) ক্যালকাটা ফিল্ম সারকল,
(গ) সিনে ক্লাব অব ক্যালকাটা,
(ঘ) ক্যালকাটা ফিল্ম সোসাইটি
(ঙ) নর্থ ক্যালকাটা ফিল্ম সারকল,
(চ) ইস্ট ক্যালকাটা সিনে ক্লাব।

(২) হিন্দুস্থানী সংগীতে সেতার ও সরোদের কি কি ঘরানা আছে? ঐ ঘরানাগুলির বৈশিষ্ট্য কি?

মণীন্দ্রচন্দ্র সাহা
কলকাতা—৬।

●

(১) স্যার আশুতোষ মুখোপাধ্যায় ইংরাজী কত সাল থেকে কত সাল পর্যন্ত কোলকাতা হাইকোর্টের অস্থায়ী প্রধান বিচারপতির পদ অলংকৃত করেছিলেন।

(২) ইংরাজী কোন সালের কোন্ তারিখে কলকাতার ঐতিহাসিক রেড রোডের দরজা সর্বসাধারণের চলাফেরার জন্যে উন্মুক্ত হয় এবং সেই সময় কলকাতা হাই-কোর্টের প্রধান বিচারপতি এবং বাংলার গভর্ণর জেনারেল কে কে ছিলেন।

নিত্যানন্দ মুখোপাধ্যায়
আদ্রা (পুরুলিয়া)।

●

(উত্তর)

৭ম বর্ষ ৯ম সংখ্যা 'অমৃতে' প্রকাশিত জানাতে পারেন বিভাগে 'অনুপকুমার বসু'র প্রশ্নের উত্তরে জানাই ধৃতরাষ্ট্রের পুত্রগণের নাম দুর্যোধন, যুযুৎসু, দুঃশাসন, দুঃসহ, দুঃশল, জলসন্ধ, সম, সহ, বিন্দ, অনুবিন্দ, দুর্ধর্ষ, সুবাহু, দুষ্প্রধর্ষণ, দুর্মর্ষণ, দুর্মুখ, দুষ্কর্ণ, কর্ণ, বিবিংশতি, বিকর্ণ, শল, সত্ত্ব, সুলোচন, চিত্র, উপচিত্র, চিত্রাক্ষ, চারুচিত্র, শরাসন, দুর্মদ, দুর্বিগাহ, বিবিৎসু, বিকটানন, ঊর্ণনাভ, সুনাভ, নন্দ, উপনন্দ, চিত্রবান, চিত্রবর্মা, সুবর্মা, দুর্বিলোচন, অয়োবাহু, চিত্রাঙ্গ, চিত্রকুণ্ডল, ভীমবেগ, ভীমবল, বলাকী, বলবর্ধন, উগ্রায়ুধ, ভীমকর্মা, কনকায়ু, দৃঢ়ায়ুধ, দৃঢ়বর্মা, দৃঢ়ক্ষত্র, সোমকীর্তি, অনুদর, দৃঢ়সন্ধ, জরাসন্ধ, সত্যসন্ধ, সদঃসুবাক, উগ্রশ্রবা, উগ্রসেন, সেনানী, দুষ্পরাজয়, অপরাজিত, কুণ্ডলশায়ী, বিশালাক্ষ, দুরাধর, দৃঢ়হস্ত, সুহস্ত, বাতবেগ, সুবর্চা, আদিত্যকেতু, বহ্বাশী, নাগদত্ত, অগ্রযায়ী, কবচী, নিষঙ্গী, কুণ্ডী, কুণ্ডধার, ধনুর্ধর, উগ্র, ভীমরথ, বীরবাহু, অলোলুপ, অভয়, রৌদ্রকর্মা, দৃঢ়রথ, অনাধৃষ্য, কুণ্ডভেদী, বিরাবী, দীর্ঘলোচন, প্রমথ, প্রমাথী, দীর্ঘরোম, দীর্ঘবাহু, মহাবাহু, ব্যূঢ়োরু, কনকধ্বজ, কুণ্ডাশী, বিরজা।

সকলেই কুরুক্ষেত্র যুদ্ধে মারা গিয়েছিলেন।

শেষপ্রকাশ চক্রবর্তী, কল্পনা চক্রবর্তী,
গেন্দ্রাপাড়া চা-বাগান
পোঃ বানারহাট,
জলপাইগুড়ি।

ওঁর চাকরির দৌলতে গোটা বাংলা দেশটাই প্রায় ঘোরা হয়ে গেল। এই ঘুরে বেড়ানোর আমেজে না মজে উপায় নেই। বদলির আদেশের সঙ্গে সঙ্গে মনটা খিঁচিয়ে উঠলেও নতুন পরিবেশের সঙ্গে পরিচিত হওয়ার আনন্দে মনটা উঁচিয়ে থাকে। পরিচিত মুখগুলির বেদনা অপরিচিতের আকাঙ্ক্ষায় এইভাবে বেশ লাঘব হয়ে যায়। এবারও যথারীতি বদলির আদেশ হলো—সঙ্গে সঙ্গে নতুন বন্দরে পাড়ি জমানোর জন্য তোড়জোড় শুরু করে দিলাম। এবার আমাদের আমন্ত্রণ এসেছে উত্তরবঙ্গের একটি মহকুমা শহর থেকে।

উত্তরবঙ্গ সম্বন্ধে বরাবরই আমার বেশ কৌতূহল ছিল। তাই সুযোগের সদ্ব্যবহারের জন্য মনটা ডগমগিয়ে উঠলো। অপরিচয়ের বন্ধনে আমি কোনদিনই ভীত ছিলাম না। সহজে অন্তরঙ্গ হওয়ার ব্যাপারে বন্ধুমহলে আমার সুনাম ছিল। হাসি ও আড্ডা দেওয়ার গুণে সবাই দুদিনে আমার আপন হয়ে যেত। এবারও এই মূলধন সম্বল করে এসে হাজির হলাম এই মফস্বল শহরটিতে। প্রথম দর্শনেই এই ক্ষুদে শহরটাকে ভালবেসে ফেললাম। দস্তুরমত প্রেমে পড়ে গেলাম আর কি। শহরের পরিধি সংকীর্ণ। তারপরই শুরু হয়েছে প্রকৃতির নিজস্ব তুলির টান। আঁধার করা বন আবার বন পেরিয়ে ধান ও পাটক্ষেতের শ্যাম-সমারোহ। বনে বনে কত বিচিত্র পাখির কলতান। মুগ্ধ বিস্ময়ে প্রকৃতির প্রাণপ্রাচুর্য উপভোগ করি আর মন আনন্দে ভরে ওঠে।

জায়গাটিকে প্রাণভরে ভালবেসেছি, কিন্তু স্থানীয় লোকজন কারো সঙ্গে পরিচয় তখনও জমেনি। প্রকৃতির শোভা দেখেই দিনগুলি বেশ কাটছিল। তবুও অপরিচিতজনের প্রত্যাশা সারা মন জুড়েই ছিল। সেদিন স্থানীয় বিদ্যালয়ের হেডমিস্ট্রেস এলেন। অবশ্যই প্রয়োজনে এবং প্রয়োজনটা আমার সঙ্গেও নয়। কিন্তু আলাপ জমতে দেরী হলো না। কথায় কথা বাড়লো। নানা কথায় বিকেল গড়িয়ে কখন যে সন্ধ্যে হয়ে এসেছে খেয়ালই ছিল না। হেডমিস্ট্রেস সেদিনের মত বিদায় নিলেন। তিনি চলে যেতেই উনি ফোড়ন কাটলেন, 'অচেনা কাউকে এত সহজে মজাতে তোমার জুড়ি মেলা ভার।' আমি যোগ দিলাম, 'তুমিও তো একদিন অচেনা ছিলে।' আমাদের পারস্পরিক হাসি-ঠাট্টায় সেদিনের সন্ধ্যেটা মধুর হয়ে উঠলো।

হেডমিস্ট্রেসের দৌলতে পরিচয়ের গন্ডি ক্রমেই বাড়তে থাকে। শিক্ষিকা ছাড়াও সমাজসেবী হিসেবে হেডমিস্ট্রেস স্থানীয় মহলে বেশ প্রভাবশালী। তাঁর সঙ্গে ঘোরাফেরার ফলে দুদিনেই আমি সকলের আপন হয়ে গেলাম। দেখতে দেখতে আমাদের একটি ছোটখাটো আড্ডা জমে ওঠে। ঘুরে ফিরে বিভিন্ন বাড়ীতে আসর বসতো। সন্ধ্যেটা সবাই আমরা আড্ডার মশগুল হয়ে থাকতাম। সেদিন কথায় কথায় প্রেম নিয়ে কথা উঠলো। প্রসঙ্গটা উঠতেই সবাই একটু সতর্ক হয়ে গেল, বোধহয় নিজেদের বয়সের কথা ভেবে। পাছে বেফাঁস কিছু বেরিয়ে পড়ে। দু-একজন কিন্তু আগ্রহসহকারে আলোচনায় মেতে উঠলো। দুএকটি ব্যক্তিগত তথ্যও পরিবেশিত হলো প্রসঙ্গটাকে মুখরোচক করার জন্য। এমন সময় আলোচনায় এসে যোগ দিলেন জজ-গিন্নী। আলোচনায় জের টেনে তিনি বললেন, প্রেমের বিচিত্র গতি দেবাঃ ন জানন্তি। এ সম্বন্ধে অনেক কথা বলা যায় কিন্তু বোঝানো যায় না। এ যার ব্যথা সেই বোঝে। বলে তিনি একটি দীর্ঘশ্বাস ছাড়লেন। তারপর আবার বলতে শুরু করেন, লম্বা দোহারা গড়নের শ্যামলা মেয়ে শীলা জয়সওয়াল আমার উদ্গত যৌবনের একটি বিশেষ স্মৃতি। তখন আমি স্কুলে পড়ি। বয়স ষোল কি সতের। শীলা ছিল আমার সহপাঠী। ওর চরিত্র ছিল ঠিক আমার বিপরীত। তবু বন্ধুত্বে আটকায়নি। ভাইবোনের ভেতর শীলা ছিল সবচেয়ে ছোট, তাই বেশ আদুরে। এই আদরটুকু ও বন্ধুবান্ধবের কাছ থেকেও প্রত্যাশা করতো। সে ক্ষমতাও ওর ছিল।

শীলার বাবা ছিলেন জেলা জজ। অত্যন্ত রাশভারী লোক। তাঁর চড়া মেজাজের দাপটে শীলার মাও থরহরি কম্প। সেজন্য আমাদের বন্ধুত্ব ব্যাহত হবার কথা নয়। আমাদের স্কুলের জীবন পড়াশুনোর ফাঁকে ফাঁকে হাসি-আনন্দে বেশ কেটে যাচ্ছিল। আমরা তখন ম্যাট্রিক ক্লাশের ছাত্রী। মনে মনে খুব গর্ব আর কদিন পরেই তো ম্যাট্রিক পাশ করবো। তখন ম্যাট্রিক পাশের বেশ কদর ছিল। দেখতে দেখতে টেস্ট এসে গেল। পড়াশুনার খুব চাপ। তারই মাঝে শীলার অন্যমনস্কতা আমার নজর এড়ায়নি।

ও যেন হঠাৎ চুপচাপ হয়ে গেছে, ওর ভাসা ভাসা চোখে যেন যুগান্তের বেদনা বাসা বেঁধেছে। কোন কথারই স্পষ্ট জবাব দেয় না। ভাবলাম পরীক্ষা হয়ে যাক তারপর দেখা যাবে।

টেস্ট শুরু হলো। প্রথম দিন শীলা আমার পাশে বসেই পরীক্ষা দিল। পরীক্ষার মধ্যেও ওর উদাস ভাবটা কারো নজর এড়ালো না। দ্বিতীয় দিনেও একই ঘটনা। তৃতীয় দিন থেকে শীলা আর পরীক্ষা দিতে এলো না। মনটা খটমটিয়ে উঠলো। মনের কোণে একটা চিন্তা ইতিমধ্যে দানা বেঁধে উঠেছে। বাড়ী ফিরলাম। এবং যে সংবাদটার জন্য মোটেই প্রস্তুত ছিলাম না তাই শুনতে হলো, শীলা মারা গেছে। মনটা মুষড়ে পড়লো। ভেবে পেলাম না শীলার আকস্মিক মৃত্যুর কারণ। শীলার জন্য মনটা অস্থির হয়ে উঠলো। কিন্তু মায়ের কড়াকড়িতে পরীক্ষা শেষ হবার আগে ওদের বাড়ী যাওয়া হয়ে উঠলো না।

ভারাক্রান্ত মন নিয়ে কোনরকমে পরীক্ষা শেষ করলাম। তারপরই ছুটলাম শীলার বাড়ী। শীলার মা হাত বাড়িয়ে আমায় কাছে টেনে নিলেন। মাথায় হাত দিয়ে সে কি ফুলে ফুলে কান্না—চোখের জল তখন আমারও বাঁধ মানছিল না। কিন্তু ওর এই আকস্মিক মৃত্যুর কারণ জানার জন্য আমি নিতান্ত ব্যাকুল। ইতিমধ্যে শীলার দিদি আমাকে ডেকে নিয়ে গেল। দিদি আমাকে শোনালেন এক করুণ প্রেমের উপাখ্যান।

শীলা ভালবাসতো একটি ছেলেকে। সর্বদিক থেকেই ছেলেটি নিতান্ত সাধারণ কিন্তু ভারী ভদ্র এবং শিক্ষিত। সুন্দরকান্তি। ছেলেটি শীলার বাবারই অধীনস্থ সামান্য কর্মচারী। ভালবাসা তো আর ব্যাকরণ মেনে চলে না। তাই এই সাধারণ ছেলেটিকেই শীলা তার প্রথম যৌবনের ভালবাসা উজাড় করে ঢেলে দিল। ব্যাপারটা কিন্তু বেশিদিন চাপা রইলো না। শিগগিরই জানাজানি হয়ে গেল। রাশভারী জজসাহেব এসব শুনে আরও গম্ভীর হয়ে গেলেন। অর্ধেক রাজত্ব আর রাজপুত্রে যার পথ চেয়ে বসে আছে সেখানে এই ছেলেটিকে তিনি কিছুতেই বরদাস্ত করতে পারলেন না। তাঁর সমস্ত রাগ গিয়ে পড়লো ছেলেটির ওপর। তিনি নিজে অন্যত্র বদলীর ব্যবস্থা করলেন। তারপর ছেলেটিকে শায়েস্তা করার জন্য ধরেবেঁধে একটি মেয়ের সঙ্গে বিয়ে দিয়ে দিলেন। ছেলেটি সবই মুখ বুজে সহ্য করল। আর শীলার মুখ বুজে মার খাওয়া ছাড়া কোন উপায় ছিল না। দুজনেই নীরবে চোখের জল ফেললো।

কিছুদিন কেটে গেল। হঠাৎ একদিন শীলা একটা চিঠি পেল। চিঠিটা লিখেছে সেই ছেলেটি। চিঠিতে সে জানাল, এভাবে বেঁচে থাকা অর্থহীন। নামমাত্র বিবাহিতা স্ত্রীকে আজীবনের সঙ্গী হিসেবে গ্রহণ করা আমার পক্ষে সম্ভব নয়। আর এবন্ধনে যেন তাকে বেঁধে না রাখা হয়। প্রতি মুহূর্তে এভাবে বেঁচে থাকা আত্মহত্যারই সামিল। বাধ্য হয়ে এপথই বেছে নিলাম। চিঠি পেয়ে শীলা একদম ভেঙে পড়লো। তার পথও পরিষ্কার। শীতের গভীর রাত্রে গায়ে কেরোসিন ঢেলে জ্বলতে জ্বলতে সব জ্বালার অবসান করলো। শুনলাম সর্বাঙ্গ পুড়ে গেলেও শীলার মুখখানা অক্ষত ছিল এবং তাতে মাখান ছিল গভীর প্রশান্তি।

এক অকথিত বেদনায় সারা মন তখন ভরে উঠেছে। শীলার অচরিতার্থ প্রেমের কথা ভাবতে ভাবতে যখন বেরিয়ে আসছিলাম নজর পড়লো ওর বাবার ঘরের দিকে। দোর্দণ্ডপ্রতাপ জজসাহেবের এই চেহারার কথা আমি কল্পনাও করিনি। মনে হলো প্রচন্ড ঝড়ে নাড়া খেয়ে একটা মহীরুহ সমূলে উপড়ে পড়েছে—সন্তানের মঙ্গল করতে গিয়ে তিনি একি করলেন?

শীলার বাবাকে দেখার পর আমার যেন সব ভুল হয়ে যাচ্ছিল। কেমন আচ্ছন্নের মত হয়ে পথ হেঁটে বাড়ী এসেছিলাম। সেই বয়সেও মনে হয়েছিল প্রেমের ক্ষেত্রে মানুষ কত অসহায়। সেকথা মনে হলে মনটা আজও বেদনায় গুমরে ওঠে।

গল্প শেষ হলো। একটু রাত হয়েছিল। সবাই যে যার বাড়ী চলে গেল। আমার সারা মন জুড়ে তখন শীলা জরসওয়াল পদচারণা শুরু করেছে। প্রেমের অবোধ্য গতিতে আমি তখন হাবুডুবু খাচ্ছি।
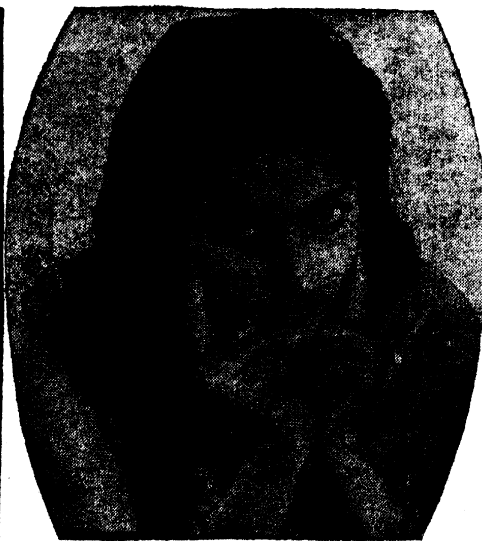
উপেন্দ্রকিশোর রায়চৌধুরী

খুব অন্ধকার রাত্রিতে সমুদ্রের জলে এক প্রকার আলোক দেখা যায়। অবশ্য উহা হইতে প্রদীপের আলোর ন্যায় আলো বাহির হয় না, খালি জলে এক রকম ঝিকিমিকি মাত্র দেখা যায়। ঢেউ ভাঙ্গিবার সময় মনে হয়, যেন অসংখ্য জোনাকী জলের উপর ছড়াইয়া পড়িতেছে। আমি দেখিতে পাই নাই, কিন্তু যাঁহারা দেখিয়াছেন তাঁহারা বলেন, যে তাহা ভারি সুন্দর। সমুদ্রের জলে নাকি এক রকম জীবাণু আছে। তাহা নাড়া পাইলে উজ্জ্বল হইয়া ওঠে। এই জীবাণু ঐরূপ আলোকের কারণ।

জীবাণুর কথায় জীব-জন্তুর কথা সহজেই মনে হইতে পারে। সমুদ্রের জীবের নাম শুনিয়াই হয়ত তোমরা ব্যস্ত হইয়া উঠিয়াছ, মনটাকে হয়ত কত বড় বড় জিনিসের জন্য প্রস্তুত করিয়া লইতেছ। সমুদ্রে বড় বড় জন্তু যে অনেক আছে, তাহাতে আর ভুল কি? দুটা-একটা তিমি যে বংগসাগরে না দেখা যায়, এমন নহে, তাহার প্রমাণ ত যাদুঘরে গেলেই দেখা যায়। কিন্তু আমি এখানে পুঁথি খুলিয়া গল্প ফাঁদিতে বসি নাই, যাহা দেখিয়াছি তাহাই বলিতে যাইতেছি, সুতরাং "সমুদ্রের সাপ" তিমি প্রভৃতির কথা বলার অবসর আমার হইবে না। আমি যে সমুদ্রের সাপ দেখিয়াছি, তাহা সাড়ে তিন হাতের অধিক লম্বা হইবে না। দেখিতে কতকটা ঢোঁড়া সাপের মত, গায় ডুমো ডুমো দাগ আছে, ল্যাজটা চ্যাটাল। এইরূপ একটা সাপ সমুদ্রের ধারে মরিয়া পড়িয়াছিল। সমুদ্রের সাপগুলির ল্যাজ প্রায়ই চ্যাটাল হয়, তাহাতে সাঁতরাইবার খুব সুবিধা। যাহা হউক আমি মাছের কথাই এখন বলিব। তবে মাছ শব্দটা এখানে একটু খোলা ভাবেই ব্যবহার হইতেছে। এরূপ অনেক জানোয়ার আছে যে, তাহাদের চৌদ্দপুরুষের কেহ মাছের ধার ধারে নাই, অথচ তাহারা 'মাছ'। যেমন 'জেলী' মাছ, 'চিংড়ী' মাছ, 'কট্‌ল' মাছ ইত্যাদি। ইহাদের কেহ শামুক, কেহ পোকা, আর কেহ যে কি, তাহা এক কথায় বলা ভারী মুস্কিল। যাহা হউক লোকে উহাদিগকে মাছই বলে, সুতরাং আমিও তাহাই সুবিধাজনক মনে করিতেছি।

ইহাদের মধ্যে সকলের আগে 'জেলী' মাছের আর 'তারা' মাছের কথা বলিতে হয়। জন্তুর মধ্যে ইহারা সকলের চাইতে নিম্ন-শ্রেণীর। সাধারণ লোকে ইহাদিগকে দেখিয়া কখনই বলিবে না, যে ইহারা কোনরূপ জন্তু। বরং ইহাদের চেহারা দেখিলে হঠাৎ গাছপালার কথাই মনে হইতে পারে। যাহা হউক, ইহারা জন্তু। ইহাদের আবার নানা রকম শ্রেণীভেদ আছে, যদিও আমি এক রকম ছাড়া আর কোন তারা মাছ সেখানে দেখিতে পাই নাই। এই মাছের চেহারা পাঁচ কোণা তারার মতন। তাহার নাক মুখের কোন পরিচয় পাওয়া যায় না। ইহাদের স্বভাব-চরিত্র অতিশয় আশ্চর্য। দুঃখের বিষয়, আমি তাহার কিছুই প্রত্যক্ষ করিতে পারি নাই, পুস্তকে পড়িয়াছি মাত্র। ইহারা ছোট ছোট শামুক ঝিনুক খাইয়া জীবন ধারণ করে। পুরীতে যে তারা মাছ দেখিয়াছিলাম, তাহার ভিতরে খুব ছোট ছোট ঝিনুকের খোলা পাইয়াছি। কিন্তু এতদ্ভিন্ন উহাদের আচার ব্যবহারের আর কোন পরিচয় পাই নাই। এগুলি দেখিতে একটুও সুন্দর নয়। একদিকের রং কাল, আর একদিকের রং ফ্যাকাশে। মনে হয় যেন পুরান জুতার পচা চামড়া আর হাড়ের কুচি দিয়া তাহাকে গড়িয়াছে। কিন্তু আমি পুস্তকে পড়িয়াছি যে অতিশয় সুন্দর তারা মাছ আছে। আর তাহাদের কোন কোনটার এই একটা আশ্চর্য স্বভাব আছে, যে তাহারা ভয় পাইলে আত্ম-হত্যা করে। সমুদ্রের ভিতরে অনেক নাড়া-চাড়া সহ্য করে, কিন্তু জল হইতে তুলিলেই সে দেখিতে দেখিতে তাহার হাত পা ফেলিয়া দেয়। তারা মাছের মাঝখানটায় তাহার মুখ থাকে; চারিধারের পাপড়ি অথবা ডালপালার মতন জিনিসগুলি তাহার পা। কোন কোনটা সাঁতরাইতে পারে, শিকার আঁকড়িয়া ধরিতেও পারে। কিন্তু কোন কোনটার হাত পা নাড়িবার বেশী ক্ষমতা আছে বলিয়া বোধ হয় না। আবার চলাফেরা করিতেই পারে না, একটা বোঁটা দ্বারা কোন জিনিসের গায় আটকান থাকে, এরূপ তারা মাছও আছে।

জেলী মাছ সেখানে অনেক রকম আছে। আকারে আধুলি হইতে ঝুড়ির মতন পর্যন্ত জেলী মাছ দেখিয়াছি। ইহাদিগকে দেখিলে তাল শাঁস অথবা থকথকে সাগুর কথা মনে হয়। সকল গুলিরই সাধারণ আকৃতি ছাতা অথবা টুপীর মতন, কোন কোনটা উড়ে বেহারাদের পানের থলের মতন। আবার সকলেরই কোন রকমের ঝালর আছে। রং সাদা অথবা লালচে, তাহাতে অনেক সময় সবুজ কারিকুরি থাকে। ইহারা জলে সাঁতরাইয়া বেড়ায়, আর ভয় পাইলে শরীর কোঁচকাইয়া হাত পা গুটাইয়া (ঐ ঝালর উহাদের হাত পা, মাঝখানে মুখ) সমুদ্রের তলায় পড়িয়া যায়। কোন কোনটা রাত্রিতে জ্বলে। অনেকগুলি আবার এমন আছে, যে তাহা গায় লাগিলে ভয়ানক যন্ত্রণা হয়। এই যন্ত্রণা কতকটা বিছুটির জ্বালার মতন, কিন্তু তার চাইতে অনেক বেশী, আর ইহাতে বুকের ভিতরে কেমন একটা কষ্ট বোধ হয়। জালে পড়িয়া বিস্তর জেলী মাছ উঠে, জেলেরা জেলী মাছকে বলে 'সংরাং'। ইহাদের ইংরেজী নাম 'জেলী ফিস' আর 'সাগর বিছুটি'। ইহাদের কোন্‌টা নির্দোষ আর কোন্‌টা বিষাক্ত, জেলেরা তাহা বেশ বুঝিতে পারে। সাধারণতঃ তাহারা এগুলিকে দু হাতে

পুরনো পাতা

ঘাঁটে, রাঁধিয়া নাকি খায়ও। কিন্তু একদিন একটা খুব উজ্জ্বল স্বচ্ছ আর সবুজ কারি-কুরীওয়ালা জেলী মাছ দেখিয়া যেই তাহার কাছে গিয়াছি, অমনি একজন জেলে আমাকে নিষেধ করিয়া বলিল, 'বাবু বিন্ধিব।' অবশ্য আমি আর তাহার কাছে যাই নাই। আর আমি নিশ্চয় বলিতে পারি, যে উহার চেহারা আমি কখনও ভুলিব না। অতঃপর আবার তাহাকে দেখিতে পাইলে আমিও বলিতে পারিব—'বিন্ধিব'! এর পর 'কট্‌ল' মাছের কথা বলি, তবেই শেষ হয়: এ মাছ যে মাছ নয়, তাহা ত বলিয়াই রাখিয়াছি। ইহারা শামুক জাতীয় জন্তু, কিন্তু শামুকের মতন ইহাদের খোলা নাই, যদিও একটা নরম গোছের হাড় আছে। এই হাড় সমুদ্রের ধারে অনেক দেখিতে পাওয়া যায়। সাদা সাদা শশা বীচির মতন আকৃতি, কিন্তু শশা বীচির চাইতে ঢের বড়। এক ইঞ্চি হইতে আট ইঞ্চি পর্যন্ত লম্বা হাড় সচরাচর দেখা যায়। অন্যান্য জন্তুর হাড়ের মতন ইহা তত মজবুত নহে। কতকটা খড়ির মতন, সহজেই গুঁড়া হইয়া যায়। সাধারণ লোকে যত্নপূর্বক এই হাড় কুড়াইয়া আনে, বাজারে বিক্রয়ও করে। এই হাড়ে নাকি অনেক ভাল ভাল ঔষধ প্রস্তুত হয়। ইহার চলিত নাম 'সমুদ্রের ফেণা'। অনেকের বিশ্বাস, সমুদ্রের ফেণা জমিয়া এই জিনিস জন্মায়। আসলে অবশ্য তাহা নহে, ইহা কট্‌ল ফিসের হাড়। ইংরেজীতে এ জিনিসকে 'কট্‌ল বোন' বলে।

জাত বিশেষে কট্‌ল ফিস এক একটা খুব বড় বড় হয়। কিন্তু আমি নিতান্ত ছোট ছোটই দেখিয়াছি। উহাদের অবশ্য কোন রকম দেশী নাম আছে, দুঃখের বিষয় আমি তাহা জানি না। একটি জেলের ছেলে চার পাঁচটা কট্‌ল ফিস হাতে করিয়া সমুদ্রের ধারে দাঁড়াইয়া ছিল, তাহা দেখিয়া আমি উহার সহিত কথাবার্তা আরম্ভ করিলাম। আমি জিজ্ঞাসা করিলাম, 'ওগুলো কি?' উদ্দেশ্য, নামটা শিখিয়া নেই। ছেলেটি বড় ভিতু, কেমন জড়সড় হইয়া উত্তর দিল, তাহাতে নাম যদি বলিয়াও থাকে, আমি তাহা কিছুই বুঝিতে পারি নাই। আমি খালি এই কথাটা একটু বুঝিলাম, যে সে তাহা দিয়া 'তরকারী পাকাইবে।' সবে আমার এইটুকু জ্ঞান লাভ হইয়াছে, আরো ঢের হইবে বলিয়া আশা করিতেছি, এমন সময় কোথা হইতে এক সাহেব আসিয়া আমার সব গোলমাল করিয়া দিল। সে বলে, ওটা নিতান্ত নিম্নশ্রেণীর মাছ। আমি বলিলাম 'ওটা মাছ নয়, শামুক জাতীয় জন্তু।' সাহেব আমার সে কথায় আমলই দিল না। ততক্ষণে সেই ছোকরা

কোথায় যে সরিয়া পড়িল, আর তাহাকে দেখিতে পাইলাম না।

সেই কট্‌ল মাছগুলিকে দেখিয়া আমার ছোট ছোট শুকনো কচু গাছের কথা মনে হইয়াছিল। শরীরগুলি যেন মুখী কচু (রং কিন্তু ঘোর খয়েরী) আর হাত-পাগুলি যেন তাহার শুকনো ডালপালা। এক একটার এইরূপ আটটি কি দশটি করিয়া হাত (অথবা পা, যাই বল) থাকে। আমি যাহা দেখিয়াছি, তাহার কটা হাত ছিল, গুনিবার অবসর পাই নাই, কিন্তু উহার আকৃতি যেরূপ দেখিলাম তাহাতে বোধ হইল, যেন উহার দশ হাত, আর দুটি হাত যেন অন্যগুলির চাইতে বেশী লম্বা বলিয়া বোধ হইয়াছিল, ইহাও দশ হাতওয়ালা কট্‌ল ফিসের একটা লক্ষণ। কটল ফিসের বড় বড় উজ্জ্বল দুটো চোখ, আর টিয়া পাখীর মতন ঠোঁটও আছে। ঠোঁটটি কিন্তু হাত-পায়ের জঙ্গলের ভিতরে লুকান থাকে বলিয়া দেখিতে পাওয়া যায় না।

এ জন্তুগুলি যেন সমুদ্রের সং। অনেক দেশে ইহাদিগকে 'শয়তান মাছ' বলে। বাস্তবিক এমন বিকট বিদ্‌ঘুটে চেহারা আর কোন জন্তুর আছে কিনা সন্দেহ। চালচলন আবার চেহারার চাইতেও অদ্ভুত। আট-দশটা পা থাকিলে তাহার চলাফেরা সম্বন্ধে অন্ততঃ আমাদের সাদাসিধা হিসাবে আর কোন ভাবনার কথা থাকে না। কিন্তু ইহারা এতগুলি পা লইয়াও সন্তুষ্ট নহে, উহাদের আরো এক রকম চলিবার কায়দা চাই। পাগুলি দিয়া পায়ের কাজ আর হাতের কাজ দুই-ই চলে, অর্থাৎ চলাফেরাও হয় আবার শিকারকে জড়াইয়া ধরিতে যায়। সাধারণ চলাফেরার সময় এই পাগুলিই ব্যবহার হয়। কিন্তু পলায়নের সময় তেমন পুরাতন পাড়াগেঁয়ে দস্তুর উহারা পছন্দ করে না, তখনকার জন্য একটা নূতন কায়দার নিতান্তই দরকার। সুতরাং চম্পট দিবার কাজটি দমকলে না হইলে উহাদের মন উঠে না। দমকলের বন্দোবস্ত বিধাতা উহাদের শরীরের মধ্যেই করিয়া দিয়াছেন, তাহা দ্বারা উহারা ইচ্ছা করিলেই পিচকারীর মতন বেগে জল ফুঁকিয়া (অবশ্য মুখে ফুঁকিয়া নয়, সেই কলে ফুঁকিয়া) বাহির করিতে পারে। সে জলের এমনি ধাক্কা যে, সেই ধাক্কায় তীরের মতন বেগে পিছু হটিয়া উহারা তিলার্ধে অর্ধ-ক্রোশ দূরে গিয়া উপস্থিত হয়।

ইহাদের প্রত্যেকের আবার এক থলে করিয়া কালী থাকে। যেমন বেথাপ্পা গোছের কোন শত্রু দেখিলে ফস করিয়া তাহার সামনে এক রাশ কালী বাহির করিয়া দেয়। কালীতে জল ঘোলা হইয়া গেলে শত্রুর ধাঁধা লাগিয়া যায়। ততক্ষণ যে শয়তান দমকল ফুঁকিয়া কোথায় গিয়া গা ঢাকা দেয় তাহা টেরই পাওয়া যায় না। ইহার উপরে আবার ইহাদের চলাফেরার অভ্যাস রাত্রিতেই বেশী। সুতরাং ইহাদিগকে সং বা ভূত-পেত্নী বলিলে এমন অন্যায় আর কি হয়।

আমি পুরীতে যেমন ছোট ছোট কট্‌ল ফিস দেখিয়াছি, তাহাতে আমার হাসিই পাইয়াছিল। কিন্তু এই জাতীয় জন্তু বড় হইলে নিতান্তই ভয়ানক হয়। এক রকম আটপেয়ে কট্‌ল ফিস (Octopus) আছে, তাহার এক একটা হাত-পা ছড়াইলে আট-দশ ফুট জায়গা জুড়িয়া বসে। এক একটা পাই তার দশ-বারো ফুট লম্বা, এমন অক্টোপাসও আছে। হাতীর শুঁড়ের মত আকৃতি এক একটা পা, তাহার ভিতর দিক দিয়া ছোট ছোট বাটির মতন এক প্রকার জিনিস সার সার সাজান থাকে। এই সকল বাটির মতন জিনিসের প্রত্যেকটি একটি জোঁকের মুখের মতন কাজ করে। অর্থাৎ, যাহাতে লাগে, তাহাকেই উহারা এমন ভয়ানক চুষিয়া ধরে যে, তাহার প্রাণ পর্যন্ত চুষিয়া বাহির করিবার গতিক হয়। যাহাকে একবার ধরে, তাহার কি আর রক্ষা আছে! আট হাতে জড়াইয়া ধরিয়া একটিবার ঐ ভয়ানক টিয়া পাখীর ঠোঁটের মধ্যে লইয়া ফেলিতে পারিলেই বেচারার জীবন শেষ হয়। এই-রূপে অকটোপাসের হাতে পড়িয়া মানুষের প্রাণ হারাইবার কথা শুনিতে পাওয়া যায়। ছোটখাট নৌকা কট্‌ল ফিসের টানে উল্টিয়া গিয়াছে, এরূপ ঘটনাও ঘটিয়া থাকে।

ঐ 'চোষনী'গুলির সাহায্যে উহারা এমন সব অসম্ভব কাজ করিতে পারে, যে লোকে তাহা দেখিয়া আশ্চর্য হয়। নিতান্ত ছোট ফাটলের ভিতর ঢুকিয়া থাকা, নিতান্ত অসম্ভব স্থানে বাহিয়া উঠা, এ সকল এবং মানুষবাজীকরের অসাধ্য অন্যান্য রকমের অনেক কাজ ইহারা নিতান্ত সহজভাবে প্রত্যহই করিয়া থাকে।

ইহারা আঙ্গুরের মতন থোকা থোকা ডিম পাড়ে। শামুকেরাও ঐরূপ করে, তবে শামুকের ডিম অবশ্য খুব ছোট ছোট। ডিমগুলিকে কোন নিরাপদ জায়গায় আটকাইয়া রাখিয়া কট্‌ল মাছ অতি যত্নে পাহারা দেয়। ইহাদের শরীরের রং সকল সময় এক প্রকার থাকে না, প্রয়োজন মত বদলায়। যে স্থানের যেমন রং, উহাদের শরীরের রংও উহারা অনেকটা সেইরূপ করিতে পারে।

কাঁকড়া

কাঁকড়ার মত এমন সরেস জন্তু আর যে খুব বেশী আছে, একথা আমি বিশ্বাস করিতে প্রস্তুত নহি। সমুদ্রের ধারের বালিতে প্রথমে তাহাদের পায়ের দাগ দেখিতে পাই! একটা ছোট গোলার গায় লম্বা লম্বা কাঁটা বিঁধাইয়া সেই কাটাসুদ্ধ গোলাটাকে গড়াইয়া দিলে যেমন দাগ পড়িতে পারে, সেইরূপ দাগ। একটা দুটো নয়, অসংখ্য। যে দিকে চাও, খালি ঐরূপ দাগ। আমি ত অবাক হইয়া গেলাম। এরূপ অদ্ভুত চিহ্ন কিসের হইতে পারে, তাহা আমার মাথায়ই আসিল না। খানিক অগ্রসর হইয়া দেখিলাম, যে এইরূপ এক সার দাগ একটা গর্তের কাছে গিয়া উপস্থিত হইয়াছে, আর গর্তের মালিকও দরজায় বসিয়া আছে। কিন্তু আমাকে দেখিয়া সে বেচারা এত তাড়াতাড়ি গর্তের ভিতর ঢুকিয়া গেল, যে আমি ভাল করিয়া তাহার পরিচয়ই লইতে পারিলাম না।

আমি প্রথমে মনে করিয়াছিলাম, বুঝি মাকড়সা। আকারে একটি মাঝারী মাকড়সার চাইতে বেশী বড় হইবে না, আর রংটাও কতকটা সেই রকমের। সে যে কাঁকড়া, তাহা আমার আদপেই মনে হয় নাই, কারণ কাঁকড়া এমন ছুটিতে পারে, তাহা আমি জানিতাম না। যাহা হউক আমার ভ্রম দূর হইতে বেশী সময় লাগিল না। কারণ উহার আশেপাশে ঐরূপ আরো অনেক গর্ত ছিল, আর অনেক গর্তের দরজায় এক একটি ছোট্ট কাঁকড়াও বসিয়াছিল। উহারা যে কিরূপ বিস্ময় এবং কৌতূহলের সহিত আমাকে দেখিতেছিল, তাহা না দেখিলে বুঝিতে পারিবে না। কাঁকড়ার মুখশ্রীতে বিস্ময় কৌতূহল প্রভৃতি ভাব প্রকাশ পাওয়া সম্ভব নহে, একথা তোমরা বলিবার পূর্বেই আমি স্বীকার করিতেছি। তথাপি ঐ সময়ে উহাদের নিতান্তই কৌতূহল হইয়াছিল একথা আমি নিশ্চয়ই বলিতে পারি। উহাদের অনেকেই আমাকে দেখিবার জন্য গর্ত ছাড়িয়া খানিক অগ্রসর হইয়া আসিয়াছিল, আর আমি একটু নড়িলে-চড়িলে উহারাও তাহার সঙ্গে সঙ্গে ফিরিয়া দাঁড়াইতেছিল।

কাঁকড়ার চেহারা দেখিলে আমার ভারি হাসি পায়। প্রথমতঃ উহার চক্ষু দুটি এক একটি চোখ এক একটি বোঁটার আগায় বসান। ঐরূপ দুই চক্ষু দিয়া যখন সে তোমার দিকে তাকাইবে তখন তোমার মনে হইবে যেন তোমাকে ভাল করিয়া দেখিবার জন্য সে দূরবীন লাগাইয়াছে। ভয়, বিস্ময় বা কৌতূহল হইলে চোখ কেমন বড় হইয়া উঠে দেখিয়াছ? হঠাৎ মনে হয় যেন চোখ দুটি একটু বাহির হইয়া আসিয়াছে। বোধ হয়, এই জন্যই কাঁকড়ার চেহারায় একটা

কৌতূহলের ভাব দেখিতে পাওয়া যায়। তাহার পর উহার দুটি দাঁড়া হাত, অর্থাৎ দাঁড়া। আমি যে কাঁকড়াগুলির কথা বলিতেছি, তাহাদের একটি দাঁড়া আর একটির চাইতে ঢের বড়। কাহারও ডাইনের বড়, কাহারও বাঁয়েরটি বড়। বেশী ভারি কাজ হইলে বড় দাঁড়াটি ব্যবহার করে। ছোটটি হাল্কা কাজের জন্য। কাঁকড়ার মুখ তাহার বুকের কাছে, দাঁড়া দিয়া তাহাতে খাবার তুলিয়া দেয়। আমরা যেমন করিয়া হাঁ করি, কাঁকড়া তাহা করে না, তাহার ঠোঁট আলমারীর দরজার মতন পাশা-পাশি খোলে।

বালির উপরে কত কাঁকড়ার গর্ত যে রহিয়াছে, তাহার সংখ্যা নাই। কাছে গেলেই উহারা ভয় পাইয়া গর্তের ভিতরে চলিয়া যায়। কিন্তু তুমি যদি কোনরূপ গোলমাল না করিয়া চুপচাপ বসিয়া থাক, তাহা হইলে খানিক পরেই উহারা আবার বাহিরে আসিবে। গর্তটাকে পরিষ্কার রাখা উহাদের এক প্রধান কাজ। সকলের গর্তের সামনেই খানিকটা নূতন মাটি দেখিতে পাইবে। হয়ত তোমার চোখের সামনেই আবার খানিকটা মাটি আনিয়া উহার উপরে ফেলিবে। দু হাতে সাপটিয়া ধরিয়া গর্তের ভিতর হইতে মাটি লইয়া আসে। দরজার বাহিরে আসিয়াই তাহা ছুঁড়িয়া দূরে ফেলিয়া দেয়। কাঁকড়ার পক্ষে অনেকখানি দূরেই ফেলে বলিতে হইবে। মাকড়সার মতন বড় কাঁকড়াটি মটরের মতন বড় এক রাশ মাটি প্রায় ছয় ইঞ্চি দূরে ফেলিতে পারে। মনোযোগ দিয়া দেখিলে দেখা যায়, যে মাটি ছুঁড়িয়া ফেলিবার সময় বড় দাঁড়াটিকেই বেশী ব্যবহার করে।

গর্তের সামনে কোন একটি ছোট জিনিস ছুঁড়িয়া ফেলিলে কাঁকড়া তাড়াতাড়ি তাহার কাছে ছুটিয়া আসে। তারপর বেশ করিয়া সে জিনিসটিকে হাত বুলাইয়া দেখে, পছন্দ হইলে তাহাকে তুলিয়া মুখে দেয়। একদিন আমি লম্বা সুতায় রুটির টুকরা বাঁধিয়া দিয়াছিলাম। একটা কাঁকড়া আসিয়া সেটাকে পরীক্ষা করিল, তারপর তাহাকে টানিয়া [illegible] [illegible] [illegible] গেল। গর্তটা [illegible] [illegible] ছিল, [illegible] [illegible] [illegible] সুতা [illegible] [illegible] [illegible] গেল। আমরা [illegible] সুতা ধরিয়া টানিলাম। সহজে টানে কি আর বাহির হবে! কাঁকড়াটা কোনমতে নিজেকেই রুটিটুকু ছাড়িয়া দিতে প্রস্তুত ছিল না, তাই সে যতক্ষণ পারিল, প্রাণপণে তাহাকে আঁকড়াইয়া ধরিয়া রাখিল। শেষে কাঁকড়া রুটির সঙ্গে সঙ্গে বাহিরে আসিয়া উপস্থিত। তখনও সে তাহা ছাড়ে নাই। এটুকু আসিবার সময় সে এতটা ভুলিয়া গিয়াছিল, যে এদিকে আমি যে তাহাকে একেবারে আমার কাছে টানিয়া আনিয়াছি, তাহা সে বুঝিতেই পারে নাই। অবশেষে হঠাৎ একবার যখন রুটির সঙ্গে সঙ্গে সে শূন্যে দুলিতে লাগিল, তখন তাহার চৈতন্য হইল। এবারে রুটি ছাড়িয়া দিয়া সে গর্তের ভিতরে ঢুকিল, শত রুটির প্রলোভনেও আর সে বাহিরে আসিল না।

ইহারা কেমন ছোটে, তাহা আগেই বলিয়াছি। তালমন্দের মতন সোজাসুজি সামনের দিকে যে চলে, তাহা নহে, সে চলিবে পাশাপাশি দৌড়েই তাড়া করিতে ইচ্ছা করে। কিন্তু তাড়া করিতে গেলে দেখা যায়, যে তাহাকে ধরা কাজটি বড় সহজ নহে। তুমি খুব চটপটে সেয়ানা লোক হইলে অবশ্য শেষে তাহাকে ধরিতে পার, কিন্তু তাহার পূর্বে সে তোমাকে একশবার কাঁকি দিয়া হাজার ঘুরপাক খাওয়াইয়া তবে ছাড়িবে।

এই জাতীয় কাঁকড়া যেমন ছুটিতে পারে তেমনি আবার এমন কাঁকড়াও আছে, যে তাহারা ছুটিবে দূরে থাকুক, শুকনো মাটিতে চলিতেই পারে না। একদিন সমুদ্রের ধারে গিয়া দেখি, যে ইহাদের এক-জন চিৎপাত হইয়া পড়িয়া আছেন। দেখিতে বেশ গাট্টাগোট্টা জোয়ান, কাঁঠালের মতন কাঁটাওয়ালা খোলা পরিয়া সঙ্গীন সিপাই সাজা হইয়াছে। কিন্তু এদিকে দুরবস্থার একশেষ কখন কে চিৎ করিয়া রাখিয়া গিয়াছে, তদবধি সেইভাবেই রহিয়াছেন, খোলা [illegible] [illegible] [illegible] তাহারা আবার [illegible] [illegible] [illegible]। [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]। [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] তাহা নিজেই উঠাইয়া দিয়াছে। কিন্তু উঠাইয়া দিলে কি হইবে, তাহা ইহাদের [illegible] [illegible] থাকে। সেইজন্য যতক্ষণ [illegible] পা, তাহাকে [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] সুবিধা হইবে, [illegible] [illegible] [illegible] একেবারেই চলে না। দুই পা না থাকিলে থাকিলেই আবার [illegible] [illegible] [illegible] সেই চিৎ। ইহার পরে এইরূপ আরো অনেক কাঁকড়া জেলেদের জালে ধরা পড়িতে দেখিয়াছি, এ কাঁকড়া কেহ খায় না, সুতরাং জেলেরা এগুলিকে ফেলিয়া দেয়। জেলেরা যেখানে ফেলে, সেটা আর সেখান হইতে দূরে যাইতে পারে না। কারণ মাটিতে পৌঁছাই উল্টাইয়া যায়, আর সেইভাবেই তাহাকে পড়িয়া থাকিতে হয়।

জালে আর এক রকম কাঁকড়া ধরা পড়ে, তাহার স্বভাব একটু আশ্চর্য রকমের। এই কাঁকড়ার খোলা না থাকিলে [illegible] বাঁচিয়া থাকাই ভার হয়। তাই সে নিজের সুবিধা মত করিয়া কোন এক [illegible] [illegible]। সমুদ্রে শঙ্খ শামুক ইত্যাদির খালি খোলার অভাব নাই। এই কাঁকড়া এইরূপ একটা খালি খোলার ভিতরে ঢুকিয়া থাকে। নরম শরীরটির সমস্তই খোলার ভিতরে, কেবল হাত-পাগুলি বাহিরে থাকে, তাহাও ইচ্ছা করিলেই গুটাইয়া লইতে পারে। এইরূপে পরের খোলা পরিয়া ইহারা জীবন কাটাইয়া দেয়, চলাফেরা সমস্তই ঐ খোলা সমেত হইয়া থাকে। যেন সেটা তার নিজেরই খোলা। আমি এইরূপ যতগুলি কাঁকড়া দেখিয়াছি, তাহাদের সকলেই লম্বা লম্বা কাঁটাওয়ালা এক রকম ছোট শঙ্খের ভিতরে ছিল। কাঁটা থাকার জন্য কোন জন্তু আসিয়া খপ করিয়া তাহাদিগকে গিলিয়া ফেলিবার ভয় ছিল না। এই কাঁকড়ার নাম সন্ন্যাসী কাঁকড়া।

সুরের সুরধুনী

বীরেন্দ্রকিশোর রায়চৌধুরী

(৩)

স্বর্গীয় সংগীতনায়ক উজির খাঁ সাহেবের সাংগীতিক জীবন অনেকের নিকটেই আজ অজ্ঞাত; অথচ অনেকেই তাঁকে বর্তমান যুগের শ্রেষ্ঠ যন্ত্রীরূপে স্বীকার ক'রে থাকেন। আমরা তাঁর জীবন-বৃত্তান্ত নিরপেক্ষ সংগীতজ্ঞগণের নিকট থেকে অনেক কিছুই জানতে পেরেছি। তাঁর পিতা তানসেনের দৌহিত্র বংশীয় বীণকার আমীর খাঁ; সিপাহী বিদ্রোহের পরেই বাহাদুর হোসেনের সঙ্গে সঙ্গে লক্ষ্ণৌ ছেড়ে রামপুর দরবারের বীণকারের পদে প্রতিষ্ঠিত হন। তখন রামপুরের নবাব ছিলেন কাল্‌বে আলী খাঁ। ইনি উচ্চাঙ্গ সংগীতের বিশেষ পৃষ্ঠপোষক ছিলেন: কিন্তু তাঁর কনিষ্ঠ সহোদর হায়দর আলী খাঁ সংগীতের ক্রিয়াঙ্গের এক নিষ্ঠাবান সাধক ছিলেন। এই দুই নবাবের চেষ্টায় রামপুর উত্তর ভারতের এক প্রধান সংগীত-কেন্দ্ররূপে পরিণত হয়। হায়দর আলী খাঁ স্বয়ং দুই লক্ষ টাকা বাহাদুর হোসেনের চরণে সমর্পণ করেন সংগীতশিক্ষার উদ্দেশ্যে। বাহাদুর হোসেন তাঁকে সুর-শৃঙ্গার বাদন ও সেনী ঘরাণার বহু ধ্রুপদ শিক্ষা দেন; সঙ্গে সঙ্গে আমীর খাঁ বীণ্‌কার এক লক্ষ টাকার বিনিময়ে তান-সেনের দৌহিত্র বংশীয় ধ্রুপদ, ধামার এবং বীণা বাদন পদ্ধতি তাঁকে শিক্ষা দেন। এইভাবে হায়দর আলী খাঁ উভয় ওস্তাদেরই যথেষ্ট অনুগ্রহ লাভে সমর্থ হন। আমীর খাঁর সঙ্গে রবাবী কাশেম আলী খাঁর ভগিনীর বিবাহ ইতিপূর্বেই ঘটেছিল। বিবাহের যৌতুকস্বরূপ সেনী রবাবী ঘরের অনেক ধ্রুপদ, ধামার ও বাদন পদ্ধতি আমীর খাঁ লাভ করেছিলেন। বাহাদুর হোসেন খাঁও রবাবী ঘরের ওস্তাদ ছিলেন এবং সম্পর্কে আমীর খাঁ'র শ্বশুর হ'তেন। শ্বশুর ও জামাতা সম্মিলিতভাবে রামপুরের সংগীত ঘরাণার প্রতিষ্ঠায় অগ্রণী হন। রামপুরের অন্যান্য ওস্তাদরাও এ'দের শিষ্যস্থানীয় ছিলেন। বাহাদুর হোসেন নিজে নিঃসন্তান ছিলেন, কিন্তু আমীর খাঁ দুই পুত্ররত্ন লাভ করেন—জ্যেষ্ঠ পুত্র উজীর খাঁ সাহেবই তানসেন বংশের গৌরব রক্ষার কৃতিত্ব অর্জনে সমর্থ হন। উজির খাঁ সাহেবের জন্ম রামপুরে, ১৮৫৮ সালে। বাল্যে ও কৈশোরে তিনি পিতা আমীর খাঁ ও মাতামহ বাহাদুর হোসেনের নিকট কণ্ঠ ও যন্ত্রসংগীতে দীক্ষা ও শিক্ষা লাভ করেন। যৌবনের প্রারম্ভে পিতা ও মাতামহের দেহান্তের পর উজির খাঁ নবাব হায়দার আলীর আশ্রয়ে প্রতিপালিত হন। যদিও তাঁর ঘরাণা তালিম ইতিমধ্যেই অধিগত হয়েছিল, তথাপি তাঁর সংগীতপ্রতিভার সম্পূর্ণ বিকাশের পথে হায়দর আলী খাঁ'র অবদান এক দৈব আশীর্বাদস্বরূপ ছিল। হায়দর আলী খাঁ তাঁর গুরুদ্বয়ের নিকট প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন যে তাঁদের দেহা-বসানের পর উজির খাঁ সাহেবের ভরণ পোষণ ও সাংগীতিক পরিপূর্ণতার ভার তিনিই গ্রহণ ক'রবেন। হায়দর তাঁর প্রতিশ্রুতি অক্ষরে অক্ষরে পালন ক'রেছেন। যে সকল রাগ ও ধ্রুপদ পিতা ও মাতা-মহের নিকট শিখবার সময় উজির খাঁ পান্‌নি,—সে সবই হায়দর আলীর নিকট থেকে পেয়ে গেলেন। হায়দর আলী তাঁকে পুত্রবৎ স্নেহের দৃষ্টিতে দেখতেন এবং উপযুক্ত মৌলবী ও পন্ডিতগণের দ্বারা উজির খাঁ'র সর্বতোমুখী বিদ্যার বিকাশে বিশেষভাবেই সহায়ক হন। হায়দর আলীর সঙ্গে উজির খাঁ সম্বন্ধ নিয়ে বিভিন্ন ব্যক্তি বিভিন্ন প্রকারের মন্তব্য প্রকাশ ক'রে থাকেন। আমরা বহু বৃদ্ধ, গুণী ও বিদ্বানদের নিকট এবং সর্বশেষে রামপুর নবাব পরিবারের প্রতিনিধিগণের নিকট থেকে যে বিবরণ লাভ ক'রেছি—তা প্রমাণসহ এবং আমার বিবরণ যতদূর সম্ভব সত্যসহ ও নিরপেক্ষ বিচারের উপরে প্রতিষ্ঠিত। বাহাদুর হোসেনের দেহান্তের পর রবাব, সুরশৃঙ্গারের শিক্ষা সংগ্রহের জন্য প্রতি বৎসরই হায়দর আলীর অনুমতি-ক্রমে দু-এক মাসের জন্য উজির খাঁ তাঁর অপর মাতামহ আলী মহম্মদ খাঁ'র (বড়কু মিয়া) নিকট বারাণসী ধামে বসবাস ক'রতেন। আলী মহম্মদ কাশী নরেশের সংগীতগুরু এবং বাহাদুর হোসেনের দেহান্তের পর ভারতের অদ্বিতীয় সুর-শৃঙ্গার বাদকরূপে খ্যাতি লাভ করেছিলেন। মদীয় সংগীতগুরু মহম্মদ আলী খাঁ আলী মহম্মদেরই কনিষ্ঠ ভ্রাতা ছিলেন।

দশ বৎসরকাল এইভাবে একনিষ্ঠ সংগীত শিক্ষা ও সাধনার ফলে উজির খাঁ সাহেব বীণা, সুরশৃঙ্গার, রবাব প্রভৃতি যন্ত্রে এবং কণ্ঠসংগীতে ধ্রুপদ ও আলাপে সম্পূর্ণ পারদর্শিতা অর্জন ক'রে হায়দর আলীর নবাব বংশীয় নিকটতম কোন আত্মীয়া মহিলার সঙ্গে পরিণয়সূত্রে আবদ্ধ হন। প্রথম শিশুসন্তান যিনি উত্তরকালে প্যারে মিয়া নামে খ্যাতিলাভ ক'রেছিলেন তাঁর জন্মের পরই উজির স্বপরিবারে কোলকাতা চ'লে আসেন (১৮৮৮ খৃঃ)। তখন উজির খাঁ'র বয়স ত্রিশ বৎসর মাত্র; অবশ্য তাঁর কোলকাতা আগমন রামপুর নবাব বংশের নিকট বিশেষ প্রীতিকর হয়নি,—তথাপি সত্যের খাতিরে বলতে হয় যে ১৮৮৮—১৮৯৫ খৃষ্টাব্দ পর্যন্ত সাত বৎসরকাল কোলকাতা বাস এবং সঙ্গে সঙ্গে ভারতের নানা সংগীত-কেন্দ্রে ও রাজদরবারে সংগীতানুষ্ঠান দ্বারাই ভারতের অন্যতম শ্রেষ্ঠ কলাকার-রূপে উজির খাঁ সাহেবের খ্যাতি সারা ভারতে পরিব্যাপ্ত হওয়া সম্ভবপর হয়েছিল।

উজির খাঁ'র কল্‌কাতা বাসকালে তিনি দু-তিনবার তাঁর মাতুল ও ভারতের শেষ শ্রেষ্ঠ রবাবী কাশেম আলী খাঁ'র সঙ্গে দেখাসাক্ষাৎ করেন। একবার মামার সঙ্গে সাক্ষাতের জন্য পূর্ববঙ্গে ঢাকা শহরেও তিনি গিয়েছিলেন; তবে উজির খাঁ'র বঙ্গদেশে আগমনের দু-তিন বৎসর পরেই ঢাকায় কাশেম আলীর মৃত্যু ঘটে। কাশেম আলী শেষজীবনে ঢাকার নিকট-বর্তী ভাওয়ালের রাজগুরুরূপে সেখানেই অধিকাংশ সময় থাকতেন। পূর্ব পাকিস্থান সরকার ভাওয়ালের ঐতিহ্য রক্ষা ক'রেছেন,—সেখানে রাজবাড়ীর পুরোন সকল দর্শনীয় বস্তুর সঙ্গে কাশেম আলীর রবাব ও বীণা প্রভৃতি যন্ত্র সযত্নে রক্ষিত

আছে; কাসেম আলীর কবরস্থানও দর্শনার্থীদের দৃষ্টি আকর্ষণ করে। কাসেম আলীর দেহান্তের পর বঙ্গদেশের সংগীত-ক্ষেত্রে উজির খাঁ তাঁর স্বর্গীয় মাতুলের শূন্য আসন অধিকার করেন সেনী ঘরাণার প্রতিভূরূপে। অধিকাংশ জলসাতেই উজির খাঁ তাঁর মাতামহদ্বয়ের যন্ত্র সুরশৃঙ্গার ও রবাব বাজাতেন, বিশেষ আমন্ত্রণে বীণাও বাজাতেন। বস্তুতঃ উজির খাঁ ছিলেন তানসেনের পুত্র ও কন্যা দুই ঘরেরই প্রতিনিধিস্বরূপ। কলকাতা বাসকালে তাঁর প্রধান পৃষ্ঠপোষকদের মধ্যে দুনী শীল মহারাজা যতীন্দ্রমোহন, মেটিয়াবুরুজের নবাব ওয়াজেদ আলী শা'র পুত্র, পাণিহাটীর জমিদার ও রাণাঘাটের পালচৌধুরী বংশীয় জমিদারগণের নাম বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। বঙ্গ বাসকালে তিনি দুজন বিখ্যাত শিষ্য তৈরী ক'রে গেছেন; প্রথমতঃ মেদিনীপুর পঞ্চেৎগড়ের জমিদার যাদবেন্দ্র মহাপাত্র (সুরবাহার) ও দ্বিতীয়তঃ ভবানীপুরের প্রবীণ শিল্পী প্রমথনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় (রুদ্রবীণা)। এই দুজন কৃতী শিষ্যই বঙ্গদেশে উজীর খাঁ'র গৌরববর্ধনে সমর্থ হ'য়েছেন। স্টার থিয়েটারের হাবু দত্তও উজির খাঁর নিকটে ঐক্যতান, যৌথ-বাদ্য পদ্ধতি শিখেছিলেন। এখানে পাঠক-দের অবগতির জন্য নিবেদন করা আমার কর্তব্য এই যে উত্তরকালে হাবু দত্তই আলাউদ্দিনের ঐক্যতান বাদন বিষয়ে প্রেরণা স্থানীয় হয়েছিলেন। উজির খাঁর সঙ্গে আলাউদ্দিনের কলকাতায় পরিচয় ঘটেনি। কিশোর আলাউদ্দিন তখন পূর্ববঙ্গবাসী।

কোল্‌কাতা ত্যাগের ইচ্ছা উজির খাঁ'র আদৌ ছিল না; তবে নবাব হামিদ আলী খাঁ পাঠ্যজীবনের অবসানে বৃটিশ সরকার যখন তাঁকে রামপুর সরকারের উত্তরাধি-কারীরূপে নবাবের আসনে প্রতিষ্ঠিত ক'রলেন, তখন নবাব বাহাদুর তাঁর পিতৃব্য ও অভিভাবকস্থানীয় হায়দর আলী খাঁ সাহেবের পরামর্শমত বহু চেষ্টার ফলে উজির খাঁকে রামপুরে ফিরিয়ে নিয়ে যান। রামপুর নবাবের গুরুপদে প্রতিষ্ঠিত হওয়ার পর উজির খাঁ বহু শিষ্য গঠন ক'রে গেছেন,—তবে তাঁদের মধ্যে যাঁরা ভারতীয় সংগীতজগতের প্রধান সংগীত-রত্নরূপে খ্যাতি অর্জন ক'রেছিলেন, তাঁরা হ'লেন:—(১) জ্যেষ্ঠ পুত্র প্যারে মিয়া (ধ্রুপদী), (২) নবাব হামিদ আলী খাঁ (ধ্রুপদী), (৩) স্বনামধন্য পন্ডিত ভাত-খন্ডে, (৪) ওস্তাদ আলাউদ্দিন খান (সরোদী), (৫) ওস্তাদ হাফিজ আলী খাঁ (সরোদী), (৬) চৌকোশ গায়ক মুস্তাক হোসেন খাঁ, (৭) কোল্‌কাতাবাসী বিখ্যাত ওস্তাদ মেহেদী হোসেন খাঁ।

বর্ষার আগে

ফটো: সুনীলচন্দ্র পোদ্দার

স্বর্গীয় উজীর খাঁ সাহেবের শ্রেষ্ঠ শিষ্য ছিলেন তাঁর জ্যেষ্ঠ পুত্র নাজির খাঁ (প্যারে মিয়া)। দুঃখের বিষয় এই যে, প্যারে মিয়াঁর গুণরাজি ভারতীয় সংগীত-শ্রোতাদের নিকট প্রকাশ পাবার সুযোগ ঘটেনি। পিতার সামনেই তাঁর মৃত্যু ঘটে। জ্যেষ্ঠ পুত্রকে হারিয়ে উজীর খাঁ সাহেবও আর অধিককাল জীবিত থাকেন নি। পুত্র-শোকের আঘাতই তাঁর অন্তিম ব্যাধির কারণ। ১৯২৪ সালে প্যারে মিয়াঁকে হারাবার পর ১৯২৬ সালে উজীর খাঁ সাহেবেরও দেহান্তর ঘটে, তবে তাঁর অন্তিম ঐ দুই বৎসরের মধ্যে আলাউদ্দীন খাঁ সাহেবকে তিনি তৈরী করে যান। আলাউদ্দীন আমাকে বলেছেন যে ১৯১২ থেকে ২৪ পর্যন্ত সুদীর্ঘ দ্বাদশ বৎসর যে সকল শিক্ষার সুযোগ তিনি পাননি পরের দুই বৎসর তা শিখার সৌভাগ্য তাঁর ঘটেছিল। উজীর খাঁ সাহেব স্ব-মুখে আলাউদ্দীনকে বলেছিলেন যে ছয়মাসের মধ্যে আলাউদ্দীনকে একজন উৎকৃষ্ট বীণকররূপে গঠিত করতে পারতেন। কিন্তু আলাউদ্দীন সরোদ যন্ত্রে সারাজীবন অভ্যাসের পর নতুন যন্ত্র বীণা আয়ত্ত করবার ইচ্ছা ত্যাগ করেছিলেন। উজীর খাঁ তখন তাঁকে বললেন, 'প্যারে-এর মৃত্যুর পর তুমি আমার জ্যেষ্ঠপুত্র স্থানীয়। তুমি যেভাবে আমার সেবায় সারাজীবন সমর্পণ করেছ তাতে তুমি আমার রক্তের সন্তান না হলেও কোনও সন্তান অপেক্ষা কম আদরের নও, তবে বীণা বাজাতে যখন তোমার মন বসছে না তখন সরোদই বীণার তালিম তোমার হাতে তুলে দেব? এরপর থেকে আলাউদ্দীন খাঁ সাহেব পুত্র-শোকার্ত উজীর খাঁ সাহেবের শয্যাপার্শ্বে তাঁর সেবা যেভাবে কায়মনোবাক্যে করে গেছেন। তার ফলস্বরূপ গুরুর আশীর্বাদও লাভ করেছেন। মৃত্যুর পূর্বে উজীর খাঁ তাঁকে বলেছিলেন, "পৃথিবীতে চন্দ্র সূর্যের উদয় যেখানে পরিলক্ষিত হবে সেখানে তোমার নাম ও কীর্তি অবিনশ্বর হয়ে থাকবে।" বর্তমান যুগে আলী আকবর ও রবিশঙ্করের মাধ্যমে ওস্তাদ আলাউদ্দীনের নাম জগতে সর্বত্র প্রচারিত হয়েছে এবং গুরুর আশীর্বাদ অক্ষরে অক্ষরে ফলে গেছে। আমার প্রথম জীবনে হাফিজ আলী ও আলাউদ্দীন খাঁ সাহেবের মাধ্যমে উজীর খাঁ সাহেবের সঙ্গীতবিদ্যার সংস্পর্শে আসার সুযোগ ঘটেছিল। হাফিজ আলী খাঁ সাহেবের সঙ্গীতশিক্ষার ইতিহাস অন্যরূপ। তাঁর পিতা নান্নে খাঁ গোয়ালিয়র দরবারে সরোদীরূপে প্রতিষ্ঠিত ছিলেন। তিনি গৎতোড়া ও তারপরণে যথেষ্ট খ্যাতি অর্জন করেছিলেন। হাফিজ আলী তাঁর পৈতৃক বিদ্যা আয়ত্ত করার পর গোয়ালিয়র দরবারে বসেই জয়পুরের সেনী ঘরাণার বীণকার ও সেতারী আমীর খাঁর বাজনা শুনবার যথেষ্ট সুযোগ লাভ করেছিলেন। তিনি আমীর খাঁর অনেক মজিদখানি গৎতোড়ার পদ্ধতি সরোদে অনুকরণের চেষ্টা করতেন। তাছাড়া উজীর খাঁ সাহেবের ঘরের বিখ্যাত শিষ্য ও হাফিজ আলীর সম্পর্কের জ্যেষ্ঠ ভ্রাতৃতুল্য আজগর আলী খাঁ সরোদীর নিকট কয়েক বৎসর শিক্ষার সুযোগ পেয়ে-ছিলেন। পিতা ও ভ্রাতা আজগর আলীর দেহত্যাগের পর দু-তিন বৎসর মথুরা ধামের সুবিখ্যাত ধ্রুপদী ও কলাবিদ গণেশীপ্রসাদ চতুর্বেদীর আশীর্বাদ ও শিক্ষার সৌভাগ্য তাঁর ঘটেছিল।

হাসুন হেসে বাঁচুন

হাসি সজীব আনন্দের প্রকাশ, স্ফূর্তির অদৃশ্য ফোয়ারা। হাসির মধ্যে দিয়ে মানব-মনের সুস্থ দিকটির পরিচয় যত সহজে ফুটে ওঠে এমন আর কিছুতেই নয়। মানুষ হাসতে পেলে আর কিছু চায় না আর সব কিছুকে যে হেসে উড়িয়ে দিতে পারে তার মত সুখী আর কে?

হাসলে গালে টোল পড়ুক আর না পড়ুক তবু হাসুন, যদি মুক্তোর মত সাজানো দাঁত না-ই থাকে ক্ষতি নেই, ফোকলা দাঁতে হেসে নিন প্রাণভরে। অহরহ হেসে যান, হাসির মধ্যে লুকিয়ে আছে আরোগ্যের অভয়বাণী দীর্ঘজীবনের প্রতিশ্রুতি। দুঃখ দুশ্চিন্তা অভাব আর অনটন মানুষকে অক্টোপাশের মতন ঘিরে রয়েছে। তার মধ্যেও যে হাসতে জানে, সে বাঁচতে জানে। তার মুখের হাসি হল তার হাতের তলোয়ার।

কবি বলেছেন, হেসে নাও দু'দিন বই তো নয়। পদ্মপাতে নীরের মত অস্থায়ী এই জীবনের যদি মাথায় হাত দিয়ে আকাশ-পাতাল ভাবতে ভাবতেই কেটে যায় তাহলে বাঁচবো কখন? তার চেয়ে আসুন না সব চিন্তাকে তুচ্ছ করে সব দুঃখের কথা ভুলে এই মেয়াদটুকু হেসে খেলে কাটিয়ে দিই।

কিন্তু হাসি যে স্বাস্থ্যের লক্ষণ, তাতে যে দীর্ঘজীবনের আশ্বাস এ নিছক কথার কথা নয়। চিকিৎসা-বিজ্ঞান ও মনঃস্তত্ত্বের পরীক্ষায় এ তথ্য নির্ভুলভাবে প্রমাণিত হয়েছে যে রোগ সারাতে হাসির মত দাওয়াই আর দুটি নেই। আমরা যখন হাসি তখন আমরা বাঁচার আনন্দ উপভোগ করি। সুতরাং হাসি জীবন-নদীর আনন্দ ঢেউ, এতে দিন যাপনের কালিমা নিঃশেষে ধুয়ে যায়।

বিদেশে হাসি নিয়ে অনেক পরীক্ষা-নিরীক্ষা হয়েছে। প্যারিসের মনঃস্তত্ত্ব-বিষয়ক শিক্ষাকেন্দ্রের পিয়েরি ভ্যাচেট বলে এক ডাক্তার একটি পরীক্ষার দ্বারা প্রমাণ করেছেন যে হাসিতে শ্বাস-প্রশ্বাসের কাজ অনেক ভালভাবে চালিত হয় এবং মানসিক উত্তেজনা প্রশমিত হয়।

সম্প্রতি নিউইয়র্ক বিশ্ববিদ্যালয়ে হাসি নিয়ে একটি অভিনব পরীক্ষা করা হয়েছিল। এই পরীক্ষায় দু-দল ছাত্রকে রোজ একই খাদ্য খাওয়ানো হত। প্রথম দলটি খাওয়া-দাওয়ার পরেই একজন অধ্যাপকের কাছে জটিল বৈজ্ঞানিক বিষয় নিয়ে পড়াশুনো করত অপর দলটি তাদের আহার সেরে একজন হাস্যরসিকের ভাঁড়ামো দেখে হেসে আকুল হত। পনের দিন ধরে এই কার্যক্রম অনুসরণ করার পর দুটি দলকে

ডাক্তারী পরীক্ষা করে দেখা গেল যে দ্বিতীয় দলটির সাধারণ স্বাস্থ্য, মানসিক অবস্থা ও পরিপাক শক্তি অনেক ভালো রয়েছে প্রথম দলের চেয়ে।

কিন্তু এই প্রসঙ্গে একটা কথা মনে রাখা উচিত যে কৃপণ দেঁতো হাসি বা 'ফিক' করে হাসা লজ্জাশীল হাসিতে দৈহিক বা মানসিক অবস্থার কোন উন্নতি ঘটে না। বেশ দরাজ প্রাণে গলা ছেড়ে হাসলে তবেই লাভ নচেৎ কিছু নয়। এই রকম হাসিতে সমস্ত শরীরে প্রচণ্ড দোলা লাগে এবং স্বরযন্ত্র থেকে আরম্ভ করে পায়ের গোড়ালী পর্যন্ত সমস্ত শরীর এই হাসির ঢেউয়ে কেঁপে দুলে ওঠে। মার্ক টোয়েন বলেছেন, 'হাসির তোড়কে কোন বাঁধ দিয়েই আটকে রাখা যায় না।'

কিন্তু এ দুনিয়ায় রামগরুড়ের ছানারও অভাব নেই। অনেক অভিজাত পরিবারের লোকেরা দাঁত বার করে বা আওয়াজ করে হাসা অসভ্যতা বলে মনে করেন। হাসি পেলে এদের মুখটা কাঁদুনে হয়ে ওঠে। এঁদের জোরে কাতুকুতু দিলে এঁরা নিশ্চয় বলেন 'হাসবো না-না-না'। এই সমস্ত পরিবারে শিশুকাল থেকেই ছোটদের শিক্ষা দেওয়া হয় গলা ছেড়ে হাসাটা নীতিজ্ঞান-হীনের কাণ্ড। অন্যের হাসি এদের কাছে ফাঁসির মত লাগে।

হাসির গুণ তখনই বোঝা যায় যখন সে হাসি হয় দিলখোলা দরাজ। এ রকম হাসি হেসেও আনন্দ শুনেও তৃপ্তি। এক-জন ডাক্তার বলেছেন অল্প-বিস্তর হাসে সবাই, কিন্তু যে যত বেশী হাসে সে তত বেশীদিন বাঁচে। হাসি মন থেকে ভয় আর সন্দেহকে ঝাঁটাপেটা করে তাড়ায়। খুব একচোট হাসির পর মনটা শরতের আকাশের মত লঘু আর নির্মল হয়ে ওঠে। হাসির কোন রং নেই কিন্তু এর গুণে মুহূর্তে সব রঙীন হয়ে ওঠে। হাসি যত স্বতোৎসারিত তত সুন্দর। যে লোক হাসে বুঝতে হবে যে সে সত্যি এই মাটির পৃথিবীর মানুষ, জীবন সম্বন্ধে তার দৃষ্টিকোণ নিতান্ত স্বাভাবিক। মনস্তাত্ত্বিক বলেন যাঁরা প্রাণ-খোলা হাসি হাসেন তাঁরা সহৃদয় ও কোমলস্বভাব, গোমড়ামুখো ভীষণ ভাবুক-দের চেয়ে তারা আমাদের অনেক বেশী আপনজন।

তাই বলি আরও হাসুন, নিজের পরমায়ুকে আনন্দ-উজ্জ্বল করে তুলুন।
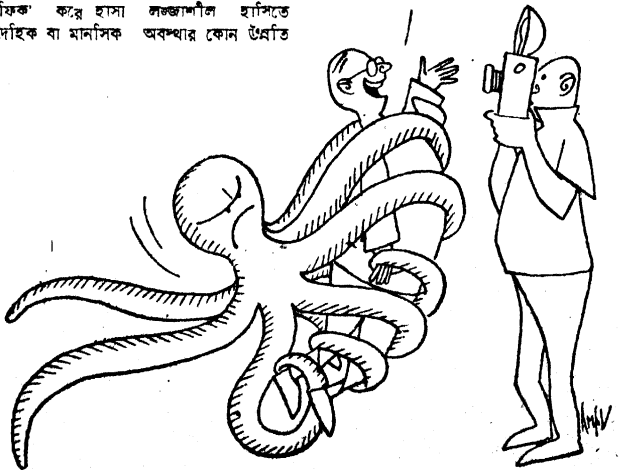
শিল্প ও নৈতিকতার পারস্পরিক সম্পর্ক

শ্রীঅনন্তকুমার জানা

বাস্তব জীবনের অসম্পূর্ণতা থেকে শিল্প ও নৈতিকতা উদ্ভূত। কিন্তু বাস্তব-জীবনে অসম্পূর্ণতা শিল্প ও নৈতিকতা ব্যতীত আরো অন্যভাবে দূর করা যায়। শিল্প ও নৈতিকতার সঙ্গে অন্যান্য কাজের পার্থক্য [illegible]—এদের প্রাণনিঃস্বার্থতায়। [disintestedness [illegible] selfishness] কিন্তু অন্যান্য কাজ মূলত মানুষের স্বার্থের সঙ্গে সংযুক্ত। শিল্পচেতনা ও নৈতিকতা-বোধ ব্যক্তিগত স্বার্থ বা স্বদ্বন্দ্বের ঊর্ধ্বে এবং সেখানে তাদের সার্থকতা। এদের প্রেরণা হচ্ছে নির্মল সৌন্দর্যবোধ ও শুভ্র কল্যাণবোধ।

শিল্প হচ্ছে কল্পনাবিলাসী মনের ছন্দ ও বৈচিত্র্যের সাহায্যে প্রকৃতির মধ্যে এক রস-সৃষ্টি; যে সৃষ্টি মানবমনের উপলব্ধ-মান সৌন্দর্যবোধের বহিঃপ্রকাশ। Art is nature born again out of spirit.. সমাজ সংসারের গোটা বাস্তব জীবনকে অবলম্বন করে শিল্পী আপন মনের মাধুরী মিশিয়ে এক অপূর্ব ভঙ্গিমার রস-সৃষ্টি করেন—যা মানুষমাত্রকেই আনন্দ ব authetic delight দেয়। এই প্রকাশ দেখতে পাই কাব্য, সাহিত্য, চিত্র, ভাস্কর্য, স্থাপত্য ও সঙ্গীত প্রভৃতির মধ্যে। এই বহিঃপ্রকাশ মানবমনের সৌন্দর্যবোধেরই বহিঃপ্রকাশ। কিন্তু এই সৌন্দর্যবোধের ধারণা মানুষ সম্পূর্ণরূপে উপলব্ধি করতে পারে না। তাই এটা উপলব্ধমান। বহিঃ-প্রকাশের মধ্যেই এই উপলব্ধি চলছে।

নৈতিকতা [নীতিশাস্ত্র] হচ্ছে এক বিশেষ নীতির মানদণ্ডে স্বাধীন মানবা-চরণের উৎস [illegible]খ্যা, বিচার ও মূল্যায়ণ; যে-নীতি মানবমনের উপলব্ধমান কল্যাণ-বোধের বহিঃপ্রকাশ। মানুষ স্বাধীনভাবে যে সমস্ত আচরণ সম্পাদন করে সেই সমস্ত আচরণগুলির যথার্থতা ও অযথার্থতা বিচার করে নীতিশাস্ত্র কতকগুলি নীতির সাহায্যে। আর সেই নীতি এক কল্যাণবোধে উদ্ভাসিত। কিন্তু সেই কল্যাণবোধের ধারণা পরিবর্তনশীল, যদিও যুগে যুগে সমাজে সমাজে একটা ঐক্য পরিদৃষ্ট হয়। তাই বলা যেতে পারে নীতিশাস্ত্রের কল্যাণবোধ উপলব্ধমান।

শিল্পসৃষ্টির প্রেরণা ও নৈতিকতাবোধ মানুষের সহজাত জিনিষ। এবং আদিমকাল থেকেই মানুষের চিন্তা ও ভাবুকতায় এই দুটি জিনিস প্রবাহিত হয়ে আসছে। মানুষের জীবন যদি মিলনান্ত হয় তাহলে শিল্প ও নৈতিকতাবোধ মানুষের আনন্দকে সৌন্দর্য ও কল্যাণবোধে পরিপূর্ণ করে তুলবে। [illegible] যদি [illegible] জীবন [illegible] Atlantic মহাসমুদ্রের মতো দুঃখের গভীরতায় নিমজ্জিত হয় তাহলেও শিল্প ও নৈতিকতা মানুষের জীবনে এনে দিতে পারে একটা সান্ত্বনা ও প্রশান্তি। মানব-জীবনে শিল্প ও নৈতিকতার প্রয়োজনীয়তা এদিক থেকেই এবং সার্থকতাও এখানেই।

'শিল্প ও নৈতিকতাবোধ মানুষের আধ্যাত্মিক দিকের বা "বড়-আমি"টার প্রকাশ। মানুষ যখন 'ছোট আমি'র ক্লেদাক্ত স্বার্থনিপীড়িত দিকটাকে ভুলে গিয়ে বড়-আমিত্বকে উপলব্ধি করে তখনই এদের সুষ্ঠু বহিঃপ্রকাশ ঘটে। কিন্তু মানুষ যখন 'বড়-আমি'কে বাদ দিয়ে 'ছোট-আমি'টাকে নিয়েই শিল্পসৃষ্টি বা নীতিপ্রচারে উন্মত্ত হয় তখন শিল্পের জগতে দেখা দেয় বিকৃতি, নীতিশাস্ত্র বা নৈতিকতাও তখন 'সর্ব-জনহিতায়' হতে পারে না। শিল্পের ও নৈতিকতার যে অধঃপতন ঘটে তাকে বলা যেতে পারে 'aberrations in art, and aberration in morality'

শিল্প ও নৈতিকতাকে এই বিকৃতির হাত থেকে বাঁচানো যেতে পারে যদি দুটোকেই আমরা সামগ্রিক দৃষ্টিভঙ্গী নিয়ে দেখি। শিল্প কেবলমাত্র রচনাশৈলী [Style and form] নিয়ে আবদ্ধ থাকলে না অথবা কেবলমাত্র বস্তুগত সত্য [matter] নিয়ে আবদ্ধ থাকবে না। উভয়ের এক অনুপম সামঞ্জস্য থাকা দরকার যার ফলে সার্থক রসসৃষ্টি ঘটতে পারে—যা সর্বজনকে আনন্দ দেবে। তখন সেই শিল্প হবে 'বড়-আমি'র অভিব্যক্তি—আর সেই শিল্প কেবলমাত্র ব্যক্তিগত না হয়ে হবে সার্বিক। নৈতিকতাও কেবলমাত্র 'ছোট-আমি'কে বিসর্জন দিয়ে 'বড়-আমি'কে প্রকাশ করলে চলবে না; 'বড়-আমি' ও 'ছোট-আমি'র সামঞ্জস্য বিধানে এক কল্যাণ-বোধের আদর্শই প্রচার করবে। তখন নৈতিকতার আবেদন হবে সার্বিক। এছাড়াও বাস্তব তথ্য ও তত্ত্বের যোগ থাকবে নৈতিকতার সঙ্গে। Sacretes বলেছেন 'virtue is knowledge' খাঁটি জীবনদর্শন কি শিল্প কি নৈতিকতা দুটোর মধ্যেই প্রকাশ না পেলে শিল্প ও নৈতিকতা সার্বিক ও কালজয়ী হতে পারবে না। তাই একান্ত প্রয়োজন প্রজ্ঞ দৃষ্টি Reflection or deeper insight into the nature of things or realities of the world

এই প্রকার ফলে খাঁটি জীবনদর্শন ও কল্যাণবোধের পরিপ্রেক্ষিতে নৈতিক আচরণ মূল্যায়ণ যেমন সহজ হয়, তেমনি শিল্পও খাঁটি জীবনদর্শন এবং সৌন্দর্যবোধের পরি-প্রেক্ষিতে সার্থকরসমণ্ডিত হয়ে ওঠে। তখন কি শিল্পী কি [illegible] উভয়ের মনে জাগে এক স্বতঃস্ফূর্ত আনন্দ।

শিল্প ও নৈতিকতার সম্বন্ধে উপরোক্ত আলোচনার পরিপ্রেক্ষিতে শিল্প সম্বন্ধে দুটি ভ্রান্ত মতবাদের বিচার করা প্রয়োজন। একটি হোল ডঃ জনসন, রাস্কিন প্রভৃতি মনীষীদের মত—যাঁরা শিল্পকে আদর্শ প্রচারের বাহন বলে মনে করেন। এঁদের মতে নীতিবোধ বা নৈতিকতাকে সরাসরি প্রচার করাই শিল্পীর আদর্শ। এঁদের মত ভ্রান্ত এই কারণে যে এঁরা শিল্পীর বস্তুগত এবং নীতিগত আদর্শের দিকেই জোর দিচ্ছেন। শিল্পীর যে Subjective sight অর্থাৎ মানসকল্পনার রঙ যার বর্ণচ্ছটায় প্রকৃতি নিতান্তনভাবে সৃষ্ট হচ্ছে সেই দিকটার কথা বাদ দিচ্ছেন। তাই এঁদের মত একপক্ষপাতিত্ব দোষে দুষ্ট।

আর একদল যেমন হুইস্‌লার, অস্কারওয়াইল্‌ড প্রভৃতি মনীষী বলেছেন যে শিল্প শিল্পসাধনার জন্য—Art for art's sakes only এঁদের মতে শিল্পীর কাজ হবে সৌন্দর্যের জন্য সৌন্দর্যের সৃষ্টি। এঁদের সমাজনীতিবোধ সম্পর্কে কোন দায়িত্ব থাকবে না। এঁরা এঁদের কল্পনারাজ্যে একচ্ছত্র অধিপতি। শিল্পীর আনন্দ তার সৃষ্টিতে—যত কদর্য, কুৎসিত বিষয়বস্তু হোক না কেন। যৌন আবেদনপূর্ণ বিকৃত চিত্র বা হত্যাকাণ্ডের বীভৎস দৃশ্যও আমাদের আনন্দ দিতে পারে। সৌন্দর্যপ্রকাশের বহিঃপ্রকাশেই শিল্পের সার্থকতা, বিষয়বস্তু গৌণ। এঁদের মতে—

> in art the matter does not matter, what matters is only form and treatment and to that along should our attention be turned

এঁদের মতের কিছুটা মূল্য আছে, তবে শিল্পের জন্য শিল্পের প্রয়োজনীয়তা ততটুকুই স্বীকার্য যাতে শিল্পীর মন অনাসক্তভাবে শিল্প-সৌন্দর্যসৃষ্টিতে মনো-যোগী হতে পারে। জ্ঞান আহরণের জনাই জ্ঞানাহরণের ইচ্ছা যেমন মানুষকে জ্ঞানী বা পণ্ডিত করে তোলে, তেমনি শিল্পের জন্য শিল্পের প্রয়োজন—এই বোধ শিল্পীকে সঠিক শিল্পী করে তোলে—শিল্পীকে এই স্বাধীনতা দিতে হবে। কিন্তু তা সত্ত্বেও, এই মত কয়েকটি কারণে সম্পূর্ণ গ্রাহ্য নয়। শিল্পে কদাচিত সৌন্দর্যহীনতা, অরুচিকর বাস্তবতা স্বীকার করা যায় না। শিল্পের মধ্যে যদি অরুচিকর এবং অনৈতিক কিছু থাকে তাহলে তা যথার্থ শিল্পের পর্যায়ে পড়বে না শিল্পমন্দিরের চত্বরের বাইরে হবে তার স্থান; মন্দিরের পবিত্রবেদীতে তার স্থান নেই। যে কোন কবিতা উপন্যাস চিত্র ভাস্কর্য শিল্পপদ-কর্ষতা লাভ করেছে কিনা—এই বিচারের সময় দেখতে হবে এ সমস্ত কিছুর মধ্যে নীতিবিগর্হিত কিছু প্রবেশ করে শিল্পকে কলঙ্কিত করেছে কি না। কারণ—

> "An immoral work will never be considered beautiful however enchanting be the form in which it is emobodied".

কোন নীতিবিগর্হিত [illegible] শিল্পের পর্যায়ে ফেলা যাবে না যতই প্রকাশ-

কালিমার ওড়না ঢেকে তাকে মনোমুগ্ধকর করা যায়। পাপ ও অপবিত্রতা যতই শিল্পীমনের সুন্দর পোষাকে সজ্জিত করা যাক পাপ-পাপই—তা না হবে সার্থক শিল্প না হবে কোন সৌন্দর্য। কয়লা জল দিয়ে ধুলে যেমন সাদা হয় না, ময়ূরপুচ্ছ দিয়ে নিজেকে ঢাকলে কাক যেমন ময়ূর হয় না, তেমনি পাপ ও অপবিত্রতা নিয়ে শিল্প রচনা করলে তা কখনো সুন্দর হবে না। বরং কয়লা ধোয়ার সময় পরিষ্কার জল যেমন ঘোলাটে হয়ে যায়, কাকের 'পাখনে ময়ূর-পুচ্ছের সৌন্দর্য' যেমন ম্লান হয়ে যায়, শিল্পীর সৌন্দর্যবোধও তেমনি কুৎসিত ও কদর্যতার সংস্পর্শে এসে কালিমাপ্রাপ্ত হয়ে যেতে পারে। শিল্প তখন হয় vulgar এবং degraded। এগুলিকে বলা যায় aberrations in art.

কেউ কেউ বলতে পারেন যে, 'Brilliance in style.' অর্থাৎ অনুপম রচনাশৈলী শিল্পের মধ্যে রস-সৃষ্টি করতে পারে, বিষয়বস্তু যাই হোক না কেন। এর উত্তরে বলা যেতে পারে চৌর্যবৃত্তির অপরাধে ধরা পড়ার পর যদি চোর বলে যে তার চুরি আধুনিক বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির বিজ্ঞানসম্মত উপায়ে সম্ভব হয়েছে তাহলে হয়ত বিচারক তার প্রশংসা করতে পারেন কিন্তু শাস্তি তার হবেই। তাই আর্টের রচনানৈপুণ্য যতই থাক না কেন কুৎসিত বিষয়বস্তু কল্যাণ-বোধের মানদণ্ডে অবশ্যই বিচার্য।

অনেকে বলতে পারেন সমাজের চোখে যা কুৎসিত শিল্পীর চোখে অনেক সময় তা সুন্দর ঠেকে, আবার সমাজের চোখে যা সুন্দর শিল্পীর চোখে তা কুৎসিতরূপে প্রতিভাত হয়। অনেক ক্ষেত্রে এরকম হয়। সমাজের নীতির মধ্যে দুর্নীতি থাকে আবার আপাত কুৎসিতের মধ্যেও কল্যাণ বা মঙ্গল নিহিত থাকতে পারে। এই সমস্ত নির্বাচনের জন্য শিল্পীর থাকা চাই প্রজ্ঞা বা সত্যদৃষ্টি—তাহলেই যথাযথভাবে কুৎসিত ও সুন্দরের বিচার হবে। তবে শিল্পীর ব্যক্তিগত ধ্যানধারণা ও সত্যবোধের সঙ্গে সমাজের দ্বন্দ্ব ও বিরোধ প্রবল হয়ে উঠতে পারে। কিন্তু শিল্পীর রস-সৃষ্টি যদি সর্বজনহিতার কল্যাণবোধের পরিপন্থী না হয়, তা হলে মহাকালের দরবারে শিল্প ও শিল্পীর জয় একদিন অনিবার্য। peter Croce প্রভৃতি মনীষীগণও যাঁরা রচনাশৈলীর উপর বেশি জোর দিয়েছেন। বৃহত্তর জীবনের কথা স্বীকার করে নিয়েছেন। সৌন্দর্যদৃষ্টি শিল্পের সর্বোপরি ব্যাপার হলেও শুধুমাত্র সৌন্দর্যের মধ্যেই শিল্পের চরম সার্থকতা নয়। যে-শিল্পে মানুষ রসানন্দ ভোগ করতে করতে পায় সত্য শিব ও সুন্দরের সন্ধান তাই সার্থক শিল্প। শুধু 'Art for art's sake'-এর বাহ্যিকতা নিয়ে শিল্পীদের সৃষ্টিকর্মে নিযুক্ত থাকলে চলবে না। শিল্পীরা সৌন্দর্যসৃষ্টির মাধ্যমে এক কল্যাণময় ও প্রেমময় জগৎ তৈরীর কাজে আত্মনিয়োগ করবেন। পরিপূর্ণ আশা ও দৃঢ় আত্মবিশ্বাসসহ শিল্পীরা তাদের হাতুড়ি, তুলি, লেখনী অথবা বীণা নিয়ে এগিয়ে যাবেন সৃষ্টিকর্মে যতদিন না জগৎ সৌন্দর্য শান্তি আনন্দ ও প্রেমে ভরপুর হয়ে ওঠে। আজ পর্যন্ত কোন শিল্প এবং নৈতিকতা পরিপূর্ণতা লাভ করেনি। কিন্তু শিল্পী-যাত্রীরা অগ্রসর হয়ে চলেছেন। একদিন হয়ত—

"কেবল যাবে আঁধার কেটে
আলোয় ভরবে গেহ
দিন যে তার পূর্ণ হবে
ধন্য হবে সেই
পুলক পরশ পেয়ে—
নীরবে তার চারিদিকের ঘুচিবে [illegible]
ফুলে আসবে বেয়ে।"

পুরোনো কলকাতায় ডাক্তারি

গোপেন্দু সরকার

দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ায় ওলন্দাজ ঔপনিবেশিকদের বিষয়ে যেমন বলা হয়ে থাকে যে জবদ্বীপের অধিবাসীদের তরবারির আঘাতের চেয়ে সেখানকার জলাভূমি, পচা খানাডোবা ও মহামারী অনেক বেশী সংখ্যক ওলন্দাজের মৃত্যুর কারণ হয়েছিল তেমনি ভারতবর্ষে ইংরাজদের বেলাতেও অনুরূপভাবে বলা চলে যে বিদ্রোহ, অন্ধকূপ-হত্যা (যদিই বা আদৌ ঘটে থাকে), যুদ্ধ-বিগ্রহ বা বিপ্লবীদের গুলি বা বোমা ইত্যাদির দরুণ এখানে যত না তাঁদের জীবনহানি হয়েছিল তার চেয়ে ঢের বেশী ইংরাজ মারা পড়েছিলেন স্থানীয় জলবায়ু ও অসুখবিসুখের প্রকোপে। এর জন্য—অন্ততঃ তাঁদের মৃত্যুহারের মাত্রার পরিপ্রেক্ষিতে বলা চলে যে তাঁরা নিজেরা ছাড়া আর কেউ দায়ী নয়। ওলন্দাজেরা তো প্রায় খাল কেটে কুমীর ডেকে এনেছিলেন যেহেতু তাঁদের স্বদেশের রাজধানী আমস্টারডামে বহু খাল ছিল তাই তাঁরা উঠে পড়ে লেগেছিলেন ব্যাটাভিয়াতেও তাঁদের বসতির মধ্যে বহু খাল কেটে সেখানে তাঁদের স্বদেশীয় পরিবেশ সৃষ্টি করতে! কি নিদারুণ সাংঘাতিক হয়ে দাঁড়িয়েছিল, তা অনেকেরই জানা। দুর্গন্ধ পচা ডোবার জলের সঙ্গে সেই সব খাল দিয়ে করাল মহামারী এসে তাঁদের বসতি প্রায় উজাড় করে দেওয়ার উপক্রম করেছিল। প্রাচীন ইংরাজ চিকিৎসা-বিজ্ঞানী ডাঃ জে আর মার্টিন-এর মতে যে সব ইউরোপীয় জাতি পৃথিবীর সুদূর প্রান্তে তাদের উপনিবেশ স্থাপন করেছে তাদের মধ্যে ইংরাজরাই দেখা গেছে ঔপনিবেশিক শহর পত্তনের স্থান নির্বাচনে সকলের চেয়ে অবিবেচক।' শহর কলকাতার জন্য স্থান নির্বাচন নিয়েও ইংরাজদের প্রাচীন বিজ্ঞ ব্যক্তিদের কাছ থেকে কম সমালোচনা সহ্য করতে হয়নি। ভ্রাম্যমাণ নাবিক আলেকজাণ্ডার হ্যামিলটন যিনি ১৬৮৮ থেকে ১৭৩৩ সালের মধ্যে বার কয়েক ভারত পরিক্রমা করে গিয়েছেন তিনি ১৬৯০ সালের ২৪ আগস্ট জব চার্নকের কলকাতা পত্তনের বিষয় মন্তব্য করতে গিয়ে লিখেছিলেন, 'জব চার্নক সারা নদীর দুই পাড়ে এর চাইতে অস্বাস্থ্যকর স্থান আর একটিও খুঁজে পেতেন না।' তৎকালীন জনৈক ইংরাজ কবি অ্যাটকিনসন প্রাচীন কলকাতার আবহাওয়া ও প্রাকৃতিক অবস্থার বর্ণনা সম্বলিত যে পদ্যটি লিখেছিলেন তার সারার্থ এই রকম:—'কলকাতা! তখন তোমার অবস্থা কি ছিল? তোমার অস্তিত্ব ছিল কষ্টসাধ্য। তুমি গড়ে উঠেছ গহন বন আর স্বাস্থ্যহানিকর দুর্গন্ধময় জলাভূমির উপর। দিনের বেলাতেও সেখানে আলোর নিশানা মিলতো না আর তার উপর ছিল অসম্ভব ভ্যাপসানী আর প্রচণ্ড উত্তাপের দুর্ভোগ যন্ত্রণা। উচ্চাভিলাষী, দুঃসাহসিক বহু দুর্ভাগার অকালে প্রাণ হরণ করেছ তুমি। তোমার প্রতিটি রাত্রিই ছিল যেন অমানিশা, যার অঙ্গে দেখা দিতো ভীষণ জলো স্যাতসেঁতে পরিবেশ। সন্ধ্যায় জন্ম-স্তাব নিয়ে শয্যা গ্রহণ করে কতই না পথিকের সকাল হতে না হতেই জীবন-দীপ নিভে গেছে!'

এই প্রসঙ্গে উল্লেখযোগ্য যে কলকাতাই হুগলী নদীর পূর্বতটে প্রথম বিদেশীয় বসতি। ১৮১৫ সালে স্বনামধন্য পাদ্রী রেঃ জেমস লং কেন যে ইংরাজরা শেষ পর্যন্ত জব চার্নকের (অপ)পছন্দসই ভূখণ্ডটি পরিত্যাগ করেননি তার কয়েকটি গ্রহণযোগ্য কারণ তাঁর 'পীপস ইন টু সোস্যাল লাইফ অফ ক্যালকাটা' গ্রন্থে লিপিবদ্ধ করে গিয়েছেন: 'এই প্রশ্নটি প্রায় করা হয় যে কেন কলকাতা হুগলী নদীর ডান (পশ্চিম) তটে অবস্থিত নয়, যা ফরাসী, দিনেমার এবং ওলন্দাজদের মতে আরো স্বাস্থ্যকর স্থান?......বাম (পূর্ব) তটের জল ছিল আরো গভীর আর যে তন্তুবায় পরিবারেরা কোম্পানী বাহাদুরকে সুতা ও বস্ত্রাদি সরবরাহ করতো তারা (গোবিন্দপুরের বসাক, শেঠ ও শীলেরা) এই পাড়েই বাস করতো এবং হাওড়ার দিকের মতন এই দিকটি মারাঠা আক্রমণের পক্ষে উন্মুক্ত ছিল না।'

বর্ষা সমাগমের সঙ্গেই ঘনিয়ে আসতো মৃত্যুর করাল ছায়া—কলকাতার বুকের উপর শুরু হত মহামারীর তাণ্ডবলীলা। আণ্ডারটেকার বা সৎকার সংস্থাগুলির তখনই আসতো পৌষ মাস অবশ্য যদি না এগুলির মালিক-কর্মীরা নিজেরাই এই সর্বনাশা মরণ-যজ্ঞে বলি হতেন। হ্যামিলটন ১৭৯২ সালে কলকাতা পরিদর্শন করে তাঁর অভিজ্ঞতা বর্ণনা করতে গিয়ে লিখেছেন যে, সে বছর আগস্ট মাসে সর্বসমেত ১২০০ ইংরাজ কলকাতায় বাস করছিলেন কিন্তু পরবর্তী জানুয়ারী মাস শুরু হওয়ার পূর্বেই তাঁদের মধ্যে ৪৫০ জনের সমাধিস্থ হওয়া কথা কবরস্থানের কেরানীর খাতা থেকে জানতে পারা যায়! এই পরিস্থিতিতে 'ভাগ্যবলে যাঁরা বেঁচে রয়েছেন তাঁরা যাতে পরস্পরকে অভিনন্দন জানাতে পারেন' এই উদ্দেশ্যে যে প্রাচীন কলকাতা নিবাসী ইংরাজদের প্রতি বছর ১৫ অক্টোবর একটি সর্বজনীন ভোজসভা আয়োজিত হত তাতে আর বিস্মিত হবার কি আছে? হ্যামিলটন আরো দেখেছিলেন যে কলকাতার প্রথম গীর্জা, ১৭০৯ সালে দ্বারোদ্ঘাটিত সেন্ট অ্যানস চার্চ, প্রায়ই মৃত্যু ঘটিত পাদ্রীর অভাবে বিপন্ন হয়ে পড়ত। তখন কোম্পানীর সাধারণ পঠনক্ষম কর্মচারীদের মধ্যে থেকে কাউকে দিয়ে রবিবারের প্রার্থনা ও নীতি স্তব পাঠ করিয়ে নেওয়া হত। এই গীর্জাটি ১৭৫৬ সালে নবাব সিরাজ-উদ্দৌলার কলকাতা আক্রমণকারী সেনাবাহিনীর দ্বারা বিধ্বস্ত না হওয়া পর্যন্ত বর্তমান রাইটার্স বিল্ডিং-এর পশ্চিম প্রান্তে বিরাজমান ছিল। এক পাদ্রীর মৃত্যু ঘটলে ইংলন্ড থেকে নতুন লোক আমদানী করতে অনেক সময় লাগতো তাই যে সকল কর্মচারীরা রবিবারে গীর্জার কাজ করতেন তাঁদের নির্ধারিত বেতনের উপর বছরে পঞ্চাশ পাউণ্ড অতিরিক্ত ভাতা বরাদ্দ করার পাকাপাকি ব্যবস্থা করা হয়।

অষ্টাদশ শতকের মাঝামাঝি যখন ইউরোপে ইঙ্গ-ফরাসী মনকষাকষির পরিপ্রেক্ষিতে কলকাতার ইংরাজেরা চন্দননগর থেকে ফরাসী আক্রমণ আশঙ্কা করে কলকাতার প্রতিরোধ ব্যবস্থা আরো মজবুত করতে উঠে পড়ে লেগেছিলেন তখন যেন তাঁদের সেই কাজে মূর্তিমান বাধার মতন আসেন স্বয়ং যমরাজ! ১৭৫১ থেকে ১৭৫৩ সনের মধ্যে মাত্র এই দু বছরেই ইংরাজদের তিন-তিনজন দুর্গরক্ষা-বিশারদ প্রধান ইঞ্জিনীয়ার রবিনস, স্কট ও ওয়েলস, মারাত্মক ব্যাধির কবলে পড়েন। তৎকালীন বেঙ্গল কাউন্সিল, গভীর দুঃখে ও হতাশায় সে সময়ে লণ্ডনের কর্তাব্যক্তিদের কাছে লিখে পাঠালেন, 'অভিজ্ঞতা থেকে আমরা শিখেছি যে যাঁদের চল্লিশ বা তার কাছাকাছি বয়স হয়েছে তাঁদের পক্ষে এই ধরণের জল-বায়ুর ভিন্নতা বিশেষ বিপজ্জনক। ......এই বসতির দুর্ভাগ্য যে আমাদের মালিকদের দ্বারা নিযুক্ত একজন দক্ষ মানুষও এখানকার রক্ষা ব্যবস্থা দৃঢ়তর করার পরিকল্পনা অনুসারে কাজ শুরু করার জন্য বেঁচে থাকলেন না।' এই পরিপ্রেক্ষিতে উল্লেখযোগ্য যে ১৭৫৭ সালে কর্ণেল ক্লাইভের ১০৯৬ জন বিশিষ্ট ইউরোপীয় সৈন্যবাহিনীর পলাশীর যুদ্ধে ক্ষতি হয়েছিল মাত্র সাতজন আহত ও

তেরোজন নিহত' কিন্তু ১৭৬২ সালের মড়কে বাংলাদেশে সর্বসমেত ৮০০ জন ইউরোপীয়ের জীবনাবসান হয়েছিল। হ্যামিলটনের সময়ে আরো জানা যায় যে 'আরক (তাড়ি বিশেষ) ও জলো হাওয়া গায়ে লাগানো থেকে উদ্ভূত নানান ব্যাধির দরুণ তখন প্রায় প্রত্যেক জাহাজেরই ইউরোপীয় লস্করদের গড়পড়তা এক-তৃতীয়াংশ মৃত্যুমুখে পতিত হতেন।

আঠার শতকে কলকাতায় যে সকল মারাত্মক ব্যাধির ব্যাপক প্রকোপ প্রায়ই দেখা যেতো তাদের মধ্যে ছিল কলেরা, বসন্ত, টাইফাস, ম্যালেরিয়া, ব্যাসিল্যারী ডিসেন্ট্রি, হেপাটাইটিস প্রভৃতির ন্যায় ভয়াবহ সব রোগ। কিন্তু এদের অনেকেরই সে সময়ে নামকরণ পর্যন্ত হয়নি আর ব্যাধির চেয়ে যেন আরো ভয়াবহ ছিল অল্প বিদ্যায় ভয়ঙ্কর তৎকালীন ইউরোপীয় 'মেডিক্যাল জেন্টলম্যান'দের অপরিচিত ও অভাবিত রোগাদির লক্ষণ-সমষ্টির সঙ্গে যুঝতে গিয়ে হালে পানি না পাওয়া হাতুড়ে দাবাই। এঁদের চিকিৎসার ধরণের বিষয়ে ১৭৮০ সালে 'ক্যালকাটা রিভিউ' পত্রিকায় একটি ব্যঙ্গ কবিতা প্রকাশিত হয়েছিল যার অংশ বিশেষের বাংলা অনুবাদ এখানে দেওয়া হল—'এঁদের চিকিৎসার কোনও কানুন নেই। তাঁরা ন্যাচায় চিকিৎসা করেন শরীর থেকে রক্ত বার করে দিয়ে। আপনার স্ত্রীর যদি মাথা ধরে তো ডাক্তারবাবু এসে প্রথমেই কসাইদের মতন একটা ধারালো ছোরা দিয়ে রোগীণীর শরীরে একটি কোপ বসাবেন। তাঁরা নাড়ি দেখেন যেন জাহাজের দড়াদড়ি নিয়ে টানা-হেঁচড়া করছেন। আপনার যদি মাথার খুলি ফেটে যায় তো গম্ভীরভাবে নিরীক্ষণ করে—তাঁরা রায় দেবেন যে আপনার হজমে দোষ হয়েছে আর ঘোড়ার পরিমাপের জোলাই খাইয়ে আপনার প্রাণান্ত পরিচ্ছেদ করে ছাড়বেন!'

অবিশ্বাস্য মনে হলেও সত্যি যে এই ব্যঙ্গ কবিতার মধ্যে অতিরঞ্জনের ভাগ সামান্যই। পুরোন নথিপত্র থেকে জানা যায় যে ১৬৯৮ সাল থেকে কলকাতায় কলেরার পরিচিতি 'ইণ্ডিয়ান মরুডেচি' নামে এবং এই রোগের জন্য প্রাচীনকালের 'কার্যকরী' ওষুধ বলতে ছিল হয় 'রোগীর দুটি গোড়ালী বরাবর তপ্ত-রাঙ্গা একটা লৌহ-শলাকা রেখে তাকে মরিচ গুলে কাঞ্জির রস গেলানো' কিংবা 'ব্র্যাণ্ডি ও লডেনাম (এ্যালকহলে গোলা আফিম) খাইয়ে রোগীকে গরম জলে স্নান করিয়ে নেওয়ার পর তার বাহু থেকে রক্ত-ক্ষরণ করানো (একবিন্দু জলও যেন রোগীর মুখে না যায়)"! এরপর আসে এই রোগের 'প্রতিকার' হিসাবে এমেটিক্স (বমির ওষুধ), ওপিয়েট (আফিম মেশানো ঘুম পাড়ানোর ওষুধ), হার্টসহর্ন (হরিণের শিং-এর শাস যার মধ্যে প্রচুর এ্যামোনিয়া বিদ্যমান) ও জল নিষিদ্ধ করার যুগ। কলেরা রোগীকে জল খেতে অনুমতি দেওয়া হয় একটি বাস্তব ঘটনা অনুযায়ী। মার্কুইস অফ হেস্টিংস যখন বড়লাট তখন একটি সৈন্য-ছাউনিতে কলেরা মহামারীরূপে দেখা দেয়। ডাক্তারবাবুদের কঠোর নিষেধ সত্ত্বেও কয়েক-জন রোগী নাকি দু'-এক ঢোক জল লুকিয়ে-চুরিয়ে পান করে এবং শেষপর্যন্ত দেখা যায় যে, যারা জল খেয়েছিল, তাদের মধ্যেই কয়েকজন বেঁচে গিয়েছিল আর যারা তা করেনি, তারা সবাই ভবলীলা সাঙ্গ করেছে।

উদরাময়ের চিকিৎসা ছিল আরো সাংঘাতিক ও উদ্ভট। কলকাতা মেডিকেল কলেজের প্রতিষ্ঠাকালের শিক্ষক ডাক্তার গুডিভ চক্রবর্তী একটি গবেষণালব্ধ প্রবন্ধে লিখেছেন, "উদরাময়ে শক্তিবৃদ্ধি করার প্রয়োজন বলে প্রাচীন ডাক্তাররা রোগীদের পোলাও, কারী, মুর্গীর কাবাব ও অপর্যাপ্ত পরিমাণে মুর্গীশাবক নির্যাস (মরিচ মিশিয়ে), দু'-এক দাগ ওষুধ, অল্প ব্র্যাণ্ডি ও জল এবং শেষকালে একথালা ফল খেতে নির্দেশ দিতেন!" 'ক্যালকাটা রিভিউ' পত্রিকায় প্রকাশিত ডাক্তার লিণ্ড-এর একটি প্রবন্ধ অনুযায়ী প্রাচীন পোর্তুগীজ ডাক্তার-দের কিন্তু ডিসেণ্ট্রি বা উদরাময়ের সমূহ প্রতিকার বা 'গ্র্যাণ্ড কিয়োর'-এর সম্বন্ধে অন্য ধারণা ছিল। তাঁদের মতে ইউরোপীয়-দের এই ব্যাধি থেকে পরিত্রাণের একমাত্র উপায় ছিল ইউরোপীয়দের দেহে প্রবাহিত রক্তের বদলে ভারতীয় রক্ত প্রবাহিত করা। ডাঃ লিণ্ড লিখেছেন যে, পোর্তুগীজরা 'এই কঠিন কাজটি' সম্পাদন করতে চেষ্টা করতেন ইউরোপীয় দেহ থেকে বারে বারে রক্তক্ষরণ করিয়ে প্রায় নির্জীব করে দিয়ে তারপর ভারতে উৎপন্ন শাকসব্জি ও অন্যান্য পুষ্টি-কর আহার্য দিয়ে 'খাঁটি ভারতীয় রক্ত' ইউ-রোপীয় দেহে উৎপন্ন করে! যদিও জানার উপায় নেই ক'জনা ইউরোপীয় এই 'রক্ষা-কবচ' লাভ করেছিলেন এবং আদৌ এভাবে তা লাভ করা যায় কিনা। তবু মনে হয় আধুনিক কালের 'ব্লাড-ট্রান্সফিউসানের' প্রথা সে সময়ে আবিষ্কৃত হয়ে থাকলে হয়তো প্রাচীন-পন্থী পোর্তুগীজ উদ্ভটসাগরদের পরিশ্রমের লাঘব হত।

প্রাচীন কলকাতার ইউরোপীয় ডাক্তার সাহেবরা যেন সব সময়েই তাঁদের 'ল্যানসেট' উঁচিয়ে থাকতেন—কখন কার দেহে কোপ বসিয়ে রক্তপাত করবেন বলে। জ্বরের চিকিৎসারও ছিল এই ব্যবস্থা—রক্তক্ষরণ। অবশ্য আনুষঙ্গিকভাবে 'বার্ক' (একরকম তেতো গাছের ছাল)-এর নির্যাস সেবনের বিধি-ব্যবস্থাও থাকতো। 'বার্ক'-এর আরক সেকালে জ্বরের প্রতিষেধক হিসাবেও ইউ-রোপীয়রা নিয়মিত সেবন করতেন এবং এর অনিয়ম করেই অনেকে, বিশেষ করে সুরা-পায়ীরা, জ্বর-জ্বারি ডেকে আনতেন এবং সেই সঙ্গে অকালমৃত্যুকেও। প্রাচীন ইংরাজ-লেখকদের মতে কলকাতার ইংরাজরা স্থানীয় আবহাওয়ার সঙ্গে খাপ খাইয়ে তাঁদের জীবনধারার রীতি, আহার্য ও বেশভূষার সামঞ্জস্যবিধান করতে পারেননি বলেই তাঁরা এত বেশী রোগাক্রান্ত হতেন। ১৭৮০ সালে দেখা যায় যে, একটি সরকারী বিজ্ঞপ্তিতে কলকাতার ইংরাজদের অপরিমিত ও অসামঞ্জস্যপূর্ণ আহারের বিরুদ্ধে সতর্ক করে দেওয়া হচ্ছে। এই বিজ্ঞপ্তিটি প্রচারিত হয়েছিল যখন ইংরাজদের মধ্যে হার্ট-ফেল করে হঠাৎ মৃত্যুর হার ক্রমে বৃদ্ধি পাচ্ছিল এবং বিশেষ করে যখন একটি জাহাজের জনৈক অভিজ্ঞ চিকিৎসক কলকাতার পথে আচমকা মারা যান। জানা যায় যে, ডাক্তার সাহেবটি তার আগেই জাহাজের মধ্যে গো-মাংসসহকারে ভুরিভোজন সেরে বেরিয়ে-ছিলেন। কলকাতার প্রাচীনা ইংরাজ-ললনারা অনেকে ক্ষয়রোগে ভুগে মারা গেছেন। এর প্রধান কারণ ছিল তাঁদের বাংলার রুদ্র পরিবেশের মধ্যেও অত্যধিক নর্তন-প্রিয়তা। হায়! তখন এই রোগের একমাত্র চিকিৎসা-ব্যবস্থা ছিল সুখসাগরের (স্থানটি এখন গঙ্গার বক্ষে বিলীন) স্বাস্থ্যকর আব-হাওয়ার মধ্যে থেকে, হয়তো সামান্য বিলম্বিত কিন্তু অবধারিত আসন্ন মৃত্যুর জন্য দিন গোণা। ১৮০৩ সালে লর্ড ভ্যালেনসিয়ার লেখা থেকে জানা যায় যে, ইংরাজ মেয়েরা আর এক কারণে প্রায়ই কলকাতায় দুরারোগ্য ব্যাধিতে আক্রান্ত হতেন —নাচঘর থেকে গলদঘর্ম হয়ে বেরিয়ে এসেই খোলা বারান্দায় ঠাণ্ডা জলো হাওয়া গায়ে লাগিয়ে তাঁরা বিশ্রাম করতে বসতেন। এই নর্তন-তৎপরাদের ফ্যাকাশে, রক্তিমাভা-বিবর্জিত, রুগ্ন মুখাবয়ব দেখে জনৈক ইংরাজ-রসিক মন্তব্য করেন—বোধহয় দুঃখেই যে, "আমার ইতিমধ্যেই মনে হতে শুরু হয়েছে যে, এর চেয়ে তামাটে রঙের মুখের ঝলসানো ঔজ্জ্বল্য যেন অপরিসীমভাবে কাম্য!"

সে-কথা থাক। ইংরাজ রসিক-পুরুষ তাঁর মতামত নিয়ে থাকুন কিন্তু হ্যামিলটন তাঁর কলকাতা পরিদর্শনকালে (১৭১২) যে হাসপাতালটিকে যেন ভীতিপ্রদ এক ইঙ্গিত বহন করে কলকাতার প্রাচীনতম কবরস্থানের (যার এক অংশে এখন সেণ্ট জন্‌স চার্চ রয়েছে) কাছেই অবস্থিত দেখেছেন এবং তার বিষয়ে যে মন্তব্য রেখে গেছেন, তার মধ্যে মনে হয় আদৌ অতিরঞ্জন নেই। তিনি লিখে গেছেন যে, "সেখানে অনেকেই যান নিরাময় হবার জন্য ক্লেশভোগ করতে কিন্তু কেউই হাসপাতালটির কার্যা-বলীর বিবরণ দেবার জন্য বেরিয়ে আসেন না।"

প্রাচীন ইংরাজ লেখকদের রচনা থেকে জানা যায় যে, শেষ সময়ে অনেক ক্ষেত্রে ইউরোপীয়রা 'ইণ্ডিয়ান ডক্‌টরদের' তলব করতেন কিন্তু তাঁরা তাঁদের 'হট অ্যাণ্ড কোল্ড' রোগের জন্য গরম ও ঠাণ্ডা দাবাই কিংবা তাঁদের মন্ত্রতন্ত্র ও দৈবিক চিকিৎসা দিয়ে আর কিছু না পারুন, অন্তত রোগীর মৃত্যুর সময়টি কিন্তু নির্ভুলভাবে বলে দিতে পারতেন—আর সেটা তাঁরা সচরাচর নির্ণয় করতেন গঙ্গায় ভাঁটার সময়ে। ইউরোপীয় মিশনারীদের ঘোর আপত্তি সত্ত্বেও অনেক সময় দেখা যেতো যে, কলকাতার প্রাচীন 'রোড টু কালিগট' বা কালীঘাটের রাস্তা (বর্তমান চৌরঙ্গী রোড) বেয়ে মুমূর্ষু ইউরোপীয় রোগীর হতাশ্বাস আত্মীয়স্বজন, বিশেষ করে মেয়েরা, হেঁটে চলেছেন কালী-মন্দিরে পূজা দিতে—'মির‍্যাক্‌ল্‌' ঘটানোর

শক্তির অধিকারিণী হিন্দুদের এই 'গডোলের' সাহায্য লাভের মানসে।

উপরে বর্ণিত উল্ভট সাহেব ডাক্তারদের সরকারী মাইনে যদিও প্রাচীনকালে মাসিক পঞ্চাশ টাকার বেশী হত না, তবু প্রাইভেট প্র্যাকটিস করে তাঁরা বেশ পুরুষ্টু কি আদায় করে ছাড়তেন। পাল্কি করে এসে প্রত্যেক হাজীরার দরুণ ১৭৮০ সনে তাঁরা এক মোহর করে 'ভিজিট' সংগ্রহ করতেন। বিশেষ কিছু করতে হলে তাঁদের বিরাট উপরি চাহিদা মেটাতে হত। তাছাড়া তাঁরা চড়া দরে ওষুধ বিক্রি করে মোটা অংকের লাভ করতেন। ১৭৮০ সালে এক আউন্স 'বার্ক'-এর আরকের দাম তিন টাকা আর জ্বরের বড়ির দাম প্রতিটি এক টাকা করে সেকালের ডাক্তার সাহেবরা ধার্য করেছিলেন।

অবশ্য এই ইউরোপীয় 'মেডিক্যাল জেণ্টলম্যান'দের হাতুড়ে দলের সঙ্গে যে কয়েকজন ভাল ডাক্তারও ভারতে আসতেন না এমন নয়। পূর্ব ভারতে ইংরাজদের প্রারম্ভিক প্রতিষ্ঠালাভের মূলে ছিলেন দুইজন সুদক্ষ ইংরাজ চিকিৎসক। ১৬৩২ সালে যখন সম্রাট শাজাহান পোর্তুগীজদের দখল থেকে হুগলী কেড়ে নিয়ে মোগল সাম্রাজ্যভুক্ত করেন, তখন ওলন্দাজ ও ইংরাজরা সেখানে কুঠি স্থাপনের জন্য অনুমতি প্রার্থনা করেন। ওলন্দাজরা সহজেই তা পেয়ে গেলেন কিন্তু ইংরাজদের ক্ষেত্রে ওঠে নানান আপত্তি। এই সময়ে সম্রাটের প্রিয় দুহিতা জাহান-আরা বেগম গুরুতর-ভাবে পীড়িত হয়ে পড়েন। হাকিমেরা তাঁর জীবনের আশা ছেড়েই দিলেন। শুভাশ সম্রাট আগন্তুক ইংরাজ প্রতিনিধি দলের মধ্যে গ্যাব্রিয়েল ব্রাউটন নামে একজন বিশিষ্ট চিকিৎসক রয়েছেন শুনে কন্যার জীবনরক্ষার শেষ চেষ্টা করার জন্য তাঁকে তলব করেন।

ব্রাউটনের সুচিকিৎসায় জাহান-আরা আরোগ্য লাভ করায় সম্রাট খুশি হয়ে হুগলীতে ইংরাজদের কুঠি স্থাপনের অনুমতি দিয়ে-ছিলেন। তারপর ১৭৯৫ সাল—ইংরেজদের তখন বর্ধিষ্ণু অবস্থা। সুতানুটি, ডিহি-কলকাতা, গোবিন্দপুর—এই তিনটি বেশ বড়গোছের গ্রাম-সম্বলিত 'ক্যালকাট্টা'র তাঁরা মালিক হয়ে বসেছেন কিন্তু তাতেও তাঁদের মন সরে না। চাই আরও প্রসার। আশে-পাশের হাওড়াসমেত বেলগাছিয়া, শিয়ালদহ, বাগমারি, মিরজাপুর, চিৎপুর, চৌরঙ্গী প্রভৃতি ৩৮টি গ্রামের মালিকানা তাঁদের না পেলে চলে না। রাজধানীতে এবারও এক ইংরাজ প্রতিনিধি দল পাঠানো হল এবং বোধহয় পূর্ব অভিজ্ঞতার ফলেই এই দলের মধ্যে উইলিয়াম হ্যামিলটন নামে জনৈক নিপুণ শল্যবিদকেও অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছিল যদি বা তিনি কোনও কাজে লাগেন এই আশায়। মোগল মসনদে তখন সম্রাট ফারুক-শায়ার অস্তমুখী মোগল-রবির স্তিমিত আলোকে বিরাজমান হলেও ঠাট বজায় রেখেছেন ষোল আনা। ইংরাজ দল পৌঁছে দেখেন দিল্লী উৎসব-মুখর—সম্রাটের সঙ্গে মারওয়ার রাজদুহিতা বাই ইন্দুকুমারীর বিবাহ সমাসীন। এই পরিবেশে ইংরাজরা শত চেষ্টা সত্ত্বেও তাঁদের উদ্দেশ্য সিদ্ধির কোনও কুল-কিনারা পান না। কিন্তু ভাগ্য-দেবী অবশ্যই ইংরাজদের অনুকূল ছিলেন এ-কথা বলতেই হবে। তা না হলে সম্রাট এই সময়ে হঠাৎ কঠিন উদর পীড়ায় আক্রান্ত হয়ে পড়বেন কেন? আর হাকিম সাহেবদের সকল দাবাই ও বিধি-ব্যবস্থাই বিফল হবে কেন? শুভদিনটির আর বেশী দেরী নেই। ইংরাজদের সামনে এক বিরাট সম্ভাবনাপূর্ণ সুযোগ উপস্থিত। কালবিলম্ব না করে ইংরাজ সার্জন হ্যামিলটন এগিয়ে এলেন

তাঁর পাশ্চাত্য চিকিৎসা-শাস্ত্রের জ্ঞানসম্ভার নিয়ে এবং শীঘ্রই সময়মত সম্রাটকে নিরাময় করে তুললেন। কৃতজ্ঞ সম্রাট প্রফুল্লচিত্তে ইংরাজদের এই ৩৮টি গ্রামের মালিকানা তো এক 'নিশান'-এর মারফৎ দিলেনই, উপরন্তু ডাক্তার হ্যামিলটনকে ব্যক্তিগতভাবে পাঁচ সহস্র মুদ্রা, একটা হাতি, দুটি হীরের আংটি, ও দামী পাথর বসানো হরেক জিনিস ছাড়াও তাঁর সার্জিক্যাল যন্ত্রপাতি আর কোট ও ওয়েস্টকোটের বোতামগুলি সোনা দিয়ে গড়িয়ে দিয়েছিলেন।

উনিশ শতকের প্রারম্ভ থেকেই কিন্তু ইউরোপে চিকিৎসা-বিজ্ঞানের উন্নতির সঙ্গে কলকাতার তথা ভারতের চিকিৎসা-ব্যবস্থাও প্রভূত উন্নতি সাধিত হয়। আজ ভারতের চিকিৎসা-বিজ্ঞানের অন্যতম পীঠস্থান এই মহানগরীতে বসে কল্পনাও করা যায় না যে, ১৮৪০ সালে কলকাতা মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতাল প্রতিষ্ঠার পর যখন সর্ব-প্রথম এক হিন্দু ছাত্র (মধুসূদন গুপ্ত)-কে দিয়ে ইংরাজ শিক্ষকরা তাঁর কুসংস্কারের বাধার বেড়াজাল ভেঙে দিয়ে এক শব-ব্যবচ্ছেদ করাতে সক্ষম হয়েছিলেন, তখন ফোর্ট উইলিয়াম থেকে একবার তোপধ্বনি করে এই ঘটনাটিকে সম্মানিত করা হয় আর প্রিন্স দ্বারকানাথ ঠাকুর ও ডাক্তার গুডিভের যুগ্ম উৎসাহে ও আর্থিক অনুকূল্যে ১৮৪৪ সালের ৮ই মার্চ 'বেনটিঙ্ক' জাহাজে চড়ে যখন প্রথম চারজন ভারতীয় ছাত্র (গোপালচন্দ্র শীল, দ্বারকানাথ বসু, সূর্য-কুমার চক্রবর্তী ও ভোলানাথ বসু) ইংলণ্ডে চিকিৎসাশাস্ত্রে উচ্চশিক্ষা লাভের জন্য পাড়ি দিয়েছিলেন, তখন তাঁদের কি পরিমাণ সামাজিক বাধাবিঘ্ন অতিক্রম করতে হয়ে-ছিল, তা ভাবলে আজও বিস্ময় জাগে!

মৃত্যুর আলোয়

সৌম্যেন দত্ত

তখনও সূর্য ওঠে নি। কিন্তু প্রসন্ন প্রত্যুষের আলোয় সারা আকাশ উদ্ভাসিত। নিউ মেক্সিকোর দিগন্তবিস্তৃত মরুভূমির বুকে তখনও এক আশ্চর্য স্তব্ধতা। এক প্রগাঢ় শান্তির অনুভূতি।

তখন ভোর ৫-২৯ মিনিট। ১৬ই জুলাই, ১৯৪৫ খৃষ্টাব্দ।

এর ঠিক এক মিনিট পরেই ঘটল এক প্রচণ্ড বিস্ফোরণ।

সঙ্গে সঙ্গে অসংখ্য অগ্নিগোলক ভোরের আকাশের দিকে উৎক্ষিপ্ত হল। মনে হল যেন একসঙ্গে সহস্রাধিক সূর্য উদিত হয়েছে। পৃথিবীর প্রলয় মুহূর্ত সমাসন্ন। এক প্রচণ্ড শব্দের ধ্বনিতে প্রতি-ধ্বনিতে সারা বিশ্বচরাচর কম্পমান।

এই হল পৃথিবীর বুকে প্রথম পারমাণবিক বোমার বিস্ফোরণ। এর পেছনে যে বিচিত্র কর্মযজ্ঞের ইতিহাস—তার ঋত্বিক শতাধিক হলেও, মূল হোতা সম্ভবতঃ একজনই। তিনি রবার্ট ওপেনহিমার।

যিনি সত্যিই এক আশ্চর্য মানুষ। তিন বছরের অমানুষিক পরিশ্রমে তিনি ঐ বিশ্ববিধ্বংসী বোমা তৈরীর কাজে নেতৃত্ব দিয়েছেন। আশাতীতভাবে সফলও হয়েছেন। কিন্তু......

কিন্তু ঐ বিস্ফোরণস্থল থেকে ন'মাইল দূরের এক নিয়ন্ত্রণ কেন্দ্রে বসে ওপেনহিমার তখন প্রায় ধ্যানস্থ। কি যেন এক অব্যক্ত বিষাদে তিনি গীতার একাদশ অধ্যায় থেকে মূল সংস্কৃতে আবৃত্তি করে চলেছেন।—

"দিবি সূর্যসহস্রস্য ভবেদ্ যুগ-পদুত্থিতা।

যদি ভাঃ সদৃশী সা স্যাদ্ ভাসস্তস্য মহাত্মনঃ।"

(যদি আকাশে যুগপৎ সহস্র সূর্যের প্রভা উদিত হয়, তা হলে সেই দীপ্তি বিশ্বরূপের প্রভাব কিঞ্চিৎ তুল্য হতে পারে।)

একদিকে বিজ্ঞানী ওপেনহিমার পরমাণুবোমার পরীক্ষামূলক বিস্ফোরণের পুঙ্খানুপুঙ্খ প্রতিবেদন লিখেছেন। অন্যদিকে মানুষ ওপেনহিমার মানবজাতির আসন্ন দুর্যোগের কথা ভেবে হয়েছেন ব্যাকুল। তিনি যেন কুরুক্ষেত্রে সমাগত অনিচ্ছুক অর্জুনের মতই নিজের বিক্ষত বিবেকের সঙ্গে একটা আপোষ রফা করতে ব্যস্ত। তাই ঐ বিস্ফোরণের বিশ্ববিধ্বংসী রূপ দেখতে দেখতে তাঁর ভগবান শ্রীকৃষ্ণের এই উক্তি মনে পড়েছে—

"কালোঽস্মি লোকক্ষয়কৃৎ প্রবৃদ্ধো লোকান্ সমাহর্তুমিহ প্রবৃত্তঃ।"

(আমি লোকক্ষয়কারী প্রবৃদ্ধ কাল। বর্তমানে লোকসংহার করতে প্রবৃত্ত হয়েছি।)

* * *

রবার্ট ওপেনহিমারের জন্ম নিউইয়র্ক শহরে। ২২ এপ্রিল, ১৯০৪ খৃষ্টাব্দে।

পিতা জুলিয়াস ওপেনহিমার ছিলেন বিশিষ্ট বস্ত্র ব্যবসায়ী। ১৮৮৮ খৃষ্টাব্দে তিনি জার্মানী থেকে আমেরিকায় পাড়ি জমান। সেই থেকে আর দেশে ফেরেন নি। ধর্মে ইহুদী, তাই পৃথিবীর কোথাও প্রবাসী নন।

অতি শৈশব থেকেই রবার্টের প্রতিভার খ্যাতি বিস্তৃত হয়। মাত্র সাত বছর বয়সেই তিনি অনুবীক্ষণ যন্ত্রের সাহায্যে জীবাণুদের কার্যকলাপ পরীক্ষা করে দেখছেন। গড়ে তুলছেন বহুবিধ ভূতাত্ত্বিক প্রস্তরের এক বিচিত্র সংগ্রহ। অনেক বিদেশী ভাষাতেও ইতিমধ্যে তাঁর মোটামুটি দখল জন্মেছে। মূল গ্রীক ভাষায় প্লেটোর রচনা থেকে আবৃত্তি করে তিনি সকলকে অবাক করে দিচ্ছেন। ছবি আঁকাতে ও বাজনা বাজাতেও তাঁর সমান পারদর্শিতা। ঐ বয়সেই পাড়া-প্রতিবেশীদের কাছে তিনি তখন "বালক যাদুকর" নামে পরিচিত। মাত্র এগারো বছর বয়সেই তিনি নিউইয়র্ক মিনারোলজিকাল সোসাইটির সদস্য মনোনীত হন। সেই সঙ্গে আলোকতত্ত্বের ওপর একটা মৌলিক প্রবন্ধ লিখে শিক্ষকদের চমৎকৃত করে দেন।

বারো বছর বয়স থেকে রসায়ন ও গণিতশাস্ত্রের প্রতি তাঁর গভীর আগ্রহ দেখা দেয়। তিনি লিখেছেন যে, ঐ সময় থেকেই "বিশ্বপ্রকৃতির অন্তরালে যে অটুট শৃংখলা ও সামঞ্জস্য বর্তমান" তিনি তার প্রতি আকৃষ্ট হন। পিতার আনুকূল্যে তিনি নিজেই একটি ছোটখাট রাসায়নিক গবেষণাগার গড়ে তোলেন। রসায়নশাস্ত্রের জনৈক অধ্যাপকের তত্ত্বাবধানে তিনি মাত্র দেড় মাসের মধ্যেই পুরো একটি বছরের পাঠক্রম শেষ করেন।

উনিশ বছর বয়সে তিনি হার্ভার্ড বিশ্ববিদ্যালয়ে রসায়ন শাস্ত্র পড়তে যান। চার বছরের পড়া তিন বছরের মধ্যেই শেষ করে তিনি সর্বোচ্চ সম্মানের সঙ্গে ঐ বিশ্ববিদ্যালয়ের স্নাতক উপাধি প্রাপ্ত হন। হার্ভার্ডে তাঁর ছাত্রজীবনের স্মৃতিকথা লিখতে গিয়ে তাঁর জনৈক সহপাঠী লিখছেন যে, ঐ সময়ে রবার্ট প্রায় গ্রন্থাগারের মধ্যেই দিনযাপন করতেন। কি যেন এক আগ্রাসী ক্ষুধা নিয়ে ওখানের প্রতিটি আলমারীর আনাচে-কানাচে তিনি হানা দিতেন।

ইতিমধ্যেই পরমাণুতত্ত্বের প্রতি তিনি আকৃষ্ট হলেন। কেম্ব্রিজে লর্ড রাদারফোর্ড এর সাহচর্যে তিনি এক বছর কাটান। এর পর বিখ্যাত পরমাণুবিজ্ঞানী ম্যাক্স বর্ণের তত্ত্বাবধানে মাত্র তিন সপ্তাহের মধ্যেই তিনি গ্যায়টিংগন বিশ্ববিদ্যালয়ে কোয়ান্টাম তত্ত্বের ওপর একটি গবেষণামূলক নিবন্ধ (বিষয় : 'অণুর ওপর শক্তির প্রতিক্রিয়া') পেশ করে পি, এচ, ডি উপাধি লাভ করেন (১৯২৭ খৃঃ)। তখন তাঁর বয়স মাত্র তেইশ বছর।

ওপেনহিমার যখন দেশে ফেরেন তখন আমেরিকার প্রায় দশটি বিশ্ববিদ্যালয় থেকে তাঁর ডাক এসেছিল। এর মধ্যে তিনি ক্যালিফোর্ণিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ে ও সেখানের ইনস্টিটিউট অফ টেকনোলজিতেই যুক্তভাবে অধ্যাপনার কাজ বেছে নেন। একটি ছাত্র দিয়ে শুরু করে তিনি বার্কলিতে বিশুদ্ধ পদার্থবিদ্যায় উচ্চতর শিক্ষালাভের একটি বৃহত্তম কেন্দ্র গড়ে তোলেন।

কিন্তু ওপেনহিমারের মনীষা কেবলমাত্র তাঁর বিশেষজ্ঞতার সংকীর্ণ গণ্ডীতেই আবদ্ধ থাকে নি। বিজ্ঞানের অন্যান্য শাখা প্রশাখাতেও তাঁর স্বচ্ছন্দ সঞ্চরণ ছিল। সেই সঙ্গে দর্শন, সাহিত্য ও শিল্পকলাতেও তাঁর আগ্রহ ছিল অপরিসীম। চিরায়ত সাহিত্য ছাড়াও আধুনিক কবিতা উপন্যাস ও নাটক সম্পর্কেও তাঁর খোঁজখবর ছিল যেকোন সাহিত্যরসিকদের কাছেও ঈর্ষার-যোগ্য। এছাড়াও নতুন নতুন ভাষা শেখায় তাঁর ছিল অফুরন্ত উৎসাহ। তিরিশ বছর বয়সে তিনি সংস্কৃত শিখতে সুরু করেন। পরবর্তীকালে সংস্কৃত কাব্য ও শাস্ত্রের অংশবিশেষ তাঁকে প্রায়ই আবৃত্তি করতে শোনা যেত।

জীবনের প্রথমদিকে সমসাময়িক সমাজ সম্পর্কে ওপেনহিমার খুবই উদাসীন ছিলেন। তিনি বাড়ীতে টেলিফোন রাখতেন না। খবরের কাগজ পড়তেন না। এমনকি ১৯৩৬ খৃঃ পর্যন্ত আমেরিকার কোনো নির্বাচনে ভোটও দেন নি। কিন্তু যখন জার্মানীতে ইহুদী নির্যাতনের মর্মন্তুদ সব কাহিনী তাঁর কানে এসে পৌঁছয় (যাঁদের মধ্যে কেউ কেউ তাঁর আত্মীয়)— তখন থেকেই ওপেনহিমার রাজনীতি বিষয়ে সচেতন হয়ে উঠলেন।

তাই প্রেসিডেন্ট রুজভেল্টের আহ্বানে ১৯৪২ খৃষ্টাব্দে তিনি আমেরিকার পরমাণু বোমা নির্মাণ প্রকল্পে যোগ দিতে দ্বিধা করেন নি। বলতে গেলে ওপেনহিমারের নেতৃত্বের ফলেই আমেরিকা জার্মানীর আগে ঐ বোমা তৈরী করতে সক্ষম হয়। যা দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের ফলাফলকে খুবই ত্বরান্বিত করেছে। তাই সাধারণ মানুষের চোখে ওপেনহিমার আজ "পরমাণু বোমার জনক"রূপে বিখ্যাত।

কিন্তু হিরোশিমা বিধ্বস্ত হবার পর থেকেই আমরা যেন ওপেনহিমারকে বারবারই একটা প্রবল অন্তর্দ্বন্দ্বে বিক্ষত হতে দেখি। তাই কখনো তিনি পরমাণু বোমাকে আন্তর্জাতিক সংস্থার নিয়ন্ত্রণে আনতে বলেন। কখনো হাইড্রোজেন বোমা নির্মাণের কাজে আপত্তি জানান। কখনো পরমাণু বোমার ভয়াবহ পরিণামের বিষয়ে জনসাধারণকে অবহিত করার কাজে সরকারকে ব্রতী হতে আবেদন জানান। কখনো লেখেন, "পরমাণু বোমা তৈরী করে পদার্থবিজ্ঞানীরা কি পাপ করেছেন, আমি জানি। কিন্তু এর পেছনে অন্তর্নিহিত যে তত্ত্ব, সেই জ্ঞানের সম্পদ থেকে ত মানুষকে বঞ্চিত করা যায় না।" কখনো আশ্বস্ত হন পরমাণুশক্তির মানব কল্যাণে ব্যবহৃত হওয়ার অফুরন্ত সম্ভাবনার কথা ভেবে।

কিন্তু ওপেনহিমারের এইসব আপাত-বিরোধী উক্তি সেদিন মার্কিন সরকারকে তাঁর প্রতি সন্দিগ্ধ করে তুলেছিল, একটি রাজনৈতিক মতবাদে বিশ্বাসের অজুহাতে তাঁকে তাঁর গুরুত্বপূর্ণ কর্মভার থেকে অব্যাহতি দেওয়া হয়। এই অস্বস্তিকর পরিস্থিতির অবসান ঘটান প্রেসিডেন্ট কেনেডি। মূলতঃ তাঁরই সুপারিশে ১৯৬৩ খৃষ্টাব্দে ওপেনহিমারকে ৫০ হাজার ডলারের 'এনরিকো ফার্মি' পুরস্কার দেওয়া হয়।

অবশ্য মার্কিন পারমাণবিক প্রকল্পের সঙ্গে ওপেনহিমারের কোনো সম্পর্কই আর কোনোদিন ফিরে আসে নি। হয়ত না এসে ভালই হয়েছিল। প্রিন্সটনে আইনস্টাইন প্রমুখ মনীষীর সাহচর্যে বিশুদ্ধ জ্ঞান-বিজ্ঞানের রাজ্যে বিচরণ করার অবাধ স্বাধীনতা পেয়ে তিনি হয়ত খুশীই হয়েছিলেন।

আর এই নিভৃত সাধনায় ব্রতী থেকেই ওপেনহিমার মৃত্যুকে বরণ করেছেন। তিনি বিশ্ববিধ্বংসী বোমা তৈরী করেছেন সত্য, কিন্তু শেষ পর্যন্ত অমানুষিক শক্তির কাছে নিজের বিবেককে বিক্রী করে যান নি।

বিচিত্র ক্লাব : বিচিত্র কাহিনী

রাসবিহারী রায়

মত, পেশা, রুচি, খেয়াল, স্বার্থ, অনুরাগ অনেক কিছুই প্রেরণা জোগায় মানুষকে ক্লাব গঠন করতে। সাহিত্য সংস্কৃতির ক্লাব থেকে 'কেনেল ক্লাব' পর্যন্ত সব ক্লাবেরই মর্মকথা 'বার্ডস অব এ ফেদার ফ্লক টুগেদার'। ক্লাব সমাজের দর্পণ, ক্লাবের ইতিহাস সমাজের ইতিহাস। এখানে কিন্তু লিখছি না ক্লাবের ধারাবাহিক ইতিকথা। তাই বাদ পড়েছে দেশ-বিদেশের খ্যাত-অখ্যাত অনেক ক্লাব। বাদ পড়ছে ইংলণ্ডের বিখ্যাত 'মারমেড ট্যাভার্ন', 'অ্যাথেনিয়াম' ও 'লিটারেরি ক্লাব' রানী অ্যানের সময়কার শ'পাঁচেক 'কফি হাউস' আর প্যারিসের অসংখ্য হাস্যমুখর কাফের প্রসঙ্গও তুলছি না এখানে। বলছি কেবল কয়েকটি মাত্র ক্লাবের বিচিত্র কথা, বিচিত্র কাহিনী।

দজ্জাল মেয়েদের ক্লাব

আমেরিকার একটি বিচিত্র ক্লাবের কথা দিয়েই শুরু করি। এটা ছিল স্বার্থ-সচেতন দজ্জাল মেয়েদের ক্লাব। বিয়ের আগে এরা বরকে বিচারকের সামনে নিয়ে গিয়ে এফিডেভিট করিয়ে ছাড়তো। বিয়ের পর স্বামীদের কতকগুলো সর্ত পালন করতে হবে এই ছিল তাদের দাবী। কয়েকটা সর্ত এই :—

মাইনের টাকা সব স্ত্রীর হাতে তুলে দিতে হবে।

রাত্রি ৯টার আগে ঘরে ঢুকতে হবে।

স্ত্রীর বিনা অনুমতিতে কারুর সঙ্গে নাচতে পারবে না।

কোন নেশা করা চলবে না, সারাদিনে ৫টির বেশী সিগারেট খাওয়া চলবে না।

স্ত্রীর আত্মীয়-স্বজনদের সঙ্গে ভাল ব্যবহার করতে হবে।

ছেলে-মেয়েদর যত্ন নিতে হবে।

কুকুর পোষা চলবে না।

ই ক্লাবের নাম Xanppe club ? ক্রেটিসের দজ্জাল স্ত্রীর নামেই নামকরণ া হয় এই ক্লাবের।

উল্টো ক্লাব

শিকাগো শহরের কিছু লোকের মাথায় ভুত খেয়াল চাপে। নতুন একটা কিছু ় তাক লাগাবে তারা। সৃষ্টি করে এক চত্র ক্লাব। নামকরণ করে 'রিভার্স ক্লাব'। ব খামখেয়ালী সভ্যেরা পোষাক পরতো টা করে, স্বাগত জানাতো 'গুড বাই' । যখন ক্লাবঘরে ঢুকতো তখন পেছন রই ঢুকতো। দেওয়ালে ছবি টাঙাতো টা করে। ডিনার শুরু করতো dessert ফল ও মিষ্টি দিয়ে, আর শেষ করতো প বা ঝোল দিয়ে। ক্লাবের সভ্যসংখ্যা ৩৯, কিন্তু কেউ সভ্য-সংখ্যা জানতে চাইলে তারা এই সংখ্যাকেই উল্টে বলতো ৯৩।

আর্টিস্টদের ক্লাব

মাইকেল এঞ্জেলো এক ক্লাবের পত্তন করেন। এটা ছিল শিল্পীদের ক্লাব। এই ক্লাবের একটি বিশেষ সর্ত মেনে চলতে হতো। সভ্যদের প্রত্যেককে একজন সঙ্গিনী বা প্রণয়িণী আনতে হতো ক্লাবে একলা আসা চলতো না। বর্ণাঢ্য সাজে সঙ্গিনীরা সব আসতো সভ্যদের সঙ্গে। গুলজার করতো ক্লাবের আসর।

বেনভেণ্টো সিলিনি এক পরমাসুন্দরী নারীর প্রেমে পড়েন, তাকেই তিনি সঙ্গে নিয়ে ক্লাবে আসতেন। কিন্তু কি দুর্ভাগ্য সেলিনির, তাঁরই এক অন্তরঙ্গ বন্ধু এই নারীকেই ভালবেসে ফেলে। হয়তো এটা লাভ অ্যাট ফার্স্ট সাইট্। সে যাই হোক, ব্যাপারটা কিন্তু বেশ চাঞ্চল্যের সৃষ্টি করে। সেলিনি তাঁর বন্ধুর হাতেই এই সুন্দরীকে ছেড়ে দিতে বাধ্য হন। কিন্তু সঙ্গে প্রণয়িণী না থাকলে ক্লাবে তো প্রবেশ নিষিদ্ধ। আর প্রণয়িণী জোগাড় করাও তো সহজ নয়। তাই সেলিনি এক ফন্দী আঁটলেন। তাঁর বাড়ীর পাশেই থাকতো এক মিস্ত্রির ১৬ বছর বয়সের এক সুদর্শন ছেলে। তাকেই নারীর বর্ণালী পোষাকে সাজিয়ে, মাথায় পরচুলা চাপিয়ে, হাতে আংটি, গলায় হার পরিয়ে সঙ্গিনী বলে ক্লাবের সভ্যদের সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দেন। মাইকেল এঞ্জেলো বালককেই সেলিনির প্রণয়িণী মনে করে সানন্দে অভিনন্দন জানান। বালকটির কণ্ঠস্বর ছিল মধুর, গানও গাইতো সে চমৎকার। কবিতা পাঠ ও আবৃত্তিও করতো সুন্দর। বেশ কিছুদিন এমনি করেই কেটে যায়। কিন্তু পরে এই ধাপ্পা ধরা পড়ে। সেলিনি তাঁর আত্মচরিতে এসব কাহিনী লিপিবদ্ধ করে গেছেন।

ফ্যাট্ মেনস্ ক্লাব

রানী অ্যানের সময়ে এই বিচিত্র ক্লাবের জন্ম হয় ইংলণ্ডে—এ ক্লাব অব ফ্যাট্ মেন। মেদবহুল লোকেরাই এই ক্লাবের সভ্য হতে পারতো। ক্লাবঘরে প্রবেশ করার দুটি মাত্র দরজা ছিল—একটি ছোট, অন্যটি বড়। যদি কেউ এই ছোট দরজার ভেতর দিয়ে সহজেই ঢুকতে পারতো, তাহলে তাকে সভ্য করা হতো না। তাকে নিরাশ হয়েই ফিরে যেতে হতো। আর কেউ যদি এই দরজা দিয়ে ঢোকবার সময় আটকে যেতো, তাহলে সেই সভ্য হবার গৌরব অর্জন করতো। এমনি করেই বাছাই করা হতো ক্লাবের সভ্য—মেদবাহুল্যই ছিল সভ্য হবার একমাত্র মাপকাঠি। মোটা লোকেদের মত রোগাদেরও ক্লাব গড়ে উঠেছিলো এই সময়ে। যত সব প্যাঁকাটি-মার্কা কংকালসার লোক মিলে একটা ক্লাব গড়ে তোলে। ক্লাবের নামকরণ করে—'এ ক্লাব অব স্কেয়ারক্রোস অ্যান্ড স্কেলিটন্স্'।

ভার্জিনস্ ক্লাব

কয়েক বছর আগে লাহোরে 'ভার্জিনস্ ক্লাব' গজিয়ে ওঠে। সভ্যারা সব ছিল কলেজের ছাত্রী, কুমারী। শুরুতেই ডজন-দুই উৎসাহী ছাত্রী এই ক্লাবের খাতায় নাম লেখায়। বিয়ের বাজার বড্ড টাইট, মেয়েদের বিয়ে দেওয়াও খুব ব্যয়বহুল। মনোমত বর জোটানো আরও কঠিন। তাই যত বেশী নারী কুমারী থাকে, সমাজের ততই মঙ্গল। তাই ঠিক করলো তারা কুমারী ব্রত গ্রহণ করবে। তারা কেউই বিয়ে করবে না। নৈব নৈব চ। কুমারীদের এই সংকল্প থেকেই এই ক্লাবের জন্ম। বলা বাহুল্য, এই ধরনের খেয়ালী ক্লাব দীর্ঘায়ু হয় না।

স্ত্রৈণদের ক্লাব

ইয়র্কশায়ার। বছর-ষাট আগেকার কথা। এখানে গজিয়ে ওঠে 'হেনপেক্‌ট হাসবেন্ডস ক্লাব' বা স্ত্রৈণদের ক্লাব। যারা স্ত্রী কর্তৃক উপেক্ষিত ও লাঞ্ছিত, তাদেরই ছিল এই ক্লাবে প্রবেশাধিকার। ক্লাবের সভ্য হতে হলে স্ত্রীর কাছে সে কিরূপ ব্যবহার পাচ্ছে, কি কি গৃহকর্ম তাকে করতে হয়, তাকে কিরূপে স্ত্রীর মনোরঞ্জন করতে হয়, এইসব খুঁটিনাটি বিষয় ক্লাবকে জানাতে হবে। দৈনিক হাত-খরচের টাকা স্ত্রীর কাছ থেকে যদি নিতে হয়, তার প্রমাণও দেখাতে হবে তাকে। এর যদি রসিদ দেখাতে পারে, তাহলে তো কথাই নেই, তাকে ক্লাবের সম্মানিত মেম্বর করে নেওয়া হতো। সভ্যরা অতি গোপনে বার্ষিক সভাও করতো, স্ত্রীদের কবল থেকে একটা দিন মুক্তি পাবার জন্যে।

দাড়িওয়ালাদের ক্লাব

দাড়িওয়ালারাও ক্লাবধর্মী হয়ে ওঠে। জন-চল্লিশ দাড়িওয়ালা এক সময়ে ডার্বিশায়ারের টাইডওয়েল শহরে এক ক্লাবের উদ্বোধন করে। ঘন চাপ দাড়ি ছিল তাদের পরম প্রিয়। তারা দাড়ির প্রতিযোগিতাও বেশ ঘটা করেই করতো। যার দাড়ি সবচেয়ে ঘন, লাল এবং মনোহারী, সেই পেতো মোটা পুরস্কার। প্রতিযোগিতার পূর্বে দাড়ি ছাঁটা ছিল নিষিদ্ধ। দাড়ি কামালে ফাইন দিতে হতো। বীমা কোম্পানীর কাছে তারা দাড়ি ইন্সিওর করেও রাখতো।

হোস্ ক্লাব

প্রাচীন ভেনিসের একটি অতি প্রসিদ্ধ ক্লাব—হোস্ ক্লাব। সব সভ্যকেই হোস্ বা মোজা পরতে হতো। নিজেদের চিনতে পারার জন্যে তারা এক পায়ে সাদা মোজা, অন্য পায়ে লাল মোজা পরতো। এই ক্লাবের প্রতীকচিহ্ন ও মটো ছিল, ছিল কড়া নিয়ম-কানুন। ক্লাবের নিয়মভঙ্গ করলে ফাইন দিতে হতো। সুদীর্ঘ ১৮০ বছর টিকে ছিল এই হোস্ ক্লাব। কোথায়ও কোন উৎসব অনুষ্ঠান হচ্ছে কোথায় বিয়ে হচ্ছে [illegible]

বিখ্যাত ব্যক্তির আগমন ঘটেছে শহরে বা কোথাও ছোটাছুটি হচ্ছে জানতে পারলেই সভ্যেরা সেখানে গিয়ে মাতব্বরি করতো। নারীদের অবাধ আনাগোনা ছিল এই ক্লাবে। এক সময়ে শহরের কয়েক হাজার মহিলা এই সভ্যদের সঙ্গিনী হয়ে ক্লাবে আসতে শুরু করে। অবাঞ্ছিত আমোদ-প্রমোদে সভ্যেরা গা ঢেলে দেয়। এইসব নারীদের মধ্যে অধিকাংশই ছিল দুশ্চরিত্রা। এরা সৃষ্টি করে নানা সমস্যা। সভ্যেরা এমন উচ্ছৃংখল হয়ে ওঠে যে, দেশের আইনকানুন পর্যন্ত নস্যাৎ করে ফেলে। হোস্ ক্লাবের সভ্যেরা দেশের কলংক হয়ে দাঁড়ায়। শাসনকর্তা কিন্তু এ সত্ত্বেও এদের ঘাটালেন না। তিনি মনে করেন, এরা আমোদ-প্রমোদে সময় কাটাচ্ছে, তাই করুক। তা না হলে এরা মেতে উঠবে রাজনীতিতে, সৃষ্টি করবে অরাজকতা। কিন্তু এমনি করে তো বেশীদিন চলে না। শেষে গভর্ণমেন্টের চৈতন্যোদয় হয়। ১৫৮৫ সালে আইন করে এই ক্লাবকে উঠিয়ে দেওয়া হয়।

টোবেকো ক্লাব

প্রথম ফ্রেডারিক প্রাশিয়ার রাজা হলেন ১৭৯২ খৃষ্টাব্দে। তিনি বসালেন ধূমপানের এক বিচিত্র আড্ডা। জমকালো পোশাক পরে রাজ্যের সম্ভ্রান্ত ব্যক্তিরা আসতো এই আড্ডায়। বৃত্তাকারে বসে মুখে লম্বা লম্বা পাইপ গুঁজে ধূমপান করতো তারা। ধূম-কুণ্ডলীতে অন্ধকার হয়ে যেতো ক্লাবঘর। এই আড্ডা আরও জমকালো হলো রাজা প্রথম উইলিয়াম ফ্রেডারিকের রাজত্বকালে। ১৭১৩ থেকে ১৭৪০ খৃষ্টাব্দের মধ্যে। তিনিই ছিলেন এই ক্লাবের মধ্যমণি। বিকেল চারটায় বসতো এই ক্লাব। ঘণ্টার পর ঘণ্টা একটার পর একটা পাইপ ধরিয়ে চলতো ধূমপান। এই ক্লাবকেই বলা হয় 'টোবেকো ক্লাব'। কার্লাইল একে বলেছেন 'টোবেকো পার্লামেন্ট'। এই ক্লাবের নিয়ম ছিল অদ্ভুত, প্রত্যেক সভ্যকে ধূমপান করতেই হবে। নেহাৎ যারা ধূমপান করে না তাদের কিন্তু মুখে লম্বা পাইপ গুঁজে বসে থাকতে হবে, এমন ভাব দেখাতে হবে যেন তারাও ধূমপান করছে। সে এক বিচিত্র ব্যাপার—দীর্ঘ সময় মুখে পাইপ লাগিয়ে বসে থাকা। অবশ্য ধূমপানের সঙ্গে প্রচুর মদ-মাংসেরও ব্যবস্থা ছিল। গল্পগুজব, তামাসা, রাজনীতিচর্চা সবই চলতো এখানে মন্ত্রী, মোসাহেব, ইয়ারবন্ধুদের সঙ্গে। ধূমপানের এই সাড়ম্বর অনুষ্ঠান রাজার মৃত্যুর পর বন্ধ হয়ে যায়।

ব্যাচেলারস্ ক্লাব

লণ্ডন শহরের জন-পঞ্চাশেক ব্যাচেলার প্রতি মাসে একবার মিলিত হয়। গ্র্যাণ্ড ডিনার খায় আর প্রতিজ্ঞা করে বিয়ে করবে না। এই ক্লাবের ওয়েটাররাও সব ব্যাচেলর। ক্লাবের ভোজসভায় কোন নারীর প্রবেশাধিকার নেই। এরা 'ব্যাচিলার্স অ্যাসোসিয়েশন অব গ্রেট বৃটেনে'র সভ্য। এদের মধ্যে আছে নানা পেশার লোক। এদের খাবার টেবিলের ওপর থাকে একটা শপথপত্র। এতে লেখা আছে—"আমি সুস্থচিত্তে এতদ্বারা ঘোষণা করছি যে, আগামী একমাস ব্যাচেলার থাকবো এবং অবিবাহিত ব্যক্তির যা নিয়মকানুন পালনীয় তাই পালন করবো। আমি যখন নারীদের সঙ্গে মেলামেশা করবো, তখন তাদের পরিষ্কারভাবে জানিয়ে দেবো যে, আমি চিরকুমার থাকবার সংকল্প গ্রহণ করেছি।" এই ক্লাবের 'চার্টার'এ নির্দেশ আছে 'যদি কোন সভ্য কখনও অস্বাভাবিক কোন পরিস্থিতিতে পড়ে, যার জন্যে তাকে হয়তো চিরকুমার ব্রত ভাঙতেও হতে পারে, তাহলে সে তখনই ক্লাবের যে-কোন সভ্যকে টেলিফোন করে তার সংকটের কথা জানাবে। সেই মুহূর্তেই সে ছুটে আসবে তার ক্লাববন্ধুকে সাহায্য করতে, তাকে নারীর কবল থেকে উদ্ধার করতে।

মলিস্ ক্লাব

কি আশ্চর্য! পুরুষেরা নারীর মত আচরণ করবে, কাপড় পরবে তাদের মত, গয়না পরবে, কথা বলবে, হাসবে, বিনিয়ে বিনিয়ে কাঁদবে নারীদের মত। এমনি অনেক বিকৃতরুচি পুরুষে সংঘবদ্ধ হয়ে এক ক্লাব গঠন করে ইংলণ্ডে, সপ্তদশ শতাব্দীর শেষের দিকে। সভ্যেরা সকল বিষয়েই মেয়েদের অনুকরণ করতো। এমনকি মেয়েরা যেমন শিশুকে দুধ খাওয়ায়, কোলে করে আদর করে ঘুম পাড়ায়, এরা'ও ঠিক একটা ডামি পুতুলকে কোলে নিয়ে এসবই করতো। কেউবা বিধবা সেজে স্বামীর জন্যে বিলাপ করতো, কেউবা আবার স্বামীর প্রশংসায় পঞ্চমুখ হতো। এইসব গর্হিত কার্যকলাপের কথা প্রকাশ হয়ে পড়ে। এদের আড্ডা ভেঙে দেওয়া হয়, পাণ্ডাদেরও দেওয়া হয় শাস্তি। এই কুখ্যাত ক্লাবের নাম মলিস্ ক্লাব। এটা ছিল দুর্নীতি ও যৌনবিকারগ্রস্থদের আড্ডা। এই ধরনের ক্লাব শুধু যে ইংলণ্ডেই ছিল তা নয়, ইউরোপের অনেক স্থানেই এর অস্তিত্ব ছিল।

অ্যালমক ক্লাব

অ্যালমক ক্লাব ছিল লণ্ডনের অভিজাত সম্প্রদায়ের ক্লাব। প্রবেশাধিকার ছিল সীমিত, নিয়মকানুন ছিল সুকঠোর। জন-ছয়েক বিদূষী মহিলা এই ক্লাব নিয়ন্ত্রিত করতেন। তাঁরাই ছিলেন এর হর্তাকর্তা-বিধাতা। কোন্ ব্যক্তি ক্লাবের ভর্তি হবার যোগ্য, সভ্যরা নিয়মকানুন পালন করছে কিনা যথাযথ—এসবের ওপর সতর্ক দৃষ্টি ছিল এঁদের। এঁদের দাপট ছিল প্রবল। বিধিনির্দেশ অমান্য করার সাধ্য ছিল না কোন সভ্যের। বংশ, পদমর্যাদা ও কাঞ্চন-কৌলিন্য বিচার করেই এই ক্লাবের সভ্য নির্বাচন করা হতো। ক্লাবের আড্ডা বসতো রাত্রি ১১টার সময়ে। এর পরে কেউ এলে তাকে ক্লাবে ঢুকতে দেওয়া হতো না। ডিউক অব ওয়েলিংটন একবার ১১টার মিনিট কয়েক পরে এসে হাজির হন, তাঁকেও প্রবেশ করতে দেওয়া হয় না ক্লাবে। এই মহামান্য ব্যক্তি মাথা হেঁট করেই ক্লাবের নিয়ম মান্য করেন। অন্য একবার তিনি ট্রাউসার পরে ক্লাবে আসেন, কিন্তু ট্রাউসার পরা তখন ফ্যাসান ছিল না বলে তাঁকে ঢুকতে দেওয়া হয় না। এখানে ছিল ফ্যাসানের রাজত্ব, জুয়াও চলতো অবাধে। ১৭৬৫ থেকে ১৮৩৫ পর্যন্ত এই ক্লাবের স্বর্ণযুগ।

দুর্বৃত্তদের ক্লাব

আঠার শতকের প্রথম দশকে লণ্ডন শহরে দেখা দেয় গভীর আতংক। এক শ্রেণীর দুর্বৃত্তদের অত্যাচারে ত্রাহি ত্রাহি ডাক ছাড়ে লণ্ডনবাসীরা। এদের দৌরাত্ম্যে লণ্ডন শহরে সৃষ্টি হয় সন্ত্রাসের রাজত্ব—রেন্ অব টেরর। এই দলকে বলা হতো মোহক্স্। এদের ছিল আড্ডা ক্লাব। প্রচুর মদ্য পান করে আড্ডা থেকে বেরিয়ে নিরীহ পথচারীদের ওপর নির্যাতন চালাতো। তরবারির খোচায় ধরাশায়ী করতো, নাক চিরে দিতো, মুখ বিকৃত করে দিতো, প্রহারে প্রহারে পথচারীদের জর্জরিত করতো। রাস্তার পাহারাদারদের এরা নাজেহাল করে ছাড়তো, এমনকি তাদের ওপরও আক্রমণ চালাতো। নারীরাও ছিল এদের টার্গেট। নানাভাবে নির্যাতিত হতো তারা। পিপের মধ্যে পুরে লাডগেট হিল বা হলবর্ন হিলের নীচে গড়িয়ে দিতো তাদের। এরা দরজা জানলা ভেঙে সব কিছু তছনছ করে দিতো। এদের ভয়ে পথচারীদের রাত্রে পথচলা প্রায় বন্ধ হয়ে যায়। ডিন সুইফট্ এই মোহকদের ভয়ে রাত্রিতে বের হতেন না। কবি ড্রাইডেন এদের হাতে লাঞ্ছিত ও প্রহৃত হন। সেণ্ট জেমস্ পার্ক

ফটো : সুনীল পোদ্দার

ছিল এদের আড্ডাস্থল। কয়েক বছর ধরে চলে এদের তাণ্ডব:

ব্লু স্টকিং ক্লাব
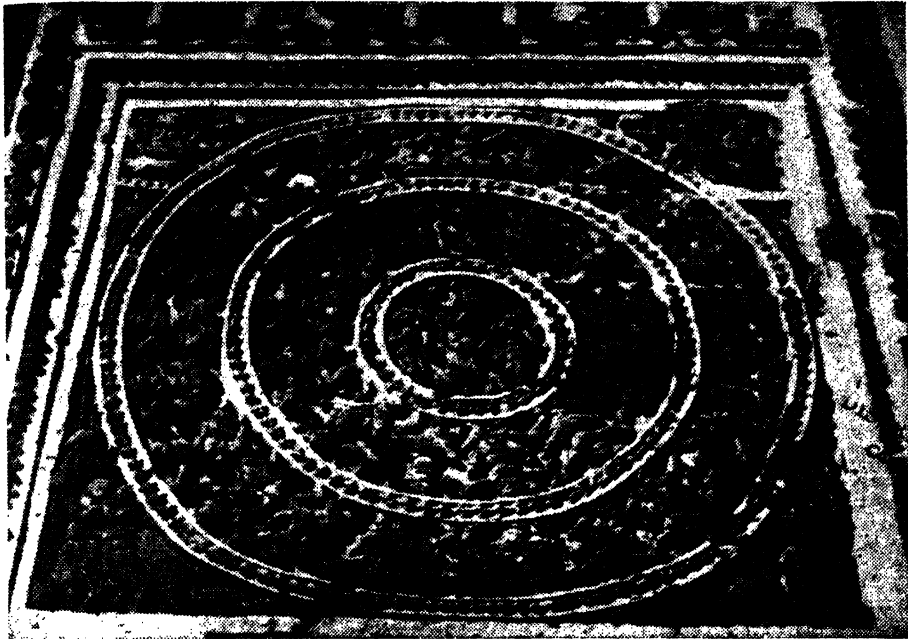
সাহিত্যানুরাগী মহিলাদের মনে বাসনা জাগে খ্যাতিমান সাহিত্যিকদের সঙ্গে তারা আলাপ আলোচনা করবে, তাদের ঘনিষ্ঠ সান্নিধ্যে আনন্দ ও শিক্ষালাভ করবে। এই উদ্দেশ্যেই স্থাপিত হয় ব্লু স্টকিং ক্লাব। বিদুষী মিসেস এলিজাবেথ মন্টেগুর চেষ্টায় ১৭৫০ সালে স্থাপিত হয় এই ক্লাব। জেম্‌স্‌ বসওয়েল ডাঃ জনসনের জীবনকাহিনী প্রসঙ্গে লিখেছেন—মিঃ বেনজামিন স্টিলিং-ফ্লিট নামে এক সৌখীন ভদ্রলোক ছিলেন। বর্ণাঢ্য তাঁর পোষাক ছিল। তিনি ব্লু স্টকিং বা নীল মোজা ব্যবহার করতেন। তাঁর কথাবার্তা ও আচরণ এমন হৃদয়গ্রাহী ছিল যে একদিন তিনি ক্লাবে না এলে সকলেই বলতো, ব্লু স্টকিং ক্লাবে না এলে আমরা তো কিছুই করতে পারবো না। ক্রমে সকলেই 'ব্লু স্টকিং' বলতে শুরু করে দিলো। আর এই থেকেই ক্লাব নামাঙ্কিত হলো— ব্লু স্টকিং ক্লাব। এই ক্লাবে আসতেন ডাঃ জনসন আসতেন অনেক রথীমহারথী। বহু সম্ভ্রান্ত মহিলা ক্লাবে যোগদান করতো। প্যারিসের Bus-blen Club-এর সঙ্গে এই ক্লাব তুলনীয়। পঞ্চদশ শতাব্দীতে ভেনিসেও এইরূপ এক ক্লাব ছিল।

নাইট ক্লাব

নাইট ক্লাব আছে বিশ্বের বড় বড় শহরে। লণ্ডন, নিউইয়র্ক, টোকিও বার্লিনের নাইট ক্লাব তো বিশ্বখ্যাত। লণ্ডনের মলবয়, লে সারকল, চার্চিল, মারে, এম্বেসী, ব্লু এঞ্জেল ক্লাবে লর্ড লেডি, রাজামহারাজা, লক্ষ্মীর বরপুত্রদের চলে আনাগোনা। জুয়ায় লক্ষ লক্ষ টাকা এক রাত্রির আসরেই উড়ে যায়। সুরা, জুয়া, নারী, নৃত্যই নাইট ক্লাবের প্রধান আকর্ষণ। তবে সব নাইট ক্লাবেরই প্যাটার্ন একপ্রকার।

উলঙ্গদের ক্লাব

এখানে সকল সভ্যকেই আদম ও ইভের মত থাকতে হয়। কাপড়-চোপড় পরা চলে না। একেবারে 'স্টার্ক নেকেড' অবস্থা। উলঙ্গ নরনারীরা এখানে সাঁতার কাটে, দৌড়ঝাঁপ দেয়, গাছে চড়ে, ঘাসের ওপর শুয়ে গায়ে রোদ্দুর লাগায়, দোলনায় দোলে, খেলাধুলো করে। এরা সব নগ্নতাবাদী, ন্যুডিস্টস। লজ্জা নেই, সরম নেই, দ্বিধা সংকোচের কোন বালাই নেই এদের। চা নিয়ে স্ত্রী আসে স্বামীর কাছে নগ্নাবস্থাতেই, বন্ধুর সঙ্গে বন্ধুপত্নী দেখা করে উলঙ্গ অবস্থায়। এদের কলোনী আছে, ক্লাব আছে আছে পত্র-পত্রিকাও। নগ্নতাবাদ প্রসারের জন্যে বইও লেখা হয়েছে অনেক। জারমানী, ফ্রান্স, ইংল্যাণ্ড ও আমেরিকায় অনেক ন্যুডিস্ট ক্লাব গড়ে উঠেছে। এদের সভ্য-সংখ্যাও অনেক! বিরুদ্ধাচরণ সত্ত্বেও এইসব ক্লাব আজও টিকে আছে।

ভারতের বিচিত্র ক্লাব

ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর আমলে কোলকাতা, বোম্বাই, মাদ্রাজ ও সিমলায় বিভিন্ন প্রকার ক্লাবের পত্তন হয়। এই সব ক্লাবের কিছু বিচিত্র কথা বলছি এখানে।

৬ই জানুয়ারী, ১৭৮১ সনের বেংগল গেজেটে 'Guzzling club' সম্বন্ধে একটি কৌতুককর সংবাদ প্রকাশিত হয়: "নিউ টেভার্নে" কয়েকজন ভদ্রলোক ঝিনুক খাবার জন্যে মিলিত হয়। বাজি রাখা হয় ১০০ মোহর। একজন তো ২৯৬টা বড় বড় ঝিনুক খেয়ে ফেলে, কিন্তু খাওয়া শেষ করার সংগে সংগে তার শ্বাসরুদ্ধ হয়। তাড়াতাড়ি এক সার্জানকে ডাকা হয়। সেকালের চিকিৎসা-রীতি অনুসারে তার শরীর থেকে রক্ত টেনে বের করা হয়, কানে লাগানো হয় গরম পুলটিস। কিন্তু তাতেও কিছু ফল হয় না। ভদ্রলোকের অবস্থা সংগীন হয়ে ওঠে। ডাকা হয় ডাঃ ফিলকারনানকে। লংকার ধোঁয়া দিয়ে বা এ ধরনের কিছু একটা বন্দোবস্ত করে তিনি তাকে বিপন্মুক্ত করেন।

সেকালে 'মটন ক্লাব', 'হাইস্‌ ক্লাব', 'বীয়র ক্লাব', 'চিজ্‌ ক্লাব' প্রভৃতি ক্লাব গজিয়ে ওঠে কোলকাতায়। কুড়ি পাউণ্ড ওজনের বরফ পাওয়া যেতো এক টাকায়। কিন্তু বর্ষ

পাউণ্ডের বেশী পেতো না কোন সভ্যই। নানা অভিযোগ শুনতে হতো ক্লাবের সেক্রেটারীকে। কেউ অভিযোগ করতো কম ওজন পাচ্ছে, কেউ অভিযোগ করতো চাকরেরা বরফ চুরি করছে। অভিযোগ বেশী এলেই সেক্রেটারী হুমকি ছাড়তো—"আমি পদত্যাগ করবো।

লন্ডনের 'বিফস্টিক ক্লাবের অনুকরণে কোলকাতারও ঐরূপ এক ক্লাব স্থাপিত হয়। ৫০ বছর টিকে ছিল এই ক্লাব। ১৮২৭ সালের পর এর শনির দশা আরম্ভ হয়। লন্ডনের সভ্যেরা শনিবার বিকেল পাঁচটায় ৪ পাউন্ড বিফ নিয়ে খেতে বসতো। কোলকাতার ক্লাবের সদস্যরা অবশ্য এত বেশী গোমাংস ভক্ষণ করতে পারতো না বলেই মনে হয়।

বোম্বাই শহরের বাইকুল্লা ক্লাব 'বহু বৈচিত্র্যের দাবী করতে পারে। এই ক্লাবের রেজিস্টারে কয়েকজন সভ্য একদা এইরূপ মন্তব্য লিপিবদ্ধ করেন—

"১২ই এপ্রিল শুক্রবার (১৮৭৮) একটা কাদাখোঁচা পাখী কেনা হয় ক্লাবের টাকায়। পরে দেখা যায় ক্লাবের সম্পাদক মহাশয় পাখীটাকে নিজেই উদরস্থ করছেন। ক্লাবের সভ্যদের প্রতি সম্পাদকের একি আচরণ? ক্লাবের সেক্রেটারীকে কি এমনি করেই অলক্ষ্যে ও অবাধে গিলতে দেওয়া হবে?" —কয়েকজন বিক্ষুব্ধ সদস্য।

মাদ্রাজে ক্লাব স্থাপিত হয় ১৮৩২ সালে। এখানেও ক্লাবের সভ্যদের কাছ থেকে নানা অভিযোগ, নানা কটু মন্তব্য আসে। এক সভ্য লেখেন—'অভিযোগের খাতার পাশে একটি স্পেলিং বুক রাখা উচিত, এতে সভ্যদের অনেক সুবিধা হবে।' অন্য একজনের অভিযোগ—'লেমোনেড খেলাম আজ সন্ধ্যায়। বোতলে ১২টা বড় বড় চুল ছিল, ঠিক হেয়ার ব্রাশের চুলের মত বড়। দুটো চুল গিলেই ফেলেছি।" আর এক সভ্য মন্তব্য করেন—"আশা করি আমাদের সেক্রেটারী একটা বিস্কুট খেয়ে দেখবেন। একটা খেলে জীবনে আর একটা খেতে চাইবেন না।" অন্য এক সভ্য (১৮৮০) ক্লাব কমিটির দৃষ্টি আকর্ষণ করেন—"ডিনার খাবার পূর্বে ও পরে কয়েকটা বেরালকে দৌড়াদৌড়ি করতে দেখলাম ঠিক ডাইনিং রুমের বাইরে। এই সব বেরালকে যদি খাবার সময় ঘরে ঢুকতে দেওয়া হয় তাহলে তো রবার্টস সাহেবের খাওয়াই হবে না। এই নুইসেন্স বন্ধ করতে হলে বেড়ালদের বিষ প্রয়োগে হত্যা করা উচিত।" এই মন্তব্যের নীচে অন্য এক ক্লাব সভ্য টিপ্পনি কাটেন—"সে কি কথা! বেড়ালদের মারলে যে ইঁদুরদের উপদ্রব বাড়বে। বেড়ালের মত উপকারী, নিরীহ প্রাণী আর নেই। এদের নিধন করা কখনই উচিত নয়।" নানা বিচিত্র মন্তব্য লিপিবদ্ধ হতো সেকালের ক্লাবের রেজিস্টারে।

খামখেয়ালী ক্লাব

প্রত্যেক সভ্যের বাড়ীতে মাসে একবার খামখেয়ালী ক্লাবের মজলিস বসতো। সভ্যেরা কবিতা, গান, আবৃত্তি, গল্প প্রভৃতি পরিবেশন করতেন সাহিত্যসেবকদের এই মিলনক্ষেত্রে। ১৩০৩ সালের এক অধিবেশনে রবীন্দ্রনাথ পাঠ করেছিলেন "ক্ষুধিত পাষাণ"। বিভিন্ন সময় ভোজন ব্যবস্থা ছিল এইরূপ—"ধূপধুনা রসুনচৌকি সহযোগে তাকিয়া আশ্রয় করিয়া রেশম বস্ত্র-মণ্ডিত জলচৌকিতে জলপান।" "ফরাসে বসিয়া প্লেট পাত্রে মোগলাই খানা", 'সাদাসিদে বাংলা জলপান'। অবনীন্দ্রনাথ ও রবীন্দ্রনাথ এই ক্লাবের নামকরণ করেন। ক্লাবের নিমন্ত্রণ পত্রও বেশ বিচিত্র ছিল। অবনীন্দ্রনাথ বলেন—"একটা স্লেট ছিল, সেটা পরে দারোয়ানেরা নিয়ে হাজনাম লিখতো। সেই স্লেটটিতে রবিকাকা প্রত্যেকবারে কবিতা লিখে দিতেন। সেইটি সভার সভ্য ও অভ্যাগতদের বাড়ি বাড়ি ঘুরতো।" একটি নিমন্ত্রণপত্র এখানে উদ্ধৃত করছি—

> শুন সভ্যগণ যে যেখানে থাকো,
> সভা খামখেয়ালি স্থান জোড়াসাঁকো:
> বার রবিবার গত সাড়ে সাত,
> নিমন্ত্রণকর্তা সমরেন্দ্রনাথ।
> তিনটি বিষয়ে হবে পরিহার্য—
> দাঙ্গা, ভূমিকম্প, খুনো-হত্যাকার্য।
> এই অনুরোধ রেখো খামখেয়ালী,
> সভাস্থলে এসো ঠিক Puntually

ননসেন্স ক্লাব

বাইশ নম্বর সুকিয়া স্ট্রীট। এই বাড়ীতেই অপরাজেয় শিশু সাহিত্যিক সুকুমার রায় যৌবনে ননসেন্স প্রতিষ্ঠা করেন এই ক্লাব। এর নিয়মিত অধিবেশন হতো তাঁরই বাসভবনে। এই ক্লাবের হস্তলিখিত একটি পত্রিকাও ছিল—'সাড়ে বত্রিশ ভাজা'। ক্লাবে অভিনীত হতো নাটক। প্রভাতচন্দ্র গঙ্গোপাধ্যায় বলেন, 'ক্লাবের প্রতিটি সদস্যেরই এক-একটি উদ্ভট নাম ছিল এবং সেগুলির উদ্ভবকর্তা ছিলেন স্বয়ং সুকুমার রায়। কয়েকটি নাম এইরূপ—'মশলা-মসোয়াব গোজ্জো', 'জা পানগাণ সাবানসোর' 'ম্যাইফজ মেটে হেন', 'মাখনলাল ভজুয়া' ইত্যাদি। "ক্লাবের সদস্যরা অধিবেশন আরম্ভ হবার পূর্বে সমবেত কণ্ঠে রবীন্দ্রনাথের

> "আমরা লক্ষ্মীছাড়ার দল,
> ভবে পদ্মপত্রে জল,
> সদা করছি টলমল" —গানটি গাইতেন।

এইটাই তাদের ক্লাবের প্রতীকসংগীত ছিল।"

এই ক্লাবের স্মরণীয় ঘটনা, জাপান কর্তৃক পোর্ট আর্থার জয়ের পর অধিবেশন। সদস্যরা উৎসবের সঙ্গে ইম্পিরিয়াল হোটেলে 'পোর্ট আর্থার ডিনার'এর ব্যবস্থা করেন।

মনডে ক্লাব

কয়েক বছর চলার পর ননসেন্স ক্লাবের বিলুপ্তি ঘটে। বিলুপ্তি ঘটে বটে কিন্তু এই ননসেন্স ক্লাবেরই অনুসরণ মনডে ক্লাব স্থাপিত হয়। বহু সুধী এই ক্লাবের সভ্য হন। অধিবেশন এখন কেবল সুকুমার রায়ের বাড়ীতে সীমাবদ্ধ থাকে না। ছড়িয়ে পড়ে সভ্যদের বাড়ী বাড়ী। সে সময়কার বহু জ্ঞানী-গুণী এই ক্লাবের সভ্য হন। এই সাহিত্যসভার আমন্ত্রণলিপিগুলি ছিল বিচিত্র, রসে ভরপুর। একটি উদ্ধৃতি করছি লেখক সুকুমার রায়—

> 'কেউ বলেছে খাবো খাবো
> কেউ বলেছে খাই।
> সবাই মিলে গোল তুলেছে
> আমি তো আর নাই।
> ছোটকু বলে রইনু চুপে
> কমাস ধরে কাহিল রূপে
> জংলি বলে রামছাগলের
> মাংস খেতে চাই।
> যত বলি সবুর কর
> কেউ শোনে না কালা।
> জীবন বলে কোমর বেঁধে
> কোথায় লুচির থালা।
> খোদন বলে রেগে মেগে
> ভীষণ রোষে বিষম লেগে
> বিবৃত বারে গড়পারেতে
> হাজিরা যেন পাই।'

এই আসরের বৈঠক প্রতি সোমবার বসতো বলে এর নাম দেওয়া হয় মনডে ক্লাব। আসরের একটি প্রধান আকর্ষণ ছিল রসনাতৃপ্তিকর নানা খাদ্য। সেইজন্য মনডে ক্লাবকে রসিকতা করে বলা হত 'মন্ডা ক্লাব'।

অমৃত পাবলিশার্স প্রাইভেট লিঃ-এর পক্ষে শ্রীসুপ্রিয় সরকার কর্তৃক পত্রিকা প্রেস, ১৪, আনন্দ চ্যাটার্জি লেন, কলিকাতা—৩ হইতে মুদ্রিত ও তৎকর্তৃক ১১।১, আনন্দ চ্যাটার্জি লেন, কলিকাতা—৩ হইতে প্রকাশিত।

OR
WO

[illegible] বর্ষ
২য় খণ্ড

১৯শ সংখ্যা
মূল্য
৪০ পয়সা

Friday, 8th September 1967. শুক্রবার, ২২শে ভাদ্র, ১৩৭৪ 40 Paise

নিয়মাবলী

লেখকদের প্রতি

১। 'অমৃতে' প্রকাশের জন্যে সমস্ত রচনার নকল রেখে পাণ্ডুলিপি সম্পাদকের নামে পাঠান আবশ্যক। মনোনীত রচনা কোনো বিশেষ সংখ্যায় প্রকাশের বাধ্যবাধকতা নেই। অমনোনীত রচনা সঙ্গে উপযুক্ত ডাক-টিকিট থাকলে ফেরত দেওয়া হয়।

২। প্রেরিত রচনা কাগজের এক দিকে স্পষ্টাক্ষরে লিখিত হওয়া আবশ্যক। অস্পষ্ট ও দুর্বোধ্য হস্তাক্ষরে লিখিত রচনা প্রকাশের জন্যে বিবেচনা করা হয় না।

৩। রচনার সঙ্গে লেখকের নাম ও ঠিকানা না থাকলে 'অমৃতে' প্রকাশের জন্যে গৃহীত হয় না।

এজেন্টদের প্রতি

এজেন্সীর নিয়মাবলী এবং সে সম্পর্কিত অন্যান্য জ্ঞাতব্য তথ্য 'অমৃতে'র কার্যালয়ে পত্র দ্বারা জ্ঞাতব্য।

গ্রাহকদের প্রতি

১। গ্রাহকের ঠিকানা পরিবর্তনের জন্যে অন্তত ১৫ দিন আগে 'অমৃতে'র কার্যালয়ে সংবাদ দেওয়া আবশ্যক।

২। ভি-পি'তে পত্রিকা পাঠানো হয় না। গ্রাহকের চাঁদা মণিঅর্ডারযোগে 'অমৃতে'র কার্যালয়ে পাঠানো আবশ্যক।

চাঁদার হার

	কলিকাতা	মফঃস্বল
বার্ষিক	টাকা ২০-০০	টাকা ২২-০০
ষান্মাষিক	টাকা ১০-০০	টাকা ১১-০০
ত্রৈমাসিক	টাকা ৫-০০	টাকা ৫-৫০

'অমৃত' কার্যালয়
১১/১ আনন্দ চ্যাটার্জি লেন,
কলিকাতা—৩
ফোন : ৫৫-৫২৩১ (১৪ লাইন)

সূচীপত্র

পৃষ্ঠা	বিষয়		লেখক
৪০৪	চিঠিপত্র		
৪০৫	সম্পাদকীয়		
৪০৬	প্রতিধ্বনি		
৪০৮	রাইনের মারিয়া রিলকে অবলম্বনে	(কবিতা)	—শ্রীবুদ্ধদেব বসু
৪০৯	মধ্যপ্রাচ্যে অনিশ্চয়তা		—শ্রীকমল চৌধুরী
৪১৫	ফিরতি গাড়ি	(গল্প)	—শ্রীনমিতা চক্রবর্তী
৪২০	সংখ্যা সংখ্যা সংখ্যা		—শ্রীঅরুপরতন ভট্টাচার্য
৪২১	গৌরাঙ্গ-পরিজন		—শ্রীঅচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্ত
৪২৩	সাহিত্য ও সংস্কৃতি		
৪২৯	ইলিয়া এরেনবুর্গ		—শ্রীগৌতম বসু
৪৩১	সূর্য কাঁদলে সোনা	(উপন্যাস)	—শ্রীপ্রেমেন্দ্র মিত্র
৪৩৩	দেশেবিদেশে		
৪৩৪	ব্যঙ্গচিত্র		—শ্রীকাফী খাঁ
৪৩৪	বৈষয়িক প্রসঙ্গ		
৪৩৬	প্রেক্ষাগৃহ		
৪৪৪	দৃশ্যের অন্তরালে		—শ্রীজ্যাক কার্ডিফ
৪৪৬	খেলাধুলা		—শ্রীদর্শক
৪৪৯	অতল জলের আহ্বান		—শ্রীশঙ্করবিজয় মিত্র
৪৫১	আধুনিক	(উপন্যাস)	—শ্রীবিভূতিভূষণ মুখোপাধ্যায়
৪৫৪	বিজ্ঞানের কথা		—শ্রীশুভংকর
৪৫৫	উড়ন্ত চাকি		—শ্রীদিলীপ মালাকার
৪৫৭	হোটেল সাম্বা	(গোয়েন্দা কাহিনী)	—শ্রীনির্মল সরকার
৪৬৩	মুদ্রণশিল্পে পথিকৃত		—শ্রীজ্যোৎস্নারঞ্জন রায়
৪৬৫	অঙ্গনা		—শ্রীপ্রমীলা
৪৬৭	আমার কাল আমার দেশ		—শ্রীসুধীরচন্দ্র সরকার
৪৬৯	পুরনো পাতা : হাঙর		—স্বামী বিবেকানন্দ
৪৭১	বঙ্কিমচন্দ্রে জীবনের অজ্ঞাত কাহিনী		—শ্রীগোপালচন্দ্র রায়
৪৭৩	উপেক্ষিতা হেলেন		—শ্রীসুধীর করণ
৪৭৬	আনন্দ		—শ্রীচন্দ্রশেখর মুখোপাধ্যায়
৪৭৭	প্রাচীন ভারতে মূক ও বধির		—শ্রীনির্মলেন্দু চক্রবর্তী
৪৮০	জানাতে পারেন		

একটি অনুরোধ

আমার মাতামহ অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুরের সমগ্র রচনাবলী প্রকাশ করবার আয়োজন প্রায় সম্পূর্ণ। কিছু কিছু দুষ্প্রাপ্য পত্রিকায় ও গ্রন্থে অবনীন্দ্রনাথের যে সব লেখা ছড়িয়ে আছে, অথবা অবনীন্দ্র লিখিত কোনো চিঠি যদি কারো কাছে থাকে, তা নকল করে আমার ঠিকানায় পাঠালে তা রচনাবলীর অন্তর্ভুক্ত করে সুখী হব।

মোহনলাল গঙ্গোপাধ্যায়,
গুপ্ত-নিবাস,
বেলঘরিয়া,
কলিকাতা—৫৬।

আজকের পোষাক-পরিচ্ছদ

বিগত ১১ই শ্রাবণ ১৩৭৪ অমৃতে চিঠিপত্র বিভাগে প্রকাশিত 'আজকের পোষাক-পরিচ্ছদ' সম্পর্কে দিলীপকুমার পাত্র যে সমালোচনা করেছেন তা মনোযোগসহকারে পড়লাম। এ সম্পর্কে আমার কিছু বিনীত বক্তব্য আছে।

এক এক ঋতু যেমন আপন আপন আপন বৈশিষ্ট্যে আমাদের কাছে স্মরণীয় তেমনি এক একটি যুগ এক একটি বৈশিষ্ট্যের ছাপ রেখে যায়।

মধ্যযুগে নারীদের বর্তমান যুগের নারীদের মত পুরুষদের সঙ্গে সঙ্গে সমান তালে পা ফেলে এগিয়ে যেতে হয় নি। তাই বর্তমানের নারীদের মত তাঁদের এমনি পোষাক-পরিচ্ছদ পরিধান করতে হয় নি। যদি হত তাহলে তখনকার পোষাক-পরিচ্ছদের সঙ্গে বর্তমান যুগের পোষাক-পরিচ্ছদের এই তুলনা করার এই যে প্রয়াস তা দরকার হত না। কারণ সকলে মনে করতেন এ ধরনের পোষাক-পরিচ্ছদই স্বাভাবিক।

সৌন্দর্যবোধ মানুষের রুচির এবং দৃষ্টিভঙ্গীর উপর নির্ভর করে। যদি বর্তমান যুগের নারীদের পোষাক-পরিচ্ছদ এতই দৃষ্টিকটু ও কুরুচিপূর্ণ তবে অজন্তা, ইলোরা, কোণারকের পবিত্র মন্দিরগাত্রে উৎকীর্ণ যে সব মূর্তিগুলির তাৎকালিক শিল্পীরা ফুটিয়ে তুলেছেন সেগুলি কি শিল্পীদের কুরুচির পরিচায়ক? না, তাঁরা দুষ্ট ছিলেন না? হয়ত কেউ বলবেন যে, যে যুগে এই সব চিত্রগুলি মন্দিরগাত্রে উৎকীর্ণ করা হয়েছে সে যুগে পুরুষদের দৃষ্টিভঙ্গী ছিল নির্মল। বর্তমান যুগের চিত্ররসিকেরাও সে সব মূর্তি দেখে কি মুগ্ধ হন না? তাই বলি সৌন্দর্যবোধ অনাবিল মন ও সুস্থ দৃষ্টিভঙ্গীর উপর নির্ভর করে।

বর্তমান যুগে নারীদের কর্মব্যস্ত সমাজে পুরুষদের সঙ্গে সমান তালে পা মিলিয়ে চলতে হচ্ছে স্কুল, কলেজ, অফিস, কার--খানায় সর্বত্র। মধ্যযুগীয় পোষাক-পরিচ্ছদে দেহকে আবৃত করে সুখী গৃহকোণে থাকা চলে, কিন্তু ট্রাম-বাসে, কারখানায় যাওয়া চলে না। বর্তমান যুগের মেয়েরা যেখানে যেমন পোষাক-পরিচ্ছদ ব্যবহার করা প্রয়োজন তেমনটিই করেন।

মেয়েদের পোষাক-পরিচ্ছদ সম্বন্ধে বিভিন্ন পত্র-পত্রিকায় এত যে সরব প্রতিকার ঘোষিত হচ্ছে তার পরিপ্রেক্ষিতে আমি এই-টুকুই বলতে চাই যে, যুগোপযোগী পোষাক ব্যবহার করা কি অন্যায়? পোষাক-পরিচ্ছদ পরিবর্তনের দাবী করার আগে বর্তমান যুগের পুরুষদের দৃষ্টিভঙ্গীর পরিবর্তন বিশেষ প্রয়োজন। যা সুন্দর তা চিরকাল সুন্দর। স্থান, কাল, পাত্র হিসেবে তার কোন তফাৎ নেই।

উমা মিত্র
কাল্কা, আসানসোল

উচ্চমানের শিশুচিত্র

সম্প্রতি 'মস্কো চলচ্চিত্র উৎসব' থেকে ফিরে এসে পদ্মশ্রী শ্রীমতী নার্গিস ভারতের শিশু-চলচ্চিত্র সম্বন্ধে যা মন্তব্য করেছেন তা আমাদের কাছে লজ্জার বিষয় হলেও একেবারে সত্যি। তিনি ঐ উৎসবের জুরী ছিলেন। তাঁর মতে ভারতের শিশুচিত্রের মান অন্যান্য দেশের তুলনায় আশানুরূপ উন্নত নয়। তাঁর সেখানের অভিজ্ঞতা থেকে তিনি জানান যে, বিদেশের শিশুচিত্রে শিক্ষা এবং আনন্দদানের যে সচেতন প্রয়াস দেখা যায়, তা লক্ষ্য করবার মত। সেই সঙ্গে শিশু-মনস্তত্ত্ব সম্পর্কে অন্তর্দৃষ্টির পরিচয়ও বিদেশের শিশুচিত্রগুলির এক অমূল্য সম্পদ—যা আমাদের দেশের শিশুচিত্রে খুব অল্পই দেখা যায়। তিনি বলেন যে, ঐ সব দেশে শিশুচিত্র নির্মাণের ব্যাপারে যথেষ্ট গুরুত্ব প্রয়োগ করা হয় এবং উদাহরণ স্বরূপ তিনি বলেন যে, রাশিয়া প্রভৃতি দেশে শিশুচিত্র নির্মাণের জন্য আলাদা স্টুডিও আছে। আমাদের দেশে অবশ্য তেমন কোন সুযোগ-সুবিধা নেই। তিনি আশা করেন, তা সত্ত্বেও এ দেশে উন্নত শ্রেণীর শিশুচিত্র তৈরী করা সম্ভব। এর জন্য প্রথমেই প্রয়োজন ভাল গল্প বা কাহিনী। তাঁর মতে শিশুচিত্র মানেই যে প্যাঁপেট চিত্র বা কার্টুন চিত্র হবে, তার কোন মানে নেই।

পরিশেষে তিনি নিজে শিশুচিত্র নির্মাণের ইচ্ছা প্রকাশ করায় আমরা খুবই আনন্দিত হয়েছি। এ জন্য তাঁকে আমাদের আন্তরিক শুভেচ্ছা ও অভিনন্দন জানাই। কামনা করি শ্রীমতী নার্গিসের এই ইচ্ছা সফল হোক।

এই প্রসঙ্গে আমার বক্তব্য এই যে উন্নতমানের শিশুচিত্র নির্মাণের জন্য পরিচালক ও প্রযোজক সংস্থা তথা সরকারকে হাত মিলিয়ে কাজ করতে হবে। এর জন্য প্রয়োজন হলে শিশুচলচ্চিত্র কমিটি গঠন করতে হবে। জানি না আমাদের দেশেও শিশুচিত্র তৈরীর জন্য আলাদা স্টুডিও তৈরী করা সম্ভব কিনা? যদি হয়, তবে তো খুবই ভাল। তবে একথা সব সময়েই স্মরণ রাখতে হবে যে, ব্যবসায়িক দৃষ্টিভঙ্গী নিয়ে কখনই উচ্চমানের শিশুচিত্র তৈরী করা সম্ভব নয়।

শঙ্করপ্রসাদ চৌধুরী
ঝরিয়া, ধানবাদ

'আমারে এ আঁধারে' প্রসঙ্গে

অমৃত পত্রিকাতে ধারাবাহিকভাবে প্রকাশিত শ্রীযুক্ত কল্যাণকুমার বসুর লেখা 'আমারে এ আঁধারে' জীবনকাহিনী পাঠ করলাম। এ বিষয়ে সর্বপ্রথম লেখককে আমাদের আন্তরিক ধন্যবাদ জ্ঞাপন করি। কারণ অতুলপ্রসাদ সেনের জীবনী আজ পর্যন্ত সঠিকভাবে এবং বিস্তৃতভাবে কোন বইতে আমরা পাই নি। ফলে অতুলপ্রসাদ আমাদের কাছে শুধুমাত্র ব্যারিস্টার এবং বিখ্যাত গীতিরচয়িতা কবি বলে পরিচিত ছিলেন। কিন্তু শ্রীবসুর এ রচনা থেকে আমরা অতুলপ্রসাদের স্বদেশপ্রীতি, মানবপ্রীতি ও সৌন্দর্যরসপিপাসু এক কবিমনের পরিচয় পাই। লেখকের রচনানৈপুণ্যে এ লেখাটি এত হৃদয়গ্রাহী হয়ে উঠেছে যে, পাঠকসমাজ যে এ লেখাটিকে সাদরে গ্রহণ করবেন তা বলাই বাহুল্য।

জীবনী পড়বার পর মনে একটি প্রশ্ন জেগেছে। অতুলপ্রসাদের মৃত্যুর পর তাঁর স্ত্রী হেমকুসুম দেবী কতদিন জীবিত ছিলেন? তিনি কোথায় এবং কিভাবে মারা যান—জানতে ইচ্ছা করি। লেখক যদি অমৃতের মাধ্যমে আমাদের এ কৌতূহল নিবৃত্ত করেন, তাঁর কাছে কৃতজ্ঞ থাকব।

সুপ্রীতি মজুমদার
ও সুতপা মজুমদার
কলকাতা—৯

ধর্মনিরপেক্ষতার পরীক্ষা

গত সপ্তাহে কেন্দ্রীয় মন্ত্রিসভায় এবং কংগ্রেস ওয়ার্কিং কমিটির বৈঠকে দেশে সাম্প্রদায়িক দুষ্টবুদ্ধির চক্রান্তে গভীর উদ্বেগ প্রকাশ করা হয়। রাঁচিতে এবং কাশ্মীরের কয়েকটি স্থানে যা ঘটেছে তা বিপদের অশুভ সংকেত বহন করে এনেছে। পুলিশ-মিলিটারী তলব করেও ঘটনা আয়ত্তে আনতে অনেক সময় চলে গেল এবং তার ফলে অনেক প্রাণ বিনষ্ট হয়েছে। বহু ধর্ম ও সম্প্রদায় নিয়ে আমাদের সমাজ গঠিত। আমাদের পাশাপাশি বাস করতে হবে, একসঙ্গে কাজ করতে হবে এবং দেশের জন্য একসঙ্গে সংগ্রাম করতে হবে। এই সত্য প্রত্যেক ভারতবাসীর জানা উচিত। অন্তত ভারতীয় সংবিধান এই মহান আদর্শকেই গ্রহণ করেছে।

গত কুড়ি বছরে বহুবার সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি কুচক্রীদের আঘাতে বিনষ্ট হয়েছে। কখনো বা এই ষড়যন্ত্রে ইন্ধন জুগিয়েছে পাকিস্থানের শাসকদের ধর্মীয় অসহিষ্ণুতা এবং নির্বিচারে সংখ্যালঘু বিতাড়ন। কিন্তু এতে আমাদের নিজেদের দোষ স্খালন হয় না। আমরা শত প্ররোচনা সত্ত্বেও ভারতবর্ষকে একটি ধর্মনিরপেক্ষ গণতান্ত্রিক সমাজবাদী রাষ্ট্ররূপে গড়ে তোলার পবিত্র প্রতিজ্ঞা গ্রহণ করেছি। একে রক্ষা করার দায়িত্ব আমাদের। দুঃখের বিষয় আমরা তা পারছি না। যারা ধর্মীয় গোঁড়ামিকে প্রশ্রয় দিয়ে অজ্ঞ, অশিক্ষিত জনসাধারণকে বিভ্রান্ত করে তাদের ষড়যন্ত্রে বারে বারে আমাদের সমাজে অশুভ-শক্তি মাথা চাড়া দিয়ে ওঠে। দেশ রক্তাক্ত হয়। প্রধানমন্ত্রী শ্রীমতী গান্ধী বলেছেন, রাঁচি ও শ্রীনগরে যে-কুকীর্তি ঘটেছে তা গুরুতর। এই ঘটনা ভারতের ধর্মনিরপেক্ষ গণতন্ত্রের মূলে কুঠারাঘাত করেছে। প্রধানমন্ত্রীর এই উক্তির সঙ্গে প্রত্যেক শুভবুদ্ধিসম্পন্ন মানুষই একমত। এই লজ্জা সমগ্র জাতির লজ্জা এবং তার দায়িত্ব সকলকে বহন করতে হবে।

রাজনৈতিক উদ্দেশ্যসাধনের জন্য অনেক সময় ধর্মীয় সংকীর্ণতাকে প্রশ্রয় দেওয়া হয়। আমাদের মাতৃভূমি খণ্ডিত হয়েছে এই সাম্প্রদায়িক উম্মত্ততার জন্য। তখন বিদেশী শাসন ছিল, তারা নিজেদের উদ্দেশ্যসিদ্ধির জন্য সাম্প্রদায়িক ভেদবুদ্ধিকে বাড়তে দিয়েছিল। দেশের স্বাধীনতাসংগ্রামের উদ্দেশ্যই অনেকখানি ব্যর্থ হয়ে গেছে সাম্প্রদায়িকতার জন্য। তা সত্ত্বেও খণ্ডিত ভারতবর্ষে আমরা অতীতের জের টানিনি। জাতিধর্ম নির্বিশেষে সমস্ত ভারতবাসীর সমান অধিকার ও মর্যাদা সংবিধানে স্বীকৃত। এই আদর্শকে রক্ষা করার দায়িত্ব আজ বড় হয়ে দেখা দিয়েছে। কারণ, দেখা গেছে যে, আমাদের চেষ্টা সত্ত্বেও সাম্প্রদায়িক অসহিষ্ণুতা এক শ্রেণীর মানুষের মন থেকে দূর হয় নি। সংখ্যাগুরু এবং সংখ্যালঘু দুই সম্প্রদায়ের মধ্যেই এই অসহিষ্ণুতা এবং অবিশ্বাস রয়েছে। ভারতবর্ষের সর্বাঙ্গীণ উন্নতির পথে এই ভ্রান্তবুদ্ধি অন্যতম প্রধান অন্তরায়। সংবাদে প্রকাশ, কংগ্রেস অন্যান্য সমধর্মী দলের সঙ্গে ঐক্যবদ্ধ হয়ে সাম্প্রদায়িকতার বিরুদ্ধে সংগ্রামের কথা ভাবছে। এই মনোভাব প্রশংসনীয়। কারণ, সাম্প্রদায়িকতার বিষ সমাজদেহে ছড়িয়ে আছে, তাকে দূর করতে হলে সর্বাত্মক সংগ্রাম প্রয়োজন। ভারতীয় রাজনীতিতে এমন অনেক দল আছে যারা হয় সংখ্যাগুরু নয় সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের ধর্মীয় সংকীর্ণতাকে ভাঙিয়ে নিজেদের প্রভাব বিস্তারের চেষ্টা করে। এই দুই ধরনের সাম্প্রদায়িকতাকেই প্রতিরোধ করতে হবে। এই প্রতিরোধ শুধু রাজনৈতিক স্তরে হলেই চলবে না। শিক্ষা, অর্থনীতি ও সমাজ এই ত্রিবিধ স্তরেই সাম্প্রদায়িকতার বিরুদ্ধে সংগ্রাম চালাতে হবে। অশিক্ষা এবং সংস্কার ধর্মীয় গোঁড়ামি ও সংকীর্ণতাকে প্রশ্রয় দেয়। শিক্ষিত দেশে ধর্মীয় অসহিষ্ণুতা হ্রাস পাচ্ছে। আমাদের শিক্ষানীতিকেও সক্রিয়ভাবে ধর্মীয় সংস্কার ও গোঁড়ামির বিরুদ্ধে কাজে লাগাতে হবে। নির্বাচনী রাজনীতি সাম্প্রদায়িক মনোভাবকে জাগিয়ে রাখতে অনেক সময় সাহায্য করে। বৃটিশ আমলে পৃথক নির্বাচন ব্যবস্থার বিরুদ্ধে জাতীয়তাবাদীরা সংগ্রাম করেছেন। স্বাধীন ভারতে সেই ব্যবস্থা রহিত হয়েছে। কিন্তু পরোক্ষভাবে নির্বাচনী রাজনীতিতে সাম্প্রদায়িকতা প্রবেশ করেছে, একথা অস্বীকার করে লাভ নেই। সংখ্যাগুরু এবং সংখ্যালঘু উভয় সম্প্রদায়ের মধ্যেই গোঁড়ামি আছে, কিন্তু অধিকাংশ মানুষই গোঁড়ামিমুক্ত। কিন্তু অনর্থ ঘটাতে মুষ্টিমেয় মানুষের চক্রান্তই যথেষ্ট। রাঁচি ও কাশ্মীরের ঘটনায় তার প্রমাণ পাওয়া গেছে।

আজ ভারতবর্ষের সামনে যে অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক সংকট দেখা দিয়েছে তা উত্তীর্ণ হতে হলে সামগ্রিকভাবে সমস্ত দেশবাসীকে একসঙ্গে কাজ করতে হবে। কিন্তু দুঃখের বিষয় এই যে, দেশের মানুষের মধ্যে নানা রকম ভেদবুদ্ধি জাগিয়ে তুলে দেশের সর্বনাশ করার ষড়যন্ত্র করে চলছে সাম্প্রদায়িকতাবাদীরা। ধর্মান্ধতার পলিটিক্স ভারতবর্ষকে অপমানিত ও লাঞ্ছিত করে রেখেছিল দীর্ঘকাল। আজকের যুগে এই ঘৃণ্য রাজনীতি আর কোনো মতেই বরদাস্ত করা চলে না। সরকারকে এ-বিষয়ে কঠোরতম ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে। কোনোরূপ দ্বিধা বা সংশয় দেখাবার সময় এখন নয়। যারা ভারতবর্ষে সত্যিকারের গণতন্ত্র ও সমাজতন্ত্র চান তাঁদের প্রাথমিক দায়িত্ব হল দেশবাসীর মন থেকে সাম্প্রদায়িক ভেদবুদ্ধি দূর করা। তারপরই মহত্তর কর্মে আত্মনিয়োগের আহ্বান দেওয়া সম্ভব।

সহৃদয় বিভূতিভূষণ

নন্দগোপাল সেনগুপ্ত

...আমি জামসেদপুরে যাচ্ছি, বিভূতি-ভূষণ যাচ্ছেন ঘাটশীলায়। হাওড়া স্টেশনে দেখা। বেডিং বোঁচকা নিয়ে দুজনে একই কামরায় উঠলাম, তারপর প্রেততত্ত্ব নিয়ে কথা আরম্ভ হল। আমি তাঁর তখনকার লেখা দৃষ্টিপ্রদীপ বইয়ের বিষয়বস্তু নিয়ে কটাক্ষ করা মাত্র দপ করে জ্বলে উঠলেন। তারপর দুই দোস্তে চোস্ত বাংলায় চলন্ত ট্রেনে সে কি বাক্‌যুদ্ধ! অন্য যাত্রীরা হয়ত ভাবলেন, দুটো বয়স্ক ব্যাপারী গাড়ীতে উঠে ঝগড়া করে মরছে দর নিয়ে।

ঘাটশীলায় নেমে খাবার সময় বিভূতি-ভূষণ গলা জড়িয়ে ধরে বললেন, বাকী রাস্তাটা ত তোমাকে একলা যেতে হবে। মনটা তাই কেমন কেমন করছে ভাই। দুটো কমলালেবু দিলেন, তারপর বললেন, হ্যাঁ ভগবানকে মানো না মানো যাবে আসবে না। তিনি করুণাময়। কিন্তু ভূত-প্রেতকে ঘাঁটিয়ো না। তারা ভীষণ প্রতিহিংসাপরায়ণ, একদিন শিক্ষা দিয়ে ছাড়বে। একথায় তখন হেসেছিলাম। মনে হয়েছিল বিভূতিভূষণ বোধহয় ভয় পেয়েছেন বাকী রাস্তাটুকুতেই ভূতেরা এসে আমায় ধরবে ভেবে।

সারা অন্তর আজ খাঁ-খাঁ করে ওঠে তাঁর সেই উজ্জ্বল মুখটি আর সে মুখের ঐ বিশ্বাসদীপ্ত কথা কটি ভাবলে। জীবন ও মৃত্যুর মাঝখানের দূরত্ব কতটা কে জানে? হয়ত জানে বিভূতিভূষণের বলা সেই প্রেত পুরুষেরা। কিন্তু কৈ তারা ত কোনোদিন আমায় দেখা দিল না। বিভূতিভূষণের খবরও তাই জানা হল না আর।

কিন্তু থাক সে কথা। বিভূতিভূষণের মতো মুক্ত ও উন্নত হৃদয় বন্ধু হয় না, এমন অহমিকাহীন শিল্পীও আর দেখিনি কোথাও। একদিন বললেন, জীবনে প্রত্যেক লোকসানই আমাকে কিছু না-কিছু সম্পদ দিয়েছে। মাস্টারি করে অন্ন হয়নি, অনেক সময়েরও অপচয় হয়েছে। কিন্তু অনুবর্তন বইখানা হত না মাস্টারি না করলে। হোটেল খুলে প্রচুর গুণাগার দিয়েছি। কিন্তু আদর্শ হিন্দু হোটেল বইখানা মাল-মসলা মিলেছে সবই ঐ থেকে। চক্রে বসে প্রেতলোকের তল্লাসি করতে গিয়ে ঢের ক্ষতি হয়েছে। বন্ধু-বান্ধবদের গালও খেয়েছি প্রচুর। কিন্তু দৃষ্টিপ্রদীপ আর দেবযান বই দুখানা পেয়েছি ঐ থেকেই।

এ তাঁর শুধু কথার কথা নয়। জীবনে তিনি যা কিছুর ভিতর দিয়ে গেছেন, যা কিছুর সংগে ওতপ্রোত হয়ে জড়িয়ে থেকেছেন, তাই তাঁকে সাহিত্য সৃষ্টির অনুপ্রেরণা দিয়েছে। বৈদগ্ধ্যপূর্ণ বা অধ্যয়ন ভূয়িষ্ঠ ছিল না তাঁর মন। তিনি ছিলেন জীবনশিল্পী। সরাসরি জীবন থেকেই রস ও রসদ আহরণ করেছেন তিনি রচনায়।...

(লেখা ও রেখা।। বৈশাখ—আষাঢ় ১৩৭৪)

ভোজপুরী লোকগীতে বিপ্রলম্ভ-শৃংগার

নৃপেন্দ্রনাথ রায়চৌধুরী

নিত্যকালের লোকসাহিত্যে মানুষের চিরন্তন সুখ-দুঃখ ও বিরহমিলনের সবুজ রাগিণী শুনতে পাই। এরই সাথে শ্যামল পল্লীমাটির গন্ধটুকু জড়ানো আছে। প্রাণের নিবিড় আদিম সম্পর্ক পল্লীর নিরক্ষর মানুষের হৃদয়-ভূমিতে সমতা লাভ করেছে। সেই কারণে ভারতীয় সংস্কৃতির প্রাণভূমি তৈরী করতে হলে প্রতিটি প্রান্তের লৌকিক সাহিত্যের আলোচনা দ্বারা পারস্পরিক সমন্বয়বোধ গড়ে তুলতে হবে। এই উৎসাহ নিয়ে বিহারের লোকসাহিত্যের শৃংগার রসের একটা আলোচনার প্রচেষ্টা করেছি। বাংলার লোকসাহিত্যে ময়নামতীর গান, গোপীচন্দ্রের গান, অসংখ্য ব্রতকথা, খেউড়, তর্জা প্রভৃতির সংগে শৃংগার রসের যে স্বতঃস্ফূর্ত অলকনন্দা বয়ে চলেছে তার বিমিশ্র প্রবাহন আমরা ভোজপুরী লোকগীতে দেখতে পাই।

মৈথিলী, মগহী আর ভোজপুরী এই তিনটি হল বিহারের মুখ্য ভাষা। কথ্যভাষা হিসাবে সংখ্যাধিক্যে ভোজপুরী হল প্রধান। আর্যভাষার পূর্ব শাখার অন্তর্গত বাংলা, অসমিয়া, উড়িয়ার সাথে ভোজপুরীর সম্পর্ক খুবই গভীর।

পুরাকালে উজ্জয়িনীর রাজধানী ছিল ভোজপুর। অধুনা শাহাবাদ জিলায় 'নবকা ভোজপুর' আর 'পুরানকা ভোজপুর' বলে দুটি গ্রাম আছে। ভোজপুরের আশেপাশের ভাষার নাম ছিল ভোজপুরী। ডঃ সুনীতি চট্টোপাধ্যায় এই ভাষাকে 'ভোজপুরিয়া' বলে উল্লেখ করেছেন। অবশ্য স্থানীয় লোকেরা ভোজপুরিয়া বলতে ভোজপুর নিবাসীকে বোঝে আর ভোজপুরী বোঝায় জনপ্রচলিত ভাষাকে। এই ভাষা-গোষ্ঠীর পরিধি মোটামুটি পঞ্চাশ হাজার বর্গমাইল। বিহারের আরা, ছাপরা, চম্পারণ, পালামৌ আর রাঁচী—উত্তর প্রদেশের বনারস, মীর্জাপুর, জৌনপুর, গাজীপুর, বলিয়া, গোরক্ষপুর, দেবরিয়া, বস্তী এবং আজমগড় এই কয়টি জেলার মাতৃভাষা হল ভোজপুরী। জনসংখ্যা প্রায় তিন কোটি।

* * *

ভোজপুরীতে লোকগীতের স্থান বড় মহত্বপূর্ণ। জন্ম-মৃত্যু, উপবীত, বিবাহ, ষোল সংস্কারাদি লোকগীতের পরম্পরা দরিদ্র গ্রামবাসীদের মনে একটা স্বতঃস্ফূর্ত ত্রিবেণীধারার প্রবাহন নিয়ে আসে। রস পরিবেশনেও এর আবেদন কম নয়। শৃংগার, বীর, হাস্য, করুণ ও শান্ত রস—লোকগীতের ছন্দে সুরে পরস্পরে অঙ্গাঙ্গী বিকশিত হয়ে উঠেছে। তবুও বলতে হয় লোকগীতে শৃংগাররসের আধিপত্য বেশী আর এরই লীলায়ন অপূর্ব। প্রেমই লোকগীতের প্রধান উপজীব্য। তাই এরই মাঝে বিপ্রলম্ভ শৃংগাররসের মধু আহরণ করতে আগ্রহী হয়েছি। কজলী, চৈতা, ফাগুয়া, অহীর-বিরহা, সোহর, কোহরগীত—এই কশ্রেণীর লোকগীতের মাঝে শৃংগার-রসের আধিক্য দেখতে পাই।

[সপ্তিতা।। প্রথম খণ্ড।। দ্বিতীয় সংখ্যা]

ভারতের স্বাধীন সংবাদপত্র

ফ্র্যাঙ্ক মোরেস

সংবাদপত্রসমূহের রেজিস্ট্রারের সাম্প্রতিক রিপোর্টের তথ্যাদি পর্যালোচনা করলে খুব সুস্পষ্টভাবে বোঝা যায়, ভারতের সংবাদ-পত্রগুলি কত স্বাধীন এবং কত বলিষ্ঠ মতাবলম্বী। গত দশ বছরে এদেশে বিভিন্ন পত্র-পত্রিকার প্রচার সংখ্যা প্রায় দ্বিগুণ বেড়ে গেছে। ১৯৫৮ সালে থেকে সংবাদ-পত্রের সংখ্যা ২২-৪ শতাংশ বেড়েছে। ১৯৫৬ সালের পর থেকে দৈনিক পত্রিকার প্রচার সংখ্যা অভূতপূর্ব বেড়েছে এবং ১৯৫৬ সালে আগের বছরের তুলনায় ১১৭.৩ শতাংশ বেড়েছে। ব্যক্তিগত মালিকানার সংবাদপত্রের সংখ্যা মোট সংখ্যার যথেষ্ট হলেও যৌথ কোম্পানীর পরিচালনাধীনে সংবাদপত্রগুলির প্রচার সংখ্যা এখনও সর্বাধিক।

রিপোর্টে বেশ কতকগুলো মজার এবং উল্লেখযোগ্য তথ্য পরিবেশন করা হয়েছে। ১৯৫৬ সালে এদেশে মোট সংবাদপত্রের সংখ্যা ছিল ৮,৬৪০। ১৯৬১ সালের তুলনায় বৃদ্ধির পরিমাণ ৩০.৫ শতাংশ। আলোচ্য বছরেই ছশ'রও বেশি দৈনিক এবং ১০,৯৭৭ সাময়িক পত্রিকা চালু ছিল। হিন্দী সংবাদপত্রের সংখ্যা ছিল সবচেয়ে

বেশি। তারপরে ইংরাজী ও উর্দুর স্থান। রাজধানী শহর দিল্লীতে সবচেয়ে বেশি সংবাদপত্র প্রকাশিত হচ্ছে। তারপর বোম্বাই, কলকাতা এবং মাদ্রাজের স্থান। মোট দৈনিকগুলির ৪০ শতাংশ সাতটি প্রধান শহর থেকে প্রকাশিত হচ্ছে। চারটি দৈনিক ও সাতটি সাময়িক পত্রিকার বয়স একশ' বছরেরও বেশি।

যে দেশে শিক্ষিতের হার হল মোট ২৫ শতাংশ সে দেশের পক্ষে এটা নিশ্চয়ই খুব গর্বের কথা। বিদেশীরা ভারতে এসে সংবাদপত্রগুলোর স্বাধীন মত প্রকাশের ক্ষমতা দেখে আমার কাছে অনেকেই আনন্দ প্রকাশ করেছেন। ব্যক্তিগতভাবে আমিও বলতে পারি বহুবার বহু বিষয়ে কেন্দ্রীয় সরকার এবং বিভিন্ন রাজনৈতিক দলের নীতির বিরুদ্ধে আমি মত প্রকাশ করেছি। উন্নতই হোক আর উন্নতিশীলই হোক, সব গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রে সংবাদপত্রের স্বাধীনতা একটা আকাঙ্ক্ষিত আদর্শ। যে কোন দুটো দেশের কাজের মধ্যে পার্থক্য থাকলে সংবাদপত্রের ভূমিকাও ভিন্ন হতে বাধ্য। কিন্তু মূলতঃ সব সংবাদপত্রই এক। একটা উন্নত রাষ্ট্রে সংবাদপত্রের দায়িত্ব প্রধানতঃ হয় প্রতিষ্ঠিত অধিকার ও দায়িত্বকে রক্ষা করা। কিন্তু উন্নয়নশীল রাষ্ট্রে জনগণের অধিকারকে নির্দিষ্ট করা এবং সেগুলিকে প্রতিষ্ঠিত করার ব্যাপারে সংবাদপত্রে এবং স্থানীয় সরকারের যথেষ্ট দায়িত্ব থাকে। ভারতে এবং এশিয়া ও আফ্রিকার বহু দেশে যে রাজনৈতিক দল স্বাধীনতা সংগ্রামে পুরোধা হয়ে সবচেয়ে বেশি দায়িত্ব নিয়ে কাজ করেছে তারাই প্রথম সরকার গঠন করেছে। ভারতে তাই কংগ্রেসের সার্বিক প্রাধান্য। কিন্তু বর্তমানে সেই প্রাধান্য চ্যালেঞ্জের সম্মুখীন। অনেক কারণে শূন্যস্থান পূরণ এবং সংসদের বাইরে একটা সরকার-বিরোধী জনমত গড়ে তুলবার দায়িত্ব সংবাদপত্রের উপর এসেছে এবং সংবাদপত্রগুলো দেশপ্রেমিকের মনোভাব নিয়ে সুন্দরভাবে সে দায়িত্ব পালন করেছে। সাধারণভাবে বলা যায় সংবাদপত্রগুলির সমালোচনা বেশ গঠনমূলক ও কাজের সহায়ক। এসবের জন্য সরকার এবং কংগ্রেস দল অভিনন্দনযোগ্য।

আমি সব সময় বলেছি যে সংবাদপত্রের প্রধান দায়িত্ব ও কর্তব্য হচ্ছে জনসেবা—সরকারতুষ্টি নয়। অবশ্য এমন কিছু করা উচিত নয় যাতে দেশের আইন ও শৃঙ্খলা বিঘ্নিত হয়। সরকারের কর্তব্য সংবাদপত্রের স্বাধীনতা রক্ষা করা এবং আমি আমার অভিজ্ঞতা থেকে বলতে পারি, ভারত সরকার তাঁর সেই দায়িত্ব সুনামের সঙ্গে, নিষ্ঠার সঙ্গে পালন করেছে।

(আর্থিক প্রসঙ্গ ॥ আষাঢ় ও শ্রাবণ ১৩৭৪)

রাইনের মারিয়া রিলকে অবলম্বনে

বুদ্ধদেব বসু

নাগরদোলা

লুক্সেমবুর্গ উদ্যান

ছাদের তলায় আলোকে ছায়ায় অবিশ্রান্ত
ঘোরে একপাল ক্ষণিক-ঝলক রঙিন ঘোড়া।—
দীপ্ত এ-দেশ একটু দাঁড়ায়, আবার হারায়
যেন ভেঙে গিয়ে ফিরে আসে ঢেউ,
দৃপ্ত গমকে গাড়ি নেয় টেনে ওরা কেউ-কেউ—রঙিন ঘোড়া।
আর দ্যাখো এক পিশুন সিংহ জ্বলে
রোষরক্তিম চিহ্ন......
আর কখনো বা একটা একলা ধবল হাতি।

এমনকি ছোটে হরিণ, যেমন বনে,
শুধু পিঠে বোঝা হাওদায় ব'সে নীল ঘাঘরায়
ছোট্ট মেয়েটি, শক্ত, সোজা।

সিংহে সওয়ার ধবল ছেলেটা কোমর দোলায়
ঝাঁকড়া কেশর হাতের মুঠোয় আঁকড়ে,
এদিকে সিংহ দাঁত বের ক'রে জিহ্বা ঝোলায়।

আর কখনো বা একটা একলা ধবল হাতি।

খেলা-পার-করা তরুণী, তারাও ঘোড়ায় চ'ড়ে
দ্রুত ছুটে যায় অঙ্গবিভায় ছড়িয়ে রঙ্গ,
ঐ উঁচু থেকে দূরে আর কাছে ঘুরে বেড়ায়
তাদের স্বেচ্ছাচালিত চোখের চঞ্চলতা—

আর কখনো বা একটা একলা ধবল হাতি।

আর, সবই এক লক্ষ্যরহিত আবর্তন,
ঘূর্ণির ঘোর, যাতে অবশেষে গতিও ফুরায়।
ধূসর, সবুজ, কদাচিৎ লোহিত বিচ্ছুরণ—
সবে-শুরু-হওয়া আধখানা মুখ ফুটে ডুবে যায়।
আর কখনো বা একটি হাসির প্রজ্বলন—
আনন্দঘন দৃষ্টি-ধাঁধানো সমর্পণ—
রুদ্ধশ্বাস অন্ধ খেলায় চকিতে হারায়।
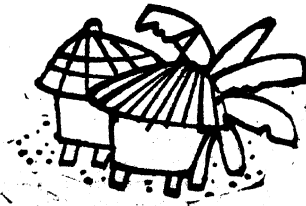
কমল চৌধুরী

মধ্য প্রাচ্যের ঘটনাবলী সহসা বজ্রপাতের মত পৃথিবীতে আঘাত করে। প্যালেস্টাইন-বাসী আরবদের নাশকতামূলক কার্যকলাপের মিথ্যা ছুতোয় সিরিয়ার বিরুদ্ধে ইসরাইলের 'দন্ডমূলক অভিযান', সমগ্র আরব জগতের সংহতি এবং সিরিয়া ও সংযুক্ত আরব সাধারণতন্ত্রের সপক্ষে আরব রাষ্ট্রসমূহের যৌথ ভূমিকা, ইসরাইলের নগ্ন আগ্রাসন, সিনাই উপদ্বীপের মধ্যে মোশে দায়ানের নাৎসিসুলভ অনুপ্রবেশ, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ও বৃটেনের পৃষ্ঠপোষকতায় তেলআভিভের পক্ষ থেকে নিরাপত্তা পরিষদের প্রস্তাব ঔদ্ধত্যভরে উপেক্ষা—এই সবই ঘটে গেল মাত্র দুমাসের মধ্যে।

মধ্য-প্রাচ্যের ঘটনাবলীর বিচিত্র প্রতি-ক্রিয়া লক্ষ করা গেছে। কেউ কেউ যেমন এই সব ঘটনায় বেদনা বা বিক্ষোভ বোধ করেছেন, অন্যেরা উল্লাসিত হয়ে উঠেছেন। বিপুল সৌভাগ্য বিবেচনা করছেন।

আরব দুনিয়ায় একটি প্রবাদ আছে, 'মরুভূমিতে প্রতিটি বালুকনায় তেলের গন্ধ পাওয়া যায়।' মরুভূমির সীমাহীন বিস্তারের নিচে সঞ্চিত আছে প্রায় ৩০০০ কোটি টন তেল। এই সহজ দাহ্য পদার্থটি আগুন জ্বালায় শুধু আক্ষরিক অর্থেই নয়। পশ্চিম এশিয়ায় প্রায়ই যে রাজনৈতিক ঝড় ওঠে বা সামরিক সংঘর্ষ বেধে যায়—তার পেছনে কাজ করে আরব দুনিয়ার তেল লুন্ঠনের অধিকার নিশ্চিত করার জন্য মনোপলিগুলির প্রয়াস। নিকট প্রাচ্যের সাম্প্রতিক সংকটেও তেলের কড়া গন্ধ পাওয়া যাচ্ছে।

সাম্প্রতিক সংঘর্ষ যদিও আরব-ইসরাইল স্থানীয় সংকটের পরিণতি তবুও একথা অস্বীকার করবার উপায় নেই যে, এর সঙ্গে বৃহৎ শক্তিজোটের স্বার্থগত দ্বন্দ্বও জড়িয়ে আছে। ইউরোপ, এশিয়া, আফ্রিকা এবং অস্ট্রেলিয়াকে এই অঞ্চলের তেলের ওপর নির্ভর করতে হয়। পশ্চিম এশিয়ার জ্বালানী তেলের বৃহৎ অংশ বৃটেন ও আমেরিকার কর্তৃত্বে। এই অঞ্চলের তেলের ব্যবসায় বৃটেন ও আমেরিকার বার্ষিক মুনাফা হয় যথাক্রমে পঞ্চাশ কোটি পাউন্ড ও নব্বই কোটি পাউন্ড। এই অঞ্চলের গুরুত্বপূর্ণ যাতায়াতপথ সুয়েজ খাল মিশরের অধীনে। মিশর কর্তৃক সুয়েজ খাল জাতীয়করণের সময়ের সংঘর্ষে বৃটেন ও ফ্রান্স স্বার্থগত যুদ্ধে জড়িয়ে পড়েছিল। সংযুক্ত আরব সাধারণতন্ত্র যাতে পশ্চিম এশিয়ায় শক্তিশালী রাষ্ট্রে পরিণত হয়ে আরব অঞ্চলের তৈল-সম্পদের ওপর আধিপত্য বিস্তার করতে না পারে, সেদিকে বৃটেন ও আমেরিকার লক্ষ্য সুস্পষ্ট। বর্তমান যুদ্ধে তাদের অংশগ্রহণ এই সত্যই প্রমাণিত করে।

পশ্চিম এশিয়ায় মজুত তেলের পরিমাণ ১২৫০০০ কোটি পিপে। আর আমেরিকার মজুত তেলের পরিমাণ হোল ৩০০০০ কোটি পিপে। পশ্চিম এশিয়ার তেল ভাগ-বাটোয়ারায় প্রথম বিশ্বযুদ্ধের পর ইংরেজ ও মার্কিন শক্তির মধ্যে অনেক পরিবর্তন ঘটেছে। ১৯১৮—'৩৯ খৃঃ মধ্যে বৃটেনের ছিল শতকরা ৫৭ ভাগ, আমেরিকার ২৭ ভাগ এবং ফ্রান্সের ১০ ভাগ। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পর আমেরিকার হয় ৫০ ভাগ, বৃটেনের হয় ১০ ভাগ। ফ্রান্সের ভাগে কোন পরিবর্তন ঘটেনি। আমেরিকা বছরে ১৪ হাজার কোটি টাকার ওপর তেল বিক্রি থেকে লাভ করে। এখানকার তেল উৎপাদনে খরচ কম। আমেরিকা পূর্ব আরব রাষ্ট্রগুলি থেকে তেলনিষ্কাশনে বিরত হয়ে স্বার্থত্যাগ করতে পারে না। তাছাড়া তার নিজের মজুত তেলের পরিমাণে থেকে এখানকার মজুত তেলের পরিমাণ থেকে অনেক বেশী।

তেলের ওপর পশ্চিমীদের একচেটিয়া অধিকারের বিরুদ্ধে আরব জনসাধারণ যে-মুহূর্তে লড়াই শুরু করেছে সংঘর্ষটা যে সেই মুহূর্তে বাধল, এটা মোটেই আকস্মিক ঘটনা নয়। আরবরা প্রবল পরাক্রান্ত শত্রুর সম্মুখীন হয়েছে। এর মধ্যে প্রথম এবং প্রধান হোল 'সাত ভগ্নী'—তেলের বৃহত্তম সাতটি এক-চেটিয়া প্রতিষ্ঠান এই নামেই পরিচিত। যথা, ব্রিটিশ পেট্রোলিয়াম, পশ্চিম এশিয়ায় যত তেল নিষ্কাশিত হয় এর ভাগে পড়ে তার এক-চতুর্থাংশেরও বেশি, রকফেলারের তিনটি কোম্পানি। ব্রিটিশ পেট্রোলিয়মকে ধরে ফেলে এরা এখন তাকে ছাড়িয়ে যাচ্ছে। গাল্ফ এবং টেক্সাকো নামের আরো দুটি আমেরিকান কোম্পানি এবং ব্রিটিশ-ডাচ রয়াল ডাচ শেল। এই শেষোক্ত কোম্পানিটি বোধহয় তার দীর্ঘকালের ঔপনিবেশিক নাম ডাকের ফলে সবচেয়ে বেশি সুপরিচিত। এই কোম্পানিগুলি সবাই মিলে গত বছর প্রায় ৪০ কোটি টন তেল নিষ্কাশন করেছে। সারা নিকট প্রাচ্যে যত তেল নিষ্কাশিত হয়েছে এটা তার চার পঞ্চমাংশের অধিক এবং দুনিয়ার (সোভিয়েত রাশিয়া বাদে) নিষ্কাশিত মোট 'কালো সোনার' এক তৃতীয়াংশের কিছু কম।

সৌদি আরব, কুয়ায়েত ও ইরাক—এই তিনটি দেশ হল তেলের রাজাদের সমৃদ্ধির উৎস। কিন্তু নিকট প্রাচ্যের অন্যান্য দেশের সঙ্গেও এই তেলের রাজাদের স্বার্থ জড়িত, বিশেষ করে ভারতসাগর ও ভূমধ্যসাগরের মধ্যবর্তী যে-বিস্তীর্ণ অঞ্চলের উপর দিয়ে তেলের পাইপ লাইন গেছে। মধ্যপ্রাচ্যে এমন কোনো দেশ নেই বললেই চলে, তেলের ট্রাস্টগুলি যাকে নিজেদের সমৃদ্ধির জন্য কোন-না-কোনোভাবে ব্যবহারের চেষ্টা করেছে।

তেল ট্রাস্টগুলি বিপুল মুনাফা করে থাকে। যদিও এই মুনাফার একটা অংশ গোপনই থেকে যায়। তবে ১৯৬৬ খৃঃ তেল বিক্রি থেকে 'সাত-ভগ্নী' যে মুনাফা করেছে তার পরিমাণ ২০০ কোটি ডলারের কম নয়।

এই বিপুল মুনাফা আসে কোথা থেকে? দুটি কথা এ-প্রসঙ্গে মনে রাখতে হবে। প্রথমত মধ্যপ্রাচ্যের তৈলক্ষেত্রে শ্রমিকদের বেতন খুবই কম। দ্বিতীয়ত, মনোপলিগুলি প্রাচ্যে কোন তৈল-শোধনাগার খোলে না, তৈলশোধন করা হয় অন্যত্র। তেল যেসব দেশে নিষ্কাশন হয় তারা দাম পায় অ-শোধিত তেলের। আর তৈলজাত দ্রব্য অপেক্ষা অ-শোধিত তেলের দাম অনেক কম। এমনকি সবচেয়ে নিরেস গ্যাসোলিনের দামও অ-শোধিত তেলের দামেরও দ্বিগুণ। দামী তেল বা রাসায়নিক দ্রব্যের দাম তো অবশ্যই বহুগুণ বেশী।

মনোপলিগুলি যে যে-কোন উপায়ে মধ্যপ্রাচ্যের এই 'কালো সোনাকে' নিজেদের আয়ত্তে রাখবার চেষ্টা করবে, এতে আশ্চর্যের কি আছে। তেল-স্বার্থের দিকে তাকিয়েই পশ্চিমী দেশগুলির পশ্চিম এশিয়া নীতি নির্ধারিত হয়।

১৯৬৬ খৃঃ সাতটি বিদেশী তেল কোম্পানী আরব অঞ্চলের মোট তৈল-নিষ্কাশনের ৮০ ভাগের অংশীদার দেখা যাচ্ছে। বিভিন্ন অঞ্চলে বিভিন্ন রাষ্ট্রের কোম্পানীগুলির নিয়ন্ত্রণ বিভিন্ন রূপ। লিবিয়ার ৯৫ ভাগ আমেরিকা, আলজিরিয়ার ৮০ ভাগ ফরাসী, ইরাকের ৪৭ ভাগ বৃটেন, ২৯ ভাগ ফরাসী এবং ২৪ ভাগ আমেরিকান কোম্পানীগুলির অধীন। এই সমস্ত কোম্পানী তৈল-নিষ্কাশন করে এত বেশী পরিমাণে যে অন্যান্য কোম্পানীর পক্ষে এদের সঙ্গে প্রতি-যোগিতায় এঁটে ওঠা অসম্ভব হয়ে পড়ছে।

তৈলসম্পদশালী আরব রাষ্ট্রগুলির অর্থনৈতিক দুরবস্থা কল্পনাতীত। তাই আজ তারা এই শিল্পের ওপর রাষ্ট্রীয় কর্তৃত্ব বা লভ্যাংশের জন্য তৎপর হয়ে উঠেছে, কিন্তু তৈল ব্যবসায়ীদের সংরক্ষক রাষ্ট্রগুলি তাদের অধিকার ত্যাগ করবে না কোনক্রমেই।

নিজেদের স্বাধীনতা সুদৃঢ় করে তরুণ আরব রাষ্ট্রগুলি তেলের ট্রাস্টসমূহের ওপর নতুন আঘাত হেনেছে। নতুন নতুন স্বাধীন জাতীয় তৈল কোম্পানী গঠিত হচ্ছে, কোন কোন দেশে স্থাপিত হচ্ছে তৈল শোধনাগার। ইরাণে সোভিয়েট রাশিয়ার সহযোগিতায় একটি তৈল শোধনাগার স্থাপিত হোচ্ছে। মধ্য প্রাচ্যের দেশগুলি মুনাফার ভাগ বাড়াবার দাবি করছে এবং পাইপ লাইন ব্যবহারের জন্য দাবি জানাচ্ছে বেশি অর্থের।

তাই সমগ্র মধ্যপ্রাচ্যে একরকম অনিশ্চয়তা এবং সংকটের সৃষ্টি হয়েছে। ইতিমধ্যে আরব রাষ্ট্রগুলি অপেক সংগঠন (অর্গানাইজেশন অফ পেট্রোলিয়াম এক্সপোর্টিং কান্ট্রিস) সৃষ্টি করেছে এবং লভ্যাংশের মালিকানা অংশ দাবী করেছে। ১৯৫০ খৃঃ পর শতকরা ২০ ভাগ লাভ তারা পায়। তারপর বিভিন্ন রাষ্ট্রে নানা-

রকম আন্দোলন ঘটতে থাকায় এই পরিমাণ বাড়িয়ে শতকরা ৫০ ভাগ করা হয়েছে। প্রধান তেল কোম্পানীগুলি গত বৎসর ৫৮ ভাগ অংশ দিতে বাধ্য হয় আরব রাষ্ট্রগুলিকে। ১৯৬০ খৃঃ আরব রাষ্ট্রগুলি যেখানে পেয়েছিল ১,১৬০ মিলিয়ন ডলার, ১৯৬৫ খৃঃ পায় ২,২৫২ মিলিয়ন ডলার।

সম্প্রতি সিরিয়া সরকারের সঙ্গে ইরাক পেট্রোলিয়াম কোম্পানির যে সঙ্ঘর্ষ বাধে তা খুবই তাৎপর্যময়। এই কোম্পানিটির অধিকাংশ শেয়ারই 'সাত ভগ্নী'দের হাতে। কোম্পানি বহুদিন ধরে ব্ল্যাক মেল ও প্রকাশ্য হুমকির আশ্রয় নিচ্ছিল। সিরিয়ার তৈল ও বিদ্যুৎশক্তি দপ্তরের মন্ত্রী আসাদ তাকলা বলেছেন, তাঁর সহকর্মীদের ও তাঁর সেই সময় মনে হত তাঁরা যেন যুদ্ধক্ষেত্রে রয়েছেন। কিন্তু শেষ পর্যন্ত তাঁরা জয়ী হন এবং কোম্পানির কাছ থেকে ১-৫ গুণ বৃদ্ধি আদায় করতে সক্ষম হন। এতে একটা চক্র প্রতিক্রিয়া স্মরণ হয়। ইরাক পেট্রোলিয়াম কোম্পানি বাধ্য হয়ে লেবাননকেও অনুরূপ সুবিধা দিতে। পাইপ লাইন ব্যবহারকারী অন্য আর একটি কোম্পানির কাছেও সিরিয়া একই দাবী জানায়। এ সবের ফলে মধ্য প্রাচ্যের তেলের পর বিদেশী মনোপলির অধিকার বেশ বড় রকমের ভাঙ্গন ধরে, নিজেদের সম্পদের নিজেরা মালিক হওয়ার জন্যে আরব জনসাধারণের সংগ্রামে নতুন প্রেরণা সৃষ্টি হয়।

নিজেদের শোষণের কবল থেকে মুক্ত করতে গিয়েও আরব দেশগুলি বিদেশী তেল কোম্পানিগুলির সঙ্গে সম্পর্ক ছিন্ন করতে চায়নি। এই দেশগুলির আর্থিক সমস্যা খুবই তীব্র—তা মনে রাখলে বোঝা যাবে তাদের এই আচরণ খুবই স্বাভাবিক। পশ্চিমী ট্রাস্টগুলির কাছে আরব দেশগুলির শুধু এইটুকুই দাবি তারা মনে না করে এই অধিকার বিক্রয়যোগ্য। ন্যায়সঙ্গত ও পরস্পরের সঙ্গে সুবিধাজনক ভিত্তিতে যেন এই সম্পর্ক স্থাপিত হয়। এটা যে সম্ভব তার কয়েকটি দৃষ্টান্ত এখনই বর্তমান। যেমন, ধরা যাক, কিছুকাল আগে সাহারার তৈলক্ষেত্র উন্নয়ন সম্পর্কে ফ্রান্স ও আলজিরিয়ার মধ্যে যে চুক্তি হয়েছে তার কথা। এই চুক্তি অনুসারে আলজিরিয়া কয়েকটি সুবিধা পেয়েছে। ফরাসী তেল ব্যবসায়ীমহল সুবুদ্ধি ও নতুন পরিস্থিতির উপলব্ধির পরিচয় দিয়েছে। ৩০ আগস্ট আলজিরিয়া সরকার আমেরিকান ও ফরাসীদের পাঁচটি তেল কোম্পানিকে রাষ্ট্রায়ত্ত করে নিয়েছেন।

দশটি আরব রাষ্ট্র (সৌদী আরব, ইরাক, কুয়ায়েৎ, লিবিয়া, আলজেরিয়া, আবু-দাবি, কাতার, বাহরেন, সিরিয়া, লেবানন) ১৯৬৭ খৃঃ ৫ই জুন বাগদাদে মিলিত হয়ে ঘোষণা করে, যে সমস্ত রাষ্ট্র ইসরাইলকে সাহায্য করবে, তাদের তেল সরবরাহ বন্ধ করে দেওয়া হবে। তারা বিদেশী তেল কোম্পানীগুলিকে সতর্ক করে দিয়ে জানায় যে, যদি এই নির্দেশের অন্যথা তারা করে, তাহলে তাদের সম্পূর্ণ বয়কট করা হবে।

পূর্ব আরবের দেশগুলি থেকে বিভিন্ন দেশে কি পরিমাণ তেল রপ্তানি করা হয়েছে, তার একটি পরিসংখ্যান (মিলিয়ন টন হিসাবে) দেওয়া হল :

এরা হোল প্যালেস্টাইনের সেইসব বিতাড়িত আরব, যারা গেরিলা সংগ্রামের পথ বেছে নিয়েছে প্যালেস্টাইনকে ইসরাইলের কবল থেকে মুক্ত করবার জন্য।

	মোট পরিমাণ	
	১৯৬৫	১৯৬৬
বৃটেন	৪৪	৪৯
আমেরিকা	১৫	১৩
ইটালি	৫৭	৫৮
জাপান	৪৮	৫৪
ফ্রান্স	৪৮	৫২
জার্মান ফেডারেল রিপাব্লিক	৪৪	৫০
হল্যান্ড	১৯	২৫

বর্তমানে বৃটেন ও আমেরিকাকে তেল সরবরাহ বন্ধ রয়েছে। পরিসংখ্যান থেকে জানা যাচ্ছে যে, ১৯৬৬ খৃঃ আরব থেকে বৃটেন ও আমেরিকার মোট আমদানির পরিমাণ ছিল যথাক্রমে ৪৯ এবং ১৩ মিলিয়ন টন। আমেরিকার মোট তেল আমদানি পরিমাণের মধ্যে শতকরা ২০ ভাগই হোল আরবীয় তেল। বৃটেন বৎসরে প্রায় শতকরা ৭০ ভাগ অপরিশোধিত তেল আমদানি করে থাকে। পশ্চিম ইউরোপের দৈনিক প্রয়োজনের শতকরা ৬৫ ভাগ তেলই আসে আরব রাষ্ট্রগুলি থেকে।

আরব রাষ্ট্রগুলি তেল বন্ধ করে দেওয়ায় একটি ভয়ংকর অবস্থার সৃষ্টি হয়েছে। পশ্চিম ইউরোপে সংরক্ষিত তেল মাত্র ২ থেকে ৪ মাস পর্যন্ত প্রয়োজন মেটাতে পারবে। ইসরাইলী আক্রমণের পর তেল-নিষ্কাশণ এবং রপ্তানি পরিমাণ কমে সর্বনিম্ন শতকরা ৩০ ভাগ পর্যন্তও গিয়ে পৌঁছুতে পারছে না। ২৯ জুন নিউইয়র্ক
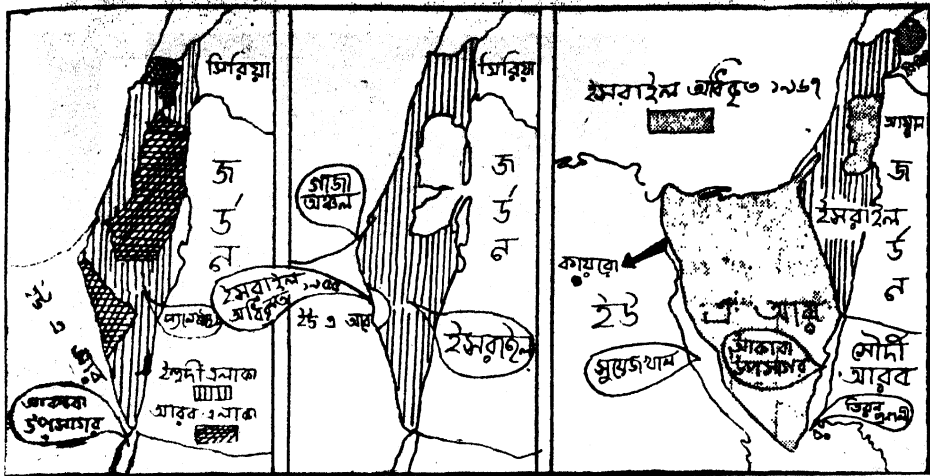
জন্মকালের ইসরাইল ঃ ১৯৪৮ — ইসরাইল ঃ ১৯৫৬ — ইসরাইল ঃ ১৯৬৭

টাইমস পশ্চিম ইউরোপকে অদূরভবিষ্যতের তৈল-সংকট সম্পর্কে সতর্ক করে দিয়েছে। বৃটেনে তেলের রেশন প্রবর্তনের সম্ভাবনা দেখা দিয়েছে।

তাছাড়া তৈলবাহী জাহাজ চলাচলের প্রধান রাস্তা সুয়েজ খাল এখন বন্ধ। এই সমস্ত জাহাজের চার ভাগের তিন ভাগ এই পথে তেল নিয়ে যায় ইউরোপ এবং অন্যান্য পশ্চিমী রাষ্ট্রে। উত্তমাশা অন্তরীপ ঘুরে প্রয়োজনীয় তেল সরবরাহের জন্য ১,৪৪০খানি অতিরিক্ত তৈলবাহী জাহাজের প্রয়োজন। বর্তমানে পশ্চিমী রাষ্ট্রগোষ্ঠীর, তৈলবাহী যে সমস্ত জাহাজ রয়েছে সেগুলিতে সরবরাহের পরিমাণ আরও ২২ শতাংশ ভাগ বাড়ান সম্পূর্ণ অসম্ভব।

ইসরাইল এবং তার মিত্ররা সমগ্র বিশ্বব্যাপী রাজনৈতিক উত্তেজনা এবং অর্থনৈতিক সংকট সৃষ্টি করেছে। আরব অঞ্চলে সামরিক কার্যকলাপ চালিয়ে বা অর্থনৈতিক অবরোধ সৃষ্টি করে কোন ফল পাওয়া যাবে না। কারণ, আরব জাতীয়তাবোধ তাদের ন্যায্য দাবী না মেটা পর্যন্ত যে কোনপ্রকার নতি স্বীকার করবে না—তাদের বিভিন্ন কার্যাবলী থেকে তা প্রমাণিত হোচ্ছে।

পশ্চিমী শক্তিজোটের সাহায্যপুষ্ট না হলে ইসরাইলী চরমপন্থীরা তাদের বেপরোয়া হটকারিতায় নামত না। ইসরাইলের সামরিক শক্তির উন্নয়নের জন্য মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ১৬০ কোটি ডলার দিয়েছে। গ্রেট বৃটেনও একটা বড় অংক দিয়েছে। ন্যাটোর অংশীদারদের সংগে পাল্লা দিতে গিয়ে পশ্চিম জার্মানীও ইসরাইলকে দিয়েছে ৮২ কোটি ২০ লক্ষ ডলার। এই সমগ্র অর্থই ব্যয় করা হয়েছে প্রধানত ইসরাইলী সৈন্যবাহিনীকে গড়ে তোলার জন্য। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র, বৃটেন, পশ্চিম জার্মানী ইসরাইলকে রাইফেল ও টমিগান থেকে শুরু করে ট্যাংক ও বিমান পর্যন্ত আধুনিক সমরাস্ত্র সরবরাহ করেছে।

এই উদারতার অর্থ কি? দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পর জাতীয় মুক্তি আন্দোলন নিকট ও মধ্যপ্রাচ্যকে ভাসিয়ে নিয়ে গেছে। বহু আরব দেশ স্বাধীন হয়েছে। ফলে তৈলশিল্পের পশ্চিমীদের একচেটিয়া মুনাফার ওপর আঘাত আসার বিপদ উপস্থিত হয়েছে। এই শক্তিগোষ্ঠীর তখন প্রয়োজন হল এমন কাউকে পাওয়া যে, পশ্চিম এশিয়ায় হবে তার স্বার্থসংরক্ষক এবং মুক্তি আন্দোলনের প্রতিবন্ধক। কিছুকাল এরূপ মনে হয়েছিল যে, রাজতন্ত্র উচ্ছেদের পূর্বেকার ইরাকী সরকার এদের কাজ হাসিল করতে পারবে। অন্য কোন কোন সরকারের ওপরও নির্ভর করা হয়েছিল। কিন্তু পরবর্তী সময়ে আরব দুনিয়ায় পশ্চিমী শক্তি তার মর্যাদা ও প্রতিপত্তি নিরবচ্ছিন্নভাবে হারিয়েছে, যদিও মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র আরব দুনিয়াকে সামরিক জোটে বেঁধে রাখার চেষ্টা করেছিল।

এই শূন্যস্থান পূর্ণ করতে এগিয়ে এল ইসরাইলের প্রতিক্রিয়াশীল মহল। আরবদের বিরুদ্ধে ইসরাইলকে অস্ত্রসজ্জিত করতে তৈলশিল্পের একচেটিয়া ব্যবসায়ীরা অর্থব্যয়ে কার্পণ্য করেনি। রণনৈতিক ও সামরিক প্রস্তুতের পাশাপাশি ইসরাইলী চরমপন্থীরা জনসমষ্টির মগজ ধোলাইয়ের জন্য সর্বপ্রকার প্রচেষ্টা চালিয়েছে। তারা আরবদের প্রতি ঘৃণা জাগিয়েছে, প্রচার করেছে যে, ইহুদীরা অন্যান্য জাতির চেয়ে বড়। ইসরাইলী সৈনিকদের আচরিত অপরাধের কথা আজ সারা দুনিয়া জানে।

পশ্চিম এশিয়ায় রাশিয়ার স্বার্থ কোন অংশে কম নয়। তারা এই অঞ্চলে আমেরিকার আধিপত্য বিস্তারে শংকিত। আমেরিকার
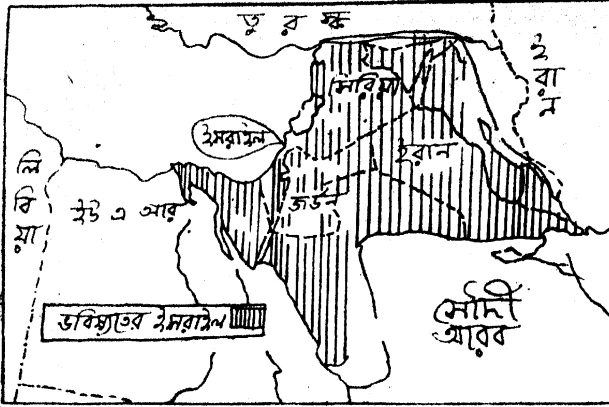
ভবিষ্যতের স্বপ্ন : তেলআভিভে পার্লামেন্ট হাউসের সামনে একটি মানচিত্রে এইভাবে ভবিষ্যতের ইসরাইল রাষ্ট্রের স্বপ্নকে ফুটিয়ে তোলা হয়েছে

সামরিক কার্যকলাপের উচ্ছেদের জন্য আরব জাতীয়তাবাদের প্রবীণ নেতা নাসেরকে তারা অবলম্বন করেছে। তারা চায় সংযুক্ত আরব সাধারণতন্ত্রের সহযোগিতায় পশ্চিম এশিয়ায় ইংগ মার্কিন প্রভাব বিনষ্ট করতে। এদিকে আমেরিকা ও বৃটেন ইসরাইলের মাধ্যমে নাসেরের প্রভাব এবং সোভিয়েত যুক্ত-রাষ্ট্রের অনুপ্রবেশ নষ্ট করতে দৃঢ়-সংকল্প। তাই আরব স্বার্থ-সংরক্ষণে এবং বিনষ্ট মর্যাদার পুনরুদ্ধারে সোভিয়েত যুদ্ধ জাহাজকে ভূমধ্যসাগরে এসে হাজির হতে হয়েছে।

যাই হোক না কেন, ইসরাইল রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠা হয়েছে। এবং তা একটি ঐতিহাসিক ঘটনা। ইসরাইলকে যদি টিকে থাকতে হয়, তবে তাকে আরব রাষ্ট্রগুলির দিকে বন্ধুত্বের হাত প্রসারিত করতে হবে। ১৯১৮ সালের পূর্বেকার সম্প্রীতির কথা যদি তারা ভেবে দেখেন, তাহলে নিজেদের অস্তিত্ব নিয়ে তাদের বিপন্ন হতে হবে না। প্যালেস্টাইনের উদ্বাস্তুদের পুনর্বাসন ও খেসারতের দায়িত্ব তাকে নিতে হবে। আর যদি পাশ্চমী শক্তি-জোটের চৌকিদারী সে করতে চায় তবে পশ্চিম এশিয়ায় শান্তি কোনদিন স্থাপিত হবে না। যুদ্ধের আগুন আবার জ্বলবে। পথ যেন ক্রমশ সেদিকেই প্রসারিত হচ্ছে।

যুদ্ধোত্তর পশ্চিম এশিয়ায় শান্তি স্থাপনে রাষ্ট্রসংঘ ব্যর্থ হয়েছে। যুদ্ধ থামলেও সমস্যা সমাধানের কোন পথ নির্দেশ হয়নি। রাষ্ট্রসংঘ অধিকৃত ভূমি থেকে ইসরাইলকে সরে যাওয়ার নির্দেশ দেয়নি। চক্রান্তকারীদের অধিকারকে যেন মেনে নেওয়া হয়েছে অপরোক্ষে।

এদিকে উগ্রপন্থী আরব নেতারা এই অপমানকে হজম করে যে নেবেন না তা বোঝা যাচ্ছে বিভিন্ন ঘটনা থেকে। সোভিয়েত রাশিয়া আরব রাষ্ট্রগুলির বিনষ্ট সামরিক শক্তি পুনরুদ্ধারে যথাসাধ্য সমরোপকরণ সরবরাহ করে চলেছে। যদি ইসরাইল অধিকৃত অঞ্চল থেকে না সরে যায় তবে সোভিয়েত যুক্তরাষ্ট্র তার প্রদত্ত প্রতিশ্রুতি যে পালন করবেই তা বিভিন্ন সোভিয়েত নেতার বক্তৃতায় ও তাদের কার্যে সুস্পষ্ট হয়ে উঠেছে। অন্যান্য সোসালিস্ট রাষ্ট্রও আরব রাষ্ট্রগুলির পক্ষে এসে দাঁড়িয়েছে অস্ত্রসম্ভার সরবরাহের প্রতিশ্রুতি নিয়ে। আমেরিকার উদ্বেগকে আমল না দিয়ে সোভিয়েত অস্ত্রবাহী জাহাজে সমরাস্ত্র চলেছে সমস্ত আরব রাষ্ট্রগুলিতে। এর ফলে আরব রাষ্ট্রগুলি সামরিক শক্তি অনেকটাই পুনরায় ফিরে পেয়েছে।

কায়রোয় পাঁচ আরব রাষ্ট্রের প্রধানদের সম্মেলনে গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে। ইসরাইলকে সতর্ক করে বলা হয়েছে সে যেন সুয়েজ খালে জাহাজ চালানর চেষ্টা না করে। রাষ্ট্রপ্রধানরা আরব ঐক্যের ওপরই সব থেকে গুরুত্ব দিয়েছেন। যে সমস্ত রাষ্ট্র যুদ্ধকালে ইসরাইলকে সমর্থন জানিয়েছিল, তাদের সঙ্গে সম্পর্ক স্থায়ী রাখার বিষয়ে বিবেচনা করা হবে। তারা আরও গুরুত্ব দিয়েছেন 'বর্তমান যুদ্ধে আমেরিকা' ও বৃটেনের যোগদান বিষয়ে। নিজেদের অধিকার তারা অক্ষুণ্ণ রাখবেন, কোন রকম প্রতিবন্ধকতাকে তারা মানবেন না।

"আরব ঐক্য কি আদৌ সম্ভব?" পাশ্চমী প্রচারে অনবরত এই প্রশ্নটি উত্থাপন করা হচ্ছে। সম্প্রতি খার্তুমে আরব দেশগুলির পররাষ্ট্র মন্ত্রীদের যে সম্মেলন অনুষ্ঠিত হল সে সময় ব্রিটিশ আমেরিকান ও পশ্চিম জার্মান পত্রিকার পৃষ্ঠায় প্রায়শই এই প্রশ্নটি উত্থাপিত হয়েছে।

আরবদের ঐক্য কামনায় কারো অনিচ্ছা থাকতে পারে না। দশ কোটিরও বেশি আরব মধ্যপ্রাচ্য ও উত্তর আফ্রিকায় বাস করেন, একই ভাষায় কথা বলেন এবং তাঁদের ইতিহাস ও অর্থনৈতিক স্বার্থ বহু বিষয়েই অভিন্ন।

কিন্তু অনেকেই আরব ঐক্যের ধ্যান-ধারণাটিই "অবাস্তব" মনে করছেন, কারণ বিভিন্ন দেশের মতামতের পার্থক্য অনতিক্রম্য। আর এ নিয়ে গুজব ছড়ানোও কম হচ্ছে না।

খার্তুম সম্মেলন যখন পুরোদমে চলছে সে সময় কয়েকটি পত্রপত্রিকায় বলা হয় যে ইরাক ইসরাইলের সমর্থক দেশগুলিকে তেল সরবরাহ সম্পর্কিত নিষেধাজ্ঞা তুলে নিয়েছে। ইরাক সরকার অনতিবিলম্বে এই গুজবের সত্যতা অস্বীকার করেছেন।

ইসরাইলী ফৌজ এখনও জর্ডান নদীর পশ্চিম তীরে মোতায়েন রয়েছে এবং এখনও জর্ডানের যথেষ্ট পরিমাণ জমি দখল করে রয়েছে একথা "বিস্মৃত" হয়ে নিউইয়র্ক টাইমস প্রস্তাব করেছে যে, ইসরাইলী আক্রমণ প্রতিহত করার জন্য জর্ডানে প্রেরিত ফৌজকে ইরাক সেদেশ থেকে সরিয়ে আনুক। পত্রিকাটি "পরিস্থিতি স্বাভাবিক করায়" জর্ডানকে নিবৃত্ত করার অভিযোগ ইরাকের বিরুদ্ধে উত্থাপন করেছে। এর জবাবে জর্ডানের প্রধানমন্ত্রী বলেছেন যে, সঙ্কট সমাধানের প্রশ্নে তাঁর দেশ আরব দেশগুলির ঐক্য, সংহতি ও কাজকর্মের সমন্বয় সাধন-ভিত্তিক মূলনীতিসমূহ অনুসরণ করে।

পশ্চিমী প্রচারের যে জবাব আরব দেশগুলি দিচ্ছে তা আরব ঐক্যের দিকে অঙ্গুলি নির্দেশ করছে। খার্তুম সম্মেলনের কার্যবিবরণীর মধ্যেই আরব ঐক্যের জীবনীশক্তি ও সংহতি প্রমাণিত।

আরব পররাষ্ট্রমন্ত্রীরা আরব দেশগুলির প্রস্তাবিত শীর্ষ সম্মেলনের আলোচ্যসূচী প্রণয়ন করেছে। ইসরাইলী আক্রমণের

পরিণতিসমূহের বিলোপসাধনের সংগ্রামে আরব দুনিয়ার দেশগুলির সংহতি আরও দৃঢ়তর করতে এই সম্মেলন নিঃসন্দেহে সহায়তা করবে।*

মধ্যপ্রাচ্য সঙ্কটের সবচেয়ে কঠিন দিনগুলিতে আরব ঐক্যের প্রকৃত তাৎপর্য প্রকট হয়েছিল। জনগণ শুধু ইসরাইলী আক্রমণের বিরুদ্ধে নয়, মিশর, সিরিয়া ও আলজিরিয়ার বিপ্লবী সরকারগুলিকে রক্ষা করার জন্যও সংগ্রামে অবতীর্ণ হয়েছিলেন।

কিন্তু সমগ্র আরব রাষ্ট্রের অভ্যন্তরে চলেছে নানান অশান্তি। আরব শীর্ষ সম্মেলনের পরিবর্তে ঐশ্লামিক শীর্ষ সম্মেলনের ওপর গুরুত্ব দিলেন সৌদি আরবের রাজা ফৈজল। বিপর্যস্ত উদ্বাস্তুভারে বিভ্রান্ত জর্ডন দ্বিধাগ্রস্ত। রাজা ইদ্রিস বৃটেন ও আমেরিকাকে তার রাজ্য থেকে ঘাঁটি অপসারণের নির্দেশ দিয়েছেন। কুয়ায়েত আরব শীর্ষ সম্মেলনে সিদ্ধান্ত মেনে চলবার প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন। কিন্তু লিবিয়া, কুয়ায়েত, মরক্কোর রাজার মনোভাব স্পষ্ট নয়। মুখে এবং কাজে এদের দুস্তর ফারাক। আরব অনৈক্য আজ যেন আরও স্পষ্ট।

মিশর বা কোন আরব রাষ্ট্র ইসরাইলের বিরুদ্ধে যুদ্ধে অগ্রসর হয়নি। [illegible] যুদ্ধের হুমকি [illegible] ইসরাইল যুদ্ধের [illegible] থেকেই। কোন [illegible] রাষ্ট্রগুলি করেনি। [illegible] অপসারণ এবং টিরান প্রণালী [illegible] পশ্চিমী শক্তিজোট প্রবল প্রচার [illegible] অথচ এই দুটি কাজ সংযুক্ত [illegible] তন্ত্র বেআইনীভাবে করেনি। টিরান [illegible] দুধারেই মিশরই ভূমি। [illegible] চার মাইল চওড়া। [illegible] অবস্থিত এই প্রণালী [illegible] আন্তর্জাতিক [illegible] ব্যাঘাত সৃষ্টি [illegible] রাষ্ট্রগুলির সঙ্গে ইসরাইল ১৯৪৮ [illegible] পর থেকে কোন না কোন ভাবে যুদ্ধরত। তাছাড়া ইসরাইলের অস্তিত্ব আরব রাষ্ট্রগুলি স্বীকার করে না। টিরান প্রণালী দিয়ে যুদ্ধাস্ত্রহীন ইসরাইলী জাহাজ যাতায়াতে মিশর কোন প্রতিবন্ধকতারও সৃষ্টি করেনি। ইসরাইলের জন্ম সময় থেকে পরবর্তীকালের ইতিহাস তার যুদ্ধোন্মাদনাই প্রমাণ করে। মধ্যপ্রাচ্যের সংকটকে ইসরাইল দিনের পর দিন উত্তপ্ত করে তুলেছে। ইসরাইলের জঙ্গীনীতি পশ্চিমী সমর্থনে ক্রমশ উগ্র হয়ে উঠেছে। আরব দেশগুলির ওপর আক্রমণের দু' সপ্তাহ আগে পশ্চিম জার্মানী ইসরাইলকে ৮০০ সামরিক ট্রাক ও অন্যান্য সমর সরঞ্জাম সরবরাহ করেছিল। এরূপ সংবাদও পাওয়া গেছে যে ইসরাইলকে বিপুলসংখ্যক বিমান পাঠানো হয়েছিল। আক্রমণের আগে আমেরিকা ও কতিপয় পশ্চিম ইউরোপীয় দেশ থেকে "স্বেচ্ছাব্রতী" পাইলটরা তেল আভিভে উপস্থিত হয়।

১৯৫৬ খৃঃ সিনাই উপদ্বীপে যুদ্ধের মধ্য এবারকার যুদ্ধের কৃতিত্ব ও সাফল্যের জন্য ইসরাইল গর্ব অনুভব করতে পারে। আরব রাষ্ট্রগুলি ইসরাইলকে ধ্বংস করবার জন্য বারবার ঘোষণা করে এসেছে। কিন্তু ইসরাইলকে ধ্বংস করা দূরে থাকুক, আরব দুনিয়া সমস্ত ফ্রণ্টেই ইসরাইলী বাহিনীর হাতে প্রথম প্রতিরক্ষা-ব্যূহ সম্পূর্ণ পর্যুদস্ত হয়েছে। দ্বিতীয় পর্যায়ে প্রবল প্রতিরোধ দিয়েও তাদের গতিরোধ করতে [illegible] ইসরাইলী রণনীতি ছিল ১৯৫৬ খৃঃ [illegible] রীতিরই অনুরূপ।

এবারের [illegible] আরব বিপর্যয়ের [illegible] ইসরাইলী [illegible] সিনাই উপদ্বীপে [illegible] সংযুক্ত আরব সাধারণ[illegible] [illegible] সংযুক্ত আরব সাধারণতন্ত্রের [illegible] ইসরাইল [illegible] যুদ্ধে ইসরাইলের সাফল্যের সম্ভাবনা কম।

ওয়াশিংটনের একটি পত্রিকায় প্রকাশিত হয়: ইসরাইল ঘাঁটি থেকে যে কোন শব্দাতিগ (সুপারসনিক) জেট বিমান মাত্র কয়েক মিনিটের মধ্যে মিশরের বিমান-ঘাঁটিতে পৌঁছতে পারে। যেমন, ঘন্টায় ১৩০০ মাইল গতিবেগবিশিষ্ট ইসরাইলী মিরেজ ৩-সি পনের মিনিটেরও কম সময়ে তেল আভিভ থেকে কায়রো পৌঁছতে পারে। জরডনের নিকটস্থ বিমান-ঘাঁটিতে পৌঁছতে ইসরাইলী জেট বিমানের লাগে পাঁচ মিনিটেরও কম সময়। অবশ্য ইসরাইলী যুদ্ধ-কৌশলের দোহাই দিয়ে আরব বিপর্যয়কে এড়িয়ে যাওয়া অন্যায় হবে। তারা যে এইভাবে আক্রমণ চালাতে পারে তার জন্য সম্পূর্ণ প্রস্তুত থাকা উচিত ছিল। সংযুক্ত আরব ইসরাইলী বিমান আক্রমণ প্রতিরোধে সম্পূর্ণ ব্যর্থ হয়েছে। যদিও তার হাতে যথেষ্ট পরিমাণে বিমান-বিধ্বংসী ক্ষেপণাস্ত্র ছিল। তবুও সেগুলি ব্যবহার করতে পারেনি। আরব সংযুক্ত সাধারণতন্ত্রের গোপন-সংবাদ সংগ্রহ ছিল খুবই দুর্বল। শত্রুদের শক্তি সম্পর্কে তারা সম্পূর্ণ জ্ঞাত ছিল না। কারণ পরে নাসের বলে-

ছিলেন যে, ইসরাইল 'আমরা যা আশা করে-ছিলাম. তার থেকে অনেক বেশী শক্তিশালী।'

আরবদের প্রচার-প্রস্তুতি ছিল যত বেশী, সমর-প্রস্তুতি তত ছিল না। সিনাই সীমান্তের প্রথম রক্ষাব্যূহ খুব সহজেই ধ্বসে পড়ে। অথচ দীর্ঘ সময় ধরে প্রস্তুতি চলেছিল। সিনাই উপদ্বীপে ইসরাইল যে ১৯৫৬ খৃঃ স্ট্র্যাটেজি অনুসরণ করতে পারে, তা সংযুক্ত আরব সাধারণতন্ত্রের বোঝা উচিত ছিল। তাছাড়া সংযুক্ত আরব সাধারণতন্ত্রের নেতারা আত্মনির্ভরতার নীতি গ্রহণ করেনি। তারা বেশী মাত্রায় সোভিয়েতের ওপর নির্ভর করেছিল।

আরব দুনিয়ার গুরুত্বপূর্ণ ও শক্তিশালী রাষ্ট্র হিসাবে সংযুক্ত আরব সাধারণতন্ত্রের ওপরই যুদ্ধের প্রধান দায়িত্ব পড়েছিল। যদি তার অপ্রস্তুতি ও অসতর্কতায় এই বিপর্যয় ঘটে থাকে, তবুও বলা যায়, অন্যান্য আরব রাষ্ট্রের নিষ্ক্রিয়তা ও দ্বিধাজড়িত মনোভাবও এর জন্য কম দায়ী নয়। ইরাক ও আলজিরিয়া যুদ্ধে সক্রিয় অংশ নিয়েছিল। অন্যান্য আরব রাষ্ট্র কতখানি যুদ্ধে নেমেছিল, সে সম্পর্কে যথেষ্ট সন্দেহের অবকাশ আছে। জর্ডন যতখানি কাহিল হয়ে পড়েছিল, ঠিক যুদ্ধে ততখানি অংশগ্রহণ করেছিল কিনা তাও প্রশ্নের বিষয়। সৌদী আরববাহিনী জর্ডনে ঢুকেছিল আরব পক্ষের হয়ে যুদ্ধ করবার জন্য, কিন্তু শেষ-পর্যন্ত তাদের কোন সংবাদ পাওয়া যায়নি। জর্ডন ও সৌদী আরব নাসেরকে বারবার ইসরাইলের বিরুদ্ধে প্ররোচিত করেছিল। ফলে নাসেরকে নিজের সম্মান বাঁচাবার জন্য কঠোর পথ নিতে হয়।

সিরিয়া-ইসরাইল সীমান্তে যুদ্ধবিগ্রহ সবসময়েই লেগে থাকে। এই সিরিয়ার জন্যই নাসেরকে চরমপন্থী মনোভাব নিতে হয়েছিল। কিন্তু সিরিয়ার প্রচার আর প্রকৃত যুদ্ধের মধ্যে বিরাট পার্থক্য থাকা আশ্চর্যের নয়। এবারের যুদ্ধে সংযুক্ত আরব সাধারণ-তন্ত্রের বিপর্যয় হোল সিরিয়ার বিপন্মুক্তি। আরব রাষ্ট্রগুলির অসহযোগী মনোভাব নাসের বিরোধী রাজনীতির বিরাট জয়লাভ বটে, কিন্তু পশ্চিম এশিয়ায় চরম সংকটের আহ্বান।

ইসরাইলের সামরিকতন্ত্রের ভিত্তি 'ব্লিজ-ক্রিগ'তত্ত্ব—এটি হিটলারী সৈন্যবাহিনীর কাছ থেকে ধার করা। এই তত্ত্বের নির্দেশ হোল আরব জাতিসমূহের সঙ্গে সীমান্ত ধরে সংগঠিত সামরিক প্ররোচনা চালাতে হবে ও তারপর আকস্মিক আক্রমণ হানতে হবে। আগে থাকতেই এই কাজের সাফাই গাওয়ার জন্য জনসাধারণের কাছে প্রতিবেশী দেশ-গুলিকে সম্ভাব্য আক্রমণকারী হিসাবে চিহ্নিত করা হোল।

রণনৈতিক লক্ষ্য ও কর্তব্যসাধনে প্রধান ভূমিকা দেওয়া হয়েছিল বোমারু বিমান-বহরকে। দ্বিতীয় স্থান দেওয়া হয়েছিল ট্যাঙ্ক ইউনিটগুলিকে। যেহেতু মরুভূমি অঞ্চল ট্যাঙ্কের পক্ষে প্রায় দুর্গম, সেজন্যই সাঁজোয়া ইউনিটগুলিকে রাস্তা আঁকড়ে থাকতে হয়েছে।

যদিও তেল আভিভের সম্প্রসারণবাদীরা শান্তির বুলির আড়ালে তাদের আক্রমণ পরিকল্পনাকে লুকিয়ে রাখার চেষ্টা করে-ছিল, তাহলেও সামরিক তৎপরতার সমগ্র গতিপথ ও ইসরাইলের পরবর্তী কর্মনীতি ইসরাইলের এই দাবি অপ্রমাণ করেছে যে, সে নাকি নিজ ভূখণ্ড রক্ষার লড়াই করছিল। অন্যদিকে ইসরাইলী সৈন্যবাহিনীর কাজ দেখিয়ে দিয়েছে যে, তেল আভিভ সীমান্ত নতুন করে রচনা করতে ও তার সম্প্রসারণ-বাদী পরিকল্পনা কার্যকর করতে কৃতসংকল্প ছিল।

ইসরাইলের এবারকার যুদ্ধবন্দীদের প্রতি ব্যবহার যে কি অমানুষিক, তার কিছু কিছু সংবাদ ইতিমধ্যে এসে পৌঁছেছে। সিনাই অঞ্চলে যে পনের হাজার আরব সৈন্য বন্দী হয়, তাদের প্রতি ব্যবহার সম্পূর্ণ অমানবিক। সমস্ত অস্ত্রশস্ত্র পোশাক কেড়ে নিয়ে গেঞ্জি ও ছোট প্যান্ট-পরা অবস্থায় তাদের ট্রাক বোঝাই করে নিয়ে যাওয়া হয়েছে বন্দী-শিবিরে। আহতদের ফিরিয়ে দেওয়া হয়েছে আন্তর্জাতিক রেডক্রসের মাধ্যমে। নিরস্ত্র অসহায় বহু আরব সৈন্য মরুভূমির দস্যু, বিষাক্ত সাপ এবং হিংস্র জন্তুর হাতে নিহত হয়েছে। পরাজিত সৈন্যদের প্রতি ইসরাইল মানবিক-তার দিক থেকে স্বরূপ আরও উদার হোতে পারত।

রাষ্ট্রসংঘের কাজে নিযুক্ত ভারতীয় সৈন্যদের ওপর ইসরাইলী পদাতিক ও বিমানবাহিনী যে অন্যায় আক্রমণ চালায়, তাতে অন্তত উনিশজন ভারতীয় সৈন্য নিহত হয়। এমনকি ইন্দ্রজিৎ রিখের বিমানও তাদের আক্রমণের লক্ষ্য ছিল। এর জন্য দ্বিধাগ্রস্তভাবে ইসরাইল দুঃখ-প্রকাশ করেছে!

এই যুদ্ধে সংযুক্ত আরব সাধারণতন্ত্র বিপর্যস্ত ঠিকই। কিন্তু আরব জাতীয়তা-বাদের রাজনৈতিক লাভ ঘটেছে প্রচণ্ডভাবে। পশ্চিমী সমর্থনপুষ্ট ইসরাইলের স্বরূপ আরবদের কাছে স্পষ্ট। বৃহৎ স্বার্থান্বেষী শক্তিরা আর তাদের বিভ্রান্ত করতে পারবে না। তাছাড়া যাদের সাহায্য ও সমর্থন ইসরাইলের ঔদ্ধত্য বাড়িয়েছে, আরবরা আজ আর তাদের মিত্র বলে জানে না।

আবার আরব সাধারণতন্ত্রের যখন চরম বিপর্যয় ঘটছিল—তখন সোভিয়েত যুক্তরাষ্ট্র তাদের সাহায্যে এগিয়ে যায়নি। কিন্তু ইস-রাইলী সাফল্যের পেছনে ছিল আমেরিকান সহযোগিতা—বলে আরবদের বিশ্বাস। তাই পশ্চিম এশিয়ায় সোভিয়েত যুক্তরাষ্ট্রের মর্যাদা কমে গেছে বহুলাংশে।

অতি সম্প্রতি মধ্যপ্রাচ্য থেকে সব সংবাদ আসছে তা যথেষ্ট উদ্বেগজনক। প্রকাশ, তেল আভিভে কর্তৃপক্ষ অধিকৃত আরব ভূখণ্ডকে ইসরাইলের মধ্যে যুক্ত করার ব্যবস্থাদি গ্রহণ করেছে। তাছাড়া এরা এই এলাকায় শুধু দখলদার শাসন সৃষ্টির কথাই বলেছে। ইসরাইলী প্রধানমন্ত্রী এশকোলের সাম্প্রতিক বক্তৃতাতেও এটা স্পষ্ট ছিল। এইসব অঞ্চল থেকে বিতাড়িত আরবদের স্বগৃহে প্রত্যা-বর্তন নিষিদ্ধ করে ইতিমধ্যেই তেল আভিভে একটি আদেশ প্রচারিত হয়েছে। কোন কোন সংবাদে দেখা যায়। আগেকার আরব বসতি এলাকাগুলিতে ইসরাইলীদের পাঠানো হবে। জেরুজালেমের জর্ডনীয় অংশকে, বিশাল সিনাই উপদ্বীপকে ইসরাইলের অঙ্গীভূত করার ব্যবস্থাদি গ্রহণ করা হচ্ছে।

এইভাবে বিশ্ব জনমতকে উপেক্ষা করে ইসরাইল আরব জাতিসমূহের বিরুদ্ধে তার আক্রমণকে সম্প্রসারিত করছে। এইভাবে তেল আভিভের কর্তৃপক্ষ জেরুজালেমে, পূর্ববর্তী শাসন বজায় রাখা সম্পর্কে রাষ্ট্রসঙ্ঘ সাধারণ পরিষদের বিশেষ জরুরি অধিবেশনের সিদ্ধান্তকেই লঙ্ঘন করছে। এমন কি মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্রও এই সিদ্ধান্তের বিরুদ্ধে ভোট দিতে সাহস করেনি।

সহজেই তেল আভিভ নেতৃবৃন্দের এইসব পদক্ষেপের ব্যাখ্যা করা যায়। এরা আক্রমণ চালিয়ে যাওয়ার, সম্প্রসারিত করার জন্য সাহায্য ও সমর্থন পাচ্ছে পশ্চিমী মহল থেকে। মধ্যপ্রাচ্যের প্রগতিশীল সরকারগুলিকে উচ্ছেদ করার চেষ্টা করছে এরা।

এখন শুরু হয়েছে আক্রমণের দ্বিতীয় পর্যায়। এর অঙ্গ হিসাবে সব রকমের প্ররো-চনা দেওয়া হচ্ছে এই আশায় যে আরব জাতিগুলির মধ্যে বিভেদ ঘটানো যাবে এবং তারপর এমন একটি দেশের বিরুদ্ধে আঘাত হানা যাবে যেখানকার সরকারকে পশ্চিমীরা বিশেষভাবে পছন্দ করে না। এইসব প্ররো-চনার একটি হোল পশ্চিমীদের সাহায্যে আরব ভূখণ্ডসমূহ আত্মসাৎ করার চলতি ইসরাইলী কর্মনীতি। পরিকল্পনাটি খুব সোজা, এটি হোল আরব রাষ্ট্রগুলিকে আর একটি সামরিক সংঘর্ষে জড়িয়ে ফেলা যাতে করে অস্ত্রবলে কোন কোন আরব দেশের আইনসম্মত সরকারগুলিকে উচ্ছেদ করার চেষ্টা করা যায়।

আজ সুয়েজ খালের দুধারে দুদেশের সশস্ত্র সৈন্য। পূর্ব পারে সংযুক্ত আরব সাধারণতন্ত্র আর পশ্চিমে ইসরাইলী সৈন্য। মাঝখানে আণবিক অস্ত্রসজ্জিত সোভিয়েত যুদ্ধ জাহাজ। সুয়েজ খাল বন্ধ। কিন্তু এই খাল খোলা প্রয়োজন মিশরের স্বার্থে এবং পশ্চিমী রাষ্ট্রজোটের স্বার্থে। পশ্চিম এশিয়ায় ব্যবসাবাণিজ্যের অধোগতি এবং পশ্চিমী স্বার্থরক্ষক শক্তিজোট আবার যদি ইসরাইল মাধ্যমে আগ্রাসী হয়ে ওঠে তবে সোভিয়েতকে এবার চুপ করে থাকা অসম্ভব হয়ে উঠবে। আবার আরব রাষ্ট্রগুলির পক্ষে বিপর্যস্ত আরবভূমি এবং লক্ষ লক্ষ উদ্বাস্তুর ক্রন্দনকে স্বীকার করে নেওয়াও অসম্ভব। ইসরাইল থেকে জানান হয়েছে, সে আরব অঞ্চলে অধিকৃত ভূমি ছেড়ে যাবে না। অথচ এই জমি থেকে না সরে যাওয়া পর্যন্ত কোন আলোচনার প্রশ্নও ওঠে না।

---

*২৯ আগষ্ট থেকে ১ সেপ্টেম্বর খার্তুমে আরব শীর্ষ সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়ে গেছে। এই সম্মেলনে পশ্চিমীদের তেল সরবরাহ এবং সুয়েজ খাল বন্ধ রাখা সম্পর্কে গুরুত্ব-পূর্ণ সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে।

ফিরতি গাড়ি

নমিতা চক্রবর্তী

কলকাতা থেকে ফিরে যাচ্ছিল মল্লিকা। বারাসতে তার বাবার কাছে। পেনসনের টাকা কমর্টে করে বাবা নতুন বাড়ি করেছেন বারাসতে। অনেকদিনের আকাঙ্ক্ষা, নিজের বাড়ি হবে। কোমরের কষি আলগা করে ইচ্ছামত গড়াবেন বারান্দায়, সামনের এক ফালি জমিতে নটে গাছটি মুড়োতে গরু ঢুকলে তাড়াবেন হৈ হৈ করে। মাসের পয়লাতে বাড়িওয়ালার মুখভার দেখতে হবে না, যতগুলো ইচ্ছে পেরেক ঠোক দেওয়ালে, কৈফিয়ৎ দেবার দায় নেই। অবশ্য নিজের বাড়িতে কেইবা আর দেওয়ালে গর্ত করে। বাবার সেই অনেক সুখের বাড়িতে মল্লিকা আছে আজ তিনমাস ধরে। হ্যাঁ, ঠিক তিনমাস। পুজোর আগের দিন ছোট ব্যাগটি হাতে নিয়ে যে বেরিয়ে পড়েছিল, সে তো আশ্বিন মাসের কথা। আজ পৌষ-মাস শেষ হতে চলেছে। বিদ্বেষে আর রাগে সমস্ত মন বিষিয়ে ছিল। দরজার কাছে দাঁড়ানো অশোকের ইনিয়ে-বিনিয়ে কথা কানেও তোলেনি মল্লিকা। তার হাত ঠেলে চলে এসেছে একবস্ত্রে। অবশ্য সেটা বুদ্ধি-মতীর কাজ হয়নি। শাড়ি-টাড়ি দু'একটা আনলে হত। বিশেষ করে সেই টমেটো রংএ শাড়িটা—পরা হয়নি একদিনও। থাকগে, কোনটাই বা সে বুদ্ধিমতীর মত কাজ করে! মেয়ে মাত্রই নির্বোধ। ছেলে-গুলোর হ্যাংলামি দেখেই গলে যায়, ভাবনা-চিন্তা না করেই দুম্ করে একটা বিয়ে! আবার মেয়েদের মধ্যে নির্বোধতম তো হচ্ছে মল্লিকা নিজেই। বন্ধুরা বারে বারে সাবধান করেছে—মাত্র ছ'মাসের চেনায় বিয়ে কি! অন্তত বছর দুই ধরে দেখ, চেন মানুষটার রীত-চরিত্র। তারপর এটা কি মল্লিকা জেনেছে যে, অশোকের চেয়ে যোগ্যতর কেউ আসবে না তার জন্য ভাল-বাসা নিয়ে, নইলে কেন এমন নির্বোধের মতো ঝাঁপিয়ে পড়ে সই দিচ্ছে দলিলে?

বাবা-মায়ের একান্ত অমত, আত্মীয়-স্বজনের মজা দেখা, সব অগ্রাহ্য করে মল্লিকা বিয়ে করে বসল পাঁচশো টাকা মাইনে পাওয়া অশোক সোমকে একটা বৃষ্টি-পড়া অন্ধকার ঘুটঘুট্টি দিনে।

উঃ, কি সাংঘাতিক ভুলই যে করে ফেলে অনেক বড় বড় মানুষ সময়ে সময়ে! মল্লিকাতো একুশ বছরের একটি বোকা—অবশ্য বোকা কথাটা ভুল, অতিরিক্ত ইন্‌নোসেন্ট মেয়ে মাত্র। অশোকের পাঁচশো টাকা মনে হল অনেক টাকা, বিশ্রী ফ্লাটটা যেন ইন্দ্রভবন আর তার চেহারাটা

যে আহা-মরি কিছু নয় তাও ভুলে গেল খুব সহজেই। ভাগ্যিস, বিয়েটা আগের দিনের মত জেলখানা নেই। একবার ঢুকলেই, দরজা বন্ধ, বের হবার কোনো উপায় নেই। কিন্তু তিলে তিলে নিঃশ্বাস বন্ধ করে মরবে, বিয়ে-মহারাজের সেই একচ্ছত্র মৌরুসী পাট্টা আজ বাতিল হয়ে গিয়েছে।

মেয়ে স্বামী ছেড়ে চলে আসতে বাবার মুখ ভার, মায়ের কান্না ঘাবড়ে দিয়েছিল মল্লিকে। সাহস দিল বন্ধু বিশাখা। দু'বছর আগে তার ডিভোর্স হয়ে গিয়েছে, নিষ্ঠুরতার অভিযোগে স্ত্রীর উপর স্বামীত্ব হারিয়েছেন তার স্বামী-মহাশয়। বিশাখা বলল—'অরে, এত ভয় পাবার কি আছে? আমার দাদাও ধমকাতে এসেছিল, তুড়ি মেরে উড়িয়ে দিয়েছি। এখন কেমন খাসা আছি দ্যাখ। চাকরি করছি, বেড়াচ্ছি, কারো কোনো তোয়াক্কা রাখি না। দাদা-বৌদিও খোসামোদ করে নাকের কাছে একশো টাকার নোট দোলালে। তুই কেস কর, নিষ্ঠুরতার অভিযোগ, খুব টিকে যাবে, তোর বেচারী-বেচারী চেহারাই মস্তবড় সাক্ষী হবে তোর পক্ষে।'

—'কিন্তু, ওতো ঠিক নিষ্ঠুরতা—'। মল্লিকাকে থামিয়ে দিল বিশাখা—'নিষ্ঠুরতা করেনি? বিয়ে করে বউকে সভ্যসমাজের উপযুক্তভাবে রেখেছে? প্রত্যেক সপ্তাহে যেতে পেরেছিস চুল বাঁধতে সেলুনে? কিনতে পেরেছিস নিজের ইচ্ছেমত শাড়ি, বিস্ট, বিস্ট একটা। থ্যাঙ্কস 'ল' আর ল-ইয়্যারকে। চল, তোকে উকিলের কাছে নিয়ে যাই।'

উকিলবাবুও হেসে হেসে একই কথা বললেন—'মন না চাইলেও চিরদিন এক দাঁড়তে বাঁধা থাকবার দিন গিয়েছে। দলিলের একটি সইতে বিয়ে, আর একটি সইতে বিয়ে নাকচ। সুন্দর ব্যবস্থা। আপনি ফ্রি হবেন, আসবে নতুন দিন পরম সৌভাগ্য নিয়ে।

সুতরাং ভ্রূ কুঁচকে বিয়েটা বাতিল করেছে মল্লিকা। তিনমাস ধরে উকিলবাড়ি হাঁটাহাঁটি সার্থক হয়েছে। আজ মিউচুয়াল কনসেন্টে ডিভোর্সে রাজী হয়েছে অশোক। একবছর আলাদা থাকলেই এরপর খারিজ হয়ে যাবে বিয়ে। একবছর! জন্মেও আর ওর সংগে একত্র থাকবে মল্লি। এত নীচ, ইতর যে তার সংগে থাকা আবার! রক্ষে করুন ভগবান মল্লিকাকে সেই নীচ প্রবৃত্তি হতে।

উকিলবাবুর কাছে সব শুনে বুক ভরে শান্তির নিঃশ্বাস ফেলে গাড়িতে উঠে বসেছিল মল্লিকা। একাই যাওয়া-আসা করে সে। বাড়িতে মানুষ অর্থাৎ সংগে আসবার মত পুরুষমানুষ কেইবা আছে। বাবা বুড়ো হয়েছেন। এসব বিশ্রী ব্যাপারে, মানে বিশ্রী আর কি তেমন—সমস্যাটার সহজ সমাধানইতো। তবু প্রাচীনপন্থী বাবার বিয়েতে যেমন সায় ছিল না, বিয়ে খারিজেও তেমনি মত নেই। ভীষণ গম্ভীর হয়ে থাকেন সর্বদা। সুতরাং তাঁর আসবার কথাই ওঠে না। নতুন বিয়ে করেছে দাদা। বউ সুন্দরী, রবীন্দ্রসংগীত জানে, বাজাতে পারে সুরবাহার, আবার মাছের ফ্রাই, মাংসের দমপোক্তে ভীষণ ভাল হাত। দাদার কাছে ডিভোর্স একটা সাংঘাতিক ন্যক্কারজনক ব্যাপার হয়ে উঠেছে। বাকী থাকে ছোট ভাই। তার এখন ক্রিকেটের সিজন চলছে, সর্বদা বিনাকারণে উত্তেজিত, কোনো কারণ দিয়ে তার উত্তেজনা বাড়াতে চায় না মল্লিকা। লাগবে না, কাউকেই লাগবে না তার। বাড়ির কারোর সহযোগিতা ছাড়াই বিয়ে করেছিল, বিয়ে কাটবেও তাদের সাহায্য ছাড়া।

এতদিনের টানা-পোড়েন, উত্তেজনা—সবকিছুর বিরতি ঘটল আজ। একটু ক্লান্ত, অবসন্ন। মন খারাপ? না না, সেসব নয়। একটা কাজ শেষ করবার পর যেমন শ্রান্তি আসে, তাই আরকি। আজতো আনন্দের দিন। জয়ী হয়েছে মল্লিকা। যা চেয়েছিল, তাই হবে। বিচ্ছেদে রাজী হয়েছে অশোক। একেবারে রাহুমুক্তি ঘটবে জীবনে। বন্ধনহীন স্বাধীন জীবনের স্বাদটা কল্পনায় অনুভব করবার জন্য গাড়ির এক কোণে মাথা রেখে চোখ বুজল মল্লিকা। প্রথমেই মনে পড়ল অশোক বিবাহ-বিচ্ছেদে রাজী হয়েছে। মাত্র এক বছর আগে অশোক বলেছিল—সমস্ত পৃথিবীর বদলেও সে মল্লিকাকে ছাড়তে পারবে না। মাত্র তিনমাসের আলোচনায় তাকে বিচ্ছেদে রাজী করিয়ে ফেলল উকিল! অশোক রাজী হয়ে মল্লিকার বিজয়িনীমূর্তিটা কিছু ম্লান করে দিল। মল্লিকা ভেবেছিল অনেকদিন ধরে, অনেক লড়াই করে তবেই জিতবে সে। হঠাৎ তার মন হল—অশোকও কি অস্থির হয়েছিল বিয়ে ভাঙবার জন্য, মল্লিকার কাছ থেকে মুক্তি পাবার জন্য ছটফট করছিল?

ভিড় নেই গাড়িতে, দু'একজন লোক এখানে-ওখানে বসে আছে অনেক জায়গা নিয়ে। উল্টোডাঙা স্টেশনে গাড়ি থামতেই প্রচন্ড কলরবের সংগে একটা ভিড় মল্লিকার কামরায় ঢুকে পড়ল। চোখ খুলতে হল তাকে। বাজারফেরৎ একপাল মেয়ে, মস্ত মস্ত চাঙারি, ভীষণ চীৎকার।

—'ওগো শিগ্গির কর তোরা। ইলেকটিরি টেরেন চলেই ইস্পিড দেয়। চলতি গাড়িতে উঠতে গিয়ে প্রাণটা দিবি তারপর।" বেঞ্চি মেঝে সব ভরে গেল। থলি বের করে হিসাব-নিকাশে মন দিল একটি মাঝবয়সী মেয়ে। গলার দমকে মনে হয় সেই দলপত্নী।

"মংগলা, তোমার নাভ হয়েছে তিন ট্যাকা। তা তিন-তিনটে ট্যাকাই খেয়ো না বাপু। দুট্যাকা লাগিয়ো নিজে মাল কিনতে। নিত্যি নিত্যি দশটা ট্যাকা ঢালতে পারবনি আমি। আরোতো নোক আচে, তাদেরও দিতে হয়। হাবিরমা আবার কানতে নেগেচে ক্যান্ গো?"

—"ওর পয়সা হাইরে গিয়েচে।" ওপাশ থেকে গলা বাড়াল একটি মেয়ে।

—"পয়সা? ওমা! পয়সা হারালো ক্যামন করে?"

—"এস্টেশনে বসে পয়সা গুনতে গিয়েলাম।" নাক ঝাড়ল হাবিরমা।

—"আ পোড়াকপাল! বলি এস্টেশনে বসে তুমি পয়সা গুনতে নাগলে কোন্ আক্কেলে শুনি?"

—"একটু দেখছিলাম নাভ কত হয়েচে।"

—"তা হলোতো দেখা? বলি হাইরেচে কত?"

—"বারো আনা।"

—"অ্যা! বারো আনা! এক আঁজলা পয়সা হাইরেচে গো হাবিরমা।" কলকল করে উঠল মেয়ের দল।

ওদিক থেকে শোনা গেল পুরুষের ভারি গলা—"তা তুমি চলে এলে ঘর ছেড়ে কি বলে বড়বো? একবার দু'বার মার খেলে প্রাণটাতো আর যেত না তোমার।"

—"চিটি দিলুম ফড়কের হাতে, তা আপনি এলেনাকো"—মিনমিন্ করে বলল একটি লালপাড় কোরা শাড়ীপরা ত্রিশ-বত্রিশ বছরের বউ।

—"আমি বাড়িতে এলুম না? কেমন ধারা কথা যে বল তুমি বড়বৌ, তার মাথা-মুণ্ডু নেই। বলি রোববার না এলে আসি কি করে? হপ্তা কাটবে না, এ্যা? ওদিকে আমার অশান্তিটাই কি কম! বলে দিয়েছিলামতো আমি আসব। তা আর দুটো দিন তর সইল না তোমার। একেবারে বেরিয়ে পড়লে ঘর ছেড়ে?"

—"এমন মাত্তে নাগল, অক্ত বের করে দিল নাক দিয়ে।"

—"ওঃ! রক্ত। অমন কত রক্ত ঝরে নাক দিয়ে, তাতে কি মানুষ মরে? নাও, এখন চল দেখি ঘরে। ছেলে-মেয়ে দুটো ভাত পাচ্ছে না, সতীনের হলেও তোমারইতো সন্তান তারা। দাদারও কষ্ট, কি বলছ? যাবে তো?"

—"আপুনি বললে তে যেতিই হয়, কিন্তুক নতুন বেবসাটা ধরিচি—কি বলগো মেনকাদিদি?"

মেনকাদিদি সবার হিসাব-পত্র বুঝিয়ে দিয়ে নিজের টাকা আঁচলে বেঁধে কোমরে গুঁজে রাখছিল। বলল—"বলবটা আবার কি! দ্যাওর তোমার ন্যায্য কথাই বলেছে। ও সোয়ামীর মার একটু খেলেও, ঘর কত্তে হয় তবে কি জান বাছা, তোমাকে, তোমাকে বলছি গো মংগলার দ্যাওর! মেয়েমানুষের গা-গতরেও বেথা নাগে। তার অক্তের অংও নাল। অমন মারধোর আর সইবোনি মংগলা। বেবসাও ছাড়বোনি।"

—"ব্যবসা ছাড়বে না? তবে ভাত-জল কে দেবে দাদাকে, ছেলেদের?" খাঁপিয়ে উঠল দ্যাওর।

—"আগ করোনি, আগ করোনি বাবু। কতাটা আমার শোনো একবার মাতা ঠাণ্ডা করে। বলি মার খেল কেন মংগলা? চার-চারটে ব্যাটা-বেটির মা, আধ বয়সী মেয়ে-মানুষ। দোজপক্ষের বউ, নষ্ট নয় দুষ্টু নয়, অক্লে অমন নিন্দয়

হয়ে মারে কেন সোয়ামী? নাকি, আগ হয়েছ্যালো পুরুষের। তা আগ হল ক্যানো? পয়সা ছেল না, চাল আসেনি, আকা জ্বলেনি। তিন পহর বেলায় ভাতের খিদেতে হনো হয়ে ঘরে এসে পুরুষটা দেকল ছেলে-মেয়ে কানচে, নিজেও ভাত পেলনি। মাথায় অক্ত উঠে চন্ডাল হল, আর মার খেল বউটা।

"পয়সা থাকলে হত এমন খোয়ার? আমি বলি কি, শাক-পাতা, ডিম-ডেংগোর বেবসা করে দু' পয়সা ওজগার করুক মংগলা। ওজগার করলে কি আর সোয়ামীর ঘর ছাড়তে হয়। তাহলে তো জীবনই মিথ্যে। ঘর করবে কিন্তু সকালা পান্তা খাবে সকলে। আঁধতে পারবে না মংগলা। আত্তির আঁধবে, গরম খাবে, আর জল ঢেলে আখবে সকালার জন্যে। দেখ, আজী থাকতো বল, ভাজ যাবে। নয়তো আমার কাছেই থাকবে মংগলা। আপনার মাসীর মেয়ে, তার এত হেনস্তা সইবোনি। পষ্কের বলনুম বাবু তোমাকে।"

অনেকটা কথা একসংগে বলে হাঁপ নিল মেনকা। আঁচলের উল্টোদিকের গেরো খুলে পানদোক্তা মুখে দিল অনেকখানি। মংগলার দেওরটি মেনকার পরিষ্কার কথায় দমে গিয়েছিল খানিকটা। একটু ভেবে বলল —"কথাটা তুমি ঠিকই বলেছ, কিন্তু দাদা কি রাজী হবে? সে আবার রোখালো মানুষ, বৌয়ের রোজগার সইবে না হয়তো। তা আমি নয় মাস গেলে দেব কিছু। দুটো ওভারটাইমই ধরে দেব কথা দিচ্ছি। বড়-বৌয়ের রোজগারের দরকার হবে না।"

—"তুমি দেবে? হাসালে বাবু। হাসালে।" জানলা দিয়ে ঝুঁকে দু'বার পিক ফেলল মেনকা—"দ্যাওরের টাকা, পরের ধন। বলি পরের সোনা দিয়োনি কানে, কেড়ে নেবে ভোর বিহানে, সেই বিত্তান্ত। তারপর তুমি টাকা দেবে তো তোমার বৌয়ের মুখ-ধরা হয়ে থাকতে হবে, তোমার মেজাজ পালতে হবে মংগলাকে। সোয়ামীর মর্জি, দ্যাওরের মেজাজ অত পালতে পারবোনি বাবু মেয়েটা। তা বেবসাতে দোষ কি। মেয়েরা কোতায় না ওজগার করচে আজকাল শুনি?"

—"তবে করুক ব্যবসা বড়বৌ।" হাল ছেড়ে দিল দেবর। "কিন্তু আমার সংগে চলুক। দাদা বড্ড অস্থির হয়ে পাঠাল আমাকে।"

—"তা আসুক ছিরিনাথ, নিজে এসে নিয়ে যাক মংগলাকে। ওতো যাবেই। ঘর ছেড়ে থাকতে বুক ফেটে যাচ্ছে না ওর! নতুন আকা পেতেচে, অ্যালুমিনির ডেকচি তাতে একটি দিন আঁধলো না, সোয়ামীর পাতে ভাত দিল না। শীতের ক্যাঁতা পেতেছেল, এও নাল পাড়, কত সাধ-আহ্লাদ। যাবে বইকি। তবে ছিরিনাথ আসুক, আমরা কটা কতা শোনাই দুটো মন্ডা খাই। বোনটার হাসিমুখখানা দেকি। তাকে পাটিয়ে দাওগে তুমি হরিনাথ।"

"—দাদা কি আসতে পারে? তুমিই বুঝে দেখ মেনকাদিদি। কুটুম-সাক্ষেতের কাছে একটা লজ্জায় পড়ে আছে না? আমি ঘাট মানচি দাদার হয়ে, আমার সংগেই যাক বড়বৌ।"

হরিনাথকে থামিয়ে কি যেন বলতে যাচ্ছিল মেনকা। মংগলার কথা শোনা গেল। হরিনাথকে বলছে সে—"তা আপনি য্যাকন বলচ, ত্যাকন যেতে আমাকে হবেই। কিন্তুক বেবসা আমি নিচ্চয়ই করব। চালে খোলা নেই, পরনে ত্যানা নেই। এক-পুরুষের ওজগারে সোম্‌সার চলে না। আমি চলেই যাই মেনকাদিদি দ্যাওরের সংগে। বলচে—মানুষটা না খেয়ে আচে। সে আর আসবে কি করে। অপমান্যি হবে তো। আমি কাল পাঁচটার টেরেন ধরব। যায়গা একো একটুকুন।"

স্টেশন গাড়ি থামল, মল্লিকা দেখল হরিনাথের সংগে নেমে গেল মংগলা।

—"মংগলাদিদি হাসতে নেগেচে মাসী", মেনকাকে বলল একটি অল্পবয়সী মেয়ে।

—"তা হাসবেনি! কমকষ্টে কাটিয়েচে একটা মাস? সোয়ামী সোংসার ছেড়ে থাকা, বুক ফেটে যাচ্ছিল। এখন শান্তি হল। কইগো চিন্তেখুড়ী, পান আচে নাকি, দাওতো একরত্তি। আমার ফুইরে গেল।"

দুই চোখ মেলে মল্লিকাও দেখল হাসছে মংগলা। ওর বুক ফেটে যাচ্ছিল, শান্তি পেয়েছে এখন। কোথা থেকে এক-ঝলক গরম জল উঠে এল, ভিজিয়ে দিল মল্লিকার গাল। মল্লিকা প্রথম অনুভব করল ওর বুকও ফেটে যাচ্ছে। বুঝল আরো অনেক কথা। এই তিনমাস ধরে মল্লিকা ভেবেছে মা আর ভালবাসে না, বাবা বিরূপ, দাদা তাকে অনাবশ্যক বোঝা, সুখের বিঘ্ন ভাবছে, ছোটভাইয়ের আনুগত্য আর নেই। আজ এইমাত্র বুঝল—কিছু হয়নি, কারো ভালবাসা একতিলও হারায়নি মল্লি। ওষে নিজের দুঃখ নিজে তৈরি করছিল, তাই

দেখে নিরুপায় সবাই স্তব্ধ হয়ে গিয়েছে। মনে পড়ল, আজকে আসবার সময় সামান্য ছুতো করে না খেয়ে এসেছে মল্লিকা, মায়ের চোখ দিয়ে জল পড়ছিল। তিনমাস ধরে সবাইকে যত কঠিন কথা বলেছে, রুক্ষ ব্যবহার করেছে, সব মনে পড়ল তার। কেন বলেছে, কেন এমন রুক্ষ শুষ্ক কঠিন হয়েছে? আসলে ওর বুক ফেটে যাচ্ছিল নিজের ঘর ছেড়ে এসে।

কিন্তু কেন এল মল্লিকা ওর স্বপ্ন দিয়ে গড়া, সুখ দিয়ে ভরা ঘর ছেড়ে? হাঁসের মত শুভ্রপাখা মেলে ঘুরছে ফ্যান, দুলছে গেরুয়া রং পর্দা, লম্বা ফুলদানিতে রজনীগন্ধা ধূপের ধোঁয়া উঠছে গন্ধ ছড়িয়ে আর কানের কাছে অশোক ডাকছে আবেগে মল্লি, মধুমল্লি। মল্লিকা কিছু দেখেনি, শোনেনি কোনো কথা। সব মাধুরী ছিন্ন করে বেরিয়ে এসেছে ঘর ছেড়ে। কেবল চলে আসা, দুদিনের মান-অভিমান নয়, অশোক-কে আর কোনো কথা বলবার সুযোগই দেয়নি সে। বার বার এসে ফিরে গিয়েছে অশোক, মল্লিকা দেখা করেনি। সে তখন ছুটেছে উকিলবাড়ি বিশাখার সঙ্গে। প্রাণ-পণে চেষ্টা করছে কেমন করে বিয়ের বাঁধন কেটে বেরিয়ে আসবে। হুইশিল বাজিয়ে ছুটছে ট্রেন, কোণে মাথা রেখে আবার চোখ বুজল মল্লিকা।

লিপিকা সরকারের স্বামী ব্যবসা করে প্রচুর টাকা কামায়। পৈত্রিক বাড়ি, গাড়ি আছে। বন্ধুদের মধ্যে লিপিকার স্থান খুব উঁচুতে। চোখ টান করেই থাকে সে। বাজার নিউ মার্কেটে, খাওয়া অভিজাত রেস্তোরাঁতে, দেখে ইংরেজি ছবি আর বেড়াতে যায় রাণীক্ষেত। গরীব স্বামীর বউ মল্লিকাকে অনুকম্পার চোখে দেখে। "বুঝলি মল্লি, পর্দার কাপড় কমদামে কেনা কোনো কাজের কথা নয়। ইস্, তোর ক্রক্যারিগুলো কি হ্যাকনিড! গড়িয়াহাটার মোড় থেকে কিনেছিস নাকি? এই শাড়ি-গুলো আজকাল রিবেটে দিচ্ছে বুঝি?"

মল্লিকার রুচি খুব সুন্দর, ওর ঘর-দুখানাকে চমৎকার সাজিয়েছে বন্ধুরা সবাই একবাক্যে বলে সে কথা। কিন্তু লিপিকার মত অন্যরকম—"মাগো, কি দমবন্ধ করা ঘর!

আমাদের ওখানে ভাল ফ্ল্যাট আছে একটা, তিন রুম, ডাইনিং স্পেশ। তাছাড়াও কম পার্টিকে হলেই দেবে। নিবি নাকি।" মুখ লাল হয়ে ওঠে মল্লিকার। জেনেশুনে অপমান করছে লিপি। বন্ধুরা সবাই

বন্ধুদের মধ্যে বিবাহিতা মল্লিকা। স্পষ্ট বুঝতে পারছিল সে লিপিকার সঙ্গে তুলনা করে মনে মনে সবাই তাকে অনু-কম্পা করছে। অশোকের প্রতি অদ্ভুত একটা বিতৃষ্ণায় সমস্ত মন তেতো হয়ে উঠছিল।

"তাচ্ছা আমাকে বাদ দিল কেন?"

ওয়াকিবহাল অশোকের মাইনে সম্বন্ধে। ব্যাপার চরমে উঠল লিপিকার ওয়েডিং-ডের নিমন্ত্রণে গিয়ে।

আলো ফুল, গ্রামোফোনে মধুর বাজনা। অসংখ্য মেয়ের মধ্যে রাণীর সাজে ঘুরছে লিপিকা। অনেকেই অন্ততঃ তখনকার মত ভাবছে স্বামী যদি মানিক-রতনে, নাইলন-সিফনে, গাড়ি-বাড়িতে প্রাচুর্যের বন্যা বইয়ে দিতে পারে তাহলে তার সামনে-ঠেলা ভুঁড়ি, বোকার মত কথা আর ম্যাট-মেটে রং সহ্য করা যায় অনায়াসেই। সবচেয়ে আকর্ষণীয় ছিল লিপিকার ওয়েডিং-ডের প্রেজেন্টেশন; গাড়ি গয়না বাদেও নতুন একটি ফ্রীজিডিয়ার কিনে দিয়েছে তাকে হিতেন্দ্র সরকার সাড়ে চার হাজার টাকা দিয়ে। বাড়ির বানানো আইসক্রীম পরিবেশন করতে করতে এবারের উপহারের অভিনবত্ব সম্বন্ধে বন্ধুদের চমৎকৃত করছিল, লিপিকা।

ঠকিয়েছে, মল্লিকে ভীষণ ঠকিয়েছে অশোক। যার নিজের বাড়ি নেই, নেই একটা সেকেন্ডহ্যান্ড গাড়ি পর্যন্ত, যে দু-হাজার টাকা দামের একটা ফ্রীজ কিনবার কল্পনা করতে সাহস পায় না, সে কেবল কথা কয়ে, দাঁত বের করে হেসে মল্লিকাকে বউ বানিয়ে ফেলেছে। গরীব চাকুরে স্বামীর গরীব বউ।

—"সত্যি একটা ফ্রীজ না থাকলে যে কি করে চলে, আমি তা ভেবেই পাই না। মল্লি, তুই না হয় ছোট দেখে একটা কিনে নে। অনেক সময় সস্তাতে—হাজারখানেক টাকার মধ্যে সেকেন্ডহ্যান্ড পাওয়া যায় বলে শুনেছি।"

হাজার টাকা! বন্ধুরা সকৌতুকে তাকাল মল্লিকার দিকে, আর মল্লিকার সমস্ত শরীরে আগুন ধরে গেল। রাত এগারোটার সময় যখন লিপিকার গাড়ি

বাড়িতে পৌঁছিয়ে দিয়ে গেল তাকে, তখনো সে আগুন নেভেনি একফোঁটা।

অশোক যদি মল্লির মনের খবর আন্দাজ করতে পারত, তাহলে কথাটি না বলে শুয়ে পড়ত। রাগ করতে করতেও রাত ভরে একটা নিটোল ঘুম দিত মল্লিকা, সকালে হয়তো লিপিকার অহংকার নিয়েই সবিস্তারে আলোচনা করত অশোকের সঙ্গে। বেচারী অশোক এত গোলযোগের ব্যাপার কিছুই বোঝেনি। সন্ধ্যে থেকে একা ঘরে বসে সে আলু-কাঁচকলার বাজার দর হতে শুরু করে আধুনিক গান-টান সবই শুনেছে আর ঘড়ি দেখেছে প্রায় প্রত্যেক মিনিটে। মেজাজপত্রও একটু বিগড়ানো ছিল তার। মল্লির অনুপস্থিতির সুযোগে রামধনিয়া একপোয়া ওজনের কাঁচা কিংবা পোড়া রুটি অসম্ভব নুন দেওয়া তরকারীর সঙ্গে পরিবেশন করেছে। একটা ডিম ভেজে দেবার প্রস্তাবে জানিয়েছে —একটা মাত্রই ডিম ছিল, বৌদি যাবার সময় সেটা চায়ের সঙ্গে খেয়ে গিয়েছে। বলা বাহুল্য সংবাদে বিশেষ তুষ্ট হয়নি অশোক। রামধনিয়া এক আলুকা ভুজিয়া ছাড়া কোনো তরকারী রাঁধতেও জানে না এবং সেটাও অখাদ্য। সুতরাং মল্লিকা ঘরে ঢোকামাত্রই খাবার কথা মুখে এল অশোকের।

"বাবাঃ তিন চার ঘণ্টা ধরে খাওয়া? খুব খাওয়ালো বুঝি লিপিকা সরকার, আচ্ছা আমাকে বাদ দিল কেন?"

অশোকের চোখে যে দৃষ্টিতে চাইল মল্লি তাতে আগুন থাকলেও তাপ ছিল না। থাকলে পুড়ে ছাই হয়ে যেত অশোক। কথাটি না বলে ঘরোয়া হতে আরম্ভ করল মল্লিকা। অশোক পাঁচ মিনিট ধরে দেখল মল্লিকার ব্যাগ খোলা, আর বন্ধ করা। ভগবানই জানেন কি যে থাকে মেয়েদের ভ্যানিটিব্যাগে। ও আর তাদের বন্ধ করা এবং খোলা শেষ হয় না। অবশ্য সব কিছুরই শেষ আছে, মল্লিকাও ব্যাগের ব্যাপার চুকিয়ে অবশেষে বসল। মাথার উপর স্তূপকরা কেশরাশির বন্ধন মোচনে লাগল একাগ্র হয়ে।

"—কি ব্যাপার! কথা নেই কেন মুখে? কি এত খেলে চার ঘণ্টা ধরে?"

মল্লিকা চোখ তুলল, আধুনিক মেয়েরা কখনো নেহাৎ অনিবার্য কারণ না ঘটলে চেঁচামেচি করে না। ওতে বিশ্রী দেখায় মুখ, তাছাড়া ঠোঁটের পাশে দাগ হবার সম্ভাবনা থাকে। ঠান্ডা গলা শোনা গেল মল্লির :

—"নিমন্ত্রণ মানেই আকণ্ঠ হয়ে খাওয়া নয়। সেখানে আরো অনেক আনন্দের আয়োজন থাকে।"

কথাটা বলে খুব গর্বিত ভাব অনুভব করল মল্লিকা। কিরকম অর্থপূর্ণ কথা, একেবারে টুকে রাখবার মত। এই ধরনের উক্তাগের আরো কিছু বলতে পারলে হয়তো রাগটা কমে যেত মল্লিকার। কিন্তু অশোক তা হতে দিল না। মাসের মাঝখানে তিরিশ টাকায় তার খাবোল বসেছে, তারপর ওকে ও বাদ দিয়েছে। বিদ্রূপ করে বলল—"তাহলে আনন্দ খাইয়েই বিদায় করেছে বন্ধু? এখন রাত কাটাবে কি করে? দেখগে হাঁড়িতে আছে নাকি কিছু। রুটি দিয়ে নিরানন্দের ব্যাপারটা চুকিয়ে এস।"

—"হাঁড়ি! তোমার ঘরের হাঁড়িতে আর কি থাকবে শুকনো রুটি ছাড়া? আজ হয়তো তাও নেই, মাসের সতেরো তারিখ তো।"

ভীষণ রাগ হল অশোকের। শুকনো রুটি—অর্থাৎ কিনা অশোক গরীব, মাসের সতেরো তারিখ—তার মানে মাইনের টাকা ফুরিয়েছে। যা কখনো, কোনো বিরক্ত মুহূর্তেও ভাবেনি, সেই কথা বেরিয়ে এল মুখ দিয়ে—"থাকবে কি করে হাঁড়িতে, যদি হরদম বিশ-তিরিশ টাকার প্রেজেন্টেশন আর একশো টাকার পাউডার-সাবান কেনা হয় মাসে।"

বারুদ হয়েই ছিল মল্লিকা। ভিজে নয়, শুকনো খটখটে বারুদ, অশোক তার মধ্যে জ্বলন্ত দেশলাই-এর কাঠি ফেলে দিল। একতিল দেরি হল না বিস্ফোরণ ঘটতে। অশোক যে কিরকম নীচ, পাষন্ড, ভন্ড ইত্যাদি ইত্যাদি, সেকথা যথোচিত নৈপুণ্য-সহযোগে প্রকাশ করতে লাগল মল্লিকা। অশোক ভাষাতত্ত্বে কিছুটা অনভিজ্ঞ হবার দরুণ প্রথমটা অসুবিধা বোধ করলেও মল্লিকাকে বিয়েকরা সম্বন্ধে নিজের অবিমৃষ্যকারিতার কথা ঘোষণা করল দ্ব্যর্থহীন ভাষায়।

এই অবস্থা যে কত রাত পর্যন্ত চলেছিল তা বলা যায় না। চাকর রামধনী সকালে উঠে দেখল বৌদি বারান্দায় সতরঞ্চি পেতে ঘুমোচ্ছে এবং চেয়ারের উপর পা তুলে নাক ডাকাচ্ছে দাদাবাবু।

সেই থেকে শুরু হল অশান্তি। মল্লিকা নিঃসন্দেহে বুঝতে পারল কি অসম্ভব খারাপ লোক অশোক, কি ভীষণ অত্যাচারী।

অত্যাচারী অশোক? মল্লিকাকে মেরেছে? অপমান করেছে কটুকথা বলে? খেতে দেয়নি? অসহ্য তার দারিদ্র্য? দারিদ্র্য!

তিন মাস ধরে মায়ের কাছে রয়েছে মল্লিকা। বাড়িতে ঠিকেঝি, মা রান্না করেন, কয়লার গাড়োতে মাটি মিশিয়ে গুল দেন নিজের হাতে। বৌদি কাপড় কেচে আনন্দে দেখে কতটা সাদা হয়েছে, চায়ের বাসন ধুতে ধুতে টুংটাং বাজনা তোলে। নাচের ছন্দে ঘুরে ঘুরে আলনাতে কাপড় গোছায়, ইস্ত্রি করে দাদার শার্ট, নিজের ব্লাউজ।

নতুন মডেলের গাড়ি, রং আর চুনের গন্ধওঠা মস্ত বাড়ি, প্রকাণ্ড ফ্রীজিডিয়র—তার মধ্যে কি মল্লিকার সব সুখ, যত আনন্দ! হঠাৎ মনে হল প্রকাণ্ড ফ্রীজের মধ্যে ঢুকে গিয়েছে সে। আস্তে আস্তে জমাট বাঁধছে। ঠান্ডা শক্ত হয়ে যাচ্ছে মল্লিকা। আলো-উত্তাপের রাজ্য থেকে চিরনির্বাসন ঘটেছে তার।

ধড়ফড় করে উঠে বসল মল্লিকা। অশোক কনসেন্ট দিয়েছে। আদালতের কেলেঙ্কারী এড়াবার জন্য কনসেন্ট দিয়েছে। দিলে হল কনসেন্ট! বিয়ে ভাঙবে, কিন্তু ভালবাসা? সে যে বসে ছিল মনের অতল গহ্বরে, মঙ্গলের হাত ধরে উঠে এসেছে, দাঁড়িয়েছে মল্লিকার মুখোমুখি।

গাড়ি থেমেছে, সামনের লাইনে দাঁড়িয়ে আছে ট্রেন, কলকাতা যাবার ফিরতি গাড়ি। ফার্স্ট বেল পড়েছে, এক্ষুনি ছেড়ে দেবে। এ গাড়িও নড়ছে, ইলেকট্রিক ট্রেন, স্পীডেই স্পিড দেয়, একবার চললে আর নামতে পারবে না মল্লিকা, আরো ব্যবধান বাড়বে অশোকের সঙ্গে। মস্তবড় ব্যবধান, উকিল বিশাখা, লিপিকা, আইন-আদালত। ভীষণ ভয় পেল মল্লিকা, দরজা খুলে নেবে পড়ল, ছুটতে ছুটতে এগিয়ে গেল।

চলতে আরম্ভ করেছে কলকাতার গাড়ি, তবু হাতল ধরে ফেলল মল্লিকা। দরজার কাছে দাঁড়িয়ে ছিল একজন মানুষ। টেনে তুলে নিল। তারপর চোখ পাকিয়ে ধমকাল মল্লিকাকে। কিন্তু মল্লিকার কানে তা ঢুকল না। সে তখন ভালোবাসায় বিহ্বল।
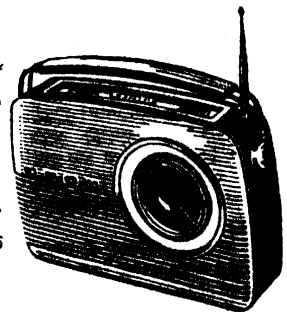
সংখ্যা সংখ্যা সংখ্যা

অরূপরতন ভট্টাচার্য

সংখ্যাকে কেন্দ্র করে যে রঙ্গীন রাজ্য আমাদের চারদিকে কবে কোন্ কাল থেকে ধীরে ধীরে গড়ে উঠেছে তার বেশ অনেক-গুলি বয়স সম্পর্কিত।

সরাসরি মানুষকে বয়স জিগ্যেস করায় স্বভাবতই সকলের সংকোচের কারণ আছে। মেয়েদের ক্ষেত্রে তো বটেই। এ রকম অবস্থায় খোলা মনে সংখ্যার কৌশলের সাহায্য নেওয়াই বুদ্ধিমানের কাজ। এতে যেমন একদিকে আপনার উদ্দেশ্যও সিদ্ধ হয়, অপর দিকে তেমনি সংকোচেরও কারণ থাকে না।

বয়স কত হলো? না জিগ্যেস করে সঙ্গের তালিকাটি সহজেই এগিয়ে দিতে পারেন। এমন কিছু নয়—সাধারণ একটি সংখ্যা চিত্র মাত্র। অথচ এটির সাহায্যে যে কারোর বয়স বিনা আয়াসেই বলে দিতে পারবেন।

উপর থেকে নীচে, এই অনুসারে সংখ্যার পাঁচটি স্তম্ভ পাশাপাশি সাজানো। প্রথম স্তম্ভের মাথায় ১, দ্বিতীয় স্তম্ভে ২, তৃতীয় স্তম্ভে ৪, চতুর্থ ও পঞ্চম স্তম্ভে যথাক্রমে ৮ ও ১৬। এই পাঁচটি স্তম্ভের যে যে স্তম্ভে আপনার বয়স লেখা আছে, শুধু সেই স্তম্ভগুলির নাম করুন। লক্ষ্য করবেন যে, সেই উল্লিখিত স্তম্ভের মাথার অঙ্কগুলি যোগ করলেই আপনি আপনার বয়সে পৌঁছে যাবেন।

মনে করুন, আপনার বয়স ২৭। কোন্ কোন্ স্তম্ভে ২৭ উল্লেখ করা হয়েছে? প্রথম, দ্বিতীয় আর চতুর্থ, পঞ্চম। প্রথম, দ্বিতীয় স্তম্ভের শীর্ষে ১, ২, আর চতুর্থ পঞ্চমের শীর্ষে ৮, ১৬। এদের যোগফল সর্বমোট ১+২+৮+১৬ অর্থাৎ ২৭।

১ থেকে ৩২ বছর বয়স পর্যন্ত যে কারোর বয়সের হিসেব এই পদ্ধতিতে আপনি এই তালিকা থেকে সহজেই বের করতে পারবেন। আরও বেশী বয়সের ক্ষেত্রে এই জাতীয় তালিকাই সক্রিয়। তবে সেখানে এ ধরনের তালিকা দীর্ঘতর করতে হবে।

সংখ্যার আরও অনেক বৈচিত্র্য আছে।

যে কোন একটি তিন অঙ্কের সংখ্যা চিন্তা করুন। উল্টে দিন সংখ্যাটাকে। এবারে বড় সংখ্যা থেকে তিন অঙ্কেরই ছোট সংখ্যাটাকে বাদ দিন। বিয়োগফল যত হল, তার সঙ্গে আবার এই বিয়োগফলের সংখ্যাটাকে উল্টে দিয়ে যোগ করুন। যোগফল বরাবর ১০৮৯।

নির্দিষ্ট যোগফল? ভাবছেন এ কেমন করে হবে? কিন্তু অবাক হওয়ার কিছু নেই। তিন অঙ্কের যে কোন একটি সংখ্যা নিলেই আমার কথা বুঝতে পারবেন।

ধরে নিন, সংখ্যাটি ১২৩। উল্টে পেলেন ৩২১। ৩২১, ১২৩-এর চেয়ে বড়। ফলে, বড় থেকে ছোট বিয়োগ করে পেলেন ১৯৮। তাকে আবার উল্টে দেখুন, এবারে ৮৯১। এখন আর বিয়োগ নয় ১৯৮ আর ৮৯১ এ যোগ করুন। যোগফল দাঁড়াবে পূর্বের কথা মত ১০৮৯।

সংখ্যার অনেকটা এ জাতীয় আরেকটা বৈচিত্র্যের কথা উল্লেখ করি। এটিতে আপনি যে সংখ্যাটি ভাববেন, নানা হিসেব-নিকেশের মাধ্যমে সে সংখ্যাটিতেই ফিরে আসবেন।

নিজের পছন্দমত যে কোন একটি সংখ্যা ভাবুন। তাকে ৩ দিয়ে গুণ করুন। যা হল তার সঙ্গে ১ যোগ করুন। আবার ৩ দিয়ে গুণ করুন। এবার প্রথমে যে সংখ্যাটাকে ভেবেছিলেন, সে সংখ্যাটাকেই যোগ করুন। যোগফলের যে সংখ্যা তার এককের অঙ্ক নিঃসন্দেহে ৩। সেটা কেটে দিন। বাকী যেটা পড়ে রইল, সেটাই আপনি প্রথমে ভেবে-ছিলেন।

মনে করুন, আপনি ভেবেছিলেন ১৭। তাকে ৩ দিয়ে গুণ করে পেলেন ৫১। ১ যোগ করুন। সম্পূর্ণ সংখ্যাটি দাঁড়াল ৫২। আবার ৩ দিয়ে গুণ করুন। ৩×৫২=১৫৬, আবার ১৭ যোগ করুন এর সঙ্গে ১৫৬+১৭=১৭৩। লক্ষ্য করুন, ৩ আছে এককের অঙ্কে আর সেটি বাদ দিলে যা থাকে তা আপনার নিজের সংখ্যাটি ১৭।

কিন্তু এ জাতীয় বিভিন্ন বৈশিষ্ট্য ছাড়াও সংখ্যা নিয়ে বিচিত্র ও বিস্ময়কর এক অভিনব হিসেবের নমুনা আছে ব্যাঙ্কের ক্যাশের লেন-দেন প্রসঙ্গে। এবারে সংখ্যার সেই হিসেবের কথাই বলব।

বেশী টাকা না নিয়ে পঞ্চাশ টাকার একটা অ্যাকাউন্টের কথাই ধরুন। এই অ্যাকাউন্ট থেকে টাকা তুলতে শুরু করলে অবস্থাটা যা দাঁড়ায় সেটাই এখানে লক্ষণীয়।

এই ৫০ টাকার অ্যাকাউন্ট থেকে ২৫ টাকা তুলে নিন। ফলে ব্যাঙ্কে থাকল ২৫ টাকা। যে ২৫ টাকা ব্যাঙ্কে থাকল, তা থেকে আরও ১০ টাকা তুলুন। এবারে ব্যাঙ্কে থাকে ১৫ টাকা। আরও ৮ টাকা তুলুন এই ১৫ টাকা থেকে। এবারে বাকী থাকে ৭ টাকা। ৭ টাকার থেকে এবারে আরও ৫ টাকা তুলুন, ব্যাঙ্কে থাকে ২ টাকা। অবশেষে সেই ২ টাকাও তুলে নিন।

এতক্ষণে হিসেব-নিকেশ সম্পূর্ণ হল। এবারে নিশ্চয় মানবেন যে, ব্যাঙ্ক থেকে যে টাকা তুললেন, আর ব্যাঙ্কে যে টাকাটা ছিল, এ দুই হিসেবের পরিমাণ সমান দাঁড়াবে। কিন্তু কার্যক্ষেত্রে গোলমাল হয়।

৫০ টাকার হিসেব

ব্যাঙ্ক থেকে যা তোলা হল	ব্যাঙ্কে যা রইল
২৫৲	২৫৲
১০৲	১৫৲
৮৲	৭৲
৫৲	২৲
২৲	০৲
৫০৲	৪৯৲

স্পষ্টতঃ বুঝতে পারছেন একটি টাকার তফাৎ দাঁড়াচ্ছে। কিন্তু ব্যাঙ্কের হিসেব-নিকেশে এ জাতীয় তফাৎ দাঁড়ানো সমীচীন নয়। এক টাকা, সে এমন কিছু মারাত্মক নয়। কিন্তু টাকার পরিমাণ যদি বাড়ে। সুতরাং এর একটা ফয়সালা করুন। নইলে ভবিষ্যতে ব্যাঙ্কে টাকা রাখবেন কোন্ ভরসায়?

সংখ্যার অভিনবত্ব নিয়ে আরও বহুবিধ বৈচিত্র্যের পরিচয় আছে। পরের যে উদা-হরণটি দিচ্ছি তা থেকে একথা নতুন করে বুঝতে পারবেন।

তিন অঙ্কের যে কোন সংখ্যা ১০০ থেকে শুরু করে ৯৯৯ পর্যন্ত, আপনার ইচ্ছে মত তাকে একবার লিখুন। আর নতুন কিছু হেরফেরের দরকার নেই। শুধু তিন অঙ্কের সংখ্যাটি যেখানে লিখলেন, তার পাশেই সেই সংখ্যাটিকে আর একবার লিখুন। অর্থাৎ ছয় অঙ্ক বিশিষ্ট একটি সংখ্যায় দাঁড়ালো প্রথমের তিন অঙ্কের সংখ্যাটি।

এখন এই সংখ্যাটির অনেক জাতীয় বৈশিষ্ট্য দেখতে পাবেন। ৭ দিয়ে সংখ্যাটিকে ভাগ করুন, নির্ভাবনায় করুন, সংখ্যাটি সম্পূর্ণরূপে বিভাজ্য হবে, ভাগশেষ কিছু নেই, অর্থাৎ শূন্য। এখন ভাগফল যা দাঁড়াল তাকে আবার ১১ দিয়ে ভাগ করুন। হাঁ, ১১ দিয়ে। এবারেও ভাগশেষ শূন্য। আর ভাগফল? ভাগফল যা দাঁড়াল এখন তাকে আবার ১৩ দিয়ে ভাগ করুন। অবাক হওয়ার কথা, ভাগশেষে এবারেও শূন্য। আর ভাগফল, তা অবাকের উপরে অবাক করবে, প্রথমে তিন অঙ্কের যে সংখ্যা কল্পনা করেছিলেন, ভাগফল এবারে তাতে এসে দাঁড়াবে।

৩ অঙ্কের কল্পিত সংখ্যা যদি ৯০৭ হয়, তাহলে ৬ অঙ্কের নির্দিষ্ট সংখ্যা ৯০৭৯০৭—উপরের পদ্ধতি অনুসরণ করে সংখ্যাটিকে ৭, ১১, ১৩ দিয়ে ভাগ করে দেখুন, ভাগশেষ প্রতিবারেই শূন্য, আর শেষ ভাগফল যা দাঁড়াবে, তা ঐ প্রথম ৩ অঙ্কের সংখ্যা ৯০৭-ই।

সংখ্যার জগতে আরও বহুবিধ বহু-বিচিত্র উদাহরণের ছড়াছড়ি। দেশে দেশে যুগে যুগে তারা ক্রমশ পূর্ণতা লাভ করছে ও আমাদের অনাবিল আনন্দ দিচ্ছে।

১	২	৪	৮	১৬
৩	৩	৫	৯	১৭
৫	৬	৬	১০	১৮
৭	৭	৭	১১	১৯
৯	১০	১২	১২	২০
১১	১১	১৩	১৩	২১
১৩	১৪	১৪	১৪	২২
১৫	১৫	১৫	১৫	২৩
১৭	১৮	২০	২৪	২৪
১৯	১৯	২১	২৫	২৫
২১	২২	২২	২৬	২৬
২৩	২৩	২৩	২৭	২৭
২৫	২৬	২৮	২৮	২৮
২৭	২৭	২৯	২৯	২৯
২৯	৩০	৩০	৩০	৩০
৩১	৩১	৩১	৩১	৩১

নরহরি ও কেশব ভারতী

(২৭)

নরহরি সরকার

শ্রীখণ্ডের বৈদ্যবংশে জন্ম, নারায়ণদাস সরকারের ছেলে। গদাধর পণ্ডিতের মতই গৌরাঙ্গের নবদ্বীপলীলার সহচর। গদাধর থাকে গৌরাঙ্গের বাঁয়ে আর নরহরি ডাইনে। 'গদাধর নরহরি করে ধরি গৌর-হরি প্রেমাবেশে ধরণী লোটায়।'

ব্রজলীলায় গদাধর শ্রীমতী রাধিকা আর নরহরি তার সখী মধুমতী। গদাধরে আর নরহরিতে অটুট বন্ধুত্ব।

কীর্তনানন্দের আবেশে যখন প্রভু মূর্ছিত হয়ে পড়েন তখন নরহরির গায়ে ঢলে পড়ে আর গদাধরের মুখখানি দেখতে-দেখতে।

'খেনে নরহরি-অঙ্গে অঙ্গ হেলাইয়া
গদাধর মুখ হেরি পড়ে মুরছিয়া।'

গৌরকিশোর যখন গদাধরের সঙ্গে হোলি খেলছে তখন নরহরিও অংশীদার। 'হোলি খেলত গৌরকিশোর। রসবতী নারী গদাধর কোর। ব্রজরস গাওত নরহরি সঙ্গে। মুকুন্দ মুরারি বাজু নাচত রঙ্গে।'

নরহরির শিষ্যই লোচনদাস। তার চৈতন্যমঙ্গলে সে লিখছে ঃ

নরহরি ভুজে আর ভুজ আরোপিয়া
শ্রীবাসের ঘরে নাচে রাসবিনোদিয়া।।
গৌর দেহে শ্যামতনু দেখে ভক্তগণ।
গদাধর রাধারূপ হইলা তখন।।
মধুমতী নরহরি হইলা সেই কালে
দেখিয়া বৈষ্ণব সব হরি হরি বোলে॥

নরহরির বড় ভাই মুকুন্দ সরকার, মুকুন্দের ছেলে রঘুনন্দন। শ্রীখণ্ডে এদের বাড়ীতে গোপীনাথের বিগ্রহ প্রতিষ্ঠিত। রঘুনন্দনের ভক্তিতে সে বিগ্রহ শুধু জাগ্রত হয় নি, ক্ষুধার্ত হাত বাড়িয়ে খেয়ে নিয়েছে থালার নৈবেদ্য। বিগ্রহের আবার সাজবার সখ, বলে, কদমফুলকে কর্ণভূষণ করবে। ওদের পুকুরের ধারে কদম গাছ, তাতে কৃষ্ণ নিত্যি ফুল ফুটিয়ে রাখে। তার থেকে প্রত্যহ দুটি ফুল ছিঁড়ে নিয়ে রঘুনন্দন কৃষ্ণের কানে দুলিয়ে দেয়।

সে কৃষ্ণ কে? সে কৃষ্ণ কোথায়?

সে কৃষ্ণ গৌরহরি। সে কৃষ্ণ নবদ্বীপে।

গৌরাঙ্গ জন্মের আগে থেকেই নরহরি পদকর্তা। তারও চেয়ে বেশি, নরহরি কবি। সে শ্রীখণ্ডে থাকে না, সে নবদ্বীপে থাকে। সমস্ত নবদ্বীপলীলা তার চোখের উপর, তার প্রত্যক্ষে। সেই প্রথম নিমাইকে চিনল কৃষ্ণ বলে। শুধু চিনল না, গৌরমন্ত্রে সে-ই প্রথম দীক্ষা নিল।

রসে তনু ঢর ঢর গৌরকিশোরবর
নাম তার শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য।
এ সব নিগূঢ় কথা কহিতে অন্তরে ব্যথা
ভক্ত বিনু নাহি জানে অন্য॥
দ্বাপর যুগেতে শ্যাম কলিতে চৈতন্য নাম
গর্গ বাক্য-ভাগবতে লিখি।
মনে করি অনুমান শ্যাম হইল গৌরাঙ্গ
রাধাকৃষ্ণতনু তার সাথী॥
অন্তরেতে শ্যামতনু বাহিরে গৌরাঙ্গ জনু
অদভুত চৈতন্যের লীলা।
রাইসঙ্গে খেলাইতে কুঞ্জবনে বিলাইতে
অনুরাগে গৌরতনু হৈলা॥
কহিবার কথা নহে কহিলে কি জানি হয়ে
না কহিলে মনে বড় তাপ।
চিত্তে অনুমান করি গৌরাঙ্গ হৃদয়ে ধরি
নরহরি করয়ে বিলাপ॥

শ্রীখণ্ডে আরো দুজন ভক্ত ছিল, সুলোচন আর চিরঞ্জীব সেন। তারাও চৈতন্যচন্দ্রের ভক্ত। তারা সবাই মিলে 'খণ্ডের সম্প্রদায়' নামে এক কীর্তনের দল গড়ল। রঘুনন্দনই সবচেয়ে বেশি উৎসাহী, সে সেই দল নিয়ে চলে আসে নবদ্বীপ, নরহরি তাতে যোগ দেয়। গৌরাঙ্গকে ঘিরে চলে নৃত্যকীর্তন। রঘুনন্দনের উপর প্রভুর অপার স্নেহ। নরহরি প্রেমের গাগরি আর রঘুনন্দন প্রেমের শতদল।

গৌরাঙ্গ রাধাভাবে ভাবিত হয়ে কৃষ্ণের প্রতীক্ষা করছে। নরহরির কী সুন্দর বর্ণনা!

কি লাগিয়া মোর গৌরসুন্দর
বসিয়া গৃহের মাঝে।
বসন আসন রতন ভূষণ
সাজায়ে অঙ্গের সাজে।।
আপন বপুর ছাঁচ নেহারিয়া
চমকি উঠয়ে মনে।
কি লাগি অবহুঁ না মিলল পহুঁ
এত বিলম্ব কেনে।।
কহে নরহরি মোর গৌরহরি
ভাবিয়া রাইয়ের দশা।
সজল নয়নে চাহে পথপানে
কহে গদগদ ভাষা।।

এই নরহরিই লিখছে ঃ গৌরাঙ্গ নহিত তবে কি হইত কেমনে ধরিত দে। রাধার মহিমা প্রেমরসসীমা জগতে জানাত কে।

শুধু নবদ্বীপেরই নয়, নীলাচলের ভাবমাধুরীর কথাও লিখেছে নরহরি।

দেখি গোরা নীলাচলনাথ।
নিজ পারিষদগণ সাথ।।
বিভোর হইলা গোপীভাবে।
বহে বাহু করিয়া আক্ষেপে।।
আমি তোমা না দেখিলে মরি।
উলটি না চাহ তুমি ফিরি।।
করিলা পিরিতিময় ফাঁদ।
হাতে দিলা আকাশের চাঁদ।।
এবে তোমা দেখিতে সন্দেশ।
কহে গোরা করিয়া আবেশ।।
ছলছল অরুণ নয়ান।
রস রস বিরস বয়ান।।
অপরূপ গৌরাঙ্গ-বিলাস।
কহে কিছু নরহরি দাস।।

রামানন্দ আর স্বরূপের সঙ্গে বসে মনের কথা বলছেন প্রভু। কী সে মনের কথা? লিখছে নরহরি, সে আর কিছুই নয়, শুধু বাঁশির কথা। বাঁশিকে গালি দিচ্ছেন, আর বলছেন, স্বরূপ, বাঁশি আমার জাত-কুল সব নষ্ট করল। সেই যে ধ্বনি একবার কানে ঢুকল, আর বেরুল না। আমাকে বধির করে রাখল। বাঁশি ছাড়া পৃথিবীর আর কোনো ধ্বনিই আমি শুনতে পাচ্ছি না। এ কী হল আমার? 'ধ্বনি কানে পশিয়া রহিল, বধির সমান মোরে কৈল।।'

গম্ভীরা-লীলারও মর্মস্পর্শী চিত্র এঁকেছে নরহরি। গম্ভীরা নির্জনে বসে গোরারায় কেঁদে-কেঁদে রাত ভোর করে দিচ্ছে।

খেনে ভিতে মুখ শির ঘষে।
কোন নাহি রহু পহুঁ পাশে।।
খেন্দে কান্দে তুলি দিই হাত।
কোথায় আমার প্রাণনাথ।।
নরহরি কহে মোর গোরা।
রাইপ্রেমে হইয়াছে ভোরা।।

মুকুন্দ, নরহরি আর রঘুনন্দন তিন-জনই নীলাচলে গিয়েছিল প্রভুর দর্শনে। তিনজনকে তিনরকম উপদেশ দিলেন প্রভু। মুকুন্দকে বললেন, ধর্মপথে থেকে ধন উপার্জন করো। রঘুনন্দনকে বললেন, কৃষ্ণ-সেবন করো। আর নরহরিকে বললেন, ভক্ত সঙ্গে থাকো আর বলো কৃষ্ণকথা।

গৌরাঙ্গই পরম, গৌরাঙ্গই প্রথম, এই পারম্যবাদের প্রবর্তক তিনজন। কাঁচরাপাড়ার শিবানন্দ সেন, নবদ্বীপের মুরারি গুপ্ত আর শ্রীখণ্ডের নরহরি। এরা আগে গৌরাঙ্গকে দেখবে, পরে জগন্নাথকে।

নীলাচলে এক পণ্ডিত এসে হাজির। স্পর্ধা করে প্রভুকে বললে, আপনার জানা এমন কি কেউ আছে যে আমাকে বিচারে পরাস্ত করতে পারে?

প্রভু জিজ্ঞেস করলেন, পরাস্ত করতে পারলে কী হবে?

আমি তার কাছ থেকে দীক্ষা নেব।

প্রভু নরহরির দিকে তাকালেন। বললেন, যাও, পাণ্ডিতের সঙ্গে বিচার করো।

বিচারে নরহরির জয় হল। হেরে গিয়ে লোকানন্দ সরে পড়ল না। নরহরির কাছ থেকে দীক্ষা নিল, আর নরহরির কাছ থেকে দীক্ষা অর্থই গৌরমন্ত্রে দীক্ষা।

বর্ধমানের কুলাই গ্রামের কংসারি ঘোষ স্বপ্নে আদেশ পেল তার বাড়ির নিমগাছের কাঠে গৌরাঙ্গমূর্তি নির্মাণ করা হোক।

কংসারি তার ভাই দৈত্যারিকে বললে।

দৈত্যারি বললে, আমিও অমনি স্বপ্ন দেখেছি।

তাদের বাড়ির নিমগাছের কাঠে তিন তিনটি গৌরাঙ্গমূর্তি তৈরি হল। মূর্তি তিনটি তারা তাদের গুরু নরহরিকে দান করলে, নরহরি তাদের প্রতিষ্ঠা করল, ছোটটি শ্রীখণ্ডে স্বগৃহে, মাঝারিটি গঙ্গা-নগরে ও বড়টি কাটোয়ায়।

নরহরির কাজ কী? ভক্তসঙ্গে কৃষ্ণকথা। নরহরির রচিত পদকথা থেকেই গৌর-চন্দ্রিকার প্রথম সৃষ্টি। তার শুধু এক গান, গৌরগান এক মন্ত্র গৌরমন্ত্র।

গৌরলীলা দরশনে ইচ্ছা বড় হয় মনে

ভাষায় লিখিয়া সব রাখি।

মুঞি তো অতি অধম লিখিতে না জানি ক্রম

কেমন করিয়া তাহা লিখি।।

এ গ্রন্থ লিখিবে যে এখনো জন্মে নাই সে

জন্মিতে বিলম্ব আছে বহু।

ভাষায় রচনা হৈলে বুঝিবে লোক সকলে

কবে বাঞ্ছা পুরাবেন পহুঁ।।

গৌরগদাধর লীলা আদ্রব করয়ে শিলা

কার সাধ্য করিবে বর্ণন।

সারদা লিখেন যদি নিরন্তর নিরবধি

আর সদাশিব পঞ্চানন।।

কিছু কিছু পদ লিখি যদি ইহা কেহ দেখি

প্রকাশ করয়ে প্রভু-লীলা

নরহরি পাবে সুখ ঘুচিবে মনের দুখ

গ্রন্থগানে দরবিবে শিলা।।

আকুমার ব্রহ্মচারী নরহরি কীর্তন করতে-করতে দেহ ছাড়ল।

গাও পুনঃ পুনঃ গৌরাঙ্গের গুণ

সরল হইয়া মন,

এ ভবসাগরে এমন দয়াল।

না দেখি যে একজন।।

গৌরাঙ্গ বলিয়া না গেনু গলিয়া

কেমনে ধরিনু দে।

নরহরি হিয়া পাষাণ দিয়া

কেমনে গড়িয়াছে।।

(২৮)

কেশব ভারতী

কণ্টকনগরে অর্থাৎ কাটোয়ার গঙ্গাতীরে বটবৃক্ষতলে সন্ন্যাসী কেশব ভারতীর আশ্রম।

একদিন কী মনে করে সে নবদ্বীপে এসে উপস্থিত। নবদ্বীপ মানে একেবারে নিমাইয়ের বাড়িতে।

কে এল? নিমাই সচকিত হয়ে উঠল। তাকিয়ে দেখল এক সন্ন্যাসী তার অঙ্গনে দাঁড়িয়ে।

খানিক আগেই সে ভাবছিল সে সন্ন্যাসী হবে। সে সন্ন্যাসী হলেই পাষণ্ডীদের উদ্ধার হবে। উদ্ধার একমাত্র নমস্কারে। দুর্জনেরা তো আমাকে এমনি নমস্কার করবে না, আমি সন্ন্যাসী হলে পরেই করবে। প্রণত হলে পরেই ওদের অপরাধক্ষয় হবে। আর ওদের অপরাধের ক্ষয় হলেই ভক্তি জাগবে।

নিমাই তাকে প্রণাম করে ভিক্ষে করাল। বললে, আপনি সাক্ষাৎ নারায়ণ, কৃপা করে আমার সংসারমোচন করে দিন।

কেশব বলে, তুমিই তো অন্তর্যামী। তুমি যেমন করাবে আমি তেমনি করব।

এখন আমাকে বলুন, জ্ঞান বড়, না ভক্তি বড়?

সমস্ত মহাজন সবশেষে এই ভক্তিই চায়। এই ভক্তিই স্থির। ভক্তিই কৃষ্ণ। সুতরাং ভক্তিই বড়।

হরি বলে গর্জন করে উঠল নিমাই। বললে, কবে আমি কৃষ্ণের উদ্দেশে দেশে দেশে ঘুরে বেড়াব? কোথায় গেলে পাব আমার কৃষ্ণকে?

গৌরসুন্দর গঙ্গা পার হলেন। চলে এলেন কাটোয়ায়। বটগাছের নিচে কেশব ভারতীর আশ্রম খুঁজে পেতে দেরি হল না।

কেশবকে সাষ্টাঙ্গ প্রণাম করলেন গৌরহরি।

এ গৌরবর্ণ অপূর্বসুন্দর পুরুষটি কে? দেখেও যেন চিনতে পারছে না কেশব।

আমি নিমাই। আপনার কাছ থেকে আমি সন্ন্যাস নিতে এসেছি।

যেমন করাবে তেমনি করব, কথা দিয়েছিল কেশব। কিন্তু এই কমনীয়কান্তি নবীন পুরুষকে কোন্ প্রাণে সন্ন্যাস দেব? কাকে আমি পুত্রহারা করব? কাকে বা স্বামীহারা?

কেশব বললে, নিমাই, তুমি অন্য গুরুর সন্ধান করো, আমি পারব না সন্ন্যাস দিতে।

কিন্তু গোঁসাই, আপনি আমাকে কথা দিয়েছেন আমার কথা রাখবেন। আমি বলছি আমাকে সন্ন্যাস দিন।

তা আমি দেব, কিন্তু এখন কেন? তুমি যখন পঞ্চাশ বছর বয়স পেরিয়ে যাবে তখন দেব।

তবে যারা অল্পায়ু, তাদের কী হবে? তারা উদ্ধার পাবে না?

কিন্তু তোমার যে মা আছে, স্ত্রী আছে।

গোঁসাই, আমি তাদের সকলের অনুমতি নিয়ে এসেছি।

অনুমতি নিয়ে এসেছ? কেশব হতভম্ব হয়ে গেল। বললে, কিন্তু তোমাকে মন্ত্র দিলে তুমি তো আমাকে গুরু বলবে তাতে আমি অপরাধী হব।

না, না, অপরাধী হবেন না। স্বপ্নে এক মহাজন আমার কানে মন্ত্র দিয়ে গেছে। দেখুন তো এ-মন্ত্রের তাৎপর্য কী। বলে প্রভু কেশবের কানে মন্ত্র উচ্চারণ করে দিলেন। পরোক্ষে কেশবই তাঁর শিষ্য হয়ে গেল।

এবার তবে দীক্ষা দিন।

সে মন্ত্রেই কেশব প্রভুকে দীক্ষিত করল। নাম দিল শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য। বললে, কীর্তনপ্রকাশে সর্বলোকের কৃষ্ণ চৈতন্য জাগাবে বলেই তোমার এই নামকরণ।

আর প্রেমে তুমি সমস্ত বিশ্ব ভরাবে বলেই তুমি বিশ্বম্ভর।

আর তুমি রাধাভাবদ্যুতিতে বিভাসিত বলেই শ্রীগৌরাঙ্গ।

সে-রাত্রি কাটোয়ায় কাটালেন প্রভু। মুকুন্দকে বললেন, মুকুন্দ, কীর্তন করো।

মুকুন্দ কীর্তন ধরল। প্রভু প্রেমোন্মত্ত হয়ে নৃত্য করতে করতে কেশব ভারতীকে আলিঙ্গন করলেন। কোথায় দণ্ড গেল, কোথায় কমণ্ডলু, কেশবও হরি-হরি বলে নাচতে লাগল। যে ভক্তিকে সে শ্রেষ্ঠ বলে স্বীকৃতি দিয়েছিল, সেই ভক্তিকে তার দেহ-মনে আবির্ভূত দেখল। মাটিতে লুটিয়ে পড়ে ধুলোয় গড়াগড়ি দিতে লাগল কেশব।

প্রভাতে কেশবের কাছ থেকে বিদায় নিলেন প্রভু। বললেন আমি এবার কৃষ্ণ খুঁজতে পথে বেরুব। অরণ্যে প্রবেশ করে দেখব আমার কৃষ্ণ কোথায় লুকোল।

কেশব বললে, আমিও তোমার সঙ্গে যাব। তোমার কীর্তনরঙ্গের সঙ্গী হব।

কেশবকে অগ্রণী করে প্রভু কাটোয়া ত্যাগ করলেন।

তারপর কেশব কোথায় গেল কবে ফিরল, ফিরলই বা কিনা, কেউ জানে না।

(ক্রমশঃ)

ভারতীয় মুসলমান সমাজ (২)

ডাঃ মুজিবের ভারতীয় মুসলমান সমাজ গ্রন্থটিতে মুসলমান শাসনকালে এদেশে যে রাজনৈতিক, শাসনতান্ত্রিক ও সামরিক নিয়ন্ত্রণ নীতি প্রচলিত ছিল এবং তার সঙ্গে উলেমা, সুফী এবং জনমতের কি চাপ ছিল তার বিস্তারিত বিশ্লেষণ আছে। সুফী-বাদের ধীর এবং স্থির গতিতে ক্রমবিকাশ, পরিপূর্ণ ধর্মীয় রীতি থেকে জনপ্রিয় মত-বাদে রূপান্তর ব্যাখ্যা করা হয়েছে। সুফী-বাদের বিভিন্ন ধারা যথা চিশ্তি, কাদিরি, নকসবন্দী এবং সুহরাবর্দীদের ধর্মমত, এবং দীন দরিদ্রের কল্যাণের প্রতি তাঁদের একনিষ্ঠ অনুরাগ, অত্যাচারিতদের প্রতি মমতা এবং শাসকতন্ত্র, উঁচুতলার সমাজ সম্ভূত আমীর ওমরাহদের কাছ থেকে নিজেদের স্বাতন্ত্র্য রক্ষা করে চলার ফলে সুফী সম্প্রদায়ের খানকাহ গোষ্ঠী এবং শাসক সম্প্রদায়ের মধ্যে যেভাবে ভারসাম্য রাখা হয়েছিল, কখনো শাসকরা সুফীদের বিরোধী আবার কখনও বা জনপ্রিয়তার বাহুল্য দেখে তাঁদের প্রতি আকৃষ্ট হয়েছেন, এই সব তথ্য পাঠকমনে বিশেষ আগ্রহ সৃষ্টি করেছে।

অধ্যাপক হুমায়ুন কবির এই গ্রন্থ সম্পর্কে পত্রান্তরে বলেছেন :

> "William Hunter wrote an account of Indian Muslims more than a hundred years ago but his account was confined mainly to Eastern India. Since then there have been several attempts, but Professor Mujeeb's study is perhaps the first comprehensive account which deals with almost every aspect of Muslim life and its repercussions on India. He has dealt not only with political and economic factors but also devoted a good deal of attention to social life.'

এইখানেই ডাঃ মুজিবের বৈশিষ্ট্য। গ্রন্থটিতে ভারতীয় মুসলমান সমাজের একটা পূর্ণাঙ্গ বিবরণ তিনি দিয়েছেন এবং সেই সূত্রে অতীত ইতিহাস এবং সমাজ-তত্ত্বের এক মনোরম বিশ্লেষণ করেছেন। সামাজিক জীবনের কথা তিনি বিস্তারিত ভাবে বর্ণনা করায় সমকালীন চিত্র পাঠকের চোখে স্পষ্ট হয়ে ভেসে ওঠে। সাহিত্য, শিল্প, সংস্কৃতি ভাষা, ধর্মবিশ্বাস প্রভৃতির ক্রমবিকাশ কিভাবে হয়েছে তাও ডাঃ মুজিব একই সঙ্গে বিশ্লেষণ করেছেন।

প্রচুর তথ্য এবং মালমশলা সংগ্রহ করাই যথেষ্ট নয়, সেই, মালমশলা এবং তথ্যগুলির রুচিকর পরিবেশনটাই আসল। উপযুক্ত স্থান নির্ণয়, পারস্পরিক সম্বন্ধ বিচারটাও বড়ো কথা। ডাঃ মুজিব আধুনিক পদ্ধতিতে সহজ ভঙ্গীতে, সুন্দর ভাষায় এইসব তথ্যাবলী পরিবেশন করেছেন।

অনেক ঐতিহাসিক আছেন, বিশেষতঃ বর্তমান যুগে, যাঁরা নিজেদের পছন্দ ও রুচিমাফিক তথ্যগুলি গ্রহণ করে বিরোধী মত বা যে তথ্য কিঞ্চিৎ বিভ্রান্তির সৃষ্টি করতে পারে, তা বর্জন করেন। রামকে উত্তমপুরুষ করে দেখানোর জন্য শ্যামকে ক্ষুদ্র করা হয়েছে এমন দৃষ্টান্ত বিরল নয়। এই গ্রন্থের লেখক সুবিধামাফিক তথ্যের সঙ্গে অসুবিধাজনক তথ্যও মিশিয়ে একটা পূর্ণাঙ্গ চিত্র এঁকেছেন, শুধু যা নয়নাভি-রাম তাই নয়, যা কদর্য তাকেও পাশে এনে বসাতে ইতস্তত করেন নি।

ডাঃ মুজিব কাউকে বড়ো করে দেখানোর লোভে কাউকে ছোট করেন নি। তাঁর চোখে সব 'হিরোই হিরো, কেউ 'জিরো' নয়; আকবর কিংবা আবদুল রহিম খান - এ - খানান কিংবা আমীর খসরু সব এক সারে বসানো হয়েছে। যেখানে তথ্য এবং তত্ত্ব লেখককে নিয়ে গেছে লেখক সেখানেই গিয়েছেন, অন্যপথে চালিত হননি। ডাঃ কে অক্ষমদের সমর্থন করার দায়িত্ব ঘাড়ে নিয়ে তাঁকে অযথা কুতর্কে মাততে হয়নি। তাঁর মত অনেক সময় তীক্ষ্ণ, তীব্র, আবার কোনো কোনো স্থলে প্রশংসায় উদার। কোনোরূপ তথ্যকে শুধুমাত্র তথ্য হিসাবে তিনি ব্যবহার করতে চেষ্টা করেন নি।

সুফী সেখ নিজামউদ্দীন আউলিয়া পারসীক ও হিন্দি ভাষায় সুপণ্ডিত ছিলেন এবং সুকবি ছিলেন। দিল্লীর আমীর খসরু তাঁর সুযোগ্য শিষ্য। নিজামউদ্দীন আউ-লিয়া আবার নিজে গান গাইতে এবং রচনা করতেও পারতেন। কেউ কেউ বলেন, সেতারবাদ্যযন্ত্রটি নাকি তাঁরই আবিষ্কৃত। এই প্রতিভাধর পুরুষটিকে সকলেই বিশেষ শ্রদ্ধা করতেন।

ডাঃ মুজিব খসরুর পক্ষে বারবার বিদ্রোহ সামলে দাঁড়ানোর শক্তি নিয়ে ব্যাখ্যা করেছেন। বারবার বিদ্রোহ অথচ সুল-তানের ডান হাত—তার মধ্যে কেউ কেউ আবার অন্য সুলতানের হত্যাকারী। কিন্তু খসরুর এমনই মনোহর ব্যবহার এবং কূট-বুদ্ধি, সে এমনই কবিতা ও গাথা লিখতে পারত যে সবাই তার ব্যবহারে মন্ত্রমুগ্ধ হয়ে থাকত।

একদিকে রাজসভার প্রিয় সভাসদ, অন্যদিকে নিজামউদ্দীন আউলিয়ার প্রীতিভাজন মুরিদ। নিজামউদ্দীন আবার সুলতানদের দরবার এড়িয়ে চলতেন, সুলতানদেরও সদয় চোখে দেখতেন না। ডাঃ মুজিব লিখেছেন :

> "It is impossible not to be impressed by his adaptability to circumstances. But there is something unedifying in this very adaptability, in this art of making talent work independently of conscience, or of detaching the conscience completely from persons and events."

ডাঃ মুজিব অবশ্য সুলতানের দরবার আর খানখার মধ্যে কোন তরফে খসরুর টানটা বেশী ছিল তা বলেন নি।

খসরু তার পৃষ্টপোষকের ঘাতককে অভিনন্দিত করেছে, তার স্বপক্ষে যুক্তি ছিল যে রাজনীতিতে ভাঁওতাবাজী এবং নরহত্যাটা একটা তুচ্ছ ব্যাপার। ক্ষমতার লড়াই যেখানে সেখানে মিথ্যা কথা বলা বা নরহত্যা করাটা অতি সাধারণ এবং স্বাভাবিক ঘটনা মাত্র।

ডাঃ মুজিব বলেছেন :

> "In allowing prejudices to pervert his judgement and write things in bad taste, Khusru only showed that he belonged to his age.... Most significant was the desire to initiate what were considered the classics, to rival if not to surpass the acknowledged masters in their particular style.. He is at his best when he is most artless."

অনেক রকমের প্রশ্ন ইতিহাস পাঠকের চিত্ত জাগে। উদারনীতিক মুসলিম নর-পতিদের মধ্যে অনেকে কেন ধর্মনিরপেক্ষ-নীতি গ্রহণ করেন নি। উলেমাদের গোঁড়া-নীতি উপেক্ষা করতে পারেন নি, বর্ণাশ্রমী হিন্দু সমাজের ওপর অধিক পরিমাণে মুসলমান নীতি ও ভাবধারা চাপানোর চেষ্টা করেছেন কেন?

ডাঃ মুজিব এই প্রশ্নের জবাবে বলেছেন : মুসলিম রাজন্যবর্গের ধর্মীয় ও রাজনৈতিক নীতি যখন আমরা বিচার করি তখন আমাদের একথা মনে রাখা কর্তব্য যে তাঁরা কি কঠিন সমস্যায় বিজড়িত ছিলেন। কিঞ্চিৎ যুক্তিসংগত উদারনীতিক মতবাদ প্রদর্শন করলে তাঁদের হয়ত মুসলমান সমাজের শ্রদ্ধা হারাতে হত এবং সেই সঙ্গে হিন্দুদের ওপরও কর্তৃত্ব রাখা সম্ভব হত না। এই ব্যাধির উপশমে কোনো দাওয়াই তাঁদের হাতে ছিল না।

হিন্দু জনগণ কেন মুসলমান রাজ-তন্ত্রের বিরুদ্ধে জোরালো প্রতিরোধ গড়ে তোলেন নি, কেন তাঁরা শান্তশিষ্ট শিশুর

মতো মুসলিম প্রভুত্ব মেনে নিয়েছিলেন? এই প্রশ্নের জবাবে লেখক বলেছেন :

হিন্দুদের এই মনোভঙ্গী হল জাতি-ভেদ প্রথার প্রত্যক্ষ ফল। সরকার চালান এবং যুদ্ধ করা একটা বিশেষ জাতির কাজ. মুসলমান রাজত্ব কায়েম হওয়া মানে হিন্দু-ক্ষত্রিয় শাসকদের ক্ষমতাহানি, প্রতিষ্ঠাহানি। আর তাদের বাদ দিয়ে বা ডিঙিয়ে অন্য জাত যে মুসলমানদের সঙ্গে লড়াই করবে এ আশাও বৃথা। তাদের কি গরজ যুযুধান জাতিকে সাহায্য করার, অর্থাৎ ক্ষত্রিয়ের কাজ ক্ষত্রিয় করবে, আমরা কে? হিন্দু সৈনিকরা জাতিতেও সৈনিক। সে যদি মুসলমান সেনাদলে যোগ দেয়, তাহলেও সে তার রীতিগত কর্তব্য পালন করে যাবে। কিন্তু অন্য পেশা গ্রহণ করলে প্রত্যাবায় ঘটবে। গজনির মাহমুদের সেনাদলে এক-জন হিন্দু সেনাপতি ছিল। অসামরিক কর্মে নিয়োগ করার জন্য মুসলিম সম্প্রদায়ের লোক পাওয়া সহজ ছিল না। তাই শাসনতান্ত্রিক কর্মের দফতরটা হিন্দুদের জন্য উন্মুক্ত করা হয়েছিল। বাণিজ্যিক লেন-দেন করলে কোনো সামাজিক বিপদের সম্ভাবনা ছিল না। যুদ্ধে হিন্দু ও মুসলিমদের ক্ষয়-ক্ষতি একই প্রকার হলেও বাণিজ্যিক ব্যাপারে পুঁজিবাদী হিন্দুদের অবস্থা মুসলমান আমলে সম্ভ্রান্ত মুসলিমদের চেয়েও অনেক নিরাপদ ছিল। রাজদরবারের চক্রান্তে জড়িয়ে পড়া বা সুলতানদের কুনজরে পড়ার সম্ভাবনা হিন্দুদের পক্ষে অপেক্ষাকৃত কম ছিল।

শেখ নিজামউদ্দীন এবং শেখ নাসির-উদ্দীনের পর সুফীবাদের রূপান্তর ঘটল কেন? পরবর্তীকালে সুফীবাদ তার আধ্যাত্মিক গভীরতার পথ থেকে নেমে এসেছিল এবং তাঁদের কাজকর্ম ভন্ড্যাপথে চালিত হয়ে তাঁরা ক্রমে সেবাব্রতী হয়ে পড়েন।

সুফীবাদের তিরোধান এবং গোঁড়ামির আবির্ভাবের মধ্য দিয়েই আধুনিক যুগের ঐতিহাসিক তাৎপর্য ব্যাখ্যা করেছেন লেখক। উদারনীতির অন্তর্ধান হওয়ার পর উলেমা-তন্ত্রের গোঁড়ানীতি সহজেই বিভেদনীতি-এনেছে, বিভেদচিন্তার ফলে—দার-এল-হারাব, জিহাদ, সংরক্ষিত নির্বাচনকেন্দ্র প্রভৃতির উদ্ভব হয়েছে।

ডাঃ মুজিবের গ্রন্থটি ইতিহাস হিসাবে এক অনন্যসাধারণ গ্রন্থ।

—অভয়ঙ্কর

THE INDIAN MUSLIMS: By M. MUJEEB: Published by George Allen and Unwin: London: Price 63 Shillings.

আন্তর্জাতিক তুলনামূলক সাহিত্য আলোচনা চক্রে শ্রীরবীন্দ্রকুমার দাশগুপ্ত ॥

এ বছর আন্তর্জাতিক তুলনামূলক সাহিত্য সংস্থার পঞ্চম বার্ষিক সম্মেলন অনুষ্ঠিত হবে বেলগ্রেডে। এই সম্মেলনে দিল্লী বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রতিনিধি হিসেবে যোগ দিচ্ছেন শ্রীরবীন্দ্রকুমার দাশগুপ্ত। তিনি বাংলা ভাষা ও সাহিত্যের অন্যতম প্রতিষ্ঠিত সমালোচক। বর্তমানে তিনি দিল্লী বিশ্ব-বিদ্যালয়ের ঠাকুর অধ্যাপক ও আধুনিক ভারতীয় ভাষা ও সাহিত্যের প্রধান অধ্যাপকের পদ অলঙ্কৃত করে আছেন। শ্রীদাশগুপ্ত এই সম্মেলনে রবীন্দ্রনাথ ও গ্যয়েটের উপর একটি তুলনামূলক আলোচনা পাঠ করবেন। ৩০শে আগস্ট থেকে ৫ই সেপ্টেম্বর এই সম্মেলন অনুষ্ঠিত হবে।

হিন্দিতে বাংলা সাহিত্যের অনুবাদ ॥

হিন্দিতে ইদানিং যে সমস্ত ভারতীয় ভাষার অনুবাদ হচ্ছে, তার মধ্যে বোধ করি সবচেয়ে বেশি অনুবাদ হচ্ছে বাংলা সাহিত্যের। ১৯৬৬ সালে বাংলা থেকে হিন্দিতে অনেক কটি গ্রন্থের অনুবাদ হয়েছে। এর মধ্যে বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য হল, জরাসন্ধের ন্যায়দণ্ড, প্রমথনাথ বিশীর কেরী সাহেবের মুন্সী, সমরেশ বসুর বিবর নীহাররঞ্জন গুপ্তের উত্তরফাল্গুনী, বিমল মিত্রের কড়ি দিয়ে কিনলাম ও বাণী রায়ের তনিমা জাতক। এ ছাড়াও অনিমা পত্রিকাটির উদ্যোগে প্রকাশিত হয়েছে বাংলা ছোটগল্পের সংকলন।

এ ছাড়াও কিছুদিনের মধ্যেই যে গ্রন্থ-গুলির অনুবাদ প্রকাশিত হবে বলে আশা করা যায়, তার মধ্যে প্রথমেই উল্লেখ করতে হয়, এ বছর আকাদমী পুরস্কারপ্রাপ্ত নিশিকুটুম্বর কথা। এ ছাড়াও আশাপূর্ণা দেবীর লঘু ত্রিপদী, গজেন্দ্রকুমার মিত্রের নারী ও নিয়তি, আশুতোষ মুখোপাধ্যায়ের সাত পাকে বাঁধা, স্বরাজ বন্দ্যোপাধ্যায়ের গোপী সংবাদ, অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্তের প্রাচীর ও প্রান্তর, গজেন্দ্রকুমার মিত্রের নারী ও নিয়তি প্রকাশের উদ্যোগ চলছে। তারা-শঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়ের গণদেবতা গ্রন্থটিও এ বছরই প্রকাশিত হবে।

হিন্দিতে বাংলা সাহিত্য অনুবাদের এই উৎসাহ দেখে যতখানি আনন্দিত হওয়া উচিত ছিল, ঠিক তা হওয়া গেল না। উপরে লিখিত সবকটি গ্রন্থের কথা বলছি না, কিন্তু অধিকাংশ বইয়ের দিকে লক্ষ্য করলে পাঠক অনুভব করবেন, বাংলা সাহিত্যের শ্রেষ্ঠ রচনা সম্ভার পরিবেশনের চেয়ে এক বিশেষ ধরনের রচনা অনুবাদেই এ'রা আগ্রহী। বিভূতিভূষণ, মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় বা তারা-শঙ্করের শ্রেষ্ঠ রচনাগুলি এখনও অনূদিত হয়নি। এ ছাড়াও প্রেমেন্দ্র মিত্র, বুদ্ধদেব বসু, অন্নদাশঙ্কর রায় বা আরও পরবর্তী-কালে সুবোধ ঘোষ, অমিয়ভূষণ মজুমদার, নরেন্দ্রনাথ মিত্র, বিমল কর প্রমুখ লেখকদের পরিচয় হিন্দি সাহিত্যে নেই বললেই চলে।

যে পাঁচটি প্রকাশনা সংস্থা হিন্দিতে বাংলা গ্রন্থ অনুবাদে উৎসাহ দিয়ে থাকেন সেই সংস্থাগুলো হল—দিল্লির রাজপাল, রাজকমল ও হিন্দ পকেট বুকস, বোম্বের বোরা এন্ড সন্স এবং কলকাতার অপেরা পাবলিকেশন। তাঁরা যদি বাংলা সাহিত্যের হিন্দিতে অনুবাদের এই অভাব দূর করতে অগ্রসর হন, তাহলে ভারতীয় সাহিত্যের পাঠক মাত্রেই খুশি হবেন। এ ছাড়াও আর একটি দিকেও প্রকাশন সংস্থা ও অনুবাদক-দের দৃষ্টি আকর্ষণ করি। সাম্প্রতিক বাংলা সাহিত্যের সবচেয়ে গৌরবোজ্জ্বল দিকটি হল কবিতা। বাংলা কবিতার একটি প্রামাণ্য সংকলন প্রকাশ করার দিকেও যদি তাঁরা দৃষ্টি দেন, তবে তাঁরা সত্যই একটি সাহিত্যিক নিদর্শন স্থাপন করবেন এবং সকলের শ্রদ্ধা অর্জন করবেন বলে আশা করি।

তামিল কবির প্রতি শ্রদ্ধানিবেদন ॥

তামিল ভাষার অন্যতম বিদ্রোহী কবি নাদু থিরু পারাথিদামনর এর প্রতি শ্রদ্ধা নিবেদনের জন্য গত ২০ আগস্ট, বাংলা তামিল সংঘের উদ্যোগে হাওড়ার রামকৃষ্ণ মিশন হলে একটি সভা অনুষ্ঠিত হয়। সভায় পৌরোহিত্য করেন শ্রীথিরু এ. এ. শাইক ফারীদ। কবির প্রতি শ্রদ্ধা নিবেদন করে বিভিন্ন বক্তা ভাষণ দেন।

তিনজন তরুণ উর্দু কবি ॥

ভারতীয় সাহিত্যের ইতিহাসে উর্দু সাহিত্যের ধারাটি নিতান্ত নিষ্প্রভ নয়। বহু উল্লেখযোগ্য পরীক্ষা-নিরীক্ষার কাজ চলছে এখন উর্দু সাহিত্যে। অতি সম্প্রতি উর্দু কবিতায় তিনজন তরুণ কবি খুবই খ্যাতি অর্জন করেছেন। এ'রা হলেন সর্বশ্রী গুলাম রবানি তবন, ফিরাক গোরখপুরী ও শামিন কারহানি।

গুলাম রবানি তবন প্রধানতঃ গজল লেখক হিসেবেই খ্যাতি অর্জন করেছেন। গজল সম্বন্ধে একটা অভিযোগ প্রায়ই শোনা যায় যে, কেবল ছন্দ মিল দিলেই একটি গজল

রচনা করা যায়। ফলে যে কেউ একটা গজল লিখে দিতে পারেন। হয়ত একদিক থেকে তা অস্বীকার করা যায় না। কিন্তু যখন এর সাহিত্যিক মূল্য নির্ধারিত হবে, তখন আর ছন্দ মিলের মধ্যেই তা সীমাবদ্ধ থাকবে না। শ্রীতবন এই সাহিত্যিক গজল রচনায় পারদর্শিতা দেখিয়েছেন। সম্প্রতি তাঁর হাদীসি দিল নামে একটি গ্রন্থও প্রকাশিত হয়েছে। গ্রন্থটি প্রকাশ করেছেন দিল্লির উর্দু রাইটার্স কো-অপারেটিভ সোসাইটি। তবনের রচনার নিদর্শন হিসেবে এই গ্রন্থ থেকে তাঁর রচনার একটি উধৃতি দেওয়া যাচ্ছে।—

মেরি আফকর কি রণায়িয়ান তেরে ডুম সে,
মেরি তাসওয়ার মে'ই শামিল তেরি
তাওয়াজ্জ ভি হাই।

ফিরাক গোরখপুরী বোধ করি সর্বাধিক খ্যাতিসম্পন্ন তরুণ উর্দু কবি। তাঁর সদ্য প্রকাশিত গ্রন্থটির নাম হাজার দস্তান। প্রকাশ করেছেন দিল্লির শ্যামা বুক ডিপো। ফিরাকের গজলগুলি সম্পূর্ণ ভিন্ন ধরনের। প্রেম হচ্ছে তাঁর রচনার প্রধান উৎস। কিন্তু এই প্রেম কেবল রক্ত-মাংসের শরীরের প্রেম নয়—অনেক সময় তা বিশ্বপ্রেমে পরিণত হয়েছে। ফিরাক যে সংস্কৃত ক্লাসিক সাহিত্যের সঙ্গে পরিচিত তা কিন্তু তাঁর রচনা পাঠ করলেই বোঝা যায়।

শামিন কারহানি এ বছর উত্তরপ্রদেশ সরকারের বিসমল এলাহাবাদী পুরস্কার লাভ করেছেন। উর্দু সাহিত্যের তিনিও অন্যতম জনপ্রিয় তরুণ কবি। পারশি সাহিত্যে তাঁর ব্যুৎপত্তি সুবিদিত। ফলে তাঁর রচনাতেও এই পারশি সাহিত্যের প্রভাব পড়েছে। কবি হিসেবে তিনি আশাবাদী। আমন কবিতাটিতে এই আশাবাদের কথা খুব স্পষ্ট ভাবে ফুটে উঠেছে। রোশনি তেজ করো কবিতাটিও তাঁর বলিষ্ঠ আশাবাদের দ্বারা উজ্জ্বল। তাঁর সাম্প্রতিক যে গ্রন্থটি বিশেষ আলোড়ন সৃষ্টি করেছে, তার নাম আকমে গুল।

উর্দু কবিতার ইতিহাসে এঁদের অবদান খুবই প্রশংসনীয়।

বিহারের ভাষা ॥

বিহারের কোন ভাষায় কতজন কথা বলেন, এ বিষয়ে "বিহার রাষ্ট্রভাষা প্রসার পরিষদ"-এর উদ্যোগে গৃহীত একটি সমীক্ষার সংবাদ সম্প্রতি প্রকাশিত হয়েছে। ১৯৬১ গণনা অনুসারে বিহারের জনসংখ্যা ছিল ৪৬,০০০,০০০ জন। সম্প্রতি জনসংখ্যা বৃদ্ধি পেয়ে দাঁড়িয়েছে ৫০,০০০,০০ জন। এর মধ্যে ২৫,০০০,০০০ জন কথা বলেন হিন্দীতে। ভোজপুরীতে কথা বলেন ৭,৮৪২,০০০ জন, মৈথিলিতে ৪,৯৮২,০০০ জন, উর্দুতে ৪,১৪৯,০০০ জন, মাগধীতে ২,৮১৮,০০০ জন এবং বাংলায় ১,১৬৭,০০০ জন। এ ছাড়াও মুণ্ডা, ওঁরাও, হো ইত্যাদি কয়েকটি আদিবাসী ভাষাও আছে। সমীক্ষকদের পক্ষ থেকে জানান হয়েছে ১৮৯৪ সালে গ্রীয়ার্সনের পর এরকম বিজ্ঞান-ভিত্তিক ব্যাপক সমীক্ষা আর গ্রহণ করা হয়নি।

একটি নতুন পত্রিকা ॥

সম্প্রতি আরো একটি ইংরেজী ত্রৈমাসিক পত্রিকা প্রকাশিত হয়েছে। পত্রিকাটির নাম 'জার্ণাল অব কনস্টিটিউশনাল এন্ড পার্লামেন্টারী স্টাডিজ'। সম্পাদনা করেছেন শ্রীএম সি কাশ্যপ। এই সংস্থাটি প্রথম প্রতিষ্ঠিত হয় ১৯৬৫ সালে এবং উদ্বোধন করেছিলেন তদানীন্তন রাষ্ট্রপতি ডঃ রাধাকৃষ্ণণ। বর্তমান সংখ্যাটি এই সংস্থার পক্ষ থেকে প্রকাশিত প্রথম সংখ্যা।

পত্রিকাটির উদ্দেশ্যকে যে সকলেই অভিনন্দন জানাবেন, তাতে কোন সন্দেহ নেই। ভারতীয় সংবিধানের উপর লিখিত ছয়টি প্রবন্ধ বর্তমান সংখ্যায় প্রকাশিত হয়েছে। প্রতিটি প্রবন্ধই সুলিখিত এবং রাষ্ট্রবিজ্ঞানের ছাত্রদের সাহায্য করবে বলে আশা করি। পত্রিকাটির ছাপা-বাঁধাই সুন্দর। পত্রিকাটি নিয়মিত প্রকাশিত হবে বলে আশা করি।।

ইংরেজিতে রবীন্দ্রসংগীত ॥

অবাঙ্গালীদের মধ্যে রবীন্দ্র ধ্যান ধারণা প্রসারের উদ্দেশ্য নিয়ে ইংরেজিতে রবীন্দ্রসংগীত পরিবেশনার প্রচেষ্টায় যুগ্মভাবে নেমেছেন 'রবীন্দ্রভারতী সোসাইটি' ও 'রাইটার্স গীল্ড'। গত শনিবার, ২৬ আগস্ট তাদের উদ্যোগে এরূপ একটি মনোজ্ঞ অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়। অনুষ্ঠানে পৌরোহিত্য করেন রবীন্দ্র-ভারতী বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য শ্রীহিরণ্ময় বন্দ্যোপাধ্যায়।

রবীন্দ্রনাথের সঙ্গীতের ইংরেজি রূপান্তর করে পরিবেশন করেন শ্রীমতী সুধাশশী বসু ও সুচন্দ্রা বসু। রবীন্দ্রনাথের 'তুমি কেমন করে গান করো হে গুণী' বা 'একটি নমস্কারে প্রভু, একটি নমস্কারে' ইত্যাদি গানগুলি ইংরেজিতে সম্পূর্ণ নতুন চেহারা নিলেও কিন্তু মূল সুরটি বুঝতে অসুবিধা হয়নি। বহু অবাঙালী শ্রোতার উপস্থিতিতে অনুষ্ঠানটি খুবই গাম্ভীর্যপূর্ণ হয়ে ওঠে।

নাট্য-বিষয়ক মাসিক পত্রিকা ॥

দিল্লী থেকে ইংরেজী ভাষায় নাটক বিষয়ে একটি মাসিক পত্রিকা প্রকাশিত হয়। সম্প্রতি পত্রিকাটির জুলাই সংখ্যা প্রকাশিত হয়েছে। আকারে ক্ষীণ হলেও পত্রিকাটিতে প্রকাশিত আলোচনাগুলি অত্যন্ত মূল্যবান। ভারতবর্ষের নাট্যসাহিত্য এবং নাট্য-সংগঠনের সংবাদ বিদেশীদের কাছে পৌঁছে দেবার সময় এসেছে। সত্যি কথা বলতে কি, আমাদের দেশের সাংস্কৃতিক জগতের খবরাখবর অন্যান্যদের কাছে পৌঁছে দেবার মাধ্যম প্রায় আমাদের নেই বললেই চলে। এদিক থেকে "এনাকট" পত্রিকাটির প্রচেষ্টা খুবই প্রশংসনীয়। পত্রিকাটির আর একটি বৈশিষ্ট্য হল, সমকালীন পৃথিবীর বিভিন্ন স্থানে যে সব নাটক রচিত হচ্ছে বা অভিনয় হচ্ছে, তার সম্বন্ধে বিভিন্ন আলোচনা ও মতামত এই পত্রিকায় প্রকাশিত হয়। পত্রিকাটি সম্পাদনা করেন শ্রীরাজীন্দর পাল।

স্তানিস্লাভস্কি ও মঞ্চশিল্প ॥

কন্স্তান্তিন্ স্তানিস্লাভস্কি হচ্ছেন রুশ দেশের একজন অসামান্য প্রতিভাধর নটশিল্পী ও নাট্যসমালোচক। তাঁর 'মাই লাইফ ইন আর্ট' একটি অনবদ্য আত্মজীবনীমূলক গ্রন্থ। উক্ত গ্রন্থটিতে একদিকে যেমন আছে নাট্যবিষয়ক আলোচনা তেমনি আছে অভিনয়কলা, মঞ্চশিল্প, নাট্যপ্রযোজনা, অভিনেতাদের জীবনকাহিনী ইত্যাদি বহুবিচিত্র বিষয়ের অবতারণা। কিন্তু মঞ্চের শিল্পী ও তার সুষ্ঠু প্রয়োগবিদ্যাকে কেন্দ্র করে তিনি একটি আলাদা বইও লিখেছিলেন। সম্প্রতি সে বইটির একটি ইংরেজী সংস্করণ আত্মপ্রকাশ করেছে। বইটির নাম ঃ 'স্তানিস্লাভস্কি অন দি আর্ট অব দি স্টেজ'।

বইটিতে স্তানিস্লাভস্কি প্রধানত আলোচনা করেছেন একজন মঞ্চশিল্পীর শিষ্টাচার ও সংযমবোধের প্রয়োজনীয়তা সম্পর্কে। অভিনেতাকে ধৈর্য অটুট রাখতে হবে, মনের পবিত্রতা ও সংকল্পে স্থিরবুদ্ধি হতে হবে। 'বিশেষত মনের পবিত্রতা ও আত্মবিশ্বাসে অবিচল থাকাই শিল্পীর ধর্ম'—একথা তিনি বারবার তাঁর শিষ্য ও পাঠকদের কাছে নিবেদন করেছেন। এবং এই একাগ্রতার অভাব দেখা দিলেই শিল্পীর পতন। তাঁর মতে 'হিরোয়িক টেনশন' জাগাতে হলে চাই মনের শান্তি ও সুস্থতা। এই গুণগুলো থাকা প্রয়োজন এই জন্যে যে তাহলে অভিনেতার পক্ষে যেকোন ধরনের অভিব্যক্তি প্রকাশ করা সহজ। একেই তিনি নাম দিয়েছেন 'চার্ম'। মূলতঃ এইসব ভাবধারা আলোচ্য গ্রন্থখানির প্রতিপাদ্য। কিন্তু অনেক সমালোচকই স্তানিস্লাভস্কির এই ধরণের বিশ্বাসকে 'ইউটোপিয়ান অ্যান্ড আনরিয়ালিস্টিক' বলে অভিহিত করেছেন। তাঁদের মতে একজন অভিনেতার এই বিশেষ গুণগুলি থাকলে তিনি একজন সন্ন্যাসীতে পরিণত হবেন।

মার্কিন উপন্যাসের মূল্যায়ন ॥

মার্কিন উপন্যাসের সমৃদ্ধি, এর বৈশিষ্ট্য, ও উদ্দেশ্যের সঙ্গে যাঁরা সংযোগ রাখেন তিনি জানেন উপন্যাসের এই শাখাটি উত্তরোত্তর ফলপ্রসূ হয়ে চলেছে। সবচেয়ে বড় কথা, হালের মার্কিন উপন্যাস আমাদের অনেকখানি আশান্বিত করে। এর কারণ খুঁজতে গেলে এর মৌলিকত্ব, জীবনবিশ্লেষণ প্রসঙ্গ, রীতিবৈচিত্র্য, নতুন সমাজভাবনার মূল্যায়ন, অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক অনুষঙ্গ—এ প্রত্যেকটি দৃষ্টিভঙ্গীর সাহায্যেই এর বিচার করতে হবে। রিচার্ড পোরিয়ার তাঁর 'এ ওয়ার্লড এলসহোয়্যার' নামক সমালোচ্য গ্রন্থটিতে মার্কিন উপন্যাসের নবমূল্যায়ন প্রসঙ্গে আলোচনা করতে গিয়ে একথাগুলি স্বীকার করেছেন। এবং সৃজনশীল এই শাখাটির প্রতি তিনি আশাবাদী। আলোচ্য বইটি সাধারণ পাঠকের কাছে আরো উপযোগী এই জন্য যে এতে ধারাবাহিক মার্কিন উপন্যাসের ইতিহাস যেমন আছে তেমনি আধুনিক উপন্যাসের বিশ্লেষণ স্থান পেয়েছে। ফলে এদের উপন্যাসের গুরুত্ব সম্পর্কে অবহিত হওয়া সম্ভব। মার্কিন উপন্যাসের যে প্রধান গুণটি তাঁর মতে বৈশিষ্ট্যময় তা হচ্ছে বাইরের পরিবেশ থেকে মার্কিন ঔপন্যাসিকদের ক্রমশই অন্তর্মুখী হওয়া এবং ব্যক্তিগত উপলব্ধির দিকে ডুবে যাওয়া। ফলত, যে ব্যক্তিত্বের জাগরণ স্পষ্ট হয়ে ওঠে তা সমাজেরই অস্তিত্ব বলে মনে হয়। এ প্রসঙ্গে তিনি এমার্সন, কুপার, হেনরি জেমস্, মেলভিল, ফক্নার প্রভৃতি কৃতবিদ্য লেখকদের রচনা থেকে উদ্ধৃতি দিয়েছেন। সমগ্র বইটিতে এই অংশটি বিশেষ মূল্যবান এবং মৌলিক দৃষ্টিকোণসঞ্জাত। একেই তিনি 'আমেরিকান ট্র্যাডিশান' বলে সংজ্ঞায়িত করেছেন। এবং আশা প্রকাশ করেছেন যে অচিরে তা অন্য এক দিগন্তের সৃষ্টি করবে। বইটি মার্কিন সাহিত্য বিষয়ে কৌতূহলী যেকোন পাঠকেরই মূল্যবান সংগ্রহ হতে পারবে।

তিন দিনে 'ওডেসি' ছাপা যাবে ॥

পেঙ্গুইন বুকস-এর ম্যানেজিং ডিরেক্টর স্যর অ্যালেন লেন ম্যাঞ্চেস্টারে একটি বোতাম টিপে ব্রিটেনের এবং সম্ভবতঃ বিশ্বের সর্বাধুনিক রোটারি পেপারব্যাক বুক প্রেসটি চালু করেছেন।

মিঃ নিকলস অ্যান্ড কোঃ লিমিটেডের ফিলিপস পার্ক প্রেসে স্থাপিত ৪০ হাজার পাউন্ড মূল্যের এই প্লান্টের সাহায্যে সাধারণ প্রচলিত প্রেসের দ্বিগুণ গতিতে বই ছাপা সম্ভব হবে।

এই নতুন প্রেস ৬৪ পৃষ্ঠার 'সিগনেচার' ঘণ্টায় ১৮,০০০ কপি করে ছাপতে পারে। স্যর অ্যালেন যখন বোতাম টেপেন তখন হোমারের ওডেসির ২০ সংস্করণটি প্রেসে চাপানো ছিল। তিন দিনের মধ্যে বইটি বাঁধাই হয়ে বিক্রয় উপযোগী হয়ে বের হয়ে আসে।

নিকলস কোম্পানী গত ২৫ বছর ধরে পেঙ্গুইন ও অন্যান্য পেপারব্যাক পুস্তক ছেপে আসছেন এবং বর্তমানে এটি বৃটেনের চারটি এই ধরনের প্রিন্টিং-এ বিশেষজ্ঞ প্রতিষ্ঠানের একটি।

দুই নাট্যকারের গল্পগ্রন্থ ॥

নাট্যকার হিসেবে আর্থার মিলার এবং টেনেসি উইলিয়ামস মার্কিন সাহিত্য ও মঞ্চজগতের দুই উজ্জ্বল প্রতিভা। আমেরিকা তথা পৃথিবীর প্রায় সর্বত্র এই দুই প্রধানের নাট্যপরিকল্পনা একদিকে যেমন মঞ্চকে করেছে পরিবর্তনশীল অন্যদিকে সাহিত্যের একটি অন্যতম শাখা হিসেবে আধুনিক নাটককে দিয়েছে প্রতিষ্ঠা। নাট্যজগতে নিজেদের অস্তিত্ব নানাভাবে জড়িত থাকা সত্ত্বেও দুজন নাট্যকারই প্রায়ই ভিন্নধর্মী কিছু লিখবার বাসনা মনে-মনে পোষণ করে এসেছেন। এর ফলে সম্প্রতি এই দুজনেরই দুটি গল্পগ্রন্থের নাম 'আই ডোন্ট নিড ইউ এনি মোর', আর টেনেসি উইলিয়ামসের বইটির নাম হচ্ছে 'দি নাইটলি কোয়েস্ট'।

নাটকরচনার আগে, সকলেই জানেন, আর্থার মিলার একজন ঔপন্যাসিক হিসেবেই সাহিত্যজগতে প্রবেশ করেছিলেন। ১৯৪৫ সালে সেই উপন্যাস 'ফোকাস' আত্মপ্রকাশ করেছিল। কাজেই ফিকশান বা ছোটগল্প রচনার একটা মুন্সিয়ানা বা আগ্রহ বহুদিন থেকেই তাঁর ছিল। মঞ্চজগতের সঙ্গে যুক্ত থেকেও মাঝে মাঝে তাই তিনি অবসর কাটিয়েছেন কিছু কিছু গল্প লিখে। 'আই ডোন্ট নিড ইউ এনি মোর' তারই উজ্জ্বল ফসল। আলোচ্য বইটিতে গল্প আছে মোট ৯টি। এর মধ্যে ৮টি গল্পের রচনাকাল ১৯৫৬ থেকে শুরু। এসময় থেকেই তাঁর চিন্তাধারায় এক ধরনের পরিবর্তন দেখা দিচ্ছিল। গল্পগুলি লেখার কারণ হিসেবে তিনি নিজেই বলেন.......'নাটক ও মঞ্চের উত্তাপসৃষ্টিকারী পরিবেশ থেকে মাঝে মাঝে সরে দাঁড়াতে চাই......।' 'দি মিসফিটস' গল্পটিতে এই ভাবটি তিনি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণভাবে চিত্রিত করেছেন। 'প্লিজ ডোন্ট কিল এনিথিং' গল্পটি পূর্ববর্তী গল্পটিরই অনুসৃত ও পরিপূরক। 'মন্টি স্যান্ট অ্যাঞ্জেলো' গল্পটিতে চরিত্র-চিত্রণই মুখ্য উদ্দেশ্য। 'এই গল্পটিতে যেন প্রত্যেক নিউইয়র্কারের আত্মজীবনী খুঁজে পাওয়া যায়'—বলেন প্রখ্যাত সমালোচক রিচার্ড ম্যাককেনা। 'সিটারস নাইট' গল্পটির পটভূমি দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের ব্রুকলিন নেভি ইয়ার্ড। আলোচ্য গল্পটি একটু থিয়েটার ঘেঁষা এবং শেখভের 'দি প্রফেসর' চালে লেখা।

টেনেসি উইলিয়ামসও গত কয়েক বছর ধরে নাট্যজগতের একঘেয়েমি থেকে মুক্তির জন্য কয়েকটি গল্প লিখেছেন—বিশুদ্ধ আনন্দ পাওয়ার জন্য। তাঁর 'নাইটলি কোয়েস্ট' বইটিতে আছে একটি বড় গল্প ও ৪টি ছোট গল্প। গল্পগুলির প্রত্যেকটিই রচনার অভিনবত্বে উজ্জ্বল। 'মাম্মাস ওল্ড স্টাকো হাউস' গল্পটি তাঁর পূর্ববর্তী নাট্যকাহিনী 'দি মিল্ক ট্রেন ডাজ নট স্টপ হিয়ার এনিমোর'-এর অনুসৃতি। 'দি কিংডাম অব আর্থ' গল্পটি অতিনাটকীয় হলেও এর অন্তর্নিহিত সুর এবং মানুষের নিঃসীম একাকীত্বের চিত্রণ ও মৃত্যুচেতনা আশ্চর্য রূপান্তর লাভ করেছে। তবে একথা ঠিক যে আলোচ্য গল্পগুলিতে উইলিয়ামস নতুন কিছু দেখাতে পারেননি বলেই অনেকের ধারণা। 'দি নাইটলি

কোয়েস্ট' মাসের যত্ন স্বল্পটি সম্পর্কেও একই অভিযোগ। বিশেষত এটি তাঁর পূর্ববর্তী নাটক 'দি স্টেয়ার্স টু দি রুফ' নাটকেরই গল্পাকারে বর্ণিত কাহিনী। তবে আলোচ্য গল্পে কমিক গ্রোটেস্কগুলো যে অভিনব তা বলা বাহুল্য।

একজন দক্ষিণ আমেরিকার কবি ॥

আঁদ্রে প্লেজ হচ্ছেন দক্ষিণ আমেরিকার অ্যালাবামা অঞ্চলের একজন তরুণ কবি। দ্বিতীয় যুদ্ধের পরে থেকেই তিনি বিভিন্ন পত্র-পত্রিকায় কবিতা লেখা শুরু করেন। কবি হিসেবে তিনি ক্ষমতাবান।

সম্প্রতি তাঁর প্রথম কাব্যগ্রন্থটি বেরিয়েছে। নাম ঃ ড্যামড আগলি 'চিলড্রেন'। এর অন্তর্ভুক্ত কবিতাগুলি যেমন নতুনত্বের গন্ধবহ তেমনই গদ্যভঙ্গীতে, কল্পনা-প্রতিভার পরিচয়ে দীপ্ত। তাঁর নিজের কবিতাগুলিকেই তিনি ড্যামড আগলি চিলড্রেন বলে অভিহিত করেছেন। কিন্তু সমালোচকদের মতে এই বিশেষণটি তাঁর অতি-বিনয়। আসলে তাঁর কবিতাগুলি অত্যন্ত বুদ্ধি-নির্ভর ও বাস্তবতার সম্পর্কে উজ্জ্বল। কবিতায় মনস্তত্ত্বের প্রক্রিয়া তাঁর কবিতাগুলিকে বিশিষ্ট করে তুলেছে। বিশেষত 'মাই সাউথ,' 'ডাইং গড', 'অ্যাডাম' বিশেষভাবে উল্লেখের দাবী রাখে। 'টল টক' কবিতায় তাঁর অ্যাংলো স্যাক্সন হৃদয়কে তিনি ধিক্কার দিয়েছেন এবং মুক্তির অন্বেষণ করেছেন।

ফরাসী ভাষায় জাপানী পত্রিকা ॥

জাপানী শিল্প সাহিত্য ও সংস্কৃতি বিষয়ক একটি পত্রিকা ফরাসী ভাষায় অনূদিত হয়ে শীঘ্রই আত্মপ্রকাশ করছে। পত্রিকাটির নাম 'ইস্ট-ওরিয়েন্ট'। প্রতি দুমাস অন্তর তা প্রকাশিত হবে। খাস টোকিও শহর থেকেই এটি বেরুচ্ছে। ফরাসী ভাষা দেশগুলিতে এবং বিশেষত ফ্রান্সের জাপানী সাহিত্যপিপাসুদের জন্যেই ইস্ট-ওরিয়েন্টের পরিকল্পনা নেওয়া হয়েছে। এর প্রতিটি রচনাই জাপানী শিল্পী, সাংবাদিক ও ইণ্টেলেকচুয়ালদের দ্বারা লিখিত। জাপানী শিল্প সাহিত্যের আধুনিক যুগ এবং ঐতিহ্যের যুগকে নিয়েই প্রধানত আলোচনাগুলি রচিত হবে। উদ্যোক্তারা মনে করেন, এইরকমভাবে অনুবাদের মাধ্যমেই তাঁদের শিল্পকলা ও সাহিত্য-কর্মকে পৃথিবীর সব দেশে পৌঁছে দেওয়া সম্ভব। জার্মান ভাষাতেও অনুরূপ একটি পত্রিকা প্রকাশ করার ইচ্ছা এঁদের আছে।

শরৎ জীবনের মনোরম আলেখ্য

বাঙলা কথাসাহিত্যে শরৎচন্দ্র একটি অবিস্মরণীয় নাম। রবীন্দ্রনাথের অলোক-সামান্য প্রতিভা যখন বাঙলা সাহিত্যের সর্বক্ষেত্র স্বকীয় সৃষ্টিতে দীপ্তময় করে তুলেছিল, শরৎচন্দ্রের আবির্ভাব ঠিক সেই মুহূর্তেই। বাঙলার পল্লী ও সমাজজীবনের যে সুনিপুণ আলেখ্য তিনি রচনা করে গেছেন, আজও মুগ্ধ-পাঠক তা সশ্রদ্ধে পাঠ করে থাকে।

শরৎচন্দ্রের সাহিত্যজীবনের মত ব্যক্তিগত জীবনের আকর্ষণও কম নয়। নানান বিচিত্র ঘটনায় তা পরিপূর্ণ। তাঁর জীবনের বিস্তৃত অধ্যায় কৌতূহল পরিচিত লোকসমাজের বাইরে। সে কারণ, এবং তাঁর বিভিন্ন সময়ের আচরণে এমন কতকগুলি ঘটনা ঘটেছিল যা তার পরিচিত মহলকে পরবর্তীকালে বিমূঢ় করে তুলেছিল। বিভিন্ন সভাসমিতি এবং বৈঠকে নানান বিষয়ে তিনি মন্তব্য প্রকাশ করে-ছিলেন। সে সম্পর্কে নানান জনের রচনা ছড়িয়ে আছে বিভিন্ন পত্রপত্রিকায়। এর মধ্যে যেমন সত্য কথন আছে, তেমনি অনেক অতি-রঞ্জন ও মিথ্যা প্রচার। সে সম্পর্কে দীর্ঘকাল কোন অনুসন্ধান হয়নি।

বেশ কিছুকাল যাবৎ শ্রীগোপালচন্দ্র রায় শরৎচন্দ্রের প্রামাণ্য জীবনী রচনায় হাত দিয়েছেন। কঠোর পরিশ্রম এবং গভীর অনুসন্ধিৎসার সঙ্গে তিনি শরৎ জীবনের নানান কাহিনী সংগ্রহ করছেন। এর মধ্যে যে অসংখ্য পরিমাণ নানান কাহিনী আছে তা তাঁর প্রামাণ্য গ্রন্থরচনার পক্ষে অন্যতম বাধাস্বরূপ হয়ে দাঁড়িয়েছে। তিনি লিখেছেন, "...শরৎচন্দ্রের সঙ্গে কিছুদিন মিশেছিলেন, এমন তাঁর কিছু ভক্ত, তাঁর মৃত্যুর পর শরৎদা আমার কাছে এই বলেছিলেন, এই বলেছিলেন করে বানিয়ে বানিয়ে নানা আলাপের কথা বিভিন্ন পত্রপত্রিকায় লিখতে শুরু করেছিলেন।" বহু বিষয়ে পরস্পর-বিরোধী বক্তব্যও লক্ষ্য করা যায়। গ্রন্থকার সেগুলি যুক্তি ও তথ্যসহ বিচার করবার চেষ্টা করেছেন।

শ্রীরায় রচিত 'শরৎচন্দ্র' গ্রন্থের দ্বিতীয় খণ্ড সম্প্রতি প্রকাশিত হয়েছে। এই খণ্ডে শরৎচন্দ্রের আলাপ আলোচনা, হাস্য-পরিহাস, বৈঠকী গল্প, নানান মৌখিক অভি-ভাষণ গৃহীত হয়েছে। বিভিন্ন সভা-সমিতি, বৈঠক এবং মজলিসে শরৎচন্দ্র বিভিন্ন বিষয়ে যে সমস্ত মন্তব্য প্রকাশ করতেন, তা শরৎ জীবনের নানাদিকের স্বরূপকেই উন্মাটন করে।

শরৎ প্রসঙ্গে এসেছে রবীন্দ্রনাথ, মধু-সূদন, বঙ্কিমচন্দ্র, দেশবন্ধু, যদুনাথ সরকার, রমেশচন্দ্র মজুমদার, অক্ষয়কুমার সরকার, কালিদাস রায়, কংগ্রেস, হিন্দু মুসলমান, চরিত্রহীন, নলিনীকান্ত সরকার, ভূপেন্দ্র-কিশোর রক্ষিত রায়, ভূতের গল্প, বিধবা বিবাহ—এমনি বহু বিষয়। যেগুলির মধ্যে ছড়িয়ে আছে নানান আকর্ষণীয় কাহিনী। সে সমস্ত কাহিনী পাঠ করে একদিকে যেমন বিস্ময় জাগে, অপরদিকে তেমনি নতুন ভাবনার দ্বার খুলে যায়। গ্রন্থ-কার লিখেছেন ঃ "শরৎচন্দ্র বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন ব্যক্তির সঙ্গে যেসব প্রয়োজনীয় বিষয় নিয়ে আলোচনা করেছিলেন, সে সমস্তই আজ আর সংগ্রহ করা সম্ভব নয়। তবে তাঁর শ্রোতাদের মধ্যে তাঁর মুখের কথাগুলি সঙ্গে সঙ্গে লিখে নিয়েছিলেন বা পরে তাঁদের স্মৃতি থেকে লিখেছিলেন, সেগুলি পাওয়া যাচ্ছে। এছাড়া শরৎচন্দ্রের বন্ধু-বান্ধব বা স্নেহভাজন আজও যাঁরা বেঁচে আছেন, তাঁরা তাঁদের স্মৃতি থেকে শরৎচন্দ্রের মৌখিক আলাপ-আলোচনা প্রভৃতির কথাও কিছু কিছু আমাকে বলেছেন" —শ্রীরায়ের গ্রন্থ-রচনার মূল সূত্র তিনি পরিস্কারভাবে স্বীকার করেছেন। সুতরাং গ্রন্থে বর্ণিত অনেক বিষয়ে বিতর্কের প্রশ্ন থাকলেও, তার প্রচেষ্টা অভিনন্দনযোগ্য। সংগৃহীত সমস্ত কাহিনী বা রচনা হয়ত কালক্রমে হারিয়ে যেত, কিন্তু শ্রীরায়ের আন্তরিক ও কঠোর পরিশ্রমে তা রক্ষা পেল—একথা অবশ্যই স্বীকার্য। ভবিষ্যতের গবেষক এর থেকেই হয়ত প্রামাণ্য শরৎ জীবনী রচনার উপাদান সংগ্রহ করতে পারবেন।
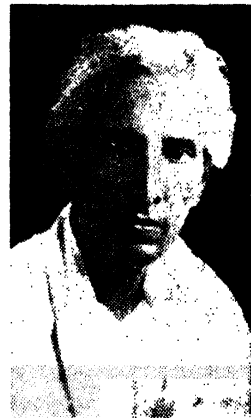
শরৎচন্দ্র—২য় খণ্ড (জীবনী)— গোপালচন্দ্র রায়। সাহিত্য সদন। এ১২৫ কলেজ স্ট্রীট মার্কেট। কলকাতা —১২। দাম ঃ ষোল টাকা।

বদরীনারায়ণের পথে

ধর্মপিপাসু মানুষের কাছে হিমালয় পবিত্র স্থান—পরম তীর্থক্ষেত্র! তবে ভ্রমণ-পিপাসু মানুষ হিমালয়কে আজও আশ্চর্য বিস্ময়ের সঙ্গেই দেখে থাকেন। তাই প্রতি বছর উপযুক্ত পরিবেশে অসংখ্য মানুষ যায় হিমালয় সন্দর্শনে। আর এই হিমালয়ের সুবিস্তৃত অঞ্চল নিয়ে অসংখ্য গ্রন্থ রচিত হয়েছে এবং এখনও হচ্ছে। এই সমস্ত গ্রন্থে তুষারধৌত হিমালয়ের বিস্ময়কর রূপকে নানান আলোকে ফুটিয়ে তোলা হয়েছে।

সম্প্রতি শ্রীমতী ভক্তি বিশ্বাসের 'হিমবাহ পথে বদ্রীনারায়ণ' গ্রন্থখানি প্রকাশিত হয়েছে। এই গ্রন্থে প্রথমেই আছে হিমালয়ের একটি ভৌগোলিক বিবরণ। তারপর হিমালয়ের হিমবাহ, কুমায়ুন, হিমবাহ পথে বদ্রীনাথ, উত্তরকাশী-গঙ্গোত্রী, গোমুখ, গঙ্গোত্রী-হিমবাহ গোমুখ ও 'রক্তবর্ণ' হিমবাহ সঙ্গম, নন্দনবন-চতুরঙ্গী ও বাসুকি হিমবাহ-সঙ্গম, অনামা হিমবাহ-বাসুকিবন-সুরালয় হিমবাহ সঙ্গম, গঙ্গোত্রী হিমবাহ যাত্রা, সীতা হিমবাহ, কালিন্দী খাল হিমবাহ, কালিন্দী - খাল-গিরিবর্ত্ম অরোয়া-তাল, অরোয়া উপত্যকা, ঘাসতোলী-মানা-বদ্রীনারায়ণ প্রভৃতি পর্যায়ে হিমালয়ের এক অসাধারণ চিত্র ফুটিয়ে তুলেছেন লেখিকা। তাছাড়া ভারতীয় পর্বতারোহণের সংক্ষিপ্ত পরিচয়ও দিয়েছেন তিনি।

শ্রীমতী বিশ্বাস দার্জিলিং মাউন্টেনিয়ারিং ইনস্টিটিউট থেকে বিশেষ শিক্ষাপ্রাপ্ত। এবং প্রায় প্রতি বৎসরই তিনি হিমালয় অঞ্চল পরিভ্রমণে যান। লেখিকা কেবল দুচোখ মেলে হিমালয়ের বর্তমান রূপই দেখেন নি, ফিরে গেছেন অতীত ইতিহাসে। মনোরম ভঙ্গীতে রচিত অথচ তথ্যনির্ভর এই গ্রন্থখানি বাংলা ভ্রমণ-সাহিত্যে একটি বিশিষ্ট সংযোজন। ভূমিকা লিখেছেন হিমালয়প্রেমিক শ্রীউমাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়। অনেকগুলি একরঙা ও রঙিন ছবি এবং মানচিত্র আছে।

হিমবাহ পথে বদ্রীনারায়ণ (ভ্রমণ)—ভক্তি বিশ্বাস। এম সি সরকার অ্যান্ড সন্স। ১৪ বঙ্কিম চাটুজ্যে স্ট্রীট। কলকাতা-১২। দাম পাঁচ টাকা।

বিচিত্র বিষয়ে গবেষণামূলক আলোচনা

শ্রীঅসিত গুপ্ত প্রবন্ধকার হিসাবে সুনাম অর্জন করেছেন। বিভিন্ন পত্র-পত্রিকায় প্রকাশিত তাঁর কয়েকটি প্রবন্ধের সংকলন 'বীক্ষা ও অন্বীক্ষা' সম্প্রতি প্রকাশিত হয়েছে। এর মধ্যে আছে 'আমাদের অবস্থা ও শিল্প স্বাধীনতা', 'সমাজতন্ত্র বিবেকানন্দ সনাতন ধর্ম', 'শার্ত্র-এর তত্ত্ব ও ব্যক্তিত্ব', 'ভারততত্ত্ব ও বিনয়তোষ' 'অলডাস হাক্সলি', 'উইলিয়ম হ্যারিসন ফকনর ও দক্ষিণাবর্ত', 'জেমস জয়স-এর ছোটগল্প ও আনুষঙ্গিক', 'রবীন্দ্রনাথের উত্তর কাব্য : আধুনিকতা ও বাস্তবতা', 'সাহিত্য ও চলচ্চিত্র', 'জন স্টাইনবেক-এর জগৎ', 'গ্রীক ঐতিহ্য ও নিকো কাজানিকা', 'সুধীন্দ্রনাথ দত্ত ও বাঙ্গালী ঐতিহ্য', 'সত্যজিৎ রায়ের চলচ্চিত্র চর্চা', 'প্রবেশ প্রস্থান', 'টি ই হিউম-এর বীক্ষা ও অন্বীক্ষা'। প্রতিটি আলোচনায় লেখকের গভীর চিন্তাশীলতা এবং বহু পঠনের পরিচয় সুস্পষ্ট। তাঁর বক্তব্য বিষয় সুগ্রথিত এবং সুসংবদ্ধ। পাণ্ডিত্য প্রকাশের মোহ কোথাও বিশেষ নেই। সহজভাবেই নিজের বক্তব্য তুলে ধরতে পেরেছেন। প্রচ্ছদে গ্রন্থের নামে বানান বিভ্রাট অমার্জনীয় ত্রুটি।

বীক্ষা ও অন্বীক্ষা (আলোচনা)—অসিত গুপ্ত। চতুষ্পর্ণা প্রকাশনী। ৫।১ রমানাথ মজুমদার স্ট্রীট, কলকাতা—৯। দাম চার টাকা।

অমর অভিনেতা চার্লি

চলচ্চিত্রে একটি বিস্ময়কর নাম চার্লি চ্যাপলিন। তাঁর অনন্যসাধারণ প্রতিভা এবং ব্যক্তিত্ব এ যুগের মানুষকে শুধু আশ্চর্যই করে নি, অসামান্য সৃষ্টিক্ষমতায় বিশ্ব-চলচ্চিত্রের ইতিহাসকে সমৃদ্ধ করেছে। তাঁর সুদীর্ঘ জীবন যেমন ঘটনাবহুল, তেমনি বৈচিত্র্যময়। উপন্যাসের মতই তার আকর্ষণ।

চ্যাপলিন ছোটবেলা থেকে দারিদ্র্যের সঙ্গে সংগ্রাম করেছেন। দেখেছেন বিচিত্র মানুষ, আর দেখেছেন সুখ-দুঃখময় জীবনকে। পরবর্তীকালে চ্যাপলিন বিশ্ব-প্লাবী সুনাম ও খ্যাতি অর্জন করলেও সে জীবন ভুলতে পারেন নি। তারা এসে বার বার উঁকি দিয়েছে চ্যাপলিনের তোলা ছবিগুলোর মধ্যে।

চ্যাপলিন আজ সুইজারল্যাণ্ডের অধিবাসী। শান্ত গ্রাম্য পরিবেশে সুখী সংসারে তিনি পরম তৃপ্ত। এই জীবনকেই তিনি কামনা করে এসেছেন। এরই স্বপ্ন দেখে এসেছেন পৃথিবীর আঁকা-বাঁকা পথে চলতে চলতে। এখানে বসেই চ্যাপলিন লিখেছেন তাঁর অসামান্য আত্মস্মৃতি। এই গ্রন্থখানি কেবলমাত্র চ্যাপলিনের জীবন নয় এর মধ্যে বিশ্বসংস্কৃতির এক অসাধারণ চিত্রও ফুটে উঠেছে। বাক্তিমানুষ চার্লি এবং বিশ্বমানব চ্যাপলিন একাকার হয়ে গেছেন এর মধ্যে।

চার্লি চ্যাপলিনের জীবনের উল্লেখযোগ্য ঘটনাবলী অবলম্বনে শ্রীঅমরেন্দ্র মুখোপাধ্যায় সম্প্রতি চ্যাপলিনের যে জীবনী রচনা করেছেন তা চ্যাপলিন-প্রেমিক বাংলাভাষী মাত্রকেই তৃপ্ত করবে। এই গ্রন্থ রচনায় তিনি চার্লির আত্মস্মৃতি অবলম্বন করেছেন। শ্রীমুখোপাধ্যায় বেশ সাবলীল ও স্বচ্ছন্দ ভঙ্গীতে চিত্রিত করেছেন চার্লির জীবনের উল্লেখযোগ্য কয়েকটি মুহূর্ত। গ্রন্থটি সমাদৃত হবে।

চার্লি চ্যাপলিন (জীবনী)—অমরেন্দ্র মুখোপাধ্যায়। জেনারেল প্রিন্টার্স অ্যান্ড পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড। ১১৯ ধর্মতলা স্ট্রীট, কলকাতা—১৩। দাম তিন টাকা।

উপভোগ্য উপন্যাস

শহরের ছেলে সুজিত সরকারী চাকরী বজায় রাখতে গেল গ্রাম কাশডাঙ্গায়—সেটেলমেন্টের কাজে। ঘটনাচক্রে কাশডাঙ্গা তার পৈত্রিক গ্রাম। অতএব সেখানে তার বাল্যসখী রেণুর সঙ্গে দেখা হল। পরিচিত মাস্টারমশাইদেরও সে কাছে পেল। কিন্তু সুজিতের আগমনে এবং কর্তব্যপরতায় যখন হীনচেতা স্বার্থান্ধ মানুষের আঁতে ঘা লাগলো, তখন তারা সুজিত ও রেণুকে ঘিরে সর্বনাশের পথে এগিয়ে গেল। এই সংঘর্ষেরই কাহিনী 'লগ্ন গোধূলি'। গ্রামের মেয়ে রেণুর হৃদয়ের উদারতা মনে দাগ কাটে। সমস্ত বিবাদ-বিরোধের শেষে রেণুর স্বামীগৃহ কলকাতায় প্রত্যাবর্তনের মধ্যে দিয়ে লেখক যে পরিণতি দেখিয়েছেন সেটি উপভোগ্য।

লগ্ন গোধূলি : (উপন্যাস) শচীপতি বন্দ্যোপাধ্যায়। ডি [illegible] বুক কোং; ১৭৩।৩, বিধান সরণি, কলি-৬। দাম—২.৭৫ পয়সা।

ভালোবাসার গল্প

মানুষের জীবনে, নারী-পুরুষ নির্বিশেষে আবহমান কাল ধরে যে ভালবাসার, প্রেমের ও যৌবনের তৃষ্ণা প্রবহমান তাকে অবলম্বন করে আলোচ্য গ্রন্থটি রচিত। শীলা, মালা, রজত, সুশোভন, সুরঞ্জন, শিবনাথ এদের কামনা, প্রেম প্রভৃতি স্বচ্ছন্দ গতিতে কাহিনীর সঙ্গে একাত্ম হয়ে ছুটে গেছে পরিণতির দিকে। সেই সঙ্গে এদের পারিবারিক সুখ-দুঃখ, আনন্দ-সংঘাতও বাঙ্‌ময় হয়েছে। অথচ কোথাও সুযোগ থাকলেও, রুচিবিকার দেখা যায়নি।

তৃষ্ণা : (উপন্যাস)— [illegible] দাম—৩.০০ টাকা।

ইলিয়া এরেনবুর্গ

ইলিয়া এরেনবুর্গ নেই। বহু জটিলতা ও নানা বিতর্কের পথে যাঁর যাত্রার কোনোদিন স্বস্তি ছিল না, তাঁর জীবনান্ত হয়েছে ছিয়াত্তর বছর বয়সে।

এরেনবুর্গ একবার বলেছিলেন, দুনিয়ার কোথাও যে পর্যন্ত একজন ইহুদীও নির্যাতিত হবে ততদিন আমি নিজেকে ইহুদী বলে ঘোষণা করব। বলা বাহুল্য, এটা নিছক তাঁর জাতিপ্রেম নয়, এ হোল জাগ্রত পৌরুষের বাণী। এরেনবুর্গের সাহিত্যই শুধু নয়, তাঁর সুদীর্ঘ জীবনের কর্মপ্রবাহই এর সার্থক প্রমাণ।

বিচিত্র অভিজ্ঞতার অধিকারী এরেনবুর্গের লেখকজীবনের শুরু বিশ বছর বয়সে। প্যারিসে পালিয়ে এলেন রাজনৈতিক কারণে। সে হল ১৯০৮ সালের কথা। একটানা প্রায় আট বছর ঘুরে বেড়ালেন ইউরোপের নানা দেশে। চষে ফেললেন গ্রাম-শহর সব জায়গা। ইতিমধ্যে কপালে জুটে গেছে অসামান্য কবিখ্যাতি। সত্যি কথা বলতে, তাঁর কবি হবার পেছনের ঘটনা ভারি অদ্ভুত। প্যারিসে আসবার পর থেকে মাঝে মাঝেই তাঁর কবিতা লিখবার ঝোঁক আসত। সৌন্দর্যের মধ্যে নিজেকে ডুবিয়ে রেখে, মানুষকে বুকের কাছে পেয়ে তিনি সেদিন পেলেন মুক্তির নতুনতর স্বাদ। একটা-আধটা কবিতা লিখলেও তেমন কিছু ঘটেনি তখনও। ইতিমধ্যে এক অঘটন ঘটে গেল। পরিচয় হল সুন্দরী তরুণী লিজার সঙ্গে। এরেনবুর্গ মুগ্ধ হলেন। লিজার সৌন্দর্য তাঁকে নতুন উন্মাদনা দিল। চঞ্চল হয়ে উঠলেন। তাঁর সঙ্গে ঘনিষ্ঠ হবার বাসনা তাঁর। ধীরে ধীরে তাঁর ভাগ্য খুলে গেল। প্রথম পরিচয়ের সূত্রে আলাপটা আরও গভীর করবার সবরকম চেষ্টাই তিনি করলেন। সফলও হলেন। নতুন এক জগতের সৌন্দর্য উপলব্ধি করলেন এরেনবুর্গ ভালবাসার মধ্যে। কবিতার নেশায় উন্মাদ হলেন তিনি। প্রথম বিস্ময়ের ঘোর কেটে গেল অল্পদিনেই। প্রেম আর কবিতা চর্চা চলল একই সঙ্গে।

১৯০৯-এর বসন্তকাল সেটা। একটি বছর ঘুরতে না ঘুরতেই প্রকাশিত হোল প্রথম কাব্যগ্রন্থ 'কবিতা'। সত্যি সত্যিই পুরোদস্তুর কবি বনে গেলেন এরেনবুর্গ। প্রথমবার প্যারিস থেকে স্বদেশে ফিরবার এক বছর বাদে আবার বেরুলো দ্বিতীয় কাব্যগ্রন্থ। রক্তে তখন তাঁর কবিতার নেশা। বইটির নাম পোয়েমস অ্যাবাউট দি ইভস—মস্কো থেকেই প্রকাশিত। সে-বই গোটা দেশে দারুণ হৈ-চৈ নিয়ে আসে। যদিও সেন্সরশিপের দৌলতে তার সব কথা জানবার সৌভাগ্য পাঠকদের ঘটে নি তবু এর ভেতর থেকে বোঝা গিয়েছিল কবির অপরিসীম ক্ষমতা। রুশ বুদ্ধিজীবীদের নজর আকৃষ্ট হোল। কবিতার আসরের নতুন নায়ক হলেন ইলিয়া এরেনবুর্গ।

এখন প্রশ্ন জাগতে পারে, এরেনবুর্গ রাশিয়া ছেড়ে প্যারিস গিয়েছিলেন কেন? সত্যিকথা বলতে, গোঁড়ামির বেড়া ভেঙে চুরমার করে দেবার নেশা জেগেছিল তাঁর একেবারে শৈশবকালেই। তখন রাশিয়ায় চলছে নতুন আর পুরনো চিন্তার টানাপোড়েন।

সে যাই হোক স্কুলে যখন পড়তেন তখন থেকেই স্বাধীনতার প্রতি তাঁর অবিচল শ্রদ্ধা আর ভালোবাসার কথা স্পষ্টভাবে ধরা পড়ে। 'নিউ রে' নামে একটি হাতে লেখা পত্রিকা সম্পাদনা করবার ভার পান সে সময়। এতে থাকত ছাত্রজীবনের স্বাধীনতা, তার গতিপ্রগতি, বিভিন্ন সমস্যা সম্পর্কে প্রবন্ধ, কবিতা ও নানাধরণের গল্প।

১৯০৬ সালে রাজনৈতিক কারণে স্কুল থেকে বিদায় নিতে হয়েছিল এরেনবুর্গকে। সে সময় রাজনৈতিক ঝড়ো হাওয়া ভয়ংকর ক্ষেপিয়ে তুলল কিশোর এরেনবুর্গের মন। নানারকম বাধা এল, ঝুটঝামেলাও কমতি হল না। কিন্তু কোনো কিছুই দামিয়ে রাখতে পারল না তাঁকে। সে সময়কার শাসনব্যবস্থার বিরুদ্ধে মাথা খাড়া করে কাজ করে যেতে লাগলেন। পুরোদস্তুর রাজনীতিক কর্মী বনে গেলেন তিনি। একদিন হঠাৎ তিনি গ্রেপ্তার হলেন। মাস পাঁচেক তাঁর জেল হল, নতুন অভিজ্ঞতা লাভ করলেন সতেরো বছরের যুবক এরেনবুর্গ। এর পরও নানা-রকম আঘাত আসতে থাকে তাঁর উপর। কড়া নজর ছিল সে সময়কার শাসনকর্তাদের। ফলে পালিয়ে বাঁচলেন প্যারিসে। জীবনের দায়ে দেশছাড়া হতে হল তাঁকে।

প্যারীতে থাকবার সময় অনেক কষ্ট সহ্য করতে হয়েছিল এরেনবুর্গকে। কখনো সংবাদপত্রের প্রতিনিধির কাজ করেছেন, আবার গাইডের কাজও করতে হয়েছে বেশ কিছু সময়।

উপন্যাস ও কবিতা, স্মৃতিচারণ ও প্রবন্ধ, কাহিনী আর রাজনৈতিক ইশতেহার, ভ্রমণকথা ও শিল্পসমালোচনার এক বিরাট সাহিত্যভাণ্ডারের রচয়িতা তিনি।

১৯২১ সালে প্যারীতে যাবার পর এরেনবুর্গের প্রথম উপন্যাস জুলিও জুরেনিটো প্রকাশিত হয়। প্রথম মহাযুদ্ধের বিভীষিকার পটভূমিতে লেখা এই উপন্যাসটি গোটা পৃথিবীতে দারুণ আলোড়ন তুলেছিল সেদিন। বলা বাহুল্য, এই যুগটা লেখক আর শিল্পীদের কাছে অনেকটা হতাশা, ক্ষোভ আর অবিশ্বাসের যুগ বলেই মনে হত। যুবক এরেনবুর্গও এই চিন্তার হাত থেকে রেহাই পাননি। তাঁর রচনাই হল এর সার্থক নজির। এই সময়টাকে তিনি বলেছেন, 'এ-এক মোহময় যুগ। কেননা এ সময় মানুষ তামাক বলে বাঁধাকপির পাতাকে ভুল করে।'

এরেনবুর্গের সবচেয়ে আলোড়নকারী উপন্যাস হল প্যারীর পতন। এই গ্রন্থে তিনি দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের দারুণতম দুর্ভোগের ঘটনাকে তুলে ধরেন। জার্মান ফ্যাসিস্টদের কাছে প্যারীর নির্মম পরাজয় এতে লিপিবদ্ধ। এটি ছাড়াও তাঁর ঝটিকা ও নবম তরঙ্গ বিশ্বসাহিত্যের অমূল্য সম্পদ। স্তালিনের

মৃত্যুর পর ১৯৫৪ সালে প্রকাশিত হয় তাঁর আলোড়নকারী উপন্যাস 'থ'। এই গ্রন্থটি নানাদিক থেকেই যেমন অবিস্মরণীয়, তেমনি বিতর্কমূলক। তবু বলতে দ্বিধা নেই, এই গ্রন্থে এমন একজন সংগ্রামী লেখককে পাওয়া যায় যিনি সব দিক থেকেই আশ্চর্যরকমের সৎ এবং নিজের মুখোমুখি দাঁড়াতে পেছপা হন না।

এর পর যখন তাঁর স্মৃতিকথা প্রকাশিত হতে শুরু করল, তখনও দেখা গেল বিতর্কের ঝড়। সে সময়কার সোভিয়েট প্রধানমন্ত্রী ক্রুশ্চেভ পর্যন্ত এরেনবুর্গের সমালোচনা করতে দ্বিধা করলেন না। অবশ্য এরেনবুর্গ এতে যে খুব বিচলিত হয়েছিলেন তা নয়; বলা বাহুল্য, ক্রুশ্চেভ পরবর্তীকালে তাঁর মত কিছুটা বদলে ছিলেন। ১৯৬১-তে এরেনবুর্গ 'অর্ডার অব লেনিন' খেতাব পান। এর আগে প্যারির পতন গ্রন্থের জন্য পেয়েছিলেন স্তালিন পুরস্কার।

মৃত্যুর পূর্বপর্যন্ত অক্লান্তভাবে লিখে গেছেন বিশ্বশান্তির অগ্রদূত সোভিয়েত রাশিয়ার এই জনপ্রিয় লেখক। তিনি মনে করতেন লেখকের বার্ধক্য বলে কিছু নেই। তাই চেয়েছিলেন মৃত্যুর পূর্বদিন পর্যন্ত লিখতে। আর সেটা যে সার্থক হয়েছে তা না বললেও চলে।

—[illegible]

তস্য তস্য অথবা সূর্য কাঁদলে সোনা

প্রেমেন্দ্র মিত্র

(পূর্ব প্রকাশিতের পর)

১৫২৩-এ মে মাসের একদিন মোরালেস-এর ক্রীতদাস গানাদা নিরুদ্দেশ হয়ে যায়।

সে-ঘটনার প্রায় দেড় বছর বাদে তারই গোপন চেষ্টায় যে উদ্যোগের সূত্রপাত হয়, তা বহুদূর অগ্রসর হয়ে সত্যি সত্যি পানামার ছোট বন্দর থেকে একটি মাঝারি জাহাজ নিয়ে 'সূর্য কাঁদলে সোনা'-র রাজ্য খুঁজতে পিজারোর অকূলে পাড়ি দেওয়া সম্ভব করে তোলে।

সময়টা ১৫২৪-এর নভেম্বর মাসের মাঝামাঝি।

ঘনরাম গোপনে যে ইঙ্গিত দিয়েছিলেন, পিজারো আর তাঁর দুই অংশীদার তাই অনুসরণ করেছেন।

দুটি জাহাজ এ-অভিযানের জন্যে দে লুকে-র হাত দিয়ে পাওনা টাকায় কেনা হয়েছে। তার মধ্যে বড়টি হল বালবোয়া নিজের জন্যে যে জাহাজ তৈরি করিয়েও আর ব্যবহার করতে পারেননি এবং খোলা অবস্থায় পানামার বন্দরে যা পচবার উপক্রম হয়েছিল, সেইটি।

সেটি নতুন করে জুড়ে খাড়া করে তাতে রসদ বোঝাই আর লোকজন অর্থাৎ মাঝ-মাল্লা আর সৈনিক নেবার ব্যবস্থা করেছেন আলমাগ্রো। লোকলস্কর মিলিয়ে দাঁড়িয়েছে প্রায় একশ' জন।

এই জাহাজ নিয়ে পিজারো প্রথমে রওনা হয়েছেন। ঠিক হয়েছে যে, পিজারোর বন্ধু ও অংশীদার আলমাগ্রো দ্বিতীয় ছোট জাহাজটির সব ব্যবস্থা যথাসম্ভব তাড়াতাড়ি সেরে ফেলে পিজারোকে কিছুদিন বাদেই অনুসরণ করবেন।

জাহাজ নিয়ে কিছুদূর অগ্রসর হবার পরই মোরালেসের বাড়িতে পরিকল্পনাটা কাগজে-কলমে তোলবার সময়কার সেই অদ্ভুত রহস্যময় সংশোধনটার কথা পিজারোর মনে পড়েছে।

তিনবন্ধু মিলে তখনই নভেম্বরে যাত্রা শুভ বলে ঠিক করেছিলেন, কিন্তু আশ্চর্য হয়েছিলেন পরের দিন সেই নভেম্বর কথাটা কাটা দেখে।

মোরালেস নিজে সে-কাটাকুটি করেছেন বলে মনে করতে পারেননি। তাঁর ওভাবে নিজের লেখা কাটবার কোন কারণও ছিল না।

নভেম্বর মাসে ওভাবে কেটে সংশোধন করবার চেষ্টাটা তাই অমীমাংসিত রহস্যই থেকে গেছে।

রহস্যটার মূলে কে তা জানা না গেলেও তার মানেটা এতদিনে যেন স্পষ্ট হয়ে ওঠে পিজারোর কাছে।

নভেম্বরটা এ-অঞ্চলের দারুণ ঝড়-তুফানের সময়। দক্ষিণের দিকে সমুদ্রযাত্রার পক্ষে সময়টা তাই একেবারেই অনুকূল নয়।

ঝড়বৃষ্টির বিরুদ্ধে যুঝতে যুঝতে প্রতি পদে বিপন্ন হয়ে অত্যন্ত মন্থরগতিতে অগ্রসর হতে হতে দৈববাণীর মত নভেম্বরে যাত্রা নিষেধের সেই নির্দেশ তাঁকে দিন দিন অত্যন্ত বিস্ময়বিহ্বল করেছে।

এ-নির্দেশ কি সত্যিই দৈবিক? তা না হলে তাঁরা নিজেরা এত খোঁজখবর নিয়েও যা জানতে পারেননি, সে-সংবাদ জেনে তাঁদের সাবধান আর কে করতে পারে!

এর আগে একটিমাত্র অভিযানই এদিকে কিছুটা পর্যন্ত অগ্রসর হয়েছিল। সে বিফল অভিশপ্ত অভিযানে আন্দাগোয়া পুয়েত্তো দে পিনিয়াস নামে একটি অন্তরীপের বেশী শুধু যে অগ্রসর হতে পারেননি, তা নয়, ফিরে যাবার পর মারাই পড়েছিলেন।

পিজারো সেই অন্তরীপ ঘুরে পার হয়ে এরপর যেখানে পৌঁছোলেন পৃথিবীর-জানিত সভ্যদেশের কোনো মানুষ ইতিপূর্বে সেখানে আসেনি বলেই তাঁর ধারণা।

বীরু নদীর মোহানায় তখন তাঁর জাহাজ ঢুকতে চলেছে।

এই বীরু নদীর কথা এদেশের আদিম অধিবাসীদের কাছে নানাভাবে শুনে শুনে পিজারো ও তাঁর বন্ধুদের তখন নিশ্চিত ধারণা হয়েছে, এই নদীই তাঁদের চরম সিদ্ধির মূলে পৌঁছে দেবে।

স্পেন থেকে এপর্যন্ত এই নতুন মহাদেশে যত অভিযান হয়েছে, সেগুলির একটিও পশ্চিমের সমুদ্রকূলের এই অজানা জগতের কোনো সন্ধান পায়নি।

এখানকার যাকিছু পরিচয় সব, আদি-বাসীদের অসংলগ্ন বেশীর ভাগ সময়ে আজগুবি অবাস্তব বিবরণ থেকে নেওয়া।

সে-বিবরণ অনেক সময় পরস্পরবিরোধী হলেও, কয়েকটি বিষয়ে সেগুলির মিল উপেক্ষা করবার নয়।

তার একটি হল এই বীরু নদীর নাম। এ-নাম নানাজনের বিবরণে নানাভাবে বহু-

[illegible] শোনা গেছে। [illegible] মনে হয়েছে, একটা রহস্যের আবরণে এ-নামটা যেন জড়ানো।

নদীটির বিস্তৃত মোহানার ঘোলা তরঙ্গিত জল কোনো সুদূর গহন গোপন রহস্য-রাজ্য থেকেই বয়ে আসছে বলে পিজারোর মনে হয়েছে।

তাঁদের পরিকল্পনার খসড়ায় বীরু নদীর নামের আগে সেই হয়ত শব্দটা অদ্ভুত-ভাবে লেখা হবার কথা তখন পিজারো ভুলে গেছেন।

কথাটা বেশ একটু অবাক হয়ে এবং দুঃখের সঙ্গে স্মরণ করতে হল কয়েকদিন বাদেই।

বীরু নদী বেয়ে মোহানা থেকে ক্রোশ-চারেক ভেতরে ঢুকে পিজারো তখন নোঙর ফেলেছেন। জায়গাটা খুব উৎসাহ বাড়াবার মত কিছু নয়। যতদূর দেখা যায়, শুধু বাদা আর জংলা জলা। মাটি যেখানে আছে, তুমুল বর্ষার জলে তা এমন পিছল কাদা হয়ে গেছে যে, তার ওপর দিয়ে চলাফেরা প্রায় অসম্ভব। এই বাদার ওপর দিয়ে বহুদূর গেলে কিছুটা উঁচু জমি আর জঙ্গল দেখা যায়। সে-জঙ্গল কিন্তু এমন ঘন, লতায়-পাতায়, কাঁটা-ঝোপে তার তলা এমন দুর্ভেদ্য যে, তার ভেতর দিয়ে পথ করে ওদিকের পাথুরে ডাঙায় পৌঁছোতে পিজারো আর তার সেপাইদের প্রাণান্ত হয়েছে। ক্ষিদের তেষ্টায় ক্লান্তিতে তারা আধমরা, কাঁটায় ছড়ে আর ধারালো পাথরে কেটে হাত-পা তাদের ওরান।

কিন্তু সোনার চেয়ে বড় নেশা নেই। পিজারো তাঁর সৈনিকদের রেহাই দেননি। তাঁর হুকুমে ভারী বর্ম আর অস্ত্রশস্ত্র নিয়েই সেপাইদের কখনো কাঠফাটা রোদে পুড়ে, কখনো অবিশ্রান্ত বৃষ্টিতে ভিজে কাদাজল ভেঙে ঘোরাঘুরি করতে হয়েছে। সেপাইদের নিজেদের মনেও সোনার লালসা না থাকলে শুধু পিজারোর হুকুমে তারা এত কষ্ট বোধহয় সহ্য করত না। সোনায় মোড়া সত্যি-কার রূপকথার রাজ্য খুঁজে পাওয়ার যে-প্রলোভন পিজারো তাদের দেখিয়েছেন, তারা তা বিশ্বাস করেছে।

কিন্তু সোনার রাজ্য দূরে থাক মেঠো গাঁয়ের একটা কুঁড়ের সন্ধানও পাওয়া যায়নি।

জনমানবহীন সেই বাদার মুল্লুক থেকে বাধ্য হয়েই পিজারোকে ফিরে আসতে হয়েছে নোঙর তুলে। জাহাজ আবার দক্ষিণমুখো চালান হয়েছে।

কিন্তু কোথায় সে সূর্য কাঁদলে সোনার দেশ!

ভাগ্য যেন তাদের সঙ্গে নিষ্ঠুর তামাসা করবার জন্যে দশদিন ধরে ভয়ংকর ঝড়-তুফানে তাদের জাহাজ তলিয়ে দেবার হুমকি দিয়েছে। ভরাডুবি থেকে যদিবা বেঁচেছে, ক্ষিদের তেষ্টায় সত্যিই তখন প্রাণ যাবার উপক্রম। নোনা মাংস সঙ্গে যা এনেছিল, সব তখন শেষ। মাথাপিছু দুটো করে ভুট্টার মাথা তখন প্রতিদিনের খাবার হিসেবে বরাদ্দ।

ভুট্টার মাথা!—উদরদেশ যাঁর কুম্ভের মত স্ফীত, ভোজনবিলাসী সেই রামশরণবাবু বাধা না দিয়ে বুঝি পারলেন না,—ওখানে তারা ভুট্টা পেল কোথায়?

ভুট্টা ওই দেশেরই ফসল। এই প্রথম শ্রীঘনশ্যাম দাসকে নিজ থেকে সমর্থন করলেন মর্মরমসৃণ যাঁর মস্তক সেই ঐতিহাসিক শিবপদবাবু,—এই আমেরিকা থেকেই, আলু, তামাক ইত্যাদির মত ভুট্টাও পুরানো মহা-দেশে আমদানি হয়েছে। কলম্বাসের আবিষ্কারের আগে সমস্ত আমেরিকায় ভুট্টাই প্রধান ফসল ছিল।

শিবপদবাবুর এ-সমর্থন পাণ্ডিত্য প্রকাশের সঙ্গে মন-কষাকষি মিটমাটের জন্যে হাত বাড়ানোরও সামিল। কিন্তু দাসমশাই হাত বাড়ানো নয়, আগেকার বেয়াদবীর দরুণ লম্বা কুর্নিশই বোধহয় চান। তাই শিবপদবাবুর সমর্থনও তিনি একটু টিঁকতে দিলেন না।

বললেন,—ভুট্টা বা মকাই-এর আদি জন্মভূমি কোথায় তা অত নিশ্চিত করে কিন্তু বলা যায় না। নতুনের বদলে পুরোনো মহাদেশের ফসলও হতে পারে বলে কেউ কেউ মনে করেন। তাঁরা এ-শস্য আরবরা প্রথম স্পেনে নিয়ে যায় বলে প্রমাণ দেখান। প্রাচীন একটি চীনা পুঁথিতেও ভুট্টার ছবিসমেত উল্লেখ তাঁরা পেয়েছেন।

শিবপদবাবুর পাণ্ডিত্যের ওপর ঠোকর-টুকু ভালো করে টের পেতে দেবার জন্যেই একটু থেমে দাসমশাই নিজেই অবশ্য শিব-পদবাবুর পক্ষে শেষ রায় দিলেন,—তবে কথা হচ্ছে এই যে, প্রাচীন চীনে পুঁথিটি কলম্বাসের আমেরিকা আবিষ্কারের প্রায় ষাট বছর বাদে লেখা। তাছাড়া এশিয়ার বা আফ্রিকা ইওরোপের কোথাও ধানের বা গমের যেমন, ভুট্টার তেমন বুনো জ্ঞাতি আর পাওয়া যায়নি। মধ্য বা আগের যুগের কোনো পর্যটক ভুট্টা জাতীয় কোনো শস্যের দেখা পেয়েছেন বলে লিখে যাননি, আর মিশরের প্রাচীন পিরামিডে নানা রকম শস্যের মধ্যে ভুট্টার একটি দানাও কোথাও নেই। সুতরাং এ ফসল নতুন মহা-দেশেরই দান বললে খুব ভুল হয় না।

হস্তীর মতো মেদভারে যিনি বিপুল সেই সদাপ্রসন্ন ভবতারণবাবুকে এই প্রথম বুঝি একটু অসন্তুষ্ট হতে দেখা গেল। ঈষৎ ক্ষুণ্ন স্বরে তিনি বললেন,—ভালো এক ভুট্টার কুলজির কথা তুললেন শিবপদ-বাবু! ওসব থাক। পিজারো-র জাহাজ সূর্য কাঁদলে সোনার দেশে কখন পৌঁছোলো তাই শুনি!

তা শুনতে হলে আরো অনেক সবুর করতে হবে,—বললেন ঘনশ্যাম দাস,—অন্ততঃ ও যাত্রায় তাদের শুধু হায়রানি সার হয়েছিল। শেষ পর্যন্ত পিজারো মন্টে-নেগরো নামে একজন সৈনিকের অধীনে তাঁর জাহাজ পানামায় ফেরত পাঠাতে বাধ্য হন। নিজে তিনি কয়েকজন বাছাই করা সঙ্গী নিয়ে সেই জলা জঙ্গলের দেশেই থেকে গেলেন, মন্টেনেগরো মুক্তা দ্বীপ থেকে রসদ নিয়ে ফিরবে এই আশায়। তাঁর সৈনিক ও মাঝি-মাল্লারা তখন প্রায় বিদ্রোহী হয়ে উঠেছে। শুধু আধ বুড়ো পিজারোর অসীম কষ্ট-সহিষ্ণুতা [illegible] তাদের সামনে ছিলো [illegible] বেসামাল হয়ে যায়নি। সোনার [illegible] সব কষ্ট সহ্য করতে কিছুটা [illegible] বটে কিন্তু সে কষ্ট কী দুঃসহ [illegible] উঠবে তারাও কল্পনা করতে পারেনি।

দিনের পর দিন, হপ্তার পর হপ্তা কেটে গেছে। মন্টেনেগরো মুক্তা দ্বীপ থেকে রসদ নিয়ে ফেরেনি। জলা-জঙ্গলের রাজ্যে পিজারো-র লোকেদের তখন শামুক-গুগলি আর বুনো ঝোপ-ঝাড়ের ফল খেয়ে দিন কাটছে। ক্ষিদের জ্বালায় যে সব ফল তারা খেয়েছে তার কিছু কিছু এমন বিষাক্ত যে তাদের শরীর ফুলে গিয়ে অসহ্য যন্ত্রণা হয়েছে। কিছুকালের মধ্যে দলের কুড়িজন তো অখাদ্য খেয়ে আর অনাহারে মারাই গেলো।

দলের অন্য সবাই বয়সে প্রায় তরুণ। শুধু পিজারো-রই পঞ্চাশ পার হয়েছে। কিন্তু তিনি যেন অন্য ধাতুতে তৈরি। সকলের সঙ্গে সব দুঃখ-কষ্ট তিনি সমান-ভাবে ভাগ করে নিয়েছেন, কিন্তু কিছুতেই দমে যাননি।

সমুদ্রের দিকে হতাশ হয়ে মন্টেনেগরো-র জাহাজের জন্যে চেয়ে থাকতে থাকতে চোখ যখন প্রায় ক্ষয়ে যাওয়ার উপক্রম, তখন একদিন ডাঙার দিক থেকে উত্তেজিত হওয়ার মতো একটি খবর পাওয়া গেল। সেখানে দূরে নাকি একটি আলো দেখা গেছে।

আলো মানেই মানুষ, মানুষের বসতি, গ্রাম, হয়ত শহর, হয়ত সেই সোনার দেশ!

ছোট একটি দল নিয়ে পিজারো সেই আলোর উৎস সন্ধানে তখনি বার হলেন। ঘন-জঙ্গল ভেদ করে যেখানে তারা পৌঁছোলেন সেটি একটি উন্মুক্ত প্রান্তর। সত্যিই সেখানে ছোট একটি বসতি দেখা গেল। বাসিন্দারা কিন্তু নেহাৎ ভীরু-নিরীহ ভালো মানুষ। পিজারো-র দলবলকে দূর থেকে দেখেই তারা গ্রাম ছেড়ে পালিয়েছে। পিজারো-র অনুচরেরা প্রথমেই অবশ্য গ্রাম লুঠ করে খাবার-দাবার যা পেলো আত্মসাৎ করলো। খাবার-দাবার সরেস কিছু নয়, ভুট্টা আর নারকেলই তার মধ্যে প্রধান। কিন্তু পিজারোর উপোসী সৈনিকদের কাছে তা অমৃত।

গাঁয়ের লোকেরা প্রথমে ভয়ে পালালেও পরে একটু ইতস্তত করে তখন ফিরে এসেছে। সম্পূর্ণ অজানা অঞ্চল হলেও সৌভাগ্যের কথা এই যে তাদের ভাষা পানামা অঞ্চলের আদিবাসীদের থেকে খুব আলাদা নয়। তাদের সঙ্গে কিছুটা আলাপ-পরিচয় তাই সম্ভব হল। আলাপের বিষয় অবশ্য একটি। গাঁয়ের আদিবাসীরা ফিরে আসার পর যা দেখে পিজারো আর তাঁর অনুচরদের চোখ ঝলসে গেছে—তা হোলো আদিবাসীদের গায়ের সোনার সব গয়না। গয়নাগুলোর সূক্ষ্ম কারু-কাজ না থাকলেও সেগুলির ওজনই পিজারো-র লোকেদের উত্তেজিত করে তুলেছে। সোনার দেশের যে কিংবদন্তী তারা শুনেছে তা তাহলে একে-বারে ভুয়ো নয়। (ক্রমশঃ)

'বুবিট্রাপে' আহত জনৈক মার্কিণ নৌসেনাকে হেলিকপ্টার থেকে নামিয়ে স্ট্রেচারে করে নিয়ে যাওয়ার সময় দানাঙের ২৫ মাইল দক্ষিণ-পূর্বে 'হিল-৬৩'তে তার দেহে রক্ত সঞ্চালন করা হচ্ছে —ইউ, পি, আই ফটো

দেশে বিদেশে

এবার বিহার ?

সংকটের পালা এরপর বিহারে এবং একটু বিচিত্রভাবে। এর আগে হরিয়ানায়, উত্তরপ্রদেশে ও মধ্যপ্রদেশে কংগ্রেস থেকে ভাঙ্গানের ফলে ঐ তিনটি রাজ্যে নির্বাচনোত্তর কংগ্রেসী সরকারের পতন ঘটেছিল। এবার বিহারে কংগ্রেস-বিরোধী যুক্তফ্রন্ট সরকারের পক্ষ থেকে ভাঙ্গানের ফলে সেখানে কংগ্রেস রাজত্ব পুনঃপ্রতিষ্ঠিত হবার সম্ভাবনা দেখা দিয়েছে।

এই সংকট ডেকে এনেছেন শ্রীবিন্ধ্যেশ্বরীপ্রসাদ মন্ডল নামক এক ব্যক্তি। তিনি গত নির্বাচনে এস-এস-পি'র প্রার্থী হিসেবে নির্বাচিত হয়েছিলেন লোকসভায়, কিন্তু রাজ্যে মন্ত্রিত্ব (স্বাস্থ্য দপ্তরের) পেয়েছিলেন। সংবিধানের নিয়মানুযায়ী ছ' মাসের মধ্যে বিধানমন্ডলীতে নির্বাচিত হয়ে নেবার কথা। এতে বাধা কিছু ছিল না, কিন্তু গোলমাল বাঁধালো এস-এস-পির কেন্দ্রীয় নেতৃত্বের একটি সিদ্ধান্ত। কেন্দ্রীয় নেতৃত্ব রায় দিলেন যে, যেহেতু তিনি লোকসভায় নির্বাচিত হয়েছেন, সেইহেতু তাঁকে লোকসভাতেই যেতে হবে, রাজ্যে মন্ত্রিত্ব করা চলবে না। এদিকে বিন্ধ্যেশ্বরীপ্রসাদ অনড় : তিনি কিছুতেই রাজ্যের মন্ত্রিত্ব ছাড়বেন না। অতএব নিয়মানুযায়ী তাঁর আর বিধানমন্ডলীতে নির্বাচিত হয়ে আসা হল না, কারণ যুক্তফ্রন্ট তাঁর জন্যে কোন আসন ছেড়ে দিতে রাজী নন।

সেই ছ' মাস সেপ্টেম্বরের প্রথম সপ্তাহে শেষ হবার কথা। এক্ষেত্রে অনিচ্ছুক মন্ত্রীকে সরাবার জন্যে যুক্তফ্রন্ট সরকারের মুখ্যমন্ত্রী শ্রীমহামায়াপ্রসাদ সিংহ বাধ্য হয়ে রাজ্যপালের কাছে সুপারিশ করলেন। গত ২৭ আগস্ট শ্রীমন্ডলের মন্ত্রিত্ব গেল।

আর প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই তিনি একটি রাজনৈতিক দল গঠন করলেন। তার নাম দিলেন শোষিত দল। ব্যক্তিগত স্বার্থসিদ্ধিতে যাঁরা ব্যর্থ হন তাঁরা শোষিত বইকি। তিনি জানালেন তাঁর সঙ্গে আরো অন্তত গোটা চল্লিশেক সদস্য যুক্তফ্রন্ট ত্যাগ করে শোষিত দলে যোগদান করেছেন। ২৮ আগস্ট শ্রীমন্ডল দলত্যাগী এই রকম ২৫ জন সদস্যের নামের একটি তালিকা প্রকাশ করেন (পরে অবশ্য এই তালিকাভুক্ত কয়েকজন বলেন যে, তাঁরা যুক্তফ্রন্ট ত্যাগ করে শোষিত দলে যোগ দেননি)।

বিহারের ৩১৮ সদস্যের বিধানসভায় কংগ্রেস গত নির্বাচনে ১২৮টি আসন দখল করেছিল। পরে একজন সদস্য জন ক্রান্তি দলে যোগ দেন। অপর পক্ষে দুজন নির্দলীয় সদস্য ফ্রন্ট ছেড়ে কংগ্রেসে যোগ দেন। এখন আরো তিনজন নির্দলীয় সদস্য কংগ্রেসের সঙ্গে আছেন। এই নিয়ে কংগ্রেসের বর্তমান সংখ্যা হল ১৩২। সুতরাং এর ওপর যদি ৪০ জন সদস্য শাসক দল ছেড়ে বেরিয়ে আসেন তবে রীতিমত একটা সংকটের সৃষ্টি হয় বইকি। কারণ তখন যুক্তফ্রন্টের সংখ্যাগরিষ্ঠতা আর থাকে না।

শ্রীমন্ডলের সঙ্গে কতজন সদস্য দল ছেড়ে এসেছেন তা নিয়ে বিতর্ক তোলা হয়েছে। এস-এস-পির শ্রীরাজনারায়ণ শ্রীমন্ডলের দাবীকে 'ধাপ্পা' বলে উড়িয়ে দেবার চেষ্টা করেছেন। মুখ্যমন্ত্রী শ্রীমহামায়াপ্রসাদ সিংহ বলেছেন, সংখ্যাগরিষ্ঠতা এখনও যুক্তফ্রন্টেরই আছে। হয়ত শেষ পর্যন্ত দেখা যেত শ্রীমন্ডলের দাবী সত্যিই অসার প্রমাণিত হয়েছে। কারণ কেউই পরাজিত নেতার পক্ষে থাকতে চান না, সকলেই ক্ষমতার আসনের কাছাকাছি থাকতে চান।

কিন্তু অসুবিধা ঘটালো কংগ্রেসের মনোভাব। বিহার কংগ্রেসের নেতৃবৃন্দ শ্রীমন্ডলের পেছনে এসে দাঁড়ালেন। শ্রীমন্ডল শোষিত দল গঠনের কথা ঘোষণা করার প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই হাই কম্যান্ডের সঙ্গে কোন পরামর্শ না করেই, বিহার কংগ্রেস শোষিত দলের সঙ্গে কোয়ালিশন গঠন করে ফেলল। কংগ্রেস-শোষিত দল কোয়ালিশন সরকার গঠিত হলে শ্রীমন্ডলকে মুখ্যমন্ত্রী করা হবে একথাও কংগ্রেস মেনে নিল। কংগ্রেস বিধানমন্ডলী দলের নেতা শ্রীমহেশপ্রসাদ সিংহ যুক্তফ্রন্টের সঙ্গে শক্তি পরীক্ষার উদ্দেশ্যে যত তাড়াতাড়ি সম্ভব বিধানসভার অধিবেশন ডাকার জন্যে রাজ্যপালের কাছে দাবী জানিয়েছেন। যুক্তফ্রন্ট সরকারের পতন ঘটাবার জন্যে রাজ্য কংগ্রেসী নেতৃবৃন্দ সবুজ আলোর সংকেত দেখালেন।

অবশ্য একথা ঠিক যে, শ্রীমন্ডল যদি সত্যিই ৪০ জন সদস্য ভাঙ্গিয়ে আনতে পেরে থাকেন, তাহলে এমনিতেই বিহারে শাসনতান্ত্রিক সংকট দেখা দেবে। কংগ্রেস শোষিত দলের সামিল হওয়ায় সেই সংকট আরো বাস্তব হল এই মাত্র। এই সংকটের পরিণতি কি হবে তা বিধানসভা ডাকা হলেই টের পাওয়া যাবে। তা নিয়ে এখন আর বিশেষ গবেষণার প্রয়োজন নেই। কিন্তু এখন যে প্রশ্নটা গুরুত্বপূর্ণ এবং যে প্রশ্ন নিয়ে কংগ্রেসের হাই কম্যান্ডের মধ্যেই একটা বিতর্ক গড়ে উঠেছে তা হল বর্তমান

সঙ্কটের পরিপ্রেক্ষিতে বিহার কংগ্রেসের আচরণ।

অত্যন্ত তাড়াতাড়ি এবং হাই কম্যান্ডের সঙ্গে পরামর্শ না করেই শোষিত দলের সঙ্গে কোয়ালিশন গঠন করে বিহার কংগ্রেস দলীয় শৃঙ্খলা ভঙ্গ করেছে। শুধু তাই নয়, কংগ্রেসের মর্যাদার ভিত্তিতেই আঘাত করা হয়েছে। কারণ এর দ্বারা বিহার কংগ্রেসের নেতৃবৃন্দ প্রমাণ করলেন যে, ক্ষমতা লাভই তাঁদের আসল লক্ষ্য এবং যেন-তেন-প্রকারেণ ক্ষমতা লাভ করতে তাঁরা সর্বদা প্রস্তুত। এই মনোভাবের দরুণই সাম্প্রতিককালে দেশব্যাপী কংগ্রেসের ভিত্তি যে দুর্বল হয়েছে, তা অনস্বীকার্য। চতুর্থ সাধারণ নির্বাচনে বিপর্যয়ও এই মনোভাবেরই ফল। এখনো যদি কংগ্রেস এই মনোভাব কাটিয়ে উঠতে না পারে তবে সেটা কংগ্রেসের পক্ষে দুর্লক্ষণই বলতে হবে।

এই অবস্থায় বিহার কংগ্রেসের কার্য-কলাপে হাই কম্যান্ডের হস্তক্ষেপ অবশ্য-ম্ভাবী হয়ে পড়েছে। হাই কম্যান্ড যদি দলীয় স্বার্থে এই হস্তক্ষেপ না করেন কিংবা করতে ইতস্তত করেন, তাহলেও সেটা কংগ্রেসের মর্যাদা বৃদ্ধি করবে না। কারণ এটা শুধু ফাঁকতালে একটি রাজ্যের ক্ষমতা দখলের প্রশ্ন নয়, এটা মূলত একটা নীতির প্রশ্ন। সাধারণ নির্বাচনের অব্যবহিত পরেই কংগ্রেস ওয়ার্কিং কমিটি এক প্রস্তাবে এই নীতি বেঁধে দিয়েছিলেন। তাতে সুস্পষ্ট ভাষায় বলা হয়েছিল যে, যে-সব রাজ্যে কংগ্রেস সংখ্যালঘু দল, সেই সব রাজ্যে কংগ্রেস অন্য কোন দলের সঙ্গে কোয়ালিশন করবে না।

হাই কম্যান্ড কি বিহারে এই নীতি লঙ্ঘিত হ'তে দেবেন? হাই কম্যান্ড এখন পর্যন্ত কোথাও এই নীতি লঙ্ঘিত হ'তে দেননি। আমরা আশা করতে পারি বিহারের ক্ষেত্রেও দেবেন না। ইতিমধ্যেই যথেষ্ট ইঙ্গিত পাওয়া গেছে যে, হাই কম্যান্ড, বিশেষত কংগ্রেস সভাপতি শ্রীকামরাজ, বিহার কংগ্রেসের কার্যকলাপ অনুমোদন করেন নি। সুতরাং আশা করা যায় শেষ পর্যন্তও এই মনোভাব বজায় থাকবে।

অবশ্য আরেকটা সম্ভাবনাও আছে। বিহার কংগ্রেসের কার্যকলাপের প্রকাশ্য নিন্দা করতে দেরী করায় এই ধারণা গড়ে ওঠা স্বাভাবিক। প্রকাশ, কোন কোন কেন্দ্রীয় কংগ্রেসী নেতা বিহারের ঘটনাকে একটা বিশেষ ছবিতে দেখতে চান। কারণ আরো কয়েকটি রাজ্যে যুক্তফ্রন্ট সরকারের ভিতরে টানা-পোড়েন আরম্ভ হয়ে যাওয়ায় কংগ্রেসের ক্ষমতা লাভের (যে-কোন রূপে হোক) সম্ভাবনা দেখা দিয়েছে। ঐ সব নেতার মতে বিহারে যুক্তফ্রন্ট সরকারের পতন ঘটাতে পারলে ঐ সম্ভাবনা উজ্জ্বল-তর হবে।

এই যুক্তি কংগ্রেসের দলীয় স্বার্থের পক্ষে উত্তম সন্দেহ নেই। কিন্তু যে-কোন রূপে ক্ষমতায় আসা কংগ্রেসের আদর্শের স্বার্থের অনুকূল কিনা হাই কম্যান্ডকে সেটাই বিচার করতে হবে।

বৈষয়িক প্রসঙ্গ

"ধর্ণার" ফল কি হল?

পশ্চিমবঙ্গের ছয়জন মন্ত্রী খাদ্যের দাবীতে দিল্লীতে গিয়েছিলেন প্রধানমন্ত্রীর বাড়ীর সামনে অনশন করতে, তারপর এক সপ্তাহের বেশী কেটে গেছে। প্রধানমন্ত্রী শ্রীমতী ইন্দিরা গান্ধী ও খাদ্যমন্ত্রী শ্রীজগ-জীবন রামের সঙ্গে আলোচনা করার পর পশ্চিমবঙ্গের মন্ত্রীরা অনশনের সঙ্কল্প ত্যাগ করে ফিরে এসেছিলেন। তখন বলা হয়েছিল যে, দিল্লী থেকে যে প্রতিশ্রুতি পাওয়া গেছে তাতে পুরোপুরি না হলেও, অন্ততঃ আংশিক ভাবে সন্তুষ্ট হয়ে ফিরেছেন।

কিন্তু এক সপ্তাহ পরে এখন আবার প্রশ্ন উঠছে, সত্যি সত্যি দিল্লী ধর্ণার পর কি পাওয়া গেল?

১লা সেপ্টেম্বর তারিখে কলকাতায় পশ্চিমবঙ্গ সরকারের তথ্যমন্ত্রী শ্রীসোমনাথ লাহিড়ী বলেছেন যে, কেন্দ্রীয় সরকারের কাছ থেকে যে "নূতন ভাষ্য" পাওয়া গেছে তাতে দেখা যাচ্ছে, কেন্দ্রীয় সরকার পশ্চিম-বঙ্গকে প্রতি মাসে যে ১ লক্ষ ৫ হাজার

স্থাপত্যশিল্পী : শ্রীরঙ্গম, ত্রিচনাপল্লী
ফটো : বাবু সামন্ত

মেট্রিক টন খাদ্যশস্য দেওয়ার প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন তার মধ্যে পাউরুটি ও বিস্কুট কারখানার জন্য বরাদ্দ ও চা বাগিচার জন্য বরাদ্দ খাদ্যশস্যও ধরা হয়েছে। শ্রীলাহিড়ী বলছেন, "খাদ্যের দাবীতে যুক্তফ্রন্টের ছয়জন মন্ত্রী যখন দিল্লী গিয়েছিলেন তখন আলোচনার সময় কেন্দ্রীয় মন্ত্রীরা এ ধরণের কোন কথা তোলেননি। যুক্তফ্রন্ট মন্ত্রীরা তখন ভাবতেও পারেননি যে, কেন্দ্রীয় সরকারের দাবী পূরণের স্বীকৃতির মধ্যে চা-বাগান ও পাউরুটি কারখানাগুলি ধরা হয়েছে। আমরা এর প্রতিবাদ জানাচ্ছি।"

(কালান্তর, ২ সেপ্টেম্বর)।

শ্রীলাহিড়ীর এই বিবৃতি থেকে মনে হচ্ছে, খাদ্যের ব্যাপার নিয়ে দিল্লীর সঙ্গে পশ্চিমবঙ্গের আর একটি দুর্ভাগ্যজনক বিতর্ক পাকিয়ে উঠছে। সংবাদে আরও প্রকাশ যে, কেন্দ্রীয় সরকারের এই "নূতন ভাষ্য" সম্পর্কে আলোচনার জন্য খাদ্যমন্ত্রী ডাঃ প্রফুল্লচন্দ্র ঘোষ দিল্লীতে যাচ্ছেন।

দিল্লীতে পশ্চিমবঙ্গের মন্ত্রীদের ধর্ণার প্রস্তাব প্রত্যাহৃত হয়ে যাওয়ার সাপ্তাহিক কাল পরে নতুন করে এই বিতর্ক ওঠা বিভ্রান্তিজনক।

কেননা, গত ২২শে আগষ্ট দিল্লীতে প্রধানমন্ত্রী ও কেন্দ্রীয় খাদ্যমন্ত্রীর সঙ্গে পশ্চিমবঙ্গের মন্ত্রীদের আলোচনার পর উভয় পক্ষের স্বীকৃত যে ঘোষণা করা হয়েছিল তার প্রথম অংশে বলা হয়েছিল:—

"এটা লক্ষ্য করা হয়েছে যে, বর্তমান মাসে গম, মাইলো ও যব মিলিয়ে পশ্চিমবঙ্গকে মোট ৯৫ হাজার মেট্রিক টন সরবরাহ করার কথা ছিল। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে সব মিলিয়ে মোট সরবরাহের পরিমাণ দাঁড়াবে ১ লক্ষ ৫ হাজার মেট্রিক টন। শ্রীজগজীবন রাম ইঙ্গিত দিয়েছেন যে, আগামী দুই মাসেও অনুরূপ পরিমাণ সরবরাহ বজায় রাখার জন্য চেষ্টা করে যাওয়া হবে।"

শ্রীসোমনাথ লাহিড়ী যখন দিল্লীতে সাংবাদিকদের কাছে এই ঘোষণা পড়ে শোনান তখন কেন্দ্রীয় খাদ্যমন্ত্রী শ্রীজগজীবন রামও সেখানে ছিলেন। "সব মিলিয়ে মোট সরবরাহ" বলতে কি বোঝান হয়েছিল এটা না জেনেই শ্রীলাহিড়ী কি করে এই ঘোষণায় সম্মতি দিয়েছিলেন?

এখন এটা পরিষ্কার যে, "সব মিলিয়ে মোট সরবরাহ" বলতে তখন বিস্কুট কারখানা ও চা-বাগানের সরবরাহও যোগ করা হয়েছিল।

যদি ধরে নেওয়া যায় যে দিল্লীর ঘোষণা যখন প্রস্তুত হয়েছিল তখন পশ্চিমবঙ্গের মন্ত্রীরা তার তাৎপর্য বোঝেননি (যদিও সেটা মন্ত্রীদের বিচক্ষণতার পরিচয় দেয় না) তাহলেও সেটা বোঝার জন্য পশ্চিমবঙ্গ সরকারের এক সপ্তাহ অপেক্ষা করার প্রয়োজন ছিল না।

কেননা, ঐ ২২শে আগষ্ট তারিখেই দিল্লীতে কেন্দ্রীয় খাদ্যমন্ত্রী শ্রীজগজীবন রাম সাংবাদিকদের বললেন, "পশ্চিমবঙ্গকে 'নানা খাতে' যতদিন সম্ভব খাদ্য যোগাবার চেষ্টা করে যাওয়া হবে।...শ্রীজগজীবন রাম বলেন যে, পশ্চিমবঙ্গকে চাল ছাড়া ৯৫ হাজার মেট্রিক টন গম ও মাইলো সরবরাহ করার কেন্দ্রীয় প্রতিশ্রুতি অটুট থাকবে। শ্রীলাহিড়ী যে ১ লক্ষ ৫ হাজার মেট্রিক টন খাদ্যশস্যের কথা বলেছেন তার মধ্যে ৯৫ হাজার মেট্রিক টন গম ও মাইলো, খয়রাতি সাহায্য হিসাবে বিতরণের জন্য তিন হাজার মেট্রিক টন যব, পাঞ্জাব থেকে আমদানী ২ হাজার মেট্রিক টন যব, চা-বাগানগুলির জন্য ৩২০০ টন গম ও বিস্কুট কারখানাগুলির জন্য ২৩০০ মেট্রিক টন গম ধরা হয়েছে।" (হিন্দুস্থান টাইমস, দিল্লী, ২৩শে আগষ্ট)।

এই সংবাদ প্রকাশিত হওয়ার পরও ঐ ছয়জন মন্ত্রী দিল্লীর সঙ্গে বিষয়টা পরিষ্কার করে নেওয়া প্রয়োজন মনে করলেন না।

২৩শে আগষ্ট তারিখে কলকাতায় সাংবাদিকদের সঙ্গে এক সাক্ষাৎকারে পশ্চিমবঙ্গের খাদ্যমন্ত্রী ডাঃ প্রফুল্লচন্দ্র ঘোষ বললেন যে, আগষ্ট মাসে কেন্দ্রীয় সরকার যে ১ লক্ষ ৫ হাজার মেট্রিক টন গম বরাদ্দ করেছেন তার মধ্যে চা-বাগিচার চাহিদাও ধরা হয়েছে. প্রধানতঃ এই সংবাদ যদি সত্য হয় তাহলে পশ্চিমবঙ্গের জন্য বরাদ্দ আদৌ বাড়ান হয়নি। তিনি আরও বললেন যে, শ্রীজগজীবন রাম ইতিপূর্বে তাঁকে ১ লক্ষ মেট্রিক টন গম ও দান হিসাবে পাওয়া তিন হাজার মেট্রিক টন যব এবং লঙ্গরখানার জন্য ৬০০ মেট্রিক টন গম সরবরাহ করার প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন। চা-বাগিচাগুলিতে যে চার হাজার মেট্রিক টন গম সরবরাহ করার কথা, সেটা এর মধ্যে ধরা হয়নি। (প্যাট্রিয়ট, ২৪শে আগষ্ট)।

পশ্চিমবঙ্গের খাদ্যমন্ত্রীর এই বিবৃতির পরও কিন্তু শ্রীলাহিড়ী প্রমুখ মন্ত্রীরা বিষয়টি পরিষ্কার করা প্রয়োজন মনে করলেন না।

ছয় মন্ত্রী কলকাতায় ফিরে আসার পরও তাঁরা রাজ্যের খাদ্যমন্ত্রীর সঙ্গে বসে বিষয়টি পরিষ্কার করে নিলেন না। ডাঃ প্রফুল্লচন্দ্র ঘোষ বললেন, দিল্লীতে ঠিক কি হল তা তাঁকে জানান হয়নি।

এখন যদি পশ্চিমবঙ্গ সরকার বুঝতে পেরে থাকেন যে, প্রতিশ্রুত ১ লক্ষ ৫ হাজার টন খাদ্যশস্যের যোগানের মধ্যে বিস্কুট কারখানা ও চা-বাগিচার দরুণ যোগানও ধরা হয়েছে এবং সেটা বুঝতে পেরে বিক্ষুব্ধ হয়ে থাকেন তাহলে একথা এখন মেনে নেওয়া মুস্কিল যে, কেন্দ্রের দায়িত্ব লঙ্ঘনের অপচেষ্টা থেকেই এই বিতর্কের উদ্ভব।

প্রেক্ষাগৃহ

চিত্র-সমালোচনা :

শেক্সপীয়ারওয়ালা (ইংরাজী) : মার্চ্যান্ট আইভরি প্রডাকসন্স; ৩,৬১৬·৪৫ মিটার দীর্ঘ এবং ১৩ রীলে সম্পূর্ণ; প্রযোজনা : ইসমাইল মার্চ্যান্ট; পরিচালনা জেমস আইভরি; কাহিনী ও চিত্রনাট্য : আর. প্রাওয়ার ঝাবওয়ালা ও জেমস আইভরি : চিত্রগ্রহণ পরিচালনা : সুব্রত মিত্র: সঙ্গীত পরিচালনা : সত্যজিৎ রায়; রূপায়ণ : শশী কাপুর, ফেলিসিটি কেন্ডাল, মধুর জাফ্রে জিয়ফ্রে কেন্ডাল, উৎপল দত্ত, লরা লিডেল, জিম টিটলার প্রভৃতি। গুডউইন পিকচার্স এর পরিবেশনায় ১লা সেপ্টেম্বর শুক্রবার থেকে লাইটহাউস সিনেমায় প্রদর্শিত হচ্ছে।

মিঃ ও মিসেস বাকিংহাম একটি ছোট ভ্রাম্যমাণ সম্প্রদায় নিয়ে ভারতের বিভিন্ন অঞ্চলে শেক্সপীয়ারের জনপ্রিয় নাটকগুলি অভিনয় করে বেড়াচ্ছেন। তাঁদের দলে তাঁরা ছাড়া তাঁদের মেয়ে লিজি এবং ব্যাবী নামে একজন বৃদ্ধ ইংরেজ অভিনেতা আছেন, বাকী সবাই ভারতীয়। মিঃ বাকিংহাম অনুভব করছেন, ভারতীয়দের রুচি পরিবর্তিত হয়ে চলেছে, তারা আর পূর্বের মতো শেক্সপীয়ারের নাটকাবলীর অভিনয় দেখাতে উৎসাহ বোধ করে না, সিনেমার প্রভাবে সস্তা দরে নাচ-গান সমন্বিত মিউজিক্যাল-এর প্রতিই তাদের ঝোঁক বেশী। এ অবস্থায় সম্প্রদায় টিঁকিয়ে রাখাই তাঁর কাছে একটি সমস্যা হয়ে দাঁড়াল।

কিন্তু তার চেয়েও বড় সমস্যা হয়ে উঠল মিঃ ও মিসেস বাকিংহামের কাছে তাঁদের মেয়ে লিজির ভবিষ্যৎ। সঞ্জু (সঞ্জয়?) নামে একটি ভারতীয় ছেলেকে সে ভালোবেসে ফেলেছে; ছেলেটি একদা এক নির্জন পথে গাড়ী বিগড়ে যেতে তারা যখন একান্ত নিরুপায় হয়ে পড়েছিল, সেই সময় ওদের উদ্ধার করেছিল। সেই থেকেই সঞ্জু ওদের অনুসরণ করে এসেছে পার্বত্য শহরটিতে এবং সঞ্জু-লিজির প্রেম ক্রমেই ঘনীভূত হয়ে চলেছে। এর মধ্যে বাধা এসে দাঁড়াল সিনেমা-অভিনেত্রী মঞ্জুলা; সে এসেছে ওখানে একটি ছবির সুটিং উপলক্ষ্যে। সঞ্জুকে সে অনেকদিন আগে থাকতেই চেনে এবং ওর প্রতি সে আকৃষ্টও বটে। লিজিকে সে জানায়, সঞ্জু অমন বহু মেয়েরই প্রেমে পড়ে বটে, কিন্তু শেষ পর্যন্ত তার নিশ্চিত আশ্রয় হচ্ছে মঞ্জুলা নিজে। একথা শুনে লিজি প্রথমটা কিছুটা বিভ্রান্ত হয় বটে, কিন্তু সঞ্জুকে সামনে পেয়ে মঞ্জুলার অভিসন্ধি তার কাছে ধরা পড়ে যায়। এর পর সিনেমা-অভিনেত্রীরূপে তার সমধিক জনপ্রিয়তার কথা জাহির করবার জন্যে সে সঞ্জুর সঙ্গে লিজিদের অভিনয়-আসরে উপস্থিত হয়ে দর্শকদের মধ্যে চাঞ্চল্য এবং অভিনয়ে বিঘ্নের সৃষ্টি করে মিঃ বাকিং-

আগামী কয়েকটি ছবির শিল্পী সুব্রতা চট্টোপাধ্যায়। ফটো : [illegible]

হামের [illegible] ... কিন্তু তাঁদের লিজি [illegible] সঞ্জুর ভালো-বাসতে শুরু করে, সঞ্জু যেন ততই তার কাছ থেকে সরে যেতে থাকে। মঞ্চাভিনেত্রীর অসম্মানিত জীবনকে সে সইতে পারে না। লিজির মঞ্চাভিনয়ের সঙ্গে সঙ্গে যুবক-দর্শকরা যখন উচ্ছ্বসিত হয়ে শিস দিয়ে ওঠে, তখন সে ক্ষিপ্ত হয়ে উঠে তাদের সঙ্গে হাতাহাতি শুরু করে দেয় এবং এমন বিশৃঙ্খল অবস্থার সৃষ্টি করে যে, অভিনয় মধ্যপথেই বন্ধ হয়ে যেতে বাধ্য হয়। সঞ্জুর এই উত্তেজনার কারণ লিজি কিছুতেই বুঝতে পারে না, কিন্তু সঞ্জুর সাহচর্যে তার জীবন যে কুসুমাস্তীর্ণ হয়ে উঠবে না, এই পরম সত্যটি অত্যন্ত দুঃখের সঙ্গে সে হৃদয়ঙ্গম করতে সমর্থ হয়। এর পর সঞ্জু থেকে দূরে গিয়ে তাকে ক্রমে ভুলে যাবার জন্যে লিজির জাহাজে চেপে ইংলণ্ড চলে যাওয়া ছাড়া গত্যন্তর থাকে না।

ভ্রাম্যমাণ শেক্সপীরীয় নাটকের দলের পটভূমিকায় লিজ-সঞ্জু-মঞ্জুলার ত্রিকোণ-আকৃতি প্রেমকাহিনীটিকে গ'ড়ে তোলা হয়েছে অত্যন্ত সহজ অনাড়ম্বর ভাবে। লিজি-সঞ্জুর মাঝে হিন্দী ছবির নায়িকাকে এনে ফেলার মধ্যে উপভোগ্য নতুনত্ব রয়েছে। সমগ্র কাহিনীর সহজ বিস্তার এবং নাটকীয় পরিস্থিতি পরিহারের মধ্যে সত্যজিৎ রায়ের প্রভাব সহজেই লক্ষণীয়। ছবিটি আগা-গোড়াই এমন সহজ অথচ অনাস্বাদিত মাধুর্যে ভরা যে, এই মাধুর্য ছবিটিকে প্রায় অসাধারণত্বের পর্যায়ে উন্নীত করেছে।

অভিনয়ের দিক দিয়ে সবচেয়ে প্রশংসা দাবি করবেন মিঃ বাকিংহামের ভূমিকায় জিওফ্রে কেন্ডাল। ম্যাকবেথ, ওথেলো প্রভৃতি শেক্সপীরীয় চরিত্রাভিনয়ে তিনি যথার্থই অনবদ্য। মঞ্চের বাইরে সম্প্রদায় ও কন্যার মঙ্গল চিন্তায় মগ্ন অবস্থায় এবং চিন্তাকে ঝেড়ে ফেলে সহজ স্বাভাবিক হবার দৃশ্য-গুলিতেও তিনি তাঁর সহজাত নাট-নৈপুণ্যের পরিচয় দিতে পেরেছেন। এঁর পরেই অসা-মান্য অভিনয়-কুশলতা দেখিয়েছেন ফেলিসিটি কেন্ডাল নায়িকা লিজির ভূমিকায়। দেসদে-মোনা, ওফেলিয়া প্রভৃতি শেক্সপীরীয় চরিত্রাভিনয়েও যেমন, রোমান্টিক নায়িকার আনন্দ-বেদনা, অবিশ্বাস-উৎকণ্ঠা প্রভৃতির প্রকাশেও তেমনি কৃতিত্বের পরিচয় দিয়েছেন মিস কেন্ডাল। বৃদ্ধ ব্যাবির ছোট্ট চরিত্রে সকলের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছেন জিম টিটলার। ব্যাবির শবযাত্রা দৃশ্যটি করুণ। মিসেস বাকিংহামরূপে লরা লিডেলও তাঁর ভূমিকাটিকে জীবন্ত ক'রে তুলেছেন।

আবেগপ্রবণ উচ্ছ্বাসধর্মী নায়ক সঞ্জুর চরিত্রে রূপদান করেছেন শশী কাপুর। মনে হয়, সহজাত অভিনয় প্রতিভাসম্পন্ন কেন্ডাল পিতা-পুত্রীর মাঝে প'ড়ে তিনি কোনো সময়েই নিজেকে সহজ ক'রে তুলতে পারেননি এবং সেই [illegible] তাঁর সর্বাঙ্গ আড়ষ্ট যেন

শেক্সপীয়ারওয়ালা চিত্রে ফেলিসিটি কেন্ডাল

আড়ষ্টভাবে অভিনয় করতে দেখা গেছে। মাত্র লিজার রূপিণী মিস কেন্ডালকে ঘনিষ্ঠ-ভাবে চুম্বন করবার সময়েই তাকে অতিমাত্রায় আন্তরিক ও সক্রিয় হ'তে দেখা গেছে। জনৈক শেক্সপীয়রবোদ্ধা ভারতীয় মহারাজা-রূপে উৎপল দত্তের ব্যক্তিত্ব-প্রকাশী অভিনয় দর্শকমাত্রেরই দৃষ্টি আকর্ষণ করে।

ছবির কলা-কৌশলের বিভিন্ন বিভাগের মধ্যে এর চিত্রগ্রহণ সুব্রত মিত্রের অসীম সাহসিকতা ও শিল্পানুভূতির পরিচায়ক। শৈল-শহরের মেঘ, রৌদ্র, বৃষ্টির বিভিন্ন পরিবেশে গৃহীত বহির্দৃশ্যগুলি এবং বাস্তব প্রাসাদ, অভিনয়-মঞ্চ ও প্রেক্ষাগৃহের অন্তর্দৃশ্যগুলি গ্রহণে সমান দুঃসাহসিকতা ও শিল্পজ্ঞানের পরিচয় দিয়েছেন শ্রীমিত্র। সাদা-কালো ফোটোগ্রাফীর একটি স্মরণীয় নিদর্শন হচ্ছে 'শেক্সপীয়ারওয়ালা'। আবহ-সঙ্গীত রচনায় পশ্চিমী ও পূর্বীয় সঙ্গীতে সহ-প্রয়োগ করেছেন সত্যজিৎ রায়। বেহালা-গীটার-পিয়ানো থেকে সেতারে আসা সব সময়েই যে সার্থক হয়েছে, এমন কথা বলতে পারি না। শৈলপথগামী সঞ্জু ও লিজির ওপর মঞ্জুলার মুখনিঃসৃত হিন্দী গানটিকে ধীরে ধীরে বাড়িয়ে নিয়ে আসার মধ্যে শিল্প-চাতুর্য অবশ্য লক্ষণীয়।

সবশেষে ছবিটি সম্পর্কে আমাদের দুটি প্রশ্ন আছে। এক, নায়ক সঞ্জুর চরিত্রটিকে দায়িত্বজ্ঞানহীন, তরলমতি যুবক হিসেবে দেখানো হয়েছে কেন? সঞ্জু যথার্থ প্রেমিক হ'লে ক্ষতি কি ছিল? আমাদের তো মনে হয় তাতে কাহিনীর আকর্ষণ বাড়ত, [illegible] না। দুই,—জনৈক ভারতীয়কে মিঃ বাকিং-হামের কাছ থেকে মিথ্যা অজুহাতে কিছু অর্থ প্রার্থনা করানো হয়েছে কেন? ভারতীয় চরিত্রটিকে লোকচক্ষে হেয় প্রতিপন্ন করা ছাড়া এর আর কি উদ্দেশ্য থাকতে পারে? ছবির প্রযোজক ইসমাইল মার্চ্যান্ট-এর কাছ থেকে আমরা আমাদের প্রশ্ন দুটির সদুত্তর চাই। সঙ্গে সঙ্গে সেন্সারবোর্ডের যে-সব সদস্য এই ছবিটিকে ছাড়পত্র দিয়েছেন, তাঁরাও যে ভারতীয়দের সম্পর্কে হীন চরিত্রাঙ্কন সম্বন্ধে যথেষ্ট অবহিত নয়, তা স্মরণ ক'রে দিতে চাই।

—নান্দীকর

অন্বিতীয়া চিত্রে মাধবী মুখোপাধ্যায়

অরবিন্দ মুখোপাধ্যায় পরিচালিত জীবন-সংগীত চিত্রে সন্ধ্যারাণী ও কালী বন্দ্যোপাধ্যায়।

বি, কে, প্রোডাকসন্সের 'মহাশ্বেতা'

জরাসন্ধ রচিত বি, কে, প্রোডাকসন্সের 'মহাশ্বেতা' ছবিটি এ মাসের ২৯ সেপ্টেম্বর উত্তরা, পূরবী, উজ্জ্বলা প্রভৃতি চিত্রগৃহে মুক্তিলাভ করবে। পিনাকী মুখোপাধ্যায় পরিচালিত এ ছবির প্রধান চরিত্রে রূপদান করেছেন সৌমিত্র চট্টোপাধ্যায়, অঞ্জনা ভৌমিক, অনিল চট্টোপাধ্যায়, শমিতা বিশ্বাস, রেণুকা রায়, মলিনা দেবী, ছায়া দেবী, জহর গাঙ্গুলী, জহর রায়, সুখেন দাস ও আনন্দ মুখোপাধ্যায়। ছবিটির সুরকার রাজেন সরকার। চিত্রালী ফিল্মস ছবিটির পরিবেশক।

মুক্তিপথে 'শীলা'

কিনে ইউনিটের প্রথম ছবি কথা-সাহিত্যিক নরেন মিত্রের কাহিনী অবলম্বনে "শীলা" অরবিন্দ মুখোপাধ্যায়ের পরিচালনায় শেষ হয়ে মুক্তির দিন গুনছে। এক বন্ধ্যা নারীর সন্তান কামনায় অব্যক্ত ব্যথা ছবির মূল বক্তব্য। সুর দিয়েছেন রাজেন সরকার। সাবিত্রী চট্টোপাধ্যায়, শুভেন্দু চট্টোপাধ্যায়, রবি ঘোষ, গীতা দে, মিতা চট্টোপাধ্যায়, শেখর চট্টোপাধ্যায়, প্রসাদ মুখোপাধ্যায়, পঞ্চানন ভট্টাচার্য, গঙ্গাপদ বসু, শোভা সেন, প্রেমাংশু বসু, মাঃ চৌম্য প্রভৃতিকে ছবির

বিশিষ্ট [illegible] [illegible] ফিল্মস ডিস্ট্রিবিউটার্স [illegible] [illegible]।

ললিত চিত্রমের 'দুষ্টু প্রজাপতি'

কোমল চট্টোপাধ্যায় প্রযোজিত ললিত চিত্রমের 'দুষ্টু প্রজাপতি' মিনার, বিজলী ছবিঘর ও শহরতলীর বিভিন্ন চিত্রগৃহে শীঘ্রই মুক্তিলাভ করবে বলে জানা গেল। পরিচালক শ্যাম চক্রবর্তীর পরিচালনায় বোম্বাইয়ে গৃহীত এ ছবির মুখ্য চরিত্রে অভিনয় করেছেন কিশোরকুমার, তনুজা, সবিতা চট্টোপাধ্যায়, তরুণকুমার, অসীমকুমার, ভারতী দেবী, পদ্মা দেবী ও চন্দ্রিমা ভাদুড়ী। বাণীশ্রী পিকচার্স পরিবেশিত এ ছবির সুরসৃষ্টি করেছেন হেমন্ত মুখোপাধ্যায়।

স্টার প্রোডাকসন্সের 'চিড়িয়াখানা'

সত্যজিৎ রায় পরিচালিত স্টার প্রোডাকসন্সের 'চিড়িয়াখানা' চলতি মাসের শেষ সপ্তাহে বিশিষ্ট চিত্রগৃহে মুক্তিলাভ করবে। শরদিন্দু বন্দ্যোপাধ্যায় রচিত এই রহস্য-চিত্রের প্রধান চরিত্রে অভিনয় করেছেন উত্তমকুমার, সুশীল মজুমদার, জহর গাঙ্গুলী, শৈলেন মুখোপাধ্যায়, শুভেন্দু চট্টোপাধ্যায়, বঙ্কিম ঘোষ, প্রসাদ মুখোপাধ্যায়, শ্যামল ঘোষাল, কণিকা মজুমদার, সুব্রতা চট্টোপাধ্যায়, গীতালি রায় ও রুচীরা রায়। বলাকা পিকচার্স ছবিটির পরিবেশক।

গীতছন্দমের 'হংসমিথুন'

পার্থপ্রতিম চৌধুরী পরিচালিত গীত-ছন্দমের 'হংসমিথুন' ছবিটি মিতালী ফিল্মসের পরিবেশনায় শীঘ্রই মুক্তিলাভ করবে। পরিচালক শ্রীচৌধুরী রচিত এ কাহিনীর মুখ্যচরিত্রে রূপদান করেছেন শুভেন্দু চট্টোপাধ্যায়, অপর্ণা সেন, বিকাশ রায়, কালী বন্দ্যোপাধ্যায়, প্রসাদ মুখোপাধ্যায়, রবি ঘোষ, জহর গাঙ্গুলী, জহর রায়, রুমা গুহঠাকুরতা ও সবিতা বসু। হেমন্ত মুখোপাধ্যায় ছবিটির সুরকার।

সম্পাদনা টেবিলে "বালুচরী"

কার্তিক বর্মন প্রযোজিত রাধারাণী পিকচার্সের "বালুচরী"র চিত্রগ্রহণ কাজ শেষ হয়ে গেছে। ছবিখানি এখন সম্পাদকের টেবিলে। ছবিখানি পরিচালনা করেছেন অজিত গাঙ্গুলী। কাহিনী : আশাপূর্ণা দেবী। সুর : রাজেন সরকার। ছবির প্রধান চরিত্রে আছেন : সাবিত্রী চট্টোপাধ্যায়, অনিল চট্টোপাধ্যায়, অনুপকুমার, পাহাড়ী সান্যাল, লিলি চক্রবর্তী, মলিনা দেবী, রেণুকা রায়, অজয় গাঙ্গুলী, জ্যোৎস্না বিশ্বাস, দীপিকা দাস, গঙ্গাপদ বসু, প্রসাদ মুখোপাধ্যায় জহর রায়, গীতা দে, প্রভৃতি। নর্মদা চিত্রের পরিবেশনায় ছবিখানি মুক্তি প্রতীক্ষায়।

মুক্তিপ্রতীক্ষায় "পদ্মাবতী জয়দেব"

সান-সাইন পিকচার্স প্রোডাকসন্স-এর সঙ্গীতবহুল ভক্তিমূলক বাংলা ছবি "পদ্মাবতী জয়দেব" মুক্তিপ্রতীক্ষায়। ছবির সংলাপ রচনা করেছেন দেবনারায়ণ [illegible]। পরিচালনা করেছেন চিত্তরঞ্জন [illegible] [illegible]

বলিষ্ঠ পরিচালক গোষ্ঠী। ছবিতে চৌদ্দখানি গান আছে। গানগুলি গেয়েছেন মান্না দে, ধনঞ্জয় ভট্টাচার্য, মানবেন্দ্র মুখোপাধ্যায়, তরুণ বন্দ্যোপাধ্যায়, আরতি মুখোপাধ্যায়, শিপ্রা বসু, মঞ্জুশ্রী ও গীতা দাস প্রমুখ শিল্পীরা। সংগীতপরিচালনা করেছেন বিজন পাল, গীতরচনা করেছেন : পুলক বন্দ্যোপাধ্যায়। ছবিখানি লাইফ পিকচার্স প্রাঃ লিঃ-এর পরিবেশনায় মুক্তিলাভ করবে।

দেব আনন্দের নতুন ছবি

দেব আনন্দ প্রযোজিত, পরিচালিত ও অভিনীত নতুন ছবিটির চিত্রগ্রহণ শুরু হয়েছে মেহেবুব স্টুডিওয়। ছবিটির নামকরণ হয়নি। নায়ক-নায়িকা চরিত্রে অভিনয় করছেন দেব আনন্দ ও ওয়াহিদা রেহমান। এই রঙিন ছবিটির সুরকার হলেন শচীনদেব বর্মন।

'বিশ্বাস' চিত্রের নায়িকা অপর্ণা সেন

কেওয়াল পি, কাশ্যপ পরিচালিত 'বিশ্বাস' চিত্রের নায়িকা চরিত্রে প্রথম হিন্দী ছবিতে অভিনয় করছেন বাংলাদেশের তরুণ নায়িকা অপর্ণা সেন। নায়ক চরিত্রে রূপদান করছেন জিতেন্দ্র। সম্প্রতি ছবিটির চিত্রগ্রহণ শুরু হয়েছে কমল স্টুডিওয়। কল্যাণজী-আনন্দজী সুরকৃত এ ছবির অন্যান্য চরিত্রে রয়েছেন ভারতভূষণ, পদ্মারাণী, গুলসন, মনমোহন, কৃষাণ দেওয়ান ও কামিনীকৌশল।

রাওয়াল ফিল্মসের 'আরজু'

সি, এল, রাওয়াল পরিচালিত রাওয়াল ফিল্মসের রঙিন ছবি 'আরজু'র চিত্রগ্রহণ শুরু হয়েছে মেহেবুব স্টুডিওয়। সম্প্রতি এ ছবির কাশ্মীর বহির্দৃশ্য গৃহীত হয়েছে। কাহিনীর প্রধান চরিত্রে অভিনয় করছেন নবাগত নায়ক-নায়িকা দীপককুমার ও ঊর্মি। পার্শ্বচরিত্রে রয়েছেন অশোককুমার, নিরুপা রায়, শশিকলা, ললিতা পাওয়ার, লীলা নাইডু ও মুকরী। সঙ্গীতপরিচালনা করছেন সোনিক-ওমি।

'এক শ্রীমান এক শ্রীমতী'

বাপ্পি সোনি পরিচালিত 'এক শ্রীমান এক শ্রীমতী' ছবিটির চিত্রগ্রহণ বর্তমানে সুসম্পন্ন হচ্ছে আর, কে, স্টুডিওয়। প্রধান চরিত্রাবলীতে অভিনয় করছেন শশি কাপুর, বাবিতা, রাজেন্দ্রনাথ, প্রেম চোপরা, ধুমল, লক্ষ্মীছায়া, মোহন চোটি ও ওমপ্রকাশ। কল্যাণজী-আনন্দজী সুরকৃত এ ছবিটির চিত্রগ্রহণ সমাপ্তপ্রায়।

পার্থপ্রতিম চৌধুরী পরিচালিত হংসমিথুন চিত্রে অপর্ণা দাশগুপ্ত ও শুভেন্দু চট্টোপাধ্যায়। ফটো : অমৃত

ইচ্ছাপূরণ

সম্প্রতি রবীন্দ্রভারতী প্রেক্ষাগৃহে নভার্ণ নার্সারী এ্যান্ড কে, জি, স্কুলের অধ্যক্ষা শ্রীমতী তৃপ্তি চট্টোপাধ্যায়ের পরিচালনায় অভিনীত হোল রবীন্দ্রনাথের ছোটগল্প অবলম্বনে 'ইচ্ছাপূরণ' নাটক। শিল্পীদের সাবলীল ও প্রাণবন্ত অভিনয়ে সমগ্র নাট্যাভিনয়টি সবার কাছেই মনোজ্ঞ হয়ে ওঠে। দীপঙ্কর ভট্টাচার্য ও চন্দনা চট্টোপাধ্যায় যথাক্রমে 'সুশীল' ও 'ইচ্ছাঠাকুরাণীর' ভূমিকায় দর্শকদের বিস্মিত করেছে। নাটকের অন্যান্য চরিত্রে অংশ গ্রহণ করেন তুহারকান্তি বৈদ্য, অশোক দত্ত, দেবব্রত ভট্টাচার্য উৎপল চৌধুরী, অমিতাভ ভট্টাচার্য, কুমারকৃষ্ণ পাঠক, উমাশঙ্কর দে, গৌতম ভট্টাচার্য, সৌরেন বৈদ্য, শঙ্কর ভট্টাচার্য, স্বপ্না মুখোপাধ্যায়, মিতা ভট্টাচার্য।

জনমৃত্যু

'পথিক' নাট্যসংস্থার শিল্পীবৃন্দ গত ১লা আগস্ট মিনার্ভা মঞ্চে অভিনয় করেন ইন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'জনমৃত্যু' নাটক। যুগজীবনের আবর্তনকে কেন্দ্র করে গড়ে উঠেছে এ নাটক এবং একই সঙ্গে তাল মিলিয়ে ভাষা পেয়েছে অগণিত জনতার জীবনধারা। রমেশ চট্টোপাধ্যায়ের নির্দে-

উমাপ্রসাদ মৈত্র পরিচালিত **রক্তরেখা** চিত্রে সবিতাব্রত দত্ত ও তপন।

শনাক্ত এই জীবননিষ্ঠ নাটকটির অভিনয় প্রায় সবারই দৃষ্টি আকর্ষণ করে। এই নাটকে যাঁরা অভিনয় প্রতিভার বৈশিষ্ট্য চিহ্নিত করতে পেরেছেন তাঁরা হোলেন গোপাল দে, মণি মানী, ইলাবন্ত ঘোষ, রবীন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, সুনীল সুর, কান্তিময় রায়চৌধুরী, পংকজ গাংগুলী, সনৎ বসু, শিবনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়।

তিনটি ছোট নাটক

রবীন্দ্র সরোবর মঞ্চে সম্প্রতি তিনটি ছোট নাটকের প্রাণোজ্জল ও সাবলীল অভিনয় অনুষ্ঠিত হোল। এই অনুষ্ঠানের আয়োজন করেন 'আগন্তুক শিল্পীগোষ্ঠী'। তিনটি নাটকের নাম হোল 'আয় খেলবি আয়', 'ইতি টুমটুমি' ও 'ব্যথার ব্যথা'। প্রথম নাটক দুটি লিখেছেন ইন্দ্রনাথ দাশ-গুপ্ত এবং তৃতীয় নাটক রচিত হয়েছে পরিমল গোস্বামীর একটি গল্পকে কেন্দ্র করে। এই তিনটি নাটকের অভিনয়, বলা যেতে পারে সফল হয়েছে, শিল্পীদের অভিনয়ে আন্তর নিষ্ঠা থাকার জন্য প্রযোজনা পরিচ্ছন্ন হয়েছে এ কথা বলতে হবে।

তিনটি নাটকই বিষয়বস্তু, আংগিকের দিক থেকে ভিন্ন স্বাদের পরিচয় বহন করেছে। একটি বৃদ্ধের লুডোখেলাকে কেন্দ্র করে গড়ে উঠেছে 'আয় খেলবি আয়' নাটক। সরস সংলাপে, আর উজ্জ্বল কয়েকটি পরিবেশ সৃষ্টির জন্য এ নাটকের সব ক'টি মুহূর্তেই দর্শক উপভোগ করেছেন। এক নববধূর মানসিক প্রতিক্রিয়াকে ভিত্তি করে রচিত হয়েছে 'ইতি টুমটুমি' নাটক। প্রথম বিবাহ বার্ষিকীর সুমধুর সন্ধ্যায় স্বামী বাড়ী ফিরতে দেরী করছেন, এরই জন্য নববধূর মনে প্রতিক্রিয়া। এই নাটকের সব ক'টি চরিত্রই মেয়ে। অতি স্বাভাবিক, বাস্তবভিত্তিক অভিনয় হয়েছে এই নাটকের। 'ব্যথার ব্যথা' নাটকের পটভূমিকা একটা মেসবাড়ী। এখানকার লোকদের মধ্যে গন্ডগোল বেধেছে দাঁত-তোলার ব্যাপার নিয়ে। কেউ বলছে দাঁত তোলা উচিত, কেউ বলছে না। বাধলো হাতাহাতি, মারামারি; ফল হোল শেষ পর্যন্ত সবাই দাঁতগুলো খোয়ালো। প্রচন্ড এ হাস্যরসের নাটকটিকে শিল্পীবৃন্দ অভিনয় দিয়ে উজ্জ্বল করে তোলেন। 'আগন্তুক শিল্পী-গোষ্ঠী'র এই নাট্য-প্রযোজনায় অনেক উজ্জ্বল সম্ভাবনা নিহিত রয়েছে।

কালপুরী

'প্রগতি পরিষদের' শিল্পীবৃন্দ আগামী ২৯শে সেপ্টেম্বর মিনার্ভায় অভিনয় করবেন পরেশ ধরের জনপ্রিয় নাটক 'কালপুরী'। কয়েকটি প্রধান চরিত্রে অভিনয় করবেন তারক ধর, শিবনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, শ্যামল দত্ত, বনানী ভট্টাচার্য, মায়া ঘোষ, সমীর দাস। নাটকটি পরিচালনা করবেন শিবনাথ ধর।।

চম্পাবতী বেদেনী

'মহুয়া' শিল্পীগোষ্ঠীর আগামী নাট্য-প্রযোজনা 'চম্পাবতী বেদেনী'। বাংলার লোককাহিনীর একটি বিশেষ অধ্যায়কে কেন্দ্র করে এর পটভূমিকা রচিত হয়েছে। 'মহুয়া'র শিল্পীবৃন্দ একেই নৃত্য-গীতি-নাট্যরূপে পরিবেশন করবেন আগামী ১০ই সেপ্টেম্বর সন্ধ্যায় অ্যাকাডেমি অফ ফাইন আর্টস মঞ্চে।।

বারো ঘন্টার পর

কিরণ মৈত্রের 'বারো ঘন্টা' নাটক নাট্যানুরাগীদের কাছে অতি পরিচিত। দৈনন্দিন জীবনের পরিপ্রেক্ষিতে লেখা এই নাটকের মধ্যে যে জীবনধর্মিতা ভাষা পেয়েছে তা' আকৃষ্ট করেছে সবাইকে। নাট্যকার এবার

অসীম বন্দ্যোপাধ্যায় পরিচালিত **বিবাহ বিভ্রাট** চিত্রে রবি ঘোষ ও অনুপকুমার।

এই নাটকের দ্বিতীয় পর্ব রচনা করেছেন, নাম হয়েছে 'আলো অন্ধকার পর'। 'অভ্যুদয়-গোষ্ঠীর' শক্তিশালী শিল্পীগোষ্ঠীর আগামী নাট্যপ্রযোজনা এটি। মধ্যবিত্ত জীবনের সুখ-দুঃখ, যন্ত্রণাকে কেন্দ্র করে এই নাটকের সংঘাত গড়ে উঠেছে। জীবন-নিষ্ঠ এই নাটকের নির্দেশনার দায়িত্ব নিয়েছেন নাট্যকার স্বয়ং। জানা গেছে আগামী মাস থেকে এ নাটকের নিয়মিত অভিনয় অনুষ্ঠিত হবে।।

এক অধ্যায়

সম্প্রতি 'ললিতায়নে'র শিল্পীবৃন্দ অমর গঙ্গোপাধ্যায়ের 'এক অধ্যায়' নাটক পরিবেশন করলেন সংস্কৃত সাহিত্য পরিষদ মঞ্চে। নাট্যপ্রযোজনা খুব একটা উচ্চমানের না হোলেও শিল্পীদের অভিনয় দর্শকদের মোটামুটি তৃপ্তি দিয়েছে। যাঁরা চরিত্রাভিনয়ে সার্থক শিল্পবোধের পরিচয় দিয়েছেন তাঁরা হোলেন শান্তি সাহা, অরুণ চট্টোপাধ্যায়, সোমনাথ ভট্টাচার্য, প্রিয়তোষ দাস, প্রশান্ত কাঞ্জিলাল। নাট্যনির্দেশনা আর সংগীত পরিচালনায় বৈশিষ্ট্যের নজীর রাখেন সলিল চট্টোপাধ্যায় ও অনিল দাস।

অংশীদার

'পিপলস্ থিয়েটার গ্রুপে'র শিল্পীবৃন্দ আগামী ২৫শে সেপ্টেম্বর সন্ধ্যায় 'কাশী বিশ্বনাথ মঞ্চে' অভিনয় করবেন গঙ্গাপদ বসুর মঞ্চসফল নাটক 'অংশীদার'। নাট্যনির্দেশনার দায়িত্ব নিয়েছেন শ্রীরমেশ চট্টোপাধ্যায়।

রূপান্তর

সম্প্রতি দুর্গাপুর কোক ওভেন কলোনীর শ্রমিক মঙ্গল কেন্দ্রে 'মৌসুমী' শিল্পীগোষ্ঠী রজত রায়চৌধুরীর 'রূপান্তর' নাটক সাফল্যের সঙ্গে অভিনয় করেন। নাট্যকার স্বয়ং নির্দেশনার দায়িত্ব পালন করেন; তাঁর প্রচেষ্টায় সূক্ষ্ম শিল্পবোধ স্পষ্ট হয়ে উঠেছে। শিল্পীদের অভিনয়ে কোথাও এতটুকু শৈথিল্য প্রকাশ না পাওয়ার জন্য নাটকের কৌতূহল শেষ পর্যন্ত অটুট থাকতে পেরেছে। অভিনয়ে যাঁরা সবচেয়ে বেশী দৃষ্টি আকর্ষণ করেন তাঁরা হোলেন কমলেশ ভড়, নরেশ মিত্র, হিমাদ্রি রায়, শুভেন্দু মুখার্জী, অমল ভট্টাচার্য, রজত রায়চৌধুরী। মঞ্চসজ্জায় পরিচ্ছন্ন রুচির ছাপ সমগ্র নাটকে একটা স্বাতন্ত্র্য এনেছে।

বরাহনগরে মুক্তাঙ্গন

বরাহনগরের বনহুগলী অঞ্চলে একটি মুক্তাঙ্গন স্থাপিত হয়েছে। নাম শ্রীনাথ অঙ্গন'। উদ্যোক্তা উত্তর শহরতলীর প্রখ্যাত নাট্যসংস্থা 'ইউরেকা'। প্রায় দুইশত আসন-বিশিষ্ট শ্রীনাথ অঙ্গনের উদ্বোধন হবে আগামী ১৭ই সেপ্টেম্বর, রবিবার সন্ধ্যা সাড়ে ছ'টায়।

উদ্বোধন-রজনীতে 'ইউরেকা' শিল্পী-গোষ্ঠীর প্রযোজনায় দুটি নাট্যাভিনয় মঞ্চস্থ হবে। অমর গঙ্গোপাধ্যায়ের 'জীবন যৌবন' ও বিধায়ক ভট্টাচার্যের 'বিশ বছর আগে'। নির্দেশনার দায়িত্বে আছেন পরি-চালক তরুণ ঘোষ। এই দুটি নাটকের বিভিন্ন চরিত্রের রূপকার অভিজিৎ চক্র-বর্তী, তরুণ ঘোষ, অজয় কোলে, কমল গঙ্গোপাধ্যায়, কমল কোলে, কল্যাণ চট্টো-পাধ্যায়, তড়িৎ বন্দ্যোপাধ্যায়, বিশ্ব-নাথ চক্রবর্তী, সোমনাথ চট্টোপাধ্যায় প্রমুখ শিল্পীবৃন্দ।
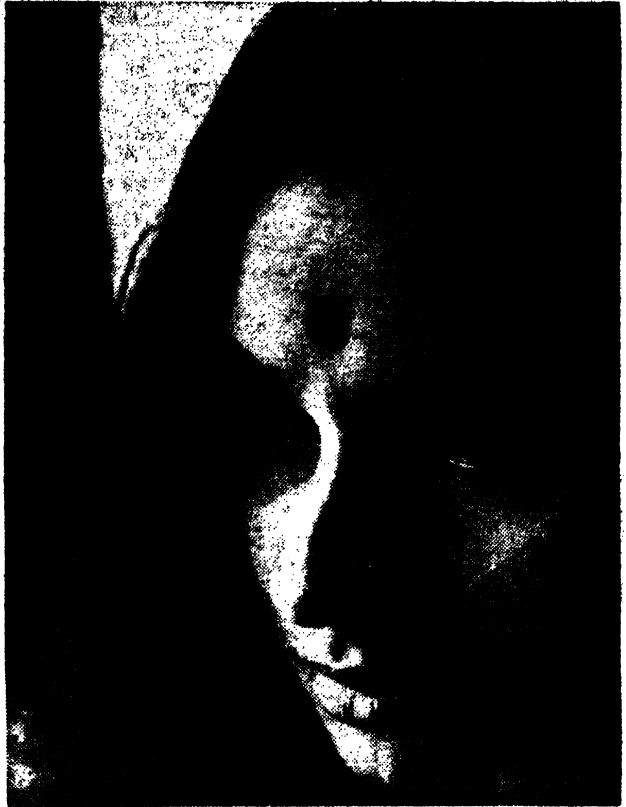
নাবিকগোষ্ঠী পরিচালিত দিবারাত্রির কাব্য চিত্রের নায়িকা মাধবী মুখোপাধ্যায়।
ফটো : অমৃত

শাস্তি

'নন্দক' নাট্যসংস্থা কয়েকটি সফল নাট্যপ্রযোজনার পর এবার অভিনয় করতে চলেছেন 'শাস্তি' নাটক। রবীন্দ্রনাথের এই সুপরিচিত গল্পের নাট্যরূপ দিয়েছেন সলিল সেন। পরিচালনার দায়িত্ব নিয়েছেন অবিনাশ দাস। নাটকটি এঁরা নিয়মিত অভিনয় করবেন বলে জানা গেছে।

শিখরকুমারী

'উত্তরণ' নাট্যগোষ্ঠীর শিল্পীবৃন্দ সম্প্রতি শ্যামাপ্রসাদ রঙ্গালয়ে 'শিখর-কুমারী' নাটক অভিনয় করেন। সামগ্রিক অভিনয়ে মোটামুটি সমবেত দর্শকমণ্ডলীকে মুগ্ধ করে। কয়েকটি প্রধান চরিত্রে উল্লেখযোগ্য অভিনয় করেন প্রণব সরকার, সুস্মিতা দে, রথীন সরকার, রবীন চট্টো-পাধ্যায়, দীপঙ্কর মৈত্র, চৈতালী রায়, অরবিন্দ দাস, সন্ধ্যা রায়, অসীম ঘোষ।।

বিবিধ সংবাদ

সুরসভার "শেষ বর্ষণ"

সম্প্রতি দক্ষিণ কলিকাতার সংস্কৃতি সংস্থা 'সুরসভা' কর্তৃক রবীন্দ্রনাথের "শেষ বর্ষণ" গীতালেখ্য পরিবেশিত হল। গীতা-লেখ্যাদি পরিচালনা করলেন রথীন চৌধুরী। সংগীতাংশে ছিলেন রমা ঘোষ, রঞ্জিতা বন্দ্যোপাধ্যায়, শ্রীপর্ণা ঘোষদস্তিদার, তনিমা মুখোপাধ্যায়, সাবিত্রী ভট্টাচার্য, জয়শ্রী দত্ত, দীপালি চৌধুরী, মৃণ্ময়ী মণ্ডল, গৌতম বসু ও তপন রায়চৌধুরী। সবশেষে গৌর বসাকের পরিচালনায় "ভজন-মঞ্জরী" পরি-

বেশিত হল। এতে অংশ নেন চন্দ্রা মুখোপাধ্যায়, কবিতা গুহঠাকুরতা আরতি বসাক, হাসি দত্ত, মধুছন্দা বসু, ইন্দ্রাণী চট্টোপাধ্যায় ও পুতুল বসাক। সঙ্গতে ছিলেন কিশোর নন্দী।

বাংলার বাইরে বাংলা নাটক

ডি ভি সি বোকারো ক্লাবের প্রযোজনায় জন্মাষ্টমী উপলক্ষে গত ২০শে আগস্ট সন্ধ্যায় বোকারোর "সৌখীন সাংস্কৃতিক সংস্থা"র সভ্যবৃন্দ বোকারো ক্লাবের স্থায়ী রঙ্গমঞ্চে নাট্যকার শ্রীরমেন লাহিড়ীর 'ঢেউ' নাটকটি মঞ্চস্থ করেন। অভিনয়ের দিক থেকে মাত্র কয়েকটি শিল্পী ব্যতীত (অন্যান্য শিল্পীর তুলনায়) কেউ সুনাম অনুযায়ী অভিনয়দক্ষতা প্রকাশে সমর্থ হননি। বিভিন্ন চরিত্রে ছিলেন : সর্বশ্রী বিবেকানন্দ দাশগুপ্ত (বুনো), গোপালচন্দ্র দে (রাধু), সুধীরকুমার রায় (শান্ত), উমেশ দত্ত (মিঃ চ্যাটার্জি), মানবেন্দ্র দাস (রসুল), সুশান্ত সেনগুপ্ত (ডঃ সেন), ভূপাল সিনহা (সুজিত), সুবিমল রায় (ক্যাপ্টেন), দিলীপ ব্যানার্জি (অমরবাবু) এবং বিমল দাশগুপ্ত (মিঃ কর)। নাটকের সেটটি খুব সুন্দর হয়েছিল। আলোক-সম্পাতও ভাল হয়েছে।

শিশু স্বর্গ

শিশু স্বর্গের নিয়মিত অনুষ্ঠান রবিবারে বসছে মহাজাতি সদনে সকাল ৯টায়। এদিন শুধু চলচ্চিত্র প্রদর্শন হবে।

আগামী ১৭ সেপ্টেম্বর এক বিশেষ অনুষ্ঠানে সোভিয়েত দেশের ছেলেমেয়েরা তাদের নাচ, গান দেখাবে, অপর ঐ দেশের সহযোগিতায় দেখান হবে একখানি শ্রেষ্ঠ চলচ্চিত্র 'চুক এ্যাণ্ড জেক'। ঐ অনুষ্ঠানে শিশু সংঘ (দর্জিপাড়া) এবং সপ্তর্ষিও তাদের সংঘের কিছু অনুষ্ঠান পরিবেশন করবেন।

ভারতীয় নৃত্যকলা মন্দির

২০শে আগস্ট—বাটানগর রিক্রিয়েশন ক্লাব হলে নৃত্যবিদ্ নীরেন্দ্রনাথ সেনগুপ্তের পরিচালনায় ভারতীয় নৃত্যকলা মন্দিরের বিভিন্ন শিক্ষাকেন্দ্রের ছাত্রীদের দ্বারা 'শ্যামা' নৃত্যনাট্য ও নৃত্য-বিচিত্রা মহাসমারোহে অনুষ্ঠিত হয়। আলো বাগচি (বজ্রসেন), উমা দত্ত (শ্যামা), সুতপা দত্ত (উত্তীয়), অনুপশঙ্কর (কোটাল) নন্দীতা চক্রবর্তী (বন্ধু), কৃষ্ণা রায় (অলারিপু-নটরাজ বন্দনা-ভারতনাট্যম), নীরেন্দ্রনাথ ও অরুণা দে (তারকাসুর বধ—কথাকলি) কৃষ্ণা ঘোষ (কথক), সুচরিতা ঘোষ, মানসী ঘোষ, রূপালী দাস, শুভ্রা গাঙ্গুলী মহুয়া ভৌমিক, মিতা হোপ (পাঞ্জাবী ভাংরা) দর্শকবৃন্দের প্রশংসা অর্জন করে। সহকারী নৃত্য পরিচালকরূপে ছিলেন অনুপশঙ্কর ও স্বপ্না সেনগুপ্তা। যন্ত্রসঙ্গীত পরিচালনা বিপুল ঘোষ, যন্ত্রসংগীতে অংশ গ্রহণ করেন অরবিন্দ মিত্র, ফেলু চন্দ, ভীম চন্দ প্রভৃতি।

পঞ্চমিত্রার প্রতিষ্ঠাবার্ষিকী

গত ১৫ আগস্ট রায়বাগান স্ট্রীটে পঞ্চমিত্রার প্রতিষ্ঠাবার্ষিকী মনোজ্ঞভাবে অনুষ্ঠিত হয়। শ্রীমতী আশাপূর্ণা দেবী অনুষ্ঠানে সভানেত্রীত্ব করেন। সভানেত্রীর ভাষণের পর পঞ্চমিত্রার সভ্য-সভ্যারা রবীন্দ্র-সঙ্গীত অবলম্বনে শ্রীউৎপলাকান্ত ভট্টাচার্য রচিত 'পূজা' গীতি-আলেখ্য পরিবেশন করেন। আলেখ্যটি গ্রন্থনা করেন শ্রীঅঞ্জলি ভট্টাচার্য, সঙ্গীত পরিচালনা করেন শ্রীমলয়া চক্রবর্তী এবং সঙ্গীতাংশে ছিলেন সর্বশ্রী মীরা রুদ্র, মণিমালা দাশগুপ্ত, রুমা ঘোষাল, শ্রীলেখা মিত্র, প্রিয়ব্রত মুখোপাধ্যায়, বারীন সরকার, দীপ্তিকুমার মিত্র, সলিলকুমার দত্ত, অনিল ভট্টাচার্য ও মলয়া চক্রবর্তী এবং যন্ত্র-সঙ্গীতে সহযোগিতা করেন সর্বশ্রী অসিতকুমার ঘোষাল, নৃপেন ঘোষ ও প্রসূন ভট্টাচার্য।

"পশ্চিমবঙ্গ যাদুকর সম্মেলন"

যাদুচক্রের উদ্যোগে প্রতি বছরের মতো এবারও পশ্চিমবঙ্গ যাদুকর সম্মেলনের আয়োজন করা হয়েছে। প্রদর্শনীতে সংগ্রহ সমস্ত টাকা বন্যা তহবিলে সাহায্য করা হবে বলে ঘোষণা করা হয়েছে। এই সম্মেলনে বিশেষ আকর্ষণ হবে ভারতের সর্বশ্রেষ্ঠ যাদুকর গ্রেট সুশীলের ইন্দ্রজাল। বর্তমানে তাঁর অসামান্য জনপ্রিয়তার দরুণ গ্রেট সুশীলের প্রদর্শনীর ব্যবস্থা করা হয়েছে। এ-ছাড়াও পশ্চিমবঙ্গের প্রসিদ্ধ যাদুকরগণও এই সম্মেলনে অংশ গ্রহণ করবেন।

'সব পেয়েছির আসর'-এর বর্ষামঙ্গল উৎসব

১৩ই আগস্ট রবিবার সকাল ৯টায় মহাজাতি সদনে সবপেয়েছির আসরের 'বর্ষামঙ্গল উৎসব' পূর্ণ প্রেক্ষাগৃহে সম্পন্ন হয়। প্রথমেই সাহিত্যিক শৈলজানন্দ মুখোপাধ্যায়ের সভাপতিত্বে আসরের অন্যতম বিশিষ্ট বন্ধু যাদুসম্রাট পি সি সরকারকে সম্বর্ধনা জ্ঞাপন করা হয়। আসর-পরিচালক স্বপনবুড়ো আসরের পক্ষ থেকে তাঁকে সাদর সম্ভাষণ জ্ঞাপন করেন। নব-মিতালি সব পেয়েছির আসর উদ্বোধন সংগীত করে এবং মিত্র আসর মাঙ্গলিক অনুষ্ঠান সম্পন্ন করে। বিপিন স্মৃতি সব পেয়েছির আসর ব্যাণ্ড ও বাঁশীতে দেশাত্মবোধক সংগীত পরিবেশন করে।

এর পর রবীন্দ্রনাথের সংগীত ও নৃত্য-সহযোগে 'বর্ষা-মঙ্গল' মঞ্চস্থ হয়। সংগীতে বীথি সেনগুপ্তা, গোপা সেনগুপ্তা, মঞ্জরী মিত্র, দীপা সেনগুপ্ত, নূপুর মজুমদার ও সুশীল সাহা এবং নৃত্যাংশে গায়ত্রী সেনগুপ্ত, দোলা রায়, পদ্মিরাণী খান্না, পার্বতী সিংহ, মঞ্জু দে ও রুমা মুখোপাধ্যায় অংশ গ্রহণ করে। এই পালায় অংশগ্রহণকারীদের সাজ-পোষাক সম্পর্কে অধিকতর যত্নবান হওয়া উচিত ছিল।

সবশেষে "সব পেয়েছির আসর"-এর বিজয়-বৈজয়ন্তী 'স্বপনবুড়ো' রচিত ও পরিচালিত নৃত্যনাট্য 'কানাই বলাই" সাফল্যমণ্ডিতভাবে মঞ্চস্থ হয়। নৃত্যে অংশ গ্রহণ করে—লিপিকা দাস, পাপা লাহা, দীপ্তি মুখোপাধ্যায়, শিল্পী দাস, স্বপ্না কুমার, মল্লিকা মিত্র, শাশ্বতী বসু, দীপা সেনগুপ্ত, তপা সেনগুপ্ত পিউ লাহা, পম্পা লাহা, মুক্তা মণ্ডল, শান্তশ্রী চৌধুরী বনশ্রী চৌধুরী ও উমা কিরণ। নূপুর মজুমদার কানাই বলাইয়ের গান শুনিয়ে সারা প্রেক্ষাগৃহের চিত্ত জয় করে নেয়। সমগ্র অনুষ্ঠানের নৃত্যপরিচালনা করেন সুশীল সাহা, আলোক নিয়ন্ত্রণ করেন—শিবনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়। এছাড়া কথক শৈলেন সরকার ও পাখ-পাখালীর ডাকে হরবোলা রথীন ভট্টাচার্য সুনাম অর্জন করেন।

সিনে সেণ্ট্রাল-এর সহযোগিতায় চলচ্চিত্র সংক্রান্ত আলোচনাসভা

১০ই সেপ্টেম্বর, সন্ধ্যা সাড়ে ৬টায় ক্যালকাটা ইনফর্মেশন সেণ্টারে সিনে সেণ্ট্রাল এর সহযোগিতায় ফেডারেশন অব ফিল্ম সোসাইটিজ অব ইণ্ডিয়ার 'চলচ্চিত্র পাঠ ও সংবাদ গোষ্ঠীর' উদ্যোগে 'চলচ্চিত্র ব্যবসায় ও চলচ্চিত্র সমিতি আন্দোলন" সম্পর্কে একটি আলোচনাসভা অনুষ্ঠিত হবে। এই অনুষ্ঠানে অংশ গ্রহণ করবেন সর্বশ্রী সত্যজিৎ রায়, মধু বসু, অজিত বসু, মৃণাল সেন, অসিত চৌধুরী, প্রভাত মুখোপাধ্যায়, বিমল দে ও প্রদীপ্ত সেন।

সুরেলা

উচ্চাঙ্গ-সঙ্গীত জগতে তরুণ শিল্পীদের যথাযথ সুযোগদানের প্রতিশ্রুতি নিয়ে প্রতিষ্ঠিত সুরেলা সাংস্কৃতিক সংঘের এবারের মাসিক অধিবেশনের অনুষ্ঠানসূচী সাজানো হয়েছিল তরুণ সেতারবাদক অর্ধেন্দুশেখর মুখোপাধ্যায় ও প্রতিভাময়ী কন্ঠশিল্পী শিপ্রা বোসের অনুষ্ঠান দিয়ে। সম্প্রতি বেঙ্গল থিওসফিক্যাল সোসাইটি হলে অনুষ্ঠিত এই সঙ্গীতাসরে সেতারে পুরিয়াকল্যাণ বাজিয়ে শোনান অর্ধেন্দুশেখর মুখোপাধ্যায়। শিল্পীর সুরেলা হাতে রাগের নিখুঁত রূপায়ণে আলাপের অংশটি সুন্দর। ঝাঁপতাল ও ত্রিতালে নিবন্ধ গতটি বিভিন্ন ছন্দ ও লয়কারীর কাজে সমৃদ্ধ। সহযোগিতায় রঞ্জিত বোস জবাব ও আড়ি ছন্দের সঙ্গতে বিশেষ পারদর্শিতার পরিচয় দেন। শিল্পী মিশ্র পিলুতে রচিত একটি চিত্তগ্রাহী ধুন বাজিয়ে অনুষ্ঠান শেষ করেন। কন্ঠ-সঙ্গীতের মেঘ রাগে খেয়াল পরিবেশন করেন শিপ্রা বোস। রাগ বিস্তারে শিল্পী নিজস্ব গায়কীর একটি উল্লেখযোগ্য বৈশিষ্ট্য শ্রোতাদের উপহার দেন। শিল্পীর পরিবেশিত তানকর্তব ও লয়কারীর কাজ রেওয়াজী কন্ঠের স্বাক্ষরে চিহ্নিত ছিল। এরপর ঠুমরী পরিবেশনায় শিল্পীর গায়ন-রীতি সমবেত শ্রোতাদের উচ্চ-প্রশংসায় অভিনন্দিত হয়। যোগীয়া রাগে একটি ভজন পরিবেশনান্তে শিল্পীর অনুষ্ঠান শেষ হয়। তবলা সহযোগিতায় শঙ্খ চট্টোপাধ্যায় ও সারেঙ্গীতে অংশ গ্রহণ করেন লক্ষ্ণন খাঁ। সমগ্র অনুষ্ঠানটির সার্থক পরিচালনায় ছিলেন রঞ্জিত মুখোপাধ্যায়।

সুরদাস সঙ্গীত সম্মেলন

কোলকাতায় সঙ্গীত মরশুমে অনুষ্ঠিত বিভিন্ন সঙ্গীত সম্মেলনগুলির তালিকায় বিশেষ উল্লেখযোগ্য সুরদাস সঙ্গীত সম্মেলন মিউজিক লাভার্সের উদ্যোগে শুরু হচ্ছে আগামী ২৯শে সেপ্টেম্বর ইন্দিরা প্রেক্ষাগৃহে। চারদিনের এই সঙ্গীতাসরের অনুষ্ঠানসূচী সাজানো হয়েছে ভারতের বিভিন্ন প্রান্ত থেকে গুণী শিল্পীদের আমন্ত্রণ জানিয়ে। এছাড়া স্থানীয় তরুণ

দি মাউস অন দি মুন চিত্রের দৃশ্য

এবং প্রবীণ শিল্পীরাও রয়েছেন শিল্পী-তালিকায়। উল্লেখযোগ্য শিল্পীদের মধ্যে কণ্ঠ-সংগীতে অংশগ্রহণ করবেন ভি এন পটবর্ধন, ভীমসেন যোশী, নারায়ণ রাও যোশী, সোহন সিং, বীরেন রায়, সলিল চট্টোপাধ্যায়, শিপ্রা বোস, আরতি বাগচী, আরতি পাল প্রভৃতি। যন্ত্র-সংগীতে আছেন আবদুল হালিম জাফর খান, আমজাদ আলী খান, জ্ঞানপ্রকাশ ঘোষ, শ্যাম গঙ্গোপাধ্যায় ও বাহাদুর খান। নৃত্যে অংশ গ্রহণ করবেন বন্দনা সেন, মালবশ্রী দাস ও ভরতনাট্যম নৃত্য-শিল্পী লিপিকা গুপ্ত। সঙ্গতের তালিকায়—শান্তাপ্রসাদ, কেরামত খান, শ্যামল বোস, শঙ্খ চ্যাটার্জি, অনিল ভট্টাচার্য, মানিক দাস ও সাগীরুদ্দিনের নাম বিশেষ ভাবে উল্লেখযোগ্য। চারদিনের অনুষ্ঠান-সূচীতে এক দিন বসবে সারারাত অধিবেশন এবং উদ্বোধনী দিবসে গুণী-সম্বর্ধনার আসরে বাংলার দু'জন প্রবীণ শিল্পীকে সম্বর্ধনা জ্ঞাপন করা হবে।

বিদেশী ছবি

দি মাউস অন দি মুন

নামটা শুনেই হাসতে হাসতে দম বন্ধ হবার জোগাড়। কারণ এযাবৎকাল যেসব গল্প অথবা সিনেমার সঙ্গে আমাদের পরিচয় হয়েছে তার মধ্যে অনেক আশ্চর্য জীব এবং আশ্চর্য লোক বা গ্রহজগতের বিবরণ থাকলেও বোধহয় ইঁদুর নিয়ে গল্প কেউ বিশেষ পড়েননি। অবশ্য সৌভাগ্যের বিষয় এটাও ইঁদুর সংক্রান্ত নয়—যদিও ছবিটি দেখতে দেখতে সত্যিই হাসতে হাসতে দম বন্ধ হয়ে আসবে তবু প্রথমেই বলে রাখি—এই ইঁদুর এমনি ইঁদুর নয় এবং একটা রকেট যার নাম ইঁদুর। গ্র্যান্ড ফেনওয়াইক দেশের রাণী ডাচেস গ্লোরিনা পড়েছেন মহা সমস্যায়—তাঁর দেশের একমাত্র রপ্তানী দ্রব্য সুরার ব্যবসা হয়েছে বিষম মন্দা এবং সুরা হয়ে উঠেছে প্রচণ্ড বিস্ফোরক পদার্থ। আবার তার ওপরে মড়ার ওপর খাঁড়ার ঘা মারার মতই—[illegible] ভেঙে গেছে। প্রধানমন্ত্রী, রাণী কেউই স্নানের সময় গরম জল পাচ্ছেন না। এখন উপায় কি? ডাক-পরামর্শদাতা। এবং উপযুক্ত পরামর্শও মিলল—কি আছে, ইউ, এস, ডলার লোন নাও। কিন্তু গরম জলের পাইপ সারানো বলে ত আর ডলার লোন চাওয়া যায় না। উপায় কি—পরামর্শদাতা বলল—'ঘাবড়াও মাৎ। উপায় আছে—ইউ এস-কে বল আমরা চাঁদে রকেট পাঠাব ঠিক করেছি। ব্যাস্ ওমনি আন্তর্জাতিক মহাকাশ গবেষণার নামে বেশ কিছু মোটা লোন পেয়ে যাবে।' যা ভাবা সেই কাজ—ওমনি এসে গেল রাশি রাশি ডলার লোন। এদিকে রাশিয়া পিছু হটবে কেন? রাশিয়া দিল একটা মান্ধাতা আমলের পুরোন রকেট।

সেই টাকায় বেশ চলছে [illegible] রাণীর [illegible] পাইপ মেরামতের কাজ এবং রাণী ঠিক করল ঐ বিস্ফোরক সুরাকেই জ্বালানী করে ছোড়া হবে ওদের রকেট কিন্তু মহাকাশচারী হবে কে—সে সমস্যার সমাধান হল। মন্ত্রীপুত্র ঠিক ঐ রকেটে চড়ে ঘুরে এসে তার বিটনিক প্রেমিকা সিন্থিয়াকে তাক লাগিয়ে দেবার জন্যে ঐ রকেটে যাত্রা করল। সঙ্গে গেল বৈজ্ঞানিক কোকমিঠ। এদিকে প্রথম চাঁদে মানুষ পাঠাবার উত্তেজনায় রাশিয়া আর আমেরিকা পাঠাল তাদের মহাকাশচারী যুগ্ম রকেট চাঁদের দিকে। গেল সবাই কিন্তু রাশিয়ার আর আমেরিকার রকেট ফিরে এলনা—এল একমাত্র ফেনওয়াইক রকেট—সমস্ত চন্দ্রযাত্রীদের নিয়ে চতুর্দিকে হৈহৈ কাণ্ড। ফেনওয়াইকের সুরার কাটতি বেড়ে গেল হুহু করে। রাণী, মন্ত্রী এঁদের গরমজলের পাইপও এদিকে ঠিক হয়ে গেছে আর সবশেষে ভিনসেণ্টের এর সঙ্গে মিলনে দর্শক পেলেন মধুরেণ সমাপয়েৎ। হাস্যরসে ঠাস বুনন এই প্রায় দেড়ঘণ্টার (৮৫ মিনিট) ছবি, দর্শকমাত্রকেই হাসির ফোয়ারায় মাতিয়ে রাখবে এবং হাসির মধ্যেও এই বিজ্ঞানসুবাসিত সিনেমার ব্যঙ্গবস্তুটিও সত্যিই উপভোগ্য। এই অপূর্ব সকল হাস্যরসে রঙা রঙীন ছবিটির বিভিন্ন চরিত্রে রূপদান করেছেন মার্গারেট রাদারফোর্ড, বার্নাড ক্রিবিয়স, রবি ম্যাকমিলান প্রমুখেরা এবং পরিচালনা করেছেন বিখ্যাত রিচার্ড লেস্টার। সায়ান্স ফিকশান সিনে ক্লাবের উদ্যোগে আগামী ১০ সেপ্টেম্বর রবিবার সকালে প্রাচী সিনেমায় প্রদর্শিত হবে এই মহাকাশ কমেডী ফিল্ম 'দি মাউস অন দি মুন'।

দৃশ্যের অন্তরালে

জ্যাক কার্ডিফ

সে দৃশ্য আমি কোনদিন ভুলবো না—মারলিন ডিয়েট্রিচ বাথ টাব থেকে নামতে গিয়ে সাবানজলে পা পিছলে ধড়াস করে পড়ে গেলেন। স্নানের দৃশ্যের ছবি তোলা হচ্ছিল। মারলিন রাজরানীর মত সেজে ঢুকলেন। ঝক্‌ঝকে সাদা রঙের স্নানের পোষাক পরেছেন। লম্বা সিগারেট হোল্ডার হাতে। দুটো ঝি এক গাদা তোয়ালে নিয়ে চলেছে পেছন পেছন। সকলের চোখের সামনে স্নান করতে হবে বলে যে সংকোচ বোধ করছেন তা মোটেই নয়।

সেটের সবাই স্নানের দৃশ্যে কাজ করেছেন আগে। কাজেই তাঁদের কারোরই বিশেষ কোন আগ্রহ বা কৌতূহল ছিল না এ দৃশ্য সম্বন্ধে। তাছাড়া স্নানের ছবি তুলবার সময় অভিনেত্রীরা স্নানের পোষাক পরে বাথ টাবে নামেন। পরন্তু সাবানের ফেনা দিয়ে স্নানের জলও ঢেকে দেওয়া হয়। ফলে মাথা আর কাঁধ ছাড়া আর কিছুই দেখা যায় না। অতএব এসব দৃশ্যে উত্তেজিত হবার মতো কিছু থাকেও না।

আঙুলের ডগা দিয়ে জলটা একবার দেখে নিলেন মারলিন, লম্বা টান দিলেন সিগারেটে আর তারপর খুবই সহজ স্বাভাবিক ভঙ্গিতে স্নানের পোষাকটি খুলে ফেলে মহা আনন্দে ডুবে গেলেন জলের মধ্যে। খালি তাঁর সুন্দর গলা আর মাথা জেগে রইল জলের ওপরে। কিন্তু পোষাক খোলার পর থেকে জলে নামা পর্যন্ত সম্পূর্ণ বিবস্ত্র ছিলেন তিনি!

সেটের কেউই এর জন্যে প্রস্তুত ছিল না। মারলিনের সহজ স্বাভাবিকতাই প্রতারণা করেছিল আমাদের। আমরা ভাবতেই পারিনি এরকম একটা কাণ্ড ঘটতে পারে।

নিঃশব্দে প্রথম দৃশ্যের ছবি তোলা শেষ করলাম আমরা। পর পর অনেকগুলো স্নানের দৃশ্য তোলা হবে। অতএব এক দৃশ্যের ছবি তোলা শেষ হয়ে অন্য দৃশ্যের জন্যে তৈরি হওয়া পর্যন্ত সময়টা মারলিনের বাথ টাবে বসে থাকবার কোন প্রয়োজন নেই। সুতরাং পরিচালক তাঁকে বাথ টাব থেকে নেমে গিয়ে বিশ্রাম করতে বললেন।

আমরা নিশ্বাস বন্ধ করে অপেক্ষা করছি কখন মারলিন নামবেন বাথ টাব থেকে। মারলিন উঠে দাঁড়ালেন কিন্তু দাঁড়ালে কি হবে, মুহূর্তের মধ্যে ঝি দুটো এসে তোয়ালে দিয়ে ঢেকে ফেলল তাঁকে। যারা সেই অসামান্য দৃশ্য দেখবার আশায় হাঁ করে বসেছিল তারা খুব হতাশ হল।

স্নানের আরো কয়েকটা দৃশ্য বাকি তখনো। ছবি তুলে চলেছি। হঠাৎ মনে হল চারদিকে লোকের সংখ্যা যেন ক্রমশঃ বেড়ে যাচ্ছে। টেকনিসিয়ানদের সংখ্যাও যেন অনেক বেশি।

মারলিন ডিয়েট্রিচ

ওপরে ইলেকট্রিসিয়ানদের জায়গায় জন তিন চারেকের বেশি লোক থাকবার কথা নয়, অথচ প্রায় দুশো লোক বসে আছে বলে মনে হল। বাথ টাবের কাছে দুটো ল্যাম্প ছিল। শক্ত ল্যাম্প স্ট্যাণ্ডের ওপর থেকে পড়ে যাবে এমন মনে হবার কোনই কারণ নেই। অথচ কয়েকজন ইলেকট্রিসিয়ান দেখি ধরে আছে ল্যাম্প দুটো—যদি পড়ে যায়! মুখচোখ দেখলে মনে হবে অত্যন্ত গভীর একাগ্রতা নিয়ে কাজ করছে তারা!

পর পর কয়েকটি দৃশ্যের ছবি তোলা হল। এক একটি দৃশ্যের কাজ শেষ হয় আর মারলিন লাফিয়ে নেমে পড়েন বাথ টাব থেকে এবং ঠিক সেই মুহূর্তেই ঝিদুলো এসে তোয়ালে দিয়ে ঢেকে ফেলে তাঁকে। তাদের দক্ষতাও আশ্চর্যরকম বেড়ে চলেছে ক্রমশ। মারলিন যতবারই নামছেন বাথ টাব থেকে ততবারই সাবানজল পড়ছে মেঝের ওপর।

অবশেষে সব ক'টা স্নানের দৃশ্য তোলা হয়ে গেল।

মারলিন ডাকলেন তাঁর ঝিদের। পরম আত্মবিশ্বাস নিয়ে এগিয়ে এল তারা। মারলিন লাফিয়ে নামতে গেলেন বাথ টাব থেকে। কিন্তু হঠাৎ সাবানজলে পা পিছলে পড়ে গেলেন মেঝের ওপর। তোয়ালেগুলো ছিটকে গেল এদিক ওদিকে। প্রায় সেকেণ্ড পাঁচেক ধরে পৃথিবীর সবচেয়ে নামকরা সুন্দরী মারলিন ডিয়েট্রিচ বিবস্ত্র অবস্থায় মেঝের পড়ে গড়াগড়ি খেতে লাগলেন। সেই পাঁচ সেকেণ্ডকে প্রায় পাঁচ মিনিট মনে হল আমাদের।

অবশেষে উঠে দাঁড়াতে চেষ্টা করলেন মারলিন আর তখন তাঁর শরীরের [illegible] সৌন্দর্য সম্পূর্ণভাবে ধরা দিল [illegible] সকলের চোখে।

[illegible] এ অবস্থায়—[illegible]

সুন্দরী [illegible] হয়ে [illegible] [illegible] পায়ের [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] কিন্তু পারছেন না?

আমাদের মধ্যে কেউ কেউ বকিয়ের মতো। এগিয়ে গিয়েও মাঝপথে থেমে গেল আবার। অবশেষে [illegible] এসে [illegible] [illegible] মারলিনকে।

তোয়ালে জড়িয়ে তাঁর সাজঘরে চলে গেলেন মারলিন। যেন কিছুই হয়নি এমন একটা ভাব মুখেচোখে। মারলিন চলে যেতে একটা হৃদয়বিদারী দীর্ঘশ্বাস পড়ল টেকনিসিয়ানদের বুক থেকে।

এই দুর্ঘটনায় বোধহয় সবচেয়ে বেশি বিচলিত হয়েছিলাম আমিই। কারণ এর খানিকটা দায়িত্ব আমারও। আগেকার একটি দৃশ্যের ছবি তুলবার সময় মারলিনকে আমি বলেছিলাম যে, [illegible] ভেতর দিয়ে তাঁর [illegible] দেখা যাচ্ছে। ফলে সেগুলো খুলে ফেলেছিলেন তিনি।

পরে মারলিন আমাকে বলেছিলেন যে, নগ্নতাকে তিনি অসভ্যতা বলে মনে করেন না। বরঞ্চ ঝালরদেওয়া অন্তর্বাসকে কুৎসিত, কুশ্রী বলে মনে হয় তাঁর। মানবদেহকে কোন-মতেই কশ্রী বলা যায় না।

অত্যন্ত মার্জিতরুচি বয়স্কা বুদ্ধিমতী মহিলার কথা এটা। সাধারণ মেয়েদের

কিন্তু মারলিন মেঝে থেকে উঠে যখন সাজ-ঘরের দিকে যাচ্ছিলেন তখন সেদিকে অসীম বিস্ময়ে তাকিয়েছিল সেটের সবচেয়ে অল্প-বয়সী টেকনিসিয়ান ছোকরাটি। মারলিনের এসব মতামত তার চোখের বিস্ময়কে মুছে দিতে পারেনি।

ঠিক এইরকম আর একটা ঘটনা ঘটেছিল আমি যখন নেহাৎ-ই বালক। সামান্য চাকরি করি একটা ফিল্ম কোম্পানীতে, যে ছবিটা তোলা হচ্ছে তখন সে ছবিতে নির্বাক যুগের অপূর্বসুন্দরী অভিনেত্রী লিয়া দ্য পুত্তি অভিনয় করছেন।

লিয়া বরাবরই দেরী করে আসত সেটে। সেদিনও দেরী হচ্ছে তার আর ছবির পরি-চালক দশ মিনিট পরে পরেই লিয়া এলো কিনা দেখবার জন্যে তার সাজঘরে পাঠাচ্ছেন আমাকে। কিন্তু প্রতিবারই নিরাশ হয়ে ফিরে আসছি আমি।

শেষবার ঘুরে আসবার পাঁচ মিনিট যেতে না যেতেই পরিচালক আবার পাঠালেন আমাকে। আমি ধরেই নিয়েছিলাম লিয়া আসে নি তখনো। সুতরাং সোজা গিয়ে হাট করে খুলে ফেললাম তার সাজঘরের দরজা। খুলেই চক্ষুস্থির আমার! একটু আগেই এসে পৌঁছেছে লিয়া এবং পোষাক পাল্টাচ্ছে তখন। আর ঠিক সেই মুহূর্তে শরীরের সর্বশেষ আবরণটি মাথার ওপর দিয়ে টেনে খুলছে সে। সুতরাং তখন শুধুমাত্র মুখটুকুই ঢাকা রয়েছে তার।

আমি কাঠ হয়ে দাঁড়িয়ে রইলাম এক মুহূর্ত। তারপরেই লিয়ার চাপা গলা কানে এলো, কে? আমি যে ছুটে!

[illegible] [illegible] জানতে পারেনি কে তার [illegible] [illegible] খুলেছিল। কিন্তু আমি তার দিকে তাকাতে লজ্জায় লাল হয়ে যেতাম আমি।

এ প্রসঙ্গে অ্যানিটা এগবার্গ-এর কথা মনে পড়ছে। দেহসৌষ্ঠবে অ্যানিটার সঙ্গে পাল্লা দিতে পারেন এমন কেউ নেই। জেন ম্যান্সফিল্ড, সোফিয়া লোরেন, জোলো-ব্রিজিডা—কেউ না।

যেবার 'ওয়ার এ্যাণ্ড পিস'-এর ছবি তুলছি। অ্যানিটা সেটে এলো। দৃশ্যটা এখনো ভাসছে আমার চোখের ওপর। সাদা সিফনের পোষাক পরা, চুলে নীল ফিতে। একটা ছোট কুকুর সঙ্গে। পোষাকের গলাটা রীতিমত বড়ো, বেশ বেশিরকমই বড়ো!

আমরা তখন যুদ্ধবন্দীদের গুলী করে মারার ভয়ঙ্কর দৃশ্য তুলছি একটা। কিন্তু অ্যানিটা ঢুকবার সঙ্গে সঙ্গে সেটের সব কাজ বন্ধ হয়ে গেল—এতো তাড়াতাড়ি এমন করে কাজ বন্ধ হয়ে যেতে আগে কখনো দেখিনি আমি।

নারীদেহের সৌন্দর্যকে সম্মান দিতে ইটালিয়ানদের জুড়ি নেই। টেকনিসিয়ানরা প্রথম মিনিট দুয়েক চুপ করে ছিল; শিস শোনা গেল একটা এবং পরে মুহূর্তেই আর কোন টেকনিসিয়ান নেই সেটে। থাম বেয়ে ওপরে উঠে পড়েছে সব। কেননা ওপর থেকে অ্যানিটার বিশাল বক্ষযুগল আরো পরিচ্ছন্ন-ভাবে দৃষ্টিগোচর হবে।

ছবিটির পরিচালক ছিলেন কিং ভিডর। তাঁর মত গম্ভীরপ্রকৃতির পরিচালক আমি আর দ্বিতীয় দেখিনি। অ্যানিটার অভিনয় পরিচালনা করবার সময় সেই কিং ভিডর-এর চোখেও এক অস্বাভাবিক আলো ফুটে উঠতে দেখেছি আমি।

এক সময় ফোটোগ্রাফারদের মডেল ছিল অ্যানিটা। এখনো মডেলিং করে সে এবং এখনো ছবি তোলার জন্য 'পোজ' করতে তার দক্ষতা অশেষ।

অ্যানিটার সংস্পর্শে এলে বিচলিত না হয়ে উপায় নেই। একবার অ্যানিটার সঙ্গে একই বাড়িতে ছিলাম আমি আর আমার স্ত্রী। আমরা ওপরের তলার ফ্ল্যাটে থাকতাম। অ্যানিটা থাকত নিচের তলার ফ্ল্যাটে। প্রায়-ই একই লিফটে নিচে নামতাম আমরা দুজন। খুবেই ছোট ছিল লিফটা। একদিন নামছি, নিচের তলা থেকে অ্যানিটাও এসে উঠল লিফটে, আর তারপরেই হঠাৎ ইলেকট্রিসিটি বন্ধ হয়ে গেল। রোমে প্রায়ই ঘটে এরকম।

লিফট অন্ধকার হয়ে গেল। প্রায় মিনিট দুয়েক আমি আর অ্যানিটা বন্দী হয়ে রই-লাম সেই অচল অন্ধকার লিফটে। তারপর আবার ইলেকট্রিসিটি এলো এবং লিফট চলতে শুরু করল।

অ্যানিটার সঙ্গে অন্ধকারে বন্দী হয়ে থাকবার পক্ষে দুমিনিট রীতিমতো দীর্ঘ সময়। তাছাড়া লিফটাও অত্যন্ত ছোট; আরো কিছুক্ষণ দেরী হলে আমার নৈতিক চরিত্রের দশা যে কি হত তা ঈশ্বরই জানেন!

× × ×

চিত্রজগতে ম্যাসনদের মতো এমন বিচিত্র চরিত্রের মানুষ আমি আর দেখিনি। জেমস্ ম্যাসন, তাঁর স্ত্রী পামেলা এবং তাঁদের কন্যা পোর্টল্যান্ড।

'প্যাণ্ডোরা এ্যাণ্ড দি ফ্লাইং ডাচম্যানের' ছবি তুলতে গিয়ে স্পেনের এক হোটেলে জেমস্ ম্যাসনের সঙ্গে আলাপ হয়েছিল আমার। পোর্টল্যান্ডের বয়স তখন মাত্র সেও বছর। কিন্তু হলে কি হবে, কারো কথা শুনবার পাত্রী নয় পোর্টল্যান্ড, নিজের যা খুশি তাই করে বেড়ায়। রাত দুটোর আগে ঘুমোয় না এবং বেলা বারোটার আগে ঘুম থেকে ওঠে না সাধারণত।

প্রথম যখন পোর্টল্যাণ্ডকে দেখলাম আমি তখন রাত প্রায় বারোটা বাজে। রেস্টুরেন্টের টেবিলের চারপাশে ঘুরে ঘুরে ভুক্তাবশেষ কাঁক খেয়ে বেড়াচ্ছে পোর্টল্যাণ্ড। কিছু হুইস্কি আর জিন পড়েছিল কয়েকটা গ্লাসে —তাও খেয়ে ফেলেছে সে। ম্যাসনরা খুবই উদারপ্রকৃতির মানুষ, কিন্তু এটা যেন তাদের কাছেও একটু বাড়াবাড়ি বলে মনে হল। সুতরাং পোর্টল্যাণ্ডের হুইস্কি খাবার রাস্তা বন্ধ করে দিলেন তারা।

পোর্টল্যান্ড এখন কিশোরী হয়েছে। আমেরিকান টিভিতে অভিনয় করে। কিশোরী হলেও তার ব্যবহার কিন্তু পুরো-পুরি বয়স্কাদের মতো। কারণ, ছেলেবেলা থেকে সেই শিক্ষাই পেয়েছে সে। সন্তান মানুষ করার এ পদ্ধতি অবশ্যই নতুন, চমক-প্রদও বটে। ম্যাসনদের এই পরীক্ষা সার্থক হয়েছে কিনা আমি জানি না, তবে তাঁরা যে তাঁদের মেয়েকে গতানুগতিক পদ্ধতিতে মানুষ করছেন তা জানি।

কিন্তু ম্যাসনরা বোধহয় গতানুগতিক হতেই পারে না। বিখ্যাত ক্যামেরাম্যান রয় কেলিনোর সঙ্গে বিয়ে হয়েছিল পামেলার। রয় কেলিনো যখন খ্যাতির চূড়ায় আমি তখন কিছুকাল তাঁর সহকারী হিসেবে কাজ করে-ছিলাম। তাঁর সঙ্গে পামেলার বিবাহবিচ্ছেদ হয়ে গেলে জেমস ম্যাসনকে বিয়ে করলেন পামেলা। কিন্তু রয় কেলিনোর সঙ্গে পামে-লার সম্পর্ক ছিন্ন হল না, তাঁরা পরস্পরের বন্ধু হয়ে রইলেন। এমনকি জেমস্ ম্যাসন পর্যন্ত বন্ধু হয়ে গেলেন তাঁর।

আমরা যখন প্যাণ্ডোরার ছবি তুলছি তখন একদিন রয় কেলিনো এসে হাজির হলেন সেখানে। একটা ছবির কাজ সম্বন্ধে ম্যাসনদের সঙ্গে আলোচনা করতে এসেছেন। তাঁরা তিনজনই আগ্রহী সে কাজে।

রয় কেলিনো সপ্তাহ কয়েক থেকে গেলেন ম্যাসনদের সঙ্গে। সর্বক্ষণ একই সঙ্গে থাকতেন তাঁরা তিনজন। ম্যাসনরা সাধারণতঃ একটু নির্লিপ্তপ্রকৃতির মানুষ, কারো সঙ্গে বেশি কথা পর্যন্ত বলতেন না। কিন্তু রয় কেলিনোর সঙ্গে দিনের পর দিন ঘণ্টার পর ঘণ্টা ধরে বকর বকর করে যেতে লাগলেন। আর সেই সময় পোর্টল্যান্ড ভুক্তা-বশিষ্ট কঁকর সন্ধানে এক টেবিল থেকে অন্য টেবিলে ঘুরে বেড়াতে লাগল।

নীহারকান্তি স্মৃতি ফুটবল প্রতিযোগিতার ফাইনালে যোগদানকারী খেলোয়াড়বৃন্দসহ বিশিষ্ট ব্যক্তিগণ

দর্শক

বিশ্ব ব্যাডমিন্টন প্রতিযোগিতা

আন্তর্জাতিক ব্যাডমিন্টন ফেডারেশনের সিদ্ধান্তে মালয়েশিয়া ১৯৬৭ সালের বিশ্ব ব্যাডমিন্টন প্রতিযোগিতার পুরস্কার 'টমাস কাপ' লাভ করেছে। এখানে উল্লেখ্য, গত ১০ই জুন জাকার্তার দর্শকদের প্রচণ্ড বিক্ষোভে মালয়েশিয়া বনাম ইন্দোনেশিয়ার ১৯৬৭ সালের চ্যালেঞ্জ রাউন্ডের খেলাটি ডাবলস খেলার মাঝপথে রেফারীর নির্দেশে বন্ধ হয়ে যায়। এই সময় মালয়েশিয়া ৪—৩ খেলায় অগ্রগামী ছিল, বাকি ছিল একটি পুরো ডাবলসের খেলা এবং এক'ট ডাবলসের আংশিক খেলা। ইন্টারন্যাশনাল ব্যাডমিন্টন ফেডারেশন এই দুই দলের চ্যালেঞ্জ রাউন্ডের অসমাপ্ত খেলা নিউজিল্যান্ডে স্থানান্তরণের যে নির্দেশ দিয়েছিলেন, ইন্দোনেশিয়া তা প্রত্যাখ্যান করায় শেষপর্যন্ত মালয়েশিয়াকে বিজয়ী ঘোষণার সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়।

ইংল্যান্ডে ভারতীয় স্কুল ক্রিকেট দল

লিঙ্কনশায়ারে আয়োজিত লিঙ্কনশায়ার কাউন্টি ক্রিকেট ক্লাবের (কোল্টস) বিপক্ষে ভারতীয় স্কুল ক্রিকেট দলের একদিনের খেলাটি ড্র যায়। ভারতীয় স্কুল ক্রিকেট দল প্রথম ইনিংসের ২৬৫ রানের (৪ উইকেটে) মাথায় খেলার সমাপ্তি ঘোষণা করে। লক্ষণ সিং ২১০ মিনিটে তাঁর ১৫৮ রান (বাউন্ডারী ১৮) করেন। ইংল্যান্ড সফরে তাঁর এই পঞ্চম সেঞ্চুরী এবং অপরদিকে পাঁচ ইনিংসের খেলায় তৃতীয় সেঞ্চুরী। রাজা মুখার্জি (৬৫ রান) এবং লক্ষণ সিং প্রথম উইকেটের জুটিতে দলের যে ২১৮ রান সংগ্রহ করেন, তাই শেষপর্যন্ত সফরে প্রথম উইকেটের জুটির সর্বাধিক রানের রেকর্ডে পরিণত হয়। খেলার ১৩৫ মিনিট সময় হাতে পেয়ে লিঙ্কনশায়ার দল ৬ উইকেট খুইয়ে ১০৪ রান তুলেছিল। দীপঙ্কর সরকার ২৩ রানে ৩টে উইকেট পান।

ভারতীয় স্কুল বনাম মিডলসেক্স স্কুল দলের দু'দিনের খেলা ড্র যায়। ভারতীয় স্কুল দল প্রথম ইনিংসে ১৮৮ এবং দ্বিতীয় ইনিংসে ১৬৬ রান করে। অপরদিকে মিডলসেক্স স্কুল দলের প্রথম ইনিংসে ১৪২ রান এবং অসমাপ্ত দ্বিতীয় ইনিংসে ১০১ রান (৯ উইকেটে) উঠেছিল। দীপঙ্কর সরকার ৫৫ রানে ১১টি উইকেট (২৯ রানে ৬ ও ২৬ রানে ৫) নিয়ে বোলিংয়ে বিশেষ কৃতিত্বের পরিচয় দেয়।

ভারতীয় স্কুল ক্রিকেট দলের ১৯৬৭ সালের ইংল্যান্ড সফরের ফলাফল : খেলা ১৮, জয় ৯, ড্র ৮ এবং একটি খেলা পরিত্যক্ত। বিশেষ উল্লেখ্য, ভারতীয় স্কুল দল প্রতিটি খেলায় প্রথম ইনিংসে বিপক্ষ দলের প্রথম ইনিংসের থেকে বেশী রান করেছে। সফরে সর্বাধিক মোট রান লক্ষণ সিংয়ের—৯৭৪ (ইনিংস ১৭, নট আউট ৩ এবং গড় ৬৯·৬)। তারপরই রাজা মুখার্জির ৬১০ রান (গড় ৩৫·৭)। উল্লেখযোগ্য। বাংলার আর এক প্রতিনিধি দীপঙ্কর সরকার বোলিংয়ে বিশেষ কৃতিত্বের পরিচয় দিয়েছে—১৩টি খেলায় ৬৬টি উইকেট। সফরে সেঞ্চুরী করেছে লক্ষণ সিং ৫টি, রাজা মুখার্জি ২টি, সুরিন্দর অমরনাথ ২টি এবং কিরমানি ১টি।

নীহারকান্তি শীল্ড ফাইনাল

উত্তর কলকাতার দেশবন্ধু পার্কে অনুষ্ঠিত নীহারকান্তি শীল্ড ফুটবল প্রতিযোগিতার ফাইনালে দমদম অঞ্চলের চ্যাম্পিয়ান বাগুইয়াটি পল্লী সংঘ দল ২—০ গোলে কলকাতা অঞ্চলের চ্যাম্পিয়ান উল্টাডাঙ্গা নবীন সংঘ দলকে পরাজিত করে। এ ভট্টাচার্য বিজয়ী দলের পক্ষে দুটি গোলই দেন। প্রবীণ ক্রিকেট খেলোয়াড় শ্রীকমল ভট্টাচার্যের সভাপতিত্বে পুরস্কার বিতরণ করা হয়।

বাগুইয়াটি পল্লী সংঘ : সি সাহা; এস রায়, এস দত্ত, এস বসু, আর সামন্ত, এন পাল, এম কাঞ্জিলাল, এ ভট্টাচার্য ও জি রায়চৌধুরী।

উল্টাডাঙ্গা নবীন সংঘ : এস ব্যানার্জি; এ সরকার, এ চক্রবর্তী, ডি চৌধুরী, ডি ভট্টাচার্য, বি বসু, ডি চ্যাটার্জি, পি চক্রবর্তী ও এস পাল।

ইংল্যান্ড বনাম পাকিস্তান

তৃতীয় টেস্ট ক্রিকেট

পাকিস্তান : ২১৬ রান (মুস্তাক মহম্মদ ৬৬ রান। আরনল্ড ৫৮ রানে ৫, হিগস ৬১ রানে ৩ এবং টিটমাস ২১ রানে ২ উইকেট)

ও ২৫৫ রান (আসিফ ইকবাল ১৪৬ এবং ইন্তিখাব ৫১ রান। হিগস ৫৮ রানে ৫, টিটমাস ৬৪ রানে ২ এবং আন্ডারউড ৪৮ রানে ২ উইকেট)

ইংল্যান্ড : ৪৪০ রান (কেন ব্যারিংটন ১৪২, টম গ্রেভনী ৭৭, ফ্রেড টিটমাস ৬৫ এবং জিওফ আরনল্ড ৫৯ রান। আসিফ ৬৬ রানে ৩ এবং মুস্তাক ৮০ রানে ৪ উইকেট)

ও ৩৪ রান (২ উইকেটে)

প্রথম দিন (আগস্ট ২৪) :

পাকিস্তান প্রথম ইনিংসের ৯টা উইকেট খুইয়ে ২১৪ রান সংগ্রহ করে।

দ্বিতীয় দিন (আগস্ট ২৫) :

পাকিস্তানের প্রথম ইনিংস ২১৬ রানের মাথায় শেষ হয় এবং ইংল্যান্ড প্রথম ইনিংসের ৩ উইকেট খুইয়ে ২৫৭ রান সংগ্রহ করে ৪১ রানে অগ্রগামী হয়। তাদের হাতে জমা থাকে ৭টা উইকেট। [illegible]

ব্যারিংটন ১২৯ রান করে অপরাজিত থাকেন।

তৃতীয় দিন (আগস্ট ২৬) ঃ

ইংল্যাণ্ডের প্রথম ইনিংস ৪৪০ রানের মাথায় শেষ হলে খেলার বাকি সময়ে পাকিস্তান দ্বিতীয় ইনিংসের ৪টে উইকেট খুইয়ে ২৬ রান সংগ্রহ করেছিল।

চতুর্থ দিন (আগস্ট ২৮) ঃ

পাকিস্তানের দ্বিতীয় ইনিংস ২৫৫ রানের মাথায় শেষ হয়। জয়লাভের প্রয়োজনীয় ৩২ রান তুলতে ইংল্যান্ড দ্বিতীয় ইনিংস খেলতে নামে এবং দুটো উইকেট খুইয়ে ৩৪ রান তুলে ৮ উইকেটে জয়ী হয়।

ওভালে আয়োজিত তৃতীয় অর্থাৎ শেষ টেস্ট খেলায় ইংল্যান্ড ৮ উইকেটে পাকিস্তানকে পরাজিত করে পাকিস্তানের বিপক্ষে ১৯৬৭ সালের টেস্ট সিরিজে ২—০ খেলায় (ড্র ১) 'রাবার' জয়ের গৌরব লাভ করেছে। এই দুই দেশের বিগত চারটি টেস্ট সিরিজের ফলাফল দাঁড়িয়েছে ঃ ইংল্যাণ্ডের 'রাবার' জয় ৩ এবং ড্র ১। এবং এই চারটি টেস্ট সিরিজের ১৫টি খেলার ফলাফল ঃ ইংল্যাণ্ডের জয় ৮, পাকিস্তানের জয় ১ এবং ড্র ৬।

এক বছরেরও কম সময়ে ব্রায়ান ক্লোজের নেতৃত্বে ইংল্যান্ড উপর্যুপরি ৭টি টেস্ট ম্যাচ খেলেছে। তার ফলাফল ঃ ইংল্যাণ্ডের জয় ৬ (১৯৬৬ সালে ওয়েস্ট ইণ্ডিজের বিপক্ষে ৫ম টেস্ট, ১৯৬৭ সালে

ভারতবর্ষের বিপক্ষে ৩টি এবং পাকিস্তানের বিপক্ষে ২টি) এবং ড্র ১ (পাকিস্তানের বিপক্ষে)। ব্রায়ান ক্লোজের নেতৃত্বে 'রাবার' জয়ী হয়েছে ২বার (১৯৬৭ সালে ভারতবর্ষ এবং পাকিস্তানের বিপক্ষে)।

পাকিস্তানের বিপক্ষে আলোচ্য তৃতীয় টেস্ট খেলায় ইংল্যান্ডের অধিনায়ক ব্রায়ান ক্লোজ টসে জয়ী হয়েও প্রথম ব্যাট করার দান পাকিস্তানকে ছেড়ে দেন। প্রথম দিনে পাকিস্তানের প্রথম ইনিংসের ৯টা উইকেট পড়ে ২১৪ রান উঠেছিল। মুস্তাক মহম্মদ ২০০ মিনিট খেলে দলের সর্বোচ্চ ৬৬ রান করেছিলেন।

দ্বিতীয় দিনে ২১৬ রানের মাথায় পাকিস্তানের প্রথম ইনিংসের খেলা শেষ হলে ইংল্যান্ড প্রথম ইনিংসের ৩ উইকেট খুইয়ে ২৫৭ রান সংগ্রহ করেছিল। ইংল্যান্ডের প্রথম ইনিংসের গোড়াপত্তন খুবই আশা হয়েছিল—৩৫ রানের মাথায় ২য় উইকেট পড়ে যায়। শেষ পর্যন্ত তৃতীয় উইকেটের জুটি কেন ব্যারিংটন এবং টম গ্রেভনী পরিত্রাতার ভূমিকা নিয়ে দলকে বিপদ থেকে উদ্ধার করেন। লাঞ্চের সময় ইংল্যান্ডের রান দাঁড়ায় ৫৬ (২ উইকেটে) এবং চা-পানের সময় ১৬৬ (২ উইকেটে)। তৃতীয় উইকেটের জুটি ব্যারিংটন এবং গ্রেভনী ৫৭ মিনিটের খেলায় দলের ৫০ এবং ৯৮ মিনিটে দলের ১০০ রান তুলেছিলেন। তাঁরা এই তৃতীয় উইকেটের জুটিতে দলের অতি মূল্যবান ১৪১ রান তুলে দলের বাকি খেলোয়াড়দের যথেষ্ট প্রেরণা জুগিয়েছিলেন। টম গ্রেভনী ৭৭ রান সংগ্রহের সূত্রে তাঁর টেস্ট খেলোয়াড়-জীবনে ৪০০০ রান পূর্ণ করার গৌরবলাভ করেছেন।

তৃতীয় দিনে চা-পানের পর ৪৪০ রানের মাথায় ইংল্যান্ডের প্রথম ইনিংস শেষ হলে তারা ২২৪ রানে অগ্রগামী হয়। লাঞ্চের সময় ইংল্যান্ডের রান ছিল ৩১১ (৬ উইকেটে) এবং চা-পানের সময় ৪১৭ (৮ উইকেটে)। খেলার এক সময়ে ইংল্যান্ডের মন্থর গতিতে ব্যাট করার বিরুদ্ধে মৃদু বিক্ষোভ ধ্বনি উঠেছিল। শেষ পর্যন্ত ইংল্যান্ডের দুই বোলার ফ্রেড টিটমাস এবং জিওফ আরনল্ড খেলার গতি দ্রুত করে দর্শকদের আনন্দ দেন। ফ্রেড টিটমাস তাঁর ৫০ রান পূর্ণ করলে (৬৫ রানের মধ্যে) ১৯৬৭ সালের ইংলিস ক্রিকেট মরসুমে সর্বপ্রথম 'ডাবল' সম্মান (১০০০ রান এবং ১০০ উইকেট) লাভ করেন। আরনল্ড ১১৩ মিনিটে তাঁর ৫৯ রান (ছক্কা ২ এবং বাউণ্ডারী ৬) তুলেছিলেন। কেন ব্যারিংটন ১৪২ রান তুলে আউট হন —ওভালে তাঁর এই প্রথম টেস্ট সেঞ্চুরী এবং টেস্ট খেলোয়াড়-জীবনে উনবিংশ সেঞ্চুরী। ওভালে এই টেস্ট সেঞ্চুরী (১৪২ রান) করার সূত্রে ইংল্যান্ডের ৬টি টেস্ট মাঠেই তিনি সেঞ্চুরী করার এক দুর্লভ গৌরব লাভ করেছেন। পাকিস্তানের বিপক্ষে ১৯৬৭ সালের টেস্ট সিরিজের তিনটি টেস্টেই তিনি সেঞ্চুরী করেছেন—লর্ডসে ১৪৮ রান, ট্রেন্ট ব্রিজে নট আউট ১০৯ রান এবং ওভালে ১৪২ রান।

তৃতীয় দিনে খেলার বাকি সময়ে পাকিস্তান দ্বিতীয় ইনিংসের চারটে উইকেট খুইয়ে মাত্র ২৬ রান সংগ্রহ করেছিল। হিগস মাত্র ৩ ওভার বলে কোন রান তুলতে না দিয়ে তিনটে উইকেট পেয়েছিলেন।

খেলার চতুর্থ দিনে দ্বিতীয় ইনিংসের ২৬ রান এবং ৬টা উইকেট হাতে পাকিস্তান খেলতে নেমে দারুণ বিপর্যয়ের মধ্যে পড়ে যায়—৬৫ রানের মাথায় ৮ম উইকেটের পতন। ফলে পাকিস্তান ইনিংস পরাজয়ের সম্মুখীন হয়। কিন্তু ৯ম উইকেটের জুটি আসিফ ইকবাল এবং ইনতিখাব দৃঢ়তার সঙ্গে খেলে দলকে ইনিংস পরাজয় থেকে রক্ষা করেন এবং সেই সঙ্গে ৯ম উইকেটের জুটিতে ১৯০ রান সংগ্রহ করে সরকারী টেস্ট ক্রিকেট খেলায় ৯ম উইকেট জুটির নতুন বিশ্ব রেকর্ড রান সংগ্রহ করেন। ৯ম উইকেট জুটির পূর্বের বিশ্ব রেকর্ড ছিল কলিন কাউড্রে এবং এ্যালান স্মিথের ১৬৩ রান (বিপক্ষে নিউজিল্যান্ড, ওয়েলিংটন, ১৯৬৩)। লাঞ্চের সময় পাকিস্তানের রান ছিল ১২১ (৮ উইকেটে)—ইনিংস পরাজয় থেকে অব্যাহতি পেতে তখনও ১০৩ রানের প্রয়োজন ছিল। আসিফ ঘড়ির কাঁটার সঙ্গে পাল্লা দিয়ে রান তুলেছিলেন—৫৮ মিনিটে ৫৬ রান এবং ১৩৯ মিনিটে ১০০ রান (ছক্কা ২ এবং বাউণ্ডারী ১৬)। তাঁর টেস্ট খেলোয়াড়-জীবনে এই প্রথম সেঞ্চুরী। ২৫৫ রানের মাথায় পাকিস্তানের দ্বিতীয় ইনিংস শেষ হলে জয়লাভের প্রয়োজনীয় ৩২ রান তুলতে ইংল্যান্ডকে ২টো উইকেট হারাতে হয়—শেষ পর্যন্ত তারা ৩৪ রান তুলে ৮ উইকেটে জয়ী হয়।

আমেরিকান টেনিস প্রতিযোগিতা

ব্রুকলিনে আয়োজিত ৮৭তম আমেরিকান জাতীয় লন টেনিস প্রতিযোগিতার পুরুষ বিভাগে অস্ট্রেলিয়া এবং মহিলা বিভাগে আমেরিকার খেলোয়াড়রা খেতাব জয়ী হয়েছেন।

অস্ট্রেলিয়ার জন নিউকম্ব (২৩) এবং টনি রোচ (২২) ১৯৬৫ সালে উইম্বলেডন ডাবলস এবং ১৯৬৭ সালে অস্ট্রেলিয়ান এবং ফ্রেঞ্চ ডাবলস খেতাব জয়ী হন। গত দু' বছর তাঁরা আমেরিকান ডাবলসের ফাইনালে রানার্স-আপ হয়েছিলেন।

প্রতিযোগিতার বাকি বিভাগের খেলা ফরেস্ট হিলসে শুরু হয়েছে।

ফাইনাল খেলা

পুরুষদের ডাবলস : ১নং বাছাই জন নিউকম্ব এবং টনি রোচ (অস্ট্রেলিয়া) ৬—৮, ৯—৭, ৬—৩ ও ৬—৩ গেমে বিল বাউরে এবং ওয়েন ডেভিডসনকে (অস্ট্রেলিয়া) পরাজিত করেন।

মহিলাদের ডাবলস : এ-বছরের উইম্বলেডন চ্যাম্পিয়ান বিলি জিন কিং এবং রোজমারী ক্যাসালস (আমেরিকা) ৪—৬, ৬—৩ ও ৬—৪ গেমে মেরী এ্যান ইজেল এবং ডোনা ফ্লয়েড-ফেলস্‌কে (আমেরিকা) পরাজিত করেন।

দূরপাল্লার সন্তরণ প্রতিযোগিতা

মুর্শিদাবাদ সুইমিং এসোসিয়েশনের পরিচালনায় ভাগীরথীবক্ষে আয়োজিত দূরপাল্লার সন্তরণ প্রতিযোগিতার ৭২ কিলোমিটারে পক প্রণালী চ্যাম্পিয়ান বৈদ্যনাথ নাথ এবং ১৯ কিলোমিটারে কালীকিংকর মণ্ডল প্রথম স্থান লাভ করেছেন। জঙ্গীপুর থেকে ৭২ কিলোমিটার এবং জিয়াগঞ্জ সদরঘাট থেকে ১৯ কিলোমিটার সন্তরণ প্রতিযোগিতা শুরু হলেও উভয় প্রতিযোগিতারই গন্তব্যস্থল ছিল গোরাবাজার ঘাট। ৭২ কিলোমিটার সাঁতারে ১৬ জন সাঁতারু যোগদান করেন কিন্তু দূরত্ব অতিক্রম করেছিলেন ১১ জন।

৭২ কিলোমিটার : ১ম বৈদ্যনাথ নাথ (ক্যালকাটা স্পোর্টস এসোঃ) — সময় ৯ ঘণ্টা ২১ মিনিট; ২য় রঞ্জিৎ তালুকদার (ক্যালকাটা স্পোর্টস এসোঃ) — সময় ৯ ঘণ্টা ৪০ মিনিট; ৩য় নীলমণি মল্লিক (হুগলী জেলা স্পোর্টস) — সময় ৯ ঘণ্টা ৪৫ মিনিট।

১৯ কিলোমিটার : ১ম কালীকিংকর মণ্ডল (ক্যালকাটা স্পোর্টস এসোঃ) — সময় ২ ঘণ্টা ১৫ মিনিট; ২য় হরিরঞ্জন ধর (আগরতলা, ত্রিপুরা); ৩য় বিমল দাশগুপ্ত (ইণ্ডিয়ান লাইফ সেভিং সোসাইটি, কলকাতা)।

অতল জলের আহ্বানে

শঙ্করবিজয় মিত্র

বীরসিংহের বীর সন্তান বিদ্যাসাগরকে ঘিরে সাঁতারের যে কাহিনীটি চিরস্মরণীয় হয়ে রয়েছে বর্ষার রাতে দুর্জয় দামোদরের বুকে পাড়ি জমানোর সেই কাহিনীটি আজ সর্বাগ্রে মনে পড়ে। দুর্বার সাহস ও দুর্দমনীয় সঙ্কল্প নিয়ে ঈশ্বরচন্দ্র বাঙালীর মুখ উজ্জ্বল করেছিলেন। আজকের তরুণদেরও তাঁরই মত সঙ্কল্প নিয়ে এগিয়ে আসতে হবে জীবনের বিভিন্ন ক্ষেত্রে বাঙালীর সম্মান সুপ্রতিষ্ঠিত করবার জন্যে। ক্রীড়াক্ষেত্রে বাঙালীকে স্থান করে নিতে হবে সমগ্র ভারতের পুরোভাগে। শুধু তাই নয়, তাকে নব নব পন্থা আবিষ্কার করে সমগ্র বিশ্বের দরবারে ভারতের আসন প্রতিষ্ঠিত করতেও সচেষ্ট হতে হবে।

সাঁতারে নদীমাতৃক বাংলার ছেলেরা এই পথের সন্ধান দিতে পারে। বাংলাদেশে তার ভিত পত্তনও হয়েছে প্রায় চুয়াল্লিশ বছর আগে। সে সাঁতার স্বল্পপাল্লার নয়—সে সাঁতার দূরপাল্লার। দৌড়ে ম্যারাথনের যদি গৌরব থাকে তাহলে দূরপাল্লা সাঁতারের গৌরব তার চেয়ে কম হতে পারে না।

ক্রীড়া তো কেবল প্রমোদ বা প্রতিযোগিতার প্রস্তুতি নয়। জীবনের বৃহত্তর ক্ষেত্রে বিপদ ও বিপর্যয়ের মাঝে মানুষ যাতে নিজেকে অবিচল রেখে এগিয়ে যেতে পারে খেলাধুলা তারই প্রস্তুতি। দূরপাল্লার সাঁতার সেদিক থেকে সর্বশ্রেষ্ঠ উপায়। জলের প্রতি মানুষের একটা সহজ আকর্ষণও যেমন আছে, তার বিপদের কথা ভেবে আত্মরক্ষার তাগিদও আছে তেমনি। তাই সাঁতার কোনসময়েই জনজীবনে উপেক্ষিত হয়নি। বরং যুগে যুগে তার আদর বেড়েই চলেছে এবং চলবেও। ব্যায়াম হিসেবে সাঁতারের শ্রেষ্ঠত্ব অবিসম্বাদী, দেহের সর্ব অবয়বের সুষ্ঠু গঠনের কাজে সাঁতারের তুলনা নেই। আবার এর কলাকৌশল জানা থাকলে অনেক সময় অনেক মূল্যবান জীবনরক্ষার কাজেও লাগে। এইভাবেই সাঁতারের জনপ্রিয়তা যুগে যুগে বেড়েই চলেছে।

আধুনিক জগতে সাঁতারের জনপ্রিয়তা বৃদ্ধির অন্যতম কারণ ওলিম্পিক ক্রীড়া প্রতিযোগিতায় তার অন্তর্ভুক্তি। ওলিম্পিকের জয়মাল্য কণ্ঠে ধারণের জন্য দেশে দেশে আজ সাজ সাজ রব এবং সাঁতারের সাধনায় বিজ্ঞানসম্মত উপায়ে স্ট্রোক দেবার কৌশল আবিষ্কার করে জলের বুকে গতিকে দ্রুত থেকে দ্রুততর করে তোলা হচ্ছে। সাঁতারের জন্য বিজ্ঞানসম্মত পন্থায় সুইমিং পুল তৈরী হচ্ছে, তার জলের তাপ ঠিক ঠিক করে দেওয়া হচ্ছে। এইভাবে বিজ্ঞানের সাহায্যে সাঁতার যেন অতি সহজ ও বিপদের ঝুঁকি থেকে মুক্ত হয়ে উঠেছে। ফলে এর দুঃসাহসিকতায় আকর্ষণ উঠে যেতে বসেছে। তাছাড়া স্বল্প পাল্লার সাঁতারে আমেরিকা, অস্ট্রেলিয়া, জাপান প্রভৃতি দেশ যেসব রেকর্ডের নজীর রাখছে ভারতের সাঁতারুদের কাছে তা কল্পনার অতীত। একজন্য সাঁতারুদের ত্রুটিকে দায়ী করা চলে না। যে সুযোগ ও সুবিধা পৃথিবীর বিভিন্ন রাষ্ট্র তাদের ক্রীড়াবিদদের জন্য তৈরী করে দেয় আমাদের দেশের রাষ্ট্রনায়করা তার দিকে এতটুকু আগ্রহ দেখান না। তা সত্ত্বেও সাঁতারের ক্লাবগুলি পুকুরে সাঁতার শেখার ব্যবস্থা করে বহু সাঁতারু তৈরী করেছে এবং বিভিন্ন প্রতিযোগিতার আয়োজন করে তাদের উৎসাহ বৃদ্ধি করেছে। তবে ঐ পর্যন্ত। কারণ এইসব সাঁতারের মান ওলিম্পিক মানের পর্যায়ে উঠতে এখনও অনেক দেরী, কোনদিন সে মানে উঠতে পারবে বলে খুব বেশি ভরসাও করা যায় না। কারণ রকেটের যুগে রকেটের মতই তার স্পীড বেড়ে চলেছে।

ভারতে স্বল্পপাল্লার সাঁতারের পরিবর্তে তাই দূরপাল্লার সাঁতারের উৎকর্ষ বৃদ্ধির দিকে নজর দেওয়ার কথা আগেই বলেছি। দূরপাল্লা বলতে যা বুঝি পুষ্করিণীর সাঁতারের চেয়ে গঙ্গায় সাঁতারের শ্যামায় ও কৃতিত্ব দুই-ই বেশি। দূরপাল্লার প্রতিযোগীরা যখন নদীর জলে ঝাঁপিয়ে পড়ে তখন একটা দুঃসাহসিক অভিযানের মতই তা মনে হয়।

বাংলার যুবসমাজে যে যুগে দুঃসাহসিকতার জোয়ার এসেছিল সেই যুগেই প্রবর্তিত হয়েছিল দূরপাল্লার সাঁতার। চলেছিল খড়দা থেকে আহিরীটোলা—তের মাইল সাঁতার। ইণ্ডিয়ান লাইফ সেভিং সোসাইটি শুরু করেছিল চন্দননগর থেকে আহিরীটোলা পর্যন্ত বাইশ মাইলের প্রতিযোগিতা, দুর্গাচরণ ব্যানার্জি প্রবর্তন করেছিলেন চুঁচুড়া থেকে কুমারটুলি ঘাট

৭২ কিলোমিটার সাঁতারে প্রথম—বৈদ্যনাথ নাথ
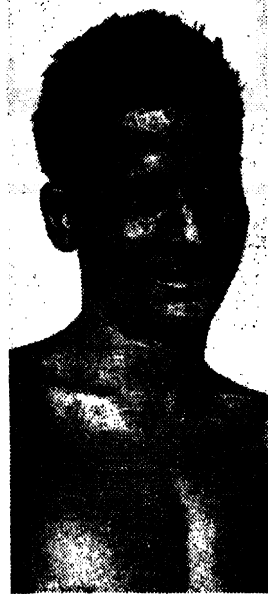
১৯ কিলোমিটার সাঁতারে প্রথম—কালীকিঙ্কর মণ্ডল

রবিবার বহরমপুরে আয়োজিত ৭২ কিলোমিটার সন্তরণ প্রতিযোগিতায় বৈদ্যনাথ নাথ (বামে) ন' ঘণ্টা কুড়ি মিনিট সাতাশ সেকেণ্ডে এই দীর্ঘ পথ অতিক্রম করে তাঁর গত বছরের রেকর্ড (৯ ঘঃ ২৯ মিনিট) ভেঙে গুঁড়িয়ে নতুন রেকর্ডের সৃষ্টি করেছেন স্টেট ট্রান্সপোর্টের ১৯৬২, ১৯৬৪ ও ১৯৬৫ সালে বিজেতা দেবী দত্ত এবং পক প্রণালী সাঁতারের দ্বিতীয় স্থানাধিকারী লক্ষ্মীনারায়ণ ভৌমিকও (বি এন আর) এবারকার এই প্রতিযোগিতায় নেমেছিলেন, তাঁরা যথাক্রমে পনের এবং এগার মাইল প্রতিদ্বন্দ্বিতা করার পর শারীরিক অসুস্থতার জন্য শেষ পর্যন্ত প্রতিযোগিতায় ক্ষান্ত হন।

১৯ কিলোমিটার সাঁতারের বিজেতা কালীকিঙ্কর মণ্ডল (ইস্টার্ণ রেলওয়ে, ডাইনে) দু'ঘন্টা ১৪ মিঃ ২০ সেকেণ্ডে নির্দিষ্ট পথ অতিক্রম করে তাঁর গেল বছরের রেকর্ডকে পেছনে ফেললেও তিনি লক্ষ্মীনারায়ণ ভৌমিকের ১৯৬৪ সালের রেকর্ড (২ ঘঃ ১১ মিঃ) ম্লান করতে পারেননি।

১৯ কিলোমিটার সাঁতারে দ্বিতীয় স্থান অধিকারী রতিরঞ্জন ধর এবং তাঁর ভগ্নী কুমারী রত্নারাণী ধর (বয়স ১৪)। কুমারী ধর প্রতিযোগিতায় ১ম স্থান লাভ করেন।

তেইশ মাইলের প্রতিযোগিতা, হ্যবি ব্যানার্জি হুগলী ব্রীজ থেকে আহিরীটোলা ত্রিশ মাইল প্রতিযোগিতার পত্তন করেছিলেন।

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময় গঙ্গাবক্ষে এইসব সাঁতার বন্ধ হয়ে যায়। যুদ্ধান্তে আনন্দ স্পোর্টিং শুরু করলো বালী ব্রীজ থেকে বেনেটোলার ঘাট পর্যন্ত সাড়ে চার মাইলের প্রতিযোগিতা। পরে সেই সাঁতার ব্যারাকপুর গান্ধীঘাট থেকে বেনেটোলা ঘাট পর্যন্ত—দশ মাইল প্রতিযোগিতা হয়। কংগ্রেস সেবাদল বালিব্রীজ থেকে আহিরী-টোলা ঘাট পর্যন্ত পাঁচ মাইলের প্রতিযোগিতা আরম্ভ করে। কিন্তু সে সমস্তও একে একে বন্ধ হয়ে যায়।

এখন দূরপাল্লার সাঁতার চোখের সামনে দেখতে পাচ্ছি এইগুলি—চিত্তরঞ্জন এ্যাথ-লেটিক ক্লাব আয়োজিত পানিহাটি থেকে শ্রীরামপুর—সাড়ে তিন মাইল। এই প্রতি-যোগিতার ক্রমশঃ শ্রীবৃদ্ধি হচ্ছে। এই প্রতি-ষ্ঠানই হুগলী থেকে শ্রীরামপুর তের মাইলের প্রতিযোগিতার ব্যবস্থা করে। গত বছর এরাই ত্রিবেণী ঘাট থেকে শ্রীরামপুর—বাইশ মাইলের প্রতিযোগিতার অনুষ্ঠান করে। এই অনুষ্ঠানটিকে পক প্রণালী সন্তরণ প্রতিযোগিতার ট্রায়াল বলে গণ্য করা হয়েছিল।

এরপর রয়েছে মুর্শিদাবাদ সন্তরণ সংস্থা। এই সংস্থাটি দৃঢ় পদক্ষেপে এগিয়ে চলেছে। জিয়াগঞ্জ থেকে মুর্শিদাবাদ এই চার মাইলের প্রতিযোগিতা দিয়ে প্রতিষ্ঠানটি যাত্রারম্ভ করে। তারপর এরা উনিশ কিলো-মিটার (১১'৪০ মাইল) চালু করে এবং এখনও তা চালু রয়েছে। এছাড়া প্রতি-ষ্ঠানটি ১৯৬০ সাল থেকে প্রবর্তন করে বাহাত্তর কিলোমিটার (৪৪'৭৪ মাইল) প্রতি-যোগিতা—জঙ্গীপুর থেকে বহরমপুর পর্যন্ত। এই প্রতিযোগিতাটি বিশ্বের দীর্ঘতম সন্তরণ প্রতিযোগিতার দাবীদার। কাগজপত্রে পৃথিবীর অন্যান্য দেশের দীর্ঘ সন্তরণ প্রতিযোগিতার যা নজীর মেলে তাতে মুর্শিদাবাদ সন্তরণ সংস্থার এই দাবী অবিসম্বাদী বলা চলে।

পুকুর এবং গঙ্গায় সাঁতারের প্রতি-যোগিতা পর্যালোচনা করলে দেখা যাবে পুকুরের সাঁতারু প্রফুল্ল ঘোষ, দ্বারকানাথ মুলজী, লীলা চ্যাটার্জি, বিমলচন্দ্র, লীলা ভড়, দেবী দত্ত, গীতা দে ও মোহিত দে গঙ্গায় এবং গঙ্গার লোনা সাঁতারু রাধাবল্লভ সাধুখাঁ, নলিন মালিক, রাজারাম সাহু, আরতি সাহা, শচীন নাগ, বেনীমাধব তালুকদার, লক্ষ্মীনারায়ণ ভৌমিক, কালী-কিঙ্কর মণ্ডল ও নিমাই দাস পুকুরের সাঁতারে বিশেষ উৎকর্ষের পরিচয় দেন।

এঁদের মধ্যে প্রফুল্ল ঘোষ, মোহিত দে দ্বারকানাথ মুলজীর তের মাইল সাঁতা ভূমিকা বিশেষভাবে উল্লেখের অপে রাখে।

গঙ্গায় যাঁরা সাঁতার কেটেছেন তাঁ মধ্যে আশু দত্ত, জ্ঞান চ্যাটার্জি, প্রফুল্ল ে রাধাবল্লভ সাধুখাঁ, নলিন মালিক, রাজা সাহু, দুর্গা দাস, মদন সিংহ, শচীন ন আরতি সাহা, বেনীমাধব তালুকদার, লক্ষ্ম নারায়ণ ভৌমিক, কালীকিঙ্কর মণ্ডল, নি দাস, লীলা চ্যাটার্জি, লীলা ভড়, বাণী ে গীতা দে ও দেবী দত্তকে কেউ বিস্ম হবেন না।

দূরপাল্লা সাঁতারে আজ মুখ্য ভূমি নিয়েছে মুর্শিদাবাদ জেলার সন্তরণ সংস্থ গত ২৭শে আগষ্ট এই সংস্থা আয়োি বাহাত্তর কিলোমিটার সন্তরণ প্রতিযোগি বৈদ্যনাথ নাথ (ক্যালকাটা স্পোর্টস এ সিয়েশন) ন' ঘণ্টা কুড়ি মিনিট সা সেকেন্ডে একটানে এই পথ অতিক্রম ক নতুন রেকর্ড করেছেন। গত বছর সাঁতারে তাঁরই নিজের রেকর্ড ছিল ন' ঘ উনত্রিশ মিনিট। দূরপাল্লার সাঁতারে বৈদ্য নাথের শ্রেষ্ঠত্ব আজ সুপ্রতিষ্ঠিত। শ গঙ্গায় বাইশ মাইল বা মুর্শিদাবা বাহাত্তর কিলোমিটার নয়, ভয়াবহ ও বিপ সংকুল পক প্রণালী অতিক্রমেও তিনি রেক করেছেন। বৈদ্যনাথ নাথ ও লক্ষ্মীনার ভৌমিক দুর্জয় সাহস নিয়ে ন্যূনতম স পক প্রণালীর এক প্রান্ত থেকে অপর প্রা যেভাবে পৌঁছেছেন তাঁদের সেই অভিযা কথা ইতিহাসে লিপিবদ্ধ হয়ে থাকবে। য যুগে নরনারী শ্রদ্ধানত চিত্তে তাঁদের স্মরণ করবে, যেমন করে ইংলিশ চ্যানে সফল প্রয়াসী সাঁতারু মিহির সেন, বিমল চন্দ্র, আরতি সাহা, নীতিন রায় ও জা পাক সাঁতারু ব্রজেন দাসকে।

বিশ্বের বিভিন্ন দেশ ক্রীড়া প্র যোগিতার বিভিন্ন ক্ষেত্রে নতুন নূ গৌরবের দাবী নিয়ে উপস্থিত হ ভারতও তেমনি নূতন গৌরবের দাবী কা পারে দূরপাল্লার সাঁতারে। আগেই উ করেছি দৌড়ে ম্যারাথন যে সম্মানের অ পায় মুর্শিদাবাদের বাহাত্তর কিলোমি পাল্লার প্রতিযোগিতাও সাঁতারে সেই সম্ পেতে পারে। তাই আমাদের আজ দূরপ সাঁতারে প্রেরণা যোগাতে হবে। সে থেকে ভারতের সুইমিং ফেডারেশন আয়ো পক প্রণালী সন্তরণ প্রতিযোগিতা প্রব প্রশংসার দাবী রাখে। ভারতের বি অঞ্চলে ক্রীড়াসংস্থাগুলি উদ্যোগী হয়ে এমনিতর সন্তরণ প্রতিযোগিতা প্রবর্তন সাঁতারুদের উৎসাহিত করে তাহলে দে সাঁতারুদের কল্যাণ হবে।

আধুনিক

বিভূতিভূষণ মুখোপাধ্যায়

[উপন্যাস]

(পূর্ব প্রকাশিতের পর)

।। ত্রিশ ।।

এরপর প্রায় মাস তিনেক এ রঙ্গমঞ্চ রইল বন্ধ। একটানা এতদিন থেকে যাওয়া, ওদিককার সংসারে ছোটখাট বিশৃঙ্খলা কোন কোন বিষয়ে এসেই গেছে, তাছাড়া পয়লা বৈশাখ এসে পড়ছে। আজ আদিনাথের ব্যবসা বিলাতী কায়দাতেই চলছে, তবু হালখাতার ব্যাপারটা তিনি সাবেক চালেই পালন করেন। অবস্থা ফিরেছে, বেশ সমারোহের সঙ্গেই করেন এটা, কলকাতা থেকে জিনিসপত্র, ঠাকুর-হালুইকর আনিয়ে। এবার আরও বেড়েছে কারবার-কারখানা সাজানো গোছানোর ব্যাপারও কলকাতা থেকে ডেকোরেটার গিয়ে করবে এই ব্যবস্থা করে গেছেন আদিনাথ সেদিন যখন এসেছিলেন। এই উপলক্ষ্যে বাপের বাড়ির যতজন সম্ভব যায়; ঠিক হয়েছে এবার সকলেই যাবেন বাড়িঘর ঠাকুরচাকরের হেফাজতে রেখে। হালখাতার দিনটা সকলেই থাকবেন, তারপর যার যেমন প্রয়োজন চলে আসবেন। প্রায় পক্ষকাল আগে থেকে সব কেনাকাটা করে সপ্তাহখানেক থাকতে মেজবৌ, তমাল আর ছেলেমেয়েদের নিয়ে চলে এলেন সুরবালা। ঠিক হলো দিনতিনেক আগে হেমন্তিনী আসবে রেবা আর তার ছেলেমেয়ে দুটিকে নিয়ে। আগের দিন কলকাতা থেকে বেটাছেলেরা সব যাবে, অনন্তও থাকবেন সঙ্গে।

রঙ্গময়ীকেও টানবার চেষ্টা করেছিলেন সুরবালা; এবার এতদিন পরে আর দুজনে একাই [illegible]

টুকু যেন আরও গেছে বেড়ে। উনি রাজিও ছিলেন, কিন্তু কতকগুলি পারিবারিক বাধা এসে পড়ায় শেষ পর্যন্ত হোল না। এর ওপরও একদিন পেড়াপেড়ি করায় বললেন—" এ ছাড়ও তো একটা কথা আছে।"

"কি?"—উনি প্রশ্ন করতে বললেন—"ভেবে দেখনা।"

—ভ্রূ চেপে সপ্রশ্ন দৃষ্টিতে মুখের দিকে চেয়ে রইলেন।

সুরবালা আকাশ-পাতাল খুঁজে উত্তর না পেয়ে বললেন—"পাচ্ছি না ভেবে।"

"তা পাবি কেন? পুরনো হয়ে গেছে কিনা। জিজ্ঞেস করি, এবারই না হয় দিব্যি তিনটে মাস কাটিয়ে দিলি বে-ফিকির হয়ে। আগে কটা দিন থাকতে পারতিস রাগ-অভিমান নিয়ে?...এতদিন তো তাসখেলার ঝগড়াঝাটি নিয়ে দেখলাম ওদের দুজনকে, এবার দেখিই না, না-দেখে অবস্থাটা কিরকম দাঁড়ায় এদিকে।...ছেলের বিয়ে না দিতেই গিন্নি হয়ে সব ভুলে বসে আছ।"

একটু লজ্জিতভাবেই কি একটা উত্তর দিতে যাচ্ছিলেন সুরবালা, রঙ্গময়ী বললেন—"কেন, এর তো উত্তরও আছে, সেইটেই দে না।"—মনটা বেশি সরস হয়ে উঠলে ভুধরের পর এইরকম আধর আসতে থাকে কন্ঠে ও'র। সুরবালা এবার লজ্জার জন্যই না চেষ্টা করে বললেন—"তুমিই বল না শুনি।"

"কেন, বলতে তো পারতিস—বা-এক ছেলে দিয়ে পরেছি, ছেলের বাপের আর [illegible] দিয়েছে।"

হেসে উঠলেন। সুরবালা একটু মুখটা ঘুরিয়ে বললেন—"এতও আসে তোমার ঠানদিদি!"

দীর্ঘকাল পরে ফিরে যাওয়ার মুখে কথাগুলো যেন আরও মিষ্ট হয়ে লজ্জাটা দিয়েছে বাড়িয়ে। কথাটা ঘুরিয়ে নিয়ে বললেন—"কিন্তু খোকার বিয়েতে ছাড়ান নেই ঠানদি; বলে রাখছি এখন থেকে।"

কটা দিন যে কোথা দিয়ে কেটে গেল যেন বোঝাই গেল না। অনন্তর সরকারি চাকরি, উপায় নেই, পরদিনই ফিরে যেতে হোল, তবে মান-অভিমান, এমন কি খানিকটা চোখের জলেরও সাহায্য নিয়ে তিন ভাইকে আটকেই রাখলেন সুরবালা। অনন্তও যে গেলেন তা একাই, রেবাকে রেখে যেতে হোল। সাত দিন পর্যন্ত উৎসবের জেরটা ধরে রাখলেন সুরবালা। পাহাড়ে জায়গা, একেবারে কলোনীর মধ্যে না থাকলেও উত্তর আর পশ্চিম দিকে মাইল কয়েকের মধ্যেই পাহাড়, দুদিন বাড়ির গাড়ি আর কারখানার মোটরভ্যান করে দলশুদ্ধ নিয়ে বনভোজনের ব্যবস্থাও হোল; একদিন ভাইয়েরা থাকতে থাকতেই, দিন পাঁচেক পরে আর একদিন। আদরে-আবদারে সুরবালার মধ্যে যে মেয়েটির বয়স বাড়তে পায়নি সে যেন আরও ছোট হয়ে গিয়ে একটা পুতুলখেলায় মেতে রইল কটা দিন; ভাই, বর, ভাজ, বোন ছেলেমেয়ে নিয়ে একটি পরিপূর্ণ পুতুলের সংসার। এর মধ্যে নেপথ্যে কোথায় যেন ছেলের বিয়ে দিয়ে গিন্নি হওয়ার একটা মিশ্র প্রত্যাশায় সুরও

ভেসে এসে সমস্ত খেলাঘরটি আরও নিটোলভাবেই পরিপূর্ণ ক'রে তুলেছে। নিজেকে এত নিবিড়ভাবে আর কখনও পেয়েছেন কিনা মনে পড়ে না সুরবালার।

তারপরেই, নিজেকে আর কখনও এত নিঃশেষভাবে হারিয়েছেন কিনা, সেটাও।

একটা অদ্ভুত শূন্যতা। সেটা যে সবাই চলে যেতে বাড়িটার এই হঠাৎ রিক্ততার জন্যই তা নয়, পেছনে রয়েছে কলকাতায় তিনটে মাসও, হাসিতে-কৌতুকে সমুজ্জ্বল, যেখানে সন্দীপকে নিয়ে দুশ্চিন্তাটাও মেঘের কোলে রামধনুর মতো রঙে রঙে অপরূপ হয়ে উঠেছিল মনের আকাশে।

এগুলো স্মৃতিতে স্পষ্ট; স্পষ্টভাবেই হারিয়েছেন সুরবালা। কিন্তু এই যেন সব নয়। এর অতিরিক্ত আরও যেন কিছু একটা হারিয়েছেন যার জন্য মনটা খাঁ-খাঁ করছে, অথচ কেমন একটা বিষণ্ণ অনুভূতি জেগেছে মনে যে, সে-অভাব আর পূর্ণ হওয়ার নয়। শুধু, সে-অভাবের স্বরূপটা কি ধরতে পারছেন না বলে আরও যেন ব্যাকুলই হয়ে উঠেছেন।

কিন্তু উনি না পারলেও আর একজন পেরেছেন; স্বামী আদিনাথ বুঝতে পেরেছেন এবার বাপের বাড়ি থেকে কত পরিবর্তিত হয়ে এসেছেন সুরবালা। ভাই-ভাজেদের আদরে লালিত ও'র মধ্যেকার সেই কিশোরীটি গেছে কবে অন্তর্হিত হয়ে, সে বিরাগ-অনুরাগের নিত্য বিবর্তনে ও'কে এক হলেও এক ধিক করে রেখেছিল। এতে হারজিৎ, বিরোধ-সন্ধির মধ্যে দিয়ে শুধু আদিনাথই যে একের মধ্যে অনেক পেয়ে এসেছেন—সুখেই হোক, বেদনাতেই হোক—শুধু তাই নয়, সুরবালা নিজের মধ্যেই পেতেন নিজের সঙ্গিনী।

একদিন এই কথাটাই প্রকারান্তরে বেরিয়ে এল আদিনাথের মুখ দিয়ে।

এঁরা সব কলকাতায় ফিরে যাওয়ার কয়েকদিন পরের কথা। কারখানার নূতন অংশটা চালু হওয়ার পরই হালখাতার ব্যাপারটা এসে পড়ল, দেখাশোনা কয়েকদিন একেবারেই একরকম বন্ধ থাকায় কাজের চাপটা বড় বেশি করে এসে পড়ল আদিনাথের ওপর।

সেদিন একটা কাজ নিয়ে মোটরে ক'রে বাইরে যেতে হয়েছিল, ফিরে কারখানা হয়ে সন্ধ্যার একটু আগে বাড়ি পৌঁছলেন। এই সময় ঠাকুরচাকর-ঝিদের কাজ তদারক করে নীচেই থাকেন সুরবালা। দেখতে না পেয়ে বরাবর ওপরে চলে গেলেন। ঘরেও নেই। ডাকতে যাচ্ছিলেন, তারপর বাইরের দিকে নজর পড়তে দেখেন বারান্দা একেবারে শেষ হয়ে নীচের ঘরের যে খোলা ছাতটা রয়েছে সেখানে একটা সোফা বের করিয়ে নিয়ে একলাটি বসে রয়েছেন সুরবালা, পাশে একটা টেবিলে কাকাতুয়ার দাঁড়টা বসানো। হয়তো নীরব থাকার জন্যই কাকাতুয়াটা কাঁধের কাছে আস্তে আস্তে মাথাটা ঘসছে।

বুকটা ধক্ করে উঠল আদিনাথের। জামা-কাপড় ছাড়তেই যাচ্ছিলেন ভেতরে, ঘরে এসে এগুতে এগুতেই বললেন—"তুমি এখানে একলাটি বসে আছ?"

উলটা দিকে মুখ করে বসেছিলেন সুরবালা, একটু চকিতভাবেই ঘুরে চেয়ে উত্তর করলেন—"না, বাঃ, একলা কৈ?...এতক্ষণ তো নীচেই ছিলাম।"

উঠেই আসতে যাচ্ছিলেন, আদিনাথ এগিয়ে যেতে যেতে বললেন—"বোস, আমিই আসছি, বসব একটু ফাঁকায়।" গিয়ে বসে পড়লেন পাশে।

একটু যেন জড়সড় হয়ে পড়েছেন সুরবালা, কিছু একটা গোপন করতে গিয়ে প্রকাশ হয়ে পড়লে যেমন হয়। "আমি তোমার চা-খাবারের কথা বলে দিই"—বলে উঠতেই যাবেন, আদিনাথ কাঁধে হাতের একটু চাপ দিয়ে বললেন—"বোস, এরা আমায় দেখেছে; বলেই দিয়েছি চায়ের কথা। কাকাতুয়াটা এতদিন পরে..."

—কথাটা ঘুরিয়ে দিতে যাচ্ছিলেন, সুরবালা বললেন—

"তোমার আজ যেন বড্ড দেরি হয়ে গেল।"

এতক্ষণে একটা সহজ কথা এল। আদিনাথও সহজভাবেই উত্তর করলেন—"হ্যাঁ, হয়ে গেল একটু বেশি দেরি আজ। এদিন কারখানাটা বাড়িয়ে কাজের চাপটা বেড়েছেই, তার ওপর এ ক'টা দিন আবার মন দিতেও পারিনি ওদিকে ভালো করে। আজ আবার একটু বাইরেও যেতে হয়েছিল। খাটুনি সত্যিই বেড়ে গেছে, একলা যে কদ্দিন সামলানো যাবে। তাই ভাবছিলাম সন্দুকে না হয় নিই-ই টেনে এদিকে এবার—ওতো.."

আচমকা থেমে যেতে সুরবালা একটু বিস্মিত হয়েই ঘুরে চেয়ে প্রশ্ন করলেন—"তা কি হোল?"

আগের মতো অভ্যাসবশেই কথাটা বেরিয়ে গেছে আদিনাথের, আলোচনাটা আগেকার খাতে এসে পড়ল। তার ফলে গত তিনটে মাসের সমস্ত ঘটনা একযোগেই মনে এসে পড়ায় ছেড়ে দিয়েছেন কথাটা, একটু আমতা আমতা করেই কাটিয়ে দিতে যাচ্ছিলেন, সুরবালা বললেন—"না হয় নাওই না টেনে। কতদিন আর একভাবে বসিয়ে রাখা চলবে ছেলেটাকে?"

বুকে আটকানো একটা নিঃশ্বাস আস্তে আস্তে ছাড়িয়ে দিলেন আদিনাথ। খানিক ঠিক মেকি, সত্য কি আগেকার মতো ব্যঙ্গ কিনা নির্ণয় করবার জন্য একটু চোখের কোণে দেখেও নিলেন, তারপর মাঝামাঝি একটা পথ ধরে বললেন—"হ্যাঁ, সেকথা একবার বড়দাও তো বলছিলেন, কিন্তু তা নিয়ে একবার ভালো করে যে পরামর্শ করব তোমার সঙ্গে তার সময় পেয়ে উঠছি কৈ?

"তুমি আর বড়দা এখন একমত হয়েছ, আমার পরামর্শের কী দরকার আর?"

আবার একটু চোখের কোণে চাইতে হোল আদিনাথকে, মনে তো হচ্ছে না আগেকার মতো। এরপর ও'র সংশয়টা আরও গেল কেটে। সুরবালার মুখটা এসে একটু বিষণ্ণই মনে হয়েছিল। এই নূতন আলোচনায় একটা চিন্তার ছাপই এসে পড়েছে তার ওপর। এরপর যা বললেনও তা একটু নূতন করেই। নিজের কথা টেনেই বললেন—"কিন্তু বড়দা চান ওকে কোন বড় অফিসে ঢুকিয়ে একটু ট্রেণিং দিয়ে নিতে। কিন্তু আমি তো বলি—তোমার যখন এত খাটুনি পড়ে গেছে ...হাসছ যে তুমি?"

সত্যিই শেষের দিকে এসে একটা হাসি ঠেলে আসছিল আদিনাথের মুখে, ধরা পড়ে গিয়ে আর সামলাতে না পেরে ডান হাতের মুঠোটা মুখে চেপে ভালো করে হেসে উঠলেন। ও'র পিঠে হাত রেখে বললেন—"রাগ না কর তো বলি। সন্দুকে টানবার কথাটা বলে ফেলে সত্যি আমি ভয় পেয়ে গিয়েছিলাম সুরো—আবার বুঝি বাধিয়ে বসলাম ফ্যাসাদ—ওবার তিন মাসের জায়গায় আবার যে ক'মাস......"

"ফ্যাসাদই বাধাতে থাকি চিরকাল......"

লজ্জিতভাবে মুখটা ঘুরিয়ে নিলেন সুরবালা।
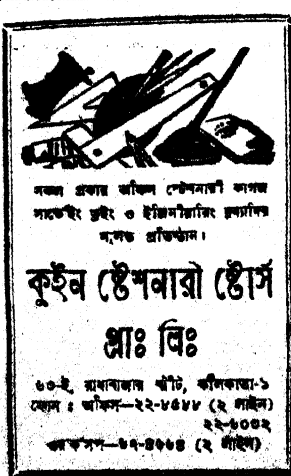
এরপর কি হোল, মুখের হাসিটা ধীরে-ধীরে মুখেই মিলিয়ে গেল আদিনাথের। সামনের দিকে চেয়ে চুপ ক'রে বসেই ছিলেন, সিঁড়িতে পায়ের শব্দ হতে ও'র কাঁধ থেকে হাতটা তুলে নিয়ে একটু সরে বসলেন। চাকর সামনে একটা টিপয় বসিয়ে দিয়ে চা'টা রেখে নেমে গেল।

চা-পানটা একেবারেই একটা নিস্তব্ধতার মধ্যেই শেষ করলেন আদিনাথ। কাপ-ডিশ টেবিলে রেখে রুমাল বের করে হাত-মুখ মুছতে মুছতে বললেন—"না, তুমি আর ফ্যাসাদ কোনদিন বাধাবে না সুরো জানি আমি......"

সঙ্গে সঙ্গে উঠে পড়ে কথার ও-টোনটাই বদলে ফেলে বললেন—"তুমি এখানেই বসো একটু, আমি জুতো-জামা ছেড়ে এখানেই আসছি।"

একত্রিশ

ফিরে এসে বসতে বসতে বললেন—"এবার তুমি কলকাতা থেকে একেবারে অন্য মানুষ হয়ে এলে সুরো, যে কাকাতুয়াটা তাকে দেখালেই [illegible]"

"[illegible] আমার কি কথা?"—[illegible] উপন্যাসটি [illegible] বলেই একটু চুপ করে থেকে [illegible] করলেন সুরবালা; তারপর একটু হেসে বললেন—"ভাল তো, সে না আমার তোমার ক্যাসাদ ঝামেলার লোক রইল না, ভালোই তো হোল।"

"হয়তো ওর কাঁধের ওপর আলতো ভাবে কেবল একটু জড়িয়ে ধরলেন আদিনাথ, বললেন—"ভালো হয়েছে কি মন্দ হয়েছে কি করে বলি? তবে একথা ঠিক যে তাকে ফেলে আসায় তোমায় যেন বড় একলাটি পাচ্ছি এবার। অন্তত একটা যে অভ্যেস হয়ে গিয়েছিল......"

—একটু হাসলেন।

"অবাধ্যতার অভ্যেস?"—একটু হেসেই উত্তর দিলেন সুরবালা, সেইভাবেই বললেন—"[illegible] মন্দ নয়!"

"মন্দ কেন হবে? একজনের মধ্যে অথচ একজনকে পাওয়া......বেশ শান্ত, শিষ্ট বাধ্যই......"

"একজন অবশ্য আমি যা বলব তার উল্টোটি না করে ছাড়বে না—কথায় কথায় বন্ধু-পার্টির গুছিয়ে বাপেরবাড়ি চলে যাবে। না হয়, ফিরবেই আনি তাকে?"

—বলতে বলতেই হাতের আঁজলায় মুখ ঢেকে খিলখিল করে হেসে উঠলেন। কাঠের সিঁড়ি, আবার পায়ের শব্দ উঠতে থেমে গিয়ে এবার নিজেই ও'র হাতটা নামিয়ে দিয়ে সরে বসলেন। চাকর টেবিলে খাবারের প্লেট আর জলের গ্লাস রেখে গেল।

নিঃশব্দেই আহার করে গেলেন আদিনাথ; চিন্তাটা যেন সামান্য অন্যদিকে ঘুরে গিয়ে মুখটা একটু গম্ভীর হয়ে পড়েছে, বিষণ্ণতার দিকেই। সুরবালাও কিছু বললেন না। শুধু একবার অপাঙ্গে চেয়ে নিয়ে দুটো যে মিষ্টি ফেলে রাখছিলেন আদিনাথ, খেয়ে নিতে বললেন। আদিনাথ খুব অন্যমনস্কভাবে একটা তুলে খেয়ে নিয়ে, জল খেয়ে হাত-মুখ রুমালে মুছে নিলেন। এরপরে যেন অনেকদূর থেকে প্রসঙ্গটা আবার ঘুরিয়ে এনে বললেন—"হ্যাঁ, কী যেন বলছিলে—তাকে ফিরিয়ে আনার কথা, না? তা আনলে বোধ হয় মন্দ হয় না সুরো। আমি ......তো করছি বইকি অভাববোধ—বললুম না? কিন্তু আমার চেয়ে তোমার অভাবটা বেশি হয়ে পড়েছে......"

"আমার?"

"হাঁ, তোমার। কথাটার মানে যে ভাবেই ধরা হোক, নিজের জিদ, রাগ, অভিমান এগুলোও মানুষের সঙ্গী। অনেকসময় সেগুলো নিরীহই, সেভাবে দেখতে পারলে যদি বা কখনও ভুল পথে এসে ভুলই করায়, এটা তো ঠিক যে, চুপ করে বসে থাকতে দেয় না। ঝিকে ডেকে সাক্ষী আনছ, যেতে যেতে শুনেছি আমি; দাদা-বৌদিদের চিঠি লিখছ—লিখতে লিখতে চোখের জল মুছছ, তাও নজরে পড়েছে; তারপর মুখ থমথমে কার [illegible]......"

"আর হবে না—[illegible] না গো—আমার [illegible]!..."

—[illegible] ছিলেন সুরবালা, [illegible]

[illegible] একেবারে হুহু করে কেঁদে উঠলেন। একেবারে হতভম্ব হয়ে চুপ করে গেলেন আদিনাথ, উনি যেন সম্পূর্ণ উল্টোটাই আশা করছিলেন—আবার হয়তো হেসেই কিছু একটা টিপ্পনী করবেন বধূ; যেমনভাবে চলছিল, যেমনভাবে আদিনাথের গাম্ভীর্যটাকেই উনি ছিন্নভিন্ন করে আসছিলেন এতক্ষণ।

সরে গিয়ে আবার সেইভাবে পিঠে-কাঁধে হাতটা বুলিয়ে দিয়ে বললেন—"কাঁদছ কেন?—আমি তো সেভাবে বলিনি কিছু, কখনও অন্যভাবে নিওনি তোমার কথা সুরো......"

"না, না, নাওনি, নাওনি তুমি—যা করে গেছি, তুমি মাফ করে গেছ বলেই আমি বাড়িয়ে গেছি। কিন্তু আমি যে কত একলা—কি করে যে আমার কাটে—কেন যে আমি ঠিক রাখতে পারি না নিজেকে—তোমার এত দয়া বুঝে নিতে পারি না—"

কেঁদেই চললেন।

আজ ওঁকে একা ওভাবে ছাদে দেখা থেকেই আদিনাথের মনটা টনটন করতে শুরু হয়েছে, অনুতপ্ত হয়ে এ ধরনের ইনিয়ে-বিনিয়ে কান্নাও পূর্বে আর শোনেন নি বলে উনিও যেন নিজেকে সামলাতে পারছেন না। চুপ করে বসে থেকে নিঃসাড়ে কেঁদেই যেতে দিলেন খানিকটা; নিজের বুকটা উদ্বেল হয়ে উঠলে ও'কে শুধু চেপে চেপে ধরছেন একটু একটু করে।

অনেকক্ষণ গেল। কান্নার স্বরও ক্রমে আসতে আসতে একসময় থেমে গেল; তবু সেইভাবে সোফার পিঠে মাথা দিয়ে শুয়ে রইলেন সুরবালা। তারপর উঠে একটা দীর্ঘ-নিঃশ্বাস ফেলে আকাশের দিকে দৃষ্টি তুলে সোজা হয়ে বসলেন।

আদিনাথ কাঁধে একটু কটা আঙুলের চাপ দিয়ে স্নেহদ্রব স্বরে ডাকলেন—"সুরো!"

"কি বলছ?" উত্তরটুকু দিয়েই সুরবালা হঠাৎ একটু চকিত হয়ে উঠলেন, অপ্রতিভ-ভাবে একটু হেসে বললেন—"দ্যাখো বেয়াক্কেলেপনা, ক্লান্ত হয়ে এলে, বাজে কথা দিয়ে আটকে রাখছি, ক্লাবে যাবে না?...... ঘুরে এসো না একটু।"

উঠে পড়তে যাচ্ছিলেন, আদিনাথ হাতের একটু চাপ দিয়ে বললেন—"বোস, ক্লাব তো রোজই আছে। আমি একটা কথা বলছিলাম সুরো, তুমি আবার কলকাতাতেই যাও, থাকো কিছুদিন এখন সেখানে।"

ঘুরে মুখের দিকে চাইলেন সুরবালা হাওয়াটা আবার আগেকার মতো লঘু-চপল করে আনবার জন্য হেসে বললেন—"নিজে তাড়াতে না পেরে চাইলে জোর করে যাওয়ানো?"

"ঠাট্টা নয়, সত্যিই আমি ক'দিন থেকেই এই কথা ভাবছি। বড়দা একটা ব্যবস্থা করতে যাচ্ছিলেন সন্দীপের জন্যে, তার মধ্যে তো চলে এলাম আমরা।"

"[illegible] না সন্দীপ, ওকে [illegible] থাকা [illegible]?"

[illegible] চেষ্টা সত্ত্বেও একটু হাসির রেখা ফুটে উঠল আদিনাথের মুখে। যেন প্রস্তুতই ছিলেন সুরবালা, বললেন—"কেন হাসছ বুঝেছি, কিন্তু সত্যিই তো আর পুতুপুতু করে মানুষ করবার বয়েস নেই ছেলের। তাছাড়া আগে আমার বাড়িটাই ছিল যে কোন এক আজব জায়গা, একেবারে দিশে-হারা হয়ে যেত, এখন আর সে ভাবটা তো মোটেই নেই...."

"না, ওর মায়েরও নেই আর।"—একটু হাসলেন আদিনাথ, পিঠে হাতটা বুলোতে বুলোতে বললেন—"আমি আর একটা কথা বলছিলাম। এবারে যখন কলকাতায় যাই একটা কথা উঠেছিল, মনে আছে?—সন্দীপের বিয়ের কথা?"

খুব মনে আছে সুরবালার, সেদিন আত্ম-পক্ষ সমর্থনে তাঁর তর্কটা বেশ জোরই হয়েছিল, বিলম্বও সহ্য করতে পারেন নি। একটু লজ্জিতভাবে বললেন—"সে কি হয়েছিল না-হয়েছিল অত মনে নেই আমার। অবিশ্যি, বিয়ে তো দিতে হবে ছেলের, তবে তার জন্য এত তাড়া কিসের যে কলকাতায় গিয়ে বসে থাকতে হবে মাকে? যা বোঝেন তো খুব।"

একটু আড়ে চাইলেনও। স্বামী কিন্তু ততক্ষণে আকাশ দেখার ভান করে মুখটা ঘুরিয়ে নিয়েছেন। একটু দেখে নিয়ে আবার ঘুরিয়ে নিলেন মুখটা; সেদিনকার কথা-কাটাকাটি যেন ও'র মনেই নেই এইভাবে বললেন—"আছে তাড়া সুরো, একটু ভেবে দেখলেই বুঝতে পারবে। আমার যেন মনে হচ্ছে, আমিই সেদিন বলছিলাম, বিয়ের কথা ধীরে-সুস্থে ভেবে দেখলেই চলবে; কিন্তু তারপর যতই ভাবছি, তত মনে হচ্ছে, ওটা সেরে নেওয়াই ভালো, কেননা......"

ও'র নিঃসঙ্গতার কথাটাই ঝোঁকের মাথায় এসে যাচ্ছিল, থেমে গেলেন। এইটিই মনের কথা বধূর, উনি নিজেই যখন চাপা দিতে চাইছেন, ভাবলেন আর না তোলাই ভালো।

তবে অনেক ভেবে সবটা ঠিক করে ফেলেছেন। এ-বিষয়ে আর যে তর্ক চলবে না এটা বোঝাবার জন্যই কাঁধে দুটো মৃদু আঘাত দিয়ে হঠাৎ উঠে পড়ে বললেন—"না, আমার প্ল্যান ঠিক হয়ে গেছে। তুমি চলে যাও সন্দুকে নিয়ে আবার। অফিসে ঢোকার কথাটা সদ্য উঠেছে, ওখানে থাকে সেই ভালো এখন, সঙ্গে সঙ্গে বিয়ের দিকটাও......"

"মেয়েটি বেশ চালাক চতুর হওয়া দরকার তো?" প্রশ্নটা যেন আপনিই বেরিয়ে গেল সুরবালার মুখ দিয়ে।

"সে তুমি বুঝবে।"—একটু হেসে কাঁধে আরও দুটি মৃদু আঘাত দিয়ে বললেন—"সে তুমি যেমন বুঝবে। মেয়ে চালাক হলে আবার বোকা-হাবা শাশুড়িকে নাকাল না করে।......আমি যাই, ঘুরেই আসি ক্লাব থেকে একটু। ভাবো আমার কথাগুলো তুমি; এবার নতুন কারখানাটা চালু হয়ে গেল, আমিও সেখান থেকে ঘুরে আসতে পারব মাঝে মাঝে।"

(ক্রমশঃ)

শুভঙ্কর

ভাইরাস-প্রতিরোধক ভেষজ

ঋতু পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে আমাদের দেশে কলেরা, বসন্ত, হাম, সর্দি ইত্যাদি নানা রোগের প্রাদুর্ভাব দেখা যায়। এসব রোগের মধ্যে অনেকগুলি ভাইরাসবাহিত। অর্থাৎ ভাইরাসের দ্বারা হাম, বসন্ত, সর্দি ইত্যাদি রোগ আমাদের দেহে সংক্রামিত হয়ে থাকে। আজকাল ছোট ছেলেমেয়েদের যে পোলিও-মাইলিটিস রোগের প্রাদুর্ভাব দেখা যায় তার মূলেও আছে ভাইরাস।

"ভাইরাস" কথাটির সঙ্গে আজকাল প্রায় সকলেই পরিচিত। কিন্তু ভাইরাস আসলে কি বস্তু সে সম্বন্ধে সুস্পষ্ট ধারণা অনেকের নেই। বিজ্ঞানীরা বলেন, ভাইরাস এমন এক বস্তু যা জীবধর্মীও বটে আবার অজীবধর্মীও বটে। এর বাস এক ভিন্ন-জগতে—প্রাণীজগৎ ও নিষ্প্রাণ জগতের মাঝখানে। ভাইরাস নানা আকৃতির হয়ে থাকে। অতি ক্ষুদ্র ভাইরাসের আকৃতি হল একটি জীবাণুর দশ হাজার ভাগের এক ভাগ। যে সব ভাইরাসের আকৃতি বৃহৎ, তারা প্রায় এক-একটি জৈব অণুর সমান। বিজ্ঞানীরা আরও বলেছেন, নিউক্লিক অ্যাসিডে তৈরী কতকগুলি জিন দিয়ে ভাইরাসের দেহ গঠিত। এর ওপরে আছে প্রোটিনের আচ্ছাদন। এটি তার আত্মরক্ষার আবরণ।

গবেষণাগারের পরীক্ষায় দেখা গেছে, ভাইরাসের আবরণটি সরিয়ে নিলেও তার রোগ-সংক্রমণের ক্ষমতা নষ্ট হয় না। এজন্য যে সব ভাইরাসের আবরণ খসে গেছে, তারা যদি ঠিকমতো অর্থাৎ তাদের উপযোগী প্রোটিন পেয়ে যায়, তবে সেই প্রোটিনের আবরণ তারা পুনরায় গ্রহণ করতে পারে। ভাইরাস পরাশ্রয়ী ও পরভুক। কিন্তু ঠিক ঠিক আশ্রয়টি খুঁজে পাওয়া তাদের পক্ষে কঠিন। কারণ যাদের দেহের বিষ বা টক্সিন নষ্ট করার ক্ষমতা নেই অর্থাৎ যাদের মধ্যে কোনো অ্যান্টিবডি নেই, সংক্রমণ করবার উপযুক্ত এরকম কোষ তাদের খুঁজতে হয়। প্রোটিনের বর্ম পরিহিত থাকার দরুন এই অতিক্ষুদ্র ভাইরাস বেশ কিছু সময় সংক্রমণ-যোগ্য কোষের সন্ধানে ভেসে বেড়াতে পারে।

সংক্রমণযোগ্য কোনো কোষের সন্ধান পাওয়ামাত্র ভাইরাস ঐ কোষের আবরণের সঙ্গে লেগে যায়, অর্থাৎ ঐ কোষটি তাকে আত্মসাৎ করে নেয়। তারপর আর ভাইরাসকে দেখা যায় না। কখনও কখন তার প্রোটিনের আবরণটি বাইরে পড়ে থাকে, কোনো সময়ে বা তা-ও থাকে না। কিন্তু কিছুকাল পরে বোঝা যায় যে, ঐ কোষটি ভাইরাসকে বন্দী করেনি বরং ভাইরাসই কোষকে বন্দী করছে এবং আত্মসাৎ করছে। ভাইরাসের দ্বারা আক্রান্ত হলে কোষের স্বাভাবিক কাজকর্ম বন্ধ হয়ে যায় এবং সে প্রোটিনের আবরণসহ ভাইরাস তৈরী করতে থাকে। প্রকৃতপক্ষে কোষটিতে এত বেশি সংখ্যায় ভাইরাস তৈরী হয় যে পরিশেষে কোষটি ফেটে যায় এবং তা থেকে পরিণত ভাইরাসসমূহ বেরিয়ে আসে। ঐ সব ভাইরাস অন্যান্য কোষকে সংক্রামিত করে। ভাইরাসের এই পর্যায়টি সম্পন্ন হতে আধ ঘণ্টার বেশি সময় লাগে না।
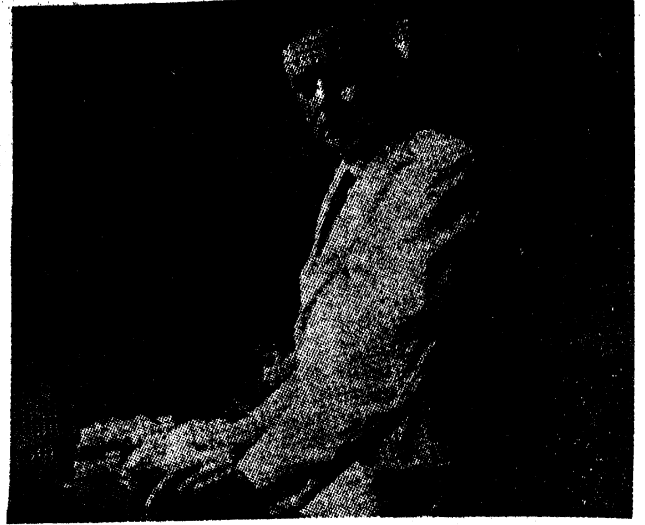
গবেষণাগারে ডাঃ জন বয়ার

এই আধ ঘণ্টা সময়ের যে কি কি ঘটে, তার পূর্ণ বিবরণ এখনও সুস্পষ্টভাবে জানা যায়নি। তবে বিজ্ঞানীরা মনে করেন, ভাইরাস কোষটিকে আত্মসাৎ করবার সময় ভাইরাসের নিউক্লিক অ্যাসিড কোষটির সঙ্গে একেবারে মিশে যায়। এইরকম জিনিসের সঙ্গে এই মিলনের ফলে এক বিরাট পরিবর্তন ঘটে, অর্থাৎ কোষটিতে জিন-এর সংখ্যা বেড়ে যায়।

রোগ-জীবাণুর মধ্যে ভাইরাস হল ক্ষুদ্রতম ও সবচেয়ে মারাত্মক। ভাইরাস-বাহিত রোগের সঙ্গে লড়াই করা দু-দিক থেকে কঠিন। ভাইরাস রোগপ্রবণ কোষে ক্রিয়াশীল হয় এবং ঐ কোষটিই হয়ে থাকে ভাইরাস আক্রমণের অনুকূল ক্ষেত্র। তবে যে কোষটি ভাইরাস কর্তৃক সংক্রামিত হয়, তার মধ্যে তার অস্তিত্বই শুধু বজায় থাকে না, সে এই কোষটির অঙ্গীভূতও হয়ে যায় অর্থাৎ কোষের অবিচ্ছেদ্য অংশে পরিণত হয়। এ হল প্রথম সমস্যা।

দ্বিতীয় সমস্যা হল—ভাইরাসের পৃথক সত্তা থাকে না বলে তাকে ধ্বংস করতে গেলে কোষটিকেও ধ্বংস করতে হয়। কাজেই কোনো ভেষজ যদি সংক্রামিত কোষগুলিকে ধ্বংস করে, তাহলে সেই ভেষজটি যে সব কোষে সংক্রামিত হয়নি, তাদেরও ধ্বংস করবে।

ভাইরাস-বাহিত বহু রোগ আজ মানুষ নিয়ন্ত্রণ করতে পেরেছে প্রতিষেধক টিকার দ্বারা। ১৭৯৬ সালে জেনার প্রথম বসন্ত-রোগের টিকা আবিষ্কার করে সারা বিশ্ব-বাসীর অশেষ কল্যাণ সাধন করেন। তারপর থেকে অন্যান্য ভাইরাস-বাহিত রোগের প্রতিষেধক হিসাবে বিজ্ঞানীরা নানা ভ্যাক্সিন বা টিকা আবিষ্কার করেছেন। দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের পর পাশ্চাত্ত্য দেশ-গুলিতে ভাইরাস-বাহিত পোলিও রোগের বিশেষ প্রাদুর্ভাব দেখা দেয়। ব্যাপকভাবে পোলিও-ভ্যাক্সিন দেবার পর এই রোগের প্রকোপ এখন অনেকটা কমে এসেছে। বিশ্বের স্বাস্থ্য বিশেষজ্ঞরা আশা করেন, এমন দিন আসবে যখন এই রোগকে সম্পূর্ণরূপে প্রতিরোধ করা যাবে।

কয়েক শ্রেণীর ভাইরাস-বাহিত রোগ নিয়ন্ত্রণ করা যায়, কারণ সেই ভাইরাসগুলি মানুষের দেহে অ্যান্টিবডি সৃষ্টি করতে পারে। কিন্তু সকলপ্রকার ভাইরাসের ক্ষেত্রে একথা প্রযোজ্য নয়। উদাহরণস্বরূপ অ্যাডিনো-ভাইরাসের কথা বলা যেতে পারে। কমপক্ষে ২৮টি অ্যাডিনো-ভাইরাস আছে। এই শ্রেণীর ভাইরাসের দ্বারা সাধারণ সর্দির মতো মৃদু ধরনের শ্বাসক্রিয়ার কষ্টজনিত বহু সংক্রমণ হয়ে থাকে। টিকার দ্বারা এই শ্রেণীর ভাইরাস-রোগ প্রতিরোধ করা যায় না।

বিজ্ঞানীরা বহুদিন থেকে চেষ্টা করছেন, টিকার পরিবর্তে এমন ভেষজ কি আবিষ্কার করা যায় যার দ্বারা ভাইরাস-রোগ প্রতিরোধ করা সম্ভব হবে। কয়েক বছর আগে একদল ব্রিটিশ চিকিৎসাবিজ্ঞানী "মিথিসাজোন" নামে এমন একটি ভেষজ আবিষ্কারের কথা জানিয়েছেন যা বসন্তের

বিরুদ্ধে কার্যকর বলে পরীক্ষাগারে প্রমাণিত হয়েছে।

লণ্ডনের ওয়েলকাম ল্যাবরেটরিজ অফ ট্রপিক্যাল মেডিসিন-এর ডাঃ জন বয়ার এবং তাঁর সহকর্মীরা এই ভেষজের আবিষ্কর্তা। গবেষণাগারে মানুষেতর প্রাণীদের ওপর সফল পরীক্ষার পর ভারতে মাদ্রাজে এই ভেষজটি মানুষের ওপর পরীক্ষা করে দেখা হয়। মিথিসাজোন হচ্ছে একটি সংশ্লেষিত রাসায়নিক ভেষজ এবং রাসায়নিক ভাষায় এর পুরো নাম হচ্ছে ১—মিথাইলইসাটিন ৩—থায়োসেমি কার্বাজোন। মাদ্রাজে ১১০১ জন মানুষের ওপর এই ভেষজটি পরীক্ষা করা হয়। তার মধ্যে মাত্র তিনজন মৃদু ধরনের বসন্তে আক্রান্ত হয়। কিন্তু ১১১৬ জন যারা এই ভেষজটি গ্রহণ করেনি তাদের মধ্যে ৭৮ জন বসন্তরোগে আক্রান্ত হয় এবং ১২ জন রোগী মারা যায়।

মিথিসাজোন বর্তমানে "মারবোরান" নামে সারা বিশ্বের বাজারে ছাড়া হয়েছে। মারবোরান ব্যবহারের একটা মস্ত বড় সুবিধা হচ্ছে যে, টিকা নেবার পর যে আনুষঙ্গিক উপসর্গ দেখা দেয় এক্ষেত্রে তার কিছুই হয় না। প্রথমে মনে হয়েছিল, মারবোরান ভাইরাস-রোগের কয়েকটি মাত্র ক্ষেত্রে কার্যকর। কিন্তু ডাঃ বয়ার ও তাঁর সহকর্মীদের সাম্প্রতিক গবেষণার ফলে দেখা গেছে মারবোরানের কার্যক্ষেত্র বেশ বিস্তৃত। অ্যাডিনো-ভাইরাসের ক্ষেত্রে মিথিসাজোন কার্যকর বলে প্রমাণিত হয়েছে।

আগেই বলা হয়েছে, ভাইরাসের বিরুদ্ধে লড়াই-এর একটা প্রধান সমস্যা হচ্ছে, ভাইরাস-আক্রান্ত কোষকে ধ্বংস না করে ভাইরাসকে স্বতন্ত্রভাবে ধ্বংস করা যায় না। যে প্রণালীতে মারবোরান কোষে ভাইরাসের বৃদ্ধি প্রতিরোধ করে তা হচ্ছে সংশ্লিষ্ট ভাইরাসের জীবনধারার একটি শেষ পর্যায় সংক্রান্ত। সম্ভবত ভেষজটি দেহকোষে অনুপ্রবেশ করে ভাইরাসের সংখ্যাবৃদ্ধির প্রক্রিয়ায় কোনো উপায়ে বাধা দেয়, যে প্রক্রিয়ায় কোনো জীব আণবিক স্তরে নিজের সংখ্যাবৃদ্ধি করে।

যে পদ্ধতিতে ওয়েলকাম গবেষণাগারের বিজ্ঞানীরা ভাইরাস-কালচারের প্রতিক্রিয়া পরিমাপ করেছেন তা অত্যন্ত ধৈর্য ও সূক্ষ্ম অনুসন্ধানের ফল। প্রথমে টিসু-কালচারকে ভাইরাসের দ্বারা সংক্রমণের প্রয়োজন হয়। তাঁরা "হে-লা" নামে এক ধরনের কোষ নিয়ে গবেষণাগারে অনুসন্ধান চালান। হেলেন লেন নামে জনৈক মহিলার দেহ থেকে এই কোষ সংগ্রহ করা হয় এবং তাঁর নাম থেকে "হে-লা" কথাটির উৎপত্তি।

প্রায় দশ বছর আগে শ্রীমতী হেলেন লেন তাঁর দেহের কানেকটিভ টিসুর কোষ দান করেন এবং তারপর থেকে গবেষণাগারে এই কোষ ব্যাপকভাবে ব্যবহার করা হয়েছে।

হে-লা কোষের কয়েকটি নমুনা প্রথমে অ্যাডিনো-ভাইরাস—১১ দ্বারা সংক্রামিত করা হয় এবং তারপর বিভিন্ন মাত্রায় মিথিসাজোন মেশানো হয়। কোষের অপরাপর নমুনাও এই ভাইরাস দ্বারা সংক্রামিত করা হয়, কিন্তু সেগুলিতে মিথিসাজোন মেশানো হয় না। তাই শেষোক্ত নমুনাগুলি নিয়ন্ত্রক (কণ্ট্রোল) হিসাবে কাজ করে।

পরীক্ষায় দেখা গেছে, এক লিটার দ্রবণে যদি এক গ্রামের অতি সামান্য ভাগ মিথিসাজোন মেশানো হয়, তা হলে ভাইরাসের ক্রিয়াশীলতা সম্পূর্ণ বন্ধ হয়ে যায়। ভাইরাস-আক্রান্ত কালচার যদি কোনো রক্তের নমুনায় মেশানো হয়, তা হলে দেখা যায় ভাইরাস দ্বারা সৃষ্ট হেম অ্যাগ্লুটিনিন রক্তকোষকে জমাট বাঁধিয়ে দিতে চেষ্টা করে। পর্যাপ্ত পরিমাণ মিথিসাজোন মেশালে রক্ত জমাট বাঁধে না এবং তা থেকে উপলব্ধি করা যায় যে, ভাইরাসের ক্রিয়াশীলতা বিনষ্ট হয়েছে।

ওয়েলকাম গবেষণাগারের বিজ্ঞানীরা ভাইরাস-প্রতিরোধক ভেষজ সংক্রান্ত গবেষণায় এখন আরও ব্যাপকভাবে মনোনিবেশ করেছেন। বিজ্ঞানীদের এই ব্যাপক গবেষণার ফলে মিথিসাজোন জাতীয় আরও বহু ভাইরাস-প্রতিষেধক ভেষজ ক্রমান্বয়ে আবিষ্কৃত হবে বলে আমরা আশা করি। এবং তার ফলে হাম বসন্ত সর্দি ইত্যাদি ভাইরাস-বাহিত রোগের সংক্রমণ একদিন সম্পূর্ণ প্রতিরোধ করা যাবে, এমন আশা করা নিতান্ত দুরাশা নয়।

উড়ন্ত চাকি

—দিলীপ মালাকার—

উড়ন্ত চাকি কাহিনী এখন আর গাঁজাখুরি গল্পে সীমাবদ্ধ নয়। যে দুটো দেশ ক্ষেপণাস্ত্রে সমৃদ্ধ সেই সোভিয়েট ইউনিয়ন ও মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের বৈজ্ঞানিকেরা উড়ন্ত চাকি সম্পর্কে আর উদাসীন নয়। এই দুই দেশের বৈজ্ঞানিকেরা উড়ন্ত চাকির রহস্য উদ্ঘাটনে তৎপর হয়েছেন।

ছোটবেলায় উড়ন্ত চাকির কল্পিত কাহিনী পড়েছি রোমহর্ষক গোয়েন্দা গল্প বা উদ্ভট গল্পের বইয়ে। দূরের কোন গ্রহ থেকে পাঠান উড়ন্ত চাকির কল্পিত কাহিনী কিশোর মনকে নাড়া দিত। এইচ জি ওয়েলস-এর মঙ্গলগ্রহের আক্রমণ গল্পেও দেখি উড়ন্ত চাকিযোগে মঙ্গলগ্রহের অধিবাসীর এই পৃথিবী গ্রহের ওপর আক্রমণ। তার আগে ও পরে বিভিন্ন দেশের আকাশে দেখা গেছে অনেকবার উড়ন্ত চাকি। বিস্ময় তখনও প্রকাশ করা হয় কিন্তু অধিকাংশ বারই চোখের ভ্রম বা গাঁজাখুরি গল্প বলে উড়িয়ে দেওয়া হয়েছে।

দ্বিতীয় মহাযুদ্ধে রকেটের আবির্ভাবে এবং অ্যাটম বোমার ধ্বংসলীলায় অনেকেই অভিভূত হয়েছিলেন। এলো জাগরুক যুগ। সোভিয়েট ইউনিয়ন ও মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র পাল্লা দিয়ে এগিয়ে চলল অ্যাটম বোমার পর হাইড্রোজেন বোমা নির্মাণে। তার পরের যুগ হল স্পুটনিকের। আকাশ ছেড়ে মহাকাশে শুরু হল দুই রাষ্ট্রের প্রতিযোগিতা। দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের ঠিক পরে প্রায় বছর দশেক ধরে যখন এই দুই বৃহৎ রাষ্ট্রের মধ্যে চলে সব দিক দিয়ে প্রতিযোগিতা তখন আমেরিকার আকাশে কোন উড়ন্ত চাকি উড়ে গেলে বলা হত রুশদের কোন গোপন রকেট হয়ত চরে বেড়াচ্ছে। তেমনি সোভিয়েত আকাশে অজ্ঞাত উড়ন্ত চাকি উড়ে গেলে মার্কিনদের কোন গুপ্তচর বিমান বা রকেট নামে আখ্যা দিয়ে উড়ন্ত চাকির সত্তাকেই উপেক্ষা করা হত। একথা এখন সোভিয়েত ও মার্কিন বিজ্ঞানীরাই বলছেন।

মাস খানেক আগেও এক উড়ন্ত চাকির সংবাদ পাওয়া গেছে। পেরুর রাজধানী লিমার বিমানবন্দর থেকে একটি বিমান ওড়ে রাত্রে। আড়াইশ কিলোমিটার পথ উড়ার পর বিমানের পাইলট লক্ষ্য করে যে, প্রায় পনেরো মিনিট ধরে একটি উড়ন্ত চাকি তার বিমানের পথ ধরে এগুচ্ছে। কাছে আসতে তিনি দেখেন ওটি গোলাকার একটি বস্তু। রাত্রের আকাশে উড়ন্ত চাকির গা থেকে বেরিয়ে আসছিল লাল ও কমলালেবুর রঙের আলো। খানিক পরে সে আলোর বদলে দেখা যায় নীল আলো। ওই বিমানের পাইলট বলেছেন যে তিনি ঠিকই দেখেছেন একটি উড়ন্ত চাকি, কোন বিমান বা রকেট নয়।

উড়ন্ত চাকি সম্পর্কে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের বৈজ্ঞানিকেরা অনেকদূর এগিয়েছেন। সোভিয়েত বৈজ্ঞানিকরাও হাত গুটিয়ে বসে নেই। হার্ভার্ড বিশ্ববিদ্যালয়ের জ্যোতির্বিজ্ঞানের অধ্যাপক ও অবজারভেটরির অধ্যক্ষ ডোনাল্ড মেনজেল উড়ন্ত চাকি সম্পর্কে প্রচুর অনুসন্ধান চালিয়েছেন। সে সম্বন্ধে তিনি একটি বইও প্রকাশ করেছেন ১৯৬২ সালে। বইয়ের নাম "ফ্লাইং সসার্স"। এক রুশ বিজ্ঞানীও এ সম্পর্কে একটি বই প্রকাশ করেছেন সম্প্রতি। উড়ন্ত চাকি ও দূর গ্রহে জীবনের আভাস সম্পর্কে সঙ্কলন প্রকাশ করেছেন রুশ বিজ্ঞানী অধ্যাপক এফ জিগেল।

জিগেল বলেছেন যে, এসব উড়ন্ত চাকি দেখা যায় ১৯৬৪ সালের মে মাসে। বিমান থেকে দেখা গিয়েছিল একটি আলোর মতন জিনিস দ্রুতবেগে চলেছে। গা থেকে নানান রঙের আলো বেরুচ্ছিল। অত দ্রুতগতিতে চলা কোন চলন্ত জিনিসে এই গ্রহের অর্থাৎ

মানুষের পক্ষে তাতে বসে থাকা সম্ভব নয়। দ্বিতীয় উড়ন্ত চাকি দেখে দুজন আমেরিকান বৈমানিক ১৯৪৭ সালের আগস্ট মাসে। তারপরে আরও অনেকবার উড়ন্ত চাকি আকাশে দেখা যায়। কিন্তু সে সম্বন্ধে সুষ্ঠুভাবে অনুসন্ধান চালান হয় ঘন ঘন। দক্ষিণ পেরুতে অবস্থিত চিলি ও আর্জেন্টিনার বৈজ্ঞানিক অনুসন্ধান কেন্দ্রের তথ্য থেকে জানা যায় যে, ১৯৬৫ সালের ৩রা জানুয়ারী আকাশে অনেকক্ষণ ধরে উড়ন্ত চাকির গতিবিধি লক্ষ্য করা যায়। কয়েক মিনিট অন্তর লাল থেকে সবুজ রঙে পরিবর্তন এবং পরে হলুদ, নীল ও সাদা রঙের আলো দেখা যায়। তারপর আবার কমলালেবু রঙের আলো। সেদিন কোন মেঘ বা ঝড়-বাদল ছিল না যে ঝড় থেকে বিদ্যুৎ বা অন্য কোন নৈসর্গিক আলো দেখা দিতে পারে। উড়ন্ত চাকি থেকে যে আলো জ্বলছিল সেগুলো রেডিও-ইলেকট্রিক সংকেত। ওই একই বছরে উড়ন্ত চাকি সম্বন্ধে আরও খবর পৌঁছয় বৃটেন, ফ্রান্স ও পর্তুগাল থেকে। ১৯৬৫ সালের গ্রীষ্মের কালে ক্যানবেরা বিমানবন্দরের কন্ট্রোল টাওয়ার থেকে দেখা যায় একটি উড়ন্ত চাকি বিমানবন্দরের ওপরে ঘুরে বেড়াচ্ছে। প্রায় চল্লিশ মিনিট থাকার পর যখন কৌতূহলবশে একটি বিমান ওঠে তাকে দেখার জন্যে তখনই সেই উড়ন্ত চাকি আকাশে অদৃশ্য হয়ে যায়।

শুধু চোখে দেখা নয় রাডার যন্ত্রে ধরা পড়ে উড়ন্ত চাকির গতিবিধি গত বিশ বছর ধরে। ১৯৬৫ সালে ওকলাহামা স্টেটের রাডার যন্ত্রে দেখা যায় যে, চারটি উড়ন্ত চাকি অনেকক্ষণ ধরে আনাগোনা করে ক্যানসাস ও কোলারডো রাজ্যে। ১৯৬৬ সালের জুন মাসে মস্কোয় বসে আন্তর্জাতিক মহাকাশ সম্মেলন। ওই সম্মেলনে মস্কো অবজারভেটরির গবেষক মিঃ এ গোরেলাকিন একটি প্রবন্ধে বলেছেন যে, শুধুমাত্র সোভিয়েত রাডার যন্ত্রই উড়ন্ত চাকির গতিবিধি সম্বন্ধে ওয়াকেবহাল নয়, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ছাড়াও অস্ট্রেলিয়া, জাপান ও ভারতের রাডার যন্ত্রেও উড়ন্ত চাকির গতিবিধি ধরা পড়েছে। কোন পতঙ্গ বা কোন পাখি বা চোখের ভ্রম ধরা পড়ে না রাডার যন্ত্রে। ১৯৬৬ সালে মস্কোয় অনুষ্ঠিত আন্তর্জাতিক গণিতজ্ঞ সম্মেলনে মার্কিন অধ্যাপক জি ভ্যালে উড়ন্ত চাকির অস্তিত্ব সম্পর্কে তিনটি মনোজ্ঞ প্রবন্ধ প্রকাশ করেন। উড়ন্ত চাকি সম্বন্ধে বিজ্ঞানের প্রথম যুগের কথাই মনে করিয়ে দেয়। নতুন কোন আবিষ্কার বা নতুন কোন সূত্র সম্বন্ধে সবাইকেই সন্দেহ প্রকাশ করতে দেখা যায়। অনেক সময়ে গাঁজাখুরি বলে উড়িয়ে দেওয়া হয়। ধূমকেতু ও কোন চলন্ত উপগ্রহ থেকে পাথরের টুকরো পড়াকে ১৮০৩ সালের আগেও বৈজ্ঞানিকেরা বিশ্বাস করতেন না। কিন্তু পরে বৈজ্ঞানিকেরা তা স্বীকার করেছেন। সোভিয়েত বৈজ্ঞানিকেরা মনে করেন যে, উড়ন্ত চাকির গতি এতই দ্রুত যে, তাতে এই পৃথিবীর কোন মানুষ বাস করতে অক্ষম। সুতরাং অন্য কোন গ্রহে তার অস্তিত্ব থাকা সম্ভব। অন্য কোন গ্রহ থেকে এই সব উড়ন্ত চাকি ছাড়া হয়। অনুসন্ধানে আরও জানা গেছে যে, যখনই মঙ্গল গ্রহ পৃথিবীর কাছে এগিয়ে আসে তখনই উড়ন্ত চাকির উপদ্রব বেশী দেখা যায়। সুতরাং বাইরের কোন গ্রহের প্রভাব এতে আছে কি না ভেবে দেখা উচিত।

উড়ন্ত চাকির অনুসন্ধান ও গবেষণায় আমেরিকান বৈজ্ঞানিকেরা অনেক দূর এগিয়েছেন। এর নাম দিয়েছেন তাঁরা উফো বা ইউ এফ ও (আনআইডেন্টিফায়েড ফ্লাইং অবজেক্টস)। বুলেটিন অব দি অ্যাটমিক সায়েন্টিস্ট অ্যান্ড সায়েন্স পত্রিকায় এ সম্বন্ধে অনেক আলোচনা প্রকাশিত হয়েছে। একটি অনুসন্ধানে জানা যায় যে, পঞ্চাশ লাখ আমেরিকান উড়ন্ত চাকি দেখেছে। এ বছরের ৪ঠা জুলাই তারিখে ক্যালিফোর্ণিয়ার কর্ণিং শহরের এক ছোট কফি বারে দাঁড়িয়ে দুই পুলিশ কর্মচারী কফি পেয়ালায় চুমুক দিতে দিতে গল্প করছিল। তখন বেশ রাত্রি। হঠাৎ তিন থেকে পাঁচশ ফিট ওপরে তারা সিগার আকারের জ্বলন্ত জিনিস উড়তে দেখে। দেখার পরে তারা তার অবয়ব আঁকে কাগজে। উড়ন্ত চাকির ওপরে জ্বলছিল বিরাট সাদা আলো এবং নিচে জ্বলছিল স্তিমিত কালচে ভীষণ বেগে ওটি উড়ে যায়। গত বছরে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের নিউ হ্যামশায়ার রাজ্যে এক রাস্তার ওপর এক মার্কিন দম্পতি উফো বা উড়ন্ত চাকি দেখে। তাদের নাকি উড়ন্ত চাকির চালকরা রাস্তা থেকে তুলে নিয়ে কিছু দূরে ফেলে দেয়। তাদের কাহিনী নিয়ে একটি বইও প্রকাশিত হয়েছে, বইটার নাম 'দি আনইন্টারাপটেড জার্ণি'। এই বই-এর ফরাসী জার্মান অনুবাদও প্রকাশিত হয়েছে। অবশ্য এই বই-এর কাহিনী অতিরঞ্জিত। মনে হবে গাঁজাখুরি গল্প। কিন্তু নিগ্রো দম্পতি উড়ন্ত চাকি দেখে সেটা ঠিকই। হয়ত চালকরাও নেমে এসেছিল। কিন্তু তার বৈজ্ঞানিক বিশ্লেষণ এখনও সঠিক পাওয়া যায় নি।

মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের সামরিক বিমান বাহিনী উড়ন্ত চাকি অনুসন্ধানকল্পে প্রজেক্ট ব্লু বুক নামে একটি অনুসন্ধান কেন্দ্র পরিচালনা করছে। ১৯৪৭ সাল থেকে এ পর্যন্ত এগার হাজারটি অজ্ঞাতনামা উড়ো যন্ত্রের ইতিহাস লিপিবদ্ধ করা হয়। তবে এর মধ্যে উড়ন্ত চাকির গতিবিধি সম্পর্কে অনুসন্ধানলিপি রাখা হয় মাত্র আটশবার। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের ন্যাশন্যাল ব্যুরো অব স্ট্যান্ডার্ডস-এর প্রাক্তন ডিরেক্টর পদার্থবিজ্ঞানী এডওয়ার্ড কনডন এবং নর্থওয়েস্টার্ণ বিশ্ববিদ্যালয়ের ডিয়ারবর্ণ অবজারভেটরির অধ্যক্ষ জে এলেন হেনেক উপরোক্ত প্রজেক্ট ব্লু বুক অনুসন্ধান কেন্দ্রের তথ্য সম্বন্ধে মন্তব্য করতে গিয়ে বলেছেন যে, উড়ন্ত চাকি সম্বন্ধে গাল-গল্প বলে উড়িয়ে দেওয়া চলে না। বাইরের কোন গ্রহ থেকে চালিত যন্ত্রপাতির কাজকর্ম বলেই মনে হয়। মার্কিন সামরিক বিমান বাহিনীর রিপোর্ট-এর ওপর ভিত্তি করে এবং তাদের অনুসন্ধানের ওপর ভিত্তি করে প্রখ্যাত মার্কিন মহাকাশ বিশেষজ্ঞ এবং এরিজোনা বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক জেমস ই ম্যাকডোনাল্ড বলেছেন যে, বর্তমান বৈজ্ঞানিক গবেষণার একমাত্র সমস্যা হল উড়ন্ত চাকি। বাইরের কোন গ্রহ কর্তৃক পরিচালিত উড়ন্ত যন্ত্র বলেই মনে হচ্ছে। এবং বিশ্বাস করার অনেক প্রমাণ ও যুক্তি রয়েছে। তবে উপরোক্ত আলোচনা আজকের ইতিহাস নয়, কয়েকশ বছর আগেও এদের দেখা গেছে। সে সম্বন্ধে অনেক কিংবদন্তী প্রচলিত। তবে সেকালে স্বর্গের দেবদূত বা ভগবানের আবির্ভাব বলে প্রচার করা হত। এখন বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিতে চলেছে তার বৈজ্ঞানিক অনুসন্ধান।

মার্কিন জ্যোতির্বিজ্ঞানী স্যাগান বলেন যে, মহাকাশে বা তারও বাইরে কয়েক শত কোটি গ্রহ-উপগ্রহ ছড়ান রয়েছে। পৃথিবী তারই মধ্যে একটি ক্ষুদ্র গ্রহ মাত্র। পৃথিবী গ্রহে অনেক পরিবর্তন এসেছে ইদানীং কালে। আমাদের সভ্যতা কতখানি এগিয়েছে সে সম্বন্ধে হয়ত কৌতূহল আছে অন্য গ্রহের এবং অনুসন্ধানকল্পে তারা হয়ত উড়ন্ত চাকি জাতীয় যন্ত্রপাতি পাঠায় খবর নিতে। সোভিয়েত মহাকাশ বিজ্ঞানী আই এস শেখাভলস্কি বলেছেন তার বই 'ইনটেলিজেন্ট লাইফ ইন দি ইউনিভার্স'-এ যে জ্যোতিমণ্ডলে কয়েক কোটি গ্রহ-তারার মধ্যে নিশ্চয় কয়েক হাজার গ্রহে আমাদের চেয়েও উন্নত ধরনের মানুষের বাস রয়েছে। তবে মার্কিন বৈজ্ঞানিকেরা বলছেন যে, আমাদের যে সব রকেট-স্পুটনিক বেরুচ্ছে সেগুলোর সাহায্যে কোন দূরের গ্রহে পৌঁছতে কয়েকশত বা কয়েক হাজার বছর লাগবে। কিন্তু বহুদূরের এই গ্রহ থেকে আমাদের পৃথিবী গ্রহে তাদের পৌঁছতে কি হাজার বছর লাগে? প্রশ্নটা এখানেই। প্রশ্নের উত্তরে তাঁরা বলছেন যে, পৃথিবীর চেয়েও উন্নত গ্রহের মানুষেরা শত গুণ বেশী উন্নত। তাই হয়ত তাঁদের পক্ষে সম্ভব। মৌমাছির ভাষা বুঝতে যেমন আমাদের অনেক সময় লেগেছে, অনেক বৈজ্ঞানিক অনুসন্ধানের পর। কিন্তু আমাদের ভাষা তাদের বোঝাবার দরকার নেই কারণ আমরা তাদের ভাষা বুঝি বলে। তেমনি হয়ত বাইরের কোন গ্রহের মানুষেরা অনুসন্ধান ও গবেষণায় আমাদের ভাষা বোঝে কিন্তু তাদের ভাষায় আমাদের কিছু বলা তারা হয়ত প্রয়োজন মনে করে না। তবে সবচেয়ে বড় প্রশ্ন থেকে যাচ্ছে এখানেই যে, উড়ন্ত চাকির ছবি ধরা হয়েছে অনেকবার কিন্তু উড়ন্ত চাকি কোন ধাতুতে নির্মিত এবং তার চালককে চোখে দেখা যায় নি। এমন কি কখনো কোন উড়ন্ত চাকি দুর্ঘটনাবশে ভূপতিতও হয় নি, তাহলে বরং পরীক্ষা করে দেখা যেত। তবে উড়ন্ত চাকির গতিবিধি সম্পর্কে আরও গবেষণা চালাতে সব দেশের বৈজ্ঞানীরা একমত। ―

প্রদীপের কথায় যেন মিলিকে নিরুত্তর করে দিল কয়েক মুহূর্তের জন্যে। স্যাম্পু করা বব্‌ড চুলটা ঝাঁকিয়ে নিজের সম্বিৎ ফিরিয়ে নিল মিলি, তারপর বলল—

তাহলে বাবার কাছে থেকে সন্তান কিছু নিতে পারবে না, সেখানে লজ্জা আর অপমানের প্রশ্ন আসবে। কোন সম্পর্ক থাকাও অপরাধের বোধহয়।

না তা আমি বলছি না, ধীরভাবে উত্তর দিল প্রদীপ, কিন্তু তার ঠান্ডা গলার স্বরটা উত্তাপ সৃষ্টি করল। এক মুহূর্তে মিলি যেন ফেটে পড়ল প্রচন্ডভাবে। চোখের দৃষ্টিটা অস্বাভাবিক হয়ে গেল সঙ্গে সঙ্গে, কপাল আর গালের রেখাগুলো স্পষ্ট হয়ে ফুটে উঠল এক নিমেষে, নীচের ঠোঁটটা কামড়ে ধরল সে দাঁত দিয়ে। সারা দেহটা তার কাঁপতে শুরু করল তরঙ্গায়িত নদীর মত। চীৎকার করে মিলি বলল, নিশ্চয়ই, তুমি তাই মিন করছ, আর লজ্জা তোমারই করা উচিত আমার নয়। যে স্ত্রীর সব দায়িত্ব নিতে অক্ষম, যার ভদ্রভাবে জীবন-যাপন করার মতও সঙ্গতি নেই—তার মুখে আর যাই হোক নীতিবাক্য নিশ্চয়ই মানায় না।

ভদ্রভাবে জীবনযাপন করতে হলে শুধু সঙ্গতির প্রশ্নই আসে না মিলি, রুচির কথাটাও আসে সে কথা ভুলে যেও না।

কথাটা বলে খোলা জানালার সামনে গিয়ে দাঁড়াল প্রদীপ। কুঞ্চিত ভ্রূ তুলে বাঁকা হাসির সঙ্গে মিলি বলল, হাউ ফানি তোমার মুখে রুচি কথাটা শুনলেই আমার হাসি পায়। তুমি বোধহয় ভুলে গেছ যে তুমি একটা থার্ড গ্রেড অফিসের একজন হাফ এডুকেটেড এমপ্লয়ি মাত্র।

না তা ভুলিনি, তবে মিলি এই তুচ্ছ লোকটাই তোমার হাতে মাসে মাসে আটশো করে টাকা তুলে দেয়। ছোট একটা সংসারের খরচ হিসেবে সেটা সামান্য নয়।

তোমার মত স্টিনজি আর মিন হলে আমারও তাই মনে হত। আর তাছাড়া আমি লাইফ এনজয় করতে চাই, আই ওয়ান্ট টু লিভ মাই ওন লাইফ।

তাই কি পার্ক স্ট্রীটের ওই হোটেলটায় তোমায় আজকাল প্রায়ই দেখা যাচ্ছে—এবার প্রদীপের কন্ঠস্বরে ব্যঙ্গের আভাস।

হ্যাঁ তাই, মিলি প্রদীপের দিকে সোজা তাকিয়ে বলল, আজকাল গোয়েন্দা লাগিয়েছ নাকি পেছনে? তাতে বিশেষ সুবিধে হবে না—। সশব্দে দরজাটা বন্ধ করে মিলি ঘর থেকে বেরিয়ে গেল।

কিছুক্ষণের মধ্যেই গাড়ীর আওয়াজটা দূরে মিলিয়ে যেতে প্রদীপ ঘরের চতুর্দিকটা তাকিয়ে দেখল একবার। এধরনের হিস্টিরিকাল আউটবার্স্ট হলে মিলি এত সহজে রেহাই দেয় না। ঘরের জিনিসপত্র লন্ডভন্ড করে দেয়, চীৎকারের সঙ্গে কাঁচের জিনিসগুলো ছুড়তে থাকে চারি-পাশে। কোন হুঁস থাকে না তখন। আজকে সেটার অভাব লক্ষ্য করে একটু আশ্চর্য হল প্রদীপ বসু।

ব্যারিস্টার কে গুপ্তের একমাত্র আদুরে মেয়েকে বিয়ে করে প্রদীপ শুধু তার হিস্টিরিয়ার টার্গেট হয়েছে মাত্র। মিলি গুপ্তের বোধহয় এ-ধরনের একটা সেফটি ভ্যালবের প্রয়োজন ছিল তাই সে প্রদীপকে বিয়ে করতে রাজী হয়েছিল। প্রদীপ কয়েক মিনিট নিস্তব্ধ হয়ে বসে রইল, তারপর ধীরে ধীরে খাবার ঘরের দিকে এগিয়ে গেল।

খাবার টেবিলে খাবার সাজানই রয়েছে, মা একপাশে বসে রয়েছেন তারই অপেক্ষায়। মায়ের স্নেহের স্পর্শ ক্ষুধাটা বাড়িয়ে দিয়েছে যেন অকস্মাৎ। খর রৌদ্রের পর শান্ত শীতল ছায়ায় আশ্রয় মিলল প্রদীপের। মায়ের দিকে তাকিয়ে দেখল প্রদীপ। বিষণ্ণ সন্ধ্যার ছায়া নেমেছে মাকে ঘিরে, ক্লান্তি আর প্রচ্ছন্ন অবসাদে মা যেন মুষড়ে পড়েছেন। বাবার কথাও মনে পড়ল সেই সঙ্গে প্রদীপের। ঘরে হয়ত তিনি চুপ করে বসে আছেন অন্ধকারের মধ্যে। তাঁর দৃষ্টিশক্তিটা হারিয়ে যাচ্ছে ধীরে ধীরে। আলোর তাঁর দরকার হয় না। কলকাতার একটা স্কুলের শিক্ষক ছিলেন তিনি। অনেক কষ্টে আর যত্নে মানুষ করেছেন প্রদীপকে। কিন্তু সবচেয়ে দুঃখের কথা প্রদীপের, সে যথেষ্ট যত্ন নিতে পারছে না এই অসহায় লোক দুটোর। মিলি সে দিক থেকে একেবারে হৃদয়হীন। প্রদীপের মা-বাবার ওপর ওর যেন একটা জাত-ক্রোধ জন্মেছে প্রথম থেকেই। নানাভাবে ওদের পীড়ন করে মিলি যেন একটা অজানা আক্রোশের শোধ নেয়।

মা তোমায় একটা কথা বলা দরকার, বলল প্রদীপ।

মা তাকালেন প্রদীপের দিকে জিজ্ঞাসু চোখে।

কিছুদিনের ছুটি নিয়ে ভাবছি বাইরে যাব—মায়ের দিকে তাকাল সে।

বেশ তো বৌমাও—

না সে বোধহয় যাবে না, কিন্তু তোমার আর বাবার কথাই ভাবছি।

কেন আমাদের জন্যে ভাবনা কি...... রান্নার লোকটা রয়েছে, তাছাড়া আমিও ত একেবারে অক্ষম নই—আশ্বাস দিলেন মা।

ইনজেকশান নিয়ে বাবার চোখের কোন উন্নতি হল?

ইনজেকশান ত—কথাটা বলতে গিয়ে থেমে গেলেন মা।

বুঝেছি, ইনজেকশান আনা হয়নি।

বোধহয় প্রেসক্রিপশানটা হারিয়ে গেছে, তুমি কিন্তু বৌমাকে এ নিয়ে কিছু বল না—অনুনয় করলেন মা।

না বলব না, কারণ বলে কিছু লাভ হবে না, তবে ব্যবস্থা একটা আমার করতেই হবে—চেয়ার ছেড়ে উঠে পড়ল প্রদীপ। বসবার ঘরে ঢুকতেই ঝনঝন করে টেলিফোনটা বেজে উঠল। টেলিফোনে শুক্লা সেনের গলা শুনতে পেল। শুক্লা সেন তার পার্সোনাল অ্যাসিস্টান্ট।

বিরক্ত করলাম অসময়ে—বলল, শুক্লা।

না বিরক্ত কি, কি ব্যাপার...

স্টেটমেন্ট কমপ্লিট করেছি, শুক্লার কন্ঠস্বরটা ক্লান্ত।

বাড়ী ফেরেননি এখনও।

না, ভেবেছিলাম তাড়াতাড়ি শেষ করতে পারব কিন্তু কয়েকটা আইটেম উল্টাপাল্টা রয়েছে বলে একটু দেরী হয়ে গেল।

কাল করলেই ত হোত।

না, কাল ফার্স্ট আওয়ারেই হিটলি জেমসের অফিসে পৌঁছন চাই।

আর বার্ন কোম্পানীর টেন্ডারটা?

সেটা বিকেলেই টাইপ করে আপনার সই করিয়ে নিয়েছি।

হ্যাঁ তাইত, একেবারে ভুলে গেছি, লজ্জিত হল প্রদীপ। একটু থেমে তারপর বলল—

আপনি তা হলে বাড়ী চলে যান, অনেক দেরী হয়ে গেছে।

না, এমন আর কি, আর একটা কথা বলছিলাম।

কি বলুন না—

কাল সকালে অফিসে আসতে একটু দেরী হবে, ওখানে ডাঃ চ্যাটার্জি বাবাকে দেখতে আসবেন তাই—থেমে থেমে কথাটা বলল শুক্লা।

কেমন আছেন এখন?

হার্টের রুগী, তার ওপর বয়স হয়েছে, কষ্ট পাচ্ছেন খুব, তবে শেষ পর্যন্ত ডাঃ চ্যাটার্জিকে পাওয়া গেছে তাই এবার বাবাকে বাঁচান গেল।

কাল নেই বা অফিসে এলেন, প্রদীপ বলল।

না, অনেক কাজ পড়ে রয়েছে, তাছাড়া বাড়ীতে বেশীক্ষণ থাকতে আমার ভাল লাগে না—মৃদু কণ্ঠে বলল, শুক্লা।

বেশ, তাহলে তাই আসবেন—আর অন্য কিছু খবর আছে নাকি?

হ্যাঁ আছে, আপনি চলে যাবার পরই বেহালা ফ্যাক্টরীর ম্যানেজার মিস্টার আয়ার ফোনে আপনার খোঁজ করছিলেন।

কেন, আবার কি হল? আয়ারের কালো মুখটা মনে পড়ে গেল প্রদীপের।

ডিজেল ইঞ্জিন কে এল কার্টি ফোর—যেটা চেকোশ্লোভাকিয়া থেকে ইমপোর্ট করা হয়েছে তার প্লাইউড সাফটে কি যেন গোলমাল হয়েছে।

কেন, আলতাফ কি করছে, সে কোথায়?

ওরা স্ট্রাইকের আয়োজন করছে। খবরটা শুনে স্তম্ভিত হয়ে গেল প্রদীপ, ঘুণাক্ষরেও সে একথা অনুমান করতে পারেনি। বেহালা ফ্যাক্টরী স্ট্রাইক করলে সব কটা অর্ডারই পিছিয়ে যাবে। শুধু তাই নয় অন্যান্য ফ্যাক্টরীতে আর অফিস পর্যন্ত তার ছোঁয়াচ লাগতে দেরী হবে না। এর ফলাফল একটিই হবে—প্রচুর লোকসান। কয়েক সেকেন্ড চুপ করে কথাগুলো ভেবে নিল প্রদীপ, তারপর বলল—

ঠিক আছে মিস সেন, আমি আয়ারকে ফোন করছি যা হোক একটা ব্যবস্থা করা যাবে, আপনাকে আর দেরী করিয়ে দোব না গুড নাইট।

আয়ারকে টেলিফোন করে প্রদীপ এইটুকু বুঝল যে স্ট্রাইক বন্ধ করার চেষ্টা হয়ত সফল হবে না। বেহালা ফ্যাক্টরীর ম্যানেজার আয়ারকে প্রদীপ কোনদিনই ভালচোখে দেখতে পারেনি। ওর মুখেচোখে কেমন একটা ধূর্তামির ছাপ আছে যেন। কর্মব্যস্ততার একটা নকল অভিনয় করে অনেক সময়ে, তাছাড়া স্ট্রাইকারদের সঙ্গেও তলে তলে যোগ-সাজস বজায় রাখে—তা না হলে এ খবরটা সে আগেই অনায়াসে জানাতে পারত অফিসে। লোকটা শুধু অপদার্থ নয়, মিটমিটে শয়তান একটা।

দেয়ালে ক্যালেন্ডারটার দিকে নজর পড়ল প্রদীপের। ডেট কার্ডটা পালটান হয়নি। সে নিজেই রোজ এ কাজটা করে। আজ একেবারে ভুলে গিয়েছে। আজ কদিন ধরেই তার কাজে এ ধরনের ত্রুটি থেকে যাচ্ছে। এই ঢিলেমী তার চরিত্রবিরুদ্ধ। তবুও তার অজান্তে এই বিচ্যুতি এসে পড়ছে লক্ষ্য করে নিজের ওপর বিরক্ত হল প্রদীপ।

সিগারেট ধরিয়ে টেবিল থেকে একটা ম্যাগাজিন নিয়ে ডিভানে গিয়ে বসল সে। কয়েক মিনিট ম্যাগাজিনটার পাতায় মনসংযোগ করার চেষ্টা করল প্রদীপ—কিন্তু পাতার ওপর মিলি আর বেহালা ফ্যাক্টরীর ম্যানেজার আয়ারের মুখ দুটোই যেন দেখতে পেল সে—দুটোই তার মনকে বিক্ষিপ্ত আর ভারাক্রান্ত করে তুলল ধীরে ধীরে।

একবার মনে হল বেহালার ফ্যাক্টরীতে গিয়ে অবস্থাটা নিজেই দেখে আসা ভাল কিন্তু ঘড়ির দিকে তাকিয়ে সে ইচ্ছাকে দমন করতে হল। রাত অনেক হয়ে গিয়েছে।

কিছু না করতে পারায় প্রদীপের অস্থিরতা বেড়ে গেল—মনে মনে সে আগামী দিনের প্রোগ্রামটা ছকে নিল। প্রথমেই তাকে সত্যেন করের কাছে যেতে হবে। তাদের ফ্যাক্টরীর ইউনিয়নের সর্বময় কর্তা সে।

যদি সত্যেন করকে বুঝিয়ে দিয়ে বোঝান যায় যে এ সময়ে স্ট্রাইকের ফল কর্মচারী বা কোম্পানী কারুর পক্ষেই মঙ্গলজনক হবে না তাহলে কিছুদিনের জন্যে হয়ত স্ট্রাইকটা ঠেকান সম্ভব হতে পারে।

সিগারেটটা নিভিয়ে বিছানায় শুয়ে পড়ল প্রদীপ। ঘুম আর আসে না, একটা চিন্তা থেকে নিষ্কৃতি পেলে আর একটা চিন্তা এসে ঘিরে ধরে তাকে, শুধু তাই নয় ঘুম না হওয়ার ফলে তার কর্মক্ষমতা পরের দিন কমে যাবে—এই ভেবে ঘুমুতে প্রাণপণ চেষ্টা করে আরও বিপদ ডেকে আনল সে। অনিদ্রার চিন্তাটাই নিদ্রা আরাধনার বিঘ্নকারী হয়ে দাঁড়াল তার অজ্ঞাতে। ধীরে ধীরে তার অবসন্ন মন আর ক্লান্ত মস্তিষ্ককে নিষ্কৃতি দিল নিদ্রাদেবী—কোন ফাঁকে ঘুমিয়ে পড়ল সে।

ভোর হতে না হতেই তৈরী হয়ে নিল প্রদীপ। দেরী করলে চলবে না। সত্যেন করকে ধরতেই হবে তাকে—তাই প্রাতরাশের আশা ত্যাগ করে সে গ্যারেজ থেকে গাড়ীটা বার করে সোজা সত্যেন করের বাড়ীর দিকে রওয়ানা হল।

শুক্লা সেন দরজা খুলে প্রদীপকে দেখে অবাক হয়ে গেল। স্তব্ধ বিস্ময়ে কয়েক মুহূর্ত দাঁড়িয়ে রইল। তারপর সামলে নিয়ে বলল—

আপনি?

হ্যাঁ, সত্যেন করের বাড়ী গেছলাম ফেরার মুখে মনে পড়ল আপনি এখানেই থাকেন তাই—।

আসুন ভেতরে—আহ্বান জানাল শুক্লা।

ভেতরে গিয়ে একটা চেয়ারে বসল প্রদীপ। হঠাৎ শুক্লাদের বাড়ী এসে নিজেই অপ্রস্তুত বোধ করছে সে। কেন যে সে শুক্লা সেনের সঙ্গে দেখা করতে এল তার কোন কারণ খুঁজে পাচ্ছে না তার। শুক্লা সেনই কথা শুরু করল, বলল—

সত্যেন কর কি বললেন।

লোকটা সত্যিই শ্রমিকদের বন্ধু, তাছাড়া ওদের দাবীগুলোও নিতান্ত অগ্রাহ্য করার মত নয়।

শেষ পর্যন্ত কি হল? উৎসুক হল শুক্লা খবরটা জানতে।

স্ট্রাইক স্থগিত রাখতে রাজী হয়েছে সত্যেন কর।

যাক, তাহলে অর্ডারগুলো ক্যানসেল করাতে হবে না।

স্বস্তির নিশ্বাস ফেলল শুক্লা।

না, উপস্থিত কোন ক্রমে ঠেকা দেওয়া গেল কিন্তু ভবিষ্যতের কথা বলা যায় না—স্ট্রাইকের খাঁড়া ঝুলতে থাকবে কতদিন তা বলা শক্ত।

এতক্ষণে শুক্লার মুখের দিকে তাকাল

প্রদীপ। পরিবেশ আর সজ্জার তফাতে শুক্লাকে এখন অন্য রকম লাগছে তার।

শুক্লার পরনে সাদাসিদে শাড়ী একটা। চুলের একটা গুচ্ছ সামনে কপালের ওপর এসে পড়েছে। পারিপাট্যের অভাব কিন্তু সর্বাঙ্গে একটা নরম হাল্কা ভঙ্গিমা লুকিয়ে রয়েছে। সব মিলিয়ে স্নিগ্ধ লালিত্যের ছাপটা স্পষ্ট।

শুক্লা বলল, চলুন বাবার সঙ্গে আলাপ করিয়ে দিই। পাশের ঘরেই বিছানার ওপর বিজনবাবু বসে আছেন, পিছনে কয়েকটা বালিশের ওপর ঠেস দিয়ে। লম্বা হয়ে শুয়ে পড়লে তাঁর হাঁপের কষ্ট হয়। এইভাবে তিনি সর্বক্ষণ বসে থাকেন। প্রদীপ সামনের একটা চেয়ারে গিয়ে বসল। বিজনবাবু তাকে স্বাগত জানিয়ে বললেন—

আপনার কথা শুক্লার কাছে প্রায়ই শুনি—একবার ভেবেছিলাম আপনাকে ডেকে পাঠিয়ে আলাপ করব, তারপর সাত পাঁচ ভেবে আবার পিছিয়ে গেলাম। নিজে গিয়ে যে আলাপ করব সে ক্ষমতাও হারিয়েছি। খুব খারাপ লাগে এভাবে অসুস্থ হয়ে জড়ের মত পড়ে থাকতে। চিরকাল বাইরে বাইরেই কাটিয়েছি, কত জায়গায় যে গেছি এখন তা আর মনেই পড়ে না—জীবনের বেশীর ভাগই কাজ নিয়ে মেতে ছিলাম। কোথা দিয়ে যে সময়টা কেটে গেছে তবে কোন হুঁসই ছিল না আমার—তাই এই বন্দী অবস্থা আরও অসহ্য লাগে।

এখন কেমন আছেন?

ডাঃ চ্যাটার্জীর চিকিৎসার ফল ভাল হয়েছে। পায়ের ফুলো আর হাঁফটা অনেক কমেছে। এই রকমে যতদিন চলে আর কি— হাসলেন বিজনবাবু। হাসিতে কোন [illegible] নেই, দুঃখ নেই, প্রাণখোলা সুন্দর হাসি। একটু চুপ করে বললেন— তাছাড়া আমি কিন্তু নিজেকে অসুস্থ বলে মনে করি না। মৃত্যুর কথা আমার মনেই হয় না। এমন কি তার জন্য প্রস্তুতির কোন প্রয়োজন আছে বলেও আমি ভাবি না। [illegible] যতদিন মেয়াদ আছে টিকিট লাগবে না [illegible] সেকেন্ডেও [illegible] ঝামেলা নেই— আবার হেসে উঠলেন বিজনবাবু—সেই সুন্দর নির্মল হাসি—তারপর প্রদীপের দিকে তাকিয়ে বললেন, নিজের কথাই বলছি শুধু—হ্যাঁ, আপনাদের ফ্যাক্টরীতে শুনছি কি একটা গোলমালের কথা শুনেছিলাম।

হ্যাঁ সেই রকম অবস্থাই দাঁড়িয়েছিল [illegible] শেষ পর্যন্ত ওটা এখনকার মত বন্ধ করা সম্ভব হয়েছে, উত্তর দিল প্রদীপ।

বিজনবাবু বললেন—

এটা একটা খুব বড় বিপদ—শ্রমিকদেরও দেখতে হবে আবার কোম্পানীকেও বাঁচাতে হবে। দুটোকে সামঞ্জস্য করে চলা বড় কঠিন।

তারপর দুজনেই যেন মশগুল হয়ে গেল ডিজেল ইঞ্জিনের আলোচনায়। কিছুক্ষণ আগেই শুক্লা চা নিয়ে এসেছে একটু দেরী, একটু অপেক্ষা করল সে, কিন্তু বেশী অপেক্ষা করলে চলবে না, ঠাণ্ডা হয়ে যাবে চা পরিবেশন করতে হবে। হঠাৎ শুক্লার গলার স্বর শুনে হুঁস হল প্রদীপের। পিছন ফিরে তাকিয়ে দেখল শুক্লা চায়ের ট্রে নিয়ে ঠিক তার পিছনেই দাঁড়িয়ে রয়েছে, অপ্রস্তুত হল সে, তাড়াতাড়ি উঠে শুক্লার হাত থেকে চায়ের ট্রে নিয়ে পাশের টেবিলে রেখে বলল, কিন্তু একি করেছেন। কিছুই নয়, উত্তর দিলেন বিজনবাবু, সামান্য একটু চা, আপনাদের মত লোককে দিতে কুণ্ঠা হয়।

নিমকী, টোস্ট, মিষ্টি আর দু কাপ চা। প্রদীপ সকালে প্রাতরাশ না করেই বেরিয়েছিল সুতরাং সবই নিঃশেষ করল সে। চা পানের পর তার খেয়াল হল অনেকটা দেরী হয়ে গিয়েছে। হাতঘড়িটা দেখে উঠে পড়ল সে, বিজনবাবুকে নমস্কার জানিয়ে বিদায় নিল প্রদীপ।

গাড়ী ড্রাইভ করতে করতে প্রদীপের মনটা খুশীতে ভরে উঠল। সকালে সন্তোষ করের কাছে আপাতত সুফল পেয়েছে, তারপর শুক্লাদের বাড়ীতে যাওয়ার ফলে তার মনে একটা স্নিগ্ধ স্পর্শের ছোঁয়াচ লেগেছে। অকারণে একটা নিবিড় আনন্দ তাকে যেন ঘিরে ধরেছে তার অগোচরে।

হঠাৎ মনে পড়ল শুক্লাদের বাড়ী চা খাওয়ার কথা। ঠিক ও যেমনটি চা খায় তেমনি—একটু কড়া লিকার, দুধ, চিনি কম আর একসঙ্গে দু পেয়ালা। এতটুকুও ব্যতিক্রম হয়নি। আশ্চর্য হল প্রদীপ। শুক্লা কি করে তার এই অভ্যাসটার কথা জানল আর মনেই বা রাখল কেন এই তুচ্ছ কথাটিকে। অকস্মাৎ মনটা হাল্কা হয়ে গিয়েছে প্রদীপের, অনেকদিন এরকম অনুভব করেনি সে।

মিলির গাড়ী যখন চৌরঙ্গীতে পৌঁছল তখন যেন তার সম্বিত ফিরল। এতক্ষণ সে প্রদীপের কথাই চিন্তা করছিল। প্রদীপ যেন তার পথের কাঁটা হয়ে দাঁড়িয়েছে। তার সুখ আর আনন্দকে নির্মূল করার চেষ্টায় সে ওৎ পেতে দাঁড়িয়ে আছে সদাসর্বদা।

ড্রাইভারকে গাড়ীটা ঘুরিয়ে নিয়ে [illegible] রোডের দিকে যেতে বলল সে। প্রদীপের সঙ্গে ইদানীং শুধু তার একটানা বিবাদই চলছে। মনোমালিন্য নয় অভিমানের প্রশ্ন ত নিশ্চয়ই নয়, একটা ক্রমবর্ধমান বিদ্বেষের বিষ তার শরীর আর মনকে অহরহ আচ্ছন্ন করে রেখেছে। প্রদীপকে এখন আর সে সহ্য করতে পারছে না। ওর দিকে তাকাতেও মিলির ঘৃণা হয়। প্রদীপের গলার স্বরে তার বিরক্তি আসে। একটা বিজাতীয় ক্রোধ আর আক্রোশ মিলিকে সর্বদা বিষাক্ত শরের মত বিদ্ধ করছে।

অনেকদিন আগেই মিলি অন্য ঘরে শোবার ব্যবস্থা করে নিয়েছে। এক বিছানা দূরের কথা এক ঘরে থাকতেও তার অসহ্য লাগে। অন্য একটা কারণও আছে— প্রদীপের মত মিলি সাধারণভাবে চলতে রাজী নয়—জীবনকে সে উপভোগ করতে চায় নানাভাবে। মধ্যবিত্ত ঘরের বৌয়ের মত মাসে একটা শাড়ী কিংবা সপ্তাহে একটা করে সিনেমা দেখালেই সে কৃতজ্ঞতায় গলে পড়বে না। এখন তার ভাবতেও আশ্চর্য লাগে প্রদীপকে সে ভালবেসে বিয়ে করেছিল কি করে।

কুমারী জীবনের অবিমৃষ্যকারিতার ফল এখন সে ভুগছে। হয়ত তারই দোষ। কেন সে নিজেকে এত হীন করেছিল। এরচেয়ে ব্যারিস্টার অশোক রায়ও ভাল বলে এখন তার মনে হচ্ছে। অবশ্য শান্তনুর কথা আলাদা। এখন তার অনুতাপ হয় শান্তনুর মত উদার, রসজ্ঞ শিল্পীর জন্যে অপেক্ষা না করে থাকার জন্যে। মনে পড়ে গেল মিলির শান্তনুর সঙ্গে প্রথম পরিচয়ের দিনের কথা।

মিতাই তাকে নিয়ে গিয়েছিল পার্ক স্ট্রীটের হোটেল সাম্বাতে। মিতার সঙ্গে একই স্কুলে মিলি পড়ত একসময়ে। সেই সূত্র ধরে অনেকদিন পর ওদের পুরোন বন্ধুত্বের বন্ধনটা ফিরে পেয়েছিল। মিলি ধারণাই করতে পারেনি যে মিতা হোটেল সাম্বার ক্যাবারে ডান্সার। প্রথমে কথাটা শুনে একটু ধাক্কা লেগেছিল তার। কিন্তু কিছুদিনের মধ্যেই ও ভাবটা কেটে গিয়েছিল। তাছাড়া ওতে দোষই বা কি, মিতা বুঝিয়েছিল ওকে, একটা মেয়ে যদি নিজে স্বাবলম্বী হতে পারে তাতে আপত্তির কি আছে? আজকাল কত মেয়েরাই ত সিনেমায় নামছে, অফিসে কাজ করছে, যে যার স্বাধীন পথ বেছে নিচ্ছে। তাহলে ক্যাবারে ডান্সারের পেশাই বা খারাপ কেন?

শান্তনুর সঙ্গে মিলির প্রথম আলাপ হয়েছিল হোটেল সাম্বাতে। মিতা পরিচয় করিয়ে দেওয়ার পর শান্তনু যখন তার করমর্দন করল তখন মিলির চমক লেগেছিল ওর পোষাক আর চেহারা দেখে। শান্তনুর দীর্ঘ দেহের সঙ্গে ফরসা রংটা অদ্ভুত মানিয়েছে। দাড়ি চিবুক, ব্যাকব্রাশ করা ঈষৎ কোঁচকান চুল, নিখুঁতভাবে তৈরী সার্কস্কিনের জ্যাকেট, ওরস্টেড প্যান্ট আর লাল বো—সব মিলিয়ে তার মনের ওপর একটা স্থায়ী ছাপ রেখে দিল।

প্রথম দর্শনেই ভাল লেগেছিল শান্তনুকে; আরও ভাল লাগল যখন মিলি দেখল শান্তনু ওখানে অর্কেস্ট্রা পরিচালক। পিয়ানো একর্ডিয়ান নিয়ে যখন সে স্টেজের

ওপর দাঁড়িয়ে বিভিন্ন সুরের মোহময় মায়াজাল বিস্তার করে তখন মিলি মুগ্ধ বিস্ময়ে তাকিয়ে থাকে তার দিকে। যৌবনের প্রাণবন্ত প্রতীক যেন শান্তনু—তার পাশে কর্মক্লান্ত, উদাসীন, প্রাণহীন প্রদীপের কথা চিন্তা করতেও লজ্জা হয় মিলির।

গাড়ী এসে মিতার ফ্ল্যাটের সামনে থামতে মিলির চিন্তার জালটা ছিন্ন হল অকস্মাৎ। মিতার সান্ধ্য সাজ শুরু হয়েছে সবে। মাথার চুলটা ক্লিপ সমেত একটা তোয়ালের মধ্যে পাগড়ীর আকারে বাঁধা, মুখে তার একটা জ্বলন্ত সিগারেট। ড্রেসিং টেবিলের আরসি দিয়ে মিলির দিকে তাকিয়ে হেসে মিতা বলল, কি এত সকালে যে?

ভাল লাগছে না বাড়ীতে—পাশের একটা কোচে বসল মিলি।

বল কি। একেবারে বাড়ীই ভাল লাগছে না, বাঁকা ভ্রূ দুটো ওপর দিকে তুলল মিতা, কেন হল কি?

হবার মত আর কিছু বাকী নেই—কিন্তু সেটা বড় কথা নয়। হি ইজ গেটিং অন মাই নার্ভস—আমি আর স্ট্যাণ্ড করতে পারছি না ওকে। তুমি জান না কি অদ্ভুত গেঁয়ো আর আনস্মার্ট ওরা—বিয়ের পরও বুড়ো বাবা-মাকে নিয়ে কেউ যে এ ধরনের মাতামাতি করতে পারে এ তুমি না দেখলে বিশ্বাস করতে পারবে না। তাছাড়া সর্বদাই অফিসের কাজ নিয়ে একটা ব্যস্তভাব, যেন ও না হলে অফিসই চলবে না।

পুরুষ-মানুষের কাজ নিয়ে থাকাই ত ভাল—আড় চোখে তাকিয়ে গালে একটু রুজ দিল মিতা।

পুরুষমানুষ, ঝলসে উঠল মিলি, প্রদীপ ঘোষ পুরুষই নয়।

বল কি—হেসে গড়িয়ে পড়ল মিতা।

না তুমি যা ভাবছ তা নয়, আমি মিন করছি ওর মধ্যে এমন কোন ব্যক্তিত্ব নেই যা আমাকে আকর্ষণ করতে পারে।

তাহলে আকর্ষণীয় লোকটির কাছেই যাও। ......মুখটা লাল হয়ে উঠল মিলির, একটু চুপ করে থেকে তারপর বলল, হ্যাঁ তাই যাব; আর নয়। এখন মনে হচ্ছে প্রদীপ বোসের চেয়ে অশোকদা ভাল।

কিন্তু তুমি তাঁর সম্বন্ধে যে সব গল্প বলেছ তা ভাবলেই আমার হৃৎকম্প হয়। মিতা পাশে রাখা অ্যাসট্রেতে সিগারেটটা টিপে নিভিয়ে দিল।

অশোকাদা নিষ্ঠুর, হয়ত একসেণ্ট্রিক, কিন্তু তবু এরচেয়ে ভাল। অ্যাবনর্মাল বলে ক্ষমা করা যায় অন্তত।

মিতা ভ্রূর ওপরে ছোট্ট ব্রাসটা দিয়ে নিপুণ শিল্পীর তুলির মত টান দিতে লাগল, তারপর আর একটা সিগারেট ধরিয়ে নিল নির্লিপ্তভাবে।

আরও অপরাধ আছে আমার, আমি নাকি খুব বেশী খরচ করি। তুমি বল মিতা এ বাজারে মাসে আটশো টাকায় কি হয়? তাছাড়া, মাসে মাসে আমি বাবার কাছ থেকে টাকা নিই বলে ওঁর আত্মসম্মানে আঘাত লাগছে নাকি।

অ্যাসট্রে থেকে হোল্ডার সমেত সিগারেটে একটা ছোট টান দিল মিতা তারপর মুখটা ছুঁচের মত করে অস্ফুট একটা আওয়াজ করল মাত্র।

জান মিতা, বাবার আমি একমাত্র মেয়ে। শুধু লি রোডের বাড়ীর ভাড়াই মাসে তিন হাজার টাকা।

বিস্ময়সূচক মুখভঙ্গী করে, মুখে একটা ছোট্ট হুইসিলের আওয়াজ করল মিতা তারপর বলল, বাড়ীটা তোমার নামে না কি?

হাসল মিলি, তারপর আড়চোখে তাকিয়ে উত্তর দিল, ওটা ছাড়া আরও তিনটে বাড়ী আমার নামে বাবা লিখে দিয়েছেন।

আছ বেশ, তাছাড়া নগদ টাকা? হাল্কাভাবে প্রশ্ন করল মিতা।

হ্যাঁ সে ত আছেই। পায়ের ওপর পা তুলে মিলি আলস্যের একটা ভঙ্গী করল।

অত টাকা নিয়ে করবে কি, ফাউণ্ডেসান ক্রীমটা মুখে নানা কায়দায় ঘসতে ঘসতে মিতা একবার মিলির দিকে তাকাল, তারপর পাশের টেবিলে রাখা একটা ছোট গ্লাস থেকে এক চুমুক ককটেল খেয়ে বলল, ওই সোকারে আছে তুমিও একটু খাও না।

না আজ আর খাব না, সেদিন আর একটু হলে ধরা পড়ে যেতাম।

এখনও অত ভয়? অবজ্ঞার হাসি হাসল মিতা।

না ভয় নয়, তবে কেমন যেন একটা বাধ বাধ ঠেকে।

ওটা যতদিন থাকবে ততদিন তুমি লাইফ এনজয় করতে পারবে না, সে যাক, তুমি হোটেলে না গিয়ে এখানে এলে যে? মিলির মুখের দিকে একদৃষ্টে তাকিয়ে রইল মিতা প্রতিক্রিয়াটা লক্ষ্য করার জন্যে।

তোমার সঙ্গে পরামর্শ করার জন্যে, ডাইভোর্স সুট ফাইল করব কিনা বুঝতে পারছি না।

যদি ডাইভোর্স না করে চলে যায় তবে আর ও ঝামেলার মধ্যে নাই বা গেলে। ব্যঙ্গের একটা সূক্ষ্ম রেশ রয়েছে মিতার কথায়।

মিস্টার এস গুপ্ত কলকাতার একজন নামজাদা ব্যারিস্টার। তাঁর খ্যাতি শুধু কলকাতার মধ্যে সীমাবদ্ধ নয় ভারতবর্ষের বিভিন্ন শহরে সেটা ছড়িয়ে পড়েছে সুতরাং আয়ের পরিধিও সমানে বেড়ে চলেছে ওই সঙ্গে। তিনি বিপত্নীক সুতরাং তাঁর ইচ্ছে মিলির বিয়ে দিয়ে তাঁর নিজের কাছেই রাখতে। মিলি তাঁর একমাত্র কন্যা সেজন্যে এ ইচ্ছা স্বাভাবিক। তিনি মনে মনে ঠিক করেই রেখেছেন যে তাঁর জুনিয়ার অশোক রায়ের সঙ্গেই মিলির বিয়ে দেবেন। ছেলেটার মাথা আছে কিন্তু একটু একসেণ্ট্রিক ধরনের। প্র্যাকটিসের চেয়ে ব্যায়াম চর্চার দিকেই ঝোঁক বেশী।

অশোকের সঙ্গে মিলির পরিচয় অনেক দিনের, এমন কি এক সময়ে অশোককে সে হিরোর পর্যায়ে ফেলেছিল। ব্যায়ামের ক্ষেত্রে অশোকের নাম ইতিমধ্যে কিছুটা হয়েছে। তার সুগঠিত দেহ আর মাংসপেশী কয়েকটা ব্যায়াম প্রদর্শনীতে বিশেষ প্রশংসা পেয়েছে কয়েকবার। সেদিক থেকে তার কিছুটা খ্যাতি জন্মেছে কিন্তু সেই সঙ্গে দুর্নাম হয়েছে যথেষ্ট—সেটা অবশ্য অন্য কারণে। অশোক রায়ের মেজাজটা ভাল নয়। অল্প কারণে উত্তেজিত হয়ে অপরের ওপর বলপ্রয়োগ করতে তার বাধে না, বরঞ্চ আনন্দ পায় তাতে। এটা তার অভ্যাসে দাঁড়িয়ে গিয়েছে। কিছুদিন আগেই হাওড়া স্টেশনে একটা নামজাদা গুণ্ডার দলকে অশোক রায় একলাই প্রহার দিয়েছে প্রচণ্ডভাবে। বিলেতে থাকার সময়ও এরকম ঘটনা বেশ কয়েকবারই ঘটেছে আর আশ্চর্যের বিষয় প্রত্যেক বারই তার ধারণাটা দৃঢ়ভাবে বদ্ধমূল হয়েছে। অশোক রায়ের অভিমত হল প্রয়োজন বোধে মারের মত আর দাওয়াই নেই। এই স্থূলধর্মী লোকটাকেই কিন্তু একদিন মিলির ভাল লেগেছিল। অশোকের বলিষ্ঠতা, তার অকারণ উচ্ছ্বাস এমন কি ও ধরনের ছেলে-মানুষীও তাকে আকর্ষণ করত দৃঢ়ভাবে। কিছুদিন থেকেই অশোক মিলির মধ্যে একটা পরিবর্তন লক্ষ্য করছিল—মিলি যেন তাকে এড়িয়ে চলছে বলে অশোক বুঝতে পারল। একদিন সে নিজেই এ বিষয়ে প্রশ্ন করল মিলিকে।

মিস্টার গুপ্তর মনোভাব সে জানে। মিস্টার গুপ্ত যে তাকেই জামাতারূপে পেতে চান এ ইঙ্গিত সে বিলেত থেকে আসার পরই পেয়েছে সুতরাং তার ন্যায্য দাবী থেকে সহজে কেউ তাকে হটাতে পারবে না বলেই তার বিশ্বাস।

মিস্টার গুপ্ত মিলির সঙ্গে অশোকের মেলামেশা করার যথেষ্ট সুযোগ করে দিয়েছিলেন, পরস্পরকে যাতে চিনতে পারে ভবিষ্যতের প্রয়োজনে। কিন্তু সেখানেও বিপর্যয় ঘটল।

সেদিন পিকনিক থেকে ফিরে এসে মিলি বাবাকে বলল—

অশোকদা আজ এক কাণ্ড করেছে, বাবা।

আবার কি হল? ব্রিফ থেকে মুখ তুললেন মিস্টার গুপ্ত।

পিকনিক থেকে ফেরার মুখে একটা গাড়ী আমাদের গাড়ীতে একটু ধাক্কা দিয়েছিল, বিশেষ কিছুই হয়নি, মাডগার্ডটা একটু টোল খেয়েছিল মাত্র, তাইতে অশোকদা ওদের ড্রাইভার আর গাড়ীর সকলকে দারুণ মেরেছে—ব্রুট একটা; আমি আর ওর সঙ্গে কোথাও যাব না; তুমি যেন আমায় বল না।

মেয়ের মুখের দিকে তকিয়ে মিস্টার গুপ্ত গম্ভীর হয়ে গেলেন, বললেন, আশ্চর্য। একটা সভ্য, শিক্ষিত লোক যে কি করে এ ধরনের কাজ করতে পারে তা আমি বুঝতেই পারি না। এ অভ্যাস না ছাড়তে পারলে অশোক ভদ্র-সমাজে বাস করবে কি করে।

ভদ্রসমাজে ও কোনদিনই বাস করতে পারবে না সে বিষয়ে তুমি নিশ্চিত থাকতে পার—কোঁচে ঠেসান দিয়ে নিস্তেজ

হয়ে কয়েক মুহূর্ত বসে রইল মিলি, তারপর বলল, আর একটা ঘটনা শোন। পিকনিকে খাবার জন্যে কয়েকটা মুরগী নিয়ে গেছল বাবুর্চি। সেগুলো তাকে না কাটতে দিয়ে অশোকদা নিজের হাতে মুরগীগুলোর গলা এক একটা করে ছিঁড়ে দিয়েছিল। বাবা, তুমি জান না কি বীভৎস দৃশ্য। অশোকদার মুখে যে পৈশাচিক হাসি দেখিছি সে সময় তা আমি কোনদিনই ভুলতে পারব না। জান বাবা, ও পাগল, আবনর্মাল। আমি আর আমার বন্ধুরা সারাদিন জলস্পর্শও করতে পারিনি। ভীত পাংশু মুখে কথাগুলো বলেছিল মিলি। মিস্টার গুপ্ত অনেক কষ্টে শান্ত করেছিলেন মিলিকে।

সাধারণত শিক্ষিত ভদ্রলোক যেমন হয়ে থাকে ব্যারিস্টার অশোক রায় তার ব্যতিক্রম। ছোটবেলায় সে মাকে হারিয়েছিল, তখন তার জ্ঞানই হয়নি। আয়া আর চাকরের কাছে মানুষ সে। বাবার কাছেও ঘেঁষতে পেত না বড় একটা। অশোকের বাবা অদিতি রায় পুরো সাহেব ছিলেন। মেমসাহেব, খানাপিনা স্ফূর্তি ছাড়া কিছু বুঝতেন না তিনি। কোনদিন যদি অশোক তাঁর সামনে গিয়ে পড়ত তাহলে বিরক্ত হতেন তিনি, সেজন্যে আয়া আর চাকরদের শাস্তি পেতে হত দস্তুর মত।

অশোকের শৈশব যেন একটা দুঃস্বপ্নের মত কেটেছে। খাবার সময় খাবার পেয়েছে প্রয়োজন মত, কাপড়-জামারও প্রাচুর্য ছিল। সাহেববাড়ীর তৈরী নানা ধরনের স্যুট আর সাজ-সজ্জা, সাহেবদের স্কুলে গিয়েছে নিয়মিত প্রকাণ্ড গাড়ী চড়ে। সেদিক দিয়ে অশোকের কোন অভাব হয়নি। স্কুলে পড়ার সময় অশোকের মনে হয়েছিল যে সে বড় একলা। তার চারিপাশ যেন একটা বিরাট শূন্যতায় ভরে আছে। কেউ তার আপনজন নেই, তার পাশে দাঁড়াবার মত কাউকে সে খুঁজে পায়নি। সেই কারণে সে মনে মনে ঠিক করে নিয়েছিল যে তাকে নিজের পায়ে দাঁড়াতে হবে। কেউ তাকে সাহায্য করবে না। এই অসহায় অবস্থা তার শিশু মনকে সর্বদা সজাগ করে রেখেছিল প্রথম থেকেই।

শিশুকাল থেকে স্নেহের অভাবে অশোকের দৃষ্টিভঙ্গী অস্বাভাবিক হয়ে দাঁড়াল। সে ঠিক করে নিল মানুষগুলো সবাই নিষ্ঠুর, সবাই তার শত্রু আর তাদের শায়েস্তা রাখতে শক্তির প্রয়োজন হয় পদে পদে। সেইজন্যে কৈশোর থেকেই মনের সঙ্গে দেহকেও গড়ে তুলতে শুরু করল শক্তভাবে।

অশোক রায় যখন কলেজে পড়ে তখনই তার ব্যায়ামবীর হিসেবে কিছুটা নাম হয়েছে। সহপাঠিরা তাকে কিছুটা সমীহ করত, ভয়ও করত হয়ত। কিন্তু ভাল কেউ বাসত না। তাতে অবশ্য অশোক রায়ের কিছু এসে যেত না।

এভাবে অশোক সুনাম পেল না বটে কিন্তু নিজেকে মনের মত গড়ে তুলল অনায়াসে।

এতদিনে বাবা বৃদ্ধ হয়েছেন সুতরাং মতি-গতিও পালটেছে। তাতে অশোকের কিছুটা সুবিধে হয়েছে। কিছু কিছু করে শোধ তুলতে শুরু করেছে সে। কলেজের পড়া শেষ হওয়ার পর একদিন অশোককে তিনি জিজ্ঞেস করলেন, এবার কি করবে ঠিক করেছে—

আমার কথার কোন দাম আছে নাকি? উত্তর দিল অশোক।

এখন তুমি বড় হয়েছে, তোমার মতের দাম আছে বৈকি।

তাহলে আপনাকেই অনুসরণ করব। উত্তর দিতে দেরী হল না তার।

তার মানে?

তার মানে আমার বয়সে আপনি যা করতেন তাই করব। নাচ-গান পান-ভোজন মেমসাহেব, বাইজী সব।

অশোক—চীৎকার করে উঠেছিলেন বাবা।

শুনতে খুব খারাপ লাগছে? সত্যি কথাগুলো শুনে অত অস্থির হয়ে পড়লেন কেন?

আমার সামনে দাঁড়িয়ে এসব কথা উচ্চারণ করতে তোমার কি এতটুকুও লজ্জা করে না?

বিন্দুমাত্র না, যখন একটা শিশুর সামনে ওগুলো করতেন তখন আপনার কি লজ্জা করত? তখন কি আপনার মনে হত একদিন এই শিশুটাই বড় হয়ে উঠবে, যতই তাকে স্নেহ আর যত্ন থেকে বঞ্চিত করা হোক না কেন। ধীরে ধীরে প্রত্যেক কথাটা স্পষ্ট করে বলেছিল অশোক।

তুমি স্নেহ যত্ন পাওনি বলতে চাও—দুর্বল কণ্ঠে প্রতিবাদ করলেন অদিতিবাবু।

হ্যাঁ পেয়েছি তবে সেগুলো নিজের লোক কেউ দেয়নি; পেয়েছি মাইনে করা আয়া আর বাবুর্চির কাছ থেকে।

তুমি ভুলে গেছ অশোক, তোমার মা তোমার ছোটবেলাতেই মারা গেছলেন। এখন মনে হচ্ছে তোমার একজন সৎমা থাকলে বোধহয় ভাল হোত, জব্দ হতে তুমি। আমার এ স্বার্থত্যাগটুকুও তোমার চোখে পড়েনি বোধহয়।

পড়েছে বৈকি, উত্তর দিল সঙ্গে সঙ্গে, তবে ওটা স্বার্থত্যাগ নিশ্চয়ই নয়। দ্বিতীয়বার বিয়ে করলে আপনি অত নিত্য নতুন আনন্দ ভোগ করতে পারতেন কি? আর আমার সৎমা থাকলে অনেক ভাল হত, স্নেহ-যত্ন না দিন অন্তত সংসারের পরিচ্ছন্নতাটা বজায় রাখতেন তিনি। একটা শিশু মনের অকালমৃত্যু হত না।

তুমি বোধহয় ভুলে গেছ অশোক, আমি ইচ্ছে করলেই তোমাকে ত্যাজ্যপুত্র করতে পারি, রাগে কণ্ঠস্বর কেঁপে উঠল অদিতিবাবুর।

তা কি করে করবেন, আমি যে অনেক-দিন আগেই আপনাকে ত্যাগ করেছি, ও আর আমার গায়ে লাগবে না। তাছাড়া আমার মাতামহের সম্পত্তিই আমার পক্ষে যথেষ্ট।

এ ধরনের কথা পিতা-পুত্রের মধ্যে প্রায়ই হোত, এতে আনন্দ পেত অশোক, বিন্দুমাত্র দ্বিধা হত না বার বার বাবাকে আঘাত করতে। এই নিষ্ঠুরতা তার চরিত্রের মধ্যে শিকড় গেড়ে বসেছিল দৃঢ়ভাবে। যৌবনের সঙ্গে সঙ্গে অশোক রায় সব রকম দুর্বলতা ঘৃণা করতে শিখেছিল একান্ত মনে। তার শিশুজীবনের অসহায় অবস্থার স্মৃতিই হয়ত তাকে এদিকে চালিত করে-ছিল তার নিজের অজ্ঞাতে।

সেদিন সে নিজেই তার ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে মনস্থির করে বাবাকে বলল—

ব্যারিস্টারী পড়তে আমি বিলেতে যাব ঠিক করেছি।

একেবারে ঠিক করে ফেলেছ, আমার সঙ্গে পরামর্শ করারও প্রয়োজন মনে করনি—অবাক হয়ে তাকালেন অদিতিবাবু।

না, আপনার সঙ্গে পরামর্শ করে লাভ কি? আমার ভাল আপনি কোনদিনই চাননি।

প্রথম থেকে তোমায় যত্ন করে লেখা-পড়া শেখার ব্যবস্থা না করলে তাহলে কি বিলেত গিয়ে ব্যারিস্টারী পড়ার সুযোগ কোনদিন হোত?

আপনার নিজের স্বার্থের খাতিরেই সেটা করেছিলেন আপনি।

আমার স্বার্থ—

হ্যাঁ আপনার স্বার্থ। আপনার কাশ্মিরী জামিয়ার, গোয়ানীজ কুক বা মিস স্ট্যানহোপের মত ওটাও একটা দেখাবার জিনিষ ছিল আপনার। লোককে জানিয়ে বা দেখিয়ে আনন্দ পেতেন, আত্মতুষ্টি হোত নিশ্চয়ই। আর তাছাড়া সন্তানকে লেখাপড়া না শেখালে, তাকে চকচকে জামা-কাপড় পরিয়ে পাঁচজনের সামনে তুলে না ধরলে সমাজে একটু ছোট হোতেন নাকি?

অশোক, তোমার কি মন বলে কোন পদার্থ নেই, তোমার কি দয়া বলে কোন জিনিস নেই—কাকুতি করেছিলেন অদিত-বাবু।

না নেই, দয়া, স্নেহ, মমতা ওসব ত চীপ সেন্টিমেন্ট, মানুষকে দুর্বল করে দেয় অনর্থক। ও শিক্ষা আপনার কাছেই পেয়েছি। স্কুলের বন্ধুদের কাছে শুনতাম, তাদের মা-বাবার স্নেহের কথা, ভালবাসা আর আবদারের ছোট ছোট গল্প। তখন মনে হত ওরা হয়ত মিছে কথা বলছে, বাবাকেও ভয় করতে হয়, দেখলেই পালিয়ে যেতে হয় লুকিয়ে, তার কাছে আবার ওসব পায় কি করে ওরা। বাজে কথা থাক, সেন্টি-মেন্টাল ট্র্যাসগুলো নাটকে শুনতেই ভাল লাগে। আমি আপনার কাছে মায়ের গয়না-গুলো চাইতে এসেছি।

গয়না নেই।

কি করলেন, মিস স্ট্যানহোপকে দান করেছেন না বাইজীদের বিলিয়েছেন।

সে কৈফিয়ৎ আমি তোমায় দেব না, চীৎকার করে উঠেছিলেন অদিতিবাবু।

তা দিতে হবে বৈকি, আপনার নিজের জিনিস হলে আলাদা কথা ছিল কিন্তু এ আমার মায়ের নিজের গয়না তাঁর বাবা

তাঁকে বিয়ের সময় যৌতুক দিয়েছিলেন। এগুলো আপনার ভোগ-বিলাসে লাগানোর কথা ছিল না।

অশোক আরও নিষ্ঠুর আরও কঠিন হয়ে উঠল। সেইসংগে তার মনটা বিকৃত হয়ে এল ধীরে ধীরে। বিলেতে থাকার সময় বাবার মৃত্যুসংবাদ পেয়ে পরম নিশ্চিন্ত হয়েছিল সে।

অশোক রায় যখন দেখল মিলি প্রদীপকে বিয়ে করাই স্থির করেছে তখন সে নিজেকে অকস্মাৎ গুটিয়ে নিল শামুকের মত। মিলিকে সে এড়িয়ে চলত। মিলির সম্বন্ধে সব কৌতূহল যেন নিঃশেষ হয়ে গিয়েছিল তার কাছে। মিলিও পারতপক্ষে তার সামনে আসত না। কেমন যেন অজানা একটা ভয়ে তার বুক কেঁপে উঠত অশোকের কথা মনে পড়লে। কিন্তু মাঝে মাঝে কৌতূহলও হোত। অনেকদিন বাস করার পর ছেড়ে-আসা পুরোন বাড়ীর সামনে গিয়ে পড়লে ভেতরটা আবার দেখার জন্যে যেমন একটা অদম্য কৌতূহল হয় অনেকটা সেই ধরনের কৌতূহল জাগত মিলির মনে। তাই হনিমুন থেকে ফেরার পর অশোককে সামনে দেখে মিলি আর নিজেকে দমন করতে পারল না, জিজ্ঞেস করল—

অশোকদা, তুমি আর আমার সংগে কথাই বল না, কেন বলত?

খুব সহজ উত্তর, কারণ তোমার সংগে কথা বলতে ইচ্ছে করে না।

কিন্তু আমার বিয়ের আগে ত করত।

তখন তুমি ব্যবসায় নামনি তাই কথা বলার যোগ্য ছিলে।

তার মানে, চীৎকার করে উঠেছিল মিলি, তুমি আমায় অপমান করছ অশোকদা।

অপমান কোথায়, এ ত সত্যি কথা, বাই নেচার তুমি একটা চীপ্ ফ্লার্ট—।

আর তুমি, তুমি কি, নীচ পশু, অ্যাবনর্মাল স্কাউণ্ড্রেল।

হ্যাঁ, আমি অ্যাবনর্মাল জানি কিন্তু মিলি তুমিও ইকোয়ালি অ্যাবনর্মাল, তুমি সেটা স্বীকার কর না আর আমি করি, এই তফাৎ মাত্র! এরপর দেখবে প্রদীপ বোসকেও কিছুদিন পরে আর ভাল লাগবে না, আর একজনকে রাস্তা থেকে পিক-আপ করবে হয়ত।

তাড়াতাড়ি চলে গিয়েছিল মিলি। তার হিস্টিরিয়া প্রদীপ বোসের মত অশোক রায়কে কাবু করতে পারে না, একথা সে জানে।

•

বাবার সংগে দেখা করে মিলি যখন হোটেল সাম্বায় ফিরে এল তখন সব সিটগুলোই প্রায় ভর্তি। শেষ পর্যন্ত ডায়াসের কাছেই একটা চেয়ার পেয়ে গেল সে।

অর্কেস্ট্রা তখন শুরু হয়ে গিয়েছে। শান্তনু একবার তার দিকে তাকিয়ে হাসল মাত্র। তার একর্ডিয়ানের তীক্ষ্ণ সুরটা অকস্মাৎ জোরের সংগে বেজে উঠল সব সুরকে ছাপিয়ে। একটা পপ সং-এর সুর বাজাচ্ছে শান্তনু। সুরটা খুব পরিচিত মিলির কাছে। মিতার ফ্ল্যাটে রেকর্ড-প্লেয়ারে এই সুরটা অনেকবারই শুনেছে সে। বার বার প্রথম লাইনটাই বাজাচ্ছে শান্তনু। এটা তার ইচ্ছাকৃত, গানের প্রথম লাইনের ভালবাসার কথাগুলো মিলির মুখস্থ হয়ে গিয়েছে। তাকে উদ্দেশ্য করেই যে শান্তনু এই কলিটা বার বার বাজাচ্ছে একথা বুঝে মুখটা আরক্ত হয়ে উঠল তার। হাসিমুখে একদৃষ্টে সে তাকিয়ে রইল শান্তনুর দিকে।

কিছুক্ষণ পরেই অর্কেস্ট্রার বাজনা থেমে গেল, শুধু পিয়ানোর সুরটা জেগে রইল আবহাওয়াকে বজায় রাখতে। শান্তনু দূর থেকে একবার ইসারা করল তাকে। পাশের দরজার দিকে এগিয়ে গেল মিলি। করিডোর পার হয়ে উন্মুক্ত বারান্দার এক কোণে গিয়ে বসল ওরা। জায়গাটার চতুর্দিকে গাছ আর ফুলের সমারোহ। স্তিমিত আলোর আভা জায়গাটাকে রহস্যঘন ছায়াঘেরা কুঞ্জের কথা মনে করিয়ে দেয়। মিলি শান্তনুর দিকে তাকিয়ে জিজ্ঞেস করল—

কি, এত গম্ভীর কেন, কি হয়েছে?

ভাল লাগছে না আর এসব, উদাসীনের মত বলল শান্তনু,—শুধু দাসত্বের যন্ত্রণা।

ঠিক বুঝলাম না, জিজ্ঞাসু চোখে তাকাল মিলি।

আমি এখানের চাকরীর কথা বলছি, ওরা ভেবেছে শিল্পীকে সহজেই একসপ্লয়েট করা যায়। তাছাড়া ওদের ধারণা ব্যবসা-বুদ্ধি নাকি আমাদের থাকতে নেই। জান মিলি, এটা একটা খুব ভুল ধারণা, কারণ ব্যবসা আমি ভালই বুঝি বিশেষত হোটেলের ব্যবসা।

তাহ'লে এতদিন চুপ করে বসেছিলে

ভুল করছ মিলি, হোটেল চালাবার মত ব্যবসা-বুদ্ধি হয়ত আছে কিন্তু—থেমে গেল শান্তনু।

টাকার কথা বলছ—উৎসাহ দেখায় মিলি।

না তোমায় বলিনি, তবে মাঝে মাঝে ভাবি বৈকি, ম্লান হাসল শান্তনু। অভিমান হল মিলির। বলল, আমার টাকার কথা বলবে না তা আমি জানি। আপনার লোক যে আমি নই, সে কথাটা অত স্পষ্ট ভাষায় নাই বা জানালে।

এই দেখ, তুমি রাগ করলে শুধু শুধু। শান্তনু বিব্রতভাবে কথাটা ঢাকা দিতে চেষ্টা করে বলল, তুমি আজকাল যেন অকারণে রেগে উঠছ মিলি।

আমার জায়গায় তুমি এলে কি করতে তাই ভাবছি, কথাগুলো বলতে গলা কেঁপে উঠল মিলির, নিজের মনের সংগে অহরহ যুদ্ধ করলে মানুষ পাগল হয়ে যায় সেকথা বোধহয় জান।

জানি, কিন্তু তুমি কেন নিজের মনের সংগে যুদ্ধ করবে মিলি? মানুষ ভুল করে অনেক কিছু করে ফেলে, সে কারণে হয়ত কষ্টভোগ করতে হয়, কিন্তু তাতে ভেঙে পড়লে চলবে কেন, বিশেষত উপায় যখন থাকে হাতের কাছে। একটু চুপ করে মিলি বলল, তুমি ঠিকই বলেছ শান্তনু, উপায়টা এবার কাজে লাগাব ঠিক করেছি।

আর একটু ভেবে দেখবে না, থেমে থেমে কথাটা বলল শান্তনু।

না আর ভাববার দরকার নেই, অবশ্য তোমার ভাববার জন্যে সময় চাও ত অন্য কথা।

না আমার অন্য কিছু ভাববার দরকার নেই, কিন্তু মিলি আমার দারিদ্র্যের কথাটা ভুলে যেও না, অন্যমনস্ক সুরে কথাটা বলল শান্তনু।

না ভুলিনি, ও প্রশ্নটা কিন্তু এখানে উঠবে না, উঠতে পারে না। কারণটা সম্বন্ধে ডিসকাসানেরও কোন প্রয়োজন দেখছি না।

আড়চোখে শান্তনুর দিকে তাকাল মিলি।

মিলি তুমি এখনও রেগে আছ। মিলির হাতের ওপর একটা আঙুল দিয়ে তুলির মত কয়েকবার হাল্কাভাবে বুলিয়ে শান্তনু বলল, বেশ, তোমার ওপরই আমি সব ছেড়ে দিচ্ছি, তুমি যা করবে তাই হবে। হয়েছে এবার?

একথাটা আগে বললেই হোত, উঠে দাঁড়াল মিলি, টেবিলের ওপর থেকে অদ্ভুত আকৃতির ব্যাগটা তুলে নিয়ে বলল, মনে আছে, কাল সন্ধ্যায় মিতার ওখানে?

আমার মনে থাকবে, উত্তর দিল শান্তনু, তুমি ভুলে যেও না যেন।

(ক্রমশঃ)
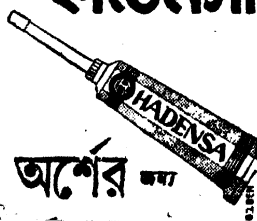
॥ আলোচনা ॥

মুদ্রণ-শিল্পে পথিকৃৎ

সম্প্রতি অমৃতের ত্রয়োদশ সংখ্যায় (২১শে শ্রাবণ ১৩৭৪) প্রতিধ্বনি বিভাগে 'মুদ্রাঙ্কন' পত্রিকার সূচনা সংখ্যা থেকে 'মুদ্রণ-শিল্পে পথিকৃৎ' শীর্ষক প্রবন্ধাংশ উদ্ধৃত হয়েছে। উল্লিখিত প্রবন্ধাংশে কিছু কিছু ভ্রমাত্মক উক্তি থাকায় এবং জোহান গুটেনবার্গের কৃতিত্বের মূলীভূত বিষয়টি উত্থাপন করতে অসমর্থ হওয়ায় এ সম্বন্ধে কিছু আলোচনার অবকাশ আছে বলে মনে হয়। বিশেষতঃ আধুনিক মুদ্রণ-শিল্পের পথিকৃৎ প্রবর্তকদের কৃতিত্বের মূল্যায়ন ও স্থান নিরূপণের ঐতিহাসিক প্রয়োজন থাকায় এই আলোচনা বোধ হয় অপ্রাসঙ্গিক হবে না।

আলোচ্য প্রবন্ধাংশে বলা হয়েছে,— "একথা মনে করিলে ভুল হইবে যে……… গুটেনবার্গ মুদ্রণ যন্ত্রের আবিষ্কার করিয়াছেন। ……জোহান গুটেনবার্গ টাইপের আবিষ্কারক এবং প্রথম একক টাইপে মুদ্রিত বই-এর প্রথম মুদ্রক। …তিনি প্রথম কারিগরী নিয়ম অনুযায়ী ছাপা কালি ও ধাতু-নির্মিত টাইপের সমন্বয় ঘটান। উহার পূর্বে ইয়োরোপে কাঠের টাইপে কাঠের মুদ্রাযন্ত্রে ছাপা হইত…। গুটেনবার্গ ধাতু-নির্মিত টাইপের সহিত যে কালি ব্যবহার করিয়াছিলেন, তাহা তাঁহারই আবিষ্কার।………" বস্তুতঃ এই কয়টি কথাতেই গুটেনবার্গের কৃতিত্বের বর্ণনার প্রয়াস হয়েছে।

প্রথম মুদ্রণ-যন্ত্রের কথা ধরা যাক। বলা হয়েছে গুটেনবার্গ এটি আবিষ্কার করেননি, তাঁর সময়ের পূর্ব থেকেই ইয়োরোপে কাঠের ব্লকে কাঠের মুদ্রাযন্ত্রে ছাপা হত। কাঠের ব্লকে কিছু কিছু চিত্রাদি, যেমন তাস, খৃষ্টীয় সাধু সন্তদের ছবি বা ছোটখাটো স্তোত্রাদি ইয়োরোপে দ্বাদশ শতাব্দী থেকেই ছাপা হচ্ছিল, যদিও এর তেমন ব্যাপক প্রচলন ছিল না। সে সময়ে ইয়োরোপে ক্যালিগ্রাফি বা সুন্দর হস্তাক্ষর-লিখিত পুস্তকেরই প্রচলন ছিল। বই ছাপার জন্য সেখানে শুধু ব্লকের ব্যবহার হয়েছে এমন কোন দৃষ্টান্তও কোন ইতিহাসে উল্লেখ নেই। ব্লক প্রথায় যে সামান্য ছাপার কাজ হোত তাতে যে কোন যন্ত্র বা প্রেস ব্যবহার হোত, তেমন উল্লেখও পাওয়া যায় না। নানা ধরনের প্রেস নানা কাজে ব্যবহার হোত ; যেমন পনীর তৈরী করার প্রেস, আঙুর পেষার প্রেস, ইত্যাদি ছাপার ব্যাপারে উল্লেখযোগ্য জিনিষ ছিল ব্লক, যা থেকে ছাপা হবে। কাগজে চাপ দেওয়া হাতেই হোক বা তখনকার প্রচলিত কোন প্রেস যন্ত্রেই হোক সেটা খুব বড় কথা ছিল না। প্রেস যন্ত্র তাই গুটেনবার্গের মাথাব্যথার কারণ ছিল না। অনুমান করা হয়, তিনিও তেমনি কোন যন্ত্রকে হয়তো বা একটু-আধটু অদলবদল করে ছাপার কাজে লাগিয়েছিলেন।

ব্লক থেকে ছাপায় যেমন সত্যকার গুরুত্ব ব্লকে, প্রেস যন্ত্রে নয়, তেমনি পৃথক টাইপ থেকে ছাপায় কেন্দ্রবিন্দুটি অক্ষর নির্মাণ ও 'অক্ষর-শয্যার' (type-bed or forme) উপর নিবদ্ধ। বলা হয়েছে গুটেনবার্গ টাইপের আবিষ্কারক এবং প্রথম একক টাইপে মুদ্রিত বই-এর প্রথম মুদ্রক। এই 'টাইপের আবিষ্কারক' কথাটির অর্থ কি? যদি আবিষ্কারের কথা একক টাইপ প্রসঙ্গে ব্যবহার করা হয়ে থাকে তবে তার ঐতিহাসিক সত্যতা বিচার করে দেখা কর্তব্য। কিন্তু একক টাইপ সম্বন্ধে সাধারণ পাঠকের ধারণা স্পষ্ট হওয়া দরকার।

কাঠের বা কোন ধাতু ফলকে বিপরীত মুখী (উল্টো করা) অক্ষরগুলি খোদাই করলে তবেই ছাপার সময়ে সেগুলি সোজা হয়ে ছাপা হবে। খোদাই করার অর্থ হল অক্ষরগুলি বা অন্য যে অংশ ছাপা হবে সেগুলি ঠিক রেখে ফলকের বাকী অংশ খোদাই করে নীচু করে দেওয়া। এতে মুদ্রিতব্য অংশটুকুই মাত্র উঁচু হয়ে থাকে, যাতে ওপর থেকে কালি-রং লাগালে শুধু ওতেই লাগবে এবং কাগজের উপর চাপলে সেই অংশটুকুরই ছাপ পড়বে। এই হল ছাপার রিলিফ পদ্ধতি। যাই হোক ব্লক-মুদ্রণে অক্ষরগুলি সবই একই ফলকের ভিত্তের উপর গ্রথিত থাকে এবং ফলক থেকে বিচ্ছিন্ন করা যায় না। ঐ গ্রথিত অক্ষরগুলি শুধু একটি বিষয় মুদ্রণেই সীমাবদ্ধ থাকে। কিন্তু অক্ষরগুলিকে বিচ্ছিন্ন করা সম্ভব হলে অপর একটি বিষয় মুদ্রণের জন্য শব্দ-যোজনায় তাদের ব্যবহার সম্ভব হোত। এখন একক টাইপ (ইংরাজীতে movable type বা চল-অক্ষর) হল তাই যা পরস্পর বিচ্ছিন্ন হয়ে নতুন ভিত্তিতে এবং নতুন আকারে গ্রথিত হয়ে পুনরায় ব্যবহৃত হতে পারে, যেমন আজকের দিনের ধাতুনির্মিত হরফগুলি। ছাপার শেষে আবার তাদের সাজিয়ে রাখা সম্ভব নতুন শব্দযোজনায় ব্যবহারের জন্য।

গুটেনবার্গ কি এই পরস্পর-বিচ্ছিন্ন একক চল-অক্ষর আবিষ্কার করেছিলেন? মুদ্রণ-শিল্পের প্রবর্তন সম্বন্ধে অজস্র পুস্তক রচিত ও প্রকাশিত হয়েছে, বহু তর্ক-বিতর্কেরও অবতারণা হয়েছে। আমেরিকায় প্রকাশিত একটি বইয়ে এ সম্বন্ধে প্রায় ৩০০০ প্রকাশিত বইয়ের তালিকা প্রকাশিত হয়েছে।(১) তবু বর্তমানে এ সম্বন্ধে মোটামুটি একটা সর্বসম্মত মত সারা পৃথিবীতেই গৃহীত হয়েছে। তাতে দেখা যায় চীনদেশে খৃঃ ১০৪১—১০৪৯ অব্দের মধ্যে অনেক পি-সং একক অক্ষর নির্মাণ করেছিলেন পোড়ামাটির সাহায্যে অথবা মাটি দিয়ে তৈরী করে পুড়িয়ে শক্ত করে নিয়ে। ১৩০০ খৃষ্টাব্দ পর্যন্ত ঐ জাতীয় হরফে কিছু কিছু কাজ হয়েছে এমন নিদর্শন পাওয়া গেছে। এই একক মুদ্রাক্ষর জাপানে ও কোরিয়ায় প্রসার লাভ করে। ১২৪১ খৃষ্টাব্দে কোরিয়ায় ধাতু-নির্মিত একক অক্ষর সৃষ্টি হয়। তারিখযুক্ত একখানি কোরীয় পুস্তকে এরূপ উল্লেখ আছে যে ১৩৭৭ খৃষ্টাব্দের সমকালীন ধাতু-নির্মিত একক অক্ষরে গ্রন্থখানি ছাপা। অক্ষর তৈরী ও ছাপার কাজে উৎসাহদানের জন্য কোরীয় সরকার ১৪০৩ খৃষ্টাব্দে একটি হরফ ঢালাইয়ের কারখানা নির্মাণ করান এবং পরবর্তী শতাব্দীর অধিককালে দশটি হরফের সাট (fount) প্রস্তুত হয়। (২)

গুটেনবার্গ পঞ্চদশ শতাব্দীর মধ্যভাগে তাঁর হরফ তৈরী ও মুদ্রণ আরম্ভ করেন। এর দু'শ বৎসর পূর্বে কোরিয়ায় ধাতব একক অক্ষর সৃষ্ট হয় এবং আরও দু'শ বৎসর পূর্বে মাটির তৈরি একক অক্ষর আবির্ভূত হয় চীনে। ১৩৭৭ খৃষ্টাব্দে কোরিয়ায় ধাতু-নির্মিত একক অক্ষরে মুদ্রিত পুস্তক আজও প্রত্নশালায় রক্ষিত। তাহলে গুটেনবার্গকে টাইপের আবিষ্কারক বা প্রথম একক টাইপে মুদ্রিত বইয়ের প্রথম মুদ্রক এই দুয়ের কোন গৌরবেই ভূষিত করা অসম্ভব।

যদি এরূপ যুক্তি বিস্তার করা যায় যে চীনে বা কোরিয়ায় প্রবর্তিত ও প্রচলিত মুদ্রণপদ্ধতি ইয়োরোপে অপরিজ্ঞাত ছিল। চীন ও কোরিয়ার অক্ষর-মুদ্রণ প্রথা ক্রমে অবলুপ্ত হয় এবং বর্তমান মুদ্রণ-শিল্পের সূচনা গুটেনবার্গের সময় থেকেই, তাহলে বিবেচনা করে দেখা উচিত গুটেনবার্গ কি আবিষ্কার করেছিলেন এবং কেন আজ তাঁর নাম আধুনিক মুদ্রণ-শিল্পের জনকরূপে কৃতজ্ঞতার সংগে স্মরণীয়।

কিন্তু একথা কি স্বতঃই স্বীকার্য যে চীন-কোরিয়ার মুদ্রণ প্রথার সংবাদ কোন সূত্রেই ইয়োরোপীয় ভূখণ্ডে প্রবেশ করেনি? প্রাচ্যের ফলক থেকে মুদ্রণ এবং প্রতীচ্যে তার আবির্ভাব কি সম্পূর্ণই অসংলগ্ন ছিল? যে স্থল-বাণিজ্য-পথে কাগজ শিল্প বহু শতাব্দী বিলম্ব হলেও মধ্যপ্রাচ্য হয়ে ইয়োরোপে প্রবেশ করে সে পথ কি মুদ্রণ-প্রথার জন্য সম্পূর্ণই অবরুদ্ধ ছিল? যাই হোক যদি ধরেও নেওয়া যায় যে ইয়োরোপে মুদ্রণ-শিল্পের আবির্ভাবের সঙ্গে প্রাচ্যের শিল্পের কোন সম্বন্ধ ছিল না, তবে কি গুটেনবার্গের পূর্বে কেউ সে চেষ্টা করেননি? ফলক-মুদ্রণের স্বাভাবিক উত্তর-পথে যেমন প্রাচ্যে একক হরফের সৃষ্টি,

(1) D. C. McMurtrie: Invention of Printing: A Bibliography (Chicago, 1942)

(2) Encyclopaedia Britannica—Vol. XVII Carter—Invention of Printing in China.

ইয়োরোপেও কি তেমন মধ্যবর্তী প্রচেষ্টা ছিল না? ফলক-মুদ্রণ ও গুটেনবার্গের ছাঁচে ঢালা ধাতব হরফ—এ দুয়ের মধ্যবর্তী কোন অধ্যায় না থাকলে গুটেনবার্গের ক্রিয়াকলাপ অত্যাশ্চর্য মনে হতে পারে।

দেখা যায় গুটেনবার্গের পূর্বে হল্যাণ্ডে কিছু কিছু একক হরফে মুদ্রণ হয়েছিল এবং এ ব্যাপারে কোস্টার নামে এক ব্যক্তির নাম উদ্ভাবনকারী বলে দাবী করা হয়। হল্যাণ্ড মুদ্রিত গুটেনবার্গ-পূর্ব কালের বইও প্রমাণার্থে উত্থাপিত করা হয়েছে।(৩) বিশেষজ্ঞদের মতে হল্যাণ্ডের সে সময়ের মুদ্রণ-শিল্প ছিল হাতে-তৈরী হরফের উপর নির্ভরশীল। কিন্তু হাতে-তৈরী হরফ (কাঠের বা ধাতুর যাই হোক) সাজিয়ে মুদ্রিতব্য বিষয় রচনা করা দুরূহ, কেননা হাতে তৈরী এই অক্ষরগুলির সব কয়টি সর্বতোভাবে সমান হওয়া সম্ভব নয়। প্রথমতঃ উচ্চতায় এগুলি সমান হওয়া দরকার, কোনটা নীচু হলে কাগজে তার ছাপ পড়বে না। আকারে আয়তনেও এদের সমান হওয়া চাই। এবং সবচেয়ে বড় কথা গায়ের পাশ মসৃণ ও সমান না হলে পরবর্তী অক্ষর সঠিকভাবে বসবে না। তাছাড়া অক্ষরগুলি সাজিয়ে ছাপার জন্য একত্র সংলগ্ন করে রাখা প্রয়োজন যাতে ছাপার সময়ে বিচ্ছিন্ন হয়ে না যায়। এই প্রয়োজনীয় গুণগুলি হল্যাণ্ডের অক্ষরে সম্ভব হয়নি বলেই সেখানকার মুদ্রণ-শিল্প উন্নতি লাভ করেনি বা অন্যত্র প্রসারিত হয়নি। এবং এই গুণগুলি আরোপ করতে পেরেছিলেন বলেই গুটেনবার্গ মুদ্রণ কার্যে সফলতা লাভ করেন এবং তার পর থেকেই মুদ্রণ-শিল্প বাস্তবসম্মত একটি প্রচেষ্টা-রূপে সর্বত্র স্বীকৃত হয়ে ক্রমে বিস্তার লাভ করে। এই কৃতিত্বের জন্যই আধুনিক মুদ্রণ-শিল্পের জনকরূপে গুটেনবার্গ স্বীকৃত হওয়ার দাবী করতে পারেন।

গুটেনবার্গ মুদ্রণ-শিল্পের আবিষ্কারক বা প্রবর্তক এই উক্তি সম্বন্ধে একটি মত: "ইয়োরোপে ধাতব চল-অক্ষর (movable metal type) সৃষ্টির কৃতিত্ব গুটেনবার্গের প্রতি আরোপ করা হয়, জেমস্ ওয়াটকে যেমনি দেওয়া হয় স্টীম এঞ্জিন আবিষ্কারের কৃতিত্ব। বস্তুতঃ ওয়াট্ স্টীম এঞ্জিন আবিষ্কার করেননি। তিনি পূর্বে আবিষ্কৃত ইঞ্জিনকে এত উন্নত করেছিলেন যে তাই নতুন আবিষ্কার বলে প্রতীয়মান হয়। মুদ্রণ-শিল্পে গুটেনবার্গও তাই করেছিলেন। তিনি অক্ষর-নির্মাণ পদ্ধতিকে বাস্তব ও বিজ্ঞানসম্মত ভিত্তিতে স্থাপন করেন। (৪) আর একটি মতে: "উত্তর-পুরুষের শ্রদ্ধার প্রতি গুটেনবার্গের দাবীর ভিত্তি হল (মুদ্রণ-শিল্পে) উৎকর্ষ-সাধন, আর সেই উৎকর্ষ এমনই অভিনব যে এক অর্থে তাঁকে (গুটেনবার্গকে) আবিষ্কারকই বলা চলে।" (৫) আপডাইক্ এবং ব্লেডস্ উভয়ের মতেই গুটেনবার্গ-পূর্ব কালের অনুন্নত ও অল্পদক্ষ একক-অক্ষর-ভিত্তিক এক মুদ্রণ-শিল্পের প্রচলন ইয়োরোপে ছিল। এই শিল্পের যে উন্নতি গুটেনবার্গ করেন তার ফলেই শিল্প এক নতুন রূপ নেয়। তখন থেকেই মুদ্রণ-শিল্প নেয় নতুন পথ।

রিলিফ পদ্ধতিতে ছাপা, কাগজ, কাঠ খোদাই, ছাপা বই, এমনকি প্রেস-যন্ত্র বা একক চল-অক্ষর কোনটাই গুটেনবার্গ স্বয়ং আবিষ্কার করেননি, এবং সবগুলিই তাঁর পূর্বকাল থেকেই বর্তমান ছিল। পূর্ববর্তীদের প্রচেষ্টার বা অভিজ্ঞতার দ্বারা গুটেনবার্গ লাভবান হয়েছিলেন, এরূপ অনুমান করাই স্বাভাবিক। তাঁর স্বকীয় আবিষ্কার হল হরফ-ঢালাইয়ের ছাঁচ এবং হরফ-ঢালাই পদ্ধতি যার ফলে সম-আকৃতিবিশিষ্ট প্রচুর সংখ্যক অক্ষর সৃষ্টি সম্ভব।(৬) জাতিতে স্বর্ণকার ছিলেন গুটেনবার্গ, অক্ষর খোদাই বা এজাতীয় কাজে তাঁর দক্ষতা ছিল সহজাত। তবু সহসাই তিনি এটি আবিষ্কার করেননি; বিশদবিবরণ না জানা গেলেও একথা বুঝতে কষ্ট হয় না যে বহু পর্যবেক্ষণ, পরীক্ষণ ও অধ্যবসায় ছিল এর পিছনে। ছাঁচটির দুটি অংশ: একটিতে গাত্রাংশ ও অপরটিতে অক্ষরাংশ ঢালাই হত, অবশ্য একই সংগে। প্রতিটি পৃথক অক্ষরের জন্য ছাঁচে নির্দিষ্ট অক্ষরের ছাঁচ সংযোজন করা হত। আবার গাত্রাংশের অভ্যন্তরের স্থানটুকু প্রয়োজন মত বাড়ান-কমান যেত। যেমন 'i' অক্ষরের প্রস্থ যতটা হবে তার বেশী হবে 'w' অক্ষরের ক্ষেত্রে। যাই হোক তিনি ছাঁচ তৈরী করে অক্ষর ঢালাইয়ের যে পদ্ধতি আবিষ্কার করেন তাতে পূর্ববর্তীদের হাতে-তৈরী অক্ষরের অসমানতা না থাকায় পরস্পর সন্নিবদ্ধ করা সহজ হল। ছাঁচে তৈরী অক্ষরের উচ্চতা যেমন সব কয়টি অক্ষরের একই হবে, তেমনি তার গাত্রও হবে মসৃণ। আর অক্ষরাংশও তেমনি একই আকারের হবে। এই অক্ষর-নির্মাণের ছাঁচ (mould & matrix) গুটেনবার্গের আবিষ্কারের মূল বিষয় ও তাঁর কৃতিত্বের প্রথম পর্যায়।

কিন্তু অক্ষর ছাড়া যেমন মুদ্রণ হয় না, তেমনি শুধু অক্ষর হলেই মুদ্রণ হয়ে যায় না। তার জন্য চাই অক্ষরগুলিকে মুদ্রিতব্য বিষয় অনুযায়ী শব্দ, পংক্তি ও পৃষ্ঠায় বিন্যস্ত করা। অক্ষরগুলিকে সাজিয়ে দৃঢ়ভাবে আবদ্ধ রাখা প্রয়োজন, যাতে মুদ্রণ কাজের সময়ে সেগুলি যথাস্থানে থাকে এবং ছাপার কাজও যথাযথভাবেই সম্পন্ন হয়। গুটেনবার্গ এই অক্ষর-সজ্জা এবং শয্যায় দৃঢ়ভাবে সন্নিবদ্ধ করার কাজটিও সুচারুরূপেই করেছিলেন, তাঁর ছাপা বই থেকেই এর প্রমাণ পাওয়া যায়।

অক্ষর-নির্মাণের ছাঁচটিকে বাদ দিলে, আবিষ্কার হিসাবে হয়তো গুটেনবার্গের কিছুই নেই। কিন্তু এটা ঠিক আবিষ্কারের বিষয় নয়, এ হল একটি পূর্ণাঙ্গ পদ্ধতির উদ্ভাবন। এর আনুষঙ্গিক সব কয়টি কাজই তিনি সুনিপুণভাবে সমাধা করেছিলেন; যেমন ছাঁচে অক্ষর-খোদাই, ছাঁচ-তৈরী ধাতু-ঢালাই, প্রেস-যন্ত্র ঠিক করা, কালি তৈরী, ছাপার জন্য মুদ্রিতব্য বিষয়ানুযায়ী অক্ষর ও পৃষ্ঠা সজ্জা, এবং সর্বশেষে সুচারু মুদ্রণ। আধুনিক মুদ্রণ প্রথায় তিনি প্রথম মুদ্রক।(৮)

গুটেনবার্গ কর্তৃক উদ্ভাবিত ও অনুসৃত মুদ্রণপদ্ধতির কালে ক্রমান্বিত উন্নতি হয়েছে, কিন্তু পরিবর্তন হয়নি, কোন মৌল পদ্ধতির যা আজও রিলিফ বা লেটার প্রেস মুদ্রণে প্রচলিত রয়েছে। তাঁর ছাঁচে ঢালাই করা সম-আকৃতি-বিশিষ্ট অক্ষর নির্মাণ পদ্ধতি, অক্ষর-সজ্জা এবং সহজ ও সুষ্ঠু মুদ্রণ প্রথা মুদ্রণ-শিল্পকে এক নতুন রূপে মণ্ডিত করে যার ফলে এই শিল্প-প্রচেষ্টা বাস্তবসম্মত বলে গৃহীত হয় এবং দিকে দিকে প্রসার লাভ করে। তাই জোহান গুটেনবার্গ মুদ্রণ-শিল্পের 'আবিষ্কারক' নন, আধুনিক মুদ্রণের পাওনীয়ার বা পথিকৃৎ।

জ্যোৎস্নারঞ্জন কর

(3) Poland: Introduction to Catalogue of Books Printed in XVth Century now in the British Museum. (London, 1913).

(4) D. B. Updike: Printing Types — That History, Forms and use (2 Vols.). (Harvard, 1962)

(5) William Blades: Books in chains (London, 1892).

(6) Theodore L. De Vinne: The Invention of Printing. (New York 1878)

(7) Sean Jenet: Pioneers in Printing.

(8) Encyclopaedia Britannica Vol. XVII. The American Pressman, Centenary Number, 1966.

অঙ্গনা

প্রমীলা

সতর্কতা

একটা কথা বহুবার উচ্চারিত হয়েছে এবং নানা ব্যাপারে। কিন্তু কার্যক্ষেত্রে দেখা গেছে যে, কথাটা যেন এই প্রথম কেউ উচ্চারণ করলেন এবং সেটা গভীর নিষ্ঠাভরে আমাদের শোনা কর্তব্য। আমরা যথাবিহিত কর্তব্যটুকু সম্পন্ন করি এবং প্রয়োজনে কর্তব্যটুকু পালনে বিস্মৃতি এসে আমাদের গ্রাস করে। আমাদের এই মরচে ধরা স্বভাবটাই এজন্য দায়ী। মরচেটুকু বার-বার পরিষ্কার না করলে চলে না। তাতেও কি রেহাই আছে। সব সময় পেছনে লেগে থাকতে হয়। তবে যদি সুফল কিছু পাওয়া যায়। নাহলে কোন কিছু আশা করা প্রচণ্ড বোকামি ছাড়া আর কিছু নয়।

সব কিছুতেই আমাদের দায়িত্বের অংশটুকু ভাগ করে নিতে হবে। এ সম্বন্ধে কোন দ্বিমত নেই এবং থাকাটাও সঙ্গত নয়। সবাই এ ব্যাপারে ঐকমত্য পোষণ করা সত্ত্বেও কার্যকালে দেখা যায় যে, কথাটা আমরা বেমালুম ভুলে মেরে দিয়েছি। ...ন করে জ্বালিয়ে দিলে হয়তো চৈতন্যোদয় ...য় নতুবা নয়। কোন কোন ব্যাপারে এটা ...তদূর দৃষ্টিকটু ঠেকে যে, কিছু না ...লেও কোন উপায় থাকে না। অবশ্য ...তিক্রম সর্বত্রই আছে। তাই এক্ষেত্রেও কোন কোন ব্যাপারে আমরা কোন আহ্বানের অপেক্ষা না করেই উপযুক্ত সাড়া দিই। এবং সময় বিশেষে সে সাড়া আশার অতিরিক্ত হয়ে পড়ে। এর ফলে পরবর্তী অধ্যায়ে ...কলেরই প্রত্যাশা আমাদের কাছে সেই ...পকাঠিতেই থাকে, হয়তো কিঞ্চিৎ বেশিও ...। আর তখনই সুযোগ বুঝে আমরা নিজেদের অকর্মণ্যতা প্রমাণ করতে বসে ...ই। অর্থাৎ সেই পরিস্থিতিতে আমাদের ... কিছু করণীয় আছে, তাই ভুলে বসে ...কি।

কিন্তু এরকম কেন হয়, তার কোন ...গ্রাহ্য উত্তর খুঁজে পাওয়া সম্ভব নয়। ...টা অনেকটা দায়িত্ব এড়িয়ে যাওয়ার মতই ...ন হতে পারে এবং সাধারণ্যে সে ...রণাটাই প্রবল হবে। যদি কেউ একথা ...বে তাহলে আমাদেরও কিছুই করণীয় ...কবে না। তাই এরকম মনোভাব সৃষ্টির ...যোগ না দেওয়াই বাঞ্ছনীয়। একটু সজাগ ...ং সতর্ক থেকে দায়িত্বের অংশভাগ বহন ...াই সঙ্গত। এবং আমাদের মনে রাখতে ...ব যে, কোন কিছুকে উপেক্ষা না করে ... পাশ কাটিয়ে না গিয়ে নিজেদেরই অগ্রণী ...র এগিয়ে গেলে আর কোন ভ্রান্ত ...ণার মুখোমুখি হয়ে অযথা বদনাম ...ভাগতে হবে না।

'খরা' নামের ফুলসজ্জায় শিল্পীর স্বকীয় চিন্তার বৈশিষ্ট্য ফুটে উঠেছে।

খরার বিরুদ্ধে

আকালের কালোছায়ায় আতঙ্কিত এ বছর ভারতের অসংখ্য গ্রাম-জনপদ। যুগান্তের এই মূর্তিমান বিভীষিকার অগ্নিশ্বাসে সবকিছু জ্বলে পুড়ে খাক হয়ে গেছে। বাকি আছে শুধু অস্থিচর্মসার মানুষের সমষ্টি। প্রকৃতির দুঃসহ অভিশাপের বোঝা অদৃষ্টের লিখন হিসেবে তারা বয়ে বেড়াচ্ছে। ক্ষুধার অন্ন, তৃষ্ণার জল তাদের বহুদূরে প্রসারিত দৃষ্টির সম্মুখ থেকে উধাও হয়ে গেছে। দিগন্ত বিস্তৃত ধু ধু মাঠ প্রকৃতির অট্টহাস্যে মুখর। বাচাল প্রকৃতির আকস্মিক অট্টহাস্যে কলগুঞ্জন মুখর মানুষগুলি মূক হয়ে গেছে। তাদের জীবনের ছায়া অদৃশ্যপ্রায়। জীবনের পরিপূর্ণ তৈলাধার হঠাৎ তৈলশূন্য হয়ে দপ দপ করছে। কিংকর্তব্যবিমূঢ় এই মানুষগুলি জীবনের কোন হদিশই খুঁজে পাচ্ছে না—তাদের বর্তমান অন্ধকার, ভবিষ্যৎ নেই। মাঠের আগুন দ্বিগুণ হয়ে পেটে জ্বলছে, সে জ্বলুনি তাদের অসহায়ভাবে অনিবার্য পরিণতির দিকে ঠেলে দিচ্ছে—সে পরিণতির অর্থ মৃত্যুর হিমশীতল স্পর্শ।

সারা দেশ জ্বলছে। অন্যান্য অংশের সঙ্গে পশ্চিম বাংলার বিস্তীর্ণ অঞ্চল জুড়ে খরার ভয়াবহতা আজ আর কারো অবিদিত নয়। দেশ জ্বলছে কিন্তু সেই সঙ্গে মানুষও জাগছে। বাঁকুড়া-পুরুলিয়ার দুর্দশাগ্রস্ত হতভাগ্যের দল যে নিঃসঙ্গ নয়, সমগ্র দেশবাসী যে তাদের বেদনার অংশীদার, তা প্রমাণ করার জন্য জেগে উঠেছে আপামর সাধারণ মানুষ। সবাই হাতে হাত মিলিয়ে এগিয়ে এসেছে এবং এখনো আসছে—যার যা সাধ্য তাই দিয়ে ভাণ্ডার ভরে দেবার চেষ্টা চলছে, কেউ বসে নেই, কেউ চুপ করে নেই। দেশের এই আকস্মিক দুর্বিপাক কাটিয়ে ওঠার সংকল্পে সবাই কোমর বেঁধে লেগে গেছেন।

বাঁকুড়া-পুরুলিয়ার খরাক্লিষ্ট মানুষদের সাহায্যে উদ্যোগী হয়েছেন অনেকের সঙ্গে শ্রীমতী উমা বসু। তিনি এগিয়ে এসেছেন নিজস্ব সম্ভার নিয়ে। পুষ্পসজ্জা প্রদর্শনীর আসর বসিয়েছিলেন তিনি কলকাতা তথ্য-

কেন্দ্রে। প্রদর্শনীর উদ্বোধন করেন রাজ্যপাল শ্রীধর্মবীর। প্রদর্শনীতে প্রায় চল্লিশটি পুষ্পসজ্জা স্থান পায়। অধিকাংশ পুষ্পসজ্জাই বস্তুনির্ভর। এক জায়গায় এসে চোখটা হঠাৎ আটকে গেল। ঝুলনের অপরূপ দৃশ্য ফুটিয়ে তোলা হয়েছে। মনে পড়ে গেল এই তো ঝুলনের লগ্ন। দেওয়ালী, হোলি প্রভৃতি নিয়েও পুষ্পসজ্জার ব্যবস্থা করা হয়েছিল।

এ সবের মধ্যে সবচেয়ে বেশি আকর্ষণীয় দুটি পুষ্পসজ্জা হলো খরা এবং খরার পরে। খরার দৃশ্যে তিনি দেখিয়েছেন শুষ্ক মাটির বুকে একটি ক্যাকটাসের বাঁচার সংগ্রামে দৃঢ়তার তীব্রতা। সমস্ত প্রতিকূলতাকে অগ্রাহ্য করে ক্যাকটাস বাঁচতে চেয়েছে এবং বেঁচে রয়েছে। দৃশ্যের পরিবর্তন ঘটে। বাঁচার সংগ্রামের আন্তরিকতা জয়যুক্ত হয়েছে। স্বপ্ন সফল হয়েছে। দুঃসময় কেটে গেছে। সুদিন হাত বাড়িয়ে সাদর আমন্ত্রণ জানাচ্ছে।

শস্য-সম্পদে প্রকৃতি উপচে পড়ছে। পুষ্পসজ্জায় এই পরিকল্পনা দুটি রাজ্যপালের কাছ থেকেও যথেষ্ট প্রশংসা কুড়িয়েছে।

পুষ্পসজ্জায় শ্রীমতী বসুর বৈশিষ্ট্য যে, তিনি কোথাও বিশেষ পদ্ধতির বশবর্তী না হয়ে সর্বত্র দেশীয় সাজটুকু ধরে রাখতে চেয়েছেন। তাঁর এই প্রয়াসে আন্তরিকতার ছাপ সহজেই উপলব্ধি করা যায়। জাপানী, পাশ্চাত্য এবং ভারতীয় শিল্পকলার মিশ্রণ তাই তাঁর পুষ্পসজ্জার বিশেষ আকর্ষণ। ক্ষেত্রবিশেষে আবার তিনি দুরূহ জাপানী প্রথার সঙ্গে ভারতীয় ঐতিহ্যের মিশ্রণ ঘটিয়ে সুন্দর সমন্বয় সৃষ্টির চেষ্টা করেছেন। তাঁর এই প্রচেষ্টা শুধু সফলই হয়নি, শিল্পভাবনার ক্ষেত্রেও নতুন নজীর সৃষ্টি করেছে।

শ্রীমতী বসুর পুষ্পসজ্জার শিক্ষা-দীক্ষা সবই নিজের এবং প্রদর্শনীর সবকিছু তিনি নিজেই নির্বাচন করেছেন। এই প্রদর্শনীর আগে ভারতের নানা শহরে এ ধরনের প্রদর্শনীর ব্যবস্থা করা হয় এবং দর্শক ও রসজ্ঞদের কাছ থেকেও উল্লেখযোগ্য সাড়া পাওয়া যায়। পুষ্পসজ্জায় প্রায় সর্বত্রই তিনি দেশীয় ফুলের সমাদর করেছেন। সবকিছুর মধ্যেও তাই তাঁর আন্তরিক রূপটি এখানে স্পষ্ট ফুটে উঠেছে। বিনয়ী এবং নম্র স্বভাবের শ্রীমতী বসুর আরো দুটি উল্লেখযোগ্য গুণ হলো পেইন্টিং এবং ফটোগ্রাফী। নানা ব্যস্ততার মধ্যে সেদিন আর এসম্বন্ধে আলোচনা বেশিদূর এগোয়নি। তবে এরকম মহৎ উদ্দেশ্যে অনুপ্রাণিত পুষ্পসজ্জার আয়োজন করায় তাঁকে অভিনন্দিত করেছি। পুষ্পসজ্জার অভিনবত্বে মুগ্ধ হয়েছি এবং আরো সার্থকতার আশা নিয়ে ফিরে এসেছি।

চাকুরে মেয়েদের সমস্যা

মেয়েদের রাজনৈতিক সমানাধিকার বহু দেশেই স্বীকৃত। ভোট দেওয়া, নির্বাচিত হওয়া, পড়াশুনো করা, কলকারখানায় কাজ পাওয়া—এসবে মেয়েদের ক্ষেত্রে বহু দেশেই কোনো বাধা নেই। কিন্তু এই অগ্রাধিকারগুলো থাকা মানেই সামাজিক জীবনের সকল ক্ষেত্রে পূর্ণ সমানাধিকারের নিশ্চয়তা নয়।

জার্মান গণতান্ত্রিক সাধারণতন্ত্র হচ্ছে এমন একটি দেশ যেখানে আইনের চোখে মেয়ে ও পুরুষে কোনোরকম ভেদ নেই। মেয়েদের সমানাধিকার সেখানে যথেষ্ট উঁচু মাত্রায়। রাজনৈতিক অধিকার, একই ধরনের কাজের জন্যে একই বেতন—এসব তো আছেই। কিন্তু সমস্যার শেষ এখানেই নয়। আরো সমস্যা আছে, যার সমাধান খুঁজতে হয় রাজনীতিবিদ ও সমাজতত্ত্ববিদদের। যে-কোনো আধুনিক অর্থনৈতিক ব্যবস্থায় মেয়েদের কাজে লাগাতেই হয়, কেননা মেয়েরাই হচ্ছে যে-কোনো দেশের মোট জনসংখ্যার অর্ধেক। কিন্তু দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের অনিবার্য ফল হিসেবে গণতান্ত্রিক জার্মানীতে মেয়েদের সংখ্যা পুরুষদের চেয়েও বেশি। সঠিকভাবে বলতে গেলে গণতান্ত্রিক জার্মানীতে কর্মক্ষম পুরুষের সংখ্যা ৪৮ লক্ষ, কর্মক্ষম মেয়ের সংখ্যা ৫১ লক্ষ (মোট জনসংখ্যা ১ কোটি ৭০ লক্ষ)। গণতান্ত্রিক জার্মানীতে ১৬ থেকে ৬০ বছর বয়স্কাদের ৬৫ শতাংশই চাকুরে।

গণতান্ত্রিক জার্মানীর অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক জীবনে বহু উঁচু পদে মেয়েরাই রয়েছেন। পার্লামেন্টের মোট আসনের এক-চতুর্থাংশ মেয়েদের দখলে। মন্ত্রী, ওয়ার্কস ম্যানেজার, অধ্যাপক, ইঞ্জিনীয়ার, ফোরম্যান ইত্যাদি পদেও মেয়েরা রয়েছেন। কিন্তু মেয়েদের মোট সংখ্যার অনুপাতে পদস্থাদের সংখ্যা এখনো যথেষ্ট নয়।

আবার কখনো কখনো দেখা যায় যে, কোনো একটি পদে একজন মেয়ে কাজ করছেন বটে কিন্তু পদের উপযোগী শিক্ষাগত মান তাঁর নেই। সেই মান অর্জন করে তিনি যাতে পুরুষের সাতিকারের সমকক্ষ হতে পারেন, তার ব্যবস্থা করা গণতান্ত্রিক জার্মানীর নীতি।

যেমন ধরা যাক, ৎসাইস-ইয়েনা কারখানা। এখানে যতো মেয়ে কাজ করেন, তার মাত্র এক-পঞ্চমাংশের বৃত্তিগত ট্রেনিং আছে। অন্যরা অ-দক্ষ বা আধ-দক্ষ কর্মে নিযুক্ত। এদের মাইনে পুরুষদের চেয়ে কম, কেননা পুরুষরা কোন-না-কোনো ট্রেনিং নিয়েই এসেছেন। এই অবস্থা কৃষিতেও।

গণতান্ত্রিক জার্মানীর প্রত্যেকটি মেয়ে স্কুলের লেখাপড়া শেষ করার পরেই কাজ নেয়। কিন্তু কারিগরী কাজে খুব কম মেয়েই আসে। গণতান্ত্রিক জার্মানীর টেকনিক্যাল বিশ্ববিদ্যালয়গুলোতে মোট ছাত্র-ছাত্রীর ১১·৫ শতাংশ হচ্ছে ছাত্রী, ১৯৭৪ সালের মধ্যে এই সংখ্যাকে বাড়িয়ে ৩০ শতাংশ করার পরিকল্পনা নেওয়া হয়েছে। মেয়েরা যাতে আরো বেশি সংখ্যায় কারিগরী কাজে আসে, সেজন্যে বিশেষভাবে চেষ্টা করা হচ্ছে।

বর্তমানে লক্ষ্য করা যাচ্ছে, কারিগরী সংস্থার কাজ করতে এসেও ক্লার্ক বা স্টেনো-টাইপিস্ট হবার দিকেই মেয়েদের ঝোঁক। ইলেকট্রো-টেকনিক্যাল সংস্থায় চাকুরে মেয়েদের মাত্র ১০ শতাংশ হচ্ছে ইলেকট্রো-মেকানিক, ৩·৭ শতাংশ মেকানিক ও ১·৭ শতাংশ ফিটার।

মেয়েরা চাকরি করতে আসে কেন?

—এ নিয়ে যাঁরা সমীক্ষা করেছেন, তাঁরা বলেন, মেয়েদের মধ্যে সম্প্রতি একটা নতুন লক্ষণ দেখা যাচ্ছে। কিছুকাল আগেও মেয়েরা চাকরি করতে আসত টাকা-পয়সার ব্যাপারে যাতে স্বামীর ওপর নির্ভরশীল হতে না হয় সেজন্যে। এখন আসছে সামাজিক প্রতিষ্ঠা করার জন্যে, বাইরের জগতের সঙ্গে পরিচিত হবার জন্যে, পেশাগত জীবনে সাফল্য ও স্বীকৃতি লাভ করবার জন্যে। বলা বাহুল্য, সুখী পরিবার গড়ে তোলার আগ্রহও সব মেয়েরই আছে। তারা চায় পারিবারিক জীবনের সঙ্গে কর্মজীবনকে যুক্ত করতে।

শিল্প ও কৃষিতে ক্রমেই স্বয়ংক্রিয়তা প্রবর্তিত হচ্ছে, ফলে সুদক্ষ শ্রমিকের চাহিদাও বেড়ে যাচ্ছে। মেয়েদের বাদ দিয়ে এই চাহিদা পূরণ করা কিছুতেই সম্ভব নয়। অন্যদিকে মেয়েদের মধ্যেও লক্ষ্য করা যাচ্ছে, উচ্চমানের টেকনিক্যাল দক্ষতা অর্জনের আগ্রহ।

এজন্যে গণতান্ত্রিক জার্মানীতে, বিশেষ করে মেয়েদের জন্যে সর্বপ্রকারের টেকনিক্যাল শিক্ষাগ্রহণের সুযোগ করে দেওয়া হয়েছে। খোঁজখবর নিয়ে দেখা গিয়েছে, গণতান্ত্রিক জার্মানীর চাকুরে মেয়েদের মধ্যে ৪২ শতাংশই উচ্চতর টেকনিক্যাল ট্রেনিং নিতে আগ্রহী। তাদের এই আগ্রহ যাতে সার্থক হতে পারে, সেজন্যে সরকার এবং কারখানার কর্তৃপক্ষ উভয়েই সজাগ।

সুধীরচন্দ্র সরকার

(পূর্ব প্রকাশিতের পর)

একদিন রাজশেখর বাবু অমর পালিতকে নিয়ে আমার দোকানে এসে উপস্থিত হলেন। বললেন, এ এবার থেকে আইন প্র্যাকটিশ করবে; এবং যে আইনের বই দরকার হয় এঁকে দেবেন। সেই থেকে অমর পালিতের সঙ্গে আমার বন্ধুত্ব সুদৃঢ় হয়ে গেল। তাঁর বাড়ীতে আমি প্রায়ই গল্প করতে যেতাম। এমন সময়ে অ্যালবার্ট ইন্স্টিটিউটে ১৯২৯ সালে আমাদের দোকান স্থানান্তর করি। যে-দোকান ঘরটি আমি নিয়েছিলাম সেটি তখন এলাহাবাদ ব্যাঙ্কের কাছে বন্ধক ছিল। আটশ টাকা দিয়ে দোকানের দখল পেলাম না। কারণ ঘরটি অ্যালবার্ট ইন্স্টিটিউটের অধীনে ছিল। এ ক্ষেত্রে অমর পালিত, সুভাষ বসু ও সুরেশ মজুমদারের সাহায্যে অ্যালবার্ট ইন্স্টিটিউটের মালিকদের সঙ্গে যোগাযোগ করে ঘরটি পাওয়ার সুবিধে ক'রে দিয়েছিলেন।

এখানে বলা দরকার এলাহাবাদ ব্যাঙ্কের সঙ্গে অমর পালিতের খুব ঘনিষ্ঠ যোগাযোগ হওয়াতে ব্যাঙ্কে বড় ধরণের চাকরি পেয়ে গেলেন। তারপর তিনি ব্যাঙ্কের কাজ ছেড়ে দিয়ে কলকাতার বিখ্যাত ইংরাজ পুস্তক-বিক্রেতা বাটারওয়ার্থ অ্যান্ড কোম্পানীতে যোগ দিলেন। এই সূত্রে তিনি কয়েক মাস মাদ্রাজে ছিলেন।

অমর পালিত মহাশয় বলিষ্ঠ ও সুদর্শন ছিলেন। কি ক'রে যে তাঁর শরীরে অকালে ক্ষয়রোগ ঢুকল তা আমরা বুঝতে পারি নি। এই রোগেই তিনি অকালে প্রাণত্যাগ করলেন। তাঁর মৃত্যুদিবস বড়ই দুঃখের তাঁর বাড়ীতে এবং আমাদের মনেও এই দুঃখের ছায়া অনেকদিন গভীরভাবে রেখাপাত করেছিল। অমর পালিত এবং তাঁর স্ত্রী অর্থাৎ রাজশেখরবাবুর একমাত্র কন্যা কয়েকঘন্টার ব্যবধানে মারা যান।

রাজশেখর বসুর কনিষ্ঠ ভ্রাতা গিরীন্দ্রশেখর বসুও একজন উঁচুদরের সাহিত্যিক ছিলেন। তিনি বিখ্যাত মনোবিজ্ঞানী ফ্রয়েডের একজন গুণগ্রাহী ছাত্র ছিলেন। সেই সূত্রে 'স্বপ্ন' বলে একটা বই লেখেন এবং সেটা আমরাই প্রকাশ করি। এছাড়া তাঁর "পুরাণ প্রবেশ" এবং গীতার একটি আলোচনা বিদগ্ধসমাজের বিশেষ খ্যাতি লাভ করে। মনস্তত্ত্ব বিশ্লেষণ বা গবেষণামূলক পুস্তকেই যে শুধু তাঁর দক্ষতা ছিল তাই নয়, শিশুসাহিত্যেও তাঁর অবদান অল্প হলেও অসাধারণ। তাঁর "লাল কালো" ছোটদের একটি বিখ্যাত বই। শিল্পী যতীন্দ্রকুমার সেন এই শেষোক্ত বইটি চিত্রে অলংকৃত করেন। এছাড়া 'মৌচাকে' তাঁর বহু সুখপাঠ্য রচনা প্রকাশিত হয়েছে। সেকালে তিনিই ছিলেন একমাত্র বাঙালী চিকিৎসক যিনি মনস্তত্ত্ব নিয়ে চিকিৎসা করতেন। অর্থাৎ যাকে বলে Psychiatrists.

তাঁর বড় ভাই শশিশেখর বসু হাস্যরসিক ছিলেন—তিনিও অনেক হাস্যরসাত্মক

সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত

রচনা লিখে গেছেন। তাঁর একখানি বইও প্রকাশিত হয়েছিল।

'ভারতী'র আসরে কবি সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত ছিলেন একজন প্রধান আড্ডাধারী। তাকে বলা হোত ছন্দের রাজা। এত বিভিন্ন মিষ্টি ছন্দে তিনি কবিতা লিখেছেন যে, রবীন্দ্রনাথ ছাড়া আর কোনো কবির কলম থেকে তা বেরিয়েছে কিনা সন্দেহ। উত্তরাধিকারসূত্রে তিনি সাহিত্যের আসরে সুপ্রতিষ্ঠিত। কারণ, তিনি ছিলেন বিখ্যাত * প্রাচীন সাহিত্যিক অক্ষয়কুমার দত্তের পৌত্র।

সত্যেন্দ্রনাথ ছিলেন গম্ভীরপ্রকৃতির মানুষ। একটি পোশাকেই তাকে আমরা বরাবর দেখেছি—সাদা ধুতি আর পাঞ্জাবি। আর প্রায় সবসময় তাঁর সঙ্গে থাকত ছাতা। চেয়ারের ওপরে বসতেন আসনপিঁড়ি হয়ে। তাঁকে দেখতে বেশ গম্ভীরপ্রকৃতির মনে হলেও অত্যন্ত সুরসিক এবং রঙ্গপ্রিয় লোক ছিলেন। 'ভারতী'র আড্ডায় তিনি প্রধান আইন জারী করেছিলেন যে, রাত্রি ন'টার আগে এখান থেকে ওঠা চলবে না। যিনি উঠবেন তাঁকে জরিমানা দিতে হবে।

সত্যেন্দ্রনাথ ছিল অগাধ পন্ডিত। এত বিভিন্ন বিষয়ে তাঁর জ্ঞান ছিল যে, আমরা তাঁর সে-জ্ঞানের পরিধি দেখে অবাক হয়ে যেতাম। অসম্ভব পড়াশুনা করতেন তিনি। তাঁর লাইব্রেরীটি ছিল একটি দেখবার জিনিস বহু ধরনের বই কিনেছিলেন তিনি। কোথাও কোনো ভাল বইয়ের সন্ধান পেলেই তিনি গিয়ে তা কিনে ফেলতেন।

মৃত্যুর আট-নয় বছর আগে তাঁর চোখের রোগ হয়। দৃষ্টিশক্তি দিনে দিনে কমে আসতে লাগলো দেখে তিনি চিকিৎসা আরম্ভ করলেন। সমস্ত বড় বড় ডাক্তার তাঁর চোখ পরীক্ষা করে শেষে বলে দিলেন যে এ রোগ আর সারবে না। ক্রমশ দৃষ্টি কমে আসার সঙ্গে সঙ্গে তিনি অন্ধ হয়ে যাবেন। ডাক্তাররা তাঁকে পড়াশুনা করতে একেবারে বারণ করে দিলেন।

সেই থেকে সত্যেন্দ্রনাথ যতদিন বেঁচে ছিলেন, ততদিন এক রকম জীবন্মৃত হয়েই ছিলেন। কারণ তিনি বেশ বুঝতে পারছিলেন যে, তাঁর চোখের দৃষ্টি দিন-দিন ক্ষীণ হতে ক্ষীণতর হয়ে আসছে—তার ওপর পড়াশুনা করতে না পারার কষ্ট—সেজন্য শেষজীবনে তাঁর সুখ ছিল না। সত্যেন্দ্রনাথ আমাদের কাছে প্রায়ই দুঃখ করে বলতেন যে এরকমভাবে জীবনধারণ করার চেয়ে মৃত্যু ভালো। আমরা তাঁকে কত সান্ত্বনা দিতাম। তাঁর এই শারীরিক অবস্থা সত্ত্বেও তাঁর কবিতা লেখা বন্ধ হয়নি। আমাদের দেশে তখন বিপ্লব ও বিপর্যয়ের অন্ত ছিল না। যখনই কোনো বিপ্লব উপস্থিত হতো তখনই তাঁর অন্তর সাড়া না দিয়ে পারত না।

চোখের অসুখ ছাড়াও পেটের গোলমালেও তিনি প্রায়ই ভুগতেন। পেটের জন্য তাঁর শরীর প্রায়ই খারাপ থাকত। সেজন্য শেষদিকে তিনি আর বিশেষ লিখতেই পারতেন না।

একবার মনে আছে আমরা অর্থাৎ 'ভারতী'র প্রধান প্রধান আড্ডাধারীরা তখন দু-এক দিনের ছুটি পেলেই সব বন্ধু-বান্ধব মিলে শহরের এই কোলাহল ছেড়ে পালিয়ে যেতাম কাছাকাছি কোনও জায়গায়। সেখানে দু' একদিন থেকে একটু হাঁপ ছেড়ে আবার কলকাতা চলে আসতাম। সেবার আমরা গিয়েছিলাম বিখ্যাত সাহিত্যিক চারু বন্দ্যোপাধ্যায়ের পৈতৃক বাড়ী হুগলী জেলার জিরেট বলাগড়ে। সেই দলে সত্যেন দত্ত-ও ছিলেন আর ছিলেন সাঁতারু কবি শান্তি পাল। এই দলের বন্ধুরা প্রায় সকলেই এখন মৃত। এটা হল সত্যেন্দ্রনাথ মারা যাওয়ার দিন পনেরো আগে—১৯২২ সালে।

একদিন চারুবাবুর জিরেট-বলাগড়ের বৈঠকখানায় বিকেলবেলায় আমাদের আড্ডা বসেছে। সত্যেন্দ্রনাথ পকেট থেকে একটি কাগজ বের করে বললেন: আজ একটা কবিতা লিখেছি—আপনারা ইচ্ছে করলে শুনতে পারেন। বলে তিনি পড়তে আরম্ভ করলেন। আমার মনে হয় এটি তাঁর একটি শ্রেষ্ঠ কবিতা। কবিতাটি এখানে উধৃত করলাম।

জ্যৈষ্ঠী-মধু

আহা, ঠুকরিয়ে মধু কুলকুলি
পালিয়ে গিয়েছে বুলবুলি:—
টুলটুলে তাজা ফলের নিটোলে
টাটকা ফুটিয়া ঘুলঘুলি।

হের, কুল্ কুল্ কুল্ বাস-ভরা
সুদ্ধ হয়ে গেছে রসঝরা
তোমরার ভিড়ে ভীমরুলগুলো
মত্ত খুঁজে ফেরে বিলকুলই।

ভাজা ঝাঁক বেঁধে ফেরে চাক ছেড়ে
দুপুরের সুরে ডাক ছেড়ে,
আংরা বোলানো বাতাসের কোলে
ফেরে ঘোরে খালি বুলবুলি।

কত বোলতা সোনেলা রোদ পেয়ে
বুঁদ হয়ে ফেরে রোঁদ দিয়ে,
ফলসা বনের জলসা ফুরুলো
মৌমাছি এলো রোল তুলি'।

ওই নিঝুম দিথর রোদ খাঁ-খাঁ
শিরীষ ফুলের ফাগ-মাখা
ঢুলঢুলে কার চোখ দুটি কালো
ঝাপ্পা দুটি হাতে লাল ঝুলি।

আজ ঝড়ে, হানা ডাঁটো ফজলী সে,
মেশে কাঁচা-মিঠে মজলিসে.
'রং-চোরা ফলে রস কি জোগালো'—
কুহু কুহু পুছে কার বুলি!

ওগো কে চলেছে ঢেলা-বন ঠেলে
বুলবুলি খোকা চোখ মেলে,
জামরুলী-মিঠে ঠোঁট দুটি কাঁপে,
ভাপে কাঁপে তনু জুঁই ফুলী।

মরি, ভোমরা ছুটেছে তার পাকে
হাওয়া করে দুটো পাখনাকে,—
ফলের মধুর মরসুম যাপে
ফুলের মধুর দিন ভুলি।'

কোনো দোকান থেকে কোনো বই কিনতে গেলে তাঁর একটি বিচিত্র স্বভাবের পরিচয় পাওয়া যেতো। তিনি যে বই কিনবেন ঠিক করতেন তার প্রতিটি পাতা উল্টে-পালটে দেখতেন। প্রথম দিনে যতগুলি পাতা পরীক্ষা করা সম্ভব হতো, সেখানে একটি কাগজ দিয়ে চিহ্ন করে রেখে যেতেন। পরদিন গিয়ে বাকীটা পরীক্ষা করে তারপর কিনতেন। আমার মনে হয় হয়ত কোনো সময় তিনি বই কেনার পর দাগী বা ময়লা লাগা বা পাতা বাদ পড়া ফর্মা পেয়ে প্রতারিত হয়েছিলেন—তাই এই বিশেষ সাবধানতা অবলম্বন করেছিলেন। তাঁকে এই বিষয়ে জিজ্ঞেস করলে তিনি মৃদু হেসে বলতেন—বই বেশ পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন না থাকলে পড়ে তৃপ্তি হয় না।

সত্যেন্দ্রনাথের বাড়ীতে আমি বার দুয়েক গিয়েছিলাম। তাঁর মৃত্যুর কয়েকদিন আগে প্রথম তাঁর বাড়ীতে আমি নিমন্ত্রিত হয়েছিলাম। সেইখানে আমার সঙ্গে আলাপ হয় বিখ্যাত ইংরাজী লেখক আমেরিকা প্রবাসী স্বর্গত ধনগোপাল মুখোপাধ্যায়ের সঙ্গে। আর একবার যাই তাঁর মৃত্যুর দিনে।

রবীন্দ্রনাথের অনুপস্থিতিতে তিনি নানা বইয়ের নামকরণ করে দিতেন—এ বিষয়ে তাঁর অদ্ভুত কৃতিত্ব ছিল।

প্রায় অর্ধ শতাব্দী আগে আমি যখন ছোটদের মাসিক পত্র 'মৌচাক' প্রকাশ করি তখন এর নামকরণ তিনিই করে দিয়েছিলেন। প্রথম সংখ্যায় তাঁর লেখা 'মৌচাক' কবিতাটি এখানে আপনাদের উপহার দিলাম।

কবিতাটি সত্যিই অত্যন্ত খ্যাতিলাভ করেছিল—

মৌচাক

ঝরছেরে মৌচাকের মধু
গন্ধ পাওয়া যায় হাওয়ায়
দাওয়ায় ব'সে ভাবিস কি আর
আয়রে তোরা বেরিয়ে আয়!

কোন্‌খানে চাক খুঁজতে হবে
কোন্ বাগানে কোন্ বনে,
তুড়ুক নেচে ফুড়ুক উড়ে
শালিক হ'ল চন্‌মনে!

ভোমরা চলে বন্‌বনিয়ে
হন্‌হনিয়ে আমরা যাই,
ঠিক-দুপুরের আগুন হাওয়া
গন্‌গনিয়ে ছুটছে ভাই।

শুক্‌নো পাতার পাঁপর-ভাজা
পায়ের তলায় গুঁড়িয়ে যায়;
জামরুলে ফুল ঝমরে পড়ে
আমরুলী-রঙ আমপাতায়।

হাওয়ার সাথে ছুটছি মেতে
রোদের তাতে মুখ-রাঙা,
কাঁচি হাতে খুঁজছি কেবল
কোথায় মধু চাকভাঙা?

মৌমাছি যা হাবিস্ করে
ফুলের ফুটোয় শুঁড় দিয়ে,
তাই নেবো ভাই, তাই নেবো আজ—
ফিরবো না তো গুড় নিয়ে।

কুড়ুক-পাখীর কান-জুড়োনো
আওয়াজ ধরে চল্ চলে,
কাঠবিড়ালীর পিছন পিছন
ঘুরবো কাঁটার জঙ্গলে।

লিচুর পাতায় বগ্‌লী যেথায়
বানিয়েছে লাল-পশপড়েরা
সেই বনে চল সেই গহনে
মৌমাছিদের সেই ডেরা!

সরষে-ফুলের মৌ ঝাঁঝালো,—
পদ্মফুলের মৌ মিঠে,—
মৌচাকেরই লাখ কুঠুরীর—
মধ্যে কে রয় কোন্ পিঠে?—

দেখতে হবে চাখতে হবে,
চল ছুটে ভাই যাই সবে,—
মৌচাকে মৌমাছির পুঁজি
মন যে ভোলায় সৌরভে।

পরেও তাঁর অনেক কবিতা 'মৌচাকে' প্রকাশিত হয়েছে। চারু রায় ও প্রেমাঙ্কুর আতর্থী সম্পাদিত আমরা যে 'রঙমশাল' নামে পুজো বার্ষিকী প্রকাশ করি তারও নামকরণ তিনিই করে দিয়েছিলেন। এই 'রঙমশাল' অবশ্য পুজো বার্ষিকী হিসাবে প্রকাশিত হয়েছিল মাত্র দু বছর।

যাঁরা তাঁকে দেখেছেন তাঁরা জানেন যে তিনি কি রকম আত্মভোলা প্রকৃতির লোক ছিলেন। বাস্তব জগতের সাধারণ কাজগুলিও তিনি করতে পারতেন না। যেমন ধরুন, সামান্য মণি-অর্ডারের ফর্ম লেখাও তাঁর দ্বারা হতো না—এ সামান্য ব্যাপারেও তাঁকে কোনো বন্ধুর সাহায্য নিতে হতো। হাট-বাজার করা তো ছেড়েই দিন, কোনো দিনই তিনি তা করতে পারতেন না।

সত্যেন্দ্রনাথ ও রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে একটা অবিচ্ছিন্ন কবিপ্রীতি ছিল। আজকাল শুনতে পাই যে সত্যেন্দ্রনাথ নাকি ছন্দ-বিশারদ সত্যিকার কবি নন, কিন্তু রবীন্দ্রনাথ তা মনে করতেন না। ১৯২২ সালে সত্যেন্দ্রনাথের মৃত্যুর পর রামমোহন লাইব্রেরী হলে তাঁর স্মৃতির জন্য আমরা একটা সভার অনুষ্ঠান করি। কথা ছিল সভা শেষ হবার পর একটা রীতিমত কমিটি গঠিত হবে তাঁর স্মৃতিরক্ষার জন্যে। অন্যান্য সভায় যেমন হয়ে থাকে তেমনভাবে কোনো সভাপতির নাম প্রস্তাব এ সভায় হয়নি। কবিগুরু রবীন্দ্রনাথ এই মৃত্যুবাসরে এসে সভাপতির আসন গ্রহণ করলেন। তার পর সত্যেন্দ্রনাথ সম্বন্ধে লিখিত কবিতাটি পাঠ করলেন।

বর্ষার নবীন মেঘ এল ধরণীর পূর্বদ্বারে,
বাজাইল বজ্রভেরী। হে কবি, দিবে না
সাড়া তারে
তোমার নবীন ছন্দে? আজিকার
কাজরিগাথায়
ঝুলনের দোলা লাগে ডালে ডালে
পাতায় পাতায়;
বর্ষে বর্ষে এ দোলায় দিত তাল
তোমার যে বাণী
বিদ্যুৎনাচন গানে, সে আজি ললাটে
কর হানি
বিধবার বেশে কেন নিঃশব্দে লুটায়
ধূলি-'পরে।
—আশা করি, মর্তজন্মে ছিল তব মুখে
যে বিনম্র স্নিগ্ধ হাস্য, যে স্বচ্ছ সতেজ
সরলতা,
সহজ সতেজ প্রভা, বিরল সংযত শান্ত কথা,
তাই দিয়ে আরবার পাই যেন তব অভ্যর্থনা
অমর্তলোকের দ্বারে—ব্যর্থ নাহি হোক
এ কামনা॥

(ক্রমশঃ)

পুরনো পাতা

হাঙর

স্বামী বিবেকানন্দ

সকালবেলা খাবার-দাবার আগেই শোনা গেল যে, জাহাজের পেছনে বড় বড় হাঙর ভেসে ভেসে বেড়াচ্চে।

জলজ্যান্ত হাঙর পূর্বে আর কখন দেখা যায়নি—গতবারে আসবার সময়ে সুয়েজে জাহাজ অল্পক্ষণই ছিল, তাও আবার শহরের গায়ে। হাঙরের খবর শুনেই আমরা তাড়াতাড়ি উপস্থিত। সেকেন্ড কেলাসটি জাহাজের পাছার উপর—সেই ছাদ হতে বারান্দা ধরে কাতারে কাতারে স্ত্রী-পুরুষ, ছেলেমেয়ে, ঝুঁকে হাঙর দেখচে। আমরা যখন হাজির হলুম, তখন হাঙর মিঞারা একটু সরে গেচেন; মনটা বড়ই ক্ষুণ্ণ হল। কিন্তু দেখি যে, জলে গাঙধাড়ার মত এক প্রকার মাছ ঝাঁকে ঝাঁকে ভাসচে। আর এক রকম খুব ছোট মাছ, জলে থিক-থিক করচে। মাঝে মাঝে এক-একটা বড় মাছ, অনেকটা ইলিশ মাছের চেহারা, তীরের মত এদিক-ওদিক কোরে দৌড়ুচ্চে। মনে হল, বুঝি হাঙরের বাচ্চা। কিন্তু জিজ্ঞাসা করে জানলাম—তা নয়। ও'র নাম বনিটো। পূর্বে ও'র বিষয় পড়া গেছলো বটে; এবং মালদ্বীপ হতে উনি শুঁটকিরূপে আমদানী হন, হুড়ি চড়ে—তাও পড়া ছিল। ও'র মাংস লাল ও বড় সুস্বাদ—তাও শোনা আছে। এখন ও'র তেজ আর বেগ দেখে খুশী হওয়া গেল। অত বড় মাছটা তীরের মত জলের ভিতর ছুটবে, আর সে সমুদ্রের কাচের মত জল, তার প্রত্যেক অঙ্গ-ভঙ্গি দেখা যাচ্চে। বিশ মিনিট, আধ ঘণ্টাটাক এই প্রকার বনিটোর ছুটোছুটি আর ছোট মাছের কিলিবিলি ত দেখা যাচ্চে। আধ ঘণ্টা তিন কোয়ার্টার,—ক্রমে তিতি-বিরক্ত হয়ে আসচি, এমন সময় একজন বললে—ঐ ঐ! দশ-বারজনে বলে উঠলো, ঐ আসচে, ঐ আসচে!! চেয়ে দেখি দূরে প্রকাণ্ড একটা কালো বস্তু ভেসে আসচে, পাঁচ সাত ইঞ্চি জলের নীচে। ক্রমে বস্তুটা এগিয়ে আসতে লাগলো। প্রকাণ্ড থ্যাবড়া মাথা দেখা দিলে; সে গদাইলস্করি চাল; বনিটোর সোঁ-সোঁ ওতে নেই, তবে একবার ঘাড় ফেরালেই একটা মস্ত চক্কর হল। বিভীষণ মাছ; গম্ভীর চালে চলে আসচে—আর আগে আগে দু-একটা ছোট মাছ; আর কতক-গুলো ছোট মাছ তার পিঠে গায়ে পেটে খেলে বেড়াচ্চে। কোনো কোনোটা বা জেঁকে তার ঘাড় চেপে বসচে। ইনিই সসাঙ্গোপাঙ্গো হাঙর। যে মাছগুলি হাঙরের আগে আগে যাচ্চে, তাদের নাম আড়কাটি মাছ—পাইলট ফিশ। তারা হাঙরকে শিকার দেখিয়ে দেয় আর বোধহয় প্রসাদটা-আসটা পায়। কিন্তু হাঙরের সে মুখ-ব্যাদান দেখলে তারা যে বেশী সফল হয় তা বোধ হয় না। যে মাছগুলি আশে-পাশে ঘুরচে, পিঠে চড়ে বসছে, তারা হাঙর 'চোষক'। তাদের বুকের কাছে প্রায় চার ইঞ্চি লম্বা ও দুই ইঞ্চি চওড়া চেপটা গোলপানা একটি স্থান আছে। তার মাঝে, যেমন ইংরাজী অনেক রবারের জুতোর তলায় লম্বা লম্বা জুলি কাটা কিরকিরে থাকে, তেমনি জুলি কাটা কাটা। সেই জায়গাটা ঐ মাছ, হাঙরের গায়ে দিয়ে চিপ্সে ধরে; তাই হাঙরের গায়ে পিঠে চড়ে চলচে দেখায়। এরা নাকি হাঙরের গায়ের পোকা-মাকড় খেয়ে বাঁচে। এই দুই প্রকার মাছ পরিবেষ্টিত, না হয়ে হাঙর চলেন না। আর এদের, নিজের সহায় পারিষদ জ্ঞানে কিছু বলেনও না। ঐ মাছ একটা ছোট হাত সুতোয় ধরা পড়লো। তার বুকে জুতোর তলা একটু চেপে দিয়ে পা তুলতেই সেটা পায়ের সঙ্গে চিপ্সে উঠতে লাগল। ঐ রকম কোরে সে হাঙরের গায়ে লেগে যায়।

সেকেন্ড কেলাসের লোকগুলির বড়ই উৎসাহ। তাদের মধ্যে একজন ফৌজি লোক—তার ত উৎসাহের সীমা নেই! কোথা থেকে জাহাজ খুঁজে একটা ভীষণ বঁড়শির জোগাড় করলে। সে 'কুঁয়োর ঘটি তোলার' ঠাকুর দাদা! তাতে সেরখানেক মাংস আচ্ছা-দড়ি দিয়ে জোর করে জড়িয়ে বাঁধলে। তাতে এক মোটা কাছি বাঁধা হল। হাত চার বাদ দিয়ে একখানা মস্ত কাঠ ফাতনার জন্য লাগানো হল। তারপর, ফাতনা শুদ্ধ বঁড়শি, ঝুপ কোরে জলে ফেলে দেওয়া হল। জাহাজের নীচে একখানি পুলিশের নৌকা আমরা আসা পর্যন্ত চৌকি দিচ্ছিল—পাছে ডাঙার সঙ্গে আমাদের কোনোরকম ছোঁয়াছুঁয়ি হয়। সেই নৌকার উপর আবার দুজন দিব্বি ঘুমুচ্ছিল, আর যাত্রীদের যথেষ্ট ঘৃণার কারণ হচ্ছিল। এক্ষণে তারা বড় বন্ধু হয়ে উঠলো। হাঁকাহাঁকির চোটে আরব মিঞা চোখ মুছতে মুছতে উঠে দাঁড়ালেন। কি একটা হাঙ্গামা উপস্থিত বলে কোমর আঁটবার যোগাড় করছেন, এমন সময়ে বুঝতে পারলেন যে, অত হাঁকাহাঁকি, কেবল তাঁকে কড়িকাষ্ঠরূপ হাঙর ধরবার ফাতনাটিকে টোপ সহিত কিঞ্চিৎ দূরে সরিয়ে দেবার অনুরোধ ধ্বনি। তখন তিনি নিঃশ্বাস ছেড়ে, আকর্ণ বিস্তার হাসি হেসে একটা বাঁকের ডগায় কোরে ঠেলেঠুলে ফাতনাটাকে ত দূরে ফেললেন; আর আমরা উদগ্রীব হয়ে পায়ের ডগায় দাঁড়িয়ে বারান্দায় ঝুঁকে, ঐ আসে ঐ আসে—শ্রীহাঙরের জন্য 'সচকিত নয়নং পশ্যতি তব পন্থানং' হ'য়ে রইলাম এবং যাঁর জন্যে মানুষ ঐ প্রকার ধড়ফড় করে, সে চিরকাল যা করে, তাই হতে লাগলো—অর্থাৎ 'সাখি শ্যাম না এলো'। কিন্তু সকল দুঃখেরই একটা পার আছে। তখন সহসা জাহাজ হতে প্রায় দুশ হাত দূরে, বৃহৎ ভিস্তির মুষকের আকার কি একটা ভেসে উঠলো; সঙ্গে সঙ্গে, 'ঐ হাঙর ঐ হাঙ্গর' রব। চুপ চুপ—ছেলের দল!—হাঙর পালাবে। বলি, ওহে! সাদা টুপিগুলো একবার নাবাও না, হাঙরটা যে ভড়কে যাবে— ইত্যাকার আওয়াজ যখন কর্ণকুহরে প্রবেশ করচে, তাবৎ সেই হাঙর লবণ, সমুদ্র জন্মা, বঁড়শি-সংলগ্ন শোরের মাংসের তালটি উদরাগ্নিতে ভস্মাবশেষ করবার জন্যে, পালভরে নৌকার মত সোঁ করে সামনে এসে পড়লেন। আর পাঁচ হাত—এইবার হাঙরের মুখে টোপ ঠেকেছে! সে ভীম পুচ্ছ একটু হেললো—সোজাগতি চক্রাকারে পরিণত হল। যাঃ হাঙর চলে গেল যে হে! আবার একটু বাঁকলো, আর সেই প্রকাণ্ড শরীর ঘুরে, বড়শিমুখো দাঁড়ালো। আবার সোঁ করে আসচে—ঐ হাঁ করে, বঁড়শি ধরে-ধরে! আবার সেই পাপ লেজ নড়লো, আর হাঙর শরীর ঘুরিয়ে দূরে চললো। আবার ঐ চক্র দিয়ে আসচে, আবার হাঁ করচে; ঐ—টোপটা মুখে নিয়েচে, এইবার—ঐ ঐ চিতিয়ে পড়লো, হয়েছে, টোপ খেয়েচে—টান্ টান্ টান্, ৪০।৫০ জন টানে, প্রাণপণে টান্! কি জোর মাছের, কি ঝটাপট—কি হাঁ! টান্ টান্। জল থেকে এই উঠলো, ঐ যে জলে ঘুরচে, আবার চিতুচ্ছে, টান্ টান্! যাঃ টোপ খুলে গেল! হাঙর পালাল! তাই ত হে, তোমাদের কি তাড়াতাড়ি বাপু! একটু সময় দিলে না টোপ খেতে! যেই চিতিয়েচে অমনিই কি টানতে হয়? আর—'গতস্য শোচনা নাস্তি'; হাঙর ত বঁড়শি ছাড়িয়ে চোঁচা দৌড়। আড়কাঠি মাছকে, উপযুক্ত শিক্ষা দিলে কিনা ত খবর পাইনি—মোদ্দা হাঙর ত চোঁচা। আবার সেটা ছিল 'বাঘা' বঁড়শি—সান্নিধি পরিত্যাগ করবার জন্য স 'আড়কাঠি'—'রক্তচোষা' অন্তর্দধে।

কিন্তু নেহাত হতাশ হবার প্রয়োজন নেই। ঐ যে পলায়মান 'বাঘা'র গা ঘেঁষে আর একটা প্রকাণ্ড 'থ্যাবড়া মুখো' চলে আসচে! আহা হাঙরদের ভাষা নেই। নইলে 'বাঘা' নিশ্চিত পেটের খবর তাকে দিয়ে সাবধান করে দিতো। নিশ্চিত বলতো 'দেখ হে সাবধান, ওখানে একটা নতুন জানোয়ার এসেচে, বড় সুস্বাদ সুগন্ধ মাংস তার, কিন্তু কি শক্ত হাড়! এতকাল হাঙর-গিরি করচি, কতরকম জানোয়ার—জ্যান্ত, মরা, আধমরা উদরস্থ করেছি, কতরকম হাড়-গোড়, ইট-পাথর, কাঠ-কুটরো, পেটে পুরেচি, কিন্তু এ হাড়ের কাছে আর সব মাখম হে—মাখম!! এই দেখ না—আমার দাঁতের দশা, চোয়ালের দশা কি হয়েছে' বলে, একবার সেই আকটি দেশ-বিস্তৃত মুখ ব্যাদান কোরে আগন্তুক হাঙরকে অবশ্যই দেখাতো। সেও প্রাচীন বয়স-সুলভ অভিজ্ঞতা সহকারে—চ্যাঙ মাছের

পরবর্তী সংখ্যায়

হঠাৎ-অবতার

কালীপ্রসন্ন সিংহ

পিঁত্ত, কুজো-ভেটাকির পিলে, ঝিন্‌কের ঠান্ডা সরেরা ইত্যাদি সমুদ্রজ মহৌষধির কোনো না কোনোটা ব্যবহারের উপদেশ দিতই দিতো। কিন্তু যখন ওসব কিছুই হল না তখন হয় হাঙরদের অত্যন্ত অভাব, নতুবা ভাষা আছে, কিন্তু জলের মধ্যে কথা কওয়া চলে না! অতএব যতদিন না কোনো প্রকার হাঙরে অক্ষর আবিষ্কার হচ্ছে, ততদিন সে ভাষার ব্যবহার কেমন কোরে হয়? —অথবা 'বাঘা' মানুষ-ঘেঁষা হয়ে মানুষের ধাত পেয়েচে, তাই 'থ্যাবড়া'-কে আসল খবর কিছু না বলে, মুচকে হেসে 'ভাল আছ ত হে' বলে সরে গেল। —'আমি একাই ঠকবো?'

'আগে যান ভগীরথ শঙ্খ বাজাইয়ে, পাছু পাছু যান গঙ্গা......'—শঙ্খধ্বনি ত শোনা যায় না, কিন্তু আগে আগে চলেচেন 'পাইলট ফিশ', আর পাছু পাছু প্রকাণ্ড শরীর নাড়িয়ে আসচেন 'থ্যাবড়া'; তাঁর আশে-পাশে নেত্য করছেন 'হাঙর-চোষা' মাছ। আহা, ও—লোভ কি ছাড়া যায়? দশ হাত দরিয়ার উপর ঝিকঝিক কোরে তেল ভাসচে, আর খোসবু কতদূর ছুটেছে, তা 'থ্যাবড়াই' বলতে পারে। তার উপর সে কি দৃশ্য—সাদা, লাল জরদা—এক জায়গায়! আসল ইংরেজি শূয়োরের মাংস, কালো প্রকাণ্ড বঁড়শির চারিধারে বাঁধা, জলের মধ্যে, রং বেরঙের গোপী-মণ্ডল-মধ্যস্থ কৃষ্ণের ন্যায় দোল খাচ্ছে!!

এবার সব চুপ—নোড়োচোড় না, আর দেখ—তাড়াতাড়ি কোরো না। মোদ্দা কাছির কাছে কাছে থেকো। ঐ—বঁড়শির কাছে কাছে ঘুরচে; টোপটা মুখে নিয়ে নেড়ে-চেড়ে দেখচে! দেখুক। চুপ চুপ—এইবার

গ্রামের পথে ফটো: অমিতেশ বন্দ্যোপাধ্যায়

চিৎ হল—ঐ যে আড়ে গিলেচে চুপ—গিলতে দাও। তখন 'থ্যাবড়া' অবসর ক্রমে আড় হয়ে টোপ উদরস্থ কোরে যেমন চলে যাবে, অমনি পড়লো টান! বিস্মিত 'থ্যাবড়া' মুখ ঝেড়ে চাইলে সেটাকে ফেলে দিতে—উলটো উৎপত্তি!! বঁড়শি গেল বিঁধে, আর ওপরে ছেলে, বুড়ো, জোয়ান, দে টান্—কাছি ধরে দে টান্। ঐ হাঙরের মাথাটা জল ছাড়িয়ে উঠলো—টান্ ভাই টান্। ঐ যে—প্রায় আধখানা হাঙর জলের উপর। বাপ কি মুখ! ও যে সবটাই মুখ আর গলা হে! টান্—ঐ সবটা জল ছাড়িয়েছে। ঐ যে বঁড়শিটা বিঁধেচে—ঠোঁট এ ফোঁড় ও ফোঁড়—টান্। থাম-থাম ও আরব পুলিশ মাঝি, ওর ল্যাজের দিকে একটা দড়ি বেঁধে দাও ত—নইলে যে এত বড় জানোয়ার টেনে তোলা দায়। সাবধান হয়ে ভাই, ও ল্যাজের ঝাপটায় ঘোড়ার ঠ্যাং ভেঙে যায়। আবার টান্—কি ভারি হে? ওমা, ওকি? তাই ত হে, হাঙরের পেটের নীচে দিয়ে ও ঝুলছে কি? ও যে নাড়িভুঁড়ি! নিজের ভারে নিজের নাড়িভুঁড়ি বেরুল যে! যাক ওটা কেটে দাও, জলে পড়ুক, বোঝা কমুক; টান্ ভাই টান্। এ যে রক্তের ফোয়ারা হে! আর কাপড়ের মায়া করলে চলবে না। টান্—এই এলো। এইবার জাহাজের ওপর ফেল; ভাই হুঁশিয়ার, খুব হুঁশিয়ার, তেড়ে এক কামড়ে একটা হাত ওয়ার—আর ঐ ল্যাজ সাবধান। এইবার, এইবার দড়ি ছাড়—ধুপ! বাবা, কি হাঙর! কি ধপাং কোরেই জাহাজের উপর পড়লো? সাবধানের মার নেই—ঐ কাঁড়কাঠখানা দিয়ে ওর মাথায় মার—ওহে ফৌজিম্যান, তুমি সেপাই লোক, এ তোমারি কাজ। 'বটে ত'। রক্ত মাখা গায়, কাপড়ে, ফৌজি যাত্রী, কাঁড়-কাঠ উঠিয়ে, দুম-দুম দিতে লাগলো হাঙরের মাথায়। আর মেয়েরা আহা কি নিষ্ঠুর, মের না ইত্যাদি চীৎকার করতে লাগলো—অথচ দেখতেও ছাড়চে না। তারপর সে বীভৎস কাণ্ড এইখানেই বিরাম হোক। কেমন কোরে সে হাঙরের পেট চেরা হল, কেমন রক্তের নদী বইতে লাগলো, কেমন সে হাঙর ছিন্ন অন্ত্র, ভিন্ন দেহ, ছিন্ন হৃদয় হয়েও কতক্ষণ কাঁপতে লাগলো, নড়তে লাগলো; কেমন করে তার পেট থেকে অস্থি, চর্ম, মাংস, কাঠ কুটরো, এক রাশ বেরুলো— সে সব কথা থাক। এই পর্যন্ত যে, সেদিন আমার খাওয়া-দাওয়ার দফা মাটি হয়ে গিয়েছিল। সব জিনিসেই সেই হাঙরের গন্ধ বোধ হতে লাগলো।

বঙ্কিমচন্দ্রের জীবনের অজ্ঞাত কাহিনী

গোপালচন্দ্র রায়

বঙ্কিমচন্দ্র তাঁর কাঁটালপাড়ার যে বাড়ীতে বসে বন্দেমাতরম্ সঙ্গীত, কৃষ্ণকান্তের উইল উপন্যাস ও অনেকগুলি প্রবন্ধ রচনা করেছিলেন এবং শেষ দু-বছর বঙ্গদর্শন সম্পাদনা করেছিলেন, পশ্চিমবঙ্গ সরকার সংলগ্ন বাগানসহ সেই বাড়ীটি নিয়ে সেখানে একটি 'ঋষি বঙ্কিম গ্রন্থাগার ও সংগ্রহশালা' স্থাপন করেছেন। রোজই দেশ-দেশান্তরের লোক কাঁটালপাড়ায় বঙ্কিম-তীর্থে এসে এই গ্রন্থাগার ও সংগ্রহশালাটি দেখে যান। ১৯৬০ খ্রীষ্টাব্দে এপ্রিল মাসে একদিন বিকালে শান্তিরঞ্জন দাশগুপ্ত নামে এমনি এক প্রৌঢ় ভদ্রলোক এলেন কাঁটালপাড়ায় এই বঙ্কিমতীর্থে। বঙ্কিমচন্দ্রের প্রতি গভীর শ্রদ্ধা নিয়ে তিনি অত্যন্ত আগ্রহের সঙ্গে ঘুরে ঘুরে গ্রন্থাগার ও সংগ্রহশালাটি দেখলেন। শেষে আমাকে গ্রন্থাগার ও সংগ্রহশালার অধ্যক্ষ জেনে আমার কাছে এসে বঙ্কিমচন্দ্র সম্বন্ধে কয়েকটা কথা শুনতে চাইলেন।

আমার মুখে তাঁর প্রশ্নের বিস্তৃত উত্তর পেয়ে শেষে তিনি বললেন—এইবার আমি আপনাকে একটা কথা শোনাব। সেটা আমার পিতামহ শিবশংকর দাশগুপ্তের আমলের একটা বিরাট মামলার কথা। সেই মামলার ফলেই আমার পিতামহ একেবারে সর্বস্বান্ত হয়েছিলেন। সেই মামলার কথা আজ আর কেউ জানে না এবং সে কথা এ পর্যন্ত কোথাও লেখাও হয়নি।

এই বলে শান্তিরঞ্জন একটি চাঞ্চল্যকর কাহিনী শোনালেন। তাঁর মুখে কাহিনীটি শুনে তাঁর উপস্থিতিতে তখনই আমি ঘটনাটা সংক্ষিপ্ত আকারে এবং ঘটনায় উল্লিখিত নদ, নদী, গ্রাম ও লোকজনের নামগুলি লিখে নিয়েছিলাম। পরে বিস্তৃত আকারে এ কাহিনীটি লিখি। বঙ্কিমচন্দ্রের সেই অশ্রুতপূর্ব কাহিনীটি আজ এখানে বলছি—

শিবশংকর দাশগুপ্তের বাড়ী ছিল বরিশাল জেলার গৌর-নদী থানার অন্তর্গত মলাচিড়া নামক গ্রামে। শিবশংকরবাবু ছিলেন একজন ছোটখাট জমিদার। তাঁর জমিদারীটা ছিল খুলনা জেলায় চরডাকাতিয়া গ্রামে। এই চরডাকাতিয়া মৌজার আয় ছিল মাত্র সাত-আট হাজার টাকা।

শিবশঙ্করবাবু তাঁর ভগ্নীপতি রামসাগর সেনকে জমিদারী দেখাশোনার ভার দিয়ে নিজে বরিশাল শহরে মোক্তারী করতেন। রামসাগর সেনের বাড়ী ছিল যশোহর জেলার বড়াইল মহকুমার অন্তর্গত কালিয়াবেন্দা গ্রামে। রামসাগরবাবু চরডাকাতিয়া গ্রামে [illegible] বাড়ীতেই থাকতেন। কাছারিতে নায়েব, গোমস্তা, পাইকও ছিল।

চরডাকাতিয়া গ্রাম থেকে আড়াই মাইল দূরে চিতলমারীতে তখন ছিল একটা খুব বড় হাট। চিতলমারী হ'ল খুলনা জেলার বাগেরহাট মহকুমায়। চিতলমারী বাগেরহাট শহর থেকে তের মাইল উত্তর-পূর্বে এবং বাগেরহাট থানার সীমান্তে অবস্থিত। বলেশ্বর ও চিত্রা নদীর সংগমস্থলে এই চিতলমারী। এখানে যে প্রকাণ্ড হাটটি ছিল, সেই হাটে সকল রকমেরই বহু দোকান ছিল। এখনকার মত তখন এত ঘন ঘন হাট বা বাজার ছিল না। চিতলমারীর হাট বা গঞ্জটিতে নিকটবর্তী গ্রামের লোকজন ত বটেই এমন কি বহু দূর-দূর গ্রামের লোকেও বেচাকেনা করতে আসত। বলাবাহুল্য চরডাকাতিয়ার লোকেরাও চিতলমারীর হাটে যেত।

একবার চরডাকাতিয়া গ্রামের এক নমঃশূদ্র শ্রেণীর ব্রাহ্মণ ঐ চিতলমারীর হাটে তামাক ও চিটেগুড় বিক্রি করতে যায়। চিতলমারী ছিল মুসলমান প্রধান গ্রাম এবং ঐ গ্রামের হাটের জমিদারও ছিলেন তখন এক মুসলমান ভদ্রলোক।

যাই হোক সেদিন হাটে এক মুসলমান খরিদ্দার চরডাকাতিয়ার ঐ নমঃশূদ্র শ্রেণীর ব্রাহ্মণের কাছে তামাক ও চিটেগুড় কিনতে গিয়ে দাম নিয়ে কথা কাটাকাটি করতে থাকে। এই কথা কাটাকাটি করতে করতেই মুসলমান খরিদ্দারটি নমঃশূদ্রের ব্রাহ্মণটির জাত তুলে অকথ্য গালাগালি দিয়ে পা দিয়ে তার চিটেগুড়ের কলসী ফেলে দেয়। এতে তার কলসীর গুড় সব মাটিতে পড়ে যায়।

ব্রাহ্মণ অপমান সহ্য করে চলে এসে তাদের গ্রামের মালিক রামসাগর সেনকে সমস্ত জানাল। রামসাগর সেনের সঙ্গে চিতলমারীর জমিদারের মোটেই সদ্ভাব ছিল না। অনেক দিন থেকেই একটা ঝগড়া-ঝাটি চলে আসছিল। রামসাগর ভাবলেন—আমার প্রজাকে ওখানকার মুসলমানরা এইভাবে অপমান করবে, এ কিছুতেই সহ্য করা হবে না। ওরা প্রায়ই এইভাবে চরডাকাতিয়ার লোককে অপমান করে। এই ভেবে তিনি সেই দিনই সন্ধ্যায় গ্রামের কয়েকজন মাতব্বর নমঃশূদ্রকে ডাকালেন। ডাকিয়ে তাদের চিতলমারীর হাটে মুসলমান খরিদ্দার কর্তৃক তাদের সম্প্রদায়ের ব্রাহ্মণের নিদারুণ অপমানের কথা শোনালেন। তাদের কেউ কেউ অবশ্য ইতিপূর্বেই ঐ ব্রাহ্মণের অপমানের কথা অন্য লোকের মুখ থেকেও শুনেছিল।

রামসাগরবাবু বললেন—আমি ভেবে দেখলাম, ওখানকার মুসলমানদের বড্ড বাড় বেড়েছে। ওদের একটু শায়েস্তা করতেই হবে। আমাদের গ্রামের লোক ওদের হাটে গেলে ওরা প্রায়ই তাদের উপর অত্যাচার করে। ওদের হাটের জমিদারও এতে কিছু বলে না। জমিদারের বলেই ওদের এত সাহস। তাই আমি অনেক ভেবে ঠিক করেছি, ঐ চিতলমারীর হাট লুঠ করাব। দেখা যাক, ওখানকার মুসলমানরা কি করতে পারে! তোমরা এক কাজ কর, আমাদের এই গ্রামকে কেন্দ্র করে কুড়ি মাইলব্যাপী চারদিকে যেখানে যত নমঃশূদ্র আছে, তাদের খবর দাও যে অমুক দিন চিতলমারীর হাট লুঠ করতে হবে। বলবে, ওখানকার মুসলমানরা তোমাদের এবং

তোমাদের সম্প্রদায়ের ব্রাহ্মণের কি দারুণ অপমান করেছে। তোমরা এও বলবে— আমি তোমাদের সঙ্গে আছি এবং আমিই এই হাট লুঠের হুকুম দিচ্ছি।

চরডাকাতিয়ার নমঃশূদ্ররাও চিতলমারীর মুসলমানদের উপর সন্তুষ্ট ছিল না। এখন রামসাগরবাবুর এই কথায় তারা খুবই উত্তেজিত হয়ে উঠল এবং চারদিকের গ্রামগুলিতে স্বজাতিদের মধ্যে গোপনে এই হাট লুঠের কথা প্রচার করতে লাগল।

ঠিক ঐ সময় বাগেরহাট থেকে মোল্লারহাট পর্যন্ত প্রায় ২৫ মাইলের একটা রাস্তা তৈরি হচ্ছিল। তাতে পাঁচ সাত শ' পশ্চিমা কুলী কাজ করছিল, তাদেরও প্রলোভন দেখিয়ে হাট লুঠের কাজে লাগানো হয়েছিল।

নমঃশূদ্ররা হাট লুঠের কথা গোপনে প্রচার করলেও কানাঘুষায় কথাটা কিছু কিছু ফাঁস হয়ে গিয়েছিল এবং সেই ফাঁস কথা চিতলমারী হাটের মুসলমান জমিদারের কানে গিয়েও পৌঁছেছিল। তিনি কিন্তু ঐ কথায় ততটা গুরুত্ব দেন নি, তিনি ভেবেছিলেন, হাট লুঠ হলে ক্ষতি হবে হিন্দুদেরও, কারণ হাটে হিন্দুর দোকানও রয়েছে অনেক। তাই তিনি লুঠ ঠেকাবার জন্য মোটেই প্রস্তুত ছিলেন না। আর প্রস্তুত থাকলেও তিনি অত লোকের বিরুদ্ধে পেরেও উঠতেন না।

যাই হোক্, নির্দিষ্ট দিনে কয়েক হাজার লোক লাঠি-সড়কি প্রভৃতি অস্ত্রে সজ্জিত হয়ে চিতলমারীর বিরাট হাটটি লুঠ করে নিল, দোকানীরা প্রস্তুত ছিল না। তারা এত লোক দেখে বাধাও দিতে পারল না। হাটে নানা রকমের ছোট-বড় করে পাঁচ ছ শ' দোকান ছিল। সমস্ত দোকানই লুঠ হল। লুণ্ঠনকারীরা বিনা বাধাতেই সমস্ত জিনিস লুঠ করে নিয়ে গেল। অবশ্য যে যত পারল সঙ্গে নিল, বাকি সব জিনিস নদীর জলে ফেলে দিল, নয়তো আগুন লাগিয়ে পুড়িয়ে দিল। আগুন লাগাবার ফলে হাটের সমস্ত দোকানই পুড়ে ছাই হয়ে গেল। লুণ্ঠনকারীরা অন্যান্য জিনিসের ন্যায় নদীতে এত বেশী কেরোসিন তেল, সরষের তেল ও নারকেল তেল ফেলেছিল যে, লোকে কয়েকদিন নদীর জল ব্যবহার করতে পারেনি।

চিতলমারীর হাট লুঠ হবার পর খুলনায় বঙ্কিমচন্দ্রের কাছে ঐ হাট লুঠের খবর গেল। বঙ্কিমচন্দ্র তখন খুলনায় ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেট ছিলেন। বঙ্কিমচন্দ্র এই খবর পেয়ে তখনই কোশ নামে এক রকমের বড় নৌকায় এক পুলিশবাহিনী নিয়ে রওনা হলেন। কোশ নৌকাগুলোর পিছন দিকটা একটু উঁচু এবং সামনের দিকটা একটু নীচু। এই নৌকা ৪০।৫০ হাত লম্বা ও ১৫।১৬ হাত চওড়া। বোঝাই নেয় প্রায় হাজার মণের বেশী।

বঙ্কিমচন্দ্র এই কোশ নৌকায় করে জলপথে চিতলমারী আসার পথে নদীতে তেলের স্রোত দেখে লুঠের পরিমাণ অনেকটা অনুমান করতে পেরেছিলেন। বঙ্কিমচন্দ্র চিতলমারীর কাছাকাছি এসে নদীর ঘাটে এক জায়গায় মেয়েদের মুখে শুনতে পেলেন, তারা নিজেদের মধ্যে বলাবলি করছে—'আমাদের যা কাপড় লুঠ করে এনেছে দু'তিন বছর আর কারও কাপড় কিনতে হবে না।' আর একজন বলছে—'আমাদের তেল ঘি যা এনেছে, তাতে ক' মাস ভালই চলে যাবে।'

বঙ্কিমচন্দ্র পথে কোথাও না থেমে একেবারে চিতলমারী চলে এলেন। চিতলমারীতে এসে হাট লুঠের সমস্ত ঘটনা শুনলেন এবং হাটের ভস্মাবশেষও দেখলেন। আর কে যে এই হাট লুঠের নায়ক বা নির্দেশকারী তাও শুনলেন।

এদিকে রামসাগর সেন বঙ্কিমচন্দ্র আসছেন শুনেই পলাতক হয়েছিলেন। বঙ্কিমচন্দ্র প্রথমে রামসাগর সেনের খোঁজ করতে গিয়ে শুনলেন, তিনি পলাতক হয়েছেন। তখন তিনি চরডাকাতিয়া ও তার আশপাশের গ্রামে গ্রামে গিয়ে লুণ্ঠনকারীদের বাড়ীতে বাড়ীতে হানা দিয়ে লুঠনকারীদের ধরতে লাগলেন। এইভাবে তিনি প্রায় ৩০০ লুণ্ঠনকারীকে ধরলেন। ধরে তাদের খুলনায় পাঠিয়ে দিলেন।

এবার তিনি পুনরায় রামসাগর সেনের খোঁজ করতে লাগলেন। রামসাগর প্রথমে চরডাকাতিয়া থেকে আড়াই মাইল দূরে শৈলদহ গ্রামে গিয়ে সেখানে অধিকারী উপাধিধারী এক অবস্থাপন্ন নমঃশূদ্রের বাড়ীতে লুকিয়ে ছিলেন। এখানেও ধরা পড়বার আশঙ্কা দেখে পরে তিনি বলেশ্বর নদের পূর্বপারে বরিশাল জেলার মাটিভাঙ্গা গ্রামে গিয়ে এক গোয়ালার বাড়ীতে আত্মগোপন করে রইলেন। বঙ্কিমচন্দ্র বহু পরিশ্রমে খোঁজ করে করে মাটিভাঙ্গা গ্রামে যে গোয়ালার বাড়ীতে রামসাগরবাবু লুকিয়ে ছিলেন, একদিন দুপুরে সেই বাড়ীতে গিয়ে হাজির হলেন। রামসাগরবাবু তখন রান্না করে, স্নান করবার আগে তেল মেখে তামাক খাচ্ছিলেন।

রামসাগরবাবু সামনে পুলিশসহ বঙ্কিমচন্দ্রকে দেখে সঙ্গে সঙ্গেই মূর্চ্ছিত হয়ে গেলেন। বঙ্কিমচন্দ্রের নির্দেশে রামসাগরবাবুর মাথায় জল দিয়ে পাখার বাতাস করায়, কিছুক্ষণের মধ্যেই তিনি চাঙ্গা হয়ে উঠলেন। তখন বঙ্কিমচন্দ্র রামসাগরবাবুকে বললেন—সেনমশায়, আপনি আহারাদি সেরে নিন। আপনার তেমন কোন ভয় নেই।

রামসাগরবাবু আর স্নানাহার করবেন কি! তিনি সকলের কথায় স্নান করে কোন রকমে কিছু মুখে দিলেন। তখন বঙ্কিমচন্দ্র তাঁকে নিয়ে খুলনায় চলে এলেন। মূল আসামী রামসাগর সেনসহ ধৃত লুণ্ঠনকারীরা সকলেই হাজতে রইল।

মামলা শুরু হল এবং এই মামলা ছ-সাত মাস চলল। মামলা চলাকালে হাজতেই রামসাগর সেন মারা গেলেন। রামসাগরবাবু মারা গেলে শিবশংকরবাবু জমিদারী দেখাশুনা করবার জন্য মোক্তারী ছেড়ে বরিশাল থেকে বাড়ী চলে এলেন।

বিচারে বহু লোকের জেল হয়েছিল। শিবশংকরবাবু মোকদ্দমার সমস্ত ব্যয় বহন করেছিলেন। শুধু তাই নয়, যাদের জেল হয়েছিল, তাদের সংসার খরচও বহন করেছিলেন। এই মামলায় তাঁর প্রায় ২৫ হাজার টাকা খরচ হয়েছিল। শিবশংকরবাবু দেনা করে জমিদারীটা কোনরকমে রক্ষা করতে পারলেও এই মামলাতেই তিনি প্রায় সর্বস্বান্ত হয়েছিলেন।

চিতলমারীর হাটলুঠের এই মোকদ্দমা থেকে বঙ্কিমচন্দ্রের দক্ষতা ত' বটেই, তাঁর নিরপেক্ষতা সম্বন্ধেও আমরা বিশেষভাবে জানতে পারি। বঙ্কিমচন্দ্র তাঁর 'বাঙলার কৃষক' প্রবন্ধে দরিদ্র হাসিম সেখের কষ্টে কাঁদিলেও এবং তাঁর উপন্যাসে একাধিক মহৎ মুসলমান চরিত্র সৃষ্টি করলেও, তাঁর উপন্যাসে পাত্র-পাত্রীর মুখের কয়েকটা কথাকে নিয়ে কিছুসংখ্যক মুসলমান তাঁকে মুসলমান-বিদ্বেষী বলে থাকেন। কিন্তু এই চিতলমারী হাটলুঠের মোকদ্দমা থেকে আমরা দেখতে পাচ্ছি, তিনি হিন্দু-মুসলমান ভেদাভেদ না করে, হিন্দু লুণ্ঠনকারীদেরই ধরবার জন্য নিজেই কি পরিশ্রমই না করেছিলেন।

উপেক্ষিতা হেলেন

সুধীর করণ

পৌরাণিক কাহিনীর অন্যতম শ্রেষ্ঠ রূপকার মহাকবি হোমার। ট্রয় যুদ্ধের কয়েকশ' বছর প'রে তাঁর জন্ম হয়েছিল বলে অনেকের অনুমান এবং ট্রয় যুদ্ধের আনুমানিক কাল খৃষ্টপূর্ব দ্বাদশ শতাব্দী। প্রেম ও যুদ্ধের মহাকবি হোমারের প্রভাব শুধু গ্রীকজগতে নয়, ইউরোপের সর্বদেশের সাহিত্যে এবং পৃথিবীর অন্যান্য অংশের সাহিত্যেও পরিলক্ষিত হয়। হোমারের নামে প্রচলিত ইলিয়াদ ও ওদিসি নামক দুটি মহাকাব্য পাশ্চাত্ত্য জগতের সবচেয়ে বেশী জনপ্রিয় মহাকাব্য।

ইলিয়াদ মহাকাব্যের নামকরণ, কোন নায়ক-নায়িকার নামের সঙ্গে জড়িত নয়। ইলিয়াদ শব্দের অর্থ ইলিয়াম-সম্পর্কিত এবং ইলিয়াম, সুপ্রাচীন এশীয় নগর ট্রয়েরই অপর নাম—যার অবস্থিতি ছিল উত্তর-পশ্চিম এশিয়া মাইনরের দার্দানেলিশ প্রণালীর সন্নিকটে।

'ওদিসি' নামকরণের সঙ্গে অবশ্য নায়কের নাম ঘনিষ্ঠ।

প্রসঙ্গতঃ বলা যায় হোমারের কাব্যে 'গ্রীক' শব্দটিও ব্যবহৃত হয়নি।

গ্রীকদের অভিহিত করা হয়েছে, একিয়ান, আরগিভ্ এবং দানান নামে। একিয়ান-রাজ্ঞী হেলেনের উদ্ধারকার্যের জন্য তার স্বামী মেনেলাউসের আহ্বানে বিভিন্ন গ্রীসীয় উপজাতি স্ব স্ব নেতৃবৃন্দের অধীনে ট্রয় অবরোধ করেছিল।

মহাকাব্যের জগৎ রোম্যান্টিক জগৎ নয়। হোমারের মহাকাব্যেও যে জগতের চিত্র পরিস্ফুট, সে জগৎ বস্তুতঃ মধুর নয়; ভয়ংকর, বীভৎস, বিস্ময়কর, রোমাঞ্চকর এবং বর্বর সংঘর্ষে রক্তাক্ত। এরই ফাঁকে ফাঁকে দুর্বার মনুষ্যত্বেরও প্রকাশ। হোমারে পৃথিবী কেন, স্বর্গ ও পৃথিবী ছাড়া অন্য কিছু নয়। স্বর্গের দেবতাদের মধ্যেও ঘৃণা-ঈর্ষা-দ্বেষ-দ্বন্দ্ব, সীমাহীন এবং ক্ষমাহীন। দেবতাদের চরিত্রও দেবোচিত নয়। দেবতাদের পারস্পরিক ঈর্ষা এবং দ্বন্দ্ব-কলহ শুধু দেবলোকেই আবদ্ধ নয়, নরলোকেও তার প্রলয়ংকর প্রসার।

হোমারের কাব্যে যে যুগের ছবি, সে যুগ, ইতিহাসের গন্ডীতে আবদ্ধ নয়, সে যুগের মানুষের বর্বরতা যেমন সত্য তেমনি সত্য তাদের আনুগত্য, বন্ধুতা, প্রেম ও আত্মত্যাগ। ভালো-মন্দ সব কিছুরই এক বলিষ্ঠ এবং বর্বর প্রকাশ—সব মহাকাব্যেরই অন্যতম লক্ষণ বলে পরিগণিত। হোমারও অ-ব্যতিক্রম। তাঁর কাব্যজগৎ খুব বিস্তৃত নয়, গ্রীস, ক্রীট, সাইপ্রাস, ফোনেশিয়া, মিশর, এশিয়ামাইনরের পশ্চিম উপকূলে এবং অন্যান্য কয়েকটি দ্বীপের মধ্যেই তা সীমাবদ্ধ; যদিও আফ্রিকার মরুদ্যানে পদ্মভোজী মানুষের এবং বিপজ্জনক ইতালীয় উপকূলভাগের রূপকথা ওদিসির মধ্যে বর্তমান।

হোমারের নারীচরিত্র সম্বন্ধে অনেক সমালোচকই প্রশংসামুখর এবং তা অযথার্থ নয়। 'সুন্দরী বুদ্ধিদীপ্ত এবং পবিত্র' এই নামে অভিহিত করে অনেকেই হোমার-বর্ণিত নারীকুলের মহিমা বৃদ্ধি করেছেন। সুন্দরী পত্নী ও মহিমান্বিতা জননী আন্দ্রোমাখে, পবিত্র ধৈর্যময়ী পেনিলোপে দুজনেই আদর্শরূপে গৃহীত। উজ্জ্বল, বিভাময়ী হেলেন, অতুলনীয়া রূপসী হেলেনও ইলিয়াদ কাব্যের কেন্দ্রস্থলে বর্তমান—কিন্তু তবু এ কথাও বলা চলে যে, ইলিয়াদ কাব্যে হোমার নারীচরিত্রগুলিকে গৌণ করে রেখেছেন। এই কারণেই অবশ্য কোন কোন সমালোচক এই অনুচ্ছ্বসিত রীতির পক্ষে অভিমত প্রকাশ করতে গিয়ে একে গ্রীক আর্টের বৈশিষ্ট্য বলে স্বীকার করেছেন।

বলা বাহুল্য হেলেন, ইলিয়াদে উপেক্ষিতা বলে, মনে করার যথেষ্ট কারণ আছে বলেই হেলেনের গৌণতাকেই অনেকে হোমারীয় বৈশিষ্ট্য বলে মনে করেন।* যুদ্ধ-বর্ণনার ক্ষেত্রে হোমারকে কিন্তু বাক্-সংযমী মনে করার কারণ নেই, কিন্তু হেলেন সম্পর্কে তাঁর বাক্-সংযমকে প্রশংসার চোখে দেখলেও এ কথা স্বভাবতঃই মনে পড়তে পারে সুন্দরী হেলেন ("Helen of Troy, the beautiful woman whom all women hate and all men, even against their will admire—") ইলিয়াদ কাব্যের মূলীভূত কারণ হলেও, সে যেন তেমন করে হোমারের কল্পনাকে উজ্জীবিত করতে পারেনি। বর্ণনার আতিশয্য কোন আর্টের পক্ষেই শোভনীয় নয়, কিন্তু মহাকাব্যের একটি বিশিষ্ট চরিত্র রূপের বর্ণনায় ও গুণের বর্ণনায় পরিপূর্ণরূপে সংক্ষেপিত হবে, এ কথা সর্বজনগ্রাহ্য নাও হতে পারে। ফলে, হেলেনকে যদি হোমারের কাব্যে উপেক্ষিতা বলা যায়, তা অত্যুক্তি হবে না। সংঘাত ও রক্তপাতের মধ্যে হেলেন যেন আচ্ছন্ন; তার অশ্রুপাতও আমাদের মনে কোনরূপ সহৃদয় রেখাপাত করে না।

ইলিয়াদ মহাকাব্যে, দেবীত্রয়ের দ্বন্দ্ব এবং প্যারিসের মধ্যস্থতার কাহিনীও বর্ণিত হয় নি। বিজয়িনী দেবী আফ্রোদিতে, প্যারিসকে পৃথিবীর সর্বশ্রেষ্ঠ সুন্দরীর অধিস্বামী করার যে প্রতিশ্রুতি দিয়েছিল, সে কথাও হোমার স্পষ্টভাবে বলেন নি। যতটুকু আভাস-ইঙ্গিত হোমারের কাব্যে পাওয়া যায়, তা একান্তভাবেই অস্পষ্ট। ইলিয়াদ কাব্যের চব্বিশটি অধ্যায়ের মধ্যে শুধু রণনির্ঘোষ, হত্যা ও মৃত্যু। তার মধ্যে হেলেন একান্তরূপেই গৌণ, নিয়তিবাধ্য এবং যন্ত্রবৎ পরিচালিত। অথচ হোমারের কাব্যে হেলেনের চরিত্র চিত্রণের অবকাশ ছিল প্রচুর।

হোমারের কাব্যের সূচনা, গ্রীকদের ট্রয় অবরোধ থেকে। ফলে হেলেনের প্রাথমিক কোন চিত্রও ইলিয়াদে নেই।

খৃষ্টীয় পঞ্চম শতাব্দীতে ইউরিপাইদেস 'ট্রোজান ওম্যান' নামে যে নাটক রচনা করেন, তাতেই প্যারিস ও অন্যান্য দেবীদের প্রসঙ্গ বিশেষভাবে উপস্থাপিত। প্যারিসের হেলেন লাভের মূলে দেবীদের বাদ-বিসংবাদই বিশেষ ক্রিয়াশীল। দেবদেবীদের মধ্যে কোন্দল সৃষ্টি করার ব্যাপারে ভারতীয় পুরাণে মহর্ষি নারদের যে ভূমিকা, গ্রীক-পুরাণে দেবী এরিস-এরও সেই ভূমিকা। দেবী এরিস হচ্ছে অমঙ্গলের দেবী; দুষ্টা সরস্বতী। দেবতাদের এক ভোজসভায় দেবী এরিস একবার একটি সোনালী আপেল ছুঁড়ে দেয়—তাতে লেখা : 'সবচেয়ে সেরা সুন্দরীর জন্য'। বলা বাহুল্য, এরিসের উদ্দেশ্য ছিল, স্বভাবতঃই ঈর্ষাপরায়ণা এবং অহংকারী দেবীদের মধ্যে বিবাদ বাধিয়ে মজা দেখা।

সব দেবীই আপেলটি গ্রহণ করার জন্য উৎসুক হয়ে উঠেছিল, কিন্তু শেষ পর্যন্ত তিনজনের মধ্যেই প্রতিযোগিতা শুরু হয়। এই দেবীত্রয়ের নাম—হেরা, এথেনা এবং আফ্রোদিতে। এরা দেবরাজ জেউসকে মধ্যস্থতা করার জন্য অনুরোধ করেছিল, জেউস কিন্তু বেগতিক বুঝে কারুর বিরাগ-ভাজন না হওয়ার জন্যই মধ্যস্থ হতে অস্বীকার করেন। দায় এড়িয়ে যাবার জন্য জেউসই দেবীদের বলেন, প্যারিসের কাছে যেতে। সুন্দর যুবক প্যারিস, সৌন্দর্য-বিচার করার ক্ষমতাও তার আছে।

দেবীরা চলে আসে ইদা পাহাড়ে। সেই পাহাড়েই পিতার আদেশে প্যারিস তখন মেষপালকরূপে ভেড়া চরানোর কাজে নিযুক্ত ছিল। অবশ্য ভেড়া চরানো ছাড়াও অন্য আর একটি কাজে নিজেকে সে নিয়োজিত করেছিল, সে কাজটি হচ্ছে এক পরীর সঙ্গে প্রেম করা।

দেবীদের উজ্জ্বল আভায় প্যারিস প্রথমে বিমূঢ়। দেবীরা অবশ্য ওদের সৌন্দর্য বিচার করার কথা না বলে বললো—'তোমাকে

"Above all, and before all, there is Helen, the innocent cause of the wars of the Greeks and Trojans alike, who is all the more impressive because we see so little of her and because Homer, unlike the makers of mediaeval romances, is far too wise to attempt a catalogue of her charms—here is an early example of the "nothing too much" which is the secret of so many triumphs of Greek art! Because of this reticence of the beauty of Helen has lived through the ages and made flaming alters of the hearts of innumerable poets."

—The outline of Literaturi

আমরা তিনটি বর দিতে চাই, তার মধ্যে যে কোন একটি তুমি গ্রহণ করতে পার।'

হেরা বললো, তোমাকে আমি ইউরোপ এবং এশিয়ার অধিপতি করে দেব।

এথেনা বললো, ট্রয়বাসী হয়েও গ্রীকদের ধ্বংস করতে পারবে তুমি।

আফ্রোদিতে বললো, পৃথিবীর সবচেয়ে সুন্দরীকে পাবে।

যুবক প্যারিস স্বভাবতঃই তৃতীয় বরটি প্রার্থনা করলো। ওরা প্রতিজ্ঞাবদ্ধ ছিল, প্যারিস যার বরটি গ্রহণ করবে, সোনার আপেল যাবে তারই অধিকারে এবং সেইই হবে সেরা সুন্দরী। ফলে আফ্রোদিতে পেল সোনার আপেল আর প্যারিস পেল—হেরা এবং এথেনার রোষদৃষ্টি।

আফ্রোদিতে প্যারিসকে নিয়ে গেল স্পার্টা-য়। স্পার্টার রাজা মেনেলাউস প্যারিসকে আশ্রয় দিলেন সম্মানিত অতিথি এবং বিশ্বাসভাজন বন্ধু হিসাবে। কিন্তু মেনেলাউসের অনুপস্থিতির সুযোগে তাঁর সুন্দরী পত্নী হেলেনকে অপহরণ করে প্যারিস চলে গেল ট্রয় নগরে। বলা বাহুল্য, আফ্রোদিতের সহায়তা লাভের ফলেই এই ঘটনা ঘটলো।

হোমার এ সব কথা ইলিয়াদে লেখেন নি। হেলেন-প্যারিস কাহিনীর আদিপর্ব যেমন তিনি লেখেন নি, তেমনি অন্ত্যপর্বও তিনি লেখেন নি। এমন কি দারু-অশ্বের ট্রয় নগরীর অভ্যন্তরে প্রবেশ, দুর্গের অভ্যন্তরে যুদ্ধ ও হত্যাকান্ড এবং শেষ পর্যন্ত দেবী আফ্রোদিতের সহায়তায় হেলেনের দুর্গ ত্যাগ ও মেনেলাউসের সঙ্গে মিলন প্রভৃতি ঘটনাও ইলিয়াদে নেই। এসব কাহিনী পরবর্তীকালে সফোক্লেস ইউরিপিদেশ প্রভৃতি কবি ও নাট্যকারদের রচনা।

ওদিসিতে ট্রয়-অশ্বের আভাস-ইঙ্গিত আছে। হেলেনও একবার মাত্র মেনেলাউসের শয্যাসঙ্গিনী হিসাবে দেখা দিয়েছে। দৈবচক্রান্তে তাকে ট্রয়ে যেতে হয়েছিল বলে, তার অনুতাপও শ্রুত।

হোমার, হেলেনের রূপবর্ণনার ক্ষেত্রে অতিশয় মিতবাক্। তিনি বারবার হেলেনকে শুধু শুভ্রপাণি (white armed) বিশেষণে বিশেষিত করে সম্ভবতঃ তার রূপের দীপ্তি প্রকাশ করতে চেয়েছেন।

ইলিয়াদের তৃতীয় অধ্যায়ে, প্রথম হেলেনের আবির্ভাব। দেবী আইরিশ প্যারিসের ভগ্নীর ছদ্মবেশে হেলেনের সঙ্গে দেখা করতে গিয়ে দেখেন, হেলেন প্রাসাদকক্ষে সূক্ষ্ম সূচীশিল্পের কাজে ব্যস্ত। সেই শিল্পকৃতির বিষয়—রথারোহী ট্রয়বাসী ও বর্মধারী গ্রীকদের যুদ্ধ। ছদ্মবেশী আইরিশ হেলেনকে বলেছিলেন—"যুদ্ধ দেখতে চাও তো এস; প্যারিস আর মেনেলাউসের দ্বন্দ্বযুদ্ধ সমাসন্ন, যে জয়লাভ করবে, হেলেনকে তারই হাতে সমর্পণ করা হবে।' এই বলে দেবী আইরিশ হেলেনের মনে তার ভূতপূর্ব স্বামীর প্রতি, জনক-জননীর প্রতি গভীর প্রীতি সঞ্চারিত করে দেন। লক্ষণীয়, হেলেন যেন দেবদেবীদের হস্তধৃত পুতুল ছাড়া আর কিছু নয়। এরপর হেলেন দুজন সহচরী নিয়ে ওড়নাতে মুখ ঢেকে মিনারে উঠে যুদ্ধ দেখতে আসে।

সংস্কৃত কবিদের মত হোমার হেলেনের পদাঙ্গুলি থেকে আরম্ভ করে কেশদাম পর্যন্ত সব কিছুর রূপবর্ণনা করেন নি। অবশ্য এই অনাতিশয্যের ফলে হেলেন হয়ত অতুলনীয়া হয়েছে, কিন্তু সম্ভবতঃ এই ধারণা—আমাদের রোম্যান্টিক, সৃষ্টিশীল মনের। কোন না কোন রূপে অতিশয়োক্তি না করেও নায়িকার বা রমণীর রূপবর্ণনা সর্বদেশের কাব্যেই লব্ধ।

হোমার যতটুকু কথা দিয়ে হেলেনকে পরিস্ফুট করেছেন তাতে হেলেনের শুদ্ধসত্বের এবং অপরূপলাবণ্যের কিছু আভাস পাওয়া যায় মাত্র। মেনেলাউসের জন্য তার ভালোবাসা এবং চোখের জল যদি চরিত্ররূপায়ণের মধ্য দিয়ে বাস্তবতা লাভ করতো, তা যদি দেবী আইরিশের ইচ্ছামাত্র না হতো তা হলেই হেলেনের 'পবিত্র মূর্তি' উজ্জ্বল হতে পারত। একজন সমালোচকের মতে অবশ্য, হেলেনের পরিপূর্ণ সৌন্দর্যই নাকি, মাত্র কয়েকটি লাইনের মধ্যে পরিস্ফুট।* সম্ভবতঃ মেনেলাউসের প্রতি প্রেম ও তারই পরিণামে চোখের জল, সমালোচককে হেলেনের সৌন্দর্য সম্পর্কে স্থির ধারণা করতে সাহায্য করেছে, কিন্তু যা হেলেনের মধ্যে স্বতঃস্ফূর্ত নয়, তাকে বিশেষ গুরুত্ব দেবার কিছু আছে বলে মনে হয় না।

অবশ্য হেলেনকে দেখে জ্ঞানবৃদ্ধ, সুবক্তা এবং ভূতপূর্ব যোদ্ধারা যা বলেছিল, তাতে রূপসী হেলেনকে চেনা যায় না বটে কিন্তু হেলেনের এক বিমূর্ত সৌন্দর্যের আভাস পাওয়া যায়। ওরা বলাবলি করেছিল—এমন দেবীর মত মেয়েকে নিয়ে ট্রয়বাসী আর গ্রীসবাসীদের মধ্যে যে যুদ্ধ বাধবে, তাতে আর সন্দেহ কি!

"Small blame is that Trojans and well-greaved Achaians should for such a woman longtime suffer hardships; marvellously like is she to the immortal goddess to look upon."

'দেবীর মত' বলেই হোমার ক্ষান্ত। বাকীটুকু পাঠকের কল্পনার উপর নির্ভরিত। সেই বৃদ্ধরা আরও বলেছিল,—এ রূপ এখানে না থাকাই ভালো, চিরযৌবনা হেলেন সবাইকে বিচঞ্চল করে তুলতে পারে।

"Yet even so, though she be goodly, let her go upon their ships and not stay to vex us and our children after us."

অবশ্য হেলেনের এই আগমনের মধ্যেই তার আবির্ভাব। সে যেন রবীন্দ্রনাথের বিজয়িনী—যার পায়ের তলায় মদনও তার পুষ্পধনু অর্পণ করেছে। কিন্তু মহাকাব্যের উপযুক্ত চরিত্র হিসাবে হেলেনকে কোন মর্যাদা অথবা বিশিষ্টতা প্রদান করা হয়েছে বলে মনে হয় না।

হোমার হেলেনকে 'বিনীতা' বলেছেন, goodly বলেছেন। হেলেনের হাবভাব, আচার-আচরণের মধ্যে সামান্যতম ছলাকলারও চিহ্ন নেই। শান্ত গম্ভীর, উজ্জ্বল এবং মহনীয় এক অপরূপতা হেলেনের মধ্যে আবিষ্কার করা যেতে পারে। হেলেন পুরুষমাত্রেরই প্রিয়, কিন্তু কামনার উন্মাদনার মধ্যে তাকে পাওয়া যায় নি। প্যারিসের পিতা প্রায়াম তাকে কন্যাবৎ স্নেহ করতেন। হেলেনকে সেই গম্বুজের মধ্যে দেখে সস্নেহ সম্ভাষণে তাকে তাঁর কাছে বসিয়ে বলেছিলেন,—"এ যুদ্ধের জন্য তোমার কোন দোষ নেই মা, এ হচ্ছে দৈব চক্রান্ত। যাই হোক, তুমি মা গ্রীক বীরদের চিনিয়ে দাও আমাকে।"

হেলেনের চোখে জল।

এই চোখের জলের মধ্যে হেলেনের অন্তর্দ্বন্দ্বের আভাস আছে বলে মনে হলেও দেবী আইরিশের ইচ্ছানুসারেই তা সংঘটিত হয়েছিল বলে এর গুরুত্ব বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হয়নি।

যাই হোক, হেলেন যে বিনীতা, বিনম্র এবং শান্তস্বভাবের নারী—তা অনায়াসে বোঝা যায়। হেলেন প্রায়ামকে পিতার মতই শ্রদ্ধা করত, প্রায়ামের আহ্বানে প্রায়ামের কাছে বসে সে গ্রীক বীরদের পরিচয় দান করছিল।

মেনেলাউস এবং প্যারিসের যুদ্ধকে যদি একটু তীর্যক দৃষ্টিতে দেখা যায়, তাহলে এ যুদ্ধকে 'মোরগ যুদ্ধ' নামে অভিহিত করা যেতে পারে। কেননা, মোরগ

* Almost all our knowledge of Helen's beauty is derived from a few lines in the third book of the Iliad where she goes upto the walls of Troy to see the fight between Paris and Menelaus. "So speaking the goddess put into her heart a longing for her husband of yore and her city and her father and mother. And straightway he veiled herself with white linen, and wentforth from her chamber, shedding a great tear."

যেমন তার প্রতিপালকের আশ্রয়ে থেকে যুদ্ধ করে এবং যুদ্ধরত অবস্থায় তার পরাজয়ের সূচনা দেখা গেলে, প্রতিপালক যেমন তার মোরগটিকে টান দিয়ে সরিয়ে নিয়ে যায় এবং তার পিঠে হাত বুলিয়ে আবার তাকে উদ্যমী করে তোলার চেষ্টা করে তেমনি অবস্থা এই যুদ্ধেও দেখা গেছে। মেনেলাউসের সঙ্গে সংগ্রামরত প্যারিসের অবস্থা যখন আর জয়ের অনুকূলে নয়, মেনেলাউসের ব্রোঞ্জনির্মিত বর্শা যখন প্যারিসের বক্ষ ভেদে উদ্যত, ঠিক সেই সময় দেবী আফ্রোদিতে অন্ধকার সৃষ্টি করে প্যারিসকে রণস্থল থেকে সরিয়ে নিয়ে তাকে একেবারে সুসজ্জিত সুবাসিত প্রাসাদকক্ষে রেখে এসে হেলেনের কাছে এসে তার কানে কানে বলেন, প্যারিস তোমার জন্য অপেক্ষা করে আছে, ওর দেহে যুদ্ধক্ষেত্রের কোন ক্লান্তি নেই, এইমাত্র নৃত্যচর্চা শেষ করে যেন বিশ্রামরত।*

হেলেন আফ্রোদিতেকে তিরস্কার করেছিল তার ভাগ্য নিয়ে ছিনিমিনি খেলার জন্য, কিন্তু শেষ পর্যন্ত চূড়ান্ত দৈবরোষের ভয়ে হেলেন সেখান থেকে সকলের অজ্ঞাতসারে প্রাসাদকক্ষে চলে গেল।

আফ্রোদিতে প্যারিসের শয্যার কাছে একটি কেদারায় হেলেনকে বসিয়ে দিল, শয্যায় বিশ্রামরত প্যারিস। দুজনে মুখোমুখি। প্যারিসের পলায়নপর কাপুরুষতার জন্য তাকে তীব্র ভর্ৎসনা করে হেলেন বললো,—রণক্ষেত্র হতে পালিয়ে না এলে আমার ভূতপূর্ব স্বামীর হাতে তোমার জীবনান্ত হত! এ কাপুরুষতা তোমার কাছে আমি আশা করি নি। এক্ষুনি যাও; যুদ্ধ কর। কিন্তু তবুও শুনে রাখ, সরাসরি ওর সংগে যুদ্ধ করো না, তা হলে তোমাকে আর ফিরে পাবো না।

প্যারিস অভিভূত হয়ে বললো,—প্রিয়তমে, আজ আর কোন তিরস্কার নয়; তোমাকে এই মুহূর্তে আমি এত ভালবাসছি যে, তোমাকে যখন স্পার্টা থেকে ট্রয়ে নিয়ে আসি, তখনও এত ভালোবাসা আমার বুকে ছিল না। প্রিয়তমে, চল, আমরা শয্যায় যাই।

হেলেন প্যারিসকে অনুসরণ করে শয্যাস্থ হতে গেল।

হেলেনের চোখের জল, হেলেনের অন্তর্দ্বন্দ্ব, সব যেন এক মুহূর্তে অন্য কিছু হয়ে গেল। দেবী আইরিশ আর দেবী আফ্রোদিতের ইচ্ছাই হেলেনের মাধ্যমে প্রকাশিত হয়েছে মাত্র।

এর পর হেলেনকে দেখা গেল একেবারে শেষ অধ্যায়ে। ট্রয়বাসীদের প্রিয় বীর হেকটরের মৃতদেহ ঘিরে যে শোকোচ্ছ্বাস, সেই উচ্ছ্বাসে হেলেনেরও অংশ ছিল। হেকটরের জননী হেকেবার করুণ ক্রন্দনের সংগে মিলিত হচ্ছিল আন্দ্রোমাখের বেদনার্তি এবং অন্যান্য পুরনারীদের আর্ত চিৎকার। বীর হেকটরের উপর হেলেনের শ্রদ্ধাও যে কত গভীর ছিল তার প্রমাণ আছে হেলেনের শোকোক্তিতে। হেলেন বলেছিল—"আমার ভ্রাতৃপ্রতিম সমস্ত ট্রয়বাসীর মধ্যে যাকে আমি গভীর শ্রদ্ধার সংগে গ্রহণ করেছি,—আজ সেই বীরকে হারিয়ে আমি অসহায়। ট্রয় নগরে আমার আর কোন বন্ধু থাকলো না। এই বলে গভীর কান্নায় ভেঙে পড়লো হেলেন। এইখানেই হোমারীয় হেলেনের পরিসমাপ্তি।

ফটো : পুলিন চক্রবর্তী

প্যারিসের রূপের প্রতি তার ঘোরতর আকর্ষণ ছিল, নতুবা দীর্ঘদিন ধরে তার পক্ষে ট্রয়ে অবস্থান করা সম্ভবপর হত না। কিন্তু হোমার, কিছুতেই তাকে সজীবতা দান করেন নি, দেবহস্তধৃত পুত্তলিকার মতই তাকে জীবনযাপন করতে হয়েছে।

বলা যেতে পারে, হোমারের হেলেন ইলিয়াদের নায়িকা নয়, ট্রয় যুদ্ধের একটি সমূর্ত কারণ মাত্র, যার নায়ক একিলিস এবং প্রতিনায়ক হেকটর। তাই ইলিয়াদকে বলা হয়—একিলিসের ক্রোধের কাহিনী—— Iliad is the story of the anger of Achilles.

তাছাড়া সমগ্র ইলিয়াদ-ই—মুখ্যতঃ রণাঙ্গন, হেলেন একটি দূরস্থিত পশ্চাৎপট মাত্র। হেকটরের মৃত্যুতে হেলেনের সজীবতা একবার মাত্র পরিস্ফুট হয়েছে, কিন্তু রূপসী হেলেনও কাব্যের উপেক্ষিতা।

* "Alexandros (Paris) summoneth thee to go homeward. There is he in his chamber and inled bed, radiant in beauty and vesture; nor woulds't thou deem him to be come from fighting his foe, but rathers to be faring to the dance or from the dance to be gust resting and sat down." — Iliad.

আনন্দ

চন্দ্রশেখর মুখোপাধ্যায়

জীবন যখন বিষণ্নতা ও হতাশায় ম্রিয়মাণ, তখন আনন্দ নিয়ে বাগবিস্তার কতটা প্রাসঙ্গিক হবে জানি না, তবু জীবনটাকে একেবারে হারিয়ে বসতে যখন রাজী নই আমরা তখন আনন্দের সন্ধানে ব্যাপৃত হতেই হয় আমাদের, জীবনে আনন্দ বাদ দিলে যে জীবন নিরর্থক হয়ে ওঠে এটা আমাদের সবায়েরই জানা। রবার্ট লুই স্টিভেনসন যখন লেখেন 'জীবনে আনন্দের পুঁজি হারিয়ে গেলে, জীবনের সব কিছুই আমাদের হাতছাড়া হয়ে যাবে,' তখন প্রশ্ন হতে পারে এই আনন্দ বস্তুটি কি? এই 'আনন্দ' কি আমাদের ঐহিক কোন সুখ, না আমাদের মানসিক কোন উপলব্ধি। ইংরেজীতে 'জয়' বা 'হ্যাপীনেসে'র যে পার্থক্য আমাদের সুখ বা আনন্দেরও সেই তফাত।

বলা বাহুল্য জীবনের প্রাণ-সঞ্জীবনী ঐহিক সুখ নয়, জীবনে হঠাৎ পাওয়া আনন্দই হল আমাদের সেই দুর্লভ সম্পদ। এ আনন্দ হঠাৎ আমরা আবিষ্কার করি, অপ্রত্যাশিত মুহূর্তে এই আনন্দের বিস্ময়জনক সঞ্চরণ।

হঠাৎ যেদিন বৃষ্টি নামে, নিঃসঙ্গ পথের মাঝে বন্দী হই আমি। সামনে ধু-ধু করা মাঠ আর সেই মাঠের বুকে বড় বড় গাছগুলো ঝড়ের ধাক্কায় দোল খায় তাদের মাথাগুলো দুলিয়ে। হঠাৎই আবার বর্ষণ যায় থেমে। সূর্যের আলো গলানো সোনার মত ছড়িয়ে পড়ে গাছের পাতায়-পাতায়, পায়ের তলায় ভেজা ঘাসগুলোর মাথায় আটকে থাকা জলবিন্দুগুলো হীরের মাকছাবির মত ঝিকমিক করে ওঠে। আমাকে মুগ্ধ বিস্মিত করে দিয়ে ওঠে ঠাকুরমার মুখে শোনা সেই সাতরঙা রামধনু। বিস্ময় আর আনন্দে কথা বলবার শক্তি আমি হারিয়ে ফেলি। মনে হয় আমার জীবনে এই আনন্দের সাক্ষাৎ এর আগে কোনদিন ঘটেনি।

বা নিঃসঙ্গ সমুদ্র উপকূলে কানে শুধু যখন ভেসে আসে সমুদ্রের ঢেউয়ের কল্লোল, তখন ভুলে যেতে বাধ্য হতে হয় জীবনের প্রাত্যহিকতার গ্লানি, ঐকতানের সাঙ্গীতিক সঙ্গীতের মত মানসিক আবেগের সঙ্গে মিশে এক হয়ে যায় শরীরের বাইরের বিশ্বপ্রকৃতি।

আমরা প্রত্যেকেই এমনি অজানা আনন্দের আকাঙ্ক্ষাতেই সম্মুখীন হয়ে থাকি। এরা হঠাৎ আসে, আবার হারিয়ে যায় কিন্তু রেখে যায় আমাদের মনে এমনই এক সম্পদ, যা আমাদের মুক্ত করে গ্লানি থেকে, তুচ্ছতা থেকে উত্তীর্ণ করে আনন্দময় মানবসত্তায়।

আমাদের জীবনে এই আকস্মিক আনন্দময় মুহূর্তগুলি সম্পর্কে মনোবিজ্ঞানীরা গবেষণা করে দেখেছেন যে, বাহ্য দৃষ্টিতে এই আনন্দবোধের কারণগুলি হয়ত খুবই সাধারণ কিন্তু সামান্য উৎস থেকে এর জন্ম হলেও এ অসামান্য কিছুই আমাদের দিয়ে যায়।

একজন মার্কিন মনোবিজ্ঞানী এমনি বহু ঘটনা তাঁর গবেষণায় লিপিবদ্ধ করেছেন। সংগৃহীত ঘটনাগুলির মধ্যে একজন মায়ের ঘটনা প্রথমে উল্লেখ করা যাক। আমেরিকান মায়ের এই আনন্দময় মুহূর্তটি যে আমাদের মায়েদেরও অভিজ্ঞতার অনুরূপ তা বলে দিতে হবে না।

সুন্দর একটি সকাল। গৃহের ঘরণী পরিবারের প্রাতরাশের প্রস্তুতিতে ব্যস্ত। ছেলেমেয়েরা খাবারঘরে বসে কলকল করে কথা বলে চলেছে। সূর্যের একফালি রোদ ঘরে এসে পড়েছে। ওদের বাবা প্রভাতী কাগজখানা নিয়ে সবচেয়ে ছোট বাচ্চাটার সঙ্গে খুনসুটিতে ব্যস্ত। এ ত রোজের দৃশ্য যে কোন সুখী গৃহকোণে। কিন্তু সেদিন টোস্টে মাখন মাখাতে মাখাতে ঘরের গৃহিণী যখন তাঁর স্বামী আর সন্তানদের দিকে চেয়ে চেয়ে দেখছিলেন তখন অবর্ণনীয় এক আনন্দের বন্যায় ভদ্রমহিলা বাকরুদ্ধ হয়ে গেলেন। এই তাঁর সংসার, ওদের কত ভালবাসেন তিনি......কি সৌভাগ্য তাঁর, এত সুখ তাঁরই জন্যে জড়ো করে রাখা হয়েছে ছোট্ট এই গৃহকোণে।

এমনি হঠাৎ পাওয়া আনন্দে আমরা আত্মহারা হয়ে যাই শিশুর মত, আনন্দে মনে হয় চিৎকার করি আমরা। আর এই আনন্দের সূত্র হতে পারে সামান্য কিছু উপকরণ। সে উপকরণ হয়ত নিস্তব্ধ রাত্রির পরিবেশ, শিশুর হাসিমুখ বা বিশ্বপ্রকৃতির অফুরন্ত সৌন্দর্য। উপকরণ যাই হোক, আমরা সেই মুহূর্তে নিজের সম্বন্ধে শুধু সচেতনই হই না, এই পৃথিবী, এর প্রতিটি গাছপালা, কীটপতঙ্গ, আকাশ, মেঘ, এমন কি যে কাকটি সামনের নিমগাছের বাসায় বসে কা-কা শব্দ করে বিরক্ত করে এসেছে, সেও আমাদের মনোযোগ আকর্ষণ করে। মনে হয়, যা এতদিন আমাদের দৃষ্টির সামনে থেকেও দৃষ্টির আড়ালে ছিল, তাই নতুন করে দেখতে পেলাম আমরা।

কবিরা বলেন, যেখানে আনন্দের অবস্থিতি, সেখানেই জীবনের পরিপূর্ণতা। বিপরীত অর্থে জীবনের পরিপূর্ণতাই আনন্দ।

কিন্তু দুঃখের বিষয় আমাদের দেহের বয়স যত বাড়ে, ততই এই হঠাৎ আনন্দ পাওয়ার সুযোগ আসে কমে। একটা নীরস কর্মব্যস্ত জীবনের জাঁতাকলে নিষ্পিষ্ট হতে দিই নিজেদের। প্রাজ্ঞের দৃষ্টিতে পৃথিবীটাকে দেখতে গিয়ে শিশুর সারল্য ও অজানাকে জানার আগ্রহকে বিসর্জন দিই আমরা।

কিন্তু এই দৃষ্টিভঙ্গী ভ্রান্ত। কবি হুইটম্যান যখন বলেন 'আমার কাছে প্রতি মুহূর্তের আলো-অন্ধকার একটা অপূর্ব কিছু বা পঙ্গু এক বৈজ্ঞানিক তার চেয়ারে বসে যখন আবেগদীপ্ত গলায় বলেন, 'এই পৃথিবীর প্রতিটি তৃণকণা আমার, ওদের প্রত্যেককে আমি ভালবাসি। নীল আকাশের বুকে যে পাখীটা অপূর্ব ছন্দে উড়ে যায়, সেও আমার...... সব কিছুকে আমি ভালবাসি......সব কিছু দেখতে আমার এত ভাল লাগে', তখন বিজ্ঞের মত ও'দের এই অনুভূতিতে বিস্মিত হবার কিছু নেই, জীবনকে ভালবাসবার এই মুগ্ধ দৃষ্টিভঙ্গীই যে জীবনের আনন্দকে করায়ত্ত করার একমাত্র পথ সেটাই সকলের পক্ষে বোঝা অসম্ভব।

আর জীবনে সৃষ্টির চেয়ে আনন্দ আর কিসে আছে? শিল্পী ছবি আঁকেন, সুরকার করেন সঙ্গীত রচনা, গ্রন্থকার লেখেন বই—এমনিভাবে প্রতিটি মানুষ তাঁর নিজের নিজের সাধনায় ব্যাপৃত। কত না পরিশ্রম আছে তাঁদের এই সৃষ্টির মধ্যে কিন্তু পরিশ্রম শেষে তাঁদের জন্যে অপেক্ষা করে আনন্দ। আনন্দ ছাড়া সৃষ্টি হয় না।

এই জীবন চিরস্থায়ী নয়, একে ভালবাসতে পারাটাই আনন্দকে খুঁজে পাওয়া জীবনে। যে মানুষ তিন মাস পরে মারা যাবে বলে চিকিৎসকেরা রায় দিয়ে দিয়েছেন, সে মানুষ মরার কথা ভেবেই পৃথিবীর সব কিছুই গভীর আগ্রহে দেখে থাকে। আমাদের ঘুম যেন ভাঙ্গল সবে মাত্র, আর সদ্য ঘুম ভাঙ্গা সেই চোখ নিয়েই দেখতে হবে পরিচিত পৃথিবীটাকে।

এই পৃথিবীর চারধারে সঙ্কটের কালো ছায়া। কুটিল হিংস্র একটা অমঙ্গল যেন ওৎ পেতে রয়েছে। আর হয়ত তাই বেশী করেই আমাদের উজ্জ্বল সুন্দর পৃথিবীটার কথা ভাবতে হবে। বিশ্বাস রাখতে হবে শুভের কাছে অশুভবোধ পরাস্ত হবে, তা যদি না হত চারধারের নিরানন্দ আবহাওয়ার মধ্যে আমরা এখনও হাসতে পারতাম না, গাইতে পারতাম না গান।

আনন্দ পাবার ক্ষমতা আমাদের এখনও আছে, আমরা তাই ফুরিয়ে যাই নি। হারিয়ে যায় নি আমাদের ঐশ্বর্যময়ী পৃথিবীটারও ভবিষ্যৎ।

(বিদেশী নিবন্ধ সূত্রে)

প্রাচীন ভারতে মূক ও বধির

নির্মলেন্দু চক্রবর্তী

'মূক' ও 'বধির' শব্দদুটি সুপ্রাচীনকাল থেকে ভারতবর্ষে প্রচলিত। বেদ, পুরাণ ও সংস্কৃত সাহিত্যে 'মূকঃ' (মূ + কক্, যে) ও 'বধিরঃ (বন্ধ + কিরচ্, যে) শব্দদুটির উল্লেখ এবং বাচ্যার্থ ও ব্যঙ্গার্থ উভয়তঃই ব্যবহার লক্ষ্য করা যায়। এও লক্ষ্য করা যায় যে, ঐ শব্দদুটির সে-সময়ের ব্যবহার ও আধুনিক ব্যবহারের মধ্যে বিশেষ কোন পার্থক্য নেই। সংস্কৃতে 'মূকঃ' শব্দটির আভিধানিক অর্থ—"জড়বাক্, স্তব্ধবাক্, বাগ্রহিতঃ, বাগিন্দ্রিয়বিকলঃ, অবাক, বাণীহীনঃ, বাক্‌শক্তিহীনঃ, নাদশূন্য, মুদ্রিতমুখঃ, নিঃশব্দ, নির্বচনঃ, অনালাপ, অনুত্তরঃ, নিরুত্তরঃ" প্রভৃতি। 'বধিরঃ' অর্থে "এড়ঃ, অকর্ণঃ, বধিরঃ, কল্লঃ, শ্রোত্রবিকলঃ, শ্রবণেন্দ্রিয়বিকলঃ, শ্রবণশক্তিরহিতঃ শ্রুতি-বর্জিত" প্রভৃতি। সহজ কথায় বলা যায়, প্রাচীনকালে 'মূক' ও 'বধির' শব্দ দ্বারা যথাক্রমে বাগিন্দ্রিয় ও শ্রবণেন্দ্রিয়ের অ-ক্রিয়তাকেই বুঝান হয়েছে।

বাংলাভাষায় 'মূক' ও 'বধির' শব্দের পাশাপাশি 'বোবা' ও 'কালা' শব্দদ্বয়ের ব্যবহার লক্ষ্য করা যায়। অনেকের ধারণা, শেষোক্ত ব্যবহার অবজ্ঞার্থে। কিন্তু তা যুক্তি-সঙ্গত নয়। সংস্কৃত সাহিত্যে 'বোবা' [অবাক্ শব্দ? বো + অ (যে করে)] শব্দটি সৃষ্টির পূর্বে-সংকেত কিছু পাই না। অষ্টম থেকে দ্বাদশ শতাব্দীর মধ্যে রচিত 'চর্যাপদ'-এ মূক অর্থে 'বোব' শব্দটি উল্লেখ রয়েছে। (১)। 'কালা' শব্দের উৎপত্তি সংস্কৃত 'কল্লঃ' (বধির অর্থে) শব্দ থেকে বলে অনুমান। 'চর্যাপদে' ব্যবহৃত 'কাল' শব্দ 'কালা' শব্দের প্রাচীন বাংলা রূপ। (২)। শব্দদুটি প্রাচীন বাংলায় অবজ্ঞার্থে ব্যবহৃত হওয়ার কোন প্রমাণ পাওয়া যায় না।

।। দুই ।।

উপনিষদে 'দশবিধ জ্ঞান—কর্মেন্দ্রিয়ের মধ্যে 'বাক্' ও 'শ্রোত্র' ইন্দ্রিয়দ্বয় বিশেষ গুরুত্বের সঙ্গে ব্যাখ্যাত হয়েছে। সেখানে পুরুষকে অগ্নির সঙ্গে তুলনা করে, বাক্‌কে তার সমিৎ বলা হয়েছে। (৩)। কেননা, পুরুষ (প্রাণী অর্থে) বাক্ দ্বারাই সমিন্ধ (=প্রখ্যাত) হয়। কিন্তু মূক পুরুষ সমিন্ধ হয় না। (৪)। 'বাক্' অর্থে বাগিন্দ্রিয় বুঝতে হবে;—যা জিহ্বামূলাদি অষ্টস্থানে স্থিত এবং বর্ণাভিব্যঞ্জকরূপে প্রসিদ্ধ। বর্ণাভি-ব্যঞ্জক আটটি স্থানের সুস্পষ্ট উল্লেখ পাওয়া যাচ্ছে—বক্ষঃ, কণ্ঠ, মস্তক, জিহ্বামূলক, দন্ত, নাসিকা, ওষ্ঠ ও তালু। (৫)।

উপনিষদে 'বাক্' ও 'শ্রোত্র'-কে ব্রহ্ম বলা হয়েছে। (৬)। কারণ, যদি বাক্ না থাকত, তাহলে ধর্মাধর্ম বিজ্ঞাপিত হত না। মানুষের চেতনায় সত্য-অসত্য, ধর্ম-অধর্ম কেউই আপনাকে প্রকাশ করতে পারত না। বাক্-ই এই সমস্ত বুঝিয়ে দেয়, সেজন্য একে ব্রহ্মরূপে উপাসনা কর্তব্য। শ্রোত্রকে ব্রহ্ম বলা হয়েছে কারণ, যে শ্রবণে অক্ষম, তার কোন বস্তুই লাভ হয় না। শ্রবণেন্দ্রিয়ের সাহায্যেই প্রথমতঃ বেদসমূহ গৃহীত হয় এবং বেদার্থও বিজ্ঞাত হয়। তা থেকে (বেদোক্ত) কর্মের অনুষ্ঠান হয়, কাম-সম্পৎ অর্থাৎ অভিষ্ট ফল লাভ হয়। এইরূপ কাম-সম্পত্তি প্রাপ্তির হেতু বলে শ্রবণেন্দ্রিয়কে 'সম্পৎ'-ও বলা হয়েছে। বাক্‌কে আবার 'বসিষ্ঠ বলা হয়েছে। (৭)।

উপনিষদে 'বাক্' ও শ্রবণেন্দ্রিয়ের প্রয়োজনীয়তা ব্যাখ্যাত হলেও, ইন্দ্রিয়দুটির অক্রিয়তা সম্বন্ধে স্পষ্টতঃ কিছু বলা হয়নি। তবে উপরের আলোচনা থেকে অনুমান করা যেতে পারে যে, যেহেতু মূক ও বধিরদের দ্বারা ধর্মাদি গৃহীত বা বিজ্ঞাপিত হতে পারত না, সেইহেতু তাদের সম্বন্ধে প্রাচীন (বৈদিক বা ঔপনিষদিক) ধর্মানুগামী সমাজ গুরুত্ব প্রদান করেনি। কোন কোন ক্ষেত্রে স্পষ্টতঃ অবহেলাই প্রকাশ করা হয়েছে বলে মনে হয়; ঋগ্বেদ-সংহিতায় রয়েছে যে, "যাহাদিগের চক্ষু বা কর্ণ নাই, তাহারা সত্যের পথ পরিত্যাগ করিল। দুষ্কর্মান্বিত লোকে কখনো উত্তীর্ণ হয় না।" (ঋ; অ;—রমেশচন্দ্র দত্ত)। (৮)। প্রাচীন ভারতবর্ষে যাদের ধর্মাচরণের অধিকার ছিল না, তাদের শূদ্র, ম্লেচ্ছ ইত্যাদি বলা হত। এরা অস্পৃশ্য ছিল। মনু-সংহিতায় পাওয়া যাচ্ছে যে, ব্যঙ্গ অর্থাৎ অঙ্গহীনদের মন্ত্রকালে অপসরণ করতে হবে। (৯)। অর্থাৎ অঙ্গহীনদের মন্ত্র-গ্রহণের অধিকার নেই, তারা ধর্মাচরণ থেকে বিশ্লিষ্ট থাকার কারণে, সমাজে হীন প্রতিপন্ন হত। এইদিক থেকে বিবেচনা করলে, সুপ্রাচীনকালে ভারতবর্ষে বধিরেরা সমাজে অনাদৃত ছিল বলে মনে হয়। কিন্তু মূক, বধির ইত্যাদি অঙ্গহীনদের অসহায় অবস্থা সম্বন্ধে সমাজ যে বিশেষ সহানুভূতিসম্পন্ন ছিল, তার প্রমাণ রয়েছে। মহাভারতে প্রশ্নচ্ছলে উপদেশ দিতে গিয়ে নারদ যুধিষ্ঠিরকে জিজ্ঞাসা করছেন—"হে ধর্মজ্ঞ! আপনি অন্ধ, মূক, পঙ্গু, বিকলাঙ্গ, বান্ধব-শূন্য এবং প্রব্রজিত লোকদিগকে পিতার ন্যায় পালন করেন ত?" (শ্রীহরিদাস সিদ্ধান্ত-বাগীশ ভট্টাচার্যের বঙ্গানুবাদ)। (১০)। ষোড়শপিণ্ডদানে বিরূপ, ব্যঙ্গ [অন্ধ, মূক, বধির, পঙ্গু ইত্যাদি অর্থে] প্রভৃতিকে পিণ্ডদানের উল্লেখ রয়েছে। (১১)।

উপরের আলোচনা থেকে এ মনে করবার কারণ নেই যে, প্রাচীন ভারতে মূক, বধির প্রভৃতিরা সমাজে ঘৃণিত বা অবজ্ঞাত ছিল। ভারতীয় সংস্কৃতির প্রধান বৈশিষ্ট্য এই যে, সমাজের মধ্যে ধর্ম বা বর্ণের পার্থক্য থাকলেও একটি সামঞ্জস্য সূত্রে তা গ্রথিত ছিল এবং সেইহেতু প্রাচীন সমাজের ভারসাম্য ব্যাহত হয়নি। ভারতীয় প্রাচীন ধর্মীয় জীবনচর্যা, দর্শন ইত্যাদিতে বক্তব্যের সমর্থন পেয়েছি। ঘৃণা নিশ্চয়ই নয়। দেবতাকে 'মূক'-রূপে আরাধনার প্রমাণ আছে। 'তারা-সাধনা' গ্রন্থে দেবী দুর্গাকে 'মূকাম্বিকা' বলে উল্লেখ করা হয়েছে। (১২)। "অপাণি-পাদো জবনো গ্রহীতা পশ্যত্যচক্ষুঃ স শৃণোত্যকর্ণঃ..." ইত্যাদি শ্লোকে সর্বনিয়ন্তা ঈশ্বর সম্বন্ধে বলা হয়েছে যে, "তিনি হস্তপদবিহীন অথচ দ্রুতগামী ও গ্রহিতা, চক্ষুবর্জিত অথচ দর্শন করেন, কর্ণহীন অথচ শ্রবণ করেন..."। শ্লোকটির ব্যঞ্জনা যাই হোক না কেন, বাচ্যার্থে ভগবানের ইন্দ্রিয়াভাব কল্পনা করা হয়েছে বলে স্পষ্ট প্রতীয়মান হয়। সুতরাং মন্তব্য করা চলতে পারে যে, অঙ্গহীনদের প্রতি আত্যন্তিক সহানুভূতির ও করুণার কারণেই পূজ্য দেবতা বা ভগবানও কখনো কখনো তদনু-রূপ পরিকল্পিত হয়েছিলেন।

।। তিন ।।

'মূক' ও 'বধির' শব্দদ্বয়ের পৃথক ব্যবহার লক্ষ্য করে মনে হয় যে, সে সময়ে মূকত্বের সঙ্গে বধিরতার যে ঘনিষ্ঠ বা কার্যকারণগত সম্বন্ধ রয়েছে, তা অজ্ঞাত ছিল। বক্তব্যের প্রমাণ হিসাবে উপনিষদের ইন্দ্রিয়দের দ্বন্দ্ব-বিষয়ক অংশের বঙ্গানুবাদ উদ্ধৃত করা যাচ্ছে :

"বাক্ প্রভৃতি ইন্দ্রিয়গণ স্ব স্ব শ্রেষ্ঠত্ব-খ্যাপনার্থ 'আমিই [সর্বাপেক্ষা] শ্রেষ্ঠ, আমিই শ্রেষ্ঠ' এইরূপ বিবাদ করিয়াছিল। (১৩)।

"এইরূপ বিবাদ করিতে করিতে প্রাণ-সমূহ প্রজাপতির নিকট উপস্থিত হইয়া বলিল—ভগবন্, আমাদের মধ্যে শ্রেষ্ঠ কে? প্রজাপতি তাহাদিগকে বলিলেন—যিনি বহির্গত হইলে এই শরীর অত্যন্ত পাপিষ্ঠের ন্যায় হয়, অর্থাৎ অস্পৃশ্য হয়, তিনিই তোমাদের মধ্যে শ্রেষ্ঠ। (১৪)।

"(এই কথার পর) বাগিন্দ্রিয় শরীর হইতে চলিয়া গেল; সে এক বৎসরকাল বাহিরে থাকিয়া পুনঃ প্রত্যাগত হইয়া জিজ্ঞাসা করিল—[হে ইন্দ্রিয়গণ তোমরা] আমার অভাবে কি প্রকারে জীবিত ছিলে? অর্থাৎ আত্মরক্ষা করিতে সমর্থ হইয়াছিলে? [ইন্দ্রিয়গণ বলিল] বাগিন্দ্রিয় বিকল মূক ব্যক্তিরা যেরূপ কথা না বলিয়া প্রাণের সাহায্যে জীবন-ধারণ করিয়া, চক্ষুদ্বারা দর্শন করিয়া, শ্রবণেন্দ্রিয়ের দ্বারা শ্রবণ করিয়া এবং মনের সাহায্যে ধ্যান করিয়া জীবিত থাকে, তদ্রূপ আমরা [ছিলাম]। [ইহা শুনিয়া] বাগিন্দ্রিয় [শরীর মধ্যে] প্রবেশ করিল। (১৫)।

"অনন্তর শ্রবণেন্দ্রিয় শরীর হইতে চলিয়া গেল। সে এক বৎসরকাল প্রবাসের পর প্রত্যাগমন করিয়া জিজ্ঞাসা করিল, [হে ইন্দ্রিয়গণ] আমার অভাবে তোমরা কিরূপে জীবনধারণ করিতে সমর্থ হইয়াছিলে। তাহারা বলিল, বধিরলোকেরা যেরূপ কেবল শুনিতে পায় না অথচ প্রাণের সাহায্যে জীবন-ধারণ করিয়া, চক্ষুদ্বারা দর্শন করিয়া, বাগিন্দ্রিয়ের দ্বারা কথা বলিয়া এবং

মনের সাহায্যে ধ্যান করিয়া জীবিত থাকে, তদ্রূপ আমরাও [ছিলাম] [ইহা শুনিয়া] শ্রোত্র [শরীর মধ্যে] প্রবেশ করিল।" (বঙ্গানুবাদ—শ্রীদুর্গাচরণ সাংখ্যবেদান্ততীর্থ)। (১৬)।

উদ্ধৃতিটিতে মূক অবস্থায় কানে শুনবার এবং বধির অবস্থায় কথা বলবার প্রসঙ্গের অবতারণা হয়েছে। বোধহয়, সে-সময়ে (ছান্দোগ্যোপনিষদ্ রচনার কালে) মূক-বধিরতার কারণ অজ্ঞাত ছিল। কিন্তু বিষয়টির উপর বিশেষ গুরুত্ব প্রদান করা চলে না এইজন্য যে, উদ্ধৃত অংশটির অবতারণা প্রাণের শ্রেষ্ঠত্ব প্রতিপাদনের জন্য; মূক বা বধিরতার তাৎপর্য অথবা অবস্থা বিচার কিংবা সূত্র নির্ণয়ের জন্য নয়! আবার বিচার্য যে, মূকতা ও বধিরতার অবস্থাভেদে তাদের দ্বারা যথাক্রমে শ্রবণ ও কথন সম্ভব। সুতরাং, কোন স্পষ্ট মন্তব্যের সুযোগ এখানে নেই। তবে উদ্ধৃতিটির মধ্যে অন্য একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় লক্ষ্যণীয় যে, মূক বা বধির কোন অবস্থায়ই মানসিক চিন্তার বিকাশ ব্যাহত হয় না।

।। চার ।।

কেবলমাত্র ভারতবর্ষেই নয়, যে-কোন দেশের 'মূকতা' বা 'বধিরতা'র কারণ সম্বন্ধে দৈবী চেতনার অস্তিত্ব লক্ষ্য করা যায়। কিন্তু কোন কোন দেশে যেমন তাকে দেবতার অভিশাপ বলে মনে করা হত, ভারতীয় চিন্তাধারায় সেখানে জন্মান্তরবাদের উপর অধিক গুরুত্ব আরোপ করা হয়েছে। অর্থাৎ পূর্বজন্মের সুকৃতী বা দুষ্কৃতী পরজন্মের বা জন্মান্তরের অবস্থার হেতু। দর্শনের এই জন্মান্তরবাদ প্রাচীন ভারতীয় সমাজ-জীবনকে বিশেষ প্রভাবিত করেছিল বলে বিবেচনা করি। একটি শ্লোকে এর পরিচয় পাই :

> নানাদানং ময়া দত্তং
> রত্নানি বিবিধানি চ।
> ন দত্তং মধুরং বাক্যং
> তেনাহং সুকরো মূকঃ।।

[শ্লোকটির উল্লেখ কোন গ্রন্থে প্রত্যক্ষ করিনি। শ্লোকটির মৌখিক প্রচলন বর্তমানেও রয়েছে। কারো কারো মৌখিক পাঠে শ্লোকের শেষ ছত্রটি পরিবর্তিত আকারে শ্রুত হয়েছে [অর্থাৎ...তেনাহং শূকরো মুখ (তাই আমার শূকরের মত মুখ)]। কিন্তু ছন্দরক্ষার দিক থেকে বিচার করলে আমাদের গৃহীত পদটিই সুললিত এবং অর্থের দিক থেকে সুপ্রযুক্ত বলে অধ্যাপক শ্রীযুক্ত চিন্তাহরণ চক্রবর্তী এম-এ, কাব্যতীর্থ মহাশয় মনে করেন। সে কারণে পরিবর্তিত পাঠটি পরিত্যাগ করেছি। অধ্যাপক চক্রবর্তী মহাশয়ের মৌখিক পাঠ অনুযায়ী শ্লোকটি লিখিত। শ্লোকটির প্রাচীনত্ব সম্বন্ধে অধ্যাপক চক্রবর্তী সন্দেহ প্রকাশ করেন।]

মূক বা বধির সম্বন্ধে কিংবা মূকতা ও বধিরতার কারণ সম্বন্ধে স্পষ্ট উল্লেখ পেয়েছি মহামতি শ্রীমন্মাধবকর-এর 'নিদানম্' গ্রন্থে। তাতে বলা হয়েছে যে, "কফযুক্ত বায়ু শব্দবাহিনী ধমনী সকলকে আবৃত করে মনুষ্যকে অক্রিয়ক অর্থাৎ হয় বোবা, না হয় খনা, না হয় গদ্‌গদভাষী করে থাকে।" (১৭)। লক্ষ্যণীয়, মূকতার সঙ্গে শ্রবণেন্দ্রিয়ের অক্রিয়কতার যোগ মাধবকর কর্তৃক স্পষ্টভাবে নির্দেশিত হয়েছে।

বধিরতার কারণ সম্বন্ধে মাধবকর বলেছেন, "শুদ্ধ বায়ু বা কফ-সংযুক্ত বায়ু শব্দবহ স্রোতঃকে আবরণ করলে, বাধির্য (কালা) রোগ উপস্থিত হয়।" (১৮)।

মাধবকরের গ্রন্থে 'কর্ণনাদ' নামে যে রোগটির উল্লেখ পাওয়া যায়, আধুনিক চিকিৎসাবিজ্ঞানে তাকেই Tinnitus বলে উল্লেখ করা হয়ে থাকে। রোগটির লক্ষণ—"কর্ণস্রোতোগত বায়ুদ্বারা কর্ণে ভেরী, মৃদঙ্গ ও শঙ্খ প্রভৃতি শব্দের ন্যায় বিবিধ শব্দ অনুভূত হয়।" (১৯)।

মাধবকর মূক ও বধিরতার যে কারণ উল্লেখ করেছেন, তা অসম্পূর্ণ হলেও, আধুনিক বিজ্ঞানসম্মত। সুতরাং প্রাচীন ভারতবর্ষে মূক-বধিরতা যে একপ্রকার ব্যাধি তদনুরূপ তথ্য পাওয়া যাচ্ছে। তবে মাধবকরের প্রাচীনত্ব সম্বন্ধে প্রশ্নের অবকাশ রয়েছে।

আয়ুর্বেদশাস্ত্রে বধিরতাকে অ-আরোগ্য বলা হয়েছে। (২০)। কিন্তু বধিরতার প্রকারভেদে কিছু কিছু চিকিৎসা প্রচলিত ছিল। 'বিল্বতৈলম' 'শিখরীং অপামার্গং' প্রভৃতি বিভিন্ন ঔষধদ্বারা চিকিৎসার ব্যবস্থা এবং ঔষধ প্রস্তুত পদ্ধতির উল্লেখ ভাবপ্রকাশ ও গারুড় সংহিতায় পাওয়া যাচ্ছে। (২১)।

।। ছয় ।।

প্রাচীনকালে দৈবীকৃপা বা ভগবৎকৃপা দ্বারা বিভিন্ন রোগের ন্যায় 'মূকতা' ও 'বধিরতা' আরোগ্যের উল্লেখ পাওয়া যায়। শ্রীমদ্ভাগবৎ গীতার 'মঙ্গলাচরণম' অংশের বিখ্যাত উদ্ধৃতি "মূকং করোতি বাচালং...", কিংবা মধ্যযুগীয় নাথ সাহিত্যের বাংলা ত্রিনাথের পাঁচালীতে 'খোঁড়া নাচে, কানার দেখে, বোবায় বলে বম্বোলা..." ইত্যাদির মধ্যেই উক্ত ভগবৎ-কৃপার উপর সমাজের আত্যন্তিক আস্থার পরিচয় পাওয়া যায়। যীশুখ্রীষ্টের ন্যায় একাধিক অবতারকল্প ভারতীয় মহাপুরুষের অলৌকিক ক্ষমতা দ্বারা মূক-বধিরতা আরোগ্যের কাহিনী প্রচলিত রয়েছে। কিন্তু সর্বক্ষেত্রেই উপায়ের বস্তুনিষ্ঠা অপেক্ষা অলৌকিকতা লক্ষ্য করে মনে হয় যে, অবতারকল্প মহাপুরুষেদের অলৌকিক ক্ষমতা প্রচারের উদ্দেশ্যে ভক্তরা অস্বাভাবিকতার এবং অতিকথনের আশ্রয় গ্রহণ করেছেন। তবে বিভিন্ন উল্লেখদৃষ্টে অনুমান করা যেতে পারে যে, প্রাচীনকালে মূক-বধিরতার আরোগ্য ঘটত। কিন্তু প্রচারিত উপায়টি অলৌকিক চেতনা দ্বারা আচ্ছন্ন।

।। সাত ।।

প্রাচীন ভারতীয় সমাজে মূক বা বধিরেরা পিত্রাদিধনে অধিকারী ছিল না। মনুসংহিতায় বলা হয়েছে, "ক্লীব, পতিত, জন্মান্ধ, জন্ম-বধির, উন্মত্ত, জড়, মূক এবং কল ইত্যাদি ইন্দ্রিয়শূন্য—এরা পিত্রাদিধনে অধিকারী নয়। ধনহারীরা উক্ত ক্লীবাদিকে ন্যায্য গ্রাসাচ্ছাদন দেবে। যদি না দেয়, তবে

তারা পাপী হবে।" (২২)। লক্ষ্যণীয়, উপরের উদ্ধৃতিটিতে জন্ম-বধিরতার উল্লেখ আছে। অনুমান করা যেতে পারে যে, জন্ম-বধির বা জন্ম-মূক এবং জন্ম-বধির বা জন্ম-মূক নয়, এই উভয় পর্যায়ের পার্থক্য সে সময়েই নির্ধারিত হয়েছিল।

মনুসংহিতার আর একটি গুরুত্বপূর্ণ তথ্য এই পাওয়া যাচ্ছে যে, সেকালে মূক বা বধিরদের বিবাহ অসিদ্ধ ছিল না। এবং তাদের সন্তানরা উক্ত রোগ-বিমুক্ত হয়ে জন্মগ্রহণ করতে পারত। ধনাধিকার প্রসংগে উল্লিখিত রয়েছে—"ক্লীবাদির [অর্থাৎ ক্লীব, পতিত, জন্মান্ধ, জন্ম-বধির, উন্মত্ত, জড়, মূক এবং কান প্রভৃতি ইন্দ্রিয়শূন্য বুঝতে হবে] যদি বিবাহেচ্ছা জন্মে, তবে তাদের যে পুত্র হবে, তারা যদি ক্লীবাদি দোষশূন্য হয়, তবে তারা পিতামহধন পাবে।" (২৩)।

নির্দেশ :

(১) জেতই' বোলী তে তবি টাল।
গুরু বোব সে সীসা কাল॥
(চর্যাপদ ৪০।৪)
অথবা,
ভণই কাহ্নু জিণ রঅন বি কইসা।
কাল বোবে' সংবোহিঅ জইসা॥
(ঐ ৪০।৫)

(২) ঐ

(৩) পুরুষো বাব গৌতমাগ্নিস্তস্য
বাগেব সমিৎ।
—ছন্দোগ্যোপনিষদ্ ৩৫৩।১

(৪) বাচা হি মুখেন সমিন্ধতে
পুরুষো ন মূকঃ।
— ঐ (শঙ্করভাষ্যম্)।

(৫) অষ্টৌ স্থানাদি বর্ণানাম্
উরঃ কণ্ঠ শিরস্তথা।
জিহ্বামূলঞ্চ দন্তাশ্চ
/নাসিকৌষ্ঠঞ্চ তালুক।
— ঐ (ঐ)।

(৬) 'বাগেব ব্রহ্ম'; শ্রোত্রং বৈ ব্রহ্মেতি।
—ঐ ৪৮০।১; ৩২০।৪

(৭) বাগ্বাব বসিষ্ঠ।
—ঐ ৩১৮।২

(৮) আপানক্ষাসো বধিরা অহাসত
ঋতস্য পন্থাং তরন্তি দুষ্কৃতং।

(৯) জড়মূকান্ধবধিরাংস্তৈর্যগ্‌যোনান্
বয়োগতান্।
স্ত্রীম্লেচ্ছব্যাধিতব্যঙ্গান্
মন্ত্রকালেহপসারয়েৎ॥
—মনুসংহিতা, অঃ ৭।১৪৯।

(১০) কশ্চিদন্ধাংশ্চ মূকাংশ্চ
পঙ্গূন্ ব্যঙ্গানবান্ধবান্।
পিতেব পাসি ধর্মজ্ঞ।
তথা প্রব্রজিতানপি॥
—মহাভারত : সভাপর্ব :
পঞ্চমোধ্যায় : ১২৫ সংখ্যক শ্লোক

(১১) ক্রিয়ালোপগতা যে চ
জাত্যন্ধাঃ পঙ্গবস্তথা
বিরূপা আমগর্ভাশ্চ
জ্ঞাতাজ্ঞাতাঃ কুলে মম।
তেষাং পিণ্ডো ময়া
দত্তোঽক্ষয্যমুপতিষ্ঠতাম্।

(১২) A Sanskrit English Dictionary — Sir M. M. Williams.

(১৩) সামবেদীয়া ছান্দোগ্যোপনিষদ্
(২য় ভাগ)— ৩২২।৬

(১৪) ঐ — ৩২৩।৭

(১৫) ঐ — ৩২৩।৮

(১৬) ঐ — ৩২৬।১০

(১৭) আবৃত্য বায়ু সকফো
ধমনীঃ শব্দবাহিনীঃ।
নরান্ করোত্যক্রিয়কান্
মূকমিন্মিন গদ্গদান্॥
—নিদানম্—১৫২।৩৮

(১৮) যদা শব্দবহং বায়ুঃ স্রোত
আবৃত্য তিষ্ঠতি।
শুদ্ধঃ শ্লেষ্মান্বিতো বাপি
বাধির্যং তেন জায়তে॥
—ঐ— ২৯২।২

(১৯) কর্ণস্রোতঃস্থিতে বাতে
শৃণোতি বিবিধান্ স্বরান্।
ভেরী মৃদঙ্গশঙ্খানাং
কর্ণনাদঃ স উচ্যতে॥
—ঐ— ২৯১।২

(২০) বাধির্যং বালবৃদ্ধোত্থং
চিরোত্থঞ্চ বিবর্জয়েৎ।
—ভাবপ্রকাশ

(২১) কর্ণশূলে কর্ণনাদে বাধির্যে
ক্ষেড় এব চ।
চতুর্ষ্বপি চ রোগেষু
সামান্যং ভেষজং স্মৃতম্॥
শৃঙ্গবেরঞ্চ মধু চ সৈন্ধবং তৈলমেব চ।
কটুষ্ণং কর্ণয়োর্ধার্য্যমেতৎ
স্যাদ্বেদনাপহম্॥
—ভাবপ্রকাশঃ।

।। শিখরী অপামার্গঃ ।।
শিখরীক্ষারজবারিতৎকৃতকল্কেন
সাধিতং তৈলম্।
অপহরতি কর্ণনাদং
বাধির্যঞ্চাপি পূরণতঃ।

॥ বিল্বতৈলম্ ॥

গবাং মূত্রেন বিল্বানি পিষ্টবা
তৈলং বিপাচয়েৎ।
সজলঞ্চ সদুগ্ধঞ্চ তদ্বাধির্যহরং পরম্॥
ক্ষীরমত্রাজং গ্রাহ্যম্।
—ভাবপ্রকাশঃ

শুষ্কমূলক শুণ্ঠীনাং
ক্ষার হিঙ্গুলনাগরম্।
শুষ্কং চতুর্গুণং দদ্যাৎ
তৈলমেতৈর্বিপাচয়েৎ॥
বাধির্যং কর্ণশূলঞ্চ পূয়স্রাবশ্চ কর্ণয়োঃ।
ক্রিময়শ্চ বিনশ্যন্তি তৈলস্যাস্য
প্রপূরণাৎ॥
—গারুড়ে ১৯৭ অধ্যায়।

(২২) অনংশৌ ক্লীবপতিতৌ
জাত্যন্ধ বধিরৌ তথা।
উন্মত্ত জড় মূকাশ্চ যে চ
কেচিন্নিরিন্দ্রিয়াঃ॥
সর্ব্বেষামপি তু ন্যায্যং দাতু
শক্ত্যা মনীষিণা।
গ্রাসাচ্ছাদনমত্যন্তং পতিহ্যদদং ভবেৎ॥
—মনুসংহিতা—৯।২০১, ৯।২০২

(২৩) যদর্থিতা তু দারৈঃ স্যাৎ
ক্লীবাদীনাং কথঞ্চন
তেষামুৎপন্নতন্তুনামপত্যং
দায়মর্হতি॥
—ঐ— ৯।২০৩।
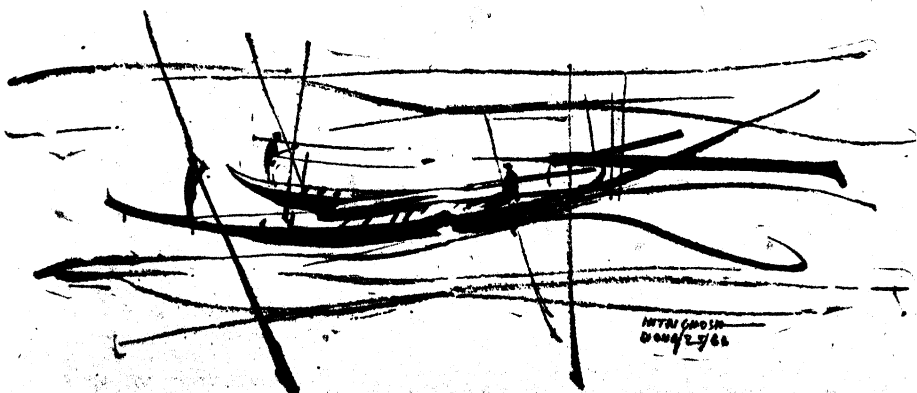
প্রশ্ন

আফ্রিকায় মোট কয়টি রাষ্ট্র আছে? রাষ্ট্রগুলির রাজধানীর ও রাষ্ট্রপ্রধানদের নাম কি?

শিবেশ চৌধুরী
কলিকাতা—৬।

●

১। পৃথিবীতে সবচেয়ে বড় রেলওয়ে ইয়ার্ড কোনটি?

২। পৃথিবীতে দুইটি রেলওয়ে স্টেশনের মধ্যখানের দূরত্ব সবচেয়ে বেশি কোথায় এবং সেই স্টেশনগুলির নাম কি?

৩। ভারতবর্ষের রেলওয়েতে বর্তমানে যে অটো সিগন্যালিং চালু হয়েছে সেই অটো-সিগন্যাল-এর আবিষ্কারক কে?

৪। পৃথিবীতে সবচেয়ে দ্রুত গতিবেগ-সম্পন্ন ট্রেন কোনটি এবং ভারতবর্ষেই বা কোনটি?

৫। পৃথিবীতে সবচেয়ে বড় রেলওয়ে দুর্ঘটনা কোনটি এবং ঘটনার কারণ কি?

এস, এন মৈত্র
আনাড়া,
পুরুলিয়া।

●

১। বর্তমানে ভারতের এটর্নী জেনারেল কে? ভারতবর্ষ স্বাধীন হওয়ার পর কয়জন এবং কে কে এই পদে অধিষ্ঠিত হয়েছেন?

২। বর্তমানে ভারতের কম্পট্রোলার ও অডিটর জেনারেল কে? স্বাধীন ভারতে আজ পর্যন্ত কয়জন ও কে কে এই পদে অধিষ্ঠিত হয়েছেন।

উজ্জ্বলকুমার সেন
কলিকাতা—৩০।

●

(১) ভারতে কতগুলি আর্ট কলেজ ও কতগুলি হাসপাতাল আছে?

(২) পৃথিবীর মধ্যে সবচেয়ে বৃহৎ প্রাসাদ কোনটি? কোথায় অবস্থিত?

(৩) পৃথিবীর আশ্চর্য জিনিসগুলি কি কি?

পঞ্চানন প্রামাণিক,
নূপুরকান্তি ঘোষ,
পাতিহাল (হাওড়া)।

(উত্তর)

৭ম বর্ষ, ১৬শ সংখ্যা প্রকাশিত সন্তোষ-কৃষ্ণ গুপ্তের প্রশ্নের উত্তরে সত্যজিৎ রায়ের সংক্ষিপ্ত জীবনী জানালাম।

স্বনামধন্য কবি সুকুমার রায়ের পুত্র শ্রীসত্যজিৎ রায়। জন্ম ১৯২২ সালের ২রা মে। তিনি কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে স্নাতক হন। তিনি তিন বৎসর শান্তি-নিকেতনে থেকে চিত্রকলা শেখেন। অবসর বিনোদনের জন্য তিনি চলচ্চিত্র-কলা সম্পর্কে বই-পত্র পড়েন ও চিত্রনাট্য রচনা করতে থাকেন। তাঁর হবিই ছিল চলচ্চিত্র। তিনি ক্যালকাটা ফিল্ম সোসাইটির প্রতিষ্ঠাতা। ১৯৫০ দশকের গোড়ার দিকে শ্রীরায় নিজেই চলচ্চিত্র নির্মাণ করবেন বলে স্থির করেন। এরপর তিনি বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের বিখ্যাত উপন্যাস "পথের পাঁচালী"র স্বত্ব সংগ্রহ করেন। এই চলচ্চিত্র নির্মাণের জন্য ভূতপূর্ব মুখ্যমন্ত্রী ডাঃ বিধানচন্দ্র রায়ের নিকট সাহায্য চান। ডাঃ রায় সরকারীভাবে কিছু সাহায্য করেন। তারপর তিনি পথের পাঁচালী চিত্রটি নির্মাণ করেন। এর পরের সৃষ্টি অপরাজিত ও অপুর সংসার। তাঁর অন্যান্য চলচ্চিত্রের মধ্যে রয়েছে, পরশ পাথর, জলসাঘর, দেবী, কাঞ্চনজঙ্ঘা, টু ডটারস (সমাপ্তি ও পোস্টমাস্টার) মহানগর, চারুলতা, তিন কন্যা, কাপুরুষ ও মহাপুরুষ ও নায়ক। এগুলির মধ্যে মহানগর ও চারুলতা আন্তর্জাতিক পুরস্কার লাভ করেছে। গত আট বছরে শ্রীরায় ভারতীয় ও বিদেশী, উভয় রকমেরই অসংখ্য পুরস্কার পেয়েছেন। তাঁর প্রথম চলচ্চিত্র "পথের পাঁচালী" ১৯৫৬ সালে সর্বোৎকৃষ্ট মানবীয় দলিল-রূপে বহু-আকাঙ্ক্ষিত কানে ফিল্ম ফেস্টিভ্যাল পুরস্কার লাভ করেন। যুক্তরাষ্ট্রে "তিনি"ই প্রথম ব্যক্তি যিনি ১৯৬০ সালে দুটি প্রধান পুরস্কার —শেলোৎসনিক গোল্ডেন লরেল অ্যাওয়ার্ড এবং শেলোৎসনিক গোল্ডেন লরেল ট্রফি জয় করেন। তিনি ১৯৬২ সালে বার্লিন ফিল্ম ফেস্টিভ্যালে "মহানগর", চলচ্চিত্রের জন্য শ্রেষ্ঠ চলচ্চিত্রের পুরস্কার লাভ করেন। ১৯৬৪ সালে "চারুলতা", চলচ্চিত্রের জন্য শ্রেষ্ঠ পুরস্কার 'গোল্ডেন বিয়ার" পান। ভারতে "পথের পাঁচালী" ও "অপুর সংসার" দুটি চলচ্চিত্রই যথাক্রমে ১৯৫৫ ও ১৯৫৯ সালে রাষ্ট্রপতির স্বর্ণপদক লাভ করেন। ১৯৫৫ সালে পদ্মশ্রী এবং ১৯৬৫ সালে পদ্ম-ভূষণের সম্মান লাভ করে। ১৯৬৭ সালে ম্যাগসেসে ফাউণ্ডেশন সংস্থা (আমেরিকা) শ্রীরায়কে তাঁর শিল্পকৃতির মাধ্যমে সাধারণ মানুষের প্রতি যে মমত্ববোধ এবং সহানুভূতির পরিচয় দিয়ে এসেছেন তারই পরিপ্রেক্ষিতে তাঁকে ম্যাগসেসে পুরস্কারে দিয়ে সম্মানিত করেছেন। এই পুরস্কারের অর্থমূল্য দশ হাজার মার্কিন ডলার, (৭৫০০০ টাকা)। তিনিই প্রথম ভারতীয় যিনি এতগুলি সম্মানের অধিকারী হয়েছেন।

উমাপ্রসাদ সেনগুপ্ত
ঝরিয়া
(ধানবাদ)।

●

১০ম সংখ্যায় প্রকাশিত জয়দেব সেনের একটি প্রশ্নের উত্তরে জানাচ্ছি যে, কিরণ মৈত্র রচিত ও কোলকাতার বিশ্বরূপা মঞ্চে সহস্র রজনী উত্তীর্ণ 'সেতু' নাটকই বাংলা রঙ্গমঞ্চে সবচেয়ে দীর্ঘস্থায়ী নাটক।

একই সংখ্যায় সুশান্ত হালদারের অন্য একটি প্রশ্নের উত্তরে জানাচ্ছি যে হিন্দু কলেজ (যা পরে দু'ভাগে বিভক্ত হয় এবং বিভাগ দুটি হিন্দু স্কুল ও প্রেসিডেন্সী কলেজ নামাঙ্কিত হয়) প্রতিষ্ঠার আগে কোলকাতায় যেসব শিক্ষা-প্রতিষ্ঠান ছিল, সেগুলো হল ক্যালকাটা মাদ্রাসা, ফোর্ট উই-লিয়াম কলেজ, ব্যাপটিস্ট মিশন স্কুল এবং কয়েকটি দেশীয় পাঠশালা। হিন্দু কলেজ প্রতিষ্ঠার পরে কিন্তু সংস্কৃত কলেজ প্রতিষ্ঠার আগে চালু হয়েছে পটলডাঙ্গা স্কুল, ক্যালকাটা স্কুলবুক সোসাইটি পরিচালিত পাঠশালা ও আদর্শ বিদ্যালয়, এবং বিশপস কলেজ।

১৪শ সংখ্যায় প্রকাশিত একটি প্রশ্নের উত্তরে জানাচ্ছি যে, রাষ্ট্রদূত বা অ্যাম্বাসাডর ও হাই-কমিশনার—এঁদের মধ্যে পদমর্যাদা বা কাজের দিক থেকে কোন পার্থক্য নেই। তফাৎ শুধু পদের নামে। কমনওয়েলথ রাষ্ট্রগুলির মধ্যে যে দূত বিনিময় হয়, তাঁদের বলা হয় হাই-কমিশনার। এছাড়া অন্য সকল দূতই অ্যাম্বাসাডর। চার্জ দ্য অ্যাফেয়ার্স পদমর্যাদার দিক থেকে অ্যাম্বাসাডর বা হাই-কমিশনারের ঠিক নীচে। তিনি বিদেশে একটি দেশের প্রতিনিধির কাজ করেন এবং দূতাবাসের শীর্ষস্থানীয় যদিও তিনি দূতের মর্যাদা বা আখ্যার অধিকারী নন। চার্জ দ্য অ্যাফেয়ার্সের অস্তিত্ব পূর্ণাঙ্গ কূটনৈতিক সম্পর্কের অভাবের পরিচায়ক।

প্রতিবাদ:

শিশির কবিরাজের একাদশ সংখ্যায় প্রকাশিত একটি প্রশ্নের উত্তরে রত্না ঘোষ দ্বাদশ সংখ্যায় জানাতে চেয়েছেন যে, তৃতীয় উইকেটে এডরিচ-কম্পটন জুটির সংগৃহীত ৩৭০ রানই সর্বাধিক রানের বিশ্ব-রেকর্ড। এটি ভুল। ১৯৩০ সালে ইংল্যাণ্ডের বিরুদ্ধে ওভাল মাঠে অস্ট্রেলিয়ার ব্র্যাডম্যান-পন্সফোর্ড জুটির দ্বিতীয় উইকেটে সংগৃহীত ৪৫১ রানই টেস্টে যে কোন জুটি সংগৃহীত সর্বাধিক রানের বিশ্ব-রেকর্ড। টেস্ট ম্যাচে ৩৭০-এর বেশী রান করেছে, এমন জুটির সংখ্যা ব্র্যাডম্যান-পন্সফোর্ড জুটিকে বাদ দিয়েও অন্ততঃ তিন। যথা হান্ট-সোবার্স (ওয়েস্ট-ইণ্ডিজ), ২য় উইকেট জুটিতে ৪৪৬ রান (ব্রিজটাউন, ১৯৫৮ পাকিস্তানের বিরুদ্ধে; পঙ্কজ রায়-মানকড় (ভারত)—১ম উইকেট ৪১৩ রান (মাদ্রাজ ১৯৫৫-৫৬), নিউজীল্যাণ্ডের বিরুদ্ধে এবং লরী-সিম্পসন (অস্ট্রেলিয়া)—১ম উইকেট—৩৮২ রান (পোর্ট অফ স্পেন, ১৯৬৫) ওয়েস্ট ইণ্ডিজের বিরুদ্ধে।

সব্যসাচী সেনগুপ্ত
কলিকাতা—৩।

অমৃত পাবলিশার্স প্রাইভেট লিঃ-এর পক্ষে শ্রীসুপ্রিয় সরকার কর্তৃক পত্রিকা প্রেস, ১৪, আনন্দ চ্যাটার্জি লেন, কলিকাতা—৩ হইতে মুদ্রিত ও তৎকর্তৃক ১১।১, আনন্দ চ্যাটার্জি লেন, কলিকাতা—৩ হইতে প্রকাশিত।

৭ম বর্ষ
২য় খণ্ড

২১শ সংখ্যা
মূল্য
৪০ পয়সা

Friday, 22nd September 1967 শুক্রবার, ৫ই আশ্বিন, ১৩৭৪ 40 Paise

সূচীপত্র

পৃষ্ঠা	বিষয়		লেখক
৫৬৪	চিঠিপত্র		
৫৬৫	সম্পাদকীয়		
৫৬৬	দক্ষিণের বারান্দা : গগনেন্দ্রনাথ		—তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়
৫৭১	সুন্দরবনে দুলো মোষ শিকার		—শ্রীকিশ্বনাথ বসু
৫৭৪	স্মৃতি	(কবিতা)	—শ্রীমণীন্দ্র রায়
৫৭৪	পাঁকে, পদ্মে	(কবিতা)	—শ্রীচিত্ত ভট্টাচার্য
৫৭৫	মহামারীর কবলে		—শ্রীশিশির নিয়োগী
৫৭৮	সাহিত্য ও সংস্কৃতি		
৫৮৩	সুর্য কাঁদলে সোনা	(উপন্যাস)	—শ্রীপ্রেমেন্দ্র মিত্র
৫৮৫	দেশেবিদেশে		
৫৮৬	ব্যঙ্গচিত্র		—শ্রীকাফি খাঁ
৫৮৭	প্রতিধ্বনি		
৫৮৯	আন্তর্জাতিক চলচ্চিত্রে ক্রাইম থ্রিলার		—শ্রীগুরুদাস ভট্টাচার্য
৫৯৩	প্রেক্ষাগৃহ		
৬০৩	দুর্গের অন্তরালে		—জ্যাক কার্ভিক
৬০৫	খেলাধুলা		—শ্রীদর্শক
৬০৭	বেণী কাপ ও প্রদীপ ব্যানার্জি		—শ্রীকমল ভট্টাচার্য
৬০৯	নর্দ্রিভিক ক্যাম্প		—শ্রীদিলীপ মালাকার
৬১০	জানাতে পারেন		
৬১১	আধুনিক	(উপন্যাস)	—শ্রীবিভূতিভূষণ মুখোপাধ্যায়
৬১৪	অঙ্গনা		—শ্রীপ্রমীলা
৬১৭	আমার কাল, আমার দেশ		—শ্রীসুধীরচন্দ্র সরকার
৬১৯	হোটেল লাম্বা	(বড় গল্প)	—শ্রীনির্মল সরকার
৬২৫	সৌজাম্ম-পরিজন *(অস্পষ্ট)*		—শ্রীঅচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্ত
৬২৭	বিজ্ঞানের কথা		—শ্রীশুভঙ্কর
৬২৯	পুরনো পাতা : হরিদাসের গুপ্তকথা		—ভুবনমোহন মুখোপাধ্যায়
৬৩৩	কলকাতার জাতীয় মেলা *(অস্পষ্ট)*		—শ্রীশান্তি ঘোষ
৬৩৪	প্রকৃতিপাগল বিভূতিভূষণ		—শ্রীসুরেশনাথ ঘোষ *(অস্পষ্ট)*
৬৩৭	ত্রৈমাসিক সূচীপত্র *(অস্পষ্ট)*		

সংখ্যা প্রসঙ্গে

গত ১৯শ সংখ্যা 'অমৃত'তে প্রকাশিত শ্রীঅরূপরতন ভট্টাচার্যের 'সংখ্যা সংখ্যা সংখ্যা' শীর্ষক লেখাটি খুব ভাল লাগল। কিন্তু ঐ প্রসঙ্গে ব্যাঙ্ক অ্যাকাউণ্টের হিসেব ঠিক বুঝতে পারা গেল না। শ্রীভট্টাচার্য বলেছেন যে, এক নির্দিষ্ট টাকার অ্যাকাউণ্ট থেকে প্রতি ক্ষেত্রে যে টাকা তোলা হ'ল তার যোগফল এবং প্রতি ক্ষেত্রে যে টাকা ব্যাঙ্কে রইল তার যোগফল সমান হবে। কিন্তু এই দুটো যোগফল যে সমান হতে হ'বে তার কোন মানে নেই। যা হওয়া প্রয়োজন তা হচ্ছে, প্রতি ক্ষেত্রে ব্যাঙ্ক থেকে যত টাকা মোট (cumulative) তোলা হ'ল + প্রতি ক্ষেত্রে ব্যাঙ্কে যত টাকা রইল = যত টাকার অ্যাকাউণ্ট। শ্রীভট্টাচার্য যা দিয়েছেন, অর্থাৎ ৫০ টাকার অ্যাকাউণ্ট ধরে, সাজিয়ে লিখলে হিসেবটা এইরকম দাঁড়াবে :

৫০ টাকার হিসেব

যা তোলা হোল	মোট যা তোলা হ'ল	যা রইল	মোট
(ক)	(খ)	(গ)	(খ+গ)
২৫	২৫	২৫	৫০
১০	৩৫	১৫	৫০
৮	৪৩	৭	৫০
৫	৪৮	২	৫০
২	৫০	০	৫০

হিসেবটা ঠিক মিলে গেল।

একটা এবং একমাত্র একটা বিশেষ ক্ষেত্রে, যা তোলা হ'ল (ক) এবং যা রইল (গ) তার যোগফল (শ্রীভট্টাচার্য যা দেখাতে চেয়েছেন) সমান হবে তখনই, যখন প্রতি ক্ষেত্রে যা আছে তার অর্ধেক তোলা হচ্ছে। প্রকৃতপক্ষে এ হিসেবটা কোনদিন শেষ হবে না এবং এটা সিরিজ হয়ে যাবে। নীচে ঐ হিসেবটা দেখান হল :

যা তোলা হ'ল	যা রইল
২৫	২৫
১২·৫০	১২·৫০
৬·২৫	৬·২৫
৩·১২৫	৩·১২৫
১·৫৬২৫	১·৫৬২৫
ইত্যাদি	ইত্যাদি
৫০	৫০

পরিষ্কার বোঝা যাচ্ছে যে এ হিসেবটা চলতে থাকবে। যদি আমাদের হাতে অনন্ত সময় থাকে এবং যদি টাকার ইচ্ছেমত ভগ্নাংশ আমরা পেতে পারি এবং যদি ব্যাঙ্ক কর্তৃপক্ষের বিরক্তি না আসে, তাহলে আমরা এই লেনদেন চালিয়ে যেতে পারব, যতক্ষণ না পুরো ৫০ টাকা তোলা হয়, এবং শেষে নিশ্চয় দেখব উভয় দিকেরই যোগফল ৫০ হচ্ছে।

সমীর মুখোপাধ্যায়,
কলকাতা—২৬।

অঙ্গসজ্জায় নারীর রুচি

আমি অমৃতের নিয়মিত পাঠক। গত ৭ম বর্ষের ৮ম সংখ্যায় শ্রীমতী রত্না দেবীর 'আজকের পোশাক-পরিচ্ছদ', ১৭শ সংখ্যায় শ্রীমতী আভা পাকড়াশীর 'লো-কাট', এবং এই সংখ্যাতেই 'চিঠিপত্র' বিভাগে প্রকাশিত শ্রীভৈরবানন্দ রায়ের 'পোশাক বিবর্তন-প্রসঙ্গে' আলোচনা আমাকে বিশেষভাবে আকৃষ্ট করেছে। বলা বাহুল্য, প্রত্যেকটি আলোচনাই তথাকথিত উগ্র আধুনিকাদের পোশাক-পরিচ্ছদ ও সাজ-সজ্জা প্রসঙ্গে। সত্যি, সমাজের সামনে এ এক কঠিন প্রশ্ন বটে—কি করে মেয়েদের রুচিবোধকে শালীনতার পর্যায়ে ফিরিয়ে আনা যাবে। পাশ্চাত্যের নারী-সমাজ হলে হয়ত এত চিন্তা করতে হ'ত না কিন্তু রুচিবোধকে বিকৃত করার প্রতিযোগিতায় বাঙালী মেয়েরা যখন অবতীর্ণা হয়েছেন তখন সমাজের পক্ষে তা' অবশ্যই চিন্তার বিষয়। যে বঙ্গনারী এককালে শ্রদ্ধাসম্মানের সর্বোচ্চ আসনে নিজের স্থান সংগ্রহ করে নিয়েছিলেন, অঙ্গ-সজ্জাই কিনা শেষে তাকে এখন নিন্দার পঙ্কে নিক্ষেপ করছে? এর জন্য দায়ী কারা? দায়ী সমগ্র চলচ্চিত্র প্রতিষ্ঠান, দায়ী নারীর অনুচিকীর্ষা, দায়ী সমাজ, দায়ী কিছুটা পরিমাণে অভিভাবকবৃন্দ। চলচ্চিত্রের নায়িকার সাজ-সজ্জা, পোশাক-পরিচ্ছদ, চলন-বলনের স্টাইলই সাধারণ মেয়েদের মনে অনুকরণের স্পৃহা জাগায়। কিন্তু এর পরই প্রশ্ন আসে, চলচ্চিত্রে নায়িকাকে দেখেই কি তাকে অন্ধ অনুকরণ করতে হবে? সিনেমা-নায়িকার নকল করতে তো খুব ইচ্ছা করে, খুব ইচ্ছা করে, তাঁর মত গুণে দেখিয়ে বিদেশের চলচ্চিত্র-জগৎ থেকে বিজয়িনীর পুরস্কার জয় করে আনার ইচ্ছা ক'জন মেয়ের মনে জাগে? অবশ্য এর জন্য সমাজের কাছেও কিছু কৈফিয়ৎ তলব করার আছে। আধুনিকাদের মধ্যে যখন উগ্রতার অনুপ্রবেশ ঘটলো, সমাজ সচেতন থাকলে, প্রায় অশ্লীল পোশাক-পরিচ্ছদের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ করলে মেয়েদের পরিচ্ছদের এতখানি অবনতি হতে পারত কি? না কি, অভি-ভাবকের সচেতনতা ও শাসন থাকলে ঘরের মেয়েরা অমন অপরূপ সাজে সজ্জিত হয়ে, পথচলতি পুরুষের মাথা ঘুরিয়ে দেবার জন্য পথে বার হতে পারত? উগ্রতার সত্তা যখন প্রশ্রয়ের অবলম্বন পেয়ে সমাজের চালে উঠেছে, তখন তাকে ছেঁটে ফেলতে গেলে যথেষ্ট বেগ পেতে হবে। মহীয়সী-রূপে নারী পুরুষকুলের শ্রদ্ধা আকর্ষণ করবে তার রুচির মার্জিত পরিচয় দিয়ে। সেই প্রাচীন সজ্জা—লালপাড় শাড়ী, সিঁদুররঞ্জিত সিঁথি, হাতে এয়োতির লক্ষণ লোহা ও শংখ কঙ্কণ, অলক্তকরঞ্জিত পাদদুখানি নিয়ে শুভ্রতা, পবিত্রতার প্রতি-মূর্তি কোন নারী এসে যদি সামনে দাঁড়ান, সে মূর্তি দেখে পুরুষের সশ্রদ্ধচিত্ত থেকে মাতৃসম্বোধনই বেরিয়ে আসবে। পরিবর্তে কোন নারী যদি মিনি শাড়ী, হাত-কাটা পিঠ-কাটা পেট-কাটা—এক কথায় 'সর্বাঙ্গ কাটা ব্লাউজ, মাথায় অসমুন্নত বুফে, চাঁদ-মুখখানিকে কসমেটিক পেন্ট করে চটুল ভঙ্গিতে কোন পুরুষের সামনে এসে দাঁড়ান, মাতৃ-সম্বোধন দূরে থাকুক, চিত্ত থেকে তখন যে বাসনা জাগ্রত হয় তার অর্থ অপ্রাপ্তবয়স্কদেরও অবুঝ নয়।

সুখের কথা অনেক মহিলা উন্নয়ন সমিতি মেয়েদের এই কদর্য রুচিকে মার্জিত করার প্রচেষ্টায় এগিয়ে এসেছেন এবং এর আনন্দের কথা অমৃতে প্রকাশিত মেয়েদের পোশাক পর্যায়ের আলোচনাগুলো অধিকাংশই মহিলাদের লেখা। এই রচনা-গুলো যদি বহু আলোচিত আধুনিকারা পাঠ করেন এবং পাঠ করে লজ্জিত হন, তবে আশা করি সেই লজ্জাই তাঁদের রুচির মার্জিতকরণে সহায়তা করবে। প্রায় বছর অনেক আগে কলকাতা পুলিশের পক্ষ থেকে ছেলে-মেয়েদের আপত্তিকর পোশাকের বিরুদ্ধে যে অভিযান চালান হয়েছিল তার ফলে উল্লেখযোগ্য কিছুদিন ভদ্র পোশাকে রাস্তায় চলাফেরা করতে দেখা গেছল। পুলিশী অভিযান হঠাৎ বন্ধ হয়ে যাওয়ায় আবার ঐসব অঙ্গসজ্জা উগ্র আকারে আত্ম-প্রকাশ করেছে। আমার মনে হয় পুলিশের পক্ষ থেকে আবার এ অভিযান চালু করলে কিছু ফল হতে পারে। আজ আধুনিক নারীসমাজের সামনে আমি একটা অনুরোধই রাখবো—তাঁরা তাঁদের রুচিকে মার্জিত শোভন, শালীনতা ও শালীনতার পর্যায়ে সীমাবদ্ধ রেখেই আধুনিকতা প্রকাশ করুন। প্রত্যেকের ঘরেই গৃহলক্ষ্মীস্বরূপা মা রয়েছেন। তাঁদের পবিত্র পোশাকের দিকে তাকিয়েও যে মেয়েরা কি করে নিজেদের অমার্জিত সজ্জায় সজ্জিত করেন বুঝি না! অথচ এঁরাই না আগামীদিনের মা? বড়দের দেখেই ছোটরা শেখে; তাই তরুণী ও যুবতীদের হাতকাটা পেটকাটা জামার পাশে পাশেই কিশোরীদের টাইট জিন আর টুকু কামিজ দেখা যায়, যা পরলে দেহের প্রতিটি খাঁজই স্পষ্ট হয়ে ওঠে। কদর্যতার বীজ যাদের মধ্যে এখনও অঙ্কুরিত হয়নি, অভিভাবকদের উচিত সেইসব কিশোরীদের রুচিকে মার্জিত পথে চালিত করবার নির্দেশ দেওয়া। একে সামাজিক দিয়ে বাঙালীর গৌরবসূর্য আজ অস্তমিত, গোধূলির স্তিমিত আলোটুকুও যদি আধুনিকারা এভাবে আচ্ছাদিত করে, তবে বাঙালীর অদূরভবিষ্যতে যে অন্ধ থাকবে না!

প্রসেনজিৎ কুমার,
কলকাতা—১১।

অমৃত

সীমান্তে সংকট

গত সপ্তাহ আমাদের খুব উদ্বেগের মধ্যে কেটেছে। সিকিমের নাথু লায় অতর্কিতে গোলাবর্ষণ সুরু করে চীন। ভারতীয় সৈনিকরা তার প্রত্যুত্তর দেয়। উভয় পক্ষেই হতাহত হয়েছে। হিমালয় সীমান্তে এই শান্তিভঙ্গে স্বভাবতই গোটা দেশ উদ্বিগ্ন হয়ে পড়েছিল। ভারতের পক্ষ থেকে প্রতিবাদ জানানো হয় চীনের এই মারমুখী আচরণের। প্রস্তাব দেওয়া হয় অস্ত্রসংবরণ চুক্তির। চীন যথারীতি এই প্রস্তাবে কোন কান দেয়নি। বরং পাল্টা প্রচার চালানো হয় যে আক্রমণটা হয়েছিল ভারতের পক্ষ থেকেই। যাই হোক, যেমন দুর্জ্ঞেয় কারণে চীন সীমান্তে গোলাবর্ষণ সুরু করেছিল তেমনি রহস্যজনকভাবে আপাতত গোলাবর্ষণ বন্ধ আছে।

কিন্তু এতে নিশ্চিন্ত হবার কোনো কারণ নেই। কেননা চীনের সঙ্গে আমাদের বিরোধের কোনো মীমাংসা হয়নি। মীমাংসা হবার কোনো লক্ষণও দেখা যাচ্ছে না। মীমাংসা একতরফা হয় না। তার সূত্র উভয়পক্ষ থেকেই বের করতে হয়। দুর্ভাগ্যের বিষয় ১৯৬২ সালের পর থেকে আজ পর্যন্ত সেই সূত্র আবিষ্কারের জন্য ভারতের পক্ষ থেকে বিস্তর চেষ্টা হয়েছে। কোনো ফল হয়নি। কারণ চীনের দিক থেকে বৈরিতা কমেনি, তা বেড়ে চলেছে উত্তরোত্তর। চীনের আচরণে ক্ষুব্ধ হয়ে কেউ কেউ দাবী করছেন যে, অবিলম্বে তার সঙ্গে কূটনৈতিক সম্পর্ক ছিন্ন করা হোক। কেউ কেউ বলছেন, ফরমোজাকে স্বীকৃতি দিয়ে আমাদের চীনানীতির পরিবর্তন করা হোক।

এ প্রসঙ্গে দ্বিতীয় চিন্তার অবকাশ যে আছে তা আশা করি রাষ্ট্রনীতিজ্ঞ ব্যক্তিরা স্বীকার করবেন। প্রথমতঃ চীনের মতো একটি শক্তিশালী এবং বৈরী রাষ্ট্রের পাশাপাশি আমাদের বাস করতে হলে আমাদের সামরিক শক্তি বাড়ানো দরকার। নিশ্চিতই ১৯৬২ সালের পর আমাদের চেতনা হয়েছে যে, সামরিক শক্তিতে আত্মনির্ভরশীল এবং আত্মরক্ষায় সজাগ না হলে আমাদের সীমান্ত সংকট কাটবে না। এই কাজই আমাদের করতে হবে সবার আগে। দ্বিতীয় প্রশ্ন, কূটনৈতিক সম্পর্কের। কার্যত পিকিং-এ আমাদের দূতাবাস প্রায় অচল। আমাদের মতোই রাশিয়া, ইংলন্ড প্রভৃতি দেশের দূতাবাসেরও একই অবস্থা। তা সত্ত্বেও কেউ চীনের সঙ্গে কূটনৈতিক সম্পর্ক ছিন্ন করেনি। সুতরাং এ ব্যাপারে আমাদেরও তাড়াতাড়ি কিছু করা সঙ্গত হবে না। কূটনৈতিক সম্পর্ক ছিন্ন করাটা হল তুরুপের তাসের মতো। অনেক ভেবে চিন্তে সকলের শেষেই তা করতে হয়। তৃতীয়ত, ফরমোজাকে স্বীকৃতির প্রশ্ন। এ বিষয়েও বাস্তব দৃষ্টি নিয়েই আমাদের এগোতে হবে। ফরমোজা যদি নিজেকে মূল চীনের প্রতিভূ বলে দাবী না করে তাহলে একটি স্বাধীন ও স্বতন্ত্র রাষ্ট্র হিসেবে তাকে স্বীকৃতি দিতে কোনো অসুবিধা হবে না। কিন্তু ফরমোজাই চীন, এই অবাস্তব স্বীকৃতি দিলে আমাদের পরেও বিড়ম্বিত হবার সম্ভাবনা। কারণ এতে চীনের বৈরিতা বাড়বে ছাড়া কমবে না।

এই সংকটের পরিপ্রেক্ষিতে আমাদের অভ্যন্তর সংকটের দিকেও নজর দিতে হবে। সারা দেশ আজ ক্ষুধার্ত। খরা ও বন্যায় ফসলের প্রচুর ক্ষতি হয়েছে। দেশে শিক্ষিত বেকারের সংখ্যা ক্রমবর্ধমান। ভূমিহীন চাষীর ক্ষুধা রয়েছে অতৃপ্ত। চোরাকারবারী, মুনাফাকারীদের লোভ আকাশছোঁয়া। তরুণ সমাজে ব্যাপক হতাশাজনিত বিক্ষোভ আজ দেশের সর্বত্র ছড়িয়ে পড়ছে। আইন ও শৃঙ্খলার প্রতি আনুগত্য ক্রমশই হ্রাস পাচ্ছে। যে-কোনো অজুহাতে বিরোধের আগুন জ্বলে ওঠে। আমরা দেখেছি ভাষা নিয়ে কী আগুনের খেলা চলছে। প্রাদেশিকতার সংকীর্ণ মনোভাব আবার মাথা চাড়া দিয়ে উঠেছে। মহারাষ্ট্রে যার নাম শিবসেনা তাই অনানামে অন্য রাজ্যেও দেখা দিচ্ছে। আমরা যে এক জাতি এবং একই ভাগ্যের সঙ্গে জড়িত এই ঐতিহাসিক বোধ আমরা হারিয়ে ফেলছি। যখন ঐক্য এবং সংহতিবোধ সবচেয়ে বেশি প্রয়োজন তখনই আমাদের মধ্যে দেখা দিয়েছে বিরোধ, সংশয় এবং অবিশ্বাস। কোনো সংকটাপন্ন দেশের পক্ষে এই আভ্যন্তর বিরোধ আত্মহত্যার তুল্য। ভারতবর্ষকে এ বিষয়ে চিন্তা করে দেখতে হবে যে, আমরা ঐক্যবদ্ধ জাতি হিসাবে বাঁচবো, না খণ্ডবিচ্ছিন্ন কতকগুলি দুর্বল জাতিগোষ্ঠির পরিচয় নিয়ে অর্ধমৃত হয়ে বাঁচবো। আত্মকলহে মগ্ন জাতি কখনই বাইরের শত্রুর সঙ্গে সার্থকভাবে মোকাবিলা করতে পারে না। ত্রিশের যুগে জাপানী আক্রমণের মুখে গৃহযুদ্ধে বিভক্ত চীন ঐক্যবদ্ধ হয়েছিল। ভারতবর্ষে অবশ্য গৃহযুদ্ধের কোনো আশংকা নেই। কিন্তু ক্ষুদ্র বিষয় নিয়ে, ক্ষুদ্র স্বার্থ নিয়ে দৈনন্দিন বিরোধ গৃহযুদ্ধের চেয়ে আত্মক্ষয়ী। এতে রাষ্ট্রের কেন্দ্রীয় ক্ষমতা দুর্বল হয়, জাতি আত্মবিশ্বাস হারিয়ে ফেলে।

ইতিহাস থেকে আমাদের এ বিষয়ে শিক্ষা গ্রহণ করা উচিত। নাথু লায় কামান দাগিয়ে চীন কী চায় তা বোঝা শক্ত নয়। আমাদের দুর্বলতার ফাটলগুলোকে আরও বড় করে দেবার জন্যই এই কামানগর্জন। বলা বাহুল্য শুধু সীমান্তে পাহারারত সৈনিকরাই দেশরক্ষা করে না। তাকে সাহস ও সমর্থন দেয় গোটা দেশের মানুষ। আমাদের দেশের বর্তমান বিশৃঙ্খলার দিকে তাকালে মনে হবে না যে, সত্যি সত্যিই এক পরাক্রান্ত বৈরী রাষ্ট্রের কামানের মুখে আমাদের সীমান্তের শান্তি বিঘ্নিত হচ্ছে। দেশের নেতারা কি এ-সম্পর্কে সজাগ?

দক্ষিণের বারান্দা : গগনেন্দ্রনাথ

তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়

বিংশ শতাব্দীর বর্তমান এই সপ্তম দশকের একদিনে দাঁড়িয়ে পিছন ফিরে এক শতাব্দী পূর্বের এই দশকটিকে এক আশ্চর্য বিস্ময় ও সম্ভ্রমের সঙ্গে লক্ষ্য করছি ও সশ্রদ্ধ অভিবাদন জানাচ্ছি। বিগত শতাব্দীর এই শতকটির কি আশ্চর্য মহিমা! এই দশকটি যেন মহাকালের অনন্ত-বিস্তৃত অন্ধকার আকাশে সম্মিলিত জ্যোতিষ্ক-মণ্ডলীতে গঠিত এক আশ্চর্য ছায়াপথের মত ধ্রুবজ্যোতিতে বিরাজমান। বিগত শতাব্দীর এই দশকে যেসব সুমহৎ পুরুষ আমাদের দেশের মৃত্তিকায় জন্মগ্রহণ করে কুলকে পবিত্র ও দেশবাসীকে কৃতার্থ করে গিয়েছেন, তাঁদের সংখ্যা ছায়াপথের জ্যোতিষ্কমণ্ডলীর মতই। আজ তাঁদের জন্ম-শতবার্ষিকী অনুষ্ঠানের মাধ্যমে তাঁদের জনে জনে তাঁদেরই উত্তরপুরুষ হিসেবে স্মরণ করার সৌভাগ্যলাভ করছি আর মনে মনে বলছি—শতবর্ষ পরে আপনাদের স্মরণ করে, আপনাদের উত্তরপুরুষ আমরা, আমরা ধন্য ও কৃতার্থ।

গগনেন্দ্রনাথ ঠাকুরের আঁকা একটি কার্টুন

আজ তেমনি একটি প্রণাম করবার ক্ষণ সমাগত। এই বৎসরটিতে সুমহৎ শিল্পী গগনেন্দ্রনাথের জন্মের শতবর্ষ পূর্ণ হল। সেই উপলক্ষে তাঁর জাতির উত্তরপুরুষ হিসেবে সমগ্র জাতির সঙ্গে সেই সুমহৎ শিল্পীকে সশ্রদ্ধ প্রণাম নিবেদন করি। তাঁর কাছে আমাদের সুগভীর কৃতজ্ঞতা নিবেদন করি শিল্পের যে মহৎ উত্তরাধিকার তিনি আমাদের জন্য রেখে গিয়েছেন তার জন্য। শিল্পী হিসেবে তিনি প্রকাণ্ড বিশিষ্ট ও অনন্য। তাঁর সেই বিশিষ্ট ও অনন্য শিল্প-সৃষ্টিকে পুনরায় পরম সমাদরের সঙ্গে আমাদের একান্ত শ্লাঘার সামগ্রী হিসেবে স্বীকার ও বরণ করি।

একান্ত বিনয়ের সঙ্গে প্রথমেই স্বীকার করি অন্তরের শ্রদ্ধা ছাড়া এই অনন্য শিল্পীকে নিবেদন করার আমার কিছুই নাই। তাঁর শিল্পের বিশিষ্টতা বা তার খুঁটিনাটি সম্পর্কে কেন, চিত্রশিল্প সম্পর্কেই আমার জ্ঞান একান্ত সীমিত। সেই সীমিত জ্ঞান নিয়ে শিল্পী গগনেন্দ্রনাথ সম্পর্কে কিছু বলা আমার পক্ষে অনধিকার চর্চা হবে। তবে তাঁর আঁকা ছবি দেখেছি। একই কালে, একই সংস্কৃতির মধ্যে তাঁর অনুজ সমকালীন হিসেবে বেড়ে উঠে, আলো-বাতাস-জল গ্রহণ করার মতই তাঁর কথার সঙ্গে এবং তাঁর ছবির কথার সঙ্গে যৎসামান্য পরিচয় ঘটেছে। সেই অতি স্বল্প জানার উপর নির্ভর করে, সামান্য কয়েকটি কথায় তাঁর শিল্প সম্পর্কে আমার যে-ধারণা হয়েছে, সেটুকু নিবেদন করব। নিবেদন করব একান্ত শ্রদ্ধাপ্রকাশের উদ্দেশ্যেই।

এই শ্রদ্ধা নিবেদনের প্রারম্ভেই এ-কথা যেন আমরা না ভুলি যে, গগনেন্দ্রনাথ সম্পর্কে মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথের পৌত্র, দ্বিজেন্দ্রনাথ - সত্যেন্দ্রনাথ - জ্যোতিরিন্দ্রনাথ-রবীন্দ্রনাথের ভ্রাতুষ্পুত্র, অবনীন্দ্রনাথের জ্যেষ্ঠ সহোদর এবং ভারতীয় সংস্কৃতির প্রাণকেন্দ্র জোড়াসাঁকো ঠাকুরবাড়ীর এক আশ্চর্য সন্তান। আবার এইসবের সঙ্গে এবং এইসবের উপরে তিনি শিল্পী হিসেবে অনন্য শক্তি ও বৈশিষ্ট্যের অধিকারী।

আজ গগনেন্দ্রনাথকে সামগ্রিকভাবে বুঝতে গিয়ে সেই বুঝবার চাবিটির জন্য কেবলই সন্ধান করেছি। সে সন্ধান সহজে মেলেনি। কারণ, সমগ্র দেশের অন্তরঙ্গ ও বহিরঙ্গ মূর্তি তো সে চাবিকে খুঁজে পাবার পক্ষে অনুকূল নয়। আমাদের পরিপার্শ্বের প্রাত্যহিক যে মূর্তি, তাতে মহাকবিই তাঁর রচনায় উৎকীর্ণ করে গিয়েছেন :

কাঁঠালের ভূতি-পচা, আমানি, মাছের যত আঁশ
রান্নাঘরের পাশ,
মরা বিড়ালের দেহ, পেঁকো নর্দমায়
বীভৎস মাছির দল ঐকতান-বাদন জমায়।
শেষ রাত্রে মাতাল বাসায়
স্ত্রীকে মারে, গালি দেয় গদগদ ভাষায়
ঘুমভাঙা পাশের বাড়ীতে
পাড়াপ্রতিবেশী থাকে হুংকার ছাড়িতে।
ভদ্রতার বোধ যায় চলে
মনে হয় নরহত্যা পাপ নয় বলে।

প্রত্যহের দিন আর রাত্রি, জীবনের অন্তরঙ্গ ও বহিরঙ্গ রূপ যেখানে সর্ব অঙ্গে এই কুশ্রীতাকে বহন করে চলেছে, সেখানে

গগনেন্দ্রনাথের শিল্পের সৌন্দর্যকে আবিষ্কার করবার চাবিকাঠি খ‍ুঁজে বের করা সহজ কাজ নিশ্চয়ই নয়। তবু খ‍ুঁজতে খ‍ুঁজতে সন্ধান মিলল জীবন-স্মৃতির পাতায় :

"পুষ্করিণী নির্জন হইয়া গেলে সেই বটগাছের তলাটা আমার সমস্ত মনকে অধিকার করিয়া লইত। তাহার গুঁড়ির চারিধারে অনেকগুলো ঝুরি নামিয়া একটা অন্ধকারময় জটিলতার সৃষ্টি করিয়াছিল। সেই কুহকের মধ্যে, বিশ্বের সেই একটা অস্পষ্ট কোণে যেন ভ্রমক্রমে বিশ্বের নিয়ম ঠেকিয়া গেছে। দৈবাৎ সেখানে যেন স্বপ্ন যুগের একটা অসম্ভবের রাজত্ব বিধাতার চোখ এড়াইয়া আজও দিনের আলোর মাঝখানে রহিয়া গিয়াছে। মনের চক্ষে সেখানে যে কাহাকে দেখিতাম এবং তাহাদের ক্রিয়াকলাপ যে কী রকম, আজ তাহা স্পষ্ট ভাষায় বলা অসম্ভব।"

"বাড়ীতে আরও একটা জায়গা ছিল, সেটা যে কোথায় তাহা আজও পর্যন্ত বাহির করিতে পারি নাই। আমার সমবয়স্কা খেলার সঙ্গিনী একটি বালিকা সেটাকে রাজার বাড়ী বলিত। কখনো কখনো তাহার কাছে শুনিতাম, আজ সেখানে গিয়াছিলাম। কিন্তু একদিনও এমন শুভযোগ হয় নাই, যখন আমিও তাহার সঙ্গ ধরিতে পারি। সে একটা আশ্চর্য জায়গা, সেখানে খেলাও যেমন আশ্চর্য, খেলার সামগ্রীও তেমনি অপরূপ।

মনে হইত, সেটা আমার অত্যন্ত কাছে; একতলায় বা দো-তলায় কোন একটা জায়গায়, কিন্তু কোনোমতেই সেখানে যাওয়া ঘটিয়া উঠে না। কতবার বালিকাকে জিজ্ঞাসা করিয়াছি, রাজার বাড়ী কি আমাদের বাড়ীর বাহিরে? সে বলিয়াছে, না, এই বাড়ীর মধ্যেই। আমি বিস্মিত হইয়া ভাবিতাম, বাড়ীর সকল ঘরই তো আমি দেখিয়াছি কিন্তু সে-ঘর তবে কোথায়! রাজা যে কে সে-কথা কোনো দিন জিজ্ঞাসাও করি নাই, রাজত্ব যে কোথায় তাহা আজ পর্যন্ত অনাবিষ্কৃত রহিয়া গিয়াছে—কেবল এইটুকু মাত্র পাওয়া গিয়াছে যে, আমাদের বাড়ীতেই সেই রাজার বাড়ী।”

কথাগুলি জোড়াসাঁকো সংস্কৃতি-বৃক্ষের শ্রেষ্ঠ পুষ্প, শ্রেষ্ঠ পুরুষ রবীন্দ্রনাথের। কিন্তু গগনেন্দ্রনাথের কথা ভাবতে গিয়ে বার বার আমার মনে হয়েছে এ কথাগুলি যেন গগনেন্দ্রনাথের শিল্পসৃষ্টির মূল কথা। গগনেন্দ্রনাথের মর্মের গোপনতম কথাগুলি যেন তাঁর মর্মকেন্দ্র থেকে আবিষ্কার করে রবীন্দ্রনাথ তাঁর হয়ে আমাদের জানিয়ে দিয়ে গিয়েছেন।

স্বপনযুগের একটা অসম্ভবের রাজত্বকে, সেই অনাবিষ্কৃত রাজার বাড়ীকে খুঁজে বের করাই যেন গগনেন্দ্রনাথের সমগ্র শিল্প-জীবনের, বোধহয় সমগ্র জীবনেরই মর্মবাণী।

আজ শতাব্দী পারে যখন জোড়াসাঁকোর মহৎ স্রষ্টাদের সৃষ্টিকর্ম আমাদের কাছে এক ঐশ্বর্যময়, বিশাল বিচিত্র ইতিহাসের উত্তরাধিকারের মত হস্তান্তরিত হয়েছে তখন তার আলোচনায় নেমে মনে হয় যেন বিশ্ব-বিধাতার এ এক আশ্চর্য কৌতুক যে, সেই একই বাগান, একই গাছপালা, একই মৃত্তিকা, একই সরোবর, একই প্রাসাদ দেখে এই বিশাল স্রষ্টারা নিজের নিজের বৃত্তি ও প্রবণতা অনুযায়ী সৃষ্টির রস সংগ্রহ করেছিলেন! পৃথিবীর সংস্কৃতির ইতিহাসে এমন ব্যাপার বোধহয় একক ও অনন্য।

সেখানকার বাগান, গাছপালা, মাটি, পুকুর চারিদিকে প্রত্যহের অতি তুচ্ছ, শ্রীহীন পৃথিবীর দ্বারা পরিব্যাপ্ত হয়েও অনাদিকালের অক্ষত প্রকৃতির অন্তহীন, নির্বাক সৌন্দর্য ও মাধুর্যকে যেন পূর্ণ মধুভাণ্ডের মত ধারণ করে রেখেছিল; তাকেই এখানকার প্রাণগুলি অনাদি বিস্ময়ের মত দেখেছিল, দেখতে পেয়েছিল, দেখতে পেরেছিল।

কিন্তু এ, সবই উপলক্ষ্য মাত্র। এই পার্থিব সৌন্দর্যকে অবলম্বন করে বাড়ীর অন্য সকলের মত গগনেন্দ্রনাথের মন, হৃদয় ও কল্পনা যেন হৃদয়ের মর্মলোকবাসী উধাও কামনাকে চিনতে পেরেছিল। মর্ত-লোকের বাক্যহীন প্রকৃতিকে উপলক্ষ্য করে তাঁর কল্পলোকে এক অরূপ সুন্দর বার বার তাঁকে ইসারা জানিয়েছে, চকিত ইঙ্গিতে হাতছানি দিয়েছে। সেই অপরূপ অরূপের পীড়নই তাঁকে শিল্পের পথ ধরিয়েছে, তাঁকে রঙ ও রেখায় চিরস্থায়ী বন্ধনে আবদ্ধ করবার মন্ত্রণা জুগিয়েছে।

একেই তিনি আবিষ্কার করেছিলেন জোড়াসাঁকোর বাড়ীর দক্ষিণের বারান্দায়। এই দক্ষিণের বারান্দাই তাঁর শিল্পের সাধন-ক্ষেত্র। যাকে তিনি মর্ত-সৌন্দর্যের বিদ্যুৎ-স্পর্শে নিজের মর্মে অনুভব করেছিলেন, তাকেই বোধহয় তিনি মনের বাইরে রূপময় মূর্তিতে খুঁজতে গিয়েছিলেন। এবং সে খোঁজার যা স্বাভাবিক পরিণতি তাই ঘটেছিল। তাকে তিনি মর্তলোকের অনুপম রূপের মধ্যেও খুঁজে পাননি। খুঁজে পাওয়া যায় না বলেই পাননি। বাইরে খুঁজে-না-পাওয়া সেই রূপকেই আবার রঙ ও রেখার মধ্যে সন্ধান করেছেন, সন্ধান করে পেয়েছেন তাকে। পেয়ে নিজে পরিতৃপ্ত শুধু নয়, ধন্য হয়েছেন। আমরাও তা আস্বাদন করে ধন্য হয়েছি। তাকে তিনি খুঁজে পেয়েছেন দক্ষিণের বারান্দায়।

এই দক্ষিণের বারান্দাই গগনেন্দ্রনাথের সাধনার সিদ্ধিভূমি এবং তাঁকে বুঝবার চাবিকাঠি। সমগ্র চেতনা দিয়ে যাকে সন্ধান করেছেন, তাকে রঙ ও রেখার যাদুবন্ধনে আবদ্ধ করেছেন তিনি এই দক্ষিণের বারান্দায়। শুধু গগনেন্দ্রনাথ নন, যিনিই কোন না সন্ধানে সিদ্ধ হয়েছেন, তিনি নিজের 'দক্ষিণের বারান্দাকে' আবিষ্কার করতে পেরেছেন। সব সিদ্ধ শিল্পীরই একটি করে 'দক্ষিণের বারান্দা' থাকে। গগনেন্দ্র-নাথকে তাঁর দক্ষিণের বারান্দায় দাঁড়িয়েই আমাদের বুঝতে হবে।

গগনেন্দ্রনাথের জীবনে দক্ষিণের বারান্দার আক্ষরিক অর্থ ধরলে প্রথমেই আজকের মানুষের মনে একটি বিচিত্র দৃশ্য ভেসে উঠবে। সুপরিসর দক্ষিণের বারান্দার বড় বড় এক এক জানলার সামনে এক একখানি ইজিচেয়ার পাতা। অন্তত তিনখানি আসন। তিনখানা আসনের একখানায় অবনীন্দ্রনাথ, একখানায় সমরেন্দ্রনাথ এবং অন্যখানায় গগনেন্দ্রনাথ বসে ছবি আঁকছেন। এই দক্ষিণের বারান্দার আরও একজন অংশীদার ছিলেন। আক্ষরিক অর্থে না হলেও দক্ষিণের বারান্দায় তাঁরও স্থায়ী জায়গা ছিল। তিনি শিল্পী সুনয়নী দেবী। এই তিন শিল্পী-ভ্রাতার শিল্পী ভগ্নী।

এই দক্ষিণের বারান্দায় তাঁরা ছবি আঁকতেন, আলাপ-আলোচনা করতেন, আবার অতিথিদের সৎকার করতেন, আবার বিষয়-কর্ম পরিচালনা, তাও এখানেই ঘটত।

এইখানে আমরা এক বিচিত্র কাহিনীর মধ্যে প্রবেশ করতে যাচ্ছি। আমরা, যারা আজ সত্তর বৎসরে পা দিয়েছি, তাদের কাছে শৈশব থেকে পঞ্চাশ বছর বয়স পর্যন্ত গগনেন্দ্রনাথ একটি অতি উজ্জ্বল অস্তিত্ব। আমাদের বয়স যখন পাঁচ-সাত বছর, তখন গগনেন্দ্রনাথ শিল্পক্ষেত্রে প্রবেশ করেছেন এবং প্রায় পঞ্চাশ বছর ধরে নব নব সৌন্দর্যকে নিজের শিল্পসাধনার মধ্যে রঙ ও রেখার চিরস্থায়ী বন্ধনে আবদ্ধ করে সাধনা সমাপ্ত করেছেন। কাজেই তাঁর চলমান শিল্পসাধনার সুষমায় আমাদের জীবনের একটি দীর্ঘকাল যে প্রতিদিন কিছু পরিমাণে নিয়মিত রঞ্জিত হয়েছে—এ সত্যকে আজ অকৃত্রিম শ্রদ্ধা ও কৃতজ্ঞতার সঙ্গে স্মরণ করি।

এ কথা সত্যই বিস্ময়কর যে, গগনেন্দ্র-নাথ, তাঁর যখন আটত্রিশ বছর বয়স, তখন শিল্পীরূপে আত্মপ্রকাশ করেন। ১৯০৫ সালের আগে তাঁর আঁকা কোন ছবির হদিশ মেলে না। ভাবতে আশ্চর্য লাগে যে, গগনেন্দ্র-নাথের মত শিল্পী এতদিন চুপ করে ছিলেন কি করে? এত পরিণত বয়সে তিনি তুলি ধরেছিলেন কেন? অথচ যে পরিবেশে তাঁর জন্ম, সেখানে তো উৎসাহ ছিল অফুরন্ত, প্রেরণার প্রবাহ ছিল অতি প্রবল। তিনি তুলি ধরার বহু পূর্বেই রবীন্দ্রনাথের কবি-খ্যাতি মহাসমারোহে সুপ্রতিষ্ঠিত; ইতি-মধ্যেই কনিষ্ঠ অবনীন্দ্রনাথের নেতৃত্বে ভারতীয় চিত্রশিল্পের নবীন প্রকাশ তখন নিত্য নব রূপান্তর লাভ করে মহাসমারোহে সমাদৃত। তখনও গগনেন্দ্রনাথ চুপ করে ছিলেন কি করে?

এর জন্য তাঁর ব্যক্তিগত জীবনের কটি মোটা রেখার উপর পিছন ফিরে তাকাতে হবে। পিতা গুণেন্দ্রনাথের তিনি জ্যেষ্ঠ পুত্র। তাঁর যখন চৌদ্দ বছর বয়স, তখন তাঁর পিতৃবিয়োগ হয়। পিতার মৃত্যুতে সংসার ও সম্পত্তি দেখাশোনার দায়িত্ব তাঁর উপর এসে না পড়লেও পিতৃহীন সংসারের জ্যেষ্ঠ পুত্র হিসেবে কিছু দায়দায়িত্বের আঁচ অন্তত তাঁর মনে লেগেছিল নিশ্চয়ই। সংসারের অন্তরালে কল্যাণময়ী মহাপ্রকৃতির মত মা ছিলেন। তিনিই মানুষ করেছিলেন ছেলেকে; যোগ্য-ভাবেই মানুষ করে তুলেছিলেন। ১৮৯৬ সালে, তাঁর বয়স যখন উনত্রিশ বছর, তখন সম্পত্তি বণ্টনের ফলে সংসারের খানিকটা দায় পরোক্ষভাবে এসে পড়েছিল তাঁর উপর। সে দায়িত্ব তিনি যোগ্যতার সঙ্গেই পালন করেছিলেন। প্রিন্স দ্বারকানাথের প্রপৌত্রের যেমন যোগ্যতা ও মর্যাদার সঙ্গে সে দায়িত্ব পালন করা উচিত তাই তিনি করেছিলেন।

পরিবারের জ্যেষ্ঠ হিসেবে পারিবারিক দায়িত্ব পালনের সঙ্গে, প্রিন্স দ্বারকানাথের প্রপৌত্রের উপযুক্ত উদারতার সঙ্গে আন্তরিক হৃদয়বত্তা যোগ করে বন্ধুবান্ধব, আত্মীয়-

স্বজনকে আদর করেছেন, অতিথি-অভ্যাগতকে আপ্যায়ন করেছেন, জীবনের প্রতিটি ক্ষেত্রে স্বদেশিকতা ও সংস্কৃতির স্বাভাবিক ধারাটি প্রবাহিত করে পারিপার্শ্বিক সবকিছুকে নতুন অর্থ ও নতুন মূল্যদান করেছেন। অনুশীলন দলের সন্ত্রাসবাদী গুপ্ত আন্দোলনের সঙ্গে যুক্ত হয়েছেন. বাড়ীর বিলাতী আসবাব বদল করে তার জায়গায় নতুন দেশী আসবাব সযত্নে আবিষ্কার ও সৃষ্টি করে গৃহের নতুন সজ্জা রচনা করেছেন। অভিনয়ে তাঁর প্রবল আগ্রহ ও আসক্তি ছিল। নাট্যমঞ্চকে নুতন দেশীয় সজ্জায় সজ্জিত করেছেন। রাজার রূপ, রাজার মেজাজ ও রাজার চরিত্র নিয়ে তিনি জন্মেছিলেন, তাই নাটকে রাজার ভূমিকা থাকলে তা স্বাভাবিকভাবেই তাঁর জন্য নির্দিষ্ট হত।

এরই ফাঁকে ফাঁকে দক্ষিণের বারান্দায় বসে এইসব কাজ করতে করতে দেখেছেন, পাশেই আর একখানি ইজিচেয়ারে বসে নবীন ভারতীয় শিল্পের পুরোধা কনিষ্ঠ সহোদর অবনীন্দ্রনাথ ছবি এঁকে চলেছেন। আশ্চর্য, তখনও মানুষটি তুলি না ধরে-ছিলেন কি করে?

আজ কল্পনা করতে পারি, পাশেই সংসার-ভোলা, দৃষ্টি-পাওয়া মানুষটির ছবি আঁকা ও নব নব রূপসৃষ্টি করা দেখে তৎকালীন বহুতর ভিন্ন আকর্ষণে আবদ্ধ এই মানুষটির অন্তরে রূপসৃষ্টির বেদনা ঘন হয়ে উঠেছে ক্ষণে ক্ষণে। কিন্তু যেভাবেই হোক, তাকে প্রকাশ করার সুযোগ তখন ঘটেনি। তবে মনে হয় তিনি তার দীর্ঘশ্বাসও ফেলেননি বা সৃষ্টির বাসনাবহ্নিকে নিভেও যেতে দেননি। তাকে হৃদয়ে পবিত্র হোম-বহ্নির মত গোপনে ধারণ করে রেখেছিলেন।

তাঁর চরিত্রে যে এই বহ্নি লোকদৃষ্টির অগোচরে বরাবর প্রস্থায়ী ছিল, তার একটি ছোট্ট প্রমাণ আছে। জোড়াসাঁকোর একজন ইস্কুল-পালানো ছাত্রের সংবাদ আমরা জানি, যিনি বারে বারে ইস্কুলে গিয়েও বাঁধা নিয়মে নিজেকে আটকে রাখতে না পেরে ইস্কুল ছেড়ে পালিয়ে এসেছিলেন। গগনেন্দ্রনাথও এদিকে তাঁর বিখ্যাত পিতৃব্যের অনুগামী। তাঁকেও ইস্কুলে পাঠানো হয়েছিল। সেন্ট জেভিয়ার্স স্কুলে সামান্য কিছুকাল গিয়ে খানিকটা ড্রইং ও ছবি আঁকা শিখে অবশেষে পড়েই ইস্কুল ছেড়ে চলে এসেছিলেন। আর সে পথ মাড়াননি। তাঁর সৌন্দর্যস্ফূর্তি ও রূপ-সৃষ্টির অদম্য ইচ্ছা যে আকুল কামনা হয়ে তাঁর মনকে অধিকার করলো ঘোড়ার মত আপনার নিজস্ব পথে ছুটিয়ে নিয়ে যেত, ইস্কুলের ধরা-বাঁধা শিক্ষা ও শাসনের অস্বস্তিকর লাগাম তার মুখে তিনি কিছুতেই তুলে দিতে পারেননি। এই দুর্দমনীয় ইচ্ছাকে বরাবর তিনি অতি সামাজিক, উদার, স্বভাব-ভদ্র প্রাত্যহিক ব্যবহারের অন্তরালে রক্ষা করে এসেছেন। নিজের স্বভাবের তুলি ও রঙের পথ ছাড়িয়ে দিয়েছে অবসর করেছে।

কি-করে তা সম্ভব হয়েছিল? আদৌ তা সম্ভব কি? এর উত্তরও তাঁর জীবনের সামান্য-জানা কথার মধ্যে নিহিত আছে। গগনেন্দ্রনাথ স্বাভাবিকভাবেই নাটকের প্রতিটি রাজার ভূমিকায় অভিনয় করতেন। চরিত্র-মহিমায় তিনি স্বভাবতই ছিলেন রাজকীয়। তাঁর জীবনের সুপরিসর পরিচ্ছন্ন ক্ষেত্রে সিস্টার নিবেদিতা, জাস্টিস উড্রফ, কাউন্ট জুরেলার, লর্ড কারমাইকেল, কাউন্ট কেসরলিং, গোলোবিউ, আন্দ্রি কারপেলেস, লিজডী লেডী, এ্যানা পাভলোভা, আনন্দ কুমারস্বামীর মত বৃহৎ মানুষেরা নিয়মিত চলাফেরা করেছেন, তাঁর বৃহৎ হৃদয়ের প্রীতির উত্তাপ লাভ করে পরিতৃপ্ত হয়েছেন এবং তাঁর রাজকীয় মহিমাকে সাধুবাদ জানিয়েছেন। মারকুইস অব জেটল্যান্ড তাঁর সম্পর্কে লিখেছেন : এক অসাধারণ পরি-শীলিত সাংস্কৃতিক পরিবেশের মধ্যে যে তাঁর সমগ্র জীবন অতিবাহিত হয়েছে তা সব সময়েই বুঝতে পারা যেত তাঁর চরিত্রের এক নিঃশব্দ মহিমা থেকে। উপবিষ্ট বুদ্ধের মূর্তি যেমন এক মহৎ শান্তি বিকীরিত করে, তাঁর সান্নিধ্যে এসে সেই ধরনের কিছুকে সব সময় অনুভব করছি। তথু তাঁর চরিত্রে আবার এক ধরনের জীবন্ত তীব্রতা ছিল যাতে ভিন্ন জীবনযাত্রায় অভ্যস্ত ভিন্ন জাতির মানুষ পরস্পরের সান্নিধ্য এসে যে ধরনের বাধাবন্ধ অনুভব করে তাঁর সান্নিধ্যে

সে ধরনের কোন সংকীর্ণ গণ্ডীকে কখনও অনুভব করেনি।

গগনেন্দ্রনাথের চরিত্রের এই দ্বৈত মূর্তির কথা থেকেই তাঁকে স্পষ্ট অনুমান করা যাবে। যেখানে তিনি সামাজিক মানুষ, সেখানে অমনি এক মহিমান্বিত শান্তিতে তাঁর জীবনের প্রশস্ত পরিসরে যেসব মানুষ এসেছেন তাঁদের আসন দিয়েছেন। আবার অন্যদিকে যেখানে তিনি রূপস্রষ্টা সেখানে তিনি সদা অশান্ত, এক তীব্র আকুলতায় আকুল।

তাঁর জীবনের সঙ্গে আমাদের প্রথম পরিচয়ের অবসান ঘটেছে, কিন্তু দ্বিতীয় পরিচয় আমাদের জন্য অপেক্ষা করছে। সে পরিচয় রূপসন্ধানী ও শিল্পস্রষ্টা গগনেন্দ্রনাথের পরিচয়।

আমি কালক্রম অনুসারে, ঐতিহাসিকভাবে তাঁর শিল্প-সৃষ্টির কথা ভাবিনি। সমগ্রভাবে তাঁর শিল্প সম্পর্কে যা মনে হয়েছে তাই বলছি। তাঁর শিল্প-সাধনা যেন রূপের এক-একটি পর্দাকে উন্মোচিত করে এক-একটি স্তরে গিয়ে পৌঁচেছে। এখানে বিশেষ উল্লেখযোগ্য যে পরিণত বয়সে যখন তিনি প্রথম তুলি ধরলেন তার পূর্বেই রূপের বিভিন্ন স্তরে তাঁর মানস-পরিভ্রমণ তিনি প্রায় সম্পূর্ণ করেই রেখেছিলেন। মন যখন যেমন চেয়েছে, রূপলোকে মানসযাত্রার বিভিন্ন স্মৃতিকে তিনি তেমনি রূপ ও রেখায় বন্দী করেছেন। তাই তাঁর শিল্পকর্মে বিভিন্ন পর্যায়ের ও চরিত্রের শিল্প থাকলেও তারা কোন নির্দিষ্ট, ধরা-বাঁধা কালের পর্যায়ে দফায় দফায় আত্মপ্রকাশ করেনি। আবার অন্যদিকে তিনি ইণ্ডিয়ান সোসাইটি অব ওরিয়েণ্টাল আর্ট-এর অন্যতম প্রধান উদ্যোক্তা ও প্রতিষ্ঠাতা হলেও তিনি নিজের শিল্পকর্মে শুধুমাত্র বিশুদ্ধ ভারতীয় শিল্পপদ্ধতির ধারাকেই অনুসরণ করেননি। রূপের আস্বাদনের ক্ষেত্রে তাঁর মানসভ্রমণ যত ব্যাপক, শিল্পরীতির বহু বিচিত্র ক্ষেত্রে তাঁর বিচরণ তেমনি অবাধ, বিভিন্ন পদ্ধতির মধ্য থেকে তাঁর নিজের রুচিমত গ্রহণ ও আত্মসাৎ করবার শক্তিও তত প্রবল। এই কারণেই তাঁর শিল্পকর্মে দেশী-বিদেশী নানান শিল্প-পদ্ধতির স্পর্শ ও ইঙ্গিত যত ব্যাপক এমনটি খুব কম শিল্পস্রষ্টার ক্ষেত্রেই লক্ষ্য করা যায়। দেশী হোক বিদেশী হোক, যে-কোন শিল্প-পদ্ধতির বিশিষ্টতা ও উৎকর্ষ তাঁর উদার শিল্পদৃষ্টিকে একান্ত সহজে আকৃষ্ট করত এবং তার থেকে তাঁর সৃষ্টিশক্তি ও প্রতিভা নিজের রুচিমত তাকে গ্রহণ করতে পারত।

১৯০৫ সালে শিল্পী হিসেবে তাঁর প্রথম আবির্ভাব। এই সময়েই ১৯০৬-৭ সালে তিনি আদালত থেকে স্পেশাল জুরী হিসেবে আহ্বান পেতেন। আইনের নানা কূট তর্ক, জেরা ও বক্তৃতার অবকাশে তিনি বিচারক, জুরী, উকিল-ব্যারিস্টার, মুহুরী, পেশকার ও আসামীদের দেখেছেন আর তাঁর শিল্পী-মন সজাগ হয়ে উঠে তাদের ছবি চিরকালের জন্য কালির টানে সাদা কাগজের বুকে উজ্জ্বল করে রেখেছে। এখানে আরম্ভ। এইখানেই তিনি দৃশ্যমান পৃথিবীর খণ্ড খণ্ড রূপকে তাদের প্রত্যক্ষ মূর্তিতে কখনও বা স্কেচে কখনও বা কার্টুনে ধরে রেখেছেন। দৃশ্যমান প্রত্যক্ষ পৃথিবীর খণ্ড রূপের শিল্পী হিসেবেই যেন তাঁর শিল্পী-জীবনের প্রথম পট উত্তোলিত হল। আবার সেই প্রত্যক্ষ দর্শনের সঙ্গে যেমনি একটু কৌতুক, একটু শ্লেষের সংমিশ্রণ হল, অমনি তারা রূপান্তরিত হল কার্টুনে। তিনি সেখানে খণ্ড জীবনের প্রত্যক্ষ মূর্তিগুলিকে স্কেচে রূপ দিয়েছেন সেখানে সব ক্ষেত্রেই প্রথম লক্ষণীয় বৈশিষ্ট্য হল তাদের কোমল সৌন্দর্য। তাদের যে বিশিষ্টতা তা যেমন অতি স্পষ্টভাবে সেখানে ধরা পড়েছে, তেমনি তারই সঙ্গে যেন কোন্ এক আশ্চর্য অলৌকিক কোমলতার মায়াজাল তাদের সর্বাঙ্গ জড়িয়ে আছে। প্রসঙ্গত এখানে সেই আশ্চর্য কাকটির উল্লেখ করছি। সেই কাকটি যদি বাস্তবে পাওয়া যেত তাহলে যে কোন রসিক ব্যক্তি তার প্রিয়তম কাকাতুয়াকে উপেক্ষা করে সেই কাকটিকে সোনার দাঁড়ে বসিয়ে অবিরাম তার দিকে অপলক দৃষ্টিতে চেয়ে থাকতেন।

এর পরের পর্যায়ে যেন মর্তলোকের প্রত্যক্ষ মূর্তি একটু সরে গেল, অথবা তিনিই একটু দূরে দাঁড়ালেন। প্রকৃতি, দূরের সংসার, দূর কাল যেন তাদের সুন্দরতর শোভা নিয়ে শিল্পীকে বার বার সংকেত জানাল। তিনি তাদের ধরে রাখলেন জীবন-স্মৃতির চিত্রাবলীতে, পল্লী বাঙলার চিত্রাবলীতে, রাঁচী ও পুরীর ছবিগুলিতে, হিমালয় ও চৈতন্য সিরিজের চিত্রাবলীতে। এখানে বাইরের প্রকৃতি তার অগাধ ও অনন্ত সৌন্দর্যের ঝাঁপি যেন তাঁর কাছে অসংশয়ে উন্মোচিত করেছে। মানুষ ও প্রকৃতি, স্থাবর ও জঙ্গম দুই যেন এক বিশাল সৌন্দর্যের অংশ হিসেবে একই দৃশ্যপটে মিলে মিশে একীভূত হয়ে গিয়ে এক পূর্ণরূপক আস্বাদনের ইঙ্গিত দিচ্ছে। এই প্রসঙ্গে 'পদ্মা' ছবিটির কথা বার বার মনে পড়ছে। দিগন্ত-বিস্তার বালি আর জল তার উপরে বিশাল অসীম আকাশ। আকাশের কোলে দিগন্ত-বিস্তার বাড়ীঘর সারি আর মহিমান্বিত সন্ধ্যা-সমাগমের পূর্বে বালি আর জলের সঙ্গমস্থলে স্থির বোট পদ্মা। চলমান ও স্থির সকলে মিলে যেন অসীম নিস্তব্ধতা ও মহৎ বিশালতাকে চিরকালের জন্য এখানে ধরে রাখা হয়েছে। যে স্থির হয়েও চলমান, চলমান হয়েও এই পূর্ণতাকে যে বিন্দুমাত্র বিঘ্নিত করে না, সেই পরিপূর্ণ যেন এখানে ধ্যানাসনে উপবিষ্ট। এ তো মাত্র একখানির কথা। সমস্ত ছবিতেই যেন প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে এই কথাটিই ফুটে উঠতে চেয়েছে। এখানে যেন অনেক মহিমা, অনেক পবিত্রতা, অনেক বৈরাগ্য এক নির্জন স্তব্ধতায় কখনও বিষণ্ণ, কখনও প্রসন্নভঙ্গিতে স্তব্ধ হয়ে আছে এক গম্ভীর, কোমল সৌন্দর্যের আধারে।

রূপের আরও এক পর্দা যেন উন্মোচিত হল। এখানে রূপ যেন গলে গিয়ে, ভেঙে গিয়ে অরূপের মধ্যে একাকার হয়ে যেতে চাইছে। এ জগৎ আমাদের জানা জগৎ নয়; এমন কি ঠিক কল্পনার জগৎও নয়। এ যেন এক স্বপ্নের জগৎ। এ বাস্তব জগৎ নয়, আবার অবাস্তবও নয়। অবাস্তব এখানে বাস্তব হয়ে উঠেছে। কেবল সে এক অবাস্তবের রঙ মেখে ও রূপ ধরে রয়েছে যেন। এ আমাদের শেষতম কামনার জগৎ, যা আমাদের সব স্বপ্নকে মূর্তিমন্ত করেছে। এ সেই রাজ্য যেখানে আমাদের সব সন্ধানের সমাপ্তি ঘটে। কোন্ বালককালে রাজার বাড়ী খোঁজার যে সাধ মনে বাসা বাঁধে সেই সন্ধান ও সেই সাধ ও সন্ধান মেটে এখানে এলে। শিল্পী হিসেবে গগনেন্দ্রনাথের শক্তির চরম উৎকর্ষ এখানকার প্রতিটি পদক্ষেপে। পূর্ণ অরূপ এখানে রেখায় রেখায় রঙ বেরঙের আধো-রূপে, আধো অরূপে এখানে রূপময়।

দক্ষিণের বারান্দায় বসে যার সন্ধান আরম্ভ হয়েছিল সেই সন্ধান দক্ষিণের বারান্দা থেকে দক্ষিণের বাগান, সেখান থেকে আরও অনেক চেনা মুখ দেখে আরও এগিয়ে গেল। দূরের সে ইতিহাসের দূরকালে, ভূগোলের দূরালোকে, পল্লী-বাঙলার আনাচে-কানাচে, পদ্মার চরে, রাঁচীতে, পুরীতে, হিমালয়ের কোলে কোলে। কত কাল, কত বছর ধরে তার সন্ধান চলল। তারপর মর্তলোকের সীমা ছাড়িয়ে আকাশ যেখানে পৃথিবীর মুখে মুখ রাখি রাখি করে সেইখানে সেই রাজার বাড়ীর সন্ধান মিলল। দক্ষিণের বারান্দা থেকে আকাশলোক পর্যন্ত সবটা একরূপের মালার মাল্যবন্ধনে বাঁধা পড়ে গেল।

সকলেই আপন আপন জীবনে আপনার দক্ষিণের বারান্দাকে খুঁজে পাবার চেষ্টা করে। কেউ যদি পায়ের তলায় স্থির ভূমি পেয়ে যায় তাহলে সেই দক্ষিণের বারান্দায় থেকে শ্রদ্ধা প্রেম ও অনুভবের একখানি পুষ্পমাল্য দিয়ে ওই দক্ষিণের বারান্দা যুক্ত করে দেয়। সেই দক্ষিণের বারান্দায় থেকে যে বহুরূপের মালা প্রত্যহের মর্ত্য লোক থেকে চিরকালের আকাশলোক পর্যন্ত বিস্তৃত, তার সুরভি, বর্ণ ও সুষমা আজও অম্লান। নির্মাক অনন্ত তাকে আপন অতুল উত্তরীয়ের মত ধারণ করে রাখেন।

প্রয়োজনের তাগিদে কৃষকদের ছোট্ট একটি দল ঢুকেছিল পার্শ্ববর্তী জঙ্গলে খুঁটির উপযোগী গাছের সন্ধানে। ঘুরতে ঘুরতে একটু বেশী ভিতরেই গিয়েছিল তারা। দু'চারটি গাছের গোড়ায় সবে কুড়ুলের কোপ পড়েছে আর যায় কোথা? মনে হোল যেন বনের ভিতর দিক থেকে ঝড় আসছে। সঙ্গে সঙ্গে ফোঁস ফোঁসানীর শব্দ। বিস্ময় বিস্ফারিত চোখে কৃষকরা দেখে ঠিক যেন সাক্ষাৎ মৃত্যু শিং বাগিয়ে তেড়ে আসছে। অতি কষ্টে প্রাণ নিয়ে ফিরে ছিল তারা। এই বুনো জানোয়ারদের হাত থেকে তাদের সারা বছরের ধান রক্ষা করা অসম্ভব হবে ভেবে তারা দুশ্চিন্তা-গ্রস্ত হয়ে পড়েছিল। ফলে সারা বছর সপরিবারে অনাহার অনিবার্য।

খবরটা সরকারী ও বেসরকারী মহলে যে জানাজানি হয়নি এমনও নয়। কিন্তু কোন স্থানীয় শিকারীর সাহসে কুলোয়নি। একটা দুটো জানোয়ার তো নয়, বেশ কয়েক ডজনের বিরাট দল। ফাঁকা মাঠ—মাচান করে বসা যেতে পারে। কিন্তু গুলী ব্যর্থ হলে অসীম শক্তিশালী দলবদ্ধ মোষের পালের আক্রমণে মাচান ধূলিসাৎ হওয়াও অসম্ভব নয়। কাজেই উদ্যোগী শিকারীর বুকে সাহস ও লক্ষ্যভেদে স্বীয় হাতের উপর অগাধ বিশ্বাস থাকা দরকার। তখন বৃটিশ আমল। উপযুক্ত আগ্নেয়াস্ত্রের অধিকারী হয়েও সাহেব শিকারীদের সাহসে কুলোয়নি এই যূথবদ্ধ বুনো মোষের মোকাবিলা করতে।

যশোহর জেলার জঙ্গলবাদাল গ্রামের বিখ্যাত শিকারী শ্রীকালীপদ নাথের ডাক পড়েছিল এই দুঃসাহসিক শিকার অভিযানে।

নির্দিষ্ট স্থানে যখন শিকারীরা গিয়ে পৌঁছলেন বেলা প্রায় তখন পড়ে এসেছে। থানার দারোগা ও মহকুমার কয়েকজন ঊর্ধ্বতম সরকারী অফিসার এসে উপস্থিত হয়েছেন। দরিদ্র কৃষকরাও এসেছে সদলবলে। অসহায় তারা চোখের জলে তাদের সর্বনাশের বর্ণনা দিল। প্রশ্ন করে জানা গেল—দলের মোষগুলি বেশ বৃহদাকার ও অত্যন্ত বেপরোয়া।

বেলা পড়ে এসেছে। আজই শিকারের উদ্যোগ নিতে হলে সন্ধ্যার অন্ধকার ঘনিয়ে আসবার পূর্বে মাত্র দেড় দুঘন্টা সময় হাতে আছে। জানোয়ারের বিচরণক্ষেত্র সতর্কতার সহিত পর্যবেক্ষণ না করে বিপজ্জনক কোন শিকারের উদ্যোগ নেওয়া উচিত নয়। তাই কয়েকজন কৃষক ও ইংরেজ শিকারীদের সঙ্গে নিয়ে কালীপদবাবু অবিলম্বে বেরিয়ে গেলেন পর্যবেক্ষণে।

দীর্ঘ বিস্তৃত ধানক্ষেত। নরম মাটির বুকে শক্ত খুরের চাপে দুর্দ্ধর্ষ মোষের দল যে চলাচলের চিহ্ন এঁকে দিয়ে গিয়েছে সতর্ক বিশ্লেষণে শিকারীরা তা থেকে বুঝে নেবার চেষ্টা করছেন তাদের গতিপ্রকৃতি। জঙ্গলের দিক থেকে নেমে এসে আধ-পাকা ধানের তারা প্রচুর ক্ষতি করেছে। প্রতি রাত্রে ইতঃস্তত দাপাদাপি ও গড়াগড়ির ফলেও প্রচুর ধান মাটিতে ধুলো কাদায় মিশে গিয়েছে। এবার ধানের ফলন ভালই হয়েছিল। কাজেই ক্ষতির দরুণ কৃষকদের মনোকষ্ট উপলব্ধি করতে গ্রাম-বাংলার মানুষ কালীপদ নাথের অসুবিধা হোল না। ফলে প্রতিকারের জেদও তাঁর মনে দৃঢ়তর হোল।

নরম মাটিতে মোষের খুরের দাগ এত বড় যে দেখে মনে হোল যেন গুজরাটী হাতির পায়ের দাগ। কৃষকদের রিপোর্টে জানা গেল যে প্রথমে পালের গোদা দু' একটি জানোয়ার ফোঁস ফোঁস এবং ভাঙা গলায় কর্কশ স্বরে শব্দ করতে করতে ধান ক্ষেতে এসে নামে, গড়াগড়ি যায়, খুর ও শিঙের ঘায়ে মাটি ছিটায়। তারপর ধান ক্ষেত চষে বেড়ায়। এদের পেছনে পেছনে অল্প সময়ের মধ্যে বয়ার (বুনো মোষের দল) নামে। তাদেরও প্রারম্ভিক কার্যক্রম একই প্রকারের। পরে শুরু হয় তাদের দলবদ্ধভাবে শস্য-ধ্বংসকারী বীভৎস কর্মকান্ড।

বুনো মোষ অত্যন্ত পরাক্রমশালী ও প্রতিহিংসাপরায়ণ। সব সময় ঘুরে বেড়ায়। কোথাও উত্তেজিত হলে একই সঙ্গে আক্রমণ করে। আক্রমণমুখী বুনো মোষের হাত থেকে রক্ষা পাবার জন্য গাছে উঠলেও শুনেছি এরা দীর্ঘ সময় ধৈর্যের সঙ্গে নীচে অপেক্ষা করে শত্রুর উপর প্রতিহিংসা চরিতার্থ করবার আশায়। এদের শিঙের গুঁতোয় বা পায়ের তলায় পিষ্ট হয়ে কৌশলী শিকারীর মৃত্যু হয়েছে এরূপ ঘটনাও বিরল নয়।

বিশ্ববিখ্যাত শিকারী মিঃ হান্টারের মতে আফ্রিকার অরণ্যে পাঁচটি বিপজ্জনক শিকার-প্রাণীর মধ্যে বন্য-মোষিষও একটি। আসাম, উড়িষ্যা, মধ্যপ্রদেশ ও দক্ষিণ ভারতের বিভিন্ন অরণ্যাঞ্চলে এদের প্রাদুর্ভাব দেখা যায়। অতীতে সুন্দরবনের মূল জঙ্গলেও এদের অস্তিত্ব ছিল বলে শোনা যায়। শেষের দিকে সুন্দরবনের লুপ্তপ্রায় বুনো মোষের কিছুসংখ্যক যে বরিশাল জেলার দক্ষিণা-ঞ্চলের জঙ্গলে গিয়ে আশ্রয় নিয়েছিল বিভিন্ন

ব্যক্তিদের কাছ থেকে যে খবর জানা গেছে, এবং কালীপদ নাথের আলোচ্য শিকার-ঘটনাতেও তা প্রমাণিত হচ্ছে।

বুনো মোষ এমনই শক্তিশালী ও দুর্ধর্ষ প্রাণী যে দল থেকে বিচ্ছিন্ন একাকী বিচরণ-শীল ছাড়া এদের নিকট বাঘ বা সিংহ পর্যন্ত ঘেঁষতে সাহস পায় না। ২৪-পরগণা জেলার দক্ষিণে আবাদী অঞ্চলে মেছো-ভেড়ীর মালিক আমার এক বন্ধুর একটি গৃহপালিত মোষের শিঙের গুঁতোয় একটি সুন্দরবনের বাঘকেও এলাকা ছাড়া হতে হয়েছিল।

কিন্তু, বিশেষ করে এক্ষেত্রে ফাঁকা মাঠের মধ্যে মাটিতে দাঁড়িয়ে অতগুলি বুনো মোষের একটি দলের মহড়া নেওয়ার সাহস দেখান যে চরম নির্বুদ্ধিতা হবে একথা বুঝে নিতে বিচক্ষণ শিকারী কালীপদ নাথের বিন্দুমাত্র দেরী হোল না। মাঠের মধ্যে কোন গাছ নেই। আজ শিকারে বসলে মাচা বাঁধারও সময় নেই। পর্যবেক্ষণে এই দুর্দান্ত প্রাণীগুলির যে বৃহদাকার খুরের দাগ ও নষ্টামির চিহ্ন চোখে পড়েছে তাতে পাংশুমুখে সাহেব শিকারীরা প্রস্তাব দিলেন—আজ মোটরলঞ্চে ফিরে যাওয়াই বিধেয়। মোষগুলি চরতে চরতে যদি পাল্লার মধ্যে এসে যায়, টর্চ ফেলে লঞ্চের আপার ডেক্ থেকেই গুলি করা যাবে।

কালীপদবাবু লক্ষ্য করে দেখলেন—নদী থেকে প্রায় চার পাঁচশত গজ দূরে মাঠের মধ্যে স্বল্প উঁচু একটি টিলামত আছে—তার উপরও ক্ষীণকায়া কিছু ধান গাছ আছে। চট করে শিকারীর মাথায় মতলব খেলে গেল। ঐ টিলাটাইতো শিকারীদের কিছুটা আড়াল দিতে পারে। কথাটা খুলে বলতেই রাইফেলধারী সাহেব শিকারীদের মাথা ঘুরে গেল। "বলে কি? পাগল নাকি"?

সকৌতুকে ওদের মানসিক অবস্থা অনুমান করে নিয়ে কালীপদবাবু সবাইকে লঞ্চে ফিরে যেতে বললেন। একটি দিনও তিনি নষ্ট করতে রাজী নন। একাই টিলার পেছনে ধান গাছের মধ্যে অপেক্ষা করবেন। তাঁর অভিজ্ঞতায় দলে—দুর্ধর্ষ এইসব প্রাণীর ক্ষেত্রে যদি পালের গোদাকে হত্যা করা যায়, তবে সাধারণত অন্যগুলি ভয়ে পালিয়ে যায়। অবশ্য এর ব্যতিক্রম যে কখন কোথাও হয় না—এমনও নয়।

কিন্তু এক্ষেত্রে সুবিধা হচ্ছে—পালের নেতৃদ্বয়ের আবির্ভাব ঘটে সব থেকে প্রথমে। কাজেই প্রথমে দেখাচোটেই যদি দুটিকেই খতম করা যায়, তবে দূরে বনের ভেতরে অপেক্ষারত অন্যান্যরা ভয়ে পালিয়ে যেতে পারে—অন্তত সেটাই বিভিন্ন ক্ষেত্রে দেখা গেছে। সেক্ষেত্রে একমাত্র লাভ এই হবে যে মোষের দলটি এই ধান ক্ষেতে ভবিষ্যতে আর কখনও হয়ত ফিরে আসবে না। এইসব প্রাণীর এইরূপেই ধর্ম। সঙ্গীর রক্ত ঝরেছে যেখানে, সাধারণত সে-স্থানকে এরা সভয়ে এড়িয়ে যায়।

ভীত ও বিহ্বলচিত্তে সাহেব ও অন্যান্যরা ফিরলো লঞ্চের দিকে। ব্রীচেজ ও হান্টিং বুটপরা নির্ভরযোগ্য রাইফেল হাতে দৃঢ়চেতা শিকারী কালীপদ নাথ নির্ভয়ে এগিয়ে চলেছেন নির্দিষ্ট টিলাটির দিকে। ঠিক এই সময় পেছন দিক থেকে একটি নম্র ও চাপা কণ্ঠস্বর ভেসে এলো তাঁর কানে—"সাব"। শিকারী চোখ ফেরালেন। মিলিটারী ড্রেস্ পরা দীর্ঘদেহী একজন অবাঙালী কনেস্টবল কয়েক পা এগিয়ে এসে বুটে বুট ঠুকে মিলিটারী কায়দায় দাঁড়াল। হাতে তার ৩০৩ বোরের মিলিটারী রাইফেল। সসম্ভ্রমে হিন্দিতে সে যা বললে তার বাংলা অর্থ হচ্ছে এই—"সাহেব, দয়া করে আপনার সঙ্গে আমাকে থাকতে দিন। আপনাকে একা ছেড়ে যেতে আমার মন চাইছে না। অমত করবেন না—হুকুম দিন সাহেব"।

ডি, এস, পি যে পাঁচজন রাইফেলধারী আর্মি কনেস্টবল পাঠিয়েছিলেন এ লোকটি তাদেরই একজন। রাওলপিণ্ডির পাঠান—নাম দিলদার খাঁ। কালীপদবাবুর অজ্ঞাতেই সে পর্যবেক্ষক দলের সঙ্গ নিয়েছিল। এ থেকেই অনুমিত হোল লোকটি শিকার-প্রিয়। লোকটির সাহস, দরদী মন ও নৈতিক কর্তব্যজ্ঞানের পরিচয় পেয়ে কালীপদবাবু মুগ্ধ হলেন এবং সস্নেহে তাকে আহবান করলেন। দুজনে গিয়ে টিলার পেছনে ধান গাছের আড়ালে ঘাঁটি নিলেন। নিজেদের দুটি রাইফেল ছাড়া পাঁচ ব্যাটারীর একটি হান্টিং টর্চ সঙ্গে।

শিকারী মাত্রেই জানেন মোষের ঘ্রাণশক্তি কত প্রখর। শিকারী একমুঠো ধুলো উড়িয়ে দেখলেন হাওয়া জঙ্গলের দিক থেকেই বইছে। কাজেই মোষের পক্ষে মানুষের গন্ধ পাওয়া সম্ভব নয়। ধান গাছের আড়াল থেকে সামান্য মাথা উঁচু করলেই জঙ্গল দেখা যায়। শিকারীদের অবস্থানস্থল অপেক্ষাকৃত উঁচুতে থাকায় নীচের লাইনে গুলি করারও সুবিধা হবে।

অপরাহ্ন সূর্য অস্তগামী। জঙ্গলের দিকে ধীরে ধীরে সন্ধ্যার অন্ধকার ঘনিয়ে আসছে। [illegible] উৎসুক দৃষ্টিতে তাঁরা তাকিয়ে [illegible] জঙ্গল-সীমানার দিকে। দিলদার খাঁ কালীপদবাবুর ডান দিকে উপবিষ্ট। ইশারা না করলে সে গুলি করবে না এইরূপই নির্দেশ দেওয়া আছে।

দিনের আলো তখনও যতটা আছে তাতে জঙ্গলের কিছুটা অভ্যন্তরভাগ নজরে আসছে। শিকারী কালীপদ নাথ তাঁর অভ্যস্ত চোখে আবিষ্কার করলেন—ধূসর বর্ণের দুটি বৃহদাকার গতিশীল প্রস্তরখণ্ড যেন গাছের ফাঁকে ফাঁকে ধানক্ষেতের দিকে এগিয়ে আসছে। একরোখা তাদের চলার ভঙ্গী। ফাঁকায় বেরুলে বোঝা গেল—বিশালকায় দুটি বুনো মোষ। লম্বা শিঙওয়ালা বিরাট মাথা—কপালে চুল ঝুলছে। বক্রমুখী শিঙ দুটি মাথা থেকে বেরিয়ে দুদিকে সমান্তরালভাবে বিস্তৃত রয়েছে। ধান ক্ষেতের সীমানায় একটু থমকে দাঁড়াল তারা। নাসারন্ধ্রের ফোঁস ফোঁস শব্দ। হেঁড়ে-গলার গভীর আওয়াজে যেন ঘোষণা করলে তারা—"আমরা এসেছি"।

দেখে মনে হোল—যমের বাহন নয়, যেন যমরাজ স্বয়ং সশরীরে এসে হাজির হয়েছেন। কি ভয়ংকর বিকট চেহারা ওদের। ওরাই যেন ধরিত্রীর অধিকর্তা।

কিছুটা এগিয়ে এসে ধান ক্ষেতে নেমে তারা গড়াগড়ি সুরু করলো। মধ্যে মধ্যে উঠে মাটিতে শিং বসিয়ে দিচ্ছে এবং এক এক ঝটকায় চতুর্দিকে ধুলো কাদা ছিটিয়ে স্বীয় শক্তিমদ মত্ততার পরিচয় দিচ্ছে। শিং শুঁকছে—তাই হয়ত এই গোয়ার্তুমির লক্ষণ। দীর্ঘ-বিস্তৃত শিঙযুক্ত এই নোংরা চেহারার বিশালদেহী জীবগুলিকে দেখলে অতি বড় দুঃসাহসীরও বুকের রক্ত হিম হয়ে যায়।

পশুগুলি তখনও রাইফেলের পাল্লার বাইরে। বিস্ময় বিস্ফারিত শিকারী অপেক্ষারত। এদিকে আঁধার ঘনিয়ে আসছে। আর দেরী হলে প্রথম দিনের প্রচেষ্টা হয়ত ব্যর্থ হয়ে যাবে। যাক—তাতে কিছু এসে যায় না—পরদিন না হয় আবার বসা যাবে। শিকারী হিসাবে কালিপদবাবু অসীম ধৈর্যের অধিকারী।

হঠাৎ কি হোল? পশু দুটি জোর পায়ে দৈত্যের মত সোজা সম্মুখের দিকে এগিয়ে আসছে। দৃষ্টি তাদের শিকারীদের অবস্থান-স্থল টিলার দিকেই নিবদ্ধ। মাঝে মাঝে শিঙেল মাথা ঝাড়া দিচ্ছে আর লম্বা লম্বা কানের ঝাট্‌পটানীর শব্দ হোচ্ছে। ওরা কি শিকারীদের উপস্থিতি টের পেয়েছে? না—তাওতো সম্ভব নয়। কারণ, শিকারীরা টিলার পেছনের ঢালুতে ধান গাছের আড়ালে লুকিয়ে, এবং বাতাসও জানোয়ারদের সহমুখী। তবে? আর চিন্তা করার সময় নেই। গুলিভরা দোনলা শক্তি-শালী রাইফেল শিকারীর হাতে প্রস্তুত। আড় চোখে শিকারী লঞ্চের দিকে তাকালেন। লঞ্চের ক্রু ও সাহেব শিকারীরা সবাই কৌতূহলী চোখে আপার ডেকে দাঁড়িয়ে। এখানে দিলদার খাঁ তাঁর ডান পাশে

রাইফেল বাগিয়ে নিঃশব্দে অপেক্ষারত। দৃষ্টি তার শিকার রাইনে শরীরিকবদ্ধ। উপযুক্ত সহ-শিকারীই বটে।

মোষ দুটি আগু পিছু এগুচ্ছে। শিকারীর পরিকল্পনা ছিল—পশু দুটি অনামনস্কভাবে চরতে চরতে যখন পাল্লার মধ্যে এসে যাবে তখন একটু 'সাইড্ ভিউ' পেলে প্রথম সুযোগেই তিনি প্রথমটির পাঁজড়ে আঘাত করবেন। কিন্তু তাতো হোল না। ওরা নাক বরাবরই এগিয়ে আসছে। পদক্ষেপ অপেক্ষাকৃত দ্রুততর হলেও হাবভাবে ওদের উত্তেজিত বলে মনে হচ্ছে না। কিন্তু এক্ষেত্রে মুস্কিল দাঁড়াচ্ছে এই যে, ঐ অবস্থায় জানোয়ারদের মস্তকের সম্মুখভাগে গুলীর লক্ষ্যস্থল ছোট হলেও ওরা যদি সর্বক্ষণ একইভাবে এগুতে থাকে, তবে আত্মরক্ষার তাগিদে গুলী না ছুড়ে উপায় থাকবে না। কালিপদ নাথ লক্ষ্য ভেদে পারদর্শী। কিন্তু জানোয়ার দুটি প্রতি পদক্ষেপের সঙ্গে সঙ্গে যেভাবে মাথা দোলাচ্ছে তাতে ভয় হচ্ছে ফাঁকা মাঠের বুকে ঘনায়মান অন্ধকারে রাইফেলের প্রথম আঘাতের অপ্রত্যাশিত ব্যর্থতা কোন বিপদ না ঘটিয়ে বসে। মুখ্য শিকারী হিসাবে সংগী দিলদার খাঁর জীবনের দায়ীত্বও এই মুহূর্তে তাঁর উপর বর্তেছে।

কালিপদ নাথ টিলার ঢালুতে দেহের বাম পাশে হেলান দিয়ে শক্ত হয়ে বসে ধীরে ধীরে রাইফেল কাঁধে তুলে নিলেন। একটু খস খস শব্দ হোল এবং আশপাশের ধান গাছের মাথাও হয়ত একটু নড়ে উঠলো। এটুকু সাড়াতেই মোষ দুটি প্রায় একশত গজ দূরে হঠাৎ থমকে দাঁড়িয়ে গেল। আর দেরী নয়। শিকারী রাইফেলের ট্রিগার টানতে উদ্যত। ঠিক সেই সময় নদীর দিকে মোটর লঞ্চের ছাদ থেকে সাহেব শিকারীরা কি জানি কেন হাত নেড়ে চিৎকার করে উঠলেন। হয়ত তাঁরা ভেবেছেন অগ্রসরমান মোষ দুটি কালিপদবাবুর নজরে আসে নি। তাই চিৎকার করে তাঁরা ঐদিকে তাঁর দৃষ্টি আকর্ষণের প্রয়াস পাচ্ছেন। এইরূপ জরুরী পরিস্থিতিতে গুলীবর্ষণে উদ্যত শিকারী ওঁদের চিৎকারে বাধা পেয়ে মনে মনে খুবই বিরক্ত হলেন বটে—কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে চিৎকারে আকৃষ্ট হয়ে মোষ দুটিও লঞ্চের দিকে মুখ করে ঘুরে দাঁড়াল।

কি সৌভাগ্য! সাপে বর হয়েছে। শিকারী যা প্রত্যাশা করেছিলেন তাই পেয়ে গেলেন। বজ্রনির্ঘোষে কালিপদবাবুর হাতের রাইফেল গর্জে উঠলো। সম্মুখের প্রথম মোষটি যেন একটি প্রচণ্ড ঝোড়ো ঝাপটার মত লঞ্চের দিকে রুখে যাবার ব্যর্থ চেষ্টা করে কয়েক পা এগিয়েই ধান ক্ষেতের মধ্যে লুটিয়ে পড়ল। দীর্ঘ শিংযুক্ত বিরাট মাথাটি মাটির ওপর কয়েকবার আঘাত করে স্তব্ধ হয়ে গেল। শক্তিশালী রাইফেলের প্রচণ্ড বিস্ফোরক শক্তিসম্পন্ন বুলেট জানোয়ারটির বাম পাঁজড় ভেদ করে হৃদপিণ্ড বরাবর ভিতরে ঢুকে গেছে।

আচমকা এই পরিস্থিতিতে দ্বিতীয় মোষটি ক্ষণিকের বিহ্বলতায় স্থির হয়ে দাঁড়িয়ে নিহত সঙ্গীর মৃতদেহের দিকে এক নজর দেখে চোখ ফিরিয়ে পুনরায় লঞ্চের দিকে—মাথাটি একবার ঝাড়া দিলে, সম্মুখের পা একবার মাটিতে ঠুকলে। অর্থাৎ শত্রু চেনা হয়ে গিয়েছে—এবার আক্রমণের পূর্ব ইঙ্গিত।

শিকারী টিলার ঢালুতে আধো-শোয়া অবস্থায় থেকে প্রথম গুলী ছুঁড়েছিলেন। ফলে রাইফেলের পিছ-ধাক্কায় পা একটু নীচের দিকে হড়কে গিয়েছিল। হিসাব মতই দ্বিতীয় মোষ কয়েক সেকেণ্ডের জন্য বিহ্বল অবস্থায় দ্বিতীয় গুলীর সুযোগ দিয়েছে। কিন্তু হড়কে যাওয়া পা-টি একটু অন্তত উপরের দিকে টেনে খুঁটি নিতে না পারলে রাইফেলের নিশানা করতে অসুবিধা হচ্ছে। তাই করতে গিয়ে সাবধানতা সত্ত্বেও মৃদু খস খস শব্দ ওদিকে আক্রমণমুখী মোষকে সতর্ক করল এবং সে মাথা ঘুরিয়ে তাকিয়েই রণংদেহী মূর্তিতে সেই দিকে ছুটলো।

এ যেন কালো পাহাড় ছুটে আসছে টিলার দিকে বিধ্বংসী তেজে। দুরন্ত গতিশীল এই জানোয়ারকে রোখা বোধহয় অসম্ভব। আর রক্ষা নেই। তার ঝাপ-দৌড়ের কারণে উপযুক্ত লক্ষ্যস্থলে রাইফেল নিশানাবদ্ধ করা খুবই মুস্কিলের ব্যাপার।

বিপদ যত মারাত্মকই হোক না কেন রণে ভঙ্গ দিয়ে পৃষ্ঠপ্রদর্শন কালিপদ নাথের কুষ্ঠিতে লেখে নি। তিনি চিৎকার করে উঠলেন—"হুঁসিয়ার দিলদার খাঁ, জলদি গোলি চালাও জানোয়ারকা শীরপর।" সঙ্গে সঙ্গে নির্ভীক দিলদার খাঁর রাইফেল গর্জে উঠলো। এদিকে অতি সতর্ক ক্ষিপ্র নিশানায় কালিপদবাবুরও রাইফেলের দ্বিতীয় নল অনল উদ্গীরণ করলো। শব্দ তার ধ্বনিত প্রতিধ্বনিত হোল বনে-প্রান্তরে।

দুই শিকারীর রাইফেলের মোক্ষম আঘাতে রক্তাক্ত মুখমণ্ডল ও গর্দান বিধ্বস্ত অবস্থায় টাল সামলাতে না পেরে বিশাল দেহী যমের দ্বিতীয় বাহনটি হুমড়ী খেয়ে গিয়ে পড়ল ধান ক্ষেতের মধ্যে তার গমন পথের উপরেই। এতদিনকার সব আরণ্যক দর্প তাদের খর্ব হল আজকের সন্ধ্যার এই সম্মুখ যুদ্ধে।

শত্রুর বিনাশ হয়েছে। লঞ্চ থেকে নেমে রাইফেল বাগিয়ে 'কুইক মার্চ' করতে করতে সাহেব শিকারীরা এসে উপস্থিত হলেন। পাট কাঠির মশাল জ্বালিয়ে কৃষকেরা ছুটে এল ধান ক্ষেত আলোকিত করে। তাদের আনন্দ আর ধরে না। করজোড়ে কায়মনবাক্যে তারা ভগবানের নিকট শিকারীর দীর্ঘ জীবন কামনা করলো।

মোষ দুটির শিং-এর দৈর্ঘ্য বক্রপীঠের বাইরের দিক থেকে প্রথমটির চার ফুট ও দ্বিতীয়টির সাড়ে তিন ফুট ছিল। এইরূপ বিশাল আকারের বুনো মোষ এ অঞ্চলে সত্যই বিরল ও বিস্ময়ের বস্তু।

স্মৃতি ॥ মণীন্দ্র রায়

তিনি কি এখন তাঁর পুকুরের পাড়ে, নাকি খেতের ভিতরে
পাসপোর্ট-ভিসা ছাড়া একাকী পথিক?
কতো আঁটি ধান কতো পাটের ওজন, কার ছিপে মাছ ধরে?
মাটি, না আকাশ তাঁর এখন শরিক?

এতো যে হিসাব এই ছিমছাম বুদ্ধিময় মেধা ও মনীষা,
পরতে পরতে এই অভিজ্ঞতা, সবই কি উধাও?
এখনো সিঁদুরে আম, ঢাক-বাজা শারদীয়, চৈতালি সরিষা
মানুষের ঘরে তুমি সাড়া তার পাও!

একি পাতাঝরা শূন্য? হাওয়ায় উড়ন্ত, শেষে মাটি, স্মৃতিহীন?
সে কি সূর্যপান করে রাখেনি অঙ্গার!
হে বৃক্ষ, হে মহাতরু, ফুলে-ফলে বর্ষে বর্ষে নবীন, স্বাধীন।
সে কার নিঃশব্দ চূর্ণ উত্তরাধিকার!

তিনি কি এখানে এই স্তোত্রেরই অক্ষরে, নাকি আমার মজ্জায়?
তিনি কি আমার ছেলে, কিম্বা তারো ছেলে?
অনন্ত-তিমিরে তিনি জ্যোতির্বিন্দু, দৃপ্ত অলঙ্কার
মৃত্যুতে গেলেন দীপ-পরম্পরা জ্বেলে॥

পাঁকে, পদ্মে ॥ চিত্ত ভট্টাচার্য

এই যে জড়িয়ে থাকা
সংলাপে প্রলাপে শত পাকে
গ্রন্থি-পর্ব-কিশলয়-মুকুলের মিলিত গৌরবে
ঘনঘোর মেঘমন্দ্রে
খড়ের পালুই বেয়ে টুপটাপ বৃষ্টির নূপুরে,

কখনও জড়িয়ে থাকা—দেখে
লক্ষ্মীর শিয়রে বসে হৈমন্তীর হাসি
নিকানো উঠোনে তৃপ্ত কুকুরের কুণ্ডলিত দেহ
স্বপ্নের কাজল চোখে দোলনায় দোলা
হাঁটি-হাঁটি-পা-পা শিশু, সামাল সামাল
পুতুল খেলার আয়োজন,

বিকেলে পুকুর ঘাটে যাবার রাস্তায়
[illegible]
নিরিবিলি অবসরে কখনও ব্যস্ত থাকা মেরামতে
সুখদ স্মৃতির ফোঁড়ে প্রপিতামহের প্রিয়
জীর্ণ বালাপোষ,—

এই যে ব্যাপ্ত থাকা
সংসার প্রতিমার চালচিত্র নিয়ে
মশারী খাটিয়ে নিত্য জেগে ওঠা আলোর ফেনায়,

আজ নয় কাল কেউ
পর্যাপ্ত পুষ্পের স্তবক দু হাতে নম্র চোখে
দুয়ারে দাঁড়াবে ভেবে
স্বেদ-অশ্রু নিরন্ত ঝরালো,

এই যে জড়িয়ে থাকা কিছুদিন
পাঁকে-পদ্মে, অনল-অনিলে,
এর চেয়ে নিবিড় পরম
সুগন্ধ কখনো
ছড়ালো না—উদ্যানে আমার।

মহামারীর কবলে

শিশির নিয়োগী

সর্বধর্মের পীঠস্থান এশিয়া, অসুখের রাজা কলেরারও জন্মস্থান। প্রসিদ্ধ লেখক ম্যাকনামারা (১৮৭৬) তাঁর বিখ্যাত বই 'এশিয়াটিক কলেরার ইতিহাসে' ভারতবর্ষকে কলেরার জন্মস্থান বলে বর্ণনা করেছেন। তিনি বলেছেন যে বঙ্গদেশের দক্ষিণাঞ্চলে বহুদিন থেকেই কলেরা দেবীর পুজোর প্রচলন ছিলো। কলেরার মড়ক দেখা দিলে গ্রামে গ্রামে খুব ধুম করে এই পুজো হোত। গঙ্গানদীর বদ্বীপ অঞ্চলেই এই অসুখের প্রকোপ ছিলো বেশী। গ্যাসপার কোরিয়া তাঁর বিখ্যাত বই 'ভারতের কাহিনী'তে ষোড়শ শতাব্দীতে ভারতের অনেক অংশে কলেরার প্রকোপের কথা লিখেছেন। বৃটিশ, ওলন্দাজ, ফরাসী, পর্তুগীজ বণিকেরা কখন কিভাবে এই বীভৎস রোগের কবলে পড়েছে তার নানান বিচিত্র কাহিনী এই বইয়ে বর্ণিত হয়েছে।

বাংলাদেশের গাঙ্গের বদ্বীপ অঞ্চলে ও দক্ষিণ ভারতের উপকূল অঞ্চলে এই রোগ এত বিস্তৃত হয়ে পড়েছিলো যে ১৭৮৬ খৃষ্টাব্দে কলেরা রোগ প্রতিরোধের জন্য কলকাতায় ও মাদ্রাজে 'হসপিটাল বোর্ড' স্থাপিত হয়।

সতের শতকে কলেরা ভারতের আশেপাশের দেশগুলোতে আস্তে আস্তে ছড়িয়ে পড়তে থাকে—বিশেষ করে ব্রহ্মদেশের দিকে প্রধান ঝড়টা যায়। জাভা, সুমাত্রা পর্যন্ত এটা বিস্তৃত হয়। উনিশ শতকে চীন দেশেও এই রোগ ঘাঁটি গাড়ে।

ভারতের কলেরা বিস্তৃতির হিসাব নিতে গেলে দেখা যায় যে ১৭৭২ থেকে ১৭৮২ খৃষ্টাব্দ পর্যন্ত কলেরা চোরমণ্ডল উপকূলে বিস্তৃত হতে থাকে। ১৭৮১ খৃষ্টাব্দে গঞ্জাম জেলায় ৫০০০টির এক সৈন্য বাহিনীর ১১৪৩ জন কলেরায় আক্রান্ত হন। গঞ্জাম জেলা থেকে কলেরা কলকাতার দিকে সরতে থাকে। ১৭৮৩ খৃষ্টাব্দে এপ্রিল মাসে হরিদ্বারে এক মেলায় ২০০০০ তীর্থযাত্রী কলেরা রোগে আক্রান্ত হয়ে মারা যায়। ঠিক এই সময়েই টিপু সুলতানের সঙ্গে যুদ্ধরত মারাঠা সেনাদল কলেরা রোগে আক্রান্ত হয়ে পড়ে। ১৭৮২ খৃষ্টাব্দে সিংহলে কলেরা মহামারী দেখা যায়। ১৭৭৫ খৃষ্টাব্দে মরিশাস দ্বীপে কলেরা শুরু হয়েছিল। ১৭৮৭ ও ১৭৯৪ খৃষ্টাব্দে আর্কট ও ভেলোরে এবং ১৭৯০ খৃষ্টাব্দে পুনরায় গঞ্জাম জেলায় কলেরা শুরু হয়। ১৭৯২ খৃষ্টাব্দে ত্রিবাঙ্কুরে ও ১৮০৪ সালে পুনরায় সিংহলে কলেরার মড়ক লাগে। বিহার উড়িষ্যা ও মধ্যপ্রদেশে তখন কলেরা অল্পদিনে বেশ পরিচিত হয়ে গিয়েছে।

প্রথম বিশ্ব মহামারী (১৮১৭)—১৮১৭ খৃষ্টাব্দেই প্রথম কলেরা বিশ্ব মহামারী রূপে দেখা দিয়ে পৃথিবীর সমস্ত লোকের দুশ্চিন্তার কারণ হয়ে পড়ে। ১৮১৫ ও পরে ১৮১৭ খৃষ্টাব্দে ভারতের সর্বত্র প্রচুর বৃষ্টিপাত হয়। পরে নানা জায়গায় বন্যা দেখা যেতে থাকে। ১৮১৭ সালে ভারতে কলেরা ভীষণ মূর্তি নেয়। প্রথম শুরু হয়—গংগা ও ব্রহ্মপুত্রের অববাহিকা বরাবর। উত্তরপ্রদেশ ও মধ্যপ্রদেশের মধ্যবর্তী বুন্দেলখণ্ড অঞ্চলে রোগ এতো ছড়িয়ে পড়লো এবং সৈন্য বাহিনীর মধ্যে এত মড়ক দেখা দিলো যে মার্কুইস অব হেস্টিংস ঐ অঞ্চলে যে ছাউনী করেন তা উঠিয়ে আনতে বাধ্য হন। ঐ সৈন্য বাহিনীতে একদিনে ৫০০ জন সৈন্য কলেরায় মারা গিয়েছিল। ১৮২০ খৃষ্টাব্দ পর্যন্ত এই রোগ উত্তরে নেপাল, উত্তর ও পশ্চিমে দিল্লী, পাঞ্জাব ও বোম্বাই অবধি ছড়িয়ে পড়ে। তারপর গতি নেয় হায়দরাবাদ ও ব্যাঙ্গালোরের দিকে। মাদ্রাজেও এই ঢেউ এসে পৌঁছোয়।

১৮১৯ খৃষ্টাব্দে ব্রহ্মদেশ ও শ্যামদেশে স্থলপথে এই রোগ এগিয়ে ছিল। জলপথে বিস্তৃত হয়েছিল মালাক্কা, পেনাং ও সিংগাপুর অবধি। ১৮১৯ খৃষ্টাব্দে জাভা-দ্বীপে ১ লক্ষ লোক মারা যায় এবং বাটাভিয়াতে ১৭০০০। ১৮১৭ খৃষ্টাব্দে স্থলপথে কলেরা চীনদেশ পর্যন্ত ধাওয়া করেছিল। জাপানে কলেরা দেখা দিল ১৮২২ খৃষ্টাব্দে। ১৮২১ খৃষ্টাব্দে ভারতীয় সৈন্যদল ওমানে নিয়ে যাওয়াতে স্থলপথে তাদের সংগে কলেরা আরব দেশে ছড়ালো। ১৮২১ খৃষ্টাব্দে পারস্য উপসাগরের প্রবেশ পথ বসরাতে তিন সপ্তাহে ১৮০০ লোক কলেরায় মারা যায়। ১৮২৩-২৪ খৃষ্টাব্দের প্রচণ্ড শীতে কলেরা ইউরোপের পথে আর এগুতে পারলো না। এই বিশ্ব মহামারীর পর কিন্তু পারস্য, সিংহল, ব্রহ্মদেশ ও চীনে কলেরা কয়েক বছর ধরে হোলই না। কিন্তু কলেরার জন্মভূমি ভারতবর্ষে কলেরা চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত করে বোসল।

দ্বিতীয় বিশ্ব মহামারী (১৮২৯)।।

অনেকের মতে দ্বিতীয় বিশ্ব মহামারীও ভারতবর্ষের বাংলাদেশ থেকে শুরু হয়েছিল। চীনা লেখক উ লিয়েন তে লিখেছেন যে ১৮২৬ থেকেই নাকি ভারতের কলেরা চীনদেশে ছড়ায় পরে ওটা চীনের প্রাচীর অতিক্রম করে মঙ্গোলিয়ার দিকে প্রসারিত হয়। বাংলাদেশের থেকে উৎপন্ন একটি শাখা পশ্চিমে পাঞ্জাব, পারস্য ও ইউরোপীয় রাশিয়া পর্যন্ত চলে গিয়েছিল। মস্কোয় কলেরা গিয়ে পৌঁছোয় ১৮৩০ খৃষ্টাব্দে। তারপর এটা পোল্যান্ডে গিয়ে পোলিশ সৈন্য বাহিনীর ওপর আক্রমণ চালায়। অস্ট্রিয়ায় কলেরা দেখা দেয় ১৮৩১ সালে। ১৮৩১ সালে আগস্টে কলেরা বার্লিনে প্রবেশ করে এবং হামবুর্গে আসে অক্টোবরে। তারপর জার্মান দেশ থেকে বাণিজ্যবাহী জাহাজ বেয়ে কলেরা ১৮৩১ সালে অক্টোবরে ইংলণ্ডে হাজির হয়। ১৮৩২ সালে ইংলণ্ডে জানুয়ারীতে ৬১৪, ফেব্রুয়ারীতে ৭০৮, মার্চে ১৫১৯ ও এপ্রিলে ১৪০১ জন মারা যায় কলেরায়। বেলজিয়ামে ১৮৩২ সালে বসন্তকালে প্রায় আট হাজার লোক কলেরায় কবলিত হয়। ইউরোপের অন্যান্য দেশেও এই সময়ে কলেরা অল্পাধিকতর ছড়ায়। তারপর ১৮৩২ সালেই আমেরিকায় চলে আসে। কানাডার কুইবেক শহরেই দুই সপ্তাহ সময়ের মধ্যে ১০০০ লোক প্রাণ হারায় এবং সেন্ট লরেন্স নদী বেয়ে এই রোগ দেশের অভ্যন্তরে ঢুকে পড়ে। আমেরিকার যুক্তরাষ্ট্রেও ১৮৩৪ সালে কলেরা বেশ জাঁকিয়ে বসে। পেরু, চিলি এবং অন্যান্য দেশেও তখন কলেরা ক্রমে ক্রমে ছড়িয়ে পড়েছিল।

১৮৩১ খৃষ্টাব্দে মক্কায় হজযাত্রীদের মধ্যে হঠাৎ কলেরা শুরু হয় এবং ঐ বছরে ১২০০০ তীর্থযাত্রী প্রাণ হারায়। অন্য তীর্থযাত্রীরা দেশে ফিরে এসে তাদের দেশ যথা সিরিয়া, প্যালেস্টাইন, ঈজিপ্টে কলেরা বিস্তার করে। ১৮৩৫ খৃষ্টাব্দে কলেরা ইউরোপে আবার একবার মরণ কামড় দেয় এবং কেবলমাত্র ফ্রান্সেই ১৫০০ লোকের জীবন-অবসান ঘটে।

১৮৩৫ থেকে ১৮৩৭ পর্যন্ত মিডল ইস্ট থেকে কলেরা আস্তে আস্তে আফ্রিকার দিকে নজর দেয়। ১৮৩৫ সালে কলেরা আর একবার মক্কায় তীর্থযাত্রীদের ওপর হামলা করে। ১৮৩৫ সালে কলেরা আবার চীন আক্রমণ করে এবং ১৮৩১ সালে জাপানে কলেরা দেখা যায়। ১৮৩৭ সালে ভারতে কলেরা পশ্চিমে প্রসার লাভ করতে করতে ১৮৩৯ সালে আফগানিস্থানে এসে হাজির হয়। ১৮৪০ সালে কলেরা বাংলাদেশে আবার ভীষণ আকৃতি নেয় এবং পূর্ব এশিয়ার দিকে অগ্রসর হয়। ১৮৪৫ সালে বাংলাদেশের কলেরা সিংহল, মাদ্রাজ ও বোম্বাই-এর দিকে প্রসারিত হয় এবং ১৮৪৬ সালে একটি শাখা আরব দেশে এসে পল্লবিত হয়। কলেরা এখান থেকে পারস্য ও ককেশাস পর্বতমালা বরাবর গিয়ে রাশিয়ায় প্রবেশ করে। মক্কায় ১৮৪৬ সালে নভেম্বর মাসে ১৫০০০ লোকের প্রাণ নেয় কলেরা। ১৮৪৮ সালে কলেরা সারা পশ্চিম জগতে ছড়িয়ে পড়ল। নরওয়ে বলকান দেশসমূহ, ইংলণ্ড স্পেন, স্কটল্যান্ড, আয়ারল্যান্ড, আমেরিকা, এশিয়া মাইনর, সিরিয়া প্যালেস্টাইন, ইটালী, উত্তর আফ্রিকা কেউই বাদ গেল না। ১৮৫১ সালে আফ্রিকায় মরক্কো অঞ্চলে কলেরার মহামারী দেখা দেয়। ১৮৫২ সালে ইউরোপে শেষ কামড় দিয়ে যায়। এই সময়ে রাশিয়ায় কলেরার প্রকোপটা অনেকদিন ধরে চলেছিলো।

তৃতীয় বিশ্ব মহামারী (১৮৫২)

এবারও সেই ভারতবর্ষ: ১৮৫২ সালে শুরু হোল। ১৮৫৩ সালের মধ্যে দ্রুত ছড়িয়ে পড়লো ইউরোপ, যুক্তরাষ্ট্র, মেক্সিকো ও ওয়েস্ট ইণ্ডিজে। ১৮৫৩ সালে ইংলণ্ডে বিশেষ করে দক্ষিণ ইউরোপ

অঞ্চলে কলেরা ছড়াতে শুরু করে। ফ্রান্সের ক্রিমিয়া যুদ্ধের পর সৈন্যরা দেশে ফিরে এলো কলেরা সংগে নিয়ে। এইভাবে গ্রীস ও তুরস্কে কলেরা এলো। এই সময়ে আমেরিকাতেও কলেরার প্রকোপ হোল। ১৮৫৫ সাল থেকে আরম্ভ করে পৃথিবীর সব জায়গাই যারা ভারতবর্ষের কাছ থেকে কলেরার হাতেখড়ি পেয়েছে তারা সবাই আবার কলেরা নিয়ে বিব্রত হয়ে পড়লো। ইংলণ্ড ১৮৫৪ সালে প্রথম বোঝাতে শুরু করল যে কলেরা হবার অন্য কোন কারণ নেই, খারাপ জলই হচ্ছে এই রোগ ছড়ানোর বিশেষ সহায়। ১৮৫৬ থেকে ১৮৫৮ সালের মধ্যে স্পেন ও পর্তুগাল ছাড়া অন্য কোন ইউরোপীয় দেশে কলেরা তেমন মারাত্মক আকার ধারণ করেনি।

কলেরার যে শাখা পূর্ব দিকে বিস্তৃত হয়েছিল সেটা ইন্দোনেশীয়া, জাপান, কোরিয়া আর চীন পর্যন্ত বিস্তৃত হোল। ১৮৫৯ সালে বাংলাদেশে কলেরা প্রচণ্ড আকার ধারণ করে। শুরু প্রত্যক্ষভাবে এই মহামারীর কড় সাড়া ইউরোপ থেকে গেল।

চতুর্থ বিশ্ব মহামারী (১৮৬৩)

অনেকের মতে ভারত থেকে হজযাত্রীরা প্রথমে আরবে কলেরা বয়ে নিয়ে আসে। আবার কারো কারো মতে আরবে পুরানো কলেরা সুপ্ত ছিল। তীর্থযাত্রীরা প্রতি-বারের মত এবারও পুণ্যের সংগে সংগে একটুখানি করে বিশুদ্ধ কলেরা বীজাণু নিয়ে দেশে ফিরলো। ১৮৬৫ সালে মোট ৯০০০০ হজযাত্রীর মধ্যে কম করে ৩০০০০ জন কলেরায় আক্রান্ত হয়েছিল। তীর্থযাত্রী মারফৎ কলেরা মেসোপোটেমিয়া, সিরিয়া, প্যালেস্টাইন, আলেকজান্দ্রিয়া, ইজিপ্টে পর্যন্ত চলে এলো। আলেকজান্দ্রিয়ার মধ্যে দিয়ে ইটালীতে কলেরা প্রবেশ করে। ১৮৬৫ সালে ফ্রান্সে ১০,০০০ লোক প্রাণ হারালো এবং তারপর পর পর দু বছর কলেরা থেকেই গেল। এই ধাক্কায় রাশিয়া ১৮৬৬ সালে ৯০,০০০ লোক শহীদ হয়। সুইডেনে মারা গেল ৪৫০৩ জন, জার্মানীর প্রুশিয়াতেই ১১৫,০০০ লোক প্রাণ হারালো। যুদ্ধক্রান্ত অস্ট্রিয়া হাঙ্গেরীতে গোদের ওপর বিষফোঁড়ের মতো কলেরা এসে ১ লক্ষ ১০ হাজার লোকের প্রাণ নিলো। নেদারল্যাণ্ডে ২০০০০ ও বেলজিয়ামে ৩০,০০০ লোক মৃত্যুকে দেখলো। গ্রেট বৃটেনে সেবার ১৪ হাজারেরও বেশী লোক উজাড় হয়। ১৮৬৭ সালে ইউরোপে আগের বছরের থেকে অনেক কম কলেরা হোল। কেবল হতভাগ্য ইটালীকে ১ লক্ষ ৩০ হাজার জীবন কলেরার হাতে সঁপে দিতে হোল। ১৮৬৬ সালে যুক্তরাষ্ট্রে কলেরা দেখা দেয়। ১৮৬৬ সালে সৈন্য অপসারণের অব্যবস্থার জন্য নিউ পোর্ট, কেনটাকী, ইত্যাদি জায়গায় কলেরা বেশী অনুভূত হোল। নিউ অর্লিন্‌সে জুলাই থেকে অক্টোবর পর্যন্ত ১২০০ জন মারা গেল। ১৮৬৬ সালে যুক্তরাষ্ট্রে মোট লোক মারা যায় ৫০,০০০ মতো।

১৮৬৬ থেকে ১৮৬৮ পর্যন্ত মধ্য আমেরিকা বিশেষ করে নিকারাগুয়ে ও বৃটিশ হণ্ডুরাসে কলেরা ছড়াল নিউ অর্লিয়েন্স থেকে আমদানী করা বীজাণুর কৃপায়। ১৮৬৭তে দক্ষিণ আমেরিকাতেও বিশেষ করে ব্রেজিলে কলেরা শুরু হয়। ১৮৭০ সালে রাশিয়ায় আবার এলো কলেরা। লোক মরল ১ লক্ষ ৩০ হাজার। ১৮৭১ থেকে রাশিয়া নিজির দিকে কলেরার আবার বিস্তার করতে লাগল। একটা শাখা কৃষ্ণসাগর, রুমানিয়া, বুলগেরিয়া ও এড্রিয়াটিক মাইনরের দিকে এল। আর একটি শাখা পশ্চিমে ফিনল্যান্ড, সুইডেন, প্রুশিয়া ও অস্ট্রিয়ার দিকে গেল। প্রুশিয়াতে ১৮৭৩-এ লোক মরল ৩৩১৫৬, হাঙ্গেরীতে দু বছরে মারা গেল ১ লক্ষ ১০ হাজার মানুষ। ১৮৭৩ সালে কলেরা আর একবার যুক্তরাষ্ট্রে মাথাচাড়া দিয়ে উঠেছিল। ১৮৭৫ সালে ভারতে লোক মরেছিল ৩ লক্ষ ৬৪ হাজার ৭৫৫ জন। ১৮৭১-৭২ সালে পারস্য, ইজিপ্ট ও রাশিয়ায় কলেরা শুরু হয়েছিল। ১৮৭৫ সালে সিরিয়ার যে প্রচণ্ড কলেরা মহামারী শুরু হয়েছিল তার সূত্র জানা যায় নি। ১৮৭৩ সালে সুমাত্রা জাভা, থাইল্যান্ড ও মালয়ে কলেরা ভীষণ আকার ধারণ করে। জাপানে ১৮৭৭ সাল থেকে ১৮৭৯ সাল পর্যন্ত কলেরা উগ্রমূর্তি নিয়েছিল এবং মোট ১৫,৮,২০৪ জন আক্রান্তের মধ্যে ৮৯,২০৭ জন প্রাণ হারিয়ে-ছিল।

পঞ্চম বিশ্ব মহামারী (১৮৮১)

পঞ্চম বিশ্ব মহামারী ১৮৮১ থেকে ১৮৯৬ পর্যন্ত চলেছিল। এই বিশ্ব-মহামারীতে যদিও ক্ষয়ক্ষতির পরিমাণ অন্য-বারের তুলনায় কম হয়েছিল তবুও এটা স্মরণীয় হয়ে থাকবে এই জন্যে যে, এই সময়েই প্রথম (১৮৮৩-৮৪) আবিষ্কৃত হল (ডঃ কোচ্) যে কলেরা রোগটা খাদ্যদ্রব্যের মধ্য দিয়েই আমাদের শরীরে প্রবেশ করে অর্থাৎ এটা একটি Gastro-Intestinal disease।

এবারের মহামারী ভারতের পাঞ্জাবে শুরু হয়েছিল, তারপরই এটা মক্কায় নিয়ে যায় তীর্থযাত্রীরা এবং সেখান থেকে মধ্য-প্রাচ্যে ছড়ায়। ইউরোপে এবার কলেরা শুরু হয় ফ্রান্স, স্পেন ও ইটালীকে দিয়ে। ফ্রান্সে আক্রান্ত ১০ হাজার লোকের মধ্যে ৫ হাজার মারা যায়। অনেক চেষ্টা করেও ইটালী কলেরা রোধ করতে পারে নি। নেপলস এলাকায় এবার কলেরার প্রাদুর্ভাব বেশী দেখা দিল; অগাস্ট ও সেপ্টেম্বর এই দুই মাসের মধ্যেই রোগাক্রান্ত ১০ হাজার জনের মধ্যে ৫ হাজার জন প্রাণ হারাল। ১৮৮৪ সালে স্পেনে মাত্র মারা গেল ৫১২ জন মাত্র। কিন্তু ১৮৮৫ সালের গ্রীষ্মকালে কলেরা এক হাত দেখে নিল। এক লক্ষ ষাট হাজার লোক আক্রান্ত হোল ও ৬০ হাজার জন মারা গেল। ইংলণ্ডে তখন মাঝে মাঝে দু-একটা কলেরার খবর পাওয়া গেলেও সেখানে পানীয় জলের বন্দোবস্তের উন্নতি করায় কলেরা বাড়তে পারছিল না। ১৮৮৭ সালে ফ্রান্স ও ইটালী থেকে দুখানা জাহাজ নিউইয়র্কে আসছিল। কিন্তু সন্দেহ হওয়ায় বীক্ষণাগারের পরীক্ষায় ধরা পড়ল যে, জাহাজ দুটি সঙ্গে কলেরাও নিয়ে আসছে। জাহাজকে আর তীরে ভিড়তে দেওয়া হল না। এইভাবে উত্তর আমেরিকা নিস্তার

পেলেও কোপটা গিয়ে পড়ল দক্ষিণ আমেরিকার ওপর।

১৮৯২ সালে আফগানিস্তান ও পারস্যের কলেরা রাশিয়া পর্যন্ত ছড়াল। ১৮৯৪ সালে রাশিয়ার কলেরায় ৮ লক্ষ লোক মারা গেল। এই সময়ে জার্মানী ও ফ্রান্সেও কলেরা দেখা দিয়েছে। ১৮৯৩ থেকে ১৮৯৬ পর্যন্ত আফ্রিকায় বিশেষ করে ট্রিপোলিটানিয়া, টিউনিশিয়া, আলজেরিয়া, মরক্কো, ফরাসী, পশ্চিম আফ্রিকা, সুদান ও ইজিপ্ট-এ কলেরা ছড়িয়েছিল। তবে ১৮৯৬ সালের ইজিপ্টে ১৬ হাজার লোকের মৃত্যু ছাড়া আর কোন বড় ঘটনা ঘটে নি। ১৮৮৮ সাল থেকে ১৮৯৬ সাল পর্যন্ত দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ায় ইন্দোনেশিয়া, সিংহল, থাইল্যান্ড, স্ট্রেটস সেটলমেন্ট ও জাভায় কলেরার খবর পাওয়া যায়। জাপানে ১৮৮১ সালে ৯ হাজার, ১৮৮২ সালে ৫০ হাজার, ১৮৮৫ সালে ১৩,৭৭২, ১৮৮৬ সালে ১ লক্ষ ৫৫ হাজার, ১৮৯০ সালে ৪৬ হাজার, ১৮৯১ সালে ১১ হাজার ও ১৮৯৫ সালে ৫৫ হাজারেরও বেশী লোক কলেরায় আক্রান্ত হয়।

ষষ্ঠ বিশ্ব মহামারী (১৮৯৯)

অনেক দিন ধরে, তা প্রায় ২৪ বছর এক নাগাড়ে মহামারী চলেছিল সারা পৃথিবীতে। এবার ভারতের অবস্থা সত্যিই শোচনীয় হয়েছিল। ১৮৯৯-এ শুরু; পরের বছরই একসঙ্গে কলকাতা, বোম্বাই ও মাদ্রাজ এলাকায় শুরু হল ভীষণভাবে। তারপর সেটা ছড়াল ভারতের বাইরে পশ্চিমের দিকে আফগানিস্তান, পারস্য উপসাগর ধরে, আর পূর্বে ছড়াল বার্মা, সিঙ্গাপুরে। মাদ্রাজ থেকে এবার জাহাজ-পথে মক্কায় তীর্থযাত্রীদের সঙ্গে কলেরা চলল আরবে। ৪ হাজার লোক প্রাণ দিল এক মাসেই। তারপর সেটা গেল ইজিপ্টে।

১৯০৩ সালে প্যালেস্টাইন, এশিয়া মাইনর, কৃষ্ণসাগর উপকূলে, মেসোপোটেমিয়া ও পারস্য হয়ে কলেরা রাশিয়ায় প্রবেশ করল। ১৯১০ সালে রাশিয়ায় কলেরা ভীষণ আকার ধারণ করে এবং সেবারে ২৩০২৩২ জন লোক কলেরায় আক্রান্ত হয়েছিল এবং মারা গিয়েছিল ১০৯৫৬০ জন। মধ্যে কলেরাটা বেশ কমে গিয়েছিল কিন্তু ১৯২০ ও ১৯২১ দুবছরের মধ্যেই আবার ভীষণ অবস্থা দাঁড়ায়—১৯২১ সালে মোট ২০৭৩৮৯ জন লোক কলেরায় আক্রান্ত হয়।

পশ্চিম দেশে বিশেষ করে আমেরিকায় এবার কলেরাটা বেশী ছড়াতে পারল না। দক্ষিণ আমেরিকায় ১৯১০ সালে একটি রাশিয়ান জাহাজের দৌলতে কিছু কলেরা এসেছিল এবং ৬০০ জন মারা গিয়েছিল।

ইউরোপের মধ্যে দক্ষিণ ও দক্ষিণ-পূর্ব অংশেই এবার আক্রমণ হয়েছিল বেশী। ১৯১৪ থেকে ১৯১৮ পর্যন্ত প্রথম মহাযুদ্ধের সময়ে রাশিয়ান যুদ্ধবন্দী মারফত কলেরা অস্ট্রিয়ায় প্রবেশ করে। এইভাবে জার্মানীতেও কলেরা ঢোকে।

দক্ষিণ-পূর্ব ও দক্ষিণ এশিয়ায় প্রতিবারের মত এবারও কলেরা দেখা দিল। ১৯০৮ সালে ২৫ হাজার হজযাত্রী মারা গেল। পারস্যে তেমন কিছু করতে পারল না এবার।

১৯০১ ও ১৯০২ সালে পূর্ব এশিয়ায় চীন, মাঞ্চুরিয়া, কোরিয়া, জাপান ও ফিলিপাইনে কলেরা ছড়াল। ১৯০৪ থেকে ১৯০৯ পর্যন্ত ভারতের ইতিহাসে কলেরার বিজয়-বৈজয়ন্তী বৎসর, নীচের হিসাবটা দেখলে কিছুটা বোঝা যাবে। এর পরের উল্লেখযোগ্য বছর হল ১৯১৮ ও ১৯১৯।

সাল	মৃত্যুর সংখ্যা
১৯০৪	১৮৯৮৫৫
১৯০৫	৪৩৯৪০৯
১৯০৬	৬৮২৬৪৯
১৯০৭	৪০০০২৪
১৯০৮	৫৭৯৮১৪
১৯০৯	২২৭৮৪২
১৯১৮	৫৫৬৫০০
১৯১৯	৫৬৫১১৬

এই হল মোটামুটি পৃথিবীর কলেরা মহামারীর ইতিহাস। এই ইতিহাস বিশ্লেষণ করতে গেলে একই সঙ্গে জানা দরকার পৃথিবীর কোথায় কোথায় কলেরা মহামারী হয় না। সাধারণভাবে বলা যায় যে, কলেরা পৃথিবীর উত্তরতম ও দক্ষিণতম প্রান্তে কখনও দেখা দেয় নি। এদিকে আবার আফ্রিকার দক্ষিণাঞ্চলে বন্দরগুলোতে মাঝে মাঝে কলেরা ছড়িয়েছে কিন্তু পশ্চিমাঞ্চলের বন্দরগুলোতে কলেরা আসে নি। আবার দক্ষিণ আমেরিকায় দক্ষিণাঞ্চলও কলেরা থেকে সব সময় মুক্ত থেকেছে। মহাদেশ থেকে দূরে অবস্থিত দ্বীপগুলো যেমন সেন্ট হেলেনা, বার্মুডাসও কলেরার হাত থেকে রেহাই পেয়েছে। একটা লক্ষ্য করার বিষয় যে, বিষুবরেখার উত্তরের দেশগুলোতে দক্ষিণাঞ্চলের দেশগুলো থেকে বেশী কলেরা হয়েছে।

ভারতবর্ষে এক সময়ে কলেরা ও প্লেগ দুটোই মারাত্মক ছিল। আস্তে আস্তে প্লেগটা কমে গেছে। কিন্তু কলেরা সেই পরিমাণে কমে নি। নীচের হিসাবটা দেখলেই অনেকটা অনুমান করা যাবে।

দশক	কলেরায় মৃত্যু	প্লেগরোগে মৃত্যু
১৯০৯—১৮	৩৪৭,০৩৮	৪২২,১৫৩
১৯১৯—২৮	২৫০,২৪৬	১৭০,২৭২
১৯২৯—৩৮	১৮৮,১৯০	৪২,২৮৮
১৯৩৯—৪৮	২০২,১৯৫	২১,৭৯৭

কলেরা এখন আর উন্নত দেশের অসুখ নয়। ইংলন্ড বা যুক্তরাষ্ট্রে কলেরা নেই বললেই চলে। ভারতে এবং পৃথিবীর অন্যান্য অনুন্নত দেশে এখনও হাজার হাজার লোকে কলেরায় কবলিত হয়। এর কারণ হল অনুন্নত দেশগুলো কলেরার যেটি প্রধান বাহন সেই 'জলের' সুবন্দোবস্ত করতে পারে নি। যতদিন লোককে আমরা ভাল জল দিতে না পারব ততদিন কলেরা আমাদের সঙ্গী হয়ে থাকবে।

বার বার বিশ্ব মহামারী ভারতবর্ষ থেকেই উদ্ভূত হতে দেখে সারা পৃথিবীর লোকের নজর ভারতের দিকে পড়েছে। কলেরাকে সমূলে উৎপাটিত করতে হলে কলেরার জন্মভূমি ভারতবর্ষকে ভালভাবে শোধন করতে হবে। বিশ্বস্বাস্থ্য সংস্থা পরিষ্কারভাবে বলে দিয়েছেন যে, যতদিন না আমরা ভারতবর্ষের প্রতিটি গ্রামে ও শহরে ভাল পানীয় জলের ব্যবস্থা করতে পারব ততদিন ভারতবর্ষ কলেরা সৃষ্টি করে যাবে এবং তা পৃথিবীতে ছড়াবে। তাই বিশ্বস্বাস্থ্য সংস্থা ভারতবর্ষের দিকে নজর দিয়েছেন। আর দশটা সমস্যার মধ্যে পুরোভাবে তাই তাঁরা স্থান দিয়েছেন পরিশ্রুত জল সরবরাহ ও দূষিত জল নিষ্কাষণী ব্যবস্থার ওপর। পৃথিবীর অন্যান্য সমাজসেবী সংস্থাকে চোখে আঙুল দিয়ে বুঝিয়ে দিচ্ছেন যে, পৃথিবীকে কলেরামুক্ত করতে হলে প্রথমেই করতে হবে ভারতকে।

পাঠকের বৈঠক

দস্‌তয়েভস্‌কী প্রতিভা বিশ্লেষণ (২)

দসতয়েভসকীর মানসিক প্রকৃতি ছিল স্বভাবতই বিষাদমলিন। একথা তিনি স্বয়ং বিভিন্নভাবে ব্যক্ত করেছেন। তাঁর সমগ্র জীবনের মধ্যে এই বিষাদ আচ্ছন্ন কুয়াশার সুস্পষ্ট আভাষ পাওয়া যায়। তরুণ বয়সেই তিনি লিখেছিলেন:

"I move in a cold a-otic atmosphere, wherein no sunlight ever pierces".

আর একবার দসতয়েভসকি চিঠি লিখলেন তাঁর ভাইকে:

"I have indeed an evil, repellent character . . . Even when my heart is warm with love, people often can't get so much as one friendly word out of me".

দসতয়েভসকী স্বীকার করেছেন যে তাঁর মধ্যে একটা 'মরবিড সেনসিবিলিটি' বা বিকৃত অনুভূতি আছে। এই বিকৃত বোধের ফলে তিনি সামান্য তিলমাত্র ব্যাপারকেও তাল করে দেখতেন। মানবিক সান্নিধ্য ও স্পর্শের ছোঁয়াচ বাঁচিয়ে স্বয়ং যিশুখৃষ্ট তাঁকে যে মহান কর্তব্য অর্পণ করেছেন (এই তাঁর ধারণা ছিল), তা পালন করার চেষ্টা করতেন। পবিত্র ভূমি রাশিয়া, মহান ও শক্তিশালী হোলি রাশিয়া, আওয়ার হোলি মাদার এই স্বদেশজননীই তাঁর কাছে সবচেয়ে বড়ো এবং পুণ্যকর্ম।

দসতয়েভসকীর বিশ্বাস ছিল যে বিশ্বজনীন সভ্যতার ক্ষেত্রে রাশিয়া এক সুমহান ভূমিকা গ্রহণ করবে, সারা য়ুরোপকে প্রভাবিত করবে। তাঁর বিশ্বাস ছিল—

"Russia must reveal to the world her own Russian Christ, whom as yet people know not and who is rooted in our native Orthodox faith".

এই বিশ্বাসের ফলে তিনি সাম্যবাদের বিরোধী ছিলেন, তাঁর বিশ্বাসমতে সাম্যবাদের ভিত্তি জড়বাদে এবং প্রকৃত ধর্ম বা সত্যের দ্বারা প্রতিষ্ঠিত, সাম্যবাদ তার শত্রু।

তলস্তয় ব্যক্তিগতভাবে দসতয়েভসকীকে জানতেন না। তাঁর মতে দসতয়েভসকীর স্থান পুসকিনের পরে। আর তুর্গেনিভের ধারণা ছিল দসতয়েভসকী কিঞ্চিৎ উন্মাদ। 'লেটারস অব দসতয়েভসকী' পাঠে একটি আহত মানসিকতার পরিচয় পাওয়া যায়। কোথায় একটা সুগভীর বেদনা পুঞ্জীভূত ছিল। মানবিকতার প্রতি ছিল নিদারুণ সন্দেহ। ব্যক্তিগত সম্পর্ক বিষয়ে বিশেষ বিচারশীল ছিলেন না, আর মন্দভাগ্য চিরদিন তাঁকে অনুসরণ করেছে। এই চিঠি-পত্রের মধ্যে আর একটি জিনিষ জানা যায়—প্রতিভাধর মহৎ শিল্পীরাও কত ক্ষুদ্র হতে পারেন সেই পরিচয় আছে পত্রাবলীর মধ্যে। তবে, কোনো কালেই মহৎ প্রতিভা সম্পর্কে সরাসরি বিচার করে মন্তব্য করা অনুচিত। তাঁদের আচার আচরণটাই বড় কথা নয়, তাঁদের সৃষ্টিটুকুই বিচার্য।

মিঃ ডেভিড মাগরস্যাক দসতয়েভসকীর যে জীবনীগ্রন্থ (প্রকাশক : সেকার অ্যান্ড ওয়ারবুর্গ) রচনা করেছেন তার মধ্যে শক্তিমত্তার পরিচয় আছে এবং তাঁর পরিবেশনভঙ্গী চমৎকার। মাগরস্যাক রচিত এই জীবনীতে বিগত ত্রিশ-চল্লিশ বছরকাল ধরে দসতয়েভসকী প্রসঙ্গে যত আলোচনা হয়েছে এবং নতুন তথ্য আবিষ্কৃত হয়েছে তার পূর্ণ সুযোগ গ্রহণ করা হয়েছে। সেই কারণে ইংরাজী ভাষায় দসতয়েভসকীর প্রথমতম প্রামাণ্য জীবনী হিসাবে মাগরস্যাকের গ্রন্থটি সমাদৃত হবে। কিন্তু মাগরস্যাক কোন কোন সূত্র ধরে তথ্যাদি সংগ্রহ করেছেন তার কোনো হদিশ দেননি। তাই এই গ্রন্থটি একটি সাধারণ জীবনীগ্রন্থ হয়েছে। কিন্তু প্রায় একই সময়ে প্রকাশিত হয়েছে মিসেস জেসি কুলসন রচিত—'দসতয়েভসকী—এ সেলফ পোর্ট্রেট' (প্রকাশক— অক্সফোর্ড য়ুনিভার্সিটি প্রেস)। এই গ্রন্থটি পাঠ করে জানা যায় মাগরস্যাক দস্‌তয়েভসকীর চিঠিপত্র সম্পর্কে যা উল্লেখ করেছেন বা উধৃতি দিয়েছেন তা শুধু যে নির্ভুল তা নয়, এক হিসাবে স্বয়ংসম্পূর্ণ। মিসেস কুলসন যেখানে প্রচুর উধৃতি দিয়েছেন দসতয়েভসকীর পত্রাবলীর মাগরস্যাক দিয়েছেন সংক্ষেপিত সারাংশ। মিসেস কুলসনের গ্রন্থটি মাগরস্যাকের গ্রন্থের পরিপূরক এবং সংশোধক বলে নয়, তিনি তাঁর আলোচনায় একটা নিরপেক্ষ এবং অধিকতর গ্রহণযোগ্য মনোভংগী অটুট রেখেছেন। মাগরস্যাক কিন্তু দসতয়েভসকীর জীবনের বিতর্কমূলক অংশের শরীকদার হয়ে পড়ে মাঝে মাঝে পক্ষপাত প্রদর্শন করেছেন।

একথা অবশ্য সত্য যে দসতয়েভসকীর শেষ জীবনে তাঁর যে রাজনৈতিক এবং ধর্মীয় মনোভংগী গড়ে উঠেছিল তা অসহনীয়, অবাস্তব এবং উদ্ভট। সমালোচকদের মতে তাঁর 'সদো-মাসোচিসটিকস' (সদন ও মর্ষণকামী) মনোবৃত্তির ফলে তিনি এক অপ্রীতিকর আবহাওয়ায় জড়িয়ে পড়েছিলেন এবং তাঁর বাক্যে এবং কর্মে একটা দুমুখো নীতির পরিচয় পাওয়া যায়। তাঁর প্রায় জটিল অর্থকৃচ্ছ্রতার কথাও বিচার করতে হবে, এই অর্থকষ্ট আরো বেড়ে গিয়েছিল তাঁর জুয়াখেলার প্রতি অত্যাধিক আগ্রহ। জুয়াখেলায় এই ঝোঁক হয়ত একটা মানসিক উত্তেজনার জন্য প্রয়োজন হয়েছিল, কিন্তু এর ফলে তাঁর কথা বলার কুৎসিত ভঙ্গীর কোনো পরিবর্তন ঘটেনি। মাগরস্যাকের গ্রন্থটি পাঠ করে মনে হয় নীতিবাগীশরা একটা মশক সিংহের দেহের আশ-পাশে গুঞ্জন করেছিল, সিংহ তাতে মাঝে মাঝে উৎপীড়িত হয়েছেন। আর এই উত্তেজনার আবার অনেক সময় কোনো হেতু খুঁজে পাওয়া যায়নি।

জীবনের মাত্র কয়েক সপ্তাহ অনাবিল আনন্দ স্রোতে গা ভাসিয়েছেন দসতয়েভসকী। জীবনের এমনই একটা সুখময় কালকে লেখক বলেছেন—

"high jinks at his sister's country house".

কিন্তু এই উক্তির কারণ কি? কিংবা দসতয়েভসকী যখন সর্বপ্রথম তাঁর দ্বিতীয়া স্ত্রী আনা সাথলিনকে দেখলেন স্টেনোগ্রাফার রূপে তখন তিনি তাঁকে সতের বছর আগে সেমিওনোভসকীর প্যারেড গ্রাউন্ডে যখন গুলি বিদ্ধ হয়ে মরার জন্য অপেক্ষা করছিলেন সেই অভিজ্ঞতার কথা ব্যক্ত করেছিলেন। মিঃ মাগরস্যাক বলেছেন যে লজ্জাশীলা একজন তরুণী কর্মচারীকে আকৃষ্ট করা বা চিত্তবিনোদন করার উদ্দেশ্যেই

"he trotted out the story of his mock execution, a story that he knew from his experience — made a great impression on young girls —".

এই জাতীয় উক্তি পাঠককে জীবনীকার সম্পর্কে সতর্ক করে তোলে। আরো ঘটনার কথা উল্লেখ করা যায়, যেমন স্বামীর অর্থনৈতিক ব্যবস্থাদির অক্ষম পরিচালনার ফলেই স্ত্রীর আর্থিক দুরবস্থা ঘটেছে। অপর জীবনীকাররা কিন্তু বলেছেন দ্বিতীয়া স্ত্রীর জন্য আর্থিক স্বাচ্ছন্দ্য এবং আরো অনেক সুখ-সুবিধা সম্ভব হয়েছিল। উভয়ের মধ্যে বয়সের পার্থক্য থাকলেও এবং সাধারণ বুদ্ধিমত্তার [illegible] দাম্পত্য জীবনে তার ছাপ পড়েনি।

দস্তয়ভস্কীর জীবনের মধ্য পর্বে, যখন তাঁর চারখানি বিখ্যাত উপন্যাস রচিত হয়েছিল সেইকালের জীবনকাহিনী অতিশয় রমণীয় ভঙ্গীতে বর্ণিত। দস্তয়ভস্কী যখন নিদারুণ অর্থকষ্টে আছেন তখন তাঁর শ্যালিকা এবং তার পরিবারস্থ সকলকে এবং তাঁর নিজের স্ত্রীর পূর্ব-পক্ষের সন্তানকেও পালন করতে লাগলেন। এই ছেলেটির নাম পাশা। মাগরস্যাক মহৎ উপন্যাস লেখকের হৃদয়-বৃত্তির প্রশংসা করতে পারতেন কিন্তু তা না করে তিনি কঠোর মন্তব্য করেছেন। দস্তয়ভস্কী নাকি পাশার উদ্ধতভঙ্গী এবং আলসেমি সহ্য করতেন। আর অল্প-বয়সী আনাকেও তিনি যেভাবে সমালোচনা করেছেন তা অশোভন হয়েছে। সংসার চালনার জন্য আনাকে অনেক রকম অপকর্ম করতে হয়েছে সত্য তবে তার জন্য তার নির্বুদ্ধিতার নিন্দা করা অকর্তব্য।

সব জড়িয়ে দস্তয়ভস্কীর জীবনের প্রথমাংশটুকুই আসল, যে কালটুকু পর্যন্ত নাতাশিয়া ফিলিপোভনার চরিত্রের আদর্শ সুসোলভার সঙ্গে প্রেমলীলা চলেছে তা সুন্দর। 'তারপর দি ডায়েরী অফ এ রাইটার' গ্রন্থের মধ্যে উদ্ভট এসেছে। দস্তয়ভস্কীর সৃষ্টিই তাঁর জীবন। যে মহৎ সৃষ্টির তিনি জনক সেই পৃথিবীখ্যাত চারখানি উপন্যাসের মধ্যেই প্রচ্ছন্ন আছে তাঁর ভাবগত জীবন। মানুষের ব্যবহারিক জীবনটাই সব নয়। অবশ্য এই উপন্যাস-গুলি সম্পর্কে মিঃ মাগরস্যাক উত্তম বিশ্লেষণ করেছেন।

মিঃ রোনাল্ড হিংলে লিখেছেন 'দি আনডিসকভারড দস্তয়ভস্কী'। তাঁর এই গ্রন্থটিও সংশোধক। কলা-কুশলী এবং রস-রসিক দস্তয়ভস্কীকে তিনি ফুটিয়ে তুলেছেন। জীবনের তিক্ততা যে তাঁর চিত্তকে আবিল করেছিল তা তিনি উপেক্ষা করেছেন। মিঃ হিংলের বিশ্লেষণ অতিশয় বিস্ময়করভাবে বৈজ্ঞানিক এবং ব্যক্তি-নিরপেক্ষ। এই গ্রন্থ সকলের ভালো লাগবে। তবে দস্তয়ভস্কীর সমালোচকরা তাঁর ব্যক্তিজীবনের মরমী সাধনার অংশটুকু অনেক সময় বড় করে দেখেছেন এবং বিভ্রান্ত হয়েছেন, মিঃ হিংলেও সেই ফাঁদে জড়িয়ে পড়েছেন। শুধু দস্তয়ভস্কীর সাহিত্যকর্মের এমন সূচারু বিশ্লেষণ আর আছে বলে মনে হয় না। মিশকিন ও পিটার ভেরোখভনস্কীর মধ্যে যে সু ও কু দ্বন্দ্ব ঘটেছে মিঃ হিংলে তার অনন্য-সাধারণ ব্যাখ্যা করেছেন।

—অভয়ঙ্কর

(1) LETTERS of DOSTOEVSKY: Tr. by Ethel Mayne (Peter Owen), Price 35 shillings.
(2) DOSTOEVSKY — A Life: By David Magarshack (Secker & Warbury.) Price 50 shillings.
(3) DOSTOEVSKY — A Self-Portrait: By Jessie Coulson (Oxford University). Price 30 shillings.
(4) THE UNDISCOVERED DOSTOEVSKY: By Ronald Hingley (Hamis Hamilton). Price 25 shillings.

গগনেন্দ্রনাথ ঠাকুরের জন্মশতবর্ষ ॥

আগামী ১৮ সেপ্টেম্বর গগনেন্দ্রনাথ ঠাকুরের জন্মশতবর্ষ উৎসব উদ্‌যাপিত হবে। পশ্চিমবঙ্গের রাজ্যপাল শ্রীধর্মবীর মহাজাতি সদনে এই উৎসবের উদ্বোধন করবেন। এই উৎসব উপলক্ষে সরকারী আর্ট ও ক্র্যাফ্‌ট কলেজে গগনেন্দ্রনাথের ছবির একটি প্রদর্শনী হবে। এই প্রদর্শনীটি ২৩ সেপ্টেম্বর থেকে ৭ অক্টোবর পর্যন্ত খোলা থাকবে। উৎসব সমিতি এই সময়ে ইণ্ডিয়ান সোসাইটি অব ওরিয়েণ্টাল আর্টস-এর সহযোগিতায় গগনেন্দ্রনাথের ছবির একটি সংকলন গ্রন্থ প্রকাশ করবেন বলেও শোনা যাচ্ছে।

হিন্দি কবিতা প্রসঙ্গে ॥

সাম্প্রতিক হিন্দি কবিতার গতি ও সম্ভাবনা সম্বন্ধে প্রখ্যাত কবি গিরিজাকুমার মাথুরের সমালোচনা গ্রন্থটি বিশেষ আলোড়ন সৃষ্টি করেছে। আলোড়ন সৃষ্টি করবার প্রথম কারণ হয়ত এই যে, শ্রীমাথুর একজন কবি এবং কবিতা সম্বন্ধে তাঁর মতামতের যথেষ্ট মূল্য আছে। এছাড়াও গ্রন্থটিতে আধুনিক কবিতার অগ্রগতি সম্বন্ধে বহু বিতর্কিত বিষয়ের অবতারণা করা হয়েছে। আধুনিক কবিতার যে বিষয়গুলি নিয়ে কবি আলোচনা করেছেন, পর্যায়ক্রমে সাজালে তা দাঁড়ায়—আত্মীকৃতির নতুন উন্মেষ, মান-সিকতার দ্বৈতীয় লৌকিক অর্থ; সামাজিক পরিবর্তন ও নতুন ভাবধারা; জাতীয় মূল্যের পরিপ্রেক্ষ; নতুন কবিতা : ঐতিহাসিক পটভূমি; আধুনিকতার প্রক্রিয়া; গীত : মধ্যযুগীয় রোমান্স, গোচরী প্রবৃত্তি এবং আধুনিকতা; অন্তপ্রায় প্রবৃত্তি; সংস্কারের দিশা।

আধুনিক কবিতার পাঠকমাত্রেই জানেন, উপরের বিষয়গুলি আধুনিক কবিতা উপলব্ধির জন্য কতখানি প্রয়োজনীয়। প্রতিটি বিষয়েই লেখকের পাণ্ডিত্য প্রখর হয়ে উঠেছে। হয়তো, কোথাও কোথাও মত-পার্থক্য থাকতে পারে, কিন্তু তৎসত্ত্বেও গ্রন্থটির প্রশংসা না করে থাকা যায় না। আধুনিক কবিতার পাঠকের কাছে গ্রন্থটি খুবই মূল্যবান।

তারাশঙ্করের সম্বর্ধনা ॥

গত রবিবার, ৯ সেপ্টেম্বর বিকেলে 'সবিতা' সাংস্কৃতিক সংস্থার পক্ষ থেকে সাহিত্যিক তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়কে সম্বর্ধনা জানান হয়। এই অনুষ্ঠানটি অনুষ্ঠিত হয় রাজভবনের মন্ত্রী-আবাসে। তাঁকে সম্বর্ধিত করতে গিয়ে রাজ্যের খাদ্য-মন্ত্রী শ্রীপ্রফুল্লচন্দ্র ঘোষ বলেন, "যদিও তারাশঙ্কর গদ্য লেখক, তবু বিখ্যাত সংস্কৃত লেখক বাণভট্টের মতো তাঁকেও কবি নামে চিহ্নিত করা যায়। বাংলা সাহিত্যকে যাঁরা বিবিধ ভূষণে অলঙ্কৃত করেছেন, তাঁদের মধ্যে তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায় অন্যতম।" সম্বর্ধনার উত্তরে শ্রীবন্দ্যোপাধ্যায় বলেন, বাংলা সাহিত্য ও ভাষার জন্য তিনি তাঁর যথাসাধ্য করে চলেছেন। ভবিষ্যতে যাঁরা সাহিত্য সেবায় এগিয়ে আসছেন, তাঁরা বাংলা ভাষাকে আরও সুন্দর ও সমুজ্জ্বল করে তুলতে সমর্থ হবেন। "সবিতা"র পক্ষ থেকে শ্রীমতী সাধনা সোম শ্রীবন্দ্যোপাধ্যায়কে মানপত্র প্রদান করেন।

পাঠ্যপুস্তক প্রদর্শনী ॥

উপাচার্য সম্মেলন উপলক্ষে কেন্দ্রীয় শিক্ষা-মন্ত্রকের উদ্যোগে দিল্লিতে একটি পাঠ্য-পুস্তক প্রদর্শনীর ব্যবস্থা করা হয়েছে। এতে বিভিন্ন ভারতীয় ভাষায় রচিত প্রায় ৪,০০০ গ্রন্থ স্থান পেয়েছে। এই প্রদর্শনীর উদ্বোধন করতে গিয়ে মাদ্রাজ বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য ডঃ এ, এল, মুদালিয়র বলেন, "ইংরেজি থেকে ভারতীয় ভাষায় অনুবাদের সময়ে, যে বিষয়ক গ্রন্থের অনুবাদ হচ্ছে, সেই বিষয়ের শিক্ষকের পরামর্শ গ্রহণ করা প্রয়োজন। এক্ষেত্রে বাইরের লোকের উপর আস্থা স্থাপন করলে গুরুতর সংকটের সৃষ্টি হতে পারে। যাঁরা শিক্ষা বা গবেষণার সঙ্গে যুক্ত নন, তাঁরা শিক্ষার সাম্প্রতিকতম অগ্রগতির সঙ্গে ততটা পরিচিত নন। ফলে তাঁদের দ্বারা পাঠ্য-পুস্তক অনুবাদ কখনই সার্থক হতে পারে না।"

স্মরণযোগ্য চিত্র-প্রদর্শনী

'এ কমাস আমি বড় কম কাজ করছি। আমি যেন দৈত্যের মত কাজ করতে পারি, কম কথা, বেশী কাজ।' নিখিল বিশ্বাস স্মারক প্রদর্শনীতে নিখিলের ১৬০ নম্বর ড্রয়িং-এর ওপর দিকের কোণে তাঁর হাতের লেখায় ইংরিজিতে এই কটি কথা লেখা ছিল। নিখিলের সমস্ত শিল্পসাধনার স্বরূপ ইতিহাসের সবটুকুই এই কটি কথায় তিনি নিজেই বলে গিয়েছেন। তাঁর মৃত্যুর নয় মাস পরে তাঁর স্ত্রী এবং অনুরাগী বন্ধু-বান্ধবদের উদ্যোগে অ্যাকাডেমি অব ফাইন আর্টসের একতলার চারখানি হল জুড়ে তার প্রদর্শনী এ মাসের সবচেয়ে উল্লেখ-যোগ্য ঘটনা। তাঁর অজস্র ছবির মধ্যে ২৩৫ খানি ড্রয়িং-এর এই প্রদর্শনী আয়োজনের দুরূহ কাজের জন্যে এঁরা ধন্যবাদভাজন সন্দেহ নেই। ১৯৫০ থেকে ১৯৬৬ পর্যন্ত তাঁর ড্রইং-এর একটা মোটামুটি নিদর্শন এখানে তুলে ধরবার চেষ্টা করা হয়েছে এবং উল্লেখ নিষ্প্রয়োজন যে এ উদ্দেশ্য সফল হয়েছে। তাঁর গোড়ার দিকের কাজের মধ্যে বিভিন্ন ধরনের নিসর্গ দৃশ্য—যার মধ্যে বিভিন্ন প্রভাব কাজ করেছে, সেখান থেকে ক্রমে ক্রমে তাঁর শেষদিকের কাজ, যেখানে নিখিলের নিজের ব্যক্তিত্ব একটা আত্মপ্রকাশের পথ পাচ্ছিল সেই পর্যন্ত তাঁর পরিণতির একটা নিরথ পাওয়া গেল। তাঁর প্রথম দশ বছরের কাজের ভেতর বহির্জগতের প্রতিচ্ছবিই প্রধান। বিভিন্ন ধরনের পার্বত্য দৃশ্য, বারাণসীর পথঘাট গলি, কলকাতার দৃশ্য, বন, প্যাগোডা, পার্বত্য গ্রাম, তিব্বতী দোকান ইত্যাদি বিষয় নিয়ে ছবিই বেশী। এ সময়ের মধ্যে তাঁর স্টাইল পূর্ণতা লাভ করেনি। ১৯৬১ থেকে যে ড্রয়িংগুলি দেখা গেল তার মধ্যে অন্তর্জগতের প্রতিফলন আসবার প্রচেষ্টাটাই মুখ্য হয়ে দেখা দিয়েছে। এযুগে তাঁর ঘোড়া, ক্লাউন, যুদ্ধ, অপহরণ, বৃষমূর্তি, নরাহমূর্তি বারাণসীর মন্দির এবং বিশেষ করে খৃষ্টের লাঞ্ছনা ও ক্রুশের যন্ত্রণা, মানুষ ও পশুর সংঘর্ষ ইত্যাদি ছবিগুলি একটা প্রতীকধর্মিতা নিয়ে উপস্থিত হয়েছে। তাঁর কাজের মধ্যে দ্বিধার ভাব চলে গিয়ে একটা দৃঢ় আত্ম-প্রত্যয় ফুটে উঠেছে। রঙের ব্যবহার পরি-ত্যাগ করে কেবলমাত্র সাদা কালোতেই তিনি নিজের বক্তব্যকে উপস্থিত করতে সচেষ্ট হয়েছিলেন। এযুগের বারাণসী ঘাটের কয়েকটি দৃশ্য, উড়ন্ত ঘোড়া এবং খৃষ্টের সমাধি, শক্তি এবং বেদনার প্রকাশ অনেকখানি মর্মস্পর্শী হয়েছে; এবং তাঁর অকালমৃত্যু তাঁর পূর্ণ পরিণতির পথে বাধা হয়ে দাঁড়ানোয় দর্শকের আফশোষের কারণ হয়েছে। প্রদর্শনীর ক্যাটালগটি অতি সুরুচিসম্পন্ন হয়েছিল।

'বেঙ্গলী লিটারেচার' আয়োজিত আলোচনাচক্র ॥

গত ১৩ই সেপ্টেম্বর অকল্যান্ড রোড-স্থিত সাউথ পয়েন্ট ক্লাবে খ্যাতনামা মার্কিন অধ্যাপক এডোয়ার্ড ডিমক কয়েকজন বাঙালী কবি-সাহিত্যিকের সঙ্গে এক আলোচনাচক্রে যোগদান করেন। আলোচনা-চক্রের উদ্বোধন করেন শ্রীসতীকান্ত গুহ। অধ্যাপক ডিমক মূলত অনুবাদ-তত্ত্ব সম্পর্কে আলোচনা করেন। তাঁর মতে অনুবাদ হবে ভাবগত, ভাষাগত নয়। অনুবাদ সম্পর্কে উন্নাসিকতাও পরিহার করতে হবে। বাংলা সাহিত্যের ব্যাপক অনুবাদ প্রয়োজন এবং সেদিক থেকে 'বেঙ্গলী লিটারেচার'-এর ভূমিকা প্রশংসার্হ। অধ্যাপক ডিমক বর্তমানে 'চৈতন্যচরিতামৃত' অনুবাদ করছেন।

কবি-সাংবাদিক দক্ষিণারঞ্জন বসু, গোপাল ভৌমিক, জগন্নাথ চক্রবর্তী, সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়, তরুণ মিত্র ও ক্যাথলিন ও'কনেল প্রভৃতি আলোচনাচক্রে যোগ দেন।

বই চুরি ॥

বই চুরি ভারতীয় গ্রন্থাগারগুলির একটি বিশেষ সমস্যা। অনেক দুষ্প্রাপ্য গ্রন্থও এভাবেই সাধারণের ধরাছোঁয়ার বাইরে চলে যাচ্ছে। জাতীয় গ্রন্থাগারে কয়েক বছরের মধ্যে প্রায় সাতশত বই এভাবে হারিয়েছে। গ্রন্থাগারের গ্রন্থসংখ্যা প্রায় ১৩ লক্ষের মত। সম্প্রতি দেখা গেছে এর প্রায় ৭ শত বই নেই। কিভাবে এসব বই যায়, তারও কোন হদিশ নেই। অথচ আশ্চর্য এই যে, জাতীয় গ্রন্থাগারে যাঁরা পড়তে আসেন, তাঁদের একটা মোটামুটি শিক্ষাগত যোগ্যতা প্রয়োজন। এইসব শিক্ষিত লোকেরাই এভাবে দেশের একটি জাতীয় সম্পত্তির ক্ষতি করছেন, তা ভাবলে যেমন দুঃখ হয় তেমনি তাজ্জব বনে যেতে হয়।

তরুণতম হিন্দি লেখক ॥

অতি সাম্প্রতিককালে হিন্দি সাহিত্যে যাঁরা আবির্ভূত হয়েছেন, তাঁদের সঙ্গে আমাদের পরিচয় সত্যিই খুব সীমিত। যে সমস্ত তরুণ সাহিত্যিক ছোটগল্প রচনার ক্ষেত্রে বিশেষ খ্যাতি অর্জন করেছেন, তাঁদের মধ্যে রমেশ বক্সী, রাজেন্দ্র যাদব, মোহন রাকেশ, রবীন্দ্র কালিয়া, বিজয় চৌহান প্রমুখ উল্লেখযোগ্য।

উপন্যাসের ক্ষেত্রে ফণীশ্বরনাথ রেণু, অমৃতলাল নাগর, মনোহর চৌহান, গুরু দত্ত, সোমা বীরা প্রমুখ তরুণতম লেখক হিসেবে খ্যাতি অর্জন করেছেন।

কবিতায় রাজীব শাক্সেনা, অশোক বাজপেয়ীর খ্যাতি সর্বাধিক। রাজকমল চৌধুরী অবশ্য খ্যাতির দিক দিয়ে সবচেয়ে পরিচিত। গল্প, কবিতা, প্রবন্ধ—সব দিকেই তাঁর সমান প্রভাব। তাঁর অকালমৃত্যু তাঁর পরিচিতির ক্ষেত্রকে আরও প্রসারিত করেছে।

এডওয়ার্ড অ্যালবির নতুন নাটক ॥

'হু ইজ আফ্রেড অব ভার্জিনিয়া উলফ' লিখে বিখ্যাত হয়েছিলেন এডওয়ার্ড অ্যালবি। 'দি চেয়ার্স'-এর প্রতীককল্পনা ও অতি-বাস্তববাদ আরো একটু ভিন্নধরনের স্বাদ ও বৈচিত্র্য সৃষ্টি করতে সক্ষম হয়েছিল। কিন্তু হালে অ্যালবির যে আরেকটি নাটক "ম্যালকম" আলোড়ন তুলেছে, এবং ব্রডওয়ে মঞ্চে যেটি সাফল্যজনক রজনী অতিক্রম করে চলেছে, সমালোচকদের মতে তাতে যে পরিমাণে আছে জনশ্রুতির প্রচার সে তুলনায় নিখাদ নাট্যরসের পরি-বেশনা নেই।

প্রায় সব সমালোচকের অভিমতই হচ্ছে যে এর প্রধান কারণ অ্যালবি নিজের উপর থেকে নিজের দুর্বলতা আর কাটাতে পারছেন না। আগেকার দুটি বিখ্যাত নাটকেরই চরিত্রপরিকল্পনা, পরিবেশ, সমাজ-সচেতনতা এবং বিশেষ বৈচিত্র্যময় স্যুরিয়ালিজমের অতিপরিচিত দৃশ্যাগুলিই যেন পুনরাবৃত্তি করেছে। ফলে 'ম্যালকম' অনন্য-সাধারণ ব্যক্তিত্ব হয়েও পার্শ্বচরিত্রগুলির দুর্বলতার জন্য এবার যেন পাঠকদের কাছে অনেকটাই জনপ্রিয়তা হারিয়েছে। এক সময় তরুণ [illegible] বলেছেন, 'লর্ড টাই ক্যাটিলড [illegible] মিঃ অ্যালবি।' তবে একথা অনস্বীকার্য যে এ নাটকের মূল চরিত্র

ম্যালকম ভার্জিনিয়া উলফের চেয়ে ব্যক্তিত্বময়। আর এই চরিত্রটির প্রয়োগ পরিকল্পনাও অভিনব। নাটকটি সম্পর্কে আরেকটি উল্লেখযোগ্য তথ্য হচ্ছে যে, এ পর্যন্ত অ্যালবির সর্বশেষ নাটক হল এটি এবং প্রখ্যাত ঔপন্যাসিক জেমস পার্ডির সমনামধারী উপন্যাসের ছায়া অবলম্বনে রচিত।

কয়েকটি কানাডিয়ান কাব্যগ্রন্থ ॥

কানাডিয়ান কবিতা সম্পর্কে যাঁদের আগ্রহ আছে তাঁরা অনেক সময়ই সে দেশের তরুণ কবিদের কাব্যগ্রন্থ সম্পর্কে তেমন খবরাখবর কিছু পান না। অথচ একথা সকলেই হয়তো জানেন যে বর্তমান দশকে কানাডায় সবচেয়ে বেশি চর্চা হচ্ছে কবিতার। আমরা কয়েকটি সম্প্রতি প্রকাশিত জনপ্রিয় কাব্যগ্রন্থের নাম জানাচ্ছি।

ডরোথি লিভ্‌সের কাব্যগ্রন্থটির নাম 'দি আনকোয়াইট বেড্'। সম্প্রতি এ বইটি শ্রেষ্ঠ গ্রন্থের বিচারে গভর্ণর-জেনারেল্স পুরস্কার পেয়েছে। ডরোথির কবিতা সঙ্গীতধর্মী। রীতিবৈচিত্র্যে তাঁর কবিতা ধ্বনিময় ও কথ্যরীতির ব্যঞ্জনাধর্মী।

রেমণ্ড সাউস্টারের সংকলিত কবিতা-গ্রন্থটির নাম "দি কালার অব্ দি টাইমস্"। ইনি কানাডার একজন অন্যতম শ্রেষ্ঠ কবি। উইলিয়াম কার্লোস উইলিয়ামস্ এঁ'র কবিতা সম্পর্কে বলেছিলেন, 'এঁ'র কবিতা পড়ে আমি আনন্দ পাই।' বলাবাহুল্য কবিতাগুলির নির্বাচন সাউস্টার নিজেই করেছেন। ১৯৬৪ সালে ইনিও অন্যতম পুরস্কার 'গভর্ণর জেনারেল প্রাইজ' লাভ করেন কবিতার জন্য। অপর বইটির নাম: "ডিউরিং রেইন, আই প্ল্যাণ্ট ক্রিসান্থিমামস"। লেখিকার নাম লক্ষ্মি গীল্। ইনি একেবারে নতুন কবি। এটি তাঁর প্রথম কাব্যগ্রন্থ। "কিন্তু কবিতাগুলির মৌলিকত্ব বিস্ময়কর" —বলেন কাব্যসমালোচক আর্ল বিরনে।

আজকের কানাডায় আরেকজন শক্তিমান তরুণ মহিলা কবি গোয়েণ্ডোলিন ম্যাক্-ইওয়েন। তাঁর কবিতাগ্রন্থ "এ ব্রেকফাস্ট ফর্ বারবারিয়ানস্" হালে অত্যন্ত জনপ্রিয়।

এ বইগুলো প্রকাশ করেছেন "দি রিয়ার্সন প্রেস।" ঠিকানা: ২৯৯, কুইন স্ট্রীট ওয়েস্ট, টোরোণ্টো ২বি, অনটারিও।

অস্ট্রেলিয় ইংরেজী ॥

অস্ট্রেলিয় ইংরেজী আজ স্বীকৃতিলাভ করেছে। এবং বিশ্বে এর জনপ্রিয়তা ক্রমশঃই বাড়ছে। যেমন ওয়েস্ট ইন্ডিজের ইংরেজীও আজ সর্বত্র স্বীকৃতিলাভ করেছে। ইংরেজরা অস্ট্রেলিয় ইংরেজী-কে অসভ্যদের ভাষা ও অসংস্কৃত বলে অভিহিত করেছিল। কিন্তু অস্ট্রেলিয়া এই ভাষাকেই তাদের পবিত্র মাতৃভাষা বলে শ্রদ্ধা করেন। সম্প্রতি ডঃ ডবল্যু এস্ রামসন অস্ট্রেলিয় ইংরেজীর শ্রেষ্ঠত্ব বিষয়ে একটি শ্রমসাধ্য গবেষণগ্রন্থ প্রকাশ করেছেন। বইটির নাম: "অস্ট্রেলিয়ান ইংলিশ: অ্যান হিস্টোরিক্যাল স্টাডি অব দি ভোকাব্যুলারি ১৭৮৮-১৮৯৮"। তিনি এই বিরাট গ্রন্থে অস্ট্রেলিয়ার বিভিন্ন দশকের ইংরেজী পর্যালোচনা করে প্রমাণ করেছেন যে তা বর্বরদের ভাষা নয়—বরং এর মান অনেক উচ্চপর্যায়ের। বইটি প্রকাশ করেছেন ক্যানবেরার অস্ট্রেলিয়ান ন্যাশনাল ইউনিভার্সিটি প্রেস। বইটি অত্যন্ত মূল্যবান এই জন্যে যে এতে ভাষাগত প্রশ্নে বহুদিনের একটি মৌল সমস্যার সদুত্তর মেলে।

দ্রুত পঠন-পাঠনের মাধ্যম ॥

সম্প্রতি চিকাগোর এক প্রকাশনা সংস্থা অতি স্বল্প সময়ে অতিদ্রুত পঠন-পাঠনের এক অভিনব ও সহজ পদ্ধতি নির্ণয় করেছেন। এই পদ্ধতিতে স্মৃতিশক্তিকেও প্রখর করা যায়। সময় স্বল্পতার যুগে দ্রুত পঠনের এই প্রক্রিয়া যে কোন পাঠককে আনন্দিত করবে। "হাউ টু রিড ফাস্টার অ্যান্ড রিটেন মোর" বইটিতে তা বিস্তারিতভাবে বর্ণনা করা হয়েছে।

এই প্রকাশকের মতে, যে কেউ—যিনি বর্তমান পঠন-পাঠনের শ্লথগতিত্ব ইত্যাদি বিষয়ে বিরক্ত তিনিই এই প্রক্রিয়ার সাহায্য নিতে পারেন। গল্প, উপন্যাস, সংবাদপত্র অথবা টেকনিক্যাল বিষয় যে কোন কিছুই কয়েক সেকেণ্ডে, দৃষ্টিপাতমাত্র এবং অতি সংক্ষিপ্ত উপায়ে পড়া সম্ভব। এ বইটি বিনামূল্যে এবং বিনা ডাকমাশুলেই পাওয়া যাবে। লিখুন: "রিডিং", ৮৩৫ ডাইভারসে পার্কওয়ে, ডিপার্টমেণ্ট ৬৭১—০১৭, চিকাগো, ইলিনয় ৬০৬১৪। একটি মাত্র পোস্টকার্ডেই অনুরোধ করা চলে। আপনার "জিপ কোড অবশ্যই ব্যবহার করবেন।

চোর থেকে সাহিত্যিক ॥

কার্ল-হাইঞ্জ ইয়েগার ও তার গুন্ডার দল পোস্ট অফিস থেকে যখন আশিহাজার মার্ক চুরি করে, তখন তার বয়স প্রায় সাতাশ। ইয়েগার ধরা পড়ে ও আদালতের বিচারে তার বারো বছর জেল হয়।

জেলে বসে বসে সে টয়লেট পেপারে "দি ফোরট্রেস" নামে একখানা উপন্যাস লিখে ফেলে এবং জেলের একজন যাজক সেই পান্ডুলিপিটি বাইরে নিয়ে এসে ছাপিয়ে ফেলেন। ১৯৭০ সালে ইয়েগার জেল থেকে মুক্তি পাবার আগেই বাজারে বইটির খুব নামডাক হয়।

মুক্তি পেয়ে বাইরে এসে ইয়েগার ফ্রাঙ্কফুর্টের একটি সংবাদপত্রের সম্পাদনার কাজ নেয় ও জজসায়েবের মেয়েকে বিয়ে করে ফেলে। এরপর ইয়েগার আরও অনেক বই লিখেছে ও প্রচুর পয়সা রোজগার করেছে।

ইতিমধ্যে ইয়েগার বই লেখার পয়সা দিয়ে পোস্ট অফিসের হাজার মার্ক দেনার বেশিরভাগ শোধ করেছে। কিন্তু ডাকবিভাগ বলছে যে তাকে সুদে-আসলে এক লক্ষ দশ হাজার মার্ক দিতে হবে। ইয়েগার অবশ্য মকুব করার জন্যে সরকারের কাছে আবেদন করেছে। সরকার তাকে রেহাই দেবেন কিনা সন্দেহ। যাই হোক চুরির বদনামের জন্যে লেখক হিসেবে ইয়েগারের খ্যাতি একটোটুকু কমে যায়নি।

টেলিভিশনে ও'কেসি ॥

গত ষোলোই জুলাই প্রখ্যাত নাট্যকার সীন ও'কেসির "দি প্লাউ এন্ড স্টারস" টেলিভিশনে প্রচারিত হয়ে গেল। ব্রিটেনের টেলিভিশনে বহুপ্রতীক্ষিত ও'কেসির নাটক বেশ সাড়া জাগিয়েছিল। এ সম্পর্কে ম্যাঞ্চেস্টার গার্ডিয়ান লিখেছে: "ওআন ওয়াণ্ডারস অ্যাবাউট এ ল্যাংগুয়েজ দ্যাট ইজ সো গুড ইন দ্য মাউথস অফ দেন্টস অ্যান্ড ইয়েট স্ট্যাংগ্লড ইন দ্য থ্রোট অফ দ্য নেটিভ"। সাম্প্রতিককালে স্মরণীয় এই নাট্য-প্রযোজনার পরিচালনায় ছিলেন লিলিয়া ডুলান। অভিনয়াংশে ম্যারী কীন, এরিগ গর্মান ও রোনি ওয়ালশ উল্লেখ্য।

রবার্ট লোয়েল-এর নতুন কাব্যগ্রন্থ ॥

সম্প্রতি ফেবার প্রকাশনী প্রখ্যাত কবি রবার্ট লোয়েল-এর "নিয়ার দ্য ওসান" প্রকাশ করেছেন। এই কাব্যগ্রন্থটি নানাকারণে গুরুত্বপূর্ণ। অনুকরণ সম্পর্কে তাঁর শংকা সুবিদিত, যা বর্তমান কবিদের মৌলিকত্বের অন্তরায়স্বরূপ। লোয়েল ব্যর্থ অনুবাদকেও অন্ধ অনুকরণ বলেন। তাঁর নতুন গ্রন্থে হোরেসের গুড-এর অনুবাদ, দান্তের ইনফার্নোর অনুবাদ ও কোরেভেদো এবং গঙ্গোরার সনেটের অনুবাদ আছে।

লোকসঙ্গীতের কোষগ্রন্থ

কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের রবীন্দ্র অধ্যাপক ডক্টর আশুতোষ ভট্টাচার্য মহাশয় বাংলা লোকসাহিত্য এবং লোকসংস্কৃতির ক্ষেত্রে যে অনন্যসাধারণ নিষ্ঠা এবং অধ্যবসায় প্রদর্শন করেছেন তা সর্বজনের প্রশংসায় ধন্য হয়েছে। বাংলা লোকসংস্কৃতির যে বিরাট ঐতিহ্য এতকাল অবহেলিত ছিল আজ তার যথাযোগ্য সমাদর ঘটেছে এবং কিছু সংখ্যক গবেষক ও তরুণ ছাত্র-ছাত্রীদের এই বিষয়ে আগ্রহের শুভ লক্ষণ দেখা যাচ্ছে। ডক্টর ভট্টাচার্য এই বিভাগের জনপ্রিয়তা ও আগ্রহবর্ধনের জন্য দীর্ঘদিনব্যাপী যে সাধনা করে চলেছেন আজ তা সাফল্যলাভ করেছে বলা যায়। ইতিপূর্বে আমরা লোকসংগীতের কোষগ্রন্থ লোকসংগীত রত্নাকরের প্রথম ও দ্বিতীয় খণ্ড দুটির আলোচনা করেছি। সম্প্রতি এই মহাগ্রন্থের তৃতীয় খণ্ডটি প্রকাশিত হয়েছে। এই খণ্ডে 'প থেকে ব' পর্যন্ত বর্ণামালানুক্রমে লোকসংগীতের পরিচয় পাওয়া যাবে। 'প' অক্ষরটির মধ্যে পাঁচালী ও প্রেমসংগীত স্বভাবতই দীর্ঘ স্থানাধিকার করেছে। এরপর 'ব' অক্ষরে আছে বিবাহের গান, বাউল গান এবং বোলান গান। কিন্তু ব্রহ্মসংগীত, ব্রজবুলি, বাসি বিবাহের গান, বিজয়া গান, বাঙ্গ গান, বালিকা পুজার গান প্রভৃতি সংকলিত হয়েছে। বাঘনাচের গান নামক গান কিংবা পাতানাচের গান বা পাট কাটার গান যে প্রচলিত আছে তা আমাদের জানা ছিল না। পুতুল খেলার গান ও পুতুল নাচের গান অংশগুলিও বিশেষ আকর্ষণমূলক। প্রেমসংগীতের তিনটি বিভাগ করা হয়েছে, রাধাকৃষ্ণবিষয়ক, লৌকিক এবং মাঝির গান। এছাড়া বারমাসী গান বা ইতিপূর্বে 'লোকসাহিত্য' গ্রন্থটির তৃতীয় খণ্ডে অন্তর্ভুক্ত হয়নি তাও সংযোজিত হয়েছে। ডক্টর ভট্টাচার্য পাঁচালীগান সংগ্রহ করেছেন প্রধানতঃ মুর্শিদাবাদ জেলা থেকে। আজ থেকে প্রায় পঞ্চাশ বছর আগে এই কলকাতা শহরের উচ্চ মধ্যবিত্ত সমাজে পাঁচালীগানের আদর ছিল। অনেক বিবাহ-বাসরে পাঁচালীগানের আয়োজন হত। সাধারণত এক শ্রেণীর সংগীতকুশলা বাঈজীদের সম্প্রদায় এই সব গান করতেন ভদ্রবাড়িতে আমন্ত্রিত হয়ে। তাঁদের সেই সব গান বোধকরি এতদিনে লুপ্ত। মনে হয়, সেইগুলি পুনরাবিষ্কারে আমাদের সচেষ্ট হওয়া উচিত। পাঁচালি, খেমটা প্রভৃতি গানের সমাদর ছিল পূর্বকালে যেমন পালাকীর্তনের সমাদর ছিল গ্রামবাড়িতে। ডক্টর ভট্টাচার্য বলেছেন—'পশ্চিম সীমান্ত বাংলার লোকসংগীতের মধ্যে পাতা নাচের গানের একটি বিশিষ্ট স্থান

আছে। ইহাতে আদিবাসীর গীতিসুর এবং নৃত্যভঙ্গী সাধারণ বাঙালীর সংস্কৃতির সঙ্গে আসিয়া মিশিয়াছে। জাতীয় সংগীত-সংস্কৃতির সমন্বয়ের ইহা একটি উল্লেখযোগ্য নিদর্শন।'

দৃষ্টান্তস্বারা বাংলাভাষা যে কিভাবে আদিবাসীর ভাষাকে প্রভাবিত করেছে তার পরিচয় পাওয়া যায়। সভ্যতার সংঘাতে যে সব অমূল্য সম্পদ ক্রমশ বিলুপ্তির পথে [illegible] সংগ্রহ [illegible] করেছেন। ডক্টর [illegible] প্রসঙ্গে বলেছেন যে, বিবাহের [illegible] সংগ্রহ করা হয়েছিল তার [illegible] এই গ্রন্থে প্রকাশ করা যায়নি। তিনি বলেছেন—'বাংলার লোকসংগীতের মধ্যে বিবাহের গানই দ্রুত শুধু পরিবর্তনই নহে, লুপ্ত হইতেছে। অথচ বিবাহের গানের মধ্যে দিয়া সমাজের একটি গুরুত্বপূর্ণ অনুষ্ঠানের যে প্রত্যক্ষ পরিচয় উদ্ধার করা যায় তাহা ইতিহাস ও সমাজতত্ত্বের দিক দিয়া বিশেষ মূল্যবান। সুতরাং ইহারা লুপ্ত হইয়া গেলে জাতির একটি বিশিষ্ট সম্পদ লুপ্ত হইয়া যাইবে।' কথাগুলি যুক্তিযুক্ত, সেই কারণে এই কোষগ্রন্থের সুযোগ্য সংকলককে অনুরোধ জানাই বিশেষ বিশেষ বিভাগে যে সব সংগ্রহ তিনি ইতিমধ্যে করেছেন তা বিষয় বিধায়ক নামে বিভিন্নভাবে প্রকাশ করুন। এই খণ্ডের অধিকাংশ গানই আগের খণ্ডগুলির মত কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের স্নাতকোত্তর বাংলা বিভাগের লোকসাহিত্য শাখার ছাত্র-ছাত্রী দ্বারা প্রত্যক্ষ ক্ষেত্র থেকে সংকলকের তত্ত্বাবধানে সংগৃহীত। ৩২ ফর্মার সম্পূর্ণ এই সুবৃহৎ গ্রন্থটি সুমুদ্রিত অথচ এর মূল্য সেই অনুপাতে অনেক কম।

বঙ্গীয় লোকসংগীত রত্নাকর (তৃতীয় খণ্ড) প-ব। আশুতোষ ভট্টাচার্য সংকলিত ও সম্পাদিত। পশ্চিমবঙ্গ লোক-সংস্কৃতি গবেষণা পরিষদ। ৩২, বেচারাম চ্যাটার্জি রোড। কলিকাতা-৩৪। প্রাপ্তিস্থান ডি এম লাইব্রেরী-৪২, বিধান সরণী, কলিকাতা-৬। দাম ছয় টাকা মাত্র।

সংকলন ও পত্র-পত্রিকা

রঙবেরঙ ছোটদের উপযোগী শিল্প ও সাহিত্য-বিষয়ক অভিনব পত্রিকা। কিশোর পাঠকদের উদ্দেশ্য করে বলা হয়েছে : "যারা ছবি আঁকতে, ছবি দেখতে আর ছবি দেখে ভাবতে ভালোবাসে—'রঙবেরঙ' শুধু তাদেরই। কালো কালি দিয়ে নিজের হাতে আঁকা মোটা দাগের ছবি যদি পাঠাও, তবে আমরা সম্পাদকেরা সবচেয়ে খুশী হবো।" বর্তমান সংখ্যাটি হাতে নিয়ে বেশ আশ্চর্য হতে হবে। এই ধরনের পত্রিকা চোখে পড়ে খুব কমই। গল্প, কবিতা, আর শিল্পীদের জীবন সুন্দর ভাষায় রচনা করা হয়েছে। ছবিও আছে অনেকগুলি। ছবির আকার ধরনটাই আলাদা। কেবলমাত্র ছোটরা নয়, বড়রাও এটি সংগ্রহ করতে পারেন।

রঙবেরঙ (জুলাই)—সম্পাদক : নীতিশ মুখোপাধ্যায় ও রজতকুমার বড়ুয়া। ৫, বালীগঞ্জ প্লেস। কলকাতা-১৯। দাম দু' টাকা।

কবিকণ্ঠে লিখেছেন মন্মথনাথ চক্রবর্তী, সুনীলেন্দ্রপ্রকাশ রায়, সমরেশ দাশগুপ্ত, দেবপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়, সুপ্রভাত গঙ্গোপাধ্যায়, বিজয়দেব মণ্ডল, নিত্যগোপাল পোদ্দার, শ্রীলেখা চট্টোপাধ্যায়, নচিকেতা ভরদ্বাজ, প্রণব বন্দ্যোপাধ্যায়, রঞ্জিতবিকাশ বন্দ্যোপাধ্যায় এবং আরো কয়েকজন।

কবিকণ্ঠ (বৈশাখ — আষাঢ়)—সম্পাদক : অসীমকৃষ্ণ দত্ত। নেতাজী সুভাষ রোড। আসানসোল। দাম পঁচাত্তর পয়সা।

●

'কুন্তম' পত্রিকার সাম্প্রতিক সংখ্যায় লিখেছেন মণিভূষণ ভট্টাচার্য, রমেশ্বর হাজরা, মৃন্ময়েশ দাশগুপ্ত, দীপঙ্কর চক্রবর্তী, মিহির আচার্য এবং আরো অনেকে।

কুন্তম। কল্যাণনগরী। বালুরঘাট, পশ্চিম দিনাজপুর।

তস্য তস্য অথবা সূর্য কাঁদলে সোনা

প্রেমেন্দ্র মিত্র

(পূর্ব প্রকাশিতের পর)

বার্থোলমিউ রুইজকে নাবিক-প্রধান করে পিজারো ও আলমাগরো আগের চেয়ে আরো দুটি বড় জাহাজে অস্ত্রশস্ত্র এমন কি ঘোড়া পর্যন্ত নিয়ে পানামা বন্দর থেকে সত্যি একদিন দ্বিতীয় অভিযানে রওনা হয়েছেন।

সে অভিযানও ব্যর্থ। কিন্তু তার ব্যর্থতার ইতিহাসও বিস্ময়কর। "সূর্য কাঁদলে সোনার দেশে" সেবারেও পিজারো কি আলমাগরো পৌঁছুতে পারেননি। কিন্তু অজানা মহাসমুদ্রে দক্ষিণের দিকে যত এগিয়েছেন তত এমন কিছু সব দেখেছেন যা তাঁদের কল্পনারও বাইরে।

এ অভিযানের প্রথমে অসামান্য বিস্ময় নাবিক-প্রধান রুইজকে প্রায় স্তম্ভিত করে দিয়েছে। সমুদ্রের উপকূলে নতুন নতুন বাধিক গ্রাম-নগর নতুন জাতের মানুষ ও পশু-পাখি তারা এ পর্যন্ত অনেক দেখেছেন। সন্দেহে তীরে নেমে কোথাও লুঠপাট করে, কোথাও ভদ্রভাবে বিনিময় করে সোনাদার জিনিস ও অলঙ্কার যা তাঁরা সংগ্রহ করেছেন তা চোখ ধাঁধাবার মতো। সূর্য কাঁদলে সোনার দেশের আশ্বাস এই সব সোনার জিনিসের মধ্যে ভালোভাবেই পাওয়া গেছে। কিন্তু রুপো ও সুখ করলেও এইসব ঐশ্বর্য তাঁদের কল্পনাতীত নয়।

কল্পনাতীত যে বস্তুটি নাবিক-প্রধান রুইজের চক্ষু বিস্ফারিত করে তুলেছে তা তিনি দেখেছেন উপকূল থেকে বহু দূরে মাঝদরিয়ায়।

প্রথমে নিজের চোখকেই বিশ্বাস করতে পারেন নি। বিশ্বাস করা সত্যিই কঠিন। কারণ দিগন্তবিস্তৃত সমুদ্রের মাঝে যা তিনি দেখেছেন তা গোড়াতে পাল তোলা ক্যারভেল জাতীয় বেশ বড় জাহাজ বলেই মনে হয়েছে। এ অজানা সমুদ্রে তাঁদের আগে কোনো ইউরোপীয় জাহাজের পাড়ি দেওয়া ত অবিশ্বাস্য ব্যাপার। ইউরোপীয় যদি না হয় তাহলে নিশ্চয়ই জাহাজটি এই দেশীয়দেরই। কিন্তু নৌ-বিদ্যায় এ সব দেশ ত একেবারে আদিম যুগে পড়ে আছে বললেই হয়। সভ্যতায় অতখানি অগ্রসর মেক্সিকোর মানুষও ত সমুদ্রে জাহাজ ভাসাবার কথা কল্পনাই করতে পারে না। এ পাল তোলা জাহাজ তা হলে কাদের?

কাছাকাছি যাবার পর বিস্ময় আরো বাড়ে।

যা জাহাজ ভাবা গেছল তা জাহাজ নয়, অদ্ভুত বিরাট সম্পূর্ণ নতুন ধরণের এক রকম ভেলা বা ছোট খাটো জাহাজেরই সামিল।

প্রথমে যা শুধু দেখেই অবাক হতে হয়েছিল পরে খুঁটিয়ে তার পরিচয় পাবার পরও সে বিস্ময় মেটেনি বই কমে নি। এই ভেলা-জাহাজ বড় বড় অত্যন্ত হাল্কা এক রকম গাছের কাঠ দিয়ে তৈরী। গাছটির নাম বালসা তা থেকে এই ধরণের জাহাজ-গুলিও বালসা নামে পরিচিত। এই বালসা কাঠের ভেলায় লোহা ত নয়-ই তামার কোনো পেরেকও ব্যবহার করা হয় না। সমস্ত কাঠের গুঁড়িগুলো ওখানকার জঙ্গলের এক রকম শক্ত লতায় বাঁধা। ভেলার ওপর মোটা শরের পাটাতন। তার ভেতর থেকে দুটি শক্ত মাস্তুলের খুঁটি বেঁধে তোলা হয়েছে। সেই মাস্তুলে প্রকান্ড পাল ঝোলানো। এই বালসা বা ভেলা-জাহাজে দাঁড় বলে কিছু নেই। একটি বড়ো হাল আর বাঁকানো হেলানো যায় এমন 'ইয়াক' বা 'কীল' এর সাহায্যে সেটি চালাবার ব্যবস্থা। এ বালসা যারা চালায় তাদের নৈপুণ্য নিশ্চয়ই খুব উঁচুদরের, তা না হলে খোলা সমুদ্রে এই ধরণের ভেলা নিয়ে তারা চলাফেরা করতে সাহস করতো না।

রুইজ তাঁর জাহাজটি বালসা-ভেলার কাছে ভেড়াবার পর উভয় পক্ষই কিছুক্ষণ অবাক হয়ে পরস্পরকে লক্ষ্য করেছে। তারপর পরস্পরের আলাপ পরিচয়ের সুযোগ হয়েছে বালসার একজন আদিবাসী যাত্রীর সাহায্যে।

রুইজ ও তাঁর এসপানিওল নাবিকেরা প্রথমতঃ ভেলা-জাহাজ বালসা আর তারপর তার সওয়ারী নারী পুরুষদের গায়ের সোনা-দানা আর পোষাকের বৈচিত্র্য দেখে যত হতভম্ব ও মুগ্ধ হোক না হলে এই সম্পূর্ণ অজানা অঞ্চলের আজব ভেলা-জাহাজে অমন আশাতীত ভাবে দোভাষী পাওয়াতেও কৌতূহলী হয়ে তাকে একটু ভালো করে লক্ষ্য করত।

কিন্তু তারা সবাই তখন বালসার যাত্রী-দের সোনার গহনার ওজন ও কারুকাজ আর সেই সঙ্গে তাদের গায়ে পশমের মত কি

বস্তুতে চমৎকার নক্সা তুলে বোনা পোষাকের খোঁজ নিতেই তন্ময়।

দোভাষীর কাছেই রুইজ জেনেছেন যে পশমের মত যা দেখতে সে পোষাক ভেড়ার লোম থেকে তৈরী নয়, এ দেশের সম্পূর্ণ ভিন্নজাতের অদ্ভুত এক পশুই তা যোগায়।

সেই দোভাষীই তাঁকে আরো কিছু দক্ষিণের এক বন্দর-নগরের খবর দিয়েছে। সে নগরের নাম টম্‌বেজ। সেখানে গেলে এ দেশের পশম যারা যোগায় সেই অদ্ভুত প্রাণীর পাল মাঠে ঘাটে দেখা যাবে আর যা দেখা যাবে তার বর্ণনা শুনেই রুইজ ও তাঁর সঙ্গীদের চোখ লোভে চক্‌চক্ করে উঠেছে।

সেখানে সোনা আর রুপো নাকি কাঠ কাঠরার মতই সস্তা জানিয়েছে দোভাষী। সোনা রুপো সম্বন্ধে এ ধরণের উচ্ছ্বাস রুইজ বা অন্য এসপানিওলরা এর আগেও অনেক শুনেছে। যত অতিরঞ্জিতই হোক, এ সব বিবরণের মধ্যে কিছু সত্য আছে বিশ্বাস করেই তারা সুখ শান্তি এমন কি জীবনের মায়াও জলাঞ্জলি দিয়ে পাড়ি দিয়েছে এই অজানা বিপদের দেশে। কিন্তু ভেলা-জাহাজ বালসার দোভাষীর আশ্বাসের বেশ ভালো রকম প্রমাণ চাক্ষুষই দেখা গেছে। দেখা গেছে ওই বালসাতেই। ওই

ভেলা-জাহাজে রুইজ আর তার নাবিকেরা কি দেখেছিল তার একটা তখনকার লেখা বিবরণ আছে, একটা পুরোনো পাণ্ডুলিপিতে। তাতে লিখছে 'এস্পেহোস গুয়ার নাসিদস দে লা দি চা প্লাটা। ই তাসাস ই ওট্রাস ভাসিহাস পারা বেবের......

শ্রীঘনশ্যাম দাসকে থামতে হয়েছে। উদর দেশ যাঁর কুম্ভের মত স্ফীত সেই তামশরণবাবুর গলা থেকে জলে কুম্ভ নিমজ্জনের মতই একটা খাবি-খাওয়া গোছের আওয়াজ শোনা গেছে। ধ্বনিটা সত্যিই মারাত্মক কিছু নয়, দাসমশাইকে তাঁর কি যেন বলার চেষ্টা দ্বিধায় সঙ্কোচে ওই ধ্বনিরূপ নিয়েছে।

দাসমশাই অস্ফুট বক্তব্যটা সঠিক অনুমান করে নিয়ে বলেছেন,—ও আপনারা ত আবার স্প্যানিশ জানেন না। ও পাণ্ডুলিপিতে লেখা আছে......

দাসমশাইকে আবার থামতে হয়েছে; এবার বাধা দিয়েছেন মর্মরের মত মস্তক যাঁর মসৃণ সেই শিবপদবাবু। দাসমশাইএর উন্নাসিক কৃপাকটাক্ষটুকুই সহ্য করতে না পেরে শিবপদবাবু জিজ্ঞাসা করেছেন,—পাণ্ডুলিপিটা কি জানতে পারি?

পারেন বইকি।—দাসমশাই অনুকম্পাভরে চেয়ে বলেছেন,—পাণ্ডুলিপির পরিচয় হল রিলেসইয়োর সাকাদা দে লা বিব্‌লিওটেকা ইম্‌পেরিয়াল দে ভিয়েনা।

শিবপদবাবু সামলে ওঠবার আগেই মেদভারে হস্তির মত যিনি বিপুল সেই সদাপ্রসন্ন ভবতারণবাবু তাড়াতাড়ি বলেছেন, পাণ্ডুলিপির নাম জেনে কি হবে মশাই। বালসা—কি ছিল তাই বলুন।

দাসমশাই যেন ভোট অফ্ কন্‌ফিডেন্স পেয়ে আবার সুরু করলেন,— ওই পাণ্ডুলিপি থেকে জানা যায় যে, ভেলা-জাহাজটিতে সোনা রুপোর উঁচুদরের কারুকাজ করা গহনাপত্র ও পশমী পোষাক ছাড়া বিচিত্র আকারের ধাতুর পাত্র আর পালিশ করা রুপোর যে আয়না ইত্যাদি জিনিস রুইজ দেখেন, তা উঁচুস্তরের সভ্যতারই পরিচয় দেয়। এ পর্যন্ত এ ধরণের সূক্ষ্ম ও উন্নত চারুশিল্পের নিদর্শন তাঁরা কোথাও দেখেন নি।

দোভাষীর কাছে টম্‌বেজ নামে বন্দর-নগরের কথা শুনে রুইজ সেখানেই যাবার জন্যে উদ্গ্রীব হয়ে ওঠেন। পথ দেখাবার জন্যে বালসা থেকে দোভাষীকে যে তিনি নিজের জাহাজে তুলে নেন, তা বলাই বাহুল্য। টম্‌বেজ-এ একা যাওয়া অবশ্য তাঁর চলে না। এ অভিযানের নেতা পিজারোর অধীনেই সেখানে যাবার আয়োজন করতে হয়। তাই পিজারো আর তাঁর সঙ্গীদের রিও-দে-সান-জোয়ান নদীর তীরে যেখানে ছেড়ে এসেছিলেন, সেইখানেই প্রথমে ফিরে গেছেন রুইজ।

পিজারো আর তাঁর দল বলের ইতিমধ্যে দুর্দশার একশেষ হয়েছে। রুইজ জাহাজ নিয়ে সে সময়ে না ফিরলে এ দলের অস্তিত্বই থাকত কিনা সন্দেহ। পিজারোর দলের কিছু নাবিক সৈনিক মারা গেছে অসুখে বিসুখে ও অনাহারে। সঙ্গের সামান্য খাবার ফুরিয়ে যাবার পর বুনো আলু,

নোনা [illegible] গরান গাছের তেতো [illegible] কোন আহার তাদের [illegible]। [illegible] বাদা-জঙ্গলে [illegible] কেম্যান-এর পেটে গেছে কেউ কেউ, কারুর জীবনান্ত হয়েছে ওখানকার অজগর আনাকোণ্ডার আলিঙ্গনে। আর কিছু মরেছে আদিবাসীদের গোপন আক্রমণে। ও অঞ্চলের যে আদিবাসীরা প্রথম দিকে স্পেনের অভিযাত্রীদের সূর্যের সন্তান দেবতা বলে ভক্তি দেখেছিল, তারা এস্পানিওলদের সত্যকার স্বরূপ তখন জেনে ফেলেছে।

রুইজ একেবারে শেষ মুহূর্তে জাহাজ নিয়ে ফিরে পিজারো আর তাঁর অনুচরদের শোচনীয় পরিণাম থেকে বাঁচিয়েছেন। পিজারোর ভাগ্য এবার সর্বদিক দিয়েই অনুকূল মনে হয়েছে। শুধু রুইজ নয় আলমাগরোও পানামা থেকে প্রচুর রসদ ও নতুন ভর্তি হওয়া নাবিক-সৈনিক নিয়ে এসে পৌঁছেছে সেই সময়।

রুইজ-এর কাছে পিজারো ও আলমাগরো তাঁর অভিযানের বিস্তারিত বিবরণ শুনে উৎসাহিত হয়ে উঠেছেন। টম্‌বেজ বন্দর-নগরের খবর যার কাছে পাওয়া গেছে ভেলা-জাহাজ বালসা থেকে তুলে নেওয়া সেই দোভাষীর সঙ্গে তাঁরা সরাসরি আলাপ করতে চেয়েছেন।

কিন্তু কোথায় সে দোভাষী! কোথাও তার পাত্তা পাওয়া যায় নি। রিও-দে-সান-জোয়ানের তীরে পিজারোর আস্তানায় ফিরে আসার দিনও দোভাষীকে জাহাজে দেখেছেন, বলে রুইজ-এর মনে আছে। অন্যান্য নাবিকরাও তাঁকে সমর্থন করে জানিয়েছে যে, সেই দোভাষীকে তীরে নামতেও তারা দেখেছে। তারপর থেকে তার আর কোন হদিশ নেই।

নদীর মোহনায় বালুকাময় তীরভূমিতে পিজারো আর তাঁর সাঙ্গপাঙ্গ অনুচরদের ছোট্ট একটা উপনিবেশ। তার চারদিকে দুস্তর বিপদসংকুল বাদাজলা আর দুর্ভেদ্য জঙ্গল। নেহাৎ আহাম্মকের মত জলা-বাদা পার হয়ে যদি না সে কুমীর, অজগর কি জাগুয়ারের শিকার হবার ভয় তুচ্ছ করে পালিয়ে থাকে তাহলে তার এমনভাবে উধাও হওয়া ত অবিশ্বাস্য ব্যাপার। হঠাৎ অকারণে সে পালাতে যাবেই বা কেন?

দোভাষীর অন্তর্ধান-রহস্যের কোন মীমাংসা শেষ পর্যন্ত হয় নি।

তার দেওয়া বিবরণের ওপর নির্ভর করে পিজারো দক্ষিণের বন্দর-নগর টম্‌বেজ খুঁজতে যাওয়ার সংকল্প কিন্তু ছাড়েন নি। দলের সকলেরই মনে এখন নতুন আশা, নতুন উৎসাহ। বুনো আলু আর গরান গাছের ফল খেয়ে যাদের হাড়-চামড়া সার হয়েছিল, তাদের এখন আর রসদের অভাব নেই। আলমাগারোর চেষ্টায় লোকবলও তাদের বেড়েছে। তুমুল উত্তেজনা ও উৎসাহের মধ্যে দুটি জাহাজ প্রায় একসঙ্গেই ছেড়েছে। লক্ষ্য দূর দক্ষিণ সমুদ্রের বন্দর-নগর টম্‌বেজ, এ যুগের স্বর্ণলঙ্কার যা হয়ত প্রথম সোপান।

(ক্রমশঃ)

দেশে বিদেশে

নাথুলায় হামলা

ফটো : অমিতেশ বন্দ্যোপাধ্যায়

সিকিমের রাজধানী গ্যাংটক থেকে একটি রাস্তা হিমালয়ের গা বেয়ে উঠতে উঠতে ১৪৫০০ ফুট উচ্চ একটি গিরিসঙ্কট পর্যন্ত উঠে যেখানে আবার তিব্বতের উপত্যকায় নামতে আরম্ভ করেছে সেইখানে হচ্ছে নাথুলা—সিকিম ও তিব্বতের সীমান্ত। ১৯৫৮ সালের ১৮ই সেপ্টেম্বর তারিখে ভারতের তৎকালীন প্রধানমন্ত্রী সেখানে একটি পাথর পুঁতে সেই সীমানা চিহ্নিত করে এসেছিলেন এবং সেই সঙ্গে চীন ও ভারতের দুই হাজার বৎসরের পুরাতন মৈত্রীর ঘোষণা সেই প্রস্তরফলকে উৎকীর্ণ করেছিলেন।

আজও হয়ত সেই প্রস্তরফলকটি রয়েছে। কিন্তু সেটি আজ আর ভারত-চীন মৈত্রীর প্রতীক নয়, দুই দেশের সৈন্যদের মধ্যে সশস্ত্র সংঘর্ষের ক্ষেত্র।

১৪,৫০০ ফুট উঁচু সেই গিরিবর্ত্মে—যেখানে মে থেকে অকটোবর মাস পর্যন্ত চলে বৃষ্টি আর অকটোবর থেকে মে পর্যন্ত তুষারপাত, সেখানে একদিকে ভারতীয় সীমান্তরক্ষী আর একদিকে লালচীনের সৈনিকরা পরস্পরের মুখোমুখি দাঁড়িয়ে আছে গত কয়েক বছর ধরে। চীনারা তাদের দিকে মাও সে তুং-এর একটি বিরাট প্রতিকৃতি খাড়া করেছে এবং কিছুকাল ধরে মাইক্রোফোনে চীনা সঙ্গীত সহযোগে ভারতীয় জওয়ানদের উদ্দেশে সংস্কৃত-ঘেঁষা হিন্দীতে বাণী বিতরণ করছিল। উল্টোদিকে সিকিমের দিক থেকে ভারতীয় সৈন্যবাহিনীর মাইক্রোফোনে বোম্বাইয়ের হিন্দী ফিল্মের সঙ্গীত সহযোগে চীনা ভাষায় বাণী বিতরণ করা হচ্ছিল।

গত সপ্তাহে কামানের গর্জন যখন নাথুলার ঐ সঙ্গীতকে স্তব্ধ করে দিচ্ছিল তখন মাও-সে-তুং-এর প্রতিকৃতিটিও ছিন্ন-ভিন্ন হয়ে গেল।

সোমবার ১১ই সেপ্টেম্বর ভোর পাঁচটায় এই সীমান্তে চীনারা অকস্মাৎ বিনা-প্ররোচনায় ৭৬ মিলিমিটার কামান থেকে ভারতীয় সীমান্তরক্ষীদের উপর গোলাবর্ষণ করতে আরম্ভ করল।

এই সংবাদ গত সপ্তাহে সারা ভারত-বর্ষে—এবং ভারতবর্ষের বাইরেও—প্রবল চাঞ্চল্যের সৃষ্টি করল। কেননা, ১৯৬২ সালের আক্রমণের পর চীনারা ইতিপূর্বে আর কখনও সীমান্ত সংঘর্ষে কামান ব্যবহার করেনি। গত পাঁচ বছরে ভারত-চীন সীমান্তে যেসব হাঙ্গামা হয়েছে সেগুলিতে চীন শুধু হাতে বহন করা যায় এমন আগ্নেয়াস্ত্র ব্যবহার করেছে।

তিব্বত-সিকিমের সীমানা ১৮৯০ সালের ইঙ্গ-চীন চুক্তির দ্বারা সুনির্দিষ্ট এবং এই সীমানা বর্তমান চীনা সরকারও মেনে নিয়েছেন। তৎসত্ত্বেও কিছুকাল যাবৎ চীনা সৈন্যরা সীমান্ত অতিক্রম করে সিকিমের এলাকায় অনুপ্রবেশ করছিল। সম্প্রতি চীনারা একটি বাঙ্কার তৈরী করে যার কিছু অংশ সিকিমের এলাকার মধ্যে পড়ে। এই ধরনের চীনা অনুপ্রবেশ বন্ধ করার জন্য এবং টহলদার ভারতীয় সৈন্যরা যাতে ভুল করে চীনা এলাকায় না ঢোকে সেজন্য ভারতীয় সৈন্যবাহিনী নাথুলার সীমান্তে একটি তারের জালের বেড়া দিচ্ছিল। গত ৬ই সেপ্টেম্বর তারিখে যখন এই বেড়া দেওয়ার কাজ চলছিল তখন ৬০ জন চীনা সৈনিক ভারতীয় সৈনিকদের বাধা দেওয়ার চেষ্টা করে। একটা ধস্তাধস্তি হয় এবং তাদের হুঁসিয়ার করে দিলে তারা সরে যায়। ৯ই ও ১০ই সেপ্টেম্বর তারিখে ছোট ছোট দলে সেই বেড়া পার হয়ে তারা সিকিম এলাকার ভিতরে ঢুকে এবং সেখানে কিছুক্ষণ দাঁড়িয়ে ভারতীয় সীমান্তরক্ষীদের হোঁসিয়ার শুনে ফিরে যায়। ১০ই সেপ্টেম্বর তারিখে চীনা পররাষ্ট্র বিভাগ থেকে প্রতিবাদ জানিয়ে বলা হয় যে, ভারতীয় সৈন্যরা চীনের এলাকায় প্রবেশ করেছিল।

এর পরদিন ভোরবেলা থেকেই নাথুলা সীমান্তে চীনারা গোলাবর্ষণ আরম্ভ করল। ভারতীয় সৈন্যরা পাল্টা জবাব দিল। কিছু থেমে থেমে এই গোলাবিনিময় ১৪ই সেপ্টেম্বর সকালবেলা পর্যন্ত চলেছে।

সংঘর্ষ শুরু হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে ভারতের পক্ষ থেকে প্রস্তাব দেওয়া হয় যে, অবিলম্বে সীমান্তে অস্ত্রসম্বরণ করে দুই পক্ষের স্থানীয় সেনাধ্যক্ষ মিলিত হয়ে ভবিষ্যতে এমন ঘটনা যাতে আর না হয় তার ব্যবস্থা অবলম্বন করুন। ১১ই সেপ্টেম্বর তারিখে নয়া দিল্লীর চীনা দূতাবাসে পাঠানো এই ভারতীয় নোটে বলা হয় যে, এই সশস্ত্র হামলা করে চীনা সরকার এমন একটা স্থানে উত্তেজনা সৃষ্টি করতে চাইছেন যেখানে কোন বিরোধ ছিল না। নোটে বলা হয়, "চীনা সরকার ভালই জানেন, সিকিম-তিব্বত সীমান্ত সুনির্দিষ্ট এবং চীনও তা স্বীকার করে নিয়েছে।"

১২ই সেপ্টেম্বর তারিখে ভারত সরকারের পক্ষ থেকে পুনরায় অস্ত্রসম্বরণের প্রস্তাব দেওয়া হয়।

কিন্তু চীন এই প্রস্তাব গ্রহণ করেনি। উপরন্তু ১৩ই সেপ্টেম্বর তারিখে নাথুলার ২০ মাইল দক্ষিণে জেলাপলাতে চীনা মাইক্রোফোনে ভারতীয় বাহিনীকে এই বলে হুমকি দেওয়া দেওয়া হল যে, ঐদিন বিকাল ৬টার মধ্যে ভারতীয় বাহিনী যদি তাদের প্ররোচনামূলক কাজ বন্ধ করে সরে না যায় তাহলে চীনা বিমান থেকে বোমাবর্ষণ করা হবে। ১৪ই সেপ্টেম্বর তারিখে চীনের পক্ষ থেকে বলা হল, অস্ত্রসম্বরণের জন্য ভারত যে প্রস্তাব দিয়েছে সেটা "নিছক ধোঁকা-বাজী।"

১৪ই সেপ্টেম্বর থেকে চীনারা গোলা-গুলী বন্ধ করেছে বটে, কিন্তু সেটা সাময়িক, না, দীর্ঘস্থায়ী সেটা বোঝা যাচ্ছে না।

চীনারা এই সময়ে নাথুলায় আবার নতুন করে একটা হাঙ্গামা বাধাল কেন এবং তাদের প্রকৃত মতলব কি সে বিষয়ে ভারতে ও ভারতের বাইরে স্বভাবতই গবেষণা হচ্ছে। এ বিষয়ে বিভিন্ন মত প্রকাশ করা হয়েছে। যেমন,

১। এটা লক্ষণীয় যে, সিকিমের চোগিয়াল যখন ভারতে তাঁর সফর সেরে দেশে ফিরছিলেন এবং ফিরবার পথে তিনি যখন বলছিলেন যে, ভারতের সঙ্গে সিকিমের মৈত্রী চিরস্থায়ী হবে ঠিক তখনই চীনারা এই সীমান্তে আক্রমণ শুরু করে। "হিন্দী-চীনী ভাই ভাই" পাঠ যদিও সিকিমের সঙ্গে ভারতের বিশেষ সম্পর্ক, (যে বিশেষ সম্পর্কের একটি দিক হল, সিকিমের দেশরক্ষার দায়িত্ব ভারতের হাতে

ন্যস্ত) স্বীকার করে নিয়েছিল, আজকের দিনে চীনের প্রবল চেষ্টা হচ্ছে কি করে এই সম্পর্কের মধ্যে ফাটল ধরান যায়। এই সময়ে নাথুলায় আক্রমণ শুরু করে চীন হয়ত চোগিয়ালের ভারত সফরে অসন্তোষ প্রকাশ করতে ও সিকিমকে ভয় দেখাতে চেয়েছে।

২। চীনা পররাষ্ট্রমন্ত্রী মার্শাল চেন ই আগামী মাসে পাকিস্থানে সফর করতে আসছেন। তার আগে এই আক্রমণ করার একটা উদ্দেশ্য এই হতে পারে যে, চীন পাকিস্থানকে দেখাতে চায়, সে পাকিস্থানের সঙ্গে হাত মিলিয়ে ভারতবর্ষকে বিব্রত করতে সব সময়েই প্রস্তুত। এটা লক্ষণীয় যে, নাথুলার এবারকার সংঘর্ষ সম্পর্কে পূর্ব পাকিস্থান চীনের সঙ্গে পুরোপুরি হাত মিলিয়ে ভারতের বিরুদ্ধেই দোষারোপ করেছে।

৩। নকশালবাড়ী-ওয়ালাদের উৎসাহিত করাও চীনের উদ্দেশ্য হয়ে থাকতে পারে। নকশালবাড়ীর আন্দোলন যাঁরা পরিচালনা করেছেন পিকিং তাঁদের পিঠ চাপড়ে দিয়েছে। যে সীমান্তে এবার সংঘর্ষ হয়েছে সেখান থেকে নকশালবাড়ী এলাকা খুব দূরে নয়।

৪। কারও কারও মত হচ্ছে, চীনারা ছয় হাজার মাইল দীর্ঘ ভারত-চীন সীমান্তের অন্য কোথাও হামলা করার প্রস্তুতি হিসাবেই নাথুলায় হামলা করেছে। এতে ভারতের দৃষ্টি একদিকে আবদ্ধ করে অন্যদিক দিয়ে অতর্কিত আক্রমণ চালাবার সুবিধা পাওয়া যাবে। আমাদের সীমান্তের এক অংশ থেকে অন্য অংশে সহজে যাতায়াতের পথ নেই। কিন্তু তিব্বতের মালভূমিতে চীনা সৈনাদের পক্ষে সহজেই এক স্থান থেকে অন্য স্থানে যাওয়া সম্ভব। কাজেই চীনারা একটা বৃহৎ ভারতীয় বাহিনীকে নাথুলায় আটকে রেখে নেফায় অপেক্ষাকৃত উচ্চতর স্থান থেকে আক্রমণ চালাবার চেষ্টা করতে পারে।

৫। আর একটি মত হচ্ছে, ভারত-চীন সীমান্তে মোতায়েন চীনা সৈন্যবাহিনীর মধ্যে মাও-বিরোধী মনোভাব দেখা দেওয়ায় এই বাহিনীর পরিবর্তে মাওয়ের অধিকতর অনুগত সেনাবাহিনী মোতায়েন করার প্রয়োজন দেখা দিয়েছে। ভারত-চীন সীমান্তে উত্তেজনার ছুতায় সেখানে নতুন সৈন্য আমদানী করে মাও-য়ের অনুগত বাহিনীর শক্তি বৃদ্ধি করার চেষ্টা হতে পারে।

৬। এমনও হতে পারে যে, এই সংঘর্ষ নিছক স্থানীয় চীনা সৈন্যাধ্যক্ষের কেরামতি, এর পিছনে হয়ত পিকিং-এর কোন নির্দেশ ছিল না।

ভারত সরকার এই নতুন চৈনিক উপদ্রবকে কি দৃষ্টিতে দেখছেন তা এখনও উপযুক্ত কর্তৃপক্ষসম্পন্ন কেউ পরিষ্কার করে বলেননি। তবে এই সংঘর্ষ অধিকতর বিস্তৃত ও তীব্রতর হতে পারে, সেই সম্ভাবনার জন্য তাঁরা প্রস্তুত হচ্ছেন বলে মনে হচ্ছে। পশ্চিমবঙ্গে অসামরিক প্রতিরক্ষার ব্যবস্থাকে আবার ঝালাই করে তোলার সিদ্ধান্তের মধ্য দিয়ে তার একটা আভাস পাওয়া যাচ্ছে। ভারতবর্ষ নিজে থেকে এই সংঘর্ষকে খুঁচিয়ে তুলবে না, কিন্তু চীন হাঙ্গামা বাধাতে চাইলে ভারতবর্ষের তরফ থেকে তার উচিত জবাব দেওয়া হবে—এই হচ্ছে ভারত সরকারের নীতি।

এখন পর্যন্ত ভারতবর্ষ যে এই সংঘর্ষের মধ্যে বড় রকমের কোন আশঙ্কার কারণ দেখছেন না তার কয়েকটা লক্ষণ প্রকাশ পাচ্ছে। যেমন, সীমান্তে হামলার দরুণ প্রতিরক্ষা মন্ত্রী সর্দার স্বরণ সিং তাঁর মস্কো যাত্রার কর্মসূচী স্থগিত রাখেননি, সেনানী-মণ্ডলীর অধ্যক্ষ জেনারেল কুমারমঙ্গলম তাঁর বিদেশ সফর বাতিল করে ফিরে আসেননি, প্রধানমন্ত্রী শ্রীমতী ইন্দিরা গান্ধীও তাঁর সিংহল যাত্রার সংকল্প স্থগিত রাখেননি। আর একটি লক্ষণীয় ব্যাপার এই যে, ওয়াশিংটনে উপ-প্রধানমন্ত্রী শ্রীমোরারজী দেশাই বলেছেন যে, এই সংঘর্ষ দীর্ঘস্থায়ী হবে বলে তিনি মনে করেন না।

চিন্তার আলোকে চলচ্চিত্র

ভবরঞ্জন ভট্টাচার্য

বিদেশী ছবির ক্ষেত্রে আমরা সাধারণতঃ জীবনভিত্তিক ছবি নির্মাণের মনোভাব দেখতে পাই না। বিদেশী ছবি বিশেষতঃ আমেরিকা, ইটালী, ফরাসী ইত্যাদি দেশের ছায়াচিত্রের প্রধান উদ্দেশ্য যৌন আবেদন-মূলক ছবি নির্মাণ। এই জন্যই 'ওরিয়েন্ট বাই নাইট' এর মত 'বাই নাইট' ছবিগুলো দেখতে পাই আর 'জেমস বণ্ড' ধরনের ছবিগুলোও কম ক্ষতিকারক নয়। হিন্দীতেও এইসব ছবি উঠছে (এবং অদূরভবিষ্যতে হয়তো 'বাই নাইট' ছবিও উঠবে) অবশ্য সমাজতান্ত্রিক দেশগুলোর ছবির বেশীরভাগই স্বাধীনতা সংগ্রাম অথবা সাধারণ সমাজের জীবনযাত্রার পটভূমিকায় নির্মিত। রাশিয়া, চেকোশ্লোভাকিয়া, যুগশ্লাভিয়া ইত্যাদি দেশের ছবিগুলি প্রায় সব বাস্তবধর্মী। অবশ্য বর্তমান যুগোশ্লাভিয়ার কিছু ছবিতে 'হলিউডী' গন্ধও বেশ অনুভব করা যায়। পোলিশ ছবিগুলোর ক্ষেত্রেও তাই। তাই দেখি যুগোশ্লাভ, পোলিশ ও চেক ছবি 'এবনশ্যাম লাভ', 'ক্রাইম এ্যাট দি গার্লস স্কুল', 'নাইফ ইন দি ওয়াটার', 'দি প্যাসেঞ্জার' ইত্যাদিকে।

ভাল কাহিনীর ছবি, বাস্তবিক রুচি-সম্মত ছবি অজ্ঞ আর নেই। (থাকলেও অতি নগণ্য)। চিত্রের মাধ্যমে রুচি আজ ভিন্নধর্মী, যৌন আবেদনমূলক চিত্রের দিকে ঝোঁক বেশী। আবার চাহিদার জন্য আরো এইরকম ছবির নির্মাণ। এইভাবে 'সাই ক্লক'ভাবে এসব ছবির প্রদর্শন বেড়ে চলেছে। এসব ছবি চললে কিছু লোকের স্বার্থসিদ্ধি হয় সন্দেহ নেই। যুবসমাজকে বেশ ভুলিয়ে রাখা যায় অন্যদিকে। ওরা সচেতন হলে যে ওদেরই বিপদ। তাই এই ধরনের চিত্র-প্রদর্শন বন্ধ হবে না (সামান্য নোংরা পোস্টার মারা বন্ধ করা যায় না তো আবার চল চ্চিত্র!) উদ্দেশ্য সাধু, কিন্তু এই নোংরা, কদর্য ষড়-যন্ত্রের কি শেষ হবে না? সমস্ত ফিল্ম ইন্ডাস্ট্রী নজর দিলে ভাল ছবি চলতে বাধ্য। সংশ্লিষ্ট মহল এইসব ছবির প্রদর্শন বন্ধ করে ভাল, সুচিন্তিত, শিল্পগুণসম্পন্ন ছবি নির্মাণে সহায়তা করলে সকলের ধন্য-বাদের পাত্র হবেন। সমাজের ভালর মন্দয় ওদেরও হাত আছে।

(উলুবেড়িয়া মহাবিদ্যালয় বার্ষিক পত্রিকা॥ ১৩৭৪)

কোয়াসার

মৃত্যুঞ্জয়প্রসাদ গুহ

সম্প্রতি লস্ আলামস্-এর বিজ্ঞানী টেরেল কোয়াসারের অস্তিত্ব সম্পর্কে এক নতুন প্রস্তাব দিয়েছেন। কেম্ব্রিজের বিজ্ঞানী হয়েল এবং ক্যালিফোর্নিয়ার বিজ্ঞানী বারবিজও এই মতবাদ সম্ভবপর বসে স্বীকার করেছেন। এ'রা বলেন, আমাদের নক্ষত্রজগতেই (ছায়াপথ) কিংবা আমাদের নিকটবর্তী কোন নক্ষত্রজগতে স্বল্পকাল আগেই হয়তো এক ভয়ংকর বিস্ফোরণ ঘটে গেছে এবং তারই ফলে হয়তো এসব কোয়াসারের সৃষ্টি হয়েছে। এরা অপেক্ষাকৃত কাছ দিয়েই অত্যন্ত দ্রুতবেগে আমাদের নিকট থেকে দ্রুত ছুটে পালিয়ে যাচ্ছে। অন্যান্য গ্যালাক্সীর তুলনায় এরা অনেক কাছ দিয়ে ছুটে চলেছে বলেই হয়তো এদের আপেক্ষিক গতিবেগ এত বেশী বলে মনে হচ্ছে। আর এজন্যেই হয়তো এদের লাল-অপসরণের মাত্রা এত বেশী বলে মনে হচ্ছে। বলা বাহুল্য, এরা যদি আমাদের কাছ দিয়েই যাচ্ছে বলে মনে করা যায়, তাহলে এরা অপরিমিত তেজ-শক্তির আধার, এরূপ মনে করবার দরকার হয় না।

কিন্তু বিজ্ঞানী স্মিড এই মতবাদ সমর্থন করেন নি। তিনি বলেন, আমাদের নক্ষত্রজগতে কিংবা আমাদের নিকটবর্তী কোন নক্ষত্রজগতে এক ভয়ংকর বিস্ফোরণের ফলেই যদি এসব কোয়াসারের উৎপত্তি হয়ে থাকে, তাহলে সকলেই আমাদের কাছ থেকে ছুটে পালিয়ে যাচ্ছে—এটা হতে পারে না। কেউ কেউ নিশ্চয়ই বিপুল বেগে আমাদের দিকে ছুটে আসবে। কাজেই কোন কোনটির আলোর বর্ণালী নিশ্চয়ই নীল আলোর দিকে সরে যাবে। আবার কেউ কেউ নিশ্চয়ই আশেপাশে সরে যাবে, তখন তাদের প্রকৃত গতি নিশ্চয়ই প্রত্যক্ষ করা সম্ভব হবে। কিন্তু কই, এরূপ ঘটনা তো কেউ আজ পর্যন্ত প্রত্যক্ষ করতে সক্ষম হন নি। তাই স্মিড বলেন, কোয়াসার আমাদের নক্ষত্র-জগতের নিকটে অবস্থিত দ্রুত ধাবমান কোন জ্যোতিষ্ক, এরূপ প্রস্তাব মেনে নেওয়া যায় না। সুতরাং এখন একথা অবশ্যই স্বীকার করতে হবে যে, কোয়াসারের অপরিমিত তেজ-শক্তির উৎস সম্পর্কে বিজ্ঞানীরা যে তিমিরে ছিলেন, সেই তিমিরেই রয়ে গেছেন।

যাহোক, পৃথিবী থেকে অনুসন্ধান চালিয়ে জ্যোতির্বিজ্ঞানীরা আজও ঠিক বুঝতে পারছেন না যে, কোয়াসার দূর-দিগন্তের অধিবাসী কোন অতিকায় নীহারিকা বা ঘনসন্নিবিষ্ট কতকগুলি তারকার সমষ্টি, না অতিনোভা। তবে এরা যে মহাকাশের প্রত্যন্ত দেশে অবস্থিত এক একটি অতি উজ্জ্বল জ্যোতিষ্ক, সে বিষয়ে এখন অধিকাংশ বিজ্ঞানীই একমত হয়েছেন. যদিও তাঁরা এখন পর্যন্ত এদের অপরিমিত তেজ-শক্তির উৎস সম্পর্কে সঠিক কোন সিদ্ধান্তে উপনীত হতে পারেন নি।

...কোয়াসার যদি সত্য সত্যই দূর-দিগন্তের জ্যোতিষ্ক হয়, তাহলে একথা আমাদের স্বীকার করতেই হবে যে, আমরা এখন প্রায় ১০ মহাপদ্ম বছর আগেকার ঘটনা প্রত্যক্ষ করতে সক্ষম হচ্ছি। কারণ পৃথিবীতে বসে সবচেয়ে দূরবর্তী কোয়াসরের যে আলো আমরা দেখতে পাচ্ছি, তা ঐ জ্যোতিষ্ক থেকে যাত্রা করেছিল প্রায় ১০ মহাপদ্ম বছর আগে! জানি না, হয়তো ইতিমধ্যে ঐ কোয়াসারের আলো নিবে গেছে, কিন্তু সে খবর যে আমরা করে জানতে পারবো, তা কে বলবে? অনেকের অনুমান, এই পৃথিবীর সৃষ্টি হয়েছিল ৫ মহাপদ্ম বছর আগে। তাহলে বলতে হয় যে, কোয়াসারের সৃষ্টি হয়েছিল তারও প্রায় ৫ মহাপদ্ম বছর আগে; অর্থাৎ এই বিশ্ব-ব্রহ্মাণ্ডের সৃষ্টি হয়েছিল অন্ততঃ ১৮ মহাপদ্ম বছর আগে।

[জ্ঞান ও বিজ্ঞান ।। সেপ্টেম্বর ১৯৬৭]

পন্ডিত হরিচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়

হীরেন্দ্রনাথ দত্ত

১৩০৯ সালে অর্থাৎ বিদ্যালয়-প্রতিষ্ঠার বৎসরকাল মধ্যেই হরিচরণবাবু শান্তিনিকেতনের কাজে যোগ দিয়েছিলেন। কর্মনিষ্ঠার দ্বারা অল্পকাল মধ্যেই নিঃসন্দেহে রবীন্দ্রনাথের শ্রদ্ধা আকর্ষণ করেছিলেন, নতুবা কাজে যোগ দেওয়ার পর দু' বৎসর অতিক্রান্ত হতে না হতেই ৩৭।৩৮ বৎসরের এক যুবককে ঐ সুবৃহৎ অভিধান রচনার কার্যে আহ্বান করতেন না। অপর-

পক্ষে শান্তিনিকেতনে বসবাসের শুরু থেকেই বিদ্যাচর্চায় যে উৎসাহ এবং উদ্দীপনা তিনি বোধ করেছেন সে কথা আত্মপরিচয় প্রসঙ্গে হরিচরণবাবু নিজ মুখেই ব্যক্ত করেছেন। সুতরাং রবীন্দ্রনাথের প্রস্তাব তাঁর কাছে দেবতার আশীর্বাদের মতো মনে হয়েছে। তিনি তৎক্ষণাৎ নম্র হৃদয়ে নতমস্তকে কবির আদেশ শিরোধার্য করে নিলেন। ১৩১২ সালে অভিধান রচনার সূচনা, রচনাকার্য সমাপ্ত হল ১৩৩০ সালে। মাঝে আর্থিক অনটনের দরুণ শান্তি-নিকেতনের কর্ম ত্যাগ করে তাঁকে কিছুকালের জন্য কলকাতায় যেতে হয় এবং অভিধান-সংকলনের কাজ বন্ধ থাকে। এটি তাঁর নিজের পক্ষে যেমন রবীন্দ্রনাথের পক্ষেও তেমনি ক্লেশের কারণ হয়েছিল। তাঁকে অবিলম্বে শান্তিনিকেতনে ফিরিয়ে আনবার জন্যে কবি নিজেই উদ্যোগী হলেন। রবীন্দ্র-নাথের আবেদনক্রমে বিদ্যোৎসাহী মহারাজ মণীন্দ্রচন্দ্র নন্দী অভিধান রচনাকার্যে সহায়তার উদ্দেশ্যে হরিচরণবাবুর জন্য মাসিক পঞ্চাশ টাকার একটি বৃত্তি ধার্য করেন। ১৩১৮ সাল থেকে অভিধান সংকলন কার্য শেষ হওয়া পর্যন্ত তেরো বৎসরকাল তিনি এই বৃত্তি ভোগ করেছেন। বাংলাদেশের গৌরবের কথা যে, ইংরেজি ভাষার প্রথম অভিধান রচয়িতা ডক্টর জনসন যে সহায়তা থেকে বঞ্চিত হয়েছিলেন হরিচরণবাবুর বেলায় তা ঘটে নি। মহারাজের মহানুভবতার কথা শেষ পর্যন্ত কৃতজ্ঞচিত্তে স্মরণ করেছেন; আর রবীন্দ্রনাথ যে তাঁর জন্যেই উপযাচক হয়ে মহারাজের কাছে আবেদন জানিয়েছিলেন সে কথাও মুহূর্তের জন্য বিস্মৃত হন নি। মুদ্রণকার্য শুরু হবার পূর্বেই মহারাজ মণীন্দ্রচন্দ্রের মৃত্যু হয়। যাঁর সহায়তায় অভিধান রচনা সম্ভব হল তাঁকে স্বহস্তে একখণ্ড অভিধান কৃতজ্ঞতার অর্ঘ্যস্বরূপ অর্পণ করতে পারেন নি, এই দুঃখ শেষ পর্যন্ত তাঁর ছিল। ১০৫ খণ্ডে সমাপ্ত অভিধান-মুদ্রণ শেষ হবার পূর্বে রবীন্দ্রনাথও বিদায় নিলেন।...পাণ্ডু-লিপির কাজ শেষ হয় ১৩৩০ সনে। তার পরেও, প্রায় দশ বৎসরকাল অপেক্ষা করতে হয়েছে—অর্থাভাবে মুদ্রণকার্যে হাত দেওয়া সম্ভব হয় নি।

এরূপ বিরাট গ্রন্থ প্রকাশের সামর্থ্য বিশ্বভারতীর ছিল না। অবশ্য মাঝে এই কয়েক বৎসরও তিনি অভিধানের নানা পরিবর্তন-পরিবর্ধনের কাজ নিয়েই ব্যস্ত ছিলেন। অবশেষে ১৩৩৯ সালে মুদ্রণকার্য শুরু হয়। তিনি নিজেই তাঁর যৎকিঞ্চিৎ সম্বল নিয়ে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র খণ্ডে প্রকাশের আয়োজন করেন। প্রাচ্যবিদ্যা মহার্ণব-নাথ বসু মহাশয় মুদ্রণ ব্যাপারে উদ্যোগী হয়েছিলেন। শান্তিনিকেতনের প্রাক্তন ছাত্ররা এবং শান্তিনিকেতনের অনুরাগী কিছু-সংখ্যক শিক্ষিত ব্যক্তি নিয়মিত গ্রাহক হয়ে এই ব্যাপারে যথেষ্ট আনুকূল্য করেন।

১৩১২ সালে রচনার সূচনা, ১৩৫২ সালে মুদ্রণকার্য সমাপ্ত। জীবনের চল্লিশটি বছর এক ধ্যান, এক জ্ঞান, এক কাজ নিয়ে কাটিয়েছেন। এ এক মহাযোগীর জীবন। বাঙালী চরিত্রে অনেক গুণ আছে, কিন্তু নিষ্ঠার অভাব। এদিক হরিচরণ বন্দ্যো-পাধ্যায় বাঙালী জাতির সম্মুখে এক অত্যুজ্জ্বল দৃষ্টান্ত রেখে গিয়েছেন। নিষ্ঠার যথার্থ পুরস্কার অভীষ্ট কার্যের সফল সমাপ্তি। এর অধিক কোনো প্রত্যাশা তাঁর ছিল না। সুখের বিষয়, লৌকিক পুরস্কারও কিছু তাঁর ভাগ্যে জুটেছে। কলকাতা বিশ্ব-বিদ্যালয় তাঁকে সরোজিনী স্বর্ণপদক দিয়ে সম্মানিত করেছেন। শান্তিনিকেতন আশ্রমিক সংঘ প্রাচীন ভারতীয় রীতিতে ষোড়শো-পচারে সম্বর্ধনা জ্ঞাপন করেছিলেন। সর্বশেষে বিশ্বভারতী তাঁকে 'দেশিকোত্তম' (ডি, লিট) উপাধি দানে সম্মানিত করেন।

[বিশ্বভারতী।, শ্রাবণ-আশ্বিন ১৩৭৪]

তথ্য বিস্ফোরণ বিংশ শতাব্দীর একটি সমস্যা

প্রবীর রায়চৌধুরী

বিংশ শতাব্দীতে আমরা প্রায়ই দুটি বিস্ফোরণের কথা শুনে থাকি—আণবিক বিস্ফোরণ ও জনসংখ্যার বিস্ফোরণ। এর সাথে আরও একটি বিস্ফোরণ—তথ্য ও জ্ঞানের বিস্ফোরণ (Explosion of Information and knowledge)—পৃথিবীর বিজ্ঞানী, গবেষক, তথ্যবিজ্ঞানী ও গ্রন্থা-গারিকদের বিশেষভাবে চিন্তিত করে তুলেছে। কি গুণগত দিক, কি পরিমাণগত দিক কোন দিক থেকেই তথ্য ও জ্ঞানের এই বিস্ফোরণ আণবিক বিস্ফোরণ ও জনসংখ্যার বিস্ফোরণের চেয়ে কম গুরুত্বপূর্ণ নয়। বিখ্যাত Nature পত্রিকার এক প্রবন্ধে বিষয়টি সম্পর্কে মন্তব্য করতে গিয়ে বলা হয়েছে যে পৃথিবীর জনসংখ্যা যেখানে শতকরা ২ ভাগ হারে বাড়ছে সেখানে বৈজ্ঞানিক প্রকাশনের সংখ্যা শতকরা ৫-১০ ভাগ হারে বাড়ছে। ......গবেষণা ও আবি-ষ্কারের ফলে অনেক অনাবিষ্কৃত তথ্য ও তত্ত্ব আমাদের সামনে ফুটে উঠছে—নূতন দিগন্ত পরিলক্ষিত হচ্ছে। তথ্য বিস্ফোরণের এই গুণগত দিকের একটি প্রধান বৈশিষ্ট্য হল এক বা একাধিক বিষয় এক বা একাধিক বিষয়ের সংগে সংশ্লিষ্ট হয়ে নূতনতর বিষয় সৃষ্টি করছে। ......তথ্য বিস্ফোরণের আরও একটি গুণগত দিক হল একটি বিষয়ের গভীর থেকে গভীরতর, সূক্ষ্ম থেকে সূক্ষ্মতর গবেষণার ফলে নূতন নূতন তথ্য ও তত্ত্বের আবিষ্কার। পদার্থবিদ্যা, রসায়ন-শাস্ত্র, জীববিদ্যা, চিকিৎসাশাস্ত্র এবং কারিগরী বিদ্যার বিভিন্ন শাখায় অসংখ্য নূতন তথ্য ও তত্ত্ব প্রতিনিয়ত আবিষ্কার হচ্ছে, প্রচলিত তথ্য ও তত্ত্ব বাতিল হয়ে যাচ্ছে। ......তথ্য বিস্ফোরণের পরিমাণগত দিক কি তা নিয়ে অনেক তথ্য প্রকাশিত হয়েছে। ১৯৬০ সালে Kent হিসেব করে দেখেছেন প্রতি ৬০ সেকেণ্ডে (১ মিনিটে) পৃথিবীতে ২০০০ পৃষ্ঠার বিষয়বস্তু প্রকাশিত হচ্ছে। একজন পাঠক যদি সারা বছর ধরে যথাসাধ্যভাবে সব কিছু পড়বার চেষ্টা করেন তাহলে তিনি বছরের শেষে ১,০৫১,২০০,০০০ পৃষ্ঠা পিছিয়ে থাকবেন। আর তিনি যদি জ্ঞানের কোন একটি শাখার, যথা, রসায়নশাস্ত্রের সব কিছু পড়বার চেষ্টা করেন তাহলে বছরের শেষে ৮৫০,০০০ পৃষ্ঠা পিছিয়ে থাকবেন। ......বিশাল পরিমাণের এই বিস্ফোরিত তথ্য সবচেয়ে বেশী পরিবাহিত হচ্ছে পত্রপত্রিকার মধ্য দিয়ে। পৃথিবীর পত্রপত্রিকার সংখ্যা কত?

শেষ সংখ্যা কখনই বলা যাবে না। ১৯৫০ সালে প্রকাশিত World List of Scientific Periodicals এ শুধুমাত্র বিজ্ঞান ও কারিগরী বিষয়ে ৫০,০০০ পত্র-পত্রিকার নাম লিপিবদ্ধ করা হয়েছে। ১৯৬০ সালে এই সংখ্যা দাঁড়িয়েছে ৬০,০০০। অনুমান করা যাচ্ছে ১৯৮০ সালে প্রায় এক লক্ষে পৌঁছবে। সমাজবিজ্ঞানের বিভিন্ন শাখায় পত্র-পত্রিকার সংখ্যা বিগত ২০-২৫ বছরে বিপুল পরিমাণে বৃদ্ধি পেয়েছে। বৈজ্ঞানিক ও কারিগরী বিষয়ক পত্রপত্রিকাগুলিতে বছরে ৬০ লক্ষ প্রবন্ধাদি প্রকাশিত হচ্ছে! একমাত্র রসায়ন-শাস্ত্র ও তার সংগে সংশ্লিষ্ট বিষয়গুলিতে প্রতি বছর প্রায় ১২,০০০ পত্র-পত্রিকা প্রকাশিত হয়। তথ্য বিস্ফোরণের প্রভাব রসায়নশাস্ত্রের ক্ষেত্রে কিভাবে পড়েছে তার একটা উদাহরণ দিই—১৯২২ সালে Chemical Abstracts এর মোট পৃষ্ঠা ছিল ৪৩,৬৪০ আর ১৯৬৯ সালে তা এসে দাঁড়িয়েছে ২৩,১১৪ পৃষ্ঠায়। পত্র-পত্রিকার এই বিস্ফোরণ দেখে বিংশ শতাব্দীর একজন বিখ্যাত গ্রন্থাগারবিদ্যাবিদ Dr. A. Fasdalle বলেছেন "পত্র-পত্রিকা গবেষণার ক্ষেত্রে এক নতুন আতঙ্ক সৃষ্টি করেছে।"

[Librarian] 1967.

গুরুদাস ভট্টাচার্য

বাইবেলের গল্প : আদম-ঈভের ছেলে আবেল ও কেইন ; একজন পশু চরায়, অন্যজন চাষ করে। একদিন দুজনে যখন মাঠে, কেইন হঠাৎ উঠে আবেলকে মেরে ফেলল। শুনে, ঈশ্বর কেইনকে বললেন : আজ থেকে অভিশাপ তোমার নিত্যসঙ্গী: তুমি নিরাশ্রয় ছন্নছাড়া হয়ে ঘুরে বেড়াবে পৃথিবীতে।

কেইন আবেলকে, ভাই ভাইকে হত্যা করল—ওল্ড টেস্টামেন্ট মতে, এটাই পৃথিবীর প্রথম ক্রাইম। আন্তর্জাতিক দৃশ্যপটে প্রথম যে কাহিনীচিত্র তৈরী হল, (আশ্চর্যের বিষয়, হয়তো আশ্চর্যের নয়) সেটিও একটি ক্রাইম-থ্রিলার। বাস্তব ঘটনা থেকে নেওয়া। ছবির নাম : 'দ্য গ্রেট ট্রেন রবারী'; পরিচালক : আমেরিকার এডউইন পোর্টার; পৃথিবীর বয়স তখন দেয়াল-পাঁজীর হিসেবে ১৯০৩। একদল সশস্ত্র দুর্বৃত্ত স্টেশনে ঢুকে টেলিগ্রাফ অপারেটারকে কাবু করে মুখ বেঁধে, মেল ট্রেন লুঠ করল। ঘটনাটা প্রথম জানল অপারেটরের মেয়ে, বাবাকে খাবার দিতে এসে। পুলিশ এল; তদন্ত, তারপর চেজ; ডাকাতদলের মুখোমুখি, লড়াই, খতম; একটা পিস্তলের মুখ ক্যামেরার চোখের সামনে—ফায়ার ! এক রীল, মোট আট মিনিট। ক্রাইম-থ্রিলার ও ওয়েস্টার্ণের বীজ উপ্ত হল।

এরপর টমাস ইন্‌সে। উইলিঅম হার্টকে নিয়ে তুললেন কাউবয়-ছবির আদি প্রোটোটাইপ, অন্যদিকে 'দ্য গ্যাংস্টার এণ্ড দ্য গাল' (১৯১৪)। শিল্পের সিঞ্চনে বীজ অঙ্কুরিত হল। ব্রিটেন, ফ্রান্স ও সুইডেনও পিছিয়ে ছিল না। কিন্তু সবাইকে টেক্কা দিয়ে গেল জার্মানী। ট্রিটমেন্ট ও টেকনিকের গুণে তার আলোচ্য ছবিগুলি নিরীক্ষাধর্মী বলে গণ্য, কিন্তু মূলে আখ্যান ক্রাইম।

রবার্ট ভাইনে পরিচালিত 'দ্য ক্যাবিনেট অফ ডাঃ ক্যালিগারি' (১৯১৯) এমনি একটি দুর্ধর্ষ সৃষ্টি। ডাঃ ক্যালিগারির সম্মোহনবিদ্যার জাদুতে আচ্ছন্ন এক দৈত্যাকার পুরুষ যতোসব অসম্ভব কাণ্ড করে। আশেপাশে কয়েকটা রহস্যজনক মৃত্যু ঘটে যায়। ফ্রান্সিস ও পুলিশের সন্দেহ—একাজ ডাক্তারের। কিন্তু প্রমাণ নেই। অবশেষে ফ্রান্সিসের প্রণয়িনীকে চুরি করতে গিয়ে সহকারীটি ধরা ও মারা পড়ে, ডাক্তার আশ্রয় নেন এক পাগলাগারদে। তাঁকে বেঁধে রাখা হয়। তারপরেই দেখা যায়, ডাঃ ক্যালিগারি হাসপাতালটার পরিচালক এবং ফ্রান্সিস, তার প্রণয়িনী, সেই জনচরটি, সবাই তাঁর রোগী ! অর্থাৎ সমস্ত কাহিনীটাই পাগল ফ্রান্সিসের নিজের মনগড়া। ডাকিনীবিদ্যা ব্যাপারটাকে ভিত্তি করে এবং ফ্রয়েডীয় মনোবিশ্লেষণ রীতিতে এর কাহিনী গড়ে তোলা হয়েছে। এবং প্রকাশ করা হয়েছে ইমপ্রেশনিস্ট পদ্ধতিতে। আরও কারণ আছে, সেকথায় পরে আসছি।

১৯৩১-৩২এ ফ্রিৎস ল্যাঙ্গ তোলেন 'এম' (অর্থাৎ 'মার্ডারার')। এর ভিত্তি বাস্তব। ডুসেলডর্ফের এক খুনী, ছোট ছোট মেয়েদের ধরে নিয়ে গিয়ে খুন করত। ওটা ওর মনোবিকার। পুলিশ হানা দিল গুণ্ডাপাড়ায়। খুনী ওদের দলের নয়। ওরা ব্যতিব্যস্ত হয়ে একদল ভিখারিকে লেলিয়ে দেয়। অবশেষে খুনীর সন্ধান মেলে, ও পালিয়ে ঢুকে পড়ে এক অফিসের গুদামঘরে। রাতের বেলা দরজা ভেঙে গুণ্ডারা ওদের ধরে নিয়ে আসে এবং নিজেদের

'দ্য স্কারলেট রোজ'-এর একটি দৃশ্য

আদালতে বিচার করে মৃত্যুদণ্ড দেয়। ইতিমধ্যে পুলিশ এসে পড়ে। ছবিটির বৈশিষ্ট্য : খুনীকে ধরার জন্যে পুলিশ ও গুণ্ডাদের প্রস্তুতি পাশাপাশি দেখানো হয়েছে, যেন একই দলের দুটো শাখা। 'এম'-এর নবছর আগে ল্যাংগ আর একটি ক্রাইম ছবি তোলেন, আরও ভয়ংকর, 'ডাঃ মাবুসে—জুয়াড়ী, পাপের রাজা'। পয়লা

ট্রান্স ইউরোপ এক্সপ্রেস-এর একটি দৃশ্য

নম্বর জনশত্রু ডাঃ মাবুসে বৈজ্ঞানিক, সম্মোহনবিদ্যাপটু, ছদ্মবেশে ও অভিনয়ে দক্ষ, অসাধারণ বুদ্ধিমান এবং ক্ষমতালোভী। যতো খুনে-জালিয়াত-গুন্ডা তাঁর অনুগত, মাটির নীচে ঘরে অন্ধ কারিগররা জাল নোট তৈরি করে। পাবলিক হলে তিনি জাদুবিদ্যার খেল্ দেখান, জুয়ার আড্ডায় সর্বস্বান্ত করেন অভিজাত নারী-পুরুষদের। একান্ত অনুগত কয়েকজন ছাড়া তাঁর আসল চেহারা কেউ জানে না। পুলিশও হদিশ পায় না। কিন্তু পাবলিক প্রসিকিউটর ডঃ ওয়েনক নাছোড়বান্দা। ছদ্মবেশে জুয়ার আড্ডায় গিয়ে তিনি ডাক্তারের মুখোশ খুলে ফেলেন কিন্তু ধরতে পারেন না। তাঁর সহকারিণী কারা কারোনা পুলিশের হাতে পড়ে। মাবুসে অটো-সাজেসন্‌সের মাধ্যমে এক কাউন্টকে হত্যা ও কাউন্টেসকে অপহরণ করেন। তাঁর নির্দেশে কারোনা জেলের মধ্যেই বিষ খেয়ে মরে। এরপর তাঁর লক্ষ্য : ডঃ ওয়েন্‌ক। পাবলিক হলেই সম্মোহিত ওয়েন্‌ক গাড়ি চালিয়ে ছুটে চলেন মৃত্যুর অভিমুখে: সহকারীরা ওঁকে বাঁচায়। অতঃপর পুলিশ মাবুসের বাড়ী ঘিরে ফেলে। প্রচন্ডরকম গুলি বিনিময়। সহচররা একে একে নিহত। আহত মাবুসে গোপন সুড়ঙ্গ দিয়ে পালিয়ে যান নোটজালের গর্ভগৃহে। ইঁদুরের মতো বন্দী হয়ে নানান দুঃস্বপ্ন দেখতে থাকেন। পুলিশ এসে দেখে : ডাঃ মাবুসে বদ্ধ উন্মাদ।

ক্রাইম-থ্রিলার বা গ্যাঙ্গসটার ফিল্মস্‌কে পালিশ দিল হলিউড। কল্পনা নয়, বাস্তবের সাহায্যে। ১৯২৭ স্টার্ণবার্গের 'আন্ডারওয়র্ল্‌ড'—খবরের কাগজের পাতা থেকে টাটকা তুলে আনা। নতুন স্বাদ পেয়ে জনগণ তৃষ্ণার্ত। ১৯৩০ 'লিটল সীজর' বাজিমাত করল। ১৯৩১—সংখ্যা দাঁড়াল বছরে পঞ্চাশ খানা। গতি-উত্তেজনা-নিষ্ঠুরতা-অধৈর্য অসামাজিকতা; দেহজীবীনীদের নিয়ে রোমান্স, রাজনৈতিক দুর্নীতি, মস্তানী বীরত্ব; নিউইয়র্কের কুখ্যাত 'ডেড এন্ড বয়েজ'দের মহিমা প্রচার। তাদের আদর্শ : জেমস ক্যাগনী, পল মুনি, জর্জ র‍্যাফ্‌ট, এডওয়ার্ড জি রবিনসন প্রভৃতি অধিকাংশ কাহিনীই বাস্তব। 'আই'ম এ ফিউজিটিভ ফ্রম এ চেইন গ্যাং' এইসব দল সম্পর্কে পুলিশেরও টনক নড়িয়ে দিয়েছিল।

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময়, কয়েক বছরের জন্যে, ক্রাইম বাসাবদল করল ওঅরপিকচারে। নাজীরা হল ভিলেন এবং (স্টক ভিলেন) রাশিয়ানরা হল হিরো। চল্লিশের দশকে ক্রাইম আর যুদ্ধচিত্র মিলে তৈরি হল যুগ্ম-স্বাদের ছবি : 'ডার্ক কর্ণার, কর্নার্ড', দ্য লেডি ইন দ্য লেক' ইত্যাদি। মূল ক্রাইম-থ্রিলারেরও পরিবর্তন ঘটল; ক্রাইমের চেয়ে ক্রিমিন্যালের বিকৃত অবদমিত মনোবিকারের মনোবিকলন শুরু হল। পুরুষ-মহিলা, উভয় পক্ষেই। যথা : রিচার্ড ওআইডমার্কের 'কিস অফ ডেথ'। এই ধারাকেই প্রসাধিত শ্রীমণ্ডিত করে মাস্টার্পিসে পরিণত করেছিলেন আলফ্রেড হিচকক—যাঁর

পরিচালক-জীবন সূচিত হয়েছিল ১৯২৯এ ব্রিটিশ ছবি 'ব্ল্যাকমেইল'এ।

শার্লক হোমস, পিটার চেনী, আগাথা ক্রীস্টি, আয়ান ফ্লেমিং। জেমস বণ্ড সিরিজ : ক্রাইম প্ল্যামার-ফ্যানটাসী। তারপর : স্পাই-এজেন্ট—কাউন্টার এজেন্ট—প্ল্যামার-ফ্যানটাসী। তারপর : ক্রাইম প্লাস প্ল্যামার-ফ্যানটসী। তারপর : ক্রাইম প্লাস গুপ্তচরবৃত্তি প্লাস ফ্যানটাসী প্লাস এজেন্ট ০০৭/১১৭ প্লাস সায়েন্স ফিকশন ইনটু অ্যাটম বোমব। ব্যাটম্যান-র‍্যাটম্যান—জেড কারস ইত্যাদি ইত্যাদি। এদের সঙ্গে ভারতীয় দর্শক সুপরিচিত।

হলিউডী কায়দা-কানুন আজ সর্বজনীন। তবু দেশগত স্বাতন্ত্র্যও আছে। সাম্প্রতিক কিছু ছবি থেকে তার নিদর্শন এবার সংকলন করা যেতে পারে।

(২)

জেমস বণ্ডের দোসর অথচ তার উল্টো পিঠ মিকি স্পিলেনের উপন্যাসের 'প্রাইভেট আই' মাইক হ্যামার—ইংলেন্ডের কিশোর-কিশোরীদের প্রিয়তম চরিত্র। মাইক জিঘাংসু, ধর্ষণকামী, মেয়েদের নরম চামড়ায় চাবুকের দাগ বসাতে প্রচণ্ড উৎসাহী, বদমাইসদের যম। জনস্বার্থে ইনি ছটি উপন্যাসে এ পর্যন্ত আটাত্রটা খুন করেছেন ! বলা বাহুল্য, স্পিলেনের উপন্যাস চলচ্চিত্র-বণিকদের অমরাবতী। তার মধ্যে সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য রবার্ট অলড্রিচের তোলা 'কিস মী ডেডলী'। বর্ষাতি পরা নগ্নপদ এক নারী রাতের রাজপথ দিয়ে ছুটে চলেছে; চারপাশ একান্ত নীরব; শুধু ওর নিঃশ্বাসের শব্দ (সাউণ্ড-ট্রাকে শোনাচ্ছে যেন সংগম-অন্তিম দীর্ঘশ্বাস !) একটা চলন্ত স্পোর্টস কারের ওপর গিয়ে ওর দেহ আছড়ে পড়ে। চালক মাইক হ্যমার; মেয়েটির নাম ক্রিশিনা। মাইক ওকে গাড়িতে তুলে নেয়। ওর মনে হয়, মেয়েটি পাগল। একটু পরে আরেকটি গাড়ি; মাইককে অজ্ঞান করে কয়েকজন লোক ক্রিশ্চনাকে তুলে নিয়ে যায়। মাইক তদন্তে নামে। অজ্ঞাত শত্রুপক্ষ ওকে ডিনামাইট দিয়ে উড়িয়ে দেবার চেষ্টা করে, ওর সুন্দরী সেক্রেটারী ভেলডাকে চুরি করে নিয়ে যায়, বন্ধু নিককে মেরে ফেলে। শেষে মাইককেও ধরে নিয়ে গিয়ে ওষুধ (ট্রুথ ড্রাগ) খাইয়ে পেট থেকে কথা বার করার চেষ্টা করে। মাইক ডাক্তার ও তার সঙ্গীদের গুলি করে মেরে ফেলে। ও জানতে পারে : একদল বিদেশী এজেন্ট একটা গোপন আণবিক বাক্স হাতাতে চাইছে; ক্রিশ্চনা বিজ্ঞানী, তাই ওদের শিকার। শেষ পর্যন্ত ও আণবিক বাক্সটা পায়। কিন্তু দুর্বৃত্তদের এক সহকারিণীর মারাত্মক কৌতূহলে অণুর বিস্ফোরণ, আগুন, ছাই। ভেলডাকে নিয়ে মাইক পালিয়ে আসে। বিজ্ঞান-যৌনতা-ফ্যানটাসী-ক্রাইম সব মিলিয়ে এক অভিনব বস্তু, যাকে সমালোচকগণ বলেছেন 'ডাঃ মাবুসের উত্তরাধিকারী'। ব্রিটেনেই সম্প্রতি বণ্ডের এক দোসর নবজাত : হ্যারি পামার, গাট্টাগোট্টা যুবক। মিলিটারী জেল থেকে ওকে ছেড়ে দেওয়া হয়েছে জনৈক নিরুদ্দেশ বিজ্ঞানীর তল্লাস করতে। এছাড়া, ডবল্-এজেন্ট ও নারী-এজেন্টও আছেন চিত্রপট আলো করে। পামার প্রথম আত্মপ্রকাশ 'দি ইপক্রেস ফাইল'এ।

বণ্ড্-কাল্ট্-এর ফরাসী সংস্করণ 'ফ্যন্তোমাস' সিরিজ। ফ্যন্তোমাস জাত-বজ্জাত—নতুন নতুন কায়দায় অপরাধ করে, ঘন-ঘন নাম ও চেহারা বদলায়, চ্যালেঞ্জ করে স্কটল্যাণ্ড ইয়ার্ডকেও ধোঁকা দেয়। আঁদ্রে হুনেবেলের 'ফ্যন্তোমাস এগেন্স্ট্ স্কটল্যাণ্ড ইয়ার্ড' এমনি এক বিদ্ঘুটে ছবি। আরেকটা সিরিজ—ও, এস, এস, ১১৭। ভদ্রলোক ভাগ্যবান; রহস্যের ঢাকনি খুলতে গিয়ে ঝাঁকে ঝাঁকে সুন্দরীর পাল্লে গিয়ে

দি আউট সাইডাস-এর একটি দৃশ্য

পড়েন, নতুন নতুন বিপদ ডেকে আনেন, শেষ পর্যন্ত হাঁসের মতো 'ক্লীন' বেরিয়ে আসেন। জেমস্ বণ্ডের ভূমিকায় যেমন সিন কনোরী, ও এস এস ১১৭'র ভূমিকায় তেমনি অস্ট্রেলিয়াগত যুবক ফ্রেডরিক স্ট্যাফোর্ড। আরএকজন এজেন্ট—জুডোকা। তার কাজ : সমাজের যাঁরা মাথা, তাঁদের মাথা বাঁচানো। এ কাজে অনেক দায়িত্ব, আবার অনেক আনন্দও; যেহেতু, বিপদের পথে পথে সুন্দরী রমণীদের সঙ্গে অবশ্যম্ভাবী মোকাবিলা।

ফিলিপ দ্য ব্রোকা গণ্যমান্য পরিচালক। কিন্তু তিনিও 'বোম্বাই' কল্পনার ক্রীতদাস যে ছবিতে, তার নাম 'দ্যাট ম্যান ফ্রম হংকং' : অর্থপিশাচিনী সুন্দরী ভাবী জামাতা আর্থারকে বিষ খাইয়ে মারতে না পেরে দুর্ধর্ষ খুনী চার্লিকে নিযুক্ত করে। আর্থার আশ্রয় নেয় স্ট্রীপটিজ নর্তকী আলেকজান্দ্রিজের কাছে। দুজনে পালায় নেপাল থেকে তিব্বত থেকে পুনশ্চ হংকং-এ, এক চীনা থিয়েটারে। পুলিশ ওদের ধরে নিয়ে যায়। চার্লি বোমা মেরে জেল উড়িয়ে দেয়। দুজনে তখন এক সমুদ্রতীরে। চার্লির প্লেন থেকে মেশিনগান চার্জ। ওরা এসে ওঠে এক বন্ধুর বাড়ি। চার্লি গ্রাম ঘেরাও করে। কতকগুলো হাতীর অনুগ্রহে শিকার পালায়। শেষে, চার্লির প্লেনে; দুর্দান্ত ফাইট; পাপীদের লীলাখেলা শেষ; ভালবাসা জিন্দাবাদ।

জাপানের জেমস্ বণ্ড হলেন : জাতো ইচি। হাফপ্যান্ট, তার ওপর কিমানো, পায়ে ফেট্টি, হাতেও। এবং পরিপূর্ণ অন্ধ! তবু, ডজনখানেক ঠ্যাঙাড়ের মহড়া অনায়াসে নিতে পারেন। এ ছাড়া, স্পাই-থ্রিলার এবং ভাইসর‍্যাকেট ও শহুরে মস্তানদের নিয়েও ছবি আছে। কিঞ্জি ফুকাসাকুর 'লীগ অফ দ্য গ্যাংগস্টার্স'এর মস্তানস্য মস্তানের মুখেই শুনুন তার আত্মকথা; 'তারপর আমি এসে শুনলুম, একদল আনসান্ বদমাস আমার এরিয়াটা বিলকুল কব্জা করে নিয়েছে। সাগরেদদের ডেকে পাঠালুম, মতলব ঠিক হল। একদিন হোটেল থেকে ওদের লীডারকে স্রেফ তুলে নিয়ে এলুম; সেই সঙ্গে ওর মেয়ে আকিকোকেও। বুঝলেন, মেয়েটাকে আমি ভালবেসে ফেললুম। নইলে, ওর বাবাকে আমার দলের ছেলেরা কবে খতম করে ফেলত। ওদের ভাইস-প্রসিডেন্টকে ফোন করে জানালুম : বসকে ফেরত চাও তো টাকা দিয়ে নিয়ে যাও। ওরা এল—টাকা নয়, দল নিয়ে। ফাইট বেধে গেল। আমাদের ওগাতা গেল, বস্টাকে আমিই ডবুলে দিলুম. তারপর ডিনামাইট হাঁকড়ালুম ওদের ওপর। তারপরে কী হল, জানেন ? আকিকো হাসতে লাগল! তাজ্জব! ও বললে : আমি কে জানো? —কাজানা। আবার আমাদের দেখা হবে। আমি পুরো বেওকুফ! 'উমেজি ইনু-এর 'দ্য স্কারলেট রোজ' : নাইট ক্লাবের সুন্দরী গায়িকা মাকি, বুকে লাল গোলাপ; তার খপ্পরে পড়ে পুলিশ ইনস্পেক্টর তাৎসুনো দাওয়াই—স্মাগলারদের দলে ভিড়ে গেল, শেষে অন্ধকার রাজ্যের বসও হয়ে গেল। কিন্তু ততদিনে লাল গোলাপবালার জালে অন্য একটি নবযুবক খেলা করছে। ক্ষেপে গিয়ে তাৎসুনো মাকিকে খুন করে, ওকে মারে দলের লোকেরা।

জাপানী ছবিতে নারীর ভূমিকাও কম উগ্র নয়। আমাদায় 'দ্য ট্র্যাপ্'এর নায়িকার এক ভাইয়ের মিথ্যে কেসে শাস্তি হয়। মেয়েটি ভাইয়ের জন্যে এক আইনজীবীর শরণ নেয় কিন্তু প্রত্যাখ্যাত হয়। মেয়েটি তখন করল কী, ঘটনা সাজিয়ে প্রমাণ হাজির করল পুলিশের কাছে—আইনজীবীর এক রক্ষিতা আছে সে খুনের সঙ্গে জড়িত, এবং ভদ্রলোকও চরিত্রহীন ইত্যাদি। ফল : অর্থ, সম্মান বিনষ্ট, প্রাণ নিয়ে টানাটানি। ইমামুরার 'দি ইন্সেকট্ উওম্যান' এক বঞ্চিতা নারীর আলেখ্য : লোকে বলে, হতাশে অবৈধ সন্তান, স্বামী পরিচারিকার সন্তানের অবৈধ পিতা। ঘৃণায় ও গৃহত্যাগ করে এবং মার্কিনী সেনানিবাসের কাছে ঘর বাঁধে; তারপর এক পতিতালয়ের পরিচালিকা, অনেক পাপকার্যের নেত্রী। জেল। ফিরে এসে দেখে, ওর মেয়ে ওর বন্ধুর অনুগৃহিতা।

পূর্ব-য়োরোপের সমাজতান্ত্রিক দেশ-গুলিও এখন ক্রাইম ছবি তুলছে। তবে, তাদের চরিত্র ঈষৎ ভিন্ন। কিছুদিন আগে এদেশে একটা চেক ছবি দেখানো হল : 'ক্রাইম ইন দ্য গার্লস স্কুল'। প্রথম গল্প : তিনটি ছেলে, একটি মেয়ে, পাহাড়ে উঠছে। মালাও গেছে অন্য পাহাড়ে। এদিক দিয়ে আগে ওঠে পাতেরা। পরে বারতোস উঠে দেখে, পাতেরা নিহত। ছোট্ট নির্জন পাহাড়ের চূড়া; কে খুন করল? পুলিশ এল, এলেন লেঃ বরুভ্কা। তিনি প্রমাণ করলেন, মালাও হত্যাকারী। দ্বিতীয় গল্প : প্রাগের নাইট ক্লাব, নতুন শো-এর রিহার্সাল; সেরা নাচিয়ে এস্থারকে পাওয়া গেল, স্নানের ঘরে নিহত অবস্থায়। লেঃ বরুভ্কা এলেন। একটা পাবলিক বাথে স্নান করতে গিয়ে সূত্রটা পেলেন ও খুনীকে ধরলেন। তৃতীয় গল্প : একটা মেয়ে-স্কুলের এক শিক্ষক স্কুলের ফান্ড নিয়ে উধাও, এবং ফিজিক্স্ ক্লাসে রোজ একটা করে সাস্পেন্ডার পড়ে থাকে। লেঃ বরুভ্কা এলেন। ইতিমধ্যে শিক্ষকও ফিরে এলেন টাকাসমেত। কিন্তু সাস্-পেন্ডার? গোয়েন্দা বরুভকারই মেয়ের! সম্প্রতি প্রেমে পড়েছে, ক্লাসরুমটি ওদের মিলনকুঞ্জ। শেষে দেখা গেল, শিক্ষকটিও হেডমিস্ট্রেসের প্রেমিক! উৎসাহিত তরুণ পরিচালকগণ আর একটি ছবি করছেন : 'ক্রাইম অ্যামংগ দ্য এম এস এস'।

বর্তমান চলচ্চিত্র-দুনিয়ায় চেক ছবি স্মার্টতম। পোলিশ ছবিতে এতোটা ধার নেই, তবে পালিশ আছে, ছবির নাম 'দ্য স্কোর্প', সংজ্ঞা কমেডি, পরিচালনায় ('মাচ্ অ্যাবাউট লিটল বারবারা'র) শ্রীমতী মারিয়া কানিয়ে-ওস্কা। একটা ছোট্ট শহর; পুলিশে চাকরী করে পাবেল। বড়োরকম অপরাধ ধরতে না পারলে প্রমোশন হয় না। অথচ এখানে সবাই ভালো। হঠাৎ বড়-বড় লোকেরা বেনামী চিঠি পেতে লাগল : 'নির্দিষ্ট জায়গায় নির্দিষ্ট পরিমাণ টাকা না পেলে তোমাদের সব কেচ্ছা ফাঁস করে দেব'। ক্রাইম না থাক, কেচ্ছা সর্বব্যাপনী, পুলিশী তল্লাস। আসামী—পাবেলেরই ছোট ভাই ফেলেক। দাদার প্রমোশনে মদত্ দিতে চেয়েছিল। গোপন খবরগুলো ও পেয়েছে পাড়াবেড়ানী গপ্পিসে মার সঙ্গে থেকে থেকে। রিচার্ড বের-এর 'হোয়ার ইজ কিং?' ভিয়েস্বাদের। পুরনো রাজপ্রাসাদ; রাজার ছবি। প্রবাদ : রাজার গলার ঘণ্টা বাজলেই একজনের মৃত্যু অবধারিত। সেদিন প্রচণ্ড বৃষ্টির রাত, রাজপ্রাসাদে আশ্রয় নিয়েছে কয়েকটি পরিবার। হঠাৎ ঘণ্টা বেজে ওঠে, একটা তীর এসে বেঁধে বুড়ো দরোয়ানের বুকে। এক লেখক ও তাঁর স্ত্রী ঘটনার বল্গা হাতে নিলেন। জানা গেল : একদল দুর্বৃত্ত রাজার ছবিটা চুরি করতে এখানে এসেছে, এই পরিবারেরই কোন-একটা। নতুন করে তল্লাসী শুরু হল। ভদ্রমহিলা যুযুৎসু-পটীয়সী, ভদ্রলোক পিস্তল-বিশারদ। অত-এব অপরাধী অপাবৃত। এবং ও'রা দুজন স্বামী-স্ত্রী নন, পুলিশ অফিসার।

আর্জেন্টিনার লিওপোল্ডো টোরে নীলসন উল্লেখ্য পরিচালক। তাঁর 'ফিন দ্য ফিয়েস্তা'র নায়ক অ্যাডলফোর ঠাকুরদাদা রাসেরাস অসৎপথে প্রচুর অর্থ কামিয়ে আজ রাজনৈতিক নেতা। অ্যাডলফোর এসব ব্যাপার অপছন্দ। ঠাকুরদার সহকারী গুয়াস্তা-ভিনোর সঙ্গে রাতের পর রাত ঘুরে ঘুরে ও ঠাকুরদার কীর্তিকলাপ সব দেখে। ঘৃণা বাড়ে। অবশেষে গুয়াস্তাভিনোকে সন্দেহ-বশে রাসেরাস যখন হত্যা করান, ওর সহ্য হয় না, ও ঠাকুরদাকে পরিত্যাগ করে। রাসেরাস বৃদ্ধ, এ-আঘাতে প্রায় বিধ্বস্ত হয়ে মারা যায়। অ্যাডলফো ভালবাসা পায়, সৎ রাজনীতির মাধ্যমে বংশগত পাপের প্রায়শ্চিত্ত করতে থাকে।

(৩)

খুন-রাহাজানি-পাশবিকতা যদি ক্রাইম হয়, তাহলে প্যারীর হেলেন-হরণ, রাবণের সীতা-হরণ, হত্যা ও প্রতিশোধ কণ্টকিত গ্রীক ও শেকসপিয়রীয় নাটকও ক্রাইম-লিটারেচার। কিন্তু মহত্তর জীবনাদর্শ ও সূক্ষ্মতর মনস্তত্ত্বের আন্তরিকতায়, শিল্পা-য়নের সহযোগে এসব রচনা মহাকাব্য ও ট্র্যাজেডি পর্যায়ে উন্নীত, যার প্রবন্ধে পাঠক ও সমালোচকের বিন্দুমাত্র সংশয় নেই। তাই নরম্যান মুহলেন লিখেছেন :

> What is wrong with the violence is not that it is violent but that it is not art (Commentary, vol-I, P 44)

উক্তিটির সমর্থন আছে আরিসততলের ট্র্যাজেডিতত্ত্ব এবং অভিনবগুপ্তের (করুণ) রসতত্ত্বে। অর্থাৎ আর্ট হয়ে ওঠে না বলেই চলচ্চিত্রপাড়ায় ক্রাইম ছবি উত্তেজনাপ্রদ নিরুদ্দেশ অসুন্দর ও অসুস্থ থ্রিলার মাত্র। হয় না যে, সে দোষ চলচ্চিত্রের নয়, তার নির্মাতাদের, এবং পরিপার্শ্বেরও। তবু, এরা যে পরিপূর্ণভাবে নির্গুণ, তাও নয়। অন্তত, কিছু বিশিষ্টতা অবশ্যই আছে। সমাজ-তাত্ত্বিক বিশ্লেষণে তার খোঁজ পাওয়া যায়।

পোর্টার কাহিনীচিত্র সৃষ্টি করতে চেয়েছিলেন, ক্রাইম ছবি তৈরি করতে নয়' ইংরেজের বাসনা ছিল শিল্পমন্থনের। ব্রিটেনের 'দ্য লাইফ অফ চার্লস পীস' (১৯০৫) বাস্তবসম্মত হতে চেয়েছিল। ভায়োলেনস এলো জার্মান চলচ্চিত্রের দুতীয়ালীতে। তৎকালীন জার্মানীর মন্দা বাজার, বেকারী, অবক্ষয় ইত্যাদির পটভূমিকায় এজাতীয় ছবির আবির্ভাব ছিল অনিবার্য'। সিগফ্রিড ক্রাসোয়ার তাঁর 'ক্যালিগরী টু হিটলার' বইয়ে দেখিয়েছেন, ফ্যাসিবাদ তথা নাৎসীবাদের অভ্যুত্থানের সঙ্গে 'ক্যালিগরী-মাবুসে এম-ড্রাকুলা' ইত্যাদি ছবির ঘনিষ্ঠতম সংযোগ ছিল। লুই জেকব ও আর্থার নাইট দেখিয়েছেন, একই কারণে, অর্থনৈতিক এবং সেই সঙ্গে যাবতীয় নীতির নিম্নগামিতায় তিরিশের দশকে মার্কিন চলচ্চিত্রে গ্যাংস্টার ছবির কদর শুরু হয়েছিল। তারপর একবার শুরু হলে এবং লোভী বণিকসমাজের হাতে পড়লে অনিবার্যভাবে খুন-রাহাজানি-জালিয়াতী-যৌনতার অয়মারম্ভ শুভায় ভবতু। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পরবর্তী ঘটনাবলী ও তন্নিষ্ঠ জাতীয় নীতিও নানাবিধ সহযোগিতা দান করেছে।

এ তথ্যও অনস্বীকার্য যে, ক্রাইম থ্রিলারের আজ আবির্ভাব দুটি কারণে। এক : বাস্তবতার ঝাঁঝ; দুই : টেকনিক্যাল নিরীক্ষা। পরে এক-একটা প্যাটার্ন দাঁড়িয়ে গেছে। ক্রাইম থ্রিলারের উৎস সংবাদপত্র-প্রচারিত কাহিনী যা মূলত বাস্তব। ক্রসোয়ার আরও দেখিয়েছেন; সাজানো-গোছানো স্টুডিয়োরুম ছেড়ে ক্যামেরা এখানে পথে নামে, সমাজের অবহেলিত অন্ধকার দিকগুলিকেও পরিস্ফুট করে; যেমন, বস্তি, পতিতালয়, নোংরা রেস্তোরাঁ, ডাস্ট-বিনের আশপাশ, আস্তাখানা ইত্যাদি। অন্যদিকে, কৌতূহল সৃষ্টির উদ্দেশ্যে এ ছবিতে চাই গতি, ছন্দ, দৃশ্যময়তা আঙ্গিকগত পারফেকশন। একটা জীবন-দর্শনও মেলে। যে দর্শন হ্যামলেটের মতোই বলে। the world is out of joints রবীন্দ্রনাথের মতো 'সৃষ্টি যেন বাঁধা নাই নিয়মনিগড়ে!' এসবই নিরীক্ষার অন্ত-র্গত এবং এই নিরীক্ষার প্রভাব ছড়িয়ে পড়ে কাহিনী ও তথ্যচিত্রেও। যেমন বিশ্বখ্যাত 'বাইসাইকেল থীভস্', যেমন আব্বাসের 'শহর ও স্বপ্ন'। ক্রাইম ছবিতে ট্র্যাজেডি দুর্লভ, কারণ, মেলাংকলি বা প্যাথস্ তার মূল সুর। তবু হল ও হোআজেল তাঁদের সমাজ-বিশ্লেষণমূলক গ্রন্থ 'দ্য পপুলার আর্টস'এ সিদ্ধান্ত রেখেছেন : এ ছবি 'ইভিল' এর, যাবতীয় অন্যায়ের বিরুদ্ধে লড়াইয়ে মদত দেয়। চরিত্রকে দৃঢ় করে, জীবনসংগ্রামের প্রতিস্পর্ধী করে তোলে। অবশ্যই, (মুহলেনের ভাষায়) রচনা আর্ট হওয়া চাই।

ক্রাইম-থ্রিলারের শত দোষ আছে, সে-দোষ রচনাকারীর। আবার, এই থ্রিলারই গুণিজনের হাতে পড়ে আশ্চর্য সৃষ্টি হয়ে ওঠে। সংখ্যালঘু হলেও এমন সৃষ্টি দুর্লভ নয়। যেমন, চার্লি চ্যাপলিনের 'মঁশিয়ে ভের্দু', যেমন গদারের 'ব্যান্ড অফ আউটসাইডার্স', যেমন জুলে দেসাঁর 'রিফিফ'।

তখন যুদ্ধ চলছিল। একজন সামরিক অফিসার বিদ্রোহের অপরাধে ওর বাবাকে এবং পরিবারের সকলকে মেরে ওকে শিশু-কারাগারে পাঠিয়ে দিয়েছিল। সেখানকার কর্তা ছিল ভয়ানক নিষ্ঠুর। অনেকদিন পরে ও ফিরে এসেছে দ্বীপটাতে, শৈশবের অন্যায়ের প্রতিশোধ নিতে। এসে দেখে, জীবন দিব্যি চলছে, সময় অনেক কিছু বদলে দিয়েছে, ছোটরা বড়ো হয়েছে, নানা কাজে সেই কর্তাটিও অতীতকে ভুলে গেছে। ও ভয় পেয়ে যায়—সময় এতো নিষ্ঠুর! শেষে, বুড়োকে না মেরে শুধু ওর আঙ্গুলটা কেটে নিয়ে পালায়—পালায় সময়ের কাছ থেকে, জীবনের কাছ থেকে, যে জীবনকে ও নষ্ট করেছে একটা মাত্র ঘটনার প্রতিশোধ নিতে, যে ঘটনার কোন মূল্য দুনিয়ার আর কারও কাছে নেই। জাপানী ছবি, মশাহিরো শিনোদা পরি-চালিত 'পানিশমেন্ট আইল্যান্ড'।

অ্যালা রেনের ছবির চিত্রনাট্যকার অ্যালা রব গ্রিয়ে সম্প্রতি তুলেছেন 'ট্রান্স-য়োরোপ এক্সপ্রেস'। [illegible] ও অ্যথাস, রিয়েলিটি

ও ইল্যুসনের সম্পর্ক (পিরানদেল্লোর মতো) এখানে তুলে ধরা হয়েছে। ট্রেনে তিনটি লোক চলচ্চিত্র পরিচালক, প্রযোজক, স্ক্রীপ্ট-গার্ল। দু ঘণ্টার ভ্রমণ। একটা ছবির গল্প তৈরি করছে ওরা ওষুধের চোরা-কারবারীদের নিয়ে। পরিচালক গল্পটা শুরু করেন, প্রযোজক ও স্ক্রীপ্ট-গার্ল মতামত দেয়। ক্রমশ গল্পটা শরীরী হয়ে ওঠে, চরিত্রগুলো দেহ ধারণ করে, ট্রেনের মধ্যেই, ওদের কল্পনামতো, চোরা কারবার, তার লেনদেন, সন্দেহ-মারামারি শুরু হয়ে যায়। ট্রেন আন্তওয়ার্পে পৌঁছয়। গল্পটা গল্প নয়, এখন সেটা সত্য ঘটনা, বাস্তব পরিণতি লাভ করে।

জ্যাঁ-লুক গদার-এর 'ব্রেদলেস'ও উদ্দেশ্যমূলক। উঠ্তি জোয়ান মাইকেল বেপরোয়া। একটা গাড়ি চুরি করে, একজন পুলিশকে খুন করে, বান্ধবীর টাকা ছিনিয়ে নেয় ইত্যাদি। প্রেমিকা প্যাট্রিসিয়া ওকে পরিত্যাগ করে। ভালবাসা হারিয়ে মাই-কেল অসহায়। পালাবে কি পালাবে না, ভাবতে ভাবতে পালায়। শেষে পুলিশের গুলীতে আহত হয়ে মারা যায়। ফ্রান্সের 'হারিয়ে-যাওয়া' নবযুবকদের ট্র্যাজেডি এখানে ফুটে উঠেছে। অবশ্য, এইটুকুতেই গদারের ছবির ব্যাখ্যা হয় না। এবং আপাতদৃষ্টিতে সায়েন্স্-ফিকশন হলেও তাঁর 'আল্ফাভিলে' বর্তমান জীবনেরই জটিল চিত্ররূপ। আল্ফাভিলে এমন একটি জগৎ, যেখানে মানুষের আবেগ-কল্পনা বলে কিছু নেই, যেখানে বিজ্ঞানসম্মতিতে যন্ত্রই সবকিছু করে, যন্ত্ররাজ রোবট এল-৬০। প্রোঃ ভন ব্রনের সন্ধানে চারজন গুপ্তচরকে পাঠানো হয়েছে, কেউ ফেরেনি। এবারে গেল লেমী কশান। ব্রনের মেয়ে নাটাশা ওর গাইড হল। তারপর যন্ত্র-পুরীতে একের পর এক বিচিত্র অভিজ্ঞতা, মনুষ্যত্ব-বিনাশের নানাবিধ প্রক্রিয়ার মুখো-মুখি। যে আসে, সে-ই গলে যায়। কিন্তু লেমী কশান কার্যোদ্ধার করে ফিরে আসে। আল্ফাভিলে যখন ভেঙে চুরমার, ওর অধিকন্তু লাভ—নাটাশা।

স্পেন-মেক্সিকোর পরিচালক লুই বুনুএল আজীবন পাপ ও সামাজিক ব্যাধির বিরুদ্ধে আপোষহীন সংগ্রামী। এবং পাপের ছবি না দেখিয়ে দর্শককে লড়াইয়ে উদ্বুদ্ধ করা যায় না। তাঁর 'লস অল্‌ভিদাদোস' উঠ্তি মস্তানদের সত্য-স্বরূপ, বাস্তবতার নিষ্ঠুরতায় সমবেদনায় ও কারুণ্যে সৎ সৃষ্টি। 'দ্য ক্রিমিন্যাল লাইফ অফ আর্চি-বলডো দ্য লা ক্রুজ' গ্যাঙ্গ্‌স্টার-ফিল্ম নয়, ক্রাইমেরও নয়, মনোবিকারের। শৈশবের এক ঘটনায় আর্চিবল্ডোর বিশ্বাস জন্মে যে, ও যার মৃত্যু কামনা করবে, সেই মরবে। এই-ভাবে, একের পর এক চারটি মেয়ে মারা পড়ে। পরে ওর মনোবিকার সেরে যায় এবং ভালবাসা সব ক্ষত মুছে নেয়।

আন্তর্জাতিক চলচ্চিত্রজগতে আর-একজন শিল্পপতি সুইডেনের ইঙ্গমার বেরিম্যান। তাঁর 'ভার্জিন স্প্রীং' বিখ্যাত ছবি। একটি কুমারী কন্যা বনের মধ্যে দিয়ে ঘোড়ায় চেপে পূজো দিতে যাচ্ছিল। পথে তিনজন গ্রাম্য লোকের সঙ্গে দেখা, একজন বাচ্চা। কুমারী কন্যার রূপ ও অহংকার দেখে একজন জোর করে ওর সতীত্ব নাশ করে। সব হারিয়ে মেয়েটি আর্ত চিৎকার করে কেঁদে ওঠে। সেই ভয়া-বহ কান্না সহ্য করতে না পেরে লোকটি ওকে কুড়ুল দিয়ে মেরে ফেলে। তারপর সবাই পালিয়ে যায়। ভাগ্যচক্রে ওরা মেয়েটির বাড়িতেই এসে ওঠে। মা জানতে পারে, এরাই খুনী। বাপ খৃষ্টান, তবু আদিম ক্রোধে উজ্জীবিত হয়ে ওঠেন। আদিমদের মতোই একটা অনুষ্ঠান, তারপর হত্যা, নিষ্ঠুর, বীভৎস ভয়ানক হত্যা একের পর এক, বাচ্চাটাকে শুদ্ধ। তারপর অনু-তাপ, বিষাদ, যন্ত্রণা। ঈশ্বরের কাছে ব্যাকুল জিজ্ঞাসা। মেয়েটি যেখানে মারা গিয়েছিল, সেখানে একটা নতুন ঝর্ণা জন্ম নিল—ভার্জিন স্প্রীং। মূল কাহিনী স্কান্দিনেভিয়ার মধ্যযুগের লোকগীতি থেকে নেওয়া। বেরিম্যান তার অন্তরে রেখেছেন আজকের সৎ-অসতের প্রশ্ন : পাপ ও তার শাস্তি, যৌন অপরাধ বনাম স্নেহ-প্রেম। এ-ছবি আমরা দেখেছি এবং দুনিয়ার অনেক দর্শকের মতো পিতার প্রতিশোধ-গ্রহণের সমর্থন না করে পারি নি।

অভিশপ্ত কেইন বলল : হে ঈশ্বর, এ শাস্তি আমার পক্ষে গুরুভার, অসহনীয়, আমার শান্তি থাকবে না, ঠাঁই পাব না, যে দেখবে, হত্যা করবে আমাকে। ঈশ্বর ওকে আপন চিহ্ন দিয়ে বললেন : অতঃপর কেইনকে যে হত্যা করবে, তার সাতগুণ প্রতিশোধ নেওয়া হবে তার প্রতি।

কেইনকে ঈশ্বর ক্ষমা করেছিলেন। পাপীকে, দুর্বৃত্তকে, অন্যায়কারীকে মানুষ ক্ষমা করতে পারে কি সমভাবে? সময় ও ব্যক্তিবিশেষে হয়তো পারে—যেমন, 'পিতা, ক্ষমো ক্ষেমংকরে' (মালিনী : রবীন্দ্রনাথ)। অনেক ক্ষেত্রে পারে না, পারা উচিতও নয়—এরই দ্বন্দ্ব ও সিদ্ধান্ত বেরিম্যানের 'ভার্জিন স্প্রীং' : ক্রাইম থ্রিলার নয়, সিন তথা পাপ ও তার শাস্তির, আমাদের অস্তিত্ব-প্রসঙ্গেই এক বিরাট জীবন-জিজ্ঞাসা। 'মানুষের ধর্ম' ও 'সাধনা'য় রবীন্দ্রনাথও একই প্রশ্ন তুলেছেন ও তার উত্তর দিয়েছেন।

অতএব, প্রতিভাবান শিল্পীর হাতে পড়লে, ক্রাইম-থ্রিলারও মানবজীবনের অস্তি-নেতিবাচক ও মহৎ শিল্প হতে পারে, হয়ে উঠেছে। ধ্রুপদী মহাকাব্য ও ট্র্যাজেডির সঙ্গে এইসব ছবির তখন নিকট-আত্মীয়তা।

(৪)

ভারতীয় চলচ্চিত্রে—মহৎ সৃষ্টির কথা বাদই দিচ্ছি, এমনকি নিরীক্ষামূলক ছবির কথাও—সাধারণ, নিপাট নিখুঁত ও আনন্দ-দায়ক ক্রাইম-থ্রিলার একটাও নেই। ব্যোম-কেশ, ঘনাদা, পরাশর বর্মা ছাড়া মৌলিক গোয়েন্দাও আমাদের সাহিত্যে নেই। এমনকি, অরণ্যদেব - ম্যানড্রেক - লোগানদের মতো স্ট্রিপ্ কমিক্স্ নেই। নেই, তার সন্ধানে চলচ্চিত্র-সাহিত্য-শিল্পের পাড়া ছুঁয়ে আমাদের যেতে হবে সমাজবিজ্ঞানের মানমন্দিরে। সেও আরেক বিচিত্র থ্রিলার। কিন্তু সে বিরাট প্রসঙ্গ।
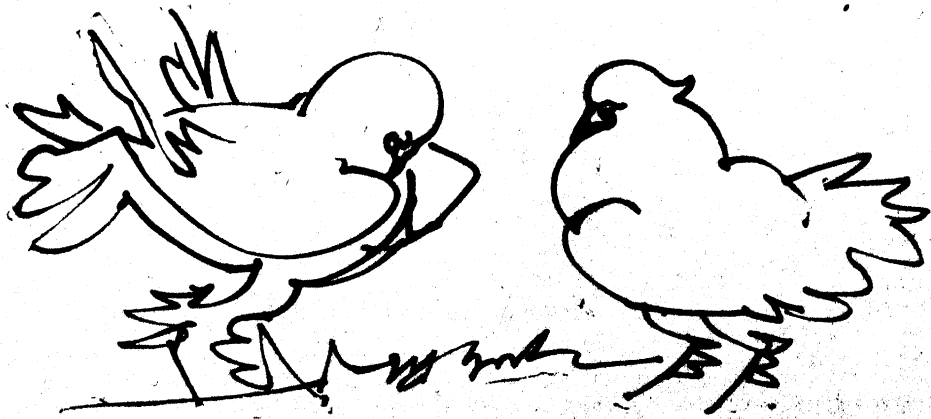
প্রেক্ষাগৃহ

আজকের কথা :

ফ্রান্সের "নব তরঙ্গ"-এর কয়েকজন পরিচালক

আজ আর এ-কথা কারুরই অবিদিত নেই যে, আধুনিক ইয়োরোপীয় সিনেমার শুরু হচ্ছে ফরাসী 'নুভেল ভাগ' দিয়ে। এই 'নুভেল ভাগ' বা নবতরঙ্গ আখ্যায় বিশেষিত করা হয়েছে ফরাসী দেশের এমন কয়েকজন চিত্র-পরিচালককে, যাঁরা ১৯৫৮-৫৯ সালে ফ্রান্সের চলচ্চিত্রজগতে স্বাধীনভাবে পরিচালিত তাদের প্রথম ছবির মাধ্যমেই চিত্ররসিক দর্শকদের দৃষ্টিকে বিশেষভাবে আকৃষ্ট করতে সক্ষম হন। এই যে 'নুভেল ভাগ' বা নবতরঙ্গের লেবেল, এটি বিশেষ কোনো অর্থবোধক না হ'লেও এর প্রয়োজনীয়তার কথা অস্বীকার করা যায় না। এই নব তরঙ্গের লেবেল যে-ক'জন নবাগত ফরাসী চলচ্চিত্রকারের নামের সঙ্গে যুক্ত করা হয়েছিল, তাদের পরস্পরের মধ্যে আর কোনো সাধারণ সম্পর্ক থাকুক আর নাই থাকুক, ফরাসী চলচ্চিত্রশিল্পের তাৎকালীন অবস্থা যে তাদের সকলকেই অতি অল্প সময়ের ব্যবধানে ফ্রান্সের ব্যবসায়িক চলচ্চিত্রজগতে প্রবেশ করতে উদ্বুদ্ধ করেছিল, এই তথ্যটি স্মরণ রাখা প্রয়োজনীয়। এদের মধ্যে কয়েকজন—এবং বিশেষ উল্লেখযোগ্য কয়েকজন **চিত্রসমালোচক থেকে চিত্র-পরিচালকে** রূপান্তরিত হয়েছিলেন; এ'রা প্রায় সকলেই ছিলেন 'লে কায়িয়ের দু সিনেমা' নামে চলচ্চিত্র মাসিকের প্রতিষ্ঠাতা ও নিয়মিত লেখক। এ'দের মধ্যে তিনজন—ফ্রাঁসোয়া ত্রুফো, জাঁ লুক গদার এবং ক্লদ চাব্রল আজকের নূতন ফরাসী চলচ্চিত্র-জগতের বিশিষ্ট প্রভাব। অ্যালা রেনে, অ্যাগ্‌নেস্‌ ভার্দা ও জর্জ ফ্রাঞ্জু প্রমুখ কয়েকজন আবার তথ্যচিত্রের পরিচালনা ছেড়ে কাহিনী-চিত্রকারের ভূমিকা গ্রহণ করেছেন।

সম্প্রতি এই 'নুভেল ভাগ', বা নব তরঙ্গকে একটা সংজ্ঞা দেবার প্রয়াস চলেছে, যার দ্বারা কোন্‌ কোন্‌ পরিচালক এর গন্ডীর অন্তর্ভুক্ত এবং কে কে নয়, তা বোঝা যায়। অথচ এ-ধরণের সংজ্ঞা তখনই দেওয়া সম্ভব, যখন এর গন্ডীভুক্ত পরি-চালকদের মধ্যে কোনো বিশেষ শিল্পরীতি আবিষ্কার করা যায়; অথচ দুর্ভাগ্যের বিষয়, নব তরঙ্গের সূচনাতে তাদের মধ্যে এমন কোনো সাধারণ বৈশিষ্ট্য ছিল না এবং বর্তমানেও নেই। প্রথমটা এই 'নব তরঙ্গ'-এর সংজ্ঞাকে জলের মতো সহজ করবার চেষ্টা হয়েছিল। ঘটনাটি এই। রোজার ভাদিম যখন সহকারী চিত্রপরিচালকরূপে কাজ করছেন, তখনই তিনি তখনকার উঠতি-তারকা ব্রিগিত বার্দোকে বিবাহ করেন। বেশ কয়েক বছর সহকারী পরি-চালক থাকবার পরে তিনি একজন উৎসাহী

মেয়রের খরত্রাণ তহবিলের জন্য অভিনেতৃ সংঘ স্টারে যে অনুষ্ঠানের আয়োজন করে-ছিলেন, তার কয়েকটি চিত্রে রাধামোহন ভট্টাচার্য, পশ্চিমবঙ্গের রাজ্যপাল শ্রীধর্মবীর, উত্তমকুমার, মেয়র শ্রীগোবিন্দ দে, শ্রীসুকমলকান্তি ঘোষ, নন্দিনী মালিয়া, সুব্রতা চট্টো-পাধ্যায়, সৌমিত্র চট্টোপাধ্যায়, শুভেন্দু চট্টোপাধ্যায় ও অনুপকুমার। ফটো : অমৃত

প্রযোজকের দ্বারা স্বাধীনভাবে চিত্র-পরিচালনা করবার জন্যে নিযুক্ত হন। এর ফলে নায়িকারূপে তাঁর স্ত্রী দ্বারা অভিনীত ও ১৯৫৬ সালে মুক্তিপ্রাপ্ত 'এ দিও ক্রেয়া লা ফাম' ছবিখানি দেশে-বিদেশে প্রচুর আর্থিক সাফল্য লাভ করে। এই সময় থেকেই চিত্রপ্রযোজকেরা অল্প-বয়সী পরিচালক এবং অল্প-বয়সী নায়ক-নায়িকার ওপর অর্থলগ্নী করবার ঝুঁকি নিয়ে এগিয়ে এলেন এই আশায় যে, তারুণ্যই পণ্য হিসেবে বিকোবে ভালো। হাতের কাছেই তাঁরা পেয়ে গেলেন 'লে বক্তারিয়ের দ্যু সিনেমা'র নব্য গোষ্ঠীটিকে। ফলে অকস্মাৎ একত্রে যে-সব প্রতিভা বিস্ফোরণের মতোই ফরাসী চলচ্চিত্রাকাশে উদ্ভাসিত হয়ে উঠল, তাদেরই মধ্যে বৈশিষ্ট্যসম্পন্ন তিনজনকে—ত্রুফো, গদার ও রেনেকে বেছে নিয়ে তাদের শিল্পসৃষ্টি সম্পর্কে কিছু আলোচনা করা যাব।

ফ্রাঁসোয়া ত্রুফো ঃ

চলচ্চিত্ররসিকদের সঙ্গে ত্রুফোর প্রথম পরিচিতি ঘটে চলচ্চিত্রসমালোচক হিসেবে। তাঁর সমালোচনার প্রতি বিখ্যাত সমালোচক আঁদ্রে বেজিন-এর দৃষ্টি আকৃষ্ট হয় এবং তিনিই এঁকে 'লে কায়িয়ের দ্যু সিনেমা'র পরিচালকগোষ্ঠীর সঙ্গে পরিচয় সাধন ক'রে দেন। এই পত্রিকাতে ত্রুফো প্রায় দীর্ঘ আট বছর ধ'রে তদানীন্তন ফরাসী চলচ্চিত্রের গতানুগতিকতার বিরুদ্ধে বিষোদ্গার করেন। একদিকে তিনি যেমন ফরাসী লেখকের বক্তব্য-এর সমর্থক ছিলেন, অন্যদিকে তেমনি তখনকার দিনে ফ্রান্সে অল্প পরিচিত আমেরিকান পরিচালক—হাওয়ার্ড হক্‌স্‌, রাউল ওয়াল্‌স্‌, আলফ্রেড হিচকক প্রভৃতির সপক্ষে উচ্ছ্বসিতভাবে লেখনী চালনা করেছেন। ১৯৫৪ সালে ত্রুফো 'য়ুন ভিজিত' নামে ১৬ মিঃ মিটারের একটি স্বল্পদীর্ঘ চিত্র পরিচালনা করেন, কিন্তু এর সম্বন্ধে বিশেষ কোনো উচ্চবাচ্য শোনা যায় নি। ১৯৫৭ সালে 'লে মিস্ট' নামে একখানি ছোট ছবির মাধ্যমেই তিনি প্রথম সাড়া জাগাতে সমর্থ হন সম্পূর্ণ অপ্রত্যাশিতভাবে। বিদ্রোহী ভাবাপন্ন একজন তরুণ চিত্রসমালোচকের হাত দিয়ে যে বাল্যের অপাপবিদ্ধ মাধুর্য-মণ্ডিত দিনগুলির কল্পনা-রঙীন স্মৃতিচিত্র গ'ড়ে উঠবে, এ-কথা ভাবতেই পারা যায় না। অথচ একদল বালক কৈশোরে পদার্পণ ক'রে নিতান্ত বাল্যোচিত ঔৎসুক্য নিয়ে কিভাবে একজন তরুণীর বিষয়ে আগ্রহশীল হয়ে উঠেছিল এবং তাদের ব্যায়ামশিক্ষক ও তরুণীটির মধ্যে উপজাত প্রণয়কে বাধা দিতে গিয়ে ব্যর্থ হয়েছিল, তাই নিয়েই ছবিটি গ'ড়ে উঠেছিল।

ত্রুফোর প্রথম পূর্ণদীর্ঘ কাহিনীচিত্র হচ্ছে ঃ 'লে কাতর সাঁ কু' বা 'দি ফোর হাণ্ডরেড ব্লোজ' (অবশ্য মূল ফরাসী নামের যথার্থ ইংরিজী হওয়া উচিত 'লিভিং ইট আপ')। ছবিটির বক্তব্যের মধ্যে বিদ্রোহের সুর থাকলেও আসলে এটি একটি আত্মজীবনীর দলিল। ছবিটিতে একটি বছর বারো বয়েসের ছেলের কাহিনী বিধৃত। স্কুল তার কাছে বৈচিত্র্যহীন, একঘেয়ে এবং অন্যায়শাসন পীড়নের জায়গা। বাড়ীতে সে দেখে, তার বাপ-মা পরস্পরকে অবিশ্বাস করে, দুজনেই দুজনকে দেখতে পারে না। এরই মাঝে সে আরও পাঁচটা ছেলের মতো নিজের একটা ছোট্ট জগৎ গড়ে নিয়েছে ঃ সে-জগৎ হচ্ছে পুতুলের জগৎ এবং পুতুল-পুজোর জগৎ। একটি পুজোর পুতুলের জন্যে সে তার ঘরে একটি বেদী পর্যন্ত তৈরী করেছিল। একদিন ঐ বেদীর ওপর মোমবাতি জ্বেলে সে ঘরে অগ্নিকাণ্ড বাধায় আর কি। তার জীবনে ঝঞ্ঝাট লেগেই ছিল; কিন্তু বড়ো রকম বিপদ এল সেইদিন, যে-দিন সমুদ্রের ধারে বেড়াতে যাবার জন্যে খরচ জোগাড়ের উদ্দেশ্যে সে একটি টাইপরাইটার চুরি ক'রে তার বাপের কাছে ধরা প'ড়ে গেল এবং তার বাপ তাকে সোজা থানায় টেনে নিয়ে গেলেন।

কাহিনীর এই পর্যন্ত ছবিটি ছোট ছোট দৃশ্য এবং তুলির আঁচড়ের মতো ছোট ছোট ইঙ্গিতে ভরা হয়ে ছেলেটি, তার বাপ-মা এবং তার বিশিষ্ট বন্ধুর চরিত্রচিত্রণে সাহায্য করেছে; এ-ছাড়া তার বাপ ও মা একবার যেন তার প্রতি স্নেহপরায়ণ হয়ে তাকে বোঝাবার চেষ্টা করছেন, আবার পরক্ষণেই তার প্রতি একান্ত বিরূপ হয়ে উঠছেন, এ দৃশ্যও যেমন দেখানো হয়েছে, তেমনই আবার তার নিজেরও বিপরীতমুখী চরিত্রটিকে—কোনো সময়ে সে অকারণেই খুশীতে ভ'রে উঠছে এবং অপর কোনো সময়ে দারুণ হতাশায় সে ভেঙে পড়ছে, এই চরিত্রটিকে—সুন্দরভাবে দর্শকের সামনে তুলে ধরা হয়েছে। অথচ মজা এই যে, সমস্ত জিনিসটা এমন স্পষ্টাস্পষ্টি, নিস্পৃহ এবং আবেগহীনভাবে বলা হয়েছে যে, দর্শক চরিত্রটির যেন ভিতর পর্যন্ত দেখতে পায়, অথচ তার প্রতি কখনও কখনও সহানুভূতি প্রকাশের সুযোগ পেলেও তার সম্বন্ধে সমালোচনাও করতে পারে অর্থাৎ চরিত্রটিকে চিরাচরিতভাবে এমন আবেগভরা ক'রে চিত্রিত করা হয় নি, যাতে দর্শক তার বিচারবুদ্ধি হারিয়ে তার সঙ্গে একাত্ম হয়ে পড়বে। তার চারপাশের যে-জগৎকে দেখানো হয়েছে সেটি তারই দৃষ্টিকোণ থেকে এবং তার সঙ্গে ওতোপ্রোতভাবে সংশ্লিষ্ট। যা-কিছু তার জীবনে ঘটেছে, তার জন্যে বহুলাংশে সে নিজেই দায়ী এবং নিজের অপরাধেই সে শেষ পর্যন্ত নাবালকদের জন্যে নির্দিষ্ট জেলখানায় এসে হাজির হল।

কিশোর-নায়কের এই জেলখানায় আসবার পর থেকেই ছবিটির সুর ও পদ্ধতি ধীরে ধীরে পরিবর্তিত হয়েছে এবং দুটি প্রচণ্ড শক্তিশালী অবিচ্ছিন্ন ঘটনাপ্রবাহ এই দ্বিতীয় অংশে দেখতে পাওয়া যায় ঃ এক, জনৈক মনঃসমীক্ষকের সঙ্গে তার কথোপকথন এবং দুই, জেল থেকে পালিয়ে দীর্ঘপথ বেয়ে সমুদ্রের মাঝে গিয়ে পড়া, যে-সমুদ্র দুরন্ত মুক্তির প্রতীক রূপেই ছবিটিতে ব্যঞ্জিত।

মনঃসমীক্ষকের সঙ্গে সাক্ষাৎকারের সম্পূর্ণ দৃশ্যটি একটি বিশেষ দৃশ্যবিন্যাসের মাধ্যমে তোলা হয়েছে; এখানে প্রশ্নকর্তাকে চোখের বাইরে রাখা হয়েছে সর্বক্ষণ, যার কিশোর-নায়ককেই আমরা দেখি। এই দৃশ্যটিতে নায়কের জীবনে আগে যা কিছু ঘটে গেছে এবং তার ব্যক্তিগত, অন্তরের কথা, সবই প্রকট হয়ে ওঠে। দৃশ্যটিকে এমনভাবে গ'ড়ে তোলা হয়েছে যে, মনে হয় জায়গাটা একেবারেই একান্ত নিভৃতে, অন্ধকারময় স্থানে। এর পরই আসে সেই লম্বা দৌড়ের দৃশ্য এক সম্পূর্ণ আলোকজ্জ্বল এবং উন্মুক্ত পরিবেশে। এখানে ক্যামেরা যেন বন্ধনহারা, স্বচ্ছন্দগতিবিশিষ্ট। দৌড়ের শেষে সমুদ্রের তীরভূমিতে কিশোরটি যখন থমকে দাঁড়িয়ে পড়ে দর্শকদের দিকে সপ্রশ্ন দৃষ্টিতে তাকায় এবং শটটি অতর্কিতে ফ্রীজ হয়ে গিয়ে ছেলেটিকে স্বাধীনজীবনে প্রবেশের মুখেই অনড় ও স্তব্ধ করে দেয়, তখন দর্শক হয়ে যায় বিস্ময়ে হতবাক্।

এই ছবিতে ত্রুফোর বক্তব্য যতখানি বিদ্রোহসূচক, তাঁর চিত্রগ্রহণ পদ্ধতি ততখানি নয়। মনঃসমীক্ষকের সঙ্গে সাক্ষাৎকারের দৃশ্যটি নূতনত্বপূর্ণ এবং উত্তেজক, সন্দেহ নেই; কিন্তু ছবির সর্বত্র এমন নূতনত্ব নেই। এখানে ত্রুফো বালকের স্বাস্থ্য ও স্বাধীনতার জয়গান করেছেন এবং বয়স্কদের বাঁধা-ধরা আইনের প্রতি নির্বিচার আনুগত্যকে ধিক্কার দিয়েছেন। ছবিটির মধ্যে ত্রুফোর নিজের বাল্যজীবনী কিছুটা প্রতিফলিত দেখতে পাওয়া যায়।

'তিরে স্যুর ল পিয়ানিস্ট' (১৯৬০) হচ্ছে ত্রুফোর দ্বিতীয় ছবি। এর দৃশ্য-সংস্থাপনা ও চিত্রগ্রহণ পদ্ধতি 'লে কাতর সাঁ কু' থেকে সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র। মনে হয়, চলচ্চিত্রমাধ্যমের কলাকৌশলকে কতদূর পর্যন্ত প্রয়োগ করতে পারা যায়, এই চিন্তাই পরিচালককে পেয়ে বসেছিল। হিচকক, অ্যাল্ড্রিচ, তাস্‌লিন প্রভৃতি পরিচালকের বিশেষ বিশেষ কায়দাগুলিকে এই ছবিতে আত্মসাৎ করা হয়েছে; ছবির কতকটা হচ্ছে রোমাঞ্চকর, কতকটা পরিহাসচ্ছলে রোমাঞ্চকর, আবার কিছুটা কৌতুকে ভরা, আবার এও ইঙ্গিত করা হয়েছে যে, এই সবের পিছনে একটি গভীর তত্ত্ব নিহিত আছে।

এই ছবিটির মেজাজ প্রতি মুহূর্তেই বদলিয়ে যায় অকারণে, এক সময়ে হয়ত মনে হ'ল, কি এক অশুভ ঘটতে চলেছে, আবার তার ঠিক পরমুহূর্তেই কৌতুক-রসের ছড়াছড়ি। বিদ্রূপকে যে কোথায় টেনে নিয়ে যাওয়া হয়েছে, তার ঠিক নেই। এক জায়গায় একটি দুর্বৃত্ত বলছে, আমি যদি মিথ্যা বলি, তাহ'লে আমার মা অকারণে পড়ে মারা যাবে,' আর সঙ্গে সঙ্গে দেখানো হ'ল, জনৈক বৃদ্ধা মরণাপন্ন হয়ে উঠল। আবার কোনো কোনো জায়গায় পরিচালক যেন নিজের খেয়াল চরিতার্থ করবার জন্যে শট নিয়েছেন; যেমন, একটি দরজার ধারে লাগানো ইলেকট্রিক ঘণ্টা বাজানো টেপা-সুইচের ওপর এক বিরাট আঙুল যা শেষ দৃশ্যে তুষারস্তূপকে সুন্দর সজ্জিতভাবে দেখাবার প্রয়াস। কোনো কোনো জায়গায় এমন ব্যঙ্গ প্রয়োগ করা

হয়েছে, যা মাত্র চলচ্চিত্র দর্শকেরাই উপভোগ করবেন; যেমন, নায়ক চার্লি বিছানার ওপর নগ্ন অবস্থায় শোওয়া বারবনিতাকে তার বুকের ওপর চাদর ঢাকা দিতে উপদেশ দিয়ে বলছে : 'ফিল্মে ওরা এইভাবেই করে।' কিন্তু ছবির এই বহুমুখিতা সত্ত্বেও পরিচালকের ব্যক্তিত্ব ছবিটিকে একটি একক বৈশিষ্ট্য দান করেছে; মনে হয়, ছুটির মেজাজ নিয়ে পরিচালক ছবিটি তুলেছেন প্রধানত নিজেকে খুশী করবার জন্যে।

ত্রুফোর পরবর্তী ছবি হচ্ছে 'জুল এ জিম' এই ছবির কাহিনী জুল ও জিম—এই দুই বন্ধুর একই নারী ক্যাথারিণকে ভালোবাসা নিয়ে গড়ে উঠেছে। কাহিনীচিত্রের মধ্যে ত্রুফো সংবাদচিত্রের বহু টুকরো প্রচুর পরিমাণে ব্যবহার করেছেন। ছবি সব সময়েই তিনটি চরিত্রকে ইঙ্গিতধর্মী সুন্দর লাবণ্যপূর্ণ প্রাকৃতিক দৃশ্যের ভিতর দিয়ে অনুসরণ করেছে। যেহেতু ছবিটি কাহিনীপ্রধান, সেই কারণে কাহিনীটি আমাদের জানা দরকার। বন্ধু দুজন—একজন ফরাসী এবং একজন জার্মান—একই সঙ্গে একটি মেয়েকে ভালোবাসে পরস্পরের জ্ঞাতসারে, তারা জানে, ওই মেয়েটিই তাদের মধ্যে সেতুবন্ধন করে তাদের পরস্পরকে নিকটতর করেছে এবং ওদের মধ্যে কোনো ঈর্ষা দ্বেষ নেই। ওরা আরও জানে, একমাত্র মৃত্যুই ওদের তিনজনকে পরস্পরকে কাছ থেকে পৃথক করতে পারে, অন্য কিছুই নয়। কাজেই দেখা যাচ্ছে যে, কাহিনীর মূল গতিবেগ যোগাচ্ছে ঐ মেয়েটি, কেননা ওরই সিদ্ধান্তের ওপর সব কিছু নির্ভর করছে। কাকে সে বিবাহ করবে এবং কার সন্তানকে সে গর্ভে ধারণ ধারণ করবে, ঘর করবার জন্যে সে কাকে নির্বাচিত করবে এবং কাকেই বা সঙ্গী হিসেবে নিয়ে সে মৃত্যুবরণ করবে—এইসব সমস্যার সমাধানের পথে ছবিটি এগিয়েছে: কোনো বিষয়ে মনস্থির করতে মেয়েটির যত দেরী হয়েছে, ছবিটিকে ততই থমকে থমকে দাঁড়াতে হয়েছে।

মহাশ্বেতা চিত্রে শ্রীমান মলয় ও অঞ্জনা ভৌমিক

মেয়েটি হচ্ছে চিরন্তনী নারী, তার পরিবর্তনশীল মনের হদিশ খুঁজে পাওয়া দায়, সহজে সে কোনো সিদ্ধান্ত নিতে পারে না, সব সময়েই আকস্মিক আবেগের দাস। অপরদিকে এমনই তার মোহিনী শক্তি যে, যে-কেউ তার সংস্পর্শে আসে, সেই তার বশীভূত হয়ে পড়ে। কিন্তু এই যে প্রায়-উর্বশী চরিত্র, এ উপন্যাসে পড়তেই ভালো লাগে, কোনো রক্তমাংসের দেহধারিণীকে—তিনি যতই কোমল, পেলব, সুন্দরী হোন না কেন—দিয়ে মঞ্চে বা পর্দায় অভিনয় করাতে গেলেই ত্রুটি দেখা দিতে বাধ্য। এবং সেই অবধারিত ত্রুটির হাত থেকে 'জুল এ জিম' ত্রুফোর 'জাম্প কাট' সত্ত্বেও মুক্ত হতে পারেনি।

খতায়নের দিবস্বপ্নে নিতাই ঘোষ এবং শান্তা দাশগুপ্ত

ত্রুফোর আধুনিকতম ছবি হচ্ছে 'লা মুর আ ভাঁতাঁ'—ছবিটি একটি আন্তর্জাতিক সহ-প্রযোজনার ফল। ত্রুফো সম্পর্কে মোটের উপর বলতে পারা যায় যে, ভুলভ্রান্তি বা ত্রুটিবিচ্যুতি সত্ত্বেও তিনি একজন প্রতিভাবান চলচ্চিত্র-পরিচালক, যিনি চলচ্চিত্রের মাধ্যমে অত্যন্ত স্বাভাবিকভাবে ও নিঃসংশয়ে নিজেকে প্রকাশ করতে সমর্থ।

জাঁ লুক গদার :

ত্রুফোর মতো জাঁ লুক গদারও 'কাহিয়ের দু সিনেমা'র গোষ্ঠীভুক্ত; প্রথমে সমালোচক, পরে পরিচালক। ১৯৫৮ সালে এঁরা দুজনে মিলে 'য়্যুন হিস্টয়ে দু' নামে একটি ছোট বেপরোয়া সস্তা হাসির ছবি পরিচালনা করেছিলেন। কিন্তু ওঁদের পরিচালনাধারার মধ্যে মিলের সমাপ্তি ওইখানেই। ত্রুফোর পরিচালনার স্টাইলের মধ্যে ক্ষ্যাপামি ও বিদ্রোহের ছোঁয়াচ থাকলেও আসলে তাঁর মধ্যে আছে তাঁর পূর্বসূরী রেনোয়ার কাব্যধর্মী মানবিকতাবাদ এবং তারই সঙ্গে জনচিত্তনন্দনকারী ধ্রুপদী শিল্পগুণ। কিন্তু গদার হচ্ছেন সম্পূর্ণ মৌলিক। ইনি হচ্ছেন এমন একজন চিত্রপরিচালক, যিনি চলচ্চিত্রকে নতুন পথে চলতে বাধ্য করেন। চলচ্চিত্রের মাধ্যম তাঁকে কোনো দিন আতঙ্কিত করেনি; কারণ, চলচ্চিত্র সম্বন্ধে যে কখনও কোনোও শেষ কথা থাকতে পারে, তা তিনি কোনোও দিনই বিশ্বাস করেন নি। এটা করতেই হবে এবং ওটা করা কিছুতেই চলবে না—এমন ধরাবাঁধা অনুশাসন তিনি নিজে পরীক্ষা ক'রে না দেখে মানতে নারাজ।

গদার যদিও জন্মেছিলেন প্যারিসে, তাঁর জীবনের প্রথম চব্বিশটা বছর কেটেছিল সুইজারল্যান্ডে এবং তাঁর বংশেও ছিল সুইস রক্ত। ১৯৫৪ সালে তিনি একটি বন্যা নিরোধক বাঁধ সম্পর্কে 'অপারে-

শন বেটন' নামে একটি তথ্যচিত্র নির্মাণ করেন। এর পরেই তিনি প্যারিসে চলে এসে 'লে কাহিয়ের দ্যু সিনেমা' নামে পত্রিকাটির লেখক গোষ্ঠীভুক্ত হন এবং ১৯৫৫ থেকে ১৯৫৮ পর্যন্ত ছোট ছোট গল্পের চিত্ররূপ দিতে দিতে সিনেমা সম্পর্কে নিজের সহজ ও মুক্ত ভঙ্গীটিকে গড়ে তোলেন। এরপর ১৯৫৯ সালে তিনি নির্মাণ করেন তাঁর প্রথম পূর্ণ দৈর্ঘ্য কাহিনীচিত্র "আ বু দ' স্যুফল" (শ্বাসরোধ)। ত্রুফোর সহযোগিতায় চিত্রনাট্য রচনা করে অনুসন্ধানমূলক রূপে চরিত্রকে রেখে ও দু'জন অখ্যাত শিল্পীকে নায়ক-নায়িকারূপে নিয়ে ছবিটিকে অত্যন্ত কম খরচায় চার সপ্তাহের মধ্যে তুলে ফেলা হয়। অথচ মুক্তিলাভ মাত্রই ছবিটি অভাবিতপূর্ব আর্থিক সাফল্য লাভ করে, এর নায়ক-নায়িকাকে রাতারাতি উজ্জ্বল তারকায় পরিণত করে এবং নব তরঙ্গ সম্প্রদায়ভুক্ত পরিচালকদের মধ্যে গদারকে সবচেয়ে বেশী আলোচনার পাত্র ক'রে তোলে।

ছবিটির সাফল্যের অনেকগুলি কারণের মধ্যে ছবির নায়কের চরিত্রটি হচ্ছে দর্শক-সাধারণের অত্যন্ত মনোমত। আইন, শৃঙ্খলা সম্বন্ধে তার ব্যক্তিগত কোনো ধারণা নেই; তবে সে মনে করে, ওগুলো তার সম্বন্ধে প্রযোজ্য নয়। বিদ্রোহের নায়ক সে হতে চায় না, তবে পয়সা পেলে সে বিদ্রোহ করতে পারে। যা-কিছু করে, তাতেই সে সফলকাম হয়। নারীসঙ্গ সে গণ্ডায় গণ্ডায় পায়; মোটর গাড়ী চুরি করতে সে ওস্তাদ, অর্থ সে অজস্র সংগ্রহ করে। কিন্তু কোনো অজ্ঞাত কারণে শেষ পর্যন্ত তার ভালোবাসার পাত্রীটি তার সঙ্গে বিশ্বাসঘাতকতা করে এবং তাকে পুলিশের হাতে সমর্পণ করে। এই নায়কের চরিত্রটি নিয়ে বহু রকম আলোচনা হয়েছে, কিন্তু চরিত্রটি যে ঠিক কি—সে কি চলতি সমাজশৃঙ্খলাকে তছনছ ক'রে ফেলতে চায়, কিম্বা একটা বিরাট শক্তিমান পুরুষরূপে নিজেকে প্রকাশ করতে চেয়েও শেষ পর্যন্ত ব্যর্থ হয়েছে?—, গদার আসলে তাকে কি করতে চেয়েছিলেন, তা' নিশ্চয় করে কিছু বলা যায় না। কিন্তু চরিত্রটি এই যে ধরাছোঁওয়ার বাইরে, এই যে তার সম্বন্ধে একটা দ্ব্যর্থভাব রয়ে গেছে, এইটিই ছবিটিকে দুর্বল করার পরিবর্তে শক্তিশালী করে তুলেছে। সাধারণ মানুষের সুপ্ত ইচ্ছাগুলি এই চরিত্রটির মাধ্যমে রূপ পায় বলে চরিত্রটিকে তাদের কাছে বিশ্বাস্য বলে বোধ হয়।

ছবিটিতে কি বলা হয়েছে, সেইটেই বড়ো কথা নয়; কি ভঙ্গীতে বলা হয়েছে, সেইটিই আসল বিবেচ্য বস্তু। এবং এইখানেই আসে, ছবির মূল সুর, গদার-পরিকল্পিত চিত্রকল্প বা ফিল্ম ফর্ম। স্বীকার করতেই হয়, মানুষকে চমক দেবার একটি সুপরিকল্পিত প্রয়াস গোড়া থেকেই লক্ষ্য করা যায়: যেমন জাম্প কাট অর্থাৎ একটি প্রকাণ্ড দূরের লং শটের পরেই একট ক্যামেরা-কোণ থেকে একটি অত্যন্ত কাছের ক্লোজ-আপ গোছের ব্যাপার। শুধু তাই নয়: ঘন ঘন পারিপার্শ্বিক, আলোকীকরণ ও ছবির মেজাজের পরিবর্তন এবং সবই যেন আগে থাকতে কোনো কিছু না ভেবেই হঠাৎ হঠাৎ অতি সহজেই ঘটছে, এমন একটা ভাব। গদারের চলচ্চিত্র-রীতি আসলে দ্রুতগতিসম্পন্ন ও সরস। দর্শককে তিনি চরিত্র ও ঘটনাগুলি থেকে বিচক্ষণতার সঙ্গে দূরে রাখেন এবং তিনি জানেন দর্শককে কতটুকু দেখাতে হবে ও কতখানিই বা অকথিত রাখতে হবে।

ফ্রান্সের পূর্বপ্রচলিত রীতিকে ভঙ্গ করে গদার দুঃসাহসিকতার সঙ্গে তাঁর রীতিকে স্পষ্ট ও জোরের সঙ্গে প্রয়োগ করেছিলেন, অথচ তাঁর ছবির উপভোগ্যতাকে অণুমাত্রও কমতে দেননি। লোকের মনে প্রশ্ন জেগেছিল, গুরুগম্ভীর বিষয়বস্তুকে অবলম্বন করে তিনি ছবি করতে পারবেন কিনা। এর উত্তর তিনি তাঁর দ্বিতীয় ছবিতেই দিয়েছিলেন। অবশ্য ১৯৬০ সালে কৃত "ল পেতি সোলদা" ছবির চরিত্রগুলি সেই সময়কার ঐতিহাসিক আলজিরিয়া-সঙ্কটের সঙ্গে জড়িত বলে প্রায় তিন বছর মুক্তি পায় নি। 'ল পেতি সোলদা' ছবিটি আমাদের সামনে একটি সমস্যা হয়ে দেখা দেয়। সমস্যাটি হচ্ছে : ছবিটি কি কতকগুলি নির্বোধ ভণ্ড লোক সম্পর্কে একটি তীব্র অথচ নির্লিপ্ত আলোচনা, কিম্বা ছবির পরিচালকের মতে যে লোকগুলি বুদ্ধিমান, তাদের সম্বন্ধে একটি বোকামি ও ভণ্ডামিতে ভরা চিত্রায়ণ? ছবির বুদ্ধিজীবী নায়ক সিদ্ধান্ত নিতে দেরী করে, সমাজদ্রোহিতার মনোভাব নিয়ে প্রেম করতে গিয়ে নিজের দুর্বলচিত্ততা প্রকাশ করে ফেলে, দুঃসাহসিকতা দ্বারা সম্মোহিত হলেও আসলে একটি কাপুরুষ। কিন্তু এ সত্ত্বেও ছবিটি আশ্চর্যভাবে উপভোগ্য। মনে হয়, গদারের জাদুস্পর্শে ছবিটি সজীব হয়ে উঠেছে। ছবিটি যে শতকরা একশো ভাগই চলচ্চিত্র, এ বিষয়ে সন্দেহের অবকাশ নেই।

"য়ুন ফাম এতুন ফাম" হচ্ছে গদারের তৃতীয় ছবি। এই ছবিতে তিনি আবার তাঁর প্রিয় হাস্যরসপ্রধান মিলনান্ত (কমেডি) কাহিনীতে ফিরে আসেন। অনেকে বলেন, এটি আসলে তাঁর অভিনেত্রী-স্ত্রী আনা কারিণার দেহ-সৌষ্ঠবকে চলচ্চিত্রে ধরে রাখবার জন্যেই নির্মিত হয়েছিল এবং সেই কারণেই এটিকে সিনেমাস্কোপ ও রঙ্গীনচিত্র করা হয়েছে। ১৯৫৮ সালে অভিনেত্রী গেনেভিভ ক্লুনি প্রদত্ত একটি সূত্র ধরে গদার একখানি চিত্রনাট্য তৈরী করেন। সেই চিত্রনাট্য অবলম্বন করে তরুণ পরিচালক ফিলিপ দ্য ব্রোকা যখন "লে জ্যু দ্য লাম্যুর" (১৯৫৯) ছবি তৈরী করেন, তখন দেখা গেল যে, তিনি চিত্রনাট্যটির সমূহ পরিবর্তন করেছেন। কাজেই গদার সেই চিত্রনাট্যকে আবার কাজে লাগালেন "য়ুন ফাম এতুন ফাম" তৈরী করবার জন্যে। একটি তরুণী তার প্রেমিকের সম্পূর্ণ মনোযোগ আকর্ষণ করতে চায় এবং তারই এক ঘনিষ্ঠ বন্ধুর কাছ থেকে সন্তান কামনা করে—এই কাহিনীসূত্রটি যাতে জাঁ পল বেলমন্ডো, জাঁ ক্লড ব্রিয়ালি এবং আনা ক্যারিণা, এই তিনজন প্রথিতযশা শিল্পীর নাট্যনৈপুণ্য প্রকাশের সহায়ক হয় এবং সঙ্গে সঙ্গে পরিচালকের বহু রকম কল্পনা ও কলাকৌশলকে স্বচ্ছন্দে প্রযুক্ত হতে দিতে পারে, সেই দিকে লক্ষ্য রেখেই ছবিটি তৈরী করা হয়েছে। ছবিটির মধ্যে সহজ পরিচালনপদ্ধতি, অত্যন্ত হাল্কা ও মুক্ত সুর দর্শককে খুশীতে ভরিয়ে তোলে। কিন্তু ছবিটিকে প্রাণ খুলে উপভোগ করতে হলে একথা ভুললে কিছুতেই চলবে না যে, এটি হচ্ছে আসলে আনা কারিণা সম্বন্ধে একটি ঘনিষ্ঠ তথ্যচিত্র। এই কারণেই দেখা যায়, কোনো কোনো দৃশ্যে গদার যে শটটি সবচেয়ে খারাপ হয়েছে, ভালো শট-এর পরিবর্তে সেটিকেই রেখেছেন। অভিনেত্রী কারিণা কোথাও হয়ত' একটি লাইন ভুলে গেছেন, কিম্বা চলতে গিয়ে সেটের কোনো একটি জিনিষের সঙ্গে ধাক্কা খেয়েছেন, সুন্দরী আনা কারিণার ব্যক্তিগত জীবনকে পরিস্ফুট করবার জন্যে সেই ভ্রান্তিপূর্ণ দৃশ্যগুলিকেই তিনি তুলে ধরেছেন দর্শকের সামনে।

১৯৬২ সালে তোলা "ভিভ্র্ সা ভি" হচ্ছে গদারের পরবর্তী চিত্র। কল্পনাবিলাসিতা থেকে সম্পূর্ণভাবে দূরে রেখে এই ছবিটিতে বেশ্যাবৃত্তি সম্বন্ধে বলা হয়েছে। পর পর বারোটি 'ট্যাব্লো'র মাধ্যমে কাহিনীটি বিধৃত হয়েছে। এক একটি ট্যাব্লো'র আগে কি ঘটতে চলেছে সংক্ষেপে তার পরিচায়িকা দেওয়া হয়েছে। কাহিনীতে দেখানো হয়েছে নানা নামে প্যারিসের এক দোকানকর্মী পয়সার অভাবে কেমন করে প্রথমে জুয়াচুরি-চুরির মধ্যে মিশেছে এবং পরে নিয়মিতভাবে বেশ্যাবৃত্তি গ্রহণ করে; এরই ফাঁকে সে কেমন করে প্রেমে পড়ে ও জীবন সম্বন্ধে নতুন করে চিন্তা করতে চায় এবং শেষ পর্যন্ত যখন তার দালাল তার এক খরিদ্দারের সঙ্গে বিশ্বাসঘাতকতা করে, তখন সে কেমনভাবে

দৈবক্রমে গুলি দ্বারা আহত হয়। কিন্তু গদার কাহিনীটিকে ভিন্ন চোখে দেখেছেন। তিনি বলছেন, নানা তার দেহ বিক্রয় করেছে বটে, কিন্তু আত্মাটিকে সে মরতে দেয়নি। সে বহু ঘটনার মধ্য দিয়ে মানুষের গভীরতম আবেগের যত রকম প্রকাশ সম্ভব, সে সম্বন্ধে বিচিত্র অভিজ্ঞতা লাভ করল। একটি রোমান্টিক ব্যাখ্যা নিশ্চয়ই। ছবিটির ব্রেখটীয় ভঙ্গী সম্পর্কে অনেকে অনেক কথাই লিখেছেন। কোনো কোনো সমালোচকের মতে ছবিটি আসলে বলতে চেয়েছে, জীবন হচ্ছে পরীক্ষার জায়গা এবং এক একজন সেই পরীক্ষার জন্যে এক একটি ক্ষেত্র বেছে নেয়। নানা সেইভাবেই বেছে নিয়েছিল বেশ্যাবৃত্তিকে।

কিন্তু গদারের অন্যান্য ছবি এবং আনা কারিনা যে তাঁর স্ত্রী, এই কথা মনে রেখে ছবিটির অপর এক তাৎপর্য খুঁজে পাওয়া যায়। ছবিটিকে আনা কারিনার একটি জীবন্ত প্রতিকৃতি বলা চলে। ছবিটি আরম্ভ হয়েছে পর্যায়ক্রমে আনার ডান ও বাঁ পার্শ্ব-চিত্র বা প্রোফিল দিয়ে। ভাবাবেগের দিক দিয়ে বলা যায়, নানার জীবনের ঘটনাবলী হচ্ছে আনা কারিনারই পরীক্ষা; তার বিভিন্ন প্রতিক্রিয়া থেকে আমরা আনা সম্বন্ধেই বেশী করে জানতে পারি। এডগার অ্যালেন পোর গল্পটি এতে ফাঁদা হয়েছে গদার কি করতে চান, দর্শককে তাই জানাবার জন্যে। শিল্পী এখানে তাঁর প্রেমের নিদর্শনস্বরূপ তাঁর প্রেমিকার মূর্তিকে একটি চিরন্তন শিল্প-বস্তুতে পরিণত করতে উৎসুক। এইজন্যেই নানাকে শেষ পর্যন্ত মরতে হয়েছে, যদিও তার দ্বারা আনা কারিনার মৃত্যু ঘটেছে, এ-কথা ভাবতে পারা যায় না (সত্যিই এ দুর্দৈব ঘটা কারুরই অভিপ্রেত নয়)। নিজের চিত্রতারকা-স্ত্রীর প্রতি কিছুটা পক্ষপাতিত্বের জন্যেই বোধকরি গদার এই ছবির পরিচালনা ব্যাপারে কোনোরকম চমক আনবার চেষ্টা না করে অত্যন্ত শান্তভাবে নিয়মমাফিক ছবি তুলে গেছেন—প্রতিটি শট্ অত্যন্ত যত্ন-সহকারে পূর্বপরিকল্পিতভাবে তোলা।

তাঁর পরবর্তী ছবিগুলিতে কিন্তু এই শান্তভাব আর নেই। মানবমনের ওপর আণবিক বিস্ফোরণের প্রতিক্রিয়াকে উপজীব্য করে তিনি সৃষ্টি করেছেন "দি নিউ ওয়ার্ল্ড' ইন রোগোপাগ" (১৯৬২)। তাঁর সর্বাধুনিক চিত্র হচ্ছে "লে কারাবিনিয়ের"। একটি নিরপেক্ষ পটভূমিকায় কাহিনীটিকে উপস্থাপিত করা হয়েছে। একটি নির্জন দেশে দুজন চাষী তাদের স্ত্রী নিয়ে সুখে বাস করত। একদিন সেখানে এসে উপস্থিত হল চারজন পোশাক-আঁটা বন্দুকধারী ব্যক্তি। তারা চাষী দুজনকে জানাল যুদ্ধ শুরু হয়ে গেছে এবং যুদ্ধকালীন সুযোগ-সুবিধার কথাও বলল; বলল, সাধারণত যে-সব জিনিস করা বারণ, যুদ্ধের সময়ে সে-সব জিনিস করা বে-আইনী নয়। বলেই তারা চাষী দুজনকে তাড়িয়ে দিয়ে তাদের স্ত্রী ও ধনসম্পত্তি অধিকার করে নিল। চাষীরা ঠিক করল, এই যুদ্ধকালীন সুযোগ তারা নিজেরা গ্রহণ করবে। এই ভেবে তারা রওনা হয়ে গেল। যখন তারা ফিরে এল, তখন দেখা গেল, তারা প্যারিসের নাম-করা প্রাসাদগুলি লুঠ করে এনেছে; অবশ্য এটা 'ছবি-পোস্টকার্ড'-এর প্রতীক দ্বারা বোঝানো হয়েছে। এর পর যুদ্ধ থেমে শান্তি ঘোষিত হল। ওরা ওদের লুঠের সম্পত্তির ওপর দাবি জানাতে গিয়ে শুনল, শান্তির শর্ত হিসেবে রাজা তাঁর সৈন্যদের যুদ্ধাপরাধী ব'লে স্বীকার করে নিয়েছেন এবং ফলে তাদের গুলি করে হত্যা করা হ'ল।

ছবিখানি ব্রেখটীয় প্রভাবের অত্যুজ্জ্বল নিদর্শন। বিচ্ছিন্নকরণকে (অ্যালিয়েনেশনকে) এতদূর পর্যন্ত নিয়ে যাওয়া হয়েছে, ছবির সব চরিত্রকে এমন বিরক্তিকর ও বর্বর করে তোলা হয়েছে যে, দর্শককে শেষ পর্যন্ত সম্পূর্ণভাবে মনুষ্যদ্বেষী হয়ে উঠতে হয়। এইজন্যেই হয়ত ছবিটি আদৌ জনপ্রিয় হয়ে উঠতে পারেনি। কিন্তু সহানুভূতির সঙ্গে যাঁরা ছবিটি দেখবেন, তাঁরা নিশ্চয়ই এর মধ্যে অচিন্তানীয় এবং উত্তেজক উপাদানকে খুঁজে পাবেন।

আজ পর্যন্ত গদার যে-সব ছবি উপহার দিয়েছেন, তা' থেকে তাঁকে একজন মৌলিক, চিন্তাশীল ও দুরন্ত গতিবেগসম্পন্ন চলচ্চিত্র-পরিচালকরূপে স্বীকৃতি দিতেই হয়।

আলাঁ রেনে :

'ব্যবসায়িক' চলচ্চিত্র-জগৎ থেকে অনেকখানি তফাতে পৃথিবীর প্রায় সকল দেশেই একক শিল্পজ্ঞান দিয়ে সৃষ্ট 'আর্ট সিনেমা' জন্মগ্রহণ করেছে। এই 'আর্ট সিনেমা'র অধিকাংশ পরিচালকই চেষ্টা করছেন, চলচ্চিত্রকে সাহিত্য-নিরপেক্ষ করবার জন্যে। ভাস্কর যেমন সেরামূর্তি গড়বার চেষ্টা করে, চিত্রাঙ্কন-শিল্পী যেমন তুলির সাহায্যে তার মনের কল্পনাকে রূপ দেন, চলচ্চিত্র-পরিচালকও তাঁর মানসলোকে সচল ও মুখর ছবির সাহায্যে তাঁর কল্পনাকে রূপায়িত করবার চেষ্টা করেন; এখানে চলচ্চিত্র সাহিত্যনির্ভর নয়, এটি একটি স্বয়ংসম্পূর্ণ বিশিষ্ট আর্ট। আলাঁ রেনে কিন্তু মুখ্যত 'আর্ট সিনেমা'র পরিচালক হয়েও তাঁর সৃষ্টির জন্যে পরমুখাপেক্ষী। প্রথমে তিনি ১৬ মিলিমিটারে ছোট ছোট

ছবি তুলতেন প্রায়ই অন্য আর একজনের সঙ্গে মিলে; তথ্যচিত্র পরিচালনাতেও তিনি ধীরে ধীরে পারদর্শিতা দেখান। বিখ্যাত চিত্রকর 'ভ্যান গগ্' সম্পর্কে তাঁর তথ্য-চিত্রটির কথা এখানে উল্লেখযোগ্য।

রেনে সাহিত্যজগতের খ্যাতনামা ব্যক্তি-দের সঙ্গে সহযোগিতা করে কয়েকটি তথ্যচিত্র তুলেছেন; যেমন, বন্দীশিবির সংক্রান্ত "ন্যূত এং ব্রুইলা" ছবিটির জন্যে তিনি জাঁ কেরলের সাহায্য নিয়েছিলেন। প্লাস্টিক পলিয়েস্টিন প্রস্তুত শিল্প সম্পর্কে 'লে সাঁত দু স্টিরিন' ছবিতে ছড়ার আকারে নেপথ্য ভাষা রচনার জন্যে তিনি রেমন্ড কুইন্যুর শরণ নিয়েছিলেন। তাঁর প্রথম পূর্ণ দীর্ঘ চিত্র "হিরোসিমা, মনামুর" ছবির মূল চিত্রনাট্য ছিল ঔপন্যাসিক মার্গুরাইট ডুরাস রচিত। তাঁর দ্বিতীয় কাহিনীচিত্র "লানে দোর্নিয়ের আ মারিয়েনবাদ"-এর চিত্রনাট্য রচনা করেছেন অ্যালেন রবগ্রিলেট এবং তাঁর তৃতীয় কাহিনীচিত্র "ম্যুরিয়েল য়া ল তাঁ দারতুল"-এর জন্যে তিনি আবার জাঁ কেরল-এর সহায়তা পেয়েছিলেন। রেনে 'হিরোসিমা মনামুর' প্রসঙ্গে যা বলেছেন, তা থেকেই বোঝা যাবে, তাঁর মতে ছবিতে চিত্রনাট্যের স্থান কি, তিনি বলেছেন: "আমি মার্গুরাইট ডুরাসকে খাঁটি সাহিত্যের প্রতি উৎসাহিত করেছিলুম এবং তাঁকে চলচ্চিত্র সম্পর্কে বৃথা চিন্তিত হতে বারণ করে-ছিলুম। আমি একটি কবিতা রচনা করতে চেয়েছিলুম, যাতে ছবি মূল-সাহিত্যের পরিপূরক রূপে কাজ করবে।"

কাহিনীচিত্রে এই যে লেখক-পরিচালক সহযোগিতা, এটি একটি রীতিমত আলো-চনার বস্তু। কেতাবী-পাণ্ডিত্যের ছোঁয়াচ আছে রেনের প্রতিটি কাহিনীচিত্রে। মনে হয়, তিনি চিত্রপরিচালককে সাহিত্যিকের ব্যাখ্যাতা ও চিত্রকলাকুশলতার অধিকারিকের সংকীর্ণ ভূমিকায় নাবিয়ে এনেছেন। কিন্তু "হিরোসিমা, মনামুর" দেখে মন এ-কথা মানতে চায় না। ছবিটা আসলে প্রেমের চিত্র; আকস্মিক প্রেমোচ্ছ্বাসে ভরা; অথচ কাহিনীর চিত্রায়ণে কোথাও যৌন আবেদনের গন্ধ নেই। অবশ্য ফরাসী চিত্রতারকার সঙ্গে জাপানী যুবকের এই প্রেমকে কেন্দ্রীভূত করা হয়েছে হিরোসিমায়, কারণ রেনে চেয়ে-ছিলেন, প্রেমের গল্পটি যেন আণবিক বোমার তুলনায় নগণ্য আকার ধারণ না করে, দর্শক-চিত্তকে সেটি যেন ঐ আণবিক বোমার মতোই বিচলিত করতে সমর্থ হয়। কাহিনীটিতে শেষ পর্যন্ত ফরাসী চিত্র-তারকারই প্রাধান্য দেখা দেয় এবং এই ছবিটি প্রকৃতই নায়িকাপ্রধান। নেভার্স-এ অভি-নেত্রীটির জার্মান সৈন্যের সঙ্গে প্রেমের অভিজ্ঞতা ও বঞ্চনার উপলব্ধি জাপানী যুবকের জীবনের অভিজ্ঞতা থেকে ঢের বেশী মর্মান্তিক।

রেনের পরবর্তী চিত্র 'লানে দের্নিয়ের আ মারিয়েনবাদ' চিত্র হিসেবে সুন্দর। তাঁর ক্যামেরাম্যানের সাহায্যে তিনি ছবিটিকে চোখজুড়ানো রূপ দিয়েছেন। কিন্তু ছবিটির তাৎপর্য কি এবং এর মধ্যে কতটুকুই বা বাস্তব এবং কতটুকুই বা কল্পনা, এ খুঁজে বার করতে গেলে বুদ্ধিজীবীকে পরাস্ত হতে হবে। একজন অপরের মনে প্রত্যয় উৎপাদনে সক্ষম হ'ল, কি হ'ল না—এ নিয়ে কোনোমতেই মতৈক্যের আশা নেই। অনেকে আবার ছবিটির নিহিতার্থ খুঁজতে চেষ্টা করেন; তাঁরা বলেন, দুটি আত্মা হোটেল-নামক পৃথিবীতে পরস্পরের সম্মুখীন হয়েছে এবং স্বাভাবিকভাবেই একজন অপরকে বলেছে: আগেও তাদের দেখা হয়েছিল। তাঁর তৃতীয় ছবি "ম্যুরিয়েল য়া ল তাঁ দা রতুর"ও একটি ধোঁয়াটে সামগ্রী। একজন বিধবা তার সৎ-পুত্রের সঙ্গে কিছুদিন বাস করবার পর তার এক পুরোনো প্রণয়ীকে ডেকে পাঠাল। প্রণয়ী এল সঙ্গে একটি তরুণীকে নিয়ে; মিথ্যা পরিচয় দিল ভাগ্নী বলে। সৎ-ছেলেটি তার এক প্রেমিকার চিন্তায় মগ্ন, যাকে তারই এক বন্ধু উৎপীড়ন করে মেরে ফেলেছে। বিধবার ভূতপূর্ব প্রণয়ীটিও শেষ পর্যন্ত মিথ্যাবাদী বলে প্রতিপন্ন হল। সমস্ত কাহিনীটাই অর্থহীন, গাঁজাখুরি ধোঁয়াটে বলে বোধ হয়। এবং এই কাহিনীর সার্থকতা খুঁজে পাওয়া যায় না।

রেনের সব ছবিতেই স্মৃতিচারণ আছে এবং আছে কল্পনার বিলাস। বুদ্ধি ও নন্দনতত্ত্ব সংক্রান্ত সমস্যার সমাধানের প্রতি তাঁর একটা ঝোঁক সব ছবিতেই প্রকট।

—নান্দীকর

নতুন নতুন ছবি

ভারতীয় চলচ্চিত্রে বাংলার গৌরব দিন দিন শ্রীবৃদ্ধিলাভ করছে। রাষ্ট্রীয় চলচ্চিত্র পুরস্কারের তালিকায় যে কটি ছবি নানান পুরস্কারে চিহ্নিত তার প্রায় অধিকাংশ চিত্র নির্মাতারাই হলেন বাঙালী। ১৯৬৬ সনের শ্রেষ্ঠ ভারতীয় চিত্র 'তিসরী কসম'র পরিচালক বাসু ভট্টাচার্য বাংলা দেশেরই কৃতী সন্তান। শ্রেষ্ঠ চিত্রনাট্যকার হিসেবে পুরস্কৃত হয়েছেন সত্যজিৎ রায় তাঁর 'নায়ক' ছবিটির জন্য। এছাড়া বিশিষ্ট ভারতীয় চিত্র হিসেবে 'সুভাষচন্দ্র', 'ছুটি' এবং স্বল্প-দৈর্ঘ্যের চিত্র 'পিকম্পসেস অফ ওয়েস্ট বেঙ্গল' সম্মানিত তিনটি ছবিরই পরিচালক বাঙালী এবং বাংলা দেশ থেকে নির্মিত। আঞ্চলিক বিভাগের শেষ তিনটি ছবি, যথা—'নায়ক', 'অনুপমা' এবং ওড়িয়া ছবি 'মাটির মনিষ'র পরিচালক হলেন সত্যজিৎ রায়, হৃষীকেশ মুখোপাধ্যায় ও মৃণাল সেন।

জাতীয় চলচ্চিত্র পুরস্কারে গর্বিত বাংলা ছবি স্বদেশ থেকে বিদেশে বন্দিত হোক, প্রশংসিত হোক এ আশা আমরা নিশ্চয়ই মনে মনে পোষণ করতে পারি। বাঙালী এবং বাংলার ছবি নানান পরীক্ষা-নিরীক্ষায় সাফল্য লাভ করুক এটা আমরা সবাই চাই। কারণ বাংলা চলচ্চিত্রের নানান সমস্যা নানা অসুবিধা সত্ত্বেও আপন সিদ্ধান্তে সে অবিচল। এই সঙ্কট মুহূর্তে বাংলা ছবি নির্মাণের প্রাত্যাহিক পরিকল্পনার পরিসমাপ্তি ঘটেনি। নতুন নতুন ছবির মহরৎ এক এক করে অনুষ্ঠিত হচ্ছে। স্টুডিওপাড়ার কর্মজীবনের ব্যস্ততা আলাপে-সংলাপে মুখরিত। পরিচালক তপন সিংহ সম্প্রতি তাঁর নতুন ছবি 'আপন জন'-এর চিত্রগ্রহণ শুরু করেছেন। ইতিমধ্যে ছবির কয়েকটি গান গৃহীত হয়েছে। সঙ্গীতকার হলেন পরিচালক শ্রীসিংহ। এ ছবির কয়েকটি প্রধান চরিত্রাভিনয়ের জন্য মনোনীত হয়েছেন ছায়া দেবী, পার্থ মুখোপাধ্যায়, চিন্ময় রায়, ভানু বন্দ্যোপাধ্যায়, রবি ঘোষ, মৃণাল মুখোপাধ্যায়, রোমী চৌধুরী এবং শমিত ভঞ্জ।

প্রস্তুতি-পরিকল্পনার কথা বলতে গিয়ে নির্মীয়মান 'প্রথম প্রস্তুতি' ছবিটি নাম আগে মনে পড়ল। ইন্দ্রপুরী স্টুডিওয় বর্তমানে এ ছবির অন্তর্দৃশ্য গ্রহণের কাজ চলেছে। বি ডি প্রোডাকসন্সের এ ছবিটির পরিচালক হলেন রবি বসু। ছবিতে গানের সুর-রচনা করেছেন হেমন্ত মুখোপাধ্যায়। অভিনয় করছেন মাধবী মুখোপাধ্যায়, অনুপ মহেন্দ্র ও নির্মলকুমার।

বাংলাদেশে নির্মিত 'মমতা' সাফল্যের পর দুটি একটি করে কলকাতায় হিন্দী ছবি নির্মাণ হচ্ছে। সম্প্রতি প্রযোজক পরিচালক শ্রীপদ নতুন হিন্দী ছবি 'রিওয়াজ'র চিত্রগ্রহণ ইন্দ্রপুরী স্টুডিওতে শুরু করেছেন। এ ছবির নায়ক চরিত্রে রূপদান করছেন প্রবীরকুমার। নায়িকা চরিত্রে মনোনীত হয়েছেন নবাগতা আরতি।

পৌরাণিক ছবি 'দুষ্মন্ত ও শকুন্তলা' শুরু করেছেন পরিচালক বিভূতি চক্রবর্তী। এ বি এম প্রোডাকসন্সের এই নতুন প্রয়াসটির নাম-ভূমিকায় অভিনয় করছেন অভি ভট্টাচার্য ও অনিতা গুহ। সঙ্গীত-পরিচালনায় রয়েছেন কালিপদ সেন।

'এক্ একেলা' চিত্রের শুভারম্ভ

জ্যোৎস্না পিকচার্সের নতুন ছবি 'এক্ একেলা'র শুভমহরৎ সম্প্রতি প্রকাশ স্টুডিওয় অনুষ্ঠিত হয়। ছবিটির পরিচালক হলেন ফণী মজুমদার। বিভিন্ন চরিত্রাভিনয়ে মনোনীত হয়েছেন ইন্দ্রাণী মুখার্জী, দুর্গা খোটে, অভি ভট্টাচার্য, আনোয়ার হুসেন, কনককুমার এবং জীবনকলা। সঙ্গীত পরিচালনা করবেন শচীনদেব বর্মন।

'কাহি' দূর পাপিয়া বোলে'র শুভমহরৎ

পরিচালক বিজয় কাপুর তাঁর নতুন ছবি 'কাহি' দূর পাপিয়া বোলে'র মহরৎ অনুষ্ঠান সম্প্রতি মোহন স্টুডিওয় পালন করলেন। মহরৎ উদ্বোধন করেন পৃথিরাজ কাপুর এবং দিলীপকুমার। ছবির দুটি প্রধান চরিত্রে অভিনয় করছেন নন্দা ও সঞ্জয়। সঙ্গীত পরিচালনা করবেন রাহুল-দেব বর্মন।

আর এক চড়াই ভেঙ্গে ও জীবনরঙ্গ

নতুনত্বের স্বাদ অধুনাকাল অফিস নাট্য-সংস্থা প্রযোজিত নাটকে মাঝে মাঝে পাওয়া যায়, কিন্তু যে অভিনয়রীতির ওপর ভিত্তি করে এই নতুনতর চিন্তা মঞ্চে মূর্ত হয়ে ওঠে তার অভাব অনেক সময়ে সমগ্র নাট্য-প্রযোজনাটি স্বাতন্ত্রে দীপ্ত হয়ে ওঠার পথে অন্তরায় সৃষ্টি করে। এই সত্যটি সম্প্রতি 'স্টার' রঙ্গমঞ্চে ন্যাশনাল এ্যান্ড গ্রিন্ডলেজ ব্যাঙ্ক (মেন) অফিসের কর্মচারীবৃন্দ প্রযোজিত 'আর এক চড়াই ভেঙ্গে' ও '—জীবনরঙ্গ' নাটক দুটি দেখে অনুভূত হয়েছে। প্রতিটি শিল্পীরই অভিনয়দক্ষতা যে আছে তা তাঁদের স্বকীয় অভিনয়েই চিহ্নিত হয়েছে, কিন্তু সংঘবদ্ধভাবে নাটকের গতিকে অব্যাহত রাখার জন্য যে সুষ্ঠু টিমওয়ার্কের প্রয়োজন তা এই নাট্য-প্রযোজনায় যে সব সময়েই ছিল এমন কথা বলা যায় না। নাট্য-নির্দেশক পরেশ মল্লিকের এ বিষয়ে অধিকতর সচেতন হওয়া উচিত ছিল বলে মনে করি।

একথা ঠিক প্রথম নাটক 'আর এক চড়াই ভেঙ্গে' নাটকে বক্তব্যের দিক থেকে যে নতুন চিন্তার খোরাক আছে, কাহিনী-

অজিত গংগোপধ্যায় পরিচালিত প্র[illegible] কাজল গুপ্ত

বিন্যাসের দুর্বলতায় তা সব সময়ে স্বচ্ছ ও সাবলীল হয়ে উঠতে পারেনি। মুখ্য চরিত্রের অভিনেতা তার অভিনয়প্রতিভা দিয়ে এ অভাব পূরণ করতে পারতেন, কিন্তু বাস্তবক্ষেত্রে তা হয়নি। নায়ক চরিত্রের দুঃখ যন্ত্রণা ক্ষোভের প্রকাশ সুশীল ব্যানার্জির অভিনয়ে প্রস্ফুটিত হয়নি। 'জীবনরঙ্গ' নাটকটিতে একটা অশ্রান্ত কৌতূহল প্রথম থেকে শেষ পর্যন্ত বজায় ছিল, এবং এই নাটকের মঞ্চরূপায়ণে প্রাণোচ্ছলতা কিছু পরিমাণে মুখর হয়ে উঠেছে। তবে এখানে নায়ক চরিত্র রূপায়ণে মনীশ সেনগুপ্ত শেষ পর্যন্ত তার বিশিষ্ট অভিনয়রীতিকে অটুট রাখতে পারেননি। কয়েকটা জায়গায় আবেগপূর্ণ অভিনয়ের অভাব পরিলক্ষিত হয়েছে তাঁর অভিনয়ে। তবে শেষ দৃশ্যে তাঁর অভিনয়নৈপুণ্য বেশ কিছুটা প্রতিষ্ঠিত হয়েছে বলতেই হবে। সুতপা ভট্টাচার্য নিষ্ঠার সংগে রুচিরার হৃদয়-যন্ত্রণাকে ভাষা দিয়েছেন, নির্মল দের অভিনয় 'সঞ্জয়' চরিত্রের সাথে তাল মিলিয়ে চলেছে। তবে আরো একটু দৃপ্ত ব্যক্তিত্ব আরোপ করা তাঁর পক্ষে উচিত ছিল। 'সুলতা' চরিত্রে স্বাভাবিক অভিনয় করেছেন প্রতিমা পাল। অন্যান্য চরিত্রে অভিনয় করেছেন—সূর্য পাল, পরেশ মল্লিক, জিতেন সেনগুপ্ত, অমিয় নন্দী, অমিয় সামন্ত, মানিক চক্রবর্তী, মদন মোদক, শচীন দত্ত, আলোক দে, প্রহ্লাদ মল্লিক।

রূপোলী চাঁদ

সম্প্রতি 'শিক্ষায়তন হলে' ধনঞ্জয় বৈরাগীর 'রূপোলী চাঁদ' সাফল্যের সঙ্গে অভিনয় করলেন 'বেঙ্গল পটারিজ ড্রামাটিক গ্রুপের শিল্পীবৃন্দ। প্রভাত গৌতমের সুচিন্তিত নির্দেশনায় সমগ্র নাট্যাভিনয়টি সবার দৃষ্টি আকর্ষণ করে। বিভিন্ন চরিত্রে অভিনয় করেছেন—অশোক মোদক, সুপ্ত বসু, গোকুলচন্দ্র দে, অনিল গোস্বামী, বিজয় বসু, সরোজ রুদ্র, বিশ্বনাথ ভট্টাচার্য, ধীরেন্দ্রনাথ পুরোহিত, দিলীপ সোম গোবিন্দ চট্টোপাধ্যায়, ডি, পি মেনন, শ্রীঅরবিন্দন, খোকন দত্ত, অমিয় ঘোষ, শম্ভু চৌধুরী, সুনীল সরকার, অহীন্দ্র সরকার, অহীন্দ্র মন্ডল অনাদি সিংহ, প্রতিমা চক্রবর্তী, ইরা মিত্র, শাশ্বতী রায়।

ধন্বন্তরী ক্লিনিকস্ ও রসাভাব

'শিল্পতীর্থ' নাট্যসংস্থার শিল্পীবৃন্দ সম্প্রতি মুক্ত অঙ্গনে একটি বড় নাটক 'ধন্বন্তরী ক্লিনিকস্' ও ছোট নাটক 'রসাভাব' অভিনয় করলেন। সদ্য পাশকরা এক ডাক্তার, তার তিন বন্ধু ও তিন তরুণীকে নিয়ে 'ধন্বন্তরী ক্লিনিকস্' নাটকের কাহিনীর বিস্তার। নিরঞ্জন রচিত প্রতিটি স্তরেই রয়েছে প্রচুর হাসির উপাদান। ডাক্তারী পাশ করে সুমোহন একটা ডিসপেনসারী করেছে, নাম দিয়েছে—'ধন্বন্তরী ক্লিনিকস্'। কিন্তু বেশ কিছুদিন যায়, সেখানে কোন রোগী আসে না, বহু টাকা সুমোহনের বাকী পড়ে যায় অনেকের কাছে। তাঁর সাংবাদিক বন্ধু সত্যেন, অনন্ত আর ইঞ্জিনীয়ার বন্ধু পূর্ণ এই ক্লিনিকসে এসে বসে, উদ্দেশ্য সুমোহনকে তার বৃত্তিতে সুপ্রতিষ্ঠিত করা। ক্লিনিকসের পাশে মেয়েদের একটা বোর্ডিং, এই বোর্ডিং-এর লেডি সুপারিনট্যানডেন্ট সুনয়না ও এক বোর্ডার মঞ্জুকে আনা হয়েছে এই ক্লিনিকে এবং ডিসপেনসারী ঘরের মালিক জগবন্ধুর মেয়ে রেখা এসেছে এখানে। সুতরাং, স্বাভাবিকভাবেই প্রেম, ভালোবাসা আর মিলনের সূত্রপাত হোল এবং এই ঘটনার মধ্য দিয়েই নাটকের বিন্যাস হয়েছে।

হাস্যরসের নাটক হিসাবে 'ধন্বন্তরী ক্লিনিকস্' মোটেই উচ্চাঙ্গের হয়নি, কাহিনী গ্রন্থনে বারবার বহু দুর্বলতা ও শৈথিল্য চোখে পড়েছে। চরিত্র-চিত্রণেও নাট্যকার কোন সংহত মনের পরিচয় রাখতে পারেন নি, অনাবশ্যক প্রেম আর ভালোবাসার কাহিনী এনে নাটকের মধ্যে যে সুন্দর হাস্যরস সৃষ্টি করা যেতো তাকে ক্ষুন্ন করেছেন। নাটকের কাহিনী তার স্বকীয় গতিতে চলেনি, দর্শককে জোর করে হাসানো জন্যই নাট্যকার অপ্রয়োজনে কাহিনীর বিস্তার ঘটিয়েছেন। অনন্ত চরিত্রের বাচন-ভংগিতে সবাই হেসেছেন একথা ঠিক, কিন্তু অর্থহীন তার সংলাপ। বলা যেতে পারে নাটকের শুরুতে যে স্পষ্ট একটা সম্ভাবনা ছিল, তা একটু পর থেকেই স্তিমিত হোতে থেকেছে। এ ব্যাপারে নাট্য-নির্দেশক সত্যেন মুখোপাধ্যায়ের দৃষ্টি সম্প্রসারিত হওয়ার প্রয়োজনীয়তা ছিল। ডিসপেনসারীতে কয়েকটি অতি প্রয়োজনীয় জিনিসের অভাব চোখে বড় লেগেছে।

হাস্যরসাত্মক নাটককে মঞ্চে মুখর করে তুলতে গেলে যে স্বচ্ছ, সাবলীল অভিনয়ের প্রয়োজন হয়, 'শিল্পতীর্থে'র শিল্পীবৃন্দের অভিনয়ে তা সব সময়ে না থাকার জন্য এই নাটক প্রাণবন্ত হয়ে উঠতে পারেনি। বিশ্বনাথ পালের 'পূর্ণ' চরিত্রে অভিনয় একেবারেই দুর্বল হয়েছে, নিস্প্রভ মনে হয়েছে 'সুমোহন' চরিত্রে অলোক সান্যালকে। 'সুনয়না' চরিত্রে রত্না পাল মোটেই প্রাণপ্রতিষ্ঠা করতে পারেননি, শিল্পীর আরো অনেক মহড়ার প্রয়োজন ছিল। জগবন্ধু ও অনন্তের ভূমিকায় আনন্দ ঘটক, হেমন্ত হাজরা উল্লেখযোগ্য অভিনয় করেছেন। সত্যেন মুখোপাধ্যায় ও চিত্রিতা মন্ডল 'সুমোহনের মামা' ও 'সৌদামিনী' চরিত্রের বৈশিষ্টকে মোটামুটি মূর্ত করে তুলেছেন। মধুমতী রায়চৌধুরীর 'রেখা' মন্দ নয়। অন্যান্য কয়েকটি চরিত্রে অংশ নিয়েছেন—বৈদ্যনাথ ঘোষ, শ্রীকাশীনাথ, শ্যামল ও শিবনাথ বসু। নাটকীয় কাহিনী ও গতির বিস্তারে আবহসংগীত তাল রাখতে পারেনি।

শিল্পতীর্থে'র দ্বিতীয় নাটক 'রসাভাবে' কাহিনীর দিক থেকে বাস্তবতার অভাব পরিলক্ষিত হয়েছে। তবে নাট্যকার এ নাটকের কয়েকটি এমন মুহূর্ত সৃষ্টি করেছেন যার মধ্যে এক মানবিক আবেদন নিহিত

রয়েছে। এই সব অংশে শিল্পীদের অভিনয়গত নিষ্ঠা প্রশংসার দাবী রাখে। সন্তোষ মুখোপাধ্যায় প্রৌঢ়, অসহায়, দুর্বল, 'যুগল' চরিত্রটি আন্তরিকতার সঙ্গে মঞ্চে উপস্থিত করেছেন। 'পাখা' চরিত্রে মঞ্জুশ্রী রায়চৌধুরী প্রাণপ্রতিষ্ঠা করতে পেরেছেন, তাঁর অভিনয়ে চরিত্রের সঙ্গে নিবিড় পরিচিতি প্রমাণিত হয়েছে। হিমাংশু দাসের 'কানাই' চরিত্র-চিত্রণ উল্লেখযোগ্য, বিরিঞ্চির ভূমিকায় অলোক সান্যাল নাট্যানুরাগীদের স্বীকৃতি পেয়েছেন।

বন্দে বর্গী

সম্প্রতি 'মিত্রম'এর শিল্পীবৃন্দ নেতাজী সুভাষ ইনস্টিটিউট মঞ্চে ঐতিহাসিক নাটক 'বন্দে বর্গী' পরিবেশন করেছেন। সামগ্রিকভাবে নাট্যপ্রযোজনাটি সবারই দৃষ্টি আকর্ষণ করতে পেরেছে বলে মনে হয়। কয়েকটি চরিত্রে উল্লেখযোগ্য অভিনয় করেন—হরিপদ দে, রবীন দাস, ধীরেন দাস, চঞ্চল মুখোপাধ্যায়, অমর চক্রবর্তী, তিনকড়ি বিশ্বাস, প্রভাত মুখোপাধ্যায়, পরীক্ষিত সাহা, গণেশ ঘোষ, অরুণ মুখোপাধ্যায়।

মনে ছিল আশা

আজকে সমাজজীবন বহু জটিল সমস্যার ভারে ক্লান্ত, রাষ্ট্রজীবনের পটভূমিকায়ও এই সূত্র ধরে জমে উঠছে দুর্যোগের কালো মেঘ। তবু আমাদের পথ চলতে হবে, মনের স্বপ্নকে রূপ দিতে হবে বাস্তবে, সরবে ঘোষণা করতে হবে আমাদের অস্তিত্বকে। কিন্তু আমরা সত্যি কি সবাই দুর্বার বেগে সংগ্রাম করবার মতো শক্তি অর্জন করতে পারছি? বোধহয় নয়। আজো আমাদের অনেকের অর্থ নেই, অন্নসংস্থানের নেই কোন উপায়, পায়ের নীচে মাটিও শিথিল। আজকে এই নৈরাশ্যের অনুভূতি এসেছে বেকারত্বের প্রতিক্রিয়া স্বরূপ, সমাজে বোধ হয় এইটেই আজকের জটিলতম সমস্যা। 'মনে ছিল আশা' নাটকটি এরই পরিপ্রেক্ষিতে রচিত, নাট্যকার হরিপদ বসু একটি শিক্ষিত বেকার যুবকের আশা-আকাঙ্ক্ষার কাহিনীর মধ্য দিয়ে এ সমস্যার ওপর আলোকসম্পাত করেছেন। সম্প্রতি প্রতাপ মেমোরিয়াল মঞ্চে 'বর্ণালী' শিল্পীগোষ্ঠী এ নাটকে অভিনয় করেছেন।

নাট্যকার হরিপদ বসু কাহিনীর বিন্যাস যেভাবে করেছেন এবং প্রয়োজন মতো যেসব চরিত্র এনেছেন তাতে তাঁর জীবনবোধ স্পষ্ট হয়ে উঠেছে। কিন্তু একটা কথা। বেকার জীবনের যে গ্লানি যে যন্ত্রণা তার একটা বহিরঙ্গ রূপ নিশ্চয়ই আছে, বাইরের লোকের চোখে তা কাজের মধ্য দিয়ে দেখা যায়, কিন্তু অন্তরের অতলে যে গভীরতর বেদনা যন্ত্রণার আলোড়ন তাকে ভাষা দেওয়াই বোধহয় মরমী শিল্পীর কাজ। নাটকে নায়ক 'শুভময়' চরিত্রের বাইরের রূপকে যেভাবে নাট্যকার প্রতিষ্ঠিত করেছেন, গভীরতম অন্তরের রূপককে তিনি ঠিক একইভাবে বোধহয় স্পষ্ট করে তুলতে পারেন নি।

'বর্ণালী' শিল্পীগোষ্ঠী সমবেত অভিনয় নৈপুণ্যের স্বাক্ষর রেখেছেন, একথা বলতেই হবে। প্রতিটি শিল্পীই এই জীবননিষ্ঠ নাটকের চরিত্রের সাথে মিশে যেতে পেরেছিলেন বলেই তাদের সংঘবদ্ধ অভিনয় সব সময়ে ছিল সাবলীল। 'বাসুদেব' 'শুভময়' চরিত্রটির যন্ত্রণা সুন্দরভাবে মঞ্চে তুলে ধরতে পেরেছেন, শুভময়ের 'কল্যাণ' চরিত্রে অজিত দাস মর্মস্পর্শী অভিনয় করেছেন। কল্যাণের স্ত্রী 'নবনীতা'র ভূমিকায় কমলা চৌধুরীর অভিনয় চিত্তাকর্ষক। অন্যান্য চরিত্রে অংশ গ্রহণ করেন—অরূপ বাগ, মুকুল বিশ্বাস, সমর বসু, চিত্ত দাস, মোহন, নির্মলকুমার, অরুণ চট্টোপাধ্যায়, সমীর দাস, প্রণব ঘোষ, উৎপল, প্রদীপ, মুকুল রায়, অধীর ঘোষ, শিশির চক্রবর্তী, ঝর্ণা সিংহ, আলো রায়। 'বাসুদেবে'র নাট্যনির্দেশনায় কিছু কিছু উন্নতধরনের শিল্পাঙ্গিকের ছাপ আছে।

দীপক গুপ্ত পরিচালিত মহাবিপ্লবী অরবিন্দ চিত্রের একটি দৃশ্যে দ্বিজু ভাওয়াল ও দীলিপ রায়। ফটো : অমৃত

পরিশোধ চিত্রে নরেশ মিত্র

।। প্রতিযোগিতা ।।

'মালঞ্চ' সাংস্কৃতিক সংস্থা নিখিল বঙ্গ একাঙ্ক প্রতিযোগিতার আয়োজন করেছেন। প্রবেশমূল্য ও আবেদনপত্র পাঠাবার শেষ তারিখ নির্ধারিত হয়েছে আগামী ৩০শে সেপ্টেম্বর। যোগাযোগের ঠিকানা : মালঞ্চ কার্যালয়, ৯১ বেচারাম চট্টোপাধ্যায় রোড, বেহালা, কলকাতা—৩৪।

দমদম মতিঝিল ইনস্টিটিউটের পরিচালনায় এবারও একাংক নাট্য প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠিত হবে। যোগদানের শেষ তারিখ ২২শে সেপ্টেম্বর। বিস্তৃত বিবরণ নিম্নলিখিত ঠিকানা থেকে পাওয়া যাবে—শিবনাথ বসু, ২৫ মতিঝিল, কলকাতা—২৮।

সিনে ক্লাব অফ ক্যালকাটার উদ্যোগে কানাডিয়ান চলচ্চিত্র উৎসব

সিনে ক্লাব অফ ক্যালকাটা আগামী ২৯ সেপ্টেম্বর থেকে ৫ অকটোবর পর্যন্ত কানাডিয়ান চলচ্চিত্র উৎসবের আয়োজন করছে। এই উৎসবে চারটি পূর্ণ দৈর্ঘ্যের ছবি : হেলিকপ্টার কানাডা, ড্রাইল্যান্ডার্স, মেরি ওয়ার্লড অফ লেওপোল্ড এবং ওয়েডড্ গুডবাই প্রদর্শিত হবে বলে জানা গেল। এছাড়া কয়েকটি স্বল্প দৈর্ঘ্যের ছবিও এই চলচ্চিত্র উৎসবে প্রদর্শিত হবে।

ওস্তাদ দবীর খাঁর ৫৮তম জন্মোৎসবে একটি উচ্চাংগ সংগীতানুষ্ঠান

গত ১লা সেপ্টেম্বর মহাজাতি সদনে ওস্তাদজীর ৫৮তম জন্মোৎসব উপলক্ষে মনোজ্ঞ উচ্চাংগ সংগীতানুষ্ঠানের আয়োজন করেন খাঁসাহেবের গুণমুগ্ধ সংগীত-রসিকবর্গ।

এই অনুষ্ঠানে শ্রীমতী অপর্ণা রায়ের সুরবাহারে শ্যামকল্যাণ রাগ, শ্রীমতী মাধু চানচানির যোগ রাগে খেয়াল, শ্রীরাধিকামোহন মৈত্রের সরোদ দেশ রাগ, শ্রীসন্তোষ বন্দ্যোপাধ্যায়ের সেতারে মালকোষ-রাগ, সংগীতাচার্য তারাপদ চক্রবর্তীর ছায়ানট রাগে খেয়াল, শ্রীমতী বন্দনা সেনের কথক-নৃত্য পরিবেশিত হয়। সবচেয়ে আকর্ষণীয় ছিলো পণ্ডিত ভি জি যোগ ও খাঁসাহেবের সুযোগ্য শিষ্য শ্রীঅজিত মুখোপাধ্যায়ের যোগ-কোষ রাগে দ্বৈত যন্ত্রসংগীত (বেহালা) পরিবেশন। শ্রীপ্রহ্লাদ গঙ্গোপাধ্যায়ের ধ্রুপদাংগে সংস্কৃত সংগীত ও শান্তি প্রশস্তি পাঠ সমগ্র অনুষ্ঠানের ভাব-গাম্ভীর্য, রুচিবোধ ও শিল্পীমনের পরিচয় প্রকাশ বিশেষভাবে সাহায্য করে।

১৯৬৬ সালের জাতীয় চলচ্চিত্র পুরস্কার :

কেন্দ্রীয় জাতীয় চলচ্চিত্র পুরস্কার সমিতি গেল ১২ই সেপ্টেম্বর, মঙ্গলবার তাঁদের সম্মিলিত সিদ্ধান্ত ঘোষণা করেছেন। ১৯৬৬ সালের শ্রেষ্ঠ ভারতীয় কাহিনীচিত্রের সম্মান পেল পরলোকগত গীতিকার শৈলেন্দ্র প্রযোজিত ও বাসু ভট্টাচার্য পরিচালিত হিন্দী ছবি 'তিসরী কসম'। নেপাল দত্ত প্রযোজিত এবং অরুন্ধতী দেবী পরিচালিত 'ছুটি' [illegible] সাহিত্য-অংশের ছবির বিভাগে শ্রেষ্ঠ বিবেচিত হয়েছে। জাতীয় ঐক্য ও [illegible] সংহতিব্যঞ্জক চিত্ররূপে শ্রেষ্ঠ বিবেচিত হয়েছে এ-কে-বি ফিল্মস্ নিবেদিত ও পীযুষ বসু পরিচালিত 'সুভাষচন্দ্র'। সত্যজিৎ রায় পরিচালিত 'নায়ক' আঞ্চলিক ছবি হিসেবে শ্রেষ্ঠ বাংলা চিত্র। শ্রীরায় বৎসরের শ্রেষ্ঠ চিত্রনাট্যকার রূপে সম্মানিত হয়েছেন। শ্রেষ্ঠ ওড়িয়া চিত্র : মৃণাল সেন পরিচালিত 'মাটির মনিষ'। শ্রেষ্ঠ অসমীয়া চিত্র : ভূপেন হাজারিকা পরিচালিত 'লোটি-ঘোটি'। শ্রেষ্ঠ হিন্দী চিত্র : হৃষীকেশ মুখোপাধ্যায় পরিচালিত 'অনুপমা'। শ্রেষ্ঠ তামিল, তেলেগু, কানাড়া, মালয়লাম ও মারাঠি চিত্র হচ্ছে যথাক্রমে 'রামু', 'রাঙ্গুলা রাত্নম', 'সন্ধ্যারাগ', 'কুঞ্জলি মরক্কর' ও 'পবনকন্ঠা ধোন্দি'। শ্রেষ্ঠ তথ্যচিত্রের গৌরব লাভ করেছে পশ্চিমবঙ্গ ট্যুরিজম্ বিভাগ প্রযোজিত ও বংশীচন্দ্র গুপ্ত পরিচালিত 'গ্লিমপ্সেস অব ওয়েস্ট বেঙ্গল'। সামাজিক ও জাতীয় আদর্শব্যঞ্জক চিত্ররূপে শ্রেষ্ঠ বিবেচিত হয়েছে মালয়লাম চিত্র 'ইরুটিনটে আত্মাবু'। এবং শ্রেষ্ঠ শিশুচিত্র হিসেবে সম্মানিত হয়েছে চিলড্রেনস্ ফিল্ম সোসাইটি প্রযোজিত 'জ্যায়সে কো ত্যায়সা' (যেমন কর্ম তেমনি ফল) নামে কার্টুন চিত্র। সমিতি চিত্রদীপ প্রযোজিত ও তরুণ মজুমদার পরিচালিত 'বালিকাবধূ'র নায়িকা মৌসুমী চট্টোপাধ্যায় এবং চিলড্রেনস্ ফিল্ম সোসাইটি প্রযোজিত রবীন্দ্রনাথের 'ডাকঘর' ছবির বালক-নায়ক অমলের ভূমিকাভিনয়কারীকে যথাক্রমে শ্রেষ্ঠা অভিনেত্রী ও শ্রেষ্ঠ অভিনেতা রূপে সম্মানিত করবার সুপারিশ করেছেন।

বোম্বাই-এ চারণকবি মুকুন্দ দাসের জন্মজয়ন্তী

আগামী ৩০শে সেপ্টেম্বর ও ১লা অকটোবর বোম্বের চার্চগেটে 'ইন্ডিয়ান মার্চেন্ট চেম্বার' হলে বাংলা চারণ কবি মুকুন্দদাসের ৯০তম জন্ম-জয়ন্তী স্থানীয় বাঙালী ও অবাঙালী বিশিষ্ট ব্যক্তিগণ কর্তৃক সাড়ম্বরে উদ্‌যাপিত হবে। এই উপলক্ষে দুদিনব্যাপী এক সংগীত অনুষ্ঠানে সংগীত পরিবেশন করবেন শ্রীসত্যেশ্বর মুখোপাধ্যায় ও সম্প্রদায়।

মহাজাতি সদনে বিরাটতম সম্মিলিত যাত্রাভিনয় :

২রা অকটোবর মহাত্মা গান্ধীর পুণ্য আবির্ভাব দিবসে যাত্রাজগতের শ্রেষ্ঠতম শিল্পী সমন্বয়ে কালজয়ী দু'খানি শ্রেষ্ঠতম যাত্রাভিনয় অনুষ্ঠিত হবে। প্রথমটি 'বাঙ্গালী' হবে ম্যাটিনী ৩টায়, আর দ্বিতীয়টি হবে সন্ধ্যা ৬॥টায় 'সোনাই দীঘি'। দুটি নাটকের প্রধান চরিত্রে থাকছেন : স্বপনকুমার, সুজিৎ পাঠক, ভোলা পাল (বড়), জ্যোৎস্না দত্ত [illegible] ফণি বিদ্যাবিনোদ, পঞ্চু সেন এবং দিলীপ [illegible] সিদ্ধেশ্বর ভট্টাচার্য [illegible] সদন।

[illegible] মূকাভিনয়

[illegible] দিলীপ বসু দক্ষিণ কলকাতার [illegible] ইয়ং ফ্রেন্ডশিপ আয়োজিত এক বিরাট বিচিত্রানুষ্ঠানে মূকাভিনয় পরিবেশন করেন। আমাদের দেশের বর্তমান সামাজিক এবং অর্থনৈতিক পরিস্থিতি শ্রীবসু মূকাভিনয়ের মাধ্যমে অতি সুন্দরভাবে উপস্থিত করেছেন। শ্রীবসুর এই নির্বাক ব্যঞ্জনায় আমাদের অত্যন্ত কাছের মানুষের চরিত্রগুলি যথাযথভাবে প্রকাশিত হয়েছে এবং তিনি তার বিচিত্রসুন্দর কল্পনাশক্তির পরিচয় দিয়েছেন। শ্রীবসুর সংগে সংগীতে সহযোগিতা করেন শ্রীসমীর গুপ্ত।

সংগীত আসরে—কৃষ্টি (হাওড়া)

কৃষ্টির ব্যবস্থাপনায় বালি কেন্দ্রের উদ্বোধন উপলক্ষে উত্তরপাড়া লাইব্রেরী হলে এক সংগীতের আসরে সভাপতিত্ব করেন প্রখ্যাত টপ্পাগায়ক শ্রীকালীপদ পাঠক। এই অনুষ্ঠানে ঘোষণা করা হয়, উপযুক্ত সংগীতানুরাগী শিশু ও কিশোর-শিল্পীদের সংগীত বিষয়ে শিক্ষাদানে যথেষ্ট সাহায্য করা হবে। এই অনুষ্ঠানে কণ্ঠসংগীত, যন্ত্রসংগীত ও নৃত্যানুষ্ঠানের ব্যবস্থা করা হয়। সভাপতি শ্রীপাঠক কয়েকজনের গানের খুব প্রশংসা করেন। তাঁরা হলেন ছয় বৎসর বয়স্ক বাবুল কুণ্ডু, রুণী ভট্টাচার্য, মিতালী গাঙ্গুলী ও তপন মুখোপাধ্যায়। এছাড়া যাঁরা যোগদান করেন—অশোক বন্দ্যোপাধ্যায়, সবিতা মুখোপাধ্যায়, চন্দ্রা মুখোপাধ্যায়, কৃষ্ণা বন্দ্যোপাধ্যায়, অরুন্ধতী বন্দ্যোপাধ্যায়, শিখা রায়, দীপক ভট্টাচার্য, কুমকুম বন্দ্যোপাধ্যায়, সুদীপ্ত রায়, উমারাণী চট্টোপাধ্যায়, চন্দন সরকার ও ইসাবেলা রায়। সমগ্র অনুষ্ঠানটি প্রযোজনা, পরিচালনা ও ঘোষণায় ছিলেন শ্রীসন্তোষ গাঙ্গুলী, ভগবতীশংকর ঘোষ ও অরবিন্দ সিংহ।

'প্রত্যয়' নাট্যগোষ্ঠীর 'ফেরা' :

নাট্যকার রতনকুমার ঘোষ মনে করেন, পৃথিবীর মানুষ অমৃতলাভের আশায় নিরন্তর সংগ্রাম করে চলেছে সেই আদিম যুগ থেকে আজ পর্যন্ত এবং কবে যে তার এই অবিরাম সংগ্রামের সমাপ্তি ঘটবে কিম্বা আদৌ ঘটবে কিনা, তার কোনো নিশ্চয়তা নেই। শ্রীঘোষ মানুষের এই সংগ্রামকে উপজীব্য করে ট্রিলজির ধরণে তিনখানি নাটক রচনা করেছেন : (১) সম্রাট, (২) অমৃতস্য পুত্রা এবং (৩) ফেরা। বলা বাহুল্য, তিনখানিই রূপকের ভংগীতে রচিত। প্রথম নাটক 'সম্রাট' নৈহাটি মুকুট নাট্য প্রতিযোগিতায় দত্তপুকুর চতুরঙ্গগোষ্ঠী কর্তৃক অভিনীত হয়ে শ্রেষ্ঠ নাটক হিসেবে পুরস্কৃত হয়েছে। এবং তারপরে বিভিন্ন নাট্যসম্প্রদায় দ্বারা সুখ্যাতির সংগে অভিনীত হচ্ছে। শ্রীঘোষের দ্বিতীয় নাটক 'অমৃতস্য পুত্রা' শৌভনিক নাট্যগোষ্ঠী দ্বারা মুক্ত-অঙ্গন রংগমঞ্চে বেশ কিছুদিন ধরে অভিনীত হয়ে

প্রশংসা অর্জন করেছে। [illegible] 'ফেরা' হচ্ছে আগামী দিনের [illegible] রচিত নাটক, "আজকের [illegible] সভ্যতা কোথায় [illegible] সৃষ্টিতে? মানুষ তখন ঈশ্বর হবে, না, ঈশ্বর হবেন মানুষ?"—এইসব প্রশ্ন ও সম্ভবত তাদের উত্তর দেবার প্রয়াস রয়েছে এই 'ফেরা' নাটকে। এই নাটকটি [illegible] প্রকাশ বন্দ্যোপাধ্যায়ের নির্দেশনায় [illegible] নাট্যগোষ্ঠী দ্বারা প্রথম মঞ্চস্থ হবে [illegible] কলিকাতার মুক্ত-অঙ্গনে আসছে ২৯-এ সেপ্টেম্বর, শুক্রবার সন্ধ্যা সাতটায়।

পরলোকে শিল্পী অরুণাভ মজুমদার

খ্যাতিমান মূকাভিনেতা শ্রীঅরুণাভ মজুমদার ১৭ই সেপ্টেম্বর সকালে কলকাতায় পি জি হাসপাতালে মারা গেছেন।

হাসপাতালে শেষবারের জন্য তাঁকে দেখতে গিয়েছিলেন বহু বন্ধুবান্ধব ও শিল্পী।

শ্রীমজুমদারের বয়স হয়েছিল মাত্র ২৮ বছর। তাঁর মূকাভিনয় অগণিত মানুষের মনে দীর্ঘস্থায়ী ছাপ রেখে গিয়েছে। তাঁর 'চোর', 'ঘুড়ি ওড়ানো', 'বেকার যুবক' দর্শক-সাধারণের প্রশংসা লাভ করেছে।

১৬ই এপ্রিল তারাতলা রোডে এক গাড়ী দুর্ঘটনায় তিনি গুরুতররূপে আহত হন। তারপর ৬ মাস হাসপাতালে ছিলেন, কিন্তু স্বাভাবিক জ্ঞান আর ফিরে আসেনি।

অঙ্গার কৃষ্টি সংসদের 'রত্নদীপ':

পূর্ব রেলওয়ে সদর দপ্তর কর্মীদের সাংস্কৃতিক সংস্থা 'অঙ্গার কৃষ্টি সংসদের' সভারা গেল ৮ই সেপ্টেম্বর রঙমহল রঙ্গমঞ্চে 'রত্নদীপ' নাটকটি অভিনয় করলেন। প্রভাত মুখোপাধ্যায়ের কাহিনী অবলম্বনে বিধায়ক ভট্টাচার্য কৃত এই নাটকখানি বিনয় [illegible] পরিচালনায় অভিনীত হয়ে সাফল্য লাভ করেছে। দৃশ্যপট, আবহসঙ্গীত ও আলোকসম্পাত বিভাগের প্রশংসনীয় হয়েছে। সোনার হরিশ চরিত্রে চিরঞ্জীব মুখোপাধ্যায় ও হারার মার ভূমিকায় সবিতা মুখোপাধ্যায়ের অভিনয় স্মরণীয়। দেওয়ান, রাখাল, হরিশ, ভট্টাচার্য ও গোস্বামী চরিত্রে যথাক্রমে সতীশ দত্ত, অমিয় দাশ, বিশ্বনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, দাশরথি সরকার ও মনোজ মুখোপাধ্যায়ের অভিনয় উল্লেখ্য। শিপ্রা সাহার 'কনক', বাসন্তী চট্টোপাধ্যায়ের বউ-রাণী, অন্নপূর্ণা মুখোপাধ্যায়ের সুরবালা ও রেবা কুণ্ডুর সর্বমঙ্গলাও সুন্দর।

খরাত্রাণ তহবিলের জন্য চিত্রশিল্পীদের বিচিত্রানুষ্ঠান

মেয়রের খরাত্রাণ তহবিলে অর্থসংগ্রহের ডাকে সাড়া দিয়ে অভিনেতৃ সঙ্ঘ গত ১৮ সেপ্টেম্বর স্টার রঙ্গমঞ্চে এক বিচিত্রানুষ্ঠানের আয়োজন করেন। অনুষ্ঠানের উদ্বোধন করেন রাজ্যপাল শ্রীধরমবীর এবং প্রধান অতিথি ও সভাপতির আসন গ্রহণ করেন যথাক্রমে শ্রীবিবেকানন্দ মুখোপাধ্যায় ও শ্রীসুকমলকান্তি ঘোষ। অনুষ্ঠান উদ্বোধন করে শ্রীধরমবীর বাংলা দেশের সুখ-দুঃখের সঙ্গে নিজেকে জড়িত করতে পেরে আনন্দ প্রকাশ করেন। প্রাকৃতিক বীভৎসতার কাছে মানুষের অসহায়তার কথা উল্লেখ করে তিনি এসব ক্ষেত্রে সংঘবদ্ধ প্রচেষ্টার আহ্বান জানান। এইসঙ্গে তিনি অভিনেতৃ সংঘের এই প্রয়াসকেও স্বাগত জানান। সভাপতির ভাষণে শ্রীসুকমলকান্তি ঘোষ শিল্পীর দরদীমনের উপর বিশেষ গুরুত্ব আরোপ করেন এবং দেশের প্রয়োজনে শিল্পীদের এই আন্তরিক উপলব্ধিকে অভিনন্দিত করেন। অভিনেতৃ সংঘের তরফ থেকে সভাপতি শ্রীবিকাশ রায় প্রয়োজনের মুহূর্তে শিল্পীদের যেকোন প্রচেষ্টায় সাহায্যের প্রতিশ্রুতি দেন। সকলকে ধন্যবাদ জ্ঞাপন করেন মেয়র শ্রীগোবিন্দচন্দ্র দে।

উত্তমকুমারের পরিচালনায় বিচিত্রানুষ্ঠানে অংশগ্রহণ করেন সর্বশ্রী শ্যামল মিত্র, চিত্তপ্রিয় মুখোপাধ্যায় প্রহ্লাদ বাউল এবং রুমা গুহঠাকুরতা সঙ্গীতে, ভানু বন্দ্যোপাধ্যায় ও রবি ঘোষ উপহার দেন কৌতুক নাটিকা "ব্রজবাবু ও তার ছেলে", হাস্য-কৌতুক পরিবেশন করেন জহর রায় ও অজিত চট্টোপাধ্যায় এবং আবৃত্তিতে অংশগ্রহণ করেন শ্রীরাধামোহন ভট্টাচার্য এবং তৃপ্তি মিত্র। শ্রীভট্টাচার্য আবৃত্তি করেন নিগ্রো যাজক-কবি জেমস জনসনের একটি কবিতা। আবৃত্তি খুবই উপভোগ্য হয়।

এরপর অভিনেতৃ সংঘের পরিচালনায় মঞ্চস্থ হয় রবীন্দ্রনাথের 'শেষরক্ষা'। অভিনয় বেশ সাবলীল হয়েছে এবং মাত্রাজ্ঞান ও রসবোধ পরিমিত। অভিনয়ে অংশগ্রহণ করেন সৌমিত্র চট্টোপাধ্যায় (চন্দ্রকান্ত), শুভেন্দু চট্টোপাধ্যায় (বিনোদ), অনুপকুমার (গদাই), জহর গঙ্গোপাধ্যায় (নিবারণ), কালী বন্দ্যোপাধ্যায় (শিবচরণ) সতীন্দ্র ভট্টাচার্য (ললিত), তরুণকুমার (নলিনাক্ষ), অজয় গঙ্গোপাধ্যায় (শ্রীপতি), প্রেমাংশু বসু (ভূপতি), শ্যাম লাহা (দরজি) এবং সুকুমার দে (ভৃত্য)।

স্ত্রীচরিত্রে রূপদান করেন গীতিমা দাস (ক্ষান্তমণি), বাসবী নন্দী (কমল-মণি) জ্যোৎস্না বিশ্বাস (ইন্দুমতী এবং আশা দেবী (ঠাকুরদাসী)।

জ্যাক কারভিক

আত্মনিন্দুক

যদি আমাকে বলা হয়—তোমার জীবনের এটাই শেষ পার্টি, যাকে খুশি নেমন্তন্ন করতে পার তুমি—তাহলে যে দু'জনকে আমি সবাইর আগে নেমন্তন্ন করব তাঁরা হলেন ডেভিড নিভেন আর এরোল ফ্লিন।

ডেভিড নিভেন আর এরোল ফ্লিনের মধ্যে এক বিষয়ে খুব মিল ছিল—দুজনাই নিজের নিজের নিন্দে করে বেড়াতেন। অথচ চিত্রজগতে এ জিনিস একেবারেই নেই, যা আছে তার নাম আত্মমন্যতা।

আলাপ হতেই আমার ওপর ঝড়ের মতো ভেঙে পড়েছিল এরোল ফ্লিন। প্রথম পরিচয়ে সবাইর সঙ্গেই নাকি তাই করত সে।

ইংলণ্ডে সমুদ্রের ধারের একটা গ্রামে ছবি তুলছিলাম আমরা। প্রাতরাশের পর একজন সহপরিচালক ছুটে এসে হাজির হলেন। চোখ দুটো যেন ঠিকরে বেরিয়ে আসছে তার। বললেন, 'এরোল ফ্লিন বসে আছেন হোটেলে। প্রাতরাশ খান নি, হুইস্কি আর বিয়ার খাচ্ছেন তার বদলে!'

অথচ দুপুরে যখন লাঞ্চ খেতে সেই হোটেলে গেলাম, আমরা তখন কে বলবে যে এরোল এক চুমুক বিয়ারও খেয়েছেন। জীবন, প্রেম আর মদ এই তিনের ডাকে সাড়া দিতে কখনো এক মুহূর্ত চিন্তা করেননি এই অস্ট্রেলিয়ান অভিনেতা। মদের গ্লাস হাতে নিয়ে গল্পের পর গল্প বলে যাবেন এরোল—অধিকাংশই নিজের সম্বন্ধে নিন্দাবাচক। হলিউডের রেস্তোরার একটা ঘটনা তার মধ্যে বিখ্যাত হয়ে আছে।

একদিন সেই রেস্তোরায় বসে আছেন এরোল হঠাৎ শুনতে পেলেন একটি লোক তার খুব নিন্দে করছে। এরোল খুব ভালো ঘুষি মারতে জানতেন। তাবলেন লোকটাকে শিক্ষা দিয়ে দেবেন। ঘুষোঘুষিতে যারা খুব পারদর্শী তাঁরা ইয়োরোপ [illegible] পায়। এরোলও ইয়োরোপে বেল্ট আখ্যা পেয়ে ছিলেন। তিনি উঠে সেই লোকটার সামনে গিয়ে দাঁড়ালেন, তারপর খুব শান্ত গলায় বললেন, 'আমিই এরোল ফ্লিন।' চমকে দাঁড়াল লোকটা।

এরোল মুষ্টিযুদ্ধের বিশেষ ভঙ্গিতে নিজের হাত দুটো শরীরের ওপর আড়াআড়ি

করে হাতের তালু নিচের দিকে রেখে লোক-টার মুখোমুখি দাঁড়ালেন। কয়েক মুহূর্ত যেতেই হঠাৎ লক্ষ্য করলেন সেই লোকটাও একই ভংগীতে দাঁড়িয়ে আছে।

একটু থেমে থেকে এরোল বললেন, 'ইওলো বেল্ট।' লোকটা তার দিকে একটু এগিয়ে এসে শান্তকণ্ঠে বলল, 'ব্ল্যাক বেল্ট।'

যুযুৎসুতে যারা সবচেয়ে বেশি পার-দর্শী তারাই 'ব্ল্যাক বেল্ট' আখ্যা পায়। সারা পৃথিবীতে মাত্র কয়েকজন ব্ল্যাক বেল্ট আছেন।

এক মুহূর্ত চুপচাপ কাটল। হাত নামিয়ে ফেলে এরোল বললেন, 'আপনাদের কথা-বার্তায় বাধা দিয়েছি বলে সত্যিই খুব দুঃখিত আমি। অনুগ্রহ করে কথাবার্তা বলুন গিয়ে আবার।'

একবার রোম থেকে আমাকে টেলিফোন করলেন এরোল। একটা ছবিতে কাজ করতে হবে তার সংগে।

'সাধারণত যে টাকা পান আপনি তার অর্ধেক পাবেন এ ছবিতে; তবে আনন্দ পাবেন প্রচুর। চলে আসুন আপনার স্ত্রীকে নিয়ে', বললেন এরোল।

আমি শুধু গেলাম তা-ই নয়, চার বছর থেকে গেলাম সেখানে। এরোলের ব্যবহার এমনই মুগ্ধ করত সবাইকে।

এরোল আর গোলোব্রিজিডাকে নিয়ে ছবি তুলছি একটা। হঠাৎ একদিন সেটের মধ্যে ভীষণ অসুস্থ হয়ে পড়লেন এরোল। আমরা ভাবলাম এরোলকে বুঝি হারাতে হবে এবার। তাড়াতাড়ি করে হাসপাতালে পাঠান হল তাঁকে। ছবির প্রযোজক খুব চিন্তিত হয়ে পড়লেন। ছবি শেষ করবেন কি করে সেই দুশ্চিন্তা তাঁর। এরোল কবে সুস্থ হয়ে ফিরবেন জানবার জন্যে হাসপাতালে টেলি-ফোন করলেন একদিন।

ন'মাস পরে আবার টেলিফোন করবেন, জবাব এলো হাসপাতাল থেকে, 'যকৃতের অসুখে ভুগছেন ভদ্রলোক, অবস্থা খুবই খারাপ, মারাও যেতে পারেন। সম্ভব হলে ভদ্রলোকের আত্মীয়-স্বজনদের জানিয়ে দেবেন খবরটা।'

দেড় মাস পরে এরোল আবার ফিরে এলেন সেটে। ডাক্তাররা মদ খেতে বিশেষ করে বারণ করে দিয়েছেন তাঁকে। মদ আর কোন-দিনই খাওয়া চলবে না তাঁর।

কিন্তু প্রথম যে-দিন সেটে এসে কাজ শুরু করলেন সেদিনই জিন আর ভডকা দিয়ে মদের ভয়াবহ মিশ্রণ তৈরি করলেন এরোল।

ডেভিড নিভেন এরোলের তুলনায় অনেক শান্ত স্বভাবের মানুষ, কিন্তু তিনিও এরো-লের মতো নিজেই নিজের নিন্দাসূচক গল্প বলতেন। তাঁর 'উইদারিং হাইটস্'-এ অভি-নয়ের গল্প বিখ্যাত হয়ে আছে। মেরলি ওবেরন-এর সংগে অভিনয় করছেন ডেভিড নিভেন। মেরলি মরে পড়ে আছে একটি দৃশ্যে। ছবির পরিচালক ডেভিড নিভেনকে তাঁর শবের ওপর উপুড় হয়ে পড়ে ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কাঁদতে বললেন। ডেভিড বললেন, 'কান্নাটান্না আমাকে দিয়ে হবে না, ও আমার আসে না।'

'কিছু ভাবতে হবে না আপনাকে.' বললেন পরিচালক, 'কিছু মেন্থল গুঁজে দিন নাকে, তারপর স্যুটিং শুরু হলে জোরে জোরে নিশ্বাস নেবেন—দেখবেন চোখ দিয়ে জল গড়িয়ে পড়ছে আপনার।'

অতএব নাকে মেন্থল গুঁজলেন ডেভিড। মেরলি শুয়ে আছে চোখ বুঁজে, ক্যামেরাও ছবি তোলার জন্যে তৈরি।

কিন্তু মেন্থল বিশ্বাসঘাতকতা করল। ডেভিড ঝুঁকে পড়ে, কাঁদবেন কি, একেবারে মেরলির মুখের ওপর হেঁচে ফেললেন। মেরলির মৃতদেহ চীৎকার করে লাফিয়ে উঠল। ডেভিড ছুটে পালালেন।

অভিনেতাদের মধ্যে ইটালির রোজানো ব্র্যাজিকে সবচেয়ে অসাধারণ বলে মনে হয়েছে আমার। অফুরন্ত প্রাণশক্তি তাঁর আর লম্বা চওড়া কথাও তেমনি।

রোজানোর স্ত্রী দৈর্ঘ্যে প্রস্থে বিরাট, বিশ বছর আগে যখন বিয়ে হয়েছিল তখনো অভিনেতা অভিনেত্রী হিসেবে নাম হয় নি তাদের।

চরিত্রের দিক থেকে পুরোপুরি ইটালিয়ান রোজানো। বড় বড় কথা বলে, কিন্তু তার মধ্যে ঔদ্ধত্য নেই বরঞ্চ বন্ধুত্বের অন্তরংগতা আছে। আপনি যখন ভাবছেন ওর বড় বড় কথা মাত্রা ছাড়িয়ে যাচ্ছে তখনই অবাক হয়ে লক্ষ্য করবেন যে রোজানো মিথ্যে কথা বলছে না। যা বলছে সবই সত্যি। সব কিছু-তেই 'চ্যাম্পিয়ন' সে। যেমন ঃ

প্রেম?—রোজানো বলবে, 'লণ্ডন আর নু্য ইয়র্কে মেয়েরা হোটেলে এসে আমার দরজা ভেঙে ফেলতে চেষ্টা করেছিল। আমার চেহারাটা যে ভালো, তাই প্রেমে পড়ে যায় মেয়েরা।'—ওর অন্য অনেক গল্পের মতো এটাও সত্যি।

ফুটবল?—'আমি একটা চ্যাম্পিয়ন ফুট-বল খেলোয়াড় ছিলাম।' বলত রোজানো। একবার মরুভূমিতে ফুটবল খেলার ব্যবস্থা করেছিলাম। চমৎকার খেলেছিল রোজানো। সত্যি সত্যিই প্রথম শ্রেণীর ফুটবল খেলো-য়ার ও।

উকিল?—'ফিল্মে আসার আগে পর্যন্ত ইটালির সবচেয়ে বড় উকিল ছিলাম আমি।' খুব আশ্চর্য মনে হলেও রোজানোর এ দাবিও সত্যি।

রোজানোর এ সব বড় বড় কথা নিয়ে সবাই হাসিঠাট্টা করত খুব, কিন্তু রোজানোকে মিথ্যুক প্রমাণ করতে পারে নি কখনো।

একবার এক ইটালিয়ান রিপোর্টার এসেছে রোজানোর সংগে সাক্ষাৎ করতে। তাকে সাক্ষাৎ-কারের বিবরণ শর্টহ্যাণ্ডে লিখতে দেখে রোজানো বলল, 'আমি খুব তাড়াতাড়ি শর্ট-হ্যাণ্ড লিখতে পারতাম।'

আমরা ভাবলাম, রোজানোকে ধরেছি এবার। ওর এ অহংকার সত্যি হতে পারে না।

'নিশ্চয়ই চ্যাম্পিয়ন ছিলে না,' সমস্বরে বললাম আমরা। ভদ্রলোকের হাত থেকে খাতাটা ছোঁ মেরে নিয়ে দ্বিগুণ দ্রুততায় শর্টহ্যাণ্ড লিখতে শুরু করল।

একবার আফ্রিকায় ছবি তুলছি। রোজানোর স্ত্রীর কাছ থেকে খবর এলো যে রোমে একটা ফ্ল্যাট কিনেছে সে।

'ফ্ল্যাটটা নিশ্চয়ই সবচেয়ে বড়? চ্যাম্-পিয়ন ফ্ল্যাট?' জিজ্ঞেস করলাম আমরা।

'নিশ্চয়ই?' বলল রোজানো, 'তিরিশ হাজার পাউণ্ড দাম ফ্ল্যাটটার'।

রোমে ফিরে রোজানোর ফ্ল্যাটে গেলাম আমরা। সত্যিই রোমের সবচেয়ে বড় ফ্ল্যাট সেটা!

বক্সিং এবং কার রেসিং-এও রোজানো একজন চ্যাম্পিয়ন। দুটো অত্যন্ত দ্রুতগামী রেসিং কার আছে তার; বদ্ধ উন্মাদের মতো গাড়ীদুটো চালায় রোজানো।

ছবির চুক্তিতে প্লেনে চড়া বারণ ছিল রোজানোর। একবার এ্যাকসিডেন্ট হয়েছিল বলেই এই সাবধানতা। কিন্তু যেভাবে গাড়ী চালাতে সে তাতে এই সাবধানতার আর কোন মানে ছিল না। দ্রুতগামী রেসিং কার চালানোর চেয়ে অভিজ্ঞ পাইলট-চালিত প্লেনে চড়া বরঞ্চ অনেক বেশি নিরাপদ তার পক্ষে।

এই নিষেধের জন্যে একবার খুব কষ্ট-কর অবস্থার মধ্যে পড়তে হয়েছিল রোজা-নোকে। আফ্রিকায় গেছি ছবি তুলতে। যে জায়গায় ছবি তোলা হচ্ছে প্লেনে গেলে দু' ঘন্টা লাগে সেখানে পৌঁছুতে, জিপে গেলে দু'দিন।

রোজানো জিপে এলো। গলা চড়িয়ে বলল, 'পথে প্রতিটি মিনিট আনন্দে কেটেছে তার।' কিন্তু দেখে মনে হল, খুবই ক্লান্ত সে।

ফিরে যাবার সময় এলো। রোজানো বলল, 'আমি প্লেনেই যাব। গোল্লায় যাক্ তোমাদের চুক্তি গোল্লায় যাক তোমাদের জিপ।'

প্লেনে উঠবার সময় খুব নার্ভাস হয়ে পড়েছিল রোজানো। রোমে পৌঁছে রোজানো যখন নামছে প্লেন থেকে আমরা হৈ-চৈ করে আনন্দ প্রকাশ করলাম, অভিনন্দন জানালাম তাকে। রোজানোর ভাব দেখে মনে হল যেন এটা প্রাপ্য ছিল তার; হাত নাড়তে নাড়তে স্মিত হাস্য করল সে—ভাবটা যেন একা প্লেন চালিয়ে আতলান্তিক মহাসাগর পার হয়ে এসেছে!

রোজানোর চরিত্রের বৈশিষ্টই এটা এবং এজন্যেই সবাই ভালবাসত তাকে। একেবারেই ছেলেমানুষের মতো অহংকার করত সে এবং নিজেকে একেবারে ভুলে গিয়ে কাঁদত।

১৯৬৭ সালের প্রথম বিভাগের ফুটবল লীগ চ্যাম্পিয়ান মহমেডান স্পোর্টিং দল। ফটো : অমৃত

খেলাধুলা

দর্শক

আমেরিকান টেনিস প্রতিযোগিতা

ফরেস্ট হিলসে আয়োজিত ৮৭তম আমেরিকান জাতীয় লন টেনিস প্রতিযোগিতার বাকি তিনটি অনুষ্ঠানের ফাইনাল খেলা সম্প্রতি শেষ হল। পুরুষদের সিংগলসে অস্ট্রেলিয়ার জন নিউকম্ব এবং মহিলাদের সিংগলস এবং মিক্সড ডাবলসে আমেরিকার শ্রীমতী বিলি জিন কিংয়ের খেতাব জয়ের ফলে তাঁরা ১৯৬৭ সালের আন্তর্জাতিক লন টেনিসের প্রধান চারটি প্রতিযোগিতায় বিশেষ সাফল্যের পরিচয় দিলেন। জন নিউকম্ব ১৯৬৭ সালের উইম্বলেডন (ইংল্যাণ্ড) এবং আমেরিকান লন টেনিস প্রতিযোগিতায় পুরুষদের সিংগলস খেতাব জয়ী হয়েছেন। তাছাড়া আমেরিকান লন টেনিস প্রতিযোগিতায় পুরুষদের ডাবলস খেতাবও পেয়েছেন। অপরদিকে আমেরিকার শ্রীমতী বিলি জিন কিং পেয়েছেন উইম্বলেডন এবং আমেরিকান টেনিস প্রতিযোগিতায় মোট ৬টি খেতাব—সিংগলস, ডাবলস এবং মিক্সড ডাবলস; তাছাড়া ফ্রেঞ্চ টেনিসের মিক্সড ডাবলস খেতাব। অস্ট্রেলিয়ার জন নিউকম্বের থেকে আমেরিকার শ্রীমতী বিলি জিন কিংয়ের সাফল্য অনেক বেশী উল্লেখযোগ্য এই কারণে যে, শ্রীমতী কিং উইম্বলেডন এবং আমেরিকান টেনিস প্রতিযোগিতায় মোট ৬টি খেতাব জয়ের সূত্রে প্রতিটি প্রতিযোগিতায় দুর্লভ 'ট্রিপল্‌ক্রাউন' সম্মান জয়ী হয়েছেন।

আলোচ্য প্রতিযোগিতায় পুরুষদের সিংগলসের কোয়ার্টার ফাইনালে যে ৮ জন খেলেছিলেন তাঁদের মধ্যে অস্ট্রেলিয়ার ৩জন, আমেরিকার ২জন এবং একজন করে দক্ষিণ আফ্রিকা, ব্রেজিল এবং ডেনমার্কের খেলোয়াড় ছিলেন। সেমি-ফাইনালের ৪জন খেলোয়াড়ের মধ্যে ছিলেন আমেরিকার ২ জন এবং একজন করে অস্ট্রেলিয়ার এবং ডেনমার্কের। মহিলাদের সিংগলসের কোয়ার্টার ফাইনালের খেলায় আমেরিকা প্রাধান্য বিস্তার করেছিল। আটজনের মধ্যে আমেরিকার ৩ জন, বৃটেনের ২ জন এবং একজন করে অস্ট্রেলিয়া, ফ্রান্স এবং দক্ষিণ আফ্রিকার। সেমি-ফাইনালে এই চারটি দেশের খেলোয়াড় উঠেছিলেন—আমেরিকা, বৃটেন, অস্ট্রেলিয়া এবং ফ্রান্সের।

শ্রীমতী বিলি জিন কিং (আমেরিকা)

ফাইনাল খেলা

পুরুষদের সিংগলস: জন নিউকম্ব (অস্ট্রেলিয়া) ৬-৪, ৬-৪ ও ৮-৬ গেমে ক্লার্ক গ্র্যাবনারকে (আমেরিকা) পরাজিত করেন।

মহিলাদের সিংগলস: শ্রীমতী বিলি জিন কিং (আমেরিকা) ১১-৯ ও ৬-৪ গেমে শ্রীমতী এ্যান হেডেন জোন্সকে (বৃটেন) পরাজিত করেন।

এখানে উল্লেখযোগ্য, ১৯৬১ সালের পর মহিলাদের সিংগলস ফাইনালে আমেরিকার এই প্রথম জয়। ১৯৬১ সালে

জন নিউকম্ব (অস্ট্রেলিয়া)

আমেরিকার পক্ষে সিঙ্গলস খেতাব পেয়েছিলেন ডার্লিং হার্ড। অপরদিকে পুরুষদের সিঙ্গলস ফাইনালে ১৯৬৩ সালের পর আমেরিকার খেলোয়াড় এই প্রথম খেললেন। ১৯৬৩ সালের ফাইনালে খেলেছিলেন ফ্র্যাঙ্ক ফেরাহোলিং।

আই এফ এ শীল্ড

১৯৬৭ সালের আই এফ এ শীল্ড ফুটবল প্রতিযোগিতায় খেলা বর্তমানে সেমি-ফাইনাল পর্যায়ে পৌঁছে গেছে। কোয়ার্টার ফাইনালের আটটি দলের মধ্যে স্থানীয় দল ছিল ৬টি এবং বহিরাগত দল এই ২টি—ভাস্কো ক্লাব (গোয়া) এবং পাঞ্জাব পুলিশ।

এ পর্যন্ত খেলায় 'হ্যাটট্রিক করেছেন ছয়জন—(১) বাটা স্পোর্টস ক্লাবের পি বিশ্বাস (বিপক্ষে ওয়েস্ট বেঙ্গল পুলিশ), (২) বালী প্রতিভার টি গাঙ্গুলী (বিপক্ষে হুগলী জেলা দল), (৩) কালীঘাটের বলাই ব্যানার্জি (বিপক্ষে টালীগঞ্জ অগ্রগামী), (৪) বি এন আর দলের আপ্পালারাজু (বিপক্ষে কালীঘাট) (৫) মোহনবাগানের সীতেশ দাস (বিপক্ষে খিদিরপুর) এবং (৬) ইস্টার্ণ রেলের পি ব্যানার্জি (বিঃ এয়ার ফোর্স)। কালীঘাট ৮-১ গোলে টালীগঞ্জ অগ্রগামী, গোয়ার ভাস্কো ক্লাব ৮-০ গোলে বর্ধমান ডি এস এস এ এবং ইস্টার্ণ রেল ৮-১ গোলে এ এস সি সেণ্টার দলকে (বাঙ্গালোর) পরাজিত করে সর্বাধিক ৮ গোলে জয়লাভের রেকর্ড করেছে।

স্কুল ফুটবল প্রতিযোগিতা

ডাঃ বি সি রায় শীল্ডের ফাইনালে কালিমপংয়ের এস ইউ এম স্কুল দল ৬-১ গোলে কুলটি হাই স্কুলকে পরাজিত করে পশ্চিমবঙ্গের একমাত্র প্রতিনিধি হিসাবে এ বছরের সর্বভারতীয় সুব্রত মুখার্জি ফুটবল প্রতিযোগিতায় অংশ গ্রহণের যোগ্যতা লাভ করেছে।

আন্তঃ জেলা স্কুল ফুটবল প্রতিযোগিতার ফাইনালে গত বছরের বিজয়ী দক্ষিণ কলকাতা স্কুল দল ২-১ গোলে গত বছরের রাণার্স আপ হুগলী জেলা স্কুল দলকে পরাজিত করে রেঞ্জার্স জুবিলি কাপ জয়ী হয়েছে।

আন্তঃ বিশ্ববিদ্যালয় ফুটবল প্রতিযোগিতা

১৯৬৭ সালের আন্তঃ বিশ্ববিদ্যালয় ফুটবল প্রতিযোগিতার পূর্বাঞ্চলের খেলা আগামী ২৮শে সেপ্টেম্বর থেকে কলকাতায় শুরু হবে। পূর্বাঞ্চলের খেলায় ১৫টি বিশ্ববিদ্যালয়কে নিয়ে খেলার তালিকা তৈরী হয়েছেঃ প্রথম রাউণ্ডঃ (১) রবিশঙ্কর বনাম গোরখপুর, (২) বর্ধমান বনাম মগধ, (৩) উৎকল বনাম পাটনা, (৪) ভাগলপুর বনাম বারাণসী, (৫) সাগর বনাম উত্তর বাংলা, (৬) ডিব্রুগড় বনাম গোহাটি, (৭) বিহার বনাম যাদবপুর। দ্বিতীয় রাউণ্ডঃ কলকাতা (গত বছরের চ্যাম্পিয়ান) বনাম প্রথম রাউণ্ডের ১ নম্বর খেলায় বিজয়ী দল।

চ্যানেল সাঁতারে বিশ্ব রেকর্ড

ভারতীয় সাঁতারু নীতীশ্দ্রনারায়ণ রায় ১০ ঘণ্টা ২১ মিনিট সময়ে ইংলিস চ্যানেল অতিক্রম করে ইংল্যান্ডের উপকূল থেকে ফ্রান্সের উপকূল পর্যন্ত চ্যানেল সাঁতারে নতুন বিশ্ব রেকর্ড করেছেন। এখানে উল্লেখ্য, ফ্রান্সের উপকূল থেকে ইংল্যান্ডের উপকূল পর্যন্ত চ্যানেল সাঁতারে ইংল্যান্ডের ব্যারি ওয়াটসনের বিশ্ব রেকর্ড সময় আজও অক্ষুন্ন আছে—তাঁর সময় ছিল ৯ ঘণ্টা ৩৫ মিনিট। ১৯৬১ সালে শ্রীরায় ফ্রান্সের উপকূল থেকে ইংল্যান্ডের ডোভার পর্যন্ত সাঁতারে ১১ ঘণ্টা সময় নিয়েছিলেন। ভারতীয় সাঁতারুদের মধ্যে একমাত্র তিনিই উভয় দিকের চ্যানেল সাঁতারে সাফল্য লাভ করেছেন।

নীতীশ্দ্রনারায়ণ রায়

বছরের শ্রেষ্ঠ ফুটবল খেলোয়াড়

স্পোর্টিং ফুটবল ক্লাব অরুণ ঘোষকে (বি এন আর) ১৯৬৭ সালের মরশুমে শ্রেষ্ঠ খেলোয়াড় সম্মানে ভূষিত করেছেন। স্কুল ফুটবল খেলায় এই সম্মান দেওয়া হয়েছে নাকতলা হাইস্কুলের স্বপন দত্তকে। এই সম্মান লাভের সূত্রে অরুণ ঘোষ পাবেন 'কানু রায় ট্রফি এবং স্বপন দত্তকে দেওয়া হবে পি ভৌমিক ট্রফি।

অরুণ ঘোষ (বি এন আর)

বিশ্ব অপেশাদার স্কোয়াস প্রতিযোগিতা

অস্ট্রেলিয়ার সিডনিতে আয়োজিত প্রথম বিশ্ব অপেশাদার স্কোয়াস প্রতিযোগিতায় অস্ট্রেলিয়া প্রথম, বৃটেন দ্বিতীয় এবং নিউজিল্যান্ড তৃতীয় স্থান লাভ করেছে। প্রতিযোগিতায় একমাত্র অস্ট্রেলিয়াই অপরাজিত থেকে বিশ্ব খেতাব জয়ী হয়েছে। এই প্রথম বিশ্ব অপেশাদার স্কোয়াস প্রতিযোগিতায় ৬টি দেশ—অস্ট্রেলিয়া, বৃটেন, নিউজিল্যান্ড, দক্ষিণ আফ্রিকা, ভারতবর্ষ এবং পাকিস্থান যোগদান করেছিল। প্রতিযোগিতার চূড়ান্ত তালিকায় সর্বনিম্ন স্থান পায় ভারতবর্ষ। ভারতবর্ষের একমাত্র জয় পাকিস্থানের বিপক্ষে ২—১ খেলায়।

ইউনিভার্সিয়াড গেমস

টোকিও সহরের জাতীয় স্টেডিয়ামে আয়োজিত পঞ্চম ইউনিভার্সিয়াড গেমসের চূড়ান্ত পদক জয়ের তালিকা ঃ

	স্বর্ণ	রৌপ্য	ব্রোঞ্জ	মোট পদক
আমেরিকা	৩২	২৪	৬	৬২
জাপান	২১	১৭	২৫	৬৩
পঃ জার্মানী	৮	৮	৫	২১
বৃটেন	৪	১১	৮	২৩
ফ্রান্স	৪	৫	১৩	২২
ইতালী	৪	৫	৯	১৮
অস্ট্রেলিয়া	২	১	৩	৬
সুইডেন	২	১	১	৪
সুইজারল্যান্ড	২	০	০	২
দঃ কোরিয়া	১	৯	১	১১
ফিনল্যান্ড	১	১	৩	৫
নেদারল্যান্ডস	১	১	১	৩
অস্ট্রিয়া	১	০	৩	৪
আইভরি কোস্ট	১	০	০	১
স্পেন	১	০	০	১
যুগোশ্লাভিয়া	১	০	০	১
কানাডা	০	২	০	২
মেক্সিকো	০	১	০	১

পশ্চিম জার্মানীর দু মহিলা এ্যাথলীট লাইজেল ওয়েস্টারম্যান (বাঁয়ে) ও ব্রিজট বেরেনড্ংক। সম্প্রতি টোকিওতে অনু-ষ্ঠিত বিশ্ব বিশ্ববিদ্যালয় ক্রীড়ায় ওয়েস্টারম্যান ডিসকাস ছোড়ায় স্বর্ণ এবং বেরেনড্ংক রৌপ্যপদক অর্জন করেন।

রণী কাপ ও প্রদীপ ব্যানার্জী

রণী কাপ জয় করে আনলেন প্রদীপ নার্জী। বলা ভুল হল। এ গৌরব একা দীপের নয়। সারা ইস্টার্ণ রেলের।

১৯ আগস্ট মাদ্রাজের নেহরু স্টেডিয়ামে ইনাল খেলা হল। ইস্টার্ণ রেল বনাম দার্ণ রেল। খেলার উদ্যোক্তা সাদার্ণ রেল, রাই আবার ফাইনালে খেলছে। কাজেই ড় খুবই হয়েছিল। সারা মাঠ জুড়েই দার্ণের সমর্থক। তবে সমর্থন ইস্টার্ণের ও ছিল। দলটির ছক-বাঁধা খেলা, দলের ত একনিষ্ঠতা এবং সংহতি দেখে সবাই মনে খুশী হয়েছিল। খুশী হবার শ্য কারণ ছিল। এবারকার খেলায় র্ণ রেলের কি কোন স্থান ছিল? সর্ব-সাধারণের অনুমোদনেই সাউথ-ইস্টার্ণ এবং উথ-সেন্ট্রাল রেল বাছাই দল হিসেবে ন পেয়েছিল। কাজেই এ জয় ইস্টার্ণের প্রত্যাশিত হলেও সংগতির কোন অভাব না। এই অসাধ্যসাধন করেছেন প্রদীপ নার্জী। এটা ছিল তাঁর কঠিন সংকল্প। এই সংকল্প নিয়েই তিনি পা বাড়িয়ে ছিলেন মাদ্রাজের পথে।

আগস্টের পাঁচ তারিখে প্রতিযোগিতা সুরু হয়। সুরুতেই ইস্টার্ণ দল বিস্ময় সৃষ্টি করল ওয়েস্টার্ণ রেলকে ৩-১ গোলে পরাজিত করে। এই প্রথম খেলায় প্রদীপ ব্যানার্জী অংশ নেননি।

পরের খেলা সাউথ-সেন্ট্রাল রেলের সঙ্গে। হায়দ্রাবাদের শক্ত-সামর্থ খেলো-য়াড়েরা ছিলেন এই দলে। প্রথমদিনে বৃষ্টির জন্যে খেলা বন্ধ হয়ে যায়। দ্বিতীয়দিনে প্রদীপের একমাত্র গোলে দুর্ধর্ষ সাউথ-সেন্ট্রাল রেল দল পরাজিত হয়।

সেমি-ফাইনালে পোর্ট কমিশনার দল ৪-১ গোলে ইস্টার্ণের কাছে হেরে যায়। অর্ধেক গোল করলেন কৃতী খেলোয়াড় পি কে।

ফাইনালে প্রদীপ একাই দুটি গোল দিয়ে সাদার্ণ রেলকে পরাজিত করেন।

পি কে ব্যানার্জি

প্রথমটি দূর থেকে বাঁ পায়ের সট। দ্বিতীয়টি হেডে। এই গোল দুটি দেখে দর্শকরা খুব খুশী হয়েছিলেন।

এইবার বোধকরি বলতে বাধা নেই ইস্টার্ণ রেলের এবারকার রেণী কাপ জয় সম্ভব হয়েছে প্রদীপের ক্রীড়াচাতুর্যের গুণেই। আর্ধেক তাঁর খেলা এবং তাঁর নেতৃত্ব।

দলের পরিচালনার ভার নিয়ে প্রদীপ যে এবার গুরুদায়িত্ব নিয়েছিলেন একথা স্বীকার করতেই হবে। দলের আছেই বা কি। কতকগুলি নবাগত খেলোয়াড় নিয়ে প্রদীপ এবারকার ফুটবল মরশুম সুরু করেন। বলতে গেলে তাঁকে নতুন করে খেলা সুরু করতে হয়েছিল। মরশুমের বেশ কয়েকটি খেলায় প্রদীপ যে উজ্জ্বল সাক্ষর রেখেছে সে কথায় আজও ক্রীড়ানুরাগীরা মুখর। রেণী কাপের খেলায় সে যে অসাধ্যসাধন করেছে সেকথা বলতে অনেকেই পাগল। তবুও প্রদীপ আজ মন্থর। বার্ধক্যের ছাপ তাঁর দেহে না পড়ুক, তার খেলার বয়স পেরিয়েছে।

পুরোন চাল ভাতে বাড়ে। এ কথাটার তাৎপর্য আছে বৈকি! তার প্রমাণও প্রদীপ। মরশুমের অনেক আগেই তিনি জানিয়েছিলেন খেলবেন না। কাগজের মারফৎ সেকথা ছড়িয়ে পড়েছিল। এটা ছিল সকলেরই কাছে এক বেদনাদায়ক সংবাদ। বাঙালী তথা ভারতের ক্রীড়ারসিকদের মনে যে চাঞ্চল্য দেখা দেবে সে বিষয়ে কোন সন্দেহ ছিল না।

সেদিনের কথাই বলি। সাতসকালে কাগজে প্রদীপের খবর পড়ে মনটা দারুণ ভারাক্রান্ত হয়ে পড়েছিল। প্রদীপের এ সিদ্ধান্তের কথা ঘুণাক্ষরেও জানতে পারিনি। কত কথাই না মনে পড়ল সেদিন।

প্রদীপের জুড়ি নেই। সে বিষয়ে কি কোন সংশয় আছে? প্রমাণও ঝুড়ি ঝুড়ি। ১৯৫৬ সালে মেলবোর্ণ অলিম্পিকে প্রদীপের খেলা দেখে [illegible]লাভিয়ার কোচ উচ্ছ্বসিত হয়ে [illegible] কর্মকর্তা এম দত্তরায়কে বলেন—[illegible] বিদেশে তিন মাস ট্রেণিংয়ে পাঠালে রাতারাতি বিশ্ববিখ্যাত খেলোয়াড় হতে পারে। ফিফার প্রেসিডেন্ট স্ট্যানলী রাউস বলেন: ভারতীয় দলে এমন একজনের খেলা দেখলাম যার মধ্যে ব্রেজিলের খেলোয়াড়দের ছাপ আছে। চীনের অতীত দিনের খেলোয়াড় লী ওয়াই টং বলেন: ভারতীয় দলের আক্রমণভাগের খেলোয়াড় বলতে একা প্রদীপ।' প্রদীপ অসুস্থ হওয়ার সংবাদ পেয়ে তিনি বলেছিলেন—নো-প্রদীপ। নো-গোল।' টুঙ্কু আবদুল রহমান বলেন: 'আমার দেশে দশ লক্ষ ভারতবাসী আছে। আর একজন বাড়লে আমি খুব খুশী হই।' খুশী হয়েই তিনি বলেন—'পি কের জন্য আমার দ্বার উন্মুক্ত। যা চাইবে তাই পাবে। মালয়েশিয়ার সবচেয়ে সুন্দরী মহিলাও।'

'গ্র্যান্ড অফার' এল হংকং ফরমোজা থেকে। এদের দলে দলে মিল খুব। খুব শক্তিশালী। প্রদীপকে চল্লিশ হাজার ডলার দিতে চেয়েছিলেন। সমস্ত খরচ ছাড়াই। মাত্র এক সিজনের জন্যে। চিন্তার [illegible] পড়ল স্পুটনিকের শব্দ শুনে।...

মুখ বাড়িয়ে দেখি প্রদীপ ব্যানার্জী। একেবারে মেঘ না চাইতেই জল। তখনও হাতে কাগজখানা। ঘরে ঢুকেই প্রদীপ বলল—'খেলার সঙ্গে আমার সম্পর্ক শেষ।' তাড়াতাড়ি সামলে নিয়ে বললাম—'আগে চা খাও। পরে কথা।' প্রদীপ বিছানায় গা এগিয়ে দিল। কিন্তু কথা না বলে কি প্রদীপ থাকতে পারে। প্রদীপ উঠে বসে আরম্ভ করলো: "আর কি। এবার সংসার ধর্মে মন দিতে হবে। এতকাল শুধু খেলা..." তার মুখের কথাটি কেড়ে নিয়ে বললাম: 'না, খেলা এখনও তোমার শেষ হয়নি। আন্তর্জাতিক খেলা থাক। কিন্তু কলকাতার মাঠে 'খেলতে দোষ কি!' কথাটা প্রদীপের মনে ধরল কিনা জানি না। আমতা আমতা করে বলল: 'না, আপত্তি নেই।' কি যেন ভাবল প্রদীপ। মুখ-চোখের অবস্থাও কেমন পরিবর্তন হয়ে গেল। উদাস নয়নে চেয়ে থেকে বলল: 'আচ্ছা, আমি ভাল করিনি? অনেক ত খেললাম।' কেমন আনমনে আমি বলেই বসলাম: 'হ্যাঁ, ভাল করেছ নিশ্চয়ই। লোকে আঙুল দেখিয়ে বলবে বুড়ো প্রদীপটাকে দিয়ে আর চলে না। তার চেয়ে সময় থাকতে সরে যাওয়া ভাল নয় কি?' আমার কথায় প্রদীপ যেন ব্যথা পেল। হঠাৎ ছেলেমানুষি কান্ড করে বসল। বলল: 'কি বললেন, বুড়ো! এই দেখুন আজও আমি ফিট।' চোখের পাতা ফেলতে হল না। প্রদীপ এক লাফে ঘরের কড়ি কাঠে মাথা ঠেকাল। ঠক করে [illegible]টা আওয়াজ হল। দেখে চোখ বুজে ফেললাম। ভাবলাম না জানি সে কত ব্যথা পেয়েছে। কিন্তু না। একগাল হেসে শুধু মাথাটায় একবার হাত বুলিয়ে নিল।

হায়রে প্রদীপ তোমার মনের অভিব্যক্তি আমার কাছে খুবই স্পষ্ট। জানি আজ কি ব্যথা তোমার মনে বাজছে। এটা খুব স্বাভাবিক। মনে পড়ল আমার কথা। ১৯৪৯ সালে রণজি ট্রফির ম্যাচ খেলছি ইউ-পির সঙ্গে। কথায় কথায় কর্তৃপক্ষকে জানালাম আর খেলব না। এইটাই আমার শেষ খেলা। আর নয়। কথাটা বলতে কতটুকুই বা সময় লেগেছে। কিন্তু পরে আক্ষেপ করেছি। খেলতে পারিনি বলে কত চোখের জল ফেলেছি। প্রদীপের এই অবস্থা কাটতে অনেক সময় লাগবে। তাই তাকে বললাম, 'বড় খেলা থাক। অফিস ক্লাবের হয়ে খেলতে অসুবিধে কি? বরং শরীর ও মন ভাল থাকবে। আর বয়সও তোমার এমন কি হয়েছে?'

বয়স প্রদীপের তেত্রিশ কি চৌত্রিশ। দেখলে মনে হয় আজও উনিশ-বিশ। খেলছে অনেকদিন। সেদিক দিয়ে প্রদীপ অবশ্যই বর্ষীয়ান। ফুটবল খেলা বাঙালীর ঠিক [illegible] না। কিন্তু বার্ধক্যের ছাপ [illegible]।

[illegible] তাই সে [illegible] [illegible] ঠিকই ছিল। [illegible] সাজ-সরঞ্জাম [illegible] [illegible] কোন কাজও নেই। এদিক-সেদিক ঘুরে বেড়ায়। বাড়ল শুধু কথাটা। কত কথাই সে বলতে পারে। শুধু খেলার কথা। ফুটবল নয়, ক্রিকেট, হকি, টেনিস এমন কি সাঁতার, কুস্তির নখদর্পণ তার কণ্ঠস্থ। প্রশ্ন কর। জবাব মুখে মুখে। কোন এক অনুষ্ঠানে আমি সভাপতি। প্রদীপ প্রধান অতিথি। আমিও বললাম। প্রদীপও বলল। আমার বলা পাখীর বুলি আওড়ান। প্রদীপের বলা বাঁধা বুলি ছাড়া। যা মনে পড়ে তাই বলে। বলতে পেরে কত খুশী হয়। রীতিমত পড়াশুনা করে। বাড়িতে ছোট আকারের লাইব্রেরী। দামী দামী খেলার বই। বিলাতী জার্ণালে ভরা। অহরহ তাই পড়ে। দিবা-রাত্র খেলার কথাই বলে। কোন নেশা নেই। সাজতে-গুজতে ভালবাসে। যখন যেমন, তখন তেমন। নিমন্ত্রিত আসরে প্রদীপের সাজগোজ সাহেবকেও হার মানাবে। বন্ধু বান্ধবদের আড্ডায়, খেলার মাঠে প্রদীপের গায়ে রং-বেরঙের জামা দেখে সবাই অবাক বনে যায়। সাজের খোঁটা সইতে পারে না প্রদীপ। বাহারী রঙের জামাটা এগিয়ে দিয়ে বলে কোথাকার জানেন: 'প্রেস ফ্রম হল্যান্ড।'

সামান্য গৃহস্থের ছেলে প্রদীপ। কষ্টে সংসার চলে। বড় ধরনের লোভ তার কোনদিন ছিল না। রেলের চাকুরীই তার শিরোধার্য। আজ প্রদীপের অনেক নামডাক। কিন্তু এক সময়ে সামান্য রেলের চাকুরী সে লুফে নিয়েছিল। সেকথা আজও বলে প্রদীপ: রেল আমার জন্যে যা করেছে তার তুলনা নেই। এক কথায় আমি কৃতজ্ঞ। হাজার প্রলোভনেও প্রদীপ রেল ছাড়েনি। রেলের হয়ে খেলা সে আজও ছাড়তে পারেনি। অবসরের কথা শুনে রেলের কর্মকর্তারা বেশী ব্যস্ত হয়ে পড়েছিলেন। তাঁরা প্রদীপকে অফিস ক্লাবে খেলতে অনুরোধ জানান। উপরোধে ঢেঁকি গেলার মত প্রদীপ আবার নতুন করে খেলা সুরু করল। সে খেলারও তুলনা নেই। তার প্রমাণ, রেলের রেণী কাপ এবং বরদোলৈ কাপ জয়। এ কৃতিত্ব কি একা প্রদীপের নয়? এবার বোধহয় বলা ভুল হয়নি।

বড় খেলায় অংশ না নেওয়ার আর একটি কারণ প্রদীপ বলেছিল। 'অনেক খেলেছি। আর নয়। চাই বিশ্রাম। সংসার ধর্মে মন দেব। একেবারে গুড বয়। বাড়ির অবস্থা জানেন ত। ছটি ভাই। আমি সবার বড়। মা আছেন—ঠাকুরমাও। আর আছে স্ত্রী এবং ছোট দেড় বছরের মেয়ে। সব দায়-দায়িত্ব আমার। খেলায় মারের যা চোট দেখছি—বুড়ো হাড় ভাঙলে আর জোড়া লাগবে না।'

—[illegible] ভট্টাচার্য

ন্যুডিস্ট ক্যাম্প

দিলীপ মালাকার

ক্যাম্প বলতেই আমাদের মনে জাগবে
উজি ক্যাম্পের কথা। যাঁরা দ্বিতীয়
দ্ধের কথা এখনও আলোচনা করেন,
র স্মরণে আসবে কন্‌সেনট্রেশন ক্যাম্পের
। ন্যুডিস্ট ক্যাম্পের সঙ্গে রিফিউজি
প কন্‌সেনট্রেশন ক্যাম্পের কোনো
র্ক নেই। রিফিউজি ক্যাম্প ও কন্‌সেন-
ন ক্যাম্প দুঃস্বপ্নের ইতিহাস। ন্যুডিস্ট
প ঠিক তার বিপরীত। মানুষ বাঁচতে
আরও বেশী দিন সে বাঁচতে চায়।
য়ুর সঙ্গে সে চায় সুস্থ সবল দেহ
ন। শরীর অসুস্থ হলে আমরা ডাক্তার
ই, ওষুধ খাই। কিন্তু শরীর যাতে
থাকে এবং অসুখে ভুগতে না হয়, তার
থেকে ব্যবস্থা অবলম্বন করাকে বুদ্ধি-
র কাজ বলে মনে করেন ইউরোপের
ল লোক। তাঁরা বলেন যে, দেহ অসুস্থ
কেন? অকালে বার্ধক্য এসে শরীরকে
করবে কেন? আমরা প্রকৃতির সন্তান।
তর দেওয়া রোদে-আলোয়-জলে-ঝর্ণায়-
ড়ে ও বনে ছড়িয়ে আছে প্রকৃতির
। সেগুলোর সদ্ব্যবহার করতে পারলে
দের রোগটোগ কম হবে। শরীর থাকবে
।

আধুনিক সভ্যতার কৃত্রিম পরিবেশে
ওঠা মানুষের মধ্যে যত বেশী রোগ
যায়, তত রোগভোগ দেখা যায় না
তক পরিবেশে গড়ে-ওঠা মানুষের মধ্যে।
তর দেওয়া পরিবেশে জল-হাওয়া
বহার করাটাই নেচারিস্টদের উদ্দেশ্য।
রিস্ট বা প্রকৃতিবাদীরা ন্যুডিস্ট ক্যাম্প
লনের প্রবর্তক। ন্যুডিস্ট ক্যাম্পের
হল পোষাকহীন নর-নারীর নগ্ন দেহে
পোহান, সমুদ্র-জলে সাঁতার কাটা,
কয়েক বা মাসখানেক ন্যুডিস্ট ক্যাম্পে
ন। ন্যুডিস্ট ক্যাম্পে বাস করার সময়ে
রা ভুলেও কোনো পোষাক পরিধান করে
পোষাক পরিধান করা সেখানে নে-
। ছোটখাট পোষাক পরলেই তাকে
র বাইরে তাড়িয়ে দেওয়া হয়। নগ্ন-
তারা খাওয়া-দাওয়া, রান্না, খেলাধুলা
শোনা করে থাকে।

উরোপে নেচারিস্টদের সংখ্যা কম নয়।
ন্যুডিস্ট ক্যাম্প ছড়িয়ে আছে ইউ-
প্রতিটি দেশে। অধিকাংশ ক্যাম্প
ধারে, ঘন বন ও সুবৃহৎ হ্রদের
ক্যাম্পের চার ধারে ঘেরা। বাইরের
রীর সেখানে নাক গলানো অসম্ভব।
সব সময়ে তীক্ষ্ণ কড়া মেজাজে
চলেন। তাঁরা আইন মেনে চলেন। একটু
গলতি হলেই চারধারে কেলেঙ্কারির রটার ভয়
ও পুলিশের সতর্ক দৃষ্টিই তার প্রধান
কারণ। তাছাড়া ক্যাম্পের নিয়মকানুনও বেশ
কড়াকড়ি। সময়মতন সবাই খেতে বসবে।
দুপুরে বিশ্রাম। সন্ধ্যেবেলা সঙ্গীত ও
দার্শনিক আলোচনা।

ইউরোপে নেচারিস্ট আন্দোলনের অনেক
কারণ আছে। ইউরোপের আবহাওয়াই তার
জন্যে দায়ী। বছরের নয় মাসই ঠাণ্ডা। সারা
বছর পোষাকে-আসাকে আচ্ছাদিত থাকতে
হয়। রোদ-আলো-বাতাসের সঙ্গে দেহের
সংস্পর্শ হয় কমই। এমনকি গ্রীষ্মকালে
গরমে সেদ্ধ হলেও শহুরে টাই-কোট খোলার
জো নেই। সভ্যতার অবদান পোষাক পরে
সভ্যতা জাহির করতেই হবে। প্রাকৃতিক
সম্পদগুলো আমরা বিনামূল্যে সদ্ব্যবহার
করতে পারি না বলেই শরীর অসুস্থ হলে
তার পূরণ করি প্রকৃতির গুণগুলো কৃত্রিম-
ভাবে রাসায়নিক দ্রব্যের সাহায্যে। ইউরোপে
গ্রীষ্মকাল খুবই অল্প। তাই এই গ্রীষ্মকালে
প্রাকৃতিক সম্পদকে পুরোপুরিভাবে সদ্ব্যব-
হার করার জন্যেই নেচারিস্টরা ন্যুডিস্ট
ক্যাম্পের সৃষ্টি করেছেন। এ'দের মতে
উন্মুক্ত বাতাস, পর্যাপ্ত রোদ ও সমুদ্রের
জলে অবগাহন করতে পারলে দেহের হারান
শক্তি আবার ফিরে পাওয়া যেতে পারে।
দেহের জন্যে এই ব্যবস্থা। আর মনের জন্যে
হল প্রাকৃতিক পরিবেশ, পোষাকহীন
অকৃত্রিম স্বচ্ছন্দ চলাফেরা। পোষাক ও নীতি-
বাগীশদের অত্যন্ত রকমের আইনকানুন ও
ঢাকাঢুকির জন্যেই যত নীচ মনের উদয়।
এ'রা বলছেন যে, পোষাকহীন আদিম
সমাজে অপরাধ খুব কমই হোত। পোষাকে
ঢাকা নীতিবাগীশ সমাজে যত ব্যভিচার ও
যৌন অপরাধ হয়, তার এক-চতুর্থাংশ হয়নি
আদিম সমাজে। যাই হোক, নীতির দিক
থেকে এ'দের মতবাদ কতখানি যুক্তিযুক্ত তা
নিয়ে যথেষ্ট প্রশ্নের অবকাশ আছে। কিন্তু
খোলা বাতাসে, রোদে ও সমুদ্র-জলে সাঁতার
কেটে দিনকয়েক কাটালে যে-কোনো সুস্থ
দেহে আরও শক্তির সঞ্চার হতে বাধ্য। এটা
ডাক্তারি মত। এবং এই কারণেই গ্রীষ্মকালে
সমস্ত ইউরোপময় ছুটি উৎসব পালিত হয়।
সবাই তখন সামর্থ অনুযায়ী সমুদ্রতীরে,
বনে-জঙ্গলে, পাহাড়ে ছুটি উপভোগ
করতে চায়। সমুদ্রতীরে মেয়েরা বিকিনি
আর ছেলেরা নেঙটি পরে রৌদ্র ও সমুদ্র-
স্নান উপভোগ করে থাকে। নেচারিস্টদের
মত তারা একেবারে উলঙ্গ হয়ে প্রাকৃতিক
সৌন্দর্য উপভোগ করে না বটে, তবে স্বাস্থ্য
কামনায় এদের উদ্দেশ্য নেচারিস্টদের মতন
একই।

ইউরোপে সর্বত্র ন্যুডিস্ট ক্যাম্পের সংখ্যা
বেড়ে চলেছে। এদের সদস্য-সংখ্যাও বাড়ছে।
তাই প্রতিটি ইউরোপীয় দেশের সংবাদপত্রে
আজকাল প্রায়ই ন্যুডিস্ট ক্যাম্প নিয়ে
আলোচনা চলেছে। ভারতে ন্যুডিস্ট ক্যাম্পের
কোনো প্রশ্নই ওঠে না। কারণ, আমাদের
রোদে-ভরা দেশে বছরের অধিকাংশ সময়ই
গরম। এ-গরমে অতিষ্ঠ হয়ে যতখানি পোষাক
রাখা দরকার, তার বেশী রাখার প্রয়োজন
হয় না আমাদের। উপরন্তু পোষাক কেনার
সামর্থ নেই বহু দরিদ্র জনসাধারণের।
ভারতের তিন-চতুর্থাংশই গ্রাম। এবং গ্রামের
অধিবাসীরা বছরের অনেক সময়ই স্বল্প
জামা-কাপড় ব্যবহার করেন। ভারতের তিন-
চতুর্থাংশের অবস্থাই এই। সুতরাং শখের
ন্যুডিস্ট ক্যাম্পের কোনো প্রয়োজন হবে না।
তবে সমুদ্র ও পাহাড়ের সম্পদ আহরণে
আমাদের কোনো বাধা নেই। এই দুই
অঞ্চলে দিনকয়েক কাটালে এবং সমুদ্র-জলে
সাঁতার কাটলে যে-কোনো সাহেব-বাবুদের
শরীরে আও শক্তি আসতে বাধ্য। এটি অবশ্য
শহরবাসীদের জন্যে।

দিনকয়েক আগে এক ফরাসী সাংবাদিক
গিয়েছিলেন ভূমধ্যসাগরের তীরে অ্যাগাদ
নামে ছোট্ট গ্রামে। এই গ্রামের এক ধারে
ন্যুডিস্ট ক্যাম্প। সাংবাদিকটি ভয়ে ভয়ে
পোষাক খুলে শুধু স্নান করার নেঙটি
পরে ক্যাম্পের দরজায় ঢুকতেই প্রহরী তাঁকে
ধরে ফেলে। ন্যুডিস্ট ক্যাম্পে তাঁর এই প্রথম
আগমন। ক্যাম্পের কর্তা এসে ধমকালেন যে,
তিনি যতবড় সাংবাদিকই হোন না কেন,
পোষাক পরে এখানে ঢোকা যাবে না। পরে
ডিরেক্টর মশাই বলেন যে, তাঁর স্ত্রী যদি
সঙ্গে থাকেন, তাহলে স্নানের পোষাকে
ঢোকার অনুমতি দেওয়া যেতে পারে। একা
নয়। সাংবাদিকটির দুর্ভাগ্য তাঁর স্ত্রীও
নেই। যাই হোক শেষকালে তাঁকে আদম ও
ঈভের রাজ্যে আদমের বেশেই প্রবেশ করতে
হয়। সাংবাদিকটি খোঁজ নিয়ে জানিয়েছেন
যে, ন্যুডিস্ট ক্যাম্পে আদম-ঈভদের তালিকায়
শীর্ষে থাকে জার্মানরা তারপর হল সুইস-
বাসী, বেলজিয়ান, ডাচ ও স্ক্যান্ডিনেভিয়ান
দেশের লোক, তারপর হল ফরাসী।
ইতালিয়ান ও স্প্যানিশরা সবার পেছনে।
ওই ন্যুডিস্ট ক্যাম্পের বনে এখানে সেখানে
তাঁবু ছড়িয়ে আছে। ছোটখাট গ্রাম বলা চলে।
কাফে-রেস্তোর যেমন আছে তেমনি আছে
মুদির দোকান। এমনকি একটি ছোট ব্যাঙ্কও
রয়েছে। তবে ব্যাঙ্কের কর্মচারীরা প্যান্ট-
কোট-টাই পরিহিত নয়। তারাও ব্যাঙ্কে কাজ
করে নগ্ন দেহে।

বছরকয়েক আগে আমার দুই বন্ধু
গিয়েছিল পশ্চিম জার্মানীর উত্তরে বাল্টিক
সমুদ্রের তীরে এক ন্যুডিস্ট ক্যাম্পে।
তাদের মুখে শুনেছি বাল্টিক সমুদ্রের তীরে
ন্যুডিস্ট ক্যাম্পের সংখ্যা বেড়েই চলেছে প্রতি
বছর। ক্যাম্পে কয়েক সপ্তাহ কাটান বেশ
ব্যয়সাধ্য। আমার সেই দুই বন্ধুর মধ্যে

একজন একটু লাজুক ছিল। আরেকজন সোজা দিগম্বর হয়ে প্রবেশ করে বিনা দ্বিধায়। লাজুক বন্ধুটি ক্যাম্পে প্রবেশ করেই এখানে সেখানে লুকোতে চায়। ঢেকে-ঢুকে চলতে চায়। কিন্তু ঢাকা দেওয়ার মতন কিছুই ছিল না সেখানে। তার মুখেই শুনেছি যে, প্রথম আধঘণ্টা তার সত্যি অস্বস্তিকর বোধহয়। তারপর সব ঠিক হয়ে যায়। কয়েক ঘণ্টা বাদে অন্যান্য নগ্ন নর-নারীকে দেখে তার কোনো উত্তেজনা বা অস্বস্তিকর অবস্থার উদ্ভব হয়নি। যে-ক'দিন সে ছিল ওই ন্যুডিস্ট ক্যাম্পে, সে প্রত্যহ ভলিবল খেলেছে অন্যান্য ছেলে-মেয়েদের সঙ্গে। অস্বস্তি দূরের কথা, তার মনেই হয়নি যে, সে সভ্য-জগতের বাইরে ন্যুডিস্ট ক্যাম্পে বাস করছে।

নেচারিস্ট আন্দোলন ও ন্যুডিস্ট ক্যাম্পের সূত্রপাত হয় বিশ শতকের গোড়ায় জার্মানীতে। তারপর সেখান থেকে সুইৎ-জারল্যাণ্ডে। তবে ইদানীং কালে স্ক্যাণ্ডি-নেভিয়ান দেশে তার বিস্তার অনেক। ফ্রান্সও পিছিয়ে নেই। বিভিন্ন ন্যুডিস্ট ক্যাম্প ও ক্লাবের সংখ্যা বিশটি হবে। এবং সদস্য-সংখ্যা পঁচিশ হাজার। বড় বড় ন্যুডিস্ট ক্যাম্পগুলো ভূমধ্যসাগরের তীরে। প্যারিসের কাছে গ্রামাঞ্চলে বনের মধ্যে রয়েছে গোটা-চারেক ন্যুডিস্ট ক্লাব। এখানে তাদের জন্যে রয়েছে হোটেল, খেলার মাঠ, সাঁতার কাটার পুকুর ইত্যাদি।

ভূমধ্যসাগরে তীরে ন্যুডিস্ট ক্যাম্পের মধ্যে সবচেয়ে বড় হল মার্সাই-এর কাছে ছোট দ্বীপে 'লভ্য', আরেকটি অ্যাটলান্টিকের ধারে ম'ন্তালিভে। ম'ন্তালিভের ক্যাম্প সম্বন্ধে জানা গেল যে, সেখানে কোনো দম্পতি বা একটি পরিবার নিজের তাঁবুতে বাস করতে পারে অথবা আটচালা ঘর ভাড়া নিয়েও থাকতে পারে। অধিকাংশ নেচারিস্ট কিন্তু নিরামিশভোজী। মদ ও মাংস অনেকে ছোঁয় না। ক্যাম্পের মধ্যে অশ্লীল আলোচনা বা অশোভন ইঙ্গিত করা চলবে না। তাহলেই সভ্যপদ খারিজ করা হবে। এইসব বিষয়ে ন্যুডিস্ট ক্যাম্পের কর্তারা ভীষণ কড়াকড়ি প্রদর্শন করেন। কোনো এক জার্মান ন্যুডিস্ট ক্যাম্পে কিছুকাল অশ্লীল আচরণকে প্রশ্রয় দেওয়া হয়েছিল বলে আন্তর্জাতিক ন্যুডিস্ট সংঘ সেই ক্যাম্পের সদস্য-পদ খারিজ করে এবং সেই ক্যাম্প তুলে দেওয়া হয়। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রেও অনুরূপ কারণে একটি ন্যুডিস্ট ক্লাবকেও শাস্তি দেওয়া হয়। ইংলণ্ডে ন্যুডিস্ট ক্লাব অনেক ছড়িয়ে আছে। তাদের প্রকাশিত পত্রিকা তো বাজারেও বিক্রি হয়: আজকাল কখনো কখনো ইংরেজ ন্যুডিস্ট ক্লাবের সদস্যরা তাদের বাড়ীতে পর্যন্ত যখন তাদের বন্ধুদের নেমন্তন্ন করে, সে সময়ও বিনা পোষাকেই নিমন্ত্রণ রক্ষা করে।

ম'ন্তালিভে ন্যুডিস্ট ক্যাম্পের গায়ে-ঘেঁষা একটা গাছে চড়ে এক ব্যক্তি দৃশ্য দেখছিল। ক্যাম্পের এক কর্তা এসে তাকে গাছ থেকে নামতে বলে। তাকে বলা হয় সে কেন কষ্ট করে গাছে চড়ে দৃশ্য দেখছে—তার চেয়ে বরং ক্লাবের সভ্য হয়ে কার্ডখানা নিয়ে ক্যাম্পে ঢুকলেই হল। তাহলে দৃশ্য দেখার জন্যে কষ্ট করতে হবে না। সেই ব্যক্তি ক্যাম্পে সভ্য হয়ে ঢোকার সময়ে ইতস্তত করতে থাকে। কারণ, সে পোষাক কিছুতেই খুলবে না। তাকে জোর করে পোষাক খুলিয়ে ক্যাম্পে ঢোকান হলো। ... কিছুক্ষণ ছুটোছুটি করার পরে সহজ ... হয়ে 'দৃশ্য' দেখে। এবং পরে সে নিয়মি... সদস্য হয়ে যায় এবং ন্যুডিস্ট ক্যাম্প সম্বন্ধে তার কৌতূহল মিটে যায়।

এক ভদ্রমহিলা বলেছেন, যেদিন তি... তাঁর স্বামীর সঙ্গে প্রথম ন্যুডিস্ট ক্যাম্পে যান, সেদিন তাঁর সত্যি খারাপ লেগেছিল। প্রথমত নিজের পোষাক খুলে সবার মধ্যে মিশে যাওয়া সহজ ছিল না। উপরন্তু তিনি দেখেন যে, একটি পুরুষ নগ্নদেহে ... ধরে একটা পুঁটলি নিয়ে চলেছে। ... দৃশ্যটুকুতে তিনি শিউরে ওঠেন। তারপর বিভিন্ন বয়সের নারীর দেহের গড়ন দেখে তিনি বিরক্ত হয়ে যান। কারণ, নারীমাত্রেই সুন্দরী নয়। সব নারীর দেহ এক ... অনেকের আবার দৃষ্টিকটু। তবে দ্বিতীয় দিনে তাঁর কাছে সবই ঠিক হয়ে যায়। ... কোনো অসুবিধে হয়নি। বরং সপ্তাহকাল নিরলস রৌদ্র ও সমুদ্র-স্নানে তাঁর ক্লান্ত দেহে নতুন জীবন ফিরে আসে।

কিছু নেচারিস্ট আছেন, যাঁরা এই সভ্য জগতের কোলাহলের হাত থেকে রেহাই পেতে চান বলেই ন্যুডিস্ট ক্যাম্পে আসেন। সারা দিন খেলাধুলো দৌড়ঝাঁপ আর সন্ধ্যেবেলা বিভিন্ন ধর্ম ও দর্শন আলোচনা, সঙ্গীতের আসরে প্রাণ ঢেলে দেওয়া। পঁচাশি বছরের এক বৃদ্ধ নেচারিস্ট ও ম'ন্তালিভে ন্যুডিস্ট ক্যাম্পের সভ্য বলেছেন যে, আমার ... হয়েছে অনেক, ডাক্তার, পুলিশ, রাজনৈতিক নেতা—এঁদের কাউকে পছন্দ করি ... রাজনীতির চর্চা অনেক হয়েছে। এরা ... আমায় জ্বালাতন করে মেরেছে। এখানে ওদের জ্বালাতন নেই। সুখেই আছি।

(প্রশ্ন)

(১) প্রখ্যাত সাহিত্যিক তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায় এপর্যন্ত কি কি পুরস্কার পেয়েছেন ?

(২) কলকাতায় কয়টি আর্ট স্কুল আছে এবং তাদের নাম কি ?

ত্রিপর্ণা দাসগুপ্ত
কলিকাতা

●

সর্বভারতীয় কোন সাহিত্য প্রতিযোগিতা আছে কি ? যদি থাকে তবে এই সম্বন্ধে জানতে চাই। এবং কে কিভাবে ওতে যোগ-দান করার সুযোগ পায় সে সম্বন্ধেও জানালে বাধিত হব।

উদয়কুমার দাশ
ওয়েলিংটন
কলিকাতা—৩৩।

(১) ডাকবাংলো কথাটার উৎপত্তি কি ভাবে ?

(২) পৃথিবীতে সর্বপ্রথম কোন ভাষায় সাহিত্য রচনা করা হয়েছে ?

(৩) সৈন্যসংখ্যা কোন দেশে সবচেয়ে বেশী এবং সে হিসেবে ভারতের স্থান কত ?

অসিতরঞ্জন দত্ত,
পোঃ বরহাপজান,
আসাম (লখীমপুর)।

● •

উত্তর

অমৃতের গত ১৭শ সংখ্যায় উত্তর দিয়েছেন তিনজন। আমি তাঁদের উত্তরগুলি সম্বন্ধে কিছু বলতে চাই।

হীরেন্দ্রনাথ দিগপতি একটি প্রশ্নের উত্তরে লিখছেন—"বাংলাদেশের সবথেকে প্রাচীন ও বৃহৎ গ্রন্থাগার হচ্ছে, ক্যালকাটা পাবলিক লাইব্রেরী সেটা স্থাপিত হয় ১৮৩৬ খৃষ্টাব্দে।" কিন্তু আমার বক্তব্য শুধু গ্রন্থাগারবাংলাদেশের নয়, ভারতের বর্তমান যুগের প্রথম গ্রন্থাগার হচ্ছে, কলিকাতা রয়েল এশিয়াটিক সোসাইটির গ্রন্থাগার। সেটার সূচনা হয় ১৭৮৪ খৃষ্টাব্দে।

রথীন্দ্র মিত্রের উত্তর হচ্ছে "... পরিকল্পনার জন্ম হয় ১৯৫৬ সনে।" ... আমি জানি এই পরিকল্পনার জন্ম ১৯৫১ খৃষ্টাব্দের ১লা জুলাই।

অচ্যুতানন্দ বেরা একটি প্রশ্নের উত্তরে জানাচ্ছেন যে, ব্যাপটিস্টা পোর্ট ১৫১৮ ... ক্যামেরা আবিষ্কার করেন (ফ্রান্স) ... ক্যামেরার আবিষ্কর্তা হচ্ছেন ইস্ট... কোডাক, খৃষ্টাব্দ হচ্ছে ১৮৮৮ এবং ... আমেরিকার লোক।

—শ্রীজিতেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়
বান্দোয়ান—পুরুলিয়া

●

৭ম বর্ষ ১৮শ সংখ্যার ... প্রকাশিত 'জানাতে পারেন' বিভাগে লুৎফুর রহমানের প্রশ্নের উত্তরে জানাই (১) ও (২) আমরা যে কথা শুনতে ... তা বায়ুমণ্ডলের ইথারের মাধ্যমে নয়; বললে বায়ুমণ্ডলে যে ঢেউ বা তরঙ্গের ... হয়, তার ফলেই আমরা শুনতে পাই। বেতারবার্তা হল বিদ্যুৎ-কণার সঞ্চরণের ইথারে সৃষ্ট ঢেউ এবং (৩) আকাশ... পৃথিবীর সবচাইতে দ্রুতপ্রাণী হল ...

অনুপ সেন, দশম ...
শিলচর সরকারী উচ্চতর মাধ্যমিক ...
পোঃ শিলচর, জেলা কাছাড়

(পূর্ব প্রকাশিতের পর)

।।চৌত্রিশ।।

গড়িমসিই করতে লাগলেন সুরবালা। গেকার চেয়ে ঢের বেশি স্পষ্ট কাজ রয়েছে ন. তাড়াতাড়ি গিয়ে ঠিকঠাক করে ফেললে সারটারও চেহারা যায় বদলে, কিন্তু কেমন ন গা উঠাতে চাইছেন না এখান থেকে। রও বেশ কয়েকদিন কেটে গেল।

তারপর উপস্থিত যাওয়াটা নিরর্থকও পড়ল।

হেমাঙ্গিনীর সঙ্গে চিঠিপত্র চলছিল। বালা প্রায় সব চিঠিতেই ভাবটা দেখা-লেন যেন এইবার এসে পড়বেন; একটার র একটু তাড়াতাড়িই এস। হেমাঙ্গিনী খছেন—এখন এসে বিশেষ ফল নেই। দিন-ক আগে রঙ্গময়ী পাটনায় মেয়ের বাড়ি ন. ফিরতে আরও কিছুদিন লাগবে। এসে গেলেই জানিয়ে দেবেন হেমাঙ্গিনী।

'করুণাময়ী হোম'-এ ডায়মন্ডহারবার ক আসার কয়েক দন পরে যে একবার ছিলেন রঙ্গময়ীর সঙ্গে, আর যাওয়া নি। আদুও আর সেই থেকে আসা করে দিয়েছে একরকম। একদিন ত্রণ করে পাঠিয়েছিলেন, সেই উপলক্ষ্য এসেছিল। নিশ্চয় নূতন চাকরিতে আর পায় না। নাকি, বিয়ের কথায় কোন পেল কোনরকমে? বেশ একটু লজ্জা-ভাব। হয়তো সেদিনকার ব্যাপার ও।

না, ওর চাকরির কথা কেউ জানে না তে। রঙ্গময়ী কিম্বা হেমাঙ্গিনী জানান নি কাউকে, আদুও তোলে নি। সুরবালাও যেন এদিকে কাউকে না জানান এখন।

মেয়েটা যেন সত্যিই কি রকম হয়ে গেছে একটু।

শেষের এই কথাটা ধ'রে মনটা বড় খারাপ হয়ে থাকে সুরবালার. বড়ই নাকি কাছাকাছি এসে পড়েছিল মেয়েটা, এখন তো আরও মন জুড়ে বসেছে।......যাবেনই না হয় চলে! কিরকম হয়ে যাওয়ায় মুখখানি এতে টানে, এত অধীর করে তোলে।......কিন্তু রঙ্গময়ী যে নেই......

দিন ছয়সাত একটা অসহ্য দোটানার মধ্যে কাটল, তারপর একদিন সনাতনের একটা টেলিগ্রামে না-যাওয়ার প্রশ্নটাই গেল চলে, আদিনাথ যত সম্ভব শীঘ্র সন্দীপকে পাঠিয়ে দিন।

ট্রেনের সময় ছিল না, মোটরে করেই তাড়াতাড়ি ছেলেকে নিয়ে বেরিয়ে পড়লেন সুরবালা।

একেবারে এতটা তাড়াহুড়ো না করলেও হোত। গিয়ে শুনলেন একটা ভালো ফার্মে কয়েকটা সেকশনে লোক নেওয়ার জল্পনা হচ্ছে, ভেতর থেকে খবরটা পেয়ে টেলিগ্রাম করে দিয়েছেন সনাতন, সন্দীপ যাতে এসে ব'সে থাকতে পারে তার জন্যেই করা টেলিগ্রামটা।

এদিকে এই পর্যন্ত। তবে অন্যদিক দিয়েও চক্র অসাধ্য বেশ ভালোই হয়েছে।

হেমাঙ্গিনী প্রশ্ন করলেন—'আমার চিঠিটা পাওনি?'

পাননি শুনে বললেন—পরশুই দিয়েছেন উচিত ছিল তো পাওয়া, আজকের ডাকে নিশ্চয় পৌঁছে যাবে। রঙ্গময়ী এসে গেছেন, পরশু ভোরের গাড়িতেই। একটু যেন হঠাৎই এসেছেন মনে হোল। তাঁর সঙ্গে দেখা হয়নি এখনও; হেমাঙ্গিনী দিনদুয়েকের জন্য চন্দননগরে বাপের বাড়ি গিয়েছিলেন। আজই দুপুরে ফিরেছেন।

বড় খবর সুরবালার পক্ষে। প্রশ্ন করলেন—'একবার যাবে বৌদি ওঁর ওখানে?"

—বেশ একটু আগ্রহের সঙ্গেই।

হেমাঙ্গিনী বললেন—"তুমি ক্লান্ত রয়েছ। খবর দিচ্ছি, নিজেই চলে আসবেন।

'একরকম ডেকে পাঠানই তো। ঠিক হবে কি?'

আরও সবাই রয়েছে। স্থিরদৃষ্টিতে একটা ইসারা রইল। একটু হেসে বললেন—"তাছাড়া, কখন আসবেন তাঁর সুবিধে মতো। মনে হচ্ছে যেন কতদিন দেখিনি।"

'তা হয়; মানুষটা সেইরকমই তো।'—বুঝে নিয়েছেন হেমাঙ্গিনী, বললেন—'তোমার অসুবিধে না হয়, তাই না হয় যাওয়া যাবে। আর একটু হোক।'

সন্ধ্যার পর ও'রা গিয়ে উপস্থিত হলেন। রঙ্গময়ী আহ্নিকে বসেছিলেন, রাঙাবৌ এসে ও'দের অভ্যর্থনা করলেন, তারপর ও'দেরই কথায় একেবারে ছাতের ওপর নিয়ে গেলেন। এদিক-ওদিক গল্প-স্বল্প হচ্ছে, সিঁড়ির কয়েক ধাপ নীচু থেকেই আওয়াজ উঠে এল—'কৈরে বড় নাৎবৌ? শুনলাম নাকি সুজাও এসেছে?'

সিঁড়ি বয়ে উঠে ডান হাতটা চেপে একটু দাঁড়ালেন, জিরিয়ে নেওয়ার ভঙ্গিতে। তারপর রাঙাবৌকে উদ্দেশ করে বললেন—'নাতবৌ, যতীন যেন কি জন্যে তোকে ডাকছিল মনে হোল।'

যতীন বড় নাতি। রাঙাবৌ উঠে পাস দিয়ে নেমে গেলেও একটু দাঁড়িয়েই রইলেন রঙ্গময়ী, জিরানোর ভঙ্গিতেই, তারপর এগিয়ে আসতে আসতেই বললেন—'কাল আবার পূর্ণিমেটা ছিল তো।'

সব কথাই রস দিয়ে বলা অভ্যাস, জুড়ে দিলেন—'ওসব নাতীন-নাৎবৌয়েদেরই ভালো বাবা, কাব্যিটা জমে; আমার পক্ষে যম।'

রাঙাবৌয়ের ভালো করে নেমে যাওয়ার জন্য সময় নেওয়া। একবার দেখেও নিলেন সিঁড়ির দিকটা ঘাড় ফিরিয়ে। তারপর একেবারে কাছে এসে বললেন—'বুঝেছি, এসেই যেমন তাড়াতাড়ি ছুটে আসা।......কিন্তু শিকার তো ওদিকে উধাও।......হ্যাঁ, আদ্রের কথাই বলছি।'

'আদ্রা!! পালিয়েছে!!'

দুজনেই একসঙ্গে বলে উঠেই যেন কাঠ হয়ে গেলেন।

রঙ্গময়ীর মুখটা ছেয়ে চাঁদের জ্যোলো পড়েছে। আশ্চর্য লাগছে, তাতে যেন এতবড় খবরটা দিতেও দুঃখের কোন ছাপ পড়েনি। যদি থাকেও কিছু তো যেন তেমনই সূক্ষ্ম একটা খুশির সঙ্গে মিশে গিয়ে একাকার হয়ে গেছে। ক'টা মুহূর্ত একেবারেই নিশ্চুপ, তারপর উনিই বসতে বসতে বললেন—'না, সে মেয়েটার মতন কিছু নয়। শিকারীরও তো ভালো মন্দ আছে—সেই-রকমই একজন নিয়ে গেছে; অবিশ্যি আমাদের কাছ থেকে ছোঁ মেরেই।'

—একটু হাসলেনও।

এরপর ধীরে-সুস্থেই পান-দোক্তা মুখে দিয়ে কাহিনীটা বললেন ও'দের, কমলার কাছে উনি যেমন শুনেছেন।

সংক্ষিপ্তই। যা হয়ে গেল তার একটা কাঠামো। এসব ক্ষেত্রে, কিভাবে, কি সব আলাপ-আচরণের মধ্যে দিয়ে দুটি মন পরস্পরকে বুঝে নিয়ে শেষে এক হয়ে যায় তার বিবরণ তো প্রকাশ পায় না। নিজের ভাষায় এই গোছের একটা ভূমিকাটুকু ক'রে ব'লে গেলেন রঙ্গময়ী।

ছেলেমানুষই হোক বা যাই হোক, কমলাকে একটু সতর্ক দৃষ্টি রেখে যেতে ব'লে দিয়েছিলেন রঙ্গময়ী। কেউ মেস থেকে এসে রাঙাবৌকে বলে যাবে, তিনি জানিয়ে যাবেন রঙ্গময়ীকে। অবশ্য তেমনই কিছু হলে। জয়া এসে জানিয়ে যেত।

গোড়ার দিকে হয় নি তেমন কিছু। সিঁদুরটা বন্ধই করে দিয়েছিল আদ্রা, সেই যে মুছেছিল, আর পরে নি। রং-তামাসার ভাবটা রয়েছেই, প্রশ্ন করতে বলল—'চলুক না সাদা চোখেই, তেমন বুঝি তো চোখ রাঙিয়ে তুলতে কতক্ষণ?'

এই ভাবটা—রংতামাসার—কিন্তু অল্প-দিনই ছিল, সপ্তাহখানেক নয় হয়তো। তার-পরেই কেমন যেন আস্তে আস্তে মুষড়ে যেতে লাগল আদ্রা। খুবই যে বিমর্ষ বা চিন্তিত এমন নয়, অন্যমনস্ক, মনটা যেন কি নিয়ে কতদূরে প'ড়ে রয়েছে। আবার কমলার ঘরের মজলিসে এক একবার এত হুল্লোড়ে হয়ে পড়েছে যে, যেন নিজেকেই গেছে ছাড়িয়ে। দুটোই নজরে পড়বার মতো।

অফিসের সময়টা ঠিক রেখে যাচ্ছিল বিশেষ ক'রে ফেরার সময়টা, এইসময় এক-দিন হঠাৎ একেবারে সন্ধ্যা ক'রে ফিরল। কমলা উৎকণ্ঠিতভাবেই ওপর-নীচে করছিলেন, একবার নীচে আসতে মোটর থামার আওয়াজ শুনে দরজার কাছে এসে দাঁড়িয়েছেন, আদ্রাও নামল একটা ট্যাক্সি থেকে। বেশ গম্ভীরভাবেই ও'র মুখ দিয়ে প্রশ্নটা বেরিয়ে গেল—'এত দেরি হোল যে আজ?'

নিশ্চয় উত্তরটা তোয়েরই ছিল আদ্রার, তবু হঠাৎ একেবারে এভাবে সামনা-সামনি দেখে একটু থতমত খেয়েই বলল—'আজ হঠাৎ কাজের চাপ বেশি পড়ে গিয়েছিল—পার্সনাল স্টেনোই তো।......অবিশ্যি, আরও ক'টা সেক্‌শনেও ওভারটাইমে থাকতে হয়েছে।'

'হোক, তুমি থেকো না।'

সংক্ষিপ্তই হুকুম করলেন কমলা। তার-পরেই সামলে নিয়ে হেসে বললেন—'কেন, বললেই তো পারিস বুঝি করে যে, কর্তা পছন্দ করে না।'

দেরি আর হয়নি ঐ সাত-আট দিনের মধ্যে।

তারপরেই একেবারে চরম, আদ্রা আর ফিরলই না মেসে। সমস্ত রাতের মধ্যে নয়, পরদিনও না। তারপর একেবারেই নয়। সেই একটা রাত একটা দিন যে কীভাবে কেটেছে সবার, বিশেষ করে কমলার তা বলে শেষ করা যায় না। পথ চেয়ে চেয়ে যখন অফিসে ফোন্ করার হুঁসটা হোল তখন সন্ধ্যা উৎরে গিয়ে বেশ একটু রাতই হয়ে গেছে। বন্ধ হয়ে গেছে অফিস, তবু কোন কেরানি বোধহয় ওভারটাইম্ কাজ করছিল, ফোন্ ধরতে প্রশ্ন করায় যে খবরটা দিল তাতে সবার চক্ষু একেবারে কপালে উঠল। মিসেস রায়চৌধুরী, নূতন পার্সনাল স্টেনো, আজ পাঁচদিন অফিসে আসছেন না। কাজে ইস্তফা দিয়েছেন, কি দেননি বলতে পারল না। কেউই ঠিক মতো জানে না।

মুশকিল হোল, বেশি খোঁজ নেওয়াও যায় না, নিতান্ত প্রচ্ছন্নভাবে যেটুকু হয় তা ছাড়া। একটু জানাজানি হয়ে গেলে আবার মেসের বদনাম।

কমলা রাত জেগে, দুশ্চিন্তায়, অসুস্থই হয়ে পড়লেন। সমস্তদিন আর একটা রাত এইভাবে কাটবার পর তৃতীয় দিন সকালে যখন উনি জ্বরগায়েই হুগলী যাওয়ার ব্যবস্থা করছেন, অপ্রত্যাশিতভাবে সমস্ত ব্যাপারটার হদিস মিলে গেল। প্রায় ন'টার সময়; পিয়ন যখন ডাক নিয়ে এল।

একটি রেজেস্টারি-করা প্যাকেট কমলার নামে। প্রেরিকা আদ্রা রায়চৌধুরী। আসছে টালিগঞ্জের একটা পল্লী থেকে। রাস্তা, বাড়ির নম্বর, ফ্ল্যাট নম্বর দেওয়া।

যে যেখানে ছিল, অফিস, কলেজ, স্কুল যাওয়ার প্রস্তুতিতে, হুমড়ি খেয়ে পড়ল কমলাকে ঘিরে। উনি কম্পিতহস্তে প্যাকেটটা তাড়াতাড়ি ছিঁড়ে ফেললেন।

বিয়ের নিমন্ত্রণ পত্র, আটজনের নামে। ভেতরে ফটো মাউন্টে দু'খানি ছবি, একটি আদ্রারই। অপরটি একটি বেশ সুপুরুষ যুবকের। নাম অমিতাভ রায়চৌধুরী।

একটা চিঠিও আদ্রার, কমলার নামে।

লিখেছে, এত অন্যায় করেছে, মেসে তার মুখ দেখাতে পারছে না বলেই পারল না আসতে, নৈলে নিজেই এসে নিমন্ত্রণ করে যেত।

কিন্তু আসতেই হবে সবাইকে, সব কিছু মাফ করে শুধু পুরনো স্নেহ-ভালবাসার কথা ধ'রে। ওরা বড় নিঃসঙ্গ, আয়োজন নিজেদেরই করে নিতে হচ্ছে। তাই—একটা যা অপরাধ—অফিসেই যাচ্ছে বলে আজ পাঁচ দিন থেকে আদ্রা এখানেই এসেছে চলে—কেনা কাটা, গোছগাছ নিয়ে ব্যস্ত, সাহায্য করছে গৌতম আর আদ্রার ভাবী ননদ।

ঘর সজ্জা কি কমলার, না, জ্বরজ্বালার কিছু আর থাকতে পায়? সেইদিনই গিয়ে উপস্থিত।......না, সবই ভালো। ছেলেটি ওদের অফিসেই একটা বড় কাজ করত। একটা কি মোটা ভাতা কোথা থেকে জোগাড় করেছে, কাজ ছেড়ে দিয়ে বিলেত, না, কোথায় যাবে বছর দুয়েকের জন্যে। নিয়ে যাবে আদ্রাকেও, গৌতমের একটা ভালো ব্যবস্থা করে। কাজ আদ্রা মাত্র দিনচারেক করেছিল।

একটু ছেড়ে দিয়ে প্রশ্ন করলেন রঙ্গময়ী—'কি রকম বুঝছিস?'

দুজনেরই শুধু দুটি দীর্ঘনিঃশ্বাস পড়ল।

রঙ্গময়ী বললেন—'তা বললে কি হয়! শক্ত দেরী করে ফেললি যে। ওরকম মেয়ে কখনও পড়ে থাকে? আজকাল ছেলেরা নিজেই জহুরী হয়ে যে খাঁটি সোনা খুঁজে বেড়াচ্ছে।'

।। পঁয়ত্রিশ ।।

একটা অদ্ভুত শূন্যতা এসে গেছে। তিনজনের জীবনেই, তবে যা স্বাভাবিক, পুরবালার জীবনে সবচেয়ে বেশি করে।

শূন্যতার প্রকৃতিভেদও আছে।

রঙ্গময়ী নিরাশ হয়েছেন, তবে নাতিঘাত যে হননি এমন বেশি, তা তাঁর গল্পটা বলার ভঙ্গি, বিশেষ করে শেষের মন্তব্য থেকেই বোঝা যায়। ও'র ভাবটা হলে ভালোই হতো, মেয়েটিকে ভালবাসতেন, বেশ কাছাকাছি এসে পড়ত, কিন্তু এই বা মন্দ কি? যোগ্য পাত্রেই পড়েছে তো। পাত্র বেছে নেওয়ার যে অকথিত অংশটুকু নেপথ্যে রইল, রোম্যান্টিক মন বলে সেটুকু মিষ্টিই লাগে।

একটু সূক্ষ্ম দৃষ্টিতে দেখতে গেলে, ও'র শূন্যতা এই নিয়ে যে, বেশ মনের মতো একটা কাজ ছিল হাতে, আর রইল না। সফল না হওয়ার একটা নির্বিকার শূন্যতা।

হেমাঙ্গিনীর মনের ভাবটা মাঝামাঝি। নিজেদের ব্যাপার বলে নৈরাশ্যটা একটু গুরুতরই, ভালোও বাসতেন আদ্রাকে, তবে

ভালোবাসতেন বলেই তার যোগ্যপাত্রে পড়ার দীপ্ত নৈরাশ্যটুকুকে খানিকটা ফিকে করেই দিয়েছে।

বাকি থাকেন সুরবালা।

ও'র সাম্প্রতিক কলিকাতা অভিযান ছেলেকে যুগের উপযোগী করে তোলা থেকে শুরু হলেও, যেদিন থেকে বিবাহের কথা উঠল সেদিন থেকে বিবাহটাই ধীরে ধীরে বড় হয়ে উঠল। সব মায়েরই মনের এটি সবচেয়ে বড় কথা, যেমন শিক্ষা-দীক্ষার কথাটা মূলত বাপের।

সুরবালার মনের শূন্যতাটা এই নিয়ে। হোল না—এত চেষ্টা করেও যখন হোল না, তখন হয়তো হওয়ারই নয়—কী হবে!... মনটা হু-হু করতে থাকে। ছেলে নিয়ে সব ভয়ই যেন বিভীষিকার আকার নিয়ে ওঠে মায়ের মনে।

তবে, আর দুজনের মতো ও'র মনেও একটা সান্ত্বনার বীজ ছিল, আরও সূক্ষ্ম আকারে। প্রথম আঘাতের মূঢ়তায় সেটা বুঝতে পারেননি; আস্তে আস্তে সেটা অংকুরিত হতে লাগল। একটা অবলম্বন পেলেন যেন। কথাটা ছিল মনের অবচেতনে। একদিন স্পষ্ট হোল রঙ্গময়ীর একটা ছোট্ট কথায়।

পুরুষের প্রবেশ নিষিদ্ধ 'করুণাময়ী হোম'-এ। ওরা সে-নিয়মটা একদিনের জন্য ভাঙল, অবশ্য রঙ্গময়ীর সম্মতি নিয়েই। আর্দ্রা আর তার বরকে নিমন্ত্রিত করল। সবাইকে থাকা চাই, তাইতে একটু দেরি হয়ে গেল। বিবাহের দিন দশেক পরে হল ব্যবস্থাটা। রঙ্গময়ীর সঙ্গে এ ভিড়েতে নিমন্ত্রণ করল হেমাঙ্গিনী আর সুরবালাকে। নিমন্ত্রণ করার ভার ছিল রঙ্গময়ীর ওপর।

বেড়াতে এসেছিলেন সন্ধ্যার পর। এ সময়ের বৈঠকে, শেষ পর্যন্ত ও'রা তিন-জনই বাকি থাকেন। নিমন্ত্রণের কথাটা শেষ-কালে বলবেন বলেই অপেক্ষা করছিলেন রঙ্গময়ী, বলে প্রশ্ন করলেন—'যাবি? তাহলে কাল যাওয়ার সময় তুলে নিয়ে যাই।'

হেমাঙ্গিনী আর সুরবালা মুখ চাওয়া-চাওয়ি করলেন। হেমাঙ্গিনী সুরবালার ওপরই চাপিয়ে দিলেন, বললেন—'ঠাকুরঝি যদি যান...'

সুরবালা একটু ম্লান হেসে বললেন—'আর কেন?'

এই ধরনেরই উত্তর হবে, জানা রঙ্গ-ময়ীর। নিমন্ত্রণটা করেননিও এখন কিছু বাগবিস্তার করে, ওদিকে টেনে, তবু ও'র মুখ দিয়ে বেরিয়েই গেল—'কেন, তোর মনে যেন একটু খুঁতখুঁতুনি তো ছিলই লেগে বাছা।'

আক্রোশের বশে নয়, ব্যঙ্গও নয়, তবু কোথায় যেন একটু অনুযোগের আভাস রয়েছেই লেগে।

সঙ্গে সঙ্গে ঘুরিয়েও নিলেন কথা। বললেন—'না, অমন একটা ব্যাপার যখন হয়েই গেল, তাহলে আমিও বলি, না যাওয়াই ভালো। একটু অমঙ্গলের আশংকাই তো রা, সবার হাসি-খুশির মধ্যে সে আরও খারাপ, থাক।'

যাওয়ার সময় সুরবালাই বললেন—'কিন্তু এসে সব বলবে ঠানদি, তোমার মুখে শুনতে হবে সব একবার।' দুজনে নব-দম্পতির জন্য ভালো উপহার কিনে পাঠিয়েও দিলেন রঙ্গময়ীর বাড়ি।

বলছিলেন রঙ্গময়ী। তবে বেশি বিস্তার করেও না, বেশি বড়াই করেও না। বরঞ্চ শেষে একটু জুড়েই দিলেন—'দেখতে তা বলে আমাদের সন্দুর মত অতটা কি? তাছাড়া একটু বয়সও তো হয়েছে, চাকরিই করছিল বছর তিন ধরে।'

যতটুকু আত্মপ্রসাদের প্রলেপ দেওয়া যায়।

গাড়িয়ে চলল দিনগুলো, নিরুদ্বেগ অবসাদের মধ্যে দিয়েই। সান্ত্বনার মধ্যে রইল ঐ কথাটুকু, রঙ্গময়ীর দুটি কথার আঘাতে যা মনের অবচেতন থেকে স্পষ্ট হয়ে বেরিয়ে এসেছে: ক্রমেই আরও স্পষ্ট হচ্ছে—একটু যেন কোথায় ছিলই খুঁত-খুঁতানি আর্দ্রাকে নিয়ে—না, দোষের তেমন কিছু নয়—তবে একেবারে অতটা কেন না করলে চলতই না কি? আদিনাথও ঐ ধরনের কি একটা বলেছিলেন—সমর্থন করেও আর্দ্রাকে...

খুঁজে খুঁজে যুক্তি জড়ো করেন সুরবালা।

ব্যথাটা আস্তে আস্তে মরে আসে।

যখন বিধি প্রতিকূল, মেয়েলি কথায় বলতে গেলে যখন 'পড়তা' নেই, তখন বিফলতা যেন চারিদিক থেকেই ভিড় করে আসে। ইন্টারভিউটা দিয়েছিল সন্দীপ, পারেনি। ওদিকে আর্দ্রা, এদিকে ইন্টার-ভিউ—দুটোয় মিলিয়ে কেমন একটা আশঙ্কাই দাঁড়িয়ে গিয়েছিল সুরবালার মনে যে, এ ছেলের না বিবাহ, না মনুষ্যত্ব—কিছুই হওয়ার নয়।

ইন্টারভিউ নিয়ে অসফলতার কারণটা আবিষ্কার করতে দেরি হয়নি, এতখানি সুবিধা থাকা সত্ত্বেও যে হোল না, সেটা অনভ্যস্ত বলেই। মামারা ঠিক করলেন সন্দীপ বিজ্ঞাপন দেখে দেখে ঐ কাজই করে যেতে থাকুক। আরও দুটো ছিল সপ্তাহখানেকের মধ্যে। একটা বিফলই, একটার সম্বন্ধে এখনও জানা না গেলেও বিফল হওয়ারই কথা। তবু, একটা রাস্তা তো ধরেছে।

বিবাহের দিকে—আর্দ্রা যখন একেবারে কড়াক্রান্তি ধরে ষোল আনা বাঞ্ছনীয়া ছিলই না, তখন অতটা নিরাশ হওয়ার কি আছে?

দুদিক দিয়ে আশঙ্কাটা তরল হয়ে এসে আবার আশা ফিরে এল মনে, বিশ্বাস জাগল—হবে, না হওয়ার এমন কি হয়েছে?

দিন কতক এক ধরনের লজ্জায় পড়েই না বাড়িতে, না বাইরে—কারুর সঙ্গে কিছু আলোচনাই করতে পারলে না ছেলের কোন কথা নিয়ে, তারপর হেমাঙ্গিনীর কাছে এক-দিন তুললেন কথা; একটু নিভৃতে পেয়ে—

'খোকার এদিকের ব্যবস্থাটুকু তো বেশ করে দিলেন দাদারা। আজই না হয়, এক-দিন না একদিন হবেই, কি বলো বৌদি?'

'ওমা, হবে না? হতে বাধ্য; তুমি যেমন একেবারে মুষড়ে গেছ!' —অনু-যোগের স্বরে বললেন হেমাঙ্গিনী—'নিজের ভুল বুঝতে বুঝতেই তো এগোয় সবাই গো। এই তো হচ্ছে চিরকাল।'

'তাহলে বৌদি......' ও'র মনের যা আসল ভয় সেটা প্রকাশ করে ফেলেন সুরবালা—'তাহলে বিয়ের জন্যেও ভাবনা নেই কোন, হবেই কি বল?......তোমারও তো একটু খুঁতখুঁতুনি লেগেই ছিল।'

অবাক হয়ে ঘুরে চান হেমাঙ্গিনী, দেরি হয় কথা জোগাতে। বলেন—'ভাবনা! ছেলের বিয়ের জন্যে! তাও আবার সন্দুর মতন ছেলের!......মাথাখারাপ হয়েছে তোমার?'

বার দুই চোখ মিলতে হয় সুরবালাকে, একটু অনুমোদন হয়ে ওঠার ভাব দেখিয়ে বলেন—'তাই কেন বলছি আমি!'

তারপর উলটে চাপ দেন, ও'র যা স্বভাব। বলেন—'আমি তো ভাবছিই সেই থেকে, এটা হোল না, আবার দেখতে হবে। তা বলি কাকে বলো? পিসিরই মুখে কোন রা নেই, যিনিই নাকি এতটা উদ্যোগী হয়ে করছিলেন সব। রঙ্গঠানদি তো একে-বারেই গা-ঝাড়া দিলেন। এখানে আমার ভরসা কে, বলো?'

'পিসি ভাবছে।' —গম্ভীরভাবে জবাব দিলেন হেমাঙ্গিনী।

উৎসুকভাবে চোখ তুলে চাইলেন সুরবালা।

'ভাবছে পিসি।' পুনরুক্তি করলেন হেমাঙ্গিনী। বললেন—'তবে একটু অন্য-ভাবে, বিয়ে দেওয়ার যা পদ্ধতি—চিরকাল চলে আসছে।'

আবার প্রশ্নের দৃষ্টিতে চেয়ে রইলেন সুরবালা।

'আমাদের ঘটককে ডেকে পাঠিয়েছি।' আর মেসটেস নয়।' মুখটা হঠাৎ কঠিন হয়ে উঠেছে। চোখ তুলে কি যেন ভেবে নিয়ে বললেন—'অনেক গলদ থাকে...... অন্তত থাকতে পারে।'

বেশ এগুচ্ছিল কথা, হঠাৎ সুর কেটে গেল। সেদিন সুযোগ পেয়েও আর তুলতে পারলেন না কথাটা সুরবালা। দমে গেছেন বেশ খানিকটা। (ক্রমশঃ)

নতুন সুরভি

ফুলের সৌন্দর্য মন ভোলায়, মন রাঙায়, মনভোলানো এবং মনরাঙানোর এই উজ্জ্বল আমন্ত্রণে সাড়া না দিয়ে দূরে সরে থাকার উপায় নেই। পুষ্পপ্রীতি তাই মানুষের স্বাভাবিক বৈশিষ্ট্য। এখানে বোধ হয় সবাই সমগোত্রীয়। অবশ্য মাত্রাভেদ মেনে নিয়েই একথা বলছি। ফুলের প্রতি কেউ বীতস্পৃহ এরকম কথা সচরাচর শোনা যায় না। এটা অনেকটা সহজাত প্রবৃত্তির পর্যায়ে পড়ে। অন্য সবকিছুর মত এটাও তাই স্বাভাবিক।

এই স্বাভাবিকতার মধ্যে একটা 'কিন্তু' এসে অনেকটা জায়গা জুড়ে দাঁড়ায়। সঙ্গে সঙ্গে নানা প্রশ্ন ভিড় করে আসে। ফুল সবাই ভালবাসে সত্যি কথা। কিন্তু সে ভালবাসা কিরকম? শুধু ফুলে সে ভালবাসা সীমাবদ্ধ হলে বুঝতে হবে তা নেহাতই সাধারণ ব্যাপার—সেখানে আর কোন কৌতূহল সীমাবদ্ধ হয়ে নেই। যখন ফুলের ভালবাসা ফুল ছেড়ে লতাপাতা এবং অন্যান্য আনুষঙ্গিকে ছড়িয়ে পড়বে তখনই সেখানে কৌতূহলের সঞ্চার হবে। এই কৌতূহল চরিতার্থ করতে গিয়েই পুষ্পপত্রসজ্জার প্রয়োজন। শুধুমাত্র ফুল বা পাতা হলেই হবে না। কোন ফুলের সঙ্গে কোন পাতা মানায় সেটাও ভেবে দেখতে হবে। আর সেখানেই তো কারিগরী। এমনি কত ফুল-লতাপাতা আমরা হামেশা দেখছি। তা মনে তেমন সাড়া জাগায় না। সাড়া জাগালেও গভীরে নাড়া দেয় না। যখনি তা গভীরে নাড়া দেয় তখন ঘটে শিল্পপ্রকাশের পূর্ণ পরিতৃপ্তি। পুষ্পপত্র উপযুক্ত শিল্পীর হাতে অপরূপ হয়ে মনকে কখনো গভীরভাবে নাড়া দিয়ে যায়। তখন নানা দ্বিধা ও সংশয় মনে ভিড় জমায়। এই জিনিসগুলি তো রোজই দেখছি.—কিন্তু এ থেকে যে এমন সৌন্দর্যের উৎসার সম্ভব তা ভেবে দেখার সুযোগ কোনদিন পাইনি।

এই সুযোগ সম্প্রতি আমাদের সামনে এসে হাজির করেছিলেন শিল্পশ্রী। শিল্প সংস্থা হিসেবে শিল্পশ্রী বেশ খ্যাতির অধিকারী। কিন্তু তার এই পরিচয় এতদিন অজ্ঞাত ছিল। গিয়ে পৌঁছুলাম শিল্পশ্রীর সেই সুন্দর ঘরটিতে। সিঁড়ি থেকে শুরু করে ঘর পর্যন্ত পৌঁছুতে না.মুগ্ধ হয়ে উপায় নেই। পুষ্পপত্রের বিন্যাসে সমস্ত ঘরটি যেন মাতোয়ারা। অথচ দেখলাম কোথাও ফুলের খুব একটা প্রাচুর্য নেই। আর প্রাচুর্য থাকবেই বা কোত্থেকে—এটা ফুলের মরশুমও নয়। কিন্তু পুষ্পসজ্জায় যে শুধু ফুলই থাকবে এমন তো কোন কথা নেই সবকিছু সমানভাবে স্থান পেয়েছে। ফুলের মেলায় স্বচ্ছন্দে কচু ফুল, কচু পাতা, নারকেলের বোঁটা, তালপাতা, খেজুর গাছের ঝুরি। উপকরণ যত সামান্যই হোক না তা ঠিক সাজিয়েগুছিয়ে এমনভাবে দাঁড় করানো হয়েছে অতিবড় বেরসিকেরও

শিল্পশ্রীতে
পুষ্প ও পত্রপুঞ্জসজ্জা

শিক্ষাঃ নতুন চিন্তা

শিক্ষার বিচিত্র দুয়ারে মেয়েরা আজ আর নবাগত নয়। সমস্ত দরজাই তাদের কাছে উন্মুক্ত। শিক্ষার আঙিনায় তাদের প্রতিষ্ঠা সর্বজনবিদিত। কিন্তু এসব সত্ত্বেও তাদের জন্য সারা দেশে বিশেষ কোন ব্যবস্থা হয়েছে বলে মনে হয় না। অবশ্যই প্রশ্নটা শিক্ষার দিক থেকে তুলে ধরা হচ্ছে। অধিকাংশ মেয়েই আজ উচ্চশিক্ষার আগ্রহী। আবার অনেকে বৃত্তিশিক্ষায় যথেষ্ট আগ্রহ প্রকাশ করে। কিন্তু শিক্ষাক্ষেত্রে সুযোগের অভাবে তাদের বাসনা ফলবতী হতে পারে না। কলেজে বা বৃত্তিশিক্ষা কেন্দ্রের দরজা থেকে স্থান না পেয়ে তারা ফিরে আসে। অবশ্য সম্প্রতি মেয়েদের জন্য আরো কয়েকটি কলেজ বাড়ানোর এক পরিকল্পনা গ্রহণ করা হয়েছে। এতে সাধারণ শিক্ষার অনেকটা সুযোগ-সুবিধা বাড়বে সন্দেহ নেই। কিন্তু সাধারণ শিক্ষার পাশাপাশি যদি বৃত্তিশিক্ষার ব্যবস্থা না রাখা হয় তবে বেকারীত্বের অসহ্য যন্ত্রণা একসময় এসব মেয়েদের মধ্যেও মাথাচাড়া দেবে। তাছাড়া অনেকে এমনিতেই বৃত্তি-শিক্ষা পছন্দ করে এবং জীবিকার পক্ষে উপযুক্তও বটে। কিন্তু সেরকম কোন সুযোগ পাচ্ছে না। ইঞ্জিনীয়ারিং এবং মেডিক্যাল কলেজে চান্স না পেয়ে অনেকে অন্য রাস্তা খোঁজে। কিন্তু পলিটেকনিকে এদের যথাযথ ব্যবস্থা নেই। নিরুপায় ভবিষ্যৎ এদের সামনে ডুকরে কেঁদে ওঠে।

সারা দেশে শুধুমাত্র মেয়েদের জন্য নির্দিষ্ট মেডিক্যাল কলেজ একটি আছে। তা হচ্ছে দিল্লীর 'লেডি হার্ডিঞ্জ মেডিক্যাল কলেজ'। এছাড়া বৃত্তিশিক্ষায় মেয়েদের কোন আলাদা বন্দোবস্ত নেই—ইঞ্জিনীয়ারিং, পলিটেকনিক কোনকিছুই নয়। তাই আজ প্রয়োজন হয়ে পড়েছে বৃত্তিশিক্ষার কেন্দ্র মেয়েদের জন্য আলাদাভাবে খুলতে হবে: মেডিক্যাল, ইঞ্জিনীয়ারিং এবং পলিটেকনিক কলেজ খুলে মেয়েদের বৃত্তিশিক্ষার পথ উন্মুক্ত করে দিতে হবে এবং একমাত্র এর ফলেই অধিকসংখ্যক মেয়ে বৃত্তিশিক্ষা লাভ করে দেশ ও দশের সেবা করতে পারবে। সেই সঙ্গে বৃত্তিশিক্ষার ফলে বেকারের সংখ্যাটা স্ফীত হতে পারবে না—এটাও কম লাভ নয়। কিন্তু সবচেয়ে বড় কথা যে, শিক্ষার বিচিত্র আঙিনায় প্রবেশের ছাড়পত্র যখন তারা পেয়েছে তখন সুযোগ তাদের করে দিতেই হবে। নতুবা আগ্রাসী ভবিষ্যৎ আমাদের ছেড়ে কথা কইবে না। তাই উদ্যোগপর্ব অনতিবিলম্বেই শুরু হওয়া বাঞ্ছনীয়।

অঙ্গনা

প্রমীলা

শিল্পশ্রীর আর দুটি নিদর্শন

। মজে উপায় থাকবে না। পুষ্পসজ্জায় ...পাটি ফুলের ব্যবহারটি বিশেষ লক্ষ্যণীয়। ...তিপূর্বে কোথাও দোপাটি এই উদ্দেশ্যে ...বহৃত হতে দেখেছি বলে মনে পড়ে না।

শুকনো ডালে অর্কিড আর ফুলের ...র একটি স্থায়ী গৃহসজ্জার উপকরণ ...রকম আরো অনেক আছে। স্বল্প পরিসরে ...মনভাবে সাজানো হয়েছে যে, সৌন্দর্য ...কাথাও ব্যাহত হয় না বরং তা আরো ...াকর্ষণীয় হয়েছে।

উদ্যোগ শিল্পশ্রীর কিন্তু আয়োজন করেছেন দুজন—শ্রীমতী শেফালী চৌধুরী এবং শ্রীমতী রাবেয়া মুখোপাধ্যায়। এঁরা পুষ্পসজ্জায় মোটামুটি প্রাথমিক পাঠ নিয়েছেন এবং বাদবাকীটুকু নিজেরাই করে নিয়েছেন। শ্রীমতী মুখার্জি দেশীয় অভি-জ্ঞতার সঙ্গে বিদেশের অভিজ্ঞতার মিশ্রণ ঘটিয়েছেন। আর শ্রীমতী চৌধুরী নিজের আন্তরিকতায় এবং পুষ্পপ্রীতির সমন্বয়ে গড়ে তুলেছেন এই পুষ্পসজ্জার নেশা। এটাকে তাঁর নেশা বলাই সঙ্গত। তিনি নিজে এসম্বন্ধে ক্লাশ নেন নিজের বাড়ীতে। একসময়ে তিনি বোম্বাইয়ে তাজমহল হোটেলে পুষ্পসজ্জার কাজে নিযুক্ত ছিলেন।

নানা কথার মধ্যে ও'রা দুজনেই জানালেন যে, সাধারণ জিনিস দিয়ে ঘরের শোভা বাড়ানোই আমাদের এই পুষ্পসজ্জার আয়োজনের প্রধান উদ্দেশ্য। জানতে চেয়ে-ছিলাম, এমন অসময়ে পুষ্পসজ্জায় আসর বসালেন কেন? উত্তর এলো, ফুল ছাড়াও অন্যান্য আনুষঙ্গিকের প্রাধান্য দেওয়াই আমাদের উদ্দেশ্য। তাই এই অসময়ে এর আয়োজন করেছি। তাছাড়া লক্ষ্যও করলাম সমগ্র ব্যবস্থায় ফুল অপেক্ষা লতাপাতার প্রাধান্যই বেশি। ও'রা আরো জানালেন যে, এতে আর একটা জিনিসও বোঝা যাচ্ছে কোন ফুল কতদিন সতেজ থাকে। পাশের দোপাটির অ্যারেঞ্জমেন্টটি দেখিয়ে বললেন, এই ফুলগুলি আজ তিনচারদিন ধরে একই রকম আছে—কোন বিকৃতি ঘটেনি। তাই এই আয়োজনকে এক্সপেরিমেন্টাল বলা চলে।

ও'দের দুজনেরই পুষ্পসজ্জায় প্রকাশ্য আবির্ভাব এই প্রথম। বলতে দ্বিধা নেই, এই প্রচেষ্টায় ও'রা সার্থক বা বলা চলে বৃহত্তর সার্থকতার প্রস্তুতিবিশেষ।

জীবনসংগ্রামেনারী

সত্যি ভাই, অনেকদিন যেন ঘুমইনি। আমি যেন লাসকাটা ঘরের অন্ধকারে ভয়ার্ত বিভীষিকা নিয়ে জেগে আছি। আমার শরীর থেকে যেন ঘুমের অস্তিত্বটুকু নিংড়ে নিয়েছে। আশ্চর্য, যে সপ্তাহে নাইট ডিউটি থাকে না—সে রাতগুলোতেও আমার এই দশা। বিছানাটাকে কিছুতেই আপন করতে পারি না। মনে হয়, 'লেবার রুম থেকে একটি নারীর প্রসব বেদনার করুণ আর্তনাদ ভেসে আসছে। নয়তো পেসেন্ট রুমের রুগীদের ডাক—'দিদিমণি জল দিন', 'হটওয়াটার ব্যাগে আর একটু গরম জল'—'উঃ আমার মাথা গেল, ঘুমতে পারছি না', 'এই যে সিস্টার তিরিশ নম্বর বেডের পেসেন্টকে একটু কেয়ারফুলি রাখবেন, দরকার হলে আমাকে কোয়ার্টারে কল' দেবেন'—ডক্টর চৌধুরীর ভারি কণ্ঠ! অপারেশন থিয়েটারের ক্লোরফরমের গন্ধ—...য় ডেটল, ইউক্যালিপটাস নিঃশ্বাসে জড়িয়ে আসে। হয় শুনি, ওয় ডাঁর-মেথরাণীদের ঝগড়া। সব মিলিয়ে হসপিটালের ওই বিচিত্র রাতগুলোকে মনে হয়—চোখ চেয়ে দেখা একটি মৃত্যুপুরীর মত। এই অপলক চোখ দুটির সামনে থেকে রাত যখন ফুরিয়ে যায়—তখন যেন আর আমি নেই শরীরটার মধ্যে। মাত্র সেন্ডোলিন পার্সেন্ট হিমোগ্লোবিনের সার যুক্ত শরীরে অব-হেলিত হয়ে যেন পড়ে থাকে—'মমতা রায়' বলে একটি নামের অস্তিত্ব!

'মনে হয়, এই তো এলাম চাকরীতে। থাকবার কোয়ার্টার, খাবার সংস্থান, বেঁচে থাকবার আশ্বাস নিয়ে যেদিন এলাম—কলকাতা থেকে এই জগৎবল্লভপুরের সেবা সদন-এ, সেদিনই শুধু মনে হয়েছিল, জীবনসংগ্রামে এবার আমি জিতেছি। হ্যাঁ, অনেক চেষ্টার পর কর্তৃপক্ষের মনোনয়নপত্র যেদিন পেলাম—সেদিনও মনে হয়নি জীবনটা শুধু এক যন্ত্রণার আয়োজনেই ধাপে ধাপে এগিয়ে চলেছে।

'আরো একবার মনে পড়ছে দিনটাকে, বিধবা মায়ের মুখে, পরিচ্ছন্ন একটি সকালের হাসি। ছোট ভাই দুটো আনন্দে বাক্স বাজাচ্ছিল দিদির চাকরী হলো বলে। আর আমার চিরদিনের সেই বোবা বোনটা যে কোন আনন্দই কথায় প্রকাশ করতে পারেনি, শুধু তার নির্বাক চোখের দু কোণে দিয়ে—কি একটা বিচিত্র আশা কাঁপছিল। মনে হয়েছিল, মূক ও বধিরতার অপরাধে এ পৃথিবীর কোন আনন্দকে যে ভোগ করতে পারেনি, আজ চাকরীর টাকায় তাকেই আগে চিকিৎসা করে ভাল করে তুলবো। তাই ওর কানের কাছে মুখ নিয়ে চিৎকার করে বলে উঠেছিলাম—মানু, এবার আমি সত্যি সত্যিই তোকে ভাল করে তুলবো তোর মুখে সত্যিই কথা ফোটাব দেখিস।

'না, না যা ভাবছেন তা নয়। জীবন-সংগ্রামে এবার সত্যিই হেরে যাচ্ছি...। আমার নাইট ডিউটিতে ডিউটি নিয়ে—যা সর্বসাকুল্যে মেলে তাতে আমাদের সংসার
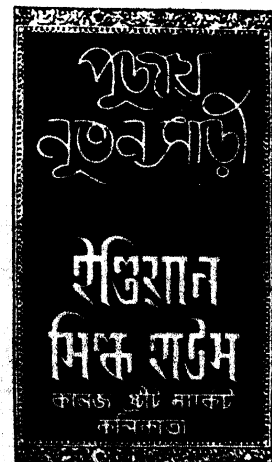
চলে না। এই মুক্তবল হসপিটালে কটা টাকা পাই এলাউন্স নিয়ে? জুনিয়র ট্রেনিং পাশ করেছি। সিনিয়র হতে এখনো বেশ কিছুদিন বাকি। তবু মাঝে মাঝে স্বপ্ন দেখি—আইনেটা এবার বোধহয় থাকবে। তাই দুটোকে ভাল করে লেখাপড়া শেখাব...হয়তো, হয়তো পারব না শুধু ওই মানুটাকে ভাল করতে। ঈশ্বরের নির্মম কৌতুক শুধু ওই এক জায়গায় যেন জমে আছে।'

ঠিক এই সময়। সহসা ঝড়ের পর যেন দেখলাম—কালো দুটি চোখের বর্ষণ! অনেকক্ষণ হাঁফিয়ে, ফুঁপিয়ে কেঁপে কেঁপে—যে কথা বলে যাচ্ছিল এক নাগাড়ে, যার প্রতি কথায় জীবনযন্ত্রণার এক বিচিত্র সাইক্লোন শুনছিলাম, হঠাৎ যেন তা এক মুহূর্তে থেমে গেল। এই অঞ্চলের সকলের অতিপরিচিত নার্স দিদিমণি। মমতা রায় সত্যিই বুঝি কাঁদছে!

দোহারা চেহারা। শ্যামলা রঙ। মুখের নীচের অংশটা মিষ্টি—ওপরের অংশের চোখ দুটিতে—যেন শেষরাতের চাঁদ ডুবে যাওয়া ফিকে অন্ধকার। আর সেই অন্ধকার সমুদ্রে বুঝি তরঙ্গ উঠেছিল। আমি দেখছিলাম আশ্চর্য হয়ে, সত্যিই যেন কাঁদতে পারে এই মেয়েটা।

শীতের সকালে নিঃসীম কোন আকাশের নীচে—নার্স কোয়ার্টারের সেই খোলা বারান্দায় বসেছিলাম আমরা দুজন। যেন অনেকদিনের পরিচিত—গ্লাসকাটা ঘরের পাশে—যে দোপাটি ফুলের গাছটা—অযত্নেই বেড়ে উঠেছে—তার দিকে চেয়ে মমতা রায় বুঝি একটি অতীত স্বপ্ন দেখছিল।...

ভাল ভাল বিয়ের সম্বন্ধ এসেছিল। ভালও যেন কেউ বাসতো মমতা রায়কে। কবেকার সেই বকুলপুর গ্রামের পাখী ডাকা সন্ধ্যেতে, সেই নায়কের চিন্তা অনেকদিন পর যেন ফিরে এলো এই দোপাটি গাছের তলায়।

না, না। সে স্মৃতি নেই। তাকে তো মমতা রায় ফিরিয়ে দিয়েছিল। বলেছিল—'আমার ভাই-বোনগুলোকে মানুষ করি আগে।' সত্যিই, আজ চোখে জল পড়ে। বোবা বোনটার মুখে একটি দিনের জন্যও কথা ফোটানো গেল না। ভাই দুটোও মানুষ হোল না। তবু, সব জেনে বুঝে—আজও চাকরীটাকে আঁকড়ে রাখতে হয়েছে। উপায় নেই। ক্ষুধার পৃথিবীতে—তবু তো ওরা বেঁচে আছে—এক মুঠো খেয়ে।

'আর সেটাই যেন পরম সৌভাগ্য।' এই হলো শেষ কথা মমতা রায়ের। এবং আমার সঙ্গে শেষ দেখাও।

জানি না, আজও সে লড়াই করছে কিনা। কিন্তু আমি ভাবছি অন্য কথা। অর্থনৈতিক সমস্যাবহুল এই সমাজে এই দেশে মমতা রায়ের মত মেয়েরা আর কতদিন ধরে লড়াই করবে। জীবন-সংগ্রামের অথৈ পারাবারের এরা হাল বেয়ে চলেছে। মেয়েদের জীবনের এই 'ঘরে-বাইরে' সংগ্রামের ইতিহাসে নতুন আলোক-রেখা দেখা দেবে কবে? নাকি সমস্যার অন্ধকারেই এরা শেষ হয়ে যাবে?

—জয়শ্রী চক্রবর্তী

ওলন্দাজ গৃহিণীগণের সম্পর্কে কয়েকটি তথ্য

ওলন্দাজ গৃহিণীগণের মধ্যে শতকরা ১৩ ভাগ কোন সময়েই মোজা রিপু করতে পারেন না, শতকরা ১০ ভাগ কখনও কেশ চর্চার দোকানে যান না, শতকরা ৩০ জন কোন সময়েই তাঁদের স্বামীদের সঙ্গে বেড়াতে যাওয়ার সময় পান না এবং শতকরা ৯ ভাগ এ পর্যন্ত ঘরের কাজ থেকে কোন রকম ছুটি পাননি। দেশব্যাপী মতামত সংগ্রহের ব্যবস্থা করে এই তথ্যগুলো পাওয়া গিয়েছে।

এই মতামত সংগ্রহের সময় গৃহিণী-গণকে অনেকগুলি প্রশ্নের উত্তর দিতে হয়।

যে তথ্যাদি সংগৃহীত হয়েছে তাতে দেখা যায় যে, ওলন্দাজ পুরুষগণকে বর্তমানে সপ্তাহে ৪৫ ঘণ্টা কাজ করতে হলেও, গৃহিণীদের মোটামুটি ৬০ ঘণ্টা কাজ করতে হয়। সংগৃহীত তথ্য থেকে জানা যায় যে, শতকরা ৭৫ গৃহিণীর বস্ত্রাদি পরিষ্কার করার মেশিন আছে, শতকরা ৯৬ ভাগের ভ্যাকুয়াম ক্লীনার আছে, শতকরা ৬৪ জনের বৈদ্যুতিক কফিমিশ্রণকারী এবং শতকরা ৪০ জনের রেফ্রিজারেটর আছে। হল্যান্ডের গৃহিণীগণ সাধারণতঃ রাত্রি ১১টায় ঘুমোন এবং সকাল ৭টায় শয্যাত্যাগ করেন। শতকরা ৬৫ জন জানালা খুলে ঘুমান, শতকরা ৫৪ জন পরিবার দুপুরে প্রধান আহার গ্রহণ করেন। হল্যান্ডের বেশীর ভাগ বাড়ীতে প্রতিদিন তিনবার করে কাপড় কাচা হয় এবং এর জন্য গৃহিণীদের প্রতিদিন মোটামুটি ৫০ মিনিট সময় লাগে। শতকরা ৩৫ ভাগ তাঁদের স্বাস্থ্য সম্পর্কে বিশেষ করে শ্রান্তি এবং মাথা ধরা সম্পর্কে অভিযোগ জানিয়েছেন।

ওলন্দাজ গৃহিণীগণের গড়পড়তা উচ্চতা হল ৫ ফিট ৬ ইঞ্চি আর ওজন হল ১০ স্টোন ৬ পাউন্ড। শতকরা ৩৯ জন মনে করেন যে তাঁদের ওজন বড় বেশী। ৩৫ বছরের নিম্নবয়স্কা মহিলাদের মধ্যে শতকরা ৪০ জন ধূমপান করেন না, ৩৫ থেকে ৫০ বছর বয়স্কা মহিলাদের মধ্যে শতকরা ৫৫ জন এবং ৫০ বছরের ঊর্ধ্ব বয়স্কাদের মধ্যে শতকরা ৭৫ জন ধূমপান করেন না। যাঁরা ধূমপান করেন তাঁরা সপ্তাহে মোটামুটি ২৫টা সিগারেট পান করেন। যাঁদের প্রশ্ন করা হয় তাঁদের মধ্যে শতকরা ২৩ জন কোন সময়েই কোন প্রতিবেশী বা পরিচিত পরিবারে বেড়াতে যাননি, শতকরা ৩ ভাগ নিজেদের শহর বা গ্রাম থেকে অন্য কোথাও যাননি, শতকরা ২৫ জন বিদেশে যাননি। ওলন্দাজ গৃহিণীদের মধ্যে শতকরা ৯০ জনের সাইকেল আছে ও চালাতে জানেন, শতকরা ১২ জনের মোটর আছে ও চালাতে পারেন এবং শতকরা ৪৭ জন সাঁতার কাটতে পারেন। অর্ধেক সংখ্যক বাড়ীতে পোষা জীবজন্তু আছে। শতকরা ১৬ জনের বাড়ীতে সাহায্যকারী আছে।

একটি প্রশ্ন ছিলোঃ আপনি কতখানি সুখী বা অসুখী? এর উত্তরে শতকরা ২১ জন লিখেছেন 'খুব সুখী', ৫১ জন লিখেছেন 'সুখী', ১৬ জন লিখেছেন 'মোটামুটি সুখী', ৩ জন লিখেছেন 'বরং অসুখী', ১০ জন উত্তর দেননি এবং খুব অসুখী কেউ লেখেননি। সুখ বলতে আপনি কি বোঝেন এই প্রশ্নের উত্তরে ৩৭ জন লিখেছেন যে সুখী বিবাহিত জীবনের চাইতে বরং সুস্থ পরিবারই বেশী সুখের। শতকরা ২৪ জন বলেন যে সুখী বিবাহিত জীবনের বেশী সুখ, ১৯ জন বলেন ভালো পারিবারিক জীবন মানেই সুখের জীবন, ২১ জন বলেন যে, ছেলে-মেয়ের মধ্যে ভাল সম্পর্ক বেশী সুখের, ১৫ ভাগের মতে ভাল থাকা খাওয়াটাই সুখের, শতকরা ৪ জনএর মতে বাড়ীর কাজ-কর্ম করতে পারাতেই সুখ এবং শতকরা ৩ জনের মতে আধ্যাত্মিক জীবনটাই সুখের।

সুধীরচন্দ্র সরকার

(পূর্ব প্রকাশিতের পর)

বিখ্যাত সাহিত্যিক সৌরীন্দ্রমোহন মুখোপাধ্যায়ের সংগে আমার প্রথম পরিচয় হয় তখন, ভারোভাবে যখন আমি ও হেমেন্দ্রকুমার রায় 'ভারতী'র সংগে যুক্ত হলাম। সে সময় সৌরীন্দ্রমোহন ও মণিলাল গংগোপাধ্যায় 'ভারতী'র যুগ্ম-সম্পাদক ছিলেন। সৌরীনবাবুর সবচেয়ে বড় গুণ ছিল যে, তিনি সবরকমের বাংলা লেখা লিখতে পারতেন—উপন্যাস, ছোটগল্প, নাটক, প্রবন্ধ, কবিতা, সমালোচনা, এমনকি গান পর্যন্ত। 'ভারতী'তে তিনি নিয়মিত পুস্তক সমালোচনাও করতেন।

প্রথম জীবনে থিয়েটারের সংগে তাঁর ঘনিষ্ঠ যোগাযোগ ছিল। সেই সময় তাঁর কয়েকটি নাটকও সাধারণ রঙ্গমঞ্চে অভিনীত হয়েছিল। রবীন্দ্রনাথের কয়েকটি ছোটগল্পের নাট্যরূপ দিয়ে তাঁর নাট্য-জীবনের হাতেখড়ি। তারপর তাঁর নিজের লেখা অনেক বই মঞ্চস্থ হয়: যেমন—লাখ টাকা, দশচক্র, যৎ-কিঞ্চিৎ, কাজরী, মন্দির প্রভৃতি। ছায়াচিত্রেও তাঁর অনেকগুলি কাহিনী রূপায়িত হয়েছে। যেমন সাবিত্রী, বাবলা, আঁধি প্রভৃতি। এর মধ্যে 'বাবলা', আন্তর্জাতিক খ্যাতিলাভ করে। তাঁর সন্তানদের মধ্যে রবীন্দ্রসংগীতে সুচিত্রা মিত্র এবং চিত্র-পরিচালনায় সৌমেন্দ্র মুখোপাধ্যায় সর্বাধিক প্রসিদ্ধ:

আমি যখন 'মৌচাক' বের করি, তখন তিনি শিশু-সাহিত্যে প্রথম কলম ধরলেন এবং তাঁর বহুমুখী প্রতিভার আর একটি স্বাক্ষর রাখলেন এই বিভাগেও। শিশু-সাহিত্যিক হিসাবে তাঁর খ্যাতি অতি অল্পকালের মধ্যেই চারিদিকে ছড়িয়ে পড়ল। তাঁর বিখ্যাত শিশু উপন্যাসগুলির নাম হল পাঠান মুলুকে, মা কালীর খাঁড়া, চালিয়াৎ চন্দর, লালকুঠি প্রভৃতি। 'চালিয়াৎ চন্দর' নামে তিনি একটি অদ্ভুত 'টাইপ' সৃষ্টি করেন। শিশু-সাহিত্যের জন্য ৫০০ টাকা মূল্যের 'মৌচাক' পুরস্কারও তিনি লাভ করেন। ফরমায়েসী লেখায় তাঁর কেউ জুড়ি ছিল না।

তিনি নিরবচ্ছিন্নভাবে সাহিত্যসেবা করতে পারেননি। কারণ, পুলিশ কোর্টে ওকালতি গ্রহণ করায় যতটা আশা করা গিয়েছিল, ততটা সাহিত্যসেবার দিকে মনোনিবেশ করতে পারেননি। জীবনের শেষদিকটায় তিনি আদালতে যাওয়া ছেড়ে দিয়েছিলেন। এই সময়টা পুরোপুরিভাবেই সাহিত্য-সাধনায় আত্মনিয়োগ করেন। রূপ-কথা, উপকথা এবং অনুবাদেও তিনি সমান পারদর্শী ছিলেন। বার্ধক্য সত্ত্বেও তাঁর কর্ম-ক্ষমতা এবং উৎসাহের অভাব কোনদিন আমরা দেখিনি। বহু জিনিস তিনি নিয়মিত অনুবাদ করে ও নানা বিভাগ পরিচালনা করে সাময়িক পত্রিকাগুলির খোরাক যোগাতেন। এই সমস্ত কাজে তাঁর তৎপরতা দেখে আমরা অবাক হয়ে যেতুম।

আমার মনে হয় তাঁর প্রথম দিকের লেখা 'বৌদির কাণ্ড' (!) 'কুন্তলীন পুরস্কারে'র বইয়ে প্রকাশিত হয়ে পুরস্কারলাভ করে।

প্রেমাঙ্কুর আতর্থী

সম্ভবতঃ এই-ই তাঁর সাহিত্যে প্রথম আত্ম-প্রকাশ।

'মৌচাকে'র পঁচিশ বছর বয়স পূর্ণ হলে তার 'রজত-জয়ন্তী' উৎসবের সর্বাঙ্গীণ ভার ন্যস্ত ছিল সৌরীন্দ্রমোহন ও তাঁর স্ত্রীর উপর। বলা বাহুল্য, এঁরা দুজনে সে-দায়িত্ব অত্যন্ত সুষ্ঠুভাবে পালন করে-ছিলেন। স্যার যদুনাথ সরকার ছিলেন এই অনুষ্ঠানের সভাপতি।

মানুষ হিসাবেও তিনি ছিলেন অত্যন্ত সদালাপী ও সুরসিক।

কথাশিল্পী বিভূতিভূষণের মত সরল, অমায়িক ও নিরহংকার মানুষ আমি খুব কম দেখেছি। তিনি যখন খেলাতচন্দ্র স্কুলে শিক্ষকতা করেন, তখন থেকেই তাঁর সংগে আমার পরিচয়। আগে তিনি শিশু-সাহিত্যের ক্ষেত্রে পদার্পণ করেননি, আমিই তাঁকে জোর করে ছোটদের উপযোগী রচনা লিখতে অনুপ্রাণিত করি। এর ফলে তিনি লেখেন ছোটদের জন্য 'চাঁদের পাহাড়' এবং 'মরণের ডঙ্কা বাজে' উপন্যাস। আর এছাড়াও অনেক ছোটগল্প—যা বেশীর ভাগই 'মৌচাকে' প্রকাশিত হয়েছে।

আমাদের আড্ডায় তাঁর উপস্থিতি ছিল নিয়মিত। তাঁর সরলতা আমাদের সকলকে মুগ্ধ করত। পরের দুঃখে সহজেই তাঁর মন কেঁদে উঠত। সেইজন্য বহু লোককে তিনি অর্থ দিয়ে সাহায্য করতেন।

তাঁর 'পথের পাঁচালী' চিত্রে রূপায়িত হয়ে আন্তর্জাতিক সম্মান লাভ করেছে। এছাড়াও তাঁর আরও কয়েকটি কাহিনী চলচ্চিত্রায়িত হয়েছে, যেমন অপরাজিত, অপুর সংসার, বাক্সবদল, আদর্শ হিন্দু হোটেল প্রভৃতি।

যদিও মাত্র তাঁর দু-একখানা বই-ই আমি প্রকাশ করেছি, তবুও তাঁর সংগে সৌহার্দ্য ও প্রীতির সম্বন্ধ তাঁর জীবনের শেষ দিন পর্যন্ত অটুট ছিল।

সুসাহিত্যিক ও সুরসিক প্রেমাঙ্কুর আতর্থী আমার বহু পুরাতন ও অন্তরঙ্গ বন্ধুদের মধ্যে অন্যতম। তাঁর মত হাস্য-রসিক ও মজলিসী লেখক আমি খুব কমই দেখেছি। কি ছোটদের, কি বড়দের সবরকম লেখাতেই তিনি ছিলেন সিদ্ধহস্ত। তাঁর বেশীর ভাগ লেখাই হলো নিম্ন-মধ্যবিত্ত এবং সমাজের নিম্নস্তরের লোকদের নিয়ে—আর এই লেখার দ্বারা তিনি বাঙলা সাহিত্যে একটি স্থায়ী আসন সৃষ্টি করে রেখে গেছেন। দুঃখকষ্ট ও নানারকম গ্লানির মধ্যে তিনি যে হাসির ছটা ফোটাতে পারতেন সেটা অতুলনীয়। 'মহাস্থবির জাতক' তাঁর শ্রেষ্ঠ রচনা—এটি কয়েকটি খণ্ডে সম্পূর্ণ। এটি তাঁর আত্মজীবনী হলেও আমরা তাতে সমসাময়িক কালের সুন্দর একটা প্রতিচ্ছবি পাই।

সব বিষয়েই তাঁর অদ্ভুত পারদর্শিতা ছিল—যেমন সংগীত, ভ্রমণ, খেলা, অভিনয় এবং সাহিত্য-সাধনা। বহুদিন বহুদেশ প্রেমাঙ্কুরের সংগে ভ্রমণ করেছি। শেষজীবনে তিনি সত্য সত্যই স্থবির হয়ে পড়লেও মুখে তাঁর হাসিটি লেগে থাকত সব সময় এবং তাঁর কথাবার্তাতেও কৌতুক-রস উপচে পড়ত।

মাত্র কয়েক বৎসর আগে তিনি পর-লোকগমন করেছেন এবং তাঁর মৃত্যুতে আমি এমন একজন অকৃত্রিম সুহৃদকে হারিয়েছি যার শূন্যস্থান কোনদিন পূর্ণ হবে না।

যৌবনে প্রেমাঙ্কুর আতর্থী বেশ সুপুরুষ ছিলেন এবং যেখানেই যেতেন, সেখানেই আসর জমিয়ে তুলতেন। আসরে বসে সত্য, মিথ্যা, আজগুবী প্রভৃতি মিশিয়ে তিনি যে গল্পের সৃষ্টি করতেন, তার কৌতুক-রস প্রত্যেকেই উপভোগ করত। 'বেতার জগতে'র তিনি একজন সম্পাদক ছিলেন। 'আদুরে' নামক একটি শিশুদের পত্রিকার তিনি ছিলেন যুগ্ম-সম্পাদক।

হেমেন্দ্রকুমার রায়

চিত্র-পরিচালনা ক্ষেত্রেও তিনি যথেষ্ট সুনাম অর্জন করেছিলেন। নিউ থিয়েটার্সের প্রথম সবাক ছবি 'দেনা পাওনা'র তিনিই ছিলেন পরিচালক। তারপর এখানে বহু হিন্দী ও বাংলা ছবি পরিচালনা করেন। কলিকাতার বাইরে বোম্বাইতেও কয়েকটি ছবি পরিচালনা করেছেন তিনি।

প্রেমাঙ্কুর বন্ধু-বান্ধবদের কাছে পরিচিত ছিল 'বুড়ো' নামে। যাঁরা তার সঙ্গে ঘনিষ্ঠ-ভাবে মিশেছেন তাঁরা জানেন যে, প্রেমাঙ্কুরের চরিত্রে এমন কতকগুলি বিশেষত্ব ছিল, যা অপরের মধ্যে দুর্লভ। একদিন গজেনদা-র বিবেকানন্দ রোডস্থ বাড়ীর আড্ডায় একটা ভারী মজার ঘটনা ঘটেছিল।

ঘটনাটা হল—গজেনদা-র আড্ডায় বহু লোক আসতেন—সাহিত্যিক, অ-সাহিত্যিক সবাই। কারণ, গজেনদার মেজাজটাও ছিল যেমন দিলদরিয়া, তাঁর আড্ডাও ছিল তেমনি সবার জন্য অবারিত। এই আড্ডায় এক-জন অবাঙালী ভদ্রলোক প্রায়ই আসতেন। তিনি এসে রোজই বাঙালীদের নানা বিষয়ে দোষ ধরতেন। বাঙালীরা এটা পারে না, বাঙালীরা ওটা জানে না ইত্যাদি! সব সময়ে তাঁর কথায় একটা বাঙালী-বিদ্বেষ ফুটে উঠত। যদিও এসব তিনি বলতেন ঠাট্টার ছলে, কিন্তু ক্রমাগত শুনতে শুনতে আমরা সবাই অস্বস্তি বোধ করতাম।

একদিন প্রেমাঙ্কুর বলল, আজ ব্যাটাকে জব্দ করতে হবে। আমাদের নিন্দে শুনতে শুনতে কানে তালা ধরে গেল।

আমরা সবাই উৎসুক হয়ে রইলুম—দেখি 'বুড়ো' কি কাণ্ড বাধায়।

যথারীতি সেদিনও সেই অবাঙালী ভদ্রলোক এলেন। এসেই শুরু করলেন : বাঙালীরা এটা পারে না—বাঙালীরা ওটা পারে না—এইসব।

বুড়ো তখন তাকে চ্যালেঞ্জ করে বললে, কিন্তু বাঙালীরা যা পারে আপনি কি তা পারবেন ?

ভদ্রলোক তখন অবজ্ঞার ভঙ্গীতে জানালেন যে, বাঙালীরা যা পারে তিনি তা নিশ্চয়ই পারবেন।

তখন বুড়ো বললে : বেশ, তাহলে বাজী হয়ে যাক।

ভদ্রলোক রাজী হয়ে পাঁচ টাকা বাজী ধরলেন।

প্রেমাঙ্কুর তখন কাপড় খুলে ফেলে মাথায় জড়িয়ে সম্পূর্ণ উলঙ্গ অবস্থায় রাস্তায় বেরিয়ে খানিকটা ঘুরে এসে বললেন : এইবার আপনি এইভাবে ঘুরুন।

ভদ্রলোক লজ্জায় অধোবদন হয়ে স্বীকার করলেন যে, এ-কাজ অবশ্য তাঁর দ্বারা হবে না—বলে বাজীর ৫ টাকা দিয়ে দিলেন।

এরপর কিন্তু সে ভদ্রলোককে আমাদের আড্ডায় আর দেখা যায়নি!

ঘটনাটি আপাতদৃষ্টিতে খুব ছেলে-মানুষী বলে অনেকের মনে হলেও, আমি বলব যে, বাঙালীদের বিরুদ্ধে নিন্দায় অস্থির হয়ে মনের জ্বালা মেটাতেই এই পন্থা অবলম্বন করেছিলেন প্রেমাঙ্কুর। নয়তো শালীনতা বোধ ও রুচিজ্ঞান তাঁর একতিলও কম ছিল না।

যতদূর মনে পড়ছে হেমেন্দ্রকুমারের সঙ্গে আমার পরিচয় হয় কলেজে পড়ার সময় থেকেই অর্থাৎ ১৯১১-১২ সালে। সেই সময় আমরা কয়েকজন বন্ধু মিলে 'জাহ্নবী'র সম্পাদনা করতে শুরু করেছি, এমন সময় তিনি আমাদের সম্পাদকগোষ্ঠীতে এসে যোগ দিলেন। অভিনয়, নৃত্য-গীত অর্থাৎ নাট্যকলা সম্বন্ধে হেমেন্দ্রবাবু সাধারণত লিখতেন নানাবিধ প্রবন্ধ, গল্প ইত্যাদি। তাঁর লেখা বেশীর ভাগ তখন 'মানসী'তে বেরুত। এমন সময় তাঁর ডাক পড়ল 'যমুনা'তে।

শরৎবাবু তখন 'যমুনা'র লিখতে শুরু করেছেন। 'যমুনা'র খুব নামডাক। সাহিত্যিক মহলে এবং পাঠক মহলে 'যমুনা' তখন বেশ আসর জাঁকিয়ে বসেছে। হেমেন্দ্রবাবু এই সময় পুরো-পুরিভাবে 'যমুনা'য় যোগ দিলেন। কিন্তু কিছুদিন কাজ করার পরই

বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়

সৌরীন্দ্রমোহন মুখোপাধ্যায়

তাঁকে সেখান থেকে চলে আসতে হয়। মণিলাল গঙ্গোপাধ্যায়ের অনুরোধে তিনি 'ভারতী' পত্রিকায় যোগ দিলেন। আমি 'ভারতী'তে মণিলালের অনুরোধে পুরো-পুরি যোগ দিতে পারলাম না। কারণ আমি তখন কলেজে পড়ি।

এরই মধ্যে হেমেন্দ্রকুমারের সাহিত্যিক হিসাবে সুনাম ছড়িয়ে পড়েছে। তাঁর দুখানি বই ইতিমধ্যে প্রকাশিত হয়েছে। একটি ছোটগল্পের, নাম 'পসরা', অপরটি কবিতার, নাম 'যৌবনের গান'। এরপর ক্রমশ প্রকাশিত হয় বেনো জল, মধুপর্ক, ফুল-শয্যা, পায়ের ধুলো প্রভৃতি উপন্যাস ও গল্পগ্রন্থ।

'ভারতী'তে থাকাকালীন আমার সদ্য প্রকাশিত 'নাচঘরে'ও নিয়মিত লিখতে লাগলেন। এ ছাড়াও অন্যান্য পত্রিকায় তিনি নিয়মিত লিখতেন। কিন্তু এঁর সাহিত্য-জীবনের মোড় ফিরে গেল যখন আমি 'মৌচাক' পত্রিকা বের করি। "মৌচাকে"র লেখকগোষ্ঠীতে তিনি যোগদান করে শিশু-সাহিত্যকে বহুবিধ রচনার দ্বারা সমৃদ্ধ করে তুললেন। তাঁর প্রথম শিশু উপন্যাস 'যখের ধন' বাংলার শিশু-সাহিত্যে একটি আলোড়ন সৃষ্টি করল। এই বইকে শুধু শিশু-সাহিত্যে নয় বাংলা সাহিত্যক্ষেত্রেও একটি অবিস্মরণীয় অবদান বললে অত্যুক্তি হয় না।

এর পর থেকে জীবনের শেষদিন পর্যন্ত ছোটদের লেখা নিয়েই তিনি কাটিয়ে দিলেন। তাঁর লেখার মধ্যে এমন একটা সহজ, সুন্দর যাদুকতা ছিল যা পড়তে সুরু করলে শেষ না করে ওঠা যায় না। মূলতঃ তাঁর লেখাগুলি কিশোর-কিশোরীদের জন্যে হলেও বড়রাও তা থেকে সমান আনন্দ পেতেন। এইখানেই তাঁর শ্রেষ্ঠত্ব, আর এই শ্রেষ্ঠত্বের জন্যেই তিনি একজন শ্রেষ্ঠ শিশু-সাহিত্যিক হিসাবে 'মৌচাক' পুরস্কার পেয়েছিলেন।

(ক্রমশ)

(পূর্ব প্রকাশিতের পর)

পুলিশের লোক মিঃ ঘোষের সঙ্গে কথা বলতে বলতে আচম্বিতে তার মনে পড়ে গেল যে তাকে আর সেই তীক্ষ্ম মর্মভেদী কথাগুলো আর শুনতে হবে না, অপেক্ষা করে থাকতে হবে না কখন অপমানের ঢেলাগুলো তার দিকে সজোরে নিক্ষেপিত হবে। প্রদীপের স্নায়ুগুলো প্রচণ্ড চাপ থেকে নিষ্কৃতি পেয়ে গিয়েছে দৈবলব্ধ আরোগ্যের মত। নিষ্ক্রিয়তা আর জড়তা তাকে পঙ্গু করার জন্যে এগিয়ে আসছিল সাঁড়াশী অভিযানে কিন্তু মাঝপথে থেমে গিয়েছে সেটা—প্রদীপ বাঁচিয়ে নিয়েছে নিজেকে। বিচার-বুদ্ধিটা সজাগ হয়েছে এতক্ষণে, ধীরে ধীরে উঠে দাঁড়াল সে. তারপর সোজা মিঃ ঘোষের দিকে তাকিয়ে বলল, এবার আমি আপনাকে দু-একটা কথা জিজ্ঞেস করব মিঃ ঘোষ। হঠাৎ মুহ্যমান লোকটার শিরদাঁড়াতে কিভাবে শক্তি সঞ্চারিত হল তাই চিন্তা করে আশ্চর্য হলেন মিঃ ঘোষ।

প্রদীপ বলল, আপনি বলেছিলেন আমার স্ত্রী নাকি বেরুতে গেছেন তার বর্ণনাটা দিয়েছেন অবিকল, তাহলে তিনি কে?

হয়ত দৈবযোগে মিলটা ঘটেছে, কিংবা শেষমুহূর্তে হয়ত মিসেস বোস যাওয়া স্থগিত রেখেছিলেন।

তাহলে বিবরণটা পেলেন কি করে? এবার প্রদীপ জেরা করল! হাসলেন মিঃ ঘোষ তারপর বললেন, ওসব ব্যাপারে পুলিশ নজর রাখে, তাছাড়া আমরা সন্ধান চালিয়েছি, হদিশ একটা মিলবেই শেষ-পর্যন্ত। উঠে পড়লেন মিঃ ঘোষ।

পুলিশের লোকটা চলে যাবার পর প্রদীপ অফিসে ফোন করে তার আগমন সংবাদটা দিয়েছিল। শুক্লাই ফোন রিসিভ করেছিল। কথা বলতে শুক্লার কুণ্ঠা হবে জেনে প্রদীপই বলল, আমার স্ত্রীর মৃত্যু সংবাদটা শুনেছেন নিশ্চয়।

হ্যাঁ শুনেছি, মৃদু কণ্ঠে বলল শুক্লা, বাবা বলেছেন যদি সম্ভব হয় তাহলে একবার ওঁর সঙ্গে দেখা করবেন।

বেশ যাব, কিন্তু তার আগে দু-একটা খবর দিন আমাকে। বাস্টা হর্নসবির সেকেণ্ড কনসাইনমেন্টের জন্যে জয়েন্ট কন্ট্রোলার অফ ইমপোর্ট এক্সপোর্টে অ্যাপ্লিকেশান দেওয়া হয়েছে কি?

হ্যাঁ হয়েছে, আশ্চর্য হল শুক্লা সেন এ অবস্থাও অফিসের কথা বলছেন কি করে মিঃ বোস, মনে মনে ভাবল সে।

আমাদের গোডাউনে প্রিমোর্ট ফিল্টার কিংবা প্রাম ফিল্টার আছে কিনা জানেন?

না নেই, ডিস্ক আর সেল ফিল্টার কিছু আছে, মিঃ আয়ারের রিকুইজিসান স্লিপে তারই উল্লেখ ছিল, তাহলে কি লোকটা হৃদয়হীন ভাবল শুক্লা।

তার কণ্টেনার রেকর্ড কানেকশানস কিছু আছে?

হ্যাঁ প্রায় সবগুলোই আছে, হোসলক ক্ল্যাম্প, বেল্টিং লিকিউড। তাহলে উনি বোধহয় ভুলে থাকতে চাইছেন কাজের মধ্যে নিজেকে ডুবিয়ে দিয়ে ভাবছে শুক্লা, তাই হঠাৎ করেই প্রশ্ন করল—

আপনি কয়েকদিন বিশ্রাম নেবেন ত?

না, আজই আমি জয়েন করছি, বাড়ীতে বসে থাকলে আমি শুধু নিজেকে ক্ষয় করে ফেলব পঙ্গু করে ফেলব অকারণে। আমি একটু পরেই আসছি। লাইনটা কেটে গেল। একটা নিশ্বাস ফেলল শুক্লা সেন।

তৈরী হয়ে নিল প্রদীপ। শশকের মত মুখ লুকিয়ে থাকলে চলবে না, বিপদের সঙ্গে সামনা-সামনি লড়তে হবে তাকে। সার্টের কলার তুলে লক্ষ্য করল প্রদীপ বাইরে কোন টাই রাখা নেই। ড্রয়ারটা টেনে একটা টাই নিল সে। আরশির সামনে দাঁড়িয়ে নট দেবার সময় হাতটা তার হঠাৎ অচল হয়ে গেল। মনে পড়ল এই টাইটা মিলি প্রথম বিয়ের অ্যানিভার্সারীতে তাকে উপহার দিয়েছিল। তখনও সম্পর্কের মধ্যে মাধুর্যের কিছুটা অবশিষ্ট ছিল হয়ত। টাইটা আস্তে আস্তে খুলে নিয়ে আরশিতে নিজের মুখের দিকে তাকিয়ে রইল কয়েক মুহূর্ত।

মনে পড়ে গেল মিলির গলাটেও—। প্রদীপ লক্ষ্য করল তার মুখটা অকস্মাৎ রক্ত-শূন্য হয়ে গিয়েছে, বুকের ভয় পেয়েছে সে। শক্ত হয়ে দাঁড়িয়ে রইল প্রদীপ, না এ চলবে না, হি মাস্ট ফাইট ইট—ওদের মধ্যে কোন ক্রমেই ভয়ের ঠাণ্ডা হাতকে আশ্রয় পেতে দেবে না সে। সেই টাইটা পরে নিল প্রদীপ।

অফিসে অনেকগুলো কৌতূহলী চোখ একযোগে তার ওপর গিয়ে পড়ল— এক্সরের মত তার মনের সন্ধান নিতে। প্রদীপ

অনুভব করল বটে কিন্তু অগ্রাহ্য করল দৃঢ়ভাবে। সারাদিন সে কাজ নিয়েই মেতে রইল—চিঠি ডিকটেট করা, ফাইলে মন্তব্য লেখা, বেহালা ফ্যাকটরীর ইনস্টলেশান খবরের হিসেব দেখা, এক-এক করে সব কাজই শেষ করল যথাসময়ে।

বাড়ীতে ফিরে শুক্লা বাবাকে প্রদীপের আসার খবরটা জানিয়ে বসবার ঘরটা একটু পরিষ্কার করে নিল। প্রদীপ বসুর সম্বন্ধে শুক্লার একটা মমত্ববোধ হয়েছে। প্রদীপের ব্যক্তিত্বের মধ্যে কোথায় যেন একটু ফাঁক লক্ষ্য করেছে সে। কাজের লোক সে নিশ্চয় সে বিষয়ে ডাইরেক্টার বোর্ড থেকে টাইপবাবু পর্যন্ত সকলেই একমত, কিন্তু সেটা একটা দিক। চারিত্রিক মাধুর্য থাকলেও ছবিটা যেন অসম্পূর্ণ লাগছে শুক্লার কাছে। এছাড়া প্রদীপ বসুর মধ্যে একটা অসহায় অবস্থাও সে লক্ষ্য করেছে। কতকগুলো অদৃশ্য বন্ধন হয়ত ভদ্রলোকের শক্তিকে প্রতিহত করছে অনবরত, ব্যক্তিত্বটা ফুটেও ফুটছে না, গতি ভঙ্গ হচ্ছে বার-বার।

ঘরটা গুছিয়ে নিয়ে চায়ের ব্যবস্থাটাও সেরে রাখল শুক্লা। বিজনবাবুও প্রদীপের জন্যে অপেক্ষা করছিলেন, সে আসতেই তিনি নিজেই কথা শুরু করলেন, বললেন, আমিই আপনাকে এখানে আসতে শুক্লাকে দিয়ে অনুরোধ জানিয়েছিলাম। আমার মনে হয়েছিল, এরকম অবস্থায় মানুষ নিজেকে বড় অসহায় আর নিঃসঙ্গ মনে করে। একটা দীর্ঘশ্বাস ফেললেন বিজনবাবু, বললেন, এর চেয়ে বড় আঘাতও সহ্য করতে হয় মানুষকে।

প্রথমে একেবারে ভেঙ্গে পড়েছিলাম কেন, বলল প্রদীপ, তারপর সব জিনিসটাকে সামনা-সামনি বোঝাপড়া করে নিতে হবে। একথাটা বড়ই মূল্যবান মিঃ বোস, যুদ্ধ করার শক্তিটাই বেশী প্রয়োজন হয় এই সময়ে। হঠাৎ একটা আঘাত এসে পড়লে আমরা দিশেহারা হয়ে পড়ি জীবনটা অর্থ-হীন আর বিস্বাদ হয়ে পড়ে সঙ্গে সঙ্গে। আপনার এ বিপদের কথা শুনে আমার মনে হয়েছিল, আপনি আবার নিজেকে রিক্ত অসহায় না ভেবে বসেন। এই চিন্তাটাই আমাদের কর্মহীন আর পঙ্গু করে দেয় নিমেষের মধ্যে।

প্রদীপ কৃতজ্ঞ দৃষ্টিতে তাকাল বিজন-বাবুর দিকে তারপর বলল, আমি আগে থেকেই ঠিক করেছিলাম আপনার কাছে আসব, না ডাকলেও আমার আসতে হোত, কেন জানি না আপনার ওপর আমার একটা গভীর আস্থা জন্মেছে। জীবনের সবচেয়ে বড় বিপদের সামনে দাঁড়িয়ে আপনার কথাই মনে হয়েছিল। বাবা অসুস্থ, শ্বশুরমশায় শোকার্ত, তাই মনে হয়েছিল আপনিই আমাকে সঠিক পরামর্শ দিতে পারবেন।

বিজনবাবুর মনে হল প্রদীপকে একটু অনামনস্ক করা দরকার, তাই বললেন, আপনারা ত বুলডোজার ট্র্যাক্টার নিয়ে ডিল করেন, কিন্তু বুলডোজার চালিয়েছেন কখনও?

না, টেকনিক্যাল নলেজ আমার বিশেষ কিছুই নেই, উত্তর দিল প্রদীপ।

আমি চালিয়েছি, বললেন বিজনবাবু, আচ্ছা অনেক রকমের রেস দেখেছেন, বুল-ডোজারের রেস দেখেছেন কখনও?

না দেখিনি, স্বীকার করল প্রদীপ।

তা হলে শুনুন, বুলডোজার ট্র্যাক্টার ড্র্যাগলাইন আমাদের দেশে তখন সবে এসেছে সুতরাং ব্যবহারটা সীমাবদ্ধ ছিল। পাঞ্জাবের নাঙ্গাল এরিয়ায় তখন প্রাথমিক কাজ শুরু হয়েছে সবে। গ্রামের পাশেই বড় বড় গাছ আর পাথর ঘেরা জায়গাটা নিয়েই কাজ আরম্ভ হয়েছে। ড্রাইভার বচন সিং বুলডোজার চালাত একটা, আর একটা কে চালাত এখন আর তা মনে নেই। বুল-ডোজার দিয়ে যখন বড় বড় গাছগুলোকে ধরাশায়ী করত বচন সিং, তখন তার মত আমরাও আনন্দ পেতাম প্রচুর। এক-একটা বুলডোজারের ওজন প্রায় চৌদ্দ মেট্রিক টন, দুশো হর্স পাওয়ারের বোধহয়, আর ইঞ্জিন কামিংস এর বলে মনে পড়ছে। যেন দৈত্য এক-একটা। ভীষণ গর্জন করে যখন গাছ-গুলো আর পাথরের ছোটখাট পাহাড়-গুলোকে সমভূমিতে শুইয়ে দিত তখন বোঝা যেত ওর শক্তি কত। ড্রাইভার বচন সিংও শক্ত লোক—যেমন লম্বা-চওড়া তেমনিই শক্তিমান পুরুষ, তা না হলে দৈত্যকে চালাবে কি করে?

সাইটের কাছেই আমাদের অস্থায়ী বাসস্থান তৈরী হয়েছে শালের খুঁটি আর করগেট টিন দিয়ে তার মধ্যেই অফিস আর ছোট ছোট কোয়ার্টার্স। তার কিছুটা আগেই ট্র্যাকক্টার আর বুলডোজার রাখার একটা সেড। ক্রেন, ট্র্যাকটার, বুলডোজার সিমেন্ট মিক্সার, রিভেটের অস্ত্র, ড্র্যাগলাইন সব মিলিয়ে যেন দানবীয় আওয়াজ হোত একটা। নির্জন পাহাড়ে জায়গায় এতগুলো বিরাট যন্ত্রের সে শব্দ যেন এখনও আমার কানে লেগে রয়েছে। একটু থামলেন বিজন-বাবু, চোখ মুছে যেন আগেকার ছবিটা দেখতে পেলেন তিনি, তারপর একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে আবার বলতে শুরু করলেন, অন্যান্য প্রায় সব প্রদেশেরই লোক সাইটে আছে, সকলেরই স্বাস্থ্য ভাল, কেবল ক্ষীণজীবীদের প্রতিনিধি হিসেবে আমি আর দুজন বাঙ্গালী কেরানী। ড্রাইভার বচন সিংকে প্রায়ই বলতে শুনতাম—সাইটে একমাত্র সে-ই বুলডোজার চালাবার উপযুক্ত, আর বাকী সব আওরৎ, চুড়ি পরে বসে থাকা উচিত তাদের। কেউ প্রতিবাদ করে না দেখে তার স্বভাব একটু উদ্ধত হয়ে পড়ল। একদিন আমার আর সহ্য হল না, বচন সিং-এর চ্যালেঞ্জ আমি গ্রহণ করে বসলাম ঝোঁকের বশে।

ঠিক হল আমরা দুটো বুলডোজার নিয়ে পর পর একই জায়গা থেকে গিয়ে শেডের নীচে পৌঁছুব—যার সময় কম লাগবে সেই জয়ী হবে। মনে আছে বচন সিং বলেছিল, সব গজ চালনার আগেই বাঙ্গালীবাবু ডোজার থেকে কুপোকাৎ হবে নিশ্চয়।

সাইটের সব লোক এসে জড় হয়েছে জায়গাটায়। স্টার্টিং লাইনে বুলডোজার দুটো স্টার্ট দিয়ে পাশাপাশি দাঁড় করান আছে। প্রথমে আমার পালা। সিটের ওপর বসতেই আমার মাথা ঘুরে গেল—প্রবল ঝাঁকুনীতে তখনই আমি প্রায় দিশেহারা হয়ে গেলাম। দাঁড়ান অবস্থাতেই যদি এই হয় তা হলে চলার সময় কি হবে চিন্তা করে গলার ভেতরটা আমার শুকিয়ে কাঠ হয়ে গেল। নেমে পড়ারও কোন উপায় নেই, ড্রাইভার বচন সিং-এর মুখে বাঁকা হাসি, সে তাকিয়ে রয়েছে আমার দিকে। সে যেন আমার মনের অবস্থাটা বুঝে ফেলেছে।

প্রচণ্ড গর্জন করছে দুটো বুলডোজার, কানে আমার তালা লেগে গেল। ট্রাক, বুলডোজার চলে চলে একটা পথ তৈরী হয়ে গিয়েছে আপনা হতে। অসমতল জমি বড় বড় পাথরের টুকরো, মাটির ঢেলা আর মাঝে মাঝে বালির ওপর ঘন আর শক্ত বুনো ঘাস আর কাঁটা-লতার ছোট ছোট ঝোপ। আমি সিটের ওপর বসে কাঁপছি, মনে হল যেন ভূমিকম্প হচ্ছে প্রচণ্ডভাবে। অদূরে লাল ফ্ল্যাগ নিয়ে দাঁড়িয়ে রয়েছে ড্র্যাগলাইন অপরেটার ভার্গব। তার পাশেই ফানসাল-কার আছে স্টপওয়াচ হাতে করে, স্টার্ট থেকে ফিনিস পর্যন্ত সময়টা সে নোট করবে নির্ভুলভাবে, এ বিষয়ে তার অভিজ্ঞতা আছে যথেষ্ট।

চতুর্দিকে দর্শকরা উন্মুখ হয়ে দাঁড়িয়ে আছে, তাদের কলরোল আর আশ্বাসবাণী চাপা পড়ে যাচ্ছে ডোজারের গর্জনে। ভার্গবের হাতের ফ্ল্যাগের দিকে তাকিয়ে আমি উদগ্রীব হয়ে রয়েছি। ফ্ল্যাগ সমেত হাতটা তুলল সে, আমার হৃদপিণ্ডের গতিটা বেড়ে গেল অকস্মাৎ। হাতটা নামাতেই আমি ক্লাচটা ছেড়ে অ্যাক-সিলেটারে চাপ দিলাম।

একটা প্রকাণ্ড পাহাড় যেন আমায় নিয়ে এগিয়ে চলেছে। প্রথমে ধীরে ধীরে কয়েক সেকেণ্ড যাবার পর গতিটা বাড়ালাম আমি। তীব্র ঝাঁকুনীতে আমার সব অস্থি-সন্ধি যেন খুলে যাবার মত অবস্থা হল। সিটে বসে থাকাও কষ্টকর হয়ে উঠল, সেই সঙ্গে আমায় কে যেন ঠেলে ফেলে দিতে চাইল সজোরে। হুইলটা প্রাণপণে আঁকড়ে ধরে রইলাম আমি। একটানা বিস্ফোরণের আওয়াজ একটা হয়ে চলেছে আমার চতুর্দিকে। মাথার ভেতর একটু যন্ত্রণা অনুভব করলাম তার সঙ্গে বোধ-শক্তিটাও যেন কমে গিয়েছে বলে মনে হল আমার। ড্রাইভার বচন সিং-এর ব্যঙ্গের হাসিটা মনে পড়ে যেতে আমি মরিয়া হয়ে গেলাম।

পথটা প্রথমে সোজা চলে গিয়েছে একশ গজের মত তারপর হঠাৎ বেঁকে

গিয়েছে, এই বাঁকের মুখটাই বিপজ্জনক। এটা পার হয়ে আরও প্রায় পঞ্চাশ গজ দূরে চালা রয়েছে। বাঁকটা পার হয়ে গেলাম কোনক্রমে। ধূলির ঝড়ের মধ্যে তাকিয়ে চালাটা দেখতে পেলাম অস্পষ্টভাবে। আর একটু গতি বাড়িয়ে দিলাম—হঠাৎ মনে হল চালাটা যেন খুব কাছে এসে গিয়েছে। তারপর আর কিছুই জানিনা সব অন্ধকার— আমি জ্ঞান হারিয়েছিলাম। আমাকে সিট থেকে নামিয়ে নেবার পর আমার জ্ঞান ফিরল, একটু পরেই চাঙ্গা হয়ে উঠলাম। তুমুল হর্ষধ্বনি হল।

এবার বচন সিংয়ের পালা। দূর থেকে লক্ষ্য করলাম অপরেটার ভগর্বের লাল ফ্ল্যাগটা নীচে নামল সঙ্গে সঙ্গে বচন সিং স্টার্ট নিল, একটু জোরেই যেন। তখনও আমি সুস্থ হয়ে উঠিনি, প্রচন্ড ঝাঁকুনীতে আমার শরীরের অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ যেন স্থানচ্যুত হয়ে গিয়েছে, এতক্ষণ পরে সেটা অনুভব করতে শুরু করলাম. সর্ব-শরীর আমার কাঁপছিল অনবরত। বুল-ডোজারের মর্মভেদী আওয়াজটা এগিয়ে এল আরও। বাঁকের কাছাকাছি এগিয়ে এসেছে বচন সিং তীব্র গতিতে কিন্তু এখানেও সে গতি থামাল না, আমরা অবাক হলাম ওর দুঃসাহস দেখে।

বাঁকটা পার হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে কে যেন বচন সিংকে সিট থেকে ছুঁড়ে ফেলে দিল সজোরে। সকলে চীৎকার করে উঠল এক যোগে—না বচন সিং বেঁচে গেল, কিন্তু বুলডোজারটা থামল না, প্রচন্ড গর্জন করতে করতে সেটা ছুটে চলল অপ্রতিহত গতিতে। অনেকেই ছুটতে লাগল তার পিছু পিছু। চালার তলায় যেখানে আমার বুলডোজারটা রাখা ছিল ঠিক তার পাশ দিয়ে চালাটাকে কাগজের মত ভূমিসাৎ করে দৈত্যটা ছুটতে লাগল সমান বেগে। মাঝে একটু খালি জায়গা মাত্র তার পরেই আমাদের অস্থায়ী ছাউনী। আমি মন্ত্র-মুগ্ধের মত তাকিয়ে রইলাম সেইদিকে। না কেউ ধরতে পারল না তাকে। আমাদের কোয়ার্টার্স তাসের ঘরের মত অদৃশ্য হয়ে গেল এক মুহূর্তে। দূরে একটা প্রকান্ড তেঁতুল গাছ ছিল, ডোজারটা তাতে একটা ধাক্কা খেয়ে কাৎ হয়ে পড়ে গেল। মনে হল বিরাট একটা প্রাগৈতিহাসিক ডাইনোসোর যেন মৃত্যুযন্ত্রণায় ছটফট করছে।

এর সঙ্গে আরও একটা দুর্ঘটনা ঘটে গেল; ইউ পির রামাকার মিশর কোয়ার্টার্সে খাটিয়ার ওপর নিদ্রাভিভূত ছিল। মাটির প্রায় দু' হাত নীচে খাটিয়া আর রামাকারের সামান্য কিছু অংশ খুঁজে পাওয়া গিয়ে-ছিল। চুপ করলেন বিজনবাবু। ঘরের আব-হাওয়াটা নিস্তব্ধ হয়ে গিয়েছে প্রদীপ আবিষ্টের মত শুনছিল এতক্ষণ। বিজন-বাবু বললেন, যেকোন প্রজেক্ট সাইটের আশে-পাশে খোঁজ করলে এধরনের অনেক লোমহর্ষক কাহিনী শুনতে পাবেন। একটু নড়ে-চড়ে বসলেন তিনি তারপর বললেন, থাক ওসব, এবার আমরা কাজের কথায় ফিরে আসি। আপনার শ্বশুরমশায়ের সঙ্গে এ-বিষয়ে কোন আলোচনা করেছেন?

না, এ সময়ে ওঁকে বিরক্ত করতে চাইনা, ইট উইল বি টু পেনফুল, উত্তর দিল প্রদীপ।

তাহলে ক্রিমিনাল সাইডের নরেন দেকে এনগেজ করুন...

কিন্তু তিনি ত ভয়ানক ব্যস্ত, তাঁকে কি পাওয়া যাবে?

যাবে, আমি একটা চিঠি লিখে দিচ্ছি, বোধহয় না করবে না।

চিঠিটা লিখে ক্লান্তি অনুভব করলেন বিজনবাবু, পিছনের বালিশগুলোর ওপর হেলান দিয়ে চোখ বুজলেন। শুক্লা ঘরে ঢুকে তাঁর দিকে চেয়ে অস্ফুট একটা আওয়াজ করে বলল, বাবা বোধহয় অজ্ঞান হয়ে গেছেন।

সে কি! ব্যস্ত হয়ে উঠল প্রদীপ, বলল, একজন ডাক্তার ডাকি।

অত দেরী হলে চলবে না, ওই সিরিঞ্জে ওষুধ ভরা আছে, আপনি ইনজেকসানটা দিয়ে দিন।

কিন্তু আমি ত ইনজেকসান দিতে জানিনা।

আর দেরী করবেন না, ব্যাকুল হয়ে উঠল শুক্লা।

আর দ্বিধা করল না প্রদীপ, কোনক্রমে ইনজেকসানটা দিয়ে দিল সে বিজনবাবুর বাহুতে। হটওয়াটারের ব্যাগ দুটো দুজনে মিলে গরম জল দিয়ে ভরে নিয়ে বিজনবাবুর হাতে-পায়ে তাপ দিতে শুরু করল ওরা। প্রদীপ একটু বিচলিত হয়ে পড়েছিল, এতক্ষণে সামলে নিয়েছে অনেকটা, সে বলল, আমার জন্যে এটা ঘটল হয়ত। কিছুটা উত্তেজিত হয়ে পড়েছিলেন। মাথা নেড়ে শুক্লা বলল, না, তা নয়, এমনিতেই ওঁর এটা হয়—তাই হাতের কাছে ওষুধ ভরা সিরিঞ্জটা রাখা থাকে।

কিন্তু আপনি যখন বাড়ীতে না থাকেন?

সামনেই একজন কম্পাউন্ডারবাবু থাকেন; তিনি দিনে চার-পাঁচবার দেখে যান। বিজনবাবু ধীরে ধীরে চোখ খুলে ঘরের চতুর্দিক দেখে নিয়ে বললেন, দেখুন কত অক্ষম আমি, আপনার সামনেই অজ্ঞান হয়ে গেলাম বোকার মত। ম্লান হাসলেন তিনি।

আপনি কথা বলবেন না, অনুরোধ করল, প্রদীপ, বিজনবাবুর শীর্ণ হাতের ওপর একটা হাত রাখল সে, তারপর বলল, কথা বলেই ক্লান্ত হয়ে পড়লেন বোধহয়।

না সেজন্য নয়, যেকোন অবস্থায়ই এটা হয়ে থাকে আমার; কথা কইলেও যা—না কইলেও তাই। এজন্যে আপনি কুন্ঠিত হবেন না; আপনি আর দেরী করবেন না চিঠিটা নিয়ে এখুনি চলে যান নরেন দের কাছে।

ওখান থেকে বিদায় নিয়ে প্রদীপ উকীল নরেন দের বাড়ীর দিকে রওয়ানা হল। গাড়ী চালাতে চালাতে প্রদীপ সারা-দিনের ঘটনার সন্নিবেশ সম্বন্ধে চিন্তা করতে লাগল। আজকের দিনটা তার কাছে একটা অজানা তীব্রগতি যানের মত বলে মনে হল। তাকে মুহূর্তে মুহূর্তে দৃশ্য থেকে দৃশ্যান্তরে নিয়ে গিয়েছে কোন মন্ত্রবলে। কখনও পর্বত থেকে সমুদ্রের তলায় তলিয়ে দিয়েছে, কখনও বা অন্ধকার ভয়াবহ আবর্তের পর আলোকোজ্জ্বল নব-প্রভাতের সন্ধান দিয়েছে পর পর।

প্রদীপের অনুভূতিগুলো সূক্ষ্ম থেকে সূক্ষ্মতর হয়ে উঠেছে। বিপদকে নৈর্ব্যক্তিকভাবে দেখতে পারছে অনেকদিন পরে—ফিরে পেয়েছে সে তার হারিয়ে যাওয়া অদম্য মনোবলের ভগ্নাংশ।

উকীল নরেন দে বিজনবাবুর চিঠি পেয়ে সাগ্রহে প্রদীপের ভার নিল। পরম নিশ্চিন্ত হল সে। বাড়ীতে ফিরে তার জন্যে পুলিসের লোক মিঃ ঘোষ আর সুব্রত চৌধুরীকে দেখে মনটা অজানা আশঙ্কায় ভরে উঠল। তাঁদের দিকে তাকাতেই মিঃ ঘোষ বললেন, আপনাকে একটা খবর জানাতে আবার আসতে হল।

কি খবর? প্রদীপ বিস্মিত হল।

আপনার স্ত্রী আত্মহত্যা করেন নি, তাঁকে হত্যা করা হয়েছিল, সহজভাবেই বললেন মিঃ ঘোষ।

কথা শুনে বজ্রাহতের মত একটা চেয়ারে বসে পড়ল প্রদীপ, আকস্মিক আঘাতে মুহ্যমান হয়ে পড়ল সে; একসঙ্গে অনেক প্রশ্ন তার মনকে আচ্ছন্ন করে দিল সেই সঙ্গে। তার মনে হল জিবটা যেন তালুতে আটকে গিয়েছে—তার গলা যেন কে বজ্রমুষ্ঠিতে ধরে আছে।

আই অ্যাম সরি, বললেন মিঃ ঘোষ, আপনার কেউ শত্রু আছে?

না, উত্তর দিল প্রদীপ, তারপর টেবিলে রাখা জাগ থেকে এক গ্লাস জল খেয়ে নিল একনিঃশ্বাসে।

আপনি যে রাত্রে ট্যুরে যান সে-রাত্রে কি আপনার স্ত্রীর সংগে দেখা হয়েছিল?

না, আমি ট্যুরে বেরুবার আগেই আপনারা আমায় জানিয়েছিলেন যে আমার স্ত্রী প্লেনে বেরুট গেছেন সান্তাক্রুজ থেকে।

তিনি আপনার স্ত্রী নন, উত্তর দিলেন মিঃ ঘোষ।

তাহলে কে? প্রদীপ মিঃ ঘোষের দিকে তাকাল।

আপনার স্ত্রীর মত মেক-আপ দিয়ে যে ভদ্রমহিলা বেরুট গেছলেন তাঁর নাম মিতা দেবী, তিনি হোটেল সাম্বার ক্যাবারে ডান্সার। মিঃ বোস, আপনি কি হোটেল সাম্বায় কখনও গেছেন?

হ্যাঁ, আমার স্ত্রীর খোঁজে একবার গেছি ওখানে।

মিতা দেবীর সংগে পরিচয় আছে?

না, বিরক্তিভরে ভ্রূকুঞ্চিত করে তাকাল প্রদীপ।

শুক্লা সেন কি আপনাদের অফিসে কাজ করেন? শান্তগলায় প্রশ্ন করলেন মিঃ ঘোষ। আচমকা নামটা শুনে বিস্মিত হল প্রদীপ। শুক্লা সেনের নাম এখানে আসছে কেন? এরা কি কাউকে রেহাই দেবে না; শুক্লা সেনকে ওরা কোথা থেকে টেনে আনল? এ-ধরনের জটিলতার কথা তার মনে একবারও ওঠেনি। তাকে আর শুক্লাকে নিয়ে একটা উদ্দেশ্য খাড়া করে তাকে শেষ পর্যন্ত অভিযুক্ত করতে চাইছে এরা।

কথাটা চিন্তা করতেই প্রদীপ অবসন্ন হয়ে পড়ল, তবু মিঃ ঘোষের প্রশ্নের জবাবটা দিল, সে বলল, হ্যাঁ মিস সেন আমাদের অফিসেই কাজ করেন আর আমারই প্যার্সোনাল এ্যাসিস্টেন্ট।

আপনার সংগে কি রকম সম্পর্ক বলবেন? বাঁকা চোখে তাকালেন মিঃ ঘোষ।

প্রায় সাধারণ, তবে আমার সংগে ওঁকে বেশী কাজ করতে হয়।

সেই কারণে ঘনিষ্ঠতা একটু বেশী বললে কি অন্যায় হয়?

সেটা কথাটার মানের ওপর নির্ভর করছে, সংগে সংগে উত্তর দিল প্রদীপ।

আপনাদের বেহালা ফ্যাক্টরীতে একটা স্ট্রাইক হবার কথা ছিল না?

হ্যাঁ তা ছিল, কিন্তু শেষপর্যন্ত একটা মিটমাটের ব্যবস্থা হয়েছিল।

আপনিই মিটমাট করেছিলেন?

হ্যাঁ, সত্যেন দত্তের সংগে আমিই একটা বোঝাপড়া করতে পেরেছিলাম।

মিঃ ঘোষ একটু চুপ করে রইলেন, তারপর প্রশ্ন করলেন আবার, যেদিন আপনি সত্যেন দত্তের বাড়ী গেছলেন স্ট্রাইক মেটাবার জন্য, সেদিন কি মিস, সেনের বাড়ীও গেছলেন?

হ্যাঁ, খবরটা জানাবার জন্যে গেছলাম।

কিন্তু তিনি ত অফিসেই আছেন, সেখানে না জানিয়ে আপনাকে আবার তাঁর বাড়ীতে যেতে হল কেন মিঃ বোস?

মিস, সেনের বাড়ী একই রাস্তায় পড়ে, তাছাড়া ওঁর বাবার অসুখ চলছিল তাঁকেও দেখে এলাম।

অফিস কর্মচারীদের পরিবারের কারুর অসুখে কখনও বাড়ী গিয়ে কি খবর নিয়েছেন? মিঃ ঘোষের দৃষ্টিতে বিদ্রূপ সুস্পষ্ট।

না, তা নিইনি, প্রদীপের গলার স্বরটা ক্ষীণ।

অফিসিয়াল ডিউটি ছাড়া আপনি কি মিস, সেনের সংগে মেলামেশা করেন নি?

না, আমি যেটুকু করেছি তাকে মেলা-মেশা বা ঘনিষ্ঠতা বলা ঠিক হবে না।

আপনি এখন কোথা থেকে ফিরছেন?

উকিল নগেন দের বাড়ী থেকে।

অফিস থেকে কি উকীলবাবুর বাড়ীই গেছলেন?

না, মিস, সেনেদের বাড়ী গেছলাম, সেখান থেকে ওঁর বাবা বিজনবাবুর চিঠি নিয়ে তারপর উকীলবাবুর বাড়ী গেছি।

ধন্যবাদ, ট্যুরে যাবার দিন মিস, সেন কি আপনাকে সী-অফ, করতে যান নি?

না, আমি একটা ফাইল অফিসে ফেলে এসেছিলাম সেইটে পৌঁছে দিয়েছেন মাত্র।

সেটা করার দায়িত্ব উনি নিলেন কেন? একজন বেয়ারা দিয়ে ফাইলটা পাঠিয়ে দিলেই ত চলত। এর কোন জবাব দিল না প্রদীপ, চুপ করে রইল কয়েক সেকেন্ড তারপর একটু উঁচু গলায় বলে উঠল: আপনারা অন্যায় করছেন। একজন নির্দোষ ভদ্রমহিলার নাম জড়িয়ে অকারণে তাঁকে বিপদে ফেলতে চাইছেন।

উত্তেজিত হয়ে লাভ নেই মিঃ বোস, সুব্রত চৌধুরী এবার কথা বলল। প্রদীপ তাকিয়ে দেখল তার দিকে। সুব্রত চৌধুরী বলতে লাগল, আমরা কোন নির্দোষ ভদ্র-মহিলা বা ভদ্রলোককে বিপদে ফেলতে চাই না—ওটা আমাদের কাজ নয়, আমরা সব জিনিসটা জানতে চাই। মনে রাখবেন একটা জীবন নিষ্ঠুর আততায়ীর আঘাতে শেষ হয়েছে এবং তিনি আপনারি স্ত্রী, আমাদের সাহায্য করলে আমরা দোষীকে ধরতে পারব; আপনি নিশ্চয় তাতে বাধা দেবেন না।

না, আমিও তাই চাই, উত্তর দিল প্রদীপ।

পুলিসের লোক চলে গেলে প্রদীপ মুখ ধুয়ে চা খেয়ে নিল। মায়ের সংগে ইদানীং বেশী কথা বলতে পারে নি সে, মাও তাকে অযথা স্বান্তনা দিয়ে বিরক্ত করেন নি। প্রদীপ এ-বিষয়ে মা কিংবা বাবার সংগে কোন আলোচনা করে নি, এতে ওঁদের মানসিক কষ্ট দেওয়া ছাড়া অন্য কোন ফল হবে না। তার জ্বালা-যন্ত্রণার বোঝা অন্য লোকের ঘাড়ে চাপিয়ে দিতে সে নারাজ, দুর্ভাবনা আর ক্লেশের দুর্ভোগ শুধু সেই ভোগ করবে, অপর কেউ নয়।

হঠাৎ শুক্লা সেনের কথা মনে পড়ে গেল প্রদীপের। তার দুর্ভাবনার কিছু অংশ সে দিয়ে এসেছে ওখানে, তার বদলে শুক্লা আর বিজনবাবুর কাছ থেকে সহা-নুভূতি আর সমবেদনা পেয়েছে প্রচুর। কৃতজ্ঞতায় তার মন ভরে উঠল। তার অজান্তে শুক্লা আর বিজনবাবু তার দুঃখের অংশীদার হয়ে গিয়েছে।

এতক্ষণে পুলিসের প্রশ্নগুলো প্রদীপের এক এক করে মনে পড়ছে। শুক্লা নিজে টমসন ম্যাথুসের ফাইলটা নিয়ে কেন স্টেশনে গিয়েছিল? একজন বেয়ারা দিয়ে পাঠালেই ত পারত। শুক্লার সমবেদনা, তার সহজ সুন্দর ব্যবহার প্রদীপকে আকর্ষণ করেছে, ভাল লেগেছে এ-কথা সে অস্বীকার করতে পারে না, তাই বার বার শুক্লার সান্নিধ্য খুঁজেছে সে।

অপরপক্ষে মিলি তার সংগে কিরকম ব্যবহার করত? প্রদীপের মনে পড়ল একবার তার অ্যাপেন্ডিসাইটিস হয়েছিল সেই সময়ের কথা। বাড়ীতে যখন সে যন্ত্রণায় ছটফট করছিল তখন মিলি পার্টি বা সিনেমা একদিনের জন্যেও বন্ধ করে নি, একবারও তার কাছে আসে নি তাকে দেখতে। হাসপাতালে তার অপরেশান হয়ে-ছিল, মনে আছে ক্লোরফর্মের ঘোর কাটলে মিলি ছাড়া আর সকলকেই সে দেখতে পেয়েছিল। এ নিয়ে পরে সে মিলিকে প্রশ্ন করেছিল। বলেছিল—মিলি, তুমি আমায় হাসপাতালে দেখতে পর্যন্ত গেলে না?

না, আমি সেকালের পতিব্রতা স্ত্রী নই, তোমার অপারেশানের চেয়ে পার্টি অনেক ইনটারেস্টিং।

ভাল, কিন্তু স্বামী-স্ত্রীর সম্পর্কটাও সেকেলে বলে মনে হয় তোমার কাছে?

নিশ্চয় শুধু সেকেলে নয়, অবাস্তব, সারা-জীবন এই বোঝাটাকে বয়ে বেড়াতে হবে জানলে এ পথে পা বাড়াতাম না, বলেছিল মিলি।

শুক্লার সংগে বিয়ে হলে সেও কি এরকম ব্যবহার করত? সেও কি মিলির মত অপঘাতে প্রাণ দিত এইভাবে? ক্যাবারে ডান্সার মিতা কেন মিলির বেশ ধরে বেরুট গেছল? মিলিই পাঠিয়েছিল তাকে বিভ্রান্ত করতে? না অন্য কোন উদ্দেশ্য ছিল? হোটেল সাম্বায় মিতার নাচের কথা মনে পড়ল প্রদীপের—মিতার নাচ তার ভাল লেগেছিল, দেখতেও সুন্দর। এ তিনজনের মধ্যে সবচেয়ে সুন্দর কে? মানসচক্ষে তিনজনের চেহারা তুলনা করতে লাগল প্রদীপ বসু।

মিলি দেখতে সুন্দর নিশ্চয়, তবে মিতার মত রূপটা চোখ-ঝলসানো নয়, মিলির ফিগারও মিতার মত পারফেক্ট নয়, সামঞ্জস্যের অভাব আছে, তাছাড়া মিলির মুখের ভাবে কোথায় একটা রুক্ষতা লুকিয়ে আছে, চোখে একটা তাচ্ছিল্যের দীপ্তি স্পষ্ট দেখা যায়। মিতাকে অত কাছ থেকে সে দেখেনি দেখলে হয়ত কিছু খুঁত বার হত। স্টেজে অভিনয় করার সময় অনেক খুঁত দর্শকদের কাছে ধরাই পড়ে না, ক্যামেরার লেন্সকে কিন্তু ফাঁকি দেওয়া শক্ত। মানুষকে দূরে থেকে দেখলে কিংবা অল্প মেলামেশা করলে ভালই লাগে প্রথমে।

মিলিকেও প্রথমে ভাল লেগেছিল কিন্তু প্রেমের লেন্সকে সে ফাঁকি দিতে পারে নি শেষপর্যন্ত। মিতার সংগে মিলিকেও

মোহটা হয়ত ওইভাবেই কেটে যেত। আর শুক্লা সেন, সৌন্দর্য চর্চা না করেও তার আকর্ষণ কম নয় কেন?" শুক্লার মাথায় ঘন কাল কুঁচকান চুল, মিলি আর মিতার ববড—শুক্লার চুল ববড হলে মানাত না, বিসদৃশ লাগত হয়ত। মিলি কিংবা মিতার পক্ষে যা মানানসই, শুক্লার বেলায় সেটা ঠিক তার উল্টো।

একটা সিগারেট ধরিয়ে বিছানায় শুয়ে পড়ল প্রদীপ। মিলি বিছানার মাঝখানে শুত না। কারুর কিছু না বললেও এটা বোঝা যেত, তার মনে কোন ভয় লুকিয়ে ছিল হয়ত। সিলিং-এ টাঙ্গান পাখাটা ঘাড়ে পড়ে যাবার ভয় ছিল? মাঝখানে শুয়ে শিশুকালে কোন বিপদে পড়েছিল? কে জানে? প্রদীপ লক্ষ্য করেছে সমস্ত মানুষের প্রায় এই ধরনের একটা না একটা মানসিক খুঁত থেকে গিয়েছে। তার নিজেরও আছে একটা। লাল রং প্রদীপ পছন্দ করে না, কেন করে না তা সে নিজেই জানে না, কারণ হয়ত একটা ছিল, কিন্তু এখন আর মনে নেই সেটা। পারতপক্ষে লাল জিনিস সে কেনে না। মনে আছে কিছুদিন আগে তাকে একটা লাল রংএর সুদৃশ্য পেনহোল্ডার কে যেন প্রেজেন্ট করেছিল, যতদিন না সেটা বিদায় করতে পেরেছিল ততদিন তার স্বস্তি ছিল না।

ক্লান্ত লাগছে প্রদীপের। আজকাল কাজ করতেও তার অবসাদ আসছে কিছুক্ষণের মধ্যেই। কলকাতা তার ভাল লাগছে না—এখানকার শব্দগুলো আরও যেন তীক্ষ্ণ হয়ে উঠেছে, ধোঁয়া, ধুলো আর অহরহ কোলাহল তার শ্বাস বন্ধ করে দিচ্ছে ক্রমে ক্রমে। নির্জন নিঃশব্দ শান্ত পরিবেশ প্রদীপের ভাল লাগে। মনে পড়ল বিয়ের কিছুদিন পরে মিলিকে নিয়ে সে দার্জিলিং বেড়াতে গিয়েছিল। বেড়াতে বেরিয়ে একদিন ওরা পথ ভুল করে একটা জঙ্গলে গিয়ে পড়েছিল বলে মনে পড়ল তার।

জঙ্গল—ঘন জঙ্গল বুনোলতা মস্‌ আর অর্কিড। চতুর্দিকে ফগ, অন্ধকার জায়গাটা ভিজে মাটির সোঁদা গন্ধ—চোখ মেলে তাকিয়ে দেখল প্রদীপ—সে জঙ্গলেই দাঁড়িয়ে রয়েছে মিলি, কিন্তু কাছে নেই, কোথায় হারিয়ে গিয়েছে সে। দূরে একটা টিলার ওপর কে যেন দাঁড়িয়ে রয়েছে দেখে এগিয়ে গেল প্রদীপ, মিলি নয়, তবে চেনা মনে হচ্ছে প্রদীপের।

কি চিনতে পারছ না? আমি মিতা?

মিতা কে?

কি আশ্চর্য! এর মধ্যে ভুলে গেলে? হোটেল সাম্বায় আমার নাচ দেখে ত মুগ্ধ হয়েছিলে, বাঁকা ভ্রূ দুটো তুলে কোমরে হাত দিয়ে তার দিকে তাকিয়ে রইল মিতা।

কিন্তু, তুমি—বেরুটে না কোথায় কেন ছিলে।

তোমার ডাকে চলে এলাম, অমায়িক মিতা হাসল একটু।

আমি তোমায় ডাকিনি, মিলিকে ডাকছি।

তাই নাকি! মিলির কথা জানি না তবে তোমার জন্যে আর একজন অপেক্ষা করছে—ওই গাছের আড়ালে।

প্রদীপ দ্রুত এগিয়ে গেল গাছটার দিকে। কি আশ্চর্য! এ ত শুক্লা। মাটিতে বসে চা করছে সে, চুড়ীর আওয়াজটা স্পষ্ট শুনতে পেল প্রদীপ।

চা খাবে? স্নিগ্ধ দৃষ্টিতে তাকাল শুক্লা।

দাও, হাত বাড়াল প্রদীপ।

দাঁড়াও এত তাড়া কিসের? অল্প চিনি, অল্প দুধ আর কড়া লিকারে তাই না? ঘাড়টা অল্প হেলিয়ে তাকিয়ে রইল শুক্লা। চা খেতে খেতে পিছন ফিরে তাকাল প্রদীপ, টিলার ওপর মিতাকে আর দেখতে পেল না সে। মিলিকে চীৎকার করে ডাকল প্রদীপ। প্রতিধ্বনিটা পাহাড়ের গায়ে ধাক্কা লেগে ফিরে এল শুধু। প্রদীপ একটা গর্জন শুনতে পেল, লক্ষ্য করল, সেটা ক্রমশ এগিয়ে আসছে। ভাল করে তাকিয়ে সে দেখতে পেল একটা প্রকাণ্ড পাহাড়ের মত বুলডোজার তার দিকে এগিয়ে আসছে তীব্রবেগে। ড্রাইভারের সিটে পুলিসের মিঃ ঘোষকে চিনতে পারল প্রদীপ। মিঃ ঘোষের ক্রূর হাসিটা দেখে ভয় পেয়ে চীৎকার করে বারণ করল আর এগিয়ে আসতে। মিঃ ঘোষ কিন্তু বুলডোজারটা তাকে লক্ষ্য করেই দ্রুত চালাতে লাগল। এবার প্রদীপ মিলিকে ডাকতে লাগল বার বার—তার চীৎকারের শব্দটা বুলডোজারের বজ্রনির্ঘোষে চাপা পড়ে গেল। হঠাৎ পাশে তাকিয়ে শুক্লাকে দেখতে পেল সে।

শুক্লা বলে উঠল, একটু চা দোব তোমায়, বেশ কড়া লিকার, তার পিছনে দাঁড়িয়ে মিতা বলল, সেই সঙ্গে কম চিনি। ওপর পাশে কখন মিলি এসেছে, সে বলে উঠল, কম দুধ। সকলেই হাসছে ওরা। বুলডোজারটা ভীম গর্জনে তেড়ে আসছে তার দিকে। শুক্লা তার দিকে তাকিয়ে বলছে, কড়া লিকার। মিতা আর মিলিও একসঙ্গে ওই একটা কথাই বার বার বলছে, কড়া লিকার, কড়া লিকার।

বুলডোজারটা প্রায় ঘাড়ের ওপর এসে পড়েছে প্রদীপের। আর তার বাঁচবার কোন আশা নেই। প্রদীপের ঘুমটা ভেঙে গেল। বিছানার ওপর উঠে বসল সে, তার স্নায়ুমণ্ডলীর ওপর দিয়ে একটা যেন প্রচণ্ড টাইফুন বয়ে গিয়েছে, চিন্তাশক্তি আর দেহ প্রদীপের বিকল হয়ে গিয়েছে অকস্মাৎ। ঘড়িটা দেখল—ভোর হতে আর দেরী নেই। বাথরুমে গিয়ে দাড়ি কামিয়ে স্নান করে ফেলল। শীতল জলের স্পর্শে তার মনের ভাবটা শান্ত হয়ে এল ধীরে ধীরে।

স্বপ্নের কথা মনে পড়ল প্রদীপের। প্রত্যেক স্বপ্নেরই নাকি একটা মানে আছে বলে সে শুনেছে; মনস্তত্ত্ববিদ এক ডাক্তারের সঙ্গেও জানা আছে তার। একবার ভাবল সেখানে যাওয়ার কথা কিন্তু হঠাৎ তার মনে পড়ে গেল তার এখন অনেক কাজ, সময় করে ওঠা শক্ত হবে।

গায়ে তোয়ালেটা জড়িয়ে অশোক রায় বাথরুম থেকে বেরিয়ে এল। ব্যায়ামের পর বিশ্রাম তারপর স্নান সেরে ব্রেকফাস্ট। এসব নিয়মগুলো অশোক রায় নিয়মিত মেনে চলে। পোশাক পরে ব্রেকফাস্ট শেষ হবার সঙ্গে সঙ্গে বেয়ারা এসে জানাল পুলিশ থেকে দুজন লোক তাকে খোঁজ করছে। তাদের ভেতরে নিয়ে আসতে বলল সে। মিঃ ঘোষকে চিনল অশোক, একটা কেসের ব্যাপারে তাঁর সঙ্গে আলাপ হয়েছে কয়েক মাস আগে। সঙ্গের লোকটির সঙ্গে আলাপ করিয়ে দিলেন মিঃ ঘোষ—সুরেশ চৌধুরী ডি-ডির লোক। চেয়ারে বসে মিঃ ঘোষ বললেন, আমরা মিলি দেবীর সম্বন্ধে কিছু প্রশ্ন করব আপনাকে।
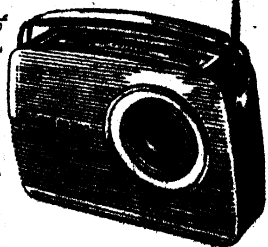
স্বচ্ছন্দে করুন—অশোক রায় পাইপে আগুন ধরিয়ে নিল।

ওঁর সঙ্গে আপনার কতদিনের আলাপ?

প্রায় বছর ছয়েক হবে, একটু ভেবে বলল অশোক, আমি বিলেতে থেকে ব্যারিস্টারী পাশ করে ফিরে এসে দেখি আমার পিতৃদেব খরচ-খরচা বাদ দিয়ে যেটুকু রেখে গেছেন তার একজিকিউটার করে গেছেন তাঁর বন্ধু মিঃ গুপ্তকে। মিঃ গুপ্ত আমাকে জুনিয়ার করে নিলেন। সেই সময় থেকেই মিলির সঙ্গে আলাপ।

আপনাদের সঙ্গে সম্পর্ক কি রকম ছিল?

ঘোরালো কিছু নয়।

আপনার সঙ্গে ওঁর বিয়ের কথা হয়েছিল বলে শুনেছি।

ঠিকই শুনেছেন, মিঃ গুপ্ত আমাকে ঘরজামাই করার মতলবে ছিলেন।

আপনার নিজের কোন আপত্তি ছিল?

বিন্দুমাত্র নয়, তবে পাত্র হিসেবে আমারও চাহিদা আছে, মিলি ছাড়া আরও কয়েক জায়গায় আমার বিয়ের কথা হয়েছিল, তাতে কি?

কিছু নয়, তবে প্রদীপ বসুকে মিলি দেবী বিয়ে করায় আপনার মনোভাব কি রকম হয়েছিল?

রাগ বা হিংসে হয়েছিল কিনা জানতে চাইছেন? হ্যাঁ তা হয়েছিল বৈকি—সেটা ত স্বাভাবিক তবে মজনু বা রোমিওর মত হতাশ প্রেমিক হই নি।

এ নিয়ে কি মিলি দেবীর সঙ্গে কোন বোঝাপড়া করার চেষ্টা করেছিলেন?

কোন জটিল কেস হলে বোঝাপড়া করা যেত, ব্যর্থ প্রেমিকের সে সুযোগ কোথায়? দুহাতে ওথেলোর মত ভঙ্গী করল অশোক রায়।

না, আমি বলছি এ নিয়ে কোন আলাপ আপনাদের মধ্যে হয়েছিল কি?

আলাপ ঠিক নয়, তবে চুক্তি বলতে পারেন, আর সেটা আমিই করেছি। বলতে বাধল না অশোক রায়ের।

আচ্ছা মিঃ রায় আপনি ব্যারিস্টার হয়ে ব্যায়াম চর্চা করেন কেন?

কেন, ব্যায়াম কি ব্যারিস্টারের পক্ষে নিষিদ্ধ? এরকম নতুন কোন আইন করেছেন নাকি আপনারা?

না তা নয়, তবে কেমন বিশদৃশ ঠেকে।

ব্যায়াম না করলে স্থূল দেহ আরও বিশদৃশ ঠেকে। মিঃ ঘোষের স্থূল দেহের দিকে অশোক রায় তাকিয়ে রইল নির্লজ্জভাবে, তারপর বলল, সমারসেট মম, এ জে ক্রোনিন, বনফুল ডাক্তার হয়েও সাহিত্য করেন, সেটাও বিশদৃশ ঠেকে আপনাদের? তাছাড়া ওটা ব্যক্তিগত ব্যাপার, এ নিয়ে প্রশ্ন করা অবান্তর বলে মনে হয় আমার।

আই অ্যাম সরি, আমি ভুলে গেছলাম আপনি ব্যারিস্টার, যাই হোক মিলি দেবীর মৃত্যু সম্বন্ধে আপনার মত কি?

আমার মতে মিলি আর একটু ভদ্রভাবে মরতে পারত, গলায় দড়ি না দিয়ে স্লিপিং ট্যাবলেট খেলে ক্ষতি কি ছিল? সবদিক দিয়ে দেখতে শুনতেও ভাল হত।

মৃত্যুর কারণ কি বলে মনে হয় আপনার?

আমি একটা কেস জানি সেখানে স্বামী তার স্ত্রীকে না নিয়ে একলা সিনেমায় যাওয়ার জন্যে মহিলাটি আত্মহত্যা করেছিলেন।

আপনি মিসেস বসুর সঙ্গে অনেক দিন মিশেছেন ঘনিষ্ঠভাবে, আপনার কি মনে হয় আত্মহত্যা করার মত তাঁর মনোভাব ছিল?

তা বলতে পারব না, তবে আত্মহত্যা ওর আগেই করা উচিত ছিল।

কথাটা শুনে স্তম্ভিত হয়ে গেলেন মিঃ ঘোষ, নির্বাক হয়ে তাকিয়ে রইলেন কয়েক মুহূর্ত, তারপর বললেন, একথাটার মানে ঠিক বুঝলাম না মিঃ রায়।

ইট ইজ এ গুড রিডেন্স, মানে আপদ গেছে, উত্তর দিল অশোক রায়, আপনারা আমায় নিষ্ঠুর হৃদয়হীন ভাবছেন কিন্তু একটা হিস্টিরিক্যাল মেয়ে শুধু নিজের জীবনই নষ্ট করে না, আশপাশের লোকদেরও বিপদে ফেলে আনন্দ পায়।

সুব্রত চৌধুরী বলল, মিঃ রায় আপনি একটা খবর এখনও জানেন নি—মিলি দেবী আত্মহত্যা করেন নি, তাঁকে গলা টিপে মারা হয়েছিল।

নিস্তব্ধ ঘরের মধ্যে ঘড়ির পেন্ডুলামের আওয়াজটা স্পষ্ট হয়ে উঠল, অশোক রায় সোজা তাকিয়ে রইল একদৃষ্টে সামনের শূন্য দেয়ালটার দিকে।

আশ্চর্য! কিন্তু যে অবস্থায় ওকে পাওয়া গেছল তাতে সুইসাইড বলেই ত মনে হয়। অশোকের গলার স্বরটা গম্ভীর।

দেখে আমাদেরও তাই মনে হয়েছিল কিন্তু গলার দাগগুলো অ্যান্টিমর্টেম, মৃত্যুর আগের, সুতরাং হত্যার পর দেহটা ওইভাবে সাজিয়ে রাখা হয়েছিল আমাদের চোখে ধুলো দেবার জন্যে।

কিন্তু মিলিকে মারলে কে? আর কারণটাই বা কি?

সেটা আমরাও জানতে চাইছি।

তার মানে আপনারা কি আমাকে সন্দেহ করছেন?

সন্দেহ করাই আমাদের কাজ, উত্তর দিল সুব্রত চৌধুরী, আপনার সঙ্গে মিলি দেবীর মনোমালিন্য ছিল, তিনি আপনাকে প্রত্যাখ্যান করেছিলেন। আপনার মেজাজ সম্বন্ধেও অনেক গল্প আমরা শুনেছি, শুধু নিষ্ঠুর নন, বলপ্রয়োগের জন্যে কয়েকবার অভিযুক্তও হয়েছেন, একথা নিশ্চয় অস্বীকার করবেন না।

বাই নো মিনস, অস্বীকার করব কেন? পাইপটা মুখ থেকে নামিয়ে নিল অশোক রায় তারপর ওদের দিকে একবার তীব্র দৃষ্টিতে তাকিয়ে বলল, আমার স্বভাবের যে দিকটা আপনাদের মনোমত হয়েছে সেটা নিয়ে একটা মনগড়া গল্পও তৈরী করে নিয়েছেন আপনারা। ওয়েল দেন, গো অ্যাহেড—অ্যারেস্ট করেন যদি করুন, আই অ্যাম রেডি।

তার আগে আরও দু-একটা প্রশ্ন করব আমরা।

মাই গড, আরও প্রশ্ন? বেশ করুন—অ্যাসট্রেতে ছাইটা ফেলে পাইপে আবার নতুন তামাক ভরে নিল অশোক রায়।

মিলি দেবীর সঙ্গে আপনার বিয়ের ব্যবস্থা প্রায় ঠিকই ছিল।

হ্যাঁ, তা একরকম ছিল বৈকি।

প্রদীপবাবু যদি মাঝে এসে না পড়তেন তাহলে হয়ত বিয়েটা হয়ে যেতে পারত।

আবার নাও পারত, সঙ্গে সঙ্গে উত্তর দিল অশোক রায়, ওসব সম্ভাবনার কথা না ভাবাই ভাল।

মিঃ রায় মিলি দেবীকে আপনি কি কখনও শাসিয়েছিলেন?

ঠিক মনে নেই।

তাহলে মনে করিয়ে দিই—প্রদীপবাবুর সঙ্গে ঘনিষ্ঠতার পর আপনি মিলি দেবীকে এ বিষয়ে কথা উঠলে বলেছিলেন, যদি দরকার হয় তাহলে আপনি ওকে গলা টিপে মারতে পারেন স্বচ্ছন্দে, কি ঠিক না?

ও ধরনের কথা বলার আমার অভ্যাস আছে।

ধন্যবাদ, আর আমাদের জিজ্ঞাসা কিছু নেই, যদি ঠিকানা পরিবর্তন করেন তাহলে জানাতে ভুলবেন না মিঃ রায়।

পুলিশের লোকেরা বিদায় নিল।

ওরা চলে যাবার পর অশোক রায় অনেকক্ষণ চুপ করে বসে রইল মেঝের দিকে তাকিয়ে। মিলি আত্মহত্যা করেছে বলে সকলে জানে, এখন অন্য কথা পুলিশের মুখে শুনে সে একটু বিচলিত হয়ে পড়েছে। ঠিক এটা সে আশা করে নি, মাঝখান থেকে একটা হিস্টিরিক্যাল মেয়েকে আজে-বাজে বাজে কথাগুলো বোকার মত কথা বলে মিথ্যে পুলিশের জালে জড়িয়ে পড়ল।

মনে মনে পুলিশকে বাহাদুরী দিল অশোক রায়। কতদিন আগের কথা, কিন্তু গুপ্তসাহেবের বেহারা আর চাকরদের কাছ থেকে মিলির সঙ্গে তার এই ঝগড়ার হুবহু কথাগুলো পর্যন্ত তারা যোগাড় করেছে।

চেয়ার ছেড়ে উঠে পড়ল সে। টেবিলের একটা ড্রয়ার থেকে এক তাড়া ফিতে-বাঁধা চিঠি বার করে, একটা-একটা করে পড়তে শুরু করল অশোক রায়। এগুলো প্রদীপের সঙ্গে আলাপের আগে মিলি তাকে লিখেছিল মুসৌরী থেকে।

পড়া শেষ করে অ্যাসট্রের ওপর চিঠিগুলো জড়ো করে রাখল অশোক, তারপর একটা জ্বলন্ত দেশলাই কাঠি ধরে রইল তার নীচে। ধীরে ধীরে চিঠিগুলো পুড়ে গেল। কালো ধোঁয়া উঠল প্রথমে তারপর জ্বলন্ত শিখা, শেষে কাগজের কুঞ্চিত কালো ছাইগুলো পড়ে রইল শুধু। একদৃষ্টে অশোক তাকিয়ে রইল সেই দিকে, ভ্রূ কুঞ্চিত করে।

(আগামী সংখ্যায় শেষ হবে)

গৌরাঙ্গ পরিজন

—অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্ত—

জগদীশ-পুণ্ডরীক-গুপ্ত

(৩২)

জগদীশ পণ্ডিত

জগদীশের বাপের নাম কমলাক্ষ, মায়ের নাম ভাগ্যবতী।

বাবা-মা মারা যাবার পর জগদীশ তার স্ত্রী দুঃখিনীকে নিয়ে জগন্নাথ মিশ্রের বাড়ির কাছাকাছি এসে বাসা বাঁধে। তার আরেক প্রতিবেশী হিরণ্য-ভাগবত। হিরণ্যের সঙ্গে তার বিশেষ ঘনিষ্ঠতা।

গৌরাঙ্গ-আবির্ভাবের আগে থেকেই নবদ্বীপে এদের অবস্থিতি। অদ্বৈতের সভায় গিয়ে এরা বসে, শোনে কৃষ্ণকথা। বিষয়ী সংসারীদের বহির্মুখিতা দেখে মনে মনে পীড়িত হয়। প্রতিকারের উপায় কোথায়, তার প্রতীক্ষা করে।

এদিকে গৌরাঙ্গ-গোপালের হাতেখড়ি হল; দেখা মাত্রই সমস্ত অক্ষর লিখতে শিখল। দু-তিন দিনেই লিখে ফেলল ফলা, সংযুক্তবর্ণ। আর নিরন্তর লিখতে লাগল কৃষ্ণনাম। রামকৃষ্ণ মুরারি মুকুন্দ বনমালী। কেশব মাধব গোপাল গোবিন্দ বাসুদেব।

যা হাতের মুঠোয় পাওয়া যাবে না তারই জন্যে কান্না ধরে। আকাশে পাখি উড়ে যাচ্ছে তাই তাকে ধরে দাও। আকাশে ছড়ানো-ছিটানো এত-এত তারা, তাকে দাও না একমুঠো। মাটিতে গড়িয়ে পড়ে হাত পা ছোঁড়ে নিমাই। এ কোলে নেয়, ও কোলে নেয়, তবু নিমাই শান্ত হয় না। দাও না পাখি ধরে, দাও না চাঁদ পেড়ে।

বাবা নিমাই, হরিনাম শুনবি?

শুনব। নিমাই তখুনি শান্ত হয়।

তখন সবাই হাতে তালি দিয়ে হরিনাম করে। নিমাই স্নিগ্ধ চোখে হাসে।

জগন্নাথের গৃহ যে কৃষ্ণনিকেতন হয়ে উঠল। ক্ষণে-ক্ষণে নিমাই আবদার ধরে কাঁদে, আবার তৎক্ষণেই হরিনাম শুনে স্থির হয়।

কিন্তু সেদিনের কান্না আর কিছুতেই থামছে না নিমাইয়ের। হরিনামেও ফল হচ্ছে না। বল কী চাই, তাই এনে দেব।

নিমাই কিছুই বলছে না, কেবল কাঁদছে।

তবে কি নিমাইয়ের কোনো অসুখ করেছে?

হ্যাঁ, কঠিন অসুখ। যদি আমাকে বাঁচাতে চাও তবে বিপ্রবীর জগদীশ আর হিরণ্য-ভাগবতের বাড়ি যাও।

সেখানে কী?

সেখানে কী! আজ একাদশী না? আজ একাদশীর দিনে জগদীশ আর হিরণ্য নানা উপাচারে বিষ্ণুর নৈবেদ্য করেছে। সে নৈবেদ্য যদি খেতে পাই তবেই সুস্থ হই। যাও সেই নৈবেদ্য আমাকে এনে দাও।

এ শিশু বলে কী! চুপ কর বাপু, তাই দেব। কিন্তু জগদীশ আর হিরণ্য কি সত্যিই বিষ্ণুর নৈবেদ্য করেছে? আজ কি সত্যিই একাদশী?

জগদীশ আর হিরণ্য, দুই প্রতিবেশী ব্রাহ্মণ, এ অদ্ভুত কাহিনী শুনে চরিতার্থ হয়ে গেল। আজ যে হরিবাসর তা এই শিশু জানল কী করে? আর আমাদের দুজনের বাড়িতেই যে বহুতর বিষ্ণু-নৈবেদ্য করেছি তাই বা ওকে বললে কে? সন্দেহ নেই, এই পরমসুন্দর শিশুর দেহেই গোপাল অধিষ্ঠিত আছেন, সেই গোপালই চাচ্ছেন নৈবেদ্য।

জগদীশ আর হিরণ্য দুজনেই প্রভূত নৈবেদ্য নিয়ে জগন্নাথের গৃহে এল। বললে, বাপ, খাও। তুমি খেলেই আমার কৃষ্ণের খাওয়া হবে।

অল্প-অল্প, তুলে-তুলে খেল নিমাই। সকলকে বিতরণ করল। কিছু আবার খেলাচ্ছলে কারু গায়ে ছুঁড়ে মারল। কিছু বা ছিটিয়ে দিল মাটিতে। কেউ নালিশ করতে পেল না যে নিমাই কিছু অনাচার করছে। সে ইচ্ছে মতো নেবে, ইচ্ছে মতো বিলোবে, ইচ্ছে মতো ফেলে দেবে।

জগদীশ ক্রমে-ক্রমে গৌরাঙ্গের নবদ্বীপ লীলার মুখ্য হল। তাকে দেখা গেল প্রভুর নৈশকীর্তনে, কাজী-দলনের সন্ধ্যায়। গৌরাঙ্গ সন্ন্যাসী হচ্ছেন শুনে ম্রিয়মাণ হয়ে গেল জগদীশ। প্রভু বললেন, দুঃখ কিসের? তুমিও নীলাচলে যাবে আমাকে দেখতে।

প্রভুর সন্ন্যাসের পর জগদীশ নবদ্বীপ ছেড়ে যশড়ায় চলে গেল ছোট ভাই মহেশ আর স্ত্রী দুঃখিনীকে নিয়ে। প্রভু যখন শান্তিপুরে ফিরে এলেন, গেলেন যশড়া। মাতা দুঃখিনীর হাত থেকে খাবার চেয়ে নিয়ে খেলেন।

সেই ছেলেবেলার মত। কতদিন দুঃখিনী সংসারের কাজে ব্যস্ত আছে, নিমাই এসে খাবার চেয়েছে। হাঁটু গেড়ে বসেছে হাত পেতে।

বাল-গৌর-বিগ্রহ নির্মাণ করে প্রতিষ্ঠা করল জগদীশ। কর্মরতা মাতা দুঃখিনীর সামনে যেমন বসত হাঁটু গেড়ে, বিগ্রহেরও সেই ভঙ্গি।

জগদীশ নীলাচলে গেল প্রভুকে দেখতে। প্রভু তাকে নিত্যানন্দের সঙ্গী করে গৌড়ে পাঠিয়ে দিলেন।

(৩৩)

পুণ্ডরীক বিদ্যানিধি

নবদ্বীপে প্রভু যখন তাঁর ঈশ্বরত্ব প্রকাশ করলেন, হঠাৎ কেঁদে উঠলেন, পুণ্ডরীক, আমার বাপ, আমার বন্ধু, কবে আমি তোমাকে দেখব?

সবাই ভাবল প্রভু বুঝি পুণ্ডরীক বলতে পুণ্ডরীকাক্ষকে বোঝাচ্ছেন। এ কান্না তাঁর কৃষ্ণের জন্যেই কান্না।

কিন্তু আবার বিদ্যানিধি বলে কাঁদছেন। ও আমার বিদ্যানিধি, তুমি কবে আসবে, কবে দেখা দেবে?

তখন সবাই ভাবল পুণ্ডরীক বিদ্যানিধি বোধহয় কোনো ভক্তের নাম। কিন্তু তাকে এ তল্লাটে তো কই দেখিনি। কোনোদিন নামও শুনিনি। লোকটির বাড়ি কোথায়? করে কী?

প্রভু বললেন, তোমরা তার কথা জানতে চাইছ এও তোমাদের ভাগ্য। তার বাড়ি চট্টগ্রাম। সে বিষয়ীর মত থাকে, কিন্তু সে যে কত বড় বৈষ্ণব কেউ বুঝতে পারে না।

নবদ্বীপেও তার বাড়ি আছে। মাঝে মাঝে সে এখানে এসে থাকে। অন্তরে কৃষ্ণ-প্রেমে ভরপুর হলেও বাইরে থেকে কাউকে চিনতে দেয় না। বিলাসীর ছদ্মবেশ পরে ঘুরে বেড়ায়।

মাধবেন্দ্র পুরীর মন্ত্রশিষ্য পুণ্ডরীক। গঙ্গার প্রতি তার অচলা ভক্তি। অভিনব মনোভাব। গঙ্গায় পা লাগবে বলে গঙ্গাস্নান করে না। গঙ্গার জলে লোকে কুলকুচো করে দাঁত মাজে চুল ফেলে বলে দিনের বেলায় সে গঙ্গা দেখে না পর্যন্ত। গঙ্গা দেখতে যায় রাত্রে, যখন এসব অনাচারের সম্ভাবনা নেই। তখনই গঙ্গাজল আহরণ করে। আর এমন বিচিত্র ক্রিয়াময়, দেবার্চনা করার আগে সে গঙ্গাজল পান করে নেয়।

পুণ্ডরীক, বাপ, তুমি কবে আসবে? প্রভু আকুল হয়ে ডাকলেন।

ঈশ্বর-আকর্ষণে পুণ্ডরীক নবদ্বীপে চলে এল। এসে থাকতে লাগল সেই গুপ্তভাবে—সেই বিষয়-বিলাসীর ভূমিকায়। শুধু মুকুন্দ দত্ত জানল। সেই গদাধর পণ্ডিতকে খবর দিল, যদি অদ্ভুত বৈষ্ণব দেখতে চাও, পুণ্ডরীক বিদ্যানিধিকে দেখে এস।

গদাধর-বিজয়ের পর পুণ্ডরীক রাত্রে একা-একা প্রভুর গৃহে চলে এল। প্রভুকে দেখেই প্রেমাবেশে মূর্ছিত হয়ে পড়ল। দণ্ডবৎ করবারও অবকাশ পেল না। অনেকক্ষণ পরে চেতনা ফিরে পেয়েই হুংকার করে উঠল: কৃষ্ণ, আমার প্রাণ, অপরাধীকে আর কত কষ্ট দেবে? সমস্ত জগৎকে যে উদ্ধার করল সে শুধু আমাকে, একমাত্র আমাকেই বঞ্চিত করল কেন?"

প্রভু তাকে কোলে টেনে নিলেন। বললেন, পুণ্ডরীক, বাপ, তোমাকে আজ দেখলাম। আমার দু নয়ন আজ তৃপ্ত হল।

তখন সকলে বুঝল এই পুণ্ডরীক বিদ্যানিধি, এই প্রভুর প্রিয়তম। সকলের মনে তখন জাগল প্রিয়বন্ধুত্ব।

কিন্তু পুণ্ডরীক যে আর বুক থেকে ঈশ্বরকে ছাড়ে না।

প্রভু বললেন, আজ আমার জীবনের শুভদিন। তাই তো প্রেমনিধির সন্ধান পেলাম। তোমরা একে চিনে রাখো। প্রেম-

ভক্তি বিতরণের [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]। [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]। [illegible]

[illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]। [illegible] [illegible] লাগলেন।

গদাধর বললেন, আমি এই মহাত্মার কাছ থেকে মন্ত্র নেব। আমি এঁর অবজ্ঞা করেছি। বাইরে দেখতে পাইনি তাই অন্তরে ঢুকে প্রথমে অবজ্ঞা করেছিলাম। আমি যদি এঁর শিষ্য হই তবেই আমার অপরাধের ক্ষমা হবে।

প্রভু বললেন, এক্ষুনি যাও, দেরি কোরো না।

সেই থেকে পুণ্ডরীক গৌরলীলার সহচর। আছে শ্রীবাস-অঙ্গনের কীর্তনে, জগাই-মাধাই উদ্ধারের প্রসাদ-লীলায়।

প্রভু যখন জগাই-মাধাইকে তাঁর গৃহে নিয়ে গিয়ে দরজা দিলেন তখন উপস্থিত বৈষ্ণবসমাজের মধ্যে পুণ্ডরীক একজন। দুই দস্যু দুই মহা ভাগবতে পরিণত হল তার সাক্ষীদের একজনও পুণ্ডরীক।

তারপর যখন গঙ্গাস্নানের মহোৎসব হল, আনন্দ-আবেশে প্রভু-ভক্তের মধ্যে দূরে গেল, চারদিকে শুধু প্রীতি আর সখ্যের রসধারা, সেই জনস্রোতে বিদ্যানিধিও একজন মহোৎসাহী।

তারপর শ্রীক্ষেত্রে নীলাচললীলায়ও যুক্ত হল পুণ্ডরীক। পুণ্ডরীককে দেখলেই প্রভু বাপ-বাপ বলে উদ্বেল হয়ে উঠতেন। প্রভু তো রাধাভাবাবিষ্ট আর রাধিকার বাপই তো পুণ্ডরীকরূপ বৃষভানু। লোকে বলে, তারই জন্যে প্রভু পুণ্ডরীককে বাপ বলে ডাকেন। তারই জন্যে পুণ্ডরীকের বাড়িতে রাধিকার জন্মোৎসব করান।

আজু কি আনন্দ বিদ্যানিধি ঘরে
রাধিকা-জনম-চরিত-গানে।
নাচে সে আবেশে শচীসুত গোরা
সে নবরঙ্গ কি উপমা আনে।।
বিবিধ মঙ্গল করে নারীকুল
পুলকিত চিত উলু-লু দিয়া
বৃষভানু পুরসম শোভা ভেল
ধনদ্যায় সুখে উথলে হিয়া।

সেখানে নীলাদ্রিতেই আছে বিদ্যানিধি, বন্ধু স্বরূপ দামোদরের ঘরে আশ্রয় নিয়ে কৃষ্ণকথায় দিন কাটাচ্ছে। ওড়নষষ্ঠীতে জগন্নাথকে দেখতে গিয়েছে। অগ্রহায়ণ মাসের শুক্লা ষষ্ঠীই ওড়নষষ্ঠী। সেদিন জগন্নাথকে নতুন শীতবস্ত্র দেওয়া হয়। কিন্তু এ কী, পাণ্ডারা যে জগন্নাথকে 'মাড়ুয়া বসন' দিচ্ছে। মাড়ুয়া বসন মানে মাড়যুক্ত বসন, কোরা কাপড়। দেখে বিদ্যানিধির মন অপ্রসন্ন হয়ে গেল। ছি-ছি, পাণ্ডারা কি আচার জানে না? জগন্নাথকে আধোয়া কোরা কাপড় দিল কেন?

রাতে ঘুমুচ্ছে পুণ্ডরীক, স্বপ্ন দেখল জগন্নাথ ও বলরাম তার কাছে এসেছে—দুজনেই ক্রুদ্ধ। কী, মাড়ুয়া বসনকে অপবিত্র মনে করো? আমার সেবকদের প্রতি তোমার ঘৃণা? [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]।

স্বপ্নে বিদ্যানিধি কেঁদে উঠল। শ্রীচরণে মাথা রেখে বললে, প্রভু, অপরাধকে ক্ষমা করো।

প্রভাতে স্বরূপ-দামোদর জাগাতে এল। ওঠো, চলো, জগন্নাথদর্শনে যাই।

কিন্তু বিদ্যানিধির মুখের চেহারা দেখে স্বরূপ-দামোদর স্তম্ভিত হয়ে গেল। এ কী, বিদ্যানিধির দুই গালই যে ফুলে আছে, দুই গালেই বিশাল চড়ের চিহ্ন।

এ কী, তোমাকে মারল কে?

বিদ্যানিধির চোখে জল মুখে হাসি। বললে, কাল রাত্রে কানাই-বলাই দুভাই এসে মেরে গেছে। আমার কী ভাগ্য, ওদের শ্রীহস্তের স্পর্শ পেয়েছি। তাই বলো এ কী শাস্তি, না, প্রসাদ?

বন্ধুকে সমস্ত স্বপ্নবৃত্তান্ত বললে বিদ্যানিধি।

বন্ধুর সৌভাগ্যে স্বরূপ-দামোদরের উল্লাস হল। 'সখার সম্পদে হয় সখার উল্লাস।' বললে, ভাই, এমন অদ্ভুত দণ্ডের কথা শুনিনি। স্বপনে এসে স্বহস্তে শাসন করে যায়? শুধু কী, এ যে স্বচক্ষেই দেখতে পাচ্ছি।

(৩৪)

তপন মিশ্র

আদি নিবাস পূর্ববঙ্গে, পদ্মাতীরের কোনো অখ্যাত গ্রামে। বিজ্ঞ কিন্তু বহু চেষ্টা করেও সাধ্য-সাধনতত্ত্বের নির্ণয় করতে পারছে না। যা পাবার জন্যে লোকে ভজনা করে তার নাম সাধ্য আর সাধ্যবস্তুকে পাবার জন্যে যে অনুষ্ঠান বা আচরণ তার নাম সাধন। কিন্তু কে সাধ্য? কী সাধন?

পূর্ববঙ্গে বেড়াতে এসে নিমাই তপন মিশ্রের গ্রামে এসে উঠেছে।

রাত্রিশেষে তপন স্বপ্ন দেখল, যেন এক দেবতা তার সামনে এসে দাঁড়িয়েছে, বলছে, তোমার গ্রামে নিমাই পণ্ডিত এসেছে, তার কাছে যাও, সে তোমাকে সাধ্যসাধনতত্ত্ব বুঝিয়ে দেবে। জানবে সে মানুষ নয়, নররূপে সাক্ষাৎ ভগবান। কিন্তু এই দেবের সংবাদটুকু কিন্তু আগেই কোথাও প্রকাশ করে দিও না।

খুঁজতে খুঁজতে নিমাই পণ্ডিতের সন্ধান পেল তপন। দেখামাত্রই পড়ল দণ্ডবৎ হয়ে।

তুমি কে?

আমি তপন মিশ্র।

কী চাই?

সাধ্যসাধন বুঝতে চাই। বহু শাস্ত্রের বহু বাক্যে দিশেহারা হয়ে পড়েছি। আপনার কাছে তাই এসেছি জানবার জন্যে।

আমি সাধ্যসাধনের কী জানি?

আপনি জানেন না তো কে জানে? আপনি [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]। তুমি যদি [illegible] [illegible] হবে বলবে না হয়ে আর কী [illegible] [illegible] জানবে কেন? কেন দেখা দেবে এই [illegible]কে?

তোমার কী ভাবনা, তোমার কৃষ্ণভজনে মতি হয়েছে।

কৃষ্ণভজন? তপন বললে উচ্ছল।

হ্যাঁ, কৃষ্ণই সাধ্য, ভজনই সাধনা।

এ ভজন হবে কী করে?

শুধু হরিনামে। কলির যুগধর্মই হরি-নাম-সংকীর্তন। ষোল নাম বত্রিশ অক্ষর। হরে কৃষ্ণ হরে কৃষ্ণ কৃষ্ণ কৃষ্ণ হরে হরে। হরে রাম হরে রাম রাম রাম হরে হরে।। 'সাধ্যসাধনতত্ত্ব যে কিছু সকল। হরিনাম-সংকীর্তনে মিলিবে সকল।।'

কিন্তু নাম যে করব, মনের মধ্যে যে অনেক মল অনেক কুটিলতা।

তার প্রতিকারও নামেই। নাম করতে করতেই মন স্থির হবে স্বচ্ছ হবে স্বাদু হবে। পিত্ত বেশি হলে মিছরিও তেতো লাগে, ঐ তিক্ততার ওষুধও সেই মিছরিই। তেমনি নামে চিত্ত শুদ্ধ হবে, পরে জাগবে কৃষ্ণপ্রেমের মাধুর্য। তখন বুঝবে কেন সাধ্যের জন্যে কী সাধন। কৃষ্ণপ্রেমের জন্যেই কৃষ্ণকীর্তন। 'সাধিতে সাধিতে যবে প্রেমাঙ্কুর হবে। সাধ্যসাধনতত্ত্ব জানিবা সে তবে।।'

তপন বললে আমাকে আপনার সঙ্গে নবদ্বীপে নিয়ে চলুন।

না, নবদ্বীপে নয় তুমি কাশী যাও।

কাশী? তোমাকে ছেড়ে কাশী?

হ্যাঁ, সেখানেই যথাসময়ে আমি তোমার সঙ্গে মিলব। কাশীতে মায়াবাদী সন্ন্যাসীদের উদ্ধার করতে হবে।

তপন মিশ্র সপরিবারে কাশী চলে গেল।

ঝারিখণ্ডের পথে বৃন্দাবন যাবার সময় কাশী এলেন প্রভু, মিললেন তপনের সঙ্গে। ফেরবার সময়ও তাই। প্রতিবারেই তপনের ঘরে ভিক্ষানির্বাহ করলেন। তপনের ছেলে রঘুনাথ ভট্ট গোস্বামী প্রভুর সেবায় আত্ম-নিয়োগ করল। এই রঘুনাথকেই প্রভু উপদেশ করলেন, পিতা-মাতার সেবা করবে, বৈষ্ণবের কাছে ভাগবত পড়বে আর বিয়ে করবে না।

বৈদান্তিক সন্ন্যাসীদের চৈতন্যনিন্দা সহ্য করতে না পেরে তপন আর চন্দ্রশেখর বৈদ্য প্রভুকে নিবন্ধ করতে লাগল, এর একটা বিহিত করুন।

সন্ন্যাসীদের উদ্ধারের জন্যে প্রভুর কৃপা উদ্বুদ্ধ হল। গর্ব না চূর্ণ হলে তো কৃপা বর্ষিত হয় না। তাই সন্ন্যাসীদের গর্ব আগে খর্ব করলেন প্রভু, তারপরে ঢাললেন তাঁর করুণা।

দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে দেখল তপন মিশ্র।

(ক্রমশঃ)

বিজ্ঞানের কথা

[illegible]

ছত্রাকের বিরুদ্ধে উদ্ভিদের আত্মরক্ষা

ফটো : দেবীপ্রসাদ সিংহ

আজ সারা বিশ্বে একটি প্রধানতম সমস্যা হচ্ছে খাদ্যাভাব। বস্তুত, বর্তমানে বিশ্বে যে পরিমাণ খাদ্য উৎপন্ন হয় তা যদি বিশ্বের প্রতিটি মানুষকে সমভাবে বণ্টন করে দেওয়া হয়, তা হলে কেউই পর্যাপ্ত পরিমাণ খাদ্য পাবে না। এদিকে প্রতি বছর খাদ্যাভাব বেড়েই চলেছে। কারণ একদিকে যেমন জনসংখ্যা দ্রুত বাড়ছে, অপরদিকে তেমনি বিজ্ঞান ও ভেষজের প্রগতির ফলে প্রত্যেক মানুষের জীবনকাল দীর্ঘতর হচ্ছে।

এই খাদ্যসমস্যা সমাধানের জন্যে অধিকতর খাদ্যোৎপাদন একান্ত প্রয়োজন। বিজ্ঞানের বলে আমরা যে জ্ঞান সঞ্চয় করেছি তার দ্বারা এবিষয়ে প্রভূত সাহায্য হতে পারে। সারের যথোপযুক্ত ব্যবহার, উন্নত ধরনের ফসল উৎপাদন এবং উদ্ভিদের ক্ষতিকারক কীট-পতঙ্গ, রোগ ও আগাছার নিয়ন্ত্রণ—সবই এ ব্যাপারে গুরুত্বপূর্ণ। বৈজ্ঞানিক কৃষিকার্যের সর্বস্তরে এমন ব্যাপকভাবে গবেষণা চালানো উচিত যাতে অধিকতর উন্নয়নশীল দেশগুলিতেও খাদ্যোৎপাদন বাড়ানো যেতে পারে। এ বিষয়ে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ হচ্ছে উদ্ভিদের রোগ নিয়ন্ত্রণ।

উদ্ভিদের অনেকগুলি রোগ ছত্রাক ও ব্যাকটিরিয়া বা জীবাণুর দ্বারা হতে থাকে। তবে ছত্রাকের দ্বারা খাদ্যশস্যের সবচেয়ে বেশি ক্ষতি হয়। ফল, কাঁচা শাক-সব্জি, খাদ্যশস্য ও উদ্ভিদদেহের নানা রোগ সৃষ্টি করে ছত্রাক এবং নানা নামে এই সব রোগ অভিহিত। তবে একই ছত্রাক সবরকম উদ্ভিদের ক্ষতি সাধন করতে পারে না। 'গ্রে মাউল্ড' জাতীয় ছত্রাক বহু প্রজাতির উদ্ভিদ আক্রমণ করতে পারে, কিন্তু 'ব্ল্যাক স্টেম রাস্ট' জাতীয় ছত্রাক শুধু গমেরই ক্ষতি করে।

বিবিধ রাসায়নিক পদার্থের সাহায্যে উদ্ভিদের ছত্রাকজনিত ক্ষতি অনেকখানি কমানো যায় বা একেবারে দূর করা যায়। কারণ উদ্ভিদের দেহে এই সব রাসায়নিক পদার্থ ব্যবহার করলে ছত্রাকের বংশবৃদ্ধি রুদ্ধ হয় এবং তার ফলে আর আক্রমণ চালাতে পারে না। 'বোর্ডোক্স মিকশ্চার' ইত্যাদি কয়েকটি ছত্রাকনাশক রাসায়নিক দ্রব্য বহু বছর যাবৎ খাদ্যশস্য সংরক্ষণে প্রভূত সাহায্য করেছে। কৃষিকার্যে উপকারক হতে হলে ছত্রাকনাশক দ্রব্য এমন হওয়া উচিত যাতে সেটি কেবল ছত্রাকের পক্ষে বিষ হবে না সেই সঙ্গে উদ্ভিদের কোনো ক্ষতি করবে না বা শস্যের পক্ষে বিষস্বরূপ কোনো অবশিষ্টাংশ রেখে যাবে না। এছাড়া, ছত্রাকের নতুন সংক্রমণ প্রতিরোধের জন্যে বেশির ভাগ ছত্রাকনাশক দ্রব্যই বার বার ব্যবহার করতে হয়। এই সমস্ত অসুবিধার দরুণ এখন বিজ্ঞানমহলে প্রশ্ন উঠেছে—গবেষণার সাহায্যে অন্য কোনো উপায় কি উদ্ভাবন করা যায় যার দ্বারা রোগাক্রমণের হাত থেকে উদ্ভিদকে রক্ষা করা যাবে?

উদ্ভিদের রোগ বহু যুগ আগে থেকে চলে আসছে। বাইবেলে 'ব্লাস্টিং রাস্ট' নামে যে উদ্ভিদ-রোগের উল্লেখ পাওয়া যায় সে রোগ রোমান যুগেও অব্যাহত ছিল এবং আজও তার প্রাদুর্ভাব দেখা যায়।

গত শতাব্দীর চতুর্থ দশকে আয়ারল্যান্ডে আলুগাছের পাতা ও স্ফীতকন্দ 'ফাইটোপ থেরা ইনফেস্টানস' ছত্রাকের দ্বারা আক্রান্ত হওয়ার ফলে আলুর যে মড়ক হয় তাতে ব্যাপক অনাহার ও দুর্ভিক্ষ দেখা দেয়। সিংহলে একটি উন্নতিশীল কফি-শিল্প ছত্রাক আক্রমণের ফলে ধ্বংস হয়ে যায়। উদ্ভিদের 'পানামা' রোগ সৃষ্টিকারী ছত্রাক পৃথিবীর কতক অংশে কলার চাষ নির্মূল করে দিয়েছে। এখানেই সব শেষ নয়। কারণ উদ্ভিদ রোগের আক্রমণ সব সময়েই চলে। তাতে শস্যাদি সম্পূর্ণ নষ্ট না হলেও ফলন ও ফলনের উৎকর্ষ বিশেষভাবে ব্যাহত হয়।

এখন কথা হল—ছত্রাক যদি উদ্ভিদের এত ক্ষতি সাধন করে, তা হলে রাসায়নিক প্রতিরোধ ব্যবস্থা অবলম্বন না করে আমরা খাদ্যশস্যের উৎপাদন হার বাড়াতে ও ফলনের উৎকর্ষ অব্যাহত রাখতে পারব কি?

সৌভাগ্যক্রমে, উদ্ভিদের নিজস্ব দেহেই ছত্রাক-প্রতিরোধের স্বাভাবিক ব্যবস্থা আছে। কৃষিক্ষেত্রে কোনো শস্যের গাছ সাধারণত একটি বা দুটি ছত্রাকের দ্বারা আক্রান্ত হতে থাকে। উদাহরণ স্বরূপ বলা যায়, আলুর গাছ 'পোটাটো ব্লিট' নামে ছত্রাকের দ্বারা সহজেই আক্রান্ত হয়, কিন্তু আপেলের ছত্রাক ও অন্যান্য বহু ছত্রাকের দ্বারা কোনোক্রমেই আক্রান্ত হয় না। প্রকৃতিতে উদ্ভিদের ছত্রাক-প্রতিরোধের ক্ষমতা কোনো ব্যতিক্রম নয়, বরং তা স্বাভাবিক নিয়ম।

উদ্ভিদের এই ছত্রাক-প্রতিরোধ ক্ষমতার মূলে আছে নানা কারণ। প্রথমত, কোনো উদ্ভিদ কোনো একটি নির্দিষ্ট ছত্রাকের পক্ষে অনাক্রম্য হতে পারে। কারণ সেই উদ্ভিদের পাতায় যে ছত্রাক-রেণু জন্মাবে তা পাতার কোনো মোমজাতীয় বাচ-স্তর বা অন্য কোনো বৈশিষ্ট্যের দরুন সম্ভবত অনুপ্রবেশ করতে পারে না। পক্ষান্তরে উদ্ভিদ-নিঃসৃত রাসায়নিক পদার্থের দরুন ছত্রাক-রেণু জন্ম রোধ হতে পারে। উদ্ভিদের এই ধরনের আত্মরক্ষার কিছু প্রমাণ পাওয়া গেছে। গাছের সতেজ অক্ষত পাতা ধুলে সেই ধৌত দ্রবণে ছত্রাকনাশক পদার্থের সন্ধান পাওয়া যায়।

কোনো কোনো ছত্রাক-রোগ ছত্রাকের নিঃসৃত পেপটিক এনজাইমের দরুন হয়ে থাকে। এই এনজাইমগুলি আশ্রিত উদ্ভিদের কোনো কোনো কোষগুচ্ছ ভেঙে দেয় এবং তার ফলেই ছত্রাক উদ্ভিদ-দেহে অনুপ্রবেশ করে। কোনো কোনো উদ্ভিদে

পেপটিক এনজাইম-এর জন্মরোধক রাসায়নিক পদার্থ থাকায় এই সকল রোগের দ্বারা সেই উদ্ভিদগুলি আক্রান্ত হয় না। কোনো কোনো ক্ষেত্রে দেখা গেছে, ছত্রাকের আক্রমণের ফলে আক্রান্ত কোষসমূহের সন্নিকটস্থ কোষগুলির বিনাশ ঘটে এবং এই মৃত কোষগুলি ছত্রাকের অনুপ্রবেশের পথে বাধার প্রাচীর খাড়া করে তোলে ফলে সংক্রমণ আর ঘটে না। এছাড়া আর একটা বিষয় আছে, যার ওপর উদ্ভিদ-দেহে ছত্রাকের অনুপ্রবেশ ও বৃদ্ধি নির্ভর করে। উদ্ভিদ-দেহ থেকে ছত্রাক যে খাদ্য সংগ্রহ করে সেটা যদি তার পুষ্টির পক্ষে সহায়ক না হয়, তা হলে উপযুক্ত খাদ্যের অভাবে ছত্রাক বাঁচতে পারবে না।

ছত্রাক-রোগ প্রতিরোধের আর একটি সম্ভাব্য ভিত্তি হচ্ছে, উদ্ভিদ-দেহে এমন একটি রাসায়নিক পদার্থের উপস্থিতি যা সত্যসত্যই ছত্রাকের পক্ষে বিষ। এর উদাহরণ হিসাবে উল্লেখ করা যায়, পেঁয়াজের খোসায় বিদ্যমান প্রোটোকাটাচুইক অ্যাসিড 'স্মাজ' রোগ প্রতিরোধক, গমে বিদ্যমান ফেনল-জাতীয় পদার্থ 'রাস্ট' ছত্রাক প্রতিরোধক। এছাড়া, রাই-এর চারা এবং ভুট্টা ও গমের গাছ থেকে ছত্রাকনাশক রাসায়নিক যৌগিক পদার্থ পৃথক করা গেছে। যদিও এই সমস্ত রাসায়নিক পদার্থ বিভিন্ন ছত্রাক-রোগ থেকে উদ্ভিদকে রক্ষা করতে পারে, কিন্তু এদের কোনোটিরই বিষক্রিয়া ছত্রাকের পক্ষে বিশেষ মারাত্মক বলে পরীক্ষায় প্রমাণিত হয়নি। গবেষণায় দেখা গেছে, লম্বা বীন-এর চারায় এমন একটি রাসায়নিক পদার্থ আছে যার ছত্রাকনাশক বিষক্রিয়া তীব্র। এই পদার্থটির অস্তিত্ব প্রথম প্রকাশ পায়, যখন চারাগাছের মূল বা কাণ্ডের কিছু অংশ অ্যাগারপূর্ণ প্লেটে লম্বভাবে রাখা হয়। এই অ্যাগারে আগে থেকে 'অ্যাস-পারজিলাস নিগার' ছত্রাকের রেণু জন্মানো হয়েছিল। সারা প্লেট জুড়ে ছত্রাকের কালো রেণু দেখা যায়, শুধু বীন-চারায় অংশটির তলদেশের চারপাশ ছাড়া। এই অংশে একটি বৃত্তাকার ক্ষেত্র দেখা যায় যেখানে ছত্রাকের উৎপাদন ব্যাপকভাবে কমে গেছে। এর কারণ হল অংশটি তলদেশ থেকে ছত্রাকনাশক রাসায়নিক পদার্থ অ্যাগরে ব্যাপিত হয়েছে।

মাত্র দশমিক ২ গ্রাম ওজনের বীনের অংশ দিয়ে ছত্রাক-উৎপাদনের বৃহত্তর ক্ষেত্র রোধ করা যায়। এ থেকে স্পষ্টই বোঝা যায়, বীন-কোষ থেকে ব্যাপিত অ্যান্টি-বায়োটিক পদার্থ ছত্রাকের পক্ষে মারাত্মক বিষ।

কয়েক হাজার বীনের চারা নিষ্কাশন করে আধুনিক পদ্ধতিতে এই ছত্রাকনাশক রাসায়নিকটিকে পৃথক করা হয়েছে এবং তার সক্রিয় উপাদান বিশুদ্ধ অবস্থায় পাওয়া গেছে ও তার স্বরূপ জানা গেছে। বৃটেনের ওয়াই কলেজে এই গবেষণা পরিচালিত হয় এবং সেই অনুসারে এই রাসায়নিক পদার্থটির নামকরণ হয়েছে 'ওয়াইয়েরোন'। অকস্‌ফোর্ডের অধ্যাপক এওয়ার্ট জোনস ও তাঁর সহকর্মীরা এই প্রাকৃতিক উপাদানটি গবেষণাগারে সংশ্লেষণ করেছেন এবং তার রাসায়নিক গঠনশৈলী নির্ধারণ করেছেন। প্রাকৃতিক ও সংশ্লেষিত রাসায়নিক পদার্থ দুটির গুণাবলী সম্পূর্ণ একরকম। উদ্ভিদ-দেহে এই জাতীয় ছত্রাকনাশক রাসায়নিক পদার্থের সন্ধানে জৈব রসায়ন-বিজ্ঞানীরা বর্তমানে ব্যাপক গবেষণায় ব্যাপৃত রয়েছেন।

ভারতে কৃত্রিম উপগ্রহের মাধ্যমে যোগাযোগ ব্যবস্থা

সম্প্রতি ভারতে কৃত্রিম উপগ্রহের মাধ্যমে যোগাযোগ ব্যবস্থার প্রবর্তন হয়েছে। এজন্যে পুণার কাছে আরভিতে একটি যোগাযোগ-কেন্দ্র স্থাপিত হয়েছে। ভারত-ভূপৃষ্ঠের এই কেন্দ্র তৈরীর জন্যে প্রায় চার কোটি টাকা খরচ হবে এবং তার মধ্যে যন্ত্রাংশের জন্যে খরচ পড়বে প্রায় তিন কোটি টাকা। আন্তর্জাতিক কনসর্টিয়াম-এর সহযোগিতায় এটি নির্মিত হচ্ছে।

কৃত্রিম উপগ্রহ পদ্ধতি পৃথিবীর অন্যান্য দেশের সঙ্গে যোগাযোগ ব্যবস্থার উন্নতি ঘটাবে। বর্তমানে ভারতে বত্রিশটি বেতার টেলিফোন ব্যবস্থা, উনত্রিশটি বেতার টেলিগ্রাফ ব্যবস্থা, সাতটি সরাসরি আন্তর্জাতিক টেলেক্স ব্যবস্থা এবং সাতটি বেতারচিত্র ব্যবস্থা রয়েছে। আর সাতাশটি টেলিগ্রাফ চ্যানেল ভারত ইজারা নিয়েছে। এছাড়া জলের নীচে ভারতের দুটি টেলিগ্রাফ তারের যোগাযোগও রয়েছে। উচ্চ রেডিও ফ্রি কোয়েন্সির উপর নির্ভরশীল এই ব্যবস্থাগুলির আবহাওয়াগত গণ্ডগোলের জন্যে কয়েকটি সহজাত অসুবিধা রয়েছে। এছাড়া এগুলির ক্ষমতাও সীমিত।

কৃত্রিম উপগ্রহের মাধ্যমে যোগাযোগ ব্যবস্থার ফলে সংবাদপ্রেরণের হার অনেকটা বেড়ে যাবে, সেই সঙ্গে যোগাযোগ ব্যবস্থার মানও উন্নত হবে। কৃত্রিম উপগ্রহগুলি শুধু ধ্বনি-তরঙ্গই বহন করবে না, পৃথিবীর এক প্রান্ত থেকে অন্য প্রান্তে টেলিভিশন অনুষ্ঠানগুলিও পুনঃপ্রচার করবে। আরভির ভূপৃষ্ঠ-কেন্দ্রটির টেলিভিশন অনুষ্ঠান পুনঃপ্রচারের ক্ষমতা থাকবে। ভবিষ্যতে সাগরপারে পৃথিবীর অন্য অংশে অনুষ্ঠিত অলিম্পিক ক্রীড়ানুষ্ঠানের মতো গুরুত্বপূর্ণ ঘটনাবলী ভারতে বসে টেলিভিশনের পর্দায় দেখতে পাওয়া সম্ভব হবে। অনাগত সেই শুভদিনের জন্যে আমরা পরম আগ্রহান্বিত হয়ে রইলুম।

পারমাণবিক চিকিৎসা সম্পর্কে আন্তর্জাতিক আলোচনা-চক্র

পারমাণবিক চিকিৎসা সম্পর্কে সম্ভবত প্রথম আন্তর্জাতিক আলোচনাচক্র অনুষ্ঠিত হবে আগামী ২৫ থেকে ২৭ সেপ্টেম্বর লণ্ডনের ইম্পিরিয়াল কলেজ অব সায়েন্স অ্যাণ্ড টেকনোলজি ভবনে।

ইনস্টিটিউট অব ক্যান্সার রিসার্চ আয়োজিত এই সম্মেলনে তেরটি দেশের চিকিৎসকরা যোগ দিচ্ছেন। সম্মেলনে ৭০টি কথিকা পড়া হবে—বিষয়বস্তু চিকিৎসাক্ষেত্রে রেডিও-এ্যাকটিভ আইসোটোপ-এর নতুন নতুন ব্যবস্থার পদ্ধতি নিয়ে আলোচনা।

নতুন পদ্ধতি

ডঃ ডি আর ম্যাকরেডি, যিনি এই আলোচনাচক্র পরিচালনা করবেন, তিনি লণ্ডনে বলেন, সম্মেলনের উদ্দেশ্য হল বিশেষজ্ঞ ও আগ্রহীদের এক জায়গায় মিলিত করা যাতে তাঁরা একসঙ্গে আলোচনা করে স্ক্যানার, গামা-ক্যামেরা প্রভৃতির সাহায্যে টিউমার সীমাবদ্ধ করে রাখার নতুন পদ্ধতি স্থির করতে পারেন।

তিনি আরও বলেন, 'মাথার ও হাতের টিউমার সীমাবদ্ধ রাখা ও তাদের অস্তিত্ব নির্ধারণের নতুন যন্ত্রপাতি নিয়ে আলোচনা করা হবে।'

সম্মেলনে যোগদানকারী প্রতিনিধিরা যাতে লণ্ডনের কয়েকটি হাসপাতাল ও রেডিও-কেমিক্যাল ক্লিনিক পরিদর্শন করতে পারেন তার ব্যবস্থা করা হয়েছে।

সম্মেলনের সঙ্গে সঙ্গে পারমাণবিক চিকিৎসাক্ষেত্রে ব্যবহৃত নতুন নতুন সরঞ্জামের একটি প্রদর্শনীও অনুষ্ঠিত হবে।

পুরোণো পাতা

হরিদাসের গুপ্তকথা

ভুবনমোহন মুখোপাধ্যায়

ভারতবর্ষের উত্তরে গিরিরাজ হিমালয়; পুরাণে পাওয়া যায়, হিমালয়ের উপর দিয়ে স্বর্গে যাবার পথ। আমি মাণিকগঞ্জের উত্তরে এসেছি, এখানে স্বর্গের পথ নাই: এখানে যদি আমি অমরকুমারীর সন্ধান পাই, কি দর্শন পাই, তা হোলে এই স্থানকেই আমি স্বর্গধাম বিবেচনা কোরবো। যেখানে অমরকুমারী আছেন, সেই স্থানটি আমার পক্ষে স্বর্গ।

মাণিকগঞ্জের উত্তরসীমা অতিক্রম কোরে আমি অনেকদূর এসেছি, সীমা অতিক্রম হোয়ে গেছে, তথাচ আমি মাণিকগঞ্জে।...... গ্রামের মধ্যে আমি প্রবেশ কোল্লেম। গ্রাম নিতান্ত ক্ষুদ্র নয়। অনেকগুলি বড় বড় বাড়ী জনশূন্য হয়ে খাঁ খাঁ কোচ্ছে। ইমারতের উপর বৃক্ষলতার সঙ্গে বন্য জন্তু বাসা কোরেছে, স্থানটি নির্জ্জন।

বিষণ্ণ নয়নে ইতঃস্তত দৃষ্টিসঞ্চালন কোত্তে কোত্তে বিষণ্ণ বদনে বিষণ্ণ হৃদয়ে মন্থরগতিতে আমি অগ্রসর হোতে লাগলাম। পথে এতক্ষণ একটিও মনুষ্য দৃশ্য হয় নাই, এই সময় আমার সম্মুখে দুইটি লোক।...... লোকদুটি পরস্পর বলাবলি কোচ্ছে, "তাই তো ভাই! তুমি ঠিক কথা বোলেছো।...... পঙ্কহ্রদে পদ্মফুল! তেমন সুন্দরী মেয়েটি এমন জায়গায় কেমন কোরে এলো, যারা এনেছে,......তাদের মতলব নিশ্চয় দুষ্ট মতলব!"

"সে কথা আর বোলতে?......জান না বুঝি তুমি?......মেয়েটিকে তারা বেচে ফেলবে। দাম ধার্য হয়েছে দু'হাজার টাকা। ও পাড়ার সেই বংশী পোদ্দার দু'হাজার টাকা পণ দিয়ে সেই মেয়েটিকে কিনে নেবে। কথাবার্ত্তা সব ঠিক, কেবল লেখাপড়া বাকী।"

......আমি তখন প্রকাণ্ড একটা বৃক্ষের অন্তরালে দাঁড়িয়ে ছিলেম, লোক দুটিকে দেখে আরও একটু সাবধান হয়ে লুকিয়ে ছিলেম।... তারা চোলে গেল, কথা বলাবলি কোত্তে কোত্তে অনেকদূর এগিয়ে গেল; শেষে তারা আর কি কি কথা বোল্লে সেগুলি শুনতে পেলেম না।

পঙ্কজলে পদ্মফুল। কোন্ পদ্মের কথা এরা বোলে গেল! বোধ হচ্ছে যেন, আমার হৃদয়-সরোবরের পদ্মফুল' আমি যেন জানতে পারছি, এখানেই আমার ইষ্টসিদ্ধির সম্ভাবনা আছে।......আরোও কিছু জানতে পারা যায় কিনা এই আশায় গ্রামের দিকে খানিকদূর অগ্রসর হোলেম।......রাস্তার বামদিকে পূর্ব-পশ্চিমে লম্বা একখানা বৃহৎ বাড়ী দেখতে পেলেম। সেই বাড়ীখানা বহুদিনের পুরাতন, অর্দ্ধেকের অধিকাংশ অব্যবহার্য, পূর্বদিকের অল্পাংশমাত্র নূতন মেরামত করা হয়েছে, কপাট-জানালা বদল করা হয় নাই, এক একটি জানালা গরাদে-শূন্য, কীট-জীর্ণ, ভগ্নকপাটে ঢাকা। বোধ হলো, সেই অংশে মানুষ আছে; ছাদের উপর থেকে লম্বিতভাবে খানকতক ধুতি-শাড়ী রবিতাপে বিস্তৃত ছিল, সেই নিদর্শনেই আমি বুঝলেম; সেই অংশে মানুষ আছে। একটু তফাতে দাঁড়িয়ে সেই বাড়ীখানার দিকে আমি চেয়ে চেয়ে দেখছি, এমন সময় দেখি, একজন অর্দ্ধবৃদ্ধ ব্রাহ্মণ একটি গাভীর বন্ধনরজ্জু ধারণ কোরে সেই পথ দিয়ে আসছেন। আমি সেই ব্রাহ্মণকে জিজ্ঞাসা কোল্লেম, "এ বাড়ীখানি কার?"

ব্রাহ্মণ নীরবে আমাকে দেখলেন কিছুক্ষণ। তারপর বোল্লেন, "বাবুদের বাড়ী। বাবুরা পূর্বে এখানকার বিখ্যাত জমিদার ছিলেন প্রজা-লোকেরা এই বাড়ীর কর্তাকে রাজা বোলে গৌরব কোত্তো, বাড়ীখানার নাম ছিল রাজবাড়ী। এখন অবস্থা খারাপ।... অতিকষ্টে দিন চলে। এখন আছেন কেবল তিনটি বাবু আর গুটিকতক বিধবা। বাবু তিনটির মধ্যে দুটি এখনো নাবালক, যিনি এখন কর্তা, তিনিই ঐ নাবালক ভাই দুটার অভিভাবক। কর্তার নাম রমণীবল্লভ ভৌমিক।"

ব্রাহ্মণের কথায় উৎসাহ এলো। গাভীর দড়িখানি তার হাত থেকে নিয়ে একটা গাছের ডালে বাঁধলেম ব্রাহ্মণকে জিজ্ঞাসা কোল্লেম "বংশী পোদ্দারের বাড়ী এখান থেকে কত দূর?"

আমার প্রথম প্রশ্নে ব্রাহ্মণ যেমন চকিত নেত্রে আমার বদন নীরিক্ষণ কোরেছিলেন, এবারও তাই কোল্লেন। তারপর জোরে একটা নিশ্বাস ফেলে বোল্লেন: "তুমি বুঝি হুগলী জেলার ছেলে?"......

তাঁর প্রশ্ন শুনে আমিও অবাক হোলেম। তিনি দুই তিনবার মস্তক সঞ্চালন কোরে বোল্লেন, হুঁ-হুঁ-হুঁ। বংশী পোদ্দারকে এখন অনেক ছেলেই খুঁজবে। বংশী পোদ্দারের এখন জোর কপাল।"

—"কেন মহাশয়?"

—......"ঐ বাগানের ভিতর একখানা আটচালা ঘর আছে, সেইখানে চল। পথের মাঝখানে সে সব কথা গল্প করা ভাল নয়।"

আটচালায় বারান্দায় এসে ব্রাহ্মণ বোল্লেন, "বংশী পোদ্দার এতদিন সোনারূপা বিক্রী কোত্তো, চোরদের কাছে চোরামাল কিনে কিনে রাখতো, সেই বংশী এবার একটি মা-লক্ষ্মী কিনে ফেলবে।"

—"মা-লক্ষ্মী কেনা কি রকম?"

—"কে জানে বাপু, কোথাকার কারা আমাদের এই গ্রামে একটি মা-লক্ষ্মী এনে রেখেছে......দরদস্তুর হোয়ে গিয়েছে; দু'হাজার টাকা পণ।"

—ব্যাপারীরা এখন আছে কোথায়?

—কে জানে বাপু, কোথা তারা চোলে গিয়েছে, এই মাসের শেষাশেষি এসে কাজটা নির্বাহ কোরে দিয়ে যাবে, এই রকম আমি শুনেছি।

—লক্ষ্মী এখন আছেন কোথায়?

—তা আমি তোমায় বোলবো না।

—লক্ষ্মীটির নাম কি?

—তাও আমি বোলতে পারব না। কেনাবেচার কথা ঠিক হবার সময় আমি একজন সাক্ষী ছিলেম। ব্যাপারীরা আমাকে দুটি টাকা প্রণামী দিয়ে গেছে; কথা প্রকাশ করা নিষেধ।

আমি, (প্রণাম করিয়া)—ঘটকঠাকুর আপনি? আপনাকে দণ্ডবৎ।......আমি আপনাকে পাঁচটাকা দিচ্ছি। দয়া কোরে সেই লক্ষ্মীর নামটি আমায় বলুন।

—না আমি কিছুতেই বোলবো না। শেষ ব্যাপারের দিন ব্যাপারীরা আমাকে আরও দশটাকা দিয়ে যাবে, অঙ্গীকার আছে।

—আচ্ছা, দশ টাকাই আমি দিচ্ছি, নামটি আপনি বলুন।

—বাপ্ রে! তাও কি হয়? ঘটক আমি হোতে পারি, বিশ্বাসঘাতক হোতে পারি না।

—আচ্ছা লক্ষ্মীর ঠিকানা বলুন, তাতেও আপনি দশ টাকা পাবেন।

ব্রাহ্মণ, (হস্তবিস্তার করিয়া) অগ্রে দক্ষিণা দাও তারপর—

টাকা নিয়ে, টাকাগুলি খুব শক্ত কোরে কোঁচার কাপড়ে বেঁধে রেখে প্রফুল্ল বদনে ব্রাহ্মণ বোল্লেন, "ঠিকানাটি তুমি তো জানতে পেরেছ, তবে, আর আমার মুখে নতুন শুনবার আকিঞ্চন কেন? কর্ণ অপেক্ষা চক্ষের গুণ বেশী।"

...বিস্ময় প্রকাশ কোরে তৎক্ষণাৎ তাঁরে আমি জিজ্ঞাসা কোল্লেম, সে কি মহাশয়! ঠিকানা আমি জানতে পেরেছি, এটা আপনি কিরকম কথা বল্লেন?

......ব্রাহ্মণ তখন যেন চঞ্চল হয়ে উত্তর কোল্লেন, "কেন? যে বাড়ীর সম্মুখে তুমি দাঁড়িয়ে ছিলে, যে বাড়ীর ছাদে সেই সকল কাপড় শুকুচ্ছে, সেই বাড়ী, সেই বাড়ীতেই এখন মা-লক্ষ্মীর অধিষ্ঠান। আমি যাই—চল্লেম।"

—আর একটি মাত্র কথা। যদি কোন বিশেষ আপত্তি না থাকে, অনুগ্রহ কোরে বলুন, আপনার নামটি কি?

—শ্রীধনঞ্জয় ঘটক ন্যায়ভূষণ।

ব্রাহ্মণ চোলে গেলেন।... বেলা অধিক হয়েছিল। বাসায় ফিরে চোল্লেম। বাড়ী ফিরে ভাবতে লাগলেম, অতঃপর কি করা উচিত।

পরবর্তী সংখ্যায়
পথিক
হরিশ্চন্দ্র মিত্র

পুলিশ মোতায়েনের জন্য মণিভূষণকে দিয়ে দরখাস্ত করাব? যদি আমার অনুমান মিথ্যা হয়, তাহলে দরখাস্তকারী মিথ্যাবাদী প্রতিপন্ন হবে, না সে কার্য ভাল নয়।......

নির্ণয় করবার উপায় কি? হয় স্বচক্ষে অমরকুমারীকে দর্শন করা, না হয় অন্য কোন উপায়ে অন্য কাহার দ্বারা সেই বিদেশিনী কন্যার নামটি অবগত হওয়া।

কি করা যায়। আদালতের সাহায্য নিয়ে অমরকুমারীর অনুসন্ধানে আমি এসেছি, ক্রমশই দিন গত হোচ্ছে, আসল কাজ হোচ্ছে না।... আর তিনদিন অতিবাহিত। যা কিছু জানতে পাচ্ছি, আপনার মনে মনেই রাখছি। হরিবাবুকেও জানাচ্ছি না, মণিভূষণকেও কিছু বলছি না। শেষে ঠিক কোল্লেম, আর একটু অগ্রসর হওয়া ভাল। কি ভাবে অগ্রসর হওয়া যায়, সেটিও মনে মনে অবধারণ কল্লেম।

মুর্শিদাবাদ থেকে যখন আমরা আসি, তখন তিন প্রস্থ ছদ্মবেশ, দুই জোড়া পিস্তল, আর গুলীবারুদ আমার সংগে ছিল, এইবার ছদ্মবেশ ধারণের প্রয়োজন উপস্থিত। চতুর্থ দিবসে অপরাহ্নে বাসা থেকে আমি বেরুলেম, একপ্রস্থ ছদ্মবেশ আমার সংগে থাকলো। ধনঞ্জয় ঘটকের সংগে যে বাগানের আটচালায় কথাবার্তা হয়েছিল, সেই বাগানের সারি সারি আম্রবৃক্ষের অন্তরালে অতি সাবধানে বসন পরিবর্তন কোল্লেম। স্ত্রীলোকের বেশ। বক্ষআবরণের যোগ্য কাঁচুলি-ধরনের ছোট একটি জামা, যেন অনেক দিনের ব্যবহার করা একটু একটু ময়লা, ঠাঁই ঠাঁই একটু একটু দাগ। পরিধানে একখানি আধময়লা শাড়ী, মাথায় পরচুল-কবরী, অলঙ্কারের মধ্যে কেবল দুহাতে দুগাছি পিতলের বালা।

বেশ পরিবর্তনের পর আমার পুরুষ বেশের সজ্জাগুলি এক খন্ড ক্ষুদ্র বস্ত্রে বন্ধন কোরে একটি পুঁটলী প্রস্তুত কোল্লেম। সন্ধ্যার পরেই আকাশে চন্দ্রোদয় হলো; সেই বাগান পেরতেই রাস্তা; ওপারে সেই গৃহের ফটক, রাস্তার পরেই একটা পুষ্করিণী। পুষ্করিণীর ঘাটে একটি যাত্র স্ত্রীলোক। গাত্রপ্রক্ষালন কোরে জলকুম্ভ কক্ষে সিক্ত বসনে সেই স্ত্রীলোকটা ঘাটের চাতালে এসে উঠলো। ঠিক চাতালের ধারেই আমি। আমাকে দেখে কেমন একরকম অবাক সুরে জিজ্ঞেস কোল্লে, কে তুমি?

মুখে আমার ঘোমটা ছিল না, বুকে আমার কাঁচুলি ছিল। মুখের কথা না শুনে, চেহারা দেখে হঠাৎ কাহারো মনে হোতে পারে খোট্টার মেয়ে। আমি বাংলা কথাতেই বোল্লেম, আমি, 'আমি বিদেশিনী, এই গ্রামে নূতন এসেছি, পথে শুনলেম, এইখানে রাজবাড়ী আছে, বিদেশী গরীব-দুঃখী দৈবাৎ এখানে এসে উপস্থিত হোলে সেই বাড়ীতে আশ্রয় পায়। তুমি যদি বলে দাও, কোথায় সেই রাজবাড়ী, কোন দিকে যেতে হবে, তবেই—'

স্ত্রীলোকটি অর্ধবয়সী, বোল্লে, 'আর বাছা রাজবাড়ী! রাজাদের কি আর সেকাল আছে? তা তুমি এসেচো, থাকতে পারো আমার সঙ্গে। সেই বাড়ীতেই আমি থাকি, কাজকর্ম করি, বড়বৌমা ভালবাসে, সেই খাতিরেই থাকি, অনেকদিন আছি, ছেড়ে যেতেও মন চায় না। এসো তুমি আমার সঙ্গে।'......

স্ত্রীলোকটি সেই রাজবাড়ীর দাসী। দাসীর নাম রেবতী। দাসীর কাছে সব শুনে সেই বাড়ীর বৌমা আমাকে নিশাকালে সেই বাড়ীতে আশ্রয় দিতে সম্মত হোলেন, মনে মনে আনন্দ অনুভব কোরে আমি আশ্বাসপ্রাপ্ত হোলেম।

......আহারাদি হলো। বৌমার সংগে খানিকক্ষণ গল্পও হলো। তারপর একটি শূন্য ঘরের মধ্যে আমি বিশ্রাম কোত্তে লাগলেম। রেবতীকে বল্লেছিলেম, আমার দু-একটা বলবার আছে, তাই কিছু সময় পরে রেবতী এসে বোল্লে, কি তুমি আমারে তখন বোলবে বল্লেছিলে? বল দেখি শুনি কথাটা কি?'

—বাবু কোথায়?

—ছোটবাবু দুটি তাঁদের ঘরেই আছেন, একটা কারবার করবার ইচ্ছে আছে, সেই চেষ্টাতেই ঘুরে ঘুরে বেড়াচ্ছেন, বোলে এ সংসারের দুরবস্থার কথা শুনালো রেবতী।

—কিন্তু লক্ষ্মীর সংসারে ততটা কষ্ট হয় না, যদিও কিছু কিছু হয়, লোকে সেটা পায় না। বিশেষ এই বৌমাটি দেখছি সাক্ষাৎ লক্ষ্মী ঐ লক্ষ্মীর দয়াগুণে দুঃখিনী বিদেশিনীরা আজিও এ সংসারেব আশ্রয় পায়।

রেবতী (বিস্ময়ে চাহিয়া)—কেন তুমি এমন কথা বোল্লে? তুমি বিদেশিনী, তুমি আজ রাত্রে এই বাড়ীতে আশ্রয় পেয়েছো, সেই জন্য কি?

—না, না, না, শুধু সেই জন্যই নয়, কত দুঃখিনী বিদেশীই তো আসে।

—এ সব তুমি কি কথা বোলচো? গ্রাম আছে পদ্মপুকুর, পদ্মফুল নাই এ-বাড়ীতে এখন বিদেশিনীর অক্লেশে আশ্রয় পাওয়া এটা তোমার কি রকম অনুমান?

—অনুমান বল কেন? ..ঠিক কথাই আমি বোলছি; পদ্মপুকুরে পদ্মফুল আছে, সম্প্রতি একটি বিদেশিনী কুমারীও—

রেবতী (বিস্ময়ে)—ওমা গো! সেই কথা বুঝি তুমি বোলছো? সে কথা তুমি কেমন করে জানলে?

—কোন কথা? পদ্মফুলের কথা।

রেবতী। বল যদি, পদ্মফুল বোলতে পারো, বটেও একটি পদ্মফুল, পদ্মফুলের মত একটি বিদেশিনী সম্প্রতি এই বাড়ীতে এসেছে।

—পদ্মফুলটি কি রকমে এলো?

—পশ্চিমদেশের তিনজন লোক একটি সুন্দরী মেয়েকে এই বাড়ীতে রেখে গিয়েছে।

—তারা কোথায়?

—বাবু হয়তো শুনে থাকবেন, আমি কেমন কোরে শুনবো?

—বিদেশিনী মেয়েটি কি অবস্থায় আছে?

—আহা-হা। বাছা কেবল রাতদিন কাঁদে, খায় না, ঘুমায় না, কথা কয় না কেবল কাঁদে, কেবল কাঁদে।

—আহা-হা। তোমাদের সেই বিদেশিনী মেয়েটাকে একবার দেখতে পাই না?

—কেন পাবে না? তুমি বিদেশিনী, সেও তো বিদেশিনী।

—দেখাও না একবার। সেই দুঃখিনীকে দেখবার জন্য আমার প্রাণ কেমন আকুল হয়ে উঠছে।

—দেখে তুমি কি কোরবে?

—কে কার কি করে তা তো তুমি জান। সমান সমান কষ্টভাগিনী একটি সঙ্গী হব......সেই বিদেশিনীকে একটু সান্ত্বনা দিব।

—তা তুমি পারবে। তোমার যে রকম মধুর বচন—আনব তারে এইখানে, না, তুমি সেই ঘরে যাবে?

—তারে তুমি এইখানেই এনে দাও।

রেবতী গেল। এদিকে আমার নারীবেশ, কন্ঠস্বরে ধরা পড়ার ভয় ছিল। বিধাতা আমার প্রতি সদয় হয়ে আমার কন্ঠে যেরূপ স্বর দিয়েছেন, বেশী বয়সে কি রকম হয় বলা যায় না, কিন্তু এই পঞ্চদশবর্ষ পর্যন্ত স্বদেশের অল্পবয়স্কা বালিকাদের স্বরের সংগে সেই স্বরে আমার এই কন্ঠস্বরে সুন্দর মিলন হয়।......

আমি ঠিকঠাক হয়ে চিবুক-দেশ পর্যন্ত ঘোমটা দিয়ে ঢেকে রাখলেম।......বোসে আছি, ঘরের একধারে একটি প্রদীপ জ্বলছে, এমন সময় বিদেশিনী এলেন, সংগে সংগে রেবতী।

রেবতী বোল্লে, 'ওমা! একি গো? মেয়েমানুষকে মেয়েমানুষের লজ্জা! কি রকম বিদেশিনী! ঘোমটা-ঢাকা কলা-বৌ'।

বিদেশিনী বোসলো। রেবতীও। কিছুক্ষণ পরে আমি চাপা কন্ঠস্বরে ধীরে ধীরে বোল্লেম, 'বিদেশিনী, আমি গণনা জানি। তুমি এখানে আছো, তাও জানি।...কেমন কোরে তুমি এখানে এসেছো, কারা তোমাকে এখানে এনেছে, গণনা কোরে তাও আমি জানতে পেরেছি।'

বিদেশিনী সুমধুর স্বরে বোল্লেন, আমার দুর্ভাগ্যের কথা তুমি জানতে

পড়েছো, মুখখানি একবার উঁচোলো, তারপর তোমার সঙ্গে আমার কথা হবে?

—আমি বোল্লেম, গণনায় দেখে বলা দুঃসাধ্য না হোলে স্ত্রীলোকের কাছে স্ত্রী-অলংকারীর মুখের কলঙ্ক ঘুচবে নাই। এখানে এসে তুমি দিনরাত্তির কাঁদো, আর যারা তোমায় এনেছে, আমার তারা আসবে, সইবার তোমার ভালোর সঙ্গে তাদের দুঃখ হবে।

—কি রকম দুঃখ হবে আর কেন আমি যদি তোমার গণনা কি তার উত্তর দিতে পারে?

—পারে, যারা তোমায় এনেছে, তারা তোমারে বেচে ফেলবার মন্ত্রণা কোরছে। দু হাজার টাকা পণ ধার্য হয়েছে। খরিদ্দার এখানকার বংশী পোদ্দার। সেই বিক্রয় উপলক্ষেই তোমার ভাগ্যদুঃখ। আর কোথায় তুমি ছিলে, কোথায় তুমি এসেছ, কারে তুমি হারিয়েছ, তার সঙ্গে আর দেখা হবে কিনা, এরপর তোমার কি হবে, এই সব ভেবে তুমি কাঁদো।

রেবতী হঠাৎ একটু উচ্চকণ্ঠে বললে, ও বাপু। এ মেয়ে তো কম মেয়ে নয়।...যা যা বলে দিলে সব ঠিক।

—তোমার গণনা আর কি বলে?

—আর কি বলে শুনবে? তুমি মুক্ত হবে। শীঘ্রই তুমি এখানকার যন্ত্রণা থেকে মুক্তি পাবে। রেবতী বোল্লে, আজ আমাদের বাবু এখানে থাকলে—

এমন সময় বৌমা এসে দেখা দিলেন। রেবতীর মুখের কথা মুখেই রয়ে গেল। বৌমা বোল্লেন, এই যে বেশ হয়েছে। দুটি বিদেশিনীরই এক ঠাঁই। কিগো বিদেশিনী, তোমাদের আলাপ পরিচয় কেমন হলো?

রেবতী বোল্লে, মা গো মা, এই নূতন বিদেশিনী চমৎকার গণনা জানে, আশ্চর্য গণৎকার। এই ব্রজকিশোরীর আগাগোড়া সকল কথা এক এক কোরে বোলে দিলে।

বৌমা খানিকক্ষণ সুস্থির দৃষ্টিতে আমাদের দিকে চেয়ে থাকলেন, চেয়ে চেয়ে আমারে জিজ্ঞাসা কোরলেন, সত্যই কি তুমি গণনা শিখেছ? বল দেখি, আমাদের সংসারের এ দুর্দশা আর কতদিন থাকবে?

—যে দিন ব্রজকিশোরীর ভাগ্যদুঃখের অবসান হবে। সেই দিন আমি এই বাড়ীতে আর একবার আসবো, রাজলক্ষ্মীর রূপাদৃষ্টি দর্শন করবো।

......বাবু যদি পূর্বপুরুষের ধর্মপথ পরিহার না করেন, যারা বিপদে পড়ে, তাদের যদি সহায় হন, অবস্থাচক্রে মানুষের যেমন কুমতি ঘটে বাবু যদি সেরূপ কুমতির দাসত্ব না করেন, তাহলেই আপনার এই ধর্মের সংসারের এ দুর্দিন কখনই স্থায়ী হবে না। আপনার তুল্য দয়াময়ী যে সংসারের লক্ষ্মী, সে সংসার অবশ্যই সর্ব-সৌভাগ্যে সমুজ্জ্বল হবে।

বৌমা বিস্মিত হোলেন। কিন্তু কোন কথা বোল্লেন না।

......ভোরবেলা। বাড়ীর কেহই তখন জাগরণ করেন নাই, সেইসময় আমি আমার কাপড়ের পুঁটুলিটি কক্ষে লয়ে উপর থেকে নেমে এলেম। রেবতী উঠেছিল, নীচের প্রাঙ্গণে রেবতীর সঙ্গে দেখা হলো।

বল্লেম, দেবতারা এ সংসারের মঙ্গল করুন, এই আশ্রয়ে নিরাপদে এক রাত্রি আমি আশ্রয় পেলেম, কৃতজ্ঞতা বিস্মৃত হব না। ভাগ্যে যদি থাকে পুনরায় আর একবার সাক্ষাৎ হবে, বৌমাকে এই কথাগুলি তুমি বোলে রেখো। সূর্যোদয়ের পর রাস্তায় আমি বাহির হব না। চোল্লেম।

রাত্রে বাসায় না ফেরায় হরিহরবাবু ও মণিভূষণ দুজনেই অতিশয় চিন্তাক্রান্ত হোয়েছিল। হরিহরবাবুকে বোল্লেম, "কার্য-গতিকে স্থানান্তরে আটক থাকতে হয়েছিল, ফলাফল একটু পরেই জানতে পারবেন। মণিভূষণকে বোল্লেম, সকাল সকাল প্রস্তুত হও, কালবিলম্ব না কোরে ঢাকা যেতে হবে। শত্রু-মিত্রের পরিচয় সেখানেই পাবে।"

মণিভূষণ, "সন্ধান কিছু পেয়েছ কি?"

আমি উত্তর কোল্লেম, "হাতের বস্তু যতক্ষণ হাতে না আসে, সন্ধান হয়েছে বোলে শ্লাঘা প্রকাশ করা উচিত নয়।" হরিহর-বাবুর কাছে গিয়ে বোল্লেম, "অমরকুমারীর সন্ধান হয়েছে। দুদিন একটু একটু উড়ো ভাসা সন্ধান। গত রাত্রে নিঃসংশয়।...আমরা এখন ঢাকায় যাব। আমি আর মণিভূষণ। আপনি অনুগ্রহ কোরে দুটি লোক আমাদের সঙ্গে দিন, অচেনা জায়গায় আমরা যেন ফাঁপরে না পড়ি। এখন আপনি কেবল এই-টুকু জেনে রাখুন, এই মাণিকগঞ্জের উত্তর প্রান্তে একটি ভদ্রলোকের বাড়ীতে অমর-কুমারী আছেন।"

—বাহাদুর তুমি। ঈশ্বর তোমার মনস্কামনা পূর্ণ করুন। দেখো ঢাকায় যাচ্ছ, সাবধান। সাবধানে সকল কাজ কোরো। ঠোকো না।.. আর ঢাকা কোর্টের উকিল শিবশংকর মল্লিকের সঙ্গে দেখা কোরো, তিনি আমার বিশেষ বন্ধু।

ঢাকায় এলেম। শিবশংকরবাবুর সঙ্গে দেখা কল্লেম। দরখাস্ত লেখা হলো, দাখিল হলো এবং উকিল-সেরেস্তাদার-পেস্কারের সহায়তায় সেইদিনেই হাকিমের হুকুমমত পুলিশের নামে পরোয়ানা বাহির হইয়া গেল। এর পর শিবশংকরবাবুর প্রচেষ্টায় পুলিশের সঙ্গে একজন ক্ষমতাপ্রাপ্ত ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেট থাকার প্রার্থনাও মঞ্জুর হলো।

শিবশংকরবাবুর বাড়ীতে রাত্রিবাস করে পরদিন পুলিশের দারোগা, জমাদার, বরকন্দাজ ও সকলের উপর ডেপুটিবাবুকে নিয়ে আমরা মাণিকগঞ্জে পৌঁছলেম। সঙ্গে একজন উকিলও এলেন।

সেই আমবাগান। সেই আটচালা। ডেপুটিবাবু জিজ্ঞাসা কোল্লেন, "সনাক্ত করবার লোক কেহ এখানে আছে?"

আমি বোল্লেম, আছে। দরখাস্তকারী মণিভূষণ ও আমি যে মেয়েটিকে উদ্ধার করতে যাচ্ছি, সেই বালিকা যদি আমাদের দুজনকে চিনতে পারে, তা হোলে আপনার হৃদ-প্রত্যয় জন্মিবে তো?

এরপর দারোগা আমাকে অজস্র প্রশ্ন কোত্তে লাগলেন। সে-মেয়েটি চুরি গিয়েছে কতদিন? তার সঙ্গে আমার কি সম্পর্ক? কতদিন হলো আমি এই গ্রামে এসেছি? কেমন করে জেনেছি মেয়েটি এই বাড়িতেই আছে? মেয়েটির বয়স কত? ইত্যাদি।

কিছুক্ষণ—বিশ্রামের পর আমরা সকলে একত্র হয়ে রমণীবল্লভের বাড়ীর নিকটে গিয়া উপস্থিত হোলেম। দালানে এসে উঠতেই রেবতী আঁৎকে উঠলো, 'ওমা! এরা সব কে গো? এখানে এসব থানা-পুলিশ কেন গো?'—আতঙ্কে এই সব কথা বোলতে বোলতে রেবতী বাড়ীর ভেতরে ছুটে পালালো।

রেবতীর নাম ধরে আমি ডাকলেম। রেবতী আমায় চিনতে পাল্লো না। অবাক হলো। ভয় পেলো। ডাকাডাকিতে ছোট ছোট দুটি বাবু আদুড় গায়ে বেরিয়ে এসে বৈঠকখানায় প্রবেশ কোল্লেন।

আমি বোল্লেম, তোমার দাদাবাবু কি বাড়ী এসেছেন?

—এসেছেন। শেষ রাত্রে এসেছেন। একটু অসুস্থ আছেন, আহার করেননি, ঘুমুচ্ছেন।

—তাঁকে বলো ঢাকা সদর দপ্তরের

ডেপুটিবাবু এসেছেন, বিশেষ দরকার, সংবাদ দাও।

ছোটবাবুদের একজন ভেতরে চলে গেল। ডেপুটিবাবু অপর বালককে জিজ্ঞাসা কোল্লেন, "ব্রজকিশোরী নামে একটি মেয়ে তোমাদের বাড়ীতে আছে?"

—আছে।

—কোথা থেকে এসেছে?

—তিনজন লোক আমার দাদার কাছে তারে রেখে গিয়েছে। বিয়ে হবে।

—মেয়েটি এখন কি করে?

—কাঁদে।

—কার সংগে বিয়ে হবে?

—ঐ দাদা আসছেন।

দুই হস্তে নয়ন মার্জন কত্তে কত্তে বালকের দাদাটি সেই ঘরে প্রবেশ কোল্লেন। বিরক্ত বদনে জিজ্ঞাসা কোল্লেন, আপনারা কে? আপনারা কেন এখানে এসেছেন? বাহিরে পুলিশের লোক খাড়া আছে। ওরাইবা এখানে কেন? ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেট উত্তর দিলেন, আপনি বসুন, জেলার ম্যাজিস্ট্রেট সাহেবের আদেশে আমরা এখানে এসেছি। পুলিশও এসেছে।...এখানে, মানে আপনার বাড়ীতে ব্রজকিশোরী নামে একটি বালিকা আছে, যারা তাকে এখানে এনে রেখে গিয়েছে, তাদের আপনি জানেন কিনা?

—আমার উপর এরূপ প্রশ্ন করবার আপনার কি অধিকার?

—ম্যাজিস্ট্রেটের আদেশ। আমার কাছে আপনি উত্তর দিতে বাধ্য। বলুন, তাদের আপনি জানেন কিনা?

—পূর্বে জানাশোনা ছিল না; হঠাৎ একদিন একটি মেয়ে সংগে কোরে তিনটি ভদ্রলোক এখানে আসেন। সেই তিনজনের মধ্যে একজন সেই মেয়েটির পিতা। তিনি গরীব, এই গ্রামে একজন ধনবান পাত্রে মেয়েকে তিনি সম্প্রদান কোরবেন।

—মেয়েটিকে একবার আমার কাছে আনয়ন করুন।

—তা আমি পারি না। পিতা যারে বিশ্বাস কোরে আমার কাছে গোছিয়ে রেখে গিয়েছেন, তারে আমি পুলিশের কাছে হাজির কত্তে অসম্মত।

—বেশ তিনজন লোককে আপনি হাজির করুন।

—যতদিন পরে তাদের আসবার কথা ততদিন পরে যদি আবশ্যক হয়, তবে আমি তাদের হাজির কোত্তে পারবো। এখন পারি না।

—উত্তম। সে ভার পুলিশ নেবে। আপনি মেয়েটিকে আমাদের কাছে হাজির করুন। সেই মেয়েটির মুখের কথাগুলি আমি শ্রবণ করবো।

—তা আপনি পারেন না।

—উত্তম। আপনার নিজ পরিবারের রমণীগণকে অন্য গৃহে সরে যেতে বলুন, আমি অন্তঃপুরে প্রবেশ কোরে কুমারীর এজাহার গ্রহণ করবো।

—আমি খুন করি নাই, ডাকাতি করি নাই, আমার নামে কোন নালিশ নাই। আপনি আমার বাড়ীতে খানাতল্লাস কোত্তে চান, এটা কিন্তু আইনের মর্ম নয়।

—আপনি একটু সাবধান হয়ে কথা কবেন। মেয়ে-চুরি মামলা, আপনি সেই মামলার আসামীগণের বালিকারি। আমি বেআইনী কার্য কত্তে এসেছি, বা উপস্থিত হচ্ছি, এমন কথা যদি পুনরায় আপনি বলেন, তা হলে—

—তা হলে আপনি কি কোরবেন?

—কুইন ভিক্টোরিয়ার নামে আমি আপনাকে পুলিশের হেপাজতে সমর্পণ করবো।

—করুন আমি প্রস্তুত আছি।

—এখনো আমি ভালো কথায় বলছি, মেয়েটিকে আপনি এইখানে হাজির করুন।...আমি জানি, একজন সুবর্ণ বণিকের সংগে সেই মেয়ের বিবাহ সম্বন্ধ স্থির কোরেছেন, মধ্যস্থ হয়ে মেয়েটিকে আশ্রয় দিয়েছেন, দু হাজার টাকায় মেয়েটিকে বিক্রয় করার বন্দোবস্ত করেছেন, এসব কথা কি আপনি অস্বীকার কোত্তে পারেন?

রজনীবাবুর আরক্ত বদন অকস্মাৎ পাণ্ডু-বর্ণ হয়ে এলো। ডেপুটিবাবু দারোগা-বাবুকে সম্বোধন করে বোল্লেন, "এই গ্রামে ধনঞ্জয় ঘটক আর বংশী পোদ্দার নামে দুইটি লোক আছে, আপনার বরকন্দাজদের বলুন অবিলম্বে সেই দুইজনকে এখানে যেন হাজির করে।"

রজনীবাবু কাঁপতে কাঁপতে কম্পিত স্বরে বোল্লেন, অত ক্যাসাদে দরকার নাই.... ব্রজকিশোরীকে আমি আনিয়ে দিচ্ছি। ব্রজকিশোরীকে দেখুন, যে যে কথা জিজ্ঞাসা করার করুন, ঘটককে পোদ্দারকে তলব দেবার দরকার নাই।

—তিনটাই আমার দরকার। ব্রজ-কিশোরীকে যারা এখানে রেখে গিয়েছে, তারা চোর, যারা তারা চোরের সহায়তা করে, তারাও চোর, অতএবই চোর, বিচারালয়ে তাদের সকলকেই আনয়ন করা কর্তব্য।

কিয়ৎক্ষণ পরেই অবগুণ্ঠনবতী একটি বালিকাকে নিয়ে রজনীবাবু এলেন। ডেপুটি-বাবু বোল্লেন, মা, আমি এখানকার ম্যাজিস্ট্রেট, তোমার কোন ভয় নাই। যে যে কথা তোমাকে জিজ্ঞাসা করবো, কাহারও উপরোধ অনুরোধ মনে না করে নির্ভয়ে তুমি সেই কথাগুলির উত্তর দিও।

—তোমার নাম কি?

—অমরকুমারী।

—তোমার আর কোন নাম আছে?

—না।

—এখানে ব্রজকিশোরী নামে আর কোন বালিকা আছে?

—এই বাড়ীর লোকেরা আমাকেই ব্রজ-কিশোরী বলেন।......

—কারা তোমারে এখানে এনেছে?

—তাদের সকলকে আমি চিনি না। একজনকে চিনি, সে লোকটাও নিজের নাম প্রকাশ করে নাই।

—তুমি তার আসল নাম জান?

—জানি, জটাধর।

—তাদের সংগে তুমি কেন এখানে এসেছিলে?

—চোখ-মুখ বেঁধে তারা আমাকে চুরি কোরে এনেছে।

—কোথা থেকে এনেছে?

—মুর্শিদাবাদ থেকে।

—এ বাড়ীর বাবুকে তুমি আর কখনও দেখেছিলে?

—না।

—এ বাড়ীতে এখন তুমি থাকতে ইচ্ছা কর?

—না; থেকে আর কোথায় যাব! আমার কেহ নাই।

—তবে যে শুনেছি তোমার পিতা তোমাকে এই বাবুর কাছে গোছিয়ে রেখে গিয়েছেন?

—মিথ্যা কথা। আমার জন্মের পর অবধি আমার পিতা নিরুদ্দেশ। মা ছিলেন, সম্প্রতি তিনিও স্বর্গে গিয়েছেন।

ডেপুটিবাবু বোল্লেন....কেমন বাবুজী, মেয়েটির কথাগুলি শুনলেন।......

আইনের চক্ষে এখন আপনিও অপরাধী হোতে পারেন।

তারপর আমাদের কাছে ডেকে, আমাদের দিকে অঙ্গুলী নির্দেশ করে ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেট বললেন, দেখ দেখি অমরকুমারী, দেখ দেখি মা, এই বাবু দুটিকে তুমি চিনতে পার কিনা?

অমরকুমারীর উজ্জ্বল চোখ সজল হলো, বাষ্পরুদ্ধ কণ্ঠে মৃদু গুঞ্জনে...সে বোল্লে, হরিদাস! মণিভূষণ! দাদা!

ডেপুটিবাবু কহিলেন, কেঁদো না মা, কেঁদো না। এই দুটি বালক তোমারে উদ্ধার-নিমিত্ত বিস্তর আয়াস, বিস্তর কষ্ট, বিস্তর অর্থব্যয় স্বীকার কোরেছেন। তোমারে উদ্ধার কোরে এই দুই বালকের হস্তেই সমর্পণ করা হবে; তুমি কেঁদো না।

কলকাতায় লটারী খেলা

শক্তি ঘোষ

লটারীর প্রাইজ না পেলে মনের মিলে ছেলেবেলার বিয়ে হয় না। পুরানো দিনের লটারীর অনেক তথ্য আমাদের কাছে উপকথার মত মনে হয়। কলকাতা সেই কাঁচা মাটির কথাই ধরুন না। প্রথম বিশ্বযুদ্ধের তাণ্ডব লীলা চলছে তখন। মেয়েটি ছালনালাত গভর্ণর সাহেবের ব্যাণ্ড পার্টির সার্জেন্টকে। মেয়েটি জাঁদরেল সরকারী অফিসারের বউকে গিয়ে ধরল। যদি মেয়ের দুঃখে মনিবানীর মন গলে। উল্টো ফল হোল তাতে। সার্জেন্টের কাছে তা-বড় অফিসারের ওয়ার্ণিং পৌঁছে গেল। বিনা পারমিশনে বিয়ে করলে ব্যাণ্ড পার্টির সার্জেন্টকে আবার লড়াইয়ে ফিরে যেতে হবে। কলকাতা অসহায় পাগল মেয়ের। আসামে একটা চাকুরী নিয়ে চেনা মানুষের কাছ থেকে দূরে পালাল। আসামে গিয়ে দশ টাকার একটি লটারী টিকিট কিনল ও। আর লাগ ভেল্কি, মেয়েটি ১৮,০০০ টাকা পেয়ে গেল লটারীতে। পরের ঘটনা মধুরেণ সমাপ্ত।

দুশো আড়াইশো বছর আগে লটারীর জন্য কলকাতা কম বিখ্যাত ছিল না। ইংরেজদের পাবলিসিটির কৃপায় তারতের মানুষ জানত দি ক্যালকাটা ডার্বি সুইপ আর অন্ধকূপ হত্যার কাহিনী। হবস সাহেব লটারীকেই ব্ল্যাক হোল ডেথ থেকে বেশী স্বর দিয়েছেন। তাঁর দি রোমান্স অব দি ক্যালকাটা সুইপ বইয়ে অনেক চমকপ্রদ বিবরণ পাওয়া যায়। বাইরের দুনিয়ায় এ-নিয়ে কৌতূহলের অন্ত ছিল না। কলকাতা ফেরত কাউকে পেলে নাকি ডার্বি সুইপের গল্প শুনতে চাইত। অত টাকার খেলা। তাহলে ব্যাপারটা ধোঁকাবাজীও হতে পারে। আফ্রিকার ঘন অরণ্য ভেদ করে ফার্স্ট-প্রাইজ পৌঁছাল ১৯২৯ সালে। দক্ষিণ আফ্রিকার মানুষ জানল তাদেরই একজন ভাগ্যবান লাখ ত্রিশ দেড়াই লক্ষ পাউণ্ড লাভ করেছে। দুই ভায়ের গল্পও বেশ চমকপ্রদ। এ-ঘটনার পটভূমিও দক্ষিণ আফ্রিকা। দুজনে ঘুরে বেড়াচ্ছে চাকরীর খোঁজে। মনের মত চাকুরী আর মেলে না। তবু কোনরকমে ওরা ক্যালকাটা ডার্বি সুইপের দুটো টিকিট কিনল। এক ভাইয়ের বরাত ভালো, ওয়াকার ঘোড়া ৬৩,০০০ পাউণ্ড পাইয়ে দিল।

কলকাতায় লটারী বা লটারী খেলা চালু করে ইংরেজ বেনিয়া। বণিকদের মানদণ্ড আগেই রাজদণ্ড রূপে দেখা দিয়েছে। সুতানুটি ও গোবিন্দপুরের সেই জঙ্গল একটু একটু করে শহরের চেহারা নিচ্ছে। পাদরি সাহেবরাও তৎপর। কালী কলকাতাওয়ালীর মন্দির থাকলে চলবে না, উঁচু গীর্জাও চাই। কলকাতার লটারীর রূপ এই ধর্মের হাত ধরে। কলকাতার প্রথম লটারীর আয়োজন একটি গীর্জা নির্মাণ উপলক্ষ করে। হবস সাহেবের মতে ১৭৮৪ খৃষ্টাব্দে লটারীর ব্যবস্থা হয়। ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর কর্মচারীরা ধর্ম ব্যাপারে মাথা ঘামায় নি। ওদিকটায় তাদের তত্ত্বেযেনা দিন বাড়ছিল। তাদের মনকে জনপ্রিয় ...: ওরা ইংল্যাণ্ড আসার পথে কেপ অব গুড হোপ) আইনের জন্য ... রেখে আসত। ঘোড় গাড়ি দেখার সময় ও বস্তু আবার ফেরত নিয়ে যেত। তাও প্রায় সেটা বিশ সাল বাদে।

লটারীর কৃপায় যে চার্চ সম্ভবত নির্মিত হয়েছিল, সেটি সেন্ট জনের নামে উৎসর্গ করা। ঐতিহাসিকদের মধ্যে বিতর্ক আছে। অনেকে মনে করেন ন্যাবকদের মুক্তহস্ত সাহায্যের জন্যই সেণ্টজন চার্চ নির্মাণ করা হয়েছিল। যা হোক, গীর্জা নির্মাণের প্রথম ৮০,০০০ টাকা এসেছিল লটারী থেকে। লটারীও বেশ জনপ্রিয় হয়েছিল। ১৭৮৪ সালের এপ্রিল মাসে গীর্জার কাজ শুরু হয়। সে সময়কার গভর্ণর-জেনারেল কলকাতার বাইরে থাকায় মিঃ এডওয়ার্ড হুইলার গীর্জাটির ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন করেন।

হুইলার সাহেব কিন্তু লটারীকে নেক-নজরে দেখেন নি। যাতে এই জনপ্রিয় জুয়াখেলা বন্ধ হয়, তিনি কোম্পানীর ডিরেক্টারদের পার্লামেন্টে আইন পাশ করাতে বলেছিলেন। তাঁর মতে লটারী হচ্ছে, এ ফেভারিট স্পেসিজ অব গ্যামবলিং।

কিন্তু কে শোনে তাঁর কথা। আট বছর পরে আবার ফ্রীম্যানস হল নির্মাণের ব্যাপারে লটারীর আয়োজন হল। কলকাতার জলা-জায়গা থেকে জলনিকাশের জন্য কয়েকটি দীঘিও খনন করা হয়েছিল। ফলে বেশ কিছু নীচু জমি জমাট হয়েছিল। গোরী সেনের তহবিল থেকে টাকা আসে নি। লটারী থেকে টাকা জোগাড় করা হয়েছিল। লটারীর ইতিহাস সুতিবাগানের নামে জড়িত আছে। নাগরিকদের সুবিধার জন্য সুতিবাগান কেনা হয়। কে না জানে লটারীর আর এক নাম সুতি। প্রবীণদের মুখে এখনো সুতি খেলার কথা শুনতে পাবেন।

কলকাতার লটারীর নাম চারদিকে ছড়িয়ে পড়েছিল। এমন কি লণ্ডনে ১৮১১ খৃষ্টাব্দে প্রকাশিত 'ক্যালকাটা' কবিতায় লটারীর উল্লেখ আছে। কবিতাটি সংলাপে রচিত।
what if on some good number
you may fix some lucky ticket
that may make you rich?
অনেকের বাড়িতে লুকোনো সোনার তাল যারা খুঁজে পেত না, তারা স্বপ্ন দেখত লটারীর ফার্স্ট প্রাইজের। আবার টম, জিক ও হ্যারি অনেকে ঘোড়, দুইটি মেয়ে জাঁকিয়ে বসতে পারেনি, অ্যাংলো-ইণ্ডিয়ানদের স্বর্গপ্রাপ্তির চেয়ে হোমপ্রাপ্তি ছিল অধিক কাম্য। আর তাতে পুণ্য সঞ্চয় থেকে লটারীর টিকিট ঢের বেশী উস্কানি দিয়েছে।

সেকালের পত্র-পত্রিকায় লটারী সম্পর্কে কম আলোচনা হয় নি। আসলে লটারীর এত বেশী আর্থিক ও সামাজিক গুরুত্ব ছিল যে, একে উপেক্ষা করা সম্ভব ছিল না। ১লা জানুয়ারী ১৮২৫ সালে বাংলা পত্রিকায় সংবাদ ছাপা হয়েছে ঃ কলিকাতা লটারী খেলা। গত বৃহস্পতিবার গভর্ণমেন্ট গেজেট দ্বারা অবগত হইয়া লাটরি খেলা সংক্ষেপে প্রকাশ করিতেছি। কলিকাতা নগরের শোভা করিবার নিমিত্তে সন ১৮২৫ সালের প্রথম লাটরি গভর্ণমেন্ট দ্বারা স্থাপিত হইয়াছে... ইত্যাদি। আরও খবর আছে...টিকিট বাঙ্গাল বেঙ্কে বিক্রয় হইবেক। প্রত্যেক টিকেটের মূল্য একশত টাকা।

এক শত টাকায় লটারীর টিকিট কেনার সাধ্য থাকলেও আমাদের সাধ্য নেই। দু'এক টাকায় কপাল ফেরাতে পারলে আমরা বর্তে যাই। এখানে উল্লেখ দরকার পুরনোদিনের কলকাতায় লটারীর টিকিটের দাম ছিল আকাশ-ছোঁয়া। কালো টাকা আর ডিভ্যালুয়েশনের পরও অত চড়া দামে টিকিট কেনা সাধারণ মানুষের পক্ষে সহজ নয়।

ক্যালকাটা রিভিউ পত্রিকায় ১৮৬০ খৃষ্টাব্দে নানা পরিকল্পনার সংবাদ ছাপা হয়। তাতে স্পষ্ট করে বলা হয়েছে কলকাতার স্যানিটারী অবস্থার উন্নতিকল্পে লটারীর বিশেষ অবদান আছে। ১৭৯৪ সালে লটারী কমিশন গঠন করা হয়। প্রতি টিকিট ৩২ টাকা হিসেবে ১০,০০০ টিকিট বিক্রির জন্য বিজ্ঞাপনও বেরিয়েছিল। ক্যালকাটা রিভিউ পত্রিকার আরও অনেক তথ্য পাওয়া যায়। কলকাতার অধিকাংশ ভালো রাস্তার পিছনেই নাকি লটারীর টাকা। এমন কি টৌনহল হল ওরফে টাউন হল এবং ফ্রী স্কুল স্ট্রীট লটারীর টাকায় নির্মিত হয়।

লটারী বিষয়ে মানুষের উৎসাহ নাকি চিরকালের। লণ্ডনেও একদা লটারীর সাহায্যে প্রচুর অর্থ উপার্জন করা হোত। কখনো সেটা জনহিতকর কাজে লেগেছে, আবার কখনো শূন্য রাজকোষ পূর্ণ করেছে। ক'বছর আগে ১৯৫৪ সালে আইরিশ হাসপাতালগুলোর জন্য তিন-তিনটি লটারীতে অর্থসংগ্রহ করা হয়। টাকার পরিমাণ হোল ৯,০০০,০০০ পাউণ্ড। রাশিয়ায় দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময় ওয়ার বণ্ড কিনলে একটি করে লটারীর টিকিট ফ্রী দেওয়া হয়। সে লটারীর ফার্স্ট প্রাইজে ১০০,০০০ রুবল পর্যন্ত দেওয়া হয়েছিল।

কিন্তু দুনিয়ার লটারীর ইতিহাসে কলকাতার স্থান প্রথম পাতায়। বিশ্বের অন্যতম মহানগরীর সৃষ্টির পিছনে লটারীর অবদান আজ গবেষণার বিষয়। কলকাতার বর্তমান দুরবস্থার কথা ভাবলে পুরোনো-দিনের কথা মনে পড়ে। আজকার পৌরপিতারা অনেকেই হয়তো জানেন না ১৮১৭ থেকে ১৮৩৬ সাল পর্যন্ত একটি লটারী কমিটি কলকাতা মিউনিসিপ্যালের বহু কাজকর্ম দেখাশুনো করেছে। কলকাতায় লটারীর সে গৌরবময় দিন আর বুঝি কখনো ফিরবে না।

প্রকৃতি-পাগল বিভূতিভূষণ

মন্মথনাথ ঘোষ

প্রকৃতিরসিক বলতে আমরা সাধারণত বুঝি, যাঁরা প্রকৃতিকে ভালবাসেন। পুজো কিংবা বড়দিনের ছুটির সঙ্গে সারা বছরের পাওনা অফিসের ছুটি জুড়ে লম্বা করে বেশ কিছুদিন বিদেশ ভ্রমণে যান। অর্থাৎ কাশী, দেওঘর, দিল্লী, এলাহাবাদের পরিবর্তে শিমুলতলা, হাজারীবাগ, পুরী, দার্জিলিং, শিলং কিংবা হরিদ্বারে বেড়াতে যান। শহরের গোলমাল, ঝামেলার চেয়ে সেখানে প্রাকৃতিক সৌন্দর্য বেশী, সে জায়গাগুলো পছন্দ করেন।

ঘরে বসে চায়ের সঙ্গে ওদেশের সস্তার মিষ্টান্ন বা বড় সাইজের খাঁটি ঘিয়ে ভাজা সিঙাড়া বা কচুরীর আস্বাদ তারিফ করতে করতে জানলার ভেতর দিকে দৃশ্য দেখেন,—পাহাড়, জঙ্গল, নদী উপনদীর শোভা নিরীক্ষণ করতে করতে বলেন, আঃ কি 'ন্যাচারেল সিনারি'। আর একদল আছেন, যাঁরা বলেন প্রকৃতিকে 'এনজয়' করতে এসেছি, ঘরের মধ্যে বসে চা খবো কেন? চাকরকে দিয়ে চেয়ার-টেবিলগুলো বাড়ীর সামনের বাগানে আনিয়ে, ডবল ডিমের পোচের সঙ্গে কলকাতা থেকে কিনে আনা টিনের বাটার ছুরি দিয়ে পাউরুটির গায়ে লাগিয়ে চিবতে চিবতে জঙ্গল বা পাহাড়ের দিকে তাকিয়ে উচ্ছ্বাস করে বলেন, 'ওঃ হাউ লাভ্‌লি!' এ রকম দৃশ্য সুইজারল্যাণ্ডেও আছে কিনা সন্দেহ! ওর মধ্যে আবার যাঁরা হয়ত আরো একটু বেশী প্রকৃতিকে ভালবাসেন, জুতো মোজা পরে, প্যাণ্টের ওপর ওভারকোট চাপিয়ে বিকেলের দিকে ছড়ির বদলে হাতে একটা লম্বা ছয় কি আট ব্যাটারীর টর্চ নিয়ে ঘুরতে বেরোন বা 'সাইট সিয়িং'-এ যান। আরো যাঁরা বেশী সাহসী, তাঁরা আট দশজন মিলে শেয়ারে একটা মোটর বা ট্রাক ভাড়া করে সকাল থেকে সন্ধ্যা পর্যন্ত একশো দুশো মাইল মোটর ছুটিয়ে প্রকৃতির যেখানে যতটুকু সৌন্দর্য আছে, নিংড়ে নিয়ে এক গণ্ডূষে পান করে ফিরে আসেন। খুশিতে ডগমগ হয়ে যাঁরা অফিসের সহকর্মীদের কাছে যা দেখেছেন বর্ণনা করতে গিয়ে, শিমুলতলার ঘাড়ে হাজারীবাগ কিংবা শিলঙের ঘাড়ে দার্জিলিং চাপিয়ে দেন।

কিন্তু বিভূতিভূষণের প্রেম ছিল অন্যরকম। প্রকৃতিকে দূর থেকে দেখে তাঁর সাধ মিটতো না। যতক্ষণ না তাকে স্পর্শ করতে পারবেন, তার সঙ্গে একাত্ম হয়ে উঠতে পারবেন, ততক্ষণ তাঁর অতৃপ্ত মন যেন কিছুতেই শান্ত হতো না। ছোট ছেলে যেমন মায়ের সামনে দুপুরবেলা রোদে বাইরে বেরুতে না পেয়ে ছটফট করে, কখন বিকেল হবে ছুটে মাঠে যাবে খেলতে, তারি চিন্তায় প্রহর গুনতে থাকে, ঠিক সেইরকম মনোভাব দেখেছি বিভূতিভূষণের এই বৃদ্ধবয়সে।

মনে পড়ে প্রথম যেদিন ওঁর দেশের বাড়ী ব্যারাকপুরে যাই। ঘোর পল্লীগ্রাম। চতুর্দিকে আম, কাঁটাল, আসশেওড়া, সিম, নিশিন্দের যেমন জঙ্গল তেমনি ঘন বাঁশবন এখানে-ওখানে, পথে-ঘাটে, সর্বত্র। নীরব, নিস্তব্ধ পল্লী। সামান্য দুচারটে ঘর। দেখি বিভূতিভূষণ খোলা বারান্দায় একটা মাদুর বিছিয়ে বসে বসে লিখছেন। ঘরের ভেতর টেবিল-চেয়ারে বসে লেখা তিনি একেবারে পছন্দ করতেন না। চোখের সামনে আশে পাশে প্রকৃতিকে দেখতে না পেলে, তাঁর মনটা ভরতো না।

একদিন রাজবাড়ীর দিকে বেড়াতে গিয়েছিলুম। ওদিক থেকে সুবর্ণরেখার দৃশ্য দেখে আমরা দুজনে ফিরছি। ছোট্ট একটা জঙ্গল, বড় বড় কয়েকটা গাছের তলা দিয়ে পায়ে চলা পথ। হঠাৎ একটা প্রকাণ্ড কালো পাথর একটা উঁচু গাছের তলায় দেখে আমাকে দাঁড়িয়ে গেলেন। আমি ওঁর পিছু পিছু আসছিলুম, প্রশ্ন করলুম, দাঁড়ালেন যে?

এই পাথরটা দেখুন—এটার ওপর বসে দেবযানের কপি লিখেছি কতদিন।

এ্যাঁ, বলেন কি? এই জঙ্গলের ভেতর? তাছাড়া আপনার বাড়ী থেকে এতদূর—প্রায় মাইল দুয়েকের কম নয়?

বললেন, হাঁ, ভোরে উঠে তখন এদিকে বেড়াতে আসতুম। এই শিলাসনে বসে লেখার জন্যে। বলে সেই কালো পাথরটার ওপর একবার সস্নেহে হাত বুলিয়ে নিয়ে নিজে বসলেন এবং আমাকে বসালেন।

ওঁর বাড়ীতে যেদিন গিয়েছিলুম সেদিন সর্বপ্রথম তিনি বললেন, চলুন, অপুর সেই বকুলগাছটা দেখিয়ে আনি, আপনাকে। বলে আমাকে নিয়ে চললেন, বেশীদূর নয়, নিকটেই। ঘেঁটুফুল, ভাঁটফুলের গাছের বনের মধ্যে ঢুকে বললেন, এই দেখুন।

দেখলুম, বকুলগাছ একটা দাঁড়িয়ে, অজস্র শুকনো পাতা তার তলায় জমে রয়েছে, উনি বললেন, বসুন, এর তলায় একটু। বলেই তিনি নিজে সেই পাতানাতা জঙ্গলের ওপর বসে পড়লেন। একেবারে ওইরকম বনজঙ্গলে পাতানাতার ভেতরে সাপখোপ, উইচিংড়ি, জোঁক, কেঁচো বা কাঠপিপঁড়ে কিছুই থাকা বিচিত্র নয়। তাই একটু ইতস্ততঃ করছিলুম। খপ করে উনি বলে উঠলেন, জানেন সেদিন কাননবালা এসেছিলেন এই গাছ দেখতে, এই গাছের তলায় অনেকক্ষণ তিনি বসেছিলেন।

মুচকি হেসে বললুম, তিনি যে কাননবালা, তার পক্ষে এটাই ত স্বাভাবিক।

অগত্যা বিভূতিভূষণকে খুশি করার জন্যে চারিপাশে ভাল করে চোখ বুলিয়ে নিয়ে কোনরকমে আড়ষ্ট হয়ে একটা জায়গায় বসে পড়লুম।

এতক্ষণে বিভূতিভূষণের মুখে বেশ একটা আনন্দের দীপ্তি যেন ফুটে উঠলো। কিন্তু এখানেই তার শেষ নয়, হঠাৎ তিনি গাছের গুঁড়িটার ওপর পিঠ রেখে হেলান দিয়ে বললেন, এমনি করে গাটা গাছের সঙ্গে ঠেসিয়ে দিয়ে ইজিচেয়ারের মত করে বসুন দেখবেন ভারী ভাল লাগবে!

আমার ভাল লেগেছিল কিনা জানি না তবে বিভূতিভূষণের মুখের দিকে তাকিয়ে আমার মনে হয়েছিল, যেন তিনি মায়ের কোলে বসে, মায়ের বুকে হেলান দিতে পারার সৌভাগ্যে বিভোর।

এরপরে স্নান করতে নিয়ে গেলেন নদীতে। ওঁর বাড়ী থেকে ইছামতী নদীটা বেশী দূর নয়। পিছনের মেটেরাস্তাটা আমবাগান, বাঁশবাগান, আসশেওড়া ও ঘেঁটু বনের ভেতর দিয়ে চলে গেছে এঁকেবেঁকে নদীর ঘাটে।

ঘাট বলতে কিছু নেই। মাটির উঁচু পাড়, বর্ষার ধোয়াট জলে যেমনভাবে ভেঙেচুরে উঁচুনীচু এবড়োখেবড়ো হয়ে গিয়েছে, তেমনি আছে প্রকৃতির হাতে গড়া। শক্ত এঁটেল মাটি আগে যারা স্নান করে গেছে, তাদের পায়ের চাপে জলে ভিজে বেশ পিচ্ছল হয়ে রয়েছে। সাবধানে, পা টিপে টিপে বিভূতিভূষণ নেমে পড়লেন। আমাকে ইতস্তত করতে দেখে বললেন, নেমে আসুন, কোন ভয় নেই।

বললুম, না ভয় কিছু নেই শুধু পা স্লিপ করে আছাড় খেলে হাত-পা ভেঙে যেতে পারে।

বললেন, কলকাতার লোকেরা কি বাথরুমে আছাড় খেয়ে পা ভাঙে না? অগত্যা জলে নেমে পড়লুম। বললেন, দেখুন দেখি এমন দৃশ্য কোথায় আছে? এ নদীর জলে স্নান নয় যেন সৌন্দর্যে অবগাহন করা।

সত্যি খুব ভাল লাগল। নীল স্বচ্ছ ইছামতীর জলে পায়ের তলা পর্যন্ত দেখা যায়। মাথার ওপর মেঘহীন ঘন নীল আকাশ। সামনে নদীর ডান পাড়ে কয়েকটা বাবলা গাছ, রোদে শিরশির করে কাঁপছে তার পাতাগুলো, গাছগুলো হেলে পড়েছে নদীর ওপর, নদীর বুকে তাদের প্রতিচ্ছবি। বাঁদিকে ধানের ক্ষেত যতদূর দৃষ্টি চলে, কেবল সবুজ আর সবুজ, নদীর উঁচু পাড়টা ঢালু হয়ে নেমে এসে জলকে ছুঁয়েছে যেখানে ঝাঁজি ঝাঁজি কাদের গুচ্ছ, দূর থেকে একটা পালতোলা নৌকো এদিকে নিঃশব্দে এগিয়ে আসছে।

ডুব দিতে মনে হলো শরীর মন একসঙ্গে উৎফুল্ল হয়ে উঠলো। সত্যি, সেদিনের স্নানের আনন্দ আর কখনো পাইনি। বিভূতিভূষণের সেই কথা আজো ভুলতে পারিনি। এ শুধু জলে স্নান নয়, সৌন্দর্যে অবগাহন।

আর একদিনের ঘটনা আমি কখনো ভুলবো না। বিভূতিভূষণের মৃত্যুর [illegible]

আগের বছর। ঘাটশিলায় গিয়েছি। বিখ্যাত সাহিত্যিক প্রবোধকুমার সান্যাল মহাশয় একদিন হঠাৎ আমার অতিথি হলেন।

বিভূতিভূষণও তখন তাঁর ঘাটশিলার বাড়ীতে। ও'কে দেখে আনন্দে লাফিয়ে উঠলেন। বললেন, চলো কাল তাহলে আমরা কোথায় বেড়াতে যাই। তুমি ত এদিকে আসোনি কখনও, হিমালয়, কৈলাস, অমরনাথ দেখেছো, আমাদের এখানের বিউটি একটু দেখে যাও। প্রবোধকুমারের চোখ দু'টো সঙ্গে সঙ্গে যেন নৃত্য করে উঠলো। ভ্রমণের নেশা দু'জনেরই সমান। দু'জনেই প্রকৃতি-পাগল। একজন যেমন গাছপালা, বনজঙ্গল, নদী, পাহাড় প্রকৃতির শ্যামল, সজল, কান্তরূপের সাধক, আর একজন তেমনি এর বিপরীত। তুষারমৌলী হিমালয়ের ধ্যানমগ্নরূপে আত্মভোলা বৈরাগী। দেবতাত্মা হিমালয়ের ভক্ত শিষ্য সাধক! এই দুই প্রকৃতি-তপস্বীর সান্নিধ্যলাভের সৌভাগ্য ভোলবার নয়। পরদিন সকালে বিভূতিভূষণ এসে বললেন, মুকুলবাবুর ট্রাক ঠিক করে এসেছি। ঠিক দশটার সময় প্রস্তুত থাকবেন।

ঘাটশিলায় পাহাড়-জঙ্গল দেখতে হলে ওছাড়া আর কোন উপায় ছিল না। মোটরের জন্যে রাস্তাঘাট কিছুই ছিল না। চারিদিকে বনজঙ্গল, পাহাড় আর রাশি রাশি পাথর। মুকুলবাবু গভর্নমেন্টের কাছ থেকে বন ইজারা নিয়ে কাঠ কেটে শহরে চালান দেবার ব্যবসা করতেন। তাই তাঁর ট্রাক লোকজন নিয়ে বনেজঙ্গলে রোজ যেতো কাঠ কাটতে। এই মুকুলবাবুর আনুকূল্যে বিভূতিভূষণ ও অঞ্চলের গভীরতম জঙ্গলে ঘুরে বেড়াতেন।

যথাসময়ে অনেকগুলি কুলিমজুর সমেত ট্রাক এসে দাঁড়ালো আমতলায়। আমরা তিনজনে গিয়ে ট্রাকে উঠে বসলুম। একখানা সতরঞ্চি বিছিয়ে দিলে ড্রাইভার ট্রাকের ওপরে বিভূতিভূষণেরই পীড়াপীড়িতে। নইলে ড্রাইভার তার পাশেই আমাদের তিনজনকে একটু ঠেসাঠেসি করে বসবার জায়গা করে দিয়েছিল। কিন্তু বিভূতিভূষণের তা পছন্দ হলো না। বললেন, খোলা ট্রাকে বসে না গেলে কি প্রকৃতিকে দেখা যায়? 'সিনারী' কিছুই দেখা যাবে না।

ড্রাইভার অবশ্য আরো একটা কথা চিন্তা করে তার পাশে আসন করে দিতে চেয়েছিল। ওই বনজঙ্গলে ত পিচঢালা সমান রাস্তা নেই, যে ট্রাক গড়গড়িয়ে চলে যাবে। পাথরের ওপর দিয়ে ডিঙিয়ে ডিঙিয়ে লাফ করে লাফিয়ে যখন ট্রাক চলবে, তখন সে ঝাঁকানি কি সহ্য করতে পারবো আমরা!

কিন্তু বিভূতিবাবু সে কথায় কর্ণপাত না করে দিব্যি আরামে সতরঞ্চির ওপর উঠে বসে বললেন, দেখি প্রবোধ একটা বিড়ি দাও দেখি।

ট্রাক ছুটলো। বনজঙ্গলের ভেতর দিয়ে, ছোটবড় পাহাড় ডিঙিয়ে ডিঙিয়ে। কোথাও চারিদিকে গভীর জঙ্গল, কোথাও একটু ফাঁকা জায়গায় ধানের চাষ হয়েছে। কোথাও বা দু'চার ঘর আদিবাসীদের কুটির। কোথাও শুধু বড় বড় গাছের জড়াজড়ি জটিল ভয়াবহ অরণ্য।

এমনি করে ঝাঁকানি খেতে খেতে তিন ঘণ্টা চলে, তারপর এক জায়গায় গিয়ে ট্রাকটা থামলো। ড্রাইভার বললে, আর যাবে না গাড়ী এইখানেই থাকবে। কাঠবোঝাই হয়ে গেলে, আমি হর্ন দেবো আপনারা সেইসময় চলে আসবেন। অবশ্য তিন ঘণ্টা সাড়ে তিন ঘণ্টার আগে গাড়ী বোঝাই হবে না। তবে সন্ধ্যের আগেই আমাদের এই জঙ্গল থেকে বেরিয়ে যেতে হবে। এ জঙ্গলে বাঘ, ভালুক, হাতী সবকিছু আছে। আপনারা একটু সাবধানে চলাফেরা করবেন। পাহাড়ের ভেতরে একা চলে যাবেন না!

চারিদিকে পাহাড়ের পাঁচিলঘেরা, অদ্ভুত নির্জন সেই স্থান।

ড্রাইভাররা সকলে কাজে চলে গেলে, বিভূতিভূষণ বললেন, চলো, ওই দিকটায়
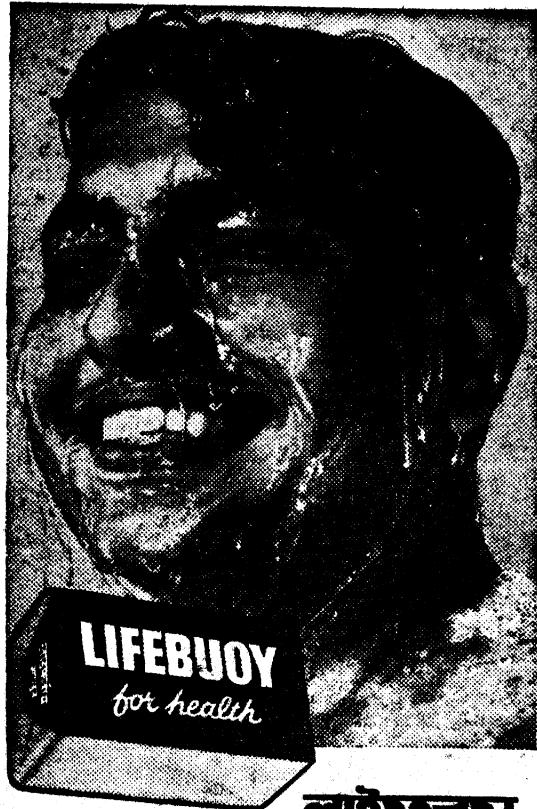
আমরা বেড়িয়ে আসি। বলে তিনি অগ্রসর হলেন।

আমি ও প্রবোধবাবু তাঁর পশ্চাদানুধাবন করলুম?

কিন্তু কোথায় যাচ্ছি? জনমানবহীন এ কোন স্থান? সৃষ্টির আদিকাল থেকে যেন এখানে আর কোনদিন কোন মানুষের পায়ের চিহ্ন পড়েনি। আমরা তিনজন প্রথম এলুম! বড় বড় প্রাচীন গাছ, উঁচু উঁচু পাহাড়। তারি মধ্যে দিয়ে এগুতে এগুতে বেশ একটা উঁচু পাহাড়ের ওপর উঠে হঠাৎ বিভূতিভূষণ থেমে গেলেন। বললেন, আর এগুনো উচিত হবে না। এখানে কোন পথ-ঘাট নেই। শেষে ফিরতে পারবো না। ট্রাক থেকে অনেকটা দূরে এসে পড়েছি আমরা।

কেমন একটা অজানা আতঙ্কে যেন গা ছমছম করতে লাগল আমার। প্রবোধবাবু বললেন, এ কোথায় নিয়ে এলে বিভূতি? এখানে ত এর আগে কোন মানুষ এসেছে বলে মনে হচ্ছে না। একেবারে যাকে বলে 'ভার্জিন সয়েল'।

উৎসাহিত হয়ে তিনি জবাব দিলেন, আহা, প্রকৃতির কি সুন্দর লীলাভূমি।

প্রবোধবাবু বললেন, কিন্তু এখানে যদি হঠাৎ কোন হাতী বা বাঘ ভালুক এসে পড়ে এখনি, তাহলে উপায়?

অবিশ্বাসের সুরে বিভূতিভূষণ বললেন, ওরা কখন দিনের বেলায় বেরোয় না। বলেই বিভূতিভূষণ হঠাৎ সামনের একটা গাছের ওপর উঠে আমাদের ডাক দিলেন, চলে এসো তোমরা।

আরে সর্বনাশ! নেমে এসো! এখান থেকে পা ফসকে পড়লে, যে তোমার কোন চিহ্ন খুঁজে পাওয়া যাবে না। দেখছো নীচে অতল খাদ!

পড়বো কেন। ভাল করে ডালটা হাতে চেপে বসবে এসো!

প্রবোধবাবু বলেন, না-না—একি তোমার বিদঘুটে সখ! বেশ ত এখানে পাহাড়ে দাঁড়িয়ে দেখছিলুম!

বিভূতিভূষণ বললেন, এখানে উঠে দেখো কত ভাল লাগবে। ওই দূরে কতদূর পর্যন্ত দেখা যাচ্ছে। দেখবে এসো।

অগত্যা আমরা দুজনে উঠে তাঁর পাশে গিয়ে বসলুম।

নীচের দিকে তাকালে মাথা ঝিমঝিম্ করে। গাছের সেই ডালটা হেলে রয়েছে গভীর খাদটার ওপর।

গাছের ডালের ওপর চুপচাপ আমরা বসে আছি, এমন সময় মনে হলো একটা কি যেন নড়ছে, পায়ের নীচের দিক থেকে এগিয়ে আসছে ক্রমশ আমাদের দিকে।

প্রবোধবাবু বললেন, ওটা কি বিভূতি? কি আসছে এদিকে। চলো আমরা নেমে পড়ি গাছ থেকে।

গাছ থেকে আমি ও প্রবোধবাবু নেমে এলুম, বিভূতিভূষণও নামবার জন্য দু'এক পা এগিয়ে এসেছেন, এমন সময় তাঁর মুখে হাসি ফুটে উঠলো। আরে ভয় নেই, একটা লোক আসছে। ওই দেখো জঙ্গলের ভেতর থেকে ফাঁকা জায়গায় এসেছে, স্পষ্ট দেখা যাচ্ছে!

এরকম জায়গায় কোন মানুষ থাকতে পারে, যেন বিশ্বাস করতে প্রবৃত্তি হয় না। যা হোক, একটু পরেই সত্যি সত্যি একটা কালোমিশমিশে ল্যোংটিপরা লোক কাঁধে একটা ধামাজো কুড়ুল নিয়ে নীচের দিক থেকে উঠে এলো, একেবারে আমাদের সামনে।

প্রবোধবাবু প্রশ্ন করলেন, তুই কোথায় থাকিসরে!

হুই খানে—বলে হাত বাড়িয়ে অনেকদূরে দেখালে।

তা তুই এদিকে কোথায় যাচ্ছিস?

যাচ্ছি, আমার কুটুমবাড়ী।

সেটা কোথায়?

সে বললে, আরো দুটো পাহাড় ডিঙিয়ে সেখানে যেতে হয়।

প্রবোধবাবু প্রশ্ন করলেন, এখানে কি বাঘ, ভালুক, হাতী আছে নাকি?

হাঁ বাবু আছে। বাঘ ত বড় নেই। নেকড়ে আছে। নইলে ভালুক, হাতী আছে অনেক।

বিভূতিবাবু প্রশ্ন করলেন, এ জায়গাটার নাম কিরে!

সে বললে শুরুজল!

এমন সময় মোটরের হর্ন বেজে উঠলো। প্যাঁক-প্যাঁক-প্যাঁক।

আমরা এসে হাজির হতে দেখি ওরা সব প্রস্তুত। কাঠ পাহাড়ের মত করে সাজিয়েছে ট্রাকটার ওপর। আর সেই কাঠের ওপর কুলিগুলো বসে আছে।

ড্রাইভার বললে, আপনারা তিনজন এবার ভেতরে আসুন।

বিভূতিভূষণ বেঁকে দাঁড়ালেন। বললেন না, আমরা ওই কাঠের ওপরে বসে যাবো।

প্রবোধবাবু বললেন, না, অসম্ভব। আমার দ্বারা তা হবে না।

আমারও বুক আতঙ্কে কেঁপে উঠলো। ওই কাঠের ওপর বসে উঁচুনীচু পাথরের খানা-খন্দের ওপর দিয়ে লাফিয়ে লাফিয়ে যখন ট্রাক যাবে, তখন ত কিছুতেই নিজেকে সামলানো যাবে না। পতন অবশ্যম্ভাবী। তাছাড়া পরের দিন গা-গতরে যা ব্যথা হবে। আমিও তাই প্রবোধবাবুর পথ অনুসরণ করলুম।

কিন্তু বিভূতিভূষণের মুখে সেই এক কথা। ওর ভেতরে বসলে, 'সিনারী' কিছুই দেখা যাবে না। কাজেই তিনি আমাদের সঙ্গ-ত্যাগ করলেন। একা সেই কাঠের পাহাড়ের ওপর গিয়ে উঠে বসলেন। এবং ওই তিন ঘন্টা ধরে 'সিনারী' দেখতে দেখতে ফিরে এলেন ঠিক সন্ধ্যার মুখে ঘাটশিলায়।

প্রবোধবাবু তাড়াতাড়ি নেমে, একটু রসিকতা করে বললেন, তুমি পড়ে যাওনি ত! আমি ভাবলুম বোধহয় পড়ে গেছো পথে কোথাও, তাই এত চুপচাপ!

বিভূতিভূষণ তাঁর সে কথায় উত্তরে শুধু বললেন, আহা কি অদ্ভুত 'সিনারী', সূর্য অস্ত গেল, মেঘের আড়ালে, পাহাড়ের মাথায় মাথায় ছড়িয়ে পড়লো আলো হাজার সোনার টুকরো হয়ে। কিছুই তোমরা দেখলে না!

প্রবোধবাবু বললেন, যা দেখেছি, অনেক-কাল মনে থাকবে!

আমি শুধু মনে মনে তাঁকে বললুম! হে সৌন্দর্যের সাধক, তোমাকে নমস্কার!

অমৃত পাবলিশার্স প্রাইভেট লিঃ-এর পক্ষে শ্রীসুপ্রিয় সরকার কর্তৃক পত্রিকা প্রেস, ১৪, আনন্দ চ্যাটার্জি লেন, কলিকাতা—৩ হইতে মুদ্রিত ও তৎকর্তৃক ১১।১, আনন্দ চ্যাটার্জি লেন, কলিকাতা—৩ হইতে প্রকাশিত।

নিয়মাবলী

লেখকদের প্রতি

১। 'অমৃতে' প্রকাশের জন্যে সমস্ত রচনার নকল রেখে পাণ্ডুলিপি সম্পাদকের নামে পাঠান আবশ্যক। মনোনীত রচনা কোনো বিশেষ সংখ্যায় প্রকাশের বাধ্যবাধকতা নেই। অমনোনীত রচনা সঙ্গে উপযুক্ত ডাক-টিকিট থাকলে ফেরত দেওয়া হয়।

২। প্রেরিত রচনা কাগজের এক দিকে স্পষ্টাক্ষরে লিখিত হওয়া আবশ্যক। অস্পষ্ট ও দুর্বোধ্য হস্তাক্ষরে লিখিত রচনা প্রকাশের জন্যে বিবেচনা করা হয় না।

৩। রচনার সঙ্গে লেখকের নাম ও ঠিকানা না থাকলে 'অমৃতে' প্রকাশের জন্যে গৃহীত হয় না।

এজেন্টদের প্রতি

এজেন্সীর নিয়মাবলী এবং সে সম্পর্কিত অন্যান্য জ্ঞাতব্য তথ্য 'অমৃতে'র কার্যালয়ে পত্র দ্বারা জ্ঞাতব্য।

গ্রাহকদের প্রতি

১। গ্রাহকের ঠিকানা পরিবর্তনের জন্যে অন্তত ১৫ দিন আগে 'অমৃতে'র কার্যালয়ে সংবাদ দেওয়া আবশ্যক।

২। ভি-পি'তে পত্রিকা পাঠানো হয় না। গ্রাহকের চাঁদা মণিঅর্ডারযোগে 'অমৃতে'র কার্যালয়ে পাঠানো আবশ্যক।

চাঁদার হার

		কলিকাতা		মফঃস্বল
বার্ষিক	টাকা	২০-০০	টাকা	২২-০০
ষান্মাষিক	টাকা	১০-০০	টাকা	১১-০০
ত্রৈমাসিক	টাকা	৫-০০	টাকা	৫-৫০

'অমৃত' কার্যালয়

১১/১ আনন্দ চ্যাটার্জি লেন,

কলিকাতা—৩

ফোন : ৫৫-৫২৩১ (১৪ লাইন)

৭ম বর্ষ

২য় খণ্ড

২২শ সংখ্যা

মূল্য

৪০ পয়সা

Friday, 29th September 1967 শুক্রবার, ১২ই আশ্বিন, ১৩৭৪ 40 Paise

সূচীপত্র

পৃষ্ঠা	বিষয়		লেখক
৬৪৪	চিঠিপত্র		
৬৪৫	সম্পাদকীয়		
৬৪৬	প্রতিধ্বনি		
৬৪৮	ঝড়ের দিন	(কবিতা)	—শ্রীকিরণশঙ্কর সেনগুপ্ত
৬৪৮	মাইলস্টোন	(কবিতা)	—শ্রীরত্নেশ্বর হাজরা
৬৪৯	নীলের বিদায়		—শ্রীহেমচন্দ্র ঘোষ
৬৫৫	অক্টোপাশ		—শ্রীসুভাষ সিংহ
৬৫৯	সাহিত্য ও সংস্কৃতি		
৬৬৪	বন্য মেজাজেও বৈচিত্র্য আছে		—শ্রীবিকাশকান্তি রায়চৌধুরী
৬৬৯	সুখ কাঁদলে সোনা	(উপন্যাস)	—শ্রীপ্রেমেন্দ্র মিত্র
৬৭৩	দেশেবিদেশে		
৬৭৪	ব্যঙ্গচিত্র		—শ্রীকাফী খাঁ
৬৭৫	বৈষয়িক প্রসংগ		
৬৭৬	প্রেক্ষাগৃহ		
৬৮৬	খেলাধুলা		—শ্রীদর্শক
৬৮৭	কলকাতার ফুটবল লীগের কথা		—শ্রীশঙ্করবিজয় মিত্র
৬৮৯	আধুনিক	(উপন্যাস)	—শ্রীবিভূতিভূষণ মুখোপাধ্যায়
৬৯২	মিগুয়েল হেসারভান্তেজ		—শ্রীভৈরবপ্রসাদ হালদার
৬৯৬	অঙ্গনা		—শ্রীপ্রমীলা
৬৯৭	পরী আর নাগরের গল্প	(গল্প)	—শ্রীপরেশ সাহা
৭০১	গৌরাঙ্গ-পরিজন		—শ্রীঅচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্ত
৭০৩	হোটেল সাম্বা	(বড় গল্প)	—শ্রীনির্মল সরকার
৭১১	আমার দেশ আমার কাল	(স্মৃতিচারণ)	—শ্রীসুধীরচন্দ্র সরকার
৭১৩	ভালোবাসা		—শ্রীঅমরেন্দ্র দত্ত
৭১৪	জানাতে পারেন		
৭১৫	পুরনো পাতা : পথিক		—হরিশ্চন্দ্র মিত্র
৭১৮	প্রদর্শনী পরিক্রমা		—শ্রীচিত্ররসিক

'ফাঁদ' প্রসঙ্গে

প্রতারনার যে দু'টি কাহিনী—অতীন মজুমদার মহাশয় অমৃত (১৫ই সেপ্টেম্বর, ৬৭) পত্রিকায় উল্লেখ করেছেন—এর modus operandi হচ্ছে সাধারণ মানুষের লোভকে উস্কিয়ে দেওয়া। এই লোভের শিকার যারা হন আসলে তাঁরাও এক প্রকার অপরাধী। বিচারবুদ্ধি লোপ পাওয়ার মূলে কাজ করে সেই এক প্রতারনারই মনোবৃত্তি। পুরানো-বই এর ভিতরে দশ পাউন্ডের নোট আর ম্যাচ কেসটা খুলে ফেলে পাঁচ পাউন্ড পুরস্কার পাওয়ার মধ্যে দোকানদারকে ঠকানো আর আধ বুড়ো ভদ্রলোককে বোকা ভাবার ব্যাপারটিই মূলত কাজ করেছে। তবে crime does not pay —এই ইংরেজী কথাটি এখানে বিশেষ প্রণিধানযোগ্য। দেখা যাচ্ছে প্রতারক আর প্রতারিত শেষ পর্যন্ত কেউই রেহাই পাচ্ছে না। কিন্তু তা'হলে কি হ'বে, পৃথিবীর সর্বত্রই নূতন নূতন ভাবে প্রতারনার পদ্ধতি উদ্ভাবন হচ্ছে—আর মজার কথা এই যে ব্যাপারটা যখনই এক স্থানে ফাঁস হয়ে যাচ্ছে —অন্যত্র আবার সেই একই কৌশল প্রয়োগ হচ্ছে। এসব ঘটনা পত্র, পত্রিকা, টি-ভি, সিনেমা ইত্যাদির মারফতে প্রচারিত হয়ে সমাজের উপকার ও অপকার দুইই করছে। কিন্তু আপনাদের বহুল প্রচারিত পত্রিকার মাধ্যমে আমি এমন এক প্রকারের প্রতারনার উল্লেখ করছি যা'র সঙ্গে উপরিউক্ত ঘটনার কোন মিলই নেই। এইসব প্রতারনার ক্ষেত্র সাধারনত শিল্পনগরী ও তাঁর উপকন্ঠ। আর শিকার হচ্ছে অসহায় বেকার মহিলা, কিংবা নিতান্ত সরল প্রকৃতির মেয়েরা। এ'রা ঠিক হটাৎ প্রাপ্তি বা অন্যায় লোভের বশবর্তী হয়ে নয়, নিতান্ত পেটের দায়ে কিছু রোজগারের আশাতেই এই ফাঁদে পা দেয়। আরও আশ্চর্যের ব্যাপার অনেকে অবশ্য জানতেই পারে না যে ওরা প্রতারিত হয়েছে। নিজে-দের অক্ষমতার বেদনা নিয়েই নীরবে ভাগ্যকে দোষারোপ করে থাকে।

বহুদিনের বেকার মেয়ে, নাবালক নিয়ে অসহায় বিধবা কিংবা স্বামীর সামান্য রোজগারে সংসার চলে না এ-রকমের অনেক মহিলা পাড়ার এক মাসীমা বা পিসীমার কাছে খবর পেলো, একটা ফুরনের চাকুরী আছে, যদি করতে চাও জুটিয়ে দিতে পারি। কি কাজ? না, কাজটা তেমন কিছু নয়—এই মেসিন পার্টস ঘসা মাজা। দৈনিক একশো ঘসে মেজে ঠিকমতো করে দিতে পারলে এক টাকা পঞ্চাশ পয়সা। একটু চিন্তা করে দেখো না। এ'বাজারে ন'টা টাকা কি কম কথা। কাজ শুরু হয়ে গেলো। চার, পাঁচ দিন কেটেও গেলো। কিন্তু ছ'দিনের দিন চোস্ত ইংরেজী কথাবার্তা, প্যান্ট কোট পরনে পাইপ, মালিক এসে সব নেড়ে চেড়ে দেখলেন। মুখে বিরক্তির চিহ্ন সুস্পষ্ট। ম্যানেজারকে ডেকে ধমকালেন সব কাজ পন্ড হয়ে গেছে কিছু হয় নি। কন্ট্রাক্টের মাল কি ভাবে সাপ্লাই দেবেন ইত্যাদি। বলাই বাহুল্য ম্যানেজারবাবু নিতান্ত দয়াপরবশ হ'য়ে একটি বা দু'টো টাকা দিয়ে কিংবা অনেক ক্ষেত্রে কিছু না দিয়ে শুধু সমবেদনা জানিয়েই বিদায় করলেন মহিলাকে। কিন্তু জিনিসগুলি কী সত্য সত্যই নষ্ট হয়েছে? মোটেই তা' নয়। আসলে প্রায় বিনা পারিশ্রমিকে কাজটি আদায় করার এটি একটি চক্রান্ত। আর তথা-কথিত মাসীমা বা পিসীমারা আসলে আড়-কাঠি হিসেবে কমিশনে এভাবে লোক জোগাড় করে থাকে। প্লাস্টিকস্ কারখানা, ঔষধ, কালি বা পারফিউমরী দ্রব্যাদির প্যাকিং তৈরী কিংবা ছোট খাটো রেডিমেড জামা কাপড় সেলাইর কারখানার কন্ট্রাক্ট নিয়ে মাল জোগানোর ক্ষেত্রেও অনেক সময় এই একই কৌশল খাটানো হ'য়ে থাকবে।

ঘটনাটা উল্লেখ করলাম এ'জন্যই যা'তে অন্যায়ের প্রতিবিধান করা যায়।

ইতি
চিত্তরঞ্জন কর্মকার
কলিকাতা-৩২

আজকের পোষাক-পরিচ্ছদ

গত ২২শে ভাদ্র ১৩৭৪ অমৃতে চিঠি-পত্র বিভাগে প্রকাশিত "আজকের পোষাক পরিচ্ছদ" সম্পর্কে শ্রীউমা মিত্র শ্রীদিলীপ-কুমার পাত্র সম্বন্ধে সমালোচনা করেছেন তা পড়ে কেবল বিস্মিতই হই নি তাঁর নিজের আত্মসমর্থনের প্রয়াস দেখে হাসিও পেল।

এটা সত্য যে, মধ্যযুগে নারীদের পোষাক পরিচ্ছদ আজকের পোষাক পরিচ্ছদ থেকে অন্য রকম ছিল। কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে পাশ্চাত্য এবং প্রাচ্যের মধ্যে বিভেদটাও ভুললে চলবে না। তাদের আচার ব্যবহার, সমাজের ভাবধারা, রীতি নীতি, পোষাক-পরিচ্ছদ সমস্তই তাদের সেই দেশের ক্ষেত্রেই প্রযোজ্য। আমরা যখন সেই সমস্ত নকল করতে যাই তখন ঠিক "কাকের পালক লাগিয়ে ময়ূর হওয়ার" মতই আমাদের অবস্থা হয়ে দাঁড়ায়। গত ৮ই ভাদ্র অমৃতের অঙ্গনা বিভাগে প্রকাশিত "লো কাট" নিবন্ধটি পড়লেই এর কিছুটা হয়তো আন্দাজ করা যাবে।

লেখিকার মত অনুসারে সৌন্দর্যবোধ মানুষের রুচির এবং দৃষ্টিভঙ্গির উপর নির্ভর করে। এটা ঠিক। কিন্তু সেটা যে এক-মাত্র নগ্নতা দিয়েই ব্যক্ত করতে হবে এমন তো কোন কথা নেই।

যতই আমরা বুলি আওড়াই না কেন সৌন্দর্যবোধ অন্তর্নিহিত যেকোন পরিস্থিতিতে নিজের অস্তিত্ব সে অপ্রতিহত রাখবে, আজকের নগ্নতার কুরূপকে ঢাকতে অজন্তা ইলোরার যত দোহাই দেওয়া হোক না কেন যুগের এই হাওয়াকে কি কেউ অস্বীকার করতে পারবে? লেখিকা লিখেছেন পুরুষ-দের সঙ্গে সমস্ত কাজেই ভাগ নিতে হচ্ছে, সেইজন্য বর্তমান যুগের মেয়েরা যেখানে যেমন পোষাক-পরিচ্ছদ ব্যবহার করা প্রয়োজন তেমনটিই করেন। কিন্তু লেখিকা হয়ত এখনও "লো কাট" এ বর্ণিত "চোলি"র কথা ভুলে যাননি। আমার মনে হয় এটা পরিধান করা মানে পঞ্চ-দেশে হাওয়া লাগান এবং নিজের দেহের অপ্রকাশিত অংশের কিছু আভাস দেওয়ার ইচ্ছে ছাড়া আর কিছুই নয়।

যুগোপযোগী পোষাক ব্যবহার করা অন্যায় নয়। কিন্তু এমন পোষাকও পরা উচিত নয় যা সমাজকে অসুস্থ করতে পারে।

আমাদের দেশে লেখকরা নারীকে মাতৃরূপে, ভগিনীরূপে অংকিত করেছেন। কিন্তু সেই নারীই যখন নগ্নরূপে উপস্থিত হন তখন কি আমরা ফ্রয়েডের সিদ্ধান্তকে অগ্রাহ্য করতে পারি?

তপনকুমার দাশ।
মজফরপুর

'আমারে এ আঁধারে' প্রসঙ্গে

৭ম বর্ষ ১৯শ সংখ্যা অমৃত পত্রিকায় শ্রীসুরভি মজুমদার ও সুতপা মজুমদার পত্র লেখিকাদ্বয়ের পত্রের উত্তরে জানাই কবি অতুলপ্রসাদের লখনউএ প্রয়াণের পরে ২ বছর ১১ মাস ২৩ দিনের দিন কবি-পত্নী হেমকুসুম সেন প্রবাসে লখনউ শহরেই তাঁর বাসভবনে পক্ষাঘাত রোগে পরলোকগমন করেন। তারিখ ১৯শে জ্যৈষ্ঠ ১৩৪৪। মৃত্যুকালে তাঁর বয়স হয়েছিল ৫৮ বৎসর।

এই প্রসঙ্গে 'হেমকুসুম দেবী' প্রসঙ্গে আরো কয়েকটি কথা জানানোর প্রয়োজন আছে বলে মনে হল। কবিপত্নী হেমকুসুম সেন অত্যন্ত দয়াশীলা মহিলা ছিলেন। লখনউর বহু জনহিতকর ও মহিলা প্রতি-ষ্ঠানের সঙ্গে তিনি যুক্ত ছিলেন। হেম-কুসুম দেবীর সঙ্গীতে এবং চিত্রকলাতে বিশেষ অনুরাগ ছিল। এস্রাজ-বেহালা ও পিয়ানো বাজনাতেও বিশেষ পারদর্শিনী ছিলেন। লখনউএ কবিপুত্রের পরিবারে কবিপত্নীর কয়েকটি সুঅঙ্কিত ছবি দেখে এসেছিলাম। যেগুলি প্রশংসার যোগ্য। এত গুণ থাকা সত্ত্বেও অনেক প্রতিভার অধিকারিণী হয়েও কবিবর অতুলপ্রসাদের সুবিশাল-সম্মান ব্যক্তিত্ব প্রতিভা ও গুণাবলীর জন্যেই হয়তো তিনি ম্লান হয়েছিলেন।

কল্যাণকুমার বসু,
কলিকাতা—২৯।

অমৃত

শরতের আমন্ত্রণ

আশ্বিনের আকাশে এসেছে উৎসবের আমন্ত্রণ। মন বলছে, ছুটি, ছুটি, ছুটি। বাঙালীর শ্রেষ্ঠ আনন্দ শারদোৎসবের বাঁশি বেজেছে জলে-স্থলে। এখনও মাঝে মাঝে বর্ষণ চলছে হালকা তালে। কিন্তু আশা করা যায়, আর এক সপ্তাহের মধ্যেই আকাশ নির্জল মেঘের ভেলায় ভাসবে। ভারতের অন্যত্র এখনো চলছে অক্লান্ত বর্ষণ। প্রতিবেশী রাজ্য বিহারের প্রলয়ঙ্কর প্লাবন শরৎ-প্রকৃতির বিপরীত চিত্রই তুলে ধরেছে আমাদের চোখের সামনে। এই দুশ্চিন্তা, উদ্বেগ এবং আর্তদের করুণকণ্ঠের আবেদন ছাপিয়ে শরতের উৎসবের বাঁশি কিভাবে বাজবে জানি না। তবু কালটা শরৎ এবং এই কালেই বাংলাদেশে সর্বশ্রেষ্ঠ আনন্দোৎসবের আয়োজন।

জাতির জীবনে আনন্দের অবশিষ্ট আর বেশি নেই। যখন সুদিন ছিল, তখন পুজোবকাশ ছিল বাঙালীর মিলনের দিন, ঘরে ফেরার দিন। দূরে প্রবাসে যাঁরা থাকেন, তাঁরা এই সময়ে ঘরে ফেরার জন্য উন্মুখ হয়ে উঠতেন। বহুদিন পর প্রিয়জনের মুখ দেখা, সবার সঙ্গে প্রীতি-সম্ভাষণ বিনিময়, কুশলবার্তা গ্রহণ, এই ছিল রীতি। এখন ঘর আর বাহির সমান। জীবনের সীমান্ত থেকে নিশ্চিন্তি যেন ক্রমশ অবলুপ্ত। তাই ঘরে ফেরার দিনও আগেকার মতো নিরবচ্ছিন্ন আনন্দের বার্তাই শুধু বহন করে আনে না, তার সঙ্গে নিয়ে আসে উদ্বেগ।

দুর্গোৎসবের বৈশিষ্ট্যই ছিল সামাজিক উৎসবরূপে। এই উৎসবকে কেন্দ্র করে গ্রামভিত্তিক সমাজ পরস্পরের কাছ থেকে কিছু প্রত্যাশা করত। তার অর্থনীতিক দিকও ছিল। প্রতিমা-শিল্পী থেকে শুরু করে পোশাকবিক্রেতা, খাবারবিক্রেতা, পুজোপচার সরবরাহকারী, খেলনাবিক্রেতা সকলেই কিছু-না-কিছু উপার্জন করত। এইভাবেই জড়িয়ে ছিল উৎসবের সঙ্গে আমাদের অর্থনীতি। এই সময়ে চাষীর ঘরে আউশ ধান উঠত, সামনে থাকত আমন ধানের আশা। সারা বছরের পরিশ্রমের পর এই হল তাদের নিশ্চিন্তে আনন্দ উপভোগের সময়।

নগরজীবনের প্রসারে, শিল্পোন্নয়নের প্রভাবে সমাজ-ব্যবস্থার অনেক পরিবর্তন ঘটেছে। কিন্তু আমাদের উৎসবের রূপ বদলায়নি। এখনো আমরা সামাজিক উৎসবরূপেই শারদোৎসবকে শ্রেষ্ঠ মর্যাদা দিই। এবারে বড়ো উদ্বেগের মধ্যে বাঙালীর দুর্গোৎসব আসছে। অর্থনৈতিক সংকটের সমুদ্রে সাধারণ গৃহস্থ হাবুডুবু খাচ্ছে। জিনিসপত্রের চড়া দাম, খাদ্যবস্তুর অভাব, জীবনযাত্রার মান সাধারণ মানুষের পক্ষে অসহনীয় হয়ে উঠেছে। দোকানীরা পসরা সাজিয়ে বসেছেন। 'রিডাকশন সেল' ঘোষণা করেছেন বহু পণ্যবিক্রেতা, রিবেট দিচ্ছেন অনেকে। কিন্তু কলকাতার পুজোর বাজারের দিকে তাকালে বোঝা যায় জনসাধারণের ক্রয়ক্ষমতা কতখানি নিঃশেষিত হয়ে গেছে নিত্যপ্রয়োজনীয় জিনিসের আকাশছোঁয়া দামের দরুণ। প্রাণ রাখতেই গৃহস্থের প্রাণান্ত। এই সময়ে বাড়তি টাকা খরচ করে ছেলেপিলের জন্য নতুন পোশাকই বা কিনতে পারবেন ক'জন? পুজোর ছুটিতে আত্মীয়স্বজনের বাড়িতে বেড়াতে যাওয়ার কল্পনাও বোধহয় কেউ করতে পারছেন না। কারণ, সর্বত্রই খাদ্যাভাব।

এই সময়ে কলকাতা ও বাংলাদেশ থেকে বহু মানুষ ভারতভ্রমণে বেরোন। শরৎকাল ভ্রমণের পক্ষে প্রকৃষ্ট। আগেকার দিনে রাজারা শরৎকালেই বেরোতেন দিগ্বিজয়ে। এ-যুগের দিগ্বিজয়েরই অন্য নাম পর্যটন। হাওড়া স্টেশন স্পেশ্যাল ট্রেনের শব্দে গম গম করত। এবারেও রেল কর্তৃপক্ষ আয়োজন করেছেন বিস্তর। কিন্তু লক্ষণ দেখে মনে হচ্ছে বাইরে যাবার সঙ্গতিও এবার অনেকের কম। তার কারণ এখানেই পুজোর সময়ের বাড়তি আয়ের একটা মোটা অংশ চলে যাবে চাল-ডাল-নুন-তেল কিনতে। ঠিক এমনিভাবে হাত থেকে মুখে তুলে মানুষ বাঁচতে পারে না। তার অবকাশ চাই, আনন্দ চাই। সেইজন্যেই আমাদের দেশে তৈরী হয়েছিল বারো মাসে তেরো পার্বণ। কাজের ফাঁকে ফাঁকে আনন্দ, আনন্দের সঙ্গে সঙ্গে কাজ—এই ভাবেই জীবন সুন্দর হয়, সঙ্গতিপূর্ণ হয়। আজকের এই ছন্নছাড়া সময়ে বাস করে আমরা কর্মসংস্থানও করতে পারছি না, আনন্দও হাতছুট হয়ে যাচ্ছে। সেইজন্যেই এবারের শারদোৎসবে কোথায় যেন একটি করুণ সুরের রেশ শোনা যাচ্ছে।

তবু এর মধ্যেই উৎসব আসছে। বারোয়ারী উৎসবের উদ্যোক্তারা কুমোরটুলী যাতায়াত করছেন। প্রতিমায় রঙ লাগছে। দূরযাত্রীরা বুকিং-কাউণ্টারে লাইন দিচ্ছেন স্লিপিং বার্থের প্রত্যাশায়। শিশুরা আশা করে আছে নতুন পোশাকের। বড়রা আর কিছু না হ'ক ক'দিনের ছুটি পাবেন বহুদিনান্তে দৈনন্দিন একঘেয়েমি থেকে। এই নিয়েই এবারের শরতের আমন্ত্রণ। এই শরৎ চিরনবীন, এই শরৎ চিরপুরাতন। জীবেম শরদঃ শতম্। এই ছিল আমাদের আশীর্বাদের মন্ত্রোচ্চারণ। শরৎ মানুষের মনে আনন্দের বাণী বহন করে আনে, জীবনের আলোকে তা উদ্ভাসিত। শত দুঃখ, বেদনা ও বঞ্চনার মধ্যেও শারদলক্ষ্মীকে আমরা আমাদের আঙিনায় আলপনা-আঁকা পিঁড়িতে বসতে দেবো, নবজীবনের আশীর্বাণী লাভের জন্য।

'ফাঁদ' প্রসঙ্গে

প্রতারনার যে দু'টি কাহিনী—অতীন মজুমদার মহাশয় অমৃত (১৫ই সেপ্টেম্বর, ৬৭) পত্রিকায় উল্লেখ করেছেন—এর modus operandi হচ্ছে সাধারণ মানুষের লোভকে উষ্কিয়ে দেওয়া। এই লোভের শিকার যাঁরা হন আসলে তাঁরাও এক প্রকার অপরাধী। বিচারবুদ্ধি লোপ পাওয়ার মূলে কাজ করে সেই এক প্রতারনারই মনোবৃত্তি। পুরানো-বই এর ভিতরে দশ পাউণ্ডের নোট আর ম্যাচ কেসটা খুলে ফেলে পাঁচ পাউণ্ড পুরস্কার পাওয়ার মধ্যে দোকানদারকে ঠকানো আর আধ বুড়ো ভদ্রলোককে বোকা ভাবার ব্যাপারটিই মুখ্যত কাজ করেছে। তবে crime does not pay—এই ইংরেজী কথাটি এখানে বিশেষ প্রণিধানযোগ্য। দেখা যাচ্ছে প্রতারক আর প্রতারিত শেষ পর্যন্ত কেউই রেহাই পাচ্ছে না। কিন্তু তা'হলে কি হ'বে, পৃথিবীর সর্বত্রই নূতন নূতন ভাবে প্রতারনার পদ্ধতি উদ্ভাবন হচ্ছে—আর মজার কথা এই যে ব্যাপারটা যখনই এক স্থানে ফাঁস হয়ে যাচ্ছে—অন্যত্র আবার সেই একই কৌশল প্রয়োগ হচ্ছে। এসব ঘটনা পত্র, পত্রিকা, টি-ভি, সিনেমা ইত্যাদির মারফতে প্রচারিত হয়ে সমাজের উপকার ও অপকার দুইই করছে। কিন্তু আপনাদের বহুল প্রচারিত পত্রিকার মাধ্যমে আমি এমন এক প্রকারের প্রতারনার উল্লেখ করছি যা'র সঙ্গে উপরিউক্ত ঘটনার কোন মিলই নেই। এইসব প্রতারনার ক্ষেত্র সাধারনত শিল্পনগরী ও তার উপকন্ঠ। আর শিকার হচ্ছে অসহায় বেকার মহিলা, কিংবা নিতান্ত সরল প্রকৃতির মেয়েরা। এ'রা ঠিক হটাৎ প্রাপ্তি বা অন্যায় লোভের বশবর্তী হয়ে নয়, নিতান্ত পেটের দায়ে কিছু রোজগারের আশায় তাই এই ফাঁদে পা দেয়। আরও আশ্চর্যের ব্যাপার অনেকে অবশ্য জানতেই পারে না যে ওরা প্রতারিত হয়েছে। নিজেদের অক্ষমতার বেদনা নিয়েই নীরবে ভাগ্যকে দোষারোপ করে থাকে।

বহুদিনের বেকার মেয়ে, নাবালক নিয়ে অসহায় বিধবা কিংবা স্বামীর সামান্য রোজগারে সংসার চলে না এ-রকমের অনেক মহিলা পাড়ার এক মাসীমা বা পিসীমার কাছে খবর পেলো, একটা ফুরনের চাকুরী আছে, যদি করতে চাও জুটিয়ে দিতে পারি। কি কাজ? না, কাজটা তেমন কিছু নয়—এই মেসিন পার্টস ঘসা মাজা। দৈনিক একশো ঘসে মেজে ঠিকমতো করে দিতে পারলে এক টাকা পঞ্চাশ পয়সা। এক হপ্তা করে দেখো না। এ'বাজারে নগদ টাকা কি কম কথা। কাজ শুরু হয়ে গেলো। চার, পাঁচ দিন কেটেও গেলো। কিন্তু ছ'দিনের দিন চোস্ত ইংরেজী কথাবার্তা, প্যান্ট কোট মুখে পাইপ,—মালিক এসে সব নেড়ে চেড়ে দেখলেন। মুখে বিরক্তির চিহ্ন সুস্পষ্ট। ম্যানেজারকে ডেকে ধমকালেন সব কাজ পন্ড হয়ে গেছে কিছু হয় নি। কন্ট্রাক্টের মাল কি ভাবে সাপ্লাই দেবেন ইত্যাদি। বলাই বাহুল্য ম্যানেজারবাবু নিতান্ত দয়াপরবশ হ'য়ে একটি বা দু'টো টাকা দিয়ে কিংবা অনেক ক্ষেত্রে কিছু না দিয়ে শুধু সমবেদনা জানিয়েই বিদায় করলেন মহিলাকে। কিন্তু জিনিসগুলি কী সত্য সত্যই নষ্ট হয়েছে? মোটেই তা' নয়। আসলে প্রায় বিনা পারিশ্রমিকে কাজটি আদায় করার এটি একটি চক্রান্ত। আর তথাকথিত মাসীমা বা পিসীমারা আসলে আড়কাঠি হিসেবে কমিশনে এভাবে লোক জোগাড় করে থাকে। প্লাস্টিকস্ কারখানা, ঔষধ, কালি বা পারফিউমারী দ্রব্যাদির প্যাকিং তৈরী কিংবা ছোট খাটো রেডিমেড জামা কাপড় সেলাইর কারখানার কন্ট্রাক্ট নিয়ে মাল জোগানোর ক্ষেত্রেও অনেক সময় এই একই কৌশল খাটানো হ'য়ে থাকবে।

ঘটনাটা উল্লেখ করলাম এ'জন্যই যা'তে অন্যায়ের প্রতিবিধান করা যায়।

ইতি
চিত্তরঞ্জন কর্মকার
কলিকাতা-৩২

আজকের পোষাক-পরিচ্ছদ

গত ২২শে ভাদ্র ১৩৭৪ অমৃতে চিঠিপত্র বিভাগে প্রকাশিত "আজকের পোষাক পরিচ্ছদ" সম্পর্কে শ্রীউমা মিত্র শ্রীদিলীপকুমার পাত্র সম্বন্ধে সমালোচনা করেছেন তা পড়ে কেবল বিস্মিতই হই নি তাঁর নিজের আত্মসমর্থনের প্রয়াস দেখে হাসিও পেল।

এটা সত্য যে, মধ্যযুগে নারীদের পোষাক পরিচ্ছদ আজকের পোষাক পরিচ্ছদ থেকে অন্য রকম ছিল। কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে পাশ্চাত্ত্য এবং প্রাচ্যের মধ্যে বিভেদটাও ভুললে চলবে না। তাদের আচার ব্যবহার, সমাজের ভাবধারা, রীতি নীতি, পোষাক-পরিচ্ছদ সমস্তই তাদের সেই দেশের ক্ষেত্রেই প্রযোজ্য। আমরা যখন সেই সমস্ত নকল করতে যাই তখন ঠিক "কাকের পালক লাগিয়ে ময়ূর হওয়ার" মতই আমাদের অবস্থা হয়ে দাঁড়ায়। গত ৮ই ভাদ্র অমৃতের অঙ্গনা বিভাগে প্রকাশিত "লো কাট" নিবন্ধটি পড়লেই এর কিছুটা হয়তো আন্দাজ করা যাবে।

লেখিকার মত অনুসারে সৌন্দর্যবোধ মানুষের রুচির এবং দৃষ্টিভঙ্গির উপর নির্ভর করে। এটা ঠিক। কিন্তু সেটা যে একমাত্র নগ্নতা দিয়েই ব্যক্ত করতে হবে এমন তো কোন কথা নেই।

যতই আমরা বুলি আওড়াই না কেন সৌন্দর্যবোধ অনাবিল। যেকোন পরিস্থিতিতে নিজের অস্তিত্ব সে অপ্রতিহত রাখবে, আজকের নগ্নতার কুরূপকে ঢাকতে অজন্তা ইলোরার যত দোহাই দেওয়া হোক না কেন যুগের এই হাওয়াকে কি কেউ অস্বীকার করতে পারবে? লেখিকা লিখেছেন পুরুষদের সঙ্গে সমস্ত কাজেই ভাগ নিতে হচ্ছে, সেইজন্য বর্তমান যুগের মেয়েরা যেখানে যেমন পোষাক-পরিচ্ছদ ব্যবহার করা প্রয়োজন তেমনটিই করেন। কিন্তু লেখিকা হয়ত এখনও "লো কাট" এ বর্ণিত "চোলি"র কথা ভুলে যাননি। আমার মনে হয় এটা পরিধান করা মানে পৃষ্ঠদেশে হাওয়া লাগান এবং নিজের দেহের অপ্রকাশিত অংশের কিছু আভাস দেওয়ার ইচ্ছা ছাড়া আর কিছুই নয়।

যুগোপযোগী পোষাক ব্যবহার করা অন্যায় নয়। কিন্তু এমন পোষাকও পরা উচিত নয় যা সমাজকে অসুস্থ করতে পারে।

আমাদের দেশে লেখকরা নারীকে মাতৃরূপে, ভগিনীরূপে অঙ্কিত করেছেন। কিন্তু সেই নারীই যখন নগ্নরূপে উপস্থিত হন তখন কি আমরা ফ্রয়েডের সিদ্ধান্তকে অগ্রাহ্য করতে পারি?

তপনকুমার দাশ।
মজফরপুর

'আমারে এ আঁধারে' প্রসঙ্গে

৭ম বর্ষ ১৯শ সংখ্যা অমৃত পত্রিকায় শ্রীসুরভি মজুমদার ও সুতপা মজুমদার পত্র লেখিকাদ্বয়ের পত্রের উত্তরে জানাই কবি অতুলপ্রসাদের লখনউএ প্রয়াণের পরে ২ বছর ১১ মাস ২৩ দিনের দিন কবি-পত্নী হেমকুসুম সেন প্রবাসে লখনউ শহরেই তাঁর বাসভবনে পক্ষাঘাত রোগে পরলোকগমন করেন। তারিখ ১৯শে জ্যৈষ্ঠ ১৩৪৪। মৃত্যুকালে তাঁর বয়স হয়েছিল ৫৮ বৎসর।

এই প্রসঙ্গে 'হেমকুসুম দেবী প্রসঙ্গে আরো কয়েকটি কথা জানানোর প্রয়োজন আছে বলে মনে হল। কবিপত্নী হেমকুসুম সেন অত্যন্ত দয়াশীলা মহিলা ছিলেন। লখনউর বহু জনহিতকর ও মহিলা প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে তিনি যুক্ত ছিলেন। হেমকুসুম দেবীর সঙ্গীতে এবং চিত্রকলাতে বিশেষ অনুরাগ ছিল। এস্রাজ-বেহালা ও পিয়ানো বাজনাতেও বিশেষ পারদর্শিণী ছিলেন। লখনউএ কবিপুত্রের পরিবারে কবিপত্নীর কয়েকটি সুঅঙ্কিত ছবি দেখে এসেছিলাম। যেগুলি প্রশংসার যোগ্য। এত গুণ থাকা সত্ত্বেও অনেক প্রতিভার অধিকারিণী হয়েও কবিবর অতুলপ্রসাদের সুবিশাল-সুমহান ব্যক্তিত্ব প্রতিভা ও গুণাবলীর জন্যেই হয়তো তিনি ম্লান হয়েছিলেন।

কল্যাণকুমার বসু,
কলিকাতা—২৯।

শরতের আমন্ত্রণ

আশ্বিনের আকাশে এসেছে উৎসবের আমন্ত্রণ। মন বলছে, ছুটি, ছুটি, ছুটি। বাঙালীর শ্রেষ্ঠ আনন্দ শারদোৎসবের বাঁশি বেজেছে জলে-স্থলে। এখনও মাঝে মাঝে বর্ষণ চলছে হালকা তালে। কিন্তু, আশা করা যায়, আর এক সপ্তাহের মধ্যেই আকাশ নির্জল মেঘের ভেলায় ভাসবে। ভারতের অন্যত্র এখনো চলছে অক্লান্ত বর্ষণ। প্রতিবেশী রাজ্য বিহারের প্রলয়ঙ্কর প্লাবন শরৎ-প্রকৃতির বিপরীত চিত্রই তুলে ধরেছে আমাদের চোখের সামনে। এই দুশ্চিন্তা, উদ্বেগ এবং আর্তদের করুণকণ্ঠের আবেদন ছাপিয়ে শরতের উৎসবের বাঁশি কিভাবে বাজবে জানি না। তবু কালটা শরৎ এবং এই কালেই বাংলাদেশে সর্বশ্রেষ্ঠ আনন্দোৎসবের আয়োজন।

জাতির জীবনে আনন্দের অবশিষ্ট আর বেশি নেই! যখন সুদিন ছিল, তখন পুজাবকাশ ছিল বাঙালীর মিলনের দিন, ঘরে ফেরার দিন। দূর প্রবাসে যাঁরা থাকেন তাঁরা এই সময়ে ঘরে ফেরার জন্য উন্মুখ হয়ে উঠতেন। বহুদিন পর প্রিয়জনের মুখ দেখা, সবার সঙ্গে প্রীতি-সম্ভাষণ বিনিময়, কুশলবার্তা গ্রহণ, এই ছিল রীতি। এখন ঘর আর বাহির সমান। জীবনের সীমান্ত থেকে নিশ্চিতি যেন ক্রমশ অবলুপ্ত। তাই ঘরে ফেরার দিনও আগেকার মতো নিরবচ্ছিন্ন আনন্দের বার্তাই শুধু বহন করে আনে না, তার সঙ্গে নিয়ে আসে উদ্বেগ।

দুর্গোৎসবের বৈশিষ্ট্যই ছিল সামাজিক উৎসবরূপে। এই উৎসবকে কেন্দ্র করে গ্রামভিত্তিক সমাজ পরস্পরের কাছ থেকে কিছু প্রত্যাশা করত। তার অর্থনীতিক দিকও ছিল। প্রতিমা-শিল্পী থেকে শুরু করে পোশাকবিক্রেতা, খাবারবিক্রেতা, পুজোপচার সরবরাহকারী, খেলনাবিক্রেতা সকলেই কিছু-না-কিছু উপার্জন করত। এইভাবেই জড়িয়ে ছিল উৎসবের সঙ্গে আমাদের অর্থনীতি। এই সময়ে চাষীর ঘরে আউশ ধান উঠত, সামনে থাকত আমন ধানের আশা। সারা বছরের পরিশ্রমের পর এই হল তাদের নিশ্চিন্তে আনন্দ উপভোগের সময়।

নগরজীবনের প্রসারে, শিল্পোন্নয়নের প্রভাবে সমাজ-ব্যবস্থার অনেক পরিবর্তন ঘটেছে। কিন্তু আমাদের উৎসবের রূপ বদলায়নি। এখনো আমরা সামাজিক উৎসবরূপেই শারদোৎসবকে শ্রেষ্ঠ মর্যাদা দিই। এবারে বড়ো উদ্বেগের মধ্যে বাঙালীর দুর্গোৎসব আসছে। অর্থনৈতিক সংকটের সমুদ্রে সাধারণ গৃহস্থ হাবুডুবু খাচ্ছে। জিনিসপত্রের চড়া দাম, খাদ্যবস্তুর অভাব, জীবনযাত্রার মান সাধারণ মানুষের পক্ষে অসহনীয় হয়ে উঠেছে। দোকানীরা পসরা সাজিয়ে বসেছেন। 'রিডাকশন সেল' ঘোষণা করেছেন বহু পণ্যবিক্রেতা, রিবেট দিচ্ছেন অনেকে। কিন্তু কলকাতার পুজোর বাজারের দিকে তাকালে বোঝা যায় জনসাধারণের ক্রয়ক্ষমতা কতখানি নিঃশেষিত হয়ে গেছে নিত্যপ্রয়োজনীয় জিনিসের আকাশছোঁয়া দামের দরুণ। প্রাণ রাখতেই গৃহস্থের প্রাণান্ত। এই সময়ে বাড়তি টাকা খরচ করে ছেলেপিলের জন্য নতুন পোশাকই বা কিনতে পারবেন ক'জন? পুজোর ছুটিতে আত্মীয়স্বজনের বাড়িতে বেড়াতে যাওয়ার কল্পনাও বোধহয় কেউ করতে পারছেন না। কারণ, সর্বত্রই খাদ্যাভাব।

এই সময়ে কলকাতা ও বাংলাদেশ থেকে বহু মানুষ ভারতভ্রমণে বেরোন। শরৎকাল ভ্রমণের পক্ষে প্রকৃষ্ট। আগেকার দিনে রাজারা শরৎকালেই বেরোতেন দিগ্বিজয়ে। এ-যুগের দিগ্বিজয়েরই অন্য নাম পর্যটন। হাওড়া স্টেশন স্পেশাল ট্রেনের শব্দে গম গম করত। এবারেও রেল কর্তৃপক্ষ আয়োজন করেছেন বিস্তর। কিন্তু লক্ষণ দেখে মনে হচ্ছে বাইরে যাবার সঙ্গতিও এবার অনেকের কম। তার কারণ এখানেই পুজোর সময়ের বাড়তি আয়ের একটা মোটা অংশ চলে যাবে চাল-ডাল-নুন-তেল কিনতে। ঠিক এমনিভাবে হাত থেকে মুখে তুলে মানুষ বাঁচতে পারে না। তার অবকাশ চাই, আনন্দ চাই। সেইজন্যেই আমাদের দেশে তৈরী হয়েছিল বারো মাসে তেরো পার্বণ। কাজের ফাঁকে ফাঁকে আনন্দ, আনন্দের সঙ্গে সঙ্গে কাজ—এই ভাবেই জীবন সুন্দর হয়, সঙ্গতিপূর্ণ হয়। আজকের এই ছন্নছাড়া সময়ে বাস করে আমরা কর্মসংস্থানও করতে পারছি না, আনন্দও হাতছুট হয়ে যাচ্ছে। সেইজন্যেই এবারের শারদোৎসবে কোথায় যেন একটি করুণ সুরের রেশ শোনা যাচ্ছে।

তবু এর মধ্যেই উৎসব আসছে। বারোয়ারী উৎসবের উদ্যোক্তারা কুমোরটুলী যাতায়াত করছেন। প্রতিমায় রঙ লাগছে। দূরযাত্রীরা বুকিং-কাউন্টারে লাইন দিচ্ছেন স্লিপিং বার্থের প্রত্যাশায়। শিশুরা আশা করে আছে নতুন পোশাকের। বড়রা আর কিছু না হ'ক ক'দিনের ছুটি পাবেন [illegible]রাস্তে দৈনন্দিন একঘেয়েমি থেকে। এই নিয়েই এবারের শরতের আমন্ত্রণ। এই শরৎ চিরনবীন, এই শরৎ চিরপুরাতন। জীবেম শারদ শতম্। এই ছিল আমাদের আশীর্বাদের মন্ত্রোচ্চারণ। শরৎ মানুষের মনে আনন্দের বাণী বহন করে আনে, জীবনের আলোকে তা উদ্ভাসিত। শত দুঃখ, বেদনা ও বঞ্চনার মধ্যেও শারদলক্ষ্মীকে আমরা আমাদের আঙিনায় আলপনা-আঁকা পিঁড়িতে বসতে দেবো, নবজীবনের আশীর্বাণী লাভের জন্য।

লোকসঙ্গীতে পঙ্কিলতা

দীনেন্দ্র চৌধুরী

বারো মাসে তেরো পার্বণ আর নিয়ত উৎসব বাংলাদেশকে গীতিসম্পদে সমৃদ্ধ করেছে। মনের সুখ-দুঃখ, আশা-নিরাশা বাঙময় হয়েছে তার লোকগাথায় আর গ্রামীণ গীতির অজস্র ধারায়। বিভিন্ন প্রদেশে, জেলায়, লোকগীতি আঞ্চলিক স্বকীয়তায় এক একটি বিশেষ শ্রেণীতে চিহ্নিত হয়েছে। অবশ্য এর জন্য মূলতঃ পারিপার্শ্বিকতার দায়িত্ব রয়েছে অনেকখানি। ভৌগোলিক বিশিষ্টতার জন্যই ধূসর ঊষর পরিবেশে বাউলের প্রাধান্য আর নদীমাতৃক অঞ্চলে ঢেউয়ের দোলায় দোলায়িত অনুভূতি ভাটিয়ালীতে মূর্ত। পূর্ব-পশ্চিম ও উত্তর-বাংলার বহু যুগের সংস্কৃতি মণ্ডিত লোক-সঙ্গীতের যে ধারা বাংলা দেশে প্রবাহিত তার আবেদন সার্বজনীন। নাগরিক সভ্যতার প্রাচীর ভেদ করে ফ্যাসনেবল মহলেও সমভাবে আদৃত। এর কারণ লোকসঙ্গীতের অকৃত্রিমতা। সভ্যতার অন্তরালে সব মানুষই এক, তার অনুভূতি এক, তার জিজ্ঞাসা এক। লোকগীতির ব্যাপ্তি সীমাহীন ...রাজনৈতিক কারণে বাংলা আজ দ্বিধাবিভক্তই শুধু নয়—সংযোগ ব্যবস্থাও বিচ্ছিন্ন। সাংস্কৃতিক আদান-প্রদানও বন্ধ। তবুও বাংলার লোকগীতির সেই চিরন্তন ধারাকে অবিকৃতভাবে বাঁচিয়ে রাখার দায়িত্ব যাদের হাতে—এবিষয়ে তাদের সচেতনতা নৈরাশ্যজনক। ...লোকসংগীত সম্প্রসারণ এবং জনপ্রিয় করে তোলার জন্য আকাশবাণীর উল্লেখযোগ্য ভূমিকা অনস্বীকার্য। কিন্তু আকাশবাণীর কর্তৃপক্ষের উৎসাহে আজ বাংলার বিভিন্ন অঞ্চলের লোক-গীতি শোনার এবং পরিবেশনের যে সুযোগ শ্রোতা এবং শিল্পীদের ওপর অর্পিত; শিল্পীরা তা যথাযথ পালনে অসমর্থ হয়ে পড়েছেন। তার ফলে শ্রোতারা বাংলার ঐতিহ্যমণ্ডিত ট্রাডিশনাল পল্লীসঙ্গীতের কথা ও সুরের ঠিক ঠিক পরিচয় থেকে বঞ্চিত থেকে যাচ্ছেন। পরিবর্তে প্রতিষ্ঠিত গীতিকার ও সুরকারের রচিত এবং সুর-সম্পদে সমৃদ্ধ পল্লীগীতি নামাঙ্কিত এক নতুন শ্রেণীর গানের সঙ্গে শ্রোতারা পরিচিত হয়ে পড়ছেন। কথা ও সুরের মুন্সীয়ানার ঐ জাতীয় গান আধুনিক সঙ্গীতজগতে এক নবতর সংযোজন এবং নিঃসন্দেহে এক বিশেষ ধরনের গবেষণা। কিন্তু লুপ্তপ্রায় বাংলার আঞ্চলিক লোকগীতির সংগ্রহ চর্চা ও প্রচার-এর দ্বারা কতটুকু সাধিত হচ্ছে; লোকসঙ্গীত রসিক মাত্রেই তা অনুধাবন করবেন।

খ্যাতিমান শিল্পীদের নিজ কণ্ঠে একই গান সময়ান্তরে একাধিক প্রচারের সময় সুরান্তর পরিলক্ষিত হয়েছে। এতে একথাই কি প্রমাণিত হয় না যে, গানটি (ট্রাডিশনাল) নিজের খেয়ালখুশীতে সাজানো এবং এ-ধরনের নজীর গানটির অকৃত্রিমতার বিরুদ্ধেই এক উজ্জ্বল সাক্ষী?

শিল্পের ধারক বাহক বলতে বুঝি শিল্পীকেই। তাঁরা এ সম্পর্কে [illegible] না হলে সমস্যার সমাধান অসম্ভব।

[বালার্ক ।। প্রস্তুতি সংকলন ১৩৭৪]

জাতীয়তার মন্ত্রগুরু, মুক্তিদাতা রামমোহন রায়

প্রিয়নাথ জানা

রামমোহন এদেশে জাতীয়তার যেমন আদি মন্ত্রগুরু, আন্তর্জাতিকতারও তেমনি প্রধান পুরোহিত। নিজের দেশ পরাধীন ভারতবর্ষকে যেমন স্বাধীন দেখবার জন্য তাঁর উদগ্র কামনা ছিল, তেমনি পৃথিবীর অন্যান্য সমস্ত দেশও স্বাধীনতা লাভ করুক ইহা তিনি মনেপ্রাণে চাইতেন। তিনি তাঁর কলকাতার বাড়ীতে বসে সংবাদপত্র মারফত বিশ্বের বিভিন্ন দেশের রাজনৈতিক অবস্থার বিষয় অবগত হতেন। কোন দেশে ন্যায় ও সত্যের জয় হয়েছে শুনতে পেলে তাঁর মন আনন্দে ভরে উঠত। তাঁর এই আন্তর্জাতিকতার মূলে ছিল তাঁর প্রগাঢ় বিশ্ব-মানবতাবোধ। এই বোধ সেদিন বিশ্বে একমাত্র রামমোহনের মধ্যেই দেখা গিয়েছিল।

মধ্য ও দক্ষিণ আমেরিকায় স্পেনের বিরাট উপনিবেশ ছিল। এবং ঐসব দেশের অধিবাসীরা স্পেনের অত্যাচারে জর্জরিত হয়ে উঠেছিল। ১৮২১ সালে ঐ উপনিবেশ-গুলি মুক্তি পেলে রামমোহন আনন্দে আত্মহারা হন এবং নিজ ব্যয়ে টাউন হলে একটি বিরাট ভোজসভার আয়োজন করেছিলেন। গ্রীসবাসী [illegible] তুরস্কের অত্যাচার [illegible] অধীনতা থেকে মুক্তিলাভ করুক এ তিনি একান্তভাবে কামনা করতেন। নেপলস-বাসীরা তাদের স্বাধীনতার সংগ্রামে পরাজিত হচ্ছে খবর [illegible] ন ভেঙে, দুঃখে মুহ্যমান [illegible]লেন। 'ক্যালকাটা জার্নালের' [illegible] ও তাঁর বন্ধু [illegible] লিখেছিলেন, "নেপলসবাসীদের [illegible] আমার নিজের দাবী বলিয়া মনে করি, তাহাদের শত্রুদের নিজের শত্রু বলিয়া গণ্য করি। ...তাহাদের সাধনা আমারও সাধনা। ...বাধ্য হইয়া আমাকে এই সিদ্ধান্তে আসিতে হইতেছে যে, ইউরোপ এবং এশিয়ার দেশগুলিতে, বিশেষ করিয়া সেগুলি ইউরোপের উপনিবেশ সেগুলি তাহাদের স্বাধীনতা ফিরিয়া পাইবে, ইহা আমি আর দেখিয়া যাইতে পারিব না।"

পরাধীনতার জ্বালায় জর্জরিত নিপীড়িত আয়ার্ল্যাণ্ডের বিপ্লবের প্রতি রামমোহনের অকুণ্ঠ সমর্থন ছিল। একবার সেখানে ভীষণ দুর্ভিক্ষ দেখা দেয়। রামমোহন তাঁর প্রকাশিত 'মিরাৎ-উল আখবর' পত্রিকা মারফত সাহায্যের আবেদন জানান। ফলে বহু ইংরেজ ও এদেশবাসী আয়র্ল্যাণ্ডে অর্থসাহায্য পাঠিয়েছিলেন। ১৮২২ সালের ১১ই অক্টোবর 'মিরাৎ' পত্রিকায় রামমোহন 'আয়ার্ল্যাণ্ডের বিপদ ও অসন্তোষ' নামে একটি কঠোর সমালোচনামূলক প্রবন্ধ প্রকাশ করেন। ইহা ইংরেজ রাজপুরুষদের সুনজরে পড়েনি। [illegible] 'মিরাৎ' বন্ধ হয়ে গিয়েছিল।

১৮৩০ খৃষ্টাব্দে ফরাসী বিপ্লব সফল হলে রামমোহন আনন্দে অধীর হয়ে সর্বপ্রথম তিনিই বিপ্লবের সফলতার সংবাদ পান, তখন একখানি জাহাজে বিলেত যাত্রা করছিলেন। আফ্রিকার নাটাল বন্দরে জাহাজ থামলে একখানি ফরাসী জাহাজে স্বাধীনতার পতাকা উড়ছে শুনতে পেয়ে তিনি অভিনন্দন জানাবার জন্য ডেকের দিকে দৌড়ে যান। হঠাৎ পা পিছলে পড়ে যাওয়ায় একখানি পা ভেঙে যায়। তবুও তাঁর কোন ভ্রূক্ষেপ ছিল না। অপরের সহায়তায় ডেকে নীত হয়ে সর্বাগ্রে ত্রিবর্ণরঞ্জিত মুক্তির পতাকাকে অভিবাদন জানিয়ে ক্ষান্ত হন। স্বাধীনতার আদর্শে উদ্বুদ্ধ এমন মুক্তিপাগল আদর্শ পুরুষ তৎকালে ঐ দেশে ত ছিলই না, পৃথিবীতেও খুব কম ছিল। আজ স্বাধীন ভারতে সারা বিশ্বে শান্তির কামনায় পৃথিবীর সমস্ত পরাধীন জাতিগুলির স্বাধীনতার যে দাবী ও কামনা করছে, সোয়া শতাধিক বৎসর পূর্বে পরাধীন ভারতে রামমোহন একক সে প্রার্থনা জানিয়েছিলেন। অত্যাশ্চর্য তাঁর মানবপ্রীতি, মনীষা ও দূরদৃষ্টি।

[আমীন ।। চৈত্র-জ্যৈষ্ঠ ঃ ১৩৭৩-৭৪]

দাম প্রতি সংখ্যা তিন টাকা

শারদীয় অমৃত ১৩৭৪ প্রকাশিত হয়েছে

রবীন্দ্রনাথের পত্রগুচ্ছ
অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুরকে লিখিত

তিনটি সম্পূর্ণ উপন্যাস লিখছেন

বিমল মিত্র মহাশ্বেতা দেবী প্রফুল্ল রায়

কয়েকটি সুনির্বাচিত গল্প লিখছেন

অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্ত, আশাপূর্ণা দেবী, আশুতোষ মুখোপাধ্যায়, গজেন্দ্রকুমার মিত্র, দীপক চৌধুরী, নমিতা চক্রবর্তী, নীলিমা মুখোপাধ্যায়, পরিমল গোস্বামী, প্রাণতোষ ঘটক, বনফুল, বিভূতিভূষণ গুপ্ত, বিভূতিভূষণ মুখোপাধ্যায়, মনোজ বসু, লীলা মজুমদার, শেফালী চট্টোপাধ্যায়, শ্রীলেখা বসু, সরোজকুমার রায়চৌধুরী, সুমথনাথ ঘোষ, স্বরাজ বন্দ্যোপাধ্যায় এবং আব্দুল আজীজ আল আমান।

তিনটি ভিন্নস্বাদের গল্প লিখেছেন

তারাশংকর বন্দ্যোপাধ্যায় প্রেমেন্দ্র মিত্র অন্নদাশংকর রায়

সুনির্বাচিত কবিতাগুচ্ছ

বিষ্ণু দে, সঞ্জয় ভট্টাচার্য, অরুণ মিত্র, দিনেশ দাস, কিরণশংকর সেনগুপ্ত, হরপ্রসাদ মিত্র, হরেন্দ্রনাথ সিংহ, মঙ্গলাচরণ চট্টোপাধ্যায়, অরবিন্দ গুহ, কামাক্ষীপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায়, সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়, নবনীতা সেন, রাম বসু, মৃগাঙ্ক রায়, অলোকরঞ্জন দাশগুপ্ত, উমা দেবী, জগন্নাথ চক্রবর্তী, শান্তিকুমার ঘোষ, মৃণাল দত্ত, তরুণ সান্যাল, শক্তি চট্টোপাধ্যায়, শংকর দে, বীরেন্দ্রনাথ রক্ষিত, শান্তনু দাস, অমিতাভ চট্টোপাধ্যায়, আশিস সান্যাল, পবিত্র মুখোপাধ্যায়, গণেশ বসু, সমরেন্দ্র সেনগুপ্ত, চিন্ময় গুহঠাকুরতা, মণীন্দ্র রায়।

একাঙ্ক নাটক : **বুদ্ধদেব বসু** হাসির গল্প : **নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়**

শিকার ভ্রমণ রম্যরচনা রহস্য কাহিনী নক্সা এবং নিবন্ধ

অদ্রীশ বর্ধন, আভা পাকড়াশী, আশা দেবী, কমল চৌধুরী, কৃষ্ণ ধর, দক্ষিণারঞ্জন বসু, দিলীপ বসু, ধীরেন্দ্রনারায়ণ রায়, পশুপতি ভট্টাচার্য, প্রমীলা, বিশু মুখোপাধ্যায়, বিশ্বনাথ মুখোপাধ্যায়, বেলা দে, রথীন্দ্রনাথ রায়, সুকুমার বসু, সুকুমার সেন, সুখময় ভট্টাচার্য, সুধীরচন্দ্র সরকার, ভবানী মুখোপাধ্যায় এবং ক্ষেত্রনাথ রায়।

চলচ্চিত্র বিভাগে

যাঁরা লিখেছেন এবং আলোচিত হয়েছেন

সত্যজিৎ রায়, কানন দেবী, তপন সিংহ, ঋত্বিক ঘটক, মৃণাল সেন, নির্মলকুমার ঘোষ (এন কে-জি), বিজন দত্ত, উত্তমকুমার, সুচিত্রা সেন, সুপ্রিয়া দেবী, মাধবী মুখোপাধ্যায়, সৌমিত্র চট্টোপাধ্যায়, অনুপকুমার, সন্ধ্যা রায়, বিনতা রায়, সত্যব্রত দে, অজয়কুমার বসু।

সিনেমা তারকাদের আট খানি অফসেট ছবি

আলোকচিত্র : সুকুমার রায়

অসংখ্য আলোকচিত্র • রেখাচিত্র • রঙীন ছবি • অফসেট ছবি

অলংকরণ : ধ্রুব রায়, সুধাময় দাশগুপ্ত, নিতাই ঘোষ, সুব্রত ত্রিপাঠী, স্বপন রায়, [illegible] দাশগুপ্ত।

ঝড়ের দিন ॥

কিরণশঙ্কর সেনগুপ্ত

আবার তোমার কাছে ফিরে যাবো। এখন কেবল
ঘরে ফেরবার উজ্জ্বলতা
মাঠের বৈকালী রোদে, প্রায় অন্ধকার
গাছের সারির শীর্ষে, এখন কেবল
সব আকাঙ্ক্ষার শেষে
স্নেহের স্বচ্ছতা। বস্তুত সবাই

চেকপোস্ট-এ এসে একবার
পুরাতন স্মৃতির বকুল
বুকে ক'রে রাখে। এখন কেবল
নিষ্ঠুরতা বিধিলিপি, সমুদ্রসৈকতে
ডিঙিগুলো ডুবে যায় ঝড়ে।।

মাইল স্টোন ॥

রত্নেশ্বর হাজরা

স্মৃতিফলকের জন্য মনোনীত করতে পারি এরকম মুখ
বেশি নেই
সবচেয়ে উজ্জ্বল দিন ক্ষুদ্রতম
সবচেয়ে উজ্জ্বল দিন পাতা ঝরবার শব্দ নিয়ে আসে
স্মৃতিফলকের জন্য
কোনো ঋতু করতল নয়
মনোনীত নক্ষত্রেরও না।

অথচ ভীষণ দ্রুত হেঁটে একটা সাঁকোর অর্ধেক
পেরিয়েছি
সাঁকো দুলে উঠতে ভালোবাসে
সমানবয়সী জল সমানবয়সী নীলাকাশ—
উজ্জ্বল রাত্রিরা ক্ষুদ্রতম। কিন্তু কতদূর
হেঁটে গেলে গোলাপ পোড়ানো ছাই উড়িয়ে দেবার মঞ্চ
ডেকে ওঠে : এদিকে আসুন!

মনোনীত করতে পারি এরকম মুখ বেশি নেই—
অর্ধেক খোঁজার পর করতলে পাতার ফসিল জমতে থাকে
অর্ধেক হাঁটার পর দুপাশের মাঠ খুব চওড়া মনে হয়
ঘুমন্ত শ্রোতার দেহ
যাত্রার আসর থেকে বাইরে আনে স্বেচ্ছাসেবকেরা—
আর কতদূর হাঁটবো! কতোদূর
হেঁটে গেলে মুহূর্তে ভোলানো এক কষ্টিপাথরের মঞ্চ
ডেকে উঠবে : এদিকে আসুন!

নীলের বিদায়

হেমচন্দ্র ঘোষ

১৮৫৭ সাল। ঠিক একশ' বছর আগে পলাশীর প্রাঙ্গণে সিরাজের পরাজয় ঘটে। যুদ্ধের তোড়জোড় চলছে। নবাবী সৈন্য ছাউনি করে বসেছে। কামান বন্দুকে গোলা বারুদ কোনটার কমতি নেই। ইংরেজ তার সৈন্য নিয়ে পরাজয়ের চিন্তায় ব্যাকুল। মিরজাফর, রায়দুর্লভ এদের দেওয়া কথা ইংরেজের একমাত্র সম্বল। ক্লাইভ একটা আমগাছতলায় চিন্তায় নিমগ্ন। এক ঘণ্টা কেটে গেল, ক্লাইভ তখনও যুদ্ধের গতি কি হবে স্থির করতে পারল না। বিশ্বাসঘাতক মিরজাফর তার সঙ্গে বিশ্বাসঘাতকতা করবে কিনা তাই ছিল ক্লাইভের চিন্তার বিষয়। ক্লাইভের আশা নিষ্ফল হল না। পলাশীর রণক্ষেত্রে বিজয়ী ইংরাজ মুর্শিদাবাদের মসনদে জাফর খাঁকে বসিয়ে দিল। দেশের লোকগুলোকে বোকা বানিয়ে ইংরেজ ঘটনা-প্রসঙ্গে এ-দেশের পুরোপুরি মালিক হয়ে বসল। দমদম ও বারাকপুরে হল ক্যান্টনমেণ্ট। সিপাহী আর গোরাপল্টনে ক্যান্টনমেন্ট দুটো ভরে উঠলো। ইংরেজের অর্থনৈতিক শোষণের বিচিত্র পন্থা দেশের লোক ধরতেই পারল না। দেশ বিজয়ের সঙ্গে সঙ্গে বিজয়ীদের ধর্ম প্রতিষ্ঠার চক্রান্ত বেশ পাকা হয়ে উঠল। খৃষ্টান ধর্ম পুরামাত্রায় চালু হল। বার্মায় তখন ভীষণ গোলযোগ। সেখানে ইংরেজদের অস্তিত্ব নির্মূল হবার উপক্রম হয়ে উঠেছে। ভারত হতে সৈন্য পাঠান অপরিহার্য হয়ে উঠল। তখন সবেমাত্র এদেশে এন্‌ফিল্ড রাইফেল চালু হয়েছে। চর্বিমাখা টোটা দাঁতে কেটে রাইফেলে ভর্তি করতে হয়। উভয় সম্প্রদায়ের সিপাহী—হিন্দু ও মুসলমান নিষিদ্ধ প্রাণীর চর্বি দাঁতে কাটিয়ে ইংরেজ তাদের বিধর্মী করে দিচ্ছে. এই ছিল তাদের আশঙ্কা। ফলে তাদের মন বিদ্রোহী হয়ে উঠল। সিপাহীদের মধ্যে গুঞ্জন শুরু হল।

—ইংরেজ দেশ নিয়েছে, এবার জাত-ধর্মও নিল।

প্যারেড থেকে সদ্য-ফেরা সিপাই ছোট ছোট দলে জড়ো হয়ে কর্মপন্থা নির্ধারণ করার জন্যে বসে গেল।

—হিন্দুস্থানে কারো আর জাত থাকবে না।

ঈশ্বরী পাণ্ডে জোর গলায় বলল,

—দাঁতে টোটা আর কাটবো না।

চীৎকার করে সকলে বলে উঠলো—না, কখন না।

সিপাহীদের ভাবগতিক কর্ণেল মিচেলের কানে গেল।

কর্ণেল সিপাহীদের কাছ থেকে অস্ত্র কেড়ে নেবার একটা মতলব আটলেন।

সিপাহীরা তা জেনে ফেললো। তাকে গুলী করে হত্যা করল।

১৮৫৭ সাল—মার্চ মাস। সিপাহীরা প্রকাশ্যে বিদ্রোহ ঘোষণা করল। সিপাহীদের নেতা মঙ্গল পাণ্ডে, সহকর্মী ঈশ্বরী পাণ্ডে দুজনে ধরা পড়লো। তাদের হল কোর্ট-মার্শাল—তাদের গুলী করে মারা হল। বিদ্রোহের আগুন তখন সর্বত্র ছড়িয়ে গেছে। দিল্লী, কানপুর, লক্ষ্ণৌ, মীরাট প্রভৃতি বড় বড় শহরগুলো সিপাহীদের হাতে চলে গেল। বহরমপুর থেকে ১৯নং নেটিভ ইন্‌ফ্যান্ট্রীকে বারাসতে এনে রাখা হল। তারা সেখানে ছাউনি করে রইল। উদ্দেশ্য ছিল বারাকপুর ও বহরমপুরের সিপাহীদের মধ্যে যোগাযোগ বিচ্ছিন্ন করা। বারাকপুর ও বারাসাত মাত্র আট মাইলের ব্যবধান। কাজেই সিপাহীদের যোগাযোগের কোন অসুবিধা হল না। তারা স্থির করল বারাকপুর থেকে সিপাহীরা সোজা কলকাতায় চলে যাবে আর বারাসতের সিপাহীরা যশোর রোড ধরে একযোগে কলকাতায় আক্রমণ চালাবে। ১৮৫৭ সালের ১৪ই জুলাই সেই দিন। হিন্দু পেট্রিয়টের ৯ই জুলাই তারিখে এই সংবাদ প্রচারিত হলে কলকাতার লোকেরা ভীত-সন্ত্রস্ত হয়ে পড়লো। পেট্রিয়ট এই দিনটা 'প্যানিক সান্‌ডে' বলে অভিহিত করলেন।

হুতোম লিখেছেন—যাঁরা বাবুরা তুফানের ভয়ে নৌকোয় উঠতেন না, তাঁরা গঙ্গা পার হয়ে পাড়াগাঁয়ে চলে গেলেন। যাঁরা থাকলেন তাঁদের রাত্রে বাথরুমে যাবার প্রয়োজন হলে গিন্নীর শরণাপন্ন হতে হতো।

—গিন্নী, আমায় ধর, একবার বাইরে যাব।

তখন দিল্লীতে সিপাহীদের উৎসব চলছে। বাহাদুর শা'কে হিন্দুস্থানের সম্রাট বলে ঘোষণা করা হল। উৎসবমুখর দিল্লীর রাস্তায় রাস্তায় জয়োল্লাসে ভরে উঠেছে। কিন্তু সিপাহীদের বিজয়োল্লাস হল ক্ষণস্থায়ী। তাঁতিয়া তোপী, নানা সাহেবের সংগঠনে ত্রুটির মূল্য দিল সিপাহীরা। বিপর্যয়ের মুখে তারা পড়ে গেল। শিখ আর গুর্খারা ইংরেজদের সাহায্য করে সিপাহীদের পর্যুদস্ত করে দিল। বাহাদুর শা'র নাতিরা হুমায়ুন কবরের মধ্যে লুকিয়েছে। হাডসন তাদের টেনে টেনে বার করলে। লাইনবন্দী করে তাদের একের পর এক গুলী করে মারা হইল। বিদ্রোহ সম্পূর্ণরূপে দমিত হোল।

১৮৫৮ সাল। কোম্পানীর রাজত্বের অবসান ঘটেছে। মহারাণী ভিক্‌টোরিয়া এখন ভারত-সম্রাজ্ঞী। লর্ড ক্যানিং হলেন ভাইসরয়। সিপাহী বিদ্রোহের অবসান হবার সঙ্গে সঙ্গেই বাংলাদেশে নীল বিদ্রোহ দানা বেঁধে উঠলো। ক্যানিং মহা চিন্তিত হয়ে পড়লেন। দিল্লীর ঘটনাগুলো তাঁকে যতখানি না বিচলিত করেছিল, বাংলার নীল বিদ্রোহ তাঁকে আরও বেশী অস্থির করে তুলল। রাগ করে কিংবা ভয় পেয়ে যদি কোন নীলকর গুলী ছোঁড়ে, তাহলে সমগ্র বাংলাদেশে আগুন জ্বলে উঠবে এই ছিল তাঁর আশংকা।

> 'a shot fired in anger or fear by one foolish planter, might put every factory in Lower Bengal in flames'.

হ্যালিডে তখন ছোটলাট। ক্যানিং তাঁর পরামর্শ নিয়ে বাঙালী বাবুদের বন্দুক দেওয়া বন্ধ করলেন। হ্যালিডে ছিলেন হিন্দুদের পরম শত্রু। কোলকাতায় প্রতিবাদ উঠলো। নাগরিকদের সভা ডাকা হল গোপাল মল্লিক মহাশয়ের বাড়ীতে। সিপাহীদের বিদ্রোহের সময় কলকাতার বাবুরা সরকারকে সর্বতোভাবে সাহায্য করেছেন, তাঁদের বন্দুক না দিলে খুব অবিচার করা হবে। কত আবেদন, কত নিবেদন সব নিষ্ফল হোল। বাবুরা বন্দুক পেলেন না।

সিপাহী বিদ্রোহের পর নীল বিদ্রোহ বাংলার ইতিহাসে এক বিশিষ্ট স্থান অধিকার করে আছে।

নীল চাষ প্রাগৈতিহাসিক যুগের কথা—তিমিরাচ্ছন্নে আবৃত। রোম সাম্রাজ্যে ভারতের নীল রপ্তানি হোত এবং মধ্যযুগে ইউরোপের সর্বত্র ভারতের নীলের কদর ছিল। ভাস্কো-ডা-গামা ভারতের পথ আবিষ্কার করলেন। পর্তুগীজরা এই নীলের ব্যবসা একাধিপত্য করে নিল। তারপর এই ব্যবসাক্ষেত্রে উদয় হল ডাচেরা। ভারত ইংরেজদের অধিকৃত দেশ। ভিন্নদেশের লোকেরা নীলের ব্যবসা করে ভারত থেকে টাকা লুটে নিয়ে যাচ্ছে। ইংরেজ সহ্য করতে পারল না। ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানী নীলের ব্যবসা শুরু করল।

> 'On some of the first voyages of the English East India Company to Surat, indigo consumed the entire investment and earned the Company a profit of over 400 percent on its investment.'

চাহিদা প্রচুর হলে লোকে ভেজালের কথা চিন্তা করে: উইলিয়ম ফিন্‌চ রাজস্থানের নীল চাষীরা কিভাবে নীলে ভেজাল দিত, তার একটা বিবরণ দিয়েছেন।

> "The growers of Rajasthan combined inferior second and third year growths with good first year leaves very knavishly'.

এত বড় লাভের ব্যবসা ইংরেজ ছাড়তে পারল না। ডিরেক্‌টার বোর্ড বড়লাটকে নির্দেশ দিলেন কয়েকজন ইউরোপীয়ানকে এই কাজে উৎসাহ দিতে, সাহায্য করতে। বাংলা সরকারও প্রয়োজনীয় অর্থসাহায্য করতে লাগলেন। নীল চাষের ব্যাপকতা সারা

বাংলাদেশে ছড়িয়ে পড়ল। ১৮৫৯ সালে ৫০০শ' নীলকুঠি, তার মধ্যে ১৪৩টি থেকে শতকরা ৬০ ভাগ নীল কলকাতার বন্দর থেকে রপ্তানি হত। নদীয়া আর যশোর থেকে বেশী পরিমাণ নীল আসতো। এগারটির মধ্যে নিশ্চিন্তপুরে জেমস্ হিলস্-এর কুঠিটি সর্বপ্রথম। সবচেয়ে বড় কনসার্ণ ছিল বেঙ্গল ইনডিগো কোম্পানী: নদীয়া, মুর্শিদাবাদ ও বারাসাত এদের প্রচুর নীলকুঠি ছিল। জে পি ওয়াইজ ও রবার্ট ওয়াটসনদের কুঠিগুলো ছিল নদীয়া, মুর্শিদাবাদ, রাজসাহী ও পাবনা জেলায়। বেঙ্গল ইনডিগো কোম্পানীর জেনারেল ম্যানেজার লারমুর সাহেব অধিকাংশ সময়ে বারাসতে থাকতেন। কলকাতার সঙ্গে যোগাযোগ রাখার সুবিধার জন্যে তাঁর পক্ষে বারাসতে থাকার প্রধান কারণ ছিল। নীল চালানের গঞ্জ বারাসত থেকে কয়েক মাইল পশ্চিমে লাবণ্যবতী নদীর ধারে বসত। সে স্থানটিকে এখন নীলগঞ্জ বলে। জেমস্ হিলের কাজের ভার ছিল তাঁর ম্যানেজার জেমস্ ফরলং-এর ওপর। ফ্যাক্টরীতে একজন বাঙালী দেওয়ান ও তার অধীনে থাকত কয়েকজন কর্মচারী। এদের কাজ ছিল দাদনের চুক্তিপত্রে কারচুপি করে রায়তদের ভুল বুঝিয়ে সাক্ষর নেওয়া। জর্জ উড্‌নে আর একজন নীলকর। তার কাজ ছিল কালেক্‌টারদের সঙ্গে বন্ধুত্ব করে লভ্যাংশ বাড়িয়ে দিয়ে তাদের ভাগ দেওয়া। শ্রীরামপুরের মিশনারী দলে যোগদানের আগে উইলিয়ম কেরী এই উড্‌নির কর্মচারী ছিলেন। নীলকর সাহেবদের অমানুষিক অত্যাচারের কাহিনী বিলাতে ডিরেক্‌টাররা জ্ঞাত হলেন। গভর্নর-জেনারেলকে উপযুক্ত ব্যবস্থা গ্রহণ করার জন্যে নির্দেশ দেওয়া হল। এর ফলে ১৮৫৯ সালে পাশ হলো রেণ্ট অ্যাক্‌ট্। এই আইনের আগে প্রজাদের যখন-তখন উচ্ছেদ করা চলতো। ১৮৫৯ সালের আইনে নীলকর সাহেবরা, যারা জমিদার হয়ে বসেছে, তাদের খুব অসুবিধা হতে থাকে। এই আইন সংশোধন করার জন্যে ইন্‌ডিগো প্লাণ্টার্স অ্যাসোসিয়েশন গঠিত হয়। গভর্নমেণ্ট এই সংস্থাকে স্নেহের চোখে দেখতে লাগলেন। দেশী জমিদাররা প্লাণ্টার্সদের ঘোর বিরোধী, দেশে তখন শিক্ষাদীক্ষার একান্তই অভাব। পাঠশালার পড়ুয়ারা একটু লিখতে শিখলেই ফ্যাক্‌টরীতে পাঁচ টাকা মাইনের চাকরীর জন্যে উমেদারী করে বেড়াতো। কলকাতায় তখন ইংরেজী শিক্ষার প্রচলন হচ্ছে। যারা ডিরোজিওর ছাত্র, কুসংস্কারে ভরা হিন্দু-ধর্মে তাদের আর কোন আস্থা রইল না। এদের বলা হোত ইয়ং বেঙ্গল। দ্বারকানাথ ঠাকুরের কথামত জর্জ টমসন এই ইয়ং বেঙ্গলদের নিয়ে একটা সংস্থা গঠন করলেন —বেঙ্গল ব্রিটিশ ইণ্ডিয়া সোসাইটি। ইউরোপীয়ানরা এই দলের সভ্য হলো। এই সোসাইটির মুখ্য উদ্দেশ্য ছিল বর্ণবিদ্বেষ দূর করা বা প্রশমিত করা। ব্লাক অ্যাক্ট—মফঃস্বলের সাহেবদের ওপর প্রযোজ্য হলো। মফস্বলের সাহেবদের তীব্র আন্দোলন শুরু করে দিল। দেওয়ানী মামলার বিচার মফস্বলের আদালতেই হতো। রামগোপাল ঘোষ সে সময়ের একজন বিখ্যাত বক্তা। তিনি ব্লাক অ্যাক্টের সাপক্ষে তাঁর মত প্রকাশ করতে আরম্ভ করলেন। আইনের চোখে সবাই সমান—কোন লোক বিশেষ সাধিকার পাবার হকদার হতে পারেন না। ঠিক এই সময়ে আর একটা ব্যাপার ঘটে গেল। রেভারেণ্ড আলেকজাণ্ডার ডাফ কতকগুলো হিন্দু ছেলেকে খৃষ্টান করে ফেললেন। কলকাতার বুকে বর্ণবিদ্বেষ যেন শত শিখায় জ্বলে উঠলো। বাঙালী সমাজ সাহেবদের হয়ে পড়ল ঘোর বিরোধী। ১৫৫৭ সালে কলকাতার নাগরিকরা এক সভা ডাকলেন। বিখ্যাত পণ্ডিত রাজেন্দ্রলাল মিত্র সেই সভার সভাপতি। তিনি বল্লেন—নির্বোধ ইংরেজগুলোর আর দোষের অন্ত নেই। যেখানেই গেছে তারা সেখানকার সর্বনাশ না করে ছাড়েনি। এখন কলকাতার হলো তিনটি দল। প্লান্টার্সরা ইয়ং বেঙ্গল দলের ওপর যেন মারমুখী হয়ে উঠলো। কাদা ছোঁড়াছুড়ির মতো কদর্য ও জঘন্য ভাষায় পরস্পর পরস্পরকে আক্রমণ করতে কেউই ইতস্তত করল না। মিশনারী সম্প্রদায় মীমাংসার জন্য তৎপর হলেন বটে কিন্তু তাদের ইচ্ছা সফল হয়নি। ফটোগ্রাফিক সোসাইটি থেকে রাজেন্দ্রলালকে বিদায় নিতে হল।

'Because of his speech Rajendra Lal Mitter was expelled from membership by the Europeon members.' Hindu Patriot.

প্লান্টার্সরা সমর্থন পেলো ইংলিশম্যান ও থিওবোল্ডের সম্পাদিত বেঙ্গল হারকারুর। নীলকরদের স্বার্থরক্ষার জন্যে এই কাগজ দুখানি বদ্ধপরিকর হয়ে উঠলো। হরিশ মুখার্জী তাঁর হিন্দু পেট্রিয়টে রায়তদের দুঃখ-দুর্দশার করুণ কাহিনী প্রকাশ করতে লাগলেন। ১৮৫৬ থেকে ১৮৬১ সাল পর্যন্ত হিন্দু পেট্রিয়টে প্লান্টার্সদের বিরুদ্ধে তীব্র আক্রমণ তাদের জর্জরিত করে তুললো। হিন্দু পেট্রিয়টের যশোরের সংবাদদাতা ছিলেন শিশিরকুমার ঘোষ। অকর্মণ্য ম্যাজিষ্ট্রেটদের কুকীর্তি, স্বজাতির ওপর অযথা পক্ষপাতিত্ব তাদের অন্যায় অত্যাচারের সকল কাহিনী শিশিরবাবু কাগজে দিতে লাগলেন। শিশিরকুমার একবার লাটসাহেবের বিরুদ্ধে তীব্র সমালোচনা করে বসলেন। সাহেব মহলে বেশ একটু চাঞ্চল্যের সৃষ্টি হোল। লেখকের খোঁজ পাওয়া গেল না। পুলিশ এ বিষয়ে আর অগ্রসর হয়নি।

বারাসাত, নদীয়া, যশোর ও পাবনা এই কটা জেলা, ছিল নদীয়া ডিভিসনের অন্তর্গত। দেশময় অরাজকতা। ধন-প্রাণ রক্ষে করার মতো কঠোর শক্তি তখন বাংলায় ছিল না। দস্যু-তস্করদের বেশ সমীহ করে চলতে হোত। এ সময়ে হল 'ফারাইদী' সম্প্রদায়ের অভ্যুত্থান। সেটা একটা বিরাট অভিশাপ। জমিদারদের লুঠ-পাট করে নিজেদের দলপুষ্ট করাই ছিল এই সম্প্রদায়ের একমাত্র উদ্দেশ্য। নীলকরদের মধ্যে যারা জমিদার হয়ে পড়েছিল তারাও এই অত্যাচারের বলি হল। ১৮৫৫-৫৭ সালে সাঁওতালরা তীর-ধনুক নিয়ে বেরিয়ে পড়ল। তারাও করল বিদ্রোহ। তাদের লক্ষ্য ছিল জমিদার আর নীলকর। নৌবাহিনীর ছাটাই, করা কতকগুলো ভবঘুরে যোগাড় করে সাহেবরা ভলেণ্টিয়ার দল গড়ে তুলল। তারা শান্তিরক্ষা করতে যশোরে গেল। তাদের শান্তিরক্ষার নমুনা হল—যশোর ও তার আশেপাশের গ্রামগুলোতে লুঠ-তরাজ, দাংগা-হাংগামা বাধিয়ে দিয়ে লোকদের ভয় দেখিয়ে অর্থোপার্জন করা। লোকেরা অতিষ্ঠ হয়ে উঠলো। শিশিরকুমার লাটসাহেবকে দোষী করলেন—পেট্রিয়ট ফলাও করে তাঁর বক্তব্য প্রকাশ করা হলো। তখন যশোরের ম্যাজিষ্ট্রেট মিঃ মোলনি। লাটসাহেবের বিরুদ্ধে সমালোচনা ম্যাজিষ্ট্রেট মোলনি ঘৃতাহুতির মতো ক্রোধে জ্বলে উঠলেন। ইন্ধন যোগাল ঝিকারগাছার প্লান্টার ম্যাকেঞ্জি। অপকর্মে কেউ তার জোড়া ছিল না। কপোতাক্ষের কূলে ম্যাকেঞ্জির প্রাসাদ। তার নিকটেই নীলকুঠি। পালা করে গ্রামের লোকদের সাহেবের বাড়ী প্রত্যহ পরিষ্কার করে দিতে হোত। মেয়েদেরও সাহেব বাড়ী আসতে হোত। যারা হুকুম না মানতো তাদের ভাগ্যে হত কয়েদ আর পেতো ধান-চাল একসংগে অর্ধসিদ্ধ আহার। ম্যাকেঞ্জি নাকি প্রজাদের টিট করতে জানতো। মাঝে মাঝে বন্দুক উঁচিয়ে তাদের গুলি করার ভয় দেখাতো। শিশিরকুমার ম্যাকেঞ্জির বিরুদ্ধে কঠোরতর ভাষায় পেট্রিয়াটে লিখলেন। ম্যাকেঞ্জির অত্যাচারের মাত্রা আরও বেড়ে গেল।

সন্ধ্যা সবে মাত্র নেমেছে। ঝিকারগাছা হাটের লোকজন সব ফিরে চলেছে। বড় বড় নৌকোয় মাল বোঝাই করে মাঝিরা চলেছে তাদের গন্তব্য স্থানে। তাদের আর দেরী করলে চলবে না। সাহেবের হাওয়া খেতে বেরুবার সময় হয়েছে।

—কচি!

—কি বাপজী!

—মোর বড্ড জ্বর হয়েছে গা, হাত, পা কাঁপছে, মুই হাল ধরতি পারব না।

দ্বাদশ বৎসরের বালক বাপের কাছে এলো।

—তাই তো গাডা দেখছি খুব গরম! বাপজী, তুমি একটু শোও, এই থালেটা চাপা দি।

—ওরে না, না! লা সরা এমানি-সাহেবের লোক এসে যাবে! এর ওপর বেত খেলে আর বাঁচবো না।

—ইঃ! কে মারে দেখি না।

সাহেব পাইক এসে হাজির।

—এই লা হটাস নি কেন?

ছেলে এগিয়ে এল।

—বাপজীর বড্ড জ্বর কিনা। ঐ দেখ না শুয়ে আছে।

—আরে বিটলে ছোঁড়া! তুই সরাস নি কেন?

—মুই কি হাল ধরতি পারি!

—হাটে কেন এসেছিল?

পাইক তাকে ঘাড় ধরে ফেলে দিল।

মাঝি কাঁপাতে কাঁপতে উঠে এলো।

সর্দার সাহেব! মোর বড্ড জবর! ও শিন্দু ও কি হাল টানতি পারে।

একটু সময় দাও!

পাইকের আর সবুর সইল না। মাল-গুলো নদীর জলে ছুঁড়ে ফেলল।

—কি করলে সর্দার সাহেব! মোর মুয়ের অন্ন পানিতে দিলে!

সাহেবের আসার সময় হয়েছে। ঘাটে বাহিরের কোন নৌকো দেখলে তার আর পিঠের চামড়া থাকবে না। সাহেবের তো আসতে একটু দেরী হচ্ছে শুধু বিবির যে এখনও সাজ-গোজ শেষ হয়নি।

ম্যাকেঞ্জির বিবি একটা গ্রামের মেয়ে। গোমস্ত তফাজ্জেল তাকে সংগ্রহ করে এনেছে। ম্যাকেঞ্জির খুব পছন্দ। স্বাস্থ্যটা বেশ ভাল। যখন প্রথম আসে তখন নাকি সে তত ফরসা ছিল না। সাহেবের সাড়ী এসে তার রং নাকি বেশ ফুটেছে। ম্যাকেঞ্জির ইচ্ছে ছিল তার একটা বিলিতী নাম দেবে কিন্তু তার তাতে খুব আপত্তি। তাই ম্যাকেঞ্জি তাকে শুধু 'বিবি' বলেই ডাকত। অবার কেউ কেউ তাকে বিবি-বেগম বলতো। তাতেই সে খুশী। ম্যাকেঞ্জির কুব্যবহার, তার অমানুষিক অত্যাচারের কথা চারিদিকে ছড়িয়ে পড়ল। বারাসাতের চাষীরা নীলকুঠি উচ্ছেদের সংকল্প নিল। যশোর, বারাসাত ও নদীয়া পরস্পর পার্শ্ববর্তী জেলা। চাষীদের এক-জোট করার ব্যবস্থা গ্রহণ করলেন শিশির-কুমার। নড়ালের রামরতন রায় এই কাজে এগিয়ে এলেন। রতন রায়ের দেওয়ান মহেশ চট্টোপাধ্যায় সকল ব্যবস্থা সম্পূর্ণ করে ফেললেন। পাবনার চাষীরাও এই জোটে যোগ দিল। মহেশ অতি দুষ্ট, দুর্দান্ত তাকে জেলে না পুরলে নীলকরদের সমূহ বিপদ। তারা ধর্ণা ছিল জেলা ম্যাজিস্ট্রেটের কাছে। জেলা ম্যাজিস্ট্রেট ডুনিসকে নির্দেশ দিলেন, সত্যি মিথ্যা যে কোন অজুহাতে মহেশকে আটক করতে হবে। রাণাঘাটের জমিদার শ্রীগোপাল পাল-চৌধুরী, জয়রামপুরের তালুকদার রাম মল্লিক আর শিবনিবাসের বৃন্দাবন সরকার নীলকর সাহেবদের বিরুদ্ধে একটা বিরাট দল গঠন করলেন। নড়ালের রতনবাবুর সঙ্গে যোগাযোগ রেখে কর্তব্য ঠিক করে নেওয়া হল। রাণাঘাট পালচৌধুরীদের বাড়ীদের গোপন সভা হতে লাগল। রাম মল্লিকের ছোট ভাই গিরীশের ওপর সংগঠনের ভার পড়লো। স্থির হল— বীর কৃষ্ণপুরের ফ্যাকটরী প্রথমে আক্রমণ করা হবে। মিয়ার্স ম্যানেজার। মিয়ার্স একটু ভীতুগোছের লোক। ফ্যাকটরীর দেওয়ান এ শুনে ভয়ে ভয়ে সব কথা সাহেবকে জানিয়ে দিল।

—গাঁয়ের লোকেরা একজোট হয়েছে সাহেব! গিরীশ মল্লিক তাদের মোড়ল। দু-একদিনের মধ্যে ফ্যাকরী ভেঙ্গে তচনচ করে দেবে। জীবন নিতে তারা একটুকু পেছুবে না।

—তোমার কত লোক?

—যে লোক আছে তাতে রক্ষে হবে না। যশোরের বড় বড় লোকেরা লেঠেল পাঠিয়ে সাহায্য করবে শুনেছি।

দেওয়ান মাথায় হাত দিয়ে মাটিতে বসে পড়লেন।

—সাহেব! আমাদের কি হবে! আমাদের বাড়ী-ঘর তারা আর আস্ত রাখবে না। পেলো মাগুরোর শিশির ঘোষ তাদের দলে যোগ দিয়েছে। প্রজারা সেখান থেকে সকল রকম উস্কানি পাচ্ছে।

পরদিন সকালে মিয়ার্স ছুটলো যশোরে মোলনি ও স্কীনারের কাছে। সাহেব নালিশ করল গিরীশ মল্লিকের নামে পরোয়ানাও বার হল। গিরীশের ওপর অত্যাচারের কাহিনী শিশিরকুমার হিন্দু পেট্রিয়েট প্রকাশ করলেন। স্কীনার একটা মামুলি তদন্তের আদেশ দারোগাকে দিলেন। দারোগা অতসত বুঝল না মিয়ার্সের বিরুদ্ধে রিপোর্ট দিল। দারোগার তদন্তে প্রকাশ, মিয়ার্স গিরীশকে আটক করে ছিলো। পুলিশের সাহায্যে তাকে উদ্ধার করা হয়েছে।

যশোরের কোর্ট—বিচারক স্কীনার।

—দারোগারা কখন সত্যি রিপোর্ট দেয় না। মোক্তারবাবু!

গিরীশবাবুর মোক্তার গোপী চট্টো-পাধ্যায় মিয়ার্স-এর বিরুদ্ধে মামলা করার অনেক যুক্তি দেখালেন।

স্কীনার রেগে উঠল নথিপত্র ছুঁড়ে ফেলে চীৎকার করে বলে উঠল—

—তুমি মোক্তার গোপী চট্টোপাধ্যায় আদালত অপমাননার দায়ে তোমার জরিমানা হোল!

মোলনি গিরীশের মামলা ডিসমিস করে দিল কিন্তু পিমার্সের মামলার তখনও শেষ হয়নি। গিরীশের বিরুদ্ধে যে পরোয়ানা বেরিয়েছিল তার বলে গিরীশকে ধরে কৃষ্ণ-নগরে চালান দেওয়া হোল। হ্যারসন নগদ চার হাজার টাকার জামিনে গিরীশকে মুক্তি দিয়ে যশোরে বিচারের জন্য পাঠিয়ে দিলেন। লোকদের কুপরামর্শ দিচ্ছে এই অভিযোগে গিরীশের জেল হল।

নীলকরেরা কিন্তু মিশনারীদের ভাল চোখে দেখতো না। মিশনারীরা প্রায় সকলেই জার্মাণ। এঁরা নীলকরদের অত্যাচারের প্রতিবাদ করতে কখনও সংকুচিত হতেন না। ১৮৬০ সালের ৮ই জুন ইংলিশম্যান এই মিশনারীদের বিরুদ্ধে অভদ্রোচিত আক্রমণ করলো।

'Where is the German's father land? is a question we have heard with all sorts of replies — the wondering German of the very lowest class, being nearly as un-wel-come an intruder upon strange soils as the Chinaman and for very much the same reasons.'

পাদরী বোমওয়েস কিছুদিনের জন্যে দেশে গিছলেন, ফিরে এসে চাষীদের সংকটাপন্ন অবস্থা দেখে মর্মাহত হয়ে পড়েন। নীলের দাম একেবারে পড়ে গেছে। নিড়ানোর খরচ চাষীদের ওঠে না, বোম-ওয়েস পেট্রিয়টে আর ইণ্ডিয়ান ফিল্ড কয়েকখানা চিঠি দিলেন। নীলকর সাহেবরা বোমওয়েস-এর ওপর খড়্গহস্ত হয়ে উঠলো। বেনামী চিঠিতে এই সাধু মিশনারীর চরিত্র সম্বন্ধে নানা রকম কুৎসা রটনা করে দিল। তখন দেশে আইন শৃংখলা ভেঙ্গে পড়ছে। রতনপুরের গাউস্মিথ ভোবাপাড়া গ্রামটিকে ধ্বংস করে দিল। স্মিথের লেঠেলরা ঘর জ্বালিয়ে দিল, তাদের চাল-ধান লুঠ করে নিয়ে গেল। মেয়েদের ওপর কদর্য ব্যবহারে তাদের উত্যক্ত করে তুলল। মিশনারী লিংক কলকাতার চার্চ মিশনকে জানালেন কিন্তু লাট হ্যালিডে অভিযোগ অসত্য বলে অগ্রাহ্য করে দিলেন।

১৮৬০ সালের ২৪ মার্চ বড়লাট আইনসভা ডাকলেন। ইণ্ডিগো কনট্রাক্ট বিল পাশ হোল। ভারত সচিব উড সাহেব ক্যানিংকে লিখলেন—দেওয়ানী ব্যাপারটা ম্যাজিস্ট্রেটদের এক্তিয়ারভুক্ত করা আইনসংগত নয়। এ সত্ত্বেও আইন বলবৎ করা হল। ১৮৬০ সালের ২৬ মে হরিশচন্দ্র লিখলেন—'dozen corrupt, bribe-eating magis-trates have prostituted themselves in executing the Act.' নদীয়ার ম্যাজিস্ট্রেট হারসেন, ম্যাকলিন, বেটস প্লাটাস ও ম্যাকনীলকে তাঁর জেলার অন্তর্গত মহকুমাগুলোর ভার দেন। রায়ত-দের চুক্তিপত্র অনেক ক্ষেত্রে জাল প্রমাণিত হোল হ্যারসেল দলিলগুলিতে টিপ নেবার ব্যবস্থা করলেন। ১৮৯২ সালে পুলিশ হ্যারসেলের এই ব্যবস্থা মেনে নিয়ে দলিলে টিপ দেওয়া চালু করে। আইন পাশের এক মাসের মধ্যে হ্যারসেলের সঙ্গে ফরলং-এর সংঘর্ষ বেধে গেল। ফরলং-এর গ্রামে হ্যারসেল গিয়েছেন। আইনের ব্যাখ্যা করে ম্যাজিস্ট্রেট গ্রামবাসীদের বুঝিয়ে দিচ্ছেন। ফরলং বাধা সৃষ্টি করতে আরম্ভ করল। হ্যারসেল তাকে গ্রাম ছেড়ে চলে যেতে আদেশ দিলেন। এত বড় অপমান ফরলং সহ্য করত পারল না। ডিভিশনাল কমিশনার গ্রোট সাহেবকে ম্যাজিস্ট্রেটের রূঢ় ব্যবহার সম্বন্ধে নালিশ করল। তখন পাঁচ-জনের একসঙ্গে গ্রামে ঘোরাফেরা নিষিদ্ধ হল, এমন কি পাঁচজনে একসঙ্গে ভিন্ন গ্রামেও যেতে পারবে না। মুলনাথ কুঠীর ক্যাম্বেলকে মারপিট করার অপরাধে রায়ত-দের শাস্তি হলো। শান্তি ভঙ্গ করলে গুরুতর শাস্তি হবে গ্রামে গ্রামে জানিয়ে দেওয়া হল।

৮ এপ্রিল বনগ্রামে গুরুতর শান্তি-ভঙ্গের কারণ ঘটে গেল। দারোগা নারায়ন-পুর গ্রামে এসেছে। চাষীদের কর্তব্য যে কি দারোগা তা জানিয়ে দিচ্ছে। গাঁয়ের লোকেরা জড় হয়ে তাকে ঘিরে ধরল।

—যাও-যাও, মোরা আইন মানি না—কখখনো মানব না। ভবিষ্যতের আইন অমান্য আন্দোলনের বোধহয় এই-ই গোড়ার ঘটনা! দারোগা চারজন মোড়লকে গ্রেপ্তার করল। গাঁয়ের প্রায় দুশজন লোক লাঠি, সড়কি, বল্লম নিয়ে দারোগাকে আক্রমণ করে বসল। তারা ধৃত ব্যক্তিদের ছিনিয়ে নিয়ে গেল। ম্যাজিস্ট্রেট ম্যাকলীন পরদিন এলেন সেই গ্রামে। কুঠীর জমাদারকে নিয়ে ঘরে-ঘরে ঢুকে নীল চাষের বাধা শত্রু বলে জমাদারের

ধারণা তাদের মধ্যে তিনজনকে গ্রেপ্তার করলো। গ্রামেই বসে তখনই বিচার হোল। তাদের দুমাস জেল ও মোটা জরিমানা দিতে হোল। ঐ সব চৌকিদার দারোগার সঙ্গে অসহযোগ করেছিলো তাদের চাকরী গেল।

বিনা ওয়ারেন্টে রাত্রিবেলা রায়তদের গ্রেপ্তার করার জন্যে মিঃ গ্রোট ম্যাকলীনকে ধমক দিলেন। দামুর হুদা একটা বড় কনসার্ণ সেখানে স্বয়ং ফরলং থাকতেন। ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেট সি বেটস তার কথামত মোক্তার তিনু চক্রবর্তীকে ছয় মাস জেল ও দুশ টাকা জরিমানা করল কারণ নীল না বুনতে মোক্তারবাবু নাকি রায়তদের প্ররোচনা দিয়েছেন। মিঃ গ্রোট এ ব্যাপারে খুব অসন্তুষ্ট হলেন এবং বেটসের কাজের ওপর নজর রাখতে জেলা ম্যাজিস্ট্রেটকে আদেশ দিলেন। যশোরের ম্যাজিস্ট্রেট মোলনি, লোকটা ছিল বুদ্ধিমান ও কর্মঠ কিন্তু নীলকরদের পাল্লায় পড়ে কালো নেটিভদের ওপর অত্যাচার কম করেনি। তার এ্যাসিস্টেন্ট স্কীনার পদে পদে ঘোরতর অন্যায় করেও মোলনির সাহায্যে রক্ষা পেয়ে গেল। শিশিরকুমার ছিলেন স্কীনারের শত্রু। হিন্দু পেট্রিয়টে স্কীনারের বিরুদ্ধে গুরুতর অভিযোগগুলো দেশময় ছড়িয়ে পড়ল। স্কীনার খুব উত্তেজিত। শিশিরকুমারকে জেলে পোরার চেষ্টা করার জন্যে দারোগা গিরীশ বোসকে নির্দেশ দিলন। দেশে তখন সন্ত্রাসের রাজত্ব চলছে। মিয়ার্স একজন ক্রুর ও নিষ্ঠুর প্রকৃতির প্লান্টার। যশোরের এমন ম্যাজিস্ট্রেট ছিল না যে তার কুঠীতে খানাপিনা করেনি। তার চাল-চলন ছিল এক রাজকীয় ব্যাপার। বাংলার লাটও বোধহয় এমন জাঁক-জমকে থাকতেন না।

মিয়ার্সের কাছারীবাড়ী। সকালেই সব রায়তরা এসে জুটেছে সাহেব তাদের ডেকেছে। কাছারীবাড়ীর ফরাস পাতা তক্তাপোষের ওপর গোমস্তা তফজ্জেল। সামনে একটা ছোট ডেক্স।

—রহিমে! দশ বিঘের মধ্যে আট বিঘেতে তোর নীল বুনতে হবে।

—মুই বুনবো না—নীল আর মুই বুনবো না।

তফজ্জেল ক্রোধে ফেটে পড়ল।

—হুকুম মানবি না? মজাটা দেখতে চাস?

রহিম উঠে দাঁড়াল, চিৎকার করে বলে উঠলো—মুই মানব না? কয়েদ করবে? তাও সই!

তফাজ্জেল উঠে গেল। মিয়ার্সের সঙ্গে পরামর্শ করে রহিম ও তার সঙ্গী দুষ্টু রায়তদের নামে নালিশ করল। বিচারক স্কীনার। বিচারে জেল ও কুড়ি টাকা করে জরিমানা হল। শিশিরকুমার প্রতিবাদের ঝড় তুললেন। পেট্রিয়টে প্রকাশ হল স্কীনার নীলকরদের খুশীমত কাজ করে, তাদের সঙ্গে তার ডিনার চলে, নাচ-গানের মজলিসে প্ল্যান্টার্সদের সঙ্গে স্কীনার অনেক রাত পর্যন্ত কাটিয়ে যায়। দারোগা গিরীশ লেখকের নাকি খোঁজ পেয়েছিল কিন্তু লেখককে ধরার মত কোন প্রমাণ ছিল না।

স্কীনার গিরীশকে ডাকলেন।

—গিরীশ (গিরীশ) তুমি অপদার্থ।

—হুজুর।

—তোমার বদলি করব।

—হুকুমের অপেক্ষায় রলাম।

তখন মীরগঞ্জের নীলকুঠিতে গোলযোগ বেধে উঠেছে। জন ড্রাইভারের হুকুম, গাঁয়ের লোকদের পিটিয়ে দুরুস্ত কর। মারপিট লাঠিয়ালরা ছুটেছে গাঁয়ের ভিতর। মারপিট শুরু হয়ে গেল, খবর এলো, একজন মরা গেছে। স্কীনার খবরটা চাপা দেবার প্রাণপণ চেষ্টা করল। ২৮ নভেম্বর পেট্রিয়টে শিশিরবাবু খবরটা প্রকাশ করে দিলেন! স্কীনার পড়ল মহা ফাঁপরে। অনিচ্ছা সত্ত্বে জজের কাছে তাদের বিচারের জন্যে মামলাটা পাঠিয়ে দিল। সাক্ষীদের হাত করতে হবে তফাজ্জেলকে নির্দেশ দেওয়া হল।

—রহিম এ মামলায় তো তুমি সাক্ষী?

—না গোমস্তা সাহেব! মোর ভাই কোরমে।

তফাজ্জেল গোমস্তা করিমের খোঁজে চলে গেল।

যশোরের জজ বেলী সাহেবের কোর্ট। সাহেব খুব কড়া লোক, কারও খাতির রাখেন না। বিচার বিভাগের সুনাম তিনি রক্ষা করে চলেছেন।

করিম সাক্ষীর কাটগড়ায়।

—আসামীদের চিনি। তারা সব ফরিদপুরের লেঠেল। কুঠীতে থাকে—মাহিনে পায়।

দ্বিতীয় প্রশ্নের উত্তরে করিম বলল—একটা সাহেবকে দেখেছিলুম কিন্তু তাকে চিনতে পারিনি।

মিঃ লংগুভেলী ক্লার্ক তখনকার দিনে হাইকোর্টের সবচেয়ে নামকরা ব্যারিস্টার। যশোরে এসেছেন ড্রাইভারের পক্ষ নিয়ে। ড্রাইভার খালাস পেল আর সব আসামীদের শাস্তি হল।

কোর্টের মাঠ উল্লাসে ভরে উঠেছে।

—সিন্নীবাবু (শিশিরকুমার) এ তোমার জয়।

—না চাচা! এ জয় তোমাদের জয়। জনগণের জয়!

লোকে চিৎকার করে উঠল—জয় সিন্নীবাবুর জয়।

যশোর আর নদীয়া নীল চাষে সব জেলাগুলো থেকে এগিয়ে ছিল। যশোরে অত্যাচারটা হয়েছিল সবচেয়ে বেশী। নদীয়ার হ্যারসেন সাহেব খুবই ভাল লোক কিন্তু তাঁর সহকর্মীরা ছিল দুর্বিনীত, নিষ্ঠুর বিচারহীন ও অপদার্থ। সেইজন্যে নদীয়ার লোকদের দুর্ভোগের অন্ত ছিল না। দীনবন্ধুবাবুর নীলদর্পণে নদীয়ার অবস্থা দর্পণের মতই পরিষ্কার ও তাতে সত্যের প্রকাশ পেয়েছে। বারাসাতের গোলযোগটা প্রশমিত ছিল ম্যাজিস্ট্রেট মিঃ ইডেনের প্রচেষ্টায়। যেখানে নীলকুঠি খোলেনি সেই সেই জায়গায় গিয়ে বিচার শুরু করে দিল। অশ্বত্থতলায়, তেঁতুলতলায় তার কোর্ট বসত, এক দল পাঞ্জাবী ঘোড়সওয়ার তাকে সব সময়ে ঘিরে থাকত। নীলকুঠির গুদোম-ঘর — অন্ধকূপের মত—মোলনী সেখানে কয়েদ করত রায়তদের। এসব গুদোম-ঘরে ১৫ জন আবাদাদি করেও কোনক্রমে থাকতে পারত কিন্তু মোলনী এক একবারে ৪০।৫০ জন করে সেখানে কয়েদী পাঠাত। তারা দম ফেলতে পারত না। জীবনের মায়ায় তারা নীল বুনবে এই প্রতিশ্রুতি দিয়ে মুক্তি নিত।

করিমপুরে নদীয়া জেলায়। ম্যাজিস্ট্রেট টেলর। রায়তদের জব্দ করার জন্যে নীলকরদের সঙ্গে ষড়যন্ত্রে লিপ্ত। প্রকাশ্যে মারপিট করলে জানাজানি হয়ে যায়। পেট্রিয়ট একজন দুষ্ট লোকের কাগজ সব খবর ফাঁস করে দেয়। টেলর নতুন পথ ধরল। নীল না বোনার জন্যে একই জমির দরুণ নীলকরদের দুবার করে ক্ষতিপূরণ দিতে আরম্ভ করল। শিশিরকুমারের নজর এড়াল না। তিনি কর্তৃপক্ষের কাছে এই অন্যায় কাজের জন্যে তীব্র প্রতিবাদ করলেন। যশোরে নীল বিদ্রোহের এটা অন্যতম কারণ। গঙ্গার দক্ষিণ দিকটা তখন পাবনা জেলার মধ্যে। ১৮৬০ সালে কুষ্টিয়া পাবনা জেলার এক মহকুমা। কুষ্টিয়ার চাষীরা সবাই সঙ্ঘবদ্ধ। তারা লাঠিয়ালও ভাল। নড়ালের রতন রয় আর তাঁর দেওয়ান মহেশ কুষ্টিয়ার চাষীদের আশ্বাস দিলেন। রতনবাবুর কাছারীবাড়ী লাঠিয়ালদের সর্দার রঘু এসেছে। চাষীরা কেউ নীল বুনছে না। ম্যাজিস্ট্রেট মুসপ্রাট মিলিটারী পুলিশ চেয়ে পাঠালেন। পাবনায় শান্তিভঙ্গের নাকি ভীষণ আশঙ্কা।

—কত লেঠেল দিতে পারবে রঘু?

—দেওয়ানজীর কৃপায় পঞ্চাশ জন পুলিশকে ঘায়েল করার মত ক্ষমতা রাখি।

চাষীরা একজোট হয়েছে, ম্যাজিস্ট্রেটের কানে সে খবরটা গেলে গোলযোগ আরও বাড়বে বিদ্রোহের আগুন সারা বাংলায় ছড়িয়ে পড়বে এই আশঙ্কায় লাটসাহেব পাবনায় কোন মিলিটারী পুলিশ দিলেন না।

চারিদিকে অশান্তি, গোলযোগ। মুসপ্রাট একটা মারাত্মক ভুল করে বসলেন।

—নীল মোরা বুনব না।

চিৎকার করে বলে উঠল একজন চাষী। মুসপ্রাট তাকে গ্রেপ্তার করলেন। আদালত অবমাননার দায়ে সেই চাষীকে জেল দিলেন। লাটসাহেব গ্রান্ট রাজশাহীর কমিশনারকে জানালেন—এইভাবে শাস্তি দেওয়া অন্যায় এবং তাতে গোলযোগ বাড়বে ছাড়া কমবে না।

Magistrates jailing a man for contempt of court was unwarrented and absurd since he was not holding court at the time.'

বারাসাত জেলাটা কলকাতার খুব কাছে। এখানকার চাষীরা নীল চাষের ঘোর বিরোধী। চাষীরা সব সময়ে কলকাতার সঙ্গে যোগাযোগ রেখে থাকে। ১৮৫৫ সালে জে এইচ ম্যানগেলস বারাসাতের ম্যাজিস্ট্রেট। বেঙ্গল ইনডিগো কোম্পানীর বারাসাত অঞ্চলে নীলের চাষ ভাল হল না। ম্যাজিস্ট্রেট জোর করে দাদন দেওয়া বন্ধ করে দিলেন। নীলকর সাহেবরা ভীষণ অপমানবোধ করল। তাঁরা লাটসাহেবের কাছে ম্যাজিস্ট্রেটের বিরুদ্ধে অভিযোগ আনলেন। হ্যালিডে তখন বাংলার লাট। তাঁর কাছে

ম্যানগেলস হলেন অপদার্থ। বারাসাত থেকে তাঁকে বদলী করা হল। অ্যাশলি ইডেন এবার ম্যাজিস্ট্রেট। তিনি লর্ড অকল্যাণ্ডের ভাগনে। নীলকরদের মোটেই ধামাধরা লোক নন। তাঁর কতকগুলো মন্তব্যের প্রতিবাদ করল নীলকরেরা। তাদের কথা, ইডেন একটু বেশী মাত্রায় রায়ত ঘেঁসা হচ্ছেন। রায়তদের রক্ষা তিনি করেছেন—তার কারণও একটু ছিল। হাবড়ার নীলকর প্রেসটাইট ও ওয়ারনর রায়তদের দাদন নিতে বাধ্য করার জন্যে ইডেনকে অনুরোধ করলেন। ফল হল তার উল্টো। তিনি মিরহাটের ডেপুটিকে আদেশ দিলেন

> 'Since the ryotts can sow in their lands whatever crop they like, no one can without their consent and by violence sow any other crops'

অন্যান্য ম্যাজিস্ট্রেটদের মত ইডেন তার কথায় উঠবে বসবে লারমুর এটাই ভেবেছিল কিন্তু ইডেন ভিন্নধরনের লোক। লারমুরের চিঠির উত্তর দিলেন ইডেন

> 'I donot consider that it is desirable to carry on a correspondence with a party to a suit in my court on subjects connected with the case'.

নীলকর সাহেবরা কমিশনার গ্রোট সাহেবের কাছে দরবার করল 'Eden had done all in his power to instigate the ryotts not to sow' গ্রান্টসাহেব তখন বাংলার লাট। ইডেনের কাজের তিনি সমর্থন জানালেন। বেঙ্গল প্ল্যান্টার্স অ্যাসোসিয়েশন বড়লাটের কাছে

দরবার করল কিন্তু কোনই ফল হল না। নীলকর আর্থার দুজন রায়তকে প্রকাশ্য রাস্তায় বেত মেরেছে। আবার তাদের কয়েদ করে রেখেছে। ক্যামবেল আর্থার অতি ধূর্ত অতি শয়তান। লেঠেলদের হুকুম দিল মীরগঞ্জের আশে-পাশের গ্রামগুলো তারা লুটপাট করে নিজেদের খরচ নিজেরা চালিয়ে নেবে। ফ্যাক্টরী থেকে তারা কিছুই পাবে না। ফরিদপুরের গুন্ডারা দলে দলে মীরগঞ্জের নীলকুঠিতে চাকরী নিল। গভর্নমেণ্ট সবই জানলেন। ম্যাজিস্ট্রেট বেনব্রীজ গেলেন তদন্ত করতে। আর্থার তাঁকে খুব আপ্যায়ন করে ডিনারে নিমন্ত্রণ করলেন। শীতল সর্দার মীরগঞ্জের একজন বড় রায়ত। ঠিক করল তারা গ্রামের দু-একজন সাহেবের সঙ্গে দেখা করে তাদের দুঃখের কথা বলবে। বেনব্রীজ নৌকো থেকে নেমেছেন। সাহেব একটু দার্শনিক গোছের লোক। মেঠো পথ—এগিয়ে চলেছেন নীলকুঠির দিকে।

—সাহেব! সেলাম।

বেনব্রীজ মুখ তুললেন—কে তুমি?

—হুজুরের প্রজা আমরা। নীলকুঠির সাহেবরা আমাদের ভিটেছাড়া করছে, আমরা এখন মরিয়া। তুমি সাহেব, আমাদের রক্ষে কর। তুমিই পারবে।

—নীলকরেরা ভাল কাজ করছে না? কোলকাতার লোকেরা তো তাদের খুব গুণগান করে!

—সাহেব! আমাদের সঙ্গে চল সব দেখিয়ে দেব।

বেনব্রীজ একটু চিন্তা করলেন। তাদের সরল কথার মাঝে কোন কৃত্রিমতার একটুকু আভাস পেলেন না।

—চল, তোমাদের সঙ্গে যাব?

নীলকুঠি থেকে একটু দূরে একটা ছোট্ট ঘরের কাছে শীতল সাহেবকে নিয়ে গেল। ঘরটা যশোরের কয়েদখানার মত একই আয়তনের—সেঁতসেঁতে। ঘরের ছাদ যেন হুমড়ি খেয়ে মেঝের ওপর পড়-পড় হয়েছে।

একটি মাত্র দরজা ঢুকতে গেলে মাথায় ঠেকে। দরজায় চাবি দেওয়া।

শীতল ঘরটার সামনে দাঁড়াল।

—সাহেব কিছু শুনতে পারছো?

বেনব্রীজ দরজার আরও কাছে গেলেন। বেশ খানিকক্ষণ পরে পরে অবোধ্য কথার রেশ যেন ভেসে আসছে—কণ্ঠস্বর অতিক্ষীণ, জড়তায় ভরা।

—দরজা ভাঙো।

—কে ভাঙবে?

সাহেবের মনটা বড় খারাপ ঠেকতে লাগল।

—আমি বলছি—ভাঙো!

—তুমি তো হুকুম দিয়েই খালাস, তারপর যখন তুমি চলে যাবে?

—কি হবে?

গলাটা দেখিয়ে শীতল বলল,—এটা আর তখন ধড়ে থাকবে না, সাহেব থাকবে না।

সাহেব গম্ভীর হয়ে গেলেন।

—আচ্ছা দেখা যাবে!

—সাহেব! লোকের রূপসী বউ মহাশত্রুর। আমাদের পুন্নি, নীলকর সাহেবদের লোকেরা তাকে ধরে নিয়ে গেল। সে ছিল বড্ড সুন্দরী, স্বামীটা হল পাগল, ছোট ছেলেটা ছটফট করে মরেই গেল।

—ওসব এখন শুনতে চাইনে। এদের বের কর।

দরজা ভাঙা হল। ঘর থেকে দুজন বেরুল, কঙ্কালসার, মৃত্যুর জন্যে যেন অপেক্ষা করছিল।

—তোমরা ক'দিন আছ?

তাদের মধ্যে যে বয়স্ক, সে ডুকরে কেঁদে উঠল।

—আমরা দু মাস আছি সাহেব। ধানচালে মিশিয়ে আমাদের খেতে দিত, তাও আবার এক বেলা।

বেনব্রীজ তাদের মুক্তি দিলেন। নীলকুঠিতে ডিনার খাওয়া হল না। বেনব্রীজ আর্থার ও তার পাঁচজন লোককে ধরে যশোরে পাঠালেন বিচারের জন্যে। বিচারক মোল্‌নি। বিচারে অবশ্য আর্থারের জরিমানা হল পাঁচশ টাকা। আর তার লোকজনদের হল জেল। পরবর্তী কালের চীফ সেক্রেটারী মিঃ সিটনকার তখন যশোরের জেলা জজ। এই বিচার সম্বন্ধে তাঁর মন্তব্য হল

'the owner of the factory, an Englishman should leave the court with a fine while the servant a Native and an old man to boot, should leave the court not under fine, but for the jail'.

ল্যাশিংটন এখন নদীয়ার কমিশনার। ম্যাকলীনের কাছ থেকে তিনি সব মামলাগুলো কেড়ে নিলেন। সেগুলো বেল ও ডেভিডসনের ওপর বিচারের ভার পড়ল। ম্যাকলীন কৃষ্ণনগরে আর ম্যাকেঞ্জিকে মজঃফরপুরে বদলী করা হল। আইনের মেয়াদ ফুরিয়ে গেছে। বারাসাত ও নদীয়া জেলায় রেণ্ট-কন্ট্রোলার নিয়োগের প্রয়োজন হল। বারাসাতের প্রথম রেণ্ট-কন্ট্রোলার হলেন হার্সেল। মিঃ মরিসনকে দেওয়া হল যশোরে। বারাসতে শান্তি রক্ষার জন্যে দু কোম্পানী মিলিটারী পুলিশ থাকল। নদীয়ার তখন অশান্তির ঘোর কাটে নি। দিগম্বর ও বিষ্ণুচরণ বিশ্বাস শিশিরকুমারের দুই বিশিষ্ট বন্ধু। বাঁশবাড়ী নীলকুঠির মালিক জন হোয়াইট। দিগম্বর ও বিষ্ণু ঐ কুঠির কর্মচারী ছিলেন। জন খুব বুড়ো, খুব ভাল লোক। দেশে ফিরলেন। যাবার আগে ছেলে উইলিয়মকে উপদেশ দিলেন—লোকদের সঙ্গে কখনও কুব্যবহার কর না। রায়তদের ওপর যাতে কোন রকম অত্যাচার না হয় তা সর্বতভাবে দেখবে।

বৃদ্ধ জন চলে যাবার পর দুর্বিনীত যুবক বাপের উপদেশ ভুলে গেল। ম্যাজিস্ট্রেট ককরেলের সঙ্গে খুব ভাব। এই বন্ধুত্বের সুযোগ নিয়ে উইলিয়ম তার অত্যাচার মাত্রা দিন দিন চরমে তুলল। কথায় কথায় রায়তদের চাবকে পিঠের চামড়া ছিঁড়ে দিত। দিগম্বর ও বিষ্ণু এসব দেখে কাজ ছেড়ে দিলেন। উইলিয়ম রাগে আত্মহারা হয়ে উঠল। দিগম্বরের বাড়ী পোড়াগাছায়। দাদনের টাকা দিগম্বর যাতে আদায় না করতে পারে তার জন্য উইলিয়ম লোক পাঠিয়ে গ্রামের লোকদের উৎসাহ দিতে লাগল। উভয়ের মধ্যে রেশারিশি চূড়ান্ত পর্যায়ে গিয়ে পৌঁছল। এদিকে নীল চাষ বন্ধ করার জন্যে দিগম্বরও গ্রামে গ্রামে ঘুরতে লাগলেন। হাঁসখালির গোবিন্দপুর ছাড়া আর কোন গ্রামের লোক দিগম্বরের কথায় সায় দিল না। গোবিন্দপুর সায়েস্তা করতে হবে। উইলিয়ম ক্ষেপে গেল। লেঠেল যোগাড় হল প্রায় একশ। হাতীও সংগ্রহ হল। দিগম্বর এরকম একটা যে ঘটবে আগেই তা বুঝতে পেরেছিলেন। তিনিও লোক সংগ্রহ করলেন। বেশ একটা খণ্ডযুদ্ধ হয়ে গেল। উইলিয়মের লোকেরা হেরে পালাল। নদীয়ার জজ টোটেনহামের কাছে বিচার হল এবং বিচার উইলিয়মকে ৩০০০্‌ টাকা জরিমানা দিতে হল। নীল চাষে বিচারের নামে অবিচার তখন বাংলার অস্থিমজ্জা ভেঙে যেন গুঁড়ো করে দিয়ে গেল। হরিশচন্দ্র লিখলেন

—The wretched officials prostituted themselves on this occasion'.

গভর্নমেণ্ট পূর্ণ তদন্তের জন্যে ইনডিগো কমিশন বসালেন। দ্বারকানাথ ঠাকুরের ভাগনে চন্দ্রমোহন চট্টোপাধ্যায় একমাত্র বাঙালী সদস্য। হ্যারসেন এসে সাক্ষী দিলেন abduction of Harimati clearly proved. নদীয়া, যশোর, বারাসাত থেকে বহু লোক সাক্ষী দিয়ে গেল। নীলকরদের উৎপাত ও অত্যাচারের কথা ইডেন সাহেব সাক্ষ্যে বললেন। খোলায়ে কয়েদ করা রায়তদের কিভাবে উদ্ধার করেছিলেন তাও সাক্ষী দিবার সময় কমিশনে উল্লেখ করেন। ভারতসচিব মিঃ উড লর্ড গ্রাণ্টকে জানালেন 'It is a most able document.' এর পর বাংলাদেশ থেকে নীলের চাষ এক প্রকার নিশ্চিহ্ন হয়ে যায়।

এখানে থাকতে রুনির একদম ভালো লাগে না। কেউ তাকে ভালবাসে না। না বাবা না মা। না বড়দি না মেজদি। শুধু বকুনি দেয়। অথচ সে ভালবাসার কাঙাল। খালি নিষেধ তার শাসন। শুধু কি বাবা মা? বড়দি আর মেজদি ফাঁক পেলেই তার চুল ধরে টানে। রুনি যন্ত্রণায় চিৎকার করে উঠলে, বড়দি অদ্ভুতভাবে মুখ বেঁকিয়ে বলে, 'আবার ঢং করে কান্না কিসের! বারণ করা সত্ত্বেও জানালা খুলে কি দেখছিলি? বল, কার দিকে তাকিয়েছিলি?'

রুনি কোন জবাব দেয় না। মাথা নীচু করে থাকে। সে দেখতে ভাল, যা পরে তাতেই তাকে বেশ মানায়—বাঃ এ বুঝি তার অপরাধ! অন্তত দিদিদের হাবভাবে তাই মনে হয়। বড়দি যা মোটা হচ্ছে দিন-দিন, আর ওর বিয়ের কোন চান্স নেই। গায়ের রঙ ময়লা। নাক চোখ মুখ কেমন ভোঁতা। মেজদির অবশ্য খুব একটা বয়স হয়নি। উনিশ কুড়ি হবে। কিন্তু স্বাস্থ্য একদম নেই। রুনি অনেকদিন রাত্রে হঠাৎ কিসের শব্দে ঘুম ভেঙে গেলে আবছা আলোতে মেজদিকে কাঁদতে দেখেছে। সাহস করে কোনদিন জিজ্ঞেস করেনি কেন কাঁদছে। সে সব বুঝতে পারে। সামনের পুজো পেরিয়ে গেলে ষোলয় পা দেবে।

চোখে জল এলেও রুনি মনের মধ্যে বেশিক্ষণ দুঃখ চেপে রাখতে পারে না। ফ্রকের উল্টোদিক দিয়ে চোখদুটো মুছে নেয়। একবার আড়চোখে তাকায় বড়দির দিকে। উপুড় হয়ে শুয়ে নবেল পড়ছে। মেজদি রাত নটার মধ্যেই ঘুমে বিভোর। ও শুধু ঘুমোয়। বেশি ঘুমোলে নাকি মোটা হবে। মেজদির এক বান্ধবী বোধকরি একথাই ওকে বুঝিয়েছে। গায়ে গতরে মাংস হবে। ছাই হবে। রুনি ঠোঁট উলটে ভেংচি কাটল।

এই ছোট ঘরে ওর দমবন্ধ হয়ে আসে। কখনো মনে হয় ওর মাথার উপরে নীচু ছাদ যে-কোন মুহূর্তে ভেঙে পড়তে পারে। ফলে রীতিমত অস্বস্তি নিয়ে রাত্রে শুয়ে থাকে। একদম ঘুমিয়ে না পড়া পর্যন্ত স্বস্তি পায় না। বড়দি আর মেজদি সব সময় ওর খুঁত ধরার জন্যে তৎপর। ওদের চোখের সামনে রুনি আড়ষ্ট হয়ে চলাফেরা করে। কী বিশ্রী লাগে! কে পড়ার বই-এর পাতা ওলটায়। ঝাপসা লাগছে অক্ষরগুলি। গুন্‌গুন্‌ করে পড়তে থাকে। কিন্তু কানে কিছু ঢোকে না। খক্‌খক্‌ কাশির শব্দ। বাবার ঘর আরও ছোট। ও ঘরে গিয়ে পড়বার জো নেই। বাবা খেঁকিয়ে ওঠে। হাঁপানির রোগী। কাশতে কাশতে তার দমবন্ধ হয়ে আসে। গলার শির ফুলে মোটা হয়। তখন বাবার দিকে তাকিয়ে রুনির ভয়, কান্না পায়।

একতলায় ছোট দুখানা ঘর। বারান্দার একপাশ ঘিরে রান্নার জায়গা। জ্ঞান হবার পর থেকে রুনি এই দেখে আসছে। আলো বাতাস ঘরে ঢোকে না বললেই চলে। বাবা প্রায়ই মাকে শুনিয়ে আক্ষেপের সুরে বলে, 'একটা যোয়ান মদ্দ ছেলে থাকলেও বুঝতাম। ভগবান যাকে বঞ্চিত করেন, সর্বদিক থেকেই......।'

—থাম! মা যেন ফোঁস করে ওঠে, আস্তে বলো। ওরা শুনতে পাবে। ওদের দিকে তাকিয়ে রাত্রে ঘুম হয় না।

বাবা উত্তেজিতভাবে হাত নেড়ে কি বলতে যান। অকস্মাৎ কাশির দমকে চোখের ঘোলাটে মণিদুটো গোলাকার হয়ে ওঠে। মা ছুটে গিয়ে বাবার বুকে হাত বুলোয়। এমন বহুদিন হয়েছে। রুনির চোখের সামনে সব ভাসতে থাকে। সে কিছু ভোলে না। রাত্রে ঘুম ও স্বপ্নের মধ্যে সে শৈশবে ফিরে যায়।

আজকাল সে ভাবে বড়দি আর মেজদি যদি কোন কাজ করতে পারতো...। ওরা কিছু টাকা রোজগার করতে পারলে তারা অন্য কোথায়ও উঠে যেতে পারতো। আলোবাতাস আসে সর্বদা এমন ঘরে। তাহলে তার এমন দম আটকে আসতো না রুনির।

—পড়ার শব্দ শুনছি না কেন? বড়দি ধমক দিয়ে উঠল, হাঁ করে কার ধ্যান হচ্ছে!

রুনির বুক কেঁপে ওঠে। শুকনো মুখে তাড়াতাড়ি সে অনুচ্চস্বরে পড়তে থাকে। কিন্তু কোনকিছু আর কানে ঢুকছিল না। শুধু বড়দিকে শোনাবার জন্যেই যেন পড়া। নইলে কান ধরে টানবে—এমনকি চড় চাপড়ও লাগাতে পারে। কেঁদে কোন লাভ নেই। বাবা বা মা বড়দির উপরে কোন কথা বলবে না। মনে হয় ওরা বড়দিকে ভয় করে মনে মনে।

একটু আগে শিসের শব্দ শুনে ওর বুক থরথর করে কেঁপে উঠেছিল। রুনি আর স্থির থাকতে পারেনি। পায়ে পায়ে এগিয়ে রাস্তার ধারে জানলাটার একটা পাট সামান্য ফাঁক করে রন্টুকে বুক চিতিয়ে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখেছে।। একপলক চোখাচোখিও হয়েছে। রুনি সামান্য মুচকি হেসে সরে এসেছে। ভাগ্যিস বড়দি কিম্বা মেজদি কিছু টের পায়নি।

তবু বকুনি খেতে হলো। রাস্তার ধারের জানালাটা সব সময় বন্ধ থাকে। বড়দির নির্দেশ। অমান্য করার কোন উপায় নেই। যেন জানালা খুললেই মহাভারত অশুদ্ধ হয়ে যাবে। রুনির ভারী অপছন্দ এই ছোট ঘরে থাকতে। এ ঘর থেকে গোটা আকাশকে সে কখনো দেখতে পায় না। সে টের পায় না কখন সূর্যোদয় হয়, কখন আবীরের মত লাল টকটকে হয়ে ওঠে সন্ধ্যার আকাশ!

রন্টু একটা ডাকাত ছেলে! ওর কথা ভাবলে রুনির মাঝে মাঝে গাল লাল হয়ে ওঠে। কত সহজে ওর সঙ্গে আলাপ হয়ে গেল। ছুটি হয়ে গেলে বাড়ি ফেরার পথে সহপাঠিনীদের মাঝখান থেকেও রন্টুর উপস্থিতি সে টের পায়। তখন ওর চোখের তারা বারবার কেঁপে ওঠে। চোখের দৃষ্টি চঞ্চল হয়ে ওঠে। মনে মনে এক ধরনের অস্বস্তি মেশানো আনন্দ অনুভব করে। পিছন ফিরে না তাকালেও বুঝতে পায় রন্টুর দৃষ্টি ওর

দিকে। বাড়ি ফেরা পর্যন্ত সেই মুগ্ধ দৃষ্টির বাইরে সে যেতে পারে না।

অন্য পাড়ায় থাকে রন্টু। লম্বা একহারা চেহারা। ওর চেয়ে বছর দুয়েকের বড়। এ বছর রন্টুর ফাইনাল পরীক্ষা। পাশ করার পর ডাক্তারী পড়বে। সদ্য দাড়ি কাটতে শুরু করেছে। কচি ঘাসের মত গায়ের রঙ। সুশ্রী চেহারা। ওর বাবা মস্তবড় অফিসার। কী সুন্দর দামী পোষাক পরে রন্টু। ওরা কত বড় খোলামেলা ঘরে থাকে। রন্টুর মুখে সব শুনে ওর ভীষণ ইচ্ছে হয় সেই প্রশস্ত আলোময় ঘরে গিয়ে অন্তত কিছুক্ষণ দাঁড়িয়ে থাকার।

রুনি প্রথমদিকে ভয় পেয়েছে। আর সেই সঙ্গে আশঙ্কা মেশানো এক ধরনের রোমাঞ্চ-কর অনুভূতি। কিছুতেই আলাপ করতে চায়নি। রন্টুর চেষ্টার ত্রুটি ছিল না। প্রথম-দিকে শুধু চোখের ইসারা। মাগো! ভাবলে আজও রুনির দেহের প্রতিটি রোমকূপ রোমাঞ্চিত হয়ে ওঠে। সে তাকাতেই পারতো না। অস্বস্তি আর ভয়ে সিঁটিয়ে যেত। এভাবে বেশ কিছুদিন কেটে যায়। আস্তে আস্তে ভয় দূর হয়। আড়চোখে তাকাতে সুরু করে। চোখে চোখ পড়লে অজান্তে মৃদুহাসি ফোটে মুখে। এভাবে সে নিজেকে ক্রমশঃ প্রস্তুত করে নেয়। তারপর মৃদুস্বরে কথাবার্তা। তাতেই কপালে ঘাম, ঘনঘন নিশ্বাসে বুক ওঠানামা করে। আর ভীতি-বিহ্বল দৃষ্টিতে চারিদিকে তাকানো।

কী দুষ্টু ছেলেরে বাবা! অমন করে শিস দেওয়া কি ভাল? কোন ভয়-ডর নেই। এ পাড়ার উঠতি মস্তান ছেলেগুলি বিশেষ সুবিধের নয়। ওরা কখনো সহ্য করবে না বে-পাড়ার একটি ছেলে এসে রাস্তায় দাঁড়িয়ে বুক ফুলিয়ে শিস দেবে। আর যদি জানতে পারে রুনির জন্যেই......। উঃ সেকথা ভাবলে ওর হাত পা অবশ হয়ে ওঠে। শেষকালে একটা খুনে-খুনি না হয়ে যায়।

এই কিছুদিন আগে দুপুরবেলা একটা পার্কে গাছের ছায়ায় বসে রুনি কাঁপা গলায় বলেছিল, তুমি ওভাবে আমার পিছন পিছন পাড়ায় এসো না। আমার বড্ড ভয় করে।

—ধ্যেৎ! রন্টু কায়দা করে সিগারেটের ধোঁয়া ওর মুখের উপর ছুঁড়ে অবজ্ঞাভরে বলেছে, কিসের ভয়। আমার গায়ে যেন একবার হাত দিয়ে দেখে তোমাদের পাড়ার মস্তানেরা। আমি শালা মস্তানের বাবা!

—ছি! বলে রন্টুর ঠোঁটের উপর আঙুল চেপে ধরেছে রুনি, আহা কী কথা বলার ধরন।

রন্টুর চোখের দৃষ্টি [illegible] হয়ে উঠেছে। ধীরে ধীরে ওর মুখে ভেসে উঠেছে নরম হাসি। রুনি তাড়াতাড়ি হাত সরিয়ে নিয়েছে। সহসা লাল হয়ে উঠেছে ওর সারামুখ।

স্কুলের বান্ধবীদের মধ্যে দু'একজন হয়তো ওদের মেলামেশার কথা জানতো। তবে রুনির সতর্কতার ত্রুটি ছিল না। বড়দির কানে গেলে আর রক্ষে নেই। যেন সে মা বাবার চেয়েও বড়দির ভ্রুকুটিকে বেশি ভয় করে।

সুতরাং কথায় কথায় রন্টু একদিন সিনেমায় যাবার প্রস্তাব করলে রুনি চোখ কপালে তুলে বলেছে, ওরে বাব্বা! পাঁচটার পর এক মিনিট দেরি করে বাড়ি ফিরলে বড়দি আর আস্ত রাখবে না। রন্টু, তুমি আমার বড়দিকে চেন না।

—তুমি ভারী ভীতু মেয়ে! রন্টু তেরচা করে তাকিয়েছে, চলো না। চমৎকার ছবি। তুমি অজয়কুমারের ছবি দেখেছো?

—না। আমি কোন ছবিই দেখিনি। ম্লানমুখে সে জবাব দেয়।

মুহূর্তের জন্যে রুনির মন কেমন উদাস হয়ে উঠেছিল। সেই সঙ্গে খানিকটা দুর্বলতাও। কতদিনের সাধ একটা ছবি দেখবে। কে নিয়ে যাবে? বড়দি বা মেজদি নিজেরা মজা করে সিনেমা থিয়েটারে যায়। পয়সা পায় কোত্থেকে ওরা, সে ঠিক জানে না। রুনির কথা কেউ ভাবে না।

চমৎকার সাজানো গোছানো একটা দোকান। হাঁ করে তাকিয়ে রুনি শোকেসের মধ্যে নানা রঙের জামাকাপড় দেখছে। চোখের পলক পড়ে না।

—পছন্দ হয়? রন্টু ওর কাঁধে আলগোছে হাত রাখে, ঐ হলুদ শাড়িটায় তোমাকে খুব চমৎকার দেখাবে।

রুনি একটু সরে দাঁড়ায়, শাড়ি পরলে আমাকে খুব বড় দেখাবে, না?

—হ্যাঁ। একেবারে হিরোইনের মত দেখাবে। চলো তোমাকে কিনে দিচ্ছি।

রুনি চমকে উঠল : বড়দির রুক্ষ কণ্ঠস্বর শুনে যেন ওর চেতনা ফিরে আসে। কখন অজ্ঞাতসারে পড়া বন্ধ করে রন্টুর কথা ভাবছিল, সে খেয়াল নেই। দু'চোখে ঘুম জড়িয়ে আসছে। হাত কচলে সে অনুজ্জ্বল আলোয় বড়দির কঠিন মুখ দেখল। সমস্ত ঘর কেমন ছায়াছায়া ভৌতিক। বাথরুমে যাবার জন্যে উঠে দাঁড়াল সে।

চাতালে অন্ধকার। রুনির গা ছমছম করে ওঠে। পা টিপে টিপে হাঁটে।

আবার রন্টুর কথা মনে পড়ছে। শাড়ি কিনে দেবার প্রস্তাবে প্রথমে সে হতভম্ব হয়ে গিয়েছিল। বড় বড় চোখ করে রন্টুর দিকে তাকিয়েছে। না, ঠাট্টা ইয়ার্কি নয়। সত্যিই রন্টু কিনে দিতে চায়। চাইলে কি হবে। রুনির ইচ্ছে থাকলেও নিতে পারে না। শাড়ি কোথায় পেলি, কে দিল, তোর কি শাড়ি পরার বয়স হয়েছে ইত্যাদি নানা প্রশ্নের ঝক্কি কে সামলাবে। অতএব ম্লান-মুখে সে পিছিয়ে এসেছে।

—এখানে দাঁড়িয়ে কি করছিস?

রুনি চমকে পিছন ফিরে মার উপস্থিতি টের পায়। মার সারা দেহে ঘামের গন্ধ। অস্পষ্ট আলোয় দেখল মার চোখের কোণে কালি, তোবড়ানো গাল। ওর চোখে জল এসে যায়। কেউ মার দিকে ফিরে তাকায় না। কী ভীষণ স্বার্থপর সব।

—মা! বলে রুনি দু'হাত দিয়ে জড়িয়ে বুকে মুখ গুঁজে হঠাৎ প্রবল কান্নায় ভেঙে পড়ে।

—কি হয়েছে? বলে মা রুনির নরম চুলে হাত বুলিয়ে বলে, বড়দি বুঝি বকেছে। পড়াশুনো না করলে বকবেই। চল, এখন খাবি।

মার চোখেও বোধকরি জল এসে যায়। অতি কষ্টে নিজেকে সামলে মেয়েকে নিয়ে রান্নাঘরে চলে আসে।

বিছানায় শুয়ে রুনির ঘুম আসে না। এক কোণে আড়ষ্টভাবে শুয়ে থাকে। ঘরে আলো জ্বলছে। ছোট তক্তপোষে তিন বোনে গা ঘেঁষাঘেঁষি করে শোয়। মেজদি মাঝখানে।

রুনি চোখ বন্ধ করে শবের ন্যায় শুয়ে থাকে। একটু আগে দু'চোখে ঘুম জড়িয়ে আসছিল, এখন কোথায় পালিয়ে গেল। খালি আজেবাজে চিন্তা মাথায় আসছে। রন্টু খুব চটে গিয়েছিল। বলেছিল, "সব কিছুতেই তুমি পিছিয়ে যাচ্ছ। এত ভয় করলে প্রেম করা চলে না!" শুনে রুনি কচি বাঁশ গাছের ডগার মত দুলে উঠেছিল। বিশেষ করে 'প্রেম' শব্দটি তার বুকে আঘাত খেয়ে বেজে উঠেছিল। তখন বেশ সংকোচ-বোধ করছিল রন্টুর দিকে তাকাতে।

হঠাৎ তার কানে ভেসে এল সুরেলা হাসির শব্দ। হ্যাঁ, বড়দির কণ্ঠস্বর। ওকি, মেজদিও কখন যেন জেগে উঠেছে। ওরা দু'জনে নীচু গলায় কথা বলছে। প্রতিটি অক্ষর রুনির কানে আসছিল। ওরা ভেবেছে সে বুঝি ঘুমিয়ে পড়েছে। অন্যদিন এতক্ষণে ঘুমে বিভোর হয়ে যায়। আজ কেন জানি কিছুতেই তার চোখে ঘুম আসছে না।

—দেখছিস কী রঙের বাহার! মেজদি সশব্দে দীর্ঘশ্বাস ছেড়ে বলে, ওর মুখের দিকে তাকিয়ে দ্যাখ বড়দি। ও নিশ্চয়ই প্রেমে পড়েছে। আমি লক্ষ্য করেছি, যখন তখন আয়নার সামনে গিয়ে দাঁড়ায়। আপনমনে হাসে। আর ফাঁক পেলেই জানালা খুলে রাস্তার দিকে তাকিয়ে থাকে।

বড়দি নিস্তেজ কণ্ঠে বলল, কী বলছিস তুই মেজ। ওইটুকু মেয়ে লুকিয়ে প্রেম করছে! কি জানি বাবা, আজকাল সব হচ্ছে। তবে আমি কড়া নজরে রেখেছি।

—থাক ওর কথা, বলে মেজদি মুখে কাপড় গুঁজে হি হি করে হেসে ওঠে।

—মরণ আর কি? অমন করে হাসছিস কেন? নে ঘুমো, রাত কম হয়নি।

তারপর খানিকক্ষণ চুপচাপ। রুনি টের পায় আপন হৃৎপিণ্ডের ঢিবঢিব শব্দ। তার খুব ইচ্ছে হয় একবার চোখ খুলে ওদের দেখতে। ওরা কী ঘুমিয়ে পড়ল? না, একটু পর আবার ওদের কথাবার্তা শুরু হবে। উঃ মেজদির কথা শুনে ওর বুক কেঁপে উঠেছিল। কখন আবার আপনমনে সে হাসলো। মনে পড়ছে না। আয়নার সামনে গিয়ে সে ঘন ঘন দাঁড়ায়—মেজদিটা কী মিথ্যুক।

অস্পষ্ট কান্নার আওয়াজ। রুনির দম বন্ধ হয়ে আসার উপক্রম। হ্যাঁ, মেজদি কাঁদছে। ওর চোখদুটোও জ্বালা করতে থাকে। মানুষের কান্না সে সহ্য করতে পারে না। 'মেজদি, তোমার দুঃখ আমি বুঝি!' রুনি মনে মনে সান্ত্বনা দেবার চেষ্টা করে।

—আঃ রত্নদেন্দ্রে আবার কান্না শুরু করলি! বড়দির কণ্ঠস্বরে বিরক্তি প্রকাশ পায়, চুপ কর মেজ। আলো নিভিয়ে দিলাম। এবার ঘুমো।

রুনি চোখ খুলে প্রথমে কিছু দেখতে পায় না। চাপ চাপ জমাট অন্ধকার চারিদিকে। আস্তে আস্তে অন্ধকার চোখে সরে যায়।

—আমি কোথায়ও চলে যাব। বড়দি, একদিন সকালে উঠে আমাকে দেখতে পাবি না।

খুক্ করে হেসে উঠল বড়দি, কোন্ চুলোয় যাবি!

—জানি না। যে-দিকে দুচোখ যায় চলে যাব। বলতে বলতে মেজদি হঠাৎ ক্ষেপে ওঠে, তোর মধ্যে কি মানুষের রক্ত নেই? কোন চিন্তাভাবনা নেই, দিব্যি দিনের পর দিন নোংরা বই পড়ে কাটিয়ে দিচ্ছিস। দুধের সাধ কী ঘোলে মেটে!

তারপর যা ঘটল তাতে রুনি বাস্তবিকই ভয় পেয়ে যায়। বড়দি আর মেজদি পরস্পরকে প্রথমে গালাগালি পরে খামচা-খামচি শুরু করে দিয়েছে। রুনি ঘাবড়ে যায়। কি করবে ঠিক করে উঠতে পারে না। খারাপ কথা শুনে ওর গা গুলিয়ে ওঠে। ভীষণ কান্না পায়। ও চিৎকার করে উঠতে চাইছিল। ডাকবে কি বাবা মাকে?

একটু পরে শুনল দুবোনের কান্না। শুনে ওর হাসি পায়। যাইহোক রুনি হাঁফ ছেড়ে বাঁচে। ও ভাবতেই পারেনি এভাবে দুজনে ঝগড়ায় মেতে উঠবে। পরস্পরের চুল ধরে টানাটানি করবে। এর আগেও অনেকবার বড়দি আর মেজদির মধ্যে তুচ্ছ ব্যাপার নিয়ে মন কষাকষি হয়েছে। কিন্তু আজকের ঘটনায় রুনি বেশ আহত।

তারপর রাত ক্রমশঃ বাড়ে। ঘুম কিছুতেই আসে না। রুনি গভীর শ্বাস-প্রশ্বাসের শব্দ শুনল। ওরা দুজনে বিভোর হয়ে ঘুমুচ্ছে। শুধু সে চোখ খুলে মাঝে মাঝে শ্মশান অন্ধকারে ডুবে যায়।

প্রচণ্ড বেগে ট্যাক্সি ছুটে চলেছে। রুনি জানালার কাছ ঘেঁষে মুখ বের করে বাইরে তাকিয়ে। হাওয়ায় কপালের উপর বিচূর্ণ চুল ছড়িয়ে পড়েছে। আশঙ্কা মেশানো আনন্দে মন ভরপুর। কী মজা! চিড়িয়াখানা দেখতে চলেছে। আঃ হাওয়া যেন আলতো-ভাবে ওর চোখমুখের উপর আদরের চুমো দিচ্ছে। ভাবতেই দুটি গাল লাল হয়ে উঠল। রন্টু নিশ্চয়ই ওর দিকে তাকিয়ে। অসভ্য কোথাকার! হাতে একটা খাতা আর খান-কয়েক বই। পাঁচটার আগে বাসায় ফিরে যেতে হবে। হ্যাঁ, রন্টুর সঙ্গে আসবার আগে বারবার একথা জানিয়েছে।

কী বিরাট মাঠ! রুনি অবাক হয়ে তাকায়। এই প্রকাণ্ড শহরে কত মজার জিনিস আছে, কত দেখার আছে—কিছুই সে দেখেনি। রন্টু বলেছে আস্তে আস্তে সব দেখাবে।

—এটা রেসকোর্স। জুয়ো খেলা হয় এখানে। ঘোড়া দৌড়য়, তার উপর বাজী ধরে লোকেরা। বলে রন্টু এগিয়ে আসে। রুনির গা ঘেঁষে বসে। ডান হাত তুলে দেয় কাঁধের উপর।

রন্টুর দিকে তাকাল একপলক। ওকে আজ বড় সুন্দর দেখাচ্ছে। সাদা টেরিলিনের সার্ট, লাল টাই, মুখে জ্বলন্ত সিগারেট। মুগ্ধদৃষ্টিতে তাকিয়ে থাকে রুনি।

রন্টু বলল, দ্যাখ কী ভিড়। এই তো চিড়িয়াখানা।

রোদের তেজ নেই। ঝিরঝির করছে হাওয়া। রুনি বড় বড় চোখে চারিদিকে তাকায়। কত রঙ বেরঙের পাখি। ওদিকে বানরের দল কিচকিচ করছে। ওরে বাবা, দাঁত খিঁচিয়ে তেড়ে আসছে! রুনি ভয় পেয়ে পিছিয়ে আসে।

—ওদিকে চলো। বলে রুনির একটা হাত মুঠোয় চেপে রন্টু হাসল, সাদা বাঘ, গণ্ডার, জলহস্তী, কুমীর আরও অনেক কিছু দেখার আছে। এক জায়গায় এতক্ষণ থাকলে সব দেখবে কিভাবে।

হাঁটতে হাঁটতে রুনি নানারকম প্রশ্ন করলো। কত ছেলেমানুষী প্রশ্ন। রন্টু হেসেই বাঁচে না। আইসক্রীম কিনে দেয়। রুনি খেতে খেতে সলজ্জভাবে তাকায় রন্টুর দিকে। কী চমৎকার স্বাদ! ওর এখন বাড়ির কথা মনে পড়ে না। সবকিছু ভুলে যায়। কখনো অদ্ভুত ধরনের কোন কিছু দেখে আনন্দে হাততালি দেয়. আবার দেখা যায় তাকে নরম ঘাসের উপর বেণী দুলিয়ে ছুটে বেড়াতে। আর ওর চোখে পড়ে প্রকাণ্ড নীলাকাশ। যেন জীবনে এই প্রথম ওর চোখে গোটা আকাশটা ধরা পড়ল! এখানে সব সুন্দর। ঘাস, মাঠ, পশুপাখি এমনকি হিংস্র গণ্ডার সব সুন্দর! রন্টু সুন্দর! যা কিছু দেখছে তাই ওর চোখে অপরূপ মনে হয়।

ধীরে ধীরে রোদের তেজ কমে আসে। বিকেলের নরম আলোয় রুনির চোখমুখ ঝলমল করে ওঠে। পরক্ষণেই মুখে বিষাদের

[illegible] বাড়ির জন্য। [illegible] ভেসে [illegible] জোড়া কঠিন মুখ। [illegible] বাঘ রুনি। পারপর্দ চোখমুখে তাকায় রণ্টুর দিকে।

—কি হলো? রণ্টু অনুভব করলো ওর হাতে মুঠোর রুনির নরম কচি আঙুল থরথর করে কাঁপছে।

—বাড়ি যাব।' কটা বাজে এখন?

—সাড়ে চারটে। যাঃ এখনও সাদা বাঘ দেখা হলো না।

—আজ থাক। ইস্ দেরী হলে বাড়িতে...।

রুনির চোখ ছলছল করে ওঠে। ও যেন এতক্ষণ স্বপ্নরাজ্যে বিচরণ করছিল। সব কিছু ভুলে হাওয়ায় ভেসে বেড়াচ্ছিল। এখন মার মুখ মনে পড়ছে। যেন অস্পষ্টভাবে বাবার কাশির শব্দ শুনতে পাচ্ছে। শ্যাওলা-ধরা পিছল চাতাল, ছোট ঘর ও পলেস্তারা খসানো ইঁটের দেওয়াল—এর থেকে ছিটকে খানিকক্ষণ সহজভাবে নিঃশ্বাস নিতে পেরেছিল। কিন্তু সে আর কতক্ষণ।

আবার ট্যাকসিতে উঠল রুনি। না, কিছুতেই সে রণ্টুর কথামত সিনেমায় যেতে পারে না। রাত দশটায় বাড়ি ফিরলে তাকে কেটে দুখানা করে ফেলবে বড়দি। আড়-চোখে তাকাল রণ্টুর দিকে। মুখ গম্ভীর করে সে বসে রয়েছে। রাগ হয়েছে বাবুর। বারে তার বুঝি আনন্দ করতে ইচ্ছে করে না। কিন্তু তা হবার নয়।

তবু খচখচ করে মনটা। রণ্টুর মুখে হাসি সে দেখতে চায়। এভাবে চলে গেলে রাতে তার ঘুম হবে না।

—অ্যাঃ শোন। বলে রণ্টুর আঙুলে চিমটি কেটে বলল, তাকাও আমার দিকে। তাকাবে না তো? বেশ, আর কোনদিন তোমার সঙ্গে কথা বলবো না।

অভিমানে রুনি সীটের একধারে সরে বসে। ওর চোখ ফেটে জল বেরিয়ে আসার উপক্রম।

রণ্টুর রাগ তবু যায় না। বলল, সেই [illegible] থেকে খালি বাড়ি যাব যাব করছেন। এতক্ষণ থাকলে বেরোলে কেন।

—তুমি বুঝবে না। ছেলেরা কিছু বুঝতে চায় না।

—থাক। তুমি বুঝলেই হলো। বলে রণ্টু অন্যদিকে তাকিয়ে থাকে।

রুনির মনে হলো সে বোধহয় এখুনি কেঁদে ফেলবে। রণ্টু বড় নিষ্ঠুর। ওকে শুধু বাধা দিতে চায়। বলেছে তো, অন্য একদিন সিনেমায় যাবে। তা নয়, আজই ওর সঙ্গে যেতে হবে। জেদ ছেলের!

—ড্রাইভার গাড়ি থামান। বলে রণ্টু হাতের ঘড়ি রুনির চোখের সামনে ধরে বলল, এই দ্যাখ। এখনো পাঁচটা বাজতে দশ মিনিট দেরী আছে।

রুনি রাস্তায় নেমে কোনদিকে তাকায় না। এমন কি রণ্টুকে বিদায় জানাতে পর্যন্ত ভুলে যায়। খুব দ্রুতপদে হাঁটতে থাকে। মনে মনে কোথায় যেন একটা খুশীর আমেজ। এখনও যেন তার চোখের সামনে ভেসে উঠছে গোটা চিড়িয়াখানাটা। কী সুন্দর চোখ হরিণের! কেমন টালুমালু করে তাকায়। সে একবার হাত দিয়ে স্পর্শ করতে চেয়েছিল। কিন্তু এক লাফে পালিয়ে গেছে। ও নিজেও হরিণশিশুর মত ছুটোছুটি করেছে। ভেবে ফিক করে হেসে উঠল রুনি। আবার কি ভেবে ওর সারামুখে আতঙ্ক ফুটে উঠল। এবং প্রায় ছুটতে সুরু করল।

এখন সব স্তব্ধ। রাত কত হলো রুনি জানে না। তার দুপাশে বড়দি মেজদি গভীর ঘুমে মগ্ন। ওদের সশব্দে নাক ডাকা, রাস্তায় মাঝে মাঝে কুকুরের চিৎকার, রিকশার ঠুংঠাং শব্দ ও মাতালের মুদুকণ্ঠে অসংলগ্ন প্রলাপ—সবকিছুর মাঝখানে সে জাগরণ ও স্বপ্নের মধ্যবর্তী স্থানে পৌঁছে হঠাৎ নিঃশব্দ কান্নায় ভেঙে পড়ল। আর ফুলে ফুলে উঠল ওর যৌবন সমাগত সুকুমার দেহের প্রতিটি রহস্যময় রেখা।

রুনি চিৎ হয়ে শুয়ে। সব সে মুখ বুজে সহ্য করেছে। জলভরা চোখ নিবিড় অন্ধকারে [illegible] আঘাতে বিদ্যুত, হতচকিত। [illegible] সঙ্গে বড়দির [illegible] কিছুক্ষণ সে নিজেকে নিয়ে [illegible]। তারপর যখন দেখল তার [illegible] সংবাদও এখানে এসে পৌঁছেছে, তখন বড়দির মোটা মোটা আঙুলের [illegible] রণ্টুর কথা, চিড়িয়াখানা, নরম বিকেলের মদির আলোয় স্বচ্ছ দীঘির মত টলটলে হরিণশিশুর চোখ—এখন সে ভেবে রীতিমত অবাক, সব কিভাবে তার মুখ দিয়ে জলোচ্ছ্বাসের মত প্রকাশ হয়ে পড়ল। অসহনীয় যন্ত্রণার হাত থেকে বোধহয় রেহাই পাবার জন্যে সে তাড়াতাড়ি সবকিছু খুলে বলেছে।

একবার পাশ ফেরার চেষ্টা করতেই ব্যথায় অস্ফুটস্বরে কাতরুক্তি করে উঠল। উঃ এভাবে বড়দি তাকে মারতে পারল! কেউ বাধা দেয়নি। শুধু মা নীরবে চৌকাঠে হেলান দিয়ে নির্নিমেষে তার দিকে তাকিয়েছিল। তারপর মাথা নীচু করে চলে গেছে। বোধহয় পালিয়ে গেছে। রুনির মনে হয় মার ঠোঁট দুটি একবার শুধু থর-থর করে কেঁপে উঠেছিল। কি বলতে চেয়েছিল মা?

অনেকক্ষণ পরে যখন রাত আরও নিথর ও নিস্তব্ধ হয়ে এসেছে, এমন কি বেওয়ারিশ কুকুর, মাতালের বিচ্ছিন্ন কণ্ঠের সংলাপও আর শোনা যাচ্ছিল না—সেই সময় কে যেন মাথার কাছে বন্ধ জানালার ওপাশে রাস্তায় শিস দিয়ে উঠল পর-পর কয়েকবার। রুনি আচ্ছন্নাবস্থায় উঠে বসার চেষ্টা করতে গিয়ে অনুভব করল তার সমস্ত শরীর বড়দি আর মেজদির কঠিন আলিঙ্গনে ক্রমশঃ পিষে যাচ্ছে। সে মরীয়া হয়ে অনেকবার ব্যর্থ চেষ্টা করল বাইরে বেরোবার জন্যে। বাইরে রণ্টু পা ফাঁক করে সিগারেট মুখে দাঁড়িয়ে শিস দিচ্ছে। হাওয়ায় লাল টাই পতাকার মত উড়ছে। রুনি অনেকটা ঘুমঘোরে কথা বলার মত ফিসফিস করে উচ্চারণ করল, "বড়দি আমাকে ছেড়ে দাও। তোমার দুটি পায়ে পড়ি! রণ্টু আমাকে সাদা বাঘ দেখাবে বলেছে। মেজদি আমাকে আর মারিস না। তুই কাঁদিস না মেজদি। আমি জানি কেন তুই অন্ধকারে বালিসে মুখ ডুবিয়ে কাঁদিস। রণ্টু, তুমি বড্ড দুষ্টু। দ্যাখ, ঐ বাচ্চা হরিণ-শিশুর চোখ দুটি কী সুন্দর! আমাকে এই হলুদ শাড়ীটায় খুব মানাবে, না? জান রণ্টু, বড়দি আমাকে খুব মেরেছে। বলেছে আর আমাকে বাইরে বেরোতে দেবে না। আমাকে খেতে দেয়নি। কী চমৎকার আইস-ক্রীম তুমি কিনে দিয়েছিলে। আঃ তুমি আর শিস দিয়ো না। দেখছো না ওরা আমাকে চেপে ধরেছে। ছাড়ো, আমি যাব কি করে।"

সাহিত্য ও সংস্কৃতি

প্রতিভা ও পরিবেশ

প্রতিভাবিকাশে পারিপার্শ্বিকতা বংশানুক্রম ইত্যাদি বিশেষভাবে সহায়ক। যাঁরা মহৎ এবং বিরাট লাভ করেছেন তাঁরা কি রকম পরিবার থেকে এসেছেন, কেমন তাঁদের জনক-জননী। পিতা বা মাতার অসাফল্যের প্রতিক্রিয়া জাতকের জীবনে কি ভাবে ফলে। এই সমস্ত প্রশ্নও যেমন সমীচীন, এর উত্তরও তেমনই কৌতূহল-জনক। এই শতাব্দীর কয়েকজন প্রখ্যাত নর-নারীর পারিবারিক জীবনের ইতিহাস সমীক্ষা করে এক বিচিত্র তথ্যসমৃদ্ধ গ্রন্থ রচনা করেছেন ভিক্টর ও মিলড্রেড গোয়ার্ৎসেল।

ডাঃ ভিক্টর গোয়ার্ৎসেল ১৯১৪ খৃষ্টাব্দে সিকাগো শহরে জন্মগ্রহণ করে ক্যালিফোর্ণিয়া থেকে এম-এ ডিগ্রী নিয়ে ইলিনয়ের ন্যাশনাল ইয়থ এডমিনিস্ট্রেশনে ও সিকাগো বোর্ড অব এডুকেশনে এসিস্ট্যান্ট সাইকোলজিস্ট হিসাবে কাজ করেন। বলা বাহুল্য, এই দুটি জায়গাতেই শিশুমনস্তত্ত্ব বিশ্লেষণেই তিনি কাজ করেছেন। দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের পর ওয়েন কাউন্টি হসপিটাল অ্যান্ড মেন্টাল হাইজিন ক্লিনিকে তিনি চীফ সাইকোলজিস্ট হিসাবে কাজ করেছেন। নিরন্তর এইভাবে কাজ করায় তাঁর যথেষ্ট সুবিধা হয়েছে। ১৯৫৩ খৃষ্টাব্দে মিসিগান বিশ্ববিদ্যালয়ের পি এইচ ডি ডিগ্রী পাওয়ার পর ডাঃ ভিক্টর গোয়ার্ৎসেল রিসার্চ সাইকোলজিস্ট হিসাবে কাজ করছেন। ন্যাশনাল এসোসিয়েশান ফর গিফটেড চিলড্রেন নামক প্রতিষ্ঠানের তিনি দু বছর সভাপতি ছিলেন।

১৯৩৮-এ ভিক্টর বিবাহ করেছেন মিলড্রেডকে। উভয়েই সমান গুণের অধিকারী। কর্ম ও চিন্তা দুজনেরই একই পথে চালিত। দুজনেই মানসিক রোগীদের পুনর্বাসনের কাজে নিযুক্ত। কিন্তু এর অতিরিক্ত একটি বিষয়ে আগ্রহ আছে, সেটি হল যাঁরা খ্যাতি অর্জন করেছেন, শৈশবে তাঁরা কিভাবে মানুষ হয়েছেন সেই বিষয়ে অনুসন্ধান। ন্যাশনাল এসোসিয়েশান ফর গিফটেড চিলড্রেনের বাৎসরিক অধিবেশনে তিনি একটি প্রবন্ধ পাঠ করেন। সেইকালে সাধারণের তরফ থেকে যে আশ্চর্য আগ্রহ দেখা যায় তার ফলে এই মনস্তাত্ত্বিক দম্পতি লিখেছেন, 'ক্রাডেল্স অব এমিনেন্স'। ওঁদের তিনটি সন্তান, তিনজনেই এখন বড় হয়ে উঠেছে। তাদের নাম টেড, জন এবং পেন।

এই গ্রন্থের ভূমিকায় গোয়ের্ৎসেল দম্পতি লিখেছেন—

> 'Curiosity about the training of that most valuable human resource, the capable child, led us to attempt this survey of the emotional and intellectual climate in which eminent people of twentieth century were reared.'

এঁদের মধ্যে অনেকে বিশেষভাবে খ্যাত তাঁদের দুষ্কৃতির জন্য, কিন্তু বেশীর ভাগ মানুষই উত্তম এবং মানব-সংস্কৃতিতে তাঁদের দান অসামান্য। গোয়ের্ৎসেল দম্পতি বলেছেন—কেন তাঁরা 'eminent' কথাটি বেছে নিয়েছেন। বাংলায় 'এমিনেন্ট' কথাটির প্রতিশব্দ প্রখ্যাত, মহৎ, প্রতিষ্ঠাসম্পন্ন, সুমহান ইত্যাদি কিন্তু ইংরাজী শব্দটির ঠিক ঠিক অর্থ করা যায় না। লেখকদ্বয় লিখেছেন—

> 'We use the term 'eminent' to describe them because they became important enough to their contemporaries to have books written about them.'

এই কর্মে তাঁরা সেই সব মানুষকে বাদ দিয়েছেন যাঁদের জীবনী প্রকাশিত হয়েছে উত্তরাধিকার সূত্রে প্রাপ্ত খ্যাতির দাবীতে, যথা রাজা, রাণী, ইত্যাদি। কেন একটি মানুষের সঙ্গে অপরের পার্থক্য, কেনই বা দুটি মানুষের মধ্যে থাকে একই রকমের বৈশিষ্ট্য এই জিজ্ঞাসার উপযুক্ত উত্তর সন্ধানে বহুসংখ্যক বিষয় পরীক্ষা করা প্রয়োজন। যে সব ভিক্টেটর জন্মেছেন এই শতাব্দীতে তাঁদের জীবনের পটভূমি কি একই ধরনের? প্রখ্যাত মানুষরা আসেন কোথা থেকে, গ্রাম, নগর বা শহরাঞ্চল থেকে? উক্ত অনুকূল পরিবেশে কি প্রতিভার স্ফূরণ সহজ হয়? এঁরা কি সাধারণত শিশুবয়সে সুখী ও সুস্থ ছিলেন।

অতীতকালের অনেক শিশু যাঁরা উত্তরকালে প্রখ্যাত হয়েছেন তাঁরা যুক্তি-বিচারে, সম্পর্ক-নির্ণয়ে অধিকতর শক্তিমত্তার পরিচয় দিয়েছেন। শৈশবেই তাঁদের মধ্যে বিদগ্ধমানসের পরিচয় পাওয়া গিয়েছিল, কৌতূহলে সেই বৈদগ্ধ্যের স্পর্শ ছিল। এ ছাড়া বিভিন্ন বিষয়ে তাঁদের আগ্রহ ছিল। পড়াশোনায় তাঁরা সবচেয়ে অধিকতর শক্তির পরিচয় দিয়েছেন, কেউ চার বছর বয়স থেকে পড়তে সুরু করেছেন। চিন্তার ক্ষেত্রে এঁদের মৌলিকত্ব ছিল, খেলার সাথীরা এঁদের বর্জন করেছে, কিন্তু তাঁদের জনক-জননীর কাছে শিক্ষার সমাদর ছিল। এঁদের মধ্যে বেশীসংখ্যক মানুষ এসেছেন মধ্যবিত্ত ব্যবসায়ী বা অন্যবিধ পেশার সংসার থেকে।

জীবনীগ্রন্থ বা আত্মজীবনীর অনেক কথার সত্যাসত্য নিরূপণ করা কঠিন। যে সূত্রে সেই সংবাদ সংগৃহীত তা নিয়ে প্রশ্ন উঠতে পারে এমন কথা মনে হয়েছে এই গ্রন্থের যুগ্ম-লেখকদের। সেই কারণে তাঁরা বলেছেন—

> We can only hope to be accurate in reporting what their authors say and sensitive in the selection of material chosen to report. We are now in an era of self-concious revelations made in full awareness of the significance in Freudian terms of the behaviour described.'

লেখকদ্বয় বলেছেন, যেখানে কোনো কিছু বাদ দেওয়া হয়েছে বা বিশেষ বিশেষ ঘটনাই নির্বাচিত করে নেওয়া হয়েছে সেইখানে পাওয়া যায় অর্ধসত্য, আর এই অর্ধ-সত্য অসত্যের চেয়ে অনাস্থাতের।

কি কারণে, ক্লাসের সবচেয়ে ভালো ছাত্র উত্তরকালে বয়স যখন বাড়ে তখন কল্পনা-হীন এবং বৈশিষ্ট্যবিহীন মানুষে রূপান্তরিত হয়, আর যে ছাত্র ক্লাসে ছিল অসফল, পড়াশোনায় অমনোযোগী সে কি-ভাবে এমন প্রভাবশালী হয়ে ওঠে যে, সমগ্র সমাজে তার ব্যক্তিত্বের ছাপ থেকে যায়, তার উপস্থিতি সর্বত্র অনুভূত হয়, এই প্রশ্ন সবসময়েই একটা বিস্ময়কর জিজ্ঞাসা-চিহ্ন নিয়ে আমাদের দিকে তাকিয়ে থাকে।

এই গবেষণা উপলক্ষ্যে কিছু প্রশ্নের জবাব এঁরা সন্ধান করেছেন, কিন্তু তার সঙ্গে আবার অনেক নতুন প্রশ্ন উত্থাপন করেছেন।

যাঁরা প্রখ্যাত তাঁরা কিভাবে নিজেদের প্রযুক্ত করেছেন সমাজে? কি ধরণের সংসার থেকে এসেছেন? বিশেষ মতামতসম্পন্ন জনক-জননীর প্রভাব সন্তানে কিভাবে বর্তে? পিতামাতার অসাফল্যই বা কি প্রভাব আনে? যে ঘরে প্রতিভার বাল্যরঙ্গ সেই ঘরে গ্রন্থাদির প্রতি বা শিক্ষালাভের আগ্রহ কতটুকু। সক্ষম এবং সফল শিশুর জীবনরহস্য সম্পর্কে কৌতূহলবশেই লেখকরা এই গ্রন্থটির বিষয়বস্তু নিয়ে দীর্ঘকাল সমীক্ষায় কাটিয়েছেন। এই গ্রন্থ

তাঁরই ফলশ্রুতি। বিংশশতাব্দীর প্রায় চারশো মনীষী যাঁদের শৈশবজীবন কেটেছে বিদগ্ধ আবহাওয়ায় বা ভাবাবেগপূর্ণ আবহাওয়ায় তাঁদের সম্পর্কে অনুসন্ধানের রিপোর্ট 'ক্র্যাডেলস্ অব এমিনেন্স' (প্রকাশক ঃ—কনস্টেবল অ্যান্ড কোম্পানী লন্ডন)।

যে সব সংসারে শিক্ষা ও সাফল্যের প্রতি অনুরাগ ছিল এই পরিচ্ছেদটি দিয়ে গ্রন্থারম্ভ। শিক্ষার প্রতি অনুরাগ এই কথাটির অর্থ কিন্তু ক্লাসরুমের প্রতি অনুরাগ নয়। কিছুসংখ্যক বালক-বালিকা একেবারে স্কুলেই কখনো যাননি। অনেক বাবা-মা শিশুদের স্কুল থেকে ছাড়িয়ে এনে হয় বাড়িতে পড়িয়েছেন নয় কোনোরকম কাজকর্মে ভর্তি করে দিয়েছেন। টমাস এডিসন ও মারকনি উভয়েরই শিক্ষা-দীক্ষা বাড়িতে, এঁরা কেউ বিশ্ববিদ্যালয়ের ডিগ্রি সংগ্রহ করতে পারেন নি।

যে সব বিজ্ঞানী, ডাক্তার, শিক্ষক, কিংবা আইনজীবী উত্তরকালে প্রতিষ্ঠা অর্জন করেছেন, তাঁদের ক্ষেত্রে বিশ্ববিদ্যালয়ের লাইসেন্স অপরিহার্য। সুতরাং তাঁদের উত্তম কলেজে যেতে হয়েছে, পাশ করতে হয়েছে। কিন্তু এর পিছনে যে তাঁরা কি পরিমাণ মানসিক যন্ত্রণায় পিতামাতাকে উৎপীড়িত করেছেন সেই ইতিহাস চাপা থাকে।

যে পুত্রের বা কন্যার মধ্যে কোনো সম্ভাবনা আছে তার যাতে যথাযোগ্য ব্যবস্থা হয়, জনক-জননীরা তার জন্য সচেষ্ট থাকেন। যেখানে প্রতিশ্রুতিসম্পন্ন সন্তান এবং জনক-জননীর মধ্যে সংযোগ এবং বোঝাপড়া উন্নতধরনের সেইখানে ফলটাও উভয়পক্ষের পক্ষে বাঞ্ছনীয় হয়।

উইলিয়ম ও হেনরী জেমস আর তাঁদের অন্যান্য ভাইবোনেরা সর্বদাই স্কুলে ঢুকেছেন আবার বেরিয়ে এসেছেন। ধনী পিতার সঙ্গে কেবল এদিকওদিকে ভ্রমণ করেছেন, তাঁর আগ্রহ ছিল বহুমুখী। বিভিন্ন ধরনের সংস্কৃতির ও বিভিন্ন দেশসমূহের সঙ্গে ছেলেমেয়েদের পরিচিতি ঘটুক এই ছিল তাঁর বাসনা।

উড্রো উইলসনের যখন ন' বছর বয়স হয়েছে তখন সবে অক্ষর পরিচয় হল, আর এগারো বছর বয়সে পড়তে শিখেছেন, তাঁর বাবা তাঁকে পড়ে শোনাতেন। কারণ উড্রো কবে লেখাপড়া শিখে বই পড়ে তার রস গ্রহণ করবে তার জন্য অপেক্ষা করে থাকা তাঁর পক্ষে সম্ভব ছিল না, তাই তিনি নিজেই পড়ে ছেলেকে শোনাতেন, ব্যাখ্যা করতেন, তাৎপর্য বোঝাতেন এবং সে কি বুঝল এবং কি তার প্রতিক্রিয়া জানতে চাইতেন।

যে সব পরিবারে মনীষীদের আবির্ভাব ঘটে সেখানে সোজাসুজি ব্যক্তিগত চেষ্টায় গঠন করার প্রবণতাই সর্বাধিক। চারিদিকে যে অজস্র জ্ঞানভান্ডার রয়েছে সে কথা কেউ মনে রাখে না। পরিবারের কোনো একজনের উচিত, কেন তাঁর বা তাঁদের সন্তান অপরের চেয়ে বিভিন্ন প্রকৃতির তার কারণানুসন্ধান করা।

এই মহাগ্রন্থের আরো কয়েকটি মূল্যবান পরিচ্ছেদ নিয়ে আগামীবারে আলোচনা করা হবে।

—অভয়ংকর

'অজ্ঞেয়'র নতুন কবিতা সংগ্রহ ॥

আধুনিক হিন্দী সাহিত্যে 'অজ্ঞেয়'র অবদান খুবই উল্লেখযোগ্য। তার-সপ্তক আন্দোলনের তিনি অন্যতম প্রবক্তা। সম্প্রতি ১৯৫২-৬৬ সালের মধ্যে রচিত তাঁর কবিতার একটি নির্বাচিত সংকলন প্রকাশিত হয়েছে। প্রকাশ করেছেন বারাণসীর ভারতীয় জ্ঞানপীঠ। এই গ্রন্থে সংকলিত কবিতাগুলির মধ্যে 'অজ্ঞেয়'র এক স্বতন্ত্র মানবধর্মের বিকাশ লক্ষ্য করা যায়। কবি যেন এখানে এক নিরন্তর পথিক। কিন্তু এই যাত্রা কোনও মতবাদ বা প্রত্যয়ের দিকে নয়। গ্রন্থটির নাম 'কিতনি নাবোঁ মে কিতনি বার'।

রাষ্ট্রপতি কর্তৃক সিদ্ধেশ্বর শাস্ত্রীর প্রয়াসের প্রশংসা ॥

প্রখ্যাত মারাঠি পন্ডিত মহামহোপাধ্যায় সিদ্ধেশ্বর শাস্ত্রী মহাশয়কে সম্প্রতি পুণায় সম্বর্ধনা জানান হয়। এই সম্বর্ধনা অনুষ্ঠানে রাষ্ট্রপতি ডঃ জাকির হোসেন উপস্থিত থেকে ভারতীয় ভাষায় শ্রীসিদ্ধেশ্বর শাস্ত্রী মহাশয়ের অবদানের ভূয়সী প্রশংসা করেন। এই উপলক্ষে তিনি ভারতীয় বুদ্ধিজীবীদের আহ্বান জানিয়ে বলেন, "যদি তাঁরা নিজেদের কথা আপন আপন মাতৃভাষায় প্রকাশ করেন, তাহলে ভারতীয় জনতার কাছে তা সহজে পৌঁছাবে।" তিনি সিদ্ধেশ্বর শাস্ত্রীর কথা উল্লেখ করে বলেন, "দীর্ঘ ৩৫ বৎসর তিনি এই সাধনায় নিযুক্ত আছেন। তাঁর এই সাধনার দ্বারা ভারতীয় সাহিত্য সমৃদ্ধ হবে। সিদ্ধেশ্বরজী তাঁর সমস্ত রচনাই তাঁর মাতৃভাষা মারাঠিতে লিখেছেন।" তাঁকে অনুসরণ করে মাতৃভাষায় জ্ঞান-বিজ্ঞান চর্চার জন্য তিনি বুদ্ধিজীবীদের আহ্বান জানান।

বদলেয়র সম্পর্কে আলোচনা ॥

গত বুধবার, ১৩ সেপ্টেম্বর, সন্ধ্যায় কলকাতার পার্ক ম্যানসনে ফরাসী কবি বদলেয়রের মৃত্যুর শতবার্ষিকী উৎসব অনুষ্ঠিত হয়। এই সভায় শ্রীবুদ্ধদেব বসু বদলেয়রের উপর একটি মনোজ্ঞ ভাষণ দেন। তিনি বলেন যে, "বাংলা সাহিত্যে বদলেয়র তেমন কোন প্রভাব বিস্তার করতে পারেননি।" বাংলা সাহিত্যে বদলেয়রের প্রভাব প্রসঙ্গে আলোচনা করতে গিয়ে তিনি ঊনিশ শতকের বাংলার মানসিকতার উল্লেখ করেন এবং বলেন, "ঊনিশ শতকে যে রেনেসাঁসের প্রভাবে সমগ্র জাতি ভয়ানক মাত্রায় চঞ্চল হয়ে উঠেছিল, তার মূলে ছিল প্রধানত তিনটি উপাদান — মানবধর্ম, জাতীয়তাবোধ ও ধর্মীয় প্রেরণা। সেই বিশেষ মানসিকতা বদলেয়রকে গ্রহণের পক্ষে অনুকূল ছিল না। তাছাড়া বাঙালীর ভাব-প্রবণ মনের সঙ্গে বদলেয়রের ক্যাথলিক মনোভাবের কোন সামঞ্জস্য লক্ষ্য করা যায় না। কিন্তু এখন সময়ের পরিবর্তন হয়েছে। এই পরিবর্তিত সমাজ-মানসে বদলেয়রকে গ্রহণ অসম্ভব নয়।" তিনি তরুণ লেখকদের সংস্কারমুক্ত মনোভাব নিয়ে বদলেয়র-চর্চার জন্য আবেদন জানান।

বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদের বার্ষিক অধিবেশন ॥

গত ১৭ সেপ্টেম্বর "বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদের ৭৪তম প্রতিষ্ঠা দিবস উদ্‌যাপিত হয়। ডঃ রমেশচন্দ্র মজুমদার অনুষ্ঠানে পৌরোহিত্য করেন। তিনি তাঁর ভাষণে এই প্রতিষ্ঠানটিকে পুনরুজ্জীবিত করবার জন্য বাংলার তরুণ লেখক, শিল্পী এবং চিন্তাবিদদের আহ্বান জানান। তিনি বলেন, "আগামী দিনের হাওয়া যদি একে প্লাবিত না করে, তবে এই প্রতিষ্ঠান কখনই জীবন্ত হয়ে উঠতে পারবে না। তাই এর পেছনে তরুণদের সক্রিয় সহযোগিতা প্রয়োজন। বাংলা ভাষায় উচ্চশিক্ষা প্রদানের দাবী উঠেছে। তাই আজ বেশী পরিমাণে বাংলা পরিভাষা এবং গ্রন্থ প্রকাশ প্রয়োজন। এ ব্যাপারে বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদের দায়িত্ব অনেকখানি।"

শ্রীপ্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায় বলেন, "আজ বাংলা ভাষার একটি পরিভাষা অভিধানের প্রয়োজনীয়তা দেখা দিয়েছে। এছাড়াও বাংলায় বিদেশী গ্রন্থের অনুবাদ করা একান্ত দরকার।" বাংলা বানানের বিভিন্ন সমস্যার কথা আলোচনা করে তিনি এ বিষয়ে সকলকে সচেতন হতে আহ্বান জানান। তিনি দুঃখের সঙ্গে আরও বলেন যে, বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদ এই সুদীর্ঘ বৎসরের মধ্যে গবেষক শ্রেণী ছাড়া সৃজনশীল সাহিত্যিকদের বেশি আকৃষ্ট করতে পারেনি। অথচ এঁদের সহযোগিতা ছাড়া পরিষদের উন্নতি অসম্ভব। তাই তিনি নবীন সৃষ্টিধর্মী সাহিত্যিকদের এই প্রাচীন সাহিত্য মন্দিরে প্রবেশের আহ্বান জানান। ডঃ জগদীশ ভট্টাচার্য 'আধুনিক সাহিত্য' বিষয়ে ভাষণ দেন।

এই উৎসব উপলক্ষে পরিষদের সম্পাদকীয় রিপোর্টে জানান হয় যে, অর্থ

ভাবের জন্য গ্রন্থ ক্রয়, বাঁধাই এবং সংরক্ষণ ইত্যাদি কাজ বিশেষভাবে বিঘ্নিত হচ্ছে। এছাড়া গ্রন্থাগারে অবিরত ব্যবহারের জন্য ছিন্ন গ্রন্থের সংখ্যা ক্রমাগত বেড়ে যাচ্ছে। অবিলম্বে একটি ধাইমল চেম্বার ও একটি হ্যান্ড লেথিনেশন ইউনিট পরিষদের নিতান্ত প্রয়োজন। সম্পাদকীয় রিপোর্ট পাঠ করেন শ্রীঅতুলচন্দ্র দে মহাশয়।

পরলোকে দুজন হিন্দি সাহিত্যিক ॥

প্রখ্যাত হিন্দি কবি ও সমালোচক পণ্ডিত শান্তিপ্রিয় দ্বিবেদী গত ২১ আগস্ট বারাণসীতে পরলোকগমন করেন। মৃত্যুকালে তাঁর বয়স হয়েছিল ৬১ বৎসর। তিনি দীর্ঘদিন ধরেই অসুস্থ ছিলেন।

বিক্রম বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য ও প্রখ্যাত সমালোচক আচার্য নন্দদুলারে বাজপেয়ী গত ২৩ আগস্ট হৃদরোগে আক্রান্ত হয়ে উজ্জয়িনীতে পরলোকগমন করেন। মৃত্যুকালে তাঁর বয়স হয়েছিল ৬২ বৎসর।

রাষ্ট্রপতি কর্তৃক মারাঠি গ্রন্থ বিমোচন ॥

গত ২৪ আগস্ট রাষ্ট্রপতি ডঃ জাকীর হোসেন 'তিলক মহারাষ্ট্র বিদ্যাপীঠ'এ 'মহারাষ্ট্র গ্রামকোষ' ও 'দেবীকোষ' নামক দুটি মারাঠি গ্রন্থ প্রকাশের আনুষ্ঠানিক বিমোচন করেন। 'মহারাষ্ট্র গ্রামকোষ' গ্রন্থটি সম্পাদন করেন শ্রী এন জি আপ্টে। এই গ্রন্থে মহারাষ্ট্রের প্রতিটি গ্রামের মানচিত্র ও ভূ-তাত্ত্বিক বিশ্লেষণ সংকলিত হয়েছে। 'দেবীকোষ' গ্রন্থটি সম্পাদনা করেছেন শ্রী পি কে প্রভু দেশাই। এই গ্রন্থে ভারতের বিভিন্ন দেবতা, মন্দির, ধর্ম ইত্যাদির পাণ্ডিত্যপূর্ণ আলোচনা আছে। এই গ্রন্থটি পুরাতত্ত্ব, সমাজ ও ইতিহাস বিষয়ে ভারতীয় সাহিত্যে একটি মূল্যবান সংযোজন।

পাঠ্যপুস্তক প্রদর্শনী ॥

গত ২১ থেকে ২৫শে আগস্ট পর্যন্ত ভারত সরকারের শিক্ষা মন্ত্রক কর্তৃক বিশ্ববিদ্যালয় স্তরের ভারতীয় ভাষায় রচিত পাঠ্যপুস্তকের একটি প্রদর্শনীর ব্যবস্থা হয়। এতে বিভিন্ন ভারতীয় ভাষায় রচিত প্রায় চার হাজার গ্রন্থ প্রদর্শিত হয়। বিষয় অনুসারে এই প্রদর্শনীতে প্রদর্শিত গ্রন্থগুলির সংখ্যা নিম্নে উল্লেখ করা যাচ্ছে।

আয়ুর্বিজ্ঞান—২২৯, ইঞ্জিনীয়ারিং—৩০, ভূ-বিজ্ঞান—৮, গণিত—১৫৪, রসায়ন—৭৩, বনস্পতি বিজ্ঞান—৫০, কৃষি—১৮৭, প্রাণীবিজ্ঞান—৬৭, ভৌতিকী—১৪০ সৈন্যবিজ্ঞান—১০, অর্থশাস্ত্র—২৭৮, ইতিহাস ও সংস্কৃতি—২০২, দর্শন—৭০, রাজনীতিবিজ্ঞান—৪১৪, মনোবিজ্ঞান—১৪৭, শিক্ষা—৩০২, সমাজশাস্ত্র—২৪০, ভাষাবিজ্ঞান—৫০, সমালোচনা—৫৫৮, বাণিজ্যবিজ্ঞান—২১৮, ভূগোল—১০২, সাধারণ বিজ্ঞান—১৯২ ও বিভিন্ন—১৪।

জন ওসবর্নের দুঃসাহসিক নাটক

ইংরেজী ভাষার নাট্যকার হিসেবে জন ওসবর্ণ স্বদেশে এবং বিদেশে জনপ্রিয়। ইতিপূর্বে তাঁর 'লুক ব্যাক ইন অ্যাঙ্গার' ও 'ইনঅ্যাডমিসিবল এভিডেন্স'—নাটক দুটির সহজ সরল ভাবভঙ্গী তাঁকে খ্যাতিমান করেছিল। কিন্তু ওসবর্ণের ইদানীং চিন্তাধারায় আমূল পরিবর্তন লক্ষ্য করা গেছে। বদল হয়েছে রীতির। এখন তিনি 'ক্ষুদ্র' নাটক লেখবার পক্ষপাতী। এবং প্রকরণের ব্যাপারেও তাই তিনি এখন কিমিতিবাদীদের দলে।

সম্প্রতি বেরিয়েছে তাঁর একটি নতুন নাটক। নাম : 'এ বণ্ড অনারড'। এটি অশ্লীল ও দুঃসাহসিক নাট্যকর্ম বলে অভিহিত হয়েছে। ইতালিয়ান নাট্যকার লোপ দি ভেগা-র একটি ক্ষুদ্র নাটক অবলম্বনে আলোচ্য নাটকটির ভাবমণ্ডল গঠিত। অধিকাংশ সমালোচকেরই মতে এটি 'অ্যাবসার্ড' বা কিমিতিবাদী। এর অন্তর্ভুক্ত চরিত্রগুলি কখনো অত্যন্ত কৌতুকপ্রবণ, বিমূর্তভাবকল্পনার প্রতীক, নিষ্ঠুর ও যৌন-বাসনার ইন্দ্রিয়নির্ভর। চরিত্রচিত্রণ নাটকটির অন্যতম সম্পদ। নায়কচরিত্র লিওনিডো এবং মারসেলা চরিত্র দুটি অনন্য। মুর এবং ক্রিশ্চিয়ানদের ধর্মবোধ নাটকটির প্রাণকেন্দ্রে সংঘাতকে ঘণীভূত করেছে। আকারে ছোট-নাটকটি যতোটা পঠনের উপযোগী ততটা মঞ্চ-বিরোধী।

ওয়েস্ট ইণ্ডিজ সাহিত্যের ত্রয়ী ॥

ওয়েস্ট ইণ্ডিজের সাহিত্য সম্পর্কে ইতিপূর্বে এই বিভাগে আমরা কিছু আলোচনার সূত্রপাত করেছিলাম। বর্তমানে সেখানে অল্পবয়সীদের সাহিত্যচর্চা তাঁদের প্রতিষ্ঠার পথে অনেকটাই এগিয়ে নিতে পেরেছে। সম্প্রতি সেখানে একধরনের বিচিত্র গোষ্ঠীভুক্তির মাধ্যমে জনসাধারণ্যে সাহিত্য প্রচারের লক্ষণ স্পষ্ট হয়ে উঠেছে। এইরকম তিনজন তরুণ লেখকের খবর জানা গেছে।

এঁরা হলেন পল রবিন্স, টেড এ হ্যারিস, ম্যাক জে হান্ট। এঁরা নিজেদেরকে নতুন তারুণ্যের অন্যতম ত্রয়ী বলে দাবী করছেন। তিনজনেই একাধারে কবি, ছোটগল্পকার। উপন্যাস এখনও কেউ লেখেননি—তবে শিগ্গীরই লিখবেন বলে জানিয়েছেন।

নিজেদের আত্মপ্রকাশের মাধ্যম হিসেবে এঁরা এক প্রকাশনা সংস্থার সহযোগিতায় একটি পত্রিকা প্রকাশ করেছেন। পত্রিকাটির নাম 'দি থ্রি'। ত্রৈমাসিক এই মুখপত্রটিতে কেবলমাত্র তিনজন লেখকেরই রচনা থাকবে। বলা বাহুল্য এই তিনজন—রবিন্স, হ্যারিস ও হান্ট। তিনজনই বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র। বয়স উনিশ থেকে একুশের মধ্যে। তিনজনই যে শক্তিশালী লেখক সমালোচকরা তা স্বীকার করেছেন। এ পর্যন্ত তিনজনেরই একটি করে বই বেরিয়েছে। রবিন্সের বইটির নাম : 'দি রিঙ অ্যান্ড আদার স্টোরিজ'। হ্যারিসের বইটির নাম 'মাই পোয়েট্রি অ্যান্ড প্রোজেস'। হান্টের বইটির নাম 'ইট ওয়াজ ওয়ান ফাইন মর্ণিং।' এটি একটি কাব্যগ্রন্থ।

জার্মানীতে আন্তর্জাতিক লেখক সম্মেলন ॥

জার্মানীর অন্যতম প্রকাশনা সংস্থা "ভেরলাগ" একটি আন্তর্জাতিক লেখক সম্মেলনের খসড়া প্রস্তুত করছেন। এ উপলক্ষ্যে এ পর্যন্ত তাঁদের দুটি অধিবেশন হয়ে গেছে। আন্তর্জাতিক লেখক সংঘ তৈরী করা, লেখকদের পরস্পরের কাছাকাছি আনতে পারা বিভিন্ন দেশের সাহিত্যসম্পর্কে আগ্রহ সৃষ্টি করা, ভাব ও বিনিময়ের সুযোগ ইত্যাদি আলোচ্য লেখক সম্মেলনের প্রধান উদ্দেশ্য। এর জন্য পৃথিবীর বিভিন্ন দেশ থেকে লেখকদের আমন্ত্রণ জানানো হবে। এ উপলক্ষ্যে একটি আন্তর্জাতিক পুস্তক প্রদর্শনীরও ব্যবস্থা থাকবে। মোট তিনদিনের অনুষ্ঠান হবে আলোচ্য সম্মেলনের 'বয়র।' প্রথমদিন লেখক সম্মেলন ও পুস্তক প্রদর্শনী। দ্বিতীয়দিন আমন্ত্রিত লেখকদের

সম্বর্ধনা ও জার্মানীর বিভিন্ন সাংস্কৃতিক চক্রের বিভিন্নরকম অনুষ্ঠান। নৃত্য, নাটক, চলচ্চিত্র প্রদর্শন ইত্যাদিও এদিনের অনুষ্ঠানের অন্তর্ভূত। তৃতীয়দিনের অনুষ্ঠানটি সম্পূর্ণতই জার্মানীর নিজস্ব সংস্কৃতির পরিচয় সম্বন্ধ। বর্তমান জার্মানীর সাহিত্য ও সংস্কৃতি, জার্মানীর তরুণ লেখক সম্প্রদায়, চলচ্চিত্র ও জার্মানী প্রভৃতি বিষয়গুলি এদিনকার প্রধান অঙ্গ। ইতিমধ্যেই পৃথিবীর ১৩০টি দেশের প্রধান লেখকদের কাছে আমন্ত্রণপত্র পাঠানো শুরু হয়ে গেছে। আগামী নভেম্বরের মাঝামাঝি এই আন্তর্জাতিক লেখক সম্মেলনটি অনুষ্ঠিত হবে। ভারতবর্ষ থেকে আর কে নারায়ণ ও দুজন তরুণ সম্প্রদায়ের লেখক নিমন্ত্রিত হচ্ছেন বলে জানা গেছে। বাংলাদেশ থেকেও একজন লেখক তার মধ্যে স্থান পাবেন বলে অনুমান করা হচ্ছে।

হেনরি সিগেলের নতুন উপন্যাস ॥

মাত্র একখানি উপন্যাস লিখেই বিখ্যাত হয়েছিলেন হেনরি সিগেল। জাতি হিসেবে মার্কিন—কিন্তু সিগেল তাঁর সাহিত্যকর্মের ভাষা গ্রহণ করেছেন ফরাসী। ফরাসীভাষীদের কাছে তাঁর উপন্যাসের জনপ্রিয়তা আছে। ইতিপূর্বে যে উপন্যাসটি তিনি লিখেছেন তার নাম 'টেম্পটেমোনি'। সম্প্রতি বেরিয়েছে তাঁর আলোড়নসৃষ্টিকারী আরেকখানি উপন্যাস। নাম : 'দি ওয়াণ্ডারার্স'। বলা বাহুল্য এটি তাঁর দ্বিতীয় উপন্যাস।

'দি ওয়াণ্ডারার্স' উপন্যাসের নায়িকা ক্লারা বিকৃতমস্তিষ্ক, কামুক ও অসুস্থ। সমালোচকদের মতে চলতি দুনিয়ার অশান্ত বিকৃতি ও জটিলতাই আলোচ্য উপন্যাসের ক্লারা চরিত্রের মাধ্যমে প্রতীকের সাহায্যে সিগেল বর্ণনা করেছেন। বিশেষত আমেরিকার যুবজীবনের জীবনযাত্রার প্রতিই যেন লেখকের ধিক্কার বেশীমাত্রায় ধ্বনিত হয়েছে। আলোচ্য উপন্যাসের পটভূমি আমেরিকার একটি ঘনবসতিপূর্ণ শহরাঞ্চল। পাত্রপাত্রীরাও সকলেই মার্কিন সম্প্রদায়েরই পরিচয় বহন করেছে। লেখক কোথাও সোজাসুজি তা লেখেননি কিন্তু তাঁর ইঙ্গিতধর্মিতা থেকেই মূল অর্থ গ্রহণ করা সহজ হয়েছে।

লেখক অভিযুক্ত ॥

বৃটেনের এক মঞ্চাভিনেত্রী তাঁর জীবন-কাহিনী নিয়ে রচিত একটি উপন্যাসের রচয়িতার বিরুদ্ধে মানহানির মামলা দায়ের করেছেন। উপন্যাসটির নাম : 'শী অ্যাণ্ড হি'। এর রচয়িতা জন ক্রেটন। অভিযোগকারী ডোরা ক্রেণ্ডার্স বলেন যে, জন ক্রেটন ছিলেন তাঁর প্রণয়াসক্ত। গত এক বছরে ক্রেটনকে তিনি তাঁর জীবনের সমস্ত কাহিনী বলেছিলেন। এই গোপন অধ্যায়গুলিকেই ক্রেটন তাঁর বর্তমান উপন্যাসটির বিষয়বস্তু হিসেবে ব্যবহার করেছেন। বইটি ক্রেটন ডোরা ক্রেণ্ডার্সের নামেই উৎসর্গ করেছেন। কিন্তু ক্রেণ্ডার্স তাতে আরো ক্ষিপ্ত হয়েছেন। এবং মামলার জন্য উকিলের শরণাপন্ন হয়েছেন। জানা গেছে যে এই মানহানির ক্ষতিপূরণ বাবদ তিনি এক বিরাট অঙ্ক দাবী করেছেন।

নতুন বই

বিচিত্র স্বাদের কাহিনী

কল্লোলের কাল থেকে অচিন্ত্যকুমার অজস্র গল্প লিখে এসেছেন এবং সুখের বিষয় আজো তাঁর লেখনী অক্লান্ত। অচিন্ত্যকুমারের 'শতগল্পে'র একটি সংকলন কিছুকাল আগে প্রকাশিত হয়েছে এবং এই বিভাগে তার বিস্তারিত আলোচনা হয়েছে। কি বিচিত্র জীবনের কাহিনী সন্ধান করেছেন কথাশিল্পী অচিন্ত্যকুমার তার পরিচয় তাঁর "শত গল্পে"র বিভিন্ন গল্পগুলির মধ্যে পাওয়া যায়। আর পাওয়া যায় কালানুসারে লোকের মর্জি এবং লেখার আঙ্গিকও কি ভাবে পরিবর্তিত হয়েছে। অচিন্ত্যকুমারের কাহিনীনির্বাচনে যেমন বৈশিষ্ট্য আছে তেমনই বৈচিত্র্য বর্তমান তাঁর পরিবেশন ভঙ্গীতে। সম্প্রতি প্রকাশিত 'চন্দন-মালিকা' নামক গল্পগ্রন্থটিতে গত এক বছরে অমৃত, দেশ, আনন্দবাজার প্রভৃতি সাময়িক পত্রে প্রকাশিত গল্পগুলি সংকলিত হয়েছে। প্রথম গল্প 'ডাকনাম'। স্বামীর মৃত্যু হয়ে গেল অকস্মাৎ, তারপর এল চমক. দেখা গেল কে একজন আবেদন করেছে স্বামীর সম্পত্তিতে অর্ধেক দাবী জানিয়ে। অনেক সন্ধানে জানা গেল সে একজন বারবনিতা মাত্র, জীবনের প্রথম স্তরে বংশে সুন্দর, চেহারায় সুন্দর, পুণ্যবান মহাপুরুষ স্বামী এসেছিলেন এই মেয়েটির সংস্পর্শে, একটা নামকাওয়াস্তে বিবাহ হয়েছিল। একটি ধাতের সঙ্গিনী রতন। এই রতনকে নবারুণ (স্বামী) ভুলতে পারে নি তাই তার আইনসিদ্ধ স্ত্রীকে সে মৃত্যুর পূর্বমুহূর্ত পর্যন্ত রতন বলেই ডেকেছে। 'উপল ও উৎপল' গল্পটিতে অফিসের বড়কর্তা অধিক রাতে তাঁর অফিসের মহিলাকর্মীকে ফোন

শ্রীঅচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্ত

করছেন অকারণে, গলার স্বরটা শুনতে ইচ্ছে হল পর্যন্ত। তারপর সেই বড়কর্তা মিঃ রক্ষিত ওদের জন্য কি কি করতে পারেন, ফ্ল্যাট জোগাড় করা থেকে সুদীপের জন্য স্যানেটোরিয়ম, এই নিয়ে মা ও মেয়েতে আলোচনা। মেয়ে বিরক্ত হয়ে বলে আমাকে এখন ঘুমাতে দাও। অফিস যাওয়ার সময় মা মেয়েকে বলে দেন—এমন কিছু বলিসনে যাতে মিঃ রক্ষিত ক্ষুণ্ণ হন। যাই হোক অফিসের বড়সাহেব শেষ পর্যন্ত একদিন বললেন—তোমাকে আমি চাই। ভীষণভাবে চাই। তোমার জন্য আমি মরে যাচ্ছি। আর সেই সঙ্গে স্পষ্টই বললেন আমার কাছে রক্ষিতা হয়ে থাকো। চাকরী ছেড়ে দিল কিন্তু আবার চাকরী হল, স্মরজিৎ বিবাহ করবে ঘোষণা করল। এই গল্পের চমক একেবারে শেষে, সধবা সেজে বিপদত্রাণের উপায় হিসাবে যে রক্ষাকবচ ডাক্তারের কাছে গিয়ে পরেছিল সেটি আবার খুলে দিতে বলল। কারণ আমার বিয়ে।

এই ধরনের ঘটনা বর্তমান কালে সমাজে সর্বদাই ঘটছে তার এমন শিল্পসংগত প্রকাশে লেখক সংযম এবং দক্ষতা প্রকাশ করেছেন। তৃতীয় গল্প 'নয়ন'। একটি সাধারণ গণিকার মহৎ প্রাণের পরিচয়। হেনরী মিলারের একটি গল্পে প্যারিসের এক গণিকার মহৎ অন্তকরণের বর্ণনা আছে, কিন্তু সেই সঙ্গে আছে গণিকালয়ের ক্লেদাক্ত বিবরণ। অচিন্ত্যকুমার কয়েকটি আঁচড়ে এঁকেছেন একটি কিশোরের চরিত্র, তার নাম দীপক। তারপর দীপককে যখন বাড়িউলি ধরে এনেছে মামলার সাক্ষী দেওয়ার জন্য তখন নয়ন বলল ও ত আমার ভাই নয়। ভাই না ছাই। আমার ভাই কলেজে পড়ে। এই ভাবে এক নিদারুণ সঙ্কটের মধ্য থেকে কলেজ-পড়া দীপককে রক্ষা করেছিল নয়ন

কিসের আকর্ষণে? লাবণ্য যে পুলিশের কাছে পরিচয় দিয়েছিল সে মেয়ে নয়, বউ। সেই লাবণ্য সম্পর্কে অলকা বিশ্বাস উক্তি করলেন ওর সত্যি পরিচয় ও মা। একটা গৃহসুখ-বঞ্চিতা জননীহৃদয়ের আকুলতা এই 'লাবণ্য' গল্পটিতে ফুটে উঠেছে। পার্ক'স শাদা শূন্যগায় মন্দিরার মধ্যে কি দেখেছিল যার ফলে তার ছবি আঁকা আর হয় নি—সেই ছবির জায়গায় সে রেখেছিল একখানি শাদাপাতা। তার মধ্যে লোভ ছিল কিন্তু ভদ্রতাও ছিল তাই মন্দিরা পার্কসকে ভুলতে পারেনি। 'অনাথ বাসনা' কাহিনীটিতে যে বেদনা আছে তা আধুনিক সমাজের জীবনযন্ত্রণা। সন্দীপ আত্মহত্যা করেছিল শর্বরীর কুষ্ঠ হয়েছে মনে করে, কিন্তু ট্রাজেডি আত্মহত্যায় নয়, ট্রাজেডি যখন ডাক্তারি রিপোর্ট এল যে কেসটা কুষ্ঠ নয়, সেটা ধবল।

'চন্দনমালিকা' অচিন্ত্যকুমারের পরিণত মানসের ফসল। গল্পগুলি আয়তনে ক্ষুদ্র, নাটকীয়ত্বে ভরপুর অথচ জীবনযন্ত্রণার আকুলতা তার প্রতিটি ছত্রে। কাহিনীগুলির পরিবেশন ভঙ্গী সংক্ষিপ্ত এবং সমাপ্তি আকস্মিক, এই আঙ্গিক বাংলা গল্পে বিরল।

চন্দন মালিকা (ছোটগল্প)—অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্ত প্রণীত। প্রকাশক : সাহিত্যপ্রকাশ ; ৫।১, রমানাথ মজুমদার স্ট্রীট, কলিকাতা—৯।। দাম তিনটাকা পঞ্চাশ পয়সা।।

রবীন্দ্রনাথের সোভিয়েট সফর

ফিওদোর পেত্রফ রুশ সাহিত্য পত্রিকা 'লিতারাতুরনাইয়া গাজেতা'র সাম্প্রতিক সংখ্যায় রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের সোভিয়েত ভ্রমণ সম্পর্কে তাঁর স্মৃতিকথা লিখেছেন। ১৯৩০ সালে রবীন্দ্রনাথ সোভিয়েত পরিদর্শনে যান।

ডঃ পেত্রফ সে সময় ছিলেন বিদেশের সঙ্গে সাংস্কৃতিক সম্পর্কের সোভিয়েত সমিতির অধ্যক্ষ। মস্কোয় কবির সঙ্গে তাঁর প্রথম আলাপ-আলোচনাই হয়েছিল দীর্ঘ কয়েক ঘণ্টা ধরে বিভিন্ন বিষয়ে এবং তার সমস্তটাই শর্টহ্যান্ড-এ লিপিবদ্ধ করে রাখা হয়।

রবীন্দ্রনাথ তখন ডঃ পেত্রফকে বলেছিলেন : ভারতবর্ষের সমস্ত প্রগতিশীল মানুষ আজ মাতৃভূমির স্বাধীনতার জন্য সংগ্রাম করছে। আমরা বিশ্বাস করি যে মুক্তির প্রহর আসবেই। আর তা খুব দূরে নয়। ভারত যদিও তার নিজের পথ ধরেই এগোবে, কিন্তু সে অন্যান্য দেশের অভিজ্ঞতা থেকেও সমৃদ্ধ হবে। বিশেষ করে সোভিয়েত অভিজ্ঞতা থেকে।

রবীন্দ্রনাথের সম্বর্ধনা হয় মস্কোয়। পেত্রফ লিখেছেন : এত জনসমাগম সে সভায় হয়েছিল যে, মনে হয়েছিল মস্কোর সমস্ত মানুষই বুঝি কবিকে দেখতে চায়। সে সভার প্রবেশপত্র সব নিঃশেষিত হয়ে গিয়েছিল।

কবি সোভিয়েত সফরে তাঁর চিত্রসম্ভার সঙ্গে করে এনেছিলেন। মস্কোয় রবীন্দ্রনাথের চিত্র-প্রদর্শনীটি অত্যন্ত সাফল্যমণ্ডিত হয়। ৫০০০-এর ওপর নরনারী রবীন্দ্রনাথের আঁকা ছবি দেখতে এসেছিল।

পেত্রফ লিখেছেন : রবীন্দ্রনাথকে দেখে আমার দৃঢ়প্রত্যয় হয়েছিল যে, তিনি এক বহুমুখী প্রতিভার পুরুষ। সব সময়েই তাঁর মন কবিত্ব, কল্পনাশক্তি ও নতুন নতুন সৃজনী ধ্যানধারণায় ভরপুর থাকত। আর এর সঙ্গে সর্বদাই জনসাধারণের সমস্যাগুলির সম্পর্কে ছিল তাঁর মন জাগ্রত। তিনি প্রায়ই বলতেন যে, তিনি দীর্ঘজীবন চান। কারণ তিনি দেখে যেতে চান তাঁর স্বপ্নকে সার্থক হতে। সে স্বপ্ন ছিল ভারতবর্ষের মানুষ একদিন পরাধীনতা ও শোষণের নাগপাশ ছিঁড়ে মুক্ত হবে ও নিজের অর্থনীতি, শিল্প ও সংস্কৃতি নিয়ে জগৎসভায় আবার মাথা তুলে দাঁড়াবে।

পেত্রফ আরও লেখেন : একবার মনে আছে যুদ্ধের বিষয়ে কবির সঙ্গে আমার কথা হয়েছিল। কবি খুব জোরের সঙ্গে যুদ্ধ ও হিংসার নিন্দা করলেন। এর বহুদিন পরে আবার যখন একটা বিশ্বযুদ্ধ বেঁধে গেল, রবীন্দ্রনাথের তখন জীবনসন্ধ্যা। তবু সেই শেষ মুহূর্ত পর্যন্তও রবীন্দ্রনাথ যুদ্ধ ও ফ্যাসিবাদের বিরোধিতা করে গিয়েছিলেন আর সর্বান্তকরণে সমর্থন জানিয়ে গিয়েছিলেন সোভিয়েত ইউনিয়নের প্রতি।

প্রতিষ্ঠিত কবির নতুন বই

শ্রীশান্তিকুমার ঘোষ কবিতা লিখছেন প্রায় বছর পনের ধরে। কিন্তু এতদিনে বেরোল তাঁর দ্বিতীয় কবিতার বই, 'কবিতা এবং কবিতা'। বইখানি হাতে পেয়ে তাই আগ্রহের সঙ্গে পাঠ করা গেল, এবং বলা যায়, তাঁর কবিতার বিষয়ে উৎসাহিত হবার মতো উপকরণ এ বইয়ে যথেষ্টই আছে। তাঁর কবিতা আগেও আমাদের ভালো লাগত। এখন শব্দ-ব্যবহার আরো নিপুণ, চিত্রগুলি ইঙ্গিতময় এবং কবিতার ভাবগত আবেদন আরো গভীর হয়ে উঠেছে। কয়েকটি কবিতার নিসর্গ পরিবেশ-রচনার দক্ষতা এবং আবেগের শান্ত বিষাদময় গাম্ভীর্য সত্যি মুগ্ধ হবার মতো। কখনো বা শান্তিকুমারের কাব্য-বক্তব্যই দানা বেঁধেছে চিত্রকল্প এবং প্রতীকের মারফৎ। যেমন

> আধখানা-নারী-অর্ধেক-জন্তু
> বিরাট মূর্তিতলে
> স্বপ্নচালিত আকাঙ্ক্ষা ঘোরে
> বঙ্কিম হাত' ঘেঁসে।

এবং একটি গোটা কবিতা—

> কখন পাথর খসে গেছে
> তোমার আংটি থেকে :
> হা-হা করছে গহ্বর।
> কে ফিরিয়ে দেবে
> অসম্ভব ভালোবাসা অসাধ্যপ্রণয়।
> বিদ্ধ কম্পমান হৃৎপিণ্ড
> তেজস্ক্রিয় ঝড়ে।

প্রসঙ্গত উল্লেখ করা দরকার, শেষ লাইনে 'তেজস্ক্রিয়' কথাটি আকস্মিক নয়। শান্তিকুমারের কবিতায় এ কালের বিজ্ঞান-চেতনাও উপযুক্ত মর্যাদায় স্বীকৃত। তাই এ ধরনের শব্দাবলী তাঁর স্বকীয় কাব্য-পরিমণ্ডলেরই সহায় হয়ে উঠেছে।

যুক্তির সঙ্গে আবেগের মিশ্রণ তাঁর কবিতায় এক নতুন স্বাদ বহন করে এনেছে, এবং এরই ফলে তিনি পঞ্চাশের অন্যান্য সতীর্থদের থেকে হয়ে উঠেছেন বিশিষ্ট।

কবিতা এবং কবিতা— শান্তিকুমার ঘোষ। কৃত্তিবাস প্রকাশনী। দাম আড়াই টাকা।

সংকলন ও পত্র-পত্রিকা

বাংলা সাহিত্যের প্রসার ও প্রচারের জন্যে প্রকাশন সংস্থাগুলির অবদান কম নয়। সেকালে 'ভারতবর্ষ' এবং 'বসুমতী'র উদ্যোক্তা ছিলেন প্রকাশকবর্গই, এবং সেই সাহিত্যসেবার ঐতিহ্যে পত্রিকা দুটি গর্ববোধ করতে পারে। একালে কিন্তু প্রকাশকগণ এ ব্যাপারে ততোটা আগ্রহী নন। ব্যতিক্রম হিসাবে 'মৌচাক', 'কথাসাহিত্য' এবং 'নবকল্লোলে'র নাম নিশ্চয়ই করা চলে, কিন্তু আরো কাগজ কেন প্রকাশিত হয় নি সে আক্ষেপও কম নয়। অন্তত আজকের দিনের শিক্ষাপ্রসার এবং নতুন লেখকদের সংখ্যাবৃদ্ধির তুলনায় পরীক্ষা-নিরীক্ষা ও অনুশীলন করা যায় এমন লিটল ম্যাগাজিনের সংখ্যা যে কম তা স্বীকার করতেই হবে। সেইজন্যে শ্রীশচীন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়ের সহযোগিতায় এবং শ্রীবিমল মিত্রের সম্পাদনায় 'কালি ও কলম' নামে এককালের বিখ্যাত কাগজটির পুনরাবির্ভাব দেখে খুবই আশ্বস্ত হওয়া গেল। পত্রিকাটি ছিমছাম ও রুচিবান, আর প্রকাশিত প্রথম সংখ্যা ও বিজ্ঞাপিত দ্বিতীয় সংখ্যার লেখক-সূচিও খুবই উৎসাহজনক। নতুন লেখকগণ এ কাগজের জন্যে প্রকাশকবর্গকে ধন্যবাদ জানাবেন তাতে সন্দেহ নেই। আর পাঠকগণও পাবেন নতুন স্বাদের লেখা।

কালি ও কলম : সম্পাদক—বিমল মিত্র; সহযোগী সম্পাদক — শ্রীশচীন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়। ১৫, বঙ্কিম চ্যাটার্জি স্ট্রীট, কলকাতা—১২। দাম—৬০ পঃ।

বন্য মেজাজেও বৈচিত্র্য আছে

বিকাশকান্তি রায়চৌধুরী

দ্বিপদীর দুনিয়ায় মেজাজ একটা মস্ত কথা। মানুষভেদে তার হেরফেরটাও চোখে না পড়ার কথা নয়। চতুষ্পদীর অরণ্য-সংসারেও এই ব্যক্তি-মেজাজের বৈষম্য কিছু কম নয়। তবে অরণ্যচারী মানুষ আরণ্যকের মেজাজ নিয়ে মাথা ঘামাতে চিরকালই যেন নারাজ। একটা বাঁধাধরা ছকের মধ্যে ফেলেই এর হিসেব-নিকেশ করতে অভ্যস্ত হয়েছে মানুষের মন ও মগজ। ফলে বদ্ধমূল একটা ধারণা গড়ে উঠেছে আরণ্যকের সম্পর্কে। আদ্যিকালের সেই বুড়ো বটের মত ডালপালা ছড়িয়ে সকল ধ্যান-ধারণাকে জুড়ে আছে সে, আচ্ছন্ন করে আছে নতুন আলোর পথ।

বাঘের কথাই বলি আগে। অরণ্য-সমাজের সেরা সে মহামহিম মহারাজ। হিংস্রতা কিংবা শক্তিমত্তায়, চৌর্যে অথবা চাতুর্যে ওরা অপরাজেয়; পৌরুষে ওরা জ্বলন্ত পাবক, সংগ্রামে ওরা সব্যসাচী আর অহঙ্কার ওদের আকাশছোঁয়া। ভয়াল সুন্দর বলেই না অরণ্য এমন অপরূপ, আলেয়ার হাতছানির মত এমনি দুর্বার ওর মোহিনী মায়ার আকর্ষণ।

আরণ্যকের জাতে সেই ভয়াল সুন্দর রূপটি যেন ব্যাঘ্রবপুতেই বিধৃত। গাম্ভীর্যে সে জন্ম-গম্ভীর, চলনে সে চরম আভিজাত্য-অভিমানী। সব মিলিয়ে বিধাতার সৃষ্টিবৈচিত্র্যে সে যেন মহাকালের প্রলয় বিষাণ।

সুসম ছন্দে সেরা হচ্ছে সিংহ, তাই বোধহয় পশুরাজ ওর পদবী।

মানুষ শুধু সৃষ্টিতেই তার কল্পনাকে উজাড় করে দেয় নি, সংহারকেও আবার শেষ বলে মেনে নিতে পারে নি সে মনে মনে। এক বিধাতাকেই তিন টুকরো করে গড়েছে তাই তিন বিধাতা—স্রষ্টা, পালন-কর্তা আর সংহারদেবতা—ব্রহ্মা, বিষ্ণু আর শিব। এই তিনকে মিলিয়েই সৃষ্টির প্রাণ-প্রবাহকে সে দেখেছে সজীব, গড়তে চেয়েছে সুসম সংসার।

এহেন মানুষ বাঘকে বিচার করেছে শুধু মহাকালের প্রতীকরূপে। পালন-কর্তার ক্ষমা নেই, সহনশীলতা আর ঔদার্য নেই বাঘের, নেই মনের মাধুরী মিলিয়ে সংসারকে মধুর করে তোলার মত ত্যাগ আর মমতাবোধ।

বন্য সমাজের তখত-ই-তাউসে মানুষ তাই প্রতিষ্ঠিত করতে চেয়েছে কেশরীকে। দিয়েছে ওকে পশুরাজের পদবী, শ্রদ্ধা জানিয়েছে যুগে যুগে, বন্দনা করেছে সাহিত্যে, শিল্পে, ভাস্কর্যে, কাব্য-গাথায় কিংবা চিত্র-লেখায়।

মায়ের স্নেহে ইতরবিশেষ নেই। মানুষী মা আপন সন্তানের জন্যে যে স্নেহের পরিচয় দেন চতুষ্পদী কোন মায়ের সন্তান-বাৎসল্য তার চাইতে কিছু কম বলে মনে করবার কোন সঙ্গত কারণ দেখি না। পরি-বেশ, জীবনযাত্রা আর বিচারবুদ্ধির আসমান-জমীন ফারাক যেখানে সেখানে কোন একটা মাপকাঠিতেই তার পরিমাপ চলে না। স্বয়ং মহাকালী মূর্তি যে বাঘিনী মা সেও মানুষী মায়ের মতই সমান স্নেহে লালন করে শিশু-সন্তানকে। সন্তানের প্রাণচাঞ্চল্যে সেও সমান আনন্দ পায়, সমান গরবে গরবিনী। আবার সন্তানের শোকে মানুষী মায়ের মতই কেঁদে মরে সে।

হ্যাঁ, বাঘিনী মাও কাঁদে।

হরিণী মায়ের কান্না আমি শুনেছি কতবার, হস্তিনী মায়েরও। মৃত শিশুকে বুকে জড়িয়ে বেড়াতে দেখেছি ভালুকী মাকে।

পুত্রহারা এক বাঘিনী মায়ের সঙ্গে পরিচয় আমার বেশ ঘনিষ্ঠ বলেই সাহস করে অমন কথাটা বলতে পারলাম।

সুন্দরবনের তেরকাঠির বাদা। জঙ্গল এখানে যেমন গভীর, তেমনি প্রচুর এখানে বন্যপ্রাণের স্পন্দন। এই জঙ্গলখণ্ডের এক দুর্গম গভীরতায় ছিল এক ইঁটের ভগ্ন-স্তূপ। পোড়ো বাড়ির একটি কক্ষ তখনও দাঁড়িয়েছিল তার ভাঙাচোরা চেহারা নিয়ে। অগুণতি কাঁটা-ঝোপে লতায়-পাতায় এমনি আত্মগোপন করেছিল সেই জীর্ণ স্তূপ যে দশ হাত দূরে দাঁড়িয়েও ওর নিশানা ঠাহর করতে পারি নি আমরা।

অকস্মাৎ কানে এলো এক সময় কাতর গোঙরানি। যন্ত্রণাকাতর বাঘের গলার চাপা আওয়াজ। একটানা সেই অস্ফুট আর্তনাদ দিল পথের নিশানা।

ভগ্নস্তূপের এক অন্ধকার সুড়ঙ্গপথে প্রসববেদনায় কাতর কোন বাঘিনী। জরা-জীর্ণ সেই কুঠুরীতে আশ্রয় নিয়ে এবার চোখ রাখলাম বাঘিনীর উপরে। দুঃসহ সেই প্রসববেদনার শেষ হল এক সময়। একে একে তিনটি সন্তান প্রসব করল বাঘিনী। সদ্যপ্রসবের ধাক্কা কাটে নি তখনও, বিশ্রী শব্দ করে হাঁপাচ্ছে সে রীতিমত। তবু ওর অন্ধ সন্তান তিনটিকে আগলে রাখার জন্যে কি কষ্টকর প্রয়াস মায়ের।

শেষ বর্ষা তখন। আগাছায় ভরে গেছে ভগ্নস্তূপ। পায়ে পায়ে বিষাক্ত সাপের ভয়। মাথার উপরকারের ছাদ তার দেহটাকে এলিয়ে

দিয়েছে এক পাশে। তবু যেন বাঘিনী মায়ের মায়া এড়াতে পারি না। বেশ কয়েক দিন ধরে লুকিয়ে বসে আমরা লক্ষ্য করেছি বাঘিনী মায়ের নিত্যকারের জীবনযাত্রা।

বাচ্চাদের চোখ ফুটেছে। বর্ষা বিদায় নিল বন থেকে। সেবারের মত আমরাও বিদায় নিলাম বাঘিনী মায়ের কাছ থেকে।

মাঝে মাত্র শরতের দুটি মাস। হেমন্তের হাওয়া বইতেই আমরাও ফিরে এলাম আবার আমাদের সেই পোড়ো বাড়ির আস্তানায়।

ইটের পাঁজার উপরে লাফিয়ে ছুটে হুটোপুটি করে বেড়াচ্ছে ওরা ভাই-বোন তিনটি। আর সদাজাগ্রত প্রহরার ভঙ্গীতে প্রবেশপথ রুদ্ধ করে শুয়ে আছে ওদের গরবিনী মা। চেয়ে চেয়ে দেখছে ওদের হুটোপুটি. উজ্জ্বল দুই হলুদ চোখে উপচে পড়ছে আনন্দ।

বাঘিনী এখন অতিমাত্রায় হুঁসিয়ার। ঘন ঘন টহল দিয়ে বেড়াচ্ছে সে চারপাশে। মাঝে মাঝে থমকে দাঁড়িয়ে কান পেতে শুনতে চাইছে আশপাশের আওয়াজ। কেমন করে ওর সন্দেহ হয়েছে কি জানি। হঠাৎ সে তার বাচ্চা কটিকে মুখে তুলে নিয়ে সেঁধিয়ে গেল সেই অন্ধকার আস্তানায়।

শিশুদের নিরাপদ আস্তানায় রেখে বেরিয়ে পড়ে বাঘিনী। রাতদুপুরে রাত্রি-শেষে ফিরে আসে আবার। ক্ষুধার্ত শিশু-দের সুমুখে মুখ থেকে উগরে দেয় ওর চর্বিত আহার। বাচ্চারা গোগ্রাসে গিলতে থাকে সেই উগরে-দেওয়া মাংসের তাল। খাওয়া নিয়ে মারপিট করে বাচ্চারা। মা তখন মুখে করে সরিয়ে দেয় যুধ্যমান দুই পক্ষকে কিংবা আদরে চাপড় মারে ওর থাবা দিয়ে। কখনও বা ধমক দেয়। ভয় পেয়ে আদুরে ছেলের মতো গুঁড়ি মেরে ঢুকে পড়ে ওরা মায়ের বুকের তলে।

ক'দিন পরের কথা। পড়ন্ত রোদের সিঁদুর রাঙা আভা তখন উঁচু গাছের মাথায়। অদৃশ্য আড়াল থেকে ভেসে এলো ভারী গলার আওয়াজ--আ-উন। ভয় পেয়ে দ্রুত পায়ে বাঘিনী তার বাচ্চাদের নিয়ে গা ঢাকা দিল ওর আস্তানায়। শিশু কটিকে ওর বুকের তলে চেপে নিয়ে নিঃসাড়ে গুঁড়ি মেরে রইল মা।

অদৃশ্য সেই আড়াল থেকে আবার শোনা গেল সেই জলদ গম্ভীর কণ্ঠস্বর—আউন+আ-উন। পুরুষের গলা। আর এই আওয়াজের অর্থও আমরা জানি। সঙ্গিনীর সান্নিধ্য চায় সে।

স্বাভাবিকভাবে বাঘিনীরও সাড়া দেবারই কথা। কিন্তু চুপ করে রইল বাঘিনী। ডাকতে ডাকতে অদেখা বাঘ চলে গেল আমাদের পঞ্চাশ গজ দূর দিয়ে।

বাঘিনী বেরিয়ে এলো এবার। চারপাশে পরিক্রমা করে সব কিছু খুঁটিয়ে দেখে নিল সে। সে যে সন্তানের মা। সন্তানের অমঙ্গলের ভয়ে সে যে এমনি চুপটি করে তার শিশুদেরকে আগলে নিয়ে আত্মগোপন করেছিল বাঘিনীর আচরণে সে কথা আজ স্পষ্ট হয়ে গেল আমাদের কাছে।

আবাদী লোকের ধারণা বাঘিনীর পোষ্যদেরকে আদৌ বরদাস্ত করে না বাঘ। আপন সন্তানের রক্ত-মাংসে উদরপূর্তি করে সে। অন্ততপক্ষে হত্যা করে সে শিশু-দেরকে।

কথাটা হয়ত সত্যি। ব্যাঘ্র দম্পতির সঙ্গে ছোট বাচ্চা কেউ কখনও দেখেছেন বলে শুনি নি। নিজেও আমি দেখি নি কখনো। বরং বাচ্চা বেশ কিছুটা বড় না হওয়া পর্যন্ত বাঘিনী যে বাঘকে এড়িয়ে চলে তা আমি অনেকবারই দেখেছি।

বাঘিনী মায়ের সঙ্গে তার দু বছর থেকে আড়াই বছর বয়সের বাচ্চাদের প্রায়ই দেখেছি। ফলে তিন বছরের আগে বাঘিনী দ্বিতীয়বার সন্তানপ্রসবের সুযোগ পায় না বলেই আমার ধারণা।

অবিশ্যি এই প্রসঙ্গে আরো একটু বলা ভাল। ব্যাঘ্র দম্পতির মিলনের সঠিক কাল বলা মুস্কিল। তবে সাধারণভাবে জানুয়ারী থেকে মার্চ পর্যন্ত ওদের জোড়া বেঁধে থাকতে দেখা যায়। সন্তানপ্রসবের সময় প্রায়ই বর্ষাকাল। বর্ষাকালে জঙ্গল জুড়ে আগাছা জন্মায়। নির্জনে ঝোপেজঙ্গলে আত্মগোপন করে বাঘিনী তার সন্তান পালন করে সবার অলক্ষ্যে।

গর্ভধারণের মেয়াদ হবে মাস চারেকের মত। বনের মধ্যে একটু খুঁটিয়ে দেখলেই শিকারী টের পাবেন যে. পুরুষের তুলনায় স্ত্রীর সংখ্যা ওদের বেশি। ফলে স্ত্রীরত্ন লাভের জন্যে পুরুষে পুরুষে যত বেশি লড়াই লাগে প্রণয়ীর অধিকার নিয়ে প্রতি-যোগিনীদের মধ্যে লড়াইটা বাধে তার চাইতে অনেক বেশি সংখ্যায়।

অনেকের অভিমত এই যে,, পুরুষ শাবকদেরকেই শুধু হত্যা করে বাঘ। হয়ত এই কথাটা আরো বেশি সত্যি।

বলছিলাম শাবকের জন্যে বাঘিনী মায়ের বাৎসল্যের কথা। সেই কথাতেই ফিরে যাই আবার।

বাঘিনী মায়ের সুখের সংসারে শেষ পর্যন্ত আগুন জ্বালিয়ে দিল মানুষের লোভ। সুযোগ বুঝে একদিন চুরি করে নিলাম আমরা একটিকে।

পরের দিন আবার গেলাম আমরা আর একটি শাবক চুরি করার জন্যে।

বাঘিনী মা অক্লান্তভাবে পায়চারি করে বেড়াচ্ছে সেই ভগ্নস্তূপের চারপাশে। মাঝে মাঝে থমকে দাঁড়িয়ে করুণ কণ্ঠে ডেকে মরছে তার হারানো শিশুকে। পর-ক্ষণেই আবার ক্ষ্যাপার মত ইঁট কাঠ সুমুখে যা দেখছে তাই কামড়ে ধরছে। আশপাশের কাঁটাঝোপ আর বড় বড় গাছগুলোকে ক্ষত-বিক্ষত করছে ওর ধারালো নখের আঁচড়ে।

শেষ পর্যন্ত ক্লান্ত হয়ে এলিয়ে পড়ে বাঘিনী. কেঁউ কেঁউ করে কাঁদে, দীর্ঘশ্বাস ছাড়ে ঘন ঘন কাতর কণ্ঠে ডেকে মরে ওর হারানো ছেলেকে।

দু-তিন দিন কেটে গেল এমনি করে। বাঘিনী মা সেদিন শুয়ে আছে তার সুমুখের দুই থাবার মধ্যে মুখ গুঁজে। বাচ্চা দুটি ক্ষিধের জ্বালায় কেঁউ কেঁউ করে কেঁদে মরছে। আঁচড়ে কামড়ে ওরা ওদের মাকে অস্থির করে তুলতে চেষ্টা করছে অক্লান্তভাবে। বাঘিনীর ভ্রূক্ষেপ নেই।

হঠাৎ এক সময়ে আবার সচকিত হয়ে উঠে দাঁড়ায় সে। ইস। কি বিশ্রী চেহারা হয়েছে ওর! পেটে এসে লেগেছে পিঠে।

গুঁড়ি মেরে সমুখের একটা ঝোপের মধ্যে ঢুকে পড়ল বাঘিনী। কয়েক মিনিট যেতে না যেতেই ফিরে এলো সে, ক্ষুধিত শিশুদের সমুখে মুখ থেকে নামিয়ে দিল এক অসাবধানী বনমোরগকে।

লোভী অনশনক্লিষ্ট শিশুর মত চুকচুক করে রক্ত চেটে খেতে শুরু করল শাবক দুটি। সমুখের দুই থাবার মধ্যে মুখ গুঁজে আবার তেমনি করে শুয়ে পড়ে বাঘিনী। আহারে ওর রুচি নেই, দীর্ঘ উপবাসে দেহ ওর দুর্বল, শীর্ণ। হারানো সন্তানের শোকে করুণ নিষ্প্রভ দুটি চোখ।

আচম্বিতে এক সময়ে হুংকার ছেড়ে লাফিয়ে উঠলো বাঘিনী। ভয় পেয়ে বাচ্চা দুটি ছুটলো ওদের আস্তানার দিকে। অগ্নি-মূর্তি হয়ে ওঠে বাঘিনী। ঘন ঘন লেজের ঝাপটে আর ক্রুদ্ধ গর্জনে কাঁপিয়ে তোলে বন।

প্রতিপক্ষের কণ্ঠে তখন মোলায়েম স্বর—গর-র—গর-র। চেয়ে দেখি বাঘিনীর মুখোমুখি দাঁড়িয়ে বিশালকায় বাঘ।

আগু পাছু ভেবে দেখে না বাঘিনী—মুহূর্ত মধ্যে ঝাঁপিয়ে পড়ে ওর প্রতি-পক্ষের উপরে।

লাগলো লড়াই। বাঘিনীর সেই মহা-কালী মূর্তির সমুখে পেছু হঠতে হলো রুদ্ররূপী মহাদেবকে। বাঘিনীর সেই রণরঙ্গিণী রূপটিকে আজও ভুলতে পারি নি আমি।

রক্তাক্ত দেহ— ধুকছে সে রীতিমত। তবু ওর শিশুদুটিকে মুখে নিয়ে আস্তানা ছেড়ে বেরিয়ে পড়ে বাঘিনী। শিশু হত্যা-কারী স্বজাতি পুরুষের নাগালের বাইরে অন্য কোন নিরাপদ আশ্রয়ের সন্ধানে চললো সে।

পিছনে অনুসরণ করে চলি আমরা। এক হাঁটু জলের একটা খাল পেরিয়ে বাঘিনী শেষ পর্যন্ত হারিয়ে গেল এক গোলবনের গভীরতায়।

মাতৃস্নেহের এই মমতাময়ী ভূমিকা মন-মানসে নিয়ে এলো ঝড়ের ঝাপট। স্থির নিস্তরঙ্গ সমুদ্রে এলো প্রচণ্ড কল্লোল। কান পাতলে যে কেউ সেদিন শুনতে পেতো সেই কল্লোলের কণ্ঠস্বর—'মাকে ফিরিয়ে দাও তার সন্তান।'

ফিরিয়ে দিতে এলাম তাই পরেরদিনই। কিন্তু কোথায় খুঁজে পাই ওদের গোপন আশ্রয়। ক'দিনের অবিশ্রান্ত চেষ্টার পর আবিষ্কার করলাম ওদের নতুন আস্তানা।

ঠিক সেই আগেকার মতই সমুখের দুই থাবার মধ্যে মুখ গুঁজে শুয়ে আছে বাঘিনী। মায়ের কাছে খেলা করে বেড়াচ্ছে শিশু দুটি। দীর্ঘ প্রতীক্ষার পরে বিকেলের দিকে বাসা ছাড়লো বাঘিনী। হাঁটু-জলের সেই খালটা পেরিয়ে পুরানো আস্তানার দিকেই চললো সে।

সুযোগ বুঝে আমরা শিশুটিকে এবার ছেড়ে দিলাম ওর মায়ের আস্তানার কাছে। গোলবনের দুর্ভেদ্য বেষ্টনী ভেদ করে এগুতে পারে না শিশুটি। কেঁউ কেঁউ করে অভিযোগ জানাতে শুরু করে সে। শেষ পর্যন্ত একটানা আর উচ্চগ্রামে ওঠে ওর গলা।

কি জানি কোথায় ছিল বাঘিনী। বাচ্চার ডাকে সাড়া দিয়ে দ্রুতপায়ে ফিরে এলো সে। শিশুটিকে মুখে তুলে নিয়ে ফিরে গেল ওর আস্তানায়।

স্বস্তির নিশ্বাস ছেড়ে বাঁচলাম আমরা। পাছে ওর ডাকে আকৃষ্ট হয়ে কোন পুরুষ বাঘ এসে ওকে হত্যা করে এই ভয়ে আমরা দুশ্চিন্তাগ্রস্ত ছিলাম বড় কম নয়। বিপজ্জনক ঘাঁটির পাহারা দিতে গিয়ে বাঘের মুখে পড়তে পারতো আমাদের যে কেউ। তাই শুধু স্বস্তির অবকাশ নয়, আনন্দের আবেগে জাগে শিহরণ।

এবার ফেরার পালা। ফিরেই আস-ছিলাম। হঠাৎ দেখি শিশুটিকে মুখে তুলে নিয়ে আসছে বাঘিনী। ঠিক সেই আগে-কারের জায়গাটিতে নামিয়ে দিয়ে বাসার দিকে ফিরে চললো সে। বাচ্চাটি কেঁউ কেঁউ করে মায়ের পিছনে ছুটতে চায়।

বাঘিনী ওকে মুখে তুলে নিয়ে আবার ছেড়ে দেয় সেই নির্দিষ্ট জায়গাটিতে।

এমনিটি চলতে থাকে কিছুক্ষণ। চার পাঁচ দফা এমনি করে বিরক্ত হয়ে ওঠে বাঘিনী। ধমক দেয়, সমুখের থাবা দিয়ে ঠেলে ফেলে দেয় অবোধ শিশুটিকে।

বুঝতে পারি বাঘিনী মা তার বাচ্চাকে গ্রহণ করতে নারাজ। দু'তিন দিনের ব্যর্থ চেষ্টার পরে আমরা আবিষ্কার করলাম যে বাঘিনী তার সেই পুরানো আস্তানায় রোজই একবার যায় শেষ বিকেলের সময়টাতে। মতলব এঁটে পরের দিনের দুপুরে আমরা ফিরে এলাম সেই পোড়ো বাড়ির আস্তানায়। যেখান থেকে শিশুটিকে চুরি করে নিয়েছিলাম ছেড়ে দিলাম আবার সেখানেই। সুড়সুড়ে করে বাচ্চাটি অমনি সেঁধিয়ে গেল তার সূতিকাগৃহের অন্ধ সুড়ঙ্গে।

শেষ দুপুরে এলো বাঘিনী। কেঁউ কেঁউ করে ভগ্নস্তূপের চারপাশে সে ঘুরে বেড়ালো কিছুক্ষণ। তারপরে এসে দাঁড়াল সেই অন্ধকার সুড়ঙ্গের মুখে। ওখানে দাঁড়িয়ে ডাক দিল সে। সম্ভবতঃ বাচ্চাটি এতসময়ে ঘুমিয়েছিল। মায়ের ডাকে সাড়া দিয়ে ছুটে বেরিয়ে এলো এবার।

পরম মমতায় বাঘিনী ওর মুখ চাটলো কয়েকবার। তারপরে ছোট্ট একটি চড় বসিয়ে দিল ওর গালে। বাচ্চাটি কেঁউ কেঁউ করে কেঁদে উঠলো প্রথমটাতে। পরক্ষণেই গুঁড়ি মেরে ঢুকলো গিয়ে মায়ের বুকের তলে। বাঘিনী ওকে মুখে নিয়ে ওর নতুন আস্তানার দিকে চললো এবার।

মাস কয়েক পরের কথা। গ্রীষ্মের দুপুরে আবার একদিন ফিরে এলাম আমরা। পোড়ো বাড়ির সেই জরাজীর্ণ কুঠরীর দরজার সমুখে শুয়ে ঘুমুচ্ছে এক জাঁদরেল চেহারার বাঘ।

স্বাভাবিকভাবেই আমরা অনুমান করে নিলাম যে বাঘিনী তার শাবকদের নিয়ে আর এখানে ফিরে আসে নি। ঘুমন্তকে হত্যা করা শিকারীর পক্ষে পাপ। কাপুরুষতার দুঃসহ অভিশাপ। লুকিয়ে তাই অপেক্ষা করে রইলাম আমরা।

বেলা পড়ে আসছে। হঠাৎ দেখি জীর্ণ সেই কুঠরীর ভেতর থেকে বাইরের আলোতে এসে দাঁড়ালো বাঘিনী। একে একে এসে দাঁড়াল ওর শাবক তিনটি। ওরা এখন বড়সড় হয়ে উঠেছে। ভগ্ন-স্তূপের আশে-পাশে পায়চারি করে বেড়াতে থাকে বাঘিনী। ছুটোছুটি হুটোপুটি করে বেড়াতে থাকে ওরা তিনটি ভাই-বোন।

বাঘিনীর ডাকে ঘুম ভেঙ্গে উঠলো বাঘ। আড়ামোড়া ভেঙে নিয়ে সেও এসে দাঁড়ালো বাঘিনীর পাশে। তারপরে ওরা যুগলে মিলে বেরিয়ে পড়লো আহারের চেষ্টায়। মায়ের পাশে পাশে ছুটে চললো শিশুরা।

দ্বিপদী মানুষের দীর্ঘদিনের সাধনায় তিল তিল করে গড়া যে সমাজ সেখানে পিতৃত্বের দায়-দায়িত্ব মাথায় নিয়ে জন্মদাতা হয়েছেন পিতা।

পশুজগতে পিতৃত্বের দায় নেই পুরুষের। আছে এমন কথা কেউ বলবেন না। আমিও বলি না। চিরন্তন নিয়মের এ এক দুঃসহ ব্যতিক্রম বুঝিবা।

সংসার বলতে যা বোঝায় বাঘের তা নেই বটে, তবে সিংহের আছে। পশুরাজ তার পরিবার নিয়েই বাস করে। শুধু তাই নয়। গির জঙ্গলে ওদের একটি যৌথ পরিবারকে দেখেছি। স্ত্রী পুরুষ ও শিশু-দের নিয়ে গোনাগুণতিতে ওরা ছিল নয়—চারটি শিশু, বয়স্ক পাঁচজনের মধ্যে তিনটি সিংহী।

রাতদুপুরে ওরা এসেছিল ডাক-বাংলোর আঙিনায়। আশে-পাশে ঘোরা-ঘুরি করেছিল অনেকক্ষণ। সকালে চায়ের টেবিলে বসে যখন মিস্টার গায়কোয়াড়কে

এই কথা বলছিলাম তখন দেখি ছোট্ট একটি সিংহশিশু বাংলোর বারান্দায় উঠতে চেষ্টা করছে প্রাণপণে। আশপাশে কোথাও ওর মায়ের পাত্তা নেই দেখে কোলে তুলে নিলাম ওকে সযত্নে।

কিছুপরেই কানে এলো চাপা গর্জন। ভাবলাম হারানো ছেলের সন্ধানে ওর মা এসে হাজির হবে এক্ষুণি। কোল থেকে নামিয়ে দিলাম তাই শিশুটিকে বারন্দার নিচে।

দূরে দাঁড়িয়ে বারকয়েক শিশুটিকে ধমক দিল যে সে ওর মা নয়, হয়তো বা বাবা। অবুঝ শিশু কি বুঝতে চায় কিছু। বারান্দায় উঠবার জন্য তখনও মরীয়া হয়ে চেষ্টা করছে সে। দূরে দাঁড়িয়ে হাঁক-ডাক করে অবাধ্য পুত্রকে বাগ মানানো গেল না দেখে ধীরে ধীরে কয়েক পা এগিয়ে এলো পশুরাজ। এদিকে মিস্টার গায়কোয়াড় তখন শিশুটিকে কোলে নিয়ে এগিয়ে গেলেন কিছুটা।

পশুরাজ গুটিগুটি এগিয়ে আসে আরো কয়েক পা। নিরুদ্ধ নিঃশ্বাসে বারান্দায় দাঁড়িয়ে থাকি আমরা। সিংহের সঙ্গে পরিচয় আমার তেমন নিবিড় নয় বলেই বুকের ভেতরটাতে টিপ টিপ করতে থাকে।

গায়কোয়াড়সাহেব এবার কোল থেকে নামিয়ে দিলেন শিশুটিকে। পিছনে হেঁটে ফিরে আসতে থাকেন বাংলোর দিকে।

শিশুটি প্রথমে গায়কোয়াড়সাহেবের সঙ্গেই ফিরে আসছিল। ওদিক থেকে পিতার ধমক শুনে হকচকিয়ে গেল সে। একছুটে হাজির হোল গিয়ে পিতার পাশে। সিংহ ওকে মুখে তুলে নিয়ে চললো। এতক্ষণে দেখি শিশুর মাও হাজির হয়েছে এসে। সিংহ তার মুখ থেকে শিশুটিকে নামিয়ে দিল সিংহীর কাছে। তিনজনে মিলে ওরা ফিরে চললো ওদের ডেরায়।

প্যান্থারের পিতৃত্ববোধ সম্পর্কে তেমন কোন নজীর আমার চোখে পড়েনি কখনও। তবে প্যান্থার যুগলের সঙ্গে ওদের শিশুপুত্রদেরকে কেউ দেখে নি। অথচ প্যান্থার মায়ের সঙ্গে বছর দুয়েক বয়সের বাচ্চাকে হামেশাই দেখতে পাওয়া যায়। আমার ধারণায় পুরুষ বাঘের মতই পুরুষ প্যান্থার শিশুদেরকে বরদাস্ত করতে নাচার। তবু একটা কথা এখানে না বললেই নয়।

প্যান্থারের প্রতিহিংসা বড় নিদারুণ। বিশেষ করে স্ত্রী প্যান্থারের মেজাজ শিকারীর পক্ষেও শঙ্কাজনক। মধ্যপ্রদেশের জঙ্গলে ঘুরতে ঘুরতে এক কাঠুরের মুখে শুনলাম যে স্ত্রী প্যান্থারের সঙ্গে এক জংলী কুকুরের বাচ্চাকে দেখছে সে। কথাটাকে বিশ্বাস করিনি সেদিন। সেই কাঠুরে যে গল্প বলেছিল সেই গল্পটিকেও বলি এখানে।

জংলী কুকুরের দল যেদিন জঙ্গলখণ্ডে হাজির হোল সেদিন নাকি প্যান্থার মা তার দুটি দুধের বাচ্চাকে নিয়ে বাস করতো এখানকার এক লুকনো নালার পাশে। জংলী কুকুর অভিযানের ফলে সে তার আস্তানা বদল করতে বাধ্য হয়, আর সেই সময়ে কিভাবে তার একটি শিশু নিখোঁজ হয়। প্যান্থার মায়ের রাগ পড়ে ঐ জংলী কুকুরদের উপর। রাতের আঁধারে সে ঐ কুকুরদের একটি বাচ্চাকে চুরি করে নিয়ে আসে। সেই থেকে প্যান্থার মায়ের স্নেহে পালিত হচ্ছে সারমেয় শিশু।

কাঠুরের গল্পে বিশ্বাস না করলেও প্যান্থার মাকে খুঁজে বেড়াতে কসুর করি নি সেদিন। একনাগাড়ে তিনচারদিন চেষ্টা করেও কোন ফল হয় নি সেবারে।

প্রায় বছর বাদে আবার একদিন গেছি মধ্যপ্রদেশে। ভুলেই গিয়েছিলাম গল্পটির কথা। হিন্দুপুরের তাঁবু থেকে বেরিয়ে জঙ্গলের ভেতর দিয়ে বেলবা গাঁয়ের দিকে চলেছি আমরা। পথে দেখা হলো এক জংলী কুকুরের বাচ্চার সঙ্গে। শিশুটি ভয় পেয়ে ছুটলো ওর মাকে খবর দিতে। তারপরে দেখি সমুখের এটা নালা বেয়ে প্যান্থার মায়ের সঙ্গে পালিয়ে যাচ্ছে সেই শিশু সারমেয়।

পুরুষ বাঘ বা প্যান্থারের সম্পর্কে যা বলেছি লেপার্ডের বেলাতেও সেই একই কথা খাটে। লেপার্ড পিতা তার শিশুদেরকে বরদাস্ত করতে নাচার।

তবে লেপার্ড চরিত্রের দুটি অস্বাভাবিক নজীর এই প্রসঙ্গে তুলে ধরছি ব্যক্তি মেজাজের বৈশিষ্ট্য বোঝাতে।

মানুষকে আক্রমণ করার মত সাহস সহসা সঞ্চয় করতে পারে না লেপার্ড। গেরস্তের হাঁস, মুরগী, ছাগল, ভেড়া, কুকুর বা ক্ষুদ্রকায় গৃহপালিতের উপরেই ওর নজর। সাঁঝের আঁধার নামলেই গেরস্ত-বাড়ির আনাচে-কানাচে ঘুরে বেড়ায় সে। মানুষকে সে ভয় করে না তেমন, আবার মানুষের সম্পর্কে ওর একটা জাতক্রোধ আছে বলেও মনে হয় না। ওর সব রাগ ঐ কুকুরদের উপরেই। কুকুরকে সে মনে করে তার জাতশত্রু। তাই কোন গাঁয়ে লেপার্ডের আবির্ভাব ঘটলে গাঁয়ের কুকুরকুলই শিকার হবে প্রথম। মানুষের সম্পর্কে লেপার্ডের ভয় নেই বলেছি। তার অর্থ এই নয় যে সে মানুষকে তার মিত্র মনে করে। সুযোগ মত মানুষের অনেকখানি কাছাকাছি এসে পড়তে সে পেছপা নয়। পালিয়ে যাবার পথ খোলা থাকলে প্রয়োজনমত সে মানুষকে আক্রমণ করতেও ছাড়ে না। অকারণ ঝুঁকি নিতে সে নারাজ। তাই মানুষকে ছেড়ে ক্ষুদ্রকায় চতুষ্পদীদের উপরেই ওর নজর।

তা বলে ঘুমন্ত মানুষকে লেপার্ড রেহাই দেবে এমন কথা ভাবাই যায় না একেবারে। অবিশ্যি প্যান্থারের মত সিংহ কোর্টে ঘরের ঘুমন্ত মানুষকে শিকার করার মত সাহস ওর নেই সত্যি।

ভুটান সীমান্তের অঞ্চল। দুরন্ত দুর্যোগের রাত্রি। কেমন করে কি জানি আমাদের তাঁবুর মধ্যে সবার অলক্ষ্যে ঢুকে পড়েছিল এক লেপার্ড। পাশাপাশি দুটো খাটিয়ায় শুয়ে ঘুমিয়েছি আমি আর ঘোষসাহেব। সকালে উঠে দেখি পায়ের কাছে শুয়ে পোষা বিড়াল যেমন ঘুমোয় তেমনি করে ঘুমুচ্ছে এক জাঁদরেল চেহারার লেপার্ড।

বিকনা লেরীর জঙ্গলে রাত কাটিয়ে ফিরে আসছি রাত্রিশেষে। জঙ্গলের গায়ে গাঁয়ের সীমায় ছোট্ট একখানি পরিত্যক্ত কুঁড়ে। বিশ্রাম নেওয়ার জন্যে ওরই দাওয়ায় বসতে যাচ্ছি। মনে হলো দাওয়ায় শুয়ে ঘুমুচ্ছে একজোড়া বিশালকায় কুকুর। অগত্যা কিছুটা দূরে মাটিতেই বসে পড়লাম। ভোরের আলো ফুটলে দেখি ওদের একটি বিশালকায় তিব্বতী কুকুরী বটে, অপরটি পুরুষ লেপার্ড। দুই জাতশত্রুর মধ্যে এমন জমাটি ভাব জমলো কেমন করে সে কথা জিজ্ঞাসা করবার মত কাউকে পেলাম না। শুধু এইটুকু জেনেছিলাম যে ঐ পরিত্যক্ত কুঁড়েতে কিছুকাল আগেও বাস করতেন এক তিব্বতী লামা।

মাংসাশীদের তুলনায় তৃণভোজীদের জীবনযাত্রা অনেক বেশি সামাজিক আর এই সামাজিকতায় সেরা বোধ হয় হাতি। গোষ্ঠীগত জীবনে ওরা পরস্পরকে সাহায্য করে বলে অনেকেই অনেক নজীর দেখিয়েছেন। তবে পিতৃত্বের দায়দায়িত্বের কোন বাঁধাধরা হিসেব না থাকলেও কথাটাকে একেবারেই উড়িয়ে দেওয়া চলে না। তবে ওটাকে নিয়ম বলেও জাহির করা চলে না, বরং ব্যতিক্রম, ব্যক্তি-মেজাজের বৈচিত্র্য বই কিছু নয়।

আসাম-জাতিঙ্গা উপত্যকার চারণভূমিতে চরে বেড়াচ্ছে হাতির পাল। কেমন করে কি জানি দলের একটি শিশু আটক পড়লো এক পাহাড়ী খাদে। শিশুর চীৎকারে ছুটে এলো ওর মা। কিন্তু প্রাণপণ চেষ্টাতেও উদ্ধার করা গেল না দেখে হস্তিনী মা শুঁড় উঁচিয়ে চেঁচাতে শুরু করলো। হস্তিনীর ডাকে সাড়া দিল শুধু একটি হাতি। দ্রুত পায়ে হস্তিনীর কাছে এসে
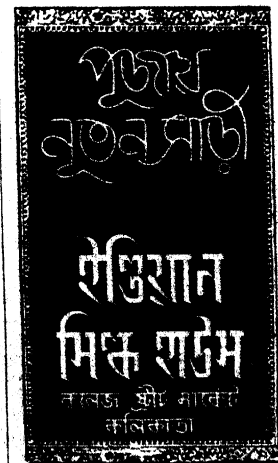
দাঁড়ালো সে। দুজনায় মিলে চেষ্টা করলো কিছুক্ষণ। ব্যর্থ হয়ে ওরা শেষ পর্যন্ত দলের উদ্দেশ্যে হাঁক ডাক শুরু করে দিতে গোটা দলটাই এসে হাজির হলো সেখানে। বিস্তর টানা হ্যাঁচড়া। শেষ পর্যন্ত ওদের কারো মাথায় বুদ্ধি গজালো বোধ হয়। বড় বড় পাথর ওরা খাদে ফেলতে থাকে। তারপরে এক সময়ে বন্দী শিশুটিকে উদ্ধার করে ওরা। দল আবার ছড়িয়ে পড়ে চারণের এলাকায়। কিন্তু চেয়ে চেয়ে দেখলাম চারণভূমিতেও এই অসাবধানী শিশুটিকে সতর্ক পাহারায় রেখেছে ওর বাবা আর মা।

কাজিরংগার গণ্ডার মানুষকে এখন বেশ চিনে ফেলেছে। তা বলে জঙ্গলের গণ্ডারকুলও যে অমন হাঁ করে মানুষকে চেয়ে দেখবে এমন কোন কথা নেই। হাতির পিঠে থাকলে অবিশ্যি আলাদা কথা।

মানুষখেকো এক প্যান্থারের তল্লাসীতে সকাল কাটিয়ে ভরদুপুরে মধ্যাহ্নভোজে বসেছি খরস্রোতা রুবি নদীর পাশে। হঠাৎ কোত্থেকে এসে হাজির হলো এক গণ্ডারশিশু। শিশুর পেছনে কোথাও না কোথাও আছে ওর মা। অতএব হুঁসিয়ার হতে হলো। অবুঝ শিশুকে অভুক্ত রাখা চলে না। তাই আশেপাশের গাছ থেকে ডাল ভেঙে দিলাম কটি। নিরাপত্তার জন্যে নিজেরাও গাছে চড়ে বসতে যাচ্ছি চোখ পড়লো ওর মায়ের উপরে। চুপটি করে দাঁড়িয়ে সে দেখছে এই কাণ্ড। কিন্তু গণ্ডারের মতলব বোঝা মুস্কিল। বসুসাহেব আগেই গাছে চড়ে বসেছেন। গণ্ডার মায়ের দৃষ্টি আকর্ষণ করার জন্যেই গাছের কটি ডাল ভেঙে দিতেই গণ্ডার মাও আহার শুরু করে দিল। বাসুসাহেবের সঙ্গে গণ্ডারীর এমনিভাব জমে উঠলো যে ওর পিঠের উপর পা চাপিয়ে দিয়ে মুখের কাছে আহার এগিয়ে দিচ্ছেন তখন। মাটিতে দাঁড়িয়েই বাচ্চাটিকে খেতে দিচ্ছিলাম আমি। হঠাৎ দেখি আমাকে লক্ষ্য করে তেড়ে আসছে একটি গণ্ডার। তাড়াতাড়িতে গাছে চড়ে বসলাম।

আগন্তুক পুরুষ গণ্ডারটি ক্ষ্যাপার মত লণ্ডভণ্ড করে দিল সব এক নিমিষে। কয়েকবার নাক উঁচিয়ে তেড়ে এলো আমার দিকে তারপর গণ্ডারী আর শিশুটিকে সঙ্গে নিয়ে চলে গেল জোর কদমে।

বানরের বুদ্ধি যেমন বহুবিদিত বাইসনের বোকামি তেমনি বহুনিন্দিত। আসলে বাইসন একটুও বোকা নয়, একটু বেশি গোঁয়ার বা কাঠগোঁয়ার। তাবলে ওর মুখের ভাবে শিষ্টস্বভাবের ছাপ নেই এমনটিও তো নয়।

মধ্যপ্রদেশের জঙ্গলে একবার এক গণ্ডকে দেখেছিলাম বাইসনের পিঠে চেপে বেড়াতে। কম বিস্মিত হইনি এই দৃশ্যে। জিজ্ঞাসাবাদের পর জানা গেল যে বছর পাঁচেক আগে বনে কাঠ কাটবার কালে একদল বাইসনের সম্মুখে পড়ে যায় সে। ক্ষ্যাপা বাইসনের শিংএর গুঁতো খেয়ে উঁচু পাহাড় থেকে গড়িয়ে পড়ে সে এবং আঘাতের ফলে জ্ঞান হারায়। জ্ঞান ফিরলে দেখে ওর সম্মুখে কালো যমদূতের মত দাঁড়িয়ে আছে সেই লম্বা শিংওয়ালা বাইসন। সাহস সঞ্চয় করে সে বাইসনের পিঠে শুয়ে পড়ে কোন মতে এবং তার গায়ে এসে হাজির হয়। সেই থেকে বাইসনটি ওর বাহন হিসেবেই আছে।

ওর বাহনটি কিন্তু আমাদের দেখে হঠাৎ ক্ষেপে উঠলো। ওকে শান্ত করতে গিয়ে শিংএর গুঁতো খেয়ে ছিটকে পড়লো লোকটি। আমরা তখন বন্দুক বাগিয়ে ধরেছি। কিন্তু লোকটিকে শিংএর গুঁতো মেরেই হঠাৎ আবার শান্ত হয়ে গেল বাইসনটি। বার বার গা শুঁকতে লাগলো ভূতলশায়ী লোকটির। বাচারা গণ্ড ধীরে ধীরে উঠে দাঁড়ালো। চেপে বসলো আবার বাইসনের পিঠে, ধীরে ধীরে ফিরে চললো ওর গন্তব্যপথে।

ভালুক আমার প্রবন্ধের শেষ প্রসঙ্গ। জন্তুজগতে ভালুক যেন ভাঁড়। মহাবলশালী এই জীবটির অদ্ভুত কাণ্ডকারখানা দেখে হাসি চেপে রাখাই দায় হয়ে ওঠে অনেক সময়ে।

পেশোক থেকে পাঁচ মাইল দূরে সূর্যপ্রসাদের বাড়ি।

আমাকে নিয়ে যাবার জন্যে পেশোকে সূর্যপ্রসাদের লোক অপেক্ষা করছিল। তার মুখে শুনলাম গোটা পথ হেঁটে যেতে হবে—শুধু উতরাই চড়াই ভেঙে। তবে পথে কোন ভয় নেই। না থাক ভয়। রাইফেলটাকে ছেড়ে দোনলা বন্দুকে দুটি গুলি ভরে নিয়ে যাই অন্ততপক্ষে। জানি পাহাড়ী পথে দশ সেরের বোঝা শেষ পর্যন্ত এক মণ ভারী হয়ে উঠবে। তবু এই অচেনা পথে নিত্যসঙ্গী বন্দুকটিকে ফেলে যেতে মন চায় না।

আধাআধি পথ অতিক্রম করেছি বোধ হয়। হঠাৎ পিঠের মালপত্তর ফেলে দিয়ে চীৎকার করে ছুটতে শুরু করলো আমার সঙ্গী। পিছনে তাড়া করেছে ভালুক। ক্ষিপ্র গতিতে গুলি চালালাম বটে। তবে গুলির আঘাত খেয়ে ক্ষেপে উঠলো সে আরও। পায়ের জোর বাড়িয়ে এক নিমিষে ওর লম্বা আলখাল্লাটাকে সে ধরে ফেললে তক্ষুণি। আলখাল্লার সঙ্গে পরনের শেষ পরিধেয়টি খুলে এলো। হোঁচট খেয়ে পড়লা আমার সংগী। সেই মুহূর্তেই আমার শেষ গুলিটি বিঁধলো গিয়ে আততায়ীর মাথায়। লুটিয়ে পড়লো সে আমার সঙ্গীর পায়ের তলে।

পিছনে একটা বিশ্রী আওয়াজ শুনে তাকিয়ে দেখি বিশ পঁচিশ গজ দূরে দুপায়ে ভর দিয়ে দাঁড়িয়ে আছে দুরন্ত যমদূত। বন্দুকে গুলি নেই আর।

বন্দুকটিকে ফেলে দিলাম হাত থেকে। ভালুকটি এগিয়ে আসছে পায়ে পায়ে। জীবন এখন মৃত্যুর হাতে। কয়েকটি মুহূর্ত আর মোটে। ওর মুখে বিশ্রী শব্দ, মুখ বেয়ে গড়াচ্ছে বিশ্রী লালা। মাঝে মাঝে কুৎসিত ফুৎকার—ওর মুখ থেকে সেই দুর্গন্ধ লালা ছিটকে এসে পড়ছে আমার গায়ে। দশ পনেরো হাত দূরে হঠাৎ সে থামলো। এক দৃষ্টে চেয়ে রইল আমার দিকে।

তারপরে কি জানি কি ভেবে চারপায়ে হেঁটে ধীরে ধীরে অদৃশ্য হয়ে গেল পাহাড়ের নিচের পথে।

তস্য তস্য অথবা সূর্য কাঁদলে সোনা

প্রেমেন্দ্র মিত্র

(পূর্ব প্রকাশিতের পর)

অভিযাত্রীদের এবারের স্বপ্নও কিন্তু বিফল হয়েছে। আশ্চর্য বন্দর-নগর টম্বেজ-এ পিজারো তাঁর দলবল নিয়ে পোঁছেছেন। আশাতীত অভ্যর্থনাও সেখানে পেয়েছেন। বন্দর-নগর টম্বেজ যে অত্যন্ত উন্নত ও সমৃদ্ধ এক অজানা রাজ্যের একটি সীমান্তঘাটি মাত্র তা বুঝতে তাঁর দেরী হয় নি। সর্বত্র রাস্তায় ঘাটে দেবস্থানে সোনারূপোর ছড়াছড়ি দেখেছেন, দেখেছেন সেই আশ্চর্য প্রাণী যার কোমল মসৃণ লোম ইউরোপের শ্রেষ্ঠ পশমকেও হার মানায়,—অজানা সভ্যতায় ব্যবহৃত নতুন কয়েকটি শব্দ শিখেছেন যেমন কুরাকা, যেমন মিনি মায়েস্, যেমন ইংকা।

এই টম্বেজ এই পিজারো মহামহিম রাজ্যেশ্বর হুয়াইনা কাপাক-এর নাম শুনেছেন, সমুদ্রতীর থেকে অনতিদূরের অভ্রভেদী তুষারমৌলি পর্বতশ্রেণী পর্যন্ত যাঁর একচ্ছত্র রাজত্ব বিস্তৃত।

এ রাজ্যের শাসনশৃংখলার পরিচয় টম্বেজ নগরীতে ভালোভাবে পাওয়া গিয়াছে। মহামহিম টুপাক ইউপাঙ্কি এ নগরে একটি দুর্ভেদ্য দুর্গ স্থাপন করেছেন। এ নগরের সুবর্ণমণ্ডিত দেবস্থান পিজারো ও তার সহ-অভিযাত্রীদের বিস্ময় উৎপাদন করেছে। নগরের একটি আশ্চর্য আবাস-হর্ম্য তাঁরা দেখেছেন সূর্যকুমারীদের জন্যে যা নির্দিষ্ট। নগরময় অসংখ্য জলধারা বহন করবার কৃত্রিম প্রণালী দেখা গেছে। সমুদ্র আর উর্বর মৃত্তিকার দাক্ষিণ্যে নগরবাসীদের কোন কিছুরই অভাব নেই।

নমুনা স্বরূপ এ নগর দেখেই এ সোনার রাজ্য জয় করবার লালসা তীব্র হয়ে উঠেছে পিজারোর মনে। কিন্তু সে বারের মত এ রাজ্যের বিশদ কিছু বিবরণ আর তার কল্পনাতীত ঐশ্বর্যের বিস্ময়কর কিছু নিদর্শন নিয়েই পিজারোকে সদলবলে পানামায় ফিরতে হয়েছে।

টম্বেজ থেকে আরো কিছু দক্ষিণ পর্যন্ত অবশ্য তিনি পাড়ি দিয়েছিলেন। সে পথে সমুদ্র উপকূলে আরো বহু সমৃদ্ধ নগর তিনি দেখেন আর সর্বত্রই সেই অসামান্য রাজ্যেশ্বরের কথা শোনেন, আকাশছোঁয়া তুষারমৌলি গিরিশ্রেণীর এক গহন গোপন উপত্যকায় যাঁর পরমাশ্চর্য রাজধানী রূপকথার রহস্য বিস্ময় দিয়ে ঘেরা।

সে স্বপ্নপুরীতে পোঁছোবার সুগম পথ কি নেই!

দক্ষিণ সমুদ্রে একটু করে পিজারো এগিয়ে গেছেন জাহাজ নিয়ে। তাঁর বাঁদিকে অজানা তটরেখা। অনতিদূরে আকাশপটে অভ্রংলিহ সব গিরিশিখরের একসঙ্গে নিষেধ ও নিমন্ত্রণ। যে সব গিরিশিখরের নাম তিনি শুনেছেন স্থানীয় অধিবাসীদের কাছে।

চিম্বোরাজো, কোটোপাক্সি, —সে সব নামগুলিই ঝঙ্কারমেশানো সম্ভ্রম জাগায় বিস্ময় জাগায়।

আর একটু আর একটু করে পিজারো আর তাঁর সঙ্গীরা বিষুবরেখার দক্ষিণে প্রায় নবম অক্ষাংশের কাছে এসে পোঁছেছেন। ইউরোপের কারুর এতদূর পর্যন্ত আসাব সৌভাগ্য হয় নি।

সুন্দর বিশাল একটি নদীর মোহনায় ঢুকে পিজারো এক বন্দর-নগরে জাহাজ ভিড়িয়েছেন এবার।

প্রশস্ত চওড়া নদী তার ধারে সুন্দর ছোট্ট শহর। তবু এখানে পা দেবার পর থেকেই কেমন যেন একটা অস্বস্তিবোধ করেছে সবাই, কি একটা প্রায় গা ছম-ছম করা ভাব।

কি নাম এ শহরের? নাম জানা গেছে সান্তা।

এখানে এ রকম অদ্ভুত অনুভূতি হবার কারণটা কি হতে পারে? শহরটা কি আলাদা ধরনের কিছু?

এমন কিছু নয়। হাওয়াটা শুধু বড় বেশী রকম যেন শুখনো। নিঃশ্বাস নিতে নাকের ভেতর পর্যন্ত শুকিয়ে দেয়।

আর, আর ওগুলো কি? —জিজ্ঞাসা করেছে পিজারো আর তাঁর দলের লোকেরা, শহরে ঘুরতে বেরিয়ে।

ওগুলো 'গুয়াকাস'!

গুয়াকাস! সে আবার কি! —অবাক হয়ে জিজ্ঞাসা করেছেন পিজারো।

নগরবাসীরা গুয়াকাস কি বুঝিয়ে দিয়েছে। কিন্তু দলের কেউ ত নয়ই, পিজারো যা আন্দাজেও স্পষ্ট করে কিছুই বুঝতে পারেন নি।

বুঝবেন কি করে? আসলে দুজনেই ত সরস্বতীর ভাজ্যপত্র টিপসই দেওয়া মূর্খ। এ দেশের রাজেশ্বরের পরিবার আর খান-দানিরা যে মৃত্যুর পর আপনজনের মৃতদেহ মিশরীদের মত মামী করে রাখে আর এখানকার আবহাওয়া অসম্ভব রকম শুকনো বলেই সান্তা বন্দর যে সমাধি-নগর হিসেবে নির্বাচিত, তা বোঝবার মত জ্ঞানবিদ্যে দুজনের কারুরই নেই।

গুয়াকাস মানে সমাধিস্থান এইটুকুই তাঁরা বুঝেছেন, আর যত রাজ্যের সেকাল একালের মড়া তার মধ্যে ওষুধে আরকে তাজা রাখবার ব্যবস্থা হয় এইটুকু জেনেই ও শহরে থাকবার আর উৎসাহ পান নি।

জীবিতের চেয়ে মৃতের মর্যাদাই যেখানে বেশী সে বন্দর-নগর ছাড়বার পর পিজারোর লোকজন আর অজানা দক্ষিণে পাড়ি দিতে চায় নি। পিজারোকেও তাদের মতে সায় দিতে হয়েছে।

'সূর্য' কাঁদলে [illegible] কিংবদন্তীর দেশ যে সত্যি আছে তার যথেষ্ট প্রমাণ ত' তাঁরা এবার সঙ্গে করে নিয়ে যাচ্ছেন। ছোটখাট একটা জনপদ 'ত' নয়, এ বিশাল সমৃদ্ধ শক্তিমান রাজ্য জয় করা পিজারোর ওই সামান্য ক'জন সাঙ্গোপাঙ্গদের ক্ষমতার বাইরে। তার জন্যে পুরোপুরি তৈরী হয়ে আসতে হবে।

এবারের সার্থক অভিযানের বিবরণ শুনলে আর এ অজানা আশ্চর্য রাজ্যের

কল্পনাতীত ঐশ্বর্যের কিছু নিদর্শন চাক্ষুষ দেখলে শাসনকর্তা পেদ্রারিয়াস যে কিছুতেই আগের মত বিমুখ থাকতে পারবেন না, নতুন অভিযান সাজাবার জন্যে যা কিছু দরকার সাগ্রহেই তা দেবেন, এ বিষয়ে পিজারোর কোনো সংশয় তখন আর নেই।

আশায় উৎফুল্ল হয়ে দৃঢ় আত্মবিশ্বাস নিয়ে প্রায় আঠারো মাস বাদে পিজারো তাঁর সাঙ্গপাঙ্গ সমেত দুটি জাহাজ পানামা বন্দরে ভেড়ালেন।

পানামা বন্দরে সে এক অভূতপূর্ব দৃশ্য। সমস্ত শহরই যেন ভেঙে পড়েছে পিজারো আর তাঁর সঙ্গীদের দেখতে। অভ্যর্থনা জানাতে। তাঁরা যে এখনো প্রাণে বেঁচে আছেন পানামার কেউ স্বপ্নেই ভাবতে পারে নি। আঠারো মাস তাঁদের কোনো সংবাদ নেই, অজানা অসীম সমুদ্রে সম্পূর্ণ অনাবিষ্কৃত ভূভাগে বেপরোয়া হয়ে পাড়ি দিয়ে নিজেদের গোঁয়ার্তুমির চরম শাস্তিই তারা পেয়েছে বলে সবাই ধরে নিয়েছিল।

তার বদলে তারা শুধু নিরাপদে ফিরে আসে নি, কিংবদন্তীর দেশ সত্যিই আবিষ্কার করে তার আশ্চর্য বিবরণ আর নিদর্শন সঙ্গে নিয়ে এসেছে, এ খবর চাউর হবার পর পানামার মত বন্দর-নগরে উৎসাহ-উত্তেজনার জোয়ার বওয়া অস্বাভাবিক কিছু নয়।

পানামা বন্দরে সেদিন গণ্যমান্য থেকে অতিনগণ্যদেরও প্রায় সকলকেই উপস্থিত দেখা গেছে।

দেখা গেছে মোরালেসকে, পাদ্রী হার্নান্দো লুকে-কে, আর তখনও পর্যন্ত পিজারোর অভিযানের আসল মহাজন হিসেবে যিনি আত্মপ্রকাশ করেন নি সেই লাইসেনসিয়েট গ্যাসপার দে এসপিনোসাকেও।

দেখা যায়নি শুধু পানামার গভর্নর পেদ্রো দে লোস রিয়স ওরফে পেদ্রারিয়াসকে। তাঁর সম্মানে বাধলেও তাঁর সরকারী দপ্তরের কেউ ত' তাঁর হয়ে পিজারোদের অভ্যর্থনা জানাতে আসতে পারত! সেরকম কেউও আসে নি।

পিজারো, আলমাগরো ও রুইজ-এর তখনই উদ্বিগ্ন হবার কথা। কিন্তু নাগরিক-দের উচ্ছ্বসিত সমাদরে কিছুকাল মাথা ঠাণ্ডা রাখাই তাঁদের পক্ষে কঠিন হয়েছে।

মেঘলোক থেকে মাটিতে নামবার অবসর হবার পর তিনজনে যখন পেদ্রারিয়াসের কাছে নিশ্চিন্ত বিশ্বাসে দরবার করতে গেছেন তখন যে আঘাত তাঁরা পেয়েছেন তা সত্যিই কল্পনাতীত।

সূর্য কাঁদলে সোনার দেশ জয় করার স্বপ্ন একমুহূর্তে ধূলিসাৎ করে দিয়ে গভর্নর পেদ্রারিয়াস বলেছেন,—নো এনতেন-দিয়া দে দেসপোবলার্ স্যু গবর্নেসিওন্ পারা কে অাভিত্রা মুয়েরতো......

নিজেকে যেন কড়া রাশ টেনে থামিয়ে দালমশাই নিজের ত্রুটি স্বীকার করে বললেন,—ভুলে পেদ্রারিয়স-এর আসল মুখের [illegible]

পেদ্রারিয়াস পিজারোদের আর্জি অগ্রাহ্য নাকচ করে দিয়ে রূঢ়ভাবেই জানিয়ে দিয়েছেন যে নিজের মুল্লুক ভাসিয়ে দিয়ে অন্যের মুল্লুক গড়ে দেবার বাসনা তাঁর নেই। সস্তা কটা সোনা-রূপোর খেলনা আর কিম্ভূত একজাতের ভেড়ার জন্যে যতজন প্রাণ খুইয়েছে তা-ই যথেষ্ট। তার বেশী প্রাণ অকারণে নষ্ট হতে তিনি দেবেন না।

পাহাড় টললেও পেদ্রারিয়াস টলবেন না। হয় পিজারোদের অভিযানের অসীম সম্ভাবনা তিনি ধারণা করতে পারেন নি কিংবা সে সম্ভাবনা অত বিরাট বলেই ভয় পেয়ে গেছেন।

কিন্তু পিজারো আর তাঁর সঙ্গীরা যে চোখে অন্ধকার দেখেছেন। তাঁদের এত দুর্ভোগ এত প্রাণের মায়া ত্যাগ-করা দুঃসাহস সব নিষ্ফল! অন্যের কাছে যা সাহায্য পেয়েছেন তার ওপরে নিজেদের যথাসর্বস্ব তাঁরা এই অভিযানের পেছনে ঢেলেছেন। এখন তাঁরা পথের ভিখিরী বললেই হয়। পানামার গভর্নর বিরূপ হবার পর আর নতুন অভিযান সাজাবার কথা ভাবা বাতুলতা। 'সূর্য কাঁদলে সোনা'র দেশ অনাবিষ্কৃতই থেকে যাবে, কিংবা তাঁরা যে প্রথম ধাপ কেটে দিয়ে যাচ্ছেন তাই দিয়ে ভাগ্যের পরিহাসে আর কেউ সাফল্যের শিখরে উঠবে এ দেশ আবিষ্কারের গৌরব আত্মসাৎ করতে।

পিজারো আর আলমাগরো একেবারে ভেঙে পড়ে নিজেদের বাসা থেকেই বার হন না।

রুইজ শুধু এত বড় আশাভঙ্গের দুঃখ ভুলতে শুঁড়িখানাতেই প্রায় দিনরাত পড়ে থাকেন। অনেক রাতে শুঁড়িখানার মালিক যখন এক রকম জোর করে তাঁকে রাস্তায় ঠেলে বার করে দিয়ে দোকান বন্ধ করেন, রুইজ তখন কোনরকমে টলতে টলতে মোরালেস-এর বাড়িতেই গিয়ে ওঠেন। সেই তাঁর আস্তানা।

সেদিন অমনি টলতে টলতে মোরালেসের বাড়িতে যাবার পথে রুইজ নির্জন রাস্তায় যেন ভূত দেখেছেন। নেশায় নিজেকে বেহুঁশ জেনে প্রথমে নিজের চোখকে বিশ্বাস করতে না পেরে জেগে স্বপ্ন দেখছেন বলেই মনে করেছেন। কিন্তু স্বপ্ন বা চোখের ভুল নয়। সত্যিই নির্জন রাস্তায় চাঁদের আলোয় মানুষটাকে স্পষ্ট দাঁড়িয়ে থাকতে দেখা গেছে। নির্জন রাস্তায় এমন একজন মানুষ দাঁড়িয়ে থাকা কিছু আজগুবি ব্যাপার নয়। কিন্তু মানুষটা যে সেই দোভাষী, ভেলা-জাহাজ বালসা থেকে যাকে তুলে নিয়েছিলেন আর পিজারোর তখনকার আস্তানা রিও দে সান জুয়ান-এর তীরে জাহাজ বাঁধবার পর যে নিশ্চিহ্ন হয়ে গিয়েছিল আশ্চর্যভাবে।

তুমি! তুমি এখানে? রুইজ-এর নেশায় জড়ানো জিভ যেন আরো অসাড় হয়ে গেছে।

হ্যাঁ, একটা কথা শুধু বলবার জন্যে দাঁড়িয়ে আছি এখানে!

কি কথা?—রুইজ মাথাটা পরিষ্কার করবার চেষ্টা করে জিজ্ঞাসা করেছেন।

ইঁদারায় জল না পেলে নদীতে যেতে হয়।

অ্যাঁ!—মাথাটায় ঝাঁকানি দিয়ে ঝাপসা বুদ্ধি ও দৃষ্টি একটু স্পষ্ট করতে যাবার পর রুইজ সামনে আর কাউকে দেখতে পান নি। লোকটা যেন জ্যোৎস্নার আবছা আলোয় মিশে গেছে।

বালসা থেকে যাকে তুলেছিলেন সেই দোভাষীকেই সত্যি এইমাত্র দেখেছেন কিনা মনে সন্দেহ জেগেছে।

যা সে বলে গেল সে কথাটারও মাথা-মুণ্ডু কিছু খুঁজে পান নি।

(ক্রমশঃ)

মিশরের নতুন মাছ-মাব্রুক

সবিতা দাশগুপ্ত

মিশর দেশের আয়তনের তিরিশ ভাগের মাত্র একভাগে জল আছে, মোটামুটিভাবে বলা যায়। অর্থাৎ নীলনদের জল মরুভূমির বালুর সঙ্গে হাজার হাজার বছর ধরে নিত্য লড়াই করে যতখানি জায়গা কব্জা করে রাখতে পারছে। নীলকে মদত দেবার মত কেউ নেই—বৃষ্টি আর এই দেশে কোথায়? তাছাড়া অন্য কোন নদী বা শাখা নদী কোথাও নেই। মরুদ্যান বা ওয়েসিসগুলোতে মাটি খুঁড়লে নাকি প্রচুর জল পাওয়া যায় এবং সেই ভরসাতেই নতুন বসতি 'ওয়াদি গাদিদ' গড়ে তুলছেন নাসের সরকার পশ্চিম মরু অঞ্চলে। বিশেষজ্ঞরা বলেছেন, পশ্চিম সুদানের বৃষ্টির জল মাটির ভিতরে চুইয়ে চুইয়ে বয়ে চলেছে মিশরের মরুভূমির নীচ দিয়ে এক অতি গভীর ফল্গুনদীর মত। সেই জল তোলা এবং কাজে লাগানো অবশ্যই আয়াস এবং অর্থ সাপেক্ষ। কিন্তু তারপরেও সব কাজ এই জলে হয় না। মিশরের ধানক্ষেতের জলে মৎস্যচাষের পরিকল্পনায় এই জলের বিশেষ কোন স্থান নেই এবং থাকা সম্ভব নয়। নীলনদের থেকে টানা জলেই কেবল মাছের চাষ হতে পারে।

নদীমাতৃক বাংলা দেশের মাছের সঙ্গে মিশরের মাছের পাল্লা দেবার কোন কথা ওঠে না। নদী হিসাবে নীল কুলীন—অত লম্বা নদী আমাদের দেশে নেই। কিন্তু তাতে ইলিশমাছ পাওয়া যায় না। অন্তত কোন বাঙালীকে বলতে শুনিনি তিনি খেয়েছেন বা দেখেছেন। কায়রোর বাজার দেখে যাচাই করলে বলতে হবে আরো অনেক মাছ পাওয়া যায় না এই দেশে। উল্টো দিক থেকে বলা সুবিধে—ভেটকি মাছ আছে, ছোট হোট চিংড়ি মরসুমে আসে প্রচুর, আর রুই-জাতীয় কিছু মাছ কখনো-সখনো পাওয়া যায়। পছন্দসই অন্য মাছ নেই। বেশীর ভাগ মাছই শুনি ইস্কান্দেরিয়া বিকল্পে আলেকজান্দ্রিয়া থেকে আসে। সে সবই ভূমধ্যসাগরের মাছ এবং অনেক সময় ভীষণ-দর্শন।

তবু কেন বাংলাদেশের লোকের কাছে মিশরের মাছ নিয়ে কথা বলা? কারণ মিশরী বিশেষজ্ঞরা ঘোষণা করেছেন যে, তাঁদের দেশের ধানজমিতেই তাঁরা বছরে প্রায় ৫০,০০০ টন মাছ ধরবেন। অর্থাৎ বাচ্চা থেকে বুড়ো মিশরের প্রত্যেক লোকের জন্য মাথাপিছু এখন যতখানি মাছ পাওয়া যাচ্ছে তার চেয়ে আরো দুই কিলোগ্রাম বেশী। সত্যি ধানজমিতে অত মাছ ফলাতে তাঁরা পারবেন কিনা বলা শক্ত। কিছুদিন পরে বলা যাবে। যদি মাছ না হয়, তাহলে এই পরিকল্পনার কথা বোধহয় আর শোনা যাবে না। যাই হোক কলকাতার মৎস্যকষ্টের দিনে এরকম পরিকল্পনার কথাও উল্লেখ্য-খবর মনে করেই লিখছি।

একটি বিশেষ মাছের ওপর ভরসা করেই পরিকল্পনা তৈরী হয়েছে। গোড়ায় খাস মিশরী মাছ 'বুল্টি' অথবা আন্তর্জাতিক মৎস্যবিদদের ভাষায় 'তিলাপিয়া নিলোটিকা' নিয়ে গবেষণা চালানো হচ্ছিল। কিন্তু ধানক্ষেতের জলে ধানও হবে, মাছও হবে—এরকম অতিআধুনিক বন্দোবস্ত প্রাচীন সভ্যতার দেশের বুল্টি মাছ বরদাস্ত করতে রাজী হলো না—প্রাণ দিয়ে প্রতিবাদ করলো। অগত্যা আলেকজান্দ্রিয়ার 'ওশেনোগ্রাফি অ্যান্ড ফিসিকালচার ইনস্টিটিউট' স্বদেশী বা আরবী ভাষায় 'বালাদী' মাছ ছেড়ে বিদেশী মাছের স্মরণাপন্ন হলেন। নতুন মাছ এলো ফ্রান্স আর সুদূর ইন্দোনেশিয়া থেকে। ইংরেজীতে নাকি তার নাম 'মিরর কার্প'। বোধহয় রুই জাতীয় কোন মাছের বাচ্চা। দেখার সৌভাগ্য এখনো হয়নি, সুতরাং বাঙালীর কাছে পরিচিত কোন মাছের সমগোত্রীয় বলতে পারবো না হলফ করে। মিশরী বিশেষজ্ঞরা নতুন নাম দিয়েছেন এই মাছের আরবী ভাষায়—'মাব্রুক', অথবা ভাগ্যবান। এই দেশে ছেলেমেয়েরা নতুন জামা পরলে সঙ্গীরা ইংরেজী কায়দায় চিমটি কেটে 'নিউ পিঞ্চ' বলে সম্ভাষণ জানায় না, খালিমুখে বলে 'মাব্রুক'। বর্তমান ক্ষেত্রে মিশরে আগমন 'মিরর কার্পে'র পক্ষে এমনই সৌভাগ্যের কথা যে তার নামই পাল্টে দেওয়া হোল।

ভাগ্যবান ত বলতেই হবে, কারণ কয়েক বছরের পরীক্ষাতেই নাকি অদ্ভুত ভাল ফল দেখিয়েছে এই মাছ। নীলনদের অববাহিকায় দাখালিয়া প্রদেশের আল সারোয়া গ্রামে তিন বিঘা ধানজমিতে মৎস-বিশেষজ্ঞরা 'মাব্রুক' নিয়ে তাদের পরীক্ষা আরম্ভ করেন। দশ সেন্টিমিটার লম্বা পাঁচ-শ মাছ ছাড়া হোল ধানক্ষেতের জলে। দু মাস পরে তাদের আবার মাপা হোল ওজন করা হোল। আগে তাদের ওজন ছিল সর্বসাকুল্যে প্রায় দশ কিলোগ্রাম আর এখন দাঁড়ালো প্রায় চারগুণ।

এক-একটি মাছ [illegible] উজ্জ্বল হয়ে উঠেছে।

বছর দুয়েক পরে [illegible] পরীক্ষায় দেখা গেল ৭২ দিনে [illegible] মাছের ওজন ১৬•৮ কিলোগ্রাম থেকে বৃদ্ধি পেয়ে দাঁড়িয়েছে ৫১•৪ কিলোগ্রাম। নতুন নতুন এলাকায় পরীক্ষা চালানো হোল এবং ফল পাওয়া গেল সর্বত্রই সমান আশাপ্রদ। কেবল এক জায়গায় পোকার হাত থেকে ধান বাঁচাতে গিয়ে একটু বেশী পেস্টিসাইড প্রয়োগ করা হয়েছিল—সেখানে মাব্রুকের বরাত টি'কলো না, প্রায় সব মাছ মরে গেল। বিশেষজ্ঞরা হিসাব দিয়েছেন, এক ফেদ্দান (প্রায় তিন বিঘা ধানক্ষেতের জলে ১২ থেকে ১৪ সেন্টিমিটার মাপের ৪০০। ৫০০ মাছ ছাড়লে সবচেয়ে ভাল ফল পাওয়া যায়। দুই-আড়াই মাসে মাছের ওজন বাড়বে তিন-চার গুণ, অর্থাৎ এই ফর্মুলা অনুযায়ী ৪০ থেকে ৬০ কিলোগ্রাম মাছ পাওয়া যাবে। বাজারে বিক্রী করলে এইরকম এক চালানের দাম পাওয়া যাবে সাত কি আট মিশরীয় পাউন্ড অথবা ভারতীয় টাকার এখনকার আন্তর্জাতিক মূল্য অনুযায়ী ১২০। ১৩৫ টাকা। এটা অবশ্যই পাইকারী দর। 'মাব্রুক' বাজারে এলে কি হবে জানি না, তবে এখনো পর্যন্ত কায়রোতে মাছের খুচরো দর বেশ চড়া। কখনো কখনো একটু নামে কারণ সরকার দর বেঁধে দিতে চেষ্টা করেন এবং পুলিশ দু-চারজন গোঁয়ার মুনাফাখোর দোকানদারকে ধরে চালান দিয়ে দেয়। নাসের সরকারের পুলিশ খুবই জবরদস্ত এবং তারা চোখ রাঙালে লোক ভয় পায়। তবু মনে হচ্ছে শেষপর্যন্ত সাপ্লাই ডিমান্ডের নিয়মমাফিকই মৎস্যমূল্য চড়তে থাকে।

বিশেষজ্ঞদের পরীক্ষা শেষ হয়েছে এবং ধানজমিতে মাছেরও চাষ করা যাবে শুনে মিশর সরকার খুব খুশি। আসছে জুলাই মাস থেকে মাব্রুকের বাচ্চা ছাড়া হবে মিশরের ধানক্ষেতের জলে। ঠিক কোথায় কোথায় ছাড়া হবে তা অবশ্য এখনো ঠিক হয়নি। তবে মিশরী সংখ্যাতাত্ত্বিকেরা এরি মধ্যে হিসেব কষে বলে দিয়েছে কত মাছ পাওয়া যাবে। মিশরে ১০,০০,০০০ ফেদ্দান জমিতে ধান চাষ হওয়ার কথা, সুতরাং ৫০,০০০ টন মাছ পাওয়া যাওয়া উচিত এই পরিকল্পনাটির ফলে। এবং তাহলে বোধহয় আর চিন্তা নেই। ধান আর মাছ পাওয়া যাবে একই সঙ্গে—মিশরের 'ফেল্লা' বা চাষীকে প্রোটিন খাওয়ানো আর শক্ত হবে না। এরকম পরিকল্পনা ভারতবর্ষে বা অন্ততঃ বাংলাদেশে চালু করতে পারলে মৎস্য-চিন্তা মন থেকে অন্তত দূর হবে, কিছুদিনের জন্য।

মিশরী বিশেষজ্ঞরা আরো দাবী করছেন যে, ধানক্ষেতের জলে মাছের চাষ করলে জমির উর্বরতা বাড়বে, কারণ মাছগুলি খাদ্যান্বেষণে মাটি খুঁড়তে থাকবে।

কিন্তু মাছ যখন বড় হবে আর ধানও থাকবে তখন একটা তুলতে গেলে আরেকটা নষ্ট হওয়ার আশঙ্কা নেই কি? মিশরী বিশেষজ্ঞরা গবেষণা করে সে প্রশ্নেরও সংখ্যাতাত্ত্বিক জবাব দিয়ে রেখেছেন—ধান বাঁচাতে গেলে অল্প কিছু মাছ নষ্ট হবেই তবে বড় জোর শতকরা ১১ ভাগ।

দেশে বিদেশে

পড়শীর দেশে শ্রীমতী ইন্দিরা

ফটো : অমিতেশ ব্যানার্জি

চারদিন সিংহল সফর করে ফিরে আসার আগে ভারতের প্রধানমন্ত্রী শ্রীমতী ইন্দিরা গান্ধী মন্তব্য করেছেন যে, তাঁর এই সফরের ফলে দুই প্রতিবেশী দেশের মধ্যে বহু শতাব্দীর পুরাতন বন্ধন আরও দৃঢ় হল।

শ্রীমতী গান্ধী এর আগেও সিংহলে গিয়েছেন। কিন্তু তাঁর সেই যাওয়া ছিল প্রধানমন্ত্রীর সংগে তাঁর কন্যা হিসাবে। ভারতবর্ষের প্রধানমন্ত্রীরূপে তাঁর সিংহল সফর এই প্রথম।

প্রধানতঃ বৌদ্ধধর্ম ভারতবর্ষের সংগে সিংহলের যে যোগসূত্র রচনা করেছিল, ইদানীংকালে তার উপর কয়েকটি প্রতিকূল ছায়া পড়ছিল। ভারতবর্ষের তামিলনাদ ও অন্যান্য দক্ষিণাঞ্চল থেকে যে লক্ষ লক্ষ ভারতীয় বৈধ বা অবৈধভাবে সিংহলে গিয়ে বসতি স্থাপন করেছেন, তাঁদের নাগরিক অধিকার ও ভাষার অধিকার সম্পর্কে প্রশ্ন দেখা দিয়েছিল। দ্বিতীয়তঃ, একটা বৃহৎ জনবহুল দেশের পাশে অতিক্ষুদ্র একটি দেশ হিসাবে সিংহল কিছুটা অস্বস্তি বোধ করছিল। ভারতবর্ষের কারও কারও কথায় যে মুরুব্বিয়ানার সুর ফুটে ওঠে, সেটা এই অস্বস্তিবোধকে বাড়িয়ে তুলছিল। (কিছুকাল আগে সর্দার কে এম পানিকরের একটা বইয়ে সিংহলকে ভারতের দেশরক্ষা বন্দরের অন্তর্ভুক্ত বলে উল্লেখ করায় সে-দেশে বিরূপ প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি হয়েছিল।)

সারা পৃথিবীর চায়ের বাজারে ভারত ও সিংহলের প্রতিদ্বন্দ্বিতা ইদানীংকালে আর একটি বিরোধের ক্ষেত্র প্রস্তুত করছিল। ১৯৬৫ সালে সিংহলের বহির্বাণিজ্য থেকে মোট যে আয় হয়েছিল, তার ৬২ শতাংশই এসেছিল চায়ের রপ্তানি থেকে। সম্প্রতি পৃথিবীর বাজারে চায়ের দর পড়ে যেতে থাকায় সিংহল মার খাচ্ছিল। সিংহল থেকে অভিযোগ করা হচ্ছিল যে, ভারতবর্ষে চায়ের উৎপাদন বেড়ে যাওয়ায় সে তার বাড়তি চা দুনিয়ার বাজারে কাটাবার জন্য সিংহলের সংগে দরের লড়াই করছে এবং তার ফলে দুনিয়ার বাজারে চায়ের দর পড়ে যাচ্ছে। সম্প্রতি সিংহল থেকে একদল প্রতিনিধি ভারতবর্ষে এসে এই বিষয়ে আলোচনা করে গেছেন।

বিপরীত দিকে, সিংহলের উপর চীনা হুমকি দুই প্রতিবেশী দেশের মধ্যে একটা সাধারণ স্বার্থের ভিত্তি প্রস্তুত করছিল। মাও সে তুং-য়ের উদ্ধৃতি-সম্বলিত পুস্তিকা সিংহলের বন্দরে নামাতে দিতে সেখানকার সরকার অস্বীকার করায় চীন সিংহলের উপর ক্রুদ্ধ হয়েছে। কিন্তু যেহেতু সিংহলকে তার রবারের বিনিময়ে চীন থেকে চাল আমদানী করতে হয়, সেহেতু সে চীন সম্পর্কে প্রয়োজনীয় কঠোর মনোভাব অবলম্বন করতে পারছিল না।

এই পরিস্থিতির মধ্যে শ্রীমতী গান্ধীর সিংহল সফর বেশ সার্থক হয়েছে বলেই মনে হয়েছে। এই সফরের মধ্য দিয়ে এটা স্পষ্ট হয়েছে যে, সিংহলবাসী সওয়া ন'লক্ষ ভারতীয় বংশোদ্ভূত মানুষ আজ আর এই দুই দেশের মধ্যে সমস্যা হয়ে দাঁড়িয়ে নেই। এ'দের মধ্যে প্রায় সওয়া পাঁচ লক্ষ ভারতীয় নাগরিকত্ব গ্রহণ করে ভারতে ফিরে আসবেন এবং তিন লক্ষ সিংহলের নাগরিকত্ব গ্রহণ করে সে-দেশে থেকে যাবেন। এটা ১৯৬৪ সালে ভারতের তৎকালীন প্রধানমন্ত্রী লালবাহাদুর শাস্ত্রী ও সিংহলের তৎকালীন প্রধানমন্ত্রী শ্রীমতী শ্রীমাভো বন্দরনায়কের মধ্যে চুক্তির দ্বারা স্থির হয়েছিল। বাকি যে লাখখানেক ভারতীয় বংশোদ্ভূত 'রাষ্ট্রহীন' হয়ে থাকবেন, তাঁদের সমস্যাটা অবশ্য এখনও অমীমাংসিত আছে। কিন্তু, শ্রীমতী গান্ধী বলেছেন, দুই দেশের মধ্যে যে সম্প্রীতি রয়েছে, তাতে এই সমস্যাটা এমন বড় কিছু নয় যাতে এর সমাধান করা কঠিন হবে। দুই দেশের প্রধানমন্ত্রী এটা স্থির করেছেন যে, আপাততঃ শাস্ত্রী-শ্রীমাভো চুক্তিকে ঠিকভাবে কাজে পরিণত করার দিকে নজর দিলেই যথেষ্ট হবে, পরে ঐ এক লক্ষ 'রাষ্ট্রহীন'-এর সমস্যা বিবেচনা করা যাবে।

যেসব ভারতীয় বংশোদ্ভূত ব্যক্তি সিংহলের নাগরিকত্ব গ্রহণ করবেন, তাঁদের শ্রীমতী গান্ধী উপদেশ দিয়ে এসেছেন যে, তাঁরা যেন এখন থেকে আর ভারতবর্ষের দিকে না তাকিয়ে নিজেদের ভাগ্যকে সম্পূর্ণভাবে সিংহলের সংগে যুক্ত করেন। তাঁর এই মন্তব্য সিংহলীদের সন্তুষ্ট করেছে।

শ্রীমতী গান্ধীর সফরের শেষে তাঁর ও সিংহলের প্রধানমন্ত্রী শ্রীডাড্‌লি সেনানায়কের যে যৌথ বিবৃতি প্রকাশিত হয়েছে, তাতে দুনিয়ার বাজারে চায়ের পড়তি দামের সমস্যার উল্লেখ করা হয়েছে। বিবৃতিতে এই ইঙ্গিত দেওয়া হয়েছে যে, ভারত ও সিংহল নিজেদের মধ্যে পরামর্শ করে চায়ের বিশ্ববাণিজ্যের ক্ষেত্রে একটা সাধারণ নীতি গড়ে তোলার চেষ্টা করবে।

কলম্বোতে একটি সাংবাদিক সম্মেলনে শ্রীমতী ইন্দিরা গান্ধী বলেছেন যে, ভারতবর্ষে চায়ের উৎপাদন বেড়ে যাওয়ায় বিশ্বের বাজারে তার দাম কমে গেছে এ-কথা ঠিক নয়। এই দাম কমার অনেক কারণ থাকতে পারে, কিন্তু ভারতবর্ষের চায়ের বাড়তি উৎপাদন আভ্যন্তর চাহিদা বৃদ্ধির ফলেই দেশের ভিতরেই কেটে যাচ্ছে।

চীনা হুমকির কোন উল্লেখ অবশ্য এই যুক্ত ইস্তাহারে নেই। কিন্তু ভারতবর্ষের পক্ষে এটা গভীর সন্তোষের বিষয় যে, এই যুক্ত বিবৃতিতে চীনের সংগে ভারতের বিরোধ কলম্বো প্রস্তাবের ভিত্তিতে মিটিয়ে নিতে বলা হয়েছে। এটা সম্পূর্ণভাবে ভারত সরকারের অভিমতের সংগে সংগতিপূর্ণ। ভারতবর্ষ বরাবরই বলে এসেছে যে, সে চীনের সংগে তার সীমান্ত বিরোধ শান্তিপূর্ণ আলোচনার মধ্য দিয়ে মিটিয়ে ফেলতে চায় এবং এই আলোচনার একমাত্র সম্মানজনক ভিত্তি হতে পারে কলম্বো প্রস্তাব।

ভারতবর্ষের পক্ষে এটাও সন্তোষের বিষয় যে, ভারত-সিংহল যুক্ত বিবৃতিতে তাসখন্দ ঘোষণার উপর জোর দিয়ে বলা হয়েছে, এই চুক্তির ভিত্তিতে ভারত ও পাকিস্থানের সমস্যা মিটিয়ে নেওয়া উচিত।

ভারতবর্ষও এই কথাই বলে আসছে এবং তাসখন্দ ঘোষণা অনুযায়ী দুই দেশের মধ্যে স্বাভাবিক সম্পর্ক গড়ে তোলার জন্য কি ব্যবস্থা অবলম্বন করা যায়, সে-বিষয়ে আলোচনা করার উদ্দেশ্যে ভারত বারবার পাকিস্থানকে প্রস্তাব দিয়েছে। কিন্তু পাকিস্থান সে-প্রস্তাবে বিশেষ সাড়া দেয়নি।

যুক্ত বিবৃতির মধ্য দিয়ে এ-কথাও প্রকাশ পেয়েছে যে, ভারত ও সিংহল ভিয়েৎনাম ও পশ্চিম এশিয়ার সমস্যাকে অনেকটা একই দৃষ্টিতে দেখে।

দুই প্রধানমন্ত্রী স্থির করেছেন যে, দুই প্রতিবেশী দেশের মধ্যে বোঝাপড়া অক্ষুন্ন রাখার জন্য নিয়মিতভাবে দুই দেশের মধ্যে মন্ত্রী পর্যায়ের বৈঠক বসবে।

আর একটি তাৎপর্যপূর্ণ ঘোষণা এই যে, আগামী ফেব্রুয়ারী মাসে নয়াদিল্লীতে বাণিজ্য ও উন্নয়ন সম্পর্কে রাষ্ট্রসংঘের যে সম্মেলন হওয়ার কথা আছে, সেখানে পৃথিবীর দরিদ্র দেশগুলি যাতে নিজেদের মধ্যে একজোট হয়ে ধনী দেশগুলির কাছে নিজেদের বক্তব্য উপস্থিত করতে পারে, সেজন্য ভারত ও সিংহল নিজেদের মধ্যে পরামর্শ করবে।

ভারতের প্রধানমন্ত্রীর এই সফর দুই দেশের পারস্পরিক স্বার্থে এবং সমগ্র উন্নতিকামী দুনিয়ার স্বার্থে দুই প্রতিবেশী দেশের বন্ধুত্বকে অগ্রসর করে নিয়ে যেতে সাহায্য করবে।

বিশ্বব্যাপী মন্দা

আন্তর্জাতিক অর্থ তহবিল (ইন্টারন্যাশনাল মনিটারি ফাণ্ড) ১৯৬৭ সালের প্রথম তিন মাসের জন্য যে রিপোর্ট দিয়েছেন তাতে প্রকাশ পেয়েছে যে, পৃথিবীর শিল্পোন্নত দেশগুলিতে উৎপাদন হ্রাস পাচ্ছে। রিপোর্টে বলা হয়েছে যে, এই সময়ের মধ্যে উত্তর আমেরিকা, জার্মানী ও বৃটেনের মোট শিল্প উৎপাদন গত বৎসর এই সময়ের তুলনায় ৪ শতাংশ হ্রাস পেয়েছে। ১৯৬৭ সালের প্রথম তিন মাসে আগের বছরের এই সময়ের তুলনায় ফ্রান্স, ইতালী ও জাপানের শিল্পোৎপাদন অবশ্য বেড়েছে। মিলিতভাবে এই তিনটি দেশের শিল্পোৎপাদন বৃদ্ধির হার শতকরা ১০ ভাগ; কিন্তু তৎসত্ত্বেও সবগুলি শিল্পোন্নত দেশের শিল্পোৎপাদনের সমষ্টি বিচার করলে দেখা যাবে ১৯৬৬ সালের প্রথম তিন মাসের তুলনায় এবার উৎপাদন কমেছে।

আই-এম-এফ-এর রিপোর্টে বলা হয়েছে যে এই উৎপাদন হ্রাসের সমস্যার মোকাবিলা করার জন্য সংশ্লিষ্ট দেশগুলি গত বৎসরের

মূলধন সঙ্কোচন ও উচ্চ সুদের হার বজায় রাখার নীতি থেকে সরে আসছে।

ভারতের মত উন্নতিকামী দেশগুলির পক্ষে আই-এম-এফ-এর রিপোর্টের একটি উদ্বেগজনক সংবাদ এই যে, ১৯৬৫ থেকে ১৯৬৬ সালের মধ্যে এই দেশগুলির বিদেশ থেকে পণ্য ক্রয় করার ক্ষমতা বাড়েনি বললেই চলে, এবং এবার সম্ভবত তাদের এই ক্রয়-ক্ষমতা আরও কমেছে। ১৯৬৬ সালে দরিদ্র দেশগুলিকে সরকারী স্তরে প্রদত্ত বৈদেশিক সাহায্য ও ঋণের পরিমাণ সামান্য কিছু বেড়েছিল বটে; কিন্তু বেসরকারী মূলধন রপ্তানির পরিমাণ অনেকখানি কমে গিয়েছিল। আন্তর্জাতিক অর্থ তহবিলের মতে বেসরকারী মূলধন রপ্তানী এইভাবে হ্রাস পাওয়ার একটি কারণ হচ্ছে বৃটেন ও আমেরিকা থেকে মূলধন রপ্তানীর উপর নিষেধাজ্ঞা আরোপ করা হয়েছে, আর একটা কারণ হল এই যে, উন্নতিকামী দেশগুলিতে যে জাতীয় নীতি অনুসরণ করা হচ্ছে তাতে বৈষয়িক অগ্রগতি আসবে, এবিষয়ে মূলধন নিয়োগকারীরা আশ্বস্ত হতে পারছেন না।

আন্তর্জাতিক অর্থ তহবিলের এই রিপোর্টের দ্বারা ইতিপূর্বে রাষ্ট্রসংঘের রিপোর্টে বিশ্বব্যাপী মন্দার যে চিত্র উপস্থিত করা হয়েছিল তারই আর একটি সমর্থন পাওয়া গেল। গত জুলাই মাসে প্রকাশিত রাষ্ট্রসংঘের ঐ রিপোর্টে বলা হয়েছিল যে, ১৯৬৫ সালের তুলনায় ১৯৬৬ সালে সারা পৃথিবীর উৎপাদন পাঁচ শতাংশ বেড়েছে। কিন্তু এই বৃদ্ধির হার ১৯৬৪-৬৫ সালের বৃদ্ধির হারের চেয়ে কম। ১৯৬৪-৬৫ সালে
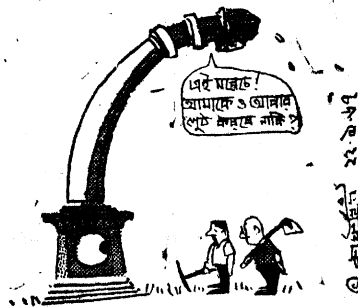
স্যার জন কক্‌ক্রফ্‌ট্‌

স্যার জন কক্‌ক্রফ্‌ট, যিনি সম্প্রতি কেম্‌ব্রিজে তাঁর নিজের বাসভবনে পরলোক গমন করেছেন, ব্রিটেনের একজন বিশিষ্ট বিজ্ঞানী ছিলেন এবং সেই সংগে ছিলেন পরমাণু পদার্থবিদ্যার ক্ষেত্রে একজন পথিকৃত। ১৯৫৯ সাল থেকে স্যার জন, মৃত্যুকালে যাঁর বয়স হয়েছিল ৭০ বছর, কেম্‌ব্রিজের বৈজ্ঞানিক ও সংযুক্তিবিদ্যার নতুন শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান চার্চিল কলেজের 'মাস্টার' পদ অলংকৃত করে আসেন।

জন ডগলাস কক্‌ক্রফ্‌ট ১৮৯৭ সালের ২৭মে ইয়র্কশায়ার ও ল্যাংকাশায়ারের সীমান্তবর্তী একটি ছোট শহর টডমরডেন-এ জন্মগ্রহণ করেন। অতি শৈশবেই তিনি বিজ্ঞান সম্পর্কে আগ্রহ দেখিয়েছেন। স্কুলের পড়া শেষ করার পর—স্কুলে তিনি সকল বিষয়েই কৃতিত্ব দেখিয়েছেন—তিনি ম্যাঞ্চেস্টার বিশ্ববিদ্যালয়ে গিয়ে ভর্তি হন গণিত ও পদার্থবিদ্যা শিক্ষা করার জন্য, এই সময় তিনি রয়েল ফিল্ড-আর্টিলারিতে যোগ দেন।

যুদ্ধের পরে ম্যাঞ্চেস্টার থেকে তিনি ইলেকট্রিক্যাল এঞ্জিনীয়ারিং-এ স্নাতক হন। ১৯২২ সালে তিনি দুটি বৃত্তি লাভ করে যোগ দেন কেম্‌ব্রিজের সেন্ট জনস কলেজে। এখানে তিনি ১৯২৪ সালে গণিতে সর্বোচ্চ সম্মান ট্রাইপস লাভ করেন। তিনি লর্ড রাদারফোর্ডের সময়ে ক্যাভেণ্ডিশ ল্যাবরেটরিতে কাজ আরম্ভ করেন।

তিনি সেন্ট জনস কলেজের ফেলো হন এবং ১৯২৮ সালে পি-এইচ-ডি ডিগ্রি লাভ করেন, এবং পরে ১১ বছর ধরে কেম্‌ব্রিজ বিশ্ববিদ্যালয়ে পদার্থবিদ্যার লেকচারার হিসেবে কাজ করেন। ১৯৩৯ সালে তিনি ন্যাচারাল ফিলসফির অধ্যাপক নিযুক্ত হন।

১৯৩২ সালে জন কক্‌ক্রফ্‌টের নাম সারা বৈজ্ঞানিক বিশ্বে ছড়িয়ে পড়ে। ঐ বছর তিনি পরমাণু পদার্থবিদ্যায় এক বড় রকমের কৃতিত্ব দেখাতে সক্ষম হন,—তিনি ও তাঁর সহকর্মী ডঃ ওয়ালটন কৃত্রিম উপায়ে পরমাণু বিদারণ করেন। ১৯৩৫ সালে তিনি কেম্‌ব্রিজে রয়েল সোসাইটির মণ্ড ল্যাবরেটরির দায়িত্ব গ্রহণ করেন এবং পরের বছর রয়েল সোসাইটির ফেলো নির্বাচিত হন।

দ্বিতীয় মহাযুদ্ধ বেধে উঠলে তিনি শিক্ষার ক্ষেত্র ছেড়ে বিভিন্ন সরকারী পদে যোগ দেন।

১৯৪৪ সালে তিনি কানাডায় যান কানাডার ন্যাশনাল রিসার্চ কাউন্সিলের এটমিক রিসার্চ-এস্টাব্লিশমেন্টের পরিচালন দায়িত্ব গ্রহণের জন্য। তিনি চক-রিভারে কানাডীয় গবেষণাগারের ডিরেক্টর হন। এই গবেষণাগারটিই ক্রমশ বিশ্বের অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ গবেষণা-কেন্দ্র হয়ে দেখা দেয়।

যুদ্ধের পর প্রকাশ পায় কানাডায় পরমাণু শক্তির উন্নয়ন সম্পর্কে কাজ করা ছাড়াও তিনি রেডার সম্পর্কে যথেষ্ট কাজ করেন। এই কাজ যুদ্ধের সময় কনভয় ইত্যাদি রক্ষার ব্যাপারে উল্লেখযোগ্যভাবে সহায়ক হয়।

১৯৪৬ সালে তিনি ব্রিটেনে ফিরে আসেন হারওয়েলের পারমাণবিক গবেষণা কেন্দ্রটির স্থাপন পরিকল্পনা সম্পর্কে কাজ করার জন্য। তিনি এই কেন্দ্রের প্রথম ডিরেক্টর হন। ১৯৫৪ সালে ইউনাইটেড কিংডম এটমিক এনার্জি অথরিটি স্থাপিত হলে তিনি তার প্রথম বৈজ্ঞানিক গবেষণার প্রথম সদস্য নিযুক্ত হন।

স্যার জন কক্‌ক্রফট ১৯৪৮ সালে নাইট উপাধি লাভ করেন। ১৯৫১ সালে পদার্থবিদ্যায় নোবেল পুরস্কার লাভ করেন (অধ্যাপক ওয়ালটনের সঙ্গে একত্রে)। ১৯৫৭ সালে তিনি অর্ডার অব মেরিট খেতাব লাভ করেন। এছাড়া আরও অনেক সম্মান তিনি দেশে-বিদেশে লাভ করেন। ১৯৬১ সালে তিনি মাসাচুসেটস ইন্সটিট্যুট অব টেকনলজি থেকে 'শান্তির জন্য পরমাণু-শক্তি' পুরস্কার পান।

স্যার জন যুদ্ধের পর বহু দেশ ভ্রমণ করেছেন। ভারত সহ কমনওয়েলথের অধিকাংশ দেশই তিনি ঘুরে এসেছিলেন। ১৯৬১ সালে তিনি অস্ট্রেলিয়ার ন্যাশনাল ইউনিভার্সিটির চ্যান্সেলর নিযুক্ত হন।

উৎপাদন বৃদ্ধির হার আবার তার আগের বছরের উৎপাদন বৃদ্ধির হারের চেয়ে কম।

রাষ্ট্রসংঘের ঐ রিপোর্টে বলা হয়েছে "উন্নত অর্থনীতির দেশগুলিতে উপকরণের অভাব এবং উন্নতিকামী দেশগুলিতে কৃষি-পণ্যের উৎপাদন হ্রাস বিশ্বব্যাপী এই উৎপাদনের মন্থরতার মধ্যে প্রতিফলিত হয়েছে।"

"কেন্দ্রীয় পরিকল্পনাধীন" দেশগুলিতে (অর্থাৎ কম্যুনিস্ট দেশগুলিতে) ১৯৬৫ সালের তুলনায় ১৯৬৬ সালে মোট জাতীয় উৎপাদন অধিকতর হারে বৃদ্ধি পেয়েছে এবং তার কারণ হচ্ছে, ঐ দেশগুলিতে অনেক ভাল ফসল হয়েছে।

রাষ্ট্রসংঘের ঐ রিপোর্টে বলা হয়েছে যে, কিছুটা অনুকূল আবহাওয়ার দরুণ এবং কিছুটা কৃষির পরিপোষক নীতি গ্রহণ করে কম্যুনিস্ট দেশগুলি তাদের খাদ্যশস্যের ফলন বাড়াতে সমর্থ হয়েছে।

কিন্তু এই দেশগুলির বহির্বাণিজ্যে কিছুটা ভাটা লক্ষ্য করা গেছে এবং উন্নতিকামী দেশগুলির সংগে তাদের বাণিজ্য প্রসারের হারও কিছুটা কমেছে।

রাষ্ট্রসংঘের হিসাবে ১৯৬৬ সালে ধনতন্ত্রী দেশগুলির মোট শিল্পোৎপাদন বৃদ্ধির হার (পূর্ব বৎসরের তুলনায়) ৭ শতাংশ আর কম্যুনিস্ট দেশগুলির ক্ষেত্রে এই বৃদ্ধির হার ৮-৪ শতাংশ। কিন্তু রাষ্ট্রসংঘের হিসাবে উভয় গোষ্ঠীর দেশগুলিতেই উৎপাদন হ্রাসের লক্ষণ দেখা যাচ্ছে। মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্রে অসামরিক ভোগ্যপণ্যের শিল্পে বিশেষ করে গৃহ-নির্মাণে মন্দা দেখা দিয়েছে এবং পশ্চিম ইউরোপে বস্ত্রশিল্প ও ধাতুদ্রব্য-শিল্পে মন্থরতার লক্ষণ রয়েছে।

আন্তর্জাতিক অর্থ তহবিলের রিপোর্টের মত রাষ্ট্রসংঘের এই রিপোর্টেও বলা হয়েছিল, "উন্নতিকামী দেশগুলির অধিকাংশ দীর্ঘ-মেয়াদী সমস্যার সমাধানে ১৯৬৬ সালে খুব সামান্যই অগ্রসর হওয়া গেছে।" বলা হয়েছে যে, অতীতের তুলনায় এই উন্নতিকামী দেশগুলির বহির্বাণিজ্য অধিকতর প্রসার লাভ করেছে ; কিন্তু তাদের রপ্তানী-বাণিজ্য এতটা প্রসার লাভ করেনি যাতে ক্রমবর্ধমান বৈদেশিক দেনা মিটিয়েও ঐ দেশগুলি মূলধন লগ্নীর হার বাড়িয়ে যেতে পারে।

সম্প্রতি লণ্ডনে দশটি উন্নততম দেশের সম্মেলনে আন্তর্জাতিক দেনা শোধের মাধ্যম সম্পর্কে যে সিধান্ত করা হয়েছে তাতে উন্নতিকামী দেশগুলির বৈদেশিক মুদ্রার এই সংকটের কতকটা সুরাহা হবে বলে আশা করা হচ্ছে। এতদিন সোনায় অথবা আমেরিকান ডলার কিম্বা বৃটিশ স্টার্লিং-এ এই আন্তর্জাতিক দেনা শোধ করতে হত। কিন্তু এর পর থেকে আন্তর্জাতিক অর্থ তহবিলে জমা মুদ্রা থেকেই দেনাদার দেশ তার দেনা শোধ করতে পারবে।

বিশ্বব্যাপী মন্দার পরিপ্রেক্ষিতে, পৃথিবীর বাজারে কৃষিপণ্যের পড়তি দামের পরিপ্রেক্ষিতে উন্নতিকামী দেশগুলির সামনে আন্তর্জাতিক দেনা শোধ করার এই যে সমস্যা এসে পড়েছে সেটা সম্প্রতি ত্রিনিদাদের রাজধানী পোর্ট অব স্পেনে কমনওয়েলথ অর্থমন্ত্রীদের সম্মেলনে আলোচিত হল। ঐ সম্মেলনে ত্রিনিদাদ ও টোবাগোর সরকারের পক্ষ থেকে কতকগুলি তথ্য উপস্থিত করে দেখান হয়েছিল যে, একদিকে উন্নত দেশগুলির বৈদেশিক সাহায্যের পরিমাণ কমছে এবং উন্নতিকামী দেশগুলির অগ্রগতি মন্থর হচ্ছে আর একদিকে উন্নতিকামী দেশগুলির উপর বিদেশী ঋণশোধের বোঝা ক্রমেই বাড়ছে। এই অবস্থা চলতে থাকলে ১৯৭০ সাল নাগাদ দেখা যাবে, উন্নত দেশগুলি থেকে যে পরিমাণ অর্থ উন্নতিকামী দেশগুলিতে আসছে তার থেকে বেশী অর্থ উল্টো পথে বেরিয়ে যাচ্ছে।

কমনওয়েলথ অর্থমন্ত্রীদের এই সম্মেলনে গৃহীত ইস্তাহারে বলা হয়েছে যে, উন্নয়ন সাহায্যের সর্তগুলি অবশ্যই এমন হওয়া চাই যাতে উন্নয়নকামী দেশগুলির উপর ঋণশোধের বোঝা যথাসম্ভব কম হয়।

আশা করা যাচ্ছে যে, রাও ডি জেনিরোতে কয়েকদিন পরে আন্তর্জাতিক অর্থ তহবিল ও বিশ্ব-ব্যাঙ্কের যে মিলিত বৈঠক বসবে সেখানে বিশ্ব অর্থনীতির এইসব সমস্যা আলোচনা করা হবে।

প্রেক্ষাগৃহ

আজকের কথা :

চলচ্চিত্র ব্যবসায় ও চলচ্চিত্র সমিতি আন্দোলন :

সম্প্রতি একটি প্রচণ্ড চিত্তাকর্ষী এবং উত্তেজনাপূর্ণ আলোচনা-সভায় উপস্থিত থাকবার সৌভাগ্য হয়েছিল। সভাটি আহ্বান করেছিলেন কলিকাতা সিনে সেন্ট্রাল-এর সহযোগিতায় ফেডারেশন অব ফিল্ম সোসাইটির 'ফিল্ম স্টাডি অ্যাণ্ড ইনফর্মেশন গ্রুপ' এবং আলোচনার বিষয়বস্তু ছিল : চলচ্চিত্র-ব্যবসায় ও চলচ্চিত্র সমিতি আন্দোলন (ফিল্ম ইণ্ডাস্ট্রি অ্যাণ্ড ফিল্ম সোসাইটি মুভমেণ্ট)। চলচ্চিত্রব্যবসায়ীদের তরফ থেকে এই আলোচনায় অংশগ্রহণ করেছিলেন প্রযোজক-পরিচালক শ্রীপ্রভাত মুখোপাধ্যায়, আর ডি বনশল পরিবেশক সংস্থার কর্মাধ্যক্ষ শ্রীবিমল দে এবং অরোরা ফিল্ম কর্পোরেশনের ম্যানেজিং ডিরেক্টার ও ফিল্ম ফেডারেশন অব ইণ্ডিয়ার প্রাক্তন সভাপতি শ্রীঅজিত বসু। চলচ্চিত্র-সমিতিগুলির প্রতিনিধিত্ব করেছিলেন শ্রীপ্রদীপ্তশংকর সেন (ক্যালকাটা ফিল্ম সোসাইটি), শ্রীশ্যামাপ্রসাদ ভট্টাচার্য (নৈহাটি সিনে ক্লাব), শ্রীসোমেন ঘোষ (ক্যালকাটা সিনে ইনস্টিটিউট) এবং শ্রীজয়সুন্দর গুপ্ত (সিনে সেন্ট্রাল)।

সভার কাজ আরম্ভ হয় চিত্র-পরিচালক শ্রীমধু বসু প্রেরিত একখানি পত্র পাঠের মাধ্যমে। এই পত্রে তিনি ফিল্ম সোসাইটিগুলিকে বিদেশী চলচ্চিত্র প্রদর্শনের প্রতি অত্যধিক অনুরাগ না দেখিয়ে ভারতীয় চলচ্চিত্র প্রদর্শন সম্পর্কেও সমভাবে আগ্রহশীল হতে অনুরোধ জানিয়েছেন। ফিল্ম সোসাইটিগুলির প্রতি তাঁর দ্বিতীয় আবেদন ছিল, প্রেক্ষাগৃহের মালিকেরা তাঁদের ব্যবসায়িক নিরাপত্তার জন্যে পরিবেশকদের সঙ্গে চুক্তির অন্যতম শর্ত হিসেবে যে সাপ্তাহিক নিম্নতম বিক্রয়ের পরিমাণ (হোল্ড-ওভার ফিগার) নির্দিষ্ট করে রাখেন ও গৃহরক্ষা-মুদ্রা (হাউস প্রোটেকশন মানি) আদায়েরও বন্দোবস্ত রাখেন, এই ব্যবস্থার বিরুদ্ধে তাঁরা যেন সংঘবদ্ধভাবে আন্দোলন করেন বাঙলার চলচ্চিত্রশিল্পকে বেঁচে থাকতে সাহায্য করবার জন্যে।

অজানা শপথ চিত্রে সত্য বন্দ্যোপাধ্যায় এবং মাধবী মুখোপাধ্যায়

শ্রীবসুর পত্রের সূত্র ধরেই আলোচনা শুরু করেন ক্যালকাটা ফিল্ম সোসাইটির শ্রীপ্রদীপ্তশংকর সেন। তিনি বলেন, পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে ব্যবসায়িক চিত্রজগতের বাইরে চলচ্চিত্রকে নিছক আর্ট ও শিল্পসৃষ্টির নিদর্শনরূপে উপস্থাপিত করবার বিরাট প্রচেষ্টা চলেছে, সভ্যগণকে তারই সঙ্গে পরিচিত করবার গুরুদায়িত্ব রয়েছে ফিল্ম সোসাইটিগুলির। দুঃখের বিষয়, ব্যবসায়িক জগতের বাইরে আর্ট ফিল্ম তৈরী করবার বিশেষ কোনো প্রচেষ্টা ভারতবর্ষে দেখা যায় না। তবুও বাঙলার চলচ্চিত্রজগতের আধুনিক দিকপালগণের সৃষ্টির সঙ্গে পরিচিতি ঘটাবার চেষ্টা শুধু বাঙলা দেশের ফিল্ম সোসাইটিগুলির মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকেনি, বোম্বাই, মাদ্রাজ, দিল্লী প্রভৃতি রাজ্যস্থিত ফিল্ম সোসাইটিগুলিও এ-ব্যাপারে সক্রিয় ভূমিকা অবলম্বন করেছে। এছাড়া বছরখানেক আগে ক্যালকাটা ফিল্ম সোসাইটি দুটি পর্যায়ে পুরানো বাঙলা চলচ্চিত্রগুলি দেখাবার ব্যবস্থা করেছিলেন। এমনকি, বোম্বাই শহরেও কিছুদিন আগে 'নিউ থিয়েটার্স চলচ্চিত্র উৎসব' পালিত হয়েছিল। অতীতে নির্মিত বিখ্যাত ভারতীয় চিত্রগুলির কপি যোগাড় করা যে অত্যন্ত দুরূহ ব্যাপার, এ-সম্বন্ধে সমবেত শ্রোতৃবৃন্দকে সচেতন করবার পরে শ্রীসেন শ্রীমধু বসুর দ্বিতীয় আবেদন সম্পর্কে বলেন, চিত্রগৃহের মালিকদের শর্ত বাঙলার চলচ্চিত্র শিল্পের পক্ষে মারাত্মক রকম ক্ষতিকর, এ-কথা মেনে নিয়েও বলতে হচ্ছে এ-বিষয়ে ফিল্ম সোসাইটির করণীয় বিশেষ কিছু নেই।

ফিল্ম সোসাইটিগুলি বাঙলা চলচ্চিত্রের বৃহত্তর দর্শকসমাজকে আদৌ প্রভাবিত করতে পারেনি, এই সত্য উদ্ঘাটিত করে প্রযোজক-পরিচালক শ্রীপ্রভাত মুখোপাধ্যায় বলেন, একদিকে বাঙালী দর্শকেরা আদিম প্রবৃত্তিগুলির পক্ষে উত্তেজক হিন্দী ছবির দিকে ক্রমেই বেশী করে ঝুঁকে পড়ছেন, অন্যদিকে চিত্রগৃহের মালিকেরা বাঙলা ছবির মুক্তির ব্যাপারে বিশদ[illegible] ... [illegible] দিচ্ছেন। যেখানে ছবিতে [illegible]

তপন সিংহ পরিচালিত আপনজন চিত্রের একটি দৃশ্যে নির্মলকুমার ও সুস্মিতা সান্যাল। ফটো : অমৃত।

ফেরত [illegible] মাত্র আর্ট [illegible] নামান্তর। [illegible] মুষ্টিমেয় [illegible] সৃষ্টি করেছেন, তাঁরা [illegible] বাঙলা ছবির পৃষ্ঠপোষকতা করেন না। বাঙলা দেশে ফিল্ম সোসাইটি আন্দোলন যে ‘কমার্শিয়াল বার্থ’, তার প্রমাণস্বরূপ শ্রীমুখোপাধ্যায় সাম্প্রতিককালে নির্মিত একটি অভিনবত্বের ছবির আশাতীত ব্যবসায়িক সাফল্যের কথা উল্লেখ করেন। বাঙলা চলচ্চিত্র-শিল্পকে বাঁচিয়ে রাখবার জন্যে শ্রীমুখোপাধ্যায় কয়েকটি পন্থা অবলম্বনের সুপারিশ করেন : (১) বিদেশী চিত্রগৃহগুলিতে বছরের অন্তত শতকরা ত্রিরিশ ভাগ সময় ভারতীয় ছবি দেখানো বাধ্যতামূলক করা, (২) প্রতিটি চিত্রগৃহের গেল পাঁচ বছরের আয়-ব্যয়ের হিসাব থেকে সরকারীভাবে সাপ্তাহিক ভাড়া বেঁধে দেওয়া এবং (৩) সেন্সারিং-এর তারিখ অনুসারে পর পর ছবিগুলির মুক্তির বন্দোবস্ত করা।

আর ডি বনশাল সংস্থার কর্মাধ্যক্ষ বিমল দে ফিল্ম সোসাইটিগুলিকে আর্টের নামে বিভিন্ন দেশের যৌন-উত্তেজনামূলক ছবির প্রদর্শনীকেন্দ্ররূপে অভিযুক্ত করেন। তিনি বলেন, ‘ব্লণ্ডে লাস্ত’ ছবি দেখবার জন্যে কোনো সংস্থার সভ্যবৃন্দের অত্যন্ত আগ্রহের কথা সকলেরই স্মরণ আছে। ফিল্ম সোসাইটির সভ্যরা নিজেরাও আর্ট ফিল্ম ভালোবাসেন না ও দেখতে চান না, এই অভিযোগ করে তিনি বলেন, কোনো এক ফিল্ম সোসাইটির সভ্যরা একটি চ্যারিটি শো-এর জন্যে তাঁর কাছে এলে তিনি তাঁদের মৃণাল সেন পরিচালিত ‘আকাশকুসুম’ ছবিখানি দিতে চান। কিন্তু তাঁরা কোনোমতেই ছবিখানি নিতে সম্মত হন না এবং পরিবর্তে ‘সাত পাকে বাঁধা’, এমনকি তা না পাওয়া গেলে ‘এক টুকরো আগুন’ ছবিখানি দেবার জন্যে সবিশেষ অনুরোধ করেন। ফিল্ম সোসাইটিগুলিতে সাধারণত যে-সব ছবি দেখানো হয়, তাদের তুলনায় ভারতের যে-কোনো ছবি দর্শকের পক্ষে কম ক্ষতিকর, এই মন্তব্য করে শ্রীদে বলেন, চলচ্চিত্র সমিতিগুলি এক হিসেবে আমাদের চলচ্চিত্র ব্যবসায়ের শত্রুতাচরণই করে চলেছে।

অরোরা ফিল্ম কর্পোরেশনের অজিত বস্, তাঁর নাতিদীর্ঘ বক্তৃতায় ছবি নির্মাণের ব্যাপারে প্রযোজক সংস্থাগুলির সঙ্গে চলচ্চিত্র সমিতিগুলির সহযোগিতা কামনা করে বলেন, উভয় গোষ্ঠীরই পরস্পরের সুবিধা-অসুবিধার কথা চিন্তা করে পরস্পরের প্রতি সহানুভূতিসূচক মনোভাব অবলম্বন করা উচিত।

চলচ্চিত্র সমিতিগুলির পক্ষ থেকে প্রদীপ্তশংকর সেন ছাড়া বাকি আর তিনজন যে-বক্তৃতা করেন, তাতে মাত্র যৌন-উত্তেজনামূলক ছবি দেখানোই সমিতিগুলির উদ্দেশ্য, এই অভিযোগ দৃঢ়তার সঙ্গে খণ্ডন করে বহু উদাহরণসহ বলা হয়, বিভিন্ন দেশের শিল্পরীতিকে সভ্যদের সামনে উপস্থাপিত করে ছবির প্রকৃত মূল্যায়ন (ফিল্ম অ্যাপ্রি-[illegible]) সম্বন্ধে তাদের [illegible] তোলাই সমিতিগুলির [illegible] উদ্দেশ্য। এছাড়া আজ যে সত্যজিৎ রায়ের মতো বিশ্ববন্দিত চিত্র-পরিচালকের সাক্ষাৎ মিলেছে, এর জন্যেও ফিল্ম সোসাইটি মুভমেন্টই দায়ী। ভারতের জনগণও যে আজ অধিকমাত্রায় চলচ্চিত্রমুখী, এর জন্যেও চলচ্চিত্র সমিতিগুলির দান অল্প নয়। ভারতের বহু পরিচালক ও বিভিন্ন বিভাগের কলাকুশলীরা চলচ্চিত্র সমিতিগুলির সভ্য হয়ে ও তাদের সঙ্গে ঘনিষ্ঠ যোগাযোগ রেখে বিভিন্ন দেশের চলচ্চিত্র-রীতির সঙ্গে নিজেদের ওয়াকিবহাল রাখছেন এবং তার [illegible] প্রভাবিত হচ্ছেন, [illegible] অনস্বীকার্য। তাঁরা আরও বলেন যে, ভারতীয় চলচ্চিত্র-প্রযোজনায় যে-সব দৈন্যজনক রুচি-বিকৃতি ও রীতিবিরোধী নিদর্শন এখনও পর্যন্ত দর্শকদের শিল্পবোধকে পীড়িত করে চলেছে, চলচ্চিত্র সমিতির আন্দোলন তাদেরই বিরুদ্ধে।

এই আলোচনা-সভার আহ্বায়ক অধ্যাপক ডঃ গুরুদাস ভট্টাচার্য উপসংহারে বলেন যে, এই গুরুত্বপূর্ণ আলোচনাটি আজ নানাদিক দিয়েই অসম্পূর্ণ থেকে গেল এবং সেই কারণে আর একটি আলোচনা-অনুষ্ঠানের প্রয়োজনীয়তার কথা উপলব্ধি করছি। গেল

ছিন্নপত্র চিত্রের মহরতে দেবকী বসু, সুব্রত মুখোপাধ্যায়, আরতি ভট্টাচার্য, বিজয় ঘোষ, উত্তমকুমার ও পরিচালক সুনীল বন্দ্যোপাধ্যায়। ফটো : অমৃত

১০ই সেপ্টেম্বর, রবিবার সন্ধ্যায় ক্যালকাটা ইনফর্মেশন সেণ্টার-এ অনুষ্ঠিত এই সভাটি পরিচালনা করেন পশুপতি চট্টোপাধ্যায়।

চিত্রসমালোচনা

ম্যারেজ ইটালিয়ান স্টাইল (ইংরাজী) : প্রযোজনা : জোশেফ ই লেভিন; ২৭৩৫·৪৮ মিটার দীর্ঘ এবং ১২ রীলে সম্পূর্ণ; পরিচালনা : ভিত্তোরিয়া দ্য সিকা; রূপায়ণ : সোফিয়া লোরেণ, মার্সেলো ম্যাস্ট্রোইয়ানি, মেরিল টোলো, অ্যাণ্ডো পুগ্‌লিশ, টেক্‌লা স্কেরাণো প্রভৃতি। চিত্রগঙ্গার পরিবেশনায় গেল শুক্রবার, ২২-এ সেপ্টেম্বর থেকে এলিট সিনেমা ও হাওড়া শান্তি সিনেমায় প্রদর্শিত হচ্ছে।

কলকাতা শহরে প্রায় প্রতি সপ্তাহেই গড়পড়তা তিন-চারখানি করে ইংরাজী ছবি মুক্তি পেয়ে থাকে। এদের মধ্যে কোনোটি ভালো, কোনোটি বা মন্দ এবং অপর কোনোটি হয়ত চলনসই। কিন্তু দৈবাৎ কখনও আমাদের সামনে অতর্কিতে এমনও ছবি এসে উপস্থিত হয়, যা দেখতে দেখতে আমাদের মন উচ্ছ্বসিত হয়ে বলে ওঠে, এমনটি বহুদিন দেখিনি এবং আবার ভবিষ্যতে বহুদিন দেখব কিনা, জানি না। এমনই একখানি ছবি হচ্ছে, ভিত্তোরিয়া দ্য সিকা পরিচালিত ও সোফিয়া লোরেণ অভিনীত 'ম্যারেজ ইটালিয়ান স্টাইল'। আশ্চর্য এর কাহিনী, আশ্চর্য এর বক্তব্য, আশ্চর্য এর অভিনয়, আশ্চর্য এর পরিচালনা!

যুদ্ধবিধ্বস্ত নেপলস্ শহরের এক বেশ্যালয়ে বিমান আক্রমণের সময়ে ধনী-সন্তান ডোমেনিকোর সঙ্গে সতেরো বছরের এক বুভুক্ষু তরুণীর অতর্কিতে সাক্ষাৎ হয়। ফিলোমেনাকে ডোমেনিকো সান্ত্বনা দেয়, সকলের দৃষ্টির অগোচরে নিরাপদে রাখে। ফিলোমেনার জীবনে প্রথম পুরুষ হচ্ছে ডোমেনিকো—তার কাছে সে স্বেচ্ছায় আত্ম-দান করে। এর দু' বছর পরে যুদ্ধ-সমাপ্তি ঘটলে আবার অকস্মাৎ তারা পরস্পরের সামনে আসে। এখন ডোমেনিকো একটি মদ্যালয় এবং একটি রুটি ও পেস্ট্রি কারখানার মালিক; ফিলোমেনা সেই রূপজীবিনী। ফিলোমেনাকে ডোমেনিকো নিজের মোটরে তুলে নিল এবং পথে প্রেমালাপের পরে তাকে নিজের রক্ষিতা করে রাখল। ফিলোমেনা ডোমেনিকোর হয়ে তার ব্যবসাপত্তর চালাতে লাগল। কিছুদিন বাদে যখন ফিলোমেনা ডোমেনিকোর কাছে বিবাহের প্রস্তাব করল, তখন ডোমেনিকো তাকে তার নিজের বাড়ীতে নিয়ে গেল। সেখানে যাবার

সত্য বন্দ্যোপাধ্যায় রচিত কাহিনী অবলম্বনে চিত্রসাথী পরিচালিত সাহা চিত্র-পীঠের প্রথম থেকে শুরু, চিত্রের মহরতে ক্ল্যাপস্টিক দিচ্ছেন উত্তমকুমার। মহরৎ-শিল্পী সত্য বন্দ্যোপাধ্যায়।

পরে ডোমেনিকোর আসল উদ্দেশ্য বুঝতে ফিলোমেনার দেরী হল না। সে বুঝল, ডোমেনিকোর কাছে তার সম্মান তার বাড়ীর পরিচারিকার উঁচুতে নয়। কিন্তু শীঘ্রই ফিলোমেনা তার গৃহস্থালি পরিচালনারও ভার নিল এবং যে-রকম দক্ষতার সঙ্গে তার ব্যবসায়ের দেখাশুনা করছিল, ঠিক সেই রকমভাবেই তার গৃহস্থালিও চালাতে লাগল। এইভাবে দীর্ঘ কুড়ি বছর কেটে যাবার পরে ফিলোমেনা যেদিন দেখল, ডোমেনিকো তার ব্যবসায়ের অন্যতম কর্মীর পাণিপ্রার্থী, তখন সে মনে মনে প্রমাদ গুণল এবং কৌশলে ডোমেনিকোকে লাভ করবার পন্থা আবিষ্কার করল। একটি দূরে স্থান থেকে অত্যধিক অসুস্থতার ভান করে সে সোজা ডোমেনিকোর বাড়ীতে এসে হাজির হল। যখন হন্তদন্ত হয়ে ডোমেনিকো তার কাছে এসে হাজির হল, তখন সে আকারে-ইঙ্গিতে জানাল, তার শেষ সময় উপস্থিত; কাজেই বৃথা ডাক্তার না ডেকে একজন ধর্মযাজককে আহ্বান করাই শ্রেয়। ধর্মযাজক এলেন এবং পতিতা ফিলোমেনা যাতে উদ্ধার পায়, তার জন্যে ঐ মরণপথগামিনীকে বিবাহ করবার জন্যে ডোমেনিকোকে পরামর্শ দিলেন। ডোমেনিকো এতে আপত্তি করল না। কিন্তু বিবাহের ক্ষণকাল পরেই ফিলোমেনা আশ্চর্যভাবে সুস্থ হয়ে উঠল। ডোমেনিকোর বুঝতে দেরী হল না, ফিলোমেনা মিথ্যার আশ্রয়ে এই বিবাহ ঘটিয়েছে। এরপর যখন ফিলোমেনা তাকে জানাল যে, তার তিনটি ছেলে আছে এবং এখন সে তাদের তার স্বামীর বংশগত উপাধি 'সোরিয়ানো' নামে অভিহিত করে আইন বাঁচাতে পারবে, তখন ডোমেনিকো রীতিমত ক্ষেপে গিয়ে একজন আইনজীবীর সাহায্যে তাদের বিবাহ নাকচ করতে সমর্থ হল।

কিন্তু ডোমেনিকো তাতেও রেহাই পেল না। কারণ, ছেলে তিনটিকে নিয়ে ডোমেনিকো সোরিয়ানোর বাড়ী ছেড়ে চলে যেতে যেতে ফিলোমেনা অত্যন্ত সুস্পষ্টভাবে তাকে

জানাল যে, ঐ তিনটি ছেলের মধ্যে একটি হচ্ছে তারই [illegible] এবং [illegible] সে তার সামনে তারই দেওয়া একশো টাকার নোটটি খুলে [illegible] তার কোণে লেখা তারিখটি ছিঁড়ে নিয়ে, আর জানাল, যেদিন সে অন্তঃসত্ত্বা হয়েছিল সেইদিনই খুশীর নিদর্শনস্বরূপ এই নোটটি সে তার কাছ থেকে উপহার পেয়েছিল।—এ-কথা শোনবার পরে ডোমেনিকো আর স্থির থাকতে পারেনি। অস্থির ডোমেনিকো শেষপর্যন্ত কেমনভাবে সকল সমস্যার সমাধান করল, তাই নিয়েই ছবির শেষ উত্তেজক অংশটি গড়ে উঠেছে।

সোজাসুজিভাবে কাহিনীটিকে ছবিটিতে বিবৃত করা হয়নি। ছবিটি শুরু হয়েছে যেখানে ফিলোমেনা অত্যন্ত অসুস্থতার ভান করে ডোমেনিকোর বাড়ীতে এসে হাজির হয় এবং ইঙ্গিতে জানায় একজন ধর্ম-যাজককে হাজির করতে। এরপর ফ্ল্যাশব্যাকের সাহায্যে অতীতকে উদ্ঘাটিত করা হয় কিছু-দূর পর্যন্ত। আবার বর্তমানে ফিরে এসে বিবাহ হয়ে যাওয়ার পরে যখন ফিলোমেনা সুস্থ হয়ে ওঠে এবং খাবার টেবিলে বসে আপেল ছাড়াতে থাকে, তখন আবার ফ্ল্যাশ-ব্যাকের সাহায্যে অতীতের দ্বিতীয়ার্ধটা দেখানো হয় এবং পরে বিবাহ বাতিল হওয়া থেকে শেষের উত্তেজক অধ্যায়টি দেখানো হয়।

আশ্চর্য গতিবেগসম্পন্ন 'ম্যারেজ ইটা-লিয়ান স্টাইল' প্রধানত হাসিকে উপজীব্য করে গড়ে উঠেছে। কিন্তু এর বক্তব্যের গভীরতার কথা বিবেচনা করলে হাসি স্তব্ধ হয়ে যেতে বাধ্য। একটি নারী অবস্থার বৈগুণ্যে অনিচ্ছায় বেশ্যাবৃত্তি করতে বাধ্য হলেও, রূপে, গুণে ও বুদ্ধিতে কারু থেকে কম নয়। যেদিন থেকে সে তার জীবনের প্রথম পুরুষটির আশ্রয় পেয়েছে, সেদিন থেকে সে শুধু যে আর স্বৈরিণী হয়নি, তাই নয়, সে তার বুদ্ধি, ব্যক্তিত্ব ও সততার বলে সেই পুরুষটির ব্যবসায় ও গৃহস্থালি —দুই-ই পরিচালনা করেছে কৃতিত্বের সঙ্গে। তবু সে তার বহু আকাঙ্ক্ষিত সম্মান পায়নি। তার মাতৃত্বের ইচ্ছা প্রবল; কিন্তু যার আশ্রয়ে আছে, তার সুনাম কলঙ্কিত হবার ভয়ে সে তার মাতৃহৃদয়ের সমস্ত স্নেহকে দমিত রেখে নিজের সন্তানদের উপযুক্তভাবে পালনের ব্যবস্থা করেছে অন্য একজন কর্তব্যপরায়ণা স্ত্রীলোকের হেপাজতে তাদের রেখে, নিজের পরিচয় পর্যন্ত তাদের কাছে গোপন রেখেছে। যখন সে দেখল, তার বহু আকাঙ্ক্ষিত সম্মানিত জীবন তার চোখের সামনেই হাতছাড়া হয়ে যাচ্ছে, তখন এবং মাত্র তখনই সে-ছলনার আশ্রয় নিয়ে-ছিল এবং শেষপর্যন্ত তার আকাঙ্ক্ষাকে ফলবতী হতে দেখে সে জীবনে যা করেনি, তাই করেছিল; সে কেঁদেছিল—কেঁদে আনন্দ পেয়েছিল।

আশ্চর্য চরিত্রের এই নারী ফিলোমেনা—সাহিত্যে অমর হয়ে থাকবার মতো চরিত্র এবং এই চরিত্রে সোফিয়া লোরেনের অভিনব —অভিনয় নয়, জীবনের অভিব্যক্তি। তার সঙ্গে ডোমেনিকোর ভূমিকায় মার্সেলো ম্যাস্ট্রোইয়ানি তাঁর নটজীবনের শ্রেষ্ঠ অভিনয় করেছেন—সোফিয়া লোরেণকে কোথাও তাঁর জন্যে সামান্যমাত্রও অসুবিধাতে পড়তে হয়নি। ফিলোমেনার ছেলে তিনটি—অপেক্ষাকৃত শিশু অবস্থায় এবং পরে কিশোর অবস্থায়—প্রতিটি দর্শকের মনে রেখাপাত করেছে; বিশেষ করে ছোটটিকে ভোলা যায় না। ফিলোমেনার দাসী, ডোমে-নিকোর বৃদ্ধা মা, ছেলে তিনটির ধাত্রী-মা—প্রায় প্রতিটি চরিত্রই নিখুঁতভাবে অভিনীত। তবে সকলকে ছাপিয়ে সোফিয়া লোরেণ একক এবং অনন্যা।

বর্ণাঢ্য 'ম্যারেজ ইটালিয়ান স্টাইল' পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ চিত্রগুলির অন্যতম।

—নান্দীকর

পুজোর চাই নতুন কিছু। নতুন নতুন নানান পসরায় পুজোর হাট থৈ-থৈ করছে। সবকিছুর মধ্যে যেন একটা নতুন আকর্ষণ ছড়িয়ে আছে, ছিটিয়ে আছে। এই পুজো মরশুমে নতুন ছবি দেখার আকর্ষণটা খুব কম নয়। উৎসবের দিনগুলোতে একটা নতুন সিনেমা না দেখতে পারলে মনটা কিছুতেই যেন পরিপূর্ণ হয় না। আনন্দে মেতে ওঠে না।

সুতরাং সবকিছুর মধ্যে পুজোয় চাই নতুন সিনেমা। আসন্ন শারদীয় উৎসবে দর্শকদের নিরাশ হবার কোন কারণ নেই। চলতি এবং আগামী সপ্তাহে বাংলা এবং হিন্দী মিলিয়ে মোট সাতখানা নতুন ছবি কলকাতা ও শহরতলিতে মুক্তিলাভ করছে। নতুন ছবিগুলোর খবরাখবর জানাচ্ছি। প্রথমে

চৌরঙ্গী চিত্রে উত্তমকুমার ও সুপ্রিয়াদেবী

বাংলা ছবি দিয়ে শুরু করি। তারপর হিন্দী ছবি।

চিড়িয়াখানা

সত্যজিৎ রায়ের ছবি **'চিড়িয়াখানা'** এ সপ্তাহের ২৯ তারিখ থেকে রাধা, পূর্ণ, অরুণা এবং শহরতলির বিভিন্ন প্রেক্ষাগৃহে শুভ মুক্তিলাভ করছে। শরদিন্দু বন্দ্যোপাধ্যায়ের রহস্য-কাহিনী অবলম্বনে এটির চিত্রনাট্য রচিত। প্রধান চরিত্রগুলোতে অভিনয় করেছেন উত্তমকুমার, সুশীল মজুমদার, জহর গাঙ্গুলী, শৈলেন মুখোপাধ্যায়, শুভেন্দু চট্টোপাধ্যায়, প্রসাদ মুখোপাধ্যায়, বঙ্কিম ঘোষ, শ্যামল ঘোষাল, কণিকা মজুমদার, সুব্রতা চট্টোপাধ্যায়, গীতালি রায়, সুবীরা রায় প্রভৃতি। স্টার প্রোডাকসন্সের এ ছবিটির পরিবেশক বলাকা পিকচার্স।

নবেন্দু চ্যাটার্জী পরিচালিত জীবনতীরা চিত্রের একটি দৃশ্যে সর্বেন্দর ও মাধবী মুখার্জী। ফটো : অমৃত।

মহাশ্বেতা

বি. কে. প্রোডাকসন্সের ছবি 'মহাশ্বেতা' ২৯ সেপ্টেম্বর থেকে উত্তরা, উজ্জ্বলা, পূরবী, আলোছায়া প্রভৃতি চিত্রগৃহে শুভ মুক্তিলাভ করছে। জরাসন্ধের এই জনপ্রিয় উপন্যাসটির চিত্ররূপ দিয়েছেন পরিচালক পিনাকী মুখোপাধ্যায়। এ ছবির মুখ্য চরিত্রগুলোতে রূপদান করেছেন সৌমিত্র চট্টোপাধ্যায়, অঞ্জনা ভৌমিক, অনিল চট্টোপাধ্যায়, শমিত্রা বিশ্বাস, রেণুকা রায়, মলিনা দেবী, ছায়া দেবী, জহর গাঙ্গুলী, জহর রায়, সুখেন দাশ, আনন্দ মুখোপাধ্যায় প্রভৃতি। ছবিটির সুরসৃষ্টি করেছেন রাজেন সরকার। চিত্রালী ফিল্মস ছবিটির পরিবেশক।

দুষ্টু প্রজাপতি

ললিত চিত্রমের 'দুষ্টু প্রজাপতি' চলতি সপ্তাহের ২৯ তারিখ থেকে মিনার, বিজলী, ছবিঘর প্রভৃতি প্রেক্ষাগৃহে মুক্তিলাভ করছে। এ ছবিটির চিত্রগ্রহণ বোম্বাইয়ে গৃহীত হয়েছে। পরিচালনা করেছেন শ্যাম চক্রবর্তী। দুষ্টুমিতরা এই মিষ্টি ছবিটিতে অভিনয়

করেছেন বিশ্বজিৎকুমার, অনুভা গুপ্তা, চট্টোপাধ্যায়, অসিতবরণ, সন্ধ্যা দেবী, ছায়া দেবী। চন্দ্রিমা ভাদুড়ী, জহরকুমার প্রভৃতি। হেমন্ত মুখোপাধ্যায় ছবিটির সংগীত-পরিচালক। পরিবেশনার দায়িত্বে।

একটি জিজ্ঞাসা

আগামী সপ্তাহের ৬ অক্টোবর থেকে পুজোর নতুন ছবি 'একটি জিজ্ঞাসা' রূপবাণী, বসুশ্রী, বীণা ও শহরতলির বিভিন্ন চিত্রগৃহে মুক্তিলাভ করবে। বি, এন, রায় প্রোডাকসন্সের এ ছবিটি পরিচালনা করেছেন সুনীল বন্দ্যোপাধ্যায়। কবিয়ালের এ কাহিনীতে রূপদান করেছেন উত্তমকুমার, তনুজা, তরুণকুমার, হারাধন বন্দ্যোপাধ্যায় প্রভৃতি। এ ছবির সুরসৃষ্টি করেছেন অনিল বাগচী। ছায়ালোক ছবিটির পরিবেশক।

জাল

হিন্দী রঙিন ছবি 'জাল' এ সপ্তাহের ২৯ সেপ্টেম্বর থেকে প্যারাডাইস, প্রিয়া, প্রভাত, গণেশ, মিত্রা প্রভৃতি চিত্রগৃহে মুক্তি পাচ্ছে। মণি ভট্টাচার্য পরিচালিত এ ছবির মুখ্য শিল্পীরা হলেন বিশ্বজিৎ, মালা সিনহা, সুজিতকুমার, জনি ওয়াকর, নিরূপা রায়, হেলেন এবং অসিত সেন। মনমাতানো গানের সুরসৃষ্টি করেছেন লক্ষ্মীকান্ত-প্যারেলাল।

উপকার

মনোজকুমার অভিনীত, পরিচালিত এবং রচিত রঙিন হিন্দী ছবি 'উপকার' আগামী সপ্তাহের ৬ অক্টোবর ওরিয়েন্ট, কৃষ্ণা, ম্যাজেস্টিক, ভারতী প্রভৃতি চিত্রগৃহে শুভ মুক্তিলাভ করবে। কাহিনীর প্রধান চরিত্রে রূপদান করেছেন মনোজকুমার, আশা পারেখ, কামিনীকৌশল, প্রাণ, প্রেম চোপরা, কনহৈয়ালাল, মদনপুরী, মনমোহন কৃষ্ণ, মোহন চোটি, ডেভিড এবং অসিত সেন। সঙ্গীত-পরিচালনা করেছেন কল্যাণজী-আনন্দজী।

ফর্জ

নতুন বৈচিত্র্যের রঙিন ছবি 'ফর্জ' আগামী সপ্তাহের ৬ অক্টোবর থেকে কলকাতার বিশিষ্ট চিত্রগৃহে মুক্তিলাভ করবে। রবি নাগাইচ পরিচালিত এ ছবির নায়ক-নায়িকা চরিত্রে অভিনয় করেছেন জিতেন্দ্র এবং ববিতা। লক্ষ্মীকান্ত-প্যারেলাল ছবিটির সঙ্গীত-পরিচালক এবং রাজশ্রী ছবিটির পরিবেশক।

বি কে প্রোডাকসন্সের মহাশ্বেতা চিত্রের একটি দৃশ্যে মাঃ সৌমিত্র ও অঞ্জনা ভৌমিক।

তরুণ মজুমদার পরিচালিত প্রথম হিন্দী ছবি 'রাহগীর'

জনপ্রিয় বাংলা ছবি 'পলাতক'র হিন্দী 'রাহগীর' ছবিটি পরিচালনা করছেন পরিচালক তরুণ মজুমদার। গীতাঞ্জলি-চিত্রদীপের পক্ষ থেকে ছবিটি যুগ্মভাবে প্রযোজনা করছেন হেমন্ত মুখোপাধ্যায় এবং তরুণ মজুমদার। সম্প্রতি বোম্বাইয়ে ছবিটির সঙ্গীত গ্রহণ শেষ হয়েছে। সুরসৃষ্টি করেছেন হেমন্ত মুখোপাধ্যায়। ভূমিকালিপি এখনো সম্পূর্ণ হয়নি। ছবিটির চিত্রগ্রহণ শীঘ্রই শুরু হবে।

'ধরতি কহে পুকার কে'

পরিচালক দুলাল গুহের নতুন রঙিন ছবিটির নাম 'ধরতি কহে পুকার কে'। এ ছবির প্রধান চরিত্রে মনোনীত হয়েছেন জিতেন্দ্র, নন্দা, সঞ্জীবকুমার, নিবেদিতা, কনহৈয়ালাল, দুর্গা খোটে, তরুণ বোস, অসিত সেন এবং অভি ভট্টাচার্য। সঙ্গীত-পরিচালনার দায়িত্ব নিয়েছেন লক্ষ্মীকান্ত-প্যারেলাল।

'আয়া সনম'

ফিল্ম ফিল্ড প্রোডাকসন্সের নতুন ছবি 'আয়া সনম'র চিত্রগ্রহণ শুরু হয়েছে কমল স্টুডিওয়। ওয়াই, এন, প্রামাণ্য পরিচালিত

এ ছবির প্রধান চরিত্রে অভিনয় করছেন ফিরোজ খান, তনুজা, দেবেন ভর্মা, শবনম, মুকরী ও নানা পালসিকর। সুরসৃষ্টিতে রয়েছেন উষা খান্না।

'কন্যা দান'

পরিচালক মোহন সেগলের নতুন ছবি 'কন্যা দানে'র বহির্দৃশ্য আগামী মাস থেকে কাশ্মীর অঞ্চলে গৃহীত হবে। কিরণ প্রোডাকসন্সের এ ছবিতে অভিনয় করছেন শশি কাপুর, আশা পারেখ, ওম প্রকাশ, দিলীপ রাজ, সাঈদা খান, সবিতা চ্যাটার্জি এবং অচলা সচদেব। শংকর-জয়কিষণ ছবিটির সুরকার।

প্রসাদ প্রোডাকসন্সের 'দি প্রিন্স এন্ড দি পপার'

প্রসাদ প্রোডাকসন্সের রঙিন ছবি 'দি প্রিন্স এন্ড দি পপার'এর সঙ্গীতগ্রহণ সম্প্রতি গৃহীত হল মিনু কাত্রাক স্টুডিওয়। লক্ষ্মীকান্ত প্যারেলালের সুরারোপে কণ্ঠদান করলেন লতা মঙ্গেশকর। ছবিটির চিত্রগ্রহণ করছেন পরিচালক কে পি আত্মা। প্রধান চরিত্রে রয়েছেন সঞ্জীবকুমার, সাজিয়া, বিপিন গুপ্ত, অজিত, কমল কাপুর, মুকরী, মোহন চোটি ও নিরূপা রায়।

সূর্যের রঙ লাল
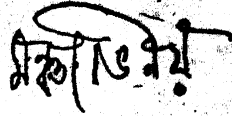
ভাস্বর সূর্যের প্রদীপ্ত উপস্থিতি সংগ্রামী মানুষের কাছে এমন এক গভীরতম সত্য যা কোন প্রহরের চিন্তায় স্তিমিত হয় না। সূর্যস্নাত আকাশের অতলে সত্যের যে প্রদীপ জ্বলে তার মহিমাকে কোন মতেই অস্বীকার করা যায় না, করা গেলে জীবনের অস্তিত্বকেই অর্থহীন ভাবতে হয়। কিন্তু চিরন্তনকালের শোভন নীতিবোধ আর চিন্তাধারা কিছু পরিমাণে আজকের এই যান্ত্রিক যুগে বিপর্যস্ত হোতে চলেছে; যে সামাজিক রীতিনীতি ও জীবন সম্পর্কে যে বোধ সূর্যের মতো সত্য ছিল তাকে যেন আজকের জড়তাধর্মী মন মাঝে মাঝে অস্বীকার করতে চাইছে। কিন্তু বিবেকের পুরোপুরি সমর্থন না পাওয়ায় একেবারে দূরে সরিয়ে রাখা সম্ভব হোচ্ছে না, তাই স্বীকৃতি-অস্বীকৃতির সংঘাত জাগছে হৃদয়ে। দিশেহারা মানুষের এই বিশেষ মানসিক পরিপ্রেক্ষিতে রচিত হয়েছে রণজিত সাহার 'সূর্যের রঙ লাল' নাটক। 'প্রাচীতীর্থে'র শিল্পীবৃন্দ সম্প্রতি প্রতাপ মেমোরিয়াল হলে এ নাটক মঞ্চস্থ করেছেন।

'সূর্যের রঙ লাল' বলিষ্ঠ বক্তব্যধর্মী নাটক, এ বিষয়ে বোধহয় কোন সন্দেহ থাকতে পারে না, কিন্তু বক্তব্য যে ঘটনার বিন্যাস ও চরিত্র উপস্থাপনায় মধ্য দিয়ে মুখর হয়ে ওঠে, তা মনে হয় এ নাটকে ততোটা স্পষ্ট নয়। বোধহয় নাট্যকার যতোটা গভীরতার আলোয় বক্তব্যকে তুলে ধরতে চেয়েছেন, চরিত্রসৃষ্টির ব্যাপারে ততোটা গভীরে ডুবে যেতে পারেন নি, তাই অনেক জায়গায় চিন্তার স্বতঃস্ফূর্ত গতি ব্যহত হয়েছে আর তারই সূত্র ধরে সংশয়ের উদ্রেক হয়েছে দর্শকের মনে।

সাম্প্রতিক নাট্যনিরীক্ষার একটা প্রধানতম বৈশিষ্ট্য হোল আঙ্গিকের ওপর অতিরিক্ত গুরুত্ব আরোপ এবং 'প্রাচীতীর্থে'র শিল্পীবৃন্দের প্রচেষ্টাতেও এ সত্য বেশ কিছুটা পরিস্ফুট হয়ে উঠেছে। নাট্যনির্দেশক অমল করের নিষ্ঠা এ বিষয়ে প্রশংসার দাবী রাখে। 'জোন লাইটিং সিসটেমে' তাঁর আঙ্গিক পরিকল্পনা নিশ্চয়ই সূক্ষ্ম চিন্তার পরিচয় বহন করে, কিন্তু সব সময়ে এ নাটকের গতি এমন কলাকৌশলের আবর্তের মধ্যে অব্যাহত থাকতে পারেনি। তবু সুশীল বর্মণের আলোকসম্পাতে গভীরতর দৃষ্টিভঙ্গীর ছাপ আছে, একইভাবে নিটোল এক শিল্পীমনের প্রকাশ ঘটেছে সুকোমল মিত্রের মঞ্চসজ্জায়।

'প্রাচীতীর্থে'র শিল্পীদের সামগ্রিক অভিনয়ে বিশেষ কোন উল্লেখযোগ্য দিক মূর্ত হয়ে ওঠেনি, সমগ্র নাট্যাভিনয়ের মধ্যে সব সময়ে যেন একটা শৈথিল্য ছিল যা নাট্যকারের আকাঙ্ক্ষিত বক্তব্যের গভীরে নাট্যানুরাগীকে উন্নীত করে দিতে পারেনি। আঙ্গিকের দিকে সবটুকু চিন্তা প্রয়োগ করায় হয়তো নাট্যনির্দেশক অভিনয়ের ব্যাপারে দৃষ্টি দিতে পারেননি, কিন্তু সুষ্ঠু নাট্যপ্রযোজনা অভিনয় আর আঙ্গিকের সার্থক সমন্বয়েই সম্ভব, এ সত্যকে তাঁর বিস্মৃত হোলে চলবে না। এ নাটকের বিভিন্ন ভূমিকায় যাঁরা অংশ নেন তাঁরা হোলেন অনিরুদ্ধ দাশগুপ্ত, অমিয় দাস, কেশব বসু, রবীন্দ্রনাথ দাস বর্মণ, যতীন দাস, সুদর্শন সেনগুপ্ত, সুবোধ চন্দ, দেবু রায়, সুধাংশু বসু, গোপাল হাজরা, মেনকা বন্দ্যোপাধ্যায়, রীণা ঘোষ।

'মণিবেগম'

ঐতিহাসিক ঘটনা আর তথ্যের ওপর ভিত্তি করে লেখা নাটক যে সব সময়ে পুরানো দিনেরই সৃষ্টি, সাম্প্রতিক কালে তার মঞ্চরূপায়ণের কোন অর্থই হয় না; এ ধারণাটা বোধহয় সত্য নয়। যদি বর্তমান সমাজ-মানসের আলোকে ঘটনার বিন্যাস আর চরিত্রের বিবর্তন দেখানো সম্ভব হয় তাহলে সে নাটক ইতিহাস আশ্রয়ী বলেই কি দূরে সরিয়ে রাখা যুক্তিসঙ্গত? আজকের চিন্তাধারার সংকেত যদি এ নাটকে থাকে তাহলে তাকে মঞ্চে উপস্থিত করতে বাধা নেই এবং থাকা উচিত নয়। শক্তিপদ রাজগুরুর 'মণিবেগম' নাটক ঐতিহাসিক ঘটনার পরিপ্রেক্ষিতে রচিত হয়েছে. কিন্তু নাটকের প্রয়োজনে তিনি ইতিহাসের তথ্যের মধ্য থেকে চরিত্রের সংঘাত খুঁজেছেন, খুঁজেছেন সাম্প্রতিক জন-মানসের বৈশিষ্ট্যকে। তাঁর প্রচেষ্টা সার্থক হয়েছে। কেননা, 'মণিবেগম' বলিষ্ঠ নাট্যসৃষ্টি হিসাবে নাট্যানুরাগীর অজস্র অভিনন্দন পেয়েছে। সম্প্রতি 'লিপটন ড্রামাটিক ক্লাবে'র শিল্পী সদস্যরা এ নাটকের অভিনয় করলেন 'স্টার' রঙ্গমঞ্চে।

সামগ্রিক নাট্য-প্রযোজনায় এমন একটা বৈশিষ্ট্য সব সময়েই চিহ্নিত হয়েছিল যা প্রথম শ্রেণীর নাট্যাভিনয়ে চোখে পড়ে। এই ব্যাপারে নাট্য-নির্দেশক দীনেন রায়ের নিষ্ঠা অভিনন্দনযোগ্য, তাঁর প্রয়োগ-পরিকল্পনা পরিচ্ছন্ন। কয়েকটি বিশেষ নাটকীয় মুহূর্ত সৃষ্টি করে তিনি সমগ্র নাটকটিতে আরো বলিষ্ঠতা এনেছেন। প্রতিটি চরিত্রই প্রায় সু-অভিনীত, এটা সম্ভব হয়েছে চরিত্রের সঙ্গে শিল্পীর নিবিড় একাত্মতার জন্য।

'মণিবেগমের' চরিত্র সৃষ্টিতে আশ্চর্য নৈপুণ্যের পরিচয় রেখেছেন গায়ত্রী দেবী। প্রতিটি মুহূর্তে তাঁর অভিনয় প্রাণবন্ত, বলিষ্ঠ। পিটার জ্যাকসন 'মীরজাফর' চরিত্রের অনুশোচনা অসাধারণ দক্ষতার সঙ্গে মঞ্চে পরিস্ফুট করে তুলতে পেরেছেন। ওয়ারেন হেস্টিংস ও ওয়াজিদের ভূমিকায় মৃত্যুঞ্জয় রায়-চৌধুরী ও অমরেন্দ্রনাথ মিত্র সু-অভিনয়

দক্ষিণীর সমাবর্তন উৎসবে শ্রীশান্তিদেব ঘোষের কাছ থেকে কৃতিত্বপত্র গ্রহণ করছেন অনীতা চট্টোপাধ্যায়। ফটো : অমৃত

করেছেন। গিরিন বন্দ্যোপাধ্যায় (নন্দকুমার), অরুণ দত্ত (রেজা খাঁ), অঞ্জলি চট্টোপাধ্যায় (বুবু বাই), খুকু ভট্টাচার্য'র (মায়া) অভিনয়ে বৈশিষ্ট্যের ছাপ আছে। অন্যান্য ভূমিকায় অংশ গ্রহণ করেছিলেন—অজিত মুখোপাধ্যায়, শক্তি বন্দ্যোপাধ্যায়, অমলেন্দু সেনগুপ্ত, অমিতাভ ঘোষ, বিশ্বনাথ মুখোপাধ্যায়, সমীর চট্টোপাধ্যায়, কৌস্তভ চট্টোপাধ্যায়, বটকৃষ্ণ ঘোষ, জিরাল্ড গোমেস, রবীন সেনগুপ্ত, কেনারাম ঘোষ, সুনীল বসু, ভক্তিরঞ্জন সাহা, চিন্ময় ভৌমিক, দেবাশিস বসু, বিনয় রায়, শিবশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়, শ্রীমতী কে ওয়াইন পিটার্স, শ্রীমতী লিয়া লেস্টার, শ্রীমতী ভি এডামস্, শরণ সিং, লালারম, বেবী ঘোষ।

মাস্টার মশাই

সম্প্রতি 'রঙ্গবাণী' নাট্য সংস্থার শিল্পীবৃন্দ 'রংমহলে' ডাঃ শৈলেন ভট্টাচার্যের 'মাস্টার মশাই' নাটক মঞ্চস্থ করেছেন। পতনোন্মুখ যুবকসমাজের সামনে নতুনতর চিন্তার দিগন্ত তুলে ধরার ব্যাপারে এ নাটক নতুন এবং বলিষ্ঠ বক্তব্য এনেছে ঠিক, কিন্তু ঘটনা বিন্যাসের অসম্ভব দুর্বলতার জন্য বক্তব্য নাটকীয় সংঘাতের মধ্য দিয়ে পরিস্ফুট হয়ে উঠতে পারেনি। 'মাস্টার মশাই' চরিত্রের বারবার উপস্থিতি নাটকে কোন বিশেষ গতি আনতে পারেনি, আর চরিত্রসৃষ্টির দুর্বলতার জন্য নাটকীয়তা কোথাও সংহত আকার বোধহয় পায়নি।

নাট্য নির্দেশনায় পরিমল দাশগুপ্ত নতুন কিছু চিন্তা সঞ্চারিত করতে পারেননি, যার ফলে সমগ্র নাট্যপ্রযোজনাটি বহুদিক থেকেই দুর্বল থেকেছে। নাটকে কয়েকটি চরিত্র মোটামুটি সু-অভিনীত।

'সিঁদুরের দাগ'

'রূপতীর্থ' শিল্পীগোষ্ঠী সম্প্রতি প্রাচী সিনেমায় তাঁদের উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে একটি ছোট নাটক 'সিঁদুরের দাগ' মঞ্চস্থ করলেন। এই গোষ্ঠীর শিল্পীবৃন্দ যে ভবিষ্যতে নতুনতর নাট্যচিন্তার অংশীদার হবেন, এই সম্ভাবনা এই নাট্যপ্রযোজনায় চিহ্নিত হয়েছে। 'সিঁদুরের দাগ' নাটকের বক্তব্য এবং পরিবেশনায় ভিন্নতর স্বাদ অনুভূত হয়।

এই একাংকিকাটি গাঢ় হয়ে উঠেছে উচ্ছৃংখল নারী-চরিত্রের কাহিনী নিয়ে। নাটকটি রচনা করেছেন মানবকুমার, নির্দেশনায় দারিত্বও ছিল তাঁর। এ নাটকের শিল্পীরা হোলেন—প্রতিমা চক্রবর্তী, শ্যামলী দাস, সুভাষ বন্দ্যোপাধ্যায়, পরিতোষ রক্ষিত।

'সোমপুরা থেকে শোনপুর'

সম্প্রতি খিদিরপুর ভেনাস ক্লাবের সভ্যবৃন্দ তাঁদের মিলনোৎসব উপলক্ষ্যে অভিনয় করলেন শুধাংশু দাশগুপ্তের নাটক 'সোমপুরা থেকে শোনপুর'। নাটকের বিভিন্ন চরিত্রে অংশ গ্রহণ করেন—সুভাষ ঘোষ, মৃণাল প্রামাণিক, দিলু ঘোষ, শ্যামল ধাড়া, সমরেশ বোস, প্রবীর মিত্র, তপন বিশ্বাস, সমর ঘোষ, সুকুমার সরকার, সীমা গুহ-ঠাকুরতা।

'শেষ সংবাদ'

স্টেট ব্যাংক অফ ইণ্ডিয়া স্টাফ রিক্রিয়েশন ক্লাবের সভ্যবৃন্দ সম্প্রতি উমানাথ ভট্টাচার্যের 'শেষ সংবাদ' নাটক মঞ্চস্থ করেন। প্রতিটি শিল্পীই চরিত্রোপযোগী অভিনয় করেছেন। নাটকের বিভিন্ন ভূমিকায় অবতীর্ণ হন সচ্চিদানন্দ মুখোপাধ্যায়, বিমল মুখোপাধ্যায়, বিশ্বনাথ চক্রবর্তী, প্রদ্যোৎ মুখোপাধ্যায়, রণেন চট্টোপাধ্যায়, পূর্ণেন্দু কুণ্ডু, অজিত চট্টোপাধ্যায়, শেখর বন্দ্যোপাধ্যায়, ভূপাল বসু, সুভাষ বসু, শক্তি ভট্টাচার্য, হিমাংশু দে, বিশ্বনাথ গুপ্ত, শেফালী বন্দ্যোপাধ্যায়।

রমা

সম্প্রতি কৃষ্ণনগর মহিলা মহাবিদ্যালয়ের দশম বার্ষিক প্রতিষ্ঠা দিবস উদ্‌যাপন উপলক্ষে স্থানীয় রবীন্দ্রভবন মঞ্চে অভিনীত হোল শরৎচন্দ্রের 'রমা'। অভিনয়ের বিভিন্ন ভূমিকায় অংশ নিয়েছিলেন মিনতি মৈত্র, কুসুমিতা বন্দ্যোপাধ্যায়, প্রতিমা চক্রবর্তী, স্বপ্না নন্দী,

সুজাতা মজুমদার, মিলি দে, কমলা চক্রবর্তী, শান্তশ্রী ঘোষ, মধুছন্দা চক্রবর্তী, গীতা পালচৌধুরী, স্নিগ্ধা মুখোপাধ্যায়, ভারতী রায়।

কর্ণার্জুন

নিউ আলীপুরে একস্টেনসনের সেবা সংঘ' সম্প্রতি সাফল্যজনক পৌরাণিক নাটক 'কর্ণার্জুন' পরিবেশন করেন। শিল্পীবৃন্দের অনবদ্য অভিনয়ে সমগ্র নাট্যপ্রযোজনাটি আকর্ষণীয় হয়ে উঠেছিল। নাট্যনির্দেশনায় সুধাংশু বন্দ্যোপাধ্যায় নিষ্ঠার পরিচয় দেন। উল্লেখযোগ্য অভিনয় করেন মেঘনাদ গোস্বামী, কাজল মুখোপাধ্যায়, সুজিত বন্দ্যোপাধ্যায়, শিবু নন্দী, মধু গোস্বামী, সীমা বন্দ্যোপাধ্যায়, কালীপ্রসাদ লস্কর, গোপী বন্দ্যোপাধ্যায়, নাট্যনির্দেশক স্বয়ং।

কলকাতা থেকে দূরে :

শ্রীরামপুরে

'কাকলী'র শিল্পীবৃন্দ সম্প্রতি রবীন্দ্রভবনে জ্যোতু বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'মুছেও যা মোছে না' নাটক মঞ্চস্থ করেছেন। নাটকের নির্দেশনার দায়িত্ব নেন অলোক বন্দ্যোপাধ্যায়। বিভিন্ন ভূমিকায় অংশ নেন—অমর মাইতি, সমরেশ বন্দ্যোপাধ্যায়, তারাপদ সাঁতরা, ব্যোমকেশ বন্দ্যোপাধ্যায়, মহানন্দ কর, অচিন মৈত্র, শান্তি গঙ্গোপাধ্যায়, কৃষ্ণা দাশগুপ্তা, সুস্মিতা চট্টোপাধ্যায়।

শান্তারামপুরে

সম্প্রতি 'শিল্পী সংসদে'র প্রযোজনায় টেগোর ইনস্টিটিউটে অভিনীত হোল 'সম্রাটের মৃত্যু' নাটক। সামগ্রিক অভিনয়

সবারই প্রশংসা আকর্ষণ করে। শান্তনু চট্টরাজের নির্দেশনায় নাটকের বিভিন্ন চরিত্রে অভিনয় করেন আশুতোষ রায়, দিলীপ বন্দ্যোপাধ্যায়, বিমল পাল, সুশীল ঘোষ, শংকর দাস, রবি রায়, আশীষ চক্রবর্তী, নিরঞ্জন ঘোষ, শ্যামল বন্দ্যোপাধ্যায়, মধু চৌধুরী, ইলা ঘোষ।

বর্ধমান

রামমোহন ক্লাবের সভ্যবৃন্দ সম্প্রতি সংস্থার নিজস্ব মুক্ত-অঙ্গন মঞ্চে 'পাশের ঘরের ভাড়াটে' নাটক অভিনয় করলেন। নাট্য-নির্দেশনায় নিষ্ঠার পরিচয় দেন শেখর মজুমদার। যাঁদের অভিনয় সবচেয়ে বেশী বৈশিষ্ট্যচিহ্নিত ছিল, তাঁরা হোলেন, তপন আদিত্য, গৌর পাত্রিত, পুতুল দত্ত।

বিবিধ সংবাদ

রঙমহলে নতুন নাটক : ছায়া নায়িকা

আসছে ২রা অকটোবর সোমবার রঙমহলে শুরু হচ্ছে পুজোর অন্যতম আকর্ষণরূপে পার্থপ্রতিম চৌধুরীর রহস্যঘন নাটিকা "ছায়া নায়িকা।"। আলোকসম্পাতে আছেন তাপস সেন। বিভিন্ন চরিত্রে রঙমহলের শিল্পিগোষ্ঠীর জহর রায়, হরিধন মুখোপাধ্যায়, অজিত চট্টোপাধ্যায়, পার্থপ্রতিম, দীপিকা দাস, ইন্দিরা দে, সরযূবালা প্রভৃতিকে দেখা যাবে।

বিশ্বরূপায় নতুন নাটক "আগন্তুক"

বিশ্বরূপার শারদীয় উপহার প্রেমেন্দ্র মিত্র ও ধনঞ্জয় বৈরাগীর লেখা সম্পূর্ণ নূতন স্বাদের রহস্যঘন নাটক "আগন্তুক।"

আমাদের সীমান্ত অঞ্চলে কত-রকমের রহস্যময় ঘটনা ঘটছে, হোটেলের পার্বত্য পরিবেশে অবাধে কত গোপন তথ্য পাচার হয়ে যাচ্ছে। যার ফলে বিঘ্নিত হচ্ছে দেশের নিরাপত্তা, বিপন্ন হচ্ছে জনজীবন—তারই চাঞ্চল্যকর কাহিনী এই "আগন্তুক।"

হোটেলের ম্যানেজারের ভূমিকায় আমরা দেখতে পাব রবীন মজুমদারকে। শেরপা-মেয়ে 'নিমা'র চরিত্রে রূপ দেবেন দীপান্বিতা রায়। হোটেলের নর্তকী "সরলা"র চরিত্রে অবতীর্ণ হচ্ছেন চিত্রাভিনেত্রী সুলতা চৌধুরী। পরিচালক তরুণ রায় স্বৈত ভূমিকায় অভিনয় করবেন, যা হবে এই নাটকের বিশেষ সম্পদ। আবহসংগীতের দায়িত্ব নিয়েছেন ভি, বালসারা। মঞ্চ-পরকল্পনা করছেন অমর ঘোষ।

সিনে ক্লাব অব ক্যালকাটার উদ্যোগে "কানাডার চলচ্চিত্র উৎসব" :

কানাডার হাইকমিশনরের সহযোগিতায় সিনে ক্লাব অব ক্যালকাটার উদ্যোগে মধ্য কলিকাতার একটি চিত্রগৃহে ২৯-এ সেপ্টেম্বর থেকে ৫ই অকটোবর পর্যন্ত কানাডার চলচ্চিত্র উৎসব সম্পন্ন হবে। এই উপলক্ষে যে চারটি কাহিনীচিত্র প্রদর্শিত হবে, সেগুলি হচ্ছে : (১) নো ওয়েভাভ্ গুডবাই, (২) হোলিফক্সের কানাডা, (৩)

[illegible] [illegible] উঠেছে। এর [illegible] দর্শক[illegible] শীর্ষ চিত্র ও [illegible] [illegible]বিশিষ্ট ছবির পরিচালক [illegible]-এর কয়েকটি ছবিও দেখানো হবে।

[illegible] ইনস্টিটিউট

১৬ই সেপ্টেম্বর শনিবার সন্ধ্যা ৬-৩০ মিনিট সময়ে ইনস্টিটিউটের স্থায়ী সভাপতি অ্যাডভোকেট জেনারেল শ্রীঅজিতকুমার দত্ত, পশ্চিমবঙ্গের বিধানসভার অধ্যক্ষ বিজয়কুমার বন্দ্যোপাধ্যায় ও সরোজিনী স্বর্ণপদক প্রাপ্ত অধ্যাপক চিন্তাহরণ চক্রবর্তীকে ইনস্টিটিউটের নিজস্ব হলে একটি সভায় সম্বর্ধনা জানান হয়।

এই উপলক্ষে বীরু মুখোপাধ্যায় কর্তৃক নাট্যরূপ প্রদত্ত কাবুলিওয়ালা রবীন্দ্রনাথের শান্তি ইনস্টিটিউটের সদস্যগণ কর্তৃক অভিনীত হয়। পরিচালনায় ছিলেন শ্রীঅশোক মুখোপাধ্যায়। সর্বশ্রী সমর দাস, অধীর মুখোপাধ্যায়, সুখেন মুখোপাধ্যায়, অশোক বন্দ্যোপাধ্যায় ও অনন্ত বন্দ্যোপাধ্যায় সুঅভিনয় করে প্রশংসা অর্জন করেন।

পশ্চিমবঙ্গ সংগীতশিল্পী সংসদ : প্রশংসনীয় উদ্যোগ

শিল্পীদের সংস্থা বাংলাদেশে যে একেবারে নেই, তা বলা চলে না। কিন্তু প্রধানত জলসা বা বিচিত্রানুষ্ঠানকে কেন্দ্র করে যে সকল শিল্পী জীবিকা নির্বাহ করেন তাঁদের কোন সংস্থার অস্তিত্ব বেশ কিছুকাল ছিল না। সম্প্রতি তাঁরা ঐক্যবদ্ধ হয়ে গড়ে তুলেছেন পশ্চিমবঙ্গ সংগীতশিল্পী সংসদ। এই সংস্থায় রয়েছেন সংগীতশিল্পী, নৃত্যশিল্পী, সুরকার, যন্ত্রসংগীতশিল্পী, গীতিকার, মূকাভিনেতা, কৌতুকাভিনেতা, সংগীত শিক্ষক এবং সংশ্লিষ্ট অন্যান্য শিল্পী।

এই প্রতিষ্ঠান গড়ে তোলার পেছনে যেসব মহৎ তাগিদ রয়েছে তার মধ্যে শিল্পীদের নিরাপত্তা রক্ষাই প্রধান। শিল্পীরা যাতে নিরপেক্ষ বিচার পান সেদিকেও নজর নানা ক্ষেত্রে দেবেন এই সংসদ। এছাড়া বিভিন্ন হাসপাতালে শিল্পীদের জন্যে নির্দিষ্ট সংখ্যক আসন সুরক্ষিত করা, বাংলা সংগীতের উন্নতি বিধানে ও গবেষণার জন্য লাইব্রেরী স্থাপন, সংগীতের বহুল প্রচার ও মান উন্নয়নের প্রচেষ্টা এবং শিল্পীদের মধ্যে আত্মপ্রত্যয় ফিরিয়ে আনতে সক্রিয় থাকবেন এই সংসদ। এক কথায় বলা যায় গঠনমূলক এই নতুন সংস্থাটি মোটামুটি যে কার্যক্রম নিয়ে তৈরী হয়েছে তা বাংলাদেশের শিল্পীদের মনে এনেছে এক নতুন আশ্বাসবাণী।

এ বছরের কার্যকরী সমিতিতে রয়েছেন : সভাপতি দ্বিজেন চৌধুরী, সহ-সভাপতি হেমন্ত মুখোপাধ্যায়, মান্না দে, কৃষ্ণচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়, সাধারণ সম্পাদিকা সুচিত্রা মিত্র, যুগ্ম-সম্পাদক চিন্ময় চট্টোপাধ্যায়, বিশ্বনাথ সোম, কোষাধ্যক্ষ শৈলেন মুখোপাধ্যায় এবং সদস্য নির্মলেন্দু চৌধুরী, শ্যামল মুখোপাধ্যায়, শ্যামল মিত্র, নির্মলা মিশ্র, তরুণ বন্দ্যোপাধ্যায়, অজয় [illegible],

দর্শক

এম সি সি'র ওয়েস্ট ইন্ডিজ সফর

কলিন কাউড্রের নেতৃত্বে মেরীলিবন ক্রিকেট ক্লাব (এম সি সি) আগামী ২৬শে ডিসেম্বর ক্রিকেট সফরের উদ্দেশ্যে ওয়েস্ট ইন্ডিজ অভিমুখে যাত্রা করবে। এম সি সি-র ১৯৬৭-৬৮ সালের এই সফরটি হল ৬ষ্ঠ বারের ওয়েস্ট ইন্ডিজ সফর। ইংল্যান্ড-ওয়েস্ট ইন্ডিজের সরকারী টেস্ট খেলার উদ্বোধন হয় ১৯২৮ সালের ২৩শে জুন লর্ডস মাঠে। এম সি সি প্রথম ওয়েস্ট ইন্ডিজ সফরে যায় ১৯২৯-৩০ সালের মরশুমে। এপর্যন্ত সরকারীভাবে এম সি সি ৫-বার ওয়েস্ট ইন্ডিজ সফরে গেছে এবং ওয়েস্ট ইন্ডিজ ক্রিকেট দল ইংল্যান্ড সফর করেছে ৭-বার। উভয় দেশের এই ১২টি সফরে টেস্ট ক্রিকেট খেলার ফলাফল দাঁড়িয়েছে : মোট খেলা৫০, ইংল্যান্ডের জয় ১৭, ওয়েস্ট ইন্ডিজের জয় ১৬ এবং খেলা ড্র ১৭। 'রাবার' জয়ের ফলাফল সমান দাঁড়িয়েছে—ইংল্যান্ডের জয় ৫, ওয়েস্ট ইন্ডিজের জয় ৫ এবং সিরিজ ড্র ২। ইংল্যান্ডের মাটিতে বিগত দুটি সিরিজেই (১৯৬৩ ও ১৯৬৬) ওয়েস্ট ইন্ডিজ ৩—১ খেলায় (ড্র ১) ইংল্যান্ডকে পরাজিত করে 'রাবার' জয়ী হয়েছে—১৯৬৩ সালে ফ্র্যাঙ্ক ওরেল এবং ১৯৬৬ সালে গারফিল্ড সোবার্সের নেতৃত্বে। সুতরাং 'রাবার' খেতাব এখন ওয়েস্ট ইন্ডিজেরই হাতে। ওয়েস্ট ইন্ডিজের মাটিতে দুই দেশের শেষ টেস্ট সিরিজ খেলা হয়েছিল ১৯৫৯-৬০ সালের মরশুমে। এই সিরিজে ইংল্যান্ড ১—০ খেলায় (ড্র ৪) জয়ী হয়ে 'রাবার' পেয়েছিল। ওয়েস্ট ইন্ডিজ খাস ইংল্যান্ডের মাটিতে আয়োজিত পরবর্তী দুটি সিরিজেই ইংল্যান্ডকে শোচনীয়ভাবে পরাজিত করলেও স্বদেশের মাটিতে ১৯৫৯-৬০ সালের পরাজয়ের প্রতিশোধ নেওয়ার সুযোগ পায়নি। দীর্ঘদিন পর আজ সে-সুযোগ তাদের হাতে এসেছে।

এম সি সি-র ওয়েস্ট ইন্ডিজ সফর শুরু হবে ৩০শে ডিসেম্বর (১৯৬৬) এবং সফরের শেষ খেলা (পঞ্চম টেস্ট) আরম্ভ হবে ২৯শে মার্চ। এই সফর তালিকায় আছে পাঁচটি পাঁচদিনব্যাপী টেস্ট খেলাসহ মোট ১৬টি খেলা।

টেস্ট খেলার স্থান ও তারিখ

প্রথম টেস্ট (পোর্ট অব স্পেন) :
জানুয়ারী ১৯, ২০, ২২, ২৩ ও ২৪

দ্বিতীয় টেস্ট (কিংস্টন) :
ফেব্রুয়ারী ৮, ৯, ১০, ১১ ও ১২

তৃতীয় টেস্ট (ব্রিজটাউন) :
ফেব্রুয়ারী ২৯ এবং মার্চ ১, ২, ৪ ও ৫

চতুর্থ টেস্ট (পোর্ট অব স্পেন) :
মার্চ ১৪, ১৫, ১৬, ১৮ ও ১৯

পঞ্চম টেস্ট (জর্জটাউন) :
মার্চ ২৯, ৩০ এবং এপ্রিল ১, ২ ও ৩

এম সি সি'র খেলোয়াড়েরা এই সফরে প্রচলিত পারিশ্রমিক, দৈনিক পকেট খরচ এবং অন্যান্য খাতে টাকা ছাড়াও বিশেষ বোনাস পাবেন; বিদেশ সফরে খেলোয়াড়দের এই বিশেষ বোনাস দেওয়ার ব্যবস্থা এম সি সি'র পক্ষে এই প্রথম।

ভারত বনাম পশ্চিম জার্মানী

টোকিওর পঞ্চম ইউনিভার্সিয়াড গেমসে যোগদানকারী পশ্চিম জার্মানী বিশ্ব-বিদ্যালয় দলটি স্বদেশ প্রত্যাবর্তনের পথে দিল্লীর নর্দার্ণ রেলওয়ে স্টেডিয়ামে আয়োজিত দুদিনব্যাপী এক ক্রীড়ানুষ্ঠানে ভারতীয় দলের সঙ্গে মিলিত হয়। প্রথম দিন এ্যাথলেটিক্সের ৯টি অনুষ্ঠানের (পুরুষদের ৫ এবং মহিলাদের ৪) ৬টিতে ভারতবর্ষ প্রথম স্থান লাভ করে (পুরুষ বিভাগে ৫ এবং মহিলা বিভাগে ১)। পশ্চিম জার্মানী মহিলাদের চারটি অনুষ্ঠানের তিনটিতে প্রথম স্থান পায়। দ্বিতীয় দিনের এ্যাথলেটিক্সে ভারতবর্ষ এবং পশ্চিম জার্মানী সমান সংখ্যক প্রথম স্থান লাভ করে—ভারতবর্ষ ৫ (পুরুষ বিভাগে ৪ ও মহিলা বিভাগে ১) এবং পশ্চিম জার্মানী ৫ (পুরুষ বিভাগে ২ এবং মহিলা ৩)। এ্যাথলেটিক্সের মোট ১৯টি অনুষ্ঠানের ফলাফল দাঁড়ায় —ভারতবর্ষের প্রথম স্থান ১১ (পুরুষ বিভাগে ৯ এবং মহিলা বিভাগে ২) এবং পশ্চিম জার্মানীর প্রথম স্থান ৮ (পুরুষ বিভাগে ২ ও মহিলা বিভাগে ৬)। অর্থাৎ ভারতবর্ষ পুরুষ বিভাগে এবং পশ্চিম জার্মানী মহিলা বিভাগে সর্বাধিক প্রথম স্থান লাভ করেছিল।

সাঁতারের ৮টি বিষয়েই (পুরুষদের ৬ ও মহিলাদের ২) পশ্চিম জার্মানী প্রথম স্থান লাভ করে। জিমন্যাস্টিক্সের দলগত এবং ব্যক্তিগত খেতাবও জয় করে পশ্চিম জার্মানী। টেনিসে পশ্চিম জার্মানী ৩—২ খেলায় ভারতবর্ষকে পরাজিত করে। এ্যাথলেটিক্স, সাঁতার, টেনিস এবং জিমন্যাস্টিক্স—এই চারটি অনুষ্ঠানের মধ্যে ভারতবর্ষ একমাত্র এ্যাথলেটিক্সে সর্বাধিক প্রথম স্থান লাভ করেছিল।

ইংলিশ ক্রিকেট মরশুম

১৯৬৭ সালের ইংলিশ কাউন্টি ক্রিকেট লীগ প্রতিযোগিতা শেষ হয়েছে। চূড়ান্ত লীগ তালিকায় ১ম স্থান পেয়েছে ইয়র্ক-সায়ার (১৮৬ পয়েন্ট), দ্বিতীয় স্থান কেন্ট (১৭৬ পয়েন্ট) এবং লিস্টারসায়ার (১৭৬ পয়েন্ট) এবং তৃতীয় স্থান সারে (১৪৮ পয়েন্ট)।

১৯৬৭ সালের প্রথম শ্রেণীর ক্রিকেট খেলার গড়পড়তা তালিকায় ব্যাটিংয়ে শীর্ষ-স্থান লাভ করেছেন সারে কাউন্টি ক্রিকেট দলের কেন ব্যারিংটন—মোট ২,০৫৯ রান। আলোচ্য মরশুমে মাত্র ৭০ জন খেলোয়াড় ১০০০ রান পূর্ণ করেছেন। কেন্টের ডি এল আণ্ডারউড বোলিংয়ের তালিকায় প্রথম স্থান পেয়েছেন। তাঁকে নিয়ে মাত্র ১৮ জন বোলার ১০০ উইকেট পূর্ণ করেছেন।

প্রফুল্ল সরকার কাপ

ইডেন উদ্যানে আয়োজিত প্রফুল্ল সরকার কাপ ফুটবল প্রতিযোগিতার ফাইনালে সাউথ ইস্টার্ন রেলওয়ের পার্সো-নেল বিভাগ ৩—১ গোলে পি, টি, আই দলকে পরাজিত করে প্রফুল্ল সরকার স্মৃতি কাপ জয়ী হয়েছে।

আন্তঃ কলেজ ও স্কুল বক্সিং প্রতিযোগিতা

স্কুল অব ফিজিক্যাল কালচারের উদ্যোগে ওয়েলিংটন স্কোয়ারে আয়োজিত আন্তঃ কলেজ ও স্কুল বক্সিং প্রতিযোগিতার কলেজ বিভাগে উত্তরপাড়ার রাজা পিয়ারী-মোহন কলেজ এবং স্কুল বিভাগে নাসিরুদ্দিন স্কুল দলগত চ্যাম্পিয়ানসীপ লাভ করেছে। কলেজ বিভাগে রানার্স-আপ হয়েছে শ্যামাপ্রসাদ কলেজ এবং স্কুল বিভাগে তিলজলা ব্রজনাথ স্কুল।

আই এফ এ শীল্ড

১৯৬৭ সালের আই এফ এ শীল্ড প্রতিযোগিতা ঘাটে পৌঁছে প্রায় ভরাডুবি হতে বসেছিল। মহমেডান স্পোর্টিং বনাম রাজস্থানের ১৮ই সেপ্টেম্বর তারিখের গোলশূন্য কোয়ার্টার ফাইনাল খেলার শেষে একশ্রেণীর দর্শকদের হামলাবাজিতে যে সব অপ্রীতিকর ঘটনা ঘটে ছিল তারই পরি-প্রেক্ষিতে প্রতিযোগিতা বন্ধ হওয়ার দাখিল হয়েছিল। রেফারীরা উপযুক্ত নিরাপত্তার ব্যবস্থা ছাড়া খেলা পরিচালনার দায়িত্ব নিতে রাজী হননি। শেষ পর্যন্ত দর্শকদের প্রতি আবেদন-নিবেদন জানিয়ে পুনরায় খেলা আরম্ভ করা হয়েছে। কোয়ার্টার ফাইনালের আটটি দলের মধ্যে মাত্র দুটি কলকাতার বাইরের দল (ভাস্কো ক্লাব এবং পাঞ্জাব পুলিস) ছিল। তাদের পরাজয়ের ফলে কলকাতার মধ্যেই আই এফ এ শীল্ড থেকে গেল। কোয়ার্টার ফাইনালে মোহনবাগান ৫—০ গোলে পাঞ্জাব পুলিস, ইস্টবেঙ্গল ২—০ গোলে ভাস্কো ক্লাব (গোয়া), মহমেডান স্পোর্টিং ০—০ ও ৪—০ গোলে রাজস্থান এবং বি এন আর ৩—৩ ও ২—০ গোলে ইস্টার্ন রেলওয়েকে পরাজিত করে সেমি-ফাইনালে উঠেছিল। সেমি-ফাইনালে মোহনবাগান ১—০ গোলে মহমেডান স্পোর্টিং এবং ইস্টবেঙ্গল ৩—০ গোলে বি এন আরকে পরাজিত করেছে।

ইউরোপীয় এ্যাথলেটিক্স কাপ

কিয়েভে আয়োজিত ইউরোপীয় এ্যাথ-লেটিক্স কাপ প্রতিযোগিতার ২১টি বিভাগে রাশিয়া মোট ৫১ পয়েন্ট সংগ্রহের সঙ্গে সাফল্যের ক্রমপর্যায় তালিকায় শীর্ষস্থান লাভ করেছে। দ্বিতীয় স্থান পেয়েছে পূর্ব জার্মানী এবং তৃতীয় স্থান পশ্চিম জার্মানী।

কলকাতার ফুটবল লীগের কথা

শঙ্করবিজয় মিত্র

খেলার জগৎটাই বিচিত্র, বিশেষ করে ফুটবল খেলার। আর কলকাতার ফুটবল একেবারে বিচিত্রতর। দুনিয়ার কোথাও যা নেই এখানে তারই রাজত্ব। এখানে লীগ প্রথায় ফুটবল খেলারও নূতনত্ব আছে। বিভিন্ন বিভাগের খেলায় যেসব নির্দিষ্ট দল খেলছে তারাই খেলবে মৌরসী পাট্টা নিয়ে। ওঠানামা নেই, নেই কোন নিয়মশৃঙ্খলার বালাই। যে উদ্দেশ্য নিয়ে লীগপ্রথার সৃষ্টি, যোগ্য দলকে তার যোগ্যতার স্বীকৃতি হিসাবে ঊর্ধ্বতন বিভাগে খেলার সুযোগ করে দেওয়া তা অনেকদিনই বন্ধ রয়েছে। কলকাতার ফুটবল পরিচালকরা অতি মহান ব্যক্তি, তাঁরা খেলোয়াড়দের গীতার কর্মযোগ শেখাচ্ছেন—নিস্পৃহ হয়ে খেলে যাও, ফলাফলের দিকে তাকিও না। "কর্মণ্যেবাধিকারস্তে মা ফলেষু কদাচন।"

এই মহৎ বাণীর আওতায় পড়ে বাংলার ফুটবল খেলোয়াড়েরাও নিস্পৃহে খেলা খেলে যাচ্ছেন। প্রতিযোগিতামূলক খেলায় যে প্রস্তুতি, যে দৃঢ়তা, যে নিষ্ঠা প্রয়োজন অঙ্গ তার কিছুই দেখা যায় না। তাই ফুটবলে বাংলা তথা ভারতের গৌরব এখন অতীত রবের পর্যায়ে এসে পৌঁছয়েছে। আন্তর্জাতিক মানের কত নীচে যে আমরা নেমে গেছি এবং এখনও নেমে চলেছি আন্তর্জাতিক প্রতিযোগিতাগুলোতে ভারতের ফলাফলই তার সাক্ষ্য দিচ্ছে। যে এশীয় ফুটবলে ভারত শীর্ষস্থান অধিকার করত এবার সেখানে তার স্থান হয়েছে অষ্টম।

স্থানীয় লীগ বা নানা প্রতিযোগিতামূলক খেলা সকল বিভিন্ন টিম ও খেলোয়াড়দের ট্রেনিং-এর সুযোগ এনে দেয়, খেলার মান উন্নত করবার সোপান হিসেবে তাদের একটা বিশেষ উপযোগিতা থাকে। কিন্তু এই সমস্ত প্রতিযোগিতা থেকে যদি সেই প্রাণবস্তুটিকেই হরণ করে নেওয়া হয় তাহলে সেগুলি প্রহসনে পর্যবসিত হয়ে থাকে। সুষ্ঠু পরিচালনা, ন্যায়নীতি ও নিয়মশৃঙ্খলার অভাবে আমাদের ফুটবলের যে দৈন্যদশা এসেছে তার প্রতিকার না করলে গভীর পঙ্ক থেকে আমরা আর কোনদিন উঠতে পারবো না।

এমন পঙ্কিল আবর্তের মধ্যেই ১৯৬৭ সালে কলকাতার প্রথম ডিভিসন ফুটবল লীগের পরিসমাপ্তি ঘটেছে। এবারের পরিসমাপ্তিতে চমক আছে, তাই ক্রীড়ারসিক মহলে দোলা লেগেছে। গত দশ বছরের লীগ প্রতিযোগিতায় মোহনবাগান আর ইস্টবেঙ্গলের প্রাধান্য প্রবল হয়ে উঠেছে। এই দুটি দল ছাড়া অন্যরা [illegible] যে লীগ বিজয় করতে পারে সে কথাটা কারো মনে সহজে দেখা দিতেই চায় না। এরই মাঝখানে মহমেডান স্পোর্টিং লীগ জয় করে সত্যিই চমক লাগিয়েছে। এবার তারা অপরাজিত চ্যাম্পিয়ানের আখ্যাও পেয়েছে। ১৯৫৭ সালের পর প্রায় দশ বছরের ব্যবধানে মহমেডান স্পোর্টিং তাদের অতীত গৌরবের দিনগুলিকে স্মরণ করিয়ে দিতে পেরেছে। তারা আরও প্রমাণ করেছে যে নিষ্ঠা ও দৃঢ়তা নিয়ে খেলতে পারলে সাফল্য অর্জন করা অসম্ভব কিছু নয়।

এবারের ফুটবল মরশুমের গোড়ারদিকে মোহনবাগান আর ইস্টবেঙ্গলের প্রস্তুতির জৌলুসে অনেকেরই চোখ ধাঁধিয়ে গেছল। মোহনবাগান দলে নামকরা খেলোয়াড়েরা যেভাবে ভীড় জমিয়েছিলেন তাতে অনেকে অনেক আশাই করেছিলেন। কিন্তু আসল পর্বে এই প্রস্তুতির উল্টো ফল দেখা গেছে। গোড়ারদিকের খেলাগুলোতে মোহনবাগানের দলগত সংহতি ও খেলোয়াড়দের ব্যক্তিগত নৈপুণ্যের ছাপ অনুপস্থিত থেকেছে, ক্রীড়ামোদীরা নিরাশ হয়েছে। সমর্থকরা ক্ষুব্ধ হয়েছে, ক্লাব কর্তারা নিরুপায়ভাবে খেলা বন্ধ রাখবার কথা বলেছেন। তবুও খেলতে হয়েছে, গোলমালের পুনরাবৃত্তি ঘটেছে, ফলে দলের খেলায় আশানুরূপ উৎকর্ষের অভাব ঘটেছে। ফলটা দাঁড়িয়েছে 'বহ্বারম্ভে লঘু ক্রিয়া'।

ইস্টবেঙ্গল দলের চিত্রটা এবার ছিল ভিন্নরকমের। গোড়ারদিকের খেলাগুলোতে দৃঢ়তার অভাব দেখা গেলেও সমর্থকদের একেবারে নিরাশ করেনি দলের খেলোয়াড়েরা, মোটামুটি একটা মান বজায় রাখার চেষ্টা তাদের ক্রীড়াধারায় লক্ষ্য করা গেছে। তবে সব সময় তারাও সমর্থকদের তুষ্ট রাখতে পারেনি, ক্ষোভ দেখা গেছে—চাপা ক্ষোভ, উচ্ছৃঙ্খলতায় ফেটে পড়েনি তারা। এ মরশুমে ইস্টবেঙ্গল দলের সমর্থকরা অনেকবেশি সংযমের পরিচয় দিয়েছে। এই সংযম প্রতিটি বড় ক্লাবের সমর্থকদের মধ্যে প্রতিভাত হলে কলকাতায় ফুটবল খেলার মাঠে শালীনতা ফিরে আসবে, খেলোয়াড়েরা নির্ভয়ে খেলতে পারবেন, দর্শকরা সুস্থ দেহে গৃহে ফিরতে পারবেন।

লীগ প্রতিযোগিতার অগ্রগতির সঙ্গে সঙ্গে ইস্টবেঙ্গল দলের খেলার উন্নতি দেখা গেছে এবং শেষপর্যন্ত চ্যাম্পিয়ানশিপ করায়ত্ত করার পাল্লায় তারা পেছপা হয়নি। দলের সর্বশেষ খেলায় মোহনবাগানের কাছে পরাজিত না হয়ে যদি তারা মোহনবাগানকে পরাজিত করতে পারত তাহলে চূড়ান্ত ফলাফল কি দাঁড়াত বলা শক্ত।

অবশ্য এখন আর কথাটা শক্ত নেই, সহজ হয়ে গিয়ে ফল দাঁড়িয়েছে যে মহমেডান স্পোর্টিং ক্লাব অপরাজিত চ্যাম্পিয়ানের গৌরব অর্জন করেছে। [illegible] ইস্টবেঙ্গলের মত ক্লাব কর্তৃপক্ষও [illegible] দলটিকে শক্তিশালী করার দিকে বিশেষ নজর দিয়েছিলেন। দলটিকে এবার ঢেলে সেজেছেন তাঁরা। আক্রমণ ও রক্ষণ উভয় বিভাগই এবার শক্তিশালী করে তোলা হয়। ফলে দলটিতে যে সংহতি গড়ে ওঠে তারই ফলে সাফল্য সম্ভব হয়।

মহমেডান দলের এবারের সাফল্যের মূলে ভিত্তি হল দলপতি স্টপার জন। ব্যক্তিগত নৈপুণ্যে ও দলগত নেতৃত্বদানে তাঁর খেলা সার্থক হয়ে উঠেছে এবার। কলকাতার লীগ প্রতিযোগিতায় এবার শ্রেষ্ঠ খেলোয়াড়ের সম্মান তাঁরই প্রাপ্য। প্রতিটি খেলায় তিনি শান্ত ও ধীর মেজাজের যে পরিচয় দিয়েছেন তা অনুকরণীয়। কোনদিন কোন খেলায় তাঁকে অশিষ্ট হয়ে খেলতে দেখি নি। সঙ্কটমুহূর্তে ঠিক জায়গায় এসে তিনি যেভাবে প্রতিপক্ষ খেলোয়াড়ের পা থেকে বল কেড়ে নিয়েছেন তাতে তাঁর বিচক্ষণতার পরিচয় মেলে। খুব কম খেলোয়াড়কেই তাঁর মাথা টপকে বল নিতে দেখা গেছে। গোলরক্ষক মুস্তাফাও এবার অসাধারণ কৃতিত্বের পরিচয় দিয়েছেন। নিপুণ হস্তে তিনি অনেক গোল ঠেকিয়েছেন। ব্যাকে সুকুমার সেন ও হাফ-ব্যাকে বিদ্যুৎ মজুমদারও বিশেষ দৃঢ়তার সঙ্গে খেলেছেন। ফলে দলের রক্ষণভাগ প্রায় দুর্ভেদ্য হয়ে উঠেছিল। এদিকে আক্রমণভাগে পাপান্নার সুযোগসন্ধানী খেলা দলের সাফল্য অর্জনে সহায়তা করেছে।

লীগ বিজয় মহমেডান স্পোর্টিং দলের কাছে নতুন কথা নয়। প্রথম বিভাগে আবির্ভাবকাল থেকেই দলটি ভারতীয় ফুটবলের ইতিহাসে যে নজীর সৃষ্টি করেছে তার তুলনা নেই। ফুটবলে তারা দিগ্বিজয়ী বলা চলে। কোন কোন বিষয়ে এখনও এ দলের রেকর্ড কেউ স্পর্শ করতে পারে নি।

ক্লাব হিসেবে মহমেডান স্পোর্টিং মোহনবাগান বা ইস্টবেঙ্গলের তুলনায় পুরনো হলেও প্রথম যুগ তাদের অন্ধকার যুগ। প্রাথমিক যুগের বাধা বিপর্যয় কাটিয়ে উঠতে তাদের প্রায় চুয়াল্লিশ বছরের চেষ্টার প্রয়োজন হয়েছে।

ঠিক এ নামে না হলেও যে ক্লাবের সূচনা মহমেডানের ভিত্ত পত্তন করে তার প্রতিষ্ঠা হয় ১৮৮৭ সালে জুবিলি ক্লাব নামে। নবাবজাদা আমিনুল ইসলামের নেতৃত্বে মুসলিম সম্প্রদায়ের জন্য যে ক্লাবটির জন্ম হয়েছিল চার বছরের মধ্যে দু দুবার নাম বদল করে অবশেষে ১৮৯১ সালে নাম হল মহমেডান স্পোর্টিং ক্লাব। গোড়ার দিকে ক্লাবটির প্রতি মুসলমান সমাজেরও যে খুব একটা পৃষ্ঠপোষকতা ছিল তা নয়। তাই আর্থিক অবস্থাও ছিল সঙ্গীন। তারপর ১৮৯৫ সালে স্যার সৈয়দ আমির আলীর সভাপতিত্বে ক্লাবের যে সাধারণ সভা অনুষ্ঠিত হয় তাতে খান সাহেব আব্দুল [illegible] প্রথম সম্পাদক নির্বাচিত হন। ফুটবল ও ক্রিকেট সম্পাদক

নিযুক্ত হলেন যথাক্রমে খান বাহাদুর আমিনুল ইসলাম এবং মহম্মদ ইসাক।

গোড়ার দিকে ক্লাবটির ফুটবলের চেয়ে ক্রিকেটের দিকেই লক্ষ্য ছিল বেশি। অবশ্য ফুটবল লীগে যোগ দেবার মত শক্তিশালী ভারতীয় দলও ছিল না তখন। কলকাতা ময়দানে প্রথম ডিভিশন ফুটবল লীগ খেলা সুরু হয় ১৮৯৮ সালে। কয়েকটি স্থানীয় সিভিল ও নাম করা মিলিটারী দল নিয়েই চলত লীগের খেলা। ক্যালকাটা ছিল সিভিল দলের শিরোমণি। তারপর ডালহৌসী ক্লাবও কিছুটা প্রতিষ্ঠা পায়। মিলিটারী দলের মধ্যে ছিল রয়েল আইরিশ রাইফেল, কিংস ওন রেজিমেন্ট, গর্ডনস্ লাইট ইনফ্যান্ট্রি, ডারহামস্, ব্ল্যাকওয়াচ্ ইত্যাদি। ১৯০১ সালে রয়েল আইরিশ রাইফেল লীগের ১৪টি খেলায় সবকটাই জিতে ২৮ পয়েন্ট নতুন রেকর্ড করে। তাদের বিরুদ্ধে কেউ গোল করতে পারে নি। অনেক দিন পরে ১৯০৮ সালে গর্ডনস লাইট ইনফ্যান্ট্রি ও ১৯১২ সালে ব্ল্যাকওয়াচ লীগের প্রতিটি খেলা জিতে এই রেকর্ডের সমকক্ষ হয়।

এর মধ্যে ন্যাশনাল, এরিয়ান্স ও মোহনবাগান ক্লাব ফুটবল খেলেছে কিন্তু লীগ প্রতিযোগিতায় খেলার অধিকার পায় নি। এমন সময় ১৯১১ সালে মোহনবাগান আই এফ এ শীল্ড জয় করে ইতিহাস সৃষ্টি করল। সে ইতিহাস ফুটবল খেলায় জেতার ইতিহাস নয়, শাসক শক্তির প্রতিভূ মিলিটারীর বিরুদ্ধে ভারতের জাতীয় শক্তির জয়। সেদিনকার ফুটবল যেন জাতীয় আন্দোলনের প্রাণবন্যায় স্নাত। মোহনবাগানের শক্তি সেদিন (১৯১৫ সালে) লীগ ফুটবলে স্বীকৃতি পায় এবং এক বছরের মধ্যেই (অর্থাৎ ১৯১৬ সলে) রাণার্স আপ হবার দুর্লভ গৌরবের অধিকারী হয়।

মোহনবাগান যেমন ভারতীয় দলের মধ্যে সর্ব প্রথম আই এফ এ শীল্ড জয় করে ইতিহাস সৃষ্টি করে, মহমেডান স্পোর্টিংও তেমনি ভারতীয় দলের মধ্যে সর্ব প্রথম লীগ বিজয়ের গৌরবের অধিকারী হয়। ১৯৩৪ সালে প্রথম ডিভিসন ফুটবলে প্রথম উন্নীত হয়েই মহমেডান দল যে সাফল্যের গৌরব অর্জন করে তা সত্যই বিস্ময়কর। ১৯৩৪ সাল থেকে ১৯৩৮ পর পর পাঁচবার লীগ জয়ের যে রেকর্ড করেছিল আজও কেউ তা স্পর্শ করতে পারে নি।

মহমেডান স্পোর্টিং দলের সাবলীল ক্রীড়াপদ্ধতি সেদিন সমগ্র ভারতের সপ্রশংস দৃষ্টি আকর্ষণ করেছে। প্রতিটি প্রতিযোগিতায় দুর্ধর্ষ মহমেডানের সামনে দাঁড়াতে পারে তখন সেরূপ দল খুব কমই ছিল।

সে সময় যে-সব দিক্‌পাল খেলোয়াড় এ দলে সমবেত হয়েছিলেন তাঁদের কথা সহজে ভোলার নয়। গোলে তখন ক্টাইলিস ওসমান জান, ব্যাকে দীর্ঘদেহী জুম্মা খাঁ, হাফব্যাক মাসুম, সেন্টার হাফে আকিআমেদ ও নূর মহম্মদ (বড়), লেফ্‌ট ইনে রহমৎ, সেন্টার ফরোয়ার্ডে হাফিজ রসিদের খেলা আজও যেন চোখের সামনে ভাসতে থাকে।

সেদিনের সেন্টার ফরোয়ার্ড রসিদ আজ যে কোন টিমে দুর্লভ। গোল করায় তাঁর অসাধারণ দক্ষতা তাঁকে সর্বকালের একজন শ্রেষ্ঠ সেন্টার ফরোয়ার্ড হিসেবে চিহ্নিত করে রাখবে, তবে সেই সঙ্গে যাঁরা শরৎ সিংহ বা মোনা দত্তের (রমেশ) খেলা দেখেছেন তাঁরা রসিদকে শ্রেষ্ঠত্ব ছেড়ে দিতে সহজে রাজী নন। আমি নিজেও তিনজনেরই খেলা দেখেছি। শরৎ সিংহ বা মোনা দত্ত যে সকল সামরিক বা অসামরিক দলের সঙ্গে খেলেছেন রসিদকে সে রকম দলের সঙ্গে খেলতে হয় নি। তবুও তাঁর নৈপুণ্য যে অসাধারণ ছিল একথা বলতেই হবে। এই তিনজনের মধ্যে কে বড় সে কথার আলোচনায় সর্বকালের একজন দিকপাল খেলোয়াড় সামাদ মন্তব্য করেন—শরৎ সিংহের মত কুশলী খেলোয়াড় তিনি ভারতীয়দের মধ্যে দেখেন নি।

বল আদান প্রদানে শরৎ সিংহের যেমন অসাধারণ বুদ্ধিমত্তা প্রকাশ পেতো তাঁর সটে তেমনি প্রচণ্ড জোর ছিল। তাঁর সট কোন দিন কেউ বুক দিয়ে ধরবার চেষ্টা করতেন না। পাসিং'এ কেউ ভুল করলে ডিগ্রি অব ডিফিকাল্টিজ দিয়ে তা বোঝাবার চেষ্টা করতেন। মোনা দত্ত ছিলেন গ্রাসকাটিং সটে ও হেড করে গোল করায় ওস্তাদ। হাফভলি ও ড্রপ সটে গোল করতে রসিদের জুড়ি ছিল না। শতকরা নব্বইটি ক্ষেত্রে তিনি সফল হতেন। প্রতিপক্ষ নাগালের কাছ থেকে রসিদ তড়িৎ গতিতে বল তুলে নিয়ে তার ওপর ভলি ও হাফভলি নিতে যে পারদর্শিতা অর্জন করেছিলেন তা সকলেরই অকুণ্ঠ প্রশংসা অর্জন করেছে। তা ছাড়া রসিদ সেন্টার ফরোয়ার্ড হিসেবে পুরোভাগে নেতৃত্ব দিতেন তাতে প্রতিটি খেলোয়াড়কে যেন অনুপ্রাণিত হয়ে খেলতে দেখা যেত।

সামাদও কিছুকাল মহমেডান স্পোর্টিং দলে খেলেছেন। বাম বা দক্ষিণ দু প্রান্তে খেলাতেই সম পারদর্শী ছিলেন। ইনসাইডের খেলতেও তিনি অপটু ছিলেন না। এক কথায় বলা যায় সামাদ ছিলেন অননুকরণীয়। তাঁর বল আয়ত্তে রাখার কৌশল, ড্রিব্লিং ও দ্রুত গমন ও নিখুঁত মাপা সট প্রতিটি দর্শককে বিমুগ্ধ করত।

তাঁর অতুলণীয় খেলা প্রসঙ্গে দু এক কথা বলা দরকার। সামাদ একবার উত্তরবঙ্গে খেলতে গিয়ে দেখেন, তিনি নিজেও যেমন গোল করছেন, তাঁর সঙ্গে সমানে পাল্লা দিচ্ছেন উত্তরবঙ্গের খেলোয়াড় শরৎ সিংহ। ঐ খেলার মাঠে দুজনার মধ্যে সখ্যতা গড়ে ওঠে।

একবার সামাদ এক প্রতিযোগিতায় খেলতে খেলতে গোলে সট নিয়েছেন, বল বারে লেগে ফিরে এসেছে। এ ব্যর্থতায় তিনি নিজে বিস্মিত হয়ে রেফারীকে গোলপোস্টের উচ্চতা মাপবার জন্য তাগিদ দেন। নিজের সট সম্পর্কে তাঁর এমন আস্থা ছিল যে তাঁর কোন সটই ব্যর্থ হতে পারে না। সামাদের অনুরোধে রেফারী খেলার শেষে বার পোস্টের উচ্চতা মেপে দেখেন যে সামাদের কথাই ঠিক।

১৯২৬ সালে ভারতীয় দল যবদ্বীপে খেলতে গেলে তাঁর ক্রীড়াশৈলী সেখানকার সংবাদপত্র ও দর্শকদের অসাধারণ অভিনন্দন লাভ করে। শুধু তাঁর খেলা দেখবার জন্য মাঠে অভূতপূর্ব জনসমাগম হয়।

১৯২৯ সালে নির্বাচিত ইউরোপীয় দলের বিরুদ্ধে ভারতীয় দলের খেলায় সামাদের নৈপুণ্য স্মরণীয় হয়ে আছে। এ খেলায় তিনি বাঁ দিক থেকে ড্রিবল করতে করতে একেবারে ডান দিকে সরে গিয়ে মাঝামাঝি জায়গায় এসে বার বার তিনবার মোনা দত্তকে গোল করবার অপূর্ব সুযোগ করে দেন এবং ভারতীয় দলকে জয়যুক্ত করেন। সামাদের ঐ সকল নয়নাভিরাম খেলা অবিস্মরণীয়। সামাদ সম্পর্কে এমন অনেক কথাই বলা যায়। সব চেয়ে বড় কথা সামাদ যে খেলা খেলতেন তা অননুকরণীয়; সামাদের তুলনা সামাদ নিজেই।

এমনিতর দিকপালদের সমাবেশে যে কোন দল শক্তিশালী হয়ে ওঠে। মহমেডান স্পোর্টিংও তাই অসাধারণ শক্তিশালী হয়। আর সেই শক্তিশালী দলের বিজয় অভিযান চলে দিকে দিকে। তারা এপর্যন্ত লীগ বিজয়ী হয়েছে দশবার—১৯৩৪ সাল থেকে একটানা ১৯৩৮ সাল পর্যন্ত, তারপর ১৯৪০, ১৯৪১, ১৯৪৮, ১৯৫৭ এবং পরিশেষে ১৯৬৭ সালে। রাণার্স আপও হয়েছে অনেকবার। আই এফ এ শীল্ড জয়ী হয়েছে ১৯৩৬, ১৯৪১, ১৯৪৪ ও ১৯৫৭ সালে। রাণার্স আপ হয়েছে ১৯৩৮ সালে। ১৯৪০ সালে ডুরাণ্ড কাপ, রোভার্স কাপ ও লাহোরের মণ্টগোমারী কাপ জয়ী হয়েছে। ১৯৫৬ ও ১৯৫৯ সালেও তারা রোভার্স কাপ জয় করে।

কলকাতার ৬৯ বছরের লীগ ফুটবলের ইতিহাসে দুবার খেলা হয় নি (১৯৪৭ ও ১৯৫৩)। তাছাড়া ৬৭ বারে লীগ খেলার মধ্যে মোহনবাগান দলই সব চেয়ে বেশিবার লীগ জিতেছেন —তেরবার। মহমেডান জিতেছে দশ এবং ইষ্ট বেঙ্গল আটবার।

এ অতীতের আলোচনা। আজ অতীত গৌরবের আলোচনাই আমাদের একমাত্র উপজীব্য। বর্তমান যাদের গ্লানিকর বাধ্য হয়েই তাদের অতীতের দিকে চোখ ফেরাতে হয়। সমগ্র বিশ্ব যখন খেলাধুলার সকল বিভাগে সমুন্নতির সাধনায় নিমগ্ন কলকাতার কর্তারা তখন তাকে পেছনে ঠেলে রাখার চেষ্টায় ব্যস্ত। ব্যক্তি স্বার্থ যখন জাতীর স্বার্থের উপরে স্থান পায়, তখনই এই দুরবস্থার উদ্ভব ঘটে। কুটিল চক্রের আবর্তে তলিয়ে যায় মান-সম্মানের প্রশ্ন, জাতীর ঐতিহ্যের কথা। কিন্তু কতকাল আর এ অবস্থা চলবে। ক্রীড়ানুরাগী জনসাধারণ ও জনপ্রিয় সরকার কি নিশ্চুপ দর্শকের ভূমিকা নিয়েই থাকবেন। ফুটবলে বাংলাকে কি আমরা আর সামনের সারিতে দেখতে পাবো না?

আধুনিক

বিভূতিভূষণ মুখোপাধ্যায়

[উপন্যাস]

(পূর্ব প্রকাশিতের পর)

"ছত্রিশ"

সুরবালার দমে যাওয়ার একটা বড় কারণ ছিল।

আদ্রা দৃশ্যপট থেকে মিলিয়ে যাওয়ার পর, একটি মুখ আস্তে আস্তে স্পষ্ট হয়ে উঠেছিল তাঁর মনশ্চক্ষুতে, তন্দ্রার। যথাযথ বলতে গেলে—সুরবালা নিজের মন অতটা তলিয়ে না বুঝুন, তন্দ্রার সঙ্গে তুলনাতেই আদ্রার সম্বন্ধে খুঁতখুঁতুনিও ছিল। সর্বদিক দিয়েই মনের মতনটি। বয়সে আরও কাঁচা, চোখদুটি তন্দ্রালুই, যার জন্য মুখখানি যেন আরও কচি দেখায়। শান্ত, এই কলোচ্ছল মেসে সে যেন একক, কারুর সখী নয়, সবার স্নেহের জিনিস। যেমন জলে জল টানে তেমনি স্নেহে—অর্থাৎ স্নেহ সেখানে কেন্দ্রীভূত হয়ে রয়েছে—সেখানে স্নেহও টানে। বেশ ভালো লেগেছিল তন্দ্রাকে।

তুলেছিলেনও কথা ইঙ্গিতে-আভাসে। তন্দ্রা বাতিল হয়ে যায় তার গুণের জন্যই। সন্দীপকে যা চাইছেন তা করে তোলবার শক্তি নেই তার। মনে পড়ছে "সাবলক" কথাটাই ব্যবহার করেছিলেন রঙ্গময়ী।

আদ্রা সরে যেতে তন্দ্রা মন জুড়ে বসেছিল, কিন্তু হেমাঙ্গিনীর একটি কথায় ও কল্পনা বুঝি আবার পরিত্যাগই করতে হয়; তিনি আর মেসের মেয়ের কথা ভাবতে রাজি নন।

হেমাঙ্গিনীর আপত্তির গোড়া যে কোথায়, সেটা সুরবালার জানবার কথা নয়, এক তিনি আর রঙ্গময়ীই শুধু জানেন; কিন্তু আর এগুনো গেল না।

কিন্তু সেখানে বাধা, সেখানেই আগ্রহ। মনের কথাটা অন্য দিক দিয়ে প্রকাশ হয়ে পড়ল একদিন, অনেক ঘুরপথে।

কলকাতায় আর কোন কাজ নেই, ফিরে যাবেন সুরবালা।

সন্দীপ এখন রইলই, ইণ্টারভিউ দিয়ে যাবে, বিজ্ঞাপন দেখে দেখে। সামনেই একটা রয়েছেও।

যাওয়ার দু'দিন আগের কথা।

দক্ষিণেশ্বর গিয়েছিলেন রঙ্গময়ীর সঙ্গে তাঁর বাড়ির গাড়িতে; উনি হেমাঙ্গিনী আর রঙ্গময়ীর এক আত্মীয়া, ও'র সমবয়সী। পুজো দিয়ে আরতি দেখে ফিরতে একটু রাতই হয়ে গেল। আত্মীয়াটিকে যখন নামিয়ে দিলেন, পাশের কোন্ একটা বাড়ির ঘড়িতে ঢং ঢং করে আটটা বাজল।

ও'র বাড়ি যেতে-আসতে পাশেই করুণাময়ী 'হোম'-এর রাস্তাটা পড়ে, বড় রাস্তা থেকে অল্প একটু ভেতরে গেলেই হয়। দেখা যায় বাড়িটা বড় রাস্তা থেকেই।

যাওয়ার সময়ই সুরবালার নজরে পড়তে কতকগুলো কথা এলোমেলোভাবে মনে উদয় হয়ে গল্প-স্বল্প, পথের দৃশ্য, পুজো-আরতির মধ্যে মনেই মিলিয়ে গিয়েছিল, এবার দূর থেকেই—বাড়িও নয়, রাস্তার মুখটা নজরে পড়তেই বুকটা হঠাৎ ধড়ফড় করে উঠল। এত বেশিরকম যে, আর রঙ্গময়ীকে কিছু না বলে একেবারে ড্রাইভারকেই বললেন—"একটু থামবে গোকুল?"

একটু ঝুঁকেও পড়েছেন সামনে। রাস্তার মাথাটা ছাড়িয়েও গিয়েছে কয়েক গজ, গোকুল-ড্রাইভার ব্রেক কষে ঘুরে চাইল। ও'রা
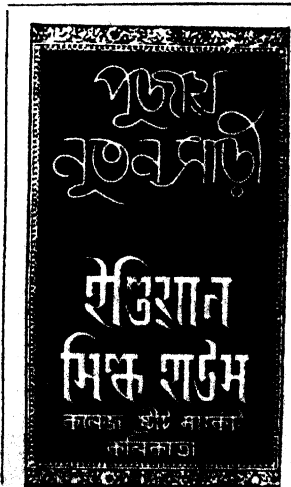
দ্বজনেই একসংগে প্রশ্ন করে উঠলেন—“কি হোল?”

লজ্জা, কুণ্ঠা, তার সংগে আর এক কী মিশে গিয়ে মুখটা অদ্ভুত দেখাচ্ছে সুরবালার। দুজনেই ও'র ডানদিকে বসে, ফ্যাল ফ্যাল করে একটু চেয়ে দেখে বললেন—“একবার 'হোম'টা দেখে যেতাম—পরশু তো চলে যাচ্ছি—আবার কবে আসব না-আসব...”

“তা যাবি, এর জন্যে এত কিন্তু হওয়া কেন?”—একটু বিস্মিতভাবেই চেয়ে থেকে উত্তর করলেন রঙ্গময়ী। বললেন—“একটু রাত হয়ে গেছে, এই যা।”

“বৌদিদি?”—অনুমোদনের জন্য চাইলেন সুরবালা।—আসল প্রতিবন্ধক তো ওখানেই।

হেমাঙ্গিনী একটু নির্লিপ্তভাবেই বললেন—“ক্ষতি কি?”

“না, যদি আপত্তি থাকে তোমার...”

“দ্যাখো!”—রঙ্গময়ীই বলে উঠলেন—“একবার একটু আসবি 'হোম'টা থেকে—চলে যাচ্ছিস, এতে এত কাকুতি-মিনতিই বা কেন, আপত্তিই বা থাকবে কিসের জন্যে কারুর? গাড়িটা ব্যাক করে নাও গোকুল।”

পতিতপাবনই এসে বন্ধ দরজার পেছনে দাঁড়িয়ে নির্দেশমতো নামধাম, পুরুষ কি নারী জেনে নিয়ে বলল (ও-নাম শোনার পরও পাকা করে নেয়, চেনা হলেও)—“বাড়িতে কেউ নেই। তবু দোর খুলে?”

“একেবারেই কেউ নেই?”—রঙ্গময়ী প্রশ্ন করলেন।

“তন্দ্রাদিদিমণি আছেন শুধু। চলবে?”

উৎকট আগ্রহে মাথাটা নীচু করে শুনছিলেন সুরবালা, “ঠানদি!...” বলে ব্যাকুলভাবে মুখটা তুলেছেন, তন্দ্রাই হন্তদন্ত হয়ে সাড়া দিতে দিতে নেমে এল—“এই আমি আসছি ঠানদি। সরো তুমি পতিতপাবন—কী যে করা যাবে তোমায় নিয়ে!”

দরজা খুলে দিয়ে বলল—“আসুন!... বাঃ, আপনারাও এসেছেন?”

রঙ্গময়ী একটা পা চৌকাঠে তুলে দিয়ে থেমে গিয়েই বললেন—“তাহলে আর ...তুই যখন একাই...”

“না ঠানদি, বাঃ—একটু বসতেই হবে—আসুন।” —দুহাত দিয়ে ও'র একটা হাত ধরে ফেলল।

চাপা উৎকণ্ঠায় সুরবালার মুখ দিয়ে একটা কথাও বেরুচ্ছে না, হেমাঙ্গিনীই বললেন—“চলো না হয়, যাই বসে একটু। কিন্তু ছেড়ে দিতে হবে এক্ষুনি।”

“তা......”

হেসে ফেলল তন্দ্রা। রঙ্গময়ী বললেন—“হ্যাঁ, বুঝেছি, একবার বসুন তো উঠে।... নারে, অনেকদূর থেকে আসছি।”

কথাবার্তা কইতে কইতেই ওপরে কমলার ঘরে গিয়ে বসলেন ও'রা “আমি এক্ষুনি আসছি।” বলে তন্দ্রা ও'দের কিছু বলবার সুযোগ না দিয়েই হনহন করে সিঁড়ি দিয়ে নেমে গেল।

“ওরে থাক চায়ের হাঙ্গাম তন্দ্রা!” হেঁকে বারণ করলেন রঙ্গময়ী। হেমাঙ্গিনী মন্তব্য করলেন—“হ্যাঁ, শুনলে!”

ও উঠে এলে রঙ্গময়ী বললেন—“তা হ্যাঁরে, আসল কথাই জিজ্ঞেসা করা হোল না তো; বাড়িসুদ্ধ এরা সব গেল কোথায়—তোকে একা ফেলে?”

“ঠাকুর রামকৃষ্ণদেবের একটা সিনেমা দেখতে গেছে।”

কথাটায় কি ছিল, হঠাৎ একটু নিঃশব্দতা এসে গেল ঘরটায়। সুরবালার মনে কি হোল, একবার হেমাঙ্গিনীর দিকে একটু চোখ তুলে চেয়ে দেখলেন। রঙ্গময়ী বললেন—“দ্যাখো, ঠাকুরের কী মাহাত্ম্য, এমন যুগটাকেও যেন কোলে করে ব'সে আছেন।...তা তুই যে গেলিনি বড়?”

একটু লজ্জিতভাবে মুখটা নামিয়ে নিল তন্দ্রা।

“গেলিনি যে?”—আবার প্রশ্নটা করলেন রঙ্গময়ী।

তারপর আবার—“মানিসনে ওসব?”

একটু ব্যঙ্গের হাসি ফুটে উঠল মুখে।

তন্দ্রা মুখ তুলে অপ্রতিভভাবে বলল—“মানব না?”

“তবে?”

আর একবার নামিয়েই নিল তন্দ্রা মুখটা, তখনই তুলে সেইরকম অপ্রতিভভাবেই বলল—“কাল একটা ইন্টারভিউ আছে। কমলাদিই মানা করলেন যেতে—বললেন, তুই বরং একটু মেজে-ঘষে নে।”

“ইন্টারভিউ...!”

যেন আপনিই কথাটা মুখ দিয়ে বেরিয়ে আস্তে আস্তে মুখেই মিলিয়ে গেল রঙ্গময়ীর। এবার নিঃশব্দতাটুকু যেন থমথমে।

ঠাকুর চা আর হালুয়া করে নিয়ে এল নীচে থেকে। রঙ্গময়ী বললেন, “ওটা সরিয়ে রাখ, চলবে না। দক্ষিণেশ্বর থেকে আসছি, আগে বাড়ি গিয়ে হাত-পা ধুয়ে একটু প্রসাদ মুখে দিতে হবে।...চা অবিশ্যি বিধবার একাদশীতেও চলছে আজকাল।”

নিঃশব্দেই চলছিল চা-পান তার মধ্যেই সুরবালা কানের কাছে মুখটা নিয়ে এসে কি একটা বলতে রঙ্গময়ী বললেন—“মন্দ নয়, সামনে ওটা একটা পরীক্ষেই তো। তা ওরা কি এতটা মানে?”

তন্দ্রার দিকে ঘুরে বললেন—“সুরো বলছে, মা-ভবতারিণীর পায়ের ফুল দিয়ে দিলে হোত, সংগে থাকত।”

“তাহলে তো বর্তে যাই”—উৎফুল্ল হয়ে একটু হেসে বলল তন্দ্রা—“যা ভয়টা করছে!”

ভিজে গামছা ঢাকা একটা পেতলের সাজি থেকে একটা জবাফুল আর বেলপাতা বের করে হাতে তুলে দিলেন রঙ্গময়ী। মুখে একটা অপূর্ব তৃপ্তি লেগে রয়েছে। বললেন—“নিয়ে যাস, কিন্তু না হলে বিশ্বাস হারাবিনি। মনে জানবি, তাহলে না-হওয়াটাই ভালো হয়েছে। মার ভালো করা কোন্ দিক দিয়ে, কি করে কে বলবে বল্?”

গলাটা শ্রদ্ধায় গাঢ় হয়ে এসেছে, তন্দ্রা বুকে কপালে ঠেকিয়ে নিয়ে উঠতে উঠতে বলল—“আগে রেখে আসি ঠানদি।”

তিনজনেই একটু মুখ চাওয়া-চাওয়ি করলেন ও চলে যেতে। ফিরে এলে অন্য একটা পাত্র থেকে গোটাকতক প্যাঁড়া বের করে, তার সংগেও দুটো ফুল রেখে দিয়ে বললেন—“আর এই প্রসাদ রইল; একটু করে ফুলও সবাইকে দিবি ছিঁড়ে নিয়ে। যাই, এইবার উঠি, রাত হয়ে গেছে।”

সমস্ত পথটাই আবার একটা থমথমে নিঃশব্দতায় কাটল। রঙ্গময়ী শুধু একবার বললেন—“তুই এই মেয়েটাকেও নিলে পারতিস সুরো।”

“হ্যাঁ, কি বললে ঠানদি”—একটা কিসের ঘোরের মধ্যে থেকে একটু চকিত হয়ে প্রশ্ন করলেন সুরবালা। সংগে সংগেই হেমাঙ্গিনীর দিকে চোখের কোণে একটু হতাশার সুরে চেয়ে নিয়ে বললেন—“বৌদি রাজি হন তবে তো।”

“ভালো হলে কেন রাজি হবে না বৌদি? আর সবই তো ভালোই; এদিকের যেমন দেখা গেল...”

"এতো আবার সব ভালোর ভালো বাছা!...যা অবিশ্বাস-অনাচারের যুগটা যাচ্ছে!"—পূরণ ক'রে দিলেন রঙ্গময়ী।

পঁয়ত্রিশ

পরের দিন সন্ধ্যার পর হেমাঙ্গিনীদের ছাতে একত্র হয়েছেন সবাই। একটু বড় দলই; পরদিন সকালেই চলে যাবেন সুরবালা।

রেবা এসেছেন, তিনিও রয়েছেন। আদুরির কথা সব শুনেছেন রেবা, তারপর তাঁকে গতরাত্রে তন্দ্রাঘটিত সব কথাও বলেছেন সুরবালা। একটু রাত হতে, দলটা যখন পাতলা হয়েছে, রয়েছেন মাত্র রঙ্গময়ী, হেমাঙ্গিনী, সুরবালা, আর রেবা, হেমাঙ্গিনী বললেন—"ঠানদি যেন কি একটা ভাবছ মনে মনে।"

রঙ্গময়ী পান মুখে নিলেন আস্তে আস্তে, তারপর দোক্তার ডিবেটা টিপে টিপে খুলতে খুলতে বললেন—"ভাবছি কাল যাবে, অথচ সুরোই যেন সবচেয়ে অন্যমনস্ক রইল আজ..."

হেমাঙ্গিনী বললেন—"মনটা ভার হয়ে থাকবে তো। সকাল থেকেই দেখছি।"

জেনেই কথাটা তোলা; তবু একটু অলসভাবে রঙ্গময়ী বললেন—"ভার থাকবার কি হয়েছে এমন? আবার ইচ্ছে হলেই আসবে।"

একটু হেসে একটিপ দোক্তা মুখে ফেলে দিয়ে বললেন—"নাৎজামাইয়ের সঙ্গে ঝগড়ার কথা সব ফুরিয়ে গেল নাকি?"

"তোমার নাৎজামাইয়ের সঙ্গে এবার মুখ তুলে কিন্তু কথা কইব কি করে ঠানদি?"—প্রশ্ন করলেন সুরবালা।

"কেন?"—উত্তরটা স্পষ্টই, তবু ডিবেটা টিপে টিপে বন্ধ করতে করতে প্রশ্ন করলেন রঙ্গময়ী; মুখে একটু হাসি লেগে রয়েছে।

হেমাঙ্গিনী বললেন—"সন্দুর। তো এবারেও কিছু হোল না, সেই কথাই হয়তো বলছেন ঠাকুরঝি। তিনটে ইন্টারভিউ দেওয়া হয়ে গেল, এদিকে বিয়ের ব্যাপারটাও অতদূর এগিয়ে..."

"আর একটি নাকি মেয়ে আছে ঠানদি, মেসেই?"—যোগ দিলেন রেবা, এতক্ষণ যেন ওৎ পেতে সুযোগ খুঁজছিলেন।

"মেয়ে থাকবে না কেন? মেসেও আছে, বাইরেও আছে; অঢেল।"—একটা অদ্ভুত ধরণের অতিসূক্ষ্ম হাসি লেগে রয়েছে ঠোঁটে, বললেন—"তা ঠানদিদি করবে কি?"

"কেন ঠানদি, তুমিই তো কাল বললে, নিতে পারিস মেয়েটিকে।"—সুরবালাই এবার উত্তরটা দিলেন। রঙ্গময়ী বললেন—"তা নেনা, বাধা দিচ্ছে ঠানদিদি?"

"না ঠানদিদি, রঙ্গ রাখো। তুমি চেষ্টাচরিত্র ক'রে ঘটিয়ে দাও—পছন্দ যখন—বৌদিদিরও পছন্দ—রেবাও শুনে অবধি..."

"রক্ষে করো বাছা!"—হাত জোড় করে শরীরটা একটু টেনেই নিলেন পেছনে রঙ্গময়ী, গাম্ভীর্য ঠেলে সেই হাসিটা একটু লেগেই রয়েছে; বললেন—"রঙ্গঠানদি আর ও পাঠ পড়ে?...সে সব নিশ্চয় শুনেছিস রেবা?—এটুকু মেয়ে এদিকে আমরা সব হয়রাণ হচ্ছি, এইবার গেঁথে ফেলব—স্রেফ কলা দেখিয়ে বেরিয়ে গেল র‍্যা!..."

বলতে বলতে খিলখিল ক'রে হেসে উঠলেন। তারই সঙ্গে কখনও হাসি কখনও কপট গাম্ভীর্যের মধ্যে বলে চললেন—"পড়ুলে আর ওপাঠ রঙ্গঠানদি! একবার মেয়ের কলা দেখালে, এবার হয়তো তোর ছেলেরই পালা—কারি ঠিকঠাক—তারপর এবার হয়তো পিঁড়েয় বসাবার সময় পিঠটান—আমি নিজের ব্যবস্থা নিজেই করে রেখেছি; আর মাতব্বরি করতে হবে না সবাইকে।...আর সত্যিই, সে কথাও বলি—মেয়েরা পারছে আর তোর ছেলে পারবে না কেন? এতদিন শহর কলকাতায় বসে পেলে কি টেনিংটা?...কিম্বা তন্দ্রাই হয়তো এগুলে না—আদু অমন টেনিংটা দিয়ে গেল ...উঃ, এক কপাল সিঁদুর নেবড়ে—অমন একটা জাঁদরেল মিনষেকে ভাঁওতা দিয়ে—উফ! উফ!..."

—আদুরির কথা আসতেই হাসির একটা বড় দমকে হঠাৎ ঘাড়টা উল্টে গেছে, সিঁড়ির মাথার কাছ থেকে একটু ত্রস্ত প্রশ্ন হোল—"রঙ্গঠানদি আছেন এখানে?... এই যে রয়েছেন। আমি 'করুণাময়ী হোম' থেকে আসছি ঠানদি। কমলাদি একটা চিঠি দিয়েছেন।"

জয়া এগিয়ে এসে একটা খাম বাড়িয়ে ধরল।

"কিসের চিঠি রে,—এত রাত্তিরে হঠাৎ?" খামটা হাতে নিয়ে বেশ একটু বিমূঢ়ভাবেই প্রশ্ন করলেন রঙ্গময়ী। আর তিনজনেও একটু হকচকিয়েই জয়ার দিকে চেয়ে রইলেন, চাওনিতে ও'র দুটো প্রশ্নই লেগে রয়েছে।

জয়া কি উত্তর দিতে যাচ্ছিল, তার আগেই রঙ্গময়ী আবার প্রশ্ন করলেন—"তুই এলি কি করে—এত রাত্তিরে—একলা?..."

চিঠিটা তেমনি হাতেই রয়েছে। বললেন—"আলোটা জেবলে দে।"

জয়া পাশেই সুইচ টিপে ছাতের আলোটা জেবলে বলল—"এসেছি ট্যাক্সি ক'রে, ঠাকুর সঙ্গে আছে। আগে আপনার বাড়িতেই যাই।"

বেশি রকম গম্ভীর হয়ে গেছে মুখটা রঙ্গময়ীর, মন 'কু' নিলে যেমন হয়। সেই-জন্যই খামটাও খোলেন নি এতক্ষণ। ওকে আর কোন প্রশ্ন না করে ছিঁড়ে ফেলে পড়ে যেতে লাগলেন। ছোট্ট চিঠি, পড়তে পড়তেই কিন্তু মুখটা আরও যেন অন্ধকার হয়ে গেল। শেষ করে রেবার হাতে দিয়ে বললেন—"পড় জোরে।"

রেবা পড়ে গেলেন—"ঠানদিদি, একটা খুব জটিল সমস্যায় পড়ে আপনাকে হঠাৎ চিঠিটা লিখতে হচ্ছে। চিঠিতে সব লেখা সম্ভব নয়। আপনি কাল বিকালে ঠিক চারটের সময় 'হোম'এ অতি অবশ্য একবার আসবেনই। ঠিক ঐ সময়, আর একলাই।"

জয়া উত্তরের জন্য অপেক্ষাই করছিল, ওকে একটু বসতে বলতেও ভুলে গেছেন সবাই, রঙ্গময়ী প্রশ্ন করলেন—"এবারের সমস্যেটা কাকে নিয়ে? জানিস নিশ্চয়?"

জয়া খবরটা দিয়েছিল একরকম সহজ-ভাবেই, এমনকি একটু বোধহয় হাসির ভাবও লেগেছিল মুখে, কিন্তু ও'দের ভাব-গতি দেখে সেও বেশ একটু থতমতই খেয়ে গেছে, অনিচ্ছা সত্ত্বেও আমতা আমতা করে বলল—"তন্দ্রা।"

"তন্দ্রা!!"—তিনজনেই একসঙ্গে শিউ-রেই যেন রুদ্ধবাক হয়ে চেয়ে রইলেন জয়ার দিকে।

রেবা সুরবালার কানের কাছে মুখ নিয়ে গিয়ে প্রশ্ন করলেন—"এই মেয়েটির কথাই না বলছিলে তখন?"

মাথাটা শুধু একটু নোয়াতে পারলেন সুরবালা।

রঙ্গময়ী জয়াকে বললেন—"বেশ, তুই যা। বলবি আসবেন কাল ঐ সময়।"

জয়া নেমে গেলে অনেকটা স্বগত-ভাবে বললেন—"'হোম' এবার তুলে দিতে হবে।...ইনি নিশ্চয় আদুর ওপর টেক্কা নিয়েই কিছু করেছেন!"

(ক্রমশঃ)

মিগ্যুয়েল ৎসারভান্তেজ

ভৈরবপ্রসাদ হালদার

শহর আলজিরিয়ার জনবহুল পথ দিয়ে এক ভিনদেশী যুবক হেঁটে চলেছে। অবিরাম উদ্দেশ্যহীন তার চলা। রাজপথের দু পাশে মুরেদের বাড়ী-ঘর-দোকান সাজান। দোকানে দোকানে খরিদ্দারের মেলা। মাঝে মাঝে মুর সৈনিকরা ঘোড়া ছুটিয়ে চলে যায়। দ্রুত পায়ে হেঁটে রাস্তা পার হয় বোরখা-পরা মেয়েরা। টমটম আর এক্কাগুলো পথচারীদের সন্ত্রস্ত করে এদিকে-ওদিকে ছোটাছুটি করে। রীতিমত ব্যস্ত শহর। বড় শহর আলজিরিয়া।

কিন্তু কোনদিকে নজর নেই ভিনদেশী যুবকের।

তার দেহের পোষাকটা শতছিন্ন। মাথায় লম্বা বাবরি চুল—পারিপাট্যহীন। পায়ের জুতোজোড়ার অবস্থাও সঙ্গীন। দু চোখে নিরুদ্ধ হতাশার চিহ্ন। দেহের উজ্জ্বল গৌরবর্ণ মরুভূমির তীব্র উত্তাপে বিবর্ণ। হাত দু খানা পিছন দিকে শিকল দিয়ে বাঁধা। শুধু হাঁটিবার স্বাধীনতা আছে তার।

একজন মুর তাকে উদ্দেশ করে কি যেন বলল।

কিন্তু ভিনদেশী যুবক ফিরেও তাকাল না—থামলও না।

কেবল একটিমাত্র কথা তার মনের মধ্যে বার বার ওঠাপড়া করেঃ স্বাধীনতাই একমাত্র বস্তু যার জন্য মানুষ জীবন উৎসর্গ করতে পারে এবং উৎসর্গ করা উচিত। কিন্তু সেও তা করতে চায়। কোন পথে আসবে তার জীবনে স্বাধীনতা? কে তার জন্য মুক্তিমূল্য গুনে দেবে এই কঠোর-প্রাণ মুর সর্দারকে? এমন কোন বন্ধু আছে তার? ক'মাস আগে নিজেই একবার পালাবার চেষ্টা করেছিল। ভেবেছিল, মুর সর্দারের দৃষ্টিকে ফাঁকি দিয়ে এই শহর থেকে পালাবে। তারপর মরুভূমি পার হয়ে হাজির হবে নির্জন সমুদ্রোপকূলে। সেখানে কোন দিন কি স্পেনের কোন জাহাজ চোখে পড়বে না? নিশ্চয়ই পড়বে। আর সেই জাহাজে চেপে সে পৌঁছে যাবে একদিন তার নিজের জন্মভূমিতে। তার ক্রীতদাস জীবনেরও অবসান ঘটবে তখন।

ত্রিশ বছরের ভিনদেশী যুবক একদিন এই স্বপ্নে বিভোর হয়ে তার মালিক মুর সর্দারের ঘর ছেড়েছিল। কিন্তু মরুভূমির মধ্যে পথ হারিয়ে আবার তাকে এই শহরেই ফিরে আসতে হয়েছিল। ধরা দিতে হয়েছিল মুর সর্দারের হাতে। তারপর থেকে আর ও পালাবার চেষ্টা করে না। জানে, তার মতন একজন সহায়সম্বলহীন যুবকের পক্ষে এভাবে পালান সম্ভব নয়। তার উপর সে ভিনদেশী। একজন মুর আর একজন মুরের ভিনদেশী পলাতক ক্রীতদাসকে কখনো পালাতে সাহায্য করবে না।

ও তাই এখন আলজিরিয়া শহরের পথে-পথে উদ্দেশ্যহীনভাবে ঘুরে বেড়ায়। শান্ত চেহারার ভিনদেশী যুবক। দু চোখে নিরুদ্ধ হতাশা। শহরের অনেক মুর ওকে চেনে। অনেকে ডেকে কথা বলতে চায়, কিন্তু যুবক ফিরেও তাকায় না। কেউ কেউ বলে—লোকটা পাগল।

শুনেও শোনে না যুবক।

শহর আলজিরিয়ার এই ভিনদেশী যুবক হচ্ছেন মিগ্যুয়েল ডি ৎসারভান্তেজ সাভাদ্রা। বিশ্ব সাহিত্যের কালজয়ী অমর উপন্যাস ডন কুইকজোট গ্রন্থের স্রষ্টা। তখনও তিনি সাহিত্যরচনায় মনোনিবেশ করেন নি। রুজি-রোজগারের আশায় মাতৃভূমি স্পেন ছেড়ে মিগ্যুয়েল গিয়েছিলেন ইতালির নেপলস শহরে। বিখ্যাত বীর ডন জুয়ানের সুনজরে পড়েছিলেন ওখানেই। ডন জুয়ানের নাম তখন সারা ইউরোপে পরিব্যাপ্ত। লেপান্তোর যুদ্ধে সামান্য সৈনিক ছিলেন মিগ্যুয়েল এবং এই যুদ্ধে তাঁর বাম হাত ভীষণভাবে ক্ষত-বিক্ষত হয়। যুদ্ধক্ষেত্রেই আহত মিগ্যুয়েলের সঙ্গে ডন জুয়ানের পরিচয়। পরিচয় ঘনিষ্ঠও হয়েছিল।

কিন্তু বিদেশের মাটিতে বেশীদিন থাকতে পারেন নি মিগ্যুয়েল ৎসারভান্তেজ। জন্মভূমি স্পেনের বুকে ফিরে আসার কামনা তাঁকে অধীর করে তোলে। কিংবা বলা যায় যে, তাঁর ভাগ্যদেবী তাঁকে আকর্ষণ করেছিলেন দুরন্ত বেগে। সে-আকর্ষণ অস্বীকার করবার ক্ষমতা তাঁর ছিল না। তাই ১৫৭৫ খৃষ্টাব্দের বিশে সেপ্টেম্বর মিগ্যুয়েল তাঁর ভাই রডরিগোকে সঙ্গে নিয়ে জাহাজে চেপেছিলেন। ভূমধ্যসাগরের নীল জলরাশির বুকে নাচতে নাচতে তাঁদের পালের জাহাজ পাড়ি জমিয়েছিল স্পেনের উদ্দেশ্যে।

জলপথে তখন জলদস্যুদের ভীষণ উপদ্রব। তুর্কী-মুর আর স্পেনীয় জলদস্যুরা ভিনদেশী জাহাজ দেখলেই আক্রমণ করত। কাজেই সাগরঅতিক্রমকারী জাহাজগুলো হোত সশস্ত্র। মিগ্যুয়েলদের জাহাজ আক্রমণ করেছিল মুর জলদস্যুরা। যাত্রীদের বন্দী করে ওরা জাহাজে আগুন ধরিয়ে দেয়। মিগ্যুয়েল আর তার ভাইয়ের মালিক হয়েছিল শহর আলজিরিয়ার এক মুর সর্দার। ডন জুয়ানের দেওয়া একখানা পরিচয়পত্র ছিল মিগ্যুয়েলের কাছে। পরবর্তী কালে এই পত্রখানা মিগ্যুয়েলের মুক্তির পথে বিরাট বাধা হয়ে দাঁড়িয়েছিল।

মুর সর্দার ভেবেছিল মিগ্যুয়েল একজন গণ্যমান্য বড়লোক। তাই ওর মুক্তির মূল্য হিসাবে সর্দার অনেক টাকা দাবী করেছিল। কিন্তু কে দেবে অত টাকা? মিগ্যুয়েল পরিবারের আর্থিক অবস্থা একেবারেই ভাল ছিল না—কাজেই সেখান থেকে মুক্তিমূল্য আসার কোনও সম্ভাবনাই ছিল না।

মিগ্যুয়েল তাই শহর আলজিরিয়ায় বন্দী-জীবন যাপন করেছিলেন।

মাদ্রিদের শহরতলিতে ১৫৪৭ খৃষ্টাব্দে ৎসারভান্তেজের জন্ম। তাঁর বাবা ছিলেন একজন সামান্য ওষুধ ব্যবসায়ী। সাতটি সন্তানের জনক তিনি। কাজেই উপযুক্ত লেখাপড়া শেখবারও সুযোগ পান নি মিগ্যুয়েল। শৈশবে সমগ্র পরিবারের সঙ্গে তাঁকে এখানে-ওখানে ঘুরে বেড়াতে হত। একটু ভাল রোজগারের আশায় তাঁর বৃদ্ধ পিতা কঠোর সংগ্রামে লিপ্ত ছিলেন। ভালাদলিড, কর্ডোভা, সেভিল এমন কত কত শহরের সাধারণ পল্লীতে শৈশবের দিনগুলো কাটিয়েছিলেন মিগ্যুয়েল। অবিরাম অভাবের মধ্যে তাঁর শৈশব কেটেছিল। তাই ছোটবেলা থেকেই তিনি এলোমেলো স্বভাবের মানুষ হয়ে ওঠেন।

সে-সময় শহর মাদ্রিদ ছিল ইউরোপীয় সংস্কৃতির পীঠস্থান। মুর এবং খৃষ্টান ধর্ম ও সভ্যতার মিলনস্থল। আরব-তুরস্ক প্রভৃতি মুসলিম রাষ্ট্র সেকালে শুধু ভারতীয় বাণিজ্যসম্ভার বহন করে স্পেনের বন্দরে বন্দরে হাজির হত না—তারা সঙ্গে নিয়ে আসত ভারতীয় সভ্যতা ও সংস্কৃতির ধারা। আর তা উজাড় করে দিত স্পেনের বুকে। ফলে ধীরে ধীরে স্পেনের বণিক সম্প্রদায়, অভিজাত পরিবারগুলি এবং ক্রমোন্নত মধ্যবিত্ত মানুষেরা এই সভ্যতা ও সংস্কৃতির ধারক ও বাহক হয়ে উঠল। সারা ইউরোপে স্প্যানিশ ভাষা ছড়িয়ে পড়ল। আর শহর মাদ্রিদ ছিল এই নবীন সভ্যতা ও সংস্কৃতির কেন্দ্রস্থল। ছোট-বড় নানা ধরনের সাহিত্য সভা, রঙ্গমঞ্চ এবং সঙ্গীতের আসর সেকালের মাদ্রিদ শহরে অফুরন্ত ছিল। এগুলোর মাধ্যমে নতুন সাংস্কৃতিক ধারার চর্চা শুরু করেছিলেন স্পেনের একজন হিউম্যানিস্ট।

উনিশ বছর বয়সে মাদ্রিদ শহরে ফিরে এলেন মিগ্যুয়েল।

একেবারে নতুন মানুষ। পরিবারের সঙ্গে অনেক শহরে ঘুরেছেন। বাস্তব অভিজ্ঞতার কঠিন শিলায় বার বার তাঁর মাথা ঠুকে গেছে। স্বপ্ন দেখবার কোন অবসর পান নি। অতীন্দ্রিয় চিন্তাধারায় তাঁর মনও আচ্ছন্ন হয় নি। স্পেনের আর্থিক সামাজিক এবং রাজনৈতিক জীবন সম্পর্কে পরিপূর্ণ জ্ঞান লাভ করেছেন। দেখেছেন, এক দল স্প্যানিশ কেবলমাত্র জীবিকার্জনের জন্য উত্তুঙ্গ উত্তাল বিক্ষুব্ধ সমুদ্রের বুকে দিনের পর দিন নাবিকজীবন যাপন করছে কিংবা যাযাবর বৃত্তি গ্রহণ করে পরিবার-পরিজনদের নিয়ে এক শহর ছেড়ে আর এক শহরের পথে পথে ফিরছে অথবা উপত্যকা-প্রান্তর-শস্যক্ষেত্রে কঠোর শ্রমের মাধ্যমে আঙুর গম এমনি কত কত ফসল ফলাচ্ছে অথচ নিজেরাই থাকছে অনাহারে ও দারিদ্র্যের অস্বাস্থ্যকর পরিবেশে। আর এক দলকে দেখেছেন, তারা কাবারে, রেস্তোরাঁয়, ভাঁটিখানায়, নাচঘরে

বিলাস জীবন যাপন করছে। নারী, সুরা ও যুদ্ধের তারা পূজারী। স্পেনের সাধারণ মানুষকে, তার সম্পদকে তারা অহরহ শোষণ করছে। আর এই দুই ধারার মধ্যে তীব্রগতিতে প্রবহমান রয়েছে স্পেনের নবীন সাংস্কৃতিক-আন্দোলনের স্রোত।

মিগুয়েল মাদ্রিদে ফিরে এসে লোপেস ডি হোজোস (LOPES de HOYOS) এর ছাত্র হলেন। এ সময় রঙ্গমঞ্চের প্রভাব পড়েছিল তাঁর উপর। নাটক লেখবার একটা উদগ্র কামনা জেগেছিল তাঁর মনে। লোপে ডি রুয়েদা (LOPE de RUEDA) নাটকের অভিনয় দেখে মুগ্ধ হয়ে গেলেন। শিক্ষাগুরুও দেখেছিলেন যে, ছাত্রের মনে পড়বার ভীষণ ইচ্ছা রয়েছে। কাজেই তিনি উৎসাহ দিলেন। মিগুয়েল অজস্র বই পড়তে লাগলেন। কিন্তু কেবল ত পড়লে চলবে না। বেঁচে থাকবার জন্যে আর পরিবারের জনাদের বাঁচাবার জন্যে অর্থ চাই, প্রচুর অর্থ। কিন্তু শহর মাদ্রিদে রোজগারের কোন সুযোগ পেলেন না মিগুয়েল। কাজেই তিন বছর পরে আবার জন্মভূমি ছেড়ে ইটালির পথে পাড়ি জমালেন।

ভূমধ্যসাগরের মালিকানা নিয়ে তখন মুসলিম ও খৃষ্টান শক্তির মধ্যে বিরোধ চরমে পৌঁছেছিল। প্রায়ই যুদ্ধবিগ্রহ হত। মাঝে মাঝে ইউরোপের সব খৃষ্টান শক্তি একজোট হয়ে মুসলিম-প্রাধান্যকে খর্ব করতে তৎপর হয়ে উঠত। কেবলমাত্র ধর্মকে রক্ষা করাই এই যুদ্ধবিগ্রহের প্রধান উদ্দেশ্য ছিল না। জেরুজালেম শহরের অধিকার কিংবা ভূমধ্যসাগরের মালিকানা করায়ত্ত করা ছাড়াও আরও একটা উদ্দেশ্য ছিল দু জাতির মনে। ভারতের সঙ্গে বাণিজ্যের একচেটিয়া অধিকার দখল করার উদ্দেশ্যও ছিল তাদের। সুতরাং নৌযুদ্ধ এবং জলদস্যুর উপদ্রব তখন ভূমধ্যসাগরের বুকে দৈনন্দিন ঘটনায় পরিণত হয়েছিল।

ইতালিতে থাকার সময় দুঃসাহসিক অভিযানে যোগ দেওয়ার নেশা তরুণ সারভান্তেজের মন জুড়ে বসেছিল। অস্থিরভাবে তিনি চিন্তা করছিলেন, কোথায় যাবেন? ধর্মযুদ্ধে না ভারত আবিষ্কারের পথে? কিংবা অজানা আফ্রিকা-অভিযানের উদ্দেশ্যে? অবশেষে তিনি স্পেনের এক নৌ-জাহাজে সৈনিক হয়েছিলেন। লেপান্ত উপসাগরে তুর্কী সেনাদের সঙ্গে যুদ্ধে মিগুয়েল আহত হয়েছিলেন এবং এই যুদ্ধের পরই পরিচিত হয়েছিলেন ডন জুয়ানের সঙ্গে। ডন জুয়ানের প্রভাব পড়েছিল তাঁর জীবনে। তিনি দেহ-মনে ভিন্নমানুষ হয়ে উঠেছিলেন। বীরত্বের দর্পণে নিজের ছায়া দেখতে পেয়েছিলেন।

সময় সময় মানুষের জীবনে এমন কতকগুলো ঘটনা ঘটে, বুদ্ধি দিয়ে কিংবা সাধারণভাবে যার ব্যাখ্যা করা চলে না। কেন যে ঘটল এমনটা, তার কোনও যুক্তিই খুঁজে পাওয়া যায় না। অথচ এমন অঘটন ঘটে এবং তার প্রভাব পড়ে ঘটনাটা ঘটে যার জীবনে তার উপর। সারাজীবন ধরে এই প্রভাব তার জীবনকে আচ্ছন্ন করে রাখে।

এমনি ঘটনা ঘটেছিল মিগুয়েল সারভান্তেজের জীবনে।

একাকী বিদেশী মুর সর্দারের কাছে ক্রীতদাস হিসাবে মিগুয়েল বাস করছিলেন। পালাবার পথ ছিল না। মুক্তি-মূল্যের আশা করা বাতুলতা মাত্র। এই জীবন থেকে মুক্তি পাওয়ার আশা ত্যাগ করে আলজিরিয়ায় বিষন্ন জীবন যাপন করেছিলেন। একটা বিশ্বাস তাঁর মনে দৃঢ়মূল হয়েছিল যে, এখানেই জীবনের অবশিষ্ট দিনগুলো তাঁর কেটে যাবে। স্পেনের মনোরম পরিবেশে ফিরে যাওয়ার সৌভাগ্য আর তাঁর হবে না।

ক' মাস আগে তাঁর ভাই রডরিগো তাঁর সঙ্গে ছিল। সে সময় একদিন মিগুয়েল পরিবারের লোকজনেরা কিছু অর্থ সংগ্রহ করে শহর আলজিরিয়ায় এসেছিলেন। কিন্তু সে অর্থে দু ভাইয়ের মুক্তি-মূল্য মেটান গেল না। শুধু রডরিগো ছাড়া পেয়ে দেশে ফিরে গেল।

মিগুয়েলের জীবনে আবার হতাশা নেমে এল।

ও'র মনে তখন একটা কথাই বার বার ওঠা-পড়া করত—স্বাধীনতা এমন একটা বস্তু যার জন্য মানুষ জীবন উৎসর্গ করতে পারে এবং উৎসর্গ করা তার কর্তব্য।

আরও কতদিন পরে ত্রিনিটির ধর্মযাজক ফাদার জন গিল এসে হাজির হলেন আলজিরিয়ায়। তিনি খৃষ্টান ক্রীতদাসদের মুক্ত করার জন্য কিছু অর্থ এনেছিলেন। মিগুয়েলের সঙ্গে তিনি কথা বললেন। খুশী হলেন। বন্দীর হাব-ভাব, চাল-চলন, কথাবার্তা তাঁর ভাল লাগল। তিনি মুগ্ধ হলেন। শপথ করলেন, যেমন করে হোক মিগুয়েলকে মুক্ত করবেন। কিন্তু মুক্তি-মূল্য হিসাবে মুর সর্দার যে-পরিমাণ অর্থ দাবি করল তত টাকা তাঁর কাছে ছিল না।

মিগুয়েলকে এক তুর্কী সর্দার কিনে নিল। স্পেনে নয় এবার তাকে আলজিরিয়ার মরুপ্রান্তর ছেড়ে কনস্টানটিনোপল শহরে যেতে হবে। এক পরাধীনতার জাল থেকে আর এক পরাধীনতার ফাঁদে ধরা পড়লেন মিগুয়েল সারভান্তেজ।

কিন্তু অঘটন ঘটল। তাঁকে কনস্টানটিপল যেতে হল না। এক স্প্যানিশ জাহাজে চেপে তিনি স্পেনে পৌঁছলেন। তাঁর মুক্তির জন্য ফাদার জন গিলের চেষ্টা সফল হল।

আবার মাদ্রিদে ফিরে এলেন মিগুয়েল সারভান্তেজ।

শহর আর শহরতলির পরিচিত পরিবেশ তখন অনেক বদলে গেছে। পরিবর্তিত হয়েছে নবীন কালের মানুষের ধ্যান-ধারণা। দরিদ্র আরও অভাবের জালে জড়িয়ে পড়েছে। অভিজাত পরিবারগুলো আরও বিলাসী হয়ে উঠেছে। আর সঙ্গে সঙ্গে সাহিত্য এবং সংস্কৃতির ধারা বেগবতী হয়েছে।

এই পরিবর্তিত অবস্থার মধ্যে পড়ে নিজেকে হারিয়ে ফেললেন মিগুয়েল সারভান্তেজ। এবার কি করবেন তিনি? বিশ্বাস করতেন যে, অর্থ আর সম্মান অর্জনের দুটো পথ আছে—হয় লেখক হওয়া আর না হয় সৈনিক হওয়া। সারভান্তেজ একটা পথের পথিক হয়েছিলেন বাইশ বছর বয়সে। লেপান্ত যুদ্ধে আহত হয়ে বীরের সম্মানও অর্জন করেছিলেন কিন্তু সেদিনকার বীরের কথা সবাই ভুলে গিয়েছিল। আর অর্থ সামর্থ্যের দিক দিয়ে তিনি একেবারেই নিঃস্ব হয়ে পড়েছিলেন। কাজেই ভেবে ছিলেন—না, আর ও পথ নয়। অক্ষম বাম হাতখানা তাঁর সৈনিক-জীবনের ব্যর্থতার স্বাক্ষর বহন করছিল। এবার লেখক হবেন। লিখবেন উনি। কিন্তু কি লিখবেন—কাব্য না নাটক? নাটকের চাহিদা খুব। মিগুয়েল নাটক লিখতে শুরু করলেন। তাঁর নাটক অভিনীত হল—কিন্তু সে নাটক দর্শক-মনে সাড়া জাগাতে পারল না। দু বছরের মধ্যে ও'র অনেকগুলো নাটক আর কবিতার বই প্রকাশিত হল। কিন্তু অর্থ বা যশ পেলেন না। এরপর লিখলেন একখানা রোমান্টিক উপন্যাস। কিন্তু লা গ্যালেশিয়া উপন্যাসখানাও আশানুরূপ সাড়া জাগাতে পারল না পাঠক-মনে। ভেঙে পড়লেন মিগুয়েল। মাথার উপর বিরাট দায়িত্বের বোঝা। বিধবা মা, বউ, দুটি বোন আর একটি মেয়ে। মাদ্রিদের মতন শহরে এত বড় পরিবারের ভরণপোষণের ব্যবস্থা করাও সহজ নয়। দেনায় ডুবে গেলেন মিগুয়েল। সাহিত্যের পথ ছেড়ে আবার তিনি চাকরি খুঁজতে লাগলেন।

এবার চাকরি পেলেন যুদ্ধ জাহাজ আর্মাডায়।

তাঁর কাজ ছিল জাহাজের সৈন্য-সামন্ত আর নাবিকদের জন্য রসদ সংগ্রহ করা। খুবই দায়িত্বপূর্ণ কাজ। আর্মাডা তখন স্পেন সরকারের গর্বের বস্তু। অতলান্তিক মহাসাগরের বুকে তার একচ্ছত্র আধিপত্য। আর্মাডার সাহায্যে স্পেন ইংলন্ড জয় করতে পারবে।

কিন্তু ১৫৮৮ সালে ইংলণ্ডের উপকূলে আর্মাডা হেরে গেল।

স্পেনের সব আশা নির্মূল হল। বিচার সভা বসল। কেন বিধ্বস্ত হল অজেয় আর্মাডা? কাদের দোষে স্পেনের মর্যাদা বিনষ্ট হল? দোষীদের তালিকায় সারভান্তেজের নামও লেখা হল।

চার বছর জেলের মধ্যে কাটিয়ে মিগুয়েল বেরিয়ে এলেন।

বন্দীজীবনে তিনি এক গ্রামে অন্তরীণ ছিলেন। সেখানে নির্জনে বসে লিখতেন। গ্রামটির নাম আগরামাসিল্লা ডি আলবা। এখানে বসেই লিখে ফেললেন একখানা বই। কিশোরদের জন্য এক অপূর্ব উপন্যাস। এল ইনজেনিওসো হিদালগো ডন কুইকসোট ডি লা মাঞ্চা।

ডন কুইকজোটের কাহিনী কিন্তু তাঁর নিজস্ব নয়, মিগুয়েল সারভান্তেজ তা স্বীকারও করেছেন। এই বদ-মেজাজী যুদ্ধ-পাগল নাইটের গল্প তিনি শুনেছিলেন আর একজনের মুখে। কাহিনীটি লিখেছেন আরেবিয়ান গল্পকার। সেই লেখক হচ্ছেন সিও হামেৎ বেন-এনজেলি। তাঁর একখানা বই এই সময় মিগুয়েলের বন্ধুর হাতে পড়েছিল। ইংরাজী সাহিত্যেও এমনি ধরনের কাহিনীর অভাব নেই। চসারের ক্যান্টারবেরীর গল্পে এমনি একটা কাহিনী আছে। র্যাবেলিয়া এবং পুলসিও এমন গল্প শুনিয়েছেন।

কিন্তু ১৬০৫ খৃষ্টাব্দে ডন কুইকযোট ডি লা মাঞ্চার প্রথম ভাগ প্রকাশিত হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে আলোড়ন সৃষ্টি হল সারা ইউরোপে। কয়েক বছরের মধ্যেই এ বইয়ের অনুবাদ হল বিভিন্ন ভাষায়। যশের শিখরে আরোহণ করলেন মিগুয়েল। সাহিত্যিক হিসাবে স্বীকৃতি লাভ করলেন।

কি আছে ডন কুইকজোট গ্রন্থে?

এক অভিজাত পুরুষের কাহিনী—তার নাম ডন কুইকজোট। আসলে সে কিন্তু অভিজাত নয়। সামান্য একজন কৃষক। কিন্তু শখ ছিল সম্পত্তি খুইয়ে নাইটদের কাহিনী লেখা বই কেনার। সেই সব বই পড়ে পড়ে সে বুড়ো হয়ে গেল। তার গাল দুটো ঢুকে গেল ভেতরে। শেষে একদিন রোগা সিড়িঙ্গে দেহের উপর মস্ত ভারি বর্ম চাপিয়ে হাতে বর্শা নিয়ে, এক ছ্যাকড়া গাড়ির ডিগডিগে ঘোড়ার পিঠে সওয়ার হল। উদ্দেশ্য, অভিযানে যাবে। কিন্তু কাদের বিরুদ্ধে তার এই অভিযান? এই সংসারে এখানে-ওখানে ছড়িয়ে রয়েছে অজস্র রক্ত-চুয়ার। তাদের শোধন করার জন্য, তাদের হাত থেকে সৎ মানুষদের রক্ষা করার জনাই তো তার এই অভিযান।

সঙ্গী তার এক গরীব চাষী। গাধার পিঠে সে সওয়ার হল। রাজা আর রাজগী

সম্পর্কে তার কোন ধারণা নেই। সৎ খেটে-খাওয়া মানুষ সাঙ্কো। আর সব গরীব মানুষরাই একই রকম সৎ আর সরল প্রকৃতির...।

মধ্যযুগের ইউরোপে নাইটদের ছিল একাধিপত্য। অভিজাত সম্প্রদায়ের জীবন-দর্শন, ধ্যানদর্শন, ধ্যান-ধারণা, রীতি-নীতির প্রভাব ছড়িয়ে পড়েছিল সারা ইউরোপে। দেশের ধনসম্পদ রাষ্ট্রীয়ক্ষমতা এমন কি ধর্ম-মন্দিরগুলো পর্যন্ত ছিল তাদের দখলে। নিজেদের খেয়াল চরিতার্থ করার জন্য কোন অন্যায় কাজ করতে এই অভিজাত পুরুষেরা দ্বিধা করত না। অসৎ এবং দুর্নীতিপরায়ণ জীবনযাপন করতে এরা অভ্যস্ত ছিল। সমাজে সংঘটিত সমস্ত পাপের সঙ্গে এদের নাম জড়িত ছিল। অধিকাংশ মধ্যবিত্ত মানুষ ছিল এদের মুখাপেক্ষী—কারণ অভিজাত সম্প্রদায়ের উচ্ছিষ্ট-ভোজী ছিল মধ্যবিত্তরা। আর ফসলউৎপাদনকারী কৃষককুল ছিল গোলাম। অভিজাত বংশের জমির মালিক জমিদারদের ইচ্ছার উপর তাদের দৈহিক অস্তিত্ব নির্ভরশীল ছিল।

মিগুয়েল সারভান্তেজ স্পেনের অভিজাতদের এ চেহারা দেখেছিলেন। রক্ত-চুয়ারদের স্বরূপ তাঁর জানা ছিল। তাই তাঁর মানসপুত্র অভিযান করেছিল এই সব রক্ত-চুয়ারদের শায়েস্তা করার জন্য। কিন্তু সোজাসুজি তাদের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করতে পারেন নি মিগুয়েল। আশ্রয় নিয়েছিলেন হিউমারের—হাস্যরসের। তাই তাঁর নায়ক ডন কুইকজোটকে আপাতদৃষ্টিতে মনে হয় এক-জন ক্লাউন। ভাঁড়।

> Alonso Quixado (Quijana, Lantera Jaws.) is a hidalgo (one of the lower nobility), tall and lean, bordering on 50.... with cheeks that appeared to be kissing each other on the inside of his mouth.... neck half a yard long.'

এই বিসদৃশ চেহারার মধ্যে মানুষটি ছিল জীবন্ত।

দেশের পরিস্থিতি সম্পর্কে সম্পূর্ণ জ্ঞান ছিল বলেই ডন কুইকজোট বলছে—

> Freedom, Sancho, is the only thing for which a man can and must give his life.

এ সত্য আজও অম্লান এবং আগামী দিনেও অম্লান থাকবে।

হাস্যরসের মালমশলা দিয়ে তৈরী এই কাহিনী দিয়ে দুঃখজনক বাস্তবতার কঙ্কাল পরিস্ফুট হয়ে পড়েছে। পাঠক-মনকে চিন্তার খোরাক দিয়েছে। নিছক হাস্যরস নয়—রয়েছে বাস্তবতার স্পর্শে উজ্জ্বল এক অভিনব কাহিনী। পাঠক-মনকে যে-কাহিনী ভাবিয়ে তোলে।

অভিযানকারী ডন কুইকজোট উৎসাহ নিয়ে এগিয়ে যেতে যেতে দেখতে পেল এক

দীর্ঘকায় রক্ত-চুয়ারকে — এক জীবন্ত দানবকে। চারখানা বিশাল হাত তুলে সে মাথা উঁচু করে দাঁড়িয়ে আছে। সমগ্র মানব-জাতির সেই শত্রুকে মিগুয়েলের মানসপুত্র আক্রমণ করল বর্শা উঁচিয়ে। আর তখনি হাওয়া প্রবাহিত হল। বাতাস-কলের পাখায় হাওয়া লাগল। নাইটের হাতের বর্শা ভেঙে গেল। গভীর হতাশায় ভেঙে পড়ে ডন কুইকজোট দেখল যে, যাকে সে দানব মনে করেছিল আসলে তা হচ্ছে একটা উইণ্ড-মিল। এই হতাশা তখন স্পেনের সামাজিক জীবনের সব জায়গায় বিরাজ করছিল। মিগুয়েলের মনেও ছিল সেই হতাশা। বন্ধু নেই, আপনজন নেই—কার কাছে মিগুয়েল মনের কথা খুলে বলবে। দুঃখের দিনে সান্ত্বনা চাইবে। হিপোক্রীটদের সংখ্যা তখন স্পেনে দিন দিন বাড়ছিল। সাহিত্য, ধর্ম, রাজনীতি সব জায়গায় এই সব হিপোক্রীটদের ছিল অসুস্থ প্রভাব। আর সে প্রভাবের আঁচ মিগুয়েলকেও স্পর্শ করেছিল।

এরপর আর এক দল শত্রুর সামনে পড়ল ডন কুইকজোট। এবার দানব একা নয়—একপাল। বিশাল প্রান্তর মাড়িয়ে এরা তেড়ে আসছে। ওদের থামাতে হবে। প্রতিরোধের দেওয়াল তুলতে হবে সামনে। কে বাধা দেবে ওদের? কে দেশকে রক্ষা করবে ওদের হাত থেকে? কার এমন হিম্মত আছে? সেই বীর হচ্ছেন ডন কুইকজোট—মিগুয়েল সারভান্তেজের মানসপুত্র। বিশ্বের রক্ত-চুয়ারদের শাস্তি দেওয়ার জন্য যার সৃষ্টি হয়েছে।

হাড়িসার ঘোড়ার পিঠে সওয়ার হয়ে ডন কুইকজোট ওদের চার্জ করল। ওদের মধ্যে গিয়ে পড়ল। ওরা পালাতে শুরু করল। এত বড় যোদ্ধার প্রতিরোধ-আক্রমণ সহ্য করবার ক্ষমতা ওদের কোথায়?

ডন কুইকজোট দেখল যে, রক্ত-চুয়াররা একপাল মেষে পরিণত হয়েছে। ওরা প্রান্তর জুড়ে এগিয়ে আসছে। অগুণতি ওদের সংখ্যা। যখন বুঝতে পারল যে, ওরা রক্ত-চুয়ার নয় ওরা নিরীহ মেষপাল—তখন ওর মনে গভীর হতাশা জুড়ে বসল। ডন কুইক-জোট যেদিকে তাকাল সেদিকেই তুষারশুভ্র মেষগুলো ছুটে পালাচ্ছে।

হতাশা ক্ষুব্ধ ডন কুইকজোট চিৎকার করে বলল— This is the work of a magician.

সারাজীবন ধরে এই দুষ্ট ম্যাজিসিয়ান মিগুয়েলকেও বিব্রত করেছে। তাড়া করে ফিরেছে।

জীবিকার সন্ধানে মিগুয়েল স্পেন ছেড়ে গিয়েছিলেন পর্তুগালে। আর সেখানেই ভালবেসে ছিলেন ফ্রান্সা ডি

রোজাকে। দুজনের বয়সের অনেক পার্থক্য ছিল। তবু তরুণী রোজা ওঁর মনে দোলা দিয়েছিলেন। দুজনের মিলন ঘটেছিল—সে মিলন আইনসিদ্ধ ছিল না। সমাজ মেনে নেয়নি। বিয়ে হয়নি তবু ও'রা ছিলেন স্বামী-স্ত্রী। কন্যা ইসাবেলার জন্মের সময় রোজা মারা গেলেন।

তারপর থেকে রোজার স্মৃতি মিগুয়েল কোনদিন বিস্মৃত হননি।

পরবর্তীকালে তিনি আবার বিয়ে করেছিলেন। তাঁর আরও ছেলেমেয়ে হয়েছিল। কিন্তু রোজাকে ভুলতে পারেন নি মিগুয়েল। কন্যা ইসাবেলার মধ্যে তিনি হারিয়ে-যাওয়া রোজার মূর্তি খুঁজে পেয়েছিলেন। সন্তানদের মধ্যে ইসাবেলা তাই ছিলেন তাঁর সবচেয়ে প্রিয়। ইসাবেলাও পিতার শেষ-জীবনের একমাত্র অবলম্বন ছিলেন।

ডন কুইকজোট প্রকাশিত হল।

স্পেনের পাঠকমহলে লুফে নিল এ বই। সারা স্পেনে ছড়িয়ে পড়ল মিগুয়েল ৎসারভান্তেজের নাম। আটান্ন বছর বয়সে খ্যাতির সিংহাসনে বসলেন মিগুয়েল। স্পেনের তখন স্বর্ণযুগ। দেশে শিক্ষিত মধ্যবিত্তদের প্রচণ্ড প্রভাব। মধ্যবিত্তদের প্রিয় লেখক হলেন মিগুয়েল। তাঁর মানসপুত্র ডন কুইকজোটের মুখ দিয়ে মিগুয়েল বলিয়েছিলেন—

> This world is nothing but schemes and plots all working at cross purposes.

নিজের জীবনেও এ-সত্যের পরিচয় লাভ করেছিলেন মিগুয়েল ৎসারভান্তেজ।

স্পেনের সীমানা ছাড়িয়ে ইউরোপের দেশে দেশে তাঁর নাম ছড়িয়ে পড়ল। বিভিন্ন ভাষায় ডন কুইকজোট গ্রন্থের অনুবাদ প্রকাশিত হল। সববয়সের পাঠক-পাঠিকার মন কেড়ে নিল ডন কুইকজোট। উপন্যাসের পাত্র-পাত্রীরা তাদের অতি প্রিয় হয়ে উঠল। এক সময় ইউরোপের লোকেরা হাড্ডিসার ছ্যাকড়া গাড়ীর ঘোড়া দেখলেই বলে উঠত—'That is Rocinante.'

ডন কুইকজোট গ্রন্থ তাদের বদ্ধমূল ধারণার ভিত টলিয়ে দিল। পড়বার পর পাঠকমন ভাবতে বসল।......

> ....the mock-heroic parody of the redundant eloquence of the romances; the puns, malapropisms, colloquialisms, and homely proverbs unsuitable to chivalric dignity....

এমন কাহিনীসমৃদ্ধ রসমধুর গ্রন্থ'ত পাঠকমনকে আকৃষ্ট করবেই।

পাঠক-মন কিছুতেই ভুলতে পারবে না সেই দৃশ্য।

একটি মৃতদেহ দেখে দাঁড়িয়ে পড়েছে ডন কুইকজোট। এ মৃত্যুর প্রতিশোধ নিতে হবে। অত্যাচারীকে শাস্তি দেওয়াই ত নাইটের কাজ।

> জিজ্ঞাসা করল—কে মারল ও কে?
> জবাব শুনল—
> God, by means of a fever.

এ হিউমার অতুলনীয়।

আরও দশ বছর পরে ডন কুইকজোটের দ্বিতীয় খণ্ড প্রকাশিত হল।

মিগুয়েলের নাম তখন সারা বিশ্বে ছড়িয়ে পড়েছে। ছেলে-বুড়ো সকলের শিক্ষিত মানুষ জানেন ডন কুইকজোট আর সাঙ্কোর নাম। রোজিনান্তকে চিনতে কারো ভুল হয় না। বাইবেলের পর ইউরোপে সবচেয়ে পঠিত গ্রন্থের গৌরব অর্জন করল ডন কুইকজোট। আজও সে গৌরব ম্লান হয়নি।

ডন কুইকজোট গ্রন্থ পাঠকমনকে আকৃষ্ট করতে পেরেছে দেখে ৎসারভান্তেজ নিজেই একদিন বলেছিলেন—

> Children handle it, young-sters read it, grown men understand it, and old people applaud it.

সব পাঠকমনই মুগ্ধ বিস্মিত চিন্তিত। বার বার পড়বার পরও এ কাহিনী পুরানো হয় না।

খ্যাতিলাভের জন্য ৎসারভান্তেজের মন লালায়িত হয়েছিল। সেটা খুবই স্বাভাবিক। তাঁর সৃষ্টসাহিত্য পাঠকমনকে আকৃষ্ট করুক এ কামনা সব সাহিত্যিকের মন ভরে রাখে। ৎসারভান্তেজের মনেও ছিল সেই কামনা। পরিণত বয়সে তিনি খ্যাতির স্বর্ণ শিখরে আরোহণ করলেন—খ্যাতির আস্বাদ গ্রহণ করলেন। কিন্তু সম্পদ লাভ করতে পারলেন না। সুখ ঐশ্বর্য ভোগ করা তাঁর ভাগ্যে ছিল না। সারাজীবন অর্থাভাবে কষ্ট পেয়েছিলেন।

১৬১৬ খৃষ্টাব্দের তেইশে এপ্রিল ৎসারভান্তেজ পরলোকগমন করেন স্যালি ডি লিয়' শহরে।

তারপর সাড়ে তিন শ বছর পার হয়ে গেছে। সারা বিশ্বে কত ঘটনা ঘটেছে, কত ওলট-পালট হয়েছে রাজনৈতিক সমাজনৈতিক এবং অর্থনৈতিক ধ্যান-ধারণার। বিশ্বে আরও কত কালজয়ী সাহিত্যিকের আবির্ভাব ঘটেছে—কিন্তু ডন কুইকজোট আজও পাঠকমনে সাড়া জাগায়—চিন্তিত করে। মনের পর্দায় অক্ষর দাগ এ'কে দেয়।

আর এখানেই ডন কুইকজোট গ্রন্থের সার্থকতা।

ভবিষ্যৎ পরিবার

সুখী এবং উজ্জ্বল ভবিষ্যৎ আমাদের সকলের প্রত্যাশা। সেদিকে আমরা দ্রুত ছুটে চলেছি। উদ্দেশ্য যত তাড়াতাড়ি কেন্দ্রবিন্দুতে পৌঁছে যাওয়া যায়। এজন্য অবশ্য অনেক কাঠখড় পোড়াতে হচ্ছে। পথে বাধা পর্বতপ্রমাণ এবং আমাদের লক্ষ্যের সংগে বর্তমানের দুস্তর ব্যবধান। পরিকল্পনার সংগে আমাদের মানসিক প্রস্তুতিকে সেই পর্যায়ে নিয়ে যেতে হবে। নাহলে উত্তরণ আর সম্ভব হবে না। যদি হয় তবে তা চিরাচরিত শম্বুকগতিতেই হবে। বর্তমান যুগ বা ধর্মের সংগে যার কোন সাদৃশ্য নেই। অর্থাৎ দুনিয়া জানবে যে, আমরা সেই সেকেলে পুরনো বস্তাপচা ধ্যানধারণা সম্বল করেই বেঁচে আছি। হয় আমরা নতুনকে নিচ্ছি না বা নতুনকে নেবার ক্ষমতা আমাদের নেই। এই অপবাদটা অনেকের মত আমাদের পক্ষেও হজম করা শক্ত। কথাটা শোনার সংগে সংগে ফুঁসে উঠতে হবে—রুখে দাঁড়াতে হবে। পুরনোর সংগে আমাদের আত্মীয়তা আছে সত্যি কথা কিন্তু তাই বলে পুরনোকে নিয়ে বেঁচে আছি, এটা ঘোর অপপ্রচার ছাড়া আর কিছু নয়। তাই সাধ্যমত প্রতিবাদ সোচ্চার করতে হবে। তার আগে অবশ্য নিজের ঘরে খবর নিয়ে গোপনে জানতে হবে যে, চলতি দুনিয়ার সংগে কতটা তাল মিলিয়ে চলতে আমরা সক্ষম হয়েছি।

লোকসংখ্যার ভারে পৃথিবী উপচে পড়ছে। বিজ্ঞানী এবং চিন্তাবিদের দল আশংকা করছেন, আগামী কয়েক দশকের মধ্যে সারা পৃথিবীতে মানুষের ভিড়ে আর তিল ধারণের ঠাঁই থাকবে না। জীবনধারা তখন এক ভীষণ সমস্যা হয়ে দাঁড়াবে। কারণ খাদ্য, আলো, বাতাস সব কিছুই অপ্রতুল হয়ে পড়বে। মানুষে মানুষে শত্রু হয়ে যাবে বীভৎস লড়াই। একজনকে সরিয়ে আর একজন নিজের বাঁচার অধিকারকে কায়েম করতে চাইবে। সে লড়াই-এর পরোয়ানা জারী করার দিনাঙ্ক স্থির হয়ে গেছে। সব কিছু এখন নির্ভর করছে আমাদের শুভবুদ্ধির উপর।

পরিবার পরিকল্পনা সপ্তাহ পালিত হচ্ছে সারা দেশে। ছোট্ট পরিবার শান্তির নির্ঝর। এতে ঝামেলা কমে না শুধু পরিবারের আয় সুষমভাবে বণ্টন করে দেওয়া যায় সকলের মধ্যে—যার ফলে সবাই সমান সুযোগ পায় ভবিষ্যৎ সৌধ রচনার পক্ষে। সরকারী উদ্যোগে এ সম্পর্কে নানা উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছে, সাফল্যও পাওয়া গেছে। কিন্তু সরকারী উদ্যোগের উপর একান্ত নির্ভরশীল না থেকে আমাদের ব্যক্তিগতভাবেও সচেষ্ট হতে হবে। বর্তমান হারে লোকসংখ্যা বৃদ্ধির গুরুত্ব আমরা সবাই বুঝি এবং এও জানি যে, এভাবে চললে আগত এবং অনাগতদের জীবন আমরাই দুর্বিষহ করে যাবো। তাই সকলকে সতর্ক হতে হবে। কারণ সমস্যাটা আমার—আপনার সকলের।

চালতার আচার

টক আচার : বেশ বড় দেখে পাকা চালতা দুটো, একশো বা দেড়শো গ্রাম আন্দাজ ভাল আখের গুড়, পঁচিশ গ্রাম সরিষা, গোটা ছয়-সাত শুকনোলংকা, পরিমাণ মত নুন ও চা-চামচের ছয়-সাত চামচ সরিষার তেল।

চালতা দুটোকে খুলে খোসা ছাড়িয়ে লম্বা লম্বাভাবে কুটে ধুয়ে রাখুন। জল ঝরে গেলে শিলে রেখে সামান্য একটু আধ-থেঁতো করে পরিমাণমত নুন, সামান্য একটু হলুদ মাখিয়ে ঘন্টাখানেক বাদে বেশ ছড়িয়ে কুলো বা কলাইয়ের থালাতে দিন। কিছুক্ষণ রোদে দেবার পর দেখা যাবে চালতার হরহরে ভাবটা শুকিয়ে এসেছে। যদি ঐ সময়ের মধ্যে না শুকোয় তাহলে আরো একটু রেখে তারপর তুলে ভাল জায়গায় ঢাকা দিয়ে রেখে দিন। এইবার সরিষা লংকা বেছে নিয়ে খুব করে রোদে দিয়ে গরম হলে পর সুন্দরভাবে শিলে গুঁড়িয়ে নিন। ঝাল যাঁরা বেশী পছন্দ করেন তাঁরা লংকার পরিমাণ কিছুটা বাড়িয়ে নিতে পারেন। পরের দিন ঐ হলুদমাখা চালতার উপর গুড়, সামান্য একটু নুন, সরিষা, লংকার গুঁড়ো, তেল দিয়ে ভালভাবে মেখে রোদে দিন। দিন পাঁচ-ছয় ধরে রোদে দিন ও তুলে রাখুন। মাঝে মাঝে নেড়েচেড়ে দিতে হবে। যখন দেখা যাবে কাঁচা-মশলা ও তেলের গন্ধ চলে গেছে, তখন বোয়ামে তুলে দিন। আবার সাত-আট দিন পরে একটু রোদে দিন। বেশ কিছুদিন রাখার পর দেখা যাবে মজে গিয়ে নরমভাব ধারণ করেছে। এইবার খেতে বেশ সুস্বাদু হবে। মাঝে মাঝে একবার একবার রোদে দেওয়া দরকার। প্রথম দফায় খুব বেশী রোদে দিলে চালতাগুলি একেবারে শুকিয়ে চিমসে হয়ে যাবে। সেই জন্য প্রথমে পাঁচ-ছয় দিন রোদে দিয়ে আবার কিছুদিন অন্তর অন্তর রোদে দিয়ে আচারটিকে তৈরী করে নিতে হয়।

গুড় আচার : বড় পাকা চালতা তিনটি, ভাল আখের গুড় আটশো গ্রাম, পাঁচফোড়ন চল্লিশ গ্রাম, শুকনো-লংকা চার-পাঁচটি (ঝাল বেশী পছন্দ করলে আরো লংকা বাড়িয়ে দেওয়া যায়)।

চালতা ছাড়িয়ে মাঝারি আকারে টুকরো করুন। গা থেকে খোসাগুলি ছাড়িয়ে ধুয়ে ঝুড়িতে রাখুন। জল ঝরে গেলে শিলেতে রেখে সামান্য ছেঁচে নিন। এমনভাবে ছেঁচা দরকার যাতে মাঝারি টুকরোগুলি ছেড়ে না যায়। সামান্য থেঁতো করে নেওয়ার প্রয়োজন হল ভালভাবে মিষ্টি যাতে প্রবেশ করে। চালতা ছেঁচবার পর ঐ টুকরোগুলিতে খুব সামান্য নুন, সামান্য হলুদ মাখিয়ে বেশ ছড়িয়ে রেখে একটু রোদে শুকিয়ে নিতে হবে। তাহলে চালতার হরহরে ভাবটি থাকবে না। খুব বেশী রোদে যেন না রাখা হয়। বেশী রোদে শুকিয়ে গেলে গুড় আচার ভাল হবে না।

এইবার এনামেলের পাত্রে বা কলাইয়ের পাত্রে গুড় দিয়ে ও দুই কাপ আন্দাজ জল দিয়ে উনানে চাপান। গুড় গলে এলে ফুটন্ত অবস্থায় আস্তে আস্তে চালতার টুকরোগুলিকে ছাড়তে হবে। কলাই-এর চামচ দিয়ে আস্তে আস্তে নাড়তে থাকুন। গুড় ঘন হয়ে এলে এবং চটচটে হলে পর নাবিয়ে রাখুন। দু-তিনদিন রোদে দিন। এইবার পাঁচফোড়ন লংকা সামান্য ভেজে নিয়ে গুঁড়িয়ে আচারটির মধ্যে দিন। কিছুদিন রেখে তারপর খাওয়া দরকার। দেখা যাবে সুন্দর গন্ধ পাওয়া যাচ্ছে, স্বাদও চমৎকার হয়েছে।

একটা কথা মিষ্টি আচার তৈরী করবার সময় একটু চেখে নেওয়া দরকার, ঠিকমত মিষ্টি হল কিনা। মিষ্টি ঠিকমত হওয়া দরকার। অনেক সময় চালতা খুব বেশী টক থাকে। সেইজন্য যে মাপের গুড়ের উল্লেখ আছে, তার চাইতে বেশীও লাগতে পারে। কম মিষ্টি হলে আচারের মধ্যে টক গন্ধ বেরোয় ও ছাতা পড়ে যায়। স্বাদ যায় নষ্ট হয়ে। আর যেসব পাত্রে তরিতরকারী, মাছ, ডিম, পেঁয়াজ রান্না হয়, সেই পাত্রে কখনও যেন আচার তৈরী না হয়। এতে আচারের স্বাদের পার্থক্য হয়, শীঘ্র নষ্ট হয়ে যায়। আচার করতে হলে উনানের নরম আঁচ করা দরকার।

চালতাশুকনো : টাটকা পাকাচালতাকে খোলা ছাড়িয়ে লম্বা লম্বা করে একটু সরু সরু মত কুটে নিয়ে, ধুয়ে জল ঝাড়িয়ে নুন মাখিয়ে রোদে দিন। বেশ কিছুদিন ধরে নেড়েচেড়ে শুকিয়ে নিতে হবে। নইলে ছাতা পড়ে যাবে। মাঝে মাঝে রোদে দিতে হবে। যখন চালতা পাওয়া যায় না, সেই সময় অম্বল রেঁধে খাওয়া যায়।

—হেমপ্রভা মল্লিক

পরী আর নাগরের গল্প

পরেশ সাহা

এ-পাড়ে সুখচর ও পাড়ে সোনাকান্দি। মাঝখানে একটি খাল। চর গোবিন্দপুরের খাল। সুখচরের বাসিন্দা জেলেরা, সোনাকান্দিতে নম। জেলেরা জাল বায়। মাছ ধরে। সেই মাছ নিয়ে তারা রূপগঞ্জের বাজারে যায়। মাছ বেচে। এই মাছ-বেচা পয়সায়ই তাদের দিন গুজরান হয়। সংসার চলে।

নমদের কাজ আলাদা। তারা চাষ-বাস করে। যাদের নিজের জমি নেই, তারা অন্যের ক্ষেতে জন খাটে। কেউ কেউ কেরাইয়া নৌকো বায়। কেউ আবার ঘরামি-কাঠমিস্ত্রির কাজ করে। এইভাবেই সুখে-দুঃখে তাদের দিন কেটে যায়।

সুখচর আর সোনাকান্দি আলাদা গ্রাম। কিন্তু গ্রাম আলাদা হলে কি হবে, সেখানকার অধিবাসীরা নিজেদের আলাদা মনে করে না। জেলেদের গঙ্গা পুজোয় নমদের নিমন্ত্রণ হয়। নমদের নীল উৎসবে জেলেদের। তা-ছাড়া বিয়ে-সাদী, সংকীর্তন-মহোৎসবে একে অন্যকে সমাদর করে।

'একখান তো খালের ফারাক, তাই বইলা আমাগোর মোনও ফারাক অইয়া যাইবো নাকি? ও পাচুদা' কওনা দেহি।' বলে সুখচরের ছিদাম রাজবংশী সোনাকান্দির পাঁচু সর্দারের হাত জড়িয়ে ধরে।

পাঁচু, মানে সোনাকান্দির পঞ্চানন সর্দার হাসে। হাসতে গিয়ে কাশ ফুলের মতো শাদা তার দাড়ির গোছা হিলহিল করে নাচে।

বলে, 'তা অইব ক্যান্? তা অইব ক্যান্? মোন আমাগোর ফারাক অইব ক্যান্? মোন আমাগোর এক। বাপ-ঠাকুর্দার যেমুনটি ছেল, ঠিক তেমুনটি।'

'হ, হ। পাশাপাশি গেরাম, মায় প্যাটের দুই ভাই। দুইডা শুধু নাম। তাগোর মোনের ভাগাভাগি কিসের?' ছিদাম রাজবংশী আর পাঁচু সর্দারের কথায় কথা যোগ করলো সোনাকান্দির নটবর মণ্ডল।

সত্যি, সুখচর আর সোনাকান্দি মায়ের পেটের ভাইয়ের মতোই ছিল। দু' গ্রামের বাদ-বিবাদের কথা কেউ শোনে নি কোন কালে।

কিন্তু একদিন সে বিবাদ দেখা দিল। শুধু বিবাদ নয়, ট্যাটা, বল্লম, গুলাই নিয়ে সুখচর আর সোনাকান্দি মুখোমুখি দাঁড়াল। চর গোবিন্দপুরের খাল দু' পক্ষের হল্লা-চিৎকারে ধ্বনিত-প্রতিধ্বনিত হলো।

আর তার জন্য দায়ী পরী আর নাগরের সৃষ্টিছাড়া প্রেম।

সুখচরের মাধাই রাজবংশীর ছেলে নাগর। বয়েস বেশি নয়। কিন্তু নয়া মাটির কলাগাছের মতো তার বাড় বেশি। অর্থাৎ ষোলতেই যেন ষোলকলা।

সেই নাগর 'ভেসাল' বইতো চর গোবিন্দপুরের খালে। মাছ ধরতো। 'ভেসালে'র ঠুঁটায় পা দিয়ে জালটি যখন টেনে তুলতো সে, রূপো ঝিক্‌মিক্ মাছগুলো তিড়িং তিড়িং করে লাফাতো সে জালের গায়। জালের উপর তারা যেন হুলুস্থুল বাঁধিয়ে বসতো।

সে সময় যারা কলসী কাঁখে জল নিতে আসতো চর গোবিন্দপুরের খালে, তারা বিস্ময় ভরা চোখে তাকিয়ে থাকতো জালের উপর ছুটন্ত মাছগুলোর দিকে। কারো কারো দৃষ্টি আবার মাছ ছেড়ে ছিটকে পড়তো 'ভেসালি' নাগরের ফনফনু করে বেড়ে ওঠা ষোল বছরের দেহের উপর।

নাগরচন্দ্রের মিষ্টি হাসি তাদের সে দৃষ্টিকে অভ্যর্থনা জানাতো। কোন কোন সময় সে আবার দু' এক কলি গানেও টান দিত। তাতে মেয়েদের দৃষ্টির সঙ্গে তাদের মুখও হেসে উঠতো। হাঁস-রাঙা সলাজ মুখ তক্ষুনি তারা ফিরিয়ে নিত নাগরচন্দ্রের দিক থেকে।

নাগর জালের কানি ধরে বার কয়েক ঝাঁকুনি দিত। মাছগুলি ছুটে এসে জড়ো হতো জালের মাঝখানে। সেখানে এসেও তাদের তিড়িং তিড়িং লাফানো থামতো না।

নাগর মুখে একটা শব্দ করে বলতো, 'রইস্, রইস্ হালা, একবার যহন কান্‌চি, তহন কি আর ছাড়া পাবি? পাবি না। মাইনষে কি বান্দে, ছাইড়া দিবার লিগা?'

নাগর তখন আবার তার হাসি-চকচক দুটি চোখের চঞ্চল দৃষ্টি মাছ থেকে উঠিয়ে কলসী নিয়ে দাঁড়ানো মেয়েদের দিকে ছুঁড়ে দিত। কারো চোখে গিয়ে এক মুহূর্তের জন্যে সে দৃষ্টি মিলতোও। চড়াই-চপল সে দৃষ্টিকে তক্ষুনি আবার সরিয়ে এনে সে মাছের উপর ফেলতো। তারপর জালের কানি ধরে বার কয়েক আবার ঝাঁকি মেরে মাছগুলিকে নায়ের 'ডগরা'য় রাখতো। নায়ের ডগরায় পড়েও মাছগুলি ছটফট করতো। নাগরচন্দ্রের চোখের দৃষ্টি তক্ষুনি আবার উড়ে যেতো কলসী কাঁখে খালের পারে দাঁড়ানো মেয়েদের দিকে।

মেয়েদের প্রসন্ন মুখ নাগরের চপল দৃষ্টিকে অভ্যর্থনা জানাতো। সে অভ্যর্থনার উত্তাপ আবার ফিরে আসতো নাগরচন্দ্রের মনে। তাতে শীতকালের কন্‌কনে উত্তুরে হাওয়ায়ও নাগর ঘামতো। আঙুল দিয়ে কপালের ঘাম কেচে ফেলে সে চর গোবিন্দপুরের খালে আবার জাল ফেলতো। এইভাবেই তার চোখে এসে সোনাকান্দির দয়াল সরকারের তেরো বছরের মেয়ে পরীর চোখ মিলেছিল।

পরী যেন কি! টিয়ে রঙা অতো বড়ো শাড়ি দিয়েও যেন সে তার বার বছরের দেহটিকে ঢাকতে পারে না। ফুরফুরে বাতাসে বুকের আঁচল উড়ে উড়ে পড়ে। সে আঁচল টানতে গিয়ে আড় চোখে সে একবার নাগরচন্দ্রের মুখের দিকে তাকিয়ে নেয়। আর তার চোখে চোখ পড়তেই সে ফিক্ করে হেসে ওঠে।

হাসে নাগরচন্দ্রও।

তার মুখের হাসি চোখে লাগে। চোখও হাসে।

তার মাছ ধরা চোখের দৃষ্টি হঠাৎ আবার চঞ্চল হয়ে ওঠে। পরীর দেহের

খাঁজে খাঁজে তা আছাড়-পিছাড় পাড়ে। আর তারই বাড়ি খেয়ে পরী সচেতন হয়। তার মুখে হাসির বদলে ভয়ের ছায়া নামে।

কাঁখের কলসীটা খালের জলে কোন রকমে ডুবিয়ে জল নিয়ে সে বাড়ী চলে যায়।

কিন্তু পরদিনই সে আসে। আসে ঠিক একই সময়ে।

তার মা শ্যামসুন্দরী বলে, 'রোজ রোজ তুই জল টানবার যাবি ক্যান্? তুই পোলাপান মানুষ, আইজ থির্যা। আইজ আমি জল লইয়া আসি।'

পরী অমনি ঝাম্‌টা দিয়ে ওঠে।

বলে, 'ইস্, আমি য্যান্ বড় অই নাই। অহনও পোলাপানই রইয়া গেলাম। থাউক, থাউক, অত মায়া দ্যাহান লাগবো না। জল আমিই আনবার পারি। তার লিগা তোমার যাওন লাগব না।'

পরী খালি কলসী কাঁখে নিয়ে খালের দিকে দৌড়ায়।

শ্যামসুন্দরী বলে, 'তাড়াতাড়ি আসিস কইলে।' পরী ছুটতে ছুটতেই উত্তর দেয় 'আইচ্ছা।'

সে উত্তর একা পরীর মায়ের কানে নয়, 'ভেসালে' বসা নাগরচন্দ্রের কানে গিয়েও বাজে। মাছ ছেড়ে এতক্ষণ সে তাঁর দৃষ্টিকে পরীদের বাড়ীর পথেই বিছিয়ে রেখেছিল।

পরীর আওয়াজে সে তা সেখান থেকে উঠিয়ে এনে আবার মাছের উপর ফেললো।

কিন্তু তার কান খাড়া রইলো পরীর পায়ের শব্দ শোনার জন্যে।

সে শব্দ দূর থেকে এগোতে এগোতে খালের পাড়ে এসে থামলো।

দৌড়ুতে গিয়ে পরীর হাঁফ ধরেছে। তার বুকটা দ্রুত ওঠা-নামা করছে।

'ভেসালে' বসে নাগরচন্দ্র সব কিছুই বুঝছে। অনুভব করছে। কিন্তু পরীর দিকে সে তাকিয়ে দেখছে না।

অভিমান?

হ্যাঁ, ঘাটে আসতে পরীর আজ একটু দেরী হয়ে গেছে। রোজ সে আরও আগে আসে। আজ আসে নি। দোষ পরীর নয়। সেজন্যে দায়ী তার মা! তার মা-ই তাকে আজ আটকে রেখেছিল। কিন্তু শেষ পর্যন্ত পরী সে বাধা ভেঙেছে। ঘাটে এসেছে। তার জন্যে অভিমান?

খালের পাড়ে কলসীটা নামিয়ে পরী বার দুই হাই তুললো। হাই তুলতে গিয়ে হাত দুটি দু' পাশে ছুড়লো। আড়মোড়া কাটলো।

কিন্তু তাতেও নাগরচন্দ্রের চোখ ফিরলো না। সে চোখের দৃষ্টি আটকে রইলো জলের উপর। জালের উপর।

অগত্যা পরী একটি মাটির ঢেলা নিল হাতে। কি যেন একবার ভাবলো। তারপর সে মাটির ঢেলা ছুড়ে মারলো খালের জলে।

জলে ধুপ করে একটা আওয়াজ হলো। সে আওয়াজে চোখ ফিরলো নাগরচন্দ্রের। দু' চোখের দৃষ্টি জল থেকে সরে এসে পরীর উপর উড়ে পড়লো।

চার চোখের তখন নীরব কথা। সে কথা মুখে প্রকাশ পায় না। চোখের আয়নায় শুধু তার ছায়া পড়ে। সে ছায়ায় দু'টি প্রাণীর উথাল-পাথাল মনের তরঙ্গ।

এভাবেই কাটলো কিছুদিন। দু'জনের দেখা হয়, কথা হয় না। চোখাচোখি হয়, তবুও কেউ কারো কাছে যায় না।

কিন্তু একদিন কথাও হলো।

সকাল থেকেই বৃষ্টি পড়ছিল। সারা-খানা আকাশ যেন আঁধার হয়ে আছে। পথে লোকজন কম। ঘাটে কেউ নেই বললেই চলে। দু'চারজন মাঝে-সাঝে যা আসে, তারাও চর গোবিন্দপুরের খালে কোন রকমে কলসী ডুবিয়ে জল নিয়ে ঘরে চলে যায়।

নাগর এসেছিল সেই সকালে।

একটি 'মাথ্‌লা' মাথায় দিয়ে সে 'ভেসালে' বসেছিল। কিন্তু বসেছিলই। মাছে তার চোখ নেই। চোখ সেই পথের দিকে, যে পথ দিয়ে পরী জল নিতে আসে।

কিন্তু পরী আসছে না।

নাগরচন্দ্রের মনটা কেমন যেন উস্‌খুস করছে। ট্যাঁক থেকে বের ক'রে একটি বিড়ি ধরালো সে। টানলো। শেষ হতে না হতেই সে আবার তা জলে ছুঁড়ে মারলো।

না, ভালো লাগছে না তার। কিছুই ভালো লাগছে না। সে 'ভেসালে'র বাঁশেই নড়ে-চড়ে বসলো। মাথার 'মাথ্‌লা'টিক ঘুরিয়ে আবার মাথায় চেপে বসালো। তারপর একখানা গানে দিল টান।

পরী আসছে। ধান ক্ষেতের 'বাতর' দিয়ে সে দৌড়ে আসছে। তার টিয়া-রঙা শাড়ীর আঁচল জলো হাওয়ায় পত্ পত্ ক'রে উড়ছে। ঘাটে কেউ নেই। পথও ফাঁকা।

নাগরচন্দ্র গলা চড়িয়ে গানে টান দিল।

'হুনগো সুইন্দরী কইন্যা
হুন দিয়া মোন,
ক্যানে বা বান্দিয়া রাকচো
অমুন যৈবোন?
(আরে) ধান পাকে, পান পাকে
আরো পাকে ফল,
(হায়রে) নারীর যৈবোন গেলে
জনম বিফল।
কইন্যা কথা হুন।'

পরী এসে খালের পাড়ে দাঁড়ালো। নাগরচন্দ্রের গান থামলে বললো, 'মাইন্দা রাখুম না তয় খুইলা দিমু নাকি?'

'ভেসাল' থেকে নাগরচন্দ্র উত্তর দেয়, 'হ।'

'ইস্, খোকন য্যান্ সস্তা। কইলেই খুইলা দিয়ন যায়।'

'সস্তা নয় তয় দাম নাকি?

'তবে কি?'

'আইচ্ছা, দ্যাহোন যাইব।'

'দেইহো।' বলে পরী জলে নামলো। কলসী দিয়ে জলের উপরে ঢেউ দিতে দিতে এক সময় সে জল ভরলো। তারপর ভরা কলসী কাঁখে নিয়ে সে পাড়ে উঠলো।

'ভেসাল' থেকে নাগরচন্দ্র বললো, 'কি কম্মবি কইয়া যা।'

থামলো পরী। মুখ ফেরালো। নাগর-চন্দ্রের মুখের দিকে তাকালো একবার। তারপর সেদিক থেকে চোখ ফিরিয়ে বললো, 'এহন না। আইজ রাইতে 'কাছ' অইব। মাখম শীলের 'মোখা কাছ'। সেহানে যাইয়ো। সেহানে কমুনে।' পরী আর দাঁড়ালো না। ধান ক্ষেতের বাতর ধরে সে আবার বাড়ীর দিকে রওনা হলো।

মাখন শীলের 'মোখা কাছের' নাম আছে। চৈত মাসে যে নীল পুজো হয়, তাতে প্রতি বছরই মাখন শীল সোনাকান্দিতে আসে। কালীর মুখোশ মুখে পরে নাচে সে কালীর নাচ। তার নামই 'মোখা কাছ'।

আজ থেকেই সে-নাচ শুরু। নাগরও জানে তা। তবুও পরীর মুখ থেকে সে খবর পেয়ে তার দেহে যেন রোমাঞ্চ হলো। জলে ভেজা শরীরও কেমন যেন গরম হয়ে উঠলো। সে আবার একটি বিড়ি ধরালো। গুন্ গুন্ ক'রে গান গাইলো। তারপর 'ভেসাল'টি গুটিয়ে রেখে নৌকো নিয়ে সে বাড়ী চললো।

কিন্তু 'কাছ' তো সেই রাতে।

তবুও দুপুর থেকেই সেখানে যাবার প্রস্তুতি শুরু করলো নাগরচন্দ্র।

গায় সে সাবান মাখলো। সাবানের পর তেল। গামছা পরে পরনের কাপড়টা সেই সাবান দিয়েই কেচে দিল।

বাড়ী ফিরলো অনেক বেলায়।

বৃষ্টি ধরেছে। আম গাছের ফাঁক দিয়ে সূর্যের আলো বারান্দায় এসে পড়ছে। নাগরচন্দ্র সেই বারান্দারই একটি বাঁশে কাপড়খানা মেলে দিল। খেলো। মেঝেয় একখানি মাদুর পেতে খানিকক্ষণ এ-পাশ ও-পাশ করলো। গুন্‌গুন্ ক'রে গান গাইলো।

তারপর এক সময় সে মাদুর ছেড়ে উঠলো।

কিন্তু তবুও বেলা যায় না।

দিনটা কি হঠাৎ বড় হয়ে গেলো? নইলে সেই কখন সে ভেসাল থেকে ফিরেছে, এখনও সন্ধ্যে হলো না।

না, দিনের মাথার ঠিক নেই।

বিরক্ত হ'য়ে নাগরচন্দ্র বাড়ীর এ-পাশ সে-পাশ ঘুরঘুর্ করলো। শিস্ দিয়ে গান গাইলো। আম গাছের মাথায় মাথায় বোল এসেছে। ভ্রমরগুলো বোলে বোলে গুঞ্জরণ তুলছে। আম গাছের সামনে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে সে তা-ও দেখলো।

তারপর এক সময় ঘরে ফিরে এলো।

যশাইতলার মেলা থেকে সে একটি আয়না কিনেছিল। অনেক দিন আগে।

আজ সেই আয়নাটি বের করে চুল আঁচড়াতে বসলো সে। তেড়ি কাটলো। উহুঁ, ঠিক হলো না। ঠিক হলো না বলে আবার ভাঙলো সে। আবার আঁচড়ালো। চিরুনির পিঠ দিয়ে চুল চেপে চেপে চুলে কাঁটি 'থাক' ফেলালো। মুখটা গামছা দিয়ে বারকয়েক ভাল করে ঘষে নিল।

কাপড় পরলো কোচা দিয়ে। চোখে দিল

গায়। তারপর নৌকো নিয়ে সে চললো সোনাকান্দি। মাখন শাঁইের 'মোথা কাছ' দেখতে।

পথেই পরীর সঙ্গে দেখা। হয়তো পরী তার জন্যেই দাঁড়িয়েছিল।

'আইচো।'

পরীই প্রথম সম্বোধন করলো নাগর-চন্দ্রকে।

নাগর বললো, 'হ, আইলাম। কি করবি কইচিলি!'

'ধ্যুৎ, কি কমু আবার। আমি অ্যাম্নেই মস্‌করা করচিলাম।' বলে পরী ফিক্‌ ক'রে হেসে ফেললো।

নাগর বললো, 'মস্‌করা করচিলি! আমি কি তর মস্‌কবার মানুষ যে আম'র লগে মস্‌করা করবি?'

পরী কিছুক্ষণ চুপ করে রইলো। এক-বার নাগরচন্দ্রের চোখের উপর দিয়ে নিজের চোখ দু'টিকে ঘুরিয়ে নিল।

তারপর বললো, 'তাইলে তুমি অমুন গান গাইলা ক্যান্‌? অমুন মন্দ কথার গান!'

'ও-গান কি আমি বান্‌চি? অন্যের বান্দা গান। হ্যা গানে যদি দোষ থাকে, তাইলে দোষ অইল তার। আমার কি?'

'না, তোমার দোষ অইব ক্যান্‌! তুমি আমার দিকে কেমুন কইরা চাইয়া চাইয়া গান কইলা, আর দোষ অইল অন্যের। খুউব মজার মানুষ তো তুমি। নিজের দোষ অন্যের ঘাড়ে চাপাইয়া দ্যাও।'

'কাছ' শুরু হয়েছে। হরেকেস্টর ঢাকে কাঠি পড়েছে। মাখন শীল আসরে নেমেছে। তার মুখোশের চূড়াটি এখান থেকেও দেখা যায়।

পরী বললো, 'কাছ' ময়মচে। লও 'কাছ দ্যাকবা না?'

'না।'

'ক্যান্, 'কাছ' দ্যাকবা না ক্যান্?'

'এম্‌তি।'

তারপর গলাটাকে আরও নামিয়ে নাগর বললো, ''কাছে' আমার কাম নাই পরী। আমার মোন ভালো নাই। তর লিগা আমার মোন কান্দে। মোনডা য্যান্ ফাং ফাং কইরা জ্বলে।' শেষ কথাক'টি বলতে গিয়ে নাগরের চোখ থেকে কয়েক ফোঁটা জল গড়িয়ে পড়লো।

পরী বললো, 'আজাইরা মোন খারাপ করো ক্যান্? আমি কি উড়াল পংখী যে উইড়া যামু?'

'পরী!'

নাগরের গলাটা কাঁপছে।

পরী বললো, 'কও।'

'আমি যে বাঁচি না!'

'ক্যান্, কি অইলো তোমার?'

'রোগ।'

'রোগ'?

পরীর গলাটাও যেন এবার কেঁপে উঠলো। তার মুখে কে যেন এক মুঠো ছাই ছড়িয়ে দিল। মুখটা ফ্যাকাশে হয়ে গেল।

নাগর বললো, 'হ। রোগ। চিন্তা রোগ।'

'ক্যান্, চিন্তা করো ক্যান্? কি চিন্তা করো।'

'তর চিন্তা। তরে ছাইড়া আমি বাঁচুম না।' বলতে বলতে নাগর খপ করে পরীর একখানা হাত নিজের হাতে নিল।

পরী বললো, 'চিন্তা করবা না। আপনা বইলা যদি ভাইবা থাকো, আমি তোমার আপনই থাকুম। কোন কালেই পর হমু না।'

সে রাতে অনেক আশা নিয়ে বাড়ী ফিরলো নাগর।

উত্তেজনায় ভালো করে ঘুম হলো না। বারে বারে ঘুম ভেঙে গেল।

জীবনে এ তার নতুন অভিজ্ঞতা। মনে কেমন যেন একটা চাঞ্চল্য। সে ঘুমোতে পারলো না। বসে থাকতেও পারলো না। বিছানা ছেড়ে উঠে গেল। খালের পাড়ে গিয়ে গানে টান দিল, গান গেয়েই রাতটা কাটিয়ে দিল।

এরপরও পরীর সঙ্গে দেখা হলো নাগরের। কোনদিন খালের পাড়ে। কোন-দিন ধানক্ষেতে। কোনদিন বা আর কোথাও।

একদিন।

আগের কথামতো ধানক্ষেতের পাশে দাঁড়িয়ে আছে নাগর। ফুরফুরে বাতাসে ধানগাছগুলি মাথা নাড়ছে। পাকা ধানগুলি ঝন্‌ঝন্ করে বাজছে।

পরী এলো।

কিন্তু অন্য দিনের মতো আজ তার মুখে হাসি নেই। চোখ ছলছল, মুখ ভার।

দেখে নাগরের প্রাণ উড়ে গেলো।

পরী বললো, 'বাবায় ট্যার পাইচে।'

'কল্ কি?'

'হ। বাবায় তো আমারে বিয়া দিবার চায়।'

'ক্যান্, বিয়া দিব ক্যান্?'

'বা-রে, আমি ডাঙর অই নাই? বাবায় কয়, দিনকাল খারাপ। ডাঙর মাইয়াকে ঘরে রাখতে নাই। কোহান দিয়া কোন্ বিপদ আইবো, তা কে কইতে পারে!'

'তুই কি কস্?'

'আমি আর কি কমু? বাবার যা মোন চায় তা-ই অইবো।'

শুনে চোখদুটি ছলছল করে উঠলো নাগরের।

বললো, 'তুই আমার পর অইয়া যাবি?'

পরী নাগরের মুখের দিকে তাকালো একবার। নাগরের চোখে জল দেখে তার নিজের চোখেও জল এলো।

বললো, 'তয় আপনার জিনিস আপনার কাচে টাইনা নিলেই পারো।'

নাগর এ-কথার উত্তর দিল না। হয়তো উত্তর তার মুখে এলো না।

পরী মিছে বলেনি। মেয়ের হাবভাব দেখে দয়াল সরকার সবই বুঝতে পেরেছিল।

বুঝে ক্ষেপে উঠেছিল সে। আর তার ঝাঁঝ গিয়ে পড়েছিল স্ত্রী শ্যামসুন্দরীর উপর।

বলেছিল, 'থাল ভইরা যে ভাত গেলো, মাইয়া সামলাইবার পারো না?'

শুনে চমকে উঠেছিল শ্যামসুন্দরী। দয়াল সরকারের এ-কথার মানে সে বুঝতে পারেনি। আর তা পারেনি বলেই সে স্বামীর মুখের দিকে হাঁ করে তাকিয়েছিল।

দয়াল সরকার গলাটা নীচু করে আরো অনেক কিছু বলেছিল।

কিন্তু চিৎ হয়ে থু থু ছিটালে নিজের বুকেই পড়ে। তাই ব্যাপারটা নিয়ে আর ঘাটাঘাটি করেনি দয়াল সরকার। সব কথাকে চাপা দিয়ে সে পাত্রের সন্ধান করছিল।

এতোদিনে পাত্র মিললো। নয়াচকের হারান মণ্ডলের ছেলে রমাকান্ত।

হারান মণ্ডল কালই পরীকে আশীর্বাদ করতে আসছে।

পরীর পিছনে সকলের সজাগ দৃষ্টি। বাড়ী থেকে সে বেরোতে পারে না। ঘাটে যেতেও তার মানা।

তাই নাগরের সঙ্গে আজকাল তার দেখাও হয় না। শেকল বাঁধা পাখির মতো ঘরে বসেই সে ছটফট করে। আর মনে মনে নাগরের 'ভেসালে'র স্বপ্ন দেখে। 'ভেসালে'র জালে তিড়িং তিড়িং করে লাফিয়ে ওঠা রুপো-চকচক মাছগুলিও যেন সে দেখতে পায়।

নাগরের কথা ভাবতে গিয়ে দু'চোখ দিয়ে তার জল পড়ে।

কিন্তু তার আশীর্বাদের কথা শোনার পর থেকেই সে-জল আরও বেড়েছে। দু-চোখ ফুলে লাল হয়েছে। হাত-পাগুলি শিথিল। দমও যেন বন্ধ হয়ে আসতে চায়।

'নাগর? নাগর কি সত্যি তার পর হয়ে যাবে।' ভাবতে গিয়ে পরীর মাথাটা যেন ঘুরে যায়।

রাত হয়। অন্ধকার নামে। লোকালয়ের পথ-ঘাট জনশূন্য। মাঝে মাঝে শুধু শেয়ালের হুক্কা-হুয়া রব রাতের নীরবতাকে ভঙ্গ করছে।

মায়ের পাশে পড়ে আছে পরী।

মায়ের চোখে ঘুম। ঘুম নেই পরীর চোখে। বুকের ভেতর যেন কাঁটা ফুটেছে। সেই কাঁটার জ্বালায় সে শুধু ছটফট করছে। নাগরের মুখটি বারবার মনে পড়ছে। তার কথাগুলি ফিরে ফিরে কানে আসছে।

না, না। নাগরকে ছেড়ে পরী বাঁচবে না। তার পক্ষে বাঁচা অসম্ভব। নাগরকে তার চাই।

মায়ের পাশ থেকে উঠলো পরী। আস্তে আস্তে দোর খুললো। বাইরে বেরুলো।

বাইরে অন্ধকার। চারপাশ নিঃঝুম। চর গোবিন্দপুরের খালটা যেন একটি শাদা কাপড়ের মতো সটান হয়ে পড়ে আছে।

ধান ক্ষেতের আল ধরে পরী সেই খালের দিকেই রওনা হলো।

'নাগরদা'!'

এতো রাতে পরীর কণ্ঠ শুনে চমকে উঠলো নাগর। তাড়াতাড়ি কুপিটা জ্বালিয়ে সে বাইরে বেরুলো।

'পরী!'

ভিজে কাপড়ে পরী কাঁপছে। তার দু'টি ঠোঁট কাঁপছে থরথর করে।

নাগরই আবার বললো, 'পরী অ্যাতো রাইতে আইলি কৈ থিকা? কাপড়ই বা ভিজা ক্যান্?'

'খাল সাঁতরাইয়া আইচি।'

বিস্মিত হলো নাগর। কুপিটা নামিয়ে পরীর হাতদু'খানি চেপে ধরে বললো, 'কস্ কি? অ্যাতো রাইতে সাঁতার দিয়া আইলি? তর ডর করলো না?'

'না। ডর কইরা কি করুম। ডর করলিই তো মরণ অইত। তার থিকা খালে ডুইবা মরি।' বলতে বলতে পরী নাগরের বুকের উপর নিজের মুখটা চেপে ধরলো।

বললো, 'তুমি আমারে লইয়া লও। যিখানে মোন চায় লইয়া লও। তোমারে ছাইড়া আমি বাঁচুম না। বাঁচবার পারুম না।'

পরীর চোখের জল নাগরের বুককে ভিজিয়ে দিল।

খানিকক্ষণ চুপ করে কি যেন ভাবলো নাগর। তারপর পরীর মাথায় হাত বুলোতে বুলোতে বললো, 'ল', নাওয়ে ল।'

ঘাটেই নৌকো বাঁধা ছিল। নাগর পরীকে এনে তাতে তুললো। তারপর 'পাড়া'র লগিটি টেনে তুলে নৌকো দিল ছেড়ে।

চর গোবিন্দপুরের খাল ধরে তারা গিয়ে ধলেশ্বরী নদীতে পড়বে। পুব আকাশে জ্বল-জ্বল-করা নক্ষত্রটাই—তাদের একমাত্র নিশানা।

গৌরাঙ্গ পরিজন

অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্ত

তিন পুরুষের পার্ষদ

(৩৫)

সদাশিব কবিরাজ

বৈদ্যবংশে জন্ম, বাপের নাম কংসারি সেন। সদাশিবেরই ছেলে পুরুষোত্তমদাস। পুরুষোত্তমদাসের ছেলে কানু ঠাকুর।

এরা তিন পুরুষের গৌরপার্ষদ।

এ এক বিরল দৃষ্টান্ত।

গৌরাঙ্গ গয়া থেকে ফিরলে তাকে সবাই দেখে অবাক হয়ে গেল। সে বিদ্যোদ্ধত নিমাই কেমন সুনম্র হয়ে গিয়েছে।

আপনাদের আশীর্বাদে গয়া থেকে এলাম। বলছে আর কাঁদছে নিমাই।

বয়োজ্যেষ্ঠেরা তার বুকে হাত বুলিয়ে আশীর্বাদ করল। শান্তিলানন্দ গোবিন্দপ্রসন্ন হোন।

কিন্তু, যাই বলো, নিমাই এত কাঁদছে কেন? তার বন্ধুরা ভেবে আকুল হল। এমন তো কই তাকে দেখিনি কখনো। গয়ায় সে কী দেখে এল? কী নিয়ে এল সেখান থেকে? কৃষ্ণ কৃপা করলে এমনি কাঁদতে হয় নাকি দিন-রাত?

শ্রীমান পণ্ডিতকে নিমাই বললে, তোমরা আজ বাড়ি যাও। কাল তুমি আর সদাশিব শুক্লাম্বরের বাড়ি যেয়ো. মুরারিকেও সঙ্গে নিয়ো। সেখানে নির্জনে আমি তোমাদেরকে বলব আমার দুঃখের কথা।

সদাশিব নবদ্বীপ লীলার একজন অন্তরঙ্গ সঙ্গী।

গৌরাঙ্গের সান্ধ্যকীর্তন আসরে সদাশিব, সদাশিব আবার জগাই-মাধাই-উদ্ধার-যাত্রায়। গঙ্গাস্নান-মহোৎসবেও শ্রীমান আর মুরারির পাশে সেই সদাশিব। চন্দ্রশেখরের বাড়িতে গোপিকা-নৃত্যের দিন যে দুজনের উপর সাজসজ্জার ভার তাদের একজন সদাশিব।

পাণিহাটিতে রঘুনাথদাস যে দই-চিঁড়ের উৎসব করেছিল, গঙ্গাতীরে পুলিন-ভোজনের রঙ্গ, সেখানে মুরারি কমলাকরের সঙ্গে সদাশিব বসে।

তারপর চৈতন্য দর্শনের কামনায় যে ভক্তদল চলল নীলাচলে তার মধ্যেও সদাশিব অন্তর্ভুক্ত।

সদাশিবের একমাত্র ছেলে পুরুষোত্তম-দাস। দ্বাদশ গোপালের একজন; কেউ কেউ বলে, নাগর পুরুষোত্তম। সাত বছর বয়স থেকেই কৃষ্ণের জন্যে উন্মাদ।

পুরুষোত্তম দেবকনন্দনের গুরু। দেবকীনন্দন কে? নবদ্বীপের সেই দুর্দান্ত বৈষ্ণবদ্বেষী ব্রাহ্মণ, চাপাল-গোপালই দেবকী-নন্দন।

গোপাল ডাকনাম আর চাপাল বোধহয়, চপল বা বাচালের অপভ্রংশ। লোকটা যেমন উদ্ধত তেমনি কটুভাষী।

রাত্রে শ্রীবাসের অঙ্গনে নিত্য কীর্তন হয় গোপালের তা অসহ্য লাগে। একদিন চুপি শ্রীবাসের সদর দরজার সামনে ভবানীপুজোর উপকরণ সাজিয়ে রেখে দিল। কলার পাতায় করে জবাফুল, হরিদ্রা সিন্দুর রক্তচন্দন—সঙ্গে এক ভাঁড় মদ। সকালে যে এখান দিয়ে যাবে সে দেখবে আর দেখে সিদ্ধান্ত করবে এ নৈবেদ্য শ্রীবাসেরই সাজানো। নৈবেদ্যে কে মদ দেয়? যে মাতাল তারই ঐ নির্বাচন। সুতরাং সন্দেহ কী, শ্রীবাসই মাতাল? মাতাল কি একলা শ্রীবাস? যতগুলো লোক দ্বার রুদ্ধ করে সারারাত উদ্দণ্ড কীর্তন করে তারা সবাই মদোন্মত্ত।

সকালে উঠে দরজা খুলে শ্রীবাসই প্রথম এই ভবানী-নৈবেদ্য আবিষ্কার করল। শিষ্ট-সজ্জন সবাইকে ডেকে এনে দেখাল অঘটন।

দেখুন, আমার কাণ্ড দেখুন। রোজ রাত্রে আমি মদ দিয়ে ভবানীপুজো করি!

সবাই হাহাকার করে উঠল। এ কোন দুরাচারের কাজ! তার অদৃষ্টে না জানি কী নিদারুণ দুর্ভোগ আছে!

দেখতে-দেখতে, তিন দিনের মধ্যে গোপাল-চাপালের কুষ্ঠ হল। ভক্তবিদ্বেষের বিষ ব্যাধি হয়ে দেখা দিল সর্বাঙ্গে।

গঙ্গার ঘাটে গাছের নিচে বসে আছে গোপাল। প্রভু যাচ্ছেন পাশ দিয়ে, গোপাল বলে উঠল, গ্রাম সম্পর্কে আমি তোমার মামা, আমার দিকে তাকাও।

প্রভু বিমুখ হয়ে রইলেন।

গোপাল বললে, কুষ্ঠের যন্ত্রণা আর সহ্য করতে পারছি না, আমাকে উদ্ধার করো।

প্রভু ক্রোধকণ্ঠে গর্জে উঠলেন, তুই ভক্তদ্বেষী, তোর ত্রাণ নেই। কুষ্ঠকীটের দংশনে তুই জন্ম জন্ম কষ্ট পাবি। তোকে কে উদ্ধার করবে? পাষণ্ড সংহার করব বলেই তো আমি অবতীর্ণ হয়েছি। পাষণ্ড সংহার না হলে ভক্তির প্রতিষ্ঠা হবে কী করে?

প্রভু গঙ্গাস্নান করতে চলে গেলেন।

প্রাণ আর প্রাণান্তকর কষ্ট নিয়ে পড়ে রইল গোপাল।

তারপর সন্ন্যাস নিয়ে প্রভু চলে গেলেন নীলাচলে। সেখান থেকে যখন বৃন্দাবনের পথে গৌড়ে এলেন, জননী ও জাহ্নবীকে দেখবার জন্যে, তখন থামলেন কুলিয়ায়, নবদ্বীপের ওপারে। তখন কুষ্ঠী গোপাল এসে প্রভুর পায়ে পড়ল।

এত দিনে প্রভুর কৃপা হল। বললেন, তোমার অপরাধ শ্রীবাসের কাছে, তার কাছে গিয়ে শরণ নাও। সে যদি প্রসন্ন হয় আর তুমি যদি ভবিষ্যতে আর ভক্তবিদ্বেষ না করো তাহলে তোমার কুষ্ঠ সেরে যাবে।

ভগবানকে বিদ্বেষ করলে ভগবানের কিছু যায় আসে না, কিন্তু তার ভক্তকে বিদ্বেষ করলে ভগবান বিদ্বেষীকে শাস্তি দেন।

সেই চাপাল-গোপালের গুরু পুরুষোত্তম। চাপাল-গোপাল বা দেবকীনন্দন একজন পদকর্তা। তার পদাবলীর নাম 'বৈষ্ণববন্দনা'।

ইষ্টদেব বন্দো শ্রীপুরুষোত্তম নাম।
সাত বৎসরে যার শ্রীকৃষ্ণ উন্মাদ ।।

পুরুষোত্তমের ছেলে কানু ঠাকুর।

আগে এদের শ্রীপাট ছিল বেলডাঙায়, সেখান থেকে চলে আসে সুখসাগরে।

সুখসাগরে এক যোগীপুরুষের আস্তানা। কত কাল ধরে যে একাসনে ধ্যাননিমগ্ন হয়ে বসে আছে কেউ জানে না। লোকের যখন এ বিষয়ে চেতনা হল তখন সেই যোগী আর কোথায়, বিরাট এক মৃত্তিকার পিণ্ড। কেউ কেউ বলে এ মাটির ঢিবির নিচেই সাধু ধ্যানস্থ হয়ে আছে।

কে এক কুম্ভকার মাটির খোঁজে এসে-ছিল এ অঞ্চলে। কিছু না জেনে শুনেই ঢিবিতে মারল কোদালের ঘা। আঘাত সেই যোগীর কাঁধে লাগল। তার ধ্যান ভেঙে গেল।

কোথায় যায়, যোগী পুরুষোত্তমের গৃহে এসে অতিথি হল। কিছু ভিক্ষে দাও মা।

পুরুষোত্তমের স্ত্রী জাহ্নবী অতিথিকে প্রাণভরে সেবা করল। যোগী তাকে বর দিতে চাইল।

জাহ্নবী কোনো বরের প্রত্যাশী হয়ে সেবা করেনি।

তা আমি জানি, মা। দেখতে পাচ্ছি তোমার সন্তান নেই। তাই বর দিচ্ছি তোমার একটি পুত্র হোক।

জাহ্নবীর বুক ভরে উঠল।

কিন্তু কে সে পুত্র?

কে?

মা, আমিই তোমার পুত্র হয়ে জন্মাব। আমার কাঁধে এই অস্ত্রাঘাত, আমাকে দেখে চিনতে পারবে।

সত্যি? জাহ্নবী উৎফুল্ল হয়ে উঠল।

কিন্তু এ কথা কারু কাছে প্রকাশ করবে না। প্রকাশ করলেই তুমি মরে যাবে।

যথাসময়ে জাহ্নবীর ছেলে হল।

সুস্থ হয়ে নিরিবিলিতে দেখতে গেল ছেলের কাঁধ। আশ্চর্য, সেখানে স্পষ্ট চিহ্ন। আপন মনে হাসল জাহ্নবী।

সে বড় পরিতৃপ্তির হাসি। ধাত্রীর চোখ এড়াতে পারল না। ধাত্রী বললে, হাসলে কেন?

অমনি।

অমনি কেউ এমন সুন্দর করে হাসে? তুমি যেন কী দেখলে লুকিয়ে। চিনলে ছেলেকে। বলো না কেন হাসলে?

পীড়াপীড়ির কাছে হার মানল জাহ্নবী। বললে, তোমাকে যা বলছি কাউকে যেন বোলো না। বলে পূর্বকথা সে প্রকাশ করে দিল।

জাহ্নবীর অসুখ করল। ছেলের যখন বারো দিন বয়স তখন সে মারা গেল।

পুরুষোত্তমের স্ত্রী জাহ্নবী আর নিত্যা-নন্দ ঘরণী জাহ্নবী পরস্পর সই পাতিয়ে-ছিল। খড়দায় যখন খবর পৌঁছুল পুরুষো-ত্তমের স্ত্রী মারা গেছে, তখন নিত্যানন্দ নিজে এসে ছেলেটিকে নিয়ে গেলেন। মাতা জাহ্নবী অপার পুত্রস্নেহে পালন করতে লাগলেন শিশুটিকে।

নিত্যানন্দ তার নাম রাখলেন কৃষ্ণদাস।

মাতা জাহ্নবী যখন বৃন্দাবনে গেলেন তখন শিশু কৃষ্ণদাসকেও সঙ্গে নিলেন। কৃষ্ণদাসকে যে দেখে সেই মুগ্ধ হয়ে যায়। দেখে তার দু-নয়নে এক মহা-অনুভব উজ্জ্বল হয়ে রয়েছে। আর সংকীর্তনে যখন সে নাচে তখন কে বলবে সেই স্বয়ং মদন-গোপাল নয়?

তারপর কৃষ্ণদাস কী সুন্দর বাঁশি বাজায়!

এইসব ভাবচেষ্টা দেখে ব্রজবাসীরা তার নাম রেখেছে কানাই ঠাকুর। জীব গোস্বামী বললে, কানু ঠাকুর।

বৃন্দাবনে কীর্তনানন্দে নাচছে কানু ঠাকুর, তার ডান পায়ের নূপুরটি খসে পড়ল হঠাৎ। কোথায় নূপুর? কেউ খুঁজে পেল না।

কানু ঠাকুর বললে, যেখানে নূপুর পাওয়া যাবে আমি সেখানে বসবাস করব।

খুঁজতে-খুঁজতে পাওয়া গেল যশোর জেলার 'বোধখানা' গ্রামে। কানু ঠাকুর বোধ-খানায় বাসা বাঁধল।

(৩৬)

রামানন্দ বসু

কুলীন গ্রামে কায়স্থকুলে আবির্ভাব, বাপের নাম লক্ষ্মীকান্ত বসু, পিতামহ মালাধর বসু। মালাধরের রাজদত্ত উপাধি গুণরাজ খান। লক্ষ্মীনাথের রাজদত্ত উপাধি সত্যরাজ খান। রামানন্দ রাজার কাছ থেকে কোনো উপাধি পায়নি, পেয়েছে গৌরহরির কাছ থেকে। সে উপাধি 'বৈষ্ণবতম'।

রামানন্দ গৌরাঙ্গের নবদ্বীপলীলার সহচর। সে নিজেই পদরচনা করেছে, কেমন কীর্তনলীলায় মত্ত হয়েছেন প্রভু।

চৌদিগে গোবিন্দধ্বনি শুনি পহু হাসে।
কম্পিত অধরে গোরা গদগদ ভাষে॥
নাচয়ে গৌরাঙ্গ যার সঙ্গে নিত্যানন্দ।
অবনি ভাসল প্রেমে বাড়ল আনন্দ।।
গোবিন্দ মাধব বাসু গায়েন মুকুন্দ।
ভুলিল কীর্তনরসে পায়া নিজবৃন্দ।।
বঙ্গিয়া সঙ্গিয়া সে অমিয়ারসে ভোর।
বসু রামানন্দ তাহে লুবধ চকোর।।

প্রভু সন্ন্যাস নিলে রামানন্দও নিদারুণ শোকে আচ্ছন্ন হল। মাঘ মাসে সন্ন্যাস গ্রহণ বলে মাঘকে রামানন্দ 'পাপী মাঘ' বললে আর এখন ফাল্গুনে সে যখন পদ-রচনা করছে তখন কিনা সুখময় বসন্ত! গদাধরের সঙ্গে প্রাণনাথকে আবার কবে দেখতে পাব নদীয়ায়?

পাপী মাঘে পহুঁ করিল সন্ন্যাস।
তবহি গেও মঝু জীবন-আশ।।
দিনে দিনে ক্ষীণতনু ঝরয়ে নয়ন।
গোরা বিনু কতদিন ধরিব জীবন।।
অবহু বসন্ত বসহু সুখময়।
এ ছার কঠিন প্রাণ বাহির না হয়।।
যত যত পীরিতি করল পহুঁ মোর।
সোঙরিতে জীউ পরে কাউকি ভোর।।
কহে রামানন্দ সোই প্রাণনাথ।
কবে নিরখিব আর গদাধর সাথ।।

নীলাচললীলার বৈশিষ্ট্যও ধরা আছে এই প্রত্যক্ষদর্শীর রচনায়।

নাচয়ে চৈতন্য চিন্তামণি।
বুক বাহি পড়ে ধারা মুকুতা গাঁথনি।।
প্রেমে গদগদ হৈয়া ধরণী লোটায়।
হুহুংকার দিয়া খেনে উঠিয়া দাঁড়ায়।।
ঘন ঘন দেন পাক ঊর্ধ্ব বাহু করি।
পতিত জনারে পহু বোলায় হরি হরি।।
হরিনাম করে গান জপে অনুক্ষণ।
বুঝিতে না পারে কেহ বিরল লক্ষণ।।
অপার মহিমাগুণে জগজনে গায়।
বসু রামানন্দ তাহে প্রেমধন চায়।।

যারা কুলীনগ্রামের লোক তারা সকলেই চৈতন্যপ্রাণধন। বিশেষত মালাধর বসু 'শ্রীকৃষ্ণবিজয়' নামে গ্রন্থ লিখেছেন, সে গ্রন্থ কতবার পড়েছেন প্রভু। বলছেন, এমন গ্রন্থ যে লিখেছে তার বংশের হাতে নিজেকে বিকিয়ে দেব এ আর বেশী কথা কী।

বলছেন, কুলীনগ্রামের লোকদের বিরাট ভাগ্য। এখানে সবাই কৃষ্ণ নাম বলে। তাই, মানুষ বলছ কী, কুলীনগ্রামের কুকুরও আমার প্রিয়।

প্রভু কহে কুলীনগ্রামের যে হয় কুকুর।
সেও মোর প্রিয় অন্যজন বহুদূরে।।
কুলীনগ্রামীর ভাগ্য কহন না যায়।
শূকর চরায় ডোম সেহ কৃষ্ণ গায়॥

সত্যরাজ ও রামানন্দ একসঙ্গে এসেছে নীলাচলে। 'খণ্ডের সম্প্রদায়ে'র মত কুলীন-গ্রামেরও এক 'কীর্তনিয়া সমাজ' আছে, তারাও রথযাত্রায় প্রভুকে নিয়ে কীর্তন করে। সব মিলে সাত সম্প্রদায়, কুলীনগ্রামের সম্প্রদায়ে সত্যরাজ আর রামানন্দই অগ্রণী। 'শ্রীবৈষ্ণব-ঘটামেঘে হইল বাদল। সংকীর্তনামৃতসহ বর্ষে নেত্রজল।।'

রামানন্দ প্রভুকে জিজ্ঞেস করলে, প্রভু, আমরা গৃহস্থ ও বিষয়ী, আমাদের সাধন কী?

প্রভু বললেন, কৃষ্ণসেবা, বৈষ্ণবসেবা আর নিরন্তর কৃষ্ণনামকীর্তন।

সত্যরাজ বললে, বৈষ্ণব চিনব কী করে?

যে মুখে একবার কৃষ্ণনাম বলবে সেই বৈষ্ণব।

সেই বৈষ্ণব?

হ্যাঁ, সেই পূজ্য সেই শ্রেষ্ঠ।

শুধু একবার কৃষ্ণনাম?

শুধু একবার। প্রভু বললেন, এক কৃষ্ণনামে সমস্ত পাপের ক্ষয় হয়, নববিধা ভক্তির জাগরণ ঘটে। নামে দীক্ষা পুরশ্চর্যা কিছু লাগে না। জিভে স্পর্শ হওয়া মাত্রই আচণ্ডাল সমস্ত প্রাণী উদ্ধার হয়ে যায়। কিন্তু আসল ফল কী জানো? আসল ফল কৃষ্ণপ্রেম। আর যদি একবার কৃষ্ণপ্রেম জাগে সংসারবন্ধন আপনা থেকেই খসে পড়ে।

পরের বছর আবার এসেছে পিতা-পুত্র। পরের বছরও প্রভুর কাছে তাদের সেই জিজ্ঞাসা, গৃহস্থ বিষয়ীর কর্তব্য কী?

প্রভু মৃদু হেসে বললেন, শুধু দুটি। বৈষ্ণবসেবা আর নামসংকীর্তন।

আবার প্রশ্ন হল : বৈষ্ণব কে?

বৈষ্ণব কে, তোমাদের আগে বলে-ছিলাম। এবার শোনো বৈষ্ণবতর কে? যার মুখে নিরন্তর কৃষ্ণনাম বিরাজিত সেই বৈষ্ণবতর। তোমরা সেই বৈষ্ণবতরের সেবা করো।

কে বৈষ্ণবতম [illegible] উত্তরের জন্যে আরো এক বছর [illegible] তারা।

[illegible] জিজ্ঞেস করলে, প্রভু বৈষ্ণবতম কে?

যাকে দেখামাত্রই মুখে কৃষ্ণনাম এসে যায় সেই বৈষ্ণবতম। 'যাঁহার দর্শনে মুখে আসে কৃষ্ণনাম। তাঁহারে জানিহ তুমি বৈষ্ণবপ্রধান।'

তুমি—তোমরা কৃষ্ণের নামমূর্তি হয়ে ওঠো। হয়ে ওঠো বৈষ্ণবতম।

আরে মোর গৌরকিশোর।
সহচর স্কন্ধে পহু ভুজযুগ আরোপিয়া
নবমী দশায় হল ভোর।।
পড়িয়া ক্ষিতির পরে মুখে
বাক্য নাহি সরে
সাহসে পরশে নাহি কেহ।
সোনার গৌরহরি কহে হায় মরি
তন্তুক দোসর ভেল দেহ।।
থির নয়ন করি মথুরার নাম ধরি
রোয়ে পহু হা-নাথ বলিয়া।
বসু রামানন্দ ভণে গৌরাঙ্গ এমন কেনে
না বুঝিলুঁ কিসের লাগিয়া।।

একবার পাণ্ডুবিজয়ের দিন একগাছি পট্টডোরী ছিঁড়ে গেল, আর বালিশ ফেটে গিয়ে তুলো পড়ল বেরিয়ে।

পাণ্ডুবিজয় কী?

হাত ধরে শিশুকে যে হাঁটতে শেখানো হয় তার নাম পাণ্ডু। জগন্নাথকে মন্দির থেকে রথের উপর হাঁটিয়ে নিয়ে যাবার নাম পাণ্ডুবিজয়। মন্দির থেকে রথ পর্যন্ত তুলোর বালিশ পাতা থাকে, তারই উপর দিয়ে নিয়ে যাওয়া হয় বিগ্রহকে। সেবক-দের কেউ ধরে কাঁধ, কেউ কটি, কেউ হাত কেউ পা। কটিতট বাঁধা থাকে পট্টডোরী দিয়ে। সেবকরা ডোরীর দুই দিক ধরে পাণ্ডুবিজয় করায়।

ডোরী ছিঁড়ে যাবার পর প্রভু ডাকালেন রামানন্দকে। বললেন, তোমরা এই পট্টডোরীর যজমান হও। প্রতি বৎসর তোমরাই ডোরী তৈরি করে আনবে। দেখো ডোরী যেন দৃঢ় হয়, যেন ছিঁড়ে না যায়।

সেই থেকে প্রতি বছর রামানন্দ পাণ্ডু-বিজয়ের পট্টডোরী নিয়ে আসে।

রামানন্দ গাইছে :

কীর্তন রসময় অগম অগোচর
কেবল আনন্দকন্দ।
অখিল লোকগতি ভকত প্রাণপতি
জয় গৌর নিত্যানন্দ চন্দ।।
হের পতিতগণ করুণাবলোকন
জগ ভরি করল অপার।
ভবভয়ভঞ্জন দুরিত নিবারণ
ধন্য শ্রীচৈতন্য অবতার।।
হরিসংকীর্তনে মাতল জগজন
সুর নর নগ পশু পাখী।
সকল বেদসার প্রেমসুধাধার
দেয়ল কাহু না উপেখি।।
ত্রিভুবনমঙ্গল নামপ্রেমবলে
দূরে গেল কলি আঁধিয়ার।
শমন ভবন পথ সবে এক রোধল
বঞ্চিত রামানন্দ দুরাচার।। (ক্রমশঃ)

(পূর্ব প্রকাশিতের পর)

অফিসে গিয়ে কোটটা খুলে হ্যাঙগারে ঝুলিয়ে রাখলো প্রদীপ, তারপর চেয়ারে বসতেই আয়ার ঘরে ঢুকে তাকে উইস্ করল নম্রভাবে। লোকটার মুখেতে ধূর্ততার ছাপটা স্পষ্ট ফুটে রয়েছে। আয়ার চেয়ারে বসার পর প্রদীপ প্রশ্ন করল, মিঃ আয়ার, আমাদের বেহালার ফ্যাক্টরী কেমন চলছে ?

ভালই স্যার।—

স্ট্রাইকের কথা আপনি জানতেন না ?

তা কি করে জানব স্যার, ওরা আমায় কিছুই বলেনি।

আপনার কোয়ার্টার্সে আলতাফের দল অত যাওয়া-আসা করে কেন ?

কি জানেন স্যার, ওরা কোনরকম বিপদে পড়লেই আমার কাছেই ছোটে—তা সে অসুখই হোক আর ছেলেমেয়ের বিয়েই হোক।

শুনে খুব আনন্দিত হলাম মিঃ আয়ার। বাই দি ওয়ে, ডিজেলের ক্র্যাংক-সাফট্ আর ফুয়েল ইঞ্জেকসান ইকুইপ-মেণ্টের বেশ কিছু পরিমাণের হিসেব আমরা পাচ্ছি না; তার হিসেব সম্বন্ধে কিছু বলতে পারেন ?

কেন স্যার, পিলভিট্ আর বেরামপুর প্লান্টে সেগুলো ত লেগে গেছে। সঙ্গে সঙ্গে উত্তর দিল আয়ার।

আপনি ভুল করছেন মিঃ আয়ার, ও-দুটো কাজে অন্য জিনিস পাঠান হয়েছিল, আমি আপনাকে মনে করিয়ে দিচ্ছি। পিল-ভিটে অয়েল ফিলটার ট্রাইমিং ফিল্ডার আর স্টারটিং অয়েল অ্যাটমাইজার কিছু কিছু পাঠান হয়েছিল আর বেরামপুরে অয়েল পাম্প আর সাম্প না পাঠানর জন্যে ওখান-কার কাজ প্রায় বন্ধ হয়ে রয়েছে। এই দেখুন ইরেকসান ইঞ্জিনীয়ারের টেলিগ্রাম। কাগজটা আয়ারের সামনে টেবিলের ওপর ফেলে দিল প্রদীপ।

আমি হিসেব আগেই দিতাম কিন্তু স্যার আপনার বিপদের কথাটা শুনে আর আপনাকে বিরক্ত করিনি।

আয়ারের ধূর্ত মুখভাবটা একবার দেখল প্রদীপ, তারপর বলল, ব্যক্তি-গত ব্যাপারের সঙ্গে অফিসিয়াল ডিউটির কোন সম্পর্ক থাকতে পারে না মিঃ আয়ার। যাই হোক, পরশু দুটোর মধ্যে আপনার হিসেব যেন পাই, দ্যাটস্ অল, মিঃ আয়ার।

আয়ার বেরিয়ে যেতে প্রদীপ ক্লান্ত হয়ে চেয়ারে হেলান দিয়ে বসল, উত্তেজনার পর শিথিল হয়ে এল তার সর্বাঙ্গ। একটু পরেই টাইপ-করা একটা চিঠি নিয়ে ঘরে ঢুকল শুক্লা, সোজা হয়ে আবার বসল প্রদীপ। চিঠিটা পড়ে অবাক হয়ে গেল সে।

গত রাতের ডাইরেক্টার্স বোর্ডের মিটিং-এ একটা জরুরী সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে। সম্প্রতি ইউ কের রাস্টন হর্নসবি, ডোরম্যান লং এবং ডেভি প্যাক্সম্যান কম্পানী—যারা তাদের স্পেসিফিকেশান অনু-যায়ী ডিজেল ইঞ্জিন, ট্রাক্টার, বুলডোজার প্রভৃতি পাঠাত, তাদের সঙ্গে লেনদেন সম্বন্ধে ডি-ভ্যালুয়েশানের আওতায় পড়ে নানা ঝামেলার উদ্ভব হয়েছে। এ সম্বন্ধে বিশদভাবে আলোচনার জন্যে বোর্ড তাকেই ইউ কে-তে প্রতিনিধি মনোনীত করেছে।

চিঠিটা পড়া শেষ হলে লক্ষ্য করল শুক্লা তখনও দাঁড়িয়ে রয়েছে—মুখে তার স্নিগ্ধ হাসি। প্রদীপ বলল, এরা আমায় মনোনীত করলে কি করে তা আমি বুঝতে পারছি না, আমি ত হত্যার দায়ে ঝুলছি।

সে-কথা মেম্বাররা জানেন, উত্তর দিল শুক্লা; যদি কোন কারণে আপনার যাওয়া না হয়, তাহলে মিঃ শর্মার নামও রেখেছেন ওঁরা, তারপর একটু থেমে বলল, আপনি মিথ্যেই ভয় পাচ্ছেন।

না, ভয় নয় লজ্জা পাচ্ছি, আমি জানি গতকাল পুলিশ আপনাদের বাড়ী গিয়ে আপনাদের অযথা উত্ত্যক্ত করেছে। আমার জন্যে আপনাদের ওপর এভাবে পীড়ন হচ্ছে সেটাই আমাকে লজ্জা আর দুঃখ দিচ্ছে বেশী। আমার পারিবারিক জীবনের এই দুর্ঘটনা আমাকে আঘাত করেছে সত্যি, যেটা আমার ব্যক্তিগত ক্ষতি কিন্তু তার প্রভাব আর একটা জীবনে গিয়ে পড়বে এটাই আমায় শুধু কাঁটার মত বিঁধছে অহরহ।

শুক্লা ধীর শান্ত কণ্ঠে বলল, আপনি ভুল করছেন মিঃ বোস, আমি মেয়েছেলে বলে আমায় দুর্বল ভাববেন না। এ-ধরনের বিপদে আমি অভ্যস্ত নই এ-কথা ঠিক; কিন্তু তাই বলে সেটার মুখোমুখি হতে ভয় পাব না আমি। একটা নিশ্বাস ফেলল শুক্লা, তারপর বলল, আপনি জানেন আমার বৃদ্ধ বাবা ছাড়া আমার কেউ নেই—সেটাই আমার মনোবল বাড়িয়ে দিয়েছে, শক্ত করেছে আমাকে নানাভাবে। বিপদ আমার সামনে অনেকবার এসেছে, ওর মূর্তিটা আমার অপরিচিত নয়।

ঝন্ঝন্ করে টেলিফোনটা বেজে উঠল

অকস্মাৎ। প্রদীপ ফোনটা কানে দিয়ে শুধু শুনল, কোন জবাব দিল না। তারপর সেটা রেখেই চেয়ার ছেড়ে উঠে পড়ল। কোটটা পরতে পরতে শুধু বলল, আমি পুলিশ স্টেশানে যাচ্ছি কখন ফিরব জানি না।

অশোক রায় হোটেল সাম্বায় খোঁজ করে জানল যে, মিতা গত দুদিন ক্যাবারেতে যোগদান করেনি। ম্যানেজারও এ-বিষয়ে তাকে কোন খোঁজ দিতে পারল না। এ-দুদিন অশোক রায় একবার মেহেতার স্টুডিও আর একবার হোটেল সাম্বায় ছুটে বেরিয়েছে। মিতার অন্তর্ধানে মেহেতাও খুব মুশড়ে পড়েছে বলে মনে হল তার। মনে মনে এটা সে জানত যে, হোটেল সাম্বায় শেষপর্যন্ত মিতার একটা সন্ধান সে পাবে, তাই আজ সকাল থেকেই সে হোটেলের কাছে ঘোরাফেরা করছিল।

হঠাৎ পুলিশের সুব্রত চৌধুরীর সংগে দেখা হয়ে গেল তার।

মিঃ রায়, আপনি কি সকালবেলাতেই নাচ দেখতে এসেছেন নাকি? সুব্রত চৌধুরী বলল।

না, নাচ নয়; তবে যে-নাচে তাকেই খুঁজছি বটে—উত্তর দিল অশোক।

তাকে পাবেন না—।

কেন বলুন ত?

তিনি এখন দেশছাড়া বলতে পারেন।

তার মানে? অশোক উদ্বিগ্ন হল।

আর মানে মিলি দেবীর ছদ্মবেশে তিনি উধাও হয়েছেন।—কথাটা বলে সুব্রত চৌধুরী হোটেলের মধ্যে ঢুকে পড়ল।

স্তম্ভিত হয়ে দাঁড়িয়ে রইল অশোক রায়। কথাটা সে বিশ্বাস করতেই পারল না, মিতা কেন মিলির ছদ্মবেশে বাইরে চলে যাবে একথা বুঝতে একটু সময় লাগল তার। নিজের কর্তব্য ঠিক করে ফেলল সে। মিতার অন্তর্ধানের কারণটা তাকে খুঁজে বার করতে হবে যে কোনো প্রকারে।

একটা ট্যাক্সী নিয়ে অশোক সোজা মার্লিন রোডের মিতার ফ্ল্যাটের দিকে রওয়ানা হল। একটু দূরে ট্যাক্সীটা থামিয়ে নেমে পড়ল সে। ভাড়াটা চুকিয়ে ফুটের ওপরে বাড়ীগুলোর গা ঘেঁসে ফ্ল্যাটবাড়ীটার ভেতরে ঢুকে পড়ল চট করে। লিফটের দিকে সে গেল না, পাশের সিঁড়ি দিয়ে সন্তর্পণে উঠতে লাগল। মিতার সংগে কয়েকবারই এ ফ্ল্যাটে এসেছে, সুতরাং জায়গাটা তার পরিচিত। কর্মচঞ্চল ফ্ল্যাটবাড়ী। বেয়ারা, বাবুর্চি, স্কুলের ছেলেমেয়ের দল, দুধ আর অন্যান্য ফেরীওয়ালা তার পাশ দিয়ে উঠতে নামতে লাগল বার বার। তাদের দিকে তাকাল না অশোক রায়— এমন কি কোটের কলার দুটো তুলে দিয়ে নিজের মুখটাও অদৃশ্য রাখতে চেষ্টা করল। ধীরে ধীরে সে তিনতলায় উঠে মিতার স্যুইটের বন্ধ দরজার সামনে দাঁড়িয়ে রইল কয়েক সেকেন্ড। এদিক ওদিক তাকিয়ে একবার বন্ধ দরজার ওপর কান রেখে ভেতরের কোন শব্দ শুনতে পাওয়া যায় কিনা তার চেষ্টা করল। কে যেন কয়েকবার পায়চারি করছে বলে মনে হল তার একবার ড্রয়ার টানার শব্দটাও অস্পষ্টভাবে তার কানে এল। সিঁড়িতে পায়ের আওয়াজ পেয়ে অশোক জায়গাটা থেকে একটু সরে দাঁড়াল তখুনি। কেউ তাকে সন্দেহ করলে বিপদ ঘটবে। দলটা পার হয়ে গেলে দরজার লকটা ঘুরিয়ে ঘরের মধ্যে ঢুকে পড়ল নিঃশব্দে।

প্রথমেই বসবার ঘর, সেটা পার হলেই মিতার বেড-রুম। পায়ের শব্দটা বেড-রুম থেকেই আসছে। পর্দার আড়াল থেকে লুকিয়ে দেখতে লাগল অশোক রায়। শান্তনুকে চিনতে দেরী হল না তার। লোকটাকে হোটেল সাম্বায় অ্যাকর্ডিয়ান আর ভায়োলিন বাজাতে দেখেছে সে। এখন তার পরনে সার্চস্কীন জ্যাকেট বা গলায় বো-বাঁধা নেই, পরনে একটা প্যান্ট আর হাওয়াই সার্ট রয়েছে মাত্র। চেহারার জৌলসও নিষ্প্রভ, হোটেলে যে স্মার্টনেস আর চটক দেখেছিল চেহারায়, এখন সেটা অদৃশ্য হয়ে গিয়েছে।

মিতার অনুপস্থিতিতে লোকটা চোরের মত ফাঁকা ঘরের মধ্যে নিশ্চয় কোন সৎ উদ্দেশ্যে আসেনি। আজ তাকে বড় ব্যস্ত বলে মনে হল অশোকের। টেবিলের ড্রয়ারগুলো খোলা অবস্থায় খাটের ওপর রাখা হয়েছে আর তার মধ্যের জিনিসগুলো ছত্রাকারে মেঝে থেকে খাটের ওপর পর্যন্ত এলোমেলোভাবে ছড়ান রয়েছে। শান্তনু এবার খাটের তলা থেকে একটা স্যুটকেস বার করে কি যেন ভরতে লাগল তাড়াতাড়ি। অশোক আর দেরী করল না, পরদা সরিয়ে ভেতরে ঢুকে পড়ল।

মুখ তুলে তাকাতেই শান্তনু দেখতে পেল একজন দীর্ঘদেহী লোক দরজা আড়াল করে দাঁড়িয়ে আছে। স্যুটকেসের ডালাটা বন্ধ করে শান্তনু বিরক্তিভরে তাকিয়ে জিজ্ঞেস করল, কাকে চাই আপনার?

মিতা দেবীকে, অশোক কয়েক পা ভেতরে গেল।

কেন, কি দরকার? শান্তনুর কণ্ঠস্বর রুক্ষ।

যা দরকার তাকেই বলব, শান্তভাবে উত্তর দিল অশোক।

জিজ্ঞেস না করে ঘরে ঢুকেছেন কার হুকুমে, আপনি কে?

সে কৈফিয়ৎ আমি আপনাকে দেব না, তার আগে আমি জানতে চাই আপনি কে, আর মিতাদেবীর অনুপস্থিতিতে আপনিই বা ঘরে ঢুকেছেন কেন?

আমি জবাব দেব? ইউ ব্লাডি সোয়াইন, আঙুল তুলে চাপাকণ্ঠে বলে উঠল শান্তনু গেট-আউট!

অশোক নড়ল না, শুধু একটু হেসে বলল, বাঃ বেশ ভাল গালাগাল দিতে পারেন দেখছি। ভদ্রলোকের মত দেখতে বটে কিন্তু ভাষাটা তেমন ভাল ঠেকছে না। কথাটা শেষ হতেই শান্তনু বলল, বেরিয়ে যাও—আবার বলছি বেরিয়ে যাও, তা না হলে—।

তা না হলে—অশোকের ভ্রূক্ষেপ নেই।

আই উইল কিক ইউ আউট, একটু এগিয়ে এল শান্তনু।

মিতা কোথায়?

আই সি; অ্যানাদার লাভার—দাট বীচ—রাগে শান্তনুর মুখটা বিকৃত হয়ে গেল, টেবিলের ওপর থেকে একটা গ্লাস তুলে সজোরে ছুঁড়ে মারল অশোকের দিকে। মাথাটা সরিয়ে নিল অশোক—গ্লাসটা দেয়ালে লেগে সশব্দে মেঝেতে পড়ল। অশোক এগিয়ে গেল আরও, মুখে তার হাসিটা লেগে রয়েছে।

অশোক দেখতে চায় লোকটা কি করে। হোটেলে যে বাজনা বাজায় তার আর দৌড় কতদূর হতে পারে? মিতার মত প্রফেসনাল মেয়ের এ ধরনের লোকের সংগে মেলামেশা করা অবশ্য স্বাভাবিক, সেটা কিছু বড় কথা নয়। কিন্তু হঠাৎ তাকে এরকম রহস্যজনকভাবে দেশ ছেড়ে যেতে হল কেন এবং এই লোকটার সঙ্গে তার কিছু যোগাযোগ আছে কিনা সেটা তার জানা দরকার।

অশোক রায়কে এগুতে দেখে শান্তনু ভয় পেল না, শক্ত হয়ে দাঁড়িয়ে রইল শুধু।

মিতা কোথায়? আবার প্রশ্ন করল অশোক। তার কথাটা শেষ হওয়ার সংগে সঙ্গে শান্তনুর মুষ্টিবদ্ধ ডান হাতটা অশোকের বুকের ওপর সজোরে এসে পড়ল। সাধারণ লোক হলে এধরনের প্রচন্ড আঘাতে তৎক্ষণাৎ ধরাশায়ী হোত, সে বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই। কিন্তু অশোক এ আঘাতটা আশা করেই এগিয়েছিল, তাছাড়া তার নিজের ওপর আস্থা ছিল প্রচুর, লোহার মত মাংসপেশীতে শান্তনুর আঘাত প্রতিহত হল, অশোকের কোন ক্ষতিই হোল না।

এবার অশোক রায়ের পালা—ডান হাতের তালুটা সোজা রেখে ধারালো অস্ত্রের মত ব্যবহার করল সেটা। শান্তনুর গলা এবং কাঁধের সংযোগস্থলে তরোয়ালের ভংগীতে তার হাতটা এসে পড়ল। শান্তনুর কি হল, তা সে নিজেই বুঝতে পারল না—নিঃশব্দে মেঝের ওপর লুটিয়ে পড়ল সংগে সংগে। অশোক রায় সেদিকে ফিরেও তাকাল না। ফলাফল সম্বন্ধে তার নিজের কোন সংশয় ছিল না। খাটের ওপর ছড়ান জিনিসগুলোর দিকে একবার তাকিয়ে অশোক বাইরের বারান্দায় একবার দেখে এল। সেখানে আর কাউকে দেখতে পেল না, অন্যান্য ঘর আর বাথরুমের ভেতরটাও দেখতে ভুলল না সে।

ফিরে এসে স্যুটকেশের ডালাটা খুলে জিনিসগুলো দেখতে লাগল তন্নতন্ন করে। কাপড়-জামাই বেশী তবে প্লাস্টিকের প্যাকেটের মধ্যে ডি ডি টি লেখা কয়েকটা পুরিন্দা দেখতে পেল স্যুটকেসের নীচের দিকে—এত ডিডিটি'র হঠাৎ প্রয়োজন কেন হল তা বুঝতে পারল না সে। ডালাটা বন্ধ করে সে অপর দিকে রাখা ড্রেসিংটেবিলটার সামনে গিয়ে দাঁড়াল। এবার ড্রয়ারগুলো খুলে মিতার অন্তর্ধানের কোন হদিস পাওয়া যায় কিনা তারই খোঁজ করতে শুরু করল একমনে।

ড্রেসিংটেবিলের আরশিতে অস্পষ্টভাবে একটা ছায়া লক্ষ্য করার সংগে মুখ ঘোরাতেই ভারী অ্যাসট্রেটা সজোরে তার চিবুকের ওপর এসে পড়ল। আচমকা আঘাতে অশোক হতভম্ব হয়ে গেল, দেখল দূরে শান্তনু দাঁড়িয়ে রয়েছে। মুখটা তার বিকৃত—ঠোঁট দুটো ফাঁক হয়ে দাঁতের সারি বেরিয়ে আছে বিসদৃশভাবে। তাড়াতাড়ি রুমাল দিয়ে রক্তের ধারাটা বন্ধ করতে চেষ্টা করল অশোক। আড়াআড়িভাবে চিবুকের ধার থেকে ঠোঁটের

কোণ পর্যন্ত একটা গভীর ক্ষত হয়েছে অ্যাসল্টের আঘাতে। অশোক কিন্তু বুঝতে পারে না লোকটা তার জাপানী জুডোর আঘাতের প্রতিক্রিয়াটা এত তাড়াতাড়ি সামলে নিল কিভাবে। হাওড়া স্টেশনে যে দাগী গুন্ডাটাকে এর স্বাদ পেতে হয়েছিল, সে পুরো চার ঘণ্টা অজ্ঞান ছিল বলে তার মনে পড়ল। আশ্চর্য হল অশোক রায়, তাই শান্তনুকে বলল—আই সি, কোয়াইট এ টাফ কাস্টমার! বাঃ বেশ শক্ত লোক বলে মনে হচ্ছে।

তা না হলে কি তোর মত পেটমোটা মাড়োয়ারী—আঘাতের পর ভাষাটা পালটে গিয়েছে শান্তনুর, মুখোসটা যেন খুলে গিয়েছে অকস্মাৎ। শান্তনুর খাটের ওধার থেকে বলল, পরস্ত্রীর সঙ্গে প্রেম করার শখ মেটাব তোর—আই উইল টিয়ার ইউ টু বিটস—টুকরো টুকরো করে ছিঁড়ে ফেলব তোকে।

উত্তম প্রস্তাব, তাহলে সেই চেষ্টাই করা যাক, কথাটা বলে অশোক কয়েক পা এগিয়ে গেল। শান্তনু খাটের সামনে এসে দাঁড়াল কিছুদূরে।

কয়েক সেকেন্ড ওরা পরস্পরের দিকে বক্তপাখীর মত তাকিয়ে রইল শুধু। দুজনেরই চোখের পলক পড়ছে না, উভয়ই অপর পক্ষের দুর্বল মুহূর্তটার সুযোগ নেওয়ার চেষ্টায় রয়েছে। দুজনেরই দৃষ্টি স্থির, অবিচল ভঙ্গী আর সংকুচিত মাংসপেশী।

শান্তনু কল্পনাই করতে পারেনি অতদূর থেকে অশোক তার ভারী দেহ নিয়ে কি করে অত দ্রুত তার এত কাছে এসে পড়তে পারে। কেবলমাত্র পায়ের মাংসপেশীর জোরে অশোক লাফিয়ে নিমেষের মধ্যে শান্তনুর সামনাসামনি এসে তার মুখের ওপর প্রচন্ড মুষ্টাঘাত করল। শান্তনুর মনে হল তার মাথার খুলি আর মুখের অস্থিগুলো চূর্ণবিচূর্ণ হয়ে গিয়েছে একসঙ্গে।

এবার আর ভুল করল না অশোক রায়। ড্রেসিংটেবিলের পাশে রাখা টুলটা নিয়ে এসে শান্তনুর জ্ঞানহীন দেহের সামনে বসে রইল। অশোকের চিবুকের ক্ষত দিয়ে ফোটা ফোটা রক্ত বয়ে চলেছে অনর্গলভাবে। রুমাল দিয়ে রক্তাক্ত মুখটা মুছল সে, কিন্তু তাতে কোন ফল হল না, কারণ রুমালটা অনেক আগেই রক্তে ভিজে গিয়েছে। সার্টটা খুলে অশোক মুখটা ভালভাবে মুছে নিল। মেঝের ওপর শান্তনুর অসাড় দেহের দিকে তাকিয়ে দেখল ভাল করে। লক্ষ্য করল, লোকটার ডানহাতের বাহুতে একটা উল্কি আঁকা রয়েছে—এধরনের জিনিস ইদানীং তার চোখে পড়েনি। নিরীক্ষণ করে দেখল, দুটো পাতায় ঘেরা একটা উলঙ্গ নারীমূর্তি আর তলায় ছোট করে ইংরাজীতে দুটো অক্ষর লেখা রয়েছে—পি, জি। এবার প্রতিপক্ষের মুখটা দেখল অশোক—মানুষের মুখ বলে আর চেনা যাচ্ছে না সেটা। নাক আর মুখের সব জায়গাটি জুড়ে প্রকান্ড একটা রক্তাক্ত ক্ষত হয়ে রয়েছে শুধু। হাতের কাজটার তারিফ করল সে নিজেই।

লোকটাকে যত তুচ্ছ সে প্রথমে ভেবেছিল, ততটা ভেবে নেওয়া উচিত হয়নি। লোকটা যে শুধু শক্ত তাই নয়, অনেক কায়দা-কানুনও জানে বলে মনে হল। অশোক রায় শুধু ব্যায়াম-সংক্রান্ত প্যাঁচগুলোই আয়ত্ত করেছে, কিন্তু এ লোকটা কৌশলী—সুযোগ-সুবিধাগুলো প্রতিবার অক্লেশে ব্যবহার করেছে ত্রুটিহীন পদ্ধতিতে। স্নায়ুর আর মনের জোরও অপরিমিত বলে মনে হল তার। আশ্চর্য হল অশোক—এই ভেবে অবাক লাগল যে, একজন শিল্পী কি করে এধরনের ক্ষমতা অর্জন করল।

শান্তনুর শ্বাসটা ধীরে ধীরে বইছে। স্পন্দনহীন দেহটার দিকে আর একবার তাকিয়ে উঠে পড়ল অশোক। তৃষ্ণা পেয়েছে তার। ঘরের কোণের টেবিলে রাখা কাঁচের জগ থেকে এক গ্লাস জল এক নিশ্বাসে পান করে ফেলল, তারপর আর এক গ্লাস জল নিয়ে টুলের ওপর আবার গিয়ে বসল সে। শান্তনুর মুখে গ্লাসের জলটা সজোরে ছুঁড়ে দিল অশোক। জলটা শান্তনুর মুখের কিছুটা রক্ত নিয়ে মেঝের ওপর দিকে গড়িয়ে যেতে লাগল সরুধারায়। দেহটা তার কেঁপে উঠল একটু। লোকটা বেঁচে আছে দেখে আশ্বস্ত হল অশোক রায়, মরে গেলে তাকে নতুন জালে জড়িয়ে ফেলত পুলিশ, একটা ত এমনিতেই ঝুলছে তার মাথার ওপর।

তৃপ্তির নিশ্বাস ফেলল সে। হঠাৎ ধূমপানের একটা অদম্য ইচ্ছে জাগল তার, মনে হল সে যেন অনেকদিন সেই প্রিয় আস্বাদ থেকে বঞ্চিত হয়ে রয়েছে। কটু আর তেজস্কর স্বাদটার চিন্তা তার প্রত্যেক রক্তকণিকাকে বুভুক্ষু করে তুলল এক নিমেষে। নীচু হয়ে ট্রাউজারের পকেটে হাতটা ঢোকাল সে।

আহত হয়ে পড়ে যাবার কিছুক্ষণ পরেই শান্তনুর জ্ঞান হয়েছে, কিন্তু চিন্তার সূত্রগুলো এলোমেলো হয়েছিল, একটা আচ্ছন্ন ভাব তার মনকে কুয়াশার অন্ধকারে ঘিরে ছিল এতক্ষণ।

অশোকের জলের ঝাপটা তাকে সেটা থেকে মুক্তি দিল। ধীরে ধীরে মনের ভারসাম্য ফিরে আসাতে তার কৌশলী মস্তিষ্ক চাঙ্গা হয়ে উঠল একমুহূর্তে। পাইপটার জন্য অশোক পকেটে হাত দিতেই অসতর্ক মুহূর্তটা কাজে লাগাল শান্তনু। পায়ের গোড়ালি দিয়ে সে সজোরে অশোকের তলপেটে আঘাত করল। টুলশুদ্ধ উল্টে পড়ে গেল অশোক রায়। তীব্র যন্ত্রণায় অশোক কয়েক সেকেন্ডের জন্যে জ্ঞান হারিয়ে ফেলল বটে, কিন্তু দেহের আর মনের সব জোর দিয়ে নিজেকে ধরে রাখল সে। অস্পষ্টভাবে অশোক দেখতে পেল লোকটা খাট ধরে গাছ বেয়ে ওঠার ভঙ্গীতে হাতের জোরে দাঁড়িয়ে ওঠার চেষ্টা করছে প্রাণপণে।

শান্তনুর মুখটা আবার দেখতে পেল অশোক। কপালের একদিকটা বীভৎসভাবে ফুলে রয়েছে, যার জন্যে সেদিকের চোখটা আর দেখা যাচ্ছে না, সম্পূর্ণ ঢেকে গিয়েছে। মুখের প্রায় সবটাই একটা বড় রক্তপিন্ডের মত দেখাচ্ছে যেন। এরকম জোরালো লোক এর আগে অশোক দেখেনি আর। তার অবস্থা যদি এ-ধরনের হোত, তাহলে সে নিশ্চয় এত তাড়াতাড়ি সামলে উঠতে পারত না, মনে মনে অশোক লোকটার শক্তির আর সহ্যগুণের প্রশংসা করল।

তখনও অশোকের সমস্ত শরীরে অসহ্য যন্ত্রণা হচ্ছে, তার মনে হল, জ্বলন্ত সাঁড়াশি দিয়ে তার সবল মাংসপেশীগুলো সজোরে কে যেন টানছে বারবার। কিন্তু এ-যন্ত্রণা তাকে জয় করতেই হবে, লোকটা ওঠবার আগেই তার কাছে গিয়ে পোঁছুতে হবে। ওইটুকু জায়গা অনেক বলে মনে হল অশোকের। তা হোক, তাকে বাঁচতে হলে এছাড়া আর কোন উপায় নেই—লোকটাকে আক্রমণ করতে হবে কোন সুযোগ না দিয়েই। কিন্তু উঠে কয়েক পা যাবার আগেই শান্তনু ট্রাউজারের পিছনের পকেট থেকে রিভলবারটা বার করে তুলে ধরল সোজা অশোকের দিকে, তারপর চীৎকার করে উঠল, নাউ আই উইল স্যুট ইউ লাইক এ ডগ, ইউ বাস্টার্ড! কুকুরের মত মারব তোকে।

ডোণ্ট মুভ, পিটার গোমেস—ঘরের মধ্যে যেন বজ্রাঘাত হল, কথার সঙ্গে সঙ্গে অশোক টুলটা ছুড়ল শান্তনুর দিকে, তার হাতের রিভলবারটা ছিটকে মেঝেতে পড়ল সশব্দে। পর্দার পাশ থেকে সুব্রত চৌধুরী ঘরের মধ্যে ঢুকল, তাকে দেখে শান্তনু বলে উঠল, হু দি হেল—।

সেকি! পুলিশকে এরি মধ্যে ভুলে গেলে গোমেস্—মেঝে থেকে রিভলবারটা তুলে নিল সুব্রত চৌধুরী। অশোক রায়ের দিকে

তা করে সুব্রত বলল, ইউ হ্যাভ মেড এ মিস-টেক মিঃ রায়, আবার আপনি অযথা ঝুঁকি নিয়েছেন। ইউ হ্যাভ টেকেন দি ল ইন ইওর ওন হ্যান্ডস্ এগেন—আবার আপনি নিজের হাতে আইন নিয়েছেন। এটা একজন আইনজ্ঞ লোকের পক্ষে অপরাধ। হোটেল সাম্বায় যখন আপনার সঙ্গে দেখা হল, তখন যদি জানতাম আপনি এখানে আসছেন, তাহলে বাধা দিতাম নিশ্চয়। আমায় এখানে মিতার খোঁজে আসতেই হোত, আমি সন্দেহ করেছিলাম, নিশ্চয় কোন বিপদ ঘটেছে, তা না হলে আমি অন্তত একটা খবর পেতাম।

সে-বিষয়ে যথেষ্ট সন্দেহ আছে, বলল সুব্রত, অবশ্য সরল বিশ্বাস থাকা ভাল, সে যাই হোক, কোন সন্ধান পেয়েছেন তাঁর?

না, এখনও পাইনি—লজ্জিতভাবে উত্তর দিল অশোক।

তাহলে আর একটু অপেক্ষা করুন—সব জানতে পারবেন, তার আগে একটু ফার্স্ট এডের ব্যবস্থা করতে হয়, দুজনের মুখের দিকে সুব্রত তাকাল পরপর।

পুলিশ স্টেশানে পেঁছে প্রদীপ যাকে দেখল, তাকে সে ওখানে আশা করতে পারেনি। হোটেল সাম্বার ক্যাবারে আর্টিস্ট মিতা দেবীকে পুলিশ স্টেশানে বেমানান লাগল। মিঃ ঘোষ তাকে দেখে ব্যস্ত হয়ে পড়লেন; বললেন, উই আর অলরেডি লেট

—অনেক দেরী হয়ে গেছে। কোথায় যেতে হবে? প্রদীপের স্বর দ্বিধাগ্রস্থ।

চলুন, গাড়ীতে যেতে যেতে বলব। একটা জীপে সকলে মিলে উঠলেন ও'রা।

প্রদীপ নিরাসক্তভাবে রাস্তার দিকে তাকিয়ে রইল কিন্তু মনটা তার তোলপাড় করছে অসহ্য উদ্বেগে। চিন্তার ধারাটা বয়ে চলেছে সেই সঙ্গে অপ্রতিহত গতিতে। প্রদীপ ভাবতে চেষ্টা করছিল এ-যাত্রাটা কোথায় গিয়ে শেষ হবে। পুলিশের ফোন পেয়ে তার মনে হয়েছিল এবার তাকে পুলিশ হয়ত আটকে রাখবে হত্যার দায়ে।

কোথা থেকে কোথায় এসে পড়ল; সেই কথাটই মনে মনে ভাবছিল প্রদীপ বসু। অবাক লাগছিল তার, নিয়তির অদ্ভুত পরিহাসের কথা চিন্তা করে। একটা স্বাভাবিক আর সাধারণ জীবন কেমন করে অসাধারণ হয়ে দাঁড়াল ঘটনার চাপে আর অজ্ঞাত পরিচালনায়। কোথা থেকে সে কোথায় চলে এল? অসংযত আর অবাস্তব চিন্তাগুলো তার মস্তিষ্ককে ভারাক্রান্ত করে তুলল এক নিমেষে।

একবার অফিসের কথা মনে পড়ল তার। শুক্রা তার সামনে যেমন ভঙ্গীতে এসে দাঁড়ায়, সেই ছবিটার কথা ভাবল সে। না, মিঃ বোস, আপনি মিথ্যেই ভয় পাচ্ছেন—কি অদ্ভুত শান্ত গলায় কথাগুলো বলেছিল শুক্রা। তার পাশেই আয়ারের কালো ধূর্ত মুখ—কেন স্যার, ক্র্যাঙ্কসাফ্‌ট আর ফুয়েল ইনজেকশান ইকুইপমেণ্ট ত পিকাডিট্‌ জবে লেগেছে। আর আপনার বিপদের কথা শুনেই আপনাকে আর বিরক্ত করিনি স্যার। ধূর্ত শয়তান! প্রদীপের মাথায় একটা যন্ত্রণা হচ্ছে, যেন একটা ভারী ওজন তার মাথায় কে ধরে রেখেছে। মা—তুমি আমার জ্বরের সময় যেমন কপালে ঠাণ্ডা হাতটা বুলিয়ে দিতে, তাই কর না। বাবার চোখ ইনজেকশান নিয়ে সেরেছে? ইনজেকশান আনাই হয়নি? মিলি, একি করলে মিলি।

মাথাটা দুহাতে টিপে ধরল প্রদীপ, জোর করে মনকে নামিয়ে নিয়ে এল শক্ত মাটিতে।

মিলির মুখটাই কিন্তু আবার ফুটে উঠল তার মনের পর্দায়। বিবাহিত জীবনে তার নিজের দিক দিয়ে কোন ত্রুটি-বিচ্যুতি ঘটেছিল কিনা তাই ভাবতে লাগল প্রদীপ। মনে পড়ল একবার মিলির সঙ্গে থিয়েটার যাবার ঘটনাটা...।

মিলির সঙ্গেই তার নিউ এম্পায়ারে শম্ভু মিত্রের অভিনয় দেখতে যাবার ঠিক ছিল কিন্তু অফিসে একটা কাজে আটকে ফেললে। যেদিনই তার নিজের কিছু কাজ থাকে, সেইদিনই অফিসও যেন তাকে রেহাই দিতে চায় না সহজে। মিলিকে ফোনে সে জানিয়ে দিল তার দেরীর কারণটা আর তাকে লবীতে অপেক্ষা করতে বলল তার জন্যে। প্রদীপ যখন নিউ এম্পায়ারে পৌঁছুল, তখন থিয়েটার শুরু হয়ে গিয়েছে আর লবীতে মিলি অস্থিরভাবে পায়চারি করছে তার অপেক্ষায়। তার মুখের দিকে তাকিয়ে আর কথা বলতে সাহস করেনি প্রদীপ। অন্ধকার হলে কয়েকজন লোকের পা মাড়িয়ে, যখন তারা সিটে বসল, তখন নাটক অনেকদূর এগিয়ে গিয়েছে। কিন্তু ঠাণ্ডা ঘরে বসে আর একটা বিপদ হল প্রদীপের—দারুণ ঘুম পেল তার, সঙ্গে সঙ্গে হাই তুলতে লাগল সে। মিলি কয়েকবার তার দিকে বিরক্ত হয়ে তাকাল কিন্তু কোন ফল হল না তাতে। শম্ভু মিত্রের অভিনয় যেখানে দারুণ জমে উঠেছে, সেখানেই প্রদীপের নাক ডাকা শুরু হয়ে গেল। মিলি তাকে কয়েকবার ধাক্কা দিয়ে জাগিয়ে রাখার ব্যর্থ চেষ্টা করল কয়েকবার। আশপাশের লোকেদের হাসি-বিদ্রূপের কথা মিলির অনেকদিন মনে ছিল আর প্রদীপও ভোলেনি তার নিজের অশোভন আচরণের কথা।...

কিন্তু এত সামান্য ত্রুটির জন্যে তাদের মধ্যে বিচ্ছেদের ফাটল ধরেছিল কিনা তাই ভাবতে লাগল প্রদীপ বসু। জীবনের কাছে সে বেশী কিছু প্রত্যাশা করেনি কিন্তু তা-ও ব্যর্থ হয়ে গেল কেন?

এতক্ষণে নিজের সংকটের কথাটা নিয়ে মনে মনে আলোচনা করতে লাগল প্রদীপ। পুলিশ তার বিষয়ে কয়েক জায়গায় খোঁজ-খবর নিয়েছে বলে সে জানে—সকলেই তার ভদ্রব্যবহার আর সংযত স্বভাবের কথা উল্লেখ করেছে নানাভাবে কিন্তু পুলিশের কাছে তার মূল্য কতটুকু তা সে জানে। অনেক ভদ্র আর সংযত চরিত্রের লোক ক্ষণিক উত্তেজনায় এ-ধরনের অপরাধ করেছে বলে সে জানে। দুশ্চরিত্রা স্ত্রীকে হত্যা করাই বা অস্বাভাবিক কি? এদিক দিয়ে পুলিশ সহজেই মোটিভ খুঁজে পাবে, তাছাড়া অপরদিকে শুক্রার নামও তুলেছে তারা ওই সঙ্গে।

মিলির মৃত্যু-কামনা কি সে করেনি? তাও করেছিল বৈকি! উত্যক্ত হয়ে সে মনে মনে মিলির মৃত্যুর কথা ভেবে সমস্যার সমাধানের চিন্তায় খুশি হয়েছে বহুবার। শুধু তাই বা কেন, কোন হত্যা-কাহিনী পড়ার সময় কাহিনীর মৃত মেয়েটির স্থানে মিলিকে কল্পনা করে সে অনির্বচনীয় তৃপ্তি আর স্বস্তি পেয়েছে। সে নিজে হত্যাকারী হলে কিভাবে নিখুঁত উপায়ে কাজটা শেষ করত, তারও ছক সে মনে মনে বহুবার প্রস্তুত করেছে।

কিছুক্ষণের মধ্যেই তারা মিতার মার্লিন রোডের ফ্ল্যাটে উপস্থিত হল। প্রদীপ লক্ষ্য করল জায়গাটার আশপাশে অনেক পুলিশ আর কৌতূহলী জনতা ঘিরে রয়েছে।

তারা ঘরে ঢুকতেই মিতাকে দেখে শান্তনু চীৎকার করে উঠল, ইউ র‍্যটন বীচ, তোকে আমি খুন করব, এগিয়ে আসতে চাইল সে মিতার দিকে।

থাক, আর বীরত্ব দেখাতে হবে না, বাধা দিয়ে বলল সুব্রত চৌধুরী।

শান্তনু আর অশোক রায়ের দিকে কয়েকবার তাকিয়ে মিতা অজানা আশংকায় বিমূঢ় হয়ে গেল। সমস্ত জিনিসটা তার কাছে অবাস্তব বলে ঠেকল—এই পরিস্থিতি আর পরিবেশে শান্তনু আর অশোক দুজনকেই একসাঙ্গে দেখে সে হতবাক হয়ে গিয়েছে।

তাকে একটা চেয়ার এগিয়ে দিয়ে সুব্রত চৌধুরী বলল, আপনাদের সকলকেই এক জায়গায় পাওয়া গিয়েছে। তাই মিলি দেবীর মৃত্যু সম্বন্ধে আমরা একটু আলোচনা করব। প্রথমে অশোকবাবু আরম্ভ করুন, আমরা শেষ থেকেই শুরু করব।

আমি কি বলব?—অশোক রায় বুঝতে পারে না সুব্রত চৌধুরী কি জানতে চাইছে।

আজ সকালে হোটেল সাম্বায় দেখা হবার পর আপনি কি করলেন?

আমি মিতার সম্বন্ধে খোঁজ নিতে এখানে এলাম।

আপনাকে আমি বলেছিলাম মিতা দেবীকে এখানে পাওয়া যাবে না, তা সত্ত্বেও এখানে এলেন কেন?

প্রথমত আমি বিশ্বাস করতে পারিনি যে, মিতা আমাকে না জানিয়ে চলে যেতে পারে, তাছাড়া—

আহা রে, একেবারে গদগদ ভাব, ডার্টি বীচ্‌, শান্তনু বলে উঠল। লজ্জায় লাল হয়ে গেল মিতা।

অশোক বলতে লাগল, তাছাড়া বাবার কারণটা জানতে চেষ্টা করেছিলাম—।

আপনি হোটেল সাম্বায় অনেকবার গেছেন নিশ্চয়, সেখানে একেও বাজনা বাজাতে দেখেছেন?

তা দেখেছি, লোকটা গিগলোর মত সাজসজ্জা করে বোধহয় মেয়ে ধরত—এখন অবশ্য চেহারাটা তেমন সুবিধের নয়, বিশ্রী-ভাবে হাসল অশোক।

উত্তরে শান্তনু একটা অশ্রাব্য গাল দিল তাকে।

তাতে কান না দিয়ে সুব্রত বলল, এই লোকটার আসল নাম পিটার গোমেস—জানেন?

হ্যাঁ, ওর হাতের উল্কীতে পি জি লেখা আজই দেখেছি।

এর সঙ্গে মিতা দেবীর কোন সম্পর্ক আছে কিনা জানেন?

না, তা কি করে জানব?

মিতা দেবী এর বিবাহিতা স্ত্রী; আস্তে কথাটা উচ্চারণ করল সুব্রত।

ঘরটা নিস্তব্ধ হয়ে গেল এক মুহূর্তে। দু হাতে মুখ ঢাকল মিতা। অশোক রায় একবার মিতার দিকে আর একবার শান্তনুর দিকে তাকিয়ে মাথা নীচু করে বসে রইল নিঃশব্দে। শান্তনু কিন্তু চিৎকার করে হেসে উঠল; বলল, কিরে পেট মোটা গাড়োল লজ্জা হল নাকি! সুব্রত এবার মিতার দিকে তাকিয়ে বলল, মিতা দেবী এবার পিটার গোমেস সম্বন্ধে কিছু বলুন, কবে প্রথম আলাপ, কোথায় প্রথম শুভ-মিলন, কেমন করে হোটেল সাম্বায় এলেন বলুন সব।

মিতা চুপ করে রইল, শূন্য দৃষ্টিতে খোলা জানলার দিকে তাকিয়ে রইল। অতীতের ভাসা ভাসা মেঘগুলো যেন খোলা জানলা দিয়ে তার দিকে এগিয়ে আসছে। নীল আকাশে সাদা মেঘ মিতার পরিচিত যেন।...

বলুন কিছু, সুব্রতর গলার আওয়াজে চমকে উঠেছে মিতা।

সুব্রতর দিকে তাকিয়ে মিতা বলতে

লাগল, প্রথম ওর সঙ্গে আমার পরিচয় হয় একটা বস্তীতে।

বস্তীতে?

হ্যাঁ, সব জাত মেশান, সব ধর্ম মেশান মানুষের খোঁয়াড়ে। পৃথিবীর যত নোংরা আর ক্লেদভরা একটা বস্তীর আস্তাকুড়ে আমায় নিয়ে আমার বিধবা মা উঠেছিলেন। পাকিস্তান থেকে আসার পর এর চেয়ে ভাল জায়গা আর পাওয়া যায় নি। তখন আমার বয়স বার বছর। মা কাপড়-জামা সেলাই আর দাই-এর কাজ করে আমাদের সংসার চালাতেন। আমাদের এত অনটনের মধ্যেও মা আমায় একটা ভাল মিশনারী স্কুলে ভর্তি করেছিলেন। ভাল ছাত্রী আর সুগায়িকা হিসেবে আমার সুনাম হল স্কুলে, তাছাড়া সুন্দর চেহারার জন্যে জনপ্রিয় হলাম সেই সঙ্গে।

মিলি দেবীও কি আপনার সঙ্গে পড়তেন?

হ্যাঁ আমরা দুজনে একসঙ্গে কিছুদিন পড়েছি। কিন্তু আমাকে স্কুল ছেড়ে দিতে হয়—এক দীর্ঘশ্বাস ফেলল মিতা—।

কেন?

এই লোকটার জন্যে। আমার মাকে কাজ দেওয়ার ছুতো করে ও প্রায়ই আমাদের ঘরে এসে গল্প জমাত।

আপনার মা আপত্তি করতেন না?

তা কি করে করবেন। নিজের নাম আর জাত ভাঁড়িয়ে ও সহজেই মাকে হাত করে-ছিল। মায়ের কাজের দশ গুণ দাম পাইয়ে দিতে লাগল, আমায় তুচ্ছ জিনিস থেকে শুরু করে দামী জিনিস উপহার দিতে আরম্ভ করল নানা ছুতো করে।

এই লোকটার বিরুদ্ধে কেউ কিছু বলে নি আপনাদের কাছে?

না, কেউ সাহস করে নি। কারণটা তখন বুঝি নি, যখন বুঝলাম তখন অনেক দেরী হয়ে গেছে।

তারপর কি হল?

তারপর মায়ের অসুখ হল—বস্তীতে যে রোগ বেশী হয় তাই—টি-বি। আমি কিন্তু তখনও বুঝতে পারছি না ওর আসল উদ্দেশ্যটা কি।

ওর দলের লোকগুলো আমাদের বাড়ীর চারপাশে গম্ভীর মুখে ঘুরে বেড়াত—আমার মনে হত নেকড়েরা যেন শিকারের আশায় ঘুরে বেড়াচ্ছে। ওদের গম্ভীর মুখগুলোর কথা ভাবলে এখনও ভয় পাই আমি। যাই হোক, লোকটা এই সুযোগে মায়ের চিকিৎসার ভার নিল। এই সময়টার কথা আমি ভুলব না। তখন বর্ষা-কাল, আকাশে কালো মেঘ আর আমাদের বস্তীর অন্ধকার এখনও আমার বুকের ওপর পাথর হয়ে বসে রয়েছে। কথাটা বলে মিতা অশোকের দিকে তাকাল একবার, তার পর আবার শুরু করল, আমার রূপের গর্ব ছিল, তাছাড়া মেয়েদের স্কুলে পড়তাম আমি, বস্তীর কারুর সঙ্গে মিশতে পারতাম না। তাতে এর সুবিধেই হল। মা মারা যাবার পর ও সহজেই আমাকে বস্তী থেকে এই ফ্ল্যাটে এনে তুলল।

কোন আপত্তি করেন নি? প্রশ্ন করল সুব্রত চৌধুরী।

না, তখন আমি সম্পূর্ণ ওর মুঠোর মধ্যে, তাছাড়া ফ্ল্যাটে এসে ঐশ্বর্য আর বিলাসিতার লোভে পড়ে ওকে বিয়ে করলাম অবশ্য তখন এ ছাড়া আর উপায় ত ছিল না। ওই আমায় নাচের স্কুলে নাচ শিখিয়ে হোটেল সাম্বায় আমার কাজ জুটিয়ে দিল।

আপনি কি বিয়ের পর এই ফ্ল্যাটেই থাকতেন?

হ্যাঁ, বিদেশে না গেলে এখানেই থাকতাম।

মিলি দেবীর সঙ্গে আপনার কোথায় দেখা হল?

হোটেল সাম্বায় আবার ওর সঙ্গে দেখা হল, আমাদের পুরোন বন্ধুত্ব চালু হল।

মিলি দেবী নিজের সম্বন্ধে আপনাকে কিছু বলেছেন?

হ্যাঁ ওদের বিবাহিত জীবন সুখের ছিল না।

কেন? সুব্রত তাকাল মিতার দিকে।

ওর স্বামী ওকে যন্ত্র করত, মিথ্যে দোষারোপ করত, নানা ছুতো করে।

আপনি জানেন মিলি দেবী আত্মহত্যা করেন নি, তাঁকে হত্যা করা হয়েছে।

হ্যাঁ, এখানে এসে শুনলাম।

আপনার কাকে সন্দেহ হয়?

ওর স্বামীকে, উত্তর দিতে কোন দ্বিধা করল না মিতা। প্রদীপ কি যেন বলতে যাচ্ছিল সুব্রত তাকে থামতে ইশারা করল, তারপর প্রশ্ন করল, কেন?

মিলির কাছে শুনেছি, অফিসের একটি মেয়ে শুক্লা সেন? তার নাকি গভীর হৃদ্যতা আছে।

আপনি মিলি দেবীর স্বামীকে চেনেন?

না।

তাহলে আলাপ করিয়ে দিই—ইনিই প্রদীপ বসু। ওরা পরস্পরের দিকে তাকাল মাত্র।

ব্যারিস্টার অশোক রায়ের সঙ্গে আপনার কত দিনের আলাপ?

তা বেশ কিছুদিন।

কে আলাপ করিয়ে দিয়েছিল?

মেহেতা হোটেল সাম্বায় আলাপ করিয়ে দিয়েছিল। শান্তনু এতক্ষণ চুপ করে ছিল। আবার সে একটা অশ্লীল গাল দিয়ে মেঝেতে থুতু ফেলল সশব্দে।

অশোক রায়ের সঙ্গে মিলি দেবীর আলাপের কথা জানতেন।

হ্যাঁ জানতাম।

বিয়ের প্রপোজাল হয়েছিল তাও জানতেন?

হ্যাঁ, মিলিই বলেছিল।

বিয়ে না হওয়াতে মিঃ রায় ওঁর সঙ্গে দুর্ব্যবহার করেছিলেন কি?

হ্যাঁ শাসিয়ে ছিলেন? বলুন, চুপ করে রইলেন কেন?

বলেছিলেন দরকার হলে মিলিকে উনি গলা টিপে মারবেন। ঘরটা নিস্তব্ধ হয়ে গেল। সুব্রত অশোক রায়ের দিকে তাকিয়ে আবার মিতাকে প্রশ্ন করল, এই ফ্ল্যাটে বাস করার সময় আপনার কার কার সঙ্গে আলাপ হয়েছিল?

চুপ করে রইল মিতা কিছুক্ষণ, তারপর বলল, জানি না।

তাহলে আমিই মনে করিয়ে দিই—বম্বের শারদার আর হাফেজ ভাই, আমেদা-বাদের যোশী, বেনারসের মদন তেওয়ারী আর বেরুটের হুসেন আলি বে।

কি এবার মনে পড়েছে? চুপ করে রইল মিতা।

আচ্ছা এবার বলুন পিটার গোমেসের সঙ্গে মিলি দেবীর কে আলাপ করিয়ে দিয়েছিল?

আমি।

মিলি দেবী কি শান্তনু ওরফে পিটার গোমেসের সঙ্গে আপনার সম্পর্কের কথা জানতেন?

না, আমাদের সম্পর্কের কথা বলা নিষেধ ছিল।

কেন? — বলুন, চুপ করে থাকলে চলবে না। একটু তীক্ষ্ণ হল সুব্রতর গলার স্বরটা।

ওদের কথা অমান্য করার সাধ্য ছিল না আমার। বস্তীতেই লক্ষ্য করেছি সকলেই ওদের ভয় করত, ওখানে একটা স্মাগলিং-এর দল ছিল ওদের। একজন ওদের বিরুদ্ধে কি যেন অভিযোগ করেছিল এর পর তাকে আর খুঁজে পাওয়া যায় নি। এদের আরও একটা দল আছে শুধু এই জন্যে, তাদের কাজই হল শত্রুদের গ[illegible] করা।

তাহলে এই ভয়েই আপনি ওদের কথা শুনতেন?

না, মরার চেয়ে আরও ভীষণ অবস্থা[illegible] জন্যে। আমায় একটা ওষুধ খাইয়ে নে[illegible] করিয়ে দিয়েছে, তার জন্যে আমি বিরুদ্ধতা[illegible] কথা ভাবতেই পারি না, আমি অ্যাডিক্ট হ[illegible] গেছি। কোন দিন ওষুধটা না পেলে আ[illegible] যন্ত্রণায় পাগলের মত হয়ে যাই ত[illegible] আবার একটা পুরিয়া দিলে শান্ত হ[illegible] আমি। এইভাবে ওই জঘন্য শয়তান আমাকে করায়ত্ত করেছে।

ওষুধটার নাম জানেন?

না, তা জানলে ত আমি নিজেই সে[illegible] কিনে ওর হাত থেকে মুক্তি পেতাম। প্র[illegible] ভেবেছিলাম কোকেন কিন্তু না নয় কয়ে[illegible] ওষুধের সংমিশ্রণ বলেই ধারণা আমা[illegible] ওদের কাছেই ছিল, বড়লোকের মে[illegible] মেয়েদের ওই নেশাটা ধরিয়ে টাকা আ[illegible] করা।

পিটার গোমেসের কি কাজ ছিল?

ওর কাজ ছিল মেয়েদের সঙ্গে। মি[illegible] হিসেবে আর ভাল চেহারার জোরে[illegible] মেয়েদের হাত করত।

মিলির সঙ্গে সেই জন্যেই আ[illegible] করেছিল?

হ্যাঁ, প্রথমে উদ্দেশ্যটা তাই ছিল।

এই সব শিকারের সঙ্গে কিভাবে যোগাযোগ রাখত?

সে ব্যবস্থা ওরাই করে নিত।

ওদের মধ্যে কেউ মিলি দেবীর মত সন্দেহজনকভাবে মারা গেছে?

না, কেউ মারা গেলে ওদেরই ক্ষতি—লোকসান হোত প্রচুর।

এক-একজনের কাছ থেকে ওষুধটার বিনিময়ে অজস্র টাকা পেত ওরা।

এবার বলুন, ওরা আপনাকে কিভাবে কাজে লাগাত।

আমি ছেলেদের সঙ্গে আলাপ করে ওষুধটা ধরাতে চেষ্টা করতাম।

তাতে আপনার কি লাভ হোত?

ওটাই আমার কাজ ছিল।

মিথ্যে কথা, মাঝ থেকে চীৎকার করল শান্তনু, ওরফে পিটার গোমেস। ও কমিশন পেত দস্তুর মত, টেন পারসেন্ট।

অশোক রায় বড়লোক, শিকার হিসেবে লোভনীয়, ওঁর সঙ্গে আলাপ করে ওষুধটা ধরিয়েছেন?

না, ছোট করে উত্তর দিল মিতা। উত্তর দেবার সঙ্গে সঙ্গে চীৎকার করে হেসে উঠল শান্তনু, বলল—মিথ্যে বলছে, ওই কেসটার জন্যে আমি ওকে টেন পারসেন্ট দিয়েছি আর আমরাও নিয়মিত টাকা পেয়েছি বাই-পোস্টে।

শান্তনুর কথা শেষ হতে অশোক রায়ের দিকে তাকাল সুব্রত চৌধুরী, বলল, মিঃ রায়, এবিষয়ে আপনি কি বলেন?

অশোক রায় অবাক হয়ে শুনছিল কথাগুলো—সব ব্যাপারটাই অবিশ্বাস্য একটা উপন্যাসের মত লাগছিল ওর। সে বলল, মিতা আমায় কোনদিনই কোন ড্রাগের কথা উল্লেখ করেনি, দেওয়া ত দূরের কথা, তাছাড়া টোব্যাকো আর হুইস্কি ছাড়া অন্য নেশায় স্বাস্থ্যহানি হতে পারে। সকলেই অশোক রায়ের স্বাস্থ্যের প্রাচুর্য লক্ষ্য করল—সার্টটা তখনও পরেনি সে।

তাহলে নিয়মিত টাকা পাঠাত কে? প্রশ্ন করল সুব্রত।

আমিই পাঠাতাম—উত্তরটা দিল মিতা।

আপনি পাঠাতেন কেন?

তা না হলে ওরা সন্দেহ করত সব জিনিসটা।

তাহলে আপনিই অশোক রায়কে ড্রাগ-অ্যাডিক্‌ট্‌ হতে দেননি?

হ্যাঁ, আস্তে কথাটা উচ্চারণ করল মিতা।

এটা ভালবাসার জন্যে করেছিলেন?

না, সঙ্গে সঙ্গে উত্তর দিল মিতা, বলল, আমি যখন দেখলাম মিলি ওর জন্যেই ডাইভোর্স করছে আর তাকে ওষুধটা ধরান হয়নি, তখনি ঠিক করেছিলাম এর শোধ আমি তুলব।

তুই শোধ তুলবি আমার ওপর? চীৎকার করে উঠল শান্তনু, পাগলের মত হয়ে গিয়েছে সে। সেদিকে লক্ষ্য না করে সুব্রত চৌধুরী মিতাকে বলল, আপনি মিলিদেবীর ছদ্মবেশে বেরুট গিছলেন কেন?

ছদ্মবেশেই আমাদের কাজ করতে হয়। বেরুটে হুসেন আলি বের সঙ্গে আমাকে দেখা করতে হয়েছিল, টাকার বরাদ্দ কম হওয়াতে সে অসন্তুষ্ট হয়েছিল। মিলির ছদ্মবেশ ওই আমার করতে বলেছিল, সঙ্গে মিসেস বোস-এর নামে এয়ারলাইনের টিকিটও দিয়েছিল ওই সঙ্গে।

দুজন সার্জেন্ট ধরে রাখতে পারছিল না শান্তনুকে, সমানে চীৎকার করে অশ্রাব্য ভাষায় মিতা আর অশোককে গাল দিচ্ছিল সে। এবার সে বলে উঠল, আমায় একবার ছেড়ে দাও, ওকে আমি গলা টিপে মারি। একটা মেরেছি আর একটাও মারতে পারব—হ্যাঁ আমিই মিলিকে গলা টিপে মেরেছি। হঠাৎ শান্তনু শান্ত হয়ে গেল কথাটা বলার পর। মুখের বীভৎস রূপটার ওপরও যেন একটা প্রশান্ত ছাপ দেখা গেল। কয়েক সেকেন্ড চুপ করে সে বলতে লাগল—

স্বামী ছেড়ে আসার পর মিলির সঙ্গে আমি এখানেই মিলতাম ও তখন অন্য নামে চৌরঙ্গীর একটা হোটেলে রুম নিয়েছে। সেদিন আমি আসার আগেই মিলি এসে গেছল। বাইরের জানলা দিয়ে দেখলাম, মিলি মিতার ড্রেসিং টেবিলের ড্রয়ার থেকে কি যেন বার করে দেখছে একমনে। আমি সন্তর্পণে ঘরে ঢুকে লক্ষ্য করলাম, মিতার লকেটটা ও দেখেছে। আমায় দেখে তাড়াতাড়ি সেটা ড্রয়ারের মধ্যে রেখে মিলি বাইরের বারান্দায় চলে গেল। বুঝলাম সর্বনাশ হয়েছে। ওই লকেটে আমার নাম সমেত একটা ফটো আছে। এটা আমি মিতাকে বিয়ের পর দিয়েছিলাম।

তারপর কতবার ওকে বলেছি, ওটা লুকিয়ে রাখতে কিংবা নষ্ট করে দিতে, কিন্তু নচ্ছার মেয়েছেলেটার এমনি পিরীত যে ওটা নষ্ট না করে একেবারে খোলা ড্রয়ারে রেখে দিয়েছে।

হোটেল খোলার নাম করে মিলির কাছে টাকা চেয়েছিলাম, বারান্দায় গিয়ে দেখি মিলি চেকটা ছিঁড়ে ফেলে দিয়েছে। আমায় দেখেই তার চীৎকার আর হিস্টিরিয়া শুরু হল। ওকে আমি টেনে নিয়ে এলাম ঘরের মধ্যে, বোঝাতে চেষ্টা করলাম নানাভাবে কিন্তু কোন ফল হল না—ঘরের আসবাব পত্র ভাঙতে শুরু করল আর আমাকে লক্ষ্য করে ভাঙ্গা জিনিসগুলো ছুঁড়তে লাগল একটার পর একটা।

বাধা দিলাম কিন্তু কোন কাজ হল না, শেষ পর্যন্ত দু-একটা চড়ও মারলাম, ভেবেছিলাম ভয়ে হয়ত থেমে যাবে, কিন্তু তাও মানল না, আরও যেন ওর পাগলামি বেড়ে গেল। শেষে ওর মুখটা টিপে ধরলাম চীৎকার বন্ধ করার জন্যে। আমার ভয় হচ্ছিল ওর চীৎকারে অন্য লোকেরা হয়ত এসে পড়বে, তাহলে শেষপর্যন্ত পুলিশেও জানাজানি হবে নিশ্চয়। মিলির গলাটা তাই টিপে ধরলাম। মারব বলেই যে টিপেছিলাম, তা নয়, আমার উদ্দেশ্য ছিল, ওকে যে-কোন প্রকারে চুপ করান।

হঠাৎ দেখলাম মিলি নেতিয়ে পড়েছে, মুখে জল দিয়ে নানাভাবে ওর জ্ঞান ফেরাবার চেষ্টা করলাম—কিন্তু কোন ফল হল না। সেই বিপদে পড়লাম আমি; অনেকবার এর আগে বিপদে পড়েছি, কিন্তু এই ধরনের বিপদ এই প্রথম। কি করব ঠিক করতে পারছি না, হঠাৎ মনে পড়ল ওর স্বামী ওই সন্ধ্যায় বাইরে চলে গেছে। রাত হলে গাড়ীতে দেহটা নিয়ে ওদের বাড়ী গেলাম, মিলির ব্যাগে ওদের বাড়ীর চাবি ছিল, তাই দিয়ে লক খুলে বাড়ীর মধ্যে ঢুকলাম। সামনেই একটা ঘরে তালা ঝুলছে দেখে সেটা খুলে ভেতরে গিয়ে দেখি একটা গুদাম-ঘর। তারপর দেহটাকে টাঙিয়ে দিতে বিশেষ বেগ পেতে হল না।

এক নিশ্বাসে কথাগুলো বলে হাঁফাতে লাগল শান্তনু।

মিতাদেবী ছদ্মবেশে বেরুট গেল কেন? সুব্রত প্রশ্ন করল।

ওটা আমিই বলেছিলাম, কিন্তু ভেবে নয়, এমনি; তখন বুঝিনি জিনিসটা এভাবে কাজে লাগবে। ঈশ্বর আমাকে সাহায্য করলেন, মিলির স্বামী বিদেশে আর মিতা বেরুট গেছে মিলির ছদ্মবেশে, সুতরাং বেশ কিছুটা সময় পেয়ে গেলাম। সবই ঠিক মত হয়ে যেত যদি মিলি ও সর্বনেশে লোকটা দেখতে না পেত। সামান্য ভুলের জন্যে সব ভেস্তে গেল।

স্বামীকে ডাইভোর্স করার পর মিলি দেবী কি বিয়ে করতে রাজী হতেন?

হ্যাঁ, আমি কিন্তু বিয়ে করতাম না।

কেন?

প্রথমত আমার বিয়ে হয়ে গেছে আর দ্বিতীয়ত যারা আমাদের মত এই ধরনের বিপজ্জনক ব্যবসা করে তারা মেয়েছেলের ব্যাপারে নির্লিপ্ত থাকে।

তার কারণ? সুব্রত তাকাল শান্তনুর দিকে।

তার কারণ, ভালবাসা থাকলে এই রকম সামান্য সেন্টিমেন্টের জন্যে ধরা পড়তে হয়, আর না থাকলে ধরিয়ে দেয়। মিলির টাকাটারই দরকার ছিল আমার অন্য কিছু নয়।

মিতাকে ড্রাগ অ্যাডিক্‌ট্‌ করার কারণ কি?

তা না হলে আটকান যেত না। ভালবাসার নেশা বড় তাড়াতাড়ি কেটে যায়, কিন্তু এ নেশা ছাড়ে না। হাতছাড়া হলে আমাদের সকলেরই বিপদ ঘটত।

ওই স্যুটকেশে ডি ডি টি লেখা প্যাকেটে মরফিন, হিরোইন আর কোকেন আছে। থামল শান্তনু।

এগুলো কোথা থেকে আসে?

মাপ করবেন। বলল শান্তনু।

—শেষ—

(পূর্ব প্রকাশিতের পর)

ভারতীয় চিত্রশিল্প ও আর্টের প্রতি তাঁর অসাধারণ আগ্রহ ছিল। এইজন্য তিনি আর্ট সম্পর্কিত বহু প্রবন্ধ লিখেছিলেন। থিয়েটার, ড্রামা ইত্যাদির প্রতিও তার বিশেষ অনুরাগ ছিল। কয়েকটি থিয়েটারে ও ছবির পর্দায় তিনি নৃত্যের পরিকল্পনা করে দিয়ে তাঁর প্রতিভার স্বীকৃতি রেখে গেছেন। মঞ্চ ও চিত্রজগতের সমস্ত শিল্পীদের সঙ্গেই তাঁর অন্তরঙ্গতা ছিল। নাট্যাচার্য শিশিরকুমার, নটসূর্য অহীন্দ্র চৌধুরী, নৃত্যযাদুকর উদয়শঙ্কর—এঁরা ছিলেন হেমেন্দ্রকুমারের বিশিষ্ট বন্ধু।

গীতিকার হিসাবে তাঁর খ্যাতি ছিল অসামান্য। শিশিরকুমার প্রযোজিত ও যোগেশ চৌধুরী রচিত বিখ্যাত "সীতা" নাটকের 'অন্ধকারের অন্তরেতে' গানখানি তাঁরই রচনা। এ ছাড়াও তাঁর বহু গান রেডিও, গ্রামোফোন ও থিয়েটারে অত্যন্ত প্রশংসার সহিত গীত হয়েছে। তাঁর কয়েকটি উপন্যাস 'পায়ের ধুলো', 'যখের ধন', 'তরুণী' চিত্রায়িত হয়েছে।

'নাচঘর' পত্রিকা আমি ছেড়ে দেবার পর দীর্ঘদিন তিনি এই পত্রিকা সম্পাদনা করেছিলেন। এরপর 'দীপালী' সাপ্তাহিক পত্রিকারও সম্পাদক ছিলেন তিনি বেশ কিছুদিন।

তিনি যেমনি সৌখীন লোক ছিলেন, তেমনি মেজাজটিও ছিল তার দিলদরিয়া।

হেমেন্দ্রকুমারের "ওমর খৈয়ামে"র অনুবাদ আমরা প্রকাশ করি। এই পুস্তকখানির প্রকাশে আমাদের ব্যয় হয়েছিল প্রচুর। বিলেত থেকে বিখ্যাত চিত্রকর এডমান্ড ডুলাকের আঁকা ছবি ছাপিয়ে নিয়ে আসি—বাংলা পুস্তক-প্রকাশনা ক্ষেত্রে এত-বড় দুঃসাহস এর আগে কেউ কখনও করেননি।

মাত্র কয়েক বছর আগে তিনি ইহলোক ত্যাগ করে গেছেন। এঁর মৃত্যুতে আমি হারিয়েছি একজন অকৃত্রিম বন্ধু এবং শিশু-সাহিত্যে হারিয়েছে তার একজন শ্রেষ্ঠ লেখককে।

ধনগোপাল মুখোপাধ্যায়—এই নামটির সঙ্গে আজকের পাঠক-পাঠিকাদের খুব বেশী পরিচয় আছে বলে আমার মনে হয় না। তবে এ রকম একটি বিচিত্র প্রাণচঞ্চল চরিত্রের সঙ্গে একবার পরিচয় হলে তা সহজে ভোলা যায় না। তাই দু' চার কথায় তাঁর সম্বন্ধে আমি সামান্য শ্রদ্ধাঞ্জলি নিবেদন করছি।

আমার যতদূর মনে পড়ে, ধনগোপাল মুখোপাধ্যায়ের সঙ্গে আমার আলাপ হয় ১৯২২ সাল নাগাদ। ইনি ছিলেন আমাদের সাহিত্যিক বন্ধু সুরেশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়ের বিশেষ বন্ধু। সুরেশচন্দ্র 'জাপানে', 'চিত্র-বহা', 'পোর্ট আর্থারের ক্ষুধা' প্রভৃতি লিখেছিলেন এবং অনুবাদক হিসাবে বেশ খ্যাতি অর্জন করেছিলেন। নানান টুকি-টাকি শেখার জন্য সুরেশচন্দ্র যখন জাপানে যান, ধনগোপালের সঙ্গে সেখানেই তাঁর পরিচয়।

মনে আছে, একদিন আমরা কয়েকজন বন্ধু মিলে ভিকটোরিয়া মেমোরিয়ালে বেড়িয়ে কবি সত্যেন্দ্রনাথ দত্তের মসজিদ-বাড়ী স্ট্রীটস্থ বাড়ীতে মধ্যাহ্ন আহারের

তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়

নিমন্ত্রণ রক্ষা করতে আসি। সেইখানেই ধনগোপালের সঙ্গে আমার প্রথম পরিচয় হয়। তখন তিনি দীর্ঘদিন আমেরিকা প্রবাসের পর স্বদেশে ফিরেছেন। এই পরিচয়ের কিছুদিন পরেই সত্যেন্দ্রনাথের মৃত্যু হয়।

মাত্র ১৮ বছর বয়সে ১৯০৮ সালে ধনগোপাল জাপান যান শিল্পশিক্ষার জন্য। পরে সেখানে কোনরকম সুযোগ-সুবিধা না পেয়ে সেখান থেকে আমেরিকায় গিয়ে বহু কষ্ট করে তাঁকে জীবনধারণ করতে হয়। বহু রকম কাজও তাঁকে করতে হয়েছিল সে সময়। যেমন গৃহস্থ বাড়ীতে বাসন মাজা, রান্না করা, ঘরদোর পরিষ্কার করা, খাবার পরিবেশন ইত্যাদি সাংসারিক কাজ থেকে সুরু করে বাগানের মালিগিরি বা শস্য-ক্ষেত্রে শস্য কাটা বা ফল তোলা পর্যন্ত।

এই সব কাজ করার ফাঁকে ফাঁকে সময় করে নিয়ে তিনি ইংরাজী সাহিত্য পড়েন এবং তার প্রতি ধনগোপালের গভীর আকর্ষণ জন্মে। পরে তিনি এই ভাষায় নানা-রকম ছোটদের বই লিখতে আরম্ভ করেন। ১৯২৪ সালে আমেরিকার লাইব্রেরী সমিতির বিচারে শ্রেষ্ঠ শিশুপাঠ্য পুস্তকের রচয়িতা হিসাবে "গে-নেক" নামক বই লিখে শিশু সাহিত্যের জন্য বিখ্যাত New Bury প্রাইজ পান। এরপর আমেরিকার শিশু-সাহিত্যে বই লিখে তিনি প্রভূত সম্মান অর্জন করেন। এঁর প্রসিদ্ধ বইগুলির মধ্যে নাম করা যেতে পারে Kari the elephant, Jungle Beasts & Men, Hari — the jungle lad, My Brother's 'Face' প্রভৃতি। আমাদের দেশের বিভিন্ন জন্তু-জানোয়ার, সাপুড়ে, বাজিকর, বোম্বেটে বা জলদস্যু, শিকারী প্রভৃতির অনেক আশ্চর্য গল্প প্রথম তিনখানি বই-এ আছে। বইগুলি পড়তে পড়তে মনে হয় যেন এ-দেশের বন-জঙ্গল, পাহাড়-পর্বত, নদ-নদী, বাজার ও মেলা, রং-বেরংয়ের পোষাকে নানারকম মানুষ—সমস্তই চোখের সামনে দেখতে পাচ্ছি। বর্ণিত জায়গার শব্দ যেন শুনতে পাচ্ছি, তাদের গন্ধ যেন আশেপাশে বাতাসে ভাসছে। ছেলে-বুড়ো সব চরিত্র যেন আমাদের কতকালের চেনা—এমনি স্বাভাবিকভাবে চরিত্রগুলি সব চিত্রিত হয়েছে।

মিস মেয়োর "মাদার ইণ্ডিয়া"র উত্তরে তিনি লেখেন 'A son of Mother India Answers' এই বইখানি তাঁর সব বই থেকে বেশী বিক্রি হয়।

বয়স্ক ও অল্পবয়স্ক দু' রকম পাঠকের জন্যেই তিনি অনেকগুলি বই রচনা করে যশস্বী হন। তা ছাড়া আমেরিকার নানা শহরে তিনি আমাদের দেশের সাহিত্য ও দর্শন সম্বন্ধে বক্তৃতা করে ভারতের নাম প্রচার করেন।

আমাদের প্রথম পরিচয়ের কিছুদিন পরে তিনি আবার আমেরিকায় চলে যান। তারপর আবার যখন তিনি ফিরে আসেন তখন তাঁর সঙ্গে আমার দেখা হয় বেলুড়ে। আমার সঙ্গে সাহিত্যিক বন্ধু অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্ত ছিলেন। তিনি তখন রামকৃষ্ণদেবের আদর্শে অনুপ্রাণিত হয়ে তাঁর ভক্ত হয়ে পড়েছেন। এই প্রসঙ্গে On the face of Silence নামে একটি পুস্তকও লিখেছিলেন। এবার এসে তিনি সব সময় বেলুড় মঠেই থাকতেন। ধুতি পরতেন এবং সব সময় খালি পায়ে থাকতেন। বিবেকানন্দের মন্দিরে জ্যোৎস্নাপ্লাবিত গঙ্গার ধারে বসে আমাদের মধ্যে চলে বহু বিষয়ের আলোচনা।

ধনগোপাল মুখোপাধ্যায়ের নাম এখন অনেকেই ভুলে গেছেন। তাঁর "চিত্রগ্রীব", 'যুথপতি' ও 'ঘরের ছেলে বাহিরে' বাংলায়

প্রকাশিত হয়েছে। তার মধ্যে "চিত্রগ্রীব" (Gayneck) ও "যূথপতি"(Chief of the Herd) নামে ধনগোপালবাবুর দু'খানা বইয়ের অনুবাদ আমি প্রকাশ করেছি। ধনগোপালের একমাত্র পুত্র এখন আমেরিকায় থাকেন। তাঁর জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা বিপ্লবী যাদুগোপাল। ব্রিটিশ সরকার তাঁকে রাঁচীতে শেষপর্যন্ত অন্তরীণ রেখেছিলেন।

১৯৩৬ খৃষ্টাব্দে তাঁর মৃত্যু হয়।

বর্তমানে বাংলার শ্রেষ্ঠ কথাসাহিত্যিক তারাশংকর বন্দ্যোপাধ্যায়ের সঙ্গে পরিচয় আমার বহু দিনের। আজ তিনি জ্ঞানপীঠ পুরস্কার লাভ করে বাংলা ও বাঙালীর মুখোজ্জ্বল করেছেন। এ পুরস্কারের মূল্য হল এক লক্ষ টাকা। প্রায় ওদেশের 'নোবেল' পুরস্কারের সমান তবে যে বইখানির জন্যে তিনি এই সম্মান লাভ করলেন, সেই 'গণদেবতা' অবশ্য প্রকাশিত হয়েছে অনেক বছর আগে।

আজ থেকে বহু বছর আগেকার কথা — যখন তারাশংকর সবেমাত্র বাণীর দেউলে প্রবেশাধিকার লাভের ছাড়পত্র পেয়েছেন। সেই সময় একদিন কবি সাবিত্রীপ্রসন্ন চট্টোপাধ্যায়ের সঙ্গে আমাদের দোকানে এসে প্রবেশ করলেন তারাশংকর। চেহারার মধ্যে এমন কোন বৈশিষ্ট্য নেই যা লোককে আকৃষ্ট করবে, তবে আলাপ করার সঙ্গে সঙ্গে বুঝলাম যে, লোকটি নিরহঙ্কার, সরল এবং জ্ঞান ও বুদ্ধির দীপ্তিতে যে কোন অন্ধকারময় পরিবেশকে আলোকিত করতে পারে।

প্রাথমিক আলাপের পর তারাশংকর আমায় তাঁর প্রথম 'চৈতালী ঘূর্ণি' এক কপি দিয়ে অনুরোধ করলেন যে, এইটি তাঁর প্রথম বই, নিজেই এর মুদ্রণব্যয় বহন করেছেন। যেহেতু তিনি নতুন লেখক, দেশের পাঠক সাধারণের সঙ্গে তাঁর পরিচয় এখনও তেমন হয় নি, সেই জন্য আমার দোকানে পুস্তক বিক্রয়ের একটা ব্যবস্থা করে দিতে। আমার রাজি না হওয়ার কোন কারণ ছিল না। সঙ্গে সঙ্গেই রাজি হয়ে আমার দোকান থেকে তাঁর বই বিক্রির ব্যবস্থা করে দিলাম। এর অনেক দিন পরে—যখন তিনি সাহিত্যক্ষেত্রে প্রতিষ্ঠা লাভ করেছেন—তখন আমরা তাঁর একখানি বই প্রকাশ করি, তার নাম হল "প্রসাদমালা"।

সেই থেকে আজ পর্যন্ত তাঁর বহু বই প্রকাশিত হয়েছে। কবি, হাঁসুলী বাঁকের উপকথা, ডাকহরকরা, বিপাশা, সন্দীপন পাঠশালা, সপ্তপদী, দুই পুরুষ, বিচারক, জলসাঘর, আরোগ্য নিকেতন, কালিন্দী, নাগিনী কন্যার কাহিনী, ধাত্রীদেবতা, পঞ্চগ্রাম, মঞ্জরী অপেরা প্রভৃতি। ধাপে ধাপে তিনি খ্যাতির শীর্ষদেশে এসে উপস্থিত হয়েছেন, কিন্তু চরিত্রমাধুর্যে এখনও তিনি সেই আগেকার তারাশঙ্করই আছেন।

মানুষকে তিনি যত ভালবাসেন, মানুষের সুখ-দুঃখকে তিনি যত নিবিড় করে দেখেছেন এবং বুঝেছেন, যে দরদ এবং সহানুভূতি দিয়ে সমাজের সেই সব অপাংক্তেয় লোকগুলিকে তিনি হৃদয়বৃত্তির দিক দিয়ে মহৎ করে তুলেছেন, তা শরৎবাবুর পর আর কোন লেখকের মধ্যে পাওয়া গেছে বলে আমার জানা নেই। যেসব গ্রামের চিত্র, যেসব মানুষের চিত্র, যেসব সমাজের চিত্র তিনি তুলে ধরেছেন তাঁর লেখনীর মাধ্যমে, তা যেমন সত্য, তেমনি শাশ্বত, তেমনি জীবন্ত।

সম্প্রতি 'শনিবারের চিঠি'তে 'আমার কথায় আমার সম্বন্ধে তিনি যা লিখেছেন তা উদ্ধৃত করে দিলাম।

"অনেক জনের অনেক কথাই কানে এসেছে। কিন্তু স্তব্ধই থেকেছি, একটি বাক্যও উচ্চারণ করি নি। কেবল একদিন শ্রীযুক্ত সুধীরচন্দ্র সরকারকে (M, C, Sarkar) বলেছিলাম, ভয় করে সুধীরদা। ভয় করে, অতর্কিতে কোথায় মর্মান্তিক আঘাতে আহত হব। আঘাতও সহ্য হয়—কিন্তু আঘাত পেয়ে যদি প্রতিবাদ করি কি আঘাত ফিরিয়ে দিয়ে উঠি, মতিভ্রষ্ট হই তাহলে লজ্জার আর শেষ থাকবে না।

কথাটা হয়েছিল শ্রদ্ধেয় সুনীতিবাবুর বাড়িতে। রাশিয়া থেকে দুজন লেখক এসেছিলেন। ইন্দো-সোভিয়েত মৈত্রী পরিষদের সভাপতি হিসেবে সুনীতিবাবু তাঁর বাড়িতে নিমন্ত্রণ জানিয়েছিলেন। কথাটা হয়েছিল সেখানে।

শ্রীযুক্ত সুধীরদা সঙ্গে সঙ্গে বলেছিলেন ভাল করেন ভাই—ভাল করেন। এই ভাল। আমরা কাজের জন্য বের হই। বের হতে বাধ্য হই। এবং বাধ্য হয়ে শুনি। কি বলব? তবু বলি, বলি, না-না-না। এমনভাবে বলতে নেই। সৌভাগ্যের দিনগুলিই জীবনের সব নয়। সৌভাগ্যের অন্ত হয়—তার সঙ্গে সব সময়ে জীবনের অন্ত হয় না। আপনি ভালই করেন। তবু মাঝে মাঝে এলে সুখী হই। ভাল লাগে।

সাহিত্যক্ষেত্রে এই একটি মানুষ। জ্যেষ্ঠের উদারতা জ্যেষ্ঠের স্নেহ দিয়ে বসে আছেন এম সি সরকার অ্যান্ড সন্সের দোকানের সেই কোণের দিকে। মোটা পুরু লেন্সের চশমা পরে, নিবাতনিষ্কম্প একটি গিরিশৃঙ্গের মত ধ্যানমগ্ন। তাঁর এদিকে—পশ্চিম দিকে বসে আছেন শ্রীযুক্ত অচিন্ত্য প্রেমেন্দ্র প্রবোধ থেকে প্রমথ গজেন্দ্র বিমল প্রভৃতিদের দু-তিনজন, অথবা আরও কয়েকজন। সামনে বসে আছে বিশু (বিশু মুখুজ্জে), তার পাশে কোনদিন থাকেন শ্রীযুক্ত তুষারবাবু অথবা আর কেউ। আগে থাকতেন শুভ্রকেশ 'কেদারনাথ চট্টোপাধ্যায়—কেদারদা। কথাবার্তার মধ্যে সুধীরদা স্তব্ধ—শুধু শুনেই যান। দরদী মানুষ। সত্যকারের জ্যেষ্ঠ। কে শ্রেষ্ঠ—এই নিয়ে যখন অন্যোন্য অন্যের প্রতি কটূক্তি বর্ষণ করে যান, তখন তিনি মধ্যে মধ্যে বলেন, না-না-না। এইভাবে এমন করে বলতে নেই। না-না-না। না-না-না। এমন করে বললে ঠকতে হয়।

কোন তর্ক তকরারও তোলেন না।

এই সুধীরদা।

সুধীরদা বাংলা-সাহিত্যের একটা কালে—১৯৪০ সন থেকে ১৯৬৭ সন পর্যন্ত নিঃসংশয়ে আমাদের জ্যেষ্ঠ।"

তারাশংকরের লেখার ওপর তো আমার অপরিসীম শ্রদ্ধা ও অনুরাগ তো আছেই, সবথেকে ভালবাসি তারাশংকরকে মানুষ হিসেবে। তিনি যখন আমাকে জ্যেষ্ঠ বলে শ্রদ্ধা জানিয়েছেন, তখন আমিও সেই সুবাদে শুভেচ্ছা এবং আশীর্বাদ দু-ই জানাই—তিনি যেন শতায়ু হয়ে বঙ্গবাণীর ভাণ্ডার আরও পরিপুষ্ট করেন।

স্বনামধন্য সাংবাদিক রামানন্দ চট্টোপাধ্যায় মহাশয়ের জ্যেষ্ঠ পুত্র কেদারনাথ আমার অত্যন্ত অন্তরঙ্গ বন্ধু ছিলেন। রামানন্দবাবুর মৃত্যুর পর ইনিই 'প্রবাসী' ও 'মডার্ণ রিভিউ' পত্রিকা দু'খানির সম্পাদক হন। অফিসের কাজকর্ম সেরে প্রতিদিন বৈকালে আমার দোকানে এসে আসর জমিয়ে তুলতেন নানারকম গল্পগুজবে। সমগ্র বিশ্বের খবরাদিও যেমন তিনি রাখতেন, তেমনি অফুরন্ত ছিল তাঁর গল্পের ভাণ্ডার। লোকের সঙ্গে মিশতেন তিনি অত্যন্ত সরল এবং অনাড়ম্বরভাবে। তাঁর এই অমায়িক এবং নিরহংকার ব্যবহারের দ্বারা তিনি প্রত্যেকেরই অন্তর জয় করেছিলেন। শিশু-সাহিত্যে তাঁর অবদান বড় কম নয়। ছোটদের জন্যে বহু গল্প ও অন্যান্য অনেক বিষয়ও তিনি লিখেছেন। ছোটদের জন্য তাঁর প্রথম গল্প বেরোয় 'সন্দেশ'-এ, তারপর অনেক লেখা প্রকাশিত হয় 'মৌচাকে'। 'জগন্নাথ পণ্ডিত' ছদ্মনামে তিনি একটি বই-ও লিখেছিলেন। বইখানির নাম হল 'জগন্নাথের খেয়াল খাতা'। আর সেখানি আমরাই প্রকাশ করি। লণ্ডন বিশ্ববিদ্যালয় থেকে ইনি বি এস-সি ডিগ্রী লাভ করেন। তাঁর আর একটি বিশেষ গুণ ছিল : তিনি খুব ভাল পাথর চিনতে পারতেন অর্থাৎ তিনি ছিলেন একজন উঁচুদরের জহুরী।

নৃপেন্দ্রকৃষ্ণ চট্টোপাধ্যায়ের সঙ্গে আমার পরিচয় প্রায় পঞ্চাশ বছরের কাছাকাছি ১৯১৯-২০ সাল থেকে। তরুণ বয়সে তিনি অত্যন্ত সুদর্শন ব্যক্তি ছিলেন। প্রচুর পড়াশুনা করতেন নৃপেন্দ্রকৃষ্ণ আর মনটিও ছিল তাঁর অত্যন্ত কাব্যধর্মী। অনুবাদ সাহিত্যে এবং ছোটদের রচনায় তাঁর মত এমন সিদ্ধহাত খুব কম লেখকেরই ছিল।

তবে তাঁর একটি মারাত্মক নেশা ছিল—সেটি হল 'রেস' খেলা। নৃপেন্দ্রর সঙ্গে আমিও অনেকবার গিয়েছি রেসের মাঠে'

কখনও সে জিতেছে কখনও হেরেছে। ফুলের প্রতি তার একটা অসম্ভব আকর্ষণ ছিল। শেষজীবনে প্রায়ই দেখা গেছে রাত্রে যখন বাড়ী ফিরত, তখন তার হাতে এক-ঝাড় রজনীগন্ধা কিংবা পদ্মফুলের গুচ্ছ। তার কথাবার্তা, সহাস্য মুখ আর অমায়িক ব্যবহারে সকলেই পরম প্রীতিলাভ করতো।

'মৌচাকে' প্রতি বৎসর দুর্গাপূজার সময় এবং বৎসরের প্রথম মাসে তিনি একটা করে প্রশস্তি লিখে দিতেন। আর সে-লেখাটা আমাদের সকলেরই খুব ভাল লাগত। এইটিই 'মৌচাকে'র কয়েক বৎসর ধরে একটি বিশেষত্ব ছিল। প্রত্যেক সাহিত্যিকই তাঁর এই প্রতিভায় মুগ্ধ না হয়ে পারতেন না।

'মৌচাকে'র নিয়মিত লেখকদের মধ্যে তিনি ছিলেন অন্যতম। ছোটদের জন্যে শুধু যে তিনি 'মৌচাকে'ই লিখতেন, তা নয়, আমার অনুরোধে তিনি ছোটদের জন্যে নিয়মিত লিখতে শুরু করেন। ছোটদের উপযোগী অনেক বইও লিখেছেন তিনি। তাঁর রচনাশৈলীর একটি নিজস্ব স্বতন্ত্র ধারা ছিল যা ছোট-বড় সকলকেই মুগ্ধ করত।

পরিণত বয়সে তিনি চিত্র-নাট্য রচনায় বিশেষ সুনাম অর্জন করেন। তাঁর প্রথম চিত্রনাট্য হল 'কাশীনাথ', তারপর 'কবি কালিদাস' নামে একটি ছবিতে নাম-ভূমিকায় অভিনয়ও করেছিলেন তিনি। এরপর পরিচালক নীতিন বসুর সঙ্গে ইনি বোম্বাই যান এবং সেখানে 'বিচার' নামে একটি বাংলা ছবিতে একটি বিশিষ্ট ভূমিকায় অভিনয় করেন।

জয়ন্তী মৌচাকে তিনি যা লিখেছিলেন তা এখানে উদ্ধৃত করে দিলাম :

"'মৌচাকে'র জন্মের সঙ্গে বাংলাদেশে সেদিন যে-সব ছেলেমেয়ে জন্মগ্রহণ করেছিল, তাদের বয়স আজ পঁচিশ বছর পূর্ণ হলো...তারা আজ যুবক...

'মৌচাক'ও তাদের সঙ্গে সঙ্গে আজ পঁচিশ বছরে পড়লো...কিন্তু সে চির-কিশোর...এই পঁচিশ বছর ধরে সে বাংলার কিশোর-কিশোরীদের জন্যে মধু সঞ্চয় করে এসেছে।

আজ যারা বাংলার ঘরে জন্মাচ্ছে, তারা আবার যখন পঁচিশ বছরে পড়বে, তারাও দেখবে পঞ্চাশ বছরের কিশোর সাথী তাদের জন্যে তেমনি মধু আহরণ করে চলেছে...

এমনি ধারা চলুক যুগে যুগে মৌচাকের মধু আহরণের মেলা, আজ কায়মনোবাক্যে তাই প্রার্থনা করি...।"

কলকাতা রেডিওতে তাঁর অবদান কম নয়। দীর্ঘদিন ধরে তিনি গল্পদাদুর আসর পরিচালনা করে বাংলার ছেলে-মেয়েদের চিত্তজয় করেন।

'গল্পভারতী'র সম্পাদকরূপেও তিনি সাধারণ্যে বিশেষ খ্যাতিলাভ করেন।

যে সমস্ত সুধী এবং সাহিত্যিকদের ঘনিষ্ঠ সান্নিধ্যে আসার আমার সুযোগ হয়েছে, তাঁদের মধ্যে সুধীন্দ্রনাথ ঠাকুরের নাম বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। ইনি ছিলেন কবিগুরু রবীন্দ্রনাথের অগ্রজ দ্বিজেন্দ্রনাথের চতুর্থ পুত্র। জোড়াসাঁকোর ঠাকুরবাড়ীতে ইনি থাকতেন। ছোটগল্প লিখে সুধীন্দ্রনাথ প্রভূত যশ ও খ্যাতি অর্জন করেছিলেন সেকালে। এঁর শ্রেষ্ঠ গল্পের নাম হল

নৃপেন্দ্রকৃষ্ণ চট্টোপাধ্যায়

'কাশিমের মুরগী'। এঁরই পুত্র হলেন সৌম্যেন্দ্রনাথ ঠাকুর। শরৎবাবুর সঙ্গে যখন আমার আলাপ হয়, তখন সুধীন্দ্রনাথের সঙ্গে তাঁর খুব প্রীতির সম্বন্ধ ছিল। আমরা যখন সুধীন্দ্রনাথের সঙ্গে দেখা করতে যেতাম জোড়াসাঁকোর বাড়ীতে, তখন সৌম্যেন্দ্রনাথ ছিল সুন্দর ফুটফুটে একটি কিশোর বালক। সবসময় সে থাকত খালি পায়ে—গান্ধীজির আদর্শকে মনেপ্রাণে গ্রহণ করেছিল সে।

সৌম্যেন্দ্রনাথ যখন তরুণ বয়সে উপস্থিত হলেন, তখন তাকে বিপ্লবী দলের একজন সন্দেহ করে বৃটিশ সরকার রবীন্দ্রনাথকে বলেছিল—এ যদি এখন বিলেত চলে যায়, তাহলে এর বিরুদ্ধে কোন চার্জ আনা হবে না, নাহলে এ যেরকম বিপ্লবে মেতে উঠেছে, তাতে একে কারারুদ্ধ করতে আমরা বাধ্য হব। ফলে সৌম্যেন্দ্রনাথকে বিলেত চলে যেতে হয়। সেখানেই তিনি পড়াশুনা করেন এবং Trotskite মতাবলম্বী হন। এই দলের মতবাদ হল কম্যুনিস্ট মতবাদের ঠিক উল্টো।

সুধীন্দ্রনাথ ছিলেন বিনয়ী, নম্র—পাণ্ডিত্যে এবং ভদ্রতায় তুলনাহীন। তিনি ওকালতি পাশ করেন কিন্তু কোনদিন আদালতে প্র্যাকটিশ করেননি। কিছুদিন আগে এঁর একটা ছোট গল্পের সংগ্রহ 'চিত্রালী' বেরিয়েছে, আর সেটা আমরাই প্রকাশ করেছি। এ ছাড়াও তাঁর আরও কয়েকটি গল্পের বই আছে। চিত্ররেখা, বৈতানিক, করঙ্ক, প্রসঙ্গ ইত্যাদি।

রবীন্দ্রনাথের 'সাধনা' পত্রিকাখানির সম্পাদনাও করেছিলেন ইনি বেশ কিছুদিন।

শ্রীঅন্নদাশঙ্কর রায়ের নাম সাহিত্য-জগতে অতি সুপরিচিত। ছড়া, উপন্যাস, কবিতা, গল্প, ভ্রমণ প্রভৃতি সকল শ্রেণীর লেখাতেই এঁর অসীম পারদর্শিতা।

অধুনালুপ্ত বিখ্যাত মাসিক পত্রিকা 'বিচিত্রা'তে যখন অন্নদাশঙ্করের সেই অপূর্ব ভ্রমণ-কাহিনী 'পথে প্রবাসে' ধারাবাহিকভাবে প্রকাশিত হচ্ছিল, তখনই তিনি শরৎচন্দ্রের মতো বাংলাসাহিত্য-জগতে উদিত হয়ে আমাদের বিস্ময়ের উদ্রেক করেন। 'পথে প্রবাসে' লিখেই তিনি বাংলাসাহিত্যে স্থায়ী আসন প্রতিষ্ঠা করলেন এবং সেই থেকে নিরবচ্ছিন্নভাবে নানাজাতীয় রচনায় বাংলা-সাহিত্যকে পরিপুষ্ট করেছেন। এই সময় থেকেই তাঁর সঙ্গে আমার আলাপ—সেই পরিচয় সর্বশেষ অন্তরঙ্গ হয়ে ওঠে তাঁর 'পথে প্রবাসে' প্রকাশ করার পর থেকে।

আমার অনুরোধে শিশু-সাহিত্যেও তাঁর আগমন সার্থক হয়ে ওঠে নানাজাতীয় লেখার মাধ্যমে। তিনি 'মৌচাকে' ধারাবাহিকভাবে লেখেন আর একটি ভ্রমণ-কাহিনী 'ইউরোপের চিঠি' নাম দিয়ে এবং সে 'ইউরোপের চিঠি' যে প্রত্যেকটি শিশুর চিত্তকে জয় করেছে, এবিষয়ে আমি নিঃসন্দেহ। পরে অবশ্য 'ইউরোপের চিঠি' পুস্তকাকারে প্রকাশিত হয়েছে।

ছড়া রচনায় তিনি এক নতুন যুগের সৃষ্টি করেছেন। আপাতদৃষ্টিতে তাঁর ছড়াগুলি কৌতুক উদ্রেক করলেও গভীরভাবে বিচার করে দেখলে বোঝা যাবে যে, তার মধ্যে অনেক সামাজিক ও রাজনৈতিক অব্যবস্থার প্রতি ইঙ্গিত আছে। যেমন ধরুন তাঁর বিখ্যাত ছড়া—

তেলের শিশি ভাঙলো বলে
খুকুর পরে রাগ করো
তোমরা যেসব বুড়ো খোকা
ভারত ভেঙে ভাগ করো
তার বেলা?

শোনা গিয়েছিল যে, এই ছড়াটি সরকার অনুমোদন করতেন না। যে-কোনো কারণেই হোক, নির্ধারিত সময়ের পূর্বেই তাঁকে সরকারী কাজ থেকে বিদায় গ্রহণ করতে হয়েছে। সেই থেকে এখন তিনি সাহিত্য-সেবাতেই সর্বক্ষণ আত্মনিয়োগ করেছেন। তাঁর বিখ্যাত ছড়ার বই দু'খানির নাম হল 'ডালিম গাছে মৌ' ও 'রাঙা ধানের খই'।

'পথে প্রবাসে' ছাড়াও তাঁর আরও অনেক ভ্রমণ কাহিনী আছে। যেমন 'জাপানে' ও 'ফেরা'। 'ফেরা' হল পশ্চিম জার্মানীর ভ্রমণবৃত্তান্ত। ভ্রমণ-কাহিনী রচনার মধ্যে যে স্বাতন্ত্র্য ও বৈশিষ্ট্য তিনি অর্জন করেছেন তার স্বীকৃতি অবশ্য পেয়েছেন পাঠকদের কাছ থেকে। 'জাপানে'র জন্য তিনি সাহিত্য আকাদেমী পুরস্কার লাভ করেন। শিশু-সাহিত্যের জন্য তিনি মৌচাক পুরস্কারও পেয়েছেন।

বাংলা-সাহিত্যে এপিকধর্মী উপন্যাস লেখার কৃতিত্ব তাঁর 'সত্যাসত্য' উপন্যাসে দেখা গেছে। এই উপন্যাস তাঁর অক্ষয় কীর্তি।

(ক্রমশঃ)

ভালোবাসা

অমরেন্দ্রনাথ দত্ত

ভালোবাসা! কী মধুর কথা! কী অনির্বচনীয়! এমন গালভরা মিষ্টি কথাটি জগতে কোথা থেকে এল, কে সৃষ্টি করল? 'ভালোবাসি' এই কথাটি মনে প্রাণে জাগায় কত সুখ, কত আনন্দ, কতনা তৃপ্তি। কবি গেয়েছেন, "ভালোবাসি, ভালোবাসি—এই সুরে কাছে দূরে জলে স্থলে বাজায় বাঁশি।"

জগতে ভালোবাসা কথাটির মতো দামী কথা বুঝি আর নেই। কিন্তু দেখেশুনে মনে হচ্ছে আজকাল ওটার মূল্য কমে গেছে; বেহাং সস্তা হয়ে পড়েছে। স্থান-কাল-পাত্র বিবেচনা নেই, যত্রতত্র এর প্রয়োগ। কথাটির অপপ্রয়োগ, যেমন ব্যবহার আপনারা লক্ষ্য করেছেন নিশ্চয়! এই দেখুন না, সেদিন এক মহিলা বললেন, আমি ঠান্ডা কফি খেতে ভালোবাসি। সম্ভবত কফিতে দুধচিনিটা ওঁর একটু বেশি চাই? আবার লোকে হামেশাই বলে থাকে, মাছমাংস ডিম খেতে তারা ভালবাসে। তাহলেই বুঝুন, ব্যাপারটা কোথায় গিয়ে দাঁড়িয়েছে? ভালোবাসাটা হল নিছক উদরের ব্যাপার, হৃদয়ের নয়। তা-ই নয় কি? পাঁইচচ্চড়ি, আলুকুমড়ো, দই-সন্দেশ কিংবা মর্তমান কলা ছাড়া 'ভালোবাসার মতো জিনিস যেন সংসারে আর নেই! কী কাণ্ড! ভালোবাসার বস্তু হল কিনা হাট-বাজারের মালপত্র!

কোনো কিছু খাওয়া সম্বন্ধে ভালোবাসা কথাটি যদি ব্যবহার করতেই হয় তবে, আমার মতে শুধু একটি ক্ষেত্রেই তা প্রযোজ্য, চুমু খাওয়া। যদি কেউ বলে, আমি চুমু খেতে ভালোবাসি, তবে তার সাতখুন মাপ।

সংসারে ভালোবাসার বস্তু তো মাত্র একটা। পুরুষমানুষ ভালোবাসবে নারীকে, আর নারী পুরুষকে। তা, দুক্ষেত্রেই হোক না সংখ্যাটা বাড়তি, কিছু এসে যায় না। পরস্পর পরস্পরকে ধরাছোঁয়া যাবে, কাছে টেনে এনে চুমু খাওয়া চলবে। সুখ-ঘন সান্নিধ্যে রোমাঞ্চ অনুভব করা যাবে,—তবে তো ভালোবাসা! এর কাছে কিনা এক কাপ চা কিংবা এক ডিস পুডিং। বলুন তো, কী অন্যায় কথা? আমার কথা হল, যে কথাটি স্বর্গীয়, পবিত্র, যা নরনারীর দিনরাত জপ করা উচিত সে কথাটির এবংবিধ ইতর প্রয়োগ মর্মান্তিক, দস্তুরমতো ট্রাজেডি। কী জানেন, দামী জিনিসকে এত সস্তা করা নিজেকেই ঠকানো।

ভালোবাসা স্বর্গীয় বস্তু। মানুষের প্রেম নিকষিত হেম। ভালোবাসার দেবতা হল মদন। তার অস্ত্র হল তীর। মদনদেব তীর ছুঁড়ে প্রাণ বিঁধেন, প্রেমের সেই ক্ষত সারায় নারী। যার প্রাণের ঐ ক্ষত শুকোয় নি, তার জীবন ব্যর্থ। কোনো কোনো ক্ষেত্রে আবার মদনদেবের তীর ছোঁড়াও ব্যর্থ হয়। দোষ তাঁর নয়, প্রকৃতির।

ভালোবাসার নানা উপকরণ। আনন্দ, আসক্তি, আকর্ষণ, ভাবোচ্ছ্বাস, দুঃখ, মান-অভিমান, হাসিকান্না ইত্যাদি। এর মধ্যে কোনটা প্রধান তা নির্ভর করে লোকের মানসিক অবস্থার উপর। আর এতো জানা কথা ভালোবাসা খানিকটা অত্যাচার করে, অত্যাচার চায়ও। "যারে সে বেসেছে ভালো তারে সে কাঁদায়"।

ভালোবাসার আবার শ্রেণীবিভাগ বা রকমফের আছে; বৈচিত্র্য তো নিশ্চয়ই। সেটা ভালোবাসার পাত্রপাত্রীদের নিজস্ব ব্যাপার। 'শেষের কবিতা' দেখুন। অমিত বলছে "যে-ভালোবাসা ব্যাপ্তভাবে আকাশে মুক্ত থাকে অন্তরের মধ্যে সে দেয় সংগ; যে-ভালোবাসা প্রতিদিনের সব কিছুতে যুক্ত হয়ে থাকে সংসারে সে দেয় আসংগ। দুটোই আমি চাই।" আরো বলছে, "কেতকীর সংগে আমার সম্বন্ধ ভালোবাসারই, কিন্তু সে যেন ঘড়ায় তোলা জল, প্রতিদিন তুলবো, প্রতিদিন ব্যবহার করবো। আর লাবণ্যর সংগে আমার যে-ভালোবাসা, সে রইলো দীঘি, সে ঘরে আনবার নয়, আমার মন তাতে সাঁতার দেবে।"

যৌবনকে জিইয়ে রাখে এই ভালোবাসা। ভালোবাসা হবে প্রাণবন্ত। ভালোবাসার আগুন অনুক্ষণ জ্বলবে প্রাণে; সে-আগুনের পরশমণির ছোঁয়ায় সার্থক হবে প্রেম। যে-নারীর প্রাণে আগুন নেই, যার কাছ থেকে সাড়া পাওয়া যায় না, সে তো মদনদেবের রাজ্যে জুজুবিশেষ! চাই আসক্তি, তাতে ভাটা যেন না পড়ে। দাম্পত্য একটা আর্ট, প্রতিদিন ওকে নতুন করে সৃষ্টি করা চাই—অনুরাগে, ভালবাসায়।

বিবাহ মানেই ভালোবাসা, লোকে বলে। সবক্ষেত্রে কি তা-ই? আপনারা তো জানেন, বিয়ে সামাজিক কারণে হয়; অনেক সময় অসামাজিক কারণেও হয়ে থাকে। আবার কখনো বা বিয়ে একটা বৈষয়িক ব্যাপার কিংবা ব্যবসাদারিতেও পরিণত হয়।

আজকাল আবার লভ্-ম্যারেজটা খুব চলতি। একটা ফ্যাশন। আগে লভ্ বা প্রেম, পরে বিয়ে। অর্থাৎ, সাঁতার না শিখে জলে নামা হবে না! ধারণাটা এই, বিয়ের পরে প্রেম হয় না। হলেও সেটা মামুলি, তাতে অ্যাডভেঞ্চার নেই। কে জানে! তবে 'যা দেখেছি যা পেয়েছি' তাতে তো মনে করি বিয়ের পরেই প্রেম জোরালো হয়, স্বামী-স্ত্রীর পরিচয়ের রস দিনে দিনে রহস্যময় হয়ে ওঠে।

অনেকের ধারণা ভালোবাসা একটা রোগ বিশেষ। হবেও বা; জানি নে। তবে মনের একটা ভাব বা অবস্থা তো বটেই। এবং এর জন্যে জীবনে দুঃখদুর্দশাও ভোগ করতে হয় বৈকি। 'আমি তোমায় ভালোবাসি'—প্রেমাস্পদের মুখ থেকে এই কথাটি শোনবার জন্যে লোক পাগল হয়, হিতাহিত জ্ঞান হারিয়ে ফেলে; হাওড়ার পুল থেকে ঝম্প-প্রদান করে, নয়ত বিষ খায়, এমনকি সর্বস্ব বিলিয়েও দেয়। ডি. এল. রায় বলেছেন, "যখন থাকে নাকো Future-এর চিন্তা, থাকে না কো shame তাকেই বলে প্রেম!"

ভালোবাসা আবার এমন বস্তু যার প্রকাশ জীবনে বাহ্যত বড়একটা দেখা যায় না। কিন্তু সিনেমা-থিয়েটারে প্রেমের হরেক লীলা-খেলা আপনি দেখতে পাবেন। অধিকাংশ ক্ষেত্রে কমেডি, কখনো বা ট্রাজেডিরূপে। সিনেমাশিল্পের ভিত্তি হল প্রেম।

প্রেমের ফাঁদ পাতা ভুবনে। ওর গতি সর্বত্র। একটু অসতর্ক হলেই বিপদ। অতি কঠোর প্রকৃতির লোকই হোক কিংবা হাল্কা মেজাজের, রেহাই নেই কারো। যথেচ্ছ প্রেম অনেকসময় জীবনটা তচনচ করে দেয়—কখনো সাইরেনরূপে, কখনো বা রুষ্টা উগ্রচণ্ডা নারীরূপে। মানুষকে নামিয়ে আনে নীচে।

যাঁরা শাসনকার্যে লিপ্ত তাঁরা ভালোবাসায় মেতে গেলে শাসনকার্য অচল হয়ে পড়তে পারে। ইতিহাসপ্রসিদ্ধ কর্মবীরদের মধ্যে প্রেম-পাগল অর্থাৎ প্রেমে হাবুডুবু খেয়েছেন এমনতর লোকের সংখ্যা বেশি নয়। অবশ্য প্রাচীন রোম সাম্রাজ্যের মার্ক এন্টনির উদাহরণ আপনি দেখাতে পারেন। ক্লিওপেট্রার প্রেমে মজে গিয়ে এন্টনি কাজকর্ম দায়িত্ব সব বিসর্জন দিয়েছিলেন। তাতে কিন্তু ওঁর কিছু ভাল হয়নি। শেষপর্যন্ত ক্লিওপেট্রা প্রতারণা করেছিলেন তাঁকে।

প্রেম সুলভ হলে প্রণয়ীর প্রণয়ের আবেগ ক্রমশ হ্রাস পায়, আগ্রহ থাকে না। কথিত আছে, ভিক্টর হিউগো যে-রমণীকে ভালোবেসেছিলেন তাকে বিয়ে করেন নি; নিজের কাছ থেকে বরাবর দূরে রেখে দিয়েছিলেন তাকে! পরে ওঁদের পুত্রের বয়স যখন একুশ বৎসর হল তখন তার জননীকে তিনি বিয়ে করেছিলেন।

কী জানেন, হৃদয়ের এই উচ্চ পবিত্র ভাব বাস্তবের ক্ষুদ্রতার মধ্যে টেনে আনলেই তা বিশ্রী খর্ব হয়ে যায়। "কেন তুমি মূর্তি হয়ে এলে, রহিলে না ধ্যান ধারণার"।

লোকে বলে, ভালোবাসা ও অর্থের নিকট সম্পর্ক। "ধন নয় মান নয়, একটুকু বাসা করেছিনু আশা"—ও কথা কবিতায় বা উপন্যাসের কাহিনীতেই মানায়।

আচ্ছা, লভ্ ফর্ লভস্ সেক্? —সে-ভালোবাসা কি নারীর পক্ষে সম্ভব? প্রেম পদার্থটা অ্যাবস্ট্রাক্ট, ধরতে ছুঁতে পাচ্ছেন না। নারী কি কখনো অ্যাবস্ট্রাক্ট কিছু ভাবতে বা ধারণা করতে পারে? ওর জীবনে সব-

কিছুই তো কন্‌ক্রীট! খেয়াল করে থাকবেন নারী মাছ কুটতে বসে পরিবারের দশজন লোকের জন্যে এক, দুই, তিন ইত্যাদি অ্যাবস্ট্রাক্টভাবে গুণে কদাপি দশটি টুকরো করে না; পরন্তু, মাছের টুকরো হিসাব করে থাকে, খোকন, মঞ্জু, ঠাকুরপো, উনি ইত্যাদি কন্‌ক্রিট প্রোসেসে! আরো দেখুন, নারীর জীবনের আল্টিমেট ব্যাপারটাও রীতিমতো কন্‌ক্রীট। নারীপুরুষের সম্মিলনের প্রোডাক্ট যে-বস্তু তা-ও মূর্তিমান কন্‌ক্রীট। ওদের জীবনে কোথাও অ্যাবস্ট্রাক্ট কিছু নেই। অতএব অ্যাবস্ট্রাক্ট ভালোবাসা......?

নারীতে অ্যাবস্ট্রাক্ট কিছু পাওয়া যায় না, এ-মতের অ্যামেণ্ডমেণ্ট হিসাবে অবশ্য এই কথা বলা চলে যে, নারী হচ্ছে জীবন-কারার একটা গবাক্ষ যার ভিতর দিয়ে ভাগ্যক্রমে সুদূরের ধূসরিমা চোখে পড়তে পারে। সে নিজে অত্যন্ত নিকট আর তাতে সুনীলিম বা অপর কোনরূপ কাণ্ড-কারখানা নেই। সে একটা গ্রন্থিবিশেষ। কিন্তু তা হলে হবে কি? সে নিজে না জেনে আপনার সমস্ত তৈজসনাড়ী সে-ই বীণার ন্যায় গবাক্ষে ঝোলাতে পারে যে-বীণা রাজা শুদ্ধোধন গৌতমের জানলায় রেখেছিলেন।

পুরুষের প্রেম নারীকে নতুন করে সৃষ্টি করেছে,—"অর্ধেক মানবী তুমি অর্ধেক কল্পনা"।

ভেবে দেখুন, পুরুষের ভালোবাসা সমগ্র নারীজাতিকে কত বড় সম্মানই না দিয়েছে! আমাদের দেশের তাজমহল আর বৃন্দাবনই তার সাক্ষ্য। মুগ্ধনেত্রে তাজমহলের সৌন্দর্যের দিকে তাকিয়ে মনে পড়ে সেই কোন্ সুদূরের অপূর্ব সৌভাগ্যশালিনী এক মহিয়সী নারীর কথা! আর প্রেম-প্রীতি-ভালোবাসার লীলাক্ষেত্র বৃন্দাবনে পদার্পণ করে নরনারী ভাবাবেশে বলে ওঠে, 'জয় রাধে' 'জয় রাধে', 'জয় রাধে'। তবে বৃন্দাবনের ব্যাপার ট্রাজেডি। আর একথা তো জানাই আছে যে, প্রকৃত ভালোবাসা যেখানে সেখানেই ট্রাজেডি। তাজমহল আর বৃন্দাবন—এই দুই স্থানে ভালোবাসা মূর্ত ও অমর হয়ে রয়েছে: একটাতে ইন্ স্টোন, ইন্ ম্যাটার; অপরটাতে ইন্ স্পিরিট।

জানাতে পারেন

(প্রশ্ন)

আমার বন্ধুর সঙ্গে একটা বিষয় নিয়ে তর্ক লেগেছে। 'ভারতের শেষ গভর্নর জেনারেল' হিসাবে অবশ্য শ্রীরাজাগোপালাচারীর নামই বই-এ পাওয়া যায়। কিন্তু ডাঃ রাজেন্দ্রপ্রসাদও যেন কিছুকাল উক্ত পদে অধিষ্ঠিত ছিলেন। সেই হিসাবে উনিই 'শেষ গভর্নর জেনারেল' নন কি?

শান্তনু ভট্টাচার্য
ডি, এস, এচ (এফ)
ডিগবয়।

●

১। কলিকাতা কর্পোরেশন এলাকায় ১৯৬৭ ইং পর্যন্ত:—

(ক) প্রাথমিক বালক স্কুল কয়টি?

(খ) প্রাথমিক বালিকা স্কুল কয়টি?

(গ) উচ্চ ইংরাজী বালক স্কুল কয়টি?

(ঘ) উচ্চ ইংরাজী বালিকা স্কুল কয়টি?

(ঙ) বালকদের কলেজ কয়টি?

(চ) বালিকাদের কলেজ কয়টি?

(ছ) অন্যান্য প্রকারের বালক স্কুল কয়টি?

(জ) অন্যান্য প্রকারের বালিকা স্কুল কয়টি?

(২) উপরোক্ত প্রতিষ্ঠানসমূহে বিদ্যার্থী মোট বালকের সংখ্যা কত এবং বালিকার সংখ্যা কত?

(৩) উত্তমচাঁদ লিখিত 'নেতাজী সুভাষচন্দ্র বসুর অন্তর্ধান' কাহিনীর প্রাপ্তি-স্থানের ঠিকানা ও মূল্য জানতে চাই।

মোহান্ত গুরুসদয় বিদ্যাবিনোদ
হাইলাকান্দি (কাছাড়)

(উত্তর)

৭ম বর্ষ, ২য় খণ্ড, ১৯ সংখ্যায় প্রকাশিত শিবেশ চৌধুরীর প্রশ্নের উত্তরে জানাই যে,

আফ্রিকায় ছোট বড় মোট ২৪টি রাষ্ট্র আছে। প্রধান ১৯টি'র নাম দেওয়া হলো—

		রাজধানী
১। নাইজিরিয়া	—	ল্যাগাস
২। ঘানা	—	আক্রা
৩। কেনিয়া	—	নাইরোবি
৪। টাঙ্গানিকা	—	ডার-এস-সালাম
৫। বেলজিয়াম-কঙ্গো	—	লিওপোল্ডভিল
৬। ফরাসী-কঙ্গো	—	ব্রাজাভিল
৭। ইরিথ্রিয়া-আবিসিনিয়া	—	আদ্দিস-আবাবা
৮। উত্তর রোডেশিয়া	—	লিভিংস্টোন
৯। দক্ষিণ রোডেশিয়া	—	স্যালসবেরি
১০। মোজাম্বিকা	—	লরেঞ্জোমার্কুয়েস
১১। মাদাগাস্কার টানানারিভে।		

১২। দক্ষিণ আফ্রিকা সম্মেলন—ট্রান্সভাল, অরেঞ্জোফ্রিস্টেট, ন্যাটাল ও অন্তরীপ প্রদেশ নিয়ে ইহা গঠিত।

		রাজধানী
(ক) ট্রান্সভাল	—	প্রিটোরিয়া
(খ) ন্যাটাল	—	পিটার্সবার্গ
(গ) অরেঞ্জোফ্রিস্টেট	—	ব্লুমফন্টেন
১৩। মরক্কো	—	রাবাট
১৪। আলজিরিয়া	—	আলজিয়ার্স
১৫। টিউনিসিয়া	—	টিউনিস
১৬। লিবিয়া	—	ত্রিপলি
১৭। মিশর	—	কায়রো
১৮। সুদান	—	খার্তুম
১৯। উগান্ডা	—	এনটেবে

কয়েকজন রাষ্ট্রপ্রধান

১। ঘানা — কে, এনক্রুমা
২। আলজিরিয়া—আহ্‌মদ বেন বেল্লা
৩। কেনিয়া — জেমো কেনিয়াট্টা
৪। দক্ষিণ আফ্রিকা সম্মেলন— এইচ, ভেরউড
৫। মিশর —গামাল আবদুল নাসের

একই সংখ্যায় প্রকাশিত পঞ্চানন প্রামাণিক, নৃপেন্দ্রকান্তি ঘোষের ২ নম্বর প্রশ্নের উত্তরে জানাই যে, পৃথিবীতে সবচেয়ে বড় প্রাসাদ ভ্যাটিক্যান প্রাসাদ। পৃথিবীতে সবচেয়ে ছোট স্বাধীন রাষ্ট্র ভ্যাটিক্যানে (১০৯ একর) অবস্থিত।

একই সংখ্যায় প্রকাশিত এস, এন মৈত্রের ৪ নম্বর প্রশ্নের উত্তরে জানাই যে আমেরিকার 'প্রেরি দাদু শাই এবং ক্রস ক্রোসের মধ্যে 'টুইন জেফিরস' বলে ডিসেল ইঞ্জিন ও বৈদ্যুতিক শক্তিতে পরিচালিত যে ট্রেনটি নিত্য যাত্রী নিয়ে যাতায়াত করে সেই ট্রেনটিই পৃথিবীর সবচেয়ে দ্রুতগামী ট্রেন। ঘণ্টায় ৮৪ মাইল বেগে এই ট্রেন চলে।

এই সংখ্যায় প্রকাশিত পঞ্চানন প্রামাণিক এবং নৃপেন্দ্রকান্তি ঘোষের ৩ নম্বর প্রশ্নের উত্তরে জানাই যে, পৃথিবীর আশ্চর্য জিনিসগুলি হলো—

প্রাচীন যুগের

১। মিশরের পিরামিড, ২। ব্যাবিলনের শূন্যোদ্যান, ৩। জুপিটার মূর্তি, ৪। ডায়েনার মন্দির, ৫। রোডস দ্বীপের পিতল মূর্তি, ৬। আলেকজান্দ্রিয়ার আলোকস্তম্ভ, ৭। প্রাচীন গ্রীসের রাজা মওসলাসের সমাধিস্তম্ভ।

মধ্য যুগের

১। চীনের প্রাচীর, ২। ন্যানকিনের চিনামাটির মিনার, ৩। সেন্ট সোফিয়ার মসজিদ, ৪। ইংলণ্ডের স্টোন হেঞ্জ, ৫। রোমের বৃত্তাকার মঞ্চ, ৬। আগ্রার তাজমহল, ৭। পিসার হেলান স্তম্ভ।

বর্তমান যুগের

১। এম্পায়ার স্টেট বিল্ডিং (১০২ তলা) ২। টেমস্ নদীর সুরঙ্গ, ৩। পানামা খাল, ৪। সানফ্রান্সিসকোর অকল্যান্ড ব্রীজ, ৫। সিন্ধুর উপর ব্যারেজ, ৬। অ্যাসুয়ান বাঁধ (মিশর), ৭। ভাকরা-নাঙ্গাল বাঁধ।

আশীষ ঘোষ
অমিয়াংশু দে
কলকাতা—৪

পুরোনো পাতা

পথিক

হরিশচন্দ্র মিত্র

শীতের প্রভাত, অন্ধকার কুয়াসার মাঝে ঊষার আভাষ ফুটিয়া উঠিতেছে, উত্তরের হিম বাতাস বহিতেছে, কিন্তু আমাদের বাড়ি আজ ব্রাহ্মণ ভোজন—সকালেই ঘরের বাহির না হইলে নয়—আমি শীতে কাঁপিতে কাঁপিতে প্রত্যুষে উঠিয়া কলসীকক্ষে গঙ্গাস্নানে যাইতেছিলাম, নদীর ধারে আসিয়া দেখিলাম একটি গাছের তলায় একজন স্ত্রীলোক শুইয়া আছে, আমাকে দেখিয়া মেয়েটি উঠিয়া বসিল, আমাদের এ ক্ষুদ্র গ্রামের মধ্যে আমরা মেয়েরা সকলকে সকলে চিনি, দেখিলাম মেয়েটি এ গাঁয়ের নয়, একটু অবাক হইলাম, অমন রূপবতী যুবতী মেয়েটি একাকী এখানে কেন? তাহার শীতে বিবর্ণ, অবসন্ন, শ্রান্ত-ভাবাপন্ন মুখখানি দেখিয়া প্রাণ কেমন কাঁদিয়া উঠিল, কাছে গিয়া জিজ্ঞাসা করিলাম—"হ্যাগা, তুমি কে গা, কোথা হইতে আসিয়াছ?" মেয়েটি বিষণ্ণ মুখ তুলিয়া আস্তে আস্তে উত্তর করিল—"আমি একজন যাত্রী গো, আর চলিতে পারিলাম না, এইখানেই তাই পড়িয়া আছি—"

"তুমি যুবতী একা যাত্রী। বাড়ির লোকেরা তোমাকে এরূপে একা ছাড়িয়া দিয়াছে?"

যুবতী চক্ষু নত করিয়া বলিল—"বাড়ির লোক আমার কেহ নাই—"। তাহার বিষণ্ণ স্বর আমার হৃদয়ে প্রবেশ করিল—বলিলাম—"কেহ নাই তোমার! তবে কোথায় যাইবে তুমি?"

যুবতী বলিল—"যদি স্থান পাই, এইখানেই থাকিব, আমাকে কেহ এখানে দাসী রাখিবেন?"

আমার চোখে জল আসিল—আর কিছু জিজ্ঞাসা করিতেও মুখ ফুটিল না—বুঝিলাম অভাগিনী বিধবা ভদ্রকন্যা, সংসারের মোহাবর্তে পড়িয়া আশ্রয় হারাইয়াছে, বলিলাম—"আজ হইতে আমি তোর দিদি হইলাম—আমার সঙ্গে চল।" গঙ্গাস্নান করিয়া তাহাকে সঙ্গে করিয়া বাড়ি লইয়া আসিলাম।

(২)

অল্পদিনের মধ্যেই যমুনা আমাদের নিতান্ত আপনার হইয়া পড়িল, এমন কোন কথা নাই যাহা তাহাকে না বলিয়া আমাদের দুই যায়ের মনের তৃপ্তি হয়, এমন কোন আমোদ-প্রমোদ কাজকর্ম নাই যাহা তাহাকে ছাড়িয়া করিতে মন ওঠে। ক্রিয়া-কর্মে, অসুখে-বিসুখে, হর্ষ-উল্লাসে যমুনা আমাদের সঙ্গিনী, সুখে-দুঃখে সে আমাদের আপনার। কিন্তু আমরা তাহাকে যত আপনার ভাবি সে কি আমাদের তত ভাবে?

আমাদের স্নেহে তাহার তো কই সে স্থির বিষণ্ণ ভাব ঘুচে না, আমাদের কাছে সে তো কখনো তাহার হৃদয়ের কথা খুলে না। এতদিন আসিয়াছে আমরা তাহার জীবন ইতিহাস কিছুই জানিলাম না, এইমাত্র জানি—জাতিতে সে আমাদের একজাতি, সে কায়স্থকন্যা। বাপের বাড়ি তাহার মেদিনীপুর জেলায়। বাপ-মা এখন কেহই নাই, তাহার দাঁড়াইবারও স্থান নাই।

"কেন শ্বশুরালয়?"

সে কথায় সে উত্তর করিতে চাহে না, এ সম্বন্ধে বেশি পীড়াপীড়ি করিলেই তাহার চোখ দুটি জলে ভরিয়া আসে—সে সেখান হইতে চলিয়া যায়।

আমাদের সহিত যমুনার এরূপ লুকাচুরি ভাব কেন? একি আমাদের প্রতি তাহার ভালোবাসার অভাব?

এখনো বৎসর পূর্ণ হয় নাই, যমুনা শীতকালে আসিয়াছিল—এখন বর্ষা আসিয়াছে। আজ সকাল হইতে মেঘ করিয়া আছে—চারিদিক একটা আঁধার বিষণ্ণ ভাবে আচ্ছন্ন—আমরা দুইজনে বিকালে গঙ্গায় গা ধুইতে আসিয়াছি। সিঁড়ি দিয়া নামিতে নামিতে আকাশের মেঘ গাঢ়তর হইয়া গঙ্গার জল যেন আরো কালো করিয়া তুলিল—দেখিতে দেখিতে জলে নামিলাম; অল্পক্ষণের মধ্যেই ঝুপ ঝুপ করিয়া বৃষ্টি আরম্ভ হইল—আমি ব্যস্ত হইয়া বলিলাম—"যমুনা, শীঘ্র ওঠ—আর না"—যমুনা আমার দিকে মুখ ফিরাইল—চমকিয়া উঠিলাম—কি ঘোর বিষণ্ণতা! বাহিরের আঁধার যেন তাহার হৃদয়ের অর্ধ বিকাশ মাত্র। আমার দিকে চাহিয়া ধীরে ধীরে বলিল—"দিদি, তুমি ঘরে যাও—আমি আর একটু থাকি"—আমি আর থাকিতে পারিলাম না—বলিলাম, "যমুনা, আমরা কি তোর এতই পর?" সে আমার কথা বুঝিল, জলপূর্ণ নেত্রে কহিল, "দিদি, আর তো আমার আপনার অন্য কেহ নাই!"

"তবে যমুনা, তোর এই বিশ্বাসের অভাব কেন? আমাদের কাছে মনের ব্যথা লুকোস কেন?"

যমুনা ঊর্ধ্বদৃষ্টি হইয়া কহিল, "ভগবান জানেন কেন লুকাই। কিন্তু আজ আর লুকাইব না, যদি এই অভাগিনীর জীবন শুনিতে এতই সাধ, তবে শোনো দিদি!"

আমরা সিঁড়িতে উঠিয়া বসিলাম; চৌদিকে অন্ধকার, পদতলে নদী, মাথার উপর অবিশ্রান্ত বৃষ্টি, দুইজনে চারিদিক ভুলিয়া দুইজনের মুখপানে চাহিয়া রহিলাম, যমুনা গল্প করিতে লাগিল, আমি নীরবে শুনিতে লাগিলাম।

(৩)

"সেদিনও ঠিক এইরকম একটি দিন, সকাল হইতে মেঘ করিয়া সন্ধ্যাবেলা বৃষ্টি আরম্ভ হইয়াছে। আমি আমাদের কুটিরে আমার রুগ্ন মাতার কাছে বসিয়া আছি। আমার বয়স বার বৎসর, কিন্তু এখনো বিবাহ হয় নাই। আমার বয়স যখন ৫ বৎসর তখন আমার পিতার মৃত্যু হয়। পিতা ধনবান ছিলেন, কিন্তু তাঁহার মৃত্যুর পর দু-একজন দুষ্ট লোক তাঁহার ঋণের দাবি দিয়া আমাদের বিষয়সম্পত্তি বিক্রয় করিয়া লয়। সংসারে আমাদের আপনার লোক কেহ নাই, উদ্যোগ করিয়া, যত্ন করিয়া আমার বিবাহ দিবার কেহ নাই, মা একা স্ত্রীলোক! দরিদ্র কায়স্থ কন্যার বিবাহ সহজে হয় না। তাই এতদিন আমার বিবাহ হয় নাই। মা সেজন্য বিশেষ চিন্তিত হইয়া পড়িয়াছেন। মনের অসুখে শরীর অসুখ দিন দিন তাঁহার বৃদ্ধি পাইতেছে, তিনি যাহাকে পান কেবল ঐ কথা

ফটো : মানস কুণ্ডুচৌধুরী

বলেন, একটি সুপাত্র স্থির করিতে অনুরোধ করেন, ঐ এক কথাই তাঁহার মনে জাগিতেছে, তাহা ছাড়া যেন তাঁহার মনে আর কোন কথা নাই। সেদিন সন্ধ্যাবেলাও ঐ কথা হইতেছিল, মা গেলে আমার কি দশা হইবে আমাকে বুকে ধরিয়া মা তাহাই বলিতেছিলেন, বাহিরে ঝুপ ঝুপ করিয়া বৃষ্টি হইতেছিল, ঘরের মধ্যে আমাদের দুজনের অশ্রুধারা বহিতেছিল। এমন সময় আমাদের কুটিরের দ্বারে ঘা পড়িল। মা বলিলেন, 'হারার মা এল বুঝি দরজাটা খুলে দে।' হারার মা আমাদের একজন বৃদ্ধ প্রতিবেশিনী, আমাদের ঘর সংসারের কাজকর্ম করিয়া দেয়। আমি উঠিয়া দরজা খুলিয়া দিলাম। হারার মা নহে, একজন আর্দ্র-কলেবর অপরিচিত পুরুষ গৃহে প্রবেশ করিলেন, তাঁহাকে দেখিয়া আমি একটু সরিয়া দাঁড়াইলাম, তিনি বলিলেন, 'আমাকে আজিকার মতো একটু আশ্রয় দিবেন কি? এই বৃষ্টিতে আর বাড়ি যাইতে পারিতেছি না।' মা তাঁহার কথা শুনিতে পাইলেন, বিছানায় উঠিয়া বসিয়া বলিলেন, 'আহা, তা ভিজবে কেন বাছা, রাতটা এইখানেই থাকো।'

পথিক সে রাত্রের জন্য আমাদের অতিথি হইলেন।

আমাদের চারখানি ঘর। একটি রান্নাঘর, একটি গোয়াল, আর দুইখানি ভালো ঘর; তাহারি একখানি পথিকের শয়নের জন্য প্রস্তুত হইল, আমাদের যথাসাধ্য অতিথিসৎকার করিলাম। তাহার পর দিন প্রাতঃকালে শুনিলাম পথিক পীড়িত। সেদিনও আর তাঁহার ফিরিয়া যাওয়া হইল না, ক্রমে এক রাত্রির পরিবর্তে এক সপ্তাহ, এক সপ্তাহের পর প্রায় একমাস কাটিয়া গেল, পীড়িত পথিক আমাদের গৃহে অতিথি হইয়া রহিলেন।"

বলিতে বলিতে সহসা যমুনার বিষণ্ণ মুখে একটা অস্বাভাবিক দীপ্তি প্রকাশ পাইল, বুঝি বা তাহার অন্ধকার জীবনে সুখ-স্মৃতির দীপ্তি। যমুনা একটুখানি থামিয়া সজল নয়নে আমার মুখের দিকে চাহিয়া বলিল, "দিদি, সেদিনের পর বাঁচিয়া রহিলাম কেন? প্রতিদিন অন্য কাজকর্মের মধ্যে ছুটিয়া যখন পথিককে দেখিতে আসিতাম, প্রতিদিন তাঁহার শুশ্রূষা করিয়া তাঁহার মুখে আরোগ্যের লাবণ্য সঞ্চার দেখিয়া হৃদয়ে যে আনন্দ উথলিয়া উঠিত, সেই আনন্দ না হারাইতে হারাইতে মরিয়া গেলাম না কেন?"

যমুনা আবার আরম্ভ করিল—"পথিক আরোগ্য হইলেন, তাঁহার যাওয়ার আর কোনো বাধা নাই, প্রতিদিন শুনিতেছি দুই চারদিনের মধ্যে যাইবেন কিন্তু সে দুই-চারদিন আর ফুরাইতেছে না। একদিন আমি অন্য ঘরে কাজ করিতেছি, পাশের ঘরে মা পথিকের সহিত গল্প করিতেছেন—হঠাৎ এই কথাগুলি কানে গেল—শুনিলাম পথিক বলিতেছেন, "আমার কথাটা একটু বিবেচনা করিবেন, আপনাদের ন্যায় আমিও সদ্বংশজাত কায়স্থ, আমার অর্থ আছে, আপনার কন্যাকেও আমি প্রাণাপেক্ষা ভালবাসি—'

এই সময় আমার সই কুসুম আসিয়া আমাকে ডাকিল, আর কিছু শোনা হইল না। কি জানি কুসুম যদি ঘরের মধ্যে আসিয়া সব শুনিয়া ফেলে—তাড়াতাড়ি ঘরের বাহির হইয়া কুসুমের কাছে আসিলাম।

সেইদিন কুসুমের বাড়ি হইতে ফিরিয়া আসিয়া শুনিলাম পথিকের সহিত আমার বিবাহ স্থির হইয়া গিয়াছে। কিছুদিনের মধ্যেই আমাদের বিবাহ হইয়া গেল। মা যেন আমাদের বিবাহিত দেখিবার জন্যই জীবনধারণ করিয়াছিলেন, বিবাহের অল্পদিন পরেই তাঁহার মৃত্যু হইল, স্বামীর প্রেম পাইয়া স্নেহময়ী মাতার অসীম স্নেহ হারাইলাম।"

"আমি শ্বশুরবাড়ি যাইব। স্বামী প্রথমে একবার একাকী বাড়ি যাইতে চাহেন, কিন্তু আমি তাহাতে নিতান্ত আপত্তি করাতে আমাকে একেবারেই সঙ্গে লইয়া যাইতে সম্মত হইলেন।

শীতকালের বিকাল, দেখিতে দেখিতে সূর্যের আলো সন্ধ্যার আঁধার এক হইয়া আসে, অল্পক্ষণের মধ্যে চারিদিক একটা মলিন আলোকে ডুবিয়া পড়িতে লাগিল, একটা নির্জন পথে স্বামীর অনুসরণ করিয়া সন্ধ্যার কিছু আগে একটা গাছপালাময় ক্ষুদ্র জঙ্গলের পথে আসিয়া পড়িলাম, সহসা একটা অন্ধকার যেন বা হৃদয়ের আলোক আচ্ছন্ন করিয়া ফেলিল, হঠাৎ যেন হৃদয় কেমন কাঁপিয়া উঠিল, স্বামী বলিলেন, 'ঐ দেখ আমাদের বাড়ি।'

কম্পিত হৃদয়ে মুখ তুলিয়া চাহিলাম; একটি ইষ্টক-নির্মিত বাড়ি নজরে পড়িল, সন্ধ্যার অন্ধকারে বাড়ির মধ্যে প্রবেশ করিলাম, প্রাঙ্গণে প্রবেশ করিবামাত্র স্বামী বলিলেন—'তুমি এইখানে দাঁড়াও আমি আসিতেছি।' তিনি দ্রুতপদে চলিয়া গেলেন, অপরিচিত অন্ধকার স্থানে, একটা অজানিত অন্ধকার হৃদয়ে ধরিয়া একাকী সেইখানে দাঁড়াইয়া রহিলাম। একটু পরে প্রদীপহস্তে একজন রমণী আমার দিকে অগ্রসর হইলেন, ভাবিলাম, এইবার শাশুড়ীঠাকরুন আমাকে লইতে আসিয়াছেন, সমস্ত শরীর রোমাঞ্চিত হইল, ভালো করিয়া ঘোমটা টানিয়া দিলাম। রমণী নিকটে আসিয়া বলিলেন—'এই বুঝি নূতন দাসী, তা দাসীর আবার এত ঘোমটা কেন?'

কি শুনিলাম কিছু বুঝিলাম না—কেবল একটা বজ্রের ধ্বনি মাথার মধ্যে কনকন করিয়া উঠিয়া মর্মভেদ করিয়া চলিয়া গেল—বাড়িঘর চৌদিকে প্রবলবেগে ঘুরিয়া উঠিল, আমি মূর্ছিত হইয়া পড়িয়া গেলাম।

একদিন দুপুরবেলায় বাড়ির সকলে যখন বিশ্রামলাভ করিতেছে—আমি একাকী গৃহের বাহির হইয়া গেলাম। জঙ্গল পার হইয়া মুক্ত মাঠে আসিয়া পড়িয়া একটি আম গাছের তলায় বসিলাম; আর চলিতে তখনও বল নাই।

অদূরে কাহাকে দেখিতে পাইলাম সেই রাতের পর এই প্রথম দেখা, সর্বশরীর কাঁপিয়া উঠিল। এই কি সেই? করুণাময় স্বামী ভাবিয়া যাহার পদতলে সর্বস্ব বিসর্জন দিয়াছি? এই কি সেই? দেবতা ভাবিয়া যাহাকে দিবানিশি পূজা করিয়াছি সেই দেবতা আমার আজ প্রতারক? সে করুণাময় স্বামী আজ আমার প্রাণদস্যুতারক

স্বামী আমার নিকটে অগ্রসর হইলেন বলিলেন, 'যমুনা, আমাকে মাপ করো, আ

পরবর্তী সংখ্যায়
স্বয়ম্বর
শ্রীশচন্দ্র মজুমদার

তোমাকে অন্যত্র লইয়া যাইব। তোমাকে এখানে আনিয়া অন্যায় করিয়াছি, সেইদিন হইতে তোমার সহিত দেখারও একবার সুবিধা হয় নাই।'

সর্বাঙ্গে হু হু করিয়া আগুন জ্বলিয়া উঠিল, এইখানে আনিয়া অন্যায় করিয়াছেন—আর কিছু অন্যায় নহে। স্বামী আমার স্কন্ধে হাত দিতে যাইতেছিলেন, বিদ্যুতের মতো সরিয়া দাঁড়াইয়া গর্বিত তীব্র স্বরে বলিলাম, আমাকে স্পর্শ করিও না, তুমি আমার স্বামী, কিন্তু আমি জানি আমি তোমার পত্নী নহি—আমাকে স্পর্শ করিও না—স্বামী থমকিয়া দাঁড়াইলেন—আমি রুদ্ধ-শ্বাসে সেখান হইতে চলিয়া গেলাম, কিছুপরে ফিরিয়া দেখিলাম স্বামী আমার অনুসরণ করেন নাই। তাহার পর এইখানে আসিয়া পড়িয়াছি।"

যমুনার কথা শেষ হইয়াছে, বৃষ্টিও থামিয়া পড়িয়াছে, কিন্তু আমাদের হৃদয়ের মতো আকাশ এখনো মেঘান্ধ, মেঘান্ধ হৃদয়ে সেই মেঘান্ধ আকাশের দিকে চাহিয়া আমরা দুজনে নিস্তব্ধ বসিয়া আছি, এই সময় ও পাড়ার কালিন্দী কলসীকক্ষে ঘাটে জল লইতে আসল—আমাদের দেখিয়া বলিল—"কি লো, তোরা দুজনে চুপচাপ করে ভাবছিস কি?" আমি তখন উঠিলাম, যমুনাকে বলিলাম, "ঘরে আয়।"

দুজনে তীর হইতে দুই এক পা আসিয়াছি—আমাদের ঝি আসিয়া বলিল, "মাঠাকরুণ, যমুনাদির দেশের একজন লোক এসেছে, তার সঙ্গে দেখা করতে চায়।" যমুনার দেশের লোক! যমুনা আশ্চর্য হইয়া গেল। আমরা গৃহাভিমুখী হইলাম, বাড়ির কাছাকাছি আসিয়া দাসী অদূরের একটি বৃক্ষতলে অঙ্গুলি নির্দেশ করল—যমুনার মুখ সহসা পাংশু হইয়া গেল, সে বদ্ধ-পদ হইয়া দাঁড়াইল—বৃক্ষতল হইতে একজন পুরুষ আমাদের দিকে অগ্রসর হইতেছে দেখিয়া আমরা সরিয়া গেলাম—পুরুষ যমুনার নিকটে আসিয়া দাঁড়াইল—ছিন্ন-শাখার ন্যায় সহসা যমুনা তাহার পদতলে পড়িয়া গেল।

সে পুরুষ আর কেহ নহে, যমুনার স্বামী। যমুনার সন্ধান পাইয়া তিনি তাহাকে লইতে আসিয়াছিলেন। যমুনার রূপের ঘোর এখনো বুঝি তাঁহার হৃদয়ে কিছু লাগিয়া ছিল। যমুনা প্রথমে তাঁহার সহিত যাইতে কোনোমতে সম্মত হইল না—কিন্তু তাহার স্বামী মহা জেদ করিয়া বলিলেন যে, যমুনা তাহার সঙ্গে না গেলে তিনি এখান হইতে কখনই যাইবেন না। দুই চারদিন চলিয়া গেল—সত্যই তিনি চলিয়া গেলেন না—তখন সে যাইতে সম্মত হইল। কিন্তু যাইবার আগে স্বামীকে এই অঙ্গীকার করাইয়া লইল যে, তিনি তাহাকে স্বতন্ত্র গৃহে রাখিয়া দিবেন—এবং তাহাকে পরস্ত্রীভাবে দেখিবেন।

যমুনা অনেকদিন চলিয়া গিয়াছে। আমার ছোট ছেলেটির কয়দিন হইতে অসুখ করিয়াছে, নিকটে বসিয়া তাহাকে পাখা করিতে করিতে ক্রমাগত এখন যমুনার কথাই মনে পড়িতেছে, সে গোপালকে বড় ভালোবাসিত, তাহার কোলে-কোলেই গোপাল মানুষ হইয়াছে—যমুনা এখন এখানে থাকিলে কত যত্নই ইহাকে করিত। হঠাৎ এ চিন্তায় বাধা পড়িল। খোকার দাসী বলিল—

"মা, খোকার অসুখ তো এখনো সারছে না—তা শুনেছি শ্মশানে একজন সন্ন্যাসিনী এসেছে, অনেক রকম মন্ত্রতন্ত্র জানে—তার কাছে একবার গেলে হয় না?"।

কথাটা মনে লাগিল, আমি সেই বিকালেই দাসীর সঙ্গে সন্ন্যাসিনীর নিকট গমন করিলাম।

নদীতীরে শ্মশানে শবকুটির, সে-কুটিরে শ্মশান হইতে বিষণ্ণ-গম্ভীর এলোকেশী সন্ন্যাসিনী মূর্তি, হৃদয় স্তম্ভিত হইল—ভক্তিপূর্ণ হৃদয়ে প্রণত হইতে গেলাম। কিন্তু ভূমিষ্ঠ না হইতে হইতে সন্ন্যাসিনী হাত ধরিয়া উঠাইলেন—অবাক হইয়া মুখের দিকে চাহিলাম—সেই রুক্ষজটাযুক্ত কেশপাশ—প্রচ্ছন্ন মলিন গম্ভীর অপরিচিত মুখশ্রীর মধ্যে পরিচিত কি যেন লুকানো মনে হইতে লাগিল, কাহাকে যেন চিনি চিনি, কাহাকে যেন এইরূপ দেখিয়াছি অথচ তাহাকে মনে করিতে পারিতেছি না—আমার সে-আকুলতা দেখিয়া সন্ন্যাসিনীর অধর প্রান্তে হাসির রেখা পড়িল—আমি বলিয়া উঠিলাম, "যমুনা!" যমুনার চক্ষু দিয়া দুই বিন্দু অশ্রু গড়াইয়া পড়িল; আমি তাহার গলা জড়াইয়া ধরিলাম।

কিছুক্ষণ কাটিয়া গেল। আবার তাহার মুখের দিকে চাহিলম, নয়ন অশ্রুতে ভরিয়া গিয়াছিল—বলিলাম, "যমুনা, তোর একি বেশ!" যমুনার নেত্র অশ্রুহীন, সে কোনো উত্তর করিল না—একটু কেবল হাসিল। অত দুঃখে লোকে হাসিতে পারে! আশ্চর্য হইলাম, জিজ্ঞাসা করিলাম— "যমুনা, আবার ফিরিয়া আসিলি কেন?" যমুনা বলিল, "দিদি, ভাঙা জিনিস কি জোড়া লাগে? শুনিলাম অন্যের নিকট স্বামী আমাকে ... বলিয়া পরিচয় দিয়া থাকেন—তাই চলিয়া আসিয়াছি।" কথাগুলি সে হাসিয়া বলিতে চেষ্টা করিল—সে-হাসিতে মর্ম বিদ্ধ হইল, বুঝিলাম সে কি কষ্টের হাসি, বুঝিলাম—অশ্রুতে যে-কষ্টের সান্ত্বনা নাই, তাই এ-হাসির উপেক্ষা। যমুনা বুঝি আমার কষ্ট বুঝিল, বলিল—"দিদি, মানুষের জন্য মানুষের কি কষ্ট হয়?—মিথ্যা কথা, সব কষ্ট আপনার জন্য"—আর কথা কহিলাম না—স্তব্ধ হইয়া গেলাম, বুঝিলাম যমুনা সে-যমুনা নহে।

কিছু পরে আমি বলিলাম, "যমুনা, আমাদের বাড়ি চলো না"—যমুনা উত্তর করিল, "দিদি, শ্মশানই আমার আপনার ঘর, এ-ঘর আর ছাড়িব না।" অনেক চেষ্টা করিলাম, কিছুতেই তাহাকে বাড়ি আনিতে পারিলাম না, তাহার দগ্ধ হৃদয় লইয়া জীবন্তে সে শ্মশানবাসী হইল। আমি প্রতি-দিন প্রাতঃকালে তাহাকে একবার করিয়া দেখিতে যাইতাম, একদিন আর তাহাকে দেখিতে পাইলাম না।

কুটিরদ্বারে আসিতেই কতকগুলো শৃগাল-কুকুর আমার মুখপানে চাহিয়া এক-বার চীৎকার করিয়া উঠিয়া কিছু দূরে সরিয়া গেল; আমার হঠাৎ কেমন একটা আতঙ্ক উপস্থিত হইল, বদ্ধদ্বার ঠেলিয়া গৃহে প্রবেশ করিলাম, দেখিলাম—অভাগিনীর মৃতদেহ ভূমিতে লুটাইতেছে; শিহরিয়া দাঁড়াইয়া রহিলাম।

প্রদর্শনী পরিক্রমা

চিত্ররসিক

গত মাসে শহরে চিত্রপ্রদর্শনীর সংখ্যা বৃদ্ধি পেয়েছে এবং গ্যালারীতে দর্শকের ভীড় কম হয়নি এটা আশার কথা। দুটি বড় প্রদর্শনী এ মাসে হতে দেখা গেল, একটি অ্যাকাডেমির গ্রীষ্মের মধ্যকালীন প্রদর্শনী এবং অন্যটি বহু প্রতীক্ষিত নিখিল বিশ্বাসের স্মারক প্রদর্শনী।

গ্রীষ্মের মধ্যকালীন প্রদর্শনী বেশ বিলম্বে ১৯ থেকে ৩১ আগস্ট পর্যন্ত অ্যাকাডেমির একতলায় করা হয়। চিত্র ও ভাস্কর্য নিয়ে নব্বইটির ওপর নিদর্শন দেখা গেল। যদিও বিভিন্ন রচনারীতির মধ্যে নিখুঁতভাবে বাছাই করে প্রদর্শনী সাজানো দুরূহ ব্যাপার তবু প্রদর্শনীর কর্তৃপক্ষ এবারে মোটামুটি সুনির্বাচিত ছবি দেখিয়ে ছিলেন। নব্যভারতীয় রীতি থেকে একেবারে আধুনিক ধরনের সব রকমের কাজই ছিল। তবে এবারে শিল্পী-দের কাজে মোটামুটি একটা মধ্যপন্থা অবলম্বনের দিকে চেষ্টা দেখা গেল। পরিপূর্ণ অ্যাবস্ট্র্যাকশন অনেকেই বাদ দিয়েছেন ফলে সাধারণ দর্শকের কাছে যে দুর্বোধ্যতার অভিযোগ পাওয়া যেত তার সম্ভাবনা ততটা হয়নি। পুরোন ধরনের জল রং-এর কাজের মধ্যে জগদীশ বন্দ্যোপাধ্যায়, রামানন্দ বন্দ্যোপাধ্যায় প্রভৃতির নাম করা যায়। তেল রঙের সাধাসিধে সরল নিসর্গ চিত্রের মধ্যে বরেন বসুর পার্বত্য দৃশ্যগুলি উল্লেখ-যোগ্য, অনিলকুমার বসুরায়ের দু-একটি প্রতিকৃতি বা দৃশ্যচিত্র সম্বন্ধেও ওই কথাই বলা চলে। ইন্দ্র দুগড় তাঁর পরিচিত ধরনের ছবি দিয়েছিলেন। গোপাল ঘোষ ও রথীন মৈত্র তাঁদের ব্যক্তিগত বৈশিষ্ট্য অনুযায়ী ছবি উপস্থিত করেন। রমেন কুণ্ডার দুখানি জল রঙ-এর—আধুনিক ট্রীটমেন্ট এবং বিশেষ ঔজ্জ্বল্য ভাল লাগল। কাতায়ুন শাকলাতের দুখানি স্টিল্ লাইফ তাঁর আগের একক প্রদর্শনীর সুনাম বজায় রেখেছে। পরিতোষ সেন ও সুনীলমাধব সেন তাঁদের আপন বৈশিষ্ট্য অনুযায়ী কাজ উপস্থিত করেছেন। সুশীল মুখোপাধ্যায় একখানি মাত্র ড্রয়িং উপস্থিত করেছেন—তবে বেশ শক্তিশালী ড্রয়িং। অমরেন্দ্রলাল চৌধুরীর কতকটা লোকশিল্প অনুপ্রাণিত 'গার্ডেন' রঙের ঔজ্জ্বল্য এবং বিশেষ একটা হাল্কা প্রীতিকর রসসৃষ্টির জন্যে ভাল লাগল। সুবল সাহার নেতাজীর অশ্বা-রোহী মূর্তিটি প্রদর্শনীতে বড় বেমানান ঠেকেছে। তবে মীরা মুখার্জির দুটি ভাস্কর্য কলেজ গার্ল এবং ফ্লুট প্লেয়ার বিশেষ করে দ্বিতীয়টি ভারি সুন্দর হয়েছিল।

শিল্পী : সুনীল দাস

●

বিভূতিভূষণ চক্রবর্তী বারাণসীর শিল্পী সেখানেই তাঁর শিক্ষাদীক্ষা এবং অ্যাকাডেমিতে ২৫ থেকে ৩১ আগস্ট যে ১৮টি ছবির প্রদর্শনী হল তা দেখে মনে হল বারাণসী শহরকেই তিনি তাঁর শিল্পের উপজীব্য করেছেন। শ্রীচক্রবর্তীর কয়েকটি আধা অ্যাবস্ট্র্যাক্ট কাজের মধ্যে একটা স্বাচ্ছন্দ্য আছে এবং সাবলীলতা আছে যেটা অনেক ক্ষেত্রে তরুণ শিল্পীদের কাজে চট করে চোখে পড়ে না। মাঝে মাঝে রেখার ক্যালিগ্রাফিক ব্যবহার যেখানে আতিশয্য দুষ্ট হয়নি সেখানে সুন্দর হয়েছে। 'রুদ্র', 'অ্যানাটমি অব লেনস', 'সিটি অন ট্রাইডেন্ট', 'সুইংগিং বোটস' প্রভৃতি ছবিগুলি বিশেষ ভাবে উল্লেখ করা যেতে পারে।

●

শিল্পী অঞ্জু চৌধুরী কমনওয়েলথ বৃত্তি নিয়ে লণ্ডন যাত্রার আগে ২৬ আগস্ট থেকে ৩ সেপ্টেম্বর পর্যন্ত অ্যাকাডেমির দক্ষিণ দিকের গ্যালারীতে একটি বড় একক প্রদর্শনী করলেন। তাঁর পেন্টিং-এর গ্রাফিকস মিলিয়ে অনেকগুলি নিদর্শন রাখা হয়েছিল। অঞ্জু চৌধুরীর কাজে বৈচিত্র্যের

শিল্পী : অমরেন্দ্রলাল চৌধুরী

নিদর্শন আছে তবে অনেক সময় বৈচিত্র্যের দিকেই ঝোঁকটা বেশী হয়ে পড়েছে। তাঁর কাজে বিভিন্ন স্তরের অ্যাবস্ট্রাকশন থেকে সোজাসুজি ডেকরেটিভ এবং ইলাস্ট্রেটিভ ধরনের ছবির সাক্ষাৎ মিলল। তাঁর অ্যাবস্ট্রাকশনগুলির মধ্যে 'মডেবল হোম', ফ্যান্টাসীর মধ্যে 'চ্যারিয়ট ইন গ্রীন' ডেকরেটিভ কাজের ভেতর 'পেপার এলিফ্যান্ট' উল্লেখযোগ্য। এছাড়া কয়েকটি গ্রাফিকস মন্দ হয়নি।

●

আলিয়াঁস ফ্রাঁসেজে ২৩ আগস্ট থেকে ২৯ আগস্ট পর্যন্ত বিমল বন্দ্যোপাধ্যায়ের ফ্রান্স যাত্রার প্রাক্কালে তাঁর ২০ খানি গ্রাফিকসের প্রদর্শনী হয়ে গেল। বিমল বন্দ্যোপাধ্যায়ের কাজের ক্যালিগ্রাফিক অ্যাবস্ট্র্যাকশন কতকগুলি ক্ষেত্রে মন্দ হয় না। রঙীন পট-ভূমিকার ওপর ইন্টাগ্লিও প্রিন্টের উন্নত শাদা রেখা স্থান বিশেষে একটা সুন্দর প্যাটার্ণ সৃষ্টি করেছে। ডেকরেশন হিসেবে কতকগুলি কাজ ভাল। তাঁর নিজস্ব ভঙ্গীতে প্রদর্শনী গৃহে অ্যাবস্ট্রাক্ট আলাপনটিও লক্ষ্যণীয় হয়েছিল।

●

৪ থেকে ১২ সেপ্টেম্বর অ্যারেকজন প্যারিস যাত্রী শিল্পী প্রকাশ কর্মকার আর্টস অ্যান্ড প্রিন্টসের তাঁর একটি একক প্রদর্শনী করেন এবং উদ্বোধনের দিন বন্ধু-বান্ধব ও গুণগ্রাহীদের আপ্যায়িত করেন। তাঁর বড় এবং মাঝারি কতকগুলি ক্যানভাস এবং ছোট রঙীন গ্রাফিক বা ড্রইংয়ের এই প্রদর্শনীটি বেশ বর্ণাঢ্য হয়েছিল। বড় ছবিগুলি অধিকাংশই কিছুটা গ্রোটেস্ক ঘেঁষা খানিকটা স্বপ্নময়তার ছাপও আছে। এর মধ্যে সবচেয়ে বড় ছবিখানির মধ্যে একটা অতিপ্রাকৃত আলোর আভাস বিশেষ দর্শনীয় হয়েছিল। ছোট ড্রইংগুলি অপেক্ষাকৃত মধুর রসের পরিবেশন করে।

●

২ সেপ্টেম্বর স্পাইস সংস্থার উদ্যোগে সুনীল দাসের একটি বৃহৎ প্রদর্শনী কলিকাতা তথ্য কেন্দ্রে আয়োজিত হল। ৪০ খানির ওপর বড় ছোট মাঝারি পেন্টিং এবং ড্রইং এবং এছাড়া আরো অনেকগুলি ড্রইং ও জল রঙের কাজ রাখা হয়েছিল। সুনীল দাস যত রকমের কাজ করেছেন তার অধিকাংশেরই নিদর্শন এখানে পাওয়া গেল। তৈল মাধ্যম, কলাজ, জলরং ও কলাজ, কাগজ পোড়ানো ছবি, পেপার ফয়েল সাজিয়ে বা পুড়িয়ে অ্যাসবস্ট্র্যাক্ট ডিজাইন সব রকমই দেখা গেল। কতকগুলি জলরং-এর কাজ বিশেষ বর্ণাঢ্য হয়েছিল, তান্ত্রিক চিহ্নাদি দিয়ে কয়েকটি অ্যাবস্ট্র্যাকশনের কাজ আমাদের পূর্বপরিচিত। এছাড়া বুল ফাইট এবং ঘোড়ার ছবি ত আছেই। তার ওপরে ছিল স্প্যানিশ নর্তকীর কয়েকটি ড্রয়িং যেগুলি যথেষ্ট উন্নত বলে আমার মনে হয়নি। সুনীল দাস তাঁর চিত্রের কতকগুলি প্রতীকচিহ্ন দিয়ে আলপনা দিয়েছিলেন। এই রীতি মনে হচ্ছে এবার থেকে প্রদর্শনীতে চালু হতে থাকবে। সুনীল দাস প্রচুর কাজ উপস্থিত করেছেন এবং তিনি প্রচুর পরিশ্রম করেন। আরেকটু সুচিন্তিতভাবে পরিশ্রম করলে তাঁর কাছ থেকে আরো আশা করা যায়।

●

১ থেকে ৭ সেপ্টেম্বর শান্তিনিকেতনে শিক্ষাপ্রাপ্ত জৈন শিল্পী জওয়ারচাঁদ দাসানির ১৫ খানি মুরালধর্মী মহাবীরের জীবন ও সাধনা নিয়ে আঁকা তৈলচিত্র প্রদর্শিত হল। শ্রীদাসানি জৈন মিনিয়েচার থেকে তাঁর শিল্পরীতির অনেক কিছু নিয়ে থাকলেও আধুনিক রীতির প্রভাবকে এড়াতে পারেননি। তাঁর রঙ একটু চড়া এবং প্রয়োগ একটু কাঁচাও বটে। এর মধ্যে, ৭, ১১, ১২ এবং ১৫ নম্বর ছবিগুলির উল্লেখ করা যেতে পারে।

●

২০ থেকে ১৬ আগস্ট ওয়েস্ট বেঙ্গল আর্টিস্ট ইউনিয়নের তরফ থেকে তরুণ শিল্পী তাপস বসুর একটি প্রদর্শনী মোনালিসা গ্যালারীতে হয়ে গেল। তাঁর কয়েকটি উজ্জ্বল অ্যাবস্ট্র্যাকশন চলনসই হয়েছিল। তবে আরেকটু তৈরী হয়ে নামলে তিনি আরো ভাল ছবি দিতে পারতেন বলে আমাদের মনে হয়। তাঁর 'থ্রু দি ডার্কনেস', 'ওশান মিউজিক' এবং 'অ্যাসোসিয়েশন' ছবিগুলি মন্দ হয়নি।

●

১ থেকে ৭ সেপ্টেম্বর বিড়লা অ্যাকাডেমির প্রদর্শনী গৃহে নবপ্রতিষ্ঠিত 'ক্যানভাস' গোষ্ঠী তাঁদের একটি যৌথচিত্র ও ভাস্কর্যের প্রদর্শনী করলেন। এই প্রতিষ্ঠান ইনস্টলমেন্টে ছবি বিক্রয়ের ব্যবস্থা করে মধ্যবিত্ত সমাজের মধ্যে ছবিকে জনপ্রিয় করে তুলতে চান। প্রদর্শনীতে ৯ জন শিল্পীর ৩৬টি চিত্র ও ভাস্কর্যের নিদর্শন রাখা হয়। এঁরা একগোষ্ঠীর হলেও সকলে আপন আপন বিশ্বাস ও রীতি অনুযায়ী কাজ করে থাকেন তাই কাজের মধ্যে বৈচিত্র্যের অভাব নেই। অশোক বিশ্বাসের 'ফিগারস ইন ডিপ্রেশন' এবং অলোক ভট্টাচার্যের 'ওল্ড এজ' কি বলাই কর্মকারের 'বোটস' তাই ভিন্ন ধরনের ছবি হয়েছে। এছাড়া মানিক তালুকদারের কয়েকটি ভাস্কর্য একটু পরিচিত ধরনের কাজ হলেও ভালই হয়েছিল।

●

১৫ থেকে ২৪শে সেপ্টেম্বর মোনালিসা গ্যালারীতে বারীন দের একটি চিত্র প্রদর্শনী হল। বারীন দে কয়েক বছর আগে বিমান ইঞ্জিনীয়ারিং-এর কাজ ছেড়ে শিল্পসাধনায় মনোনিবেশ করেন, তাঁর কিছু রিয়্যালিস্টিক কাজের সঙ্গে আমাদের ইতিপূর্বেই পরিচয় হয়েছে। এবারের আটখানি পেন্টিং একটু ভিন্ন দিকে মোড় নিয়েছে। তিনি মনে হল যেন কিছুটা দ্বিধাগ্রস্ত চিত্তে অ্যাবস্ট্র্যাকশনের দিকে ঝুঁকেছেন। কয়েকটি স্বপ্নময় ছবি মন্দ হয়নি এবং একটি পুরোপুরি বিমূর্ত ছবি 'মরীচিকা' সম্পর্কেও সেকথা বলা চলে। তবে অন্যান্য ক্ষেত্রে তাঁর রঙের ব্যবহার বা ডিজাইনের কুশলতা আরো কিছুটা উন্নতির অপেক্ষা রাখে।

২৮ আগস্ট থেকে ৩ সেপ্টেম্বর পর্যন্ত রবীন্দ্র ভারতীয় বিচিত্রাভবনে অবনীন্দ্র জন্মোৎসব উপলক্ষে অবনীন্দ্রনাথের চিত্রের একটি ছোট কিন্তু বৈচিত্র্যপূর্ণ প্রদর্শনী হল। প্রায় ১৭।১৮টি ছবি দেখানো হয়। এর মধ্যে তাঁর বিখ্যাত 'সাজাহানের মৃত্যু', 'তাজ নির্মাণ' একটি ছোট চারিত্রিক বৈশিষ্টপূর্ণ প্রতিকৃতি। মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথের প্রতিকৃতির একখানি সুন্দর লিথোগ্রাফ, জমিদারের সেরেস্তা ওমর খৈয়ামের ইলাস্ট্রেশন, চন্দ্রালোকিত পদ্মা, আরব্যোপন্যাসের ছবি ইত্যাদি দেখা গেল।

●

পুজার পূর্বে শাড়ির নক্‌শার দুটি প্রদর্শনীতে কারুশিল্পের দিকে যে নজর পড়েছে তার কিছু কিছু নিদর্শন দেখা গেল দুটি প্রদর্শনীতে। 'কবরী' সংস্থার উদ্যোগে ৭ থেকে ১০ সেপ্টেম্বর ৬৪নং লেক প্লেসে শিল্পী গোষ্ঠকুমারের অনেকগুলি শাড়ির প্রদর্শনী হল। দেশী চিরাচরিত ডিজাইনের কতকটা নতুন প্রয়োগে অনেকগুলি ছাপা শাড়ি এবং বাটিকের ডিজাইনের সঙ্গে জরির কাজ করা কয়েকটি শাড়ি দেখা গেল। এছাড়া ছাপার রঙে হাতে আঁকা কয়েকটি অ্যাবস্ট্র্যাক্ট ডিজাইনের শাড়িও মন্দ হয়নি।

●

এসপ্লানেড ইস্টের রেফুজি হ্যান্ডিক্রাফট দুটি প্রদর্শনী করেন। একটি প্রিয়দর্শিনী গ্যালারীতে শিল্পী সেলিম মুন্সীর ল্যান্ডস্কেপের প্রদর্শনী এবং অপরটি তাঁদের বিখ্যাত টাঙ্গাইল, বালুচরী এবং

সূতী ও সিল্কের মিশ্রণে শাড়ির। দুটি প্রদর্শনীই আকর্ষণীয় হয়েছিল।

●

১৬ তারিখ থেকে অ্যাকাডেমি অব ফাইন আর্টসে একের পর এক প্রদর্শনী হয়ে গেল। প্রথমে পরিতোষ সেনের ১৩ খানি বড় এবং ছোট ক্যানভাস উল্লেখযোগ্য। তিনি তাঁর কতকটা পূর্বরীতি অনুযায়ী মুখাকৃতির আভাস রেখে কতকগুলি বর্ণাঢ্য ডিজাইন তৈরী করেছেন. মোটা ইম্প্যাস্টোর বহুবর্ণ প্রয়োগে কয়েকটি বৃহদায়তন ছবি হঠাৎ দেখলে আধুনিক পর্দার নকশা বলে ভুল হয়। যথেষ্ট দূর থেকে দেখলে একটা মূর্তির আভাস পাওয়া যায়। অপেক্ষাকৃত ছোট ছবিগুলি দেখতে ততটা অসুবিধা হয় না। একটা মানবিক বেদনা রূপ দেবার চেষ্টা হয়ত কোথাও থাকতে পারে তবে দর্শকের চোখে রঙের ডেকরেটিভ প্রয়োগটাই বেশী করে ধরা পড়ে। একটি ছোট অ্যাকাডেমিক আবক্ষ প্রতিকৃতিও রাখা হয়েছিল বোধহয় এ কাজে শিল্পীর কুশলতার নিদর্শনের নমুনা হিসেবেই। সেটি একটু বেশী পালিশ করা চকচকে বলে মনে হল।

●

১৬ থেকে ২০ তারিখে অ্যাকাডেমিতে তরুণী শিল্পী রাজ বর্মার চল্লিশখানির ওপর বিভিন্ন মাধ্যমে আঁকা ছবির প্রদর্শনী হল। রাজ বর্মা ইনস্টিটিউট অব ম্যানেজমেন্টের ছাত্র অবসর সময়ে নিজে নিজেই চিত্রবিদ্যার চর্চা করে থাকেন। আধুনিক প্রচলিত বহু শিল্পরীতির প্রতিই তিনি আকৃষ্ট হয়েছেন তবে কোনটিতেই এখনো পূর্ণ দক্ষতা লাভ করতে পারেননি তাই সারা প্রদর্শনীতে একটা লক্ষ্যহীনতার ছাপ পাওয়া গেল।

●

১৭ থেকে ২৪ সেপ্টেম্বর অ্যাকাডেমির দক্ষিণের দুটি ঘরে ডেসমন্ড ডোয়িগের ড্রইং এবং পেণ্টিং-এর প্রদর্শনী হচ্ছে। তাঁর ড্রইংগুলির সঙ্গে রবিবারের স্টেটসম্যানের পাতায় সকলেই পরিচিত হয়েছেন। প্রায় ৫০ খানি স্কেচের মধ্যে কলকাতা ও পাটনার অনেকগুলি প্রাচীন খ্যাত ও অখ্যাত বাড়ি বা মন্দিরের সাক্ষাৎ মিলল। তাঁর ২৭।২৮ খানি পেণ্টিং-এর মধ্যেও কলকাতার দৃশ্য অনুপস্থিত নয়। তবে মনে হয় যেন মাতিসের চোখে দেখা কলকাতা। পার্বত্য জীবনের কয়েকটি প্রতিচ্ছবি এবং পার্বত্য-দৃশ্যের ক্যানভাসও ছিল। শেষেরটি খানিকটা রোয়েরিখের ধরনে—পুরোপুরি নয়। এছাড়া দু-তিনটি চলনসই প্রতিকৃতি ছিল।

●

২১শে থেকে ২৭শে সেপ্টেম্বর পর্যন্ত দিল্লী শিল্পীচক্রের কয়েকজন শিল্পীর ২০খানির মত ছবির একটি প্রদর্শনী অ্যাকাডেমির দক্ষিণের ঘরে করা হয়। এঁরা এক গোষ্ঠীর শিল্পী হলেও প্রত্যেকে কিছুটা ব্যক্তিত্ব বজায় রাখার চেষ্টা করেন তবে সকলেই মোটামুটি একটা আধুনিক রীতির অ্যাকাডেমিজম মেনে চলেন। সেদিক দিয়ে দেবানন্দ, জয়া আপ্পাস্বামী, আনন্দ কয়াল, অর্পিতা সিং, পরমজিৎ সিং, রমেন রুদ্র ও আর কে ভাটনগর প্রভৃতি কয়েকজনের কাজ উল্লেখযোগ্য।

●

২৩শে থেকে ২৮শে সেপ্টেম্বর কলকাতা তথ্যকেন্দ্রে শিল্পী অমিতাভ বন্দ্যোপাধ্যায়ের ৪৩খানি পেণ্টিং ও স্কেচের প্রদর্শনী হচ্ছে। শ্রীবন্দ্যোপাধ্যায় ১৯৬৪ সালে ছ'মাসের জন্যে আমেরিকার বিভিন্ন রাজ্য ভ্রমণ করেন। বর্তমান ছবিগুলি তাঁর ভ্রমণের ফল। আমেরিকার যা কিছু তাঁর দৃষ্টি আকর্ষণ করেছে, তাই তিনি উপস্থিত করেছেন। তবে ভ্রামামাণ টুরিস্টের চোখে নয়। যদিও হাতে সময় তাঁর অল্প ছিল, তবু কতগুলি ক্ষেত্রে নিছক রিপ্রেজেন্টেশন ছাড়া আরো কিছু একটা আনবার চেষ্টা হয়েছে। এই ধরনের সুচিন্তিত ছবি তৈরীর উদাহরণ হিসেবে 'বাস্কেট বল খেলোয়াড়', 'আলফালফা ফিল্ড', 'পথের ধারের বইয়ের স্টল', 'ভোর বেলা', 'জানলা থেকে' এইসব ছবির কথা বলা যেতে পারে। এখানে আধুনিক অ্যাবস্ট্রাক্ট রীতির ছবির সংগঠনটি রেখে তার মধ্যে একটা রিপ্রেজেন্টেশন আনবার চেষ্টার ফলে ছবির বিষয়-বস্তুর সহজ বোধগম্যতার সঙ্গে ছবির নিছক অ্যাবস্ট্রাক্ট প্যাটার্নের একটা অঙ্গাঙ্গী সম্বন্ধ স্থাপিত হয়েছে যেটা একটু নজর করলেই চোখে পড়ে। ভোরবেলার ছবিতে শহরের আকাশ-ছোঁয়া বাড়ির সারির জ্যামিতিক প্যাটার্নের তলায় সকালের আলোয় দু-একটি মানুষের চলাফেরার মধ্যে এই মেজাজ অনেকখানি পরিস্ফুট হয়েছে। আলফালফার ঘাসের মধ্যে গোচারণের দৃশ্যকেও সেইভাবেই একত্রিত করা হয়েছে—এছাড়া তাঁর ছোট জল-রঙের বহু স্কেচ এবং অনেকগুলি ক্ষিপ্রহাতের করা মনোক্রোম ড্রইং—যার মধ্যে বেহালা-বাদক, মা ও ছেলে, জলপ্রপাত প্রভৃতি, ছবিগুলির বিশেষ বিশেষ মুড সৃষ্টির ক্ষমতা দর্শকের অকুণ্ঠ প্রশংসা লাভ করতে সক্ষম হবে বলে আশা করি। ঠিক আর পাঁচটা প্রদর্শনী থেকে এটি একটু ভিন্নধরনের হয়েছে।

●

২২শে সেপ্টেম্বর থেকে ৩রা অকটোবর পর্যন্ত অ্যাকাডেমির উত্তরের ও মধ্যের গ্যালারিতে অতুল বসুর ১৭৫ খানি ড্রয়িং এবং পেণ্টিং-এর একটি বৃহৎ প্রদর্শনী হচ্ছে। তাঁর গোড়ার দিকের ছবি থেকে আধুনিক কাজ পর্যন্ত সবকিছুর একটা মোটামুটি রূপ পাওয়া যায় এইভাবে প্রদর্শনীটির আয়োজন হয়েছে। দীর্ঘকাল পরে কলকাতায় দর্শকেরা একটু নূতনত্বের আস্বাদ পাবেন।

অমৃত পাবলিশার্স প্রাইভেট লিঃ-এর পক্ষে শ্রীসুপ্রিয় সরকার কর্তৃক পত্রিকা প্রেস, ১৪, আনন্দ চ্যাটার্জি লেন, কলিকাতা—৩ হইতে মুদ্রিত ও তৎকর্তৃক ১১।১, আনন্দ চ্যাটার্জি লেন, কলিকাতা—৩ হইতে প্রকাশিত।

২০শ সংখ্যা
মূল্য
১০ পয়সা
0 Paise

ORWO

৭ম বর্ষ
২য় খণ্ড

২৩শ সংখ্যা
মূল্য
৪০ পয়সা

Friday, 6th October, 1967. শুক্রবার, ১৯শে আশ্বিন, ১৩৭৪ 40 Paise

সূচীপত্র

পৃষ্ঠা	বিষয়		লেখক
৭২৪	চিঠিপত্র		
৭২৫	সম্পাদকীয়		
৭২৬	প্রতিধ্বনি		
৭২৮	গিরির ছায়ায়	(কবিতা)	—শ্রীউমা দেবী
৭২৮	অমরতা কোনখানে	(কবিতা)	—শ্রীপবিত্র মুখোপাধ্যায়
৭২৯	ফ্রীডরীশ হোল্ডার্লিন : তাঁর জীবন ও কবিতা		—শ্রীবুদ্ধদেব বসু
৭৩৫	আগমনী ও বিজয়া গান		—শ্রীঅনিল মিত্র
৭৩৭	সাহিত্য ও সংস্কৃতি		
৭৪২	প্রদর্শনী পরিক্রমা		—শ্রীচিত্ররসিক
৭৪৩	সূর্য কাঁদলে সোনা	(উপন্যাস)	—শ্রীপ্রেমেন্দ্র মিত্র
৭৪৭	দেশেবিদেশে		
৭৪৮	ব্যঙ্গচিত্র		—শ্রীকাফী খাঁ
৭৪৯	বৈষয়িক প্রসঙ্গ		
৭৫১	গোসাই কুম্ভের ডায়েরী		—শ্রীভক্ত বিশ্বাস
৭৫৩	প্রেক্ষাগৃহ		
৭৬১	গানের জলসা		
৭৬৩	আজকের যাত্রা		—শ্রীদিলীপ মৌলিক
৭৬৫	খেলাধুলা		—শ্রীদর্শক
৭৬৬	আন্তর্জাতিক সাঁতার পরিক্রমা		—শ্রীক্ষেত্রনাথ রায়
৭৬৯	আধুনিক	(উপন্যাস)	—শ্রীবিভূতিভূষণ মুখোপাধ্যায়
৭৭৩	অঙ্গনা		—শ্রীপ্রমীলা
৭৭৭	আমার কাল আমার দেশ	(স্মৃতিচারণ)	—শ্রীসুধীরচন্দ্র সরকার
৭৮১	বিজ্ঞানের কথা		—শ্রীশুভঙ্কর
৭৮৩	গৌরাঙ্গ-পরিজন		—শ্রীঅচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্ত
৭৮৬	জানাতে পারেন		
৭৮৭	নক্ষত্রের নীচে	(গল্প)	—শ্রীঅনিরুদ্ধ চৌধুরী
৭৯৫	আজকের মিশর		—শ্রীদেবব্রত মিত্র
৭৯৭	পুরনো পাতা : স্বয়ম্বর		—শ্রীশচন্দ্র মজুমদার

লেখিকার বক্তব্য

সেদিন ৬ঠা সেপ্টেম্বর আমার এক আশ্চর্য অভিজ্ঞতা হয়েছে। আট বছর আগে এম সি সরকার থেকে প্রকাশিত 'প্রেমতারা' নামে সার্কাসের পটভূমিতে আমার একটি উপন্যাস আছে। 'মাস থিয়েটার্স' বলে একটি দল 'এরিণা' বলে যে-নাটকটি কলকাতায় বহুদিন ধরে অভিনয় করছে, গিয়ে দেখলাম সেই নাটকটি হুবহু আমার বই থেকে নেওয়া। কাহিনী, সংলাপ, চরিত্র ঘটনা, সবই আমার ঐ বই থেকে আত্মসাৎ করা হয়েছে। এতদিন ধরে তাঁরা যে অভিনয় করছেন তার জন্য আমার অনুমতি নেননি। আমার নাম ব্যবহার করেননি কোথাও। অন্য লোককে নাট্যকার খাড়া করেছেন এবং বলাই বাহুল্য আমাকে একটিও পয়সা দেননি। আপনাদের এই খবরটি জানাবার নৈতিক দায়িত্ব অনুভব করেছি আরো এই কারণে যে অন্য লেখক-লেখিকারা যেন সাবধান হতে পারেন এবং আমার মতো ক্ষতিগ্রস্ত না হন। একদিক থেকে আমার বদনামও হয়েছে। কারণ, আমার কাহিনী, সংলাপ ও চরিত্র ছাড়া তাঁরা নিজেরা যেসব জিনিসপত্র ঢুকিয়েছেন সেগুলি এত মামুলী, শস্তা এবং অরুচিকর অশ্লীল ধরনের যে পরোক্ষে আমার কাঁধে তার দুর্ভার এসে পড়তে পারে।

মহাশ্বেতা দেবী।
কলকাতা—২৬।

'গানের জলসা'

মাননীয় সম্পাদক মহাশয়,

১৩৭৪ সালের ১৫ই ভাদ্র আপনাদের সুপ্রসিদ্ধ সাপ্তাহিক পত্রিকা "অমৃত"তে গানের জলসা শীর্ষক একটি সমালোচনা পড়লাম। সমালোচনা পড়িয়া আমার যা মনে হল তাহা আপনাদের পত্রিকায় প্রকাশের জন্য লিখে পাঠালাম।

সুরেশ সংগীত সংসদের পক্ষ থেকে সম্প্রতি যে অনুষ্ঠানে প্রখ্যাত সরোদবাদক ওস্তাদ হাফিজ আলী খাঁ সাহেবকে সম্বর্ধনা জানানো হয়েছে, সেই অনুষ্ঠানের স্মারক পুস্তিকায় প্রকাশিত একটি প্রবন্ধকে কেন্দ্র করে মুখ্যত এই সমালোচনা করা হয়েছে। যদিও কোনও অজ্ঞাত কারণে লেখিকা প্রবন্ধকারের নামোল্লেখ করেন নি তবু সেই প্রবন্ধের কিয়দংশ উদ্ধৃত করে যাঁর প্রতি কটাক্ষ করেছেন তিনিও সংগীত-জগতে সবিশেষ পরিচিত এবং তাঁর নাম শ্রীরাধিকামোহন মৈত্র। আমি স্বয়ং সেদিনের অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলাম এবং শ্রীমৈত্রের লিখিত প্রবন্ধটি সাগ্রহে পাঠ করেছি।

শ্রীমৈত্র যে কেবলমাত্র একজন জনপ্রিয় সংগীতশিল্পী, তাই নয়। উপরন্তু তিনি একজন আন্তর্জাতিক খ্যাতিসম্পন্ন সরোদ-বাদক এবং উচ্চশিক্ষিত ব্যক্তিও বটেন। সুতরাং তাঁর মত বিদগ্ধ ব্যক্তি যে অকারণে এইরূপ একটি গুরুত্বপূর্ণ অনুষ্ঠানে অহেতুক ভুল তথ্য পরিবেশনের দ্বারা সংগীতমহলে একটি বিভ্রান্তির সৃষ্টি করবেন, এইরকম মনে করার কোনও কারণ নেই। এবং শ্রীমৈত্র যে ভুল তথ্য পরিবেশন করেন নি, লেখিকা স্বয়ং তাঁর নিজের অজ্ঞাতসারেই তা স্বীকার করেছেন। কিন্তু সে আলোচনায় পরে আসছি। তার আগে লেখিকার সমালোচনায় যে অসংগতি এবং তত্ত্ব ও তথ্যের যে সব ভুল রয়েছে তার দৃষ্টান্ত উপস্থিত করেছি।

প্রথমত সমালোচনার সূত্রপাতেই লেখিকা একটি উক্তির দ্বারা ওস্তাদ হাফিজ আলী খাঁ সাহেবের প্রতি কটাক্ষ করেছেন। তাঁর সেই উক্তিটি হল এই যে "আলাউদ্দিন খাঁ এবং এনায়েৎ খাঁর মত গোষ্ঠীগত ঐতিহ্য সৃষ্টি না করলেও" ইত্যাদি। এই উক্তিটির কী কোনও প্রয়োজন ছিল? একথা বোধহয় না বললেও চলে যে শিল্পীর প্রকৃত পরিচয় তাঁর শিল্পসৃষ্টিতে, গোষ্ঠী তৈরীর মধ্যে নয়।

দ্বিতীয়ত তিনি শ্রীবীরেন্দ্রকিশোর রায়-চৌধুরীর সংগীত শিক্ষকদের একটি ফিরিস্তি দাখিল করেছেন। তার মধ্যে প্রখ্যাত রবাব বাদক ওস্তাদ মহম্মদ আলী খাঁ সাহেবকে "মহম্মদ শা" বানিয়েছেন। কিন্তু তদপেক্ষা আশ্চর্যের বিষয় হল, তিনি শ্রীরায়চৌধুরীর সর্বপ্রথম সংগীতগুরু সুপ্রসিদ্ধ সরোদবাদক ওস্তাদ আমীর খাঁ সাহেব এবং তারপর ওস্তাদ এনায়েৎ খাঁ সাহেবের নাম দুটি বাদ দিলেন। এটা কি অনবধানবশত অথবা ঐ দুজন বিশিষ্ট গুণী শিল্পীর স্মৃতি লোপ করার ইচ্ছাকৃত চেষ্টা?

তৃতীয়ত লেখিকা তাঁর সুতীক্ষ্ণ লেখনীর মাত্র একটি খোঁচায় ওস্তাদ বুন্দু খাঁর মত সর্বজনমান্য সারেংগীবাদককে রাতারাতি সরোদীয়া বানিয়ে ফেলেছেন। সম্ভবত তিনি শ্রীমৈত্রের "সামান্য ত্রুটির অসামান্যতায়" কাতর হয়ে অথবা ভাবাবেগের আতিশয্যে অহেতুক অধীর হয়ে আত্মবিস্মৃত হয়েছেন।

চতুর্থ লেখিকা বোধহয় শ্রীমৈত্রের প্রবন্ধের প্রকৃত উদ্দেশ্য এবং মর্ম বুঝতে পারেন নি। শ্রীমৈত্র যন্ত্রসংগীতের ইতিহাস কিংবা ক্রমোন্নতির বিবরণ লেখেন নি। তিনি যন্ত্রসংগীতের কেবলমাত্র তন্ত্রবাদ্যের একটি বিশেষ অংগ অর্থাৎ "তন্ত্রকারীর সংগে গায়কী অংগের সার্থক সমন্বয়ের" ক্ষেত্রে ওস্তাদ হাফিজ আলী খাঁ সাহেবের এবং প্রসংগত ওস্তাদ এনায়েৎ খাঁ সাহেবের অবদানের কথা উল্লেখ করেছেন। যাঁরা তন্ত্রকারীতে গায়কী অংগ ব্যবহার করেন নি তাঁদের নামও উল্লেখ করার কোনও প্রয়োজন আছে বলে মনে করার কারণ ঘটেনি। কিন্তু তন্ত্রকারীর প্রসঙ্গে শানাই কিংবা বাঁশীর মত শুষির জাতীয় যন্ত্রের কথা কীভাবে আলোচ্য বিষয় হতে পারে তা হৃদয়ঙ্গম করা গেল না। তন্ত্রীবাদন (তাঁত বা তারের যন্ত্র) থেকে তন্ত্রকারীর উৎপত্তি। সেক্ষেত্রে শুষির যন্ত্রের অনুপ্রবেশ শুধু বিস্ময়কর নয়, অভাবনীয়ও বটে।

পঞ্চমত লেখিকা 'গায়কী অংগ' বলিতে কী বুঝায় তার একটি সংজ্ঞা নিজেই দিয়েছেন। তিনি বলেছেন যে—"বোল কমিয়ে কণ্ঠসংগীতের ঢংগের পরিবেশনশৈলীকে 'গায়কী অংগ বলা হয়।'" কিন্তু তারপরেই তিনি ওস্তাদ আলাউদ্দিন খাঁ সাহেবের পান্ডিত্য এবং সংগীত শিক্ষার ইতিহাস আলোচনা প্রসংগে নিজেই বলেছেন যে, "তাঁর (অর্থাৎ ওস্তাদ আলাউদ্দিন খাঁ সাহেবের) আগের যেসব যন্ত্রী যন্ত্রসংগীত বাজাতেন তাঁরা বোল কমিয়ে গলার কাজ বেশী করতেন—কিন্তু অতগুলি তাতযন্ত্রের বিশারদ হওয়ার ফলে আলাউদ্দিন হয়ে ছিলেন বোলের বাদশা।" তাহলে কি তিনি নিজেই একথা স্বীকার করছেন না যে ওস্তাদ আলাউদ্দিন খাঁ সাহেবের বাজনা বোলপ্রধান অথবা তন্ত্রকারী? যদি বোলের প্রাধান্য কম হলে তাকে গায়কী অংগ বলা হয়, তবে বোলপ্রধান হওয়া সত্ত্বেও ওস্তাদ আলাউদ্দিন খাঁ সাহেবের যন্ত্রসংগীত কীভাবে গায়কী অংগের মধ্যে পড়ে তা হৃদয়ঙ্গম করা গেল না। বস্তুত ওস্তাদ আলাউদ্দিন খাঁ সাহেব যে গায়কী অংগ না বাজিয়ে তন্ত্রকারীর বৈশিষ্ট্যই বিশেষভাবে এবং সযত্নে রক্ষা করে থাকেন, সমস্ত যন্ত্রীদের নিকট তা সুবিদিত। সুতরাং তাঁর নিজের স্বীকারোক্তির সংগে শ্রীমৈত্রের মতের পার্থক্য কোথায় যে তিনি তাঁর কটাক্ষ করতে কিছুমাত্র কুণ্ঠাবোধ করলেন না? এবং তিনি ওস্তাদ আলাউদ্দিন খাঁ সাহেবের পূর্বে যাঁরা "বোল কমিয়ে গলার কাজ করতেন" বলে উল্লেখ করেছেন, অনুগ্রহ করে সেই সমস্ত ওস্তাদের নাম প্রকাশ করতে পারবেন কি?

পরিশেষে লেখিকাকে আমি সবিনয়ে স্মরণ করিয়ে দিতে চাই যে তিনি সমালোচনার নামে অযথা ওস্তাদ আলাউদ্দিন খাঁ সাহেবের একটি প্রশস্তি গাইতে চেয়েছেন। ওস্তাদ আলাউদ্দিন খাঁ সাহেব সংগীত-জগতের একজন প্রাতঃস্মরণীয় দিক্‌পাল। যন্ত্রসংগীতে তাঁর বিস্ময়কর অবদান সম্পর্কেও সমগ্র সংগীত-সমাজ সচেতন। তাঁর মত বিশ্ববিখ্যাত সংগীত-সাধকের অপ্রাসঙ্গিক প্রশস্তি গাইবার কোনও প্রয়োজন করে না। কারণ তিনি নিজের জ্যোতিতেই উদ্ভাসিত, নিজের মহিমায় মহিমান্বিত।

বিনীত
জয়দেব চট্টোপাধ্যায়
কলিকাতা—৭

(এসম্পর্কে 'গানের জলসা'র লেখিকা চিত্রাঙ্গদার উত্তর আগামী সপ্তাহে প্রকাশিত হবে।)

অমৃত

আগমনীর সুরে বাঁধা

এমন কোনো বাঙালি নেই যার মন এই সময়ে আগমনীর সুরে বেজে ওঠে না। শরতকাল আগমনীর সুরে বাঁধা। তার মনের মধ্যে গুনগুন করছে একটি মাত্র সুর, একটি মাত্র কথা : 'যাও গিরিবর হে, আন যেয়ে নন্দিনী আমার। গৌরী দিয়ে দিগম্বরে, কেমনে রয়েছো ঘরে, কি কঠিন হৃদয় তোমার হে।' কতকাল আগের লেখা। বাংলাদেশের কবিই লিখেছিলেন। এমন শত শত গানের কলি সর্বত্র গুঞ্জন তুলছে। মহালয়ার তর্পণের পর সেই সুর আরও স্পষ্ট, আরও মধুর, তার আকর্ষণ আরও দুর্নিবার।

শরতকাল এলেই আমরা যাঁরা বয়স্ক তাঁদের মন স্মৃতিচারণা করতে থাকে। শরৎ প্রকৃতির মধ্যেই রয়েছে অতীতের প্রতিবিম্বন, সুখস্মৃতি, শৈশব-স্মৃতি, জীবনের অধ্যায়গুলো একের পর এক ভেসে ওঠে সে স্মৃতিপটে। এবারের আকাশ বিলম্বিত বর্ষাকে অনেকদিন বহন করল। আকাশ নীল, তবুও সেই গভীর শান্ত নীল নয়। তার বুকে মেঘ যেন শেষ বর্ষণ করেও কিছু বাকী রাখছে। এই হালকা বৃষ্টির ভিজে হাওয়ায় মন আরও উতলা হয়ে ওঠে শিউলিতলার জন্য। শিউলি ফুলই শরতকে সাজায়। আগমনীর ডালা সাজায় এই নিষ্পাপ নির্মল শুভ্র ফুলগুলোই। সকালের রোদে উৎসবের গন্ধ লেগে আছে। বাঙালি যেখানেই থাকুক এই সময়ে তার মনে পড়বে ঘরের কথা, শৈশবের কথা, পুজোর কথা। এই সময়েই আমাদের সব কিছু ভুলে আনন্দিত হবার মুহূর্ত। এর জন্যই দীর্ঘ বৎসরের প্রতীক্ষা।

আমরা লিখেছিলাম, এবারের উৎসব প্রতীক্ষায় কোথায় যেন সুর কেটে যাচ্ছে। প্রতিবারই তা আমাদের মনে হয়। একশো বৎসর আগে পুরনো সংবাদপত্রের পাতা খুললেও দেখা যাবে এই সম্পাদকীয় বিলাপ। এ উৎসব যেন ঠিক আগেকার মতো আনন্দময় নয়। সব সময়েই উৎসবের দিনে আমাদের মনে পড়ে দুঃখী মানুষের কথা। ধনীর দুয়ারে দাঁড়িয়ে থাকা কাঙালিনী মেয়ের কথা। এবারের উৎসব নানা দুর্যোগের ছায়ায় কিছুটা বিষন্নমূর্তি। দেশের নানাস্থানে খরা আর প্লাবনের জের চলছে। মানুষের দুর্গতি বেড়েছে। লোকের হাতে বাড়তি টাকা এমন নেই যা দিয়ে উৎসবের দিনগুলিকে আনন্দে ভরপুর করে রাখতে পারে। তবু এর মধ্যেই চলছে আয়োজন। শহরে পল্লীতে সর্বত্র উৎসবের সজ্জা প্রস্তুতি চলছে। চণ্ডীমণ্ডপ ধুয়ে মুছে, কলি ফিরিয়ে পরিষ্কার করা হয়েছে। প্রতিমা শিল্পীদের চলছে শেষ কাজটুকু। সর্বজনীন পুজো যাঁরা করেন তাঁরা চাঁদার খাতা নিয়ে অনেক আগেই বেরিয়েছিলেন। এবার শেষ সংগ্রহটুকু বাকী। অন্যান্যবারের চেয়ে হয়তো এবারে বারোয়ারি পুজোর সংখ্যা কমই হবে। অর্থের টান পড়েছে, উদ্বেগ উৎকণ্ঠা তো আছেই। কিন্তু তা সত্ত্বেও উৎসব আমাদের দুয়ারে সমাগত। এ উৎসব আগমনীর সুরে বাঁধা। তাকে আমরা সমগ্র হৃদয় দিয়ে গ্রহণ করি।

পুজোর উৎসবের প্রধান অঙ্গ গৃহস্থ ঘরে অতিথিদের আগমন, নতুন পোশাক কেনা-কাটা। ভালমন্দ খাওয়াদাওয়া, যাত্রা থিয়েটার দেখা। আনন্দময়ীর আগমনকে এইভাবেই উদযাপন করা হত বাঙালির ঘরে ঘরে। দূর প্রবাসে যাঁরা থাকেন তাঁরা এই সময়ে বাড়ি ফিরবেন। গ্রামের মানুষের সঙ্গে পরিচয় হবে নতুন করে, কুশল সংবাদ বিনিময় হবে। সেই পুরনো নদী, পুরনো গাছপালা, শিশির-ভেজা রাস্তা, চণ্ডীমণ্ডপ— এই সব ছবি স্মৃতির পাতায় চলচ্চিত্রের মতো ভেসে উঠবে। তারই টানে ঘরে ফিরে আসা, তার জন্যই এত উৎসব, এত আলো, এত আকুলতা। দোকানীরা আশা করে আছেন, শিশুরা আশা করে আছে, বাড়ির বৌ, মেয়ে সবাই আশা করে আছেন। উৎসব মানেই প্রতিদিনের চেয়ে তার স্বরূপ আলাদা, তার রঙ, তার আলো, তার উজ্জ্বলতা সবই যেন অভূতপূর্ব। সেইজন্যই শরতকালের রূপও আলাদা। এ সত্যিই পৃথিবীর বরবর্ণিনী রূপ।

ভারতের নানা প্রান্তে নানারূপে এই উৎসব উদযাপিত হয়। উত্তর ভারতে দশেরা, দক্ষিণে গণপতি, পশ্চিমে নবরাত্রি—জাতীয় উৎসবের প্রেরণা নিয়ে আসে। বাংলাদেশের উৎসবের মধ্যে ঐশ্বর্যের চেয়ে স্নিগ্ধ মাধুর্যের রূপটিই আমাদের চিরকালের চেনা। বাঙালির সমাজের পরিচিত রূপ আগমনীর গানে বন্দিত। কন্যা পিত্রালয়ে আসবে, তার জন্য মাতৃহৃদয়ের আকুলতা ও প্রতীক্ষার রূপটি অতি সুন্দরভাবে ফুটেছে এই গানে। উৎসবের এই লোকায়ত রূপটিই বাঙালির হৃদয়কে এমনভাবে আকর্ষণ করেছে যুগ যুগান্তর ধরে। তাই শরতের প্রথম রৌদ্র, প্রথম শিশিরকণা আর প্রথম ফোটা শিউলির গন্ধ বাতাসে বেরোতে না বেরোতেই গ্রামের গায়ক একতারা বাজিয়ে গান গেয়ে ওঠে :

> কবে যাবে বল গিরিরাজ, গৌরীরে আনিতে?
> ব্যাকুল হয়েছে প্রাণ উমারে দেখিতে হে,
> গৌরী দিয়ে দিগম্বরে, আনন্দে রয়েছো ঘরে
> কি আছে তব অন্তরে, না পারি বুঝিতে।

এই গানের ভাষা কবিকল্পনা নয়। যার ঘরে কন্যা আছে তার মনের কথাই উমা-মেনকার এই কাহিনীতে রূপ পেয়েছে। আগমনীর সুর তাই বাঙালির হৃদয়ের চিরন্তন সুর। এই সুরেই স্নেহমমতার নির্ঝরধারা প্রবাহিত। এই সুরেই আজ আকাশের, প্রকৃতির, মানুষের হৃদয় বাঁধা। আমরা উৎসবের জন্য সেই স্নেহ-স্নিগ্ধ হৃদয় উন্মুক্ত করে প্রতীক্ষা করে আছি।

ভারতে অষ্টাদশ শতাব্দী

সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়

। এই শতাব্দীতে চিত্রাঙ্কন শিল্পেরও খুব উন্নতি হয়। এই সময়েই বিভিন্ন প্রাদেশিক গোষ্ঠীর শিল্প উন্নতিলাভ করতে থাকে। পশ্চিমবঙ্গে আসামে কাঠের পুঁথি-ঢাকনার ওপর সুন্দর একরকম চিত্রশিল্প গড়ে ওঠে, উড়িষ্যায় তালপাতার ওপর লোহার কলমে আঁকা ছবিও এই সময় উন্নত হয়, যা কিনা উড়িষ্যার রাজাদের দরবারে নতুনভাবে উৎসাহ লাভ করেছিল। মুঘল ও রাজপুত চিত্র এবং কতকগুলি সংশ্লিষ্ট পদ্ধতিও উন্নতিলাভ করতে থাকে। দাক্ষিণাত্যেও ভারতীয় চিত্রশিল্পে কিছু নতুন বৈশিষ্ট্যের স্ফুরণ হতে থাকে। অন্ধ্র দেশে ও তামিলনাদেও অনুরূপ ঘটনা ঘটেছিল। পাঞ্জাবের পাহাড় অঞ্চলে রাজপুত ও মুঘল পদ্ধতি কাংড়া, বশোলি, চম্বা এবং অন্যান্য রাজ্যের সঙ্গে সম্পৃক্ত শিল্পপদ্ধতি-গুলির মধ্যে দিয়ে পূর্ণতা লাভ করে।

ভারতীয় সংগীত, বিশেষত উত্তরভারতে আকবরের সময়ের চেয়ে কতকগুলি বিষয়ে বৈশিষ্ট্য লাভ করে, যখন তানসেন কর্তৃক ধ্রুপদি রীতি সবচেয়ে বেশি প্রচলিত ছিল। সংগীতে হিন্দু ও মুসলিম রীতির মিশ্রণের ফলে উত্তরভারতে ভারতীয় সংগীতের সম্পূর্ণতা এবং তার থেকে 'হিন্দুস্তানী রীতির' উদ্ভব ঘটে। তুরাণ বা মধ্যএশিয়ার (অর্থাৎ তুর্কি দেশের), ইরাণ বা পারস্যের, এবং ইমেন প্রভৃতি কতকগুলি আরব দেশের সুন্দর সুন্দর সুর ভারতে প্রবর্তন করা হয় এবং সেগুলি খুব সহজেই ভারতীয় সুরের সঙ্গে মিলে যায়—এর ফলে স্বভাবতই উত্তর ভারতের সংগীত কিংবা হিন্দুস্তানী রীতির মধ্যে মাধুর্য দেখা দেয়। কিছু ইরাণীয় সংগীতযন্ত্রও ভারতে জনপ্রিয়তা লাভ করে। ইরাণীয় রন্ধনবিদ্যাও ভারতে প্রচলিত হয়:

ভারতীয় পোশাক, বিশেষ মুঘল দরবারের পোশাক রাজপুত ও ইরাণীয় উপাদানের সংমিশ্রণে গঠিত—অষ্টাদশ শতাব্দীতে সেদিক দিয়ে আরও উন্নতি হয়। কতকগুলি রাজ্যে বিশেষ বিশেষ ধরনের পোশাক ও বিশেষ ভঙ্গিতে পাগড়ি বাঁধার রীতি নির্দিষ্ট হয়—যেমন ছিল মারাঠা রীতি, রাজপুত সাফা, বাংলার শামলা, এবং দক্ষিণ ভারতীয় রীতিসমূহ। এরকম ছোট-খাট প্রাদেশিক বৈচিত্র্য থাকা সত্ত্বেও অষ্টাদশ শতাব্দীতে ভারতবর্ষ বিশেষত উত্তর ভারতে একধরনের জীবনযাত্রা ছিল, বিশেষত আনুষ্ঠানিক ঘটনার সময়। নদীয়ার রাজা কৃষ্ণচন্দ্রের দরবারের বর্ণনা দিয়েছেন তাঁর সভাকবি ভারতচন্দ্র রায় গুণাকর—তার থেকে বোঝা যায় অষ্টাদশ শতাব্দীতে ধীরে ধীরে কেমন করে হিন্দু ও মুসলিম অর্থাৎ পারসী-আরব রীতির সংমিশ্রণ ঘটে। সামঞ্জস্যবিধান যাঁর লক্ষ্য ছিল সেই সম্রাট আকবর সতী প্রথার মত নিষ্ঠুর একটি প্রথা বন্ধ করতে চেয়েছিলেন। আকবরের ঠিক পরেই এ বিষয়ে আর কোন প্রয়াসের খবর আমরা পাই না। গোঁড়া ব্রাহ্মণ্যবাদের বাইরে অধিষ্ঠিত বাংলার বৈষ্ণবরা হিন্দুদের মধ্যে একটা সামাজিক সামঞ্জস্য আনতে চেয়েছিলেন, এবং ভারতের অন্যত্রও সেরকম আন্দোলন বিভিন্ন ক্ষেত্রে দেখা গিয়েছিল।

[এষা ।। জ্যৈষ্ঠ-শ্রাবণ : ১৩৭৪]

আধুনিক-পূর্ব বাঙলা কাব্যে চতুর্দশপদী কবিতা

জীবেন্দ্র সিংহরায়

...আধুনিক-পূর্ব বাংলা কাব্যে চতুর্দশপদী কবিতার অস্তিত্ব থাকায় কোনো কোনো সমালোচক মধুসূদনকে চতুর্দশপদী কবিতার প্রবর্তক বলে স্বীকার করতে চান নি। এ সম্বন্ধে 'চর্যাপদের' ভূমিকায় অধ্যাপক মণীন্দ্রমোহন বসু মন্তব্য করেছেন—'মাইকেল এদেশে সর্ব-প্রথম চতুর্দশপদী কবিতা রচনার রীতি প্রবর্তন করেন বলিয়া প্রসিদ্ধি রহিয়াছে। একটু অনুধাবন করিলেই বুঝিতে পারা যায় যে, এই সিদ্ধান্ত সম্পূর্ণই যুক্তিহীন। তাঁহার পূর্বে কি এদেশে কোনো কবিতাই রচিত হয় নাই? বৈষ্ণব পদাবলী সাহিত্যে চৌদ্দপদী কবিতার অভাব নাই, অতএব স্পষ্টই বুঝিতে পারা যায় যে, এই জাতীয় কবিতার প্রবর্তক হিসাবে মাইকেলকে গ্রহণ করা যাইতে পারে না। বাংলা ভাষাতেও অতি প্রাচীনকাল হইতে চতুর্দশ-পদে কবিতার রচনার ধারা চলিয়া আসিতেছিল। ইহার প্রাচীনতম রূপের সন্ধান ১০ম খণ্ড ৫০শ' চর্যায় পাওয়া যায়। পরবর্তীকালে বৈষ্ণব কবিগণ এই জাতীয় বহু কবিতা রচনা করিয়া গিয়াছেন। ইহার প্রধান বিশেষত্ব এই যে পয়ারের ন্যায় প্রতি দুই চরণে মিল থাকে। রবীন্দ্রনাথও অনেক চৌদ্দপদী কবিতা রচনা করিয়াছেন, কিন্তু তাহাদের অধিকাংশই আমাদের প্রাচীন প্রথায় রচিত হইয়াছে। অতএব আমাদের নিজস্ব চৌদ্দপদী কবিতা-রচনার নিদর্শন আমরা চর্যাপদে পাইতেছি।' সুতরাং দেখা যাচ্ছে, অধ্যাপক বসুর মতে আমাদের নিজস্ব চৌদ্দপদী কবিতা-রচনার প্রাচীন নিদর্শন রয়েছে; (২) সেই সব প্রাচীন চৌদ্দপদী কবিতায় পয়ারের মতো প্রতি দুই চরণে মিল দেখা যায়; (৩) অতএব,

মধুসূদনকে বাঙলা সাহিত্যে চতুর্দশপদী কবিতার প্রথম প্রবর্তক বলা যায় না। আমার মনে হয় পয়ার মিলের সাধারণ চৌদ্দপদী কবিতা সম্বন্ধে অধ্যাপক বসুর এই মত সর্বতোভাবে গ্রহণযোগ্য।

কিন্তু চতুর্দশপদী কবিতার অর্থ সনেট ধরলে অধ্যাপক বসুর মত গ্রহণযোগ্য নয়। বস্তুতঃপক্ষে মধুসূদন ইংরেজী সনেট অর্থেই চতুর্দশপদী কবিতা কথাটি ব্যবহার করেছিলেন, পয়ার মিলের সাধারণ চৌদ্দপদী কবিতা অর্থে নয়। এবং সে কারণেই মধুসূদন সনেটার্থক চতুর্দশপদী কবিতার প্রথম প্রবর্তক বলে স্বীকৃত। অধ্যাপক বসুও সেকথা জানেন, তাই মন্তব্য করেছেন—'কেহ হয়ত বলিবেন যে, চতুর্দশপদী কবিতা অর্থে ইংরাজী সনেট, অর্থাৎ বিদেশী মাল, যাহা স্বদেশী পোষাকে চালান হইয়াছে। তাহা হইলে টেবিল, চেয়ার যেমন বাঙ্গালা ভাষায় চলিয়া যাইতেছে, সেইরূপ সনেট শব্দ দ্বারা মাইকেলী কবিতাগুলিকে চিহ্নিত করিলেই ইহার মূল প্রকৃতি সম্বন্ধে স্পষ্ট ধারণা জন্মিতে পারে।' অর্থাৎ চতুর্দশপদী নামে মধুসূদন সনেট লিখেছেন, একথা যদি সত্য হয়, তবে আমাদের প্রাচীন চৌদ্দপদী কবিতার মূল প্রকৃতির সঙ্গে মধুসূদনের চতুর্দশপদী কবিতার মূল প্রকৃতির যে পার্থক্য আছে, তা তিনিও পরোক্ষভাবে স্বীকার করে নিয়েছেন।

[শারদীয় ঐক্যতান ॥ ১৩৭৪]

গিরির ছায়ায় ॥

উমা দেবী

একটি সুন্দর স্বপ্ন রেখে গেছি গিরির ছায়ায়,
সেই স্বপ্নটুকু যেন সুষুপ্তি-তুলনা কিংবা সৃষ্টিবীজরূপা,
আমার সমস্ত সত্তা তারি মধ্যে নিলীন হয়েছে,
আমার সমস্ত সত্তা পুষ্পরূপা নিশ্চিতই হবে।

সে স্বপ্ন সতেজ সুন্দর এক প্রাণময় পুরুষতুলনা।
বলেছে সে গলা ধরে, চোখের দৃষ্টিকে নত ক'রে,
—"একই কালে আমরা দু'জনা
বার্ধক্যে শায়িত হবো,
জীবন-জলধি যদি উল্লোল তবুও তার
লোল ফেনপুঞ্জের মতন।"

বলেছে সে দৃঢ়কণ্ঠে, বলিষ্ঠ সবল এক
বাহুর বন্ধনে পিষ্ট করে,
(এ শুধুই তুলনা—তুলনা—)
"এ দুই সত্তার সংবেদনা
চূর্ণ করে এক হয়ে যাবো
স্বপ্ন আর বাস্তবের দুষ্ট ব্যবধান
মিলে যাবে ফেনারই মতন।"

আমার একটি স্বপ্ন রেখে গেছি গিরির ছায়ায়,
সে এখনো নীলাকাশ-পটে এক সুন্দর গুহার নিরালায়,
আমারই প্রতীক্ষা করে,
পুরুষপ্রধান এক প্রেমিকের মতো।
বলে সে নিত্যই কানে কানে,
"চলে এসো শহরের কোলাহল থেকে
আমার এ হৃদয়ের শান্ত স্নিগ্ধ নিরালা কুহরে,
যেখানে সমস্ত দিশা মিলে গেছে দিশাহারা হ'য়ে,
যেখানে দিগন্ত এসে চুম্বন করেছে
তরুণ শষ্পের প্রাণ,
যেখানে সত্তাও এক নগ্ন নায়িকার মতো
বিকম্পিত দেহের তন্ত্রীতে
সৃষ্টি করে নিতে পারে নূতন সঙ্গীত।"

অমরতা কোন্‌খানে ॥

পবিত্র মুখোপাধ্যায়

অমরতা! অমরতা কোন্‌খানে
স্বর্গে না পাতালে শুয়ে আছো?
অমরতা! তুমি কোন দেবতার করতলে প্রসন্ন মুদ্রায়?
তুমি বিশ্বামিত্র, করো নতুন স্বর্গের সৃষ্টি
শূন্যে যোগবলে
অমরতা, দ্যাখো, আমি শূন্যোদ্যানে শোণিত সিঞ্চনে
গোলাপ ফোটাতে চেয়ে ঈশ্বর...ঈশ্বর...বলে
আর্তনাদ করি
অমরতা! পুড়ে যাচ্ছে জতুগৃহ বুকের আগুনে
কোন্‌খানে যাবে তুমি—স্বর্গে? না পাতালে?

কল্পান্তের অন্ধকারে সমুদ্র আকাশ কিছু নেই
রাহুকবলিত সূর্য যক্ষ্মায় ক্ষয়িত হতে হতে বিন্দুবৎ
মেলায় আঁধারে ..ডোবে সৌধচূড়া...ইতিহাস...
সব প্রতিশ্রুতি
যুদ্ধশেষ হলে নামে কুরুক্ষেত্রে অন্ধকার,
একা দুর্যোধন
হাঁটু মুড়ে জেগে থাকে, মুকুট লুটায়, সারমেয়
শকুনি গৃধিনী ফেরে চারপাশে
...অনিবার্য নিয়তি যেন বা
কুরুক্ষেত্র বুকে লয়ে
অমরতা! দিতে চাও কোন্ প্রতিশ্রুতি?

ফ্রীডরীশ হ্যেল্ডার্লিনঃ তাঁর জীবন ও কবিতা

বুদ্ধদেব বসু

দুই বিপরীত, বা পরস্পরের পরিপূরক— একজন : বহুমুখী, বহুপ্রসু, বিস্তীর্ণ, রাজকীয়, বিজয়ী, যুগস্রষ্টা বা যুগপ্রতিভূ; আর অন্যজন : একতন্ত্রী, নিবিষ্ট, সীমিত, প্রগাঢ় এবং অবহেলিত, তীব্র ও ঐকান্তিক— বিশেষণগুলিকে কিছু কিছু বদলে নিয়ে এই দ্বন্দ্বসমাসে ধরা দেন ওআর্ডস্বার্থ ও ব্লেক, টলস্টয় ও ডস্টয়েভস্কি, উগো ও বোদলেয়ার, রবীন্দ্রনাথ ও জীবনানন্দ—আর, হয়তো সবচেয়ে নিটোলভাবে, গ্যেটে ও হোল্ডার্লিন। টোমাস মান্ তাঁর 'দেবতা' ও 'সন্তের' প্রতিতুলনায় গ্যেটের 'বিপরীত' হিশেবে রেখেছিলেন শিলারকে, কেননা শিলার ছিলেন রোগক্লিষ্ট ও স্বল্পায়ু, কিন্তু তাঁর সমকালীন খ্যাতি ও প্রতিপত্তির কথা মনে রাখলে তাঁকে যথার্থভাবে 'শিল্পের শহীদ' বলা যায় না। এবং 'শহীদ' কথাটায় যে-সচেতন বীরত্বের অনুষঙ্গ আছে, যা বোদলেয়ার আরোপ করেছিলেন এডগার পো-র ব্যক্তিত্বে, এবং আমরা হয়তো বোদলেয়ারের জীবনে দেখতে পাই, তারও বাইরে আছে অন্য এক ধরনের ত্যাগ ও বিনয়, এক সহজাত অবিচল তন্ময়তা, যা মূর্ত হয়েছিলো, জার্মান সাহিত্যের নবজন্মের লগ্নে, এক অখ্যাত ও অবজ্ঞাত যুবকের রচনায়। এ-দিক থেকে দেখলে ব্লেকের সঙ্গেই হোল্ডার্লিনের তুলনা বহুদূর পর্যন্ত সার্থক : ব্লেক, যাঁকে কুলগুরু ওআর্ডস্বার্থ নিশ্চিন্তে উপেক্ষা করেছিলেন, মনস্বী কোলরিজও পারেননি যাঁর গহনে ঢুকতে, টেনিসনীয় ছায়াচ্ছন্ন পলগ্রেভের 'হিরণমঞ্জুষা'য় যাঁর কবিতা স্থান পায়নি, এবং ইংরেজি ভাষার কবিদের মধ্যে যাঁর মহত্ত্ব প্রথম উপলব্ধি করেন ইয়েটস—তাঁরই মতো হোল্ডার্লিন যেন এক ভাবীকথক, ভ্রূণের মতো প্রচ্ছন্ন এক 'অকথ্য আগুন', কিংবা, তাঁর নিজেরই ভাষায়, যুগপৎ 'এক মন্দির ও সমাধিস্তম্ভ, যেখানে বংশপরম্পরায় অর্ঘ্য নিয়ে আসবে উত্তরকাল।' ব্লেকের মতোই তিনি ধর্মকেন্দ্রিক কিন্তু প্রাতিষ্ঠানিক অর্থে 'খৃষ্টান' নন, একই ধরনে চার্চের বিরোধী, যাজকের বৃত্তি এড়াবার জন্য মেনে নিয়েছেন গৃহ-শিক্ষকের ভৃত্যোপম পদবি। কিন্তু ব্লেকের প্রকৃতিতে ও ক্রিয়াকর্মে একটা অস্থিরতা ছিলো, তিনি কিছু পরিমাণে তার্কিক ও প্রচারকও ছিলেন, চেয়েছিলেন এক নতুন পুরাণ সৃষ্টি করতে, এক নতুন ধর্মের প্রবক্তা হ'তে। তুলনায় হোল্ডার্লিনের কবি-চরিত্রে আমরা লক্ষ করি এক আশ্চর্য শান্তি ও স্থিরতা, সমাহিত তিনি, নিজের ভাবনায় আবৃত ও সংযুক্ত, সব বিতর্কের বাইরে, সমাজ-সংসার থেকে [illegible] মন কিন্তু তার দ্বারা অস্পৃষ্ট যেন, কোনো নির্বাত নির্মল জ্যোৎস্নাময়ী রাত্রির মতো, বা যেন এক ক্ষণকালীন চাঁদ, পূর্ণ বিভায় উদ্ভাসিত হওয়ামাত্র যাকে হারিয়ে যেতে হবে ঝঞ্ঝায় অন্ধকারে, অমাবস্যায়। ধ্যানী কবি বলতে সত্যি কী বোঝায়, তার উদাহরণ দিতে গেলে আমার সকলের আগে মনে পড়ে হ্যেল্ডার্লিনকে।

নিয়তিবন্ধ মানুষ ছিলেন এই কবি। যে-সব দেবতাদের বার-বার তিনি স্মরণ করেছেন তাঁর কবিতায়, যাঁদের তিনি কখনো বলেছেন 'হিরন্ময়', কখনো 'দয়াময়', আর কখনো বা 'সমর্থ' বা 'দুর্ধর্ষ' বা 'ভক্ষক', তাঁদের সঙ্গে একটি গোপন চুক্তি যেন ছিলো তাঁর : তাঁর প্রার্থিত 'একটি নিদাঘ ও হেমন্ত' তিনি পাবেন, একটি সৃষ্টিশীল ঋতু, কিন্তু তারপরেই, যেন বৃত হবার মূল্যস্বরূপ, তাঁকে কাটাতে হবে উন্মাদ অবস্থায় প্রায় চল্লিশ বছর। তাঁর পারিবারিক ইতিহাসে অপ্রকৃতিস্থতা ছিলো না, ছিলো না তাঁর স্বভাবে কোনো বিকৃতির লক্ষণ, নীটশে অথবা বোদলেয়ারের মতো তাঁকে উপদংশরূপ কালসর্প দংশন করেনি—অথচ সম্পূর্ণ সুস্থ দেহে-মনে রচিত তাঁর অনেক কবিতায় (যেমন 'আমার সম্পত্তি', 'হাইপেরিয়নের অদৃষ্টের গান', 'অদৃষ্টের প্রতি', 'মধ্য-জীবন') মাঝে-মাঝেই ধরা পড়ে এক অস্বস্তিকর পূর্ববোধ, যেন তিনি জানেন তাঁর ধ্বংস আসন্ন ও অনিবার্য, যেন তাঁর নিজের ইচ্ছার বিরুদ্ধেও 'পার্থিবের সীমাতিক্রমণ' তাঁকে করতে হবে, যেন কোনো দেবতা বা দানব সবলে তাঁকে বহু ঊর্ধ্বে আকর্ষণ ক'রে তৎক্ষণাৎ ছুঁড়ে ফেলে দেবেন পাতালে। বোদলেয়ার যেদিন তাঁর 'অন্তরঙ্গ ডায়েরি'-তে লিখেছিলেন, 'আজ আমি অনুভব করলাম উন্মাদরোগের পক্ষসঞ্চালন', সেদিন তিনি সত্যিই ছিলেন পীড়িত ও ক্লান্ত, দারিদ্র্যে ও ব্যর্থতায় জর্জর, কিন্তু হোল্ডার্লিনের মনে তখনই জাগলো মরণবোধ ও ধ্বংসচেতনা, যখন তিনি, নারীর প্রণয়ের দ্বারা নন্দিত ও সঞ্জীবিত হ'য়ে, পূর্ণতাপে সৃষ্টিশীল। মনে পড়ে নাকি সেই ভয়বহ চিত্রকল্প, যা বিশ্বসভ্যতায় জর্মান মানসের বিশেষ অবদান, মহাজ্ঞানী, মহাপাপী ফাউস্ট—নেমেসিস নয়, পাপের প্রায়শ্চিত্ত নয়, সুকৃতির জন্য শাস্তির, প্রতিভার জন্য দণ্ডবিধানের এই নতুন ও রোমাঞ্চকর ধারণা, যার প্রভাবে আঁদ্রে জীদ একবার লিখেছিলেন যে, 'শয়তানের পরামর্শ বিনা কোনো মহৎ শিল্পকর্ম সাধিত হয়নি'? টোমাস মান্-এর ফাউস্ট, অসামান্য স্রষ্টা, লেফেরকুহ্‌ন, তাঁকেও, চব্বিশ-বৎসর-ব্যাপী ভাস্বর সৃষ্টিপর্যায়ের পর, অকস্মাৎ উপদংশজনিত উন্মাদরোগে লুপ্ত হ'তে হ'লো, যেমন কিনা (এই সম্বন্ধটি টোমাস মান্ স্থাপন করেছেন) উনিশ-শতকের তুলনাহীন সৃষ্টিপর্যায়ের শাস্তি-স্বরূপ জর্মান জাতির ভাগ্যে অবতীর্ণ হ'লো ব্যভিচারী, আসুরিক, দুর্দমনীয় হিটলার। টোমাস মান্-এর উপন্যাসে স্তরে-স্তরে বহু বিভিন্ন সূত্র লুকোনো আছে; লেফেরকুহ্‌নের উপদংশ তাঁর প্রতিভারই প্রতীক, যে-ক্ষমতায় তিনি গরীয়ান তা-ই তাঁকে বিনষ্ট করবে, কেননা তাঁরই মধ্যে একাধারে বিরাজ করছে সর্বার্থ-সিদ্ধ ফাউস্ট ও অবিশ্বাসী মেফিস্টোফিলিস। আমরা জানি লেফেরকুহ্‌নের প্রতিকল্প ছিলেন, হ্যেল্ডার্লিন নন, নীটশে, তবু হ্যেল্ডার্লিনের সঙ্গেও ফাউস্টের একটি আত্মীয়তা আমরা অনুভব না-করে পারি না, অন্ততপক্ষে এই কবিও একজন 'চিহ্নিত' মানুষ, তাঁর জীবনে যা-কিছু ঘটবে সবই যেন নিয়তি—বোদলেয়ারীয় 'দুর্ভাগ্যে'র অর্থে নয়, বরং হিন্দুরা যাকে বলে 'বিধিলিপি' তা-ই যেন তাঁর নিয়ন্তা। কবি হবার জন্য জন্মেছেন তিনি, কখনোই অন্য কিছু হ'তে পারবেন না—না সাংবাদিক, না চিত্রকর, না সমালোচক, দীন ও ভ্রাম্যমাণ গৃহশিক্ষক হ'য়ে জীবিকা অর্জন করতে হবে তাঁকে; সারা জীবনে একবার, মাত্র একবার পাবেন নারীর প্রেম, তাও ক্ষণিকের জন্য, চব্বিশ নয়—মাত্র সাতটি বছর পাবেন তাঁর 'সংগীতের সোনালি সময়', যার মধ্যে, এক অদ্ভুত নিগূঢ় ভাষায় তাঁর সব কথা তাঁকে ব'লে যেতে হবে, আর তারপর দীর্ঘকালব্যাপী উন্মাদের অন্ধ-অচেতন অস্তিত্ব—তাঁর জীবনের পরিপ্রেক্ষিতে এই সবই মনে হয় অমোঘ, যথাযথ, এমনকি অর্থময়। বহু কবির বহু বেদনার কথা জানি আমরা—রোগ, দারিদ্র্য, নির্বাসন, ব্যর্থতা, অবমাননা, কারাদণ্ড—কিন্তু হোল্ডার্লিনকে যেন আক্ষরিক অর্থে দেবগণের ভক্ষ্য হ'তে হয়েছিলো, সেই সব দুর্ধর্ষ দেবতা, যাঁরা বরদ ও করুণাশীল, হিংসা-পরায়ণ ও ভীষণ।

গোটে, বায়রন বা শেলির তুলনায়, হোল্ডার্লিনের জীবন যেন একখানি নিরভিমান ফলক, যাতে কয়েকটির বেশি রেখা পড়েনি। জন্ম বিশে মার্চ, ১৭৭০-এ, দক্ষিণ জর্মানির সোয়াবিয়া অঞ্চলে। দু-বছর বয়সে পিতৃহীন, ন-বছর বয়সে বিপিতাকেও হারালেন, ফলত বাল্যকাল কাটলো মাতৃতন্ত্রে। গোঁড়া প্রটেস্টান্ট মায়ের ইচ্ছে ছেলে হবে ধর্মযাজক, সেই অনুসারে ধর্মীয় বিদ্যালয়ে শিক্ষারম্ভ হ'লো। সতেরো বছর বয়সে বাগ্‌দত্ত হলেন এক কিশোরীর সঙ্গে, কিন্তু পরের বছর নিজেই ভেঙে দিলেন সেই সম্বন্ধ। এলেন ট্যুবিঙ্গেন বিশ্ববিদ্যালয়ে, ধর্মতত্ত্ব বিভাগের ছাত্র হ'য়ে, কাটলো এখানে পাঁচ বছর, পেলেন দু-একজন কাব্যরসিক দরদী বন্ধু, হেগেল ও শেলিং-এর সঙ্গে বন্ধুতা হ'লো; আরম্ভ করলেন সেই কাব্য-রচনা, যা অচিরেই তাঁর সমগ্র সত্তাকে দখল ক'রে নেবে। তাঁর বয়স যখন উনিশ তখনই তিনি বুঝে নিলেন যে ধর্মযাজক হ'তে।তিনি

গিরির ছায়ায় ॥

উমা দেবী

একটি সুন্দর স্বপ্ন রেখে গেছি গিরির ছায়ায়,
সেই স্বপ্নটুকু যেন সুষুপ্তি-তুলনা। কিংবা সৃষ্টিবীজরূপা,
আমার সমস্ত সত্তা তারি মধ্যে নিলীন হয়েছে,
আমার সমস্ত সত্তা পুষ্পরূপা নিশ্চিতই হবে।

সে স্বপ্ন সতেজ সুন্দর এক প্রাণময় পুরুষতুলনা।
বলেছে সে গলা ধরে, চোখের দৃষ্টিকে নত ক'রে,
—"একই কালে আমরা দু'জনা
বার্ধক্যে শায়িত হবো,
জীবন-জলধি যদি উল্লোল তবুও তার
লোল ফেনপুঞ্জের মতন।"

বলেছে সে দৃঢ়কণ্ঠে, বলিষ্ঠ সবল এক
বাহুর বন্ধনে পিষ্ট করে,
(এ শুধুই তুলনা—তুলনা—)
"এ দুই সত্তার সংবেদনা
চূর্ণ করে এক হয়ে যাবো
স্বপ্ন আর বাস্তবের দুষ্ট ব্যবধান
মিলে যাবে ফেনারই মতন।"

আমার একটি স্বপ্ন রেখে গেছি গিরির ছায়ায়,
সে এখনো নীলাকাশ-পটে এক সুন্দর গুহার নিরালায়,
আমারই প্রতীক্ষা করে,
পুরুষপ্রধান এক প্রেমিকের মতো।
বলে সে নিত্যই কানে কানে,
"চলে এসো শহরের কোলাহল থেকে
আমার এ হৃদয়ের শান্ত স্নিগ্ধ নিরালা কুহরে,
যেখানে সমস্ত দিশা মিলে গেছে দিশাহারা হ'য়ে,
যেখানে দিগন্ত এসে চুম্বন করেছে
তরল শষ্পের প্রাণ,
যেখানে সত্তাও এক নগ্ন নায়িকার মতো
বিকম্পিত দেহের তন্ত্রীতে
সৃষ্টি করে নিতে পারে নূতন সঙ্গীত।"

অমরতা কোন্‌খানে ॥

পবিত্র মুখোপাধ্যায়

অমরতা! অমরতা কোন্‌খানে
স্বর্গে না পাতালে শুয়ে আছো?
অমরতা! তুমি কোন দেবতার করতলে প্রসন্ন মুদ্রায়?
তুমি বিশ্বামিত্র, করো নতুন স্বর্গের সৃষ্টি
শূন্যে যোগবলে
অমরতা, দ্যাখো, আমি শূন্যোদ্যানে শোণিত সিঞ্চনে
গোলাপ ফোটাতে চেয়ে ঈশ্বর...ঈশ্বর...বলে
আর্তনাদ করি
অমরতা! পুড়ে যাচ্ছে জতুগৃহ বুকের আগুনে
কোন্‌খানে যাবে তুমি—স্বর্গে? না পাতালে?

কল্পান্তের অন্ধকারে সমুদ্র আকাশ কিছু নেই
রাহুকবলিত সূর্য যক্ষ্মায় ক্ষয়িত হতে হতে বিন্দুবৎ
মেলায় আঁধারে ..ডোবে সৌধচূড়া...ইতিহাস...
সব প্রতিশ্রুতি
যুদ্ধশেষ হলে নামে কুরুক্ষেত্রে অন্ধকার,
একা দুর্যোধন
হাঁটু মুড়ে জেগে থাকে, মুকুট লুটায়, সারমেয়
শকুনি গৃধিনী ফেরে চারপাশে
...অনিবার্য নিয়তি যেন বা
কুরুক্ষেত্র বুকে করে
অমরতা! দিতে চাও কোন্ প্রতিশ্রুতি?

ফ্রীডরীশ হ্যেল্ডার্লিনঃ তাঁর জীবন ও কবিতা

বুদ্ধদেব বসু

দুই বিপরীত, যা পরস্পরের পরিপূরক—একজন ঃ বহুমুখী, বহুপ্রসূ, বিস্তীর্ণ, রাজকীয়, বিজয়ী, যুগস্রষ্টা যা যুগপ্রতিভূ; আর অন্যজন ঃ একতন্ত্রী, নিবিষ্ট, সীমিত, প্রগাঢ় এবং অবহেলিত, তীব্র ও ঐকান্তিক—বিশেষণগুলিকে কিছু কিছু বদলে নিয়ে এই দ্বন্দ্বসমাসে ধরা দেন ওআর্ডস্বার্থ ও ব্লেক, টলস্টয় ও ডস্টয়েভস্কি, উগো ও বোদলেয়ার, রবীন্দ্রনাথ ও জীবনানন্দ—আর, হয়তো সবচেয়ে নিটোলভাবে, গ্যেটে ও হ্যেল্ডার্লিন। টোমাস মান্ তাঁর 'দেবতা' ও 'সন্তের' প্রতিতুলনায় গেটের 'বিপরীত' হিশেবে রেখেছিলেন শিলারকে, কেননা শিলার ছিলেন রোগক্লিষ্ট ও স্বল্পায়ু, কিন্তু তাঁর সমকালীন খ্যাতি ও প্রতিপত্তির কথা মনে রাখলে তাঁকে যথার্থভাবে 'শিল্পের শহীদ' বলা যায় না। এবং 'শহীদ' কথাটার যে-সচেতন বীরত্বের অনুষঙ্গ আছে, যা বোদলেয়ার আরোপ করেছিলেন এডগার পো-র ব্যক্তিত্বে, এবং আমরা হয়তো বোদলেয়ারের জীবনে দেখতে পাই, তারও বাইরে আছে অন্য এক ধরনের ত্যাগ ও বিনয়, এক সহজাত অবিচল তন্ময়তা, যা মূর্ত হয়েছিলো, জার্মান সাহিত্যের নবজন্মের লগ্নে, এক অখ্যাত ও অবজ্ঞাত যুবকের রচনায়। এ-দিক থেকে দেখলে ব্লেকের সঙ্গেই হ্যেল্ডার্লিনের তুলনা বহুদূর পর্যন্ত সার্থক ঃ ব্লেক, যাঁকে কুলগুরু ওঅর্ডস্বার্থ নিশ্চিন্তে উপেক্ষা করেছিলেন, মনস্বী কোলরিজও পারেননি যাঁর গহনে ঢুকতে, টেনিসনীয় ছায়াচ্ছন্ন পলগ্রেভের 'হিরণমঞ্জুষা'য় যাঁর কবিতা স্থান পায়নি, এবং ইংরেজি ভাষার কবিদের মধ্যে যাঁর মহত্ত্ব প্রথম উপলব্ধি করেন ইয়েটস—তাঁরই মতো হ্যেল্ডার্লিন যেন এক ভাবীকথক, ভ্রূণের মতো প্রচ্ছন্ন এক 'অকথ্য আগুনে', কিংবা, তাঁর নিজেরই ভাষায়, যুগপৎ 'এক মন্দির ও সমাধিস্তম্ভ, যেখানে বংশপরম্পরায় অর্ঘ্য নিয়ে আসবে উত্তরকাল।' ব্লেকের মতোই তিনি ধর্মকেন্দ্রিক কিন্তু প্রাতিষ্ঠানিক অর্থে 'খৃস্টান' নন, একই ধরনে চার্চের বিরোধী, যাজকের বৃত্তি এড়াবার জন্য মেনে নিয়েছেন গৃহশিক্ষকের ভৃত্যোপম পদবি। কিন্তু ব্লেকের প্রকৃতিতে ও ক্রিয়াকর্মে একটা অস্থিরতা ছিলো, তিনি কিছু পরিমাণে তার্কিক ও প্রচারকও ছিলেন, চেয়েছিলেন এক নতুন পুরাণ সৃষ্টি করতে, এক নতুন ধর্মের প্রবক্তা হ'তে। তুলনায় হ্যেল্ডার্লিনের কবিচরিত্রে আমরা লক্ষ করি এক আশ্চর্য শান্তি ও স্থিরতা, সমাহিত তিনি, নিজের ভাবনায় আবৃত ও সংবৃত, সব বিতর্কের বাইরে, সমাজ-সংসার থেকে [illegible] দূর কিন্তু তার দ্বারা অস্পৃষ্ট যেন, কোনো নির্বাত নির্মল জ্যোৎস্নাময়ী রাত্রির মতো, বা যেন এক ক্ষণকালীন চাঁদ, পূর্ণ বিভায় উদ্ভাসিত হওয়ামাত্র যাকে হারিয়ে যেতে হবে ঝঞ্ঝায় অন্ধকারে, অমাবস্যায়। ধ্যানী কবি বলতে সত্যি কী বোঝায়, তার উদাহরণ দিতে গেলে আমার সকলের আগে মনে পড়ে হ্যেল্ডার্লিনকে।

নিয়তিবদ্ধ মানুষ ছিলেন এই কবি। যে-সব দেবতাদের বার-বার তিনি স্মরণ করেছেন তাঁর কবিতায়, যাঁদের তিনি কখনো বলেছেন 'হিরন্ময়', কখনো 'দয়াময়', আর কখনো বা 'সমর্থ' বা 'দুর্ধর্ষ' বা 'ভক্ষক', তাঁদের সঙ্গে একটি গোপন চুক্তি যেন ছিলো তাঁর ঃ তাঁর প্রার্থিত 'একটি নিদাঘ ও হেমন্ত' তিনি পাবেন, একটি সৃষ্টিশীল ঋতু, কিন্তু তারপরেই, যেন বৃত হবার মূল্যস্বরূপ, তাঁকে কাটাতে হবে উন্মাদ অবস্থায় প্রায় চল্লিশ বছর। তাঁর পারিবারিক ইতিহাসে অপ্রকৃতিস্থতা ছিলো না, ছিলো না তাঁর স্বভাবে কোনো বিকৃতির লক্ষণ, নীটশে অথবা বোদলেয়ারের মতো তাঁকে উপদংশরূপ কালসর্প দংশন করেনি—অথচ সম্পূর্ণ সুস্থ দেহে-মনে রচিত তাঁর অনেক কবিতায় (যেমন 'আমার সম্পত্তি', 'হাইপেরিয়নের অদৃষ্টের গান', 'অদৃষ্টের প্রতি', 'মধ্য-জীবন') মাঝে-মাঝেই ধরা পড়ে এক অস্বস্তিকর পূর্ববোধ, যেন তিনি জানেন তাঁর ধ্বংস আসন্ন ও অনিবার্য, যেন তাঁর নিজের ইচ্ছার বিরুদ্ধেও 'পার্থিবের সীমাতিক্রমণ' তাঁকে করতে হবে, যেন কোনো দেবতা বা দানব সবলে তাঁকে বহু ঊর্ধ্বে আকর্ষণ ক'রে তৎক্ষণাৎ ছুঁড়ে ফেলে দেবেন পাতালে। বোদলেয়ার যেদিন তাঁর 'অন্তরঙ্গ ডায়েরি'-তে লিখেছিলেন, 'আজ আমি অনুভব করলাম উন্মাদরোগের পক্ষসঞ্চালন', সেদিন তিনি সত্যিই ছিলেন পীড়িত ও ক্লান্ত, দারিদ্র্যে ও ব্যর্থতায় জর্জর, কিন্তু হ্যেল্ডার্লিনের মনে তখনই জাগলো মরত্ববোধ ও ধ্বংসচেতনা, যখন তিনি, নারীর প্রণয়ের দ্বারা নন্দিত ও সঞ্জীবিত হ'য়ে, পূর্ণতাপে সৃষ্টিশীল। মনে পড়ে না কি সেই ভয়বহ চিত্রকল্প, যা বিশ্বসভ্যতায় জর্মান মানসের বিশেষ অবদান, মহাজ্ঞানী, মহাপাপী ফাউস্ট—নেমেসিস নয়, পাপের প্রায়শ্চিত্ত নয়, সুকৃতির জন্য শাস্তির, প্রতিজ্ঞার জন্য দণ্ডবিধানের এই নতুন ও রোমাঞ্চকর ধারণা, যার প্রভাবে আঁদ্রে জীদ একবার লিখেছিলেন যে, 'শয়তানের পরামর্শ বিনা কোনো মহৎ শিল্পকর্ম সাধিত হয়নি'? টোমাস মান্-এর ফাউস্ট, অসামান্য সুর-স্রষ্টা, লেফেরকুহ্ন্, তাঁকেও, চব্বিশ-বৎসর-ব্যাপী জান্তব সৃষ্টিপর্যায়ের পর, অকস্মাৎ উপদংশজনিত উন্মাদরোগে লুপ্ত হ'তে হ'লো, যেমন কিনা (এই সম্বন্ধটি টোমাস মান্ স্থাপন করেছেন) উনিশ-শতকের তুলনাহীন সৃষ্টিপর্যায়ের শাস্তি-স্বরূপ জর্মান জাতির ভাগ্যে অবতীর্ণ হ'লো ব্যভিচারী, আসুরিক, দুর্দমনীয় হিটলার। টোমাস মান্-এর উপন্যাসে স্তরে-স্তরে বহু বিভিন্ন সূত্র লুকোনো আছে; লেফেরকুহ্নের উপদংশ তাঁর প্রতিভারই প্রতীক, যে-ক্ষমতায় তিনি গরীয়ান তা-ই তাঁকে বিনষ্ট করবে, কেননা তাঁরই মধ্যে একাধারে বিরাজ করছে সর্বার্থসিদ্ধ ফাউস্ট ও অবিশ্বাসী মেফিস্টোফিলিস। আমরা জানি লেফেরকুহ্নের প্রতিকল্প ছিলেন, হ্যেল্ডার্লিন নন, নীটশে, তবু হ্যেল্ডার্লিনের সঙ্গেও ফাউস্টের একটি আত্মীয়তা আমরা অনুভব না-ক'রে পারি না, অন্ততপক্ষে, এই কবিও একজন 'চিহ্নিত' মানুষ, তাঁর জীবনে যা-কিছু ঘটবে সবই যেন নিয়তি—বোদলেয়ারীয় 'দুর্ভাগ্যে'র অর্থে নয়, বরং হিন্দুরা যাকে বলে 'বিধিলিপি' তা-ই যেন তাঁর নিয়ন্তা। কবি হবার জন্য জন্মেছেন তিনি, কখনোই অন্য কিছু হ'তে পারবেন না—না সাংবাদিক, না চিত্রকর, না সমালোচক, দীন ও ভ্রাম্যমাণ গৃহশিক্ষক হ'য়ে জীবিকা অর্জন করতে হবে তাঁকে; সারা জীবনে একবার, মাত্র একবার পাবেন নারীর প্রেম, তাও ক্ষণিকের জন্য, চব্বিশ নয়—মাত্র সাতটি বছর পাবেন তাঁর 'সংগীতের সোনালি সময়', যার মধ্যে, এক অদ্ভুত নিগূঢ় ভাষায় তাঁর সব কথা তাঁকে ব'লে যেতে হবে, আর তারপর দীর্ঘকালব্যাপী উন্মাদের অর্ধ-অচেতন অস্তিত্ব—তাঁর জীবনের পরিপ্রেক্ষিতে এই সবই মনে হয় অমোঘ, যথাযথ, এমনকি অর্থময়। বহু কবির বহু বেদনার কথা জানি আমরা—রোগ, দারিদ্র্য, নির্বাসন, ব্যর্থতা, অবমাননা, কারাদণ্ড—কিন্তু হ্যেল্ডার্লিনকে যেন আক্ষরিক অর্থে দেবগণের ভক্ষ্য হ'তে হয়েছিলো, সেই সব দুর্ধর্ষ দেবতা, যাঁরা বরদ ও করুণাশীল, হিংসাপরায়ণ ও ভীষণ।

গেটে, বায়রন বা শেলির তুলনায়, হ্যেল্ডার্লিনের জীবন যেন একখানি নিরভ্র মান ফলক, যাতে কয়েকটির বেশি রেখা পড়েনি। জন্ম বিশে মার্চ, ১৭৭০-এ, দক্ষিণ জর্মানির সোয়াবিয়া অঞ্চলে। দু-বছর বয়সে পিতৃহীন, ন-বছর বয়সে বিপিতাকেও হারালেন, ফলত বাল্যকাল কাটলো মাতৃতন্ত্রে। গোঁড়া প্রটেস্টান্ট মায়ের ইচ্ছে ছেলে হবে ধর্মযাজক, সেই অনুসারে ধর্মীয় বিদ্যালয়ে শিক্ষারম্ভ হ'লো। সতেরো বছর বয়সে বাগ্দত্ত হলেন এক কিশোরীর সঙ্গে, কিন্তু পরের বছর নিজেই ভেঙে দিলেন সেই সম্বন্ধ। এলেন টুবিঙেন বিশ্ববিদ্যালয়ে, ধর্মতত্ত্ব বিভাগের ছাত্র হ'য়ে, কাটলো এখানে পাঁচ বছর, পেলেন দু-একজন কাব্যরসিক দরদী বন্ধু, হেগেল ও শেলিং-এর সঙ্গে বন্ধুতা হ'লো; আরম্ভ করলেন সেই কাব্যরচনা, যা অচিরেই তাঁর সমগ্র সত্তাকে দখল ক'রে নেবে। তাঁর বয়স যখন উনিশ তখনই তিনি বুঝে নিলেন যে ধর্মযাজক হ'তে।তান

[illegible] অর্থকরী ও [illegible] কোনো যোগ্যতা নেই তাঁর, [illegible] হয়তো [illegible] পর্যবসিত। উপলব্ধি করলেন তিনি যদি, অন্য সব বিষয় থেকে নিজেকে বিযুক্ত ক'রে তাঁকে একান্তভাবে কবি হ'তে [illegible]। প্রথম গৃহশিক্ষকের কর্ম পেলেন ইয়েনার [illegible] একটি গ্রামে, ১৭৯৩ সালে। পরের বছর ইয়েনাতে এলেন, শুনলেন ফিক্‌টের বক্তৃতা, শিলারের গোষ্ঠীতে গৃহীত হলেন। শিলার, তাঁর এগারো বছরের বড়ো, গোটের প্রতিযোগী ও অন্তরঙ্গ বন্ধু, জর্মান রোমান্টিকতার অন্যতম প্রতিভূ, তিনি এই তরুণ কবিকে কিছুটা আশ্রয় ও পৃষ্ঠপোষকতা দিলেন, তার দু-চারটি রচনাকে স্থান দিলেন তাঁর সম্পাদিত বিভিন্ন পত্রিকায়। কিন্তু হোল্ডার্লিনের প্রতি শিলারের এই অনুকূল্য স্থায়ী হয়নি, গোটেও বিশেষ দৃকপাত করেননি তাঁর দিকে; তাঁর পরবর্তী, পরিণত কবিতা, যাতে প্রতিভার স্বাক্ষর আজকের দিনে আমাদের কাছে তর্কাতীত ব'লে মনে হয়, তা যে গোটে বা শিলার কখনো পড়েছিলেন, বা প'ড়ে থাকলেও লক্ষণীয় ব'লে ভেবেছিলেন, এমন কোনো প্রমাণ পাওয়া যায় না।

প্রথম যৌবনের বছরগুলি ভ'রে, কবি হবার অনম্য সংকল্প সত্ত্বেও, হোল্ডার্লিন এমন কিছুই লিখতে পারেননি যা অবিকল-ভাবে তাঁরই ব্যক্তিস্বরূপে অনুরঞ্জিত। কিন্তু তাঁর বয়স যখন ছাব্বিশ, তখন এমন একটি ঘটনা ঘটলো, যাকে জয়সের ভাষায় বলা যায় 'এপিফ্যানি', আর রবীন্দ্রনাথের ভাষায় 'নির্ঝরের স্বপ্নভঙ্গ', যার অভিঘাতে তিনি জেগে উঠলেন, খুঁজে পেলেন নিজেকে, অথবা রূপান্তরিত হলেন উৎসাহী প্রয়াসী থেকে এক অবশ্যমান্য উদ্গাতায়। পেলেন সেই প্রেরণা, যার ফলে বক্তব্যে ও প্রকরণে দৈব সংগম সাধিত হয়, চিন্তা হয়ে ওঠে চিত্রকল্প, মহৎ ভাব বিগলিত হয়ে যায় সৌন্দর্যে। ঘটনাটি আর কিছুই নয় : প্রেম। এসেছিলেন ফ্রাঙ্কফুর্টে গন্‌টার্ড নামক এক ধনী ব্যবসায়ীর পুত্রকন্যাদের গৃহশিক্ষক হ'য়ে। সুসেটে, গন্‌টার্ডের স্ত্রী, হোল্ডার্লিনের এক বছরের বড়ো, সুন্দরী ও সুসংস্কৃত মহিলা, প্রাণবন্ত, কল্পনাপ্রবণ, শিল্পকলা ও অনুরূপ বিষয়ে উৎসুক, অমার্জিত স্বামীর সংসর্গে অসুখী—তাঁর সঙ্গে এই সুদর্শন, গীতবাদ্যনিপুণ, ভাবুক সদালাপী কবির সাক্ষাতের পর পারস্পরিক অগ্নিসংযোগ হ'তে দেরি হ'লো না। প্রকৃতির এই প্ররোচনায় হোল্ডার্লিন কেমন সর্বান্তঃকরণে ধরা দিয়েছিলেন, তার প্রমাণ আছে তাঁর এই সময়কার চিঠিপত্রে। ফ্রাঙ্কফুর্টে আসার ছ-মাস পরে এক বন্ধুকে লিখলেন : 'আমি এক নতুন জগতে প্রবেশ করেছি। একদা আমার ধারণা ছিলো যে, সৌন্দর্য ও সাধুতা আমার পরিচিত, কিন্তু এখন সেই সব জ্ঞান আমার উপহাস্য ব'লে মনে হয়। শোনো, বন্ধু! এই পৃথিবীতেই আছে এক সত্তা, যা নিয়ে আমি পারি, আমি চাই হাজার বছর ধ'রে তন্ময় হ'য়ে থাকতে, কিন্তু তবু আমাদের সব চিন্তা, সব বুদ্ধি, যাকে প্রকৃতির মুখোমুখি দাঁড়ালে, মনে হয় যেন বালকের পদক্ষেপ মাত্র। মহত্ত্ব ও মধুরিমা, শান্তি ও প্রাণস্পন্দন, মনীষা, অনুভূতি, রূপকল্প—সব এই সত্তার মধ্যে সমন্বিত হয়েছে একত্বে, এক পূর্ণতার একত্বে। আমাকে বিশ্বাস করো, এ-রকম একটি আবির্ভাব সহজে অনুমেয় পর্যন্ত নয়, এবং এই জগতে আবার তা কখনো দেখা দেবে কিনা তাও অনিশ্চিত।...সে যেখানে উপস্থিত সেখানে কোনো পার্থিব বিষয়ে চিন্তা করাও দুঃসাধ্য, আর সেইজন্যে তার বিষয়ে ভাষায় প্রায় কিছুই বলা যায় না।...আমি আজকাল অনেক বেশি সানন্দে ও স্বেচ্ছাপ্রণোদিতভাবে রচনাকর্মে প্রবৃত্ত হচ্ছি।' কয়েক মাস পরে আবার একই বন্ধুকে : 'তোমাকে শেষ চিঠি লেখার পর আমি এক আনন্দলোক পরিক্রমা করেছি।...তরঙ্গ আমাকে ভাসিয়ে নিয়ে গেছে, আমার সমগ্র সত্তা সারাক্ষণ এত বেশি জীবন্ত হ'য়ে আছে যে নিজের বিষয়ে চিন্তা করার সময় পাচ্ছি না। এখনো, এখনো তেমনি! এখনো আমি প্রথম মুহূর্তের মতো সুখী! এক পুলকিত, শাশ্বত, পূর্ণতাময় সৌহার্দ্য—এমন একজনের সঙ্গে, যে এই অনাস্থ ও বিশৃঙ্খল শতাব্দীতে স্খলিত হ'য়ে পড়েছে! আমার সৌন্দর্যবোধ এখন আঘাতের অতীত; ঐ মাদোনা-মূর্তি তার আশ্রয়। তারই কাছে পাঠ নিচ্ছে আমার বুদ্ধি, আমার বিসংগত সংবেদনশীলতা প্রতিদিন তার স্থির শান্তির সান্নিধ্যে শোধিত ও প্রসন্ন হচ্ছে...আমি দার্শনিক তত্ত্বালোচনা একেবারে ত্যাগ করেছি, বেশি রচনাও করছি না। কিন্তু যেটুকু লিখছি তাতে ধরা দিচ্ছে আরো বেশি প্রাণ, নিবিড়তর রূপকল্প; আমার কল্পনা এখন নিখিলের প্রপঞ্চকে স্থান দিতে উৎসুক; আমার হৃদয় এখন আনন্দময়; আর, যদি দেবী নিয়তি আমার এই পুলকাঞ্চিত জীবনকে রক্ষা করেন, তাহ'লে ভবিষ্যতে আরো বেশি কিছু ক'রে উঠতে পারবো, আশা করি। ...বিদায় বন্ধু! "দেবতারা যাকে ভালোবাসেন, তার লভ্য হয় মহৎ আনন্দ, মহৎ বেদনা।" ক্ষুদ্র স্রোতস্বিনীতে নৌচালনকে শিল্প বলে না। কিন্তু আমাদের হৃদয় ও নিয়তি যখন সমুদ্রবক্ষে ছুঁড়ে দেয় আমাদের, আর সেখান থেকে স্বর্গে তুলে নেয়, তখনই আমরা সত্যিকার নাবিক হ'তে পারি।'

সাংসারিক বুদ্ধিসম্পন্ন বয়স্ক পাঠক ও পাঠিকাদের অনুরোধ জানাই, তাঁরা যেন এই পত্রাংশ দুটিকে ভাবপ্রবণ যুবকের উচ্ছ্বাস ব'লে উড়িয়ে না দেন। কথাগুলি শুধু হার্দ্য অতিকথন নয়, এর পিছনে আছে সেই জন্মান্তরকারী অনুভূতি ও অভিজ্ঞতা, হোল্ডার্লিনের শ্রেষ্ঠ কবিতাগুলিতে যার অনুরণন ও অনুকম্পন তর্কাতীতভাবে উপস্থিত। আমরা এমন কথা বলতে পারি যে অভিজ্ঞতাটি তাঁর অভিভাবক-দেবতারাই দান, এটি না-ঘটলে তাঁর কবিজন্ম ব্যর্থ হ'য়ে যেতো। আজকের দিনে দেশে-দেশে যাঁরা কবিতার রসজ্ঞ, তাঁদের মনে শ্রীমতী গন্‌টার্ড গ্রথিত হ'য়ে আছেন দিওতিমা নামে—[illegible], তিনি প্লেটোর সংলাপগুচ্ছে [illegible] যাঁর কাছে সক্রেটিস শিখেছিলেন প্রেমের তত্ত্ব, এবং যাঁর মুখে, 'সিম্পোজিয়ম' বা 'পান-সভা' নামক গ্রন্থটিতে, প্লেটো (বা সক্রেটিশ) এমন সব কথা বসিয়েছেন, যা বুদ্ধি বা অন্তর্দৃষ্টির সমন্বয়ে অবিস্মরণীয় হ'য়ে আছে। এই দিওতিমা কি সত্যি ছিলেন, না কি তিনি সক্রেটিশ বা প্লেটোর কল্পনা? এ-প্রশ্নের সঠিক উত্তর কারো জানা নেই; কিন্তু কথিত আছে, তিনি ছিলেন আর্কাডিয়ার অন্তর্গত মান্টিনিয়া অঞ্চলের এক পুরোহিত, যুদ্ধের বন্দিনী হ'য়ে আথেন্সে আসেন, এবং বিদেশিনী ব'লেই (যেহেতু আথেন্সীয় ভদ্রমহিলারা প্রায় ছিলেন অন্তঃপুরচারিকা) সক্রেটিশের সঙ্গে আলাপ-আলোচনা তাঁর পক্ষে সম্ভব হয়েছিলো। তৎকালীন আথেন্সীয় ভদ্র পুরুষে 'প্রেম' বলতে যা বুঝতেন তাকে আধুনিক ভাষায় সমকামিতা বললে ভুল হয় না; 'পান-সভা'য় আলোচনাও সে-দিক থেকেই শুরু হয়েছিলো, কিন্তু তাকে স্ত্রী-পুরুষের যৌন প্রণয়ের, এবং তারপরে 'স্বর্গীয়' প্রেমের স্তরে উন্নীত করলেন দিওতিমা, যা তাঁর মুখপাত্ররূপে সক্রেটিস। হোল্ডার্লিন, আবাল্য গ্রীক সাহিত্য ও জীবনদর্শনের ভক্ত, তিনি যে তাঁর শ্বেতবরনী কৃষ্ণকেশিনী চারুদেহিনী প্রেমিকার জন্য 'দিওতিমা' নামটি বেছে নেবেন একে সব দিক থেকেই সংগত মনে হ'তে পারে, কিন্তু লক্ষণীয়, গ্রীক কিংবদন্তী অমান্য ক'রে তিনি তাঁকে 'আশিরচরণ আথেন্সীয়' ক'রে তুলেছেন, বিশুদ্ধ রূপদী সৌন্দর্যের প্রতিমা, যিনি সম্প্রতি পুণ্যভূমি আথেন্সকে হারিয়ে এক বর্বর পরিবেশে প্রক্ষিপ্ত।

শ্রিয়মাণ তোমার কণ্ঠ,
এরা কেউ তোমাকে চেনে না;
অন্তর্দর্শিণী, তুমি ম্রিয়মাণ বিনা প্রতিবাদে;
তবু, হায়, সূর্যের আলোয়
বর্বর সংসর্গে আজও
খুঁজে ফেরো আপন দোসর।

কোনোখানে নেই আর
মহাপ্রাণ প্রেমিক পুরুষ!
কিন্তু কাল গতিশীল।
এই মর সংগীত আমার তবু
দেখে যাবে সেই দিন, দিওতিমা,
যা তোমারই সঙ্গে তুলনীয়,
যা দেখে বীরের দল,
দেবতার পরেই, তোমাকে।

এই মানসী মূর্তির মধ্যে হোল্ডার্লিন সঙ্কলিত করেছিলেন যা-কিছু তাঁর আদর্শ, তাঁর জীবনের সন্ধান—সুষমা ও সৌন্দর্য, ইন্দ্রিয় ও আত্মার সহবাস, বুদ্ধির সঙ্গে অনুভূতির সামঞ্জস্য, যা একদিন সত্য ছিলো আথেন্সে কিন্তু আধুনিক জগৎ থেকে যা লুপ্ত হয়েছে। অথচ তাঁর মানসতার একটি অংশে তিনি খাঁটি আধুনিক, খাঁটি রোমান্টিক, তাঁর গ্রন্থের 'হীপেরিয়ন'-এর অন্তর্ভুক্ত [illegible] ও সেম্পেদোক্লেস [illegible] তিনি

মহাসত্য বলে মেনেছিলেন, যা অ্যাংগনে'র লেখকের পক্ষে হয়তো অসম্ভব হতো। উপরোক্ত কবিতায় প্রথমে দেবতার স্থান, তারপর বীরের—এই মূল্যায়ন গ্রীসীয় হলেও সেই একই নিশ্বাসে প্রেমিক ও কান্তার নামোচ্চারণে ধরা পড়ছে সমকালীন য়োরোপীয় দৃষ্টিভঙ্গি—ধ্রুপদী নয়, রোমান্টিক, স্বর্গমর্ত্যের প্রতি নিষ্ঠা নয়, মারাত্মক চরমের প্রতি আকর্ষণ। 'বর্বর' জর্মানদের সংস্পর্শে তাঁর 'গ্রীক' দিওতিমা ছিলো বলে, তাঁর উচ্চাশীল হেল্ডারলিন নবজাগ্রত স্বজাতির বিষয়েও তিনি আস্থা হারাননি, এবং স্বপ্ন দেখেছেন সেই সময়ের, যখন দিওতিমা এই শীতাহত উত্তর দেশেও যথোচিত মূল্য পাবেন, অর্থাৎ গের্মানিয়াতেই গ্রীক সৌন্দর্যবোধ পুনর্জীবিত হবে। অন্য একটি উচ্চতর ও সাহসীতর সংশ্লেষেরও চেষ্টা করেছিলেন তিনি; বহুকাল ধ'রে গ্রীক দেবতাদের ভজনার পরে (লক্ষণীয়, তাঁর কবিতায় দেবতা কথাটি প্রায়ই বহুবচনে পাওয়া যায়), জীবনবিকেলে তিনি ফিরে এসেছিলেন খৃষ্টের কাছে, তাঁর স্বরচিত নতুন এক খৃষ্ট, যিনি হেরাক্লিস ও দিওনুসসের সঙ্গে একাত্ম বা আত্মীয়। এই সংশ্লেষ যে-সব কবিতায় সবচেয়ে প্রবলভাবে প্রকাশ পেয়েছে, সেগুলোই তাঁর সুস্থ অবস্থার সর্বশেষ রচনা; এদের মধ্যে বিশেষভাবে উল্লেখ্য "রুটি ও মদ" ও "পাটমস"। দুটি কবিতাই সুদীর্ঘ ও

নুম্বুর ; প্রথমটির অনুবাদের চেষ্টা আমি করিনি, দ্বিতীয়টির অংশ এখানে উপস্থিত করা গেলো। "রুটি ও মদ"-এ 'রুটি'র ভূমিকা গৌণ, কবিতাটি একদিক থেকে সুরা-দেবতা বাক্কস (দিওনুসস)-এর প্রশস্তি; —সুরা :— 'পুণ্যময়' দ্রাক্ষার রস —যা হোল্ডার্লিনের 'মানুষ' জেগে উঠেই বেছে নিয়েছিলো—গ্রীক পুরাণে যা কবিতার প্রেরণা, এবং খৃষ্টীয় তত্ত্বেও আত্মার প্রতীক। কবিতাটির শেষ স্তবকে এই জেয়ুস-পুত্র, এই উতরোল প্রাচ্য (বা 'ভারতীয়') দেবতা, রূপান্তরিত হলেন, ঈশ্বরপুত্র 'সিরিয়ান' খৃষ্টে। এবং "পাটমস"-এ, কিছুটা অখৃষ্টানভাবে, যীশুকে তিনি বলছেন 'বজ্রবাহক' (যে-বিশেষণ প্রকৃতপক্ষে জেয়ুস বা বৈদিক ইন্দ্রের প্রতি প্রযোজ্য), কখনো 'পরমের পুত্র', কখনো বা 'রাজকীয় সত্তা'—কবিতার শেষের দিকে একবার মাত্র 'খৃষ্ট' ব'লে তাঁকে উল্লেখ করেছেন। এই পর্যায়ের 'অনন্য' নামক আর-একটি কবিতায় এই সংশ্লেষ আরো স্পষ্ট ভাষায় উচ্চারিত হয়েছে; তার কয়েকটি পংক্তির গদ্য ভাবানুবাদ এখানে উপস্থিত করি। খৃষ্টকে সম্বোধন ক'রে কবি বলছেন :

আমার প্রভু, আমার গুরু, আমার ঈশ্বর, কেন তুমি এত দূরে? আমি যখন প্রাচীনদের কাছে যাই, প্রশ্ন করি বীর ও দেবতাদের, তুমি তখন বিচ্ছিন্ন থাকো কেন?—আর এখন বিষাদলিপ্ত আমার হৃদয়, যেন তোমরা, স্বর্গীয় সত্তারা, আমাকে বলছো যে একের সেবা করলে অন্যকে হারাতে হবে।

কিন্তু আমি জানি, দোষ আমারই। অত্যন্ত বেশি প্রবলভাবে তোমার প্রতি, হে খৃষ্ট, আমি আসক্ত। কিন্তু তুমিই হেরাক্লিসের ভ্রাতা। আর, সাহস ক'রে বলবো আমি, তুমি ভ্রাতা সেই দেবতারও, যিনি তাঁর রথে যোজনা করেছিলেন ব্যাঘ্রদের, সিন্ধুনদীর সীমা পর্যন্ত দিয়েছিলেন আনন্দময় অর্চনার আদেশ, স্থাপন করেছিলেন দ্রাক্ষাকুঞ্জ, শান্ত করেছিলেন জনগণের ক্রোধ।

বলা যায় যে গ্রীক ও খৃষ্টীয় সভ্যতার এই সংশ্লেষসাধন তাঁর শেষ পর্যায়ের দীর্ঘতর কবিতাগুচ্ছের একমাত্র বিষয়, এবং এর মূলেও অংশত হয়তো তাঁর 'দিওতিমা'র প্রভাব আমরা আরোপ করতে পারি, কেননা ঐ নারীর সাহচর্যেই তিনি বুঝেছিলেন যে ইন্দ্রিয়প্রসাদ ও আধ্যাত্মিকতা অবশ্যতই পরস্পরবিরোধী নয়। হোল্ডার্লিনের যে-দুটি পদ্যাংশ ইতিপূর্বে উদ্ধৃত হয়েছে, তার দ্বিতীয়টির প্রতি পাঠকের দৃষ্টি আকর্ষণ করতে চাই : 'যদি নিয়তি তোমাকে রক্ষা করেন' 'আমাদের হৃদয় ও নিয়তি...';—শুধু কবিতায় নয়, ব্যক্তিগত চিঠিপত্রেও ছায়াপাত করছে নিয়তিচেতনা, তাঁর নির্বাপণের পূর্বানুভূতি। 'দেবতারা যাকে ভালোবাসেন, তার লভ্য হয় মহৎ আনন্দ, মহৎ বেদনা' : উদ্ধৃতিটিকে প্রায় দৈববাণী বলতে লোভ হয়, যখন দেখি যে ঐ পত্ররচনার ঠিক দেড় বছর পরে অর্থাৎ ১৭৯৮-এর সেপ্টেম্বর মাসে, বিচ্ছেদ হ'লো কবির সঙ্গে তাঁর দিওতিমার, অপহৃত হ'লো তাঁর আনন্দলোক, তিনি চ'লে এলেন ফ্রাঙ্কফুর্ট ছেড়ে হোম্বুর্গে। সাংসারিক ও সামাজিক দিক থেকে অনিবার্য ছিলো এই বিচ্ছেদ, তবু সব সম্পর্ক ছিন্ন হ'তে আরো কিছুদিন দেরি হ'লো। সুসেটেকে নিয়মিত চিঠি লেখেন হোল্ডার্লিন (দুঃখের বিষয়, একটিও উত্তরকালে পৌঁছতে পারেনি কিন্তু শ্রীমতী গন্টার্ডের প্রকাশিত পত্রাবলি থেকে অনেক তথ্য জানা গেছে); সাধ্যমতো ও সম্ভবমতো গোপনে সাক্ষাৎও করেন ফ্রাঙ্কফুর্টে এসে। ধীরে-ধীরে অগ্রসর হ'তে লাগলো পদ্যে-গদ্যে রচনাকর্ম; কিছুদিন কাটলো সুইৎসার্লান্ডে, ও স্টুটগার্টে, তারপর ১৮০২-এর শুরুতে দক্ষিণ ফ্রান্সের বর্দো শহরে এলেন এক জর্মান পরিবারে গৃহশিক্ষক হ'য়ে। ঐ বৎসরেরই জুন মাসে শ্রীমতী গন্টার্ডের মৃত্যু হ'লো; জুলাই মাসে, কিছুটা বিক্ষিপ্ত মানসিক অবস্থায়, হোল্ডার্লিন পায়ে হেঁটে ফিরে এলেন বর্দো থেকে নুর্টিঙ্গেনে। ১৮০৫ সাল থেকে প্রকট হ'লো মনোবিকারের লক্ষণ; দু-বছর পরে উন্মাদ কবি তাঁর অন্তিম আশ্রয় খুঁজে পেলেন ট্যুবিঙেনে, ৎসিমার নামে এক ছুতোরের বাড়িতে। ডাক্তার বলেছিলেন তিন বছরের বেশি বাঁচবেন না, কিন্তু ঐ ছায়াচ্ছন্ন, প্রেতায়িত বিস্মরণলোকে তাঁকে শারীরিকভাবে জীবিত থাকতে হ'লো সুদীর্ঘ ছত্রিশ বছর; মৃত্যু এলো, অবশেষে ১৮৪৩ সালের সাতুই জুন তারিখে। যে-ঘরটিতে থাকতেন তা নেকার নদীর বাম-তীরবর্তী একটি প্রাচীন মন্ডলাকৃতি তেতলার ঘর, বর্তমানে তার নামকরণ হয়েছে 'হোল্ডার্লিন-টুর্ম'—হোল্ডার্লিন-মিনার।

বিশেষজ্ঞদের মধ্যে কেউ-কেউ অনুমান করেন যে ফ্রাংকফুর্ট ছেড়ে হোম্বুর্গে আসার সময় থেকেই হোল্ডার্লিনের চিত্তবিকৃতি শুরু হয়। কিন্তু তাঁর অনেক শ্রেষ্ঠ কবিতাও এই সময়কারই রচনা। বর্দো থেকে যখন ফিরে আসেন তখন তার ব্যাধি স্পষ্টত কিছুটা অগ্রসর, তবু সেই বছরেই তিনি লিখলেন 'পাটমস'-এর মতো মহৎ কবিতা। বলতে লোভ হয়, স্বল্পপরিমাণ অস্বাভাবিকতার প্রভাবে (যে-কথা হয়তো বা ব্লেক বিষয়েও বলা যায়) তাঁর কবিতা হয়েছিলো আরো ঊর্ধ্বারোহী, কিন্তু 'দেবী নিয়তি' সেখানেই থামলেন না, উৎপাটিত ক'রে নিলেন পুষ্প-পৃথিবীর এই স্বপ্নময় সন্তানের 'আগ্নেয় হৃদয়'। এমন কথা কি বলা যায় যে সুসেটের সঙ্গে বিচ্ছেদের ফলেই তাঁর মানসিক ভারসাম্য নষ্ট হয়েছিলো? এই অনুমান কবির পক্ষে সম্মানজনক নয়, এতে সূচিত হয় এমন এক ধরনের অপৌরুষেয়তা, যার সঙ্গে তাঁর নির্মল, অকেন, স্বপ্রতিষ্ঠ কবিতার সামঞ্জস্য নেই। বিচ্ছেদ, বিরহ : তা তো বিশ্বকবিতার আবহমান মহান বিষয়, হোল্ডার্লিনও সেই তন্ত্রীতে মোহন সুর তুলেছিলেন "বিদায়" ও "দিওতিমার জন্য মেনন-এর বিলাপ"-এ; ঐ বিচ্ছেদ, যেহেতু তা প্রেমেরই তুরীয় অবস্থা, তা, সন্দেহ নেই, তাঁর কবিতা ও ব্যক্তিত্বের ঋদ্ধিসাধন করেছিলো। কিন্তু শুধু বিচ্ছেদ নয়, চার বছর পরেই চিরবিচ্ছেদ : তবে কি বলা যায় শ্রীমতী গন্টার্ডের মৃত্যুর আঘাত তিনি সহ্য করতে পারেননি? না, তাও নয়; ঐ মৃত্যুর খবর তিনি ঠিক যখন জেনেছিলেন, আর জানার পরে তাঁর প্রতিক্রিয়াই বা কী-রকম হয়েছিলো, এ-সব কিছুই নির্দিষ্টভাবে জানা যায় না ব'লে, এই বিষয়টিতে নীরব থাকাই আমাদের পক্ষে যুক্তিযুক্ত। শ্রীমতী গন্টার্ডের মৃত্যুর অনতিপরেই যে হোল্ডার্লিনের অবস্থার দ্রুত অধঃপতন হ'তে থাকে, একে সমাপতন ব'লে ধ'রে নিলে দোষ নেই। তাঁর মানসিক ব্যাধিটি ঠিক কোন জাতীয়, তা নিয়ে এ-কালে ইয়ুং এবং অন্য অনেকে গবেষণা করেছেন, কিন্তু আমাদের পক্ষে সে-প্রসঙ্গ অবান্তর। আমাদের বরং মনে প'ড়ে যায় হোল্ডার্লিনের অন্য একটি উক্তি : 'মরতে হবে তাকে, যে ভগবানের দেখা পেয়েছে।' তিনি চেয়েছিলেন ভগবানকে মুখোমুখি দেখতে ("পাটমস" কবিতা তারই ইতিহাস), কিন্তু সেই পরম অভীপ্সা বজ্রের মতো বিদীর্ণ ক'রে দিলো তাঁর মানবিক সত্তাকে, তাঁকে 'মরতে হ'লো', হ'তে হ'লো উন্মাদ; তাঁর সর্বশেষ পরিণাম, ঘটলো ফাউস্টীয় পাতালপ্রবেশে। অন্য একটি কথা আমাদের স্মর্তব্য : 'দিওতিমা'র সঙ্গে প্রণয়সম্বন্ধ স্থাপিত হবার পর থেকে ঐ মহিলার মৃত্যুর বৎসর পর্যন্ত (ধরা যাক ১৭৯৬ থেকে ১৮০৩)—এই সাত বছরের মধ্যেই হোল্ডার্লিন সেই সব কবিতা লিখেছিলেন, যার জন্যে তিনি আজ স্মরণীয় ও নমস্য। তাঁর কাব্যধর্মী, পত্রাকারে রচিত গদ্য উপন্যাস 'হাইপেরিয়ন' (যা সুসেটের সঙ্গে পরিচয়ের পরে তিনি আদ্যন্ত নতুন ক'রে লিখেছিলেন), এবং অসমাপ্ত কাব্যনাট্য 'এম্পেডোক্লেসের মৃত্যু'—এ-দুটি রচনাও এই অধ্যায়ের অন্তর্বর্তী। ১৮০৪-এ সফোক্লিসের 'রাজা ঈডিপাস' ও 'আন্টিগনে' অনুবাদ করেন—এ-দুটিকেই তাঁর সর্বশেষ মূল্যবান সাহিত্যকর্ম ব'লে ধ'রে নেয়া যায়।

যাকে বলে 'নিরীহ পাগল', ট্যুবিঙেনের মিনারবাসী মানুষটি ছিলেন তা-ই। তাঁর গতিবিধি নিয়ন্ত্রণ করার প্রয়োজন কখনোই হয়নি; প্রায় একইভাবে, একই ঘরে, কাটিয়ে গেছেন দিনের পর দিন, ছত্রিশ বছর। প্রায়ই, বিশেষত গ্রীষ্মকালে, প্রাতঃকালে উঠে বহুক্ষণ ধ'রে পায়ে হেঁটে বেড়ান, চলতে-চলতে কথা বলেন আপন মনে, পথে যা-কিছু কুড়িয়ে পান পকেটে ক'রে নিয়ে আসেন বাড়িতে। মাঝে-মাঝে পিয়ানো বাজান, কোনো একটি শাদাশিধে সুর, ঘন্টার পর ঘন্টা। কেউ দেখা করতে এলে কথাবার্তা বলেন, সকলকেই সম্বোধন করেন 'প্রভু', বা 'রাজন্' বা 'মহিমান্বিত মহাশয়' ব'লে কিন্তু অস্পষ্ট ও অত্যন্ত দ্রুতভাবে উচ্চারিত ফরাশি, ইতালিয়ান ও জর্মানের মিশ্রণ থেকে কথাগুলি উদ্ধার ক'রে নেয়া সহজ হয় না। ফ্রাংকফুর্ট, দিওতিমা, গ্রীস, তাঁর কবিতা—তাঁর অত্যন্ত প্রিয় এই সব বিষয় কেউ উত্থাপন করলে

একেবারে নীরব হ'য়ে যান বা কোনো অর্থহীন উত্তর দিয়ে প্রশ্নকর্তাকে নীরব করে দেন; মাঝে-মাঝে উচ্চৈঃস্বরে কোনো গ্রন্থপাঠ করেন, কিন্তু বোঝাই যায় কথাগুলি তাঁর বোধগম্য হচ্ছে না। তাঁর 'হাইপেরিয়ন' উপন্যাসটি প্রায় সব সময় খোলা থাকে তাঁর টেবিলে, কেউ সাক্ষাৎ করতে এলে তা-ই থেকে আবেগের সঙ্গে পড়ে শোনান, আর মাঝে-মাঝে সোৎসাহে বলে ওঠেন, 'সুন্দর! কী সুন্দর!' একবার একজনকে বলেছিলেন, 'দেখছেন, কী আশ্চর্য, একটা কমা!' আর-একবার, 'আপনার বয়স কত?' এই প্রশ্নের উত্তরে বলেন, 'সতেরো।' সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য এই যে নিজের নাম তিনি ভুলে গিয়েছিলেন, বা কখনোই তা স্বীকার করতেন না; স্কার্দানেল্লি, স্কালিগের রোসা, বুওনারোত্তি, কিল্লালুসিমেনো—এই সব কল্পিত নামের তলায়, চেতন বা অচেতনভাবে, লুকিয়ে রাখতেন তাঁর প্রকৃত সত্তাকে। ১৮৪৩ সালে, তাঁর কবিতার বইয়ের দ্বিতীয় সংস্করণ যখন প্রকাশিত হ'লো (তাঁর জীবদ্দশায় ঐ একটিই কাব্যগ্রন্থ বেরিয়েছিলো তাঁর, তা কোনো অর্থেই সম্পূর্ণ বা যথোচিত নয়), তখন বইখানার পাতা উল্টিয়ে বলেন, 'হ্যাঁ, কবিতাগুলি আমারই লেখা, কিন্তু নাম-পত্রে ভুল আছে, আমার নাম কোনোকালেই হোল্ডার্লিন ছিলো না, আমার নাম স্কার্দানেল্লি বা স্কালিগের রোসা, বা ঐরকম কিছু।' উন্মাদ অবস্থায় তিনি প্রচুর পরিমাণে কবিতা ও গদ্য লিখেছিলেন—দিওতিমার উদ্দেশে পত্র, অতীতের স্মৃতি ও গ্রীক বিষয় অবলম্বনে কবিতা, নিয়তি বা ভগবানের সঙ্গে তাঁর সংগ্রামের কাহিনী, কিন্তু সে-সব রচনা অধিকাংশই বিনষ্ট হয়েছে। যে-কটি নমুনা রক্ষা পেয়েছে তা অসংলগ্ন বা বৈশিষ্ট্যহীন— সেগুলি বিশেষজ্ঞের আলোচ্য হ'লেও কাব্যরসিকের উপভোগ্য নয়।

হোল্ডার্লিনের অধিকাংশ কবিতা সরল অথচ ধ্যানগম্ভীর, প্রাঞ্জল অথচ প্রগাঢ়। ফ্রান্সে প্রতীকিতার উদ্ভবের অনেক আগেই তাঁর কবিজীবনের অবসান ঘটে, তাই তাঁর রচনায় নেই সেই তির্যক ভঙ্গি, সেই উভমুখিতা, যা বিশশতকী আধুনিকতার একটি লক্ষণ, বরং ওয়র্ডস্বার্থ কিংবা শেলির মতোই তিনি প্রত্যক্ষভাবে, ঋজু উক্তির আকারে, প্রারম্ভিক ধরনে, বক্তব্যকে উপস্থিত করেন। উপরন্তু, খৃষ্টান আদিপাপের ধারণাটিকে তিনি আজীবন সযত্নে পরিহার ক'রে চলেছেন, আদিযুগের প্রায় প্রত্যেকে রোমান্টিকের মতো, তাঁরও আস্থা ছিলো জগতের ও মানবজাতির মঙ্গলপ্রবণতায়, আনন্দিত হওয়াকেই মানুষের 'স্বাভাবিক' অবস্থা ব'লে মেনেছিলেন। এই ধরনের সরলতা ও সহজ বিশ্বাসের ফলে শেলি প্রায়শই পথভ্রষ্ট হতেন, ধরা দিতেন উচ্ছ্বাসের অস্পষ্টতায়, অত্যধিক পরিমাণে সুন্দর শব্দ ও চিত্রকল্পের চাপে তাঁর কবিতা যেতো হারিয়ে। কিন্তু হোল্ডার্লিন, গ্রীসের যোগ্যতম শিষ্য, গ্রীক আদর্শে অনুপ্রাণিত হ'য়ে মেনে নিয়েছিলেন কঠিন রূপকল্পের বন্ধন, শিখেছিলেন ধ্রুপদী সংযম, মিতভাষণের কারুশিল্প। তিনি কবিজীবন আরম্ভ করেন সমিল কবিতা দিয়ে, কিন্তু পরিণত রচনায় অমিত্রাক্ষরের প্রতি একনিষ্ঠ ছিলেন, এর পিছনেও গ্রীক প্রভাব আরোপ করলে বোধহয় ভুল হয় না, কেননা তাঁর কোনো-কোনো কবিতা গ্রীক আলকায়িক ছন্দে রচিত, তাঁর অন্তিম পর্যায়ের দীর্ঘ কবিতাগুলি শৈলীতে গ্রীক নাটকের কোরাস অথবা পিন্ডার-এর ওড্-এর সগোত্র। এবং তাঁর লিরিকধর্মী ছোটো কবিতার গঠনশিল্প কোনো উৎকৃষ্ট সনেটেরই মতো অনিন্দ্য, তার বিভিন্ন অংশগুলিও একইভাবে সম্পৃক্ত। প্রথমে একটি প্রস্তাব, পরে তার বিরুদ্ধ উক্তি, শেষাংশে দ্বন্দ্বের একটি সমাধান—এই অনুকল্প তাঁর অনেক কবিতারই নির্ভর, যেমন "আমার সম্পত্তি" "সন্ধ্যাস্বপ্ন", "বাড়ি ফেরা", "যশের প্রতি", "অদৃষ্টের প্রতি" ও "বিদায়"। লক্ষণীয়, তাঁর চিত্রকল্পগুলি যথাসম্ভব স্পষ্ট ও সর্বজনীন: ফুল, ফল, পর্বত, হ্রদ, মেঘ, ঋতু, বৃক্ষ—যা সকলেরই অভিজ্ঞতার অন্তর্ভূত, তার বাইরে তিনি সাধারণত দৃষ্টিপাত করেন না। তাঁর বিষয়বস্তুতে, শেষ পর্যায়ের কয়েকটি কবিতায় ছাড়া, কোনো অভিনবত্ব নেই, সাহিত্যিক বা ঐতিহাসিক উল্লেখও বিরল, যা আছে তা সর্বজনজ্ঞাত। তাঁর জগৎ সংকীর্ণ, বৈচিত্র্যহীন, একাভিমুখী। অথচ— আসলে সেইজন্যেই— তাঁর প্রতিটি উক্তি যেন সদ্যোজাত, যেন অম্লেয়রূপে তরুণ, অবিরলভাবে প্রফুল্ল ও সপ্রতিভ। এরও মূলে আছে তাঁর ব্যক্তিস্বরূপেরই বৈশিষ্ট্য, যাকে তার সরলতা ও আস্থা বলেছি তা-ই। নিরাভরণ ও বিশুদ্ধ উক্তির আকারে মর্মকথা প্রকাশ করার একটি অসামান্য ক্ষমতা ছিলো তাঁর; যেন, তিনি যা বলছেন, তা তিনি বলছেন ব'লেই মান্য। তাঁর রচনায় গ্রীক দেবদেবীরা কোনো মনোরম কল্পনা বা স্মৃতিমাত্র নন, অথবা নন খৃষ্টান কবির 'পেগান' পিকনিক, বা সৌন্দর্যের রোমান্টিক স্বপ্ন—তাঁরা জীবন্ত ও উপস্থিত। হোল্ডার্লিন যখন পুষণকে পিতা বলেন (মূলে 'হেলিয়স', গ্রীক সূর্যদেবতা), যখন বলেন, 'দেবগণ ছিলেন/ আমার ধাত্রী, মাতৃক্রোড়' ("যৌবন"), বা বলেন, 'একবার বেঁচেছি দেবতা হ'য়ে, আর তা-ই যথেষ্ট আমার' ("অদৃষ্টের প্রতি"), তখন এই কথাগুলি অন্তর্নিহিত ভাবনাকে অতিক্রম ক'রে আক্ষরিক অর্থে বিশ্বাস্য হ'য়ে ওঠে, আমাদের মনে হয় তাঁর কাছে এই 'দেবগণ' ততটাই সত্য, যতটা ছিলেন সফোক্লিসের কাছে আপোলো ও আথেনী, বা দান্তের কাছে যীশু ও মাতা মারিয়া। রেনেসাঁস-পরবর্তী অন্য কোনো কবিতে এই গুণটি পাওয়া যায় কিনা জানি না; অন্তত আমার বিশ্বাস যে হোল্ডার্লিনের স্বতঃস্ফূর্ত পুণ্যচেতনার সঙ্গে তুলনা করলে, ধরা যাক এলিয়টের 'ককটেল পার্টি'র ধর্মবোধকে মনে হবে একটি চেষ্টাকৃত বানিয়ে-তোলা পদার্থ—হৃদয়প্রণোদিত ভক্তি নয়, সাহিত্যরচনার একটি উপাদান বা অবলম্বন।

তথাচ, হোল্ডার্লিনকে বলা যাবে না শিলারের অর্থে 'নাঈভ' বা রোমান্টিক অর্থে স্বয়ম্ভু 'ওরিজিন্যাল'। প্রকৃতি ও চৈতন্যের বিরোধ বিষয়ে তিনি যে গভীরভাবে অবহিত ছিলেন, তার প্রমাণ আছে ১৭৯৮-তে লেখা তাঁর "মানুষ" কবিতায়। এরই দু-এক বছর পরে লেখা "মধ্যজীবন"-এ তাঁর ভাষাব্যবহারেও দেখা দিলো সাংকেতিকতা; এই অসমমাত্রিক চতুর্দশপদীটি যেন ফরাশি প্রতীকীদের একটি পূর্বলেখ, সব কথা চিত্রকল্প দিয়ে বলা হয়েছে।

বন্য গোলাপে পূর্ণ, নাসপাতির
হলুদে আক্রান্ত দেশ মুয়ে পড়ে সরোবরে,
হে সুন্দর হংসদল!
এবং চুম্বনে
মাতাল, তোমরা বার-বার
দাও মাথা ডুবিয়ে, অমল-
পুণ্যময় জলে।

এর পরে শীত
এলে আমি তখন কোথায়, হায়,
খুঁজে পাবো ফুল, রৌদ্র
পৃথিবীর ছায়া?
ঠান্ডা, বোবা দেয়াল দাঁড়িয়ে শুধু,
বাতাসে কর্কশ
শব্দ করে আবহকুক্কুট।

'বন্য গোলাপ', 'নাসপাতি', 'সরোবর', 'হংস' —প্রতিতুলনায় 'কর্কশ আবহকুক্কুট', কোন উক্তি নেই;—'মৃত্যুর ঈশ্বরেরা' তাঁকে যে 'ভীষণ নিশার মধ্যে' টেনে নিয়ে যাচ্ছেন ('দিওতিমার জন্য মেনন-এর বিলাপ'), এই ভবিষ্যৎবাণী একটি সংহত ও সম্পূর্ণ ছবি হয়ে উঠেছে, আর সেইজন্যেই পাঠকের মনে তার প্রভাব অনপনেয়। "মধ্যজীবন"কে মনে হয় হোল্ডার্লিনের 'নিদাঘ' ও 'হেমন্তে'র মধ্যবর্তী সেতু, কেননা এর পরে তাঁর শৈলীতে দেখা দিলো আরো গভীর পরিবর্তন; "রুটি ও মদ", "পাটমস", এবং অন্যান্য শেষ পর্যায়ের স্তোত্র বা এলিজি কবিতা—এগুলি পূর্বরচনার তুলনায় শুধু শুধু আকারেই দীর্ঘতর নয়, গঠনে ও বাক্যবিন্যাসেও অনেক বেশি জটিল। এ-সব রচনা স্থাপত্যধর্মী নেই আর, ভাষা তার স্বচ্ছতা হারিয়েছে; কবিতার গঠন হয়েছে নম্য, স্থিতিস্থাপক, পংক্তিগুলি পরস্পরে জড়িয়ে যাচ্ছে, মেঘচ্ছুরিত সূর্যাস্তরশ্মির মতো শব্দগুলি যেন বহুবর্ণ ও রহস্যময়—যেন, তিনি যা বলতে যাচ্ছেন তার সবটুকু নির্বাচিত আধারে ধরানো যাচ্ছে না, বক্তব্য ছাপিয়ে যাচ্ছে রূপকল্পের অবয়ব, অংশত হয়তো হারিয়েও যাবে যদি না পাঠকের থাকে পুনরুদ্ধারের ক্ষমতা। টি এস এলিয়ট একবার 'হ্যামলেট' নাটকে বহিরাশ্রয়ের অভাব দেখেছিলেন, আমি তাতে বরাবর বিস্মিত হয়েছি, কেননা, আমার মনে হয়, ঐ তথাকথিত 'অভাব'বশতই 'হ্যামলেট', "কিং লিয়র'-এর মতোই, চিত্তমন্থনের ক্ষমতায়

শেক্সপীয়রীয় রচনাবলির মধ্যেও অগ্রগণ্য। অন্যান্য সাহিত্যকৃতির কথাও মনে আনতে পারি আমরা, যেখানে কবির বেদনা ও চিন্তা যেন রচনাটির সীমা ছাড়িয়ে যায়:—যেমন ইবসেনের বার্ধক্যে রচিত 'ছোট্ট এইঅল্‌ফ' বা 'জন গেব্রিয়েল বোর্কমান', রিল্‌কের কোনো-কোনো 'ডুয়িনো এলিজি', উত্তর-ইয়েটসের কোনো-কোনো কবিতা বা কবিতা-গুচ্ছ। এ-সব রচনায় মাঝে-মাঝে যেন অন্ধকার অংশ পাওয়া যায়, পাঠকের মনে যা-কিছু পৌঁছয়, তার তুলনায় অপ্রতুল মনে হয় 'বিষয়' বা উপলক্ষটিকে অর্থাৎ এদের অভিঘাতের একটা অংশ হ'লো উদ্বৃত্ত বা অতিরিক্ত, পাঠক যাতে অধিকতর লাভবান হচ্ছেন। এমনি একটি রচনা হোল্ডার্লিনের "পাটমস"—একটি দীর্ঘ স্বগতোক্তি, স্বপ্ন-কথন, দিব্যদৃষ্টিতে উদ্ভাসিত এক আশ্চর্য দেশ, যেখানে ভগবান 'সন্নিকট'।

কবিতা বিষয়ে হ্যেল্ডার্লিনের পাঁচটি উক্তি উদ্ধৃত ক'রে হাইডেগার দেখাতে চেয়েছেন যে কবিতার (তাঁর পরিভাষায়) যা 'এসেন্স' সারাৎসার তা হৃদয়ঙ্গম করতে হ'লে এই কবিই আমাদের অবলম্বন। ঐ পাঁচটির মধ্যে দুটি উক্তি "পাটমস" প্রসঙ্গে স্মর্তব্য : এক, 'কবিতা হ'লো সবচেয়ে নিরপরাধ কারুকর্ম', আর, দুই, 'ভাষা মানুষের সবচেয়ে বিপজ্জনক সম্পত্তি।' কথা দুটিকে যুক্ত করে এ-ভাবে সাজানো যায়, 'কবিতা লেখা সবচেয়ে নিরপরাধ কাজ, কিন্তু (অথবা সেইজন্যই) সবচেয়ে বিপজ্জনক।' এবং এই চিন্তাই অন্য স্তরে প্রকাশিত হয়েছে 'পাটমস'-এর আরম্ভে :

সন্নিকট
এবং দুর্ধর ভগবান।
কিন্তু আছে বিপদ যেখানে
সেখানেই বর্ধিষ্ণু রক্ষার শক্তি।

ভগবান কাছেই, কিন্তু তাঁকে ধরা শক্ত, সেই চেষ্টাও বিপজ্জনক, কিন্তু বিপদের মধ্যেই নিহিত আছে উদ্ধার : প্রথম চার পংক্তিতে এই প্রস্তাব উপস্থিত ক'রে, কবিতাটি, অনতিসরে উল্লিখিত ঈগলের মতোই, শৃঙ্গ থেকে শৃঙ্গান্তরে যেন পাখার ঝাপটে উড়ে-উড়ে যায়, আমরা স্বপ্নচালিতের মতো যাত্রা করি পাটমসের দিকে, পেরিয়ে যাই এক নিশ্বাসে বহু মধ্যবর্তী সোপান, দেখতে পাই বিহঙ্গদৃষ্টিতে এক নতুন ভূদৃশ্য, ধীরে-ধীরে উপলব্ধি করি যে যাত্রাটি যুগপৎ এক ভৌগলিক ভ্রমণ ও ভগবানের দিকে মানবাত্মার অভিযান। এ-রকম দুঃসাহসী কল্পনা, এ-রকম বিমিশ্র ও উল্লম্ফনকারী চিত্রকল্প হ্যেল্ডার্লিনের পূর্ব-রচনায় আমরা পাইনি; পংক্তিগুলির অসমতা, বাক্যবন্ধের বিসর্পিল গতি, স্তবকবিন্যাসে নিয়মহীনতা —এ-সব থেকেও যেন বোঝা যায়, কত বড়ো উত্তেজনাকে কত বড়ো শক্তির দ্বারা সংযত করে রাখা হয়েছে। এক নতুন ও মহত্তর হ্যেল্ডার্লিনের আমরা দেখতে পাচ্ছি এখানে —যিনি "ক্ষমাপ্রার্থনা," "সন্ধ্যাস্বপ্ন," "অদৃষ্টের প্রতি" প্রভৃতি হৃদয়দ্রাবী কবিতা লিখেছিলেন, তাঁর মতো সরল ও শান্ত নন, কিন্তু মূলত তেমনি—বা আরো বেশি—সমর্পিত; আমাদের মনে হয় যে, কবিতাটির অগ্রগতির সঙ্গে-সঙ্গেই তার সূচনাকালীন শক্তি ও জিগীষা ('ঈগল') রূপান্তরিত হচ্ছে ভক্তিতে ও আত্মনিবেদনে। হোল্ডার্লিনের শেষ পর্যায়ের সব কবিতারই মতো "পাটমস"ও দুরূহ ও উল্লেখবহুল; কিন্তু তাঁর উল্লেখের ব্যবহারও আধুনিকতর কবি-দের তুলনায় ভিন্ন ধরনের। তাঁর উল্লেখগুলি কবিতাকে অন্য একটি আয়তন দিচ্ছে না, পৌরাণিক ছদ্মনামে সমকালকে চিত্রিত করাও তাদের উদ্দেশ্য নয়; তারা যা, তারা তা-ই অর্থাৎ যেমন পূর্ব-কবিতায় গ্রীক দেবদেবীর বিষয়ে, তেমনি এখানেও, হোল্ডার্লিন আমাদের মনে এই বিশ্বাস উৎপাদন করেন যে এশিয়া-মাইনরের ঐ পর্বত ও নদীসমূহকে, তাদের প্রাচীন গরীয়ান অবস্থায়, তিনি প্রত্যক্ষ করেছেন, যে পাটমস দ্বীপ এবং সেই দ্বীপবাসী সন্ত ইয়ন তাঁর পক্ষে ব্যক্তিগতভাবে প্রত্যক্ষ ও বাস্তব, এমনকি হয়তো সন্ত ইয়নের সঙ্গে একাত্ম হ'য়ে, তাঁর হেরাক্লিস-খণ্ডকেও তিনি কখনো বা দেখেছিলেন। গীতি-কবিতা নয়, মিস্টিকদের আত্মহারা উচ্চারণ নয়, একটি সুদীর্ঘ, শিল্পিত, সুনিয়ন্ত্রিত বহুলাঙ্গ ঈশ্বর-বিষয়ক কবিতা—তাতে এতদূর পর্যন্ত অনাস্থার অপনোদন সাহিত্যের একটি অসামান্য ঘটনা ব'লে চিহ্নিত হ'তে পারে।

তাঁর স্বদেশে, হ্যেল্ডার্লিনের যথার্থ সমাদর আরম্ভ হয় বিশ শতকের দ্বিতীয় দশকে তাঁর মৃত্যুর প্রায় সত্তর বছর পরে এবং দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের সমাপ্তির পর থেকে তা প্রতীচীর অন্যান্য অংশে বর্ধিষ্ণু। তাঁর পুনরুজ্জীবনে একটি বড়ো অংশ গ্রহণ করেন স্টেফান গেঅর্গে; তিনি ও রিলকে, দু-জনেই তাঁর কাছে ঋণী, দু-জনেই তাঁর উদ্দেশে কবিতায় অর্ঘ্যদান করেছেন। তাঁর সমকালীন স্বল্পসংখ্যক গুণগ্রাহীদের মধ্যে সর্বাগ্রে উল্লেখযোগ্য বেটিনা ফন আর্নিম, গ্যেটে-গোষ্ঠীর অন্তর্ভুত মনস্বিনী মহিলা, যিনি বলেছিলেন, 'গ্যেটের ভাষার সংস্কার হয়েছে উৎস তাঁর হৃদয়বৃত্তির অস্পৃষ্ট অন্তরঙ্গতা, কিন্তু হ্যেল্ডার্লিনের কাছে ভাষা, প্রণয়িনীর মতো, সশরীরে আত্মদান করেছিলো।' এই কথারই প্রায় প্রতিধ্বনি করেন নর্বেট ফন হেলিনগ্রাথ, যিনি প্রথম মহাযুদ্ধে নিহত হবার আগে পর্যন্ত হ্যেল্ডার্লিনের রচনা-সংগ্রহ সম্পাদনা ক'রে-ছিলেন—যখন জর্মান জাতিকে এই বিস্ময়-কর ঘোষণা তিনি শোনান যে তারা যদিও নিজেদের 'গ্যেটের স্বজাতি' ব'লে জানে, আসলে তারা 'হ্যেল্ডার্লিনের স্বজাতি', কেননা জর্মানদের নিহিত আগুন ও গোপন রাজত্বের হ্যেল্ডার্লিনই 'মহত্তম উদাহরণ'। যারা জর্মান নয় তাদের পক্ষে এ-সব কথার মর্মোদ্ধার করা কঠিন, কিন্তু হেলিনগ্রাথ, একই বক্তৃতায়, অন্য একটি মন্তব্য করেন, যা আমাদের সকলেরই পক্ষে ইঙ্গিতময় এবং অন্যান্য দেশের অন্যান্য কবিযুগলের প্রতিও প্রযোজ্য—যে গ্যেটের ছিলো 'সম্পদের দারিদ্র্য' আর হ্যেল্ডার্লিনের, 'দারিদ্র্যের সম্পদ'। সেই রিক্ততাপ্রসূত রত্নের কয়েকটি উদাহরণ মাতৃভাষায় উপস্থিত করতে পেরে আমি তৃপ্তিবোধ করছি, কেননা, গত চল্লিশ বছরের মধ্যে আমাদের দেশে ইংরেজি ছাড়া অন্যান্য পাশ্চাত্ত্য সাহিত্যের চর্চা যদিও কিঞ্চিৎ বৃদ্ধি পেয়েছে, এবং সুধীন্দ্রনাথ তাঁর 'সংবর্তে'র একটি পংক্তিতে 'গ্যেটে, হ্যেল্ডার্লিন, রিল্কে, টমাস মান'কে বাঙালির পক্ষে স্মরণীয় করেছেন, তবু, আমার ধারণা, আমাদের এই সাংস্কৃতিক দৈন্যময় মফস্বলে হ্যেল্ডার্লিন এখনো শিক্ষিত বা সাহিত্যিক মহলেও প্রায় সম্পূর্ণ অপরিচিত। আমরা শেষতম নোবেল-পুরস্কৃত লেখকের পশ্চাদ্ধাবন ক'রে থাকি (তিনি যেমনই হোন), পেপার-ব্যাকে পড়ি ফ্রাঁসোয়াস সাগাঁর উপন্যাস, বা নানা দেশের রাগি অথবা বৈরাগী যুবকদের ক্রিয়াকলাপে বিমুগ্ধ হই—অথচ আমরা হ্যেল্ডার্লিনকে জানি না, এই অবস্থাটিকে আমার মনে হয় সীমাহীনরূপে শোকাবহ। 'জর্মান না-হ'লে হোল্ডার্লিনকে বোঝা যায় না,' এই মন্তব্য জর্মান সমা-লোচকেরা মাঝে-মাঝে ক'রে থাকেন, কিন্তু আমার বিশ্বাস, কোনো সৎসাহিত্য-প্রেমিক শতকরা-একশো পরিমাণে শুধুমাত্র স্বজাতীর হ'তে পারেন না, এবং আমি নিজের অভিজ্ঞতা থেকে জানি যে এই কবি, বহুদূর পর্যন্ত, অনুবাদে আমাদের অধিগম্য। আমি তাঁর কাছে পেয়েছি এক বিরল চিত্তশুদ্ধি, এক চরাচরব্যাপী পবিত্রতাবোধ, এক অকলুষের সাধুতার স্পর্শ; তাঁর কবিতা যতবার পড়ি বা স্মরণে আনি, আমার মনে হয় তিনি যেন সত্যি দেবতাদের দ্বারা লালিত হয়েছিলেন, যেন তাঁর কবিজীবন কেটেছে দেবতার সান্নিধ্যে, তাঁর ছন্দোবদ্ধ অমল পংক্তিগুলির মধ্য দিয়ে যেন কোনো স্বর্গীয় সত্তা কথা বলছেন। সেই আনন্দের অংশ অন্যদের দেবার আগ্রহ থেকেই এই অনু-বাদগুচ্ছের জন্ম।

এম. সি সরকার কর্তৃক প্রকাশিতব্য 'হ্যেল্ডার্লিন-এর কবিতা' গ্রন্থের ভূমিকা।

আগমনী ও বিজয়া গান

অনিল মিত্র

বাঙলা দেশে বাঙালীর ভাব-প্রবণতার জন্য তার ধর্ম ও সমাজজীবন পরস্পর ওতপ্রোতভাবে মিশে গেছে এবং এরই প্রভাব থেকেই আগেকার কবি ও কাহিনীকার পেয়েছিলেন তাঁদের সাহিত্য সৃষ্টির প্রেরণা। সে যুগের উল্লেখযোগ্য সাহিত্য সৃষ্টির মধ্যে দেখা যায়—সবচেয়ে প্রাধান্য লাভ করেছিল—স্বর্গের দেবতা। কিন্তু এ যুগের সাহিত্যে সে স্থানে প্রাধান্য লাভ করে চলেছে মর্তের মানুষ। এটা হয়তো পরিবর্তনশীল যুগধর্মের প্রভাব।

সে যুগে—দেবদেবীর মহিমা কীর্তন ও তাঁদের জয়গানের অন্তরালে ঢাকা পড়েছিল—রক্তমাংসে গড়া মানুষের সুখদুঃখ, আশা-নিরাশা ও জীবনযন্ত্রণার কাহিনী।

কবি ভারতচন্দ্রের পরে বাঙলা সাহিত্যকে জাগিয়ে রেখেছিলেন—কবিওয়ালা ও পাঁচালিকারের দল। এঁরাই বৈষ্ণবপদাবলী থেকে বিষয়বস্তু গ্রহণ করে—মান, বিরহ, সখি-সংবাদ এই সব ছোট ছোট পদ রচনা করতেন ও তারই ফলস্বরূপ প্রকাশ পেয়েছিল শাক্তপদাবলী। সেই পদাবলীরই একটা বিশিষ্ট শাখা—আগমনী ও বিজয়া গান।

সন্ধানী পাঠকমাত্রই জানেন—যে বাঙলা সাহিত্যে নব-যুগের প্রেরণা পশ্চিমী দেশ থেকে আমদানী করা হয়নি। সে যুগে খাঁটি বাঙালী কবি বলতে ছিলেন—কবিওয়ালা ও পাঁচালিকারেরা। তাঁদের লেখা গানগুলি বর্তমান যুগেও বাঙালীদের কাছে অতিপ্রিয় ও সমাদৃত। এমনকি বিভিন্ন ভাষাভাষীরাও এর রসসৃষ্টি উপভোগ করে অভিভূত হয়ে পড়ে।

বাৎসল্যরসের প্রেরণায় অভিভূত হয়ে—যদিও মা-দুর্গাকে তাঁর আসন থেকে নামিয়ে মেয়ের আসনে প্রতিষ্ঠিত করা হয়েছে, তবুও ঐ গানগুলি বাঙালী সমাজের শিক্ষিত ও অশিক্ষিত পল্লী ও নগরবাসীদের শিক্ষা ও আনন্দই দিয়ে আসছে।

সেকালে বাঙলা ও বাঙালীর গার্হস্থ্য-জীবনের হর্ষবিষাদময় কাহিনী থেকেই সংগৃহীত উপাদানে আগমনী ও বিজয়া গানগুলি রচিত হয়েছিল।

বিশেষ করে মেয়ের পিতার গৃহে আগমন ও পতি-গৃহে প্রত্যাবর্তনের বাস্তব ও প্রাণস্পর্শী চিত্রগুলি যেন ছায়াছবির পর্দার মত অপরূপ ভাবে ফুটে উঠেছে।

এরপর রামপ্রসাদ, কমলাকান্ত ও নাম না জানা প্রমুখ আগমনী ও বিজয়া গান রচয়িতাদের কিছু কিছু আলোচনার মাধ্যমে উদ্ধৃত করতে চেষ্টা করলাম—এ বিষয় বাঙলার আর একজন প্রাচীন সাহিত্যিক—দাশরথি রায় একটি বিশেষ ভাবধারায় লিখে উপভোগ্য রসসৃষ্টি করে গেছেন।

এককালে বাঙলাদেশে বাল্যবিবাহ প্রচলিত ছিল—তখন সংসার-অভিজ্ঞতাহীন কিশোরী মেয়েকে স্বামী-গৃহে বিদায় দিয়ে মায়েরা সজল নয়নে বিনিদ্র রাত্রি যাপন করতেন—কখনও বা নিশুতি রাতে স্নেহের সেই দুলালী মেয়ের স্বপ্নে দেখা পেয়ে শয্যাপ্রান্ত সিক্ত করতেন।

তেমনি শরৎকালে রাত্রি শেষে মাতা মেনকাও শিবের গৃহিণী উমাকে স্বপ্নে দেখা পেয়ে ব্যাকুল হয়ে বলছেন :—

"আমি কি হেরিলাম নিশিস্বপনে গিরিরাজ;
অচেতনে কতনা ঘুমাও হে! এই এখনি
শিয়রে ছিল, গৌরী আমার—কোথা গেল হে॥"
[কমলাকান্ত]

বৎসরান্তে অন্ততঃ একবার মেয়েকে পিতার-গৃহে আনতেই হবে—এ নিয়ে পিতা-মাতার মধ্যে সাময়িক কলহও হয়ে যায়—মেয়েকে আনবার জন্যে মা জানান তাঁর কাতর প্রার্থনা।

জামাতা শিব একে তো নিঃস্ব—তার ওপর আপনভোলা। এদিকে আবার সতীন গঙ্গাকে মাথায় স্থান দিয়েছেন—

মাতা মেনকার হৃদয় তাই উমার অসহায় অবস্থার কথা চিন্তা করে বিচলিত হয়ে পড়ে—

"গিরিরাজ, ভিখারী সে শূলপাণি,
তারে দিয়ে নন্দিনী—
আর না কখন মনে কর একবার
কেমন কঠিন বল হৃদয় তোমার।"
[কমলাকান্ত]

কোমল-প্রাণা মাতার অশ্রুসজল কাতর প্রার্থনা কঠিন-প্রাণ পিতা আর উপেক্ষা করতে পারে না—

মেনকার মিনতি কঠিন গিরিরাজকেও বিচলিত করে তুলেছে—তাঁর পুরস্কারও মিলেছে—

"তখন গিরি যায়, আনিতে গিরিজায়,
দুনয়নে বহে বারি বলে উমা আয়লো ঘরে।"
[রামপ্রসাদ]

প্রতিবেশীর মুখে মেয়ের আগমন বার্তা শুনে বাঙালী-মা আর নিজেকে স্থির রাখতে পারেন না—আনন্দাশ্রু বিসর্জন দিয়ে মেয়েকে বরণ করতে ব্যস্ত হ'য়ে পড়েন......

ঠিক তেমনটি মাতা মেনকাও :—

"শুনিয়া এ শুভ বাণী, এলোচুলে ধায় রাণী,
বসন না সম্বরে।
গদ্ গদ্ ভাবভরে ঝর ঝর আঁখি ঝরে
পাছে করি গিরিবরে
অমনি কাঁদে গলা ধরে।"
[রামপ্রসাদ]

ঘরে এলে মেয়েকে দেখে মা অবাক হয়ে তাকিয়ে থাকে—এ কী চেহারা হয়েছে! সোনার অঙ্গ কালি হয়ে গেছে—সেখানে তাঁর মেয়েকে কেউ হয়তো যত্নই করে না—

তাই উমাকে দেখে মেনকা বলছেন—

"বাছার নাই সে বরণ, নাই আভরণ
হেমাঙ্গী হইয়াছে কালীর বরণ,
হেরে তার আকার, চিনে উঠা ভার
সে উমা আমার, উমা নাই হে আর।"
[• •]

উমাও মা'র কাছে অভিমান করে জানাচ্ছে—

"কই মেয়ে বলে আনতে গিয়েছিলে—
তোমায় পাষাণ প্রাণ, আমার পিতাও
পাষাণ জেনে,
এলাম আপনা হতে—গেলে নাকো নিতে;
রব না যাব দুদিন গেলে।"
[• •]

মেয়ে কিছুদিন পিত্রালয়ে রইলো কি না রইলো—এদিকে জামাতার ডাক এসে হাজির। বিবাহের পর মেয়ে পর হয়ে যায়—অতএব মাতা-পিতার সে ক্ষেত্রে কোনই জোর খাটে না—বাঙালী মায়েরা একথা বুঝেও বোঝে না।

"তনয়া পরের ধন, বুঝিয়া না বুঝে মন,
হায় হায় একি বিড়ম্বনা বিধাতার।"
[রামপ্রসাদ]

কিন্তু এদিকে সারা ভুবনময় বেজে উঠেছে বিদায়-বেলার—অর্থাৎ বিজয়াদশমীর সেই করুণ সুর—এবার যে স্বামীর-ঘরে ফেরার পালা—

উমার মন [illegible] হয়ে ওঠে—[illegible] [illegible]—[illegible] একটা [illegible] [illegible] মধ্যে থাকে একান্ত [illegible] ভাবে [illegible]—তা ত' আর ইচ্ছা থাকলেও চিরদিন থাকবে না—অতএব মা'র স্নেহছায়া থেকে বিদায় নিতেই হবে।

ওদিকে হয়তো জামাই শিব কৈলাস থেকে রওনা হ'য়ে পড়েছে—নবমীর রাত্রি প্রায় শেষ হয় হয়—

"কি হলো নবমী নিশি
হৈল অবসান গো,
বিশাল ডমরু ঘন ঘন বাজে শুনি—
ধ্বনি বিদরে প্রাণ গো।"
[* *]

বাঙলার জননীর মত উমা-জননী মেনকাও আসন্ন বিচ্ছেদের ব্যথা কল্পনা করে অধীর হয়ে বলেন—

"আর তোরে পাঠাব না—
বলে বলবে লোকে মন্দ
কারু কথা শুনব না:
আমরা মায়ে ঝিয়ে করব ঝগড়া
জামাই বলে মানব না॥"
[রামপ্রসাদ]

কিন্তু যতই ঝগড়া করুন না কেন, শেষ পর্যন্ত মেয়েকে পাঠাতেই হয়—ও সেই বিদায়-বিচ্ছেদের সময় জননী মেনকার প্রাণ হাহাকার করে ওঠে—উমাকে সম্বোধন করে বলে ওঠেন—

"আমার প্রাণ উমা
আজ কি যাবি গো কৈলাসপুরে,
আজ কি মা যাবি ছেড়ে হিমালয়
শূন্য করে।"
[* *]

আর কোন উপায় না দেখে শেষ পর্যন্ত মাতৃ-হৃদয়ের আকুল মন বলে ওঠে—

"রজনী জননী, তুমি পোহায়ো না—
ধরি পায়,
তুমি না সদয় হ'লে উমা মোরে
ছেড়ে যাবে।"
[* *]

আবার—
"তাই করি প্রার্থনা, করি জোড় হাত,
যেন এ যামিনী আর না হয় প্রভাত—
আর যেন উদয় হয় না দিন-নাথ,
এই ভিক্ষা চরণে।"
[* *]

মনে পড়ে যায়—
প্রকৃতিরাণী রজনীকে সম্বোধন করে—বাঙলার আর এক মরমী কবি বলেছেন—
"যেয়ো না, রজনী আজি লয়ে তারাদলে
গেলে তুমি, দয়াময়ি এ পরাণ যাবে,
উদিলে নির্দয় রবি উদয় অচলে,
নয়নের মণি মোর নয়ন হারাবে।"
(মধুসূদন)

কিন্তু মাতার এত কাতর প্রার্থনা ও মিনতি সত্ত্বেও নবমীর নিশি প্রভাত হয় ও সেই দশমী তিথিতেই প্রাণের দুলালী উমাকে বিদায় দিতে হয়।

সমস্ত রাত্রি কন্যা উমার বিনিদ্র অবস্থায় কেটেছে—ভোরের দিকে হয়তো একটু তন্দ্রা-ভাব এসেছে—

মা ভাবেন—বেচারী উমারও মন, মা-বাপকে ছেড়ে যেতে চায় না। তিনি জানেন—মেয়ে [illegible] আবার কৈলাসের পথে পাড়ি দেবে [illegible]।

তাই—
"জাগায়ো না হর-জায়ায়, জয়া
তোমায় বিনয় করি।
যাবে বলে সারানিশি কাঁদিয়া—
পোহালো গৌরী॥"
[* *]

কিন্তু সাধকের কথামত্যায়ী—উমাকে না জাগিয়ে—কৈলাসে পাঠান বন্ধ করতে চাইলেও—এই ভুবনে চিরদিন কি মাকে ধরে রাখা যায়?—

এবার মেনকা আর একটা পথ আবিষ্কার করলেন—উমাকে ধরে রাখার জন্যে—শিব কৈলাস থেকে নেমে এলে আর তাকেও ফিরে যেতে দেবো না—তাকে আমি ঘর-জামাই করে রেখে দেবো।

কিন্তু সব চেষ্টাই তাঁর ব্যথা হয়—

তাই প্রত্যেক বৎসরই শরৎ ঋতুতে উমা, গৌরী বা পার্বতী অর্থাৎ বিভিন্ন নামের সেই মা-দুর্গার আগমন ও প্রত্যাবর্তন হয়ে থাকে। আজও বাঙলার গৃহস্থবধূরা বরণ-ডালা সাজিয়ে আগমনীর বরণ করেন ও বিজয়াদশমীতে বিদায় দিয়ে থাকেন।

বাঙলার গার্হস্থ্য জীবন-চিত্রের ছায়া অবলম্বনে রচিত ঐ গানগুলির প্রভাব আজও একই ভাবধারা নিয়ে অক্ষুণ্ন হয়ে রয়েছে।

[* *] এইরূপ চিহ্নিত কবিতাগুলির রচয়িতাদের নাম না জানা থাকায় লেখক তার উল্লেখ করতে না পেরে আন্তরিক দুঃখিত!

পাঠকের বৈঠক

প্রতিভা ও পরিবেশ (২)

মনস্তত্ত্ববিদ অ্যানী রো লেখাপড়ার দিকে বিশেষ জোর দেওয়ার ফলে যে সব প্রতিভার বিকাশ সম্ভব হয়েছে তার একটি সমীক্ষা করে রিপোর্ট প্রকাশ করেছেন। তাতে দেখা যায় যে, তিনি যুক্তরাষ্ট্রের চৌষট্টিজন উল্লেখযোগ্য শারীরিক, সামাজিক এবং জীব-তাত্ত্বিক বিজ্ঞানীদের পরীক্ষা করেছেন এবং সাক্ষাৎকার করে বিভিন্ন প্রশ্নের উত্তর সংগ্রহ করেছেন। এই সব সাক্ষাৎকারের মধ্যে এমন সব ব্যক্তিগত এবং অন্তরঙ্গ প্রসঙ্গ আছে যে তা উল্লেখ করা সম্ভব নয়, অন্তত এই কালের মানুষের কাছে। যে আংশিক রিপোর্ট প্রকাশিত হয়েছে তাতে এই চৌষট্টিজন মনীষীর নামোল্লেখ করা হয় নি, কিন্তু দেখা গেছে এই সব স্বল্প আয়বিশিষ্ট মধ্য-বিত্ত এবং অল্পআয়ের মানুষের সমাজেও লেখাপড়া শেখানোর ব্যাপারটিকে বিশেষ গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে।

লেখকদ্বয় যে চারশটি নর-নারীর জীবন সমীক্ষা করেছেন তার সঙ্গে অ্যানী রোর সমীক্ষার সাদৃশ্য আছে। তাঁর সমীক্ষার

সংসারে ছেলে-মেয়েদের অনেকের পড়াশোনা বাড়ীতেই শুরু হয়েছে। একজন জগৎ-বিখ্যাত মনস্তাত্ত্বিক কিনডারগার্টেনে পড়ার সময় প্রচণ্ড উৎপীড়িতবোধ করেছেন। এক-জন বিজ্ঞানীর জননী সর্বদাই তাঁকে পড়ার জন্য পিছনে লেগে থাকতেন। একজন পদার্থ-বিদ ক্যাকোলাটির প্রতি দুর্গন্ধযুক্ত বোমা নিক্ষেপের দলের পুরোধা ছিলেন। একটি ছেলে খুব বেশী খেত, কারণ, তার আর চিত্তবিনোদনের আর কোন পথ ছিল না। উত্তরকালে যে বিশেষ কর্মে তাঁরা নিযুক্ত হয়েছেন সেইটেই তাঁদের একমাত্র চিত্ত-বিনোদক কর্মে পরিণত হয়েছে। এই সব ছাত্র-ছাত্রী কোনরকমে বৃত্তি লাভ করেন, ভাল ছাত্রের তালিকায় তাঁদের নাম ছিল না। আর একজন এই জাতীয় সমীক্ষা দ্বারা জেনেছেন যে, প্রতি বছর যে সমস্ত ছাত্র কৃতিত্বের পরিচয় দেন তাঁদের অর্ধেক আসেন এমন সব পরিবার থেকে যেখানে পড়াশোনার কোন বালাই নেই।

বিখ্যাত লেখিকা ভার্জিনিয়া উলফের পিতৃদেব লেসলী স্টীফেন ছিলেন পদব্রজে ভ্রমণের একজন চ্যাম্পিয়ান। দীর্ঘ পথ পায়ে হেঁটে অতিক্রম করার ব্যাপারে তাঁর ছিল অসামান্য উৎসাহ। তিনিই সর্বপ্রথম স্রেকহর্ণ আরোহণ করেন। আবার তিনিই "ডিকসনারী অব ন্যাশন্যাল বায়োগ্রাফী"র সম্পাদনা ব্যাপারে এমন খেটেছেন যে, শেষ পর্যন্ত অবসন্ন এবং অসুস্থ হয়ে পড়েছেন।

কাপ্তেন সামুয়েল এডিসন জুনিয়র ছিলেন ছ' ফুট এক ইঞ্চি লম্বা। তিনি

ওয়েন্ডেল উইলকি যুক্তরাষ্ট্রের সভাপতি-পদের একজন প্রতিযোগী ছিলেন। এবং মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের আর কোন পরাজিত সভাপতি এত খ্যাতির অধিকারী হতে পারেন নি। উইলকির "ওয়ান ওয়ার্ল্ড" পৃথিবীর একখানি শ্রেষ্ঠ গ্রন্থ হিসাবে স্বীকৃতি লাভ করেছে। এই উইলকি পরিবার একটি আদর্শ দৃষ্টান্ত। এ পরিবারের উৎসাহ, উদ্যম, প্রাণশক্তি, দৈহিক শক্তি, পুঁথিগত এবং বহির্জাগতিক শিক্ষাদীক্ষা তুলনা-বিহীন। তবে, পিতার চেয়ে জননীর উদ্যমই ছিল সর্বাধিক। উইলকির পিতৃদেব ছিলেন সংস্কারপন্থী সংগ্রামী পুরুষ, আর তাঁর জননী ইন্ডিয়ানা স্টেটের সর্বপ্রথম মহিলা আইনব্যবসায়ী হেনরিয়েটা ছিলেন বিশালকৃতির রমণী, প্রতিদিন আদালতে গিয়ে পুরুষের কর্তব্য সেরে বাড়ী ফিরে চিনেমাটির বাসন চিত্রিত করতেন, এবং পিয়ানো বাজাতেন। রাতে সবাই একত্র বসতেন। পিতা ডিকেন্স, স্টিভেনসন, জর্জ এলিয়ট প্রভৃতি পড়ে শোনাতেন। ছেলেরা একে একে ঘুমিয়ে পড়লে হারমান উইলকি এক একজন করে নিয়ে গিয়ে বিছানায় শুইয়ে দিতেন এবং শেষ সন্তানটি না ঘুমানো পর্যন্ত ফিরে ফিরে এসে পাঠ শোনাতেন।

ঠিক ঐ একই সময়ে ইংলন্ডের একজন বালক, যিনি পরে প্রধানমন্ত্রী হয়েছিলেন, সেই ক্লিমেন্ট এটলি ঘুমানোর সময় আর এক ধারা পালন করতেন। এটলি পরিবারে

তাঁর এলাকায় সবাইকে লাফানোর প্রতি-যোগিতায় পরাজিত করতেন, তারপর প্রাণ-ভয়ে তাঁকে কানাডা থেকে পালিয়ে আসতে হয় যুক্তরাষ্ট্রে। ম্যাকেঞ্জি অভ্যুত্থানের দায়ে তিনি ধরা পড়লে আর পুত্র টমাস এডি-সনের প্রতিভার স্বীকৃতি প্রত্যক্ষ করতে পারতেন না। টমাস এডিসনের শারীরিক দৃঢ়তার ফলে তিনি সারা দিন-রাতে মাত্র পাঁচ ঘণ্টা ঘুমাতেন। লিওনার্ড জেরোম ছিলেন উইনস্টন চার্চিলের মাতামহ। তিনি ছিলেন বিশেষ সক্রিয় ধরনের পুরুষ, এক-জন জুয়াড়ী আবার সংবাদপত্র সম্পাদক। তাঁর কন্যা চার্চিল-জননীও ছিলের পিতার মত অতিশয় উৎসাহী। কেউ কেউ বলতেন তাঁর দেহে একের আট আংশিক রেড ইন্ডিয়ান রক্ত আছে, সেই কারণেই এত উৎসাহ।

ছেলের বিদ্যালয়ের সাফল্যের প্রতি লক্ষ্য রাখা হত। রাতে খাওয়ার সময় জনক-জননীর সঙ্গে বাড়ীর জ্যেষ্ঠ সন্তানের সারাদিনের ঘটনাবলী আলোচনা হত। পিতামাতা নতুন গভর্নেসটিকে সদয়ভাবে দেখার জন্য ছেলে-মেয়েদের নির্দেশ দিতেন। এর আগে উইনস্টন চার্চিলের গভর্নেস হিসাবে তাঁকে বেশ বেগ পেতে হয়েছিল। ক্লেম (ক্লিমেন্টের সংক্ষিপ্ত নাম) ছিলেন বিশেষ মেজাজী বালক, একবারে ছোটছেলে। জননী তাঁকে সেজন্য শাসন করতেন। তাই জননীকে আসতে দেখলেই তিনি বালিশে মাথা গুঁজে বলতেন—ক্লেম পেনটিং (রিপেন্টিং) অনুশোচনা করছে ক্লেম। সেই ছোটবয়সে তাঁকে পড়তে দেওয়া হত "হাউ টু গভর্ণ ইংলন্ড", "হাউ টু ব্রিং আপ ফ্যামিলি অন এ ফিকসড ইনকাম এ ইয়ার" ইত্যাদি।

নিকিতা ক্রুশ্চেভের বাবার কাছে পড়া-শোনা করার কোন মূল্য ছিল না। তিনি অনেক বয়সে এক আত্মীয়বাড়ি আশ্রয় পান। সেখানে লেখাপড়ার সবিশেষ চর্চা ছিল এবং তাঁদের পরিবারস্থ সকলেই বিপ্লবী। কিশোর ক্রুশ্চেভের শিক্ষা ও রাজনৈতিক চেতনা এইখানে।

এইসব দৃষ্টান্ত থেকে বোঝা যায়, যে পরিবারে শিশুর শৈশব কাটে তার ওপর অনেকখানি নির্ভর করে তার ভবিষ্যৎ জীবন। জ্ঞানভিক্ষু মানুষের জ্ঞানের অভিলাষ জীবনের শেষদিন পর্যন্ত অক্ষুণ্ণ থাকে। লেখকদ্বয়ের হিসাবে যে চারশত পরিবারের সমীক্ষা করা হয়েছে তাদের মধ্যে শতকরা নব্বুই ভাগ পরিবারে লেখাপড়ার আদর বেশী।

আর এক শ্রেণীর জনক-জননী আছেন, যাঁদের নিজস্ব মতামতটুকুই প্রবল। এই শ্রেণীর পিতা-মাতাকে লেখকদ্বয় বলেছেন, "ওপিনিয়নেটিভ পেরেনটস"। পার্ল বাকের জনক-জননী ছিলেন এই শ্রেণীর। সাংহাই শহরে সতেরো বছর বয়সে মিস জুয়েলের স্কুলে ভর্তি হওয়ার আগে পর্যন্ত সমস্ত শিক্ষাদীক্ষা হয় তাঁর বাড়ি বসে। খাবার টেবিলে বসে তিনি মেয়েকে পড়াতেন।

অনেক শিশুসন্তান পিতা বা মাতা বা পূর্বপুরুষদের মনোভঙ্গী গ্রহণ করে সেই মঞ্চ থেকে খ্যাতির শিখরে উঠে থাকেন। চার্লস ডারউইনের পিতামহ বিবর্তনবাদ সম্পর্কে একটি কবিতা লিখে গিয়েছেন। তিনি তাই সর্বতোভাবে তাঁর পূর্বসূরী।

যে সব শিশু পিতা-মাতার বিরুদ্ধে বিদ্রোহী হয় তাদের সংখ্যা তেমন বেশী

নয়, এবং বিদ্রোহও দীর্ঘস্থায়ী হয় না। জুল ভার্ন এগারো বছর বয়সে কেবিনবয়ের চাকরী নিয়ে বাড়ি থেকে পালিয়েছিলেন। কিন্তু যখন তাঁর কবি ও কল্পনাবিলাসী আইনজীবী পিতা তাঁকে বাড়ী ফিরিয়ে নিয়ে এলেন এবং দেখা গেল যে তাঁর স্নেহময়ী জননী শোকে আকুল হয়ে পড়েছেন তখন তিনি অনেকখানি স্বস্তি পেলেন। স্কুল সম্পর্কে তাঁর বিদ্বেষ ছিল। তিনি পড়ার বইয়ের প্রতিটি পৃষ্ঠায় জাহাজের ও উড়োজাহাজের ছবি আঁকতেন।

হ্যারলড লাস্‌কী ছিলেন এক গোঁড়া ইহুদী পরিবারের সন্তান। আঠারো বছর বয়সে একটি সাংস্কৃতিক সম্মেলন থেকে ফিরে এলেন আটাশ বছর বয়সের স্ত্রীকে সঙ্গে নিয়ে। বিদুষী এবং রাজনীতিতে বিশেষ আগ্রহ তাঁর। তিনি বিপ্লবী হলেও অতিশয় নম্রপ্রকৃতির। তৎক্ষণাৎ স্বামী-স্ত্রীকে বিচ্ছিন্ন করে হ্যারলডকে কলেজে পাঠিয়ে দেওয়া হল। বধূ চলে গেলেন স্কটল্যান্ডে হ্যারলডের বিদ্যাশেষ পর্যন্ত অপেক্ষা করার জন্য। হ্যারলড যখন স্নাতক হলেন তখন বউকে ঘরে আনা হল। আর নাতী ভূমিষ্ঠ হওয়ার পর বাবা-মা ঠান্ডা হলেন। পুত্র যখন সুপরিচিত হয়ে উঠলেন এবং যখন স্পষ্ট দেখা গেল যে, স্ত্রীর প্রভাবেই এসব সম্ভব হল, তখন হ্যারলডের স্ত্রীর প্রতি তাঁর শ্বশুর-শাশুড়ির যে বিদ্বেষ ভাব গড়ে উঠেছিল তার অবসান ঘটল।

লেখকদ্বয় বলেছেন যে বার্নাড শ এক জায়গায় বলেছেন, যেসব ছেলে "মাতৃবুদ্ধিসম্পন্ন", তাঁরা একটু সংকীর্ণমনা হয়, যারা "পিতৃবুদ্ধিসম্পন্ন" তাঁরা অনেক উদার হন, একথা অনেক ক্ষেত্রে সত্য বলে প্রমাণিত হয়েছে। মাতৃবুদ্ধিসম্পন্ন সন্তানরা প্রায় আর্ট প্রেমিক আর পিতৃবুদ্ধিসম্পন্ন সন্তানরা হন সামাজিক বিদ্রোহী, সংস্কারপন্থী দার্শনিক, বিপ্লবী ইত্যাদি।

আগামীবারে আর কয়েকটি উল্লেখযোগ্য জীবনের আলোচনা করে এই প্রসঙ্গ শেষ করব।

—অভয়ঙ্কর

একজন বিতর্কিত মারাঠি কবি ॥

সমকালীন মারাঠি কাব্যসাহিত্যে পুরুষোত্তম শিবরাম রেগে একটি বিতর্কিত নাম। দীর্ঘ ত্রিশ বছর ধরে তিনি মারাঠি সাহিত্যকে সমৃদ্ধ করেছেন। তাঁর সমসাময়িক কবি মারঢেকার ১৯৫৬ সালে পরলোকগমন করার পর, বোধ করি তিনিই মারাঠি কাব্যসাহিত্যের পরীক্ষা-নিরীক্ষার ক্ষেত্রকে প্রসারিত করেছেন। এ পর্যন্ত তাঁর সাতটি কবিতাগ্রন্থ প্রকাশিত হয়েছে। সম্প্রতি প্রকাশিত গ্রন্থের নাম "দুসরা পাক্‌সি"। এই গ্রন্থে ১৯৬০ সালের পর রচিত তাঁর কবিতা সংকলিত হয়েছে।

যে বিশেষ গুণটি রেগেকে তাঁর সমকালীন কবিদের থেকে স্বতন্ত্র করেছে, তা হল তাঁর ক্লাসিক বৈশিষ্ট্য। প্রকৃতপক্ষে এর জন্য উনিশ শতকের পরবর্তী মারাঠি কবিদের মধ্যেও তিনি স্বাতন্ত্র্য অর্জন করেছেন। যখন অধিকাংশ কবি প্রতীচ্য কাব্য আন্দোলনের দ্বারা প্রভাবিত হয়ে পড়েছেন, তখনও রেগে ভারতীয় ঐতিহ্যের প্রতি আনুগত্য প্রকাশ করে আধুনিক মুক্তিবাদের প্রতি সমর্থন জানিয়েছেন। 'দুসরা পাক্‌সি' নামক কবিতাটি তার প্রকৃষ্ট প্রমাণ। পাঠকের সুবিধার্থে তাঁর এই কবিতাটির আংশিক অনুবাদ এখানে উল্লেখ করা যাচ্ছে—

গাছের উপরে পাখিরা যে গান গাইছে,
সে গান জানায় আরেক গানের বার্তা,
গাছে উপরে পাখিরা যে গান গাইছে।

যে গান গাইছে পাখিরা গাছের উপরে,
সে গান জানায় অন্য পাখির বার্তা,
যে গান গাইছে পাখিরা গাছের উপরে।

এই ধরনের আরো অনেক মিস্টিক-চেতনার কবিতা তাঁর কাব্য সাধনার প্রধান অবলম্বন। এই সব কবিতা অনেক সময়েই তুকারামের কথা মনে করিয়ে দেয়। কিন্তু তুকারাম যেখানে ভগবৎ সাধনায় বিভোর, সেখানে রেগের কবিতা যুক্তিপ্রধান হয়ে উঠেছে। রেগের কবিতা এত গীতিপ্রধান যে তাকে ভাষান্তরিত করা খুবই কঠিন। তাছাড়া যে ধরনের সংকেতের চিত্র তিনি অঙ্কন করেছেন, তা-ও অনুবাদযোগ্য নয় বলে অনেকের ধারণা।

আসামী সাহিত্যের ইতিহাস ॥

'অসমিয়া সাহিত্য' নামে শ্রীহেম বড়ুয়ার একটি সমালোচনাগ্রন্থ সম্প্রতি প্রকাশিত হয়েছে। প্রকাশ করেছেন দিল্লির 'বুক ট্রাস্ট অব ইন্ডিয়া'। এই গ্রন্থে প্রাচীনকাল থেকে আজ পর্যন্ত আসামী সাহিত্যের ক্রমবিকাশের ইতিহাস লিপিবদ্ধ হয়েছে। 'প্রাচীন আসামী সাহিত্য' ও 'আধুনিক আসামী সাহিত্য'—এই দুই ভাগে গ্রন্থটি বিভক্ত। আসামী সাহিত্যে অনুরাগী পাঠকদের কাছে গ্রন্থটি অপরিহার্য।

বিদেশে ভারতীয় সাহিত্য ॥

ভারতের বাইরে ভারতীয় সাহিত্যের কদর ক্রমশ বৃদ্ধি পাচ্ছে। ভারতীয় কবিতা ও গল্পের উপর বিভিন্ন সংকলন ও পত্র-পত্রিকার বিশেষ সংখ্যা প্রকাশিত হচ্ছে। সম্প্রতি পশ্চিম জার্মানী থেকেও ভারতীয় কবিতা সংকলন প্রকাশেরও একটি আয়োজন চলছে। এই ব্যাপারে প্রধান উদ্যোক্তা হলেন শ্রীকার্ল ভাইসনার। তিনি হলেন "ক্যাক্‌টো" পত্রিকার সম্পাদক। এই পত্রিকাটি একদল তরুণতর লেখকের মুখপত্র। শ্রীভাইসনার এই সংকলন গ্রন্থটি এবং পত্রিকার একটি বিশেষ সংখ্যা প্রকাশের জন্য কয়েকজন ভারতীয় লেখকের কাছে একটি আবেদন পত্র পাঠিয়েছেন। এই আবেদন পত্রে তিনি বলেছেন—"কিছুদিন যাবৎ-ই আমি ভারতীয় কবি, সম্পাদকদের সঙ্গে ভারতীয় তরুণতর কবিদের কবিতার একটি সংকলন গ্রন্থ প্রকাশ করবার জন্য যোগাযোগ করে আসছি।" বাংলা সাহিত্যের সঙ্গে তাঁর যা কিছু সামান্য পরিচয় স্থাপিত হয়েছে। অন্যসব ভারতীয় সাহিত্যের সাম্প্রতিক গতিপ্রকৃতির সঙ্গে তাঁর কোনো পরিচয়ই নেই। তাই সকল তরুণ ভারতীয় কবিকে তাঁর সঙ্গে সহযোগিতার জন্য তিনি আবেদন জানিয়েছেন।

যোধপুরে পাঠ্যপুস্তকের জন্য বিক্ষোভ ॥

সরকারী প্রকাশিত পুস্তকের অভাবে যোধপুরে ছাত্র শিক্ষক ও অভিভাবকদের মধ্যে তুমুল বিক্ষোভের সৃষ্টি হয়েছে। সরকার কর্তৃক প্রকাশিত ৪৬টি গ্রন্থের মধ্যে বাজারে মাত্র নয়টি গ্রন্থ পাওয়া যাচ্ছে। এ ছাড়াও বাজারে এই নয়টি গ্রন্থের মধ্যেও ২।১টির ভীষণ অভাব। সরকারের পাঠ্যপুস্তক প্রকাশন সংস্থা কর্তৃপক্ষের এই গাফলতির প্রতি জনসাধারণের বিক্ষোভ ক্রমশ জোরদার হচ্ছে। এ বিষয়ে স্মরণ করা যেতে পারে, এর আগে এঁদের প্রকাশিত একটি মানচিত্র নিয়ে যে বিপুল বিতর্কের সূত্রপাত হয়েছিল, তা বন্ধ করে দেবার জন্য শেষ পর্যন্ত কেন্দ্রীয় সরকারের হস্তক্ষেপ অনিবার্য হয়ে উঠেছিল।

'উল্কা' কবিতা পুরস্কার ॥

মূল ইংরেজী ভাষায় রচিত তরুণ ভারতীয় কবিদের প্রকাশিত বছরে শ্রেষ্ঠ কাব্যগ্রন্থের জন্য উল্কা পুরস্কার দেওয়া হয়। এ বছর এই পুরস্কার পেয়েছেন শ্রীপার্থসারথি। এ ছাড়াও শ্রীরুধি জন ন্যাডেল কর্তৃক একটি বিশেষ পুরস্কারে শ্রীগাইভ প্যাটেলকে পুরস্কৃত করা হয়।
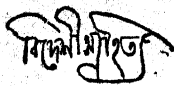
জার্মানীর পুস্তক ব্যবসা ॥

গত বছর পশ্চিম জার্মানী পৃথিবীর ১২১টি দেশে বই রপ্তানি করেছে। এবং আমদানি করেছে পৃথিবীর ৪৪টি দেশ থেকে।

এইভাবে আদান প্রদানের মাধ্যমে জার্মানীর ভাষা সাহিত্যেরও বিস্তার লাভ ঘটেছে। সুইজারল্যান্ডে ব্যবসা-সূত্রে বই এবং প্রকাশনী সম্পর্কিত অন্যান্য জিনিস-পত্র মিলে মোট বিক্রয় ৪০,০০০,০০০ শিলিং। এবং অস্ট্রিয়ার ২৮'০০০,০০০ শিলিং। এই দুই দেশের মিলিত সংখ্যা পশ্চিম জার্মানীর পুস্তক ব্যবসার মোট উৎপাদনের অর্ধেক। আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্র এবং নেদারল্যান্ড এই অনুসারে তৃতীয় এবং চতুর্থ স্থানের অধিকারী। আমেরিকায় ১৩,০০০,০০০ শিলিং এবং নেদারল্যান্ডে ১১,০০০,০০০ শিলিং। এ ছাড়া পূর্ব ইউরোপ, চেকোশ্লোভাকিয়ার সঙ্গে কেবল পুস্তক বিনিময় চলে।

১৯৬৬ সালে পশ্চিম জার্মানীতে বই, সংবাদপত্র, সাহিত্যপত্রিকা, ছবির বই ইত্যাদির রপ্তানি থেকে মোট ৯৫ কোটি টাকা লাভ হয়েছে। এর আগের বছরের তুলনায় শতকরা ১২ বেশী। আমদানীতেও শতকরা ১৫ বেড়েছে। গত ছয় বছরের তুলনায় এই পরিসংখ্যান দীর্ঘতর। তার অঙ্কের পরিমাণ ছিল ৩৩,৫০০,০০০ শিলিং।

দুই তরুণের উপন্যাস ॥

এক্সেল জেনসেন এবং গর্ডন রেইড্ এঁরা দুজনেই ইংরেজি উপন্যাস রচনায় নবাগত। কিন্তু ক্ষমতাবান। জেনসেনের অবশ্য এর আগে আরেকটি বই বেরিয়েছে কিন্তু রেইড-এর উপন্যাসটি তাঁর জীবনের সর্বপ্রথম রচনা।

জেনসেনের যে বইটি সম্প্রতি বেরিয়েছে সেটির নাম : 'এপ্'। এ বইটিতে জেনসেন বিজ্ঞানের ভবিষ্যত ও উন্নতিকামী সভ্যতার পক্ষে বিপক্ষে বেশ কৌতুকপ্রদ একটি কাহিনী-বস্তু রচনা করেছেন তার নায়ক-চরিত্রের মাধ্যমে। একজন বৃদ্ধ গ্রোটেস্ক চরিত্র আলোচ্য উপন্যাসটির নিয়ন্তা। প্রতিবেশীর দরজায় উঁকিমারা, নিজেকে বিখ্যাত করার জন্য প্রাচীরপত্র লাগালেন, বেনামীতে আত্মস্তুতির চিঠি পাঠানো ইত্যাদির মাধ্যমে তার সারাটা দিন কাটে।

গর্ডন রেইডের উপন্যাসটির নাম : 'এগেনস্ট দি গ্রেন'। প্রথম উপন্যাস হলেও রচনায় মুন্সিয়ানা আছে। এবং মৌলিকত্বও। একজন মানুষের একটি দুঃখ আগ্রহের, পরিবেশের অনুসন্ধানই আলোচ্য বইটির প্রতিপাদ্য। কখনো শৈশবের জন্মভূমিতে প্রস্থান, বৃদ্ধ পিতামহের কাছে দিনযাপন ইত্যাকার সূক্ষ্ম অভিব্যক্তির মাধ্যমে লেখক চরিত্রটির বিশ্লেষণ করেছেন। মনস্তাত্ত্বিক বিশ্লেষণ উপন্যাসটিতে গভীর আবর্ত সৃষ্টি করতে সম্ভব হয়েছে।

তরুণ কবির কাব্যগ্রন্থ ॥

উইলিয়াম এইচ অ্যালেনের নাম অনেকেরই না শোনার কথা। এই জন্যে যে আলোচ্য তরুণ কবি সাহিত্যজগতে প্রবেশ করেছেন প্রথমেই একটি কাব্যগ্রন্থ নিয়ে। পত্র-পত্রিকায় কবিতা লিখে তারপর কাব্যগ্রন্থ প্রকাশের যে স্বাভাবিক পরিণতি, অ্যালেনের ক্ষেত্রে তা হয় নি। তাই, কি স্বদেশে এবং বিদেশে এই অতিতরুণের কবিতার সঙ্গে কারোই তেমন পরিচয় লাভের সুযোগ ঘটেনি। তবে কাব্যগ্রন্থটির অন্তর্গত কবিতাগুলির গুণেই অ্যালেন পাঠকের প্রিয়পাত্র হতে পেরেছেন। বইটির নাম হলো : 'মাই অ্যাকোয়েন্টেন্সেস্ উইথ'।

অনতিদীর্ঘ এই বইটিতে অ্যালেন মোট ছাব্বিশটি কবিতা সংযোজন করেছেন। তার মধ্যে একটি দীর্ঘ কবিতাও আছে। কবিতাগুলি অধিকাংশক্ষেত্রেই প্রেমের কবিতা। কখনো কখনো নিসর্গ বর্ণনার মধ্যে অথবা অস্তিত্বের সঙ্গে সংযোগের আকাঙ্ক্ষা আছে। 'মাই অ্যাকোয়েন্টেন্সেস উইথ', 'ডাউন অ্যান্ড্ টাউন', 'আর্টিক আর্থ' প্রভৃতি কবিতা নিপুণ হাতের রচনা। সমালোচনা প্রসঙ্গে একটি প্রখ্যাত সমালোচনা সাপ্তাহিকে বলা হয়েছে,...... 'অ্যালেন কাব্যজগতে নতুন প্রতিভা, একটি উজ্জ্বল নক্ষত্র।'

আফ্রিকায় *PEN*-এর লেখক সম্মেলন ॥

আফ্রিকার আইভরি কোস্টের আবিদ্‌জান অঞ্চলে সম্প্রতি PEN এর পঞ্চত্রিংশ কংগ্রেসের অধিবেশনে একটি আন্তর্জাতিক লেখক সম্মেলন হয়ে গেল। এতে ইউরোপ, এশিয়া, আমেরিকা ও আফ্রিকার ৩৩টি দেশের মোট ২০০ জন লেখক যোগ দিয়েছিলেন। এঁদের মধ্যে কবি, ঔপন্যাসিক, সমালোচক প্রভৃতি ছিলেন। আফ্রিকার সাহিত্য ও ভাষা সম্পর্কিত সমস্যার আলোচনাই উক্ত অধিবেশনের লক্ষ্য ছিল। বিশেষত, আফ্রিকার পৌরাণিক কাহিনীগুলি ও তা উদ্ধারের কাজ সম্পর্কে কয়েকটি প্রস্তাবও নেওয়া হয় আলোচ্য সভায়।

আফ্রিকান সাহিত্যের অনুবাদের ঔচিত্য সম্পর্কেও সভায় আলোচনা চলে। আফ্রিকান সাহিত্যের প্রখ্যাত অনুবাদক জানহেজ্ জাঁ বলেন আজ পৃথিবীর অনেক দেশেই আফ্রিকান সাহিত্য জনপ্রিয় হয়ে উঠেছে। সেই সঙ্গে অনুবাদকর্মের চাহিদাও বেড়েছে। বিদেশী ভাষায় আফ্রিকান কবিতা এবং গল্পের সংকলন প্রকাশের গুরুত্ব দেখা দিয়েছে।

সম্মেলনে আন্তর্জাতিক PEN শাখার সভ্যেরা সভায় ভিয়েৎনাম যুদ্ধের আশু সমাধান ও শান্তির জন্য আবেদন জানিয়েছেন। উপস্থিত লেখক, চিন্তাবিদ ও প্রতিনিধিরা এই প্রস্তাবপত্রে স্বাক্ষর করেন।

মার্কিন নাট্যকার আর্থার মিলার আন্তর্জাতিক PEN-এর সভাপতির পদে পুনরায় নির্বাচিত হন। আগামী বছর এই সংস্থার অধিবেশন বসবে ভারতের ব্যাঙ্গালোরে।

দীনবন্ধু রচনাবলী

বাঙালীর প্রিয় নাট্যকার দীনবন্ধু মিত্র। তাঁর অনন্যসাধারণ নাটক 'নীল-দর্পণ' বাংলা দেশে তুমুল আলোড়ন সৃষ্টি করে। এই নাটকটি প্রচার ও অভিনয় ইংরেজ রাষ্ট্রশক্তি নিষিদ্ধ করে দিয়েছিল। শোনা যায় এর ইংরেজি অনুবাদ করেছিলেন মধুসূদন দত্ত। নীল-দর্পণ দীনবন্ধুর শ্রেষ্ঠ কীর্তি হলেও, তাঁর অন্যান্য নাটকও বাংলা নাট্যসাহিত্য ও রঙ্গমঞ্চের ইতিহাসকে সমৃদ্ধ হওয়ার পথে এগিয়ে নিয়ে গেছে। তাঁর কাছে বাঙালীর ঋণ অপরিশোধ্য। পরবর্তীকালে দীনবন্ধুকে উদ্দেশ্য করে সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত লিখেছিলেন—

তুমি ছিলে নাট্যকার হে বরেণ্য! ছিলে নাক নট,
করতালি—মাধুকরী তুমি কভু করনি জীবনে;
সমাজ-শোধন-ব্রতে ব্রতী যারা ছিল কায়-মনে—
নব্য বঙ্গে যারা যারা গুরু—
স্থাপিয়াছে সুমঙ্গলঘট—
তাদের চরিত্র লয়ে তুমি ব্যঙ্গ করনি বিকট
বীভৎস-কুৎসিত ভাবে।
হে রসিক! তব আলাপনে
কভু নহে পুণ্য-ধারা; রোধ' নাই কণ্টক-রোপণে
উন্নতির পন্থা কভু। দেশবন্ধু তুমি নিষ্কপট।

—দীনবন্ধুর সমগ্র রচনার পূর্ণাঙ্গ সংস্করণ এতকাল প্রকাশিত হয়নি। সম্প্রতি

নাট্যকার দীনবন্ধু মিত্র

সাহিত্য সংসদ রবীন্দ্রভারতী বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক শ্রীক্ষেত্র গুপ্তের সম্পাদনায় 'দীনবন্ধু রচনাবলী' প্রকাশ করেছেন। দীনবন্ধুর সমগ্র রচনা, জীবন ও সাহিত্যসাধনা প্রভৃতি সংবলিত এবং সুমুদ্রিত সুসম্পাদিত গ্রন্থখানি নিঃসন্দেহে সমাদৃত হবে। সম্পাদক অনেক নতুন তথ্য ও তত্ত্ব উপস্থিত করে তাঁর বক্তব্যকে করেছেন যথেষ্ট যুক্তিনির্ভর। 'সাহিত্য-সাধনা' আলোচনাটিতে শ্রীগুপ্তের পাণ্ডিত্য ও চিন্তাশীল মনের পরিচয় সুস্পষ্ট। দীনবন্ধু সম্পর্কে এত গভীর ও বিস্তৃত আলোচনা ইতিপূর্বে হয়নি।

দীনবন্ধুর সমগ্র রচনা এই রচনাবলীতে স্থান পেয়েছে। নাটক ও প্রহসনের মধ্যে আছে 'নীলদর্পণ', নবীন তপস্বিনী', 'বিয়ে পাগলা বুড়ো', 'সধবার একাদশী', 'লীলাবতী', 'জামাই বারিক', 'কমলে কামিনী নাটক' ও কুড়ে গরুর ভিন্ন গোঠ' গল্প ও উপন্যাস 'যমালয়ে জীবন্ত মানুষ' ও 'পোড়া মহেশ্বর', কাব্য কবিতায় আছে 'সুরধুনী কাব্য', 'দ্বাদশ কবিতা' ও 'নানা কবিতা'।

শ্রীক্ষেত্র গুপ্ত লিখিত দীনবন্ধু জীবনী ও সাহিত্যসাধনা বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। দীনবন্ধুর আগে বাংলা নাটক ছিল নিতান্তই শৈশবাবস্থায়। সুনির্দিষ্ট পথরেখায় তা প্রবাহিত হয়নি। শ্রীগুপ্ত লিখছেন—"বিষয় চয়নে দীনবন্ধুর সাহস নীলদর্পণে প্রকাশ পেয়েছে। একেবারে নূতন বিষয়। দীর্ঘদিন পর্যন্ত বাংলা সাহিত্যে এর দ্বিতীয় মেলেনি। কিন্তু আর নয়। পরবর্তীকালে তিনি তিনটি প্রহসন লিখেছেন। এবং বাংলা সাহিত্যে প্রহসনের অভাব ছিল না। গুণের উৎকর্ষ দীনবন্ধুতে থাকতে পারে, কিন্তু কোনো নব্য শাখার উদ্ভাবনা নেই। একটি শিরিয়স সামাজিক নাটক, মিলনান্ত এবং অতিরিক্ত আছে প্রচুর হাস্যের সাহচর্য। দুটি অতীতাশ্রয়ী কাল্পনিক নাটক। এ দুটিও মিলন-পরিণতির নাটক। পৌরাণিক নাটক তিনি লিখতে চাননি, ইতিহাস-চিহ্নিত অতীতের দিকে আকৃষ্ট হননি। দুটি নাটকে অতীত পরিক্রমা থাকলেও তিনি বর্তমান জীবনের ভাষ্যকার। নূতন নূতন সম্ভাবনার দ্বারোদ্ঘাটনের শক্তি তাঁর নেই, সাধনাও। সমকালে মধুসূদন বাংলা নাটকে নানা নূতন পথ খুঁজেছেন। টডকে অবলম্বন করে ঐতিহাসিক ট্র্যাজেডি, গ্রীক বিষয় নিয়ে লেখা মিলন-কাহিনী তাঁর বৈচিত্র্য-পিপাসার নিদর্শন। দীনবন্ধুতে বৈচিত্র্য নেই। অতীতে তিনি অসচ্ছন্দ। বর্তমানে তিনি সহজ। বিশেষ করে যেখানে আছে হাস্য এবং যেখানে বিকৃতি, কিন্তু নেই নিরন্তাপ প্রত্যহ। অন্যত্র নয়।" এরই আলোকে নীলদর্পণ, নবীন তপস্বিনী, বিয়ে পাগলা বুড়ো, সধবার একাদশী, লীলাবতী, জামাই বারিক, কমলে কামিনী নাটক, কুড়ে গরুর ভিন্ন গোট আলোচিত হয়েছে। এর মধ্যে শ্রীগুপ্তের নিজস্ব ভাবনার প্রকাশ ঘটেছে সুস্পষ্টভাবে। গল্প, উপন্যাস, কবিতা আলোচনার মধ্যে আমরা তার একই বিশ্বাস ও সত্যকে ক্রিয়াশীল দেখি। প্রখ্যাত সাংবাদিক হরিশচন্দ্র মুখোপাধ্যায়ের স্মৃতি-সভায় দীনবন্ধু প্রদত্ত বক্তৃতাটি মুদ্রিত হয়েছে গ্রন্থশেষে।

দীনবন্ধু রচনাবলী : ক্ষেত্র গুপ্ত সম্পাদিত। সাহিত্য সংসদ। ৩২এ, আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র রোড, কলিকাতা-৯। দাম তেরো টাকা।

●

শিল্প ও শিল্পী

বৎসরাধিক কাল হল আচার্য নন্দলাল বসু দেহত্যাগ করেছেন। তাঁর সমগ্র শিল্প-সৃষ্টির বিখ্যাত নিদর্শনগুলি একত্রিত করে একটি বই প্রকাশ করা প্রয়োজন। কিন্তু এখনো পর্যন্ত সে কাজে কেউ হাত দেননি। তাঁর শিল্পকলার মূল্যায়ন এবং তার প্রভাব সম্পর্কেও বিস্তারিত আলোচনার ক্ষেত্র রয়ে গিয়েছে। বিশ্বভারতী পত্রিকার নন্দলাল বসু সংখ্যাটি সুন্দর হলেও এ চাহিদা মেটাবার পক্ষে যথেষ্ট নয়। এই সংখ্যায় নন্দলাল বসু সম্পর্কে রবীন্দ্রনাথ, প্রতিমা-দেবী, অর্ধেন্দুকুমার গঙ্গোপাধ্যায়, সুরেন্দ্রনাথ কর, ক্ষিতীন্দ্রনাথ মজুমদার, বিনোদ-বিহারী মুখোপাধ্যায়, কানাই সামন্ত, হীরেন্দ্রনাথ দত্ত, অমিয়কুমার সেন, মণীন্দ্র-ভূষণ গুপ্ত, প্রভাতমোহন বন্দ্যোপাধ্যায়, ধীরেন্দ্রকৃষ্ণ দেববর্মণের কতকগুলি প্রবন্ধ এবং ইন্দিরা গান্ধী ও অবনীন্দ্রনাথের দুটি ছোট লেখা আর নন্দলাল বসুর একটি প্রবন্ধ স্থান পেয়েছে। নন্দলালের এবং সে যুগের শান্তিনিকেতনের জীবনের অনেক ঘটনাবলীর উল্লেখ বইটির মূল্যবৃদ্ধি করবে। এছাড়া নয়খানি বহুবর্ণ এবং এগারখানি একবর্ণ ছবি আর সাতখানি রেখাচিত্র বইটির অন্যতম প্রধান আকর্ষণ।

বিশ্বভারতী পত্রিকা : নন্দলাল বসু সংখ্যা। দাম—দশ টাকা।

●

অজন্তা নামের মধ্যে কেমন যেন একটা অলৌকিক রূপের স্বপ্ন বাসা বেঁধে আছে। তাই এর সম্পর্কে যে-কোন নতুন প্রকাশন একাগ্র হয়ে দেখতে ইচ্ছে করে। কেন্দ্রীয় সরকারের পুরাতত্ত্ব বিভাগের সদ্য-প্রকাশিত 'অজন্টা মুরালস' বইটি রসিকজনের আদরের বস্তু হবে সন্দেহ নেই। ৪৫টি বহুবর্ণ চিত্র এবং ষোলপাতা একবর্ণ ভাস্কর্যের প্রতিলিপি বইটির সৌষ্ঠব। এছাড়া কুড়িখানি রেখাঙ্কনের সাহায্যে ভিত্তিচিত্রগুলির কম্পোজিসনের একটা হদিশ দেবার চেষ্টা হয়েছে। গুহা, চিত্র এবং ভাস্কর্যের পরিচয় লিখেছেন শ্রী এ ঘোষ, এম, এন, দেশপাণ্ডে, ডঃ বি, বি, লাল এবং শ্রীমতী ইনগ্রিড অ.ল। এক খণ্ডে এই গুহার ইতিহাস, শিল্প এবং মুরালের সংরক্ষণ-ব্যবস্থা প্রভৃতি বিষয়ে সুন্দর আলোচনা সহজলভ্য নয়। প্রতিলিপিগুলি ভারতে ছাপা প্রতিলিপির মধ্যে উৎকর্ষের দাবী রাখে।

Ajanta Murals — Published by Archaeological Survey of India. Price Rs. 30|—

●

বাংলা ভাষায় শিল্প-সংক্রান্ত বইয়ের সংখ্যা কম। এর কারণ এ বিষয়ে লোকের উৎসাহ এখনো যথেষ্ট জাগ্রত হয়নি। তাছাড়া লেখবার মত বিশেষজ্ঞের অভাব এবং ভাল ছাপার ব্যবস্থার অভাব। তবে কিছু কিছু চেষ্টা কিছুদিন যাবৎ হচ্ছে। আশা করা যায় যথেষ্ট চাহিদা হলে ও ছাপার উন্নতি ঘটলে উপযুক্ত লেখকের অভাব হবে না। বঙ্গসাহিত্য সম্মেলনের তরফ থেকে শিল্পী পূর্ণ চক্রবর্তীর লেখা 'যুগে যুগে ভারত-শিল্প' বইখানি বাংলা ভাষায়

শিল্প ইতিহাসের একটি প্রাথমিক বইয়ের অভাব মেটাবে। ভারতের প্রাচীন প্রস্তরযুগ থেকে শুরু করে সিন্ধুসভ্যতা, মৌর্য, শুঙ্গ, কুষাণ, দক্ষিণ ভারত, গুপ্তযুগ, উড়িষ্যা, মধ্যভারত, পশ্চিম ভারত, কাশ্মীর, পূর্ব-ভারত প্রভৃতি স্থানের শিল্পকলা এই ১৬৩ পাতার বইয়ে সংক্ষিপ্ত অথচ সুন্দরভাবে আলোচিত হয়েছে। এছাড়া ভারতের বাইরে ভারত-শিল্প ও মোগল রাজপুত শিল্পের কথাও সু-আলোচিত হয়েছে। ইংরাজ অধিকারের পর ভারত-শিল্পে ব্যাপ্তি ও পরিধি বিস্তৃত হওয়ায় সে যুগকে বাদ দেওয়া হয়েছে। এ ধরনের বইয়ের ভেতর একসঙ্গে চিত্র-ভাস্কর্য ও স্থাপত্যের এমন সুষ্ঠু আলোচনা বাংলা ভাষায় বড়একটা দেখা যায় না। বইটি বিদ্যালয়ের পাঠ্য-তালিকাভুক্ত হতে পরে। প্রচুর ছবিও দেওয়া হয়েছে। তবে ব্যয়-বাহুল্য কমাবার জন্যে সবগুলিই রেখাঙ্কিত ছবি। তার ফলে শিল্পবস্তুগুলির নিখুঁত রূপায়ণ কিছুটা ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে।

যুগে যুগে ভারত শিল্প : পূর্ণচন্দ্র চক্রবর্তী, বঙ্গ-সাহিত্য সম্মেলন। দাম সাত টাকা।

আকর্ষণীয় গল্প-সংকলন

প্রখ্যাত কথাশিল্পী শ্রীগজেন্দ্রকুমার মিত্র একটি সুপরিচিত নাম। তাঁর সুদীর্ঘ সাহিত্যজীবনে কেবল বয়স্ক পাঠকের উপযোগী রচনাই পরিবেশন করেন নি, কিশোর পাঠকদের জন্যেও তিনি কলম ধরেছেন। তার এক্ষেত্রেও তাঁর কৃতিত্ব বা জনপ্রিয়তা কোন অংশে কম নয়। বহু গ্রন্থও তিনি রচনা করেছেন।

সম্প্রতি দেবসাহিত্য কুটীর থেকে শ্রীমিত্রের 'গল্পের চেয়ে অদ্ভুত' গল্প সংকলন প্রকাশিত হয়েছে। এই গল্পগুলি ইতিহাস ও বর্তমান কালের ঘটনা অবলম্বনে রচিত। ইতিহাস যেখানে নীরব লেখক সেখানে স্বীয় কল্পনায় গল্পের জগৎকে ভরাট করেছেন। অদ্ভুত এই কাহিনীগুলি দীর্ঘ পঁচিশ বৎসরকাল ধরে রচিত।

সহযাত্রী, সুদূরের আহ্বান, অগস্ত্য-যাত্রা, একটি কিশোরী মেয়ে, এটা কিন্তু গল্পই, কাজিবাবু, মুখোজ্জমশাই, শঠে শাঠ্য; তাঁতিয়া টোপীর ফাঁসি, রাজার ধর্ম, অজন্তার আত্মা, রঘুরাজার দান কাহিনী, নিক্তির তৌল, একটি কয়লাওলার কাহিনী, ছুটি প্রতিশোধ, আজব কৃপণ, মহাপুরুষ ও মহানপুরুষ, একটি ছোট কম্বলের কাহিনী, ভগবানের সঙ্গে কারবার, দুর্গণা দস্তার চৌগুণা জুজার, গল্পের চেয়ে অদ্ভুত, ঈশ্বর সাক্ষী, অতিলোভ গল্পগুলি আকর্ষণীয় বর্ণনাগুণে পরম উপভোগ্য হয়ে উঠেছে। বহুবর্ণেরঞ্জিত প্রচ্ছদ এবং অসংখ্য-চিত্রে অলংকৃত গ্রন্থখানি কিশোরদের তো বটেই যেকোন বয়সের পাঠককে মুগ্ধ করবে।

গল্পের চেয়েও অদ্ভুত (গল্প সংকলন) —গজেন্দ্রকুমার মিত্র। দেবসাহিত্য কুটীর প্রাইভেট লিমিটেড। ২১ ঝামাপুকুর লেন। কলকাতা-৯। দাম চার টাকা।

সংকলন ও পত্র-পত্রিকা

'আশ্চর্য' হোল সায়ান্সফিকশ্যান ও ফ্যানটাসি ফিল্মের মাসিক পত্রিকা। আমাদের দেশের পাঠকদের মধ্যে এই শ্রেণীর পত্রিকার প্রচলন খুব বেশী নেই। তবুও পাঁচটি বৎসর অতিক্রম করেছেন 'আশ্চর্য' পত্রিকার কর্তৃপক্ষ।

বর্তমান 'পুজো সংখ্যা'টি নানাকারণে উল্লেখযোগ্য এবং আকর্ষণীয় হয়েছে। প্রেমেন্দ্র মিত্রের 'মামাবাবু ও ভুতুড়ে দ্বীপ', নীহাররঞ্জন গুপ্তের 'আগন্তুক', বিধায়ক ভট্টাচার্যের 'অমরেশ চন্দ্রাহত হল', ধীরেন্দ্র-লাল ধরের 'বিস্ময়কর এক্সপেরিমেন্ট' এই চারটি উপন্যাসের জগৎ যেমন বিচিত্র, আকর্ষণও তেমনি বিচিত্র পথগামী। জুলস ভার্নের উপন্যাস 'জগৎ সব মুঠোয়' অনুবাদ করেছেন আদিত্যকুমার ভট্টাচার্য। বাংলাভাষায় এই উপন্যাসটি প্রথম অনূদিত হোল। তিনটি ভুতের গল্প লিখেছেন শরদিন্দু বন্দ্যোপাধ্যায় (কালো মোরগ), মনোজ বসু (রাতের অতিথি); বিমল কর (কাঠ কয়লার আঁচড়)। লীলা মজুমদারের ফ্যানটাসি গল্প 'পোশাপালের থলে' একটি ভিন্নধর্মী রচনার আশ্চর্য সুন্দর নিদর্শন। বিজ্ঞান ভিত্তিক গল্প প্রণব রায়ের 'অন্ধ উঠলো' ক্ষিতীন্দ্রনারায়ণ ভট্টাচার্যের 'রহস্য দ্বীপের কাহিনী', অদ্রীশ বর্ধনের 'গান্ধ', শ্রীধর সেনাপতির 'শেষের সেদিন', বাসুদেব ভট্টাচার্যের 'মানুষ জয়ী হলো', সৌরেন্দ্র ঘোষের 'কায়াহীনের কাহিনী' সংখ্যাটিকে সমৃদ্ধ করেছে। বিচিত্রধর্মী দুটি রচনা মনোরঞ্জন দে'র 'অতল-সমুদ্রের রহস্য' এবং রমেন ঘোষের 'জনতা ব্যঙ্গ' সকল শ্রেণীর পাঠককে বিস্ময়াবিষ্ট করে রাখবে। এছাড়া আছে সত্যজিৎ রায় ও অদ্রীশ বর্ধনের সাক্ষাৎকার সত্যজিৎ রায়ের সংক্ষিপ্ত জীবনী, নিয়মিত বিভাগ, নির্জলা বিজ্ঞান, কার্টুন এবং আরো অনেক কিছু। ভিন্নশ্রেণীর এই পত্রিকাটি পাঠকসমাজে সমাদৃত হবে।

আশ্চর্য (পুজো সংখ্যা) সম্পাদক : আকাশ সেন। ৯৭।১ সারপেনটাইন লেন। কলকাতা-১৪ থেকে প্রকাশিত। দাম সাড়ে চার টাকা।

●

ঐকতানের শারদ সংখ্যায় লিখেছেন জীবেন্দ্র সিংহরায়, বুদ্ধসত্ত্ব বসু, কৃষ্ণ ধর, চিত্ত ভট্টাচার্য, দীপককুমার দাস, জ্যোতির্ময় চট্টোপাধ্যায়, সুব্রত চক্রবর্তী, কামাখ্যা মুখোপাধ্যায়, সঞ্জীব সেন, গোপালচন্দ্র দাস এবং আরো অনেকে।

শারদীয় ঐকতান ১৩৭৪ সম্পাদক : চিত্ত ভট্টাচার্য, পিলখানা লেন। বর্ধমান দান এক টাকা।

●

আবদুল আজীজ আল আসান এবং বেগম মরীয়ম আজীজ সম্পাদিত কাফেলার শারদীয় সংখ্যাটি নানাদিক থেকে বৈশিষ্ট্য-পূর্ণ। গল্পকবিতা প্রবন্ধ, রম্যরচনা উপন্যাস প্রভৃতিতে সমৃদ্ধ এই পত্রিকায় লিখেছেন নিমাই নাগচৌধুরী, আবদুল ফজল, আবদুল আজীজ আল আমান, মউদদ আর রহমান, ইবনে ইসাক, সৈয়দ মুস্তাফা সিরাজ, মণীন্দ্র রায়, কবিরুল ইসলাম, গণেশ বসু, মহম্মদুল হক, সৈয়দ হোসেন হালিম, সৈয়দ আবদুল বারি, আহসান হাবীব, শওকত ওসমান, বুলবুল ওসমান এবং আরো অনেকে। এই সংখ্যার সব থেকে বড় আকর্ষণ নজরুলের ব্যাথার দানের পুনর্মুদ্রণ।

কাফেলা : (আশ্বিন ১৩৭৪) সম্পাদক— আবদুল আজীজ আল আসান এবং বেগম মরীয়ম আজীজ। এ-১২৭ কলেজ স্ট্রীট মার্কেট থেকে প্রকাশিত দাম এক টাকা।

কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় ছাত্র সংসদের মুখপত্র একতা সম্প্রতি প্রকাশিত হয়েছে। গল্প, কবিতা এবং সাহিত্য, রাজনীতি, খেলাধুলা, চলচ্চিত্র প্রভৃতির ওপর নানা বিষয়ের কয়েকটি প্রবন্ধ আছে। কয়েকটি প্রবন্ধ সুলিখিত এবং বক্তব্যপূর্ণ।

একতা—সম্পাদক : শিবশঙ্কর দত্ত। কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় ছাত্র সংসদ।

●

সাম্প্রতিকে লিখেছেন পবিত্র মুখোপাধ্যায়, সুনীথ মজুমদার, কাননকুমার ভৌমিক, প্রভাত চৌধুরী, শৈবাল চট্টোপাধ্যায়, মদনমোহন বিশ্বাস, রামশঙ্কর গিরি, জয়ন্ত দত্ত, রবীন্দ্র ভট্টাচার্য, অমিয়-কান্তি সিংহ, সনৎকুমার গুহ, দীপঙ্কর সরকার, চণ্ডীচরণ মণ্ডল।

সাম্প্রতিক—সম্পাদক : কাননকুমার ভৌমিক। ৪২বি. প্রিয়নাথ মল্লিক রোড, কলকাতা-২৬। দাম ত্রিশ পয়সা।

চিত্ররসিক

গগনেন্দ্রনাথ শতবার্ষিকী ও অন্যান্য প্রদর্শনী

সেপ্টেম্বর মাসে কলকাতায় যত চিত্র-প্রদর্শনী হল, অন্যান্য বছর সারা শীতের মরশুমেও এত বেশী প্রদর্শনী হতে দেখা যায় না। এর মধ্যে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ হল গগনেন্দ্রনাথ শতবার্ষিকী উপলক্ষে আয়োজিত তিনটি প্রদর্শনী। এই তিনটি প্রদর্শনীতে গগনেন্দ্রনাথের যত ছবি একত্রিত করা হয় তত ছবি একসঙ্গে কলকাতার নাগরিকরা দেখতে পেয়েছেন কিনা সন্দেহ। যদিও গগনেন্দ্রনাথের সমগ্র শিল্পসৃষ্টির তুলনায় এগুলির সংখ্যা অনেক কম তবু এতগুলি ছবি একত্রিত করার ফলে গগনেন্দ্রনাথের শিল্পসৃষ্টির একটা নিরখ পাওয়া যায়। এই তিনটি প্রদর্শনী বিভিন্ন জায়গায় না হয়ে একত্রে হলে আরো ভাল হত।

১৮ সেপ্টেম্বর থেকে ২৪ পর্যন্ত অ্যাকাডেমি অব ফাইন আর্টস এবং রবীন্দ্র-ভারতীতে গগনেন্দ্রনাথের প্রতিকৃতি ড্রয়িং-এর সবচেয়ে বেশী ছবি ছিল প্রায় ৬১খানি। এই ড্রয়িংগুলি ইতিপূর্বেও একবার অ্যাকাডেমিতেই দেখানো হয়েছিল। চাইনিজ ইংক তুলি দিয়ে আঁকা এইসব প্রতিকৃতিগুলির অধিকাংশই পাশ থেকে আঁকা। এর মধ্যে কয়েকটি তারিখ দেওয়া আছে। ১৮৮৯ সালে আঁকা রবীন্দ্রনাথের একটি সুন্দর প্রতিকৃতি তার মধ্যে অন্যতম। বাঙালী মধ্যবিত্ত এবং জমিদারশ্রেণীর কতকগুলি টাইপ অতি চমৎকার। এর মধ্যে কিছু ছবি আবার জ্যোতিরিন্দ্রনাথের স্কেচ বই থেকে নকল। ছবিগুলি খুবই ছোট প্রায় মিনিয়েচার মাপে কিন্তু মিনিয়েচারের ধরনে নয়। বহুবর্ণ ছবির মধ্যে 'স্বপনপুরী', 'সাতভাই চম্পা' 'মন্দির' প্রভৃতি ছবিগুলি গগনেন্দ্রনাথের স্টাইলের আরো বৈচিত্র্যের স্বাক্ষর।

রবীন্দ্রভারতীর প্রদর্শনীতে ৮০খানি ড্রইং ও জলরং-এর কাজ এবং ৬খানি ব্যঙ্গ-চিত্রে গগনেন্দ্রনাথের আরো পরিচয় পাওয়া যায়। এখানেও তাঁর গোড়ার দিকের কাজের মধ্যে কলকাতার কাক, কলকাতার বর্ষা এবং কতকগুলি মুখমন্ডলের রেখাঙ্কনে তাঁর ড্রইং-এর কয়েকটি চমৎকার নিদর্শন পাওয়া গেল। প্রতিকৃতির মধ্যে 'কুমারস্বামী', 'হরিনারায়ণ বসু' এবং এক অজ্ঞাতনামা ব্যক্তির একটি অসাধারণ প্রোফাইল স্টাডি দেখবার মত। গগনেন্দ্রনাথের পুরী, দার্জিলিং এবং শ্রীচৈতন্যের জীবনী সিরিজের অনেকগুলি ছবি একত্রিত করা হয়েছিল। তার মধ্যে পুরীর মন্দিরের একটি গলিতে সন্ধ্যার দৃশ্যটির বিশেষ আবহাওয়া মনে রাখার মত। সেইসঙ্গে কোনার্কে সন্ধ্যারাতও উল্লেখযোগ্য। চৈতন্য সিরিজের কাজে কিছুটা ভাবালুতা এবং দুর্বলতার চিহ্ন থাকলেও তাঁর কাজের ক্রম বিকাশের দিক থেকে এগুলি গুরুত্বপূর্ণ। অনেক ছবি মনে হয় চাইনীজ ইংকে আঁকার পর অল্প একটু রঙের ওয়াশ দিয়ে শেষ করা। এর সঙ্গে আরো পরিণত যুগের কাজ —যেখানে সোজাসুজি রঙ দিয়েই ছবি শেষ করা হয়েছে তাদের রঙের ঔজ্জ্বল্য (ফর্মের কথা ছেড়েই দিলাম) লক্ষ্য করার মত। তাঁর কালিতে আঁকা একরঙা ছবি কলকাতার বর্ষার ছাতার শ্রেণীতে বর্ষার রূপ, জনসমুদ্রের মাথায় ছাতার ঢেউ একটা সুন্দর গতিভঙ্গী এবং বিশেষ একটা হাস্যরসের অবতারণা করেছে। গগনেন্দ্রনাথের রহস্যময় অতীন্দ্রিয় লোকের রূপ ফোটানোর প্রচেষ্টা পাওয়া যায় তাঁর কতকগুলি একরঙা ছবিতে যেমন 'প্রভাতসঙ্গীত', 'হানাবাড়ি', 'গৃহ', 'ঘুমপাড়ানী গান', 'শুকতারা ও সন্ধ্যাতারা', 'জীবন নদী' ইত্যাদি ছবিতে। এখানে এক রঙের টোনে একটা চমৎকার আলোর আমেজ এবং সবশুদ্ধ মিলিয়ে একটা অতিপ্রাকৃত চেহারা আনা হয়েছে।

গগনেন্দ্রনাথের ছবিগুলি প্রায়ই খুবই ছোট মাপের, কিন্তু এতটুকু ছবির মধ্যে অনেক ক্ষেত্রেই তিনি অনেকখানি স্পেসের ইঙ্গিত দিয়েছেন। "আলোর মন্দির" ছবিটি এই প্রসঙ্গে উল্লেখযোগ্য। রাত্রের অন্ধকারে যাত্রীর সারি দুধারের অন্ধকার গাছের সারির মধ্যেকার পথ দিয়ে চলেছে। সামনে সমস্ত ছবিটি আলোকিত করে এক বিরাট মন্দির দাঁড়িয়ে—তারই আলোয় তাদের পথ দেখাচ্ছে। তাঁর জ্যামিতিক এবং কিউবিস্টিক যুগের ছবির মধ্যে ইউরোপীয় কিউবিজমের গঠনের দিকের চাইতে তাঁর নিজের মনে যে অতীন্দ্রিয় জগৎ, তাকে রূপ দেবার চেষ্টাটাই প্রধান এবং মনে হয় এখানেই তাঁর বৈশিষ্ট্য। 'দ্বারকাপুরী', 'ধ্বংসের পূর্বে দ্বারকাপুরী' এবং বিশেষভাবে 'শিল্পীর মৃত্যু' (তাঁর শেষের দিকের ছবি) উল্লেখযোগ্য। এখানে রং এবং গঠনের মধ্যে একটা প্রিজমের আমেজ এসেছে। এ যুগের ছবির মধ্যে তাঁর শিল্প-ধারার একটা পরিণতি দেখা যায়, যার সঙ্গে আধুনিক রীতির সাদৃশ্যটাই বেশী।

গগনেন্দ্রনাথের সবচেয়ে বড় প্রদর্শনী হল সরকারী চারু ও কারু মহাবিদ্যালয়ে ২৩শে সেপ্টেম্বর থেকে ৬ই অক্টোবর। বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান ও ব্যক্তিগত সংগ্রহ থেকে ১১৭খানি ছবি, ড্রইং এবং ব্যঙ্গচিত্র নিয়ে এই প্রদর্শনীর কয়েকখানি ছবি এই প্রথমবারের মত জন-সাধারণের সামনে দেখানো হল। তাঁর গোড়ার দিকের পুরী এবং রাঁচির দৃশ্য ছোট ছোট রঙীন পোস্টকার্ডে ইম্প্রেশনিস্টিক কাজ (দার্জিলিং-এর বাজার) জাপানী ধরনের পদ্মাবক্ষের বিভিন্ন দৃশ্যে তাঁর শিল্পশিক্ষার ডিসিপ্লিনের কিছুটা নিদর্শন পাওয়া যায়। কুরুক্ষেত্রের পর শতবিধবার ছবিটি এই প্রথম দেখা গেল। কম্পোজিশন গগনেন্দ্রনাথের একান্ত নিজস্ব ভঙ্গীতে করা। সুদর্শন চক্রের আকৃতির ছাদের নীচে এক কোণে ছবির সামনের দিকে কৃষ্ণ এবং বারান্দার তলা দিয়ে শতবিধবা কুরুক্ষেত্রের দিকে ছায়ার মত চলে যাচ্ছে। ছবির আলো-ছায়ার সম্পাতে নাটকীয়তা সৃষ্টি লক্ষ্য করার মত। তাঁর টুকরো স্কেচের মধ্যে সিংহীবাগানের বস্তি, বর্ষার দিনে রামায়ণ পাঠ, কলকাতার ছাদের সারি, কথকঠাকুর প্রভৃতি ছবি এবং স্বপ্নদৃষ্ট জগতের একবর্ণ চিত্র হিসেবে ঘুমপাড়ানী গান, কালো ঘোড়ার সওয়ার শুভদৃষ্টি, রহস্যপুরী, বরণ প্রভৃতি ছবির স্টাইলের পরিবর্তন দেখবার মত। পরিণত জ্যামিতিকপর্বে রঙীন ছবিগুলির মধ্যে আজান, রূপকথার রাজপুত্র ও পাখি, ঘুমন্তপুরীর রাজকন্যা, রবীন্দ্রনাথ ও মানস সুন্দরী প্রভৃতি ছবির একটা নাটকীয় পরিবেশ চমৎকার লাগে। বিভিন্ন রঙের মধ্যে কয়েকটি ক্ষেত্রে কালোর সতেজ ব্যবহার তাঁর একান্ত ব্যক্তিগত স্টাইল। ক্ষেত্রবিশেষে মনে হয় ছবিগুলি যদি আরো বড় হত এবং যদি তিনি তেলরঙে কাজ করতেন তাহলে এদের রূপ হয়ত আরো বেশী খুলত। রবীন্দ্রনাথের জাতীয় কংগ্রেস অধিবেশনে ভাষণ, সুরেন্দ্র-নাথের চৌষট হাজারী মন্ত্রিত্বের ব্যঙ্গচিত্র এবং মন্দিরে হ্যাট তুলে বাঙালী সাহেবের নমস্কার এবং তার সঙ্গীর ভক্তির আতিশয্যে পকেট থেকে ডিম ফুটে ছানা বেরোন—গগনেন্দ্রনাথের শিল্পী চরিত্রের আরেক দিক উন্মোচিত করে। গগনেন্দ্রনাথের সমগ্র শিল্প-বিচারের জন্যে তাঁর যতগুলি সম্ভব ছবি একটি স্থায়ী গ্যালারিতে সংরক্ষিত হওয়া একান্ত প্রয়োজন।

তস্য তস্য অথবা সূর্য কাঁদলে সোনা

প্রেমেন্দ্র মিত্র

(পূর্ব প্রকাশিতের পর)

সারা সেভিল শহরেই সেদিন বৎসরের আনন্দ কোলাহল। এক জায়গায় জনতার চেহারা একটু সম্ভ্রান্ত।

সেখানে ঘুরেফিরে অনেকেরই দৃষ্টি একদিকে পড়ছে। পড়া কিছু আশ্চর্য নয়। অভিজাত সুন্দরী নারী। সৌন্দর্যেও বিশেষত্ব আছে। অনেক সুন্দরী নারীর ভিড়েও এ মহিলাকে আলাদা করে দেখতে হয়।

ভিড় জমেছে অসামান্য এক গীর্জার উৎসব উপলক্ষ্যে। যে সে গীর্জা নয়, সান্তা মারিয়া দে লা সেদে ক্যাথিড্রাল। সে ভিল শহরের পরম গর্বের স্থাপত্যনিদর্শন।

পৃথিবীতে ওর চেয়ে বড় গীর্জা আর একটি মাত্রই আছে।

শতাধিক বছর আগে কাজ শুরু হয়ে ১৫১৯-এ মাত্র ন' বছর হল গীর্জাটি তৈরী শেষ হয়েছে। সেই থেকে প্রতিবছর এ গীর্জাকে কেন্দ্র করে উৎসব হয়ে আসছে। দর্শকদের ভিড় যেখানে সবচেয়ে বেশী পূজাবেদীর পেছনের সেই অপূর্ব চুয়াল্লশটি গিল্টিকরা কাঠের খোদাই মূর্তি-গুলির কাজ সাতচল্লিশ বছর ধরে নানা শিল্পীর সাধনায় সমাপ্ত হয়েছে মাত্র দু বছর আগে।

অন্য অনেকের দৃষ্টি বারবার যার ওপর গিয়ে পড়ছে, সেই সুন্দরী মহিলার অখণ্ড মনোযোগ কিন্তু এই অপূর্ব শিল্প-নিদর্শনের ওপর নেই। নেহাৎ বাইরের ভড়ং রাখবার জন্যেই সে মূর্তিগুলির ওপর চোখ বুলিয়ে যাচ্ছে মাত্র। ভালো করে একটু লক্ষ্য করলেই বোঝা যায়—ক্ষণে ক্ষণে সুন্দরী বাইরের গীর্জাতোরণের দিকেই কিসের একটা প্রত্যাশায় যেন চাইছে।

রীরডস্-এর মূর্তিগুলি পুরোপুরি না দেখেই মহিলাকে গীর্জার আর একদিকে চলে যেতে দেখা যায়।

এখানেও ক্যাথিড্রালের একটি অতুলনীয় সম্পদ অবশ্য আছে। মেরীমাতার একটি প্রমাণ কাঠের মূর্তি। জননী মেরী রূপোর সিংহাসনে বসে আছেন। তাঁর কেশরাশি সোনার সুতোয় তৈরী।

এ অপূর্ব মূর্তির সামনে হাঁটু গেড়ে বসে ক্ষণেকের জন্যে নতি জানিয়েই মহিলা উঠে পড়ে আবার গীর্জার বাইরের তোরণের দিকেই এগিয়ে যায়।

ক্যাথিড্রালের ঈষৎ স্তিমিত আলো থেকে বাইরে আসবার পর সুন্দরী মহিলাকে কেউ কেউ চিনতে পারে।

মহিলা সেভিলের অধিবাসিনী নয়। কিছুদিন মাত্র এ নগরে তাকে দেখা যাচ্ছে। এই সময়টুকুর মধ্যে মহিলা শুধু মুগ্ধ বিস্ময়ই নয় তার স্বামীর সঙ্গে বেশ একটু তীব্র কৌতূহলও জাগিয়েছে।

মার্কুইস গঞ্জালেস দে সোলিস নামটা তখন স্পেনের খানদানী মহলে একেবারে অপরিচিত নয়। খনেদী প্রাচীন ঘরানা না হয়েও কিসের দৌলতে মার্কুইস উপাধি পাবার সৌভাগ্য হয়েছে সেই বিষয়েই সঠিক ধারণা বিশেষ কারুর নেই। নানারকম অনুমান ও গুজব তাই এই নিয়ে প্রচলিত। মার্কুইস-এর আভিজাত্য কত গভীর সে বিষয়ে অনিশ্চয়তা থাকলেও তাঁর স্ত্রী মার্শনেস-এর সৌন্দর্য সম্বন্ধে দ্বিমত নেই। সেভিলের সম্ভ্রান্ত মহলে মার্কুইস ও মার্শনেস-এর খাতির সেইজন্যেই দিন দিন বাড়ছে।

কিন্তু মার্শনেস্-এর মত অভিজাত সুন্দরী মহিলাকে এখন দেখলে একটু অবাকই হবার কথা।

সান্তা মারিয়া দে লা সেদে-র ক্যাথিড্রাল থেকে সে রাস্তায় বেরিয়ে এসেছে। নেহাৎ মেলার আবহাওয়া না হলে মার্শনেস-এর এভাবে চলাফেরা অত্যন্ত দৃষ্টিকটু হত।

ধর্মের উৎসবের দিন। রাস্তায় উৎসবমত্ত নাগরিকদের ভিড়। মার্শনেস-এর ওপরে বিশেষভাবে কেউ নজর দেয় না।

এসপানিওলরা জাত হিসেবেই ফূর্তি-বাজ। তার ওপর সেভিল শহর শুধু নয় দক্ষিণ স্পেনের সমস্ত সেভিল প্রদেশের লোকেরই আমুদে বলে খ্যাতিটা সবচেয়ে বেশী। খৃষ্টপূর্ব দ্বিতীয় শতাব্দীতে সেভিল শহরের পত্তন থেকেই সেখানকার মানুষ আমাদের দেশের বারো মাসে তেরো পার্বণের মত যে কোন ছুতোয় একটা উৎসব করতে পেলে আর কিছু চায় না। স্পেনের নিজস্ব ষাঁড়ের লড়াই নিয়ে তারা যেমন মেতে ওঠে তেমনি ধর্মের অনুষ্ঠানের মেলা কি কার্নিভ্যালেও তাদের অদম্য উৎসাহ।

তখনকার উৎসবটা আবার ইস্টার-এর। সেভিলের এই উৎসবটাই সবচেয়ে বড়। সেভিল জেলায় দেশ বললেই হয়। শাখা প্রশাখা সমেত গুয়াদাল কুই ভির নদীর

সময় সাজসজ্জে বর্তমান যুগেও সেখানে অনেক তোড়জোড় করতে হয়। কিন্তু জলের দেশ হলেও গোটা আন্দালুসিয়া অঞ্চলটার শুকনো রোদে ঝলমল আবহাওয়াই সেখানকার মানুষের পোষাক যেমন মনও তেমনি রংচঙে করে তোলে।

শুধু শহরের লোক নয় দূরে গ্রামাঞ্চল থেকেও চাষীরা সপরিবারে তখন মেলায় যোগ দিতে এসেছে। তাদের রংবেরং-এর সাবেকী ধরনের সাজের মধ্যে মার্শনেস-এর পোষাক একটু বেমানান হয়ত লাগে। কিন্তু তা নিয়ে মাথা ঘামাবার মত সময় ও উৎসাহ কারুর নেই।

মার্শনেস ক্যাথিড্রাল থেকে বেরিয়ে উত্তর-পূব কোণের ঘণ্টামিনার বা জিরাল্ডার নিচে খানিক দাঁড়ায়। এ ঘণ্টামিনার এখন প্রায় দুশ হাত উঁচু। তখন ছিল মাত্র সওয়া একশ হাত। আগের মিনারটি নতুন করে গেঁথে পরে বাড়িয়ে তোলা হয়। পুরানো মিনারটির বয়স কিন্তু গীর্জাটির চেয়ে সাড়ে তিনশ বছরের চেয়েও বেশী। সে মিনার ছিল একটি প্রাচীন মসজিদের অংশ। স্পেনের সুদীর্ঘ মুসলিম অধীনতার স্মৃতিচিহ্ন হিসাবে এ ঘণ্টামিনারটি সেভিল ক্যাথি-ড্রালকে একটি বৈশিষ্ট্য দিয়েছে।

স্থাপত্যরীতির ওসব ভেদাভেদ বুঝে উপভোগ করবার মত ক্ষমতা থাক বা না থাক মার্শনেস-এর তখন সেদিকে দৃষ্টি দেবার মত মনের অবস্থাই নয়। কী একটা অস্থিরতা তাকে যেন তাড়িয়ে নিয়ে ফিরছে।

ঘণ্টামিনারের নিচে একটু অপেক্ষা করেই মার্শনেস আবার ক্যাথিড্র্যালের দিকেই ফেরবার জন্যেই পা বাড়ায়।

ঠিক সেই সময়ে পেছন থেকে তার পোষাকে একটা টান পড়ে।

বেশ একটু চমকে মার্শনেস ঘুরে দাঁড়ায়। সেভিল-এর লোকেরা ফূর্তিবাজ কিন্তু তাদের শিষ্টতার খ্যাতি অনেককালের। তারা ত পারতপক্ষে এমন অসভ্যতা করে না। তাছাড়া মার্শনেস-এর পোষাকটাই তাকে চিনিয়ে দেয়। সে পোষাক যে হেঁজি-পেঁজির ঘরের নয় তা বুঝে এরকম অসম্মান করবার সাহস করবে কে!

গাঁ-দেশ থেকে চাষাভুষো অনেক এসেছে। তারা অবশ্য অতশত বোঝে না। মাতাল হয়ে [illegible] কি না জেনেশুনে এ বেয়াদপি করেছে?

ফিরে দাঁড়িয়ে লোকটার দিকে চেয়ে সেই অনুমানই ঠিক বলে মনে হয়।

রংদার হলেও একেবারে মার্কামারা গ্রাম্য উৎসবের পোষাকে একটি গাঁইয়া লোক নেশায় ঢুলু ঢুলু চোখে তার দিকে তাকিয়ে হাসছে। খাটো আট ইঞ্চের। কোমরবন্ধ আঁটা খোলা কুর্তা আর উবুড়করা প্রকাণ্ড সানকীর মত টুপিতে লোকটার গাঁইয়া পরিচয় স্পষ্ট করে লেখা।

মার্শনেস এক মুহূর্তে রেগে আগুন হয়ে ওঠে। তার মধ্যে যে একটা হিংস্র বাঘিনী আছে বাইরের রূপ দেখে তা বোঝবার উপায় নেই।

সেই বাঘিনীটাই যেন হঠাৎ জেগে উঠে লোকটার ওপর ঝাঁপিয়ে পড়তে চায়।

নিজেকে তবু আতিকষ্টে সামলে সে গোলামদের ধমক দেবার ভঙ্গিতে ক্রুদ্ধ চাপা গলায় জিজ্ঞাসা করে,—তুই আমার পোষাক ধরে টেনেছিস বদমাস?

আজ্ঞে হ্যাঁ, মার্শনেস!—অম্লানবদনে আগের মতই মুচকে মুচকে হাসতে হাসতে বলে লোকটা।

মার্শনেস! লোকটার কাছে তার পরিচয় তাহলে অজানা নয়। তা সত্ত্বেও চাষাটার এত-বড় বেয়াদবী করবার স্পর্ধা হয়েছে!

রাগে মার্শনেস প্রায় ক্ষিপ্ত হয়ে উঠে, চোখের দৃষ্টিতে আগুন ছিটিয়ে বলে,—হাতদুটো কাটিয়ে নুলো হতে চাস?

তাতে রাজী আছি, মার্শনেস দে সোলিস! লোকটার মুখে কোন ভাবান্তর দেখা যায় না,—তার আগে ওই মিহি কোমরটা একবার জড়িয়ে ধরবার অনুমতি যদি দেন!

মার্শনেস অভদ্র চাষাটার গালে কষাবার জন্যে চড়টা তুলে দিল তার আগেই! কিন্তু হাতটা তাকে বেশ একটু হতভম্ব হয়ে নামাতে হয়।

তাকে মার্শনেস বলে চেনা একজন চাষা-ভুষোর পক্ষে যদি বা সম্ভব, মার্শনেস দে সোলিস বলে তার পুরো পরিচয়টা জানা ত প্রায় অবিশ্বাস্য ব্যাপার।

লোকটাকে তীক্ষ্ণদৃষ্টিতে এবার লক্ষ্য করে মার্শনেস সত্যিই চমকে ওঠে,—তুমি!

চাষাড়ে মোটা নকল গোঁফটা নামিয়ে আর মাথায় বড় কানাতোলা থালার মত টুপিটা নামিয়ে লোকটি এবার সম্পূর্ণ ভিন্ন গলায় তীব্র বিদ্রূপের সঙ্গে বলে, হ্যাঁ আমি, মার্শনেস দে সোলিস! তোমার প্রিয়তম স্বামী। সামান্য একটু ছদ্মবেশ করে তোমার ওপর নজর রাখছি অনেকক্ষণ থেকে। সান্তা মারিয়া দে লা সেদে ক্যাথিড্র্যালের ইস্টার উৎসবে যোগ দেবার নামে যখন একলা বাসা থেকে বেরিয়ে এসেছ তখন থেকেই। আমার ছদ্মবেশ অতি সাধারণ। কোনো ছেলেমানুষের চোখকেও বোধহয় এতে ফাঁকি দেওয়া যায় না। কিন্তু কোনো কিছুর চিন্তায় তুমি এত উতলা, এমন অস্থিরভাবে কাউকে খুঁজতে ক্যাথিড্র্যালের এ প্রান্ত থেকে ও প্রান্ত ছোটাছুটি করে বেড়াচ্ছ যে তখন একটা

বেয়াদবীর পরও আমাকে ভালো করে লক্ষ্য করবার ক্ষমতা তোমার হয়নি।

একটু থেমে মার্কুইস গঞ্জালেস দে সোলিস বাঁকা হাসিতে বিষ ছড়িয়ে তারপর জিজ্ঞাসা করে, এত ব্যাকুল হয়ে কাকে খুঁজছ বলে ফেলো দেখি। কার সঙ্গে এই ক্যাথিড্র্যালের ভেতরে বা বাইরে দেখা করবার ব্যবস্থা করেছ?

একটা গোলামের সঙ্গে ঃ প্রথম চমকের পর ইতিমধ্যেই নিজেকে সামলে নিয়ে মার্কুইস-এর চেয়েও তিক্ত তীব্র বিদ্রুপের চাবুক চালিয়ে মার্শনেস বলে—যাকে শয়তানী ফন্দিতে গোলাম না বানাতে পারলে আজ মার্কুইস গঞ্জালেস দে সোলিস-এর বদলে ছদ্মবেশে যা সেজে আছো তোমার অবস্থা তারো অধম হত।

তা যে হয়নি,—মার্কুইস যেন স্ত্রীর তীব্র বিদ্বেষটা উপভোগ করে বলে,—তার জন্যে মার্শনেস-এর কাছেই কৃতজ্ঞতা জানাচ্ছ। কারণ শয়তানকেও হার মানানো ফন্দিটা খাটানোর বাহাদুরী আমার একার নয়, তাতে তাঁরও কিছু কেরামতি আছে। আর আমি আজ মার্কুইস না হয়ে চাষার অধম হলে বেয়োয়া বিধবা হিসেবে ফার্ণানডিনাতেই তাঁরও বোধহয় এতদিনে সোনার অঙ্গে ছাতা ধরত।

জানোয়ার!—দাঁতে দাঁত চেপে কথা দিয়েই মাংস খুবলে নেবার মত স্বরে বলে মার্শনেস।

নিশ্চয়ই! তা না হলে তোমার স্বামী হবার যোগ্য হতে পারি!—আগের মতই জ্বালাধরানো হাসির সঙ্গে বলে মার্কুইস গঞ্জালেস দে সোলিস,—কিন্তু পরস্পরকে মধুর সব সম্ভাষণ করবার যথেষ্ট সময় পরে পাওয়া যাবে। আপাতত তোমার এত ছুটফটানি কার জন্যে সেইটেই বুঝে দেখা যাক। সেই গোলামটা?

মার্কুইস একটু থেমে ভুরু কুঁচকে যেন গম্ভীরভাবে ভাববার ভান করে বলে,—না গোলামটা নয়। তবে তারই হদিস পাবার আশায় আর কারুর জন্যে!

মার্কুইস কথাগুলো কিরকম বিঁধছে বোঝবার জন্যেই স্ত্রীর মুখের দিকে চেয়ে খানিক চুপ করে।

মার্শনেস-এর মুখ যেন পাথর কেটে তৈরী। শুধু চোখদুটো আঙরার মত জ্বলছে।

সে আর কেউ-কে কি আমি চিনি? মার্কুইস যেন সরবে চিন্তা করে,—মনে হচ্ছে চিনি। সেই অপদার্থ বুড়ো পাইলটটা, সেই কাপিতান সানসেদো, তোমার তিয়েন সেই আহাম্মকটা, যার ধর্মজ্ঞানের বাড়াবাড়িতে আমাদের সবকিছু বানচাল হতে বসেছিল। হ্যাঁ, ঠিক! সে ছাড়া আর কেউ নয়। বুড়ো জরদ্গবটা গোড়া থেকেই আমায় বিষনজরে দেখেছে। সেই গোলামটার ওপরই তার ছিল যত টান। জুয়াতে তাকে তার খোঁজও আমি নিয়েছি। মহামান্য স্পেন সম্রাটের সোনাদানার নজরানা মেক্সিকো থেকে জাহাজে বয়ে আনার সময়ে বেশকিছু সরাবার দায়ে তার পেছনে হুলিয়া ছুটছে। বুড়োকে এখন ফেরার হয়ে ফিরতে হচ্ছে গা-ঢাকা দিয়ে। তার মেন্দেলিনের বাড়িঘর সম্পত্তি সব বাজেয়াপ্ত হয়ে গেছে। সেই বুড়োটার সঙ্গে তোমার কোনওভাবে দেখা হয়েছে নিশ্চয়। বুড়োই গোপনে যোগাযোগ করেছে। সে তোমায় জপাতে চায় সেদিনকার আসল ব্যাপারটা তার কাছে ন্যায়ধর্মের খাতিরে খুলে বলবার জন্যে। আর তুমি তার কাছে গোলামটার হদিস চাও। বুড়ো আবার কিসব ডাইনি বিদ্যেটিদ্যের জোরে ভূতভবিষ্যত বলে কিনা। দুজনে গোপনে যুক্তি করে এইখানেই কোথাও দেখা হবার ব্যবস্থা তাই ঠিক করেছিলে, কেমন?

শয়তানের মত হেসে ওঠে এবার মার্কুইস। তারপর আক্রোশ আর বিদ্বেষে মুখচোখের বিকৃত ভঙ্গিতে বলে,—কিন্তু তা হবার নয় মার্শনেস। সেই বুড়ো আহাম্মক তোমার তিয়েন, কাপিতান সানসেদোকে সেভিল শহরে আর দেখতে পাবে না। তুমি ডালে ডালে ফেরো বলে আমায় পাতায় পাতায় থাকবার ব্যবস্থা করতেই হয়। চরেদের কাছে খবর পেয়ে তোমার আর কাপিতানের জোটবাঁধার রাস্তাটা তাই বন্ধ করতে হয়েছে। তোমার আদরের পাতানো মামা কাপিতান সানসেদোর নামে হুলিয়াটা এখানেও চালু করে দিয়েছি। এখানে ধরা পড়লে হাজতের দরজা যে তার জন্যে হাঁ করে আছে তা জেনে কত পগার তিনি এতক্ষণে পার হয়েছেন কে জানে!

তুমিই তাহলে মেন্দেলিন শহরে তাঁর ভিটেমাটি নিলামে চড়িয়ে আমার তিয়েনকে দেশছাড়া করেছ, সম্রাটের নজরানা চুরির মিথ্যে অভিযোগ সাজিয়ে তাঁর নামে হুলিয়া বার করেছ, আর এই সেভিল শহর থেকেও তাঁকে তাড়িয়েছ পাছে আমার সঙ্গে দেখা হয় বলে!

মার্কুইসকেও একবার চমকে ভুরু কুঁচকে তাকাতে হয় স্ত্রীর দিকে। মার্শনেস যেন হঠাৎ অন্য কেউ হয়ে গেছে। এতগুলো কথা যে বলেছে তার মধ্যে উত্তেজনা আক্রোশ কিছুই নেই। এক পর্দায় কথাগুলো যেন ছোটদের মুখস্থ পড়ার মত সে বলে গেছে। কিন্তু সেই একঘেয়ে একটানা বলাটাই যেন আরো বেশী অস্বস্তিকর।

ভেতরে বেশ একটু অস্বস্তি বোধ করলেও বাইরে তাচ্ছিল্য ও অবজ্ঞার সঙ্গে মার্কুইস বলে, ফিরিস্তটা ঠিকই দিয়েছ। কিন্তু আমায় লুকিয়ে মেন্দেলিন শহরে সানসেদোকে খুঁজতে গিয়ে যখন রাজদ্রোহের অপরাধে ভিটেমাটি খুইয়ে তাঁর ফেরারী হবার কথা জেনেছিলে তখনই আমার বাহাদুরীটুকু আঁচ করা উচিত ছিল। সেভিলে তাঁর সঙ্গে মেলবার মিথ্যে আশা তাহলে আর করতে না। তার যেখানেই পাও সেভিল শহরে তাঁর দেখা পাবে না।

মার্শনেস কিছুই না বলে স্বামীর দিকে একদৃষ্টে কয়েক মুহূর্ত চেয়ে থেকে ক্যাথিড্র্যালের ভেতরই চলে যায়।

মার্কুইস গঞ্জালেস দে সোলিস-এর আস্ফালন কিন্তু মিথ্যে হয়ে গেছে অপ্রত্যাশিত একটি ঘটনায়।

কাপিতান সানসেদোর মত সামান্য একটা মানুষের বিরুদ্ধে হুলিয়া নিয়ে সেভিল শহরের মাথাব্যথার তখন অবসর নেই। লুকিয়ে থাকতে হলেও কাপিতান সানসেদোকে সেভিল ছেড়ে যেতে হয়নি। তিনি তখন সেভিল ছেড়ে গেলে এ কাহিনীর সমাপ্তি এখানেই টানতে হত কিনা কে জানে!

সেভিল শহর শুধু নয় সারা স্পেনকে পরে সজাগ চঞ্চল করে তোলবার মত একটি ব্যাপার তখন ঘটেছে। ঘটেছে প্রথম কিন্তু নিঃশব্দে।

যাঁর সম্বন্ধে অনেক কিংবদন্তী আগেই স্পেনে এসে পৌঁছেছে সেই ফ্রানসিসকো পিজারো সেভিলের বন্দরে তাঁর জাহাজ নিয়ে এসে নোঙর ফেলার পরই পুরোনো দেনার দায়ে গ্রেফতার হয়েছেন।

তাঁকে গ্রেফতার করিয়ে জেলে যিনি পাঠিয়েছেন ইতিহাসে শুধু সেই একটি কারণেই তিনি স্মরণীয় হয়ে আছেন। তাঁর নাম ব্যাচিলর এনসিসো।

(ক্রমশঃ)

২৩নং লিটকুইক্ক এর

১৭টি ক্লুজের বাংলা অনুবাদ

১। অজন্তার শিল্প সম্পূর্ণ অস্তিত্বের সৌন্দর্য/ঐক্যের রহস্যকে উৎঘাটিত করে দেয়।

২। কর্তব্য/মানবতার প্রতি ভালবাসা এমন একটি জিনিষ যা মানুষকে আপনভোলা করে দেয়।

৩। জীবনের দর্শন ছাড়া শিক্ষা/ধর্মের কোন প্রকৃত মূল্য নেই।

৪। সামাজিক এবং আর্থিক সাম্য ছাড়া রাজনৈতিক ন্যায়/স্বাধীনতা একটি প্রহসন হয়ে দাঁড়ায়।

৫। ভারত রাষ্ট্রের ধর্মনিরপেক্ষতা যার উপর নির্ভর করে, বাস্তবিকপক্ষে ধর্মীয় স্বাধীনতা এবং সামাজিক ন্যায়পরতা/ঐক্য হ'ল সেই দুটি স্তম্ভমূল।

৬। আমরা যদি সত্যসত্যই ভগবানে এবং তাঁর অসীম ক্ষমতায় ও সংগুণের প্রতি বিশ্বাস রাখি তাহলে কখনই কোন বিষয়ে আমরা ভীত/রুগ্ন হতে পারি না।

৭। আমরা আমাদের দুর্বলতার জন্য নিঃসন্দেহে কোন কোন সময়ে চরম অসহায়/দুঃসাহসী হয়ে পড়ি।

৮। মানুষ একই সঙ্গে অনেকগুলি আদর্শ/ভাবধারা-র অনুরাগী হয় না।

৯। যদি ভগবান এক, তাহলে অত নির্যাতন কেন? এর কারণ তাঁর ভক্তদের অজ্ঞানতা/অসহিষ্ণুতা।

১০। আধুনিক মানুষ অধার্মিক/দায়িত্বহীন। সে নিজের স্বার্থ ও আনন্দ খোঁজে।

১১। জীবন/প্রকৃতির রহস্যের সমাধানের জন্য আমরা নিশ্চয় চাই তথ্য এবং বানান কথা চাই না।

১২। আমরা প্রত্যেকেই ঈশ্বরস্বরূপ, শাশ্বত, অমর এবং প্রচ্ছন্ন/যথাযথ স্বর্গীয়।

১৩। অন্তরের পবিত্রতা/প্রশান্তি সম্পূর্ণ আত্মত্যাগের মধ্যে দিয়েই অর্জন করা যায়, কারণ এর মাধ্যমেই আমরা সবরকম স্বার্থপরতা ও ব্যক্তিগত বাসনা থেকেই নিজেদের মুক্ত করি।

৪। দাসের সম্মান বিশ্রাম নেই।

১৫। স্বার্থহীনতা/সত্যবাদিতা-র সর্বোচ্চ স্তর হ'ল সরলতা এবং এটি একটি মহৎ গুণ।

১৬। এটা দুঃখের বিষয় যে, যে রাষ্ট্র যত বেশী উন্নত, সেই রাষ্ট্রের জন সাধারণ ততই বেশী অধীর/অসন্তুষ্ট।

১৭। ঈশ্বর, যিনি চির আনন্দময়, চির জ্যোতির্ময়, তিনি সর্বস্থানে সর্বসময়ে বিরাজমান, কিন্তু আমাদের মনে তাঁর রূপের প্রতিফলন হতে পারে না, যদি সেই মন হয় অপবিত্র অথবা অস্থির/অস্বচ্ছ।

(এন্ট্রি ফর্ম অন্যত্র দেখুন)

দেশে বিদেশে

আসামের ভবিষ্যৎ

আসামের পার্বত্য জেলাগুলির ভবিষ্যৎ সম্পর্কে পার্লামেন্টের বিরোধী সদস্যদের সঙ্গে পরামর্শ করা হবে—ভারত সরকারের এই ঘোষণার ফলে এই দেশের সবচেয়ে জটিল ও দীর্ঘকালের একটি সমস্যার সমাধান আবার অনিশ্চিত হয়ে গেল।

মূলত, সমস্যাটি আসামের পাহাড়ী এলাকার অধিবাসীদের সঙ্গে তার সমতলের অধিবাসীদের রাজনৈতিক বিরোধ। পাহাড়ী এলাকার অধিবাসীদের, অন্ততপক্ষে যে-সব রাজনৈতিক সংগঠন তাঁদের প্রতিনিধিত্ব দাবী করেন তাঁদের, দাবী হচ্ছে, সমতলের বাসিন্দাদের সঙ্গে তাঁদের এমন কোন মিল নেই যাতে তাঁরা এক রাজ্যের সীমানার মধ্যে থাকতে পারেন। তাঁদের কথা হচ্ছে, যতদিন এই পাহাড়ী এলাকাগুলি আসাম রাজ্যের অংশমাত্র হয়ে থাকবে ততদিন ঐ এলাকাগুলি ও সেখানকার মানুষের কোন প্রকৃত উন্নতি হবে না, এবং তারা সমতলবাসীদের বঞ্চনার শিকার হয়ে থাকবে। সুতরাং, তাঁদের দাবী, পার্বত্য এলাকাগুলিকে স্বতন্ত্র রাজ্যরূপে গঠন করা হোক। অন্যদিকে ব্রহ্মপুত্র উপত্যকার অধিবাসীদের সরব অংশগুলি এবং আসাম কংগ্রেসের বৃহৎ অংশ মনে করেন যে, পার্বত্য এলাকাগুলিকে আলাদা করার অর্থ হচ্ছে আসামের অংগচ্ছেদ করা, সেখানকার অন্যান্য সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের লোকদেরও বিচ্ছিন্ন হয়ে যাওয়ার প্ররোচনা দেওয়া।

গণপরিষদে যখন ভারতবর্ষের সংবিধান রচনা করা হচ্ছিল তখনই সমস্যাটা উঠেছিল। এই সমস্যার সমাধান করার উদ্দেশ্যে বড়দলৈ কমিটির সুপারিশ অনুসারে সংবিধানের ষষ্ঠ তপশীল প্রস্তুত করা হয়েছিল। ঐ তপশীলের দ্বারা আসামের সংযুক্ত খাসি-জয়ন্তিয়া হিলস্, গারো হিলস্, লুসাই হিলস (পরবর্তী কালে নামান্তরিত হয় মিজো জেলা), নাগা হিলস, উত্তর কাছাড় হিলস ও মিকির হিলস জেলাগুলিকে রাজ্যের প্রশাসনের মধ্যেই স্বায়ত্তশাসিত জেলা হিসাবে বিশেষ স্বীকৃতি দেওয়া হয়েছিল।

কিন্তু সমস্যার সমাধান হয়নি। নাগা পাহাড় ষষ্ঠ তপশীলের আওতা থেকে বেরিয়ে এসেছে। ঐ এলাকাটা আজ আর আসামের একটা জেলা নয়, স্বতন্ত্র রাজ্য। তাতেও সমস্যা মেটেনি। কেননা, সেখানে শুধু স্বতন্ত্র রাজ্যের দাবী নয়, ভারত রাষ্ট্রের বাইরে সার্বভৌম স্বাধীনতার আওয়াজ উঠেছে। স্বাধীনতার দাবী উঠেছে মিজো জেলায়ও। অন্যান্য জেলার স্বাতন্ত্র্যবাদীরা শুধু স্বায়ত্তশাসিত জেলার মর্যাদা নিয়ে সন্তুষ্ট নয়। ১৯৫৪ সালে রাজ্য পুনর্গঠন কমিশন এই দাবী বাতিল করে দিলেন। ১৯৬০ সালে এল অসমিয়াকে আসাম রাজ্যের সরকারী ভাষারূপে গ্রহণ করার প্রস্তাব। তখনই সরকারী ভাষা আইনের প্রতিরোধ করার উদ্দেশ্য নিয়ে গঠিত হল পাহাড়ী অধিবাসীদের রাজনৈতিক সংগঠন অল-পার্টি হিল লীডার্স কনফারেন্স বা সংক্ষেপে এ-পি-এইচ-এল-সি।

গত কয়েক বৎসরের মধ্যে এটা পরিষ্কার হয়ে গেছে যে, এই এ-পি-এইচ-এল-সি'র সঙ্গে সমঝোতায় না এসে আসামের পার্বত্য জেলাগুলির ভবিষ্যতের কোন মীমাংসা করা যাবে না। গত চতুর্থ নির্বাচনে, সংযুক্ত খাসি ও জয়ন্তিয়া হিলসে ও গারো হিলসে এ-পি-এইচ-এল-সি-র প্রার্থীরা যে সাফল্য দেখিয়েছেন তাতে এই ধারণা স্পষ্ট হয়ে উঠেছে। তাছাড়া এই ভয়ই আছে যে, এই পার্বত্য জেলাগুলির সমস্যার সমাধানে যত দেরী হবে ততই সেখানে নাগা পাহাড়ের ফিজো ও মিজো পাহাড়ের লালডেঙ্গার মত নেতাদের মাথাচাড়া দিয়ে ওঠার সম্ভাবনা দেখা দেবে যাঁরা শুধু আসাম রাজ্যের বিরুদ্ধে নয়, সরাসরি ভারতীয় যুক্তরাষ্ট্রের বিরুদ্ধে বিদ্রোহের ধ্বজা তুলবেন। সুতরাং আজ অপেক্ষাকৃত অল্প মূল্য দিয়ে এ-পি-এইচ-এল-সি-র সঙ্গে মীমাংসায় না আসা গেলে ভবিষ্যতে অধিকতর চরমপন্থীদের সঙ্গে মীমাংসায় না আসা গেলে ভবিষ্যতে অধিকতর চরমপন্থীদের সঙ্গে মোকাবেলায় হয়ত আরও অনেক বেশী মূল্য দিতে হবে।

কিন্তু, দুর্ভাগ্যের বিষয়, ঘটনার এই চাপ থাকা সত্ত্বেও এবং আসাম রাজ্যের বা রাজ্য প্রশাসনের পুনর্গঠন সম্পর্কে বহুবার বহু রকম প্রস্তাব হওয়া সত্ত্বেও, ভারতবর্ষের পূর্ব সীমান্তের এই অত্যন্ত স্পর্শকাতর অঞ্চলগুলির সমস্যা বলতে গেলে যেখানে ছিল সেখানেই রয়ে গেছে। তার মূল কারণ, আসাম রাজ্য থেকে তার পার্বত্য জেলাগুলির বিচ্ছেদ পাহাড় ও সমতল, দুয়ের পক্ষেই ক্ষতিকর হবে, এটাই ছিল বরাবর ভারত সরকারের অভিমত। ১৯৬২ সালের জানুয়ারী মাসে তৎকালীন প্রধানমন্ত্রী জওহরলাল নেহরু কেন্দ্রীয় সরকারের এই অভিমত আর একবার স্পষ্ট করে ব্যক্ত করলেন। তার আগেই তিনি প্রস্তাব দিয়েছিলেন যে, বৃটিশ যুক্তরাজ্যের মধ্যে স্কটল্যাণ্ডের জন্য যেমন একটা পৃথক শাসন ব্যবস্থা আছে তেমনি আসাম রাজ্যের প্রশাসনিক কাঠামোর মধ্যে পাহাড়ী জেলাগুলির জন্য পৃথক শাসন ব্যবস্থা করা যেতে পারে। পৃথক রাজ্যের দাবী প্রত্যাখ্যান করার সঙ্গে সঙ্গে তিনি তাঁর এই তথাকথিত "স্কটিশ ধাঁচের" প্রস্তাবের প্রশাসনিক তাৎপর্য বিশদভাবে ব্যাখ্যা করলেন। অর্থাৎ এ-পি-এইচ-এল সি'র দাবী অনুযায়ী আসামের পুনর্গঠন নয়, রাজ্যের প্রশাসনিক পুনর্গঠন, এই পর্যন্ত ভারতের প্রধানমন্ত্রী স্বীকৃত হলেন। দুই

বৎসর এই প্রস্তাব নিয়ে টানাহ্যাঁচড়া চলার পর ১৯৬৪ সালের এপ্রিল মাসে অল-পার্টি হিল লীডার্স কনফারেন্স নেহরুর প্রস্তাব মেনে নিলেন। কিন্তু এই প্রস্তাব কি করে কার্যে পরিণত করা যায় সে বিষয়ে পটাশকর কমিশনের সুপারিশ যখন প্রকাশিত হল তখন পার্বত্য জেলার নেতারা সেটা প্রত্যাখ্যান করলেন। ফলে, স্বাধীনতার পর সর্বপ্রথম এই বিচিত্র গোলোকধাঁধা থেকে বেরিয়ে আসার যে সামান্য সম্ভাবনাটুকু দেখা দিয়েছিল সেটাও নস্যাৎ হয়ে গেল।

ভারত সরকারের পক্ষ থেকে সুর পরিবর্তনের প্রথম ইংগিত পাওয়া গেল ১৯৬৬ সালের ডিসেম্বর মাসে। প্রধানমন্ত্রী শ্রীমতী ইন্দিরা গান্ধী শিলংয়ে ঘোষণা করলেন যে, পার্বত্য এলাকার অধিবাসীদের আশা-আকাঙ্ক্ষার পূরণ হয়, এমনভাবে আসামের পুনর্গঠন করা হবে। এর কয়েক-দিন পরেই, গত ১৩ই জানুয়ারী তারিখে প্রধানমন্ত্রী ও কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্র মন্ত্রীর সংগে এ-পি-এইচ-এল-সির নেতাদের বিস্তারিত আলোচনার পর ভারত সরকারের এক ইস্তাহারে জানান হল যে, আসামকে একটি যুক্তরাষ্ট্রের আকারে পুনর্গঠন করার সিদ্ধান্ত করা হয়েছে। অর্থাৎ আসাম হবে ভারতীয় যুক্তরাষ্ট্রের মধ্যে আর একটি যুক্তরাষ্ট্র—যার একটি অংশ সমতলের জেলাগুলি, অপর অংশ পাহাড়ী জেলাগুলি। কোন অংশটিই অপর অংশের অধীনস্থ হবে না।

কিন্তু কিছুদিনের মধ্যেই ভারত সরকার এই প্রস্তাব থেকে সরে এলেন। এই বিষয়ে সন্দেহ নেই যে, প্রধানত আসাম কংগ্রেসের চাপে ভারত সরকার এই যুক্তরাষ্ট্র গঠনের প্রস্তাবটি থেকে পিছিয়ে এলেন। তাছাড়া আর একটি যুক্তি ছিল এই যে, মিকির হিলসের মিকির উপজাতীয়েরা সংযুক্ত খাসি ও জয়ন্তিয়া হিলসের খাসি উপজাতির লোকদের সংগে একই রাজ্যের মধ্যে থাকতে রাজী হবেন না। (গত নির্বাচনে মিকির হিলসে কংগ্রেসের সাফল্য সেখানে পার্বত্য রাজ্যের সমর্থকদের দুর্বলতার পরিচয় দেয়।) অর্থাৎ এমন সম্ভাবনা আছে যে, আসামের পার্বত্য জেলাগুলিকে নিয়ে একটি পৃথক ইউনিট গঠন করলে অদূর ভবিষ্যতে আবার সেটি ভেঙে টুকরা করার প্রশ্ন দেখা দেবে।

এই পরিপ্রেক্ষিতেই গঠিত হয়েছিল অশোক মেহতা কমিটি। শ্রীঅশোক মেহতা এই কমিটির চেয়ারম্যান এবং এ-পি-এইচ-এল-সির দুজনসহ মোট ১১ জন তার সদস্য। এ-পি-এইচ-এল-সি এই কমিটি বয়কট করলেন। মেহতা কমিটি একটি পৃথক পার্বত্য রাজ্য গঠনের দাবী সরাসরি নাকচ করে প্রত্যেকটি পার্বত্য জেলার আইন সভাকে তার এক্তিয়ারভুক্ত কতকগুলি নির্দিষ্ট বিষয়ে সম্পূর্ণ স্বাধিকার দেবার প্রস্তাব করলেন।

গত ২৫শে সেপ্টেম্বর তারিখে নয়া দিল্লীতে প্রধানমন্ত্রী শ্রীমতী গান্ধী ও স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী শ্রীচ্যবনের সংগে এ-পি-এইচ-এল-সির প্রতিনিধি দলের আলোচনার পর অবশেষে অশোক মেহতা কমিটির রিপোর্ট পরিত্যক্ত হল এবং ঘোষণা করা হল যে, আগামী নভেম্বর মাসে পার্লামেন্টে এই অঞ্চলগুলির ভবিষ্যৎ সম্পর্কে কোন প্রস্তাব আনার আগে পার্লামেন্টের বিরোধী দলগুলির কাছ থেকে মতামত চাওয়া হবে। ভারত সরকারের পক্ষ থেকে বলা হয়েছে যে, যেহেতু এটা একটা জাতীয় সমস্যা সেহেতু তাঁরা সকল দলের সম্মতি নিয়েই
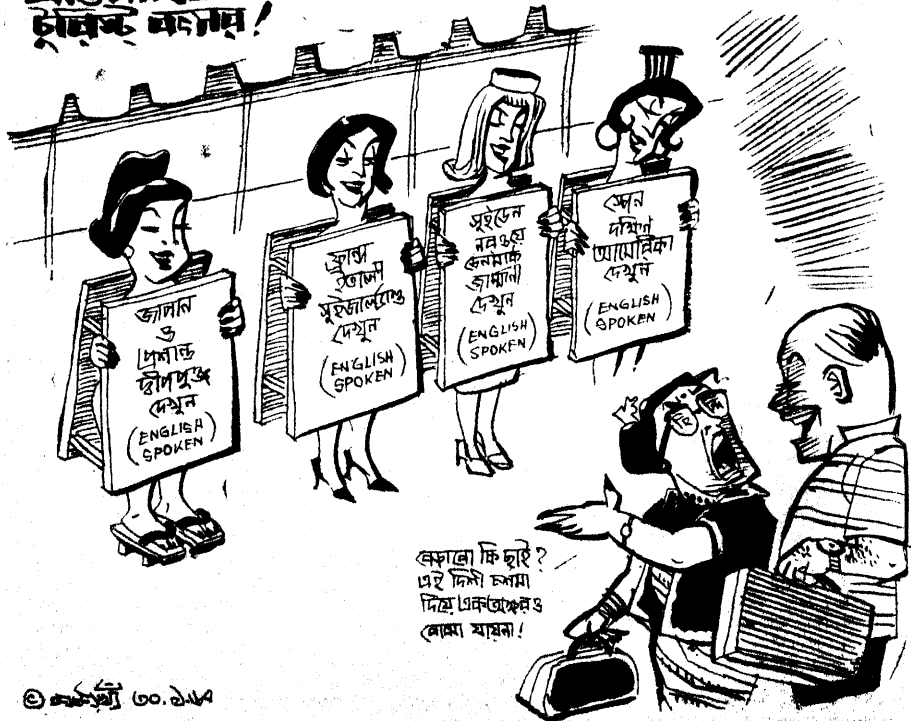
এই সমস্যা সমাধানের প্রস্তাব রাখতে চান। এই অঞ্চলগুলির পুনর্বিন্যাসের জন্য সংবিধান সংশোধন করতে হবে। তার জন্য পার্লামেন্টের সদস্যদের দুই-তৃতীয়াংশের সমর্থন প্রয়োজন। সেদিক থেকেও পার্লামেন্টের বিরোধী দলগুলির সংগে আগে থেকে পরামর্শ করা বাঞ্ছনীয়।

ভারত সরকারের এই ঘোষণা স্পষ্টতই এ-পি-এইচ-এল-সিকে সন্তুষ্ট করেছে। তাঁরা আশা করছেন যে, পার্লামেন্টের বিরোধী দলগুলি তাঁদের পৃথক রাজ্য গঠনের দাবী মেনে নেবেন।

অন্যদিকে, আসাম কংগ্রেসের প্রতিক্রিয়া ভাল হবে বলে মনে হচ্ছে না। আসাম প্রদেশ কংগ্রেস কমিটির কার্যনির্বাহক সমিতির এক প্রস্তাবে ইতিমধ্যে আসামকে খণ্ডিত করার চেষ্টার বিরুদ্ধে আপত্তি জানান হয়েছে।

এ-পি-এইচ-এল-সি নেতা অধ্যাপক জি জি সোয়েল সম্প্রতি কলকাতায় এক বিবৃতিতে কেন্দ্রীয় সরকারকে এই বলে সতর্ক করে দিয়েছেন যে, তাঁরা যেন কোন অবস্থাতেই আসাম কংগ্রেসের 'চাপের সামনে নতিস্বীকার না করেন।" কেননা, "পাহাড়ের বাসিন্দাদের উপর সমতলবাসীদের রাজনৈতিক আধিপত্য প্রতিষ্ঠা করাই" হচ্ছে কংগ্রেসের উদ্দেশ্য।

কাছাড় জেলা কংগ্রেস অবশ্য এই ব্যাপারে প্রদেশ কংগ্রেসের সঙ্গে তাঁদের মতভেদ ঘোষণা করেছেন। তাঁরা বলেছেন যে, বাংলাভাষী-প্রধান কাছাড়কেও একটি পৃথক রাজ্য হিসাবে স্বীকার করে নেওয়া হোক।

বিশ্ব ব্যাংকের রিপোর্ট

প্রায় একই সময়ে, গত সপ্তাহে, পৃথিবীর দুই প্রান্তে দুটি আন্তর্জাতিক সম্মেলন বসেছিল একটি সাধারণ প্রশ্নের মীমাংসার জন্যে: কিভাবে উন্নতিশীল দেশগুলিকে বর্তমান অর্থনৈতিক সংকটের পঙ্কভূমি থেকে উদ্ধার করা যায়।

তবে দুটি সম্মেলনের চরিত্র ছিল আলাদা। একটি—ব্রাজিলের রাজধানী রিও ডি জেনিরোয় বিশ্ব ব্যাংক ও আন্তর্জাতিক অর্থ তহবিলের যুগ্ম বৈঠক—ছিল সমৃদ্ধ দেশগুলির প্রতি উন্নতিশীল দেশগুলি সম্পর্কে আরো বেশী সহৃদয় হবার জন্যে আবেদন; আর দ্বিতীয়টি—ব্যাংককে এশিয়া ও দূর প্রাচ্য সম্পর্কে রাষ্ট্রসংঘের অর্থনৈতিক কমিশনের অধিবেশন—আবেদন ছিল এশিয়া ও দূর প্রাচ্যের দেশগুলির প্রতি, নিজেরা আরো বেশী সঙ্ঘবদ্ধ ও তৎপর হবার জন্যে।

রিও ডি জেনিরোর সম্মেলনে বিশ্ব ব্যাংকের চেয়ারম্যান মিঃ জর্জ উডস্ যে ভাষণ দেন তাতে 'উন্নয়নের দশকের' (রাষ্ট্রসংঘের পক্ষ থেকে বর্তমান দশককে উন্নয়নের দশক হিসেবে চিহ্নিত করা হয়েছে) প্রত্যাশার অপমৃত্যুতে উন্নয়নশীল দেশগুলির হতাশা প্রকাশিত হয়েছে।

মিঃ উডস্ বলেন, সমৃদ্ধ দেশগুলিকে আজ তাদের বৈদেশিক সাহায্যদানের নীতি ও রীতি সম্পর্কে নতুন করে ভাবতে হবে। কুড়ি, এমনকি ১০ বছর আগেও যে নীতি চলত, বিশ্বব্যাপী উন্নয়নের প্রয়োজনের পরিপ্রেক্ষিতে তা আর যথেষ্ট নয়।

তাঁর মতে সমৃদ্ধ দেশগুলির সামনে দুটি আশু কর্তব্য রয়েছে: এক, বৈদেশিক বাণিজ্য ও সাহায্য দানের নীতি উদারতর করা এবং আন্তর্জাতিক উন্নয়ন সংস্থা যাতে অনুন্নত দেশগুলির প্রয়োজন আরো ভালোভাবে মেটাতে পারে সেজন্যে সংস্থার সম্পদ বৃদ্ধি করা। যদি এই দ্বিবিধ কার্যসূচী গ্রহণ করা না হয়, তাহলে সমৃদ্ধ ও দরিদ্র দেশের মধ্যে ব্যবধান বেড়েই যাবে।

মিঃ উডস্ বলেন, রাসায়নিক সার কিংবা জন্মনিরোধক বড়ি দিয়ে পৃথিবীকে রক্ষা করা যাবে না। তার জন্যে আরো ব্যাপক তৎপরতা দরকার। তিনি দেখান উন্নতিশীল দেশগুলিতে বর্তমানে যত অর্থনৈতিক বিনিয়োগ হচ্ছে, তার তিন চতুর্থাংশই আসছে উন্নতিশীল দেশগুলির নিজেদের সম্পদ থেকে। সমৃদ্ধ দেশগুলি যে দীর্ঘমেয়াদী অর্থনৈতিক সাহায্য দিচ্ছে তা তাদের (উন্নত দেশগুলির) জাতীয় আয়ের মাত্র এক শতাংশ। এই অবস্থা মোটেই বাঞ্ছনীয় নয়, কারণ উন্নতিশীল দেশগুলির ওপর এর ফলে প্রচণ্ড চাপ পড়ছে।

সম্মেলনে ভারতীয় প্রতিনিধিদলের নেতৃত্ব করেন উপ-মুখ্যমন্ত্রী ও অর্থমন্ত্রী শ্রীমোরারজী দেশাই। শ্রীদেশাইও তাঁর বক্তৃতা প্রসঙ্গে আশা করেন যে, আন্তর্জাতিক উন্নয়ন পরিকল্পনা রূপায়ণের জন্যে পর্যাপ্ত পরিমাণ অর্থ পাওয়া যাবে।

রিও ডি জেনিরো বৈঠকের আলোচনার পটভূমি তৈরী করে দিয়েছিল বিশ্ব ব্যাংকের ১৯৬৬-৬৭ সালের রিপোর্ট। বৈঠকের প্রাক্কালে এই রিপোর্ট প্রকাশিত হয় যে, ১৯৬৬ সালে উন্নতিশীল দেশগুলির 'গ্রোস ডোমেস্টিক প্রডাক্ট' ৫ শতাংশ বেড়েছিল, তবু কৃষি উৎপাদনে ব্যর্থতা, শিথিল রপ্তানী বাণিজ্য এবং উপযুক্ত শর্তে বৈদেশিক সাহায্যের অভাব তাদের অর্থনৈতিক বিকাশকে ব্যাহত করেছিল। এই অবস্থা থেকে, রিপোর্টে বলা হয়েছে, বর্তমান দশকে উদ্ধার পাবার আশা কম।

এই প্রসঙ্গে রিপোর্টে আরেকটি বিপদের কথা বলা হয় যা অনুন্নত দেশগুলির অর্থনীতিকে পঙ্গু করতে চলেছে। সেটা হচ্ছে ঋণ পরিশোধের বিপদ। এব্যাপারে সংশ্লিষ্ট দেশগুলির দায়-দায়িত্ব যে হারে বাড়ছে তাদের রপ্তানী সেই হারে বাড়ছে না। এটা অত্যন্ত আশঙ্কার কথা।

১৯৬৬ সালে ৯৫টি উন্নতিশীল দেশের ঋণ শোধের দায় ছিল প্রায় ৪০০ কোটি ডলার (এর মধ্যে ১২০ কোটি ডলার ছিল সুদ)। ১৯৬২ থেকে ১৯৬৪ পর্যন্ত এই বকেয়ার দায় বছরে ১৬ শতাংশ হারে বেড়েছিল। ১৯৬৬ সালের মাঝামাঝি এসে মোট দায়ের পরিমাণ দাঁড়ায় ৪,১০০ কোটি ডলার।

ভারতের অবস্থা আরো উদ্বেগজনক। ভারতের ঋণ পরিশোধের দায় ১৯৬৬ সালের ১০ শতাংশ থেকে বেড়ে ১৯৬৬ সালে ২২ শতাংশে দাঁড়ায়। অর্থাৎ এই দায় ৮৪ শতাংশ হারে বেড়েছিল। অপর পক্ষে ভারতের রপ্তানী বেড়েছিল মাত্র ১৪ শতাংশ। এই বিপুল ঋণের বোঝা থেকে উন্নতিশীল দেশগুলিকে কিছুটা রেহাই দেওয়া যায় কিনা সেটা ভেবে দেখবার জন্যে রিপোর্টে সমৃদ্ধ দেশগুলির কাছে আহ্বান জানানো হয়।

ব্যাংককের অধিবেশনে ভারতের বাণিজ্য-মন্ত্রী শ্রীদীনেশ সিং বলেন, উন্নতিশীল দেশগুলি যদি সমস্যার সমাধান চায় তবে তাদের একযোগে কাজ করতে হবে। এমন অনেক সমস্যা আছে যেগুলির সমাধান হলে বিভিন্ন দেশের ওপর বিভিন্ন রকম প্রতিক্রিয়া দেখা দেবে। সুতরাং ঐক্যবদ্ধ দৃষ্টিভঙ্গী নিয়ে এগোতে না পারলে ঐসব সমস্যার কোন যুক্তিসঙ্গত সমাধান পাওয়া সম্ভব নয়।

আগামী বছর দিল্লীতে রাষ্ট্রসঙ্ঘের বাণিজ্য ও উন্নয়ন সংক্রান্ত সম্মেলনের দ্বিতীয় অধিবেশন বসবে। শ্রীসিং বলেন, ঐ অধিবেশনে উন্নতিশীল দেশগুলি যেন একযোগে বাজার শর্ত গঠনের জন্য দাবী জানান।

তিনি বলেন, চা, রবার, পাট, টিন, চাল, মশলা, তৈলবীজ ও অন্যান্য পণ্য সংক্রান্ত নীতিতে এশিয়ার প্রত্যক্ষ স্বার্থ রয়েছে। দিল্লী সম্মেলনে পণ্য সংক্রান্ত আন্তর্জাতিক নীতি নির্ধারণের সময় এই স্বার্থের দিকে নজর রাখতেই হবে।

গোঁসাই কুণ্ডর ডায়েরি

তৃপ্তি বিশ্বাস

সমুদ্রমন্থন করে অমৃত তুলে আনলেন দেবতা ও দানবেরা। মন্থনের দণ্ড হল মন্দার পর্বত মন্থন-রজ্জু হল বাসুকি-নাগ। সহস্র বৎসর ক্রমান্বয়ে মন্থনের ফলে বাসুকির মুখ থেকে ঝলকে ঝলকে নির্গত হল কালকূট। বিষের প্রভাবে সৃষ্টি যায় রসাতলে। তখন দেবতাদের অনুরোধে দেবাদিদেব মহাদেব সেই বিষ কণ্ঠে ধারণ করে "নীলকণ্ঠ" হলেন। কিন্তু কালকূটের প্রভাবে সৃষ্ট গাত্রদাহ প্রশমিত করবার জন্য মহাদেব হস্তস্থিত ত্রিশূল দিয়ে হিমালয়ের বিশাল প্রস্তরবক্ষ বিদীর্ণ করে জল নিয়ে এলেন। জল জমে জমে সৃষ্টি হল একটি বিরাট কুন্ডের। সেই কুন্ডের শীতল জলে প্রশমিত হল দেবাদিদেবের গাত্রদাহ। কুন্ডের নাম তাই "গোঁসাইকুন্ড।" সেই গোঁসাইকুন্ড দেখতে চলেছি এবার।

নেপালের রাজধানী কাঠমান্ডুর উত্তরে বিশাল পর্বতমালা। ল্যাংট্যাং হিমল। তারই কিছু দক্ষিণে হিমালয়ের সুউচ্চ প্রদেশের তুষারাঞ্চলের একটি বিস্তীর্ণ এলাকা জুড়ে আছে গোঁসাইকুন্ড; গোঁসাইথান শিখরের পাদদেশে। এই গোঁসাইথান নেপালের অন্তর্গত হিমালয়ের একটি শিখর। পৃথিবী-খ্যাত গোঁসাইথানকে এর বড় ভাই বলা চলে। সেই গোঁসাইথান (উচ্চতা ২৬,২৯১ ফুট) আরও উত্তরে তিব্বতের অন্তর্গত। ১৯৬৪ সালে চীনদেশীয় পর্বতারোহী হিউসচ্যান সেই দুর্গম শিখরটিতে আরোহণ করতে সমর্থ হন।

নেপালীরা বলে, গোঁসাইকুন্ড এলাকাতে একশ আটটি কুন্ড আছে। সমস্ত এলাকাটি ঘুরে দেখিনি। সর্ববৃহৎ হ্রদটিতে যাতা-য়াতের পথে আমরা দশটি কুন্ড দেখতে পেয়েছিলাম। সবগুলি কুন্ডই ১৬৫০০—১৭০০০ ফুট উঁচুতে অবস্থিত। হিমবাহ-সৃষ্ট বিভিন্ন আকারের স্বাভাবিক হ্রদ।

আমরা ট্রেনে কলকাতা থেকে পাটনা হয়ে সেখান থেকে এরোপ্লেনে কাঠমান্ডু গেলাম। কাঠমান্ডুর ট্যুরিস্ট অফিসে খোঁজ করে খবর সংগ্রহ করতে হল। পথের নিশানা, দূরত্ব, মালবাহক কুলি, সবেরই ব্যবস্থা ওখানেই করতে হবে।

ট্যুরিস্ট অফিসে ঢুকেই দেখা মিঃ জগদীশ মানসিং-এর সাথে। উনি এখানকার একজন ট্যুরিস্ট অফিসার। এঁর সঙ্গে প্রথম আলাপ হয় পোখারাতে, ১৯৬৫ সালে মুক্তিনাথ যাবার পথে। ইনি তখন পোখারার ট্যুরিস্ট অফিসার। আমাদের সঙ্গে খানিকটা বন্ধুত্বও হয়ে গিয়েছিল। তাই মিঃ মানসিংকে দেখে আমরা সকলে উৎফুল্ল হয়ে উঠলাম। তিনি বললেন, বহুকাল আগে তিনি একবার গোঁসাইকুন্ডে গিয়েছিলেন, তার সব কথা স্মরণে নেই। তবে খাতাপত্র দেখে আমাদের পথের মোটামুটি একটা ম্যাপ এঁকে দিলেন এবং যথাসম্ভব বর্ণনাও দিলেন।

প্রস্তুতিপর্ব বলতে অতি সংক্ষিপ্ত। মোট দশ-বারো দিনের হাঁটাপথ। পথে খাদ্য বা অন্য কোন রকম সুবিধা কিছুই পাওয়া যাবে না। সুতরাং দৈনন্দিন প্রয়োজনীয় সব জিনিষ সংগ্রহ করে মালবাহকের পিঠে চাপিয়ে নিতে হবে। পথে দুই তিনটি দিন কেবল গ্রাম পাওয়া যাবে সেখানে থাকবার স্থান মিলবে, কিন্তু বাকি ক'দিনের পথে গ্রাম নেই। অর্থাৎ বারো হাজার, সাড়ে বারো হাজার ফুটের উপর লোকালয় নেই, ঠান্ডার জন্য থাকা সম্ভবও নয়। কিন্তু সেখানেও কোথাও কোথাও গরু-ভেড়া চরাবার কালে পাহাড়ের উপরে রাত কাটাবার জন্য তৈরি কুটির বা খুপরি আছে। সেই সব খুপরিতে মিলবে মাথা গোঁজবার আস্তানা। এইসব খুপরি সাধারণতঃ জলের ধারেই তৈরি করা হয়। তাই ঘর পেলে জলের সমস্যাও মিটবে। কোথাও কোথাও রাত্রিবাস করবার যোগ্য পাহাড়ের গুহাও পাওয়া যাবে। তবে তাঁবু সঙ্গে থাকলে সবচেয়ে ভাল।

আরও একটি সুসংবাদ দিলেন, ওদিকের জঙ্গলে একটা নরখাদক চিতাবাঘ বেরিয়েছে। ইতিমধ্যে সাতজন লোকের প্রাণহানির সংবাদ পাওয়া গেছে। আমরা যেন সর্বদা সাবধানে চলাফেরা করি!

কাঠমান্ডু থেকে গোঁসাইকুন্ড যাবার দুটি হাঁটাপথ আছে। প্রথমটি কাঠমান্ডুর পূবে সুন্দরীজল হয়ে। অন্যটি কাঠমান্ডুর উত্তরে ত্রিশূলী বাজার হয়ে। ত্রিশূলী বাজারের উচ্চতা ২৫০০ ফুটের মতন এবং সুন্দরী-জলের উচ্চতা ৬০০০ ফুট। তবু ত্রিশূলী বাজারের পথ সর্বসম্মতভাবে সহজ, যদিও এ পথে অনেক বেশী চড়াই উঠতে হবে। আমরা স্থির করলাম সুন্দরীজল হয়ে যাবো এবং ত্রিশূলীবাজারের পথে ফিরবো। তাহলে দুটো পথই আমাদের দেখা হবে।

কুলির হদিস মিঃ মানসিং দিতে পারলেন না। বললেন, হিমালয়ান সোসাইটি কুলির বন্দোবস্ত করে দিতে পারে। হিমালয়ান সোসাইটিও এখন ভালভাবে সক্রিয় নয়। তবু সেখানে যে লোকটিকে পাওয়া গেল, সে-ই কুলির ব্যবস্থা করে দিল।

মিঃ গাঙ্গুলী কাঠমান্ডু কলেজের প্রিন্সিপ্যাল ছিলেন। বহু বছর নেপালে আছেন। তিনি বললেন, বোধনাথে যে লামা থাকেন, "চিনিয়ালামা", তিনি এ বিষয়ে সাহায্য করতে পারবেন। চিনিয়ালামা গোঁসাই-কুন্ডের নিকটস্থ অঞ্চল হেলম্বুর অধিবাসী। হেলম্বুর রাজা বললেও অত্যুক্তি হয় না। এ পথে তাঁর অখন্ড প্রতাপ। তিনি ভাল কুলি সঙ্গে দিতে পারবেন। কিন্তু হিমালয়ান সোসাইটির লোক আগেই পেয়ে গেলাম, তাই আর 'চিনিয়ালামার' কাছে যাওয়া হোল না

মিঃ মানসিং আরও বললেন, এটি তীর্থ-যাত্রার সময় নয়, যাত্রার সময় জুলাই-আগস্ট। তখন [illegible] পথে কোথাও খাবার পাওয়া যায় না। যাত্রার সময় বহু লোকজন যায়, সাময়িক দোকানপাটও বসে। তাছাড়া গভর্ণমেন্ট থেকে কিছু কিছু অস্থায়ী ঘরও তৈরী করে দেওয়া হয়। এখন সে সব সুবিধা পাওয়া যাবে না। তাঁবু সঙ্গে থাকলে কোন কথাই নেই। আমরা কলকাতা থেকে মোটামুটি জিনিষপত্র সব সংগ্রহ করেই নিয়ে গিয়েছিলাম, কিন্তু অপ্রয়োজনীয় বোধে এবার তাঁবু আনিনি। কাঠমান্ডুতে সংগ্রহ করাও সময়সাপেক্ষ। তাছাড়া এখন দেরী করতেও মন সরছে না। তাই জগদীশ মানসিং-এর পরামর্শমত 'গুহা' ও কাউশেডের ভরসাতেই রওনা হয়ে পড়া গেল।

(২)

১১ই অক্টোবর, ১৯৬৬ সাল : প্রত্যুষে হোটেল ছেড়ে একটা জীপে যাবতীয় মাল চাপিয়ে নিয়ে আমরা তিনজন যাত্রী ও চারজন মালবাহক যাত্রা করলাম। জীপ চললো পূর্বদিকে, নেপালের বিখ্যাত বৌদ্ধস্তূপ বোধনাথ হয়ে গোকর্ণ, তারপর সোজা উত্তরে সুন্দরীজলের দিকে। কাঠ-মান্ডু থেকে আট মাইল দূরে সুন্দরীজল। এপর্যন্ত চমৎকার বাঁধানো চওড়া রাজপথ। কাঠমান্ডুর পর্বতঘেরা শ্যামল উপত্যকার মধ্য দিয়ে আঁকাবাঁকা লালরঙের পথে গাড়ী চললো। সম্মুখে এগিয়ে আসছে পার্বত্যা-ঞ্চলের বন্ধুর প্রদেশ। সুন্দরীজল থেকে হাঁটাপথের শুরু। এখানে বিরাট বিরাট কয়েক-খানা সুদৃশ্য দালানের সম্মুখে জীপ আমাদের নামিয়ে দিল। এই ঘরবাড়ীগুলি সুন্দরীজল ওয়াটার ওয়ার্কসের। এই ওয়াটার ওয়ার্কস্ ভারত গভর্ণমেন্ট তৈরি করে দিয়েছেন নেপালের সঙ্গে বন্ধুত্বের নমুনা হিসাবে। মাত্র কয়েকদিন আগেই ভারতের প্রধানমন্ত্রী শ্রীমতী ইন্দিরা গান্ধী এটির উদ্বোধন করেছেন। বাগমতী নদীতে বাঁধ বেঁধে তৈরী করা হয়েছে জলাধার। সেই জল পরিশ্রুত করে মোটা পাইপ দিয়ে নীচে এনে কাঠমান্ডুর সর্বত্র সরবরাহ করা হচ্ছে।

ভোরে যাত্রার আয়োজনের তাড়াহুড়াতে আমাদের খাওয়া হয়নি। বিশেষ করে কুলিরা জমায়েত হতে দেরী করাতে আমাদের রওনা হতে দেরী হয়ে গিয়েছিল। তাই এখন খানিকটা চড়াইপথে উঠে, সুন্দরীজল গ্রামে পৌঁছে, পথের ধারে একখানা পরিচ্ছন্ন দোকানে বসে পড়েছি সবাই। চা বা দুধ নিমকি ও প্যাঁড়া দিয়ে জলযোগ করে নিয়ে এবার হাঁটাপথে যাত্রা শুরু করা গেল।

এখনকার পথ কেবল পাথরে বাঁধানো চওড়া সিঁড়ি। সেই সিঁড়ি যেন অন্তহীন-ভাবে উঠেই চলেছে। সিঁড়ির ডানদিকে এক-টানা বেয়ে গেছে মস্ত মোটা কালো রঙের পাইপ, কাঠমান্ডু শহরের জন্য জল বহন করে। তারপাশেই বাগমতী নদী উচ্ছলরূপে বয়ে চলেছে।

খানিকটা উঠে পিছন ফিরে তাকিয়ে দেখি, দূরে সুন্দরীজলের ঘরবাড়ীগুলি গাছপালার মধ্য দিয়ে উঁকি দিচ্ছে। আরও দূরে কাঠমান্ডু উপত্যকা; বাগমতী নদী

উপত্যকার বুক চিরে বয়ে চলেছে, যেন সরু রুপোলী ক্ষীণধারা। দিগন্তরেখাতে ধূসর পর্বতমালার সারি প্রহরীর মত দাঁড়িয়ে কাঠমাণ্ডুর চতুর্দিক ঘিরে যেন পাহারা দিচ্ছে।

আরও কিছুটা উঠতেই সুন্দর একটা ঝরণা পাওয়া গেল, ঘাটখোলা নদী। পথের বাঁদিকে উঁচু থেকে নেমে এসে বাগমতীর জলের ধারার সঙ্গে মিশেছে। বাগমতীর রূপও এখানে অতি অপরূপ। [illegible] ঝরণার ধারা কলস্বরে বয়ে চলেছে [illegible] মিলনক্ষেত্র আরও অপরূপ!

সিঁড়ি-সিঁড়ি-সিঁড়ি। একটানা সিঁড়ি উঠেই চলেছি। পথের ধারে, বনের মধ্যে, গাছের আড়াল থেকে একখানা সুন্দর ঝকঝকে বাড়ী উঁকি দিচ্ছে। ওয়াটার ওয়ার্কসের আরেকটি অফিস। আরও একটু এগিয়ে বিশাল জলাধারের কাছে আমরা পৌঁছে গেলাম। মস্ত চৌবাচ্চার মত অর্ধনা-[illegible] জলাধারের জল সঞ্চয় করা। জলাধারের পাশে একটা সরু সোজা পার হয়ে আবার চড়াইপথ উঁচুর দিকে উঠে গেছে। এখন আর সিঁড়ি বিশেষ নেই, তবে তেমনি খাড়া চড়াই, পাথরে খাপকাটা আছে কোথাও, কোথাও তাও নেই। সেখানে পায়ে হাঁটা বেশ কঠিন। তাই হাতের সাহায্যও নিতে হচ্ছে মাঝে মাঝে। চলা বেশ কষ্টকর, তার উপর হাঁটাপথের প্রথমদিন বলে একেবারে দম পাচ্ছি না, অল্পেতেই হাঁপিয়ে পড়ছি।

এপথের প্রথম গ্রাম মুলখড়ক। ধীরে ধীরে চলে বেলা পৌনে বারটায় আমরা মুলখড়ক পৌঁছলাম। গ্রামের মাঝামাঝি, পথের পাশে একখানা ঘরের বারান্দার সামনে ছোট একটুখানি উঠান, তারই একপাশে ধারা থেকে ক্রমাগত জল পড়ছে। সেখানেই স্নানের ব্যবস্থা। রান্নার জন্য ঘরের ভিতর উনুন জেলে নিয়েছে লামা। লামা আমাদের দলের কুলিদের 'নায়েক' বা দলপতি। তারই নির্দেশে সকলের চলা ও থামা। রান্নাও সে-ই করবে। অন্যসকলে তাকে সাহায্য করবে। পথনির্দেশ করবার ভারও তারই উপর। এপথে সে দু'বার এসেছে, সুতরাং পথঘাট সবকিছু জানে বলে দাবী করে সে। অল্পবয়সী ফুটফুটে ছেলেটি। গোলাপীরঙের গাল ফুটে লাল আভা বেরুচ্ছে। প্রথমদিন পরিচ্ছন্ন পোষাক পরে যখন দেখা করতে এসেছিল, তখন বিশ্বাস করতে মন চায়নি যে, এই কোমল তরুণ ছেলেটি এমন কঠিন পথে মালবহন করে চলতে পারবে। দলে আরও একটি বাচ্চা ছেলে আছে, কৃষ্ণবাহাদুর, সে অবশ্য লামার চেয়েও কমবয়সী। সে-ও সকলের সঙ্গে সমান ওজনের মাল বহন করে নিয়ে চলেছে।

খাওয়াদাওয়ার পর মুলখড়ক ছেড়ে বের হতে সোয়া একটা বেজে গেল। চলেছি পাতিভঞ্জনের দিকে। এখনো চড়াইপথে চলা। উঠতে উঠতে মনে হল উপরে চড়াই শেষ হয়ে গেছে। মনে আশার সঞ্চার হলো, এবার হয় সামান্য উৎরাই, কিম্বা সমান পথ পাওয়া যাবে। অনেক কষ্টে হাঁচড়ে পাঁচড়ে চড়াইর মাথাতে উঠে [illegible] 'মাথার' উপর আরেকটা মাথা, অবিকল আগেরটির মতন। নতুন উদ্যম নিয়ে আবার ওঠা শুরু করি। এবার? এবার নিশ্চয় ভাল পথ। হায় ভগবান! সেটার শেষে আরও একটা মাথা দেখা দেয় যে! এমনিভাবে হিমালয় তার সহস্র 'মাথা' নিয়ে আমাদের সামনে এগিয়ে আসছে। এর যেন আর শেষ নেই!

ঘণ্টাদুই পর [illegible] শুরু হল, চড়াইও [illegible] কম। তাই চলতে ভাল লাগছে। [illegible] সৌন্দর্যের অবধি নেই, সব গাছে ফুল নেই বটে, কিন্তু ঝোপের মত গাছগুলিই যেন হাতছানি দিয়ে ডাকে, এগিয়ে চলতে সাহায্য করে। অজস্র ফুলহীন রডোডেনড্রন গাছ ছড়িয়ে আছে। এখন তার ফুল ফোটার সময় নয়, এপ্রিল মে মাসে সে পর্ব শেষ হয়ে গেছে। পথ কিন্তু সর্বত্র ভাল নয়। কোথাও কোথাও পথ ধসে গেছে। বনের মধ্য দিয়ে গাছপালার ডাল সরিয়ে চলেছি। কোথাও পথ ফেটে চৌচির হয়ে মস্ত হাঁ হয়ে আছে, হয়তো বর্ষার জলে মাটি ধুয়ে গেছে, তাই পাহাড়ের ফাটল বেরিয়ে পড়েছে, সেখানে চারহাতপায়ের সাহায্য নিয়ে উঠতে হচ্ছে।

নেপালী [illegible] দল বেঁধে মুলখড়কের দিকে চলেছে। তাদের সঙ্গে পথে দেখা হচ্ছে। ভাষার অসুবিধার জন্য কথাবার্তা এগোয় না। এরা কেউ কেউ পিঠে একরাশ নেপালী টুকরি বিক্রির জন্য বয়ে নিয়ে চলেছে, কেউ বন থেকে ঘাস কেটে টুকরি বোঝাই করে নিয়ে চলেছে, কেউবা অন্য মালপত্র নিয়ে চলেছে, মেয়েরা ছেলেদের সাথে সাথে সমানতালে চলেছে, তাদের সমান মাল পিঠে নিয়ে। চৌকোণা লম্বাধাঁচের টুকরিগুলি দড়ি দিয়ে আটকে, কপাল থেকে একটা মোটা ফিতে দিয়ে পিঠের উপর ঝোলানো। ওদের ভাষা না বুঝলেও হিন্দি-নেপালী মিশিয়ে জিজ্ঞাসা করি—

"পাতিভঞ্জন কতি বাটছে?"—পাতিভঞ্জন কত দূরে?

একটি বর্ষীয়সী মহিলা এগিয়ে এলেন। লালরঙের সাড়ী ঘাঘরার মত করে পরা, গাঢ় নীলরঙের লম্বাহাতা ব্লাউস, কোমরে একখানা মস্ত লম্বা সাদা কাপড় জড়ানো, গলায় একরাশ রঙিন পুঁতির মালা, কানে কানপাশ, নাকে বেসর, বলেন—"দূর ছই—পুগছু না।"

বুঝলাম, অনেকদূর; আজ বেলা হয়ে গেছে, আজ আর পাতিভঞ্জন পৌঁছবার আশা নেই। অন্যান্য মেয়ে পুরুষরা আমাদের দিকে ফিরে ফিরে গুনগুন করে নিজেদের মধ্যে আলাপ করে। দু'টা একটা কথা কেবল কানে আসে—"বঙালী ছই, বঙালী ছই!"

বেলা তিনটার পর বনভূমি পার হয়ে একখানা ছোট্ট গ্রাম পেলাম, মোটে দুটি ঘর এখানে। এখানে আমরা থামবো না। ঘরের মালিকের কাছ থেকে জল চেয়ে নিয়ে আকণ্ঠ পান করলাম। প্রশ্ন করে বোঝা গেল, পরের গ্রাম বনলুংভঞ্জন তত দূরে নয়। রাস্তার ধারে পাথরে বসে বিশ্রাম করে আবার চলা শুরু। গ্রামের ক্ষেত শেষ হতে হতেই আবার গভীর বনের শুরু, পথও চড়াই। এই ঘনবনের মধ্য দিয়ে চড়াইপথে প্রায় ঘণ্টাখানেক চলার পর বন ক্রমশঃ হাল্কা হয়ে এল। অচিরেই আমরা বনলুংভঞ্জন গ্রামের ঘরগুলিতে পৌঁছে গেলাম।

শেষপ্রান্তে যেখানে গ্রামের শুরু হয়েছে, সেখানেই ক্ষেতের সরু। শস্য ফলে সবুজ হয়ে আছে চারধারটা, মাঝখানে ঘরকটি তৈরি।

'নায়েক' ব্যস্ত হয়ে ওঠে, ঘর ঠিক করতে হবে। তার পিঠের বোঝা নামিয়ে রেখে তাই এদিকসেদিক ছুটে বেড়ায়। কেউ ঘরে থাকতে দিতে চায় না। অনেক বলে কয়ে, ঘরভাড়া বাবদ ৪্ কবুল করে রাত কাটাবার যোগ্য ছোট্ট একখানা কামরা পাওয়া গেল। ঘরখানির প্রায় মাঝামাঝি খানিকটা জায়গা গর্ত করে পাথরে বাঁধানো। সেখানে আগুন জ্বলছে। তার ঠিক উপরে, উঁচু বাঁশের মাচাতে একরাশ জ্বালানী কাঠ কেটে বোঝাই করা। কালো ঝুলে কাঠগুলি কালো হয়ে গেছে। ঘরের একপাশে আমরা আমাদের বিছানা তিনটি পেতে নিলাম। গৃহের মালিক সস্ত্রীক দুটি কন্যা নিয়ে দোতলার নীচু মাচাতে রাত কাটাবেন। লামা তার দলবল নিয়ে বারান্দায় রইল।

বারান্দার একপাশে বাঁশের তৈরি বেঞ্চির আকারের মাচা। তার উপর বসে বসে দেখি, মেঘের ফাঁক দিয়ে গণেশ হিমলের উজ্জ্বল চূড়া একটু একটু ঝিকমিক করে উঠেছে। সন্ধ্যার মুখে আমাদের ভাগ্নে 'মধু'র ডাকাডাকিতে বাইরে বেরিয়ে এক অপূর্ব সুন্দর দৃশ্য দেখি। গ্রামের সবুজ ক্ষেতের শেষপ্রান্ত বনের গাছগুলির মধ্যে মিলিয়ে গেছে, তারওপরে বনটা যেন ধোঁয়াটে পাহাড়ের সঙ্গে একাকার হয়ে গেছে। আরও একটু দূরে, আকাশের দিকে তাকালেই চোখে পড়ছে তুষারশৃঙ্গাবলী। পড়ন্ত সূর্যালোকে এখন টুকটুকে লাল হয়ে উঠেছে। যেন আকাশে কয়েক টুকরা উজ্জ্বল লাল রঙের মেঘ ভেসে আছে।

সূর্য ডুবতেই প্রচন্ড শীত নেমে এল। তারউপর চলার পরিশ্রমে আমাদের জামা ঘামে ভিজে জবজবে হয়ে আছে, এখন থেমে থাকাতে আরও বেশী শীতবোধ হচ্ছে।

আমাদের আশ্রয়দাতা গৃহকর্তার দু'টি ছোট ছোট মেয়ে ঘরের ভিতর উনুনের ধারে বসে ফুঁ দিয়ে আগুন উসকে দিচ্ছে। সেই আগুনের উত্তাপে আমরা ক্লান্ত শীতার্ত শরীর তাজা করে নিই। আগুনের ধার ছেড়ে আর উঠতে ইচ্ছে করে না।

আজ আমরা 'সেওপুরী' পর্বতমালার উচ্চতম প্রান্তে বসে আছি। এখানকার উচ্চতা ৮০০০ হাজার ফুট।

(ক্রমশঃ)

সুনীল বন্দ্যোপাধ্যায় পরিচালিত এন্টনী ফিরিঙ্গী চিত্রে উত্তমকুমার ও তনুজা।

চিত্র-সমালোচনা :

চিড়িয়াখানা (বাঙলা) : স্টার প্রোডাকসন্স-এর নিবেদন: ৩,৭৫৮·৪৯ মিটার দীর্ঘ এবং ১৪ রীলে সম্পূর্ণ; প্রযোজনা : হরেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য; চিত্রনাট্য, গীতরচনা, সঙ্গীতপরিচালনা ও পরিচালনা : সত্যজিৎ রায়; কাহিনী : শরদিন্দু বন্দ্যোপাধ্যায়; চিত্রগ্রহণ : সৌমেন্দু রায়; শব্দানুলেখন : নৃপেন পাল, অতুল চট্টোপাধ্যায় ও সুজিত সরকার; সঙ্গীতানুলেখন ও শব্দপুনর্যোজনা : শ্যামসুন্দর ঘোষ; শিল্পনির্দেশনা : বংশী চন্দ্রগুপ্ত; সম্পাদনা : দুলাল দত্ত; রূপায়ণ : উত্তমকুমার, শৈলেন মুখোপাধ্যায়, সুশীল মজুমদার, শুভেন্দু চট্টোপাধ্যায়, জহর গাঙ্গুলী, শ্যামল ঘোষাল, বঙ্কিম ঘোষ, প্রসাদ মুখোপাধ্যায়, নৃপতি চট্টোপাধ্যায়, কালীপদ চক্রবর্তী, কণিকা মজুমদার, গীতালি রায়, সুব্রতা চট্টোপাধ্যায়, সুধীরা রায়, কমল মৌশিক্স প্রভৃতি। বলাকা পিকচার্স-এর পরিবেশনায় গেল ২৯-এ সেপ্টেম্বর, শুক্রবার থেকে রাধা, পূর্ণ, অরুণা এবং অপরাপর চিত্রগৃহে প্রদর্শিত হচ্ছে।

সদ্যমুক্ত চিড়িয়াখানা ছবিটিতে শ্রীযুক্ত সত্যজিৎ রায় আরও একটি নতুন পথের সন্ধান দিলেন। চিড়িয়াখানা গোয়েন্দা ছবি। কিন্তু পরিচিত সাধারণ গোয়েন্দা ছবি থেকে এর পার্থক্য কেবল পরিমাণগত নয়, বলা যেতে পারে গুণগত। হিন্দী এবং বাঙলা মিলিয়ে গোয়েন্দা ছবি এদেশে কম হয়েছে তা বলা যায় না। কিন্তু ঘটনা এবং আরও বেশী ঘটনার রোমাঞ্চকর অতিনাটকীয়তাই এই ধরনের বেশীর ভাগ ছবির চরিত্র লক্ষণ। চিড়িয়াখানাতে দেখা গেল ঘটনার পরিবর্তে মস্তিষ্কের ব্যবহার। তাই এই ছবিটি বহন করছে একটি বুদ্ধিময় সাবালক জগতের আবহাওয়া এবং এর ফলে গোয়েন্দাপ্রবর ব্যোমকেশের সত্যানুসন্ধান শুধু বাইরের ব্যাপার না হ'য়ে, হ'য়ে উঠেছে দর্শকদের চিন্তাভাবনার সঙ্গে একাত্ম।

অবশ্য ঘটনা যে এ ছবিতে কম আছে তা নয়। দুটি খুন এবং সন্দেহজনক কয়েকটি চরিত্রের টানাপোড়েনে এ ছবির জমিন রীতিমত খাপ। কিন্তু প্রত্যেকটি ঘটনা কার্যকারণের ভেতর থেকে এমনভাবে বেরিয়ে এসেছে যে, তা চোখে খোঁচা দিয়ে নিজের অস্তিত্ব জাহির করে না। একটি সংযত সুরুচিময় বুদ্ধিমূলক আবহাওয়া ছবিটির সর্বাঙ্গে জড়ানো। এবং অপরাধমূলক ছবিতে এ স্বাদ আমাদের দেশে একেবারেই নতুন।

শ্রীরায়ের আঙ্গিকসিদ্ধি ও শিল্পচেতনার ছাপ এ ছবির সর্বত্র লক্ষ্য করা যাবে। সামান্য তুলির স্পর্শে চিত্রকর যেমন ছবিতে নতুন ব্যঞ্জনা তৈরী করতে পারেন তেমনি শ্রীরায়ও একটি-দুটি শটের সাহায্যেও নতুন গভীরতা সঞ্চার করতে পারেন। এমনি একটি শট হ'ল—অ্যাংলো ইণ্ডিয়ান মেয়েটিকে ব্যোমকেশ যখন ডাক্তার দাশের ঘরের মধ্যে রুমালে মুখ বেঁধে পিস্তল দেখিয়ে বসিয়ে রাখে তারই কিছুক্ষণ পর ঘরের বাইরে থেকে ভেসে আসে পিয়ানোর টুংটুং ধ্বনি। সেই সময় যদিও অচেনা পিস্তলধারী ব্যক্তির সামনে অসহায়ভাবে বসেছিল মেয়েটি, তবু একটি শটে টেবিলের নীচে পিয়ানোর তালে তালে নৃত্যপর মেয়েটির পা দেখিয়ে যেভাবে সমস্ত পরিবেশ এবং মেয়েটির চরিত্রকে সজীব করে তোলা হয়েছে তা উল্লেখযোগ্য। তেমনি পানুগোপালের খুনের রাতে গোলাপ কলোনীর আতঙ্কগ্রস্ত শ্মশান আবহাওয়াটি স্পষ্ট অভিব্যক্তি লাভ করেছে, একটি মহিষের মুখ ও চোখের ক্লোজ-আপ শটটিতে।

গোলাপ কলোনীর প্রতিষ্ঠাতা অবসরপ্রাপ্ত সেসন জজ নিশানাথ সেন ও তারপর

পানুগোপালের অজ্ঞাত এক আততায়ীর হাতে মৃত্যু সম্পর্কে উদ্দণ্ডই হল ছবিটির আসল বিষয়বস্তু। গোয়েন্দাচিত্রের প্রচলিত ধর্ম হচ্ছে দর্শকমনে প্রতি মুহূর্তে রোমাঞ্চ বা থ্রীল এবং উৎকণ্ঠার সৃষ্টি। আলোচ্য চিত্রে এই ধর্মটিকে পরিহার করা হয়েছে। সেকথা আগেই বলা হয়েছে। পরিবর্তে নিশানাথ সেনের হত্যাকাণ্ডের কিছু লোকের গোপনে সন্দেহজনকভাবে চলাফেরা দেখিয়ে তাদের প্রত্যেককেই হত্যাকাণ্ডের সঙ্গে জড়িত থাকবার সম্ভাবনাকে গড়ে তোলা হয়েছে এবং পরে সুবিস্তৃত যুক্তির অবতারণা করে তাদের মধ্যে বেশ কিছুসংখ্যক ব্যক্তিকে ঐ হত্যাকাণ্ডের দায় থেকে অব্যাহতি দেওয়া হয়েছে। এবং তারও পরে অধিকতর সাক্ষ্যপ্রমাণের সাহায্যে প্রকৃত দোষী কে, তার সন্ধান দেওয়া হয়েছে। গোলাপ কলোনীর বাসিন্দাদের অতীত সম্পর্কে স্বয়ং নিশানাথ সেনের মুখ দিয়ে রহস্যজনক তথ্য পরিবেশন করে, অতীতের বাঙলা ছবির অভিনেত্রী সুনয়না দেবীর রহস্যজনক অন্তর্ধানের সংবাদ দিয়ে এবং জজসাহেবের হত্যাকাণ্ডের প্রায় সমকালে ঐ কলোনীর কয়েকজনের রহস্যজনক গতিবিধি দেখিয়ে দর্শকমনে যে-কৌতূহলের সঞ্চার করা হয়েছিল, কাহিনীর শেষ দৃশ্য রচিত হয়েছে সেই কৌতূহলের প্রতিনিবৃত্তির জন্যে।

অভিনয়ে ব্যোমকেশের ভূমিকায় উত্তমকুমারের নাটনৈপুণ্য নিঃসন্দেহে তাঁর ব্যক্তিত্বের পরিচায়ক। অবসরবিনোদনের জন্যে তাঁর তাসের হাতসাফাই কসরৎ দেখানো এবং সাপকে আদর করার মাধ্যমে গোয়েন্দা ব্যোমকেশের চারিত্রিক রূপটি প্রতিভাত।

ডাঃ ভূজঙ্গধর দাসের ভূমিকায় শ্যামল ঘোষাল ভুজঙ্গধর এবং অভিনয়ে চরিত্রটিকে মূর্ত করে তুলেছেন। বনানজপাল্লীর মুখোপাধ্যায়ের অভিনয়ের পৃথিবীর মানুষের বিরুদ্ধে ক্ষোভ ফেটে পড়েছে। এছাড়া চাকর ভূমিকায় ... চরিত্রটিকে সু-অভিনয় করেছেন। ব্যোমকেশের সহকারী অজিতের ভূমিকায় শৈলেন মুখোপাধ্যায় সম্বন্ধেও সমান কথাই প্রযোজ্য। সেশন জজ নিশানাথ সেনরূপী সুশীল মজুমদার চরিত্রোপযোগী ব্যক্তিত্বপূর্ণ অভিনয় করেছেন। ধনী রমেন মল্লিকের ভূমিকায় জহর গাঙ্গুলী তাঁর স্বভাবোচিত অভিনয়ের মধ্যে সে চরিত্রটিকে রূপদান করেছেন। মুস্কিল মিঞারূপে নৃপতি চট্টোপাধ্যায় উপভোগ্য। বিজয়বেশে শুভেন্দু চট্টোপাধ্যায় মন্দ নয়।

স্ত্রী-ভূমিকাগুলির মধ্যে অতীতে লাল সিংয়ের পত্নী এবং ছবির বর্তমানে জজ-গৃহিণী দময়ন্তীবেশে কণিকা মজুমদার বাচনে ও ভঙ্গীতে চরিত্রটিকে জীবন্ত করেছেন। মুস্কিল মিঞার স্ত্রী নজর বিবি-রূপে সুব্রতা চট্টোপাধ্যায় চরিত্রের চঞ্চলা রূপটিকে সহজেই প্রকাশ করেছেন। অসহায়া কলঙ্কিত জীবনযাপনে বাধ্য বনলক্ষ্মীর হৃদয়ের উত্তাপকে যথাযথভাবে পরিস্ফুট করেছেন গীতালি রায়। নেপাল গুপ্তর অনূঢ়া কন্যা, প্রেমিকা মুকুলের ভূমিকায় সুবীরা রায় চরিত্রোচিত অভিব্যক্তি প্রকাশে সমর্থ হয়েছেন।

ছবির কলাকৌশলের বিভিন্ন বিভাগে উচ্চাঙ্গের নৈপুণ্যের পরিচয় পাওয়া যায়। গোলাপ কলোনীর পরিকল্পনাটি শিল্পসম্মত ও নয়নাভিরাম। এর প্রতিটি পরিবেশ চরিত্রগুলির বিশেষত্বব্যঞ্জক। ব্যোমকেশ গোয়েন্দার বাসস্থানটি সম্পর্কেও সমান কথা প্রযোজ্য। আবহ-সৃষ্টির জন্যে ধ্বনি একটি বা দুটি যন্ত্রের সাহায্য গ্রহণ করা হয়েছে।

মহাশ্বেতা (বাঙলা) : বি, কে, প্রোডাকসন্স-এর নিবেদন; দৈর্ঘ ৩৮৮৮·১৩ মিটার এবং ১৪ রীলে সম্পূর্ণ; পরিচালনা : পিনাকী মুখোপাধ্যায়; কাহিনী এবং অতিরিক্ত সংলাপ : জরাসন্ধ; চিত্রনাট্য : গৌরাঙ্গপ্রসাদ বসু ও পিনাকী মুখোপাধ্যায়; সঙ্গীত-পরিচালনা : রাজেন সরকার; গীতরচনা : রবীন্দ্রনাথ, দ্বিজেন্দ্রলাল ও পুলক বন্দ্যোপাধ্যায়; চিত্রগ্রহণ : বিজয় ঘোষ; শব্দানুলেখন : বাণী দত্ত, অতুল চট্টোপাধ্যায় ও সুজিত সরকার; সঙ্গীতানুলেখন ও শব্দ-পুনর্যোজনা : শ্যামসুন্দর ঘোষ; শিল্প-নির্দেশনা : কার্তিক বসু; সম্পাদনা : রবীন দাস; পুতুল-নৃত্যপরিকল্পনা : রঘুনাথ গোস্বামী; রূপায়ণে : সৌমিত্র চট্টোপাধ্যায়, অনিল চট্টোপাধ্যায়, জহর গঙ্গোপাধ্যায়, কানু বন্দ্যোপাধ্যায়, আনন্দ মুখোপাধ্যায়, উৎপল দত্ত, জহর রায়, অর্ধেন্দু মুখোপাধ্যায়, অঞ্জনা ভৌমিক, শমিতা বিশ্বাস, রেণুকা রায়, মলিনা দেবী, ছায়া দেবী, গীতা দে, রায় সৌমিত্র বন্দ্যোপাধ্যায়, রায় ... চক্রবর্তী প্রভৃতি। ছিয়াশী কিন্তু ডিস্ট্রিবিউটার্স-এর পরিবেশনায় ছবিটি ২১-এ সেপ্টেম্বর, শুক্রবার উত্তরা, পূরবী উজ্জ্বলা, আলোছায়া এবং অন্যান্য চিত্রগৃহে মুক্তিলাভ করেছে।

জিয়াগঞ্জের বিপত্নীক বৃদ্ধ জমিদার সতীনাথ নিজের বিপত্নীক বৈমাত্রেয় ভাই রতিনাথের বিবাহ ঠিক করেছিল শাস্ত্রজ্ঞ ব্রাহ্মণের মেয়ে মহাশ্বেতার সঙ্গে। কিন্তু শহুরে সুন্দরী মেনকার মায়া বিবাহের দিনেই রতিনাথকে পাকড়াও ক'রে নিয়ে যাবার ফলে এই বিবাহ পণ্ড হয়ে যায়। মেয়েকে লগ্নভ্রষ্টা হওয়া থেকে রক্ষা করতে গিয়ে ব্রাহ্মণ পরিবারের এই সর্বনাশের জন্যে সতীনাথ যখন নিজেকে অপরাধী সাব্যস্ত করল, রতিনাথ তখন ফিরে এল মেনকাকে বিবাহ করে—তার সঙ্গে শুধু মেনকাই নয়, তার মুখরা শাশুড়ী ও মামাশ্বশুর। বৈমাত্রেয় ভাইয়ের শাশুড়ী ও মামাশ্বশুরের নীচতা ও হীনতা থেকে নিজেদের দূরে রাখবার জন্যে সতীনাথ তার নাবালক পুত্র সুধীনকে শান্তিনিকেতনে ভর্তি করে দিয়ে নিজে তীর্থপর্যটনে বেরিয়ে পড়ল। কাশীতে গিয়ে তার দেখা হয়ে গেল নিজের পিসিমার সঙ্গে এবং আচম্বিতে আবিষ্কার করল নিরুদ্দিষ্ট মহাশ্বেতা ও তার মাও ঐখানে রয়েছে। পিসীমার অনুরোধে সতীনাথ মহাশ্বেতাকে বিবাহ করে দেশে ফিরল এবং সঙ্গে সঙ্গে পুত্র সুধীনকেও নিয়ে এল শান্তিনিকেতন থেকে। মহাশ্বেতাদের পরিচিত দেশভক্ত নির্মল জেল থেকে মুক্তিলাভের পরে ওকালতী শুরু করেছিল এবং সতীনাথ হয়েছিল তার একজন বড়ো মক্কেল। মহাশ্বেতার সঙ্গে পরিচয়ের সূত্রে নির্মল হয়ে উঠেছিল সতীনাথের পারিবারিক বন্ধু। কিন্তু এই ব্যাপারটাকে রতিনাথের শাশুড়ী সহজভাবে গ্রহণ করতে পারেনি। তাঁর ও তাঁর ভাইয়ের ইতরভাবে গুপ্তচরবৃত্তিতে উত্যক্ত হয়ে সতীনাথ বৈমাত্রেয় ছোট ভাই রতিনাথের কাছে প্রতিবাদ জানাতে গিয়ে এমন নিদারুণভাবে অপমানিত হ'ল যে, সেই অপমান তার বুকে শেলের মতো বিঁধে তার মৃত্যুর কারণ হ'ল। বিধবা মহাশ্বেতা তার সপত্নীপুত্র সুধীনকে নিয়ে অসহায় অবস্থায় একমাত্র নির্মলের ভরসায় দিনযাপন করতে থাকল। কিন্তু তাতেও বাধ সাধল স্বার্থান্ধ রতিনাথ। সে নির্মল সম্বন্ধে বিধবা ভ্রাতৃজায়ার নামে কলঙ্ক আরোপ করল এবং সুধীনের অভিভাবকত্ব দাবী করে মামলা দায়ের করল। নির্মলের বুদ্ধিমত্তায় যখন মামলায় তার পরাজয় হ'ল, তখন সে রীতিমত ক্ষেপে গিয়ে সদলবলে নির্মলকে করল নৃশংস আক্রমণ এবং নিজের বৌদিকে করতে গেল চূড়ান্ত অপমান। স্নেহময়ী বিমাতার এই অপমানকে চোখের সামনে সহ্য করতে না পেরে বালক সুধীন তার পিতৃব্যকে পিস্তলের গুলি ছুঁড়ে করল হত্যা। বিচারে দোষী সাব্যস্ত হয়ে সুধীন গেল জেলেদের জন্যে বিশেষভাবে

রক্ষিত কারাগারে। —এর পরে কিভাবে মহাশ্বেতার চেষ্টায় সুধীন ছাড়া পেয়ে আবার মায়ের সঙ্গে মিলিত হ'ল, তাই নিয়েই ছবির শেষ দৃশ্যগুলি রচিত।

চিত্রকাহিনীর চুম্বক থেকে স্পষ্টই দেখা যাচ্ছে যে, কাহিনীটি শুধু অতিমাত্রায় ঘটনাপ্রধানই নয়, উৎকেন্দ্রিকও বটে। নামানুসারে কাহিনীটিতে মহাশ্বেতা চরিত্রের প্রাধান্য পাওয়া উচিত ছিল, কিন্তু কোনোখানেই তা হয়নি। যতক্ষণ সতীনাথ জীবিত, ততক্ষণ দেখা যায়, সেই প্রধান চরিত্র এবং তার মৃত্যুর পরে সহসা বালক সুধীন গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা গ্রহণ করে। একেবারে শেষে সুধীনের মুক্তিভিক্ষার ব্যাপারে মহাশ্বেতা দর্শকদৃষ্টিতে প্রাধান্য লাভ করে। এই উৎকেন্দ্রিকতা কাহিনীটিকে রসোত্তীর্ণ হতে বাধা দিয়েছে এবং চিত্রটির উপভোগ্যতাকে সীমিত করেছে।

"মহাশ্বেতা"র মতো ঘটনাপ্রধান চিত্রে শিল্পীদের পক্ষে নাট্যনৈপুণ্য প্রদর্শনের সুযোগ থাকে অল্প। তবু ঐ অল্প সুযোগেরই যথেষ্ট সদ্ব্যবহার করেছে সৌমিত্র চট্টোপাধ্যায় (সতীনাথ), অনিল চট্টোপাধ্যায় (নির্মল), কানু বন্দ্যোপাধ্যায় (মহাশ্বেতার পিতা), মলিনা দেবী (পিসীমা), আনন্দ মুখোপাধ্যায় (রতিনাথ), রেণুকা রায় (মেনকার মা), অর্ধেন্দু মুখোপাধ্যায় (রাজ্যপাল), উৎপল দত্ত (রতিনাথের পক্ষের ব্যবহারজীবী), ছায়া দেবী (মহাশ্বেতার মাতা), অঞ্জনা ভৌমিক (মহাশ্বেতা), শমিতা বিশ্বাস (মেনকা), মাস্টার সৌমিত্র ও মলয় (বিভিন্ন বয়সে বালক সুধীন)।

ছবির কলাকৌশলের বিভিন্ন বিভাগের মধ্যে চিত্রগ্রহণের কাজ নিতান্তই মধ্যমানের; এই অংশে উন্নততর নৈপুণ্য দেখাবার যথেষ্টই অবকাশ ছিল। সঙ্গীতানুলেখন ও শব্দপুনর্যোজনার কাজ অত্যন্ত উচ্চাঙ্গের ও ত্রুটিহীন। পুতুলনাচের দৃশ্যটি উপযোগী গানের সাহায্যে সার্থকতালাভ করেছে। তিনখানি রবীন্দ্রসঙ্গীতই সুগীত: দ্বিজেন্দ্রগীতির অংশটি সম্পর্কেও সমান কথাই বলা চলে। সম্পাদনা ছবিকে যথেষ্ট গতিশীল হ'তে সাহায্য করেছে; বিশেষ করে ছবির শেষাংশে রাজ্যপালের কাছে সুধীন সম্পর্কীয় ঘটনার বর্ণনা দৃশ্যগুলিতে সংলাপ লোপ করে আবহসঙ্গীতের ব্যবহার অভিনবত্বের সঙ্গে সঙ্গে প্রয়োগকৌশলের পরিচায়ক।

—নান্দীকর

বিষপাথর চিত্রের সেটে অনিল চট্টোপাধ্যায়, সহকারী পরিচালক অজিত চক্রবর্তী, পরিচালক প্রশান্ত চক্রবর্তী ও মাধবী মুখোপাধ্যায়। ফটো : অমৃত

এন্টনী ফিরিঙ্গী

বি এন রায় প্রোডাকসন্সের 'এন্টনী ফিরিঙ্গী' শারদীয় শুভমুক্তি হিসেবে ৬ অক্টোবর রূপবাণী, বসুশ্রী, বীণা এবং শহরতলীর বিশিষ্ট চিত্রগৃহে মুক্তিলাভ করছে। ঐতিহাসিক এন্টনী ফিরিঙ্গী কবিয়ালের চরিত্রে রূপদান করেছেন উত্তমকুমার। এছাড়া অন্যান্য চরিত্রে অভিনয় করছেন তনুজা,

মান্নের হুমনি, কোনো শিল্পীদের অভিনয়ে সার্থক চরিত্রোপলব্ধির কোন পরিচয় ছিল না। বিভিন্ন চরিত্রে রূপদান করেছেন—কল্যাণ বন্দ্যোপাধ্যায়, চৈতালী রায়, হিমাংশু কুমার, সন্ধ্যা রায়, সুবোধ মিত্র, রমেন সাহা, নিতাই সাহা, অরুণেন্দ্র কুণ্ডু, জীতেন ভট্টাচার্য, তপন বন্দ্যোপাধ্যায়, গোবিন্দ চৌধুরী, শম্ভু দাস, শ্রীরাম ঘোষ, হৃষিকেশ মালাকার, বিজয় দাস।

জীবনকাহিনী

সম্প্রতি বিডন স্ট্রীট পোস্ট অফিস রিক্রিয়েশন ক্লাবের ত্রয়োদশ বার্ষিক অনুষ্ঠান উপলক্ষে 'বিশ্বরূপা রঙ্গমঞ্চে' অভিনীত হোল "জীবনকাহিনী" নাটক। নাট্য-নির্দেশনার দায়িত্ব সার্থকভাবে বহন করেছিলেন স্মরজিৎ চট্টোপাধ্যায়। সাম্প্রতিক অভিনয়ে সব সময়েই একটা উজ্জ্বল বজায় ছিল। অভিনয়ে যাঁরা বৈশিষ্ট্য দাবী করতে পারেন তাঁরা হোলেন মৃগাঙ্ক ভট্টাচার্য, হেমচন্দ্র সরখেল, শিশির বর্মণ, সন্তোষ রায়, হিরণ্য গাঙ্গুলী, অমর দাস, নরুল আলম, মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়, নমিতা বন্দ্যোপাধ্যায়।

প্রতিযোগিতা

মুকুট নাট্য সংস্থার পরিচালনায় চতুর্থ বার্ষিক পূর্ণাঙ্গ নাটক প্রতিযোগিতা শুরু হবে আগামী ১৫ই ডিসেম্বর থেকে। নাম দেওয়ার শেষ তারিখ ৩০ অক্টোবর। যোগাযোগের ঠিকানা: শ্রীনিরঞ্জন দাস, সম্পাদক মুকুট নাট্য-সংস্থা, ১৬, ব্যানার্জীপাড়া, নৈহাটী, ২৪ পরগণা।

রূপাবেশ-এর নতুন নাটক

উত্তর কলিকাতার প্রগতিধর্মী নাট্য-সংস্থা রূপাবেশ এবার দুটি ভিন্ন রসের, ভিন্ন বক্তব্যের এবং নতুনতর চিন্তাসমন্বিত নাটকের প্রযোজনায় তৎপর হয়েছে। ভিন্নস্বাদের এই নাটক দুটির রচয়িতা প্রতিশ্রুতিসম্পন্ন নাট্যকার নিখিল রায়। নির্দেশনার দায়িত্বে আছেন মণি বিশ্বাস, এ বছরের শেষাশেষি নাটক দুটি নিয়ে এ'রা নিয়মিত অভিনয়ের আসরে অবতীর্ণ হবে।

ডি জি ইন্সপেক্শন রিক্রিয়েশন

ক্লাবের কর্মীবৃন্দ বিশ্বকর্মা পূজো উপলক্ষে গত ১৭ সেপ্টেম্বর ডি এল রায়ের 'সাজাহান' নাটকটি অভিনয় করলেন রাধা ফিল্ম স্টুডিওতে।

সাজাহানের চরিত্রে শৈলেন গাঙ্গুলি তাঁর সাবলীল অভিনয়ে দর্শকদের বেশ প্রশংসা অর্জন করেছেন। আওরাঙ্গজেব, যশোবন্ত সিংহ ও জাহানারার চরিত্রে যথাক্রমে নীরেন্দ্র ভট্টাচার্য, মতিলাল গুহরায় ও স্বপ্না মিত্র চরিত্রানুগ অভিনয় করেছেন। অন্যান্য চরিত্রে রূপদানকারীদের মধ্যে হরিনারায়ণ ভট্টাচার্য (দিলদার), অশোক সেনগুপ্ত (সুজা), সন্ধ্যা মজুমদার (পিয়ারা) ও শেখ হারুণের (নিহন খাঁ) অভিনয়ও ভালো হয়েছে।

নাটকটি পরিচালনা করেন নীরেন্দ্র ভট্টাচার্য। সুরসংযোজনায় ছিলেন অনিল গুহ।

মরমী'র শারদীয় নাট্যোৎসব

প্রতি বছরের মত এবারও শারদীয়া দুর্গাপূজা উপলক্ষে মরমী চারদিনব্যাপী এক নাট্যোৎসবের আয়োজন করেছে পল্লী সরিষা (ডায়মন্ডহারবার) দত্তপাড়া চণ্ডীমণ্ডপ প্রাঙ্গণে। উৎসবে যে কখানি নাটক অভিনীত হবে তাদের মধ্যে আছে—সলিল সেনের 'স্বীকৃতি', কবিগুরুর 'শাপমোচন' অভিসার ও স্বপন বসুর 'পাশাপাশি'। নাট্য পরিচালনায় আছেন—শঙ্কর মিত্র, শক্তি দত্ত।

বাল্মীকারের নাট্যোৎসব

আগামী ১০ই, ১১ই ও ১২ই অক্টোবর সকাল সাড়ে দশটায় নিউ এম্পায়ারে যথাক্রমে 'নাট্যকারের সন্ধানে ছটি চরিত্র' 'যখন একা' এবং 'শের আফগান' নাটকগুলি মঞ্চস্থ হবে। প্রথম নাটক দুটি যথাক্রমে সিক্স ক্যারেক্টার্স এবং স্ট্রাটস থেকে রূপান্তর করেছেন রুদ্রপ্রসাদ সেনগুপ্ত। শেষ নাটকটি অজিতেশ বন্দ্যোপাধ্যায় কৃত পিরানদেল্লোর হেনরী দ্য ফোর্থের রূপান্তর। অভিনয়ে

অংশগ্রহণ করেছেন অজিতেশ বন্দ্যোপাধ্যায়, অসিত বন্দ্যোপাধ্যায়, বরুণ সেন, রুদ্র সেনগুপ্ত, রাধারমণ তপাদার, পশুপতি বসু, অরুণ চ্যাটার্জি, জয় সেনগুপ্ত, সুবীর দত্ত, অমলেন্দু চক্রবর্তী, সৌমেন্দ্র আচার্য, রণজিৎ ঘোষ, পরিতোষ পাল, পল্লব মুখোপাধ্যায়, কেয়া চক্রবর্তী, দীপালি চক্রবর্তী, শেলী পাল, মঞ্জু ভট্টাচার্য, বীণা মুখোপাধ্যায়, কবিতা বন্দ্যোপাধ্যায়, সুতপা সেন, কমল ভট্টাচার্য, রথীন চক্রবর্তী, পবিত্র সরকার। আলোক সম্পাতের দায়িত্বে আছেন স্বরূপ মুখোপাধ্যায় ও অসিত বন্দ্যোপাধ্যায়; মঞ্চ ব্যবস্থায় রাধারমণ তপাদার ও রূপসজ্জায় শক্তি সেন। নাটকগুলি পরিচালনা করেছেন অজিতেশ বন্দ্যোপাধ্যায়।

যাদের দেখে না কেউ

সম্প্রতি 'তীর্থম্' নাট্যগোষ্ঠী বাগবাজার নব-বৃন্দাবন ধামে শ্রীব্রজেন্দ্রকুমার দে'র 'যাদের দেখে না কেউ' অভিনয় করলেন। নাটকটির সামগ্রিক অভিনয় সবারই দৃষ্টি আকর্ষণ করে। নাট্য-নির্দেশনা ও সঙ্গীতপরিচালনা করেন শ্রীতারকচন্দ্র রায়। অভিনয়ে কৃতিত্বের স্বাক্ষর রাখেন—গৌরাঙ্গ দাস, মনোরঞ্জন বাগুই, বটা ভট্টাচার্য, দেবু বাগচী, সুনীল ব্যানার্জি, অনাথ মুখার্জি, সন্তোষ চক্রবর্তী, নারায়ণ পাল, কৃষ্ণ চৌধুরী, দেবীপ্রসাদ দে, রীণা ব্যানার্জি, রীতা চ্যাটার্জি, স্বপ্না মুখার্জি, রীণা ঘোষ। সংগীতাংশে পূর্ণেন্দু মুখার্জি ও ইরাণী সেন নৈপুণ্যের পরিচয় দিতে পেরেছেন।

উইমেন্স পলিটেক্‌নিকের ছাত্রীবৃন্দ কর্তৃক বিশ্বকর্মা পূজা উপলক্ষ্যে নাট্যানুষ্ঠান—"অম্লমধুর" :

গেল ১৭ই সেপ্টেম্বর রবিবার উইমেন্স পলিটেক্‌নিকের ছাত্রীবৃন্দ কর্তৃক বিশ্বকর্মা পূজা এবং নবাগতা ও প্রাক্তন ছাত্রীদের সম্বর্ধনা উপলক্ষে এক বিচিত্রানুষ্ঠানের আয়োজন করেন উক্ত কলেজ ভবনে। অনুষ্ঠানে পৌরোহিত্য করেন কলেজ অধ্যক্ষা শ্রীমতী ইলা ঘোষ।

এই ক্ষুদ্র অনুষ্ঠানটি সব মিলিয়ে বেশ উপভোগ্য হয়েছিল। অনুষ্ঠানসূচীর মধ্যে ছিল—রবীন্দ্রসংগীত, রাজস্থানী নৃত্য, আবৃত্তি, যন্ত্রসংগীত এবং বিশেষ আকর্ষণ সূচীতে শ্রীপ্রতাপচন্দ্র বিরচিত "অম্লমধুর" নাট্যানুষ্ঠান। নাটকটি পরিচালনা করেন উক্ত কলেজের ইলেকট্রিক ও লাইন কম্যুনিকেশন বিভাগের তৃতীয় বার্ষিক শ্রেণীর ছাত্রী কুমারী কুন্তলা রায়চৌধুরী। অভিনয়ে কুন্তলা রায়চৌধুরী, সুরভী খান, বনশ্রী দত্তগুপ্ত, স্বাতী বর্মণ, মধুলেখা মৈত্র এবং অঞ্জনা মুখোপাধ্যায়।

'থিয়েটার ওর্কশপ"-এর 'ছায়ার আলোয়' :

১৯৬৬ সালের জুলাই মাসে 'থিয়েটার ওঅর্কশপ' নাট্যগোষ্ঠীর প্রতিষ্ঠা। এক-বছরের মধ্যেই তিনটি প্রযোজনা (লোলিতা, জংলী ও তিরেক্তনাম) মঞ্চস্থ করে বাংলা নাট্যজগতে এক নতুন নজীর রেখেছে এই সংস্থা। আসছে অক্টোবরে থিয়েটার ওঅর্কশপের নবতম 'পূর্ণাঙ্গ' প্রযোজনা "ছায়ার আলোয়" মঞ্চস্থ হবে। নাটকটি প্রখ্যাত আইরিশ নাট্যকার শন ও কেসীর 'জুনো অ্যান্ড দ পেকক' অনুসরণে রচিত। প্রযোজনার বিভিন্ন বিভাগে অংশগ্রহণ করছেন : মায়া ঘোষ, চিন্ময় রায়, নীহার চক্রবর্তী, অশোক মুখোপাধ্যায়, জাহ্নবী গুহ, তরুণ ঘটক, অমর সরকার, অজিত সরকার, দীপঙ্কর ধর, বিমলেন্দু ঘোষ, মানিক রায়চৌধুরী, লক্ষ্মী মণ্ডল, মহেশ সিংহ, সৌরেশ দত্ত, সত্যেন মিত্র ও নিমাই ঘোষ। মঞ্চ, আলো ও মেক-আপে উপদেষ্টা-মণ্ডলী : বিমল চক্রবর্তী, স্বরূপ মুখোপাধ্যায় ও শক্তি সেন।

অনুশীলন সম্প্রদায়-এর "একাএকা" :

"শেষ সংবাদ", 'কাবুলীওলা' প্রভৃতি নাট্য-ঐতিহ্যের অধিকারী অনুশীলন সম্প্রদায়-এর আধুনিকতম নিবেদন "একা-একা" মঞ্চস্থ হল গেল বুধবার ২০-এ সেপ্টেম্বর "মুক্ত-অঙ্গন"-এ। জনৈক যুবকের জীবনে রাজনৈতিক আদর্শের সঙ্গে ব্যক্তিগত চরিত্রের অসঙ্গতি এবং দলের আদর্শচ্যুতির সঙ্গে তাঁর ব্যক্তিগত রাজনৈতিক আদর্শের সংঘাতকে উপজীব্য করে নাটকটি গড়ে তোলবার চেষ্টা করা হয়েছে। কিন্তু কিছুটা ব্যক্তিগত আবেগ-অনুভূতির সুর দিলে শেষাশেষি নাটকটি রীতিমত রাজনৈতিক মতবাদের শুষ্ক তর্কসভায় পরিণত হয়েছে, যার মধ্যে নাটকীয় রস শূন্যস্থান অধিকার করে আছে। নায়ক, দলের সেক্রেটারী, নায়কের স্ত্রী—এই তিনটি ভূমিকা সু-অভিনীত। উদ্যোক্তাদের ঔদাসীন্যে আমরা নাট্যকার থেকে শুরু করে অভিনেতা-অভিনেত্রীদের নাম পর্যন্ত কিছুই জানতে পারিনি। সংক্ষেপে বলতে হয়, সে-রামও নেই, সে-অযোধ্যাও নেই।

হাওড়া নর্থ ক্লাবের শেষরক্ষা

মুখ্যমন্ত্রীর খরাত্রাণ তহবিলের সাহায্যার্থে রবীন্দ্রনাথের "শেষরক্ষা" নাটক ১৭ই সেপ্টেম্বর হাওড়ার ইস্টার্ণ রেলওয়ে রঙ্গমঞ্চে উপস্থিত করলেন হাওড়া নর্থ ক্লাবের সদস্যরা। সংস্থার পঞ্চবিংশতিতম বার্ষিক নাট্যানুষ্ঠানোৎসব ছিল এদিন। ব্যক্তিগত ও সমষ্টিগত ঐক্যে নাটকটি

মেঘের একটি নাট্যঘনমুহূর্তে অজয় শ্রীমানী ও সুনীল বন্দ্যোপাধ্যায়

আলোচ্য সংস্থার এক উল্লেখ্য সৃষ্টি। প্রয়োগ পরিকল্পনার কয়েকটি নাট্যমুহূর্তও বিশেষ উপভোগ্য হয়। প্রশংসনীয় অভিনয়ের পুরোভাগে ছিলেন বাসুদেব মুখোপাধ্যায় (গদাই) অশোক গাঙ্গুলী (বিনোদ) ও প্রতিমা চক্রবর্তী (কমলমণি)।

অন্যান্য চরিত্রে অভিনয় করেছেন প্রশান্ত চট্টোপাধ্যায়, বীরেন্দ্র রক্ষিত, অমূল্যরতন মুখোপাধ্যায়, সতোন মিত্র, কল্পনা ভট্টাচার্য, দত্তা মুখোপাধ্যায় ও হারাধন ঘোষ প্রভৃতি।

কল্যাণী স্পিনিং মিল হাবড়া শাখার নাটকাভিনয়

বিশ্বকর্মা পূজা উপলক্ষ্যে গত ১৮ সেপ্টেম্বর সন্ধ্যায় কল্যাণী স্পিনিং মিল, হাবড়া শাখার কর্মীবৃন্দ একটি সুন্দর বিচিত্রানুষ্ঠান ও নাট্যাভিনয়ের আয়োজন করেছিলেন। পৃথ্বীশ সরকার রচিত 'লবণাক্ত' নাটকটি এ'রা মঞ্চস্থ করেন।

'লবণাক্ত' এ'দের প্রথম মঞ্চস্থ নাটক। প্রথম অভিনয় হলেও অভিনেতারা সকলেই নিজ নিজ ভূমিকার প্রতি আন্তরিক ছিলেন।

প্রতিভার প্রযোজনায় 'প্ল্যানমাস্টার'

প্রতিভা প্রযোজিত হাসির নাটক 'প্ল্যান মাস্টার' অভিনীত হলো ১০ই সেপ্টেম্বর রবিবার সকালে বিশ্বরূপা থিয়েটারে। নাটকটি রচনা করেছেন নাট্যকার বিমল রায়। নাটকটির সুসংবদ্ধ ঘটনা এবং হাসির সংলাপ নাটকটিকে অত্যন্ত প্রগতিশীল করে তুলেছে।

হাসির নাটক শুধু হাসার জন্য, বক্তব্যের প্রাধান্য সেখানে কম থাকে। অধিকাংশ ক্ষেত্রেই তাই দেখা যায়। কিন্তু 'প্ল্যানমাস্টার' নাটকে যেমন প্রথম থেকে শেষ পর্যন্ত হাসির জোয়ার বয়ে যায়, তেমনি এতে একটি বিশেষ বক্তব্য রয়েছে। 'প্রতিভা'র শিল্পীদের অভিনয়-নৈপুণ্য দর্শকদের মুগ্ধ করে রাখে। নাট্যকার-পরিচালক শ্রীবিমল রায় নাট্যপরিচালনায় উচ্চমান-স্বীকৃতির দাবী রাখেন।

বিবিধ সংবাদ

ব্রজেন্দ্রকিশোর স্মরণ

গত ১৬ই সেপ্টেম্বর ন্যাশনাল হাই-স্কুল হলে 'ব্রজেন্দ্রকিশোর স্মৃতি সমিতি'র সভ্যগণের পরিচালনায় ব্রজেন্দ্রকিশোরের স্মৃতিবার্ষিকী উৎসব বহু জ্ঞানী ও গুণী ব্যক্তির উপস্থিতিতে সুসম্পন্ন হয়। শ্রীমধু বসু সভার উদ্বোধন করেন এবং ঝংকারের জেনারেল সেক্রেটারী শ্রীমুকুলচন্দ্র চক্রবর্তী ব্রজেন্দ্রকিশোরের প্রতিকৃতিতে মাল্যদান করেন। সভাপতি শ্রীবিজয়কুমার ব্যানার্জি ব্রজেন্দ্রকিশোরের বহুমুখী প্রতিভার কথা বর্ণনা করেন। সমিতির পক্ষ থেকে জেনারেল সেক্রেটারী বিশিষ্ট শিক্ষাবিদ্ শ্রীকৃষ্ণকালী ভট্টাচার্য প্রথমে বৈদিমন্ত্রে মঙ্গলাচরণ করে ব্রজেন্দ্রকিশোর সম্বন্ধে বক্তৃতা দেন। মলয় গীতবীথির পক্ষ থেকে শ্রীমতী শেলী সান্ন্যালের সুযোগ্যা ছাত্রী কুমারী কৃষ্ণা পাল শ্রীআর এস আনন্দমের নির্দেশনায় উৎকৃষ্ট নৃত্য প্রদর্শন করেন। শ্রীমতী শেলী সান্ন্যালের দ্বিজেন্দ্রগীতি, শ্রীমতী বাসন্তী বাগচীর রবীন্দ্রসংগীত, শ্রীজগন্নাথ মুখার্জি'র বিষ্ণুপুর গায়কী অনুযায়ী ছায়ানটে ধ্রুপদ ও বিমলাকান্ত রায়চৌধুরীর ইমদাদ খাঁর পদ্ধতি অনুযায়ী সুরবাহার যন্ত্রে পরিয়া-রাগের আলাপ খুবই উপভোগ্য হয়েছিল। বিখ্যাত মৃদঙ্গী শ্রীপ্রত্যাপনারায়ণ মিত্রের সংগতে সমন্বত মানের পরিচয় দেয়। শ্রীভি জি যোগের বেহালায় মিয়াকী মল্লার ও খাম্বাজ সংগীতের এক অপরূপ আবহাওয়া সৃষ্টি করে। সংগতে সৌকৎ আলী খাঁর অনবদ্য তবলা বাদন শ্রোতাদের মনে স্বর্গত আজিম খাঁর স্মৃতি জাগিয়েছিল। পরিশেষে শ্রীমতী আরতি পালের কণ্ঠে বেহাগ আলাপের সংগে ধীরেন্দ্রকিশোর রায়চৌধুরীর সুরশৃংগার আলাপ উচ্চাঙ্গ রাগসংগীতের আবর্তে অনুষ্ঠানটিকে জমিয়ে তোলে। তারপর দবীর খাঁ সাহেব বেহাগে ঝাঁপতালের একটি গানে সৌকৎ আলী খাঁ-এর সঙ্গে লয়কারী ও তেহাইয়ের বৈচিত্র্য প্রদর্শন করে সকলকে মুগ্ধ করেন। পরে জাতীয় সংগীত সমাপনান্তে সভা ভঙ্গ হয়।

ইউরেকার দুটি অনুষ্ঠান

ইউরেকা পরিচালিত শ্রীনাথ অঙ্গনের উদ্বোধন অনুষ্ঠান এক অনাড়ম্বর ভাবগম্ভীর পরিবেশের মধ্যে অনুষ্ঠিত হয়ে গেল গত রবিবার, ১৭ই সেপ্টেম্বর সন্ধ্যায়। প্রারম্ভে ইউরেকার কার্যকরী সমিতির অন্যতম সদস্য প্রখ্যাত মূকাভিনেতা শ্রীঅরুণাভ মজুমদারের অকাল-মৃত্যুতে এক মিনিটকাল ব্যাপী নীরবতা পালন করা হয়। শ্রীতারক ঘোষ, শ্রীঅনিল মাইতি ও ইউরেকার সাধারণ সম্পাদক শ্রীতরুণ ঘোষ অরুণাভ'র উজ্জ্বল প্রতিভা সম্বন্ধে আলোচনা করেন। ইউরেকা গঠনের মূলে শ্রীমজুমদারের দানের সবন্ধেও বক্তারা উল্লেখ করেন।

স্বর্গত মজুমদারের আত্মার সদ্গতি জানিয়ে অনুষ্ঠান শুরু করা হয়। শ্রীনাথ অঙ্গন উদ্বোধন করলেন প্রখ্যাত নট শ্রীতারক ঘোষ। শ্রীপ্রদোষ চৌধুরীর উদ্বোধন সংগীতের পর শ্রীগণেশ ঘোষাল ও শ্রীমতী ঝর্ণা ভট্টাচার্য যথাক্রমে আবৃত্তি ও সংগীত পরিবেশন করেন। সুবোধ দেবের গীটারে যন্ত্রসংগীতের সুর প্রশংসাযোগ্য।

শেষে ইউরেকা সম্প্রদায় দুটি নাট্যাভিনয় পরিবেশন করেন। অমর গঙ্গোপাধ্যায়ের 'জীবন-যৌবন' ও বিধায়ক ভট্টাচার্যের 'বিশ বছর আগে' নাটক দুটির বিভিন্ন চরিত্রের উল্লেখযোগ্য রূপকার অভিজিৎ চক্রবর্তী, কমল গঙ্গোপাধ্যায়, সৌর মুখোপাধ্যায়, অজয় কোলে, তরুণ ঘোষ, তড়িৎ বন্দ্যোপাধ্যায় প্রমুখ শিল্পীবৃন্দ।

ব্যারাকপুর ফিল্ম সোসাইটির দ্বিতীয় বার্ষিক উৎসব :

গেল ১০ই সেপ্টেম্বর, রবিবার সকালে ব্যারাকপুরের চম্পা সিনেমায় ব্যারাকপুর ফিল্ম সোসাইটির দ্বিতীয় বার্ষিক উৎসব সুসম্পন্ন হয় আনন্দবাজার পত্রিকা ও দেশ-সম্পাদক এবং বেঙ্গল ফিল্ম জার্নালিস্ট অ্যাসোসিয়েশনের সভাপতি অশোককুমার সরকারের সভাপতিত্বে। বহু চিত্রসমালোচক ও চিত্রবিদদের উপস্থিতিতে এই অনুষ্ঠানে 'ছুটি' ছবির নায়িকা নন্দিনী মালিয়া এবং 'অতিথি' ও 'বালিকা বধূ'র নায়ক পার্থ মুখোপাধ্যায়কে সম্মানিত করা হয়। চলচ্চিত্রের মানোন্নয়ন ও চলচ্চিত্রের প্রকৃত মূল্যায়নে দর্শকদের শিক্ষিত ক'রে তোলায় ফিল্ম সোসাইটির ভূমিকা সম্পর্কে বক্তৃতা করেন সভাপতি শ্রীসরকার ও ফেডারেশন অব ফিল্ম সোসাইটিজ-এর প্রতিষ্ঠাতাদের অন্যতম ডঃ গৌরাঙ্গ ভট্টাচার্য

গানের জলসা

চালডাল-চিনির সমস্যায় দৈনন্দিন জীবন যখন সঙ্কুচিত, নকসালবাড়ী ইত্যাদি হাজারো সমস্যায় বুদ্ধিজীবীরা বিব্রত—ঠিক সেই সময় সদারং সঙ্গীত সম্মেলনের উদ্যোক্তাদের সঙ্গীতসভার আয়োজন একটুকরো মুক্ত আকাশের স্বপ্ন দেখিয়ে স্মরণ করিয়ে দিল সমস্যাক্লিষ্ট বাঙ্গালী সুন্দরের ধ্যানে আজও আত্মভোলা। তাই জীবনযন্ত্রণার চরম মুহূর্তেও গান শুনতে ভোলে না।

এবারে সদারং-এর সঙ্গীত সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয় রবীন্দ্র-সদনে। শিল্পী নির্বাচনের ক্ষেত্রে সদারং-এর চিরাচরিত অভিজাত ঐতিহ্য আজও অনাহত। ওস্তাদ বড়ে গোলাম আলি খান, ওস্তাদ আমীর খাঁন, যাদুকর সেতারী ওস্তাদ বিলায়েত খাঁ ও সুনন্দা পট্টনায়ক—আমজেদ আলি খাঁ, গিরিজা দেবী—একাধারে প্রবীণ-নবীন ও স্থানীয় শিল্পী মীরা বন্দ্যোপাধ্যায়, মালবিকা কানন এবং আরো অনেক সুপ্রতিষ্ঠিত জনপ্রিয় শিল্পীকুলের অপূর্ব সমাবেশ যে কোনো সঙ্গীতরসিকের আকর্ষণের বস্তু। নৃত্যে স্বয়ং শ্রীমতী অমলাশঙ্কর ছাড়াও তাঁর পরিচালনায় উদয়-শঙ্কর কালচারাল সেন্টারের সদস্যগণ এবং উড়িষ্যার প্রখ্যাতা নৃত্যশিল্পী শ্রীমতী মিনতি মিশ্র অনুষ্ঠানকে সৌন্দর্যসমৃদ্ধ করে তুলেছেন।

আসর জমিয়ে তোলার পরিপ্রেক্ষিতে বিচার করলে যন্ত্রসঙ্গীতে ওস্তাদ বিলায়েত খাঁ ও কন্ঠসঙ্গীতে সুনন্দা পট্টনায়কের নাম বিশেষ উল্লেখের দাবী রাখে।

ওস্তাদ বিলায়েত খাঁ—দুদিনের অনুষ্ঠানে ইমন-বিহাগিনী ও ঠুংরী পরিবেশন করেছেন। মীড়ের দীর্ঘস্থায়ী স্বপ্নরেশ সুরু থেকেই আসরকে মন্ত্রমুগ্ধ করে রেখেছিল। সাপট তানের দাপটের ঝড় থাকলেও মাধুর্যের অভাব ঘটেনি। তবে একটা কথা না বলে পারছি না, বিলায়েত খাঁর মত যুগচিহ্নিত শিল্পী সমালোচকদের উক্তিতে এত গুরুত্ব দেবেন কেন? শিল্পীমন স্পর্শকাতর হতে পারে কিন্তু কাতর হবে কেন?

আরও একটা কথা। তিনি যে সেতারের যাদুকর সে কথা কি অবিরাম গান গেয়ে, বক্তৃতাসহ সেতারে সুরের কাজ দেখিয়ে এবং সমালোচকবৃন্দের প্রতি কটাক্ষ করে প্রমাণের প্রয়োজন আছে? তাঁর হাতের একটি টোকাই অনুচিত সমালোচনা স্তব্ধ করে দেওয়ার পক্ষে যথেষ্ট নয় কি?

সুনন্দা পট্টনায়ক গতবছরের মত এবারেও একটি স্বরচিত রাগ উপহার দিয়েছেন "যোগেশ্বরী"। অলঙ্কারসমৃদ্ধ, উদার উদাত্তকন্ঠে ষড়জপঞ্চমের সুক্ষ্ম-শিল্পসম্মত প্রয়োগ, ভাবগম্ভীর ধ্যানে রাগরূপের উন্মোচন ও তানশিল্পীর বিচিত্র্যে তিনি তাঁর উচ্চমান বজায় রেখেছেন কল্পনাসমৃদ্ধ মনটিও ব্যক্ত করেছেন।

ওস্তাদ বড়ে গোলাম আলি খাঁর উপস্থিতিই যেকোনো সঙ্গীতাসরের সম্মান। ভগ্নস্বাস্থ্যেও তিনি যে ঐশ্বর্য বিলিয়ে যাচ্ছেন, হয়ত তা অতীতের ব্যঞ্জনা, স্মারকমাত্র। কিন্তু তারই মধ্যে যে ইঙ্গিত, ব্যঞ্জনা, দূরাভিসারী ধ্যানধারণার ছবি পাওয়া গেল, তা বর্তমান যুগের তরুণ শিল্পী-সম্প্রদায়ের পথনির্দেশক আলোক-স্তম্ভস্বরূপ। তাঁর "দেশ" শুনতে, শুনতে একথা বার বার মনে হয়েছে। ওস্তাদজীর "আয়ে ন বালম"—আজও সেই সম্মোহন-শক্তিসমৃদ্ধ।

তাঁর পুত্র মুনোয়ারও পিতাকে কন্ঠ-সঙ্গতে উপযুক্ত সহায়তাদান করেছেন। একক সঙ্গীতেও তিনি যথেষ্ট আনন্দ দিয়েছেন। তাঁর সম্বন্ধে পূর্বেও আমরা বলেছি, (যুগযাত্রী'র অনুষ্ঠানপ্রসঙ্গে) এখনও বলছি,—আগে আমাদের আক্ষেপ ছিল পিতার তানবৈচিত্র্য ও পান্ডিত্যের অধিকারী হলেও, কন্ঠমাধুর্যের অভাবে নিজেকে উপভোগ্য করে তুলতে পারছেন না। কিন্তু ইদানীং এঁর কন্ঠে একটি কোমলতার ছোঁয়া ক্রমশ বিস্তারিত হতে দেখা যাচ্ছে। সেইজন্যই তিনি এককভাবেও আকর্ষণীয় হয়ে উঠছেন।

ওস্তাদ আমীর খাঁ—আপন শান্ত-সৌন্দর্যে আজও অবিচল। ছন্দবৈচিত্র্যের অভাব, তাঁর অনুষ্ঠানকে আশানুরূপ জনপ্রিয়তা থেকে বঞ্চিত করলেও অবিমিশ্র শুদ্ধতার সম্পদে ইনি কন্ঠস্বরের কিছু সৌন্দর্য হারিয়েও শ্রদ্ধেয়।

মীরা বন্দ্যোপাধ্যায় ও মালবিকা কানন পূরিয়া ধ্যানেশ্রী, পূরিয়া কল্যাণ এবং ঠুংরীতে তাঁদের সুনাম অব্যাহত রেখেছেন।

গিরিজা দেবীর খেয়াল তাঁর নামের অমর্যাদা করেনি—তবে ঠুংরী ভোলবার নয়। হিমরাৎ খাঁর সেতারের ওপর বিস্ময়কর দখল শ্রদ্ধেয় কিন্তু অলঙ্কারপ্রবণতার চাঞ্চল্য তাঁর মত শিল্পীর সযত্নে পরিহার করা কর্তব্য।

রহিম খাঁর হাতটিও ঘরানার উপযুক্ত দক্ষতাউজ্জ্বল কিন্তু 'রামকল্যাণ' রাগে তেমন জমেনি।

আমজেদ আলির তান, তকীপ, এবং —টিপ বাহার মনমাতানো। আলাপের অঙ্গ আরো অনুশীলনসাপেক্ষ। মিনতি মিশ্রর ভারতনাট্যম প্রাধান্য। কিন্তু ওড়িশী নৃত্যের কাব্যসৌন্দর্য ও চিত্রধর্মিতা মন্দিরশিল্পকে স্মরণ করিয়ে দিয়েছে।

উদয়শঙ্কর কালচারাল সেন্টারের শিক্ষার্থীশিল্পীরা গুরু অমলাশঙ্করের এবং অন্যান্য গুরুদের শিক্ষাপদ্ধতির উচ্চমানকে সুপ্রতিষ্ঠিত করেছে। স্বয়ং অমলাশঙ্করের 'ভারতনাট্যম'— ছোট পরি-সরের মধ্যেও তাঁর মত আন্তর্জাতিক খ্যাতিসম্পন্না শিল্পীর উপযুক্ত। সম্প্রতি আমেরিকা ভ্রমণের পর এই তাঁর প্রথম মঞ্চাবতরণ।

কমলেশ মৈত্রর "তবলাতরঙ্গ" শুধু উদয়শঙ্কর কালচারাল অনুষ্ঠানের নয় সদারং সঙ্গীত সম্মেলনের অন্যতম শ্রেষ্ঠ আকর্ষণ।—ইনি বাজালেন "কিরবাণী"—এযে কি বস্তু না শুনলে ধারণা করা যায় না। উদয়শঙ্করের প্রাক্তন সঙ্গীত পরিচালক সিরালিজীর পর এ-যন্ত্র এমন সুসংবদ্ধ পদ্ধতিতে অন্য কোথাও শোনা যায় না। বিস্ময়ে, আনন্দে, মুগ্ধতায় শ্রোতারা অভিভূত হয়ে গিয়েছেন। অত্যন্ত পরিতাপের বিষয়,—সাগরপারের দেশে ইনি যথেষ্ট খ্যাতি অর্জন করলেও আমাদের দেশে আজও সুপরিচিত নন।

আবৃত্তি ও সঙ্গীত প্রতিযোগিতার ফলাফল

কৃষ্টি আয়োজিত শিশু ও কিশোর শিল্পী সম্মেলনের তৃতীয় অধিবেশন উপলক্ষে যে আবৃত্তি ও সঙ্গীত প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠিত হয় তার ফলাফল প্রকাশিত হয়েছে। প্রতিযোগীর সংখ্যা প্রায় একশত জন। বাংলার বিভিন্ন অঞ্চল থেকে এইসব প্রতিযোগী অংশগ্রহণ করে। প্রতিযোগিতা দুই ভাগে বিভক্ত ছিল : 'ক' (১২ বৎসরের বৎসর পর্যন্ত) 'খ' (১৮ বৎসর পর্যন্ত)। ফলাফল 'ক' আবৃত্তি—১ম বৈশাখী দাস, ২য় সোমা সিংহ, ৩য় বেবী মুনমুন, প্রশংসাপত্র পাবে—সীমা ভট্টাচার্য, গৌতম সিংহ, রুমা সিংহ, বাপী ভট্টাচার্য, দেবব্রত রায়, অসীম রায়, কল্পনা অধিকারী, বিঙ্কু মুখার্জি, মহুয়া চৌধুরী। **'খ' আবৃত্তি**—১ম কল্পনা বন্দ্যোপাধ্যায়, ২য় শিখা সরকার, ৩য় যূথিকা ঘোষ। প্রশংসাপত্র পাবে—শিখা ভট্টাচার্য, রীণা রিত। **"ক" রবীন্দ্রসঙ্গীত**—১ম অরুন্ধতী বন্দ্যোপাধ্যায়, ২য় বাবুল কুন্ডু, ৩য় স্বাতী বন্দ্যোপাধ্যায়, রীণা দাস। **'খ' রবীন্দ্রসঙ্গীত**—১ম কাকলী দাস, ২য় চন্দনা চট্টোপাধ্যায়, ৩য় পলি ভট্টাচার্য। **'ক' ভজন** ১ম সবিতা মুখোপাধ্যায়, ২য় অরুন্ধতী মুখোপাধ্যায়, ৩য় বাবুল কুন্ডু। **'খ' ভজন** ১ম কাকলী দাস, ২য় মিতালী গাঙ্গুলী, ৩য় চন্দনা মুখোপাধ্যায়।

গীতালীর আয়োজন

গত ২৩শে সেপ্টেম্বর শনিবার গীতালীর ছাত্রছাত্রীবৃন্দ কর্তৃক আয়োজিত ৬নং মন্দির রোড, দমদম, গোরাবাজারে

সংগীতাচার্য সতীশচন্দ্র ঘোষ মহাশয়ের ৭৬তম জন্মদিবস উপলক্ষে সারারাত্রিব্যাপী একটি উচ্চাঙ্গ সংগীতানুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়। এই অনুষ্ঠানে বহু বিশিষ্ট কণ্ঠ ও যন্ত্রশিল্পী যোগদান করেন।

প্রথমে শ্রীজয়কৃষ্ণ সান্যাল ধ্রুপদ ও ধামার পরিবেশন করেন। পরে গীতালীর পরিচালক শ্রীনিমল ভাণ্ডারীর সুযোগ্য ছাত্র শ্রীনবকুমার দাশ বাগেশ্রী রাগে খেয়াল এবং পরে ঠুংরী ও ভজন পরিবেশন করে উপস্থিত শ্রোতাদের আনন্দদান করেন। এরপর প্রঃ এ কানন যোগ ও ললিত রাগে খেয়াল এবং পরে ঠুংরী ও ভজন পরিবেশন করে শ্রোতাদের মুগ্ধ করেন। সর্বশেষ শিল্পী প্রঃ রবীন ঘোষ বেহালায় নটভৈরব ও রাগমালা পরিবেশন করে শ্রোতাদের প্রশংসা লাভ করেন। তাঁদের সংগে পাখোয়াজ, তবলা ও সারেঙ্গী সহযোগিতা করেন যথাক্রমে রাজীবলোচন দে. প্রঃ বিশ্বনাথ বসু, শ্রীনিমাই ভট্টাচার্য, এইচ মোস ও শ্রীবিদ্যা সহায়।

সুরগীতি বালিকা সংগীতালয়

সুরগীতি বালিকা সংগীতালয়ের সমাবর্তন উৎসব ৬ই সেপ্টেম্বর মহাজাতি সদনে সাফল্যের সংগে পালিত হয়। প্রধান আকর্ষণ ছিল মহাকবি কালিদাসের 'কুমার সম্ভবম্' নৃত্যনাট্য। প্রধান চরিত্রে যথা —শিব, পার্বতী, নারদ, বসন্ত, কার্তিক ও তারকাসুরের ভূমিকায় যথাক্রমে সর্বশ্রী কৃষ্ণা ঘোষ, পূর্ণিমা পাইন, তপতী মল্লিক, শিপ্রা গোস্বামী, গোপা পাল ও কৃষ্ণা বন্দ্যোপাধ্যায়ের নৃত্যাভিনয় দর্শকদের অকুণ্ঠ প্রশংসা অর্জন করে। নৃত্য পরিচালনায় নৃত্যশিল্পী শ্রীসুখেন বড়ুয়া কৃতিত্বের পরিচয় দেন।

এইচ এম ভি ও কলাম্বিয়া রেকর্ড

এবার পুজায় গ্রামোফোন কোম্পানী রেকর্ডের এক বিচিত্র ডালি সাজিয়েছেন। সম্পূর্ণ তালিকা এইরূপঃ—শ্যামল মিত্র আধুনিক।। কি নামে ডেকে।। এই শহরে এই বন্দরে। শচীনদেব বর্মন আধুনিক।। যদি ডাকি অকারণে।। অসময়ে বাজাও বাঁশী। লতা মঙ্গেশকর আধুনিক।।মন লাগে না।। কে যাবি আয়। হেমন্ত মুখোপাধ্যায় আধুনিক ।। জীবনের হাট থেকে।। চোখে যদি জল। গীতশ্রী সন্ধ্যা মুখোপাধ্যায় আধুনিক ।। ওরে মন আমার ।। যদি নাম ধরে তারে ডাকি। আশা দে রিম ঝিম্ ঝিম্ বৃষ্টি।। তুমি আঁধার দ্যাখো। আশা ভোঁসলে আধুনিক ।। যখন আকাশ কালো হয়।। আমি খাতার পাতায় চেয়েছিলাম। সবিতা চৌধুরী আধুনিক ।। মিটি মিটি তারারা।। বোলো না ভুলিতে। ধনঞ্জয় ভট্টাচার্য।। মহুয়ার চেয়ে আরো মিষ্টি।।দূরে দূরে থেকো না। সুমন কল্যাণপুর আধুনিক ।। কাঁদে কেন মন আজ।। শুধু স্বপ্ন নিয়ে খেলা চলছে। সতীনাথ মুখোপাধ্যায় আধুনিক ।। বলেছিলে হবে দেখা।। সুন্দরী ললনা। উৎপলা সেন আধুনিক।।জোনাকী দীপ জ্বালো আলো।। টুপ্ টুপ্ টুপ্ টুপ্। তরুণ বন্দ্যোপাধ্যায় এই জানালা দিয়ে।।না না যাস নে পাখী। মুকেশ আধুনিক।। আমার মনের কত সুখ নিয়ে।। মনকে কিছু বোলো না। অরুণ দত্ত আধুনিক।। মন যে কত কথা বলে।। ঝর্ণা ঝরো ঝরো। দ্বিজেন মুখোপাধ্যায় চিত্রতারকা মাধবী মুখোপাধ্যায়ের সংগে। আধুনিক।। হয়ত বসবে ধানের গোলাতে।। আহা যৌবন তরংগে। প্রতিমা বন্দ্যোপাধ্যায় আধুনিক ।। তোমার দেওয়া অংগুরীয়।। সাধের পিঞ্জরায়। নির্মলেন্দু চৌধুরী হায় হায় কি হেরিলাম।। সুনয়নী সুনয়নী।। (সবিতা চৌধুরীর সংগে)। আরতি মুখোপাধ্যায় আধুনিক।। না বলে এসেছি।। যদি আকাশ হত আঁখি। মানবেন্দ্র মুখোপাধ্যায় আধুনিক।। সেতে নাম ধরে।। না, রয়না বাধা। গীতশ্রী ছবি বন্দ্যোপাধ্যায় কীর্তন—বিরহকাতরা বিনোদিনী রাই।। তুমি মধু।। মিন্টু দাশগুপ্ত ব্যঙ্গ কৌতুক।। আমি এক নিন্দুক।। স্বপ্ন দেখি রোজ। ইলা বসু ফুল দোল্ দোলে।। রিমঝিম নেশা নেশা।। সুবীর সেন আধুনিক ।।মোনালিসা সারাদিন তোমায় ভেবে। নির্মলা মিশ্র আধুনিক।। ও আমার মনপাখীকে।। কখন যে প্রজাপতি। পিন্টু ভট্টাচার্য আধুনিক।। না দেখাই ছিল ভাল।। আমি পৃথিবী তোমায় যাবো ভুলে। মাধুরী চট্টোপাধ্যায় আধুনিক। গুন্ গুন্ ফাগুন্।। ঐ যে সবুজ বনবীথিকা। অজয় মুখোপাধ্যায় পল্লীগীতির থাকে থাকে।। উঠিয়ো থেকে অনেক দূরে। কল্যাণী সেনগুপ্ত আজ শুধু খেলা।।এত করে কাছে ডাকি। মৃণাল চক্রবর্তী আধুনিক। তুমি যে আশানদী।। কতদিন যে খুঁজে গেলাম। সাধন মৈত্র পল্লীগীতি। ময়নকা, ভোর সতীরে।। আরে মশা, প্যাচ কোনা। কিশোরকুমার কৌতুক নক্সা। বাবা-খোকা।। একদিন পাখী উড়ে যাবে। ভানু বন্দ্যোপাধ্যায় এবার উপহার দিয়েছেন "বাংলার স্পুটনিক্" ব্যঙ্গ রচনাটি।

৪৫-আর-পি এম ঈ পি রেকর্ডে আছে—কৃষ্ণচন্দ্র দে-র গাওয়া—গোষ্ঠলীলা ।। সখী, লোকে বলে কালো ।। আমি চন্দন হইয়ে। চিন্ময় চট্টোপাধ্যায় রবীন্দ্র-সংগীত। সেদিন দুজনে দুলেছিনু বনে ।। এখন আমার সময় হল ।। এই লভিনু সংগ তব ।। বড় বেদনার মত ।। পান্নালাল ভট্টাচার্য শ্যামাসংগীত। এ কেমন করুণা কালী ।। বিপদে পড়েছি শ্যামা। কৃষ্ণা চট্টোপাধ্যায় অতুলপ্রসাদী। ওগো আমার নবীন শাখী ।। আজ আমার শূন্য ঘরে ।। বঁধু এমন বাদলে তুমি কোথা ।। প্রকৃতির ঘোমটাখানি। সুনীল গংগোপাধ্যায় ইলেকট্রিক গীটারে লঘু সংগীতের সুর।

বাংলা কবিতা—লং প্লেইং রেকর্ডে সুনির্বাচিত বাংলা কবিতার আবৃত্তি। ছয়জন শ্রেষ্ঠ কবির কণ্ঠও এতে শোনা যাবে।

এবারের 'শারদ অর্ঘ্য' গানের বইখানিও খুব সুন্দর হয়েছে। ৪০ জন শিল্পীর পাতাজোড়া ছবিসহ 'চিত্রাঙ্গী' নামে এলবাম এবং রেকর্ডের পুরো গানগুলি সহ 'গীতালী' নামক কাব্য অংশের পরিকল্পনাটিও সত্যই অভিনব। পূজা উপলক্ষে গ্রামোফোন কোম্পানীর এই প্রভূত আয়োজনের জন্য আমাদের আন্তরিক অভিনন্দন জানাই।

ভারতী রেকর্ড

এবারে পূজায় ভারতী রেকর্ড কয়েকটি আকর্ষণীয় রেকর্ড প্রকাশ করেছেন। এর মধ্যে রবীন্দ্রসংগীতের তিনটি রেকর্ড সবথেকে উল্লেখযোগ্য। শ্রীসমর গুপ্তের কণ্ঠে 'প্রাণ চায় চক্ষু না চায়' ও 'কাছে যবে ছিল', শ্রীসুকান্তি হাজরার কণ্ঠে 'দিনের প্রথম কদম ফুল' ও 'আমার দোসর যে-জন', শ্রীরেবা ঘোষের কণ্ঠে 'আমি যখন ছিলেম অন্ধ' ও 'তুমি এপার ওপার কর' গান ছয়টি রবীন্দ্রসংগীত পিপাসুদের আকৃষ্ট করে। রবীন্দ্রসংগীতের প্রকরণগত বৈশিষ্ট্য এবং ভাবব্যঞ্জনা সার্থকভাবে পরিস্ফুট। 'যা চেয়েছি মাগো' ও 'কৃষ্ণ রূপে দাঁড়াও কালী' ভক্তিগীতি দুটি গেয়েছেন শ্রীবিমান মুখোপাধ্যায়। শ্রীলক্ষ্মীকান্ত চক্রবর্তীর কণ্ঠে গীত 'ঝুমুর-র-র বাজুম-ঝুম্' ও 'গহীন গাঙের নাইয়া' পল্লীগীতি দুটি শিল্পীর দরদভরা কণ্ঠে প্রাণপূর্ণ হয়ে উঠেছে। হিন্দী ছবির দুটি জনপ্রিয় গান গীটারে বাজিয়ে শুনিয়েছেন শ্রীজগন্নাথ ধর।

আজকের যাত্রা

দিলীপ মৌলিক

বাংলার আকাশ-বাতাস একদিন যাত্রা গানের হিল্লোলে মুখর ছিল, সমাজ সংস্কৃতির মর্মবাণী ভাষা পেয়েছিল পালা গানের প্রাণবন্ত সাবলীলতায়। কালের বিচারে সেদিনটা ছিল হয়তো অতীত, আজ আমরা বর্তমান যুগের বিক্ষুব্ধ বন্দরে অস্তিত্ব প্রতিষ্ঠিত করবার সংগ্রামে ক্লান্ত, পরিশ্রান্ত। মাঝখানে কয়েকটা শতাব্দী শুধু তরঙ্গিত পরিবর্তনের সমুদ্র ঢেলে দিয়েছে, বৈচিত্র্যমুখী স্রোত-ধারায় হয়ত আমরা ভেসে গিয়েছি কোন্ দূরে এক অজানা বেলাভূমিতে। কিন্তু সূর্যালোকে স্পষ্ট হলেই বুঝতে পেরেছি এ আকাশ অনেক দিনের চেনা। তাই সেই অতীতের বন্ধনকে আমরা ছিন্ন করতে পারি নি আজও, যে যাত্রার প্রাচুর্যের মধ্যে মন একদিন অনাবিল আনন্দের জোয়ার খুঁজে পেত তাই আবার আমাদের মাটিতে অনেক সোনালী সম্ভাবনা চিহ্নিত করতে চলেছে। যে অতীতের হৃদয় উদ্বেলতার সঙ্গে আমাদের আত্মার সেতু-বন্ধন হয় তাকে ভোলা যায় না, সে বিস্মৃতি জাতীয় সংস্কৃতির শুভ অগ্রগতির ধারাকে ব্যাহত করে। আজকের নবনাট্য আন্দোলনের পরীক্ষা-নিরীক্ষার যুগে যাত্রার প্রয়ো-জনীয়তা নিয়ে অনেকের মনে হয়ত প্রশ্ন আসতে পারে, কিন্তু একটা কথা এই প্রসঙ্গে মনে রাখা প্রয়োজন যে, যে যাত্রার মধ্যে জাতীয় সংস্কৃতি ও ইতিহাসের ছবি আছে তাকে যুগের দোহাই দিয়ে অস্বীকার করা যায় না, সব যুগেই তা চিরন্তন। সত্যি কথা বলতে কি এ ছাড়াও মাঝে মাঝে যাত্রায় এমন দীপ্ত অভিনয় সম্পদ থাকে যা মঞ্চাভিনয়ের ঔজ্জ্বল্যকেও অনেক সময় স্তিমিত করে দেয়। তবে যাত্রার যে একটা চিরকালীন রূপ আছে তার আমূল পরিবর্তন কিম্বা অতিমাত্রায় তাতে আধু-নিকতার রঙ লাগান বোধহয় শোভন হবে না। তবে তা যুগের মর্মকথাকে প্রকাশ করবে নিশ্চয়।

শারদীয় পূজার আগমনী বার্তা যখন সিক্ত সকালের শিশিরে মূর্ত হয়ে ওঠে তখন থেকেই যাত্রাগোষ্ঠীর যাত্রা শুরু নতুন উদ্যমে, নতুন ছন্দে। বৎসরের অন্যান্য সময়ে এ'রা নিজেদের অভিনয় প্রতিভাকে বহু জায়গায় পরিবেশন করেন, কিন্তু পূজার প্রীতি-স্নিগ্ধ পরিবেশে এ'দের অন্তর খুলে যায় সীমানাবিহীন আনন্দের উদ্বেলতায়, এ'রা তখন ভাবেন 'এই হল সেই সময় যখন শিল্পী শিল্পের আত্মা খুঁজে পায়, শ্রোতার সঙ্গে হৃদয়ের একটা নিবিড় মেলবন্ধন হয়, দুজনেই হয় দুজনার অনুভবের দোসর।' এবারের শারদীয়া পূজার ব্যাপ্ত গভীরতাকে স্মরণ করে অনেক দিন আগে থেকেই যাত্রা আসরের প্রস্তুতি শুরু হয়েছে। কয়েকটা পালার উদ্বোধন হয়েছে ইতিমধ্যে। এই সব গোষ্ঠীর শিল্পীরা কলকাতার কয়েকটি মুখরতায় নিজেদের এই সময়ে বিলীন করে দেবেন না। এ'রা ছুটে চলে যাবেন দূরে দূরান্তের আসামে, উত্তরবঙ্গে, কোলিয়ারী অঞ্চলে, আর কেউ কেউ থাকবেন কাছাকাছি। এ'রা যেখানেই আসর তৈরী করবেন, সেখানেই প্রাণচাঞ্চল্যের বন্যায় জাতির সংস্কৃতিকে একটা উন্নত তীর্থে তুলে দেবেন।

এবারে পালাগানের বহু গোষ্ঠী হয়েছে, অনেকেই এগিয়ে এসেছে জাতির এই ঐতিহ্যকে নতুন গৌরবে ভূষিত করতে, এই আকুলতা যত বিস্তৃতি পাবে ততোই জাতীয় ঐতিহ্য সৃষ্টির পক্ষে শুভ। এবারকার বেশীর ভাগ যাত্রার পালাগুলো দেখে মনে হয়েছে যে, পরিচালক, নাট্যকার সব সময়েই ঐতিহাসিক, পৌরাণিক বিষয়বস্তুর পট-ভূমিকায় সব কিছু পরিবেশন করতে চাইছেন না, আজকের সমাজ জীবনের বহু-বিধ সমস্যারও আলোকসম্পাত করতে চাইছেন তাঁদের পালাগানে। তাই আজ যাত্রার আসরে যা পরিবেশিত হতে চলেছে তা শুধু কনসার্ট বাজানো দীর্ঘ সময়ের একটা পালাগান নয়, জীবননিষ্ঠ একটা শিল্পসৃষ্টি। অনেক সূক্ষ্মতর আঙ্গিক এবার যাত্রায় চিহ্নিত হবে। শ্রোতারা এবার মুগ্ধ হবে শিল্পী, পরিচালকের জীবনবোধ ও বাস্তব সচেতনতা উপলব্ধি করে।

কয়েক দিনের মধ্যেই সব আসরের আলোগুলো জ্বলে উঠবে। এই পালাগানের কিছু কিছু পরিচয় দিলে বোঝা যাবে আজকের যাত্রার গতি কোন দিকে। আজকের অর্থনৈতিক অস্বচ্ছলতার দিনেও যাত্রার প্রাচুর্য নিঃসন্দেহে জাতীয় ঐতিহ্যের প্রতি আমাদের আত্মিক বিশ্বাসের বলিষ্ঠতাকে প্রমাণ করে।

যাত্রাজগতের অপ্রতিদ্বন্দ্বী ঐতিহ্যবাহী দল 'নট্ট কোম্পানীর যাত্রা পার্টি' এবার শারদ অর্ঘ হিসাবে পরিবেশন করবেন মহিমময় অতীতের এক প্রদীপ্ত কাহিনী—নাম 'সুলতানা রিজিয়া'। প্রসিদ্ধ দাসবংশের বীরাঙ্গনা, মমতার স্নিগ্ধ প্রতিমূর্তি এই নারীর শাসনকাল ভারতের ইতিহাসের এক গৌরবময় অধ্যায়। শ্রীব্রজেন্দ্রকুমার দে ইতি-হাসের এই শাশ্বতী নারীকে কেন্দ্র করে রচনা করেছেন ঐতিহাসিক এই নাটক, যা এই প্রখ্যাত গোষ্ঠীর শিল্পিবৃন্দের অভূত-পূর্ব অভিনয়ে নতুন গৌরবে বিভূষিত হবে। মহিময়ী নারী রিজিয়ার ভূমিকায় অভিনয় করছেন শ্রীচপল ভাদুড়ী, প্রায় এক যুগ পর যাত্রাজগতের দুই অপ্রতিদ্বন্দ্বী অভিনেতা শ্রীপূর্ণেন্দুশেখর বন্দ্যোপাধ্যায় ও শ্রীসুজিত পাঠক দুটি বিশিষ্ট চরিত্রে অবতীর্ণ হচ্ছেন। যশস্বী পরিচালক শ্রীসূর্য দত্তের নিষ্ঠা নিঃসন্দেহে এই নতুন নাট্যার্ঘকে এক বিরল সৌন্দর্য দান করবে। নট্ট কোম্পানীর দ্বিতীয় অর্ঘ হল 'দুখ সায়রের দেশে'। এতে বর্ণিত হয়েছে দেশ বিভাগের পটভূমিকায় স্বাপ্নিক এক যুবকের স্বপ্ন-ভাঙার মর্মন্তুদ কাহিনী। এ'দের অন্যান্য নাটকের মধ্যে আছে বিল্বমঙ্গল, ভারত বিজয়, রক্তে সিংহাসন, সোনায় অরুণ, চাঁদ-বিবি, চিতোর লক্ষ্মী। শিল্পীর তালিকায় যাঁরা আছেন তাঁরা হলেন নির্মল অধিকারী, নবকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়, কার্তিক দাস, গুরুদাস রায়, অনিল রায়, মনোজকুমার, অচিন মৈত্র, গোষ্ঠ পাল, চপল ঘোষ, মণীন্দ্র পাল, ফণী ভট্টাচার্য প্রভৃতি।

যাত্রার অগ্রগতির ধারার সঙ্গে যাদের এতটুকু পরিচিতি আছে তাদের কাছে 'সত্যাম্বর অপেরা'র বৈশিষ্ট্যটি হস্ত অব-দানের কথা নতুন নয়। নাট্যানুশীলনে যখন পরিবর্তনের পালা চলেছে, তখন তারই সঙ্গে তাল মিলিয়ে এই অপেরার শিল্পিবৃন্দ একটি দুঃসাহসিক সৃষ্টি 'একটি পয়সা' পালা পরিবেশনে ব্রতী হয়ে-ছেন। অভিনব আঙ্গিকে শ্রীভৈরব গঙ্গো-পাধ্যায়ের এই পালা যাত্রাজগতের এক অনন্য সংযোজন, দিক পরিবর্তনের ইতি-হাসের প্রতীক স্বরূপ এটা চিহ্নিত হয়ে থাকবে। মমতাহীন সমাজের চরম দুর্নীতির একটা সুস্পষ্ট ছবি আঁকা হয়েছে এই পালায়, আজকের সমাজ জীবনকে প্রতি-মুহূর্তে ভীত সন্ত্রস্ত করছে যে সব জটিল সমস্যা তাও ভাষা পেয়েছে এই নাটকে। দুর্নীতি আর শোষণের বিরুদ্ধে অবিরাম সংগ্রাম চালিয়ে শেষ পর্যন্ত ধ্রুব সত্যের প্রদীপ জ্বালানোই বোধহয় এই পালাগানের গভীরতম বক্তব্য। দর্শক চিত্তজয়ী এ'দের আরও কয়েকটি পালা হলো—অভিশপ্ত রাজপুরী, সাহারার কান্না, দীপ আজও জ্বলে, অশ্রু দিয়ে লেখা, পাষাণের মেয়ে। বিশিষ্ট শিল্পীদের মধ্যে রয়েছেন শুভ্র ভট্টাচার্য, পশুপতি ঘোষ, মাখন সমাদ্দার, গোরাশশী মণ্ডল, রবীন মজুমদার, দিলীপ চৌধুরী, শিবদাস মুখোপাধ্যায়, মনোরঞ্জন চক্রবর্তী, সাহানা বসু, বাণী দাসগুপ্ত, মৌসুমী চ্যাটার্জি।

স্বাধীনতা সংগ্রামের বিক্ষিপ্ত কাহিনী আর তারই পটভূমিকায় বিভিন্ন চরিত্রের জীবনদ্বন্দ্ব রূপলাভ করেছে নাট্যভারতী থিয়েট্রিকাল যাত্রা পার্টির শারদ অর্ঘ 'বাঁশের কেল্লা' পালায়। উদ্বোধন রজনীতেই এই পালা সমবেত অনুরাগীদের হৃদয় জয় করে নিতে সমর্থ হয়েছে। শ্রীপ্রসাদ ভট্টাচার্য রচিত এই পালায় ডাকাত চাষী তিতুমীরের অসাধারণ স্বদেশপ্রেম ও ইংরেজের সঙ্গে তার বিরোধের কাহিনী বর্ণিত হয়েছে। অনেক চরিত্র এসেছে এই পালায়, তাই পরিচালক শ্রীফণিভূষণ বিদ্যাবিনোদ সমবেত অভিনয়সংহতির ওপরেই গুরুত্ব আরোপ করেছেন বেশী। বিভিন্ন চরিত্রে অংশ নিয়ে-ছেন শান্তি হাজরা, ভোলা পাল, খিজির ঘোষ, তপনকুমার (ছোট), মোহন চ্যাটার্জি, সেন্টুবাবু, তারক দাস, রঞ্জিৎ সেন, রিক্তা সরকার, নমিতা চট্টোপাধ্যায়, জয়শ্রী মুখার্জি। এ'দের অন্যান্য পালাগুলোর মধ্যে রয়েছে চন্দ্রলেখা, ক্ষমা, নরমেধ যজ্ঞ, মা ও ছেলে, কীর্তিগড়, উট্‌কণ্ঠা, বাঙ্গালী, হে অতীত কথা কও।

যাত্রাগানের ইতিহাসে বোধহয় যুগান্তর আনবে 'নবরঞ্জন অপেরা'র 'মাইকেল মধু-সূদন' পালার অভিনয়। কোন কবির জীবন

নিয়ে এই বোধহয় পালাগানের ইতিহাসে প্রথম গ্রন্থ রচিত হল। শ্রীবিধায়ক ভট্টাচার্য এই পালায় মধু কবির জীবনের বিচ্ছিন্ন ঘটনাগুলোকে তুলে ধরে কবির জীবন-যন্ত্রণাকে ভাষা দিয়েছেন। 'নবরঞ্জনে'র শিল্পিবৃন্দ আন্তরিক নিষ্ঠায় আধুনিকতার অগ্রদূত এই কবির জীবনকে আশ্চর্য দক্ষতায় মূর্ত করে তুলতে পেরেছেন। নাম-ভূমিকায় অভিনয় করেছেন সুদক্ষ নট শ্রীস্বপনকুমার, নির্দেশনায় দায়িত্ব তাঁর। প্রধানা নারী চরিত্রে রূপ দিয়েছেন জ্যোৎস্না দত্ত। সহশিল্পীদের মধ্যে রয়েছেন গুরুদাস ধাড়া, আনন্দময়, পরেশ বন্দ্যোপাধ্যায়, বাণী ঘোষ।

আধুনিক যাত্রাপালা বক্তব্যের গভীরতার দিক থেকে প্রগতির কোন সীমায় গিয়ে পৌঁছেছে তার একটা প্রোজ্জ্বল দৃষ্টান্ত হল 'তরুণ অপেরা' প্রযোজিত 'ঘুম ভাঙার গান' পালা। প্রথমেই বলা উচিত প্রচলিত ছকে গতানুগতিক রীতিকে অনুসরণ করে এই পালা রচিত হয় নি, রচয়িতা শ্রীশম্ভুনাথ বাগ এর মধ্যে এনেছেন আজকের মানুষের অনেক বৈশিষ্ট্যের কথা। সামাজিক কাহিনীর পটভূমিকায় রচিত এই পালায় মানুষের সাম্যবাদের প্রতি অন্তরগাঢ় বিশ্বাসকে স্বীকৃতি জানান হয়েছে। গ্রন্থকার এর মধ্যে রাজনীতি, সমাজনীতি, বিপ্লববাদের বিভিন্ন ধারার ওপরেও কিছু আলোকসম্পাত করেছেন। ভিন্নতর আঙ্গিক ও চরম হৃদয়াবেগের অসাধারণ জীবনধর্মী নাটকের বিভিন্ন ভূমিকায় অংশ নিয়েছেন দেবেন বন্দ্যোপাধ্যায়, শান্তিগোপাল, অজিত সাহা, শিব ভট্টাচার্য, ক্ষিতীশ রায়, সত্য অধিকারী, ক্ষেত্র চ্যাটার্জি, মণি চ্যাটার্জি, কল্যাণী ভট্টাচার্য, নরেন দে, বর্ণালী বন্দ্যোপাধ্যায়।

যাত্রাজগতে এবার আর একটি দুঃসাহসিক সৃষ্টি হল 'জনতা অপেরা'র 'অঙ্গার'। পালাযাত্রা অনুরাগীদের মধ্যে এ নাটক নতুন চেতনা, আর নতুন আস্বাদ এনেছে। কাহিনী, বক্তব্য, আঙ্গিক ও উপস্থাপনের একটা শিল্পসম্মত রূপান্তর এনেছে এই নাটক। মঞ্চনাটক 'অঙ্গারে'র সঙ্গে কাহিনীতে, ঘটনার বিস্তারে কোন সাদৃশ্য এর নেই। কয়লাখনি অঞ্চলের পটভূমিকায় 'অঙ্গার' পালা রচিত, খনি অঞ্চলের কুলি-মজুর আর মালিকদের নিয়ে এর কাহিনী বিস্তার। কয়লা খাদের শ্রমিক জীবনকে নিয়ে এই পালা রচনা করেছেন 'তামসী' খ্যাত সত্যপ্রকাশ দত্ত।

একটি ভয়াবহ খনি দুর্ঘটনার দৃশ্যও সংযোজিত হয়েছে এই পালায়। নির্দেশনার দায়িত্ব নিয়েছেন শ্রীঅরুণকুমার দাশগুপ্ত, তাঁর প্রচেষ্টায় সুচিন্তিত ও সংযত আঙ্গিকের ছাপ আছে। শ্রীপঞ্চানন মিত্রের সুরসৃষ্টিও যাত্রাজগতে অভিনবত্ব আনতে সক্ষম হয়েছে। বিভিন্ন চরিত্রে অংশ গ্রহণ করেছেন অরুণ দাশগুপ্ত, সোনালী গোস্বামী, জনাদি চক্রবর্তী, প্রফুল্ল গোস্বামী, ছবি চট্টোপাধ্যায়, কমলা পাল, তিনকড়ি ভট্টাচার্য।

আর একটি রসোত্তীর্ণ সামাজিক পালাগান পরিবেশন করবেন 'নিউ রয়েল বীণাপাণি অপেরা'র শিল্পিবৃন্দ। পালার নাম 'মূর্খের পাঁচালী'। ডাঃ অরুণকুমার দে'র কাহিনীকে পালাগানে রূপ দিয়েছেন শ্রীব্রজেন্দ্র দে। শ্রীপ্রসাদ ভট্টাচার্য রচিত 'লাল রাজপথ' নামে ঐতিহাসিক পালাটিও এঁরা পরিবেশন করবেন। এঁদের শিল্পিবৃন্দের মধ্যে রয়েছেন তপনকুমার, গোপাল চট্টোপাধ্যায়, ছবিরাণী, অভয় হালদার, গোকুল দে, বিভূতি পান্ডে, বুলবুল, পাঁচু মুখোপাধ্যায়, মমতা দাস, তারা ভট্টাচার্য।

'ভারতী অপেরা' এবার দুটি নতুন পালা পরিবেশন করবেন—পালা দুটির নাম হোল 'অকূল গাঙের মাঝি', 'লৌহ প্রাচীর'। শ্রীব্রজেন দে রচিত প্রথম পালাটিতে রয়েছে তীব্র গতিবেগ, নাট্যস্পন্দ ও বিস্মিত হবার মতো একাধিক নাট্য-মুহূর্ত। 'লৌহ প্রাচীর' একটি কাল্পনিক পালাগান। ভারতী অপেরার শিল্পীবৃন্দের মধ্যে আছেন স্বনামধন্য নট দিলীপকুমার চট্টোপাধ্যায়, পালনচন্দ্র নস্কর, হিরণ বসু মল্লিক, দেবকুমার, শেখর আচার্য, হীরালাল ব্যানার্জি, শচী মন্ডল, নিমাই দত্ত, শ্যামলী মজুমদার, কৃষ্ণা চক্রবর্তী, রিতা দত্ত, চন্দ্রা সিন্‌হা, স্বপ্না চক্রবর্তী, নেপাল মন্ডল, অনিল দাস। এঁদের অন্যান্য পালাগুলো হোল ভৈরবের ডাক, বিসর্জন, সোনাই দীঘি।

'অম্বিকা নাট্য কোম্পানী'র শিল্পীবৃন্দ এই মরশুমে দুটি পালা পরিবেশন করবেন শ্রীকানাই নাথের 'কাঁসাই নদীর তীরে' ও 'চন্ডীতলার মন্দির'। উদ্বোধন রজনীতে এ দুটি পালাগান যাত্রানুরাগীর অকুন্ঠ প্রশংসা অর্জন করেছে। দলগত অভিনয় ও প্রয়োগ পরিকল্পনায় আছে অনেক নতুনত্বের ছাপ। বিভিন্ন চরিত্রে অংশ গ্রহণ করেছেন অমিয় বসু, অমর বন্দ্যোপাধ্যায়, ছবি রায়, গুরুদাস মিত্র, দীপেন চট্টোপাধ্যায়, চন্ডী বন্দ্যোপাধ্যায়, নির্মল ভট্টাচার্য, বেচু সিংহ, মায়া পাল, সন্ধ্যা নন্দী। এদের অন্য দুটি পালা হোল মেঘমুক্তি, নিঝুম রাতের কান্না।

দুটি ভিন্ন স্বাদের পালা পরিবেশন করে অকুন্ঠ অভিনন্দন লাভ করবেন 'শ্রীরাধা নাট্য কোম্পানীর' শিল্পীবৃন্দ। পালা দুটির নাম হোল শ্রীকানাই নাথের 'লক্ষ্মী এলো ঘরে' ও শ্রীনির্মল মুখোপাধ্যায়ের 'দীপ নিভে গেলো'। বিমল লাহিড়ী, নিতাই দাস, জহর রায়, সুধরঞ্জন সরকার, রঙ্গলাল কর, অজনকুমার, ছবি কর, লতা অধিকারী, কানন দাস, অসীমা কুন্ডু, ইরা চ্যাটার্জি।

'নবরূপা নাট্য কোম্পানীর' এবারের শারদ অর্ঘ্য হোল কবিরাজ অ্যান্টনী ফিরিঙ্গী, নির্ভীক সৈনিক, অগ্নি-বন্যা, নিষ্কৃতি প্রভৃতি। এই নতুন নাটকগুলোতে অভিনয় করছেন সুধীরকুমার, সরোজ মুখোপাধ্যায়, বীরেশ সরকার, অজিত বন্দ্যোপাধ্যায়, ভূপতি চক্রবর্তী, তারাপদ বন্দ্যোপাধ্যায়, জনককুমার দে, অরূপকুমার, অসীমকুমার, পরিমল দাশগুপ্ত, জ্যোৎস্না দাস, রুবী হালদার, মঞ্জু সেনগুপ্ত, বীণা চ্যাটার্জী।

বঙ্কিমচন্দ্রের 'বিষবৃক্ষ' বাংলা সাহিত্যে একটা অবিস্মরণীয় সৃষ্টি। সাহিত্য-সম্রাটের এই অমূল্য গ্রন্থকে পালাগানে রূপান্তরিত করেছেন 'কুন্ডু নাট্য কোম্পানী'র শিল্পীবৃন্দ। রূপান্তরের দায়িত্ব যোগ্যতার সঙ্গে পালন করেছেন শ্রীআনন্দময় বন্দ্যোপাধ্যায়। এ পালার বিভিন্ন চরিত্রে রূপ দিয়েছেন বিজন মুখোপাধ্যায়, বেলা সরকার, রাজেন সাহা, বাবলী রাণী, পঞ্চানন বন্দ্যোপাধ্যায়, রতন মল্লিক, খগেন বন্দ্যোপাধ্যায়, হারাধন চক্রবর্তী, চন্দন বিশ্বাস। কুন্ডু নাট্য কোম্পানীর আর একটি পালার নাম হোল 'আবুল হাসান'।

'নিউ প্রভাস অপেরা' অত্যন্ত নিষ্ঠার সঙ্গে দুটি নতুন পালা পরিবেশনে ব্রতী হয়েছেন। পালা দুটির নাম হোল শ্রীআনন্দময়ের 'গুপ্ত রহস্য' ও শ্রীদিবাকরের 'মরণ সংকেত', প্রথম পালাটি ঐতিহাসিক পটভূমিকায় রচিত। রাজা জয়সুর ও পাঠান সর্দার ইব্রাহিম খাঁর সংঘাত দিয়েই এই পালার কাহিনীর যাত্রা শুরু হয়েছে। একটি পৌরাণিক কাহিনী থেকে রচিত হয়েছে দ্বিতীয় পালা 'মরণ সংকেত'। নর্তকী চিত্রলেখার নিঃসীম জীবন-যন্ত্রণা এই পালায় পরিস্ফুট হয়ে উঠেছে।

'শ্রীমা নাট্য কোম্পানীর' শারদীয়ার বিশেষ আকর্ষণ হোল শ্রীসত্যপ্রকাশ দত্তের সমস্যামূলক নাটক 'ভুক্কা' ও বিজয় ঘোষের পৌরাণিক নাটক 'সতী মদালসা'। শিল্পীদের মধ্যে রয়েছেন শান্তি চক্রবর্তী, বিজয় ভদ্র, প্রণয়কুমার, অসীমকুমার, প্রবীর দে, মণীন্দ্র নন্দী, অন্নদা চক্রবর্তী, সীমা সরকার, শ্রীমতী রায়, কমলা সূত্রধর, কনকলতা।

'নিউ আর্য অপেরা' এবারে যে পালাগুলো পরিবেশন করবেন সেগুলোর মধ্যে অন্যতম হোল ভক্তভৈরব, গিরিশচন্দ্র, নিষ্পত্তি, জনপ্রিয় রাজা, বিষ পাথর, অপরাধী কে? বিশিষ্ট কয়েকটি ভূমিকায় অভিনয় করছেন পল্টু সেন, ফিরোজবালা, অনিল ঘোষ, বিজনকুমার, তিলোত্তমা, দিলীপ মুখোপাধ্যায়, কালী চট্টোপাধ্যায়, মনোরমা বন্দ্যোপাধ্যায়, সন্ধ্যা মুন্সী।

আরো হয়তো অনেক অপেরা তাঁদের পালা নিয়ে প্রস্তুত হয়েছেন। শুধু সংখ্যায় নয়, বক্তব্যের গভীরতা ও প্রয়োগ পরিকল্পনায় অভিনবত্বে আজকের পালাগান নাট্যানুরাগীকে যে আকৃষ্ট করেছে এ বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই। যাঁরা আজকের দিনে অপেরা পরিচালনা করছেন তাঁদের ভাবতে হবে কেমন করে নিয়মিত ভাবে যাত্রা পরিবেশন করা যায়। শুধুমাত্র বিশেষ উৎসবের সময় নয়, প্রাত্যহিকতায় শিল্প, সংস্কৃতি আন্দোলনের মধ্যে যাত্রাও একটা বিশিষ্ট স্থান করে নিক।

দর্শক

আই এফ এ শীল্ড

মোহনবাগান বনাম ইস্টবেঙ্গল দলের ১৯৬৭ সালের আই এফ এ শীল্ড ফাইনাল খেলাটি, গোলশূন্য অবস্থায় শেষ হয়েছে। দুই দলই তাদের সুনাম অনুযায়ী খেলতে না পারায় সমর্থক এবং দর্শকদের খুবই হতাশ হতে হয়েছে। নানা রকমের অসুবিধা থাকায় এই দুই দলের অমীমাংসিত ফাইনাল খেলাটি পুনরায় কোন তারিখে হবে তা আই এফ এ-র পক্ষে ঘোষণা করা সম্ভব হয় নি। উভয় পক্ষ রাজী হলে আই এফ এ শেষ পর্যন্ত দুই দলকেই যে যুগ্ম-বিজয়ী ঘোষণা করবেন তার প্রস্তাবও নাকি করা হয়েছে; অর্থাৎ জয়-পরাজয়ের ভিত্তিতে নয়, কাগজে-কলমে যখন শীল্ড ফাইনালের মীমাংসা হবে।

এ বছরের ফুটবল মরসুমে মোহনবাগান এবং ইস্টবেঙ্গল দলের এই নিয়ে তৃতীয় সাক্ষাৎ। লীগের প্রথম খেলায় ইস্টবেঙ্গল ২—১ গোলে এবং দ্বিতীয় খেলায় মোহনবাগান ১—০ গোলে জয়ী হয়েছিল।

আই এফ এ শীল্ডের ফাইনালে মোহনবাগান ক্লাব পূর্বে যে আঠারবার খেলেছে তার মধ্যে ৩ বারের ফাইনাল খেলায় জয়-পরাজয়ের নিষ্পত্তি হয়নি— ১৯৫২ সালে রাজস্থানের বিপক্ষে ফাইনাল খেলা দুদিন ড্র (২—২ ও ০—০) যাওয়ার পর পরিত্যক্ত হয়, ১৯৫৯ সালে ইস্টবেঙ্গল দলের বিপক্ষে নির্ধারিত ফাইনাল খেলা একেবারেই হয়নি এবং ১৯৬৪ সালে ইস্টবেঙ্গল দলের বিপক্ষে ফাইনাল খেলাটি ১—১ গোলে ড্র যাওয়ার পর বাতিল ঘোষণা করা হয়। বাকি ১৫টি ফাইনালে মোহনবাগানের জয় ৮ বার (এর মধ্যে ১৯৬১ সালে ইস্টবেঙ্গলের সঙ্গে যুগ্ম-বিজয়ী)। অপর দিকে ইস্টবেঙ্গল দলের ১৫টি ফাইনাল খেলার মধ্যে দুটি পরিত্যক্ত (মোহনবাগানের সঙ্গে ১৯৫৯ ও ১৯৬৪ সালে) এবং জয় ৯ বার (এর মধ্যে একবার যুগ্ম-বিজয়ী)।

আই এফ এ শীল্ডের ফাইনালে মোহনবাগান এবং ইস্টবেঙ্গল এই দুই দলের এই নিয়ে দশম সাক্ষাৎ। বিগত ৯টি ফাইনাল খেলার মধ্যে ২টি খেলা পরিত্যক্ত (১৯৫৯ ও ১৯৬৪ সালে) এবং ১৯৬১ সালে দুই দলই যুগ্ম-বিজয়ী হয়। বাকি ৬টি ফাইনাল খেলায় ইস্টবেঙ্গলের জয় ৫ বার এবং মোহনবাগানের জয় মাত্র একবার।

মোহনবাগান বনাম ইস্টবেঙ্গল

১৯৪৫	ইস্টবেঙ্গল	১ :	মোহনবাগান	০
১৯৪৭	মোহনবাগান	১ :	ইস্টবেঙ্গল	০
১৯৪৯	ইস্টবেঙ্গল	২ :	মোহনবাগান	০
১৯৫১	ইস্টবেঙ্গল	০,২ :	মোহনবাগান	০,০
১৯৫৮	ইস্টবেঙ্গল	১ :	মোহনবাগান	০
১৯৫৯	মোহনবাগান	:	ইস্টবেঙ্গল	
১৯৬১	মোহনবাগান	০ :	ইস্টবেঙ্গল	০
১৯৬৪	মোহনবাগান	১ :	ইস্টবেঙ্গল	১
১৯৬৫	ইস্টবেঙ্গল	০,১ :	মোহনবাগান	০,০

দ্রষ্টব্য : ১৯৫৯ সালের ফাইনাল খেলা হয়নি; ১৯৬১ সালে উভয় দলকে যুগ্ম-বিজয়ী ঘোষণা করা হয়; ১৯৬৪ সালের ফাইনাল খেলা শেষ পর্যন্ত পরিত্যক্ত হয়।

১৯৬৭ সালের আই এফ এ শীল্ড

কোয়ার্টার ফাইনাল

মোহনবাগান	৫ :	পাঞ্জাব পুলিশ	০
ইস্টবেঙ্গল	২ :	ভাস্কো ক্লাব	০
বি এন আর	৩,২ :	ইষ্টার্ণ রেল	৩,০
মহমেডান স্পোর্টিং	০,৪ :	রাজস্থান	০,০

সেমি-ফাইনাল

মোহনবাগান	১ :	মহমেডান স্পোর্টিং	০
ইস্টবেঙ্গল	৫ :	বি এন আর	০

ফাইনালের পথে

মোহনবাগান : তৃতীয় রাউন্ডে খিদিরপুরকে ৬—০, কোয়ার্টার ফাইনালে পাঞ্জাব পুলিশকে ৫—০ এবং সেমি-ফাইনালে মহমেডান স্পোর্টিংকে ১—০ গোলে পরাজিত করে।

ইস্টবেঙ্গল : তৃতীয় রাউন্ডে বাটা স্পোর্টসকে ৪—০, কোয়ার্টার ফাইনালে ভাস্কো ক্লাবকে (গোয়া) ২—০ এবং সেমি-ফাইনালে বি এন আরকে ৫—০ গোলে পরাজিত করে।

আই এফ এ শীল্ডে জয়-পরাজয়

মোহনবাগান (ফাইনাল ১৯ বার) : জয় (৮ বার) : ১৯১১, ১৯৪৭, ১৯৪৮, ১৯৫৪, ১৯৫৬, ১৯৬০, ১৯৬১ (যুগ্ম বিজয়ী), ১৯৬২
রানার্স—আপ (৭ বার) : ১৯২৩, ১৯৪০, ১৯৪৫, ১৯৪৯, ১৯৫১, ১৯৫৮, ১৯৬৫
খেলা পরিত্যক্ত (৩ বার) : ১৯৫২ (রাজস্থানের সঙ্গে) এবং ১৯৫৯ ও ১৯৬৪ (ইস্টবেঙ্গলের সঙ্গে)
খেলা ড্র : ১৯৬৭

ক্যালকাটা এফ-সি (ফাইনাল ১৭ বার) :
জয় (৯ বার) : ১৮৯৬, ১৯০০, ১৯০৩, ১৯০৪, ১৯০৬, ১৯১৫, ১৯২২—২৪
রানার্স—আপ (৮ বার) : ১৯০৫, ১৯০৭, ১৯১০, ১৯১৪, ১৯১৬, ১৯১৯, ১৯২৭ ও ১৯৩৬

ইস্টবেঙ্গল (ফাইনাল ১৬ বার) :
জয় (৯ বার) : ১৯৪৩, ১৯৪৫, ১৯৪৯—৫১, ১৯৫৮, ১৯৬১ (যুগ্ম বিজয়ী), ১৯৬৫—৬৬
রানার্স—আপ (৪ বার) : ১৯৪২, ১৯৪৪, ১৯৪৭, ১৯৫৩
খেলা পরিত্যক্ত (২ বার) : ১৯৫৯ ও ১৯৬৪ (বিপক্ষে মোহনবাগান)
খেলা ড্র : ১৯৬৭

ডালহৌসী (ফাইনাল ৬ বার) :
জয় (২ বার) : ১৮৯৭ ও ১৯০৫
রানার্স—আপ (৪ বার) : ১৯০০, ১৯০২, ১৯২২ ও ১৯২৮

মহমেডান স্পোর্টিং (ফাইনাল ৬ বার) :
জয় (৪ বার) : ১৯০৬, ১৯৪১, ১৯৪২ ও ১৯৫৭
রানার্স—আপ (২ বার) : ১৯৩৮ ও ১৯৬০

রয়েল আইরিশ রাইফেলস (ফাইনাল ৬ বার) :
জয় (৬ বার) : ১৮৯৩—৯৫, ১৯০১ ১৯১২—১৩

গর্ডন হাইল্যান্ডার্স (ফাইনাল ৩ বার) :
জয় (৩ বার) : ১৯০৮—১০

শেরউড ফরেস্টার্স (ফাইনাল ৩ বার) :
জয় (৩ বার) : ১৯২৬—২৮

এরিয়ান্স (ফাইনাল ৩ বার) :
জয় (১ বার) : ১৯৪০
রানার্স-আপ (২ বার) : ১৯৫৫—৫৬

শীল্ড ফাইনালে উপর্যুপরি পাঁচবার

ক্যালকাটা এফ-সি (১৯০৩—৭) :
জয় (৩ বার) : ১৯০৩—৪ ও ১৯০৬
রানার্স-আপ (২ বার) : ১৯০৫ ও ১৯০৭

ইস্টবেঙ্গল (১৯৪২—৪৭):
জয় (২ বার) : ১৯৪৩ ও ১৯৪৫
রানার্স-আপ (৩ বার) : ১৯৪২, ১৯৪৪ ও ১৯৪৭
দ্রষ্টব্য : ১৯৪৬ সালে প্রতিযোগিতা স্থগিত ছিল

মোহনবাগান (১৯৫৮—৬২) :
জয় (৩ বার) : ১৯৬০—৬২
রানার্স-আপ (১ বার) : ১৯৫৮
খেলা পরিত্যক্ত : ১৯৫৯

উপর্যুপরি ৩ বার শীল্ড জয়

(১) গর্ডন হাইল্যান্ডার্স (১৯০৮—১০)
(২) ক্যালকাটা এফ সি (১৯২২-২৪)
(৩) শেরউড ফরেস্টার্স (১৯২৬—২৮)
(৪) ইস্টবেঙ্গল (১৯৪৯—৫১)
(৫) মোহনবাগান (১৯৬০—৬২)

দ্রষ্টব্য : ১৯৬১ সালে মোহনবাগান-ইস্টবেঙ্গল যুগ্ম-বিজয়ী।

শীল্ড বিজয়ী ভারতীয় দল

(১) ইস্টবেঙ্গল—৯ বার, (২) মোহনবাগান—৮ বার, (৩) মহমেডান স্পোর্টিং—৪ বার এবং একবার করে (৪) এরিয়ান্স, (৫) অধুনালুপ্ত বেঙ্গল এ্যান্ড আসাম রেলওয়ে, (৬) ইন্ডিয়ান কালচার লীগ (বোম্বাই), (৭) রাজস্থান এবং (৮) বি এন আর।

লেডী হার্ডিঞ্জ শীল্ড

১৯৬৭ সালের প্রথম বিভাগের লীগ চ্যাম্পিয়ান মহমেডান স্পোর্টিং দল ফাইনাল খেলায় ৩—১ গোলে উয়াড়ীকে পরাজিত করে লেডী হার্ডিঞ্জ শীল্ড জয়ী হয়েছে।

জাপানের আমন্ত্রণমূলক হকি ফাইনাল

ইয়োকোহামায় জাপান বেতার প্রতিষ্ঠান কর্তৃক আয়োজিত আমন্ত্রণমূলক হকি কাপ প্রতিযোগিতার ফাইনালে জাপান একাদশ দল ৪—০ গোলে মাদ্রাজ হকি দলকে পরাজিত করে।

জন ডেভিট (অস্ট্রেলিয়া) : অলিম্পিকের ১০০ মিটার ফ্রি স্টাইল সাঁতারে নতুন অলিম্পিক রেকর্ড সময়ে (৫৫-২ সেঃ) স্বর্ণপদক বিজয়ী (১৯৬০)।

আন্তর্জাতিক সাঁতার পরিক্রমা

ক্ষেত্রনাথ রায়

অলিম্পিক গেমসের এ্যাথলেটিক্সে আমেরিকা যেমন অটুট প্রাধান্য অক্ষুণ্ণ রেখেছে তেমনি তাদের প্রাধান্য বজায় রেখেছে অলিম্পিক সাঁতার বিভাগে। অলিম্পিক সাঁতারে বিরাট সাফল্যের ভিত্তিতে আমেরিকানদের নিঃসন্দেহে জাত সাঁতারু বলা যায়। আধুনিককালের অলিম্পিক গেমসের উদ্বোধনী বছরের (১৮৯৬) ক্রীড়াসূচীতে সাঁতার স্থান পেলেও অনুষ্ঠানের সংখ্যা খুবই কম ছিল। সেই সময় থেকে সাঁতারের অনুষ্ঠান বাতিল এবং যোগ করে বর্তমানে অনুষ্ঠান সংখ্যা দাঁড়িয়েছে—পুরুষ বিভাগে দশটি এবং মহিলা বিভাগে আটটি। ১৯৬৪ সালের গত টোকিও অলিম্পিকে পুরুষ বিভাগে এই তিনটি নতুন অনুষ্ঠান যোগ করা হয়—২০০ মিটার ব্যাক স্ট্রোক, ৪০০ মিটার ফ্রিস্টাইল রিলে এবং ৪০০ মিটার ব্যক্তিগত মেড্‌লি। অপরদিকে মহিলা বিভাগের নতুন অনুষ্ঠান ছিল একটি—৪০০ মিটার ব্যক্তিগত মেড্‌লি।

অলিম্পিক গেমসের সাঁতার অনুষ্ঠানে দু'একবার যা আমেরিকাকে বাধার সম্মুখীন হতে হয়েছে। যেমন ১৯৩২ সালে জাপান এবং ১৯৫৬ সালে অস্ট্রেলিয়া পুরুষ বিভাগে শ্রেষ্ঠত্বের পরিচয় দিয়েছিল। কিন্তু ১৯৫৬ সালের পরবর্তী আট বছরে আমেরিকা সাঁতারে কি বিরাট সাফল্যের পরিচয়ই না দিয়েছে। ১৯৫৬ সালের অলিম্পিক সাঁতারে আমেরিকা পুরুষ ও মহিলা বিভাগে মাত্র একটি ক'রে স্বর্ণ পদক জয়ী হয়েছিল। অপর দিকে ঐ বছরের সাঁতারের শীর্ষস্থান অধিকারী অস্ট্রেলিয়া পেয়েছিল আটটি স্বর্ণ পদক—পুরুষ বিভাগে পাঁচ এবং মহিলা বিভাগে তিনটি। কিন্তু ১৯৬০ এবং ১৯৬৪ সালের অলিম্পিক সাঁতারে আমেরিকা পুনরায় শীর্ষস্থানে ফিরে আসে। ১৯৬০ সালে আমেরিকা জয়ী হয়েছিল নয়টি স্বর্ণ পদক—পুরুষ বিভাগে চার এবং মহিলা বিভাগে পাঁচ।

১৯৬৪ সালের অলিম্পিক সাঁতারে যে আঠারটি বিষয় ছিল সেই সব অনুষ্ঠানের সূচনা থেকে এ পর্যন্ত ফলাফল হিসাব করলে এই রকম অবস্থা দাঁড়ায় : পুরুষ বিভাগের দশটি বিষয়ের মধ্যে আটটিতে আমেরিকা বিরাট ব্যবধানে সর্বাধিক স্বর্ণ এবং সর্বাধিক মোট পদক জয়ের গৌরব লাভ করেছে। তাদের ১০০ মিটার ফ্রিস্টাইলে মোট পদক ১৯ (স্বর্ণ ৮), ৪০০ মিটার ফ্রিস্টাইলে মোট পদক ১২ (স্বর্ণ ৭) এবং ৮০০ মিটার ফ্রিস্টাইল রিলেতে মোট পদক ১২ (স্বর্ণ ৭)। পুরুষদের বাকি দুটি অনুষ্ঠানে—১,৫০০ মিটার ফ্রিস্টাইলে অস্ট্রেলিয়া (স্বর্ণ ৪) এবং ২০০ মিটার ব্রেস্ট স্ট্রোকে জাপান (স্বর্ণ ৪) আমেরিকার থেকে মাত্র একটি পদক বেশী পেয়ে সর্বাধিক স্বর্ণ পদক জয়ের রেকর্ড করেছে। তবে আমেরিকা—১,৫০০ মিটার ফ্রিস্টাইলে অস্ট্রেলিয়া এবং ২০০ মিটার ব্রেস্ট স্ট্রোকে জাপানের সঙ্গে সর্বাধিক মোট পদক জয়ের ক্ষেত্রে সমান ভাগীদার—১,৫০০ মিটার ফ্রিস্টাইলে মোট পদক দশটি এবং ২০০ মিটার ব্রেস্ট স্টোকে মোট পদক আটটি।

মহিলা বিভাগের মোট আটটি অনুষ্ঠানের মধ্যে সাতটি অনুষ্ঠানে সর্বাধিক স্বর্ণ এবং সর্বাধিক মোট পদক জয়ের রেকর্ড করেছে আমেরিকা। স্বর্ণ এবং মোট পদক জয়ের ক্ষেত্রে আমেরিকা দ্বিতীয় স্থান অধিকারী দেশের থেকে বিরাট ব্যবধানে এগিয়ে আছে। মহিলা বিভাগের বাকি একটি অনুষ্ঠানে (২০০ মিটার ব্রেস্ট স্ট্রোক) সর্বাধিক স্বর্ণ (২) এবং সর্বাধিক মোট পদক (৭) জয়ী হয়েছে জার্মাণী। এই ২০০ মিটার ব্রেস্ট স্ট্রোক অনুষ্ঠানের সূচনা (১৯২৪ সাল) থেকে আমেরিকা এ পর্যন্ত সংগ্রহ করেছে দুটি রৌপ্য পদক। অলিম্পিক সাঁতারের বর্তমান আঠারটি অনুষ্ঠানের মধ্যে একমাত্র মহিলাদের ২০০ মিটার ব্রেস্ট স্ট্রোক সাঁতারে আমেরিকা যা স্বর্ণ পদক জয়ী হয় নি। চাঁদের কলঙ্কের মত আমেরিকার বিরাট সাফল্যময় জীবনে একটা ছোট দাগ থেকে গেছে, তবে তা চিরস্থায়ী নয়।

১৯৬৪ সালের অলিম্পিক

আমেরিকার বিরাট সাফল্য, প্রতিটি বিষয়ে নতুন অলিম্পিক রেকর্ড এবং বারটি বিষয়ে নতুন বিশ্ব রেকর্ড করার সূত্রে টোকিও অলিম্পিকের সাঁতার প্রতিযোগিতা নতুন অধ্যায়ের সূচনা করেছে। টোকিও অলিম্পিক সাঁতারের আঠারটি অনুষ্ঠানে স্বর্ণ পদক জয়ী হয়েছিল মাত্র এই তিনটি দেশ—আমেরিকা (তেরটি), অস্ট্রেলিয়া (চারটি) এবং রাশিয়া (একটি)। পুরুষ বিভাগে স্বর্ণ পদক পায় আমেরিকা সাত এবং অস্ট্রেলিয়া তিন। অপরদিকে মহিলা বিভাগে স্বর্ণ পদক জয়ী হয়—আমেরিকা ছয়টি, অস্ট্রেলিয়া একটি এবং রাশিয়া একটি। পুরুষ এবং মহিলা বিভাগের মোট ৫৪টি পদক তালিকায় আমেরিকা একাই ২৯টি পদক জয়ী হয় (স্বর্ণ ১৩, রৌপ্য ৮ ও ব্রোঞ্জ ৮)। বাকি ২৫টি পদক ভাগ করে নিয়েছিল অপর সাতটি দেশ। পুরুষ এবং মহিলাদের প্রতিটি অনুষ্ঠানেই নতুন অলিম্পিক রেকর্ড স্থাপিত হয় এবং নতুন বিশ্ব

রেকর্ড স্থাপিত হয় বারটি অনুষ্ঠানে -পুরুষদের আটটি এবং মেয়েদের চারটি। নতুন অলিম্পিক এবং বিশ্ব রেকর্ড প্রতিষ্ঠায় প্রধান ভূমিকা নিয়েছিল আমেরিকাই -আমেরিকা মোট তেরটি নতুন অলিম্পিক রেকর্ড করে এবং বিশ্ব রেকর্ড করে পুরুষ বিভাগে ছয়টি এবং মহিলা বিভাগে চারটি। তাছাড়া আমেরিকা পুরুষ বিভাগের ২০০ মিটার ব্যাক স্ট্রোক এবং মহিলা বিভাগের ৪০০ মিটার ব্যক্তিগত মেড্‌লে ও ৪০০ মিটার ফ্রিস্টাইলের প্রতিটিতে তিনটি ক'রে পদক (স্বর্ণ, রৌপ্য ও ব্রোঞ্জ) জয় করে অসাধারণ কৃতিত্বের পরিচয় দিয়েছিল।

টোকিও অলিম্পিকের সাঁতারে যে-সব স্কুল-কলেজের ছাত্র-ছাত্রী এবং অল্প বয়সের সাঁতারু পদক জয়ের সূত্রে অলিম্পিক সাঁতারে নতুন অধ্যায় যোজনা করেছেন তাঁদের মধ্যে নীচের কয়েকজনের নাম বিশেষ উল্লেখযোগ্য।

শারণ স্টাউডার (আমেরিকা) : পনের বছর বয়সের এই মেয়েটি মহিলা বিভাগে সর্বাধিক তিনটি পদক (স্বর্ণ ২ ও রৌপ্য ১) জয় করেন। ৪০০ মিটার ফ্রিস্টাইল রিলে ও ১০০ মিটার বাটার ফ্লাই সাঁতারে স্বর্ণ পদক* এবং ১০০ মিটার ফ্রিস্টাইলে রৌপ্য পদক। ডোনা ডে ভারোনা (আমেরিকা) : সতের বছর বয়সের স্কুল ছাত্রী। ৪০০ মিটার ব্যক্তিগত মেডলি সাঁতারে নতুন অলিম্পিক রেকর্ড সময়ে (৫ মিঃ ১৮-৭ সেঃ) স্বর্ণ পদক জয় করেন। তাছাড়া ৪০০ মিটার ফ্রিস্টাইল রিলেতেও স্বর্ণ পদক পান। গিনি ডুয়েনকেল (আমেরিকা) : সতের বছর বয়সের স্কুল ছাত্রী। ৪০০ মিটার ফ্রিস্টাইলে বিশ্ব রেকর্ডের অধিকারিণীকে পরাজিত করে নতুন অলিম্পিক রেকর্ড সময়ে (৪ মিঃ ৪৩-৩ সেঃ) স্বর্ণ পদক জয় করেন।

ডন স্কোল্যান্ডার (আমেরিকা) : আঠার বছর বয়সের এই বিশ্ববিদ্যালয় ছাত্রটি টোকিও অলিম্পিক সাঁতারে পুরুষ এবং মহিলাদের পক্ষে সর্বাধিক স্বর্ণ পদক

* বিশ্ব রেকর্ড সময়ে

রবার্ট উইন্ডল (অস্ট্রেলিয়া)
অলিম্পিকের ১,৫০০ মিটার ফ্রি স্টাইলে
স্বর্ণপদক বিজয়ী (১৯৬৪)

'সাঁতারের রাণী' ডন ফ্রেজার (অস্ট্রেলিয়া)
তিনটি অলিম্পিকে ৭টি পদক (স্বর্ণ ৪
ও রৌপ্য ৩) বিজয়িনী

(৪টি) জয়ের রেকর্ড করেন। এঁর স্বর্ণ পদক জয় ১০০ ও ৪০০ মিটার ফ্রিস্টাইল এবং ৪০০ ও ৮০০ মিটার ফ্রিস্টাইল রিলে সাঁতারে।

আয়ান ও' ব্রীয়েন (অস্ট্রেলিয়া) : সতের বছর বয়সের স্কুল ছাত্র। ২০০ মিটার ব্রেস্ট স্ট্রোকে নতুন বিশ্ব এবং অলিম্পিক রেকর্ড সময়ে (২ মিঃ ২৭-৮ সেঃ) স্বর্ণ পদক জয়ী হন।

বব্ উইন্ডল (অস্ট্রেলিয়া) : সতের বছর বয়সের এই স্কুল ছাত্রটি ১,৫০০ মিটার ফ্রিস্টাইল সাঁতারে নতুন অলিম্পিক রেকর্ড সময়ে (১৭ মিঃ ০১-৭ সেঃ) স্বর্ণ পদক জয়ী হন। কেভিন বেরী (অস্ট্রেলিয়া) : উনিশ বছর বয়সের বিশ্ববিদ্যালয় ছাত্র। নতুন বিশ্ব ও অলিম্পিক রেকর্ড সময়ে

মারে রোজ (অস্ট্রেলিয়া)
অলিম্পিকের ৪০০ মিটার ফ্রি স্টাইল
(১৯৫৬ ও ১৯৬০) এবং ১,৫০০ মিটার
ফ্রি স্টাইলের (১৯৫৬) স্বর্ণপদক বিজয়ী

(২ মিঃ ০৬-৬ সেঃ) ২০০ মিটার বাটার ফ্লাই সাঁতারে স্বর্ণ পদক জয় করেন।

গ্যালিনা প্রোজুমেনশ্চিকোভা (রাশিয়া) : পনের বছর বয়সের স্কুল ছাত্রী। অলিম্পিক রেকর্ড সময়ে (২ মিঃ ৪৬-৪ সেঃ) ২০০ মিটার ব্রেস্ট স্ট্রোক সাঁতারে স্বর্ণ পদক জয় করেন।

অস্ট্রেলিয়ার প্রাধান্য

অলিম্পিক সাঁতারে আমেরিকার অন্যতম প্রতিদ্বন্দ্বী অস্ট্রেলিয়া। অস্ট্রেলিয়া উপর্যুপরি দুটি অলিম্পিকের (১৯৫৬ ও ১৯৬০) পুরুষ বিভাগের ১০০ মিটার ফ্রিস্টাইল এবং ৪০০ মিটার ফ্রিস্টাইলে স্বর্ণ পদক জয় করেছিল। তাছাড়া ১৯৫৬ সাল থেকে উপর্যুপরি তিনটি অলিম্পিকে অস্ট্রেলিয়া পুরুষদের ১,৫০০ মিটার ফ্রি স্টাইল সাঁতারে স্বর্ণ পদক জয়ের সূত্রে একটানা প্রাধান্য গড়ে তুলেছে এবং অপর দিকে ১৯৬৪ সালে পুরুষদের ২০০ মিটার ব্রেস্ট স্ট্রোক ও ২০০ মিটার বাটার ফ্লাই সাঁতারে স্বর্ণ পদক জয়ী হয়ে আমেরিকার প্রাধান্য খর্ব করেছে।

জাপানের ভূমিকা

অলিম্পিক সাঁতারে জাপানের নাম ডাক এক সময়ে আমেরিকা এবং অস্ট্রেলিয়ার পরেই ছিল। অলিম্পিক সাঁতারে জাপান এ পর্যন্ত পুরুষ বিভাগে জয় করেছে ৩৩টি পদক (স্বর্ণ ৯, রৌপ্য ১৬ ও ব্রোঞ্জ ৮) এবং মহিলা বিভাগে মোট ৩টি (স্বর্ণ ১, রৌপ্য ১ ও ব্রোঞ্জ ১)। ১৯৩২ সালের অলিম্পিক সাঁতারে জাপান পুরুষ বিভাগে মোট ১১টি পদক (স্বর্ণ ৫, রৌপ্য ৪ ও ব্রোঞ্জ ২) জয়ের সূত্রে শীর্ষস্থান পেয়েছিল। কিন্তু ১৯৬৪ সালে স্বদেশের মাটিতে আয়োজিত অলিম্পিক সাঁতারে মাত্র একটি ব্রোঞ্জ পদক সংগ্রহ করে শোচনীয় ব্যর্থতার পরিচয় দেয়।

অলিম্পিক রেকর্ড

ডাবল খেতাব

অলিম্পিক গেমসের একই বছরের আসরে একই ব্যক্তির পক্ষে ১০০ ও ৪০০
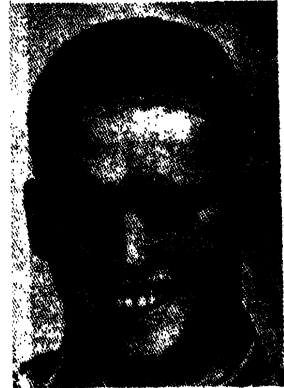
ডন স্কোল্যান্ডার (আমেরিকা)
১৯৬৪ সালের অলিম্পিকে সর্বাধিক
স্বর্ণপদক বিজয়ী

মিটার ফ্রি স্টাইল এবং ৪০০ ও ১,৫০০ মিটার ফ্রি স্টাইল সাঁতারের স্বর্ণ পদক জয় রীতিমত এক দুর্লভ সম্মান। এ পর্যন্ত মাত্র ৮ জন সাঁতারু এই সম্মান লাভ করেছেন।

১০০ ও ৪০০ মিটার ফ্রি স্টাইল

পুরুষ বিভাগ

১৯২৪ : জনি ওয়েসমুলার (আমেরিকা)

১৯৬৪ : ডন স্কোল্যান্ডার (আমেরিকা)

মহিলা বিভাগ

১৯৩২ : হেলেন ম্যাডিসন (আমেরিকা)

১৯৩৬ : হেন্ড্রিকা মাস্টেনব্রোক (নেদারল্যান্ড)

৪০০ ও ১,৫০০ মিটার ফ্রি স্টাইল

পুরুষ বিভাগ

১৯০৮ : হেনরী টেলর (ইংল্যান্ড)

১৯১২ : জর্জ হজসন (কানাডা)

১৯২০ : নর্ম্যান রস (আমেরিকা)

১৯৫৬ : মারে রোজ (অস্ট্রেলিয়া)

একই বিষয়ে উপর্যুপরি দু'বার স্বর্ণ পদক

পুরুষ বিভাগ

১০০ মিটার ফ্রি স্টাইল :
ডিউক কাহানামোকু (আমেরিকা)—১৯১২ ও ১৯২০।

৪০০ মিটার ফ্রি স্টাইল :
মারে রোজ (অস্ট্রেলিয়া)—১৯৫৬ ও ১৯৬০।

২০০ মিটার ব্রেস্ট স্ট্রোক :
য়োসীজুকি ৎসুরুটা (জাপান)—১৯২৮ ও ১৯৩২।

মহিলা বিভাগ

১০০ মিটার ফ্রি স্টাইল :
ডন ফ্রেজার (অস্ট্রেলিয়া)—১৯৫৬, ১৯৬০ ও ১৯৬৪।

৪০০ মিটার ফ্রি স্টাইল :
মার্থা নোরেলিয়াস (আমেরিকা)—১৯২৪ ও ১৯২৮।

দ্রষ্টব্য : অলিম্পিক সাঁতারের যে কোন একটি ব্যক্তিগত অনুষ্ঠানে উপর্যুপরি তিনটি স্বর্ণ পদক জয়ের নজির ডন

রয় সারি (আমেরিকা)
অলিম্পিকের ৪০০ মিটার ব্যক্তিগত মেডলির রৌপ্যপদক বিজয়ী (১৯৬৪)

ডোনা ডে ভারোনা (আমেরিকা)
অলিম্পিকের ৪০০ মিটার ব্যক্তিগত মেডলির স্বর্ণপদক বিজয়িনী (১৯৬৪)

ফ্রেজারের ছাড়া অপর কোন পুরুষ বা মহিলা সাঁতারুর নেই।

একই বিষয়ের তিনটি পদক জয়

অলিম্পিক গেমসের একই বছরের আসরে একটি দেশের পক্ষে কোন একটি বিষয়ের স্বর্ণ, রৌপ্য ও ব্রোঞ্জ পদক জয় নিঃসন্দেহে বিশেষ সাফল্যের পরিচয়। এ পর্যন্ত মাত্র এই তিনটি দেশ—আমেরিকা ১০ বার, অস্ট্রেলিয়া ২ বার এবং জার্মানী ১ বার এই কৃতিত্বের পরিচয় দিয়েছে।

পুরুষ বিভাগ

১০০ মিটার ফ্রি স্টাইল :
আমেরিকা—১৯২০ ও ১৯২৪।
অস্ট্রেলিয়া—১৯৫৬।

২০০ মিটার ব্রেস্ট স্ট্রোক :
জার্মানী—১৯১২।
আমেরিকা—১৯৪৮।

২০০ মিটার ব্যাক স্ট্রোক :
আমেরিকা—১৯৬৪।

মহিলা বিভাগ

১০০ মিটার ফ্রি স্টাইল :
আমেরিকা—১৯২০ ও ১৯২৪।
অস্ট্রেলিয়া—১৯৫৬।

৪০০ মিটার ফ্রি স্টাইল :
আমেরিকা—১৯২৪ ও ১৯৬৪।

১০০ মিটার বাটার ফ্লাই :
আমেরিকা—১৯৫৬।

৪০০ মিটার ব্যক্তিগত মেডলি :
আমেরিকা—১৯৬৪।

আমেরিকা ১৯২০ সালে পুরুষ ও মহিলাদের ১০০ মিটার ফ্রি স্টাইল, ১৯২৪ সালে পুরুষ ও মহিলাদের ১০০ মিটার ফ্রি স্টাইল ছাড়া মহিলাদের ৪০০ মিটার ফ্রি স্টাইল এবং ১৯৬৪ সালে পুনরায় তিনটি বিষয়ে—পুরুষদের ২০০ মিটার ব্যাক স্ট্রোক, মহিলাদের ৪০০ মিটার ফ্রি স্টাইল এবং ৪০০ মিটার ব্যক্তিগত মেডলি অনুষ্ঠানে তিনটি করে পদক জয়ের যে গৌরব লাভ করে তা অলিম্পিক সাঁতারের ইতিহাসে অসাধারণ কৃতিত্বের পরিচয়।

সময়ের গাঁট প্রথম অতিক্রম

অলিম্পিক সাঁতারের বিভিন্ন অনুষ্ঠানে যাঁরা সময়ের গাঁট প্রথম অতিক্রম করার গৌরব লাভ করেছেন তাঁদের নামসহ, সময় এবং তারিখ :

পুরুষ বিভাগ

১০০ মিটার ফ্রি স্টাইল (গাঁট ১ মিনিট) :
জনি ওয়েসমুলার (আমেরিকা), সময় ৫৯.০ সেকেন্ড, ১৯২৪।

৪০০ মিটার ফ্রি স্টাইল (গাঁট ৫ মিনিট) :
ক্লারেন্স ক্র্যাব (আমেরিকা), সময় ৪মিঃ ৪৮.৪ সেঃ, ১৯৩২।

৪০০ মিটার মেডলি রিলে (গাঁট ৪ মিনিট):
আমেরিকা, সময় ৩ মিঃ ৫৮.৪ সেঃ, ১৯৬৪।

১,৫০০ মিটার ফ্রি স্টাইল (গাঁট ১৮ মিঃ)
মারে রোজ (অস্ট্রেলিয়া), সময় ১৭ মিঃ ৫৮.৯ সেঃ ১৯৫৬।

৮০০ মিটার ফ্রি স্টাইল রিলে (গাঁট ৮ মিঃ)
আমেরিকা, সময় ৭ মিঃ ৫২.১ সেঃ, ১৯৬৪।

মহিলা বিভাগ

১০০ মিটার ফ্রি স্টাইল (গাঁট ১ মিনিট) :
ডন ফ্রেজার (অস্ট্রেলিয়া), সময় ৫৯.৫ সেঃ ১৯৬৪।

৪০০ মিটার ফ্রি স্টাইল (গাঁট ৫ মিনিট) :
লরেন ক্র্যাপ (অস্ট্রেলিয়া), সময় ৪ মিঃ ৫৪.৬ সেঃ, ১৯৫৬।

কেভিন বেরী (অস্ট্রেলিয়া)
অলিম্পিকের ২০০ মিটার বাটারফ্লাইয়ে স্বর্ণপদক বিজয়ী (১৯৬৪)

(পূর্ব প্রকাশিতের পর)

"আটত্রিশ"

একটা সুনিবিড় ক্লান্তি আর তন্দ্রাসন্নতা এসে গেছে, কোন স্পৃহাও নেই আর, শুধু একটা শুষ্ক কৌতূহলের বশে সুরবালা থেকে গেলেন পরের দিনটা। কারণটি শুধু ওঁদেরই রইল জানা, বাইরে বাইরে শরীরের অসুস্থতার একটা অজুহাত দেওয়া রইল।

চারটের সময় বাড়ির গাড়ি করে গিয়েছিলেন রঙ্গময়ী। ফিরলেন যখন, সন্ধ্যা বেশ গাঢ় হয়ে এসেছে। সনাতনের বাড়ি হয়েই ফিরলেন, তবে ভেতরে না গিয়ে গাড়ি থেকেই একটি ছেলেকে হেমাঙ্গিনী বা সুরবালা, যাকে সামনে পায় ডেকে দিতে বললেন। নেমে এলেন দু'জনেই ওপর থেকে; একটু হন্তদন্ত হয়েই। দু'জনেই প্রশ্ন করলেন একসঙ্গে—"কি খবর ঠানদি?"

"খবর..."

একটু টেনে ছেড়ে দিয়ে বললেন—"সে শুনবি খন। দু'জনেই চলে আয় শীগ্গির আমার ওখানে—তিনজনেই—রেবা আছে তো?...চলো গোকুল।"

অন্ধকারে ওঁর মুখের ভাবটা কেউ দেখতে পেল না।

ঘটনাটা গম্ভীরভাবেই বলে গেলেন রঙ্গময়ী, সহজ কণ্ঠেই। তবু ওঁদের মনে হোল, ভেতরে একটা যেন কিসের উত্তেজনা রয়েছেই। স্বাভাবিকই। ছাতের তরল অন্ধকারে অতটা লক্ষ্য করেননি মুখের ভাবটা, তারপর খানিকটা অগ্রসর হতেই টের পাওয়া গেল, যেটাকে উত্তেজনা ভাবছিলেন সেটা আর কিছু নয়, একটা হাসিকেই যেন চাপা দিয়ে যাওয়ার চেষ্টাতে মুখটা রাঙা হয়ে উঠছে, চোখ দুটো হয়ে উঠছে উজ্জ্বল।

উনি "করুণাময়ী হোম"-এ গিয়ে কমলার কাছে যা শুনলেন তা মোটামুটি এই—

কাল সন্ধ্যার একটু পরে সবাই কমলার ঘরে জড়ো হয়েছে, পতিতপাবন ওপরে এসে খবর দিল একটি যুবা দেখা করতে এসেছে, নীচের ঘরে বসিয়ে এসেছে তাকে। কি ধরনের যুবা, কি দরকার প্রশ্ন করতে পতিতপাবন একটু চোখ তুলে মনে মনে মিলিয়ে নিয়ে বলল—হয়তো ঘটকালি করবার জন্যে এসেছে। ওর এরূপ মনে করার কারণ জিজ্ঞেস করায় জানালে—তন্দ্রা দিদির নাম করল যুবাটি।

ওর নিজের বুদ্ধিতে যতটুকু কুলিয়েছে। কারুর কোন বেটাছেলে আত্মীয় এলে, বসবার জন্যে নীচে একটা ছোট ঘরের মতো করে রাখা হয়েছে, সেই মেয়েটির ব্যাপারটার পর থেকে; বসানো হয়, যার আত্মীয়, গিয়ে দেখা করে। তন্দ্রাও ছিল, কমলা প্রশ্ন করলেন "তোর কেউ আসবার কথা ছিল নাকি?"

ভ্রূ চেপে বেশ একটু সন্দেহের সঙ্গেই প্রশ্ন, কেননা তন্দ্রার থাকার মধ্যে আছেন বুড়ো মা, আর বড় বোন পূর্ণিমা আর ভগ্নীপতি। আন্দুলে থাকেন। এলে পূর্ণিমাই আসেন কখন কখন।

তন্দ্রা বলল—"কৈ, না তো। কে আসবে?"

"থাক, তোর গিয়ে কাজ নেই, আমিই দেখি আগে।"—বলে কমলাই নেমে গেলেন।

একজন যুবাই। বেশ সুপুরুষই। একেবারে আধুনিক ফ্যাশানে সজ্জিত, সাদা প্যাণ্ট, গায়ে হাল্কা খয়েরি রঙের বুশ-শার্ট, বুক পকেটে দুটো দামী স্টাইলোর ক্লিপ ঝকমক করছে, হাতে কাগজে মোড়া রাঙা ফিতের বাঁধা একটা কি, মনে হয় যেন বই-ই। কমলার মনে হোল কোথায় যেন দেখা—খুবই ধোঁয়াটে একটা স্মৃতি—কিন্তু কোনমতেই স্পষ্ট করতে পারলেন না। তারপর যা গল্প ফাঁদলে সেই দিকেই মনটা গেল চলে। বোধহয় তন্দ্রাকেই আশা করেছিল, কমলা প্রবেশ করতে বেশ যেন থতমত খেয়েই দাঁড়িয়ে উঠে নমস্কার করল। কমলা বসতে বললেন, প্রশ্ন করলেন—তন্দ্রার সঙ্গেই দরকার?

বেশ একটু আমতা-আমতা করেই বলল—না, সে না হলেও হয়। আজ এক জায়গায় ইন্টারভিউ ছিল কয়েকটা সেকশনে লোক নেওয়ার জন্য। তন্দ্রা যেমন ছিল স্টেনোর জন্য উমেদার, যুবকটি তেমনি ছিল এ্যাকাউণ্টস্ সেকশনের। ডাক পড়তে তন্দ্রা উঠে গেলে ও দ্যাখে, সে, বেঞ্চের যেখানটায় বসেছিল—মেয়েদের জন্যে আলাদা বেঞ্চ—তার তলায় একটি বই পড়ে রয়েছে। তাই হয়তো ওর বই ভেবেই নিয়ে এসেছে।

যা গল্প ফেঁদেছে তার মধ্যে অনেক ফাঁকি। জিজ্ঞেস করে করে কমলা জানতে

প্যাকলেজ ওরাই দু'জনে ইন্টারভিউয়ের একেবারে শেষের দিকে পড়ে গিয়েছিল। সেই সময় নিতান্তই কৌতূহল বশে ওদের দু'জনের একটু আলাপ পরিচয় হয়, এক-একটা ইন্টারভিউতে লম্বা সময় নিচ্ছিল, বিশেষ ক'রে এইজন্যেই। 'আপনার কোন সেকশনে? 'আপনার কোন সেকশনে?—তাই থেকেই আর দুটো-চারটে কথা। নামটা সে জানল, সেই সময়ই। তারপর কথায় কথায় 'করুণাময়ী হোমের' কথাও ওঠে। নামটা জানা ছিল যুবকের। তাইতে আরও দু' একটা কথা হয়। দু'জনেই মাত্র রয়েছে, সময় যেন কাটতে চায় না। এরপরই তন্দ্রার ডাক পড়তে সে উঠে যাওয়ার পর বইটা দেখতে পেয়ে তুলে নিয়েছে। তারপরেই ওরও ডাক পড়ে। নৈলে অপেক্ষাই করছিল, তন্দ্রা বেরুলেই তাকে দিয়ে দেবে।

জিজ্ঞাসাবাদ করতে উত্তরের মধ্যে যেন অনেক ফাঁক, মাঝে মাঝে নিজের আড়ষ্টের জন্য একটু করে জবাবদিহিও সাধ করিয়ে দেওয়া, বেশ ভাল লাগছিল না কমলার। কথা বলতে বলতে গোড়ার সেই আড়ষ্ট ভাবটাও অনেকখানি কেটে এসেছিল।

একটা ভয় সর্বদা লেগেই থাকে কমলার, হয়তো সেইজন্যেই 'করুণাময়ী হোম'-এর কথাটা জানা থাকাটাও তেমন ভালো লাগেনি। বসিয়ে রেখে আরও দু'-একটা প্রশ্ন করলেন। বইয়ে কি তন্দ্রারই নাম? বললে, না, তন্দ্রা মুখোপাধ্যায় নয়, শান্তা মুখোপাধ্যায়। তবে নিয়ে এল কেন জিজ্ঞেস করতে বলল, মুখোপাধ্যায় দেখেই, বিশেষ করে তন্দ্রা যেখানে বসে ছিল তার নীচেই পড়ে থাকতে দেখে ভাবল—তবে হয়তো তার কোন আত্মীয়ার হবে, তাই নিয়ে এসেছে।

এরপরে হঠাৎ যেন এক অন্যভাব। হঠাৎই উঠে প'ড়ে বলল—"তাহলে দেখছি, তার কেউ নয়, তাহলে আসি।"

যেন প্রশ্নে প্রশ্নে উদ্দেশ্যটা ধরা পড়ে যেতে স'রে পড়তে চায় তাড়াতাড়ি এইবার। তাইতেই আরও সন্দেহ বেড়ে গেল কমলার;

ভাবলেন এ-ধরনের লোককে হাতছাড়া করা ঠিক হবে না। রুণাময়ীর কথা মনে পড়ে গেল।

বসতে বললেন একটু। 'দেখি'—বলে বইটাও নিলেন চেয়ে; তারপরে কাগজটা খুলে যেন মনে করবার চেষ্টা করছেন এই-ভাবে নামটার দিকে চেয়ে থেকে খানিকটা ভেবে নিয়ে বললেন—"মুশকিল হয়েছে, তন্দ্রা নেই মেসে এখন—ছিল, তাইতেই নিশ্চয় চাকরটা ওকে বলেছে আছে—এই এক্ষুনি বেরিয়ে গেল— একটা টুইশানি করে এই সময়। আসুক, জিজ্ঞেস করে রাখবেন। হতেও তো পারে ওর নিজের কারুর। যুবকটি কাল এই সময় একবার আসুক না।"

বসেছে, তবে বলল—যদি হয় নিজের কারুর তো ভালোই, গোল চুকে গেল; যদি না হয়, তো আর এসে কি হবে?

সুবিধের নয় ভেবে গা-ঝাড়া দিতে চায়। কমলা জানালেন—যদি না হয়, তন্দ্রা নিশ্চয় রাখতে চাইবে না, ফিরিয়ে দেবে ওকে। দামটা দেখে নিয়ে বললেন—একটা আট টাকা দামের বই। ও একটু হেসেই বলল—ওই বা নিয়ে কি করব? যার বই তাকে তো পাচ্ছে না। কমলা বললেন—অন্তত তন্দ্রার চেয়ে তো ওর অধিকার বেশি, ওই তো কুড়িয়ে পেয়েছে, যার বই-ই হোক না কেন।

একটু যেন নিমরাজির মতো দেখে কমলা লোভের দিকটাও সামলাবার চেষ্টা করলেন। বললেন—যদি হয়ই ওর কোন আত্মীয়ের বই —পড়েছিল, তাহলে এই উপকারটুকু করার জন্য দুটো কথা বলতে না পারায় নিশ্চয় ক্ষোভ থেকে যাবে তার মনে—বিশেষ করে, যখন জানাশোনাও হয়েছে একটু—চাপা মেয়ে, ও'দের এই ভুলটুকুর জন্যে কিছু বলতে পারবে না—নিজের মনেই গুমরাবে।

কমলার মুখে ওদিককার যতটুকু শোনা, শেষ করে পান-দোক্তা নিলেন রুণাময়ী। একটু চোখটা পাকিয়ে ঠোঁট কুঁচকে বললেন —"মজেছে, তার ওপর আঁতে ঘা দিয়ে কথা —যাকে দেখে মজা সেও আপন মনে গুমরে মরছে—আর রাজি না হয়ে পারে? তাই আসবে বলে ও বেরিয়ে যেতে কমলা এসে তন্দ্রাকে চেপে ধরল—কি হয়েছে, বল্।"

তন্দ্রা প্রথমেই তো বইয়ের কথা একেবারে অস্বীকার করল; কোন বই-ই ও নিয়ে যায়নি—বেশ রেগেই গেছে, বলল তার এমনই মাথার ঠিক নেই, এর ওপর একটা নভেল নিয়ে যাবে পড়তে। আবার আসতে বলার জন্যও বলল—কমলার মতিভ্রংশ হয়েছে, তবে, বেশ আসুকই ও নিজেই গিয়ে একচোট বোঝাপড়া করবে এবার।

ওকে শান্ত করতে একটু বেগ পেতেই হোল কমলাকে, আরও সবাই বুঝিয়ে ঠাণ্ডা করল—উনি তো রাম-দিদির সঙ্গেই ভিড়িয়ে দেবার ব্যবস্থা করেছেন, তখন ওর আর আপশোষের কি আছে? তবে আগে থাকতে সমস্ত ব্যাপারটা ঠিক ঠিক জেনে রাখা চাই তো। অত চাপা দেওয়ার চেষ্টার মধ্যে ওর দিকটা; অর্থাৎ ওর প্ল্যান আর উদ্দেশ্য বেরিয়ে পড়ছে খানিকটা—নিজেই বইটা কিনে ঐ ছুতোয় ঘনিষ্ঠতা বাড়াবার মতলব।

কিন্তু, তন্দ্রা, যে মেসেও আছে কি নেই ঠিক পাওয়া যায় না, সে সেখানে আলাপ জমাতে যাবে—এটা তো বিশ্বাস করা শক্ত।

বুঝিয়ে একটু তোয়াজই করা তন্দ্রাকে তার নিরীহতার কথা তুলে। তাই থেকে বাকিটুকু সব পরিষ্কার হোল।

কোম্পানীর ভিজিটারদের বসবার জন্য ঘরটা বেশ মাঝারি সাইজের। একদিকে পুরুষদের বসবার ব্যবস্থা, অন্যদিকে মেয়েদের। একটু দূরে দূরেই। ইন্টারভিউয়ের জন্য শেষ পর্যন্ত যে ওরা দুজনেই বসে ছিল এটাও ঠিক। এই যুবকটিই, বর্ণনা থেকে যেমন বোঝা যাচ্ছে। একটু উসখুসে ভাব বৈকি, যেন ইচ্ছেটা, গল্প করে ততক্ষণ ব'সে দু'জনে। একবার আড়ামোড়া ভেঙে নিজের মনে বললেও—"আমাদের আবার কখন্ শেষ হয় কে জানে।" তন্দ্রা কিছু বললে না। আর একবার আর একটা ক... ছোট্ট করে, দু'বারই তন্দ্রার দিকে চেয়ে। এবারেও চুপ করেই রইল তন্দ্রা।

তারপর হঠাৎ ওদিককার পাখাটা আস্তে হতে হতে একেবারে থেমে গেল। নিশ্চয় কল বিগড়ে গেছে বা ফিউজ হয়ে গেছে। হ্যাঁ, গরম বৈকি, তবে কি একেবারে অসহ্য? তন্দ্রার দিকেরটা হ'লে ব'সেই থাকত তন্দ্রা, ওর কিন্তু উসখুসনিটা বেড়েই গেল, যেন সহ্য করতে পারছে না গরমটা। বার-দুই রুমাল বের করে মুখ মুছে রুমাল নেড়ে হাওয়াও খেলে—ভাবটা যেন, তন্দ্রা চেয়ারটা সরিয়ে আনতে বলে পাখার নীচে। তন্দ্রা চুপ করেই আছে, তারপর নিজেই বলল—আপত্তি আছে তন্দ্রার, যদি চেয়ারটা এগিয়ে নিয়ে যায় একটু?

তন্দ্রার আপত্তি থাকবে কেন? তার তো পাখা নয়, ভাগে হাওয়া কমেও যাবে না। বললে—আনুক না সরিয়ে, আপত্তি কিসের? একটা মানুষ জিজ্ঞেস করছে, তার যতটুকু উত্তর দিতে হয়।

একটু? তন্দ্রা বলে, যতটা পারল, পাখার ঠিক নীচেয়। বেঞ্চটা সরিয়ে নিলেই ভালো হোত, কিন্তু তা-তো সম্ভব নয়, তন্দ্রা চুপ করে বসেই রইল। তারপরেই প্রশ্ন —"আপনার কোন্ সেকশন?" তন্দ্রা জানাল। তারপর তন্দ্রা বলে—অতক্ষণ বোবা সেজে বসে থাকতে পারে লোকে? সেও জিজ্ঞেস করল— ওর সেকশন্; বলল এ্যাকাউন্টস্-সে। তারপর একটু চুপ করে থেকে বলল—'এত দেরি করছে। যেতে হবে অনেক দূরে, ট্রাম-বাসের এই অবস্থা। আপনাকে কোথায় যেতে হবে?' বলল তন্দ্রা। জিজ্ঞেস করল, বাড়ি? তন্দ্রা বলল—না, মেয়েদের মেস, 'করুণাময়ী হোম' শুনে কি যেন বলতে যাচ্ছিল, এই সময় আফিসের লোকটা ওপর থেকে নেমে এসে ঘরে মুখটা বাড়িয়ে জিজ্ঞেস করল—'তন্দ্রা মুখার্জি আছেন?' তন্দ্রা জানাল, সেই তন্দ্রা মুখার্জি। জিজ্ঞেস করল, 'কাল আসতে পারবেন না?' বিরক্ত হয়ে গেছে তন্দ্রার দেয়ালের ঘড়িটার দিকে চেয়ে নিজে উত্তর করল—না, কাল আর আসতে পারবে না, আজ যদি হয়, বসবে একটু। কয়েকটা আফিসেই ইন্টারভিউ দিল, এদের যে জানার নতুন কাণ্ড।

লোকটার ফিরে আসতে একটু দেরিই হল। এর মধ্যে আর কোন কথাই হোল না চলতে গেলে। শুধু একবার খুকুকাটি জিজ্ঞেস করল—তন্দ্রা বুঝি মুখার্জি ?

এরপর আর কোন কথাই নয়, তন্দ্রা দেখল শুধু কপালে দুটো আঙুল চেপে পা দোলাচ্ছে, তার একবার এ-পায়ের ওপর ও-পা রাখছে, একবার ও-পায়ের ওপর এ-পা। তারপরই লোকটা আবার নেমে এসে ডেকে নিয়ে গেল। এরপর কি হয়েছে না-হয়েছে তন্দ্রা কিছু জানে না।

"উনচল্লিশ"

শেষ করে স্বর্ণময়ী পানের ডিবেটা খুললেন। এলিয়ে যাওয়া একটা পান গুছিয়ে নিয়ে মুখে পুরে দিয়ে প্রশ্ন করলেন—"তা কেমন শুনলি ?"

তিনজনে মুখ চাওয়া-চাওয়ি করলেন। বেশ একটু ধাঁধায় পড়ে গেছেন। যা শুনলেন, খানিকটা বেশ কৌতূহল জাগায় নিশ্চয় : কিন্তু এমন আর কি যার জন্য এত কাণ্ড ? বিশেষ ক'রে বলবার সময় ওঁর চাপা হাসির ভাব দেখে আর তন্দ্রার নাম নিয়েই কথাটা উঠতে তিনজনেরই মনে হয়েছিল—তন্দ্রা তাহলে বুঝি আদ্দার চাইতে এক মাত্রা ছাড়িয়ে গিয়ে কিছু করেছে।

হেমাঙ্গিনী তারই ইঙ্গিত দিয়ে প্রশ্ন করলেন—"কিন্তু এতে তন্দ্রার কি আর দোষ এমন ঠানদি ?"

"আমিও তাই বলি।"—সায় দিলেন সুরবালা। ও'র আশঙ্কাটা অন্য ধরনের। প্রশ্ন করলেন—"যাক, শেষ হয়ে গেল তো? আমি বলছি, তন্দ্রার—"

"চুপ কর! শেষের এখন হয়েছে কি? ওদিকে আদুরে হাওয়া লেগেছে গায়ে—লেগেছেই, যতই ভালো মানুষ সাজুক, আর এদিকে যা এক..."

এর পরেই এতক্ষণের চাপা হাসিটা যেন তোড়ে বেরিয়ে এল। ও'রা অবাক হয়েই গেছেন, "কী জবালা বাবা! কোথায় যাব!"—বলে কোন রকমে সামলে নিয়ে বললেন—"কমলার কাছে সব শুনে সবাই ব'সে জল্পনা-কল্পনা করছি, চাকরটা উঠে এসে খবর দিলে—এসে গেছে। নেমে গিয়ে ঢুকেই দেখে চক্ষু চড়কগাছ! ও'রও তাই, আমারও তাই!"

—হাসিতে একেবারে উল্টে গেলেন রঙ্গময়ী, তারই মধ্যে সুরবালার দিকে আঙ্গুল দেখিয়ে বললেন—"তোমার খোকা! —হ্যাঁগো হ্যাঁ, সন্দুই—উফ্! সে-কি মুখের ভাব! তোয়ের হয়ে সেজেগুজে এসেছে—আহা কোথায় তন্দ্রা এসে ধন্যি-ধন্যি করবে—তার জায়গায় মা-মাসিদের সেই অকাল-কুষ্মাণ্ড ঠানদি!—উফ্! সে কী চোখের চাউনি!—সে-কী...!"

এ'দের চোখও কপালে উঠেছে, ফাঁক পাচ্ছে না যে কিছু প্রশ্ন করেন। প্রশ্নও যেন সব হারিয়েও গেছে।

এক সময় রেবা—যেন কিছু একটা বলবার মতো পেয়েই শুধোলেন—"তা ঠানদি', ঠিক চিনেছ তো তুমি?—যেমন, সাজপোষাক বলছ..."

"নেঃ, সাজপোষাকে আমার চোখে ধুলো দিত, কমলা পেয়েছে কিনা! আর সে বেচারিরও তো সেই একটিবার তোর ওখানে দেখা। তবু ধোঁকা লাগবার ছিল বৈকি খানিকটা। ও! তুই যে আর এদিকে আসিস নি অনেকদিন..."

"সন্দুর সে ঘাড় পর্যন্ত লম্বা বাবরি চুল ও তো আর নেই,"—একটু হেসে হেমাঙ্গিনীই বললেন—"বারবার ইন্টারভিউয়ে কিছু করতে পারছে না দেখে রঞ্জন ঠাকুরপোই একদিন বললে—তুমি তাহলে দিনকতকের জন্যে ওগুলো নামিয়ে ফেল, এ-ব্যাটারা দেখছি কদর বোঝে না। কাজ হয়ে গেলে তখন আবার চুল গজিয়ে নিলেই হবে। পটলাকে সঙ্গে দিয়ে চুল-ছাঁটার সেলুনে পাঠিয়ে দিলেন, হাল-ফ্যাশানের করে আনতে।"

"—আহা, বাছারে আমার! কী নিগ্রহটাই ভোগ করছে মামার হাতে পড়ে!"

রঙ্গময়ীর টিপ্পনীটুকুতে, বিশেষ করে দরদ দেখিয়ে ও'র বলার ভঙ্গিতে এবার সবাই হাসিতে একটু দুলে উঠলেন। তবু সুরবালা একটু চাপাই। বললেন—"কেন, দুটোয় ফেল করার পর রঞ্জনকে বলে আর তো ধুতি-চাদরও "

"ঐ নাও! ভাই-বোনে একজোট হয়ে ছেলেটাকে..."—একেবারে ফুকরে হেসে উঠলেন রঙ্গময়ী, হাসির মধ্যে কথাটা পড়তে। ও'রা দুজনেও। শুধু সুরবালাই একটু অপ্রতিভ হয়ে প'ড়ে—"না—সেকথা নয় বলছিলাম..."—বলে মুখে একটু হাসি ধ'রে রেখে বসে রইলেন। যেন কিসের জন্যে অপেক্ষা করছেন, কোন একটা সুযোগ।

রঙ্গময়ীর পান-দোক্তা আজ বেড়ে গেছে। তোড়টা নরম হয়ে এলে, টেপা হাসি নিয়ে দোক্তার কৌটা থেকে মসলা বাছছেন, উনি একটু স্নিগ্ধভরে প্রশ্ন করলেন—"এখন তাহলে কী হবে ঠানদি?"

প্রশ্নটা ও'দের দুজনেরও; হেমাঙ্গিনী আর রেবাও উৎকণ্ঠিত হয়েই রঙ্গময়ীর দিকে চেয়েছেন, উনি মুখটা তুলে ভ্রু-দুটো কুঁচকে হেমাঙ্গিনীর দিকে চেয়ে বললেন—"এ হাবীকে নিয়ে কী করা যায় বলতো হেমা?—হ'তে আর কি বাকি রাখলে যে—কী হবে তাই নিয়ে মাথাব্যথা?"

অন্তরের সমর্থনে তিনজনের মুখ যেন খানিকটা ক'রে পরিষ্কার হয়ে গেল। হেমাঙ্গিনী বললেন—"আর, আমরা সবাই তো চাইছিলামই একরকম, কি বল রেবা-ঠাকুরঝি?"

"হ্যাঁ, সত্যিই চোখে লাগবার মতন মেয়ে"—প্রশংসায় রেবার চোখ দুটি নরম হয়ে এল, বললেন—"আমি সেই ডায়মণ্ড হারবারে একবারটিই দেখেছি তো, কিন্তু যেন..."

"কিন্তু আমি একটা কথা ভাবছিলাম ঠানদি"—মুখটা উজ্জ্বল হয়ে উঠেছে সুরবালার; খানিকটা ভয়ে-ভয়েই, খানিকটা যেন মনের কথা বের করবার জন্যও বললেন—"আমি বলছি—তাহলে একবার পাঁজিটাঁজি দেখিয়ে—বেশ রাজযোটক হবে কিনা..."

বেশ বিরক্তভাবেই রঙ্গময়ী হেমাঙ্গিনীর পানে চাইলেন। ডান হাতটা তুলে বললেন—"এবার তুই ওকে বোঝা, আমি হার মানলাম। ওর দিকেরই পাখাটা বন্ধ হয়ে গিয়ে দুটোকে মুখোমুখি করে বসালে।—তারপর কাকের মুখে বকের মুখে মেয়েটা মুখুজ্যে শুনেই তো এগুলো ছেলে। বই কিনে ভাব করবার বুদ্ধিটাই বা জোগালে কোত্থেকে? তারপর ঐ বসে বসে পা দোলানো—মনের ফুর্তিতেই তো না? লক্ষণ চেনে না, এ মানুষকে কি করে বোঝাই বল্ তো? এর পরেও পাঁজি উল্টে রাজযোটক বের করতে হবে? তাই করুকগে তবে।"

"আর ওসবের দরকার কি? একটা খুঁৎ বের করতে কতক্ষণ?—রেবা মন্তব্য করলেন।

"তাহলে, তার চেয়ে আমি বলি ঠানদি"—সব বেশ মনের মতো হয়ে যাচ্ছে দেখে সাহস পেয়ে আরম্ভ করলেন সুরবালা—"আমি বলি, এবার তোমার গাড়িটা করে তিনজনে একেবারে ওর মা-দিদির কাছে গিয়ে......"

"—দেখি, ছেলে আমার আগে থাকতেই সেখানেও আর এক ইন্টারভিউয়ের জন্যে হা-পিত্যেশ করে ব'সে আছে!"

—একেবারে উচ্চকিত হ'য়ে হেসে উঠে রঙ্গময়ী এমন করে কথাটা পূরণ করে দিলেন যে, ও'রা তিনজনেও এবার স্থান-কাল-পাত্র ভুলে সজোরে উঠলেন হেসে। কী একটা রয়েছে চিত্রটাতে, সামলে আসেন, আবার মনে প'ড়ে গিয়ে হাসিতে গুটিয়ে গুটিয়ে যান।

বেশ খানিকটা গেল। একসময় বেগটা কমে আসতে রঙ্গময়ী আঁচল দিয়ে চোখ দুটো মুছে নিয়ে একটা পান মুখে দিলেন; বললেন—"কেন, বললি নি সেবার?—ছেলেকে তোর 'সম্মত' করতে হয় তো ওদেরই কেউ করবে। মিলিয়ে নে এবার।"

হেমাঙ্গিনীর দিকে হাত বাড়িয়ে বললেন—"দেখি, তোর জর্দার কৌটোটা বের কর তো হেমা।"

আমান্তরে হয়তো সুরবালার প্রস্তাবটার ওপর নিজের সম্মতির শীলমোহর বসিয়ে দেওয়ার একটা ইঙ্গিতই।

সমাপ্ত

দুটি সংবাদ

গত ৮ সেপ্টেম্বর ইউসাবিলা আয়োজিত প্রদর্শনীটির উদ্বোধন হয়েছিল ২৩।৪৮, গড়িয়াহাট রোড, শ্রীমতী ঊর্মিলা মিত্রের বাড়ীতে। ইউসাবিলা প্রদর্শনীটির পরিচালনায় ছিলেন গৃহবধূ শ্রীমতী ঊর্মিলা মিত্র, শ্রীমতী স্বাগতা দে, শ্রীমতী বিভা মজুমদার ও শ্রীমতী ইলা রাউত। শ্রীমতী মিত্র ছাড়া শ্রীমতী স্বাগতা, বিভা ও ইলা—রিজিওনাল হ্যান্ডিক্রাফটস ইনস্টিট্যুট ফর উওমেন-এর প্রাক্তন ছাত্রী। শ্রীমতী বিভা ও ইলা বর্তমানে উল্লিখিত ইনস্টিটিউটে কর্মরতা। এঁরা সবাই সুদক্ষ শিল্পী। এঁদের প্রচেষ্টায় প্রদর্শনীটি সর্বাঙ্গসুন্দর হয়েছে। শ্রীমতী মিত্র এই প্রদর্শনীর সাফল্যে তাঁর সর্ব উদ্যম ও প্রচেষ্টাকে নিয়োজিত করেছেন অকুণ্ঠভাবে। শ্রীমতী মিত্র কোন শিল্প-প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে যুক্ত নন কিংবা কোন শিল্পায়তন থেকে কোন শিক্ষাও তিনি গ্রহণ করেন নি। ব্যক্তিগত প্রচেষ্টা ও ঔৎসুক্য কুটির শিল্পের প্রতি তাঁর আগ্রহকে বাড়িয়ে তুলেছে।

এই প্রদর্শনী বাটিক, সূচীশিল্প, তাঁত, পুতুল ও অঙ্গনাশিল্পের বিচিত্র সম্ভারে পরিপূর্ণ ছিল। স্বল্পায়তন পরিবেশে সকল শিল্পের সার্থক পরিবেশনে এঁদের আয়োজিত প্রদর্শনীকে সাধুবাদ জানিয়েছেন অগণিত দর্শক। কলকাতার প্রখ্যাত শিল্পবৃন্দ এই প্রদর্শনীকে তাঁদের আগমনে ধন্য করেছেন। কলকাতার কয়েকজন বিশিষ্ট নাগরিকের আগমনে প্রদর্শনীর উদ্বোধন-লগ্নটি সার্থক হয়েছে। এঁরা সবাই একবাক্যে পরিচালকমণ্ডলীর বধূ চতুষ্টয়কে অভিনন্দন জানিয়েছেন।

এই প্রদর্শনীর প্রধান উদ্যোক্তা শ্রীমতী মিত্র ইউসাবিলা আয়োজিত প্রদর্শনীর উদ্বোধন ও এই প্রতিষ্ঠান স্থাপনের উদ্দেশ্য সম্পর্কে যে ধারণা ব্যক্ত করেছেন তা হচ্ছে আমাদের দেশের মহিলারা অবসর সময়ে কুটির শিল্পের প্রচার ও প্রসারে যথাসাধ্য আত্মনিয়োগ করলে কুটিরশিল্পের সর্বাঙ্গীণ উন্নতি এবং অর্থকরী সমস্যার সমাধান কিছু পরিমাণ সম্ভব।

ইউসাবিলা পুরোপুরি শিল্পী-চতুষ্টয়ের প্রতিষ্ঠান। এই শিল্পী চতুষ্টয়ের ভবিষ্যৎ কর্মসূচীর প্রধান উদ্দেশ্য বহুলরূপে সমাজের সকল স্তরের মহিলাদের মধ্যে কুটির শিল্পের বহুল প্রসার ও কুটির শিল্পের প্রতি আগ্রহ বর্ধিত করা। কুটির শিল্পের মাধ্যমে অর্থকরী সমস্যার সমাধানের পথকে সুগম করা। কুটির শিল্পে কায়িক শ্রমের প্রয়োজন স্বল্প। যে কোন বয়সের মহিলারা কুটির শিল্পের উন্নতি-বিধানে সক্ষম। এই মহৎ উদ্দেশ্যকে স্মরণে রেখেই ইউসাবিলা-শিল্পী চতুষ্টয় তাঁদের উদ্দিষ্ট কর্ম-বিজ্ঞানার পৌঁছুবার প্রয়াসী।

ঘোর কাটুক

সভ্যতার অগ্রগতির সঙ্গে সঙ্গে জীবনে বৈচিত্র্য বাড়ছে। পুরনো সুরের রেশ ধরে অনেকে অবশ্য বলবেন, পেছনে ফেলে আসা দিনগুলিই ভাল ছিল। তাদের মধুর স্মৃতি আজো মনে সুন্দর জলতরঙ্গ সৃষ্টি করছে। তাদের উদ্দেশ্যে শুধু বলবো, 'দোহাই মশাইরা, একটু থামুন। ব্যক্ত্যটা বড় একতরফা হয়ে যাচ্ছে। অন্যদের বলার সুযোগের কথাটা একটু ভেবে দেখুন।' পুরনো দিনের স্মৃতি বেদনামধুর। সেই ফেলে আসা মাড়িয়ে চলা দিনগুলি জীবনে অবিস্মরণীয় সুধাভাণ্ড। কিন্তু পুরনো নিয়ে মশগুল হয়ে থাকলে তো চলবে না। অতীতের পরিপ্রেক্ষিতে বর্তমান কি দিচ্ছে সেটা অবশ্যই খতিয়ে দেখতে হবে। তবেই না হবে আসল মূল্যায়ন। এর বিপরীতে শুধুমাত্র অসারের বাগ-বিতণ্ডায়ই সার হবে। কাজের কাজ কিসসু হবে না।

স্মরণাতীতকে ছেড়ে স্মরণীয়কে নিয়ে টানা-হ্যাচড়ার সুবিধা অনেক। সকলের জানাশোনার গন্ডীর মধ্যে থাকাই ভাল। তাহলে সবাই সমান অংশ নিতে পারবেন। আর এই আলোচনার উদ্দেশ্যও তাই। সেই স্মরণীয় অতীত প্রসঙ্গ মেয়েদের কথা দিয়েই শুরু করা যাক। পর্দানশীন মেয়েরা সেদিন নিতান্ত গতানুগতিক জীবনযাত্রায় অভ্যস্ত ছিল—গড্ডালিকা প্রবাহে ভেসে চলা ছাড়া একে আর কোন অভিধায় ভূষিত করা চলে না। সে তুলনায় আজকের মেয়েদের জীবন বহু বিচিত্র। এই যে পরিবর্তনের পথে বৈচিত্র্য আসছে এ তো আর আলাদিনের জাদুই চিরাগের প্রভাবে রাতারাতি সম্ভব হয়নি। এজন্য প্রতিটি দিনের সঞ্চয় আমাদের ধরে রাখতে হয়েছে— তিলে তিলে তিলোত্তমার সৃষ্টি সম্ভব হয়েছে। দিন এগুচ্ছে পরিবর্তনের চাকাটাকে উল্টে-পাল্টে, বৈচিত্র্যের পসরা সাজিয়ে। তাই ছেড়ে আসা অতীতের তুলনায় আজকের জীবনে বৈচিত্র্য যে অনেক বেশি, এ সত্যটা প্রসন্ন মনে স্বীকার করতে আর আপত্তি কোথায়।

আরো একটু কথা আছে। জলে-স্থলে-নভোতলে আজকের মেয়েদের বিজয়-বৈজয়ন্তী উড়ছে। দুঃসাহসের ডাকে ওরা সাড়া দিয়েছে। মৃত্যুর অসহ্য চোখ রাঙানিকে উপেক্ষা করে ওরা অগ্রগতির রথ ছুটিয়েছে। পর্বতের শিখরে শিখরে ওদের অভিযানের সফলদীপ্ত জয়টীকা শোভা পাচ্ছে। ক্রমশই ওরা আরো বেশি সংখ্যায় দুঃসাহসের নেশায় মেতে উঠছে। সম্প্রতি আর একদল নারী অভিযাত্রী যাচ্ছে পর্বত শিখর বিজয়ে।

এবার ছেদ টানা যেতে পারে। পুরনোর ঘোর-লাগা চোখে নবীনের আভা এতক্ষণে ফুটেছে। বর্তমান আমাদের জীবনে এত বৈচিত্র্য জুগিয়েছে। আরো বৈচিত্র্যের এতো অগ্রিম প্রতিশ্রুতি মাত্র। ইতিমধ্যে যার কাছ থেকে এতটা পাওয়া গেছে তার কাছে প্রত্যাশা স্বাভাবিকভাবেই বেশি। তাই আসুন, এই বৈচিত্র্যকে স্বচ্ছ চোখে প্রত্যক্ষ করে আরো সম্ভাবনার মূলে আমরা বারি-সিঞ্চন করি।

মেয়েরা সাজে কেন

"মেয়েরা সাজে কেন?"—এ প্রশ্নের সঠিক উত্তর কোনদিন পাওয়া যাবে বলে আমার মনে হয় না। কেন না সাজপোশাক অথবা প্রসাধন জিনিসটা এমনই যে, সেটার কোন নির্দিষ্ট সীমা নেই। পৃথিবীর অন্তহীন ঊর্ধগামী বয়সের সঙ্গে নারীর (এমন কি পুরুষেরও) রূপচর্চা বা সাজ-পোষাকের মাত্রা দিনের পর দিন বেড়েই চলেছে। এই সীমাহীন রূপচর্চার ব্যাপারে একথা কি একবারও মনে হয় যে, কোন দেশের কোন একটা পোষাক কোন একদিন পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ পোষাক বলে অথবা কোন একটা প্রসাধন পৃথিবীর সর্বশ্রেষ্ঠ প্রসাধন বলে বিবেচিত হবে এবং তারপরে রূপচর্চার আর কোন প্রশ্ন থাকবে না? না, এ প্রশ্ন শুধু আজ কেন, পৃথিবীর মৃত্যুশয্যাতেও এ প্রশ্ন উঠবে না এবং যদিও ওঠে তবে তার সমাধান হবে বলে মনে হয় না। তবু সেই অন্তহীন অনাবিষ্কৃত জিনিসটাকে নিয়েই আমাদের গবেষণা করতে হবে। কারণ, মনুষ্য জাতির চিরকালের অহঙ্কার, চেষ্টায় কি না হয়? অতএব সেই সূত্রেই এই ধরনের একটা নীরস তথ্যের গবেষিকা হওয়া গৌরবেরই কথা। এখানে একটা কথা বলে রাখা প্রয়োজন যে, "মেয়েরা সাজে কেন?" —রূপচর্চার ব্যাপারে এ প্রশ্নটাই আজকের দিনের সবচেয়ে বড় প্রশ্ন নয়, এর চেয়েও বড় প্রশ্ন হল, পুরুষেরা সাজে কেন? কারণ নারীর সাজের পিছনে যুক্তি আছে প্রচুর, কিন্তু পুরুষের সাজের পিছনে কি যে যুক্তি কে জানে। এখানে হয়ত অনেক পাঠক-পাঠিকাই আমাকে ভুল বুঝবেন। আসলে কিন্তু আমি পুরুষের রূপচর্চা এবং সাজসজ্জা নিয়ে বিদ্রূপ করছি না, আমি কেবল পূর্বকথাই প্রমাণ করতে চাই যে, রূপচর্চার স্বরূপটি কি?

মেয়েরা সাজে কেন?—এ প্রশ্নের উত্তরে অনেকেই বলেছেন, মেয়েরা সাজতে ভালবাসে, তাই সাজে। তারা সৌন্দর্যপ্রিয় তাই সাজে। এই সৌন্দর্যানুভূতি তাদের জন্মলব্ধ তাই সাজে ইত্যাদি। অর্থাৎ সকলের উত্তরের মূল কথাই হল, নারীর রূপচর্চা নিতান্তই

অঙ্গনা

প্রমীলা

তাজিকিস্তানের লেনিনাবাদ সিল্ক মিলের কর্মীরা ছত্রিশ মিলিয়ন মিটার সিল্ক তন্তু উৎপাদন করেন। চিত্রে সিল্ক কারখানায় কর্মরত জনৈক কর্মীকে দেখা যাচ্ছে এবং পাশে তাজিক সিল্কভূষিতা সুন্দরীদের সমাবেশ। এই ধরনের প্রিন্টে স্থানীয় শিল্পীরা বেশ অভিনবত্বের সৃষ্টি করেছেন।

ব্যক্তিগত ব্যাপার। তাই সে যেমন খুশি সাজতে পারে। কিন্তু আশা করি, পুরোনো প্রবাদ বাক্যটি নিশ্চয়ই তাঁরা ভুলে যাননি—'আপ্ রুচি খানা, পর্ রুচি পর্ না।' অর্থাৎ সেখানে রূপচর্চার ব্যাপারে ব্যক্তিগত প্রভাব বলে কিছু নেই। সেখানে সাজসজ্জা একান্তভাবেই পরনির্ভরশীল। সেখানে রূপচর্চার বিস্তৃতির অর্থই হল অপরের প্রভাব। একজন যেমন করে সাজবে, তারই দেখাদেখি আর পাঁচজন সাজবে। অর্থাৎ একটা জিনিসই সেখানে বিস্তৃতি লাভ করবে দীর্ঘ সময় ধরে। অবশ্য প্রবাদটাকে যে মানতেই হবে এমন কোন বাধ্যবাধকতা নেই। কারণ, অনেকেই ব্যক্তিত্বের কথা তুলবেন।

পুরুষ অথবা নারী কেন যে সাজে, তা চিন্তা-সাপেক্ষ। অপরের ধ্যান-ধারণার এই রূপচর্চার পরিমাপ করা যায় না। কি এক প্রাকৃতিক ধারাবাহিকতায় সেই শকুন্তলার যুগ থেকে আজও পর্যন্ত নারীর রূপচর্চা নিরবিচ্ছিন্নভাবে চলে আসছে। এখনো পর্যন্ত তার কোথাও ভাঙন ধরেনি, বরং তার আয়োজন আরো বর্ধিত হয়েছে এবং তার সঙ্গে সৃষ্টির নতুনত্বও কিছু মিশেছে। কিন্তু কেন যে এই সাজসজ্জা, কেন যে এই অপরের চোখে নিজেকে সৌন্দর্যমণ্ডিত করে তোলা, সে সম্বন্ধে কোন গবেষণা হয়েছে বলে জানা হয় না। স্নেহ, মমতা, দয়া, মায়া এবং সবার উপরে যে প্রেম, তার কাছে এই সাজসজ্জা আর রূপচর্চার যে কি মূল্য আছে অথবা কি প্রয়োজন আছে কে জানে। নারীর প্রেমে মত্ত হয় পুরুষ, পুরুষের হাতে ধরা দেয় নারী, কিন্তু সেই প্রেম মানে কি শুধুই সাজসজ্জা? হৃদয় দিয়ে হৃদয়কে গাঁথার সার্থকতা তবে কোথায়? অতএব সেখানে বনকুসুম অথবা অলঙ্কারে সজ্জিত হওয়ার কোন প্রয়োজনই নেই। তবু নারী সাজে, তবু পুরুষ সুন্দর হতে চায়। যেন এ এক কতদিনের কত পুরনো একটা নেশা, যেটাকে ছাড়ব ছাড়ব করেও ছাড়া যায় না। সৌন্দর্যপ্রিয় বলেই নারী আবহমানকাল ধরে সেজে আসছে—এই কথাই যদি সত্য হয়ে থাকে, তবে আমি বলব তো নিতান্তই মামুলি। প্রমাণস্বরূপ বলা যায়ঃ

যে জিনিসটা থেকে মানুষ কোনদিন কোন উপকার পায় না, সেটাকে সে ভালবাসলেও সে ভালবাসায় শিথিলতা থাকে। অথবা যে জিনিসটা থেকে মানুষ কোনদিন ব্যর্থকাম হয়, সেটাতে কৃত্রিমতা থাকে অনেক। কিন্তু রূপচর্চার ব্যাপারে ঘটে ঠিক উল্টো। প্রসাধনপ্রিয় অনেক নারীর ক্ষেত্রেই দেখা গেছে যে, তার জীবনের সৌন্দর্যের জন্য হয়ত তাকে অনেক লাঞ্ছনা, গঞ্জনা ভোগ করতে হয়েছে। তবু সে জীবনে কোনদিন সাজসজ্জাকে ত্যাগ করতে পারেনি। এমন কি জীবনের সায়াহ্নে এসেও সে তার সৌন্দর্য আর দেহসৌষ্ঠবের স্বপ্ন দেখেছে। এর নজীর মিলবে বিভিন্ন উপন্যাসের পাতায়। এ কি তার সৌন্দর্যপ্রিয়তা? তা নয়, সারা জীবনের ক্ষতি আর নিঃসঙ্গতাকে এড়াতে নিশ্চয়ই সে তার প্রসাধন আর সাজসজ্জা ত্যাগ করতে পারত, কুটিল দৃষ্টির হাত থেকে নিজেকে বাঁচাতে নিশ্চয়ই সে অসুন্দর হতে পারত, কিন্তু পারল না। এর অর্থ এই নয় যে, সে সাজতে ভালবাসে। এ রূপচর্চা সাধারণ রূপচর্চা নয়, এ তার কোন পূর্বপুরুষের রক্ত থেকে পাওয়া সম্পদ, যেটাকে সে আজও শত ক্ষতি স্বীকার করেও আঁকড়ে ধরে বসে আছে। এ যেন বহু পুরানো এক ট্রাডিশান আজও অবাধে চলে আসছে। নচেৎ সংসারের শত দায়িত্ব, শত কর্তব্য আর শত সমস্যার মধ্যেও নারী কি করে আজও তার প্রসাধনের জের নিরবিচ্ছিন্নভাবে টেনে নয়ে চলেছে? রান্নাঘরের তেল-জলের মধ্যে থেকে বেরিয়ে এসেও কেন সে আবার পাউডারের পাফটা মুখে বুলিয়ে নিচ্ছে? কেনই বা ফুটন্ত গোলাপ খোঁপায় গুঁজে সুন্দর হচ্ছে। কেনই বা অসুস্থ শরীরেও আরশির সামনে গিয়ে একটিবার নিজের মুখটা দেখে নিচ্ছে? এ কি শুধুই সাজার জন্যে? নাকি শুধু নিজেকে সুন্দর করে তোলার জন্যে? হ্যাঁ, তা তো বটেই? কিন্তু তারও চেয়ে বড় কথা, নারীর সৌন্দর্যপ্রিয়তা ও আবহমানকালের তীব্র প্রভাব। পৃথিবী ও প্রাণের জন্মলগ্ন থেকেই সেই প্রভাব চলে আসছে, আজও চলছে, হয়ত শেষও হবে চলতে চলতেই।

ভারতীয় ফ্যাশান

লণ্ডনের মার্লবরো হাউসে বিরাট ফ্যাশান শো অনুষ্ঠিত হবে আগামী ৪ ডিসেম্বর থেকে। এতে ভারতসহ সকল কমনওয়েলথ দেশের মডেল ও পোশাক-পরিচ্ছদ প্রদর্শিত হবে।

এই ধরনের বিপুলাকার যৌথ উদ্যোগ পৃথিবীতে এই প্রথম। এই প্রদর্শনীর বিষয়-বস্তু : একই সময়ে কমনওয়েলথের দেশে দেশে ভিন্ন ঋতু'। প্রদর্শনীতে প্রবেশ-মূল্য ধার্য করা হয়েছে পাঁচ গিনি। দর্শকদের মধ্যে রাজকুমারী মার্গারেটও থাকবেন।

প্রদর্শনী অনুষ্ঠিত হবে যে হলে কমনওয়েলথ প্রধানমন্ত্রী সম্মেলন হয়ে থাকে সেই হলঘরে। 'কমন ওয়েলথ অ্যাপীল অব অ্যাকশন ফর দি ক্রিপলড' (সি-এ-এ-সি-সি)-এর সাহায্যার্থে এটি অনুষ্ঠিত হবে এবং আশা করা যায় ১০,০০০ পাউন্ড অর্থ সংগ্রহ করতে সক্ষম হবে। লণ্ডনের পর এই প্রদর্শনী হ্যারোগেট, নিউইয়র্ক এবং সম্ভবতঃ কমনওয়েলথ দেশগুলি সফর করবে।

লণ্ডনে এক সাংবাদিক সম্মেলনে প্রদর্শনীর সংগঠক মিঃ জন হেওয়ার্ড বলেন, সি-এ-এ-সি-সি ফাণ্ডের জন্য অর্থ সংগ্রহের ওপর জোর দেওয়া হয়েছে।

সি-এ-এ-সি-সি একটি দাতব্য প্রতিষ্ঠান, কমনওয়েলথের পঙ্গু শিশুদের জন্য প্রতি বছর ৫ লক্ষ পাউণ্ড ব্যয় করে থাকেন। বর্তমানে এই প্রতিষ্ঠান বিদেশে অনেকগুলি প্রকল্পে সক্রিয় সাহায্য করছেন। ১৯৬১ সালে এই সংস্থা ভেলোরের ক্রিশ্চিয়ান মেডিক্যাল কলেজকে ১৮,০০০ পাউণ্ড সাহায্য করেন।

এই ফ্যাশান শো-এর আইডিয়া প্রথম জাগে লন্ডন কলেজ অব ফ্যাশান-এর রেবেকা ব্যানারম্যান (১৯) এর মনে। ইনি বর্তমানে ২২টি দেশের পোশাক-পরিচ্ছদের মডেল নিয়ে কাজ করছেন। এর মধ্যে ভারতের শাড়ি ও পুরুষের পোশাকও রয়েছে।

মিনি স্কার্ট পরিহিতা মিস ব্যানারম্যান ২২টি দেশের প্রতিনিধিদের সংগ্রহ থেকে পোশাক ব্যবহার করবেন। তিনি বলেন, এই শো হবে নতুন ধরনের এবং নাটকীয়।

৪ ডিসেম্বর মডেলেরা নিজ নিজ দেশের ঐ সময়কার পোশাকে সেজে এসে দাঁড়াবেন। ঐ সময় ইংলণ্ডে শীতকাল, অস্ট্রেলিয়া ও নিউজীল্যাণ্ডে মধ্য-গ্রীষ্ম এবং ভারত, সিংহল ও পাকিস্থানে অল্প শীত।

"আলোর সাহায্যে দেশের ও ঋতুর পরিবেশ ফুটিয়ে তোলা হবে। সংগীত ও মডেলের সাহায্যে আমরা আশা করি কমনওয়েলথ ফ্যাশানের বৈচিত্র্য তুলে ধরতে পারব।"

ভারতীয় দ্রষ্টব্য

ভারতীয় ফ্যাশানগুলি বাছাই করা হয়েছে 'বড়িমা' ও 'সবিতা'র সর্বশেষ সংগ্রহ থেকে। চিরাচরিত শাড়ি ছাড়াও নতুন ডিজাইনের শাড়ি এখানে থাকবে এবং পুরুষদের পোশাক যা বর্তমানে ব্রিটেনে জনপ্রিয় হয়ে উঠেছে তা-ও প্রদর্শিত হবে।

ব্রিটেনের প্রদর্শনী শিল্পের প্রতিভারা এখানে প্রদর্শনীর কাজে অংশ গ্রহণ করছেন। প্রদর্শনীর প্রযোজনা করছেন 'ওয়েস্ট সাইড স্টোরি' 'ক্যামেলট'খ্যাত অ্যান্টনি চারডে। স' এ লুমিয়ের বিশেষজ্ঞ রিচার্ড লক আলোক সম্পাত করছেন।

প্রদর্শনীর জন্য সংগীত রচনা করেছেন 'ইর্মা লব ডুস', 'হাফ এ সিক্স পেন্স' ও 'চার্লি গার্ল'খ্যাত ডেভিড হেনেকার।

ব্যাংকগুলির সাহায্য

কেশ বিন্যাসের দায়িত্ব নিয়েছেন ফেন্স অব লণ্ডন, বিনা পয়সায় মেক-আপ করে দেবেন লিচনার। বেশ কয়েকটি ব্রিটিশ ব্যাংক এই বিরাট ফ্যাশান শো'র জন্য অর্থ সাহায্য করবেন এবং আশা করা যায় কমনওয়েলথ দেশগুলি যাঁরা বিনা মূল্যে মডেল ও পোশাক সরবরাহ করছেন, তাঁরা এই মহৎ কাজে অর্থ সাহায্যও করবেন।

মার্লবরো হাউস সন্ধ্যায় কমপিয়রের কাজ করবেন বি-বি-সি'র জুডিথ চালমারস। শো-এর পরে কমনওয়েলথ দেশের বিচিত্র খাদ্য সম্ভারে 'বুফে' অনুষ্ঠিত হবে। এই উদ্দেশ্যে অস্ট্রেলিয়া পাঠাচ্ছে 'অয়েস্টার'. পৃথিবীর অন্যান্য দেশ থেকেও খাদ্যবস্তু বিমানে পাড়ি দেবে বলে আশা করা যায়।

ভারত ছাড়া শো-তে অংশ গ্রহণ করছেন অস্ট্রেলিয়া, কানাডা, সাইপ্রাস, জাম্বিয়া, ঘানা, গিয়ানা, জ্যামাইকা, কেনিয়া, নাইজেরিয়া, মালাউই, মালয়েশিয়া, মাল্টা, নিউজীল্যান্ড, সিয়েরা লিওন, সিংগাপুর, পাকিস্থান, সিংহল, ত্রিনিদাদ, টোবাগো, উগান্ডা ও ব্রিটেন।

শিশুদের সুখ ও স্বাস্থ্যের জন্য

গত ৪ঠা সেপ্টেম্বর তাশখন্দে এশিয়া ও আফ্রিকার উন্নয়নশীল দেশগুলির শিশুদের স্বাস্থ্যরক্ষা, পথ্য ও শিক্ষার সমস্যা সম্পর্কে একটি আন্তর্জাতিক সেমিনার শুরু হয়েছে। রাষ্ট্রসংঘ শিশু তহবিলের সঙ্গে যুক্তভাবে সোভিয়েত যুক্তরাষ্ট্রের রেডক্রশ ও রেড-ক্রেসেন্ট সোসাইটিগুলির ইউনিয়নের কার্য-নির্বাহক কমিটি এই সেমিনারের ব্যবস্থা করায় এর বিশেষ গুরুত্ব রয়েছে। এই সেমিনারে উজবেকিস্তানের জনস্বাস্থ্য ও শিক্ষা-সংক্রান্ত সংগঠনগুলি সক্রিয় অংশ গ্রহণ করছে। যোগদানকারী ২৩টি দেশের আটটিই দক্ষিণপূর্ব এশিয়ার। সেমিনারের মূলমন্ত্র হল : 'পৃথিবীর শিশুরা স্বাস্থ্যবান ও সুখী হোক।'

ছেলেমেয়েদের স্বাস্থ্যরক্ষা ও শিক্ষা-সম্পর্কিত জরুরী সমস্যাদি নিয়ে কাজের ও তত্ত্বগত সমীক্ষার অভিজ্ঞতার সঙ্গে আফ্রো-এশীয় দেশগুলির প্রতিনিধিদের পরিচয় করিয়ে দেওয়া এই সেমিনারের উদ্দেশ্য। এই সেমিনারে যোগ দিচ্ছেন শিশুদের স্বাস্থ্যরক্ষা, পথ্য ও শিক্ষা সম্পর্কিত মন্ত্রণালয়গুলির বিশেষজ্ঞরা এবং রাষ্ট্রসংঘ সম্পাদকমন্ডলী, উনেস্কো ও অন্যান্য আন্তর্জাতিক সংগঠনের প্রতিনিধিরা।

উন্নয়নশীল দেশগুলি থেকে প্রতিনিধিরা শুধু উজবেকিস্তানে মাতা ও শিশুদের যত্ন ব্যবস্থা সম্পর্কে নয়, এক্ষেত্রে অর্জিত সাফল্যসমূহ সম্পর্কেও আগ্রহী। এক্ষেত্রে উজবেকিস্তানের সমৃদ্ধ অভিজ্ঞতার সঙ্গে তাঁরা পরিচিত হতে পারবেন। এই পরিচয় লাভের কাজ শুরু হয়েছে।

এই সেমিনার উদ্বোধনের প্রাক্কালে উজবেকিস্তানের স্বাস্থ্যমন্ত্রী কাইয়ুম জাইরোফ সাংবাদিকদের বলেছেন : 'আমরা সবাই আশা করছি যে, জনস্বাস্থ্য সম্পর্কিত সমস্যাদির সমাধানে এই সেমিনার এশিয়া ও আফ্রিকার দেশগুলিকে সাহায্য করবে এবং জাতিসমূহের মধ্যে মৈত্রী দৃঢ়তর করার আরও সহায়ক হবে।'

সেমিনারের উদ্বোধন দিবসে উজবেকিস্তান সরকারের পক্ষ থেকে উপ-প্রধানমন্ত্রী সারওয়ার আজিমোফ অংশগ্রহণকারীদের স্বাগত জানান। তিনি বলেন : 'উজবেকিস্তানের যে জনগণ বিপ্লবের আগে পুরো দারিদ্র্য ভোগ করেছেন, তাঁরা জানেন ব্যাধিজনিত শিশুমৃত্যু ও অপুষ্টি কি জিনিস। পৃথিবীতে এখনও নিযুত নিযুত শিশু যে কষ্টভোগ করছে তা তাঁরা বোঝেন। সেজন্যই আমরা আমাদের ক্ষুদে নাগরিকদের স্বাস্থ্য-রক্ষার ক্ষেত্রে আমাদের প্রজাতন্ত্র যে অভিজ্ঞতা সঞ্চয় করেছে তার সঙ্গে পরিচিত হবার সর্বপ্রকার সুযোগ অতিথিদের সাগ্রহে দিচ্ছি।' উজবেক প্রজাতন্ত্রে মাতা ও শিশুদের স্বাস্থ্য-রক্ষার অর্থনৈতিক ও সামাজিক পরিবেশ সম্পর্কে কাইয়ুম জাইরোফ সেমিনারে রিপোর্ট পেশ করেন।

শ্রীতুষারকান্তি ঘোষ

সুধীরচন্দ্র সরকার

(পূর্ব প্রকাশিতের পর)

১৯২৫-২৬ সালের কথা। তাঁর প্রথম উপন্যাস হল 'অসমাপিকা'। সেটা আমরাই প্রকাশ করি। 'অসমাপিকা'র পাণ্ডুলিপি পড়ে আমার সেইকালেও এক জায়গায় মনে হল কিরকম যেন একটু ঠেকছে। অর্থাৎ কিনা একটু বেশী রকম উগ্রভাবে নর-নারীর সম্বন্ধটাকে দেখানো হয়েছে। তিনি তখন বহরমপুরের ম্যাজিস্ট্রেট। আমি আর অচিন্ত্য সেনগুপ্ত দুজনে মিলে গেলাম একদিন তাঁর কাছে বহরমপুরে। তাঁকে এ-বিষয়ে বলতেই তিনি সে-স্থানটা সামান্য সংশোধন করে একটু নরম করে দিয়েছিলেন।

এ-দেশে আই সি এস-এর প্রারম্ভিক পরীক্ষায় প্রথম স্থান অধিকার করে বিলাতে যান শিক্ষা সম্পূর্ণ করতে। সেখানে কৃতিত্বের সঙ্গে শিক্ষা সম্পূর্ণ করে ভারতে দীর্ঘকাল সিভিল সার্ভিস পদ অলংকৃত করে ভারত স্বাধীন হবার পরই চাকরীতে ইস্তফা দেন। এই পদত্যাগ করার কারণ যে কি, এ-বিষয়ে তাঁকে অবশ্য কোনদিন প্রশ্ন করিনি এবং তিনিও নিজে থেকে কিছু বলেননি।

প্রাবন্ধিক হিসেবে অন্নদাশঙ্করের স্থান খুব উঁচুতে। রবীন্দ্রনাথ ও গান্ধীজির তিনি বিশেষ অনুরাগী এবং তাঁদের সম্পর্কে নিজের অনেক রচনাও আছে। ইংরাজীতেও ইনি বহু রচনা লিখেছেন।

অন্নদাশংকরের সহধর্মিণী হলেন একজন আমেরিকান মহিলা। কিন্তু তিনি এমন চমৎকার বাংলা বলেন যে, আর তাঁকে বিদেশী মহিলা বলে মনেই হয় না। তিনি ভারতীয় নাম নিয়েছেন লীলা।

লেখা সম্বন্ধে অন্নদাশংকরের একটি বিশেষ পদ্ধতি আছে। তাঁর লেখা ইচ্ছে করলে বা অর্থ দিলেই পাওয়া যায় না। তিনি খুব বিচার-বিবেচনা করে সাহিত্য রচনা করেন—এ-বিষয়ে ইনি রাজশেখর বসু মহাশয়ের সমগোত্রীয়।

'লীলাময় রায়'—এই ছদ্মনামেও অন্নদাশঙ্কর অনেক রচনা লিখেছেন।

সাংবাদিক হিসেবে তুষারকান্তি ঘোষের নাম বিশ্ববিশ্রুত। বিখ্যাত ইংরাজি দৈনিক 'অমৃতবাজার পত্রিকা' এবং সাপ্তাহিক 'অমৃত' পত্রিকার সম্পাদক ইনি তো বটেনই, তাছাড়া মহাত্মা শিশিরকুমারের পুত্র ইনি। এই কাগজদুটি এবং 'যুগান্তর' পত্রিকার কর্ণধার হিসেবে বর্তমান সাংবাদিক-জগতে ইনি অদ্বিতীয় স্থান অধিকার করে আছেন।

তাঁর সঙ্গে আমার প্রথম আলাপ আমার দোকানে। তাঁর আত্মীয় শচীবিলাস রায়চৌধুরীর সঙ্গে টাট্টু ঘোড়ার গাড়িতে আমার দোকানে এসেছিলেন। সেই সময়ে শচীবিলাস রায়চৌধুরী ঘোষ অ্যাণ্ড কোম্পানীর কাগজের দোকানে কাজ করতেন এবং আমরা এই দোকান থেকে প্রচুর কাগজ কিনতাম। সেই সূত্রে তুষারবাবুর সঙ্গে আমার সৌহার্দ ও প্রীতির সম্পর্ক দীর্ঘদিনের, সেইজন্য তাঁর সম্বন্ধে দু'-চার কথা বলা আমি অত্যন্ত প্রয়োজনীয় বলে মনে করি।

তুষারবাবু এখনও মনেপ্রাণে তরুণ। তাঁর মনে এমন একটা শিশুসুলভ ভাব আছে যা আমার দৃষ্টি ও ভালবাসা বিশেষভাবে আকর্ষণ করেছে। প্রকৃতপক্ষে বলতে গেলে তিনি একজন সত্যিকার শিশু-সাহিত্যিক। খুব অল্প সময়ের মধ্যে লোকজনকে তিনি এমন আপনার করে নিতে পারেন—এমনই একটা গুণ তাঁর মধ্যে আছে যা খুব কম লোকের মধ্যেই দেখা যায়।

বই কেনা তাঁর একটা বিশেষ ধরনের বাতিক। আর বই কেনার সময় প্রত্যেক বই তিনি ৪ কপি করে কেনেন। কারণ, এ'র চারটি স্থানে চারটি লাইব্রেরী আছে এই লাইব্রেরীগুলির জন্য বই যোগাড় করতে তাঁর অর্থব্যয় হয় প্রচুর। বাস্তবিক তাঁর লাইব্রেরী বহু পুরাতন আমল থেকে আধুনিক যুগ পর্যন্ত সবরকম পুস্তক ও পত্রিকায় ভরা। শিশু-মাসিক পত্রিকা ও পুস্তক ছাড়াও বড়োদের বই ও পত্রিকাও কম নেই। অর্থাৎ তুষারবাবুর মত পুস্তক সংগ্রহ বর্তমানে আর কোনো ব্যক্তির আছে বলে আমার জানা নেই। এছাড়াও তাঁর সংগ্রহের মধ্যে পাওয়া যাবে বটতলার বই রহস্য-সিরিজ, রহস্য উপন্যাস প্রভৃতি। কারণ, রহস্য উপন্যাসগুলির প্রতি এ'র দারুণ আকর্ষণ আছে। প্রিয়নাথ মুখোপাধ্যায়ের 'দারোগার দপ্তর', প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায়ের উপন্যাস এবং রহস্য উপন্যাস পাঁচকড়ি দে ও দীনেন্দ্রকুমার রায়ের তিনি খুব পছন্দ করেন। এসব ছাড়াও বিদেশ থেকেও তিনি বহু বই সংগ্রহ করে এনেছেন।

বই সংগ্রহ করেই শুধু তিনি নিশ্চিন্ত হন না, বেশীর ভাগ বই-ই তিনি পড়েন। তাঁর স্মরণশক্তিও আশ্চর্য, এ-বিষয়ে আমি নানাভাবে পরীক্ষা করে দেখেছি। ২৫।৩০ বছর আগে যে-গল্প তিনি পড়েছেন, তা তিনি হুবহু বলে দিতে পারেন গল্পের চরিত্রগুলির নামসুদ্ধ। শুধু তাই নয়, কলকাতা থেকে এলাহাবাদ পর্যন্ত সমস্ত স্টেশনের নামগুলি এ'র মুখস্থ।

তাঁর আর একটি বড়ো গুণ হল যে, আসর জমিয়ে তিনি চমৎকার বৈঠকী গল্প বলতে পারেন। এই সূত্রে তিনি দু'খানি গল্পের বই লিখেছেন। বইদুখানির নাম হল 'বিচিত্র কাহিনী' এবং 'আরো বিচিত্র কাহিনী'। এই বইদুখানি পড়ে বড়রা এবং ছোটরা উভয় সম্প্রদায়ই প্রচুর আনন্দ পায়। তাঁর সংগ্রহে শিকারের গল্প, মাছ ধরার গল্প, জীবজন্তুর গল্প, অশরীরী প্রেতাত্মার গল্প প্রচুর থাকে। এইসব গল্প তিনি চমৎকারভাবে বলতে পারেন এবং লিখতেও পারেন। তা ছাড়া তুষারবাবু একজন ভ্রমণবিলাসী লোক—পৃথিবীর সর্বত্র তিনি বহুবার ঘুরেছেন—অর্থাৎ দেশ-ভ্রমণটাই যেন তাঁর নেশা।

হাস্যরসিক হিসাবেও আমরা তাঁকে

দেখেছি একান্ত অন্তরঙ্গ মহলে, তবে তাঁর চরিত্রের এদিকটা সকলে জানে না।
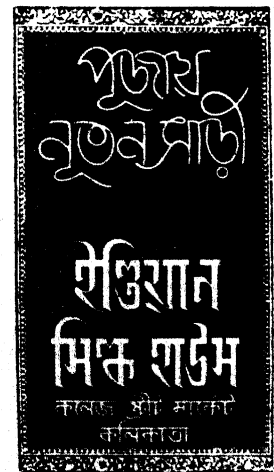
তুষারবাবু সম্পর্কে আমার জীবনের আর একটি বিশেষ স্মরণীয় ঘটনার কথা এখানে উল্লেখ করি। ১৯৫৮ সালে আমার স্ত্রীবিয়োগের এক বছর পরে ১৯৫৯ সালের ২রা আগস্ট তুষারবাবু তাঁর বারাসাতের বাগান-বাড়িতে আমাকে সংবর্ধনা দেবার এক বিরাট ব্যবস্থা করেন। এখনও সে ঘটনার কথা স্মৃতিপথে উদয় হলে আমি অভিভূত হই। কলকাতার বহু বন্ধুবান্ধব, আত্মীয়স্বজন, সাংবাদিক ও বিশিষ্ট সাহিত্যিকগণ এই সংবর্ধনা সভায় উপস্থিত ছিলেন। কলকাতা থেকে এইসব সাহিত্যিক ও নিমন্ত্রিত ব্যক্তিদের দশ মাইল দূরে 'শিশির কুঞ্জ' নামক তাঁর বাগান-বাড়িতে নিয়ে যাবার এবং পৌঁছে দেবার জন্যে কয়েকখানি গাড়ির ব্যবস্থাও করেন তুষারবাবু নিজেই। কেবলমাত্র তাই নয়, অনুষ্ঠানের পর সমবেত উপস্থিত ব্যক্তিদের প্রায় ৯০ জনকে তিনি তাঁর বাড়িতে পাত পেড়ে ভূরিভোজনে আপ্যায়িত করেন। সে রাজসূয় আয়োজনের কথা, মাছ মাংস প্রভৃতির বিভিন্ন পদ ও মিষ্টান্নের কথা যাঁদের মনে আছে, তাঁরা অবশ্যই স্বীকার করবেন যে, এ ধরণের আয়োজন কদাচিৎ কোন অনুষ্ঠানে হয়ে থাকে। আসলে ঐ খাওয়া-দাওয়ার কথা মনে হলে আজও এই বৃদ্ধ বয়সে জিবে জল আসে!

এই অনুষ্ঠানে সেদিন সভাপতিত্ব করেছিলেন শ্রদ্ধেয় সাংবাদিক হেমেন্দ্রপ্রসাদ ঘোষ। তুষারবাবু নিজে, তাঁর পুত্র শ্রীযুক্ত তরুণকান্তি ঘোষ পরিবারের সকলেই সমবেত অভ্যাগতদের বিশেষ সমাদর ও অভ্যর্থনা করেন। শ্রীযুক্ত তরুণকান্তি সে সময় পশ্চিমবঙ্গের কৃষি ও খাদ্যোৎপাদন মন্ত্রী ছিলেন। এই সংবর্ধনা সভায় তুষারবাবু সহ বহুজন তাঁদের প্রীতির নিদর্শনস্বরূপ বহুবিধ মূল্যবান উপহার দিয়ে আমায় কৃতজ্ঞতাপাশে বদ্ধ করেন। স্বনামধন্য মনীষী রাজশেখর বসু তাঁর স্বহস্তে প্রস্তুত কয়েকটি গন্ধদ্রব্যসহ একটি রৌপ্য পেটিকা আমাকে উপহার দেন। এই পেটিকার ডালায় তাঁর নিজের সহ আরও ছ'জন বন্ধুর স্বাক্ষর উৎকীর্ণ ছিল। সেদিনের এই সভায় উপস্থিত সাহিত্যিক বন্ধুবান্ধবের মধ্যে আজকে যাঁরা আমার আগেই এই পৃথিবী ছেড়ে চলে গেছেন, তাঁদের কথাই এই প্রসঙ্গে বেশী করে মনে পড়ছে। এঁরা হচ্ছেন—হেমেন্দ্রপ্রসাদ ঘোষ, রাজশেখর বসু, কেদারনাথ চট্টোপাধ্যায়, অবনীনাথ মিত্র, সজনীকান্ত দাস ও অবিনাশচন্দ্র ঘোষাল।

১৯১০ খৃষ্টাব্দে আমি যখন মির্জাপুরের সিটি কলেজে আই-এ পড়ার জন্য ভর্তি হই, তখন অমল হোম ছিলেন আমার সহপাঠী। ক্রমশ তাঁর সঙ্গে আমার অন্তরঙ্গতা ও বন্ধুত্ব বিশেষভাবে জন্মে যায় এবং অল্প দিনের মধ্যে আমার অত্যন্ত নিকট বন্ধুদের ভিতর তিনি একজন হয়ে ওঠেন। এই সময় সিটি কলেজের অধ্যক্ষ ছিলেন স্বনামধন্য হেরম্বচন্দ্র মৈত্র আর আমাদের ইংরাজীর অধ্যাপক ছিলেন ডঃ হরেন্দ্রকুমার মুখোপাধ্যায়—যিনি পরে পশ্চিম বাংলার রাজ্যপাল হয়েছিলেন। ছাত্রজীবনে অমল হোম পড়াশুনায় বিশেষ কিছু কৃতিত্ব দেখাতে পারেননি বটে, কিন্তু পরবর্তী জীবনে সাংবাদিক ও সাহিত্যিক হিসাবে দেশব্যাপী প্রচুর নাম করেছিলেন।

জালিয়ানওয়ালাবাগ হত্যাকাণ্ডের প্রতিবাদে লাহোরের 'ট্রিবিউন' পত্রিকার সম্পাদক কালীনাথ রায় মহাশয় কারাবরণ করার পর তরুণ অমল হোম উক্ত পত্রিকার সম্পাদনাভার গ্রহণ করেন এবং সেই থেকে সাংবাদিক জগতে তাঁর নাম চারিদিকে ছড়িয়ে পড়ে। তিনি বিপিনচন্দ্র পাল মহাশয়ের আনুকূল্যে এলাহাবাদের Independent কাগজের সঙ্গে যুক্ত হন। এইসব কাজকর্মের ফলে তিনি দেশবন্ধুর দৃষ্টি আকর্ষণ করেন। তিনি তাঁকে কলিকাতা মিউনিসিপ্যাল গেজেটের সম্পাদনা ভার দেন এবং দীর্ঘদিন ধরে সুখ্যাতির সঙ্গে এই 'গেজেটে'র সম্পাদনা করেন। তারপর তিনি সরকারী প্রচার বিভাগের কর্মকর্তা হন, পরে ডি, ভি, সির প্রচার বিভাগের অধিকর্তার পদ গ্রহণ করেন।

ইনি রবীন্দ্রনাথের দীর্ঘসান্নিধ্য লাভ করেছিলেন। ভারতের বহু বিশিষ্ট নেতৃস্থানীয় ব্যক্তিদের সঙ্গে অমলচন্দ্রের যোগাযোগ ছিল। এককালে তিনি রাজনৈতিক দলের সঙ্গে খুব মিশতেন। তাঁরই চেষ্টায় রবীন্দ্রনাথ তাঁর একখানি ছোট উপন্যাস আমাদের প্রকাশ করতে দিতে রাজী হয়েছিলেন। কিন্তু কোনো কারণে সেটা প্রকাশ করা সম্ভব হয়নি। রবীন্দ্রনাথ সম্বন্ধে অমল হোম লিখিত একখানি বই আমরা প্রকাশ করি।

বিশ্বসাহিত্য সম্বন্ধে তাঁর প্রচুর পড়াশুনা ছিল—বিশেষ করে রবীন্দ্র-সাহিত্য সম্বন্ধে তাঁর জ্ঞান ছিল অসাধারণ। এরকম একজন সাংবাদিক, সাহিত্যিক ও সাহিত্যরসিক ব্যক্তির সঙ্গে যে আমার ঘনিষ্ঠ পরিচয় ছিল—সেকথা ভেবে আমি গর্ব অনুভব করছি।

এখন অমলবাবু অসুস্থ অবস্থায় শয্যাগত হয়ে আছেন। আমরা তাঁর রোগনিরাময় প্রার্থনা করি।

১৯১২-১৩ সালে যখন আমি রিপণ কলেজে (বর্তমান সুরেন্দ্রনাথ কলেজ) বি-এ পড়ি তখন থেকেই প্রভাতচন্দ্রের সঙ্গে আমার আলাপ। সেই আলাপ পরে এত গভীর হয় যে আমরা যুক্তভাবে অনেক লেখা লিখতাম, আর তা 'ভারতবর্ষে' ছাপা হোত।

বি-এ পরীক্ষার জন্য যখন আমি প্রস্তুত হচ্ছি, প্রভাতচন্দ্রও সে সময়ে আমার বাড়িতে এসে একত্রে পড়াশুনা করত।

আমি যখন 'যমুনা'র সঙ্গে যুক্ত ছিলাম—তখন প্রভাতচন্দ্রও ওখানে প্রায়ই আসত। শরৎবাবু যখন হাওড়ায় থাকতেন তখন আমি আর প্রভাত দুজনে মিলে একসঙ্গে যেতাম শরৎচন্দ্রের কাছ থেকে কপি আনতে।

এঁর পিতা দ্বারকানাথ গঙ্গোপাধ্যায় তৎকালীন নানা আন্দোলনের সঙ্গে জড়িত ছিলেন। এঁর মা কাদম্বিনী গাঙ্গুলী হলেন প্রথম বাঙালী মহিলা যিনি বিলেত থেকে ডাক্তারী পাশ করে এসে এদেশে নিয়মিত প্র্যাকটিস করেন। এঁর ভগিনী জ্যোতির্ময়ী গাঙ্গুলী এবং তিনি নিজেও স্বদেশী আন্দোলনে কয়েকবার কারাবরণ করেন। বর্তমানে ইনি 'জনসেবক' পত্রিকার সম্পাদক।

প্রভাতচন্দ্রের বয়স বর্তমানে ৭০ বৎসরেরও বেশী, কিন্তু এত বয়স হওয়া সত্ত্বেও তাঁর কর্মক্ষমতা দেখলে অবাক হয়ে যেতে হয়।

ইনি হলেন একজন গোঁড়া ব্রাহ্ম—এবং অন্তরঙ্গ বন্ধু-বান্ধবদের মধ্যে ইনি 'জংলী' নামে বিশেষভাবে পরিচিত।

শ্রীহুমায়ুন কবির ১৯২০-২১ সালে যখন প্রেসিডেন্সী কলেজের ছাত্র তখন থেকেই তিনি বাংলা সাহিত্যের সেবা করে আসছেন। ছাত্রাবস্থাতেই তাঁর প্রথম কবিতার বই 'স্বপ্নসাধ' বের হয়। এই পুস্তক প্রকাশনার ব্যাপারে তাঁর সঙ্গে প্রথম আলাপ। আমিই সে পুস্তক প্রকাশ করি।

এখানকার পড়াশুনা শেষ করে তিনি বিলাত চলে যান উচ্চশিক্ষার জন্য। সেখানে অক্সফোর্ড বিশ্ববিদ্যালয়ে ডা ল ডা বে পরীক্ষায় পাশ করে পরে বহু সম্মান লাভ করেন। সেই থেকে শ্রীকবিরের সঙ্গে আমাদের প্রীতি ও সৌহার্দ আজও অক্ষুণ্ণ আছে।

বিলাতে থাকার সময় মৌচাকে তিনি ধারাবাহিকভাবে কয়েক মাস ধরে 'অক্সফোর্ডের চিঠি' নাম দিয়ে ওদেশের কথা

লিখতেন। সে রচনাগুলি সাহিত্যিক মাত্রেই দৃষ্টি আকর্ষণ করেছিল। বিশেষ করে ছোটদের মহলে এগুলি খুবই আকর্ষণীয় হয়েছিল।

তারপর বিলাত থেকে ফিরে এসে নানা শিক্ষায়তনের সঙ্গে যুক্ত থেকে তিনি স্বর্গত আবুল কালাম আজাদের শিক্ষাদপ্তরে

শ্রীহুমায়ুন কবির

উচ্চ কর্মচারী হয়ে নতুন কর্মজীবন শুরু করলেন। তিনি প্রায় দশ বৎসর ভারত সরকারের শিক্ষামন্ত্রী ছিলেন। এর পর কামরাজ পরিকল্পনাধীন হয়ে তিনি কিছু দিন তৈলমন্ত্রী ছিলেন, কিন্তু দুঃখের বিষয় কিছু দিন এই পদে অধিষ্ঠিত থাকার পর তাঁকে পদত্যাগ করতে হয়।

আমাদের ভূতপূর্ব রাষ্ট্রপতি ডঃ সর্বপল্লী রাধাকৃষ্ণনের 'ভারতীয় দর্শনের ইতিহাস'-এর বাংলা সংস্করণ আমরাই প্রকাশ করি শ্রীকবিরের সাহায্যে।

এ ছাড়াও শ্রীকবিরের সঙ্গে আমার প্রীতির সম্বন্ধে যে কত গভীর তার প্রমাণ হল ১৯৫৭ সালে All India Writers Conference -এর কোষাধ্যক্ষের গুরুভারটিও তিনি আমার ওপর চাপিয়ে দেন। আমিও সে দায়িত্ব ভালভাবেই পালন করেছিলাম—কনফারেন্সের শেষে সব খরচ-খরচা বাদ দিয়ে উদ্বৃত্ত ছিল ৭০০০ টাকা—এতদিন সে টাকাটা আমার কাছেই ছিল। সম্প্রতি সেই টাকাটা বাড়িয়ে প্রায় ১০০০০ টাকা করে বর্তমান কোষাধ্যক্ষ গজেন্দ্রকুমার মিত্রের হাতে তুলে দিয়েছি।

শ্রীকবির একজন সত্যিকারের বাংলা সাহিত্যিক—তাঁর লেখা অনেকগুলি বাংলা বই আছে—তার মধ্যে কয়েকখানি বইয়ের প্রকাশক আমরাই। বাংলা দেশের খ্যাতনামা ত্রৈমাসিক পত্রিকা 'চতুরঙ্গ' সম্পাদনা করে আসছেন তিনি দীর্ঘ দিন ধরে। বর্তমানে শুনতে পাই ('নাউ') নামক ইংরাজি সাপ্তাহিক পত্রিকাটির সঙ্গে তিনি ঘনিষ্ঠভাবে যুক্ত।

রাজনৈতিক ক্ষেত্রে তিনি যে একজন নির্ভীক পুরুষ, সে বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই। রবীন্দ্র শতবার্ষিকীর সময় তাঁরই অক্লান্ত পরিশ্রমের জন্য ভারতের সর্বত্র রবীন্দ্র উৎসব বিশেষভাবে পালিত হয়।

দীর্ঘদিন কংগ্রেসের সেবা করে আদর্শগত মতভেদের জন্য তিনি কংগ্রেস পরিত্যাগ করে বর্তমানে বাংলা কংগ্রেসের একজন বিশিষ্ট সভ্য।

কবি নরেন্দ্র দেবের নাম কে না জানে বাংলা দেশে? আমার অন্তরঙ্গ বন্ধুদের মধ্যে তিনি একজন। তাঁর সঙ্গে আমার প্রথম পরিচয় হয় 'ভারতী'র আসরে ১৯১৩ সালে। সেই পরিচয় ক্রমশ গভীর থেকে গভীরতর হতে হতে অন্তরঙ্গতায় ভরে ওঠে। আর আজ এই দীর্ঘ ৫৪ বৎসরের ব্যবধানেও তা এতটুকু ম্লান হয় নি। 'মৌচাকে'র প্রথম অবস্থা থেকে আজ পর্যন্ত তাঁর নানান ধরনের হাস্যরস কবিতা, প্রবন্ধ ও অন্যান্য রচনা 'মৌচাকে'র পাঠক-পাঠিকাদের আনন্দ পরিবেশন করেছে। বৎসরের শ্রেষ্ঠ শিশু-সাহিত্যিক হিসাবে 'মৌচাকে'র তরফ থেকে ৫০০ টাকা পুরস্কার দিয়ে তাঁর প্রতিভার সম্মান করা হয়।

তাঁর কৃত 'ওমর খৈয়ামে'র অনুবাদ বাংলা সাহিত্যে একটি বিশিষ্ট অবদান। বহু দিন পাঠশালা নামক একটি শিশু-পত্রিকা সম্পাদনা করেও তিনি বিশেষ খ্যাতি অর্জন করেন। তাঁর সহধর্মিণী শ্রীমতী রাধারাণী দেবীও বাংলা সাহিত্যে একটি স্থায়ী আসন দখল করে আছেন। স্বামী-স্ত্রী দুজনে সমানে

শ্রীনরেন্দ্র দেব

কাব্য চর্চা করার জন্য 'কবি দম্পতি' বললে এঁদের দুজনকেই বোঝায়।

রাধারাণী দেবীর সঙ্গে নরেন্দ্রর তখনও বিবাহ হয় নি—সেই সময় তাঁদের যুগ্ম সম্পাদনায় বাংলার শ্রেষ্ঠ কবিদের কাব্য-সঙ্কলন 'কাব্য-দীপালী' প্রকাশিত হয়। সে সঙ্কলনটি আমরা প্রকাশ করি। তার কিছুদিন পরেই তাঁদের বিবাহ হয়।

নরেন্দ্রর সঙ্গে রাধারাণী দেবীর বিবাহ হয় ১৯৩১ সালের ৩১শে মে। সেই বিবাহে আমি, আমার স্ত্রী সুলেখা, চারু রায়, মায়া রায় এবং আরও অনেকে উপস্থিত ছিলাম।

রাধারাণী দেবী 'অপরাজিতা দেবী' ছদ্মনামে উগ্র প্রেমের কবিতা লিখতেন। 'আঙিনার ফুল', 'বুকের বীণা' প্রভৃতি বইগুলি অপরাজিতা দেবী নামেই প্রকাশিত হয়। রাধারাণী দেবীর প্রসিদ্ধ কাব্যগ্রন্থগুলির নাম হল 'সীঁথিমৌর', 'লীলাকমল' প্রভৃতি।

স্বামী-স্ত্রী দুজনেই নানা ধরনের বই লিখে বাংলা সাহিত্যকে সমৃদ্ধ করেছেন। শিশু-সাহিত্যেও এঁদের অবদান বিশেষ উল্লেখযোগ্য। একমাত্র কন্যা নবনীতাকে সঙ্গে নিয়ে একবার এঁরা ইরোপ ভ্রমণ করে এসেছেন। এঁরা মনে-প্রাণে কবি—তাই বাড়ীটির নামও দিয়েছেন 'ভালবাসা'। এই বৃদ্ধ বয়সেও নরেন্দ্রর সাহিত্যসাধনার কর্মতৎপরতা দেখলে অবাক হয়ে যেতে হয়। তাঁর লেখনী এখনও সমানে চলেছে।

আগেকার দিনে আমাদের দোকানের আড্ডা থেকে যে ক'জনা-ছয়েক এক সঙ্গে বহু দেশ ভ্রমণ করেছি, তার মধ্যে কবি নরেন্দ্র দেবও একজন। সেই ভ্রমণের দলটির মধ্যে নরেন্দ্র ছাড়া থাকতেন প্রেমাঙ্কুর আতর্থী, চারু রায়, হেমেন্দ্রকুমার রায় ও আমি।

কুস্তিগীর যে শিল্পী হতে পারে এর প্রমাণ শুধু বাংলা দেশে আমরা একটি লোকের কাছ থেকেই পেয়েছি। তিনি শুধু কুস্তিগীর নন, তিনি শিকারী, সাহিত্যিক, চিত্রশিল্পী, ভাস্কর, বংশীবাদক। হ্যাঁ, আমি বলছি দেবীপ্রসাদ রায়চৌধুরীর কথা।

দেবীপ্রসাদের সঙ্গে আমার বন্ধুত্ব দীর্ঘ দিনের—সেই ১৯২০ সাল থেকে। এই ৪৭ বছরের ব্যবধানেও সেই বন্ধুত্বের মধ্যে এতটুকু চিড় খায় নি। পার্ক স্ট্রীটের মুখে মহাত্মা গান্ধীর প্রতিমূর্ত, যা আমরা প্রতিদিন যাতায়াতের পথে দেখি, তা তাঁরই সৃষ্টি। পাটনা শহরে শহীদের যে মূর্তি তিনি সৃষ্টি করেছেন তাতে তিনি চিরস্মরণীয় হয়ে থাকবেন। Martyrs Memorial নামে সম্প্রতি তিনি দিল্লী লালকেল্লার সম্মুখে কয়েকটি প্রতিমূর্তসম্বলিত ভাস্কর্যের কাজে নিযুক্ত আছেন।

শুধু যে ভাস্কর্যের মাধ্যমেই তিনি বিশ্ববিশ্রুত হয়েছেন তা নয়, সাহিত্যক্ষেত্রেও তাঁর অবদান কম নয়। তাঁর কয়েকটি পুস্তকও প্রকাশিত হয়েছে। মাদ্রাজে শিল্প মহাবিদ্যালয়ের তিনি অধ্যক্ষ এবং দিল্লীর ললিতকলা আকাদমীর সভাপতি ছিলেন। তাঁর এই শিল্পপ্রতিভার স্বীকৃতিস্বরূপ বৃটিশ ও বর্তমান সরকারের কাছে তিনি বহু সম্মানের অধিকারী হয়েছেন।

বহু চিত্র তিনি আমাকে এঁকে দিয়েছেন এবং তাঁর বহু লেখাও 'মৌচাকে' প্রকাশিত হয়েছে।

এরকম একজন দিলখোলা, মেজাজী লোক খুব কমই দেখা যায়। (ক্রমশঃ)

শুভঙ্কর

পরমাণুবিজ্ঞান ও জন ককক্রফট

প্রখ্যাত পরমাণু-বিজ্ঞানী স্যার জন ককক্রফট সম্প্রতি লোকান্তরিত হয়েছেন। পরমাণুবিজ্ঞানের ইতিহাসে ককক্রফট একটি অবিস্মরণীয় নাম। তিনিই সর্বপ্রথম সম্পূর্ণ কৃত্রিম উপায়ে পরমাণু-বিভাজনের পথ প্রদর্শন করেন। তাঁর এই অনন্য অবদানের জন্যে বিজ্ঞানী ওয়ালটনের সঙ্গে যৌথভাবে ১৯৫১ সালে পদার্থবিজ্ঞানে তিনি নোবেল পুরস্কার লাভ করেন।

ককক্রফট এবং ওয়ালটনের পরমাণু-বিভাজনের কথা বলতে গেলে পূর্ব-ইতিহাস বলা প্রয়োজন। ১৮৯৬ সালে পরমাণুর অবিভাজ্যতা সম্পর্কে প্রথম সন্দেহ জাগে। ঐ সালে ফরাসী পদার্থবিদ বেকেরেল আবিষ্কার করেন ইউরেনিয়াম ধাতু আপনা-আপনি ভেঙে গিয়ে রশ্মি বা কণিকা বিকিরণ করে। এর কিছুকাল পরে মাদাম কুরী আবিষ্কার করেন 'রেডিয়াম' নামে একটি নতুন ধাতু, যা ইউরেনিয়ামের মতো স্বতঃবিকিরণ করে। মাদাম কুরী এই বিকিরণের নাম দেন 'তেজস্ক্রিয়তা'। এই সময় বিশ্ববিশ্রুত বৃটিশ বিজ্ঞানী রাদারফোর্ড পরমাণুবিজ্ঞানের ইতিহাসে আবির্ভূত হন। তিনি পরীক্ষার দ্বারা দেখান, ইউরেনিয়ামের মতো ভারী মৌলগুলি নিরবচ্ছিন্নভাবে আপনা-আপনি ভেঙে যায়। এবং ভাঙনের সময় প্রচন্ড বেগে ইলেকট্রন বা গামা রশ্মি বিকিরণ করে। স্থায়ী মৌল সীসায় পরিণত হবার পর এই ভাঙন শেষ হয়। উচ্চ গতিসম্পন্ন হিলিয়াম পরমাণুকে হাতিয়ার হিসাবে গ্রহণ করে তিনি পরমাণুর প্রকৃতি ও তার আভ্যন্তরীণ গঠনের রহস্য উদ্ঘাটনের চেষ্টা করেন। তিনি বলেন, পরমাণুর আভ্যন্তরীণ গঠন সৌরজগতের মতো। সৌরজগতের কেন্দ্রে যেমন আছে সূর্য এবং তার চারিদিকে গ্রহাদি ঘুরে বেড়ায়; পরমাণুর অভ্যন্তরে তেমনি একটি ক্ষুদ্র কেন্দ্র বা নিউক্লিয়াস আছে এবং তার চারদিকে ইলেকট্রনের দল ঘুরে বেড়ায়। তেজস্ক্রিয় মৌলে যে স্বতঃ-ভাঙন দেখা যায় তার মূলে আছে পরমাণুর কেন্দ্রীণের পরিবর্তন।

১৯২৪ সালে ককক্রফট যখন ক্যাভেন্ডিশ গবেষণাগারে কাজ শুরু করেন, তখনও রাদারফোর্ড উচ্চগতিসম্পন্ন হিলিয়াম বা আলফা কণিকা দিয়ে পরমাণু কেন্দ্রীণের রহস্য উদ্ঘাটনের চেষ্টা করছেন। জিঙ্ক সালফাইডের প্রলেপ-মাখানো একটি কাচের প্লেটের ওপর আলফা কণিকার আঘাতের ফলাফল থেকে তার পরিমাপ তিনি নির্ণয় করেন। প্রতিবার যখন একটি আলফা কণিকা কাচের প্লেটে আঘাত করে তখন ক্ষীণ ঝলক সৃষ্টি হয়। অন্ধকার ঘরে শক্তিশালী অনুবীক্ষণ যন্ত্রের সাহায্যে এই ঝলক ধরা যায়। এইভাবে রাদারফোর্ড দেখান, আলফা কণিকার দ্বারা পরমাণুর কেন্দ্রীণ আঘাত করলে কেন্দ্রীণের পরিবর্তন ঘটে অর্থাৎ অন্য মৌলের কেন্দ্রীণে পরিণত হয়। রাদারফোর্ড নাইট্রোজেন পরমাণু রেডিয়াম-নিঃসৃত আলফা কণিকার দ্বারা আঘাত করে অক্সিজেন পরমাণুতে পরিণত করেন। এতদিন ধরে মানুষ যে পরশপাথরের সন্ধান করছিল তার প্রথম চাবিকাঠি দেখিয়ে ছিলেন রাদারফোর্ড। ১৯২৪ সালের মধ্যে রাদারফোর্ড ও তাঁর সহকর্মীরা এভাবে চার-পাঁচটি মৌলান্তীকরণ সম্পন্ন করেন। এসব ক্ষেত্রে একটি হিলিয়াম কেন্দ্রীণ অপর একটি কেন্দ্রীণে প্রবেশ করে একটি হাইড্রোজেন কেন্দ্রীণ বার করে দেয়। জিঙ্ক সালফাইডের পর্দায় ক্ষীণতর ঝলকের মাধ্যমে হাইড্রোজেন কেন্দ্রীণ লক্ষ্য করা যায়।

স্যার জন ককক্রফট

স্কটিশ বিজ্ঞানী সিটি আর উইলসনের 'মেঘপ্রকোষ্ঠ' নামে অভিনব উদ্ভাবনের দ্বারা এই মৌলান্তীকরণ পদ্ধতির বাস্তবতা নিঃসংশয়ে প্রমাণিত হয়। উইলসনের এই মেঘপ্রকোষ্ঠ যন্ত্রে ধাবমান পরমাণু-ভেদকের পথের ওপর জলকণা ঘনীভূত হয়, যেমন জেটবিমানের পশ্চাতে নিক্ষিপ্ত অংশের ওপর জলীয় বাষ্প ঘনীভূত হয়ে তার পথরেখা দৃশ্যমান করে তোলে।

উইলসন উদ্ভাবিত এই পদ্ধতিতে পরমাণু-কেন্দ্রীণ থেকে উৎক্ষিপ্ত আলফা কণিকা, অথবা হাইড্রোজেন কেন্দ্রীণ বা ইলেকট্রনের পথরেখা সত্যসত্যই দেখা সম্ভব হয়। ক্যাভেণ্ডিশ গবেষণাগারে বিজ্ঞানী পি এম এস ব্ল্যাকেট এইভাবে রাদারফোর্ড সাধিত নাইট্রোজেন পরমাণুর অক্সিজেন পরমাণুতে রূপান্তরের আলোকচিত্র গ্রহণে সমর্থ হন। এই কাজে সাফল্যলাভের জন্যে গভীর মনোনিবেশ ও অদম্য অধ্যবসায় দরকার। ব্ল্যাকেট কয়েক হাজার আলোকচিত্র গ্রহণের পর একটিতে এই বিরল ঘটনা প্রত্যক্ষ করেন।

এরপর দেখা গেল, এবিষয়ে আরও অগ্রগতির জন্যে রেডিয়াম উৎস ছাড়া আরও শক্তিশালী পরমাণু ভেদক প্রয়োজন। ১৯২৭ সালে ককক্রফট এমন একটি যন্ত্র

উদ্ভাবন করেন যার দ্বারা উচ্চ ভোল্টেজের সাহায্যে হাইড্রোজেন কেন্দ্রীণের গতি বৃদ্ধি করা সম্ভব হয়। এইভাবে কৃত্রিম উপায়ে লক্ষগুণ বেশি ভেদক উৎপাদন করা গেল। এছাড়া তরুণ রুশ বিজ্ঞানী গ্যামো উদ্ভাবিত একটি নতুন তত্ত্ব থেকে জানা গেল, পরমাণুকেন্দ্র অভিবেধের কাজে হাইড্রোজেন-কেন্দ্রীণ ইতিপূর্বে যা অনুমান করা গিয়েছিল তার চেয়েও বেশি কার্যকর। ককক্রফট ভাবলেন, যদি কয়েক হাজার ভোলটেজ বৃদ্ধির সাহায্যে ভেদকের গতি বৃদ্ধি করা যায় পরমাণুকেন্দ্রের রূপান্তর ঘটাবার পক্ষে তা বিশেষ কার্যকরী হবে। এই সময় আইরিশ বিজ্ঞানী ই টি এস ওয়ালটন এসে ককক্রফটের গবেষণাকাজে যোগ দেন। তাঁরা দুজনে উচ্চগতিসম্পন্ন ভেদক উৎপাদনের অন্যান্য উপায় সম্পর্কে পরীক্ষা-নিরীক্ষা চালাতে লাগলেন (পরবর্তীকালে মার্কিন বিজ্ঞানীরাও ঘটনাক্রমে এই পদ্ধতি উদ্ভাবনে সফল হন)। ককক্রফট এবং ওয়ালটন পেট্রোল স্টেশনে ব্যবহৃত কাচের বড় চারটি সিলিণ্ডার একটার ওপর একটা সাজিয়ে প্লাস্টিসিন ও টিনের প্লেট দিয়ে জুড়ে দিলেন। এই হল তাঁদের উচ্চ ভোলটেজের উৎস। এছাড়া তাঁদের একটি ট্রান্সফর্মার ছিল। তাঁরা ট্রান্সফর্মার থেকে কাচের সিলিণ্ডারে পরিবর্তী বিদ্যুৎপ্রবাহ সঞ্চালন করলেন। এইভাবে তাঁরা একটা স্থিরমাত্রার উচ্চ ভোলটেজ উৎপাদন সমর্থ হন। এর দ্বারা ৫ লক্ষ ভোলটেজ উৎপন্ন হয়, যা অতি শক্তিশালী ট্রান্সমিশন লাইনের চেয়ে তিন

গুণ বেশি। আরও দুটি পেট্রোল পাম্প সিলিণ্ডার দিয়ে তৈরী হল পরমাণুকেন্দ্র ভেদের বুলেট নিক্ষেপের 'বন্দুক'। তাঁরা একটি ডিসচার্জ টিউবের শীর্ষদেশ থেকে হাইড্রোজেন-কেন্দ্রীণ নিক্ষেপ করেন। উচ্চ বায়ুশূন্য অবস্থায় সিলিণ্ডারের মধ্যে দিয়ে যাবার সময় তাদের গতি তীব্রভাবে বৃদ্ধি পায়। এই কেন্দ্রীণগুলি সিলিণ্ডার থেকে বেরিয়ে কয়েক মিলিমিটার পুরু সীসার তৈরী একটি ক্ষুদ্র কক্ষে প্রবেশ করে। এই কক্ষে তারা লিথিয়াম ধাতুর একটি পাতে আঘাত করে। লিথিয়াম পাতের কাছে দু পাশে দুটি জিঙ্ক সালফাইড প্রলেপ-মাখানো পর্দা রাখা হয়। ককক্রফট এবং ওয়ালটন তাঁদের অনুবীক্ষণ যন্ত্র নিয়ে লক্ষ্য করতে লাগলেন কোনো আলোর ঝলক দেখা যায় কিনা। তাঁরা লক্ষ করে উৎফুল্ল হলেন, ক্ষীণ আলোক-বিন্দু দেখা যাচ্ছে। এই আলোক-বিন্দুগুলি আলফা কণিকার সাক্ষ্য দেয়। এ থেকে বোঝা গেল লিথিয়াম পাত থেকে হিলিয়াম কেন্দ্রীণ বেরিয়ে আসছে। কাজেই এ বিষয়ে কোনো সন্দেহ রইলো না যে হাইড্রোজেন-কেন্দ্রীণ লিথিয়াম-কেন্দ্রীণকে অভিবিদ্ধ করেছে এবং তাকে দুটি হিলিয়াম কেন্দ্রীকে বিভক্ত করেছে। কৃত্রিম উপায় ত্বরায়িত হাইড্রোজেন কেন্দ্রীণের দ্বারা মৌলান্তরীকরণ অর্থাৎ এক মৌল থেকে অন্য মৌলে রূপান্তর এই সর্বপ্রথম সাধিত হল। এই অসাধ্যসাধনের পথিকৃৎ হলেন ককক্রফট এবং ওয়ালটন।

এই পথ ধরে পরবর্তীকালে পরমাণু-বিজ্ঞানের ইতিহাসে আরও বহু গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা ঘটেছে এবং তার শেষ পরিণতি ঘটেছে ইউরেনিয়াম পরমাণুর বিভাজনে এবং পরমাণু-শক্তির বিকাশে। তারপর আবিষ্কৃত হয়েছে পরমাণু-বোমা, হাইড্রোজেন বোমা। পারমাণবিক অস্ত্রের প্রলয়ঙ্কর রূপ দেখেছি নাগাসাকি ও হিরোশিমার ওপর পরমাণু-বোমা বর্ষণে। অপরদিকে পরমাণুর শক্তির কল্যাণময় রূপেরও পরিচয় আমরা পেয়েছি তেজস্ক্রিয় আইসোটোপের বিবিধ ক্ষেত্রে ব্যবহারে। চিকিৎসা, কৃষিকার্য, শিল্প, শক্তি উৎপাদন সর্বক্ষেত্রেই পরমাণু-শক্তির ব্যবহার মানুষের কাছে পরম আশীর্বাদের বাণী বহে এনেছে।

কুষ্ঠরোগ নিয়ন্ত্রণের চেষ্টা

লণ্ডনের ন্যাশনাল ইনস্টিট্যুট ফর মেডিক্যাল রিসার্চ-এর গবেষণায় সম্প্রতি এমন একটা সুফল পাওয়া গেছে যা থেকে আশা করা যেতে পারে, কুষ্ঠরোগ একদিন সাফল্যের সঙ্গে নিয়ন্ত্রণ করা যাবে, এমন কি শেষপর্যন্ত উচ্ছেদও করাও যাবে।

এই ইনস্টিট্যুটে সম্প্রতি কুষ্ঠরোগ সম্পর্কে যে সব কাজ হয়েছে তার একটা বিশদ বিবরণ প্রকাশিত হয়েছে। এই বিবরণীতে বলা হয়েছে—গ্রীষ্মমণ্ডলীয় ও আধা গ্রীষ্মমণ্ডলীয় অঞ্চলে, বিশেষত উন্নয়নশীল দেশগুলিতে এই রোগের প্রকোপ বেশি। সারা বিশ্বে কুষ্ঠরোগাক্রান্ত লোকের সংখ্যা ১ কোটি ২০ লক্ষ থেকে ১ কোটি ৫০ লক্ষের মধ্যে।

কৃত্রিম উপায়ে সংক্রামক জীবাণুর বিষয় অনুশীলন করা সম্ভব না হওয়ায় এ পর্যন্ত গবেষণাগারের কাজ-কর্মে অনেক অসুবিধা দেখা যায়। এই কারণে পরীক্ষামূলকভাবে জীব-জন্তুর ওপর রোগ সংক্রমণ করাও সম্ভব হয় না।

কিছুদিন ধরে জানা গেছে, কুষ্ঠরোগের সংক্রামক জীবাণু ইঁদুরের গায়ে কিছুটা সংক্রামিত হতে পারে। এই তথ্য জানার পর নানা ভেষজ নিয়ে পরীক্ষা করা এবং জীবাণুর আচরণের প্রতি দৃষ্টি রাখা সম্ভব হয়েছে। কিন্তু সংক্রমণের প্রকৃতি সীমিত হওয়ায় গবেষণা বেশি দূর অগ্রসর হতে পারেনি।

এখন ইনস্টিট্যুট গবেষক-কর্মীরা আবিষ্কার করতে পেরেছেন কিভাবে ইঁদুরের কুষ্ঠরোগ সংক্রমণ প্রতিরোধ ক্ষমতা কমানো যায় এবং কিভাবে ইঁদুরের মধ্যে সংক্রমণের বিস্তার ঘটানো যায়।

এই আবিষ্কারের মূল্য অপরিসীম। কারণ এই আবিষ্কার নতুন ভেষজের সন্ধান জোগাড় করতে সাহায্য করেছে এবং গবেষণাগারে রোগ সম্বন্ধে এবং বিশেষভাবে এই রোগ কিভাবে স্নায়ুর ক্ষতি করে তা ভালো করে জানতেও সাহায্য করছে।
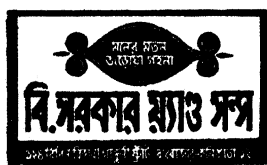
বুদ্ধিমন্ত-দেবানন্দ-অচ্যুতানন্দ

(৩৭)

বুদ্ধিমন্ত খান

নবদ্বীপের সনাতন মিশ্র, পদবীতে 'রাজপণ্ডিত', ব্যবহারেও পরমসম্পন্ন। অতিথিপরায়ণ, অকৈতব বিষ্ণুভক্ত। তারই কন্যা পরমসুচরিতা বিষ্ণুপ্রিয়া।

রোজ গঙ্গার ঘাটে স্নানের সময় শচীদেবীর সঙ্গে দেখা হয়। বিষ্ণুপ্রিয়া নম্র হয়ে শচীদেবীকে প্রণাম করে। শচীদেবী আশীর্বাদ করেন, কৃষ্ণ তোমাকে যোগ্য পতি জুটিয়ে দিন।

কিন্তু আমার নিমাইয়ের চেয়ে যোগ্যতর কে আছে? মনে মনে কামনা করলেন, 'এ কন্যা আমার পুত্রে হউক ঘটনা।'

ঘটক কাশী মিশ্রকে ডাকালেন শচীদেবী। বললেন, সনাতন মিশ্রকে বলো, তার কন্যাটিকে পুত্রবধূরূপে ঘরে আনি। মেয়েটির উপর আমার বড় মায়া পড়েছে। দেখলেই ইচ্ছে করে কোলে করে রাখি।

কাশী মিশ্র তক্ষুনি চলল সনাতনের কাছে।

কী মনে করে?

একটি বিশেষ কথা আছে। তোমার মেয়েটিকে নিমাই পণ্ডিতের হাতে সমর্পণ করো।

প্রস্তাব শুনে সনাতন অভিভূত হল। এ কি সম্ভব? দাঁড়াও গৃহিণীকে জিজ্ঞেস করি।

সনাতন ধনী, তার স্ত্রী মহামায়াও আশা করেছিলেন জামাই ধনী হবে। জিজ্ঞেস করল, নিমাই কি ধনী?

সনাতন বললে, নিমাই বিদ্বান। ধনবানের চেয়ে বিদ্বান বেশি বরণীয়। কৌলীন্য কাঞ্চনে নয়, কৌলীন্য বিদ্যায়।

আর বিদ্যা কী? 'হরিভক্তিরেব ন পুনর্বেদাদিনিষ্ণাততা।' হরিভক্তিই বিদ্যা, বেদপারঙ্গমত্ব বিদ্যা নয়। 'বিদ্যা ভাগবতাবধি।' নিমাই সেই ভাগবতী বিদ্যায় গৌরকান্ত।

মহামায়া রাজি হল। তাকাল বিষ্ণুপ্রিয়ার দিকে। এগারো বছরের মেয়ে, যেন মূর্তিমতী শ্রী। 'বিষ্ণুপ্রিয়া অঙ্গ জিনি লাখ বাণ সোনা।'

শ্রী কী? 'তৎপ্রিয়তা ন ধনজনগ্রামাদিভূয়িষ্ঠতা।' ভগবৎপ্রীতিই শ্রী, ধনজনসম্পত্তিসমৃদ্ধি শ্রী নয়। 'সম্পত্তি মধ্যে জীবের কোন সম্পত্তি গণি। রাধাকৃষ্ণ প্রেম যার সেই বড় ধনী।।'

নিমাইয়ের সঙ্গে কাশী মিশ্রের পথে দেখা।

আমি কোথায় যাচ্ছি জানো?

কে কোথায় যায় তার আমি কী জানি?

সনাতন মিশ্রের বাড়ি যাচ্ছি। তার মেয়ের বিয়ের দিনক্ষণ ঠিক করতে।

তা যাবে তো যাক, তাতে নিমাইয়ের কী। নিমাই পাশ কাটাতে চাইল।

কার সংগে বিয়ে তা জানো তো?

আমি কী করে জানব!

বেশ বলেছ! কাশী মিশ্র অপ্রস্তুত হল: তোমার বিয়ে, আর তোমারই খবর নেই?

আমার বিয়ে! নিমাই হাসতে লাগল: আর আমিই কিছু জানি না! বলে চলে গেল আপন মনে।

কাশী মিশ্রের মুখ ঘোরালো হয়ে উঠল! তবে বুঝি নিমাইয়ের এ বিয়েতে মত নেই।

সনাতনকে গিয়ে বললে, এ বিয়ে হবে না। নিমাই রাজি নয়।

বাড়িতে কান্নাকাটি পড়ে গেল। কিন্তু বিষ্ণুপ্রিয়া বিচলিত হল না। ভাবল এ তাঁর কৌশল, তিনি আমাকে উপেক্ষা করছেন যাতে তাঁর প্রতি আমার ব্যাকুলতা বাড়ে। উপেক্ষাতেই তো শ্রীমতীর কৃষ্ণ-অপেক্ষা।

কাশী মিশ্র শচীদেবীকে খবর দিল।

শচীদেবী নিমাইকে ডেকে বললে, এ বিয়ে যে আমি ঠিক করেছি।

তুমি ঠিক করেছ? নিমাই উল্লসিত হয়ে উঠল: তা হলে আর কথা কী। তুমি যা বলবে তাই করব। তাহলে উদ্যোগ শুরু করে দাও।

কিন্তু গরীবের ঘরের ছেলে তুই, কী উদ্যোগ করব?

নবদ্বীপের কায়স্থ জমিদার বুদ্ধিমন্ত খান এগিয়ে এল। বললে, বিয়ের সমস্ত ব্যয়ভার আমি বহন করব।

মুকুন্দসঞ্জয়, যার বাড়িতে নিমাইয়ের টোল, বললে, সকল ভার তুমি নেবে কেন? আমাকেও কিছু অংশ নিতে দাও।

রাখো। এ তোমার 'বামনাই' বিয়ে নয় এ এক রাজপুত্রের বিয়ে। প্রচণ্ড আয়োজন করব আমি। সাহায্য করতে চাও কোরো, কিন্তু তার দরকার হবে না।

বড় বড় চন্দ্রাতপ টাঙানো হল, চারধারে কলাগাছ পোঁতা, দুলল নিশান, দুলল আম্র-পল্লব। সমস্ত ভূমিতল আলপনা দিল মেয়েরা। আজ অধিবাস, সকাল হতেই বাজছে মৃদঙ্গ সানাই। ভাটেরা রায়বার পড়ছে। ব্রাহ্মণ-বৈষ্ণব সকলের নিমন্ত্রণ হয়েছে, অপরাহ্নে এসে মালা-চন্দন নেবে, নেবে পান-সুপুরি। তারই জন্যে কী ভিড়। একবার নিয়েও আবার লুকিয়ে নিতে আসছে।

তিনবার করে নাও, সোজাসুজিই নাও, শাঠ্যের কী দরকার। যা খরচ লাগবে বুদ্ধিমন্ত দেবে।

পরদিন বিয়ে, সারা নবদ্বীপে ভোজ্য-বস্তু বিতরণ করা হল। গঙ্গাস্নান করে বিষ্ণুপূজা সেরে নিমাই বসল নান্দীমুখ করতে। পুরনারীরা গঙ্গাপূজা ষষ্ঠীপূজা করলে, মন্দিরে-মন্দিরে আরো কত পূজা, ঘরে ঘরে কতশত স্ত্রী-আচার। খাদ্যদ্রব্যেরই আয়োজন কত। পাঁচ-সাতবার করে দিয়েও সে খাবারে অনটন হল না। এ প্রাচুর্য শুধু ঈশ্বরের প্রভাবে।

বুদ্ধিমন্তের উপরেও আছে একজন।

অপরাহ্নে নিমাইয়ের বন্ধুরা নিমাইকে সাজাতে বসল। 'দিব্য সূক্ষ্ম পীতবস্ত্র ত্রিকচ্ছ বিধান।' কপালে অর্ধচন্দ্রের আকারে চন্দনের ফোঁটা, মধ্যস্থলে মৃগমদবিন্দু, নয়নে কাজল, গলার ফুলের মালার উপরে আবার মতির মালা। কানে সোনার কুণ্ডল, বাহুতে রত্ন-বাজু। মাথায় মুকুট, গায়ে পট্ট-চাদর। মণিবন্ধে সুতো দিয়ে ধান-দুর্বা বাঁধা, হাতে দর্পণ। দেখ সকলে নবদ্বীপচন্দ্রকে দেখ।

বুদ্ধিমন্ত দোলা সাজিয়ে নিয়ে এল। এ দোলায় চড়ে গোধূলিলগ্নে নিমাই কন্যার বাড়িতে যাবে।

সর্বাগ্রে নিমাই মাকে প্রদক্ষিণ করে প্রণাম করল, তারপর ব্রাহ্মণ-বৈষ্ণবদের নমস্কার করে দোলায় গিয়ে বসল। তার বন্ধুরাও তার সঙ্গ নিলে। বুদ্ধিমন্তের পদাতিকেরা আগে-আগে চলল, আশে-পাশে পাটোয়ারের দল। নর্তক-বিদূষকই বা কত। আর বাজনাও বিচিত্র। 'জয়ঢাক বীরঢাক মৃদঙ্গ কাহাল। পটহ দগড় শঙ্খ- বংশী করতাল।।' হাজার হাজার দীপ চলল সঙ্গে, পুড়তে লাগল আতসবাজি।

সমস্তই বুদ্ধিমন্তের আনন্দ-নিবেদন। বিবাহান্তে নিমাই তাকে দিল তাই আলিঙ্গনের প্রসাদ।

তারপর যখন প্রভু গয়া থেকে ফিরলেন তাঁর কৃষ্ণ-উন্মাদনাকে অনেকে বায়ুব্যাধি বলে মনে করল। বললে, একে হাতে-পায়ে বেঁধে ঘরের মধ্যে বন্দী করে রেখে দাও।

কেউ বললে, শুধু বেঁধে রাখলে সারবে না, কবরেজ ডাকিয়ে শিবাঘৃত প্রয়োগ করো।

শচীদেবী বুদ্ধিমন্তকে ডাকলেন। বললেন, আমার নিমাইয়ের চিকিৎসার ব্যবস্থা করে দাও।

বুদ্ধিমন্ত ব্যবস্থা করে দিল। কোথায় কে বৈদ্য আছে ডেকে আনো। কোন্ ওষুধে কত খরচ পড়বে সব আমি দেব।

কিন্তু এ তো রোগ নয়, এ প্রেম—এ মহাভাব। কবরেজ তার করবে কী! বুদ্ধিমন্তই শুধু কবরেজের জন্যে করবে।

তারপর চন্দশেখর আচার্যের ঘরে প্রভু যখন অভিনয় করলেন তারও সাজ-সরঞ্জামের খরচ বুদ্ধিমন্তের।

সেই থেকে বুদ্ধিমন্ত প্রভুর লীলা-সঙ্গী। শুধু সঙ্গী নয়, সেবক, আজ্ঞাবহ।

তাই প্রভুর টানে বারেবারেই সে নীলাচলের অভিযাত্রী। যদি প্রভু তাকে আজ্ঞা করেন। যদি তার ধনসম্পদ প্রভুর কোনো কাজে লাগে।

(৩৮)

দেবানন্দ পণ্ডিত

কুলিয়া গ্রামের অধিবাসী, থাকে নবদ্বীপে মহেশ্বর বিশারদের জাঙালে। সুশান্ত, জ্ঞানবান, তপস্বী, আজন্ম-উদাসীন। কিন্তু তার আকাঙ্ক্ষা মোক্ষের, ভক্তির নয়।

ভাগবতের অধ্যাপনা করে কিন্তু ভক্তির ধার ধারে না।

তখনো প্রভুর আবির্ভাব হয়নি, সমস্ত জগৎ প্রেমশূন্য, একদিন শ্রীবাস যাচ্ছে দেবানন্দের ঘরের দুয়ার দিয়ে। দেখল পড়ুয়াদের সভা বসেছে, ভাগবত ব্যাখ্যা করছে দেবানন্দ। শ্রীবাস সভার এক প্রান্তে গিয়ে বসল। মূল শ্লোক শুনেই দ্রবীভূত হয়ে গেল, তার শরীরে সাত্ত্বিক ভাবের উদয় হল, বিহ্বল হয়ে মাটিতে লুটিয়ে পড়ে কাঁদতে লাগল অঝোরে।

এ আবার কোন জঞ্জাল এসে জুটল! পড়ুয়ারা তেড়ে এল শ্রীবাসকে।

তারা সবাই ভক্তিহীন, তারা ভাগবত-শ্রবণের মর্ম কী বুঝবে!

আমাদের অধ্যয়ন মাটি করে দিল। কে এই আপদ? পড়ুয়ারা শ্রীবাসকে ধরে বাড়ির বাইরে রেখে এল। কাঁদতে হলে এখানে বসে কাঁদো। আমাদের পড়ার না ক্ষতি হয়!

দেবানন্দ চুপ করে রইল। দুর্বৃত্ত ছাত্রদের নিরস্ত করবার চেষ্টাও করল না।

মনে দুঃখ নিয়ে শ্রীবাস ঘরে ফিরে গেল এবং বিরলে বসে ভাবতে লাগল ভাগবতের কথা।

প্রভু একদিন নগরভ্রমণে বেরিয়েছেন, হঠাৎ দেবানন্দের সঙ্গে দেখা হল। শ্রীবাসের কাছে দেবানন্দের অপরাধের কথা মনে পড়ে গেল। আমি তখনো আসিনি বটে কিন্তু আমার জানতে বাকি নেই।

প্রভু ক্রুদ্ধস্বরে বললেন, 'যে ভাগবত শুনে কৃষ্ণপ্রেমে কাঁদে তাকে তুমি তোমার বাড়ি থেকে বের করে দিলে? তুমি শুধুই পড়াও, ভাগবতের অভিমত আয়ত্ত করতে পারো তোমার এমন সাধ্য নেই। তুমি চিনি বহনই করতে পারো তার স্বাদ জানো না।'

দেবানন্দ এ ভর্ৎসনার প্রতিবাদ করল না। লজ্জিত মুখে চুপ করে রইল। স্তব্ধতা দ্বারা স্বীকার করল অপরাধ।

প্রভু যাকে বচনেও দণ্ড দেন সে নিঃসংশয় পুণ্যবান। আর সে দণ্ড যে মেনে নেয়, মাথায় তুলে নেয়, সে ভক্তির পথে চলে আসে।

দেবানন্দ কি তাই এবার ভক্তির পথ ধরবে?

প্রভুর ভগবত্তায় বিশ্বাস নেই দেবানন্দের। কিন্তু বক্রেশ্বরের নৃত্য দেখে তার প্রাণ-মন মুগ্ধ হয়ে গেল। বুঝল কাকে বলে প্রেমাবেশ, কাকে বলে অশ্রু কম্প স্বেদ হাস্য, কাকে বলে আনন্দমূর্ছা। নাচতে নাচতে মাটিতে পড়ে গেলে দেবানন্দ বক্রেশ্বরকে নিজের কোলে টেনে নিল ও তার অঙ্গধূলি নিয়ে রাখতে লাগল নিজের শরীরে। ভক্তধূলি গায়ে মেখে তার ভক্তিতে বিশ্বাস হল। বিশ্বাস হল শ্রীচৈতন্যে। 'ভাগবতী দেবানন্দ বক্রেশ্বর-কৃপাতে। ভাগবতের ভক্তি-অর্থ পাইল প্রভু হৈতে।।'

তারপর প্রভু যখন কুলিয়ায় এলেন, মাধবদাসের বাড়িতে দেবানন্দ এসে তাঁর চরণে দণ্ডবৎ হয়ে পড়ল। জানাল তার তৃণদৈন্য।

বৈষ্ণবের কৃপায় বিশ্বম্ভরকে পেলাম। বুঝলাম, 'ভক্তি-বিনা জপ-তপ অকিঞ্চিৎকর।' বুঝলাম মোক্ষের চেয়েও ভক্তি গরীয়সী। তোমার স্বভাব সর্বভূতকৃপালুতা, তোমাতে আমার অনুরাগ হোক।

প্রভু দেবানন্দের অপরাধ ভঞ্জন করলেন। বললেন, এবার থেকে তুমি ভাগবতের যথার্থ ব্যাখ্যাতা হবে। 'শুন বিপ্র, ভাগবতে এই বাখানিবা। ভক্তি বিনু আর কিছু মুখে না আনিবা।।'

সেই থেকে দেবানন্দের নাম হল ভাগবতী দেবানন্দ। চলতি ভাষায় 'ভাগবতিয়া দেবানন্দ'।

দেবানন্দ বললে, প্রভু, আমাকে একটি বর দিন।

বলো।

এই কুলিয়ায় এসে যে কেউ শ্রীগৌরাঙ্গের কাছে অপরাধভঞ্জনের প্রার্থনা করবেন, তন্দণ্ডেই তাঁর সমস্ত অপরাধের ভঞ্জন হবে।

প্রভু বললেন, তথাস্তু।

সেই থেকে কুলিয়ার নাম হল অপরাধ-ভঞ্জনের পাট। আর দেবানন্দ পরমভাগবত।

(৩৯)

অচ্যুতানন্দ

পিতা অদ্বৈত আচার্য, মা সীতা দেবী। অচ্যুতানন্দেরা ছ' ভাই, অচ্যুতানন্দ, কৃষ্ণদাস, গোপালদাস, বলরাম আর যমজ স্বরূপ-জগদীশ।

ছ ভাইয়ের মধ্যে অচ্যুতানন্দ শুধু জ্যেষ্ঠ নয়, শ্রেষ্ঠ। 'অচ্যুতের যেই মত সেই মত সার।'

যখন রামাই পণ্ডিত এসে অদ্বৈতকে খবর দিলে পূজার উপকরণ নিয়ে গৌরাঙ্গের সঙ্গে দেখা করতে, তখন অদ্বৈত দ্বিধা করলেও, বালক অচ্যুত কাঁদতে বসল। সে যেন বুঝেছে কার আবির্ভাব হয়েছে, পৌঁচেছে এসে কার আহ্বান! এ যেন সেই মহা বদান্যের উদ্দেশে কৃতজ্ঞতার অর্ঘ্য।

শৈশব থেকেই তার গৌরাঙ্গে সুদৃঢ় বিশ্বাস।

গৌরাঙ্গের জন্যে সীতা দেবী দুধ জ্বাল দিয়ে রেখেছেন, অচ্যুত তা খেয়ে ফেলেছে। তুই গৌরের দুধ খেয়ে ফেললি? ক্রুদ্ধ হয়ে সীতা দেবী ছেলেকে চড় মেরে বসলেন। যখন গৌরাঙ্গ এল দেখা গেল তার গায়ে সেই চড়ের দাগ। বুঝিয়ে দিল অচ্যুত তার কত অন্তরঙ্গ, কত একাত্ম।

প্রভুর সন্ন্যাস নিয়ে চলে যাবার পর এক সন্ন্যাসী এল তাদের বাড়িতে। অদ্বৈতকে জিজ্ঞেস করলে চৈতন্যগোসাইয়ের গুরু কে?

অদ্বৈত বললে, কেশব ভারতী।

বালক অচ্যুত অসন্তুষ্ট স্বরে বলে উঠল, বাবা, তুমি এ কী বললে? যিনি চতুর্দশ ভুবনের গুরু তাঁর আবার গুরু কে? কেশব ভারতী এই মর্তভুবনের একজন অধিবাসী মাত্র, সে চৌদ্দ ভুবনের গুরুর গুরু হয় কী করে? বাবা, তুমি সামান্য কথা ফিরিয়ে নাও, তুমি এরকম উপদেশ করলে দেশের লোক অনিষ্ট হবে।

ছেলের কথা শুনে তুষ্ট হল অদ্বৈত। প্রশ্নকর্তা অধোবদন হল।

বয়সে যত বড় হতে লাগল ততই তীব্রতর হল তার সংসারবৈরাগ্য। নীলাচলে এসে উপস্থিত হল। গদাধর পণ্ডিতের শিষ্যত্ব নিয়ে লাগল চৈতন্যসেবায়।

অদ্বৈতের দ্বিতীয় ছেলে কৃষ্ণদাসও গৌরাঙ্গভক্ত, দাদার দেখাদেখি সেও যেতে চাইল নীলাচলে। সীতা দেবী বিচলিত হলেন। বড় ছেলে কুমারবৈরাগ্য নিয়েছে এও তার পদাঙ্ক অনুকরণ করবে নাকি? কৃষ্ণদাসকে বিয়ে দিলেন আর যাতে কৃষ্ণবিমুখ না হয় তারই জন্যে কৃষ্ণমন্ত্রে দীক্ষা দিলেন। শুধু কৃষ্ণ মিশ্রকে নয়, তার স্ত্রী বিজয়াকেও। কৃষ্ণদাসের নতুন নাম কৃষ্ণ মিশ্র প্রভুরই রটনা। 'কৃষ্ণ মিশ্র নাম আর আচার্যতনয়। চৈতন্য গোসাঞি বৈসে যাঁহার হৃদয়।।'

তৃতীয় ছেলে গোপালদাস। সেও বাল্যাবধি গৌরানুরাগী। অন্নপ্রাশনের সময় সজ্জিত সম্ভার না ধরে ধরেছিল গৌরাঙ্গচরণ।

সেও গিয়েছে নীলাচলে। গুণ্ডিচা-মন্দিরে প্রভুর সামনে হরি-হরি বলে নাচতে-নাচতে মূর্ছিত হয়ে পড়েছে। এ কী, এ যে কোনো সম্বিৎ নেই।

অদ্বৈত উদ্বিগ্ন হয়ে নৃসিংহমন্ত্র পড়তে লাগল। তার বোধহয় ধারণা হল গোপালের উপর ভূতাবেশ হয়েছে, তাই ভাবল নৃসিংহমন্ত্রে কাজ হবে। কোনো মন্ত্রেই কিছু হল না। অদ্বৈত তখন হাহাকার করে উঠল।

প্রভু এগিয়ে এলেন। গোপালের বুকের উপর তাঁর পদ্মহাতখানি রাখলেন। বললেন, হরি-হরি। গোপাল, এবার ওঠো।

স্পর্শে ও ধ্বনিতে গোপাল জেগে

উঠল। চারদিকে পড়ে গেল হরিধ্বনি। হরি তো শুধু হরণ করেন না, পূরণ করেন।

নীলাচলে কীর্তনের দলের মধ্যে এক শান্তিপুরের সম্প্রদায় আছে, তার মধ্যে নর্তক হচ্ছে অচ্যুত। অচ্যুত শুধু নৃত্যো-গানেই মত্ত নয় সে আবার তত্ত্বব্যাখ্যায় তৎপর। তার ব্যাখ্যায় স্বয়ং প্রভুই চমৎকৃত।

তোমার আবার চমৎকার কিসে? আমার সমস্ত ব্যাখ্যা তো তোমারই প্রসাদে।

সেই অচ্যুতের শৈশবে প্রভু একবার তাকে বলেছিলেন, অচ্যুত, আচার্য আমার বাপ আর সেই সম্পর্কে তুমি আমি দুই ভাই। অচ্যুত বলেছিল, দেবে তুমি জীবের বন্ধু, নইলে তোমার আবার বাপ কে?

তোমার আবার গুরু কে? তোমার আবার ব্যাখ্যাতা কোনজন?

প্রভুর তিরোধানের পর অচ্যুতানন্দ শান্তিপুরে ফিরে এল। নীলাচলের পথে নরোত্তম শান্তিপুরে এলে দেখল অচ্যুতকে। প্রভুবিচ্ছেদে কাতর, ম্লান মুখে বসে আছে। নরোত্তম তাকে প্রণাম করল। নরোত্তমকে বুকে জড়িয়ে ধরল, বললে, যাও নীলাচল-চন্দ্রকে গিয়ে দেখে এস। তোমাকে দিয়ে অনেক কাজ করিয়ে নিতে হবে।

তারপর নরোত্তমের খেতুরির মহোৎসবে যোগ দিল অচ্যুত। সেখানে মাতা জাহ্নবীকে নিয়ে এসেছিল বীরচন্দ্র। বৃন্দাবন যাচ্ছেন শুনে অচ্যুত এসেছিল বিদায় নিতে। বললে, আর হয়তো দেখা হবে না।

(ক্রমশঃ)

জানাতে পারেন

(প্রশ্ন)

(১) ভারতীয় রেলপথে প্রথম ডিজেল ইঞ্জিন চালু হয় কবে?

(২) জীবজগতের বিবর্তনবাদের উপর ভালো বাংলা বই-এর নাম কি? এবং প্রাপ্তিস্থানের ঠিকানা কি?

(৩) প্রথম বাংলা সাপ্তাহিক পত্রিকার নাম কি? এবং কবে প্রকাশিত হয়?

অমল সরকার
ও
সুদীপ্ত চোপরা
পাত্র (আসাম)

●

(ক) সিনে ক্লাব অফ ক্যালকাটার পুরো ঠিকানা কি? এই ক্লাবের সভ্য হওয়ার নিয়ম কি?

(খ) এই ক্লাব ছাড়া সিনেমা সংক্রান্ত আর কোন প্রতিষ্ঠান আছে কিনা জানতে পারলে উপকৃত হবো।

সুচিত দাস,
আমতা, হাওড়া।

●

(১) বিশ্বের শ্রেষ্ঠ যাদুকর কে? তিনি কি এখনো বেঁচে আছেন?

(২) কোন দেশের পোলটি বড়?

(৩) গ্যারিবল্ডির জীবনী জানতে চাই।

সুজিত বিশ্বাস,
ময়নাগুড়ি, জলপাইগুড়ি।

●

(১) ইংরেজী শর্টহ্যান্ড শেখার কোন মাসিক পত্রিকা আছে কি? থাকলে তার ঠিকানা জানতে চাই।

(২) "বাঙালকে হাইকোর্ট দেখানো" এই প্রবাদটির ইতিহাস জানতে চাই।

বিনয়কুমার কর,
ধূপগুড়ি, জলপাইগুড়ি।

●

১। রাশিয়া এবং চীনের সীমারেখা কত মাইল বিস্তৃত?

২। মধ্য এশিয়ায় ভারতীয় সভ্যতার নিদর্শন প্রথম কে আবিষ্কার করেন?

দেবপ্রসাদ মিত্র
উদয়রাজপুর
চব্বিশ পরগণা

●

১। সমাচার দর্পণ পত্রিকা কতদিন প্রকাশিত হয়েছিল?

২। বাঙলা দেশে সর্বাপেক্ষা দীর্ঘকাল ধারী পত্রিকা কোনটি?

ভবতোষ সান্যাল
হাওড়া

(উত্তর)

গত ৭ম বর্ষ, ১ম খণ্ড, ১১শ সংখ্যায় প্রকাশিত নৃপেন্দ্রকান্তি ঘোষ, কার্তিকচন্দ্র রায় ও পঞ্চানন প্রামাণিক-এর প্রশ্নের উত্তরে জানাই যে, (১) পদার্থ বিদ্যায় সকল আবিষ্কারকই বিশ্ববিখ্যাত বৈজ্ঞানিক, তবে দৈনন্দিন জীবনে বিজ্ঞানের যে সমস্ত জিনিস দেখি বা ব্যবহার করি, তাহাদের আবিষ্কারকর্তা ও আবিষ্কারগুলির নিম্নে উল্লেখ করলাম।

১। নিউটন—ল'জ্ অব্ ইউনিভার্সাল গ্র্যাভিটেশন্ (১৬৮৭)
ল'জ্ অব রিফ্রেক্টিং টেলিস্কোপ, (১৬৮৮)

২। ভোল্ট—ইলেক্‌ট্রিসিটি কারেন্ট এবং ইলেক্‌ট্রিক ব্যাটারি (১৮০০)

৩। রন্‌জেন—এক্স-রে (১৮৯৫)

৪। ফ্যারাডে—ইলেক্‌ট্রিক ডায়নামো (১৮৩১)

৫। টমসন্—ইলেক্‌ট্রোনস্ (১৮৯৭)

৬। মারকনী—রেডিও (১৮৯৫), ওয়্যারলেস, টেলিগ্রাফ (১৮৯৬)

৭। মাদাম কুরী—রেডিয়াম (১৮৯৯)

৮। রাদারফোর্ড—থিওরী অব্ এ্যাটমিক্ নিউক্লিয়স্ (১৯১১)
—নিউক্লিয়স্-এর অণুতে বিভক্তিকরণ (১৯১৮)

৯। এডমন্ড কার্টরাইট—যান্ত্রিক তাঁত (১৭৮৫)

১০। বোর—ইলেকট্রন থিওরী (১৯১৩)

১১। সি, ভি, রমন—ক্রিস্টাল ডায়নামিকস্ (১৯২৮)

১২। মোরস্—টেলিগ্রাফ (১৮৩৫)

১৩। স্টিফেনসন্—লোকোমটিভ ইঞ্জিন (১৮১৪)

১৪। ওয়াটসন ওয়াট—রাডার

১৫। সোলস্—টাইপরাইটার (১৮৫৮)

১৬। গ্রাহাম বেল্—টেলিফোন, ফটোফোন (১৮৭৬)

১৭। ফারেনহিট—মার্কারী থার্মোমিটার (১৭২০)

১৮। হুইট্‌লী—জেট প্রপালসন (১৯৩০)

১৯। গ্যালিলীও—টেলিস্কোপ (১৬০৮)

২০। এডিসন—বাল্ব (ইনক্যান্ডিসেন্ট) (১৮৭৮), ফোনোগ্রাফ (১৮৭৭), সিনেমাটোগ্রাফি (১৮৯৩)

২১। ডিজেল—ভারী অয়েল ইঞ্জিন (১৮৯৭)

২২। ডেইমলার—অটোমোবাইল (মটর) গাড়ী (১৮৮৫)

২৩। ক্যাক্সটন—আধুনিক ছাপাখানা যন্ত্রের আবিষ্কারক

২৪। বের্লিনার—মাইক্রোফোন, গ্রামফোন (১৮৭৭ এবং ১৮৮৭)

২৫। J L Baird—টেলিভিসন্ (১৯২৫)

২৬। আলেকজান্ডারসন—রেডিও ট্রান্সমিটার (১৯১৪)

২) ক্লোরোফরম-এর প্রধান কাজ অসাড় অসাড় করা। রোগীর অপারেশন-এর সময় রোগীকে ক্লোরোফরম-এর সাহায্যে অজ্ঞান করে (আজকাল অবশ্য যে অংশে অপারেশন হবে কেবলমাত্র সেই অংশই ক্লোরোফরম-এর সাহায্যে অসাড় করে করা হয়) অপারেশন করা হয়। যাতে রোগী অপারেশন-এর তীব্র যন্ত্রণা অনুভব করতে না পারে এবং অপারেশনও নিরাপদে সম্পন্ন করা যায়। স্যার জেমস্ হ্যারিসন্ এবং ইয়ং সিম্পসন নামক দুইজন বৈজ্ঞানিক এর আবিষ্কারক। 'ইথার' স্পিরিট জাতীয় এক প্রকার তরল পদার্থ। এবং জীবাণুনাশক। ইথারের কাজ অত্যন্ত সীমাবদ্ধ। ইন্‌জেকশন দেওয়ার আগে ইন্‌জেকশনের ছুঁচ ইথার দিয়ে পরিষ্কার করে নেওয়া হয় এবং ইন্‌জেকশন দেওয়ার আগে ও পরে অঙ্গের যে অংশে ইন্‌জেকশন দেওয়া হয় সেখানে একটু ইথার তুলোতে করে ঘষে দিলে যন্ত্রণা হয় না।

৪) লন্ডন শহরের সেন্ট উড রোড-এ অবস্থিত 'লর্ডস' মাঠ-ই বিশ্বের বিখ্যাত ক্রিকেট মাঠ। এই শহরের 'ওয়েম্বলি স্টেডিয়াম' বিশ্ববিখ্যাত ফুটবল মাঠ।

গত ১২শ সংখ্যায় প্রকাশিত প্রভাত মান্নার ২নং প্রশ্নের উত্তরে জানাই যে, ন্যাশানাল হাইওয়ে বা গ্রান্ডট্রাঙ্ক রোড ধরে হাঁটা পথে কলকাতা থেকে দিল্লী যাওয়া সম্ভব। ঐ একই সংখ্যায় সুরজিৎ রায়-এর ১নং প্রশ্নের উত্তরে জানাই যে, টাইপরাইটার আবিষ্কার করেন 'সোলস্' (১৮৫৮ সালে)। ক্যামেরা অবিষ্কার করেন L Daugerre এবং টেপ-রেকর্ডার আবিষ্কার করেন 'পুল্সেন'।

ঐ একই সংখ্যায় প্রকাশিত উমাপ্রসাদ সেনগুপ্তের ২নং প্রশ্নের উত্তরে জানাই যে, ইংলন্ডের 'ওয়েম্বলি' ফুটবল স্টেডিয়াম মাঠই পৃথিবীর বৃহত্তম ফুটবল ময়দান। ১নং প্রশ্নের উত্তরে জানাই যে, যতদূর জানা গেছে, 'ইংল্যান্ডেই প্রথম ফুটবল খেলা হয়।

অজয়কুমার সেন।
কোহিমা।
(নাগাল্যান্ড)

●

৭ম বর্ষ, ১২শ সংখ্যায় প্রকাশিত জয়ন্তী ঘোষের প্রশ্নের উত্তরে জানাই—

শব্দ	যে ভাষা থেকে বাঙলায় এসেছে	মূল শব্দ
কসাই	আরবী	কস্সাব
চিজ	ফার্সী	চীজ
খেতাব	আরবী	খিতাব
জঙ্গি	ফার্সী-মূলক	জঙ্গী
আসমান	ফার্সী	আসমান
জিলাপি	হিন্দী	জলেবী
কদ্দুস	হিন্দী	কদ্দুস

পাতিকাক—পণ্ডকাক থেকে এসেছে এবং নিখুঁত শব্দটি বাঙলা প্রয়োগ।

হরিচরণ মিত্র
লিপটন (ইণ্ডিয়া) লিমিটেড
[illegible], [illegible]-১

প্ল্যাটফরমের একটা গুলমোহর গাছের নীচে অন্যমনস্ক নিঃসঙ্গতায় চুপ করে দাঁড়িয়েছিল রতিনাথ। একটা হাতের আঙুলে চেপে-ধরা সিগারেটটা ধোঁয়া আর ছাই হয়ে ক্রমশ আপন আশ্রয়স্থলকে আক্রমণ করতে এগোচ্ছিল। আর একটা হাতের মুঠোয় ধরা একটা হলুদ কাগজ ক্রমশ ভিজে যাচ্ছিল ঘামে। যদিও সময়টা শীত-শেষের হিম-হিম গোধূলিবেলা, তবু কেমন একটা অস্থির উত্তেজনায় ঘামের সুস্পষ্ট চিহ্ন রতিনাথের নানান জায়গায় প্রকট হয়ে উঠেছিল।

এ-জায়গাটায় আগে কখনো নামেনি রতিনাথ। নামবার ইচ্ছেও তার হয়নি কখনো। এই লাইন দিয়ে তাকে মাসের মধ্যে অন্তত সাত-আটবার যাতায়াত করতে হয়। ট্রেনে যেতে যেতে কোনবার চোখে পড়েছে নামটা। কোনবার ব্যবসার নথিপত্রের তলায়, গভীর মনোযোগ আর সিগারেট-ধোঁয়ায় ভেসে হারিয়ে গেছে অনাবশ্যক অনেক হল্টেজের একটা হয়ে।

আশ্চর্য! রতিনাথ যেন শিহরিত হচ্ছিল। বাড়ি থেকে বের হবার আগে কি একবারের জন্যেও তার মনে হয়েছিল, একটুকরো কাগজ কুড়িয়ে এমন একটা বিচিত্র যোগাযোগের আসামী হয়ে যাবে সে? একটুকরো কাগজ ছাড়া কিই বা ছিল ওটা তার কাছে: অন্তত পকেটে রেখে দেবার পরে এবং এখানে পেঁাছে যাবার আগে পর্যন্তও ওটা একটুকরো হলুদ কাগজ ছাড়া আর অন্য কিছু ছিল না রতিনাথের কাছে।

একটু প্রান্তসীমায় তার বাড়ি। শহর ছাড়িয়ে বেশ খানিকটা দূরে। বাস-স্ট্যাণ্ডে পেঁাছতে হলে হাঁটতে হয় অনেকখানি। ঐ রাস্তার এক পাশের একটা কোণে পড়েছিল একটা চমৎকার শৌখিন মানিব্যাগ। ওতে যে টাকা ভরা নেই এ-বিশ্বাসে নিশ্চিন্ত ছিল রতিনাথ। তবু নিতান্ত কৌতূহল বশেই ব্যাগটা তুলে নিয়ে খুলে দেখেছিল সে। নানান কাগজপত্রের মধ্যে হলুদ, তুলোট কাগজে ছাপা একটা বিবাহের নিমন্ত্রণপত্রও ছিল। সেই নিমন্ত্রণপত্রের গায়ে কি এক নাম আর ঠিকানা লেখা ছিল। নামটা পড়তে না পারলেও ঠিকানাটা পড়তে পেরেছিল রতিনাথ। এবং বুঝেছিল ব্যাগের মালিক ভদ্রলোকেরই নিমন্ত্রণপত্র ওটা। হয়ত রতিনাথ ফেলে দিত সবটাই।

তবু ফেলতে গিয়ে কি মনে ভেবে কে জানে, প্রজাপতয়ে নমঃ-মার্কা হলুদ কাগজটা পকেটে রেখে দিয়ে বাকিটা যেখানের জিনিস সেখানে রেখে, মনে মনে সেই ব্যাগখোয়ানো ভদ্রলোকের প্রতি সহানুভূতি অনুভব করে বাস-স্ট্যাণ্ডে বাস ধরবার জন্য দ্রুত সে হেঁটে গিয়েছিল। নেহাতই খেয়াল। রতিনাথের মনে হয়েছিল, সে তো আজ যেখানে বিয়ে হচ্ছে সেই স্টেশনটার পাশ দিয়েই যাবে। যদি কেউ নামে তার কামরা থেকে তো তার হাতে নেমন্তন্নের চিঠিটা দিয়ে বলবে, এটা যদি আপনার বাড়ির কাছাকাছি কোন বিয়ে হয় তো বলবেন, এই নাম-ঠিকানার ভদ্রলোক পকেটমারা গিয়ে মুষড়ে পড়েছেন দারুণ। আসতে পারবেন না বোধহয় উনি।

একটু মজা করার নেশা। আর কিছু নয়। কল্পনাতেও একবার মনে হয়নি তার, ঐ অপরিচিত ঠিকানাপাঠ্য, বিবাহে আমন্ত্রিত ব্যক্তিরূপে নিতে হঠাৎ ব্যগ্র হয়ে উঠবে তার মন একটা ছোট্ট দুর্ঘটনার পরিপ্রেক্ষিতে।

সামান্যই ব্যাপার। এ-লাইনে প্রায়শ সংগঠিত একটি বিরক্তিকর দুর্ঘটনা। অবশ্য রেলের লাইনে ছাগল বা গরু কাটা পড়া যদি দুর্ঘটনা হয়। যে-ছাগল মারা যেত বিক্রি হয়ে কশাইখানায় বা যে-গরু কাটা না পড়লে মরত অনাহার আর অতিদোহনে, সেই পশুদের কর্তিত দেহ প্রত্যক্ষ করার উত্তেজনাটা কেন জানে না রতিনাথ, চাপতে পারে না এলাইনের কোন ট্রেন-ড্রাইভারই। লেভেল-ক্রসিংটা পেরুতে না পেরুতেই একটা গরুকে চাপা দিল ট্রেনটা। তারপরেই ট্রেন থামা। এবং পরবর্তী ঘটনা বিরাট বচসা।

রতিনাথের অভিজ্ঞতা—এটা চলবে ঘণ্টাখানেক।

জানলা দিয়ে উঁকি মেরে দেখেছিল রতিনাথ। স্টেশনটা একেবারে কাছেই। এভাবে চুপচাপ বসে থাকবার চাইতে একটু নেমে হেঁটে গিয়ে যদি এক কাপ চা খাওয়া যায় তো মন্দ হয় না। কথাটা মনে হতেই গলার মধ্যে তীব্র চাতকতৃষ্ণা অনুভব করেছিল রতিনাথ। তারপর আর কামরার মধ্যে বসে থাকেনি সে।

স্টেশনটার নামটা চোখে পড়তেই চমকে উঠেছিল রতিনাথ। মনে হয়েছিল, নামটা যেন তার খুব চেনা-চেনা। কোথায় যেন আজকেই সে পড়েছে নামটা। মনে আসতে দেরি হয়নি রতিনাথের পকেট থেকে চার ভাঁজ করা সকালের নেমন্তন্নের চিঠিটা বার করে প্ল্যাটফরমের ওপর উঠে ইংরাজি, বাংলা, হিন্দি—তিনটি ভাষাতে লেখা জায়গাটার নাম আর একবার মিলিয়ে নিয়েছিল। আর তারপরেই একটা সিগারেট ধরিয়ে কি এক অন্যমনস্ক চিন্তায় হাতের মুঠোয় কাগজটা ধরে নিজের সত্তা হারিয়ে ফেললো রতিনাথ।

স্টেশনের নাম, বিবাহের নেমন্তন্নের চিঠি আর ঘটনার অদ্ভুত যোগাযোগে রতিনাথ নিজের মনের মধ্যে একটা রহস্যের স্বাদ নেবার বাসনাকে অনুভব করেছিল। তার মনে হয়েছিল, ভালো-মন্দ কোন নেমন্তন্নই সে খায়নি বহুদিন। ভবিষ্যতে খাওয়ার আশাও নিতান্ত কম। আজ কি তবে সেই ভদ্রলোকের জায়গায় খাওয়াটা তারই পাওনা আছে? ঐ আকর্ষণে এবং একটি গ্রাম্য বিবাহ-রাত্রির অনুষ্ঠান দেখতেও বটে, রতিনাথ তার কনসান্সের সঙ্গে সংগ্রাম

করছিল। উচিত ও অনুচিত বোধের ধারাগুলো তার মানসিকতাকে সম্পূর্ণভাবে আচ্ছন্ন করে ফেলেছিল। তাছাড়া নিজের স্বার্থচিন্তাও ছিল।

গন্তব্যস্থলে পৌঁছনো রতিনাথের আজ একান্ত দরকার। কিছু টাকা দেবার আছে ব্যবসার ব্যাপারে একজনকে। না দিতে পারলে নিজের এবং সেই পার্টি—অসুবিধে হবে দুজনেরই। অবশেষে সেই হলুদ কাগজই জিতে গিয়েছিল। রতিনাথ সিদ্ধান্ত নিয়েছিল এই মত যে, ব্যবসার ব্যাপারটা তার ব্যক্তিগত লাভক্ষতির। অ্যাডভেঞ্চারের সুযোগ জীবনে যেহেতু প্রায় আসেই না, অতএব নেমন্তন্নর, নাম অপাঠ্য, ঠিকানাপাঠ্য ভদ্রলোক সাজতে তার কোন অপরাধ নেই।

এবার রতিনাথ তার জ্বলে জ্বলে প্রায় শেষ হয়ে আসা সিগারেটটায় একটা সুদীর্ঘ টান দিয়ে সেটাকে পায়ের তলায় পিষে স্টেশনটার বাইরে এসে দাঁড়ালো। বাইরে এসে একটু আশাহত হল রতিনাথ। অপরাধটা অবশ্য তারই। কেননা অভিজ্ঞতা থাকা সত্ত্বেও সে একটু রোমান্টিকতার স্পর্শ পেতে চেয়েছিল বাইরের পরিবেশটায়। গোটা-তিনেক চালাঘরের দোকান ও একটা বিরাট, বোধহয় অশ্বত্থ গাছই হবে—গাছের নিচে কিছু জটলা করা শীর্ণকায় মানুষ ছাড়া অন্য কিছু সে দেখতে পেল না। না—একটা গরুরগাড়ি পর্যন্ত নয়। চালাঘরগুলোর ভগ্নদশা।

একটাতে ফুলুরি-বেগুনির দোকান। ভয়ঙ্কর রকম তেলচিটে বিরাট বারকোশে গুলোর একটা ভগ্নাংশের গায়ে এখনো বড় বড় মাছিদের বক্তীয়ান জটলা। আর একটা চালাঘরের গায়ে ডাক্তারখানা। পরেরটাতে একপাশে পান-বিড়ি আর এক-পাশে মুদি-মসলার ভাগাভাগি সহাবস্থান। আবহাওয়াটা এই মুহূর্তে বিশ্রিরকম ভারি মনে হল রতিনাথের। তার খুব বিষন্ন লাগলো হঠাৎ নিজেকে। ঝোঁকের মাথায় কোন একটা কাজ করে ফেলবার পর যেমন বিভ্রান্তি জাগে মনে তেমনি একটা বিভ্রান্তি তার চেতনাকে আচ্ছন্ন করতে চাইছিল।

রতিনাথের মনে হচ্ছিল সে যেন ভুল করে কোন মৃত-নগরীর দুয়ারে এসে দাঁড়িয়েছে। তেমনিই যেন সমস্ত কিছু। শব্দহীন, বর্ণ-হীন, ছন্দহীন, স্পন্দনহীন। শুধু চাপ-চাপ জমাট নিথরতা।

রতিনাথ যে এ-ধরনের পরিবেশের সঙ্গে অপরিচিত তা নয়। বাঙলাদেশের সমস্ত জায়গা জুড়ে এই ভয়াবহ নিস্পন্দতাকে সে অনুভব করেছে অতীতে। ঠিক যেন মৃত্যুর আগের চৈতন্যলোপ অথবা বিরাট একটা ঝড় ওঠবার অবস্থা। আজ কিন্তু রতিনাথ একটু অন্য আবহাওয়াকে চেয়েছিল। মনের অ্যাডভেঞ্চার লোভের সঙ্গে সিনেমার দেখা উজ্জ্বল প্রাকৃতিক পরিবেশ।

রতিনাথ একটা বিরাট দীর্ঘ নিঃশ্বাস ফেললো।

তারপর পথের সন্ধান নিতে একটা দোকানঘরের দিকে এগিয়ে গেল। দোকানি তখন তার কারবাইডের আলোটা জেলে নেবার প্রচেষ্টায় রত ছিল। রতিনাথ ডাকলে, "শুনছেন...।" দোকানি ফিরে তাকালে। রতিনাথকে খদ্দের ভেবে এগিয়ে এসে এক-গাল হেসে বললে, "বলুন স্যার।"

কারবাইডের কটু গন্ধটা নাকে গিয়ে রতিনাথকে বেশ কষ্ট দিচ্ছিল। একটু সরে এসে সে বললো, "এ-গ্রামে কোথায় বিয়ে হচ্ছে বলতে পারেন?" পান-বিড়ি দোকানের মালিককে একটু ক্ষুন্ন দেখালো। বললে, "কার বাড়ি যাবেন আপনি স্যার?"

রতিনাথ পকেট থেকে নেমন্তন্নর চিঠিটা বার করে দেখে নিয়ে নিশ্চিন্ত হয়ে বললে, "যতীন সেনশর্মা। চেনেন নাকি তাঁকে?"

"খুব চিনি। যতীন কোবরেজকে এ-শর্মা চিনবে না? এ-গাঁয়ে কাকে না চেনে বলুন স্যার এই নেয়াপদ, বাড়ি বলুন, ঘরের সব হদিশ দিয়ে দেব। হাঁ—কোবরেজমশায়ের মেয়েরই বিয়ে আজ। বড় ভালো মেয়ে স্যার। একেবারে লক্ষ্মী পতিমা"...আরও কি যেন বলতে যাচ্ছিল সেই নেয়াপদ দোকানি। রতিনাথ বাধা দিলে। তার সময় কম লেকচার শোনার। রাত্রি নামছে ধীর পায়ে। শুধোলো, "কতদূর যেতে হবে বলতে পারেন?"

"সামান্যই স্যার। এই আধক্রোশটাকের বেশি হবে না।"

আধক্রোশ পথ সম্বন্ধে ঠিক আন্দাজ করতে পারল না রতিনাথ। সময় কতটা লাগবে তাতেই মাপা হতে পারে দূরত্বটা। শুধোলে ফের, "কতক্ষণ লাগবে আন্দাজ?"

"আমাদের তো স্যার আধঘণ্টাও লাগে না। আপনার..." বলে রতিনাথের জামাকাপড় আর চেহারার দিকে চেয়ে চুপ করে গেল নেয়াপদ দোকানি।

আর দাঁড়াল না রতিনাথ। যে রাস্তাটা সোজা চলে গেছে গাঁয়ের ভেতর, সেটা ধরে হাঁটা আরম্ভ করে দিল সে।

রাস্তায় নামতেই স্টেশনে ট্রেনের আওয়াজ কানে এলো রতিনাথের। পেছন ফিরে চেয়ে দেখলে তার ট্রেনটা স্টেশন পেরিয়ে চলে যাচ্ছে। সেদিকে চেয়ে সামান্য করুণ দেখালো রতিনাথকে। আধক্রোশ পথের শেষে বিয়েবাড়ির ম্যারাপ বাঁধা হয়েছে এমন একটা ধারণা থাকলে এই নেমন্তন্নর লোভটা আর অ্যাডভেঞ্চারের নেশাটা সে যে করেই হোক রুখত; কিন্তু এখন তো উপায় নেই কোন। রতিনাথ এগিয়ে চললে মেঠো পথ ধরে। অনেকটা হাঁটতে হবে। একঘণ্টাও হতে পারে।

একটা সিগারেট ধরাল রতিনাথ। অজানা পথে অচেনা যতীন কবিরাজের অনিমন্ত্রিত অথচ আমন্ত্রিত ব্যক্তিরূপের পোষাক চাপিয়ে দ্রুত সেই মেঠো পথ ধরে হেঁটে চললে সে। অপরিচিত যতীন কবিরাজের বাড়ি সাজা নিমন্ত্রিত অতিথি হবার বাসনায় যে উত্তেজনাটা একটু আগেও মানসিক সংঘাতের কারণ হয়েছিল, তা এখন প্রায় নির্বাপিত। সেই জায়গায় এক ধরনের চাপা কৌতুক-বোধকে অনুভব করছিল রতিনাথ। বাজি রেখে বিনা-নিমন্ত্রণে যে অতীতে বিবাহের ভোজ খেয়ে আসেনি সে তা নয়। কিন্তু তার থ্রিলটা ছিল অন্য। উদ্দেশ্যটাও নিতান্ত স্থূল। আজকে যেখানে চলেছে রতিনাথ, তার পেছনে তেমন কোন থ্রিল নেই। সে-বয়সটাও তো নেই এখন। এখন যা মন টানে তা রহস্য আর কৌতুক। কৌতূহলের ফ্রেমে সেটা বসে গেছে মনে চমৎকারভাবে।

ধরা পড়ার ভয় রতিনাথের হচ্ছিল না। সে জানে তাকে এ-বিষয়ে প্রশ্ন করেও কেউ কিছু ধরতে পারবে না। ব্যবসাদার মানুষ সে। অত সহজে ধরা পড়ার ভয় তার নেই। রতিনাথ শুধু একটা কথা ভাবছিল। হাতে একটা উপহার-টুপহার কিছু থাকলে হত। গাঁয়ের মানুষ। শহরের ভালো কিছু জিনিস পেলে এরা খুশি হয়। শহরকে এরা চিনলেও, ভাগ তার সামান্যই পায় এরা। যাকগে—মনে মনে ভাবলো রতিনাথ। বরং তাড়াতাড়ি চলে আসাতে শূন্য হাতেই আসতে হয়েছে। তার জন্য কিছু টাকা ধরে দিলে দোষ হবে না এমন কিছু।

রতিনাথের এ-কথাও মনে হচ্ছিল, যার নামে এই নেমন্তন্নর চিঠি তিনি যদি এসে পড়েন? নামটা অনেক চেষ্টাতেও পড়ে উঠতে পারেনি রতিনাথ। এমন বিশ্রী হাতে

লেখা। শুধু ঠিকানাটা তার মনে আছে।

অবশ্য এমনও কোন কথা নেই যে, তার কাছে কেউ নেমন্তন্নর চিঠিটা দেখতে চাইবে। বা জিগ্যেস করে বসবে নামধাম— *কোন পাক্কার লোক। তবে বিয়েটা যেহেতু শহরের নয় গ্রামের সেহেতু ঐসব প্রশ্ন যে* উঠতে পারে না এমন নয়। কারণ বস্তুটা তো ছোট। রতিনাথ হাঁটতে হাঁটতে ভাবো তকথার কথা বিবেচনা করে নিজেকে নিয়ে প্রোসপাল করে নিচ্ছিল। রতিনাথের একটুও ভয় করছিল না।

সিগারেটের গভীর টানে দম নিয়ে, নিয়ে গাঁয়ের মেঠোপথ ভেঙে সে ভেতরের দিক এগোচ্ছিল। তখন রাত্রি তার কালো ঘোমটায় পৃথিবীকে ঢেকে নিয়েছিল চুপ-সাড়ে। শীতশেষের পাতলা হিমেল বিষন্ন বাতাসে মাটি আর ফুলেদের মিশ্রিত সুবাস। মাথার ওপর আকাশের চাদরে ম্রিয়মাণ নক্ষত্রদের ছিটে। রাস্তার দু-পাশের নানা গাছে জোনাকদের আগুনে ফুলকি। ধানকাটা ন্যাড়া ক্ষেতগুলোর এবড়ো-খেবড়ো শুকনো চষা শরীর। সব মিলিয়ে কেমন যেন অদ্ভুত লাগছিল রতিনাথের।

অন্যমনস্ক পদচারণায় কতটা পথ হেঁটেছে খেয়াল ছিল না তার। খেয়াল হতে হাতের রেডিয়াম ডায়ালটা চোখের সামনে তুলে সময় মিলিয়ে দেখে একটু ভীত হল সে। হিসেব মত তার তো পৌঁছে যাবার কথা? অন্তত গাঁয়ের ভেতর তো বটেই।

রতিনাথ ভীত হয়ে ভাবলো তার দিগভ্রান্তি হয়নি তো? এমত অবস্থার যখন রীতিমত বিভ্রান্তি অনুভব করছিল সে তখন ঝড়ে পড়া জাহাজের নাবিকের তীর দেখতে পাওয়ার মত একজন মানুষকে সে দেখতে পেলে দূরে।

সারা পথে এই প্রথম একজন মানুষ চোখে পড়লো রতিনাথের। একটু জোর গলায় ডাকলে সে, "ও মশাই, শুনছেন?"

যাকে উদ্দেশ্য করে রতিনাথ তার এস ও এস পাঠালে, সেই মানুষটি থমকে দাঁড়ালো। হাতে তার টর্চ ছিল। যেটা সেই অন্ধকারেও মানুষটি জ্বালাবার প্রয়োজন বোধ করেনি। এবার তা জ্বলে উঠলো। জ্বলে উঠে লকলকিয়ে আছড়ে পড়লো রতিনাথের গায়। "আমায় বলছেন?" রতিনাথের সর্বাঙ্গে টর্চের আলো বুলিয়ে উল্টে প্রশ্ন করলো মানুষটি। তখুনি ফের তার প্রশ্ন সংশোধিত হল এবং স্বয়ংক্রিয় হয়ে "আমাকে ছাড়া আর কাকেই বা বলবেন। এখানে আর আছে কে। তা আপনি কি কলকেতা থেকে আসছেন?" কথা বলতে বলতে কাছে এসেছিল মানুষটি।

রতিনাথের এবার ভালোকরে দেখবার সুযোগ হল। বাংলাদেশের শতকরা নব্বুই-ভাগ গ্রাম্য প্রৌঢ় মানুষেরা যেমন হয় তেমনই। সাধারণ স্বাস্থ্য, টাকমাথা, মলিন চেহারার নির্জীব গোছের একটি মানুষ। রতিনাথ কলকাতায় নাম শুনে একটু সন্দিগ্ধ হয়েছিল।

"কেন বলুন তো?"

"যতীন কোবরেজের বাড়ি যাবেন তো?"

রতিনাথ ঢোক গিলেছিল। "হাঁ কিন্তু...।"

"তাই বলুন। আসুন আসুন। চলুন আমার সঙ্গে।" আগ্রহ আর উপছে পড়া আনন্দে ভদ্রলোকের গলার স্বর মিঠে শুনিয়েছিল। "আমিও তো ওখানে যাচ্ছি। আমায় বলছিল বটে যতীন, কার যেন আসবার কথা ছিল কলকেতা থেকে।"

রতিনাথ মনে মনে নিজেকে দায়ী করলো নেমন্তন্নর চিঠির ওপর নামটা উদ্ধার না করতে পারার জন্যে। কে জানে কি ব্যাপার। এক করতে আর এক না হয়ে যায় আবার। রতিনাথ বিবেচনা করলো অতঃপর এখন তার চুপ করে থেকে ভদ্রলোককে বলবার সুযোগ দেওয়া উচিত। এবং সেইমত সে ভদ্রলোকের পরবর্তী সংলাপগুলোর জন্যে অপেক্ষা করতে লাগলো। ভদ্রলোক পথ চলতে চলতে বকে চললেন আপনার মনে। "আপনার বোধহয় দিয়ে দুপুরের ট্রেনে আসবার কথা ছিল। যতীন ঘাবড়ে গেছে। বললাম, লগন তো সেই গিয়ে ভোর রাত্তিরে। তোমার অত ঘাবড়াবার কি আছে বাপু। আপনি গিয়ে আসবেনই এ আমি জানতুম। মানুষ হলে দায়িত্বজ্ঞান তার থাকবেই। বিশেষ করে বে-থার ব্যাপার। তা কোন ট্রেনটাতে এলেন?"

হঠাৎ কি মনেহল রতিনাথের। হালকা গলায় বললো। "ট্রেন? ট্রেনে তো আমি আসিনি?"

"তাহলে এলেন কিসে?" বিস্মিত ভদ্রলোক চমকে দাঁড়ালেন।

"ট্যাক্সিতে এলাম। ট্রেনের ব্যাপার। লেট হয় কি একদম চলোই না কে বলতে পারে? তাই ঐ ট্যাক্সি ধরেই চলে এলাম।" অম্লান বদনে অকারণ মিথ্যেটা উচ্চারণ করে গেল রতিনাথ।

"ট্যাকসিতে এলেন?" ভদ্রলোকের শ্বাস যেন রুদ্ধ হয়ে এলো। "ছি, ছি। একগাদা ভাড়া নিলে তো?" একটু হাসলো রতিনাথ। বললো, "বেশি আর কি। এই যা নেয়।"

ভদ্রলোক আর কোন কথা বলছিলেন না। বোধহয় থ হয়ে গিয়েছিলেন বিস্ময়ে।

খানিক চুপচাপ।

হাওয়ার সিরসিরানি। গাছের পাতাদের দোল খাওয়া। কোথায় যেন প্যাঁচা ডাকলো বিশ্রী সুরে। কে যেন গান গাইছিল। অনেক দূর থেকে ভেসে এলো বেসুরো পল্লীগীতির সুর। আকাশে ঝিমধরা তারাদের আপনমনে ফিসফিসানি। অনেকক্ষণ বাদে সেই ভদ্রলোকই প্রশ্ন করলেন ফের, "তা গিয়ে অনুবাবুর শরীর কেমন আছে?"

ধক করে উঠেছিল রতিনাথের বুকটা। জল নিচুর দিকে নামছে না তো? ঢোক গিলেছিল রতিনাথ। বললে, "মানে ভালোই আছেন।"

"এ্যাঁ? ভালো আছেন তবু এলেন না? আশ্চর্য তো। আসলে আসার কথা ছিল তো তাঁরই। হঠাৎ গিয়ে হার্ট এ্যাটাক্। একেবারে শয্যাশায়ী ছিলেন শুনেছিলাম?"

রতিনাথ দ্রুত সামলে নিলে নিজেকে। বললে, "ভালো মানে ঘোরাঘুরি নয়। আমি বলছিলাম ভালো মানে এখন ভালোর দিকেই।" একটু থেমেছিল রতিনাথ। তারপর গলা নামিয়ে বললে, "ব্যাপার কি বলুন তো? অনুবাবুকে দেখলাম খুব মুষড়ে পড়েছেন?"

রতিনাথ টিল ফেললে অন্ধকারে। আসন্ন ভবিষ্যৎটার জন্যে সব কিছু অর্থাৎ যতটুকু পারা যায় জেনে নেওয়া দরকার। ভদ্রলোককে চিনতে বিশেষ অসুবিধে হয়নি তার। ব্যবসায়ী মানুষ রতিনাথ। উনিশ বছরে মা মরেছিল। পৃথিবী আর পার্থিব দ্বিপদদের সম্বন্ধে তার প্রখর জ্ঞান জন্মে গিয়েছিল অনেক আগে থেকেই।

"বলেন কি? অনুবাবুর মন খারাপ হবে নাতো কার হবে? ভাইঝির বিয়ে। তিনি হলেন গিয়ে বড়মানুষ জ্যাঠা। বিয়েতে আসতে পারলেন না একি কম দুঃখু। আপনাকে আসতে হল তাই। অবশ্য নেমন্তন্ন আপনার তো ছিল?"

কিছু না বুঝেই ঘাড় নাড়লে রতিনাথ। বললে, "তা ছিল।"

"তাই আপনার জন্যেই, মানে গিয়ে আপনার ওপরই তো সব ভরসা নিয়ে বসে আছে যতীন। ধড়ে প্রাণ পাবে ও আপনাকে দেখলে।"

রতিনাথের প্রাণ কিন্তু তখন রীতিমত ধড়ফর শুরু করে দিয়েছিল। ভদ্রলোকের শেষ সংবাদটি রতিনাথের স্নায়ু-দৌর্বল্যের কারণ ঘটালে। তার তখন নিঃসন্দেহে মনে হচ্ছিল সে একটা ঘটনার সঙ্গে জড়িত হতে

চলেছে। যার থেকে নিস্তার পাবার আর কোন উপায় নেই। নিজের কৌতূহল আর নেমন্তন্ন খাবার লোভের শিকার নিজেই হয়ে বসে আছে রতিনাথ। আলিবাবার কাশেমের কথা মনে এসেছিল তার। শঙ্কিত কিছুটা বিহ্বল রতিনাথের মুখ দিয়ে আর কোন কথা সরছিল না। ঘুমের ঘোরের মধ্যে মানুষ যেমন কথা শুনতে পায় অথচ অর্থ ধরতে পারে না তেমনভাবেই শুনতে পেল রতিনাথ "এই যে, এসে গেছি এবার। দেখতে পাচ্ছেন?"

"হ্যাঁ!" রতিনাথ স্বপ্নের ঘোরে উত্তর দিলে যেন।

"ঐ তো, আলো দেখতে পাচ্ছেন না? ঐটেই তো বিয়ে বাড়ি।" জানান দিলেন ভদ্রলোক তার টর্চটা উঁচু করে ধরে।

রতিনাথ তার দু-চোখ মেলে বাড়িটাকে দেখছিল। বাড়িটার বিশালত্ব তাকে অবাক করে দিয়েছিল। তবু ঐ বিশাল বাড়ি আর বিবাহের আলোকসজ্জা তাকে একটা কথা যেন চাবুকের ঘা'এর মত তীব্র যন্ত্রণার সঙ্গে স্মরণ করিয়ে দিচ্ছিল। রতিনাথ অনুভব করতে পারছিল মৃত্যুর মত দারিদ্র্যও যেন সংজ্ঞাহীন অথচ নির্মম এক উপলব্ধি। যাকে বলে যতটা না বোঝানো যায় তার চেয়ে বেশি যায় নিঃসহ উপলব্ধির ওপর ছেড়ে দিলে।

এই তাহলে সেই যতীন সেনশর্মা নামে তার এখনও অপরিচিত পিতার বাড়ি যার কন্যা মণিমালার আজ ভোররাত্রির লগনে হতে চলেছে গোত্রান্তর? রতিনাথ মনে মনে কথা বললে নিজের সঙ্গে। সে তাকালো সামনের দিকে।

বিবর্ণ চাঁদোয়া তার জীর্ণ কানাতে ঘেরা একফালি মারাপ ঐ প্রাগৈতিহাসিক প্রাণীর বিশাল কংকালের মত বাড়িটার সঙ্গে অদ্ভুতভাবে মানিয়ে গিয়েছিল আর সব কিছুকে যেন ব্যঙ্গ করছিল ভেঙেপড়া সিংদরজার মত দরজার সামনে রাখা দুটি সদ্য কাটা কলাগাছ। কারবাইড ল্যাম্পের অসহ্য কুশ্রী আলোয় দুঃস্বপ্নের মত মনে হল রতিনাথের চারপাশের সমস্ত অস্তিত্বটাকেই। কল্পিত এক গ্রাম্যবিবাহের আমূল রোমান্টিকতাকে কেউ যেন গলা টিপে মারলো।

স্বপ্নভঙ্গ, বিষণ্ণ রতিনাথ একাই দাঁড়িয়েছিল। এমন সময় দেখতে পেল সে, তার পথনির্দেশকারী ভদ্রলোক কাকে যেন সঙ্গে করে আনছেন। ময়লা পাঞ্জাবি, কোঁচকানো খাটো ধুতি আর হন্তদন্ত হয়ে হাঁটার ভঙ্গিতে নিঃসন্দেহ হল রতিনাথ, প্রৌঢ় লোকটি আর কেউ নন যতীন কবরেজই। কলুর বলদ, ধোপার গাধা, আর বিবাহযোগ্যা কন্যার কর্তব্যপরায়ণ বিত্তহীন পিতা ছাড়া অমন করুণ, বিহ্বল, ক্লিষ্ট চেহারা অন্য কারুর হতে পারে না। ভেঙে পড়া ঐ বিরাট বাড়িটার সঙ্গে তার বর্তমান মালিকের একটা আশ্চর্য সাদৃশ্য দেখতে পেয়েছিল রতিনাথ। দু-জনেই যেন নিঃশব্দ অসহায়তায় ফিসফিস করে বলছে, আমরা হেরে গেছি—জীবনের যুদ্ধে হেরে গেছি দারুণভাবে।

বড় বড় চোখদুটিতে বিহ্বলতা—অপহৃত আভিজাত্যিক দেহে অকাল জরার গ্রাস—মাথার কোঁচকানো চুলে গভীর ফাটল—অতীতের ফর্সা রঙ এখন পীতবর্ণ। মানুষটি রতিনাথের সামনে এসে দাঁড়ালেন।

হাতজোড় করে বললেন, "আমার নাম যতীন কবরেজ। আপনাকে যে কি বলে ধন্যবাদ দেব বুঝতে পারছি না...।"

প্রতিবাদ জানাল রতিনাথ। "আমাকে ধন্যবাদ দিচ্ছেন কেন? এটা তো কর্তব্য আমার। আপনি ভালো আছেন? কোন গোলমাল হয়নি তো?"

যতীন কবরেজ অসীম কৃতজ্ঞতার ভঙ্গিতে মাথা নেড়েছিলেন। "না না সব ভালো। আপনি সোজা দাদার কাছ থেকেই আসছেন তো?"

মাথা নেড়েছিল রতিনাথ স্বীকৃতির ভঙ্গিতে।

"দাদা এখনো আছেন কেমন?"

দ্রুত উত্তর দিল রতিনাথ। ভঙ্গি তার সপ্রতিভ। "ঐ একরকম।"

"কি যে খারাপ লাগছে। দেখে আসব, তারও সময় পাচ্ছিনে।" বিষণ্ণ আক্ষেপে মথিত হয়ে উঠেছিল যতীন কবিরাজের কণ্ঠ। তারপর রতিনাথের প্রসঙ্গে ফিরে বললেন, "আপনার জন্যে লোক পাঠিয়েছিলাম ইস্টিশনে। তা সে গাড়িতে আপনি এলেন না দেখে, সত্যি বলতে কি একটু ভয়ই পেয়েছিলাম। শুনলাম আপনি ট্যাক্সি করে এসেছেন। অনর্থক কতগুলো খরচ হল আপনার। এ দুর্দিনের বাজারে বেকার অতগুলো টাকা কেন খরচা করতে গেলেন বলুন তো?'

অর্থহীন একটা মিথ্যে কথা বলার কৌতুকটা এবার ঘা হয়ে বেজেছিল রতিনাথের মনে। নিজেকে অকারণ মিথ্যে ভাষণের অপরাধী মনে হয়েছিল। সমস্ত ব্যাপারটাকে লঘু করে দেবার চেষ্টায় বলেছিল রতিনাথ, "শহরের মানুষ। লোভ সামলানো বড় শক্ত আমাদের। চেনাশোনা ছিল লোকটা। আসছিলও এদিকে। তা সে যাকগে, বুঝলেন গাঁয়ের পথ ধরে হাঁটতে ভারি ভালো লাগছিল। একটু টায়ার্ড হয়েছি নিশ্চয়ই তবে আনন্দ পেয়েছি যথেষ্ট।"

"তাইতো, তাইতো—" হঠাৎ যেন কি মনে পড়লো যতীন কবরেজের। ছি ছি ভুলেই গেছি একেবারে। বলে হাঁক পাড়লেন তিনি। "ওরে নন্দে, জল দে বাবুকে।"

রতিনাথের দিকে ফিরলেন এবার যতীন কবরেজমশায়। বললেন, "আসুন, ভেতরে আসুন শচীবাবু। বাইরে দাঁড়িয়েই বকবক করছি তখন থেকে।"

নিজের বর্তমান নামটা জানতে পেরে স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেললে রতিনাথ। বললে, "তাতে কি। আমি কি আর বাইরের লোক?"

"না—না, তা নয়, তা চান করবেন না হাত-মুখ ধুয়ে নেবেন?"

অন্যমনস্ক রতিনাথ জবাব দিলে, "হাত-মুখই ধোব।" রতিনাথ ভাবছিল তার পুরো নামটা কি হতে পারে? শচীপতি, শচীবিনোদ না শচীন্দ্র। শচী'র পর একটা কিছু হবে নিশ্চিত। অবশ্য তা নিয়ে মাথা ঘামাবার কিছু ছিল না রতিনাথের। নিছক কৌতূহল। আর এখন পর্যন্ত সব কিছুর পেছনে তো ঐ কৌতূহলটাই কাজ করছে।

রতিনাথ যতীন কবরেজের পেছন পেছন বাড়ির ভেতর এলো।

আগের দিনে জমিদার বাড়ি যেমন হয় এ বাড়িটা তাদের থেকে খুব বেশি পৃথক নয়। তবে উঁচু উঁচু থামগুলো এখনও

আশ্চর্য মজবুত। ধূমলোচনও কেল্ বাবু বড়।" রতিনাথকে নিয়ে যতীন কবরেজ যে ঘরটায় ঢুকলেন সেটা অপেক্ষাকৃত একটু ছোটই। তবে খোলামেলা বেশ। আলোর জন্য কেরোসিন তেলের অভাবে মোমবাতি জ্বালানো হয়েছে। সেই আলোয় তমিস্রার ভার দূর হয়নি পুরো। আসবাবপত্র সামান্যই। একটা চমৎকার সেকেলে আমলের হাতিমুখো পালঙ্কে বিছানা পাতা। এক কোণে রাখা ছোটমত আলনা। তার পাশেই একটা বিশাল আলমারি। আর এক কোণে রাখা ক'টা স্টীলের ট্রাঙ্ক। তাতে প্রাচীনদের ছাপ সুস্পষ্ট।

রতিনাথ দেখলো পালঙ্কের পাশেই রাখা রয়েছে একটা জলচৌকি। তার ওপর রাখা রয়েছে কাঁসার গেলাস চাপা ছোট্ট জলের কুঁজো।

দেয়ালে টাঙানো ক'টা ক্যালেণ্ডার ছাড়া আর যা কিছু দেখতে পেল রতিনাথ তা একটা ফ্রেমে আঁটা, কাপড়ের পাড়ের সুতোর আঁকা একটা কুকুরের মুখ। নিচে লেখা, কষ্ট করে পড়লো রতিনাথ—"ঈশ্বর সর্বত্র আছেন।"

রতিনাথের ক্লান্ত লাগছিল।

জল এলে জামা কাপড় না ছেড়েই হাত পা মুখ ধুয়ে ভিজে গামছা দিয়ে গায়ের যতটুকু মোছা যায় ততটুকু মুছে নিয়ে আরামের নিঃশ্বাস ফেললো। যতীন কবরেজ দাঁড়িয়েছিলেন। ধুতি তিনি দিতে চেয়েছিলেন। বলেছিলেন, "প্যাণ্টুলুন ছেড়ে কাপড় পড়ে নিলে আরাম পাবেন।" রাজি হয়নি রতিনাথ। আসলে তার প্যাণ্টটা পা ছাড়া করতে ইচ্ছে হয়নি। তাতে টাকা আছে অনেক। বলা যায় না, বিয়ে বাড়ির মওকা। গেলে তো তারই যাবে।

যতীন কবরেজ এবার বললেন, "এই আলোতে খুব কষ্ট হবে আপনার শচীবাবু। গাঁয়েভিতে কোথাও কেরোসিন পাবেন না আপনি। মোমবাতি, তাও কি ছাই পাওয়া যায়। বর্ধমান থেকে ছোটশালা নিয়ে এসেছে। তারপর মশা। উঃ, কি মশাটাই যে হয়েছে এবার।"

রতিনাথের কষ্ট হচ্ছিল না একটুও। শুধু একটু অনভ্যস্ত লাগছিল নিজেকে। হেসে বললে, "আমি তো আর বিলেত থেকে আসছি না। কলকাতা এর থেকে অনেক খারাপ জায়গা কবরেজমশায়।"

যতীন কবরেজের তা কানে গেল কিনা কে জানে। আপনমনে বলতে লাগলেন তিনি, "শাদামাটা লোক আপনি। কত বড় ব্যাপার ওখানে। লেখাপড়া শুনি আপনিই নাকি করাচ্ছেন এখন সব কিছুর। আপনার মত এত বড় শিক্ষিত মানুষের কতটুকু যত্নই বা আমি করতে পারব।"

রতিনাথ জানে এসব যা কিছু সব সেই শচীবাবুরই প্রাপ্য ছিল। তাঁর অবর্তমানে যে পাচ্ছে সেও ঐ রতিনাথ নয়, শচীবাবুই। তবু দারুণ কুণ্ঠা লাগছিল তার।

এড়াবার জন্যে বললে, "এক গেলাস জল খাওয়াতে পারেন কবরেজমশায়?"

"হাঁ, আসছি।" অপ্রকৃতিস্থ মানসিকতায় অন্যমনস্ক উত্তর এসেছিল যতীন কবরেজের। খাটের ওপর পা ঝুলিয়ে বসে একটা সিগারেট ধরালো রতিনাথ। আরাম করে এতক্ষণ বাদে ধোঁয়া ছাড়লে একমুখ। তার বিশ্রী লাগছিল। মনে হচ্ছিল সে যেন ঠকাচ্ছে যতীন কবরেজকে। আর সেই ভাবনাটা থেকে মুক্তি পাবার জন্যে তার উপস্থিতিটা সহ্য হচ্ছিল না রতিনাথের।

রতিনাথের চিন্তাটা নানান পথ দিয়ে এঁকেবেঁকে চলে যাচ্ছিল। তার মনে হচ্ছিল, অনুবাবুর পাঠানো আসল শচীবাবু যদি সত্যিই এসে পড়েন তাহলে কি হবে? এখনও কি চলে যায়নি শেষ মেচেদা লোকালটা? রতিনাথের তা জানা নেই। অবশ্য বাস্তবসম্মতভাবে দেখতে গেলে শচীবাবুর আসার সম্ভাবনা সামান্যই। মাসের শেষে যার পকেট মারা গেছে তার পক্ষে শোক সামলে বিয়ে বাড়ির আনন্দে যোগ দেওয়া রীতিমত অস্বাভাবিক ব্যাপার। বিশেষ করে নেমন্তন্নটা যখন প্রতিনিধিত্বের। অবশ্য শচীবাবু ভদ্রলোক তার মত ব্যবসাদার বা ব্যবসার সঙ্গে জড়িত কোন ব্যক্তিও হতে পারেন। তবু টাকার প্রসঙ্গটা ত একেবারে উড়িয়ে দেওয়া যায় না। ব্যবসাদারের পক্ষে টাকা মারা যাবার শোকটা আর পাঁচটা চাকরি করা মানুষের চাইতে বেশিই হয় বরং। আর আসেই যদি বা সেই শচীপতি।

রতিনাথ তো আর চুরি, ডাকাতি করতে আসেনি। গল্প বানাতে কষ্ট নেই কিছু।

ঈষৎ দুর্বল হয়ে পড়া মনটাতে একটু জোর পেয়েছিল রতিনাথ। সিগারেটে একটা দীর্ঘ টান দিয়ে ভাবনাগুলোকে বহির্গত ধোঁয়ার সঙ্গে বাতাসে ভাসিয়ে দিলে সে। ফিরে জানলা দিয়ে তাকাল বাইরের দিকে।

সামনের প্রায় কিছুই দৃশ্যমান নয়। শুধু জোনাকজ্বলা অন্ধকারের রহস্যময় অপার্থিবতা। আকাশটাকেও ভালো দেখা যাচ্ছে না। জানালার সামনে বিরাট একটা গাছ আড়াল করেছে সবকিছুকে। আপন মনের গভীরে তলিয়ে গিয়েছিল রতিনাথ, হঠাৎ চমক ভাঙলো তার। কানে এলো, "রাখ— এখানে রাখ। আসনটা পেতে দাও ভালো করে।"

রতিনাথ ফিরে তাকিয়েছিল। দেখেছেন যতীন কবরেজ শুধু জল আনেননি, এনেছেন লাল কস্তা পেড়ে শাড়ি পরা, মোটাসোটা, ছোটখাট চেহারার এক মহিলাকেও—যাঁর একহাতে থালা অন্য হাতে আসন। এবারেও চিনে নিতে ভুল হল না রতিনাথের, এঁরই মেয়ে মণিমালার আজ রাত্রের কোন এক লগ্নে ঘটবে গোত্রান্তর।

রতিনাথ ঠিক বুঝে উঠতে পারছিল না অতঃপর তার কি করা উচিত। রতিনাথকে কিছু করতে হল না। সেই ভদ্রমহিলাই বললেন, "তুমি আমার ছেলের বয়সী বাবা। তুমি বলছি, মনে কিছু নিও না। মা-মাসিরা তো আপনজনকে তুমিই বলে। খিদে পেয়ে গেছে তো খুব? তা তো পাবেই বাবা। সব শুনলাম ওনার মুখে। তা বাবা, বসো এখানে। আর কি সেদিন আছে। কি খাবে মানুষ—এখন সেইটেই ভাবনা। কি দিয়ে খাবে ভাবনা তো আলাদাই কথা। এসো বাবা, লজ্জার তো কিছু নেই। এটা ঘর বলেই মনে কর তুমি?" আশ্চর্য স্নিগ্ধ গলা যতীন কবরেজের স্ত্রীর।

রতিনাথের মনেও সেই স্নিগ্ধতার ছোঁয়া লাগলো। বললে, "আমাকে এত খাতির যত্নের কি আছে মাসিমা। আমি সত্যিই তো এই বাড়িরই লোক বলতে গেলে।"

"তা তো বটেই বাবা।" আসনটা ভালো করে পাততে পাততে বললেন যতীন কবরেজের স্ত্রী।

"তবু ঘরের ছেলেরই বা কি আদরযত্ন করতে পারি। ভগবান যে কি চান কে জানে।" দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেললেন তিনি। আক্ষেপের

প্রলম্বিত স্বীকারোক্তি। "তা বাবা, ঐ প্যান্টলুন পরেই খেতে বসবে?"

"তাতে কি। ও আমার অভ্যেস আছে। কিন্তু বলছিলাম কি, সকলে একসঙ্গে খেলে হত না?"

"না, না শচীবাবু, তার এখনও দেরি আছে। তা ছাড়া তেমন বন্দোবস্তও নেই।" এবার যতীন কবরেজ কথা বললেন। ব্যবস্থাটা ভালো না লাগলেও যেহেতু রতিনাথ যথেষ্ট ক্ষুধার্ত ছিল তাই আর সে কথা বাড়ালে না। পাতা আসনের ওপর ভালো করে বসলো গুছিয়ে।

খাওয়া-দাওয়ার ব্যাপারে রতিনাথ চিরদিনই সপ্রতিভ। খিদে পেটে অযথা লজ্জা করার অভ্যাস তার নেই। যতীন কবরেজের স্ত্রী থালা সাজিয়ে আরও দু-তিনটে জামবাটি নিয়ে এলেন।

রতিনাথের ভালো লাগছিল খুব। এতবড় পদ্মথালায় জামবাটি সাজিয়ে কে আর কবে তাকে খাইয়েছে। নিঃশব্দে খাচ্ছিল রতিনাথ। প্রত্যেকটি রান্নাই তার অনবদ্য লাগছিল। যতীন কবরেজের স্ত্রী—মণিমালার মা লাল পাড়ে বোনা খসখসের হাতপাখা দিয়ে বাতাস করছিলেন। এক কোণে তৃপ্ত চোখে দাঁড়িয়েছিলেন যতীন কবরেজ। বোধহয় কোন ফরমাসের প্রতীক্ষাতেই।

খাওয়া শেষ করে হাত ধুতে ধুতে রতিনাথ বললো একটা ছোটখাট ঢেঁকুর তুলে, "রান্নাগুলো অপূর্ব হয়েছিল মাসিমা। এত ভালো রান্না বহুদিন খাইনি।"

মণিমালার মা'র মুখটি ঘোমটার আড়ালে উজ্জ্বল হয়ে উঠলো। সে ঔজ্জ্বল্যের ছোঁয়া গলায় নামিয়ে বললেন, "তোমার ভালো লেগেছে বাবা? কি আর রান্না, সামান্যই তো। কিছু কি আর পাওয়া যায় বাবা। চালই নেই তার খাওয়া। ডাল নেই, দুধ নেই, মাছ নেই। মানুষের খাবার কিছুই নেই। তা এখানের মত মাছ তুমি কোথাও পাবে না। তাই না?"

ঘাড় নাড়লে রতিনাথ স্বীকৃতির ভঙ্গিতে। বললে, "চমৎকার রুই মাছ। তবে রান্নাটিই আসল।" মণিমালার মাকে আর কথা বাড়াতে দিলেন না যতীন কবরেজ।

বললেন, "এবার আপনি বিশ্রাম করুন শচীবাবু। লগন্ তো সেই ভোররাত্তিরে। তুলে দেব তখন আপনাকে।" বিশ্রামের প্রয়োজনকে অস্বীকার করতে পারলে না রতিনাথ।

হেসে বললে, "যা পেটে ঠেসেছি। খেতে খেতেই কেন ঘুম পাচ্ছিল।"

ওঁরা চলে গেলেন ঘর ছেড়ে ফের উঠিয়ে দেবার প্রতিশ্রুতি দিয়ে। রতিনাথ মৌজ করে সিগারেট ধরালে এবার। শচীবাবুর জন্যে যে স্পেশাল রান্না হয়েছিল তা সে থালা সাজানো দেখেই বুঝতে পেরেছিল। নাঃ, বেচারি শচীবাবু। পকেটমার তাকে একেবারে সবদিক দিয়ে মেরে গেল। সিগারেটে সুখটান দিতে দিতে মনে হল রতিনাথের। শচীবাবুর কথাটাই বারবার মনে আসছিল তার।

কোন কথা লেখা নেই। ধূসর, প্রাচীন পাতায় লেখা স্ট্রাগল-ফর-এক্‌জিসটেন্স।" রতিনাথ তার বুকের গভীরে একটা শূন্যতা অনুভব করলে। ঐসব প্রতিক্রিয়াশীল চিন্তাদের হাতে আত্মসমর্পণ করে একসময় কখন ঘুমিয়ে পড়েছিল রতিনাথ। টের পেল ঘুমটা ভেঙে যেতে।

"শচীবাবু... শচীবাবু।" ......যতীন কবরেজ ব্যস্তভাবে ডাকছিলেন।

চোখ মুছতে মুছতে উঠে বসলো রতিনাথ। শুধোলো "লগ্ন কি এসে গেছে?"

নিঃশব্দে খাচ্ছিল রতিনাথ

ক্লান্ত লাগলেও রতিনাথের ঘুম আসছিল না। বিছানায় হাত পা ছড়িয়ে শুয়ে এলোমেলো কত কিছুই ভাবছিল সে। আশ্চর্য। এখন তার কোথায় থাকার কথা ছিল, কোথায় সে শুয়ে আছে। মণিমালা—যার বিয়ের নেমন্তন্ন খাবার লোভেই এখানে এসে পড়েছে রতিনাথ—তার মুখটা কল্পনা করবার চেষ্টা করছিল সে। তার মনে হচ্ছিল, মণিমালা কি তার মায়ের মতই মমতাময়ী? স্নিগ্ধ দরদ মাখানো মনের অধিকারিণী? ভাবতে ভাবতে হঠাৎ যন্ত্রভাবে মনে হল রতিনাথের, তার জীবনটা বড় ব্যর্থ—বীভৎস অবয়বহীন কোন গ্রোটেস্ক যেন। একই নিয়মে অন্যের মত ঘুরে মরা শুধু। দুঃখ ছাড়া সে জীবনের পাতায় আর অন্য

"হাঁ......কিন্তু......।" যতীন কবরেজের গলাটা কাঁপছিল। কি যেন বলতে চেয়ে বলতে না পারার রুদ্ধ যন্ত্রণায় স্বর তাঁর বন্ধ হয়ে আসছিল। সেই তখনও ঘুমের মায়া লেগে থাকা চোখে যতীন কবরেজের মুখটা অদ্ভুত করুণ দেখালো রতিনাথের। বোকার মত—বিহ্বল কোন গৃহপালিত পশুর মত।

"কিন্তু কি যতীনবাবু?" মশারির ভেতর থেকে বাইরে বেরিয়ে এলো রতিনাথ।

"বরকর্তা বর ছাড়ছেন না।" কান্নালুব্ধ, বিপর্যস্ত, অসহায় গলায় বললেন যতীন কবিরাজ।

"কেন কিসের জন্যে?" ঘুমের শেষ আলসতাটুকু ছুঁড়ে ফেলে আহত যৌবন গর্জে উঠেছিল রতিনাথের।

যতীন কবরেজ খাটের একটা বাজু ধরে মাথা নিচু করে বললেন—আমুদে কেমন নীচ-

শচি বলে তেমনভাবে, "তখনই জানতাম ঐ হাজার টাকাটা ছাড়বে না বরের বাপ। আগে হাঁ না বলেনি কিছু। প্যাঁচ দিয়ে শেষমুহূর্তে আদায় করে নেবে বলেই হয়ত বলেনি কিছু। মানুষ তো নয়—পিশাচ। আমি জানতাম, একটা এমনকিছু ঘটবেই। তাই তো দাদাকে বলে রেখেছিলাম টাকাটা ধার দেবার জন্যে। এখানে পাঠিয়ে দেবার জন্যে লোক দিয়ে। তা আপনিই এলেন। দাদা তো আসতে পারলে না।"

রতিনাথ যেন 'থ' হয়ে গেল বিস্ময়ে।

বললে, "আমার হাত দিয়ে?"

"এ্যাঁ? দাদা টাকাটা দেয়নি আপনার হাতে?" শানিত আর্তনাদ করে সামনের জল-চৌকিটার ওপর বসে পড়লেন যতীন কবিরাজ। গেলাসঢাকা কুঁজোটা উল্টে পড়ে গেল। সেদিকে দৃষ্টি দেবার অবস্থা কারুরই ছিল না। রতিনাথের দৃশ্যটা চোখে পড়লো শুধু। তার তখন মণিমালার কথা মনে হচ্ছিল। যে মণিমালার আজ উষালগ্নে ঘটবে লোত্রান্তর—যার অপেক্ষায় চন্দন-চর্চিত, চীত-বিহ্বল হয়ে লাল চেলি পরে সে বসে আছে রাত জেগে। সে কি জানে মাত্র একহাজার টাকার জন্যে এই পৃথিবীরই মানুষ নামের কোন সভ্য প্রাণী তার সেই সমস্ত বিহ্বলতাকে ছিঁড়েখুঁড়ে ধর্ষিত করবার জন্যে পরমহংসের মত বসে আছে পিতা সেজে?

রতিনাথ তার কল্পনাতে নববধূর সাজে সজ্জিতা এক গ্রাম্য কুমারীকে দেখতে পেল স্পষ্ট। তারপর খানিকবাদে সহজ গলায় বললে, "টাকাটার কথা অনুবাবু তো কিছুই বললেন না আমায়। আশ্চর্য। এমন জানলে জেনেই নিয়ে আসতাম না হয় নিজের দায়িত্বে।"

"বলেনি? সত্যিই দেয়নি?" যতীন কবরেজকে কোন প্রাচীন মামির মত মনে হয়েছিল এবারে রতিনাথের। সে চুপ করে দেখতে লাগলো দৃশ্যটা।

"তাহলে......তাহলে কি আমার মেয়ের বিয়ে হবে না? মণি যে আমার লজ্জায় আর অপমানে আত্মহত্যা করবে শচীবাবু? মণির মা যে পাগল হয়ে যাবে শোকে?"

মণিমালা—ঐ অদেখা গ্রাম্য কুমারীর মন এতটা গভীর হতে পারে যে সে আঘাত পেলে আত্মহত্যা পর্যন্ত করতে পারে? আর তার মা? সেই ছোটখাট, মোটাসোটা মমতাময়ী ভদ্রমহিলা যিনি কথা বলেন আশ্চর্য স্নিগ্ধ-স্বরে—তাঁর শোকে পাগল হয়ে যাবার সম্ভাবনাটাকেই বা কি উড়িয়ে দিতে পারে রতিনাথ?

রতিনাথ জানে বাংলা দেশটা বয়সে যতটা এগিয়েছে মনে ততটা নয়। বার্ধক্যে যতটা নুইয়ে পড়েছে সভ্যতার উদারতায় ততটা নয়। রতিনাথ জানে আজও বাংলা দেশের বিবাহ-বাসরে বরেরা বর্বরতা দেখাতে কুণ্ঠিত হয় না। কত মণিমালার বুক সারাজীবনের জন্যে রক্তাক্ত হয়ে যায় লাল-চেলি গায়ে জড়ানোর অপরাধে। যাদের পিতারা ঐ যতীন কবরেজের মতই বিত্তহীন, সম্ভ্রম ঐশ্বর্যের ক্ষুধিত-পাষাণের চেতনাতপ্ত রক্ষক। মায়েরা মমতা-ময়ী, প্রতি সংলাপ উচ্চারণে যাঁদের মাতৃত্ব ঐশ্বর্যময়ী হয়ে ওঠে আরও। হঠাৎ হেসে উঠেছিল সে। যতীন কবরেজের কাছে এগিয়ে এসে বলেছিল, "ভয় পেয়ে গেছেন তো? ভয়ের কিছু নেই। একটু দেখছিলাম শুধু। টাকা অনুবাবু আমায় দিয়েছেন। বলেছিলেন, বনিবনা হয়েই যাবে বোধহয়। এখনও কি আর সে যুগ আছে। আমরা ক্রমশ মানুষ হচ্ছি, না বর্বর।" রতিনাথ তার প্যান্টের পকেট থেকে ব্যাগটা বার করেছিল। সেটা খুলে তার মধ্যে থেকে দশটা একশো টাকার নোট বার করে দিতে, দিতে বললে, "নিন, দিয়ে দিন বরের বাপকে।"

টাকা হাতে পেয়ে আর দাঁড়ালেন না যতীনবাবু। পাগলের মত উর্ধশ্বাসে ছুটলেন বোধহয় ছাঁদনাতলার উদ্দেশ্যেই। রতিনাথ তা দেখলো। তারপর একটুকরো হেসে ব্যাগটা ফের ভরে রাখলো পকেটের মধ্যে। টাকাটা তার ব্যবসার জন্যে রাখা ছিল। এক পার্টিকে ওটা দেবার জন্যেই তাকে আসতে হয়েছিল এ লাইন ধরে। সামান্য কিছু রয়ে গেল তা থেকে। যাকগে। ব্যবসার ব্যাপার। কথার খেলাপ কতবারই হয়। আবার তা মিটেও যায়। ক্ষতি হবে হয়ত তারই। তা হোকগে। মণিমালার তুলনায় তা কতটুকুই বা।

মণিমালা? ভারি মিষ্টি নাম ঐ মণি-মালা। ওর হয়ত আর বিয়েই হত না ঐ সামান্য কটা টাকার জন্যে। কান্না আর বন্দনার মিশে তাকে মৃত্যুর স্বাদ নিতে হত মৃত্যুর আগেই। একে একে সাজা বিয়ের সাজ ছিঁড়ে ফেলতে হোত অবসন্ন বেহুঁস চেতনায়। নিজে হাতে ঘষে, ঘষে তুলে ফেলতে হোত চন্দন আর কুমকুমের কারুকার্যগুলো। আর হতভাগা পিতাকে হয়ে যেতে হত জীবিত ফসিল। আশীর্বাদ প্রার্থিত মাকে অহল্যা।

না। ভালোই হয়েছে। মনে হয়েছিল রতি-নাথের। টাকাগুলো যে এত অপরূপ ভাবে সার্থক হবে একথা কি কল্পনাতেও মনে এসেছিল তার?

কখনো কি ভেবেছিল সে একটা কৌতূহল, হঠাৎ খেয়াল আর বিচিত্র ঘটনার যোগাযোগে সে গিয়ে পড়বে একটি কুমারী জীবনের নিশ্চিত ব্যর্থতা রোধায় সার্থক দূত হয়ে? প্রায় লুণ্ঠিত আশা, আকাঙ্ক্ষার স্বপ্নদের প্রতিশ্রুতি হিসেবে? শচীবাবু হয়ে—আর এক অদেখা, অচেনা মানুষের নামাবলী চাপিয়ে? রতিনাথ নিঃশ্বাস ফেললো।

নিজেকে কেমন যেন তার অদ্ভুত, অবিশ্বাস্য মানুষ বলে মনে হচ্ছিল। কুড়োনো খালি পার্স, হলুদ ভুলোটে ছাপা, উড়ন্ত প্রজাপতিমার্কা বিয়ের চিঠি, দুর্ঘটনায় ট্রেন থেমে যাওয়া, চায়ের চাতক পিপাসা—সব যেন কেমন শক্ত একটা অঙ্কের কষে ফেলা নিখুঁত উত্তরের সংখ্যা বলে মনে হচ্ছিল। ব্যবসাদার মানুষ রতিনাথ। ভাগ্যে এবং দুর্ভাগ্যে দুটোতেই তার সমান অবিশ্বাস। তবু সেই মুহূর্তে প্রগাঢ় বিশ্বাসে মনে হচ্ছিল রতিনাথের, পৃথিবীতে ঘটনাগুলো কারুর বিশ্বাস, অবিশ্বাসের পরোয়া করে ঘটে না।

জীবনে এত ভালো কাজে আর কখনো লাগেনি তার টাকা। আর হয়ত লাগবেও না। রতিনাথের কানে এলো শাঁখ বাজছে।

উলু দিচ্ছিল কারা জিভ আর তালুর অনবদ্য ব্যঞ্জনায়। বিয়েটা না দেখতে পেলেও তার সবটুকু ঐশ্বর্যের উল্লাস কানে আসছিল রতিনাথের। তাকে ডেকে নেবার কথা কারও মনে নেই। ওরা এখন ব্যস্ত। আস্তে, আস্তে বাইরে বেরিয়ে এলো রতিনাথ। বাঁ হাত তুলে রেডিয়াম ডায়ালটার ওপর চোখ রেখেছিল সে। একটু বাদেই ভোর হবে ঘড়ির সময়মত। এই সময় বোধহয় ফেরার একটা ট্রেন আছে—ঘণ্টা-খানেক বাদেই বা তার কাছাকাছি সময়ে।

রতিনাথ অন্ধকারের আবছা গায়ে মেখে বাড়ির বাইরে এলো দেউড়ি পার হয়ে। যেতে, যেতে পেছন ফিরে তাকালে একবার। শেষ-বারের মত দেখলে সেই বাড়িটাকে। যেটার কোন একঘরে সে দান করে এসেছে একটু আগে একটি কুমারী মেয়ের জীবনের ধর্ষিত হতে চলা ভবিষ্যৎকে। যার নাম মণিমালা—যার মা অসীম মমতায় আক্ষেপ করে বলেন, "কি আর তোমায় খাওয়াতে পারলাম বাবা......" নাঃ। তাকে আর দেখা হল না রতিনাথের।

পৃথিবীটায় তখন ভোর হচ্ছিল। এখানে, ওখানের অন্ধকারেরা দ্রুত অপসৃত হচ্ছিল। সেই হিম, হিম ভোর-পৃথিবীর মেঠো পথ দিয়ে হাঁটতে হাঁটতে রতিনাথের বার, বার কেমন জানি মনে হচ্ছিল, সে যেন কি একটা ছবি দেখতে পাচ্ছে এই ভোর, ভোর গ্রাম্য পৃথিবীর নক্সায় আর আশ্চর্য মিল।

আজকের মিশর

দেবব্রত মিত্র

ফিল্ডমার্শাল আব্দেল হাকিম আমের এবং প্রধানমন্ত্রী গামাল আব্দাল নাসের সুদীর্ঘকালের বন্ধু। সংযুক্ত আরব সাধারণতন্ত্রের এই দুই কর্ণধার তাঁদের জীবনে অসামান্য জনপ্রিয়তা অর্জন করেছেন। সম্প্রতি কায়রোয় আমের আত্মহত্যা করেছেন। সর্বজনপ্রিয় এই সমরনায়কের পরলোকগমনের পর আরব সাধারণতন্ত্রের রাজনৈতিক পরিস্থিতি কেমন জটিল চেহারা নিয়েছে। সাম্প্রতিক বিপর্যয়ের পর প্রেসিডেন্ট নাসেরের পদত্যাগ এবং জনগণের দাবীতে তাঁর প্রত্যাবর্তন পর্যন্ত চেহারাটা পরিষ্কার ছিল। আমের সন্দেহ করেছিলেন বিপর্যয়ের সমস্ত দায়িত্ব হয়ত তাঁর ওপর পড়তে পারে। বিশেষ করে বহু উচ্চপদস্থ সমরনায়কদের সংগে যখন তাঁকেও গ্রেপ্তার করা হয়, তখন তাঁর পক্ষে সমস্ত পরিবেশটা ভয়ংকর হয়ে উঠে। একটি গোপন ষড়যন্ত্রও ঠিক এই সময়ে ফাঁস হয়ে যায়। আমের প্রথম আত্মহত্যার চেষ্টা করে ব্যর্থ হন। কিন্তু দ্বিতীয়বার সফল হয় তিনি সমস্ত দায়-দায়িত্ব থেকে নিজেকে মুক্ত করে নিলেন।

১৯৫২ খৃঃ মিশরে রাজতন্ত্র উচ্ছেদ হয়। তারপর থেকে এই ক্ষুদ্র দেশটিকে নানান প্রতিকূল অবস্থার সঙ্গে লড়তে হচ্ছে। আভ্যন্তরীণ গোলযোগ এবং বাইরের চাপ প্রতিরোধ করে প্রেসিডেন্ট নাসের তাঁর দেশ গঠন করবার জন্য অপ্রাণ-চেষ্টা করে চলেছেন। তিনটি বৃহত্তর সংঘর্ষে তাঁকে বিব্রত হতে হয়েছে। দেশের বৃহৎ স্বার্থান্বেষী গোষ্ঠী এবং কম্যুনিস্টদের সঙ্গে তাঁকে মোকাবিলা করতে হয়েছে স্বল্প শক্তি নিয়ে। অন্তরঙ্গ সুহৃদের সহযোগিতায় এবং দেশের সাধারণ মানুষের আন্তরিক সমর্থনে যে ক্ষমতা নাসের পেয়েছেন, তা আজ এক বিরাট পরীক্ষার সম্মুখীন।

এই অবস্থায় গামাল আবদুল নাসের কিভাবে ক্ষমতায় এলেন এবং তাঁর কর্মপদ্ধতি কোন পথে পরিচালিত হোয়েছে তা সংক্ষেপে তুলে ধরা হোল।

রাজা ফারুকের নিদারুণ দুর্নীতিগ্রস্ত শাসনব্যবস্থা, প্রশাসনিক ক্ষেত্রে তাঁর যথেচ্ছ স্বৈরাচার আর ব্যক্তিজীবনে কল্পনাতীত অনাচার দেশের মানুষের কাছে যে দুর্বিষহ হয়ে উঠেছিল, সেসব কথা সকলেরই জানা। তাই ১৯৫২ সালের ২৩ জুলাই তারিখে যখন মিশরীয় সেনাবাহিনীর একদল তরুণ অফিসার ক্ষমতা দখল করে বিপ্লবী পরিষদ গঠন করে দেশের শাসনভার হাতে নিলেন, তখন তা জনসাধারণের কাছ থেকে বিপুল সমর্থন পায়। এই বিপ্লবী পরিষদে যাঁরা ছিলেন, তাঁদের ব্যক্তিজীবনের পটভূমি বিভিন্ন ধরনের। যেমন, গামাল আবদুল নাসের এক-জন ডাক-কর্মচারীর ছেলে; আবদুল হাকিম আমের এবং আনওয়ার সাদাৎ কৃষকের সন্তান; আলি সাব্রি প্রভৃতি কয়েকজন ধনী-ঘরের সন্তান। এরা সকলেই ছিলেন দেশ-প্রেমে উদ্বুদ্ধ, শোষণ থেকে দেশকে মুক্ত করার প্রতিজ্ঞায় ঐক্যবদ্ধ।

ব্রিটিশ শক্তির অসহনীয় ঔপনিবেশিক শোষণ, সামন্ততন্ত্রের দুর্বিষহ বোঝা, জমিদারদের পার্টিগুলির (ওয়াফদ, সাদী, লিবারল-ন্যাশনালিস্ট ইত্যাদি) ভাঁড়ামি এবং ব্রিটিশদের আর রাজপরিবারের সংগে তাদের স্বার্থের সংযোগ দেশকে সর্বদিক থেকে এক ভয়ংকর সর্বনাশের গহবরে ক্রমেই ঠেলে দিচ্ছিল। সরকারী কর্মচারীদের মধ্যে দুর্নীতির সীমা ছিল না। সমস্ত রাষ্ট্রশক্তি হয়ে পড়েছিল অনাচার অত্যাচার আর অবিবেকী কার্যকলাপের কেন্দ্র। ফারুকের বিতাড়ন-পর্ব আর বিপ্লবী পরিষদ কর্তৃক ক্ষমতাদখল প্রকৃতপক্ষে বিনারক্তপাতেই ঘটেছিল। এই বিপ্লবী পরিষদ খুব গোপনে নিজেদের সংগঠিত করে। প্রথমে তাদের সদস্যসংখ্যা ছিল এক হাজারের মত।

বিপ্লবী পরিষদের কর্মসূচী প্রথম দিকে ছিল খুবই অস্পষ্ট। তাদের মূল লক্ষ্য ছিল ফারুককে অপসারিত করে দেশে গণতান্ত্রিক শাসনব্যবস্থা প্রতিষ্ঠা, ঔপনিবেশিক শোষণ থেকে জনগণকে মুক্ত করে জাতীয় অর্থনীতির ভিত্তি প্রতিষ্ঠা করা। এই লক্ষ্য সাধনে যে তাঁদের প্রতি দেশের সাধারণ মানুষের পূর্ণ সমর্থন আছে, তা তাঁরা বুঝেছিলেন এবং কর্তব্য নির্ধারণে অগ্রসর হলেন।

ক্ষমতাদখলের পর এই বিপ্লবী সরকার প্রথমেই যেসব ব্যবস্থা অবলম্বন করলেন, সেগুলির মধ্যে প্রধান হল লক্ষ লক্ষ একর জমির মালিক জমিদারদের একটি সীমাবদ্ধ পরিমাণের অতিরিক্ত সমস্ত জমি বাজেয়াপ্ত করে গরীব কৃষকদের মধ্যে বন্টন করে দেওয়া—যেটাকে জনসাধারণ বিপুলভাবে স্বাগত জানায়। এই ব্যবস্থা অবলম্বন করতে গিয়ে ভয়ংকর প্রতিকূলতার মুখোমুখি হতে হয়েছিল নতুন সরকারকে।

নতুন সরকারের প্রাথমিক প্রয়োজনগুলি সর্বতোভাবে পরিচালিত হয় বিদেশী শোষণ আর দেশীয় সমস্ত প্রথা থেকে জাতীয় অর্থনীতিকে, দুর্নীতিগ্রস্ত অফিসার আর সমাজদ্রোহীদের কবল থেকে দেশের মানুষকে মুক্ত করার লক্ষ্যে। উপনিবেশ-জীবীদের বিরুদ্ধে সংগ্রামে সমস্ত আরব জাতিকে, আফ্রিকেয় জাতিকে ও মুসলমান-দের ঐক্যবদ্ধ হবার জন্যে তাঁরা আহবান জানান। সৈয়দ আর সুয়েজ বন্দরে মোতায়েন ব্রিটিশ ফৌজের বিরুদ্ধে একদিকে কূটনৈতিক অভিযান আর অন্যদিকে গেরিলা যুদ্ধ ১৯৫৪ সালে শুরু হয়—যার ফলে শেষ পর্যন্ত ব্রিটিশদের মিশর ছেড়ে চলে যেতে হয়।—এটা একটা বিরাট সাফল্য। কিন্তু আরও কঠিন সংগ্রাম মিশরীয়দের চালাতে হয়েছে বৃহৎ শক্তি-গুলির বিরুদ্ধে।

যে কোনো স্বাধীন দেশের মতোই, স্বাধীন মিশরেরও ব্রিটিশ তত্ত্বাবধান থেকে সেনাবাহিনীকে মুক্ত করার প্রয়োজন দেখা দেয় সর্বাগ্রে। মার্কিনরা মিশরকে অস্ত্রশস্ত্র বিক্রয় করতে রাজি হয় একমাত্র এই শর্তে যে তাকে 'মধ্য-প্রাচ্য-চুক্তি'তে (পরবর্তীকালে "বাগদাদ চুক্তি") যোগদান করতে হবে। ফ্রান্স দাবি করে যে অস্ত্রশস্ত্রের জন্যে চড়া দাম তো দিতেই হবে, সেই সঙ্গে উত্তর আফ্রিকায় ফরাসী উপনিবেশগুলির বিরুদ্ধে মিশর কোনরকমে প্ররোচনা চালাবে না, এমন কি কোন কথাও বলতে পারবে না। —এই সব দাবির প্রতি কর্ণপাত না করে নাসের চেকো-স্লোভিয়ার কাছ থেকে অস্ত্র কেনার এক চুক্তি করেন ১৯৫৪ সালের ফেব্রুয়ারী মাসে। তারপর নাসের সরকারকে এক নিদারুণ সংকটে পড়তে হয়।

এর পরের মাসেই মিশর সরকার ছয় দফা এক কর্মসূচী পেশ করেন : (১) দেশ থেকে সাম্রাজ্যবাদকে ও তার সমর্থকদের সম্পূর্ণরূপে উৎখাত করা; (২) সব রকমের সামন্ত প্রথার উচ্ছেদ সাধন; (৩) একচেটে সংস্থাগুলির আধিপত্যর অবসান ঘটানো; (৪) সামাজিক ন্যায়বিচার ও সকলের জন্যে একই আইন-কানুন প্রবর্তন; (৫) শক্তি-শালী এক জাতীয় সেনাবাহিনী গড়ে তোলা; এবং (৬) দেশের জীবনে গণতান্ত্রিক নীতি-গুলিকে সুপ্রতিষ্ঠিত করা।

মিশরের বিপ্লবের সাম্রাজ্যবাদবিরোধী প্রবণতাটুকু গোড়া থেকেই সুস্পষ্ট ছিল। অস্ত্রক্রয়ের ব্যাপারে যে অভিজ্ঞতা হয়েছিল, সেইটেই আরও তিক্তভাবে মিশরীয়েরা উপলব্ধি করেন আসোয়ান বাঁধ নির্মাণের ঘটনাকে কেন্দ্র করে। এই আসোয়ান বাঁধ যে শুধু মিশরের প্রায় ১৫ লক্ষ একর জমিকেই সুফলা করে তুলবে তাই নয়, বিপুল পরিমাণে বিজলী উৎপাদন করে মিশরের শ্রমশিল্পেও বিরাট অগ্রগতি ঘটাবে। এর জন্য ১৯৫৪ সাল থেকেই মিশর পশ্চিমী শক্তি-গুলির সংগে ঋণ পাওয়ার জন্যে কথাবার্তা চালাচ্ছিল। কিন্তু সুদের খুব চড়া হার ছাড়াও মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ও ব্রিটেন সেই ঋণ দানের বদলে বাস্তবিক পক্ষে মিশরের পররাষ্ট্রনীতিকে আর তার অর্থনীতিকে নিয়ন্ত্রণ করার সুবিধা দাবি করে।

অনেক টালবাহনার পর ১৯৫৬ সালের জানুয়ারি মাসে, আসোয়ান বাঁধের জন্য ইন্টারন্যাশনাল ব্যাঙ্ক ২০ কোটি ডলার ঋণ দিতে রাজি হয় এবং ব্রিটেন ও মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র আরও ৭ কোটি ডলার ঋণ দিতে 'নীতিগতভাবে সম্মত' হয়। কিন্তু সকলেই জানেন, কয়েক মাস বাদেই এই দুই দেশ ওই ঋণ দিতে সরাসরি অস্বীকার করে বসে।

মিশরীয়রা আসোয়ান বাঁধ সম্পর্কে ইঙ্গ-মার্কিন ঘোষণার উত্তর দিল সুয়েজ-খালকে রাষ্ট্রায়ত্ত করে নয়ে—যে ঘটনাটি উপনিবেশবাদের বিশ্ব-অর্থনীতিক ভিত্তির মূলে এক প্রচণ্ড আঘাত হানে। এর প্রতিশোধ নেবার জন্য তিন মাস বাদে (অকটোবর, ১৯৫৬) মিশরের ওপরে মার্কিন-পৃষ্ঠ-পোষিত ইঙ্গ-ফরাসী ইসরায়েলী আক্রমণ চলে এবং সে ক্ষেত্রেও উপনিবেশজীবী এই শক্তিগুলিকে আরেকটি অপমানজনক পরাজয় বরণ করতে হয়।

খালের সম্পূর্ণ কর্তৃত্ব গ্রহণ করেই সংযুক্ত আরব সাধারণতন্ত্র তার আধুনিকীকরণ ও আরো সুপরিকল্পিত ব্যবহারের উদ্যোগ গ্রহণ করে। দুই দিকে জাহাজ চলাচল এবং বহু টন ভারী জাহাজের উপযোগী করে খালকে আরো গভীর করার পরিকল্পনা রচিত হয়। জাতীয়করণের পর প্রথম দশ বছরে সংযুক্ত আরব সাধারণতন্ত্র সরকার খালের উন্নতিকল্পে যে অর্থব্যয় করেন তার পরিমাণ পূর্ববর্তী ৮৭ বছর ধরে সুয়েজখাল কোম্পানী যে অর্থ ব্যয় করেছে তার পরিমাণের তিন গুণ।

পশ্চিমী বিশেষজ্ঞদের অশুভ ভবিষ্যদ্‌বাণী মিথ্যা প্রমাণ করে খালটি আগের চেয়ে অনেক ভালোভাবে কাজ করে। ১৯৫৫ সালে ১৪,৭০০ জাহাজ খাল পার হয়, ১৯৬০-এ ১৮,৭০০ জাহাজ, ১৯৬৫ সালে ২১,২০০ জাহাজ খাল পার হয়। ১৯৬০-এ ৫০০ কোটি মিশরীয় পাউণ্ডের জায়গায় ১৯৬৬ সালে ৯ কোটি ৫০ লক্ষ মাশুল পাওয়া যায়। সুয়েজখালই দেশের বৈদেশিক মুদ্রা উপার্জনের অন্যতম প্রধান উৎস। এই উপার্জনের ওপর দেশের অর্থনৈতিক পরিকল্পনা নির্ভরশীল।

এই ঘটনার মধ্যে দিয়ে বিশ্ব-উপনিবেশবাদ যে প্রচণ্ড মার খায়, তার ফলে মিশরের আভ্যন্তরীণ অর্থনীতি ক্ষেত্রেও বড়ো রকম পরিবর্তন ঘটে। দেশের ভেতরে প্রতিক্রিয়াশীল শক্তি ও ব্রিটিশের ওপর নির্ভরশীল শক্তি দুর্বল হয়ে পড়ে। মিশর সরকার ব্রিটিশ ও ফরাসী ব্যবসায় প্রতিষ্ঠানগুলিকে এবং যেসব মিশরীয় প্রতিষ্ঠানে তাদের ১০ শতাংশের বেশি পুঁজির অংশ আছে তাদের বাজেয়াপ্ত করলেন। যার ফলে মিশরের ব্যবসায়রত সমস্ত জয়েন্ট স্টক কোম্পানীগুলির মোট পুঁজির এক-পঞ্চমাংশেরও বেশি রাষ্ট্রের আয়ত্তে এল। তেল, তৈলজাত পণ্য, তুলো ইত্যাদি বিদেশী নিয়ন্ত্রণ থেকে মুক্তি পেল। সেই সঙ্গে যেসব মিশরীয় সংস্থার উৎপাদন দেশের প্রতিরক্ষার পক্ষে গুরুত্বপূর্ণ, সেগুলিকে বিশেষ সামরিক নিয়ন্ত্রণাধীনে আনা হল।

মিশরের বিপ্লবের চরিত্রটা ছিল গোড়ার দিকে রাজনৈতিক জাতীয় ধরণের। শীঘ্রই সেটা এক সামাজিক বিপ্লবাত্মক চরিত্র অর্জন করে এবং সেটা আরও গভীর সুদূরপ্রসারী হয়ে ওঠে।

সুয়েজের পরে, মিশর সরকার দেশের অর্থনীতিকে বিদেশী নিয়ন্ত্রণমুক্ত ক'রে, তথাকথিত "মিশরীকরণ"এর যে কার্যসূচী নিয়েছিলেন (১৯৫৭-৫৯), তা সাময়িকভাবে দেশী পুঁজিপতিদের উল্লসিত করেছিল। তারা ভেবেছিল যে এবারে তারা বিদেশী পুঁজিবাদীদের স্থান দখল করবে এবং মিশরে ধনতন্ত্রের সমৃদ্ধি ঘটবে। কিন্তু তাদের সে আশায় ছাই পড়তে বেশি দেরি হয়নি।

এর পরেই, মিশরের বিপ্লবে খুব একটা জটিল অবস্থা দেখা দেয়। সিরিয়ার সঙ্গে যুক্ত হয়ে একটি রাষ্ট্র গঠনের (সংযুক্ত আরব সাধারণতন্ত্র, ফেব্রুয়ারি ১৯৫৮ সেপ্টেবর ১৯৬১) ব্যর্থতা এবং সোভিয়েত যুক্তরাষ্ট্রের সঙ্গে সম্পর্কের অবনতির দ্বারা এই অধ্যায়টি চিহ্নিত। কিন্তু খুব শীঘ্রই সেই কালো মেঘ কেটে যায়।

১৯৬১ সালের সেপ্টেম্বর মাসে এক ডিক্রি জারি করে মিশরীয় বৃহৎ মালিকদের অধীন সমস্ত শ্রমশিল্প প্রতিষ্ঠানকে ও অন্যান্য ব্যবসায়-সংস্থাকে রাষ্ট্রায়ত্ত করা হোল। তারপর ১৯৬২ ও ১৯৬৩ সালে পর পর কতকগুলি ডিক্রি জারি ক'রে সমস্ত ব্যক্তিগত মালিকানাধীন ব্যাংক, জীবন বীমা সংস্থা, বড়ো ও মাঝারি দোকান ও ডিপার্টমেন্ট স্টোর ইত্যাদিকে জাতীয় মালিকানাধীনে আনা হয়। কৃষি প্রগতিতে এক বিরাট পদক্ষেপ হল দ্বিতীয় ভূমি সংস্কার আইনটি—যে আইনবলে জমিদারী প্রথার সম্পূর্ণ বিলোপ ঘটানো হল। ১৯৬৪ সালের মার্চ মাসে গৃহীত মিশরের নতুন সংবিধানে এক পূর্ণ বিকশিত সমাজতান্ত্রিক সমাজ প্রতিষ্ঠানকেই দেশের ও জাতির লক্ষ্য বলে ঘোষণা করা হয়েছে।

কিন্তু যে সুয়েজখালের ওপর সংযুক্ত আরব সাধারণতন্ত্র নির্ভরশীল, যার আয়েই দেশের অর্থনৈতিক বিকাশ সম্ভব হচ্ছে, তা সাম্প্রতিক বিপর্যয়ের পর বন্ধ। অবশ্য খার্তুমে সম্মিলিত আরব রাষ্ট্রপ্রধানরা এই ক্ষতিপূরণের জন্য উপার্জিত অর্থের প্রায় অর্ধেকটা দিতে চেয়েছেন। আপাত সংকট দূরীভূত হলেও ভবিষ্যৎ চলেছে সম্পূর্ণ অনিশ্চিতের পথে।

সুয়েজখালকে ঘিরে সংকট আজকের নয়। একে আন্তর্জাতিক নিয়ন্ত্রণাধীনে আনবার জন্য ১৯৫৬ সালে প্রবল চেষ্টা চলে, কিন্তু তা ব্যর্থ হয়। আবার সেই একই কথা উঠেছে। সুয়েজের পূর্ব তীরে গিয়ে দাঁড়িয়েছে ইসরায়েলী বাহিনী। ইসরাইল চাইছে খালের মাঝ বরাবর তাদের অধিকার বিস্তৃত হোক। কিন্তু আরব সাধারণতন্ত্রের পক্ষে তা মেনে নেওয়া কোন ক্রমেই সম্ভব নয়।

সংযুক্ত আরব সাধারণতন্ত্রের সামগ্রিক উন্নয়ন প্রচেষ্টার স্বরূপ নীচের পরিসংখ্যানটি থেকে মোটামোটি বোঝা যাবে। অবশ্য সাম্প্রতিক বিপর্যয়ের পর এর অনেকখানি পরিবর্তন করতে হচ্ছে।

	১৯৬৪	১৯৬৫	১৯৭০
স্টীল উৎপাদন	৩৭২,৪০০ টন	৪৯০,০০০ টন	২,২৫০,০০০ টন
যন্ত্রপাতি ও কলকব্জা	৪০০ ইউনিট	৫২০ ইউনিট	৮,১৫০ ইউনিট
সার	৮৫০,০০০ টন	২,০০০,০০০ টন	৩,৭০০,০০০ টন
পেপার ও কার্ড বোর্ড	৯৫,০০০ টন	১৪৫,০০০ টন	৪৫৯,০০০ টন
সিন্থেটিক উড	৮,০০০ টন	৭০,০০০ টন	১০৬,০০০ টন
প্লাস্টিক নির্মিত দ্রব্য	২,৭০০ টন	৭,৫০০ টন	৩৭,৫০০ টন
টায়ার	৭,০০০ টন	১৬,২০০ টন	৩১,০০০ টন
কাঁচা তেল	৬,১০০,০০০ টন	৭,৫০০,০০০ টন	১২,০০০,০০০ টন
পরিশোধিত তেল	৩,১০০,০০০ টন	৩,৬০০,০০০ টন	৪,৫০০,০০০ টন
কেরোসিন	৮০০,০০০ টন	৯০০,০০০ টন	১,১০০,০০০ টন
ডিজেল অয়েল	৩০০,০০০ টন	৪০০,০০০ টন	৫০০,০০০ টন
বেনজিন	৩০০,০০০ টন	৫০০,০০০ টন	১,০০০,০০০ টন
চিনি	৩৫৫,০০০ টন	৬৩০,০০০ টন	১,০০০,০০০ টন
সিমেণ্ট	২,৪০০,০০০ টন	২,৪০০,০০০ টন	৪,০০০,০০০ টন
অতিরিক্ত স্টীল উৎপাদন	২০০,০০০ টন	৩০০,০০০ টন	৭০০,০০০ টন
কাচ	৩১,০০০ টন	৪৪,০০০ টন	৭৫,০০০ টন
কয়লা	———	১২,০০০ টন	৬২০,০০০ টন
ফসফেট	৬০০,০০০ টন	১,৫০০,০০০ টন	৪,০০০,০০০ টন
ট্রাক বাস ট্রলি	২,৪৫০ ইউনিট	৪,৬০০ ইউনিট	৬০,০০০ ইউনিট
ট্রাকটর	৬৩২ ইউনিট	৩,০০০ ইউনিট	৫,০০০ ইউনিট
অটোমোবাইল	৫,৫০০ ইউনিট	১২,৬০০ ইউনিট	২৫,৬০০ ইউনিট
মটর সাইকেল	———	১৪,৫০০ ইউনিট	২৫,০০০ ইউনিট
বাইসাইকেল	৪২,০০০ ইউনিট	৬০,০০০ ইউনিট	১৫০,০০০ ইউনিট

পুরণো পাতা

স্বয়ম্বর

শ্রীশচন্দ্র মজুমদার

পাঁচ বৎসরের মাতৃহীনা কন্যা সুহাসিনীকে লইয়া শশাঙ্কশেখর যখন কাশীবাসী হইয়াছিলেন, তখন তাঁহার মনে হয় নাই, ইহজন্মে আবার জন্মভূমিতে ফিরিয়া আসিতে হইবে। গৃহলক্ষ্মীকে চিরবিদায় দিয়া শ্মশানবৈরাগ্য প্রভাব ক্ষীণবল হওয়ার পূর্বেই তিনি বাটীর বাহির হইয়া পড়িয়াছিলেন। তারপর ছয় বৎসর উত্তীর্ণ হইয়াছে, কন্যা বিবাহযোগ্যা হইয়া উঠিল। তাকে সৎপাত্রস্থ করা এখন তাঁহার জীবনে সর্বপ্রধান কার্য। আত্মীয়-বন্ধুরা ইতিপূর্বে উপযাচক হইয়া চিঠিপত্রে তাঁর ক্ষুদ্র বিষয়সম্পত্তিটুকুর ভার গ্রহণপূর্বক তাঁহাকে আপ্যায়িত করিয়াছিলেন, কিন্তু জামাতা নির্বাচন করিবার গুরুতর দায়িত্ব লইতে কেহ অগ্রসর হইলেন না। কাজেই দেশে প্রত্যাগমন ছাড়া তাঁর গত্যন্তর ছিল না।

কাশীধামের বাঙালী টোলায় যাঁহারা বসবাস করেন, বঙ্গদেশীয় এবং গঙ্গা-তীরবর্তীদের সংখ্যা তন্মধ্যে প্রায় সমান। দেশে যেমন ভাষার প্রাদেশিকতা তাঁহাদের মধ্যে সর্বতোমুখ মিলনের অন্তরায়স্বরূপ, এখানেও কতকটা সেইরূপ। কিন্তু তাঁহাদের বালক-বালিকাগণের ভিতর এই ভাষাগত ভেদ আদৌ দেখা যায় না। তাহারা সকলেই কলিকাতা ও তাহার নিকটবর্তী ভদ্রসমাজে চলিত "দক্ষিণ দেশী" ভাষায় কথা কয় এবং "বাঙাল" বা "ঘেটো" কথাবার্তা শুনিলে সমভাবে আনন্দানুভব করে।

শশাঙ্কশেখর রায় পাবনা জেলার লোক। ছয় বৎসরকাল কাশীবাস করিয়াও কথাবার্তার ভাষায় জন্মভূমির টানটুকু ভুলিতে পারেন নাই। কিন্তু কন্যা সুহাসিনী (চলিত নাম সুহাসি) দক্ষিণ দেশী বাংলায় ও বেনারস অঞ্চলের হিন্দীতে সমান অভ্যস্ত। বাপের বাঙালে বাক্যভঙ্গী ও উচ্চারণ তার হাস্যরস উদ্রিক্ত করিয়া থাকে। তার উপর সুহাসি একটু রঙ্গপ্রিয়, স্নানের ঘাটে সাঁতার-কাটা ও বাঙাল স্ত্রী-পুরুষদের কথাবার্তার হুবহু নকল-ব্যাপারে শিশু-মহলে সে অদ্বিতীয়। মা মরা মেয়ে, সহজেই বাপের বড় আদরের, কেহ তাহাকে আঁটিয়া উঠিতে পারে না। তার উপর অন্যান্য বালিকাসুলভ কতকগুলি গুণের জন্য সে সকলেরই প্রিয়পাত্রী। পাড়ায় কাহারও পীড়ার খবর পাইলে সুহাসি আত্মপর-নির্বিশেষে রোগীর শুশ্রূষা করিতে ছুটিয়া যায়। যত কাঁদুনে ও দুষ্টছেলেকে ঔষধ খাওয়াইবার কল-কৌশল তার মত আর কেহ জানে না। একাদশীর দিন মধ্যাহ্নে পাড়ার বিধবাদের রামায়ণ-মহাভারত পড়িয়া শুনান তার নির্দিষ্ট কার্য এবং যে বৃদ্ধারা একাকিনী বাস করেন, পরদিন প্রাতে পারণের পূর্বে এই বালিকা তাঁহাদের একবার খোঁজখবর না লইয়া নিশ্চিন্ত হইতে পারে না। তাছাড়া ইহার ভিতর সুহাসি যেরূপ রাঁধিতে এবং সেলাই করিতে শিখিয়াছে, সচরাচর যুবতীদের পক্ষে তাহা শ্লাঘার কথা। তবে একলাটি ঘুটিং খেলিতে বসিলে তার ক্ষুধা তৃষ্ণা অথবা স্থান-কালজ্ঞান বড় থাকে না।

> পরবর্তী সংখ্যায়
> **পোড়া মহেশ্বর**
> **দীনবন্ধু মিত্র**

কোন ব্রাহ্মণগৃহে, ভোজের উদ্যোগ হইলে পল্লীর ঠাকুরাণীরা অতর্কিতে সুহাসির সন্ধানে বাহির হন এবং তাহার দেখা পাইলে ঘুটিং কাড়িয়া লইয়া উৎসব-গৃহে ধরিয়া আনেন। তারপর কাপড় ছাড়াইয়া তার কোমরে অঞ্চল জড়াইয়া দিতে পারিলেই তাঁরা নিশ্চিন্ত,—সমস্তদিন সুহাসি রন্ধনে বা পরিবেশনে তন্ময় থাকিবে হাতের কাজ ফেলিয়া পলাইবে, সে তেমন মেয়ে নহে।

(২)

শশাঙ্কশেখর গৃহে ফিরিবার সকল বন্দোবস্ত করিয়াছেন, এমন সময় খবর পাইলেন, তাঁর শ্বশুরকুলের দূরজ্ঞাতি ভবানীচরণবাবু সপরিবারে তীর্থযাত্রায় বাহির হইয়াছেন। ভবানীচরণের একটি বিবাহযোগ্য ছেলে কলিকাতা মেডিকেল কলেজে পড়ে এবং সেও সঙ্গে আসিতেছে জানিয়া, রায়মহাশয় একটু আশ্বস্ত হইলেন। নিতান্ত কর্তব্যানুরোধেই তিনি দেশে ফিরিতে কৃতসংকল্প হইয়াছিলেন; কিন্তু আসল কথা, শূন্য গৃহমন্দিরে পুনঃ প্রবেশের চিন্তাও তাঁহার অসহনীয়। যাহা-হউক, ফাল্গুন মাসে গৃহযাত্রার যে দিন স্থির হইয়াছিল, তাহা বদলাইয়া গেল।

ভবানীচরণবাবু দ্বিতীয়পক্ষের নায়ক করিয়া দুইটি পুত্র লাভ করিয়াছেন। বড় ছেলেটির বিবাহে অলংকার ও নগদ টাকার বেশ দু'পয়সা তাঁর লাভ হইলেও, পুত্র-বধূটি তেমন মনের মত হয় নাই। সে জন্য যখন-তখন তাঁহাকে গৃহিণীর গঞ্জনা সহ্য করিতে হয়।

শশাঙ্কশেখরের সঙ্গে বহুকাল পূর্বে দুই একবার তাঁহার দেখা হইয়াছিল, দেশে থাকিতে সুহাসির সৌন্দর্যখ্যাতির কথা শুনিয়াছিলেন। কাশীধামে পেঁৗছিয়া মেয়েটিকে দেখিয়া করণীয় ঘরে ছেলের বিবাহ দিতে তাঁর খুব ইচ্ছা হইল। কিন্তু মেয়েটির সরলহাস্যপ্রদীপ্ত সুলক্ষণা শ্রীতে একটু খুঁত ছিল—রং মেমের মত অমন ধবল নহে। সেইজন্য স্বয়ং গৃহিণী কন্যাদর্শন করিয়া মতামত না দিলে সহসা তিনি রায়মহাশয়কে বাক্যদান করিতে সাহস করিলেন না।

এদিকে শ্রীযুক্ত ভবানীচরণ চৌধুরী মহাশয়ের সহধর্মিণী ওরফে শ্রীমতী ইচ্ছাময়ী দুইদিনের ভিতর বাঙালী টোলার মহিলাবৃন্দকে আপনার রূপ ও গহনার ছটায় এবং শ্বশুর বিশেষত পিতৃকুলের ধন গৌরব-প্রসঙ্গে একেবারে চমকিত করিয়া তুলিলেন। ইহাতে চৌধুরাণী বলিয়া তাঁহার যে নামডাক রটিয়া গেল, বালক-বালিকা মহলেও তাহা অজ্ঞাত রহিল না। সুহাসিকে দুই-তিনবার দেখিয়া তিনি তাহার পরিচয় গ্রহণ করিয়াছিলেন বটে, কিন্তু পিতার নিষেধবশত বালিকা তাঁহার সম্মুখে বড় আসিত না, দূরে থাকিয়া এবং অন্য সূত্রে শুনিয়া শুনিয়া সে তাঁর ভাবভঙ্গী ও গল্প-গুজবের আখ্যানবস্তু যথাসাধ্য হৃদয়ঙ্গম করিয়াছিল। ইহার ফলে বালক-বালিকা মহলে দিনকতক চৌধুরাণীকে লক্ষ্য করিয়া নূতন রকমের খেলা ও আনন্দের সৃষ্টি হইল এবং বলাবাহুল্য, দুষ্ট মেয়ে সুহাসি তাঁহাকে যেমন নকল করিতে পারিত, আর কেহ তেমন নয়। দুর্ভাগ্যক্রমে চৌধুরী-মহাশয়দের আগমনের ১০।১২ দিন পরে দশাশ্বমেধ ঘাটে সমবেত স্নানযাত্রী ছেলে-মেয়েদের ভিতর সুহাসি যখন চৌধুরাণীর অভিনয় পূর্ণমাত্রায় করিয়া সকলকে হাসাইয়া হাসাইয়া পাগল করিতেছিল, স্বয়ং ইচ্ছাময়ী স্নানার্থ সদলবলে সেখানে

উপস্থিত হইয়া স্বকর্ণে তাহার কতক-কতক শুনিলেন। স্বামীর স্বারা অনুরুদ্ধ হইয়া তিনি যাহাকে পুত্রবধূ করিবেন ভাবিতে-ছিলেন, তাহার মুখে নিজের এইরূপ ব্যাখ্যান শুনিয়া তিনি রোষে-অভিমানে জ্বলিয়া গেলেন। তারপর নানা ওছিলায় প্রতিবেশনীদের সঙ্গে প্রকাশ্য কলহ করিয়া স্বামীর দীর্ঘকাল কাশীবাসের সংকল্প উড়াইয়া দিলেন। কাজেই পথমধ্যে পত্নী-বৎসল ভবানীচরণকে কলিকাতায় ফিরিয়া আসিতে হইল। ছেলে ষোড়শীচরণের সঙ্গে সুহাসির বিবাহের কথা তিনি আর গৃহিণীর কাছে পাড়িতে পারিলেন না।

(৩)

এই সম্বন্ধটির উপর রায়মহাশয় পূর্ণ-মাত্রায় নির্ভর করিয়াছিলেন, কিন্তু কোন জবাব না দিয়া চৌধুরীমহাশয় অকস্মাৎ অন্তর্হিত হওয়ায় তিনি বুঝিলেন, বিবাহ ঘটিবার নহে। ভিতরের কথা কিছু জানিতে না পারায় তিনি বড় ম্রিয়মাণ হইলেন।

চৌধুরীমহাশয়দের কাশীত্যাগের সপ্তাহখানেক পরে ডাকযোগে নূতন একটি সম্বন্ধ আপনা-আপনি আসিয়া উপস্থিত হইল। পাত্রের পিতা অনেকদিন পাবনা জেলায় ডেপুটি ইন্সপেক্টারি করিয়া পেনশন লাভ করিয়াছেন এবং তাঁর পুত্রটি রসায়ন-বিজ্ঞানে এম-এ পাস করিয়া কোন-রূপ স্বাধীন জীবিকা অর্জনের চেষ্টা করিতেছেন। পিতা লিখিয়াছেন,—"বলা-বাহুল্য, আমার পুত্র রসায়নশাস্ত্রে পারদর্শিতা লাভ করিয়াই নিশ্চিন্ত নহে, অন্যান্য বিজ্ঞানেও তাহার দৃষ্টি আছে। সেকালের ইংরেজনবিশ আমরা, সকলই যুক্তির চক্ষে দেখিতাম; কিন্তু আমার পুত্র গিরিজা সম্ভব-অসম্ভব সকল বিষয়েই যেরূপ গবেষণার সহিত অনুবন্ধ করিয়াছে, তাহাকে বিজ্ঞানই বলুন, কি ভক্তিতত্ত্বই বলুন, কবিবর সেকসপীয়রের সেই চরণ দুটি মনে করিয়া বলিতে হয়, 'যে নামেই ডাক, অন্য নামে গোলাপের সুবাস সমান!' এই সকল মৌলিক তত্ত্ব আবিষ্কার করিয়া সে স্বাধীন জীবিকার পথ খুঁজিতে চাহে। কিন্তু তাহাতে মূলধনের দরকার। আমার তত সঞ্চয় নাই। শুনিলাম, মহাশয়ের কন্যাটিমাত্র সম্বল এবং বিষয়সম্পত্তি জমাতারই প্রাপ্য। সেইজন্য ছেলেটি মহাশয়ের হস্তে সমর্পণ করিয়া আমিও কাশীবাসী হইব, মনে করিয়াছি।" "পুনশ্চ।—মেয়েটির জন্মপত্রিকার নকল ও দৈর্ঘ্যের পরিমাণ ফেরত ডাকে পঠাইতে পারিবেন কি? আমার পুত্রটি একটু-একটু ফলিত জ্যোতিষের আলোচনা করিতেছে—আশ্চর্য তাহার মেধা। মহাশয় একটু সত্বর হইবেন। নানা স্থান হইতে সম্বন্ধ আসিতেছে।"

শশাংকশেখর এরূপ গুণবান পাত্রকে হাতছাড়া করা কর্তব্য বোধ করিলেন না। ফেরত ডাকে রেজেস্টারি চিঠিতে তিনি কন্যার জন্মপত্রিকা প্রভৃতি পাঠাইয়া দিলেন এবং প্রস্তাব করিলেন, ভাবী-বৈবাহিক-

মহাশয় যদি সত্বর তাঁর মেয়েটিকে দেখিতে চান, কাশীধামে তাঁহাদের যাতায়াতের ব্যবস্থা তিনি বহন করিতে প্রস্তুত আছেন। যথাসময় উত্তর আসিল যে, বড় গরম পড়িয়া গিয়াছে, এসময়ে তাঁহারা দেশ ছাড়িয়া যাইতে সাহস করেন না। অথচ মেয়েটিকে দেখাও একবার দরকার। পাত্রের মাতা সেজন্য বড় ব্যস্ত হইয়াছেন। রায়মহাশয়ের পক্ষে বৈশাখের শেষে কি জ্যৈষ্ঠের প্রথমে স্বদেশে আসা কি তেমন কষ্টকর হইবে? প্রত্যুত্তরে শশাঙ্কশেখর লিখিলেন, জ্যৈষ্ঠ মাসে তিনি, যেমন করিয়াই হউক, দেশে ফিরিবেন।
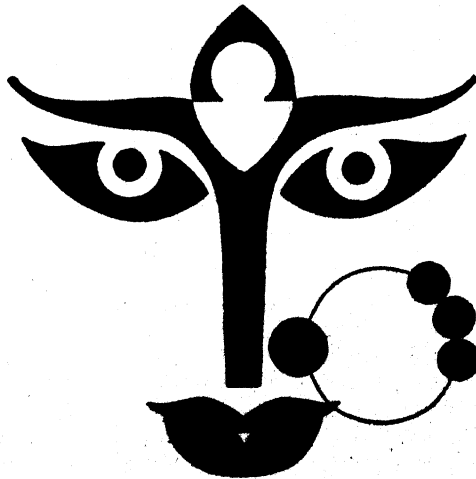
(৪)

রায়মহাশয় যথাসময়ে জন্মভূমিতে প্রত্যাগমন করিয়া শুনিলেন, ডেপুটি ইন্‌স্পেক্‌টর বিধুভূষণবাবু কলিকাতায় কোন ধনিগৃহে পুত্রের সম্বন্ধ স্থির করিয়া ফেলিয়াছেন। সত্যাসত্য নির্ধারণের জন্য বিধুভূষণবাবুকে পত্র লিখিয়া সপ্তাহ পরে যে জবাব পাইলেন, তাহার অর্থ এইরূপঃ—"মহাশয়ের সংবাদদাতা ঠিক কথাই বলিয়াছেন। ১৬ই জ্যৈষ্ঠ আপনার পৌঁছানর কথা ছিল, কিন্তু ১৭ই মধ্যাহ্ন পর্যন্ত যখন কোন খবর পাইলাম না, আমি ভাবিলাম কি, যে দূর পথ, মহাশয় হয় ত' কোন সঙ্কটে পড়িয়াছেন। তাহাছাড়া আপনার কন্যাটি এগার বছরে পড়িয়াছে, কিন্তু আমার পুত্র বলেন যে আর্যজাতি যে নবমবর্ষে গৌরীদানের ব্যবস্থা করিয়াছিলেন, তাহাই বিজ্ঞানসম্মত। কলিকাতার মেয়েটি সাড়ে দশ বৎসরের বটে, কিন্তু তথাপি ছয় মাসের ছোট। মহাশয়কে অসুবিধায় পড়িতে দেখিয়া আমি এবং আমার পুত্র উভয়েই বাস্তবিক বড় দুঃখিত, কিন্তু দুঃখপ্রকাশ ছাড়া আমরা আর কি করিতে পারি?" শশাঙ্কশেখর অবশ্য বুঝিতে পারিলেন, ভিতরের কথাটা কি খাস্ বাংলায় নিত্য নূতন অনেক পরিবর্তনের কথা কাশীধামে থাকিয়া তিনি শুনিতে পাইতেছিলেন, কিন্তু ছয় বছরের ভিতর বঙ্গীয় সমাজ বন্ধন এতটা শিথিল হইয়াছে, ইহা তিনি জানিতেন না।

যাহাহউক, তাঁর বাড়ী আসার পর কন্যার সৌন্দর্যখ্যাতিগুণে অথবা তদীয় পৈতৃক বিত্তটুকুর লোভে রোজ রোজ নূতন নূতন সম্বন্ধ আসিতে লাগিল। তাহাতে আর কিছু না হউক, রায়মহাশয়ের গৃহে মিষ্টান্ন-খরচটা বড়ই বাড়িয়া গেল। আর কখন কে দেখিতে আসিবে, এইরূপ অনিশ্চয়তায় সুহাসিকে সর্বদা প্রায় সাজিয়া গুজিয়া থাকিতে হইত। কাজেই তাহার পুতুল খেলায় এবং দৌড়াদৌড়ি কি সাঁতার-কাটায় পূর্বের সে স্বাচ্ছন্দ্য রহিল না। সুহাসি ত্যক্ত-বিরক্ত হইয়া বাপের কাছে জেদ ধরিল, একবার সে মামার বাড়ী যাইবে। কেন না, তাহার মামাবাড়ী কালিকাপুর গ্রামে রথের বড় ধুম, ইহা সকলের মুখেই শুনা যাইতেছিল।

(৫)

বাস্তবিক কালিকাপুরে রথের বড় ধুম। পদ্মানদীর সঙ্গমস্থলে প্রকাণ্ড মাঠ এবং অশ্বথ বৃক্ষরাজির চারিদিকে ক্রোশ-ব্যাপী শ্যামলক্ষেত্র 'রথতলা' নামে পরিচিত। আষাঢ়ের প্রথমে আকাশে নবীন জলদরাজি সঞ্চিত হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে প্রতি বৎসর এখানে উৎসব আরম্ভ হইয়া থাকে। বেশীর-ভাগ এবার দুর্গাপুরের জমিদার ভবানী-চরণবাবু নীলামে কালিকাপুরের দশ-আনা খরিদ করায়, এইখানেই পুণ্যাহ করিবেন, স্থির করিয়াছেন। যমুনার অনতিদূরে নবীন জমিদারের নূতন কাছারিবাড়ী প্রস্তুত প্রস্তুত হইয়াছে। ধুমধামের সীমা নাই,—ঘোড়দৌড় ও আতসবাজির ব্যবস্থা হইয়াছে, কলিকাতা হইতে থিয়েটার আসিবে, জনরব এইরূপ।

দুইদিন হইল, শশাঙ্কশেখর কন্যাটিকে লইয়া শ্বশুরালয় দুর্গাপুরে আসিয়াছেন। শ্বশুরের ভিটা এবং তাঁহার ভ্রাতুষ্পুত্র ছাড়া সেখানে আকর্ষণের বড় কিছু লৌকিক চক্ষে ছিল না, কিন্তু তাহা হইলে কি হয়, তাহার প্রত্যেক ধূলিকনায় তাঁহার সাধ্বী পত্নীর স্মৃতিমোহ জড়িত ছিল, অন্তিমশয্যায় শয়ানা গৃহিণীর অনুরোধে দুর্গাপুরের যমুনা-তীরে স্বহস্তে চিতারচনা করিয়া প্রেমময়ীর সঙ্গে সঙ্গে তিনি নিজের সকল সুখশান্তি চিরতরে বিসর্জন দিয়া গিয়াছিলেন। আজ প্রায় ছয় বৎসর পরে প্রীতির সে সমাধি-মন্দিরে উপস্থিত হইয়া শোকে তিনি মুহ্যমান হইলেন।

রথের দিন প্রভাতে ঘনকৃষ্ণ মেঘজালে পদ্মা-যমুনার নূতন জলধারা ছায়ান্ধকারা—পরিব্যাপ্ত হইয়াছে। রথতলায় জন-স্রোতের বিরাম-বিশ্রাম নাই এবং তাহার কল্লোল তটপ্লাবিতসমুদ্র গর্জনবৎ বহুদূর পর্যন্ত প্রহত হইতেছিল। শুনিয়া সুহাসি রথ দেখিবার জন্য অস্থির হইয়া উঠিল। শশাঙ্কশেখরের শরীর ও মন ভাল ছিল না, তিনি শ্যালক উমাচরণের উপর ছেলেমেয়ে-দের রথ দেখাইবার ভার দিয়া নির্জনে শ্রীমদ্ভাগবত পাঠে চিত্তসমাহিত করিলেন। কিন্তু সুহাসিরা কালিকাপুর চলিয়া গেলে রায়মহাশয় কিছু বিমনা হইলেন। সর্বদা কন্যাকে কাছে কাছে রাখিয়া তিনি তাহাকে আর ক্ষণমাত্রের জন্য চক্ষের আড় করিতে পারিতেন না। সুহাসি রথতলায় পৌঁছিতে না পৌঁছিতে তিনি স্নানোদ্দেশে বাহির হইলেন এবং যমুনাতটে সহধর্মিণীর চিতাস্থানে উপবেশন করিয়া অশ্রু বিসর্জন করিতে লাগিলেন।

এদিকে মাতুল উমাচরণ রথতলায় পৌঁছিতে না পৌঁছিতে সুহাসিকে লইয়া ব্যতিব্যস্ত হইয়া পড়িল। সে ইহারই ভিতর বিস্তর ভেঁপু ও খাবার কিনিয়া মামাতো ভাইবোনেদের মধ্যে বিতরণপূর্বক অবশিষ্ট গরিবদুঃখীদের ছেলেমেয়েদের দিবার জন্য চারিদিকে ছুটিয়া বেড়াইতেছে।

কাজেই মাতুলকে গলদঘর্ম হইয়া চঞ্চলা ভাগিনেয়ীর অনুসরণ করিতে হইতেছিল। মনিহারীর দোকানগুলোর দিকেই সুহাসির বেশী ঝোঁক। কেন না, পাড়াগাঁয়ের বধূ ও কন্যারা যেরূপে মুখ বিকৃত করিয়া বেলওয়ারি চুড়ি ও শাঁখা পরিবার যন্ত্রণা সহ্য করিতেছিল, তেমন দৃশ্য ইতিপূর্বে সে আর কখন দেখে নাই। দেখিয়া দেখিয়া তাহার ভারি হাসি পাইতেছিল এবং কাশীতে ফিরিয়া কেমন তাহার খেলার সাথীদের সে অভিনয় দেখাইবে ভাবিতে তাহার আনন্দের সীমা ছিল না।

বেলা প্রায় উত্তীর্ণ হইলে পুরোজন জমিদারগৃহ হইতে লক্ষ্মীনারায়ণ বিগ্রহ মহাধুমধামে আনীত হইয়া রথে অধিষ্ঠিত হইলেন। কিছুক্ষণ পরে রথটানা সুরু হইল। "জয় জগন্নাথ" রবে আকাশ-প্রান্তর নদীবক্ষ কম্পিত করিয়া সহস্র সহস্র নরনারী রথরশ্মি আকর্ষণ করিয়া চলিল। ঘোর ঘর্ঘর ধ্বনি জাগ্রত করিয়া রথচক্র সকল আবর্তিত হইতে লাগিল। কিন্তু সহস্র হস্ত পরিমিত স্থান অতিক্রম করিতে না করিতে পুলিশের আদেশে রথের গতি বন্ধ হইয়া গেল। সুহাসি মাতুলের নিষেধ অগ্রাহ্য করিয়া রথটানায় যোগ দিয়াছিল, সহসা রথচলা বন্ধ হওয়ায় তাহার ক্ষোভের সীমা রহিল না। কনেষ্টবলদের লক্ষ্য করিয়া নির্ভয়ে সে বলিয়া উঠিল, "মরু, পোড়ার-মুখো মিন্সেরা!"

মধ্যাহ্নে সহসা পশ্চিম গগন প্রান্ত আচ্ছাদিত করিয়া কালো মেঘ ঘনীভূত হইয়া উঠিল। সঙ্গে সঙ্গে প্রবল ঝড় দেখা দিল। রথের দিনে বৃষ্টিপাতের জন্য সচরাচর লোকে প্রস্তুত থাকে, কিন্তু এরূপ প্রবল ঝাড়া ঝড় দেখা যায় না। জনস্রোত

আলো আঁধার ফটো : অপূর্ব বন্দ্যোপাধ্যায়

ছিন্নবিচ্ছিন্ন হইয়া গ্রামাভিমুখে ছুটিয়া চলিল।

উমাচরণ ছোট একখানি পান্সী করিয়া সুহাসিদের রথ দেখাইতে আনিয়াছিলেন। ক্ষুদ্র নদী যমুনার তীরে অশ্বত্থবটের ছায়া-স্নিগ্ধ একটু নির্জন স্থান ছিল, ঝড় ও বৃষ্টির প্রাক্‌কালে নিরাপদ জানিয়া সেইখানে তাঁহারা নৌকা লইয়া গেলেন।

ঝড় উঠিবার সময় কেহ লক্ষ্য করিয়া দেখে নাই যে, পদ্মাগর্ভে একখানি সওয়ারি নৌকা বেগে রথতলার দিকে অগ্রসর হইতেছিল। মাঝিমাল্লারা প্রাণপণ যত্নে নৌকা যমুনার মোহনায় আনিয়া ফেলিয়াছে, এমন সময় একটা দমকা বাতাস আসিয়া উহাকে একেবারে উল্টাইয়া দিল, মন্দীভূত জনস্রোতের ভিতর সকলেই আপন-আপন প্রাণ লইয়া ব্যস্ত, বিপন্ন নৌযাত্রীদের উদ্ধার করিবার কেহ ছিল না।

(৬)

শশাঙ্কশেখর রায় প্রায় সমস্তদিন প্রাণাধিকা কন্যাকে না দেখিয়া অস্থির হইয়া উঠিলেন। কিছুতে মনঃস্থির করিতে না পারিয়া ঝড়বৃষ্টির পূর্বেই পদব্রজে তিনি রথতলাভিমুখে অগ্রসর হইয়াছিলেন এবং বিপন্ন নৌকাখানি জলমগ্ন হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে পদ্মা-যমুনার সঙ্গমস্থলে উপনীত হইলেন।

তখন পদ্মার ভয়ংকর অবস্থা। রুষিয়া, ফুলিয়া, গর্জিয়া রাক্ষসীর মত সে ঝড়ের সহিত যুঝিতেছিল। সেই অবস্থায় রায়-মহাশয় সহসা দেখিলেন, তাঁহার সুহাসির মত কেহ সন্তরণ করিয়া যমুনার তীরাভি-মুখে অগ্রসর হইতেছে—পশ্চাতে অদূরে অর্ধনিমজ্জিত মনুষ্যদেহ, কণ্ঠে সে বালিকার অঞ্চল জড়াইয়া আসিয়া আসিতেছে।

শশাঙ্কশেখর নিজের চক্ষুকে বিশ্বাস করিতে পারিতেছিলেন না। ইহা কি সম্ভব যে, উমাচরণ বালক-বালিকাসহ জলমগ্ন হইয়াছে? এই সময়ে ঝড়বৃষ্টির বেগ কথঞ্চিৎ মন্দীভূত হইতেছিল। তিনি ছুটিয়া গিয়া দেখিলেন, তাঁহার সন্তরণপটু কন্যা নিমজ্জনোন্মুখ মূর্তি মৎস্যকন্দর্পীর তুল্য যুবকের প্রাণরক্ষা করিয়া নির্বিঘ্নে তীরে উত্তীর্ণ হইয়াছে।

সুহাসি আর্দ্রকেশ ও আর্দ্রবস্ত্রে পিতার চক্ষে মূর্তিমতী উমারাণীর মত প্রতিভাত হইতেছিল। বাপকে দেখিয়া প্রথমত সে অপ্রতিভ হইল। তারপর হাসিয়া উঠিয়া বলিল, "বাবা, মামাকে লুকিয়ে নৌকোর জানলা দিয়ে কেমন পালিয়েচি দেখ, এখনও হয় ত তিনি জানতে পারেন নি; তা ভাল করিচি কিনা, তুমিই বল ত বাবা! দেখলুম একখানা নৌকো ডুবে গেল, কিন্তু সেজন্যে কারু মায়া হলো না,—মামারও নয়! একটুর জন্যে বামুনের ছেলেটি মারা যেত বসেছিল আর কি!" শশাঙ্কশেখর দেখিলেন, যুবকের গলদেশে উপবীত জড়িত। সস্নেহে সজলনেত্রে কন্যাকে বুকের কাছে টানিয়া আনিয়া তিনি যুবকটিকে ভাল করিয়া দেখিতে লাগিলেন। চিনিতে দেরী হইল না। পিতার কণ্ঠে "কে ও ষোড়শী-চরণ" উচ্চারিত হইবামাত্র সুহাসি ছুটিয়া পলাইল। তখন তার ভারি লজ্জা হইয়াছিল; কেন না, চৌধুরাণীর কাশীত্যাগের পর এই নাম অনেকবার সে শুনিয়াছিল।

ষোড়শীচরণ সন্তরণে একান্ত অপটু নহে। কিন্তু বালিকার অঞ্চল সাহায্য ব্যতীত পদ্মাগর্ভ হইতে সেদিন তার বাঁচিয়া আসার সম্ভাবনা ছিল না।

কথঞ্চিৎ সুস্থ হইয়া সে শশাঙ্ক-শেখরের পদধূলি গ্রহণ করিল। প্রাণদাত্রী বালিকার প্রতি কৃতজ্ঞতায় তাহার হৃদয় ভরিয়া গিয়াছিল, কিন্তু মুখে কিছু বলিতে পারিল না।

রায়মহাশয় ষোড়শীচরণকে কাছারি-বাড়ীতে পৌঁছাইয়া দিলেন। পুত্রের প্রাণ-রক্ষার খবর পাইয়া ভবানীচরণবাবু সস্ত্রীক বাটী হইতে ছুটিয়া আসিলেন। সকল শুনিয়া তাঁহারা শশাঙ্কশেখরের নিকট উপস্থিত হইলেন। চৌধুরাণী মহাশয়ার আদর চুম্বনে সুহাসির কোমল গণ্ড লাল হইয়া উঠিল। হাসিয়া কাঁদিয়া সেই পুণ্যাহ বাসরেই তিনি সুহাসির সঙ্গে ষোড়শীচরণের বিবাহ দিবেন, স্থির করিলেন।

তারপর ষোড়শীচরণ চিরদিনের মত সুহাসিনীর আঁচলে বাঁধা পড়িয়াছেন। শাশুড়ীর বড় আদর এবং স্নেহের বউ হইলেও, সুহাসি মুখ তুলিয়া কখন তাঁহার সঙ্গে কথা কহিতে পারে না। "চৌধুরাণীর মা" বলিলে তার লজ্জা এবং অভিমানের সীমা থাকে না।

"বঙ্গদর্শন" : ১৩০৯ ২য় বর্ষ—ভাদ্র

অমৃত পাবলিশার্স প্রাইভেট লিঃ-এর পক্ষে [illegible] সরকার কর্তৃক পত্রিকা প্রেস, ১৪, আনন্দ চ্যাটার্জি লেন, কলিকাতা—৩ হইতে মুদ্রিত ও [illegible], আনন্দ [illegible] রোড, কলিকাতা—৩ হইতে প্রকাশিত।

৭ম বর্ষ
২য় খণ্ড

২৪শ সংখ্যা
মূল্য
৪০ পয়সা

Friday, 13th October, 1967. শুক্রবার, ২৬শে আশ্বিন, ১৩৭৪ 40 Paise

সূচীপত্র

পৃষ্ঠা	বিষয়	লেখক
৮০৪	চিঠিপত্র	
৮০৫	সম্পাদকীয়	
৮০৬	প্রতিধ্বনি	
৮০৮	অবাক-গাঁয়ের মানুষ কি তুই	(কবিতা)—শ্রীঅমিতাভ দাশগুপ্ত
৮০৮	অথৈ নীল সমুদ্র	(কবিতা)—শ্রীগিরিজা গঙ্গোপাধ্যায়
৮০৯	অসময়	(গল্প)—শ্রীযশোদাজীবন ভট্টাচার্য
৮১৩	মানুষের শত্রু ক্যানসার	—শ্রীদীপ্তিময় দে
৮১৬	সাহিত্য ও সংস্কৃতি	
৮২১	সূর্য কাঁদলে সোনা	(উপন্যাস)—শ্রীপ্রেমেন্দ্র মিত্র
৮২৫	দেশেবিদেশে	
৮২৬	ব্যঙ্গচিত্র	—শ্রীকাফী খাঁ
৮২৭	বৈষয়িক প্রসঙ্গ	
৮২৮	সাহেব নবাব ক্লাইব	—শ্রীমুরারী ঘোষ
৮৩০	জানাতে পারেন	
৮৩১	দখল	(গল্প)—সৈয়দ মুস্তাফা সিরাজ
৮৩৫	প্রেক্ষাগৃহ	
৮৪৩	খেলাধুলা	—শ্রীদর্শক
৮৪৫	আমার কাল আমার দেশ	(স্মৃতিচারণ)—শ্রীসুধীরচন্দ্র সরকার
৮৪৭	গোসাইকুণ্ডর ডায়েরি	—শ্রীভক্তি বিশ্বাস
৮৫৮	ট্যাক্স কাহিনী	—শ্রীপ্রিয় গুহ
৮৬১	আপার ইণ্ডিয়া এক্সপ্রেস	(গল্প)—শ্রীছবি বসু
৮৬৩	ঝড়ের সহর কলকাতা	—শ্রীবৈদ্যনাথ মুখোপাধ্যায়
৮৬৫	অবিস্মরণীয় প্রেম	—শ্রীসুধাংশুমোহন বন্দ্যোপাধ্যায়
৮৬৭	মুর্জরালিঙ্গ দার্জেআলা	—শ্রীতারাপদ পাল
৮৬৯	অঙ্গনা	—শ্রীপ্রমীলা
৮৭২	পুরনো পাতা : পোড়া মহেশ্বর	—দীনবন্ধু মিত্র
৮৭৫	সুন্দর সুন্দরী	—শ্রীবীরেন্দ্রকিশোর রায়চৌধুরী
৮৭৭	পদ্মপুকুর মুখোমুখি	—শ্রীশৈল চক্রবর্তী
৮৭৯	অন্য গ্রহের প্রাণী	—শ্রীশচীন্দ্রলাল বসু

গানের জলসার উত্তর

শ্রীযুক্ত জয়দেব চট্টোপাধ্যায়ের অভিযোগ পড়লাম। তাঁর মত সংগীতরসিক বিজ্ঞ ব্যক্তি অনুগ্রহ করে আমার সমালোচনা আদ্যোপান্ত পড়েছেন এবং মূল্যবান সময় ব্যয় করে প্রতিবাদপত্র লিখেছেন বলে নিজেকে গৌরবান্বিত মনে করছি। যথাসম্ভব সংক্ষেপে আমি তাঁর অভিযোগের উত্তর দেবার চেষ্টা করছি।

প্রথমত, লেখক যে শ্রীমৈত্রের বিষয়ে "শিক্ষিত ও আন্তর্জাতিক খ্যাতিসম্পন্ন" —ইত্যাদি কথা বলেছেন, সে সম্পর্কে আলোচনার ক্ষেত্র এটা নয়। আমাদের আলোচ্য শ্রীমৈত্রের রচিত প্রবন্ধ।

দ্বিতীয়ত, "আলাউদ্দিন এবং এনায়েত খাঁর মত গোষ্ঠিগত ঐতিহ্য সৃষ্টি না করলেও" কথাটির ওপর রোষকষায়িত দৃষ্টিপাত করতে গিয়ে শ্রীচট্টোপাধ্যায় তার পরের অংশটির প্রতি মনোযোগ দেননি, যেখানে "চিত্তহারী মাধুর্যময় সুরসৃষ্টির জন্য ওস্তাদ হাফেজ আলি খাঁর রসঘন" ব্যক্তিত্বের প্রসঙ্গ উল্লিখিত হয়েছে। এঁদের মত স্মরণীয় প্রতিভা তাঁদের বৈশিষ্ট্য ও ধ্যানবিত্তব উত্তরসুরীদের হাতে ন্যস্ত করে যাবেন, যাতে ভাবীকালের দরবারে তাঁদের নিজস্ব স্বপ্ন ও সংগীতচিন্তার সূত্রটি পৌঁছয়, এই আশাই আমরা রাখি। এনায়েৎ খাঁ আজ নেই। তবু তাঁর সংগীতব্যক্তিত্বের স্বাক্ষর পুত্রদ্বয় ও অন্যান্য শিষ্যাশিষ্যাদের বাজনায় জাজ্জ্বল্যমান। এবং অন্যান্য ঘরানার শিল্পীদের বাজনার কোন অংশে এনায়েত খাঁ ঘরানার প্রভাব বিদ্যমান তা নির্দেশ করাও কঠিন নয়। ওস্তাদ আলাউদ্দিন খাঁ জীবিত এবং তাঁর সম্বন্ধেও ঐ একই উক্তি প্রযোজ্য। তাঁর বাদনশৈলী বেঁচে আছে এবং বেঁচে থাকবে তাঁর একাধিক দিকপাল শিষ্যগোষ্ঠী এবং তাঁর বৈশিষ্ট্যের অনুগামী অন্যান্য শিল্পীদের মধ্যে। হাফেজ আলি খাঁর বৈশিষ্ট্যযুক্ত কোনো শিষ্য নেই, এই কথাটাই বলতে চেয়েছি। হাফেজ আলি খাঁর সংগীতসম্পদ উত্তরকালের শিল্পীদের মধ্যে বেঁচে থাক, এ আকাঙ্ক্ষা করা মানে তাঁকে ছোট করা, অথবা অসম্মান করা নয়।

শ্রদ্ধেয় সংগীতবিদ বীরেন্দ্রকিশোর রায়চৌধুরীর শিক্ষকের তালিকায় আমীর খাঁ এবং এনায়েত খাঁর উল্লেখ যদি বাদ গিয়ে থাকে তা ইচ্ছাকৃত শৈথিল্য নয়, অনিচ্ছাকৃত ত্রুটি। শ্রীরায়চৌধুরী অনেকের কাছেই লিখেছেন, সকলের নামের সম্পূর্ণ তালিকা পেশ করা সম্ভব নয় এবং সেটা বড় কথাও নয়। বড় কথাটা হচ্ছে এই যে ভারতের তৎকালীন প্রায় সকল গুণীর কাছে শিক্ষাগ্রহণ করলেও এঁরা শিক্ষার প্রধান অংশের উল্লেখযোগ্য গুরু হলেন মহম্মদ আলি খাঁ, আলাউদ্দিন খাঁ এবং দবীর খাঁ—শ্রীরায়চৌধুরীর সকৃতজ্ঞ উক্তি হোলো এই। অথচ আলাউদ্দিন খাঁর নামটাই বাদ গিয়েছিলো।

তৃতীয়ত, বুন্দু খাঁ—"সরোদীয়া" নন, 'সারেংগীয়া'। হস্তাক্ষর দোষ অথবা মুদ্রণপ্রমাদের জন্য এই ত্রুটি। সেজন্য দুঃখিত।

চতুর্থত,—তন্ত্রকারীতে আলাউদ্দিন খাঁ গায়কী অঙ্গ ব্যবহার করেননি, একথা আমরা মানি না। শ্রীমৈত্রের প্রবন্ধে ছিল 'তন্ত্রকারীর সাথে গায়কী অঙ্গের অভিনব সমাবেশ ঘটিয়ে যন্ত্রসংগীতের ক্ষেত্রে একটি নবযুগের সূচনা করেছেন।' শানাই, বাঁশী ইত্যাদি সমস্তই যন্ত্রসংগীতের অন্তর্ভুক্ত। সুতরাং যন্ত্রসঙ্গীতের ক্ষেত্রে এই সমস্ত যন্ত্রের এবং যন্ত্রীর উল্লেখ বিস্ময়কর নয়, অভিনবও নয়।

আলাউদ্দিন খাঁ 'বোলের বাদশা' মানেই গায়কী অঙ্গবিবর্জিত শিল্পী, একথা ভাবাটা ভুল। গায়কী অঙ্গ তাঁর বাদনশৈলীর গহনসঞ্চারী মূল রস। তার সঙ্গে বোলের বৈচিত্র্য মিশে তাঁর প্রকাশরীতি সমৃদ্ধতর। গায়কী অঙ্গের পান্নালাল ঘোষ, রবিশংকর, আলি আকবর খাঁ তার প্রমাণ। সকলের চেয়ে বড় প্রমাণ বেহালাবাদক আলাউদ্দিন খাঁ স্বয়ং। তন্ত্রকারী ও গায়কী অঙ্গের অপরূপ সম্মেলনই তাঁর ঘরানার আকর্ষণীয় ঐশ্বর্য। গুণীসমাজে এ সত্য সপ্রশ্নে স্বীকৃত।

আলাউদ্দিনের পূর্বে যাঁরা বোল কমিয়ে গলার কাজ করতেন—এই শ্রেণীর শিল্পীদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলেন বাহাদুর হোসেন খাঁ (সেনী, রামপুর)। ইনি ধ্রুপদী অঙ্গের সমস্ত গলার কাজ সুরশৃঙ্গারে দেখাতেন, বোলের প্রাধান্য তাতে কম থাকত।

মজরু খাঁ (রামপুর), ইনি বোল কমিয়ে গায়কী অঙ্গে ঢোলেনার গৎ বাজাতেন।

আহমেদ আলি খাঁ (রামপুর), ইনি বোলের বৈচিত্র্য রেখেও গায়কী অঙ্গে সরোদ বাজাতেন।

ইমদাদ আলি খাঁ, বোলের অঙ্গ কম করে ইন্দু খাঁর খেয়ালের ঢঙে বাজাতেন।

বন্দে আলি খাঁ বীণকারের নাম এই প্রসঙ্গে উল্লেখযোগ্য।

উজীর খাঁ সাহেব বোলসমৃদ্ধ এবং বোলপ্রাধান্যবর্জিত উভয় অঙ্গেই বাজাতেন।

পরিশেষে, "আলাউদ্দিন খাঁ সাহেব যন্ত্রসংগীতের একজন প্রাতঃস্মরণীয় দিকপাল এবং যন্ত্রসঙ্গীতে তাঁর বিস্ময়কর অবদান"-এর কথা পত্রলেখক নিজেই স্বীকার করছেন। অথচ 'যন্ত্রসংগীত'-এর আলোচনা প্রসঙ্গে এ নামের অনুল্লেখের প্রতিবাদ তিনি অপ্রাসঙ্গিক বলে মনে করেন। এটা কি অসংগত আব্দার নয়?

[illegible]

শেক্সপীয়রওয়ালা প্রসঙ্গে

অমৃত (৭ম বর্ষ, ১৯শ সংখ্যায়) পত্রিকায় নান্দীকর লিখিত 'শেক্সপীয়রওয়ালা' ছবিটির সমালোচনা পড়লাম। অনেকেই বোধহয় জানেন যে ছবিটি সবে ভারতবর্ষে মুক্তিলাভ করলেও প্রায় বছর দুই আগে লণ্ডনে ও আমেরিকায় দেখান হয়। লণ্ডনে 'একাডেমী' সিনেমা হলে বইটি তিন মাস একটানা দেখান হয় ও ছবিটি অভূতপূর্ব সমাদর পায়। তার একটা কারণ বোধহয় এই চিরাচরিত দারিদ্র্যের বদলে নতুন ভারতের একটা সাংস্কৃতিক পরিচয় বইটিতে দেবার চেষ্টা করা হয়েছে। নানা কারণে বইটি আমাকে তিনবার দেখতে হয়। India Relief Committee বিহারে সাহায্য পাঠানোর জন্য একটি বিশেষ প্রদর্শনীর আয়োজন করেন এবং তাতে ফেলিসিটি কেণ্ডাল নিজে উপস্থিত ছিলেন।

ইংরেজরা দুশো বছর আমাদের শাসন করেছিল বলেই তাদের সবকিছুতে দুরভিসন্ধি খুঁজে বের করাটা সুস্থ মনোবৃত্তির পরিচয় নয়। 'শেক্সপীয়রওয়ালার' নায়ক সঞ্জু একটি চরিত্র। গোটা ভারতবর্ষকে সে উপস্থাপিত করছে না। বইটির উদ্দেশ্যও তা নয়। নান্দীকর নিশ্চিন্ত থাকতে পারেন সাধারণ ইংরেজ দর্শক ভুলেও ভাবেনি যে ভারতীয়রা সবাই সঞ্জুর মত।

দ্বিতীয়ত দুই বিরাট সংস্কৃতির মধ্যে প্রচুর মিল থাকা সত্ত্বেও যে দুস্তর ব্যবধান তাও পরিচালক দেখাতে চেয়েছেন। ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতায় এইটুকু বলতে পারি জীবনবোধ ও তার প্রকাশে ভারতীয় ও পাশ্চাত্য মন এক পথ অনুসরণ করে না। আমাদের নীতিবোধ অনেক ব্যাপারে ভিন্ন এবং পরস্পরকে শ্রদ্ধা করলেও অনেক অনুভূতির অংশ আমরা পরস্পরকে দিতে পারি না। যে জন্য বহু 'সঞ্জুই' ইংরাজতনয়াকে বিবাহ করতে গিয়েও পিছিয়ে যায়।

নান্দীকর স্মরণ করলে দেখবেন একটি দৃশ্যে সঞ্জু প্রেমিকাকে বলছে প্রকাশ্যে প্রেম করা তার অভ্যাস নেই। তাছাড়া সঞ্জু লিজির ছাড়াছাড়ি হয় তখনই যখন লিজি সঞ্জুকে বিবাহ করতে অনুরোধ করে। সঞ্জু তাকে অভিনেত্রীর জীবন ছেড়ে দিতে বললে সে বলে সে সঞ্জুর সব কথা শুনবে। তার আগে সঞ্জুর কাছে সে শুধু একটি কথা শুনতে চায়।

বইটি সম্পর্কে সমালোচনার যথেষ্ট কারণ আছে কিন্তু ভারতীয়টি মিথ্যা কথা বলে মিঃ বাকিংহামের কাছ থেকে টাকা নিচ্ছে এ সিদ্ধান্তে নান্দীকর এলেন কেমন করে? আমি এবং অন্য যারা এই বইটি দেখেছি তারা তো এর মধ্যে একটি ছোট আদর্শবাদী দলের পারস্পরিক ভালবাসা ও প্রীতির নিদর্শন দেখেছি যা সব দেশেই এক রকম। যেখানে ভারতীয় অভিনেতাটি সকরুণভাবে বলছে যে দল ছেড়ে যেতে তার মন সাড়া দিচ্ছে না কিন্তু পারিবারিক দায়িত্ব সে এড়াবে কি করে? সেখানে দর্শক মন সমবেদনায় অভিভূত হয়ে যায়। অর্থাভাব সত্ত্বেও মিঃ বাকিংহাম প্রতিশ্রুতি দেন টাকা তিনি দেবেন। দলপতি সব দেশেই একই রকম। ইংলণ্ডেও অপেশাদার নাট্যদলের অবস্থাও এর চাইতে আলাদা নয়।

ব্যক্তিগতভাবে বলতে পারি শেক্সপীয়রওয়ালা বিদেশে আমাদের মর্যাদা বাড়িয়েছে এবং ভারতীয় সেন্সর বোর্ড এর ওপর কাঁচি না চালিয়ে সুবুদ্ধির পরিচয় দিয়েছেন।

রাণী ঘোষ
লণ্ডন

অমৃত

ঢাকিরা ঢাক বাজায় খালে বিলে

সারাদেশ আজ উৎসবের আনন্দে মত্ত। এতদিনের আয়োজন প্রতীক্ষা আর প্রস্তুতির পূর্ণ পরিণতি হল বাঙালির দুর্গোৎসব। প্রতীক্ষাতেই যত আনন্দ। উৎসবের লগ্ন উপস্থিত হলেই মনের মধ্যে উঁকিঝুঁকি মারতে থাকে বিদায়ের দিনটি। অল্পদিনেই যেন সব ফুরিয়ে যায়। কাতরতা বাড়ে, আকুলতা ছড়ায় আকাশে বাতাসে। 'যেয়ো না নবমী নিশি' বলে সুর বাজতে থাকে। তবু সব বিচ্ছেদবেদনাকে ছাপিয়ে উৎসবের ঢাক বাজছে, কাছে এবং দূরে, শহরে এবং গ্রামে, বাংলাদেশে এবং বাংলার বাইরে। যেখানে বাঙালি আছে সেখানেই উৎসব, সেখানেই পরস্পরের প্রীতিসম্ভাষণ। এইদিনে আমরাও আমাদের পাঠক পাঠিকাদের এবং দেশের সকল মানুষকে আন্তরিক প্রীতিসম্ভাষণ জ্ঞাপন করি। উৎসব আনন্দময় হোক, দুঃখের দিন সীমায়িত হোক। মানুষের মনে প্রীতি ও সৌহার্দ্য গভীরতর হোক।

আমরা দেশকে জেনেছিলাম সুজলা আর সুফলারূপে, জেনেছিলাম শস্যশ্যামলা আর মলয়জশীতলা রূপে। এই রূপও উৎসবের রূপ। পরিপূর্ণতাই উৎসব। দুর্গোৎসব সেই পূর্ণেরই প্রকাশ। যাঁরা ধার্মিক তাঁদের কাছে এই উৎসব গভীর ধর্মপ্রেরণার উৎস। শক্তি ও মমতার প্রতীকরূপিণী মাতৃবন্দনা। যাঁরা শুধু সামাজিক মানুষ তাঁদের কাছেও এই উৎসব আনন্দের, তাঁদের বন্দনা মানববন্দনাতেই সুন্দর। এই দুই রূপেই দুর্গোৎসব বাংলাদেশে আবহমান কাল থেকে মানুষের কাছে নন্দিত। এবারে অনেক অনিশ্চয়তা আর অভাবের মধ্যে বাঙালির কাছে উৎসবের লগ্ন উপস্থিত হয়েছে। দেশের সেই শ্রী আর নেই। অন্নপূর্ণার ভাণ্ডার ফাঁকা। কবি একদিন তাঁর স্বপ্নদৃষ্টিতে দেখেছিলেন 'পারে না বহিতে নদী জলভার, মাঠে মাঠে ধান ধরে নাক আর'। আজ সেই নদীজলভার দেখা দেয় প্লাবনের রূপে, মাঠের সেই সোনার ধান হয় অজন্মা প্রেতে নেয় শুষে, নয়তো তা চলে যায় মুনাফালোভীর অন্ধকার গুহায় ক্ষুধার্ত মানুষের চোখের অন্তরালে। এইভাবে চলছে এবং তার মধ্যেই চলছে মানুষের বাঁচার সংগ্রাম। বিদ্যা, অর্থ, যশ, আয়ুর জন্য উৎসবের সময়ে ধর্মার্থী মানুষে দেবীর কাছে প্রার্থনা জানায়। কিন্তু সমাজে যে অবিচার বাসা বেঁধেছে তাকে দূর করার জন্য সামগ্রিক প্রচেষ্টা কোথায়? কোনো উৎসবই সার্থক হতে পারে না, যদি তাতে মানুষের শুভবুদ্ধির জাগরণ না ঘটে। অপরের পকেট কাটার জন্য উৎসব নয়। এর মধ্য দিয়ে আসবে পারস্পরিক সহযোগিতা, পরস্পরের ওপর নির্ভরশীলতা। সমাজ আজ যেন পরস্পর থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে যাচ্ছে। কৃষিনির্ভর সমাজে, সামন্তযুগের পরিবেশে মানুষের এত প্রত্যাশা ছিল না। দান-দক্ষিণার দ্বারা সাময়িকভাবে অভাবপূরণের ও বঞ্চিত মানুষের সন্তুষ্টিবিধানের চেষ্টা হত। এখন যুগ পাল্টেছে। কৃষির সঙ্গে যুক্ত হয়েছে শিল্পবিজ্ঞান। সামন্তযুগ গত হয়ে এসেছে ব্যক্তিস্বাধীনতাভিত্তিক গণতন্ত্রের যুগ। মানুষের প্রত্যাশাও বাড়ছে। কিন্তু সেই প্রত্যাশা পূরণের মতো সম্পদ আমরা অর্জন করতে পারিনি। যে সম্পদ আছে তাও সমবন্টন করতে গিয়ে হাতের কাছে পাওয়া যাচ্ছে না। তাই আজ ক্ষুধার্তের দেশে দেবী এসেছেন মানুষের মুখে হাসি ফোটাতে। আমরা প্রার্থনা করি, সত্যি সত্যিই যেন মানুষের মুখে হাসি ফোটে। এই অভাব অনটন দূর হয়ে যাক। বাংলার ঘরে ঘরে শারদোৎসবের আনন্দ চিরস্থায়ী হোক।

অন্যদিকে বাংলাদেশে একটা রাজনৈতিক অনিশ্চয়তার মেঘ ভারী হচ্ছিল পুজার পূর্বাহ্নে। এখনও তা আছে। তবে সংকটের মেঘ খানিকটা পাতলা হয়েছে। সাত মাসের যুক্তফ্রন্ট সরকারের মধ্যে মতানৈক্য অনেকবার ঘটেছে, আবার তা মিটে গেছে। এবারে মুখ্যমন্ত্রীর সঙ্গে মতানৈক্যটা গৃহবিচ্ছেদের মুখ থেকে কোনোরকমে ফিরে এসেছে। তবু আশঙ্কা কাটে নি। যদি পালাবদল ঘটেই তা যেন শান্তিপূর্ণভাবে ঘটে। গণতন্ত্রে মন্ত্রিত্বে আসা এবং মন্ত্রিত্ব ছেড়ে চলে যাওয়া দুই-ই স্বাভাবিক এবং দুই-ই প্রত্যাশিত। এর জন্য মতান্তর যত তীব্রই হোক, যত ন্যায্যই হোক তা যেন অনমনীয় মনান্তরে পর্যবসিত না হয়। সামাজিক অগ্রগতির জন্য সামাজিক স্বস্তি সর্বাগ্রে প্রয়োজন। বাংলাদেশ থেকে যেন সেই স্বস্তি বিলুপ্ত না হয়। উৎসবের দিনে এই প্রার্থনাই আমরা করি।

এখনো কানে বাজছে উৎসবের বাঁশির সুর। শোনা যাচ্ছে ঢাকের বাদ্যি। সব মিলিয়ে আকাশ-বাতাস মুখর। পুজামন্ডপে জড়ো হয়েছেন দর্শনার্থী নরনারী ও শিশু। এরা সাধারণ মানুষ। এরা স্বস্তি চায়, শান্তি চায়। এরা চায় অভাব-অনটন আর দুশ্চিন্তা থেকে মুক্তি। আমরা জানি এবারের দুর্মূল্যের বাজারে এদের অনেকেরই মুখে উৎসবের মিষ্টান্ন উঠবে না, অনেকে নতুন পোশাকও হয়তো কিনতে পারেনি। তবু উৎসবের দিনে সকলের সঙ্গে আনন্দে যোগ দেবার জন্য এরাও প্রস্তুত। আজ সকলেরই আমন্ত্রণ। উচ্চ-নীচ, ধনী-নির্ধন সকলেই উৎসব-মন্ডপে সমবেত হয়েছেন আনন্দের অংশ নেবার জন্য। আমাদের সামগ্রিক প্রার্থনায় এদের মন আনন্দে পরিপূর্ণ হয়ে উঠুক। আমরা যেন আগামীবারের উৎসবে সকলের মুখে হাসি ফোটাতে পারি: অভাব-অনটনের দিন যেন শেষ হয় আমাদের সকলের আন্তরিক প্রচেষ্টায়। সকলের শুভ হোক।

কবিতার ছবি

কৃষ্ণ ধর

ছবি কবিতার একটি রমণীয় উপকরণ। কিন্তু সব কবিই জানেন যে শুধু ছবি দিয়ে কবিতা হয় না। যেমন নিসর্গ কাব্যের একটি উল্লেখনীয় উৎসাহদাতা, কিন্তু কবিতার মুখ্য উৎসাহ মানুষ, তাঁর মন এবং আচরণ।

কবির সামনে দুটো জগৎ। একটি বাইরের, দৃশ্যমান বস্তুজগৎ। অন্যটি ভিতরের হৃদয়ের যেখানে বস্তুজগতের সমীকরণ ঘটেছে নিরন্ত। এই সমীকরণ ছাড়া কবিতার শরীর পূর্ণ হয় না। কবিতা শুধু আবেগ নয়, তা একটি শিল্প। এই শিল্প দিয়ে তৈরী হয় কবিতার প্রতিমা বা ফর্ম। এর মাল মসলা হল অনুভব যা দৃষ্টিগ্রাহ্য রূপ পায় ভাষার মাধ্যমে।

ভাষা একটি সামাজিক বস্তু। কোন নির্দিষ্ট দেশে তার কালের মানুষের চিন্তা ভাবনা ও ঐতিহ্য মিলিয়ে ভাষার দৃষ্টি। সামাজিক বিষয় বলেই ভাষার কতকগুলি সীমাবদ্ধতা থাকে। এই সীমাবদ্ধতা কবিরও।

অথচ কবিতা তখনই সত্যিকারের কবিতা হয় যখন তা শব্দের শরীরকে অতিক্রম করে অর্থের প্রতীকীরূপ ধারণ করে। শব্দ সামাজিক মানুষের পরিচিত এবং ব্যবহৃত। এই চেনা শব্দগুলিকে কখনো প্রতীক, কখনো সুর, কখনো বা চিত্রময়তার বিশিষ্ট অর্থে পূর্ণব্যবহার করে কবি তৈরী করেন একটি বিশেষ পরিবেশ, একে জাদুর পরিমন্ডলের সঙ্গে উপমিত করা যায়। এই জাদু-র বলে চেনা শব্দ এক অনাস্বাদিত রূপ, গন্ধ ও বর্ণ নিয়ে পাঠকের মনকে নাড়া দেয়।

আধুনিক কবিতাকে কোন কোন সমালোচক ভাস্কর্যের প্রতীকের সঙ্গে তুলনা করেছেন, সঙ্গীতের সঙ্গে নয়। সঙ্গীতে চিত্রকল্প বা ছবির প্রয়োজন হয় না। একটি ভাবনাকে অনির্বাচ্য গীতিময়তায় প্রকাশ করলেই তার আবেদন সহৃদয় মনে গিয়ে পৌঁছয়। আধুনিক কবিতায় সঙ্গীতের সঙ্গতি খুঁজতে যাওয়া বিড়ম্বনা। যদিও শেষার্ধে কবিতা সঙ্গীতই, ছবির মধ্য দিয়েই এই সঙ্গীত সৃষ্টি হয়। অনুভূতির জগতের বাসনালোকের কাদামাটি দিয়ে গড়ে ওঠে এই চিত্রকল্প। যা দৃশ্য, যা স্পর্শগ্রাহ্য। এই ছবি কোন আলাদা বিষয় নয়, দেখা যাবে যে কোন কোন কবিতা গোটাটাই একটি ছবি বা শুধু স্পর্শগ্রাহ্য নয়, অনুভূতির সরণি দিয়ে তার কাছে পৌঁছতে হয়।

আধুনিক কবিতার সঙ্গীতও তাই চিত্রধর্মী। বস্তুজগতের সঙ্গে কবিতার স্বতন্ত্রজগতের সামঞ্জস্য হবে চিত্রকল্পের সহায়তায়। এই চিত্রটি বোধগম্য হলেই পাঠক কবির নিজস্ব জগতকে নিজের বলে গ্রহণ করতে পারবেন। আদি সমাজে কবিতা ছিল জীবনের অনুকৃতি। আজকের কবিতা জীবনের আবিষ্কার ও বিশ্লেষণ।

প্রত্যক্ষ উপলব্ধি আধুনিক কবিতার মুখ্য দায়িত্ব, সাধারণ মানুষের প্রাকৃত চেতনায় আচ্ছন্ন মন সচেতনভাবে এই বস্তুজগতের অন্তর্নিহিত সত্যকে সর্বসময় বিচার করতে পারে না। কবির দায়িত্ব সেই প্রকৃত বস্তুকে নিজস্ব মননের গভীর দৃষ্টি দিয়ে উপলব্ধি করে স্পর্শগ্রাহ্য জগতে তুলে ধরা।

সেইজন্যই কবিতায় চাই নিত্য-নতুন বাহন-শব্দের বাহন, চিত্রের বাহন। কবি প্রসিদ্ধি বর্জন না করলে আধুনিক কবিতা পাঠকের মনকে নাড়া দিতে পারে না। ব্যবহৃত উপমা, অলঙ্কার ও শব্দ নতুন চিন্তাকে স্পর্শগ্রাহ্য করে তুলতে পারে না।

●

জীবনানন্দের একদিক

সরিৎ তোকদার

সৃষ্টি মাত্রই একক ও নিঃসঙ্গ। সন্ধ্যার পাখিদের ক্লান্ত ডানার মত কবি সযত্নে একটি বীজ মনের জমিতে রসে জারিত করে এক পরম লগ্নে, সেই শুভ মুহূর্তের অপেক্ষা করে যখন তা অঙ্কুরিত হবে। এই অঙ্কুরোদ্গম অপেক্ষা করে উপযুক্ত পরিবেশের। বীজ থেকে গাছ হবার পর তা' আর যেমন বীজের নয় সার্মগ্রিকভাবে প্রকৃতির অঙ্গ তেমনি কবিমাত্রই তার মনোরাজ্যে এক বিরল নিঃসঙ্গ মানসের অধিকারী। সুতরাং এককভাবে জীবনানন্দকে নির্জনতম কবি (ব্যক্তিকে) বলার সার্থকতা কতদূর তা' পুনর্বিবেচনার অপেক্ষা রাখে।

আমাদের দেশে, জনতা কোন প্রিয়জন বা জিনিসকে নিজস্ব একটা নামকরণের গন্ডীতে আবদ্ধ করতে না পারলে তৃপ্তি পায় না—হয়ত দেবদেবীর আধিক্য থেকেই এমনি মানসিকতার জন্ম। তাই প্রিয় কবিদেরও আমরা এমনি নামাবলী চাপিয়ে তৃপ্তি পাই—ভাবি ওতেই ভক্তির পরাকাষ্ঠা দেখানো হল। একবারও ভেবে দেখি না এতে সেই কবি সম্পর্কে নতুন করে ভাবনা করবার উৎসাহ স্তিমিত হয়, কবিতা যা' কিনা বেগবতী নদীর মত গতিময়তায় প্রাণোচ্ছল, তা' বদ্ধ জলার পঙ্কিলতায় সৃষ্টি করে। জীবনানন্দের কবি-মানস অন্য সব মহৎ কবির মতই কোন নির্দিষ্ট ভূমিতে আবদ্ধ থাকেনি—বারবার সময়ের পরিধি অতিক্রম করে গেছে, আর সেই জন্যই তাঁকে খুঁজতে হবে সামগ্রিকতায়।

জীবনানন্দ প্রকৃতিকে ভালোবেসেছেন। প্রকৃতি তার অকৃপণ দাক্ষিণ্যে যে সৌন্দর্য উজাড় করে দিয়েছে জীবনানন্দ তা' সমস্ত অন্তর দিয়ে গ্রহণ করেছেন। প্রথম যুগের কবিতায় এ ছায়া বারবার এসেছে স্পষ্টভাবে। 'ঘাসের ভিতরে ঘাস হয়ে জন্মাই কোন এক নিবিড় ঘাস-মাতার / শরীরের সুস্বাদ অন্ধকার থেকে নেমে।' কবি তাঁর ভাবাবেগ প্রকাশ করতে গিয়ে চিত্রের পর চিত্র সাজিয়েছেন, প্রকৃতির সমস্ত রহস্য স্বাচ্ছন্দভাবে অনুভূতির রাজ্যে নিয়ে এসেছেন—প্রকৃতির শব্দ, স্পর্শ, স্বাদ, গন্ধ সব-কিছুই কবিতার মধ্য দিয়ে প্রতিবিম্বিত হয়েছে। প্রসঙ্গত আর একটি কথা অত্যন্ত কৃতজ্ঞতার সঙ্গে স্মর্তব্য—কবিতার যে-ভাষার সঙ্গে আজ আমরা অতি পরিচিত—প্রাত্যহিকতায় ধূলিমলিন যে-সব শব্দরাজি আজ কাব্যলক্ষ্মীর কোলে ঠাঁই পেয়েছে তার সূত্রপাত করেছিলেন জীবনানন্দ—এবং যথার্থভাবে প্রয়োগ করেছেন আশ্চর্য কুশলতা দিয়ে। 'আমার পায়ের শব্দ শোনো; / নতুন এ,'—আর সব হারানো পুরানো।' 'মানুষ যেমন করে ঘ্রাণ পেয়ে আসে তার নোনা মেয়ে মানুষের কাছে—কিন্তু মহৎ কবি কোন নির্দিষ্টতাতেও আবদ্ধ থাকতে পারেন না—তাই জীবনানন্দও ফিরে এসেছেন আলোকিত স্বজনপ্রিয়তায়—

'পৃথিবীতে এই জন্মলাভ তবু ভালো।
মৃত্যু আছে, তবু সেই মৃত্যু ভেদ করে
উড়ে যাওয়া,
সূর্য নেই, তবু সেই অঘ্রানের সূর্যের
বিশ্বাসে।'

তাঁর কল্পনাপ্রিয় মন নব নব পরীক্ষা-নিরীক্ষায় ব্যাপৃত ছিল তাই তাঁর মধ্যযুগের কবিতার বিষয়ে অনেকে তাঁর বিরুদ্ধে অস্পষ্টতার অভিযোগ তুলেছেন। একটা কথা প্রথমেই স্বীকার করে নেওয়া ভালো, যে-কোন মহৎ কবি তার অভিজ্ঞতার মাধ্যমে সাধারণ মানুষের চেয়ে ঢের বেশী অগ্রসর। অভিজ্ঞতার ব্যবধান যতদিন না পূরণ হয় ততদিন কবি-পাঠকের সংযোগ সেতু রচিত হয় না। আর, এই অভিজ্ঞতার পূরণ হয় অভিনিবেশ ও অনুশীলন দ্বারা।

[কুন্তন।। শারদ সংকলন]

●

পটশিল্পে কালিঘাট

প্রদ্যোৎ ঘোষ

আজ আর কেউ কালীঘাটের পটের কথা বলে না। প্রতিদিন কালীঘাটে হাজার হাজার আবাল-বৃদ্ধবনিতার হয় সমাগম। কেহ দর্শনার্থে কেহ বা অর্ঘনিবেদনার্থে, বাড়ী যখন ফেরে তখন আনে প্রসাদী ফুল, গঙ্গাজল, গঙ্গামাটি, কেহ আনে নানা বর্ণে চিত্রিত শিব, দুর্গা, কালীর ছাপা ছবি। পার্বনে পার্বনে বাড়ে ভীড়। দূরদেশের যাত্রীদেরও নেই আসার বিরাম এ স্রোত বিরাম-বিহীন। পুণ্যার্থীরা আজ যাওয়ার সময় পটের কথা তোলে না। যদিও অনেকে

জানে না। এইখানে ঘটেছে একটা বিরাট শিল্পের উত্থান ও পতন। কালীঘাটের মন্দিরই তার নীরব সাক্ষী। বহু দশক নীরবতার পর আজ সুখের বিষয় কলা-রসিকদের মনে এর মূল্যায়ন সম্পর্কে সচেতনতার অবকাশ জেগেছে।

প্রায় দেড়শ বছর আগের কালীঘাটে দিনের আলোয় খানিকটা প্রাণচাঞ্চল্য দেখা দিত—দূরদেশের পুণ্যলোভাতুরা নর-নারীর ব্যস্ততাও উচ্চকণ্ঠে। কিন্তু সেই কালীঘাট প্রায়ান্ধকার প্রদোষে টিমটিম করে মাটির প্রদীপ এখানে ওখানে জ্বালিয়ে দিত। আঁধার যখন গাঢ় হয়ে জড়িয়ে ধরত ধরণীকে, মন্দিরের শঙ্খ-ঘন্টাধ্বনি যখন নীরব হয়ে রাত্রির গভীরতাকে বিশেষভাবে প্রকাশ করতো সেই নিস্তব্ধ নিশীথিনীতে দোকানের ঝাঁপ বন্ধ করে সেই সব নাম-না-জানা শিল্পীরা সানকি বা সস্তাদরের থালায় ভাত নিয়ে খেতে বোসত। ঘরে ছড়ানো থাকতো অযত্নে এখানে ওখানে সদ্য আঁকা বা অর্ধসমাপ্ত দু-একখানা পট। শীর্ণকায় প্রদীপের শিখা বুঝি ভাগ্যহত শিল্পীর মুখের দিকে চেয়ে থাকতো সকরুণভাবে. সেদিনকার ধূম্রনিঃশ্বাসী কালিমালিপ্ত ঘরের চেহারাই বুঝি শিল্পীর অন্তরধর্মের বহিঃপ্রকাশ হয়ে দেখা দিয়েছিল।

আজ বিংশশতাব্দীর পাদপীঠে দাঁড়িয়ে আছে কালীঘাট। তার চেহারার পটভূমিও হয়েছে আমূল পরিবর্তন। আজ সেখানে নেই সেই প্রদীপের সারি, ডাকে না প্রহরে প্রহরে খামঘোষ। তার পরিবর্তে বিজলী আলোকে চোখঝলসানো বিপণীশ্রেণী। ছবির দোকানে পট আজ নেই। মুদ্রণশিল্পের বলিষ্ঠ মুষ্ঠাঘাতে সে পটশিল্প পর্যুদস্ত। মাঝে যে শান্তরস মৃদুমন্দগতিতে প্রবাহিত হয়েছিল তাদের ছবির রংয়েই তার প্রকাশ পেয়েছিল।

আজ কালীঘাটের সেই মন্থর গতির পরিবর্তে এসেছে কল-কোলাহলময় জীবনের আবর্তসংকুল গতি। বিজলীর চোখঝলসানো আলোক ও কোলাহল শংখঘণ্টার সুমধুর-ধ্বনির শ্বাস করেছে রুদ্ধ।

আজ সেই পুরানো ইতিহাস বেদনার্ত হৃদয়ে বহন করে রয়েছে কালীঘাটের পটোপাড়া বা পটুয়াপাড়া। নামে পটো কিন্তু সেই পটোরা পট আজ আঁকে না। গড়ে দুর্গা, কালী, সরস্বতীর মূর্তি। কে জানে সেইসব পটোদের বংশধরেরা আজ কোথায়। কেবলমাত্র একটি বংশের খবর এখনও কালীঘাটের এক অন্ধকারাচ্ছন্ন গলিতে পাওয়া যায়। অতীতের সেই সব পটের জন্মদাতাদের নাম প্রায় অজানাই রয়ে গেছে। এ পর্যন্ত যতগুলো পাওয়া গেছে সেগুলো হচ্ছে নীলমণি দাস, বলরাম দাস, গোপাল দাস, পরাণ, কলাই বৈরাগী, বটকৃষ্ণ পাল, নিবারণ ঘোষ ও কালীচরণ ঘোষ।

আজ এখানকার আসর জমিয়েছে অনা-স্থানের মূর্তিশিল্পীরা। পট তারা আঁকে না। "পটো" আখ্যা এই সব মূর্তি-শিল্পীদের আছে বলে পটোপাড়ার অধিষ্ঠাত্রী দেবী অন্তরীক্ষ থেকে বিদ্রূপের হাসি হাসেন কিনা কে জানে?

ক'লকাতার বুকে ঘটল প্রায় এক-শতাব্দীর মধ্যে একটা বিরাট শিল্পের উদয় অস্ত।

অতীতের সেই সব পটের রেখার মধ্যে যে কত রূপ, কত ব্যঞ্জনা ছিল লুকিয়ে, তা সেদিন ছিল অজানা। নেহাত রোজগারের তাগিদেই তারা এঁকেছিল এই পটগুলো। মণিকে বদরীফল বলে লোকে মনে করেছিল তাই সেদিন তার ছিল না কদর। আজ জহুরী (?) চিনেছে তাকে। ধূলিমুঠি হয়ে গেছে সোনামুঠি। কালের বিচারে তার মূল্যমান হল নিরূপণ। তাদের স্বপ্নেরও অগোচরে ছিল যে এই সব সস্তা দরের (?) ছবি হয়ে উঠবে পরবর্তীকালে সমালোচনার বস্তু! সেদিন তাদের হয়নি মূল্যায়ন।

(চিত্র প্রসঙ্গ ॥ ২য় বর্ষ ১ম সংখ্যা)

●

মরমী শিল্পী তারাশঙ্কর

লক্ষ্মীকান্ত বন্দ্যোপাধ্যায়

মানুষের কথা ভাবতে গেলেই আসে সমাজের কথা। সমাজ ছাড়া মানুষের কোন

অনিবার্য কারণবশতঃ বর্তমান সংখ্যায় শ্রীঅচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্তের 'গৌরাংগ পরি-জন' প্রকাশিত হোলনা। আগামী সংখ্যা থেকে নিয়মিত প্রকাশিত হবে।

অস্তিত্ব নেই; দেশ ছাড়া সমাজেরও কোন অস্তিত্ব নেই। তারাশংকরেরই সমসাময়িক কালে বাংলাদেশে একটা বিরাট সাহিত্যের অভ্যুদয় ঘটেছে, যার সংগে বাংলাদেশের মাটির কোন যোগাযোগ নেই। আন্তর্দেশীয় বা আন্তর্জাতিক ভাবধারা আমাদের সাহিত্যিকদের মনে এমনভাবে বাসা বেঁধেছে যে, তাঁরা নগরজীবনকে কেন্দ্র করে যে জীবনের ছবি এঁকেছেন বা আঁকতে চেষ্টা করছেন তাতে মানবজীবনের বিচিত্র স্বরূপ উদঘাটিত হলেও বাংলাদেশের নিজস্ব সমাজের সত্যকার রূপ রয়ে গেছে অবহেলিত উপেক্ষিত। কাদা-মাটির পৃথিবীর বুকেই ফুল ফোটে। মাটির বুকের রসে পুষ্ট হয় ফুলের সৌন্দর্য। তারাশংকর ফুটে উঠেছেন মাটির বুকে বাংলাদেশের বাঙালীর একান্ত আপন জনের মতো। রবীন্দ্রনাথ যাকে একদিন আশীর্বাদ জানিয়েছিলেন আজ তিনি সত্যই সেই আশীর্বাদের যোগ্য বলে আপনাকে প্রমাণিত করেছেন। মাটির কাছা-কাছি কোন কবির বাণী লাগি' রবীন্দ্রনাথের যে প্রত্যাশা ছিল তা সার্থকভাবে পূরণ করেছেন কবি তারাশঙ্কর তাঁর অসংখ্য উপন্যাস ও গল্পে। তাঁর অধিকাংশ গল্প ও উপন্যাসের পটভূমিকা রাঢ় অঞ্চলকে কেন্দ্র করে বিস্তৃত হলেও তাতে মিশে রয়েছে সমগ্র গঙ্গা-হৃদি বঙ্গভূমির মাটির নির্যাস।

বাংলা দেশের জনসাধারণের একটা সুবৃহৎ শ্রেণী অন্ত্যজ নামে পরিচিত। বিভূতিভূষণ বাংলার নিসর্গ শোভার বর্ণনায় ঘেঁটু ফুলকে একটা বিশেষ মর্যাদা দিয়েছেন। বাংলা বন প্রকৃতির স্বরূপ প্রকাশে ঘেঁটু ফুলের বর্ণনা স্বকীয় ঐতিহ্যের গৌরবে ভাস্বর। বাংলার আদি বাসিন্দা অন্ত্যজ শ্রেণী তারাশঙ্করের সাহিত্যে ঠাঁই পেয়েছে নিজস্ব ঐতিহ্যে। ভারতবর্ষের সনাতন ঐতিহ্যের উপর সৃষ্টি হয়েছে রবীন্দ্রনাথের বিশ্বসাহিত্য; আর বাংলা দেশের আপন ঐতিহ্যের উপর গড়ে উঠেছে তারাশঙ্করের সাহিত্যজগৎ। জাতির নিজস্ব ভাবধারা এবং জাতীয় ভাবধারাকে যিনি সার্থক রূপ দিতে সক্ষম, তিনিই জাতির মর্মশিল্পী। বাংলাদেশের মূক জনতা মুখর হয়ে উঠেছে তারাশঙ্করের সাহিত্যে। বিশেষ কোন একটি নাম বা চরিত্র উল্লেখের অপেক্ষা রাখে না। সৎ, উদার বিবেকবান, ত্যাগী, পর-পকারী মানুষের চিত্র তিনি এঁকেছেন, আবার সমাজের শঠ, ক্রূর, লম্পট, কৃপণ, অবিবেকী, পরস্বাপহারী মানুষের চিত্রও চিত্রিত হয়েছে তাঁর সাহিত্যে। মানব-মনের বিচিত্র রহস্য অত্যন্ত নিপুণভাবে তিনি উদ্ঘাটন করেছেন। একদিকে বেদেনী, মজুরাণী, কৃষাণ রমণী, মধ্যবিত্ত বাঙালী ঘরের কুলবধূ আর নাচনেওয়ালী বাঈজী প্রতিটি চরিত্রই অত্যন্ত নিখুঁতভাবে ধরা দিয়েছে শিল্পীর তুলিতে। অপরদিকে রাজ-মিস্ত্রী, দিনমজুর, কৃষক, গ্রামের ডাক-হরকরা, ছন্নছাড়া বাউল, বেদে, ড্রাইভার প্রভৃতি নানান শ্রেণীর শিল্পীর ক্যানভাসে অত্যন্ত জীবন্ত রূপে ধরা দিয়েছে।

সাহিত্যিক শ্রেষ্ঠ সমাজকর্মী। আপন সমাজের প্রতি আপনার কর্তব্য সম্পর্কে তারাশঙ্কর পূর্ণমাত্রায় সচেতন। শিল্পী হৃদয়বান মরমী না হলে সত্যকার রূপ ফোটাতে পারেন না। ভাল কি মন্দ প্রতিটি চরিত্র তারাশঙ্করের হৃদয়ের স্পর্শে সঞ্জী-বিত। দেশের মাটিকে আশ্রয় করে দেশের সাহিত্য সৃষ্টি করতে পেরেছেন বলে তা সুদৃশ্য মূল্যবান বিদেশী খেলনার মত আমাদের আলমারীর শোভা বাড়াবার কারণ না হয়ে আমাদের মাথার উপাধানের পাশে ঠাঁই পেয়েছে। তারাশঙ্কর বাংলার জাতীয় সাহিত্যিক। বাংলাদেশ নতুন করে জেগে উঠেছে তাঁর সাহিত্যে। কোন একটি ফুল কোন একটি বাগানের নিজস্ব সম্পদ নয়; তারাশঙ্করের সাহিত্য কেবল বাংলাদেশেরই নিজস্ব নয়, তা যে ভারতবর্ষের তথা বিশ্বের পরম আদরের সামগ্রী, সেই পরিচয় এতদিন পরে বাংলাদেশের মানুষ জানতে পেরে আনন্দিত ও গর্বিত। জ্ঞানপীঠ পুরস্কার যে স্বীকৃতি বহন করে এনেছে, তা আগামী দিনের বৃহত্তর ও মহত্তর সম্ভাবনার দ্যোতক।

[ছন্দিতা।। আশ্বিন ১৩৭৪]

অবাক-গাঁয়ের মানুষ কি তুই ॥

অমিতাভ দাশগুপ্ত

অনেক দূরে বসতি তোর, কি করে এই পাড়ায় এলি,
রুপোলী চুল, সোনালী মুখ, গায়ে হরেকরঙের জামা,
হুইল হাতে সবুজ-চোখো কিসের খোঁজে সাত-গাঁ ছেড়ে
রুপোলী চুল সোনালী মুখ এতটা পথ উড়িয়ে এলি?

অবাক-গাঁয়ের মানুষ কি তুই, চলন-বলন সবি কি তোর
বাজীকরের ঘরের থেকে তালিম নেয়া, হাত নাড়ালে
পায়রা ওড়ে, ঝাড়লে রুমাল রুপোর টাকা রেজগি সিকি
গড়ায় ছড়ায়, কত অচিন
পাখির পালক বাবরি ঠাসা,
শরীরে বুনো দেশের গন্ধ, পায়ে বেতাল চলার ছন্দ
রুপোলী চুল সোনালী মুখ, কিসের খোঁজে এখানে এলি?

অথৈ নীল সমুদ্র ॥

গিরিজা গঙ্গোপাধ্যায়

ভয় হয়েছিল
এই যে মনটা এত বড় একটা নাড়া খেল
উঠবে কি এর তলা থেকে?

কাদা জলের দুর্গন্ধ বুদ্বুদ?
পচা শামুকের খোলা?
ভাঙা মেটে কলসীর কানা?
আর লেজ-নাড়ানো বেঙাচির পল্টন?

আঃ বাঁচলাম!
শ্বাস ফেলে বাঁচলাম!
ঐ বস্তুগুলো উঠলো না কিছুই।

উঠলো চিত্রিত শঙ্খ ও কড়ি;
উজ্জ্বল মুক্তা;
রজনীগন্ধার মত পুঞ্জিত ফেনা
যা ছুঁয়ে ছুঁয়ে ঝিলমিলিয়ে ওড়ে শাদা-ডানা
সিন্ধুসারসের দল;
আর—তার শাঁই শাঁই সাগরের গান!

মনের এঁদো ডোবাটাকে নাড়া দিয়ে
করে দিলে তুমি অথৈ নীল সমুদ্র।

পনেরো বছর ধরে তাকেই মনে রেখেছে কেতকী। মনের মধ্যে পুষে রেখেছে তার নাম, অনুচ্চারিত ভালোবাসা। অথচ দীর্ঘকাল পাশাপাশি থাকা। প্রায় একই সঙ্গে ওঠা-বসা, চলা-ফেরা তাদের। তবু কি মনের কথাটা ঘুণাক্ষরে জানতে দিয়েছে কেতকী?

কেবল মাঝখানের এই কটা দিনের ব্যবধান। অমন করে আচমকা ছাড়াছাড়ি না হলে বোঝাও যেতো না, পরস্পরের কাছে তাদের প্রয়োজনটা কত জরুরি। তারা কত আপন। যেন ব্যবধানটাই একজনকে অন্য-জনের কাছে পাইয়ে দিয়েছে। অনেকের মাঝ-খানে একা আর আলাদাভাবে থেকে-থেকে তারা বুঝে নিয়েছে নিজেকে। এখন নিজের সঙ্গেই বোঝা-পড়া করে একটা সিদ্ধান্তে পৌঁছুতে চায়। নইলে শুধু যে দেহ নিয়ে-কাল কাটিয়ে দেবে তেমন সাধ্য আছে কার? দেহটাকে আলগা আদর দিয়ে মাথায় তুলে রাখা আর মুখ-চোরা মনটাকেই টুঁটি টিপে জাহান্নামে পাঠিয়ে দেবার কথাও ভাবে না কেউ। অনিন্দ্য চায়, একটু বেশী করেই চায়, এই অসহায়, অভঙ্গ জটিলতার হাত থেকে কেতকী যদি নিজেই মুক্তির পথ খুঁজে নিতে পারে তো মন্দ কি? একটুও নাক গলাতে হল না ভেবে সে বরং আরেকটু খুশি হবে। একেবারে ঝাড়া হাত-পা নিয়ে ঘুরে বেড়াবে। স্বরচিত দুঃখের স্বাদ একা-একা প্রাণভরে উপভোগ করার তৃপ্তিতে ভরপুর হয়ে থাকবে। সংসারে মুণ্ডহীন দেহের মত মন নিয়ে অবরুদ্ধ এই যে অসহ্য টানাপোড়েন, অন্তত তার হাত থেকে রেহাই পাবে অনিন্দ্য।

মাঝখানে দুম করে একটা ছোটলোকের বিয়েঅলা মেয়েকেই ঘরে তুলে আনা ছাড়া আর কোনো অপরাধই করেনি সে। কিন্তু তার আগেও তো ছিল পাঁচটা বছর। তখন কি মনে পড়েনি কেতকীর? আজকের মত খোলাখুলি, বেপরোয়া কথা বলার সময় কিংবা সুযোগ ছিল না? পায়নি কেতকী? ভেতরে ভেতরে একজাতীয় হতাশা আর আফশোস তাকে ম্রিয়মাণ করে রাখে। কেমন কষ্ট হয়। নিজের জন্যে করুণা বোধ করে অনিন্দ্য।

"কেমন করে পাবো? তখন কি আজকের মত এতখানি পেকেছিলাম?"

অভিমানে ঠোঁট ফুলিয়ে সেই আগের মত কেঁদে ওঠার বদলে নিজেকে ভয়ানক পাকা আর বয়স্কা প্রমাণ করতে চেয়ে ঝাঁঝিয়ে ওঠে কেতকী। গম্ভীর হয়ে যায়। কদিন বাদে পরীক্ষায় বসতে হবে। সাধারণ মেয়ের পক্ষে উঁচুতে ওঠার একেবারে শেষ ধাপ। পাশ করা অসম্ভব হলে তার গোটা প্ল্যানটাই ভেস্তে যাবে। তখন মিথ্যে করেও প্রমাণ করা যাবে না, জীবনে পুরুষমানুষের ধরা-ছোঁয়ার বাইরে থেকেই সে সত্যি-সত্যি স্বাধীনভাবে বেঁচে থাকতে চায়, চেয়েছিল। সে বাঁচা সংসারে আর পাঁচটা সাধারণ খেটে-খাওয়া মেয়ের মত চিরন্তন হা-হুতাশ বুকে বয়ে বেঁচে থাকা নয়। ইতিমধ্যেই যে জীবন ও যৌবন সম্পর্কে কতগুলি তিক্ত আর বিবর্ণ অভিজ্ঞতা সঞ্চয় করে নিদারুণভাবে পোড় খেয়ে খাক্ হয়ে গেছে কেতকী। সে খবর তো অনিন্দ্য জানে না।

অভিভূতের মত তাকিয়ে থাকে খানিক। আশ্চর্য, মেয়েরা কত তাড়াতাড়ি বড় হয়ে যায়! আর সুযোগ পেলে বড় হবারও আগে লাভ করে চিরকালীন মেয়েলি পরিপক্বতা। কিন্তু কেতকী যেমন ছিল, যেখানে ছিল, সেখান থেকে একচুল নড়েছে কি কোথাও? ভেতরে-বাইরে একটুও কি অদল-বদল হয়েছে তার? নির্লজ্জের মত চেহারা দেখে। বয়সের ঢল নেমেছে দেহে। কাচের মত স্বচ্ছ হয়েছে মুখাবয়ব। উজ্জ্বল ভাসা-ভাসা দুই চোখে প্রখর দীপ্তি। বুদ্ধির, না বয়সের ঠিক ঠাহর করা যায় না। ফুলের পাপড়ির মত পাতলা ঠোঁট আর বাঁশির মত নাকের ডগার কাঁপন দেখে একটা অবর্ণনীয়, অর্ধ-পরিচিত দৈহিক যন্ত্রণা অনুভব করে অনিন্দ্য।

'তোর জন্যে আমার মায়া হচ্ছে কেতকী। ঠিক আজকের মত এতখানি বেপরোয়া না হলেও চলত। দশ বছর আগের সেই দিন-গুলি তো মুঠোর ভেতরেই ছিল তোর। এত কথা কোথায় ছিল তখন? আভাসেও যদি একবার মনের খবরটুকু জানবার সুযোগ দিতিস?'

চিন্তায়, বিষাদে আরো ক্লিষ্ট মনে হয় তাকে। সে যেন মুষড়ে পড়ছে ক্রমশ। ভেঙে গুঁড়িয়ে যাবে এক্ষুনি।

দেখে তৃপ্ত হয় কেতকী। সহসা আবিষ্কার করে, ভেতরে-ভেতরে সে ভীষণ রোগা হয়ে গেছে। মনে সুখ নেই? শান্তি নেই অনিন্দ্যর? মালতী তাকে একটুও

ভালোবাসে না বুঝি? আগেকার দিন হলে আরো খুশি হ'ত কেতকী। কিন্তু মালতীর মত একটা গেঁয়ো, মূর্খ মেয়ের ভাগ্যের কথা ভেবে ঈর্ষা হচ্ছে তার। সেই চিরন্তন মেয়েলি অভিমান। একটা জবরদস্ত, চাপা আর অহংকারী মানুষকে নিজের হাতে জায়েল করা গেল না। হাতের মুঠোয় পেয়ে মালতী আজ একাই যা খুশি, যেমন খুশি করবার, চলবার অধিকার খুঁজে পেয়েছে। সুখের কাঙাল জীবনটাকেই বিনাবাধায় ব্যর্থ, বিষময় করে দিতে পেরেছে।

ঠিক হয়েছে। গুরুগিরির ফল প্রায় হাতে-হাতেই পেয়ে গেছে অনিন্দ্য। যা তার প্রাপ্য ছিল, পাওয়া উচিত ছিল যা।

পর্দাটা টাঙানোই ছিল। এইখানে বসেই আকাশের অস্পষ্ট রেখা চোখে পড়ে। অনেক দূরে প্রায় দিগন্ত থেকে ভেসে আসা প্লেনের শব্দটা যেন ছাদ আর দেয়াল সমেত গোটা বাড়িটাই কাঁপিয়ে তোলে। বুকের ভেতরে গুড়ু-গুড়ু করে অনিন্দ্যর। কিছু একটা হতে পারে। এই মুহূর্তে চরম সর্বনাশ হয়ে যেতে পারে। অনিন্দ্য যেন সেই সর্বনাশের প্রতীক্ষায় বসে থাকে। দেহে-মনে শক্তি কিংবা সাহস বলতে কিছু নেই আর। কোথায় গাছপালার আড়ালে মুছ-রাঙার আর্তনাদ শোনা যায়। বাইরে দোপাটি-বেলের গা ছুঁয়ে মৃদু-মন্দ হাওয়া উঠে আসছে ঘরে। ভেজা মাটির সোঁদা গন্ধে শীতল হতে চাইল অনিন্দ্য। এইসব শব্দ-গন্ধ-বর্ণের ভেতরে এখনো বেঁচে থাকার সাধ যায়। বড়বেশী চেনা ছিল, বড়বেশী আপন হয়ে ছিল এই সব। আছে সব, সবাই নিজের জায়গায় স্থির হয়ে আছে। কেবল সে, অনিন্দ্য আজ দূরে সরে গেছে। পর হয়ে গেছে সকলের কাছে। নইলে আজ আর কেতকীর সরু-সরু আঙুলগুলি ছুঁয়ে থাকার সাধ তাকে কেন যে তেমন করে উষ্ণ, উদ্বেল করে না। তবু ইচ্ছে হয় বসে থাকার, চোখে চোখে মিলিয়ে চেয়ে থাকার। মনের বাসনাগুলি চিরকাল এমনি করেই তাকে শীতল, সংগোপন করে রাখে।

বড়বেশী গুমোট হয়ে উঠেছে আজ-হাওয়া। মেঘ জমেছে কি কোথাও? ভেতরে ভেতরে হাঁপিয়ে উঠেছে অনিন্দ্য। ঘরে থেকে বোঝার উপায় নেই। একবার বাইরে গেলে হত। এখন ঝম-ঝমিয়ে বৃষ্টি নামলে বেশ হয়। ঘামে ভেজা পাঞ্জাবিটাই বুকে পিঠে সেঁটে গেছে। কেমন টক-টক গন্ধ। অথচ কি মসৃণ মুখ কেতকীর। এক ফোঁটা ঘামের চিহ্ন নেই কোথাও। তাহলে একা অনিন্দ্যই ঘাবড়ে গেছে আজ? কেতকীর কিছু হয়নি? সে কেমন নিশ্চিন্ত, নির্বিকার। নিজের ওপরে রাগ হয়, দুঃখ হয়। আজ এই কেতকী তার হ'ত। তাহলেই কি সুখী হ'ত অনিন্দ্য? খটকা লাগে। স্ত্রী হয়ে ষোল আনা স্ত্রীত্বের দাবি জানিয়ে এই কেতকীই যে একদিন তাকে বিব্রত, অস্থির করে তুলত না সে কথাটাই হলফ করে বলার সাধ্য আছে কার? চোখ তুলে কেতকীর ঘাড়ে রাখে। মস্ত খোঁপাটা আধ-ভাঙা হয়ে এলিয়ে পড়ে আছে। খোলা কাঁধের ওপরে হাত রাখতে ইচ্ছে করে। শ্রী, ছাঁদ আগের চেয়ে বেড়েছে বরং। একদিন মনে মনে ভীষণ লোভ হত দেখে। ইচ্ছে হত এমনি আকণ্ঠ তৃষ্ণা নিয়ে অনন্তকাল পাশে বসে থাকার। অথচ ভয় ছিল, পাছে শ্রদ্ধা-ভক্তির আসন থেকে নিচে নেমে দাঁড়াতে হয়। কেতকীর কাছে ছোট না হলেও, যদি সমান-সমান হয়ে যেতে হয়। তাই নিজেকে নিয়ে পালিয়ে বেড়িয়েছে। লুকিয়ে-লুকিয়ে দেখেছে তাকেই। অন্তত দশ বছর আগে পর্যন্ত কেতকীর বড় হওয়ার ইতিহাস তার মুখস্ত। তারপর কোথা থেকে মালতী এসে আড়াল করে দাঁড়াল সব। কেবল ভাত-কাপড়ের বিনিময়ে তাকে দশ বছরে দুটো ছেলে-মেয়ের বাপ হবার ষোল আনা সুযোগ আর অধিকার দিয়ে যেন পা থেকে মাথা পর্যন্ত কিনে কায়েম করে নিয়েছে মালতী। ঘেন্না হয় ঘেন্না হয় এখন। মনের সমস্ত সাধ-আহ্লাদ চিরতরে ঘুচিয়ে দিয়েছে মালতী। ইচ্ছা রুচি, অভিমান সব এখন তার হাতধরা। অথচ পুরুষ হিসেবেই একদিন নিজেকে যথেষ্ট শক্তিমান, ভাগ্যবান মনে হ'ত অনিন্দ্যর। মেয়েরা কাছে এলে কিংবা মেয়েদের সামনে দাঁড়ালে গর্বে, গাম্ভীর্যে সে প্রায় আকাশের কাছে পেঁছে যেতো। তখন তার নাগাল পাওয়া ছিল ভার। কোথায় গেল সেই সব মেয়েরা। আর তাদের পিছু পিছু সুন্দর-সুন্দর এক-একটা দিন। সে এখন অন্যমানুষ। দেখে চেনা যাবে না, বোঝাও যাবে না, এক দিন তার বুকের ভেতরে আগুন ছিল। ক্ষমায়, প্রেমে, সহনশীলতায় আজ সে একেবারে নিস্তেজ, নিরহংকার, সাধারণ। যাকে সব দিয়ে বিশ্বাস করা চলে, কিন্তু দেহ দিয়ে ভালোবাসা যায় কচিৎ। অথচ দেহ থেকে মনটা যে আদৌ আলগা নয়, আলাদা নয়, ভাশুর আর ভাদ্দর-বধূ সম্পর্ক নয় তাদের সেই কথাটাই কে কাকে বোঝায়?

'তোর মনে ভীষণ কষ্ট না রে?'

'মন কি আর বেঁচে আছে? মরে ভূত হয়ে গেছে কবে!'

আফশোস করার বদলে কেতকী যেন গালাগাল দিতে চায়। আনমনা কথা বলতে বলতে কাগজের গায়ে একই বোঁটায় দুটো ফুল ফুটিয়েছিল। কী ভেবে হিজিবিজি আঁচড় কেটে সেই ফুলের অঙ্গ ঢেকে দেয়। হাই তুলে সারা দেহের আড়মোড়া ভেঙে আরেকটু সরে বসে। বলে, 'নিজের দিকে চেয়ে বুঝতে পারেন না, কী নিয়ে অটুট থাকে মন?'

এই মুহূর্তে কেতকীর চোখ থেকে অন্তত দু' ফোঁটা জল গড়িয়ে পড়বে ভেবেছিল অনিন্দ্য। গল্পে, নাটকে যেমনটি ঘটে থাকে চিরকাল। কিন্তু তাকে হতাশা করে মুখে-চোখে পুরুষালি ভঙ্গি ফুটিয়ে নিজেকে আরো কঠোর আরো কর্কশ করে তোলে কেতকী।

'এখন আর পাগল হব না কেতকী। আবোল-তাবোল কথা বলে আমাকে আর ক্ষেপিয়ে তোলা যাবে না। বয়স কি দ্রুত-গতিতে বেড়ে যাচ্ছে দেখতে পাচ্ছিসনে? এবার ছেড়ে দে আমি যাই।' কাতর কণ্ঠে সে যেন অনুনয় করে। কেতকীর কাছে প্রাণভিক্ষা চায়। কী হবে হৃদয় খুঁড়ে অকারণ নিজেকে রক্তাক্ত করে? যা হয়নি, তা হবে না।

'না!' প্রায় চেঁচিয়ে ধমকে কেতকী তাকে থামিয়ে রাখে। বলে, 'যাবো বললেই কি যাওয়া

যায়? আজ আমার অনেক কথা আছে আপনার সঙ্গে।'

পরীক্ষার পড়া আর হয় না। হবে না এখন। অনিন্দ্য এসে এলোমেলো করে দিয়েছে সব। আবার গুছিয়ে বসতে সময় নেবে। হয়তো অনিন্দ্য চলে যাবার পরেও বেশ কিছুদিন সময় পাবে না কেতকী। এবার যে গোড়া থেকেই পণ করে বসে আছে দুজন। দেখা হতেই পরস্পরের মন-মেজাজ বিগড়ে দিয়ে বসে আছে। আসলে আজ তারা কেউই ঠকতে নারাজ।

দেয়াল-ঘেঁষা লম্বা, টানা টেবিল। এক-রাশ আবর্জনার মতই কোণের দিকে বই-খাতা কলম সরিয়ে রেখে কেতকী উঠে দাঁড়ায়। খোলা জানলার পাশে এগিয়ে যেতে-যেতে অস্ফুট গলায় অভিযোগ আর আক্ষেপ মিশিয়ে বলে, 'সেদিন বলতে পারিনি। বয়েস অল্প ছিল তখন। মনে ভয় ছিল। কী জানি সত্যি কথাটা শুনেই যদি ক্ষেপে যান। চড়-চাপড় না লাগিয়েও হয়তো গুরুর মত উপদেশ ঝাড়তে শুরু করবেন। জ্ঞান হওয়া থেকে দেখে আসছি তো, বড় কথা ছাড়া, নীতি-বাক্য ছাড়া আপনার মুখে কিছু রোচে না। আপনি আমাকে ছেড়ে বাবার সঙ্গে গুরু-গম্ভীর বিষয় নিয়ে আলোচনা করতে পারলেই যেন খুশি হতেন বেশী। এদিকে আমি যে একটা মেয়ে আপনারই পথ চেয়ে বসে আছি, আপনার কথা ভেবে আপনারই জন্যে মরমে মরে যাচ্ছি সে খেয়াল যদি থাকতো।'

হাসে না কেতকী। হাসির কথাও নয়। কাঁদেও না। হাসি-কান্নার মাঝামাঝি একটা দম-আটকানো নিদারুণ যন্ত্রণার আভাস ফুটিয়ে তোলে মুখে। আজ বাস্তবিক তার জন্যে মায়া হয়। খাপছাড়া স্বভাব আর কৃতকর্মের জন্যে নিজের ওপরে হয় ভয়ানক রাগ। এই যদি কেতকীর মনে ছিল, সে তা টের পায়নি কেন? পেতে চায়নি বলেই কি পায়নি? অথচ দিব্যি অনাবাদী জমির মত মালতী এসে দখল করে নিলে তাকে। ক' বছরেই একেবারে নিঃস্ব হয়ে গেছে। সে। দেহে মেদ ছাড়া আর সবই গেছে শুকিয়ে। অথচ অনিন্দ্য তা চায়নি। ফুলে-ফলে পূর্ণ হতেই চেয়েছিল। জীবনে কেতকী এল না তাই। নইলে সব আশাই কি সফল হত না তার? অন্তত কিছু আশা?

'ছিঃ, অমন করে লোভ দেখাতে নেই কেতকী। গুরুজন হিসেবে মানতে না চাস, আমি এখনো তোর চেয়ে বয়সে বড়।'

এই সেই অনিন্দ্য, যার কন্ঠে এখনো অতীত খেলা করে। সুরে যথাসম্ভব গাম্ভীর্য মিশিয়ে সে আবার মহাপুরুষ বনে যেতে চায়। কিন্তু বিপন্ন মনে হয় তাকে। বয়স হয়েছে না? কালের হাতে দেহ-মন ভেঙেচুরে একাকার।

কথা বলে না কেতকী। মুখ কালো করে খানিক চেয়ে থাকে। শেষে কী ভেবে জানলাটা বন্ধ করে দেয়।

অন্ধকার ঘনঘোর হয়ে এল। বাইরে মেঘ জমছে ধীরে-ধীরে। এইবার বর্ষণ শুরু হবে। অনিন্দ্যর উঠে যেতে ইচ্ছে করে। কেতকীর হাত ধরে জন্মের মত বাইরে চলে যেতে। টের পায়, নিশ্চল দাঁড়িয়ে থেকে কেতকী তাকেই নিরীক্ষণ করছে, যা তার কাছে প্রত্যাশা করেনি কোনোদিন। দশ বছর আগে তো সে আর এতখানি সহজ, সরল, সাধারণ মানুষের মত ব্যবহার করেনি। এমন উদার, অকপট হতে চায়নি অনিন্দ্য। বরং ভেতরে-বাইরে নিজেকে অসাধারণ জটিল করে রাখার আপ্রাণ সাধনাই ছিল তার। ঘৃণা করেনি কেতকী। সেই দুর্দিনে দূরে থেকেই চোখের জলে পুজো করে গেছে তাকে। বাঙলা দেশের আর পাঁচটা আবেগসর্বস্ব মেয়ের মত সেও তো ছিল সাধারণ, অতি-সাধারণ। প্রেমের পরিণতি বিবাহ ছাড়া আর কিছুই যাদের মগজে ঠাঁই পায় না। পেলে ভবিষ্যৎ অন্ধকার হয়ে যায়। অবস্থা পাল্টে গেছে আজ, কেতকীও বদলে গেছে। নইলে এত কথা কোথায় পায়, কেমন করে বলে?

'পুরুষমানুষ চিরকাল মেয়েদের কাছে বড় থাকতে চায়। এইটে তাদের স্বভাব। কিন্তু বন্ধুত্বর ক্ষেত্রে বয়সটা কোনো সমস্যাই নয়।' অন্ধকারে সারা দেহ কাঁপিয়ে কাছে আসে কেতকী। দরজা না খুলে বেশ জোর গলায় চেঁচিয়ে শুনিয়ে দেয় সবাইকে, 'এ ঘরে যেন কেউ এসো না এখন। আমরা প্রাইভেট কথা বলছি।'

বাড়ির বড় মেয়ে। একমাত্র শিক্ষিতা মেয়ে। চারদিকের হাল-চাল দেখে-শুনেই সে যে একটা যাচ্ছেতাই কান্ড বাধিয়ে বসবে না, এটা ধরে নিয়েছে সবাই। সাতাশ বছর নির্বিচারে সকলের নির্যাতন, অবহেলা আর ঔদাসীন্য সয়ে গেছে। নির্বিবাদে মেনে নিয়েছে গোটা সংসারের অসংখ্য গোপন দাবী-দাওয়া। দুদিন বাদে আবার তার হাতেই প্রাণের দায় ছেড়ে দিয়ে নিশ্চিন্ত হতে চাইছে সবাই। সুযোগ পেলেও বিয়ে করে আলাদা সংসার পেতে সে যে আর কাউকে ঠকাবার, নিরাশ করার মতলব আঁটছে না তা জানতে কারো বাকি নেই। তাই ইচ্ছে না থাকলেও এইটুকু আবদার প্রায় মুখ বুজে মেনে নিচ্ছে সবাই। কখনো-সখনো মনের মানুষ কাছে এলে দুটো সুখ-দুঃখের কথা শুনে আর শুনিয়ে হাল্কা হবার অধিকার তারও আছে। তাছাড়া অনিন্দ্য তো ঘরেরই ছেলে।

রান্নাঘরে খুন্তি-কড়াইয়ের ঠোকাঠুকি শোনা যাচ্ছিল। চেঁচিয়ে বাড়িশুদ্ধ সবাইকে সাবধান করে দেয় প্রমীলা।

'এই রুবি ওদিকে যাসনে কেউ। বিরক্ত করিসনে ওদের। অনিন্দ্যকে এক কাপ চা করে দে-তো বেবি!'

আসলে চরম উৎকণ্ঠার ভেতরে প্রায় বিবর্ণ হয়ে থাকে তারা। কেমন ত্রস্ত, ভয়-ভয় ভাব। দিনকালের যা হাল। এখন একটু তেই অন্ধকার দেখে সবাই। সামনে ভবিষ্যতের ছবিটা তো আগের মত স্পষ্ট, উজ্জ্বল আর নেই। আগা-গোড়া ধোঁয়াটে হয়ে আছে সব। চেনা যায় না, বোঝাও যায় না কাউকে। বিশ্বাস করতে কষ্ট হয়। এমন কি কেতকীর মত আধা সুন্দরী, উচ্চশিক্ষিতা মেয়ের হাব-ভাব দেখেও মন কেমন করে। কোথা থেকে একটা সর্বনাশ ঘটে যাবে কবে। ভাবতে বসলে বুকের ভেতরে ঢিপ-ঢিপ করে প্রমীলার। একবার ধরলে হার্টের অসুখ কি আর সারে?

'হাত দেখতে পারেন?'

যেন এক্ষুনি নাটকের চরম মুহূর্তে পৌঁছে গেছে তারা। নাড়ী টিপে বলে দিতে হবে অনিন্দ্যকে, অমন সতেজ, সবল দেহের আড়ালে প্রাণ অটুট আছে কিনা। দীর্ঘ-দিনের বিরহের ধকল কাটিয়ে হৃদয় নিয়ে বাস্তবিক টিকে আছে কিনা।

অনিন্দ্য কেতকীর হাত চেপে ধরে। কোমল কণ্ঠে যথার্থ প্রেমিকের মত বলে, 'কী হয়েছে তোর কেতকী?'

'আমার ভালো লাগে না, কিচ্ছু ভালো লাগে না, কেবল মরে যেতে ইচ্ছে করে।'

'আমারই কি ইচ্ছে করে এভাবে বেঁচে থাকতে? তবু দ্যাখ দিব্যি হেসে-খেলে ঘুরে বেড়াচ্ছি। তুই-ও তেমনিভাবেই বেঁচে থাক।' অনিন্দ্য কেতকীর মাথায় হাত রাখে।

মেঘের মত একরাশ কালো, কোঁকড়ানো চুলের গভীরে ধীরে-ধীরে বিলি কাটে।

'বেঁচে থাক বললেই বুঝি বাঁচা যায়?'

'যায়। বেঁচে থাকাটাও একটা অভ্যাস। মরার চেয়ে সেটা বরং সহস্র গুণে ভালো। মরার মধ্যে তো কোনো রোমাঞ্চ নেই, আর্ট নেই। বরং বাঁচার ভেতরে তা সেন্ট পারসেন্ট আছে। যতক্ষণ বেঁচে থাকবি ততক্ষণই তুই বলতে পারবি কেমন করে বেঁচে আছিস? সুখ-দুঃখের স্বাদ কেমন। কিন্তু মৃত্যুর কোনো স্বাদ নেই। কারণ কেঁদে বোঝাবার নয়, হেসে দেখাবার নয়। তার স্বাদ নেই, বিস্বাদও নেই। বিশ্রী পানসে জিনিস।' মুখ বিকৃত করে পথের দুপাশে ভিড় দেখে অনিন্দ্য, জনস্রোত।

জায়গা বদল করে কেতকী। চলতি রিক্‌সার ভেতরেই ডাইনে থেকে বাঁয়ে সরে আসে অনিন্দ্যর। বিরক্ত হয় না, ভাবাবেগে চঞ্চল হয়ে ওঠে না সে। এইটুকু ছেলে-মানুষি মেনে নিতে হয়। পাশে বসার, কাছে পাবার এই দুঃসাহস কি কেতকীর আজকের? মনের মধ্যে কতকালের পুষে রাখা ইচ্ছে তার! অনিন্দ্য কোনো আশাই পূরণ করেনি। তার ইচ্ছে-অনিচ্ছের হদিশ রাখেনি।

'কেতকী!'

'উঁ।'

'সব কথা বলা হয়ে গেছে তোর?'

'আপনি কি ঘড়ি ধরে প্রেম করেন? ঘন্টা-মিনিট-সেকেন্ডের হিসেবে ভালোবাসা? তাহলে এতকাল মালতীকেই বরদাস্ত হচ্ছে কেমন করে?' কেতকী ফেটে পড়ে। ভেতরে জ্বালাটা অভিযোগের আকার নিয়ে একেবারে নগ্ন হয়ে বাইরে এসে দাঁড়াতে চায়।

'ওটা আমার প্রেম নয়, ভালোবাসাও নয়। বেঁচে থাকার মতই আরেকটা অভ্যাসের দাসত্ব। তোদের পাঁচমেশালি মনগড়া সুখ-দুঃখের হিসেবে যার সঠিক ব্যাখ্যা মেলে না।'

'আপনি কি মানুষ, না পাষাণ?' কেতকী এবার সত্যি-সত্যি কেঁদে ফেলে। স্থান-কালের চেতনা হারিয়ে গলা কেঁপে যায়, কথা-গুলি ছলছলিয়ে ওঠে। অথচ দুপাশে ভিড়। অগণিত বাস-ট্যাক্সি-রিক্‌সার দু-মুখো স্রোত। শহরতলীর সংকীর্ণতম পথ। সারা-দিন বৃষ্টি হয়ে গেছে। কাদায় কদাকার হয়ে আছে। মানুষ আর পশুতে মিলে চলেছে পাশাপাশি, ঘেঁষাঘেঁষি অভিযান। চেনা-জানা একটা চোখও কি পড়তে নেই, দেখতে নেই তাদের? অস্বস্তি বোধ করে অনিন্দ্য। কে জানে তার মনের কথাটাই শুনতে পায় কিনা কেতকী! হঠাৎ সে বেঁকে যায়, একে-বারে হাজার মানুষের হাটে বিদ্রোহ করে বসে। কাঁধ থেকে আঁচল টেনে মাথায় তুলে দিয়ে বলে, হল তো?'

'কী?' চমকে ওঠে অনিন্দ্য।

'বউ হয়ে গেলাম। এখন আর কেউ কিছু ভাববে না, বলবে না আমাদের।' কেতকী নির্ভয়, নির্বিকার, দ্বিধাহীন।

অনিন্দ্য গম্ভীর হয়ে যায়। সাতাশ বছর নির্বিঘ্নে পেরিয়ে এসে আচমকা এ কেমন খেয়াল কেতকীর। অবেলায় তাকে নিয়েই ছিনিমিনি খেলার সাধ! কই, অনিন্দ্য তো ভাবেনি, এমন করে তলিয়ে বুঝতে চায়নি তাকে। অথচ বুঝতে না চেয়ে তার চরম ক্ষতি হয়েছে ভেবে আফশোসও হচ্ছে না। এমন কি মালতীর সমস্ত আচরণের কথা ভেবেও হচ্ছে না। মনে-মনে ভীষণ অসহায় বোধ করে। অনেক দূরে পালিয়ে যেতে ইচ্ছে করে কোথাও। তাকে সুখী হতে দেবে না কেউ।

'অথচ বার-বার তোদের কাছেই আসতে চেয়েছি আমি। সেই আসা এমন করে আসা নয়। আমিও মানুষ।' অনেকক্ষণ চুপ-চাপ থেকে এবার যেন জবাবদিহির ভঙ্গিতে কথা বলে অনিন্দ্য। ঘরে-বাইরে ক্রমাগত যুদ্ধ করে করে সে আজ ক্লান্ত, বিধ্বস্ত, ম্লান। কথাটা সরলভাবে, সহজ ক'রে বুঝিয়ে দিতে চায়। বলে, 'আমার শুধু মন নিয়ে কারবার নয় কেতকী। মনের সঙ্গে দেহটাও রয়েছে। মন যদি এগিয়ে যেত, চায় দেহটা পিছিয়ে থাকতে নারাজ। তাই ভয় হয়। নইলে পুরনো পাপের প্রায়শ্চিত্ত করতেই তো আসা। না জেনে তোকে আঘাত করেছি, ঠকিয়েছি একদিন, সে কথা কি ভোলা যায়? মুখ ফুটে তুই কিছু না বললেও আমি আজ চুপ থাকতাম ভেবেছিস? তোকে নিয়ে আমারও তো জল্পনা-কল্পনার শেষ ছিল না। কিন্তু দেখা হতেই সব এলোমেলো করে দিবি জানলে আজকেও দেখা দিতাম না তোকে।'

মুখে আর কথা সরে না কেতকীর। কেমন অসাড়, বিহ্বল, হতচেতন মনে হয় তাকে। যতদূর এগিয়ে এসেছিল ঠিক তত-দূরেই পিছিয়ে পড়ে যেন। কান্না করে হার মানিয়ে অনিন্দ্যকে বশ করার সমস্ত চেষ্টাই কি ব্যর্থ হয়ে যাবে? কেতকী ভেবে পায় না। আর কোনো কৌশলের কথাই মনে পড়ে না এখন। নিজেকে সত্যি-সত্যি ছোট মনে হয়, তুচ্ছ মনে হয়। সাতাশ বছরেও যথার্থ সাবালিকা হতে সে পারে না। বা খেতে-খেতে বড় হওয়া তো নয়। আদরে-আদরে বেড়ে ওঠা। রক্তের ভেতরে ফেনিয়ে ওঠা সমস্ত কল্লোল এক ধমকে থামিয়ে দিয়ে এখন অনিন্দ্যর পায়ের তলায় লুটিয়ে পড়ে ঠিক শিশুর মতই চেঁচিয়ে কেঁদে ক্ষমা চাইতে ইচ্ছে করছে। যা সে ভেবেছিল তা নয়। অন্ধ কিংবা বধির হলে বরং ধরে নেয়া যেতো নিষ্প্রাণ নিরাবেগ একটা অসম্পূর্ণ অস্তিত্ব মানেই অনিন্দ্য। কিন্তু এতকালের সেই তিল-তিল অধ্যবসায় দিয়ে গড়ে তোলা স্বর্গ থেকেই তাকে টেনে নামিয়ে ঋতুচক্রে আবর্তিত রোদ-বৃষ্টি, ধুলো-বালির সংসারের মাঝ-খানে দাঁড় করিয়ে কিছু না বলেও বুঝিয়ে দিতে চায়, জাগতিক যাবতীয় সুখ-দুঃখ, ভালো-মন্দের বিচারে তারা কেউ ছোট কিংবা বড় নয়।

স্টেশনে পেঁছে গেলে কেতকীর মনে পড়ে যায়, প্রাণের কথাটাই এখনো বাকি। আরেকটু পরেই তো ঘন্টা বাজিয়ে ট্রেন ছেড়ে দেবে। বিচ্ছিন্ন হয়ে যাবে তারা। কতকাল পরে দেখা হবে আবার কেউই জানে না। হয়তো ততদিনে বুড়িয়ে যাবে, চিরদিনের মত নিঃশেষ হয়ে যাবে কেতকী অথবা অনিন্দ্য। কিংবা দুজনেই।

'ট্রেন থাক।'

'যেতে হবে না আমায়?'

'যাবেন। তার আগে আমি যে আপনাকে না জানিয়ে কত পাপ করেছি, আশা করেছি, স্বপ্ন দেখেছি সে সব কথা শুনে যেতে হবে।' এই যেন তার অন্তিম দাবী।

রিক্‌সা ছেড়ে দেয়। এবার পায়ে-পায়ে তীর্থযাত্রীর মত এগিয়ে গেল তারা।

আর নারী নয়, নদীর কাছে গেল অনিন্দ্য। সেখানে শুধু ঢেউ আর আবর্ত আর অন্তহীন ব্যাকুলতা।

'জানেন, এই দেহ নিয়ে ধনু কি কুৎসিত খেলা মেতেছিল? আমি বাধা দিতে পারিনি।'

'তারপর?'

'রঞ্জনকে আমিই মেরেছি। আমার জন্যে আত্মহত্যা করেছে সে।'

'এই শেষ?'

'না। আশা ছিল একদিন আপনি আমার হবেন।'

'আর?'

'এখন স্বপ্ন দেখছি।'

'কী?'

'মন্টুকে, আমার ছোট ভাইয়ের বন্ধু মন্টুকেই বিয়ে ক'রে, সংসার পেতে সুখী হবো। বয়সে ছোট বলেই ও আমাকে দেবীর মত ভক্তি ক'রে। কিন্তু কাঙালের মত এই হৃদয়হীন উচ্ছিষ্ট দেহটার দিকেই যে ওর লোভ তা আমি জানি।'

কিন্তু ততক্ষণে কেতকীর কণ্ঠ ছাপিয়ে কল-কল, ছল-ছল করে কোথা থেকে ঊর্ধ্ব-শ্বাসে ছুটতে-ছুটতে চলে এল দু-কূল ভাসানো বান। পৃথিবীর আদিমতম অন্ধ-কারে দাঁড়িয়ে সেই স্ফীত, ফেনিল উচ্ছ্বাসের দিকে মুগ্ধ বিস্ময়ে অপলক চেয়ে থাকে তারা। যেন সমুদ্র নিকট হচ্ছে ক্রমশ। সামনে সমুদ্র।

মানুষের শত্রু ক্যানসার

দীপ্তিময় দে

ক্যানসারের ভয়াবহতা মানুষকে ভাবিয়ে তুলেছে। এ রোগের কারণ সম্বন্ধে অনিশ্চয়তাই চিকিৎসার পথে খানিকটা অন্তরায়। তাই দেশ-বিদেশের বিজ্ঞানীরা চেষ্টা করে চলেছেন যাতে অন্যান্য রোগের মত এ রোগেরও সঠিক কারণ নির্ণয় করা যায়। এই গবেষণা পুরোপুরি সফল হলে চিকিৎসাও সুগম হবে। এর ফলাফল চিকিৎসকদের হাতে যতটা এসেছে বা ক্রমে ক্রমে আসছে তাকে মূলধন করেই তাঁরা এগিয়ে চলেছেন। আশা করা যায় সারা পৃথিবীর বিজ্ঞানীদের সমবেত চেষ্টায় অদূর ভবিষ্যতে মানুষের এই শত্রুর ধ্বংস অনিবার্য।

বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থার হিসেব অনুসারে সারা পৃথিবীতে ক্যানসার রোগে মৃত্যুর সংখ্যা ১৯৫০-৫২ সালে ছিল ২১,৭৫, ০০০ জন। ১৯৫৮-৬০ সালে তা বেড়ে দাঁড়িয়েছে ২৬,২৩,০০০-তে, প্রায় ২০ শতাংশ বেশী। মৃত্যুর কারণ হিসেবে হৃদ্‌পিণ্ডের রোগের পরই ক্যানসারের নাম করা যেতে পারে। পৃথিবীতে প্রায় ৫০ লক্ষ এমন লোক আছেন যাঁরা হয় ক্যানসারে আক্রান্ত হয়েছেন, চিকিৎসিত হচ্ছেন অথবা চিকিৎসায় সুস্থ হয়েছেন। অনুসন্ধানে জানা গেছে প্রতিটি ক্যানসার রোগাক্রান্ত লোক পিছু তিন-চারজন আক্রমণের পূর্বাবস্থায় আছেন।

সাধারণ মানুষের কাছে ক্যানসার হচ্ছে এক ধরনের অনিষ্টকর টিউমার যা শরীরের যে কোন স্থানে দেখা দিয়ে বাড়তে শুরু করে। আধুনিক বিজ্ঞানীরা অবশ্য ক্যানসারের কারণ অনুসন্ধানে শরীরের পেশীর মূল উপাদান কোষের ক্ষুদ্রাতি-ক্ষুদ্র পরিবর্তন লক্ষ্য করেছেন। তাঁদের গবেষণার প্রধান উদ্দেশ্য হচ্ছে সুস্থ ক্ষয়ের ও অবিনাস্তভাবে ক্ষয়িষ্ণু কোষের সংখ্যা বৃদ্ধির কারণ খুঁজে বের করা। এর জন্য পৃথিবীর বিভিন্ন বিজ্ঞানাগারে বিজ্ঞানীরা অবিশ্রাম চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছেন।

প্রমাণিত হয়েছে যে ক্যানসার কেবলমাত্র একটি রোগ নয়, কয়েকটি রোগের সমাবেশ। রাসায়নিক, প্রাকৃতিক ও অন্যান্য অনেক উপাদান থেকেই ক্যানসারের উৎপত্তি হয়ে থাকে। এতে ক্যানসার নিবারণের পথ কিছুটা সুগম হয়েছে।

গবেষণারত দেশগুলির বিজ্ঞানীরা বলেছেন যে, কোন কোন কর্কট রোগের কারণ ভাইরাস। আমেরিকায় কার্যরত পোলিশ চিকিৎসক ডঃ লুডউইক গ্রসও এই মত পোষণ করেন। ইনি ১৯৪৬ সালে ল্যুকোমিয়া রোগে আক্রান্ত হওয়ার প্রবণতা আছে এমন এক ধরনের ইঁদুর নিয়ে গবেষণা শুরু করেন। এই ইঁদুরের পেশীর রস নিয়ে তিনি ল্যুকোমিয়া প্রতিরোধ ক্ষমতাযুক্ত আর এক ধরনের ইঁদুরের শরীরে প্রবেশ করিয়ে দেখলেন ১৪টির মধ্যে ১২টিই ল্যুকোমিয়ায় আক্রান্ত হয়েছে। গ্রস এ থেকে অনুমান করেন ল্যুকোমিয়া ভাইরাসের মাধ্যমে ছড়িয়ে পড়ে। তিনি ধেড়ে ইঁদুর, ব্যাঙ, খরগোস, কুকুর ইত্যাদি অন্যান্য জীব-জন্তু নিয়েও গবেষণা চালিয়েছেন। এই সব জীবজন্তুর মধ্যে কোন কোন ধরনের কর্কট, বিশেষ করে, অনিষ্টকর রক্তের রোগগুলি সংক্রামক। অবশ্য পশু ও মানুষের ল্যুকোমিয়া অথবা অন্যান্য ক্যানসার রোগ একই ধরনের কিনা তা এখনও প্রমাণসাপেক্ষ। সম্ভব হলেও এ বিষয়ে আরও পরীক্ষা-নিরীক্ষার অবকাশ আছে। ভাইরাসকেই কেবলমাত্র ক্যানসারের কারণ বলে মেনে নেওয়া যায় না। কেননা দেখা গেছে আলকাতরা ও আর্সেনিকের মত রাসায়নিক উপাদান থেকেও ক্যানসারের উৎপত্তি হয়। এছাড়া হরমোন থেকেও ক্যানসার-এ আক্রান্ত হওয়া বিচিত্র নয়। এখানে বিশেষ করে বিচ্ছুরণের উল্লেখ করা যেতে পারে যা সময় বিশেষে ক্যানসার আক্রমণের কারণ ও নিবারণের উপায়। সবচেয়ে বড় কথা এখনও পর্যন্ত ক্যানসার-আক্রান্ত রোগীর শরীর থেকে কোন ভাইরাস পাওয়া যায়নি। গ্রস সাহেব অবশ্য বলেছেন, 'আমাকে মাত্র একটি যুক্তি দেখান যা প্রমাণ করে মানুষের দেহে ক্যানসার ভাইরাসের কীর্তি নয়, তখন আমি বুঝবো।'

বিখ্যাত ফরাসী বিজ্ঞানী প্রোফেসর জেন বার্নার্ড স্বীকার করেছেন যে ভাইরাসই ইঁদুরের কয়েক ধরনের ল্যুকোমিয়ার কারণ। উনি ক্যানসারের প্রতিষেধকের সম্ভাবনার কথাও বলেছেন। কয়েকটি ক্ষেত্রে উনি প্রতিষেধকের সাহায্যে ইঁদুরকে ল্যুকোমিয়ার হাত থেকে বাঁচাতে পেরেছেন। এখনও পর্যন্ত এসবই বিজ্ঞানাগারে সীমাবদ্ধ। এই গবেষণার ফল পশু থেকে মানুষের ক্ষেত্রে প্রযুক্ত হতে বিজ্ঞানাগারের টেস্ট টিউব থেকে হাসপাতালে পৌঁছুন পর্যন্ত অপেক্ষা করতে হবে।

শুধু ভাইরাসকেই ক্যানসারের কারণ হিসেবে মেনে না নিয়ে অন্যান্য বিষয়েও অনুসন্ধান চলছে। রোগীর শারীরিক অবস্থার সংগে জড়িত নানা বিষয়ের উপর পরীক্ষা চলছে। ল্যুকোমিয়া বংশানুক্রমিক কিনা তা বের করারও চেষ্টা হয়েছে। দু-একটি ক্ষেত্রে সে রকম দেখা গেলেও এ বিষয়ে প্রমাণ তেমন কিছু পাওয়া যায়নি।

প্রোফেসর বার্নার্ড ক্যানসার সংক্রান্ত গবেষণার বিষয় বলতে গিয়ে বলেছেন যে, যদি প্রমাণ করা সম্ভব হত যে এক ধরনের ভাইরাসই ল্যুকোমিয়ার কারণ অথবা অন্য কোন বিশেষ কারণে এ রোগের উৎপত্তি হয় তাহলে একে সুষ্ঠুভাবে মানুষের কাজে লাগান যেত। ভাইরাসের জাতকুল নির্ণয়ের পর প্রতিষেধক তৈরী করা কঠিন হত না। জন্মের পর যে সব শিশুর ল্যুকোমিয়ায় আক্রান্ত হবার সম্ভাবনা দেখা দেয় তাদের এই প্রতিষেধকের সাহায্যে রক্ষা করা সম্ভব।

১৯৫৪ সালে নুয়র্কের স্লোআন কেটারিং ইনস্টিটিউট-এ অনেক ঝুঁকি নিয়ে মানুষের উপর ক্যানসার সংক্রান্ত কিছু পরীক্ষা করা হয়েছে। ডঃ সাউথঅ্যাম-এর ডঃ লেভিন ১৫ জন স্বেচ্ছাসেবকের উপর এই পরীক্ষা চালান। এদেরকে কর্কট রোগাক্রান্ত রোগীর অনিষ্টকর টিউমার থেকে নেওয়া তাজা রসের ইনজেকশন দেওয়া হয়, এই সংগে বহুদিন ভুগছে এরকম কিছু ক্যানসারের রোগীকেও একই ইনজেকশন দেওয়া হয়। কোন ক্ষেত্রেই রোগের লক্ষণ বা বাড়াবাড়ি কিছু দেখা যায়নি। তবে দেখা গেছে রোগাক্রান্ত কোষগুলি অসুস্থ ক্যানসারের রোগীদের চাইতে স্বেচ্ছাসেবকদের সুস্থ শরীরে অনেক তাড়াতাড়ি মিলিয়ে গেছে। এতদিন যা অজানা ছিল মানুষের সেই প্রতিরোধ ক্ষমতা এতে প্রমাণও হয়েছে। আরও জানা গেছে যে ক্যানসার রোগীদের প্রতিরোধ ক্ষমতাও দুর্বল। কিন্তু একটা প্রশ্ন রয়ে গিয়েছিল যে ক্যানসার রোগীদের এই দুর্বলতা কেবল ক্যানসারের ক্ষেত্রেই সত্যি না অন্যান্য রোগের ক্ষেত্রেও প্রযোজ্য। নতুনভাবে আবার পরীক্ষা চালিয়ে দেখা গেল কেবল ক্যানসারের ক্ষেত্রেই এই ফলাফল পাওয়া যায়। এরপর এই পরীক্ষাকে আর এক ধাপ এগিয়ে নিয়ে যাওয়া হল। স্বেচ্ছাসেবকদের দ্বিতীয়বার ক্যানসার আক্রান্ত কোষের ইনজেকশন দেওয়ায় দেখা গেল যে দ্বিতীয় ইনজেকশনের পর ঐ অনিষ্টকর কোষগুলি প্রথমবারের চাইতেও তাড়াতাড়ি মিলিয়ে যায়। প্রমাণ হল শরীরের প্রতিরোধ ক্ষমতা প্রথম ইনজেকশন-এর পর বেড়েছে। Dr. Southam -এর Dr. Levin আরও প্রমাণ করেছেন যে কেবলমাত্র ক্যানসার আক্রান্তদের ক্ষেত্রেই ঐ রোগের বিরুদ্ধে প্রতিরোধ ক্ষমতা কমে যায়, অন্য রোগের রোগীর শরীরে সুস্থ মানুষের মতই তাড়াতাড়ি রোগাক্রান্ত কোষগুলি ধ্বংস হয়ে যায়।

ক্যানসারের উপর কাজ করছেন নানা দেশের অনেকগুলি সংস্থা জনসাধারণকে রোগের পূর্বলক্ষণ হিসেবে কতকগুলি বিষয়ে সতর্ক করে দিয়েছেন, যেমন—(১) বুকের খানিকটা জায়গা জুড়ে শক্ত হয়ে থাকা। পুরুষরাও বুকের ক্যানসারে আক্রান্ত হতে পারেন, যদিও সম্ভাবনা খানিকটা কম। (২) দেহের আঁচিল বা তিলে কোন পরিবর্তন। (৩) হজম শক্তির লক্ষণীয় পরিবর্তন। (৪) অনেকদিন ধরে কাশি ও গলাধরা চলা। (৫) শরীরের বিভিন্ন স্বাভাবিক ছিদ্রপথে রক্তপাত হওয়া। (৬) শরীরের কোন ফোলা জায়গা অথবা ঘায়ের স্বাভাবিক হতে দেরী হওয়া। (৭) অজানা কারণে ওজন কমে যাওয়া।

কিছুদিন আগে পর্যন্ত ক্যানসার শরীরে দেখা দেওয়ার পূর্বাবস্থায় ধরা না পড়লে চিকিৎসায় বিশেষ সাফল্য পাওয়া যেত না। বর্তমানে ঠিক সময়ে ধরা পড়লে

আধুনিক চিকিৎসায় সুস্থ হয়ে ওঠার হার অনেক বেশী। এ রোগের সম্বন্ধে জ্ঞান বাড়ায় সাধারণ লোক ও বিশেষ বৃত্তিজীবীদের ক্ষেত্রে এ রোগের প্রসারের কারণগুলি ক্রমে স্পষ্ট হয়ে আসছে। ক্যানসার প্রসারে সহায়তা করে এমন অনেক কিছু চারদিকে ছড়িয়ে আছে। এই সব বৃত্তিগত ও পারিপার্শ্বিক অবস্থাজানিত (দূষিত বায়ুমণ্ডল, ধূমপান ইত্যাদি) ক্যানসারের উৎসগুলি সম্বন্ধে ব্যবস্থা অবলম্বন করা প্রয়োজন। যা থেকে ক্যানসার হতে পারে এমন কয়েকটি কারণের একটি তালিকা বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা তৈরী করেছেন। নীচে সে বিষয়ে আলোচনা করছি।

মহামারী সংক্রান্ত অনুসন্ধানাদি থেকে জানা যায় যে, প্রখর সূর্যালোকের দেশগুলিতে ফর্সা লোকেদের চামড়ার, বিশেষ করে মুখে ও ঘাড়ে, ক্যানসার আক্রমণের সম্ভাবনা থাকে। চামড়ায় রঙ-এর তারতম্যের উপর এটা নির্ভর করে। এর হাত থেকে বাঁচবার উপায় হচ্ছে অতিরিক্ত সূর্যালোক না লাগানো এবং অতিবেগনী রশ্মির উৎস থেকে সাবধান থাকা। বিশেষ করে যে সব লোক এ বিষয়ে সংবেদনশীল ও যে সব ফর্সা লোকেদের রোদে থাকলে চামড়া তামাটে হওয়ার পরিবর্তে পুড়ে যায় তাদের ক্ষেত্রেই এ সতর্কতা প্রয়োজন। যাদের রোদে কাজকর্ম করতে হয় তাদের টুপি ব্যবহার করা উচিত। কয়েক ধরনের ক্রীমও এ ব্যাপারে ভাল ফল দেয়।

দেখা গেছে যেসব জায়গায় পান, তামাক ইত্যাদি চিবানোর রেওয়াজ আছে সেখানে মুখের ও গলার অনিষ্টকর টিউমারের আক্রমণ সংখ্যা বেশী। ভারত, সিংহল, বর্মা ও পাকিস্তানে পান খাওয়ার প্রচলন আছে। অবশ্য স্থান বিশেষে পান তৈরীর রকমফের আছে। কোন কোন জায়গায় পানে চুন, তামাক ও সুপারী দিয়ে খাওয়া হয় আবার কোথাও শুধু পান পাতাই খাওয়া হয়। তাই ক্যানসার প্রসারের তারতম্যও আছে। এটা স্থানবিশেষে পানের অনুপানের উপর নির্ভরশীল। রাশিয়ার অন্তর্গত মধ্য এশিয়ার রাজ্যগুলিতে খৈনির মত এক ধরনের নেশার প্রচলন আছে। এই খৈনি তামাক, চুন, ছাই ও মাখন দিয়ে তৈরী করে জিভের নীচে অথবা ঠোঁট ও দাঁতের মধ্যে রাখা হয়। ঐ সব জায়গায় ক্যানসারের আক্রমণ লক্ষ্য করা যায়। অবশ্য এ বিষয়ে বিভিন্ন জায়গায় পান তামাক ও খৈনি জাতীয় জিনিস নিয়ে গবেষণা করে দেখতে হবে। বিভিন্ন ধরনের অনুপান নিয়েও তুলনামূলক বিচার করে দেখতে হবে এদের সঙ্গে রোগাক্রমণের কতটা সম্পর্ক আছে। জনসাধারণকে এ সব নেশার কুফল সম্বন্ধে সচেতন হতে হবে।

অতিরিক্ত মদ্যপানের অভ্যাসও ক্যানসার আক্রমণের আর একটি কারণ বলে মনে করা হয়। মদ্যপানের আনুসঙ্গিক হিসেবে প্রয়োজনীয় খাদ্যের ঘাটতি ও অন্যান্য কারণও এ বিষয়ে উল্লেখযোগ্য।

ধূমপানের সঙ্গে ক্যানসারের সম্পর্ক একটি বহুল আলোচিত বিষয়। সাধারণভাবে মেনে নেওয়া হয়েছে সিগারেট খাওয়ার সঙ্গে ফুসফুসের ক্যানসারের সম্পর্ক আছে। অনুসন্ধানে জানা গেছে দৈনিক সিগারেট খাওয়ার সংখ্যার সঙ্গে ফুসফুসের ক্যানসারের ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক আছে। এ ছাড়াও দেখান হয়েছে যে, সিগারেট খাওয়া ছেড়ে দেওয়ার পর ক্যানসার আক্রমণের সম্ভাবনাও কমে আসে এবং ছাড়ার পর যত বছর যেতে থাকে সম্ভাবনাও তত কমতে থাকে। তামাকের মধ্যে যে আলকাতরা থাকে তাতে ক্যানসার আক্রমণে সহায়ক অনেক জিনিস আছে।

সম্প্রতি নুইয়র্কের ওয়ার্ল্ড কনফারেন্স অন টোবাকো অ্যান্ড হেলথ-এ প্রারম্ভিক ভাষণে সিনেটর রবার্ট কেনেডি বলেন—

> "Every year, cigarettes kill more Americans than were killed in World War II, the Korean War, and Vietnam combined. The cigarette industry is peddling a deadly weapon. It is dealing in people's lives for financial gain. Cigarettes would have been banned years ago were it not for the tremendous economic power of their producers".

আমেরিকান ক্যানসার সোসাইটির সহ-সভাপতি হ্যামন্ড এই সভাতেই বলেন যে, ২৫ বছর বয়সের একজন যুবক যদি দিনে ২৫টি করে সিগারেট খায় তবে তার আয়ু সমান বয়েসের ধূমপায়ী নয় এমন যুবকদের চেয়ে প্রায় ৮ বছর কম হবে। তাঁর মতে ধূমপায়ীদের আয়ু গড়ে ৬৫ বছর ৩ মাস যেখানে ধূমপায়ী নয় এমন লোকেদের আয়ু ৭৩ বছর ৮ মাস। তাছাড়া যারা ধূমপায়ী নয়, তাদের ৮৫ বছর পর্যন্ত বেঁচে থাকার সম্ভাবনা প্রায় তিন গুণ বেশী।

সিগারেট খাওয়ার সঙ্গে ক্যানসারের সম্পর্ক যদিও ভালভাবেই প্রমাণিত হয়েছে তাহলেও কয়েকটি বিষয়ে খটকা রয়েছে। কেননা দেখা গেছে সিগারেট ছাড়া ধূমপানের অন্যান্য উপায় যেমন পাইপ, চুরুট ইত্যাদির ক্ষেত্রে ক্যানসার আক্রমণের সম্ভাবনা অনেক কম। অবশ্য ধোঁয়া গেলার উপর হয়তো এটা খানিকটা নির্ভর করে। ফুসফুসের ক্যানসারের সঠিক কারণ নির্ণয়ে আরও পরীক্ষা-নিরীক্ষার অবকাশ আছে।

এটা স্পষ্ট যে ধূমপান বন্ধ করলে এর হাত থেকে রেহাই পাওয়া যাবে। কিন্তু রাতারাতি ধূমপান নিষিদ্ধকরণ সহজ নয়। তাই জনসাধারণকে বিশেষ করে যুবকদের ধূমপানের কুফল সম্বন্ধে সচেতন করে তুলতে হবে। আইন করে সিনেমা থিয়েটার হলে ও বাসে ট্রামে ধূমপান অবশ্য আগেই বন্ধ করা হয়েছে। সিগারেটের বিজ্ঞাপনের উপর কড়াকড়ি আরোপ করতে হবে। ধূমপান একেবারে বাতিল করতে না পারলে সিগারেট প্রস্তুত পদ্ধতির উন্নতি করা প্রয়োজন যাতে এর ক্ষতিকর জিনিসগুলিকে কমান যায়। সিগারেটে উন্নত ধরনের 'ফিলটার' ব্যবহারে অনেক সুফল পাওয়া যাবে আশা করা যায়। কেননা দেখা গেছে প্রচলিত 'ফিলটারও' তামাকের ক্ষতিকর আলকাতরা কমাতে যথেষ্ট সহায়তা করে এবং এতে ক্যানসার আক্রমণের সম্ভাবনাও খানিকটা কমে।

পাকস্থলীর ও আন্ত্রিক ক্যানসারের জন্য যে খাদ্যকেই দায়ী করা যায় এ অনুমান সত্য হলেও কারণ হিসেবে কোন বিশেষ বস্তুকে এখনও চিহ্নিত করা সম্ভব হয় নি। আমেরিকা ও অন্যান্য কয়েকটি দেশে পাকস্থলীর ক্যানসারের সংখ্যা কমে আসছে। মনে হয় সুসম খাদ্যের প্রাচুর্যই এর কারণ।

অতিভোজনের ফলে মোটা হয়ে যাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে পিত্তকোষের ক্যানসারের আশংকা থাকে। এ নিয়ে এখনও গবেষণা চলছে। প্রয়োজনের তুলনায় কম খাদ্য গ্রহণের সঙ্গে সাধারণতঃ ক্যানসারের আক্রমণ বা প্রতিরোধের সম্পর্ক নেই। তবে খাদ্যের মধ্যে বিশেষ বিশেষ কয়েকটি উপাদানের অভাব ঘটলে কয়েক ধরনের কর্কট রোগ দেখা দিতে পারে। যেমন সে সব এলাকার জলে আয়োডিনের অভাব থাকে সেখানে গলগণ্ডের ও স্বরযন্ত্রের তরুণাস্থির ক্যানসার দেখা যায়। পৃথিবীর কোন কোন অংশে যকৃতের ক্যানসারের প্রাদুর্ভাব আছে। এ নিয়েও অনুসন্ধান চলছে।

কলকারখানার ময়লা জল ও অন্যান্য কারণে পানীয় জলের উৎস দূষিত হয়। সাধারণতঃ পানীয় জল যে প্রণালীতে পরিশ্রুত করা হয় তাতে ক্ষতিকারক বিশেষ কতকগুলি রাসায়নিক পদার্থ ও রোগোৎপাদী জীবাণুমুক্ত করাই প্রধান। নানা রকমের রাসায়নিক পদার্থের জন্য ভিন্ন ভিন্ন পরিশোধনের ব্যবস্থা আছে। যা থেকে ক্যানসারের সূত্রপাত হতে পারে এমন সব জিনিসের শোধনের ব্যাপারে গুরুত্ব দিতে হবে। খাদ্য ও পানীয়ের তাপমাত্রার উপরও ক্যানসার আক্রমণ নির্ভরশীল। যদিও এ বিষয়ে জ্ঞান সীমাবদ্ধ। ইরাণের উত্তরাঞ্চলে, মঙ্গোলিয়ায়, রাশিয়ার অন্তর্গত মধ্য এশিয়ার রাজ্যগুলিতে ও দক্ষিণ আমেরিকার কোন কোন অঞ্চলে অতিরিক্ত গরম পানীয় জলা

াদ্যনালীর ক্যানসার দেখা যায় বলে অনু-
ান করা হয়।

খাদ্যবস্তুর সংগে ভেজাল ছাড়াও
্রয়োজনে অন্যান্য জিনিস মেশান হয়। এর
ধ্যে আছে রং, গন্ধ, ইমালসনের জিনিস,
চন নিরোধক ও কীটনাশক বস্তুগুলি।
। ছাড়া আছে তৈরী ও প্যাকিং করার সময়
য সব জিনিস খাদ্যের সংগে মিশে যায়
সগুলি। ফাংগাস থেকে বিপদের সম্ভাবনার
পরও নজর দেওয়া হচ্ছে। এ ব্যাপারে
ন্নত দেশগুলি অনেক দূরে এগিয়ে গেছে।
াদ্যের সংগে যে সব জিনিস সাধারণতঃ
মশান হয় সেগুলির প্রত্যেকটিকে পরীক্ষা
রে দেখে ক্যানসার সংক্রান্ত ব্যাপার
দাবাবহ কিছু পেলে তৎক্ষণাৎ তা বাতিল
রা হয়। এ ব্যাপারে সব দেশেই বিজ্ঞানা-
ারের রায়কেই সর্বাধিক প্রাধান্য দেওয়া
চিত।

মেয়েদের বুকের ক্যানসার সন্দেহাতীত-
াবে সন্তানহীনাদের মধ্যেই বেশী প্রকট।
নিক শ্রেণীর মধ্যেই সাধারণত এ রোগ বেশী
দখা যায়। অনেক ক্ষেত্রে দেখা গেছে
তনাদানকাল যত বেশী, ক্যানসার আক্র-
ণের সম্ভাবনাও তত কম। অবশ্য এ
ব্যাপারে পরস্পরবিরোধী তথ্যও পাওয়া
ায়, তাই এই প্রক্রিয়াকে বুকের ক্যানসার
নিবারণের উপায় হিসেবে সুপারিশ করা
ায় না।

প্রসাধন তৈরীর কাজে অনেক রকমের
রাসায়নিক পদার্থের ব্যবহার আছে। খাদ্য-
বস্তুতে ব্যবহৃত জিনিসগুলির উপর যতটা
নজর দেওয়া হয়েছে প্রসাধনের ব্যাপারে
ততটা নয়। কিন্তু বিপদের আশংকা দুটি
ক্ষেত্রেই প্রায় সমান। যে সব উপাদান এ কাজে
ব্যবহার করা হয় তার মধ্যে নানারকমের
রং রয়েছে। বিশেষ করে লিপস্টিক-এর রং
উল্লেখ করা যেতে পারে। প্রসাধনে ব্যবহার্য
অনেক জিনিস জন্তু-জানোয়ারের উপর
প্রয়োগ করে দেখা গেছে এতে ক্যানসার
রোগোৎপাদী অনেক জিনিস আছে। এবং
এতে এমন অনেক রং-এর চলন আছে যা
খাদ্যবস্তুতে ব্যবহার নিষিদ্ধ। খাদ্যবস্তুর
মত এ ব্যাপারেও কঠোর ব্যবস্থা অবলম্বনের
প্রয়োজন আছে।

বিজ্ঞানের উন্নতির সংগে সংগে আমাদের
গৃহস্থালীর ক্ষেত্রেও বিভিন্ন রাসায়নিক
পদার্থের ব্যবহার বেড়েছে। কীটনাশক ও
গৃহস্থালীতে ব্যবহার্য জিনিসপত্র পরিষ্কারের
জন্য যে সব উপাদান ব্যবহৃত হয় এদের
মধ্যে এমন কয়েকটি আছে যা ক্যানসার
প্রসারের পরিপ্রেক্ষিতে বিপজ্জনক। এ সব
জিনিস ব্যবহারে বিপদ কতটা তা বের করা
কষ্টসাধ্য। কারণ এগুলি তৈরীর উপাদান
বেশ জটিল এবং এদের মিশ্রণের সঠিক
বিবরণ অনেক সময়েই জানা যায় না। তাই
আইন করে এ সম্বন্ধে সব জ্ঞাতব্য তথ্য
প্যাকেটের গায়ে ছাপিয়ে দেওয়ার বন্দোবস্ত
করা প্রয়োজন। এবং এর নিরাপদ ব্যবহার
বিধিও দেওয়া উচিত। অপব্যবহারের ফলে
এ সব জিনিস থেকে শিশুদের আক্রমণের
ভয় সবচেয়ে বেশী।

চিকিৎসকদেরও কোন কোন বিষয়ে
সাবধান হতে হবে। অষুধের ব্যবস্থাপত্র
দেওয়ার সময় এর উপকারের ক্ষমতা ও
বিষক্রিয়ার সম্ভাবনা উভয়ের কথাই মনে
রাখতে হবে। ওষুধে ব্যবহৃত হরমোন,
আলকাতরা, আর্সেনিক ও জন্মনিয়ন্ত্রণের
খাওয়ার ওষুধ ইত্যাদি নিয়ে গবেষণা চলছে।
অস্ত্রচিকিৎসায় প্রয়োজনীয় কয়েক ধরনের
প্লাস্টিকও সন্দেহাতীত নয়। এ ব্যাপারে
আরও অনুসন্ধান প্রয়োজন।

শিল্পসংস্থানগুলি থেকেও বিপদের
ঝুঁকি কম নয়। কয়লা পরিশ্রুত করার
সময় আলকাতরা, পীচ, ক্রিয়োজোট, অ্যান-
থ্রাসিন, ভুসা কালি ইত্যাদি উৎপন্ন হয়। এ
থেকে চামড়া ও ফুসফুসের ক্যানসার
হওয়ার সম্ভাবনা থাকে।

আকরিক ক্রোমিয়াম ও নিকেল পরি-
শোধনাগারের কর্মীদের ফুসফুস ও শ্বাস-
নালীর ক্যানসার দেখা দেওয়া বিচিত্র নয়।

রঞ্জন রশ্মি ও রেডিও অ্যাকটিভ পদার্থ-
গুলির বিকিরণ থেকে চামড়া, হাড়, ফুসফুস
ও রক্তের ক্যানসার হতে পারে। অতিবেগনী
রশ্মির বিচ্ছুরণ কোন কোন ক্ষেত্রে চামড়ার
ক্যানসারের কারণ। অ্যাসবেসটসের কার-
খানার কর্মীদের ফুসফুসের ক্যানসার থেকে
সাবধান থাকতে হবে। আর্সেনিক থেকে
চামড়া ও ফুসফুসের ক্যানসারের ভয় থাকে।

আজকাল কলকারখানার কর্মীদের এসব
বিপদের হাত থেকে বাঁচাবার অনেক উপায়
উদ্ভাবিত হয়েছে। প্রয়োজনীয় সাবধানতা
অবলম্বন করলে এ ব্যাপারে চিন্তার কারণ
থাকে না। তাই দেখতে হবে কলকারখানার
মালিকরা যেন এ বিষয়ে যথেষ্ট সচেতন
থাকেন।

অনেকেই স্বীকার করেন যে, দূষিত
বায়ু থেকেও ফুসফুসের কর্কট রোগের
উৎপত্তি হয়। দেখা গেছে যে, শহর এলাকায়
গ্রামের তুলনায় ফুসফুসের ক্যানসারের হার
অনেক বেড়ে যাচ্ছে। ধূমপানের অভ্যাসের
তফাৎ অবশ্য আছে। কিন্তু এটাই বৃদ্ধির
একমাত্র কারণ নয়। শহরের দূষিত বায়ু-
মণ্ডলকেই এর জন্য দায়ী করা হয়।
বিজ্ঞানীরা এর হাত থেকে নিষ্কৃতি পাওয়ার
কিছু উপায় বার করেছেন। সেগুলি হল
(১) গৃহস্থালীর অন্যান্য জ্বালানী বাতিল
করে বিদ্যুৎ ও গ্যাসের ব্যবহার বাড়াতে
হবে। (২) কয়লা ও তেল ব্যবহারের জন্য
উন্নত ধরনের উনুনের প্রয়োজন। (৩) শিল্প-
সংস্থায় জ্বালানীর ব্যবহারকে ধূমশূন্য
করার ব্যবস্থা করতে হবে। (৪) ডিজেল
ইঞ্জিনের উন্নতিবিধান করে ধূমশূন্য করতে
হবে। অনেকে বলেন, ডিজেলের ধোঁয়া
পেট্রোলের চাইতে ক্ষতিকর। কিন্তু পরীক্ষায়
উল্টোটাই সত্যি বলে জানা যায়। (৫)
মোটরগাড়ীর ধোঁয়া বেরুবার যন্ত্রাংশের
উন্নতির প্রয়োজন। (৬) জলবিদ্যুতের ব্যবহার
বাড়াতে হবে। (৭) বিদ্যুৎ ও ডিজেলের
রেলগাড়ী চালান উচিত। (৯) শহর ও
কলকারখানার মধ্যে খানিকটা ফাঁকা জমি
থাকা চাই।

মানুষ না জেনে অনেক বিপদের সংগে
জড়িয়ে পড়ে। তাই বিপদ সম্বন্ধে সচেতন
হতে গেলে বিপদের কারণগুলিকে জানাতে
হবে। এবং সম্ভবপর ক্ষেত্রে সেগুলিকে
এড়িয়ে চলতে হবে। অনেক সময়ে বিপদের
সম্ভাবনা জানা সত্ত্বেও অনেকের মধ্যে একটা
বেপরোয়া ভাব দেখা যায়। এতে যে সব
সময়েই অনিবার্যভাবে বিপদ ডেকে আনবে
তার স্থিরতা নেই। কিন্তু এ বিষয়ে দ্বিমত
নেই যে, অসাবধানীরই বিপদের আশংকা
বেশী। এ বিপদে ঝুঁকি নেওয়ায় হিসেব-
নিকেশের অবকাশ আছে।

পাঠকের বৈঠক

প্রতিভা ও পরিবেশ (৩)

লেখকদ্বয় যে সমীক্ষার বিবরণ দিয়েছেন তাতে দেখা যায় আলোচিত ব্যক্তিগণ প্রায় অর্ধাংশ ক্ষেত্রে জনকজীবনে সাফল্যলাভ করতে পারেন নি। অসাফল্যের দিকেই তাঁদের প্রবণতা, কিন্তু সেই কারণে, তাঁদের সন্তানদের বিকাশলাভে অসুবিধা হয়নি। আর্থার কোয়েসলার তাঁর পিতৃদেবের বৈশিষ্ট্য বিশ্লেষণে বলেছেন :

"The financial heavyweights who have crossed my path, publishers, art-dealers, bankers, movie producers — have been without exception idiosyncratic, eccentric, irrational and basically naive individuals....Apparently the shrewd, cold calculating type is mainly to be found in the light and middle-weight categories of business".

আনাতোল ফ্রাঁসের পিতৃদেব সামান্য কৃষক থেকে পুস্তকবিক্রেতা হয়েছিলেন। তাঁর ব্যবহার ছিল অতিশয় শীতল, আর জননী ছিলেন নিউরোটিক, দিনরাত কাঁদতেন। এই দুই চরিত্রের মাঝখানে আনাতোলকে মানুষ হতে হয়েছে। ফ্রাঁসোয়া জোলা একটা খাল নির্মাণের কাজে যখন নিযুক্ত ছিলেন তখন হঠাৎ মারা যান, ফলে তাঁর স্ত্রী-পুত্র একেবারে নিঃসহায় অবস্থায় পড়েন। সিগমুন্ড ফ্রয়েডের বাবা যখন বললেন তিনি আর তাঁর ছাব্বিশ বছর বয়স্ক প্রতিভাধর পুত্রের খরচ দিতে পারবেন না তখন সিগমুন্ড অতিশয় বিরক্ত হয়েছিলেন। হেনরী ফোর্ড এবং চার্লস চ্যাপলিন দুজনেই অতি দরিদ্র ছিলেন ও পরে ধনী হয়েছেন, টাকাকড়ির ব্যাপারে তাঁদের নিদারুণ অরুচি।

আরেকটি বালকের পিতার জীবনে ছিল আশ্চর্য উত্থান-পতন। তিনি জন ডি রকফেলার।

মদ্যপ পিতৃদেবরা আরেক সমস্যা। যে চারশ পরিবারের সমীক্ষা সাধন হয়েছে তাদের মধ্যে মদ্যপ জনকের সংখ্যা কম নয়। একজন গবেষণা করে দেখেছেন খরা বা বন্যার জন্য উদ্বেগ যত প্রবল হয়েছে, মদ্যপানের প্রবণতা ততই বেড়ে উঠেছে। জর্জ বার্নার্ড শ'র পিতৃদেব সম্পর্কিত প্রতিক্রিয়া সর্বজনবিদিত। তিনি স্বয়ং জীবনে একবিন্দু মদ্য স্পর্শ করেননি, এমনকি ওষুধের সঙ্গেও নয়। তিনি বলেছেন—

"If you can not get rid of the family skeleton, make it dance".

বার্নার্ড শ'র পিতৃদেবের জীবন অসফল। এর ফলে জর্জ বার্নার্ড শ'র প্রকৃতি হয়েছিল অদ্ভুত, আসন্ন অসাফল্যের সামনে তিনি খিল খিল করে হাসতে পারতেন। শবযাত্রায় উপহাস করা তাঁর কাছে কিছু নয়। বার্নার্ড শ'র বাবা নিজে অবশ্য লজ্জাবোধ করতেন এবং পুত্রকে মদ্যপান-বিরোধী উপদেশ দিতেন। পুত্র কিন্তু গোপনে জেনে নিয়েছিলেন পিতার আসক্তি কোথায়।

কোনো কোনো পরিবারে প্রভুত্ব করেন কর্তা স্বয়ং, কোনো পরিবারে গৃহকর্ত্রী। ছেলেমেয়েরা সেখানে পড়ে প্রবল টানাপোড়েনে। এই সব সংসারে ছেলেমেয়েদের বিদ্রোহী হওয়ার সম্ভাবনা।

জওহরলাল নেহরু তাঁর পিতৃদেবের মেজাজ সম্পর্কে বলেছেন—

"His temper was indeed an awful thing, and even in after years I do not think I ever came across anything to match it"

স্বয়ং জওহরলালের মেজাজও সর্বজনপরিচিত। বিখ্যাত ইংরাজ সমালোচক জে মিডলটন মারে তাঁর আত্মজীবনীতে লিখেছেন—

"My manifest purpose in life was to be what he wanted me to be. The idea that a small human being might have needs of its own would have been confusing to his simple soul: therefore it gained no lodgement in it".

পিতা জন মারে সকাল আটটা থেকে রাত বারোটা পর্যন্ত কাজ করতেন। তিনি কিছুতেই বুঝতে পারতেন না, তাঁর পুত্র কেন সেইভাবে সমস্ত সময়টুকু পড়াশোনায় কাটাবে না।

মাও সে-তুং একবার এডগার স্নোকে কথাপ্রসঙ্গে বলেছিলেন :

"There were two parties in my family. One was my father, the Ruling Power. The opposition was made up of myself, my mother, my brother, and sometimes even the labourer".

মাও সে-তুং তাঁর বাল্যকালের এক চমৎকার চিত্র এঁকেছেন এইভাবে। মাও বাল্যে বৌদ্ধ ছিলেন, তাঁর মার ধর্ম ছিল বৌদ্ধধর্ম, আবার একবার কানফুসিয়াসের মন্দির পুড়িয়ে দিয়েছিলেন। তাঁর বাবা ছিলেন কানফুসিয়ান। মাও-এর বন্ধুরা বলেন, মাও সর্বদা বিয়ের পদ্য লিখতেন এবং অতিদ্রুত পঠনক্ষমতা ছিল তাঁর।

অসকার ওয়াইলড যখন সমকামিতার দায়ে অভিযুক্ত হয়ে কারারুদ্ধ হলেন, তখন তাঁর স্ত্রী ছেলেদের বোঝাতেন—

"Try not to feel harshly about your father. All his troubles arose from the hatred of a son for his father".

অসকারের পিতৃদেব প্রকাশ্য আদালতের বিচারে অপরাধী সাব্যস্ত হয়েছিলেন জনৈক মহিলার ওপর অত্যাচার করার দায়ে।

রিলকে পরিবারে পিতা পুত্রের সঙ্গে কথা বলতেন না, আর জননী মেরী ছিলেন এক নির্বিরোধ রমণী, অত্যন্ত ভাবাবেগগ্রস্ত, কল্পনাপ্রবণ মহিলা। রিলকের মার কাছে তিনি ছিলেন একটি মেয়ে। ও'র আগে যে বোনটি মারা যায়, জননী পুত্র রেইনারকে তার স্থলাভিষিক্ত করেন। মাথায় লম্বা লম্বা চুল, পরণে ফ্রক, তাকে ডাকতেন সোফি বলে। ঘর-সংসারের ঝাড়পোঁছের কাজ করতেন। সর্বদাই পুত্রকে নজরে নজরে রাখা হোত, পাছে ঠান্ডা লাগে, পাছে অসুখ করে। পিতা ছিলেন সৈনিক, অপেক্ষাকৃত নিচুপদে চাকরী নিয়ে প্রাণ ত্যাগ করেন, পুত্রের স্বাস্থ্যের কল্যাণে। এইরকম মেয়েলি-স্বভাবের কবি-কবি পুত্র তিনি পছন্দ করতেন না। ও'দের হল সৈনিকের বংশ। তাই তিনি ছেলেকে সামরিক বিদ্যালয়ে পাঠানোর জন্য জেদ করলেন।

এগারো বছর বয়সে রিলকের চুল ছাঁটা হল, মরদের পোষাক পরানো হল। পাঁচশ ছেলে ছিল ছাত্রাবাসে, তারা অতি নিষ্ঠুর ব্যবহার করল রিলকের ওপর। বিরক্ত করত, মারত। কোথাও তিনি শান্তিতে থাকতে পারতেন না।

শিল্পী তুলোস লত্রেকের খামখেয়ালী পিতা কাউন্ট তুলোস লত্রেক তাঁর পুত্রকে নিজের মতে মানুষ করার চেষ্টা করেছিলেন এবং লত্রেকের জীবন অতিশয় বেদনাময় হয়েছিল।

সিসিল ডে লুইসের পিতৃদেব ছিলেন একজন ধর্মযাজক। তাঁর যখন চার বছর তখন তাঁর মাতৃ-বিয়োগ হয়। তাঁর পিতা পুত্রকে অতিশয় যত্ন নিয়ে মানুষ করেন। তিনি সর্বদা তাঁকে বেশী করে খাওয়ানোর জন্য আগ্রহশীল ছিলেন। ডে লুইস তাঁর আত্মজীবনীতে লিখেছেন :

"Relying solely on my father for that spiritual infusion which a child can accept only from a parent and receiving from him the full force of a love which had nowhere else now to turn (since his wife's death) created

between us a bond of abnormal tension."

ক্লেপফারের বাবার মৃত্যুর পর তিনি খুশী হয়েছিলেন।

"I went home at once, prepared to live a newer and freer life".

এই জাতীয় অসংখ্য দৃষ্টান্তে গ্রন্থটি পরিপূর্ণ। দৃষ্টান্ত ও বিশ্লেষণ পদ্ধতি গ্রন্থটিকে বিশেষ আকর্ষণমূলক করে তুলেছে।

—অভয়ংকর

CRADLE OF EMINENCE — By VICTOR & MILDRED GOERTZEL : Published by Constable and Company Ltd., London : Price 35 Shillings'.

ভারতীয় ভাষায় পরিভাষা

গত ২৩শে সেপ্টেম্বর, ইণ্ডিয়ান সোসাইটি অব্ রেফ্রিজারেটিং ইঞ্জিনীয়ারদের আর্য সমাজ হলে আয়োজিত এক সভায় কেন্দ্রীয় শিক্ষা বিভাগের প্রতিমন্ত্রী শ্রী শের সিং এক ভাষণে মাতৃভাষাকে শিক্ষার সর্বস্তরে গ্রহণের জন্য অনুরোধ জানান। এই প্রসঙ্গে তিনি আরও বলেন, 'মাতৃভাষায় উচ্চশিক্ষার জন্য ভারতের সকল ভাষায় গ্রহণযোগ্য একটি পরিভাষা অভিধান রচনার কাজ ত্বরান্বিত করা প্রয়োজন। এই পরিভাষা অভিধান ত্বরান্বিত করে সাহিত্য, শিল্প, বিজ্ঞান ও চিকিৎসাবিদ্যায় উচ্চশিক্ষার জন্য গ্রন্থ রচনার কাজে এগিয়ে আসতে হবে।' এই কাজ দুই বছরের মধ্যেই শেষ করা হবে বলে তিনি জানান।

রবিবাসরের অনুষ্ঠান ॥

রবিবাসরের ১৮শ বর্ষের নবম অধিবেশন গত ২৪শে সেপ্টেম্বর অনুষ্ঠিত হয়। এই অনুষ্ঠানে পৌরোহিত্য করেন শ্রীযোগেশচন্দ্র রায়। বেঙ্গল মিউজিক কলেজের অধ্যাপক শ্রীপ্রসাদ সেন উদ্বোধন সঙ্গীত পরিবেশন করেন। রবিবাসরের সম্পাদক শ্রীসন্তোষকুমার দে সম্পাদকীয় বিবরণ পাঠ করেন। অনুষ্ঠানে স্বরচিত কবিতা পাঠ করেন সর্বশ্রী কালীকিংকর সেনগুপ্ত, শ্যামসুন্দর বন্দ্যোপাধ্যায়, সুধাংশুমোহন বন্দ্যোপাধ্যায়, দেড়কড়ি শর্মা, সৌরীন্দ্রকুমার দে এবং সন্তোষকুমার দে।

অনুষ্ঠানে 'আমাদের উচ্চারণ' বিষয়ে একটি প্রবন্ধ পাঠ করেন ডঃ বিজনবিহারী ভট্টাচার্য। ডঃ ভট্টাচার্যের প্রবন্ধের উপর আলোচনায় অংশগ্রহণ করেন ডঃ সুবোধচন্দ্র সেনগুপ্ত, চপলাকান্ত ভট্টাচার্য, মনোমোহন ঘোষ, কালীকিংকর সেনগুপ্ত, ডঃ আশুতোষ ভট্টাচার্য এবং ডঃ শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়। বাংলা ও হিন্দিতে একই শব্দ দুই প্রকার বানানে লিখিত হয় এবং বাংলাতে কিভাবে অনেকগুলি স্বরবর্ণ ও ব্যঞ্জনবর্ণ ব্যবহারে অচলিত হয়ে এসেছে। এ ছাড়াও দেখা যাচ্ছে, বহু প্রকার নতুন স্বরের আমদানি হওয়ায় আধুনিক বাংলা উচ্চারণের লিখিত রূপ যে সম্যকভাবে একটি সাধারণ সূত্র অনুসরণ করছে না, এ বিষয়েও সভায় আলোচনা হয়।

আখতার শিরানি : একজন প্রখ্যাত উর্দু কবি ॥

একালের উর্দু কাব্য সাহিত্যে আখতার শিরানি একটি স্মরণীয় নাম। প্রেমের কাব্য রচনায় তিনি চিরকালীন উর্দু সাহিত্যে একটি স্বতন্ত্র স্থান অধিকার করে নিয়েছেন। শুধু মাত্র প্রেমকে নিয়ে কাব্য রচনা করে আধুনিক সাহিত্যে বৈশিষ্ট্য অর্জন করা খুবই কঠিন। শ্রীআখতার এই দুরূহতাকেও জয় করতে সমর্থ হয়েছেন। উর্দু সাহিত্যে প্রেমের অমর কবিতা লিখেছেন মীর ও গালিব। এ সত্ত্বেও কিন্তু উর্দু কবিতার প্রধান ধারা ক্লাসিক রীতির দিকে। আনিম সামান্য রোমান্টিক পরিমন্ডল সৃষ্টি করতে সমর্থ হয়েছিলেন। এ ছাড়া, শাদ, নাজির আখবেরাবতী ও হালিও কিছুটা এই পরিমন্ডল সৃষ্টি করেছিলেন। ইকবালের কবিতা ছিল বিপ্লবধর্মে উজ্জ্বল।

আখতার শিরানি তাঁর কবিতায় কোনও দার্শনিক প্রত্যয় বা মতবাদ প্রচারের জন্য সচেষ্ট হয়ে ওঠেননি। এমন কি সমকালীন জীবনচেতনাও তাঁর কবিতায় বিশেষ কোনও প্রভাব বিস্তার করেনি। ব্যক্তিগত জীবন, প্রেম বা অন্যান্য অভিজ্ঞতাই তাঁর কবিতাকে দিয়েছে প্রাণাবেগ। তাঁর একটি কবিতায় তিনি লিখেছেন—

"জল দিল না সম্ভলতা থা,
আউর ইশাক মাচুলতা থা,
আরমানোঁ কি ঘাটোঁ মে,
উন চাঁদনি রাঁতো মে।"

শিরানি অনেক সঙ্গীতও রচনা করেছেন। তাঁর সঙ্গীতগুলোর একটি বৈশিষ্ট্য এই যে, এতে তিনি বহু ফার্সী প্রবাদ ব্যবহার করেছেন। তাঁর অনেক গান পাঞ্জাবী "মুশায়ারা" ধরনের। প্রেমই তাঁর কবিতার প্রধান উৎস। "মুঝে তুমসে প্যায়ার কুন হ্যায়" বা "অহ ইশাক কাহি লে চল" কবিতা দুটি তাঁর কবিতার উৎকৃষ্ট নিদর্শন। তাঁর কবিতার নিদর্শন হিসেবে একটি অংশ এখানে উল্লেখ করা যাচ্ছে—

"জো তুম সে কর গয়া মেহরুম
আশমান নে মুঝে
ম্যায় তপানি উমর পে সার্ফ-এ
গমেহা কর লুঙ্গা,
কিথি হাসে কে মাসুম ইসো ম্যায় আখতার,
জোয়ানি ক্যায়া হ্যায় ম্যায় সব কুছ
তভা কর লুঙ্গা॥"

বিভিন্ন চিত্রকল্পের মাধ্যমেই তিনি তাঁর কবিতাকে ফুটিয়ে তুলতে চান। ফলে, অত্যধিক চিত্রকল্প ব্যবহার তাঁর কবিতার মাধুর্য কোথাও কোথাও ব্যাহত করেছে। যাই হোক, তৎসত্ত্বেও তিনি আধুনিক উর্দু কাব্য জগতে একটি বিশিষ্ট নাম। বাংলা সাহিত্যের পাঠকদের সঙ্গে তাঁর পরিচয় তেমন নয়। বাংলায় এখনও পর্যন্ত তাঁর কোন কবিতা অনূদিত হয়েছে, বলেও জানা নেই।

একটি হিন্দি পত্রিকা ॥

হিন্দিতে কি কি গ্রন্থ লিখিত হচ্ছে এবং হিন্দি সাহিত্যের বিভিন্ন খবরাখবর নিয়ে দিল্লি থেকে একটি পত্রিকা প্রকাশিত হয়। পত্রিকাটির নাম "গ্রন্থ সমাচার"। প্রকাশ করেন দিল্লির "রাজমহল" প্রকাশন সংস্থা। এই পত্রিকাটি একদিক থেকে খুবই উল্লেখ্য। বাংলাতেও এই ধরনের দু-একটি পত্রিকা প্রকাশিত হয়। বিভিন্ন ভারতীয় ভাষায় এই ধরনের আরও পত্র-পত্রিকা প্রকাশিত হলে ভারতীয় সাহিত্য সম্বন্ধে উৎসাহী পাঠকদের সুবিধা হবে বলে আশা করি।

মাসিক তামিল কবিতা পত্রিকা ॥

তামিল ভাষায় প্রকাশিত একমাত্র মাসিক কবিতা পত্রিকা "কবিথাই"-এর বর্তমান সংখ্যাটি খুবই উল্লেখযোগ্য। পত্রিকাটির ষষ্ঠ বর্ষ সম্প্রতি পূর্ণ হয়েছে। মাদ্রাজ থেকে প্রকাশিত এই পত্রিকাটি সম্পাদনা করেন শ্রীভির্জিনি। এই পত্রিকাটি একটি বাংলা কবিতা সংখ্যা প্রকাশের জন্য উদ্যোগী হয়েছেন।

পাঁচ বছরের মধ্যে পাঠ্য পুস্তকের অনুবাদ ॥

কেন্দ্রীয় শিক্ষা-মন্ত্রণালয়ের রাজ্যমন্ত্রী শ্রী শের সিং এক সাংবাদিক সম্মেলনে জানিয়েছেন, স্নাতকোত্তর পাঠ্যপুস্তক অনুবাদ ভারতীয় ভাষায় প্রকাশ সম্পূর্ণ করতে, মোটামুটিভাবে পাঁচ বৎসরই যথেষ্ট। এই কাজে সত্তর কোটি টাকা ব্যয় করা হবে। তিনি আরও বলেন, ভারতীয় ভাষায় শিক্ষা দিবার ব্যবস্থা কার্যকরী না হওয়া পর্যন্ত জাতীয়মুক্তি অসম্ভব। প্রকাশন সংস্থার মাধ্যমে এই অনুবাদের কাজ করা হবে।

হালের মার্কিন লেখক ॥

মার্কিন লেখকদের যে তরুণ সম্প্রদায়ের শাখাটি ধীরে ধীরে নতুন রীতির রচনা-বৈশিষ্ট্যে নিজেদের বহুবিতর্কিত ও ক্রুদ্ধ বলে চিহ্নিত করতে সক্ষম হয়েছেন তাঁদেরই রচনার বিশেষ এক সংকলন সম্প্রতি বেরিয়েছে। বইটির নাম : 'দি নিউ রাইটিং ইন ইউ এস এ।' সম্পাদনা করেছেন ডোনাল্ড অ্যালেন ও রবার্ট ক্রিলি। এই লেখকদের প্রত্যেকেই তিরিশের অর্থনৈতিক বিপর্যয়ের মধ্যে তাঁদের কৈশোর অতিক্রম করেছেন। লেখকদের মধ্যে আছেন রবিন ব্লেজার, এডোয়ার্ড ডর্ন, অ্যালেন গিন্সবার্গ, জন অ্যাশবেরি, ফ্রাঙ্ক ওহারা, হিউবার্ট সেল্বি প্রভৃতি। দ্বিতীয় মহাযুদ্ধোত্তর বিতর্কিত মূল্যবোধ এই অনতিতরুণদের করেছে ব্যর্থ, হতাশ ও দরিদ্র। এঁদের অস্তিত্বের প্রথম জাগরণের কাল ১৯৫৬ সাল। সানফ্রান্সিসকোতে গিন্সবার্গের

পরলোকে বরদা উকিল

গত ২রা অক্টোবর দিল্লীর উইলিংডন হাসপাতালে মস্তিষ্কে রক্তক্ষরণে আক্রান্ত হয়ে শিল্পী বরদা উকিলের মৃত্যু হয়। বাংলার বাইরে নব্যভারতীয় শিল্পকলা'র প্রচার, একটি শিল্পীগোষ্ঠীর পরিচালনা এবং অল ইন্ডিয়া ফাইন আর্টস এন্ড ক্র্যাফট্‌স সোসাইটির প্রতিষ্ঠার জন্যে তিনি ভারতের শিল্প-আন্দোলনের সহায়তা ও শিল্পীদের কৃতজ্ঞতা অর্জন করেন। সংগঠক হিসেবে তাঁর ভূমিকা সকলেই মনে রাখবেন। রফি মার্গে অল ইন্ডিয়া ফাইন আর্টস এবং ক্র্যাফট সোসাইটির বৃহৎ প্রদর্শনী-গৃহ তৈরী তাঁর অন্যতম কাজ। ভারতের অধিকাংশ প্রবীণ ও নবীন শিল্পীদের সঙ্গে তাঁর ঘনিষ্ঠ পরিচয় ছিল। দিল্লীর নাগরিকদের শিল্প-চেতনার সহায়ক হিসেবে তাঁর নাম স্মরণীয় হয়ে থাকবে।

'হাউল' তখন অশ্লীলতার জন্য বিচারাধীন। 'বিট্‌'-সম্প্রদায় নামটি তখনই জন্ম নিল। ...কিন্তু 'বিট্‌'রা আজ এতোটাই প্রতিষ্ঠিত যে তাঁদের রচনার টীকাসহ সংস্করণ বিশ্ব-বিদ্যালয়ে স্থান পেয়েছে। অবশ্য বর্তমান সংকলনের সব লেখকই তাই বলে 'বিট্‌' সম্প্রদায়ভুক্ত নন। অনেক সমালোচকেরই মতে রবার্ট ব্লাই, স্নডগ্রাস ও রাইট-এর মতো কবিদের আলোচ্য সংকলন থেকে বাদ দেওয়াটা ঠিক হয়নি।

একজন অবহেলিত লেখিকা ॥

গার্ট্রুড স্টাইন লেখিকা হিসেবে যতোটা ক্ষমতার অধিকারী তাঁর রচনার ঠিক ততোটা পাঠক কোনদিনই তাঁর কপালে জোটেনি। প্রথমত, প্রথানুযায়ী তিনি লেখেন না—যদিও অনেক প্রখ্যাত লেখকের উপরই তিনি অসামান্য প্রভাব ফেলেছিলেন। সম্প্রতি বেরিয়েছে তাঁর 'দি অটোগ্রাফি অব অ্যালিস্ বি টোক্‌লাস'। নিজের জীবনের কয়েকটি মর্মস্পর্শী অধ্যায় তিনি সুচারু-সম্মতভাবে বর্ণনা করেছেন।

স্টাইনের জীবন বৈচিত্র্যময়। প্যারিসের তরুণ লেখক ও চিত্রকরেরা তাঁর ঘরেই জমাতেন আড্ডার আসর। টক্‌লাস এই সময় হন তাঁদের বিশেষ বন্ধু। স্টাইন এই টক্‌লাসের জবানীতেই নিজের আত্ম-জীবনীটি রচনার পরোক্ষ ভঙ্গী নিয়েছেন। প্যারিসের জীবনযাত্রার কাহিনী আলোচ্য গ্রন্থে সন্নিবিষ্ট হয়েছে। পিকাসো, মাতিস, হেমিংওয়ে প্রমুখ বিশ শতকের প্রখ্যাত ব্যক্তিদের সাহচর্য লাভ করার তাঁর কাহিনী ঐতিহাসিক গুরুত্বে লাভ করতে সক্ষম হয়েছে। শিল্পকর্ম ও চিত্র সম্পর্কে নানা মূল্যবান মন্তব্য আলোচ্য বইটির গুরুত্ব বাড়িয়েছে। বিখ্যাত লেখক ও চিত্রকরদের সঙ্গে পরিচয় প্রসঙ্গ ও স্টাইনের কৌতুক-প্রবণতা পাঠকদের আকর্ষণ করে। অনেকেই হয়তো জানেন না যে পিকাসো স্টাইনের একটি পোর্ট্রেটও এঁকেছিলেন। এইভাবে অনেক ফরাসী চিত্রকর ও লেখক সম্প্রদায়ের মধ্য দিয়েই স্টাইন পৃথিবীর শিল্পজগতের রাজধানীর এক অন্তরঙ্গ পরিচয় তুলে ধরেছেন। তাঁর প্রথম উপন্যাস 'দি থ্রি লাইভস্‌'।

পরলোকে তরুণ কবি ॥

ক্যারিবিয়ান সাহিত্যের কয়েকজন তরুণ কবিকে নিয়ে ইতিপূর্বে আলোচ্য বিভাগে আমরা কয়েকটি আলোচনা করেছিলাম। এই তরুণ কবিদের মধ্যে অন্যতম ছিলেন উইলিয়াম জে হান্ট। বিগত ২৭ আগস্ট দীর্ঘ রোগভোগের পর মাত্র ২৯ বছর বয়সে এই তরুণ কবি পরলোকগমন করেন তাঁর জন্মভূমি ত্রিনিদাদ অঞ্চলে। এ পর্যন্ত একটি কাব্যগ্রন্থেরই তিনি রচয়িতা। সে বইটির নাম 'ইট্‌ ওয়াজ রেনিং ইন্‌ দি মিডো'।

গোটে সোসাইটির বার্ষিক সম্মেলন ॥

গোটে সোসাইটির বর্তমান বছরের অধিবেশন সম্প্রতি অনুষ্ঠিত হয়ে গেল জার্মানীর ওয়েমার অঞ্চলে। সম্মেলনের সমাপ্তি ভাষণ দিয়েছিলেন অধ্যাপক ওয়ার্নার হিসেনবার্গ। ১৯৩২ খৃষ্টাব্দে হিসেনবার্গ পদার্থবিদ্যার জন্য নোবেল পুরস্কার পেয়েছিলেন। গোটের প্রকৃতি-অনুভাবনা এবং বিশ্বের বৈজ্ঞানিক ও প্রযুক্তিবিদ্যাই ছিল তাঁর আলোচনার বস্তু। ওয়েমার রিসার্চ এবং কোয়েমেমোরেটিভ ইনস্টিটিউটের ডিরেক্টর অধ্যাপক হেলমাট হল্টজেওয়ার উক্ত অনুষ্ঠানে 'দি ওয়েমার আর্ট লাভার্স'-এর বিষয়ে মনোজ্ঞ ভাষণ দান করেন। অধ্যাপক ফ্রিৎজ্‌ মার্টিনির পরি-চালনায় 'গোটে ও রোমান্টিসিজম' বিষয়ে একটি বিতর্কসভা ছিল সভার আকর্ষণ। বার্লিনের অধ্যাপক আলেক্স বি ওয়ার্নার সোসাইটির সভাপতি পদে পুনর্নির্বাচিত হন।

শারদ সাহিত্য

সাহিত্যের মাসিক পত্রিকাগুলির মধ্যে 'চতুষ্কোণ' স্বতন্ত্র বৈশিষ্ট্যময়। সম্পাদনায় এদের রুচি একটি বিশিষ্ট ধারায় প্রবাহিত। গল্প কবিতা প্রবন্ধ নিয়ে প্রতি মাসে নিয়মিত প্রকাশিত হয়ে থাকে। বর্তমান সংখ্যায় অনেকগুলি মূল্যবান প্রবন্ধ লিখেছেন প্রবোধচন্দ্র সেন, সুধাকর চট্টোপাধ্যায়, তারাপদ মুখোপাধ্যায়, নন্দগোপাল সেনগুপ্ত, নীলরতন সেন, নৃপেন্দ্র গোস্বামী, মনোরঞ্জন রায়, সুধীরকুমার করণ, নেপাল মজুমদার, দেবীপদ ভট্টাচার্য, নীরদচন্দ্র রায়, সুনীলকুমার নন্দী, বিনয় সিংহ এবং প্রফুল্লচন্দ্র দাশগুপ্ত। কবিতা লিখেছেন মণীন্দ্র রায়, দক্ষিণারঞ্জন বসু, কৃষ্ণ ধর, সৌমিত্রশংকর দাশগুপ্ত, সুশীল রায়, গৌরাঙ্গ ভৌমিক, গণেশ বসু, অমিতাভ চট্টোপাধ্যায় এবং আরো অনেকে। গল্প লিখেছেন নরেন্দ্র পাল, ব্রজেন্দ্রকুমার ভট্টাচার্য, বশীর আলহেলাল, অশোককুমার সেনগুপ্ত, দেবেন্দ্র রায়, সত্য গুপ্ত, ধর্মদাস মুখোপাধ্যায়, মিহির আচার্য, গৌরী ঘটক, ভবেশ গঙ্গোপাধ্যায়, ছবি বসু, উষারঞ্জন ভট্টাচার্য এবং রামরমণ ভট্টাচার্য।

এই সুসম্পাদিত উন্নতরুচির পত্রিকাটি বিদগ্ধ সমাজে সমাদৃত হবে।

চতুষ্কোণ (আশ্বিন ।। ১৩৭৪)—সম্পাদকমণ্ডলী সম্পাদিত। ৭৭।১ মহাত্মা গান্ধী রোড। কলকাতা—৯। দাম—দুই টাকা।

●

জীবনধর্মী মাসিক পত্রিকা 'শ্রীমতী' নানা আকর্ষণীয় রচনায় সমৃদ্ধ হয়ে প্রকাশিত হয়েছে। সচিত্র রঙিন সুদৃশ্য এই পত্রিকাটি বাঙলাভাষী পাঠক সমাজে বিশেষভাবে সমাদৃত। বর্তমান বৎসরের শারদীয় সংখ্যায় চারটি সুবৃহৎ উপন্যাস লিখেছেন প্রেমেন্দ্র মিত্র, জ্যোতিরিন্দ্র নন্দী, সমরেশ বসু এবং জনমেজয়। গল্প লিখেছেন বনফুল, বিমল কর, নরেন্দ্রনাথ মিত্র, শিবরাম চক্রবর্তী, আশাপূর্ণা দেবী, শান্তনু দাস, সমর বসু, হরেন ঘোষ, অমল শূর, সুধীন্দ্র ঘোষ। মোপাসাঁর একটি গল্প অনুবাদ করেছেন মলয়কুমার বন্দ্যোপাধ্যায়। কয়েকটি বিচিত্র স্বাদের বড়গল্প লিখেছেন হরিনারায়ণ চট্টোপাধ্যায়, আশুতোষ মুখোপাধ্যায়, আভা পাকড়াশী, শৈলজানন্দ মুখোপাধ্যায়। কবিতা লিখেছেন দীনেশ দাস, মণীন্দ্র রায়, দক্ষিণারঞ্জন বসু, দুর্গাদাস সরকার, শামসুল হক, স্বদেশরঞ্জন দত্ত, মৃণাল বসু চৌধুরী, শংকর দে, অতীন রায়চৌধুরী, রত্নেশ্বর হাজরা, মলয়শঙ্কর দাশগুপ্ত এবং আরো কয়েকজন। নীলকণ্ঠ, মেঘনাদ, অনিল মিত্র, স্বামী রামানন্দ গিরি, মিত্রেন, অর্ণব সেন, রবীন্দ্র ঘোষ, জয়া দেবী, দেবব্রত গুপ্ত, নীলিমা চক্রবর্তী, সুচিত্রা সেন, বিমল রায়, তাপস ব্যানার্জি চলচ্চিত্র এবং অন্যান্য কয়েকটি বিষয়ে লিখেছেন। পত্রিকাটি সমাদৃত হবে।

শ্রীমতী (শারদীয় সংখ্যা)—সম্পাদক : আভা পাকড়াশী, ২৯ ওয়াটারলু স্ট্রীট, কলকাতা—১। দাম—সাড়ে তিন টাকা।

●

প্রখ্যাত কথাশিল্পী শ্রীবিমল মিত্রের সম্পাদনায় 'কালি ও কলম' পত্রিকাটির দ্বিতীয় সংখ্যা সম্প্রতি প্রকাশিত হয়েছে। ঐতিহ্যসমন্বিত এই পত্রিকাটির পুনরায় আত্মপ্রকাশে বাঙলাদেশের সুধী পাঠকসমাজ আনন্দিত। আশা করা যায়, পত্রিকা কর্তৃপক্ষ তাঁদের সেই আশাকে পরিতৃপ্ত করবেন। বর্তমান আশ্বিন সংখ্যায় গোপাল হালদার, রমেশচন্দ্র মজুমদার, দেবনারায়ণ গুপ্ত, আশিস মজুমদার, যজ্ঞেশ্বর রায়ের আলোচনাগুলি বেশ মূল্যবান। গল্প লিখেছেন—দুর্গাদাস ভট্ট, ওঙ্কার গুপ্ত, সমরেশ বসু, রবীন্দ্রনাথ দাশ। দুটি ধারাবাহিক উপন্যাস লিখছেন বিমল মিত্র এবং জরাসন্ধ। শৈলজানন্দ মুখোপাধ্যায়ের 'আমার কথা' আকর্ষণীয় রচনা। রবীন্দ্র-গ্রন্থপঞ্জী রচনা করছেন শ্রীপুলিনবিহারী সেন।

কালি ও কলম (আশ্বিন, ১৩৭৪)—সম্পাদক : বিমল মিত্র, ১৫ বঙ্কিম চ্যাটার্জি স্ট্রীট, কলকাতা—১২। দাম—এক টাকা।

●

শারদীয়ার বিশেষ সংখ্যার মিছিলে 'অরিন্দম' স্বকীয় বৈশিষ্ট্যে ও বৈচিত্র্যে নিজের জায়গা পাকা করে নিতে পারবে বলেই বিশ্বাস। এই বিশেষ সংখ্যাটির প্রত্যেকটি বিভাগেই পরিচ্ছন্নতা ও উন্নত কলানৈপুণ্য বিদ্যমান। লেখকসূচীটিও খুবই উজ্জ্বল। এই সংখ্যায় যাঁরা লিখেছেন তাঁদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য নামগুলি : তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়, সুবোধ ঘোষ, প্রেমেন্দ্র মিত্র, নরেন্দ্রনাথ মিত্র, দক্ষিণারঞ্জন বসু, সন্তোষকুমার ঘোষ, বিমল কর, বনফুল, মনোজ বসু, গল্পকীট, নরেন্দ্র দেব, উত্তমকুমার, অনিল চট্টোপাধ্যায়, হেমন্ত মুখোপাধ্যায়, বাসু ভট্টাচার্য, ছায়াপাত, অজয় বসু প্রভৃতি।

অরিন্দম (পূজা সংখ্যা) : সম্পাদক : রঞ্জন চট্টোপাধ্যায়, ৩।১এ, চোরবাগান লেন, কলিকাতা-৭ থেকে প্রকাশিত। দাম—দুই টাকা মাত্র।

●

গণবার্তার শারদীয় সংখ্যায় কয়েকটি মূল্যবান প্রবন্ধ লিখেছেন অরবিন্দ চক্রবর্তী (শতাব্দীর মহাগ্রন্থ) ধনঞ্জয় দাশ, (গোর্কি : সোভিয়েত সংস্কৃতির শ্রেষ্ঠ প্রতিনিধি), অরবিন্দ পোদ্দার, নারায়ণ চৌধুরী, সঞ্জীবকুমার সরকার (আজকের ল্যাটিন আমেরিকা), সৌরীন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য (প্যান-আমেরিকান আন্দোলনের রূপান্তর ও গতি-প্রকৃতি) এবং ত্রিদিব চৌধুরী। প্রতিবারের মত এবারও সাময়িক পরিস্থিতি নিয়ে আলোচনায় অংশ নিয়েছেন হরেকৃষ্ণ কোঙার, ভবানী সেন, নরেন দাস এবং মাখন পাল। গল্প ও কবিতা সত্যপ্রিয় ঘোষ, অনল দাশগুপ্ত, বিমলচন্দ্র ঘোষ, অনিল বসু, অতীন্দ্র মজুমদার, কিরণশঙ্কর সেনগুপ্ত রাম বসু, আশিস সান্যাল, মানস রায়চৌধুরী, চিত্ত ঘোষ, বীরেন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, মঙ্গলাচরণ চট্টোপাধ্যায় এবং আরও অনেকে। চারটি রুশ কবিতা অনুবাদ করেছেন মণীন্দ্র রায়। ল্যাংস্টন হিউজেস-এর একটি কবিতা এবং ভিয়েৎনামের একটি লোকগাথা অনুবাদ করেছেন পার্থ বন্দ্যোপাধ্যায়।

গণবার্তা—সম্পাদক : বুদ্ধদেব ভট্টাচার্য। ৩৭ রিপন স্ট্রীট, কলকাতা—১৬। দাম দুই টাকা।

●

কবিতা পত্রিকা 'এককে' লিখেছেন প্রেমেন্দ্র মিত্র, সঞ্জয় ভট্টাচার্য, সুশীল রায়, বিমলচন্দ্র ঘোষ, জগদীশ ভট্টাচার্য, গোপাল ভৌমিক, শক্তি চট্টোপাধ্যায়, বিশ্ব বন্দ্যোপাধ্যায়, শুদ্ধসত্ত্ব বসু, সুনীলকুমার গঙ্গোপাধ্যায়, পরেশ মণ্ডল, রত্নেশ্বর হাজরা, সজল বন্দ্যোপাধ্যায়, বাসুদেব দেব, বিনোদ বেরা, শংকর দে, গৌরাঙ্গ ভৌমিক, গোবিন্দ চক্রবর্তী, মৃণাল বসু চৌধুরী, পুষ্কর দাশগুপ্ত, নন্দগোপাল সেনগুপ্ত এবং আরো অনেকে।

একক (শ্রাবণ-আশ্বিন ১৩৭৪)—সম্পাদক : শুদ্ধসত্ত্ব বসু, ৪৪৬।১ কালিঘাট রোড, কলকাতা—২৬।

●

কবিতা ও কবিতাবিষয়ক আলোচনার পত্রিকা 'সীমান্ত' ইতিমধ্যে বিদগ্ধ পাঠকমহলে বেশ প্রতিষ্ঠালাভ করেছে। বর্তমান শারদীয় সংখ্যায় রুশ কবিতার ওপর আলোচনা এবং কয়েকটি রুশ কবিতার অনুবাদ করেছেন মণীন্দ্র রায়। একটি বিতর্কমূলক প্রবন্ধ লিখেছেন জানকী বসু 'এসটাব্লিশমেন্ট ও বাঙালী কবি'। কবিতা লিখেছেন প্রেমেন্দ্র মিত্র, বিষ্ণু দে, অরুণ মিত্র, মণীন্দ্র রায়, বীরেন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, রাম বসু, চিত্ত ঘোষ, মঙ্গলাচরণ চট্টোপাধ্যায়, তরুণ সান্যাল, অমিতাভ চট্টোপাধ্যায়, যুগান্তর চক্রবর্তী, পবিত্র মুখোপাধ্যায়, আশিস সান্যাল, গৌরাঙ্গ ভৌমিক, শংকর দে, শঙ্কর রায়, মৃণাল দত্ত, শান্তনু দাস, চিন্ময় গুহঠাকুরতা ও গণেশ বসু।

সীমান্ত—সম্পাদক : মৃগাঙ্ক রায় ও তরুণ সান্যাল। পি-৩৮৮ বাঁশদ্রোণী পার্ক, বাঁশদ্রোণী। ২৪ পরগণা। দাম এক টাকা।

●

'আলোছায়া' সিনেমার পত্রিকা। বর্তমানে শারদীয় সংখ্যাটিতে একটি সম্পূর্ণ উপন্যাস লিখেছেন কুমারেশ ঘোষ। দিলীপ দাশগুপ্ত

ও বোম্মানা বিশ্বনাথন লিখেছেন দুটি নাটক। তাছাড়া আছে কয়েকটি গল্প কবিতা ও আলোচনা। বহু আলোকচিত্রে শোভিত।

আলোছায়া (শারদীয়া ১৩৭৪)—সম্পাদক : মাধবলাল মল্লিক। ১৬।১৭ কলেজ স্ট্রীট, কলকাতা—১২। দাম এক টাকা।

●

বাংলা ভাষায় বিজ্ঞানবিষয়ক পত্রিকার সংখ্যা খুবই কম। সম্প্রতিকালে অবশ্য কয়েকটি পত্রিকা প্রকাশিত হয়েছে। দীর্ঘ কুড়ি বৎসর যাবৎ জ্ঞান ও বিজ্ঞান পত্রিকা প্রকাশ করছেন বঙ্গীয় বিজ্ঞান পরিষদ। বাংলা দেশের স্কুল-কলেজে ও সাধারণ মানুষের মনে বিজ্ঞান সচেতনতা জাগাবার পেছনে এ'দের অবদান অবাশ্যাম্বীকার্য।

সম্প্রতি প্রকাশিত শারদীয় সংখ্যাটি নানা কারণে মূল্যবান। বিশিষ্ট বিজ্ঞানী এবং বিজ্ঞানবিষয়ক লেখকেরা নানান বিষয়ে অনেকগুলি প্রয়োজনীয় প্রবন্ধ লিখেছেন। এ'দের মধ্যে আছেন সত্যেন বোস (শতবর্ষ পরে—মাদাম কুরীর স্মরণে), প্রিয়দারঞ্জন রায় (বিরল ম্যাসের যৌগিক ধর্ম), সতীশ রঞ্জন খাস্তগীর (ভ্যান আলেন বেষ্টনী), শান্তিময় বসু (বায়ুমন্ডলের গবেষণায় কৃত্রিম উপগ্রহ), সত্যেশ চক্রবর্তী (বাংলা দেশের শিলাবিন্যাশের পরিবেশিক রূপান্তর), রবীন্দ্রনাথ রায় (বেতার-বার্তা পরিবেশনে উপগ্রহ), শান্তিময় চট্টোপাধ্যায় (সাইক্লো-ট্রোনের ক্রমবিকাশ), বলাইচাঁদ কুন্ডু (ভারতে পাটের চাষ), দিলীপ বসু (ক্যালেন্ডার), শংকর চক্রবর্তী (সমুদ্রের কথা) এবং আরো অনেকে। অনেকগুলি আর্ট প্লেট আছে।

জ্ঞান ও বিজ্ঞান—সম্পাদক : গোপালচন্দ্র ভট্টাচার্য। বঙ্গীয় বিজ্ঞান পরিষদ। ২৯৪।২।১ আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র রোড, কলকাতা—৯। দাম আড়াই টাকা।

●

'রবীন্দ্র প্রসঙ্গ' সাময়িকপত্রে রবীন্দ্র-প্রসঙ্গ, সৌম্যেন্দ্রনাথ ঠাকুরের আনন্দ মীমাংশা এবং সাহানা দেবীর আলোচনাটি মূল্যবান। রবীন্দ্রপ্রসঙ্গে আর একটি আলোচনা করেছেন দেবব্রত বেজ।

রবীন্দ্র প্রসঙ্গ (শ্রাবণ ১৩৭৪)—সম্পাদক : সৌম্যেন্দ্রনাথ ঠাকুর। ৪ এলগিন রোড, কলকাতা—২০। দাম এক টাকা।

●

'জয়শ্রী' গল্প কবিতা প্রবন্ধে সমৃদ্ধ। লিখেছেন মনীশ ঘটক, বীরেন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, সৌমিত্রশংকর দাশগুপ্ত, গোপাল ভৌমিক, কৃষ্ণ ধর, করুণশংকর সেনগুপ্ত, অলোক-রঞ্জন দাশগুপ্ত, রাম বসু, রথীন্দ্রনাথ রায়, অন্নদাশংকর, সত্যেন্দ্রনাথ সেন, রাখালচন্দ্র দত্ত, শংকরানন্দ মুখোপাধ্যায়, অমিতাভ দাশগুপ্ত বেলা দত্তগুপ্ত, আশাপূর্ণা দেবী, নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়, জ্যোতিরিন্দ্র নন্দী, মানস রায়চৌধুরী, হেনা হালদার, সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়, স্বদেশরঞ্জন দত্ত, দুর্গাদাস [illegible] [illegible] সেনগুপ্ত, সুশান্ত বসু, [illegible] মুখোপাধ্যায়, রত্নেশ্বর হাজরা, মঞ্জুষ দাশগুপ্ত, মনোরমা সিংহরায় এবং আরো অনেকে।

জয়শ্রী—সম্পাদক : লীলা রায়। ৩০৯ গাঙ্গুলীবাগান, কলকাতা-৪৭। দাম আড়াই টাকা।

●

একমাত্র গল্পের পত্রিকা 'শুকসারী'র শরৎ সংখ্যায় লিখেছেন মিহির আচার্য, রঞ্জিৎ ভট্টাচার্য, বাসুদেব দেব, শান্তি দত্ত, ব্রজেন্দ্রকুমার ভট্টাচার্য, ভবেশ গঙ্গোপাধ্যায়, শেখ আবদুল জব্বার, শান্তিরঞ্জন বন্দ্যো-পাধ্যায়, অজিত চট্টোপাধ্যায়, তারাপদ গঙ্গোপাধ্যায়, অশোককুমার সেনগুপ্ত, রবীন্দ্র গুহ, উৎপল চক্রবর্তী, অসিত ঘোস, অজিত মুখোপাধ্যায়, খগেন্দ্র দত্ত। বিচিত্র স্বাদের এই গল্পগুলি থেকে আধুনিক বাংলা গল্পের গতি-প্রকৃতি সহজেই উপলব্ধি করা যাবে।

শুকসারী — সম্পাদক : মিহির আচার্য। ১৭২।৩৫ আচার্য জগদীশ বসু রোড, কলকাতা—১৪। দাম দু টাকা।

●

'সোনার কাঠি' কিশোর পাঠকদের উপযোগী একটি মনোরম সংকলন। বহু আলোকচিত্র, রেখাচিত্র এবং রঙিন কালিতে ছাপা এই সংকলনটি সকলেরই ভাল লাগবে। স্বপনবুড়ো, শিবরাম চক্রবর্তী, অমিতাভ চৌধুরী, প্রফুল্ল চন্দ, হরেন ঘটক, পার্থ চট্টোপাধ্যায়, সুকুমার রায়, কৃষ্ণ ধর, অরুণ বাগচী, গোপাল ভৌমিক, প্রফুল্ল রায়, চন্ডী লাহিড়ী, আশাপূর্ণা দেবী, মলয়-শংকর দাশগুপ্ত, নিরঞ্জন সেনগুপ্ত, অতীন মজুমদার, মতি নন্দী এবং আরো অনেকে। পত্রিকাটির শারদীয় সংখ্যা হিসাবে এই প্রথম আত্মপ্রকাশ।

সোনার কাঠি—সম্পাদক : সুকুমার রায়। ৩৩।৪ রামদুলাল সরকার স্ট্রীট, কলকাতা—৬।

●

আধুনিক বাংলা কবিতার ত্রৈমাসিক পত্রিকার সাম্প্রতিক সংখ্যাটিতে বহু সুকবির একত্র সমাবেশ ঘটেছে। কাগজটি হাতে নিয়ে মনে হোল সম্পাদক উন্নতমানের কবিতা লেখা নির্বাচনের মাপকাঠি হিসাবে না নিয়ে, যত অধিক সংখ্যায় পেরেছেন কবিদের স্থান দেওয়ার চেষ্টা করেছেন। এই সংখ্যায় লিখেছেন দক্ষিণারঞ্জন বসু, সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়, শরৎকুমার মুখোপাধ্যায়, প্রণবেন্দু দাশগুপ্ত, চিন্ময় গুহঠাকুরতা, শক্তি চট্টোপাধ্যায়, পবিত্র মুখোপাধ্যায়, সজল বন্দ্যোপাধ্যায়, সমরেন্দ্র সেনগুপ্ত, মানস রায়-চৌধুরী, শুদ্ধসত্ত্ব বসু, রত্নেশ্বর হাজরা, কৃষ্ণ ধর, পরেশ মন্ডল, গৌরাঙ্গ ভৌমিক, আশিস সান্যাল এবং আরো অনেকে। কয়েকটি [illegible] কবিতার অনুবাদ করেছেন মণীন্দ্র রায়। আরো কয়েকটি বিদেশী কবিতার অনুবাদক হলেন গণেশ বসু, সামসুল হক, নচিকেতা ভরদ্বাজ।

অনুক্তব (কার্তিক, ১৩৭৪)—সম্পাদক : গৌরাঙ্গ ভৌমিক। সিগনেট বুকশপ। কলকাতা-১২। দাম—দু'টাকা পঞ্চাশ পয়সা।

●

'ব্যাহৃতি' প্রথম সংখ্যা শরৎ সংখ্যা হিসাবে প্রকাশিত হয়েছে। এই সংখ্যাতেই উন্নত সম্পাদকীয় দৃষ্টির পরিচয় সুস্পষ্ট। গল্প, কবিতা, প্রবন্ধ ও গ্রন্থ সমালোচনায় সমৃদ্ধ এই সংখ্যায় লিখেছেন সুব্রত নিয়োগী, রত্নেশ্বর হাজরা, পবিত্র মুখো-পাধ্যায়, শংকর দে, মৃণাল বসু চৌধুরী, শৈবাল চট্টোপাধ্যায়, শ্যামল মুখোপাধ্যায়, অনন্ত দাশ, কালীকৃষ্ণ গুহ, শংকর রায়, গণেশ বসু, বেরন্তকুমার চট্টোপাধ্যায় এবং আরো অনেকে। জেমস জয়েস-এর তিনটি কবিতা অনুবাদ করেছেন কল্লোল মজুমদার। টমগানের দুটি কবিতার অনুবাদ।

ব্যাহৃতি—সম্পাদক : অচিন রায় ও কল্লোল মজুমদার। ৭ নন্দী স্ট্রীট, কলকাতা—২৯। দাম এক টাকা।

●

মধ্যপ্রদেশের বিলাসপুর থেকে প্রবাসী বাঙালীরা প্রকাশ করেন 'সংগঠন'। এ'দের এই আন্তরিক সাহিত্যসেবায় মাতৃভাষার প্রতি অনুরাগ স্পষ্ট হয়ে ওঠে। বর্তমান শারদীয় সংখ্যায় গল্প, কবিতা, প্রবন্ধ ও অন্যান্য রচনা লিখেছেন হেমন্তকান্ত চৌধুরী, সুধাংশুমোহন বন্দ্যোপাধ্যায়, নন্দগোপাল সেনগুপ্ত, পুলকেশ দে সরকার, জয়ন্তী সেন, দক্ষিণারঞ্জন বসু, কৃষ্ণ ধর, মণীন্দ্র রায়, গোপাল ভৌমিক এবং আরো অনেকে।

সংগঠন—সম্পাদক : নীতিশচন্দ্র মজুমদার। বেঙ্গলী স্কুল বিল্ডিং। বিলাশপুর। আর এস। মধ্যপ্রদেশ। দাম এক টাকা পঞ্চাশ পয়সা।

●

'বালার্ক'-এ তিনটি মূল্যবান প্রবন্ধ লিখেছেন মোহনলাল মিত্র (প্রাক-বিংশ শতাব্দী বাংলা ভ্রমণ সাহিত্যের বিকাশধারা), রেখা নন্দী (ভিনসেন্ট ভ্যানগগ, একটি অবহেলিত প্রতিভা), পূর্ণেন্দুশেখর সিংহ (কার্যকারীকার দৃষ্টিকোণ থেকে শাস্ত্রীয় সঙ্গীত)। তাছাড়া আছে গল্প, কবিতা ও রম্যরচনা।

বালার্ক—সম্পাদক : জয়ন্তকুমার সিংহ। ৩৮।৩ বোসপাড়া লেন, কলকাতা—৩। দাম পঞ্চাশ পয়সা।

বহু আলোকচিত্রে শোভিত 'নতুন খবর' পত্রিকাটি গল্প, কবিতা, নাটক, উপন্যাস, গান, রম্যরচনা এবং বিবিধ রচনায় সমৃদ্ধ হয়ে প্রকাশিত হয়েছে।

নতুন খবর—সম্পাদক : ধীরেন মল্লিক। ১৬।১৭ কলেজ স্ট্রীট, কলকাতা—১২। দাম দু টাকা।

তস্য তস্য অথবা সূর্য কাঁদলে সোনা

প্রেমেন্দ্র মিত্র

(পূর্ব প্রকাশিতের পর)

হ্যাঁ পিজারো সত্যিই কুড়ি বছর বাদে আবার নিজের দেশ এস্পানায় ফিরেছেন।

ছন্নছাড়া অভাগা বাউণ্ডুলে হিসেবে দেশ ছেড়ে দুর্গম অজানা বিপদের রাজ্যে অনিশ্চিতের মধ্যে ঝাঁপ দিয়ে ভাগ্য পরীক্ষা করতে যাবার পর এতদিন বাদে অনেক আশা নিয়ে ফিরে দেশের মাটিতে পা দেওয়া মাত্র জেলখানার কয়েদী হতে বাধ্য হওয়া যদি অভাবনীয় হয়, তাহলে পানামা থেকে তোড়জোড় করে তাঁর স্পেনে আসার ব্যবস্থা করাই আশ্চর্য ব্যাপার।

পানামায় গভর্নর পেড্রারিয়াস ত পিজারো আর আলমাগ্রোর সব আশায় ছাই ঢেলে দিয়েছিলেন। তাদের আকুল প্রার্থনায় কানই দিতে চান নি, নিজেদের জীবনের তোয়াক্কা না করে চরম দুঃখ দুর্যোগ বিপদের সঙ্গে যুঝে আশ্চর্য এক দেশের যে সব চাক্ষুষ প্রমাণ তাঁরা এনেছিলেন সস্তা কটা খেলনা বলে তা অগ্রাহ্যই করেছিলেন।

পিজারো আলমাগ্রো ত' বটেই তাঁদের সঙ্গীসাথী আর মহাজন পর্যন্ত তখন হতাশায় ভেঙে পড়ে হাল ছেড়ে দিয়েছিলেন। পেড্রারিয়াস যখন বিমুখ তখন চিরকালের মত তাঁদের কপাল ভেঙে গেছে বলে তাঁরা মেনেই নিয়েছিলেন।

তারই মধ্যে হঠাৎ স্পেনে আসার মতলব এল কোথা থেকে।

এল বার্থলোমিউ রুইজ-এর সেই জেগায় ঘোরে শোনা ভুতুড়ে নির্দেশ থেকে।

ই'দারায় জল না পেলে নদীতে যেতে হয়।

এ আবার কি রকম কথা!

মাতালের খেয়ালে কথাটা মুখে আওড়াতে আওড়াতে রুইজ সেদিন মাঝ-রাত্রে মোরালেসএর বাড়িতে গিয়ে উঠেছিলেন।

বন্ধুর ঘরেই রুইজ-এর শোবার ব্যবস্থা। রুইজ-এর মাতাল হয়ে রাত করে বাড়ি ফেরা মোরালেস বন্ধুত্বের খাতিরে মেনেই নিয়েছেন। কিন্তু সেদিন এই বিড়বিড়ানির উপদ্রবে ঘুমোতে না পেরে চটে উঠে বলেছিলেন,—মাতাল হওয়ার সঙ্গে পাগলও হয়েছে নাকি! বিড়বিড় করে বলছ কি!

বলছি, ই'দারায় জল না পেলে নদীতে যেতে হয়।

তার মানে?—মোরালেস বিরক্ত হয়ে উঠেছিলেন,—রাতদুপুরে জপ করবার এ মন্তর আবার কোথায় পেলে?

পেলাম ভূতের কাছে!

থামো! ঘুমোতে দাও বলে ধমক দিয়েছিলেন মোরালেস। রুইজ কিন্তু থামেন নি। বলেছিলেন,—সত্যি বলছি তোমায়, এখানে আসতে জলার ধারের রাস্তায় ভূত দেখেছি। অনেক দূরের অজগর জঙ্গল ঘেরা, এক জলাবাদার মাঝখানে যে হঠাৎ যেন হাওয়াতেই মিলিয়ে গেছল একদিন, সেই দোভাষীটাই নির্জন পথে আমায় খানিক আগে থামিয়ে ওই কথাটা শুনিয়েছে। শুনিয়েই আবার মিলিয়ে গেছে অন্ধকারে।

কি কথাটা আর একবার বলো ত!—মোরালেস হঠাৎ উত্তেজিত হয়ে উঠেছিলেন। —বলো, বলো।

ই'দারায় জল না পেলে নদীতে যেতে হয়।—মোরালেস-এর হঠাৎ এত উত্তেজিত হবার কারণ বুঝতে না পেরে একটু হতভম্ব হয়েই বলেছিলেন রুইজ।

হয়েছে! হয়েছে! ঠিক হয়েছে!—মোরালেস বিছানা ছেড়েই উঠে বসেছিলেন।

কি ঠিক হয়েছে?—রুইজ বন্ধুর জন্যেই তখন চিন্তিত। শুঁড়িখানা থেকে ত' তিনিই আসছেন, মোরালেস তাহলে এমন আবোল-তাবোল বকছেন কেন?

ঠিক হয়েছে তোমাদের এখন কি করতে হবে তাই! —উত্তেজনার ভেতরেই গম্ভীর হয়ে এবার বলেছিলেন মোরালেস,—কালই পিজারো আর আলমাগ্রোকে ডেকে আনবে। তোমাদের সব সমস্যা মেটাবার এই উপায়টার কথাই আগে মাথায় আসে নি।

* * *

সে উপায় আর কিছু নয়, পেড্রারিয়াস-এর কাছে বিফল হলেও স্পেনে গিয়ে খোদ সম্রাটের কাছেই একবার হত্যা দেওয়া।

কুয়োয় জল না পেলে নদীতে যেতে হয়!

কুয়ো হ'ল পেড্রারিয়াস। পেড্রারিয়াস যদি আশা না মেটায় তাহলে চলো—পেড্রারিয়াস যার হুকুমের চাকর সেই সম্রাট পঞ্চম চার্লস-এর কাছে শেষ চেষ্টা করে দেখতে।
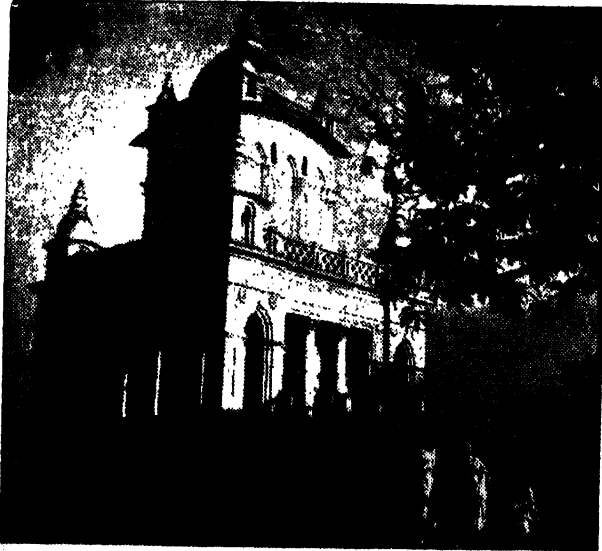
ফটো : পুলিন চক্রবর্তী

কিন্তু যাবে কে এই গুরুভার নিয়ে:

অ্যালমাগ্রো?

না, মুখ্যু শুধু নয়, বেঁটে খাটো গাঁটাগোট্টা চোয়াড় গোছের চেহারা। রাজ-দরবারে গিয়ে দাঁড়ালে চাকরবাকর ছাড়া আর কিছু মনে হবে না।

হ্যাঁ চেহারার দিক দিয়ে মানায় বটে পিজারোকে। তিনিও মুখ্যু বটে, এককালে শুয়োরের রাখাল ছিলেন। কিন্তু চেহারা দশাসই হোমরাচোমরা গোছের। বলিয়ে কইয়েও ভালো। অভিযানের কাহিনী ফলাও করে শোনাবার উপযুক্ত লোক।

সুতরাং ঠিক হয়েছে পিজারোই যাবেন স্পেনে সম্রাটের কাছে নিবেদন জানাতে।

কিন্তু এদিকে তখন অভিযাত্রী দলের যে ভাঁড়ে মা ভবানী। পানামা থেকে স্পেনের রাজদরবারে পাঠাবার পাথেয় জোগাড় করাই দায় হয়ে উঠেছে। দু' দুটো অভিযানে খরচ ত' বড় কম হয় নি। 'সুর্য' কাঁদলে সোনা'-র দেশের হদিস তাতে মিলেছে, কিন্তু লাভ যা হয়েছে তা উজ্জ্বল সোনালী আশা, আসল সোনা নয়।

অনেক কষ্টে পোনেরো শ' ডুকাট জোগাড় হয়েছে। তাই নিয়ে পিজারো একদিন পানামার বন্দর নোম্বর দে দিয়স থেকে পাড়ি দিয়েছেন।

সঙ্গী হিসেবে নিয়েছেন শুধু পেড্রো দে কান্‌ডিয়াকে।

জাতে এসপানিওল নয়, গ্রীক। বিশাল দৈত্যাকার চেহারা। পিজারোর অনুগত বিখ্যাত তেরো সঙ্গীর একজন। টমবেজ শহরে তার বিশাল বর্মপরা চেহারা দেখেই সেখানকার মানুষ থ হয়ে গেছল।

স্পেনের রাজদরবারে তাঁদের অভিযানের প্রমাণ হিসেবে দাখিল করবার জন্যে পিজারো সোনাদানার নানা জিনিসপত্র, গয়না, ও-দেশের পশমী কাপড়চোপড়, আর দু' তিনটি বিচিত্র প্রাণী ল্‌লামা ত' নিয়েছিলেনই, কয়েকজন ওদেশের আদিবাসীও সঙ্গে নিতে ভোলেন নি।

এইসব লটবহর নিয়ে পিজারোর জাহাজ নিরাপদেই মাঝখানের অকূল সমুদ্র পার হয়ে একদিন সেভিল বন্দরে গিয়ে ভেড়ে।

অতলান্ত দীর্ঘ সমুদ্রপথে যার দেখা পান নি সে আপদ তাঁর জন্যে সেভিলের বন্দরেই অপেক্ষা করছিল তা আর পিজারো কেমন করে জানবেন।

স্পেনে নতুন মহাদেশ থেকে কোন জাহাজ এসে ভিড়লেই তখনো একটু উৎসুক হয়ে খোঁজখবর লোকে নেয়।

কোথা থেকে জাহাজ এলো? ফার্নানডিনা কি হিসপানিওলা থেকে এলে তেমন কোন কৌতূহল নেই। মেক্সিকো য়ুকাটান কি নতুন উপনিবেশ পানামা গুয়াতামেলা থেকে এলে আগ্রহ একটু বেশী।

এ জাহাজ পানামা থেকে এসেছে শুনে দু'চারজন বন্দরে একটু কৌতূহলী হয়ে দাঁড়িয়েছিল। দাঁড়িয়ে দেখাটা সার্থকও হয়েছে। কি সব অদ্ভুত জানোয়ার নামানো হয়েছে তক্তা ফেলে জাহাজ থেকে! অ্যাডমিরাল কলম্বাস ছত্রিশ বছর আগে সেই নতুন সমুদ্রপারের দেশ আবিষ্কার করার পর থেকে অনেক কিছু অবাক করবার মত দেখলেও এমন অদ্ভুত জানোয়ার স্পেনের কেউ কখনো দেখে নি। শুধু জানোয়ারই নয়, একটু ভিন্ন চেহারার আদিবাসীও নেমেছে জাহাজ থেকে।

কোথা থেকে এসব আমদানি।

তা কেউ সঠিক বলতে পারে না।

এনেছে কে?

এনেছে এমন একজন যার সম্বন্ধে উড়ো খবর এই সেভিলেও কিছু কিছু পৌঁছেছে। লোকটার নাম ফ্রানসিস্‌কো পিজারো।

ফ্রানসিস্‌কো পিজারো! বন্দরে নতুন জাহাজের মাল খালাস দেখবার জন্যে ছোট্ট যে ভিড় জমেছিল তার ভেতর থেকে একজনকে উত্তেজিত হয়ে উঠতে দেখা গেছে।

ফ্রানসিস্‌কো পিজারো। নামটা শুনতে ভুল হয়নি ত? না ভুল হয়নি। ওই ত পিজারো একজন দেখিয়ে দিয়েছে। পিজারো তখন জাহাজ থেকে নামবার জন্যে ডেকের ধারে এসে দাঁড়িয়ে আর এক দৈত্যাকার সঙ্গীর সঙ্গে কথা বলছেন।

ভিড়ের উত্তেজিত লোকটিকে এবার ব্যস্ত হয়ে যেতে দেখা গেছে বন্দরেরই কোতোয়ালীতে।

কিছুক্ষণ বাদে পিজারো জাহাজ থেকে বন্দরে নেমে দু' পা যাবারও সময় পান নি। চারজন সেপাই এসে তাঁকে ঘিরে দাঁড়িয়েছে।

এ কি ব্যাপার!—অবাক হয়ে জিজ্ঞাসা করেছেন পিজারো।

কি ব্যাপার বুঝতে পারছ না!—সেপাই-দের পেছন থেকে ভিড়ের সেই উত্তেজিত লোকটি এবার এগিয়ে এসেছে,—আমার দেখলে হয়ত বুঝতে পারবে! চিনতে পারছ আমায়?

পিজারো সবিস্ময়ে তার দিকে তাকিয়ে বলেছেন,—আপনি—আপনি ব্যাচিলর এন-সিসো!

নামটা ত' মনে আছে দেখছি! ব্যাচিলর এনসিসো ব্যঙ্গ করে বলেছে,—শুধু দেনাটাই ভুলে গেছ বেমালুম। স্মরণশক্তিটা সেদিকে একটু উসকে দেবার জন্যেই এই হাজতে নিয়ে যাবার ব্যবস্থা করেছি। দেনাটা শোধ করতে পারো ভালো, নইলে হাজতেই পচিয়ে মারব।

পিজারো সত্যিই তখন হতভম্ব। স্পেনের গৌরব সে যুগের সবচেয়ে দুঃসাহসিক অভিযানের নায়ক দেশের মাটিতে পা দেবার সঙ্গে সঙ্গেই দেনার দায়ে গ্রেফতার হয়ে হাজতে চলেছেন। তাঁর হয়ে বলবার তাঁকে বাঁচাবার কেউ নেই।

বাধা দেবার জন্যে দৈত্যাকার পেড্রো দে কানডিয়া অবশ্য ছুটে এসেছিল। নেহাৎ সরকারী সেপাই না হলে অমন গোটা দশেক লোককে সে একাই তক্তা বানিয়ে দিতে পারত। কিন্তু মারামারির জায়গা এটা নয় সেটুকু বুদ্ধি তার ঘটে ছিল।

কানডিয়া নিজেকে সামলে যতদূর সম্ভব ভদ্রভাবেই জিজ্ঞাসা করেছে, ব্যাচিলর এনসিসোকে, —কি করছেন আপনি? কাকে ধরে নিয়ে যাচ্ছেন জানেন?

জানি, জানি!—ব্যাচিলর এনসিসো টিট্‌কিরি দিয়ে বলেছে,—উনি নাকি সাগর-পারে মস্ত এক বীর হয়েছেন আজকাল! বাঁশবনে গিয়ে শিয়াল রাজা! তা উনি রাজাগজা যা-ই হোন আমার কাছে উনি খাতক। দেনা শুধতে না পারলে শ্রীঘর যেতেই হবে।

কত আপনার দেনা? দেনাই বা কিসের? —জিজ্ঞাসা করেছে পেড্রো দে কার্নাডিয়া।

তারপর দেনা কত আর কিসের ব্যাচিলর এনসিসোর মুখে শুনে কান্‌ডিয়া থ' হয়ে গিয়েছে একেবারে। পিজারো স্পেন থেকে সমুদ্রে পাড়ি দিয়ে প্রথম ড্যারিয়েনেই গিয়েছিলেন। এখন যাকে পানামা-যোজক বলি তারই তখনকার নাম ছিল ড্যারিয়েন। সেখানে তখন নতুন উপনিবেশ বসছে। যারা সে উপনিবেশে বসতি করতে চেয়েছে মহাজন হিসেবে তাদের ধার দিয়েছিল এই ব্যাচিলর এনসিসো। পিজারোও এরকম ধার নিয়েছিলেন। সে ধার আর শোধ করা তাঁর পক্ষে সম্ভব হয় নি। চক্রবৃদ্ধি সুদে বেড়ে প্রতি এক ডুকাটের ঋণ বছর কুড়ির মধ্যে একশ ডুকাট হয়ে দাঁড়িয়েছে। সেই দেনার দায়েই ব্যাচিলর এনসিসো এখন পিজারোকে গ্রেফ্‌তার করিয়ে কয়েদখানায় চালান করছে।

সত্যি চোখে অন্ধকার দেখেছে পেড্রো দে কার্নাডিয়া। নেহাৎ সাদাসিধে মানুষ। চেহারাটা তার যত বিরাট বুদ্ধিটা তত অল্প। পিজারো বন্দী হবার পর সঙ্গের নজরানার জিনিসপত্র জন্তুজানোয়ার আর আদিবাসীদের কটাকে নিয়ে কি করবে তাই সে ভেবে পায়নি। তার বুদ্ধিতে মুস্কিল আসানের একটি মাত্র যে উপায় সে বার করতে পেরেছে তা হ'ল সঙ্গে যা কিছু আনতে পেরেছে তা নিলেমে বেচে পিজারোকে দেনা মিটিয়ে খালাস করা।

কিন্তু সব কিছু বেচেও দেনা শোধ হবে কি না সে বিষয়ে তার কোনো ধারণা নেই। তা ছাড়া এ সব বেচে দিয়ে পিজারোকে ছাড়ালে মনের দুঃখেও সে ত' আবার আত্মঘাতী হবে। পিজারো তখন ছাড়াই পাবে শুধু কিন্তু সম্রাটের দরবার কোন্ মুখে কি নিয়ে যাবে?

দারুণ ফাঁপরে পড়ে জাহাজ থেকে নামানো মালপত্র তদারক করতে গিয়ে কান্‌ডিয়াকে মাথায় হাত দিয়ে বসে পড়তে হয়েছে।

জাহাজ থেকে নামানো লুলামা কটার একটা লুলামা নেই। সেই সঙ্গে সুদূর টম্‌বেজ থেকে আনা চারজন আদিবাসীর একটিও নিরুদ্দেশ।

পিজারোকে ধরে হাজতে নিয়ে যাওয়ার অপ্রত্যাশিত ব্যাপারে বন্দরের লোকজন বেশ উত্তেজিত চঞ্চল থাকবার দরুনই কখন যে আদিবাসীটি আর লুলামাটা তাদের চোখের সামনে থেকে উধাও হয়ে গেছে কেউ খেয়াল করে নি।

কিন্তু আদিবাসীটার এমন দুর্বুদ্ধি হলেই বা কেন? লুলামাটাকে সেই যে বাঁধন খুলে ছেড়ে দিয়েছে এ বিষয়ে সন্দেহ নেই। সঙ্গে করেও যদি নিয়ে বেরিয়ে থাকে তাতে তার লাভটা কি? এই সম্পূর্ণ অজানা বিদেশে একটা অদ্ভুত অচেনা জানোয়ার নিয়ে সে পালাবে কোথায়? পালাবার দরকারটাই বা তার কি ছিল?

প্রশ্নগুলোর উত্তর দৈত্যাকার পেড্রো দে কান্‌ডিয়া অন্ততঃ ভেবে পায় নি।

সে তখন পিজারোকে ছাড়াবার জন্যে ব্যাচিলর এনসিসোরই হাতে পায়ে ধরা একমাত্র উপায় বলে ঠিক করেছে।

ব্যাচিলর এনসিসো কিন্তু অটল নির্মম। দেনার একটি দামড়ি সে ছাড়তে প্রস্তুত নয়, আর কড়ায় ক্রান্তিতে দেনা শোধ না হলে পিজারোকে।

দে কান্‌ডিয়া নিরুপায় হয়ে যা কিছু সঙ্গে এনেছে সব নিলেমে তোলার নিয়ম-কানুন খোঁজ করতে ব্যস্ত হয়েছে।

সেটা ১৫২৮ খৃষ্টাব্দ। গ্রীষ্মকালের শুরু। ইস্টার পরবের আনন্দে সমস্ত সেভিল শহর তখন মেতে উঠেছে।

পিজারো সম্বন্ধে একটু আধটু উড়ো খবর আর গুজব অতলান্ত সমুদ্র পার হয়ে এ কূলে মাঝে মাঝে ভেসে এসেছে বটে কিন্তু পিজারোর নামে তখনও সে যাদু নেই। বন্দরের দু'চারজন বাদে উৎসবমত্ত সেভিল শহর সেদিন পিজারোর কারারুদ্ধ হবার খবরেও এমন কিছু চঞ্চল হয়ে বোধহয় উঠত না।

সে খবর তাদের কাছে কতদিন কিভাবে পৌঁছোত তারই ঠিক নেই। বাসি ও ফিকে হয়ে সে খবর যখন সাধারণের কানে যেত তখন কান্‌ডিয়ার নিলেমে বিক্রি করা জিনিস-পত্র সৌখীন সম্ভ্রান্ত ধনীদের প্রাসাদে সাধারণের চোখের আড়ালে চলে গেছে। হাজতে থেকে মুক্তি পেলেও বিষদাঁত ভাঙা সাপের মত পিজারো তখন নিঃসহায় নিঃসম্বল।

ইস্টার উৎসবে মত্ত সেভিল শহর কিন্তু পিজারো সম্বন্ধে উদাসীন থাকতে পারে নি।

পিজারোর গ্রেফ্‌তারের খবর যাদের কাছে পৌঁছোলেই এমন কিছু সাড়া তুলত না তারাই সচকিত উত্তেজিত হয়ে উঠেছে একটি অভাবিত ব্যাপারে।

সেভিল শহরের রাস্তায় রাস্তায় উৎসব-মত্ত জনতা হঠাৎ সেদিন বিস্মিত বিহ্বল আতঙ্কিত হয়ে উঠেছে।

কিঞ্চিৎ সুরা পানে যারা মত্ত আজগুবি মস্তিষ্কের দুঃস্বপ্নই দেখছে বলে মনে করেছে। যারা সহজ স্বাভাবিক তারা নিজেদের চোখকেই বিশ্বাস করিতে পারে নি।

সেভিল শহরের চিরপরিচিত রাস্তায় রাস্তায় অবিশ্বাস্য অদ্ভুত এক প্রাণী ছুটে বেড়াচ্ছে।

এ কি শয়তানের প্রেরিত কোনো মূর্ত অভিশাপ না বাস্তব কোনো প্রাণী?

মার্শেনেস গঞ্জালেস দে সোলিস দুঃসহ রাগে ঘৃণায় স্বামীর কাছ থেকে চলে গিয়েছিল ক্যাথিড্রালের ভেতরে। সেখান থেকে কিছুক্ষণ বাদে বার হয়ে মনের অশান্ত অস্থিরতায় উৎসবের ভিড়ের ভেতর দিয়ে হাঁটতে হাঁটতে এসেছিল সেভিলের মুসলিম যুগের বিখ্যাত প্রাসাদ আলকাজার-এর কাছে। গ্রানাডার আলহাম্‌ব্রা-র সঙ্গে তুলনীয় এই প্রাসাদের কাছেই মার্শেনেস হঠাৎ জনতার ভীতর চিৎকার শুনে দাঁড়িয়ে পড়ে। তারপর তার চোখের সামনে দিয়ে যে প্রাণীটি ছুটে চলে যায় সেটিকে দেখে আতঙ্কে বিস্ময়বিহ্বলতায় মুহূর্তের জন্যে সম্বিৎ হারিয়ে সে প্রায় টলেই পড়ছিল।

পেছন থেকে কে যেন তাকে তখন ধরে ফেলে।

(ক্রমশঃ)

রামলীলা নৃত্যানুষ্ঠানে রাষ্ট্রপতি : নয়াদিল্লীর ফিরোজ শা কোটলা ময়দানে ভারতীয় কলাকেন্দ্রের উদ্যোগে অনুষ্ঠিত রামলীলা ব্যালে নৃত্যানুষ্ঠানে রাষ্ট্রপতি ডঃ জাকির হোসেন উপস্থিত ছিলেন। ছবিতে রাষ্ট্রপতিকে শিল্পীদের সঙ্গে আলাপ করতে দেখা যাচ্ছে।

দেশে বিদেশে

কেন এই গোপনতা?

ঘন কুয়াশায় আর বরফে চুম্বি উপত্যকায় এখন আসন্ন শীতের প্রস্তুতি। তবু সিকিম-তিব্বত সীমান্তকে তা শীতল করতে পারেনি।

গত ১১ সেপ্টেম্বর নাথু লা'র কাছে যে জায়গায় চীনারা ৭৬ মিলিমিটার বন্দুক, মর্টার ও রাইফেল নিয়ে ভারতীয় টহলদার বাহিনীর ওপর অতর্কিতে আক্রমণ করেছিল, তার থেকে সাড়ে তিন মাইল দূরে চো লা'য় গত ১ অক্টোবর ঐ সীমান্ত আরেকবার উত্তপ্ত হয়ে উঠেছিল।

নাথু লা'র মত চো লাতেও সীমান্ত কাটা তার দিয়ে চিহ্নিত ছিল। সুতরাং ভুল করে গোলমাল বাধার কোন কারণ সেখানে ছিল না। ভুল করে বাধেওনি। চীনাদের ঐ হামলা ছিল সম্পূর্ণ পূর্ব পরিকল্পিত। ১ অক্টোবর সকালে ভারতীয় বাহিনী চো লা'য় যথারীতি পাহারা দিচ্ছিল একটি উঁচু জায়গার ওপর দাঁড়িয়ে। ঐ উঁচু জায়গাটা পরিষ্কারভাবেই ছিল কাটা তারের এধারে, অর্থাৎ সিকিমের অভ্যন্তরে, অর্থাৎ ভারতীয়দের এক্তিয়ারের মধ্যে। হঠাৎ চীনারা সেখানে এসে দাবী জানালো ভারতীয়দের ঐ উঁচু জায়গা থেকে সরে যেতে হবে।

স্বভাবতই ভারতীয়রা ঐ অবাস্তব দাবী অগ্রাহ্য করেছিল। আর সঙ্গে সঙ্গেই চীনারা ভারতীয় সৈন্যদের ওপর ঝাঁপিয়ে পড়েছিল উন্মুক্ত বেয়োনেট নিয়ে। কিছু সংখ্যক ভারতীয় জওয়ান নিহত হয়। ভারতীয়রা আর দেরী না করে জবাব দিয়েছিল গোলা-গুলি বর্ষণ করে। সীমান্তের ওপার থেকে চীনাদের রিকয়েললেস বন্দুক ও মর্টারও তীব্র আক্রমণে গর্জে উঠল। ঐ গোলাগুলি চলেছিল বিকেল প্রায় পাঁচটা পর্যন্ত, যখন সমগ্র সীমান্তের ওপর নেমে এসেছিল ঘন কুয়াশার আচ্ছাদন। উভয় পক্ষেই কিছু হতাহত হয়েছে, কিন্তু কত, সেটা কোন পক্ষই ঘোষণা করেনি।

চীনারা নাথু লা'র ঘটনার অল্প কদিনের মধ্যেই চো লা'য় এই কাণ্ড বাধিয়ে তুলল কেন? কি উদ্দেশ্য তাদের? সিকিম-তিব্বত সীমান্ত অত্যন্ত স্পষ্টভাবেই চিহ্নিত এবং চীনারাও এই সীমান্ত সম্পর্কে কোনরকম বিরোধ তোলেনি। সুতরাং এই দুটি ঘটনা পর্যবেক্ষকদের কিঞ্চিৎ বিস্মিত করেছে।

তবে এই সীমান্ত সম্পর্কে কোন বিরোধ নেই বলেই পর্যবেক্ষকদের ধারণা চীনারা হয়ত সিকিম সীমান্তে ব্যাপক কোন আক্রমণের ফন্দি আঁটছে না। এর আরেকটা প্রমাণ, ঐ সীমান্তে চীনারা কোন ব্যাপক সৈন্য সমাবেশও করেনি। তবে নাথু লা ও চো লা'র ঘটনার ব্যাখ্যা কি? ভারতীয়দের বিব্রত করা? হতে পারে। সৈন্যদের মনোবল অক্ষুণ্ণ রাখার চেষ্টা? খুবই সম্ভব। অতি-সাংস্কৃতিক-বৈপ্লবিক উত্তেজনা? তাও অসম্ভব নয়। লক্ষণীয় যে, চো লা'র ঘটনা ঘটেছিল ১ অকটোবর, যেদিন চীনের সর্বত্র চীনা জাতীয় দিবস উদযাপিত হচ্ছিল। কিংবা সিকিম সীমান্তের উত্তেজনার আড়ালে চীনারা অন্য কোন সীমান্তে ভারতের বিরুদ্ধে বড় রকমের কোন ষড়যন্ত্র আঁটছে? সেটা একেবারেই উড়িয়ে দেওয়া যায় না।

কিন্তু চীনাদের মতলব যাই থাকুক, ভারতীয় কর্তৃপক্ষের মতলব সম্পর্কে দেশে সম্প্রতি কিছু বিভ্রান্তির সৃষ্টি হয়েছে। এই ধারণা বদ্ধমূল হয়েছে যে, নাথু লা ও চো লা সম্পর্কে প্রকৃত তথ্য ভারতবাসীদের কাছে জানানো হয়নি।

এই নীরবতা চীনাদের প্রচারাভিযানে কিভাবে সাহায্য করেছে, নাথু লা'র ঘটনায়

সময় তার উত্তকৃষ্ট প্রমাণ পাওয়া গেছে। নাথু লা'র ঘটনার কতজন চীনা নিহত হয়ে থাকতে পারে ভারতীয় কর্তৃপক্ষ তখন কোন হিসাব দিতে পারেনি। চীনারা সঙ্গে সঙ্গে তাদের পক্ষে ২৫ জন নিহত হয়েছে বলে ঘোষণা করেছিল। এখন সাংবাদিকদের বকলমে বলানো হচ্ছে যে, কমপক্ষে ৬০০ জন চীনা ঐ ঘটনায় নিহত হয়েছিল। ঘটনার ২২ দিন পরে প্রদত্ত এই হিসাব স্বভাবই চীনারা কল্পিত বলে উড়িয়ে দেবে, এবং অনেকেই চীনাদের অভিযোগকে অস্বীকার করতে চাইবে না। কেন না, এক, চীনারা নিজে থেকেই এবং আগে থেকেই নিহতের একটা সংখ্যা ঘোষণা করেছিল; দুই, ভারত এই হিসেব দিচ্ছে বাইশ দিন পর, যার অনেক আগেই চীনারা তাদের হতাহতদের নিশ্চয়ই সরিয়ে ফেলেছিল; তিন, ভারত সেই সময় নিজেদের হতাহতের সংখ্যা ঘোষণা করেনি, এমন কি চীনারা যখন ১৪ জন ভারতীয়ের মৃতদেহ ফেরত দিল তখনও বলা হয়নি। তার বেশ কিছুদিন পরে প্রধানমন্ত্রী এক বক্তৃতায় প্রসঙ্গক্রমে জানিয়েছিলেন যে, কুড়িজন নিহত হয়েছিল।

চোদ্দজন ভারতীয়ের মৃতদেহ ফেরৎ দেবার ব্যাপারটি আরো বিভ্রান্তিকর। চীনারা এই কথা বোঝাতে চাইছে এবং কোন কোন ভারতীয় সাময়িক পত্রেও এই মর্মে মন্তব্য বেরিয়েছে যে, চীনারা যখন ভারতীয়দের মৃতদেহ ফেরৎ দিয়েছে তার অর্থ ভারতীয়রা তিব্বতী এলাকার মধ্যে অনুপ্রবেশ করেছিল।

ভারতীয় তরফ থেকে ঐ ভাষ্যের প্রতিবাদ করে কিংবা ব্যাখ্যা করে কিছুই বলা হয়নি। হতে পারে, ঐ চোদ্দজন কাঁটাতারের এ পারেই নিহত হয়েছিল এবং চীনারা মৃতদেহগুলি টেনে তাদের এলাকায় নিয়ে গিয়েছিল। যদি প্রকৃতপক্ষে এটাই ঘটে থাকে, তাহলে সেটা ভারতীয় কর্তৃপক্ষের জানা না থাকার কোন কারণ ছিল না। এবং চীনারা যখন সগর্বে প্রচারের বেলুন ফোলাচ্ছে, তখন ঐ বেলুন চুপসে দেবার জন্যেও ভারতীয় কর্তৃপক্ষের মুখ খোলা উচিত ছিল। কিন্তু তাঁরা তা খোলেননি। ফলে নাথু লা'র সংঘর্ষ সম্পর্কে ভারতের প্রতি একটা সন্দেহ বিশ্বের মনে থেকে যাচ্ছে।

সাংবাদিকদের বকলমে এখন আরো বলা হচ্ছে যে, নাথু লা'য় ভারতীয়দের গোলাবর্ষণে চীনাদের চারটি গোলন্দাজ ব্যাটারি, বহু মেসিনগান ও মর্টার ঘাঁটি ও ১৪টি বাঙ্কার ধ্বংস হয়েছিল। এই তথ্য যদি সত্য হয় তাহলে ঘটনার কয়েকদিনের মধ্যেই তা জানানো উচিত ছিল। তাহলে ভারতীয় জনমত নাথু লা'র ঘটনা সম্পর্কে সংশয়াচ্ছন্ন না থেকে জওয়ানদের কীর্তি-কলাপে গৌরবান্বিত বোধ করতে পারত।

চো লা'য় ঘটনায় জওয়ানরা যখন একটি উঁচু জায়গায় দখল নিয়ে তখন ঘটনার দিনই সেটা কর্তৃপক্ষের অজানা থাকার কথা নয়। অথচ ঘটনার প্রথম দিনের বিবরণে ঐ তথ্য একেবারে উহ্য ছিল। পরের দিন সেটা জানানো হল বটে, কিন্তু তখনও একথা বলা হয়নি যে, চীনারা উন্মুক্ত বেয়োনেট নিয়ে ভারতীয় সৈন্যদের ওপর চড়াও হয়েছিল। যে প্রবল প্রতিরোধে সেদিন ভারতীয় জওয়ানেরা ঐ বর্বর আক্রমণকে প্রতিহত করেছিল, সেই বীরত্বময়, গৌরবময় কাহিনী দেশবাসীর সামনে প্রকাশ করা কর্তৃপক্ষ উচিত মনে করলেন না।

প্রতিরক্ষার সব তথ্য জনসাধারণকে জানানো যায় না ঠিকই। কিন্তু লুকোচুরিরও একটা সীমা আছে। সিকিমের ব্যাপারে লুকোচুরি করে কর্তৃপক্ষ একদিকে চীনাদের প্রচারে সাহায্য করেছেন, অন্যদিকে নিজেদের সৈন্যবাহিনীর কার্যকলাপ সম্পর্কে দেশবাসীকে সংশয়াচ্ছন্ন করে তুলছেন। দেশের মনোবল যে এইভাবে গড়ে তোলা যায় না সেটা কর্তৃপক্ষের বোঝা উচিত।

নেফা বিপর্যয়ের যেসব নেপথ্য কাহিনী এখন প্রকাশিত হয়েছে, তার পরিপ্রেক্ষিতে এই ধরনের গোপনতার বিরুদ্ধে আমাদের সচেতন হওয়া উচিত।

ফটো : প্রশান্ত ভক্ত

পূজাবাজার

পশ্চিমবঙ্গে পূজা বাজার মানে কেনাকাটার সবচেয়ে বড় মরশুম। বিশেষ করে কাপড়জামা ও তৈরী পোষাক এবং জুতোর কেনাবেচার সবচেয়ে বড় উপলক্ষ। পূজা বাজার মানে অল্পবিত্ত গৃহস্থের পক্ষে উদ্বেগের কাল। কেননা, সীমিত সংগতির মধ্যে তাঁদের এই সময়ে বিপুল অথচ অপরিহার্য ব্যয়ের ধাক্কায় পড়তে হয়। দীর্ঘকালের ঐতিহ্য পরম্পরায় এই রকমই চলে আসছে। বাজার দর চড়াই থাকুক, নরমই হোক, এই ঐতিহ্য অস্বীকার করা কোন বাঙালীর পক্ষেই সম্ভব নয়।

এবার এই বাজারের হালচাল কি? এককথায়, এবারকার বাজারে মন্দার লক্ষণ পরিস্ফুট। মানুষের হাতে পয়সা নেই। বহু কলকারখানা গত কয়েক মাসে বন্ধ হয়ে গেছে। যাঁরা এইসব কলকারখানায় কাজ করতেন এমন হাজার হাজার মানুষ বেকার হয়ে রয়েছেন। একজন বড় শিল্পপতির হিসাবে, গত কয়েক মাসে পশ্চিমবঙ্গে একশ' কোটি টাকার পণ্য উৎপাদন কম হয়েছে। পশ্চিমবঙ্গ সরকারের আর্থিক অবস্থাও খারাপ। যেসব ঠিকাদার সরকারী কাজ করে রাজ্য সরকারের কাছ থেকে টাকা পাবেন তাঁদের পাওনা টাকা আটকে রাখার আদেশ দেওয়া হয়েছিল; পরে ঠিকাদারদের আন্দোলনের ফলে তাঁদের প্রত্যেকের পাওনার অর্ধেক অবশ্য মিটিয়ে দেওয়ার আদেশ দেওয়া হয়েছে। বড় বড় যেসব ইঞ্জিনীয়ারিং কোম্পানী গত কয়েক বৎসর তাঁদের কর্মচারীদের মোটা হারে বোনাস দিয়ে এসেছেন তাঁরা এবার ব্যবসায়ে ঢিলার কারণে বোনাস কমিয়ে দিয়েছেন। সুতরাং, সহজেই অনুমান করা যায়, অন্যান্য বৎসরের তুলনায় এবার পূজার বাজারের খরিদারদের হাত দিয়ে বেশ কয়েক কোটি টাকা কম খরচ হচ্ছে।

এই গেল একদিক। অন্যদিকে, যাঁরা বাঁধা আয়ের মানুষ তাঁদের সংসার খরচ মিটিয়ে পূজার দরুণ বাড়তি খরচ করার সাধ্য এবার অনেক কম। চার পাঁচ টাকা কিলো দরে চাল কিনে ক'জনের হাতে বাড়তি কত টাকা থাকতে পারে?

ফলে স্বভাবতই এবার পূজার বাজারে চাহিদার চাপ কম। দোকানপত্রে অন্যান্যবার খরিদ্দারদের যেরকম ভীড় দেখা যায় এবার তার তুলনায় ভীড় অনেক কম।

যদি জিনিষপত্রের দাম কম হত তাহলে বিক্রী হয়ত কিছু বেশী হতে পারত। কিন্তু চাহিদার চাপ যেরকম কম সেই অনুপাতে দাম কমে নি। ছোটখাট দোকানদাররা নিজেদের লাভের অংশ কমিয়ে খানিকটা সামাল দেওয়ার চেষ্টা করছেন। কিন্তু তা সত্ত্বেও দাম কম নয়। কাপড়ের দাম গত এপ্রিল মাসে বাড়ান হয়েছে। তার ধাক্কায় এবার কাপড় ও পোষাকপরিচ্ছদের দাম গত বৎসরের তুলনায় গড়ে প্রায় ১৫ শতাংশ বেশী। সম্প্রতি কয়েক বছরের মত সুতী কাপড়ের তুলনায় নাইলন, টেরিন, টেরিকটন ইত্যাদি কৃত্রিম তন্তুর কাপড়-চোপড়ের চাহিদা বেশী। তবে অধিকাংশ খরিদ্দারই সস্তার জিনিস খোঁজেন। একজন দোকানদার বললেন, তাঁরা অতীতে ৫৫ টাকা বা ৬০ টাকা দামের ফ্রকও বেচেছেন। কিন্তু এবার তাঁরা অত দামী জিনিস রাখেনই নি।

অন্যান্যবারের মত এবারও অবশ্যও তৈরী পোষাকের চাহিদা ভাল।

পূজার বাজার সম্পর্কে পশ্চিমবঙ্গ তন্তুজীবী সমিতির সম্পাদক শ্রীভগবানদাস হরলালকা "যুগান্তর"-এর প্রতিনিধিকে বলেছেন:—"অর্ধেক নয়, তবে ব্যবসায়ের পরিমাণ এবছর সত্যিই কমেছে, তবে তা শতকরা ২০ থেকে ২৫ ভাগের বেশী নয়। মার খাচ্ছে ছোট ব্যবসায়ীরা। বড় ব্যবসায়ীরা তাদের বিচিত্র ও বিভিন্ন ধরনের পণ্যসম্ভারে এই ক্ষতির শতকরা ১৫ ভাগ মেটাতে পারবে। ছোট কারবারীদের সে সাধ্য নেই। এবছর ধুতি, শাড়ী, লংক্লথ, আদ্দি, জিন প্রভৃতির দর বেড়েছে ১০ থেকে ১৫ শতাংশ। সিল্কের শাড়ীর দর বেড়েছে শতকরা ১২ থেকে ১৫ ভাগ। কিন্তু বাঙ্গলার তাঁতের শাড়ীর একমাত্র বাজার এই পশ্চিম বাঙ্গলা বলেই হয়ত টাঙ্গাইল শান্তিপুরী শাড়ীর দাম বিশেষ কিছু বাড়ে নি।"

সাহেব নবাব ক্লাইভ

মুরারি ঘোষ

এখানে আলি লীডেন হল স্ট্রীটে। ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর সরকারী ভবন ইস্ট ইণ্ডিয়া হাউসে। ১৭৬৪ সালের এক মধ্যাহ্ন। কোম্পানীর শেয়ার-হোল্ডাররা অপেক্ষা করে রয়েছেন। মিটিং আরম্ভ হবে কিন্তু লর্ড ক্লাইভ এখনো আসছেন না।

হিন্দুস্থানের চাকরী ছেড়ে ক্লাইভ লণ্ডনে এসেছেন চার বছর আগে। ক্লাইভ এখন কোম্পানীর চাকুরিয়া নন—হিন্দুস্থান থেকে বিপুল সম্পত্তির মালিক হয়ে ফিরে এসেছেন। ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর প্রচুর শেয়ার কিনে নিয়েছেন। কোম্পানীর অংশীদারদের একটা বড় অংশ ক্লাইভকে মান্য করে চলে। এমনকি ক্লাইভের অনুপস্থিতিতে কোম্পানীর কোনো জরুরী অধিবেশন সম্ভব হয় না।

উনিশ বছর বয়সে বছরে পাঁচ পাউণ্ড মাইনের আশ্বাস পেয়ে রবার্ট ক্লাইভ স্বদেশ ত্যাগ করেছিলেন। যখন ফিরে এলেন, তখন তাঁর বার্ষিক আয় বছরে ৪০ হাজার পাউণ্ড। ৪ লাখ টাকা। তাঁর থেকে বেশী আয়ের মানুষ লণ্ডনে তখন কেউ নেই।

ক্লাইভ যেদিন ফিরে এলেন ইংলণ্ডের মানুষ অভূতপূর্ব অভ্যর্থনা জানিয়েছিল। ইস্ট ইণ্ডিয়া হাউসে কোম্পানীর বড়কর্তারা ক্লাইভের একটা স্ট্যাচু বসালেন সাদরে। ভারত সাম্রাজ্যের নির্মাতা রবার্ট ক্লাইভ। ইংরেজ-সম্রাট তাঁকে 'ব্যারণ অব প্ল্যাসী' উপাধি দিলেন। 'শ্রুউসবারী' এলাকার জনসাধারণ পার্লামেণ্টের সদস্যপদ উপহার দিলেন। ক্লাইভ ইংলণ্ডের সেরা মানুষদের অন্যতম।

কিন্তু চাকা ঘুরতে লাগলো ধীরে ধীরে। হিন্দুস্থানে কোম্পানীর অবস্থা পড়ে যেতে শুরু করলো। কোম্পানীর ভীতিজনক অবস্থা। আয় কমে গেছে। চতুর্দিকে চুরি। ছোট থেকে বড়, দেশী-বিলিতি সব কর্মচারীই অসাধু উপায়ে ব্যবসা করে কোম্পানীর আয় দিয়েছে কমিয়ে। তার ওপর এসে পড়েছে রাজ্যশাসনের দায়িত্ব। বিরাট এক ঝামেলা। কোম্পানীর অংশীদারগণ জরুরী মিটিংয়ে সমবেত। মিটিংয়ের সময় পেরিয়ে এসেছে—কেবল একজনের জন্যে অপেক্ষা—সবচেয়ে বেশী যার শেয়ার রয়েছে কোম্পানীতে সেই লর্ড রবার্ট ক্লাইভের আসতে দেরী হচ্ছে। সভা প্রায় আরম্ভ হয় হয় এমন সময় এলেন লর্ড ক্লাইভ।

কোম্পানীর চেয়ারম্যান লরেন্স সুলিভ্যান। ক্লাইভের দু-চোখের বিষ সুলিভ্যান। ডিরেক্টর বোর্ডের সভায় ক্লাইভের বিরোধী পক্ষের নেতা। ক্লাইভের উপার্জন, ক্লাইভের সম্পত্তি, প্রতিষ্ঠা সুলিভ্যান ভালো চোখে দেখেন না। অথচ কেউ কেউ চান আবার ক্লাইভ হিন্দুস্থানে ফিরে গিয়ে শক্ত হাতে রাজ্যের হাল ধরেন। কিন্তু সুলিভ্যানের ইচ্ছে ক্লাইভকে অপদস্থ করা।

মীরজাফরকে মসনদে বসিয়ে বিস্তর উপঢৌকন নিয়েছেন ক্লাইভ। ২ লক্ষ পাউণ্ড —২০ লাখ টাকা। ক্লাইভের সঙ্গে সঙ্গে কোম্পানীর অন্যান্য [illegible] কিছু বাগিয়েছেন। ক্লাইভের ভারত ত্যাগের পর আবার যখন নবাব বদল হয় মীরজাফরের জায়গায় মীরকাশিম, তাঁকেও কোষাগার উজাড় করে দিতে হয়। একদিকে কোম্পানীর আয় কমে গেছে, বাণিজ্যের অংশে মোটা ভাগ বসাচ্ছে কর্মচারীরা—অন্যদিকে কোম্পানীর প্রাপ্য টাকা ঘুষ হিসেবে আদায় করে নিচ্ছে কর্মচারীরা। উপরন্তু রবার্ট ক্লাইভ মীরজাফরের কাছ থেকে পেয়েছেন এক বিপুল জমিদারী, যার আয় বছরে ৩ লক্ষ টাকা।
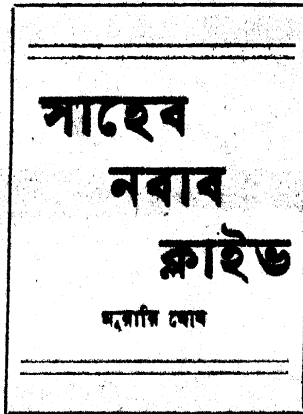
মিঃ সুলিভ্যান আর তাঁর বন্ধুরা কোম্পানীতে ক্লাইভের আধিপত্য পছন্দ করছেন না।

সভায় সুলিভ্যান বক্তব্য রাখলেন—ব্যবসা করতে গিয়ে কোম্পানী দেশ শাসনের ফেরে পড়েছে। বিরাট সেনাবাহিনী পুষতেই কোম্পানী ফতুর হবার জোগাড়—তার ওপর আছে এই অনাচার—কোম্পানীকে ফাঁকি দেওয়ার রাস্তা।

সভায় এসে ক্লাইভ নিজের ওজন বুঝে নিয়েছেন—দেখেছেন দলে তিনি ভারী। সরাসরি প্রস্তাব দিলেন আবার তিনি ভারতে ফিরে গিয়ে শাসন-ব্যবস্থার ভার নিতে পারেন—কিন্তু কোম্পানীর ডিরেক্টর বোর্ডকে তাঁর মত অনুযায়ী চলতে হবে আর সুলিভ্যানকে সভাপতির আসন ছাড়তে হবে। ক্লাইভের উচ্চাকাঙ্ক্ষার শত্রু লরেন্স সুলিভ্যান।

ক্লাইভের বাসনাই পূর্ণ হল। তাঁর দল ছিল ভারী। তাঁরই মনোনীত ব্যক্তি মিঃ রাউলস্ হলেন নতুন চেয়ারম্যান। ক্লাইভ ভারত অভিমুখে যাত্রা করলেন বাংলাদেশের শাসন-ব্যবস্থার ভার নিয়ে। মাদ্রাজে নেমে ক্লাইভ শুনলেন মীরজাফর মারা গেছেন আর ক্লাইভের জন্যে রেখে গেছেন ৬০ হাজার পাউণ্ডের মত উপঢৌকন। আশ্চর্য! এই কি উপঢৌকন নেবার সময়! যা নিয়ে এত কাণ্ড, এত হুলুস্থূল, সেই ব্যাপারই আবার ঘটতে চলেছে ক্লাইভকে নিয়ে। ঐ বিপুল সম্পত্তি ক্লাইভ নিলেন না—ঠিক করলেন টাকাটা কোম্পানীকে দেবেন। তাঁর নিজের নামে একটা 'ফাণ্ড' খোলা হবে—এই 'ফাণ্ড' থেকে সাহায্য পাবে একদা কোম্পানীর দুঃস্থ পঙ্গু বৃদ্ধ কর্মচারীরা।

নিজের সমস্যা ক্লাইভ মেটালেন—এবার আসল সমস্যার শুরু হল। বাংলার গভর্নর ভ্যান্সিটার্ট মীরজাফরের মসনদে তার ছেলে নিজামদ্দৌলাকে মনোনীত করে গেছেন। নতুন নবাব ইতিমধ্যে ১৪০ হাজার পাউণ্ড মসনদ প্রাপ্তির জন্যে খয়রাত করেছেন—সমস্ত টাকাটা কাউন্সিল মেম্বারদের পকেটে গেছে। অথচ ইতিমধ্যে কোম্পানীর নির্দেশ এসেছে কোনো ব্যক্তিগত উপঢৌকন নেওয়া চলবে না। টাকাটা কোম্পানীর ঘরে তুলে দিতে হবে।

লর্ড ক্লাইভ এখন নতুন গভর্নর। এই নির্দেশ ক্লাইভকে কার্যকরী করতে হবে। ক্লাইভ পড়লেন বেকায়দায়। এই উপঢৌকন নেওয়ার প্রথা তিনিই চালু করেছিলেন। একদা মীরজাফরের কাছ থেকে হাজার হাজার টাকা নিয়েছেন। জায়গীর নিয়েছেন—যার থেকে তিন লাখ টাকা এখনো তাঁর নামে প্রতি বছর জমা হচ্ছে। ক্লাইভ জানেন কোম্পানীর নির্দেশ জারী করতে গেলে তাঁর জায়গীরের প্রশ্ন উঠবে—জবাবদিহি করতে হবে তাঁর আগের দিনে ঘুষ নেওয়ার পদ্ধতি সম্পর্কে। কলকাতার কাউন্সিল মেম্বাররা সহজে ছেড়ে দেবেন না। ওদিকে ইংলণ্ডে ডিরেক্টররা অপেক্ষা করে আছেন ক্লাইভ কী করেন। যা করার খুব তাড়াতাড়ি করতে হবে। দেরী হলে তাঁর দুর্বলতাই ধরা পড়বে।

ক্লাইভের জাহাজ যেদিন কলকাতায় এল, কলকাতার য়ুরোপীয় সমাজে সেদিন কোনো সাড়া ছিল না। কোনো অভিনন্দন নেই—অভ্যর্থনা নেই—ক্লাইভ যেন অনাহূত। একদা যিনি বাংলাদেশে সাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠা করে ইংরেজ অফিসারদের আকাঙ্ক্ষা পূর্ণ করার অপরিসীম সুযোগ এনে দিয়েছেন, আজ তাঁরাই অনুপস্থিত। ক্লাইভ এখন অবাঞ্ছিত ব্যক্তি। নিষ্প্রাণ সরকারী অভ্যর্থনার মধ্য দিয়ে ক্লাইভ বাংলার মাটিতে পা দিলেন।

কাউন্সিল মিটিংয়ের দিনে আবহাওয়া রুক্ষ আর ভারী। ভীষণ দুর্যোগ বাইরে। এলোমেলো দুরন্ত ঝড় আর আকাশ ঘিরে কালো মেঘ। ঘরের ভেতর অন্ধকার। জানালা বন্ধ করে দেওয়া হয়েছে। ঘরের মধ্যে আলো জেলে সভার কাজ শুরু হবে। গোল-টেবিলের চারদিক ঘিরে সদস্যেরা বসেছেন। থমথমে ভাব। আগের দিন রাত্রি থেকে ক্লাইভের মাথা ধরে রয়েছে—কাজের চাপ আর দুশ্চিন্তা। একটা অপ্রিয় কাজ তাঁকে সারতে হবে।

সামনে যাঁরা তাঁর মুখোমুখি বসে সবাই ক্লাইভের বিরোধী। কেউ কেউ আগে ক্লাইভের সঙ্গে কাজ করেছেন। ক্লাইভকে ভাল করে চেনেন। ক্লাইভের সঙ্গে ভাগ-বাটোয়ারা করে নিয়েছেন নানা উপায়ের অর্থ—আর বাকি যাঁরা সকলেই ক্লাইভকে জানেন কোটিপতি ধনপতি লর্ড রবার্ট ক্লাইভ—কোম্পানীর সবচেয়ে প্রভাবশালী অংশীদার

—হিন্দুস্থানের রত্নাগার মন্থন করে যার সুবিশাল সম্পদ গড়ে উঠেছে।

এ হেন ক্লাইভ কাউন্সিলের কোনো সদস্যের সুনজরে পড়ছেন না।

এ'দের কাছে ক্লাইভ এখন হিপোক্রীট—বিশ্বাসঘাতক, নিজের স্বার্থের গুছিয়ে নিয়ে অপরের উন্নতির প্রতিবন্ধকরূপে ক্লাইভ ফিরে এসেছেন।

লর্ড ক্লাইভ তুলে ধরলেন কোম্পানীর নির্দেশনামা। তাতে পরিষ্কার লেখা, কোম্পানীর কোনো কর্মচারী কোম্পানীর কাজের জন্য কোনো উপঢৌকন নিতে পারবে না। অতএব যে-টাকা কাউন্সিল মেম্বাররা নিজামদ্দৌলার কাছ থেকে পেয়েছেন কোম্পানীকে তা ফিরিয়ে দিতে হবে। কোম্পানীর নির্দেশ সকলেই মেনে চলবে, এই মর্মে ক্লাইভ কাগজখানা সদস্যদের হাতে দিলেন। সদস্যেরা সই করে যেন ফিরিয়ে দেন।

এক এক করে অনেকে সই করে দিল, কিন্তু একজন বসলো বেঁকে। নিদারুণ ঘৃণা নিয়ে উঠে দাঁড়ালো জন জনস্টন। পলাশীর যুদ্ধে ক্লাইভের সঙ্গী ছিলেন। সে-সময়ে ক্লাইভের সঙ্গী হয়েও মীরজাফরের খয়রাতি থেকে কোনো ভাগ পাননি। আর ক্লাইভ নিয়েছেন সবথেকে বেশি। ক্লাইভের ভাগ থেকেও ত অন্তত কিছু অংশ জনস্টন পেতে পারতেন। আজ আবার যখন ভাগ বাটোয়ারায় সুযোগ এল, ক্লাইভ এবার প্রতিবন্ধক হয়ে দাঁড়ালেন। জনস্টন রাগে ফুলতে লাগলেন। এই সেই জনস্টন যিনি পরে উইলিয়ম বোল্টসের সঙ্গী হয়ে ব্যক্তিগত বাণিজ্যে বিস্তর টাকা কামিয়েছেন।

ক্লাইভের কতখানি অধিকার তা নিয়ে প্রশ্ন তুলে জনস্টন কিছুই করতে পারলেন না। ক্লাইভের ক্ষমতা ডিঙিয়ে যাওয়ার সাধ্য জনস্টনের নেই, কিন্তু মোক্ষম প্রশ্ন তুললেন :

> Nawab's father made your future easy. Your motive, Sir, remaining in this country after Plassey was said to be Company's welfare. Was it in the Company's interest that you accepted a present and a Jaghir, even at a time when the Nawab could not pay his troops, nor remit the large balances still he owed to the Company. You, sir, have taken presents. May other gentlemen not do the same?

ক্লাইভ সগর্জনে উত্তর দিলেন, না পারে না। আমার কাজ ও আর সকলের কাজের মধ্যে তফাৎ আছে। আমি নবাবকে এক সংকটজনক অবস্থা থেকে মুক্ত করেছি, তার পুরস্কার আমি পেয়েছি। এক্ষেত্রে তা হচ্ছে না। আমার মত কাজ দেখিয়ে পুরস্কার নিলে কারুরই আপত্তি হবে না।

অদ্ভুত যুক্তি দিয়ে ক্লাইভ কাউন্সিল-সভায় বিরোধীপক্ষকে চুপ করিয়ে দিলেন। কিন্তু বিরোধিতার ইতিহাস এখানে থেমে যায়নি।

শাসন-বিভাগের উচ্চ কর্মচারীদের নানারকম আয়ের রাস্তা বন্ধ হল। সেনাবিভাগও বাদ গেল না। তাদেরও নানারকম অবৈধ আয়ের পথ ছিল। ক্লাইভ সবরকম রাস্তা দিলেন বন্ধ করে। অবশ্য ডিরেক্টর বোর্ডের নির্দেশানুযায়ী এসব সংস্কার হয়েছে—ক্লাইভ এখন মুক্তপুরুষ। কোম্পানীর কর্মচারীদের অবৈধ আয় কমিয়ে কোম্পানীর নীট আয় বাড়াবার প্রেরণায় উদ্বুদ্ধ—এতটা কিন্তু কোম্পানীর সর্বস্তরের কর্মচারীদের সহ্যের বাইরে। কোম্পানীর কর্মচারীরা দেখলেন, স্বার্থের যা গুছিয়ে নেবার লর্ড ক্লাইভের তা হয়ে গেছে। সেনা বিভাগের অফিসারদের মধ্যে একটা বিদ্রোহ দেখা দিয়েছিল—কিন্তু শক্ত হাতে ক্লাইভ তা দমিয়ে দিলেন। অতএব ক্লাইভের শত্রুসংখ্যা দিনে দিনে বৃদ্ধি পেতে লাগলো। ভারতবর্ষে সহকর্মীদের মধ্যে। ইংলণ্ডে ডিরেক্টর বোর্ডের সভায়। ক্লাইভের দুই তীব্রতম শত্রু, হিন্দুস্থানে জনস্টন—ইংলণ্ডে সুলিভ্যান। দ্বিতীয়বারের বাইশ মাস হিন্দুস্থানে থাকতে হয়েছিল। তারপর ভগ্ন স্বাস্থ্য, ভগ্ন মন নিয়ে ক্লাইভ স্বদেশে ফিরলেন। কিন্তু বৃটিশ-রাজকে ভারতবর্ষে শক্ত জমিতে বসিয়ে গেলেন।

বাংলা-বিহার-উড়িষ্যার রাজস্ব সংগ্রহ করার অনুমতি দিল্লীর বাদশার কাছ থেকে আদায় করে দিলেন। বাংলা নবাব রইলেন নামকা-ওয়াস্তে—একটা বৃত্তি নিয়ে দিল্লীর বাদশার অবস্থাও তথৈবচ। এ সমস্তই ঘটেছে ক্লাইভের মুন্সিয়ানায়। এইবারের কর্মজীবনে ক্লাইভ যথেষ্ট সংযমের পরিচয় দিয়েছেন — হিন্দুস্থানের রাজনীতিতে একাধিপত্য করার অতুলনীয় সুযোগের মধ্যেও তিনি নিজের স্বার্থের দিকে আর তাকাননি।

তবু ক্লাইভের শত্রুপক্ষ এতদিন কেবল ঘুমিয়েই ছিল না—ছিল সুযোগের অপেক্ষায়। দ্বিতীয়বারে কোম্পানীর রাজত্বে অতি-দাপটের সঙ্গে ক্লাইভ আধিপত্য কায়েম রেখেছিলেন—হিন্দুস্থানের বা বিলেতের ডিরেক্টর বোর্ডের সভায় ক্লাইভের বিরোধিতায় কেউই সফল হননি।

কিন্তু সুযোগ এল ছ' বছর পরে। ক্লাইভ ভারত ছেড়ে চলে আসার পরেই অবস্থা খারাপের দিকে যেতে লাগলো। কর্মচারীদের ব্যক্তিগত ব্যবসা, উৎকোচ গ্রহণ, বাণিজ্যের নামে লুণ্ঠন অবাধে শুরু হল—বাংলাদেশে এল সেই মহামন্বন্তর। কোম্পানীর শাসন-ব্যবস্থায় বাণিজ্যে আবার সংকট এল।

ক্লাইভের শত্রুরা এবার আঙুল দিয়ে দেখিয়ে দিলেন ক্লাইভকে। ঐ সেই লোক। যে দায়ী। কিছুই করতে পারলো না—অথচ সংস্কারের নামে কেবল নিজের ভাগ্যই ফিরিয়ে এনেছে। ইংলণ্ডে লোকমুখে নানান কাহিনী চালু হয়ে গেল। সংবাদপত্রে লর্ড ক্লাইভের কাজের সমালোচনার ঝড় বইতে শুরু হল—আর রোখা গেল না।

ভারতশাসন নিয়ে পার্লামেন্টে বিল উঠলো। তাতে অরাজকতা, অব্যবস্থা—সবকিছু দায়িত্ব এসে পড়লো ক্লাইভের ঘাড়ে। ক্লাইভ কোম্পানীর পাঁঠাস-মেকার। ক্লাইভের পরিচালিত নীতি অনুসরণ করে কোম্পানীর দুর্গতির একশেষ—ক্লাইভ নিজেই দুর্নীতির পোষক—তিনি কী করেই বা দুর্নীতির মূলোচ্ছেদ করবেন।

তবু ক্লাইভ জবাব দিতে উঠলেন। মর্মস্পর্শী বক্তৃতায় সেদিন ক্লাইভ ইংলণ্ডের পার্লামেন্টের ইতিহাসে এক অতুলনীয় উদাহরণ রেখে গেলেন। ক্লাইভের পক্ষে যাঁরা ছিলেন, যেমন এটর্নী-জেনারেল লর্ড থার্লো—সলিসিটর-জেনারেল ওয়েডারবার্ন—এঁরা ক্লাইভের বিরোধীপক্ষের ভূমিকা দেখে বেশ হতাশ হয়ে পড়েছিলেন। কিন্তু ক্লাইভের বক্তৃতার পর হাউসের অবস্থা কিছুটা ফিরলো। ওয়েডারবার্ন হাঁফ ছেড়ে বাঁচলেন। করিডরে দেখা হল লর্ড চ্যাথামের সঙ্গে। লর্ড চ্যাথাম জানালেন—

> A fine speech, Clive, a finished piece of eloquence—but they won't like it.

ভারতশাসনে দুর্নীতির বিরুদ্ধে সবচেয়ে জবর ভূমিকা নিয়েছিলেন জন বারগোয়াইন। যোগ্য পার্লামেন্টেরিয়ান। ইংলণ্ডের বৈদেশিক নীতি রচনায় বারগোয়াইনের হাত থাকতো অনেকখানি। তাঁরই চেষ্টায় পার্লামেন্টে সিলেক্ট কমিটি তৈরী হল। ভারতশাসন বিল তাঁদের হাতে দেওয়া হল। সিলেক্ট কমিটি বেশ কিছুদিন অনুসন্ধান চালিয়ে ক্লাইভের বিরুদ্ধে বিস্তর নজীর জড়ো করলো। প্রায় এক বছর ধরে এই সিলেক্ট কমিটি হিন্দুস্থানের সমস্যা নিয়ে কাজ করেছে।

এই এক বছর ক্লাইভের কী যে দুর্বৎসর গেছে তা কল্পনা করা যায় না। শরীর ভেঙেছে, মন ভেঙেছে। ৪৮ বছরের ক্লাইভ তখন জীর্ণ, ভগ্নস্বাস্থ্য—মানসিক দুর্দশার প্রেতমূর্তি। নিজের কাজের সাফাই গাইতে পার্লামেন্টে একদিন বলতে হল :

"তিনি যা পেয়েছেন, এমন কি বা তা বেশি—এটা নবাবের কাছ থেকে মহৎ কাজের পুরস্কার পাওয়া মাত্র। তবু তখনকার অবস্থা কল্পনা করুন—এক বিরাট দেশের অধিপতি আমার দয়ার ওপর নির্ভর করে রয়েছেন—রাজধানীর যত সম্পত্তি আমার মুঠোর মধ্যে—দেশের সেরা বড়লোকেরা আমার সামান্য হাসিমুখ দেখার জন্যে অপেক্ষা করছে—পরিপূর্ণ কোষাগার ও রত্নাগারের চাবি আমার আয়ত্তের মধ্যে—এই অবস্থার মধ্যেও আমি যে সংযমের পরিচয় দিয়েছি, তার তুলনা কোথায়

> (By God, Mr. Chairman, at this moment I stand astonished at my moderation)?

কিন্তু ক্লাইভের সংযমের সাফাইতে পার্লামেন্টের সদস্যেরা ভুললেন না।

বারগোয়াইন প্রস্তাব আনলেন :

> "....that the Right Hon. Robert Lord Clive, Baron of Plassey, in the kingdom of Ireland, in consequence of the powers vested in him in India, had illegally acquired the sum of £234,000 to the dishonour and detriment of the State....."

সেদিন অনেক রাত পর্যন্ত পার্লামেন্টের অধিবেশন বসেছিল। সলিসিটর-জেনারেল ওয়েডারবার্ন শেষমুহূর্ত অবধি ক্লাইভের হয়ে লড়েছিলেন। পার্লামেন্টে উক্ত বিতর্কের মধ্যে ক্লাইভের পক্ষে জিতানো সম্ভব ছিল না সেদিন। হল ছেড়ে পালিয়ে এসেছিলেন তাঁর প্রাসাদে—কিন্তু সেখানে শান্তি কোথায়? সেইদিনই একটা কিছু হেস্তনেস্ত হবে—হয় ক্লাইভের মুক্তি—মহামানবরূপে বৃটিশ রাজনীতির ইতিহাসের পাতায় এক উজ্জ্বল নাম থাকবে—নয়তো বিচারের কাঠগড়ায় দুরপনেয় কলঙ্ক নিয়ে নিজেকে আহুতি দিতে হবে।

অনেক রাত হয়ে গেল। পার্লামেন্টে অধিবেশন তখনো চলছে। এদিকে ক্লাইভের প্রাসাদে সকলেরই বিনিদ্র রাত্রি জাগরণ—লর্ড ক্লাইভ, লেডী মার্গারেট, হিন্দুস্থানের সঙ্গী এডমন্ড মাস্কেলীন, আর স্ট্রাচার লরেন্স—ক্লাইভের বিশিষ্ট সঙ্গী। অসহ্য পরিবেশের মধ্যে সকলেই প্রতীক্ষায় রয়েছে। পার্লামেন্টের প্রহসন কী অনন্তকাল চলবে? প্রতি পল, দণ্ড, মুহূর্ত, বিশাল সময়ের ব্যাপ্তি নিয়ে চলেছে। তাস খেলে সময় কাটাবার প্রস্তাব উঠলো—কিন্তু খেলায় কারুর মন বসলো না। মার্গারেট হার্পিস কর্ডের তারে হাত বোলালেন—বৃথা চেষ্টা, বেসুর শোনাল—গান এখন আর বাজবে না। একজন ভৃত্য স্যান্ডউইচ আর মদ নিয়ে এল—খাওয়া হল না, খাওয়ার অভিনয় চললো। তবু মদের করুণায় গলা কিছুটা ভিজলো—মানসিক উদ্বেগ কিছু কমলো মত্ততার মধ্যে।

বৃটিশ পার্লামেন্টের ইতিহাসে অদ্ভুত সেই দিন। সারারাত সেদিন বিতর্কের ঝড় বইলো। ভোর পাঁচটায় ক্লাইভের প্রাসাদের দরজায় ঘা পড়লো। বিশেষ দূতের মারফৎ ওয়েডারবার্ন লিখে পাঠিয়েছেন : 'প্রস্তাব পাশ হয়ে গেছে, আজ ভোর চারটেয়, তবে লর্ড ক্লাইভের মহৎ কাজের গুণপনাও স্বীকৃত হয়েছে।'

(প্রশ্ন)

১। (ক) ভারতে পানীয় রূপে চা-এর প্রচলন হয় কবে থেকে?

(খ) ১৯৬৬-৬৭ সালে ভারত থেকে বিদেশে মোট কত পরিমাণ চা রপ্তানি হয়েছে?

(গ) ভারতে উল্লেখযোগ্য চা-বাগানের সংখ্যা কত?

(ঘ) ১৯৬৬-৬৭ সালে চা রপ্তানি করে ভারতের কত বৈদেশিক মুদ্রা অর্জিত হয়েছে?

(ঙ) ভারতের চা পৃথিবীর কোন্ কোন্ দেশ বেশী রপ্তানি করে?

(চ) এক কিঃ গ্রাঃ সর্বোৎকৃষ্ট ভারতীয় চা-এর বৈদেশিক বাজার মূল্য কত?

২। (ক) ভারত থেকে বিদেশে গড়-পড়তা কি পরিমাণ চিনি রপ্তানি হয়?

(খ) বিদেশের বাজারে প্রতি কুইন্টাল ভারতীয় চিনির মূল্য কত?

নিত্যানন্দ মুখোপাধ্যায়
আদ্রা (পুরুলিয়া)

উত্তর

গত ২২শে ভাদ্র প্রকাশিত 'অমৃত' পত্রিকায় 'জানাতে পারেন' বিভাগে শ্রীউমাপ্রসাদ সেনগুপ্ত লিখিত সত্যজিৎ রায়ের জীবনীতে কিছু তথ্য বাদ পড়েছে এবং কিছু ভুলও রয়েছে।

প্রথমতঃ সত্যজিৎবাবুর জন্ম ১৯২১ সালের ২রা মে। দ্বিতীয়তঃ ক্যালকাটা ফিল্ম সোসাইটির তিনি একক প্রতিষ্ঠাতা নন। কয়েকজন চলচ্চিত্ররসিক মিলে ক্যালকাটা ফিল্ম সোসাইটি প্রতিষ্ঠা করেছিলেন। শ্রীরায় ছিলেন তাঁদের অন্যতম।

ডাঃ বিধানচন্দ্র রায় 'পথের পাঁচালী'র জন্য কিছু সরকারী সাহায্য করেননি। চিত্রখানির প্রযোজনাভার পশ্চিমবঙ্গ সরকারের হাতে তুলে দিয়েছিলেন। পথের পাঁচালীর পরের সৃষ্টিগুলি যথাক্রমে অপরাজিত, পরশ পাথর, জলসাঘর, অপুর সংসার, দেবী, রবীন্দ্রনাথ (দলিলচিত্র), তিনকন্যা (মণিহারা, পোস্টমাস্টার, সমাপ্তি), কাঞ্চনজঙ্ঘা, অভিযান, মহানগর, চারুলতা, কাপুরুষ ও মহাপুরুষ, টু (দলিলচিত্র) এবং নায়ক। এইগুলি প্রযোজনার ক্রমপর্যায় অনুযায়ী সাজানো হয়েছে।

শ্রীউমাপ্রসাদ সেনগুপ্ত লিখেছেন "যুক্তরাষ্ট্রে তিনিই প্রথম ব্যক্তি যিনি ১৯৬০ সালে দুটি প্রধান পুরস্কার—শেলাৎসনিক গোল্ডেন লরেল এ্যাওয়ার্ড এবং শেলাৎসনিক গোল্ডেন লরেল ট্রফি জয় করেন।" এই কথাটির অর্থ বোঝা গেল না। প্রকৃত তথ্য হল এই যে, সত্যজিৎবাবু পথের পাঁচালীর জন্য David O Sleznick Golden Laurel Award পান ১৯৫৬ সালে। ১৯৫৯ সালে, ১৯৬০ সালে নয়—তিনি অপরাজিতের জন্য David O Sleznick Golden Laurel Award এবং Golden Laurel Trophy লাভ করেন। পরে ১৯৬৩ সালে তিনি দুইকন্যা অর্থাৎ পোস্টমাস্টার এবং সমাপ্তির জন্য David O Sleznick Golden Laurel Award লাভ করেন। পৃথিবীতে তিনিই একমাত্র ব্যক্তি যিনি এই পুরস্কারটি একাধিকবার অর্জন করেছেন। জলসাঘর মস্কো চলচ্চিত্র উৎসবে সংগীতের জন্য রৌপ্যপদক লাভ করে। অপুর সংসার ১৯৬০ সালে লন্ডনে সাদারল্যান্ড ট্রফি জয়ী হয় এবং ১৯৬০ সালে National Board of Reviews, New York কর্তৃক শ্রেষ্ঠ বিদেশী চলচ্চিত্রের সম্মান অর্জন করে। দলিলচিত্র 'রবীন্দ্রনাথ' লোকার্ণো চলচ্চিত্র উৎসবে শ্রেষ্ঠ দলিলচিত্র বলে বিবেচিত হয়। এরজন্য ছবিটিকে Golden Sail পুরস্কার দান করা হয়। দুইকন্যা ১৯৬২ সালে মেলবোর্ণ চলচ্চিত্র উৎসবের সর্বোচ্চ সম্মান Golden Boomerang লাভ করে। মহানগর ১৯৬৪ সালে বার্লিনে শ্রেষ্ঠ পরিচালনার জন্য সত্যজিৎ বাবুকে Silver Bear এনে দেয়। উমাপ্রসাদবাবু বলেছেন যে, ১৯৬২ সালে মহানগর বার্লিনে পুরস্কার পেয়েছিল। এই প্রসঙ্গে জানিয়ে দিতে চাই যে, মহানগর মুক্তি পেয়েছিল ১৯৬৩ সালে। বার্লিনের ঐ একই পুরস্কার তিনি ১৯৬৫ সালে পেয়েছিলেন চারুলতার জন্য। এই প্রসঙ্গেও উমাপ্রসাদবাবু ভুল তথ্য পেশ করেছেন। চারুলতা লোকার্ণো চিত্র উৎসবে শ্রেষ্ঠ পুরস্কার লাভ করে। গত বছর নায়কের জন্য সত্যজিৎবাবু পান Unicrit Award.

সত্যজিৎবাবুর 'পদ্মশ্রী' এবং 'পদ্মভূষণ' পাওয়ার সময় নিয়েও কিছু গোলমাল রয়েছে। উনি ১৯৫৮ সালে পদ্মশ্রী এবং ১৯৬৬ সালে পদ্মভূষণ পেয়েছিলেন।

ম্যাগসেসে ফাউন্ডেশন সংস্থা কি আমেরিকার? আমার মনে হয় এই সংস্থা ফিলিপাইনসের। এই প্রসঙ্গে সঠিক তথ্য জানালে বাধিত হব।

রাষ্ট্রপতির স্বর্ণপদক প্রাপ্তি নিয়েও ভুল তথ্য রয়েছে। শ্রীরায় পথের পাঁচালী, অপুর সংসার এবং চারুলতার জন্য স্বর্ণপদক লাভ করেন। এছাড়া ১৯৬১ সালে দলিলচিত্র বিভাগের রাষ্ট্রপতির স্বর্ণপদক তিনি রবীন্দ্রনাথ চিত্রটির জন্য পেয়েছিলেন। সত্যজিৎবাবুই একমাত্র ব্যক্তি যিনি এই স্বর্ণপদক একাধিকবার লাভ করেছেন।

স্বর্গতঃ শ্রীনেহরু তাঁকে The Award Winner বলে উল্লেখ করতেন। বর্তমান জগতে তিনি এক বিস্ময়কর প্রতিভার অধিকারী চিত্র-পরিচালক। ভারতবর্ষের এই দুর্দিনে তিনি স্বদেশকে যে সম্মান দিয়েছেন তা এর আগে কেউ দিতে পারেন নি। তাঁকে নিয়ে আমাদের গর্বের সীমা নেই।

পরিশেষে একটি প্রশ্ন। বিশ্বের আর কোন্ চিত্র-পরিচালক এতগুলি সম্মানের অধিকারী? এই বিষয়েও কি সত্যজিৎবাবু অদ্বিতীয়? অনুগ্রহ করে কেউ জানালে বাধিত হব।

জ্যোতির্ময় সেনগুপ্ত
কলকাতা—৩৯

চলতে চলতে পিছন থেকে হঠাৎ অক্ষয় ডাকল—পেনী! তারপরই আগের মত চুপ-চাপ থেকে গেল। পেনী সামনে এলো-মেলো হাঁটছিল। ফাঁকা মাঠের উপর নক্ষত্রের আকাশ। ঘাসে চবচবে শিশির জমে আছে। ঘাসের শিশিরে পা ভিজিয়ে হাঁটবার নেশায় পেনী যেন কিছুটা আন-মনা। তাই বাবার ডাক তার কানে যায়নি। আর অক্ষয়ের তৎক্ষণাৎ মনে হয়েছে, তার আঠারো বছরের পেনী এখন এই অবরোধ-হীন অন্ধকারে মাঠে ছুটে ছুটে নিজের শৈশবকে ফিরে পেয়েছে। সুতরাং ওকে বিরক্ত না করাই ভালো।

সত্যি বলতে কী, এতক্ষণ পরে এক-বার ডেকেই অক্ষয়ের মনটা কেমন নরম হয়ে গেছে। এই শরতকালীন শিশিরভেজা অন্ধকার মাঠের মত, নিজের অজানিতে, সে তার প্রৌঢ় বয়সকে বিছিয়ে দিয়েছে। এবং তার উপর তার আদরের পেনী আনন্দে ছুটোছুটি করছে। বস্তুত অক্ষয় স্যাতসেঁতে বিষণ্ণ মনের ভিতর পেনীর ছেলেবেলাকে আদর করতে লাগল।

আসলে সে জানতে চেয়েছিল, পেনীর ভয় করছে কিনা। যদি বাস্তবিক ভয় করে থাকে, হাতের টর্চটা ওকে দেবে। যে টর্চ বাড়ি থেকে বেরোনর পর এখন অব্দি একটিবারও জ্বলেনি। এমন কি পাছে অসাবধানে জ্বলে ওঠে, তাই সে সাবধানে বোতাম থেকে আঙুল যতটা সম্ভব দূরে সরিয়ে রেখেছে।

অথচ বিষণ্ণতার খাঁজে খাঁজে বিরক্তি কটু গন্ধ ছড়ায়। নিজের ওপর ক্রোধে ক্ষিপ্ত হতে চায়, সোনার-পুরের পেমাস্টার অক্ষয় সাঁতরা। কারণ, এতক্ষণে পেনীর শৈশবকে নরম অভ্রের মত নাড়াচাড়া করে সে জানতে চায় তার গন্তব্যস্থল। তার পর মাথার উপর আকাশ এবং সামনে-পিছনে ডাইনে-বাঁয়ে পুঞ্জ পুঞ্জ অন্ধকার লক্ষ্য করে জায়গাটা সনাক্ত করতে থাকে। অক্ষয় গুমরে দিয়ে ভাবে—তাই তো, পেনীকে নিয়ে সে কোথায় চলেছে? আর কী মজার কথা, পেনীও একটিবার মুখ ফুটে জানতে চাইল না!

জানতে চায়নি পেনী। কোনদিনও কি সে তার গন্তব্যস্থল জানতে চেয়েছে? চেয়েছিল একবারটিও?...তাহলে তো এমন কেলেঙ্কারী কান্ড ঘটত না। সোনারপুর ব্লকের খানু পেমাস্টার, প্রাক্তন গোমস্তা অক্ষয়মোহন সাঁতরার ছোট্ট পরিবারে—টেস্ট রিলিফের অসীম দাক্ষিণ্যে পাওয়া অভ্রের গমের মত কঠিন ও পর্যাপ্ত শান্তি বিরাজ করত! আর শান্তি বস্তুটি কী? সে তো আসলে নিরাপত্তার সুখ। অক্ষয়ের পরি-বারের নিরাপত্তা, আশ্চর্য, ওই শান্তশিষ্ট নরম মেয়ে পেনী আঠারো বছর বয়সে বিঘ্নিত করে বসল। অক্ষয় ও দৃঢ় সেই নিরাপত্তা—যাতে প্রখ্যাত তদন্ত কমিশনও সূচ বেঁধাতে সক্ষম হয়নি।...তাহলে পেনী, এই গোবেচারা পেনীর শক্তিকে প্রশংসা করতে হয়। স্বীকার করে নিতে হয়।

অন্ধকারে শুয়োরের মত নাক উঁচু করে তাকাচ্ছিল অক্ষয়। অধকারে হাঁটতে হাঁটতে তাকিয়ে দেখছিল আবছায়ার মত সঞ্চরমান পেনীকে। বড় রহস্যময়ী মনে হচ্ছিল তাকে। শক্তিময়ী মনে হচ্ছিল এবং তখনই অক্ষয় একটু ভয় পেল হঠাৎ। অস্বস্তিতে অস্থির হল। এখনই যদি পেনী মুখ ফিরিয়ে পথ জানতে চায় বা গন্তব্যস্থলের প্রশ্ন করে বসে, সে কী করবে? কী করবে অক্ষয়?

ভেজা ঘাসের উপর যেমন আলো-অন্ধকারের বিচিত্র চলচ্ছবি, ঠিক তেমনি একটি বিচিত্রতা ফুটে উঠছিল অক্ষয়ের মনে।

আর পেনী? সে তখন যেন অন্ধকারে নিরাপদ (পিছনে বাপ) চলার নেশায় বিহ্বল। আগের দিনে মানে পেনীর যখন ছেলেবেলা, গোমস্তা অক্ষয় ঘোড়ায় চেপে মহালে খাজনা আদায় করতে যেত। সঙ্গে ওই ফ্রকপরা আদুরে মেয়ে—বাপের পিঠ আঁকড়ে বসে থেকেছে। ফিরে এসে কোমর ব্যথা করলে মা কনক গরম সর্ষের তেলে কর্পূর মিশিয়ে মেয়ের কোমরে মালিশ করে দিয়েছে। বাবামায়ের পক্ষে একমাত্র কন্যার যত্নআত্তি ছিল অফুরন্ত। তায় পেনী এমন মেয়ে, যে পায়ের কাছে পথ দেখলেই হাঁটে। ভ্রূক্ষেপহীন হেঁটে যায়। উদ্দেশ্যবিহীন। যত নরম বা শান্তশিষ্ট হোক, ওই এক জ্বালা। বারান্দা থেকে উঠোন, উঠোন থেকে খিড়কি—নিঃশব্দে সে গড়িয়ে গেছে সবার অলক্ষ্যে। আর আস্তে আস্তে মেঘের ভিতর বেলা বাড়বার মত ফ্রকের আড়ালে পেনী বড় হচ্ছিল। কারুর মাথায় আসেনি, মাটির নীচেনিটোল রাঙাআলুর মত ওর শরীরটা কোষে-কোষে মিষ্টরস ধারণ করে স্ফীত হচ্ছে বা ফাটলের মধ্যে উঁকি মারছে।

কনক মধ্যে-মাঝে বলেছে—পেনী আমার চিরকালের খুকী। ও বয়স পেতে চিতের উঠব আমরা। খুকখুক করে হেসেছে অক্ষয়। বলেছে—তোমার গিয়ে, ওই সানুটাও অমনি ছিল। এখনও বেঁচে থাকলে বয়স ধরার সাধ্য ছিল না কারুর। দশেও খোকা, বিশেও খোকা—খোকাটে আদল ঘুচত না।...বলে সে নিজের উল্লেখ করেছে—এই দ্যাখো না,

বাহান্ন পেরোলাম, চুলও পাকল না দাঁতও নড়ল না। আর চোখ— আড়াই মাইল দূরের সিগনালপোস্ট দেখে বলতে পারি, ট্রেন আসবার সময় হল নাকি...এখন বোঝা যায়, কী একটা অদ্ভুত ভান করে কাটিয়েছে তারা। কী বিশ্রী চোখঠারা, গুপ্তধন লুকোবার ফিকির। কিন্তু কেন?

কদিন থেকে শুধু ওই এক চিন্তা ছিল মাথায়। ঘড়ির দোলকের মত টিকটিক।

আড়াই মাইল দূরের সিগনাল দেখতে পায় অক্ষয়, সেই সক্ষম চোখ দেখতে পায়নি মেয়ের বয়সের স্টেশনে কোন লাল-রঙা রেলগাড়ি আসবার সময় হয়েছিল। যেন জেনেশুনে এক মারাত্মক লুকোচুরি খেলছিল স্বামী-স্ত্রী মিলে—পেনী ছিল যার বুড়ি। এখন অক্ষয় বুঝতে পেরেছে, পথের পাশে ঝোপের আড়ালে বাঘের মত পেনীর যৌবন অনুসরণ করছিল। বেচারা পেনী! তার ঘাড় মটকে তবে ছেড়েছে।

বেচারা! বত্রিশ নাড়ি পাক খেয়ে টন-টন করে এখন। অনেক দিন আগে অক্ষয় একদিন ক্লান্ত হয়ে বাড়ি ফিরলে কনক আড়ালে ডেকে নিয়ে বলেছিল—শুনেছ কান্ড? চতুর সতর্ক পেমাস্টারী চোখে অক্ষয় তাকিয়েছিল বৌর দিকে। কনক বলেছিল—পেনী মানে পেনীর—তখন অক্ষয় আড়চোখে তাকিয়ে বারান্দার এক কোণে নাকি দরজার পাশে কাঠের মত দাঁড়ানো পেনীকে দেখল। হ্যাঁ, পেনী কনকের আট-পৌরে শাড়িটা পরেছে। আধো-আলোয় বাপের দিকে একবার তাকিয়েই মুখ ফিরিয়েছে। হয়ত হেসেছে। ম্লান হাসিই বলা যায়। সত্যি বলতে কী, অক্ষয়ের লজ্জা করতে থাকল। অপরাধীর মত মেয়ে স্তব্ধ আর জড়োসড়ো, হতবুদ্ধি এবং অক্ষয় অনুভব করল, নিজের দেহের এই অতর্কিত বিস্ফোরণে—বিস্ফোরণ আর অশুচিতায় ও এক ঘৃণাভাবকে অবলম্বন করেছে। ফ্রকের ভিতর ছোট্ট শরীরটা হঠাৎ ভয়ঙ্কর অগ্নি-গিরি জেনে হতভাগিনী বিস্মিত বিব্রত। সেইদিনই অক্ষয় ঠিক পরবর্তীকালের আরেকদিনের মত পেনীর ছোট্ট কোমল কচি জঠরটার কথা চিন্তা করেছিল। একদিন পেনী মা হবে—সত্যি? এ কি সম্ভব? ভাবতে ভাবতে সারাটি রাত চোখে ঘুম এল না সে রাতে। কী মজার কান্ড, দেহের ভিতর থেকে দেহ এল, সেই দেহের ভিতর ফের দেহ, ফের, আবার, আবার—

পেনীকে নিয়ে সাধ দুজনেরই ছিল। সে সাধ সামান্য নয়। কনকের সাধ—বহরম-পুরে মিশনারী স্কুলে পড়তাম। মেমদিদি আমার বিলেত নিয়ে যাবে বলত। কত ভালো ছাত্রী ছিলাম। স্বপ্নেও ভাবিনি বাবা মারা যাবেন আর আমায় আসতে হবে এই সৃষ্টিছাড়া পাড়াগাঁয়ে। অক্ষয় বৌর দুঃখটা চিরদিন বুঝেছে। বলেছে, আমারও কি কম স্বপ্ন ছিল বলতে চাও? পাড়াগেঁয়ে বাবা—বিষয়বুদ্ধি ছিল হাড়ে হাড়ে। এন্ট্রাস পাস করতেই বলে বসলেন—ব্যাটা জমিদারী সেরেস্তায় ঢোক দিকি, সুখের মুখটা দেখে আয়!

সুখের মুখ অবশ্য দেখেছে অক্ষয়। কনকও দেখল বৈকি। তত্রাচ গ্রোন নিঃঝুমে দুপুরে কি গভীর রাত্রে বিছানায় বসে বই-পত্তর খুলে দেখতে দেখতে হঠাৎ অন্যমনস্ক হয়ে গেছে। অন্যদিকে চেয়ে থেকেছে কিছুক্ষণ। তারপর দীর্ঘশ্বাস ফেলেছে একবার। পাশে ঘুমন্ত সানু। অক্ষয়ের চোখে সানুকে দেখেছে। আর সানু তিনদিনের জ্বরে মারা গেলে (পেনী তখন পেটে) কনক তবু স্বপ্ন দেখেছে। স্বভাবত কনকের স্বপ্ন তখন আরো বিচিত্র আরো মনোরম হতে পেরে-ছিল। তবে অক্ষয় পুরুষমানুষ। পুরুষ সন্তানের উপর আরোপিত তার স্বপ্ন তখন হৃদয়ের ভাঙাঘরে জ্যোৎস্নার মত বিষাদে নীরবতায় অবস্থান করেছে। পেনী—পেনীর জন্য চিন্তাভাবনা এল অনেক পরে। সোনাপুরে কালের হাওয়া এল ঝাঁপিয়ে যখন। যখন সোনারপুরের ভদ্রপরিবারের মেয়েদের রূপ গেল বদলে এবং যখন তারা হাইওয়েতে বাসে চেপে মাইল দূরের শহরের স্কুলে লেখাপড়া শিখতে যায়—তখন।

কনকের কথা শুনে আদিখ্যেতা মনে হয়েছে নিশ্চয়। কিন্তু অক্ষয়ের বাপের বুকে কনকের মায়ের আবেগও সংক্রমিত হয়েছে দিনে দিনে। 'মেয়ে তোমার মেয়েলাট হবে' বলে ঠাট্টা করলেও কী জানি কালের হাওয়ায় কী ছিল, টেস্ট রিলিফির পে-মাস্টার অক্ষয় দূর মাঠের বুকে মাটি কোপানো মজুরদের কোলাহল থেকে কান বাঁচিয়ে পেনীর দিকে রাখত। পেনীর কণ্ঠে ইংরেজী কবিতা আবৃত্তি শুনতে পেত। আর দূরে গ্রামের পাশে ন্যাশনাল হাইওয়ের দিকে তাকাত—বেলাশেষের বাসে পেনীর শহর থেকে আসবার সময় হল বুঝি। সে তাড়া দিত—ও হাজরাবাবু, চটপট জরীপগুলো সেরে নাও দিকি!

সেই স্বপ্নের মেয়ে পেনী। পরপর দুবার স্কুল ফাইনাল ফেল করেও দ্বিধাহীন গতিতে ফের শহরের স্কুলে গেছে। অজস্র নতুন বন্ধুর নাম বলেছে। নির্বিকার। অকপট। শান্ত কর্মীর মত নিরলস।

এখন অক্ষয় টের পেয়েছে, ওই খোলসে আত্মগোপন করে চলছিল পেনী। তার ভিতরের মারাত্মক জিনিসটিকে সে বাইরে আসতে দেয়নি। পরপর দুবার ফেল—অত পরিশ্রমী মেয়ে, তখনই সন্দেহ হওয়া উচিত ছিল। নির্বোধ বাবা-মাকে আশ্চর্য ফাঁক দিতে সক্ষম হয়েছে ও। দাঁতে দাঁত চেপে বসছিল অক্ষয়ের। হাঁটুর নীচে অন্ধকারে বুঝি ঘাসফড়িং সুড়সুড়ি দিচ্ছে। তাড়াতে ইচ্ছে করে না। পরাজয়ের অপমানে গ্লানিতে রক্ত চনমন করছিল। অক্ষয় সাঁতরার মেয়ে বিজয়া—সে যেন জয়ের গর্বে সামনে হেঁটে চলেছে, আর বন্দীর মত টেনে নিয়ে যাচ্ছে অক্ষয়কে; এই শরৎকালীন রাত্রে ঘাসের পথে আড়ষ্ট শরীর তার, বড় ক্লান্ত, বড় অপমানিত। আঃ, এ অপমান যেন পৌরুষের উপর পদাঘাত—পেনী, একমাত্র পুরুষ অক্ষয়েরই অধিকার ওই পেনী —তার শূন্য জঠরকে পূর্ণ করার সকল আয়োজন একটুও টের পাওয়া যায়নি। অক্ষয়ের পৌরুষকে পরাহত করে যে আততায়ী নিশ্চিন্তে অবস্থান করছে, তাকেই এখন খুঁজছিল অক্ষয়। তার মনে হচ্ছিল, সে হাজরাবাবুর ছেলে অমিয় নয়, এমনকি হয়ত পেনীও নয়—সে অন্য কেউ। সে কে, তাই সে খুঁজছিল।

নাঃ, পেনীর কোন দোষ নেই। অমন নিরীহ মেয়ে—সংসারের জটিলতায় কীই বা বোঝে, কী জানে মানুষের! এ ঠিক আকস্মিক দুর্বলতা নয়—যেন নিতান্ত হঠ-কারিতা। শহরের ডাক্তারবাবু বলেছিলেন—আজকাল এসব কেস প্রায়ই আসছে। আর বলবেন না, ওই নিয়েই গেলুম...তবে মশাই, লাইফ রিস্ক আছে বলে দিচ্ছি। তখন এদিক-ওদিক হলে ফাঁসাতে চেষ্টা করবেন না যেন। ...লাইফ রিস্ক? কেন? অক্ষয় চমকে উঠেছিল। পেনী মারা যেতে পারে? পেনী ম-রে-যা-বে? আর ঝুঁকে পড়ে কাঁদছিল পেনী নিঃশব্দে। হয়ত ভয়ে। হয়ত অব-মাননায়। ফিরে এসেছিল অক্ষয়। পথে একবার বলেছিল—পেনী, মা, একটা সত্যি কথা বলবি? পেনী জবাব দেয়নি। রিকশো ঝড়ের বেগে ছুটেছিল সেরাতে। অক্ষয় জানতে চেয়েছিল—অমিয়র সঙ্গে লোক-লজ্জার মাথা খেয়ে বিয়ে দিলে পেনীর আপত্তি আছে কিনা। পরে কনকও জানতে চেয়েছিল। তখন নাকি পেনী সাফ জবাব দিয়েছে—না।...কেন? হয়ত না মানেই হ্যাঁ—মেয়েদের ওইরকম ভাষা। এছাড়া আর কোন জবাব নেই মেয়ের মুখে। নাকি অমিয় তার সরলতার সুযোগে তার উপর বলাৎকার করেছে? তাহলে মুখফুটে বলেনি কেন পেনী? অক্ষয় প্রকাশ্য দিনদুপুরে চুল ধরে অমিয় ছোকরাকে রাস্তায় টেনে এনে খুন করত। পেনী কোন অভিযোগও করেনি। কুয়োতলায় হঠাৎ একদিন মাথায় হাত চেপে 'ওয়াক' করা, ফের পরপর কয়েকদিন ওই কান্ড, কনকের চোখ গিয়েছিল। তারপর সব বুঝতে পেরে, প্রচন্ড মার, ধিক্কার, আত্ম-হত্যার নির্দেশ—পেনী শুধু বোবার মত ফ্যাল-ফ্যাল করে তাকায় আর কাঁদে। শেষে উন্মাদিনী কনক রাতদুপুরে বঁটি হাতে মেয়ের সামনে দাঁড়িয়ে বলে—তবে বল কে এমন কাজ করলে। শীগগীর বল্, মুখপুড়ী জাতনাশা হারামজাদী, নৈলে মাছকাটা করে ফেলব। আহা, খুকী-খুকী নিষ্পাপ মুখ নিয়ে পেনী শুধু বিড়বিড় করে বলল—অমিয়দা।

আহা! বুক সেদিনের মত ভাঙছে অক্ষয়ের। এখন এই গভীর রাত্রির অন্ধকারে নির্জন মাঠের পথে তার নাকে জল জমছে। ফোঁস ফোঁস করে সে নাক ঝাড়ছিল। এখন তো আর বিধাতার নির্দেশেও সে পেনীকে বলতে পারবে না—পেনী, এই নে দড়ি, গাছের ডালে আমি ফাঁসটাও পরিয়ে দিতে রাজী আছি, তুই ঝুলে পড় দিকি মা। এমনকি ট্রেনের সামনে ঝাঁপিয়ে পড়তে বলারও সাধ্য নেই। অথচ ওইরকম একটা ভেবেছিল, কত সহজে এমন কিছু একটা করা যায়। প্রৌঢ় অক্ষয় আস্তে আস্তে অবুঝ হয়ে পড়ছিল। অনেক রকম আবোলতাবোল কল্পনা আসে মাথায়। আচ্ছা, এমন কি হয় না, হঠাৎ দেখা গেল পেনীর জঠরটা আগের মত শূন্য হয়ে গেছে

—সবটাই আগাগোড়া একটা স্বপ্নমাত্র? কিংবা, কিংবা পেনী গাছের নীচে চিৎ হয়ে শুয়ে সে তার পেটে হাত বোলাতে থাকল আর...ত্বরিতে অক্ষয়ের মনে পড়ে গেল —একদিন একটা মামলার ব্যাপারে সে খুব সকালে শহরে গিয়েছিল। পথের পাশে ভীড় ছিল। সে দ্যাখে, ড্রেনের আবর্জনা থেকে একটা সদ্যজাত শিশুকে টেনে তুলছে মেথর —দৃশ্যটা এত চমকপ্রদ, এত ভীতিব্যঞ্জক, অক্ষয় দ্রুত স্থানত্যাগ করেছিল। তখন কোর্টের প্রাঙ্গণে হাঁটবার সময় তার একই চিন্তা—শিশুটি যদি বাঁচে! ও মরে যাক, মরুক। হতভাগিনী মায়ের জীবনটা তাহলে নিরাপদ থাকবে।

এদিকে কনকের হিসেবমত তিন মাস হয়—আরও ছ-মাস পরে পেনীর গর্ভের পাপ নিষ্কাশিত হবে ছ-মা-স। এতদিন কোথায় রাখবে পেনীকে? কোন আশ্রমে? অনেক দূরে কোথাও বিশ্বস্ত আত্মীয়গৃহে? বেরোবার সময় কনককে বলে এসেছে—নাঃ যা হবার হবে, সেই ডাক্তারবাবুর কাছেই ফের নিয়ে যাই। কনক সায় দিয়েছে। কিন্তু পাছে পেনী ভয় পায়, তাকে কোন কথা জানানো হয়নি। শুধু বলেছে—চল, একবার ঘুরে আসি। অদ্ভুত মেয়ে, এমন দিনেও তার জানতে ইচ্ছে করল না, কোথায় যাবে তারা?

অক্ষয় বেরিয়ে পড়েছিল মাঠের পথে। বেরিয়ে পড়ার পর থেকে নানা চিন্তার ফাঁকে থেকে-থেকে একই

প্রশ্ন ঝরছে ফোঁটায় ফোঁটায়—কোথায় যাবে সে পেনীকে নিয়ে? এমন উদ্দেশ্যহীনভাবে কেন সে বেরিয়ে পড়ল নিশুতি রাতে? যেন এমনি করে বেরিয়ে পড়লেই সব সমস্যার সমাধান সম্ভব হয়!......অক্ষয় ফোঁস ফোঁস করে নাক ঝাড়তে থাকল। তার ইচ্ছা পেনী নীরব না থেকে মুখোমুখি প্রশ্ন করুক বাবাকে। তাহলেই সে একটা সঠিক গন্তব্যের জবাব দিতে পারবে।

আলপথের দুপাশে সতেজ ধানগাছ। হাঁটু অবধি ভিজে যাচ্ছে তার। রোসে ঘাস-ফড়িং আর ঘাসের ফুল ঘাসের কুটো জমছে থরে থরে। ভীষণ কুটকুট করছে পা দুটো। এতক্ষণে সে আবিষ্কার করল—তার পা-দুটোয় জুতো নেই। আর পেনীর শাড়ির নীচেটা অবশ্য ভিজে ময়লা হয়েছে। সাপের ভয় না মেনে পেনী দ্রুত হাঁটছে। অবোধ মেয়ে—সাপের কথা ওর মনে আসে না। যেন আলপথে ঘাসের ভিতর কেউটের মুখ দেখতে পেয়ে অক্ষয় এতক্ষণে টর্চ জ্বালাল। একঝলক আলো প্রসারিত হল ভেজা ঘাসের পথে, পেনীর পিছনের দিকে দুপায়ের ফাঁকে গিয়ে আছড়ে পড়ল আলোটা। এবং পেনীর অর্ধস্ফুট ওপরের অংশ একটা চকচকে কম্পমান কাঁচের মত স্থির হল সঙ্গে সঙ্গে। পেনী মুখ ফিরিয়ে বলল—বাবা!

—হ্যাঁ, এই যে। অক্ষয় সাড়া দিল। হাত বাড়িয়ে বলল—টর্চটা বরং তুই নে। পথ দেখে চল্। পেনী একটু হাসল।—বেশ তো যাচ্ছি।

—না, আলো নে। অক্ষয় টর্চটা হাতে গুঁজে দিল। তারপর ফের বলল—দেখিস্, আছাড় খাস্‌নে।

ফের সেই নীরবতা। কীটকণ্ঠে অস্ফুট চিৎকার। কচিৎ বাতাসের স্পর্শ—ধানের পাতায় শনশন শব্দ। কখনও মাথার উপর বালিহাঁসের ডানার আলোড়ন। স্তব্ধ নক্ষত্রের আলো উপরে—যেন অজস্র চক্ষু দিয়ে অন্ধকার তাদের দুজনকে পর্যবেক্ষণ করছে।

এবার সামনে পাটক্ষেত। বারবার টর্চ জ্বালাচ্ছিল। পথ খুঁজছে বুঝি। সারবন্ধ হলুদ পাণ্ডুর আর বিশীর্ণ পাটগাছ। তাদের লতায় পাতায় শিশির চোঁয়াচ্ছে। পেনীর হাতের আলো চক্রাকারে ছড়ালো কয়েক-বার। তারপর সে বলল—পথটা খুঁজে পাচ্ছিনে বাবা।

অক্ষয় কাছে গিয়ে দাঁড়াল। কোথায় চলে এসেছে, জানবার চেষ্টা তার আচরণে। এবং একটু দেখে নিয়ে সে বলল—মনে হচ্ছে, পাটক্ষেতের ওপারেই রেললাইন পড়বে।

পেনী কি চমকাল হঠাৎ? সে কয়েক-মুহূর্ত স্তব্ধ থেকে বলল—তাহলে সোজা-পথ ছেড়ে এদিকে এলাম কেন? যেন প্রশ্নটা বাবাকে নয় নিজেকেই। তারপর সে কেমন হেসে ফেলল। এত সব কাণ্ড ঘটেছে, দিনের পর দিন তবু পেনী ওইরকম হেসেছে। নিঃসঙ্কোচ থেকেছে। কেবল হয়ত অপরাধ-বোধের কান্না ছিল তার কাছে সান্ত্বনার মত। ছেলেবেলায় হাসিমুখে খেলাঘরে যেমন সে তার একটা জগন্নাদর প্রিয়-পুতুলকে লক্ষ্য করতে গিয়ে কেঁদে ফেলত। কিন্তু সে নিতান্ত তাৎক্ষণিক। পরক্ষণেই নিবিষ্ট মনে খেলায় মেতেছে। এইসব হাসিকান্নাও তেমনি। যেন এই অস্ফুট হাসির মত ওই কান্নাতেও তার কী পরম সুখের ব্যাপার আছে।

—এলাম,...অক্ষয় গলা ঝেড়ে বলল।... মানে, এইটেই সোজাপথ ছিল। তারপর বাঁদিকে পাটক্ষেতের ভিতর অদৃশ্য হয়ে যাওয়া আলপথটা দেখিয়ে পেনীকে ইসারা করল যেতে। পেনী পা বাড়াল।

তাহলে, অক্ষয় ভাবল, তাহলে পথটা স্টেশনের দিকেই গেছে। পেনী খুশীমত এসেছে এপথে—কিংবা অক্ষয়ের ইচ্ছা ছিল—এই অদ্ভুত নৈশ অভিযানে পেনীই নেতৃত্ব করুক। সত্যি, অন্ধকার মাঠে দিকনিশা চেনা প্রকৃতপক্ষে একটা কঠিন কাজ।

পাটক্ষেত কাঁপিয়ে সেই সময় হাওয়া এল ঝাঁপিয়ে। আর নড়বড় করে অজস্র পাট-গাছ নড়তে লাগল। আগন্তুকের পায়ের শব্দে ভয় পেয়ে তখনই একঝাঁক ছোট্ট পাখি সর-সর শব্দে উড়ে গেল। পেনীও বুঝি ভয় পেয়েছে এবার। থেমেছে। অক্ষয় সাড়া দিল —চল্, ভয় কী!

পেনী থমকে দাঁড়িয়েছিল। ওর হাতের আলোয় সামনের ফাঁকা জমি উদ্ভাসিত। উঁচু ঘাস গজিয়ে আছে জলে। গুটিকয় সাদা পোকা বিভ্রান্ত হয়ে উড়েছে। আর ওর হাতের আলো স্থির। পেনীর চোখের মত স্থির আর নির্বিকার। অক্ষয়ের মনে হচ্ছিল, এমনি চোখে পেনী বুঝি তার ভবিষ্যতকে দেখে এসেছে এতদিন। সে এগিয়ে এসে পাশে দাঁড়াল। পেনী বলল—পথ কই?

পা বাড়াতেই অক্ষয়ের হাঁটু অবধি জলে ও ঘাসে ডুবে গেল। সে ঘাড় ফিরিয়ে বলল—তুই পেছন-পেছন আয়। আলোটা জ্বেলে রাখ্।

কয়েকটি পদক্ষেপ। তারপর জল ও ঘাস ক্রমশ কমেছে। একটা অনাবাদী নাবাল জমি এটা। ইতস্তত বিক্ষিপ্ত কিছু নিঃশব্দ ঝোপ। দ্রুত পেরিয়ে যাচ্ছিল অক্ষয়। সামনে সারবন্ধ গাছপালা। বিরাট বট ছায়াগুঁড়ি দিয়ে আছে। সঠিক চিনতে পেরে সে মুখ ফেরাল এবার।—কোথায় এসেছি!

—কোথায়?

পেনীর প্রশ্নটা ঝাসঝাড়িয়ের ডাকের মত চাপা। কিছুটা ক্লান্তও। অক্ষয়ও ততোধিক চাপাস্বরে জবাব দিল—শ্মশানে।

তারপর শেষরাতে অক্ষয় বাড়ি ফিরছে। তার জামার গলার কাছটা ছেঁড়া। গালে গলার নীচে হাতে কেমন চিনচিনে ব্যথা। আর পায়ের নীচে নীচু এবড়োখেবড়ো পথ। সে এই পথটার কথা ভাবছিল। ব্লকের ওভার-সীয়ার গত সন্ধ্যায় তার বাড়ি বসে এই পথের কাল্পনিক মেরামতী কাজ জরীপ করে গেছে। হাজরাবাবু অজস্র টিপসহিভরা আধদিস্তা কাগজ নিয়ে ভীলার মাখন দত্তর বাড়ি যাবে আজ সকালেই। সেখানে অক্ষয়কে তো থাকতেই হবে। এই সকালবেলাটা না জানি কেমন যাবে। তদন্ত-ফদন্ত ও সব কাগুজে বাঘ। কেবল নিজের কাছে ব্যাপারটা কেমন-কেমন লাগে। মনে হয়, কী দরকার এসবে? টাকা যা আছে, তাতে শ্মশানযাত্রা অবধি কুলোবে হেসেখেলে। তাসত্ত্বেও......

দরজা খোলা ছিল নাকি সারারাত? দেখে অক্ষয় প্রচণ্ড চমকাল। স্ত্রীবুদ্ধি আর কাকে বলে! কনকের মুখটা ফোলা, চোখ লাল। সারারাত ঘর-বাহির করেছে বেচারা। কাছে আসতেই সে প্রশ্ন করল—রেখে এলে?

—হুঁ। অক্ষয় সংক্ষিপ্ত জবাব দিল।

—কান্নাকাটি করছিল নাকি?

—নাঃ!

কনক সহজ কণ্ঠস্বরে বলল—জানো, তোমরা বেরিয়ে গেলে অমিয় এসেছিল। পা চেপে ধরে খুব কাঁদছিল। আমি বলেছি, উনি ফিরে আসুন। তারপর......

অক্ষয় নীরবে জামা খুলছিল।

—পেনীর মতামতের কী দাম আছে? আমরা যা করব, হবে। এটা ঢাকতে হবে তো! কনক বলতে লাগল।—তুমি বরং ওখানেই ব্যবস্থা করে ফেলো। ডাক্তারবাবু তো বলেছিলেন, বলেন নি?

—হুঁ।

—আজকাল এমন অনেক হচ্ছে। শহরের বাড়িটা ওদের দিলেই চলবে। আর ভাড়াটে বসিয়ে দরকার নেই। শুনছ?

—হুঁ।

হঠাৎ কনক এগোল।—ওকি! তোমার গায়ে ওসব কিসের দাগ? ইস্ রক্ত পড়ছে। পড়ে গিয়েছিলে নাকি?

অক্ষয় একটা চাপা হুঙ্কার দিয়ে ধাক্কা মেরে সরিয়ে দিল স্ত্রীকে। হারামজাদী মেয়েটা অক্ষয়ের পুরুষশরীরে যে নখচিহ্ন দিয়ে গেছে, অমিয়কেও একদা তা দিয়েছিল কি না অক্ষয় জানে না। কিন্তু এমনি প্রচণ্ড প্রতিঘাতে কি সে অমিয়র হাত থেকেও বাঁচতে পারত না? আর কয়েকটি মুহূর্তেই শেষ হয়ে যেত—অক্ষয়ের ব্যর্থতা, হাত ফসকে অন্ধকারে পালিয়ে গেল। অক্ষয় জন্মদাতা আর অমিয় তো পর। অপমান-বোধে অক্ষয় ক্ষিপ্ত। পালিয়ে যাবে কোথায়? শরীরে পাপের বোঝা নিয়ে হারিয়ে যাবা অন্তত।

প্রেক্ষাগৃহ

জনপ্রিয় অভিনেত্রী বৈজয়ন্তীমালা।   ফটো : অমৃত

চিত্র-সমালোচনা

এন্টনী ফিরিঙ্গী (বাংলা) : বি এন রায় প্রোডাকসন্স-এর নিবেদন ; ৪,৩২৭·২৫ মিটার দীর্ঘ এবং ১৫ রীলে সম্পূর্ণ ; প্রযোজনা : বি এন রায় ; রচনা ও পরিচালনা : সুনীল বন্দ্যোপাধ্যায় ; সঙ্গীত পরিচালনা : অনিল বাগচী ; গীতরচনা : প্রণব রায় ও গৌরীপ্রসন্ন মজুমদার ; চিত্রগ্রহণ : বিজয় ঘোষ ; শব্দানুলেখন : অতুল চট্টোপাধ্যায়, বাণী দত্ত, অনিল দাশগুপ্ত ও সোমেন চট্টোপাধ্যায় ; সঙ্গীতানুলেখন ও শব্দপুনর্যোজনা : শ্যামসুন্দর ঘোষ ; রূপ ও পরিচ্ছদ পরিকল্পনা : ও সি গাঙ্গুলী, প্রণব গাঙ্গুলী, প্রণয় গাঙ্গুলী ও কবরী ; সম্পাদনা : অর্ধেন্দু চট্টোপাধ্যায় ও রাসবিহারী সিংহ ; নৃত্যপরিকল্পনা : রবি দাস ; নেপথ্য কণ্ঠসঙ্গীত : সন্ধ্যা মুখোপাধ্যায়, মান্না দে, মালবিকা কানন, রুমা গুহঠাকুরতা, তরুণ বন্দ্যোপাধ্যায়, অধীর বাগচী, আলোক বাগচী, চিত্ত মুখোপাধ্যায়, ছায়া দে, স্বপন রায়, শ্যামল চক্রবর্তী ও সলিল মিত্র ; রূপায়ণ : উত্তমকুমার, অসিতবরণ, হরিধন বন্দ্যোপাধ্যায়, হারাধন বন্দ্যোপাধ্যায়, অসীমকুমার, ভানু বন্দ্যোপাধ্যায়, প্রশান্তকুমার, তরুণকুমার, শ্যাম লাহা, জহর রায়, মন্মথ মুখোপাধ্যায়, মণি শ্রীমানী, নৃপতি চট্টোপাধ্যায়, প্রীতি মজুমদার, তনুজা, ছায়া দেবী, ললিতা চট্টোপাধ্যায়, রুমা গুহঠাকুরতা, আশা দেবী, মীনা বাঈ প্রভৃতি। ছায়ালোক-এর পরিবেশনায় গেল ৬ অক্টোবর, শুক্রবার থেকে রূপবাণী, বসুশ্রী, বীণা এবং অন্যান্য চিত্রগৃহে মুক্তিলাভ করেছে।

ঊনবিংশ শতাব্দীর প্রথম দিকে বাংলাদেশের বিদগ্ধসমাজ ধনী জমিদারদের অর্থানুকূল্যে উপভোগ করত 'কবির লড়াই'। কবিরা হিন্দু পুরাণ ও ধর্মশাস্ত্রের সকল উপাখ্যান ও ঘটনা সম্বন্ধে পারঙ্গম হয়ে এমন সব গান বাঁধতেন প্রতিপক্ষকে জব্দ করবার জন্যে, গানের ভিতর দিয়ে যার উত্তর দেওয়া এবং প্রতিপ্রশ্ন করা নির্ভর করত প্রতিপক্ষের ঐ বিষয়ে সম্যক জ্ঞান ও বুদ্ধির উপর। হরু-ঠাকুর, রাম বসু, ভোলা ময়রা প্রভৃতি সে যুগের বিখ্যাত কবিয়ালের সঙ্গে এমন আর একজন কবিয়ালের নাম শ্রদ্ধার সঙ্গে উচ্চারিত হয়, যিনি না ছিলেন হিন্দু, না ছিলেন বাঙালী। অথচ পর্তুগীজ পিতার সন্তান হয়েও এবং খৃস্টানের ঘরে জন্মেও ফিরিঙ্গী এন্টনী একজন জাত কবিয়াল হিসেবে সে-যুগের বাঙালী সমাজে সম্মানের আসন লাভ করেছিলেন এবং বাংলা সাহিত্যের ইতিহাসে চিরদিনের জন্যে স্মরণীয় হয়ে থাকবেন। এই ফিরিঙ্গী কবি বাংলা দেশকে ভালোবেসেছিলেন, বাংলা ভাষাকে ভালোবেসেছিলেন। প্রবাদ শোনা যায়, তিনি নাকি এক বাঙালী ব্রাহ্মণের ঘরের বিধবাকে ভালোবেসে বিবাহ করেছিলেন এবং নিজের প্রিয়তমার ধর্মকে মনে-প্রাণে অবলম্বন করে এমনই কালীভক্ত হয়ে উঠেছিলেন যে, বৌবাজারের প্রসিদ্ধ ফিরিঙ্গী কালীমন্দিরটি তিনিই প্রতিষ্ঠা করেছিলেন। এন্টনী ফিরিঙ্গীর ব্রাহ্মণ বিধবাকে ভালোবেসে বিবাহ এবং উত্তরকালে একজন সার্থক কবিয়াল রূপে প্রতিষ্ঠালাভের ঘটনার ওপর যথেষ্ট কল্পনার রং চাপিয়ে রচিত হয়েছে আলোচ্য বি এন রায় প্রোডাকসন্স-এর 'এন্টনী ফিরিঙ্গী' চিত্রের কাহিনী। বিভিন্ন দৃশ্য ও ঘটনার ভিতর দিয়ে সংলাপ ও গানের সুষ্ঠু সমন্বয়ে চিত্রকাহিনীটিকে এমন সুকৌশলে শেষ পর্যন্ত এগিয়ে নিয়ে যাওয়া হয়েছে যে, প্রধানত আবেগপূর্ণ এই ছবিটি দর্শকচিত্তকে প্রায় অভিভূত করে ফেলে। উপভোগ্যতার দিক দিয়ে এই ছবিটি একটি সার্থক সৃষ্টি রূপে অভিনন্দনলাভের যোগ্য। সুনীল বন্দ্যোপাধ্যায় এ যাবৎ যতগুলি ছবি পরিচালনা করেছেন, তাদের মধ্যে নিঃসন্দেহে 'এন্টনী ফিরিঙ্গী' শ্রেষ্ঠ আসন লাভ করবে।
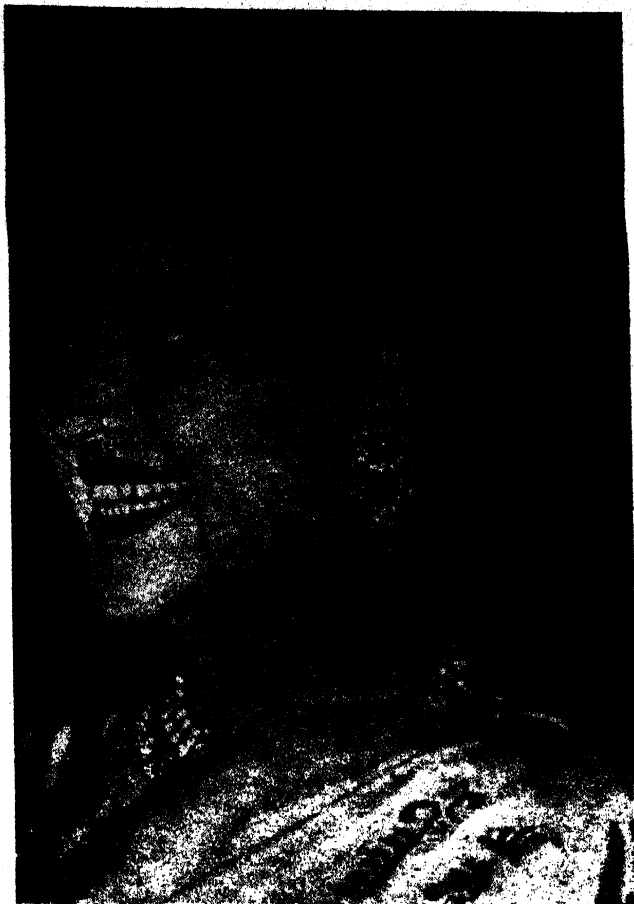
'এন্টনী ফিরিঙ্গী'র একটি বলিষ্ঠতম আকর্ষণ হচ্ছে নাম-ভূমিকায় উত্তমকুমারের অবিস্মরণীয় অভিনয়। ছবির একেবারে প্রথম অংশে নিজেদের ফেরুশাসমাজের প্রতি বীতশ্রদ্ধ, বাঙালী মায়ের একান্ত অনুরক্ত এবং একজন অতৃপ্ত গায়ক রূপে, মধ্যভাগে শাকিলা বাঈজীর গানের ভক্ত, ক্রমে শাকিলা ওরফে নিরুপমার প্রগাঢ় অনুরাগী ও স্বামীরূপে, শেষাংশে কবিয়ালরূপে পরিচিত হবার জন্যে একাগ্র সাধনার ফলে সার্থক কবিয়ালরূপে এবং একেবারে শেষের দৃশ্যে প্রাণাধিকা নিরুর অপঘাতমৃত্যুতে শোকজর্জর স্বামীরূপে উত্তমকুমার যে আশ্চর্য নাট্য-নৈপুণ্যের পরিচয় দিয়েছেন, তা সাধারণত তাঁর কাছ থেকেও পাওয়া যায় না। এন্টনী ফিরিঙ্গীর ভূমিকা তাঁর

ক্যানাডিয়ান সর্ট ফিল্ম সেলিব্রেশনের জনৈক অভিনেত্রী

সুদীর্ঘ চলচ্চিত্র-জীবনে একটি অন্যতম শ্রেষ্ঠ ভূমিকা রূপে চিহ্নিত হয়ে রইল। শাকিলা বাঈজী এবং পরে নিরুপমা রূপে তনুজা যে আবেগপূর্ণ দরদী অভিনয় করেছেন। তাতে তিনি যে বাঙালী নন, একথা ভুলে যেতে আমরা বাধ্য। এই প্রথম দেখা গেল যে, তিনি বাঙালী স্ত্রীচরিত্রের গভীরে প্রবেশ করতে পেরেছেন। হান্স এন্টনীর ফিরিঙ্গী প্রেমিকার চরিত্রে ললিতা চট্টোপাধ্যায় অত্যন্ত সার্থকভাবে অভিনয় করেছেন, তাঁকে মানিয়েছেও চমৎকার। ভোলা ময়রা বেশে অসিতবরণ বিখ্যাত কবিয়ালের দক্ষ দম্ভজরূপটি চমৎকার পরিস্ফুট করেছেন। শঠ লম্পট ধনী যুবক রতিকান্ত বেশে অসীমকুমার ভাবে-ভঙ্গীতে চরিত্রটিকে প্রকাশ করতে পেরেছেন। অপরাপর ভূমিকায় রুমা গুহঠাকুরতা (যজ্ঞেশ্বরী), ছায়া দেবী (এন্টনীর মা), হারাধন বন্দ্যোপাধ্যায় (এন্টনীর দাদা), ভানু বন্দ্যোপাধ্যায় (হরিপদ), কানু বন্দ্যোপাধ্যায় (ব্রজলাল দেবনাথ), প্রশান্তকুমার (নবাব), তরুণকুমার শ্যাম লাহা, নৃপতি চট্টোপাধ্যায়, অজিত চট্টোপাধ্যায়, মন্মথ মুখোপাধ্যায় (ফরাসডাঙ্গার গাঁজার আড্ডার বন্ধুগণ) হরিধন বন্দ্যোপাধ্যায় (রামচাঁদ কবিয়াল), ঠাকুরদাস কবিয়াল প্রভৃতি সবিশেষ উল্লেখ্য অভিনয় করেছেন।

'এন্টনী ফিরিঙ্গী' চিত্রের আর একটি বিশিষ্ট আকর্ষণ হচ্ছে এর সঙ্গীতাংশ। ছবিটিকে গানে ও সুরে ভরিয়ে দিয়েছেন সঙ্গীতপরিচালক অনিল বাগচী। বিশুদ্ধ হিন্দী ঠুংরী থেকে শুরু করে কবিয়ালদের লড়াই পর্যন্ত তিনি এমন সার্থক ও বর্ণাঢ্যভাবে প্রয়োগ করেছেন, যা দর্শকদের কানকে করেছে খুশী, মনকে করেছে পুলকিত। এমন সুরের সুরধুনী বইতে বহুদিন কোনো ছবিতে দেখিনি।

ছবিটির কলা-কৌশলের বিভিন্ন বিভাগে উচ্চশ্রেণীর নৈপুণ্যের নিদর্শন দেখা গেছে। যেমন সুন্দর এর চিত্রগ্রহণ, তেমনই এর শব্দানুলেখন, তেমনই এর কাহিনী-উপযোগী পরিবেশ সৃষ্টি। নবাবের বাগানবাড়ী, শোভাবাজারের রাজবাড়ী, আবার এন্টনীর গোরহাটীর চালাবাড়ী—সর্বত্রই শিল্পবুদ্ধির প্রকাশ। বিভিন্ন চরিত্রের পোশাক-পরিচ্ছদও বৈশিষ্ট্যপূর্ণ।

'এন্টনী ফিরিঙ্গী' বাংলা চলচ্চিত্র জগতে একটি স্মরণীয় সংযোজন। সর্বরকমে এমন প্রাণমাতানো ছবি সচরাচর দেখতে পাওয়া যায় না।

দুষ্টু প্রজাপতি (বাংলা) : ললিত চিত্রম্-এর পক্ষে সবিতা চট্টোপাধ্যায়ের নিবেদন; ৩,৯৫২.০৩৬৮ মিটার দীর্ঘ এবং ১৪ রীলে সম্পূর্ণ; প্রযোজনা: কৌশল চট্টোপাধ্যা; চিত্রনাট্য, সংলাপ ও পরিচালনা: শ্যাম চক্রবর্তী; কাহিনী: বিধায়ক ভট্টাচার্য (রাধা মধুময় আধা মধুরা); সঙ্গীতপরিচালনা : হেমন্ত মুখোপাধ্যায়; গীতরচনা : রবীন্দ্রনাথ, মুকুল দত্ত ও শ্যাম চক্রবর্তী; আলোকচিত্র-পরিচালনা: কানাই দে; চিত্রগ্রহণ: মধু ভট্টাচার্য; শব্দানুলেখন: এস আর পিংলে, নবীন জাভেরী ও রণজিৎ বিশ্বাস; সঙ্গীতানুলেখন: রবীন চট্টোপাধ্যায় ও কৌশিক; নৃত্যপরিকল্পনা : হরেনস (পাপে); শিল্পনির্দেশনা : সৌরেন সেন; সম্পাদনা: অমিয় মুখোপাধ্যায়; নেপথ্যকণ্ঠ-সঙ্গীত: হেমন্ত মুখোপাধ্যায়, কিশোরকুমার, মান্না মুখোপাধ্যায় ও নীলিমা চট্টোপাধ্যায়; রূপায়ণ: কিশোরকুমার, তরুণকুমার, অসীমকুমার, কামু রায়, কেষ্ট মুখোপাধ্যায়, মাস্টার শান্তনু চট্টোপাধ্যায়, তনুজা, সবিতা চট্টোপাধ্যায়, পদ্মা দেবী, ভারতী দেবী, চন্দ্রিমা ভাদুড়ী, কবিতা বসু প্রভৃতি। বাণীশ্রী পিকচার্স-এর পরিবেশনায় গেল ২৯-এ সেপ্টেম্বর, শুক্রবার থেকে মিনার, বিজলী, ছবিঘর এবং অপরাপর চিত্রগৃহে দেখানো হচ্ছে।

সত্যিই মিষ্টিমধুর ছবি হচ্ছে ললিত চিত্রম-এর 'দুষ্টু প্রজাপতি'। আজকের এই শত সমস্যাকণ্টকিত নিত্যকারের জীবন থেকে অন্তত ঘণ্টা দুয়েকের জন্যে মুক্তিলাভ করে প্রাণভরে উপভোগ করবার মতো ছবি এই 'দুষ্টু প্রজাপতি'। অথচ ছবির নায়ক কামু চক্রবর্তী হচ্ছে আমাদেরই মতো মধ্যবিত্ত ঘরের ছেলে। বিধবা সৎ মা, আর দুই বাউণ্ডুলে বৈমাত্রের ভাই নিয়ে অশান্তির সংসারটিকে চালিয়ে নিয়ে যেতে তার নিত্য প্রাণান্ত। বিবাহ করার স্বপ্ন দেখাও তার পক্ষে বিলাসিতা। কিন্তু জীবনপথে চলতে চলতে হঠাৎ তার সামনে এমন একটি মেয়ে এসে উপস্থিত হয়, যে তার জীবনে একমাত্র মেয়ে হয়ে উঠল এবং যে কোনো মেয়েই তার প্রতি অনুকম্পাভরা দৃষ্টিতে তাকায়, সেই মেয়ের মধ্যেই সে সেই বিশেষ মেয়েটিকেই দেখতে পেয়ে ব্যাকুল হয়ে উঠে। দৈবচক্রে এই শিবানীকেই গান শেখাবার জন্যে যখন তার ডাক এল এবং তাকে বলা হয়, মেয়েটি দেশীয় রাজ্যের দেওয়ান-কন্যা, তখন সে এই দেওয়ান-কন্যার সঙ্গে তার চলার পথের সেই হঠাৎ-দেখা বিশেষ মেয়েটির আশ্চর্য মিল দেখে বিস্মিত না হয়ে পারে না। কি পরিস্থিতিতে এই বিস্ময়ের অবসান ঘটল এবং গাইয়ে হিসেবে জনপ্রিয়তার শিখরে প্রতিষ্ঠিত কামু চক্রবর্তী নকল দেওয়ান-কন্যার ভিতর থেকে তার জীবনের সেই বিশেষ মেয়ে শিবানীকে জীবনসঙ্গিনী করতে পেয়ে ধন্য হল, তাই নিয়েই ছবির কৌতুক ও রসাভাসা রসোদ্দীপক কাহিনী।

'দুষ্টু প্রজাপতি' একটি রোমান্টিক কমেডি চিত্র এবং প্রধানত হালকারসের মাধ্যমেই চিত্রকাহিনীটি বর্ণিত। কাহিনীর নায়ক কানু চক্রবর্তীর একটি বিশেষ মানসিকতার ওপর কাহিনীটি বিস্তার লাভ করেছে; পথে হঠাৎ দেখা একটি মেয়ে যখন তার জীবনের বিশেষ মেয়েতে পরিণত হল, তারপর থেকেই তার প্রতি সহানুভূতিশীলা যে কোনো তরুণীকেই সে তার সেই বিশেষ মেয়ে ভেবে ভুল করে। এই ভুল করাটাকে সময় সময় কিছুটা বাড়াবাড়ি মনে হয় বটে, কিন্তু অস্বাভাবিক বলে উড়িয়ে দেওয়া চলে না। তরুণ বয়সের যে বিশেষ সময়টিতে মানুষ প্রেমে পড়বার জন্যে সদাই উন্মুখ হয়ে ওঠে, তখন মনে ধরার মতো প্রতিটি মেয়ের মধ্যেই সে নিজের মানসীটিকে খুঁজে পেয়েছে বলে মনে করে। কানু চক্রবর্তীরও মনোভাব তাই। তার এই বিশেষ মানসিকতারই পরিচায়ক। তার এই মানসিকতাটি বুঝে নেবার পরে ছবিটিকে প্রাণভরে উপভোগ করতে একটুও বাধে না।

ছবির নায়ক কানু চক্রবর্তীর ভূমিকায় কিশোরকুমারের সহজ, সাবলীল অথচ বিচিত্র অভিনয় ছবিটিকে আশ্চর্যরকম আকর্ষণীয় করে তুলেছে। বাংলা বলার ফাঁকে ফাঁকে হিন্দী বুকনি ছুটিয়ে তিনি দুরন্ত কৌতুকের সৃষ্টি করেছেন। তাঁর মুখের গানগুলিও কম উপভোগ্য হয়নি; বিশেষ করে তাঁর শেষ গানি—'বুটেন মর্গেন বোঁ জোর' গাওয়ার ভঙ্গীতে ও সমসাময়িকতায় অতুলনীয়। নায়িকা শিবানী রূপে তনুজা তাঁর গৃহীত চরিত্রের দাবি পূরণ করেছেন। শ্রীমতী হাবেভাবে ক্রমেই বাঙালী নায়িকারূপে নিজেকে সার্থক করে তুলছেন। কানুর অকৃত্রিম সুহৃদ, সোনা-দানার কারবারী হয়ও কবিযশপ্রার্থী বুড়ো চাটুজ্যের ভূমিকায় বাস্তব জীবনেও বুড়ো চাটুজ্যে ওরফে তরুণকুমার অত্যন্ত স্বচ্ছন্দে কিশোরকুমারের সঙ্গে তালে তাল রেখে চলেছেন। শিবানীর বান্ধবী এবং কানুর প্রেমাকাঙ্ক্ষিনী তেজী মুখার্জির ভূমিকায় প্রযোজিকা সবিতা চট্টোপাধ্যায় অত্যন্ত সংযতভাবে তাঁর নিরুচ্চার প্রেমের অভিব্যক্তি দেখিয়েছেন। কপট প্রণয়ী, আড়ম্বরসর্বস্ব, শূন্যগর্ভ বিলোল-এর ভূমিকায় অসীমকুমার চরিত্রোচিত সুঅভিনয় করেছেন। ভজা চাকর ও তার ছেলে যাত্রাদলের পচারূপে যথাক্রমে কেষ্ট মুখোপাধ্যায় ও মাস্টার শান্তনু চট্টোপাধ্যায় চমৎকার উপভোগ্য। মিস্টার ও মিসেস সেনাপতিরূপে কানু রায় ও পদ্মা দেবী, আয়ারূপে ভারতী দেবী, কানুর মায়ের ভূমিকায় কবিতা বসু, একটি বাউণ্ডুলে ভাইরূপে সুখেন দাস এবং কানুর বন্ধুরা উল্লেখ্য অভিনয় করেছেন।

ছবির কলাকৌশলের বিভিন্ন বিভাগে দক্ষতার পরিচয় পাওয়া যায়। বিশেষ করে বোম্বাইয়ে গৃহীত ছবিতে যেভাবে বাংলাদেশের আবহাওয়া নিখুঁতভাবে ফুটিয়ে তোলা হয়েছে। তা যথার্থই বিস্ময়কর। এক নায়িকা শিবানীর মুখের গীতিনু সুর, মোট কথা', এই গানখানি ছাড়া প্রতিটি গানই সুর ও গাওয়ার গুণে মাধুর্যমণ্ডিত এবং উপভোগ্য হয়েছে। আবহসংগীতে কিছু পৌনঃপুনিকতা দোষ থাকলেও মোটের উপর সুপ্রযুক্ত।

লীলা চিত্রম্‌ প্রযোজিত 'দুষ্টু প্রজাপতি' কিশোর-তরুণ-তনুজা অভিনয়-সমৃদ্ধ হয়ে দর্শকসাধারণের পক্ষে একটি চমৎকার উপভোগ্য ছবি হয়ে উঠেছে।

—নান্দীকর

বনশল-মুখোপাধ্যায় জুটি :

বহু দিন পরে প্রযোজক আর ডি বনশল এবং পরিচালক সুধীর মুখোপাধ্যায় আবার যে দুখানি ছবি করবার জন্যে মিলিত হয়েছেন, সে দুটি হচ্ছে : চৈতালী ও আঁধার সূর্য। চৈতালীর নায়ক-নায়িকারূপে দেখা যাবে উত্তমকুমার ও তনুজাকে। শচীন দেববর্মন ছবিখানির জন্যে ইতিমধ্যেই গান রেকর্ড করেছেন।

পরিচালক মুখোপাধ্যায় তাঁর 'আঁধার সূর্য' ছবিতে নায়ক-নায়িকার ভূমিকায় অভিনয় করবার জন্যে দুজন নতুন শিল্পীকে নিযুক্ত করছেন এবং এঁদের সঙ্গে থাকছেন অজিতেশ বন্দ্যোপাধ্যায়, কমল মিত্র, দীপ্তি রায়, ছায়া দেবী প্রভৃতি প্রথিতযশা শিল্পী। ধনঞ্জয় ভট্টাচার্য, প্রতিমা বন্দ্যোপাধ্যায়, শ্যামল মিত্র ও সন্ধ্যা মুখোপাধ্যায় এই ছবিটির জন্যে রবীন চট্টোপাধ্যায়ের পরিচালনাধীনে গান রেকর্ড করেছেন।

'অন্ধ পৃথিবী'র চিত্রগ্রহণ শুরু :

সুজাতা প্রোডাকসন্স-এর প্রথম প্রয়াস চিত্ত বসু পরিচালিত 'অন্ধ পৃথিবী'র চিত্রগ্রহণ পর্ব অক্টোবর মাসের ৩য় সপ্তাহ থেকে শুরু হচ্ছে। এই হাসি-কান্নার ঘরোয়া কাহিনীর চিত্রনাট্য রচনা করেছেন মণি বর্মা। ছবির সম্ভাব্য শিল্পীদের মধ্যে আছেন—পাহাড়ী সান্যাল, সন্ধ্যারাণী, বসন্ত চৌধুরী, দীপ্তি রায়, সাবিত্রী চট্টোপাধ্যায়, অনুপকুমার, জহর গাঙ্গুলী এবং নায়ক-নায়িকার ভূমিকায় থাকছেন এক নবাগত জুটি। 'অন্ধ পৃথিবী'র সুরারোপের দায়িত্ব নিয়েছেন প্রখ্যাত সুরকার মানবেন্দ্র মুখোপাধ্যায়। ছবিটি পরিবেশনার দায়িত্ব নিয়েছেন অনুরাধা মুভীজ।

'দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন' ছবির চিত্রগ্রহণ শুরু !

গত ১৮ই সেপ্টেম্বর অরোরা স্টুডিওতে মিত্র প্রোডাকসন্সের প্রথম প্রচেষ্টা 'দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন' ছবির শুভমহরৎ অনুষ্ঠিত হয়েছে এবং ঐ দিন থেকে ছবিটির নিয়মিত চিত্রগ্রহণ শুরু হয়। মহরৎ অনুষ্ঠানে ক্ল্যাপস্টিক দেন পরিচালক বিজয় বসু ও ক্যামেরার সুইচ অন করেন অরোরা ফিল্ম কর্পোরেশনের কর্ণধার ও বাংলার চিত্রজগতের অন্যতম স্রষ্টা শ্রীঅজিত বসু। মহরৎ শিল্পী ছিলেন অসিত চট্টোপাধ্যায় (দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন) ও নির্মল চট্টোপাধ্যায় (মহাবিপ্লবী অরবিন্দ)।

মানিকতলা বোমা কেসে জড়িত থাকার সন্দেহে আসামী হিসেবে জেলের গারদে বন্দী 'বিপ্লবী অরবিন্দ', তাঁর সঙ্গে দেখা করতে এসেছেন—ব্যারিস্টার চিত্তরঞ্জন দাস।

জনপ্রিয় অভিনেতা বসন্ত চৌধুরী

ফটো : অমৃত

বৃটিশ শাসকদের হাতে লাঞ্ছিত হবার ভয়ে যখন দেশের কোন ব্যারিস্টার উক্ত মামলার আইনপরামর্শদাতার দায়িত্ব নিতে সাহস করেন নি ঠিক সেই মুহূর্তে সদ্য বিলেত প্রত্যাগত ব্যারিস্টার চিত্তরঞ্জন দাস বিপ্লবী অরবিন্দ ঘোষের হয়ে হাইকোর্টে মামলা লড়ে বিপ্লবী অরবিন্দকে ফাঁসির হাত থেকে বাঁচিয়ে দিলেন।

উক্ত দৃশ্য প্রথম দিনের চিত্রগ্রহণে গৃহীত হয়। দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন দাসের সম্পূর্ণ জীবনালেখ্য অবলম্বনে ছবিটির চিত্রনাট্য রচনা করেছেন কথাশিল্পী নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়। প্রবীণ চিত্র-পরিচালক অর্ধেন্দু মুখোপাধ্যায় ছবিটির পরিচালক। সুরসৃষ্টির দায়িত্ব নিয়েছেন হেমন্তকুমার মুখোপাধ্যায়। চিত্রগ্রহণে আছেন 'রাজা রামমোহন' খ্যাত অজয় মিত্র। দেশবন্ধু সহধর্মিণী বাসন্তী দেবীর চরিত্রে রূপদান করছেন লিলি চক্রবর্তী।

তিন অধ্যায়

মঙ্গল চক্রবর্তী পরিচালিত অপ্সরা ফিল্মসের 'তিন অধ্যায়' ছবির চিত্রগ্রহণ প্রায় শেষ হয়ে এসেছে। শৈলেশ দে রচিত উক্ত নামের জনপ্রিয় উপন্যাস অবলম্বনে ছবিটির চিত্রনাট্য রচনা করেছেন পরিচালক শ্রীচক্রবর্তী স্বয়ং। সুরসৃষ্টি করেছেন গোপেন মল্লিক। নেপথ্যে কণ্ঠদান করেছেন মান্না দে। চিত্রগ্রহণ ও সম্পাদনার দায়িত্ব নিয়েছেন যথাক্রমে রামানন্দ সেনগুপ্ত ও বিশ্বনাথ নায়ক।

উত্তমকুমার ও সুপ্রিয়া দেবী ছবিটির নায়ক-নায়িকা। অন্যান্য বিশিষ্ট চরিত্রে আছেন বিকাশ রায়, অজয় গঙ্গোপাধ্যায়, অনুপকুমার, জহর রায়, ছায়া দেবী, বঙ্কিম ঘোষ, বিদ্যা রাও, সীতা মুখোপাধ্যায়, বীরেন চট্টোপাধ্যায়, সদানন্দ চক্রবর্তী, রবীন মজুমদার, ছন্দা দেবী, জ্যোৎস্না বন্দ্যোপাধ্যায়, মীরা দাস, ইন্দিরা দে, মিতা দত্ত, বিদিশা চৌধুরী, জয়ন্তী দাস, শম্ভু ভট্টাচার্য, উমাশঙ্কর বসু এবং সুপর্ণা সেন। অপ্সরা ফিল্মস ছবিটির পরিবেশক।

লালবাঈ

রমাপদ চৌধুরীর 'লালবাঈ'কে চিত্রায়িত করছেন জয়শংকর প্রোডাকসন্স। মণি বর্মা রচিত চিত্রনাট্য অবলম্বনে ছবিটি পরিচালনা করছেন প্রবীণ পরিচালক চিত্ত বসু। জয়দেব চক্রবর্তী ও শঙ্কর রায়চৌধুরী প্রযোজিত ছবিটিতে প্রধান নারীচরিত্র 'লালবাঈ'-এর চরিত্রে রূপদান করার জন্যে চুক্তিবদ্ধা হয়েছেন বোম্বাইয়ের যৌবনোচ্ছলা ও মোহময়ী অভিনেত্রী শবনম। চন্দ্রপ্রভার চরিত্রে রূপদান করছেন বাংলাদেশের শক্তিময়ী অভিনেত্রী সাবিত্রী চট্টোপাধ্যায়। অক্টোবর মাসের শেষের দিকে ছবিটির নিয়মিত চিত্রগ্রহণ শুরু হবে। বিপুল অর্থব্যয়ে নির্মিত এই ঐতিহাসিক বাংলা ছবিটির পরিবেশনার দায়িত্ব নিয়েছেন পারফেক্ট ফিল্ম ডিস্ট্রিবিউটার্স।

খেলা (বাংলা) : শুভময় নাট্যগোষ্ঠীর নিবেদন; রচনা: রতনকুমার ঘোষ; নির্দেশনা: জ্যোতিপ্রকাশ বন্দ্যোপাধ্যায়, মঞ্চপরিকল্পনা : বিমল চক্রবর্তী ; আলোকসম্পাত: স্বরূপ মুখোপাধ্যায়; আবসংগীত: সুনীলবরণ; শব্দসংযোজন: নিমাই দাস ; রূপায়ণ : জ্যোতিপ্রকাশ প্রবীরকুমার সাহা, পবিত্র চট্টোপাধ্যায়, শ্রীআনন্দম, রঞ্জিতকুমার ঘোষ, রণজিৎকুমার গাঙ্গুলী, সতীন্দ্র চক্রবর্তী, অজয় চট্টো-

পাধ্যায়, শিপ্রা চক্রবর্তী প্রভৃতি। ২৯-এ সেপ্টেম্বর মুক্ত-অঙ্গনে অভিনীত।

'ফেরা' নিঃসন্দেহে একটি রূপক নাটক। আগামীকালের একটি বিজ্ঞানাগার এর প্রধান ঘটনাস্থল। এতে যে প্রশ্নকে তুলে ধরা হয়েছে, সেটি হচ্ছেঃ রাষ্ট্র নিয়ন্ত্রিত বিজ্ঞান সাধনার চূড়ান্ত ফলশ্রুতি কি? মানবতা সম্পর্কে সম্পূর্ণ নির্লিপ্তভাবে এই যে বিজ্ঞানসাধনা, এর শেষ পরিণতি কি? ইতিহাসচেতনা, দার্শনিক অভিজ্ঞান ও মানবপ্রেম থেকে নির্বাসিত এই যে বিজ্ঞান-সাধনা, একি মানবসভ্যতাকে অনিবার্য ধ্বংসের পথে ঠেলে দিচ্ছে না? তাই নাট্যকার চাইছেন, বিজ্ঞানকে হতে হবে রাষ্ট্র-প্রভুমুক্ত। এবং তার পাশাপাশি থাকবে ইতিহাস, দর্শন ও মানব। উদার মানব-প্রেমের হাত ধরে এগিয়ে চলবে বিজ্ঞান এবং তাতেই হবে সভ্যতার আপনপথে প্রত্যাবর্তন 'ফেরা'।

প্রতীক চরিত্রগুলির চিত্রণে কিছুটা ত্রুটি থেকে গেছে—সংলাপে। বাচনে, ভঙ্গীতে, রূপসজ্জায়। শব্দসংযোজন এবং আলোকপ্রক্ষেপণেও তাই। ছোটখাট ত্রুটি মুক্ত হলে এই নাটক ও তার অভিনয় দর্শকদের মধ্যে তীব্র প্রতিক্রিয়া সৃষ্টিতে সমর্থ হয়ে সকলের অভিনন্দন লাভ করবে।

অভিনয়ে পারদর্শিতা দেখিয়েছেন পরিচালক জ্যোতিপ্রকাশ (ঋত্বিক), রণজিৎ-কুমার গাঙ্গুলী (৩৪৭), প্রবীরকুমার সাহা (সর্বকাল), সতীশচন্দ্র চক্রবর্তী (কাল) ও শিপ্রা চক্রবর্তী (শর্বরী)।

বিজ্ঞানাগারের পরিকল্পনাটি উচ্চ প্রশংসাযোগ্য।

আর্থার মিলার-এর 'আফটার দি ফল' (বাংলা ও হিন্দী):

বর্তমানকালের অন্যতম শ্রেষ্ঠ মার্কিন নাট্যকার আর্থার মিলার-এর জীবনেতি-হাসের সঙ্গে যাঁদের কিছুটা পরিচয় আছে, তাঁরাই জানেন, তাঁর শেষতম নাট্যসৃষ্টি 'আফটার দি ফল' হচ্ছে অনেকটা আত্ম-জীবনীমূলক। হলিউডের অন্যতমা শ্রেষ্ঠা সুন্দরী অভিনেত্রী মেরিলিন মনরো ছিলেন তাঁর দ্বিতীয়া স্ত্রী। তাঁর সঙ্গে বিবাহ-বিচ্ছেদের কিছুদিন পরেই শ্রীমতী মনরো মাত্রাধিকভাবে স্লিপিং পিল খেয়ে আত্মহত্যা করেন। এরও কিছুকাল পরে মিলার পুনরায় বিবাহ করে নতুনভাবে সংসার পাতেন। স্মরণ থাকতে পারে, তাঁর প্রথমা স্ত্রীও আত্মহত্যা করেছিলেন। দীর্ঘ ন বছরের ব্যবধানে এই নাটকটি যখন প্রথম প্রকাশিত হয়, তখন থেকেই এই বইখানি নিয়ে আলোচনার অন্ত নেই এবং প্রধান আলোচনার বস্তু হলেন স্বয়ং আর্থার মিলার।

সম্প্রতি কলকাতার 'চতুর্মুখ' সম্প্রদায় 'পতনের পর' নামে সাধন মৈত্রকৃত এর বাংলা রূপান্তরটিকে মঞ্চস্থ করছেন। অভিনয়ে মঞ্চপরিকল্পনাটি চোখে পড়বার মতো। কিন্তু বহু চরিত্রের ভীড়ে নাটকটিকে ভারাক্রান্ত না করে মিভাল (মূলের কোয়েন্টিন), মমতা (মেগি), অনুরাধা (ম্যাগি) ও বিপাসা (হোলগা)—এই কয়টি মূল চরিত্রের মধ্যে সীমাবদ্ধ রাখলে নাটকীয় রস ঢের বেশী দানা বাঁধতে পারত বলে আমাদের বিশ্বাস। অভিনয়ে নিঃসন্দেহে নায়করূপে অসীম চক্রবর্তী এবং অনুরাধা বেশে অনুরাধা ভট্টাচার্য সবশেষে বেশী কৃতিত্ব দেখিয়েছেন। শিপ্রা গঙ্গো-পাধ্যায়ের মানসী ও মমতা চট্টোপাধ্যায়ের বিপাসা এ'দের পরেই উল্লেখযোগ্য। অপরা-পর ভূমিকাগুলির মধ্যে অনেকগুলি সুঅভিনীত এবং আরও অনেকগুলি নয়।

বোম্বাই-এর 'ক্রিয়েটিভ ইউনিট' নাট্য-সম্প্রদায় কিন্তু এই বাংলা অভিনয়ের মাত্র দুদিন আগে ২৩-এ সেপ্টেম্বর, ঐ হিন্দী হাই স্কুল রঙ্গমঞ্চেই মূল নাটকটি থেকে মাত্র কোয়েন্টিন ও ম্যাগির অংশটুকু অবলম্বন করে 'উসকে বাদ' নাম দিয়ে একটি হিন্দী নাটিকাকে মঞ্চস্থ করেন। মাত্র এক ঘন্টার অভিনয়ে অমরিশ পুরী (কোয়েন্টিন) ও ডাঃ বিজভী (ম্যাগি) সমস্ত প্রেক্ষাগৃহকে আশ্চর্যভাবে মন্ত্রমুগ্ধ করে রেখেছিলেন। সুষ্ঠু আলোক-সম্পাতের সাহায্যে কালো পর্দায় যেন জলন্ত স্বরূপ আগুনের রেখে তাঁরা তাঁদের নাট-নৈপুণ্যের এমন পরাকাষ্ঠা দেখিয়েছিলেন, যা বাংলা রঙ্গমঞ্চেও আমরা কদাচিৎ আশা করি। শ্রীমতী রিজভীর মতো সর্বাঙ্গ দিয়ে অভিনয় করা আমাদের বহু অভিনেত্রী ধারণাই করতে পারেন না। শ্রীপুরীর মতো কণ্ঠস্বরের নিয়ন্ত্রণও আজকের দিনে অল্পই দেখা যায়।

পথের দাবী

সম্প্রতি দক্ষিণ-পূর্ব রেলওয়ের ইঞ্জি-নীয়ারিং ড্রামাটিক ক্লাবের ত্রয়োদশ বার্ষিক উৎসব উপলক্ষ্যে 'বিশ্বরূপা' রঙ্গমঞ্চে পরি-বেশন করলেন শরৎচন্দ্রের 'পথের দাবী'। নাট্যপ্রযোজনায় কয়েকটি ত্রুটি থাকা সত্ত্বেও শিল্পীদের নিষ্ঠা সবাইকেই মুগ্ধ করেছে। সুঅভিনীত নাটকের বিভিন্ন চরিত্রে অংশ-গ্রহণ করেন সুকুমার মাইতি, অমিত সেন-গুপ্ত, নারায়ণ দাস, মনোরঞ্জন চক্রবর্তী, চন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়, বিশ্বনাথ মুখোপাধ্যায়, হিমানী গঙ্গোপাধ্যায়, শ্যামলী মজুমদার, দুলাল মুখোপাধ্যায়, বিভুদাস রায়-

জনপ্রিয় অভিনেতা রাজকাপুর ফটো : অমৃত

কার, চিত্তরঞ্জন দাস, দেবু রায়-চৌধুরী, অমল চক্রবর্তী, প্রণব মুখোপাধ্যায় ও রমেশ বসুচৌধুরী। নাট্য-নির্দেশনায় সংযমের পরিচয় দেন অশ্রু ভট্টাচার্য।

কালিন্দী

শ্যামবাজার পোস্ট অফিস রিক্রিয়েশন ক্লাবের শিল্পী-সদস্যরা সম্প্রতি তারাশঙ্করের 'কালিন্দী' নাটক সার্থকতার সঙ্গে অভিনয় করেন। নাট্যনির্দেশনার দায়িত্ব বহন করেন স্মরজিৎ চট্টোপাধ্যায়। বৈশিষ্ট্য-চিহ্নিত অভিনয় দেখিয়ে যাঁরা দর্শকের অকুণ্ঠ অভিনন্দন পেয়েছেন তাঁরা হলেন বীরেশ্বর বন্দ্যোপাধ্যায়, অশোক ভট্টাচার্য, রণজিৎ সুর, ভোলা রায়, মৃগাঙ্ক ভট্টাচার্য, বেলা রায়, রাণু রায়।

আজকাল

সম্প্রতি চৌরঙ্গীর ওয়াই এম সি এ'তে স্পলস সিভ্যাল এন্ড গফ রিক্রিয়েশন ক্লাবের প্রযোজিত 'আজকাল' নাটক অভিনীত হয়। মঞ্চসফল এই নাটকের অভিনয়ে শিল্পিবৃন্দ এক নতুনতর বৈশিষ্ট্য চিহ্নিত করতে পেরেছেন। এ বিষয়ে সর্বাগ্রে প্রশংসা পাবেন নাট্যনির্দেশক বলরাম মিত্র। এই নাটকের উল্লেখযোগ্য শিল্পীরা হলেন মায়া ঘোষ, তাপসী গুহ, বিকাশ বসু, বলরাম মিত্র, শশিপদ ভট্টাচার্য, দীপেন রাহা, নীলমণি চট্টোপাধ্যায়, পয়োধিনাথ বসু।

'থিয়েটার ওয়ার্কশপে'র নতুন নাটক

'থিয়েটার ওয়ার্কশপে'র শিল্পিবৃন্দ এই মাসেই তাঁদের নতুন নাটক 'ছায়ায় আলোয়' মঞ্চস্থ করবেন। নাটকটি আইরিশ নাট্যকার শন ও কেসীর 'জনো অ্যাণ্ড দি পিকক' অনুসরণে রচিত হয়েছে। এই নাটকে যাঁরা অংশগ্রহণ করছেন তাঁদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলেন মায়া ঘোষ, চিন্ময় রায়, বিভাস চক্রবর্তী, অলোক মুখোপাধ্যায়, তাপসী গুহ, নিমাই ঘোষ।

[illegible]

'হাওড়ার [illegible] নাট্যসংস্থা 'কল্পরূপে'র উদ্যোগে [illegible] কাছে নতুন একটি নাট্যমঞ্চের উদ্বোধন হয়েছে। নাট্যমঞ্চের নাম হয়েছে 'মাইকেল থিয়েটার'। মন্মথ রায় এই নাট্যমঞ্চের উদ্বোধন করেন এবং উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে পরিবেশিত হয় 'কল্পরূপ' পরিবেশিত 'শুধু ছায়া'।

আবাদ

সম্প্রতি বিনয়নগর বঙ্গীয় পরিষদের শিল্পিবৃন্দ মনোরঞ্জন বিশ্বাসের 'আবাদ' নাটক সার্থকভাবে মঞ্চস্থ করলেন। পল্লীর মানুষদের সুখ-দুঃখ নিয়ে রচিত এ নাটকের অভিনয়ে শিল্পীদের আন্তর নিষ্ঠা পরিস্ফুট হয়েছে। অভিনয়ে বৈশিষ্ট্যের স্বাক্ষর রাখেন প্রভাস মুখোপাধ্যায়, জ্যোতিরিন্দ্র চক্রবর্তী, অরুণ ব্যানার্জি নমিতা ঘোষ, বন্দনা বন্দ্যোপাধ্যায়।

শের আফগান

বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদের শিল্পিবৃন্দ কিছুদিন আগে অভিনয় করলেন 'শের আফগান' নাটক। এ'দের সুষ্ঠু নাট্য প্রযোজনা উপস্থিত দর্শকমণ্ডলীকে মুগ্ধ করেছে। শিল্পীদের মধ্যে ছিলেন মিনতি ঘোষ, গীতা গুপ্তা, রতন কর্মকার, নির্মল দাশগুপ্ত, সুনীল দে, রুণু গুপ্ত, সলিল ঘোষাল, সুজিত ঘোষ, পটল দাশগুপ্ত, তপন ঘোষ, চিনু ভট্টাচার্য, সজল ভট্টাচার্য, নারায়ণ দত্ত, তুষার পুরকায়স্থ।

দাদা জন্মালেন

নলহাটি মিলনী সঙ্ঘের সভ্যবৃন্দ সম্প্রতি বীরু মুখোপাধ্যায়ের ব্যঙ্গাত্মক নাটক 'দাদা জন্মালেন' পরিবেশন করলেন। নাটকের বিভিন্ন চরিত্রে প্রাণবন্ত অভিনয় করেন মনোজ ঘোষ, হরেন বিশ্বাস, গোবিন্দ ধরগুপ্ত, অরুণ দাস, অমিয় চট্টোপাধ্যায়, পূর্ণেন্দু ভট্টাচার্য, বিলু সেনগুপ্ত, অনিল চট্টোপাধ্যায়, ভাস্কর রায়, নির্মল বর্মণ, সুকুমার চট্টোপাধ্যায়। শ্রীমান অজয়।

নাট্যোৎসব

শারদীয় পুজো উপলক্ষ্যে সরিষার 'মরমী সম্প্রদায়' তিন দিনব্যাপী এক নাট্যোৎসবের আয়োজন করেছেন। নাট্যোৎসবে অভিনীত হবে 'স্বীকৃতি', 'পাশের বাড়ী' নাটক ও 'শাপমোচন', 'অভিসার' নৃত্যনাট্য। অভিনয়াংশ পরিচালনা করছেন শক্তি দত্ত, শঙ্কর মিত্র।

অ্যামেচার ইউনিট

কলকাতার প্রখ্যাত নাট্যসংস্থা 'এ্যামেচার ইউনিটে'র শিল্পিবৃন্দ তাঁদের মঞ্চসফল চারটি নাটক নিয়ে উত্তরবঙ্গ অভিমুখে যাত্রা করেছেন। আগামী ১১ই, ১২ই অক্টোবর শিলিগুড়ির আর্য সমিতির মঞ্চে পরিবেশিত হবে এ'দের প্রথম দুটি অভিনয়। ১৪ই ১৫ই অক্টোবর শিল্পিবৃন্দ অভিনয় করবেন দার্জিলিংয়ের নৃপেন্দ্রনারায়ণ পাব্লিক হলে।

[illegible] নাট্যানুষ্ঠান

'কৃপণের ধন', 'বিল্বমঙ্গল' ও 'আমি বাবায়' অভূতপূর্ব নাট্যসাফল্যের [illegible] দক্ষিণ কলিকাতায় প্রখ্যাত নাট্যসংস্থা 'আরথী' প্রমথনাথ বিশীর 'ভূতপূর্ব স্বামী

জনপ্রিয় অভিনেত্রী মাধবী মুখোপাধ্যায়। ফটো ঃ অমৃত
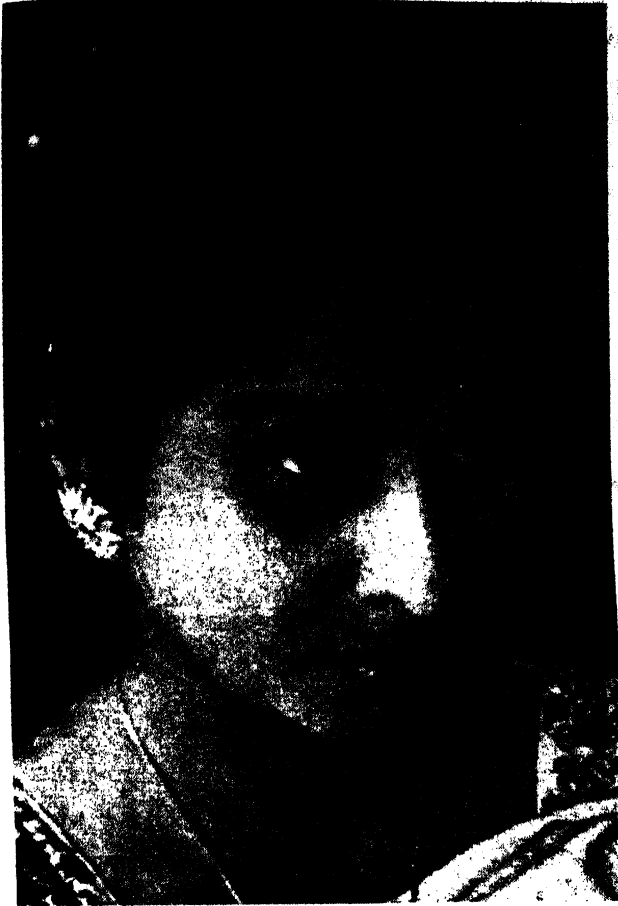
ও সমীর ঘোষের 'রোদনভরা বসন্ত' নিয়ে এবারের পূজার আসরে নামছেন।

কালচারাল সেমিনারের নতুন প্রযোজনা

আগামী ১৬ই অক্টোবর সন্ধ্যা সাড়ে ছটায় বিশ্বরূপা মঞ্চে সমর মুখোপাধ্যায়ের 'দধীচি' ও দিলীপ ভট্টাচার্যের 'নেপথ্যে' (একাংক) নাটক মঞ্চস্থ হবে। প্রয়োগ প্রধানে সমর মুখোপাধ্যায়।

বিবিধ সংবাদ

রামকৃষ্ণ মিশন সেবা প্রতিষ্ঠানের সাহায্যকল্পে প্রাচী সিনেমায় 'এন্টনী ফিরিঙ্গী'র প্রাক্-প্রদর্শনী ঃ

যা অচরাচর ঘটে না, সেদিন তাই ঘটে গেল কয়েকজন সেবাব্রতী মানুষের সমবেত চেষ্টা ও পরিশ্রমে। কোন বাংলা ছবি সাধারণ প্রদর্শনীর আগে কোনো প্রতিষ্ঠানের সাহায্যের জন্যে তার প্রাক-প্রদর্শনী কখনও হয়েছে বলে আমাদের জানা নেই। কিন্তু রামকৃষ্ণ মিশন সেবা প্রতিষ্ঠান নামে বিখ্যাত হাসপাতালটির সাহায্যকল্পে প্রাচী সিনেমার কর্ণধার জিতেন বসুর অক্লান্ত চেষ্টায় এবং 'এন্টনী ফিরিঙ্গী'র প্রযোজক বি এন রায়ের অকুণ্ঠ সহযোগিতায় গেল ৫ অক্টোবর রাত্রি ৮-৩০টায় প্রাচী সিনেমাগৃহে 'এন্টনী ফিরিঙ্গী'র একটি প্রাক-প্রদর্শনী হয়ে গেল। টিকিটের মূল্য যথেষ্ট বর্ধিত করা হলেও সেবাপ্রাণ দর্শকবৃন্দ এই প্রদর্শনীতে কাতারে কাতারে উপস্থিত ছিলেন এবং বহু বদান্য ব্যক্তির দানসমৃদ্ধ হয়ে এই প্রদর্শনী থেকে ন্যূনাধিক পঁচিশ হাজার টাকা সংগৃহীত হয়েছে বলে প্রকাশ। এই প্রদর্শনীর [illegible] সকলকে [illegible] জানাই।

পাণিহাটী যুব সম্মেলন ঃ

সম্প্রতি পাণিহাটী পৌরাঞ্চলের যুব সমাজের উদ্যোগে বিপুল উৎসাহ-উদ্দীপনার সঙ্গে পাণিহাটী যুব সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। এই সম্মেলনে স্থানীয় নেতাজী শিক্ষায়তনের প্রধান শিক্ষক শ্রীস্বপন ভট্টাচার্য বক্তৃতা করেন। পাণিহাটী যুব সংঘের তরফ হইতে যুগ্ম সম্পাদক শ্রীস্নেহাশীষ সান্যাল প্রতিনিধি সম্মেলনে স্থানীয় সমস্যার উপর গৃহীত কয়েকটি প্রস্তাব পাঠ করেন। প্রতিনিধি সম্মেলনে নেতাজী শিক্ষায়তনের প্রধান শিক্ষক শ্রীসুধীন্দ্রনাথ লাহিড়ী ও শ্রীদুলাল-চন্দ্র চক্রবর্তীকে যথাক্রমে সভাপতি ও

সম্পাদক নির্বাচিত করে এক কমিটি গঠন করা হয়েছে।

প্রকাশ্য সম্মেলনে গান, আবৃত্তি ও দুটি একাঙ্ক নাটক মঞ্চস্থ হয়। এছাড়া 'আফ্রিকা স্বাধীনতা সংগ্রামের' উপর এক পোস্টার-প্রদর্শনীর আয়োজন করা হয়েছিল।

কিশোর কল্যাণ পরিষদ

গত ২রা অক্টোবর মানিকতলাস্থ বিবেকানন্দ স্মৃতিমন্দিরে কিশোর কল্যাণ পরিষদের সপ্তদশ প্রতিষ্ঠাবার্ষিকী 'সমাবর্তন উৎসব এবং ভগিনী নিবেদিতা ও মাদাম কুরী জন্মশতবার্ষিকী মনোজ্ঞভাবে অনুষ্ঠিত হয়। অনুষ্ঠানে পৌরোহিত্য করেন সুসাহিত্যিক শ্রীনারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায় এবং প্রধান অতিথির আসন গ্রহণ করেন অধ্যাপক শ্রীশঙ্করীপ্রসাদ বসু। সভায় রেবা ও ইভা পাল, শান্তা দত্ত ও মিতালী গঙ্গোপাধ্যায় রবীন্দ্রসঙ্গীত, দেবযানী সরকার নজরুলগীতি, পলি ভট্টাচার্য খেয়াল গান পরিবেশন করে এবং স্বাতী ভট্টাচার্য ও প্রণব দাস কবিতা আবৃত্তি করে। অনুষ্ঠানের প্রারম্ভে পরিষদ-সভাপতি ডাঃ হেমেন মুখোপাধ্যায় সকলকে স্বাগত জানান এবং জাতীয় অধ্যাপক সত্যেন বসু, কেন্দ্রীয় শিক্ষামন্ত্রী ডঃ ত্রিগুণা সেন, মুখ্যমন্ত্রী শ্রীঅজয় মুখোপাধ্যায় প্রমুখের প্রেরিত শুভেচ্ছাবাণী পাঠ করেন সাধারণ সম্পাদক শ্রীকৃষ্ণপদ সরকার। অনুষ্ঠানশেষে পরিষদ আয়োজিত সপ্তদশ বার্ষিক প্রতিযোগিতার বিভিন্ন বিষয়ে সর্বসমেত ২৫জন স্থানাধিকারীদের পুরস্কার এবং ৬৬জন উত্তীর্ণদের অভিজ্ঞানপত্র প্রদান করা হয়। এই উপলক্ষে বিশিষ্ট লেখকদের রচনাসমৃদ্ধ একটি স্মারকগ্রন্থ প্রকাশ করা হয়।

তাপ-বিদ্যুৎ-কেন্দ্রে অনুষ্ঠান

ডি-ভি-সি বোকারোর 'সৌখীন সাংস্কৃতিক সংস্থার' সত্যবৃন্দ মহলায় উপলক্ষে গত ৩রা অক্টোবর বোকারো ক্লাবের প্রযোজনায় বোকারো ক্লাবের স্থায়ী রঙ্গমঞ্চে নাট্যকার শ্রীমনোজ মিত্রের 'বেকার বিদ্যালঙ্কার' নাটকটি সাফল্যের সঙ্গে মঞ্চস্থ করেন। অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন বোকারো তাপ-বিদ্যুৎ-কেন্দ্রের জেনারেল সুপারিন্টেন্ডেন্ট শ্রীঅজিতকুমার দাস মহাশয়। ঐ দিনই নাটকাভিনয়ের পর্বে 'সৌখীন'-এর পূর্ব-আয়োজিত আবৃত্তি প্রতিযোগিতায় পুরস্কার বিজয়ীদের পুরস্কার বিতরণ করা হয়। অনুষ্ঠানে সৌখীনের সভাপতি শ্রীবিশ্বসুন্দর দাস এবং সৌখীন সম্পাদক শ্রীমানবেন্দ্র দাস উপস্থিত দর্শকবৃন্দকে ধন্যবাদ জানিয়ে সংক্ষিপ্ত ভাষণ রাখেন। আবৃত্তি প্রতিযোগিতায় পুরস্কার বিজয়ীরা হলেন-ঃ 'ক' বিভাগ, প্রশ্ন, রবীন্দ্রনাথঠাকুর, ৭ বৎসর বয়স পর্যন্ত। সর্বশ্রী ঋদ্ধি গুপ্তা, কর্ণিকা চট্টোপাধ্যায়, কল্লোল সান্যাল এবং সিদ্ধার্থ সেন। 'খ' বিভাগ, লিচু চোর, কাজী নজরুল ইসলাম, ৮-১২ বৎসর বয়স পর্যন্ত। মধুমিতা চৌধুরী, স্মৃতি গুপ্তা, পার্থ ভৌমিক, রত্নাবলী কালী, পুলক দত্ত এবং উৎকল সিং। 'গ' বিভাগ, সিগারেট, সুকান্ত ভট্টাচার্য, ১৩-১৮ বৎসর বয়স পর্যন্ত। সীমন্তী চট্টোপাধ্যায়, সুমিতা দেব, বাসব বন্দ্যোপাধ্যায় এবং কৃষ্ণা মিত্র। 'ঘ' বিভাগ, দোকান, শ্রীপ্রেমেন্দ্র মিত্র। ১৯-৩৫ বৎসর বয়স পর্যন্ত। সুবীরকুমার রায়। মোট প্রতিযোগীর সংখ্যা ছিল পঁচানব্বই জন।

তারপর নাটকটি অভিনীত হয়। দলগত অভিনয়নৈপুণ্যে নাটকটি উপস্থিত দর্শকবৃন্দকে প্রচুর আনন্দ দিতে সক্ষম হয়। বিভিন্ন চরিত্রে অভিনয় করেন সর্বশ্রী সুবিমল রায় (অগরুচন্দ্র), চঞ্চল চক্রবর্তী (শীর্ণকায় বিদ্যালঙ্কার), মদন রায় (পাহাড়ী বিদ্যালঙ্কার), সুনীল ভট্টাচার্য (কিষেণ), সুবীর রায় (পবন), ভূপাল সিন্‌হা (ভোম্বল), তুষারকান্তি ঘোষ (মশা), তুষার সরকার (মিঃ বসাক), সদানন্দ মাঝি (সোমনাথদা) এবং গোপাল দে (মন্টু)। অনুষ্ঠানের সূচনা হয়েছিল শ্রীজ্যোতিপ্রসাদ মিত্র, শ্রীমতী বাণী বন্দ্যোপাধ্যায় এবং শ্রীঅমলেন্দু রায়চৌধুরীর সমবেত উদ্বোধনী সংগীতের মাধ্যমে।

আমন্ত্রণ

বম্বের বিখ্যাত সাংস্কৃতিক সংস্থা কল্লোলের আমন্ত্রণে বঙ্গের মূকাভিনেতা শ্রীযোগেশ দত্ত ও আধুনিক সঙ্গীতশিল্পী শ্রীমানবেন্দ্র মুখোপাধ্যায় এবং উচ্চাঙ্গ সঙ্গীতশিল্পী শ্রীমুরারি বন্দ্যোপাধ্যায় আগামী ৮ই অক্টোবর বোম্বাই অভিমুখে যাত্রা করেছেন। কল্লোলের অনুষ্ঠানের পর শ্রীদত্ত আরো কয়েকটি স্থানে একক মূকাভিনয় পরিবেশন করবেন। পরিশেষে তিনি দিল্লী ও এলাহাবাদে অংশগ্রহণ করবেন।

উডস্টকে ভারতীয় নৃত্যানুষ্ঠান

বহু বিখ্যাত শিল্পীদের গ্রীষ্মকালীন আবাসস্থল 'উডস্টক', 'নিউইয়র্ক' স্টেটে নিউইয়র্ক নগর থেকে দূরে বনসবুজ অসমতল ভূমির উপর বেশ নিভৃত জায়গাটি। ছোট্ট সহরটিতে অসংখ্য আর্ট গ্যালারী, নানাধরনের হস্তশিল্পের কেন্দ্র। ভাস্কর, চিত্রকর, অলঙ্কারশিল্পীদের সঙ্গে সঙ্গীত, নৃত্য, বাদ্যশিল্পীদেরও প্রচুর সমাবেশ হয় এখানে। গ্রীষ্মকালীন অনুষ্ঠানগুলিতে যোগ দেবার জন্য এদেশের বিখ্যাত শিল্পীরা সকলে আসেন। গত ৫ই আগস্ট 'পারফরমিং আর্টস অফ উডস্টক' কর্তৃপক্ষের আমন্ত্রণে কলকাতার নৃত্যশিল্পী শ্রীমতী মঞ্জুশ্রী সরকার (চাকী) একটি দেড়ঘন্টাব্যাপী একক নৃত্যানুষ্ঠান করেন। অনুষ্ঠানের প্রথমাংশে মণিপুরী, ভারতনাট্যমের আলারিপু, নটনম ধাড়িনার ও নবরস নৃত্য প্রদর্শন করেন। দ্বিতীয়াংশে রাবীন্দ্রিক নৃত্যধারার বৈশিষ্ট্য আলোচনা করে তিনি রবীন্দ্রনাথের 'নৃত্যের তালে তালে' সঙ্গীতটির সঙ্গে নৃত্য পরিবেশন করেন। এরপর হয় ভারতীয় লোকনৃত্য। সর্বশেষ এদেশের দরদী জ্যাজশিল্পী থিওলোনিস মঙ্কের গভীর সুরের সঙ্গে তিনি ভারতীয় নৃত্যের একটি অতি নম্র ও মনোরম রূপ সৃষ্টি করেন। ১৫ মিনিটের এই নৃত্যটির নাম ছিল— 'Eastern mind meets Jazz' জ্যাজসঙ্গীতের গভীর ও ছন্দময় অংশগুলি একজন ভারতীয় নৃত্যশিল্পীর মধ্য দিয়ে কী গভীর সৌন্দর্যে প্রকাশ হতে পারে সেদিনকার নৃত্যে তারই প্রকাশ হয়েছিল। শিল্পীর নৃত্যে কোন বিদেশী প্রভাব নেই। উচ্চাঙ্গ জ্যাজ্ সঙ্গীতের গভীর রসে ও ছন্দবৈচিত্র্যে ভারতীয় নৃত্যরূপের কোন অসামঞ্জস্য নেই।

শ্রীমতী মঞ্জুশ্রীর নৃত্য এ অঞ্চলে এত সমাদৃত হয় যে গত ১৬ সেপ্টেম্বর নৃত্যানুষ্ঠানটির পুনর্ব্যবস্থা হয়। এবার তাঁর আমেরিকান ছাত্রীরা নৃত্যানুষ্ঠানটিকে আরো বৈচিত্র্যপূর্ণ করে তুলেছিল। নিউইয়র্ক স্টেটে নিউপাল্ডস্ শহরে তিনি একটি নৃত্য-শিক্ষাকেন্দ্র খুলেছেন। উডস্টকের পারফরমিং আর্টস কেন্দ্রের উদ্যোগে উডস্টকে শ্রীমতী সরকারের জন্য আর একটি নৃত্য-শিক্ষাকেন্দ্র স্থাপনের ব্যবস্থা করেছেন। নিউইয়র্ক নগরে 'International School of Dancing' এর কর্তৃপক্ষ শ্রীমতী সরকারকে কার্ণেগী হলে ভারতীয় নৃত্যশিক্ষা দেবার জন্য আমন্ত্রণ করেছেন। নিউইয়র্ক স্টেট বিশ্ববিদ্যালয়ের সঙ্গীত বিভাগ 'ভিডিওটেপ'এ চলচ্চিত্র গ্রহণ করে শ্রীমতী সরকারের নৃত্যের মাধ্যমে ভারতীয় ছন্দের সাধারণ শিক্ষাদানের ব্যবস্থা করেছে।

খেলাধুলা

দর্শক

ডেভিস কাপ

নয়াদিল্লীর ন্যাশনাল স্পোর্টস ক্লাবের নবনির্মিত তৃণাচ্ছাদিত টেনিস কোর্টে আয়োজিত ১৯৬৭ সালের ডেভিস কাপ প্রতিযোগিতার পূর্বাঞ্চলের ফাইনালে ভারতবর্ষ ৪—১ খেলায় জাপানকে পরাজিত করে মূল প্রতিযোগিতার ইণ্টার-জোন সেমি-ফাইনালে দক্ষিণ আফ্রিকার সংগে খেলবার যোগ্যতা লাভ করেছে। অপরদিকের ইণ্টার জোন সেমি ফাইনালে আমেরিকান জোন বিজয়ী ইকুয়েডোরকে পরাজিত করে স্পেন ইণ্টার জোন ফাইনালে উঠে বসে আছে। ইণ্টার জোন ফাইনালে স্পেনের বিপক্ষে খেলবে ভারতবর্ষ বনাম দক্ষিণ আফ্রিকা দলের খেলায় বিজয়ী দেশ।

ভারতবর্ষ বনাম দক্ষিণ আফ্রিকার এই ইণ্টার-জোন সেমি-ফাইনাল খেলাটির আসর কোথায় বসবে তা এখনও ঠিক হয়নি। দক্ষিণ আফ্রিকার মাটিতে এ খেলা হওয়ার কোন সম্ভাবনাই নেই। কারণ সরকারী নীতি অনুসারে সেখানের মাটিতে একমাত্র শ্বেতকায় খেলোয়াড়দেরই সংগে দক্ষিণ আফ্রিকা দল খেলবে। এদিকে ভারত সরকার দঃ আফ্রিকা সরকারের এই বর্ণবৈষম্য নীতি মোটেই সমর্থন করেন না। ফলে এ খেলা ভারতবর্ষের মাটিতেও হচ্ছে না।

ডেভিস কাপের পূর্বাঞ্চলের ফাইনালে ভারতবর্ষ এবং জাপানের এইটি ছিল ষষ্ঠ সাক্ষাৎ। ভারতবর্ষ প্রতিটি ফাইনাল খেলায় জয়লাভের গৌরব লাভ করেছে—১৯৫৬ সালে ৩—২, ১৯৬১ সালে ৪—১, ১৯৬৩ সালে ৩—২, ১৯৬৫ সালে ৪—১, ১৯৬৬ সালে ৪—১ এবং ১৯৬৭ সালে ৪—১ খেলায়।

খেলার ফলাফল

প্রথম সিংগলস : প্রেমজিৎলাল ৬—২, ৬—৪ ও ৬—২ গেমে কোজি ওয়াতানাবেকে পরাজিত করেন।

দ্বিতীয় সিংগলস : জয়দীপ মুখার্জি ৩—৬, ৬—৩, ৫—৭, ৯—৭ ও ৬—৩ গেমে ইচিজো কোনিসিকে পরাজিত করেন।

ডাবলস : রমানাথ কৃষ্ণান এবং প্রেমজিৎলাল ৬—২, ৬—৪, ৭—১ ও ৬—২ গেমে কোজি ওয়াতানাবে এবং ইসাও ওয়াতানাবেকে পরাজিত করেন।

তৃতীয় সিংগলস : কোজি ওয়াতানাবে ৬—৪, ৬—২, ৬—২ ও ৬—১ গেমে জয়দীপ মুখার্জিকে পরাজিত করেন।

চতুর্থ সিংগলস : প্রেমজিৎলাল ৬—২, ৯—৭ ও ৬—৩ গেমে ইচিজো কোনিশিকে পরাজিত করেন।

মোহনবাগান বনাম ইস্টবেঙ্গল দলের আই, এফ, এ শীল্ড ফাইনাল খেলার (১৯৬৭) একটি দৃশ্য।
ফটোঃ অমৃত

এশিয়ান বাস্কেটবল প্রতিযোগিতা

দক্ষিণ কোরিয়ার সিউলে আয়োজিত চতুর্থ এশিয়ান বাস্কেটবল প্রতিযোগিতায় ফিলিপাইন এবং দক্ষিণ কোরিয়া যথাক্রমে চ্যাম্পিয়ন এবং রাণার্স-আপ খেতাব লাভের সূত্রে আগামী ১৯৬৮ সালের মেক্সিকো অলিম্পিকের বাস্কেটবল প্রতিযোগিতায় এশিয়া মহাদেশের পক্ষে প্রতিনিধিত্ব করার যোগ্যতা লাভ করেছে। গতবারের চ্যাম্পিয়ান জাপান ৬৯-৮১ পয়েণ্টে ফিলিপাইনের কাছে এবং ৬২—৬৩ পয়েণ্টে দক্ষিণ কোরিয়ার কাছে পরাজিত হয়ে চ্যাম্পিয়ানশীপের লড়াই থেকে পিছিয়ে পড়ে।

প্রতিযোগিতার শেষ দিনে ফিলিপাইন ৮৩-৮০ পয়েণ্টে দক্ষিণ কোরিয়াকে পরাজিত করে অপরাজিত অবস্থায় চ্যাম্পিয়ানশীপ লাভ করে। এই নিয়ে ফিলিপাইন তিনবার এশিয়ান খেতাব পেল। অপরদিকে রাণার্স-আপ দক্ষিণ কোরিয়ার লীগের ৯টি খেলায় একমাত্র পরাজয়। ১৯৬৬ সালের রানার্স-আপ থাইল্যাণ্ড এবারের প্রতিযোগিতায় মাত্র ২টি খেলায় জয়ী হয়। সিংগাপুর ৯টি খেলাতেই পরাজিত হয়ে তালিকার সর্বশেষ ১০ম স্থান পেয়েছে।

প্রতিযোগিতার চূড়ান্ত তালিকায় ফিলিপাইন ১ম, দক্ষিণ কোরিয়া ২য় এবং জাপান ৩য় স্থান লাভ করেছে। ভারতবর্ষ, ইন্দোনেশিয়া এবং তাইওয়ান—এই তিনটি দেশেরই খেলার ফলাফল সমান দাঁড়িয়েছিল (প্রত্যেকেরই জয় ৫ এবং পরাজয় ৪)। শেষ পর্যন্ত খেলায় অর্জিত পয়েণ্টের গড়পড়তার ভিত্তিতে ইন্দোনেশিয়া ৪র্থ এবং তাইওয়ান ৫ম স্থান লাভ করে।

ভারতবর্ষের খেলা

ভারতবর্ষ লীগের উপর্যুপরি ৪টি খেলায় পরাজিত হয়ে পরবর্তী ৫টি খেলায় জয়লাভের সূত্রে প্রতিযোগিতার জয়পর্যায় তালিকায় ৬ষ্ঠ স্থান লাভ করেছে।

পরাজয় (৪): দক্ষিণ কোরিয়ার কাছে ৪১-১০৬ পয়েণ্টে, জাপানের কাছে ৫৬-৮৯ পয়েণ্টে, ফিলিপাইনের কাছে ৬৩-১১১ পয়েণ্টে এবং ইন্দোনেশিয়ার কাছে ১০৭-১৩০ পয়েণ্টে।

জয় (৫): থাইল্যাণ্ডকে ৮৬-৮২ পয়েণ্টে, সিংগাপুরকে ৯৬-৭৭ পয়েণ্টে, মালয়েশিয়াকে ১৩-৬৪ পয়েণ্টে, হংকংকে ৭৪-৬৫ পয়েণ্টে এবং তাইওয়ানকে ৮৭-৭৩ পয়েণ্টে পরাজিত করে।

রাজভবনে আয়োজিত উত্তর শহরতলী জেলা জাতীয় ক্রীড়া ও শক্তি সঙ্ঘের এক অনুষ্ঠানে পশ্চিম বাংলার রাজ্যপাল শ্রীধর্মবীর এবং তাঁর বাঁ দিকে সঙ্ঘের সহ-সভাপতি শ্রীজয়নালকুমার দাস।

খেতাব জয়ের পথে ফিলিপাইন জয় (৯)ঃ ইন্দোনেশিয়াকে ১০৩-৬৭, মালয়েশিয়াকে ৯২-৫৫, ভারতবর্ষকে ১১৯-৬৩, জাপানকে ৮৯-৬৯, সিঙ্গাপুরকে ১০৭-৫৮, তাইওয়ানকে ৮৩-৭৯, হংকংকে ১০৩-৫২, তাইল্যান্ডকে ৮৫-৬২ এবং দক্ষিণ কোরিয়াকে ৮৩-৮০ পয়েন্টে পরাজিত করে অপরাজিত অবস্থায় খেতাব জয়ী হয়।

এম সি সি প্রসঙ্গ

আগামী এম সি সি দলের ওয়েস্ট ইন্ডিজ সফর উপলক্ষে ওয়েস্ট ইন্ডিজ ক্রিকেট মহল এখন থেকেই বেশ সক্রিয় হয়ে উঠেছে। এম সি সি ১৯৬৭-৬৮ সালের ওয়েস্ট ইন্ডিজ সফরে প্রথম ম্যাচ খেলতে নামবে আগামী ৩০শে ডিসেম্বর এবং ওয়েস্ট ইন্ডিজের বিপক্ষে তাদের প্রথম টেস্ট ক্রিকেট খেলা সুরু হবে ১৯৬৮ সালের ১৯শে জানুয়ারী। স্বদেশের পেশাদার ক্রিকেট খেলোয়াড়দের সুবিধার্থে ওয়েস্ট ইন্ডিজ ক্রিকেট কর্তৃপক্ষ ইতিমধ্যেই টেস্ট দল গঠন করে দশজন খেলোয়াড়ের নাম ঘোষণা করেছেন। এই দশজনের কয়েকজন পেশাদার খেলোয়াড় হিসাবে ইংল্যান্ডে অবস্থান করছেন। 'ইংল্যান্ডের টেস্ট ক্রিকেট দল পরিচালনায় ওয়েস্ট ইন্ডিজের ক্রিকেট মহল কলিন কাউড্রেকেই বেশী পছন্দ করে'—রয়েল গেজেট সংবাদপত্রে প্রকাশিত এই মন্তব্যটি ওয়েস্ট ইন্ডিজ টেস্ট ক্রিকেট দলের বর্তমান অধিনায়ক গারফিল্ড সোবার্স নসাৎ করে দিয়ে বলেছেন এ ধরণের মন্তব্য খুবই হাস্যাস্পদ ব্যাপার। তিনি বলেছেন, প্রধানতঃ যে দুটি কারণে আমরাই ব্রায়ান ক্লোজকে ইংল্যান্ড দলের অধিনায়ক হিসাবে দেখতে চেয়েছিলাম তার প্রথমটি হল— ক্লোজের প্রথম নেতৃত্বে ১৯৬৬ সালের টেস্ট সিরিজে ইংল্যান্ড যে আমাদের বিপক্ষে একটি খেলায় জয়ী হয়েছিল তার প্রতিশোধ নেওয়া এবং দ্বিতীয়টি—কাউড্রে যদি তাঁর চরম ব্যর্থতার পরিচয় দেন তাহলে ইংল্যান্ডের লোক যে বলবে ব্রায়ান ক্লোজই ইংল্যান্ড দল পরিচালনায় একমাত্র যোগ্য ব্যক্তি সে বলার পথটি বন্ধ করা।

ইংল্যান্ড দলের অধিনায়ক পদে কলিন কাউড্রের নিয়োগে গারফিল্ড সোবার্স তথা ওয়েস্ট ইন্ডিজ দলের এই দুটি বাসনাই অপূর্ণ থেকে গেল। ইংল্যান্ডের পক্ষে সেটাই পরম লাভ।

এখানে উল্লেখ্য, এক বছরের কিছু বেশী সময়ে (১৯৬৬ সালের ১৮ আগস্ট থেকে ১৯৬৭ সালের ২৮ আগস্ট) ব্রায়ান ক্লোজের নেতৃত্বে ইংল্যান্ড টেস্টে পরাজয় স্বীকার করেনি। তাঁর নেতৃত্বে উপর্যুপরি ৭টি খেলার ফলাফলঃ ইংল্যান্ডের জয় ৬ (১৯৬৬ সালে ওয়েস্ট ইন্ডিজের বিপক্ষে ৫ম টেস্ট, ১৯৬৭ সালে ভারতবর্ষের বিপক্ষে ৩টি এবং পাকিস্থানের বিপক্ষে ২টি টেস্ট) এবং ড্র ১। ক্লোজের নেতৃত্বে ইংল্যান্ড ২ বার 'রাবার' জয়ী হয়েছে—১৯৬৭ সালে ভারতবর্ষের বিপক্ষে ৩-০ খেলায় এবং পাকিস্তানের বিপক্ষে ২-০ খেলায় (ড্র ১)। ব্রায়ান ক্লোজ ভাগ্যবান এবং ইংল্যান্ডের পয়মন্ত অধিনায়ক। ১৯৬৩ সালে ওয়েস্ট ইন্ডিজের বিপক্ষে টেস্ট খেলার পর তিনি দীর্ঘদিন ইংল্যান্ড দলে স্থান পাননি। ওয়েস্ট ইন্ডিজ দলের বিপক্ষে ১৯৬৬ সালের টেস্ট সিরিজের শেষ ৫ম টেস্ট খেলায় তিনি একেবারে অধিনায়ক হিসাবে দলভুক্ত হন। এই সিরিজের প্রথম চারটি টেস্ট খেলায় যে খেলোয়াড় দলে নির্বাচিতই হননি তাঁকে একেবারে অধিনায়কের গুরুদায়িত্ব দেওয়াতে চারিদিকেই প্রতিবাদের ঝড় উঠেছিল। কিন্তু ব্রায়ান ক্লোজ ইংল্যান্ডের মুখ রেখেছেন। যদিও ওয়েস্ট ইন্ডিজ আগেই ৩-১ খেলায় (ড্র ১) ইংল্যান্ডের বিপক্ষে 'রাবার' জয়ী হয়েছিল কিন্তু ব্রায়ান ক্লোজ পরিচালিত ইংল্যান্ডের কাছে শেষ ৫ম টেস্টে এক ইনিংস ও ৩৪ রানে পরাজিত হলে ১৯৬৬ সালের টেস্ট সিরিজে অপরাজেয় সম্মান হাত-ছাড়া হয়।

এম সি সি ঃ কলিন কাউড্রে (অধিনায়ক), ফ্রেড টিটমাস (সহ-অধিনায়ক), কেন ব্যারিংটন, জিওফ বয়কট, ডি ব্রাউন, বেসিল ডি'অলিভেরা, জন এডরিচ, টম গ্রেভনী, কেন হিগস, আর এম হবস, ই জোন্স, এ নট, কলিন মিলবার্ন, জেমস পার্কস এবং জন স্নো।

ওয়েস্ট ইন্ডিজ ঃ গারফিল্ড সোবার্স (অধিনায়ক), কনরাড হান্ট (সহ-অধিনায়ক), রোহন কানহাই, বেসিল বুচার, ওয়েসলি হল, চার্লস গ্রিফিথ, সেমুর নার্স, সি লয়েড, লেসলি কিং এবং ল্যান্স গিবস।

জাতীয় স্কুল ক্রীড়ানুষ্ঠান

পাতিয়ালায় অনুষ্ঠিত ত্রয়োদশ জাতীয় শরৎকালীন ক্রীড়ানুষ্ঠানের ছাত্র এবং ছাত্রী বিভাগের সাঁতারে পশ্চিম বাংলা শীর্ষস্থান পেলেও ফুটবলে বাংলার মুখ রাখতে পারে নি। ফুটবলের ফাইনালে বিহার ১—০ গোলে পাঞ্জাবকে পরাজিত করে চাম্পিয়ান হয়েছে। ভলিবলের ছাত্র-ছাত্রী বিভাগে চ্যাম্পিয়ানসীপ পেয়েছে পাঞ্জাব। টেবল টেনিস চ্যাম্পিয়ান হয়েছে ছাত্র বিভাগে অন্ধ্র এবং ছাত্রী বিভাগে মহারাষ্ট্র।

কিশোর কিশোরী সমাবেশ

জাতীয় ক্রীড়া ও শক্তি সঙ্ঘের উত্তর শহরতলী শাখা সংস্থা কর্তৃক আয়োজিত সপ্তম বার্ষিক মুক্তবায়ু ও ভ্রমণ শিবিরে যেসব কিশোর-কিশোরী যোগদান করেছিল রাজভবনের এক বিশেষ অনুষ্ঠানে তাদের আপ্যায়িত করা হয়। এই অনুষ্ঠানে পশ্চিমবঙ্গের রাজ্যপাল শ্রীধর্মবীর উপস্থিত কিশোর- কিশোরীদের খেলাধুলায় উৎসাহিত করেন।

আন্তঃ বিশ্ববিদ্যালয় ফুটবল

আন্তঃ বিশ্ববিদ্যালয় ফুটবল প্রতিযোগিতার পূর্বাঞ্চলের ফাইনালে কলকাতা ৩—০ গোলে যাদবপুরকে পরাজিত করে মূল প্রতিযোগিতায় সেমিফাইনালে উঠেছে। এই নিয়ে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় দল উপর্যুপরি ৫বার পূর্বাঞ্চলের চ্যাম্পিয়ান হল। এখানে উল্লেখ্য, কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় দল গত চার বছর এবং সর্বাধিকবার স্যার আশুতোষ মুখার্জি শীল্ড (মূল প্রতিযোগিতার ফাইনালে বিজয়ী পুরস্কার পুরস্কার) জয়ী হয়েছে।

সুধীরচন্দ্র সরকার

(পূর্ব প্রকাশিতের পর)

এই সঙ্গে আর একজন আবাল্য সুহৃদের কথা আমার মনে পড়ছে। তিনি হলেন প্রখ্যাত চিত্রশিল্পী ও চিত্র-পরিচালক চারু রায়। চারুর সঙ্গে আমার পরিচয় হয় ১৯১১-১২ সালে, যখন আমি রিপন কলেজে পড়ি। সেও পড়ত একই কলেজে। ছোটবেলা থেকেই তার ছবি আঁকার দিকে ঝোঁক। তার প্রথম ছবি প্রকাশিত হয় 'জাহ্নবী' পত্রিকায়। 'জাহ্নবী'র প্রচ্ছদপটটি তারই আঁকা। সে শিল্পাচার্য অবনীন্দ্রনাথের শিষ্যত্ব গ্রহণ করে এবং তার সব ছবিই ভারতীয় পদ্ধতিতে আঁকা। কিন্তু তার শিল্পী হিসেবে খ্যাতি চারদিকে ছড়িয়ে পড়ে কমার্শিয়াল আর্টের মাধ্যমে।

চারু প্রথমে ভাল চাকরী করত যার্ড কোম্পানীতে। কিন্তু শিল্পসৃষ্টির মোহ তাকে এমনভাবে পেয়ে বসল যে, সে অমন সুন্দর চাকরীর মায়া পরিত্যাগ করে কমার্শিয়াল আর্টকেই নিজের পেশা হিসেবে গ্রহণ করল। পুস্তকের প্রচ্ছদপট, সিল্ক প্রিন্টিং, স্টেজ ক্র্যাফট, পোস্টার ডিজাইন প্রভৃতির চর্চাতেই নিজেকে নিয়োজিত করল এবং বলতে বাধা নেই, আর্টের এই সব শাখায় বাংলা দেশে চারুই পথিকৃৎ। তখনকার দিনে যতীন্দ্রকুমার সেন বেঙ্গল কেমিক্যালের সমস্ত প্রচার-চিত্র আঁকতেন — আর যতীন্দ্রকুমার ছাড়া চারুই ছিল অন্যতম শিল্পী যে কমার্শিয়াল আর্টের সব বিভাগেই নিজের প্রতিভার পরিচয় দিয়েছিল।

মাসিক পত্রিকা ও পুস্তকের প্রচ্ছদ আঁকতে চারুর জুড়ি ছিল না কেউ সে সময়। এর পর এই শিল্পকলার চর্চা ছেড়ে দিয়ে সে চিত্রশিল্পের দিকে মন সংযোগ করে। বিখ্যাত চিত্রনির্মাতা হিমাংশু রায়ের সঙ্গে চারু 'সিরাজ' 'লাইট অফ এশিয়া', 'থ্রো অফ এ ডাইস' প্রভৃতি ছবিতে অভিনয় করে এবং শিল্পনির্দেশক হিসেবেও কাজ করে। এই সব ছবির পরিচালক ছিলেন ফ্রাঞ্জ অস্টেন নামক একজন জার্মান সাহেব। হিমাংশু রায় এক দল জার্মান কলাকুশলী ও জার্মান শিল্পপতিদের অর্থ নিয়ে উপরোক্ত ছবিগুলি ভারতে নির্মাণ করেন। শিল্পীরা অবশ্য ছিলেন সবাই ভারতীয়।

এইখানেই চারুর সিনেমার সঙ্গে প্রথম হাতেখড়ি হয় এবং বিদেশী টেকনিসিয়ানদের অধীনে থেকে সিনেমার টেকনিকটি ভালভাবেই আয়ত্ত করে। পরে সে নির্বাক ও সবাক অনেকগুলি চিত্র নির্মাণ করে খ্যাতিলাভ করে।

১৯২৯ সালে সে প্রথম চিত্র পরিচালনা করে—ছবিটির নাম হল— Loves of a Moghul Prince। এটি তোলা হয় লাহোরে। এতে দেখলাম তার কি সাংঘাতিক দুঃসাহস। তার স্ত্রী মায়া রায়কে এই ছবিতে নায়িকার ভূমিকায় অভিনয়ের সুযোগ দেয়। শ্রীমতী রায়ই হলেন প্রথম বাঙালী শিক্ষিতা অভিজাত বংশীয় মহিলা যিনি চলচ্চিত্রে অভিনয় করেন।

তারপরে চারু আরও অনেক ছবি পরিচালনা করে, যেমন চোরকাঁটা, পথিক, সরলা, ডাকু-কা-লেড়কা প্রভৃতি। এখন অবশ্য চিত্র-পরিচালনা আর না করলেও শিল্প-নির্দেশনার কাজ সেদিন পর্যন্ত করেছে। তবে এটা ঠিক যে, চিত্র-পরিচালনার আশা সে এখনও মনে মনে পোষণ করে।

সঙ্গী হিসেবে বা আসর জমিয়ে রাখতে চারুর জুড়ি মেলা ভার। নানা ধরনের গল্প-গুজবে অর্থাৎ যাকে সাধারণ বাংলায় বলে আড্ডা দেওয়া ব্যাপারে চারু হল একটি বিরাট আকর্ষণ।

* * *

এই আড্ডার কথা বলতে গিয়ে আমার কয়েকটি পুরনো আড্ডার কথা মনে পড়ছে। সেই সম্বন্ধে কিছু বলতে চাই।

আড্ডার কথা উঠলেই যাঁরা ভাবেন তাসের আড্ডা বা গাঁজার আড্ডা বা কর্মহীন বেকার লোকদের বাড়ীর রকে বসে দুনিয়ার রাজা-উজীর মারা—আমি সে রকম আড্ডার কথা বলছি না। তবে এই আড্ডা পৃথিবীর সর্বত্রই আছে। তবে দেশভেদে রুচিভেদে আড্ডার রকমফের আছে। যেমন আধুনিক সমাজে ক্লাব, ককটেল, ডিনার পার্টি ইত্যাদি তেমনি আড্ডার মুখ্য উদ্দেশ্য একই।

সমস্ত দিন মানুষ মুখ বুজে কাজ করে যেতে পারে না—সে চায় মাঝে মাঝে প্রাণখুলে হাসতে ও মনখুলে কথা বলতে। তাই সমবয়সী ও সমগোষ্ঠীয় লোকেরা একত্র হলে বলগাছেঁড়া অশ্বের মত তারা ছুটে যেতে চায়। সে আনন্দ থেকে যারা বঞ্চিত তারা বেঁচে থাকার আসল আনন্দই উপভোগ করতে পারে না।

সাহিত্যক্ষেত্রে আমরা আগে দেখেছি, সাহিত্যিকরা সব একত্র হয়ে নানা ধরনের আলাপ-আলোচনার দ্বারা বেশ ভাল রকম আড্ডা জমাতেন। এ না হলে বোধ হয় সাহিত্যের পাকা কাজ করে হয় না প্রকৃত সাহিত্যও প্রস্ফুটিত হতে পারে না। এই আড্ডায় যোগ দিয়ে তার রস উপভোগ করা আমার জীবনের একটা অংশ।

এই সব আড্ডাধারীরা সাহিত্যিক তো ছিলেনই, তাছাড়া ছিলেন সুরসিক, সঙ্গীত-প্রিয় আর হাসি-গল্পের প্রকৃত সমঝদার। নানান দিকে নানা বিষয়ে এ'দের ঝোঁকও ছিল।

পূর্বে বাঙালীর সাধারণ জীবনে গ্রামের চণ্ডীমণ্ডপে বা বুড়ো শিবতলার অশ্বত্থ গাছের নীচে কিম্বা অমুকের বৈঠকখানা বাড়ীতে সকলে সমবেত হয়ে পারস্পরিক নানা বিষয়ের চর্চা হত। এর মধ্যে পরনিন্দা, পরচর্চাই প্রধান ছিল এবং সেইটেই উপভোগ করার জন্য লোকে স্নানাহার ত্যাগ করে ঘন্টার পর সেই চণ্ডীমণ্ডপে বসে থাকত। সেসব দিন বর্তমানে গত হয়েছে। তবে ঊনবিংশ শতাব্দীর শেষ ভাগে ও বিংশ শতাব্দীর প্রথম ভাগে কলকাতাতেও বাঙালীদের এই ধরনের এক রকম আড্ডার প্রচলন হয়েছিল। সেটা হল বাগানবাড়ীর আড্ডা। সেটা ছিল বেশীর ভাগ ক্ষেত্রেই সুরা আর নারীঘটিত ব্যাপার। ধনী বা হাতে কাঁচা পয়সা ছিল যাঁদের তাঁরাই এই ব্যাপারে সব থেকে বেশী জড়িয়ে থাকতেন তাঁদের মোসাহেবদের নিয়ে। আমি অবশ্য সে সব আড্ডার কথাও বলছি না। আমি বলব সাহিত্যিকদের আড্ডার কথা। এ সব আড্ডায় নোংরামি ছিল না, ছিল অনাবিল আনন্দ এবং জ্ঞানী ও গুণীদের সমাবেশে তৈরী হত বহু বিরাট সাহিত্য-সৃষ্টির প্রেরণা। এই ধরনের আড্ডার প্রয়োজনীয়তা আছে, তবে আজকের জীবন-সংগ্রামের নিষ্পেষণে নানা ধরনের মুনিজন, রাজনীতিক সংস্থা সত্ত্বেও আজও আমাদের সাহিত্যিক আড্ডা বেঁচে আছে মরা নদীর মত।

তখনকার দিনে তরুণ বয়সে আমি যে সাহিত্যিকদের আড্ডায় প্রথম যোগ দিই সেটা হল 'যমুনা' কার্যালয়ের আড্ডা। এখানে নিয়মিত আসতেন শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, সুধীন্দ্রনাথ ঠাকুর, হেমেন্দ্রকুমার রায়, প্রেমাঙ্কুর আতর্থী, 'যমুনা' সম্পাদক ফণীন্দ্রনাথ পাল, প্রভাত গঙ্গোপাধ্যায়, চারু রায় প্রভৃতি। প্রভাত ও চারু ছাড়া আজ সবাই গত হয়েছেন। এখানে সাহিত্য থেকে আরম্ভ করে সব রকম বিষয়েই আলোচনা হত। সেই সময় বাংলার রাজনীতি ক্ষেত্রে স্বর্ণযুগ চলছে—সে আলোচনাও আমাদের বাদ পড়ত না।

বিশেষ যে কয়েকটি বিষয় নিয়ে আমরা প্রায়ই আলোচনা করতাম তা হলো (১) স্বর্গীয় ডি এল রায়ের রবীন্দ্রনাথের উপর বিরূপ ভাব পোষণ, (২) 'ভারতবর্ষ' মাসিক-পত্রের জন্ম ও প্রকাশ, (৩) সাহিত্যক্ষেত্রে শরৎচন্দ্রের অভ্যুদয়, (৪) স্টার থিয়েটারে ডি এল রায়ের 'আনন্দ বিদায়ে'র অভিনয় এবং সঙ্গে সঙ্গে তা বন্ধ হওয়া (৫) স্নেহলতার পুড়ে মরা প্রভৃতি। এ ছাড়াও ভোজশেষে চাটনীর মত নারী সংক্রান্ত আলোচনাও যে না হত, তা নয়।

এই সময় রবীন্দ্রবিরোধী একটি দল গড়ে উঠেছিল। সব সময় তাঁরা রবীন্দ্রনাথের

বিরুদ্ধে সমালোচনা করতেন। সে সময় দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন দাসের কাগজ 'নারায়ণ' পত্রিকাতেও রবীন্দ্রনাথের বিরুদ্ধ-সমালোচনা দেখা যেত। এই প্রকার বিরুদ্ধ-সমালোচনায় রবীন্দ্রনাথ খুবই ক্ষিপ্ত হয়ে উঠেছিলেন। ১৯১৩ সালে তিনি যখন 'নোবেল প্রাইজ' পান তখন বিশেষ ট্রেন ভাড়া করে এক দল সাহিত্যিক রবীন্দ্রনাথকে সম্বর্ধনা জানাতে শান্তিনিকেতনে গিয়েছিলেন।

এই দলের পুরোভাগে ছিলেন আচার্য জগদীশ বসু, সুরেশ সমাজপতি, হীরেন দত্ত, পাঁচকড়ি বন্দ্যোপাধ্যায়, জলধর সেন, রামানন্দ চট্টোপাধ্যায় প্রভৃতি। কিন্তু রবীন্দ্রনাথ তাঁদের সে অভিনন্দনের উত্তরে বলেছিলেন : আপনাদের এই সম্মান-মদিরা গ্রহণ করলাম, কিন্তু পান করব না।

এই উক্তিতে সকলেই অপমানিতবোধ করেন।

ডি এল রায় বরাবরই রবীন্দ্র-বিরোধী। তিনি এক শ্লেষাত্মক নাটক লিখলেন নাম 'আনন্দ-বিদায়', নন্দ বিদায়ের অনুকরণে। মূল উদ্দেশ্য ছিল রবীন্দ্রনাথকে হেয় প্রতিপন্ন করা। কিন্তু সে অভিনয়ের হল মাত্র এক রজনী —প্রথম রজনীই হল শেষ রজনী। রবীন্দ্র-ভক্তের দল এই নাট্যাভিনয়ের বিরুদ্ধে প্রবল আন্দোলন শুরু করায় সঙ্গে সঙ্গেই স্টারের কর্তৃপক্ষ তা বন্ধ করে দেন। এই আন্দোলনের প্রধান ভূমিকা নেন চারু বন্দ্যোপাধ্যায়।

এই সময় পাবনায় উত্তরবঙ্গ সাহিত্য সম্মেলন হয়। সভাপতি হন নাটোরের মহারাজা সুসাহিত্যিক জগদীন্দ্রনাথ রায়। রবীন্দ্রনাথ এলেন শিলাইদহ থেকে। এই সভায় রবীন্দ্রনাথ তাঁর ভাষণ পাঠ করেন। আমি, মণিলাল, ফণীন্দ্র পাল, হেমেন্দ্রকুমার রায় সব এক সঙ্গে সে সাহিত্য সম্মেলনে যোগদান করেছিলাম। রবীন্দ্রনাথকে সেই দ্বিতীয়বার দেখলাম। তাঁর কাছ থেকে ভাষণটি সংগ্রহ করে 'যমুনা'য় ছাপিয়ে দিলাম।

তারপর এল 'ভারতী'র আড্ডা ১৯১৩-১৪ সালে। একদিন আমি ও হেমেন্দ্রকুমার সুকিয়া স্ট্রীট দিয়ে যাচ্ছি, এমন সময় রাস্তায় দেখা হয়ে গেল মণিলাল গঙ্গোপাধ্যায়ের সঙ্গে। তিনি আমাদের সুখবর দিলেন যে, তিনি ও সৌরীন্দ্রমোহন মুখোপাধ্যায় সম্প্রতি 'ভারতী'র সম্পাদকীয় ভার গ্রহণ করেছেন। আমরা দুজনে যেন 'ভারতী'কে সব রকমে সাহায্য করি। সেই থেকে হেমেন্দ্রকুমার পুরোপুরি 'ভারতী'র একজন স্থায়ী লেখক হয়ে গেলেন। আমি তখনও কলেজের ছাত্র বলে পুরোপুরি সে দিকে নিজেকে নিয়োজিত করতে পারলাম না। ক্রমে ক্রমে আমাদের যমুনা অফিসের সাহিত্যিক আড্ডাটি 'ভারতী' অফিসে স্থানান্তরিত হল এবং আমিও ছাত্রাবস্থা সত্ত্বেও 'ভারতী'র দলের একজন বলে পরিগণিত হলাম।

সুকিয়া স্ট্রীট 'ভারতী' অফিসের পুরনো আড্ডার সঙ্গে সে সময়ের সব সাহিত্যিকই মোটামুটি পরিচিত ছিলেন। সকাল ও সন্ধ্যা দুবেলাই এই অফিসে আড্ডা বসত। সন্ধ্যাবেলায় ৯টা।১০টা পর্যন্ত আসর সরগরম থাকত, এবং রাত্রি বেলাতেই আসর জমত বেশী। রবিবার প্রায় সমস্ত দিনই আড্ডাধারীরা নানা রকম আলাপ-আলোচনায় আসর জমিয়ে রাখতেন। অনেক দিন খাওয়া-দাওয়া ঐখানেই হত। 'ভারতী'তে নিয়মিত আসতেন সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত, চারু বন্দ্যোপাধ্যায়, সুরেশ বন্দ্যোপাধ্যায়, হেমেন্দ্রকুমার রায়, প্রেমাঙ্কুর আতর্থী, সৌরীন্দ্রমোহন মুখোপাধ্যায়, নরেন্দ্র দেব, গিরিজাকুমার বসু, চারু রায়, মোহিতলাল মজুমদার ও যতীন্দ্রমোহন বাগচী। অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর, অজিতকুমার চক্রবর্তী, সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়, প্রমথ চৌধুরী এঁরাও মধ্যে মধ্যে আসতেন।

আমার বেশ মনে আছে—'ভারতী' অফিসে আড্ডা জমত প্রতিদিনই। ছুটিছাটার দিনে সকাল থেকে রাত্রি পর্যন্ত আসর *সরগরম থাকত। প্রায়ই প্রচুর খাওয়া-দাওয়া হত—কখনও চপ-কাটলেট, কখনও মুড়ি-ফুলুরী, কখনও বা সন্দেশ-রসগোল্লা। আমাদের মধ্যে সত্যেন্দ্রনাথ বসতেন চেয়ারের ওপর আসন-পিঁড়ি হয়ে। তিনি মজা রগড়ার [illegible] পড়ে শোনাতেন। কখনও নিজের লেখাও পড়তেন। সকালে অবশ্য কোন দিন আমার যাওয়া সম্ভব হত না—সন্ধ্যার সময় প্রায় রোজই যেতাম।*

সাহিত্যক্ষেত্রে 'ভারতী'র আড্ডার একটি বিশেষ তাৎপর্য ছিল। তখনকার দিনের বড় বড় সাহিত্যিকদের একটি মিলনকেন্দ্র ছিল এই আড্ডা। 'কল্লোল'-যুগ বলার মত এ যুগকে 'ভারতী'র যুগও বলা চলে। অনেক নতুন সাহিত্যিকের আবির্ভাব এইখান থেকেই হয়েছে। সেইজন্যই আমি বলতে বাধ্য যে সাহিত্যক্ষেত্রে 'ভারতী'র আড্ডার দান মুখে বলে প্রকাশ করা যায় না। 'ভারতী'র এত উন্নতমানের কৃতিত্ব মণিলাল বন্দ্যোপাধ্যায় ও সৌরীন্দ্রমোহন মুখোপাধ্যায়ের জন্যই সম্ভব হয়েছিল।

'কল্লোল' সম্পাদক দীনেশ দাশের সঙ্গেও আমার যথেষ্ট প্রীতির সম্পর্ক ছিল। তিনি ছিলেন শিল্পী ও সাহিত্যিক, পরে হয়েছিলেন অভিনেতা ও চিত্রপরিচালক। তুলনা করলে এই দুটি গোষ্ঠীর মধ্যে বেশ একটা পার্থক্য দেখা যায়। 'ভারতী'র লেখকগোষ্ঠীও যেমন গুরুগম্ভীর প্রকৃতির আড্ডাটিও ছিল সেই রকম সিরিয়াস ধরনের। আর 'কল্লোল' ছিল তরুণদের পত্রিকা। এঁরা নানা পরীক্ষা-নিরীক্ষা করতেন সাহিত্য নিয়ে। এই 'কল্লোলে'র আসরটি তাই তারুণ্যের সজীবতায় ছিল চঞ্চল, কলহাস্যমুখর। 'ভারতী' এবং 'কল্লোল' দুটি আড্ডাই ছিল তখনকার সাহিত্যিকদের মহাপীঠস্থান।

কবি গিরিজাকুমার বসুকে নিয়ে আমরা মাঝে মাঝে মজা করতাম। কারণ মেয়েদের বিষয়ে তাঁর একটু দুর্বলতা ছিল। কেউ যদি কখনও তাঁকে বলত 'ঐ বাড়ীর ঐ মেয়েটি তোমার সঙ্গে আলাপ করতে চায়' তাহলে আর রক্ষে নেই। গিরিজাকুমার অমনি ছুটেছেন আর [illegible]। ঐ দুর্বলতাটুকু ছাড়া [illegible] তিনি বড় ভাল ছিলেন। বঙ্গ কলেজের [illegible] তিনি যুক্ত ছিলেন, ১৯৩৪-৩৫ সালে তদানীন্তন বিখ্যাত পত্রিকা 'দীপালি'র সম্পাদনাও করেছিলেন কিছুদিন। তাঁর একটি কবিতার দুটি লাইন এখনও আমার বেশ মনে আছে :

> পা দুখানি অমনো কাছে মনোহারিকে,
> চুম্বনে দিব তাহা কবিতা লিখে?

এই সময়কার ভারতী যাঁরা উল্টেপাল্টে দেখবেন তাঁরা এর রত্নসম্ভার দেখে অবাক হয়ে যাবেন।

আমার সম্পাদিত 'মৌচাক' এই সাহিত্যিক আড্ডা থেকে এঁদের সহযোগিতাতেই প্রকাশিত হয়েছিল। 'ভারতী' গোষ্ঠীর সমস্ত লেখকই একযোগে রাতারাতি শিশুসাহিত্যের জন্য কলম ধরলেন, এমন কি সত্যেন্দ্রনাথ, অবনীন্দ্রনাথও লিখতে আরম্ভ করলেন। অবনীন্দ্রনাথ তো প্রায় নিয়মিতই 'মৌচাকে' লিখতেন। যাঁরা এতদিন শুধু বড়দের জন্যই লিখে এসেছেন এখন তাঁরা প্রায় সবাই ছোটদের জন্যে লিখতে শুরু করে দিলেন। এঁদের মধ্যে কয়েকজন তো শিশুসাহিত্যে তাঁদের স্থান প্রথম থেকেই কায়েমী করে নিলেন। তাঁরা হলেন হেমেন্দ্রকুমার রায়, সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত, সৌরীন্দ্রমোহন মুখোপাধ্যায়, মণিলাল গঙ্গোপাধ্যায় ও নরেন্দ্র দেব। এর মধ্যে হেমেন্দ্রকুমার তো জীবনের শেষদিন পর্যন্ত শিশুসাহিত্য নিয়েই পড়েছিলেন এবং একজন শ্রেষ্ঠ লেখক বলে সর্বজনস্বীকৃত হয়েছেন। তাঁর 'যখের ধন' বাংলাসাহিত্যে স্থায়ী আসন লাভ করেছে। সুতরাং এক কথায় বলা যায় শিশুসাহিত্যে 'ভারতী'র অবদান কিছু নগণ্য ছিল না।

১৯১৮-১৯ সালে ভারতী অফিসের তিনতলায় একটি সাহিত্য-বাসর বসত প্রতি রবিবার বিকেলবেলায়। এই সাহিত্য-বাসরটির নাম ছিল 'রবি-তীর্থ'। এখানে সাহিত্যিকরা নিজেদের রচনা পাঠ করতেন এবং অন্যান্য সাহিত্য আলোচনাও হত। এই 'রবি-তীর্থে' মণিলালের দুই সুযোগ্য পুত্র মোহনলাল ও শোভনলাল ছোটদের গল্প পড়েন। সেগুলি সকলেরই প্রশংসা অর্জন করে। পরে এ গল্পগুলি 'মৌচাকে' প্রকাশিত হয়েছিল।

এই সময় তরুণ সাহিত্যিকদের মধ্যে একটি বিচিত্র ফ্যাশান গড়ে উঠেছিল। অর্থাৎ বেশীর ভাগ কবি এবং সাহিত্যিকদের পোশাক-পরিচ্ছদে বেশ একটা স্বাতন্ত্র্য ফুটে বেরুত। যেমন মাথায় ঝাঁকড়া ঝাঁকড়া চুল, মুখে ফ্রেঞ্চকাট দাড়ি, পরনে গরদের ধুতি ও গেরুয়া রঙ-এর পাঞ্জাবী। এই 'ধারা'টা বেশ কিছুদিন স্থায়ী হয়েছিল। আজকাল অবশ্য কে সাহিত্যিক আর কে অসাহিত্যিক—তা পোশাক দেখে বোঝবার উপায় নেই। কারণ দেখবেন যিনি কবি তাঁর মুখভরা গোঁফ, কিংবা পাতলুন-বুশ শার্ট।

(ক্রমশঃ)

গোঁসাইকুণ্ডর ডায়েরি

ভক্তি বিশ্বাস

(পূর্ব প্রকাশিতের পর)

(৩)

একটু আলো হতেই আমার স্বামী মিঃ বিশ্বাসের গলার আওয়াজ পেলাম। বাইরে বেরিয়ে হেট্ হেট্ করে কি তাড়াচ্ছেন। বন্ধু বললো, দুটো ভাল্লুকের মত মস্ত মস্ত কুকুর তার জোটমামার পিছু নিয়েছে। আমি ব্যস্ত হয়ে উঠি, বন্ধু হেসে আশ্বাস দেয়, না, ভয়ের কিছু নেই, ওরা ফিরে এসেছে।

উনি ফিরে এসে বলেন, "কি সাংঘাতিক অবস্থা! আমি বনের দিকে যাচ্ছি, ওই ভোটিয়া কুকুরদুটি আমার পিছু নিয়েছে, ছাড়ে না কিছুতেই। অনেক কষ্টে তাড়াতে সক্ষম হলাম, মনে হল, কিন্তু আমারই ভুল, আমি ফিরে আসবার আগেই দেখি নিঃশব্দে তাদের প্রত্যুষের ভোজন শেষ!"

আজ পথ আর কঠিন নেই। আমাদের যেন সান্ত্বনা দিতেই এবার উৎরাই পথ এগিয়ে এসেছে। বনের মধ্য দিয়েই পথ, তবে একটানা ঘন বন কোথাও নেই। তুষারমৌলী গিরি-শ্রেণী আজ আমাদের খুব কাছে এগিয়ে এসেছে। গণেশ হিমল (২৪,২৯৯ ফুট), হিমলচুলী (২৫,৮০১ ফুট), ল্যাংটাং হিমলের শৃঙ্গগুলির কি অপরূপ রূপ! আকাশে কোথাও মেঘ নেই। গাছের ফাঁক দিয়ে দিয়ে চূড়াগুলি যেন উঁকি দিচ্ছে। আজ আর আমাদের আনন্দের অবধি নেই। উৎরাই পথে চলতে কষ্ট নেই, তার উপর অসীম সৌন্দর্য পরিপূর্ণ পথ। তাই পরমানন্দে চলেছি। মাইল দুই এগিয়ে এসে বনের প্রান্তে একটা ফাঁকা জায়গায় পৌঁছলাম। এখন আর ডালপালার আবরণও সরে গেছে। আকাশের গায়ে, তুষারশৃঙ্গরাজি পরিপূর্ণ উজ্জ্বলরূপে সম্মুখে প্রসারিত।

পথে মাঝে মাঝে নেপালীদলের সঙ্গে দেখা হচ্ছে। তাদের বেশীরভাগই নতুন ঝুড়ির বোঝা বয়ে নিয়ে চলেছে কাঠমাণ্ডুর দিকে। তাদের মুখের দিকে তাকিয়ে দেখি, সবাই হাঁপাচ্ছে। পরিশ্রমের ক্লান্তিতে মুখগুলি লাল হয়ে উঠেছে। প্রশ্ন না করেও বোঝা গেল, এখনো আমাদের সামনে উৎরাই পথ রয়েছে। চড়াই উঠে আসছে বলে ওরা অত হাঁপাচ্ছে।

আমরা এদেরই একটা দলকে ধরে জিজ্ঞাসা করি। কিন্তু তুষারশৃঙ্গগুলির নাম এরা কেউ জানে না। এসব নিয়ে এরা মোটেই মাথা ঘামায় না।

'কিধর সানু পরছে? উল্টে ওরাই আমাদের প্রশ্ন করে।

"গোঁসাইকুণ্ড", উত্তর দিই।

একটি বর্ষিয়সী মহিলা এগিয়ে এসে বলেন, "উধু, পুগ্গছু না, হিম পড়ুলা, লকছ না।" অর্থাৎ এখন সেখানে তুষারপাত হচ্ছে এখন পৌঁছাতে পারবে না।

আমরা নায়েককে ধরে বসেছি। কি বলছে ওরা? আমরা নাকি গোঁসাইকুণ্ড পৌঁছাতে পারবো না? তবে তুমি জেনেশুনে এখন আমাদের নিয়ে এলে কেন?

নায়ক চটপট্ উত্তর দেয়, কেন যেতে পারবেন না? ওই যে দেখছেন পর পর চারটি পাহাড়ের সারি, ওরই শেষ চূড়াটার ফাঁকে একটু নেমে গেলেই গোঁসাইকুণ্ড, দেখুন না, ওখানে কি বরফ আছে? এখন তো বরফ পড়া শুরুই হয়নি, খু-উ-ব যেতে পারব। পথ খারাপ, সে তো আগেই বলেছি। তবে যাওয়া যাবে।

আমরাও মনে মনে তাই বলি। নিশ্চয়ই যাওয়া যাবে। একদিনের পথ না হয় দুদিনেই যাবো, তাতে কি? ধীরে ধীরে চলবো, তবে কেন যেতে পারবো না? তাছাড়া তুষারঢাকা পথে তো আমরা আগেও হেঁটেছি।

শেষে মাইলখানেক থাকতেই দূরে থেকে আমরা পাতিভঞ্জন গাঁও দেখতে পেলাম। গিরিশিরার একটা অংশ যেন প্রকাণ্ড মাঠে পরিণত হয়েছে, তারই মাঝখান দিয়ে সরু সিঁথির মত লাল রঙের পথ, এখান থেকেই স্পষ্ট দেখতে পাচ্ছি। মাঠের পর পথ উপত্যকার নীচের দিকে নেমে গেছে খাতের মধ্যে, একেবারে পাতিভঞ্জন গাঁ পর্যন্ত। যেন একটা ছোট মালভূমির উপর অবস্থিত গ্রামটি। ছবির মত দেখাচ্ছে। লামা দেখায়, ওই পাতিভঞ্জন।

বেশী দেরী হয় না। একেবারে খাড়া নীচু বিপজ্জনক পথ হলেও বেলা নয়টা বাজতেই আমরা পাতিভঞ্জনে পৌঁছে গেলাম। নায়েক আমাদের সঙ্গে সঙ্গেই এসেছে। পৌঁছানোর সঙ্গে সঙ্গেই আমাদের জন্য ভালো দেখে একখানা ঘর ঠিক করে রেখেছে। মাদুর এনে বিছিয়ে দিয়েছে বিশ্রাম করবার জন্য। বাইরের বারান্দার কোণে রান্না উদ্যোগে ব্যস্ত রয়েছে।

বাইরের উঠানে মস্ত একটা বেদী, তার উপর বড় বড় বাঁশপোতা—তাতে বৌদ্ধ ঢঙে পতাকা টাঙানো। বেদী ঘিরে চারিদিকে দোকানঘর, থাকবার দোতলা বাড়ী। আমাদের দেখে গ্রামবাসীরা ভিড় করে এল। এখানে পুলিশ চেকপোস্ট আছে, আমাদের নামধাম গতিবিধি লিখে নিল। পারমিট চাইল, নেপাল প্রবেশের জন্য দেওয়া ভারতীয় পারমিট দেখালেও খুশী হয় না। এপথে আসবার পারমিট কই?—বলে কিন্তু সে তো নেই দরকার নেই—টুরিস্ট অফিসার মিঃ মানসিং বলেছিলেন। পুলিশটি নামঠিকানা লিখতে লিখতে আমার স্বামী ডাক্তার শুনে খুশী, তার অসুস্থ স্ত্রীকে নিয়ে এলো দেখাতে। স্ত্রীর পেটের গোলমাল হয়, জ্বর হয়—অনেক পুরানো রোগ। উনি সাময়িক চিকিৎসার ব্যবস্থা করে সঙ্গের বাক্স থেকে দু' চারটে ট্যাবলেট বের করে দিলেন।

পাশের বাড়ীটাতে একটা দোকান আছে। চাল, ডাল, আলু পেঁয়াজ, কুমড়ো ছাড়াও অত্যাবশ্যক জিনিষপত্র পাওয়া যায়। আমরা আমাদের প্রয়োজনীয় খাদ্যদ্রব্য সঙ্গেই এনেছি। তবু লামার পরামর্শে কয়েকটা স্কোয়াশ ও একটা ছোট কুমড়ো—নেপালী ভাষায় কর্সি—কেনা হল।

দুপুরের খাওয়া-দাওয়ার পর মাল গুছিয়ে আবার চলা। পাতিভঞ্জন পেরিয়ে খানিকটা সমতল পথ, পাহাড়ের গায়ে গায়ে চলেছে। পথের পাশে কত ফুল ফুটে আছে। জায়গায় জায়গায় মনে হয় যেন সবুজ পাহাড়ের গায়ে খানিকটা করে গোলাপী রং কার হাত ফসকে পড়ে গেছে। অপরূপ দেখতে সেই রঙিন ঝোপগুলি।

কিন্তু বেশিক্ষণ নয়। একটু এগোতেই চড়াই পথ শুরু হল। নীচে থেকেই দেখতে পাচ্ছি, সামনের পাহাড়ের চূড়া অবধি খাড়া চড়াই পথ সিধে উঠে গেছে। কোথাও বাঁকা-চোরা নেই। সে-চূড়াটা দেখা যাচ্ছে, তারপরও আরও চূড়া আছে কিনা কে জানে! কোন গাছপালার বালাই নেই যে তার নীচে দু-দণ্ড বসে বিশ্রাম করা যাবে। ঠাঁটাপোড়া রোদ্দুরে এক-টানা চড়াই ওঠা। ভীষণ কষ্টকর। একদল নেপালী নেমে আসছে। পথে দেখা। পিঠে তাদের টুকরি-বোঝাই মাল।

"চিপ্লিঙ্ কি ধর?" প্রশ্ন করি।

"হুই মাথি পর। ঘর দেখাই কাডা না? ওই উধর।"

চিপ্লিঙ্ গাঁও আমাদের গন্তব্যস্থল। সামনের পাহাড়টা যেখানে আকাশের মাঝ-খানটা ফুঁড়ে বেরিয়েছে, ঠিক সেইখানে। 'মাথিপর' দুটি ছোট ছোট কুঁড়েও দেখতে পেলাম। চোখে দেখা গেলেও, এখনো উঠতে অনেক সময় দরকার।

মাঝপথে গাছপালা-ঘেরা ছোট্ট একখানা কুটির। হাঁপাতে হাঁপাতে ধীরে ধীরে উঠে কুটিরের সামনের ছায়াঢাকা ছোট্ট উঠানে বসে পড়লাম। কুটিরের গৃহিণী জল দিলেন। খেয়ে আকণ্ঠ তৃষ্ণা নিবারণ করি। গাছে কয়েকটা কাঁকুড় ফলে রয়েছে, আমাদের কাছে বিক্রি করতে রাজী হল। গাছের ছায়াতে ঘাসের উপর শুয়ে শুয়ে কাঁকুড় চিবোতে চিবোতে আমরা দুজনে খানিক বিশ্রাম করে নিই। বন্ধু এগিয়ে গেছে।

গ্রামের নাম 'চিপলিং', আমাদের মনে হল 'শিবলিঙ্গ'-এর অপভ্রংশ। চিপলিঙ্ পৌঁছাতে আমাদের বেলা আড়াইটা বাজলো। গ্রামবাসীরা বললো, এর পরের গ্রামে পৌঁছাতে আমাদের তিন কি সাড়ে তিনঘণ্টা লাগবে। সুতরাং আমরা এখানে আজ রাতের মত থাকাই মনস্থ করলাম। পথের ধারে একখানা মস্তবড় ঘর, তার পাশেই একখানি নতুন ঘর তৈরি করছে কয়েকজন মজুর। আশেপাশে সিঁড়ির ধাপের মত ক্ষেতে শস্য জন্মেছে। বাড়ীর লাগোয়া উঠানের ধারে ধারে নানারকম সব্জী।

একটু এগোতেই আরও কয়েকখানা ঘর পেলাম। অধিকাংশ ঘরের গৃহকর্তা মাঠে কাজ করতে গেছে, ফেরেনি এখনো। কর্ত্রীরা

ঘরে থাকতে দিতে চয় না কেউ। নায়েক লামা ছুটোছুটি করতে লাগলো। কিছুতেই ঘর পাওয়া যাচ্ছে না। কি বিপদ!

আমাদের হাঁকডাকে এক বুড়ো উঁচু পাহাড় থেকে নেমে এল। উপরে উঠেই তার ঘর। স্বতঃপ্রবৃত্ত হয়ে আমাদের ডেকে নিয়ে গেল। গ্রামের শেষ ঘরখানি তার। মস্ত ঘর, কিন্তু অধিকাংশ জায়গাই ভুট্টা ও অন্যান্য শস্যে বোঝাই। তবু মাথা গোঁজবার মত একটা স্থান পেয়ে আমরা স্বস্তির নিশ্বাস ফেললাম।

সন্ধ্যের আগেই বুড়োর দুই জোয়ান ছেলে ও স্ত্রী এলো মাঠের কাজ সেরে। তাদের জন্য বুড়ো নুনমরিচ দিয়ে কাঁকুড় মেখে দিল, আর দিল মদের সঙ্গে ভুট্টার ছাতু গুলে। ঐ খাদ্য প্রচুর পরিমাণে খেল তারা। ঐ ঘরেরই এক পাশে আমাদের বিছানাকটি পাতা হোল, ঘরের মাঝখানে উনুন জ্বলছে, সেখানেই রান্না করা। কাঠের সিঁড়ি দিয়ে উঁচুতে মাচার উপর ওঠা যায়, সেখানে ছেলেরা উঠে গেল শোবার জন্য। যাবার আগে ভুট্টার ছাতুর কাই দিয়ে বুড়োর রাঁধা তরকারির ঝোল খেয়ে নিল আরেক দফায়।

"উঃ!" বন্ধু মাথায় হাত দিয়ে বসে পড়েছে।

"কি হোল?" প্রশ্ন করি।

"কি আবার? মাথাটা ছাতের কড়িকাঠে ঠুকে গেল! এই বেঁটে ব্যাটারা এমন করে ঘর তৈরি করে যে সোজা হয়ে দাঁড়ানো পর্যন্ত চলে না।"

পরিষ্কার তারাভরা আকাশ, কিন্তু শীতও প্রচণ্ড। তাই বাইরে বসে থেকে উপভোগ করা যায় না। ঘরের ভিতর উনানের ধারে বুড়ো ক্রমাগত কেশে চলেছে। সারারাত ধরেই সে কাশলো। তারই ফাঁকে ফাঁকে তার হুঁকোটি বের করে হুড়ুৎ হুড়ুৎ করে তামাক টানছে।

(৪)

সকালে উঠে চা খেয়ে আবার চলা শুরু। রওনা হবার আগে বুড়োর দাম মিটিয়ে দিতে হবে। কিন্তু দামের বহর শুনে আমাদের চক্ষু চড়কগাছ। রান্নের ও সকালের উনানের কাঠের জন্য ২ এবং রাত্রিবাসের জন্য জন-প্রতি ১ করে।

চিপলিঙ ছেড়েই চড়াই পথের শুরু। তার কিছুপর থেকে চড়াই উৎরাই মেশানো পথ। ধীরে ধীরে বনের মধ্যে কখন যেন প্রবেশ করেছি। পাইন, ফার গাছের প্রাধান্যই চোখে পড়ে। এখন অনেকটা সহজ পথ, দৃশ্যও মনোরম।

"উঃ বাবা!" "কি হোল?"

উনি পা মচকে পড়ে গেছেন। পচা পাইন পাতাতে পা হড়কে গেছে তাঁর। আমাদের সকলের মুখ শুকিয়ে গেল। তাড়াতাড়ি কুলিদের থামিয়ে ওষুধের ব্যাগ খুলে প্লাস্টার বের করে আঁট করে বেঁধে নিলেন নিজেই। টিপে টিপে দেখে বলছেন, নাঃ, হাড়গোড় ভাঙেনি, তবু সাবধানের মার নেই।

সামান্য চড়াই-উৎরাই পথে চলে আমরা যখন গোলভঞ্জন (৮০০০ ফুট) গ্রামে পৌঁছলাম, ঠিক তিনটি ঘণ্টা পার হয়ে গেছে তখন। গোলভঞ্জনকে কেউ কেউ 'গোল্‌বু' বলেও উল্লেখ করছে। আজও সমস্ত পথটাতেই তুষারশৃঙ্গগুলির উজ্জ্বল রূপ দেখা যাচ্ছে। গাছের ফাঁকে ফাঁকে বার বার উঁকি দিচ্ছে শিখরগুলি, ঝক্‌ঝক্‌ করে জ্বলছে যেন। যুগল-হিমল সবচেয়ে কাছে, তার রূপ সবচেয়ে উজ্জ্বল ও বিশাল।

গোলবুতে একটা দোকানঘরের বারান্দায় ঠাঁই পেলাম। এই পাথরের দেশে ঘরের কোণে রসালো আখ দেখে আর লোভ সংবরণ করা গেল না। কিনে নিয়ে চিবোতে শুরু করলাম। বেশ সুমিষ্ট।

গোল্‌বুতে দুপুরের খাওয়া ও বিশ্রাম সেরে বেলা থাকতে থাকতেই চড়াই ওঠা শুরু করে দিলাম। গোল্‌বুতে জলাভাব, স্নান করা সম্ভব হোল না, কিন্তু মাত্র আধঘণ্টা চড়াই উঠেই একটা বেশ বড় ময়দান পাওয়া গেল। তার মাঝখান দিয়ে টলটলে জলভরা নীলরঙের একটা ঝরণা বয়ে চলেছে। আমরা সকালে আর আধঘণ্টা হাঁটলেই এখানে পৌঁছাতে পারতাম। গোল্‌বুর থেকে অনেক ভাল জায়গা, স্নানও করা যেত। নায়েক এ-পথে দু'বার এসেছে বটে, কিন্তু খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে সবকিছু জানা নেই তার।

ময়দান পার হয়ে এখনো চড়াই উঠে চলেছি। ঘন গাছপালা ঢাকা পথ, কোথাও চড়াই, কোথাও সমতল—উৎরাই নেই বললেই চলে। তবে মোটামুটি ভাল রাস্তা। বিকাল গড়িয়ে এসেছে, কিন্তু গ্রাম তো চোখে পড়ছে না। একটা গিরিশিরার উপর দিয়ে চলেছি। ডানদিকে পুবে দূরে ইন্দ্রাবতী নদী দেখা গেল। সবুজ উপত্যকাতে সরু রুপালী সুতোর মত ঝিকমিক করছে। কাঠ-মাণ্ডু—কোডারী চীনা সড়কও দেখা গেল। এই বিরাট পথটি কাঠমাণ্ডু থেকে সোজা তিব্বতের রাজধানী লাসায় যাবে।

সন্ধ্যা হয় হয়। সন্ধ্যার আগেই একটা গ্রামে যে পৌঁছাতে হবে। কিন্তু কোথায় গ্রামে? নায়ক লামা এগিয়ে গেছে, আমরা দূর থেকে তাকে অনুসরণ করে চলেছি। একটু এগিয়ে গাছপালার মধ্য দিয়ে দেখি, লালমাটির পথ দু'ভাগ হয়ে গেছে। একটা উঁচুর দিকে পাহাড়ে উঠেছে, অন্যটা নীচের উপত্যকার দিকে ধীরে ধীরে নেমে গেছে। লামা নীচের পথটি ধরলো। আরও একটু এগোতেই একখানা পরিচ্ছন্ন সুন্দর গ্রাম দেখা গেল; বালোমুজি গাঁও। নিশ্চিন্ত হওয়া গেল।

ছিম্‌ছাম ছোট্ট গ্রামটি। চারিদিক ক্ষেত ভরা। চার-পাঁচটি ঘর মাত্র। তারই মধ্যে একটি বিত্তবান পরিবারের ঘরে থাকবার স্থান অতি সহজেই পাওয়া গেল। এই প্রথম একটি পরিবারের মধ্যে সহৃদয়তার আভাস পেলাম। এরা নেপালী নয়, ভোটিয়া (তিব্বতী)। তাদের চালচলন, কথাবার্তা তাই ভিন্নরকমের। মস্ত দোতলা বাড়ী। একতলার গোটাটাতেই গোয়ালঘর এবং মুর্গির খাঁচা। দোতলাতে একখানা প্রকাণ্ড ঘর। ঘরের বেশীর ভাগ জায়গা মস্ত মস্ত ঝুড়িতে ভরা, নানারকম শস্য বোঝাই তাতে। একপাশে বড় বড় কলস ভর্তি মদ, তা সত্ত্বেও অনেকটা জায়গা ফাঁকা পড়ে আছে। এক-ধারে একটা পরিচ্ছন্ন দামী বিছানা পাতা। ভালো লেপ গায়ে দিয়ে এক ভদ্রলোক আমাদের সঙ্গে হিন্দীতে কথাবার্তা চালাতে লাগলেন। একটি রূপসী মেয়ে চায়ের জন্য উনানে জল চাপিয়ে দিল। ভদ্রলোকের কোলে বছরখানেকের একটি সুন্দর ফুটফুটে শিশু। আরেকটি বছর চার-পাঁচেকের শিশু তার কোলটি ঘেঁষে বসে আছে।

ভদ্রলোক পরিচয় দিলেন, মেয়েটি ওঁর স্ত্রী। আরও দুটি মহিলা আছেন, একজন শাশুড়ী, অন্যজন শালী। এটি এঁর শ্বশুর-বাড়ী। তবে ভদ্রলোক এখানেই থাকেন। মেয়েটি খুব কর্মঠ। অতিথিদের আপ্যায়ন করতে তার ব্যস্ততার সীমা নেই। হিন্দী জানেন বলে আলাপ হওয়া সম্ভব হল। ইনি ভারতবর্ষে বহুকাল কাটিয়েছেন।

বিশ্রামের ফাঁকে ফাঁকে ঘরখানা ভাল করে দেখি। পুরো বাড়ীটাই কাঠের তৈরি। দরজা-জানালাগুলি নিশ্ছিদ্র কাঠের, অপরূপ কারুকার্যময়। ঘরের ভিতরের দেয়ালের কাঠেও কারুকার্য-করা আছে। একপাশে দেয়ালের গায়ে কাঠের সেল্‌ফে আসবাব সাজানো। মেয়েদের পরনে তিব্বতীদের মত ঢোলা পোষাক, নানারঙের সমাবেশ রয়েছে তাতে।

আমরা ভাব করবার জন্য বাচ্চাদুটির হাতে লজেন্স ও বিস্কুট দিলাম। তারা হাত বাড়িয়ে নিলো বটে, কিন্তু ভাব করবার আগ্রহ তাদের দেখা গেল না, বিন্দুমাত্রও।

দিনের আলো নিভু নিভু। মিঃ বিশ্বাস চারিদিক ঘুরে দেখবার জন্য বাইরে গেলেন, কিন্তু প্রচণ্ড ঠাণ্ডায় ও হাওয়ায় বেশী এগোতে হল না। বাইরের বারান্দায় বেরিয়েই হাঁকাহাঁকি ডাকাডাকি। একান্ত অনিচ্ছায় আগুনের ধার ছেড়ে উঠে বারান্দায় বের হই। কি অপরূপ দৃশ্য! অদূরে একটা পাহাড়ের ঢেউ পার হলে পরের ঢেউটাতেই তুষারশৃঙ্গাবলী,—পরিষ্কার নীল আকাশের গায়ে হেলান দিয়ে দাঁড়িয়ে যুগল হিমল গিরিমালা। তার উচ্চতম চূড়া দোরজে লাক্‌পা (১) (২৩,২৪০ ফুট)। চূড়াগুলি পড়ন্ত সূর্যের আলোতে টুক্‌টুক্‌ করছে। দৌড়ে ভিতরে ঢুকে ক্যামেরা আনতে যে মিনিটখানেক দেরী হল, তাতেই সূর্য ডুবে গেল। ছবি তোলার মত আলো আর নেই। এই দৃশ্যের পূর্ণরূপ রঙিন ফিল্মে আটকে রাখতে পারলাম না, কিন্তু আজও মনের কোণে উজ্জ্বল হয়ে আছে। হিমালয়ের নানাদিকে, নানা মুহূর্তে নানা রূপ!

ঘরের ভিতর বউটি লম্বা বাঁশের চোঙের মধ্যে তৈরি চা ঢেলে একটা লম্বা কাঠি দিয়ে ঘুঁটে দিল, কিছু মেশাল কিনা জানি না।

বন্ধু ঐ চা চেখে দেখল খানিকটা, ভালো লাগল না।

রাত্রে ওদের নিজেদের জন্য ওই মেয়েটিই রান্না করল। প্রথমে অনেকগুলি আলুর টুকরো মশলা দিয়ে সিদ্ধ করে নিল। আলু সিদ্ধ হয়ে গেলে ওই জলের মধ্যে ভুট্টার ছাতু ঢেলে দিয়ে কাই মত তৈরি করে নিল। সকলে মিলে তাই ভাগাভাগি করে খেল। আমাদের খিচুড়ীও একটু করে চেখে দেখল কেমন লাগে।

এদের আতিথেয়তা আমাদের খুব ভালো লাগল। আমরা গোসাইকুণ্ড যাবো শুনে বললে এখনো তিনদিনের পথ বাকি আছে। আমাদের মনে হচ্ছে, নায়ক যদিও এপথে দুবার এসেছে বলে দাবী করে, কিন্তু এ-পথ সম্বন্ধে তার অভিজ্ঞতা খুবই কম। আমরা তাই এখানে একজন গাইড চাইলাম। একটি ছেলে যেতে রাজী হল কিন্তু তিন-দিনের জন্য ১০০্ টাকা চাইল। আমরা ত্রিশ টাকার বেশী দিতে রাজী নই। তাই আর গাইড নেওয়া হোল না।

উচ্চতার জন্য অক্ষুধা বোধ করছি। জোর করে কোনক্রমে লেবু দিয়ে খানিকটা পাতলা খিচুড়ী গলাধঃকরণ করতে হ'ল। এখানকার উচ্চতা বারো হাজার ফুটের মত হবে বলে আমাদের ধারণা। এখনো সামনে অনেকখানি চড়াইপথ বাকি আছে।

(৫)

১৪ই অক্টোবর। আজ আমাদের যাত্রার চতুর্থ দিন। শেষ লোকালয় ভোটিয়া গ্রামটি ছেড়ে চলেছি।

নেপালের সংস্কৃতিতে হিন্দু ও বৌদ্ধ-ধর্ম ওতঃপ্রোতভাবে জড়িয়ে রয়েছে। একটা থেকে অন্যটা যেন আলাদা করা যায় না।

নেপালের দক্ষিণাঞ্চলে হিন্দুধর্মের প্রাবল্য দেখা যায়, তেমনি আবার যত উত্তরে তিব্বতের সীমানার দিকে যাওয়া যায়, বৌদ্ধধর্মের প্রাবল্য চোখে পড়ে। তিব্বতের সীমান্তবর্তী অঞ্চলে, লামাদের সংগে বন্ ধর্মের অদ্ভুত সমন্বয় দেখা যায়। কাঠমাণ্ডু উপত্যকাতে হিন্দু ও বৌদ্ধধর্মের মিলন সর্বত্রই চোখে পড়েছে। বিখ্যাত পশুপতিনাথ যেমন হিন্দু-মন্দির, তেমনি স্বয়ম্ভুনাথ ও বোধনাথ বৌদ্ধধর্মের তীর্থস্থান বলে পরিগণিত। জনসাধারণ হিন্দু ও বৌদ্ধ মেশানো, কিন্তু তাদের আচার অনুষ্ঠানে দুটি ধর্মকেই আঁকড়ে ধরতে দেখা যায়। দুটি ধর্ম যেন দুই ভাই-এর মত একত্র অবস্থান করছে। একই স্থানে হিন্দুমন্দির ও বৌদ্ধস্তূপ এবং মনাষ্টারী পাশাপাশি দেখা যায়। কোন কোন সময়ে একই দেবমূর্তি দুই ধর্মের লোকদের দ্বারা পূজা পেতেও দেখেছি। যেমন দেখেছি মধ্য নেপালের হিন্দুতীর্থ মুক্তিনাথে। সেখানে দুইজন পূজারী আছেন। একজন হিন্দু অন্যজন বৌদ্ধ। নেপালের রাজারা পুরুষানুক্রমে হিন্দু হলেও এই দুই ধর্মকে তাঁরা সমান চক্ষে দেখেছেন। হিন্দুদের মতে নেপালের রাজা মনুষ্যরূপী স্বয়ং বিষ্ণু, অন্যপক্ষে বৌদ্ধরা মনে করেন রাজা হচ্ছেন একজন বোধিসত্ত্ব বা বুদ্ধের জন্মান্তর পরি-গ্রহ করা রূপ।

কাঠমাণ্ডু উপত্যকার জন্মবৃত্তান্ত সম্বন্ধে একটি প্রবাদ প্রচলিত আছে। পুরাকালে এই উপত্যকাটিতে একটি বিশাল শান্ত জলপূর্ণ হ্রদ ছিল। মঞ্জুশ্রীদেব একদা চীন দেশ থেকে তিব্বত হয়ে বৃহৎ হিমালয়ের সু-উচ্চ পর্বত-শিখর পার হয়ে পর্বতবেষ্টিত এই নীল স্বচ্ছ হ্রদের তীরে পৌঁছান। এই হ্রদ তখন নাগদের বাসভূমি ছিল। মঞ্জুশ্রীদেব ধ্যানমগ্ন অবস্থায় এই বৃহৎ হ্রদটিকে তিনবার প্রদক্ষিণ করেন এবং তাঁর হস্তস্থিত চন্দ্রহাস (তরবারি) দিয়ে একদিকের পর্বত ছেদন করেন। ঐ পথে হ্রদের সেই বিপুল উচ্ছল জলরাশি নির্গত হয়ে মহাভারত পর্বতমালার মধ্য দিয়ে পথ করে নিয়ে ভারতের সমভূমিতে গঙ্গা-নদীর সঙ্গে মিলিত হোল। জল নিষ্ক্রমণের ফলে সৃষ্টি হোল একটি বিরাট শুষ্ক স্থল-ভূমির। তিনি ধর্মকার নামক একজন পুণ্যাত্মাকে ঐ ভূমির অধীশ্বর হবার আদেশ প্রদান করেন।

এই একই প্রবাদ বৌদ্ধদের মত হিন্দুরাও বিশ্বাস করে। কেবল তারা বলে যে, পর্বত ভেদ করে উপত্যকা শুষ্ক করার কার্য জগৎ-পালক বিষ্ণু সাধন করেন। তবে মঞ্জুশ্রী-দেবকেও হিন্দুরা অবিশ্বাস করে দূরে রাখে না। তাঁকে তারা সর্বজ্ঞ বলে মনে করে। শ্রীপঞ্চমী তিথিতে মঞ্জুশ্রীর মন্দিরে হিন্দু, বৌদ্ধ উভয় সম্প্রদায়ের সহস্র সহস্র লোক পূজা দিতে জমায়েত হয়।

আমরা তিব্বত সীমান্তের কাছে এসে পড়েছি, তাই এই অঞ্চলে যত্রতত্র তিব্বতী ভোটিয়া চোখে পড়ছে। গ্রামগুলির আরম্ভ হবার মুখে এবং গ্রামের শেষে বৌদ্ধ চোর্টেন বা স্তূপ এবং তার উপর উঁচু বাঁশে পতাকা টাঙানো দেখেছি।

এই ভোটিয়া গ্রামটি এ পথের শেষ লোকালয়। গ্রামের শেষেও একটু উঁচুতে উঠেই আবার চোর্টেন পাওয়া গেল, তেমনি বাঁশে প্রেয়ার ফ্লাগ উড়ছে। লামা বললো, মৃত গ্রামবাসীদের উদ্দেশ্যে এই পতাকাগুলি টাঙানো হয়েছে। আমরা ওদের নিয়ম মেনে স্তূপকে ডাইনে রেখে চড়াই উঠে চলেছি। আজকের পথ কেবলই চড়াই। ঘনবনের গাছ-পালার মধ্য দিয়ে সরু আঁকাবাঁকা লাল রঙের পায়েচলা রাস্তা চলেছে। এ বনের বেশীরভাগই পাইন গাছ। পথের ধারে ধারে ছোট্ট ছোট্ট ঝোপে লাল টুকটুকে বেরীফল ফলে রয়েছে। টক-মিষ্ট আস্বাদ। মুখে দিলে তৃষ্ণাবোধ কমে যায়। বন্ধু আর উনি দুজনে সংগ্রহ করে দিচ্ছেন। তাই খেতে খেতে চলেছি।

এপথে যে কোথায় আমরা থামবো তা লামা বলতে পারছে না। আমরা ওদের নিয়ে হতাশ হয়ে পড়েছি, খানিকটা ভীতও। কিছু চেনে না, অথচ কাঠমাণ্ডুতে বসে ওরা বলেছিল, ওরা এপথে দু'বার এসেছে, এ পথের সব খবর ওরা খুব ভালো করে জানে। সম্ভবতঃ ওরা যাত্রীদের সঙ্গে তীর্থের সময় এসেছিল, সে সময় পথে সর্বত্র সাময়িক দোকান-পাঠ, ঘরবাড়ী তৈরী করা ছিল, পথের কথা চিন্তা করবার প্রয়োজন হয়নি। এখন নির্জন পথে ওরাও দিশাহারা হয়ে পড়েছে।

খানিকটা এগিয়ে একটা পাহাড়ের ধার দিয়ে চলেছি। অনেক দূরে পশ্চিমে নীচের উপত্যকার মধ্যে ত্রিশূলী নদীর ক্ষীণ রেখা চোখে পড়ছে। সর্বকনিষ্ঠ কৃষ্ণবাহাদুর বলে, ত্রিশূলীবাজারের মোটরের আওয়াজও সে শুনতে পেয়েছে। হবেও বা, পাহাড়ীদের চোখ কান খুব তীক্ষ্ণ হয়।

"ও কি! ও কি! কি হচ্ছে?" চেঁচাচ্ছি। লামা ও কৃষ্ণ বাহাদুর মাল নামিয়ে রেখে মারামারি করছে। তবে তাদের ঝগড়াঝাঁটির কোন কারণ ঘটেনি। মনের জড়তা কাটাতেই বুঝি এই মক্-ফাইটের আয়োজন! এই সুযোগে উনি তাদের সিনেমাও তুলে নিলেন।

"হুঁসিয়ার! হুঁসিয়ার!" চিৎকারে আমরা সন্ত্রস্ত হয়ে পথ ছেড়ে বনের মধ্যে সরে দাঁড়ালাম। মেঘ গর্জনের মত হুড়মুড় শব্দ করে পাহাড়ীরা বাঁশের বোঝা মাটির উপর দিয়ে টানতে টানতে দ্রুতবেগে উপর থেকে নামছে। উপরের জঙ্গল থেকে তারা সরু সরু লম্বা লম্বা পাহাড়ী বাঁশ সংগ্রহ করেছে। পথে অসমান জায়গাগুলি তারা অবলীলাক্রমে লাফিয়ে পার হয়ে গেল। আমরা ভীত, বিস্মিত, স্তব্ধ।

ওই বাঁশ কেটে ওরা ঝুড়ি বানাবে, কাঠ-মাণ্ডু নিয়ে যাবে বিক্রী করতে। কাঠমাণ্ডুতে ওই ঝুড়ির প্রচণ্ড চাহিদা।

সামনের এই পাহাড়টার পুরোটা চড়তে হবে। দূর থেকেই পাহাড়ের গায়ের পায়ে চলা পথের রেখা দেখা যাচ্ছে। কিন্তু এখনো অনেকটাই ওঠা বাকি। বেলা ন'টা নাগাদ দুজনা স্থানীয় লোকের দেখা পেলাম। তারা নীচে নামছে। তারা বললো, সামান্য নীচে একটা ঝরণা আছে। আমরা আর

না এগিয়ে ওইখানেই একটি পরিষ্কার সমতল স্থান নির্বাচন করে নিয়ে প্লাস্টিক পেতে বিশ্রামের জন্য বসে পড়লাম। রোদের উত্তাপ থেকে মাথা বাঁচানোর জন্য বন্ধু দুটো লাঠি পুঁতে একটা প্লাস্টিক-চাদর দিয়ে আচ্ছাদন তৈরী করে দিল। সামান্য নীচে ঝরণা কিন্তু অনেক নীচে, সুতরাং আজও স্নানের আশা করা বৃথা।

ধীরে ধীরে পথের গাছপালা বিরল হয়ে এসেছে। রডোডেনড্রন গাছের প্রাধান্য চোখে পড়ছে, মনে হয় তের হাজার ফুট উঁচুতে উঠে এসেছি।

দুপুরের খাওয়া-দাওয়ার পর চলা সুরু করেই মাত্র আধ ঘন্টার মধ্যে বেশ বড় একটা ময়দান পেলাম। তার মাঝখান দিয়ে কুলু-কুলু রবে একটা টলটলে জলের ঝরণা বয়ে চলেছে। ময়দানের মাঝখানে একটা খুপরিও আছে। জানা থাকলে আমরা সকাল বেলা এখানেই চলে আসতাম, তাহলে স্নান করাও সম্ভব হোত। নায়ককে বলে লাভ নেই। ওরা স্নানের ধার ধারে না। সুতরাং স্নানের মর্মও বোঝে না।

আরও একটু উঁচুতে উঠে দুটো রাস্তা পাওয়া গেল। দুটোই চড়াই উঠেছে এবং সমান চওড়া, নায়ক কোন ইঙ্গিত দেয়নি আগে, কোন পথে চলব তাহলে? নায়ক তার দলবল নিয়ে পিছনে আসছে, অগত্যা থেমে থাকাই স্থির হোল।

এইটেই নিশ্চয় 'দোবাট'—আমরা, বলাবলি করি। টুরিস্ট অফিসার যে-সব জায়গার নাম দিয়েছেন, তাতে তাই মনে হয়।

নায়কের নির্দেশে বাঁদিকের পথ ধরে জঙ্গলের মধ্য দিয়ে চলা সুরু করলাম। কিন্তু কিছুটা উঠেই দেখি, ডান দিকের পথটিই পাহাড়ের উঁচুতে এসে একই জায়গায় মিলে গেছে। একই গন্তব্যস্থলের দুটি পথ, তাই এখানকার নাম 'দোবাট'। (বাট—পথ)।

বনের মধ্য দিয়ে পথ চলেছে, এবড়ো-খেবড়ো সর্পিল। প্রথম দিকের অনেকটাই চড়াই। খানিকটা উঠবার পর গাছপালা বিরল হয়ে এল, পথও উৎরাই। নীচে যেন ময়দানের মধ্য দিয়ে একটা ঝরণা কলস্বরে বয়ে চলেছে উপল সমাচ্ছন্ন পথে। এই শুকনো রাজ্যে জল দেখলেই আনন্দ হয়। আমরা নীচে নেমে সেই জলে হাত-মুখ ধুয়ে নিই, কিঞ্চিৎ জলপান করে তৃষ্ণা নিবারণ করি। জলের ধারে একপাশে কতকগুলি গরু-ভেড়া রাখবার ঘর, ইতস্ততঃ ছড়ানো। বাঁশ কাটবার চিহ্ন চোখে পড়ছে সেখানে। আগাগোড়া পথে বাঁশের বোঝা টেনে নিয়ে যাওয়ার দাগ রয়েছে। বনের সর্বত্র বাঁশগাছ ঘন হয়ে জন্মেছে, কেবল কেটে নিয়ে যাওয়ার অপেক্ষা মাত্র।

ঝরণা পেরিয়ে একটু দূরে আরও কয়েকটা খুপরি দেখা গেল। নায়ক বলে, আজ আমরা এখানেই থামি। কিন্তু উনি রাজী হচ্ছেন না। এখন মোটে বেলা দুটো বেজেছে, আরও ঘন্টা দুই অনায়াসে চলা যাবে। এত তাড়াতাড়ি থামবার দরকার নেই।

ফটো : পার্থসারথি
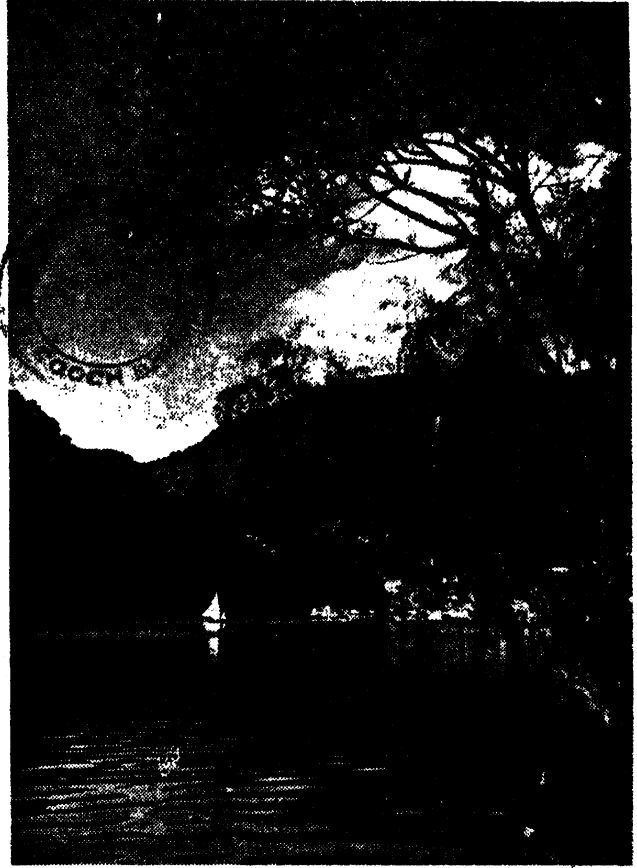
লামা দোনামনা করে, কি জানি আবার ঘর কতদূরে পাওয়া যাবে, কে জানে! সেখানে জল থাকবে কিনা তারই বা ঠিক কি?

বন্ধু বলে, আমরা এখানে বসছি, তুমি মাল রেখে এগিয়ে পাহাড়ের উঁচুতে উঠে একটু দেখ, কোন খুপরির চিহ্ন দেখা যায় কিনা।

লামা তৎক্ষণাৎ রাজী হয়ে গেল, সঙ্গী হল মনবাহাদুর। মিনিট পনেরর মধ্যেই ওরা ফিরে এল, হ্যাঁ কয়েকটা ঘর দেখা যাচ্ছে। একটু এগোলেই পাওয়া যাবে।

এবার চড়াই ওঠা, তবে বেশী দূর পর্যন্ত নয়, তাই বাঁচোয়া। আমরা ঘন্টাখানেকের মধ্যেই বেশ বড় বড় চার পাঁচটা খুপরি পেয়ে গেলাম। কিন্তু নিকটে যে জলের ধারাটা আছে, তাতে জল খুব কম। খুপরিগুলিও বড় নোংরা। অপরিষ্কৃত গোয়াল আর কি! পাথরের তৈরি দেয়াল, অর্থাৎ পাথরের উপর পাথর সাজিয়ে উঁচু করে দেয়াল তৈরি, মাটি বা সিমেন্টের কোন গাঁথুনী নেই, বড় বড় কাঠের তক্তা দিয়ে ছাত তৈরি, তার ফাঁক দিয়ে কোথাও কোথাও আকাশ দেখাও যাচ্ছে।

মনবাহাদুর খুব চটপটে কাজের লোক। লামা ও মনবাহাদুর পাইনের পাতাভরা ছোট-ছোট ডাল কেটে এনে ঘরের মেজেতে বিছিয়ে দিল—তার উপর আমাদের এয়ারম্যাট্রেস পাতবে। ঘরের মাঝখানে আগুন জ্বললো। ছাতের উপর প্লাস্টিকের চাদর ঢাকা দিয়ে সেগুলি পাথর চাপা দিয়ে আটকে দেওয়া হল। যাহোক, বৃষ্টি হলেও আর ভয় নেই। ঘরের মধ্যে আমার একটা শাড়ী টাঙিয়ে খোলা দুয়ারের মধ্য দিয়ে আসা বাতাসের পথ রোধ করবার ব্যবস্থা হোল।

এখানেও ওই বিপদ! বন্ধু যতবার উঠে দাঁড়াচ্ছে, ছাতে তার মাথা ঠুকে যাচ্ছে। তা হোক, কিন্তু এই পলকা ঘরখানি ওর মাথায় গুঁতোতে না ভেঙে পড়ে! ওর এত লম্বা হওয়া কোনক্রমেই উচিত হয় নি।

অনেকক্ষণ পর লামা সমু একটা জলের

ধারা থেকে আধ বালতি জল সংগ্রহ করে নিয়ে এল। অন্যান্য সকলে খালি হাতে ফিরে এসেছে। ইতিমধ্যে সন্ধ্যাও হয়ে গেছে। কাছাকাছি আর কোন ধারা পাওয়া গেল না। কি আর করা যাবে! এখন এখানকার এই নিশ্চিত আশ্রয় ছেড়ে বের হবার কথা চিন্তাও করা যায় না।

পড়ন্ত সূর্যের লাল আভা পড়েছে চারিদিকের তুষার-শৃঙ্গাবলীর উপর। টুক-টুকে লাল হয়ে অপরূপ দেখাচ্ছে শৃঙ্গ-গুলিকে।

নির্মেঘ নীলাকাশ, উজ্জ্বল তারায় ভরা। বিন্দুগুলি যেন জ্বলছে। এমন অপরূপ আকাশ বুঝি পাহাড়ের দেশ ছাড়া অন্য কোথাও দেখা যায় না।

সন্ধ্যা হবার আগে থেকেই অসহ্য শীত বোধ হচ্ছে। বাইরে বের হওয়া অসম্ভব। এখানকার উচ্চতা কত হবে? ১৪ হাজার, সাড়ে চোদ্দ হাজার? গাছগুলি ছোট হয়ে এসেছে। ছোট ছোট জুনিপারের ঝোপের মধ্যে দু'চারটে রডোডেনড্রন গাছ, আর বিশেষ কিছু নেই।

(৬)

ভোরের শিশির জমে সাদা হয়ে আছে সবগুলি ঝোপ। ঘাসের উপরও তুষার জমেছে। বেশ সুন্দর দেখাচ্ছে। আজকের পথের খানিকটা পর্যন্ত চড়াই। সামনের জঙ্গলে ঢাকা পাহাড়টার চূড়াতে উঠতেই আমাদের এক ঘণ্টা কেটে গেল। এখান গিরিশিরার উপর থেকে পূর্ব-পশ্চিম দুদিকের উপত্যকাই দেখা যাচ্ছে। পশ্চিমে ত্রিশূল-গণ্ডকীর উপত্যকা। পূর্বের উপত্যকায় হেলাম্বুর জনপদ। খানিকটা এগিয়ে আরও কয়েকটা ঘর পেলাম, সবই শূন্য। এর কাছাকাছি কোথাও জলের চিহ্ন নেই। একটা বেশ বড় বৌদ্ধ চোর্টেন বা স্তূপ, চারিদিকের পাথরে খোদাই করে লেখা "ওঁ মণি পদ্মে হুঁ।" তাকে ডাইনে রেখে এগিয়ে চলা। এই জায়গাটির নামই সম্ভবতঃ "সাওনে মনি"। কিন্তু জন-মানবহীন। জিজ্ঞেস করি কাকে?

গাছের পাতাগুলি সব তুষারে সাদা হয়ে গেছে। পথের রেখাটা পর্যন্ত তুষারে ঢেকে গেছে। সেই শুভ্ররেখা ধরে এগিয়ে চলেছি।

"যাঃ গেল।" "কি, কি?" প্রশ্ন করি মিঃ বিশ্বাসকে। উত্তর দেন না কিন্তু বন্ধুকে হুকুম করেন—

"যা তো, ওই—চোর্টেনের উপর গ্লাভস্-জোড়া ফেলে এসেছি, নিয়ে আয়।

বন্ধু ছুটে গেল। বেশীদূর এগোইনি আমরা।

নায়কের নির্দেশে এখানে কুলিরা সকলে মাল নামিয়ে কুক্‌রি হাতে পাইন ও রডো-ডেনড্রন গাছের ডাল কেটে কেটে স্তূপাকার করে ফেলেছে। এখান থেকেই ওরা দুদিনের জন্য লাকড়ি সংগ্রহ করে নেবে। এরপর আরও উঁচুতে লাকড়ি আর পাওয়া যাবে না।

আমরা না থেমে এগিয়ে চলি। পাহাড়টার ওপিঠে খানিকটা নীচে একটা মস্ত ময়দান যেন। সেখানে অনেকগুলি ঘর। পুরোপুরি ঠিক বলা চলে না। তাও ঘর আছে অনেকগুলি। যেন কোনকালে একটা গ্রাম ছিল। কোন কোন ঘরের ছাদে নতুন কাঠ-পাতা। হয়তো বর্ষার সময় যাত্রীরা এখানে থেকেছে, তাই ঘরগুলি মেরামত করা হয়েছে। ঝরণার ধারা আছে কয়েকটা, কিন্তু এখন সবগুলি শুকনো। মনে হয় এইটিই পরিত্যক্ত গ্রাম "থারেপাটি"। আমরা ভাবছি, এখন লামা মশাই। আজ এখানেই দুপুরের খাওয়া হবে। জলও নিশ্চয় কাছে-ভিতে পাওয়া যাবে। দেখি, লামা আসুক, সে কি বলে শুনি।

আমাদের বিশ্রামের ফাঁকে বন্ধু ডান-দিকের গিরিশিরাতে উঠে গেল দেখতে। ওদিকে একটা চওড়া পথ চলে গেছে। ওইটিই সম্ভবতঃ হেলমুর বিখ্যাত গ্রাম মালেমচির রাস্তা। আমরা ওদিকে যাবো না।

কাঠমাণ্ডুতে প্রিন্সিপ্যাল গাঙ্গুলী বলেছিলেন, "এপথেই হেলমু পড়ে, দেখে আসবেন। হেলমু ছিমিরালামার রাজ্য বললেই হয়। ওখানে তাঁর মস্ত জমিদারী আছে। তিব্বত চীনা দখলে যাবার আগে ছিমিরা লামা নেপালের তিব্বতী এম্বাসাডার ছিলেন। বিশেষ করে এই অঞ্চলে তাঁর খুব প্রতাপ। এখন তিনি বোধনাথে থাকেন। হেলমুর আরেকটি বিশেষত্ব আছে। এখান-কার মেয়ে পুরুষ সকলেই নাকি অপরূপ রূপবান। এদের রূপ জগদ্বিখ্যাত।

উত্তরে বলেছিলাম, "ওঁকে ওদিকে যেতে দেব না, তাহলে কি আর ফিরে আসবেন উনি?"

হেসে কটাক্ষ করে বলেছিলেন গাঙ্গুলী গিন্নি—"ছেলেরাও যে পরম রূপবান। তার কি হবে?"

এখন বন্ধুকে পাহাড়ের উপরে উঠতে দেখে চেঁচিয়ে ডাকি—"ও বন্ধু! কি হেলমু যেতে চাও নাকি?"

হাসতে হাসতে বন্ধু ফিরে এসেছে। "কিছুই দেখা গেল না। ভাবছিলাম দু' এক-জন লোক বা গ্রাম-টাম দেখা যাবে অন্ততঃ।"

বহু বিদেশী ট্যুরিস্ট এই পথেই হেলমু দেখতে যান। শুনেছি হেলমু নাকি অতি মনোরম স্থান। এখানকার অধিবাসীরা এক-জাতের শেরপা। এদের বিয়েথাওয়াও নাকি হয় কেবলমাত্র শেরপাদের সঙ্গেই। এই এলাকা ল্যাংট্যাং হিমল গিরিমালার উপর হলেও ল্যাংট্যাং-এর লোকেদের সঙ্গে এদের কোন সম্পর্ক নেই। এভারেস্টের পথে পড়ে দুটি জেলা 'সোলু' ও 'খুম্বু'। এই দুইটি জেলার লোকেরাই সাধারণতঃ শেরপা নামে পরিচিত। সোলু ও খুম্বু অনেক পশ্চিমে হলেও শেরপাদের মত পাহাড়ীদের পক্ষে সেখানের সঙ্গে হেলমুবাসীদের সংযোগ রাখা কঠিন নয়।

হেলমুতে দশ বারোটি বড় বড় বৌদ্ধ মনাস্টারী আছে। এপথে গেলে প্রথম মালেমচি গাঁও পড়ে, আরও এগিয়ে পূর্বের দিকে গেলে থাড়কোঁগদাং পৌঁছানো যায়। এই দুটি গ্রামই ইন্দ্রাবতী নদীর তীরে অবস্থিত। ইন্দ্রাবতী নেপালের বিখ্যাত সুনকোশী নদীর একটি উপনদী। ১৯৪৯ খৃষ্টাব্দে শরৎকালে বিখ্যাত পর্বতারোহী টিলম্যান যখন ল্যাংট্যাং-খোলা নদী যেখানে ল্যাংট্যাং হিমল থেকে বেরিয়ে এসে ত্রিশূলীতে পড়েছে, সেই অঞ্চলে আসেন। সেই সময় তিব্বতের বিখ্যাত গোসাইথান পাহাড়টির (২৬,২৯১ ফুট) প্রাথমিক পর্যবেক্ষণ করেন। তিনি দক্ষিণে ফেরবার সময় "গঙ্গা-লা" গিরিবর্ত্ম অতিক্রম করে থারকে গিয়াং পৌঁছেছিলেন। এই 'গঙ্গা-লা' ১৮,০০০ হাজার ফুটেরও বেশী উঁচু, তাই শরৎকাল ভিন্ন এপথে আসা সম্ভবপর ছিল না।

প্রায় আধঘণ্টা অপেক্ষা করবার পর দল-বলসহ লামা এল। এখানে না থেমে, উপ-ত্যকার ঘরগুলির মাঝখান দিয়ে সোজা নীচের দিকে নেমে চললো। কোথাও জল নেই। পথে যদিও অনেকগুলি শুকনো ধারা পাওয়া গেল। আরও নামছি, নামছি তো নামছিই। পথ ক্রমশঃ ঢালু, শেষে মস্ত মস্ত পাহাড় ছড়ানো, চলা রীতিমত কষ্টকর হয়ে দাঁড়াচ্ছে। তবু চলতেই হচ্ছে।

সর্বকনিষ্ঠ কৃষ্ণ বাহাদুর মাল নামিয়ে বিশ্রাম করছে। খুব হাঁপিয়ে পড়েছে সে। কাল রাতে ওদের খাওয়া হয়নি। জলাভাবে রান্নাই করতে পারেনি। আজ কোথায় তাড়া-তাড়ি করে রান্না সেরে খেয়ে নেবে, না এ কি বিপত্তি! এর ঘর বাড়ী, মাঠ, বন, কিন্তু জনহীন ও জলহীন শুকনো সব।

এখনো নেমেই চলেছি। মনে হচ্ছে একটানা এক হাজার ফুট নামা হ'ল। ওই যে ঝরণার আওয়াজ পাচ্ছি যেন! না, সে ওপারের পাহাড়টায়। কি জানি এত নেমে এলাম, শেষে কি ত্রিশূল নদীতে নেমে জলাভাব মেটাতে হবে নাকি?

বামে, পশ্চিমে বহুদূরে ত্রিশূলী নদীর ক্ষীণ রেখা সরু রূপালী সুতার মত দেখা যাচ্ছে। ঘন সবুজ বনসমাচ্ছন্ন পাহাড় কেটে বয়ে চলেছে। ওপারের পাহাড়ে দুটো একটা গ্রামও দেখা যাচ্ছে।

ঝরণার আওয়াজই তো! কৃষ্ণ বাহাদুর এবার ছুটে চলেছে। মন বাহাদুর আর লামা জলের ধারে আগুন জ্বালাবার চেষ্টা করছে। মস্ত একটা ঝরণা পাওয়া গেছে এখানে। আজ স্নানও করা চলবে। পথের উপরই প্লাস্টিক চাদর বিছিয়ে রোদ্দুরে বসে বিশ্রাম নিচ্ছি সকলে।

কী শীত! চলার পরিশ্রমে এতক্ষণ বুঝতে পারিনি, এখন থেমে থাকতেই অনু-ভব করছি, অসম্ভব শীত এখানে। বেলা বাড়তেই কুয়াশা নীচের উপত্যকা থেকে পাহাড়ের গা বেয়ে উপরে উঠে এসে আমাদের সম্পূর্ণরূপে ঢেকে দিল—সূর্যদেব সঙ্গে সঙ্গে অদৃশ্য।

দূরে বনের মধ্যে সবুজ গাছপালার ফাঁকে বড় সাদা মত কি একটা দেখা যাচ্ছে, ভাল বোঝা যাচ্ছে না। বন্ধু বলে, ওই একটা ঘর নিশ্চয়। আজ রাতে ওখানেই আশ্রয় মিলবে।

লামাকে প্রশ্ন করে সঠিক উত্তর মেলে না। "কেমা জানে! মালুম হোই, ঘর মিলেগা কি নেই!" নির্বিকার সুরে সে বলে।

কৃষ্ণ বাহাদুর হেসে হেসে বলে, আজ বনের মধ্যে থাকতে হবে, ঘর পাওয়া যাবে না। ওর হাসি দেখে গা জ্বলে যায়। হতভাগা একটা।

বেশী দেরী না করে খাওয়া-দাওয়ার পরই আবার হাঁটতে সুরু করি। একে শীত, তায় কুয়াশা, এখানে থেমে থাকা কোন অর্থই হয় না। রাত্রি কাটাবার জন্য একটা আস্তানা জোটাবার ব্যবস্থা করতেই হবে।

ঘন বনের মধ্য দিয়েই চলবার পথ। প্রথমটা কিছুটা উৎরাই হলেও পরের পথের সবটাই চড়াই। কষ্টকর নয়, ধীরে ধীরে উঁচুতে উঠে যাওয়া। ঘন কুয়াশার পর্দা ঠেলে এগিয়ে চলেছি। ত্রিশ চাল্লিশ হাতের বেশী দূরে দেখা যায় না। কাজেই সামনের পথ যে কোন্ দিকে, কেমন পথ, খুপরি আছে কিনা, কিছুই আগে থেকে জানবার উপায় নেই। পায়ের সামনে যে পথ এগিয়ে এসেছে তার উপর দিয়ে চলেছি, খানিকটা অন্ধের মত।

বেলা সাড়ে চারটার সময় একটা ভাঙা খুপরির চিহ্ন পেলাম। দুদিকে আধখানা করে মাত্র দেয়াল আছে, একদিকে পাহাড়টাই দেওয়ালের মত হয়ে আছে, অন্যদিকে সম্পূর্ণ খোলা। খোলা দিকটা উপত্যকার দিকে। ছাতের চিহ্ন নেই। এখান থেকে অনেক নীচের পাহাড়ে বন্ধুর দেখা সেই সাদা "ঘর" ছাড়িয়ে চলে এসেছি। এখন বুঝেছি, ওটা ঘর নয়, নীচে বনেরই মধ্যেকার একটা মস্ত পাথর। দূর থেকে ঘরের মতন দেখাচ্ছিল।

এখানে জলের আওয়াজও পাওয়া গেল। লামা বললো একটু নীচে নামলেই জল পাওয়া যাবে। সুতরাং আজ এখানেই থাকা স্থির হ'ল। ঘরের পাশে অনেকটা জমি সমতল করা, তাঁবু থাকলে বেশ দু' তিনটা তাঁবু পাতা যেত।

মন বাহাদুর ও লামা মিলে কয়েকটা বাঁশ ও গাছের বড় বড় ডাল কেটে এনে পুঁতে দিল। তার উপর প্লাষ্টিক চাদর ঢাকা দিয়ে কোনমতে আমাদের তিনজনার জন্য একফালি আশ্রয় তৈরি হ'ল। শাড়ী দিয়ে উপত্যকার দিকটা ঢেকে হাওয়া বন্ধ করা হ'ল। কিন্তু কুলিদের জন্য গাছের পাতাশুদ্ধ ডাল ছাড়া আর কোন ঢাকনি রইল না। ওরা বললো, আগুন জ্বালিয়ে ওরা বেশ থাকতে পারবে। কিন্তু বৃষ্টি যদি হয়?

আগে থেকেই আমার ও আমার স্বামীর অক্ষুধা সুরু হয়েছে। আমরা পানীয় ছাড়া কিছুই প্রায় খেতে পারছি না। বন্ধু নিজের খেয়ে আমাদেরটা পুরিয়ে দিচ্ছে। এখানেও তাই হোল। আমরা তাড়াতাড়ি শুয়ে পড়লাম, আর বন্ধু এখনো সমানে খেয়েই চলেছে। বলে, ওর নাকি খিদেও উচ্চতা বাড়বার সঙ্গে সঙ্গে বেড়ে যাচ্ছে।

আজ পাহাড়ের পথে চতুর্থ রাত।

(৭)

রাত কাটল মন্দ নয়। বৃষ্টি পড়ে নি, হাওয়াও নেই, তাই ভালই বোধ করছি সকলে। ভোর হতে হতেই কৃষ্ণবাহাদুর মস্ত একটা আগুন জ্বালিয়ে ফেলেছে, সুতরাং আর ভয় কি? কিন্তু আগুন ছেড়ে নড়বার উপায় কই? তাই রওনা হতে হতে ৭-২৫ বেজে গেল। মাথা থেকে বালাক্লাভাটা খুলে মুখ ধুতে যাব, তো চশমার ডাঁটিটা খুলে চলে এল। কি করি এখন? চশমা ছাড়া আমি যে একেবারে অন্ধ!

ওষুধের ব্যাগ খুলে প্লাস্টার বের করে উনি ভাঙা ডাঁটি জোড়া দিয়ে দিলেন। সাবধানে ব্যবহার করতে হবে, আবার ভাঙলে জোড়া দেওয়াও আর চলবে না।

চলতে চলতে আমাদের প্রশ্নের উত্তরে নায়ক জানায়, কোথায়, কতদূরে যে আজকে রাত কাটাবার জায়গা পাওয়া যাবে, তা সে জানে না। তবে চলতে চলতে পথে হয় খুপরি, না হয় গুহা, একটা-না-একটা কিছু পাওয়া যাবেই!

আমরা ১৫,০০০ ফুট উঁচুতে উঠে এসেছি বলে মনে হচ্ছে। হাল্কা হাওয়াতে দম নিতে কষ্ট হচ্ছে। একটুতেই হাঁপিয়ে পড়ছি। আমাদের চলার গতি তাই আরও মন্থর হয়ে গেছে। কুলিরা এগিয়ে গেছে। উনি বলছেন, সামনের চড়াইটা উঠে তবে যেখানে ঝর্ণা পাওয়া যাবে, সেখানেই রান্নার যোগাড় করতে। তাই তারা এগিয়ে গেছে।

ধীরে ধীরে চলেছি। চড়াই,—কেবলই চড়াই। রডোডেনড্রেন গাছ শেষ হয়ে গেছে, এখন ঘাসের মাঝে মাঝে কেবল ছোট ছোট জুনিপারের ঝোপ আর দুটি-একটি নীল জেনসিয়ানা ফুল।

বাঃ, বাঃ, ওখানে কি কেউ একখানা নীল ফুল তোলা কার্পেট বিছিয়ে রেখেছে নাকি? নীল জেনসিয়ানাতে যে পাহাড়ের সবুজ গা একেবারে ঢেকে গেছে! ওই, আবার ওই দিকে! কি অপরূপ শোভা আজকের পথের! অগণ্য নীল ও বেগুনী জেনসিয়ানা ফুল ফুটে আছে। কত বড় বড় ফুলগুলি। অনেকটা মহুয়া ফুলের মত বড় বড়, দেখতেও তেমনি। হিমালয়ের বহু জায়গায় ঘুরেছি, কিন্তু এত বড় জেনসিয়ানা কোথাও দেখিনি।

মস্ত বড় একটা ঝর্ণা। মস্ত মস্ত পাথর পাহাড়ের উঁচু থেকে গড়িয়ে এসেছে তার গতিপথে। তাই কি বাধা মানে সে? দুর্বার গতিতে সেগুলি ডিঙিয়ে নেমে আসছে অপূর্ব উজ্জ্বল রূপালী ঝর্ণা।

সেটি পার হবার পর একটু এগিয়ে পাহাড়ের খাঁজ বেয়ে আরও একটা ঝর্ণা। আহা! কি অপরূপ রূপ তার! যে জলের জন্য কাল সমস্ত সকাল হা-হুতোশ করেছি, আজ সকালে সেই অমৃতধারা একটার-পর-একটা অবহেলায় পার হয়ে চলেছি। এখানেও থামব না। "হুই মাথি পর" এখনো পৌঁছান হয় নি যে!

ক্রমাগত চড়াই উঠেই চলেছি, আর যে পারি না। একটা "মাথি" চোখের সামনে এগিয়ে আসছে, সেটা পার হয়েই দেখি আরেকটা "মাথি"—হিমালয়ের ফণাও কি শত-সহস্রটা?

কিন্তু, আরেক বিপদ। মাথা ঘুরছে যে! চোখ চাইতে কষ্ট হচ্ছে, কানের মধ্যে ভোঁ-ভোঁ করছে। উচ্চতার জন্যই এমন বোধ করছি! এখন কি করি?

'ওগো, কোথায় ওরা? আমার যে বড্ড মাথা ঘুরছে, চলতে পারছি না আর। কত দূরে ওরা? কোথায় থামবে?' মিঃ বিশ্বাসকে করুণ সুরে ডেকে বলি।

বন্ধু তৎক্ষণাৎ হাত বাড়িয়ে দিয়েছে, 'আমার হাত ধরে আসুন!'

তাই করি। বন্ধুর হাত ধরে ধরে খানিকটা এগোই। খুব অসহায় বোধ করছি তবু।

অবশেষে না পেরে বসে পড়েছি। পথের ধারে যেখানে নীল ও বেগুনী রঙের জেনসিয়ানা ফুটে আছে, সেই ফুলের কার্পেটের উপর বসে পড়েছি। এখন আর একবিন্দু চলবার শক্তি নেই।

'তুমি যেন বসে পড় না, আমার হাত ধরে ধীরে ধীরে এগোও। আর বন্ধু, তুই এগিয়ে দেখ, লামারা কতদূরে আছে, ওদের একজনকে পাঠিয়ে দে সাহায্য করবার জন্য।' উনি বন্ধুকে আদেশ করেন।

দ্রুতপদে বন্ধু এগিয়ে গেল। মিনিট পনেরোর মধ্যেই লামা ও কৃষ্ণবাহাদুর ছুটে এসে গেল। আমাকে ওদের দুজনার হাতে সঁপে দিয়ে উনি চলা শুরু করলেন। লামা হাত ধরে ধীরে ধীরে নিয়ে চলেছে। পথ কঠিন নয়, কিন্তু শক্তি নেই যে!

ওরা বেশী দূরে যায় নি। একটা প্রকাণ্ড ঝর্ণার ধারে বসে উনুন ধরিয়ে ফেলেছে। মস্ত একটা স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেললাম।

উঃ কি শীত! থেমেও নিশ্চিন্দি নেই। নীচের উপত্যকা থেকে কুয়াশা ধীরে ধীরে গড়িয়ে গড়িয়ে উপরে উঠছে। দেখতে দেখতে আমাদের সম্পূর্ণরূপে ঢেকে দিল। ঢেকে গেলেন সূর্যদেবও, সঙ্গে সঙ্গে তাঁর উত্তাপটুকুও মিলিয়ে গেল। বন্ধু একটা কম্বল বের করে এনে দিল, তাই ঢাকা দিয়ে

প্লাস্টিকের চাদর পেতে পথের উপর শুয়ে রইলাম।

চোখ মেলে দেখছি, দুটি উঁচু উঁচু নেড়া পাহাড়ের খাঁজের মধ্য দিয়ে ঝর্ণার ধারাটা কেমন সুন্দরভাবে নেমে আসছে। তার চলার পথে মস্ত মস্ত গড়িয়ে আসা পাথর। উচ্ছল জলধারা তার উপর দিয়ে যেন নেচে নেচে নামছে। আরও আকর্ষণীয় হয়ে উঠেছে তার রূপ।

ওদিকে দুটি উনুন জেবলে ওরা দুটি হাঁড়িতে রান্না বসিয়েছে। একটা ওদের জন্য, অন্যটা আমাদের জন্য। লামা ব্যস্তভাবে রান্নার যোগাড় করছে কিন্তু ল্যাংট্যাংবাহাদুর আর কৃষ্ণবাহাদুরের যেন কোন তাড়া নেই। তারা উনুনের আগুনের ধারে বসে হাত-পা সেঁকছে। একটু কষ্ট করে উঠে ওদের পাশে বসলে একটু গরম হওয়া যেত, কিন্তু সেটুকু শক্তিও আর অবশিষ্ট নেই।

খেতে পারলুম না বিশেষ কিছু। তবু জোর করে খানিকটা ডালের জলে চুমুক দেওয়া গেল। ভাগ্যে উনি কাঠমাণ্ডু থেকে অনেকগুলি লেবু এনেছিলেন, তাই ওই খাদ্যটুকু গলাধঃকরণ করা গেল। একে প্রচণ্ড ঠাণ্ডা, তায় কুয়াশায় চারিদিক ঢাকা, তাই স্নানও আর হল না।

একটার মধ্যেই আবার চড়াই ওঠা শুরু— আবার তেমনি 'মাথির' পর 'মাথির' শুরু। একটা ডিঙোলেই আরেকটা নজরে পড়ে। কিন্তু পথের রূপ পাল্টে গেছে। চারিদিকে এখন কেবল মস্ত মস্ত পাথর ইতস্ততঃ ছড়ান, মাঝে মাঝে খুপরির ধ্বংসাবশেষ। ছোট ছোট শক্ত ঘাস ও দুটো-চারটে জুনিপার গাছ ছাড়া আর কোন গাছ নেই, বৃক্ষের রাজ্যও শেষ হয়ে গেছে। এমন রুক্ষ প্রকৃতির রুদ্ররূপ।

এবেলা আর অসুস্থতাবোধ নেই। মাথাও আর ঘুরছে না। বেশ চলতে পারছি।

মধ্যে মধ্যে দেখ্ না দেখ্ করে কুয়াশা এসে আমাদের ঢেকে দিচ্ছে, তখন চার-পাঁচ হাত দূরের জিনিসও আর দেখা যাচ্ছে না। আবার একটু বাদেই মেঘ সরে যাচ্ছে। আকাশ খানিকটা পরিষ্কার হতেই আবার ঘন কুয়াশা ফিরে আসছে। মেঘ সূর্যের লুকোচুরি খেলা!

সামনেই মস্ত একটা গুহা। নাঃ, এখানে এত শিগগির থামা চলবে না, এখন মোটে দুটো বেজেছে। আরও এগিয়ে যাব, উনি বলেন।

তাই আরও এগিয়ে চলি। পছন্দমত খুপরি দেখা যাচ্ছে না, গুহাও নেই। বেলা তিনটা অবধি চলে বাসস্থানের খোঁজ শুরু করা হল। জলও কাছাকাছি চাই, নইলে চলবে না।

কয়েকখানা খুপরির ধ্বংসাবশেষ ইতস্ততঃ ছড়ান। কোনটাই আস্ত নেই। কোনটার ছাদই নেই! কোন-কোনটার দেয়াল আছে অবশ্য, তবে চলনসই একটাও পাওয়া যাচ্ছে না। লামা বলে, জুলাই-আগস্টের মেলা এখান থেকেই শুরু হয়।

আরও খানিকটা এগিয়ে চলি। বেলা পড়ে এসেছে, এখানেই কোথাও থাকবার বন্দোবস্ত করে নিতে হবে। কাছেই একটা ছোট ঝর্ণাও আছে, জলের অসুবিধা হবে না।

একেকটা খুপরির ধ্বংসাবশেষের দিকে করুণ নেত্রে তাকিয়ে দেখি। হায় ভগবান! শেষে কি এই সব খুপরিতে থাকতে হবে! এ যে প্রায় কিছুই নেই। চার টুকরো প্লাস্টিকের চাদরে ছাতটা কোনমতে ঢেকে নিলেও, কোনটারই দেয়ালের সবটাও নেই যে!

মনটা দমে যাচ্ছে, তাই একটা পাথরের উপর বসে পড়েছি। খুব রক্ষা যে এখন এখানে হাওয়া নেই। শুনেছি, এখানে সাধারণতঃ ভীষণ জোরে হাওয়া বয়। তীর্থযাত্রীরা অনেকে তাতেই মারা পড়ে। কিন্তু এই প্রচণ্ড শীতে প্রায় উন্মুক্ত ময়দানে রাত কাটাব কি করে?

কৃষ্ণবাহাদুর আর ল্যাংট্যাংবাহাদুর ইতিমধ্যেই আগুন জ্বালিয়ে ফেলেছে। মেলার সময় ফেলে যাওয়া অনেক বাঁশের কঞ্চি পড়ে আছে, তাই জ্বালিয়ে মস্ত আগুন করে তার ধারে বসে হাত-পা সেঁকছে। ল্যাংট্যাংবাহাদুরের পরণে লম্বা পাজামা নেই, কেবল খাটো ইজের পরা। গায়ে অবশ্য ছেঁড়া সার্ট আছে। তাই পরেই সে এই বরফের রাজ্যে এসেছে। তাই সে সর্বদাই আগুন জ্বালাবার তালে থাকে। ল্যাংট্যাং পাহাড়ের রাজ্যেও প্রায় লেংটা বলে এবং এই অঞ্চলের নামের সঙ্গে মিলিয়ে ওর নাম আমরা দিয়েছি 'ল্যাংট্যাংবাহাদুর'। আসল নাম ওর নতুন নামের নীচে চাপা পড়ে গেছে।

লামা কিন্তু ওদের মত নিশ্চিন্তে বসে নেই। পুরো দলের ভার ওর উপর, তাই ঘুরে ঘুরে দেখছে, কোন চলনসই খুপরি বা গুহা পাওয়া যায় কিনা।

'ছোটমামা, একটু আগে একটা গুহা ফেলে এসেছি!' বন্ধু বলে।

তৎক্ষণাৎ মিঃ বিশ্বাস বন্ধু ও লামাকে নিয়ে রওনা হয়ে গেলেন গুহা দেখতে। আমি হাঁটুতে মাথা গুঁজে পাথরের উপর আগুনের পাশে বসে রইলাম।

একটু বাদে লামা ফিরে এল। এসেই ওর মাল তুলে নিয়ে ফিরে চলল। অদূরেই একটা চলনসই গুহা আছে, আজকের রাত সেখানেই কাটাতে হবে।

একখানা বিশালকায় পাথর পাহাড়ের ঢালু গায়ে বসান, তারই তলায় ত্রিকোনাকার গুহার সৃষ্টি হয়েছে। ও'রা দেখে বলেন, ওর ভিতর তিনটি বিছানা পাতা যাবে। তবে গুহার ভিতর দাঁড়ানো চলবে না। শোবার সময় হামাগুড়ি দিয়ে বিছানাতে ঢুকতে হবে। পায়ের দিকটা এত নীচু যে শুলে পায়ের আঙুল ছাতে ঠেকে যাচ্ছে। ওই গুহাতেই আমাদের বিছানা তিনটি বিছানোও হল। গুহার সামনের খানিকটা আধঢাকা জায়গাও প্লাস্টিকের চাদর ও শাড়ী দিয়ে পুরো ঢাকবার ব্যবস্থা করে দিল বন্ধু। লামা ওর সঙ্গে সাহায্য করছে। ওই জায়গাটুকুতেই কুলিরা কোনমতে থাকতে পারবে। বন্ধুর খুব কষ্ট হচ্ছে। আমাদের দলে সর্বকনিষ্ঠ, কিন্তু সবল, তাই কাজের বোঝা ওর ঘাড়েই সর্বদা পড়ে। কিন্তু এখানে নড়তে-চড়তে দম শেষ হয়ে যায়, কাজ করবার শক্তি কারুর আর থাকে না।

তবু যা হোক একটা আশ্রয় পেয়ে সকলেই খুশী হলাম। একেবারে পাশেই একটি তিরতিরে ঝর্ণাও পাওয়া গেল, সুতরাং জলের সমস্যাও মিটল।

অসম্ভব শীত। হাত-পা ঠাণ্ডায় জমে গেল যেন। আজ আর আমরা রান্না করা কিছু খাব না। দলনেতা ডাঃ বিশ্বাস বসে বসে রুটি কাটবার চেষ্টা করছেন। এক সপ্তাহ আগেকার পাঁউরুটি, কাঠমাণ্ডু থেকে আনা। এখন শক্ত কাঠের মত হয়ে গেছে। লামা কুকরি দিয়ে টুকরো করে দিল। পাথরের মত জমাট বাঁধা শক্ত মাখন, তাও কাটা যাচ্ছে না। ও'র হাত প্রতি মুহূর্তে ঠাণ্ডায় জমে যাচ্ছে। আগুনে একবার একবার সেঁকে নেন, আবার মাখন কাটেন, জ্যাম লাগান। আবার কখনো কখনো ছুরিটাও আগুনে সেঁকে গরম করে নিতে হচ্ছে। সুইসরা নেপালে একটি চিজ-এর ফ্যাক্টরী গড়েছে, আমরা কাঠমাণ্ডু থেকে সেই চিজ কিনে নিয়ে এসেছিলাম, তা-ই কাটছেন বসে বসে। আমি আজ আর ওর মধ্যে নেই, নীরব দর্শকের ভূমিকা নিয়ে আগুনের ধারে বসে আছি। মস্ত বড় করে আগুন জেবলে দিয়েছে মনবাহাদুর। ওরা সকলে মিলে আশ-পাশের পাহাড় থেকে প্রচুর জুনিপার গাছ সংগ্রহ করে এনেছে, সেগুলি আগুনে ঠেলে ঠেলে দিচ্ছে। বন্ধু মাখন, জ্যাম, চিজ লাগান রুটির টুকরো হাতে পাচ্ছে আর মুখে পুরে দিচ্ছে। এক এক গ্রাসে এক একটা টুকরো খেয়ে নিচ্ছে। আমাদের ভাগে কম পড়লেও আজ মন্দ খাওয়া হল না। শেষকালে পুরো এক গ্লাস দুধভরা গরম কফিতে শরীর চাঙ্গা হয়ে উঠল।

জামা-কাপড় বালাক্লাভা, মোজা শুদ্ধ স্লিপিং ব্যাগে ঢুকে শুয়ে পড়েছি। কেবল জুতো জোড়া খুলেছি। এখন মোটে সাড়ে ছটা বেজেছে। কিন্তু মনে হয় যেন কত রাত হয়ে গেছে। বেশ আরামের বিছানা, তবু গরম কি সহজে হচ্ছি?

সামনে একটা মস্ত পাথরের আড়ালে হাওয়া বাঁচিয়ে লামা তাদের নিজেদের জন্য ভাত চাপিয়েছে। কৃষ্ণবাহাদুর আর ল্যাংট্যাং উনুনের দু পাশে বসে। লামা সকলকে প্রয়োজনমত সাহায্য করছে। বন্ধু গুহার ভিতর বিছানায় শুয়ে প্লাস্টিকের চাদরের ফাঁক দিয়ে উনুনের উপর কুলিদের ফুটন্ত ভাতের দিকে তাকিয়ে মস্ত একটা দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলে বলল—

'বেশ লাইট খানা খাওয়া গেল আজ!'
বেচারী!!

(৮)

রাতদুপুরে মিঃ বিশ্বাসের চেঁচামেচিতে ঘুম ভেঙে গেল।

'বন্ধু, ও বন্ধু, শিগগির ছাতাটা খুঁজে দে। বরফ পড়ছে রে। আমার মাথা যে ঢেকে গেল বরফে!'

প্লাস্টিকের চাদরের পর্দা পাহাড়ের গুহার মুখটা সবখানি ঢাকে নি। একটা

কোনো ফাঁক ছিল। সেই ফাঁক দিয়ে হাল্কা তুষার উড়ে উড়ে ওঁর মাথায় এসে পড়ছে। উনি ছাতা খুলে মাথা ঢাকা দিয়ে শুয়ে রইলেন। আমার কোন অসুবিধা নেই, দুজনের মাঝখানে দিব্যি আরামে আছি।

১৭ অক্টোবর সকালে দেখা গেল, মিঃ বিশ্বাসের বিছানার একটা ধার তুষারে ভরে গেছে। ঘন কুয়াশার মধ্যেই ভোর হয়েছে। আজ আমাদের যাত্রার সপ্তম দিন। লামা বলছে, মনবাহাদুরও তাতে সায় দিচ্ছে, আজ হয়ত সন্ধ্যা নাগাদ আমরা গোঁসাইকুণ্ডে পেঁছাতে পারব। গতকাল বলেছিল, আজ সন্ধ্যায় পেঁছালেও পেঁছাতে পারি। আমরা একটু অস্বস্তিবোধ করছি। এতদিন লাগবে আমরা আশা করি নি। গোঁসাইকুণ্ড পেঁছাতে এখনো পুরো দুটি বেলা বাকী!

বন্ধু চেঁচাচ্ছে—'ছোটমামা, শিগগির করে বাইরে বেরিয়ে এসো, দেখো সব যে তুষারে ঢেকে সাদা হয়ে গেছে!'

দেখতে বেশী কষ্ট করতে হয় না। বিছানা থেকে উঁকি মেরেই দেখতে পাই, চারিদিক তুষারে সাদা হয়ে গেছে। তুষারের একখানা সাদা চাদর যেন পাথরগুলিকে পর্যন্ত ঢেকে ফেলেছে, পাথর ও মাটির রঙ নিঃশেষ করে মুছে দিয়েছে।

লামা প্লাস্টিকের চাদরের উপর জমা তুষার ঝেড়ে ফেলে দিচ্ছে। কৃষ্ণবাহাদুর তাড়াতাড়ি উঠে জুনিপারের স্তূপের উপর ছড়ান তুষার ঝেড়ে ফেলে আগুন জ্বালাবার দিকে মন দিয়েছে। ওগুলি কাঁচাও জ্বলে বেশ। আমরা তারই উত্তাপে হাত-পা উত্তপ্ত করে নিয়ে রওনা হবার উদ্যোগ করি।

ন্যাড়া পাহাড়ের পথে চলা। দুটো-একটা জুনিপারের ঝোপ দেখা যাচ্ছিল, এখন তাও তুষারে ঢেকে একাকার হয়ে গেছে। সবচেয়ে বিপজ্জনক কথা হল এই যে, আমাদের পায়ে-চলা পথের হাল্কা দাগ-টুকুও ঐ তুষারে নিশ্চিহ্ন হয়ে মিলিয়ে গেছে। দিকনির্ণয় করে চলা মুস্কিল। চতুর্দিক তুষারে একাকার হয়ে গেছে। আশে-পাশের পাহাড় যতটুকু দেখা যাচ্ছিল, কুয়াশাতে সেটুকুও ঢেকে দিয়েছে। লামাই এখন একমাত্র ভরসা। সে দুবার এ পথে এসেছে। সুতরাং পথ সম্বন্ধে ওয়াকিবহাল বলে সে দাবী করে। তাই তার পিছু পিছু চলেছি।

লামা ক্রমাগতই বলে চলেছে—'গোঁসাই-কুণ্ড আভিভি বহুৎ দূর হ্যয়।' কি জানি, রোজই ভাবি এসে গেলাম, পথটা যেন রবারের মত বেড়েই চলেছে!

আজকের পথ চড়াই হলেও, ধীরে ধীরে উঁচুতে উঠেছে। কতদূর আর চলব তা কেউ বলে না, ও ব্যাটারা এ পথে এসেছে কিনা, এখন কেমন সন্দেহ হচ্ছে'

সামনের উঁচু পাহাড়টায় পথের একটা একটা ক্ষীণ রেখা যেন দেখা যাচ্ছে। ওই পাহাড়টা তো পার হতেই হবে, তারপরের পথ কেমন কেউ বলতে পারছে না। কখনো বলে চড়াই, কখনো বলে সমান সমান।

'আজ্ গোঁসাইকুণ্ড জরুর পেঁছেগা' বলে, আবার যখন-তখন 'বহুৎ দূর' বলে মন খারাপ করে দিতেও ওদের আটকায় না। কি জানি, কোন দিনই কি গোঁসাইকুণ্ডে পেঁছাতে পারব না?

বেলা সাড়ে নটার সময় আমরা একটা সুন্দর টলটলে জলের ঝর্ণা পেলাম। নায়ক সেখানেই বসে গেছে রান্না করতে। আমরা বিশ্রামের জন্যে প্লাস্টিকের চাদর পেতে শুয়ে পড়েছি। নিশ্চিন্ত হবার কি উপায় আছে? দিব্যি পরিষ্কার আকাশ ছিল, হঠাৎ কোথা থেকে কুয়াশা এসে ঘিরে ধরল, সঙ্গে সঙ্গে গুঁড়ি গুঁড়ি তুষার পড়তে শুরু করেছে। অগত্যা ছাতা খুলে বসে থাকি। ভাগ্য ভাল, অল্পক্ষণের মধ্যেই তুষার-পাত থেমে গেল।

অনেক কষ্টে খিচুড়ি রান্না হল। উচ্চতার জন্য ভাল করে সিদ্ধ হয় নি। সেই আধসিদ্ধ খিচুড়িই অনেক চেষ্টা করে গলাধঃকরণ করে পৌনে একটায় আবার চলা শুরু করলাম।

মন্দভাগ্য যেন আজ আমাদের তাড়া করে নিয়ে চলেছে। একে পথ দেখা যায় না, তুষারে ঢেকে গেছে, তায় পিচ্ছল। ক্রমাগত পা ফসকে যাচ্ছে। লামাদের পিছু পিছু ওদের পায়ের দাগ ধরে চলেছি। এর উপর আবার তুষারপাত শুরু হল। এবার আর থামবার নামটি নেই। প্রথমে যেন সাদা সাদা সরষের দানা ঝরছিল, ক্রমে ক্রমে পেঁজা তুলো যেন চতুর্দিক অন্ধকার করে এলোমেলো উড়তে লাগল। আমাদের চারিদিক থেকে তুষারে যেন ছেঁকে ধরল। ছাতা মাথায় দিয়ে কেবল মাথাটুকুই বাঁচে, সর্বাঙ্গ তুষারে ঢেকে গেল। মাঝে মাঝে গা ঝাড়া দিয়ে তুষার ঝেড়ে ফেলছি। কোনক্রমেই নিষ্কৃতি পাওয়া যাচ্ছে না। এই অঞ্চলের এই তুষার-পাত বর্ষার পর বোধহয় প্রথম। শীত আসবার লক্ষণ। এর পর এখানে ক্রমাগত তুষার জমে জমে পথ চলবার অযোগ্য হয়ে যাবে।

সামনের উঁচু পাহাড়টার চূড়ায় আধ-ঘণ্টার মধ্যেই উঠে এলাম। সামনে ঠিক ওইরকম আরও একটা উঁচু পাহাড়। তার চূড়াতে বৌদ্ধ চোর্টেন এবং ধ্বজা দেখা যাচ্ছে। তবে এইটিই কি এ পথের সবচেয়ে উঁচু স্থান? তাহলে ওর পরের পথ উৎরাই না হলেও সমান সমান হবার কথা। বৌদ্ধরা চলার পথে সবচেয়ে উঁচু জায়গাটিতে সাধারণতঃ ওমনি পাথরের স্তূপ বা চোর্টেন তৈরী করে।

এইটুকু মাত্র পথ, তাও উঠতে বেশ কষ্ট হচ্ছে। মোটে আধঘণ্টা চলেছি, মনে হচ্ছে যেন কতক্ষণ ধরে চলেছি। সামনে দেখছি, সারি বেঁধে লামারা চলেছে, ওরা চূড়ায় পেঁছে গেল।

মানবাহাদুর চেঁচিয়ে কি বলছে। কি বলে ওরা? যেন অসাড় হয়ে গেছে শ্রবণযন্ত্র। মিঃ বিশ্বাস শুনে বলেন—"মানবাহাদুর বলছে 'কুণ্ড হিঁয়াই হ্যয়, পাঁচ মিনিটমে আপ পেঁছ্ যায়েগা।"

সে কি কথা? আধঘণ্টা আগে ওই মানবাহাদুরই বলেছে যে বিকালের আগে আর কুণ্ডে পেঁছাতে পারবো না!

চড়াইর বাকীটুকু উঠতে পাঁচ মিনিট না হলেও, পনের মিনিটেরও কম লাগলো। আমরা চূড়ায় চোর্টেনের কাছে উঠে দেখি সামনে শতখানেক ফিট নীচে প্রকাণ্ড একটি টলটলে জলের হ্রদ। চারিদিকে পাহাড়ঘেরা। নিস্তরঙ্গ নীল জলের মধ্যে চতুর্দিকের পাহাড়ের, নীল আকাশের ছায়া পড়ে অদ্ভুত সুন্দর দেখাচ্ছে। আকাশ কি করে হঠাৎ পরিষ্কার হয়ে গেছে, কুয়াশার পর্দা সরে গেছে, এখন আর তুষারপাতও হচ্ছে না। পাহাড় ধীরে ধীরে নেমেছে একেবারে কুণ্ডের জলের ধার অবধি। কুণ্ডের চারি-দিককার ঘাসভরা মাঠে তুষারের কোন চিহ্ন নেই। অপূর্ব সুন্দর হ্রদ ও তার চারিদিকের দৃশ্য। আমরা পথের কষ্ট ভুলে বিস্মিত, স্তব্ধ হয়ে তাকিয়ে রইলাম। ভাবি, এই সেই বিখ্যাত গোঁসাইকুণ্ড, যার জন্য আমরা এতদিন অবর্ণনীয় কষ্ট সহ্য করে এসেছি এখন আর আমাদের কোন দুঃখ নেই!

দুঃখ নেই বা বলি কি করে? মস্ত ভুল করেছি যে! বেলা দশটার পর থেকে কোন দিনই ভালো আবহাওয়া পাচ্ছি না দেখে আজ আমার ক্যামেরাটা দুপুরেই ব্যাগে পুরে কুলিদের কাছে দিয়ে দিয়েছি। তাছাড়া লামাদের মতে আজ বিকালের আগে তো গোঁসাইকুণ্ড পেঁছানোর কোন সম্ভাবনাই নেই, সুতরাং ক্যামেরার দরকারই বা কি? যে সব ন্যাড়া পাহাড়ের পথে এতক্ষণ চলেছি, তার মধ্যে ছবি তুলবার যোগ্য কোন দৃশ্যই সকাল থেকে পাইনি। এখন খুব আপশোষ হচ্ছে। মিঃ বিশ্বাস কিন্তু সে ভুল করেন নি। এখন পরিষ্কার আকাশ, উজ্জ্বল দৃশ্য পেয়ে ছবির পর ছবি তুলেই চলেছেন।

শুনেছি এখানেই গোঁসাইকুণ্ডের তীরে যাত্রীদের থাকবার জন্য ধরমশালা আছে, কিন্তু কোথায় সে সব? সবাই চারিদিকে খুঁজে বেড়াই, লামা মাল নামিয়ে এগিয়ে গেল। কোথাও নেই! সকলেই তো বলেছে, একেবারে কুণ্ডের তীরে ধরমশালা পাবেন। শেষ গ্রাম থাক্সোস্‌জিতেও আমাদের আশ্রয়-দাতা বলেছিলেন এই কথাই। সকলের কথাই কি ভুল হ'ল?

খানিকক্ষণ এদিক ওদিক খোঁজাখুঁজির পর আমরা নিরাশ হয়ে পড়লাম। এমন সুন্দর স্থান, অপরূপ দৃশ্য, প্রাণভরে উপভোগ করবো, তাও আমাদের কপালে নেই। অগত্যা উনি লামাকে বলেন, তবে চলো এখনি ফিরতিপথে ত্রিশূলীর রাস্তা ধরে। ওই পথের কোথাও খুপরি বা গুহাতে আজ রাতের মত থাকবার আস্তানা খুঁজে নিতে হবে।

ত্রিশূলীর পথ কোনদিকে? প্রশ্নের উত্তরে লামা জানায়, হ্রদের ডানদিকের পাহাড়ের উপর দিয়ে যেতে হবে। অগত্যা মনঃক্ষুণ্ণ হয়ে সেই পথেই চলা শুরু করা গেল। তবু মোহ যায় না, আমরা ধীরে ধীরে এদিক ওদিক ঘুরে দেখবার চেষ্টা করে শেষ পর্যন্ত লামাদের অনুসরণ করে চলতে থাকি। মোটে আধঘণ্টা থাকতে পারলাম

এখানে, কিন্তু আশা ছিল পুরো একটি দিন এখানে আনন্দে কাটাবো।

কুন্ডটিকে বাঁয়ে রেখে আমরা অল্প এগোতেই দেখি আরও দু'টো হ্রদ পাশাপাশি রয়েছে। মাঝখানের গিরিশিরা দিয়ে পায়ে চলা পথ চলেছে। হ্রদ দুটি প্রথমটির চেয়ে অনেক ছোট হলেও বেশ স্বচ্ছ জলে পরিপূর্ণ। আমরা এদিক ওদিক ছড়িয়ে পড়েছি। ছবি তোলবার জন্য মিঃ বিশ্বাস পাহাড়ের উঁচুতে উঠে গেছেন। বন্ধু তাঁকে অনুসরণ করেছে। কুলিরা সামনের পথ ধরে অনেকটা এগিয়ে গেছে।

আরও হ্রদ যে! আশ্চর্য মনোরম জায়গাটি। আমরা আনন্দিত মনে আরও এগিয়ে চলেছি, হঠাৎ কুয়াশা এসে আবার চারিদিক ঘিরে ফেললো। কিন্তু একটার পর একটা হ্রদের ধার ঘেঁষেই চলেছি, কতগুলি হ্রদ তা গোনা হ'ল না। মনে হয় ৫।৬টার কম হবে না। সবগুলির তীরের গিরিশিরা ধরে চলার পথ। এদিকে কুয়াশার সংগে তুষারপাত শুরু হয়ে গেল। ছাতা মাথায় দিয়ে মাথা বাঁচিয়ে চলেছি, তবে অবর্ণনীয় সৌন্দর্যে আকৃষ্ট হয়ে চলা, তাই আর কষ্টবোধ হচ্ছে না।

কয়েকটা ছোট ছোট হ্রদ পার হয়ে একটা মস্ত হ্রদের প্রান্তদেশে এসে পৌঁছলাম। পাহাড়ের অনেক উঁচুতে রয়েছি, খাড়া উৎরাই পথে এবার নেমে হ্রদের তীরে পৌঁছাতে হবে। হ্রদের সবটা দেখাও যাচ্ছে না। হ্রদের অধিকাংশ এবং আশপাশের পাহাড় কুয়াশাতে ঢাকা, এখনো তুষারপাত থামেনি।

অনেক নীচে কুলিদের রঙিন জামাগুলি ক্ষণিকের জন্য দেখা গেল। নীল জলভরা হ্রদের তীরে ওরা পৌঁছে গেছে। হ্রদের তীর দিয়েই চলার পথ। আমরা কঠিন উৎরাই পথে তুষারের মধ্য দিয়ে অতি সাবধানে পা ফেলে এগিয়ে চলেছি।

"দেখো, দেখো, ওখানে ঘরের মত দেখা যাচ্ছে না?" মিঃ বিশ্বাসকে থামিয়ে বলি।

"কই, কই?"

অনেকদূরে নীচে হ্রদের প্রায় শেষপ্রান্তে যেখানে এখন কুলিদের রঙিন জামাগুলি আবছা আবছা দেখা যাচ্ছে, হঠাৎ মেঘের ফাঁকে বিদ্যুচ্চমকের মত মনে হল যেন ক'খানি ঘর উঁকি দিল।

"ওই, ওই, ওই তো ধরমশালা! ধরমশালা নয়?"

"যাঃ ঢেকে গেল।" আবার বলি। আবার কুয়াশা এসে হ্রদটিকে পর্যন্ত ঢেকে দিল।

আমি দৌড়ে চলেছি, যেন বন্ধু ও মিঃ বিশ্বাসকে পথ দেখিয়ে নিয়ে চলেছি। ওঁরা একবারও ঘরগুলি দেখতে পান নি।

নীচে জলের ধারে পৌঁছতেই সব দৃশ্য স্পষ্ট দেখা গেল। প্রকান্ড হ্রদ, এখনও তার সবটাই প্রায় কুয়াশাতে ঢাকা। স্বচ্ছ জল, লম্বাপানা দেখতে। তার পূর্ব শেষপ্রান্তে অনেকগুলি পাথরের তৈরী ঘর। একটা মস্ত পাথরের স্তূপের উপর কয়েকটা বাঁশের পতাকা উড়ছে। কুলিরা প্রায় পৌঁছে গেছে সেখানে।

এইটাই তাহলে প্রধান গোঁসাইকুন্ড, আগেরটি তবে সূর্যকুন্ড। মনের মধ্যে থেকে মস্ত বোঝা যেন নামলো।

জলের ধারে পৌঁছে মিঃ বিশ্বাস বললেন, "এসো, আমরা জলস্পর্শ করি।"

সকলে তুহিন শীতল জল আঁজলা করে তুলে মুখে মাথায় দিলাম। অপূর্ব তৃপ্তি পেলাম। যেন নবজন্ম লাভ হ'ল। আমাদের এতদিনের আকাঙ্ক্ষা আজ সফল হ'ল। মন আনন্দে ভরে গেল।

ধীরে ধীরে কুয়াশা খানিকটা অপসারিত হ'ল। সামনে দেখি, সুবিশাল হ্রদ, পূর্ব থেকে পশ্চিমে প্রসারিত। চারদিকে সু-উচ্চ পর্বতমালা ঘিরে রয়েছে। নিস্তরঙ্গ স্বচ্ছ গাঢ় নীল জলে সবগুলি চূড়োর ছায়া পড়েছে। এতক্ষণ ধরে ক্রমাগত তুষারপাতে সর্বত্র শুভ্র আবরণ পড়ে আরও অপরূপ দেখাচ্ছে। তবু হ্রদের অনেকটাই ঢাকা, কুয়াশার পর্দা সম্পূর্ণ সরে যায়নি, সূর্যদেবেরও দেখা নেই।

জলের ধারে ধারে পূজা করবার অনেক চিহ্ন দেখতে পেলাম। শুকনো ডাব, নারকেল, ফুলপাতা গড়াগড়ি খাচ্ছে। কাঠমণ্ডুর বিখ্যাত "পরাস" হোটেলের খাবারের খালি কাগজের বাক্স উড়ে বেড়াচ্ছে। কিন্তু কোথাও জনমানবের চিহ্ন নেই।

ধর্মশালার কাছাকাছি পৌঁছে দেখি জলের ধার থেকে একটু উঁচুতে আট-দশটি ঘর এদিক ওদিক ছড়ানো। তার মাঝখানে খোলা ময়দানে মস্ত পাথরের বেদী। বেদীর মাঝখানে শিবলিঙ্গ স্থাপিত। শিবলিঙ্গের সর্বাঙ্গ হলুদ চন্দনে চর্চিত। পাশে পাথরের তৈরী ছোট একটি বৃষ। মস্ত উঁচু উঁচু কয়েকটা বাঁশে পতাকা উড়ছে।

ইতিমধ্যে লামারা সবচেয়ে কাছের বড় ও ভালো ঘরখানি অধিকার করে নিয়েছে। ঘরগুলির দেয়াল পাথরের, ছাত কাঠের তক্তা পেতে তৈরি। মাঝে জোড়ের কাছে ফাঁক থেকে গেছে। আবার তুষারপাত সুরু হতেই ঐ ফাঁকগুলি দিয়ে ঝিরঝির করে তুষার পড়তে লাগলো। পাশের ঘরখানির ছাতে কয়েকখানা তক্তাই নেই। সেটি তাই এতক্ষণে তুষারে প্রায় ভরে গেছে।

কুলিরা মালপত্র নামিয়েই ব্যস্ত হয়ে পড়েছে। কৃষ্ণবাহাদুর ও ল্যাংট্যাং ইতিমধ্যেই ওদের বয়ে আনা কাঠ দিয়ে আগুন জ্বালিয়ে ফেলেছে। লামা আর মনবাহাদুর প্লাস্টিকের চাদরগুলি নিয়ে ছাতে চলে গেছে। বন্ধুর নির্দেশমত ছাতে পেতে দিয়ে তুষারের পথ বন্ধ করছে। ওতেই আপাততঃ চলে যাবে আমাদের। ঘরখানি মস্ত। সকলের স্থান সংকুলান হয়েও আরও জায়গা বাঁচবে। তাই দুটি জায়গায় আগুন জ্বালানো হ'ল। চায়ের জলও বসে গেছে।

আনন্দে সকলের মন ভরপুর। আমাদের দীর্ঘদিনের আকাঙ্ক্ষার আজ সমাপ্তি। আজ শুভদিনে তবে সত্যিই গোঁসাইকুন্ড তীর্থে পৌঁছাতে পারলাম। ১৬৭৭০ ফুট উঁচু! দুর্গমস্থানের দুর্লভ সৌন্দর্য। তুষারপাত চলছে এখনো, বাইরে বের হবার কোন প্রশ্নই নেই। কিন্তু কাল নিশ্চয় এমন আবহাওয়া থাকবে না। ভাগ্য ভাল হলে এই অনুপম সৌন্দর্যের পূর্ণরূপ দেখতে পাবো। এখন গুটিশুটি মেরে আগুনের ধারে বসে আছি। আগুনের উত্তাপে ছাতের উপরের তুষার গলে কাঠের ফাঁক দিয়ে টপ্‌টপ্‌ করে আগুনে পড়ছে। বন্ধু আগুনের ধারে বসতে রাজী নয়, পরে নাকি আর ওঠা যায় না।

রাত্রে গরম গরম পুরি ও আলু-মটরশুঁটির তরকারী দিয়ে খাওয়ার প্ল্যান হ'ল। এখানে দুর্লভ ভোজ্য। ঘি আছে টিনভর্তি, কিন্তু এত শক্ত হয়ে জমাট বেঁধেছে সে টিন থেকে বের করা রীতিমত কষ্টকর। আটা সংগেই আছে, কিন্তু বেলবার সরঞ্জাম নেই। লামা একটা মোটা বাঁশের টুকরো পথ থেকে সংগ্রহ করে এনেছে। সেটা এখন চেঁচেছুলে বেলনা তৈরী করল। থালার উলটো পিঠে পুরি বেলে নেওয়া হ'ল। পুরি ভেজে আর কুল পাওয়া যায় না। বন্ধু এখন প্রচন্ড সক্রিয়, তার ছোটমামাও কম যাচ্ছেন না। কাল সকালের জন্যও কয়েকখানা রেখে দেওয়া হ'ল।

(ক্রমশঃ)

ট্যাক্‌স কাহিনী

প্রিয় গুহ

ট্যাক্স কথাটা ইংরাজী। তবে ভাষার সমৃদ্ধির সঙ্গে অনেক দেশী শব্দের এমন আত্মীয়তার বন্ধন হয় যে 'পরদেশী সেঁইয়া' গাঁয়ের ছেলেবেলায় পাতানো 'বকুল ফুল'-এর থেকেও বেশী আপন হয়ে ওঠে। ট্যাক্স এর বাংলা নাম ট্যাক্‌স আমাদের জিহ্বার সাবলীলতার সঙ্গে তাল মিলিয়ে যে ছন্দে মনের মাঝে বাজে তা কিন্তু মোটেই সুখকর নয়—কারণ ট্যাক্‌স দিয়ে যা আমরা পাই তা তো টেরিলিনের সার্ট বা ধনেখালির শাড়ী নয়—সে পাওয়ার অনেকটাই অদেখা পাওয়া বলে প্রাপ্তিবোধটা খুব বেশী প্রত্যক্ষ-সত্য নয়। এই ট্যাক্স জিনিষটা যাঁর মাথায় প্রথম খেলেছিল তিনি যে শুধু বুদ্ধিমান তা নয়, তিনি সমাজবিজ্ঞানে ধুরন্ধর এবং মানুষের পরিবার গোষ্ঠী ও রাষ্ট্র সৃষ্টির স্বভাবজাত প্রচেষ্টার অর্থনৈতিক দিকটার এক অপূর্ব সমাধান করেছিলেন। মানুষ যেখানেই থাক সে ঘর বাঁধবেই এবং আপনজনের সাহচর্য এবং সংস্পর্শকে কামনা করবে। এই থেকে সে ক্রমশ ছোট-বড় সমাজব্যবস্থা গড়ে তুলবে এবং সেই সমাজব্যবস্থার প্রয়োজনের জন্য নিজের অবাধ জীবনকে সীমায়িত করবে আইন ও শৃঙ্খলা দিয়ে এবং যৌথ জীবনযাত্রার সুচারু পরিচালনার দায়িত্বে নানা রকম বিধি-নিষেধ ও সমষ্টিগত সুবিধার ব্যবহারিক বুদ্ধি আবিষ্কার করবে।—এই সব জেনেই তার অর্থনৈতিক সাম্যভার রক্ষার জন্য এই ট্যাক্স ব্যবস্থার রীতি গড়ে উঠেছে—তার মধ্যে অন্যতম হোল পৌর-কর বা মিউনিসিপাল ট্যাক্‌স। এই মিউনিসিপাল ট্যাক্‌সের অনেক বহুলতা আছে এবং মুখ্যত বাড়ী-ঘরের ওপর ট্যাক্‌সই হোল প্রধান।

যে বিধি-নিষেধ দিয়ে জীবনযাত্রাকে সীমায়িত করা হলো, পৌর আবেষ্টনীতে তার অনেকগুলো বিশেষ রূপ ধারণ করে এবং তার জন্য বিশেষ বিধি হিসাবে বিধানসভায় পৌর-আইন বা মিউনিসিপাল অ্যাক্ট সূচিত হলো। এতে বিধিবদ্ধ হয়েছে শহরবাসীর জীবনযাত্রার পদ্ধতি এবং পুরবাসীদের যৌথ জীবনযাত্রার পারস্পরিক সুবিধা ও অসুবিধার মানদণ্ড। দায়িত্বের পরিমাপ হিসাবে মূল্য ধার্য হলো এবং ট্যাক্‌স কী অনুপাতে কার ওপর কিভাবে ধার্য হবে তার নিরিখ তৈরী করা হলো।

পৌর কর্তব্য ও ক্ষমতার মধ্যে আছেঃ

১। আধিকারিক বিধি ও ক্ষমতা।

২। অর্থনৈতিক ব্যবস্থা।

৩। ট্যাক্‌স বা কর ধার্য ও গ্রহণ প্রণালী।

৪। জনস্বাস্থ্য, নিরাপত্তা ও সুখ-স্বাচ্ছন্দ্য।

৫। প্রয়োজনজনিত অন্যান্য ক্ষমতা।

৬। বিধি এবং বিধান গড়ার ক্ষমতা।

৭। অমান্যজনিত দণ্ডবিধি। —এই কয়টি পর্যায়ে সমস্ত পৌর আইনটি গ্রথিত।

এর মধ্যে তৃতীয় পর্যায়টি সবথেকে বেশী প্রণিধানযোগ্য এই জন্য যে বুঝি বা না বুঝি পৌর সংস্থাকে আমার তরফ থেকে যা দেয় তার বিধি, রীতি ও পরিমাণ না জানলে অকারণেই হয়ত বেশী দিয়ে থাকব যা আমাদের মূর্খতা বা অজ্ঞতারই পরিচয় হবে। 'সভ্যতার মূল্য শাশ্বত সতর্কতা' বলে যে কথাটা আছে একে তার একটি প্রকৃষ্ট উদাহরণ বলা চলে। সভ্য শহরে বাস করবার জন্য এই সতর্কতা আরও অবিসম্বাদী এইজন্য যে পৌর-আইন বহু জায়গায় ধরে নিয়েছে যে বুঝে নেবার বা জেনে নেবার দায়িত্ব পুরবাসীর—পৌর সংস্থার নয়।

উপরোক্ত কর্তব্য এবং ক্ষমতার ব্যবহারে সমস্ত পর্যায়গুলি তৃতীয় পর্যায়ের মুখাপেক্ষী। কারণ তাদের সমস্ত ব্যয়ভার ওই পর্যায়টি নিরূপণ করে।

পৌর-আইনে পৌর সংস্থাকে এই ক্ষমতা দেওয়া হয়েছে যে, জমি-বাড়ীর বার্ষিক মূল্যের উপর শতকরা হারে কর ধার্য করা হবে। তাহলে কর ধার্য করার পূর্বেই বার্ষিক মূল্য নিরূপণ করা দরকার—এবং এই বার্ষিক মূল্যটি কী?

কর নিরূপণের জন্যে কোন জমি-বাড়ীর বার্ষিক মূল্য হলো সেই সম্পূর্ণ বার্ষিক ভাড়া যা, কর নিরূপণের সময়, যুক্তিসংগতভাবে বার্ষিক ভাড়া হিসাবে পাওয়া যেতে পারে এবং বাড়ীর ক্ষেত্রে শতকরা দশ টাকা হিসেবে বাদ দেওয়া হবে মেরামত ও অন্যান্য খরচ করে বাড়ীটিকে ওই অবস্থায় রাখার জন্যে যাতে ওই সম্পূর্ণ বার্ষিক ভাড়া বছরের পর বছর পাওয়া যেতে পারে। এর অর্থ খুব ব্যাপক এবং এর ভেতর এতগুলো 'যদি' এবং 'কিন্তু' থেকে গেল যে এর অর্থ মোটেই পরিষ্কার হোলো না। একটা কথা খেয়াল রাখা দরকার এই বার্ষিক মূল্য কিন্তু কর বা ট্যাক্‌স নয়—এর ওপর তা ধার্য করা হবে।

প্রথমেই ধরা যাক সম্পূর্ণ বার্ষিক ভাড়া কাকে বলব? সম্পূর্ণ অর্থে 'কিছু বাদ না দিয়ে'। এ সম্বন্ধে আদালতের কিন্তু বিভিন্ন রায় আছে এবং সম্পূর্ণ শব্দটি একেবারে সম-পূর্বক পূর্ণ নন এবং অবস্থা ক্ষেত্রে এটি বিভক্ত। কারণ ওই পরবর্তী কথাটি 'যাতে ওই সম্পূর্ণ ভাড়া বছরের পর বছর পাওয়া যেতে পারে'। উদাহরণ স্বরূপ ধরুন একটি ছতলা বাড়ী যার লিফট না হোলে যে ভাড়া আজ সে পাচ্ছে লিফটের দরুণ, তা সে পেতে পারে না এবং পাবেও না সুতরাং লিফটের খরচ অবশ্য বিচারের ভেতর আনা উচিত। এমনি আরও অনেক সম্ভাব্য অবস্থা বিচারসাপেক্ষ।

দ্বিতীয়ত, 'যুক্তিসঙ্গত ভাড়া' কথাটার এত বিভিন্নতা যে, যা আমার কাছে যুক্তিসংগত তা আরেকজনের কাছে সম্পূর্ণ অযৌক্তিক, বিশেষত যাকে দিতে হয় তার কাছে তো বটেই। এই সব কারণে অনেক প্রশ্নের অবতারণা হয় যেমন আমাদের পাশের ছোট ভাড়াটে বাড়ীটার একতলায় বড়দার মেজো শালা মাদ্রাজ থেকে বদলী হয়ে এসে রয়েছেন। তিনিও ভাড়া দেবেনই অথচ মা বলে দিয়েছেন আত্মীয়-স্বজনের সঙ্গে ওরকম ব্যবসা চলবে না—সুতরাং ঠিক হোলো তিনি ট্যাক্‌সর টাকাটা দিয়ে দেবেন। যদিও উপরতলায় হ্যারিস কোম্পানীর খাস্তগীর সাহেব কোম্পানীর দেওয়া পাঁচশ টাকা ভাড়ার পুরোটাই দিয়ে দেন। এখন বড়দার মেজো শালার দেয়া ভাড়া বা খাস্তগীর সাহেবের কোম্পানীর দেয়া ভাড়া দুটোর কোনটাই যুক্তিসংগত বলা চলে না। এক্ষেত্রে পৌর সংস্থা বা আদালতকে যুক্তিসংগত কী তা নির্ধারণ করে দিতে হয়। তবে যদি বাড়ী ভাড়ার আদালতে বা রেন্ট কোর্টে কোন ভাড়া ধার্য হয়ে থাকে তা আইনত যুক্তিসংগত ভাড়া বলে গ্রাহ্য হবে।

তৃতীয়ত, ওই যে শতকরা দশ টাকা হিসেবে বাদ দেওয়া হবে মেরামত এবং অন্যান্য খরচের জন্য সেটা তো সর্বক্ষেত্রে প্রযোজ্য হওয়া সম্ভব নয়। হিদারাম বাড়ুজ্জে লেনের দুশ বছরের প্রায় খসে পড়া বাড়ী আর নিউ আলিপুর-যোধপুর পার্কের ঝকঝকে নতুন বাড়ীর মেরামত ও অন্যান্য খরচ তো তুলনীয় হতে পারে না। তবে এই কথা বলা যেতে পারে যে এই বিভিন্নতাকে একটি মান বা পরিমাপের ভেতরে না আনলে কোন হিসাব করাই তো সম্ভব হবে না এবং সেই জন্য ভালো হোক, খারাপ হোক, ঠিক হোক, বেঠিক হোক এই নির্দিষ্ট গণ্ডীর ভেতরে এনে আইনের দিক থেকে সম-স্থাপনা করা হলো।

যে বাড়ীতে ভাড়া আছে তার বার্ষিক ভাড়া নিরূপণ করার বিশেষ অসুবিধা নেই। কিন্তু অনেক বাড়ীই আছে কোলকাতায় যা ভাড়ায় নয় যেমন পিণ্টুদের বাড়ী, বেবীর শ্বশুরবাড়ী, শ্যামবাজার এ ভি স্কুল সুরেন্দ্রনাথ কলেজ, সাধারণ ব্রাহ্ম সমাজ বড়া শিখ সঙ্গত, জৈন মন্দির, যাদুঘর, রাইটার্স বিল্ডিংস, ম্যাকিনন ম্যাকেঞ্জীর অফিস এমনি আরও কত সব। এদের ট্যাক্স ধার্য হবে কি করে?

যদি খালি জমি হয় তাহলে তার সম্পূর্ণ বার্ষিক ভাড়া হবে জমির নিরূপিত মূল্যের শতকরা পাঁচ অংশ। সুতরাং তাই হলো বার্ষিক মূল্য এবং এরই উপর ট্যাক্স ধার্য হবে। কত হবে সে সম্বন্ধে পরে জানব।

যদি জমি বাড়ী একসংগে হয়—তাহলে কর ধার্য করার সময় জমির দাম এবং বাড়ী তৈরীর নিরূপিত মূল্য যোগ করে তার থেকে যুক্তিসঙ্গত অপচয় বা ক্ষয়-জনিত নির্ধারণকে বাদ দিলে যে মূল্য হবে তার শতকরা পাঁচ ভাগকে সম্পূর্ণ বার্ষিক ভাড়া হিসাবে গণ্য করা হবে এবং সেই বার্ষিক ভাড়া থেকে শতকরা দশ টাকা মেরামতী খরচা হিসাবে বাদ দিলে বার্ষিক মূল্য নির্ধারিত হবে।

এরপর সিনেমা, থিয়েটার, এবং এই জাতীয় সর্বসাধারণের বিশ্রাম ও চিত্ত-বিনোদনের প্রমোদগৃহগুলির জন্য একটি বিশেষ হার প্রবর্তিত আছে। এই সব ক্ষেত্রে সম্পূর্ণ বার্ষিক ভাড়া সম্পূর্ণ বার্ষিক আয়ের শতকরা সাড়ে সাত ভাগ হয়ে তার থেকে পূর্ব হিসাব মত দশ ভাগ মেরামতী এবং অন্যান্য খরচা হিসাবে বাদ দিলে বার্ষিক মূল্য হবে। এই আয় অর্থে সিনেমার টিকিট, বিজ্ঞাপন এমন কি আইসক্রীম ও পটটো চীপস বিক্রির লাভ এবং অন্যান্য সমস্ত আয়কে ধরা হবে।

বস্তী (কতগুলি কুঁড়ে ঘরের সমষ্টি), কলকাতা ইমপ্রুভমেণ্ট ট্রাস্ট, পোর্ট কমিশনার প্রভৃতির জন্য বিশেষ বিধি নির্ধারিত আছে এবং এদের হারের বৈশিষ্ট্য শুধু উপরোক্ত মৌলিক হারের ব্যতিক্রম বা বিবর্তন মাত্র।

জমি বা বাড়ীর এই বার্ষিক মূল্য নির্ধারণ করেন অ্যাসেসর বা কর-নির্ধারক এবং এর একটি নির্দিষ্ট বিধি এবং রীতি আছে। সমস্ত কলকাতাকে একশটা অঞ্চল বা ওয়ার্ডে বর্তমানে ভাগ করা আছে। প্রতি ছয় বছরে কয়েকটি ওয়ার্ডের এই মূল্য নিরূপণ ব্যবস্থা পুনঃপরীক্ষা ও সংশোধন করা হয় এবং অন্তর্বর্তীকালে নিরূপিত মূল্য স্থির থাকবে এরকম নিয়ম আছে কিন্তু তাই বলে এর মধ্যে কোন বাড়ীর যদি সংশোধন বা সংযোজন হয় কিম্বা যদি নতুন বাড়ী তৈরী হয় তার জন্য অন্তর্বর্তীকালীন নতুন মূল্য নিরূপণ বিধানসম্মত। প্রতি ছ বছরে যে অঞ্চলগুলির নিরূপিত মূল্য নির্ধারিত হবে অন্য কোন কারণে তার পরিবর্তন করা যাবে না। এই চক্রবৎ পরিবর্তন ঘুরে আসবার আগেই কিন্তু অ্যাসেসরকে অঞ্চলের প্রত্যেকটি সম্পত্তির খসড়া মূল্য নিরূপণ করতে হয় এবং ছ বছর সময়ের মেয়াদ শেষ হবার সংগে সংগেই ওই নিরূপিত মূল্যের খসড়া প্রকাশ করে দিতে হবে। প্রত্যেক সম্পত্তির মালিককে বা দখলকারীকে এই পরিবর্তন জানিয়ে দিতে হবে—অবশ্য তার ঠিকানা এবং মালিকানার অদল-বদল এসব পৌর সংস্থার কাছে তালিকাভুক্ত করানোর দায়িত্ব মালিকের এবং তা না হলে দেখ-জানা খবরের ওপরেই কর্পোরেশনকে নির্ভর করতে হবে এবং তাই আইনসম্মত বলে গ্রাহ্য হবে।

পুনঃপরীক্ষা এবং সংশোধনের ব্যাপারে একটা খুব বড় দায়িত্ব সম্পত্তির মালিকের ওপরে ন্যস্ত হয়েছে সেটি হলো এ সম্বন্ধে মালিকের অবহিত হওয়া এবং পনের দিনের ভেতর এতৎসংক্রান্ত আপত্তি পৌর প্রতিষ্ঠানকে জানানো। না জানালে পৌর সংস্থা যে নতুন মূল্য ধার্য করবে তাই পরবর্তী ছ বছরের জন্য বহাল থাকবে এবং এই গাফিলতির জন্য মালিককে—যদি বার্ষিক মূল্য বেড়ে গিয়ে, থাকে এবং সেটাই স্বাভাবিক—অকারণ অর্থদণ্ড ছ বছর ধরে গুনতে হবে। পৌরাধ্যক্ষ বা কমিশনার যদি ইচ্ছা করেন তবে পনের দিনের জায়গায় তিরিশ দিন সময় দিতে পারেন—কিন্তু তার বেশী কোনরকমেই নয়।

এই সমস্ত আপত্তিগুলো কোন সহকারী কমিশনার কিম্বা বিশেষ বিচারকের মারফতে বিচার করে যে মূল্য ধার্য হবে তাই হবে সম্পত্তির বার্ষিক মূল্য। অবশ্য এর বিপক্ষে আদালতের সাহায্য গ্রহণ যে কোন মালিকেরই সহজাত অধিকার এবং সব জিনিষটাই দেশের সাধারণ আইনে যে রকম সীমায়িত আছে তার গণ্ডীর ভেতর থাকা দরকার।

আবার বলা দরকার যে, নিজের স্বার্থেই প্রত্যেক মালিকের উচিত পৌর-সংস্থার কাছে তার ঠিকানা তালিকাভুক্ত করা আর কখন পুনঃপরীক্ষা হবে সে সম্বন্ধে সচেতন থাকা। অবশ্য পৌর আইনে ঠিকানা তালিকাভুক্ত না করা দণ্ডনীয় অপরাধ। দণ্ড অবশ্য আজ পর্যন্ত পৌর সংস্থা থেকে কাউকে দেওয়া হয়েছে বলে জানা যায়নি তবে প্রকারান্তরে দণ্ডভোগ অনেকেই করেছেন গাফিলতির জন্য।

এই হোল পৌর আইনে ট্যাক্স ধার্যের রীতি। তার পরিমাণের হিসাব এখন পর্যন্ত যে পরিমাপে গ্রহণীয় তা হলো—

১০০০ টাকা বার্ষিক মূল্য পর্যন্ত শতকরা বারো টাকা হারে, হাজারের ওপর থেকে ৩০০০ টাকা বার্ষিক মূল্য পর্যন্ত শতকরা আঠারো টাকা হারে, তিন হাজারের ওপর থেকে ১২০০০ টাকা বার্ষিক মূল্য পর্যন্ত শতকরা বাইশ টাকা হারে, বারো হাজারের ওপর থেকে ১৫০০০ টাকা বার্ষিক মূল্য পর্যন্ত শতকরা সাতাশ টাকা হারে, পনেরো হাজারের ওপর থেকে যতই হোক না কেন শতকরা তিরিশ টাকা হারে।

এই জিনিষটাকে সহজে বোঝবার জন্য একটা উদাহরণ নেয়া যাক। সুধীরবাবুকে আপনারা সবাই চেনেন। সুধীরবাবুর নীচতলায় রাস্তার ওপর তিনখানা দোকান আর পেছন দিকে থাকেন সুধীরবাবুর দূর-সম্পর্কের আত্মীয় অক্ষয় দত্ত মশাই। তিনখানা দোকানে ষাট টাকা করে ভাড়া আর অক্ষয়বাবুর ভাড়া পঁচাশি টাকা। দোতলায় ব্যাঙ্কের ম্যানেজার মিস্টার বি কে পারিজা সাহেব ভাড়া দেন তিনশো পঁচাত্তর টাকা। তিনতলায় থাকেন সুধীরবাবু, তাঁর গিন্নী, ছেলে সুবীর, বৌমা আর সুবীরবাবুর ছোট নাতি—এখনও নামকরণ হয়নি। মিস্টার পারিজা এসেছেন বছর খানিক হোল, তার আগে ওখানে ছিলেন বসন্তবাবু—তিরিশ বছরের ভাড়াটে, নিজের বাড়ী করে বুড়ো বয়সে কাশীপুরে উঠে গেছেন,— তিনি ভাড়া দিতেন দুশো। দোকানগুলোর ভাড়াও কুড়ি থেকে বেড়ে ষাটে উঠেছে। হঠাৎ একদিন নোটিশ এল সুধীরবাবুর ট্যাক্স প্রায় দ্বিগুণ হয়ে গেছে। কাগজখানা পেয়েই তো মেজাজ সপ্তমে—ঘণ্টাখানেক ধরে কর্পোরেশনের চৌদ্দপুরুষের নরকের ব্যবস্থা হলো। দেখা করতে এসেছিল বসন্তবাবুর মেজোছেলে বিকাশ—তার ছোট বোনের বিয়ের কথাবার্তা নিয়ে। বিকেলবেলার পড়ন্ত রোদ্রের মত পুরোনো স্মৃতির ম্লান মাধুর্য, বিকাশ মাসীমাকে অর্থাৎ সুধীরবাবুর গিন্নীকে বোঝাচ্ছিল তাদের সুখ-দুঃখ, সুবিধা-অসুবিধার কাহিনী। ঝড়ের মত গিয়ে পড়লেন সুধীরবাবু, 'দেখেছ বিকাশ, কর্পোরেশনের আক্কেলটা—বলা নেই কওয়া নেই একেবারে ডবলের ওপরে ট্যাক্স বাড়িয়ে দিয়েছে। আমি ঘুষ দিইনি কিনা? একটা লোক এসেছিল জিজ্ঞাসা করলে কী ভাড়া পাই। আমি প্রথমটা বলতে চাইনি—তারপর নিজেই ভড়ভড় করে বলে দিলে—আগের

থেকে জেনেটেনে নিয়েছে। আমার মুখের দিকে তাকিয়ে হেসে হেসে বললে,

'আমি শুধু আপনার কাছে যাচাই করে নিলাম। খবর আমরা আগেই নিয়েছি, নমস্কার' বলে চলে যাচ্ছিল—আমি ডেকে জিজ্ঞেস করলাম—আমার বাড়ীর তো আর কিছু বাড়েনি, দশ বছর আগে যা ছিল আজও তাই। বরঞ্চ বাড়ীটা পুরোনো হওয়ার দাম আরও কমেছে, ট্যাক্স বাড়বার তো কোন কারণ নেই।

লোকটা হেসে বললে 'বাড়ার কথা তো কিছু আমি বলিনি—বাড়ুক বা কমুক নোটিশ ত পাবেনই তখন বলবেন—তবে আমি বলে যাচ্ছি, যদি ট্যাক্স সম্বন্ধে আপনার কিছু বলবার থাকে তবে নোটিশ পাবার পনের দিনের ভেতর অবশ্য জবাব দেবেন'—কী নবাবী কথাবার্তা দেখেছ? ঘুষ খাবার মতলব থাকলে ওরকম কথা বলবেই। তারপরেই এই নোটিশ—ধুত্তোর ছাই, বাড়ী বেচে দেব।'

সুধীরবাবুর গিন্নি বিকাশের দিকে তাকিয়ে যেন সহানুভূতির আশা করছিলেন কিন্তু বিকাশের জবাব হলো—'কী আর করবেন। ভাড়া বাড়লে ট্যাক্স ত বাড়বেই। —বিকাশ অর্থনীতিতে এম-এ এবং ইনকাম ট্যাক্স আপিসে চাকরী করে, জেনে বুঝেই কথা বলে। —সুধীরবাবুর উৎসাহটা কেমন একটু আঘাত পেল।

'তা দ্যাখ বিকাশ, আমার বাড়ী ভাড়ার আয় না হয় সামান্য বেড়েছে এদিকে খরচাও তো কম বাড়েনি। সাড়ে ছ টাকা মাছ আর প'চাত্তর নয়া বেগুন এ হিসাব করেই ত ট্যাক্সর আইন।' একটা প্রকান্ড অর্থনৈতিক আবিষ্কারের গর্বে সুধীরবাবুর ঘাড়ের ওপর মাথাটা দুবার নড়ে একটু সোজা হয়ে দাঁড়াল।

এ তর্ক অনেকখানি ঝড়বে ভেবে বিকাশ রণে ভঙ্গ দিল—

'আজ চলি মাসিমা, কথাবার্তা ঠিক হলে মা এসে একদিন আপনাকে নিয়ে যাবেন। আপনি না গেলে মা কিছুতেই এগোতে সাহস পান না।'

সুধীরবাবু গিন্নিকে নিয়ে পড়লেন। 'দেখেছ ব্যাপারটা, এখন বোঝ আমি আর কদিন, তোমার ছেলে তো মাথাই দেয় না এই যে এই সব বাড়ুল। সব ঝামেলা তো এই বুড়োকে পোয়াতে হবে—যাক্ যা হয় হবে," বলতে বলতে সুধীরবাবু বেরিয়ে গেলেন।

পাঁচ বছর আগে যখন সুধীরবাবুর ট্যাক্স ধার্য হয় তখন বাড়ীতে আয়ের পরিমাণ বা ভাড়া কত ছিল?

তিনটে দোকান কুড়ি টাকা হিসাবে—ষাট টাকা
একতলার পেছনদিকে অক্ষয়বাবু—
প'চাশি টাকা
দোতলায় বসন্তবাবু— দুশো টাকা
তিনতলায় সুধীরবাবু নিজে থাকেন বসে
কর্পোরেশন দয়া করে কম করে ধরে—
একশো পঞ্চাশ টাকা

মোট ভাড়া—চারশো প'চানব্বই টাকা প্রতি মাসে।

প্রতি বছরে হলো পাঁচ হাজার ন'শ টাকা—তার থেকে বাদ দিতে হবে শতকরা দশ টাকা হিসাবে অর্থাৎ পাঁচশ চুরানব্বই টাকা,—বাকী রইল পাঁচ হাজার তিনশ ছেচল্লিশ। কিন্তু এই ভাড়া থেকে যে ট্যাক্সটা দেওয়া হবে সেটা অবশ্য বাদ যাবে, কারণ ট্যাক্স না দিয়ে ওই ভাড়া তো আর পাওয়া সম্ভব নয় সুতরাং বার্ষিক ভাড়ার সংজ্ঞা হিসাবে ওটাকে বাদ দিতে হলে সেই অংশটা এসে দাঁড়াবে প্রায় এগারো এবং এক চতুর্থ অংশ। সংখ্যায় লিখলে সমস্ত জিনিসটা দাঁড়াবে এইরকম—

মাসিক ভাড়া— ৪৯৫
এক বছরের ভাড়া— ৪৯৫×১২=৫৯৪০
মেরামত বাবদ বাদ শতকরা
দশ টাকা হিসাবে— ৫৯৪

৫৩৪৬
ট্যাক্স বাবদ বাদ শতকরা ১১¼ হিসাবে ৬০১

বিধিসম্মত বার্ষিক ভাড়া ৪৭৪৫ টাকা

তিন হাজার থেকে বারো হাজারের ভেতরে হওয়ার দরুন বার্ষিক ভাড়ার শতকরা বাইশ টাকা হারে ট্যাক্স দাঁড়াল বছরে ১০৪৩·৯০ টাকা।

নতুন ভাড়ার হিসাবে সুধীরবাবুর ট্যাক্স কত হোল?

তিনটে দোকানে ৬০, টাকা করে—১৮০ টাকা
অক্ষয়বাবুর ভাড়া— ৮৫ টাকা
দোতলায় পারিজা সাহেব— ৩৭৫ টাকা
সুধীরবাবুর তিনতলার ভাড়া পারিজা সাহেবের অনুপাতে বাড়িয়ে করা হয়েছে— ২৫০ টাকা

সবশুদ্ধ মাসিক ভাড়া— ৮৯০ টাকা

বার্ষিক ভাড়া হোল—৮৯০×১২=১০,৬৮০
মেরামত বাবদ শতকরা দশ টাকা
হিসাবে— ১০৬৮

৯৬১২
ট্যাক্স বাবদ শতকরা ১১¼ ১০৮১·৩৫

বিধিসম্মত বার্ষিক ভাড়া— ৮৫৩১ ভগ্নাংশ বাদ দিয়ে

তিন হাজার থেকে বারো হাজারের ভেতর হওয়ার দরুন বার্ষিক ভাড়ার শতকরা বাইশ টাকা হারে ট্যাক্স দাঁড়াল—
১৮৭৬·৮২ টাকা

হিসেবের দিক থেকে দেখলে আর আইনের ধারাকে মানলে এতে কারো কিছু বলবার নাই, সুধীরবাবুর তো নয়ই। কিন্তু সুধীরবাবু কি তাই শুনে বসে থাকবেন—নিশ্চয়ই নয়। এর উপর তিনচারখানা অযাচিত পোস্টকার্ড এবং দু'জন লোক বাড়ী বয়ে এসে সুধীরবাবুকে বুঝিয়ে গেল যে তাদের সব ভেতরে বন্দোবস্ত আছে—ট্যাক্স তারা কমিয়ে দেবেই। সুধীরবাবু সিধে লোক, মিথ্যে কথা বলতে বাধে এবং বললেও টি'কবে না এটা ঠিক জানেন। তাই কী করে যে কমবে তা ভাবতে পারলেন না। এদের ঠিক বিশ্বাসও করতে পারলেন না। অবশেষে পাড়ার উকীল বনবিহারীবাবুর পরামর্শে আইনের ধারা দেখে তারই মুশাবিদায় একটা আপত্তি পাঠিয়ে নিশ্চিন্ত হোলেন।

যথাসময়ে শুনানীর দিন ধার্য হোল—সুধীরবাবু এলেন কর্পোরেশনের বিশেষ বিচারকের কাছে। বিচারক ভদ্রলোক খুব সহানুভূতি দেখিয়ে বললেন,—"আপনার ভাড়া তো সবই বাঁধাধরা তবু আমি সর্বদিক বিচার করে আপনার মাসিক ভাড়া আটশো নব্বইর জায়গায় আটশো প'চিশ করে ধরলাম, আশা করি আপনার আর আপত্তির কোন কারণ নেই।" সুধীরবাবু হাজার হোক অপরিমিত বুদ্ধিসম্পন্ন নন। তাই আপত্তি করার কিছু খুঁজে পেলেন না—নিজে সব জেনে ফেলেছেন যে।

এই হলো পৌর প্রতিষ্ঠানের বাড়ীঘরের ট্যাক্স-এর কাহিনী।

* ১৯৬৭ সালে ট্যাক্সের হার পরিবর্তিত হয়েছে। পুরানো হার বদলে নিম্নলিখিত নতুন হার ধার্য হয়েছে—

১— ১০০=১৫+¼
১০০১— ৩০০০=১৮+¼
৩০০১—১২০০০=২২+¼
১২০০০—১৫০০০=২৭+¼
১৫০০০— =৩০+¼

ট্যাক্সের ওপর ¼ অংশ হাওড়া পুলের জন্য ধার্য।

আপার ইন্ডিয়া এক্সপ্রেস

ছবি বসু

আগাছা আর কাঁটা মনসার ঝোপ পেরিয়ে পথটা গুঁড়ি মেরে গড়িয়ে এসেছে রেললাইনের ধারে।

ওদের আগে সর সর করে নামল একপাল ছাগল আর ভেড়া—কুঁচলা আর অড়হরের পাতা চিবুতে চিবুতে। তাদের গলার ঘণ্টার টুংটাং আওয়াজ বিষন্ন বেলাটাকে যেন নাড়া দিয়ে গেল।

একটু আগেপিছে ওরা নামে। গড়িয়ে নামতে গিয়ে মেয়েটি বার দুই হোঁচট খায়। কাঁটাঝোপে শাড়ীর আঁচল জড়িয়ে যায়। বিব্রত মেয়েটি আড়চোখে দেখে ছেলেটি বেশ কিছুটা এগিয়ে গেছে।

—অঃ কী আপদ। অস্ফুট স্বরে বলে মেয়েটি। তারপর টেনে খুলতে গিয়ে শাড়ীটা কিছুটা ছিঁড়ে যায়। তা যাক্, ছেঁড়া সম্পর্ক ত ঐ মানুষটির সঙ্গেও। তাই বলে কি আর তাকে ছেড়ে দিয়েছে?

ছেলেটি আন্দাজে বোঝে তার সহযাত্রিনী পিছিয়ে পড়েছে। পেছন ফিরে দেখে ভুরু কোঁচকাল। বিরক্তিতে নিজের চুলের গোছা মুঠো করে টেনে ধরে।

হলদে মজা রোদ্দুর আলতোভাবে লেগে রয়েছে সাঁওতাল পরগণার কালোকুলো টিলাগুলোর পাথুরে গায়ে। দূর থেকে এই মানুষ দুটিকে মনে হয় বিন্দুর মত ভেসে বেড়াচ্ছে। বেড়াচ্ছে এইমাত্র. যেন বিপরীত দুটো আশ্রয়ের সন্ধানে দুটি ভাসমান ফুটকি এক্ষুনিই ছিটকে যেদিকে পারে বেরিয়ে যাবে।

মেয়েটি পায়ে পায়ে এসে পৌঁছে গেল। দুব পায়ের নিচে শুকনো পাতা মাড়ানর আওয়াজ ছেলেটি শুধু শোনে, চেয়ে দেখে না।

ছেঁড়া আঁচলটা আঙুলে জড়ায় মেয়েটি। কাঁটায় পায়ের খানিকটা আঁচড়ে গেছে। ভাবল বলবে সে কথা। এই নরম হলদে আলোয় একটু সহানুভূতি, মিঠে গলার স্পর্শ ভাবতেও রোমাঞ্চ হয়। কিন্তু ঐ মানুষটার অভ্যস্ত চরিত্র স্মরণ করে ওর চোয়াল শক্ত হয়ে ওঠে। আশ্চর্য, এই মানুষটার সঙ্গে বোবা হয়ে নিজেকে জড়িয়ে কেন গেঁথে রয়েছে! মরে গেলেও ওর কাছে নিজের কথা বা তার অনুভূতির প্রকাশ করতে পারবে না। অথচ এক জ্যামিতিক সূত্রে ওরা একই সঙ্গে বেড়াতে বেরিয়েছে।

ছেলেটি হঠাৎ মেয়েটির মুখোমুখি দাঁড়াল। ওর দিকে চাইল পরিপূর্ণ দৃষ্টিতে। অনেকক্ষণ ধরে কী ভেবে ভেবে বলবে বলে ঠিক করেছে। পুরুষ-পাখীর বকবকানি শোনাবে নাকি এক নীরব শ্রোতাকে?

মেয়েটি চোখ আনত করে। তার চোখে মুগ্ধ দৃষ্টি ফোটে না. শ্লেষভরা বঙ্কিম চাহনি খেলে যায়। কী বলবে বক্তা? নিজের খেয়াল খুশি পুঁথিপড়া চিন্তাভাবনার সঙ্গে সম্পর্কহীন এই জগতের হতাশা বেদনা ব্যর্থতা তারও জীবনে সংক্রামিত করার কথা।

কিন্তু ছেলেটি সে সব কিছু বলল না। সন্ধ্যার ফিকে আঁধারে মনে হয় ভ্রূ কোঁচকাল। বিষণ্ন দৃষ্টি. চিবুকে উদ্ধত বেপরোয়া ভাব। কিন্তু মুখে এখনও কৈশোরের সরসতা লেগে রয়েছে। সে বলে, আপার ইন্ডিয়া এক্সপ্রেস কটায়?

মেয়েটি বিস্মিত হয়—কেন কলকাতায় ফিরবে নাকি?

মেয়েটির গলায় উদ্বেগ। হয়ত আর পারছে না তার সঙ্গ সইতে। একসঙ্গে কাছাকাছি থাকার যন্ত্রণা হয়ত কিছুটা লাঘব হবে। কে বলেছিল এখানে আসতে? অফিসের পর দুটো টিকিট কেটে নিয়ে এখানে আসবার জন্যে কার মাথাব্যথা করেছিল?

—আঃ, কে বলেছে কলকাতায় ফেরার কথা? ছেলেটি ধমক দেয়।

—তবে?

ছেলেটি একটু ইতস্ততঃ করে—এইখান দিয়ে ট্রেনটা আর আধঘণ্টা পরে যাবে না?

মেয়েটি হেসে ফেলে। কী যে ছেলেমানুষ যেন রেলগাড়ী কখনও দেখেনি! এতক্ষণে বুঝেছে. এই ট্রেন দেখবার জন্য পাক্কা দু মাইল পথ তারা হেঁটেছে।

পাশাপাশির কুঁজওয়ালা পাহাড়টার ওপরে রঙের ছোপ লেগে রয়েছে। অন্ধকার তখনও হাল্কা সূক্ষ্ম জালের আড়ালে, চেয়ে চেয়ে মেয়েটির আশা মেটে না। বলে—এমন স্বপ্নের মত জগতটাকে যদি ধরে রাখতে পারতাম!

ছেলেটি বিরক্ত হয়—পুঁথিপড়া রোমান্টিকতা? শহুরে নেকি মেয়ে! এর চেয়ে সাঁওতাল মেয়ে অনেক সুস্থ।

মেয়েটি মুষড়ে গিয়েও রুখে বলে—কে বললে পুঁথিপড়া আমার অনুভূতি? তোমার হতাশাই ত পুঁথিপড়া!

আকাশে অনেক তারার ভিড়। মেয়েটির ক্ষণিক রাঙা আকাশ ব্যথার যন্ত্রণায় আবার কুঁকড়ে যায়।

ছেলেটির চোয়াল ছুঁচলো হয়ে ওঠে! রাত্রির অন্ধকার ওর চোখের কেমন এক ধরনের হিংস্র দৃষ্টিকে ঢেকে রাখে।

মেয়েটি একটি পাথরে বসে পড়ে।

ছেলেটি কয়েক পা এগিয়ে গিয়েছিল। আবার পিছিয়ে আসে।

—আপার ইণ্ডিয়া এক্সপ্রেসের আসবার সময় ত হয়ে এল, তাই না?

—কেন তাতে কী এসে যায়? বাড়ী ফিরবে ত চল। মাগো যা আঁধার, আজ হাত-পা কেটেকুটে কাণ্ড হবে।

—না না আর একটু বস, এখনও সময় হয়নি।

—আমাদের এখানে আর সময় অসময় কিসের? তোমার ত আপিস নেই, আমারও স্কুল, টিউশনির তাড়া নেই।

মেয়েটির গলায় একটু খুশির ঝিলিক বয়ে যায়। প্রতি মুহূর্তে তাদের সংঘাত চলেছে। যা এর ভাল লাগে, অন্যের তা কিছুতেই বরদাস্ত হয় না। জীবনের অনেক শুধু গ্লানি স্তূপীকৃত হয়ে রয়েছে। তবু অসতর্ক মুহূর্তে মানুষটা যদি একটা কথা নরম করে বলে তাই যেন তার কাছে অমূল্য হয়ে ওঠে।

নিজের এই কাঙালপনায় এক এক সময় লজ্জায় মরে যেতে ইচ্ছে হয়, তবু বেহিসাবী হয়ে ওঠে মনটা। ভাবে এইবার বুঝি ওরা স্বাভাবিকভাবে জীবন শুরু করবে। আর পাঁচটা মানুষের মত সুস্থ স্বাভাবিক জীবনযাত্রা। তাতে লড়াই করে মরেও সুখ রয়েছে।

ছেলেটি বোঝে মেয়েটির আবার রঙ ধরেছে। একটু সোহাগ কর, দেখবে ওর পায়ের তলায় কেঁচো। তখন ওর খুঁচিয়ে খুঁচিয়ে মারতে ইচ্ছে করে বেহায়া বৌটাকে। জীবনের শূন্যতা হাতড়িয়ে কি যে ওরা বাঁচার মূলধন পায় তা সে ভেবেই পায় না।

তবু আর মাথা গরম হতে দেওয়া হবে না। অনেক ভেবেচিন্তে পরিকল্পনা ঠিক করেছে। ভেবেচিন্তে স্থির মস্তিষ্কেই সে ঠিক করেছে—এ ছাড়া আর কোন পরিণতি হতেই পারে না। জীবনের এই অসংগতি ব্যর্থতা কাটিয়ে আর কোন স্বপ্ন সে ভাবতেই পারে না। তাছাড়া স্বপ্ন দেখে মূর্খেরা, রোমান্টিক মেয়েরা। এ বিলাস তার সাজে না। তাই আজ আপার ইণ্ডিয়া এক্সপ্রেসই একমাত্র সমাধান।

বলে—মহুয়া।

চমকে ওঠে মেয়েটি। এ ডাক সে কতকাল শোনেনি। কলেজে যখন ওরা দুজনে একসঙ্গে পড়ত, পরস্পর পরস্পরকে দেখবে বলে প্রতিমুহূর্তে প্রতীক্ষায় উন্মুখ হয়ে রইত। তখন এ নাম তার কাছে উচ্ছ্বসিত হয়ে উঠত।

মহুয়া ডাকে সেদিনের রঙের তুলি ধোওয়া আকাশটা যেন মুঠোর মধ্যে এসে আপনি ধরা দিল।

আকাশের সোনা এখনও ঝুর ঝুর করে এক একটা দ্বীপের মত ভেসে বেড়াচ্ছে।

ছেলেটি বলে—কী ভাবছ, সে দিনের কথা, বুঝি?

—হ্যাঁ শ্যামল সত্যি তাই। মেয়েটির গলা কান্নায় দোলে। আজ কত বছর পর—কত দীর্ঘদিনের অবহেলা আর বিরক্তির উত্তাপ পেরিয়ে রেললাইনের পাশে বুনো কুচিলার ঝোপের আড়ালে একটা ভালবাসার জগত তাকে আচ্ছন্ন করে দিচ্ছে।

ছেলেটি ভাবে আর দেরী করলে ওকে রাজী করান যাবে না। এইবারে ওষুধ ধরেছে। একটু সোহাগের মাত্রায় রঙ চড়িয়ে দিলে এইবারে পায়ের কাছে লোটিয়ে পড়বে। তারপর হয়ত নাকি কান্নায় ভেঙে পড়বে। তার চেয়ে স্পষ্ট কথা শুনিয়ে দেওয়াই ভাল।

কুচিলার ঝাড়ে জোনাকি মিটমিট করছে। মেয়েটির অধরও আঁধারে একটু সুখের দোলায় কাঁপছে।

ছেলেটি তার হাত ধরে বেশ শক্ত মুঠোয়—এস না তোমার সেদিনের স্বপ্নের আজ মৃত্যু হয়ে যাক।

—কী যা তা বলছ শ্যামল। আমার সেদিনের স্মৃতি অক্ষয় হয়ে থাক।

—মনে হলে গা রি-রি করে।

—না গো না। অমন নিষ্ঠুর হোয়ো না। আর্ত পাখীর মত মেয়েটি ছটফট করে। তারপর তার মুখটা ছেলেটির বুকে চেপে ধরে ফিসফিস করে বলে—এই ত আমি আছি, তবে ভয় কী? কই গো পারিনি ত তোমাকে ছেড়ে যেতে। কত আঘাত করেছ, বিদ্রূপ আর শ্লেষের মালা ত আমার ভালবাসার গলায় পরাতে পারনি!

—অসহ্য ন্যাকামি! ছেলেটি আর চুপ করে থাকতে পারে না।

মেয়েটি ওর উচ্ছ্বাস গিলে ফেলে। বোঝে, এভাবে নিজেকে আর মেলতে দেওয়া ঠিক নয়। তবু নিজেকে কিছুটা সংযত করেই বলে—কেন এমন হ'ল শ্যামল? বিয়ের পরও ত বেশ ছিলে! তখন কত অভাবের জ্বালা, আর আজ? আজ মোটামুটি গোছান সংসার। দুজনের রোজগার। একটা নিশ্চিন্ত ভবিষ্যৎ। তবু—।

—এক অর্থহীন মৃত ভবিষ্যৎ। তার জন্য ঘটা করে বেঁচে থাকার আর অর্থ হয় না!

ছেলেটি উত্ত্যক্ত হয়ে ওঠে। মেয়েটির হাত মুঠি করে ধরে লাইনের দিকে এগিয়ে আসে। বলে—এসনা দুজনে মিলেই সেদিনের অর্থহীন স্বপ্নের সমাধি দিই আপার ইণ্ডিয়া এক্সপ্রেসের চাকার নিচে।

—চুপ চুপ শ্যামল। আমায় বাঁচাও। সহ্য করতে না পার চলে যাও, কিন্তু এই অপমৃত্যু—!

—অসহ্য কাব্যি। ছেলেটি খেঁকিয়ে ওঠে। একটা বন্য দৃষ্টি তালে তালে চাপা আঁধারে ঘুরপাক খায়। আর দেরী নয়। এ ভাবে এ সুযোগ হয়ত দ্বিতীয়বার আর আসবে না। শ্যামল বলে ওঠে—বেশ ত, তবে চোখের ওপর দিয়েই দেখ, তোমার স্বপ্ন কেমন পূর্ণ হতে চলেছে। আমি একাই এ মৃত্যুকে ডেকে নিই।

—না না শ্যামল, এ পাগলামি আর কর না। তুমি বুদ্ধিমান তুমি বিজ্ঞ। এ ক্ষণিকের উন্মত্ততা তোমার শোভা পায় না। তার চেয়ে চল দিকি শহরে যাই। সেখানে কত আলো, কত কোলাহল, মাগো এ আঁধার যেন গিলে খাচ্ছে।

ছেলেটি ক্ষিপ্ত হয়ে মেয়েটির হাত ছাড়িয়ে নেয়, —এটা অভিনয়ের মঞ্চ নয়। কলেজে এককালে অভিনয় করতে জানি, কিন্তু সেই মুগ্ধ দর্শকদের ভিড়ে আমার জায়গা নেই।

মেয়েটি ভয় পেয়ে হঠাৎ দিক ভুলে যায়। মরীয়া হয়ে সে বুঝি লাইনের দিকেই ছুটতে থাকে। না সে কিছুতেই পাগলের মত এ অপমৃত্যু মেনে নেবে না। সে স্কুল করবে, ঘর করবে, হত দায় পরাজয়ের সঙ্গে পণ করে লড়বে।

লাইনের ওদিকে গম গম আওয়াজ উঠেছে। অন্ধকারে মাখামাখি হয়ে গেছে সারা প্রান্তর। এক ঝাঁক হাঁস উড়ে গেল অন্ধকারের বুক চিরে। কোথায় আশ্রয়ের সন্ধান? মেয়েটি ছোটে। নিরাপদ আশ্রয় তার চাই। কিন্তু শ্যামলকে সে এভাবে মরতে দিতে পারবে না। প্রাণপণে চেঁচাবে। হয়ত বা ইস্পাতের ঐ দৈত্যকে থামিয়েও দিতে পারবে।

পায়ের চটিটা তার ছিঁড়ে কখন গলিয়ে পড়ে গেছে। কাঁটায় পা ক্ষতবিক্ষত, কিন্তু কেমন যন্ত্রণাই তার কাছে তীব্র নয়। শ্যামল চলে যাক তার জীবন থেকে। এ অর্থহীন আশ্রয়ের কীই বা প্রয়োজন? পৃথিবীর যে কোন দিগন্তে সে তার অশান্ত আত্মসর্বস্ব চরিত্রের আয়নায় নিজের মুখটিই দেখুক। কিন্তু এই নির্জন কালরাত্রির আড়ালে ওর চোখের সামনে—!

না না, সে তা কখনোই সইবে না।

ট্রেনটা এসে গেছে। ওদের স্টেশনে কোন স্টপ নেই। উন্মুক্ত বাধাহীন পথে এগিয়ে আসছে অপ্রতিহত গতিতে। আর্তনাদ করে মেয়েটি এগিয়ে গেল লাইনের মধ্যে।

—শ্যামল কথা শোন। এ ভাবে মৃত্যু নয়।

কিন্তু শ্যামল তো তার কথা শোনে না। অন্ধকারে লাইনের মধ্যে স্থাবির হয়ে সে দাঁড়িয়ে রয়েছে। একহাত চুলের মধ্যে মুঠো ভর, আর চোখে নিশ্চয়ই সেই আদিম বন্য দৃষ্টি যা মহুয়ার চোখে এখন কিছুতেই পড়ছে না। প্রাণপণে সে টানাটানি করে তাকে। তারপর দুজনের ধস্তাধস্তির মাঝে নেমে এল আপার ইণ্ডিয়া এক্সপ্রেসের সেই কঠিন নির্মম চাকা।

সার্চ লাইটের আলোয় ড্রাইভারের চোখে হয়ত পড়েছিল, কিন্তু তখন তার করার কিছু ছিল না। দুটো ফুটকির একটা লাইনের পাশে কুঁচলার ঝোপে ছিটকে পড়েছিল।

শেষ পর্যন্ত মরতে পারেনি শ্যামল। অন্ধকারে হাতড়ে হাতড়ে মহুয়ার মৃত শরীরটা স্পর্শ করল। ছিন্নভিন্ন তালগোল পাকান মাংসপিণ্ড লাইনে মেশামেশি হয়ে গেছে।

না, না এ মৃত্যু ও সইবে না শ্যামলের। কেমন ন্যাকামির গন্ধভরা মেয়েলি রোম্যান্টিকতা।

তার চেয়ে?—হাতের মুঠোয় মহুয়ার রক্ত, সরীসৃপের মত অন্ধকার পথ হাতড়ে সেই মানুষটা এক পা দু পা করে কুঁচিলার ঝোপের আড়ালে মিশে যায়।

ঝড়ের সহর কলকাতা

বৈদ্যনাথ মুখোপাধ্যায়

সে রাতের মত ওরকম ভয়ংকর দৃশ্য কখনো দেখিনি। শুনিনিও কখনো। বাতাসের সে কি বেগ! ঘন ঘন বজ্রপাত আর বৃষ্টির ঝাপটায় প্রতি মুহূর্তে মনে হচ্ছিল আমি যে বাড়িটায় বাস করি, যদিও তা সহরের ভেতর সবথেকে মজবুত মজবুত বাড়ি, তবু তা মাথার ওপর ভেঙে পড়বে। শব্দ এত ভয়ঙ্কর হয়ে উঠল যে সে রাতে ওপরের ঘরে থাকা সম্ভব হল না। সপরিবারে নীচে নেমে আসতে বাধ্য হলাম। যতক্ষণ না সকাল হল নীচেই কাটালাম।

এ কথাগুলি যিনি লিখেছিলেন, তিনি হলেন স্যর ফ্রান্সিস্‌ রাসেল। সেকালের কলকাতার একজন নামজাদা লোক। ক্যালকাটা কাউন্সিলের বিশিষ্ট সদস্য। সতেরোশ সাঁইত্রিশের ঝড় তিনি চোখের ওপর দেখেছিলেন। চিঠিটি লিখেছিলেন ক' মাস পরে। তবু তাঁর হাত তখনো হয়ত কাঁপছিল। উত্তেজনায় অভিভূত হচ্ছিলেন বারবার। ঝড়ের স্মৃতি হুবহু মনে পড়ে যাচ্ছিল।

সতেরোশ সাঁইত্রিশের কলকাতা? নাঃ তখনো সে কলকাতাই হয়নি। খালেবিলে ভরা কয়েকটি গ্রাম। ঝোপজঙ্গল চারদিকে। সহরের বুকের ওপরই শোনা যায় বাঘের ডাক। খোঁজ করলে দু'একটি রাইনোও দুর্লভ নয়।

সেদিন শরৎকালের মেঘমুক্ত আকাশে যখন সোনার আলো ঝলমল করছিল, আপনার আমার মত কোনো পথিক যদি চিৎপুর থেকে কালীঘাটের দিকে এগিয়ে আসত, তবে তার চোখে যেসব দৃশ্য দেখা দিত, আজকের সঙ্গে তার অনেক তফাৎ। বাঁশবাগান আর গোলপাতার জঙ্গলের ভেতর দিয়ে একটি মন্দিরের চূড়ো নিশ্চয়ই আপনার নজরে পড়ত। সেকালের ব্ল্যাক জমিদার গোবিন্দ মিত্তির বানিয়েছিলেন ঐ মন্দিরটি। অক্টরলোনী মনুমেন্ট সেদিন ছিল না। থাকলে দেখা যেত মনুমেন্টের চেয়েও উঁচু ছিল মন্দিরটি।

চিৎপুর আর তার উত্তরদিকে নেটিভদের বাস। চিৎপুর পেরোলেই সাহেবদের আস্তানা। সাহেবদের জায়গা মানেই পরিচ্ছন্ন। সাপকুমিরের ভয়ও কম। রাস্তাঘাট নিরাপদ। পথের দুপাশে সারি দেওয়া গাছ।

এদিকে গঙ্গার ধারে অজস্র নৌকো। ছোটবড়ো সবরকম ধরলে বিশ পঁচিশ হাজার বটেই। কুলীন জাহাজের ভেতর ছিল— 'ডেকার', 'ডেভনশায়ার', 'নিউক্যাসল', 'পেনহাম'।—ব্রিটিশ জাহাজ। এছাড়া অনেক ফরাসী, পর্তুগীজ ও দিনেমারদের বাণিজ্যতরীও ছিল বইকি!

সেপ্টেম্বরের একবারে শেষ। একটু একটু করে মেঘ জমছিল আকাশে। শোনা গেল, বঙ্গোপসাগরে নাকি বাতাসের চাপ সৃষ্টি হয়েছে। দেখতে দেখতে আকাশ উঠল থমথমিয়ে। মেয়রস্‌ কোর্টে সেদিন তেমন লোক এল না। পথঘাট নির্জন। সতেরোশ চল্লিশের বজ্রাঘাতে ইংলিশ চার্চের চূড়াটি রীতিমত জখম হয়েছিল; সেই আহত নিঃসঙ্গ গির্জাটি মেঘের দিকে মাথা উঁচু করে দাঁড়িয়ে রইল। সেদিনও নবরত্নের মন্দিরে মন্দিরে ঘন্টা বাজল, চার্চে প্রার্থনা হল। কিন্তু কেউ কি জানত, ওটা শেষ প্রার্থনা এবং শেষ আরতি?

রাসেল সাহেব লিখেছিলেন—'দি ড্রেডফুল হারিকেন উই হ্যাভ হিয়ার দি থার্টিয়েথ সেপ্টেম্বর অ্যাট নাইট।' হ্যাঁ তিরিশে সেপ্টেম্বরের রাত্তির বেলাতেই সেই প্রলয় ঝঞ্ঝা এল। প্রচন্ড বর্ষণও। পাঁচ ঘন্টার ভেতর পনেরো ইঞ্চি জল বেড়ে গেল। জোয়ার এল। নদীখাত ধরে এ প্রবাহ একশ আশি মাইলেরও ওপরে উঠে গেল।

আর কলকাতার বুকের ওপর যে অঘটন ঘটল, তা অবর্ণনীয়। 'দি ওয়াটার রোজ ইন অল ফরটি ফীট হায়ার দ্যান ইউজুয়াল।' অর্থাৎ চারতলা সমান জলের প্রাচীর এসে লোকালয়ের ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ল। তারপর? তারপর যা ঘটল না-বলাই ভালো।

অন্ধকার রাত। ভয়ার্ত মানুষ যে যেদিকে পারছে দৌড়ুচ্ছে। দৌড়ুচ্ছে বন্য জন্তুরাও। পিছনে তাড়া করেছে জলের প্রাচীর। মাটির ঘরের চার দেয়ালের তলায় কেউ ভরসা পেল না। কেননা, চাল উড়ছে হাওয়ায়, প্রাচীর ভাঙছে জলোচ্ছ্বাসে। তাই দরকার পাকা বাড়ির। সেই পাকা বাড়ির উদ্দেশ্যেই লোক দৌড়ুচ্ছে। সেই গভীর অন্ধকারে সেই ঘন দুর্যোগে তারা শুনতে পেল নবরত্নের মন্দির ভেঙে পড়ছে। সাহেবপাড়ার লোকেরা অনুরূপভাবে শুনল ভেঙে পড়ছে চার্চ। —তবে কি ঈশ্বর বিরূপ? মহাপ্রলয় কি আসন্ন?

পাকা মজবুত বাড়িতে থেকেও ফ্রান্সিস্‌ রাসেল যে ওপরে থাকতে পারেন নি, সেকথা আগেই বলেছি। নেমে এলেন নীচে। নীচে এসে শুনলেন রমণীকন্ঠের করুণ আর্তনাদ। খুললেন দরজা। এক ঝাপটে ঝড়ের সঙ্গে পুত্রকন্যাসহ এক মেমসাহেব ঘরের ভেতর হুমড়ি খেয়ে পড়ল। মুহূর্তের মধ্যে ঘরের আলো নিভে গেল। দরজা বন্ধ করে আলো জ্বালালেন সাহেব।

আলোয় মেমসাহেবকে চিনতে পারলেন তিনি। প্রতিবেশী ওয়াসটেল সাহেবের স্ত্রী। সাহেব সেদিন বোধহয় সহরে ছিলেন না। নাবালক কয়েকটি শিশুপুত্র নিয়ে দুর্ভাবনায় ছিলেন মিসেস ওয়াসটেল। ঝড় আসা পর দরজা বন্ধ করে দিয়ে ছেলেপুলেকে কোলের কাছে টেনে নিয়ে ঠকঠক করে কাঁপছিলেন। শার্শি খড়খড়িতে বাজছিল প্রলয় ডমরু। ঝড়ের বেগে হঠাৎ একটি জানালা দেয়াল থেকে খসে এসে পড়ল মেঝেয়। সঙ্গে সঙ্গে জলোচ্ছ্বাসে ভরে গেল ঘর। আলোও নিভে গেল।

তারপর তারপরের ইতিহাস সংক্ষিপ্ত। ঝড়ের সঙ্গে পাল্লা দিয়ে দৌড়ে এসেছেন রাসেলের বাড়ির দিকে। পথে অনেক আর্তনাদ শুনেছেন। শুনেছেন 'ক্রাইস্টের' নাম। আর বাড়ি পড়ার শব্দ?—হ্যাঁ, তাও শুনেছেন।

আজ যেখানে টেরিটি বাজার, তার উল্টোদিকে মিঃ ওয়েসটন বলে একজন সাহেব থাকতেন। তিনি ছিলেন মেয়রস্‌ কোর্টের রেকর্ডার। ছ বছরের সন্তান চার্লসকে নিয়ে তিনি নিরাপদ আশ্রয়ের জন্য ঐরকমভাবে বেরিয়ে পড়েছিলেন। ছোট্ট চার্লস বড়ো হয়েও সে ভয়ংকর রাতের স্মৃতি ভুলতে পারে নি। ঐ দুর্যোগের রাত্রিটি চিরকাল তার মনে গাঁথা হয়েছিল।

দুঃখের রাত ভোর হল। পরের দিন দিন সকালবেলা সহরের দিকে যেন তাকানো যায় না। একজন প্রত্যক্ষদর্শীর ভাষায়— শত্রুর গোলায় বিধ্বস্ত একটি সহরের যে অবস্থা হয়, কলকাতারও সেই অবস্থা। চারদিকে কেবল ধ্বংসস্তূপ। বড়ো বড়ো গাছগুলি সব উল্টে পড়ে আছে। মরে গেছে অসংখ্য পাখি। গোরুবাছুর ছাগল-ভেড়া আর কুকুর-বেড়ালের মৃতদেহ চারিদিক সমাকীর্ণ। এমনকি দু-একটি মরা বাঘ ও রাইনোও পাওয়া গেল।

নদীতীরের দৃশ্য আরো ভয়াবহ। পাঁচশ টনের দুটি ব্রিটিশ জাহাজকে পাওয়া গেল দুশ ফ্যাদাম দূরের একটি গ্রামে। চূর্ণবিচূর্ণ অবস্থায়। জাহাজের লোক-লস্কর? হ্যাঁ, তাদেরও পাওয়া গেল। তবে মৃত অবস্থায়। সাহেবের শব পাওয়া গেল জন্তু-জানোয়ার আর নেটিভদের মৃতদেহের সঙ্গে। ষাট টনের একটি বার্ককে দেখা গেল ছ' মাইল দূরের একটি গাছের আগায়। 'ডেকার', 'ডেভনশায়ার' ও 'নিউক্যাসেল'কে চূর্ণবিচূর্ণ অবস্থায় পাওয়া গিয়েছিল। 'পেনহামকে' ত পাওয়াই যায়নি। ওরই ভেতর 'ডিউক অব ডরসেটে'র অবস্থা ছিল একটু ভালো।

কোনো কোনো জায়গায় এই ভালো থাকাটাও আবার মন্দ হয়ে দেখা দিল। দেখা গেল, তারা মৃত্যুর ফাঁদ পেতে বসে আছে।

একটি ফরাসী জাহাজ নদী থেকে একটু দূরে ছিটকে পড়ে গিয়েছিল। তলাটা ফেটে মালগুদামের ভেতর গিয়েছিল জল ঢুকে। রাতের অন্ধকারে তার ভেতর কি অঘটন ঘটেছিল কে জানে? সকালবেলা যখন বাতাসের জোর আর জলের বেগ কমে এল, তখন কয়েকজন সাহেব খালাসীদের নিয়ে মাল খালাস করতে গেলেন। অনেক দামী দামী পণ্যের গাঁট ছিল জাহাজের খোলে। একজন খালাসী ভেতর থেকে তুলে দিচ্ছিল মাল, আর ওপর থেকে অন্য খালাসীরা ধরে নিচ্ছিল। এইভাবে কাজটি বেশ এগোচ্ছিল। হঠাৎ ভেতরের লোকটি নীরব হয়ে গেল। ব্যাপার কি? রহস্য সন্ধানের জন্য একজনকে ভেতরে নামিয়ে দেওয়া হল। কিন্তু কি আশ্চর্য, দ্বিতীয় ব্যক্তিরও কোনো সাড়াশব্দ পাওয়া গেল না। তবে কি জাহাজের খোলে ভূত-প্রেত বা কোনো দৈত্যদানো ঢুকল নাকি? মুহূর্তের ভেতর ছিন্ন হয়ে গেল সকলের পা। ভেবেচিন্তে খালাসীদের ভেতর যে সব থেকে সাহসী ও স্বাস্থ্যবান ছিল, নামানো হল তাকে। না, তারো টিকি দেখা গেল না।

সকলের মুখে চোখে তখন দারুণ আতঙ্ক। তাহলে? এতগুলি লোক কোথায়

গেল? ওপর থেকে মশাল জ্বালিয়ে খোলের ভেতর কে আছে, দেখবার চেষ্টা চলল। আর রহস্য উন্মোচিত হতে দেরী হল না। কিন্তু মশালের আলোয় যা দেখা গেল, তা বড়োই ভয়ংকর। কোন্ ফাঁকে একটি নরখাদক অ্যালিগেটর তার ভেতর ঢুকেছে কে জানে? সবকটি মানুষকে পেটে পুরে তারো শিকারের আশায় সে হাঁ করে তাকিয়ে আছে ওপরের দিকে। মশালের আলোয় তার ক্ষুধার্ত দৃষ্টি চকচক করছে।

এহেন গল্প একটি নয়, অনেক। সেদিন ঝড়ের হাত থেকে বাঁচলেও, হিংস্রপ্রাণীদের হাত থেকে অনেকে রেহাই পায় নি। জলে কুমীর, ডাঙগায় বাঘ। আর সাপ ত ছিলই। এদের কবলে অনেকের ভবলীলা সাঙ্গ হল। শোনা যায়, এদের সঙ্গে ভূমিকম্পও নাকি যোগ দিয়েছিল। ফলে, ক্ষতির পরিমাণ আরো ব্যাপক হল।

যাই হোক, সেদিন কলকাতার যা ক্ষতি হল তা অপরিমেয়। ঘরবাড়ি, ধনসম্পত্তি বা জাহাজ প্রভৃতির যে ধ্বংসসাধন ঘটেছিল, তার হিসাব না হয় বাদ দেওয়া গেল, কিন্তু কত মানুষ যে মারা গিয়েছিল তার হিসাব কি আমরা নিয়েছি? শোনা যায়, তিনলক্ষ নেটিভই নাকি মারা গিয়েছিল, সাহেব-সুবোরা বাদ। আর কলকাতার বাইরে যা ঘটেছিল, তাও এ হিসাবের ভেতরে ধরা হয়নি। পৃথিবীর ইতিহাসে এ হেন দুর্যোগ কবার এসেছে কে জানে?

তবে এহেন দুঃখের গল্পেও সামান্য একটু হাসির খোরাক আছে। যে ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানী সেদিন কলকাতার মালিক, তারা কিন্তু এ ঝড়ের বিবরণ একটুও ধরে রাখেনি। যা রেখেছে, তার চেয়ে না রাখলেই ছিল ভালো। এত মৃত্যু এত অপচয়ের বদলে ফোর্ট উইলিয়াম কাউন্সিলের কনসালটেসনসে কেবল দুটি লাইন লেখা ছিল। তার মর্মার্থ—'গত তিরিশে সেপ্টেম্বর একটি বিরাট ঝড় হয়ে গেছে। তার ফলে অনেক জাহাজ তীরে উঠে পড়েছে। আর বালাসরের মোহানা ফ্ল্যাগ-স্টাফটি উড়ে গেছে।'—ব্যস আর কিচ্ছু না।

মানুষের মনের ভেতরেও হয়ত এমনি একটি 'কিচ্ছু না' লুকিয়ে থাকে। ফোর্ট উইলিয়াম কাউন্সিলের থেকেও বোধহয় সে নিষ্ঠুর। দুঃখের কথা বেমালুম সে ভুলে যায়। ধ্বংসস্তূপে সরিয়ে নতুন উদ্যমে সে নতুন বাড়ির ভিত ফেলে। কলকাতারও তাই হল। সব খুইয়ে সে যে একদিন নিঃস্ব হয়েছিল, একথা সে ভুলেই গেল। দেখতে দেখতে সে আরো শ্রীমন্ডিত হল। এমন কি সে ভারতের রাজধানীতে পরিণত হয়ে গেল। তখন তার নাগাল পায় কে?

ভুলে গিয়েছিল। হ্যাঁ, সকলে ভুলে গিয়েছিল সে পুরনো দিনের কথা। কিন্তু একজন ভোলে নি, সে হল প্রকৃতি। সতেরোশ সাইত্রিশের শতবার্ষিকী পালন করতে এল সে। তবে কাঁটায় কাঁটায় একশ বছরের ব্যবধানে নয়। পাঁচ বছরের এধার ওধার। জ্যৈষ্ঠ মাসেও আমরা যেমন রবীন্দ্রজয়ন্তী পালন করি, সেরকম আর কি!

আঠারোশ বিয়াল্লিশের মে মাসে তার চরণধ্বনি প্রথম শোনা গেল। সেদিন বাইশে মে। প্রচন্ড ঝড় আর প্রবল বর্ষণে কলকাতার আকাশ ভেঙ্গে পড়ল। মুন্সীবাড়ির ছেলে মধুসূদন তখন হিন্দু কলেজের ছাত্র। কবিতা লেখে ইংরেজিতে। খিদিরপুরের বাড়িতে বারান্দায় পায়চারি করতে করতে লিখল :

The sable clouds now gathering fast,
The fiercely howling blast,
Proclaim, the Storm is nigh:
And, hark! the roar,
of ordance loud
Sharp peals that
rend each gloomy cloud,
Hails his dread majesty!

কালো মেঘ জমছে দ্রুত। ভয়ংকর গর্জন। ঘোষণা করছে, ঝড় এসে গেল। গোমড়া মেঘ দীর্ণ-বিদীর্ণ করে কামানের তোপের মত শোনা যাচ্ছে গর্জন। সেই ভয়ংকর মহানকে জানাচ্ছে স্বাগত।

সেই ভয়ংকর মহান এলেন। তবে কয়েকদিন পরে। প্রথমে এল দূত। থাকল সামান্য ক্ষণের জন্য। 'অল দো বাট্ ব্রিফ ইন ইট্স্ ডিউরেশন, ওয়াজ প্রোডাকটিভ অব কন্সিডারেবল্ ড্যামেজ।'

দোসরা জুন। সওদাগরি আর সরকারী আপিসের কর্মচারীরা সেদিন যখন আপিস আসছিলেন, তখন আকাশটি ছিল থমথমে। আপিসে এসে অনেকেই ঘামছিলেন। হাতপাখা ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে হাওয়া খেতে খেতে বারবার আকাশের দিকে তাকিয়ে দেখছিলেন। মাঝে মাঝে দমকা বাতাস আর টিপিটিপি বৃষ্টিও পড়ছিল। কোরট-কাছারীর লোকেরা বটতলা ছেড়ে বারান্দায় গিয়ে বসেছিল। কলেজের ছাত্ররাও দৌড়াদৌড়ি করছিল। আকাশের মতই কালো ছিল তাদের মুখ। ফিস্‌ফিস্ করে তারা ডেভিড হেয়ারের নাম করছিল, আর বোঝা যাচ্ছিল তাদের চোখের কোণে জল টলটল করছে। ডেভিড হেয়ার নাকি কলেরায় আক্রান্ত। অজ্ঞান হয়ে পড়ে আছেন বাঁচেন কি না বাঁচেন।

রাত্তির এগারটা পঁচিশ মিনিটে সেই মহান ভয়ংকর এলেন। সারা আকাশ ভেঙ্গে পড়ল। যেমন বৃষ্টি, তেমনি ঝড়! উত্তর-পশ্চিম মৌসুমীর তান্ডবে ভেসে গেল কলকাতা। সতেরোশ সাঁইত্রিশের মতই বিপর্যয় ঘটল নদীপথে। হাজার হাজার নৌকা চূর্ণবিচূর্ণ হয়ে গেল। কত জাহাজ হল নিখোঁজ।

আজ যার নাম ডালহৌসি স্কোয়ার, সেদিন তার নাম ছিল ট্যাঙ্ক স্কোয়ার। লালদীঘির ধারে সেদিন সুন্দর সুন্দর গাছ ছিল, সারি দিয়ে লাগানো। পরের দিন সকালে দেখা গেল তারা মাটিতে লুটিয়ে পড়ে আছে।

কোথাও ভেঙ্গেছে দেয়াল, কোথাও ল্যাম্প পোস্ট— আবার কোথাও বা ঘরবাড়ি। মাটির ঘর যা ভেঙ্গেছিল, তা অসংখ্য। আর জীবনহানি?—না, সেকথা আর না তোলাই ভালো।

চৌরঙ্গী থেকে গার্ডেনরিচ যেদিকেই আপনি যান না কেন, সর্বত্রই দেখবেন ঐ হিংস্র স্বাক্ষর। ক্ষতচিহ্ন। এসপ্লানেডের একবারে দক্ষিণদিকে সেই যে বিরাট পিপুল গাছটি ছিল, সেকালে আপনি বর্তমান থাকলে নিশ্চয় তার তলায় একদিন না একদিন বসেছিলেন। ঝড়ের সঙ্গে লড়াই করে সে বেচারি ভূমিশয্যা নিয়েছে। মিসেস স্টাচির বাড়ির সেই যে মনোরম বারান্দাটি। তা উড়ে গেছে। সতেরোশ সাঁইত্রিশে মিসেস ওয়াসটেলের মত ডঃ স্ট্রং-এর জানালাটিও দেয়াল থেকে খুলে বেরিয়ে গেছে। গভর্ণমেন্ট হাউসের পশ্চিম গেটের সেন্ট্রি বক্স একেবারে কাৎ, ইংলিশম্যান পত্রিকার ওপরের একটি বারান্দা হেলে গেল পশ্চিমে। হরকরা আপিসের সাতটি জানালা এবং একটি ঝুল বারান্দার অবস্থা অবর্ণনীয়। চৌরঙ্গী থিয়েটারও জখম না-হওয়া থেকে বঞ্চিত থাকল না।—দেয়ালের প্লাস্টার খুলে গেছে অথবা এক দোকানের সাইনবোর্ড অপর দোকানে আটকে গেছে এ হেন দৃশ্যত হামেশাই।

সহর কলকাতায় সেদিন যে ক্ষতি হয়েছিল, সত্যি সত্যিই তা অপরিমেয়। তবে সব দুঃখকে ছাপিয়ে গিয়েছিল ডেভিড হেয়ারের মৃত্যু। সন্ধ্যার সময় তিনি চোখ বুজলেন। তখন আকাশ ছিল থমথমে। হেয়ার সাহেবের শোকে একটু পরেই ভেঙ্গে পড়ল সে। ঝড়ের কান্নায় ভরে গেল কলকাতা। গাছপালায় লাগল কাঁপন। তারপর শোক হয়ত ক্রোধের রূপ নিল। জলস্থল অন্তরীক্ষে তখন বেজে উঠল প্রলয় ডমরু।

ঝড়ের বৃত্তান্ত এখানেই শেষ করা যেতে পারে। তবে মনে রাখা দরকার এরচেয়ে অনেক ছোটখাট ঝড় কলকাতায় দেখা দিয়েছে বহুবার। ছোট ছোট তান্ডবও বাধিয়ে গেছে। আঠারোশ চৌষট্টিতে বা আঠারোশ সাতষট্টিতে কলকাতায় যে ঝড় হয়েছিল, তার স্মৃতি পুরনো খবরের কাগজে পাতায় পাতায় আজো ধরা আছে। তবে যে দুটি ঝড়ের কথা বলা হল, তার সঙ্গে ওদের তুলনাই হয় না। এ শতকেও সে শতবার্ষিকী উৎসবে এসেছিল। বিয়াল্লিশ সালে। খবরের কাগজে নয়, অনেকের চিত্তেই আজো সে স্মৃতি জাজ্বল্যমান। সুতরাং পুনরুক্তির দরকার কি!

আবার হয়ত সে আসবে বিশ শ সাঁইত্রিশ কি বিয়াল্লিশে, কে জানে? তবে ভরসা এই, আপনার আমার মত কোনো বয়স্ক ব্যক্তিই সেদিন সে মহাভয়ংকরকে স্বাগত জানাতে উপস্থিত থাকবে না। অতঃ কিম! 'ইতিহাসে সেদিন বিলম্বিত হোক', এই প্রার্থনা করব, না 'পুনরাগমনায় চ'?—কোনটি?

অবিস্মরণীয় প্রেম

সুধাংশুমোহন বন্দ্যোপাধ্যায়

রোমাঁরোলাঁ (১৮৬৬—১৯৪৩) বিশ্ব-সংস্কৃতির ইতিহাসে একটি স্মরণীয় নাম। তাঁর "বিমুগ্ধ আত্মা" স্বাধীন চিন্তানায়কদের মধ্যে একটি প্রণামযোগ্য প্রতীক—জীবন থেকে জীবনে যে পদ্মটি ঘোমটা খুলে খুলে শতদলে বিকশিত হয়ে মানস সরোবরে ফুটে ওঠে তারই একটি অবিস্মরণীয় প্রকাশ। 'বিমুগ্ধ আত্মা'। কবির ভাষায় যে মানুষের অতিথিশালায় প্রাচীর নেই, পাহারা নেই—যারা এসেছে ইতিহাসের মহাযুগে আলো নিয়ে, অস্ত্র নিয়ে, মহাবাণী নিয়ে,—যে মানুষ বীর, যারা তপস্বী, যারা মৃত্যুঞ্জয়, তারাই তাঁর অন্তরঙ্গ, স্ববর্ণ, স্বগোত্র—মনুষ্যকে তিনি গন্ডীর মধ্যে হারাতে চাননি—শ্মশানচারী ভৈরবের পরিচয়জ্যোতি তিনি পেয়েছেন দুই বিশ্বযুদ্ধের মধ্যে, পরিত্রাণ চেয়েছেন ভেদচিহ্নের তিলকপরা সংকীর্ণতার ঔদ্ধত্য থেকে। দুনিয়ার সংস্কৃতির দরবারে এই মানুষটির নাম একালের একজন স্বাধীনচেতা চিন্তানায়কদের মধ্যেই পড়ে। ভারতবাসী আমরা আরো মুগ্ধ হই কারণ ভারতবর্ষের সাম্প্রতিক আত্মিকচেতনার প্রকাশকে জ্ঞানীর দৃষ্টি ও মরমীর অনুভব দিয়ে মূল্যায়ন করতে চেয়েছিলেন তিনি, শুধু রামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দের নয়, গান্ধী-রবীন্দ্রনাথের নয়, রামমোহন কেশব দেবেন্দ্রনাথ দয়ানন্দ শ্রীঅরবিন্দ প্রভৃতি মিলনমন্ত্রের মিতাদেরও উপযুক্ত মূল্যায়ন করেছেন তিনি। তাঁর চেতনারাজ্যে আলোড়ন এনেছিলেন শুধু এঁরা নন—তাঁর অপেক্ষাকৃত তরুণ বন্ধুরা হচ্ছেন জওহরলাল নেহরু, সুভাষচন্দ্র বসু, কালিদাস নাগ, সুনীতি চট্টোপাধ্যায়, দিলীপ রায়, ধনগোপাল মুখোপাধ্যায় এবং আরো অনেকে। তাঁর আবির্ভাব যুগে, অর্থাৎ উনিশ শতকের শেষ থেকে বিংশ শতকের দ্বিতীয় দশক—ইউরোপীয় সভ্যতার একটা স্বর্ণোজ্জ্বল যুগ—রূপরসে ঐশ্বর্যে সাম্রাজ্যে চাকচিক্যে বিজ্ঞানের অবদানে, প্রয়োগশিল্পে, তার যৌবন শতদল টলমল, ঝলমল। সত্যসন্ধানী রোলাঁ খুঁজছেন ইউরোপের সত্তাকে, শুধু তার বহিপ্রকাশ নয়, অন্তরের সাধনাতেও, সুরে গানে, খুঁজছেন তিনি বাখ্‌বীটোভেনে, টলস্টয়ে, শেক্সপিয়রে, গ্যয়টের মধ্যে। তাঁর শ্রীক্রিস্টোফার, যা অলীভিয়র এই যুগযন্ত্রণারই শিল্পময় প্রকাশ। তবু তিনি আসলে অন্তর্মুখীন, তাঁর যাত্রা মনের গভীরে, তাঁর মূলমন্ত্র—আমি থামবো না। এই অসীমের পথে জীবনযাত্রাকে এমারসন বলেছেন—একটি বিবেকের কাহিনী, শুধু ব্যক্তির নয়, সমষ্টিরও, একটা যুগের, একটা কালাতীত অনুভবের জন্ম, যে চেতনা অনন্ত মমতা ও সর্বত্র সমত্বকে সূচিত করে, [illegible]-অন্ধ রাত্রেও কর্তার ভূতের মত কাড়েও না ছাড়েও না। তাঁর জীবন তাই চলমান—"a majestic chemi qui march" যে পথের সীমানা নেই, নিশানা নেই, যে নদী শুধু মরুপথেই হারায় না, মহাসাগরে গিয়ে মেশে। শিলারের ভাষায়—I am a fellow citizen of those who come later. তাঁর চলতি পথের ইতিহাসে অনেক বন্ধুবান্ধবীর মধ্যে একটি নারী এসেছিল যাঁর প্রভাব তাঁর জীবনে অপরূপ রূপে নিয়েছে। সাধারণতঃ নারীকে আমরা তুচ্ছতার আবরণে অনুজ্জ্বল অতি সাধারণত স্ত্রীস্বরূপে, না হয় মাতার মমতাময়ী রূপে, না হয় প্রিয়ার মধুর রূপে, না হয় কন্যা ভগিনী, সখী, প্রিয়া, আত্মীয়রূপে দেখি, বড়জোর কালিদাসের ভাষায় 'গৃহিণী সচিবসখীমিথঃ প্রিয় শিষ্যা ললিতে কলাবিধৌ' রূপে। কিন্তু দেহের সীমানা পারায়ে এইখানে অসম ভালোবাসার এক অপরিসীম ধ্যানরূপ দেখতে পাচ্ছি, যা চেতনার নিভৃত গভীরে চিরবিরহের প্রদীপশিখা জ্বেলে রেখেছে। কাহিনীর রূপকার ভাষাকার রোলাঁ নিজেই লিপিবদ্ধ হয়েছে তাঁর শেষ পুস্তকে 'অন্তর যাত্রায়'। রুশো, আগস্টিন, গ্যয়টের আত্মকথার সমধর্মী এই পুস্তক। এর নামকরণই এর অন্তর্নিহিত সত্যকে, শিবকে, সুন্দরকে প্রতিভাত করে। বইটির উৎসর্গও লক্ষণীয়—তাঁর ধ্যানের স্বপ্নের মননের সহচর এক বৃদ্ধ বনস্পতিকে উৎসর্গীকৃত—মানুষকে নয়, জগৎপ্রকৃতির প্রতীককে। ভিলেনিউভের এক বৃদ্ধ 'ওয়ালনাট' বৃক্ষকে 'companion of my dreams" শ্রদ্ধা জানিয়েছেন এই কবি মনীষী।

১৮৮৯ সালের শেষ বসন্তের একটি নিদাঘছোঁয়া দিনান্ত। 'সে প্যারীর রমণীয় উপান্তে ভার্সাই-এর এক কমনীয় উদ্যান বাড়ী। দক্ষিণের এক মনোরম পরিবেশে দেখা হয়ে গেলো একজন পুরুষ আর একজন নারীর। —একজন যৌবনতপ্ত প্রমোদচঞ্চল, আর একজন ছোট্টখাট্টো শান্ত-শিষ্ট আপন মহিমায় সমুজ্জ্বল। একজন ফরাসী মধ্যবিত্ত ঘরের ছেলে, আর একজন পুরনো অভিজাত বংশের সুকন্যা ও গৃহিণী। দুজনেই গানের সমঝদার, বাচ্ বিঠোভেনের শিষ্যাশিষ্য, গ্যয়টে টলস্টয় শেকস-পীয়রের অনুরাগী-অনুরাগিণী, শিল্প-কলায় প্রবল উৎসাহ। একজনের নাম রোলাঁ, ভবিষ্যৎ দিনের নোবেল লরিয়েট, জ্যাঁক্রিস্তফের লেখক, বয়স তেইশ আর একজনের নাম ব্যারনেস্ ভন্ ম্যাটিল্ডা ম্যাজেনবার্গ। একজনের বয়স কুড়ি পেরিয়েছে, আর একজনের সত্তর—মাঝখানে অর্ধশতাব্দীর একটি দুস্তর পারাবার—তবু ভালোবাসার সবই সহজ হয়—একটি সেতু গড়ে উঠেছিল—দেহের পরিখায় নয়, স্থূলজ রূপবিলাসে নয়, মনের সহজ বন্ধনে। কবির ভাষায় এ যেন—

> তোমার খেলায় আমার খেলা
> মিলিয়ে দেব তবে
> নিশীথিনীর স্তব্ধ সভায়
> তারার মহোৎসবে
> তোমার বাঁশীর ধ্বনির সাথে
> আমার বাঁশির রবে
> পূর্ণ হবে রাতি
> তোমার আলোয় আমার আলো
> মিলিয়ে খেলা হবে
> নয় আরতির বাতি

একজন ভাবলে আমিও একদিন নবীনা ছিলাম। আর একজনের মনে হলো আমিও একদিন ঐরকম হবো। প্যারিস থেকে ফিরে এলো নারী—সাঁলোর মক্ষিরাণী। নায়কও এলো মাসখানেক পরে। প্রথম সন্ধ্যার মিলনবাসরের কথা বলছেন রোলাঁ। এক গোধূলির আলোআঁধারির বিষণ্ণ দিন। আকাশে অস্ত সূর্যের শেষ রেশ, আলোক মাতাল স্বর্গসভায় তারার দল গরহাজির। ম্যালভিডা বসে আছেন, তাঁর 'ডিভানে' পড়েছে পড়ন্ত দিনের শেষ ছায়া। সারাজীবন তিনি কাটিয়েছেন গানে বাজনায়, হাস্যোলাস্যে বুদ্ধিজীবী, সুরজীবী মসীজীবিদের সঙ্গে, শিল্পীদের সাহচর্যে রূপরসরেখারতিমন্ডলের মন্ডলেশ্বরী হয়ে। রোলাঁ লিখছেন—

> She had passed all her life in the society of heroes and intellectual greats, of their problems and their stains. They had all confided in her and nothing had dimmed the clear crystal of her thought.

সারাজীবন ধরে তিনি বোধিদীপ্ত মহানদের সাহচর্য দিয়েছেন, তাঁদের গোপন কথা শুনেছেন, তার স্মৃতি ও মনন শেষদিন পর্যন্ত অক্ষুণ্ণ ছিল, কিন্তু তাঁর নিজের মনের বেদনা, তার আশাআকাঙ্ক্ষার কথা কেউ কি বুঝলে? কেউ কি জানলে লাস্যময়ীর বুকের নিভৃত গোপন ব্যথার সুরটি? এমনি দিনে তাঁর দেখা এই তরুণ শিল্পীর সঙ্গে। এতো আগমন নয়, এ হলো তাঁর জীবনে এক অত্যাশ্চর্য আবির্ভাব।

২৮শে মে, ১৮৯০ সালের এক চিঠিতে মহিলা লিখছেন—

> "I had to fight a stiff battle in order to recover the serenity of intellectual spheres where regret and sorrow of the heart are appeased .... And, then you came".

সারাদিন ঘুরেছেন এই তরুণ লেখক ও সুরশিল্পী, রোমের রাস্তায় রাস্তায়, কলিসিয়ামের ছায়াতে, দেহ তপ্ত চঞ্চল আকুল, আর বুকে গুমরেওঠা কান্না। তারপর ম্যালভিডার সারস্বতকুঞ্জে চললেন তিনি। সন্ধ্যার অন্ধকার ঘনিয়ে এসেছে সিঁড়িতে—সেই আলো-আঁধারির অন্ধকারে রোলাঁ দেখলেন একটি শরীরিণী ছায়াকে।

সত্যিই সেদিন গানের ভিতর দিয়েই, তাদের মিলন সম্পাদিত হলো—সেই সুর হচ্ছে

'a canata of Bach or the Missa Solemnis'. একটি কথা নয় We did not exchange a word. By wabeling my profile, she followed the music dramas across the transparent screen of my expressionless face; and strictly we followed the Passion of Beethoven or his station of the Cross. The last note had died out. I got up, seated myself on a corner of the divan, and leaned by elbows on a table. She was opposite. Still we did not speak. It was impossible! Of what use would it be when all had just been said by the music....We were dreaming....

বাখ্‌বীঠোভেনের সুরসাগরে দুলতে দুলতে তাদের এই আলাপ। সুরের আগুন ছাড়িয়ে গেছে, নতুন প্রমিথুয়স জন্ম নিচ্ছেন মনে—সেখানে দেহের সীমা বয়সের বাধা সব কিছু এহ বাহ্য, তুচ্ছ। কথা নয়, শব্দ নয়, দৈহিক স্পর্শ নয়, শুধু পরিপূর্ণ স্তব্ধতার মাঝে এক স্বপনচারী আর এক স্বপনচারিণীকে পেয়ে গেলো, আত্মার অন্তরীয়তায়। তারপর স্তব্ধতার তপোভঙ্গ করি, উঠিল শিহরি. নারীর মৃদু মধু স্মৃতি—কতো পুরুষ এসেছিল তার আঙিনায়—ওয়াগনার, নীটশে, ম্যাজিনি, লিস্ট। ঐ মহিলা তাঁর জীবনকথা বললেন রোলাঁকে—লণ্ডনে ছিলেন নির্বাসিতার মত—সংশয় জেগেছে, সন্দেহ এসেছে, আত্মঘাতী হবার ইচ্ছা হয়েছে—জানো আমার সালোঁয় এসেছিল যারা তাদের মধ্যে অন্ততঃ চারজন আত্মঘাতী হয়েছিল, আমার মনেও এসেছিল অবসাদ, বৈরাগ্য, হতাশা। কিন্তু বাঁচিয়ে দিলেন শেকস্‌পীয়র ও তাঁর সৃষ্ট গুখেলো চরিত্র। রোলাঁ লিখছেন যে ম্যালভিডার চোখে আর একটি জিনিস দেখেছিলাম, সেটি হচ্ছে জার্মানীর অন্তর সত্তার বিদ্যুৎ খরদীপ্তি—জ্যাঁক্রিস্তফকে পেয়েছি সেখানে—অলিভারের প্রেমকে, মনে হয়েছে, কিসের জন্য এ বিবাদ জার্মানী ও ফ্রান্সে। নীটশের কয়েকখানি ঘনিষ্ঠ চিঠি পুড়িয়ে ফেলেছিলেন ম্যালভিডা। সারা ইউরোপের শিল্পী গুণী কৃতী সাহিত্যিকরা ভিড় জমাতেন ঐ মহিলার আমদরবারে এবং ম্যালভিডাকে বলা যেতে পারে যে তিনি ছিলেন তাঁর যুগের সারা ইউরোপের মর্মকেন্দ্রে অধ্যাসীনা। এবং রোলাঁ সেই ইউরোপকেই পেয়েছিলেন শুধু তাঁর স্মৃতিতে শ্রুতিতে। স্পর্শে স্পর্শে পরিমুক্তেন্দ্রিয় হয়ে নয়, রসস্নিগ্ধ আন্তর আবাহনে। তিনি লিখছেন—

I saw them in her — all the race of celebrated shades more alive than the living. She was the last. She bore the message. And I know that she transmitted it to me. I pass it along to you in my turn. Young brothers guard the flame.

এক বিদ্যুৎচঞ্চলা মহানায়িকার মধ্য দিয়েই ইউরোপাকে পেয়ে গেলেন রোলাঁ, তাঁর মানসীকে, মর্মবাণীকে, প্রিয়াকে, সাধ ও সাধ্যাকে, শক্তিকে ভক্তিকে—আহিতাগ্নির মতো—সেই হোমাগ্নিশিখরে জ্বলদর্চিরেখাকে জ্বালিয়ে রাখো এই হলো তার কাতর প্রার্থনা আরো নবীনদের কাছে—অগ্নিমীলে—হে নবীন সৌম্য মানবকরা অগ্নিস্থাপন করো, উজ্জীবিত হোক সেই গ্রীকো রোমান লাতিন প্যাগান জুডাইক সভ্যতার লেলিহান শিখা। তাঁকে বাঁচিয়ে রাখতেই পান করতে হয় হেমলক—সক্রেটিসের মত। নীলকণ্ঠ ত এ'রাই। ম্যালভিডাই তার নাটক 'অর্সিনো'র পাণ্ডুলিপি প্যারিসে পাঠিয়ে দেন, অধ্যাপক মনোড্‌কে অনুরোধ করেন যে রোলাঁ যেন জীবিকা হিসাবে অধ্যাপনার বৃত্তি না নেন, তাঁর লেখক হওয়া উচিত। তারই সন্ধানে মাতার মত মমতাময়ী মানসীকে ছেড়ে রোলাঁর প্যারিসে পুনরাগমন। শেষ হলো সেই দরদভরা আকুতিপূর্ণ সাহচর্যের দিনগুলি। আরম্ভ হলো আর এক ধরনের সামীপ্যসাযুজ্যনৈকট্য। পত্রদূত ভরিয়ে তুললো দুজনের নিভৃতির অবসরগুলি। নতুন ধরনের এই লিপি অভিসারে প্রথম প্রণয় পরশমুগ্ধতার আবেগক্লিন্ন আবিলতা নেই, দেওয়া-নেওয়া চাওয়া-পাওয়ার হিসাবনিকাশ নেই, দেহাতীত প্রেমজ বিলাসের সূক্ষ্ম দেনাপাওনা নেই—স্বচ্ছ সহজ প্রাণলীলার মনোজ্ঞ শিল্পীসুলভ অভিজ্ঞতার শুধু একটু প্রকাশ। ৩১ জানুয়ারী ১৮৯৭ থেকে ফেব্রুয়ারী সাতাশ ১৯০৩ পর্যন্ত প্রতি সপ্তাহে চললো এই চিঠি লেখালেখি, এক বৃদ্ধার সঙ্গে এক যুবকের। প্রায় ছশো চিঠি দুপক্ষে লেখা হয়েছিল। চিঠিগুলি প্রকাশিত হয়েছে প্যারিসে ও নিউইয়র্কে'।

তাঁর মানসীর একটি চিঠি উদ্ধৃত করে দিচ্ছি। অভিসারের, বয়স তখন আশী পেরিয়েছে—রোলাঁর বয়স ত্রিশ। ম্যালভিডা লিখছেন, রোগশয্যায় শুয়ে—

তুমি কি কখনো আমার শক্তি সম্বন্ধে সন্দেহ করেছিলে? না না, আমি সারাজীবনই শক্তসামর্থ থেকেছি, আশা করি শেষ পর্যন্ত থাকতে পারবো। রাত্রির গভীরে যখন চোখে ঘুম আসে না, অতন্দ্র ক্ষণগুলি স্মৃতিতে ভরে ওঠে—আর বুঝতে পারি যে সেই অবশ্যম্ভাবী মুহূর্তটি দ্রুত এগিয়ে আসছে, আমি তো ধর্মবিশ্বাসী নই যে শরণ নেবো সেই পরম কারুণিকের, সেই স্বর্গের, শুধু বলবো যীশুর মত—যাক্, সমাপ্তি হোক্ শান্তি, শান্তি, শেষ হোক অশেষ। আমি জানি আমার বুক ভরে আছে সুখে দুঃখে, আনন্দে বেদনায়, ভুলে ভ্রান্তিতে আবার ঊর্ধ্বতন আস্পৃহাতেও মনে হয় কতো ভালোবেসেছিলাম আমি—এই আকাশ আলোভরা পৃথিবী, এই সূর্য, এই ফুল, এই গান, এই সুর, কতো বড় বড় চিন্তাশীলরা আমার জীবনের অন্ধকার গলিকে আলোকিত করেছেন, আর আমার বন্ধুরা যারা আমায় ভালোবেসেছিল। যদি আমি হই অমর তবে আমি জানি যে আমি ঊর্ধ্বতরলোকে যাবো। আর তা যদি না থাকে, তবে আমার চিরবিশ্রাম হবে শান্তিময়—

বিদায় বন্ধু বিদায়—এই কটা লাইনই লিখলাম যাতে আমাদের রবিবাসরীয় পত্রালাপের ধারাবাহিকতা ক্ষুণ্ণ না হয়।

তাঁর মহাপ্রয়াণের আগের দিনও (বয়স তখন প্রায় উননব্বই) চিঠি লিখছেন—

বন্ধু—তুমি উল্লসিত হও—আমার জীবনদীক্ষা সম্পূর্ণ, বন্দরের কাল শেষ, এখন আমি যেতে পারি। আজই বিকালে হয়তো স্বর্গের দুয়ার খুলে যাবে আমার জন্য। তার বাইরের সীমানা পর্যন্ত তুমি চলবে আমার সঙ্গে সঙ্গে, কিন্তু তারপর তুমি ফিরে যাবে পৃথিবীতে, এখনও অনেক যুদ্ধ তোমায় করতে হবে। সংঘাত ছাড়া বাঁচা যায় না—সংঘাত আর প্রেম, তারপর তুমি আসবে তোমার সময় হলে।

এই প্রসঙ্গে মনে পড়ছে মহাভারতের একটি স্বল্পপরিচিত উপাখ্যান। যেন পরস্পরের পরিপূরক গল্প। শুভ্রা ছিলেন ঋষির মানসকন্যা। যৌবন সে পার করেছিল কঠোর তপস্যায়। তারপর যেদিন সে সশরীরে স্বর্গে যাবার শক্তি আহরণ করলে, সেদিন দেবতারা বললেন—তুমি নারী তপস্বিনী ব্রহ্মচারিণী কিন্তু নারীত্বের মধ্য দিয়ে তুমি প্রেম আস্বাদন করোনি—তোমার প্রিয় নেই পরিজন নেই, স্বর্গের দুয়ার তোমার জন্য বন্ধ। তুমি জীবনের মধ্য দিয়ে জীবনেশ্বরকে খোঁজো তবেই স্বর্গের দ্বার হবে খোলা। নারী গেলো ফিরে, যৌবনহীনা বৃদ্ধা দ্বারে

দ্বারে প্রেমভিক্ষা করে বেড়ালো। হাসলো কেউ, তাড়িয়ে দিলো অনেকে, ভর্ৎসনা করলো— লজ্জাবিহীনা এই কামাতুরা রমণীকে দিলো তাড়িয়ে। শেষকালে এক তরুণ তাপস ঋষিপুত্র শাঙর্গবান দয়াপরবশ হয়ে বললো— নারী, তোমায় আমি বিবাহ করবো এক রাত্রির জন্য—আয়োজন করো। অগ্নি সাক্ষী করে গ্রহণ করলেন ঋষিতনয় প্রৌঢ়াকে। হোমাগ্নির আভাতে প্রেমের উজ্জীবনে সে যেন ক্ষণিকের জন্য পেয়ে গেলো তার লুপ্ত যৌবনের বহ্নিশিখাকে, অগ্নিশুদ্ধা হয়ে সে পরিবর্তিত হয়ে গেলো এক তন্বী যৌবন-বতীতে। ঋষির তনয় ভাবলো—একী প্রহেলিকা, মায়া না মরীচিকা। পরের দিন সূর্যোদয়ের সঙ্গেই তার যাত্রা হলো শূন্য স্বর্গের দিকে—অধিকার সে পেয়েছে, প্রেমের জয়টীকা সে পরেছে, দেহের কূলে কূলে তার জীবনগঙ্গা পরিপূর্ণা।

২৪ এপ্রিল রোলাঁর শেষ চিঠি পৌঁছয় —বৃদ্ধার পক্ষাঘাতগ্রস্ত হাতে সেটি গুঁজে দেওয়া হয়—অস্পষ্টভাবে শোনা গেলো কয়েকটি বাক্য—প্রেম, প্রেম ছড়িয়ে দাও প্রেম—

২৮ এপ্রিল বেলা দুটোয় হলো সেই মহীয়সীর পরিনির্বাণ, দেহ ভস্মীভূত করা হয় তাঁরই নির্দেশ অনুসারে। রোমের সেস্টিয়াসের পিরামিডের ছায়ায় বিস্তৃত সাইপ্রেস বনের কবরাগারে তার ভস্মরাশি প্রোথিত হল, যেখানে গ্যয়টের ছেলে আর কবি শেলীর সমাধি রচিত হয়েছে—দুটি কথা স্মারকলিপিতে রইলো—প্রেম—শান্তি।

তারপর চল্লিশ বছর কেটে গেছে। রোলাঁর জীবনে এসেছে কত খ্যাতি গৌরব, কত সাফল্য কত বিপর্যয়, ব্যক্তিগত বিবাহিত জীবনে কত অশান্তি—সারা পৃথিবী জুড়ে দু দুটো বিশ্বযুদ্ধ, পতন অভ্যুদয় বন্ধুর পন্থার মধ্য দিয়ে শান্তিকামী রোলাঁ— যুগ যুগ ধাবিত যাত্রী, কিন্তু তাঁর কৈশোর যৌবনের এই অমলিন স্মৃতি জীবনপাত্র উচ্ছলিয়া তাঁকে ঘিরে রেখেছে। মৃত্যুর কিছুদিন পূর্বে ১৯৪৩ সালে তিনি লিখছেন—১৯০২ সালের ৭ জুন আমি তাঁর কাছ থেকে বিদায় নিয়েছিলাম, শেষবারের মত আলিঙ্গন করেছিলাম, বলে এসেছিলাম— বন্ধু হে আমার, তুমি যেখানেই থাকো, তুমি আমার জীবনের শ্রেষ্ঠ অংশ হয়ে রইলে।

দুর্জয়লিঙ্গ দার্জেলামা

তারাপদ পাল

ইংরেজ আমল থেকেই দার্জিলিং প্রমোদ ভ্রমণের বিশেষ স্থান। আজও এপ্রিল-মে মাসের সুরু থেকেই দেশী-বিদেশী ভ্রমণ-বিলাসীদের মধ্যে দার্জিলিং-এ যাবার তোড়-জোড় সুরু হয়ে যায়। এ বছরও তার ব্যতিক্রম হয় নি। এ বিষয়ে ইদানিং কালে সহায়ক হয়ে উঠেছে সরকারী ও বেসরকারী ভ্রমণ সংস্থাগুলি—যা অতীতে ছিল না। তাই বিভিন্ন পর্যটকদের আকর্ষণ করার জন্য এই সব সংস্থাগুলিকে বিশেষ তৎপর দেখা যায়। মরশুম সুরু হবার সঙ্গে সঙ্গে সুরু হয় পত্র-পত্রিকায় উৎসাহ উদ্দীপনকারী বিজ্ঞাপন দানের। সচিত্র বিবরণীপুস্তিকা প্রচারের। ইত্যাদি আরও অনেক কিছুর।

সরকারী ভ্রমণ সংস্থার পক্ষ থেকে ইতি-মধ্যেই বিভিন্ন পত্র-পত্রিকায় বিভিন্ন পর্যটক-দের দার্জিলিং-এ যাওয়ার জন্য আহবান জানিয়ে বিজ্ঞাপন প্রকাশ সুরু হয়ে গেছে। সেই সঙ্গে দার্জিলিং-এর বিভিন্ন হোটেল মালিকরাও তাদের হোটেলে ওঠার তাৎপর্য বিশ্লেষণ করে বিজ্ঞাপন দিচ্ছেন। এ বছর আবার 'আন্তর্জাতিক পর্যটন বৎসর' হওয়ায় বিজ্ঞাপনের ক্ষেত্রে কিছুটা বৈচিত্র্যও দেখা যাচ্ছে।

এক কথায় বিজ্ঞাপনগুলোর দিকে তাকালে সহজেই বোঝা যায় যে, দার্জিলিং যাবার উপযুক্ত সময় উপস্থিত হয়েছে। ট্যুরিস্ট অফিসেও ব্যস্ততার সুর ধ্বনিত হচ্ছে। ট্যুরিস্ট অফিস ও ভ্রমণবিলাসীদের কাছে এখন একটি কথাই বিশেষ অর্থ নিয়ে বারবার ধ্বনিত হচ্ছে : 'দার্জিলিং-এর মরশুম, দার্জিলিং-এর মরশুম'।

*

দার্জিলিং-এর প্রাকৃতিক সৌন্দর্যের প্রতি বিশেষ আকর্ষণের সূত্রপাত ঘটে প্রায় দেড়শো বছর আগে। এই জায়গাটাকে ভ্রমণ-বিলাসের স্থান হিসেবে চিহ্নিত করার প্রয়াসও সে সময়েই লক্ষ্য করা যায়।

সেদিন অবশ্য দার্জিলিংকে তার সব সৌন্দর্যের সমারোহ সহ বাইরে থেকে আরও আকর্ষণীয় করে তোলার এমন সযত্ন প্রয়াস ছিল না। দার্জিলিং-এর স্বপ্রকৃতিও ছিল তার সকল সম্পদ। পরবর্তীকালে তার সেই সম্পদকে আরও সৌন্দর্যশালিনী করে গড়ে তোলার চেষ্টা হয় এবং করাও হয়।

দেড়শো বছর আগের দার্জিলিং-এর অনেক পরিবর্তন ঘটে গেছে আজ। এই পরিবর্তনের ইতিহাসও লুকিয়ে আছে সেই পুরনো দিনের মধ্যে।

*

আজকের দার্জিলিং জেলা পশ্চিমবঙ্গের অংশ। কিন্তু সে সময়, সেই প্রাচীনকালে এ জেলা ছিল সিকিম রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত। কিন্তু দার্জিলিং-এর ভাগ্যে এমনি ভাবে সুস্থির হয়ে কেবল কোন এক রাজ্যের তাঁবে থাকা সম্ভব হয় নি। এর ওপর দিয়ে বয়ে গেছে অনেক ঝড়। বিবাদের কালো মেঘে।

গোর্খারাজ পৃথ্বীনারায়ণ এক সময় প্রভূত বিক্রমে নেপাল অধিকার করে নেন। তারপরই রাজ্য বিস্তারের নেশায় যুদ্ধের ডাক দিয়ে অগ্রসর হতে সুরু করলেন। সিকিম-রাজ হলেন রাজ্যচ্যুত। তখন তিনি আশ্রয় চাইলেন তৎকালীন বৃটিশ সরকারের কাছে। পেলেনও।

তার কয়েক বছর পর সুরু হলো নেপালের সঙ্গে ইংরেজের যুদ্ধ।

১৮১৬ খৃষ্টাব্দে ইংরেজের সঙ্গে যুদ্ধে নেপাল পরাজিত হয়। পরাজিত নেপাল-রাজ তৎকালীন বৃটিশ সেনাপতি স্যার ডেভিড অকটারলনীর সঙ্গে সন্ধি স্থাপন করলেন। সেই সন্ধির সর্ত অনুসারে সিকিম ও তার দক্ষিণাংশ বৃটিশ শাসনাধীনে যায়। বৃটিশ গভর্ণমেন্ট তখন সহানুভূতি দেখিয়ে সিকিম রাজ্যটি ফিরিয়ে দেন তার প্রকৃত স্বত্বাধিকারীকে। সেই ঘটনায় ফলে সিকিম-রাজ্য ইংরেজের মিত্ররাজ্যে পরিণত হয়।

আঠাশ বছর পরে আবার দেখা দিলো বিরোধ। নেপাল ও সিকিমের মধ্যে সীমানা নিয়ে ১৮৩৪ সালে। বৃটিশ গভর্ণর-জেনা-রেলের প্রতিনিধি হিসেবে মেজর বয়েড ঐ বিবদমান দুই রাজ্যের মধ্যস্থ হয়ে বিবাদ মিটিয়ে দেন। সেই সঙ্গে তিনি সিকিম-রাজকে জানান : গভর্ণর-জেনারেল দার্জিলিং-এর জলবায়ু ও প্রাকৃতিক সৌন্দর্যে মুগ্ধ হয়েছেন। আপনি মৈত্রীর স্মারক হিসেবে দার্জিলিং এলাকাটি তাঁকে উপহার দিন।

১৮৩৫ সালে সিকিমরাজ দার্জিলিং-এর একটি বিরাট অংশ ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানীকে উপহার দিলেন। সেই এলাকাটি ছিল এই-রকম : দার্জিলিং-এর পার্বত্যাংশ, অর্থাৎ বড় রঙ্গিত নদীর দক্ষিণ, কালিয়াল, মুন্সী (বলাসন) ও ছোট রঙ্গিত নদীর পূর্বে এবং রঙ্গনায়ু ও মহানন্দা নদীর পশ্চিম— এই চতুঃসীমাবর্তী ভূভাগ।

কোম্পানীর নিজের সম্পত্তি হিসেবে এই এলাকার সংস্কার সাধনে ব্রতী হন।

যাতায়াতের সুবিধার জন্য বয়েড সাহেব দার্জিলিং-এ পাহাড় কেটে পথ প্রস্তুত কর-লেন। রেলপথ হবার আগে এই পথ দিয়েই লোকজন দার্জিলিং-এ যাতায়াত করতো। শিলিগুড়ি থেকে দার্জিলিং যাবার রেলপথের পাশে এই পাহাড়-কাটা পথটি আজও দেখা যায়। প্রধানতঃ ভুটিয়ারাই এখন এই পথ ব্যবহার করেন বলে শোনা যায়।

রাস্তা তৈরীর পরই বয়েড সাহেব সিঞ্চল পাহাড়ে সৈনিক শিবির নির্মাণ করেন। ভূম্যাদির বন্দোবস্ত ও বিচারালয়াদিও স্থাপন করেন।

এরপর ১৮৩৮ সালে বয়েড সাহেবের তৎপরতায় নেপালরাজ বলাসন ও ছোট রঙ্গিত নদীর পশ্চিমাংশ এবং মেচী নদীর পূর্বাংশ-স্থিত ভূখন্ড বৃটিশ সরকারকে উপহার দিলেন।

অল্পদিনের মধ্যেই দার্জিলিং বাংলার রাজপুরুষদের দৃষ্টি আকর্ষণ করে। এই স্থানটি অকর্মণ্য ইউরোপীয় সৈনিকদের স্বাস্থ্যনিবাস বলে গণ্য হয়। এই সময়ে অনেকেই গৃহাদি নির্মাণ করার জন্য জমির বন্দোবস্ত নেন। তখনও দার্জিলিং-এ চায়ের চাষ প্রবর্তিত হয় নি।

দার্জিলিং-এর নৈসর্গিক দৃশ্য

এর পরেই এখানকার রাজনৈতিক পরিস্থিতি একটু জটিল আকার ধারণ করে।

১৮৪৯ সালে ডাক্তার হুকার বৃটিশ সরকার ও সিকিমরাজের অনুমতিক্রমে দার্জিলিং-এর সুপারিনটেনডেন্ট ডাক্তার ক্যাম্বেলের সঙ্গে সিকিম যান। কিন্তু কোন এক অজানা কারণে রাজমন্ত্রীর ষড়যন্ত্রে ডাক্তার হুকার ও ডাক্তার ক্যাম্বেল ধৃত ও বন্দী হলেন। এই খবরে অপমান বোধ করলেন বৃটিশ সরকার। ক্ষুব্ধ হয়ে প্রতিশোধ নেবার জন্য একদল বৃটিশ সৈন্যকে পাঠালেন সেখানে। বৃটিশ সরকার বছর বছর সিকিমরাজাকে যে রাজকর দিতেন তাও বন্ধ করে দিলেন। সিকিম তাঁদের কাছে পরাজিত হলো। ফলে সিকিমের তরাই সহ প্রায় ৬৪০ বর্গ মাইল এলাকা বৃটিশ শাসনাধীনে চলে আসে।

১৮৫৬ সালে সুরু হয় চা-বাগান তৈরীর কাজ।

এর পর ভুটান যুদ্ধের পর ১৮৬৪ সালে তিস্তা নদীর পূর্বে পার্শ্বস্থ সমুদয় পার্বত্য ভূভাগ দার্জিলিং-এর সামিল হয়।

•

সমুদ্রপৃষ্ঠ থেকে দার্জিলিং-এর সমতলক্ষেত্রের উচ্চতা মাত্র ৩০০ ফিট। কিন্তু গিরিশৃঙ্গের উচ্চতার বিস্তার দু হাজার থেকে দশ হাজার ফিট পর্যন্ত।

পার্শ্ববর্তী ভূভাগ সমুজ্জ্বল তুষারমণ্ডিত। পৃথিবীর সর্বোচ্চ গিরিশৃঙ্গ ধবলগিরি ও কাঞ্চনজঙ্ঘা ঐ তুষারময় প্রদেশের সঙ্গে সম্মিলিত। পার্বত্য প্রদেশে বারো হাজার ফিট উচ্চ পর্যন্ত এলাকায় শ্যামল তৃণাদি দেখা যায়। তার ওপর তালীশপত্রজাতীয়, তার নিচে দেবদারু, পাইন প্রভৃতি এবং সমতলে মূল্যবান শালগাছের বন। সেকালে তরাই অঞ্চলে ম্যালেরিয়া জ্বরের বিশেষ প্রাদুর্ভাব ছিল। মেচ, ধীমাল ও কোচেরা জঙ্গল পুড়িয়ে জমি পরিষ্কার করে চাষবাস করতো। তরাই হলো পর্বতের তলদেশের নাম। স্থানীয় লোকেরা একে বলে মোরঙ্গ।

এক হাজার তিনশো সতেরটি গ্রাম ও দুটি নগর নিয়ে গঠিত দার্জিলিং জেলার ভূ-পরিমাণ এক হাজার দুশো চৌত্রিশ বর্গ মাইল। দার্জিলিং-এ প্রথম চা-বাগান তৈরী হয় ১৮৫৬ সালে।

•

দার্জিলিং নামের উৎপত্তি সম্বন্ধে অনুসন্ধান করতে গিয়ে দুটি প্রাচীন নামের সন্ধান পাওয়া যায়। একটি 'দুর্জয়লিঙ্গ', অপরটি 'দার্জেলামা'।

স্থানীয় বৌদ্ধদের বিশ্বাস এই স্থানের আসল নাম 'দার্জেলামা'। সেই থেকেই পরবর্তীকালে এর নাম হয় দার্জিলিং।

এই বিশ্বাসের পেছনের কাহিনীটি এই রকম :

পুরাকালে কোন এক সময়ে এখানে 'দার্জে' নামে এক লামা বসবাস করতো। তার নানা রকমের অলৌকিক ক্ষমতা ছিল। সেজন্য ভুটিয়ারা তাকে বিশেষ ভক্তি-শ্রদ্ধা করতো। আজও ভুটিয়ারা পুরনো স্মৃতিকে স্মরণ করে সেই 'দার্জে' লামাকে দেবতা বলে বিশ্বাস করে। সেই থেকেই এই স্থানের নাম হয় 'দার্জেলামা'। পরে দার্জিলিং।

অপরপক্ষে 'দুর্জয়লিঙ্গ' নাম সম্পর্কে বিশ্বাস পোষণ করেন হিন্দুরা। শিবের নাম থেকেই এই নামকরণ করা হয়।

কালিকাপুরাণে 'দুর্জেয়গিরি' নামের সন্ধান পাওয়া যাবে। পণ্ডিতরা মনে করেন বর্তমান দার্জিলিং থেকে কামরূপ পর্যন্ত বিস্তৃত গিরিমালাকেই কালিকাপুরাণে 'দুর্জয়গিরি' বলে উল্লেখ করা হয়েছে।

অনেকে আবার দার্জিলিং নামের ব্যুৎপত্তি করতে গিয়ে বলেছেন, দ+রজে+লিঙ্গ। এই শব্দগুলির অর্থ বিশ্লেষণ করতে গিয়ে বলেছেন, 'দ' অর্থে প্রস্তর ; 'রজে' অর্থে শ্রেষ্ঠ এবং 'লিঙ্গ' অর্থে স্থান বা প্রদেশ। অর্থাৎ পবিত্র গুহা বা লামাদিগের চিহ্নিত স্থান।

দার্জিলিং-এর কাছারির কিছু দূরে একটা গুহা বা গুম্ফা দেখা যায়। ভুটিয়ারা মাঝে মাঝে এখানে এসে মহাকালের পূজা করেন। অনেক সন্ন্যাসীও মাঝে মাঝে এখানে আসেন সাধনার জন্য।

ভুটিয়াদের বিশ্বাস ঐ গুম্ফার ভেতর দিয়ে তিব্বতের রাজধানী লাসা নগরী পর্যন্ত যাতায়াত করার রাস্তা আছে। লামারা নাকি এই পথে যাতায়াত করেন।

একটি প্রবাদ থেকে জানা যায় যে, নেপালের কুনুসোলামুগে নামক এক রাজার রাজত্বকালে এখানে লামাসরাই বা গুম্ফা নির্মিত হয় এবং লামারাই এই স্থানটিকে 'দার্জিলিং' নামে অভিহিত করেন। এই নামেই এখন সমগ্র জেলার প্রসিদ্ধি।

•

এক সঙ্কীর্ণ পাহাড়ের ওপর দার্জিলিং শহর অবস্থিত। তিনটি শৃঙ্গ এর সঙ্গে সংলগ্ন। নিম্নভাগ অতিশয় ঢালু। কোন কোন ইংরাজের বিশ্বাস দার্জিলিং শহরে ও লণ্ডন নগরে প্রায় একই ভাবে শীত ও গ্রীষ্ম দেখা দেয়।

এখানকার এডেন স্যানাটোরিয়াম, কোচবিহার মহারাজের বাড়ি, ছোটলাটের প্রাসাদ ভবন উল্লেখ্য। তাছাড়া আছে বড় বড় কয়েকটি গির্জা, মাঝারি বাড়ি, বোটানিক্যাল গার্ডেন।

দার্জিলিং-এর আশেপাশে রয়েছে জলাপাহাড়ের সুন্দর সৈন্য-নিবাস, মহাকাল পাহাড়ের গুম্ফা, ভুটিয়া বস্তিতে ভোট-গ্রন্থ সজ্জিত বুদ্ধ-মন্দির। লিবঙ্গে নির্মিত নতুন সৈন্য স্বাস্থ্য-নিবাস। নগরের মধ্যে আছে আকর্ষণীয় কাকঝোরা জলপ্রপাত। যাকে ইংরেজরা নাম দিয়েছেন 'ভিক্টোরিয়া ফলস্'। এই জল-প্রপাত সম্পর্কে প্রবাদ আছে যে, শিব-পত্নী দেবী গৌরী এই জল-প্রপাতে স্নান করতেন।

আজকের দার্জিলিং শহরের দ্রষ্টব্য বিষয় : জলাপাহাড়, বার্চ হীল, অবজার-ভেটরী হীল, লেবঙ্গ রেসকোর্স, হিমালয়ান মাউন্টেনিয়ারিং ইনস্টিটিউট, সেন্ট পলস্ স্কুল, সেন্ট জোসেফ কলেজ, মল, রাজভবন, ভিক্টোরিয়া জলপ্রপাত, প্রাকৃতিক ঐতিহাসিক যাদুঘর, লয়েড বোটানিক্যাল গার্ডেন, চা-বাগান, ভুটিয়া বস্তির মন্দির এবং চিড়িয়াখানা। কলকাতা থেকে দার্জিলিং-এর দূরত্ব ৪১৬ মাইল। কলকাতা থেকে দার্জিলিং-এর পথে বাগডোগরা পর্যন্ত বিমানপথ আছে। বাগডোগরা থেকে দার্জিলিং-এর দূরত্ব ৫৬ মাইল।

দার্জিলিং শহর থেকে ন' মাইল দূরে অবস্থিত 'টাইগার হিল'। টাইগার হিল থেকে সূর্যোদয় দেখা ভ্রমণকারীদের কাছে অন্যতম প্রধান আকর্ষণ। এখান থেকেই পরিষ্কার ভাবে দেখা যায় কাঞ্চনজঙ্ঘা, মাকালু, লোটসি, এভারেস্ট, জানু, কাবরু, নরসিং, সিমভো এবং সিনিওচাউ গিরিশৃঙ্গ। এইসব পর্বতশৃঙ্গকে আরও পরিষ্কার ও সুস্পষ্টভাবে দেখা যায় টঙ্গলু থেকে। দার্জিলিং থেকে টঙ্গলুর দূরত্ব সাড়ে আঠাশ মাইল। এখান থেকে রাতের দার্জিলিং শহরকে দেখায় যেন কোন রূপকথার নগরী।
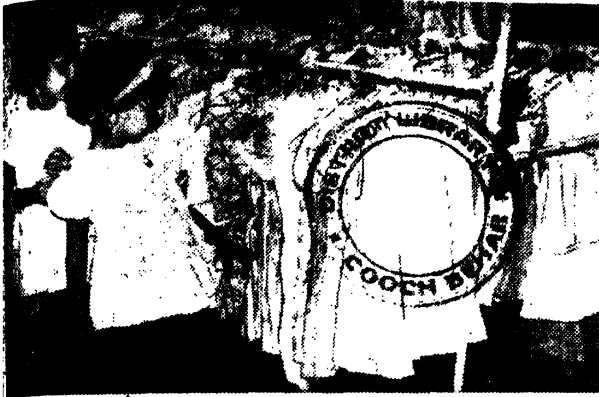
ভাবনার গভীরতা

ওদের কথা সবাই ভাবে। আবার ভুলে যেতেও বেশি সময় লাগে না। কিন্তু কমলচন্দ্র ওয়েলফেয়ার সেন্টার ওদের কথা ভাবতে শুরু করে আর ভুলতে পারেনি। প্রমাণটা তাই হাতে হাতেই পাওয়া গেল। ১৯৬৫ সালে সমিতির সূচনা বলতে গেলে এই সেদিনের কথা। এরই মধ্যে কর্মী-সংখ্যাবৃদ্ধি বেশ চমকে দেয়। কিছুদিন আগেও ছিল শ' সোয়া'শ—আজ সে সংখ্যাটা বৃদ্ধি হতে হতে দাঁড়িয়েছে পৌনে দু'শয়। এও সংখ্যাটা মোটেই স্থির নয়—নিতান্তই অস্থির। আমার সামনেই আরেকটি মেয়ের কাজের কথাবার্তা পাকা হয়ে গেল। পুজোর পর আরো জনা পঁচিশেককে নেওয়ার ইচ্ছে আছে। এ থেকে আর কিছু না হোক সদিচ্ছা তথা সমাজসেবায় আন্তরিকতাটুকু উপলব্ধি করতে অসুবিধা হয় না। ইচ্ছা এ'দের আরো অনেক কিছু আছে কিন্তু সামর্থ্য মাঝে-মধ্যে বেকায়দায় ফেলে দেয়। চলার পথটা একটু পিচ্ছিল ঠেকে। তা ওসব আর ও'রা আজকাল গ্রাহ্যের মধ্যে আনেন না। এসব সয়ে গেছে। একটি কথাই ও'রা সার জেনেছেন সদিচ্ছার আন্তরিকতার কাছে কোন বাধা ধোপে টে'কে না তাই সমিতির অগ্রগতি অপ্রতিহত।

'সবচেয়ে বড় অসুবিধা কি জানেন', বলছিলেন সমিতির একজন মুখপাত্র, 'তৈরি জিনিস বিক্রি করা চাই। না হলে এসব মেয়েদের টাকাই দেব কোত্থেকে আর কর্মসূচীর পরিধি আরো বাড়াবো কি করে।' অবশ্য ওদের তরফ থেকে চেষ্টার ত্রুটি করা হয়নি। সরকারী বে-সরকারী সকল পর্যায়েই আলোচনা চালিয়েও তার খেই হারিয়ে গেছে। তাই শুরুর মত আজো ভরসা নিজেদের সেলস সেন্টার ১৪, কুইন্স পার্ক, কলকাতা-১৯। বেচাকেনা এখানেই চলে। গুণগ্রাহী ক্রেতারা এখানে এসেই ভিড় করে। জিনিসপত্র কেনাকাটা করে, পছন্দসই জিনিসের অর্ডার দেয়। বিক্রি খুব একটা খারাপ না হলেও আরো ভাল হলে সমিতির আরো উন্নতি সম্ভব। তাই সেকথাটা এ'দের প্রতিটি চিন্তায় এখন বিশেষভাবে ঘোরাফেরা করছে।

গত ৩ সেপ্টেম্বর থেকে ও'রা একটা প্রদর্শনী আয়োজন করেছেন। বাটিক ও প্রিন্টের শাড়ি, বাচ্চাদের জামা-কাপড়ের বিরাট সমাবেশ। সেইসঙ্গে তাল মিলিয়ে আছে উলের পোষাক—আসন্ন শীতের প্রস্তুতির নির্দেশ দিচ্ছে হয়তো। তারপর সমিতির নিজস্ব বৈশিষ্ট্য আচার এসব তো আছেই। অনেক বিক্রি হয়ে গেছে এবং এখনো অনেক আছে। কমলচন্দ্র ওয়েল-ফেয়ার সেন্টার যে ক্রেতামহলে সাড়া জাগাতে পেরেছে, তার প্রমাণ প্রতি মুহূর্তেই পাচ্ছিলাম। কে একজন বললেন, "দামে সস্তা আর জিনিসগুলিও ভাল তাই ছুটে এলাম।' কথাটা ভাল লাগলো। যাচাই করার ইচ্ছে ছিল না তবু একবার ঘুরে-ফিরে সব কিছু দেখলাম। আজকের ঊর্ধ্বগামী বাজারে 'প্রাইস কন্ট্রোলের' এ এক অতি সাধু প্রয়াস। জিনিষপত্রের মানও বেশ প্রশংসনীয়। এটুকু ও'দের সম্বন্ধে না বললে অনেক কিছুই অবলা হয়ে থাকতো। প্রদর্শনীটি চলবে পুজো পর্যন্ত। ইতিমধ্যে আশা করা যায়, সব জিনিসই বিক্রি হয়ে যাবে। কিছুই থাকবে না।

গরীবের কথা বলে অনেকের লম্বা বক্তৃতা করার বিশ্রী অভ্যেস আমাদের ভীষণ বিরক্ত করে। এ'রা কিন্তু তা করেননি। কথা না বলে কাজ করে চলেছেন। যতটা সম্ভব মেয়েদের সমিতিতে কাজ দিচ্ছেন। এই আয়ে মেয়েরা সংসার আর ছেলেপুলের পড়াশোনায় কিছুটা সাহায্য করতে পারে। আজকের আর্থিক সংকটের মুখোমুখি দাঁড়িয়ে এই সাহায্যের প্রয়োজন আছে বৈকি। তাছাড়া সংসার বাঁচিয়ে আয় করার সুযোগ দিচ্ছে কমলচন্দ্র ওয়েলফেয়ার সেন্টার। সে সুযোগ স্বভাবতই আরো অনেককে আকর্ষণ করছে। কিন্তু আরো মেয়ের সংস্থান করার দায়িত্ব সমিতির একার পক্ষে সম্ভব নয়। এজন্য প্রয়োজন প্রতিটি মানুষের সহৃদয় মনোভাব। যাতে সমিতির জিনিসের কাটতি বাড়বে, অর্থ-ভাণ্ডার গড়ে উঠবে এবং অসংখ্য মেয়ে সংস্থার ছত্রছায়াতলে আশ্রয় পাবে।

অঙ্গনা   প্রমীলা

সেলস্‌গার্ল বেলাদি

আশ্চর্য! আগে কোনদিনই অতি সাধারণ ভাবেও সাজতে দেখিনি আমাদের বেলাদিকে। এইভাবেই একটি সাজহীন জীবনের শৈশব থেকে যৌবন কেটেছে। কিন্তু আজ প্রৌঢ়াত্বে বেলাদিকে সাজতে দেখি। এই সাজ এত উগ্র এবং চোখ ঝলসানো যে অনেক সময় থিয়েটারের নায়িকা বলেই মনে হয়।

এই অধুনালুপ্ত তর্কলঙ্কার পাড়ায়—প্রাচীনতার ঘোর একেবারে কাটেনি বলেই—আজ বেলাদির সাজ নিয়ে ছোট-বড় সকলেই উপহাস-সমালোচনায় ভেঙে পড়ে। শুধু তাই কেন, বেলাদির জীবনযাত্রার সঙ্গে অতিপরিচিত প্রতিবেশীরাও এমন কথা বলে—যা কানে শুনেও—বেলাদিকে হাসতে হয়। মরা মানুষের মুখের মত ফ্যাকাসে দৃষ্টি নিয়ে বেলাদি বলেন—কেউ কেউ বলে আমায় রাত পসারিণী। শুনতে কিন্তু মনে হয় এ আমার নতুন নাম। আবার হাসতে গিয়ে বেলাদির চোখে জল আসে।

ভাঙা একটি জীর্ণ বাড়ীর প্রায়ান্ধকার কক্ষে—সর্বহারার মত কার কণ্ঠস্বর শুনতে পাই—"ভাই জীবনসংগ্রামে তো নামিনি; নইলে এ জীবন কত কষ্টের মধ্যে ভরে আছে। তবু...তবু, কখনো তো ভাবিনি, শীতের মধ্যে আমাদের উঠোনে দাঁড়ানো শিউলির ডালে যে পাতাগুলো ঝরেছে—ভেবেছি তখন সে বৃদ্ধ হয়েছে— একটি নিরুত্তাপ আশার মধ্যে—তার ক্ষীণ প্রাণটুকু সঞ্চারিত শুধু! কিন্তু বসন্তের কতকগুলো সুন্দর প্রভাত—আবার তাকে সবুজ সাজে সাজিয়ে দেবে একথা ভাবতে গেলেই নিজের কথা মনে পড়ে। তবে, আমার এ সাজ সাধের নয়। এই নতুন বসন্তের ইশারা মাঝে মাঝে খুবই একটা কষ্টের কথা মনে করিয়ে দেয়। তবে, এই সাজটুকুর বিনিময়ে অনেকগুলি জীবনের বসন্ত সমারোহ শুরু হয়েছে, শুধু সেইটুকু ভাবতে আমার আনন্দ।

'বেলাদি বল না, তোমার এই জীবন-সংগ্রামের ইতিহাসটা?

বেলাদি বিচিত্র 'মেক-আপ' নিচ্ছিলেন, পড়ন্ত বেলার প্রায়াসন্ন অপরাহ্নে। হঠাৎ যেন চমকে উঠলেন আমার কথায়। সেই মৃত বিবর্ণ ফ্যাকাসে হাসির বিদ্যুৎ ফোটালেন—রং করা দুটি ঠোঁটে। আবার যেন কার আর্ত কণ্ঠ—তর্কলঙ্কার পাড়ার একটি রুদ্ধ কক্ষের চারটে দেওয়ালকে কাঁপিয়ে দিল। পাশের ঘর থেকে—টিউবার-কুলোসিস জার্মে আক্রান্ত সমীরদার—এক-টানা কাশির শব্দ শুনে—আমার সঙ্গে বেলাদি মুখ ফেরালেন ওদিকে।

'হ্যাঁ কি বলছিলে—জীবনসংগ্রামের ইতিহাস। বোধহয়, লিখবে আমার কথাটা। তা লিখো ভাই। আমাদের মত হতভাগিনী-দের কথা কেই বা লেখে—আর কেই বা শোনে। সময় কম—চাকরীতে যেতে হবে—এর মধ্যে যা পারি বলছি।' কথা শেষে বেলাদি নিজেকে ভাল করে দেখতে লাগলেন—আয়নার মধ্যে দিয়ে...

আমি দেখছিলাম, সেই আয়নার ছায়াকে—কতকটা অশরীরী রূপে। তর্ক-লঙ্কার পাড়ার কোন আদিম অন্ধকারের নেপথ্য থেকে কে যেন বলে যাচ্ছিল...'এই বিশ শতকের দারিদ্র্য ক্ষয় মৃত্যুর মধ্যে যদি জোর করে বাঁচতে চাওয়া হয়—তাহলে যে বাঁচার নাম—মৃত্যুরই আর এক রূপ।'

হ্যাঁ আমরা তেমনি করে বেঁচে আছি। বেলাদি বলে চললেন—'যেদিন তোমার সমীরদার চাকরী ছিল, সেদিন সমস্ত পৃথিবীটাকে ভাবতাম সুন্দর একটি কবিতার মত। তর্কলঙ্কার পাড়ায় চিরদিন ধরে যে মুখ ঢাকা অন্ধকার দেখেছি—তাতে বুঝিনি সত্যিই এ পৃথিবীর অনেক নগ্ন সৌন্দর্য চাপা পড়ে আছে তার মধ্যে। যেদিন থেকে এই অন্ধকারের ওপারে—আলো পাব বলে ছুটে গেলাম—তখন দেখলাম কত অকরুণ এই পৃথিবী।

তোমার দাদার চাকরী যেতে—দিনের পর দিন পথে পথে ঘুরেছে—এই তর্ক-লঙ্কার পাড়ার এক অসূর্যম্পশ্যা বধূ। একটি মানুষকেও দেখলাম না সহানুভূতির চোখে তাকাতে। এদিকে চারটে ক্ষুধার্ত ছেলেমেয়ে, টি-বি রোগে পড়ে থাকা একটি মুমূর্ষু মানুষ—সব নিয়ে তখন দিশাহারা হয়ে যাচ্ছি......

তোমার দাদা তখন বিছানায় শুয়ে ছেলেমানুষের মত কাঁদতো বুকফাটা কাশির মধ্য দিয়ে—যে রক্তস্রোত বইতো—সেদিকে চেয়ে বলতো—'বেলা, বেলা লক্ষ্মীটি আমাকে বাঁচাও। আমার বড় কষ্ট!

উঃ সে কি কষ্ট আমার। পাড়া-প্রতিবেশী আত্মীয়-স্বজন এমন কেউ নেই—যার কাছে না গেছি অতি দীনতম ভিখারীর মত। সবাই ফিরিয়ে দিয়েছে। তর্কলঙ্কার পাড়ার সমস্ত আকাশ ভেঙে যেন আমার মাথায় 'বাজ' পড়লো। বেশী লেখাপড়া জানি না যে অফিসে চাকরী নেব। তবে, তবে কি উপায়! অনেক চেষ্টার পর প্রথমে জুটলো একটি রাঁধুনীর কাজ। ঈশ্বরের প্রথম আশীর্বাদের মত— মনে হলো এই প্রথম প্রাপ্তিটাকে। কিন্তু বেশীদিন থাকতে পারলাম না। রাঁধুনীর কাজের মাইনেতে চারটে ছেলেমেয়ের ক্ষুধার পেট ক্ষুধার যন্ত্রণা নিয়েই কাঁদে। আর চিকিৎসাহীন রুগীর আর্তনাদ।

সত্যিকারের দারিদ্র্যকে সেদিন দেখে-ছিলাম। যার সঙ্গে এসেছিল আরো অনেক অবাঞ্ছিত ইতিহাস! যখন মনে হয়েছিল সত্যিই আর আমাদের বাঁচবার অধিকার নেই। ঠিক সেই সময়-সন্ধিক্ষণে একটি অপরিচিত মানুষের কাছে পেলাম এই চাকরীর খবরটা। চিনে পাড়ার এ বিপণীর 'সেলস গার্ল' এর চাকরীতে ব হতে পারলে আমরা সবাই খেতে প হয়তো...মৃতপ্রায় স্বামীকে চিকিৎসা ক ভাল করতে পারবো।

হ্যাঁ সেলস গার্ল! হাসলেন এ বেলাদি। বললেন—আমার বড় মে যৌবন এসে গেল—আর আমাকে রংচং মেখে গার্ল সাজতে হয়েছে।

মালিকের সঙ্গে দেখা করতে—জানা দেড়শো টাকা মাইনে ছাড়াও 'মেক-আ জন্য যা খরচ লাগবে, তিনি সেটা দে যথেষ্ট 'মেক-আপ' নিয়ে বসতে হ বিপণীতে—সন্ধ্যে ছটা থেকে রাত পর্যন্ত। ক্রেতাদের সামনে নয়নাভি হয়ে উঠতে হবে। তারপর আটটার ঘণ্টাখানেক বিশ্রাম নিতে হবে—বি অভ্যন্তরে মালিকের প্রাইভেট চেম্বারে। সেই অবসর সময়টুকুতে একজন শিকারীর সামনে নিখুঁত প্রেমের অ করতে হবে। এক নারীর জীবনয অদ্ভুত সেই প্রেমকাহিনী—আজও বি নিভৃত অন্ধকারে অন্ধকারে একটি ম গন্ধে ধূপের মতই চলে......

তর্কলঙ্কারপাড়ার মতঅন্ধ থাকে, কখনই শুধু মনে হয়—আমার সেই

পরলোকে হেমলতা ঠাকুর

"বড়মা" বলে পরিচিতা শ্রীমতী হেমলতা ঠাকুর গত ৪ঠা অক্টোবর সন্ধ্যায় পুরীতে পরলোকগমন করেন। তিনি ঠাকুর পরিবারের জীবিত সদস্যদের মধ্যে বয়ঃজ্যেষ্ঠা ছিলেন। মৃত্যুকালে তাঁর বয়স হয়েছিল ৯৫ বৎসর।

শ্রীমতী ঠাকুর গত ১৫ দিন যাবত অসুখে ভুগছিলেন। কয়েকদিন থেকে তাঁর স্বাস্থ্যের অবনতি ঘটে এবং বিকাল ৫টায় তিনি ইহলোক ত্যাগ করেন।

তাঁর জন্ম হয় কৃষ্ণনগরে। তিনি রাজা রামমোহন রায়ের প্রপৌত্র এবং কবিগুরু রবীন্দ্রনাথের জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুরের পুত্রবধূ ছিলেন।

তিনি বাল্যকাল থেকেই রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের নিকট ইংরাজীসহ আধুনিক শিক্ষা গ্রহণ করেন। তিনি নারী সমাজের উন্নতির জন্য সারা জীবন কাজ করে গেছেন। দীর্ঘকাল তিনি সরোজ নলিনী সমিতির কর্ণধার ছিলেন। ১৯৩০ সালে তিনি পুরীতে আসেন এবং বিধবা আশ্রমের দায়িত্ব গ্রহণ করেন।

তিনি বহু গ্রন্থও রচনা করেছেন

সম্ভ্রমটাকে কোথায় যেন হারিয়ে ফেলেছি। এমন করে কারো কোন দামী জিনিস বুঝি হারায়নি। কিন্তু পরমুহূর্তে যখন শুনি—সেই ছেলেমানুষের মত কেঁদে ভাসানো মানুষটার গলা—'বেলা সত্যি তুমি এবার আমাকে বাঁচাতে পারবে। আর আমি বাঁচলে...কি হবে জানো, তোমাকে আর এত কষ্ট করতে হবে না। হ্যাঁ, শুধু সেইদিনগুলো পর্যন্ত তুমি ধৈর্য ধরে থাকো...'

পাশের ঘর থেকে আবার কাশির শব্দটা ভেসে এলে—বেলাদি চুপি চুপি বললো—আমি জানি—ও আর বাঁচবে না। এই টাকায় ভাল মত চিকিৎসা হয় কোথায়? কাজেই...

হয়তো আমিও জানি, বেলাদির দামী সম্ভ্রমের বিনিময়েতেও সমীরদার জীবন রক্ষা হবে না। তবু সব জেনেও জীবন-সংগ্রামে হেরে যাবার কথা ভাবছে না বেলাদি। ওই চিনে পাড়ার বিপণীর অত্যুজ্জ্বল আলোকরেখা যেন তর্কালঙ্কার-পাড়ার এই জীর্ণ বাড়ীটার মধ্যে এসে,—আজও বধূর চোখে আনে স্বপ্ন...অটন আশা...আনে ভরসা!

আমি যেন আজও মুগ্ধ যন্ত্রণার চোখে চেয়ে আছি—অদ্ভুত এক ক্ষুধা-তৃষ্ণা-কাতরতার মধ্যে বেঁচে থাকা—ওই—তর্কালঙ্কারপাড়ার প্রায়ান্ধকার জীর্ণ বাড়ীটার দিকে। যদিচ জানি, শীতের পর শিউলির ওই ডালে আসতে পারে নতুন বসন্ত। কিন্তু কবে।

—জয়শ্রী চক্রবর্তী

একটি পবিত্র উৎসব

একটি পবিত্র উৎসব শেষ হোল। পূর্বেও যেমন ছিল এর মহত্ত্ব, এখনও তেমনি আছে। উৎসবের বিসর্জন হয় শিবরহস্যের সেই স্তোত্র দ্বারা—

"সর্ব্বদেবময়ীং দেবীং
সর্ব্বরোগভয়াপহাং
ব্রহ্মেশ বিষ্ণুনমিতাং
প্রণমামি সদা উমাম্।"

নবরাত্রের এই দুর্গাপূজায় রয়েছে একটি অর্থপূর্ণ উপাখ্যান।

মহাপ্রতাপী মহিষাসুর—সূর্য, ইন্দ্র, অগ্নি, বায়ু, যম, বরুণ, চন্দ্র এবং আরো অনেক দেবতা অধিকারচ্যুত হলেন তার প্রভাবে। অবশেষে তাঁরা শরণাপন্ন হলেন শিব ও বিষ্ণুর। শক্তির অবতার শিব ও অমিত-পরাক্রমী বিষ্ণু রাগে, ক্রোধে দীপ্তমান হলেন। সেই দীপ্তির সঙ্গে অন্য সকল দেবতার দীপ্তি মিলিত হয়ে সৃষ্টি হোল এক মহাশক্তি। এই সম্মিলিত শক্তির নাম দুর্গা।

'দুর্গা' শব্দের ব্যুৎপত্তিগত অর্থ হোল দুর্ অর্থাৎ দুঃখ, গম্ অর্থাৎ গমন করা বা জানা। অ—দুর্গ+আ (স্ত্রী) অর্থাৎ যাকে দুঃখে জানা যায় কিম্বা যিনি দুর্গ অর্থাৎ সংকট ত্রাণ করেন। পৌরাণিক অর্থে দুর্গ—অসুরবিশেষ, আ—বধকর্ত্রী অর্থাৎ যিনি দুর্গ নামক অসুরকে বিনাশ করেছেন। তন্ত্রে দুর্গা শব্দের বর্ণগত অর্থেরও ব্যাখ্যা পাওয়া যায়—দ (দৈত্যনাশসূচক), উ (বিঘ্ননাশসূচক), র (রোগঘ্নবাচক), গ্ (পাপঘ্নবাচক) আ—ভয় ও শত্রুনাশকবাচক। দ্+উ+র্+গ্+আ=দুর্গা—অতএব দুর্গা হলেন রোগ-শোকপাপভয়বিঘ্ন ও শত্রুনাশকারিণী দেবী।

দেবাসুরের সেই ভীষণ প্রলয়ঙ্করী যুদ্ধে সিংহবাহিনী দুর্গার সম্মুখে অসুরের শক্তি টিঁকতে পারল না, নিষ্প্রভ হয়ে গেল। সে পরাস্ত হল, দেবতারা জয়লাভ করলেন। দেবী অন্তর্হিতা হলেন। দেবতারা ফিরে পেলেন নিজেদের শক্তি।

একে রূপক হিসেবে ধরে নিলে একটি মহাসত্যের ইঙ্গিত পাওয়া যায়। মহিষ দুর্গুণের প্রতীক, পাপের প্রতিনিধি, পাশবিক প্রবৃত্তির প্রবল পরিচায়ক। তার রক্তাক্ত চক্ষুদ্বয়ে ক্রোধ প্রতিবিম্বিত—কাম, লোভ, মোহ, মদ, মাৎসর্যের মহাপঙ্কিলে নিমজ্জিত থাকাতেই তার আনন্দ। তার স্পর্শে মৃত্যু নিকটবর্তী হয়। এ ম্লেচ্ছ—সংস্কৃতির পোষক, অশুভ দর্শন এবং আসুরী সম্পত্তি। এই পাশবিক প্রবৃত্তিকে পরাস্ত করবার পক্ষে সংযুক্ত তেজোময় সত্ত্বগুণের সম্বন্ধ শক্তি দুর্গার প্রয়োজন। সেইজন্য দুর্গা দুর্গতিনাশিনী। সত্ত্বগুণের সমন্বয়ে দুর্গার সম্পূর্ণ পূজনে শুচিতা ও স্বচ্ছতার প্রয়োজন। এই কথা ব্যাসদেবের নিম্নশ্লোকে পাওয়া যায়—

"দুর্গে স্মৃতা হরসি ভীতিমশেষ জন্তোঃ
স্বস্থৈঃ স্মৃতামতীমতীব শুভাং দদামি।"

ভিন্ন ভিন্ন প্রান্তে বিভিন্ন প্রকারের রূপ এই উৎসবের। পশ্চিম প্রান্তে রজ এবং তম গুণের উপর সত্ত্বগুণের এই বিজয়কে রাবণের উপর রামের বিজয়ের সঙ্গে তুলনা করা হয়। অন্তরের অর্থ একই। অধর্ম, বৈভব, পাপ, ক্রূরতা, দুশ্চরিত্রতা, রাক্ষসত্ব ও দুর্জনতার অদ্ভুত সংমিশ্রণে রাবণের ব্যক্তিত্ব। তার উপর রামের আধ্যাত্মিক বিজয়—উৎসবের রূপ ধরেছে। আধ্যাত্মিক প্রভাবের অভাবে আধ্যাত্মিক বিজয় হতে পারে না। সমস্ত রামায়ণে রামের আধ্যাত্মিক বিজয়ের ভাব স্পষ্ট। মহান আত্মার পক্ষে—কোন লঘু আত্মার উপর বিজয় লাভ করা, নিজের প্রভাবে প্রভাবিত করা যতটা সহজ ও সরল, ততটাই দুষ্কর ও কঠিন কোন মহান আত্মার উপর বিজয় লাভ করা। রাবণ একটি মহান আত্মা—তার বৈদগ্ধ্য, কুলিনত্ব ও ব্রাহ্মণত্বে তা প্রকাশ পায়। এই মহান আত্মাকে পরাজিত করা বাস্তবিক আনন্দের কথা। লোকজীবন আধ্যাত্মিক বিজয়ের প্রকাশ স্তম্ভ।

উৎসবের পরিসমাপ্তি বিজয়া সম্মিলনীতে। যুদ্ধের অবসানে বিজয়ের চিহ্নস্বরূপ পরস্পরের সঙ্গে পরস্পরের ভক্তি, ভালবাসা, প্রেমজ্ঞাপন। আবার ঠিক তারই প্রতিরূপ রামলক্ষ্মণের সঙ্গে ভরত ও শত্রুঘ্নের মিলন। সুতরাং আমরা দেখতে পাই যে রূপ ভিন্ন হলেও উদ্দেশ্য এবং আত্মা একই। সুতরাং সংস্কারযুক্ত বিপত্তিসঙ্কুল জীবনে শক্তির উপাসনা দেবীর স্মরণ—অসতের উপর সতের বিজয়ের প্রতিষ্ঠাতেই মানবের সুখ, সৌভাগ্য, সমৃদ্ধি ও মুক্তি।

নন্দিতা ভট্টাচার্য

নগর প্রশাসনে নারী

আসাম রাজ্যের রাজধানী শিলং শহরের পৌরসভার ভাইস-চেয়ারম্যান হিসাবে শ্রীমতি নর্মদা চৌধুরীর সাম্প্রতিক নির্বাচন সমগ্র আসামে এক বিস্ময়কর রেকর্ড। শ্রীমতি চৌধুরী সম্প্রতি সর্বসম্মতিক্রমে শিলং-এর প্রথম মহিলা ভাইস-চেয়ারম্যান হিসাবে নির্বাচিত হয়েছেন।

শিলং-এর স্থায়ী অধিবাসী এক সম্ভ্রান্ত নেপালী পরিবারের কন্যা ও স্থানীয় বিখ্যাত শিক্ষা প্রতিষ্ঠান সেন্ট মেরীজ কলেজে শিক্ষাপ্রাপ্তা নর্মদা চৌধুরী আসামের বিখ্যাত জননায়ক পরলোকগত রোহিনীকুমার চৌধুরীর দ্বিতীয় পুত্রবধূ। কলেজে থাকাকালেই শ্রীরোহিণী চৌধুরীর দ্বিতীয় পুত্র শ্রীপ্রবীণকুমার চৌধুরীর সঙ্গে নর্মদার বিবাহ হয়। সাময়িকভাবে পড়াশোনা বিঘ্নিত হলেও কয়েক বছর পর তিনি বি-এ পার্ট ওয়ান পরীক্ষায় উত্তীর্ণা হন। শীঘ্রই তাঁর ফাইনাল পরীক্ষায় বসার ইচ্ছা আছে।

তিন কন্যার জননী তেত্রিশ বৎসর বয়স্কা নর্মদা চৌধুরী স্বামীর বহুবিধ রাজনৈতিক ও সামাজিক কর্মে সহকর্মিণী। তাঁর স্বামী শ্রীপ্রবীণকুমার চৌধুরী আসামের বর্তমান চালিহা মন্ত্রিসভার পরিবহন দপ্তরের মন্ত্রী।

শ্রীমতী নর্মদা বিগত পৌর নির্বাচনে তাঁর প্রতিদ্বন্দ্বী তদানীন্তন ভাইস-চেয়ারম্যানকে বিপুল ভোটে পরাজিত করে পৌরসভায় নির্বাচিত হন।

শ্রীমতী নর্মদা চৌধুরী

আসামের ইতিহাসে সর্বপ্রথম একজন মহিলা একটি প্রধান শহরের ভাইস-চেয়ারম্যান পদাভিষিক্ত হলেন।

সুগৃহিণী শ্রীমতি নর্মদা বহুভাষাবিদ ও বটে। নেপালী, অসমীয়া, বাংলা, হিন্দী ও ইংরেজী ভাষায় তিনি অনর্গল আলাপ-আলোচনা চালাতে পারেন। শিলং মহিলা সমিতি সহ বহু জনহিতকর ও সমাজসেবা সংস্থার সাহিত তিনি ঘনিষ্ঠভাবে যুক্ত।

পুরোনো পাতা

পোড়া মহেশ্বর

দীনবন্ধু মিত্র

ইস্টারণ বেঙ্গাল রেলওয়ের চাগদা স্টেশন হইতে পাঁচ ক্রোশ পূর্বাভিমুখে গমন করিলে পোড়া মহেশ্বর দর্শনাভিলাষী পথিকের অভিলাষ সফল হয়। পথিমধ্যে একখানি মাত্র গণ্ডগ্রাম আছে; সে গ্রামখানির নাম ভট্টাচার্য কামালপুর। বহুকালাবধি কামালপুরে অসাধারণ ধীশক্তিসম্পন্ন বিবিধ শাস্ত্র-পারদর্শী পণ্ডিত পটলের আবাসস্থান বলিয়া বিখ্যাত। এক্ষণে এ স্থানে অনেক লোক বাস করেন বটে, কিন্তু শ্রদ্ধাস্পদ বিজ্ঞ অধ্যাপক অতি বিরল, বোধ হয় বিদ্যা-বিশারদ বনমালী বিদ্যাসাগর মহোদয়ের সহিত বীণাপাণির পরলোক হইয়াছে।

পূর্বাভিমুখে গমন করিতে করিতে কামালপুর গ্রাম ক্রোশার্ধ পশ্চাতে পতিত হইলে, খলসির বিল নামে একটি সুদীর্ঘ রমণীয় জলাশয় লোচন-পথে পতিত হয়। খলসির বিলের বারি যারপর নাই পরিপাটি; একবার তাহা পান করিলে তাহার শীতলতা নির্মলতা এবং মধুরতা কস্মিন কালেও ভুলিতে পারা যায় না। কাচের গেলাসে সুবিমল নীর রাখিলে গেলাস শূন্য কিংবা পূর্ণ, সহসা বলা কঠিন, কলিকাতার কলের জল অপেক্ষাও সে জল স্বাদু, গলাজলে মুদ্রা ফেলিয়া দিলে সুস্থির জলে সে মুদ্রা দৃষ্টিগোচর হয়। কুন্দ কুমুদ কহ্লার কুবলয় কমলসমূহে জলাশয়টি অতি সুন্দররূপে বিভূষিত। এত পদ্ম একস্থানে সচরাচর দেখা দুর্লভ। জলাশয়ের কিয়দংশ সম্যক পদ্মপাত্রে আবৃত, সেখানে বোধ হয় পদ্মপত্র বিরচিত একখানি প্রশস্ত বসন বিস্তারিত রহিয়াছে। উপকূলের অতি মনোহর শোভা; নবীন নিবিড় দূর্বাদলে আচ্ছাদিত, বৈকালে সূর্যদেব অস্তাচল চূড়াবলম্বী হইবার সময় তদুপরি উপবেশন করিলে জলকুসুম-সৌরভামোদিত শীতল অনিল শরীর স্নিগ্ধ করিয়া দেয়; নিকটস্থ গ্রামের বালকেরা প্রায় প্রতিদিন সায়ংকালে তথায় উপনীত হইয়া দৌড়াদৌড়ি খেলায় মত্ত হয়। জলাশয়ে নানারূপ পক্ষী সন্তরণ করে; তাহাদিগকে নিধনকরনাভিলাষে সময়ে সময়ে কিরাত-স্বভাব আমোদপ্রিয় মহোদয়গণকে বন্দুক হস্তে উপকূলে ভ্রমণ করিতে দেখা যায়।

খলসির বিলের দেড় ক্রোশ পূর্বোত্তরে সরাবপুর গ্রাম; অতি ক্ষুদ্র গ্রাম, কয়েকঘর মুসলমান এবং কয়েক ঘর গোয়ালা মাত্র গ্রামের বাসিন্দা লোক।

সরাবপুর গ্রামের পুরোভাগে পোড়া মহেশ্বর বিরাজিত। পূর্বকালে একটি সুদীর্ঘ মন্দির ছিল; তন্মধ্যে পোড়া মহেশ্বর অবস্থান করিতেন। এক্ষণে মন্দিরের কোন চিহ্ন দৃষ্টিগোচর হয় না। মন্দির সম্যক ভগ্ন হইয়া গিয়াছে; মন্দিরের ইষ্টক এবং মৃত্তিকা স্তূপাকারে নিপতিত, দেখিলে বোধ হয় একটি ক্ষুদ্র পাহাড়, এই স্তূপোপরি পোড়া মহেশ্বর যেন পাতাল ভেদ করিয়া মস্তক উচ্চ করিয়া রহিয়াছেন। পোড়া মহেশ্বর প্রস্তরে বিনির্মিত, হস্তপদ কিংবা অন্য অবয়ব কিছুই নাই, একখানি সুগোল শিলাস্তম্ভ মাত্র, উপরিভাগটি বর্তুলবৎ। পোড়া মহেশ্বরের সমুদায় শরীর মৃত্তিকা মধ্যে নিমগ্ন, কেবল তিন হাত মাত্র বাহিরে আছে। সরাবপুরের লোকেরা বলেন, মহাদেবের অঙ্গ পাতাল পর্যন্ত গমন করিয়াছে, কিন্তু তাঁহাদের এ বিশ্বাস যে অমূলক, তাহা সহসা প্রতীত হয়। যেহেতু শিবের মস্তক ধরিয়া নড়াইলে শিবের শরীর ঢক ঢক করিয়া নড়িতে থাকে। পোড়া মহেশ্বরের কলেবর পাতাল পর্যন্ত বিস্তৃত না হউক, কলেবরটি যে বৃহৎ, তাহার আর কোন সন্দেহ নাই। পোড়া মহেশ্বরের মস্তকের এক পার্শ্বের কতকটা প্রস্তর চটিয়া গিয়াছে। কিরূপে মস্তকের প্রস্তর চটিয়া গেল, তাহার বিবরণ অতি মনোহর।

কিম্বদন্তী, পোড়া মহেশ্বরের মস্তকাভ্যন্তরে স্পর্শমণি ছিল। কেহই জানিতেন না এবং কাহারও জানিবার সম্ভাবনাও ছিল না যে, এমন অমূল্য দেব-দুর্লভ রত্ন শশাঙ্কশেখরের শিরোদেশে বিরাজিত। বহুকাল হইল একজন সন্ন্যাসী যোগবলে অবগত হইলেন, এই মহাদেবের মস্তকের মধ্যে স্পর্শ-মণি আছে, এবং অবিলম্বে সরাবপুরে আগমনপূর্বক মন্দিরের সম্মুখে অশ্বত্থবৃক্ষমূলে অবস্থান করিতে লাগিলেন।

সন্ন্যাসী অতি দীর্ঘকলেবর; প্রভাত সূর্যের ন্যায় রূপ, শ্বেত কুন্তল এবং শ্মশ্রুরাজি মুখমণ্ডল একেবারে আবরণ করিয়াছে, পৃষ্ঠদেশে জটাপুঞ্জ বিলম্বিত, দক্ষিণ হস্তে আষাঢ় দণ্ড, বামহস্তে কমণ্ডলু, গাত্রে গাছের বল্কল, সন্ন্যাসী-মৌনাবলম্বী, কাহারও সহিত বাক্যালাপ করেন না। জিজ্ঞাসা করিলে উত্তর দেওয়া দূরে থাকুক, গ্রীবা-সঞ্চালন পর্যন্তও করেন না, দিবা বিভাবরী কেবল মুকুলিত লোচনে, রবশূন্য বদনে, অবিচলিত চিত্তে আরাধ্য দেবের আরাধনায় অবিরাম নিমগ্ন। কৃষকেরা তাঁহাকে দর্শন করিয়া বিবেচনা করে, স্বয়ং জগধাম ভবানীপতি কৈলাসধাম হইতে অবতরণ করিয়া পৃথ্বীমণ্ডলে অবতীর্ণ হইয়াছেন। রাখালেরা তাঁহাকে দেখিয়া বিবেচনা করে, একটি ভয়ঙ্কর ব্রহ্মদৈত্য। স্ত্রীলোকদিগের বিশ্বাস, সন্ন্যাসী যমের দূত, জীবন্তসে প্রেরিত।

সপ্তাহকাল অতিবাহিত না হইতে হইতে সন্ন্যাসি সম্বন্ধে নানারূপ অদ্ভুত কথার আন্দোলন হইতে লাগিল। সুমিত্রা গোয়ালিনী স্বচক্ষে দৃষ্টি করিয়াছে—সুমিত্রা মিথ্যা কথা কহিবার লোক নয়—সন্ন্যাসী পার্বতীর ঘাট হইতে দুইটি কাঁচা মড়া আনয়ন করিয়া ভক্ষণ করিতেছে। শবদ্বয় সমুদয় উদরস্থ করিয়া চুলগুলি তেমাতা পথে ফেলিয়া রাখিয়াছিল, সুমিত্রা ঐ চুল অজ্ঞাতসারে পদ দ্বারা স্পর্শ করে। স্পর্শ করিবামাত্র তাহার কক্ষস্থ দুগ্ধ রুধির হইয়া প্রস্রবণরূপে ঊর্ধ্বে উঠিয়া গেল, পরিধেয় বসনখানি রক্তে ঢেউ খেলিতে লাগিল। দৈববলে শোণিত-সিক্ত বসনের অলৌকিক গুণ জন্মিল; সুমিত্রা এই বসন পরিধান করিয়া যে কার্য অনুষ্ঠান করে, তাহাতেই সফলতা প্রাপ্ত হয়। গোয়ালিনী ঘোল বিক্রয় করিতে যায়, লোকে দুধ বলিয়া গ্রহণ করে; গোয়ালিনী গরুর বাঁট ধোয়া নিরবচ্ছিন্ন কলসী কলসী জল দুধ বলিয়া পাড়ায় বিক্রয় করিতে লইয়া যায়, পাড়ার গিন্নীরা বলেন, সুমিত্রার দুধ যেন বটের আটা। রক্ত বস্ত্রাচ্ছাদিতা সুমিত্রা যাহা বাঞ্ছা করে তাহাই লাভ করে। আম্র-বৃক্ষের নিকট কাঁটাল চাহিল, আম্রবৃক্ষ রক্ত-বস্ত্রের ভয়ে স্বভাব অতিক্রম করিয়া কাঁটাল দিল; ভ্রমরার বিলে বাঁচ হইতেছে, শত শত লোক নৌকা, ডোঙ্গা, জাল, পলো, দুড়ে, ঘুনি লইয়া মাছ ধরিতেছে, একটি আঁশমাত্র কাহারও ভাগ্যে সংগ্রহ হইল না, সুমিত্রা রক্তবস্ত্র পরিধান পূর্বক বিলের উপকূলে দণ্ডায়মানা হইল, অমনি রুই, মিরগেল, কাতলা, কালবোস, শোল, বোল, বান, লাঠা লম্ফ দিয়া ডেঙ্গায় আসিয়া তাহার চরণতলে পতিত হইল; অনাবৃষ্টিতে সৃষ্টিনাশ হয়, ক্ষেত্র শুষ্ক হইয়া ফুটির মত ফাটিয়া যাইতেছে, জল জল করিয়া কৃষকগণের জীবন ওষ্ঠাগত, গাছপালা লতাপাতা পুড়ে ঝাঁই, একদিন কিংবা দুইদিন এরূপ থাকিলে প্রলয় উপস্থিত হইবে, সুমিত্রা রুধিরাক্তাম্বরে আবৃতা হইয়া মধুরস্বরে ফটিক জল, ফটিক জল বলিয়া আকাশকে সম্ভাষণ করিল, অমনি মুষলধারে বারি বর্ষিতে লাগিল, মুহূর্ত মধ্যে পুষ্করিণী খাল বিল ডোবা খানা জলে পরিপূর্ণ; চিরবন্ধ্যা বামলোচনা বাষ্পবারি-বিগলিত-লোচনে পরিশূন্য হৃদয়ে সন্তান সন্তান করিয়া অহর্নিশ দীর্ঘ-নিশ্বাসের সহিত রোদন করিতেছে, শোণিতার্দ্র বসনধারিনী সুমিত্রা সগৌরবে বলিলেন, "হতভাগিনি বন্ধ্যে! অচিরাৎ পুত্রবতী হও" সেই মুহূর্তে বন্ধ্যার প্রসব-বেদনা; জামাতা তনয়াকে ভালবাসে না; জননী সেজন্য যারপর নাই দুঃখিনী, চাল-পড়া, জলপড়া, মাচপোড়া, ক্ষীর, কলসীর জল, কালকাসুন্দ্যায় শেকড়, কন্যার বাম চরণের রেণু জামাইকে কত খাওয়াইলেন, বশীকরণ মন্ত্র যেখানে যাহা ছিল, সকলি অবলম্বন করিলেন, কিছুতেই কিছু হইল না, জামাই মেয়ের ছায়া মাড়ায় না, ঘরে আসে না, যদি আসে কথা হয় না, সুমিত্রা প্রদত্ত রক্তবসনের একগাছি সুতা জননী অতীব ভক্তিসহকারে তনয়ার কবরীতে বন্ধন

করিয়া দিলেন, নিশি অবসান না হইতে হইতেই জামাই কন্যাকে স্কন্ধে করিয়া রাজ-পথে পরিভ্রমণ করিতে লাগিল। সুমিত্রা সম্বন্ধে আর একটি অনৈসর্গিক ব্যাপার ঘটিয়াছিল, কিন্তু তাহার বয়স-দোষ বলিয়া সকলে সে ব্যাপার বিশ্বাস করিত না। সুমিত্রার দ্বাবিংশতি বৎসর বয়ঃক্রম, দ্বাদশ বৎসর বয়সে বিধবা, স্থূলাঙ্গী, দীর্ঘকলে-বরা, মস্তকে কাঞ্চনবরন চিকুর গোছা, শরীরে এত শক্তি যে দুই মণ দুগ্ধের কলসী অবলীলাক্রমে লীলার ঘটের ন্যায় বহন করে, কলহে কালভৈরবী, পরনিন্দায় বিশেষ পারদর্শিনী; সুমিত্রা সতী বলেই হউক, কিংবা তাহার কলহদক্ষতার ভয়েতেই হউক, তাহাকে লক্ষ্য করিয়া কেহ কখন কানাকানি করে নাই; প্রচার হইল সুমিত্রা শোণিতসিক্ত-বসনে আচ্ছাদিত হইয়া পবিত্র হৃদয়ে শোয়ার ঘরে মৃত স্বামীকে আহ্বান করে, স্বামী প্রেত-ভূমি পরিহার পুরঃসর উপস্থিত হইয়া সুমিত্রাকে দেখা দিয়া যায়। সুমিত্রা বলিল, সে তাহার পতিকে বিলক্ষণ চিনিতে পারিয়াছিল। কলঙ্কামোদী লোকেরা বলে সে পতির প্রতিনিধি মাত্র। যদি বর্তমান সময়ে এ অলৌকিক ব্যাপার উপস্থিত হইত, অভিনব সম্প্রদায় অম্লান-বদনে বলিতেন, সুমিত্রা বাহার দিবার জন্য ম্যাজেন্টার দ্বারা বসন ছোপাইয়াছিল।

দাসু ঘোষের বর্ষীয়সী জননী নিশীথ-সময়ে একাকিনী যূথভ্রষ্টা সদ্যঃ প্রসূতা গাভীর অনুসন্ধানে অশ্বত্থ মহীরুহের নিকট দিয়া গমন করিতে করিতে নিজনেত্রে নিরীক্ষণ করিয়াছে, সন্ন্যাসীর সমক্ষে শ্মশানবিহারী ভূতপ্রেতনী সসজ্জা সমাগত। সন্ন্যাসী দিবসে কোনো মনুষ্যের সহিত বাক্যালাপ করেন না; কিন্তু রজনীতে অভ্যাগত অপদেবতাদিগের সহিত ভড়-ভড় করিয়া কথা কহিতেছেন। যমরাজ গৃধিনী-যুগল প্রযোজিত অস্থি-পঞ্জর-শকটে শনৈঃ শনৈঃ শব্দে সন্ন্যাসীর নিকটে আগমন করিলেন। বক্রশ্মশ্রু মামদো-ভূত শকটের সারথি; উদ্বন্ধনে মৃত মানবের নাড়ী-ভুঁড়ীর বল্গা; সদ্যোনিহত বারবিলাসিনীর একা বেণী চাবুক; উজ্জ্বল আলেয়াদ্বয় দীপ; নবশিশু মুন্ডবিমন্ডিত মুক্তা-মালালংকৃত যুবরাজ মহারাজের সমভি-ব্যাহারে। সন্ন্যাসীর সম্মুখে যমরাজ কিয়ৎ-কাল দাঁড়াইয়া সন্ন্যাসীর আবক্ষে বিলম্বিত ধবলচামরবৎ শ্মশ্রু অবলোকন করিতে লাগিলেন; বাসনা—একবার তাহা হস্ত দ্বারা স্পর্শ করিয়া জন্ম সফল করেন। রাজার ভয়ঙ্কর ভঙ্গী দেখিয়া সন্ন্যাসীর বাঙনিষ্পত্তি রহিত; অনন্তর যমরাজ অদ্ভুত ভূতের ভাষায় বিড় বিড় করিয়া সন্ন্যাসীকে অভিবাদন করিলেন, সন্ন্যাসী অদ্ভুত ভূতের ভাষায় কতদূর পারদর্শী তাহা তিনিই বলিতে পারেন; দাসু ঘোষের মাতা অদ্ভুত ভূতের ভাষায় সম্পূর্ণানভিজ্ঞা; সুতরাং যমরাজের অভিবাদনমর্ম নরলোকে অপ্রকাশিত রহিল। সন্ন্যাসী রাজাকে আলিঙ্গন করিয়া বসিতে অনুমতি দিলেন। রাজা আসন গ্রহণ না করিয়া যুবরাজকে সন্ন্যাসীর সম্মুখে দিয়া কহিলেন, "হে ভূতকুলশিরোভূষণ মৃত্যুঞ্জয়-মুখ্যমন্ত্রি ব্রহ্ম-দৈত্য মহোদয়! এই আমার ঔরসজাত যুবরাজ, আমি একপ্রকার রাজকর্ম হইতে অবসর লইয়াছি, ইনিই এক্ষণে সমুদয় কর্ম সম্পাদন করিতেছেন, যুবরাজ সকল বিদ্যায় পণ্ডিত, লোকের সর্বনাশ করিতে বোধ হয় বাবাজীর মত দুটি নাই, আপনি কোল দিয়া বাবাজীর সম্মান বৃদ্ধি করুন।" সন্ন্যাসী যুবরাজকে কোল দিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "যুবরাজ, তোমার বয়স কত?"

যুবরাজ। আজ্ঞে, বাবা জানেন।

সন্ন্যাসী। তুমি তবে কি জান?

যুবরাজ। লোকের সর্বনাশ করিতে।

সন্ন্যাসী। তুমি কত দিবস রাজ্য করিতেছ?

যুবরাজ। আজ্ঞা, বাবা জানেন।

সন্ন্যাসী। তোমার বিবাহ হইয়াছে?

যুবরাজ। আজ্ঞা হাঁ।

সন্ন্যাসী। সেটা জানিলে কি প্রকারে?

যুবরাজ। বউ আছে।

সন্ন্যাসী। বউয়ের বয়স কত?

যুবরাজ। আজ্ঞে বাবা জানেন।

সন্ন্যাসী। তুমি জীবিত না মৃত?

যুবরাজ। জীবিত।

সন্ন্যাসী। প্রমাণ কি?

যুবরাজ। নিশিথে বাঁশী বাজিলে জননী আহার করেন না।

সন্ন্যাসী। তোমার হস্তে প্রত্যহ কত লোক ধ্বংস হয়?

যুবরাজ। আজ্ঞে বাবা জানেন।

যমরাজ। প্রভো, যুবরাজ শটকেতে কিঞ্চিৎ কম মজবুত, আঁতুড় ঘরে আরশুলায় বাবাজীর মস্তিষ্ক আহার করিয়া ফেলিয়াছিল।

সন্ন্যাসী। খোল পুরাইলে কি দিয়া?

যমরাজ। গোময়।

সন্ন্যাসী। সেই জন্যে এমন ঘুঁটে-বুদ্ধি।

যমরাজ। যুবরাজ ঘুঁটে-বুদ্ধি বটেন; কিন্তু বাবাজীর অসাধারণ সংহার-পাণ্ডিত্য, কত লোকের যে সর্বনাশ করিয়াছেন তাহার সংখ্যা অঙ্কবিদ্যায় নাই।

সন্ন্যাসী। দেখ যমরাজ, ভগবান মৃত্যু-ঞ্জয়ের কর্মই সংহার কিন্তু তাঁহার এমত অভিপ্রায় নহে, যে তাঁহার পরিচারকেরা কেহ অসঙ্গত সংহার করে; পৃথিবী মৃত্যুঞ্জয়ের কুসুমোদ্যান; তরুগুলি সজলজলদরুচি লতাপল্লবে অবিরত সুশোভিত থাকে, কুসুমকুল বিকশিত হইয়া সুশীতল-সমীরন সহকারে সৌরভবিতরণ দ্বারা সকলের চিত্ত-বিনোদন করে, এই তাঁহার ইচ্ছা; পরশ্রীকাতর, পাষন্ড, নির্দয়, নীচাত্মারা কাননের কোমলপত্র ছিন্ন করে, বসন্তা-নিলান্দোলিত মুকুল ভারাবনত লতিকার উচ্ছেদ করে, পরিমল-পরিপূর্ণ বিকাশোন্মুখ অথবা বিকশিত কুসুমসমূহ অবচয়ন করে, তাঁহার অভিপ্রায় নহে। এতদুদ্যান পরিষ্কার রাখিবার নিমিত্ত তোমাকে নিয়োজিত করিয়াছেন; যে সকল পাতা সময়ক্রমে শুষ্ক হইয়া বাত্যাঘাতে নিপাতিত হয়, যেসকল লতা দিন দিন রসহীন হইয়া স্বতঃই ধরাশায়ী হয়, যে সকল কুসুম কালসহকারে রসহীন সৌরভশূন্য এবং অসংলগ্নদান হইয়া ভূমিতে শায়িত হয়, তাহাই তুমি পৃথিবী হইতে স্থানান্তরিত করিবে। যমরাজ, তুমি উদ্যানের সংমার্জনী মাত্র। কিন্তু তুমি এমনি পাষন্ড, তোমার গন্ডমূর্খ যুবরাজ এমনি সর্বনাশা-মোদী তোমরা অল্পদিনের মধ্যেই এমন মনোহর উদ্যান ছারখার করিয়া তুলিয়াছ। তুমি ভাব, ভগবান ভোলা মহেশ্বর ভাংধুতুরায় নিশিযামিনী বিভোল, দূর প্রদেশের শাসন-প্রণালীর কোন সংবাদ রাখেন না, সেটি তোমার অতিশয় ভ্রম; তোমার দৌরাত্ম্য, তোমার যুবরাজের দুঃসহনীয় অত্যাচার, মৃত্যুঞ্জয়ের সম্পূর্ণ কর্ণগোচর হইয়াছে; সেই দন্ডেই তোমাকে পদচ্যুত করিতেছিলেন, কেবল তোমার বৃদ্ধা জননীর সকরুণ রোদনে আপাততঃ ক্ষান্ত হইয়াছেন। অকালমৃত্যুতে মৃত্যুঞ্জয় যারপরনাই অসন্তুষ্ট; আর তুমি এমনি অপরিণামদর্শী, অকালমৃত্যুই আজকাল তোমার প্রধান কর্ম। যদি তোমার জীবনে কিছুমাত্র ভয় থাকে, তবে অচিরাৎ অকালমৃত্যু হইতে বিরত হও, নচেৎ মৃত্যুঞ্জয়ের অনুমত্যনুসারে এক অষাঢ় দন্ডাঘাতে তোমাদের মুন্ডদ্বয় চূর্ণ করিয়া ফেলিব! কল্যপ্রাতে লোক দেখিবে দুটি দাঁড়-কাক মরিয়া রহিয়াছে।

যমরাজ। হে অমাত্যপ্রধান, অকৃতাপরাধে অকিঞ্চনের অবমাননা করিবেন না। আমার জানত কোন স্থানে অকালমৃত্যুর প্রাদুর্ভাব হয় নাই। আপনি প্রদেশের নাম ব্যক্ত করুন, আমি প্রতিবাদ করিতে অক্ষম হই, আমার জীবনান্ত করিবেন।

সন্ন্যাসী। যমরাজ, তুমি হস্তিমূর্খ; তোমার কান্ডজ্ঞান নাই। আমি জনসমাজ ভ্রমণ করিতে করিতে দেখিলাম, অকালমৃত্যু বীরদম্ভে বিহার করিতেছে, মর্মান্তিক শোকে লোকে অভিভূত,—বিচারালয়ে নবীন বিচার-পতির শোকে শূন্য আসন হাহাকার করিয়া রোদন করিতেছে, সংবাদপত্রের কার্যালয়ে তেজঃপুঞ্জ নবীন সম্পাদকের বিরহে লেখনী শুষ্ক জিহ্বায় অচেতন, নাট্যশালা নাটকা-ভিনয়প্রিয় নবীন পালকের অকালমৃত্যুতে ম্রিয়মাণ হইয়া রহিয়াছে, মহাভারত নবীন অনুবাদকের অভাবে লুপ্তপ্রায়। যমরাজ, তোমার নূতন লেখনীর শতশত উদাহরণ দিতে পারি, তুমি কি সাহসে অপবাদের প্রতিবাদ করতে উদ্যত, অস্মদের কিছুমাত্র বোধগম্য হয় না; তুমি যুবক নিধন করিয়া ক্ষান্ত নও; তুমি শোকের উপর শূল সন্ধান করিয়াছ; যেসকল মানবের জীবন-পাট্টার মেয়াদ অন্ত হইয়াছে, তাহাদিগের উচ্ছেদ কর নাই, সুতরাং তাহারা পুনরায় জীবন আরম্ভ করিয়া হাস্যাস্পদ হইতেছে,—মীনহট্ট নামে বারমহিলা পল্লীতে দেখিলাম, একজন অশীতি-বৎসরের বৃদ্ধ টাকপড়া মস্তকে জরির টুপি দিয়াছেন, দাড়ীর দৌরাত্ম্যে সকালে বৈকালে নাপিতের আশ্রয় লওয়া হয়, গোঁপে কলপ, পরিধানে কালাপেড়ে ধুতি, অঙ্গে জামদানের পিরান, ঢাকাই উড়ানীখানি কোঁচাইয়া স্কন্ধে ফেলা, পায়ে কারপেটি জুতা, কোমরে সোনার গোট, গোট হইতে

সোনার চাবিশিকলি লম্বমান, মাসশূন্য অঙ্গুলে হীরক অঙ্গুরী, হাতে একগাছি একপাব বেত, গলায় গড়ে, মালা, দন্তে গোলাপী মিসি। বৃদ্ধ জনৈক নবীনা বারাঙ্গনাকে দেখিয়া যেমন দন্ত বিস্তার করিয়া হাসিলেন, স্বৈরিণী অমনি একটি কুসুমগোছা তাঁহার দন্তোপরে নিক্ষেপ করিল, আর দন্তগুলি ঝরঝর্ করিয়া ভূমে পড়িয়া গেল—দাঁতগুলি কৃত্রিম।

রাজীবলোচন মুখোপাধ্যায়ের পরলোকযাত্রার সকল উদ্যোগ,—তাহার পুত্রেরা তাহার শ্রাদ্ধের নিমিত্ত কাষ্ঠ তন্ডুল তৈলবস্ত্রাদি সকল সংগ্রহ করিয়াছিল, রূপার ষোড়শ পর্যন্ত প্রস্তুত। রাজীব মরিতে অসম্মত, মরণের পরিবর্তে পরিণয়ের জন্য ব্যাকুল; অনেক অনুসন্ধানের পর তাহার কানিষ্ঠ পুত্রের কেলিকুঞ্চিকা কন্যার সহিত উদ্বাহ সম্পন্ন হইল। পাত্রটি যদিও শ্মশানের ফেরত, তথাপি শ্বশুর রীতিমত বরসজ্জা দিতে কৃপণতা করেন নাই। বরসজ্জার ভিতর একটি রূপার ষোড়শ ছিল। শ্বশুরের অবস্থা এমত নহে যে তিনি রূপার বরসজ্জা দেন, কিন্তু রাজীব শ্বশুরের মুখোজ্জ্বলহেতু তাহার পুত্রদিগের প্রস্তুত রূপার ষোড়শ শ্বশুরকে গোপনে দিয়া বলিয়া দিয়াছিল, রূপার ষোড়ষটি বরসজ্জা বলিয়া দান করিবেন। রাজীবলোচন অদ্যাপি জীবিত; কিন্তু মুমূর্ষু। মৃত্যুশয্যায় শয়ন করিয়া অষ্টপ্রহর কেবল নববিবাহিতা বনিতার অলকায় দোল দিতেছে।

যমরাজ এই কি তোমার শাসনপ্রণালী? এই কি তোমার দয়া-নিধান গম্ভীরস্বভাব মৃত্যুঞ্জয়ের উদ্দেশ্য সাধন করা? তুমি অতিশয় নিষ্ঠুর, মূঢ়, পামর অকর্মন্য। তুমি যদি এবম্বিধ বিবিধ অহিতাচারের সন্তোষজনক কারণ দর্শাইতে না পার, এই দন্ডে তোমাকে পদচ্যুত করিয়া যমদন্ড অপরের হস্তে অর্পণ করিব।

যুবরাজ। ব্রহ্মদৈত্য মহাশয়, পিতা মহাশয়ের কোন অপরাধ নহে, যে সকল দুর্ঘটনা বর্ণন করিলেন, তাহা ভুলক্রমে ঘটিয়া গিয়াছে।

সন্ন্যাসী। কাহার ভুল?

যুবরাজ। বাণের ভুল।

যমরাজ। বাবা যুবরাজ, বিশেষ করিয়া ভ্রমের বিবরণ ব্যক্ত কর।

যুবরাজ। একদিন সমস্তদিন স্বকার্য সাধনানন্তর সন্ধ্যাকালে শমনবাণটি মহাদেবের মন্দিরের পশ্চাৎ শিমূল গাছের ডালে ঝুলাইয়া এক ডালে মাথা এক ডালে পা রাখিয়া শয়ন করিলাম। কিঞ্চিৎ পরে কন্দর্প কাকা সেখানে উপস্থিত হইলেন, তিনিও শ্রান্ত, আর গমন না করিয়া ঐ গাছের তলে ফুলবাণটি ঝুলাইয়া নিকটস্থ একটি শিমূল ফুলের কলিকায় শয়ন করিলেন। নিশি অবসান। হাড়ীচাঁচা, শকুনি, পেচক কলরব করিতেছে, চাষারা মরা গরু লইয়া ভাগাড়ে ফেলিতে যাইতেছে, ঠাকুরদাদা মহাশয় গাত্রোত্থান করিয়াছেন, রথ প্রস্তুত, গমনের আর বিলম্ব নাই, আমার এবং কন্দর্পকাকার তখনও ঘুম ভাঙে নাই। হঠাৎ ঠাকুরদাদার রথচক্র-আভা আমাদিগের অঙ্গে লাগিল। আমারা ধড়মড় করিয়া উঠিয়া প্রস্থান করিলাম। তাড়াতাড়িতে শমনবাণের সহিত ফুলবাণের বিনিময় হইয়া গেল। সেইদিন হইতে পৃথিবীতে মহাবিভ্রাট। কন্দর্পকাকা যুবক যুবতী দেখিয়া বাণ নিক্ষেপ করেন, আর তাহারা তদ্দণ্ডে পঞ্চত্ব প্রাপ্ত হয়, আমি মৃত্যুঞ্জয়ের অভিপ্রায়ানুসারে বৃদ্ধদিগের প্রতি শরসন্ধান করি, কিন্তু তাহারা না মরিয়া শুষ্ককাষ্ঠে কাঁচ পাতার ন্যায় অপ্সরা মনোরঞ্জন বেশবিন্যাস করে।

সন্ন্যাসী। বাণ বদল করিয়া লইয়াছ?

যুবরাজ। আজ্ঞে না, কন্দর্প কাকার দেখা পাচ্ছি না।

সন্ন্যাসী। তুমি অদ্য শিমূল বৃক্ষে ফুলবান লইয়া অবস্থান কর, আমি কন্দর্পকে শমনবাণ লইয়া সেখানে আসিতে আহ্বান করি, কন্দর্প আগত হইলে বাণের বিনিময় করিয়া লইবে।

যমরাজ এবং তাহার অকালকুষ্মাণ্ড যুবরাজ "যে আজ্ঞা" বলিয়া প্রস্থান করিল। দামু ঘোষের মাতা গাভী অনুসন্ধানে অগ্রসর হইতে আর সাহসী হইল না, দ্রুতপদে ভবনে প্রত্যাগমনপূর্বক সমুদায় বৃত্তান্ত প্রতিবেশীদিগের নিকটে ব্যক্ত করিল। তদবধি গ্রামের জনপ্রাণী শিমূলবৃক্ষের নিকট যায় না।

একদিন সন্ন্যাসী নয়ন মুদ্রিত করিয়া ধ্যানে নিমগ্ন আছেন এমন সময়ে রাখালরা অশ্বত্থ বৃক্ষের তলায় সমবেত হইয়া সন্ন্যাসীর শ্বেতশ্মশ্রু আবৃত মুখ অবলোকন করিতে লাগিল। একজন সিদ্ধান্ত করিল, সন্ন্যাসীর হাঁ নাই; একজন বলিল, সন্ন্যাসীর জটার ভিতর কেউটে সাপ রক্ষিত; একজন সন্ন্যাসীর মস্তকে একটি সপল্লব আম্রশাখা নিক্ষেপ করিল; একজন পাঁচনি দ্বারা সন্ন্যাসীর পৃষ্ঠে ধীরে ধীরে খোঁচা দিল; সহসা সন্ন্যাসী একটি হাই তুলিলেন, আর গালের প্রকাণ্ড গহবর রাখালদিগের নয়নগোচর হইল, অমনি তাহারা দৌড়াইয়া দূরে পলায়নপরায়ণ হইল। সন্ন্যাসী পুনর্বার ধ্যানে নিমগ্ন, রাখালেরা আবার ক্রমে ক্রমে সন্ন্যাসীর নিকটবর্তী। সন্ন্যাসীর ঝুলির দিকে দৃষ্টিপাত করিয়া দেখে, ঝুলির ভিতর হইতে কয়েকটি শিশু মস্তক উত্তোলন করিয়া রহিয়াছে, শিশুদিগের গলায় তামার মাদুলি, মস্তকে কেশবিন্যাস করিয়া ঝুঁটিবাঁধা, তাহাতে সোনার পুঁটে, কর্ণে কুন্ডল। এই ভয়ঙ্কর দৃশ্য রাখালদিগকে যারপরনাই ভীত করিল, তাহারা কিছুমাত্র বিলম্ব না করিয়া গ্রামের ভিতর গিয়া সকলকে জানাইল, সন্ন্যাসী ছেলেধরা, অনেক ছেলে ধরিয়া ঝুলির ভিতর রাখিয়াছে। গ্রামের লোক অমনি সতর্ক হইল, শিশুদিগের আর বাড়ীর বাহির হইতে দেয় না, রাত্রিতে কেহ দ্বারোদ্ঘাটন করে না।

এইরূপে কতিপয় দিবস অতিবাহিত হইলে একদিন মধ্যাহ্ন সময় প্রখরপ্রভাকর করনিকরে অবনীদগ্ধবৎ পুষ্করিণীর নীর সীতাকুন্ডোদকাপেক্ষাও উষ্ণ, দুঃসহ আতপতাপিত গাভীকুল প্রান্তরস্থ কদম্ব তলে শয়ন করিয়া রোমন্থনে নিযুক্ত কৃষকেরা প্রান্তরের প্রান্তভাগে আম্রকাননে উপবিষ্ট হইয়া গৃহিণী-প্রেরিত পান্তাভাত কাঁচ নেবু-রস সহযোগে ভক্ষণ করিতেছে শুষ্ককণ্ঠে জল প্রার্থনা করিতে কারে চাতকিনীর কন্ঠরোধ, বিজাতীয় রৌদ্র কাহার সাধ্য তাহার দিকে চাহিয়া দেখে এমন সময় মহাদেবের মন্দির হইতে সপ্ত স্বরে চীৎকার শব্দ আসিতে লাগিল "কে কোথা হে গ্রামের লোক, ত্বরায় মন্দিরে আইস, পামর সন্ন্যাসী আমাকে অগ্নিদ্বারা দগ্ধ করিতেছে, সন্ন্যাসীর হস্ত হইতে আমাকে রক্ষা কর।" কৃষকেরা, রাখালেরা গ্রামের অপরাপর লোকেরা অতিশয় ব্যস্তত সহকারে মন্দিরে আসিয়া দেখে, সন্ন্যাসী এক অগ্নিচক্র করিয়া তাহার মধ্যে উপবিষ্ট হইয়া চীৎকার করিতেছে, কারণ জিজ্ঞাসা কারে কথা হয় না। সকলে ভৌতিক ব্যাপার বিবে চনায় প্রত্যাবর্তন করিল। পরদিবস সন্ন্যাসী ঐরূপ অগ্নি জ্বালিয়া চীৎকার করিতে লাগিল। অনেক লোক চীৎকার শুনিয়া আগত হইল এবং ভৌতিক ব্যাপার বিবে চনায় ফিরিয়া গেল। সন্ন্যাসী প্রত্যহ এইরূপ করে কিন্তু গ্রামস্থ লোক ক্রমে চীৎকার শুনিয়া তথায় আসা রহিত করিল। ঐরূপ চীৎকার শব্দ লোকের কর্ণে প্রবেশ কর কিন্তু তাহারা বলে, "সেই পাগল সন্ন্যাসী রোদন করিতেছে, সেখানে যাইবার প্রয়োজন নাই।"

এইরূপে কিছুকাল গত হইলে সন্ন্যাসী একদিন বড় বড় কাষ্ঠের কুঁদা, স্তূপাকার শুষ্ক গোময় এবং বিচালি আহরণ করিল যখন দেখিল কেহই কোথাও নাই, মহেশ্বরের অঙ্গ আবরণ করিয়া সেই সমুদয় পা সাজানোর ন্যায় সাজাইয়া তাহাতে অগ্নি প্রদানপূর্বক কুলা দ্বারা বায়ু সঞ্চালন করিতে লাগিল। অল্পক্ষণের মধ্যে দাবানল তুল্য ভীষণানল প্রজ্বলিত, কর্মকারাগ্নি কুন্ড-দগ্ধ লৌহবৎ পার্বতীনাথের প্রস্তরাঙ্গ পরিতপ্ত, সমৃদ্ধিশালী অনল-জ্বালা সহ করিতে নিতান্ত অক্ষম মহাদেব অতী কাতরতাসহকারে উচ্চৈঃস্বরে রোদন করিতে লাগিলেন, 'কে কোথা হে গ্রামের লোক ত্বরায় মন্দিরে আইস, পামর সন্ন্যাসী আমাকে অনলে দগ্ধ করিয়া মারিতেছে, তাহার হস্ত হইতে আমাকে রক্ষা কর।' গ্রামের লোক প্রত্যহ এইরূপ রোদনধ্বনি শুনিতে পাই বলিয়া এবং প্রত্যহই পাগল সন্ন্যাসী ভৌতিক ব্যাপার বলিয়া তৎপ্রতি মনোযো করিত না, অদ্যও সকলে সেই ব্যাপার বি করিয়া কেহই মন্দিরের নিকট আগমন করি না, মহাদেব নির্জনে নির্বিঘ্নে দগ্ধ হই লাগিল। প্রদোষকাল উপস্থিত, কাঞ্চনকা সূর্যমন্ডল দূরস্থ আম্রকাননাভ্যন্তরে নিম বিচরণানন্তর বিহঙ্গমকুল কুলায়ে গ করিতেছে, গাভীদল দ্রুতপদে ভব প্রত্যাগত, ব্রাহ্মণেরা ঘাটে কষ্ঠোপরি উপবি হইয়া সন্ধ্যা করিতেছে, বামাকুল পরিধ বসন পরিত্যাগপূর্বক পবিত্র হৃদয়ে গোল

গোয়াল ঘরে, তুলসী পিঁড়িতে দীপ দেখাই-তেছে। এমন সময় প্রবল হুতাশনে মহাদেবের মস্তক দ্বিধা হইয়া গেল, আর মুর্দ্ধদেশ নিহিত স্পর্শমণি ছিটকাইয়া সমীপস্থ জলোপরে নিপতিত হইল। তদ্দণ্ডে সে স্থলে একটি হ্রদোৎপাদিত এবং স্পর্শমণি সেই হ্রদ মধ্যে লুক্কায়িত হইয়া গেল।

সন্ন্যাসীর হর্ষে বিষাদ। যে স্পর্শমণি প্রাপ্তাভিলাষে তিনি নানা দেশ পর্যটন করিয়া মন্দিরের সমীপস্থ অশ্বত্থমূলে অনাহারে কাল যাপন করিতেছিলেন, সেই স্পর্শমণি বাহির হইল, কিন্তু বাহির হইয়াই গভীর হ্রদমধ্যে নিমগ্ন। মহাদেবের শিরোমধ্যে নিহিত থাকায় স্পর্শমণি যেমন দুষ্প্রাপ্য ছিল, হ্রদমধ্যে নিমগ্ন হওয়ায় সে দুষ্প্রাপ্যতার খর্বতা হইল না। তবে স্পর্শমণি সন্ন্যাসীর নয়নগোচর হইয়াছিল, তাহাতেই তাঁহার আয়াসের কিয়দংশ সাফল্য জন্মে। সন্ন্যাসী বিলক্ষণ জানিতেন, অধ্যবসায়ের ফল সফলতা। তিনি কিছুমাত্র বিলম্ব না করিয়া একাগ্রচিত্তে সেই সদ্যোৎপাদিত হ্রদের জল সিঞ্চন করিতে লাগিলেন, এবং রাত্রি প্রভাত না হইতে হইতে সমুদায় জল হ্রদচ্যুত হওয়ায় স্পর্শমণি প্রভাত-সূর্যের ন্যায় হ্রদগর্ভে দীপ্তিমান হইল, সন্ন্যাসী পরমানন্দে স্পর্শমণি উত্তোলন-পূর্বক কক্ষস্থ ঝুলিতে রক্ষা করিয়া গ্রামস্থ লোকেরা জাগ্রত হইবার অগ্রেই উত্তরাভিমুখে প্রস্থান করিলেন।

ধীরেন্দ্রকিশোর রায়চৌধুরী

হাফিজ আলী খাঁ সাহেবের স্বর্গতা প্রথমা পত্নী ছিলেন রামপুরে নবাবের সভাসদ ও বরস্য মুন্নন খাঁ দুহিতা। হাফিজ আলীর জ্যেষ্ঠ পুত্র মোবারক আলী খাঁ মুন্নন খাঁর কন্যার একমাত্র পুত্র; ইনি গোয়ালিয়রে মাধবরাও কলেজের যন্ত্রসংগীত অধ্যাপক। কোলকাতাবাসীরা তাঁকে চেনেন না। অধুনা বিখ্যাত উদীয়মান সরোদ শিল্পী আমজাদ আলী হাফিজ আলী খাঁ সাহেবের দ্বিতীয় পক্ষের পুত্র। যা হোক হাফিজ আলী প্রথম বিবাহের পরেই তরুণ বয়সে রামপুরে যাতায়াত করতেন। শ্বশুর মুন্নন খাঁর গৃহে তাঁর আমন্ত্রণ লেগেই থাকতো; এভাবে কিছুকাল অতিবাহিত হবার পর মুন্নন খাঁ একদিন হাফিজ আলীকে রামপুর নবাবের নৈশ সংগীত দরবারে নিয়ে যান এবং তাঁর সরোদবাদনের ব্যবস্থা করেন। ঐ সময়ে হাফিজ আলী পিতা নান্নে খাঁর শূন্যপদ গোয়ালিয়র দরবারে লাভ করেছিলেন। তিনি তখন পিতা ও জ্যেষ্ঠ ভ্রাতার (আসগর আলী) শিক্ষা অনুযায়ী সরোদ বাজাতেন। তাছাড়া গণপতিপ্রসাদের নিকটে প্রাপ্ত বহু রাগ-রাগিণীও আয়ত্ত করেছিলেন। রামপুর নবাব হামিদ আলী খাঁ হাফিজ আলীর সরোদে বাঁ-হাতের নখের টিপে অপূর্ব স্বর-লালিত্য লক্ষ্য করে সবিশেষ সন্তোষ প্রকাশ করেছিলেন। তখন মুন্নন খাঁ নবাবের নিকট প্রার্থনা করেন যে উজির খাঁ সাহেবের নিকট হাফিজ আলীর শিক্ষার ব্যবস্থা করা হোক।

পূর্ব লিখিত ঘটনাটির সময় আনুমানিক ১৯২০ খৃষ্টাব্দ। ঐ সময়ে রামপুর দরবারের কলাকারেরা সেখানকার দুইজন স্বনামধন্য সংগীতগুরুর অধীনে দুই ভাগে বিভক্ত হয়ে পড়েছিলেন। ভারতের দুই শ্রেষ্ঠ কলাকার তখন রামপুরে প্রতিষ্ঠিত। একজন ভারতবিখ্যাত সংগীতনায়ক উজির খাঁ যিনি ছিলেন নবাবের গুরু ও অপরজন নবাবের নিকটতম জ্ঞাতি ছম্মান সাহেব (সাদত আলী খাঁ) যিনি ছিলেন রামপুর রাজ্যের স্বরাষ্ট্র বিভাগের মন্ত্রী ও ভারতের অপর শীর্ষস্থানীয় সংগীত বিদ্বান ও কলাকার। উজির খাঁ ছম্মান সাহেব অপেক্ষা বয়সে অনেক বড় ছিলেন এবং তাই কৈশোর ও প্রথম যৌবনে তাঁর পিতা আমীর খাঁ, (বীণকার) মাতামহ বাহাদুর হোসেন খাঁ রবাবী ও বড়কু মিয়াঁ রবাবীর নিকট বীণা, সুরশৃঙ্গার প্রভৃতি যন্ত্র ও ধ্রুপদ, ধামার প্রভৃতি শিক্ষার সুযোগ পেয়েছিলেন। তথাপি একথাও সত্য যে ছম্মান সাহেবের পিতা নবাব হায়দর আলী খাঁ নিজ জ্যেষ্ঠ পুত্রের ন্যায় পিতৃহারা উজির খাঁ সাহেবকে আশ্রয় দিয়েছিলেন এবং উজির খাঁর প্রথম জীবনের সংগীতসাধনা সিদ্ধির পথে আনয়নে বিশেষ সহায়ক হয়েছিলেন। পক্ষান্তরে ছম্মান সাহেব পিতা হায়দর আলীর নিকটেই সুরশৃঙ্গার, বীণা এবং ধ্রুপদ-ধামারের সর্বাঙ্গীন শিক্ষা লাভ করেছিলেন। মহম্মদ আলী খাঁ সাহেব আমাকে নিজে বলেছিলেন, কোনও সেনী গুরুর নিকট আনুষ্ঠানিকভাবে দীক্ষা গ্রহণের উদ্দেশ্যেই ছম্মান সাহেব তাঁকে রামপুরে সর্বপ্রথম আমন্ত্রণ করে আনেন। তখন হায়দর আলী খাঁ সাহেব জীবিত ছিলেন; পুত্রের শিক্ষা পরিসমাপ্ত করে তিনি এই ধার্মিক অনুষ্ঠানের আয়োজন করেন। মহম্মদ আলী বলেছেন যে, ছম্মান সাহেবকে শিক্ষা দেবার বিশেষ কিছুই তাঁর ছিল না। মহম্মদ আলী রবাবে সিদ্ধহস্ত ছিলেন এবং ছম্মান সাহেব অধিকাংশ সময়েই সুরশৃঙ্গার বাজাতেন; উভয়ের মধ্যে এই পার্থক্য মাত্র ছিল। তবে উজির খাঁ বীণকার হয়েও যেমন রবাব, সুরশৃঙ্গার বাজাতেন,—তেমনই ছম্মান সাহেব সুরশৃঙ্গার বাদক হলেও বীণাযন্ত্রে যথেষ্ট কৃতী ছিলেন। উভয়ে একই দরবারে প্রতিষ্ঠা লাভ করেন। পণ্ডিত ভাতখণ্ডেজীও উভয়েরই প্রশংসায় অকুণ্ঠিত ছিলেন। পণ্ডিতজী একথাও তাঁর গ্রন্থে লিখেছেন যে, হিন্দুস্থানী সংগীতের যথার্থ মর্ম তাঁর নিকট উদ্ঘাটিত হয়েছিল—যখন তিনি ছম্মান সাহেব ও উজির খাঁর শিক্ষা রামপুরে গিয়ে অধিগত করেন।

কলাবিদ্যার ক্ষেত্রেও যে রাজনীতি প্রবেশ করে, এর উদাহরণ আমরা রামপুরেই পেয়েছি। নবাব হায়দর আলীর মৃত্যুর পর রামপুরের এই দুই সিদ্ধ কলাকারের মধ্যে বিলক্ষণ প্রতিযোগিতার উদ্ভব হয়; যদিও নবাব বাহাদুর এই দরবারের একমাত্র পৃষ্ঠপোষক ছিলেন, তথাপি তাঁর বৃত্তিভোগী ওস্তাদদের মধ্যে একটি প্রধান দল উজির খাঁ সাহেবকে গুরুরূপে বরণ করে তাঁকেই শ্রেষ্ঠ কলাকাররূপে ঘোষণা করতেন। পক্ষান্তরে অপর দল নবাব ছম্মান সাহেবের নিকটে দীক্ষিত হয়ে ছম্মান সাহেবকেই সংগীত-জগতের শ্রেষ্ঠ নায়ক বলে কীর্তন করতেন। সংগীতের ক্ষেত্রে এই প্রতিযোগিতা সত্ত্বেও দরবারে ও নানা সামাজিক অনুষ্ঠানে ছম্মান সাহেবের সংগে উজির খাঁর মিলন মিশ্রণ সর্বদাই লেগে থাকত। একদিন উজির খাঁ ছম্মান সাহেবকে বললেন : 'তোমার সুরশৃঙ্গারযন্ত্র একটি সুরেলা পেশাদার ছেলের কাঁধে চড়িয়ে ছ-মাসের মধ্যে তাকে দরবারে বাজাবার উপযুক্ত করে তুলতে আমি পারি।' ছম্মান সাহেবও তৎক্ষণাৎ প্রত্যুত্তরে বললেন : 'খাঁসাহেব আপনার বংশকৃত বীণাযন্ত্র আমিও ছ' মাসের মধ্যে শিখিয়ে-পড়িয়ে কোনও পেশাদার ছোকরার দ্বারা নবাবের দরবারে বাজিয়ে শোনাবার ব্যবস্থা করবো।'

শিষ্য গঠন সম্পর্কে নবাব ছম্মান সাহেব ও সংগীতগুরু উজির খাঁ সাহেবের প্রতিযোগিতার উপলক্ষে অনেক কলাকার সেনী-সংগীত শেখবার সুযোগ লাভ করেছেন। এঁদের মধ্যে বাংলার গিরিজাবাবু ছিলেন ছম্মান সাহেবের শিষ্য, বাংলার আলাউদ্দিন উজির খাঁ সাহেবের শিষ্য; কোন কোন গুণী দুই দরবারেই শিক্ষার সুযোগ করে নিতেন। যথা—কলকাতারখ্যাত ওস্তাদ মেহেদী হোসেন খাঁ। কিন্তু বীণা ও সুরশৃঙ্গারের শিষ্য গঠন সম্পর্কে প্রতিযোগিতায় লাভবান হলেন ওস্তাদ সেলামৎ হোসেন খাঁ যিনি বর্তমানে দিল্লী রেডিওর সংগীত-তত্ত্বাবধায়ক এবং ওস্তাদ হাফিজ আলী খাঁ যাঁর তুল্য সুরেলা সরোদী বর্তমান যুগে বিরল। মুন্নন খাঁ সাহেব কর্তৃক অনুষ্ঠিত রামপুর দরবারে হাফিজ আলীর সরোদবাদনের পর নবাব হামিদ আলী খাঁ হাফিজ আলীর প্রতি বিশেষ আকৃষ্ট হন। রামপুর পরিবারের অন্দরমহলের প্রভাবও নবাব বাহাদুরের হাফিজ আলী-প্রীতির জন্য অনেক পরিমাণে দায়ী। ফলে নবাব স্বয়ং উজির খাঁকে

অনুরোধ করলেন যে, সুরশৃঙ্গারের কোনও শিষ্য তৈরী করতে হলে হাফিজ আলীকেই মনোনীত করা সংগত। উজির খাঁও হাফিজ আলীর প্রতি বিশেষ স্নেহ পোষণ করতে লাগলেন এবং সুরশৃঙ্গারযন্ত্রে তাঁকে দীক্ষা দিলেন। কথা হলো এই যে, তিনি ছ মাসের মধ্যে দরবারী কানাড়া, ইমন-কল্যাণ, তিলক-কামোদ ও গৌড়সারং এই চার রাগের ক্রিয়াঙ্গ হাফিজ আলীর হাতে সুরশৃঙ্গার যন্ত্রে তুলে দেবেন এবং ছ-মাস পরে দরবারে নবাবের সামনে হাফিজ আলী এই চারটি রাগ সুরশৃঙ্গারে বাজাবেন। হাফিজ আলীর দীক্ষা গ্রহণের বিবরণ জানতে পেয়েই নবাব ছম্মান সাহেব ওস্তাদ আহমেদ আলী সরোদীর ভাগিনেয় কিশোরবয়স্ক সেলামৎ হোসেনকে ডেকে পাঠালেন। কয়েক মাস পূর্বে আহমেদ আলীর দেহান্ত ঘটে। তিনি মুক্তাগাছা ও মহারাজ দিনাজপুরের বৃত্তিভোগী ছিলেন এবং অধিকাংশ সময় দিনাজপুরে ও মুক্তাগাছায় থাকতেন। সেলামৎ আবাল্য দিনাজপুরেই বর্ধিত; তিনি সেখানকার বিদ্যালয়ে পড়াশুনা করতেন ও মাতুল ও মাতামহের নিকট গান ও সেতার শিখতেন। এই দুই অভিভাবকের মৃত্যুর পর সেলামৎ দিনাজপুর ছেড়ে রামপুরে নিজ পৈতৃক ভবনে ফিরে যান। আধুনিক শিক্ষায় শিক্ষিত ওস্তাদবংশীয় তরুণ গুণীদের প্রতি ছম্মান সাহেবের এক অহেতুক কৃপা ছিল। তিনি সেলামৎকে ডেকে বললেন : 'তোমার অভিভাবকদের অভাবে আমি তোমার খরচপত্র চালাবো ও সংগীতশিক্ষা দেব ; তুমি লেখাপড়া শিখেছ; বিদ্যালয়ে অধ্যয়নের আর প্রয়োজন নেই। আমি তোমাকে সংগীতবিদ্যা শিখাবো, তবে আমার কথামত চলতে হবে এবং বীণাযন্ত্রের বাদনপ্রণালী শিখতে হবে। আমি ছ-মাসের মধ্যেই নবাবের সামনে তোমার বীণা বাজাবার ব্যবস্থা করবো। ছ-মাসে চারটি রাগ শিখতে হবে; যথা— ভৈরোঁ, দরবারী কানাড়া, তিলককামোদ ও গৌড়সারং।' সেলামৎ সবিস্ময়ে ছম্মান সাহেবের আদেশ শুনে তাঁর কথা শিরোধার্য করলেন এবং তাঁর নির্দেশে বীণাযন্ত্র সাধনে অগ্রসর হলেন।

ছ-মাসকাল অতীত হওয়ার পর দেখা গেল যে, উজির খাঁ ও ছম্মান সাহেব উভয়েই তাঁদের প্রতিশ্রুতি কার্যকরী করতে পেরেছেন। কেননা নবাব বাহাদুরের সামনে হাফিজ আলী সুরশৃঙ্গার যন্ত্র সেনী-পদ্ধতি অনুযায়ী সাবলীলভাবে বাজাতে পারলেন। তাঁর অধিগত চারটি রাগের চলনও নিখুঁতভাবে পরিবেশিত হলো। তারপর সেলামৎ হোসেনও ছম্মান সাহেবের অনুষ্ঠিত সভায় নবাব বাহাদুরের কাছে বীণাযন্ত্রে চারটি রাগের আলাপ বাজালেন। সেলামতের বাজনাও সম্পূর্ণ শাস্ত্রসংগত হয়েছিল। এই ঘটনার কিছুকাল পর ওস্তাদ হাফিজ আলী খাঁ সাহেব একদিন উজির খাঁর চরণপ্রান্তে উপনীত হয়ে বললেন যে, সুরশৃঙ্গারে দীক্ষাদানের সময় উজির খাঁ যে সকল শপথ-বাক্য হাফিজ আলীকে পালন করতে বলেছিলেন, তা সম্পূর্ণভাবে অনুসরণ ভবিষ্যৎ জীবনে হাফিজ আলীর পক্ষে কঠিন হয়ে পড়বে। উজির খাঁর শপথ-বাক্যগুলির মধ্যে একটি প্রধান বিষয় ছিল এই যে, সুরশৃঙ্গার একপ্রকার রুদ্রবীণা ও মহাদেবের যন্ত্র; পেশাদার বাইজী বা নর্তকীদের আসরে এবং সুরাসেবনের আবহাওয়ায়ও ঐ যন্ত্র বাদন নিষিদ্ধ। হাফিজ আলী বললেন যে, সংগীতই তাঁর পেশা এবং গোয়ালিয়র দরবার বা অন্যত্র পেশাদারী আবহাওয়ায় যদি সুরশৃঙ্গার বাদনের উপযুক্ত আচার-নিয়ম রক্ষায় তিনি অসমর্থ হন, তবে তিনি পাপের ভাগী হয়ে পড়বেন। সুতরাং গুরুর নিকট ক্ষমা চেয়ে হাফিজ আলী সুরশৃঙ্গার যন্ত্রটি খাঁ সাহেবের পায়ের কাছে উৎসর্গ করলেন। উজির খাঁও সকল বিষয় বুঝতে পেরে হাফিজ আলীকে বললেন, আমি যা শিখিয়েছি, তা সরোদেই বাজাও, তাহলে নিয়ম-নিষ্ঠার বিধিনিষেধ রক্ষার প্রয়োজন হবে না। এর পর থেকে হাফিজ আলী গুরুর আশীর্বাদী সুরশৃঙ্গারটি ঘরে সাজিয়ে রেখেছেন, কিন্তু নিজে তাঁর সরোদ-যন্ত্রেই সবকিছু বিদ্যা প্রকাশ করে এসেছেন। উজির খাঁ এর পরেও হাফিজ আলীকে যথেষ্ট শিখিয়েছেন কণ্ঠে ও সরোদযন্ত্রে। এই একই সময়েই সেলামতের সাংগীতিক অগ্রগতির পথ পরিবর্তন হয়। একদিন নবাবের দরবার শেষ হলে উজির খাঁ ও ছম্মান সাহেব একই সঙ্গে দরবার গৃহ হতে নিচে অবতরণের সময় একটি একান্ত আলোচনার প্রসঙ্গ তোলেন। উজির খাঁ ছম্মান সাহেবকে বললেন, 'হাফিজ আলী মহাদেবের যন্ত্র রুদ্রবীণ বা সুরশৃঙ্গার বাজাতে আর ভরসা পাচ্ছে না। এই যন্ত্র বাজাবার নিয়ম-কানুন রক্ষা করা পেশাদারী জীবনে অত্যন্ত কঠিন। আমার অনুমতি নিয়ে সে আবার সরোদ ধরেছে। এখন আপনিও সরস্বতী মাতা বীণযন্ত্র পেশাদার ঘরের ছোকরাকে শেখানো বন্ধ করুন।' ছম্মান সাহেব উজির খাঁর এই অনুরোধ মেনে নিলেন। তিনি সেলামৎকে ডেকে বললেন, 'যে কারণে হাফিজ আলী সুরশৃঙ্গার বাজাতে সাহস পাচ্ছে না, সেই কারণেই তোমারও উচিত বীণাযন্ত্রের সাধনা স্থগিত রাখা। পেশাদারী জীবনে আচার-নিষ্ঠার বাড়াবাড়ি সম্ভবপর নয়। তুমি বীণা ছেড়ে দিয়ে কণ্ঠসংগীত ও সেতারে মন দাও,— সেনী-ঘরানার শিক্ষা আমি বরাবরই তোমায় দিয়ে যাবো। তুমি কণ্ঠে বা সেতারে তা তুলতে পারবে; অবশ্য আমাদের কথা বাদ দাও, কেননা আমরা নবাব-বংশীয় লোক, এসকল নিয়ম-নিষ্ঠার বাধ্য নই এবং সহজে ভয়ও পাই না। তোমরা অনেক দুর্বল মুহূর্তে ঘাবড়ে যাবে এবং তখন ভাববে— বীণাযন্ত্রের নিয়ম-নিষ্ঠা ঠিক ঠিকভাবে পালন না করার জন্য বংশের অকল্যাণ ঘটছে।

শুধু ডাক্তারদের 'ক্যান' আছে আর লেখকদের নেই এটা যারা ভাবেন তাঁরা ঠিক জানেন না।

প্রথমেই বলে রাখি লেখক হিসেবে আমি অসামান্য না হলেও নিতান্ত সামান্য নই। একথা প্রমাণ করতে আশা করি আমার বহুপাঠ্য ও অবশ্য-পাঠ্যরূপ খান পনেরো বই-এর নাম করতে হবে না।

আমি শ্রীদিগম্বর পাল, এখন শ্রীকে বাদ দিয়েই নাম লিখি। কেননা পিতৃদত্ত চার অক্ষর নামের ভূমিকায় 'শ্রীর' মত উৎকট একটা শব্দ সেঁটে দেওয়ার কোনো কারণ

শৈল চক্রবর্তী

দেখি না। শ্রীহীন হয়েও আমার বিশ্বাস, দিগম্বর মহাকাশের মতই শ্রীমান হয়ে থাকবে।

আমার নামে প্রকাশিত স্বল্প-বিজ্ঞাপিত অথচ দশ-বারো এডিশন-ওয়ালা বইগুলোর কাটতি দেখে অনেকেই যে ইতিপূর্বে এবং আজ পর্যন্ত কটাক্ষ করতে ছাড়েন না তা আমি জানি। লক্ষ্য করেছি, অনেকের কথার ফাঁকে অর্থমিশ্র ঈর্ষার চাপা-দেওয়া উদ্গত ধোঁওয়া খুব সহজেই ধরা পড়ে।

যাই হোক, আমি কৌশলে আমার বই-এর বিজ্ঞাপন দিতে চাই কিম্বা আমার লেখকত্বের ডঙ্কানিনাদ করতে চাচ্ছি একথা যারা মনে করবেন তাদের প্রতি আমি শুধু ঈষৎ-ওষ্ঠ-বাঁকা হাসি হাসব। তাঁরা নিতান্তই ভুল করবেন।

এই ধরুন 'জলিতার লালফিতা' এক-কালে যে আলোড়ন এনেছিল, একথা আমি বললে খারাপ শোনাবে। আমার ডাকবাক্স থেকেই তার উত্তর দিচ্ছি। একজন মহিলা এই পত্রে লিখেছেন—শ্রদ্ধাস্পদেষু, আপনার বইটা এক নিঃশ্বাসে পড়লুম। আমি কোনো লেখককেই বরদাস্ত করতে পারি না, কিন্তু আপনার লালফিতা আমাকে বেঁধে ফেলেছে। আরো একবার আদ্যোপান্ত না পড়ে নিস্তার নেই......

চিঠি ত লেখকদের নিত্যপ্রাপ্য জিনিস। চা-কফি খাদ্যের মত ওটা নৈমিত্তিক অভ্যাসে দাঁড়িয়ে যায়। না পেলেই খারাপ লাগে। নামকরা লেখকদের কথা জানি না, তাঁরা শুনেছি পাঠকসমাজের কাছ থেকে নিয়মিত পত্রপুঞ্জ উপহার পান এবং তা পড়তে ও তার উত্তর দিতে বেশ কয়েকটা মূল্যবান ঘন্টা খোয়াতে হয় তাঁদের।

আমি অকপটে স্বীকার করছি যে আমি আমার পাঠকদের কাছে ঋণী। প্রশংসা শুনতে কার না ভাল লাগে বলুন। কিন্তু তা নয়, আমি বলতে চাইছি শুধু প্রশংসা নয়, সমালোচনাও থাকে। পল্লবিত অনেক পল্লবে কাঁটা থাকবে এটা ত স্বাভাবিক।

নমুনা শুনবেন? এক ভদ্রমহিলা লিখে-ছেন—শ্রদ্ধেয় মহাশয়, আপনার 'কবরীর কলঙ্ক' পড়ে একটা কথা আপনাকে না লিখে পারছি না। পৃথিবীতে তথা সংসারে এতো ভাল জিনিস থাকতে আপনি কুৎসিত নোংরা ঘেঁটে মরেন কেন? আপনি নিরীশ্বর আর দিগ্‌বলয়া দিয়ে কী কাণ্ড করেছেন...।

বুঝুন ব্যাপারটা। আচ্ছা, আরো মারাত্মক নমুনা আছে। আরেকখানি লেপাফা খুলে পড়ছি...ধটুকনাথ নামধারী একজন লিখেছেন—লেখক হলেই হয় না... যা-তা লিখে আপনি পার পাবেন ভেবেছেন? আমি জানিয়ে রাখছি, সাবধান। ইহজগত থেকে প্রাণ নিয়ে পালাতে পারবেন না কিন্তু......

বিচলিত? হ্যাঁ, বিচলিত হয়েছিলুম, কিন্তু আরেকখানি পত্র আমাকে শান্ত করল। একজন (নারী কি পুরুষ আপনারা বুঝে নেবেন) লিখেছেন—মহাশয়, মুগ্ধ হ'লাম। আপনার দিগম্বর চরিত্রটি অপূর্ব ......শুধু তাই নয়, জীবনের ব্যথা-বেদনাকে আপনি যে রূপ দিয়েছেন, এরকম আর কেউ পেরেছেন কিনা জানি না। জীবনটা ত দুঃখে ভরা। অথচ কোনো লেখক দুঃখকে এমন করে ফোটাতে চান না। তাঁরা কি ভাবেন ওটা কাঁটার মত গায়ে ফুটবে? ভুল ভুল। প্রতি পদেই ত দুঃখের ধাক্কা, চলতে গেলেই ত বেদনা......পেছন থেকে এল মোটরের আকাশ-ফাটা হর্ণ, লাফিয়ে পড়লেন পাশে, সেখানে শাড্ডু ধর্মঘটের দুর্গন্ধ......বাজারে গেছেন, সেখানে ঢাঁড়সের দাম এক টাকা পঁচিশ......ধোপা আনল শাড়ির রঙটা জ্বালিয়ে...ছোট ছেলেটা রোজ রাত্তিরে দাঁত কিড়মিড় করে, মেজ মেয়ে দেখছি আজকাল না বলেই বেরিয়ে যায় বাড়ি থেকে...স্বামীস্ত্রীর ভালবাসা এখন কর্পূরের মত উড়ে গেছে...লঙ্কা গাছটায় পোকা ধরেছে, আজও ফুল ফুটল না...... ট্রামে-বাসে মেয়েদের কী নির্লজ্জ পিঠ-কাটা জামা...গভর্ণমেন্ট রেশনে সুজি দেওয়া বন্ধই করে দিল...পাশের বাড়ির বেরালটা রাত্রে কি বিশ্রী ডাকে...সিনেমায় যাব ব'লে সেজে-গুজে বেরুচ্ছি অমনি হুড়মুড় করে বিষ্টি এল...লিলির মাসী বিয়াল্লিশ বছর বয়েস হ'ল, তার নাকি আবার ছেলেপিলে হবে, ওমা কি লজ্জা! কত আর বলব? বলুন ত দুঃখ কোথায় নেই?

যদি ধৈর্য থাকে আর একখানা চিঠি পড়ছি, শুনুন; এও ঐ সুরে কথা বলছে...একটি অর্ধ-দার্শনিক আমার বই পড়েই হয়ত উদ্দীপিত হয়ে থাকবে..... মহাশয়, দুঃখকে আপনি সুন্দর করে

ফুটিয়েছেন, কিন্তু ওতে হবে না, স্যার, হতাশাকে ভাষা দিতে হবে......দেখছেন না চোখ মেলে, ক'টা চোখে দীপ্তি আছে? শিক্ষকের শিরদাঁড়া বেঁকে গেছে, উকিল থেকে হাকিম অবধি সব চোয়াল ঝুলে গেছে......চাকুরেদের জামার তলায় শুধু হাড় আর হাড়...গৃহিণীদের মুখে সব সময়ই লাউড-স্পীকার আর নয়, তাঁরা হার্টের ব্যামোয় শয্যাশায়ী...আর ছেলেমেয়েরা? তারা ত ফড়িং বনে যাচ্ছে, ভবিষ্যৎ ভারতে হয়ত মশা হয়ে ভন্‌ভন্ করবে......দেশে বিক্রী একমাত্র কস্‌মেটিকের, কেন জানেন? তরুণীরা তাদের হতাশা আর অ্যানিমিয়া ঢাকবে আর কি দিয়ে.........?

এগুলি অবশ্য অনুচ্চারিত আমারই কথা, কিন্তু শিবানী দত্তের চিঠি শুনবেন? তিনি লিখছেন—কি ঠকাই ঠকলুম। মানে, আপনি ঠকিয়েছেন...করকরে সাড়ে পাঁচ টাকা দিয়ে এক রাশ দুঃখ কিনে আনলুম ...অর্ধেক পড়েই মাথা ধরে গেছে। বুঝতে পেরেছেন নিশ্চয়ই, আপনার "হৃদয়ের হেমারেজ' বইএর গুণগান করছি......!

এখন বলুন ত কোন্ দিকে যাই?

এ ছাড়া কত উপদেশ হামেশাই পোস্টে এসে পড়ছে, সে সব কি কম ইন্‌টারেস্টিং? সেদিন ক্ষেপাশ্রম থেকে বিজনানন্দ লিখছেন—লেখার মধ্যে বস্তু চাই মশাই, মুন্সিয়ানা আছে আপনার লেখায় কিন্তু বস্তু কই? মানবাত্মার মুক্তি কিসে সেই কথা কোথাও দিতে পারেন নি ত......জ্ঞানাৎ পরতরং নহি......সত্যি কথা, কিন্তু ন তত্র চক্ষুর্গচ্ছতি ন বাক গচ্ছতি ন মনঃ......উপনিষদ বলে গেছেন, এ হ'ল শাশ্বত সত্য...... এ সব বাণী দিন লেখার মধ্যে......তপস্যা চাই, তবে ত কুলকুণ্ডলিনী জাগ্রত হবে... হাড়-মাস ভেদ করে ঠেলা মারবে ওপর দিকে ...ঈড়া পিঙ্গলা বেয়ে সুড়সুড় করে উঠবে একেবারে সাততলায়, যেখানে মনুষ্যত্বের হেড-অপিস......দপ্ করে জ্বলে উঠবে একেবারে হাজার সূর্য......

আরও ছিল, ভয়ে ভয়ে বাদ দিলুম। এ সব উপদেশ নিয়ে আমি কি করব বলুন? আমি চাই উপন্যাস বানাতে, আমি কি হিতোপদেশ না যোগশাস্ত্র লিখছি...... আমার যা দরকার সে হচ্ছে ভাল প্লট, রগ্‌রগে প্লট যেমন লিখেছিলাম 'ঘুন ধরা চাঁদ' বইটায়......কিন্তু সত্যি রাগ হয় কখন জানেন? যখন পড়ি, জিয়াগঞ্জ থেকে এক-জন লিখছেন—আপনার ভাষা তবু সহ্য করা যায়, কিন্তু আপনার প্লটগুলো পচা ঘুণ-ধরা......কিছু বিদেশী সাহিত্য পড়লে আপনার উপকার হ'ত......আমার মাথায় কত যে প্লট ঘোরে......শুধু লেখবার সময় পাই না, নয়ত দেখতেন......

আমার মাথাটাও যে ঘুরে গেল তা বুঝতেই পারছেন। এমন সময় ভাগ্যিস আরেকটা চিঠি হাতে এসে পড়ল......কুমারী মামিয়া ওই কথাই লিখছে কিন্তু কত মিষ্টি ক'রে। সে লিখছে—আমার আন্তরিক শ্রদ্ধা গ্রহণ করুন, আপনার বই খুব পড়ি...... মাঝে মাঝে মনে হয় সব কথা ঠিক বলা হ'চ্ছে না...মন কত স্বপনের জাল বোনে... কত নিশীথ রাতের কথা জড়াজড়ি ক'রে বালুচরের মত ওড়ে...নদীর চর, কখনো এপার ধরা দেয় ওপারের সঙ্গে, কথা যেন গঙ্গার ওপর ইস্পাতের ফলায় ফলায় জাল-বোনা হাওড়া পুলের মত...ওয়াল্ট ডিস্‌নির টেক্‌নিকলার কার্টুন ছবির হাস্যকর অবাস্তবতার মত...বিটোফেনের সিম্ফনির মত...কই? সে সব তো পাই না আপনার লেখায়......

পাঠিকাকে হতাশ করতে দুঃখ হয়, কিন্তু কি করব বলুন, স্বপ্নের মার্কেট সম্বন্ধে আমার ধারণা কম।

এমনি কত চিঠি আসছে, তার মধ্যে আর একখানি আপনাদের শোনাব। এটি লিখেছেন প্রসন্নবদন, গ্র্যান্ড বিউটি সেলুনের মালিক। তিনি লিখছেন—মহাশয়, কেশকলা নিয়ে থাকি, অন্যান্য শিল্পকলার খবর রাখি না......তবে হ্যাঁ, আপনাদের গল্পের প্লট যদি চান দিতে পারি...আসুন না একদিন, চুল ছাটবেন আর শুনে যাবেন...কাঁচির কচ্‌-কচ্ শব্দের সঙ্গে সঙ্গেই খোশগল্পের ফোয়ারা ছোটে...কত চমকদার কাহিনী, কত সিঁদেল চোরের কথা, কত কালোবাজারীর মুনাফা লোটবার ফন্দি-ফিকির...কত বাড়ি-পালানো মেয়ের কেলেঙ্কারী, কত ছেলে-ছোকরার ফষ্টি-নষ্টি, কত বাবুদের গুপ্ত-কথা, কত নেশাখোরের বেলেল্লাগিরি ..... ফাস্‌ক্লাশ সব গল্পের মশলা......যদি কলম ধরতে পারতুম দেখতেন, ফাটিয়ে দিতুম......

প্রসন্নবদনকে দেখিনি, চিঠিটা পড়ে মনটা প্রসন্ন হ'ল। হাতটা অজান্তে মাথায় উঠে গেল, চুলগুলো একটু বড়ই হয়েছে, ছাঁটাই করার সময়ও আগত......গ্র্যান্ড বিউটির দিকে হাঁটা দেব নাকি?

কিন্তু কি জানি কেন মনটা সায় দিল না......না থাক, আমার মত খ্যাতনামা এক-জন লেখক যাবে কিনা সেলুনওয়ালার কাছে, প্রেস্টিজে বাধল......হয়ত ঐ সব মাল ইতি-মধ্যেই কেউ প্রেসে চড়িয়েছে......বলা যায় না ত। সস্তা দরের লেখকদের অসাধ্য কি আছে?

মনটায় একটা অস্বস্তি থেকে গেল কিন্তু......একটা সিনেমা-গল্পের জন্যে তখন চিন্তা করছিলুম কিনা। কিছুতেই মাথায় আসছে না একটা হিট্-গল্পের প্লট......যা আসছে তাও ওলট্-পালট হয়ে কিম্ভূত-কিমাকার হয়ে যাচ্ছে......এবম্বিধ চিন্তা-জর্জর মুহূর্তে একটা খাম এসে হাতে ঠেকল।

মেয়েলি হাতের লেখা, মাঝে মাঝে কেঁপে গেছে। চিঠিখানি সংক্ষিপ্ত। পত্র-লেখিকা লিখছেন—আমি একজন লেডি ডাক্তার, আমার নাম দেখে হয়ত নাম-শোনা মনে হবে। না হ'লেও ক্ষতি নেই। আমি আপনার কয়েকখানা বই পড়েছি, তাতে দেখেছি, আপনি মেয়েদের সম্বন্ধে কিছুই জানেন না। হালআমলের জীবনযাত্রার কোনো জ্ঞান-গম্যি নেই আপনার। যা জানেন না তাই দিয়েও দেখি অনেক পাতা ভরান......কিন্তু একটা কথা আমি স্বীকার করছি, আপনার লেখার হাত আছে এবং সেইজন্যেই সেগুলো পড়া যায়। এখন আমার পত্র লেখার উদ্দেশ্য হ'ল, আমার একটা প্রস্তাব আছে। সেটি একমাত্র সাক্ষাতে আলোচ্য। বলা বাহুল্য, এই প্রস্তাব যদি আপনি গ্রহণ করেন্ তা'হলে আপনার কোনো লোকসানের ভয় নেই। বরং লাভের আশ্বাস দিতে পারি। সন্ধ্যার দিকে সব-দিনই আমার দেখা পাবেন— ইতি— মিস্ সত্যসাধনা দাসগুপ্তা। ১৩৮।৪। ১৭বি, মহেশ্বরীতলা লেন, কলিকাতা।

চিঠি পড়ে এক কাপ চা খেয়ে নিতে হ'ল।

ডায়েরী থেকে ঠিকানার হদিশ বার ক'রে নিয়ে সেদিন রওনা হয়ে পড়লুম।

বাস ছুটেছে ঝড়ের বেগে, আমার মনের মধ্যেও ঝড়। মিস্ দাসগুপ্তার প্রস্তাবটা কি হ'তে পারে? ভদ্রমহিলার বয়স কত? কেমন দেখতে? প্লট-সন্ধানী আমাকে নিয়ে বিধাতা আবার কোনো জটিল প্লট বানাতে চান না কি? ইত্যাকার নানা প্রশ্ন-কণ্টকিত হয়ে বাসপথ ও হাঁটাপথ পেরিয়ে দু' ঘণ্টায় অভীষ্ট ঠিকানায় সমুখীন হ'লাম।

তারপর মিস্ দাসগুপ্তা আমার সমুখে উদিতা হলেন।

সে মুহূর্তটা আমি সাহিত্যিক হয়েও বর্ণনা করতে পারব না। শুধু একটিবার মনে হয়েছিল পেছু হঠে চৌকাঠ পেরিয়ে রাস্তায় নেমে পড়ি। মহিলা সপর্কে আমার মনে যত কিছু কোমল কাব্যানুভূতি ও মধুর ধারণা ছিল, সবই তখন অন্তর্হিত।

কিন্তু আমি হয়ত অবিচার করছি তাঁর প্রতি। ভদ্রমহিলা আমাকে আন্তরিক স্বাগত জানালেন।

দুজনে বসলাম মুখোমুখি।

কবে চিঠি পেয়েছেন?

আজই।

আজ আমিও আপনাকে আশা কর-ছিলাম। তা'হলে ধরে নিচ্ছি, আমার প্রস্তাবে আপনার সম্মতি আছে।

সেটা এখনও পর্যন্ত শুনিনি ত—

সেইজন্যেই ত ডেকেছি......চিঠিতে কত-টুকু বা লেখা যায়......শুনুন, আমার লাইফ হিস্টরি বলে আপনাকে বিরক্ত করব না। শুধু এইটুকুই বলছি যে, সারাজীবন নার্সিং আর ডাক্তারি করে কাটিয়েছি আমি। এখন অবসর নিয়ে বসে আছি। এই সুদীর্ঘ কর্মজীবনে কত লোককে যে জানতে হয়েছে

'হৃদয়ের হেমারেজ' বইয়ের গুণগান করছি...

তা আপনি বুঝতেই পারছেন। শুধু লোক নয়, মানুষের জীবনের সব কিছুই দেখেছি ......আর আমরা যা দেখি, আপনারা তার সিকিও দেখেন না......বলুন ঠিক কি না?

হ্যাঁ, তা ঠিক, তবে দেখা ত অনেক রকম আছে—

তা ত আছেই, আমাকে চাপা দিয়েই বলে ওঠেন ডাক্তার দাশগুপ্তা।...আপনারা ওপর থেকে দেখছেন, যেখানে দেখছেন না, সেখানে কল্পনার রং ফলিয়ে অবাস্তব ক'রে ছেড়ে দিচ্ছেন। এই ত। আর আমার দেখা কি জানেন, মাইক্রস্কোপের মত খুঁটিয়ে দেখা... জীবনের ভাঙাগড়া জোড়াতালি দেখে দেখে চোখ ক্ষয়ে গেল......সেইগুলো সব এই টেবিল, এই দেয়ালের মত সত্যি, বুঝলেন। তার কোথাও ফাঁকি নেই, আজগুবি নেই... শুধু নামগুলো বলব না, চেপে যেতে হবে। নাম-ধাম বানিয়ে বসিয়ে দেওয়া আর শক্ত কি?

নাঃ, সেটা কিছুই নয়। ও বিষয়ে আমার দক্ষতা আছে। তা ওগুলো কি আপনার সব নোট করা আছে?

সব আমার মনে জ্বলজ্বল করছে। ইস্টারিতে মেডেল পেয়েছিলুম, বুঝলেন। হাজার হাজার জীবনের ঘটনা ছবির মত মুখস্থ......হাজার হাজার তরুণ-তরুণীর যাকে আপনারা বলেন 'লভ' হবার গল্প শুনেছেন আমার কাছে। কত রকমের প্রেম-কাহিনী কত রকমের ব্যর্থতা বিরহ আমি গড়গড় করে বলে যেতে পারি। কত রোমান্টিক ঘটনা, কত নায়কের পশ্চাদপসরণ থেকে শুরু করে বিবাগী হয়ে যাওয়া পর্যন্ত......কত বাড়ির অন্দরের অপকীর্তি, কত গোপন সংলাপ, কত অন্ধকারের ইতিহাস.........

আমি চোখে যেন সূর্যোদয় দেখলুম... বলে ফেললুম, এত প্লট আপনি দিতে পারবেন?

পারি মানে? আমি বলে যাব আপনি লিখবেন।

হ্যাঁ, আমি ভাষায় ফোটাব......আঃ, এত প্রোডাক্‌শন কোনো সাহিত্যিক কল্পনা করতে পারবে না!! সে বই কাটবে হু-হু ক'রে......

হু-হু ক'রে মানে? বলছেন কি? দাবানলের মত গিলবে পাব্লিক। আপনি কত ফেমাস হবেন ভাবুন। টাকার ওপর দিয়ে হাঁটবেন......বুঝছেন না কেন, আমি যা দেব সেটাই এখন চাচ্ছে লোক......আমি মাল দেব, আপনি ছাড়বেন বাজারে। প্লট আমার, আপনি সাহিত্যের ভাষায় সাজিয়ে বার করবেন। দুজনে সমান সমান অংশীদার... সোজা কথায় যাকে বলে ফিফটি ফিফটি... কি বলেন?

একটু দম নিয়ে বললুম, হ্যাঁ, তাই পাবেন, কিন্তু—

এর মধ্যে আর কিন্তু তুলবেন না। লাভ ত আপনারই বেশি হচ্ছে।

কিসে?

নামটা আপনার থাকবে। মানে লেখক হিসেবে......

আপনি যদি চান, জয়েন্ট নামেও—

না, আমার বয়েস হয়েছে। নামে আর কি হবে বলুন। ওটা আপনার জন্যেই থাক। আরেকটা কথা আছে। এই যে ঘরটা দেখছেন, এটাকে একটা নার্সিং হোম করব। আমি থাকব ওপরতলায়—

বাড়িটা ত একতলা দেখছি......

হ্যাঁ, ওপরের ঘর দুখানা বানাতে হবে। তার জন্যেই ত টাকা দরকার। কিছু টাকা আমি পেয়ে যাব আর আপনাকে এখুনি পঁচিশ হাজার টাকা দিতে হবে। চুক্তি থাকবে যে, আমাদের বই যাবদ আমার পাওনার টাকা থেকেই ওটা প্রথমে আপনি পেয়ে যাবেন। ওটা শোধ হ'লে তখন শতকরা পঞ্চাশ পঞ্চাশ হার......সোজা হিসেব...... পঁচিশ হাজার আপনাকে আগাম দিতে হবে?

হ্যাঁ, ওটা আমার বিশেষ দরকার বলেই বলছি। প্রথম বছরেই ত আমার মনে হয়, আমরা এক লাখ টাকা পেয়ে যাব বই থেকে। ঐ যে, রাঘব এণ্ড সন্স আছে ও তো আমার মাস্তুতো ভাইএর পাব্লিশিং ফার্ম, ওরাই ছাপতে পারে......

ঘড়ির দিকে তাকিয়ে দেখলুম, নটা বাজতে পাঁচ। উঠে দাঁড়ালুম, বললুম, আচ্ছা একটু ভেবে দেখি—

নিশ্চয়ই নিশ্চয়ই......কিন্তু ভাবতে দেরী করবেন না। বাড়ির প্ল্যানটা তৈরি হয়ে আছে......আর যদি অসুবিধা হবে মনে করেন, তাহলে আর কোনো সাহিত্যিক বন্ধুকে পাঠিয়ে দেবেন......কেমন?

রাস্তায় নেমে বাসে উঠলুম।

আসতে আসতে ঠিক করলুম মিস্ দাশগুপ্তার প্রস্তাব আমায় প্রত্যাখ্যান করতেই হবে। ঐ পরিমাণ অর্থ আমার থাকলে আমি এতদিন করে পোলট্রি ফার্মিং খুলতাম......তবে তিনি যাই ব'লে থাকুন, আমার প্রশংসা করেছেন। লেখায় আমার হাত আছে বলেছেন......এত কথার মধ্যে ঐ কথাটার মূল্য কম কি, বলুন?

মঙ্গল গ্রহের প্রাণী

শচীন্দ্রনাথ বসু

"মঙ্গলগ্রহে প্রাণের অস্তিত্ব এবং সেখানে স্বাধীনভাবে প্রাণের উদ্ভব হয়ে থাকা সম্পূর্ণ যুক্তিসংগত." এই অভিমতটি প্রকাশ করেছেন আমেরিকার জাতীয় বিজ্ঞান পরিষদের বিশেষজ্ঞরা, তাঁদের মধ্যে ছিলেন তিনজন নোবেল পুরস্কার বিজেতা। উক্তিটি স্থান পেয়েছিল ১৯৬৫ সালের প্রথম দিকে প্রকাশিত এক রিপোর্টে; চাঁদে পেঁছিবার পর মহাকাশে আমেরিকার লক্ষ্য সম্বন্ধে এঁরা সুপারিশ করেন যে, প্রথম উদ্দেশ্য হওয়া উচিত মঙ্গলগ্রহে প্রাণের অনুসন্ধান। এই কাজটি প্রথম দিকে হবে যন্ত্র পাঠিয়ে, কিন্তু বিশেষজ্ঞদের মতে পরে সম্ভবত ১৯৮০ দশকে) দরকার হবে মানুষ পাঠানো। মার্কিন রাষ্ট্রপতির বৈজ্ঞানিক পরামর্শদাতারাও অনুরূপ মত প্রকাশ করেছেন, এবং সেই অনুসারে পরিকল্পনা তৈরি হচ্ছে।

উপরোক্ত রিপোর্টের অল্প দিন পরে ম্যারিনার-৪ মহাকাশযান মঙ্গলগ্রহের পাশ কাটিয়ে যাবার সময়ে মাত্র ৬৬০০ মাইল দূর থেকে কতগুলি ছবি পাঠায়, তাতে অপ্রত্যাশিত অনেক খাদ দেখা গিয়েছে—চাঁদের গায়ে যেমন আছে। প্রাণের কিছু চিহ্ন ধরা পড়েনি, কিন্তু পরে প্রমাণ হয়েছে যে, অত দূর থেকে পৃথিবীতেও সে রকম কিছু চিহ্ন দৃষ্টিগোচর হবে না। সুতরাং মঙ্গলে প্রাণ আছে কিনা এই প্রশ্নের জবাবে আজও কোনও নির্ভরযোগ্য নির্দেশ মেলেনি, যদিও ইঙ্গিত পাওয়া গিয়েছে নানারকম।

বিজ্ঞানজগতে মঙ্গলে প্রাণের অস্তিত্ব সম্বন্ধে জল্পনা কল্পনার সূচনা করেন ইটালীয় জ্যোতিষী জোভানি স্কিয়াপারেলি। ১৮৭৭ সালে এক অপেক্ষাকৃত দুর্বল দূরবীনে তিনি ঐ গ্রহের নিরক্ষ রেখা অঞ্চলে অর্থাৎ কটি দেশে কতকগুলি আঁকাবাঁকি দেখতে পান এবং তাদের বর্ণনায় 'কানালি' শব্দটি ব্যবহার করেন; তা প্রায় ইংরেজি ক্যানাল (কৃত্রিম খাল) শব্দের মত শুনতে হলেও অর্থ কিছুটা আলাদা—অনেকটা প্রাকৃতিক নালা। কিন্তু দেখতে ইংরেজি অর্থটাই চলতি হয়ে গেল। তার একটা কারণ বোধহয় এই যে, দশ বছর পরিশ্রমের পর পৃথিবীর মানুষ তখন সবে সুএজ খাল শেষ করেছে, খালের অলোচনা তখন আকাশে বাতাসে। দু বছর পরে বিশ্বজনীন উত্তেজনার মধ্যে পড়ে স্কিয়াপারেলি নিজেই এই মত মেনে নিয়েছিলেন মনে হয়—এমন কি খালগুলির সমান্তরাল এক একটি জুড়িও দেখলেন।

মঙ্গলে মানুষের মত কি তদপেক্ষা বুদ্ধিমান জীব আছে, কিন্তু হালকা গ্রহ জল ধরে রাখতে পারেনি বলে সেই সভ্যতা এখন মুমূর্ষ, গ্রহটি শুকিয়ে যাচ্ছে দেখে শেষ বিন্দু জল সংরক্ষণ করবার উদ্দেশ্যে তাদের এনজিনিয়াররা খাল কেটেছে (যেমন পৃথিবীতেও একদা দরকার হতে পারে) এই ধারণা অবিলম্বে ছড়িয়ে পড়ল। প্রতিষ্ঠাপন্ন বিজ্ঞানীরাও তা বিশ্বাস করেছিলেন, যেমন আমেরিকার পার্সিভাল লোএল। ইনি নিজের বর্ধিষ্ণু ব্যবসা ত্যাগ করে অ্যারিজোনাতে এক মানমন্দির প্রতিষ্ঠা করেন বিশেষ করে মঙ্গলগ্রহে, তার খাল ও অধিবাসীদের অনুশীলনের জন্য—তাঁর বিশ্বাস ছিল "এই অধিবাসীরা আমাদের পরিচয়ের যোগ্য"। আজ এই মানমন্দির বিশ্ববিখ্যাত, যদিও তার প্রয়োগ অন্য কাজে। এবং বেশ কিছু দিন হল বিজ্ঞানীদের সন্দেহ জেগেছে খাল সম্বন্ধে; তাঁরা বলেন হয় তা কোনও প্রাকৃতিক দাগ, নয়তো চোখের ধাঁধা; অস্পষ্ট

বস্তু জোর করে দেখতে গেলে লোকে অনেক সময়ে ভুল দেখে। ম্যারিনার-৪ যে সকল পরীক্ষা করছে তাতে খালের কোনও চিহ্ন পায়নি।

মানুষের তুল্য বুদ্ধিমান জীব সেখানে থাকার সম্ভাবনা আপাত বিচারে বাদ পড়লেও হীন প্রাণীর অস্তিত্ব সেই সঙ্গে অসম্ভব হয়ে পড়ে না। বস্তুত, খাল সম্বন্ধে বিতর্ক কমে যাবার পর বিজ্ঞানীরা অন্য যেসব প্রমাণের দিকে নজর দেন তার থেকে অধিকাংশেরই এই ধারণা গড়ে ওঠে যে অন্তত পক্ষে হীন পার্থিব উদ্ভিদ যথা ছত্রাক ও শেওলার তুল্য প্রাণী সম্ভবত মঙ্গলে আছে। এই প্রসঙ্গে আধুনিক বৈজ্ঞানিক যুক্তিগুলি আমরা বিবেচনা করে দেখতে পারি।

সবচেয়ে উৎসাহজনক ইঙ্গিত মিলেছে মঙ্গলের বাৎসরিক রং পরিবর্তন থেকে। প্রতি বছর শীতের শেষে মেরুর তুষার মুকুট যখন সংক্ষিপ্ত হতে থাকে তখন সেইখান থেকে নিরক্ষ রেখার দিকে এই পরিবর্তন ঘটে—ধূসর রং বদলে হয় বেগুনি, কেউ কেউ উজ্জ্বল সবুজ বা নীল দেখতে পেয়েছেন বলে দাবী করেন। শীত সমাগমে আবার এই গাঢ় রং হালকা হয়। বিজ্ঞানজগতে অধিকাংশের বিশ্বাস যে এক মেরুর থেকে অন্য মেরুতে জলবাষ্পের সঞ্চারণ এর সঙ্গে যুক্ত। জল পেয়ে একাধিক কারণে রং পরিবর্তন হতে পারে, কিন্তু সহজেই যে কারণটি মনে আসে তা হল উদ্ভিদের বৃদ্ধি।

আপাতদৃষ্টিতে মঙ্গলের প্রাকৃতিক অবস্থা প্রাণের পক্ষে খুব আশাজনক না হলেও হীন প্রাণীর পক্ষে তা সম্পূর্ণ পরিপন্থী নাও হতে পারে। এবং এই প্রসঙ্গে একটা কথা মনে রাখা বিশেষ দরকার; একদা গ্রহটির প্রকৃতি অনেক প্রসন্ন ছিল, এবং পৃথিবীর নিদর্শন থেকে আমরা জানি যে, অবস্থার যদি ক্রমশ অবনতি ঘটে তবে তার সঙ্গে মানিয়ে নিয়ে টিঁকে থাকবার ক্ষমতা প্রাণের অসাধারণ। মঙ্গলের প্রাকৃতিক প্রতিবেশ অনুকরণ করে আমেরিকা ও রাশিয়ার গবেষণাগারে পরীক্ষা হয়েছে ও এখনও চলছে; আকস্মিক অবস্থা পরিবর্তনের পরেও উদ্ভিদ, কীট, মাকড়সা, কচ্ছপ ইত্যাদির মধ্যে বেশ সহনশক্তি লক্ষিত হয়েছে।

যেখানে পৃথিবীর গড় তাপ +১৫ ডিগ্রি সেন্টিগ্রেড, সেখানে মঙ্গলের মাত্র —৫৫ ডিগ্রি। কিন্তু এই তাপে পৃথিবীতেও প্রাণ নিশ্চিহ্ন হয় না, এবং বলাবাহুল্য মঙ্গলে সর্বত্র সব ঋতুতে শীত অত প্রখর নয়। মোটামুটি তা আমাদের দক্ষিণ মেরুর মত, যেখানে শুধু বিচিত্র জীবাণু নয়, কিছু পুষ্পবাহী উদ্ভিদ ও মেরুদন্ডহীন প্রাণীরও সাক্ষাৎ মেলে। আসলে ঋতু ও দিনের সময় ভেদে তাপ অনেকটা ওঠানামা করে—নিরক্ষরেখার কাছে +২৫ ডিগ্রি পর্যন্ত উঠতে দেখা গিয়েছে।

গ্রহটির বাতাসে অক্সিজেন এত কম যে, এ যাবৎ তা যন্ত্রে ধরা পড়েনি। কিন্তু পৃথিবীতেও এমন অনেক জীবাণু আছে যাদের অক্সিজেন দরকার করে না, বরং তা ক্ষতিকর। বস্তুত প্রাণ আবির্ভাবের আগে আদিম পৃথিবীর আবহে অক্সিজেন ছিল না, তা প্রাণেরই সৃষ্টি।

জলের বাষ্প পৃথিবীকে ঘিরে বরাবরই ছিল, তার থেকে যে সাগর সৃষ্টি হয় তারই মধ্যে প্রাণ প্রথম দানা বাঁধে এই রকমই সাধারণ ধারণা। আজও আমাদের দেহ বহুলাংশে জল। কিন্তু ক্ষুদ্রতর মঙ্গলের মাটির টান জলীয় বাষ্প বেশী ধরে রাখতে পারেনি, বর্তমানে তা বড় জোর পৃথিবীর এক-সহস্রাংশ। মেরুতে যে বরফের চাদর দেখা যায় তা অতি পাতলা বলে মনে হয়—এমন কি তা বরফ ছাড়া অন্য কিছুও হতে পারে। তবে পৃথিবীর বিচিত্র প্রাণীকুলের মধ্যে খোঁজ করলে এই ক্ষেত্রেও আশার রেখা দেখা যায়—এমন জীব চোখে পড়ে অতিশুষ্ক প্রতিবেশ যাদের সয়ে গিয়েছে, এমন কি তাই তারা পছন্দ করে।

দক্ষিণ ক্যালিফর্ণিয়া ও অ্যারিজোনার মেরু অঞ্চলের ক্যাঙ্গারু-ইঁদুর এমন এক প্রাণী। বিজ্ঞানীরা গবেষণাগারে পরীক্ষা করে দেখেছেন শুধু শুকনো যব খেয়েই তা বেঁচে থাকতে পারে, জল সরবরাহ করতে হয় না। আসলে এর যা জল দরকার তা খাদ্য থেকে রাসায়নিক পরিবর্তনে শরীরের মধ্যেই তৈরি হয়। অল্পে অল্পে অবস্থা খারাপ হলে তা সয়ে যাবার এই হয়তো এক নিদর্শন। অবশ্য তার মানে এই নয় যে, মঙ্গলে প্রাণের অনুসন্ধান করতে হলে প্রথমেই ইঁদুর-ধরা কল পাঠাতে হবে!

আকাশের কোনও কোনও রশ্মি প্রাণের পক্ষে ক্ষতিকর, যথেষ্ট পরিমাণে থাকলে মারাত্মক। পৃথিবীর পুরু আবহ এদের থেকে আমাদের বাঁচায়। মঙ্গলে মহাজাগতিক রশ্মি কয়েক শো গুণ বেশী জোরালো, তথাপি প্রাণের পক্ষে বিপজ্জনক নয়। ভয় বেশী সূর্যের অতিবেগনী রশ্মি থেকে, গ্রহের গায়ে তা যে পরিমাণে এসে পৌঁছায় তাতে পৃথিবীর সবচেয়ে সহনশীল জীবাণুও কয়েক মিনিটে মরে যাবে। কিন্তু এই রশ্মিকে শুষে নিতে পারে এমন বস্তু অনেক আছে, সেগুলি মঙ্গলবাসীদের বর্মের কাজ করতে পারে।

মঙ্গলে প্রাণের সন্ধানে সবচেয়ে আগে পরীক্ষা করা হবে জীবাণুর, কারণ পৃথিবীর জলে স্থলে তারা অগণিত ছড়িয়ে আছে। একটি যন্ত্র তৈরি হচ্ছে, তাতে থাকবে তেজস্ক্রিয় কারবনসংযুক্ত খাদ্য; কলের সাহায্যে মঙ্গলের মাটি এর উপর ছড়িয়ে দেওয়া হবে, জীবাণু থাকলে তা বেড়ে তেজস্ক্রিয় আঙ্গারিক গ্যাস তৈরি করবে, তা গাইগার কাউন্টার যন্ত্রে ধরা পড়বে—সেই খবর পৌঁছাবে পৃথিবীতে।

কিন্তু জীবাণু বা অন্য হীন প্রাণী ছাড়া মঙ্গলে আর কিছু থাকা, কোনওরকম বুদ্ধিমান জীবের বাস যদি একেবারেই অসম্ভব হয় তা হলে কতগুলি রহস্য অমীমাংসিত থেকে যায়। খালের মত ঐ সোজা সোজা দাগগুলির অস্তিত্ব একেবারে উড়িয়ে না দিলে আজ পর্যন্ত তার কোনও সন্তোষজনক ব্যাখ্যা পাওয়া যায়নি। দূরবীনে গ্রহটির গায়ে মাঝে মাঝে উজ্জ্বল আলো দপ করে জ্বলে উঠে আবার নিভতে দেখা গিয়েছে; সেগুলি আগ্নেয়গিরির উদ্গার হলে তার রং এত নীলাভ-সাদা হত না, এবং তা এত ক্ষণস্থায়ীও হত না; উজ্জ্বলতা উল্কার আঘাতজাত হলে তা আরও আগে নিভে যেত। তা আলোর প্রতিফলন বলেও মনে হয় না, কারণ কখনও কখনও সঙ্গে সাদা মেঘের মত বস্তু দেখা গিয়েছে।

সবচেয়ে আশ্চর্য মঙ্গলের দুই-চাঁদ—নাম ফোবস ও ডাইমস (অর্থাৎ ভয় ও ত্রাস—মঙ্গলের পাশ্চাত্ত্য নাম মার্স বা যুদ্ধদেবতা, তার উপযুক্ত অনুচর)। এদের কক্ষপথ অন্যান্য গ্রহের উপগ্রহদের মত লম্বাটে বা উপবৃত্তিক নয়, সম্পূর্ণ গোল। এদের আকৃতিও আজকাল মানুষ পৃথিবীতে যে সব কৃত্রিম উপগ্রহ বানাচ্ছে তাদের সঙ্গে তুলনীয়। উপরন্তু এই দুই সঙ্গীর চালচলন দেখেও মনে হয় এরা আমাদের চাঁদের চেয়ে হালকা বস্তু দিয়ে তৈরি। এইসব কারণে ১৯৫৯ সালে রুশ বিজ্ঞানী ইয়োসিফ শকোভস্কি বলেন যে, এরা হয়তো ফাঁপা কৃত্রিম উপগ্রহ, মঙ্গলবাসীরা তাদের গ্রহ বসের অযোগ্য হয়ে যাবার পর ওগুলি বানিয়ে ওখানে আশ্রয় নিয়েছে।

পৃথিবীর আকাশে নাকি আজকাল এমন অনেক আশ্চর্য উড়ন্ত বস্তু দেখা যাচ্ছে যার কোনও যুক্তিসঙ্গত কারণ খুঁজে পাওয়া যায় না। আসলে অনেক ক্ষেত্রেই ভুলের উৎপত্তি হয়েছে চোখের ধাঁধা, আলোর প্রতিফলন, তারা, গ্রহ ইত্যাদির থেকে। কিন্তু বেশ কয়েকটি ক্ষেত্রে কোনওরকম যুক্তিযুক্ত ব্যাখ্যা পাওয়া যায়নি। এই 'অজানা উড়ন্ত বস্তুগুলি' কি সত্যিই ভিন্ন গ্রহের মহাকাশযান হতে পারে? আমেরিকায় বর্তমানে এই নিয়ে এক তদন্ত চলছে, তার মাথায় আছেন এক প্রসিদ্ধ বিজ্ঞানী।

গ্রহান্তর থেকে যদি এই রকম কিছু আসে তবে নানা কারণে সবচেয়ে আগে মঙ্গল সন্দেহযোগ্য। মঙ্গল অবশ্য কখনও পৃথিবীর কাছে আসে, আবার দূরে চলে যায়। ১৯৪৮-৫৭ সালের মধ্যে যে সব অজানা উড়ন্ত বস্তু লক্ষিত হয়েছে তাদের নিয়ে হিসাব করে দেখা গিয়েছে যে, গ্রহটি যখন কাছে এসেছে এবং বেশী উজ্জ্বল হয়েছে, সত্যিই তখন তাদের সংখ্যা বেড়েছে—ওগুলি মঙ্গল-প্রেরিত মহাকাশযান হলে যেমন আশা করা যায়। পৃথিবীর আর এক পাশেই শুক্র গ্রহ এবং মঙ্গলের ওপারে বৃহস্পতি (দুইই আকাশে খুব স্পষ্ট), কিন্তু তাদের আপাত উজ্জ্বলতার ক্ষতি বৃদ্ধির সঙ্গে উড়ন্ত বস্তুর সংখ্যা কমে বাড়ে না।

অমৃত পাবলিশার্স প্রাইভেট লিঃ-এর পক্ষে শ্রীসুপ্রিয় সরকার কর্তৃক পত্রিকা প্রেস, ১৪, আনন্দ চ্যাটার্জি লেন, কলিকাতা—৩ হইতে মুদ্রিত ও তৎকর্তৃক ১১।১, আনন্দ চ্যাটার্জি লেন, কলিকাতা—৩ হইতে প্রকাশিত।

নিয়মাবলী

লেখকদের প্রতি

১। 'অমৃতে' প্রকাশের জন্যে সমস্ত রচনার নকল রেখে পাণ্ডুলিপি সম্পাদকের নামে পাঠান আবশ্যক। মনোনীত রচনা কোনো বিশেষ সংখ্যায় প্রকাশের বাধ্যবাধকতা নেই। অমনোনীত রচনা সঙ্গে উপযুক্ত ডাক-টিকিট থাকলে ফেরত দেওয়া হয়।

২। প্রেরিত রচনা কাগজের এক দিকে স্পষ্টাক্ষরে লিখিত হওয়া আবশ্যক। অস্পষ্ট ও দুর্বোধ্য হস্তাক্ষরে লিখিত রচনা প্রকাশের জন্যে বিবেচনা করা হয় না।

৩। রচনার সঙ্গে লেখকের নাম ও ঠিকানা না থাকলে 'অমৃতে' প্রকাশের জন্যে গৃহীত হয় না।

এজেন্টদের প্রতি

এজেন্সীর নিয়মাবলী এবং সে সম্পর্কিত অন্যান্য জ্ঞাতব্য তথ্য 'অমৃতে'র কার্যালয়ে পত্র দ্বারা জ্ঞাতব্য।

গ্রাহকদের প্রতি

১। গ্রাহকের ঠিকানা পরিবর্তনের জন্যে অন্তত ১৫ দিন আগে 'অমৃতে'র কার্যালয়ে সংবাদ দেওয়া আবশ্যক।

২। ভি-পি'তে পত্রিকা পাঠানো হয় না। গ্রাহকের চাঁদা মণিঅর্ডারযোগে 'অমৃতে'র কার্যালয়ে পাঠানো আবশ্যক।

চাঁদার হার

	কলিকাতা	মফস্বল
বার্ষিক	টাকা ২০-০০	টাকা ২২-০০
ষান্মাষিক	টাকা ১০-০০	টাকা ১১-০০
ত্রৈমাসিক	টাকা ৫-০০	টাকা ৫-৫০

'অমৃত' কার্যালয়

১১/১ আনন্দ চ্যাটার্জি লেন,

কলিকাতা—৩

ফোন : ৫৫-৫২৩১ (১৪ লাইন)

৭ম বর্ষ
২য় খণ্ড

২৫শ সংখ্যা
মূল্য
৪০ পয়সা

Friday, 27th October, 1967. শুক্রবার, ৯ই কার্তিক ১৩৭৪ 40 Paise

সূচীপত্র

পৃষ্ঠা	বিষয়		লেখক
৮৮৪	চিঠিপত্র		
৮৮৫	সম্পাদকীয়		
৮৮৬	প্রতিধ্বনি		
৮৮৮	একাকী হৃদয়	(কবিতা)	—শ্রীপরিমল চক্রবর্তী
৮৮৮	শ্রীরাধার শাড়ি	(কবিতা)	—শ্রীবিনোদ বেরা
৮৮৯	সুখের আকৃতি	(গল্প)	—শ্রীমিহির আচার্য
৮৯৪	চক্রচূড়চী-বংশ		—শ্রীঅজয় হোম
৯০০	সাহিত্য ও সংস্কৃতি		
৯০৫	আমি কান পেতে রই	(উপন্যাস)	—শ্রীগজেন্দ্রকুমার মিত্র
৯১৩	দেশেবিদেশে		
৯১৪	ব্যঙ্গচিত্র		—শ্রীকাফী খাঁ
৯১৫	বৈষয়িক প্রসঙ্গ		
৯১৬	ভিনাস-৪ ও শুক্রগ্রহ		—শ্রীদিলীপ বসু
৯১৭	বিজ্ঞানের কথা		—শ্রীশুভংকর
৯১৮	প্রেক্ষাগৃহ		
৯২৬	গানের জলসা		
৯২৭	একালের সঙ্গীতশিল্পী		—শ্রীঅদ্রিজানাথ মুখোপাধ্যায়
৯২৮	খেলাধুলা		—শ্রীদর্শক
৯৩০	ক্যাম্প নয়, অনুশীলনও নয় —সার্কাস পার্টি		—শ্রীকমল ভট্টাচার্য
৯৩১	দুর্ঘ কাঁদলে সোনা	(উপন্যাস)	—শ্রীপ্রেমেন্দ্র মিত্র
৯৩৩	অঙ্গনা		—শ্রীপ্রমীলা
৯৩৫	স্বাদেশিকতার প্রথম প্রত্যুষ		—শ্রীসৌমেন্দ্রনাথ সরকার
৯৩৯	আমার কাল আমার দেশ	(স্মৃতিচারণ)	—শ্রীসুধীরচন্দ্র সরকার
৯৪১	গোলাইকুন্ডের ডায়েরী		—শ্রীভক্তি বিশ্বাস
৯৪৭	জুলানেডা সাইনবোর্ড	(গল্প)	—শ্রীঅজিত মুখোপাধ্যায়
৯৫১	এই সেই ইতালী		—শ্রীবিশ্বনাথ মুখোপাধ্যায়
৯৫৪	সাতপাঁচ		—শ্রীচন্দ্রশেখর মুখোপাধ্যায়
৯৫৫	গোত্রজ-পরিজন		—শ্রীঅচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্ত
৯৫৭	জানাতে পারেন		
৯৫৮	পুরোনো পাতা : রূপের গুপ্ত কথা		—অম্বিকাচরণ গুপ্ত

প্রচ্ছদ : শ্রীস্বপন রায়

'শেক্সপীয়রওয়ালা' প্রসঙ্গে

শেক্সপীয়রওয়ালা ছবি সম্পর্কে আমার লিখিত সমালোচনাটি শ্রীমতী রাখী ঘোষ লন্ডন শহরের কর্মব্যস্ততার মধ্যেও মন দিয়ে পড়তে পেরেছেন ব'লে তাঁকে অশেষ ধন্যবাদ জানাই (অমৃত ২৪ সংখ্যায় প্রকাশিত পত্র)। কিন্তু ছবিখানিকে দু'বার ক'রে দেখবার পরেও আমি আমার মত পরিবর্তন করতে পারছি না। বরং এই কথাটাই আমার বেশী ক'রে মনে হচ্ছে যে, প্রচুর সুযোগ থাকা সত্ত্বেও ছবিখানির মধ্যে একজনও ভারতবাসীকে সৎ এবং মহৎ ব'লে চিত্রিত করা হয়নি। বিপন্ন দলটিকে এক-রাত্রের জন্যে আশ্রয় দেওয়ার মধ্যে যদি নায়ক সঞ্জুর মহত্ত্ব প্রকাশিত হয়ে থাকে, তা হচ্ছে স্বতন্ত্র কথা। কারণ তা না হ'লে কাহিনীটি অগ্রসরই হ'তে পেতনা। কিন্তু নায়ক সঞ্জুকে একটি প্লে-বয় হিসেবে উপস্থাপিত করার উদ্দেশ্য আমি কিছুতেই হৃদয়ঙ্গম করতে পারি না। যে-সঞ্জু লিজির সম্মান রক্ষার জন্যে অপরিচিতদের সঙ্গে মারামারি ক'রে নিজেকে ক্ষতবিক্ষত করতে পারে, সে তাকে বিবাহ করবার জন্যে যথার্থই প্রস্তুত নয়, একথা স্বীকার করি কি ক'রে! বরং দেখি, লিজির মা যখনই আবিষ্কার করেছেন, তাঁর কন্যা একজন ভারতীয়ের প্রতি অনুরক্ত হয়ে পড়ছে, তখন থেকেই তিনি কন্যার প্রতি সাবধানবাণী প্রয়োগ করতে শুরু করেছেন: ভারতবর্ষে তোমার কোনো ভবিষ্যৎ নেই।—সকলের চোখের সামনে দৃঢ় আলিঙ্গনাবদ্ধ হয়ে নিবিড় চুম্বনে লিপ্ত থাকার অভ্যাস কোনো ভারতীয়েরই নেই: কাজেই সঞ্জুর এ-কথা বলার মধ্যে দোষের কি আছে? আমি বলতে বাধ্য যে, চরিত্রটির পরিণতি উদ্দেশ্যমূলকভাবে স্বাভাবিক করা হয়নি।

সম্প্রদায়স্থ দু'জন ভারতীয় মিঃ বাকিংহামের কাছ থেকে অর্থ প্রার্থনা করেছে ঠিক সেই সময়ে, যখন দলের আর্থিক অসচ্ছলতা সম্পর্কে সকলেই ওয়াকিবহাল। প্রথমজন হচ্ছেন দলের এক কর্মী; তিনি ভগ্নীর বিবাহোপলক্ষ্যে অর্থের প্রত্যাশী। দ্বিতীয় জন হচ্ছেন দলের একজন অভিনেতা; তিনি একটি ছোটখাট ব্যবসায়ে বিনিয়োগের জন্য কিছু টাকা চান। দ্বিতীয় জন টাকা চাইতে এসেছেন মঞ্চাবতরণের আগে অর্ধসমাপ্ত মেক-আপ নিয়েই। তিনি যে-সময়ে ও যে ভঙ্গীতে টাকার কথা উত্থাপন করেছেন, তার থেকে অনুমান করা কঠিন নয় যে তিনি সত্যের অপলাপ করছেন।

জানিনা, ছবিটির বৈদেশিক সংস্করণ ভারতীয় সংস্করণ থেকে ভিন্ন কিনা। আমরা তো এই ছবিটির কোনো দৃশ্যে দলের ভারতীয় এবং অ-ভারতীয়দের মধ্যে পারস্পরিক ভালোবাসা ও প্রীতির নিদর্শন-মূলক কোনো পরিস্থিতি দেখতে পাইনি। "শেক্সপীয়রওয়ালা" ছবিখানি বিদেশে ভারতীয়দের মর্যাদা কোন্ বিশেষ দিক দিয়ে বৃদ্ধি করেছে জানতে পারলে খুশী হব।

নান্দীকর
কলিকাতা

'চিড়িয়াখানা' প্রসঙ্গে

গত ১৯শে আশ্বিন, ১৩৭৪ বঙ্গাব্দের 'অমৃত' সাপ্তাহিকে প্রকাশিত সত্যজিৎকৃত 'চিড়িয়াখানা' ছায়াছবির আলোচনা আমায় আকৃষ্ট করেছে। তবে দু'টি বিষয়ে বিস্তৃত আলোচনা হয়নি।

একটি—এ ছবিতে 'বিষবৃক্ষ' ছবির একটি অংশ তুলে ধরা হয়েছে। দৃশ্যটি নয়নরঞ্জন, শিল্পশোভন। (বলা বাহুল্য দৃশ্যপরিকল্পনা শ্রীরায়ের)। শ্রীরায় 'বিষবৃক্ষ' ছবির অংশ না দেখিয়ে অন্য কোনো ছবি তো দেখাতে পারতেন। কিন্তু তিনি তা করেন নি, কারণ সুনয়না দেবী ও ডাঃ দাস যে ছবিতে অভিনয় করছেন তা তো 'বিষবৃক্ষ' হবেই, কারণ এটাই তাঁদের জীবনে বিষবৃক্ষরোপণের কাল।

নিবেদন

(এই বিভাগে যারা লিখবেন তাঁদের প্রতি অনুরোধ, তাঁদের বক্তব্য যেন গুছিয়ে অল্প কথায় লেখা হয়। কাগজের এক পাতায় স্পষ্ট করে লিখতে হবে।)

এছাড়া সঙ্গীতের দিক দিয়ে ঐ চিত্রাংশ মনোরঞ্জক। 'ভালোবাসার তুমি কি জান' এ সঙ্গীতটি সত্যজিৎ রচিত এবং এটি এমন সুপ্রযুক্ত হয়েছে যা রসিক চিত্তকে স্বতঃই বিস্মিত করে। সুরে ও ঢঙে ছবির অংশটি যেন বিষবৃক্ষের 'কাল'কে বিধৃত করেছে! আবার এই গানটি যখন টেপ্ রেকর্ডে পরে শোনানো হয়েছে সুনয়না-দেবীকে সবার সামনে, তখন এর আবেদন-আরও চিত্তস্পর্শী হয়েছে। এখানে মূল কাহিনীর আক্ষরিক অনুসরণ যদি শ্রীরায় করতেন (গানটি যোজনা না করে) তবে তা এমন সুন্দর এবং শিল্পশ্রীমণ্ডিত হতো না।

অপরটি—বিষধর সর্প 'বাসুকির' প্রতীক হিসেবে ব্যবহার। এ সর্পটিকে কয়েকটি দৃশ্যে আমরা দেখেছি এবং প্রতি দৃশ্যেই এর ব্যঞ্জনা আমাদের চিত্তাকর্ষণ করেছে। প্রথম দৃশ্যে সত্যান্বেষী ব্যোমকেশ (উত্তমকুমার অভিনীত) সাপ নিয়ে খেলা করছেন। এটি তাঁর চরিত্রপরিস্ফুটনে সহায়ক হয়েছে। তাছাড়া এক-একটি খুন হবার দৃশ্যের আগেই সাপটিকে দেখানো হয়—গোয়েন্দাকে যে এবার সত্যই একটি জটিল কাজে নামতে হবে তারই ইঙ্গিত দেওয়া হলো। তারপর বিজয়ের হাতে সাপটিকে দিয়ে ব্যোমকেশ বললেন—জানো এটার কি অভাব? Vertebrate এদের মেরুদণ্ড আছে, যেটার তোমাদের মধ্যে একান্ত অভাব।—এই একটি উক্তির মধ্য দিয়ে আমরা বুঝতে পারি, যাদের প্রকৃত খুনের মতো কাজ করায় মেরুদণ্ড বা বলিষ্ঠতা বা সাহস আছে তাদের সমগোত্রীয় অন্ততঃ বিজয় নয়।

একেবারে শেষ দৃশ্যে আবার সাপটিকে দেখানো হলো। সাপ হাতে নিয়ে ব্যোমকেশ বলছেন (মিঃ মল্লিককে)—দেখুন, আমি অজিতকে (তাঁর অ্যাসিসটেন্ট) বিশ্বাস না করতে পারি, কিন্তু এটিকে বিশ্বাস করি!

সাপটি ব্যোমকেশের সূক্ষ্ম-জটিল চরিত্রেরই একটি বাহ্য স্থূলরূপ!

অরুণকান্তি লাহিড়ী
কলকাতা-৩৪।

শতাব্দীর শিল্পী গগনেন্দ্রনাথ

গত ১৫ সেপ্টেম্বর তারিখের 'অমৃত' পত্রিকায় গগনেন্দ্রনাথ সম্বন্ধে সুলিখিত ও সুচিত্রিত প্রবন্ধ প্রকাশের জন্য আপনাকে ধন্যবাদ জানাই।

শ্রীধ্রুবজ্যোতি সেনের প্রবন্ধটিও সুলিখিত এবং তথ্যবহুল। কিন্তু দু-একটি তথ্য কিছু ত্রুটিপূর্ণ। সে বিষয়েই দৃষ্টি আকর্ষণ করতে চাই ভবিষ্যৎ ইতিহাসকে নির্ভুল করার জন্য।

প্রথমত শ্রীযুক্ত সেন লিখেছেন—অর্ধেন্দুকুমার গঙ্গোপাধ্যায় যখন আমেরিকায় প্রদর্শনী নিয়ে যান তখন গগনেন্দ্রনাথের ছবি ছিল তিনখানা। সেই প্রদর্শনী আমিই পাঠাই, কিন্তু আমি নিজে যাইনি। ১৯১৪ সাল থেকে ১৯৩৪ পর্যন্ত এবং শেষে ১৯৪৫-এ নব্যকলার যত প্রদর্শনী বিদেশে গিয়েছে সবই আমার দ্বারা আয়োজিত হয়েছিল।

দ্বিতীয়, ১৯১৯ সালে কলিকাতায় ইন্ডিয়ান সোসাইটি অব ওরিয়েন্টাল আর্ট যে জার্মান কিউবিস্টদের চিত্রসম্ভার এনে প্রদর্শনী করা হয়েছিল তার সঙ্গে স্টেলা ক্রামরীশের আদৌ কোন সম্পর্ক ছিল না। সেই প্রদর্শনী আনয়নের মূলেও আমি, এবং স্বয়ং গগনেন্দ্রনাথ তখন সোসাইটির সম্পাদক হলেও প্রদর্শনী আনার যাবতীয় কাজ ও ব্যবস্থা করতে হয়েছিল আমাকে।

বিনীত—
ও সি গাঙ্গুলী,
কলিকাতা-২০।

ঠিকানা পরিবর্তন

বিজয়ার আন্তরিক প্রীতি ও শুভেচ্ছা জানাই। শুভাকাঙ্ক্ষী ও বন্ধুগণকে জানাই যে আমার বর্তমান ঠিকানা হোল ৩।১।৪এ বেচারাম চ্যাটার্জি রোড, কলকাতা—৩৪।

ভবানী মুখোপাধ্যায়
কলকাতা—৩৪

অমৃত

উৎসবের পরের ভাবনা

উৎসবের সময়ে আমরা সকলের শুভকামনা করেছিলাম। উৎসবের শেষে সকলকে জানাই বিজয়ার প্রীতি সম্ভাষণ। এই বিজয়া শুধুমাত্র বিসর্জনের বেদনায় ভরপুর নয়, এর মধ্যে রয়েছে অশুভের ওপর শুভশক্তির বিজয়। সেই অর্থেই একে আমরা বলি শুভ বিজয়া। সকলের শুভকামনা সেহেতু আমাদের আন্তরিক আবেগে উজ্জ্বলতর হোক।

উৎসবের পরে এসেছে নানা দুশ্চিন্তা। যে আনন্দের দিনকয়টি আমরা সব দুর্ভাবনাকে দূরে সরিয়ে রেখেছিলাম, তার বিদায়ের সঙ্গে সঙ্গে আবার দেখা দিয়েছে বাস্তবের কঠোর সমস্যা। সবচেয়ে দুশ্চিন্তা রাজ্যের রাজনৈতিক পরিস্থিতি নিয়ে। পুজোর আগে একবার কালো মেঘ ঘনিয়ে এসেছিল যুক্তফ্রণ্ট মন্ত্রিসভাকে ঘিরে। মুখ্যমন্ত্রী পদত্যাগ করতে প্রস্তুত হয়েছিলেন। যে-শরিকদের নিয়ে যুক্তফ্রণ্ট গঠিত তাদের অনেকের সঙ্গে মুখ্যমন্ত্রীর বনিবনা হচ্ছিল না। সেইজন্য তিনি যুক্তফ্রণ্ট ভেঙে দিয়ে বিকল্প ব্যবস্থা গ্রহণের কথা ভেবেছিলেন। সেই সিদ্ধান্ত তিনি শেষমুহূর্তে পরিবর্তন করেন। কেন করেন, তার একটা ব্যাখ্যাও তিনি দিয়েছিলেন। যদিও সেই ব্যাখ্যা খুব স্পষ্ট ছিল না। এবং সাধারণ মানুষ বুঝতে পারেনি যে, মতানৈক্য সত্যিই দূর হয়েছে কিনা যুক্তফ্রণ্টের চৌদ্দ শরিকের মধ্যে। যাই হোক, জনসভায় যুক্তফ্রণ্টের মুখ্য শরিকরা ঘোষণা করলেন যে, মেঘ কেটে গেছে। সংশয় এবং ভুল বোঝাবুঝি যা ছিল তা পরস্পরের সঙ্গে আলাপ-আলোচনা করে দূর করা হয়েছে। এখন থেকে আবার যুক্তফ্রণ্ট যেমন চলছিল তেমনি চলবে। এ-কথা মুখ্যমন্ত্রীর মুখ থেকেই সকলে শুনেছিল। সুতরাং অবিশ্বাস করার কোনো কথা ছিল না।

কিন্তু অবিশ্বাসের কারণ আবার ঘটালেন মুখ্যমন্ত্রী নিজেই। গত সপ্তাহে তিনি এক বিবৃতি দিয়ে যুক্তফ্রণ্টের কোনো কোনো দলের বিরুদ্ধে মারাত্মক সব অভিযোগ এনেছেন। অভিযোগের মধ্যে দেশদ্রোহিতার স্পষ্ট ইঙ্গিতও ছিল। তাঁর বিবৃতিতে আরও জানা যায় যে, যুক্তফ্রণ্টের মধ্যে যে-ঐক্যের কথা তিনি মাত্র এক সপ্তাহ আগে ঘোষণা করেছিলেন সে-ঐক্য খুব গভীর নয়। প্রতি পদক্ষেপেই ঐক্যে ফাটল ধরছে। এর পাল্টা বিবৃতি দিলেন যুক্তফ্রণ্ট মন্ত্রিসভার উপমুখ্যমন্ত্রী জ্যোতি বসু যিনি মার্কসবাদী কমিউনিস্ট দলভুক্ত। সুতরাং এই বিবৃতির লড়াই নিয়ে আবার বাজার গরম হয়ে উঠেছে। ভারতীয় ক্রান্তি দলের অন্যতম সংগঠক অধ্যাপক হুমায়ুন কবির তো যুক্তফ্রণ্ট মন্ত্রিসভা ভেঙে দিয়ে পশ্চিমবঙ্গে আপাতত রাষ্ট্রপতির শাসন এবং পরে অন্তর্বর্তীকালীন নির্বাচন দাবী করেছেন। মুখ্যমন্ত্রীর নিজের দল বাংলা কংগ্রেসে ভাঙন ধরেছে। পশ্চিমবঙ্গে ক্রান্তি দলের অন্যতম নেতা জাহাঙ্গীর কবির অবশ্য যুক্তফ্রণ্ট মন্ত্রিসভাকে টিঁকিয়ে রাখার পক্ষেই মত দিয়েছেন। কিন্তু যতদূর বোঝা যাচ্ছে মুখ্যমন্ত্রীর নেতৃত্বে তাঁর খুব আস্থা নেই।

এদিকে আমন ফসল ওঠার সময় সমাগত। যুক্তফ্রণ্ট সরকার নতুন খাদ্যসংগ্রহনীতি অনুযায়ী আমন ফসলের ওপর অনেকখানি ভরসা করে আছে। কিন্তু ফ্রণ্টের রাজনৈতিক কলহ না মিটলে খাদ্যশস্য সংগ্রহনীতি সার্থক হওয়া দুঃসাধ্য। কারণ, মন্ত্রিসভার আয়ু নিয়েই ব্যাপক সন্দেহ দেখা দিয়েছে। এই অনিশ্চয়তার মধ্যে সরকারের প্রশাসনিক শাখা আত্মপ্রত্যয়ের সঙ্গে কাজ করতে পারবে না, একথা বলা বাহুল্য। অথচ মানুষ অনেক আশা নিয়ে যুক্তফ্রণ্টকে শাসনক্ষমতায় বসিয়েছে। যুক্তফ্রণ্টের নেতারা বলছেন যে, জনসাধারণ এই সরকারকেই চায়। কিন্তু ফ্রণ্টের নানা দল যদি নানা সুরে কথা বলতে থাকে এবং পরস্পরের ওপর দোষারোপ করতে থাকে তাহলে সরকার নিজের ঘরই সামলাবেন, না, জনকল্যাণমূলক নীতি কার্যকর করবেন। খাদ্যসমস্যা সমাধানে সরকার ব্যর্থ হয়েছেন। প্রথম কয়মাস মানুষ বহু দুঃখভোগ করেও সরকারকে কাজ করার সময় দিয়েছে। কিন্তু নতুন ফসল ওঠার মুখে সরকার যেভাবে বহুধাবিভক্ত হয়ে গেছে তাতে মানুষের আর ভরসা কোথায় যে, এই সরকার টিঁকে থাকলেও তাঁরা সঠিকভাবে খাদ্যসমস্যা সমাধানে আত্মনিয়োগ করতে পারবেন।

এটা খুবই দুর্ভাগ্যের কথা যে, যুক্তফ্রণ্ট এমন সোনার সুযোগ পেয়েও নিজেদের দুর্বলতার জন্য তা কাজে লাগাতে পারল না। মানুষ শুধু শ্লোগান দিয়ে বাঁচতে পারে না। তাকে সুস্থভাবে বাঁচতে হলে চাই প্রতিশ্রুতির বাস্তব রূপায়ণ। যুক্তফ্রণ্ট সরকার কিংবা অন্য যে-কোন সরকারেরই জনপ্রিয়তা বা সার্থকতার মাপকাঠি হল তার জনকল্যাণমূলক কাজ। সেই কাজ অপূর্ণই রয়ে গেল।

ছবির ছন্দ ও গ্রন্থনা

ঋত্বিককুমার ঘটক

সম্পাদনা চলচ্চিত্রের সবচেয়ে শক্তিশালী খুঁটি। একটা ছবি যে দাঁড়ায় তার মূলে ভিত্তিই হল সম্পাদনা। চলচ্চিত্রগত সময় এবং জায়গা সম্পাদনার সাহায্যে বাড়ানো-কমানো যায়। চলচ্চিত্রের জগৎ সম্পাদনার কাঁচির জগৎ। যে-কটি অস্ত্র আমাদের হাতে থাকে ছবি করতে গিয়ে তার মধ্যে সম্পাদনাই সবচেয়ে শক্তিশালী। আইজেনস্টাইনের Conflict বা পুডভকিনের 'সমন্বয়', এগুলো হয়তো আজকের যুগে খানিকটা পুরনো হয়ে গেছে।

কিন্তু এগুলোর ভিত্তিতেই আজও আমাদের সম্পাদনার কাজ চলছে। যে কোনও Western ছবির ফাস্ট কাটিং বা আন্তোনিয়নির মন্থর গতি সবই সম্পাদনার সাহায্যে সম্পন্ন হয়। যে কোনও পরিচালক যখন ছবি করেন তখন সম্পাদনার কথা মাথায় রেখেই করেন।

সম্পাদনাকে সাধারণত বলা হয়ে থাকে 'মন্তাজ'। এই 'মন্তাজ' কথাটা কিন্তু ব্রিটিশ এবং আমেরিকান জগতে গিয়ে ভিন্ন মানে ধারণ করেছে। আমেরিকানরা মনে করে মন্তাজ বলতে সম্পূর্ণ একটা আলাদা জিনিস। তাদের কাছে মন্তাজ হচ্ছে একটা বিশেষ মুহূর্তে একটা চিত্রমালার সৃষ্টি যার সাহায্যে একটা অগ্রগতিকে খুব সংক্ষেপ করে দেখানো যায়। তাই আমেরিকানদের মন্তাজ একটি বিশেষ চলচ্চিত্রগত প্রয়োগ মাত্র—সম্পূর্ণ সম্পাদনাটি নয়।

ছবিতে আপনারা যে জোর দেখতে পান বা যে দুর্বলতা দেখতে পান সেগুলো সবই সম্পাদনার দরুন। ছবি করার বিভিন্ন উপাদান আছে সত্যি, কিন্তু শেষ অবধি সব গিয়ে পর্যবসিত হয় ওই সম্পাদনায়। আমরা যখন ছবি নিয়ে ভাবি, তখন গোড়া থেকে সম্পাদনার কথা ভেবেই ভাবি। পরে হয়ত অদল-বদল কিছু হয়, কিন্তু মূল সুরটি অব্যাহত থেকে যায় গোড়া থেকেই। একটা ছবির রূপ কল্পনা করতে গেলে প্রথমেই মাথায় আসে তার সম্পাদনার রূপ। সেইটাই ছবিটির রস গন্ধ এবং আকার নির্বাচন করে দেয়। কাজেই ছবি করার জগতে সম্পাদনার প্রেরণা অসীম।

চলচ্চিত্রকে শিল্পকলার অংশ বলে ভাবলে সঙ্গে সঙ্গে কতকগুলো ভাবনা এসে পড়ে। সব শিল্পকলারই নিজস্ব ছন্দ আছে। চলচ্চিত্রেরও তা আছে। এবং সেটা সম্পূর্ণ নির্ভরশীল সম্পাদনার ওপরে। সম্পাদনা বলতে এখানে আমি তার ব্যাপকতম অর্থে ধরছি। যেমন ধরুন Ozu-র ছবি। তিনি তাঁর ক্যামেরা রাখার ভঙ্গী থেকে আরম্ভ করতেন সম্পাদনা। বিশেষ একটি set-up এ ক্যামেরা রেখে তিনি পুরো ছবিটা তুলতেন। কাটতেন অত্যন্ত মন্থর গতিতে যেটা জাপানী জীবনের সঙ্গে ওতপ্রোতভাবে জড়িত। এর দ্বারা তিনি যে ছন্দ সৃষ্টি করতেন সে ছন্দ সম্পূর্ণ জাপানী ছন্দ। ও'র থেকে বেশী জাপানী পরিচালক কুরোসাওয়াও নন, মিৎসোগুচিও নন। এটা সম্পূর্ণ সম্পাদনার ব্যাপার।

আমার অযান্ত্রিক কোমল গান্ধার এবং সুবর্ণরেখাতে আমি যে বক্তব্য রাখার চেষ্টা করেছি সেটা মূলগতভাবে একই। প্রত্যেকটি ছবির একটা নিজস্ব দাবী আছে। যার ফলে ছবির ছন্দ বদলায় কিন্তু মূলগত জোরটা একই জায়গায় থাকে। 'অযান্ত্রিক'-এ মনুষ্যসমাজের সীমান্তে বাস করে এমন একজন ব্যক্তিকে আমি ধরেছিলাম। কাজেই সেখানে অনুভূতিটা ছিল একাকী। তাই ছন্দও ছিল এলোমেলো অগোছালো ধরনের। 'কোমল গান্ধারে'-এ এসে সমস্যাটা দাঁড়ালো গোষ্ঠীর। গোষ্ঠীর মধ্যে ব্যক্তিকে বিলোপ করে দেওয়াই আমার করণীয় কর্ম ছিল। তার সম্পাদনা কর্মও সেই হিসেবে একটু হয়ত অবিন্যস্ত। সেটাই 'কোমল গান্ধার' এর মূল সুর ছিল কিন্তু 'কোমল গান্ধার' এর পরে শুনেছিলাম আমি নাকি গল্প বলতে পারি না, তাই চটেমটে ঠিক করলাম যে এবার একটা গল্প বলতে হবে। করলাম 'সুবর্ণরেখা'। ওখানে প্যাঁচটা ছিল এই যে এবার এই ঘটনাটা ঘটতে যাচ্ছে, তোরা ঠেকা দেখি? পারলি নে তো? সঙ্গে সঙ্গে খেলি ঘা। বাঙালী দর্শক শুধু যদি গল্পের অনিবার্যতা নিয়েই চিন্তিত হয়ে থাকে তবে তাও আমি দিতে পারি। সেটা 'সুবর্ণরেখা'য় আমি চেষ্টা করেছি, পেরেছি কি না পেরেছি সেটা আপনাদের হাতে। সম্পাদনার ছন্দও সঙ্গে সঙ্গে বদলিয়েছে, তীব্রতর হয়েছে, দীর্ঘতরও হয়েছে জায়গায় জায়গায়। 'সুবর্ণরেখায়' আমার একটি ক্লোজ শটের ব্যবহার বোধহয় ভারতীয় চিত্রজগতে দীর্ঘতম। সেটা কিন্তু মানুষের চোখেই পড়েনি। ভাই যখন বোনের কাছে গিয়ে পৌঁছচ্ছে উন্মাদনার পরে সেখানে একটা বিগ ক্লোজ আগে মাধবী তাকিয়ে থাকে, আর পেছনে চলে 'প্যাথিসিয়া' মিউজিকের অস্ফুট অনুসরণ। সেটা প্রায় আশী ফুট দীর্ঘ ক্লোজ-আপ।

সম্পাদনা যে ছবি করার পক্ষে সবচেয়ে শক্তিশালী অস্ত্র সেটা স্বভাবতই গ্রিফিথের কাজে প্রমাণ হয় প্রথম। এবং তাকে সত্যি সত্যিই এগিয়ে নিয়ে যান তার যুক্তিপূর্ণ পরিণতিতে কুলেশভ এবং তাঁর গোষ্ঠী। তারই যথাযথ পরিণতি পুডভকিনেও এবং বিশেষ করে আইজেনস্টাইনে। আইজেনস্টাইনই ব্যাপারটাকে তার সম্পূর্ণ পরিণত রূপ দেন। তারপরে ব্যাপারটা আর এগোয়নি ঐটুকু নিয়েই আমরা ঘুরে মরছে খাচ্ছি। কাজেই আইজেনস্টাইনই আজও আমাদের জনক। সম্পাদনার সমস্ত দিকগুলোই তিনি নেড়েচেড়ে দেখেছেন এবং তারই তত্ত্ব এবং ব্যবহারিক প্রকাশ আজও আমাদের পরিচালিত করছে।

(চলচ্চিত্র।। পৌষ-আশ্বিন ১৩৭৪)

রবীন্দ্রনাথের আনন্দ মীমাংসা

সৌম্যেন্দ্রনাথ ঠাকুর

মানবজগৎ তার নিজস্ব কতকগুলি বিশেষ নিয়মের দ্বারা শাসিত। সেগুলি হল বিবর্তনের ধারায় মানবচৈতন্যের প্রাণসংস্থিতিকারক অভিজ্ঞতার প্রতিরূপ এবং সেগুলি শতাব্দীবাহিত ক্রিয়াশীল ঐতিহাসিক ধারার অংশও বটে। ঐ ধরনের নিয়মের একটি হল ঐক্যবোধের ঐকান্তিকতার বিকাশ। মানুষের মধ্যে ঐক্যের একটি চেতনা, এই বিপুল বিশ্ব প্রকৃতির যাবতীয় বিষয়ের সঙ্গে একটি ঐক্যানুভূতি রয়েছে। প্রাণীজগতের মধ্যে, অথবা উদ্ভিদজগতের মধ্যে এই ঐক্যচেতনার কোন অস্তিত্ব নেই। জীবনপ্রবাহের বিচিত্র স্রোতধারার মধ্যে মানুষ এই ঐক্য উপলব্ধির সমস্যার সম্মুখীন হয়েছে। কিন্তু তারপর থেকে সমস্যা হচ্ছে এই যে, কিভাবে সে মানব অস্তিত্বের ব্যক্তিক ও নৈর্ব্যক্তিক তাৎপর্যের দ্বন্দ্বকে সমন্বিত করবে? বিজ্ঞান সমাধানের চেষ্টা করেছে ব্যক্তিককে সামান্য থেকে বিযুক্ত ক'রে। দর্শন সমাধানের চেষ্টা করেছে ব্যক্তিক সত্য এবং প্রামাণ্যতাকে অস্বীকার ক'রে। কিন্তু শিল্প ব্যক্তিক এবং নৈর্ব্যক্তিক দ্বন্দ্বের সামঞ্জস্য করেছে এই বলে যে, তাদের গভীরতার অন্তরালে তারা স্বরূপে একই। এটি সম্ভব হয়েছে জ্ঞানের সঙ্গে অনুভূতির এবং অনুভূতির সঙ্গে কল্পনার সুসঙ্গত মিশ্রণের ফলে।

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর এই পৃথিবীর কয়েকজন শ্রেষ্ঠ শিল্পীর অন্যতম। তিনি উপলব্ধি করেছিলেন যে, একটি অন্তর্নিহিত একতা তার অনিঃশেষ প্রবাহের দ্বারা আমাদের সত্তার বিচিত্র বিষয়কে—আমাদের জ্ঞান এবং আবেগ, আমাদের চিন্তা এবং অনুভূতিকে—বেষ্টন করে রয়েছে। কবি লিখছেন, 'আমার মধ্যে এ একটা অব্যক্ত রহস্যময় ঐক্যানুভূতি যার মধ্যে রয়েছে অসীমের সরলতা এবং বহুবিচিত্র মানুষকে যা একটি মাত্র বিন্দুতে সংহত করে তোলে। আমার মধ্যে এই এক সৃষ্টিশীল। এই সৃজন একটি ক্রীড়া যার মধ্য দিয়ে বিচিত্রের অশেষ প্রকাশের মধ্যে একটি ঐক্যের আদর্শ প্রকাশিত হয়। এই যে সমস্ত ছবি, কবিতা, গান, তাদের মধ্যেই রয়েছে তার উল্লাস, তার কারণ, একটি অন্তর্নিহিত একতার একটি পূর্ণ রূপের

প্রকাশ।" (Creative Unity) রবীন্দ্রনাথ তাঁর সৃজন কর্মের মধ্যে এই ঐক্য-চেতনাকে যেমন প্রকাশিত করেছেন, তেমনি তাঁর অত্যুৎকৃষ্ট কল্পনাশক্তির দ্বারা তাকে গভীরতা, দীপ্তি এবং আকারও দিয়েছেন। একজন শ্রেষ্ঠ শিল্পী হওয়ায় রবীন্দ্রনাথ এই ঐক্যানুভূতির সর্জন্য গুরুত্বকে উপলব্ধি করতে পেরেছিলেন। বহুবিচিত্র সাহিত্যের সবকিছুই তিনি রচনা করেছিলেন—কবিতা, গান, উপন্যাস, ছোটগল্প, নাটক এবং প্রবন্ধ। কিন্তু তাই-ই সব নয়, রবীন্দ্রনাথের ব্যক্তিত্বের মধ্যে আমরা একটি অপরিচিত প্রকাশকে, একটি অনুপম সংমিশ্রণকে প্রত্যক্ষ করি।

এই পৃথিবীতে আমরা অনেক মহান সৃজনশীল শিল্পীকে পেয়েছি। কিন্তু সাহিত্যক্ষেত্রে একজন সৃজনশীল শিল্পীকে একই সঙ্গে সাহিত্যতত্ত্বের প্রবক্তারূপেও কদাচিৎ পাই। রবীন্দ্রনাথের ব্যক্তিত্বের মধ্যে মানবমনের এই দুই ভাস্বরূপের প্রকাশ দেখে আশ্চর্য হয়ে বলতে হয় শিল্পীসত্তা বাস্তবের পূর্ণ ঐক্য উপলব্ধি করেছিল। এরই সঙ্গে তিনি বাস্তবের বিশেষ আস্বাদের অভিজ্ঞতাও লাভ করেছিলেন। তাঁর মধ্যে শুদ্ধ আনন্দ সত্তার 'আনন্দ' তরঙ্গায়িত হয়েছিল। 'রস' অর্থাৎ বাস্তবের আস্বাদ থেকে তিনি আনন্দ-তত্ত্বে উপনীত হয়েছিলেন এবং এই আনন্দের দ্বারা অনুপ্রাণিত হয়ে তিনি সৃজনকর্মে নিমগ্ন হয়েছিলেন শিল্পীর 'লীলা'—ব্যক্তিসত্তার সঙ্গে বিশ্বপ্রকৃতির গুহ্য ক্রীড়ার কতকগুলি বিচিত্র প্রসারের মধ্য দিয়ে চলে। তিনি সত্তার মধ্যে আনন্দের অভিজ্ঞতালাভ করেন এবং রূপসৃষ্টি করেন, যা একাধারে অনুপম, ব্যক্তিক এবং নৈর্ব্যক্তিকও বটে। কিন্তু সাহিত্যতত্ত্বের প্রবক্তা তাঁর বিশ্লেষণী কর্মে শ্রেণী সনাক্তকরণেই ব্যাপৃত থাকেন। সৃজনী শিল্পীর মত তাঁর পক্ষে সৌন্দর্যের উপলব্ধিরও যেমন কোন প্রয়োজন নেই, তেমনি নেই বাস্তবের সঙ্গে একাত্মায় আন্তরিক অনুভূতির প্রয়োজন।

কিন্তু সাহিত্যজগতে একটি অসাধারণ ব্যাপার ঘটল, রবীন্দ্রনাথের মধ্যে আমরা উভয়ের একটি চমকপ্রদ মিশ্রণের অতুলনীয় উদাহরণ পেলাম। একদিকে আমরা রবীন্দ্রনাথের মধ্যে একটি সৃজনী ব্যক্তিত্বের চরম বিকাশকে লক্ষ্য করি অন্যদিকে তাঁর মধ্যে একজন প্রগাঢ় সাহিত্যতাত্ত্বিককে প্রত্যক্ষ করি। আমরা গ্রীক শিল্পতাত্ত্বিকদের কথা জানি, বর্তমানের শিল্পতাত্ত্বিক এবং আমাদের দেশের প্রাচীন শিল্প-তাত্ত্বিকদের কথাও জানি। কিন্তু আমরা কখনো এমন কাকেও দেখিনি যিনি পৃথিবীর একজন অন্যতম শ্রেষ্ঠ কবিও যেমন, তেমনি একই সঙ্গে আবার সাহিত্যতত্ত্বের একজন প্রগাঢ় প্রবক্তাও বটে।

(রবীন্দ্রপ্রসঙ্গ ।। শ্রাবণ ১৩৭৪)

এ শতকের পাঁচজন জাপানী শিল্পী

অচিন্ত্য সেন

চিরন্তন জাপানী শিল্পপ্রথা, বর্তমানের পাশ্চাত্য প্রথার অনুকরণের জন্যে হারিয়ে যেতে চলেছে। কোথাও অনুশোচনার চিহ্ন নেই চিরন্তনের জন্যে। বর্তমানে অতীতের শিল্পীদের শিল্পসামগ্রী যাদুশালার অপব্যবহারের ঘরে স্থান পেয়েছে। আবার কখনো কখনো সস্তা দামে ছাপিয়ে বিক্রী করা হচ্ছে বিদেশীদের কাছে।

বর্তমানের শিল্পীরা কালির আঁচড়ে আঁকা ছবির কথা ভুলে গিয়েছেন। আধুনিক শিল্পীদের শিল্প-বিষয় হয়েছে দেহ-কেন্দ্রীক। দেহবাদী শিল্পীদের মধ্যে প্রথমেই নাম করতে হয় টোমিও মিকিরের।

......টোমিও মিকির :

টোমিও মিকির ১৯৬৩ থেকে আজ পর্যন্ত কানই এঁকে চলেছেন। কানের আয়তন যেমনি বড় আবার তেমনি ছোটও হয়ে থাকে। কানই বা তাঁর শিল্পের বিষয় কেন? জা পল সাত্রের (লা) নোসেরের এস রোকটেনের মত কানই তাঁকে নতুন চিন্তার দিকে এনেছিল। একবার নাকি ট্রেনে করে বেড়াতে গিয়ে কামরায় অনেকগুলো কান তাঁকে একসঙ্গে আক্রমণ করেছিল। তার থেকেই তিনি কানের দাস হয়েছেন।

কিজি উকাসি (১৯৪০) :

১৯৬৩তে প্রথম শিল্প-প্রদর্শনী করেন। তাঁর ক্যানভাসে ভরে থাকতো কেবল সাদা রংয়ে। বর্তমানে নিজের দেহের বিভিন্ন দিক তিনি কাগজে কেটে নিয়ে তারই ছাপ দিচ্ছেন ক্যানভাসে। মনে হবে কোন এক স্থায়ী বিষয়ের শান্তি নষ্ট করা হয়েছে এভাবে। এ যেন ঠিক এযুগেরই চেহারা।

উমিও সিনহোরা :

'কেনই বা আমি জেসপার জোনসের মত পতাকা আঁকবো না, যদি আমি পতাকা দেখে আনন্দ পাই?'

বর্তমানে সিনহোরা বিমূর্তবাদের বিরাট প্রচারক। সিনহোরা অলোমদিক পোষাক-পরা এক মূর্তি তৈরী করেছেন। একহাতে তাঁর কোকোকোলার বোতল অন্য হাতে শিল্প-পত্রিকা। মাথার মধ্যে দিয়ে দাবার ঘুঁটি যাতে বেড়িয়ে আসতে পারে তারও ব্যবস্থা করেছেন সিনহোরা। বর্তমানে এ ধরনের কাজ এক নতুন জোয়ার এনেছে জাপানি শিল্পীদের কাছে।

যোকুশা কি কুসাইদার :

মানুষের মূর্তি আধা চাঁদের আলোতেই আঁকা হলো এর বিষয়।

মিরাচয়োচ নিকা :

দৈনন্দিন জীবনের ছবি আঁকেন তাঁর ক্যানভাসে—যেমন, কোকোকোলার বোতল আর বিভিন্ন বাদ্যযন্ত্র।

বর্তমান শিল্পীদের সঙ্গে প্রথম জাপানি বিমূর্তবাদী শিল্পীদের বিরাট প্রভেদ রয়েছে।

[চিত্রপ্রসঙ্গ ।। ২য় বর্ষ, ১ম সংখ্যা]

ফেদেরিকো ফেলিনি

অমর বন্দ্যোপাধ্যায়

ভাবতে অবাক লাগে যে, যে ফেলিনি আজ বিশ্ববন্দিত চলচ্চিত্রকার হিসেবে দেশে দেশে প্রশংসিত, তিনি প্রথম আবির্ভূত হয়েছিলেন ১৯৪৭ খৃষ্টাব্দে চিত্রনাট্যকার হিসেবে। এ থেকে আরও একটি জিনিস স্পষ্ট হয়—চিত্রনাট্য রচনায় তাঁর অসাধারণ মুন্সিয়ানাই পরবর্তীকালে তাঁকে এনে দিয়েছে জগৎজোড়া খ্যাতি। চলচ্চিত্র প্রস্তুতিতে চিত্রনাট্যের গুরুত্ব সর্বাধিক এবং সেই গুরুত্বপূর্ণ কাজে ফেলিনির আশ্চর্য দখলই তাকে করে তুলেছে আজ বিশ্বের শ্রেষ্ঠ চলচ্চিত্রকার।

ফেলিনির প্রতিটি ছবিই বক্তব্যধর্মী, কিন্তু শৈল্পিক সুষমায় আশ্চর্য রসোত্তীর্ণ। সামাজিক পরগাছা শ্রেণীকে নিয়ে তিনি করলেন প্রথম ছবি 'আই ভিতেলোনি'। নিম্নশ্রেণীর যাযাবর সম্প্রদায়কে অবলম্বন করে তুললেন 'লা স্ত্রাডা'। প্রতারণার বিভিন্ন দিক এবং প্রতারকদের স্বরূপ উদ্ঘাটন করলেন 'দি সুইন্ডল্' ছবিতে। পতিতাদের সমস্যা তুলে ধরা হয়েছে 'কাবিরিয়া' চিত্রটিতে। উচ্ছৃঙ্খল তরুণ-তরুণীর যৌবন উন্মাদনার প্রতিচ্ছবি হোল 'লা দোলচে ভিতা', প্রযোজকদের স্থূলরুচি ফরমায়েসী, পরিচালকের উদ্ভ্রান্তি, চিন্তা-বিপ্লব ও যন্ত্রণার ছায়া পড়েছে ব্যঙ্গবিদ্রূপ-মিশ্রিত ফ্যান্টাসীর আকারে 'এইট অ্যান্ড হাফ্' ছবিটিতে। ...এইসব উল্লেখযোগ্য প্রতিটি চিত্রকর্মেই লক্ষ্য করা যায় মানুষের প্রতি তার আন্তরিক দরদ এবং সুতীব্র স্যাটায়ার। বাস্তব আর কল্পনার এমন অদ্ভুত সমন্বয়ও ফেলিনি ছাড়া আর কারও ছবিতে তেমন দেখা যায়নি। কিছুটা অপ্রচলিত বিষয়বস্তুকে নিয়ে ছবি তোলায় ঝোঁক থাকার জন্যে ফেলিনিকে বেশ বেগ পেতে হয় ছবির প্রযোজক পেতে। অনেক প্রযোজকই ফেলিনির ছবি করতে প্রথমে দ্বিধা করেছেন। তাঁরা কনভেনসন বিরোধী ফেলিনির ছবিতে রিস্ক নিতে রাজী নন। কিন্তু ফেলিনির ছবি শেষ পর্যন্ত যেসব প্রযোজক ঝুঁকি সত্ত্বেও প্রযোজনা করেছেন তাঁদের সকলেরই কপাল খুলে গেছে। শিল্প ও বাণিজ্য এই দুটো দিকেই যে সাফল্যের নজির রেখেছে ফেলিনির ছবিগুলি তা বড় একটা পৃথিবীর বাজারে তেমন দেখা যায় না।

সমাজের বিভিন্ন স্তর, বিভিন্ন শ্রেণী চিত্রায়িত তার বিভিন্ন ছবিতে সংঘাতের মধ্য দিয়ে। অর্থনীতি, সমাজনীতি ও রাজনীতির বিশ্লেষণ সে সব ছবিতে যেমন অপ্রত্যক্ষ নয়, তেমনি রয়েছে স্যুররিয়ালিজমের প্রভাব। বেয়ারম্যানের ছবিতে যেমন কনটেন্টের চেয়ে ফর্মের কৃতিত্ব বেশী, ফেলিনির ছবিতে কনটেন্ট আর ফর্ম যেন হাত ধরাধরি করে চলেছে সাফল্যের সিংহদ্বারের দিকে। এদিক থেকে চ্যাপলিনের সঙ্গে সমগোত্রীয়তাই যেন তাঁর বেশী।

[মধ্যাহ্ন ।। বৈশাখ-আষাঢ় : ১৩৭৪]

একাকী হৃদয় ॥ পরিমল চক্রবর্তী

একাকী হৃদয় কেঁদেছে কতো না দুখে
রাত্রির রঙ মেখে নিয়ে দুই চোখে!
তাই দেখি আজো বিদীর্ণ করে বুক
যৌবনী-মন কেঁদে ওঠে সেই শোকে।

দুরন্ত প্রেম ফাল্গুনী অভিলাষে
কবে যেন ভরে ছুঁয়ে গেছে এই প্রাণ—
পৌষের ভোরে শিশির-সিক্ত ঘাসে
শোনা যায় তাই অনাহত সেই গান।

যদিও এখন কিছুই পড়ে না মনে,
বিগত যুগের স্বৈরিণী মৃতসাধ
তবুও জাগায় আয়ুর গহন বনে
হুহুবয়ানী সেই স্মৃতির আর্তনাদ।।

শ্রীরাধার শাড়ি ॥ বিনোদ বেরা

তোমাকে পাবার বাসনা গেছিলো বেড়ে
তাই প্রয়োজন হয়েছিলো ঘরবাড়ি,
বহুদিন হলো তোমাকে এসেছি ছেড়ে
মেঘ পটে গ্রাম যেন শ্রীরাধার শাড়ি।

বিরহের রঙ ধরেছে আকাশে ঘাসে
স্বপ্নের গাছে ফোটে অজস্র কুঁড়ি,
মধুর সমীরে দেহ পরিমল ভাসে
বাজে চেতনায় কাচের রঙিন চুড়ি।

মন, মিলনের উজ্জ্বল ফুলহার
প্রত্যাশা করে বাসনা কোরকে জাগে,
ধীরে খুলে যায় স্মৃতির জানালা দ্বার
জাগি প্রিয়তমা বেদনার অনুরাগে।

তোমার সোহাগ হৃদয়ে রয়েছে আঁকা
স্থির জ্বলে প্রাণে বিদ্যুতে গড়া বাড়ি,
ফুলে ভরে ওঠে ফাগুনে নবীন শাখা—
দূরে মেঘপটে আঁকা শ্রীরাধার শাড়ি।।

'অনেকক্ষণ তোমার জন্যে অপেক্ষা করে করে পায়ে ব্যথা হয়ে গেল।' সন্দীপের সঙ্গে দেখা হতেই জয়ন্তী বললে।

'আর বোলো না। আটকে পড়েছিলাম। বেরুচ্ছি, অফিসার ডেকে পাঠালেন। চাকরি তো রাখতে হবে।' সন্দীপ্ত হাসল।

'তোমার আর কী। রাস্তার সমস্ত লোকের যেন আমি জিজ্ঞাসার পাত্র হয়ে পড়েছি। রাস্তার মোড়ে একটা মেয়ে দাঁড়াবে তার জন্যে কত কৌতূহল।'

'তা হোক। এখন চলো।'

'কোথায় যাবে? তোমার তো দৌড় ওই। গরু যেমন ঘাস দেখলে মাঠে ছোটে, সেই ময়দানের ছায়ায়। তার, বাড়িতে পা দিয়েই আমার শাড়ির চোরকাঁটা তুলতে তুলতে প্রাণান্ত। ছোট বোন বাসন্তী পর্যন্ত মুখ টিপে হাসে।'

'কেন? শৈলেশের সঙ্গে ও বুঝি কোনোদিন মাঠে নামেনি?'

'অসভ্যের মতন কথা বোলো না।' জয়ন্তী হাঁপাতে হাঁপাতে রাস্তা পার হল, 'দেখবে একদিন গাড়ি-ঘোড়ার তলায় চলে যাবে।'

'রাগ হয়েছে মনে হচ্ছে।'

'হবে না? বেড়ানোর নামে তুমি এমনভাবে আমাকে ছুটিয়ে মারো, সেদিন এই মাঠে ঠায় ভিজতে হল।'

'ভালোবাসায় ভেজে না কে? এরপরে তো আর ভিজবে না. ঠাণ্ডা লাগবে, অসুখ করবে, কত বায়না হবে।'

'হ্যাঁ। তোমায় বলেছে।'

'মেয়েদের জানা আছে। ঘর পেতে যতক্ষণ, তারপর লেপে পা ডুবিয়ে গল্প ছাড়া আর কিছু ভালোবাসে না।'

'কটা মেয়ে দেখেছ?'

'একটাই। একাই একশো।'

জয়ন্তী হঠাৎ দাঁড়িয়ে পড়ল: 'এই, আমি আর হাঁটতে পারছিনে। সারা রাস্তা বাসে দাঁড়িয়ে এসেছি।'

সন্দীপ্ত বললে, 'লক্ষ্মীটি, আর আর একটুখানি। ওই গাছতলাটা বেশ নির্জন।'

'থামো। কী আমার নির্জন। অসভ্য ছেলেগুলো শিস মারতে মারতে চলে যায়, সেদিন কী নোংরা কথা বলে গেল—'

'রাস্তায় বেরুলে ধুলো লাগবে. তাই বলে দরজা-জানালা বন্ধ করে রাখবে। ওরা ওদের কাজ করুক, আমরা আমাদের। এই, সাবধানে, কাদা......'

জয়ন্তী বললে, 'তোমার সঙ্গে বেরুলে কাদা ছাড়া কী থাকবে?'

সন্দীপ্ত বললে. 'দাঁড়াও না. অফিসার হই, ট্যাক্সি ছাড়া একপাও চলব না।'

'আচ্ছা? টেরিলিনের স্যুট করার পর ট্যাকসির পয়সা থাকবে তো?'

'ও, আমার অক্ষমতাকে কটাক্ষ করা হচ্ছে,'

জয়ন্তী শব্দ করে হেসে উঠল।

'তোমরা পুরুষমানুষেরা না একেকটা অহংকারের পিপে। ইশ, কত মুরোদ। সর্বশক্তিমান ঈশ্বর যেন।'

'তুমি মাস্টারি করতে করতে একেবারে দিদিমণি হয়ে গেছ। হোপলেশ। কুয়োর ব্যাঙ।'

জয়ন্তী এবার ধপ করে বসে পড়ল।

'এই চিনেবাদাম খাব—'

সন্দীপ্ত পাশে বসল। 'তারপর, আজ কী বলে বাড়ি থেকে কাটলে?'

জয়ন্তী বললে, 'কেন ইস্কুলে যাচ্ছি বলে?'

'শনিবারে ইস্কুল?'

'কেন? কাজ থাকতে পারে না?'

'তাই বলো।'

'তোমার জ্বালায় পাহাড়প্রমাণ মিথ্যা জমে উঠছে। মরে গেলে ঠিক নরকে যাব।'

'যেও। দেখতে যাব না।'

'আজ্ঞে না মশায়, তোমাকেও নিয়ে যাব।'

সুদীপ্ত হঠাৎ গম্ভীর হল। 'শোনো—বাড়িতে বলেছ?'

জয়ন্তী বললে, 'তুমি অফিসার না হলে কী করে বলি।'

'ইয়ারকি কোরো না। এই ছুটোছুটি আর ভালো লাগে না—জাতও যাচ্ছে পেটও ভরে না।'

'সত্যি বলব? রাগ করবে না?'

'কী?'

'তোমার ওপর ঠিক আস্থা রাখতে পারিনে—'

'কেন?'

'তুমি একটুও সিরিয়াস নও। বিয়েটা তোমার কাছে সিনেমার টিকিট কাটার মতন। টিকিট পেলেই ভেতরে ঢোকা যায়।'

'কী করলে তুমি আমাকে সিরিয়াস মনে করবে?'

জয়ন্তী বললে, 'কিছুই করতে হবে না। তুমি যেমন আছ তেমন থাকো।'

সুদীপ্ত গম্ভীর হল। 'বুঝতে পারছি তুমি আমাকে এড়াতে চাইছ।'

'ঠিকই বুঝেছ। নইলে তোমার সঙ্গে একা-একা এই মাঠে এসে বসতে পারি?'

'তুমি বাড়িতে বলছ না কেন জানতে পারি?'

'ধরো বলেছি, ওরা রাজি হল, তারপর তুমি কী করবে?'

'বা।'

'বা। রেজিস্ট্রেশন-রেজিস্ট্রেশন করে আমার মাথা খাচ্ছ। রেজিস্ট্রেশন করার পর আমি আমার বাড়িতে হাত ধুয়ে বসে থকব আর তুমি তোমার বাড়িতে। আমাকে এত নিরীহ পাওনি।'

'কী করতে চাও?'

'একসঙ্গে একই বাড়িতে থাকতে চাই, বুঝেছ অত সোজা নয়। বিয়ে করে তুমি আমাকে হুগলি পাঠিয়ে দেবে, আর তুমি ড্যাং-ড্যাং করে কলকাতায় থাকবে, অমন শ্বশুরবাড়ি আমার দরকার নেই। আমার মাস্টারিটা করবে কে?'

'এখানে বাড়িভাড়া করতে বলছ এই তো?'

'গলা শুনে মনে হচ্ছে বাড়িভাড়া করে ফেলেছ। জানো একটা ঘর পেতে হবে, সত্তর-আশীর কমে চলে না। তারপর নতুন করে সংসার পাততে......তোমার অফিসার না হলে চলবে না।'

'তুমি আমাকে ভয় দেখাচ্ছ।'

'ভয় পাওনা মনে হচ্ছে? এতো আর ময়দানে পা ছড়িয়ে বসে বাদাম খাওয়া নয় রীতিমতো সংসার। ব্যাংকে কত টাকা আছে? নেই আগেই জানি।'

সুদীপ্ত চুপ।

'বিয়ের ব্যাপারটা যদি সত্যিই তোমার কাছে জরুরি হত তাহলে এই দুবছরে কিছু টাকা জমাতে। জানো ব্যাংকে আমার হাজার টাকা আছে।'

'তোমার কী ধারণা আমি ইচ্ছে করে টাকা জমাইনি।'

'না তা নয়। জমাতে পারোনি। এর জন্যে তোমাকে আমি দোষ দিচ্ছিনে। টাকার সমস্যাটা আমাদের কাছে এত বেশি যে প্রতিপদে ভাবতে হয়। এই নয় যে তোমার হাতে একদিন প্রচুর টাকা এসে জমা হবে, এমন অসম্ভব কল্পনা আমি করিনে, কিন্তু যখনই ভাবি তখন এমন হতাশ লাগে যে তোমার ওপর রাগ হয়, সমাধানের পথ পাইনে। আমাকে অনেক ভাবতে হয়, সংসার তো তুমি করবে না, সংসার আমাকে করতে হবে, আমি জানি তার রোজকার রূপটা এমন কর্কশ যে তুমি সহ্য করতে পারবে না।'

সুদীপ্ত মুখ কালো করে সিগারেট ধরালো।

'কী, রাগ হল মশায়ের। ভাবছ খুব স্বার্থপর আমি, তাই না? দ্যাখো আমি দুঃখকে ভয় পাইনে, সেটার সম্পর্কে আমার ধারণা আছে। কিন্তু তুমি চিরকাল বাইরে কাটিয়েছ, সংসারের ব্যাপারটা তুমি জানো না।'

'তাহলে তো—' সুদীপ্ত শেষ করল না।

'হতাশ হয়ো না। হয়তো পথ আছে। ধৈর্য হারালে চলবে কেন।'

'কী জানি বিশ্বাস নেই। এখন দেখছি ভুল করেছি, তোমাকে আমার সঙ্গে না-জড়ালেই ভালো হত।'

'হাসির কথা বোলো না। এতদিন পর এসব কথা তোমার মুখে মানায় না। দেখো তোমাকে আমি রাজপুত্তুর বলে ভালোবাসিনি, আর আমিও কিছু রাজকন্যে নয়। সব জেনেই আমরা পা বাড়িয়েছি। এই বাধাগুলো আছে বলেই তো আমরা আরো কাছে আসতে পারছি। জানো সেদিন রাত্রে খুব বর্ষা নামল, আমার হঠাৎ ঘুম ভেঙে গেল, আর কী লজ্জা আমি গুমরে-গুমরে কাঁদছি। এখনো কাঁদতে পারি বলে ভালোবাসতে পারি। সেদিন বিকেলে তুমি আমার সঙ্গে বিশ্রী ঝগড়া করেছিলে।'

'ঝগড়া!'

'হ্যাঁ। আমার পৌঁছতে দেরি হয়েছিল। মণিকা আমাকে আটকে দিয়েছিল, কিছুতেই ছাড়ছিল না, শেষ পর্যন্ত যখন ছুটতে ছুটতে আসছি, তুমি......'

'বা, রাগ হয় না? প্রায় ঘণ্টাখানেক দাঁড়িয়ে আছি।'

'মণিকা যদি দুষ্টুমি করে আমাকে আটকে রাখে, আমি কী করব। আমার খুব ভালো লেগেছিল তোমাকে ওইভাবে দাঁড় করিয়ে রাখতে? কেন বোঝো না আমার আগ্রহও কিছু কম নয়।'

'আমি কী করে জানতুম—'

'জানো না বলেই তো সেদিন অমন আঘাত দিতে পেরেছিলে। আমার সামনে সামনে তুমি চলন্ত বাসে উঠে গেলে। আমার কথা ভাবলে না। জানলেও না যে আমি সকালে অজ্ঞান হয়ে গিয়েছিলাম—'

'অজ্ঞান!'

'কলতলায় পড়ে গিয়ে—'

'আমি জানতাম না—'

'সকালে উঠে কান্নার কথা মনে পড়ে অবশ্য খুব হাসি পেয়েছিল আমার। আমার বোকামির জন্যেই এই ফলভোগ। তোমাকে আগেই আমার অসুস্থতার কথা বলা উচিত ছিল। বলি নি আরো, জানি তো তোমাকে। এমন চিন্তা করে করে সারা বিকেলটা আমার মাথা খেয়ে ফেলতে। তোমার আদিখ্যেতা তো জানি।'

'আদিখ্যেতা!'

'নয়? তুমি এমন করতে যেন আমি মরে যাচ্ছি। এমন আদিখ্যেতার সুযোগ পেলে তুমি ছাড়তে!'

'আমাকে রাগিয়ে দিচ্ছ তুমি।'

'দেখো আবার রাগ করে বেশি সিগারেট খেয়ে বোসো না। বাবা, সেবার ডায়মণ্ড-হারবারে গিয়ে কম জ্বালিয়েছিলে। প্রায় পাঁচ প্যাকেট সিগারেট—'

'তোমার কিছুই ভুল হয় না দেখছি।' সুদীপ্ত হাসল। 'কিন্তু আমি পুরোপুরি ব্যর্থ হয়েছিলাম। আমার রাগের ধারে-কাছেও যাওনি। তুমি কম চালাক।'

জয়ন্তী বললে, 'এতদিন তোমার সঙ্গে কাটালাম, তোমার নাড়ী-নক্ষত্র চিনতে আমার বাকি আছে। তোমার রাগের ওপর মনোযোগ দিলে তুমি আমাকে শেষ করে দিতে।'

সুদীপ্ত বললে, 'আহা, সত্যিই যেন কত ভয় করো আমাকে।'

জয়ন্তী বললে, 'করিনে আবার। সেই যে একবার রাগ করে প্রায় দুটো হপ্তা নিরুদ্দেশ হয়ে রইলে। আবার ঢঙ করে চিঠি লেখা হল 'আমাকে ভুলে যাও। তোমার জীবনে আমি মৃত।' দাম বাড়ানো আর কী।'

'ধরো সত্যিই যদি না ফিরে আসতাম?'

'যেতে কোন চুলোয়? আমার মতন বোকা মেয়ে আর কটা আছে? মুরোদ জানা আছে, জানো খোঁটায় বাঁধা আছে তাই 'আমাকে ভুলে যাও' বলতে বুক কাঁপে না। ব্যাপারটা সত্যি হলে হাওড়ার ব্রিজ থেকে ঝাঁপ দিতে। বীরপুরুষকে তো জানা আছে।'

'আচ্ছা জয়ন্তী, তুমি এত জোর পাও কী করে? ভয় হয় না? এই যে বার-বার বিয়ের প্রস্তাবকে সরিয়ে দিচ্ছ, যদি—'

'থামো। সে সাহস থাকলে মায়ের দেখানো পাত্রীকেই বিয়ে করতে। আমার মতন নিরীহ মেয়ে পেয়েছ, জানো কান্না করা চলবে।' জয়ন্তী মুখ বেঁকিয়ে বললে,

'কেন জয় করতে যায়? আমার অন্যায় জিনিসকে ঠকিয়ে তুমিই বা কোন রাজ-সুখ পাবে?'

সুদীপ্ত হাসল। 'তোমাকে মাঝে মাঝে বুঝতে আমার কষ্ট হয়। এত সহজ অথচ এত কঠিন।'

'কেন? কঠিন কেন? তোমার সঙ্গে এখুনি রেজিস্ট্রারের আপিসে ছুটছিনে বলে? তোমার হ্যাংলামো ভীষণ বেড়ে যাচ্ছে। বিয়ে না করে এমন কী কষ্টে আছ শুনি? এই কয়েক বছরে রেস্তোরাঁর বয়গুলো পর্যন্ত আমাদের চিনে ফেলেছে। কেবিনে ঢুকলেই পরদা টেনে দেয়।'

'সেটা বুঝি ভালো? বয়দের করুণা পেতে?'

'কেন? বকশিস পায় না? আবার মুখ গম্ভীর করছ কেন? তোমাকে নিয়ে আর পারা যায় না।'

সুদীপ্ত বললে, 'এই, চলো না একদিন বারাসাতে যাই—'

জয়ন্তীর চোখ বড় বড় হল। 'বারাসাত!'

'রমেন বহুদিন বলছিল যেতে। ওদের বিরাট বাড়ি, একা থাকে—'

জয়ন্তী সন্দেহভরা চোখে তাকাল। 'ও একা থাকে তো আমাদের কী?'

'না। ও বলছিল যেতে তাই। ওদের পুকুরে বড় বড় মাছ আছে, বেশ মজা হয় তাই না?'

'মজা! মাছ ধরতে? মাছ ধরোনা গিয়ে,
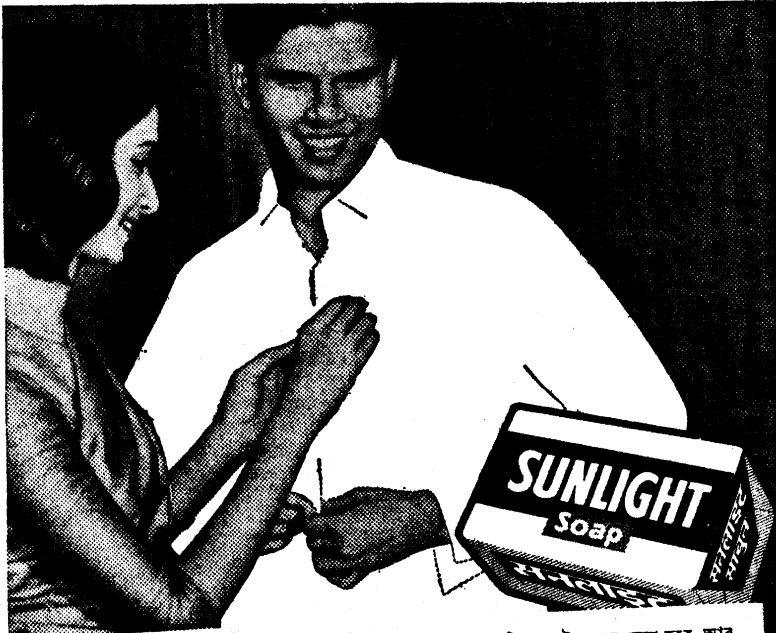
তোমার বন্ধুর বাড়িতে আমি গিয়ে কী করব।'

'এই একটু পিকনিকের মতন আবহাওয়া হত, পরিবেশ বদলানো আর কী!'

জয়ন্তী বললে, 'বুদ্ধিটা কে দিয়েছে? বন্ধু? আমাকে নিয়ে খুব রসের গল্প হয়েছে তাই না?'

'এইত! ভুল বুঝছ!'

'চুপ করো। লজ্জা করে না একটা মেয়েকে নিয়ে বন্ধুর বাড়িতে ইয়ারকি করতে যাওয়া? একটা ঘরের জন্যে খুব অসুবিধে হচ্ছে, না? পয়সা থাকে যাওনা সেইসব মেয়েদের কাছে।'

সুদীপ্ত কী বলতে যাচ্ছিল, জয়ন্তী বাধা দিল: 'আবার যদি কোনোদিন এই ধরনের মতলব আঁটো তাহলে জানবে তোমার সঙ্গে এই শেষ।'

সুদীপ্ত মুখ কালো করে রইল।

জয়ন্তী বললে, 'এভাবে তোমার চলে। আমার চলে না। ঘরে নিতে হলে আমাকে চিরকালের জন্যে থাকতে দিতে হবে।'

'এই, কী হল, কাঁদছ কেন?' সুদীপ্ত বিব্রত হয়ে পড়ল।

'এম্নি। ও কিছু নয়।'

'এই, কী হচ্ছে? বেশ তো, আমি তো জোর করছিনে। আমরা সত্যিই সিরিয়াসলি ভেবে বলিনি—'

'তুমি সিরিয়াসলি না ভেবে কিছুই বলো না। আমি দেখছি কিছুদিন থেকে তুমি এই একটি বিষয় নিয়ে তীব্র চিন্তা করছ। আমার সম্মানের দিকটা ভাবলে তুমি কখনোই অমন কথা বলতে না। তোমার মুখে এসব কথা শুনলে আমার কষ্ট হয়, মনে হয় মরে যাব। হয়তো আমি তোমার কাছে ফুরিয়ে যাচ্ছি, আর আমার......'

'বাবা, আমার অপরাধ হয়েছে। ক্ষমা চাইছি, হলো? আমিও তো একটা রক্ত-মাংসের মানুষ। আমার ইচ্ছেগুলো তোমাকে ছাড়া কার কাছে জানাব?'

জয়ন্তী বলে, 'জানাবে না একথা তো বলিনি। সেজন্যে রাগও করিনে। আমিও কী পারব। কিন্তু কী করব, বলো আমি কী করতে পারি। বার-বার মনে করিয়ে দিলে আমি যে পাগল হয়ে যাব।'

'বেশ। আর বলব না।'

'রাগ কোরো না লক্ষ্মীটি। একটু ধৈর্য ধরো। একে তো চিন্তার শেষ নেই, তারপর তুমি যদি এইভাবে মন খারাপ করে থাকো, আমার একটুও ভালো লাগবে না।'

সুদীপ্ত বললে, 'এবার ওঠা যাক। অন্ধকার হয়ে এল।'

'একটু বসি।' জয়ন্তী বললে: 'আজ আর তোমাকে ছাড়তে ইচ্ছে করছে না। তোমাকে চোখের আড়াল করতে আমার ভয় হয়। জানি তো তোমার স্বভাব, মেসে গিয়ে আবার পা ছড়িয়ে ভাবতে বসবে।'

'না। ভাবব না। আপিসের একটি জরুরি ফাইল নিয়ে এসেছি, কাজ করতে হবে।'

'আর—একটু বোসো। বসে বসে কটা সিগারেট খেলে বলো তো?'

'না। আর প্যাকেটে সিগারেট নেই।'

'বুঝেছি। সেইজন্যই ওঠবার তাড়া। এমন অভ্যেস করো কেন যার ওপর তোমার কর্তৃত্ব নেই।'

'অভ্যেস গড়ে ওঠবার আগে তুমি কেন এলে না?'

জয়ন্তী শব্দ করে হাসল। 'আমি আসবার আগে আর কী কী অভ্যেস তৈরি করে রেখেছ?

সুদীপ্ত বললে, 'ক্রমশ প্রকাশ্য।'

'ঘুমোতে ঘুমোতে হাত-পা ছোঁড় না তো?'

'পাশে তো কেউ শোয় না, জিগ্যেস করে জেনে নিতাম—'

'হাসি না। জানো ওদেশে নাক ডাকার জন্যে বিবাহ-বিচ্ছেদ হয়।'

'ঘুমোবার সময় একদিন তাহলে দেখে যেও।'

জয়ন্তী বললে, 'যাবই তো। শোধ নেবো না? একদিন তোমরা মেয়ে দেখতে এসে আমাদের ঘষে-ঘষে দেখেছ রঙ পাকা না কাঁচা! যেন বিয়ের পর বউমাকে একেবারে পটের বিবি করে টাঙিয়ে রাখবে!'

সুদীপ্ত হাসল। 'আমার অবশ্য রঙের বাছ-বিচার নেই।'

জয়ন্তী বললে, 'বাছ-বিচার করে আর কী হবে। তোমার কপালে এই কালো পেত্নীই জুটেছে। আমার ভাগ্য অবশ্য ভালো......'

'অত তেল দিচ্ছ কেন?'

'না। সত্যি। মণিকা একদিন রাস্তায় আমাদের দেখেছে। ওই বলছিল......'

'এবার বাজে বকছ তুমি। চলো রাত্তির হচ্ছে।'

'এখান থেকে উঠে তো চায়ের তেষ্টা পাবে? বাবা, ওইটুকু কেবিনে দমবন্ধ হয়ে আসে।'

সুদীপ্ত বললে, 'না। আজ আর রেস্তোরায় ঢুকব না।'

'হঠাৎ? এমন সাধুপুরুষ হলে?' জয়ন্তী হাসল। 'ভালোই হল। বাবা, একদিনের চাকরি থেকে বাঁচলাম।'

'না। আর কোনোদিনই যাব না।'

'আচ্ছা? মাতালের প্রতিজ্ঞা? দেখি কতদিন থাকে।'

'দেখো।'

'বুঝেছি। পকেটে পয়সা নেই।'

'আছে।'

'তবে? বুঝেছি বাড়ির থেকে খারাপ চিঠি এসেছে?'

'না।'

'তবে?'

'রোজ রোজ রেস্তোরায় ঢুকতে কেমন চোর-চোর লাগে।

জয়ন্তী খিলখিল করে হাসিতে ভেঙে পড়ল।

আর, ওর হাসির শব্দে চমকে উঠে ফেরিঅলা বোধহয় কাঁপা গলায় হাঁকল: 'চিনেবাদাম।'

এবার ওরা অন্ধকার থেকে আলোয় হেঁটে এল।

জয়ন্তী নিঃশব্দে সুদীপ্তের চোখের দিকে চেয়ে ওর চোখের ভাষা পড়তে চাইল।

সুদীপ্ত বেশ অস্বস্তি বোধ করতে লাগল।

'অমন করে আমার দিকে কী দেখছ?'

'তোমার চোখে আলো পড়েছে কিনা তাই দেখছি।'

'খুব ইয়ারকি হচ্ছে, না?'

জয়ন্তী ওর মুখের ওপর থেকে চোখ সরাল না।

রাস্তা পার হয়ে ওরা আলোকিত বিপণিমালার দিকে এগিয়ে গেল। তারপর দোকানের আলোগুলো তাদের পিঠের ওপর দিয়ে পিছনে চলে গেল। আশ্চর্য, সুদীপ্তের তেষ্টা পেল না। এমনকি সে দাঁড়িয়ে সিগারেট পর্যন্ত কিনল না। জয়ন্তীর বিচিত্র হাসিটা যেন তখন থেকে তাড়া করছে সুদীপ্তকে। হুড়মুড় করে ওকে নিয়ে সুদীপ্ত বাস স্টপে এসে থমকে দাঁড়াল।

'যার বাস আগে আসবে সে উঠে পড়বে—' সুদীপ্ত ঘোষণা করল।

জয়ন্তীরই বাস এল আগে। জয়ন্তী বললে, 'যাই—'

আর, জয়ন্তীর বাস ছেড়ে দিতেই সুদীপ্ত হঠাৎ বোকার মতন মুখ করে রইল। এমন ভুল তো তার হয় না। বিচ্ছিরি কাণ্ড হয়ে গেল। কালকে কোথায় দেখা হবে স্থির করা হল না।

সুদীপ্ত অনেকক্ষণ দাঁড়িয়ে রইল। তাকে ঘিরে চলমান জনস্রোত, এত উচ্চকিত আলো এবং শব্দ কেমন যেন নিবে গেল। নিজেকে নির্বাসিত দ্বীপের নিঃসঙ্গ অধিবাসী বলে মনে হল। তার না হয় এমন ভুল হতে পারে, কিন্তু জয়ন্তী তার তো নিশ্চয়ই মনে ছিল। সে কী সেই কারণেই হাসছিল। তাকে শাস্তি দেবার জন্যে। এমন নয় যে ওদের বাড়ি যাওয়া যায় না। কিন্তু গেলে সে ওদের বাড়িতেই আটকে পড়বে। কিংবা হয়তো দেখা যাবে শ্রীমতী বাড়িতে নেই।

চিন্তিত উদ্বেগ নিয়ে সুদীপ্ত মেসে ফিরল।

আপিসে সারা বিকেলটা সম্ভব-অসম্ভব চিন্তার যখন প্রায় শেষ হতে বসেছে এমন সময় জয়ন্তীর গলা ফোনে ভেসে এল: 'এই, একটা ব্যাপার হয়েছে, শিগগির এসো।'

সুদীপ্ত জিগ্যেস করল: 'তোমাকে কোথায় পাব।'

'মেট্রোর সামনে অপেক্ষা করছি।'

'এখখুনি আসছি।'

সুদীপ্ত দৃশ্যমান হতেই জয়ন্তী পা চালাল: 'চলো। এখানে দাঁড়িও না। গঙ্গার দিকে যাই—'

সুদীপ্ত ওকে অনুসরণ করল।

'কী ব্যাপার? অমন হাঁপাচ্ছ কেন?'

'বলছি বলছি। সে এক কাণ্ড। চলো আগে বসি।'

'কিছু খারাপ খবর নাকি?'

'কী করে বলব। আমি কিছু ভাবতেই পারছিনে।'

'একটা রাত্তিরের মধ্যেই কী এমন হল?'

'সেই তো। আমি তো ভাবতেই পারিনি। একটা রাত্তিরেই এত বছরের দুশ্চিন্তা......'

সন্দীপ্ত বিরক্ত হল। 'তুমি কেবল হেঁয়ালি করছ।'

'চুপ করো তো। অত বকবক কোরো না।'

'বেশ। চুপ করলাম।' সন্দীপ্ত মুখ গোঁজ করল।

জয়ন্তী হন-হন করে হাঁটছে। যেন দৌড়োতে পারলে ভালো হয়।

'উঃ আমার যে কী হচ্ছে না? এখনো বুক ধড়ফড় করছে—একে তো কাল ফিরতে দেরি হয়েছে, বাবা হয়তো বাড়ি ফিরেছেন, বকুনি কপালে আছে—'

সন্দীপ্ত চুপ।

জয়ন্তী বললে, 'বারে, তুমি কথা বলছ না কেন?'

সন্দীপ্ত তবু চুপ।

'এসো। এখানে এই গাছতলায় বসি। ওটা কোথাকার জাহাজ বলো তো?' জয়ন্তী ততক্ষণে বসে পড়েছে।

সন্দীপ্ত বসল। একটা সিগারেট ধরাল। গঙ্গার ওপারে সূর্য ডুবছে। আকাশে কতকগুলো পাখির পরিক্রমা।

জয়ন্তী হঠাৎ বিশ্রী রকমের স্তব্ধ। জাহাজ দেখছে।

'আচ্ছা—' জয়ন্তী একটু নড়ে উঠল: 'এখন, এই মুহূর্তে তুমি যদি হাজার দুয়েক টাকা পেয়ে যাও, কী করবে?'

সন্দীপ্ত বললে, 'এইটেই কী তোমার দরকারি কথা?'

জয়ন্তী বললে, 'নয়? টাকার দরকার নেই তোমার? জানো দু হাজার টাকার...'

সন্দীপ্ত বললে, 'টাকাটা পেয়ে গেছ?'

জয়ন্তী হাসল। 'পাওয়াই বলতে পারো।'

'বেশ তো।' সন্দীপ্ত নাক দিয়ে ধোঁয়া ছাড়ল।

জয়ন্তী বললে, 'ও, বিশ্বাস হচ্ছে না বুঝি?'

'বিশ্বাস না-করলে খুব দোষের হবে?'

'সমস্ত ব্যাপার শুনলে......উঃ আমি ভাবতেই পারছিনে। জানো কী হল? ভয়ে ভয়ে তো বাড়িতে ফিরছি। বাবা এসে গেছেন। কোনো রকমে খাওয়া-দাওয়া সেরে ঘুমোবার মতলব করেছি। তারপর রাত্তিরে মা এলেন। আমার পাশে শুয়েছেন। আর আমি উশখুশ করছি। আমি যে জেগে আছি মা বুঝতে পেরেছেন। মনে হল অন্ধকারে মা হাসলেন—'সেন্ন তো?'

হুঁ—'

'তারপর না মা কেমন গলায় জিগ্যেস করলেন: 'কী রে ঘুম আসছে না?' আমি হুঁ বলে মাকে জড়িয়ে ধরলাম। মা আবার বললেন: 'কিছু বলবি?' আমি অন্ধকারে কাঁটা হয়ে রইলাম। মা হঠাৎ বললেন: 'বুঝেছি। সন্দীপ্তকে বিয়ে করতে চাস এই তো?' আমি মাকে আরও আঁকড়ে ধরলাম। মা বললেন: 'বেশ তো। দেরি করছিস কেন? তোর বাবা বলছিলেন: 'বিয়েতে তো হাজার ছয়েক টাকা খরচ হতই, খরচটা বেঁচে গেল। তোদের বিয়েতে বাবা দু হাজার টাকা দেবেন।'

সন্দীপ্ত হঠাৎ উত্তর খুঁজে পেল না। যেন অহংকারে ঘা খেল। বললে, 'তা হয় না।'

জয়ন্তী মুখ ফিরিয়ে বললে, 'কী হয় না?'

'টাকা আমি নিতে পারব না।'

'আহা, টাকা তোমাকে দিচ্ছে কে? টাকা তো আমাকে দেবেন।'

'না।'

'দ্যাখো ওস্তাদি কোরো না। সব কিছু সহজভাবে হয়ে যাচ্ছে কিনা অমনি মেজাজ দেখানো হচ্ছে। তোমরা, ছেলেরা, এমন ভাব দেখাওনা যেন মাটিতে বাস করো না, হাওয়াতে উড়ছ। যত সেকেলেপনা। ও'রা যদি ভালোবেসে টাকা দেন কেন নেবো না। তোমার ভাগ্যি ভালো ও'রা বিয়েতে বাধা দেননি।'

সন্দীপ্ত সিগারেটের টুকরোটা দূরে ছুঁড়ে দিল। জয়ন্তী যেমন সহজভাবে বিষয়টা ভাবতে পারছে সে পারে না। অবশ্য ও'রা জয়ন্তীর মা-বাপ, আপনজন। জয়ন্তী কিছুই হারাচ্ছে না, দুপক্ষকেই সে পাচ্ছে। তাই বুঝি বিয়ের আনন্দ ওকে পরিপূর্ণ করে তুলছে। নাঃ সন্দীপ্ত আবার ভাবল: জয়ন্তীর আচরণ অত্যন্ত স্বাভাবিক। কিন্তু সন্দীপ্ত কেন একে গ্রহণ করতে পারছে না। সে তো চেয়েছিল ওর মা-বাবার মত থাকুক, সেদিনও তো এই নিয়ে ঝগড়া হয়েছে। হয়নি? আর সত্যিই যদি তাঁরা বাধা দিতেন তাহলে কী ব্যাপারটা একটা প্রচণ্ড বিদ্রোহের আকার নিত। আসলে সন্দীপ্ত নিজের দিক থেকে কোনো যুক্তিই খুঁজে পায় না।

'কী ভাবছ? এই?'

'না। কিছু না।' সন্দীপ্ত কী করে ওর এই আনন্দ ভেঙে দেবে। জয়ন্তীর মুখে চোখে গোধূলির ছেঁড়া-ছেঁড়া রক্তিম, ওর আবেগে কোমল আরক্ত মুখটা অসীম ক্লান্তিকে কাটিয়ে যেন প্রস্ফুট হয়েছে। ওই এই আনন্দ, আবেগগুলোকেই তো সে ভালোবাসে। সন্দীপ্ত ওর ডিজে করতল হাতে তুলে নেয়। জয়ন্তী হাসে।

'তুমি খুশি হয়েছ?' জয়ন্তী মৃদু গলায় বললে।

সন্দীপ্ত হাসল।

'এই বেশ হল তাই না? পৃথিবীটা ভীষণ বড়, আমরা দুজনে কখনোই এর নাগাল পেতাম না। তারপর চিন্তায়-চিন্তায় একদিন পাথর হয়ে যেতাম। পরস্পরকে ভুল বুঝতাম, অবিশ্বাস করতাম, এর চেয়ে—'

সন্দীপ্ত নিশ্বাস ফেলল। জয়ন্তীকে এখন নিরুদ্বেগ সুখী দেখাচ্ছে। ওর বাড়ির আশ্বাসটুকু ওকে নিশ্চিন্ত করেছে। সন্দীপ্ত কখনো বুঝতে পারেনি জয়ন্তীর জীবনে ওর বাড়িরও একটি সুদৃঢ় ভূমিকা রয়েছে। হয়তো এমনও হতে পারত ওই বাড়ির সঙ্গে সমস্ত সম্পর্ক চুকিয়ে ওর আসা কষ্টকর হত। এই চিন্তায় সন্দীপ্ত খুব খুশি হতে পারে না। সে ভেবেছিল জয়ন্তীর জীবনে একচ্ছত্র অধিকার পেতে চেয়েছিল।

অনেক রাত্রে মেসে ফেরার পথে সন্দীপ্তের চোখের সামনে আবার জয়ন্তীর আবেগমুগ্ধ নিরুদ্বেগ সুখের আকৃতিটা স্থির হয়ে ভেসে উঠল। আশ্চর্য, জয়ন্তীর এই আকৃতিটাই তার মনের ভেতরে আঁকা রয়ে গেছে। জয়ন্তী আর কিছু নয়, এই আবেগ আর সুখের প্রতিকৃতি। এবং এতক্ষণ কেন মনে হয়নি সন্দীপ্তকে ওই আবেগ আর সুখ দেবার জন্যেই জয়ন্তী ওগুলোকে অনেক কষ্টে রক্ষা করেছে। কেউ না জানে সন্দীপ্ত জানে জয়ন্তী ওরই জন্যে চোখ-মুখহীন নির্বোধ একটা অস্তিত্বকে চক্ষুষ্মান ও প্রাণময় করেছে।

সন্দীপ্ত আরেকবার ভালোবাসার মতন একটা স্থায়ী অনুভবকে গভীর আগ্রহে আলিঙ্গন করল।

চঞ্চুসূচীবংশ

অজয় হোম

চড়াই

দুই ঘরের মাঝে চাতালটাতে ইজি-চেয়ারে বসে রোজ সকালে খবরের কাগজ পড়ি। সে-সময় সাতটি ছোটো পাখি এসে চরবর চরবর চিক...চিরপ্‌চিরপ্‌ চিসিক্‌.. আওয়াজ ক'রে কান ঝালাপালা করে। ডাকের মধ্যে কোনও মিষ্টত্ব নেই। কী রকম যেন একঘেয়েমির সুর। বেশিক্ষণ সহ্য করাও যায় না। তাড়িয়ে দিলে আবার খানিকবাদে এসে চেঁচামেচি করে। কাগজ ছেড়ে বাধ্য হয়ে উঠতে হয়। এদের জন্যে সিগারেটের খালি কৌটোয় থাকে রেশনের চাল-বাছা কাঁকর আর খুদ। প্রতি-দিন এক চামচ বরাদ্দ, সেটা পেলে ওরা খুশি। মাটি থেকে খুঁটে খুঁটে খাবে। কেউ কেউ ভয়ে ভয়ে, কেউবা বেপরোয়া সাহস দেখিয়ে। সাতটি পাখির মধ্যে তিনটি পুরুষ চারটি স্ত্রী।

এরা আমাদের ঘরের পাখি। এত পরিচিত যে সকাল বিকেল সন্ধ্যে সব সময়েই দেখা সাক্ষাৎ হয়। আমরা বলি—চড়াই (পাসের ডোমেস্টিকাস)। কোথাও কোথাও "চটা" নাম। ধাস্টসাদিবর্গের অন্তর্গত চঞ্চুসূচী-বংশের (প্লোসিইনি) পাখি। চঞ্চু-সূচী অর্থাৎ যারা চঞ্চু দিয়ে সূচের কাজ করে বা বোনে। সব পাখিই যে নিখুঁত সুন্দর বোনে তা কিন্তু নয়। চঞ্চুসূচী বংশ আবার তিনটি অনু-বংশে (সাব-ফ্যামিলি) বিভক্ত। যথা, কুলিঙ্গ (পাসেরিনি), চঞ্চু-সূচী (প্লোসিইনি) এবং পুষ্পিহা (এস্ট্রিল-দিনি)। এই তিনটি অনু-বংশ আবার নানা গণ-এ (জিনাস) ভাগ। চড়াইয়ের অনু-বংশ ও গণের নাম এক—কুলিঙ্গ। সংস্কৃতে বলে—গৃহ-কুলিঙ্গ। হিন্দি—গোড়িয়া, চুড়ি বা খাস চুড়ি। ইংরেজি—হাউস স্প্যারো।

লম্বায় ৬ ইঞ্চি। পুরুষ-পাখির মাথার চাঁদি ছাই-ধূসর। চোখের ঠিক উপর থেকে লম্বা বাদামী-পাটকিলের একটা লাইন এসে ঘাড়ের উপর দিয়ে পিঠে ছড়িয়ে পড়েছে। পিঠের সেই বাদামী-পাটকিলের উপর কালো কালো ছোটো দাগ। কোমর ছাই-ধূসর। ডানার পালক বাদামী ও গাঢ় পাটকিলে মেশানো। ডানার উপর আড়াআড়ি দুটি হালকা প্রায় সাদাটে টান। লেজ গাঢ় পাট-কিলে, ধার ফিকে। বেঁটে মোটা ত্রিকোণা চঞ্চুর উপর থেকে চোখ পর্যন্ত কালো টান। চিবুক থেকে কালো টান নেমে এসেছে উপরের বুকের উপর বড়ো আঙুলের টিপ ছাপের মতো। দুই গাল, বাকি বুকের ও পেটের সব পালক সাদা এবং ধারের পালকে কেবল একটু ধূসরের আভা। কনীনিকা পাটকিলে। প্রজননের সময় চঞ্চু কালো, অন্য সময় ফিকে কালোর উপর হলদে আভা। পা ফিকে পাটকিলে।

স্ত্রী-পাখির চোখের উপর দিয়ে ফিকে সাদাটে-পাটকিলের এক টান। মাথা পিঠ ফিকে ধুলো-পাটকিলে। পিঠের উপরের অংশে কালো এবং ফিকে পাটকিলের কতকগুলি দাগ। ডানা পাটকিলে তার উপর কালচে দাগ এবং আড়াআড়িভাবে দুটি সাদাটে টান। লেজ গাঢ় পাটকিলে এবং তার ধার ফিকে। তলার সমস্ত পালক খুব হালকা ছাই প্রায় সাদাটে।

বাসস্থান—আন্দামান-নিকোবর দ্বীপ-পুঞ্জ ছাড়া ভারতের সর্বত্র ৭ হাজার ফিট উচ্চতার মধ্যে। বলতে গেলে দুনিয়া জুড়েই চড়াইয়ের দর্শন মেলে। কী ইউরোপ কী অস্ট্রেলিয়া কী আমেরিকা।

খাদ্য—সর্বভুক। সব রকমের শস্য, পোকামাকড়, ফুলের মধু, ছোটো ফল-পাকুড়, রান্নাঘরের ফেলে দেওয়া আবর্জনা থেকে টুকিটাকি।

যেখানে মানুষ সেখানে চড়াই। মানুষ যদি শহর ছেড়ে বনে যায় চড়াইও সেখানে যাবে। সঙ্গ সে কখনই ছাড়বে না। সারা দুনিয়ায় চড়াইকে যেমন লোকে চেনে এমন আর কোনো পাখিকে চেনে না। ঘন জঙ্গল বাঁচিয়ে চলে। কোথাও বা সংখ্যায় কম দেখা গেলেও সাধারণতঃ নজরে পড়ে অজস্র। এই কমবেশি দেখতে পাওয়াটা নির্ভর করে খাদ্য-সংগ্রহের উপর। এই ব্যাপারে বেশ কিছুটা এরা মানুষের উপর নির্ভরশীল। এক রকমের পরভৃত বলা চলে। যে শহর বা গ্রামে অন্যান্য স্থানের তুলনায় মানুষের খাদ্যের অনটন নেই বেশ প্রাচুর্য সেখানে সংখ্যায় এদেরও আধিক্য। মুদির দোকান, মিষ্টির দোকান, রেশন-শপ ইত্যাদি খাদ্যের দোকানে বিনাদ্বিধায় ঢুকে চাল, ডাল, গম বা চিনির বস্তায় বসে বা মাটিতে পড়ে থাকা খাদ্যকণা ঠুকরে তোলে। এমনকি গদিতে বা টেবিলে চাল-ডালের যে নমুনা সাজানো থাকে মানুষের পাশেই তা থেকেও তুলে নিয়ে পালাতে দ্বিধা করে না। এই আসছে এই যাচ্ছে। আবার ঘরের কোণে আধমরা আরশোলার ঠ্যাং ধরে টানাটানি করে ছিঁড়ে নিচ্ছে। মানুষও খেড়ে ইঁদুর ও নেংটির চেয়ে এরা কম ক্ষতিকর বলে কিছু মনেও করে না। গেরস্তর বাড়িতে যে চড়াও হয় তা খাদ্যের চেয়ে আশ্রয়ের জন্যেই বেশি। কোথায় কোন ফাঁক পাবে সেখানে বাসা বাঁধবে। তা দেওয়ালের গায়ে, কার্নিসে, ছবির পিছনে, স্নানের ঘরের ফাটলে খোঁদলে, খড়ের চালে, টালি বা খাপরার ফাঁকে যেখানেই হোক সেখানে যত কিছু আবর্জনা জড়ো করে বাসা বানাবে।

গেরস্তর বাড়িতে বাসা বাঁধতে পারলে যেন নিশ্চিন্ত হয়। মনের সুখে গান গাইবার স্পৃহা যেন বাড়ে। সে তো গান নয় অবিশ্রান্ত কতকগুলি শব্দ। গানের গলা নেই, তবু সে গাইবেই। যা অনেক সময় মানুষকে অস্থির করে তোলে। শুধু মানুষ নয় চড়াই-গিন্নিও বহু সময় ওই গান সহ্য করতে পারে না।

প্রজননের সময় পাখার আওয়াজটা হয় শুধু আর খুব জোরে ডাকে—চিস্‌সিক... চিসি চিসি চিরুচির...। সাধারণ চেঁচামেচির চেয়ে একটু তফাৎ। সে সময় গা ফোলাবে, কোমর বাঁকাবে, ডানা দুটো দু পাশে নামিয়ে লেজ অল্প তুলে ঝাঁকাতে ঝাঁকাতে ডাক দেবে।

শহুরে বাবুরা যেমন ছুটিছাটায় পিক-নিকে হাওয়া খেতে বা চেঞ্জে যান, চড়াইয়ের মধ্যেও সে স্বভাবের পরিচয় মেলে। ওরা যখন খবর পায় কাছেপিঠে কোথাও শস্য বা ছোটো ছোটো ফল পেকেছে, তখন কয়েক দিনের জন্যে বাসস্থান ছেড়ে ঝাঁকে ঝাঁকে সেখানে গিয়ে হাজির হয়। শস্যের ক্ষতি হয়তো কিছুটা হয়, কিন্তু সেই সঙ্গে অসংখ্য শস্যহানিকর পোকাও এদের হাতে মারা পড়ে। ছানাদের অর্থাৎ অল্প বয়সী যারা সঙ্গে এসেছে, তাদের এই সব পোকা খাওয়ায়।

অনেক চড়াই বন্ধ্যা হয়। এই বন্ধ্যা স্ত্রী-পুরুষ চড়াই ঘরের মধ্যে বাসা বাঁধে না। তারা খুব বড়ো একটা দলে গেরস্তর বাড়ির কাছেই খুব ঘন পাতার গাছে বাস করে। প্রজননের সময় ছাড়া চড়াই এমনভাবে দল-বদ্ধ হয়ে থাকে। সকাল-সন্ধ্যে তারা এক সঙ্গে তাদের যতরকম ডাক হতে পারে এক-একজন তাই ডাকে। সেই ঐকতান এক অদ্ভুত হট্টগোলের। যেন বাজার বসেছে।

প্রজননের সময়ের ঠিক নেই। বছরের যে কোনো সময়েই ডিম পাড়ে। সময় নির্ভর করে যেখানে বাস করে তার আবহাওয়ার উপর। বছরে একাধিকবার ডিম পাড়তে প্রায়ই দেখা যায়। তবে প্রধানতঃ ডিম পাড়ে এপ্রিল থেকে জুনের মধ্যে।

বাসার আকারে নির্দিষ্ট কোনো রূপ নেই। ডিম্বাকার থেকে গোলের মাঝামাঝি একটা কিছু। চঞ্চুসূচী-বংশের অন্তর্গত হলেও বাসা বানানোয় তার কোনো বৈশিষ্ট্যের পরিচয় পাওয়া যায় না। বাসার একদিকে একটা প্রবেশপথ থাকে। সাধারণতঃ গৃহস্থ-বাড়ির কোনো ফাটলে বা খোঁদলে করে বলে অন্যদিকে প্রবেশপথ করার কোনো জায়গা থাকে না। স্ত্রী-পুরুষ দুজনেই বাসা তৈরি ও বাচ্চা প্রতিপালনে পরস্পরকে সাহায্য করে। ডিমে তা কিন্তু একা স্ত্রী-পাখিই দেয়। ডিম ফুটতে ১৪ দিন লাগে। গাছের উপর বাসা বাঁধতে ভারতবর্ষে কদাচিৎ দেখা যায়।

ঘাস, খড়, পশম, ছেঁড়া নেকড়া, প্যাকিং বাক্সের বস্তু ইত্যাদি যা পাওয়া যায়, তাই দিয়ে হয় বাসার উপকরণ। ঠিক ডিম যেখানে পাড়ে সে জায়গাটা ভাল করে নরম পালক দিয়ে আস্তরণ বিছায়। সাধারণতঃ ৩ থেকে ৫টি ডিম পাড়ে। ডিমের রঙে তারতম্য দেখা যায়। একবারের পাড়ার অন্ততঃ একটি ডিমের রঙ অন্যগুলো অপেক্ষা ফিকে হবেই। রঙ ফিকে সাদাটে সবুজ। কখনও খুব ফিকে ধূসরাভ। খুব সূক্ষ্ম ও সমানভাবে গাঢ় এবং হালকা ছাই-ধূসর ও পাটকিলের ছিট থাকে। কখনও বা

ছিটের বদলে বড়ো ছোপ ও দাগ দেখা যায়। ডিমের মাপ—লম্বায় ০·৮০, চওড়ায় ০·৫০ ইঞ্চি।

যে চড়াই আমরা নিত্য দেখি তারা কয়েকটি উপজাতিতে দুনিয়ায় ছড়িয়ে আছে। তার মধ্যে দুটি ভারত ও তৎসংলগ্ন স্থানে বেশি নজরে পড়ে। প্রথমটি (পাসের ডোমেস্টিকাস ইণ্ডিকাস) ভারতের সর্বত্র, সিংহল ও বর্মায় দেখা যায়। আকারে একটু ছোটো এবং ভুষো ভুষো দেখতে। অপরটি (পা ডো প্রিসেইগুলারিস) আকারে বড়ো, রঙের ঔজ্জ্বল্যও বেশি। হিমালয় ও তিব্বত অঞ্চলে ৫ থেকে ১৫ হাজার ফিটের মধ্যে বসবাস করে। এরা কিছুটা পরিযায়ীও। কারণ, পাঞ্জাব ও পশ্চিম পাকিস্তানে এরা শীতকালে পাহাড় থেকে নামে। বহির্হিমালয়ে যাকে দেখা যায় তারা এই দুই উপজাতির মাঝামাঝি। দার্জিলিং অঞ্চলে একটা 'গেছোচড়াই' (পাসের মনটান্যাস) বাড়ির আনাচে-কানাচে মাঝে মাঝে দেখা যায়। তফাৎ তাদের দুই সাদা গালের মাঝখানে একটি করে কালো ছোপ। এদের স্ত্রী-পুরুষ একই রকম দেখতে। ইংরেজি নাম—ট্রি-স্প্যারো।

আর-একটি প্রজাতিকে (পাসের রুটিলান্স) সমগ্র হিমালয় অঞ্চল থেকে পুবে চীন জাপান ও ফরমোসায় দেখা যায়। এরা দু'একটি উপজাতিতে ছড়িয়ে আছে। একটি উপজাতির (পা রু শচার্ফেরি) বাস আসামে। আকারে আমাদের চড়াইয়ের চেয়ে ছোটো—৫ ইঞ্চি। উপরের পালক দারুচিনির মতো লালচে তার উপর কালো দাগ। চিবুক গলা কালো। গলার দুপাশ হলদেটে। তলার পালক হলদেটে-ধুসর। এই দারুচিনি-চড়াইকে হিন্দিতে বলে—লালি গোড়িয়া। ইংরেজি—সিনামন স্প্যারো।

কুলিঙ্গ অনু-বংশে পীতগল গণের (জাইমনোরিস) একটি প্রজাতিকে পশ্চিমবঙ্গে মেদিনীপুর অঞ্চলে দেখা যায়। নাম—জংলি চড়াই বা হলদে-গলা চড়াই (জাইমনোরিস জানথোকলিস)। হিন্দি—রাজি বা জংলি-চুড়ি। ইংরেজি—ইয়েলো-থ্রোটেড স্প্যারো।

এরাও লম্বায় ৬ ইঞ্চি। পুরুষের উপরের সমস্ত পালক ছাই-পাটকিলে অর্থাৎ ফিকে মেটে রঙ। ডানা পাটকিলে কেবল ডানার বড়ো পালকগুলি একটু গাঢ়। ডানার উপর দুটি টান। উপরেরটা সাদাটে, নিচেরটা হালকা জরদ। উপরের টানের উপরদিকে গাঢ় বাদামী ছোপ। লেজ পাটকিলে, ধারের পালক ফিকে। লেজ অল্প কাটা মাছের মতো। চিবুক ও বুকের উপরের অংশ সাদা, তার উপর হলুদ রঙের বুড়ো আঙুলের টিপ ছাপ। বাকি নিচের সমস্ত পালক ফিকে ছাই, পেটের কাছে সাদাটে ভাবটা বেশি। কনীনিকা গাঢ় পাটকিলে। লম্বা ত্রিকোণা চঞ্চু প্রজননের সময় কালো, অন্য সময় পাটকিলে। স্ত্রী-পাখির গলার হলদেটা না থাকায়, মধ্যেই আর উপরদিকে ডানার গাঢ় বাদামী ছোপের বদলে লালচে-পাটকিলে।

বাসস্থান—পশ্চিমবঙ্গে কেবল মেদিনীপুর। সেখান থেকে দক্ষিণে কেরালা এবং ভারতের অন্যত্র ৪ হাজার ফিটের মধ্যে। ভারতের বাইরে আফগানিস্থান, পারস্য, ইরাক।

খাদ্য—আমাদের চড়াইয়ের মতোই, তবে মানুষের কাছে আসে না বলে অতটা সর্বভুক নয়।

মূলতঃ গেছো-চড়াই। কিন্তু ঘন জঙ্গল পছন্দ করে না। গেরস্তর বাড়ির খুব কাছে আসে না বাগানে এলেও। একঘেয়ে ডাক এদেরও তবে আমাদের চড়াই থেকে বেশ তফাৎ। একটু মধুরও।

প্রজননের সময় এপ্রিল থেকে জুলাই। সেসময় গাছ থেকে নেমে ঝাঁকে বিচরণ করে। আবার দলবদ্ধ হয় শীতে। খেতে বা গাছের তলায় ঘুরে ঘুরে খোঁজে পোকা শস্য ইত্যাদি।

বাসা বাঁধে ৮ থেকে ৪০ ফিটের মধ্যে গাছের গর্তে বা ফোকরে ঘাস খড় পালক ইত্যাদি দিয়ে। কাঠঠোকরা টিয়া বা বসন্তবৌরির পরিত্যক্ত বাসাই পছন্দ করে বেশি। ৩ থেকে ৪টি ফিকে সবুজের উপর পাটকিলের ছিট ছোপ ও নানাভাবের দাগ। স্ত্রী-পুরুষ দুজনেই ঘর-গেরস্তালির সব কাজ করে। ডিমের মাপ—লম্বায় ০·৭৪, চওড়ায় ০·৫৫ ইঞ্চি।

কুলিঙ্গ অনু-বংশে অপর একটি গণ শৈলকুলিঙ্গ (পেট্রনিয়া) হিমালয়ের উত্তর-পশ্চিমে এবং তুর্কিস্থান থেকে পারস্য, বেলুচিস্তান, গিলগিট ও কাশ্মীরে ১০ থেকে ১৭ হাজার ফিটের মধ্যে বসবাস করে। তিব্বতেও দেখা যায়। পাহাড়ি চড়াই (পেট্রনিয়া পেট্রনিয়া ইণ্টারমিডিয়া) আকারে একটু বড়ো। তিব্বতী নাম—ডুনক-চি। ইংরেজি ইস্টার্ণ রক-স্প্যারো।

বাবুই

যশোহর রোড ধরে মোটরে চলেছি কলকাতা থেকে বনগাঁর আগে চাঁদপাড়ায়। সেখানে যাব বুড়ো ডডস্ সাহেবের কাছে। ডবলিউ ডবলিউ ডডস্ ছিলেন কলকাতার হংকং ব্যাঙ্কের ভূতপূর্ব ম্যানেজার। অবসর নিয়ে আলিপুরের চিড়িয়াখানায় পাখির খাদ্য পিঁপড়ের ডিম ইত্যাদি চালান দিতেন। সেই সঙ্গে কিছু পশুপাখিও। প্রতিদিন প্রায় দু-মণ পিঁপড়ের ডিম সংগ্রহ করতেন। চাঁদপাড়ায় ছিল তাঁর ক্যাম্প। থলে করে খুচরো পয়সা নিয়ে বসতেন। কেউ ছটাক কেউ আধ ছটাক পিঁপড়ের ডিম নিয়ে আসত। খুচরো পয়সা দিয়ে সে-সব কিনে এক বিশাল খড়ির মধ্যে ফেলতেন। আর সেই সঙ্গে নানা লোকে আনত নানা ধরনের বাংলার পাখি। কিছু রাখতেন কিছু নিতেন না। আমরা যেতাম ওইসব পাখির মধ্যে যা আমাদের নেই তা সংগ্রহের জন্যে। সেকারণে ডডস্ সাহেবের সঙ্গে আমাদের বেশ একটা খাতির ছিল।

তাই চলেছি চাঁদপাড়ায়। পথে হাবড়ার লেভেল ক্রসিং। ট্রেন যাবে তাই বন্ধ। আমাদের গাড়ি দাঁড়িয়ে আছে। ক্রসিং-এর পাশেই একটা তালগাছ। তার উপর থেকে ঝুলছে অদ্ভুত ধরনের কয়েকটি পাখির বাসা। পাখির বাসা বললে আমাদের মনে যে ছবি ভেসে ওঠে তা একদমই নয়। সাপুড়েদের বাঁশি তুবড়ি বা বকযন্ত্রের লম্বা নলটা নিচের দিকে মুখ করে যেন টাঙানো আছে। অবাক হয়ে দেখছি বাসাটা শুকনো ঘাস জাতীয় জিনিসের টানাপোড়েন দিয়ে কী অদ্ভুত সুন্দরভাবে বোনা। গোটা দশেক তালগাছটার ডালগুলো থেকে ঝুলছে।

হঠাৎ দেখি হলুদ আর পাটকিলে রংএর একটা চড়াইয়ের মতো পাখি কোথা থেকে উড়ে এসে লম্বা ঝুলন্ত মোটা নলটার মুখের ভিতর দিয়ে সটান ঢুকে গেল। লক্ষ্য করলাম বাসার প্রবেশপথ বা নলের মুখে ব'সে পড়ে সুবিধেমতো ঢুকল না। আর-একটা পাখিকেও দেখলাম ওইভাবে সটান ঢুকে পড়তে। বুঝলাম এটা ওদের একটা চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য।

পাখিটি হল চঞ্চুসূচী অনু-বংশের (প্লসিইনি) অন্তর্গত সুগৃহ গণের (প্লসিউস) প্রজাতি—বাবুই (প্লসিউস ফিলিপিনাস)। হিন্দি —বায়া বা চিন্দোরা। ইংরেজি কমন উইভার-বার্ড বা বায়া। বাংলাদেশে কোথাও কোথাও একে 'তালবাবুই' বলে।

চড়াইয়ের মতো লম্বায় ৬ ইঞ্চি। পূর্ণবয়স্ক বা প্রজননকালীন পুরুষের মাথার দুপাশ চিবুক গলা গাঢ় কালচে পাটকিলে, বাকি মাথা বুক সোনালি হলুদ। পিঠের উপর দিকের পালক কালচে-পাটকিলে, তার উপর উজ্জ্বল হলুদের টান। কোমর ও বাকি সমস্ত পালক লালচে হলুদ। একদম ধারের পালক হলদেটে ছাড়া বাকি ডানা ও ও লেজ গাঢ় পাটকিলে। কনীনিকা পাটকিলে। মোটা ত্রিকোণাকার চঞ্চু হলদেটে শিঙ রঙা; প্রজননকালে পাটকিলে শুধু গোড়ায় একটু হলুদের ভাব।

স্ত্রী-পাখির এবং শীতকালে পুরুষ বাবুইয়ের চেহারা একই রকম দেখতে। সমস্ত উপরের পালক লালচে হলুদ, তার উপর কালচে পাটকিলের ছোটো ছোটো টান। এই টান কোমরের কাছে এসে শেষ হয়েছে। ধারের লালচে হলুদ পালকসহ ডানা এবং লেজ গাঢ় পাটকিলে। চোখের উপরেও একটা টান। মাথা ও বুক একটু গাঢ় লালচে হলুদ।

বাসস্থান—মরুভূমি ও হিমালয়ের পার্বত্য অঞ্চল ছাড়া সমগ্র ভারতে ৩ হাজার ফিট উচ্চতার মধ্যে, দুই পাকিস্তান, সিংহল ও ব্রহ্মদেশ থেকে মালয়েশিয়া পর্যন্ত। আরও দুটি উপজাতিকে আমাদের দেশে দেখা যায়। প্রথমটি (প্ল ফি বার্মানিকাস) পূর্ব হিমালয়ের নিম্নাংশে বাংলা, আসাম ও ব্রহ্মদেশে। এদের গলা ও বুকের হলুদ অংশটি অল্প। কিন্তু দ্বিতীয়টির (প্ল ফি ট্রাভান-

কোরীনাসিস) একটু বেশি ছড়ানো ও গাঢ়। প্রজাতি ও উপজাতির তফাৎ এত অল্প যে সাধারণ চোখে ধরা মুশকিল। সাধারণতঃ স্থানীয় পাখি কিন্তু খাদ্যান্বেষণে কোথাও প্রাচুর্যের সন্ধান পেলে অল্পসল্প দূরেও ভ্রমণ করে।

খাদ্য—নানাবিধ শস্যই প্রধান। বাচ্চাদের শস্যের ক্ষতিকারক কীটপতঙ্গ খাইয়ে বড়ো করে। শস্য খেয়ে বা নষ্ট করে যেটুকু ক্ষতি হয় তা পূরণ হয়ে যায় এইসব শস্য-হানিকর কীটপতঙ্গ ধ্বংসে।

বাবুইকে অনেকে দেখে না চিনলেও তার বাসা চেনে প্রায় সকল মানুষই। প্রজননকালে পুরুষ-পাখি যখন হলুদ পোষাক গায়ে চাপায় তখন ছাড়া এদের মনে হয় বুঝি চড়াইয়েরই এক ঝাঁক। একারণেই মানুষের নজরে পড়ে না।

বন জঙ্গল এদের একদম অপছন্দের। খোলা খেতের ধারে বা খেতের উপযুক্ত উন্মুক্ত স্থানে অথবা একটু স্যাঁতিসেঁতে জলাজমির ধারে বাবলা বা তালগাছ যেখানে দাঁড়িয়ে থাকে সে-সব জায়গাতেই বাসা বাঁধে। বাংলা-দেশের বাইরে বিহার বা যুক্ত-প্রদেশে বাবলা তালগাছ ও সুপারি ছাড়া মহুয়া ও বাঁশগাছে, অন্ধ্রে খেজুর এবং দক্ষিণ ভারতে নারকেল গাছে বাসা বানাতে দেখা যায়।

এছাড়াও এক অদ্ভুত স্থানে বাসা দেখে কিছুক্ষণ কথা ফোটেনি। জার্ডন লিখেছেন[১] ভারতে তিনি কখনও দেখেননি এক ব্রহ্মদেশে ছাড়া। স্টুয়ার্ট বেকারও বলেছেন[২] একমাত্র ব্রহ্মদেশের বাবুইরা বারান্দা বা খোলার চালের কোণে বাসা বাঁধে। সালিম আলির বইতেও[৩] কোনো উল্লেখ নেই ভারতে কোথাও বাঁধে কিনা। তাই যুক্তপ্রদেশে কাশী বা বারাণসী থেকে ২৫ মাইল দূরে দিল্লি যাবার পথে ত্রিলোচন মহাদেব নামে এক গাঁয়ে এক খোলা বা খাপরার বাড়ির চাল থেকে বাবুইয়ের বাসা ঝোলা দেখে তাজ্জব বনে গেলাম। পথে আরও কয়েকটি চোখে পড়ে। কেরালাতে 'কোকোনাট রিসার্চ স্টেশন'-এ অমনি একটি খোলার চালের কোণ থেকে ঝুলছে একটি বাসা। আসামের জঙ্গলে বাবুইয়ের বাসা ঝুলতে দেখেছি ইলেক-ট্রিক ও টেলিগ্রাফের তারে।

বাবুইদের বাসা বানানোর পদ্ধতি থেকে জীবনযাত্রা নিয়ে গবেষণা প্রথম করেছেন—

---

1. Jerdon, T.C. The Birds of India, Vol. II, Calcutta 1863; p. 345.
2. Stuart Baker, E.C., The Fauna of British India, Birds, Vol. III (Second Edition), London 1926. p. 69
3. Salim Ali, The Book of Indian Birds, 6th Edition, Bombay 1961, p. 31.

ব্রিস্টল বিশ্ববিদ্যালয়ের মনস্তত্ত্ব বিভাগের জে এইচ ক্রুক, লস এঞ্জেলেস কাউন্টি মিউজিয়মের এন ই এবং এ সি কলিয়াস, ভারতীয় পক্ষিতত্ত্ববিদ সালিম আলি এবং ভারতীয় পরিসংখ্যান সংস্থার রিসার্চ এবং ট্রেনিং বিভাগের টি অ্যান্টনি ডেভিস। এঁদের মধ্যে টি এ ডেভিসেরই গবেষণা খুব কৃতিত্বপূর্ণ। তিনি গাছের উপর মাচা বানিয়ে দিনের পর দিন ধৈর্য-সহকারে বসে থেকে বাসা বানানো থেকে ডিম ফুটিয়ে বাচ্চা বড়ো করে তোলা পর্যন্ত দেখেছেন। শুধু তাই নয় এদের জীবনযাত্রার অনেক পদ্ধতি যা এতদিন অজ্ঞাত ছিল তা বিজ্ঞানসমাজে ব্যক্ত করেছেন।

সংঘচারী বলে এক-এক দলে ২০ থেকে ১০০ পাখি ঘোরাফেরা করে। নভেম্বর থেকে এপ্রিল যখন এদের প্রজননকাল নয়, তখন বিভিন্ন দলে বেশ কয়েকশ'র ঝাঁক রাত্রিবাস করে হয় কোনো বড়ো গাছে, না হয় লম্বা ঘাসের বনে। এমনকি আখ বা বাজরার ক্ষেতেও। কিন্তু কাছে কোনো বড়ো দীঘি বা জলা থাকা চাই।

চঞ্চুসূচী বংশের যদি কেউ বংশমর্যাদা দিয়ে থাকে তো তবে এই সুগৃহ গণের প্রজাতি বাবুই পাখিই দিয়েছে। সমস্ত জীবনটা এদের নিজের বানানো বাসাকে ঘিরেই। এতো সুন্দর ও বিজ্ঞানসম্মত বাসা ভারতের আর কোনো পাখিই টানাপোড়েন দিয়ে বুনতে বা বানাতে পারে না।

পুরুষ-বাবুই খুঁতখুঁতে স্থপতি দক্ষ তাঁতি, অক্লান্ত কর্মী এবং অন্তর্দৃষ্টিসম্পন্ন গৃহনির্মাতা। আবহাওয়া সম্বন্ধেও জ্ঞান তার কম নয়। কোন গাছে কোন স্থানে কিভাবে কত কম পরিশ্রমে বাসা বানালে ঝড়বাদলের হাত থেকে বাঁচা যাবে এ-বিষয়ে তার কখনও ভুল হয় না। এদিকে স্বভাবে বহুগামী। কিভাবে স্ত্রী-পাখিদের আকৃষ্ট করা যায়, সে-বিষয়েও তার জ্ঞান টনটনে। চৌর্য-বৃত্তিতেও বেশ পারঙ্গম। স্ত্রী-বাবুই অদ্ভুত বুদ্ধিমত্তার পরিচয় দেয় তার দয়িত নির্বাচনে। তার হিসেবে যে-বাসা নিখুঁত-ভাবে বোনা এবং দূরদৃষ্টির পরিচয় আছে, সেই বাসা ও তার মালিককে সে পছন্দ করে। কারণ, ভবিষ্যৎ বংশধররা তাদের বাপের মতোই কর্মঠ ও সুদক্ষ স্থপতি হবে।

প্রজননকাল এপ্রিলের শেষার্ধ থেকে অক্টোবর। দক্ষিণ-পশ্চিম মৌসুমী বায়ুর আরম্ভের উপর নির্ভর করে এদের যৌবন-সাজে নিজেদের প্রকাশ করার। গ্রীষ্মের মাঝামাঝি হঠাৎ কালো মেঘ আর পাগলা হাওয়ার সঙ্গে এদের ডাক শোনা যায় চড়াইয়ের মতো চিট্-চিট্-চিট্ বা আনন্দে সুর করে চি-ই-ই। তার সঙ্গে ডানার ঝাপট। বাসা বাঁধার গাছ ঠিক করে তখনই। ভারতের বিভিন্ন স্থানের কৃষকরা তখন বোঝে ফসল এবার ভালো হবেই। বর্ষা আসবে বেশ ভালো করেই তাই তাল নারকেল খেজুর আখ বাজরা ইত্যাদির পাতা চিরে চিরে ফালি বা টুকরো করলেও তারা কিছু মনে করে না।

বাবুই বাসা বাঁধে জলের উপর যে-গাছ ঝুলে পড়েছে সেই গাছে। না হয় যে-গাছে কাঁটা আছে কিংবা সহজে যে-গাছ বেয়ে ওঠা কারুর পক্ষে সম্ভব নয়। মানুষের চেয়ে ভয় ওদের মর্কট-বানরকেই বেশি। পছন্দ করে সেই ডাল বা গাছ যেখানে হাওয়া বা ঝড়ের বেগ কম লাগে। এ-বিষয়ে কখনও ভুল হয় না। এক কথায় বলা যায় এরা আব-হাওয়া-বিশারদ।

বাসার উপকরণ ভারতের এক-এক অঞ্চলে এক-এক রকম। ঘাসের শিষ, ধান, খেজুর, তাল, নারকেল, সুপারি আখ, বাজরা, ভুট্টা এবং কলাগাছের পাতা হল মোটামুটি উপাদান। কলকাতা এবং নিকটবর্তী চব্বিশ পরগণা অঞ্চলে দেখেছি নারকেল গাছের লম্বা পাতা পা দিয়ে চেপে মোটা চঞ্চু যার গড়ন পাতা ফালি করার উপযুক্ত তাই দিয়ে সরু ফালি করে প্রাথমিক ঝুলন্ত ছাঁচ বা ফর্মা বানায়। তারপর মাথার দিক এবং সবশেষে প্রবেশদ্বার বোনে খেজুর পাতা সরু করে চিরে। ডিম পাড়ার ঘর বোনে সরু ঘাস ও ধানের পাতা দিয়ে। সবকিছু কাঁচা অবস্থায় বোনে। কারণ, নরম পাতা দিয়ে বোনার সুবিধে। অনেক সময় দেখা যায় পুরোনো বাসা রিপু করেছে কাঁচা পাতা দিয়ে। শুকনো আর সবুজ পাতার নতুন বোনা বেশ ধরা যায়।

বাসা বানানোর সময় পুরুষ-পাখি দিনে বারো-তেরো ঘণ্টা খাটে, মাঝে মাঝে বিশ্রাম নেয় অবশ্য। তাও কোনো সময় আধঘণ্টার বেশি নয়। সে-সময়টা খাদ্যসংগ্রহে, পালক খুঁটে প্রসাধনে, নিছক বিশ্রাম বা কোনো স্ত্রী-পাখির পিছনে পূর্বরাগে ব্যয় করে। পাঁচ-ছয় দিনে মোটামুটি বাসা তৈরি শেষ করে। কোনো স্ত্রী-পাখি সেই বাসা পছন্দ করে সঙ্গী নির্বাচন করলে তখন বাকি কাজ শেষ হয়। কিন্তু স্ত্রী-পাখি না এলে সে বসে থাকে না। প্রথম বাসার কাছেই আর একটি বাসা বুনতে আরম্ভ করে দেয়।

স্ত্রী-বাবুইও সময় হলে এসে পৌঁছয় অবিবাহিতদের আস্তানায়। পুরুষদের মধ্যে পরস্পরে মারামারি ও প্রতিযোগিতা লেগে যায় কে তাকে আকৃষ্ট করতে পারে বেশি। দেখাতে থাকে হরেকরকমের ওড়ার কায়দা। সার্কাসে ট্রাপিজ খেলার মতো বাসা আঁকড়ে ধরে বাদুর-ঝোলা দুলতে থাকে। চিট্-চিট্-চি-ই-ই ডাকে আর ডানার ঝাপটে চারিদিক তখন সরগরম। দেখা যায় বাসাকে পায়ে আঁকড়ে ডানার ঝাপটে শূন্যে তুলে স্ত্রী-পাখির কাছে নিয়ে আসার চেষ্টা করছে। অর্থাৎ, বলতে চায় কেমন বানিয়েছি এক-বারটি দেখ, পছন্দ হয় কি? যখন বোঝে স্ত্রী-পাখিটি তার কেরামতিতে আকৃষ্ট হয়েছে, তখন নানাবিধ আনন্দধ্বনির সঙ্গে নিয়ে আসে তার বাসায়।

পুরুষের উল্লসিত কলরবের আমন্ত্রণে মেয়েটি মোটেই বিচলিত হয় না। অত্যন্ত ধীর-স্থিরভাবে বাসার কোণে এসে বসে। চঞ্চু দিয়ে টেনে টেনে বা ছিঁড়ে পরখ করে

পরবর্তী জীবনে এ-বাসা তার চলবে কিনা। এই পরীক্ষার সময় পুরুষ আশা-নিরাশার দ্বন্দে চুপ করে দেখে। অন্য কোনো পুরুষ এ-সময় ভাঙচি দিতে এলে তাকে মেরে তাড়ায়। প্রায়ই দেখা যায়, মেয়েটির বাসা পছন্দ নয়। দোকানে শাড়ী পছন্দ করতে গিয়ে পছন্দ না হলে বেরিয়ে আসার মতো তার ভাব। অন্য বাসায় অন্য অপেক্ষমান পুরুষের কাছে যায়। আবার পরীক্ষা করে। এমনিভাবে সেই কলোনির সমস্ত বাসাই পরীক্ষা বা পছন্দ করে দেখে কোন্‌টা ভালো। তারপর উড়ে চলে যায় কোনো রায় না দিয়ে।

স্ত্রী-পাখি একটি লাইনও বুনতে পারে না কিন্তু কোন্ বাসা সবচেয়ে ভালো বোনা, সে-বিষয়ে তার বিচারজ্ঞান অসম্ভব পরিষ্কার। সেইদিনই কিংবা পরদিন ফিরে আসে তার পছন্দমতো বাসায়। বরমাল্য দেয় সেই কৃতি স্থপতিকে।

রাণীর মতো এসে বসে বাসার মাথায়। বাকি বোনার কাজটুকু শেষ করে তার দয়িত।

আবার একটি খুব ভালো বোনার বাসার জন্যে দুটি স্ত্রী-পাখির মধ্যে প্রতিদ্বন্দ্বিতা বা মারামারি করতে দেখা যায়। যাদের বাসা তৈরির ভালো হয় না, তারা সে বছর বিনা স্ত্রীতে অর্থাৎ অবিবাহিত হয়ে কাল কাটায়।

অষ্টম দিনে পেয়ালার আকারে ডিম পাড়ার ঘরটা সম্পূর্ণ হয়। স্ত্রীটি সংগ্রহ করে আনে নরম পালক ও তুলো। তাই দিয়ে বাসার ভিতরটা নরম করে বিছায়। পুরুষ ডিমঘরের একটা প্রবেশদ্বার বন্ধ করে। ইতিমধ্যে স্বল্প মধুযামিনীর শেষে স্ত্রী-পাখি ২ থেকে ৪টি শাদা ডিম পাড়ে। ডিমের মাপ লম্বায় ০·৮২, চওড়ায় ০·৫৯ ইঞ্চি। পুরুষের আর ওই স্ত্রীর প্রতি কোনো আসক্তি থাকে না। সে অপর এক সঙ্গিনীর জন্যে বাসা বুনতে লেগে যায়।

অনেক পুরুষ খুবই চালাক। খাটাখাটির মধ্যে যায় না। কর্মঠ পুরুষ যে সুন্দর করে বাসা বুনে চলেছে, সে যখন খাদ্যান্বেষণে বা বাসা তৈরির মালমসলা আনার জন্যে অন্যত্র ব্যস্ত থাকে সেই ফাঁকে চালাক বা কুঁড়ে পাখি তখন বেমালুম চুরি করে তার ফালি করা খেজুর নারকেল বা তালপাতার সুতো। অনেক কর্মী পাখি চুরি যাওয়া বুঝতে পারলে ঘাপটি মেরে কাছেই লুকিয়ে থাকে এবং সময়কালে হাতেনাতে চোরকে ধরে ঝটাপটি লাগিয়ে দেয়। অনেক সময় ঝটাপটি করতে করতে মাটি বা জলের উপর এসে পড়ে তখন ছেড়ে দেয়। সন্ধ্যেবেলায় অনেক পাখি অর্ধেক তৈরি বাসা ছেড়ে রাত্রিবাসের গাছে ফিরে যায় সেই আধা অন্ধকারের মধ্যেও কেউ কেউ যতটা পারে চুরি করে।

ডিম ফুটে বাচ্চা বেরতে ১২ থেকে ১৪ দিন লাগে। স্ত্রী-পাখি একটানা একঘণ্টার বেশি ডিমে তা দেয় না। বাইরে বেরিয়ে এসে বাসার উপরের অংশে বসে গা খোঁটে, বিশ্রাম নেয় অথবা খাবারের খোঁজে এদিক-ওদিক যায়। যেদিন ডিম ফোটে সেদিন মা-বাবুই খুব উত্তেজিত অবস্থায় থাকে। ঘন ঘন যাওয়া থেকে বার হয়। ডিমের ভাঙা টুকরো ঠিক বাসার নিচেই ফেলে। জলের উপর ঝুলন্ত বাসা বানানোর বোধহয় এটা একটা কারণ। শত্রুর নজরে যাতে না পড়ে।

এ সময়ে মা-বাবুইয়ের সমস্ত কিছু ঘিরে থাকে সন্তান প্রতিপালনে। খুব অল্প-সময়ই ব্যয় করে নিজের খাবার সংগ্রহের জন্যে। বাচ্চার খাবার আনা আর কন্ঠপুটে তাকে রেখে নিজের গায়ের গরমে যতদিন না পর্যন্ত বাইরের আবহাওয়ার সঙ্গে খাপ খাইয়ে নেওয়ার উপযুক্ত হচ্ছে ততদিন এই তার কাজ। বাচ্চাদের শস্যকণা খাওয়ায় না। আমিষভোজনেই বড়ো হয়। নরম পোকা-মাকড় হচ্ছে এখন একমাত্র খাদ্য। শস্য খেলে জল খেতে হয় সেটা আনা বা বন্দোবস্ত করা অসম্ভব বলেই শিশুকালে এই খাদ্যবিধি। ১৭ দিনের দিনে বাচ্চা বাসা ছেড়ে বেরবার উপযুক্ত হয়। এর মধ্যে বাবা-বাবুই এসে মাঝে মাঝে দেখে যায়। খাবার আনে কচিৎ। দায়িত্ববহনের চেয়ে অনুসন্ধিৎসা তার বেশি।

মা ও বাচ্চারা উড়ে চলে যাওয়ার পর অনেক সময় সেই বাসার ডিম পাড়ার ঘর বন্ধ করে দিয়ে বাবুই ওই বাসারই নিচে আর-একটি বাসা বানায় নতুন সঙ্গিনীর জন্যে। দোতলা তিনতলা বাসা সময়ে সময়ে তাই নজরে পড়ে।

বাবুইয়ের বাসার ভিতরে কাদা বা গোবরের ছোটো ছোটো প্রলেপ দেখা যায়। সাধারণের বিশ্বাস বাবুই জোনাকি ধরে ওই কাদায় আটকে দেয় যাতে রাত্রে বাসার ভিতরে আলো জ্বলতে পারে। মাটির ঢেলা বা গোবরের অনেক টুকরো পরীক্ষা করে দেখেছি কখনও জোনাকি তো দূরের কথা জোনাকি বসানোর দাগ পর্যন্ত দেখতে পাই নি। অনেকের মতে কাদার ব্যবহার হাওয়ায় বা ঝড়ে বাসার ভারসাম্য বজায় রাখা বা ওর গায়ে চঞ্চু ঘষে ধার করার জন্যে। কিন্তু ডিম পাড়ার ঘরের দুপাশে এই কাদার টুকরো বা প্রলেপ এত কম ওজনের যে ঝড়ে বা হাওয়ায় ভারসাম্যের কোনো প্রশ্নই উঠতে পারে না। টি এ ডেভিস বলেন, ওই কাদার ব্যবহার আর কিছুর জন্যেই নয় কেবল ডিমঘরের যেসব অংশ বোনা দুর্বল সেগুলিকে ওভাবে প্রলেপ দিয়ে ঠিক করা। স্ত্রী-বাবুই ডিমে তা, বাচ্চা প্রতিপালনে ঘন ঘন আসাযাওয়ায় এবং বাচ্চাদের নড়াচড়া যাতে ওই বাসা সহ্য করতে পারে তার জন্যেই ওভাবে দুর্বল অংশকে শক্ত করা। অথবা চোর-পাখিদের হাত থেকে নরম বোনা অংশ রক্ষা পাওয়ার জন্যে বাসা তৈরির সময় ওভাবে সিমেন্ট করা। কিংবা বাসা যেভাবেই হোক ক্ষতিগ্রস্ত হলে পর ওভাবে কাদার প্রলেপ দিয়ে ভগ্ন বা দুর্বল অংশকে ঠিক করার জন্যে মাটি বা গোময়ের ব্যবহার।

বাবুই বেশ পোষ মানে। বন্দী অবস্থায় তার খাদ্য—ধান বাজরা কাওনদানা কলা পেঁপে ও সিদ্ধ ভাত। খাঁচার মধ্যে একদম স্থির থাকে না। সবসময়ই নড়ছে চড়ছে লাফাচ্ছে।

তেলে-বাবুই

বাংলাদেশে আরও দুটি প্রজাপতির বাবুই দেখা যায়—

১। তেলে-বাবুই (প্লসিউস মানইয়ার)। হিন্দি—বার্মান বায়া। ইংরেজি—স্ট্রায়াটেড উইভার-বার্ড।

আকারে প্রকারে বাবুইয়ের মতো কেবল কমলা রঙা বুকের উপর ছোটো ছোটো লম্বাটে কালো দাগ উপর থেকে নিচে।

বাসস্থান—পশ্চিমবাংলা, হিমালয়ের তরাই অঞ্চল অর্থাৎ গাড়োয়াল থেকে পূর্ব আসাম এবং ভারতের প্রায় সর্বত্র, দুই পাকিস্তান, সিংহল, ব্রহ্মদেশ, থাইল্যান্ড। তিনটি উপজাতিতে বিভক্ত—প্রথমটি উত্তর ভারতে (প্ল মা স্ট্রায়াটাস), দ্বিতীয় বাংলা-আসাম-ব্রহ্ম প্রভৃতি দেশে (প্ল মা পেগুয়েন-সিস) এবং তৃতীয়টি দক্ষিণ ভারত ও সিংহলে (প্ল মা ফ্লাভিসেপস্)।

শুকনো খটখটে জায়গা এদের মোটেই পছন্দের নয়। জলো স্যাঁতসেঁতে স্থান ছাড়া দেখাই যায় না। ভিজে জমিতে লম্বা ঘাসের বনে, জলার ঘাসে, নলখাগড়া বা হোগলার জঙ্গলে এরা বাস করে। ফেব্রুয়ারি থেকে সেপ্টেম্বর হল এদের প্রজননকাল। সে সময়ে এদের ডাক বেশ মিষ্টি—টিলিলিলি… টিনিলি—ই-ই…কিটি—টিলিনি—ই-ই-কিটি। বাসা বোনা থেকে আচারে ব্যবহারে বাবুইয়ের ন্যায়। বাবুইয়ের চেয়ে তেলে-বাবুই পোষ মানে বেশি। বেদে বা ওই শ্রেণীর লোকেদের কাছে দেখেছি এদের দিয়ে নানা খেলা দেখাতে। খেলনার কামানে বারুদ দিয়ে জ্বলন্ত দেশলাই কাঠি দিয়ে দাগা, আঙটি উপর থেকে ফেললে মাটিতে বা জলে পড়ার আগেই শূন্যে ধরে ফেলা, ঠিক সংখ্যার তাস টেনে বার করা, গাছ থেকে যে পাতা বলা সেই পাতা ছিঁড়ে আনা ইত্যাদি অনেক চাতুর্যপূর্ণ খেলায় বেশ পারদর্শী। ২ থেকে ৪টি পালিশহীন শাদা ডিম পাড়ে। ডিমের মাপ—লম্বায় ০·৮০, চওড়ায় ০·৫৮ ইঞ্চি।

২। সর বাবুই, কাঁটাওয়ালা বাবুই (প্লসিউস বেঙ্ঘলেনসিস)। হিন্দি—সর্বায়া। ইংরেজি—ব্ল্যাক-থ্রেস্টেড উইভার-বার্ড।

তেলে-বাবুইয়ের মতো দেখতে কেবল বুকে ছিটছিটের জায়গায় গলার নিচেই একটা কালো পট্টি। পেট শাদা সেখানে ছিট নেই।

বাসস্থান—পশ্চিমবঙ্গ বিহার এবং উত্তর ভারত থেকে পূর্ব আসাম দুই পাকিস্তান।

বড়ো ঘাস ও ইকরার জঙ্গলে বাস: বড়ো দীঘি বা জলার ধারটাই পছন্দ। খুব বড়ো দলে বাস করে না। কুড়ি জোড়ার বেশি একসঙ্গে দেখা যায় কম, সাধারণতঃ ৪ থেকে ১২টি পাখির একটি দল। জুন থেকে সেপ্টেম্বর প্রজননকাল। বাসা তেলেবাবুই অপেক্ষা আকারে একটু ছোটো। আচার-ব্যবহার অন্য দুই বাবুয়ের মতোই। প্রজনন-কালীন ডাক মৃদুস্বরে—ৎসি...ৎসিসিক্ ...ৎসিসিক্...ৎসিক্...ৎসিক্। খানিকটা ঝিঁঝিঁপোকা ও তৈলহীন চাকার সঙ্গে তুলনা করা যেতে পারে, গানের সঙ্গে ডানা নাড়তে থাকে সমানে। ডিম পাড়ে ধবধবে শাদা ৩ থেকে ৪, কখনও ৫ এবং অন্য দুই বাবুয়ের ডিম থেকে তফাৎ করা যায় না।

মুনিয়া

চঞ্চুসূচী-বংশের অন্তর্গত পুত্রিকা অনু-বংশের (এস্ট্রিলদিনি) শঙ্কুপুচ্ছ গণের (লনচুরা) পাখি মুনিয়াকে বাংলাদেশের প্রকৃতির আঙিনায় আমরা যত্রতত্র বিচরণ করতে দেখি না বটে, কিন্তু মুনিয়াকে চিনি আমরা সকলেই। মুনিয়ার সঙ্গে পরিচয় আমাদের খাঁচার পাখি হিসেবে। রথের সময় বা পাখির হাট থেকে সখ করে প্রথম পাখি কিনে মুনিয়াকেই আমরা ঘরে তুলে আনি। পাখি-ফিরিওয়ালার রকমারি পাখির খাঁচার মধ্যেও এক খাঁচা মুনিয়া প্রায়ই থাকে। তার মধ্যে থাকে আবার রঙ করা মুনিয়া। পাখি-ওয়ালা মন ভোলাবার জন্যে গায়ে মাথায় নানা রঙ। চড়াইয়ের ছানাও তার মধ্যে দু'-একটা যে থাকে না তা নয়। ফিরিওয়ালার খাঁচার সব পাখিই বাংলাদেশের মুনিয়া নয়। কিন্তু অতি পরিচিত পাখি।

এরা সবাই স্ত্রী-পুরুষে একরকম দেখতে। সকলেরই প্রধান খাদ্য নানাবিধ শস্য ও ঘাসের বীজ। কেউ কেউ উড়ন্ত পিঁপড়ে বা উই খায়। এদের ডিমের মাপ গড়ে লম্বায় ০.৬০, চওড়ায় ০.৪৬ ইঞ্চির মধ্যে।

সাধারণতঃ যে মুনিয়া আমরা খাঁচায় দেখি ও পুষি তা হল—

১। শাঁখারি-মুনিয়া (লনচুরা স্ট্রায়াটা)। হিন্দি—ঐ। ইংরেজি—হোয়াইট-ব্যাকড্ মুনিয়া।

লম্বায় ৫ ইঞ্চি। মাথা পিঠ গাঢ় বাদামী। মাথার কাছে সবচেয়ে গাঢ়। পিঠের শেষে কোমরটা শাদা। কীলক বা গোঁজ আকারের লেজ প্রায় কালো। চিবুক থেকে বুক গাঢ় কালচে বাদামী। পেট ও তলপেট শাদা। উরু ও লেজের তলা পাটকিলে। চঞ্চু ত্রিকোণাকার নীলচে। পা গাঢ় স্লেট রঙ। কনীনিকা পাটকিলে।

বাসস্থান—নিম্নবঙ্গ এবং মানভূম মেদিনীপুর ইত্যাদি অঞ্চলে, বিহার, উড়িষ্যা, আসাম, হিমালয়ের গাড়োয়ালের পূর্বাঞ্চল, উপদ্বীপাত্মক ভারতের অনেক স্থানে, আন্দামান-নিকোবর দ্বীপপুঞ্জ, সিংহল, পূর্ব পাকিস্তান ও ব্রহ্মদেশ। ভারতে মালাবার অঞ্চলে সর্বাপেক্ষা বেশি দেখা যায়। ৬টি উপজাতিতে বিভক্ত।

তেলে-মুনিয়া

জঙ্গলের পাখি। গাঁয়ের এবং খেত-খামারের ধারে পারিবারিক ৬-৭ বা তার কিছু বেশি সংখ্যার দলে প্রায়ই আসে। ডাকে খুব মৃদুস্বরে চিপ্ চিপ্। ওড়াটা সম্বন্ধ নয়, কিন্তু ঢেউয়ের মতো একবার উঁচু একবার নিচু। প্রজনন-কালের ঠিক নেই, এক এক স্থানে এক এক সময়। পশ্চিমবঙ্গে মার্চ-এপ্রিলে ৫ থেকে ৬টি ধবধবে শাদা ডিম পাড়ে। মাটি থেকে ৫-১০ ফিটের মধ্যে ঘন ঝোপে বাসা বাঁধে। ঘাস দিয়ে তৈরি বাসা বেশ বড়ো এবং গোলাকার কিন্তু কোনো ছিরিছাঁদ নেই। ঠিক মধ্যে একটি প্রবেশদ্বার। অনেক সময় বাসায় ঢোকার পথটা সরু নল বা টানেলের ন্যায়।

২। সর-মুনিয়া (লনচুরা মালাবারিকা)। হিন্দি—চারচারা। ইংরেজি—হোয়াইট-থ্রোটেড মুনিয়া।

লম্বায় ৫ ইঞ্চি। উপরের পালক মেটে পাটকিলে, কেবল কোমরের কাছে একটু শাদা। মাথায় লালচে ভাবটা একটু বেশি। ডানা এবং লেজ কালচে। চিবুক থেকে লেজের তলা পর্যন্ত শাদা। লেজ ক্রমে সরু হয়ে এসেছে, ত্রিকোণাকার চঞ্চু শীসে রঙা। পা গোলাপী। কনীনিকা গাঢ় পাটকিলে।

বাসস্থান—৬ হাজার ফিট উচ্চতার মধ্যে ভারতের সর্বত্র শুষ্কপ্রধান অঞ্চলে, সিংহল ও পশ্চিম পাকিস্তান। আসাম, পূর্ব পাকিস্তান এবং ব্রহ্মদেশে দেখা যায় না।

শুকনো খোলামেলা খেতখামারের ধারে বা ঝোপেঝাড়ে সর-মুনিয়া বাস করে। নরম ভিজে স্যাঁতসেঁতে জায়গা একদম পছন্দ করে না। ছোটো দলে বিচরণ করে। কোনো কারণে ভয় পেলে একসঙ্গে চিট্-চিট্-চিট্ বা টি-ই-টি-ই করে ডাকতে ডাকতে ওড়ে। বাবুইয়ের পরিত্যক্ত বাসায় এরা অনেক সময় বাস করে থাকে বাবুইয়ের দল যেখানে সেখানে এদের দেখা যায়। নানাজাতের ঘাস চিরে বড়ো গোলাকার বাসা বানায়। ছোটো প্রবেশ পথ গোল। সেই পথ এমনভাবে লুকানো থাকে যে চট করে ধরা যায় না। মাটি থেকে ৫-১০ ফিটের মধ্যে কাঁটা ঝোপওয়ালা গাছে এদের বাসা। সাধারণতঃ ৪ থেকে ৬টি শাদা ডিম পাড়ে জুন থেকে সেপ্টেম্বরের মধ্যে। কিন্তু বহুসময় একই বাসায় একের বেশি স্ত্রী-পাখি ডিম পেড়ে থাকে। ২৫টি পর্যন্ত ডিম একটি বাসায় দেখা গেছে। স্ত্রী-পুরুষ দুজনেই গৃহস্থালির যাবতীয় কাজ করে এবং সহজেই পোষ মানে।

৩। তেলে-মুনিয়া (লনচুরা পাংকটুলাটা)। হিন্দি—শিন-বাজ বা শিং-বাজ। ইংরেজি—স্পটেড মুনিয়া।

লম্বায় ৫ ইঞ্চি। উপরে সর্বত্র চকোলেট-পাটকিলে; মাথা ও ঘাড়ে একটু গাঢ়, কোমরের কাছে এসে ফিকে। মোটা থেকে সরু হয়ে আসা লম্বা লেজের উপরের দিক ফিকে কমলা বা জরদ, তলা শাদা। চিবুক গলা মুখ গাঢ় বাদামী। বুক ও পেট শাদা তার উপর এঁকাবেঁকা ডোরাকাটা কালো দাগের সরু লাইনে ভর্তি। তলপেটে কোনো দাগ নেই, শাদা। ত্রিকোণাকার মোটা চঞ্চুর উপরিভাগ নীলচে কালো, তলাটা ফিকে। পা শীসে। কনীনিকা লালচে-পাটকিলে।

বাসস্থান—৬ হাজার ফিট উচ্চতার মধ্যে ভারতের প্রায় সর্বত্র, একমাত্র রাজস্থান ও পাঞ্জাবের খরা অঞ্চল ছাড়া; পূর্ব পাকিস্তান, সিংহল ও ব্রহ্মদেশ। পশ্চিম পাকিস্তানে দেখা যায় না। দুটি উপজাতিতে বিভক্ত।

খুব ঘন জঙ্গল বা খরা জায়গায় এরা বসবাস করে না। ছোটো ঝোপঝাড় বা আম-বাগানের ধারে খেত থাকলেই পছন্দ। সব সময়েই বড়ো দলে ঘোরাফেরা করে। এমনকি দুশ বা তার উপরেরও দল দেখা যায়। যখন ওড়ে তখন মনে হয় এক ঝাঁক মৌমাছি বুঝি ঢেউ খেলে কিট্টি-কিট্টি-কিট্টি ডাক দিয়ে উড়ে গেল। প্রজননকাল প্রধানতঃ জুলাই থেকে অকটোবর। বাসা বানায় তরমুজ আকারে। চওড়াটা প্রায় ৮ ইঞ্চি। নানারকম ঘাস, খড়, শুকনো বাজরা বা জোয়ারের পাতা দিয়ে মাটি থেকে ৫-৭ ফিটের মধ্যে কাঁটাওয়ালা ঝোপ বা অন্যান্য গাছে বাসা বানায়। প্রবেশ-পথ প্রায় মাথার কাছে। কখনও বেশ কয়েকটা বাসা এক গাছে বা ঝোপে দেখা যায়। ৪ থেকে ৮টি শাদা ডিম পাড়ে। স্ত্রী-পুরুষ দুজনেই পরস্পরকে বাসা বানানো ও সন্তান প্রতিপালনে সাহায্য করে।

৪। নকলনুর (লনচুরা মালাক্কা)। হিন্দি—ঐ। ইংরেজি—ব্ল্যাক-হেডেড মুনিয়া।

লম্বায় ৫ ইঞ্চি। মাথা ঘাড় ও বুক কুচকুচে কালো। পিঠ ডানা ও লেজ গাঢ় দারুচিনি লাল। লেজের উপরের পালক একটু বেশি চকচকে। বুক থেকে পেটের মধ্যখান পর্যন্ত শাদা। বাকি তলার অংশ কালো। চঞ্চু নীলচে, আভায় একটু হলুদ

ভাব। পা খাঁসেরঙা। কনীনিকা গাঢ় পাটকিলে।

বাসস্থান—মধ্যপ্রদেশ থেকে দক্ষিণে উপদ্বীপাঞ্চল ভারত ও সিংহল। দুই পাকিস্তান ও ব্রহ্মদেশে এদের দেখা যায় না।

জলার মাঝে বড়ো ঘাস, হোগলা বা নল-খাগড়ার ভিতরে কখনও কখনও ৪০-৫০টির দলে বাস। কাছে ধানখেত থাকাটা খুবই পছন্দের। আচার-ব্যবহার সবই অন্যান্য মুনিয়ার ন্যায়। প্রজননকাল জুন থেকে অকটোবর। নিচু ঝোপে বা হোগলার মধ্যে ঘাসের গোলাকার বাসা। প্রবেশপথ ঘাস দিয়ে এমন ঢেকে রাখে যে চট করে ধরা যায় না। ৫ থেকে ৭টি শাদা ডিম পাড়ে।

৫। লাল-মুনিয়া (এস্ট্রিলডা অ্যামান-ডাভা)। হিন্দি—ঐ। কোথাও কোথাও শুধু 'লাল' বলতে পুরুষ, 'মুনিয়া' বলতে স্ত্রী বোঝায়। ইংরেজি—রেড ওয়াক্স-বিল, রেড-মুনিয়া বা রেড আভাডাভাট।

লাল-মুনিয়া পুত্রিকা গণের (এস্ট্রিলডা) অন্তর্ভুক্ত। শংকুপুচ্ছ গণের মুনিয়া অপেক্ষা আকারে ছোটো—৪ ইঞ্চি। পূর্ণবয়স্ক পুরুষ দেখতে খুবই সুন্দর। পেট থেকে লেজের তলায় কালো ছোপ ছাড়া বাকি দেহের সমস্ত পালক টুকটুকে লাল। লেজের গোড়ার একটু উপর থেকে, ঘাড়ের দুপাশে, বুকে ও অন্যান্য স্থানে খুব ছোটো ছোটো শাদা ফুটকি। ডানা পাটকিলে। লেজ কালচে, কেবল লেজের বাইরের পালকের ডগায় একটু শাদার ছোপ। ত্রিকোণাকার ছোট্ট চঞ্চু লাল, মনে হয় যেন মোমের তৈরি।

স্ত্রী-পাখিও দেখতে সুন্দর। তার উপরের পালক পাটকিলে। লেজের উপরের পালক নিষ্প্রভ টকটকে লাল, ডগায় একটু শাদার ছোপ। ডানা ও লেজের অন্যান্য অংশ পুরুষের ন্যায়। চোখের সামনে একটা কালো দাগ। গলা এবং চিবুক শাদাটে। মাথার দুপাশ, ঘাড় ও বুক ছাই-পাটকিলে; বাকি নিচের পালক ফিকে জরদ।

বাসস্থান—উত্তরে হিমালয় অঞ্চলে ৩ হাজার ফিট উচ্চতার মধ্যে এবং দক্ষিণে ৬ হাজার ফিটের মধ্যে ভারতের সর্বত্র; দুই পাকিস্তান এবং ব্রহ্মদেশ থেকে মালয়েশিয়া পর্যন্ত। সিংহলে দেখা যায় না।

লাল-মুনিয়াকে দেখা যায় জলা এবং জঙ্গলপূর্ণ স্থানে। ঝিলের ধারে বড়ো ঘাস হোগলা বা নলখাগড়ার বনের প্রতি আসক্তি বেশি। ঝাঁকে ঝাঁকে থাকে এবং অল্প-কিছুতেই সন্দিগ্ধ হয়ে ছোটো মেঘের মতো ঝাঁক বেঁধে মিষ্টি ডাক দিয়ে ওড়ে। দেখতে সুন্দর এবং সহজে পোষ মানে বলে এরা ধরা পড়ে সবচেয়ে বেশি। বিদেশে চালানও যায় প্রচুর। একারণে পাখির বাজারে ঢুকলে লাল-মুনিয়া নজরে পড়ে সর্বাগ্রে। খাঁচার পাখিকে কাঙনিদানা বা অন্যান্য শস্যকণা ছাড়াও কলা পাউরুটি দুধ ও ছাতু খাওয়াতে হয়। প্রজননকাল জুন থেকে অকটোবর। নানাধরনের নরম ঘাস দিয়ে তরমুজ-আকারে এদের বাসা। বাসা বাঁধে মাটি থেকে ২-৩ ফিটের মধ্যে। ঝোপের মধ্যে বাসা এমন লুকানো থাকে যে সহজে চোখে পড়ে না। ৪ থেকে ৭টি শাদা ডিম পাড়ে।

নকলনুর

৬। সবুজ-মুনিয়া (এস্ট্রিলডা ফরমোসা)। হিন্দি—হারি মুনিয়া বা হারি লাল। ইংরেজি—গ্রীন মুনিয়া।

পুত্রিকা গণের অপর প্রজাতিটি আকারে লাল-মুনিয়ারই ন্যায় কিন্তু তাদের উপরের পালক হালকা জলপাই-সবুজ, নিচে হলুদ। বুকের দুপাশ সবজে পাটকিলে ও শাদার ছোটো ছোটো টান। লেজ গোল এবং কালো। মোমের ন্যায় চঞ্চু টুকটুকে লাল। স্ত্রী-পাখি একই রকম দেখতে, তবে সব রঙই খুব ফিকে।

বাসস্থান—রাজস্থানের শিরোহি থেকে বিহারের হাজারিবাগ, দক্ষিণে বোম্বাইয়ের খান্দেশ থেকে অন্ধ্রের বিশাখাপত্তনম।

কুড়ি বা তার চেয়ে অল্পকিছু বেশি এক-এক ঝাঁকে থাকে। জলার ধার খুব পছন্দ করে না। ঘাসের বীজই প্রধান খাদ্য। প্রজননকাল অক্টোবর থেকে জানুয়ারী, কোথাও জুলাই। আখের ক্ষেতে আখের পাতা চিরে সেলাই করে বাসার একটা কাঠামো প্রথম তৈরি করে, বাকিটা ঘাস দিয়ে বাঁধে। নিরালায় ঘাসের বনে থাকে বলে এদের সম্বন্ধে বিশেষ কিছুই জানা যায় না। সবুজ-মুনিয়াও পাখির বাজারে আসে তবে কম।

আরও দুটি বংশের কথা শুধু উল্লেখ করব যারা চঞ্চুসূচীর খুবই নিকট জ্ঞাতি। পূর্বের বিচারে নাম-তালিকায় প্রথমটির মধ্যে আমাদের চড়াই অর্থাৎ কুলিঙ্গ অনু-বংশকে ধরা হতো। এই দুই বংশের কোনো পাখিই বাংলোর পাখি নয় কিন্তু বিক্রির জন্যে বাজারে আসে এবং অনেকে এদের ডাক ও দৈহিক সৌন্দর্যে আকৃষ্ট হয়ে পোষেন। এদের ভিতর বহু পাখি আবার পরিযায়ী।

১। চটক-বংশ (ফ্রিনগিল্লিদি)। তিনটি অনু-বংশ এবং আমাদের আলোচ্য চটক অনু-বংশে ২০টির উপর গণ। পূর্বে এই বংশে চড়াই-বাবুই ইত্যাদি সব পাখিই অন্তর্ভুক্ত ছিল। তুতি, লাল তুতি, গোলাপী তুতি (কার্পোডাকাস)। হিন্দি—ঐ। ইংরেজি—রোজফিন্চ।

হিমালয়ের কাশ্মীর থেকে পূর্ব তিব্বতে ১০ হাজার ফিট উচ্চে বাসা বাঁধে। শীত-কালে সিংহল ছাড়া ভারতের বহু স্থানে নেমে আসে, এমনকি দুই পাকিস্তান ও ব্রহ্মদেশে।

২। চিরিটীক-বংশ (এম্বারিজিদি)। চিরিটীকও চটক-বংশের মধ্যে একটি অনু-বংশ হয়ে ছিল কিন্তু বর্তমানে একে সম্পূর্ণ ভিন্ন বংশ বলে পক্ষিতত্ত্ববিদরা মনে করেন।

হিন্দি—গান্দাম। ইংরেজি — বান্টিং। বাংলা নাম কোনো নেই।

কালোমাথা আর লালমাথা এই দুই প্রজাতিকেই কলকাতার বাজারে দেখতে পাওয়া যায়। এরাও শীতকালে নেমে আসে ভারতের নানা স্থানে। এদের মধ্যে লালমাথা গান্দাম (এম্বারিজা ব্রুনিসেপস্) হাজারি-বাগের জঙ্গলে আমার দৃষ্টিপথে পড়েছে।

সাহিত্য ও সংস্কৃতি

পাঠকের বৈঠক

শারদীয়

এবারের মত বাঙালীর জাতীয় উৎসব শেষ হল। আবার আগামী বৎসরের দিকে তাকিয়ে থাকতে হবে, পঞ্জিকার পৃষ্ঠায় কবে আবার সেই শুভদিনটি ফিরে আসবে সেই দিকে সকলের মন পড়ে থাকবে। পুরোহিত তাই প্রতিমা নিরঞ্জনের লগ্নে উদাত্ত কন্ঠে আবৃত্তি করেছেন :

দুর্গে দেবী জগন্মাতঃ স্বস্থানং গচ্ছপুজিতে
সম্বৎসর ব্যতীতে তু পুনরাগমনায় চ ।।

সকলের কন্ঠে ধ্বনিত হয়েছে, আবার এসো মা—আনন্দময়ীর আগমনে যেন অবার এমনই মহা উল্লাসে আমরা মগ্ন হতে পারি, আবার যেন আনন্দসাগরে ভাসি।

'অমৃতে'র পাঠক-পাঠিকা ও শুভানুধ্যায়ী বন্ধুদের এই সূত্রে বিজয়ার আন্তরিক শুভেচ্ছা ও প্রীতি কামনা জানাই। সকলের আয়ু, আরোগ্য ও যশ কামনা করি।

পুজো শেষ হয়েছে, পুজোর তাত্ত্বিক দিকটি সম্পর্কে অনেক আলোচনাও প্রকাশিত হয়েছে। প্রতি বৎসর এই উপলক্ষ্যে দুর্গাপুজোর উৎপত্তি এবং মাহাত্ম্য ব্যাখ্যা করা হয়, সুতরাং তার পুনরাবৃত্তি নিষ্প্রয়োজন।

বর্তমানে জমিদারী প্রথা লোপ পাওয়ায় এবং দেশবিভাগের ফলে গৃহস্থবাড়ির পুজো প্রায় নিশ্চিহ্ন, এখন আছে সার্বজনীন মহোৎসব। এইখানে খানা-পিনার বন্দোবস্ত নেই, তবে হুল্লোড়ের অভাব নেই। মাইক-যন্ত্রের সাহায্যে কয়দিন আসর সরগরম রাখার বিরাম-বিহীন ব্যবস্থা থাকে। প্যান্ডেল আর উজ্জ্বল আলোকমালায় সজ্জিত এই পুজো-মন্ডপে কয়দিন জন-সমাগমের সীমা থাকে না। আবাল-বৃদ্ধ-বনিতা সকলেই পরমানন্দে সকল ক্লেশ ভুলে দেবীপ্রতিমা দর্শন করে সারা বৎসরের গ্লানি অপনোদন করেন।

যাঁরা ব্যবসায়ী তাঁদেরও এই উৎসবের প্রয়োজন, নিছক ব্যবসাসূত্রে। পুজোর মাসাধিক কাল আগে থেকেই শুরু হয় পুজোর বাজার। রঙীন কাপড়-চোপড় থেকে শুরু করে নতুন জুতো সবই ত' পুজোর বাজারে প্রয়োজন। তাই তাঁদের দোকানে বিরাট আয়োজন। সেখানেও অনেক আলো জ্বলে, অনেক মানুষের ভীড় হয়। দশ টাকার জিনিস বিশ টাকায় বিক্রী করার এমন সুযোগ আর আসে না। সর্বকালেই এই অবস্থা। অষ্টাদশ শতাব্দীর বিদেশী পর্যটক হ্যারিসন সাহেব লিখেছেন :

"On taking a stroll through the Bazzar at these periods you see the richest brocade of Delhi, the embroideries of Beneras, pearly white Muslins and soft velvets. Jewels peep from the inlaid caskets and serbats are prepared of the most costly perfumes and scents to cool the palets of the high and mighty. The Dukans or shops also present a grand show of finery and tinsel ornaments suiting every degree of purchaser."

এখনও এই অবস্থা, ব্রোকেড আর মসলিনের জায়গায় এসেছে, ডেকরন, টেরিকট, টেরিলিন। কিন্তু হ্যারিসন সাহেবরা একটি জিনিস দেখেননি। শারদীয় পুজোর মরশুমে যে পরিমাণ বিশেষ সাময়িকী পত্রিকাদি প্রকাশিত হয় বোধকরি ভূ-ভারতে তার আর তুলনা পাওয়া যাবে না। বড় বড় পত্র-পত্রিকার অতিকায় বিশেষ সংখ্যার সঙ্গে প্রকাশিত হয় অসংখ্য ছোট-বড় মাঝারি রকমের সাহিত্য-সাময়িকী। কোনটিতে চার থেকে পাঁচটি পর্যন্ত উপন্যাস থাকে, ছোটগল্প, প্রবন্ধ, নিবন্ধ, ইত্যাদির সঙ্গে থাকে হরেকরকম বিজ্ঞাপনের বাহার। সাহিত্যের এমন মহা-সমারোহ আর কোনো সময় হয় না। ছোট বড় মাঝারি লেখকরা সবাই একাধিক উপন্যাস, গল্পাদি লিখে থাকেন ; তাঁদের পরিশ্রম, পাণ্ডিত্য ও শক্তিমত্তার পরিচয় পেয়ে পাঠক-পাঠিকারা বিভ্রান্ত হয়ে পড়েন। এক-একটি বাড়িতে প্রায় শতাধিক টাকার পুজোর সংখ্যা কিনতে দেখেছি। তাঁরা সাহিত্যপত্র থেকে শুরু করে সিনেমা, গোয়েন্দা-কাহিনী এমন কি শিশুপাঠ্য বার্ষিকী পর্যন্ত কিনে থাকেন। নেহাৎ ছোট-খাটো পত্রিকা অবশ্য নজর এড়িয়ে যায়। পুজোর পূর্বে ব্যস্ত থাকেন লেখক, তাঁকে লিখতে হয় অনেক। সম্পাদকও ব্যস্ত, তাঁকে সংগ্রহ করতে হয়, লেখকের তোষামোদ করতে হয়, প্রতিযোগিতার জন্য কি বস্তু পরিবেশন করলে পত্রিকার কাটতি এবং সুনাম বা বদনাম বৃদ্ধি হয় সেদিকে লক্ষ্য রাখতে হয়। সুনামেও যেমন লাভ, বদনামেও তদ্রূপ। কারণ, তাহলে পত্রিকার নাম মুখে মুখে ফেরে।

পুজোর পর, ব্যস্ত হয়ে পড়েন প্রকাশক, তাঁকে 'হিট' উপন্যাস সংগ্রহ করতে হয়। সারা বছরের শিকার এই শারদীয়গুলি, কারণ, তার একটু পরেই তাঁকে মন দিতে হবে স্কুল-পাঠ্য পুস্তকের প্রকাশ আয়োজনে। তবু, কেউ স্বীকার করেন না যে তাঁর ব্যবসা বেশ ফেঁপে উঠেছে। সবাই বিষণ্ণ মুখে দীর্ঘশ্বাস টেনে বলেন, এবছর যা বাজার—!

অন্যদিকে যাঁরা পুস্তকব্যবসায়ী নন তাঁদেরও মুখে ঐ একই কথা। প্রতি বছরই পুজোর শেষে শোনা যায়, এবছর উৎসব তেমন জমেনি। লোকের হাতে টাকা নেই, কি করে কি হবে। কিন্তু দেখা গেল চার টাকা চল্লিশ পয়সা কিলোর চাল খেয়েও বাঙালীর চাল কিছু টুটে পারেনি।

১৮২৯ খৃস্টাব্দের অকটোবর মাসে "সমাচার-দর্পণ" পত্রিকা মন্তব্য করেছিলেন :

এই দুর্গোৎসব এখন সমাপ্ত হইয়াছে এবং সমস্ত দেশে পুনরায় কাজ-কারবার আরম্ভ হইয়াছে। সকলেই কহেন যে ইহার পূর্বে এই দুর্গোৎসবে যেরূপ সমারোহ-পূর্বক নৃত্য-গীত ইত্যাদি হইত এক্ষণে বৎসর ২ ক্রমে ঐ সমারোহ ইত্যাদির হ্রাস হইয়া আসিতেছে।"

এর পর কারণ বর্ণনা করা হয়েছে যে, সাহেবরা আর তেমন তামাসার বিষয়ে আমোদ করেন না। এতদ্দেশীয় ধনীলোকেরা টাকা এইভাবে নষ্ট করিতে নারাজ ইত্যাদি।

কিন্তু ১৮৫৪ খৃস্টাব্দের ৯ই অকটোবর তারিখের "সংবাদ প্রভাকরে" অন্যরকম মন্তব্য দেখা যায়—

"এক্ষণে মহামায়া মহেশ্বরীর মহা মহোৎসব অতি সমারোহ পূর্বক নির্বাহ হইয়াছে। ধনাঢ্য পরিবারেরা অতি-অকাতরে অর্থ ব্যয় করিয়াছেন। শোভাবাজারস্থিত নৃপতিদিগের উভয় নিকেতনে নৃত্য-গীতাদির মহাধুম হইয়াছিল। সাহেবরা নিমন্ত্রিত হইয়া সেই নাচের সভা উজ্জ্বল করিয়াছিলেন। লোভদেবের প্রিয়-শিষ্য শ্বেতাঙ্গ আন্দু, পিন্দ্রু, গোমিশ, ও গনসালবেশ প্রভৃতি কৃষ্ণাঙ্গগণ, যাঁহারা মোদের বিলাত ও মোদের কুইন বলিয়া গর্ব পর্ব বৃদ্ধি করেন, তাহারা এই পুজো উপলক্ষ্যে রাজভবনে উপস্থিত হইয়া বিলক্ষণরূপে উদর পূর্ণ করিয়াছেন।"

একশত বৎসরাধিক পূর্বের হুতোম প্যাঁচার নকসায় বারোইয়ারী পুজোর অনেক বিবরণ পাওয়া যাবে। বারোয়ারী পুজোই উত্তরকালে নাম পাল্টিয়ে সর্বজনীন হয়েছে। চাঁদা আদায়ের পুরাতন পদ্ধতি আজো বর্তমান। দলাদলি এবং মারামারি আজো আগের মতই আছে।

বিসর্জনের ঘটা কি কম। কত রঙ তামাসা, কত বাদ্যভান্ড, কতরকমের নৃত্যরঙ্গ।

পুজো চারদিনের খেলা। সেই চারটি দিনকে কেন্দ্র করে যে হুল্লোড় এবং হৈ হৈ তা আপাততঃ শান্ত। ঢাকীরা ঢাক নিয়ে ঘরে ফিরে গেছে—এখন তাই চারিদিক স্তব্ধ। হেমন্তলক্ষ্মীর নয়ন দুটি হিমের ঘন কুয়াশায় ঢাকা পড়ার সময় আসন্ন। সব সুখেরই শেষ আছে। শারদীয় উৎসবের শেষে সেই কথাটি মনে বার বার জাগে।

—[illegible]

কলকাতায় জাপানী সাহিত্যিক মিশিমা ॥
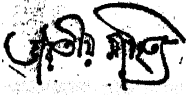
সাম্প্রতিক জাপানের সবচেয়ে জনপ্রিয় সাহিত্যিক ইকুয়ো মিশিমা। শুধু সাম্প্রতিক কালেই নয়, সর্বকালের জাপানী সাহিত্যেও তিনি অন্যতম। তাঁর খ্যাতি আজ স্বদেশের সীমারেখা অতিক্রম করে ছড়িয়ে পড়েছে চারদিকে। ১৯৬৬ সালের নোবেল পুরস্কারের জন্য তিনি ছিলেন অন্যতম প্রতিদ্বন্দ্বী। সম্প্রতি ভারত সরকারের আমন্ত্রণে তিনি এসেছিলেন কলকাতায়। গত ৮ই অক্টোবর "ইন্দো-জাপানিস এসো-সিয়েশনের" পক্ষ থেকে পার্ক হোটেলে অনুষ্ঠিত এক সভায় সম্বর্ধনা জানান হয়।

এই অনুষ্ঠানে পৌরোহিত্য করেন শ্রীফণিভূষণ চক্রবর্তী। তিনি তাঁর ভাষণে "ইন্দো-জাপানিস এসোসিয়েশনে"র উদ্দেশ্য বর্ণনা করেন ও মিশিমার সাহিত্যপ্রতিভা সম্বন্ধে বলেন। শ্রীসুধাংশুমোহন বন্দ্যো-পাধ্যায় মিশিমার ব্যক্তিত্ব ও সাহিত্যপ্রতিভা সম্বন্ধে বিস্তৃত ভাষণ দেন। সম্বর্ধনার উত্তরে মিশিমা তাঁর সংক্ষিপ্ত ইংরেজি ভাষণে জানালেন যে, ভারতে এসে তিনি খুবই আনন্দ পেয়েছেন। প্রতীচ্য যেখানে প্রকৃতিকে ধ্বংস করছে, ভারত সেখানে প্রকৃতিকে করে নিয়েছে আপন।

এসোসিয়েশনের সম্পাদক শ্রীরমেশ মাথুর সকলের সঙ্গে মিশিমার পরিচয় করিয়ে দেন। শ্রী এফ এম কমজী এসোসিয়েশনের পক্ষ থেকে সকলকে ধন্যবাদ জানান। অনুষ্ঠানে বিশিষ্ট ব্যক্তিদের মধ্যে ডঃ সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়, প্রেমেন্দ্র মিত্র, ডালমিয়া, জাপ কনসাল জেনারেল আই কাতাকামি ও তাঁর স্ত্রী, আলোক সরকার, অমিয় দেব, আশিস সান্যাল প্রমুখ উপস্থিত ছিলেন।

অনুষ্ঠানের আগেই তাঁকে "বেঙ্গলি লিটারেচার" পত্রিকার কয়েকটি সংখ্যা উপহার দেওয়া হয়, অনুষ্ঠান শেষে তিনি বলেন—"এতোক্ষণ বসে বসে পত্রিকাটি পড়ছিলাম। খুব ভাল পত্রিকা। কয়েকজনের লেখা আমাকে মুগ্ধ করেছে। বাংলাদেশে এত ভাল সাহিত্য আছে জানতাম না।" প্রসঙ্গত তিনি বাংলাদেশের কয়েকজন সাহিত্যিক সম্বন্ধেও বিভিন্ন খোঁজ-খবর নেন।

ইকুয়ো মিশিমা কিন্তু তাঁর আসল নাম নয়। আসল নাম—কিমিতাকে হিরোওকা। ১৯২৫ খ্রীঃ জানুয়ারীতে টোকিও শহরে তাঁর জন্ম। ১৯৪৪ খ্রীঃ তাঁর প্রথম গল্প সংকলন "হানাজাকারি নো মোরি" (পূর্ণ প্রস্ফুটিত অরণ্য) প্রকাশিত হয়। টোকিও বিশ্ববিদ্যালয়ের ইংরেজি ভাষায় স্নাতক শ্রেণীর ছাত্র থাকা অবস্থাতেই তাঁর "মেশাকি নিতে নো মনোগাটারি" (অন্তরীপের কাহিনী), "চিটোসিরাই" (মধ্যযুগ) গ্রন্থ দুটি প্রকাশিত হয়। এই গ্রন্থ দুটির মাধ্যমেই তিনি সাহিত্যজগতে তাঁর নিজস্ব স্থান অধিকার করে নেন। ১৯৫০ সালে তাঁর "আই নো কাওয়াকি" (ভালবাসার তৃষ্ণা) প্রকাশিত হয়। এ পর্যন্ত তাঁর ৩০টির মত উপন্যাস, ৩০টি নাটক ও ৮০টি গল্প প্রকাশিত হয়েছে। নাটকের মধ্যে কয়েকটি কাব্য-নাটকও আছে। ইংরেজিতে তাঁর অনেক গ্রন্থ অনূদিত হয়েছে। অনুবাদ কেমন হয়েছে, তাঁকে জিজ্ঞেস করা হলে বলেন—"আমি ভাল ইংরেজি জানি না। তাই বলতে পারবো না। যথার্থ অনুবাদ হয় না ঠিক, কিন্তু অনুবাদ ছাড়া অন্য কি পথ আছে?" মিশিমার সিনেমার প্রতিও আগ্রহ আছে। 'পেট্রিপটিজম' বলে একটি সিনেমার তিনি রচয়িতা, পরিচালক এবং নায়কের ভূমিকাতেও তিনি অভিনয় করেছেন। এই সিনেমায় রূপায়িত গল্পটি "ডেথ ইন মিড-সামার" গ্রন্থে সংকলিত হয়েছে।

ডঃ শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়ের ৭৫-তম জন্মদিবস ॥

বাংলা সমালোচনা-সাহিত্যে শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় একটি অবিস্মরণীয় নাম। দীর্ঘ এক যুগ ধরে তিনি বিভিন্নভাবে বাংলা সাহিত্যকে সমৃদ্ধ করে আসছেন। তাঁর ৭৫-তম পূর্তি উপলক্ষে তাঁর গুণমুগ্ধ ছাত্র-ছাত্রী, বন্ধু-বান্ধবেরা তাঁকে সম্বর্ধিত করতে উদ্যোগী হয়েছেন। গত সোমবার, ১৬ই অক্টোবর সেই অনুষ্ঠানের প্রথম পর্যায় হিসেবে তাঁর বাড়িতে এক অনাড়ম্বর পরিবেশে তাঁর জন্মতিথি পালন করা হয়। বহু ব্যক্তি উপস্থিত হয়ে তাঁকে মাল্যভূষিত করেন। "জয়ন্তী সমিতি"র আহ্বায়ক শ্রীমনোজ দত্ত ও শ্রীশৈলেশচন্দ্র ভট্টাচার্য সকলকে স্বাগত জানান। উপস্থিত বিশিষ্ট ব্যক্তিদের মধ্যে ছিলেন—ডঃ পি কে গুহ, ডঃ সুবোধ সেনগুপ্ত, শ্রীমতী গৌরী মুখো-পাধ্যায় ও আরো অনেকে।

বিদ্যাসাগর জন্মবার্ষিকী ॥

সম্প্রতি "বিবেকানন্দ বালিকা বিদ্যা-লয়ের" ছাত্রীদের উদ্যোগে বিদ্যাসাগরের ১৪৮-তম জন্মদিবস উদ্‌যাপিত হয়। এই অনুষ্ঠানে সভাপতি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন শ্রীনন্দগোপাল সেনগুপ্ত। তিনি তাঁর ভাষণে বিদ্যাসাগরের চরিত্রের বিভিন্ন দিক বিশদভাবে আলোচনা করেন। প্রধান অতিথির ভাষণে শ্রীঅচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্ত বিদ্যা-সাগরের সঙ্গে শ্রীরামকৃষ্ণদেবের সাক্ষাতকারের একটি চিত্তাকর্ষক বর্ণনা দেন। শ্রীকালী-কিঙ্কর সেনগুপ্ত, বিদ্যাসাগরকে নিবেদিত কবিতা পাঠ করেন।
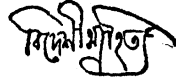
এ বছরের নোবেল পুরস্কার বিজয়ী ॥

গুয়াতেমালার প্রখ্যাত সাহিত্যিক মিগুয়েল আনজেল আসটুরিয়াস এ-বছর সাহিত্যের জন্য নোবেল পুরস্কার পেয়েছেন। একথা ঘোষণা করেছেন সুইডিস অ্যাকাডেমি।

আনজেল আসটুরিয়াস প্যারিসে গুয়া-তেমালার রাষ্ট্রদূত। বর্তমানে ইনি ৬৭ বয়সে পদার্পণ করেছেন। প্রধানত স্বদেশ ও এর অন্তর্গত আদিম অধিবাসীদের জীবন-যাত্রার নিখুঁত চিত্রণ তাঁর রচনায় পাওয়া যায়। তাঁর রচনার আরেকটি উল্লেখযোগ্য বৈশিষ্ট্য হলো তিনি দক্ষিণ আমেরিকার অন্যান্য স্প্যানিশ লেখকদের মত স্পেনের সাহিত্যধারার সঙ্গে সম্পর্কসূত্রে জড়িত ছিলেন না। স্বদেশের আদিবাসী রেড ইন্ডিয়ান ও তাদের মর্মস্পর্শী জীবনকাহিনী তিনি অত্যন্ত আন্তরিকতার সঙ্গে বর্ণনা করেছেন। তিনিই বর্তমানের একমাত্র কথা-শিল্পী যিনি এঁদের অবহেলিত পঙ্কিল জীবনযাত্রার কথা পৃথিবীর মানুষের কাছে পৌঁছে দিয়েছেন।

পরলোকে আঁদ্রে মোরোয়া ॥

গত ৯ অক্টোবর প্রখ্যাত লেখক আঁদ্রে মোরোয়া প্যারিসে পরলোকগমন করেন। মৃত্যুকালে তাঁর বয়স হয়েছিল ৮২ বছর।

ঔপন্যাসিক হিসেবে নিজেকে প্রতিষ্ঠিত করতে চাইলেও আঁদ্রে মোরোয়া সাহিত্যের চিরস্থায়ী আসন করে নিয়েছেন কয়েকখানি অনবদ্য জীবনী-গ্রন্থের জন্যে। ১৯৫২ সাল থেকে ১৯৫৯ সালের মধ্যে তিনি যে কটি জীবনী লিখেছেন সাহিত্যের ইতিহাসে তা এক অভাবনীয় ঘটনা। দুমা ত্রয়ী, ভিক্টোর হ্যুগো, জর্জ সাঁদ, স্যার আলেকজান্ডার ফ্লেমিং-এর জীবনী তাঁকে চিরস্মরণীয় করে রাখবে।

আঁদ্রে মোরোয়া জন্মেছিলেন ১৮৮৫ সালে জুলাই মাসে। এঁর আসল নাম হল এমিল সলোমন উইলহেলম হেরজেগ। সাহিত্যের জগতে তিনি আঁদ্রে মোরোয়া ছদ্মনামেই পরিচিত।

প্রতিশ্রুতিবান তরুণ কবি ॥

অস্ট্রেলিয়ার কবিতা সম্পর্কে যাঁরাই কিছু খবরাখবর রাখেন তাঁরা জানেন হালের অস্ট্রেলীয় সাহিত্যে যা কিছু আন্দোলন তা প্রধানত কবিতাকে ঘিরেই। তাই অস্ট্রে-লিয়ার আজ শক্তিমান কবির সংখ্যা বিরল নয়। সম্প্রতি আরেকজন তরুণ কবির আত্ম-প্রকাশ ঘটেছে যাঁর কবিতায় আছে তরুণো-চিত প্রতিশ্রুতি, মৌলিকত্ব। নাম রবার্ট এ ব্রাউন। তাঁর সম্প্রতি প্রকাশিত প্রথম কাব্য-গ্রন্থটির নাম 'মেন আন্ডার দি সান'।

বইটিতে মোট ৩৬টি কবিতা আছে। এর মধ্যে দুটি কবিতা দীর্ঘ। কবিতাগুলি

তাঁর ভাবপ্রকাশের আন্তরিক বাহন হয়ে উঠেছে বলে বিভিন্ন সমালোচকের ধারণা। ওয়েসলিয়ান সিরিজ থেকে তাঁর আরেকটি কাব্যগ্রন্থ শীঘ্রই প্রকাশিত হবে বলে প্রকাশ। 'মেন আন্ডার দি সান'-এর অন্তর্গত নাম কবিতাটি এবং দীর্ঘ কবিতাদ্বয় 'দি ফ্ল ব্লুম' ও 'ক্লিসানথিমাম' পাঠকমহলে অশেষ জনপ্রিয়তা অর্জন করেছে। প্রধানত, প্রকৃতিই ব্রাউনের কবিতার মূল বিষয়বস্তু। কখনো এ'র কবিতাগুলিতে এক স্বকপোলকল্পিত দার্শনিক অনুভব স্পর্শময় হয়ে ওঠে।

১৯৬৭ সালের গ্যেটে পুরস্কার ॥

কার্লো সুখিয়দ এবছর গ্যেটে পুরস্কার লাভ করেছেন। ২৮ অগাস্ট ফ্রাঙ্কফোর্টে গ্যেটের জন্মদিবস উপলক্ষে এই পুরস্কারটি তাঁকে দেওয়া হয়। ১৯২৭ সালে প্রথম এই পুরস্কারটি পেয়েছিলেন স্টিফেন জর্জ। অ্যালবার্ট সোয়াইৎজার, কার্ল জুকমেয়ার, ওয়াল্টার গ্রোপিয়াস, টমাস মান্ প্রভৃতিও পর পর এই পুরস্কারের সম্মান পেয়েছিলেন।

কার্লো সুখিয়দ ১৮৯৬ সালে ফ্রান্সের দক্ষিণে পারপিগনানে জন্মগ্রহণ করেন। ক্যালডারন, বোদলেয়ার এবং মেকিয়াভেলি প্রভৃতির রচনা তিনি অনুবাদ করেছেন। এ ছাড়া কয়েকটি গ্রন্থেরও তিনি রচয়িতা। ১৯৬৬ সাল পর্যন্ত তিনি ফেডারেল সরকারের একজন মন্ত্রী ছিলেন। ১৯৫২ সালে তিনিও 'ইণ্টারনেশেনস্'-এর একজন সহ-প্রতিষ্ঠাতা ছিলেন। বর্তমানে তিনি অ্যাডমিনিসট্রেটিভ কাউন্সিলের একজন ডেপুটি চেয়ারম্যান।

মহাত্মা লালন ফকির : চরিত-কথা ও সাধনা

ভারতবর্ষে অধ্যাত্ম সাধনার যেমন বৈচিত্র্য দেখা যায়, অন্য কোনো উপমহাদেশ বা মহাদেশে তেমন দেখা যায় না। ভারতবর্ষীয় উপাসক-সম্প্রদায় সম্পর্কে আলোচনার সূত্রপাত করেছেন মনস্বী উইলসন তাঁর 'Religious Sects of India' গ্রন্থে, তারপর দার্শনিক ও ঐতিহাসিক দৃষ্টিকোণ থেকে এ বিষয়ের অপেক্ষাকৃত পূর্ণাঙ্গ আলোচনা করেছেন জ্ঞানতাপস অক্ষয়কুমার দত্ত। তাঁর 'ভারতবর্ষীয় উপাসক সম্প্রদায়' দুখণ্ডে সমাপ্ত, গ্রন্থের দীর্ঘ ভূমিকায় মনীষী লেখকের পান্ডিত্যপূর্ণ গবেষণার নিদর্শন আছে। সমগ্র ভারতবর্ষের কথা ছেড়ে দিয়ে যদি শুধু বাংলার কথাই ধরা যায়, তা হলেও বলতে হয়, বাংলা দেশেও উপাসনার নানা ধারা প্রবাহিত হচ্ছে। বাংলার উপাসক সম্প্রদায় সম্পর্কে সংক্ষিপ্ত আলোচনা করেছেন মননশীল লেখক পাঁচকড়ি বন্দ্যোপাধ্যায়। আমরা বলতে পারি, বাংলাদেশে সাধনার তিনটি প্রধান ধারা মিলিত হয়েছে—বৈষ্ণব সাধনার ধারা, শাক্ত সাধনার ধারা ও বাউল সাধনার ধারা। 'বাউল' বলতে আমরা বাংলা দেশের নানা অলোকপন্থী বা মিস্টিক সম্প্রদায় বুঝে থাকি। আউল, বাউল, সাঁই, দরবেশ, কর্তাভজা প্রভৃতি সম্প্রদায়সমূহ মনের মানুষের সন্ধানী, তাঁরা বেদবিধি ছাড়া, ইংরেজিতে যাঁদের বলা হয় Non-conformist. বাউলের গানে আমরা শুনতে পাই—

> 'মনের মানুষ না পেলে
> মনের কথা কইবো না,
> মনের মানুষ পাবার আশে
> ভ্রমণ করি দেশ-বিদেশে
> মানুষ মিলে শত শত
> মন তো মিলে না'।

এই জন্যে বাউল সাধক তাঁদের সাধনার গূঢ়-রহস্য তথাকথিত 'পরদেশীর' নিকট প্রকাশ করেন না। তাঁরা বলেন—

> 'আপন সাধন-কথা না কহিবে যথা তথা'

তাঁরা অধর মানুষের সন্ধানে হৃদি-রত্নাকরের অগাধ জলে ডুব দেন, নইলে তাঁরা মানুষ চিনবেন কেমন করে, 'মনের মানুষ হয় যে জনা, নয়নে তার যায়গো জানা, ও সে দু' এক জনা'।

তাই বাংলার একজন বাউল গাইলেন—

> 'ক্ষ্যাপা তুই না জেনে তোর আপন খবর
> যাবি কোথায়;
> আপন ঘর না বুঝে, বাইরে খুঁজে
> পড়বি ধাঁধায়'।

এই ক্ষ্যাপা সাধক হচ্ছেন কুষ্টিয়ার অন্তর্গত (অধুনা পূর্ব পাকিস্তান) গৌরী নদীর তীরবর্তী ভাণ্ডারিয়া বা ভাঁড়ারা গ্রামের অধিবাসী লালন ফকির, যাঁর সুললিত ও গভীর ভাবপূর্ণ সংগীত কবিগুরু রবীন্দ্রনাথের ওপরেও প্রভাব বিস্তার করেছিল। রবীন্দ্রনাথের বক্তৃতামালা 'মানুষের ধর্ম' ও 'The Religion of Man' যাঁরা তাঁরা বাউল গানের প্রভাব লক্ষ্য করবেন।

মহাত্মা লালন ফকিরের ভেতর হিন্দু ও মুসলিম সাধনার ধারা অবিরোধে মিলিত হয়েছিল। বাইবেলে বলা হয়েছে—'Man is made in the image of God' লালন ফকিরের মুখে আমরা অনুরূপ উক্তি শুনতে পাই—'স্বয়ংরূপ দর্পণে ধরে মানবরূপ সৃষ্টি করে হে'। তাই মানুষের দেহের ভেতর সকল তীর্থ বিরাজিত। ভারতের বহু সাধক উপলব্ধি করেছেন—'যাহা আছে ব্রহ্মাণ্ডে (macrocasm), তাহা আছে দেহভাণ্ডে (microcosm)' লালন বলেছেন—আমাদের দেহের ভেতরেই যখন আছি মক্কা, আমাদের দেহেই যখন রয়েছে সর্বতীর্থ, তখন পুণ্যস্থান দর্শনের জন্যে ইতস্তত ছুটোছুটি করে কোনো ফল নেই। মনের মানুষের দেখা পেলেই মানুষের সকল অভীষ্ট সিদ্ধ হয়, কারণ, এই মানুষের মধ্যেই রয়েছেন সেই মানুষ, যাঁর দর্শন পাবার জন্যে নানা দেশের সাধক যুগ যুগ ধরে সাধনা করছেন। যে মানুষ সম্পর্কে বলা হয়েছে 'সবার উপরে মানুষ সত্য তাহার

মানুষ। লালন ফকিরের মনের মানুষ ছিলেন সিরাজ সাঁইজী, তাঁর উপদেশেই লালন নব-জন্ম লাভ করেছিলেন।

লালনের সাধনার একটি বৈশিষ্ট্য আমাদের লক্ষণীয়। তাঁর ভেতর ভারতীয় সাধনার বিচিত্র ধারাও সমন্বিত হয়েছিল। তিনি যে রাজ্যের অধিবাসী ছিলেন, সেখানে জাতি বা সম্প্রদায় ছিল না—

> 'সবে বলে লালন ফকির হিন্দু কি যবান,
> লালন বলে আমার আমি না জানি সন্ধান'।

লালন বলেন, যিনি অন্তর্যামীরূপে আমাদের দেহে বিরাজিত, সেই পরম পুরুষকে একমাত্র ঐকান্তিক নিষ্ঠার দ্বারাই লাভ করা যায়, কিন্তু বেদ-বেদান্ত পাঠের দ্বারা মনে শুধু সংশয় জাগে—

> 'আত্মারূপে কর্তা হরি, মনে নিষ্ঠা হলে
> মিলবে তারি ঠিকানা—
> বেদ-বেদান্ত পড়বি যত
> বেড়বি তত লখনা'।

মহাত্মা লালন যে ষট্চক্রভেদের সাধনা করেছিলেন, তাঁর রচিত বহু সঙ্গীতে তারও নিদর্শন আছে। আবার তাঁর ওপর বৈষ্ণব সাধনার প্রভাবও বড়ো কম নয়। গানের ভেতর দিয়ে তিনি নামের মাহাত্ম্য প্রচার করেছেন। তাঁর বহু সঙ্গীতের ভেতর অনুতাপ ও বৈরাগ্যের সুর ধ্বনিত হচ্ছে। আবার মহাপ্রভু শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য, প্রভু নিত্যানন্দ ও প্রভু অদ্বৈতাচার্যের ভাবধারা তাঁকে বিশেষভাবেই প্রভাবিত করেছিল। তিনি গেয়েছেন—

> 'তোরা কেউ যাসনে ও পাগলের কাছে,
> তিন পাগলে হল মেলা নদে এসে,
> দেখতে যে যাবি পাগল,
> সেই ত হবি পাগল
> বুঝবি শেষে'।

লালন ফকিরের শেষ সঙ্গীতে ভক্ত-হৃদয়ের দৈন্য ও আর্তি কেমন চমৎকার আত্মপ্রকাশ লাভ করেছে—

ক্ষম হে অপরাধ আমার ভবকারাগারে।
নহিলে তোমার কৃপা, সাধন-সিদ্ধি
কে করিতে পারে?
আমি পাপী, তাইতে ডাকি
ভক্তি দাও মোর অন্তরে।
পাপী তাপী জীব তোমার,
না যদি করহে পার
দয়া প্রকাশ করে,
পতিতপাবন, পাতক-নাশা
বলবে কে আর তোমারে!
জলে স্থলে সব জায়গায়
তোমার সব কীর্তিময়
ত্রিবিধ সংসারে,
না বুঝে অবোধ লালন
পড়ল বিষম ঘোর তরে'।

লালন ফকিরের জীবনকথা অতি বিচিত্র। তিনি দীর্ঘজীবী ছিলেন (জন্ম: ১৭৭৪, মৃত্যু ১৮৯০ ১৭ই অক্টোবর) ও ভারতের নানা স্থান পর্যটন করেছিলেন। তিনি কায়স্থকুলোদ্ভব. ঘটনাচক্রে তিনি আত্মীয়-স্বজন কর্তৃক পরিত্যক্ত হয়েছিলেন। বাল্যকাল থেকেই তাঁর ভেতর একটা তীব্র ধর্ম-পিপাসা দেখা গিয়েছিল এবং গুরু সিরাজের উপদেশে তিনি দিব্যজন্ম লাভ করেছিলেন। পরবর্তীকালে তাঁর যশ চতুর্দিকে বিস্তৃত হয়েছিল এবং বহু হিন্দু ও মুসলমান তাঁর শিষ্যত্ব গ্রহণ করে। শ্রীরামকৃষ্ণ পরমহংসদেব বলেছেন—'ধর্ম উপলব্ধির বস্তু, পাঠ বা বিচারের বস্তু নয়'। লালন ফকিরও পুঁথি-পড়া বিদ্যা অর্জন করেননি, তিনি তাঁর অন্তরের উপলব্ধিকেই প্রকাশ করেছেন গানের ভেতর দিয়ে। অজস্র সংগীত তাঁর হৃদয়-কন্দর থেকে স্বত-উৎসারিত হয়েছে। এই গানগুলো বাংলা সাহিত্যের শ্রেষ্ঠ সম্পদ। অবশ্য, তাঁর অনেক গানের ভেতর সাধনার গূঢ় তত্ত্ব নিহিত থাকায় এগুলি তত্ত্বরসজ্ঞ পাঠকের নিকট দুর্বোধ্য। ফকির সাহেবের রচিত বহু সংগীতে তৎসম ও তদ্ভব শব্দের সঙ্গে ফারসী ও আরবী শব্দের ভূরি প্রয়োগও লক্ষণীয়।

বাংলার অন্যতম খ্যাতনামা সাহিত্যিক ও তত্ত্বরসিক শ্রীযুক্ত বসন্তকুমার পাল মহাশয় প্রচুর শ্রম স্বীকার করে লালন ফকিরের চরিত-কথা সংকলন করেছেন। তাঁর 'মহাত্মা লালন ফকির' একদিকে বাংলার চরিত-সাহিত্যের একটি শ্রেষ্ঠ সম্পদ বলে পরিগণিত হবে, অপর দিকে এই গ্রন্থখানি চিরদিন রসজ্ঞ পাঠকদের রস-পিপাসা চরিতার্থ করবে। বসন্তবাবু লালন ফকিরের রচিত কয়েকটি গানের গূঢ় তাৎপর্যও অতি নিপুণভাবে বিশ্লেষণ করেছেন, আর এ বিষয়ে তিনি যোগ্য অধিকারীও বটেন। লালন ফকির সম্পর্কে বসন্তবাবুর বহু প্রবন্ধ এককালে 'প্রবাসী' পত্রিকায় প্রকাশিত হয়ে অনেক সন্ধানী পাঠকের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছিল। লালন ফকিরের বহু সংগীতের সঙ্গে তিনি কবিগুরু রবীন্দ্রনাথ, কান্তকবি রজনীকান্ত সেন, কাঙ্গাল হরিনাথ, তান্ত্রিক সাধক শিবচন্দ্র বিদ্যার্ণব প্রভৃতির রচিত বহু গানের ভাবগত সাদৃশ্য প্রদর্শন করেছেন। যাঁরা স্বল্প পরিসরে লালন ফকিরের চরিত-কথা ও জীবন-বেদের সঙ্গে পরিচিত হতে চান, বসন্তবাবুর গ্রন্থখানি তাঁদের পক্ষে অপরিহার্য। আমরা বসন্তবাবুকে অভিনন্দন জানাই ও গ্রন্থখানির বহুল প্রচার কামনা করি।

—ত্রিপুরাশঙ্কর সেন

মহাত্মা লালন ফকির: বসন্তকুমার পাল। প্রাপ্তিস্থান: আশুতোষ লাইব্রেরী, ৫ বঙ্কিম চ্যাটার্জি স্ট্রীট, কলকাতা। এক টাকা পঁচাত্তর পয়সা।

শারদ সাহিত্য

'বৈতানিকে'র শারদ সংকলনে মূল্যবান প্রবন্ধ লিখেছেন হিরণ্ময় বন্দ্যোপাধ্যায় (শরৎচন্দ্র), আশুতোষ ভট্টাচার্য (রবীন্দ্রনাথ ও বাউল গান), সন্তোষ অধিকারী (বিপ্লবী বিদ্যাসাগর), সুধীর করণ (ঈশপীয় কাহিনীর স্বরূপ), রমেন্দ্রনাথ মল্লিক (আধুনিক কবিতার সংজ্ঞা নির্ণয়), জীবন বন্দ্যোপাধ্যায় (পিরানদেল্লোর নাটক) রামজীবন ভট্টাচার্য (গণমানসের সংস্কার), ধ্রুবজ্যোতি সেন (গগনেন্দ্রনাথ), ভবানী মুখোপাধ্যায় (বাংলা যাত্রাগান)। স্মৃতিকথা লিখেছেন অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্ত এবং মনোজ বসু। গল্প লিখেছেন মিহির আচার্য, স্মরজিত বন্দ্যোপাধ্যায়, দেবব্রত মুখোপাধ্যায়, বিশ্ব বন্দ্যোপাধ্যায়, নমিতা চক্রবর্তী, নির্মল সরকার, কুমারেশ ঘোষ, শিশির লাহিড়ী, নিখিলচন্দ্র সরকার সুকুমার রায়, অনিল ভট্টাচার্য, মলয় বন্দ্যোপাধ্যায়। দুটি রুশ কবিতা অনুবাদ করেছেন মণীন্দ্র রায়। কবিতা লিখেছেন প্রেমেন্দ্র মিত্র, বিনয় ঘোষ, কার্তবীর্যার্জুন।

বৈতানিক—সম্পাদক: ভবানী মুখোপাধ্যায়। এম সি সরকার অ্যান্ড সন্স প্রাইভেট লিমিটেড। ১৪, বঙ্কিম চ্যাটুজ্যে স্ট্রীট। কলকাতা—১২। দাম দুই টাকা।

●

শারদীয় 'তরুণিমা'য় লিখেছেন তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়, নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়, দক্ষিণারঞ্জন বসু, স্বরাজ বন্দ্যোপাধ্যায়, [illegible] মল্লিক কালিদাস রায় যতীন দাশগুপ্ত, বিভূতিভূষণ গুপ্ত, হরেন্দ্রনাথ সিংহ, বিপুল বন্দ্যোপাধ্যায়, মাধব মজুমদার, মীরাটলাল, নন্দগোপাল সেনগুপ্ত, নিরঞ্জন সেনগুপ্ত এবং আরো অনেকে।

তরুণিমা—সম্পাদক: হরিদাস ঘোষ। ৪০।১, বনমালি সরকার স্ট্রীট। কলকাতা—৫। দাম আড়াই টাকা।

●

বাংলাদেশ থেকে প্রকাশিত পত্রপত্রিকার মধ্যে বেঙ্গলি লিটারেচর নিজস্ব বৈশিষ্ট্যে উজ্জ্বল। বাংলা সাহিত্যকে অবাঙালীদের কাছে পরিচিত করবার যে গুরুদায়িত্ব এ'রা নিয়েছেন তা সুষ্ঠুভাবেই পালন করছেন পত্রিকাগোষ্ঠী। সম্প্রতি প্রকাশিত হয়েছে এ'দের শারদ সংখ্যাটি। সুনির্বাচিত গল্প, কবিতা, প্রবন্ধ ও আলোচনার সমাবেশে পত্রিকাটি এককথায় স্বতন্ত্র মর্যাদার অধিকারী। এ সংখ্যায় রবীন্দ্রনাথ সুধীন্দ্রনাথ দত্ত আর প্রেমেন্দ্র মিত্রের আলোচনা তিনটি পত্রিকার গৌরব বৃদ্ধি করেছে। অমিয় চক্রবর্তী, বুদ্ধদেব বসু, সুভাষ মুখোপাধ্যায়, অরুণ ভট্টাচার্য, নরেশ গুহ, আল মাহমুদ, কেতকী কুশারী, ডাইসন, নরেন্দ্রনাথ মিত্র, বিমল কর, সন্তোষকান্ত গুহ, অন্নদাশংকর রায়, বিষ্ণু দে, বীরেন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, নীরেন্দ্রনাথ চক্রবর্তী, অতীন্দ্র মজুমদার, জগন্নাথ চক্রবর্তী, রঞ্জিত সিংহ, সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়, মৃণাল দত্ত, আশিস সান্যাল প্রমুখ বাঙালীদের লেখা ছাড়াও রয়েছে সোভিয়েট রাশিয়া, কানাডা, অস্ট্রেলিয়া, উগান্ডা ও কয়েকজন অবাঙালীর কবিতা। মণীন্দ্র রায়ের দীর্ঘ কবিতা মোহিনী আড়ালের অনুবাদটি এ সংখ্যার বিশেষ আকর্ষণ। ছাপা, বাঁধাই ও সম্পাদনা সব কিছুই উন্নতমানের।

বেঙ্গলি লিটারেচর: সম্পাদক আশিস সান্যাল। ৫৩ বিধান পল্লী, কলকাতা—৩২।

●

তরুণতম কবিদের মুখপত্র হিসেবে 'সাম্প্রতিক' মোটামুটি পরিচিত। সুনির্বাচিত কবিতা প্রকাশে এই ছোট কাগজটির বৈশিষ্ট্য সহজেই চোখে পড়ে। বর্তমান সংখ্যায় লিখেছেন পবিত্র মুখোপাধ্যায়, গণেশ বসু, শিবেন চট্টোপাধ্যায় শংকর দে, অনন্ত দাশ, সুনীল মজুমদার, শৈবাল চট্টোপাধ্যায়, কাননকুমার ভৌমিক, প্রভাত চৌধুরী, চঞ্চল ভট্টাচার্য, চণ্ডীচরণ মণ্ডল, অঞ্জন কর এবং আরো অনেকে।

সাম্প্রতিক: সম্পাদনা কাননকুমার ভৌমিক। ৪২বি প্রিয়নাথ মল্লিক রোড, কলকাতা—২৬।

●

'সাহিত্য ও সংস্কৃতি' গবেষণামূলক প্রবন্ধের ত্রৈমাসিক পত্রিকা। বর্তমান শারদীয় সংখ্যায় লিখেছেন আশুতোষ ভট্টাচার্য (পশ্চিম বাংলায় লোকসংস্কৃতি), দিলীপকুমার মুখোপাধ্যায় (সুদর্শন ও ওথবর্তী), বিমলকুমার দত্ত (ভারত শিল্পে মিথুন মূর্তি), প্রভাসচন্দ্র চৌধুরী, তারকনাথ ঘোষ (কবি মোহিতলাল), হিমাংশুভূষণ মুখোপাধ্যায়, অমিয়কুমার সেন (মহাকবি হরিচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়), জীবন বন্দ্যোপাধ্যায়

(গ্রন্থ তরুণ : জন অসবোর্ন), উজ্জ্বলকুমার মজুমদার (উনিশ শতকের বাংলা অনুবাদ সাহিত্য), হিরণ্ময় বন্দ্যোপাধ্যায়, অসিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়, বীরেন্দ্রচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়, রথীন্দ্রনাথ রায় (বিধবার একাদশী : শতবর্ষের নাটক), সুখময় মুখোপাধ্যায়, দেবকুমার চক্রবর্তী (জৈন শিল্পকলার মাধ্যমে ধর্মীয় সমন্বয়), দীপেন্দু চক্রবর্তী, কল্পিতা সিংহ, ত্রিভঙ্গ রায় এবং দেবকুমার চক্রবর্তী।

সাহিত্য ও সংস্কৃতি (শারদীয় সংখ্যা)—সম্পাদক : সঞ্জীবকুমার বসু। ১০ হেস্টিংস স্ট্রীট, কলকাতা—১। দাম দু টাকা পঞ্চাশ পয়সা।

●

'লেখা ও রেখা'র অন্যতম বৈশিষ্ট্য এদের গ্রন্থ-সমালোচনা। একসময় পরিচয় পত্রিকায় গ্রন্থ-সমালোচনা একটি ঐতিহ্যের সৃষ্টি করেছিল। তাদের সেই ধারা অক্ষুন্ন থাকেনি। 'লেখা ও রেখা'র মধ্যে তার পরিচয় পাওয়া গেল। বর্তমান সংখ্যায় গ্রন্থ-সমালোচনা করেছেন অরবিন্দ পোদ্দার, কৃষ্ণ ধর, গৌরাঙ্গ ভৌমিক, সত্য গুহ, সুশান্ত বসু, জগন্নাথ চক্রবর্তী, অমিতাভ দাশগুপ্ত, ধনঞ্জয় দাস এবং শুদ্ধসত্ত্ব বসু। প্রবন্ধ লিখেছেন—প্রফুল্লকুমার দাশগুপ্ত, নন্দগোপাল সেনগুপ্ত, পল্লব সেনগুপ্ত এবং বিশ্বনাথ চট্টোপাধ্যায়। কবিতা এবং গল্প লিখেছেন—সঞ্জয় ভট্টাচার্য, বিমলচন্দ্র ঘোষ, সুশীল রায়, বিশ্ব বন্দ্যোপাধ্যায়, কিরণশঙ্কর সেনগুপ্ত, বীরেন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, অরুণ ভট্টাচার্য, রাম বসু, শংকর চট্টোপাধ্যায়, অরুণ সান্যাল, শংকরানন্দ মুখোপাধ্যায়, রত্নেশ্বর হাজরা, সত্যপ্রিয় ঘোষ, সৈয়দ মুস্তফা সিরাজ, চিত্ত ঘোষাল, বশীর আলহেলাল, অমল দাশগুপ্ত এবং আরো অনেকে।

লেখা ও রেখা—(শ্রাবণ-আশ্বিন ১৩৭৪)—সম্পাদক : ভাস্কর মুখোপাধ্যায়। অক্ষয় গ্রন্থাগার। শান্তিপুর। দাম দু'টাকা।

●

বাঙলাদেশে ছোটদের পত্রপত্রিকা ক্রমশ বাড়তির দিকে। মৌচাক, শুকতারা, শিশুসাথী, পাঠশালা, রংমশাল, সন্দেশ, রোশনাই, আগামী, ঝিলিমিলি, অনেকগুলি পুরোন ও নতুন শিশু ও কিশোর উপযোগী পত্রিকা বেশ জনপ্রিয় এবং সুপ্রতিষ্ঠিত। এই পত্রিকাগুলি থেকে যে বার্ষিক সংকলন প্রকাশিত হয়, সেগুলির আকর্ষণ কোন অংশে কম নয়। প্রবীণ নবীন লেখকদের বিচিত্র রচনায় এগুলি সমৃদ্ধ।

'আগামী' শারদীয় সংখ্যাটি লেখায়, ছবিতে এবং অংগসজ্জায় অভিনবত্ব লক্ষণীয়। হাসির গল্প, কবিতা, অ্যাডভেঞ্চার, উপকথা, গল্প, ছড়া, ম্যাজিক, ডিটেকটিভ গল্প, কিশোর বৈঠক, ভ্রমণ সব মিলিয়ে সুপাঠ্য রমণীয় সংকলন। লিখেছেন বিমল কর, মণীন্দ্র রায়, অতনু রায়চৌধুরী, কৃষ্ণ ধর, নৃপেন্দ্রকুমার বসু, সীতা বন্দ্যোপাধ্যায়, সুধীর করণ, খগেন্দ্রনাথ মিত্র, অধীর ঘটক, দেবব্রত ঘোষ, প্রদোষ রায়চৌধুরী, সুবীর চট্টোপাধ্যায়, খাজা আহমেদ আব্বাস, পার্থ বিশ্বাস, প্রণবকুমার বিশ্বাস, মিহির সেন, জ্যোতিভূষণ চাকী, এ সি সরকার, শক্তি চট্টোপাধ্যায়, কল্যাণী প্রামাণিক, তরুণ সান্যাল, দীপক ঘোষ, রবিশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়, সীতাংশুবিমল দাশগুপ্ত, অরিজিৎ, ধনঞ্জয় দাস, রাখাল বিশ্বাস, সুশীলকুমার গুপ্ত, অমিতা রায়, শঙ্কর চক্রবর্তী। ছবি এঁকেছেন নীতিশ মুখোপাধ্যায়, সুব্রত ত্রিপাঠী, সুনীল গুহ এবং পরিচয় গুপ্ত। পত্রিকা সম্পাদনায় সুরুচির পরিচয় সর্বত্র পরিব্যাপ্ত। বোর্ড বাঁধাই সুন্দর প্রচ্ছদ।

আগামী—সম্পাদক : কৃষ্ণা দত্ত ও প্রসূন বসু। ১৯ শরৎ ব্যানার্জি রোড। কলকাতা-২৯। দাম তিন টাকা।

●

ষোড়শ সংকলন 'কবিপত্রে' কবিতা লিখেছেন রাম বসু, অলোকরঞ্জন দাশগুপ্ত, দেবীপ্রসাদ বন্দ্যোপাধ্যায়, প্রণবেন্দু দাশগুপ্ত, রত্নেশ্বর হাজরা, গণেশ বসু, শিবেন চট্টোপাধ্যায়, অনন্ত দাশ, শান্তনু দাস, শংকর রায়, গৌরাঙ্গ ভৌমিক, রেবন্তকুমার চট্টোপাধ্যায়, অঞ্জন কর, অশোক দত্তচৌধুরী, কল্লোল মজুমদার এবং আরো কয়েকজন। একটি কাব্য-নাটক লিখেছেন তুষার চট্টোপাধ্যায়। আলোচনা করেছেন প্রভাত চৌধুরী, শৈবাল চট্টোপাধ্যায় এবং মানসকুমার ভৌমিক।

কবিপত্র—সম্পাদক : পবিত্র মুখোপাধ্যায় ও তুষার চট্টোপাধ্যায়। ১৯।৭, ঈশ্বর গাঙ্গুলী স্ট্রীট। কলকাতা—২৬। দাম এক টাকা।

●

'চিত্রাঙ্গদা'য় দুটি সম্পূর্ণ উপন্যাস লিখেছেন সলিল চৌধুরী ও কমল বন্দ্যোপাধ্যায়। প্রবন্ধ, গল্প, কবিতা, সিনেমা প্রভৃতি লিখেছেন প্রশান্তকুমার সেন, বিনয় ঘোষ, মহেন্দ্র গুপ্ত, পূর্ণচন্দ্র মুখোপাধ্যায়, বোধিসত্ত্ব, বেলা দেবী, পরিমল চক্রবর্তী, গোপাল ভৌমিক, জগদীশ ভট্টাচার্য, শান্ত দাস, রেখা দত্ত এবং আরো কয়েকজন। ইন্দ্র দুগারের রঙীন ছবিটি সুন্দর। সিনেমার অনেকগুলি ছবি আছে।

চিত্রাঙ্গদা—সম্পাদক : অজিতমোহন গুপ্ত। ৭২।১ কলেজ স্ট্রীট। কলকাতা-১২। দাম আড়াই টাকা।

●

শিল্প-সাহিত্য সমালোচনার ত্রৈমাসিক পত্রিকা বিচিত্রার শারদ সংকলনটি বেশ আকর্ষণীয় হয়েছে। কয়েকটি গল্প ও প্রবন্ধ বিশেষ উল্লেখযোগ্য। কার্ল মার্কসের ক্যাপিটাল গ্রন্থ প্রকাশের শতবার্ষিকী উপলক্ষে ফ্রেডারিক এঙ্গেলস-এর নিবন্ধটির বাংলা অনুবাদ প্রকাশিত হয়েছে। দেবপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায়ের দেহাত্মবাদ খণ্ডনে নানা প্রয়াস, সঞ্জীব চট্টোপাধ্যায়ের 'অকেজিয়ার বিচার'-এর এবং বাসুদেব বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'রাজসভায় ও সর্বোদয়' তিনটি প্রবন্ধের আলোচনা [illegible] যুক্তিপূর্ণ ও তথ্যনিষ্ঠ। তাছাড়া আরো কয়েকটি প্রবন্ধ আছে। কবিতা লিখেছেন মঙ্গলাচরণ চট্টোপাধ্যায়, বীরেন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, কিরণশঙ্কর সেনগুপ্ত, সুশীল রায়, রাম বসু, মানস রায়চৌধুরী, অরুণ ভট্টাচার্য, মণীন্দ্র রায়, রত্নেশ্বর হাজরা, শিবেন চট্টোপাধ্যায়, গোবিন্দ মুখোপাধ্যায়, শঙ্করানন্দ মুখোপাধ্যায় এবং আরো কয়েকজন। স্বরজিৎ বন্দ্যোপাধ্যায়, কুমারেশ ভট্টাচার্য অমিতাভ পোদ্দার, সুব্রত রাহা, সৌরেন মিত্র এবং জীবন ভৌমিক লিখেছেন গল্প। একটি পথ-নাটিকা 'টিঅার গ্যাস' লিখেছেন বিমল গুপ্ত।

বিচিত্রা—সম্পাদক : নলিনীকুমার চক্রবর্তী, সুব্রত রাহা ও জীবন ভৌমিক। ৬৫, তর্কসিদ্ধান্ত লেন। বালি হাওড়া। দাম দু'টাকা।

●

'বেদুইন-এর শারদীয় সংখ্যায় লিখেছেন কুমুদরঞ্জন মল্লিক, গোপাল ভৌমিক, কালিদাস রায়, কালীকিঙ্কর সেনগুপ্ত, আশুতোষ ভট্টাচার্য, কুমারেশ ঘোষ এবং আরো কয়েকজন।

বেদুইন—সম্পাদক : সত্যেন্দ্রনাথ জানা। তমলুক রাজবাটী। তমলুক। মেদিনীপুর। দাম একটাকা।

●

'শিবম্'-এর পূজা সংখ্যায় লিখেছেন অমূল্যপদ চট্টোপাধ্যায় (শক্তিপূজা), হিরণ্ময় বন্দ্যোপাধ্যায় (ভগিনী নিবেদিতা), রমা চৌধুরী, হরিপদ চক্রবর্তী, অবধূত, শঙ্করনাথ রায়, বটুকনাথ ভট্টাচার্য, সুধীন্দ্রনারায়ণ রায়চৌধুরী, মহামণ্ডলেশ্বর স্বামী স্বতন্ত্রানন্দ গিরি মহারাজ এবং আরো কয়েকজন। সংখ্যাটি সংগ্রহ করার মত।

শিবম্—সম্পাদক : শচীন্দ্রকুমার ভট্টাচার্য ও কেদারনাথ চট্টোপাধ্যায়। ১ মহেশ চৌধুরী লেন। কলকাতা—২৫। দাম এক টাকা পঞ্চাশ পয়সা।

●

নতুন সাহিত্য পত্রিকা 'সৌম্য' তার প্রথম আবির্ভাবেই যে মননশীল পাঠকদের দৃষ্টি আকর্ষণ করবে তা বলাই বাহুল্য। এ সংখ্যায় লিখেছেন কালিদাস রায়, কৃষ্ণ ধর, আলোক সরকার, শংকর চট্টোপাধ্যায়, বোম্মানা বিশ্বনাথম, সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়, অমিল দে, বি দেবনাথ, রবীন সরকার, ভুপেন হাজারিকা, সবিতাব্রত দত্ত, নন্দগোপাল সেনগুপ্ত, হরিনারায়ণ চট্টোপাধ্যায়, রেবতীভূষণ ঘোষ ও আরো অনেকে।

সৌম্য : সম্পাদক অরুণকুমার চৌধুরী ও মনীষ রায়। ৭৪, ইন্দ্ররায় রোড, কলকাতা—৩৩।

বছরটা মনে আছে—১৯২৬; সময়টাও—জুন মাসের মাঝামাঝি, ১লা কি ২রা আষাঢ় হবে। গরমের ছুটি শেষ হয়ে আসছে, আর কটা দিন পরেই ইস্কুল খোলার কথা। মাত্র একশ'টি টাকা সম্বল করে বাড়ি থেকে পালিয়েছিলুম।

কেন পালিয়েছিলুম সেকথা এখন থাক। পালাবার মতো আপাত কোন কারণ ঘটেনি। লেখাপড়ায় যে ঠিক অতটা বীতরাগ ছিল, তাও নয়। যাবার আগে এর অন্ধকার দিকগুলো ভেবে দেখতে পারতুম। অনেককেই এমন পালিয়ে আবার ফিরে আসতেও দেখেছি 'কালামুখ নীলে করে'। বহু গল্পেও পড়েছি এমনি পালানোর অবশ্যম্ভাবী ও শোচনীয় ফলাফলের কথা। নিজে তখনও পর্যন্ত একটা পাসও দিতে পারিনি, মাত্র ফার্স্ট ক্লাস চলছে তখন, সুতরাং বিদ্যে-বুদ্ধিরও এমন জোর নেই যে কোথাও গিয়ে চাকরি-বাকরি জুটিয়ে নেব। তবু যে পালালুম সে নেহাৎ দুর্মতি বলতে হবে; দুর্দৈবও—নইলে অমন মতিই বা হবে কেন?

কেন পালাব সে সম্বন্ধে ধারণাটা কিছু ঝাপসা থাকলেও কোথায় পালাব সেটা ঠিক ছিল প্রথম থেকেই। অবশ্যাই দিল্লী। দিল্লী ছাড়া অন্য কোথাও যাবার কথা চিন্তাই করিনি। রাজধানী জায়গা যদি কিছু করে খেতে হয় তো সেখানেই সুবিধা, আর দেশ-ভুঁই থেকেও বহু দূর। সেখানে কেউ চিনবে না, সামান্য কোন চাকরি—এমন কি ফেরি-ওয়ালার কাজ করতেও বাধবে না।...

অন্তত সেই রকমই বুঝিয়েছিলুম নিজেকে। আসল কারণটা অন্য—সেটা আজ বুঝি। ছোটবেলা থেকেই ঐতিহাসিক নাটক আর উপন্যাসে ঝোঁক। এমন কি স্কুল-কলেজ পাঠ্য ইতিহাসের বইও বাদ দিইনি। পড়েছিও বিস্তর, এই বয়সেই নাটক-নভেলের শ্রাদ্ধ করেছি বলতে গেলে। তার ফলে দিল্লী আমার কাছে শুধুমাত্র একটা বড় শহর ছিল না, দিল্লী আমার কাছে জীবন্ত ইতিহাস, বিচিত্ররূপিণী, বিচিত্রবর্ণা। বহু ইতিকথা ও রূপকথায় গড়া তার দেহ। সে দেহে বহু কাহিনী কিংবদন্তীর ওড়না। তার চোখে বহু ঐতিহাসিক নরনারীর বহু প্রণয়-বেদনার মোহাঞ্জন সুর্মা, অধরে বহু রাজাবাদশার সর্বনাশ-করা হাসি। যদি যেতেই হয় কোথাও কোন শহরে তো—দিল্লী ছাড়া কোথায় যাব?

দিল্লী অবশ্য আগেও গিয়েছিলুম এক-বার, মা ও দাদার সঙ্গে, সে দেখে আশ মেটেনি। নিজের মতো করে কল্পনা ও ইতিহাসে মিলিয়ে স্মৃতির রঙে রাঙিয়ে দেখা হয়নি। ভবিষ্যৎ বাজে কথা, সে যা হয় হবে—ভাল করে দেখার টানেই গিয়ে পড়ে-ছিলুম। কিন্তু সে টানটা ছিল যতক্ষণ বাড়ি থেকে বেরুইনি ততক্ষণই। গাড়িতে চড়ার পরই টাকা-আনা-পাইয়ের হিসেবটা তার স্থূল বাস্তব চেহারা নিয়ে সামনে এসে দাঁড়াল। অভাব অনটনের সংসার, দাদা সবে চাকরিতে ঢুকেছেন—ষাটটি টাকা মাইনে পান, এই একশ'টি টাকাই সংগ্রহ করতে হয়েছে অনেক কাণ্ড ক'রে এক মাসিমার কাছ থেকে—এবং বলাইবাহুল্য বেশ খানিকটা মিথ্যার সাহায্যে। অতিরিক্ত আর কিছুই আনা সম্ভব হয়নি, বরং বাড়ি থেকে বেরিয়ে স্টেশনে আসবার পথেই ঐ একশ' টাকা থেকে খরচ শুরু হয়ে গেছে।

সেকালে একশ' টাকার মূল্য এখনকার থেকে ঢের বেশী ছিল; তবু একশ' টাকা যে মোটে একশ'টি টাকাই, কোনমতেই তার বেশী নয় এবং এক টাকাতে ষোল আনার বেশী কিছুতেই পাওয়া যায় না—এ জ্ঞান পুঁথি-পত্রে যতই যা থাক এমন করে এর আগে কখনও বুঝিনি। আরও একটা দিব্যজ্ঞান হল এই যাত্রায়—পৃথিবীতে টাকা না ফেললে কিছুই পাওয়া যায় না। যে সামান্য একটা কাজ করে সেও পারিশ্রমিক চায়, এক মুঠো চিনেবাদাম যে দেয় সেও তার বিনিময়ে একটা পয়সা আশা করে। এমন কি এক্কাওয়ালা বা টাঙ্গাওয়ালারা যখন সরকারী নির্দিষ্ট সওয়ারী নেবার পরও কাউকে গাড়িতে তোলে তখনও তারা পয়সাই প্রত্যাশা করে, পরোপকারের কথা ভাবতে পারে না।

সুতরাং সেই অগণিত রোম্যান্সে ভরা ইতিহাসের মোহিনী দিল্লী শহরের মাটিতে পা দেবার বহু পূর্বেই কোন্ মানসদিগন্তে মিলিয়ে গেল—তার রঙীন ওড়নার ফুঁপিটুকুও চোখে পড়ল না। যে লালকেল্লার কথা মনে হলেই সর্বাঙ্গে রোমাঞ্চ হত, সেই অদৃষ্টদেবতার বহু নাটকের অভিনয়মণ্ডিত লালকেল্লার পাষাণপ্রাঙ্গণের থেকে নব-নির্মিত ঐতিহ্যহীন সেক্রেটারিয়েটের অলিন্দ বেশী আকর্ষক বলে বোধ হল।

কিন্তু হায়! হায় রে রাজধানী কঠিন কায়া! পাষাণমুঠি তলে শুধু মাত্র ব্যাকুলা বালিকাদেরই চাপে না সে, আমার মতো অর্বাচীন ভাগ্যান্বেষীদেরও নিষ্পেষিত ক'রে তাদের সমস্ত আশা-আকাঙ্ক্ষা ভবিষ্যতের রঙীন স্বপ্ন গুঁড়িয়ে রেণু রেণু ক'রে দেয়। বরং সেক্ষেত্রে আরও কঠোর, আরও নির্মম সে।

না, কিছুই হল না এ শহরে। কোথাও কিছু জীবিকার উপায় দেখা গেল না, প্রবাসী বাঙালীদের কাছে স্বদেশবাসী কিছুটা প্রশ্রয় পাবে এই ভরসায় যেসব বড় বড় 'অফ্‌সার'দের সঙ্গে দেখা করলুম—তাঁরা উচ্চাঙ্গের হাসি হাসলেন। তাঁদেরও দোষ দেওয়া যায় না। এমন কি সেদিনও দিতে পারিনি। প্রতি মাসেই এমন আট-দশটি ছেলে আসছে 'বাড়ি থেকে পালিয়ে'—যা-হোক কিছু একটার আশায়। চাকরি এত সস্তা নয়—তার নিয়ম কানুন আছে। এমন কি বেয়ারার চাকরি দেওয়াও আগের মতো বাবুদের ইচ্ছাধীন নেই। আর এত বেয়ারার চাকরিই বা কোথায়? বুদ্ধিদীপ্ত উজ্জ্বল চেহারা দেখে এবং স্মার্ট কথাবার্তা শুনে

দু'একটি ছেলেকে তাঁরা কিছু কিছু আর্থিক সাহায্য করে ব্যবসায়ে লাগাবার চেষ্টা করেছেন,—বলাবাহুল্য, একজনও তাদের মধ্যে থেপে টেঁকেনি। কেউ কেউ তো রুল অর্থ 'প্রাপ্তিমাত্রেই' সরে পড়েছে। একথা শুধু ও'দের মুখে নয়, স্থানীয় অন্য বাঙালীদের মুখেও শুনেছিলাম।

কিন্তু তাদের কথা বা ও'দের কথা ভাববার সময় নয় তখন। চাচা নিজের প্রাণ বাঁচানোর সমস্যাই প্রবল। শুধুই সস্তার আমল সেটা, এখনকার ছেলেমেয়েরা ভাবতেই পারবে না সেদিনের অবিশ্বাস্য সুলভতার কথা, তবু ষোল আনা ষোল আনাই, পাঁচসিকে নয়। একশ' টাকাটা যখন প্রায় দশ টাকায় দাঁড়াল তখন চোখে অন্ধকার দেখলুম। এতদিন—যাত্রার পরিকল্পনা থেকেই চিন্তা ছিল কেমন করে পরিচিত লোকদের পরিহার করে চলব, এখন ভাবতে বসলুম, কাছাকাছি কোথাও কোন পরিচিত লোক আছে কিনা। আপৎকালে বুদ্ধিও যায় গুলিয়ে। সে সময় আত্মীয় বা পরিচিত কারও কথাও মনে পড়ল না, অথচ ছেলেবেলা থেকে তো কতবারই কত লোকের মুখে শুনেছি, 'অমুকের অমুক দিল্লীতে থাকে', 'অমুক এখন মীরাটে'। ইত্যাদি—

অনেক চিন্তার পর, সেই গোনা দশটি টাকা থেকে আরও দু-তিনটি টাকা খরচ হয়ে গেলে মনে হ'ল—এক উপায় আছে বৃন্দাবনে গিয়ে পড়া। মা-দাদাকে চিনি, চিঠি লিখলেই যে তাঁরা ব্রস্তে-ব্যস্তে গাড়ি-ভাড়ার টাকা পাঠাবেন তা নয়, আর পাঠালেও সে টাকা আসতে আসতে পাঁচছ দিন কেটে যাবে, ততদিন দাঁড়াব কোথায়? কোন্ ঠিকানাতেই বা টাকা পাঠাতে বলব? সুতরাং এখন একমাত্র উপায় কোনমতে গাড়ি ভাড়ার টাকাটা সংগ্রহ করে বাড়ি ফিরে যাওয়া এবং মাথা হেঁট করে গিয়ে দাঁড়ানো। এখন সেই টাকাটা সংগ্রহ করাই বড় সমস্যা। মনে পড়ল বছর দুই আগে যখন মার সঙ্গে বৃন্দাবন আসি তখন ওখানকার ব্রজবাসী বা পান্ডার সঙ্গে খুব মাখামাখি হয়েছিল। সেই সময়ই শুনেছিলাম আপদে-বিপদে এইসব পান্ডারা যজমানযাত্রীদের প্রচুর টাকা ধার দেন—তীর্থের ঋণ কেউ মারবে না এই ভরসায়। আমার মাকেই সে কথা বহুবার বলেছেন আমাদের কাশীরাম ব্রজবাসী, 'মাজী আমি হাপনার ছালিয়া— হাপনার যা দরকার হবে বলিবেন। কাপড়-চোপড় লোই-উই যা দরকার কিনিয়া লেন, টাকার কথা কুছ চিন্তা করিবেন না।' মার অবশ্য দরকার হয়নি—বরং তিনিই অনেক টাকা দিয়ে গিয়েছিলেন, সাধ্যের অতীত তাঁর—চড়া সুদে টাকা ধার করে তীর্থে গিয়েছিলেন সেকথা মনে না রেখেই। যাইহোক—সেটাও কি মনে থাকবে না ব্রজবাসীর? সেক্ষেত্রে সেই মা-জীর আপন 'ছালিয়া'কে দশ বারো টাকা ধার দিতে তাঁর আপত্তি হবে না নিশ্চয়ই।

কথাটা যত ভাবলুম তত তার উজ্জ্বল দিকগুলোই চোখে পড়তে লাগল, সেটা যে আপন গরজেই দেখছি—অর্থাৎ অন্য কোথাও বলেছিলাম না পেলেই যজমান ব্যক্তির মতো ব্রজবাসকেই সুবৃহৎ কাণ্ড ভাবছি—তা একবারও মনে পড়ল না। অতএব আর কাল-বিলম্ব না করে বৃন্দাবনেই রওনা হয়ে গেলুম এবং ট্রেন ও একায় আরও কিছু অর্থ ব্যয় করে একদা এক সন্ধ্যায় পুরনো শহরের মণিরাজপাড়ায় আমাদের ব্রজবাসীর বাড়ি পৌঁছলুম। তখন সম্বল মাত্র আড়াইটি টাকা।

গত দু'দিন ধরে পান্ডাজীর টাকাটা দেওয়া না দেওয়ার প্রশ্নটাই চিন্তা করেছি, কিন্তু তিনি যে বৃন্দাবনে না থাকতে পারেন এমন সম্ভাবনা আদৌ মনে পড়েনি। সেই সন্ধ্যা সাড়ে সাতটার নিশুতি রাত্রে অনেক ডাকাডাকির পর পান্ডানী উঠে দোর খুলে দিয়ে যখন খবরটি শোনালেন তখন হঠাৎ মনে হল বুকে-পিঠে কে খানিকটা বরফ চেপে ধরল। অথচ কথাটা মনে পড়া খুবই উচিত ছিল। এই সময় এ'রা অনেকেই বাংলা দেশে যান ঝুলনের যাত্রী সংগ্রহ করতে—সেকথা বহুবার শুনেছি। গত বছর আমাদের বাড়িও গিয়েছিলেন ব্রজবাসী ঠাকুর। শুধু আর কোন উপায় ছিল না বলেই বোধকরি কথাটা মনে করতে চাইনি।

যাই হোক—সৌভাগ্যক্রমে ব্রজবাসিনী চিনতে পারলেন, যদিচ সঙ্গে বিশেষ মালপত্র নেই দেখে ঈষৎ সন্দিগ্ধ দৃষ্টিতে বারবার আমার হাতের ছোট্ট খবরের কাগজে মোড়া পুলিন্দাটার দিকে তাকাতে লাগলেন। তা তাকান—সেজন্য সে রাত্রের মতো অন্তত আতিথেয়তার কোন ত্রুটি ঘটল না। তখনই চুলায় কাঠ ধরিয়ে ঘরের-তৈরী-ঘিয়ে ভাজা উপাদেয় বোজারের* পরোটা এবং মুগেরীর অর্থাৎ মশলাদার মুগের ডালের বড়ির তরকারী বানিয়ে দিলেন। শেষ পাতে আচারও পড়ল একটু এবং এত রাত্রে দোকান সব বন্ধ হয়ে গেছে বলে আধা পোয়া রাবড়ি কি মালাই আনিয়ে দিতে পারলেন না (মূল্যে দু' পয়সা) বলে বারবার আপসোস করতে লাগলেন। অতঃপর বাইরের উঠোনে একটা খাটিয়াও পড়ল এবং তৈল-মলিন একটা শয্যাও পাওয়া গেল রাতটুকুর মতো।

কিন্তু পরের দিন সকালে গৃহজাত মাঠা এক লোটা পান করার পর যখন আসল কাজের কথা পাড়লুম, তখন এক নিমেষে তাঁর অমন রমণীয় মুখখানি কুলিশ-কঠোর হয়ে উঠল। তিনি দ্ব্যর্থহীন ভাষায় জানিয়ে দিলেন যে ব্রজবাসী ঠাকুর আজ পনেরো-কুড়িদিন বাড়ি ছাড়া। যাবার সময় নগদ এক পয়সাও রেখে যাননি খরচার মতো—সমস্তই 'উধার' করে চালাতে হচ্ছে, এক্ষেত্রে রুপেয়া-পৈশা তিনি কিছুই দিতে পারবেন না। এবং আরও জানালেন যে যেহেতু বাড়িতে আর কোন পুরুষ নেই, তাঁর লড়কা এই সবে আঠের এক বছরের, সেহেতু আমার পক্ষে সেখানে থাকাটাও খুব শোভন নয়। একবেলাটা তিনি দয়া ক'রে থাকতে দিতে পারেন—বিকেলের মধ্যে যেন অন্য কোথাও আমি নিজের ব্যবস্থা করে নিই।

* সম পরিমাণ গম ও ছোলায় আটা।

কথাটা কিন্তু অসঙ্গতিহীন নয়, ব্রজবাসিনীর বয়স ত্রিশই অল্প এবং যদিও আমার তখন মাত্র সতেরো বছর বয়স তবু আমার যা দৈহিক গঠন তাতে দেখলে 'মিনসে' মনে হওয়াই স্বাভাবিক। কিন্তু তখন অবস্থায় একটা প্রবল অভিমান বোধ করলুম ও'র কথাতে, এটাকে রীতিমতো অকৃতজ্ঞতা বলেই মনে হ'ল। বেশ একটু চোটপাট করে মনের সাধ মিটিয়ে 'নিমকহারাম' 'বেইমান' প্রভৃতি বিশেষণে বিশেষিত ক'রে সেই অদ্বিতীয় পুলিন্দাটি নিয়ে সে স্থান ত্যাগ করলুম।

অর্থাৎ আবারও একটি বিরাট আহাম্মুকি ক'রে বসলুম। যার সম্বল পকেটে কমবেশি আড়াইটি টাকা, একটি বাড়তি ধুতি, একটি গামছা এবং একটি বোম্বাই চাদর—সঙ্গে যার একটা বিছানা পর্যন্ত নেই বা বেচবার মতো একটা আংটি কি ফাউন্টেন পেন—তার এতটা মেজাজ দেখানো উচিত হয়নি। একবেলা একবেলাই লাভ, তাছাড়া সারাদিন সময় পেলে অবস্থাটা বুঝিয়ে বলে মনটা নরম করা যেত খানিক, অন্তত ও'র ঠিকানায় টাকাটা আনাবার ব্যবস্থা করা যেত। চাইকি একটা বিছানা ধার ক'রে নিয়ে কোন ধর্মশালাতেও ওঠা যেত। তিনচার দিনের জন্য নিশ্চিন্ত আশ্রয়। ধর্মশালা একাধিক আছে, বদলে বদলেও দিন পনেরো কাটানো যায়। সেখানে থেকে ও'র কাছে খেয়ে কটা দিন যাকে বলে 'কাদায় গুণ ফেলে' কাটানো যেতে পারত। ততদিন বাড়ির টাকা না আসুক—ব্রজবাসী এসে পড়তে পারতেন।

কিন্তু এসব কিছুই করা হ'ল না। হ'ল যেটা—সারাদিন টো-টো ক'রে ঘোরা। এই মন্দির ও মন্দির—খানিকটা বা যমুনার ধার খানিকটা বা স্টেশনের দিক। এক পয়সার ছোলা ভাজা ছাড়া ভরসা ক'রে কিছু কিনে খেতে পারলুম না। একবার মনে হ'ল মাধুকরী শুরু ক'রে দিই কুঞ্জে কুঞ্জে—কিন্তু পরক্ষণেই সে চিন্তা ত্যাগ করলুম, এই চেহারায় ভদ্র জামা-কাপড় পড়ে গিয়ে 'জয়রাধে' বলে সিকিখানা কি আধখানা রুটি ভিক্ষে পাওয়া যায় না। চাইলেও কুঞ্জস্বামীরা দেবে না—তার বদলে পুলিশ ডাকবে। গোবিন্দ মন্দিরে গিয়ে মনে হ'ল কামদারের কাছে কিছু প্রসাদ ভিক্ষা করি—কিন্তু কেমন যেন শেষ মুহূর্তে গলায় আটকে গেল কথাগুলো। শেষে যখন সেই দুঃসহ গ্রীষ্মের অপরাহ্ণও ম্লান হয়ে এল তখন আর ঘুরে বেড়াবারও শক্তি রইল না, তখন মনে হ'তে লাগল এই মুহূর্তে মরে যাবার মতো সুখ আর কিছুতে নেই—মৃত্যুই সর্বাধিক শ্রেয় বোধ হ'তে লাগল।

সবচেয়ে যেটা চিন্তা এখন—আশ্রয়ের। এ অবস্থায় কোন ধর্মশালায় ঢুকতে দেবে না, 'সামান কাঁহা' প্রশ্ন করে চৌকিদাররা সন্দিগ্ধ দৃষ্টিতে তাকাবে—চুরি গেছে বললেও বিশ্বাস করবে না। এখন দাঁড়াই কোথায়? এখানে সন্ধ্যায় পরই ভোগ লেগে যায়, রাত নটা না বাজতে বাজতে নিশুতি হয়ে আসে শহর—তারপর? ঘুরে বেড়ালেও তো পুলিশ ধরবে? অভাবে দুঃখে মানুষ

হয়েছি, তবু মাথার ওপর অভিভাবকরা ছিলেন—ঠিক নিজেকে কখনও এমন অসহায় অবস্থায় পড়তে হয়নি, চোখে অন্ধকার দেখা বলতে কি বোঝায় তাও এ পর্যন্ত অনুভব করিনি। বাড়ি থেকে বেরিয়ে বাসবারই যা খাচ্ছি তবু এতদিন ঠিক এ অবস্থা হয়নি—আজ এই প্রথম চোখ ফেটে জল বেরিয়ে এল।

গোপীনাথের ঘেরা থেকে বেরিয়ে তখন পা দুটোকে টেনে টেনে লালাবাবুর মন্দিরের দিকে চলেছিলুম, লালাবাবুর মন্দির বলে নয়, এমনি উদ্দেশ্যহীনভাবেই এদিকে ফিরেছিলুম মাত্র—চলতে হবে বলেই চলা, বসবার জায়গার অভাবে—অকস্মাৎ এইভাবে বিনা প্রস্তুতিতে চোখের জল উপচে বেরিয়ে পড়ায় দারুণ বিব্রত বোধ করলুম। তখনও দিনের আলো কিছুটা আছে, গ্রীষ্মের গোধূলি এসব দেশে দীর্ঘস্থায়ী—রাস্তাতে লোকজনের চলাচলও যথেষ্ট, যমুনাপুলিন বা গোপেশ্বর থেকে, কি কৃষ্ণচন্দ্রের দর্শন সেরে গোবিন্দ গোপীনাথ—যেদিকে যাক্ যাবার এইটেই প্রধান রাস্তা, এদিকেই কিশোরীলাল ঠাকুরের সমাধি, রাধা গোপালের ভাঙা মন্দির, এদিকেই ঐ মস্ত [illegible] চত্বরে বিরাট বড়ো পুকুর—রাধাকুণ্ড। সুতরাং লোকজন তো থাকবেই। তারা একটা ধুতি-পাঞ্জাবি পরা জোয়ান ছেলের চোখে জল দেখলে কী ভাববে, কোন মন্দিরে দেখলেও বা কথা ছিল, ভক্তি-অশ্রু বলে চালানো যেত।
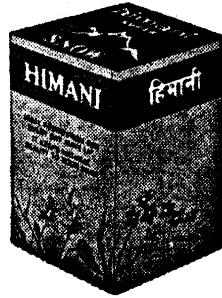
এ না জানি কত কী ব্যাখ্যা করবে—ভেবে জেরা করাও অস্বাভাবিক নয়।

কেউ দেখুক না দেখুক, সে মুহূর্তে আমার মনে হল বিশ্বের সমস্ত লোক কৌতূহলী হয়ে আমার এই চোখের জলের দিকে সন্দিগ্ধ দৃষ্টিতে তাকিয়ে আছে। আমি যেন দিশাহারা হয়ে গেলুম লজ্জায় সংকোচে, আর ঠিক সেই মুহূর্তেই চোখে পড়ল বাঁহাতি একটা দোতালা বাড়ির সদর দরজা খোলা, তার দীর্ঘ অন্ধকার গলিপথ ভেদ ক'রে দেখা যাচ্ছে—দূরে টিম টিম করছে রাধাকৃষ্ণের একটি ছোট যুগল মূর্তি। অর্থাৎ এটাও কোন মন্দির বা কুঞ্জ।

আঃ, আমি যেন বেঁচে গেলুম। আর কিছু না হোক, ঠাকুরকে ভূমিষ্ঠ প্রণাম করার ছলে চোখের জলটা তো ঢাকতে পারব, ওখানে যদি কেউ থাকেও—পূজারী প্রভৃতি—আবছা আলোতে তারা অতটা বুঝতে পারবে না। একবার প্রণামটা সারতে পারলে কোন ভাবনা নেই, সাত খুন মাপ, চোখ মুছলেও কেউ সন্দেহ করবে না, বড় জোর ভক্তির আতিশয্য ভাববে। আর দ্বিধা করলুম না, করার সময়ও ছিল না, অবাধ্য চোখের জলটা বেরিয়েই চলেছে, কোনমতে বাগ মানাতে পারছি না—তাড়াতাড়ি মাথাটা হেঁট ক'রে যেন ব্যস্তসমস্ত ভাবে ঢুকে পড়লুম মন্দিরের মধ্যে।

বাড়িটা মনে হ'ল দোমহলা, বাইরের দিকে একটা পুরো একমহল বাড়ি, তার পাশ দিয়ে এই চলন—সেই অনুপাতে দীর্ঘ, চলন পেরিয়ে গেলে সামান্য একটু উঠোন, দু' একটা ফুলের গাছও আছে বোধহয়, সামনেটা কিন্তু বাঁধানো—একটি ছোট তুলসী ও গোবর্ধন মঞ্চ,—তার ওদিকে মন্দির ও সম্ভবত একটা স্বতন্ত্র মহল—পাকের ঘর, ভাঁড়ার ঘর নিয়ে। সেটা অনুমান, এখান থেকে মন্দিরটিই মাত্র নজরে পড়ছে আর একরত্তি উঠোন ও তুলসীমঞ্চটুকু। দু' একটা সবুজ পাতার গাছপালার উপস্থিতি টের পাওয়া যাচ্ছে। এ ছাড়াও যে আর কিছু আছে তা বুঝতে পারিনি, আর কিছু যে থাকতে পারে বা থাকা উচিত তাও অত ভেবে দেখিনি—তাই নির্ভয়ে তাড়াতাড়ি এগিয়ে যাচ্ছিলুম, একমনে, বিগ্রহ লক্ষ্য করেই। ...বেশ খানিকটা গেছি, অন্ধকার চলনের একেবারে শেষ প্রান্তে গিয়ে পড়েছি—সামনেই দিবসের শেষ স্মৃতিমণ্ডিত আলো ও মুক্তি—এমন সময় পরিষ্কার বাংলায় কে বলে উঠল, 'কে র্যা? বলি কে আসছ গো, রোসো রোসো, ওমা আমি যে অংসাব্যস্ত। শোভারাম বুঝি খিল্লীটা দুয়ারিয়ে দিয়ে যায়নি; কৈ দোর খোলার সাড়া পাইনি তো!'

থেমে যাওয়াই উচিত ছিল—কারণ নারীকণ্ঠ যে তাতে কোন ভুল নেই—অতি মধুর নারীকণ্ঠ—কিন্তু আমার আর তখন থামবার উপায় ছিল না। একটা ঝোঁকের মাথায় এত জোরে এগিয়ে এসেছি যে তখন পায়ের একটা নিজস্ব বেগ তৈরী হয়ে গেছে—সে তখন আমার নিয়ন্ত্রণের বাইরে। ...তাই চেষ্টা করতে করতে করতেও চলন ছেড়ে ফাঁকা জায়গাটায় এসে পড়লুম আর সংগে সংগে এক অপরূপ দৃশ্য চোখে পড়ল। ওদিক থেকে দেখতে পাইনি—উঠোনের এই খাঁজে, বারবাড়ির সামনেই কুয়া, বাঁধানো বেশ বড় একটা কুয়াতলা ওপর সেইখানে—বোধকরি গা ধোবার জন্যই প্রস্তুত হয়ে একটি প্রবীণা মহিলা দাঁড়িয়ে আছেন; তাঁর পরনে একখানা পুরনো রংচটা জ্যালজেলে খাটো গামছা, বুকে হ্রস্বতর এবং বিবর্ণতর আর একখানি, হাতে একটি ঘটি। গামছা দুটিতে আর যাই হোক আব্রু রক্ষা হয়নি কিছুমাত্র, দেহটা যে আবৃত হয়েছে এমন বলা চলে না কিছুতেই। কিন্তু অপরূপ দৃশ্য বলতে আমি এ লজ্জাকর অবস্থা বোঝাতে চাইনি—অপরূপ ঐ মহিলাই। ও বয়সে তো আমি অমন কাউকে দেখিনি বটেই—পরবর্তী কালেও না। বয়স হয়েছে, মাথার চুল ধপধপ করছে সাদা, দাঁতও বেশির ভাগ নেই—মুখের চামড়াও কুঁচকে এসেছে সেই অনুপাতে। কিন্তু ঐ পর্যন্তই, বয়স বা জরাকে দেহের ঐটুকু অংশ দখল ক'রেই থেমে থাকতে হয়েছে, গলার নিচে নামতে পারেনি এখনও পর্যন্ত। বাকী যে দেহটা—সে যেন এখনও কোন অষ্টাদশী তরুণীর—গ্রীক ভাস্করের খোদাই করা মর্মর নারীমূর্তি—তেমনিই নিখুঁত, তেমনিই সুগোর। পরবর্তী কালে 'ভিনাস অফ মিলো'র ছবি দেখেছি, কিন্তু তারও গঠন বোধহয় এতটা ত্রুটিহীন সুন্দর নয়।...

কিছুকাল পূর্বের মানসিক আবেগ, দৈহিক শ্রান্তি, উপবাসজনিত অবসন্নতা—আর এখনকার এই সীমাহীন লজ্জা ও অপরাধবোধ এবং অপরিসীম বিস্ময়—সবটা জড়িয়ে কেমন যেন বিহ্বল করে ফেলল, না পারলুম এগোতে, না পারলুম পেছাতে—আর না পারলুম সময়োপযোগী কোন ক্ষমা-প্রার্থনা করতে। জড়ভরতের মতো জন্তুর মতো অবাক হয়ে ও'র দিকে চেয়েই দাঁড়িয়ে রইলুম।

চোখের নিমেষে আমার অবস্থাটা বুঝে নিলেন তিনি। বললেন, 'দর্শন করতে এসেছ তো? তা যাও না, এগিয়ে যাও না। ভগবানের মন্দির, দোর খোলা ছিল—ঢুকে পড়েছ, তাতে আর দোষ কি? আর এ তো দর্শনের সময়, দোর খুলে রাখাই তো উচিত এখন। আমার যে পোড়া পেটটা আবার—। অসময়ে তাই গা ধুতে নামা। নইলে ওপরেই আমি নাওয়া-ধোওয়া সারি, এখানের মতো তো নয়, আমরা কলকেতার মানুষ—আমাদের কলঘর একটা চাই, কল থাকুক আর না থাকুক! তা সে একদফা কাপড়কাচা গা ধোওয়া তো চুকে গেছে—এখন আর জল কোথায় পাবো? তোলা জল, সকাল বিকেল ওপরে পোঁছে দেয় এই ঢের, আর কি বলা যায়? তাই বলি কুয়াতলাতেই যাই, কেউ তো আসে না বড়একটা। তা এখানে এসে উবি মুখপুড়ীকে ডাকছি যদি এক ডোল জল তুলে গায়ে ঢেলে দেয়—তা দ্যাখো না, পোড়ার মেয়ে যে কোথায় গিয়ে বসে আছে—! ...এতক্ষণে কাজ সেরে আমি ওপরে চলে যেতে পারতুম!'

এতক্ষণে একটু সামলে নিতে পেরেছি। বাঙালীর মুখ দেখে বাঙলা কথা শুনে নিজেরও যেন কথা খুঁজে পেয়েছি। বললুম, 'মাপ করবেন আমি অতটা বুঝতে পারিনি—একটু গলা খ্যাঁকারি দিয়ে আসাই বোধহয় উচিত ছিল, এভাবে বাড়ির মধ্যে ঢুকে পড়াটা অন্যায় হয়ে গেছে—'

কথাটা আমাকে শেষ করতে দিলেন না ভদ্রমহিলা, বলে উঠলেন, 'তাতে কি হয়েছে, মন্দিরে ঢুকেছ তাতে আর তোমার দোষ কি! তা ছাড়া তুমি আমার ছেলে কেন—বোধ হচ্ছে নাতিরই বয়িসী—লজ্জাই বা কিসের এত! ...কিন্তু রোসো দিকি বাপু, তোমার গলাটা অমন শোনাচ্ছে কেন—?'.

বলতে বলতে এবং ওপরের দেহের আবরণ হিসেবে সেই সামান্য গামছাটুকুকে সামলাবার বৃথা চেষ্টা করতে করতে তিনি আরও দু' পা সামনে এগিয়ে এলেন—কুয়োতলার বাঁধানো বেড়টুকুর ধারে একেবারে। সেই সময় অকস্মাৎ কী এক কারণে সম্ভবত সূর্য আকাশের সর্ব পশ্চিম প্রান্তে পৌঁছনোর ফলে সামনের উঁচু সাদা দেওয়ালটা আলোকিত ক'রে থাকবে কিম্বা কোন সাদা মেঘের টুকরো রঙীন হয়ে উঠে কনে দেখানো আলোর সৃষ্টি করে থাকবে—আমার মুখের ওপর উজ্জ্বল লাল একটা আলোর আভা এসে পড়েছিল; তিনি ঈষৎ ভ্রূ কুঁচকে প্রাণপণ তীক্ষ্ণদৃষ্টিতে আমার মুখের দিকে চেয়ে বলে উঠলেন, 'ওমা তোমার যে চোখে জল! তাই গলাটা অমন ধরা ধরা—আমি বলি এ তো ঠান্ডা লাগার সময় নয়—গলাটা এমন শোনাচ্ছে কেন! মুখও তো শুকনো দেখছি, খাওয়া হয়নি বুঝি সারাদিন?... ব্যাপারটা কি বলো দিকি!'

তারপরই আপাদমস্তক আমাকে আর একবার দেখে নিয়ে বললেন, 'পোড়াকপাল, পা দুটোও যে কাঁপছে ঠকঠক করে। সারাদিন না খেয়ে ঘুরছ বুঝি টো টো করে! ...মরেছে, যা ভেবেছি তাই—বাড়ি থেকে পালিয়েছিলেন মন্দানি ক'রে, তারপর এখন হাতের পয়সাকড়ি ফক্কিকার হয়ে আতান্তরে পড়েছেন—'বল মা তারা দাঁড়াই কোথা!'... বুদ্ধি সব দ্যাখো না বাবুদের। এর নাম লেখাপড়া শিখেছেন সব। ছাই লেখাপড়া হচ্ছে, গুষ্টির পিণ্ডি হচ্ছে। এর চেয়ে আমরা যে বলতে গেলে ক অক্ষর গোমাংস—আমাদের ঘটে এর চেয়ে ঢের বেশী বুদ্ধি আছে। ...নাও, নাও, যাও এগিয়ে গিয়ে নাটমন্দিরে বসো গে, আমি এই একটা ডোল জল ঢেলে গিয়ে কাপড়টা ছেড়ে আসছি—'

চোখের জল মুছে নিশ্চিহ্ন করে ফেলারই কথা, অন্ধকার চলন দিয়ে আসতে আসতে কোঁচার খুঁটে মুছেও ফেলেছি বার কতক—উনি যা দেখেছেন তা জল নয় ভিজে চোখের পাতা—কিন্তু এবার আসল জলই বেরিয়ে এল আমার, সামান্য একটু প্রশ্রয় আর স্নেহের স্পর্শে। বরং দ্বিগুণ বেগে

বেরোতে লাগল। কোনমতেই সামলাতে পারলুম না। সেই লজ্জা ঢাকতে তাড়াতাড়ি কথা বলতে গেলুম. তা নিজের কানেই খাপছাড়া শোনাল, 'দিদি—আমি বড্ড—মানে আজকের রাতটা শুধু যদি—'

উনি এক ধমকে চুপ করিয়ে দিলেন, 'থামো, থামো! তোমাকে আর পান্ডিত্তি ফলাতে হবে না। ও আমি সব বুঝে নিয়েছি। যাও—যা বলছি, গিয়ে ওখানে বসো গে। তোমার ঐ অবস্থা নইলে তোমাকেই বলতুম দু' ডোল জল তুলে দিতে। ...না, না, ও তুমি পারবে না, এ তোমাদের দেশের পাতকো নয়—এ হ'ল গে ইঁদেরা—দেড়শ' দু'শ' হাত নিচে জল, আর এই ভারী লোহার ডোল—এ দিয়ে জল তোলা তোমাদের কলকেতার বাবুদের কম্ম নয়। দেখি আসবেই এখন—নইলে শোভারাম পুজুরীছেলে আছে—সে এসে পড়বে, এই পাড়াতেই আর এক জায়গায় কাজ করে আমার সইয়ের এক কুঞ্জ আছে সেইখেনে। চোপর রাত কি আর দাঁড়িয়ে থাকব! বলি অ উষা, উষি!... নিঘ্ঘাৎ মরেছে হারামজাদী, কোন যমালয়ে গিয়ে বসে আছে। বলি এলি—না কি আগে চোদ্দপুরুষকে নরকে পাঠাতে হবে তবে আসবি—!'

'না গো না—এসে গেছি। চোদ্দপুরুষে এখন থাক। আমাকে যমালয়ে পাঠিয়েছ উতেই হবে।' বলে হাসতে হাসতে ঠাকুরঘরের পাশ থেকে অপাত-অদৃশ্য কোন দ্বারপথে বেরিয়ে এল ছিপছিপে অল্পবয়সের একটি শ্যামবর্ণ মেয়ে—কপালে সরু উলকি, নাকে রসকলি গলায় কন্ঠী—কথায় স্পষ্ট মেদিনীপুরের টান—সম্ভবত দাসী শ্রেণীরই কেউ হবে। হঠাৎ আমাকে দেখে থমকে গেল, 'ওমা—এ আবার কে! কে গা—অমন জায়গায় দাঁড়িয়ে কেন? দর্শন করতে এসেছ, না মার কাছে কোন দরকার আছে?'

'তোর অত নিকেশে দরকার কি বাপু। ও আমার এক ভাই, এসেছে কলকাতা থেকে। যাও ভাই, লক্ষ্মীটি এখন ঐ ঠাকুরঘরের রকে একটু বসো গে, ঐ ওকেই আমরা নাটমন্দির বলি—কানাছেলের নাম পদ্মলোচন আর কি—। দে দিকি উষি, চট্ ক'রে দু' ডোল জল ঢেলে—শুদ্ধু হয়ে ওপরে উঠে যাই। সন্ধ্যের কাজ জপতপ সব বাকী, কখন কী হবে তা জানি না।... শোভারাম এলে বলবি ওর জন্যেও থান ছ-সাত টেক্‌রা বানাতে রাত্তিরে ও খাবে। আর এখন পেসাদী পেঁড়া আর ক্ষীরসা* যদি থাকে তো বার করে দে। নে, হাত চালা—সংয়ের মতো দাঁড়িয়ে থাকিসনি।'

॥ ২ ॥

অর্থাৎ আশ্রয় একটা মিলল। মাথার ওপরে আচ্ছাদন এবং ক্ষুধার অন্ন দুটো সমস্যারই সমাধান হয়ে গেল এক কথায়। একেবারে অপরিচিত পথের মানুষকে কেউ এমনভাবে যেচে আশ্রয় দেয়—তা কখনও কোন গল্প-উপন্যাসেও পড়িনি। অপর কেউ বললে বিশ্বাস করতুম না। আশ্রয় বলতে যা সাধারণত বোঝায় এ তাও নয়। দয়ার দান নয়, মাধুকরী তো নয়ই—রীতিমতো আতিথেয়তা। নিজের গায়ে জলঢালা হতেই উষাকে হুকুম করলেন, 'ওকে অমনি ঐ বালতি দুটো ভরে দে, চান করে নিক। সারাদিন নাওয়া-খাওয়া হয়নি—এই গরমে সেদ্ধ হয়েছে পরদিন।...কাপড় আছে সঙ্গে না দোব? দ্যাখো—ধুতিও আছে এখানে, আমাদের কিরণবাবুর ফাইন ফাইন ধুতি, সিমলে ফরাসডাঙ্গা ছাড়া পরেন না বাবু—দোব, না আছে?'

কোনমতে ঘাড় নেড়ে জানালুম বাড়তি ধুতি একটা সঙ্গেই আছে।

'তা এক কাজ করো তাহ'লে, ঐ সিঁড়ির নিচেটায় কলঘর মতো জায়গা আছে খানিকটা, ওখানে আলোও আছে দেখবে দ্যালের গায়ে মারা, জামাটামা ছেড়ে দিবিাকরে চান ক'রে নাও। পাশেই স্যেংখানা, যেতে চাও তো চলে যাও অমনি। উষা, চান হলে ওকে একটু পেসাদ দে খেতে। আমি চট্ করে ওপর থেকে আসছি।...আমার ভাই আজকে বড্ড দেরি হয়ে গেল—সন্ধ্যের পেছনে ছোঁকা না লাগতে লাগতে পুজুরী আরতির তাড়া দেবে—চোখেকানে দেখতে দেবে না।...না দিলেই বা চলে কি ক'রে, ওকেই যে আবার গিয়ে ভোগের খাবার রাঁধতে বসতে হবে। তা মরুকগে, জপ না হয় খাওয়ার পরও রাত বারোটা অবদি বসে বসে সারতে পারব—আহ্নিকটা তো করা চাই! জয় রাধে, হৃদয়েশ্বরী।'

অতঃপর স্নান জলযোগ যথানিয়মে চলল, কোন ত্রুটিই ঘটল না। উষা মেয়েটি বেশ হাসিখুশী, কথায় কথায় চোখ-টিপে কথা বলার অভ্যাস, মনিবের নিন্দে করার সময় তো বিশেষ করে চোখটেপা চাই-ই। অবশ্য গুরুতর কোন নিন্দে করল না, যা করল তাকে নিন্দে না বলে নিন্দের ইশারা বলা যেতে পারে।

রাস্তার দিকের যে নতুন মহলটার পাশ দিয়ে এলুম, সেইটেরই ওপরতলায় দিদি থাকেন দেখলুম। গা-ধুয়ে সেইখানেই উঠে গেলেন। খানিকপরে যখন নামলেন তখন কিন্তু সে আগের মানুষটাকে আর চেনা যায় না। পরনে চমৎকার মিহি সিমলের থান ধুতি, কুঁচনো চুনোট্ করা, ভেতরে সেমিজের মতোই একটা কি দেখলুম যেন, ভুরভুর করছে আতরের গন্ধ—একটি বেলদার সাদা ওড়না তার শৌখীন একটি জপের থলি হাতে করে নেমে এলেন। তখন অবশ্য আর কথাবার্তা কিছু হল না, কারণ ততক্ষণে সন্ধ্যা হয়ে গেছে, শোভারাম পূজারী এর মধ্যেই বারদুই আরতির জন্য তাড়া লাগিয়েছে। শোভারামেরও অল্প বয়স, পঁয়ত্রিশ ছত্রিশের বেশী হবে না, ছিপছিপে অথচ সুন্দর গঠন, গৌরবর্ণ, মুখশ্রী চমৎকার—সবচেয়ে যেটা লক্ষ্য করার মতো সেটা তার হাসি। সর্বদাই যেন একটা কৌতুক বোধ করছে—তারই হাসি চোখেমুখে লেগে আছে সর্বদা। বুদ্ধিমানও খুব নিশ্চয়ই, চোখের দিকে চাইলেই মনে হয় তোমার মনের ভেতর পর্যন্ত দেখে নিচ্ছে।

দিদি এসেই আরতির বাজনার একটা ঘড়ি তুলে নিলেন হাতে, আমাকেও একটা নিতে বললেন। কী করে তালে তালে ঘড়ি বাজাতে হয় জানতুম না, দিদিই দেখিয়ে দিলেন। বললেন: 'আজ রোজের ছুটি, রোজই বলে হাত ব্যথা করছে—তা আজ জিরোক একটু। আজ আমরা ভাইবোনেই বাজাই, কী বলো দাদা!'

দেখিয়ে দেওয়া সত্ত্বেও দু-একবার প্রথমটা একটু অসুবিধা হয়েছিল, তারপরই আরম্ভ করে নিলুম। পরে যে কদিন ছিলুম দৈনিক তিনবার আরতির সময় আমিই বাজাতুম দিদির সঙ্গে। তবে দিদিরও হাতের জোর বটে—নিত্য কন্যার আরতির সময় ঠিক ঘড়িটা নিয়ে হাজির থাকতেন, কখনও ভুল হ'ত না।

আরতির মধ্যে কখন আর দুটি মানুষ এসে দাঁড়িয়েছিলেন টের পাইনি। আরতির পর প্রণাম—যথার্থ ভক্তিভরে প্রণাম করেছিলাম সেদিন তাতে সন্দেহ নেই—সেরে উঠতেই নজরে পড়ল। একটি মধ্যগোছের ভদ্রলোক, প্রায় একহাত থাক্‌কা সমেত কালো ফিতে পাড় মিহি ধুতি পরনে—কুঁচনো কোঁচাটি পেটের কাছে গোঁজা (পরে জেনেছিলুম নিজেই পরিপাটি করে প্রত্যহ কোঁচান কাপড়খানা), একটা আদ্দির মেরজাই। এঁরও গলায় কন্ঠী তবে খুব সরুদানার, নাকে তিলক বা রসকলি নেই, তার বদলে কপালে ফোঁটা একটা। খুব ফরসা রং—বেশ গোলালো চেহারা, হঠাৎ দেখলে পাকা আমের কথাটা মনে আসে। মুখচোখও ভাল, সুপুরুষই বলা চলত যদি না একটু বেঁটে ধাঁচের হতেন। আরও একটা দোষ ছিল—একটা হাত আর একটা হাতের চেয়ে একটুখানি ছোট। তবে বাঁকা কি বিকৃত কি শুকনো নয়—সহজ স্বাভাবিক হাতই—বিধাতার হিসেবের সামান্য ভুলে দুটো ঠিক মানানসই হতে পারেনি।

আর একজন যিনি এসে আরতি দেখছিলেন তিনি মহিলা। পরনে চওড়া কালা পাড় শাড়ি, হাতে একহাত চুড়ি, সাদা সিল্কের চাদর জড়ানো গায়ে—কিন্তু সিঁথিটা অস্বাভাবিক সাদা—সিঁদুর নেই তাতে। অত সাদা না হলে হয়ত নজরে লাগত না। পরে দিনের আলোয় দেখেছিলুম সামনের চুল উঠে সিঁথি চওড়া হয়ে যাওয়াতেই অত সাদা দেখাচ্ছে। যাই হোক, সাদা সিঁথির সঙ্গে হাত-ভর্তি চুড়ির যোগাযোগটা মনের মধ্যে মিলিয়ে নিতে পারিনি—ঈষৎ একটু ধাঁধায় পড়েছিলুম। এখনকার কালের আপনারা আমার বিস্মিত হবার কথায় বিস্ময়বোধ করবেন হয়ত—কিন্তু তখনও পর্যন্ত আমার যা দেখা ছিল—তাতে বিধবাদের চওড়াপাড় শাড়ি পরতে দেখেছি বটে—কিন্তু তার সঙ্গে বড়জোর একগাছা করে চুড়ি কি মাটা বালা, কিন্তু সে খুব অল্প-

---

*পরোটা। ক্ষীরসা—ঘন ক্ষীর খুরিতে ঢালা

বাঙালী বিধবাদেরই। ইনি যে বয়স বছর পার হয়ে এসেছেন, দেখে অন্তত মনে হয় চল্লিশের কম হবে না। এ-বয়সে মা-বাপ বেঁচে থাকলে মেয়েরা অনেকে নরুনপাড় ধুতি পরে—তার বেশী নয়।

অবশ্য আমি বলতে বসেছি আজ থেকে প্রায় চল্লিশ বছর আগের কথা, এখন এসব নিয়ে কেউ মাথা ঘামায় না, পৃথিবী বহুদূর এগিয়ে এসেছে গত কবছরে। বিধবা কেন গহনা পরবে না—এ প্রশ্নের জবাব চাইছে লোকে এবং ভাল মতো জবাব পাচ্ছে না। ভারতের অন্য কোন প্রান্তে নিরাভরণ বৈধব্যের বিধান নেই—সেদিনও ছিল না। তবু আমরা যে সংস্কারের মধ্যে মানুষ হয়েছিলুম তাতে বিস্ময়বোধ করাই স্বাভাবিক।...

আরতির পর প্রণাম সেরে উঠে দিদি পরিপাটি করে চাদরটি জড়িয়ে নিলেন, তা থেকে হাতটি বার করে বেশ সুন্দরভাবে জপের থলিটি ধরলেন। বললেন, 'তুমি ভাই এখন একটু গড়িয়ে নাও, সারাদিনে ধকল তো কম যায় নি—আমরা একটু পরিক্রমা সেরে আসি। কিরণবাবু রইল—' বলতে বলতেই কেমন যেন থতিয়ে থেমে গেলেন দিদি, বোধহয় মনে হ'ল কিরণবাবুর পরিচয়টা কিছু দেওয়া দরকার, গলায় অস্বাভাবিক একটু জোর দিয়ে বললেন, 'কিরণবাবু হ'ল গে আমাদের ঠাকুরের এস্টেটের কামদার—ঐ যাকে ম্যানেজার বলে আর কি। অতি সজ্জন লোক, ওর দৌলতেই টিকে আছি।... কিরণবাবু রইল আর উষা রইল, যদি কিছু দরকার হয় স্বচ্ছন্দে বলো।...উষা শোন, বাবুকে আমার ঘরের পাশে ঐ ছোট্ট ঘরটাতে বিছানা ক'রে দে আগে—এখন একটু গড়াক। আমরা ফিরলে একসঙ্গে পঙ্গত করা যাবে। চ রে রোজে—আমরা ঘুরে আসি। এখনই আবার সব পূজুরী মুখপোড়ারা ভোগ লাগিয়ে দরজা বন্ধ করে দেবে। আরতির পর একটা ঘণ্টাও সময় দেয় না ঠাকুরকে নিঃশ্বেস ফেলবার!'

তাঁরা দুজনেই বাতাসে মৃগনাভির একটা মৃদু সুবাস ছড়িয়ে বেরিয়ে গেলেন।

উষা বেশ একটু অবাক হয়ে গিয়েছিল মনিবের হুকুম শুনে। সে হেঁকে বলল, 'ওপরে বিছানা করব? তোমার ঘরের পাশে?'

'হ্যাঁ, হ্যাঁ।... কানে শুনতে পাস না নাকি? কান দেখিয়ে আসিস কাল হাস-পাতালে গিয়ে।' যেতে যেতেই ঝঙ্কার দিয়ে উঠলেন দিদি।

উষা ভ্রূ কুঁচকে খানিকক্ষণ তাঁদের গমন-পথের দিকে আর খানিকক্ষণ আমার দিকে তাকিয়ে থেকে—শোভারামের দিকে ফিরে একবার চোখ মটকে নিয়ে বলেন, 'বাবা, আপনি কোথা থেকে আসছেন গা, এত খাতির? কৈ, এত এতদিনের মধ্যে তো ওঘরে কাউকে থাকতে দিতে দেখিনি। ওটা হল গে ওনার আহ্নিকের ঘরকে আহ্নিকের ঘর—আবার ভাবনের ঘরকে ভাবনের ঘর। লোক এলে তো থাকে এই নিচের ঘরে—কিম্বা আমাদের এই অন্দর মহলে—বড়জোর তাঁড়ারের ওপরের ভাল ঘরখানায়।... আপনি কে হন গা মার?'

ওর রকমসকম দেখে ভারী হাসি পেল। আর একটু হেঁয়ালিতে ফেলবার লোভ সামলাতে পারলুম না। আমিও চোখ টিপে হেসে বললুম, 'কে কার কী হয় কে বলতে পারে বলো। পৃথিবীতে কে কার! পরও আপন হয় অনেক সময়ে—আবার আপনও পরের চেয়ে পর হয়ে যায়।'

'ভাল। দিব্যি বুঝতে পারলুম। এখনও এখানকার পেসাদ পেটে পড়েনি, তাতেই এই বুলি। বলিহারি!'

এই বলে মুচকি হেসে সারা গমন-ভঙ্গীতে একটা তরঙ্গ তুলে চলে গেল উষা, বোধকরি আমারই বিছানা করতে।

বাইরের মহল এমন কিছু নয়—নিচে ওপরে একখানা করে ঘর, ঘরগুলো অবশ্য বড় আকারেরই—এছাড়া, নিচে যেটা চলন, সেইটেরই ওপরে খানিকটা নিয়ে ওপরে আর একটা ফালি মতো ঘর আছে, সেইখানেই আমার স্থান নির্দিষ্ট হয়েছিল। বড়ই সংকীর্ণ জায়গা—চওড়ায় আড়াই হাতের বেশী হবে না কিছুতেই—তবে আমার একার পক্ষে তাই যথেষ্ট। ঐ মাপের বিছানা বা তোশকও তৈরী করা আছে—দেখলুম ওর মধ্যেই পাশে বিঘৎখানেক জায়গা খালি রেখে সেটা পাতা হয়েছে, বেশ ফরসা চাদর, বালিশের ওয়াড়ও ফরসা—গতরাতের ব্রজ-বাসীদের বিছানার সঙ্গে তুলনা করলে এ রাজশয্যা। সারাদিনের শ্রান্তিতে পা অবশ হয়ে এসেছিল, তার ওপর এই লোভনীয় বিছানা, সুতরাং 'যান গে বাবু, আপনকার বিছানা, হয়ে গেছে', উষা খবরটা ঘোষণা করতে দ্বিরুক্তি করলুম না—টান হয়ে শুয়ে পড়লুম।

দুটো ঘরের মাঝে একটা দরজা ছিল, শুয়ে শুয়েই পাশের বড় ঘরটা দেখা গেল। ও ঘরের মেঝেতে বোধহয় আগে থাকতেই বিছানা পাতা ছিল। বোধহয় পাতাই থাকে—দুদিকে দুটি, মেঝেতে হলেও বেশ পুরু-সুরু বিছানা, একটাতে গদি আছে বলেই মনে হল। দুটো বিছানা দুদিকের দেওয়াল ঘেঁষে, মাঝে অনেকখানি জায়গা, বারান্দায় যাতায়াতের জন্যে তো বটেই—সে অনুপাতেও অনেকটা বেশী ব্যবধান। বোধহয় এখানে বসেই রাত্রের খাওয়া-দাওয়া হয়—কে জানে!

দুটি বিছানার একটিতে ইতিমধ্যে কিরণবাবু বিবিধ আকারের খাতাপত্র নিয়ে বসে গেছেন, বোধ হল এইটেই ওঁর হিসেব-পত্র করার সময়। একটা কেরোসিনের টেবিল ল্যাম্প জ্বলছে, তাতেই নাকে চশমা এঁটে হেঁট হয়ে কীসব লিখছেন খাতায়। কিরণবাবু কিন্তু এতাবৎ আমার সঙ্গে একটাও কথা বলেন নি, যতদূর মনে পড়ছে কারুর সঙ্গেই কথা কইতে দেখিনি ওঁকে এখনও পর্যন্ত—এখনও কিছু বললেন না, নামধাম পরিচয় কিছুই জানতে চাইলেন না। এমন কি একেবারে অপরিচিত এক ছোকরাকে ডেকে পাশের ঘরে ঠাঁই দেওয়া হ'ল, তাতেও কোন বিস্ময় প্রকাশ করলেন না কি প্রতিবাদ করলেন না—। আমার কেমন যেন অবাক মনে হতে লাগল, এ আবার কেমনধারা মানুষ!

আমারও অবশ্য কথা বলার গরজ ছিল না। সারাদিনের দুর্ভাবনা দুশ্চিন্তা ও অপরিসীম শ্রান্তির পর মাথায় ঠাণ্ডা জল এবং পেটে খাবার পড়েছে—দুই চোখের পাতা যেন কে টানছে ভেতর থেকে। শুয়ে পড়ার পর বেশীক্ষণ আর হুঁশ রইল না—অচৈতন্যের মতো ঘুমিয়ে পড়লুম।

দিদিরা ফিরলেন রাত সাড়ে দশটারও পর—কলকল করতে করতে। ধড়মড়িয়ে জেগে বসে পাশের ঘরে ঘড়ি দেখলুম তাই, নইলে মনে হত আট দশ ঘণ্টা ঘুমিয়েছি। কিরণবাবু দেখলুম তখনও জেগে বসে খাতা-পত্র ঘাঁটছেন। কেন এত রাত হ'ল, কোথায় গিছলেন ও'রা—তাও জিজ্ঞাসা করলেন না।

মাঝের দরজাটা ভেজিয়ে দিয়ে দিদি বেশ পরিবর্তন করে একখানি আটহাতী খাটো ধুতি পরলেন, তারপর মুখহাত ধুয়ে এসে আবার দরজা খুলে দিয়ে আমাকে ডাকলেন, 'এসো ভাই এসো, এবার এ ঘরে এসো—বড্ড তকলীফ হ'ল তোমার, এত রাত হয়ে গেল এখনও খাওয়া হ'ল না, সারাদিন পেটে কিছু নেই। কী করব, ঘুরতে ঘুরতে রাধাবল্লভের বাড়ি চলে গিয়েই যত হ্যাঙ্গাম হল। ঠাকুরটি কি সহজে দেখা দেন—ঠিকই বলে ব্রজবাসীরা—রাধাবল্লভ দর্শন দুর্লভ।... ওগো কিরণবাবু, আর দেরি নয়—চটপট শোভারামকে বলো খাবারটা ধরে দিয়ে যাক—আর দেরি করলে শোভারামরাই গাল দেবে!'

তারপর পা ছড়িয়ে বসে নিজের পায়ে হাত বুলোতে বুলোতে বলেন, 'এ বেলায় পঙ্গতটা ভাই এই ওপরেই সারি। আর একশবার ওপর নিচে করতে পারি নে। ভারী তো খাওয়া—তার জন্যে অত মেহনতানা পোষায় না—কী বলো!'

উষা এসে ঘর মুছে গেলাসে গেলাসে জল গড়িয়ে দিলে, শোভারাম মুখখানা হাঁড়ি করে এসে ঠক্ করে খাবারের বাসনগুলো নামিয়ে দিয়ে চলে গেল। পরে বুঝেছিলুম তার উষ্মার হেতু। সে ঠিক রাত চারটের ওঠে, সাড়ে চারটের স্নান সারা হয়ে যায়—তার এত রাত করলে চলে না।

ওপরে খেতে আমরা চারজন। রোজেও এসে বসেছে দেখলুম, তারও বেশ পরিবর্তন হয়েছে, বোধহয় সে-ই এর নিচের ঘরখানায় থাকে, নিচে থেকেই এল—গুনচটের মতো একখানা মিলের শাড়ি পরে।

আহার্যের ঢাকা খুলতে দেখা গেল রকমারী ব্যবস্থা। বারোখানি করে পুরী যা লুচি হয় প্রত্যহ, এইটেই ঠাকুরের ভোগ, বাকী সকলের জন্যে পরোটা বা টেকুয়া। টেকুয়া না বলে ঠিকরে বললেই ঠিক বলা হয় তাকে, পুরু পুরু একসের আটার ষোল-খানা হিসেবে তৈরী—ঘিয়ের ছিটেফোঁটা আছে কিনা সন্দেহ। এতগুলি প্রাণীর পুরী ভাজা সম্ভব নয়, অথচ যা হবে ঠাকুরকে দেখাতে হবে একবার, সুতরাং রুটিও দেওয়া

[illegible]—দুটি [illegible]। তাই শুধু [illegible] মতো [illegible] পুরী করা হয়, বাদবাকী এই বস্তু। একটি তরকারী। ঠাকুরের জন্যে এক খুঁদির কালিয়া, একটু রাবড়ি ও খান-দুই প্যাঁড়া। এ ছাড়া [illegible] সেরখানেক দুধ, আলাদা একটা বাটিতে খানিকটা সর ও মিছরির গুঁড়ো। এই দুধ থেকেই সারাদিনে তোলা।

দিদিই খাবার ভাগ করলেন। পুরী কখানি নিজে নিলেন, আর রাবড়িটুকু। কিরণবাবুর ভাগে পড়ল খানচারেক টুকরো ও সেই কালিয়া। প্যাঁড়া দুটোও ওঁরা খান বোধ হয় অন্যদিন—আজ আমাদের দুজনকে দিলেন। দুধও আমরা একটু একটু পেলুম—যদিচ দিদি বোধহয় আধসের নিজের দিকে রাখলেন। সবাইকে দিয়ে খানিকটা সরের সঙ্গে পুরির কুচি চটকে বারান্দায় পাখীকে দিয়ে এলেন। পোষা চন্দনা—ও নাকি লুচি পুরি ছাড়া খায় না।

'ষাট বছর বয়স ওর, দেখছ কি। ও কি আজকের পাখী। আমার সুখদুঃখের সঙ্গী ও।' বললেন দিদি।

খাওয়া-দাওয়ার পর ঊষা বাসন নিয়ে চলে গেল। রোজেকেও দিদি জোর করে শুতে পাঠিয়ে দিলেন নিচে। আমাকে বললেন, 'আমার এখন বিস্তর জপ বাকী, আমি বারান্দায় বসে জপ করব। তুমি ঘুমোবে এখন—না বসবে একটু আমার কাছে?'

বুঝলুম দিদি এবার আমার বিবরণ কিছু জানতে চান। আমারও জানানো প্রয়োজন। কারণ আশ্রয়টা শুধু বড় কথা নয়—আখেরের কী ব্যবস্থা হতে পারে সেটা না জানা অবধি সুস্থির হতে পারছি না। তাছাড়া পুরো দুটি ঘণ্টা ঘুমিয়ে নিয়েছি—এখন আর সহজে ঘুম আসবেও না। আমি একটু জোর দিয়েই বললুম, 'আমি আপনার কাছেই বসব।'

দেখলুম দিদি খুশী হলেন। [illegible] পরিসর বারান্দা, রাস্তার দিকে পাশ ফিরে সামনা-সামনি আসন পেতে বসলুম দুজনে। দিদি পা ছড়িয়ে বসলেন। 'আমার অবার পোড়া বাতের পা, মুড়ে বসতে পারি না, তুমি কিছু মনে করো না ভাই, লক্ষ্মীটি!'

মিনিট কতক অবশ্য নিঃশব্দেই জপ করলেন বসে, তারপর একটা-দুটো করে প্রশ্ন করতে লাগলেন, অতি কৌশলে—আমি যাতে সেটাকে জেরা বলে ভাবতে না পারি। আমার উত্তরের ফাঁকে ফাঁকে জপও চলতে লাগল। সেটা বুঝতে পারলুম তাঁর ঠোঁট নড়ার আর হাত নাড়ার। কোথায় বাড়ি, কে কে আছেন, দাদা কি করেন, কতাই আমরা, বাবা কদিন মারা গেছেন—আমার অতি শৈশবেই মারা গেছেন শুনে মুখে ইস্ আওয়াজ করে দুঃখ প্রকাশ করলেন, বললেন, 'আহা বাছারে, জীবনের [illegible] তো ঐখানেই ঘুচে গেছে তোর!'—তারপর আমি কি পড়ি, কেমন [illegible], [illegible] [illegible] [illegible] কি [illegible] [illegible]

[illegible] [illegible] বাড়ি [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] হল, ইত্যাদি।

দিদিও ধৈর্য ধারণ করে বসে শুনলেন সব। মধ্যে মধ্যে উনি ঢুলছেন সন্দেহ করে বলতে বলতে থেমে গেছি—সঙ্গে সঙ্গে বলে উঠেছেন, 'উঁহু, উঁহু,' ভাবছিস ঘুমোচ্ছি? তা নয়, ও আমার আপিংয়ের ঝিমুনি। ঘুম নয়। সব শুনেছি আমি, বলিস তো গড়গড় বলে যাব। আপিং খাই যে। অত দুধ খেলুম দেখলি না। আপিংয়ের সঙ্গে দুধ মিষ্টি বেশী করে না খেলে শরীর বসে যায়। ঘুম অত সহজে আসে না আমার—ও শুধু ঝিমুনি।'

আমার বক্তব্য শেষ হতে গম্ভীরভাবে ঘাড় নাড়লেন বার কতক। বললেন, 'ভালো করোনি ভাই, ছিঃ। আজকাল একটা পাস অন্তত না করলে পিওনের চাকরি অবধি মেলে না। তোমার মাথার ওপর বাপ নেই, অবীরে বিধবার সন্তান—তোমাদের ধ্যান-জ্ঞান হওয়া উচিত কী করে মানুষ হয়ে উঠবে এই শুধু—আর কিছু না। এই তো তোমার দাদার কথা বললে, কী কষ্ট করেছেন নিজের পায়ে দাঁড়াবার জন্যে, ঐ তো ঠিক, ঐ তো মানুষের কাজ।'

তারপর একটু হেসে বললেন, 'পোড়া কপাল সব। এখানেই কি কম লোক আসে, ছেলের পাল একধার থেকে—অমনি ঘুরতে ঘুরতে। শহর বাজারে তো ঢের বেশীই আসবে। আমি বলি মরণ, এখেনে এসেছ চাকরির খোঁজে—পয়সা কামাবে বলে? এখেনের টিকটিকি মাকড়সা পর্যন্ত পয়সা চাইছে ঈশ্বরও—আকবর বাদশা যে জন্যে নাম রেখেছিলেন ফকিরাবাদ, ভিখিরীর দেশ—এখানে এসেছ তোমরা পয়সা [illegible] করতে। মরে পড়ো, মরে পড়ো!'

তারপর কিছুক্ষণ নিঃশব্দে মালা জপবার পর বললেন, 'তোর দাদার নাম ঠিকানা দিস, কালই আমি কিরণবাবুকে দিয়ে চিঠি লিখিয়ে দোব, তোর লিখতে লজ্জা করবে, তেজ করে চলে এসেছিলি তখন, [illegible] পোড়ার মুখ পুড়িয়ে শেষে গাড়িভাড়া ভিক্ষে করে ফিরে যাওয়া সে তুই পারবি না। আমরাই লিখব, টাকা এলে ফিরে বাড়িই চলে যাস ভাল ছেলের মতো। দেখলি তো দুনিয়ার হালচাল ফিরে। আবার ইস্কুলে যাস, এখনও তো বেশীদিন হয়নি—কটা মাস, ফিরে চেপে পড়ে পাসটা দিয়ে নে!'

প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই আবার বললেন, 'কিরণবাবুকে দিয়ে লেখাবার কথা বললুম বলে ভাবিসনি যেন আমি নিজে একছত্তরও লিখতে জানি না। আমি ইংরিজী পর্যন্ত লিখতে পারি অল্প অল্প, বাংলা তো গড়গড় করে লিখে যাবো। তবে অনভ্যেস তো, হরপ সব আঁকাবাঁকা হয়ে যায়। কিরণবাবুর নিত্যি লেখা অভ্যেস, জমিদারের ছেলে—হিসেব লিখে লিখে লেখা পাকা হয়ে গেছে!'

আরও খানিকটা চুপ করার পর হেসে বললেন, 'তোকে দেখে হাঁকিয়ে না দিয়ে এমন জামাইআদরে রাখলুম কেন বল দিকি? ......এমন তো কত আসে, দূর দূর করে তাড়িয়ে দিই, বলি এটা আমার [illegible] নয়, এখানে কিছু সুবিধে হবে না। বড়—যে লাউখড়ি করে পালিয়েছিলি [illegible] থেকে, সেই বাহাদুরী দিলে যা সেখানে পারিস। তোকে তা বললুম না কেন জানিস?'

নিজেই জবাব দিলেন প্রায় সংগে সংগেই; রাস্তার তেলের আলোটা সামনেই, তার আভাটা মুখে এসে পড়েছিল, দেখলুম চোখটা ছলছল করে উঠল বলতে গিয়ে; বললেন, 'আমার একটা ছোট ভাই ছিল—ছিল কেন, বালাই ষাট, আজও আছে—তোকে অনেকটা তার মতো দেখতে। তোর মতনই ঝাড়নশা ঢ্যাঙা গড়ন, ষোলসতেরো বছর বয়সে ঠিক এইরকম দেখতে ছিল। তুই যখন আচম্‌কা এসে দাঁড়ালি—হঠাৎ মনে হ'ল সে-ই ফিরে এল আবার, সেই বয়সে। কেমন মায়া হ'ল—মনে হ'ল কোথায় না কোথায় ঘোরে, তারও হয়ত এমনি দুর্দশা হয়। তাই আর তোকে না বলতে পারলুম না। তুইও আবার তেমনি—মা মাসী না বলে দিদিই বলে ফেললি ফট করে—।'

চুপ করে রইলেন অনেকক্ষণ। মনে হ'ল চোখের জলটাই সামলাবার চেষ্টা করছেন। আস্তে আস্তে বললুম, 'তিনি এখন কোথায়?'

'কে জানে! হতভাগা হয়ে গিয়েছে একেবারে। লেখা করলে না পড়া করলে না—নেশাভাঙ্‌ ক'রে বেড়াল চিরটাকাল। কম পয়সা উড়িয়েছে আমার! শেষ খবর পেয়েছি কোন্‌ এক সার্কাসের দলে কাজ করছে। আমাদের কিরণবাবুর ভায়রাভাই, সরকারী কাজে সেও ঘোরে নানা্‌ দেশবিদেশে—খুব বড় চাকরি করে সরকারের—তার সংগে দেখা হয়েছিল সেই সিঙ্গাপুরে না কোথায় যেন। সেও তো কতকালের কথা হ'ল। হতভাগা, হতভাগা! বিয়ে দিলুম এককাঁড়ি টাকা খরচ ক'রে, সুন্দরী বৌ—তা তার দিকে একবার তাকালি না পজ্জন্ত।

এরপর অনেকক্ষণ আর কোন কথা কইলেন না, নিঃশব্দে বসে জপ করতে লাগলেন। মনে হ'ল প্রবাসী হতভাগা ভাইটার কথাই ভাবছেন বসে বসে। আমিও চুপ ক'রে বসে রইলুম। অনেকটা নিশ্চিন্ত এখন। লজ্জা যা তা তো আছেই, পরাজয়ের লজ্জা—তবু অসহায় অবস্থাটা গেছে এইজন্যেই নিশ্চিন্ত। নিজের ভাগ্য নিজে তৈরী করে নেওয়ার পথটা আর যাই হোক কুসুমাস্তীর্ণ নয়—তা টের পেয়েছি খুব, —হাড়ে হাড়ে। ও যারা পারে তারা পারুক। আমার কর্ম নয়। এর চেয়ে বাড়ির ভাত খেয়ে লেখাপড়া ঢের সহজ।......ভাগ্যিস ভগবান চেহারাটা এ'র সেই ভাইয়ের মতো দিয়েছিলেন। নইলে কি হ'ত ভাবতেই গা শিউরে ওঠে। হয় অর্ধেক রাত্রে পাহারাওলা থানায় ধরে নিয়ে যেত, নয়ত এমনি ক'রে কদিন ঘুরে ঘুরে রেলের ওপর গলা দিতে হ'ত স্টেশনে গিয়ে।......

ভারী মিষ্টি সানাইয়ের সুর ভেসে আসছে, বোধহয় লালাবাবুর মন্দির থেকেই। ঠিক জানি না—মধ্যরাত্রিরই কোন রাগিণী ধরেছে বোধহয়। এরা থামলেই রংগজীর মন্দির থেকে ধরবে। দুদলে এমনি পাল্লা চলে, এর আগেরবার এসে শুনে গেছি। আজও কান পেতে বসে শুনতে লাগলুম। একটু একটু ঘুমও পাচ্ছে এবার।

বহুক্ষণ পরে আবার কথা কইলেন দিদি। একেবারে অপ্রত্যাশিত প্রসঙ্গ পাড়লেন একটা, 'তুই কেন পালিয়েছিলি তা তুই বলতে পারবি না, কিন্তু আমি বলতে পারি।

চমকে উঠলুম। কেমন যেন একটা অস্বস্তিও বোধ হ'তে লাগল। কারণ হয়ত এক নয়—অনেক। কোন্‌টা উনি টের পেয়েছেন, মনের কোন গোপন অলিন্দসন্ধির কথা বলবেন কে জানে। এতক্ষণ ধরে বসে আমার কথাই ভাবছিলেন নাকি?

দিদি বেশ একটু আত্মপ্রসাদের হাসি হেসে বললেন, 'বাড়নশা গড়ন তোর, দেখলে সতেরো বছর মনে হয় না তো, মনে হয় মিনসে একটা। তাছাড়া পাসের পড়ার পক্ষে বয়সটাও একটু বেশী, আর ও বয়িসী অন্য ছেলে থাকলেও—আজকালকার ছেলেপিলে তো দেখি সব—কেন্‌খুড়ি কেন্‌খুড়ি—বেঁটে বেঁটে পাকানো চেহারা, এধারে হয়ত দ্যাখোগে যাও বয়সের গাছপাথর নেই বাপমা অমন চারবছর কমিয়ে বললেও ঢের হয়ে গেছে। এদিকে অমনি কচি খোকাটি সেজে থাকেন।......আসলে তোর লজ্জা করে অতটুকুটুকু ছেলের সংগে বসে বসে ইস্কুলের পড়া পড়তে। মনে হয় এই নিয়ে সবাই হাসাহাসি করছে—মায় রাস্তার লোকেরা পজ্জন্ত। তাছাড়া মেলাই নাটক নভেল পড়েছিস এই বয়সেই—যা বললি, তাতে মনটাও পেকে গেছে বয়েসের তুলনায় ঢের বেশী। মনে হয় অনেক বয়েস হয়ে গিয়েছে, এখন আর বইখাতা নিয়ে ইস্কুল যাওয়া সাজে না। এবার একটা কিছু করা দরকার বড় রকম। তাই না?'

আস্তে জবাব দিলুম, 'হয়ত তাই। কে জানে, ঠিক এমন পরিষ্কার ক'রে তো ভাবিনি। এখন মনে হচ্ছে এইটেই বড় কারণ—আপনি ঠিকই ধরেছেন।' ইচ্ছে করেই শেষের কথাটার ওপর জোর দিলুম।

ভারী খুশি হলেন দিদি। বললেন, 'আমি জানি যে। আমার ভাইয়ের ঠিক অমনি হয়েছিল। মা বাবার তো তেমন চাড় ছিল না, তখন অত পড়াশুনোর রেওয়াজও হয়নি, যে ইংরিজী হরপ চিনল সে খুব বড় বিদ্বান। যা বলছিলুম, গোড়াতেই এলাকাঁড়ি দেওয়ায় পড়া শুরু করেছেই অনেক বেশী বয়সে। আমি যখন জোর করে গৌর আড্ডির ইস্কুলে ঢুকিয়ে দিলুম তখন নিচের কেলাসে কচি কচি ছেলেদের পাশে গিয়ে বসতে হ'ল—সে ওর ভারী লজ্জা। মাস্টাররাও নাকি এই নিয়ে ঠাট্টাতামাসা করত, পড়া না পারলে ধেড়ে মন্দ বলে গাল দিত—কিছুতেই তাই আর ইস্কুলে যেতে চাইল না দিনকতক পরে।......হরি বলো, হরি বলো, জয় রাধে শ্রীরাধে। রাত বোধহয় বারোটা বেজে গেছে, না? যাই শুয়ে পড়িগে এবার।'

বারোটা অনেকক্ষণই বেজে গেছে, বাজতে শুনেছি ঘড়িতে, উনিই গল্পে মশগুল হয়ে ছিলেন, অতটা কান করেন নি। তবে সে কথা আর বললুম না। আমারও ঘুম পেয়ে গেছে বেজায়। আর দ্বিরুক্তি না করে এসে শুয়ে পড়লুম। দিদি ওঘর থেকে হেঁকে বলে দিলেন, 'কলঘর কি স্যেংখানা যাবার দরকার হলে কিন্তু নিচে যেও ভাই, ওপরের ওটি আমার নিজস্ব, নিজে হাতে খ্যাংরা দিয়ে ধুই। ওখানে কেউ যায় না, আমি ছাড়া।'

শুয়ে শুয়েই দেখতে পেলুম জপের মালাটি কপালে ঠেকিয়ে দেওয়ালের পেরেকে তুলে রাখলেন, তারপর বারান্দার দিকের দরজা বন্ধ করে সশব্দে একটা হাই তুলে বললেন, কিগো কিরণবাবু, ঘুমিয়ে পড়লে নাকি গো! ওমা, তোমার তো বেশ ফড়্‌ৎ ফড়্‌ৎ করে নাক ডাকছে দেখতে পাই। তবে নাকি তোমার ঘুম হয় না?'

কিরণবাবুর বিছানা থেকে আওয়াজ এল, খুব নরম—এই প্রথম ও'র গলা শুনলুম—'কেন, কিছু বলছ?'

'বলছি, ঘুমিয়ে তো পড়লে, মালিশটা তো করা হ'ল না, হাঁটু আর কোমর তো তেমনি তক্তা হয়েই রইল।'

'তুমি শোও, আমি মালিশ ক'রে দিচ্ছ।'

আশা করেছিলুম দিদির কাছ থেকে প্রবল প্রতিবাদ উঠবে একটা, ঘুম থেকে তুলে বুড়োমানুষকে একী অদ্ভুত ফরমাশ ও'র! কিন্তু দিদি হুঁ-হাঁ কিছুই করলেন না। দেওয়ালে একটা টিনের চক্‌চকে চাকতি দেওয়া আলো জ্বলছিল মিটমিট করে সেটাকেই একটু বাড়িয়ে কিরণবাবু মালিশের শিশি খুঁজে নিয়ে এলেন, তারপর একান্ত অনুগত ও আশ্রিতের মতো দিদির পায়ে ও কোমরে মালিশ করতে বসলেন। দিদি কিছুই বললেন না, কোমরের কাপড় আল্‌গা করে দিয়ে বরং তাঁর দিকে পিছন ফিরে পাশবালিশ জড়িয়ে বেশ জুৎ করে শুলেন। বোধকরি ঘুমিয়েই পড়লেন সংগে সংগে, কারণ একবার আস্তে আস্তে যখন বললেন, 'মাঝের কপাটটা ভেজিয়ে দিলে হ'ত, মালিশের গন্ধ নাকে খারাপ লাগবে ছোঁড়ার' তখনই দেখলুম গলা জড়িয়ে এসেছে তন্দ্রায়।

কিরণবাবু সে চেষ্টা আর করলেন না, কপাট খোলাই রইল। মালিশের গন্ধটা অবশ্য আমার খুব খারাপ লাগল না, কর্পূর কর্পূর গন্ধ একটা—কিন্তু ভালই হোক মন্দই হোক, সে আর কতক্ষণ। আমিও বোধহয় দু'তিন মিনিটের মধ্যে ঘুমিয়ে পড়লুম। কিরণবাবু আরও কত রাত অবধি বসে ঢুলতে ঢুলতে মালিশ করলেন কে জানে।

(ক্রমশঃ)

প্রধানমন্ত্রীর পূর্ব ইউরোপ সফর

এক পক্ষকালে সোভিয়েট রাশিয়া ও যুগোশ্লাভিয়াসহ পূর্ব ইউরোপের পাঁচটি দেশে এবং সংযুক্ত আরব প্রজাতন্ত্রে সফর করে ভারতের প্রধানমন্ত্রী শ্রীমতী ইন্দিরা গান্ধী নয়াদিল্লীতে ফিরে এসেছেন।

নয়াদিল্লীতে বিমান থেকে নেমে তিনি সাংবাদিকদের কাছে বলেছেন, পূর্ব ইউরোপে তাঁর সঙ্গে ঐসব দেশের নেতাদের সঙ্গে যেসব আলোচনা হয়েছে, সেগুলি "খুবই কাজের"। সাক্ষাৎ আলোচনার মধ্য দিয়ে তিনি বিভিন্ন বিষয়ে ঐসব দেশের মতামত আরও ভালভাবে জানতে পেরেছেন। প্রধানমন্ত্রী আশা করেন যে, এইসব আলোচনার পর সকল ক্ষেত্রে ও সকল স্তরে ঐ দেশগুলির সঙ্গে ভারতের সম্পর্কের বিস্তার ঘটবে।

সোভিয়েট রাশিয়ায় প্রধানমন্ত্রী শ্রীমতী গান্ধীর অবস্থান অবশ্য খুবই সংক্ষিপ্ত ছিল। প্রকৃতপক্ষে তিনি তাঁর যাত্রার পথে অল্প সময়ের জন্য মস্কোতে নেমেছিলেন। কিন্তু এই স্বল্প সুযোগেই তাঁর সঙ্গে প্রধানমন্ত্রী কোসিগিনের কিছু গুরুত্বপূর্ণ আলোচনা হয়েছিল। পাকিস্তানের প্রেসিডেন্ট আয়ুব খাঁ সোভিয়েট রাশিয়ায় সফর করে যাওয়ার পর ভারতের প্রধানমন্ত্রীর সঙ্গে রুশ প্রধানমন্ত্রীর এই সাক্ষাৎকার ঘটে। অতএব, আশা করা যায় যে, প্রেসিডেন্ট আয়ুবের রুশ সফর ও তাঁর ভারত-বিরোধী প্রচার মস্কোতে কতখানি প্রভাব বিস্তার করতে সমর্থ হয়েছে শ্রীমতী গান্ধী এই সুযোগে তাঁর আন্দাজ নিতে চেষ্টা করেছেন।

পূর্ব ইউরোপের দেশগুলিতে শ্রীমতী গান্ধীকে যে-সম্বর্ধনা জানান হয়েছে, এবং তাঁর সফর উপলক্ষে যেসব যুক্ত ইস্তাহার প্রকাশিত হয়েছে, সেগুলি থেকে অনুমান করা যায় যে, তাঁর এই সফরের ফলে এই সকল দেশের সঙ্গে ভারতের বন্ধুত্বের বন্ধন দৃঢ়তর হয়েছে।

এটা দেখা গেছে যে, ভিয়েতনাম যুদ্ধের মীমাংসা সম্পর্কে এই দেশগুলির সঙ্গে ভারতের যথেষ্ট মতের মিল রয়েছে। এই যুদ্ধ বন্ধ করার পথে প্রথম পদক্ষেপ হচ্ছে উত্তর ভিয়েতনামে বোমাবর্ষণ বন্ধ করা, ভারতের এই মত পোল্যান্ড, বুলগেরিয়া, রুমানিয়া ও যুগোশ্লাভিয়ার ব্যাপক সমর্থন লাভ করেছে।

পশ্চিম এশিয়ার শান্তি স্থাপনের প্রশ্নেও ভারতের সঙ্গে এই দেশগুলির যথেষ্ট মতৈক্য দেখা গেছে। ইসরাইলের আক্রমণের ফলেই পশ্চিম এশিয়ার শান্তি ক্ষুন্ন হয়েছে, ভারতবর্ষ গোড়া থেকেই এই অভিমত প্রকাশ করায় এইসব দেশে সন্তোষ প্রকাশ করা হয়েছে এবং শ্রীমতী ইন্দিরা গান্ধীও এইসব দেশের নেতাদের সঙ্গে একমত হয়ে ঘোষণা করেছেন যে, পশ্চিম এশিয়ার সমস্যা সমাধানের যে-কোন সূত্রের মূল কথা হওয়া দরকার, আক্রমণকারীকে তার আক্রমণের দ্বারা লব্ধ জমি থেকে সরে যেতে হবে।

দেশে ফিরে আসার পর শ্রীমতী গান্ধী অবশ্য এটা পরিষ্কার করে দিয়েছেন যে, পশ্চিম এশিয়ার সমস্যা সমাধানের জন্য ইতিমধ্যে রাষ্ট্রসংঘ যে উদ্যোগ গ্রহণ করেছেন, তার পক্ষে ক্ষতিকর কোন মনোভাব ভারতবর্ষ অবলম্বন করবে না। তিনি বলেন, "আসল কথাবার্তা সেখানেই হচ্ছে।" তিনি আরও বলেন যে, যে-কোন মীমাংসাই হোক না কেন, সেটা উভয় পক্ষের কাছে গ্রহণযোগ্য হওয়া চাই।

প্রধানমন্ত্রীর এই সফরের মধ্য দিয়ে অবশ্য কয়েকটি মতপার্থক্যের বিষয়ও প্রকাশ পেয়েছে। যেমন, পারমাণবিক অস্ত্রের প্রসার রোধ সম্পর্কে চুক্তির বিষয়টি। সোভিয়েট রাশিয়া ও মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের মধ্যে এই চুক্তির উৎসাহী সমর্থক হচ্ছে পূর্ব ইউরোপের দেশগুলি। কিন্তু ভারতবর্ষ মনে করে, এই চুক্তি একদেশদর্শী; কেননা, এতে আজ যাদের হাতে পারমাণবিক অস্ত্র নেই, ভবিষ্যতে সেসব দেশের পারমাণবিক অস্ত্র লাভের পথ রুদ্ধ করার চেষ্টা হয়েছে অথচ পারমাণবিক অস্ত্রধারী দেশগুলির নূতন অস্ত্র তৈরি করা বন্ধ করার ও মজুত অস্ত্র ধ্বংস করার কোন কথা নেই।

ভারতের সীমান্তে চীনা বিপদের গুরুত্ব সম্পর্কে এই দেশগুলির নেতারা ভারতের প্রধানমন্ত্রীর সঙ্গে একমত হয়েছেন বলে মনে হয় না। যদিও চীনা নীতির সুস্পষ্ট বিরোধিতা করে ঐসব দেশের নেতারা ভারতের প্রধানমন্ত্রীর সঙ্গে একযোগে শান্তিপূর্ণ সহাবস্থানের নীতির প্রতি আস্থা পোষণ করেছেন, তথাপি তাঁরা সম্ভবতঃ এ-কথা মেনে নেননি যে, ভারতের সীমান্তে হানা দিয়ে চীন তার আক্রমণাত্মক অভিসন্ধির অথবা পররাজ্যলোলুপতার পরিচয় দিচ্ছে।

পূর্বে প্রকাশিত একটি সংবাদ খণ্ডন করে শ্রীমতী গান্ধী এটা পরিষ্কার করে দিয়েছেন যে, ভারত ও পাকিস্তানের মধ্যে তাসখন্দ ধরনের দ্বিতীয় আর একটি সম্মেলন করার কোন প্রস্তাব দেওয়া হয়নি। শ্রীমতী গান্ধী যেসব দেশে সফর করেছেন, তারা ভারত-পাকিস্তান সম্পর্কের উন্নতি কামনা করেছে কিন্তু শ্রীমতী গান্ধী বলেছেন, কেউই কোন নির্দিষ্ট প্রস্তাব দেয়নি। প্রেসিডেন্ট আয়ুবের সোভিয়েট রাশিয়া সফরের পর পূর্ব ইউরোপে যদি এই ধারণা প্রসার লাভ করে থাকে যে, পাকিস্তানের সঙ্গে অধিকতর স্বাভাবিক সম্পর্ক স্থাপন করাটা একমাত্র ভারতের উপরই নির্ভর করে, তাহলে শ্রীমতী গান্ধী সেই ধারণা সম্ভবত দূর করতে সমর্থ হয়েছেন। কারণ, তিনি এ-কথা বুঝিয়ে এসেছেন যে, তাসখন্দ চুক্তির নির্দেশ অনুযায়ী ভারতবর্ষ পাকিস্তানের সঙ্গে স্বাভাবিক সম্পর্ক স্থাপন করতে উৎসুক কিন্তু পাকিস্তানের অনিচ্ছার দরুণই সেটা সম্ভবপর হচ্ছে না।

শ্রীমতী ইন্দিরা গান্ধীর এই সফরের আর একটি ফল হচ্ছে পূর্ব ইউরোপের দেশগুলির সঙ্গে ভারতের বাণিজ্যের প্রসারের সম্ভাবনা বৃদ্ধি। ভারতের পক্ষে এটা খুবই গুরুত্বপূর্ণ। কেননা, তার রপ্তানি-বাণিজ্য বাড়ান দরকার এবং তা করতে গেলে তার শিল্পজাত দ্রব্যের জন্য ভাল বৈদেশিক বাজার দরকার। এদিক দিয়ে পশ্চিমের শিল্পোন্নত দেশগুলিতে তার বাণিজ্য প্রসারের সম্ভাবনা খুবই সীমাবদ্ধ। পূর্ব ইউরোপের দেশগুলি বরাবরই ভারতীয় শিল্পপণ্যের ভাল ক্রেতা। ইদানীং ইউরোপের বারোয়ারী বাজারের সঙ্গে পূর্ব ইউরোপের দেশগুলির বাণিজ্যিক লেনদেনের সম্পর্ক বেড়ে যাওয়ায় এই বিষয়ে কতকটা উদ্বেগ দেখা দিয়েছে। প্রশ্ন উঠেছে, ভারতীয় শিল্পজাত পণ্য রপ্তানির জন্য এতদিন পূর্ব ইউরোপের বাজারের উপর যতটা নির্ভর করা যেত, ভবিষ্যতেও ততটা নির্ভর করা যাবে কিনা।

এটা লক্ষণীয় যে, উপ-প্রধানমন্ত্রী শ্রীমোরারজী দেশাইয়ের জাপান ও মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ভ্রমণের অব্যবহিত পরে শ্রীমতী গান্ধী সমাজতান্ত্রিক দেশগুলিতে এই সফরে বেরিয়েছিলেন। এই অবসরে সমাজতান্ত্রিক দেশগুলির নেতারা নিশ্চয়ই ভারতবর্ষের শান্তি ও জোটনিরপেক্ষতার নীতি সাক্ষাৎ আলোচনার মধ্য দিয়ে আরও ভালভাবে যাচাই করার সুযোগ নিয়েছেন।

আমেরিকায় যুদ্ধবিরোধী বিক্ষোভ প্রদর্শন

মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের রাজধানী ওয়াশিংটনে মার্কিন সমর দপ্তরের সদর কার্যালয় পেনটাগনের সামনে ৮০ হাজার মানুষ যেভাবে ভিয়েতনাম যুদ্ধের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ জানিয়েছেন, সেই ধরনের প্রতিবাদ এর আগে আমেরিকার মাটিতে আর কখনই দেখা যায়নি। ভিয়েতনাম যুদ্ধে আমেরিকা যেভাবে জড়িয়ে পড়েছে এবং যেভাবে সেই যুদ্ধে প্রাণ দেবার জন্য আমেরিকান তরুণদের স্বদেশের মাটি থেকে হাজার হাজার মাইল দূরের অচেনা দেশে পাঠান হচ্ছে, তার বিরুদ্ধে বিক্ষোভ কিছুকাল ধরেই ধূমায়িত হচ্ছিল। এইসব বিক্ষোভকারীর মধ্যে এক-দিকে যেমন শান্তিবাদীরা ছিলেন, তেমনি অন্যদিকে ছিলেন কিছুসংখ্যক কম্যুনিষ্ট ও ট্রটস্কিপন্থী। রেভারেণ্ড মার্টিন লুথার কিং এবং স্টোকলি কারমাইকেলের মত নিগ্রো

নেতারাও এই যুদ্ধের বিরোধী—যদিও কতকটা ভিন্ন ভিন্ন কারণে। রেভারেণ্ড কিং মনে করেন, আমেরিকার নিজের ঘরের ভিতরে যেখানে নিগ্রোরা আজও পুরোপুরি স্বাধীনতা পায়নি, সেখানে অন্যের দেশে স্বাধীনতার জন্য লড়াই করার নৈতিক অধিকার নেই। তাছাড়া, রেভারেণ্ড কিংয়ের মতে, ভিয়েতনাম যুদ্ধের জন্য আমেরিকার যে-টাকাটা খরচ হচ্ছে, সেটা নিগ্রোদের দারিদ্র্য দূর করার কাজে লাগালে সেই খরচটা অনেক সার্থক হত। স্টোকলি কারমাইকেলের মত অধিকতর চরমপন্থী নিগ্রো নেতারা মনে করেন যে, ভিয়েতনাম যুদ্ধ হচ্ছে অশ্বেত-কায়দের উপর শ্বেতকায়দের প্রভুত্ব বজায় রাখার শয়তানী চক্রান্তেরই একটা অংশ। তাছাড়া, এই যুদ্ধবিরোধী আন্দোলনের মধ্যে আছেন আমেরিকার তথাকথিত 'নিউ র‍্যাডিক্যাল' আন্দোলনের সঙ্গে জড়িত ছাত্ররা এবং ভালবাসার শক্তিতে বিশ্বাসী হিপিরা।

এইসব যুদ্ধবিরোধীর সংগঠিত বিক্ষোভ প্রদর্শনের একটা রূপ দেখা গেল গত ২২ অক্টোবর তারিখে আমেরিকার সশস্ত্র শক্তির প্রতীক পেণ্টাগন ভবনের সামনে। এই উপলক্ষে বিক্ষোভপ্রদর্শনকারীদের সঙ্গে সশস্ত্রবাহিনীর যে সংঘর্ষ হয়েছে, তাতে এ-কথা বোঝা গেছে যে, ভবিষ্যতে প্রেসিডেণ্ট জনসনকে যদি ভিয়েতনামের যুদ্ধ চালিয়ে যেতে হয়, তাহলে তাঁকে সেই যুদ্ধ চালাতে হবে তাঁর নিজের ঘরের মধ্যে একটা প্রচণ্ড প্রতিরোধ-আন্দোলনের মোকাবেলা করার সঙ্গে সঙ্গে।

বৈষয়িক প্রসঙ্গ

দেউলিয়া কর্পোরেশন

"কলকাতা কর্পোরেশন যদি ভারতের অগ্রগণ্য কর্পোরেশন হিসেবে তার খ্যাতি বজায় রাখতে চায়, তবে তাকে অবিলম্বে তার জড়ত্ব ত্যাগ করতে হবে।" একথা বলেছিলেন শ্রীসুভাষচন্দ্র বসু ১৯২৮ সালে।

১৯৬৭ সালের জানুয়ারী মাসে কলকাতা মেট্রোপলিটান পরিকল্পনা সংক্রান্ত একটি আন্তর্জাতিক আলোচনা চক্রের রিপোর্ট: "মানবতার অনুরূপ অধঃপতন আমরা পৃথিবীর আর কোন শহরে দেখিনি। অর্থনীতি, আবাসন, জল-নিকাশ, পরিবহন এবং জীবনধারণের অন্যান্য প্রয়োজনের ক্ষেত্রে পৃথিবীর অন্যতম বৃহৎ একটি শহরাঞ্চল দ্রুত বিপর্যয়ের দিকে এগিয়ে চলেছে।"

১৯৬৭ সালের আগস্ট মাসে কলকাতা মেট্রোপলিটান প্ল্যানিং অর্গানিজেশনের একটি রিপোর্ট: "কলকাতা কর্পোরেশন আজ ভেঙে পড়বার মুখে এসে দাঁড়িয়েছে। কর্মীদের বেতন দেবার মত টাকা তার হাতে নেই। কাজকর্ম বজায় রাখা অসম্ভব হয়ে পড়েছে। জল সরবরাহ যে-কোন সময় ভেঙে পড়তে পারে। আবর্জনা অপসারণের কাজ দিনকে দিন খারাপ হচ্ছে। রাস্তাগুলি গর্তে ভর্তি। আর্থিক দিক দিয়ে কর্পোরেশন প্রায় দেউলিয়া।"

গত ১৯ অকটোবর কর্পোরেশনের নতুন কমিশনার শ্রীদুলালগোপাল মুখোপাধ্যায়ের মন্তব্য: অন্তত ৬০ লাখ টাকা কর্পোরেশনের এখুনি চাই; নইলে কাজকর্ম করা তো দূরে থাক, কর্মীদের বেতন পর্যন্ত দেওয়া সম্ভব হবে না।

মাত্র ৬০ লাখ টাকার জন্যে কলকাতা কর্পোরেশনের মত একটি বিরাট প্রতিষ্ঠান অচলাবস্থার মুখে এসে দাঁড়িয়েছে। এই প্রতিষ্ঠান তার জড়ত্ব আজো পরিত্যাগ করতে পারেনি, আর তার ফল কি দাঁড়িয়েছে সেটা একটি তথ্য থেকেই বোঝা যাবে।

এই সঙ্কট কেন এবং তার প্রতিকার কি, সি-এম-পি-ওর সমীক্ষা রিপোর্টে তা বিশদভাবে আলোচনা করা হয়েছে। 'কলকাতা কর্পোরেশনে সঙ্কট' এই শিরোনামায় ঐ রিপোর্টে দেখানো হয়েছে যে, কর্পোরেশনের এই সঙ্কট মোটেই সাময়িক নয়, রাজ্য সরকারের সাময়িক সাহায্যে এই সঙ্কট কখনই উত্তীর্ণ হওয়া যাবে না। সঙ্কটের বীজ রয়েছে কর্পোরেশনের বর্তমান ব্যবস্থাপনা ও নিয়মকানুনের মধ্যেই। সুতরাং বিপদ থেকে উদ্ধার পেতে হলে ঐ ব্যবস্থাপনা ও নিয়মকানুনের পরিবর্তন করা দরকার।"

সমীক্ষা রিপোর্ট থেকে কর্পোরেশনের আর্থিক সঙ্কটের চারটি কারণের কথা জানা যায়: (১) এস্টাব্লিশমেণ্ট, অর্থাৎ কর্মীদের বেতন, ভাতা ইত্যাদি খাতে খরচা এত বেড়ে গেছে যে, বাজেটকে আর নমনীয় রাখা সম্ভব হচ্ছে না। ১৯৬৩-৬৪ সালের বাজেটে মোট ৮ কোটি ৫ লক্ষ টাকার বরাদ্দের মধ্যে ৪ কোটি ২০ লক্ষ টাকা, অর্থাৎ শতকরা ৫১ ভাগই, এস্টাব্লিশমেণ্ট খাতে ব্যয় করতে হয়েছিল। ১৯৬৭-৬৮ সালের বাজেটেও একই গতি লক্ষ্য করা যাচ্ছে: মোট ১৪ কোটি ৩৬ লক্ষ টাকা বরাদ্দের মধ্যে ৭ কোটি ২০ লক্ষ টাকা, অর্থাৎ ৫০ শতাংশই, এস্টাব্লিশমেণ্ট খাতে ধরা হয়েছে।
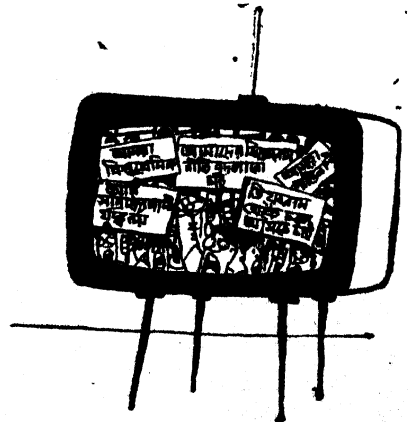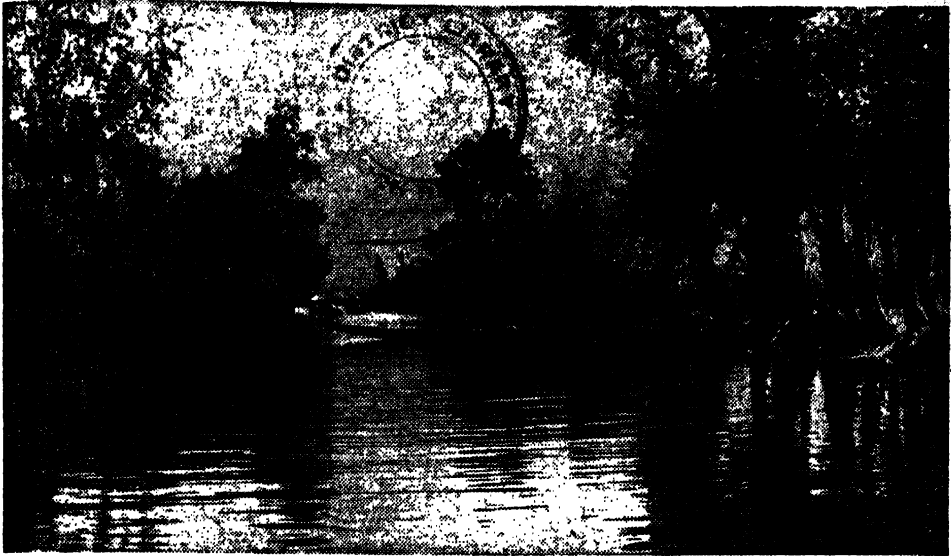
ফটো : পার্থসারথ

(২) এর ফলে অনেক জরুরী কাজকর্মই অনির্দিষ্টকালের জন্যে স্থগিত থাকছে।

(৩) তাতে শুধু যে জরুরী ব্যবস্থাগুলি দিনের পর দিন খারাপই হয়ে যাচ্ছে তা-ই নয়, যখন শেষ পর্যন্ত কাজ হাতে নেওয়া হচ্ছে, তখন দেখা যাচ্ছে খরচা এত বেড়ে গেছে যে ভালোভাবে কাজ করাই আর সম্ভব নয়। সুতরাং আবার জোড়াতালি।

(৪) রাজস্ব খাতে কর্পোরেশনের উদ্বৃত্ত এত কমে গেছে যে, তার ঋণ গ্রহণের, সুতরাং মূলধনী খাতে ব্যয়ের, সুযোগও সঙ্কুচিত হয়ে গেছে। গত চার বছরে কর্পোরেশন কোন নতুন ঋণ আদায় করতে পারেনি। বাজেটের যে ১২ শতাংশ ঋণ-পরিশোধের জন্যে বরাদ্দ করা হয়, তা বকেয়া দায় মেটাতেই নিঃশেষ। সুতরাং নতুন ঋণের দায় মেটাতে অন্যান্য খাতে খরচার ওপর হাত দিতেই হয়। কিন্তু সে সম্ভাবনাও দ্রুত নিঃশেষ হয়ে আসছে।

এ এক মারাত্মক অশুভ চক্র। কর্পোরেশন এখন যেভাবে চলছে সেভাবে চলতে থাকলে এই চক্রের হাত থেকে তার উদ্ধারের কোন আশাই নেই। উদ্ধার পেতে হলে দুটি সংস্কার অবিলম্বে করতে হবে : এক, আয়ের নতুন সূত্র আবিষ্কার করতে হবে; দুই, ব্যবস্থাপনাকে ঢেলে সাজাতে হবে।

কর্পোরেশনের আয়ের বর্তমান সূত্র চারটি : (১) সাহায্য। তৃতীয় পরিকল্পনা-কালে কর্পোরেশনের আয় বেশ দ্রুতই বেড়েছিল। তার মধ্যে দ্রুততম বৃদ্ধি ঘটেছিল সাহায্য অংশের। (২) সম্পত্তি ও অন্যান্য কর। সম্পত্তি কর এখনও কর্পোরেশনের আয়ের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ সূত্র, কিন্তু মোট আয় যে হারে বেড়েছে এই কর মোটেই সেই হারে বাড়েনি। অন্যান্য কর আয়ের মাত্র ৫ শতাংশ জোগায়। এক্ষেত্রে কিছুটা উন্নতি লক্ষ্য করা গেলেও অবস্থা সন্তোষজনক বলা যায় না।

(৩) কর্পোরেশনের সম্পত্তি বাবদ ভাড়া। বহু বছর এই সূত্রে আয় একদম বাড়েনি।

(৪) ঋণ গ্রহণ। এর সুযোগ কিভাবে সঙ্কুচিত হয়ে আসছে, সেটা ইতিপূর্বেই দেখানো হয়েছে।

আয়ের এই সূত্রগুলিকে সঞ্জীবিত করে কর্পোরেশনকে আর্থিক সঙ্কট থেকে অনেকটা মুক্ত করার জন্যে সমীক্ষা-রিপোর্টে কতগুলি প্রস্তাব করা হয়েছে।

(১) সি-এম-পি-ও মনে করে যে, যে পদ্ধতিতে রাজ্য সরকার কর্পোরেশনকে সাহায্য দিয়ে আসছেন সেটা যুক্তিসঙ্গতও নয়, কাজেরও নয়। একটি নতুন সাহায্য নীতি উদ্ভাবন করা দরকার যাতে কর্পোরেশন জনসংখ্যার তুলনায় প্রয়োজনের ভিত্তিতে একটি মূল সাহায্য পায়। এই মূল সাহায্য ছাড়াও বিভিন্ন বিভাগের কাজকর্মের বিচার করে রাজ্য সরকার বিশেষ সাহায্য দেবেন।

(২) সম্পত্তি কর বর্তমানে তিনটি ত্রুটির জন্যে কার্যকর হতে পারছে না : এক, ভুল এসেসমেণ্ট; দুই, অদক্ষ আদায়; তিন, অযৌক্তিক কর-হার।

এই ত্রুটিগুলি দূর করার জন্যে রিপোর্টে একটি কেন্দ্রীয় এসেসমেণ্ট দপ্তর খোলার প্রস্তাব করা হয়েছে। এই দপ্তর রাজনীতির প্রভাবমুক্ত ও কারিগরী দিক দিয়ে দক্ষ ব্যক্তিদের নিয়ে গঠিত হবে। সমস্ত স্থানীয় সংস্থা তাদের এসেসমেণ্টের কাজ এই কেন্দ্রীয় সংস্থার হাতে তুলে দেবে।

পেশা ইত্যাদির ওপর কর জয়েণ্ট স্টক কোম্পানীর বেলায় ভারতের অন্যান্য স্থানে প্রচলিত অনুরূপ করের সঙ্গে সমতা আনার জন্যে বাড়াতে হবে। অন্যান্যদের ক্ষেত্রে ব্যক্তিগত আয়ই হবে ভিত্তি। গাড়ীর বেলায় গাড়ী পিছু একটা সাধারণ হার ধার্য করতে হবে।

বাজারে দোকানের জায়গা প্রতি দু'বছর পর পর নীলাম করতে হবে।

(৩) সেই সঙ্গে করের নতুন সূত্রেরও সন্ধান করতে হবে। যেমন, অকট্রয়—অর্থাৎ পৌর এলাকার প্রবেশকারী মালপত্রের ওপর কর—ও বিক্রয় করের ওপর সারচার্জ। কিন্তু যেহেতু অকট্রয় সংগ্রহ করা কলকাতার পরিপ্রেক্ষিতে দুরূহ ও ব্যয়সাধ্য ব্যাপার, সেইজন্যে বিক্রয় করের ওপর সারচার্জ ধার্য করার ওপরেই রিপোর্টে বেশী জোর দেওয়া হয়েছে।

এছাড়া যে-সব কর্মনিরত ব্যক্তি পেশা ইত্যাদি বাবদ কর দেন না, তাঁদের ওপর চাকুরী কর ধার্য করার কথা বলা হয়েছে। বর্তমানে উন্মুক্ত জমির ওপর এক-চতুর্থাংশ হারে কর আদায় করা হয়ে থাকে। রিপোর্টে তার বদলে পুরো সম্পত্তি করের হারে কর আদায়ের কথা বলা হয়েছে।

রিপোর্টের দ্বিতীয় দফার সুপারিশ হল প্রশাসনিক সংস্কার সম্পর্কে। এটা আজ পরিষ্কার হয়ে গেছে যে, ১৯৫৯ সালের পৌর আইন কার্যকর হতে পারে। সি-এম-পি-ও মনে করে যে, পৌরশাসনের ক্ষেত্রে একটি ক্যাবিনেট ধরনের 'সরকার' গঠন করা দরকার। সংখ্যাগরিষ্ঠ দল সরকার গঠন করবেন, এবং ঐ দলের প্রত্যেক সদস্যের ওপর একটি বিশেষ বিভাগের ভার থাকবে। এতে কাউন্সিলাররা অনেক বেশী দায়িত্বসম্পন্ন হবেন।

ভেনাস—৪ ও শুক্রগ্রহ

দিলীপ বসু

" তুমি প্রভাতের শুকতারা
আপন পরিচয় পাল্টিয়ে দিয়ে
কখনো বা তুমি দেখা দাও
গোধূলির দেহলিতে,
এই কথা বলে জ্যোতিষী।"

আসলে শুক্র বা সাঁঝের 'তারা' হলো আমাদের শুক্রগ্রহ এবং মোটেই তারকা বা নক্ষত্র নয়, রবীন্দ্রনাথেরই ভাষায় সূর্য-বন্দনার প্রদক্ষিণপথে—তুমি পৃথিবীর সহযাত্রী।'

আকারে পৃথিবীর যমজ ভগিনী, কিন্তু বড়ো রহস্যময়ী এই গ্রহ। কারণ শুক্রগ্রহকে ঘিরে রয়েছে ঘন মেঘের আবরণ, মেঘকে ভেদ করে এতোদিন আমাদের টেলিস-কোপের দৃষ্টি শুক্রের জমি অবধি পৌঁছয়নি। ঐ মেঘের বর্ণালী বিন্যাস করে কেবল জানা ছিল যে, শুক্রের মেঘ একেবারে কারবন ডাই-অক্সাইডে ভর্তি, আর আছে সামান্য জলকণা, কিন্তু এতোদিন অক্সিজেনের কোনো সন্ধান পাওয়া যায়নি।

প্রাণসৃষ্টির এলাকা

বৈজ্ঞানিক মহলে দারুণ তর্ক, শুক্রে প্রাণসৃষ্টি হয়েছে কি, না? দুই দলের মত একেবারে উগ্র রকমের বিপরীত।

আসলে প্রাণের সৃষ্টির জন্য যে সম-পরিমাণের তাপমাত্রার দরকার সেটা সূর্য থেকে একটা নির্দিষ্ট দূরত্বে গেলেই মাত্র পাওয়া যেতে পারে। সূর্যের একেবারে কোলের কাছে, সাড়ে তিন কোটি মাইল দূরে রয়েছে বুধগ্রহ; অতএব দারুণ গরম সেখানে এবং প্রাণসৃষ্টি হওয়া সম্ভব নয়।

তার পরে শুক্র, পৃথিবী ও মঙ্গল গ্রহ রয়েছে যথাক্রমে ছয় কোটি, নয় কোটি ত্রিশ লক্ষ এবং চৌদ্দ কোটি মাইল দূরে। এখানে সূর্য থেকে যে পরিমাণে উত্তাপ পাওয়া যাচ্ছে, তাতে প্রাণসৃষ্টি সম্ভব— প্রমাণ পৃথিবী।

তারপরে সাতাশ কোটি মাইল দূরে বৃহস্পতি, তারপর আরো দূরে শনি, তার-পর আরো দূরে দূরে সাজানো রয়েছে যথাক্রমে ইউরেনাস, নেপচুন ও প্লুটো গ্রহ— বলাবাহুল্য, অত্যাধিক ঠান্ডা বলে এইসব কোনো গ্রহেই প্রাণসৃষ্টি সম্ভব নয়।

তাহলে আমাদের সৌরজগতে প্রাণ-সৃষ্টির উপযুক্ত এলাকাতে একমাত্র শুক্র, পৃথিবী ও মঙ্গল গ্রহগুলি বর্তমান— অর্থাৎ সূর্যের ছয় থেকে চৌদ্দ কোটি মাইল বিস্তৃত অঞ্চলটিকে যেন 'লাইফ-বেল্ট' বা প্রাণের বলয়রেখা বলা যেতে পারে।

অতএব পৃথিবীর দুই প্রতিবেশী— শুক্র ও মঙ্গল গ্রহকে জানবার কৌতূহল আমাদের অদম্য।

মঙ্গলের আকাশ বা আবহমন্ডল বেশ পরিষ্কার বলে আমরা অনেক কিছুই জানি এবং প্রায় জোর করেই বলতে পারি সেখানে বেশ নিকৃষ্ট ধরনের উদ্ভিতজাতীয় প্রাণ থাকলেও, উন্নত বুদ্ধিমান প্রাণীর হয়তো সৃষ্টিই হয়নি, হলেও আজ তাদের অস্তিত্ব একেবারে লুপ্ত।

শুক্রগ্রহের সম্পর্কে দুই মত

আগেই উল্লেখ করা হয়েছে শুক্রগ্রহের ঘন মেঘের আবরণে আমরা পাচ্ছি—কারবন ডাই-অক্সাইড ও কিছু জলকণা। আজ থেকে চার হাজার কোটি বছর পূর্বে প্রাণ-লীলার প্রত্যূষে পৃথিবীর আবহমন্ডলের অবস্থাও ছিল অনুরূপ। শুনতে একটু আশ্চর্য লাগলেও একথা ঠিক যে, আমাদের বায়ুমন্ডলের শতকরা যে একুশ ভাগ অক্সি-জেনের কল্যাণে আমরা বেঁচে আছি, তার কিছুই আদিম পৃথিবীর আবহমন্ডলে গোড়াগুড়ি ছিল না। সবটাই তৈরী হয়েছে উদ্ভিদের দ্বারা। কিরকম?

আমরা জানি, উদ্ভিদ সূর্যালোকের সাহায্যে কারবন ডাই-অক্সাইড গ্রহণ করে অক্সিজেন রূপে ফেরত দেয়। প্রক্রিয়াটির নাম দেওয়া হয়েছে সালোক-সংশ্লেষ।

কাজেই ঘন কারবন ডাই-অক্সাইডে ভর্তি মেঘ ও জলকণা শুক্রগ্রহে দেখে আমাদের মনে হওয়া স্বাভাবিক যে, ঐ মেঘ-পুঞ্জের নীচে রয়েছে বহু উদ্ভিদ-সম্বলিত বাষ্পকুল অরণ্যানী।

বিপরীত মতাবলম্বীরা বলছেন, শুক্রগ্রহে তাপমাত্রা এতো বেশী যে, প্রাণসৃষ্টি হওয়া সম্ভব নয়। বেশী হবার কারণ নিশ্চয়ই, শুক্র পৃথিবীর অপেক্ষা সূর্যের আরো তিন কোটি মাইল নিকটে। তাছাড়াও শুক্রদেহে সূর্যের তাপ বিকীরিত হয়ে পালিয়ে যেতে

ভেনাস-চার

পারে না, উপগ্রহের ঘন মেঘপুঞ্জের চাদরে যেন আটকে যায়। একে চলতি ইংরাজিতে বলে 'hot house effect'।

তাপমাত্রা অত্যধিক হলে প্রাণসৃষ্টি না হয়ে ধূসর রুক্ষ প্রাণহীন মরুভূমি আকারই সম্ভাবনা বেশী।

সোভিয়েট ভিনাস-৪ রকেট

প্রেমের অধিষ্ঠাত্রী দেবী হলেন ভিনাস বা শুক্র। সত্যই চিরকাল যেন ঘোমটার আড়ালে মুখটি ঢাকা। প্রেমের পূজারী মানুষও তাই ভিনাসের মুখদর্শন করতে এতো আগ্রহশীল। এই নিয়ে পর পর গুটি চারেক সোভিয়েত ও আমেরিকান প্রচেষ্টা হয়েছে। আমেরিকার ম্যারিনার ও সোভিয়েতের ভিনাস রকেটগুলির একটি বাদে সবকটিই শুক্রগ্রহের কয়েক হাজার মাইল পাশ কাটিয়ে যাবার সময় তাপমাত্রার হিসাব পাঠিয়েছিল। প্রাণসৃষ্টির পক্ষে বেশ বেশী।

কয়েকদিন পূর্বে সোভিয়েতের ভিনাস-৪ রকেটকে শুক্রগ্রহের জমিতে নিরাপদে অবতরণ করিয়ে অদ্ভুত বৈজ্ঞানিক কৃতিত্বের পরিচয় দেওয়া হয়েছে। কারণ পৃথিবী ও শুক্রগ্রহ, দুই-ই ভ্রাম্যমাণ—তাছাড়া পৃথিবী থেকে শুক্রে যেতে হবে সূর্যের চতুর্দিকে ঘূর্ণনের উপবৃত্তাকার কক্ষপথে। তৃতীয়ত, শুক্র পৃথিবী অপেক্ষা আরো বেশী দ্রুতগামী বলে পৃথিবী থেকে শুক্রের কক্ষপথে পৌঁছে রকেটের গতিবেগকে বাড়িয়ে শুক্রের সমান করতে পারলে তবেই শুক্রে অবতরণ সম্ভব। চতুর্থত নিরাপদে অবতরণের জন্য যথাসময়ে নির্দিষ্ট প্যারাসুট খুলতে হবে।

এ সবই পৃথিবীতে বসে কয়েক কোটি মাইল তফাৎ থেকে দূর-নিয়ন্ত্রণের সাহায্যে করা হয়েছে। এবং মনে রাখতে হবে রকেটটিও ছিল ভ্রাম্যমাণ। ঘটনাটি যে খুবই কৃতিত্বের তা সবাই একবাক্যে স্বীকার করেছেন।

স্মরণ করতে পারি কবির উক্তি,—'আমাদের অজ্ঞাত ঋতুপর্যায়ের আবর্তন তোমার জলে স্থলে বায়ুমণ্ডলীতে রচনা করেছে সৃষ্টি-বৈচিত্র্য। তোমার সেই একেশ্বর যজ্ঞে আমাদের নিমন্ত্রণ নেই, আমাদের প্রবেশদ্বার রুদ্ধ।'

মানুষের বিজ্ঞান আজ সেই শুক্রের একেশ্বর যজ্ঞের রুদ্ধ প্রবেশদ্বার অর্গলমুক্ত করে ঘন কুজ্ঝটিকাময় মেঘের আবরণের তলায় শুক্রের জমি ও বায়ুমণ্ডলের খবর পেয়েছে। তাতে এইটুকু বলতে পারি যে, শুক্রে প্রাণের সৃষ্টি এখনও হয়নি।

শুভঙ্কর

বাক্-সংশ্লেষণে যন্ত্র

সংশ্লেষণ পদ্ধতিতে বিজ্ঞানীরা প্রকৃতির বহু বস্তুর প্রতিরূপ গড়ে তুলেছেন ও তুলছেন। তাঁরা এমন সব যন্ত্র উদ্ভাবন করেছেন যা মানুষের স্মরণ মনন ইত্যাদি বৈশিষ্ট্য পর্যন্ত আয়ত্ত করতে পেরেছে। কিন্তু মানুষের বাক্শক্তি যন্ত্র এখনও আয়ত্ত করতে পারে নি। তবে বিজ্ঞান ও প্রযুক্তিবিদ্যার, বিশেষ করে ইলেকট্রনিকস্ বিদ্যার যে দ্রুত প্রগতি সাধিত হচ্ছে তাতে যন্ত্রের পক্ষে বাক্শক্তি অর্জন করতে আর খুব বেশি দিন লাগবে না।

ইতিমধ্যেই মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে এমন একটি ইলেকট্রনিক যন্ত্র উদ্ভাবিত হয়েছে, যা নির্ভুলভাবে বাক্সংশ্লেষণ করতে পারে। এখন পর্যন্ত এই পদ্ধতিতে কেবল শব্দবিশেষ সৃষ্টি করা যাচ্ছে। কিন্তু বিজ্ঞানীরা এই পদ্ধতির এমন উন্নতিসাধনের চেষ্টা করছেন, যার ফলে শেষ পর্যন্ত শব্দাংশ, পূর্ণাঙ্গ শব্দ ও বাক্যও সংশ্লেষণ করা যাবে। এই ধরনের 'বাক্পটু যন্ত্র' যখন বাস্তবে দেখা দেবে, তখন সেগুলি নিছক খেলার সামগ্রী হবে না। কত ক্ষেত্রে যে সেগুলিকে ব্যবহার করা যাবে তা দেখে বিস্মিত হতে হবে।

একটা উদাহরণ এখানে উল্লেখ করা যেতে পারে। কমপ্যুটারের সঙ্গে যুক্ত হয়ে এই বাক্পটু যন্ত্র কমপ্যুটারে রক্ষিত বা সৃষ্ট তথ্য 'পড়ে' দিতে পারবে। এইভাবে সাধারণ লোকের কাছে কমপ্যুটার ব্যবহারের পথ সরাসরি খুলে যাবে।

বর্তমানে কমপ্যুটার-বিশেষজ্ঞরা কমপ্যুটারের সাংকেতিক সূত্র ভাষায় পরিবর্তিত করেন। তবে কোনো কোনো কমপ্যুটার ইতিমধ্যেই টেপ-রেকর্ড-করা কিছু নির্বাচিত শব্দ কথায় প্রকাশ করে উত্তর দেয়। কিন্তু কমপ্যুটার আপনা থেকে কোনো শব্দ এখনও পর্যন্ত সৃষ্টি করতে পারে নি।

সম্প্রতি মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের শব্দতাত্ত্বিক সমিতির এক সভায় ডঃ সিসিল কোকার্ নতুন পদ্ধতির বিশদ বিবরণ প্রদান করেন। প্রথমে স্বেচ্ছাব্রতীদের শব্দনালীর এক্স-রশ্মি আলোকচিত্র গ্রহণ করে বিভিন্ন মৌলিক শব্দ উচ্চারণে স্বরযন্ত্রের যথাযথ অবস্থা নথিভুক্ত করা হয়। তারপর এই বিবরণগুলি একটি কমপ্যুটারে সংরক্ষণ করে রাখা হয়।

যখন কোনো গবেষক এই মৌলিক শব্দগুলির কোনো একটি পেতে চান, তখন তিনি কমপ্যুটারকে সক্রিয় করে তোলেন। একটি সংযুক্ত টেলিভিশন পর্দায় স্বরনালীর রেখাচিত্র ফুটে ওঠে। এই রেখাচিত্র দেখে সেই নির্দিষ্ট শব্দটি উচ্চারণে স্বরযন্ত্রের অবস্থা উপলব্ধি করা যায়।

গবেষক যখন এই রেখাচিত্র পর্যবেক্ষণ করতে থাকেন, তখন একই সময়ে বাক্-সংশ্লেষক যন্ত্র থেকে সেই শব্দটির 'উচ্চারণ' শুনতে পান। সংযোগ-সুইচ চালিয়ে ও কমপ্যুটারের বোতাম টিপে তিনি পর্দায় উদ্ভাসিত রেখাচিত্রের আকৃতি পরিবর্তন করতে পারেন এবং স্বরযন্ত্রের পরিবর্তিত অবস্থার অনুরূপ শব্দগুলিও সঙ্গে সঙ্গে শুনতে পান।

ঠিক মানুষের মতো করে যন্ত্রের কথা বলার পক্ষে এখনও অনেক সমস্যা আছে। বিজ্ঞানীরা বর্তমানে সেসব সমস্যার সমাধানে ব্যাপৃত রয়েছেন। যন্ত্র যাতে মানুষের মতো শব্দাংশ ও সম্পূর্ণ শব্দ যথাযথভাবে উচ্চারণ করতে পারে, সে জন্য তাঁরা যন্ত্রের নানা উন্নতি সাধনের চেষ্টা করছেন।

এক্ষেত্রে একটি সাম্প্রতিক উদ্ভাবন হচ্ছে, 'স্পিচ কম্প্রেশন' বা বাক্-সংরক্ষণ অর্থাৎ রেকর্ড-করা কথা পুনঃউচ্চারণের গতি কয়েক গুণ এমনভাবে বাড়িয়ে দেওয়া যাতে মানুষের স্বাভাবিক কণ্ঠস্বরের মতো কথাগুলি উচ্চারিত হয়। সাধারণত রেকর্ড-করা কথায় পুনঃউচ্চারণের গতি বাড়ালে শব্দগুলির তীক্ষ্ণতা এত বেড়ে যায় যে তাতে কথাগুলি বিকৃত শোনায়। নতুন উদ্ভাবিত পদ্ধতিতে তা হয় না। এই পদ্ধতি ইনফরমেশন রেট চেঞ্জার নামে অভিহিত। এই পদ্ধতির সাহায্যে রেকর্ড-করা বক্তৃতা বা কথোপকথন অল্প সময়ে শোনা যাবে, কিন্তু শোনবার পক্ষে কোনো অসুবিধা হবে না।

বিজ্ঞানীরা পর্যবেক্ষণ করে দেখেছেন, কোনো কোনো প্রাণীর ক্ষেত্রে উচ্চারণ ও শব্দ বিনিময় মানুষের চেয়ে দ্রুত হয়ে থাকে, কিন্তু তুলনামূলক বিচারে তা মানুষের চেয়ে ভালোভাবে হয়। বিজ্ঞানীরা আশা করছেন, বাক্-সংক্ষেপণ পদ্ধতি অপরাপর প্রাণীর সঙ্গে মানুষের বাক্-বিনিময়ের সুযোগ এনে দেবে। এমন কি ব্রহ্মাণ্ডের অন্যত্র যদি প্রাণীর সন্ধান পাওয়া যায়, তাদের সঙ্গেও বাক্-বিনিময় করা সম্ভব হবে এই পদ্ধতিতে।

এই পদ্ধতি সম্পূর্ণ হয়ে উঠলে রোগনির্ণয়ে তার ব্যাপক প্রয়োগ হবে। রোগীকে নিয়মমাফিক পরীক্ষার সময় তার কথা টেপে রেকর্ড করা হবে। এই টেপ-রেকর্ড কমপ্যুটারে ভরে দেওয়া হবে এবং সেখানে রোগীর কথাগুলির বিশ্লেষণ করে ১০ সেকেণ্ডের মধ্যে রোগের নিদান মুদ্রিতাকারে বেরিয়ে আসবে। এটা সম্ভব, কারণ কয়েকটি স্নায়বিক রোগে বাক্-বৈশিষ্ট্য নানাভাবে পরিবর্তিত হয়ে থাকে। কিন্তু পরিবর্তন এত সূক্ষ্ম যে কমপ্যুটার ছাড়া তা বিশ্লেষণ করা যায় না।

বাক্-পটু যন্ত্র পরিপূর্ণভাবে নির্মিত হলে নানা দিক থেকে তা মানুষের পক্ষে বিশেষ সহায়ক হবে বলে বিজ্ঞানীরা মনে করেন। তাই তাঁরা এই যন্ত্রকে পরিপূর্ণ রূপ দেবার জন্যে গভীরভাবে মনোনিবেশ করেছেন।

প্রেক্ষাগৃহ

আজকের কথা :

"প্রেক্ষাগৃহ"-এর অগণিত পাঠকপাঠিকা ও শুভানুধ্যায়ীদের বিজয়া উপলক্ষ্যে আন্তরিক শুভেচ্ছা জানাই ও সর্বাঙ্গীণ মঙ্গল কামনা করি।

চলচ্চিত্রের আদর্শ ও দায়িত্ব সম্পর্কে রাষ্ট্রপতি :

১৯৬৭ সালের চলচ্চিত্র পুরস্কার বিতরণ অনুষ্ঠানে ভারতের রাষ্ট্রপতি ডঃ জাকির হোসেন তাঁর ভাষণ প্রসঙ্গে ভারতের চলচ্চিত্র নির্মাতাদের কাছে যে আবেদন জানান, তা যেমন সময়োচিত, তেমনই গুরুত্বপূর্ণ। বিশেষ করে বর্তমানের হিন্দী ছবিগুলিতে যে ধরনের কাহিনী বর্ণিত হতে দেখা যায়, বোধ করি, তারই প্রতি অঙ্গুলি নির্দেশ করে তিনি বলেছেন : "সত্য বটে, চলচ্চিত্রের প্রধান উদ্দেশ্য চিত্তবিনোদন; কিন্তু তাই করতে গিয়ে চলচ্চিত্রের দর্শকদের বাস্তব জীবন থেকে দূরে সরিয়ে নিয়ে যাওয়া উচিত নয়। চলচ্চিত্রের লক্ষ্য হওয়া উচিত, বর্তমানের জটিল সমাজব্যবস্থাকে খুটিয়ে দেখার মতো দৃষ্টিভঙ্গী দর্শকদের মধ্যে জাগিয়ে তোলা। একটি ভালো চলচ্চিত্রের কাজ হচ্ছে, দর্শকদের সীমাবদ্ধ ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতা নূতন পরিসরে স্থাপন করা এবং তার পারিপার্শ্বিক জীবনধারা সম্পর্কে তার চোখের সামনে একটি পরিপূর্ণ চিত্র তুলে ধরা।

রাষ্ট্রপতি বলেন : প্রাক্-স্বাধীনতা যুগে বহু সম্প্রদায় অধ্যুষিত এবং আপাত-অনৈক্য জর্জরিত এই বিরাট দেশে জাতীয় ঐক্য ও সংহতি বজায় রাখতে এবং তাকে শক্তিশালী করে তুলতে আমাদের চলচ্চিত্র গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা গ্রহণ করেছিল। আমি আশা করি, সেই মহান ঐতিহ্য অনুসরণ করে বর্তমানের নূতন পরিস্থিতিতে আমাদের জাতীয় চলচ্চিত্র জাতীয় সংহতির উন্নতি-কল্পে সেই একই মনোভাব ও ভাবধারা দ্বারা অনুপ্রাণিত হবে।

তিনি আরও বলেন : সূচনার দিন থেকেই ভারতীয় চলচ্চিত্র আমাদের সামাজিক সমস্যাবলীর প্রতি দৃষ্টি নিক্ষেপ করেছে। লোকশিক্ষার এই শক্তিশালী মাধ্যমটি কাহিনীর ভিতর দিয়ে নানা সামাজিক সমস্যার অবতারণা ও তাদের সুষ্ঠু সমাধানের পথনির্দেশ ক'রে দর্শকসাধারণ, তথা বৃহত্তর জনসাধারণের ওপর অত্যন্ত নীরবে একটি শক্তিশালী প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি করেছে। এই-ভাবেই চলচ্চিত্র সমাজজীবনের একটি অবিচ্ছেদ্য অঙ্গ এবং দর্পণস্বরূপ হয়ে পড়েছে। কিন্তু মাত্র সমাজজীবনের দর্পণ না হয়ে আমাদের জাতীয় চলচ্চিত্রকে জন-সাধারণের মধ্যে নূতন আগ্রহ-উৎসাহ, নতুন জাগরণ ও নতুন দৃষ্টিভঙ্গীর সঞ্চার করতে

মঙ্গল চক্রবর্তী পরিচালিত 'আলেয়ার আলো' চিত্রের নায়িকা সাবিত্রী চট্টোপাধ্যায়।
ফটো : অমৃত

হবে এবং নতুন ও ফলপ্রসূ চিন্তাধারার প্রবর্তন ক'রে প্রগতিশীল পরিবর্তনের অনুকূল পরিবেশ সৃষ্টি করতে হবে এবং সমসাময়িক সমাজের মূল প্রয়োজনের সঙ্গে সঙ্গতি রক্ষা ক'রে সমাজ বিবর্তনের পথ উন্মুক্ত করতে হবে। এবং এই উদ্দেশ্য সিদ্ধির পথে অগ্রসর হবার জন্যে বর্তমানের প্রচলিত ধারা অনুযায়ী কাহিনীকে কাল্পনিক, অলীক, বিলাসবহুল জীবনের পটভূমিকাতে না রেখে অধিকতর বাস্তব ও যথার্থ জীবনের পটভূমিকাতে বিধৃত করতে অনুরোধ জানাই।

রাষ্ট্রপতি আরও বলেন যে, বিশ্বের বিভিন্ন অঞ্চলে ভারতীয় চলচ্চিত্রের জন-

চিত্রনা থখন ক্রমেই বেড়ে চলেছে এবং ভবিষ্যতে এই সংখ্যা বৃদ্ধি পেতে বাধ্য আশা সম্পারণকে করা যাচ্ছে, তখন এরূপ পরিস্থিতিতে চলচ্চিত্রশিল্প যাতে যথার্থ উন্নতির পথে অগ্রসর হতে পারে, তার জন্যে অনুকূল অর্থনৈতিক ও সামাজিক পরিবেশ সৃষ্টির জন্যে সরকার ও সমাজের যথাসাধ্য চেষ্টা করা কর্তব্য।

অগণিত জনসাধারণের ওপর চলচ্চিত্রের অমোঘ প্রভাব অনস্বীকার্য। এবং এও স্বীকার্য যে, যে-কোনও বিষয়ে শিক্ষাদান চলচ্চিত্রের সাহায্যে যেমন পরিপূর্ণ ও সুষ্ঠুভাবে সম্ভব, তেমন আর অন্য কোনোও শিল্পমাধ্যমের দ্বারা সম্ভব নয়। ইতিহাস, ভূগোল, শল্যচিকিৎসা, ভূতত্ত্ব, নৃতত্ত্ব, কারিগরীবিদ্যা প্রভৃতি থেকে শুরু করে বৈজ্ঞানিক প্রক্রিয়া, যুদ্ধবিদ্যা, রাজনীতি, সমাজনীতি পর্যন্ত সর্ব বিষয়ে মানুষের পুঁথিগত ও ব্যবহারিক বা ফলিত বিদ্যাকে দৃঢ় ভিত্তির ওপর দাঁড় করাবার জন্যে আজ চলচ্চিত্রের প্রয়োজনীয়তা সর্বজনবিদিত। জাতি গঠনের কাজে এই শক্তিশালী মাধ্যমটিকে সোভিয়েট রাশিয়ার জনক লেনিন কি সার্থকভাবে ব্যবহার করেছিলেন, তাও বোধ করি কারুর অজানা নেই। জগতের বৃহত্তর গণতান্ত্রিক জাতির নাগরিক হিসেবে আমরা যদিও চলচ্চিত্রশিল্পকে পুরোপুরি সরকারী নিয়ন্ত্রাধীনে আনবার পক্ষপাতী নই, তবু আমরা বলব, আজ যে-রকম যথেচ্ছ ও দায়িত্বজ্ঞানহীনভাবে মাত্র অর্থ উপার্জনের দিকে লক্ষ্য রেখে সাধারণ দর্শক মনোরঞ্জক চলচ্চিত্র তৈরী হচ্ছে, তা' অচিরেই বন্ধ হওয়া প্রয়োজন। এমন কোনো চলচ্চিত্রই আজ আমাদের দেশে তৈরী হওয়া উচিত নয়, যা দেখে আমাদের দেশের একজন নাগরিকেরও অন্তত মনের দিক দিয়েও কোনো রকম ক্ষতি হতে পারে। অথচ আজ এমন বহু ছবিই আমরা হামেশা মুক্তিলাভ করতে দেখছি, যা পুরোপুরিভাবে মানুষের পলায়নী মনোবৃত্তির (এস্‌কেপিজম্‌) সহায়ক এবং অধিকাংশ ক্ষেত্রেই হীন যৌনবৃত্তির উত্তেজক। এ-অবস্থায় লক্ষ লক্ষ মানুষের মনকে দায়িত্বশীলভাবে প্রভাবিত করবার অধিকার অর্জনের জন্যে চলচ্চিত্র প্রযোজক ও পরিচালকদের সম্বন্ধে উপযুক্ত আইন বিধিবন্ধ করার প্রয়োজনীয়তাকে কোনোক্রমেই অস্বীকার করা যায় না। এর দ্বারা ভারতীয় নাগরিকের সংবিধানসম্মত মৌল অধিকার ক্ষুণ্ণ হবার কথা যাঁরা উত্থাপন করবেন, তাঁরা নিশ্চয়ই ভারতীয় চলচ্চিত্রকে স্বমর্যাদায় প্রতিষ্ঠিত দেখতে চান না।

কিন্তু মাত্র এই প্রস্তাবিত আইন বিধিবন্ধ করলেই সরকারের সমস্ত দায়িত্ব শেষ হবে না। রাষ্ট্রপতি বলেছেন, "চলচ্চিত্রশিল্প যাতে যথার্থ উন্নতির পথে অগ্রসর হতে পারে, তার জন্যে অনুকূল অর্থনৈতিক ও সামাজিক পরিবেশ সৃষ্টির জন্যে সরকার ও সমাজের যথাসাধ্য চেষ্টা করা কর্তব্য।" পুরস্কার বিতরণ দ্বারাই সরকারের "যথাসাধ্য চেষ্টা"র পরিসমাপ্তি ঘটে না। সৎ ও সার্থক চলচ্চিত্র সৃষ্টির প্রয়াসকে উৎসাহ ও স্বীকৃত করবার জন্যে সরকারী সাহায্য (সাবসাইডী) ও ঋণ দেওয়ার স্থায়ী ব্যবস্থা যেমন করা দরকার, তেমনই প্রয়োজন চলচ্চিত্রশিল্পকে অযথা করভার থেকে অচিরেই মুক্ত করা এবং ঐ সঙ্গে চলচ্চিত্রের বহুল প্রচার ও প্রদর্শনীর জন্যে প্রচুর সংখ্যক চিত্রগৃহ নির্মাণের একটি সর্বভারতীয় পরিকল্পনা গ্রহণ করা। দেশে সকল রকম কাঁচা ফিল্ম প্রস্তুতের ব্যবস্থাকে ত্বরান্বিত করার সঙ্গে সঙ্গে চলচ্চিত্রশিল্পের জন্যে প্রয়োজনীয় ক্যামেরা, রেকর্ডিং মেশিন, পরিস্ফুটন ও মুদ্রণযন্ত্র, মুভিওলা (সম্পাদনার যন্ত্র) প্রভৃতি সকল রকম সরঞ্জাম প্রস্তুতের অনুকূল পরিবেশ সৃষ্টির প্রয়োজনীয়তার কথাও এই প্রসঙ্গে স্মরণ রাখতে হবে। তবেই অনুকূল অর্থনৈতিক পরিবেশ সৃষ্টির পথ প্রশস্ততর করা হবে।

—নান্দীকার

নির্মীয়মান বাংলা ছবিঃ

অজানা শপথ

সরকার প্রোডাকসন্সের নির্মীয়মান বাংলা 'অজানা শপথ' ছবিটির কাজ সমাপ্তপ্রায়। ছবিটির কাহিনী, চিত্রনাট্য ও পরিচালনার দায়িত্ব পালন করেছেন সলিল সেন। রহস্য-রোমাঞ্চে ঘেরা এ-কাহিনীর প্রধান চরিত্রাবলীতে রূপদান করেছেন সৌমিত্র চট্টোপাধ্যায়, মাধবী মুখোপাধ্যায়, দিলীপ রায়, সোমেন চক্রবর্তী, পাহাড়ী সান্যাল, সত্য বন্দ্যোপাধ্যায় প্রসাদ মুখোপাধ্যায়, হরিধন মুখোপাধ্যায়, জহর রায়, ছায়া দেবী, রেণুকা রায়, চন্দ্রিমা পাল এবং নবাগতা শিবানী বসু। দিলীপ সরকার প্রযোজিত ও হেমন্ত মুখোপাধ্যায় সুরকৃত এ-ছবিটি মুক্তিপ্রতীক্ষিত।

পরিশোধ

বিভূতিভূষণ মুখোপাধ্যায়ের কাহিনী অবলম্বনে ইকনমিক প্রোডাক্‌সন্সের 'পরিশোধ' ছবিটি বর্তমানে মুক্তিপ্রতীক্ষিত। অর্ধেন্দু সেন পরিচালিত এ-ছবির মুখ্য শিল্পীদের মধ্যে রয়েছেন সৌমিত্র চট্টোপাধ্যায়, মাধবী মুখোপাধ্যায়, দিলীপ রায়, সুলতা চৌধুরী এবং নটশেখর নরেশ মিত্র। এ-ছবিটির সুরসৃষ্টি করেছেন হেমন্ত মুখোপাধ্যায়। ইকনমিক পিকচার্স ছবিটির পরিবেশক।

আরোগ্য নিকেতন

তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়ের শ্রেষ্ঠ উপন্যাস 'আরোগ্য নিকেতন'-এর চিত্ররূপ দিচ্ছেন পরিচালক বিজয় বসু। অরোরা ফিল্ম কর্পোরেশনের এ-ছবিতে অভিনয় করেছেন বিকাশ রায়, শুভেন্দু চট্টোপাধ্যায়, রবি ঘোষ, জহর গাঙ্গুলী, বঙ্কিম ঘোষ এবং ছন্দা দেবী। নবীন চট্টোপাধ্যায় ছবিটির সুরকার।

জীবনসংগীত

অরবিন্দ মুখোপাধ্যায় পরিচালিত শচীন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের কাহিনী 'জীবনসংগীত' বর্তমানে চলচ্চিত্রে রূপায়িত হচ্ছে। ছবির প্রধান কয়েকটি চরিত্রে অভিনয় করছেন অনিল চট্টোপাধ্যায়, সন্ধ্যা রায়, রীণা ঘোষ, অনুপকুমার, সন্ধ্যারাণী, প্রসাদ মুখোপাধ্যায়, গঙ্গাপদ বসু, শেখর চট্টোপাধ্যায়, শোভা সেন ও বঙ্কিম ঘোষ। ছবিটির সঙ্গীত-পরিচালনা করেছেন হেমন্ত মুখোপাধ্যায়।

তিন অধ্যায়

মঙ্গল চক্রবর্তী পরিচালিত ও শৈলেশ দে রচিত অপ্সরা ফিল্মসের 'তিন অধ্যায়' ছবিটি বর্তমানে সমাপ্তির পথে। ছবিটির উল্লেখযোগ্য চরিত্রে রূপদান করেছেন উত্তমকুমার, সুপ্রিয়া দেবী, অজয় গাঙ্গুলী,

রাষ্ট্রপতি ডঃ জাকির হোসেনের কাছ থেকে পুরস্কার গ্রহণ করছেন প্রযোজক শ্রীনেপাল দত্ত এবং শ্রী আর ডি বনশল

সুপর্ণা সেন, অনুপকুমার, বিকাশ রায়, ছায়া দেবী, রবীন মজুমদার, জহর রায়, বঙ্কিম ঘোষ ও প্রতিমা চক্রবর্তী। গোপেন মল্লিক ছবিটির সুরকার।

মহাবিপ্লবী অরবিন্দ

এ বি ফিল্মসের জীবনীচিত্র **'মহাবিপ্লবী অরবিন্দ'** ছবিটি নিষ্ঠার সঙ্গে পরিচালনা করছেন দীপক গুপ্ত। ঐতিহাসিক তথ্য ও তত্ত্বের ভিত্তিতে রচিত এই মহান জীবনের প্রতিটি ঘটনাকে কেন্দ্র করে যেসব বলিষ্ঠ চরিত্র চিত্রিত হয়েছে, তার মধ্যে নামভূমিকায় দিলীপ রায় উল্লেখযোগ্য। এছাড়া বিশিষ্ট চরিত্রে রয়েছেন রবীন বন্দ্যোপাধ্যায়, শেখর চট্টোপাধ্যায়, নির্মল ঘোষ, তমাল লাহিড়ী, প্রসাদ মুখোপাধ্যায়, শিবেন বন্দ্যোপাধ্যায়, পদ্মা দেবী, শমিতা বিশ্বাস, অজিতেশ বন্দ্যোপাধ্যায়, জহর রায় প্রভৃতি। সঙ্গীত-পরিচালনায় রয়েছেন হেমন্ত মুখোপাধ্যায়।

অগ্রদূত গোষ্ঠীর 'কখনো মেঘ'

অগ্রদূত গোষ্ঠীর পরিচালনায় 'কখনো মেঘ' ছবিটি মুক্তিপ্রতীক্ষিত। এ ছবির মুখ্য চরিত্রে অভিনয় করেছেন উত্তমকুমার, অঞ্জনা ভৌমিক, সুব্রতা চট্টোপাধ্যায়, কালী বন্দ্যোপাধ্যায়, তরুণ মিত্র, বঙ্কিম ঘোষ ও প্রসাদ মুখোপাধ্যায়। সঙ্গীতপরিচালনা করেছেন সুধীন দাশগুপ্ত। ডিলাক্স ফিল্ম ছবিটির পরিবেশক।

অজিত গাঙ্গুলী পরিচালিত 'বালুচরী'

রাধারাণী পিকচার্সের 'বালুচরী' ছবিটির কাজ শেষ করেছেন পরিচালক অজিত গাঙ্গুলী। আশাপূর্ণা দেবীর এ কাহিনীর বিশিষ্ট চরিত্রে অভিনয় করেছেন সাবিত্রী চট্টোপাধ্যায়, অনিল চট্টোপাধ্যায়, অনুপকুমার, পাহাড়ী সান্যাল, লিলি চক্রবর্তী, অজয় গাঙ্গুলী, মলিনা দেবী এবং রেণুকা রায়। রাজেন সরকার ছবিটির সুরকার।

অরবিন্দ মুখোপাধ্যায় পরিচালিত 'শীলা'

নরেন্দ্র মিত্র রচিত কিনে ইউনিটের 'শীলা' ছবিটি মুক্তিপ্রতীক্ষিত। অরবিন্দ মুখোপাধ্যায় পরিচালিত এ ছবির প্রধান চরিত্রে রূপদান করেছেন সাবিত্রী চট্টোপাধ্যায়, শুভেন্দু চট্টোপাধ্যায়, রবি ঘোষ, প্রসাদ মুখোপাধ্যায়, শেখর চট্টোপাধ্যায়, গঙ্গাপদ বসু, শোভা সেন, গীতা দে, মিত্রা চট্টোপাধ্যায় ও সুমন মুখোপাধ্যায়। ছবিটির সুরসৃষ্টি করেছেন রাজেন সরকার।

শঙ্কর গোষ্ঠী পরিচালিত কুহু ও কেকা

শ্রীশঙ্কর প্রোডাকসন্সের প্রথম ছবি মণি বর্মা রচিত 'কুহু ও কেকা'র প্রাথমিক কাজ শেষ হয়ে গেছে। শীগ্‌গীর ছবিটির নিয়মিত চিত্রগ্রহণ হবে শঙ্কর নামে একটি বলিষ্ঠ ইউনিটের পরিচালনায়। ছবিটির প্রযোজনার দায়িত্ব নিয়েছেন শঙ্কর রায়চৌধুরী। বোম্বাই অভিনেত্রী শবনম্ ও নবাগতা লীনা চক্রবর্তীকে দুটি বিশেষ চরিত্রে দেখা যাবে। অন্য প্রধান চরিত্রে থাকবেন বাঙলার বিশিষ্ট শিল্পীরা ও নবাগত নিমাই গড়াই।

পদ্মাবতী-জয়দেব আলোর মুক্তিপথে

সানসাইন পিকচার্স (প্রা) এর ভক্তিমূলক চিত্রার্ঘ্য 'পদ্মাবতী-জয়দেব' লাইফ পিকচার্স প্রাঃ লিঃ-এর পরিবেশনায় মুক্তিপ্রতীক্ষার। পরিচালনা করেছেন চিত্রদূত নামক একটি বলিষ্ঠ ইউনিট। সুর দিয়েছেন বিজন পাল। দেবনারায়ণ গুপ্ত সংলাপ রচনা করেছেন।

'রাহগীর' চিত্রে সন্ধ্যা রায় ও বিশ্বজিৎ

গীতাঞ্জলি-চিত্রদীপ নিবেদিত প্রথম রঙিন হিন্দী ছবি **'রাহগীর'**-এর নায়ক এবং নায়িকা চরিত্রে মনোনীত হয়েছেন বিশ্বজিৎ ও সন্ধ্যা রায়। মনোজ বসু রচিত বাংলা ছবি 'পলাতক'-এর কাহিনী অবলম্বনে এই হিন্দী ছবিটির চিত্রনাট্য রচিত হয়েছে। কয়েকটি বিশিষ্ট চরিত্রে রয়েছেন শশিকলা, নিরূপা রায় এবং কানাইলাল। ছবিটি বাংলাদেশে নির্মিত হবে। পরিচালনা করছেন তরুণ মজুমদার। সঙ্গীত-পরিচালনায় রয়েছেন হেমন্ত মুখোপাধ্যায়।

ও পি রালহানের পরবর্তী ছবি: 'তলাশ'

'ফুল আউর পাথর' ছবির অসাধারণ সাফল্যের পর পরিচালক-প্রযোজক ও পি রালহান তাঁর পরবর্তী নতুন ছবিটি করছেন **'তলাশ'**। ছবির মুখ্য চরিত্রে মনোনীত হয়েছেন রাজেন্দ্রকুমার, হেমামালিনী, বলরাজ সাহানি, সুলোচনা, হেলেন, মদনপুরী, সজ্জন, জীবন, সাপ্রু, সুন্দর, ললিতা

চ্যাটার্জি, ফুলফুল, জনি হুইস্কি এবং ও পি রালহান। সঙ্গীত-পরিচালনার দায়িত্ব নিয়েছেন শচীনদেব বর্মন।

ফিল্মালয়ের প্রথম বাংলা ছবি ঃ
'এক পেয়ালা কফি'

ফিল্মালয়ের প্রথম বাংলা ছবিটির নাম 'এক পেয়ালা কফি'। সম্প্রতি এ-সংস্থার কর্ণধার প্রযোজক এস মুখার্জি ধনঞ্জয় বৈরাগীর এ-কাহিনীটির চিত্রস্বত্ব ক্রয় করেছেন। ছবিটির পরিচালনা করবেন তরুণ রায়। এ-কাহিনীর নাটকে যাঁরা অভিনয় করেছিলেন, তাঁদের মধ্যে অনেকেই এ-ছবিতে অংশগ্রহণ করবেন বলে জানা গেল।

কাশ্মীর বহির্দৃশ্যে 'সাথী'

ভেনাস পিকচার্সের 'সাথী'র বহির্দৃশ্য চিত্রগ্রহণ বর্তমানে কাশ্মীর অঞ্চলে শুরু করেছেন পরিচালক শ্রীধর। নৌসাদ সুরকৃত দুটি গানের দৃশ্যগ্রহণের জন্য নায়ক-নায়িকা রাজেন্দ্রকুমার এবং বৈজয়ন্তীমালা উপস্থিত হয়েছেন। এ-ছবির অন্যান্য চরিত্রে অভিনয় করছেন শিমি, ভীনা, নন্দিনী, সঞ্জীবকুমার এবং পাহাড়ী সান্যাল।

আর ভট্টাচার্য পরিচালিত
'সুহাগ রাত'

প্রযোজক-পরিচালক আর ভট্টাচার্য তাঁর রঙিন ছবি 'সুহাগ রাত'এর কাজ প্রায় শেষ করে এনেছেন। সম্প্রতি ছবির কয়েকটি নাটকীয় দৃশ্য রঞ্জিত স্টুডিওয় গৃহীত হল। ছবির বিশিষ্ট চরিত্রে রূপদান করেছেন

নরেন্দ্র চট্টোপাধ্যায় পরিচালিত অস্বীকৃতা চিত্রে ভেইজী ইরাণী

আপনজন চিত্রের সেটে পরিচালক তপন সিংহ, সহকারী বলাই সেন, ছায়া দেবী এবং সুমিতা সান্যাল। ফটো ঃ অমৃত

জিতেন্দ্র, রাজশ্রী, মেহমুদ, শবনম, ধূমল ও তুনতুন। সুরসৃষ্টি করেছেন কল্যাণজী-আনন্দজী।

নরেন্দ্র সুরী পরিচালিত
'বাড়ি দিদি'

পরিচালক নরেন্দ্র সুরী 'বাড়ি দিদি' ছবিটির চিত্রগ্রহণ শুরু করেছেন রঞ্জিত স্টুডিওয়। অর্চনা ফিল্মসের এ ছবিতে অভিনয় করছেন জিতেন্দ্র, নন্দা, দিলীপরাজ, ওমপ্রকাশ, অরুণা ইরানী, পদ্মা, উল্লাস, জীবন এবং মেহমুদ। এই রঙিন ছবিটির সঙ্গীতপরিচালনায় রয়েছেন রবি।

এ সামসির পরিচালিত
'দো ভাই'

কুমার ফিল্মসের নতুন ছবি 'দো ভাই'-এর দৃশ্যগ্রহণ সম্প্রতি রূপতারা স্টুডিওয় আরম্ভ করেছেন পরিচালক এ সামসির। ছবির মুখ্য ভূমিকায় রয়েছেন ইন্দ্রাণী মুখার্জি, দেবকুমার, দেবীকা, সুজিতকুমার, অসীমকুমার, রমেশ দেও, সাপ্রু, মিনাক্ষী এবং মোহন চোটি। সুরসৃষ্টির দায়িত্ব নিয়েছেন উষা খান্না।

শোহনলাল কানওয়ার পরিচালিত
'পহেচান'

প্রযোজক - পরিচালক শোহনলাল কানওয়ার তাঁর নতুন ছবি 'পহেচান'এর চিত্রগ্রহণ শুরু করেছেন রূপতারা স্টুডিওয়। ছবির নায়ক-নায়িকা চরিত্রে অভিনয় করছেন মনোজকুমার এবং ববিতা। শঙ্কর-জয়কিষণ ছবিটির সুরকার।

স্মৃতি থেকে বলছি

পুরোনের সঙ্গে নতুনের বিবাদ চিরদিনের। নতুন পুরোনকে আঁকড়ে থাকতে চায় না আবার পুরোন নতুনকে পুরোপুরি গ্রহণ করতেও চায় না। গ্রামীণ সরলতা ও তার পুরোন বিশ্বাস তাই অনেকের কাছেই আধুনিকতার পরিপন্থী। শহর জীবনের জটিলতা তাই অশিক্ষিতা সরল সাধাসিধে আনন্দময়ীকে আঘাত করেছিল। নাতি সম্পর্কে অরুণের বাড়ীতে এসে তিনি যে ব্যবহার পেয়েছেন তা যে কোনদিন স্বপ্নেও ভাবেননি।

আত্মীয় আপনজন পরিচয় দিয়ে অরুণ আনন্দময়ীকে কলকাতায় এনেছিল, বলেছিল—'দেখুন শত হলেও আপনি আমাদের আপনজন।......বুড়ো হয়েছেন, একা একা গাঁয়ের বাড়ীতে পড়ে থাকবেন, তা কি হয়।' তাই ফুলশয্যার রাতের সেই স্মৃতি-জড়ানো শ্বশুরের ভিটে ছেড়ে চলে এসেছিলেন তিনি।

শহরে এসে অনেক নতুন জিনিস দেখলেন তিনি। অরুণ তার বৌ লতিকা দুজনেই অফিসে কাজ করে, মেয়েদের বাইরে কাজ এ তার প্রথম প্রথম অসহ্য লাগলেও ধীরে ধীরে শহরের বিষাক্ত আবহাওয়ায় তার শ্বাস নেওয়া অভ্যাস হয়ে যায়। সারাটা দুপুর অরুণের ছেলে তিনকুকে নিয়ে কাটান আনন্দময়ী। মাঝে মাঝে বিকেলের দিকে বেড়াতে বের হন পার্কে, সঙ্গে থাকে তিনকু। এতদিনে তিনি অনেক কিছু বুঝে ফেলেছেন। শহরের বিভিন্ন বিচিত্র চরিত্রের সান্নিধ্যে এসে অনেক কিছুই তার জানা হয়েছে, অভিজ্ঞতার ঝুলিতে অনেক বিচিত্র কাহিনী জমা হয়েছে তাঁর। ইতিমধ্যে আপনজন অজুহাতে কোন এক দেওর রাধিকানন্দের ছেলে যতীন এই সোনা-জ্যাঠিমাকে খুঁজতে এসেছিল নিজের স্বার্থে। তবে সেবার আর ফাঁদে পা বাড়াননি আনন্দময়ী।

এদিকে পাড়ার ছেলেদের কাছে তিনি সার্বজনীন ঠাকুরমা দিদিমা হয়ে গেছেন। তার মধ্যে শিক্ষিত ভদ্রঘরের ছেলে রবি

[illegible] পাড়ার [illegible] [illegible] সেই কথা হারানো [illegible] [illegible] নিজের স্নান করে [illegible] [illegible] এই যুগে [illegible] তাঁর [illegible] মমতা, আন্তরিকতা ও স্নেহ ভালবাসার আসনে। পাড়ার প্রতিটি ছেলেকে তিনি জানতেন, প্রত্যেকের দোষগুণকে তিনি নিজের সরল বিশ্বাসে বিশ্লেষণ করে প্রত্যেকের মধ্যেই কোন না কোন গুণ দেখতে পান।

তাই যখন ভোটের সময় পাড়ার দু দলের মধ্যে সংঘর্ষ বাধে, যখন একদল পাড়ার রেশন দোকানের মালিক মিত্তির সাহেবকে ধরে নিয়ে যায় তখন তিনি চিৎকার করে কেঁদে ওঠেন, বলেন, 'ওগো, দেখো আমার ছেলেগুলো মারামারি করছে, ওদের বাঁচাও।' রবির পাড়ায় মধ্যে বেশ ভাল বলে সুনাম ছিল। থার্ড ইয়ারের ছাত্র সে। পাশের বাড়ীর কিশোরীকে সে ভালবাসত। কিন্তু প্রকাশ করতে পারেনি। ওই মেয়েটাকে নিয়ে বন্ধুর সঙ্গে মনো-[illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] হয়েছে নানা সমাজবিরোধী কাজে। এর আগে তিন পয়েন জেলও খেটে এসেছিল ঐ মেয়েটার সঙ্গে প্রেমের ব্যাপারে। বাবা তাড়িয়ে দিল। তারপর থেকেই তার অধঃপতন শুরু।

এই রবিকে খুব ভালবাসতেন আনন্দময়ী। রবিই মাঝে মধ্যে ঠাকুমা'র জন্য দুধ, দই, খই এনে দিত। নিজের ছেলে ছিল না তাই ওকে আপন ছেলের মত দেখতেন। নিজের জীবনের অনেক সুখ-দুঃখের কথা বলতেন ওকে। সার্বজনীন ঠাকুমা সত্যিই সর্বজনের ছিলেন, প্রত্যেকের সঙ্গে তাঁর হৃদয়ের সম্পর্ক।

বর্তমান শিক্ষা পৃথিবীকে যতই ছোট করে দিক না কেন মানুষকে বরং মানুষের কাছ থেকে দূরে সরিয়ে দিয়েছে। বিশ্বাসের মর্যাদা নেই, ভালবাসার মূল্য নেই আজ। দেশের অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক পরিস্থিতি আজ এমন অবস্থায় যেখানে মানবিক মূল্যবোধের দাম নেই। এখানে মানব পরিবেশের দাস। তাই রবি ভদ্রঘরের ছেলে হয়েও দুর্নাম পেয়েছে, কুকাজ করতে সে বাধ্য হয়েছে। ছোটবেলা মাকে হারাল, একটু বড় হতেই অন্ধ আবেগের তাড়নায় সে যা করেছিল তার জন্য জেল হল বলে বাবা তাকে ত্যাগ করল। কারও সহানুভূতি সে পেল না। কিন্তু আনন্দময়ী তাকে টেনে নিলেন।

তিনকুকে নিয়ে রোজই সন্ধ্যের পর রামায়ণ পড়তে বসেন আনন্দময়ী। মাঝে মাঝে আনন্দের আতিশয্যে পুরোনো দিনের সেই ছড়া করা কোন গানের দু-এক কলি বেসুরো গলায় গেয়ে শোনান। হয়ত তখনই সামনের রাস্তা দিয়ে পাড়ার মস্তান হিন্দী ফিল্মের গান গাইতে গাইতে চলে যায়। বড় খারাপ লাগে তাঁর। রাস্তাঘাটে যেতে আসতে কত ছেলেমেয়েকে দেখেন কত অবস্থায়, প্রথমটায় তাঁর এগুলো খারাপ লাগলেও পরে তা গা-সওয়া হয়ে যায়।

[illegible] দল [illegible] [illegible] [illegible] নিজের পরিবারের [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] মারামারি শুরু করে তখন তিনি তাদের [illegible] [illegible], বোঝান। পাড়ার লোকেদের কাছে তারা বকে-যাওয়া ছেলে হলেও আনন্দময়ী বলেন—'অমন ছেলে হাজার জন্ম তপস্যা করলে মেলে ভাই।' তার এই চিন্তার ধারাই মানুষকে পাড়ার প্রতিটি প্রবীণকে তার কাছে টেনে এনেছে।

দিন যায়, রাত আসে। ভোটের ক্যাম্পেন শুরু হয় পাড়ায় পাড়ায়। দু প্রার্থীর দু দল। ভোটে দাঁড়াতে পারলে তাদের ক্লাবঘর করে দেবে, জগদ্ধাত্রী পুজোয় মোটা চাঁদার ব্যবস্থা করে দেবে, আরও অনেক কিছু দেবে এই ভরসা দিয়ে তাদেরকে দিয়ে প্রচারকার্য চালায়। ভোটের দিকে এগিয়ে আসে। ঠিক আগের দিন পাড়ার একদল রেশন দোকান মালিক মিত্তির মশায়কে তাদের প্রার্থীকে ভোট দেবার জন্য বলে, মিত্তির মশায়ও তাদের মুখে মুখে জানিয়ে দেন—'দেখো বাপু, ভোট কাকে দেব তা তোমায় বলে দিতে হবে? কে ভাল আর কে মন্দ তা কি আমি বুঝি না।'

ব্যাস। আর যায় কোথায় উল্টো বুঝিলি রাম! তারা অমনি মিত্তির মশাইকে জীপে করে তুলে নিয়ে যায় আর জানায় যে কাল ভোট দেওয়ার পর তাকে ছাড়া হবে। রবির দল এ খবর পেতেই ক্ষেপে ওঠে। তাদের পাড়ার ভোটারকে তুলে নিয়ে যাওয়া, এতো অসহ্য। সাজ সাজ রব ওঠে। লাঠি ডাণ্ডা, ছোরা, সোডার বোতল, বিভিন্নভাবে সজ্জিত হয়ে বেরোয় রবির দল বদলা নেবার জন্য। প্রতিপক্ষও তৈরী। রাস্তার মধ্য দিয়ে দুদল মুখোমুখি এগোতে শুরু করে।

আনন্দময়ী খবর পেতেই বিচলিত হয়ে ওঠেন। উন্মাদের মত হয়ে রাস্তায় বেরিয়ে পড়েন। চিৎকার করে বলে ওঠেন, 'ওগো দেখো, আমার ছেলেগুলো মারামারি করছে, ওদের বাঁচাও তোমরা।' ইতিমধ্যে সংঘর্ষ শুরু হয়ে যায়। ইট-পাটকেল, সোডার বোতল ছোঁড়া শুরু হয়। হৈ-হৈ-রৈ-রৈ কান্ড। রবির সঙ্গের প্রতিপক্ষের নেতার সেই প্রথম থেকে বিরোধ, আজ তা ফেটে পড়ে। দুজনে এগিয়ে আসে রিভলবার হাতে। ঝাপটা-ঝাপটি করে দুজনেই রাস্তায় গড়াগড়ি যায়। ওদিক থেকে আনন্দময়ী আর্তনাদ করতে করতে এগিয়ে আসেন। তারপর......তারপর? সরল প্রাণ আর পুরোন বিশ্বাসের অপমৃত্যু ঘটে।

ইন্দু মিত্র রচিত এ কাহিনী অবলম্বনে পরিচালক শ্রীতপন সিংহ এখন যে ছবিটি করছেন তার নাম 'আপনজন'। চিত্রনাট্য, সংগীত ও সংলাপের দায়িত্ব শ্রীসিংহের, কে এল কাপুর প্রযোজিত এ ছবির বিভিন্ন ভূমিকায় রয়েছেন :—আনন্দময়ী— ছায়া-দেবী, রবি—নবাগত স্বরূপ দত্ত, [illegible]—নির্মলকুমার, [illegible]—সুস্মিতা সান্যাল, [illegible] [illegible]—মৃণাল মুখোপাধ্যায় ও

[illegible] দিল্লী থিয়েটার্স পার্টিতে [illegible] [illegible] [illegible] প্রদর্শনী গ্রহণের জন্য [illegible] বিভিন্ন জায়গায় লোকেশন হবে।

'রামায়ণ গাঁথা' ও 'লক্ষ্মণের শক্তিশেল'

প্রতি দেশেই এমন কিছু মহনীয় সৃষ্টি আছে যা মানুষের সুগভীর আত্মার অতলে এক নিঃসীম প্রশান্তির প্রদীপ জেলে রাখে, দুঃসহ সংগ্রামের বহুমুখী জটিলতার আবর্তের মধ্য দিয়ে বিধাতার আশিসধন্য এক সূর্যস্নাত জীবনের দিগন্ত উন্মোচন করে দেয় ক্লান্ত মানুষের কাছে। কালের বিচারে একে অতীত, বর্তমান কিংবা ভবিষ্যতের বলা যায় না, সামগ্রিক জীবনস্পন্দনের কথা স্মরণ রেখে এর নাম দেওয়া যেতে পারে 'চিরন্তন'। ভারতবর্ষের মাটিতে মহাকবি বাল্মীকির অনুভব থেকে জন্ম নিয়েছিল যে 'রামায়ণ', তার আবেদন প্রতিটি ভারতবাসীর মর্মস্থলে জড়িয়ে, প্রাণের কলরোল যতদিন থাকবে, রামায়ণী দীপ্তি ততদিনই অন্তরে অমরতার স্বাক্ষর রাখবে। এই ঐতিহ্যমণ্ডিত গাঁথা নিয়ে সম্প্রতি 'চিলড্রেন অপেরা গ্রুপ' নিউ এম্পায়ারে এক রুচিস্নিগ্ধ অনুষ্ঠান পরিবেশন করেছেন। এই গোষ্ঠীর প্রাণচঞ্চল শিল্পীরা নতুন করে রামায়ণের ব্যাপ্ত পৃথিবী থেকে আলোকের অজস্র বন্যাধারা সঞ্চারিত করতে পেরেছেন আজকের কর্মক্লান্ত স্বপ্নাহত মানুষের কাছে। জাতীয় সংস্কৃতির মর্মকথা যে সৃষ্টির চলার ছন্দে ভাষা পেয়েছে তার সঙ্গে পরিচিতিকে মাঝে মাঝে নতুন করে স্মরণ করলে আগামীদিনের আদর্শলাভে আমাদের যাত্রা যে আরো প্রবলতর উদ্দীপনায় বলিষ্ঠ হয়ে ওঠে, এ সত্য এই অনুষ্ঠানে সুন্দরভাবে মূর্ত হয়ে উঠেছে। এর জন্য যে নিষ্ঠা, অনলস পরিশ্রম ও জাতীয় সংস্কৃতির প্রতি সুগভীর মমত্ববোধ ও বিশ্বাসের প্রয়োজন, তা এই অনুষ্ঠানের পরিচালক শ্রীকমলকুমার মজুমদারের ছিল। তাঁর অনুভবের স্নিগ্ধতা ও গভীরতার ব্যাপ্তিতেই 'চিলড্রেন অপেরা গ্রুপে'র অনুষ্ঠান শুধুমাত্র সংগীত, অভিনয়, যন্ত্রসংগীতের আকর্ষণকারী অনুষ্ঠানই হয়নি, তা হয়েছে জাতীয় ঐতিহ্যের সঙ্গে পরিচিতির একটা পুণ্য লগ্ন।

'রামায়ণ গাঁথা' সংকলিত হয়েছে রামায়ণ থেকে, কিন্তু সাম্প্রতিকাল পর্যন্ত রামায়ণ নিয়ে যে আলোচনা হয়েছে, বিশেষ করে রামচন্দ্রের অলৌকিক মহত্ত্ব নিয়ে বিদগ্ধজনের যে মন্তব্য তাও ভাষা পেয়েছে এই গাঁথায়। অতীত থেকে বর্তমানকাল পর্যন্ত চিন্তাধারার যে একটা নিবিড় সেতুবন্ধন করেছেন সংকলয়িতা শ্রীকমলকুমার মজুমদার। শিল্পকৃতির ইতিহাসে নিঃসন্দেহে এ এক নতুন [illegible]। [illegible]

[illegible] তাঁর [illegible] সংগতি রক্ষা করেছেন। তাঁর আন্তরিকতা অনুষ্ঠানটিকে প্রথম থেকে শেষ পর্যন্ত সজীব রাখতে পেরেছে। শুধু বিবৃতিমূলক অনুষ্ঠান সাধারণতঃ নীরস লাগে, কিন্তু সেদিন তা লাগেনি, এরই মধ্যে লুকিয়ে আছে শিল্পীর নৈপুণ্য। সুরের সঙ্গে সুরের মেল, আর সংগীতের আবেশ এনে শ্রোতার মনটাকে সেই পরিবেশে নিয়ে যাওয়ার চেষ্টা সার্থক হয়েছে।

সুকুমার রায়ের 'লক্ষ্মণের শক্তিশেল' 'চিলড্রেন অপেরা গ্রুপে'র দ্বিতীয় অনুষ্ঠান। রামায়ণের এ কাহিনী সবারই জানা। একে গীতি, নৃত্যনাট্যের অনুষ্ঠান বলা যেতে পারে, কিন্তু চিরাচরিত প্রথায় তা সেদিন পরিবেশিত হয়নি। সাধারণতঃ দেখা যায় এই ধরনের আয়োজনে আলোকসম্পাত, গান, নানারকমের মনোরম দৃশ্যাবলী স্থান পায়, কিন্তু সাধারণ আলোর মধ্যে দাঁড়িয়ে শুধু নিষ্ঠা সহকারে অভিনয় করে গেলে যে আর কোন যান্ত্রিক কৌশলের প্রয়োজন হয় না, সেদিন মর্মে মর্মে তা বুঝেছি। পর্দা উঠে

ফ্রাংকফার্ট-এ অনুষ্ঠিত এশিয়ান ফিল্ম ফেস্টিভ্যাল-এ 'পঞ্চশর' চিত্রের প্রদর্শনী উপলক্ষে ছবির নায়ক শুভেন্দু চ্যাটার্জী এবং পরিচালক অরুপ গুহঠাকুরতা বিমানযোগে সেখানে রওনা হন। ফটো : অমৃত

গেলে দেখা গেলো, শিল্পীরা চরিত্রানুযায়ী পোশাক পরে বিচিত্র ভঙ্গিমায় দাঁড়িয়ে আছে। চমৎকার সে দৃশ্য, যেন ক্যানভাসের ওপর রঙ আর তুলির সমন্বয়ে আঁকা একটা ছবি।

ছোট্ট পরিসরে শিল্পীদের যে অপূর্ব অভিনয়নৈপুণ্য চিহ্নিত হয়েছে, তা থেকে একথা নিঃসন্দেহে বলা যেতে পারে যে ভবিষ্যতে এ'রাই জাতির সামনে তুলে ধরতে পারবে আশাদীপ্ত সৃষ্টিকে। এই অনুষ্ঠান পরিচালনায় শ্রীকমলকুমার মজুমদার তাঁর সূক্ষ্ম শিল্পবোধকে আশ্চর্য দক্ষতার সঙ্গে কাজে লাগিয়েছেন। গানে, নাচে, অভিনয়ে সব দিকেই তাঁর প্রখর দৃষ্টি ছিল, তাই সব কিছু মিলে একটা চমৎকার 'হারমনি' এসেছে। যারা এই প্রাণবন্ত অনুষ্ঠানে অংশ নিয়েছে তারা হোল—শান্তনু বসু (রাম), সতীন্দ্র সিং (লক্ষ্মণ), শিবাশীষ নাগ (জাম্বুবান), তাতনু ভট্টাচার্য (সুগ্রীব), উত্তম সেন (বিভীষণ), রঞ্জন সরকার (রাবণ) কিশোর রায় (হনুমান), অরুপ ঘোষ (১ম যমদূত), ত্রিদিব সিং (২য় যমদূত), অজয় গুপ্ত (যম), এস পি ঈশ্বর, ভাস্কর মিত্র, দীপক মৈত্র, সুরঞ্জন সেন, সৌমিত্র ঘোষ, সায়ন দাশগুপ্ত, কল্যাণ দাশগুপ্ত, প্রশান্ত মুখোপাধ্যায় প্রমুখ। সংগীত ও আবহ-সংগীতে ছিলেন শ্রীমতী নন্দিতা দাশগুপ্তা, অজিত মৈত্র, শ্রীনিবাসন।

তাপসী

বেঙ্গল চেম্বার অফ কমার্স এন্ড ইন্ডাস্ট্রিজ রিক্রিয়েশন ক্লাবের প্রযোজনায় সম্প্রতি 'বিশ্বরূপা'র মঞ্চে অভিনীত হোল নীহার গুপ্তের মঞ্চসফল নাটক 'তাপসী'। নাট্যনির্দেশনায় ছিলেন প্রেমাংশু বসু। বিভিন্ন চরিত্রে রুপ দেন—অনিলেন্দ্র চৌধুরী, অমিয়কুমার সরকার, অশোক চন্দ, সুজিত-কুমার দাস, সৌরেন মুখোপাধ্যায়, ক্ষীরোদ-রঞ্জন চক্রবর্তী, বীরেন্দ্রনাথ দত্ত, রমেন ঘোষ, প্রিয়গোপাল অধিকারী, সত্যেন মুখোপাধ্যায়, তরুণশংকর মজুমদার, সন্তোষকুমার বসু, প্রবোধ মুখোপাধ্যায়, মণি সেন, সুধীর দত্ত, গীতা দে, দীপিকা দাস, কেতকী দত্ত, রানু রায়, আশা দেবী, ইরা মিত্র, রত্না ঘোষাল।

রাজা দেবিদাস

গত ১৪ই অক্টোবর বালিগঞ্জস্থিত আদি কাঁকুলিয়া সর্বজনীন দুর্গোৎসব প্রাঙ্গণে এবং ১৭ই অক্টোবর দর্জিপাড়াস্থিত সাধক

সলিল সেন পরিচালিত 'অজানা শপথ' চিত্রে নবাগতা শিবানী বসু

রামপ্রসাদ উদ্যানে গিরিশ নাট্য সংসদ কর্তৃক ব্রজেন্দ্রকুমার দে রচিত 'রাজা দেবিদাস' নাটকটি অত্যন্ত সাফল্যের সঙ্গে অভিনীত হয়, দুইদিনকার অভিনয় সহস্র সহস্র দর্শককে বিশেষভাবে প্রভাবিত করতে সক্ষম হয়। নাটকের প্রথম থেকে শেষ পর্যন্ত এমন একটি সুন্দর অভিনয়কুশলতার পরিচয় পাওয়া যায় যা সত্যিই বিরল। প্রতিটি শিল্পী স্ব স্ব চরিত্রের সার্থক রুপায়ণ দ্বারা অভিনয়কে প্রাণবন্ত করে রাখেন। বর্তমানে সৌখীন সংস্থাগুলির অন্যতম বলে এই সংস্থা দাবী রাখতে পারে। নাটকটি পরি-চালনা করেন সমীর ব্যানার্জি। এই নাটকের অভিনয় উত্তরোত্তর জনমনসে নুতন ভাবের ও চিন্তার খোরাক যোগাতে সমর্থ হবে বলে আশা করা যায়।

'শৌভনিকে'র আগামী নাটক

'শৌভনিকে'র শিল্পীবৃন্দ আগামী নভেম্বর মাসে দুটি একাংকিকার অভিনয় করবেন। নাটক দুটি হোল বুদ্ধদেব বসুর 'পাতা ঝরে যায়' ও সৌমেন নন্দীর অনুবাদ 'চিড়িয়াখানার গল্প'। ডিসেম্বরে অভিনীত হবে প্রফুল্ল রায়ের 'নোনা জল মিঠে মাটি' উপন্যাসের নাট্যরুপ। নাট্যরুপ দিয়েছেন সুধাংশু মণ্ডল। নির্দেশনায় থাকবেন গোবিন্দ গাঙ্গুলী। আগামী জানুয়ারীতে কৃষ্ণ কুণ্ডুর নির্দেশনায় মঞ্চস্থ হবে 'মেঘনাদ বধ'।

ফেরা

আগামী ১০ই নভেম্বর মুক্ত অঙ্গন মঞ্চে সন্ধ্যা সাতটায় 'শুভময়' নাট্যগোষ্ঠী শুভেন ঘোষের 'ফেরা' নাটকটি পুনরভিনয় করছেন। এ'রা এই নাটকটি কোলকাতার বিভিন্ন মঞ্চে নিয়মিত অভিনয়ের ব্যবস্থা করছেন। নির্দেশনায় জ্যোতিপ্রকাশ বন্দ্যোপাধ্যায়।

বিবিধ সংবাদ

কানাডার চলচ্চিত্রোৎসব :

কানাডা রাজ্য এই বছর তার প্রতিষ্ঠার শতবর্ষপূর্তি উৎসব পালন করছে। সেই উপলক্ষে ভারতস্থিত কানাডার হাই কমিশনার কানাডার ন্যাশনাল ফিল্ম বোর্ড এবং সিনে ক্লাব অব ক্যালকাটার সহ-যোগিতায় স্থানীয় ম্যাজেস্টিক সিনেমায় ২৯-এ সেপ্টেম্বর থেকে সপ্তাহব্যাপী একটি কানাডার চলচ্চিত্রোৎসবের আয়োজন করে-ছিলেন। কানাডার তথ্যচিত্র ও স্বল্পদীর্ঘ চিত্রগুলি তাদের স্বকীয় বৈশিষ্ট্যে উজ্জ্বল বলে পৃথিবীর সর্বত্র আদৃত। কিন্তু কাহিনীচিত্রের প্রযোজনায় কানাডা মাত্র ১৯৬৪ সাল থেকে ব্রতী হয়েছে এবং এ পর্যন্ত বছরে এক বা দুখানির বেশী কাহিনীচিত্র নির্মাণ করেনি। ওরই মধ্যে ১৯৬৪ সালে নির্মিত 'দ্য বডি ওয়েন্ড্‌ড্‌ গডবাই' ছবিখানি আমরা সেদিন দেখলুম। রক্ষণশীল বাপ-মায়ের বিরুদ্ধে তরুণ-তরুণীর বিদ্রোহ, স্বচ্ছন্দ প্রেম, প্রেমের সার্থকতার জন্যে অন্যায় পথ অবলম্বন এবং শেষ পর্যন্ত তরুণের প্রতি তরুণীর

বিদ্রোহ—এই হচ্ছে ছবিটির উপজীব্য। ছবিটি যথেষ্টই উত্তেজক এবং চিন্তাকে প্রভুত্তর করে তোলে। বাস্টার কীটনকে ভূমিকা দিয়ে কানাডার পূর্বকূল থেকে পশ্চিমকূল পর্যন্ত ভ্রমণমূলক 'রেলরোডার' অত্যন্ত কৌতূহলোদ্দীপক ছবি। এইভাবে 'হেলিকপ্টার কানাডা', 'ফীসম্যান ক্র্যাকার', 'দি ড্র্যাগ', 'সিক্সটি সাইকলস' প্রভৃতি স্বল্পদৈর্ঘ্য ছবি অভিনবত্বপূর্ণ।

ভারতীয় নৃত্যকলা মন্দির

২২শে অক্টোবর পার্কসার্কাস বেনিয়াপুকুর সম্মেলন পূজা কমিটির উদ্যোগে পার্ক-সার্কাস ময়দানের পূজামণ্ডপে নৃত্যবিদ বীরেন্দ্রনাথ সেনগুপ্তের পরিচালনায় ভারতীয় নৃত্যকলা মন্দিরের শিল্পীদের দ্বারা "শ্যামা" নৃত্যনাট্য ও "নৃত্য বিচিত্রা" প্রদর্শিত হয়। সংগীত এবং নৃত্য পরিচালনা করেন বিপুল ঘোষ ও অনুপশঙ্কর, স্বপ্না সেনগুপ্তা:

'তরুণের অভিযান' পত্রিকাগোষ্ঠীর বিজয়া সম্মিলনী

১৫ই অক্টোবরের সন্ধ্যায় চন্দননগরে চন্দননগর ফ্রেঞ্চ ইনস্টিট্যুটের নয়নাভিরাম পরিবেশে 'তরুণের অভিযান' পত্রিকাগোষ্ঠীর বিজয়া সম্মিলনী 'মৈত্রী'র ব্যবস্থাপনায় ও শ্রদ্ধেয়া শ্রীমতী ইন্দুমতী ভট্টাচার্যের সভানেত্রীত্বে অনুষ্ঠিত হয়। নানা আলোচনা পাঠে অংশগ্রহণ করেন ইন্দুমতী ভট্টাচার্য, পিনাকী চক্রবর্তী, ঠাকুর রক্ষিত ও সাতকড়ি নন্দী। এর পর 'আলোর অমল কমলখানি' ও 'হে ক্ষণিকের অতিথি' রবীন্দ্রসংগীত দুটি গেয়ে শোনালেন শৈলেন কুণ্ডু। স্বরচিত কবিতা পাঠ করেন সুনির্মল চট্টোপাধ্যায়, নিমাই সিংহ রায় ও বিচিত্র দেব। রবীন্দ্র-সংগীত পরিবেশন করেন শিউলি চট্টোপাধ্যায়, রঞ্জিতা ঘোষ ও সুদীপ বন্দ্যোপাধ্যায়।

সন্ধানী ফিল্ম সোসাইটি

'সন্ধানী ফিল্ম সোসাইটি' এ মাসের ১৫ই, ১৯শে, ২৩শে, ২৬শে এবং ২৯শে যথাক্রমে কর্টিকান্ট (রাশিয়া), নেল কর দি বেরার ফুটেড (চেকোশ্লোভাকিয়া), স্মডার্ড এ্যান্ড টিনসেন (সুইডেন), দি সেভেনথ্ সিল (সুইডেন) এবং ফ্যানটম ক্যারেজ (সুইডেন) দেখাবেন। বিশেষভাবে উল্লেখ-যোগ্য যে শেষোক্ত তিনটি ছবির প্রথম দুটি বার্গম্যান পরিচালিত। তৎসহ ১৫ই তারিখে পুরস্কারপ্রাপ্ত শর্ট—থ্রু দি আইস অফ এ পেইন্টার প্রদর্শিত হবে।

ইস্টার্ণ রেলওয়ে টুরিং এসোসিয়েশন

সম্প্রতি ইস্টার্ণ রেলওয়ের টুরিং এসো-সিয়েশনের সভ্যবৃন্দ তাঁদের স্বল্পকালীন ভ্রমণের মধ্যে মুসৌরীতে হিমালয় ক্লাব হোটেল প্রাঙ্গণে একটা বিচিত্রানুষ্ঠানের আয়োজন করেছিলেন। এই অনুষ্ঠানে সভা-পতির আসন গ্রহণ করেছিলেন শ্রী কে চৌধুরী। এই অনুষ্ঠানে সংগীত, আবৃত্তি ও হাস্যকৌতুক পরিবেশিত হয়। সংগীতে অংশগ্রহণ করেন সর্বশ্রী সুবীরকুমার মুখো-পাধ্যায়, সান্ত্বনা মজুমদার, অপর্ণা ভট্টাচার্য এবং এন কে প্রামাণিক। আবৃত্তিতে সর্বশ্রী এন এন সরকার, এম কে সিংহরায় ও কুমারী গৌরী ভট্টাচার্য ও. হাস্যকৌতুকে শ্রীসমরকুমার মুখোপাধ্যায়। সমগ্র অনু-ষ্ঠানটি পরিচালনা করেন শ্রীসমরকুমার মুখোপাধ্যায়।

বেলপুকুর সিদ্ধেশ্বরী মহাবিদ্যালয়ের সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান

বিগত ৩রা অক্টোবর বেলপুকুর সিদ্ধেশ্বরী মহাবিদ্যালয়ে প্রবাহিনী সাহিত্য পরিষদের উদ্যোগে একটি সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়। স্থানীয় প্রায় দুই শতাধিক কবি-শিল্পী এই অনুষ্ঠানে যোগদান করেন। প্রবাহিনী সাহিত্যপত্রের সম্পাদক ডঃ জয়ন্ত গোস্বামী পত্রিকার উদ্দেশ্য ও সাফল্য সম্পর্কে ভাষণ দেন। প্রধান অতিথি শ্রীগৌরাঙ্গ ভৌমিক এই দশকের কবিতায় গতিপ্রকৃতি ও বৈশিষ্ট্য সম্পর্কে বিস্তৃত বিশ্লেষণ করেন। তা ছাড়া, বিভিন্ন বিষয় সম্পর্কে বক্তৃতা করেন অধ্যাপক প্রদ্যোৎ সেনগুপ্ত, মদনমোহন কাব্যকণ্ঠ এবং কলেজের প্রতিষ্ঠাতা সম্পাদক শ্রীমুরারিমোহন মান্না।

গানের জলসা

গোপীকৃষ্ণের সম্বর্ধনা

সুরসপ্তয়নের সভ্যবৃন্দ আহূত আয়োজিত গোপীকৃষ্ণ সম্বর্ধনা-সভায় গোপীকৃষ্ণকে মাল্যদান এবং আশীর্বাদ করেন স্বয়ং উদয়শঙ্কর। এই উদয়শঙ্করই একদা নৃত্যকে কলুষিত পারিপার্শ্বিকতামুক্ত করে উচ্চমানের শিল্পকলার পর্যায়ে উন্নীত করে এক নতুন সম্ভাবনা দিগন্ত উন্মোচন করেছিলেন। ভিন্ন ঘরানার নৃত্যশিল্পী হলেও, তরুণ শিল্পী গোপীকৃষ্ণ সেই শিল্পধারার চলমান প্রবাহকে অনাহত রেখেছেন। মেয়র শ্রীগোবিন্দ দে নৃত্যশিল্পী গোপীকৃষ্ণকে অভিনন্দন জ্ঞাপন করলেন একাদিক্রমে নয়ঘণ্টাব্যাপী নৃত্যে বিশ্বরেকর্ড সৃষ্টি করার জন্য।

আসর শুরু হয় শ্রীমতী কল্যাণী রায় ও আলি আহ্‌মেদের সেতার ও সানাই-এর যুগলবন্দী দিয়ে। রাগ 'শুদ্ধ সারং'। শ্রীমতী রায়ের পরিশীলিত বাজনা ও মার্জিত সঙ্গীতবোধের স্বরসমন্বয় আলি আহমেদের বলিষ্ঠ সুরের সানাই-এর সঙ্গে উপযুক্ত ভারসাম্য রক্ষা করে বেজেছে। শান্তাপ্রসাদের তবলাসঙ্গত ছিল এই আসরের আর এক আকর্ষণ।

গোপীকৃষ্ণর কথক-ভিত্তিতে পরিবেশিত নৃত্যানুষ্ঠান দিয়ে সঙ্গীতোৎসব সমাপ্ত হয়। সরস্বতী-বন্দনা দিয়ে অনুষ্ঠান শুরু হয়েছিল। আরম্ভের আগে ভক্তি উন্মেষের পরিকল্পনাটি সুন্দর কিন্তু শঙ্খধ্বনিনাদ, ঘণ্টা, দ্রুমের আওয়াজ ইত্যাদি দিয়ে এক অতিনাটকীয় পূজার আবহাওয়া সৃষ্টি করা হয়। গোপীকৃষ্ণর মত উচ্চমান শিল্পীর পক্ষে ভিরো রাগের একটি স্তোত্র ও তাঁর অনবদ্য নৃত্যশৈলীই কি ভাবপ্রকাশের পক্ষে যথেষ্ট হওয়া উচিত?

কথকের আঙ্গিক, ভাও, ১০১ মাত্রার চক্রধারের নিখুঁত পরিক্রমণ—শান্তাপ্রসাদের সঙ্গে অসাধারণ দ্রুতলয়ে বোল বিনিময়—গোপীকিষণজীর পাণ্ডিত্য ও বৈদগ্ধ্যের স্বাক্ষরবাহী সন্দেহ নেই। কিন্তু উত্তেজনা, গতির উন্মাদনা এবং চমকপ্রদতাই কি নৃত্যকলার বড় কথা? এই পরিণত প্রতিভার কাছে আমরা আরো সৃষ্টিধর্মী আরো মৌলিকতার আশা করেছিলাম। গোপীকৃষ্ণের রূপলাবণ্য ও নৃত্যলালিত্য আমাদের দৃষ্টিকে আনন্দ দিলেও হৃদয়ে কোনো গভীর রেখাপাত করতে সমর্থ হয়নি।

সুচিত্রা মিত্রের সম্বর্ধনা

২রা অক্‌টোবর রবীন্দ্রসঙ্গীত পরিষদ আয়োজিত এক সঙ্গীতাসরে জনপ্রিয় রবীন্দ্রসঙ্গীত শিল্পী শ্রীমতী সুচিত্রা মিত্রকে সম্বর্ধনা জানানো হয়। প্রারম্ভিক সম্বর্ধনা-সভা দিকপাল সাংবাদিকবৃন্দ এবং প্রবীণ সঙ্গীতশিল্পিবৃন্দের অংশগ্রহণে বেশ জমজমাট হয়ে উঠেছিলো।
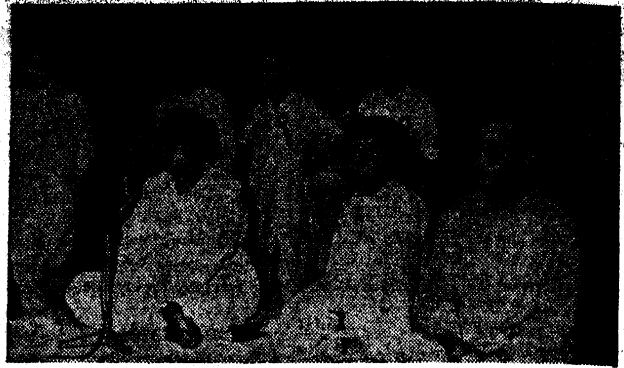
শ্রীসুকমলকান্তি ঘোষ আবেগসিক্ত ভাষণে সুচিত্রা মিত্রের সঙ্গীতব্যক্তিত্বের আলোচনা-

গোপীকৃষ্ণ সম্বর্ধনায় সর্বশ্রী উদয়শঙ্কর, গোপীকিষণ, গোবিন্দচন্দ্র দে (মেয়র) এবং, অদ্রিজা মুখোপাধ্যায়।

রবীন্দ্র-সঙ্গীত পরিষদ আয়োজিত সুচিত্রা মিত্রের সম্বর্ধনা সভায় সর্বশ্রী সুকমল-কান্তি ঘোষ, সন্তোষ ঘোষ, সুচিত্রা মিত্র, শৈলজারঞ্জন মজুমদার।

প্রসঙ্গে বলেন, শ্রীমতী মিত্র রবীন্দ্রসঙ্গীতের সুরের বিশুদ্ধতা এবং তাল ও লয়ের বৈশিষ্ট্য অব্যাহত রেখেও নিজস্ব কল্পনা-বিভবে এবং বলিষ্ঠ ও জড়তামুক্ত কণ্ঠের সুরের মাধুর্যে এমন এক প্রাণোচ্ছলতার প্লাবন এনেছেন, যা সৃষ্টির পর্যায়ে পড়ে। এই অনুভবের ঐশ্বর্যে তিনি অনন্যা, অতুলনীয়া। তাঁকে সম্মানিত করার ভাষা খুঁজে পাই না—হাজারটা সম্বর্ধনাসভায় সম্বর্ধনা জানিয়েও মন তৃপ্ত হয় না। আরো একটা কথা 'সুচিত্রাকে কেউ তৈরী করেনি' সুচিত্রা আপন যোগ্যতার আলোয় আপনি পরিব্যাপ্ত।

শ্রীসন্তোষ ঘোষ রবীন্দ্রসঙ্গীতের জনপ্রিয়তা সৃষ্টির স্তরবিন্যাস নির্দেশ করে বলেন, কনক দাস, সাহানা দেবী, অমলা দাস এবং অনেকে যাঁরা রবীন্দ্রসঙ্গীতের প্রথম যুগের শিল্পী, তাঁদের আবেদন এক বিশেষ গণ্ডীর মধ্যে সীমাবদ্ধ ছিল—জনসাধারণের অন্তরে কোনো স্থান করে নিতে পারেননি তাঁরা। সুচিত্রা মিত্র রবীন্দ্রসঙ্গীতকে জনসাধারণের মহলে শুধু পৌঁছেই দেননি, আধুনিক গানের জনপ্রিয়তার সঙ্গে সমান আসনে প্রতিষ্ঠিত করেছেন। তাঁর এ-অবদান চিরশ্রদ্ধেয় এবং বাংলার সঙ্গীতরসিক-সমাজ এজন্য তাঁর কাছে কৃতজ্ঞ।

এই প্রসঙ্গে উল্লেখযোগ্য, শ্রীঘোষ উল্লিখিত রবীন্দ্রসঙ্গীতের প্রথম যুগ এবং সুচিত্রা মিত্রের মাঝে আর একটি যুগ ছিল, যে-যুগে রবীন্দ্রসঙ্গীতের জনপ্রিয়তার প্রকৃত সূত্রপাত—সে-যুগ হোলো ছায়াচিত্রের যুগ। এই যুগেই পঙ্কজ মল্লিক, সায়গল ও কানন দেবীর মাধ্যমে বিশেষ গণ্ডীর মধ্যে রবীন্দ্রসঙ্গীত 'জনগণের সঙ্গীত' হয়ে উঠেছিলো। 'মুক্তি', 'পরিচয়', 'জীবনমরণ' কথাচিত্রের পর 'আজ সবার রঙে রং মেশাতে হবে', 'তার বিদায়বেলার মালাখানি', 'আমার বেলা যে যায়', 'আমার হৃদয়—', 'দিনের শেষে ঘুমের দেশে', 'আমি তোমায় যত শুনিয়েছিলাম গান'—এসব গান শুধু লোকের মুখে মুখেই ফেরেনি, শ্রোতাদের সামনে কবির গানের নিভৃত ঐশ্বর্যের অজানা বিস্ময়লোক উদ্ভাসিত হয়ে উঠেছিল এঁদের অতুলনীয় কণ্ঠসম্পদ এবং আবেগরঞ্জিত গায়নশৈলীর মধুরতায়। রবীন্দ্রসঙ্গীতের কথা ও সুরের অনুপম মাধুর্য সম্বন্ধে তাঁরা সচেতন হয়ে

উঠেছিলেন। স্মৃতিকা মিত্র এই ব্যালাটিকে আরো পরিপূর্ণ করেছেন এবং আবেদনকে মূর্তিমন্ত করেছেন।

অনুষ্ঠানের ভাষণ আবেগবিধিত আন্তরিকতায় শ্রীমতী মিত্র অত্যন্ত অভিভূত হয়ে পড়েছিলেন। সম্বর্ধনার উত্তরে তিনি দুটি গান গেয়ে শোনালেন। 'আমায় মাথা নত করে দাও হে' এবং 'তোমার সুরের ধারা'—কবিগুরুর এই দুটি ভাষায় তিনি সম্বর্ধনাকারীদের গভীর কৃতজ্ঞতা এবং শ্রদ্ধাজ্ঞাপন করলেন।

পরিশেষে সর্বশ্রী শৈলজারঞ্জন মজুমদার, হীরেন সান্যাল, শান্তিদেব ঘোষ, জ্ঞানপ্রকাশ ঘোষ শ্রীমতী মিত্রের সঙ্গীতের আবেদনসঞ্চারী শক্তিকে সাধুবাদ জানিয়ে আশীর্বাদ জ্ঞাপন করেন।

সভা শেষ হয় শ্রীমতী বাণী ঠাকুর, পূর্বা সিংহ, স্মৃতিকা সেন এবং স্মৃতিকা মুখোপাধ্যায়ের রবীন্দ্রসঙ্গীত দিয়ে।

গীতালির বার্ষিক অধিবেশন

৩৫ বি, লালিত সেন, শ্যামবাজারস্থিত সংগীতায়তন গীতালির একাদশতম বার্ষিক অনুষ্ঠান ২ দিনব্যাপী কর্মসূচীর মাধ্যমে নেতাজী ইনস্টিটিউট হলে অনুষ্ঠিত হয়েছে। যুগান্তরের বার্তা সম্পাদক শ্রীদক্ষিণারঞ্জন বসু ও হিন্দুস্থান স্ট্যাণ্ডার্ডের সম্পাদক শ্রীসুধাংশু বসু অনুষ্ঠানে যথাক্রমে প্রধান অতিথি ও সভাপতির আসন গ্রহণ করেন। প্রথম দিবসের অনুষ্ঠান আরম্ভ হয় গীতালির শিক্ষক শ্যাম দাসের গীটারের মাধ্যমে। পরে রবীন্দ্রসংগীতে পূর্বা দত্ত, বিজয় বসাক, লোকসংগীতে তপন মুখোপাধ্যায়, রাগপ্রধানে চায়না বন্দ্যোপাধ্যায়, দেবশ্রী মুখোপাধ্যায়, অনুপা বসু, ভাবনৃত্যে আল্পনা দত্ত, কথকে সোমা পাণ্ডা, বিবিধ নৃত্যে মন্দ্রেতী কর ও প্রণীত নাথ অংশগ্রহণ করেন। দ্বিতীয় দিনে অমার্ক পঙ্কজ সাহার নেতৃত্বে সমবেত কণ্ঠসংগীত অনুষ্ঠান সূচিত করে। উচ্চাঙ্গসংগীতে শ্রীমতী শান্তা সাহা বিশেষ প্রশংসা লাভ করেন। পরে অজয় বসুর পরিচালনায় অনিল দত্তের 'স্বীকৃতি' নাটক অভিনীত হয়। বিভিন্ন চরিত্রে ছিলেন: অজয় বসু, দেবু বসু, দীপ্তি মৌলিক, সুবোধ মুখার্জি, সুজিৎ বসু, সুশান্ত ভট্টাচার্য। অজিত চ্যাটার্জি, শীলা রায়চৌধুরী ও শ্রীরজিত রায় সংগীত পরিচালনা করেন।

একালের সঙ্গীতশিল্পী

অমিয়নাথ মুখোপাধ্যায়

অনাদ্যন্তকাল থেকে বয়ে চলেছে সুরের মন্দাকিনী ধারা—কবে থেকে কোন্ ধূর্জটির জটাজাল ভেদ করে এই ধূলার ধরণীতে নেমে এলো ঐ সুরধ্বনির সুরকর্ণা, তা নিয়ে ঐতিহাসিক মাথা ঘামাক।

কিন্তু সেই ধারায় অবগাহন করে আমরা পেয়েছি অনাবিল আনন্দের আস্বাদ, পেয়েছি অমৃতকুম্ভের সন্ধান। তা আমাদের মনকে নিয়ে গেছে অমরাবতীর নন্দন কাননে। তার অতল গহনে ডুব দিয়ে আমরা পেয়েছি কী অসীম অনাবিল আনন্দ। এত আনন্দের ভার বইব কেমন করে? আবার শুধু কি আনন্দই, বেদনা নেই? যখন গুমরে গুমরে সুর কেঁদে ওঠে চির বিরহব্যথায় আকুল ক্রন্দনে, তখন অন্তরের প্রতিটি তার কেন এমন করে বেদনায় মুচড়ে ওঠে? হৃদয়ের সমস্ত উচ্ছ্বাস কেন তবে সেই সুরের মায়ায় এমন আলোড়িত হয়। সুরের মোহনায় সব যেন কেমন একাত্ম হয়ে যায়। সেখানে হরিপদ কেরানির মনে আর আকবর বাদশার মনে কোন ভেদ থাকে না।

দৈনন্দিন জীবনের যত ব্যথা যত গ্লানি, সবই তুচ্ছ হয়ে যায় সাময়িকভাবে সেই কায়াহীন মায়ায়। কিন্তু যে শুধু রাগরাগিণীর বিভিন্ন ভাবব্যঞ্জনায় আমাদের মনের তন্ত্রী বিভিন্ন সুরে বেজে ওঠে, সে হচ্ছে বহু সাধনার ধন। ধ্যানগম্ভীর যে-রূপে আমরা মানসনয়নে প্রত্যক্ষ করি, সে-রূপের প্রাণ প্রতিষ্ঠা করতে হলে সাধককে যে একেবারে সাধনার গভীরে ডুবে যেতে হয়। আর সেইখানেই আমাদের শাস্ত্রীয় সংগীতের ভিন্নতা, সেই তার স্বাতন্ত্র্য। নইলে প্রকৃতির প্রভাব কেন থাকবে আমাদের সংগীতে?

এই সুরের সাধনায় যাঁরা ব্রতী হয়েছিলেন যাঁরা, বস্তুত তাঁরাই এর জনক। এক-একটি রাগকে তার স্বকীয় মর্যাদায় প্রতিষ্ঠিত করবার মত ছিল তাঁদের সীমাহীন ধৈর্য, তেমনি ছিল অসাধারণ নিষ্ঠা। এক-একটি রাগের রূপ অক্ষুণ্ণ রেখেই তাঁরা সুরের মাধুর্যে শিল্পকর্ম রচনা করে সবার হৃদয় জয় করে নিতেন। এরকম একনিষ্ঠ সাধক আজকের যুগে কোথায়? যাঁরা আছেন, তাঁরাও সংখ্যায় খুবই কম। কিন্তু দুঃখ হয় এই কথা ভেবে যে, আজকের নবীন শিল্পীরাই সেইসব সংগীতসাধকের উত্তরাধিকারী। কিন্তু তাঁরা কি তাঁদের পূর্বসূরীদের পথ অনুসরণ করে চলেছেন? বর্তমান কালের সংগীত-জগতের দিকে তাকিয়ে ব্যথিতচিত্তে বলতে বাধ্য হই, তেমন কোন প্রতিশ্রুতি আমরা পাচ্ছি না। এক আত্মঘাতী খেয়ালে উন্মত্ত হয়ে তাঁরা সংগীতকে কোথায় নিয়ে চলেছেন? কিসের মোহে এমন সর্বনাশা খেলায় মেতেছেন? অধুনা যেসব শিল্পীর কলাকৃতি প্রায়শই আমরা নানা আসরে শুনতে পাই, তাঁদের অনেকের মধ্যেই আমরা দক্ষ কুশলতার পরিচয় অবশ্যই পাই। সেদিক দিয়ে বিচার করলে অর্থাৎ তৈরীর দিক থেকে, তাঁদের সংগীতে হয়ত বলার কিছুই নেই। কিন্তু তবু কেন মন ভরে না? গতি ও দক্ষতা এ-দুটি গুণ যে গানে ও বাজনায় অপরিহার্য, আজ তা অবশ্য বলাই বাহুল্য। এবং সেদিক থেকে কোন কোন শিল্পী বেশ প্রশংসার দাবীও রাখেন। কিন্তু এ সবই ব্যর্থতায় পর্যবসিত হয় যখন দেখি, শিল্পী কেবল উন্মত্তের মত সেইভাবে তৈরি হতে বা তৈরি হওয়াকেই একমাত্র মূলধন করে আর সব নিয়মকানুনে জলাঞ্জলি দিয়ে বল্গাহীন ঘোড়ার মত এলোপাথাড়ি ছুটে চলেন। এমনকি বেশীর ভাগ ক্ষেত্রে রাগের রূপটি পর্যন্ত নির্ণয় করা দুঃসাধ্য হয়ে ওঠে। অবশ্য মুখে তাঁরা বেশ গালভরা রাগের নাম ঘোষণা করেন। কিন্তু বাস্তবে দেখা যায়, সবই একটা ধোঁয়ার আবরণে কুয়াশার মত আবছা। এইসব বিকলাঙ্গ রাগরাগিণী যখন আবার সুর হারিয়ে বেসুরো আর্তনাদ করে ওঠে তখন মনে হয়, আমরা কি রাগরাগিণীর শবব্যবচ্ছেদ দেখছি? সবচাইতে অবাক হতে হয় যখন দেখি, এইসব অপরূপ গান-বাজনা শুনে শ্রোতারা প্রচণ্ড করতালিতে ঘর ফাটান। কেন? এই প্রশ্ন সত্যিই মনে জাগে। তার উত্তর পেতেও দেরী হয় না। কারণ শিল্পী সাঙ্গীতিক অনুভূতি সৃষ্টি করতে পেরে থাকুন বা না থাকুন, চাকচিক্য পরিচয়ে তিনি প্রমাণ করেছেন তাঁর দক্ষতা। সাপাট তানের দাপট তো কিছু কম ছিল না। (তাতে রাগের প্রকাশভঙ্গি যদি একটু অবিন্যস্ত হয়, হোক না!) আর এরই জোরে এইসব কলাকার আসরে বাজীমাৎ করেন। আর তার জন্যে দায়ী আমাদের অগণিত শ্রোতারা, যাঁরা তাঁদের স্বল্প জ্ঞান নিয়ে প্রকৃত রসগ্রহণে অসমর্থ। আজ অগণিত শ্রোতাদের শ্রবণইন্দ্রিয়কে প্রকৃত রসগ্রহণের উপযুক্ত শিক্ষায় শিক্ষিত করে তোলা প্রয়োজন। আজকের সহজ হাততালিতে ভেসে গিয়ে ভবিষ্যৎ কালের শিল্পীরা যদি কেবল ফাঁকি দিয়েই শ্রোতাদের বঞ্চিতও করে যান, তাহলে তাঁদেরই বা দোষ কী? উচ্চাঙ্গ সংগীতের ধারাকে বজায় রাখার দায়িত্ব তাই আজ এসে পড়েছে সামাজিকবৃন্দের ওপর—তা তিনি সংগীতরসিকই হোন বা সংগীতসমালোচকই হোন। রাগ-সংগীতের পরিণাম ভেবে নবীন শিল্পীরা যদি রাগ-রাগিণীর রূপ দিতে ঐকান্তিকভাবে যত্নবান না হন, যদি না থাকে তাঁদের সে-নিষ্ঠা, যদি কেবল হাতের বা গলার কসরতটুকুই দেখাবার সাধনায় তাঁদের সমস্ত শক্তি ব্যয় করেন, তবে ভবিষ্যতের দিকে তাকিয়ে আমরা কোন আলোর সংকেত প্রত্যাশা করবো? রাগ-সংগীত কি তবে নিছক কুশলীতার নাগপাশেই বদ্ধ হয়ে মরবে। শিল্পী কি রচনা করতে চাইবে না রাগরূপের নতুন মাধুর্য, করবে না তাতে প্রাণ প্রতিষ্ঠা? আমরা কি সেই অমৃতলোকের চাবিকাঠিটি আর কোনদিনই খুঁজে পাব না—যেখানে পৌঁছনোই ছিল ভারতীয় সংগীতের প্রকৃত সাধনা!

ভারতবর্ষের শ্রেষ্ঠ টেনিস খেলোয়াড় রমানাথন কৃষ্ণান (বাঁ দিকে) মাদ্রাজের নেহরু স্টেডিয়ামে আয়োজিত এক অনুষ্ঠানে ইউ এস আই এস-এর তথ্য কর্মচারী মিঃ ডীয়ার ফিল্ডের হাত থেকে আন্তর্জাতিক হেলমস্ ওয়ার্ল্ড ট্রফি গ্রহণ করছেন। ১৯৬৬ সালের শ্রেষ্ঠ কুশলী খেলোয়াড় হিসাবে কৃষ্ণান এই ট্রফি পেয়েছেন।

দর্শক

সন্তোষ ট্রফি

কটকের বারবাটি স্টেডিয়ামে আয়োজিত ২৪তম জাতীয় ফুটবল প্রতিযোগিতার ফাইনালে মহীশূর ১—০ গোলে বাংলাকে পরাজিত করে ১৪ বছর পর পুনরায় সন্তোষ ট্রফি জয়ের গৌরব লাভ করেছে। মহীশূর এই নিয়ে ৬বার ফাইনালে খেলে মোট ৩বার সন্তোষ ট্রফি পেল। অপরদিকে বাংলা দল এই নিয়ে ফাইনালে ১৮বার খেলে ৮বার রানার্স-আপ হল। এই ১৮বারের ফাইনাল খেলায় বাংলার যে ১১বার জয়, তা প্রতিযোগিতার ইতিহাসে সর্বাধিকবার জয়-লাভের রেকর্ড হিসাবে আজও অক্ষুন্ন রয়েছে। আরও উল্লেখযোগ্য যে, মহীশূর দল এপর্যন্ত যে ৬বার ফাইনালে খেলেছে, তা বাংলা দলেরই বিপক্ষে। উভয় দলের এই ৬বারের ফাইনাল খেলার ফলাফল সমান দাঁড়িয়েছে—বাংলার জয় ৩বার (১৯৫৩, ১৯৫৫ ও ১৯৬২) এবং মহীশূরের জয় ৩বার (১৯৪৬, ১৯৫২ ও ১৯৬৭)।

আলোচ্য বছরের সেমি-ফাইনালে বাংলা দল ১—০ ও ৪—১ গোলে গত বছরের রানার্স-আপ সার্ভিসেস দলকে পরাজিত করে যে ক্রীড়ানৈপুণ্যের পরিচয় দিয়েছিল, ফাইনালে কিন্তু তাদের সুনাম অনুযায়ী মোটেই খেলতে পারেনি। অপরদিকে মহীশূর যোগ্য দল হিসাবেই জয়ী হয়েছে। প্রথমার্ধের খেলা শেষ হওয়ার চার মিনিট আগে মহী-শূরের ইনসাইড ফরোয়ার্ড আমজাদ খাঁ দলের জয়সূচক গোলটি দেন। মহীশূরের ব্যাক নগেন্দ্রন বাংলার গোল লক্ষ্য করে যে-বলটি পাঠান, তা প্রতিরোধ করতে বাংলার ব্যাক জন অযথা সময় নষ্ট করেছিলেন। সেই ফাঁকে মহীশূর দলের কুশলী আমজাদ খাঁর পক্ষে গোল দেওয়া খুবই সহজ হয়।

মহীশূর : চিন্নাবাবু; কৃষ্ণাজি রাও, নগেন্দ্রন, পুত্তাস্বামী এবং কৃষ্ণাপ্পা; আস্রোকি দাস এবং সুব্রহ্মনিয়ম; ভেঙ্কট-রামালু, ত্যাগরাজ, আমজাদ খাঁ এবং সরদার খাঁ।

বাংলা : বলাই দে; বি দেবনাথ (এস ভট্টাচার্য), এম জন, সি প্রসাদ এবং আলতাফ আমেদ; বিদ্যুৎ মজুমদার এবং নঈম; অশোক চ্যাটার্জি, সীতেশ দাস, পরিমল দে এবং কে বি শর্মা।

আলোচ্য বছরের প্রতিযোগিতায় গত বছরের চ্যাম্পিয়ান রেলওয়ে এবং রানার্স-আপ সার্ভিসেস দলকে নিয়ে মোট ১৯টি দল অংশ গ্রহণ করেছিল। একদিকের সেমি-ফাইনালে বাংলা দল ১-০ ও ৪-১ গোলে সার্ভিসেস দলকে পরাজিত করে ফাইনালে উঠেছিল। এই সার্ভিসেস দলেরই কাছে গত বছরের সেমি-ফাইনালে বাংলা দল শেষ পর্যন্ত টসে পরাজিত হয়েছিল। গত বছরের সেমি-ফাইনালের প্রথম খেলায় বাংলা ১-০ গোলে এবং দ্বিতীয় খেলায় সার্ভিসেস ১-০ গোলে জয়ী হলে টসের সাহায্য নিতে হয়। এ বছরের অপরদিকের সেমি-ফাইনালে মহীশূর ১-০ ও ২-২ গোলে উড়িষ্যাকে পরাজিত করে ফাইনালে বাংলার সঙ্গে মিলিত হয়। গত বছরের সন্তোষ ট্রফি বিজয়ী রেলওয়ে দল কোয়ার্টার-ফাইনাল খেলায় শোচনীয়ভাবে ১-৩ গোলে মহীশূর দলের কাছে পরাজিত হয়েছিল।

কোয়ার্টার ফাইনাল

বাংলা ৪	:	মাদ্রাজ ১
উড়িষ্যা ০,৩	:	অন্ধ্র ০, ২
সার্ভিসেস ৫	:	মহারাষ্ট্র ৩
মহীশূর ৩	:	রেলওয়ে ১

সেমি-ফাইনাল

বাংলা ১, ৪	:	সার্ভিসেস ০, ১
মহীশূর ১, ২	:	উড়িষ্যা ০, ২

জাতীয় মহিলা হকি

১৯৬৭ সালের জাতীয় মহিলা হকি প্রতিযোগিতার ফাইনালে মহীশূর ১-০ গোলে পাঞ্জাবকে পরাজিত করে উপর্যুপরি ৮-বার লেডী রতন টাটা ট্রফি জয়ের গৌরব লাভ করেছে। প্রথমার্ধের খেলা গোলশূন্য ছিল। দ্বিতীয়ার্ধের খেলার ২৭ মিনিটে হেদার ফেভিলি মহীশূর দলের জয়সূচক গোলটি দিয়েছিলেন। বৃষ্টির দরুণ দু'দিন এই ফাইনাল খেলা স্থগিত ছিল। প্রথম দিনে দশ মিনিট খেলার পর বৃষ্টির জন্যে খেলা বন্ধ হয়ে যায়। একদিকের সেমি-ফাইনালে মহীশূর ১-০ গোলে বোম্বাই এবং অপরদিকের সেমি-ফাইনালে পাঞ্জাব ১-০ গোলে মহা-রাষ্ট্রকে পরাজিত করে ফাইনালে উঠেছিল। বাংলা দল কোয়ার্টার ফাইনালে ১-৩ গোলে বোম্বাই দলের কাছে পরাজিত হয়েছিল।

দলীপ ট্রফি

দিল্লীর ফিরোজশা কোটলা মাঠে আয়োজিত ১৯৬৭ সালের দলীপ ট্রফি ক্রিকেট প্রতিযোগিতার কোয়ার্টার ফাইনালে উত্তরাঞ্চল প্রথম ইনিংসের রান সংখ্যার ভিত্তিতে পূর্বাঞ্চলকে পরাজিত করে সেমি-ফাইনালে পশ্চিমাঞ্চল দলের সঙ্গে খেলবার যোগ্যতা অর্জন করে।

প্রথমদিনে উত্তরাঞ্চল দল ৫ উইকেট খুইয়ে ২৩৯ রান সংগ্রহ করেছিল। পূর্বাঞ্চল দলের দীপঙ্কর সরকার একাই

সন্তোষ ট্রফি বিজয়ী ও বিজিত দল

সাল	বিজয়ী	বিজিত
১৯৪১	বাঙ্গলা (৫)	দিল্লী (১)
১৯৪২-৪৩	খেলা হয় নি	
১৯৪৪	দিল্লী (২)	বাঙ্গলা (০)
১৯৪৫	বাঙ্গলা (২)	বোম্বাই (০)
১৯৪৬	মহীশূর (১), (২)	বাঙ্গলা (১), (১)
১৯৪৭	বাঙ্গলা (০), (১)	বোম্বাই (০), (০)
১৯৪৮	খেলা হয় নি	
১৯৪৯	বাঙ্গলা (৫)	হায়দরাবাদ (০)
১৯৫০	বাঙ্গলা (১)	হায়দরাবাদ (০)
১৯৫১	বাঙ্গলা (১)	বোম্বাই (০)
১৯৫২	মহীশূর (১)	বাঙ্গলা (০)
১৯৫৩	বাঙ্গলা (০), (৩)	মহীশূর (০), (১)
১৯৫৪	বোম্বাই (২)	সার্ভিসেস (১)
১৯৫৫	বাঙ্গলা (১)	মহীশূর (০)
১৯৫৬	হায়দরাবাদ (১), (৪)	বোম্বাই (১), (১)
১৯৫৭	হায়দরাবাদ (৩)	বোম্বাই (০)
১৯৫৮	বাঙ্গলা (১)	সার্ভিসেস (০)
১৯৫৯	বাঙ্গলা (৩)	বোম্বাই (১)
১৯৬০	সার্ভিসেস (০), (১)	বাঙ্গলা (০), (০)
১৯৬১	রেলওয়ে (৩)	মহারাষ্ট্র (০)
১৯৬২	বাঙ্গলা (২)	মহীশূর (০)
১৯৬৩	মহারাষ্ট্র (১)	অন্ধ্র (০)
১৯৬৪	রেলওয়ে (২)	বাঙ্গলা (১)
১৯৬৫	অন্ধ্র (২)	বাঙ্গলা (১)
১৯৬৬	রেলওয়ে (২)	সার্ভিসেস (০)
১৯৬৭	মহীশূর (১)	বাঙ্গলা (০)

৮৩ রানে ৪টে উইকেট পেয়েছিলেন। দ্বিতীয় দিনে ৩২৩ রানের মাথায় উত্তরাঞ্চল দলের প্রথম ইনিংস শেষ হয়। দলের সর্বোচ্চ ১০০ রান করেন বিজয় মেহরা। খেলার বাকি সময়ে পূর্বাঞ্চল দল তাদের ৬টা উইকেট খুইয়ে মাত্র ১৯৪ রান তুলেছিল। পূর্বাঞ্চল দলের খেলার সূচনা ভাল হয়নি—১ম উইকেট ৬ রান, ২য় উইকেট ৩৭ রান, ৩য় উইকেট ৭০ রান, ৪র্থ উইকেট ৮১ রান এবং ৫ম উইকেট ১০৫ রানের মাথায় পড়ে যায়। খেলার তৃতীয় অর্থাৎ শেষদিনে ২১১ রানের মাথায় পূর্বাঞ্চল দলের প্রথম ইনিংস শেষ হলে উত্তরাঞ্চল দল ৪ উইকেটের বিনিময়ে ১৮৪ রান সংগ্রহ করে দ্বিতীয় ইনিংসের খেলার সমাপ্তি ঘোষণা করে। পূর্বাঞ্চল দলের অসমাপ্ত দ্বিতীয় ইনিংসের ১৫৭ রানের (৩ উইকেটে) মাথায় খেলাটি শেষ হলে উত্তরাঞ্চল দল প্রথম ইনিংসে ১১২ রান বেশী সংগ্রহ করার দরুণ জয়ী হয়।

উত্তরাঞ্চল: ৩২৩ রান (বিজয় মেহরা ১০০ এবং এস অমরনাথ ৮৫ রান। দীপঙ্কর সরকার ১১৪ রানে ৬ উইকেট)
ও ১৮৪ (৪ উইকেটে ডিক্লে:। আকাশ-লাল ৭০ এবং এইচ টি দানী ৬৯ রান। সরকার ৪২ রানে ২ উইকেট)

পূর্বাঞ্চল: ২১১ রান (অম্বর রায় ৬১ এবং আনন্দ সুকলা ৫৩ রান। এস চক্রবর্তী ৩৯ রানে ৪, ইন্দরদেব ৭৯ রানে ৪ এবং বেদী ৪৫ রানে ২ উইকেট)
ও ১৫৭ রান (৩ উইকেটে। আনন্দ সুকলা নট আউট ৭৯ রান)

প্রাক অলিম্পিক হকি প্রতিযোগিতা

ইংল্যাণ্ডের প্রখ্যাত লর্ডস এবং ওভাল ক্রিকেট মাঠে অনুষ্ঠিত প্রাক-অলিম্পিক হকি প্রতিযোগিতায় পশ্চিম জার্মানী বে-সরকারীভাবে লীগ চ্যাম্পিয়ান হয়েছে। গোলের গড়পড়তায় রানার্স-আপ হয়েছে নিউজিল্যাণ্ড, তৃতীয় স্থান লাভ করেছে ভারতবর্ষ এবং পাকিস্তান পেয়েছে ৪র্থ স্থান। নিউজিল্যাণ্ড এবং ভারতবর্ষ—উভয়েরই সমান ৭ পয়েণ্ট করে উঠেছিল। কিন্তু শেষপর্যন্ত গোলের গড়পড়তায় নিউ-জিল্যাণ্ড দ্বিতীয় স্থান পায়। নিউজিল্যাণ্ড ৪টি গোল দিয়ে মাত্র একটি গোল খায়; অপরদিকে ভারতবর্ষ ৮ গোল দিয়ে ৬ গোল খেয়েছিল। আলোচ্য প্রতিযোগিতায় ১২টি দেশ অংশগ্রহণ করেছিল। লীগ প্রথায় খেলা হলেও ১২টি দেশ মাত্র পাঁচটি করে বাছাই খেলায় অংশগ্রহণ করেছিল। প্রতিযোগিতায় অপরাজিত ছিল মাত্র দুটি দেশ—পশ্চিম জার্মানী এবং নিউজিল্যাণ্ড। ১৯৬৪ সালের অলিম্পিক হকি চ্যাম্পিয়ান ভারতবর্ষের খেলার ফলাফল দাঁড়ায় : জয় ৩, ড্র ১ এবং পরাজয় ১। ১৯৬৪ সালের অলিম্পিক হকির রানার্স-আপ পাকিস্তান ১—০ গোলে ভারতবর্ষকে পরাজিত করে পূর্ব পরাজয়ের প্রতিশোধ নেয়। তবে আলোচ্য প্রতিযোগিতায় পাকিস্তান তাদের সুনাম অনুযায়ী খেলতে পারেনি। তারা পূর্ব এবং পশ্চিম জার্মানীর কাছে ১—২ গোলে পরাজয় স্বীকার করেছিল।

লীগ তালিকার চূড়ান্ত অবস্থান

	খে	জ	ড্র	পরা	পঃ
পঃ জার্মানী	৫	৪	১	০	৯
নিউজিল্যাণ্ড	৫	২	৩	০	৭
ভারত	৫	৩	১	১	৭
পাকিস্থান	৫	৩	০	২	৬
পূঃ জার্মানী	৫	২	২	১	৬
অস্ট্রেলিয়া	৫	২	১	২	৫
ফ্রান্স	৫	১	২	২	৪
জাপান	৫	১	২	২	৪
হল্যাণ্ড	৫	১	২	২	৪
বেলজিয়াম	৫	১	২	২	৪
বৃটেন	৫	০	৩	২	৩
স্পেন	৫	০	১	৪	১

ভারতবর্ষের খেলা: জয় (৩): বৃটেনকে ৩—২, স্পেনকে ২—১ এবং অস্ট্রেলিয়াকে ২—১ গোলে পরাজিত করে; ড্র (১): ফ্রান্সের সঙ্গে ১—১ গোলে; পরাজয় (১): পাকিস্তানের কাছে ০—১ গোলে।

পাকিস্তানের খেলা : জয় (৩) : বেল-জিয়ামকে ২—০, হল্যাণ্ডকে ১—০ এবং ভারতবর্ষকে ১—০ গোলে পরাজিত করে। পরাজয় (২) : পশ্চিম জার্মানীর কাছে ১—২ গোলে এবং পূর্ব জার্মানীর কাছে ১—২ গোলে।

ভারতীয় ক্রিকেট দলের সফর

আগামী ১৯শে নভেম্বর পতৌদির নবাবের নেতৃত্বে ভারতীয় ক্রিকেট দল অস্ট্রেলিয়া এবং নিউজিল্যাণ্ড সফরে যাবে। অস্ট্রেলিয়ার মাটিতে ভারতীয় ক্রিকেট দল সফরের প্রথম ম্যাচ খেলতে নামবে ২২শে নভেম্বর এবং শেষ ম্যাচ ২রা ফেব্রুয়ারী। অস্ট্রেলিয়া এবং নিউজিল্যাণ্ডের বিপক্ষে ভারতবর্ষ চারটি করে টেস্ট ম্যাচ খেলবে। টেস্ট খেলাগুলির সময়ের ব্যবধান খুব কম থাকার দরুণ ভারতবর্ষের বিপক্ষে অস্ট্রেলিয়া দুটি দল গঠন করবে। অস্ট্রেলিয়ার প্রথম টেস্ট দলটি খেলবে প্রথম ও দ্বিতীয় টেস্ট এবং দ্বিতীয় দলটি বাকি দুটি টেস্ট। অস্ট্রেলিয়ার টেস্ট ক্রিকেট খেলার ইতিহাসে এই সিদ্ধান্ত অভিনব।

এখানে উল্লেখ্য, ভারতীয় ক্রিকেট দলের এইটি দ্বিতীয় অস্ট্রেলিয়া সফর এবং অপর-দিকে প্রথম নিউজিল্যাণ্ড সফর।

টেস্ট খেলার স্থান ও তারিখ

অস্ট্রেলিয়ার বিপক্ষে

১ম টেস্ট (এডিলেড) : ডিসেম্বর ২৩—২৮
২য় টেস্ট (মেলবোর্ন) : ডিসেম্বর ৩০—জানুয়ারী ৪
৩য় টেস্ট (ব্রিসবেন) : জানুয়ারী ১৯—২৪
৪র্থ টেস্ট (সিডনি) : জানুয়ারী ২৬—৩১

নিউজিল্যাণ্ডের বিপক্ষে

১ম টেস্ট (ডুনেডিন) : ফেব্রুয়ারী ১৫—২০
২য় টেস্ট (ক্রাইস্টচার্চ) : ফেব্রুয়ারী ২২—২৭
৩য় টেস্ট (ওয়েলিংটন) : ফেব্রুয়ারী ২৯—মার্চ ৫
৪র্থ টেস্ট (অকল্যাণ্ড) : মার্চ ৭—১২

ক্যাম্প নয়, অনুশীলনও নয়, সার্কাস পার্টি

অমল ভট্টাচার্য

এ আবার কেমন ধরনের সিলেকসন। দশদিনে বাজিমাৎ। ক্রিকেট দল গড়তে এর চেয়ে সোজা পন্থা কি আর ছিল না। ব্যাপারটা এইরকম—ধরে বেঁধে নিয়ে এস। দেখি সব কেমন খেলে। চেহারাগুলো কেমন আছে দেখতে হবে ত। তামাম মুলুক থেকে সব খেলোয়াড়রা জড় হল অনুশীলন আসরে। ক্যাম্প নয়, অনুশীলনও নয়—একে বলব সার্কাস পার্টি। কদিনে যদি ভাল কসরত দেখাতে পার তবে দলে স্থান পাবে। তিরিশজনের আসর। সবাই আছে। কর্তা-ব্যক্তিরাও। এটা প্রহসন ছাড়া আর কি বলতে পারি।

ক্যাপ্টেন সিলেকসন হয়ে গেছে। কানা-ঘুষোয় পাতৌদির "না" বলা রাতারাতি চাপা পড়ে গেল। হ্যাঁ। তিনিই বহাল রইলেন। এছাড়া কোন গত্যন্তর নেই। রাজকীয় খেলায় রাজা-মহারাজাদের হাতযশ অনেক। পাতৌদির শিক্ষা-দীক্ষা অন্য ধরনের, অন্য মেজাজের। লক্ষদের হাতে হাত মিলিয়ে তিনি কি কাজ হাসিল করতে পেরেছেন? বোধহয় না। এ কর্তব্য পালনে তিনি সক্ষম হননি। তাহলে দলের এ দুর্দশা হত না। যা ঘটেছে, যা ঘটেছে, সব ভুলে যাও। খেলায় হারজিত আছেই। আর দুর্নাম, সেও কপালের লিখন। এবার পড়ে রইল দলের খেলোয়াড়রা। ইংল্যান্ড সফরে যাঁরা ছিলেন তাঁরা অনেকেই থাকবেন। কেননা, ইংল্যান্ডের মাটিতে পরাজয় সেটা নেহাৎই দুর্যোগ বলে ধরে নেওয়া যাক। অস্ট্রেলিয়ার মাটিতে তাঁরা খেলা দেখাবেন।

বিশ বছর আগে লালা অমরনাথের নেতৃত্বে প্রথম ও শেষ অস্ট্রেলিয়া সফর করেছিল ভারতীয় ক্রিকেট দল। দল গড়তে সেবারও কর্তৃপক্ষরা চোখে সর্ষে ফুল দেখেছিলেন। কয়েকজন নামকরা খেলোয়াড় কলা দেখিয়ে সরে পড়েছিলেন। তবুও মান রাখতে অমরনাথের দল চেষ্টা কম করেনি। অমরনাথের সে দীপ্তকণ্ঠ আজও ভুলিনি। বলেছিলেন—"কেউ নেই, স্কুলের ছেলেরা ত আছে। তাতেও আমি পিছপা নই।" সুরসুন্দর করে বলেছিলেন—"দ্যাখ ভাই, আমার খেলোয়াড়রা সব জিন্দা আছে।" ফলাফল খুব ভাল না হলেও অস্ট্রেলিয়ার ধুরন্ধর লিন্ডওয়াল-মিলারের কাছে কেউ মাথা নোয়ায়নি। আজকের দিনে এই ধরনের খেলোয়াড়কেই ক্যাপ্টেন করা উচিত ছিল না কি?

কিন্তু আজকের পরিস্থিতি অন্যরকম। অনেকের ধারণা, আজও যা আছে তা নিয়েও ভাল দল গড়া যায়। তবে কি কারণে সেটা সম্ভব হচ্ছে না তা জানতে পারলে অন্ততঃ ক্রিকেট অনুরাগীরা খুশী হতেন। বিশ বছর আগে হাত গুণেও বলে দিতে পারতাম ভারতীয় খেলোয়াড়দের নাম। কোন অসুবিধা ছিল কি? তবে আজ তাতে অনেক বাধা। একটা শক্তিশালী দল গড়তে চাই বাছাই কয়েকজন ব্যাটসম্যান। আমাদের হাতে ব্যাটসম্যান অনেক। বোলারও অনেক। তবে ফাস্ট বোলার ছাড়া। স্পিন বোলারের ছড়াছড়ি। ইংল্যান্ডে যে স্পিন বোলাররা গিয়েছিলেন তাঁরা কেউ খারাপ নন। তবে শুধু বল করলেই হবে না। খেলতে গেলে ব্যাটিংও চাই। কিন্তু এবারের ইংল্যান্ড সফরে অনেক ভারতীয় বোলারই একদম ব্যাট করতে পারেননি। তাতে দেখা গেছে, কয়েকজন নির্ভরযোগ্য ব্যাটসম্যান খেলতে না পারায় দলকে চরম দুর্দশায় পড়তে হয়েছিল। আর যাঁদের ব্যাটসম্যান বলে গণ্য করা হয়েছিল তাঁরা যে কেউ তালেবর ব্যাটসম্যান নন সে প্রমাণও পাওয়া গেছে। আমাদের ব্যাটসম্যানরা ওয়েস্ট ইন্ডিজের ব্যাটসম্যানদের মত ক্ষমতাশালী নন নিশ্চয়ই। সেদিক দিয়ে তাঁরা মুষ্টিমেয় ব্যাটসম্যান দিয়ে কাজ হাসিল করেন। কিন্তু আমাদের কি সে কথা সাজে? ভেঙ্কটরাঘবন, চন্দ্রশেখর, প্রসন্ন, বেদী—এঁরা কেউ ব্যাটসম্যান নন। এমন কি ভাল ফিল্ডারও নন। সেদিক দিয়ে নাদকার্নি, দুরানী অনেকাংশে ভাল। তাঁদের কাছে বল-ব্যাট দুই ব্যাপারে নির্ভর করা যায়। এবং ফিল্ডিংয়ে নিঃসন্দেহে তাঁরা ভাল। কিন্তু নাদকার্নি এবং দুরানী আজ উপেক্ষিত।

ক্রিকেটের দূরদর্শিতা যাঁদের আছে তাঁরা নিশ্চয়ই স্বীকার করবেন বিশ্বের অন্যতম শক্তিশালী দলের বিরুদ্ধে অভিজ্ঞ খেলোয়াড়দেরই দলভুক্ত করা উচিত। নতুন-তরুণদের কয়েকজনকে দলে নেওয়া যেতে পারে তবে একেবারে খোল-নলচে বাদ দিয়ে নয়। কিছুতেই বুঝতে পারি না, যাঁরা এতদিন ধরে টেস্ট ক্রিকেটে অভিজ্ঞতা সঞ্চয় করে এলেন তাঁদের ফিটনেস থাকা সত্ত্বেও দল থেকে বাদ দেওয়া হয় কেন? এটা কি ধরনের কারসাজি সেটা বোঝবার মত ক্ষমতা আমার নেই।

ফাস্ট বোলারের সন্ধান পাওয়া গেল না। গেল না বলেই সোজা হাত-পা ছেড়ে দিয়ে ফাস্ট বোলারেই দল পাঠান যাক। কিন্তু রমাকান্ত দেশাই কি অপরাধ করেছেন? আজও যে তিনি ফুরিয়ে যাননি তার যথেষ্ট প্রমাণ পাওয়া গেছে। দেশাই ভাল ব্যাটসম্যান এবং ফিল্ডারও। অথচ চোখ-কান বুজে মঞ্জরেকারকে তিরিশ-জনের মধ্যে রাখার কি অর্থ থাকতে পারে? মঞ্জরেকার খেলা থেকে অবসর নিয়েছিলেন। কিথ মিলার এবং ডেভিডসন খেলা থাকতেই অবসর নিয়েছিলেন। ভারতের পলি উমরিগড়ও স্বেচ্ছায় খেলা ছেড়েছিলেন। তাঁদের অভাব কি কেউ পূরণ করতে পেরেছেন?

বরাবরই দেখা গেছে, বোম্বাই থেকেই শ্রেষ্ঠ খেলোয়াড়দের স্বীকৃতি আসছে। সেই কারণে বোম্বাইকে বলা হয় ভারতীয় ক্রিকেটের তীর্থভূমি। ভারতীয় দলে কম করে সাত-আটজন খেলোয়াড় স্থান পেতেন। কিন্তু আজ সব রাজ্যকেই একটা বিশেষ স্থান দেবার হুজুগ পড়ে গেছে। খেলতে পারুক আর নাই পারুক। কিন্তু যে খেলোয়াড়দের কাছ থেকে ভাল পাওয়ার কোন সম্ভাবনা নেই তাঁদের দলে নেওয়া কেন? তাই সার্কাস পার্টি বলে এই সিলেকসনকে অভিহিত করতে আমার এতটুকু বাধল না।

আবার আর এক প্রসঙ্গ। শোনা যায়, ভারতীয় খেলোয়াড়রা বড় দামাল, বড় বেসামাল। উঠতি বয়সের মাদকতায় তারা অস্থির হয়ে পড়েন। কাজেই দলের ইজ্জত রাখতে একটা শক্ত হাতে ম্যানেজারের ভার দেওয়া উচিত। তাই এই পর্যায়ে বিমুখী প্রতিদ্বন্দ্বিতায় নেমেছিলেন লালা অমরনাথ, গোলাম আমেদ এবং হেমু অধিকারী। ভেবেছিলাম খেলোয়াড়দের সামাল রাখবার জন্যে কর্তৃপক্ষ আরও কঠিন হবেন। সেদিক দিয়ে হেমু অধিকারীই উপযুক্ত লোক ছিলেন। মিষ্টি হাসিতে নয়, চোখের শাসানিতেও নয়—সরাসরি মিলিটারী কায়দায় চল। সব ঠিক হয়ে যাবে। কিন্তু ম্যানেজার হলেন গোলাম আমেদ। তিনিও কম যান না। শিক্ষায়, বাচন ভঙ্গীতে তিনি সবার ওপরে। ওয়েস্ট ইন্ডিজ সফরে প্রমাণ করেছিলেন তিনি এ গুরুদায়িত্ব নিতে সক্ষম। গোলাম আমেদ মানুষটিকে দেখতে শান্তশিষ্ট মনে হয়। কিন্তু প্রয়োজনে তিনি কঠোর হতে জানেন। যেমন ব্যক্তিত্ব তেমনি উদার মন। চালচলনে, বেশভূষায় গোলাম আমেদ দারুণ স্মার্ট।

এই প্রসঙ্গে লালা অমরনাথের কথা মনে পড়ল। তিনি বলেছিলেন—"দ্যাখ ভাই আমরা কেউ দেবদূত ছিলাম এমন কথা বলিনি। তবে খেলার দিন আগে আমরা রাত দশটার পর অবশ্যই বিছানা নিতাম। এর ব্যতিক্রম কোনদিন হয়নি। আর বেশি না, তবে ভাল খেলবার প্রেরণা যোগাতে আমরাও যদি ছেলেদের সঙ্গে অনুশীলন করি।"

তস্য তস্য অথবা সূর্য কাঁদলে সোনা

প্রেমেন্দ্র মিত্র

(পূর্ব প্রকাশিতের পর)

কে ধরে ফেলেছে মার্শনেস-কে?

দু'এক মুহূর্তের অচেতনতার পরই মার্শনেস সংজ্ঞা ফিরে পেয়ে চমকে পাশে তাকায়।

আলকাজার' প্রাসাদের কোল দিয়ে তখন ভীত বিশৃঙ্খল জনতার স্রোত বইছে। তারই ভেতর একপাশে একটু সরে দাঁড়িয়ে যিনি তাকে বুকে ঈষৎ ভর দেবার সুযোগ দিয়ে ধরে আছেন তাঁকে দেখে প্রথমটা মার্শনেস সন্ত্রস্ত হয়ে ওঠে।

এ কোন অজানা অচেনা একটা বুড়ো বাউণ্ডুলে ভিখিরী তাকে ধরে আছে?

ঝটকা দিয়ে সরে আসতে গিয়ে ভিখিরীটার মুখের হাসি দেখেই মার্শনেসকে একটু থমকে যেতে হয়।

জট পড়া শাদা কালো দাড়ির ফাঁকের হাসিটা তার যেন চেনা।

পরমুহূর্তেই আবার ভিখিরীটার বুকের ওপরই মাথা গুঁজে রেখে মার্শনেস উচ্ছ্বসিত গলায় বলে ওঠে, তিয়েন! তুমি? আমি যে তোমার...

বাউণ্ডুলে ভিখিরী চেহারার লোকটি চাপা গলায় এবার বলে,—চুপ। তারপর বেশ একটু জোর করেই মার্শনেসকে দূরে ঠেলে দিয়ে জনতার স্রোতে নিজেকে মিশিয়ে দিয়ে এগিয়ে যায়।

এক মুহূর্তের জন্যে একটু চমক লাগলেও, মার্শনেস আর অবাক হয় না।

বাউণ্ডুলে ভিখিরী চেহারার লোকটিকে চিনতে তার ভুল হয় নি। মানুষটা যে তার পাতানো তিয়ো অর্থাৎ কাকা, কখনো কখনো আদর করে যাকে সে তিয়েন বলে, সেই কাপিতান সানসেদো সে বিষয়ে কোনো সন্দেহ নেই।

কেন যে কাপিতান সানসেদো তাকে অমনভাবে ঠেলে সরিয়ে ভিড়ের মধ্যে নিজেকে মিশিয়ে দিয়েছে মার্শনেস তখন তাও বুঝে নিয়েছে।

শহরের ক'জন পাহারাদার সেপাই তাদের পাশ দিয়েই তখন ছুটে যাচ্ছে। কাপিতান সানসেদোর সন্ধানে অবশ্য তারা ছুটছে না। তবু সাবধানের মার নেই বলেই সানসেদো নিশ্চয় মার্শনেসকে ঠেলে দিয়ে সরে গেছেন।

মার্শনেস-এর মত সম্ভ্রান্ত পোশাক ও চেহারার সুন্দরী এক মহিলাকে একটা হাঘরে ভিখিরীর সঙ্গে অত ঘনিষ্ঠ হ'তে দেখলে পাহারাদারদের পক্ষে সন্দিগ্ধ হওয়া স্বাভাবিক।

কিন্তু রাস্তার ধারের এরকম অদ্ভুত কোন দৃশ্যও লক্ষ্য করবার মত অবস্থা তাদের বোধহয় তখন নয়।

রাস্তার জনতা যে কারণে তখন উত্তেজিত ভয়ার্ত, পাহারাদার সেপাইরাও অস্থির ও শশব্যস্ত সেই কারণেই।

মনের মধ্যে সেই একই আতঙ্ক বিহ্বলতা নিয়েও মার্শনেস জন-প্রবাহের মধ্যে তার তিয়োকে অনুসরণ করেই এগিয়ে চলে।

বেশীদূর মার্শনেসকে এভাবে যেতে হয় না।

আলকাজার প্রাসাদের টরে দেল অরো নামে চূড়ার নিচে পৌঁছেই মার্শনেস কাপিতান সানসেদোর সঙ্গে মেলবার সুযোগ পায়।

পাহারাদার সেপাইরা সামনে বেরিয়ে যাবার পর সানসেদো সেখানে জনতার প্রবাহ থেকে সরে চূড়ার নিচে একটি কোণে দাঁড়িয়ে পড়েছেন।

মার্শনেসকে বেশী কিছু বলবার অবকাশ সানসেদো দেন না।

সে গিয়ে তাঁর কাছে দাঁড়াবার পরই চাপা গলায় ব্যস্তভাবে সানসেদো বলেন,—শোনো আনা, তোমার আমার এখানের দাঁড়িয়ে কথা বলাও নিরাপদ নয়। তোমার মার্কুইস কি করেছে তা বোধহয় জানো। এখানকার কোতোয়ালীতেও আমার বিরুদ্ধে হুলিয়া বার করিয়েছে। সমস্ত শহরের লোক হঠাৎ অত্যন্ত উত্তেজিত সন্ত্রস্ত হয়ে উঠেছে তাই......

সানসেদোকে বাধা দিয়ে প্রধান প্রশ্নটা আপাততঃ স্থগিত রেখে অস্থির উদ্বেগের সঙ্গে আনা জিজ্ঞাসা করে,—কিন্তু ব্যাপারটা কি তিয়ো? শহরের মানুষের মত আমিও ত ভয়ে দিশাহারা। এইমাত্র যা দেখেছি তা সত্যি না দুঃস্বপ্ন তা বুঝতে পারছি না। তুমিও দেখেছ নিশ্চয়।

হ্যাঁ দেখেছি। অস্বস্তির সঙ্গে বলেন সানসেদো,—নিজের চোখকে বিশ্বাস করতে

[illegible] মন চাইছে না। কিন্তু সমস্ত শহরের [illegible] দুর্ভাবনার হওয়াও [illegible] ... একটা অদ্ভুত ভয়ঙ্কর কিছু মানে অ্যাজটেক্‌ দের নিশ্চয় আছে। কিন্তু এখন তা নিয়েও কথা বলবার সময় নেই। তোমার সঙ্গে দেখা হবার আশাই ছেড়ে দিয়েছিলাম। ভাগ্যক্রমে তা যখন হয়েছে তখন সন্ধ্যার পর সান মার্কস-এর মিনারের কাছে সাধারণ কিষাণ মেয়ের পোশাকে আমার সঙ্গে দেখা কোরো। ও মুসলিম মিনারের কাছে আজকের পরবের দিন তেমন ভিড় হয়ত না থাকতে পারে। মনে রেখো......

সানসেদোর কথায় আকস্মাতেই উত্তেজিত আতঙ্কবিহ্বল জনতার আর্ত চিৎকার হঠাৎ আবার তীব্র হয়ে ওঠে। সামনের দিকে জনতার যে স্রোত বয়ে গিয়েছিল তা আবার বিশৃঙ্খলভাবে সবেগে ঘুরে আসছে।

তাদেরই ভেতর দিয়ে ছুটে যায় উদ্ভট কিম্ভূতকিমাকার সেই প্রাণীটি।

কি? কি ওটা তিয়ো? ছদ্মবেশী সানসেদোর খাটো আলখাল্লা গোছের পোশাকটা সভয়ে আঁকড়ে ধরে মার্সেদেস প্রায় চিৎকার করে ওঠে।

কি তা জানি না! সানসেদো বিচলিত স্বরে বলেন, তবে এখন তাই জানবার চেষ্টাই আগে করতে হবে।

* * *

সানসেদো না জানলেও সেভিলের নানা জায়গায় খবরটা তখন ছড়াতে শুরু করেছে।

জনতার মধ্যে এখানে সেখানে সামান্য একটু কানাকানি। বিরাট জলাশয়ে ছোট ছোট ঢিল পড়লে যেমন হয়, সেই সামান্য খবর তেমনি চারিদিকে ঢেউ তুলে ক্রমশঃ বিস্তৃত হচ্ছে তখন।

কে যে কোথায় কলকাঠি নাড়ছে তা কেউ জানে না। কিন্তু লোকের মুখে মুখে ক'টা প্রশ্ন আর উত্তর চালাচালি হচ্ছে প্রায় সর্বত্রই।

কিম্ভূতকিমাকার প্রাণীটা সম্বন্ধে ভয়ের বিহ্বলতাটা তখন তীব্র কৌতূহলে রূপান্তরিত হতে শুরু করেছে।

এটা কি আজগুবি জানোয়ার? কোথা থেকে এল? শঙ্কিত ব্যাকুল প্রশ্ন।

সে প্রশ্নের উত্তরও কেউ কেউ দিচ্ছে,—ঠিক জানি না। তবে ওরা বলছে নতুন মহাদেশ থেকে নাকি আমদানি।

নতুন মহাদেশের জানোয়ার! সবিস্ময়ে অবিশ্বাসের সুরে বলেছে অনেকে,—এরকম জানোয়ার ত সেখান থেকে এপর্যন্ত কখনো আসেনি!

তা আসেনি। তবে এ হিসপানিওলা ফার্নান্দিনা মেক্‌সিকো কি ডারিয়েন-এর জানোয়ার নয়। একেবারে অজানা আর এক আশ্চর্য মুল্লুক থেকে আনা।

কে আনল কে? এনে এমন করে রাস্তায় ছেড়েই বা দিয়েছে কেন?

ছেড়ে দেয় নি। শুনছি, কেমন করে আপনা থেকেই পালিয়ে এসেছে বন্দরের জাহাজ থেকে।

তা কেউ ধরছে না কেন এখনো! এ জানোয়ার যে এনেছে সেই বা করছে কি? এত অসাবধান সে হল কেন?

সে আর কি করবে! সে ত শুনেছি কয়েদ হয়েছে বন্দরে পা দিতে না দিতে পুরোনো দেনার দায়ে।

দেনার দায়ে কয়েদ!

জনতার মধ্যে এই শুনেই আরেক ধরনের উত্তেজনা দেখা দিয়েছে। সুদখোর মহাজনদের ওপর সে যুগের মানুষের ঘৃণা আর আক্রোশ কিছু কম ছিল না। বিশেষ করে জীবনমরণ তুচ্ছ করে যারা নতুন মহাদেশ আবিষ্কারে সর্বস্ব পণ করছে তাদের প্রতি মুগ্ধ শ্রদ্ধা ও সহানুভূতি তখন এত বেশী যে কোনো মহাজনের হাতে তাদের একজনের নিগ্রহ জনতাকে ক্রমশঃ অস্থির ক্রুদ্ধ করে তুলেছে।

কাকে কয়েদ করেছে কাকে? এই অজানা নতুন মুল্লুক থেকে কে এনেছে এই অদ্ভুত জানোয়ার? উত্তেজিত জিজ্ঞাসা শোনা গেছে নানা জটলায়।

এনেছেন ফ্রানসিস্‌কো পিজারো! বন্দরে পা দিয়ে তিনিই হয়েছেন বন্দী!

ফ্রানসিস্‌কো পিজারো!

অনেকের কানেই নামটা একেবারে নতুন শোনায় নি।

হ্যাঁ, হ্যাঁ, এ নামটা ত একটু আধটু তাদের কানেও পৌঁছেছে। বিশেষ করে ডারিয়েন পানামা থেকে যে সব জাহাজ দেশে ফেরে তাদের কোনো কোনো মাঝিমাল্লা গল্প করেছে এক রূপকথার দেশের মত আজগুবি রাজ্যের। সে রাজ্য খোঁজার দুঃসাহসিক অভিযানের যারা নায়ক তাদের নামও শোনা গেছে এইসব নাবিকদের মুখে। কখনো অবজ্ঞার বিদ্রূপে, কখনো মুগ্ধ বিস্ময়ে। তার মধ্যে সবচেয়ে যাঁর নাম বেশী করে রটেছে, তিনি হলেন ফ্রানসিস্‌কো পিজারো।

সেই ফ্রানসিস্‌কো পিজারো দেনার দায়ে বন্দী? কে তাকে বন্দী করেছে?

করেছে ব্যাচিলর এনসিসো!

তা দেনা মিটিয়ে দিলেই ত হয়!

মেটাবে কি করে? জানপ্রাণ কবুল করে নতুন দেশ যারা খোঁজে তাদের নিজের বলতে কিছু থাকে কি! অভিযানের পেছনেই সব কিছু ঢেলে তারা ত' ফতুর। ব্যাচিলর এনসিসোর কাছে দেনাও ত' কম নয়। প্রায় কুড়ি বছর আগের তিল প্রমাণ দেনা সুদে ফেঁপে দশ বিশটা তাল হয়ে দাঁড়িয়েছে। সে দেনা শোধ করবার মত সম্বল পিজারোর নেই। তাই এখন তাঁকে যতদিন বাঁচেন জেলেই পচে মরতে হবে।

জেলেই পচে মরতে হবে! অসহায় আক্রোশ ফুটে উঠেছে নানাজনের গলার স্বরে,—কেন কেউ কি নেই তাঁর জামিন হয়ে দাঁড়াবার!

কে দাঁড়াবে তাঁর হয়ে! সত্যি সে ক্ষমতা যাদের আছে সেই বড়মানুষরা লাভের আশা যাতে অনিশ্চিৎ তেমন দায় কি ঘাড়ে নেয়! এখনো ত' তিনি কাম ফতে করে আসতে পারেন নি! ফ্রানসিস্‌কো পিজারো দুবারের পর তিনবারের অভিযানের খরচা জোগাড় করতে পারেন নি বলেই স্বয়ং সম্রাট পঞ্চম চার্লস-এর কাছে আর্জি নিয়ে তাঁর অনুগ্রহ ভিক্ষা করতে। কিন্তু এখনো সম্রাটের কাছে তাঁর খবরই পৌঁছোয় নি। আশ্চর্য দেশের সামান্য যে সাক্ষীপ্রমাণ পিজারো সঙ্গে এনেছেন তা কে থাপ করবে কে জানে?

না, কিছুতেই তা হতে দেব না! আজগুবি জানোয়ারটার ছোটাছুটি এবার আতঙ্কের বদলে একটা কঠিন সংকল্পই জাগিয়েছে নানা জায়গায় ছোট ছোট দলের মধ্যে।

পিজারোকে দেনার দায়ে কয়েদ করার খবর সম্রাটের দরবারে পৌঁছে দিতেই হবে। প্রতিজ্ঞা করেছে অনেকে।

ব্যাচিলর এনসিসো-র মত একটা মহাজনের জুলুমে এতবড় একজন সাহসী বীরের সব চেষ্টা কিছুতেই পণ্ড হতে দেওয়া হবে না। —এই কথাই শোনা গেছে বহুজনের মুখে।

তাদেরই কেউ কেউ কৌতূহলী হয়ে উঠেছে পিজারোর খবর যার কাছে পাওয়া গেছে তার বিষয়েও।

কিন্তু আপনি এত কথা জানলেন কি করে? জিজ্ঞাসা করেছে দু'একজন।

আমি? মানুষটা একটু হেসেছে। তারপর যা উত্তর দিয়েছে তা সব জায়গায় এক নয়।

কোথাও বলেছে, আমি জানব না ত' জানবে কে? আমি যে পিজারোর সঙ্গে এক জাহাজেই আসছি।

লোকে একটু অবাক হয়ে মানুষটাকে একটু বেশী করে লক্ষ্য করেছে এবার।

হ্যাঁ, মানুষটাকে আগে এ শহরে দেখেছে বলে কারুর মনে পড়ে না। লোকটার চেহারা পোশাকও একটু কেমন আলাদা। নেহাৎ ইস্টারের উৎসবের দিন বলেই এতক্ষণ তেমন চোখে পড়ে নি।

লোকটার ভালো করে খবরাখবর নেওয়ার কিন্তু সুযোগ মেলে নি কারুরই।

তার আগেই কেমন করে ভিড়ের সঙ্গে মিশে লোকটা যেন হারিয়ে গিয়েছে।

দেখা গিয়েছে তাকে আবার আর এক দলে। সেখানেও পিজারোর বন্দী হওয়ার খবরটা একটু হেরফের করে শুনিয়েছে সে।

বেশীর ভাগ জায়গায় প্রশ্নটা ঘুরে তার নিজের সম্বন্ধেই ওঠবার আগেই সে হাওয়া হয়ে গিয়েছে। যেখানে তা সম্ভব হয়নি সেখানে কোথাও বলেছে, বন্দর থেকে টাটকা খবর শুনেই সে আসছে, কোথাও নিজেকে পিজারোর জাহাজের মাল্লা বলে চালিয়েছে। কোথাও বা তারই অনুচর।

এ মানুষটার আসল পরিচয় সম্বন্ধে দু' একজন একটু সন্দিগ্ধ যে না হয়েছে তা নয়।

কিন্তু পিজারো সম্বন্ধে উত্তেজনা সহানুভূতি ও উৎসাহ ক্রমশঃ দুর্বার হয়ে উঠেছে। সমস্ত সেভিল শহরে সাড়া পড়ে গেছে তখন।

পিজারোকে কয়েদখানা থেকে ছাড়াতেই হবে। ব্যাচিলর এনসিসো যদি তাঁকে নিজে থেকে না মুক্তি দেয়, তাহলে খোদ সম্রাটের কাছে তার জুলুমের খবর না পৌঁছে দিয়ে তারা ছাড়বে না। (ক্রমশঃ)

শেষ রেশ

উৎসবের ভেরী বাজিয়ে শরৎ এসে চলে গেল। এবার শারদ উৎসব খুব একটা নির্বিঘ্নে সম্পন্ন হয়েছে একথা বলা চলে না। প্রতি বছরের খতিয়ান না নিয়েও এবছরকার হিসেব মুখে মুখে করে তার একটা জের টানা চলে। উৎসবের আগে পরের কথা বাদ দিয়ে পূজার মুহূর্তেও এবার একটা প্রচণ্ড বিপর্যয় ঘনিয়ে আসতে পারতো। আর এই বিপর্যয় ছিল প্রায় বিনা নোটিশের আগন্তুক। খবর নেই, এত্তেলা নেই তিনি এসে হাজির হলেন। ঘটনাপ্রবাহ অবশ্য খুব বেশি এগোয়নি—দুর্যোগ কাটিয়ে ঝলমলে রোদ্দুরই তার প্রমাণ। কিন্তু প্রাকৃতিক রোষ বয়ে গেল আমাদের প্রতিবেশী রাজ্যের ওপর দিয়ে। কিছু কিছু আহত হলাম আমরাও।

প্রকৃতির এমন সাঁড়াশি আক্রমণ বড় একটা দেখা যায় না। হয়তো মানবেতিহাস তোলপাড় করেও এ বছরের নজীর পুনরুদ্ধার করা খুব একটা সহজ হবে না। খরা, বন্যা এবং ঝড়ের তাণ্ডবে এবার আমাদের পরিত্রাহি অবস্থা। অনাবৃষ্টির অভিশাপ জমে জমে ঈশান কোণে জমা হয়েছিল এবার ঝড়ের সংকেতে। পশ্চিমবঙ্গ এবং দেশের অন্যান্য স্থানের বিস্তীর্ণ অঞ্চল জুড়ে শুরু হয়েছিল খরার মারণ নৃত্য—যার জের এখনো শেষ হয়ে যায়নি। দেশের সকল সামর্থ্য কেন্দ্রীভূত করা হলো প্রাকৃতিক বিপর্যয় এড়ানোর জন্য। কিন্তু বিধাতা তখন অলক্ষ্যে মৃদু হেসে-ছিলেন। সে হাসির রূপ যে এত ভয়ংকর তা ছিল আমাদের ধারণাতীত। খরার প্রকোপ শান্ত হলো বর্ষার অনাবিল বর্ষণে। বরষা যথেষ্ট ভরসা দিলে, চাষী সতেজে হয়ে মাঠে হাল চালালো—সবুজ চারা লকলকিয়ে উঠলো। কিন্তু এত সুখ সহ্য হবার নয়। বর্ষার ধারা এবার হয়ে উঠলো প্রাণঘাতী বন্যা। সবকিছু নির্বিশেষে ভাসিয়ে নিয়ে গিয়ে নতুন হাহাকারের রোল তুললো। চূড়ান্ত সর্বনাশ ডেকে আনলো ঘূর্ণিঝড়—যার সংবাদ আজ সকলেরই বিদিত।

এবারকার উৎসবের আগে-পরে প্রকৃতির অভিশাপ। তাই উৎসবপ্রাঙ্গণে বিষাদবেদনা বড় বেশি স্পষ্ট মনে হচ্ছিল। প্রাকৃতিক বিপর্যয়ের হাতে নিগৃহীত মানুষদের পরিচর্যায় এবার নারীসমাজ উল্লেখ্য ভূমিকা নিয়েছে। পুরুলিয়া, বাঁকুড়া এবং বিহারের খরাক্লিষ্ট জনসাধারণের সেবায় নারীসমাজের সেবাকার্য সকলের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছে। এদ্বারা নারীসমাজ শুধু যে নিজের যোগ্যতা প্রমাণ করেছে তাই নয়, যে কোন শত্রুর বিরুদ্ধে তারা যে সমান সক্রিয় অংশ নিয়ে অতীতের মত এবারও তার প্রমাণ পাওয়া গেল। বন্যা এবং ঘূর্ণিঝড়বিধ্বস্ত নিরাশ্রয় মানুষের সাহায্যেও তাদের এমনি সাড়া পাওয়া যাবে আশা করা যায়। আর সেটাই হবে নারীসমাজের সবচেয়ে গৌরবের বিজয়া সম্ভাষণ।

ডরোথি ফন্ শ্লোত্জের

যে মহিলার কথা এখানে বলা হচ্ছে তিনি ১৭৮৭ সালে মাত্র ষোল বছর বয়সে গোটিংগেন বিশ্ববিদ্যালয় থেকে পি-এইচ-ডি উপাধি পেয়ে সারা বিশ্বে বিস্ময়ের সঞ্চার করেছিলেন। এই মহিলার নাম ডরোথি ফন শ্লোত্জের। ডরোথির বাবা ছিলেন ইতিহাসের অধ্যাপক ও মা ছিলেন এক শিক্ষিত ঘরের মেয়ে।

মাত্র পনেরো মাস বয়সে ডরোথি সাতাশিটা কথা বলতে পারতো এবং ১৯২টা ভাব প্রকাশ করতে পারতো। ছ' বছর বয়সে সে গণিত শিখে সাত বছর বয়সে পিথাগোরাসের সূত্র প্রমাণ করতে পারতো। পরে সে ইতিহাস, প্রকৃতিবিজ্ঞান, উদ্ভিদ-বিদ্যা, রসায়ন ও ভেষজবিজ্ঞান শিক্ষা পেয়েছিল। যখন তার বয়স ষোল সে লাতিন, গ্রীক ও হিব্রু ভাষা সমেত দশটি বিদেশী ভাষায় কথা বলতে পারতো এবং সেই সঙ্গে গৃহকর্মেও নিপুণা হয়ে উঠেছিল। গণিত, খনিজবিদ্যা, ইতিহাস, লাতিন ও স্থপতি-বিদ্যা সম্বন্ধে তদানীন্তন মনীষীদের পুঙ্খানুপুঙ্খ প্রশ্নের সদুত্তর দিয়ে পি-এইচ-ডি উপাধি লাভ করেছিল।

একুশ বছর বয়সে ডরোথি লুইবেকের মেয়র ম্যাথেয়ুস ফন রোডডেকে বিবাহ করেন। পরে ১৮০১ সনে যখন তাঁরা প্যারিসে যান, তখন নেপোলিয়নের দরবারে তাঁদের যথেষ্ট সম্মান ছিল। কিন্তু তারপর নেপোলিয়নিক যুদ্ধে তাঁরা সর্বস্বান্ত হন এবং মৃত্যু এসে তাঁদের প্রথম পুত্র ও প্রিয় কন্যাকে ছিনিয়ে নিয়ে যায়। [illegible] তাঁর কনিষ্ঠ কন্যাও [illegible] আক্রান্ত হলে তাকে নিয়ে তিনি দক্ষিণ [illegible] একটি স্বাস্থ্যনিবাসে গিয়ে আপ্রাণ সেবায় তাকে বাঁচিয়ে তুলেছিলেন বটে কিন্তু নিজে সর্দিতে আক্রান্ত হয়ে ১৮২৫ সালের ১২ জুলাই ইহলোক ত্যাগ করেন।

নারী ও বর্তমান আইন

ব্যক্তি-জীবন ও সমাজ-জীবনের উন্নতির জন্যই আইনের প্রবর্তনা। পঞ্চাশ সনের পরে ভারতে এমন সব আইন প্রবর্তিত হয়েছে যা সমাজ-জীবনের সমস্ত কাঠামোকে প্রায় পরিবর্তিত করে দিয়েছে; সে পরিবর্তনের ঢেউ এসে লাগছে এদেশের বিশেষ করে মেয়েদের জীবনে। জীবনের সমস্ত ভিত্তি-ভূমি যেন কেঁপে উঠেছে। অনগ্রসর মেয়ে-দের জীবনে হয়েছে নানা সমস্যার সমাধান।

আইনের দৃষ্টিতে পুরুষ ও নারীর মধ্যে যাতে কোন ভেদাভেদ বা বৈষম্যমূলক নীতি না থাকে সেজন্য আমাদের সংবিধানেও বিধান আছে। সংবিধানে বলা হয়েছে যে, রাষ্ট্র কোন নাগরিককেই স্ত্রী, পুরুষ, ধর্ম, জাতি, বর্ণ ও জন্মস্থান নির্বিশেষে পৃথক করবে না অথবা কোন নাগরিকই স্ত্রী-পুরুষ নির্বিশেষে অসমর্থ, দায়িত্বশীল বলে বাধা-প্রাপ্ত হবে না। এছাড়া সরকার মেয়েদের জন্য কোন বিশেষ ব্যবস্থা করলেও তা অন্যায় বলে বিবেচিত হবে না। সরকারী অফিসে কাজ ও নিয়োগের ক্ষেত্রেও সমস্ত নাগরিক-দেরই সমান সুবিধে দেওয়া হবে। স্ত্রী পুরুষের সমান বেতনের জন্যও সংবিধানে বলা হয়েছে যে, সমান কাজের জন্য স্ত্রী, পুরুষের সমান বেতন স্বীকৃত হবে।

ভারতীয় সংবিধান ছাড়াও হিন্দু কোডের অন্তর্ভুক্ত যে কয়টি বিশেষ আইন মেয়েদের সামাজিক জীবনে এনেছে এক আলোড়ন তা হলো ১৯৫৫ সালের হিন্দু বিবাহ আইন, ১৯৫৬ সালের হিন্দু উত্তরাধিকার আইন ও হিন্দু দত্তক ও ভরণপোষণ আইন।

অত্যাচারী বা রোগাক্রান্ত স্বামীর সেবায় সারা জীবন কাটিয়ে যে জীবনের অপচয় করেছেন নারীসমাজ তা থেকে তাঁরা আজ সম্পূর্ণ মুক্ত হতে পেরেছেন বর্তমান হিন্দু বিবাহ আইনের সাহায্যে। এই আইনের ১০ ও ১৩ ধারায় স্বামী বা স্ত্রীকে কতকগুলি বিশেষ ক্ষেত্রে যেমন দুর্ব্যবহার, মানসিক ক্ষতি, যৌনরোগ, বিকৃত মস্তিষ্ক ও ব্যভিচারিতার অজুহাতে জুডিশিয়াল সেপারেশন এবং ডিভোর্সের অধিকার দেওয়া হয়েছে। এই আইনে আরো একটি সুফল দেখা দিয়েছে। সেটি হলো বহু বিবাহের বিলুপ্তিসাধন।

অঙ্গনা

প্রমীলা

বর্তমান যুগ-সন্ধিক্ষণে নারীর সামাজিক ভূমিকার যেসব আইনের গুরুত্ব অনেকখানি সেই আইনগুলি নিয়ে আলোচনা করতে গেলে প্রথমেই মনে হয় ১৯৫৬ সালের হিন্দু উত্তরাধিকার আইন বা Hindu Succession Act । এই আইনে প্রথম ও প্রধান কথাই হলো সম্পত্তিতে নারী ও পুরুষের সমানাধিকার। মেয়েদের দ্বারা অধিকৃত স্থাবর ও অস্থাবর সম্পত্তি এখন মেয়েদের স্বতন্ত্র সম্পত্তি রূপে গণ্য করা হয়েছে ও এই সম্পত্তির ব্যবহার তার ইচ্ছার উপরই সম্পূর্ণ নির্ভর করে।

সুতরাং হিন্দু উত্তরাধিকার আইনে সম্পত্তিতে নারী ও পুরুষের সমানাধিকারের প্রশ্নটি সমর্থন লাভ করায় হিন্দুদের দত্তক গ্রহণের ক্ষেত্রেও ঐ একই প্রসঙ্গ উত্থাপিত হয় ও তারই ফলস্বরূপ ১৯৫৬ সালের হিন্দু দত্তক ও ভরণপোষণ আইনের (Hindu Adoptions and Maintenance Act) প্রচলন। বর্তমান হিন্দু দত্তক আইনে পুত্র, কন্যা উভয়কেই দত্তক (নেওয়া যাবে ও যে কোন প্রাপ্তবয়স্ক মানসিক সুস্থতা-সম্পন্ন পুরুষ অথবা নারী উভয়েই দত্তক) গ্রহণ করতে পারেন। বিধবা মহিলাও তাঁর নিজের অধিকারে বর্তমানে পুত্র, বা কন্যাকে দত্তক নিতে পারেন। দত্তক আইনে মেয়েদের সম্মান রক্ষার জন্য পুরুষ দত্তক গ্রহণকারী ও দত্তক মেয়ের বয়সের পার্থক্য একুশ বছরের বেশী হওয়া প্রয়োজন বলে বিধান আছে। অর্থাৎ এতে পিতা-কন্যার সম্পর্কই অটুট থাকবে আশা করা যায়।

এরপর আসে ১৯৫৬ সালের হিন্দু ভরণপোষণ আইন বা Maintenance Act । সামাজিক পটভূমিকায় মেয়েদের জীবনে এই আইনটির গুরুত্ব অনেকখানি। এই আইনে বলা হয়েছে স্বামী, স্ত্রীকে যুক্তিসঙ্গত বিনা কারণে ও স্ত্রীর ইচ্ছার বিরুদ্ধে পরিত্যাগ করলে অথবা স্ত্রীকে অনাদর বা নিষ্ঠুর ব্যবহার করলে অথবা রোগাক্রান্ত হলে অথবা অপর স্ত্রী থাকলে অথবা ধর্মান্তরিত হলে স্ত্রী পৃথক বাসস্থান ও ভরণপোষণের দাবী করতে পারেন। এছাড়া নতুন আইনে পুত্র-বধূ, নিঃসন্তান বিমাতা ও অবিবাহিতা কন্যারাও ভরণপোষণ দাবী করতে পারেন।

হিন্দু কোডের অন্তর্ভুক্ত বর্তমান আইনগুলি ছাড়াও আরো একটি নতুন আইন যুগ যুগ ধরে সঞ্চিত অভিশাপ থেকে মেয়েদের মুক্তি দিয়েছে। সেটি হলো ১৯৬১ সালের যৌতুক বিরোধী আইন বা Dowry Prohibition Act. । এই আইন প্রচলনের পরে যদি কোন ব্যক্তি পণ দাবী করেন বা গ্রহণ করেন বা কেউ পণ দিয়ে থাকেন অথবা এই ব্যাপারে কেউ সহায়তা করে থাকেন তবে ৩ নং ধারা অনুযায়ী তাদের ছয় মাসের কারাদণ্ড অথবা পাঁচ হাজার টাকা পর্যন্ত জরিমানা বা উভয় দণ্ডই একসঙ্গে হতে পারে। বিবাহে সাধারণতঃ দু হাজার টাকা পর্যন্ত মূল্যের বস্ত্র ও অলঙ্কার দেওয়া যাবে বলে আইনে বিধান আছে।

সুতরাং বহুদিনের প্রবর্তিত হীন মনোবৃত্তি পরিচায়ক পণপ্রথার উচ্ছেদ ঘটানোর জন্য যে আইনটি প্রচলিত হয়েছে তার উল্লেখ করে আমরা নিবন্ধের শেষে শুধু এই কথাই বলব যে, মেয়েরা যেন সামাজিক ক্ষেত্রে তাঁদের অধিকারকে মেনে নেন ও বলিষ্ঠ মনের পরিচয় দেন নবনির্মিত আইনের সাহায্যে।

—অরুণা মুখোপাধ্যায়

নতুন আগাথা ক্রিস্টি

পশ্চিম জার্মানীর আগাথা ক্রিস্টি হলেন মহিলা লেখিকা ডক্টর ইরমগার্ড ওয়াগনার। লেখিকার রহস্য উপাখ্যান 'রাইন নদীতে হুইস্কি পার্টি' চারিদিকে হৈ-চৈ লাগিয়ে দিয়েছে। কাহিনীর নায়ক হলেন প্রতিরোধ মন্ত্রকের একজন অনুবাদক যাকে হত্যা করা হয়েছে। ঐ দপ্তরের উচ্চপদস্থ সরকারী কর্মচারী, একজন শিক্ষক ও একজন সেক্রেটারী যাঁরা গোপন দলিল সম্বন্ধে আগ্রহশীল ছিলেন, সন্দেহ করা হচ্ছে তাঁদের মধ্যে কেউ তাঁকে হত্যা করেছে। সংবাদপত্রে খণ্ডে খণ্ডে প্রকাশিত এই কাহিনীর পাঠক-পাঠিকারা হত্যাকারী কে জানার জন্য ব্যগ্র হয়ে উঠেছেন। মাত্র দশ দিনে এ-রকম একটি রহস্যঘন কাহিনী লিখে লেখিকা 'এডগার ওয়ালেশ পুরস্কার' পেয়েছেন।

মহিলা সম্মেলন

হেস্টিংস (দক্ষিণ ইংলণ্ড), ১১ অক্টোবর—এখানে দ্বিতীয় বিশ্ব প্রতিবেশী সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়ে গেল। এর আয়োজন করেন ইস্ট সাসেক্স ফেডারেশন অব উইমেন্স ইনস্টিটিউটস।

ভারতসহ ৩০টির বেশি দেশ থেকে সহস্রাধিক প্রতিনিধি সম্মেলনে যোগ দেন।

সম্মেলনের অন্যতম উদ্দেশ্য ছিল উইমেন্স ইনস্টিটিউট যে এক বিরাট আন্তর্জাতিক সংস্থার অংশ তাই দেখানো। অ্যাসোসিয়েটেড কান্ট্রিউইমেন অব দি ওয়ালর্ড-এর ৬,০০০,০০০ সদস্যের সঙ্গে ইস্ট সাসেক্স ফেডারেশনের ১২,০০০ সদস্যের যোগ রয়েছে। অ্যাসোসিয়েটেড কান্ট্রি উইমেন্স-এর বিশ্ব চেয়ারম্যান হলেন শ্রীমতী আরতি দত্ত।

সম্মেলনে আর একটি উদ্দেশ্য ছিল সাসেক্স-এর বিভিন্ন কলেজ ও হাসপাতালে অধ্যয়নরত বিদেশী ছাত্রীদের সংবর্ধনা জানানো। ঐ বিদেশী ছাত্রীদের মধ্যে অনেকেই ভারতীয়।

বিভিন্ন দেশের জীবনযাত্রা শিল্প ও সংস্কৃতির পরিচয় দেবার উদ্দেশ্যে 'কান্ট্রিস ইন মিনিয়েচার' প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠিত হয়।

'বিদেশে জীবন' অধিবেশনে 'ভারতে জীবন' বর্ণিত হয়। বর্ণনা করেন শ্রীমতী আর এস নন্দা। ইনি উইমেন্স ইণ্ডিয়া ফেডারেশনের সম্পাদিকা ও ব্রিটিশ কমনওয়েলথ লীগের ভারতীয় প্রতিনিধি।

স্বাদেশিকতার প্রথম প্রত্যূষ

সৌম্যেন্দ্রনাথ সরকার

উনিশ শতকে বাংলাদেশে যে নবজাগরণ, জাতির জীবনে ও সংস্কৃতিতে সর্বাঙ্গীণ পরিবর্তনের যে দিক-নির্দেশ আর স্বপ্নাচ্ছন্ন মানবকল্পনাপ্রবৃদ্ধ যৌবনের যে উত্তাল উর্মিল উচ্ছ্বাস, আমরা আজ তার থেকে অনেক দূরে সরে এসেছি। সেদিনের নবজাগ্রত বাঙ্গালী মানসের নিঃসীম শূন্যে যে নির্বাধ নভোবিহার, বর্তমানের সহস্র সমস্যাজর্জর কঠিন বাস্তবে তার কোন প্রভাবই যেন আমরা উপলব্ধি করতে পারি না। কিন্তু একথাও অস্বীকার করা যায় না যে সেদিনের নভোবিহার আর বর্তমানের কঠিন মৃত্তিকাশ্রয়ী বাস্তবতার মধ্যে একটা ক্রমবিবর্তনধারা নিশ্চয়ই বর্তমান। সেই ক্রমবিবর্তনধারার সেদিনের উন্মত্ততা আর বর্তমানের বাস্তবতা যেন একবৃন্তে ফুটে উঠেছিল ভূদেব মুখোপাধ্যায়ের জীবনে।

বাংলাদেশের বিগত শতাব্দীকে আমরা যুক্তির যুগ বলে জানি। কিন্তু এই যুক্তিপ্রবণতাই পরিণামে রূপ নিয়েছিল এক বিরাট আত্মিক দ্বন্দ্ব আর সংশয়ের মধ্যে। সেযুগের বাংলাদেশে খুব কম মনীষীই ছিলেন যিনি এই দ্বন্দ্বসংশয়ের হাত থেকে মুক্তি পেয়েছিলেন বা দ্বন্দ্বসংশয়কে অতিক্রম করে পৌঁছাতে পেরেছিলেন প্রজ্ঞালোকদীপ্ত স্থির জীবনক্ষেত্রে। প্রাচীন ভারতীয় জীবনদর্শন আর আধুনিক পাশ্চাত্য জীবনযাত্রা প্রণালীর সংঘর্ষে এর শুরু আর পরিণতি ব্যক্তিজীবন আর ভাবজীবনের প্রচণ্ড সংঘর্ষ। সেযুগের অনেক মনীষীই এই সংঘর্ষকে অতিক্রম করে কোন স্থির মীমাংসায় উপস্থিত হতে পারেননি।

ব্যক্তিজীবনে রামমোহন অত্যন্ত যুক্তিবাদী মানুষ ছিলেন, তাঁর এই যুক্তিবাদ কখনো কখনো নির্দয়তার পর্যায়েও পৌঁছে যেত। প্রচুর সম্পত্তির মালিক রামমোহন দুঃস্থ পিতা আর কারারুদ্ধ জ্যেষ্ঠ ভ্রাতার সঙ্গে যে ব্যবহার করেছিলেন, সে ব্যাপারে সমালোচকেরা আজও একমত হ'তে পারেননি, তীর্থযাত্রিনী মাতার প্রতি তাঁর ব্যবহারেরও অনেকে প্রশংসা করতে পারেননি। ব্যক্তিজীবনে বিদ্যাসাগরও সুখী মানুষ ছিলেন না, পিতা আর ভ্রাতাদের সঙ্গে মনোমালিন্য, স্ত্রীর সঙ্গে মতপার্থক্য, পুত্রের সঙ্গে সম্পর্কচ্ছেদ বিদ্যাসাগরকে নিঃসঙ্গ করে তুলেছিল। মধুসূদনের ব্যক্তিজীবনের বিরাট বিপর্যয় তো আজ কিংবদন্তী হয়ে দাঁড়িয়েছে। কিন্তু ভাবজীবনে, আপন আপন কর্মক্ষেত্রে এঁরা ছিলেন সার্থকতম মানুষ, আধুনিক বাঙ্গালী সংস্কৃতির প্রথম তিনটি পদক্ষেপ ঘটেছিল এই তিনটি মহাপ্রাণকে অবলম্বন করেই। কিন্তু ব্যক্তিজীবন আর ভাবজীবনের এই বিরাট পার্থক্যকে তাঁরা অস্বীকার করতে পারেননি। প্রকৃতপক্ষে তাঁরা ঘর করতেন দুটি ভিন্ন সত্তাকে নিয়ে —একটি সার্থকতম ভাবসত্তা আর একটি ব্যর্থতম ব্যক্তিসত্তা। এই দুটি ভিন্ন সত্তার মধ্যে তাঁরা কোন সমন্বয় ঘটাতে পারেননি। সে সমন্বয় ঘটেছিল সেযুগের অন্য একজন মানুষের জীবনে, তিনি হলেন আধুনিক বাঙ্গালী মানসের কাছে বিস্মৃতপ্রায় মনীষী ভূদেব মুখোপাধ্যায়।

যুগমানসের সমস্ত চিত্তবিক্ষেপ আর দ্বন্দ্বকোলাহলের মধ্য থেকে ভূদেব আপন প্রজ্ঞাবলে আহরণ করেছিলেন দ্বন্দ্বোত্তরণের বাণী আর তাকে মূর্ত করে তুলেছিলেন আপন সমাজচিন্তার মধ্যে। ভূদেব প্রবন্ধ রচনা করেছিলেন, উপন্যাস রচনা করেছিলেন; ভূদেব চতুষ্পাঠী স্থাপন করেছিলেন, দাতব্য চিকিৎসালয় স্থাপন করেছিলেন। কিন্তু এই সবকিছুর ঊর্ধ্বে ভূদেব আপন জীবনটিকে স্থাপন করেছিলেন একটি সার্থক আদর্শরূপে। সেদিন পাশ্চাত্য শিক্ষার উগ্রপ্ত জীবনমদিরাপানে ভূদেব বিহ্বল হয়ে ওঠেননি, তাকে সুস্থভাবে গ্রহণ করে নিজের ব্যক্তিজীবনের সঙ্গে সঙ্গে ভাবজীবনেও নিযুক্ত করেছিলেন নবপ্রেরণাদাত্রীর গঠনমূলক ভূমিকায়। ভূদেবের সাতষট্টি বছরের জীবনেতিহাস সেই দ্বন্দ্বোত্তীর্ণ জীবনগৌরবেরই ইতিহাস। তাই সেদিনের মনীষীকুলের মধ্যে একমাত্র ভূদেবই বলতে পারতেন,—"আমার জীবনই আমার বাণী।"

উনিশ শতকের বাঙ্গালী জীবনের অন্যতম পথিকৃৎ আর বাংলার রেনেসাঁসের অন্যতম সূত্রধার ভূদেব নিজের জীবন দিয়েই জীবনবাণী সৃষ্টি করেছিলেন। সেদিন রামমোহনের মধ্যে মানবতাবাদের রূপ ধরে যে আধুনিকতা প্রথম স্ফূর্তিলাভ করেছিল, বিদ্যাসাগরের কর্মপ্রেরণার পথে পরিচালিত হয়ে সাহিত্যের ক্ষেত্রে তাই-ই মুক্তিলাভ করেছিল মধুসূদনের মহাকাব্যে। ভূদেবের অতীত ঐতিহ্যসন্ধানী স্থিতধী জীবনচেতনা সেই আধুনিকতারই পাদপীঠিকা রচনা করেছিল। সেদিন পশ্চিমসাগরোত্থিত ঝঞ্ঝাবাতাসে অনেকেই আদর্শবিশ্বাসীরা পথ হারিয়ে ফেলেছেন, ভারতীয় ঐতিহ্য আর সভ্যতার মূলকেন্দ্র তা বিচ্যুত করতে পারেনি, তাই ঐতিহ্যবিশ্বাসীরা লক্ষ্যচ্যুত হননি, বরং সে পাশ্চাত্যপ্রভাব তাঁদের বিশ্বাস আরও দৃঢ় করে তুলেছিল। এই পাশ্চাত্য ভাবাপন্নতার যুগে প্রাচীন ঐতিহ্যমুখ বাঙ্গালী মহামানবেরাই সেদিন ভিত্তিস্থাপন করেছিলেন আধুনিক বাঙ্গালীর জীবনচেতনার। ভূদেব ছিলেন সেই দলের পুরোধা। ব্যক্তিজীবনের স্থির নিশ্চিত আদর্শবিশ্বাস আর চিন্তা ও বিচারশক্তির প্রাখর্যেই ভূদেব সর্বগ্রাসী পশ্চিমী ভাববন্যা থেকে আত্মরক্ষা করতে পেরেছিলেন আর তারই ফলে পারিবারিক, সামাজিক আর জাতীয় জীবনের বিভিন্ন আদর্শকে আপন অভিজ্ঞতার আলোকে উজ্জ্বল করে নির্ভীকভাবে উপস্থাপিত করে সূচনা করেছিলেন এক নতুন যুগের। তাঁর ধ্যানসমৃদ্ধ ঋষিমানসের প্রজ্ঞালোকে সেদিন অনেকেই পথের নিশানা খুঁজে পেয়েছিলেন; উপ্ত হয়েছিল দেশপ্রেমের প্রথম বীজ— আচার্য সুনীতিকুমারের মতে বঙ্কিমের মধ্যে যার প্রথম সচেতন প্রকাশ আর বিবেকানন্দের মধ্যে যার সার্থক পরিণতি।

ভূদেবই সর্বপ্রথম আধুনিক বাঙালী-জীবনের সংস্কৃতিক্ষেত্রে নানা বিশৃংখলার অবসান ঘটিয়ে একটা সর্বাঙ্গসুন্দর কাঠামো তৈরির চেষ্টা করেছিলেন। প্রাচীন ভারতীয় জীবনাদর্শের মৌল প্রবণতাকে আবিষ্কার করে সেই প্রবণতা অনুযায়ী যুগোপযোগী জীবনযাত্রা সৃষ্টির প্রয়াসী ছিলেন তিনি। ভূদেব উপলব্ধি করেছিলেন প্রত্যেক জাতির একটা বিশিষ্ট জাতীয় ভাব আছে আর সেই জাতীয় ভাবের অনুশীলনেই সে জাতির সমৃদ্ধি ও মুক্তি। তাই "সামাজিক প্রবন্ধে" অত্যন্ত দৃঢ়তার সঙ্গে তিনি বলেছেন, "ভারতবর্ষীয়দিগের মধ্যে যে স্বভাবসিদ্ধ জাতীয় ভাব আছে, তাহার অনুশীলন এবং সম্বর্ধনচেষ্টা ভারতবর্ষীয় মাত্রেরই অবশ্য কর্তব্যকর্ম। অতএব তাহা করাই বৈধ, না করায় প্রত্যবায় আছে।" ভৌগোলিক পরিবেশ, ভাষা, রাষ্ট্রশাসন আর সামাজিক বিধি-বিধানের ঐক্যে জাতির জীবনে সে ভাবের প্রথম স্ফুরণ ঘটে ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতায়, পরে তা পরিণতিলাভ করে স্বাজাত্যবোধ আর স্বাদেশিকতায়—অন্তঃকরণবৃত্তির সংগঠন ইন্দ্রিয়দ্বারা সংগৃহীত বাহ্যবস্তুনিচয়ের বিভূতি সমবায়েই জন্মে। সকল দেশেরই বাহ্যবস্তুসমূহের প্রকৃতিতে এক-একটি বিশেষ লক্ষণ আছে। একদেশজাত এবং একদেশপালিত ব্যক্তিদিগের পক্ষে বাহ্য-প্রকৃতি একরূপ হওয়াতে এবং একদেশজাত জনগণ পরস্পর সংসৃষ্ট থাকাতে তাঁহা-দিগের অন্তঃকরণবৃত্তিরও একরূপ হইয়া যায়। এই একরূপতাই স্বদেশের এবং স্বজাতির প্রতি ভালবাসার গূঢ় কারণ এবং সেই কারণ পুরুষপরম্পরাক্রমে কার্যকরী হওয়াতে জাতীয় ভাবটি মনুষ্যের অন্তরাত্মাকে অতি গূঢ়তররূপেই অধিকার করিয়া থাকে।" (সামাজিক প্রবন্ধ)। ভারতের ইতিহাস বিশ্লেষণ করে ভূদেব তার জাতীয় ভাবটি উপলব্ধি করেছিলেন। ভারতের ধর্ম ও ভাষা, সামাজিক রীতি-নীতি ও আচারপ্রণালীর সর্বত্রই তিনি এক সম্মিলন-প্রবণতার কার্যকরী প্রভাব লক্ষ্য করেছিলেন। জাতি-ধর্ম-বর্ণ-নির্বিশেষে ভারতবর্ষীয় মাত্রেরই শ্রেষ্ঠতম সম্পদ এই সম্মিলন-প্রবণতা। ভূদেব এই সম্মিলন-প্রবণতাকেই ভারতের জাতীয় ভাব বলে গ্রহণ করেছিলেন; তাই ভূদেবের স্বাজাত্যবোধ আর স্বদেশচেতনা কোন বাষ্পীয় আদর্শ নয়, জাতির মূল ভাবচেতনা থেকেই তা উৎসারিত হয়েছিল।

ভারতীয় জীবনের এই জাতীয় চেতনা, এই সম্মিলন-প্রবণতার অনু-শীলনেই ভূদেবের জীবনে ও কর্মে পাশ্চাত্য প্রভাবের অনুপ্রবেশ ঘটেছিল। ভূদেব পাশ্চাত্য শিক্ষাকে কোথাও অস্বীকার করেননি। কিন্তু আপন জাতীয় প্রবণতার ঊর্ধ্বেও তাকে কোনদিন প্রাধান্য দেননি—"যেমন গ্রীকেরাও কখনও আপনাদিগের জাতীয় ভাব পরিত্যাগ করে নাই—রোমীয়েরাও করে নাই এবং ইংরাজেরা যাহা করে নাই এবং করিতে ইচ্ছুক নহে, আমাদিগেরও সেইরূপ করিয়া চলা উচিত।" আপন জাতীয় প্রবণতার শ্রীবৃদ্ধিকল্পে পাশ্চাত্য প্রভাবের যেটুকু প্রয়োজন, তিনি তাই মাত্র গ্রহণ করেছেন। আচার্য সুনীতি-কুমারের ভাষায় বলা চলে, "যেখানে বিদেশীর কৃতিত্ব, সেখানে সাদরে তাহাকে বরণ করিয়া লইতে তাঁহার দ্বিধা হয় নাই; আবার যেখানে আমাদের যথার্থ গৌরব বা আমাদের সুবিবে-চনার প্রমাণ আছে, সেখানে বিদেশের এক-পত্রিগণের মত প্রতিকূল হইলেও পরম আত্ম-নির্ভরতার সহিত তিনি স্থির থাকিতেন।" এইখানেই ভূদেবের যথার্থ জাতীয়তাবোধ। এই জাতীয়তাবোধের পিছনে যেমন ছিল জাতীয় প্রবণতা, তেমনি সমানভাবেই কার্যকরী হয়েছিল তাঁর ব্যক্তিজীবনের আত্মমর্যাদাবোধ, পরার্থপরতা আর স্বজাতিপ্রীতি ও স্বাদেশিকতা।

ভূদেবের ব্যক্তিজীবনের এই ভিত্তি-ভূমিতেই গড়ে উঠেছিল তাঁর কর্মজীবন। এদেশের শিক্ষাব্যবস্থা সম্বন্ধে আলোচনা করতে গিয়ে ভূদেব এদেশীয় মানুষের তীক্ষ্ণ বুদ্ধি সম্বন্ধে কৃতনিশ্চয় হয়েছিলেন। কিন্তু সেই কৃতনিশ্চয়তাবোধ তাঁর মধ্যে কোন নিশ্চেষ্টতা এনে দেয়নি। তিনি বুঝতে পেরেছিলেন এই তীক্ষ্ণবুদ্ধিকে সঠিকপথে পরিচালিত করার মতো বিদ্যা আমাদের দেশে প্রচলিত হয়নি। কেবল ন্যায় আর বেদান্তদর্শন মানুষকে পূর্ণ মনুষ্যত্ব প্রদান করতে পারে না, তার জন্যে আরও প্রয়োজন ভূগোল, পদার্থবিদ্যা, অর্থশাস্ত্র আর ইতিহাস গ্রন্থের। ভূদেবের ঐতিহ্যবিশ্বাসী মন ঐতিহ্যের সারভূত বস্তু সম্মিলন-প্রবণতার পথ বেয়ে এসেই এখানে আধুনিকতাকে আলিঙ্গন করেছে। ভূদেব তাই ঐতিহ্যকে ভালোবেসে পিছনের দিকে ফিরে যাননি, তা তাঁকে এনে হাজির করেছে আধুনিকতার সিংহদ্বারে। শিক্ষাব্যবস্থায় এই সমন্বয়ী আদর্শকল্পনা ভূদেবের জীবনের প্রতিটি ক্ষেত্রেই অনুসৃত হয়েছিল। প্রাচ্য আর পাশ্চাত্য জীবনাদর্শের মধ্যে কোন সমন্বয় স্থাপন করতে না পেরে সেযুগের অনেক মহাপ্রাণই নিঃস্ব হয়ে গিয়েছিলেন—কেউ প্রাচীন প্রাচ্যকে সর্বোত্তম বলে গ্রহণ করে পাশ্চাত্য আধুনিকতাকে বিষবৎ পরিত্যাগ করেছিলেন, কেউবা পাশ্চাত্য আদর্শপ্রীতির আত্যন্তিকতায় প্রাচ্য জীবনধারাকে সম্পূর্ণ-রূপে অস্বীকার করে নিজের জাতীয় ভিত্তিমূলের সঙ্গে সম্পর্ক হারিয়ে ফেলে-ছিলেন। কিন্তু এই ধরণের কোন মানসিক বিপর্যয়ই ভূদেবকে বিচলিত করতে পারেনি। ভূদেবের সমন্বয়ী প্রতিভার মোহিনীশক্তি দুই-এর মধ্যে সামঞ্জস্যের একটা সাধারণ সূত্র আবিষ্কার করেছিল। ইউরোপীয় ও ভারতীয় জীবনাদর্শের সমন্বয়ের মধ্য দিয়ে ভূদেব সেদিন বপন করেছিলেন আধুনিক বাঙ্গালী শিক্ষিতধী সমাজ-জীবনের প্রথম বীজ।

ভারতের জাতীয় ভাব, এই সম্মিলন-প্রবণতা কেবল হিন্দুর ধর্মীয় আদর্শই নয়, ভূদেব উপলব্ধি করেছিলেন জাতিধর্মনির্বি-শেষে ভারতবাসী মাত্রেরই মানসিক সম্পদ হোল ভারতের জাতীয় প্রকৃতির এই বিশেষ প্রবণতা। ভূদেবের মতে এই একই মানসিক সম্পদের উত্তরাধিকার ভারতের চিন্তাক্ষেত্রে একটি বিশাল উদারতা এনে দিয়েছে,—"ফলতঃ এইটিই ভারতবর্ষ দেশের বিশিষ্টতা এবং এইজন্যই এতদ্দেশ-বাসীদিগের হৃদয়ে অন্যদেশসাধারণ একটি বিশিষ্ট ভাবের অধিষ্ঠান হইয়া আছে। ইহারা সংকীর্ণমনা হয় না, ইহাদের প্রকৃতি সহজেই অতি উদার ভাবসম্পন্ন হয়। ভারতবর্ষের বিভিন্ন প্রদেশবাসী জনগণের মধ্যে অপর যতই পার্থক্য থাকুক, ইহার সকল ভাগেরই লোকেদের চিত্তে একটি চমৎকার উদারতা আছে।" (সামাজিক প্রবন্ধ)। এই-জন্যেই ভূদেব বিশ্বাস করতেন "হিন্দু এবং মুসলমান যে মিলিবে তাহার সূত্রপাত অনেকদিন হইতেই হইয়া আসিতেছে" আর ভারতবর্ষীয় খৃষ্টানেরা "খৃষ্টের গৌরব অন্তঃকরণের অন্তরমধ্যে নিহিত করিয়া দেশীয় লোকের সহিত একপরামর্শী হইয়া বেশ চলিতে পারেন" কারণ "উঁহারাও অপরা-পর ভারতবাসীর ন্যায় আপনাপন পিতৃমাতৃ-ধর্মই প্রাপ্ত হইয়াছেন।" প্রাচীন নিষ্ঠাবান হিন্দু পণ্ডিতবংশের সন্তান ভূদেব জাতীয় সংস্কৃতি ও ঐতিহ্যকে উপলব্ধি করেছিলেন, উপলব্ধি করেছিলেন জাতীয় সংস্কৃতির মূল প্রবণতাকে আর সেই উপলব্ধিই তাঁকে এনে উপস্থিত করেছিল জাতিধর্মনির্বি-শেষে ভারতীয় জাতীয়তাবাদের উদার

উন্মেষ পটভূমিকায়। উনিশ শতকের ভারতবর্ষে জাতীয় জাগরণের প্রথম উষায় যে সমস্ত মনীষীর মন ভারত-সংস্কৃতির মিলনবাণীতে নবভারতের 'এক-জাতি একপ্রাণ একতা'-র মহানবাণী উপলব্ধি করেছিল ভূদেব তাঁদের মধ্যে অন্যতম।

জাতীয়তাবোধকে কেবলমাত্র মানসিক সম্পদরূপেই ভূদেব গ্রহণ করেননি, ভারতীয় জাতির ভবিষ্যৎ ইতিহাস সৃষ্টিতেও তাকে নিযুক্ত করেছিলেন—"স্বপ্নলব্ধ ভারতবর্ষের ইতিহাস"-এ যার স্বপ্নকল্পনাময় প্রকাশ আর প্রবন্ধরাজিতে যার পাষাণভিত্তি। 'স্বপ্নলব্ধ ভারতবর্ষের ইতিহাস' ভূদেবের স্বপ্নে দেখা মাতৃভূমি, সুখসমৃদ্ধি, সুশাসন, শান্তি আন্তর্বাণিজ্যের উন্নতি, বহির্বাণিজ্যের প্রসার, প্রাচীন শিক্ষার পীঠস্থান চতুষ্পাঠী, আধুনিক শিক্ষার পীঠস্থান বিদ্যালয়—সকলকিছু নিয়ে সে এক মহান ভারতবর্ষ। সে ভারতের রাজা হিন্দু, রাজ-মন্ত্রী হিন্দু, কিন্তু কোন ধর্মীয় উন্মাদনায় তার বাতাস কলুষিত নয়। সে ভারতের আদর্শ পুরুষ সম্রাট আকবর, কারণ 'ধর্ম-বিদ্বেষ কখনই তাঁহার অন্তরে স্থানলাভ করে নাই, তিনি হিন্দু এবং মুসলমানকে এক ধর্ম-সূত্রে সম্বন্ধ করিবার জন্য কি বিচিত্র উপায়েরই সৃষ্টি করিয়াছিলেন। যিনি এই পথে না চলিবেন তিনিই ভারত-বর্ষের সিংহাসন হইতে স্খলিত-

পদ হইবেন।" আকবর অনুসৃত এই উদার নীতি ভূদেবের স্বপ্নে দেখা ভারতভূমিতে ধর্মীয় বিরোধের অবসান ঘটিয়ে সর্বধর্মসমন্বয়ের আদর্শ স্থাপন করেছে। তাই সেখানকার মানুষ উপলব্ধি করে "সমস্ত জগৎ সেই এক অদ্বিতীয় ঈশ্বরেরই বিভূতিমাত্র, মানুষভেদে যেমন আচারভেদ—পরিচ্ছদভেদ, ভাষাভেদ, তেমনি উপাসনার প্রণালীভেদও হইয়া থাকে। সকলেই এক পিতার পুত্র। সেই পিতা ভিন্ন ভিন্ন পুত্রকে ভিন্ন পোষাক পরাইয়া দেখিতেছেন।" এই স্বপ্ন-কল্পনায় ভিত্তিভূমি ভূদেব-উপলব্ধ ভারতের জাতীয় ভাব—তার সম্মিলন-প্রবণতা। এই সম্মিলন-প্রবণতার গুণেই যুগের উন্নতির সঙ্গে সঙ্গে ভারতের বিভিন্ন ভাষা বড়ই উন্নত হবে তবেই "এক একটি ভাষার অন্তর্গত অবান্তর ভেদ লুপ্ত হইবে এবং ভিন্নভাষীদিগেরও মৌলিক ভেদ ক্রমশঃ শূন্য হইয়া আসিবে।" সমাজেও তার প্রভাব বিস্তৃত হবে—"ভারতবর্ষের সকল প্রদেশবাসী ব্রাহ্মণ কায়স্থ বণিক প্রভৃতির মধ্যে প্রদেশ-নির্বিশেষে আপনাপন বর্ণমধ্যে বিবাহ চলিলে ভারতসমাজ দৃঢ় সম্বন্ধ" হয়ে উঠবে।

ভাষা ও সমাজগত ঐক্যের ভিত্তিতে ভারতবর্ষে এক নতুন ভারতীয় জাতির সৃষ্টি হবে, একথা ভূদেব দৃঢ়ভাবে বিশ্বাস করতেন। কিন্তু তাঁর বিশ্বাস কোন বায়বীয় আদর্শ-নির্ভর ছিল না। তিনি উপলব্ধি করেছিলেন এই মহৎ কাজের জন্যে উপযুক্ত নেতার প্রয়োজন। ১৮৯২ খৃষ্টাব্দে 'নেতৃপ্রতীক্ষা' রচনাকালে ভূদেব সেই নেতার কোন চিহ্ন দেখতে পাননি। তাই আকুলভাবে প্রার্থনা করেছেন, "আমার বোধ হয় যে ভারতবাসী মাত্রেরই হৃদয়ে এখন একটি আশার সঞ্চার হওয়া উচিত যে, আমাদের অধঃপতনের নিবারণ অবস্থার উৎকর্ষসাধন, মনের সংশয়-ছেদন এবং হৃদয়ের ক্ষোভশান্তন করিবার জন্য স্বজাতির মধ্যে একজন নেতৃ-মহাপুরুষের আবির্ভাব অবশ্যই হইবে।" ভূদেব ভবিষ্যৎ দর্শন করেছিলেন, "ভারতবাসী যথার্থই 'জগদম্বিতায় কৃষ্ণায়' বলিতেছেন। তিনি সে মহাবাক্য কখনই ভুলিবেন না—পরজাতিবিদ্বেষ এবং পরজাতিপীড়ন তাঁহার স্বজাতি-বাৎসল্যের অঙ্গীভূত হইবে না। প্রত্যুত পৃথিবীর অপর সকল জাতি তাঁহার নিকটে জ্ঞান এবং প্রীতির ঐ মহামন্ত্রও উচ্চারণ করিবেন—

জননী জন্মভূমিশ্চ স্বর্গাদপি গরীয়সী।"

ভারতের জাতীয় জাগরণের, তার স্বাধীনতা-স্পৃহার অগ্রদূত মনস্বী যে কয়েকজন মহাপুরুষের শিক্ষাবিশ্বাসসমূহ জাতীয় চেতনায় প্রথম দোলা দিয়েছিল, ভূদেব নিঃসন্দেহে তাঁদের মধ্যে অন্যতম।

কিন্তু তবু আধুনিক ভারতের ভাব-সাধনার ক্ষেত্রে ভূদেব এক বিস্মৃতস্মৃতি অবহেলিত প্রতিভা, এর কারণ নির্ণয় করতে গিয়ে অনেকে বলে থাকেন ভূদেবের গোঁড়া ধর্মবোধ ও আচার-প্রবণতায় উদ্বুদ্ধ 'পারিবারিক প্রবন্ধ' ও 'আচার প্রবন্ধ' বই দুখানি এর জন্যে দায়ী। কিন্তু 'পারিবারিক প্রবন্ধ' ও 'আচার প্রবন্ধ' ভূদেবের ব্যক্তি-জীবন ও পারিবারিক জীবনের স্বলিখিত ইতিহাস। তাঁর নিজের জীবনে আচরিত ভাব ও কর্মসাধনার সাহিত্যিক প্রকাশ। তাঁর জীবনচরিত পাঠেই আমরা জানতে পারি এই বই দুখানার ভাববস্তুর সঙ্গে তাঁর ব্যক্তি-জীবন ও পারিবারিক জীবনের কোন পার্থক্য ছিল না। তাই বই দুখানা ভূদেবের আত্ম-চরিতহিসাবে গ্রহণ করা যায়। উনিশ শতকে অনেক মহাপুরুষের স্বলিখিত কিম্বা অন্যলিখিত জীবনচরিতে তাঁদের ব্যক্তি-জীবনের পুঙ্খানুপুঙ্খ চিত্র আমাদের কাছে উজ্জ্বল হয়ে উঠেছে। তাঁদের অনেকেরই ব্যক্তিজীবন আধুনিক দৃষ্টিভঙ্গীতে অনুকরণের অযোগ্য বলে বোধ হবে, কিন্তু ভাবজীবনে তাঁদের প্রভাবকে অস্বীকারের চেষ্টা বাতুলতামাত্র। তেমনি ওই বই দুখানায় প্রকাশিত ভূদেবনির্দেশিত জীবন-পদ্ধতি আমাদের কাছে অনুকরণীয় নাও হতে পারে। কিন্তু তার জন্যে তাঁর কৃতিত্বকে অস্বীকার করার চেষ্টা অনুচিত। তবে কি ভূদেবের জাতীয়তার আদর্শ আধুনিক-যুগে রূপগ্রহণ করল না বলে আমরা তাঁর প্রতি উদাসীন হয়ে পড়েছি? ভূদেবের জাতীয়তার আদর্শ চিরন্তন ভারতীয় ধর্মেরই আদর্শ, তার পরবর্তীকালে রবীন্দ্র-নাথ সারাজীবন ধরে বৈচিত্র্যের মধ্যে ঐক্য স্থাপনের কথার প্রকাশ করে গিয়েছেন, তাঁর ওপর নির্ভর করেই আমাদের জাতীয় জীবনের নবজাগরণ, স্বাধীনতা-উত্তর ভারতের জীবন ও রাষ্ট্রগঠনে তাঁর কথাই উচ্চনিনাদে প্রচারিত। তাই আধুনিক ভারতে জাতীয় জীবনের সম্মিলন-প্রবণতাকে অস্বীকার করে দ্বিজাতিতত্ত্বের অযৌক্তিক মূঢ়নীতি মেনে নিয়ে ভারতভূমির অঙ্গচ্ছেদ-করে রাষ্ট্রজগতে হিন্দু-মুসলমানের পৃথক অস্তিত্বের যে স্বীকৃতি, তাতে কেবল ভূদেবপ্রতিভারই পরাজয় ঘটেনি, পরাজয় ঘটেছে ভারতীয় জাতীয় চিন্তাধারার আর রাষ্ট্রীয় ও সমাজিক জীবনের নেতৃবৃন্দের নেতৃত্বের। আর তার কারণ হোল ভূদেবের উত্তরসূরী মনীষীদের জাতীয় চেতনার ও জীবনবোধের অভাব। তাই মনে হয় ভূদেবের প্রতি ঔদাসীন্যের কারণ নিহিত আরও গভীরে।

ভূদেবের শান্ত নিস্তরঙ্গ জীবনযাত্রা আর প্রচারবিমুখতাই তাঁকে আমাদের কাছে বিদেশী করে তুলেছে বলে মনে হয়। উনিশ শতকের সমাজ আর ভাববিপ্লবের তরঙ্গমালায় আন্দোলিত মহামানবের দল দুঃখ স্বপ্ন বাধা অপসারণের যে বর্ণাঢ্য চিত্র উপস্থাপিত করেছিলেন, তার উজ্জ্বল জ্যোতিতে আমাদের চোখে ধাঁধা লেগে গিয়েছিল, তাই ভূদেবের সরল সংযত জীবনের শুভ্র উত্তরীয়কে নিষ্প্রভ বলে মনে হয়েছিল আমাদের। তারপর উনিশ-শতকী পাশ্চাত্য ভাববিলাসের উন্মাদনা শেষ হতে না হতেই আর এক উন্মাদনা এসে আমাদের চিত্তভূমি অধিকার করেছিল, তা হোল ভারতীয় জাতীয় আন্দোলন। আর তারই তরঙ্গাবিক্ষেপে ভূদেব তলিয়ে গেলেন বিস্মৃতির অতলে। জাতীয় জীবনের সঙ্গে সঙ্গে সাহিত্যক্ষেত্রেও তাঁর মধ্যে নতুনের যে পূর্বাভাস ছিল, তাও যথেষ্ট মর্যাদা পায়নি। বঙ্কিমচন্দ্রের উপন্যাসের পূর্বসূরী যে ভূদেবের 'ঐতিহাসিক উপন্যাস' আর 'পুষ্পাঞ্জলি' একথা উল্লেখ করতে আজ সাহিত্যের ঐতিহাসিক ভুলে যান।

আজ আমাদের জাতীয় জীবনে একটা বিরাট দৈন্য দেখা দিয়েছে, এ দৈন্য কেবল-মাত্র অর্থনৈতিক বা রাজনৈতিক দৈন্য নয় এ দৈন্য মননশীলতার দৈন্য। ফলে জাতীয় জীবনের অগ্রগতি আজ রুদ্ধপ্রায়। তাই আজ আমাদের পুরনো দিনের দিকে ফিরে তাকাতে হবে—যদি সেদিনের স্মৃতিতে কিছুমাত্র অবশিষ্ট থাকে, এই আশায় তখন সেদিনের মহা-পুরুষদের জীবন ও সাধনা থেকে যদি কিছু প্রেরণা ও পথনির্দেশ লাভ করতে পারি তবে ভূদেবের জীবন জীবনের থেকে বাদ পড়বে না নিশ্চয়ই।

সুধীরচন্দ্র সরকার

(পূর্ব প্রকাশিতের পর)

দুঃখের বিষয় 'ভারতী'র এমন সুন্দর সাহিত্যিক আড্ডাটি বেশীদিন স্থায়ী হতে পারল না। এই সময় ঝড়ের মত আমাদের আড্ডায় এসে পড়ল শিশিরকুমার ভাদুড়ীর থিয়েটারের দল। ফলে হল এই যে, এই আড্ডার পরিবেশটি ছিন্নভিন্ন হয়ে গেল। শুধু যে শিশিরবাবুর দল যোগ দেওয়াতেই এই সাহিত্যিক আড্ডায় ভাঙন ধরল তা নয়, মণিলালের ব্যবসা এবং কান্তিক প্রেসের অবনতিও এর অন্যতম কারণ। এর কিছুদিন পরেই অবশ্য মণিলালের মৃত্যু হয়।

এই সময় 'ভারতী'র আড্ডার সঙ্গে সঙ্গে আর একটি আড্ডা গড়ে উঠেছিল—ওর নাম ছিল 'গজেনদা'র আড্ডা। এই আড্ডাটি বসত সন্ধ্যাবেলায় এবং 'ভারতী' গোষ্ঠীর প্রায় সকলেই এই আড্ডায় গিয়ে জমায়েত হতেন। এই গজেনদা ছিলেন নির্মলচন্দ্র চন্দ্রের নিকট আত্মীয়। গজেনদা থাকতেন বিবেকানন্দ রোডের অক্সফোর্ড মিশনের পাশে কর্ণওয়ালিশ স্ট্রীটের কাছাকাছি। এই আড্ডার বিশেষত্ব ছিল, যে যখনই যাক গজেনদা'র ঢালাও নির্দেশ দেওয়া ছিল যে সে গজেনদা'র বাড়ী থেকে এক কাপ চা পাবেই। এখানকার প্রধান সভ্য ছিলো প্রেমাঙ্কুর আতর্থী। সে মধ্যে মধ্যে সত্যি-মিথ্যে মিলিয়ে নানা ধরনের হাস্যকর গল্প বলে আসর জমিয়ে রাখত। অর্থাৎ বলা যেতে পারে যে সেই ছিল এই আসরের প্রাণস্বরূপ।

প্রেমাঙ্কুর সত্যিই একজন দিলখোলা রসিক ব্যক্তি। গান-বাজনার দিকে তার খুব ঝোঁক ছিল। একজন নামকরা মুসলমান ওস্তাদের কাছে সে এসরাজ শিখত। একদিন প্রেমাঙ্কুর এসে বললে : বাঙালীরা কি অদ্ভুত জাত।

হঠাৎ এই কথায় আমরা সকলে তাকে চেপে ধরলাম, বললাম : হঠাৎ তোমার এই সত্যদর্শনের কারণ কি, আমাদের বলবে?

তখন প্রেমাঙ্কুর হেসে বললে : মানে এটা আমার কথা নয়—এটা হল আমার খাঁ সাহেবের কথা।

চারিদিক থেকে সমস্বরে প্রশ্ন বৃষ্টি হলো : কি রকম, কি রকম। হঠাৎ তাঁর এই সিদ্ধান্তে পৌঁছবার কারণ?

তখন প্রেমাঙ্কুর বেশ রসিয়ে রসিয়ে বলতে আরম্ভ করলে : বাঙালী অদ্ভুত জাত নয়তো কি? মনে করে দেখ জলের মধ্যে মাছ থাকে—শীত-গ্রীষ্ম-বর্ষা সব ঋতুতেই মাছের বাস ঐ জলের মধ্যে। ঐ দুরন্ত শীতে বরফের মত ঠাণ্ডা জলে থেকেও মাছের সর্দি বা অসুখ করে না। সুতরাং তারা জলদেশের অসুর। আর সেই মাছকে কিনা বাঙালীরা বেমালুম খেয়ে হজম করে ফেলে!! আশ্চর্য নয়!!

তার বলার কায়দায় একটা বিরাট হাসির রোল উঠল সেদিন গজেনদা'র বাড়ীর আড্ডায়।

সুখে দুঃখে অনেক বিপর্যয়ের মধ্যে দিয়ে এই আড্ডাটি অনেকদিন চলেছিল। শেষে একে একে সব সদস্যই এখান থেকে সরে পড়ল। শেষ পর্যন্ত যিনি ছিলেন তিনি প্রফুল্লকুমার সরকার।

শেষ আড্ডার অধিবেশন গিয়ে জমল আমার দোকান—এম, সি, সরকার এণ্ড সন্স-এ। তখন আমাদের দোকান ছিল Y, M, C, A, বিল্ডিং-এর নীচে হ্যারিসন রোডে। এই দোকানের আড্ডায় আসতেন শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, সৌরীন্দ্রমোহন মুখোপাধ্যায়, হেমেন্দ্রকুমার রায়, প্রেমাঙ্কুর আতর্থী, চারু রায়, হিতেন্দ্রমোহন বসু, কেদারনাথ চট্টোপাধ্যায় প্রভৃতি।

তারপর আমাদের দোকান প্রেসিডেন্সী কলেজের সামনে অ্যালবার্ট হলের নীচে উঠে এলে সেখানেও নতুন করে আড্ডার পত্তন হলো বটে, কিন্তু আগের মত আর জমাট হলো না। এখন আমাদের শেষ আড্ডা চলছে বঙ্কিম চাটুজ্যে স্ট্রীটের বর্তমান দোকানে। এখানে নিয়মিত আসেন মনোজ বসু, অচিন্ত্য সেনগুপ্ত, প্রেমেন্দ্র মিত্র, ভবানী মুখোপাধ্যায়, প্রবোধকুমার সান্যাল, তুষার-কান্তি ঘোষ, চারু রায়, প্রমথনাথ বিশী, বিশু মুখোপাধ্যায়, নির্মলকুমার সরকার ও আরো অনেকে। কিছুদিন আগে পর্যন্তও আসতেন মাখনলাল সেন, কেদারনাথ চট্টোপাধ্যায়, হিতেন্দ্রমোহন বসু,অবনীনাথ মিত্র। আজ এঁরা সকলেই পরলোকগমন করেছেন।

হ্যাঁ একটা আড্ডার কথা বলতে ভুলে গেছি। সেটার আমরা নাম দিয়েছিলাম 'পদচারণ আড্ডা'। এইটিই আমাদের প্রথম। আড্ডাটির নাম শুনেই আপনারা হয়ত ভাবছেন—'পদচারণ আড্ডা' আবার কি রকম আড্ডা রে বাবা।

শুনুন তবে বলি।

আমরা তখন বেশ জমিয়ে বসে আড্ডা দেবার জায়গা না পেয়ে কর্ণওয়ালিশ স্ট্রীট থেকে কোন বন্ধুর বাড়ী পর্যন্ত সাহিত্য-আলোচনাকে কেন্দ্র করে হেঁটে গিয়ে আবার পূর্বস্থানে ফিরে আসতাম। এতে আমাদের ৩।৪ মাইল হাঁটা হলেও নানা গল্প ও তর্কের মধ্যে দিয়ে সময়টা কেটে যেত বলে কোন কষ্ট হত না। তারপর হাঁটার কাজ করে শ্রান্ত হয়ে শ্রীমানী বাজারের সামনের চায়ের দোকানে এক কাপ চা নিয়ে ঘণ্টার পর ঘণ্টা কাটিয়ে দিতাম। এর পরই আড্ডা গিয়ে জমল যমুনা অফিসে।

আড্ডা দেওয়াটা একটা নেশাবিশেষ। আড্ডা দিতে বসলে সময়ের জ্ঞান থাকে না এবং সময়ে সময়ে পয়সারও নয়। এটা ভাল কি খারাপ সে বিচার কোনও দিন করিনি।

এতগুলি আড্ডার পরেও আর একটি আড্ডা আমাদের এখনও আছে—সেটি হল ভূপতি চৌধুরীর বাড়ীতে যতীন দাস রোডে। ভূপতি হল ইঞ্জিনীয়ার, এবং সাহিত্যরসিক। তার ওখানে ঘর-বাড়ী, ইট-চুন-সুরকির বিষয়ই বেশী আলাপ-আলোচনা হয়। বহু ইঞ্জিনীয়রের সমাগম হয় তবে সাহিত্যিকরা এবং শিল্পসংশ্লিষ্ট বহু ব্যক্তি সেখানে যান। যেমন সি, এ, বি'র সহ-সভাপতি অক্ষয়কুমার বসু, পাহাড়ী সান্যাল, বিকাশ রায়, প্রভু গুহ, রঘুনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, শেখর গোস্বামী, শচীন লাহা, শচীন সাহা, কালিকারঞ্জন সিংহ, আমি এবং আরো অনেকে এখানে আসে।

এটা হল সাপ্তাহিক আড্ডা—বসে প্রতি রবিবার ১১টার পর। খাওয়া-দাওয়া প্রচুর পরিমাণে হয়, অবশ্য সবটাই গৃহস্বামী ভূপতিই বহন করে। আসল কথা হল ভূপতি লোকজনদের খাওয়াতে খুব ভালবাসে।

ভূপতির সঙ্গে আমার পরিচয় প্রায় ৪০ বছরেরও বেশী। 'কল্লোল' গোষ্ঠীর অন্তর্ভুক্ত ছিল ভূপতি। 'ভারতী'তে তার কয়েকটি গল্প প্রকাশিত হয়েছিল। ভূপতি একজন নামকরা স্থপতি—সেই সূত্রে গৃহনির্মাণ সম্পর্কে বহু প্রবন্ধ তাঁর অনেক পত্রিকায় এবং অমৃততেও বেরিয়েছে। বহু কর্ম-ব্যস্ততার মধ্যেও যে ভূপতি তার সাহিত্য-অনুরাগ ও চর্চা আজও সমান উৎসাহের সঙ্গে বাঁচিয়ে রেখেছে, এইটেই প্রশংসার বিষয়।

১৯৩৫ সালে বালীগঞ্জে শরৎ বসু রোডে আমার বর্তমান গৃহটি নির্মাণ করে ভূপতি। আজ থেকে বত্রিশ বছর আগে এ বাড়ীর ডিজাইন ও স্থাপত্য লোকের মনে প্রচুর চমক জাগিয়েছিল। যেদিন আমি গৃহ-প্রবেশ করি সেদিন চারিদিকে আলো দিয়ে এমন সাজানো হয়েছিল যে প্রথম দর্শনে লোকে ভুল করেছিল সিনেমা হাউস বলে। এমন কি কেউ কেউ জিজ্ঞাসা করেছিলেন—এ হাউসটার নাম কি, কি ছবি হচ্ছে—বুকিং অফিস কোনদিকে? ইত্যাদি।

আমি আগেই বলেছি আমাদের 'ভারতী'র আড্ডায় শিশিরকুমার ভাদুড়ী প্রথম এলেন মণিলাল গঙ্গোপাধ্যায়ের সঙ্গে। তার পর থেকে তিনি প্রায়ই আসতেন—নানা ধরনের আলাপ-আলোচনা হত তাঁর সঙ্গে—সাহিত্য, নাটক অভিনয়, ইংরাজী সাহিত্যে, বিশেষ করে নাট্য-সাহিত্যে তাঁর দখল ছিল অসাধারণ। সেক্সপীয়রের সম্বন্ধে

নাটক ছিল তাঁর কণ্ঠস্বর। তার উপর তাঁর সুরেলা কণ্ঠে অপূর্ব আবৃত্তি শ্রোতৃবৃন্দকে মন্ত্রমুগ্ধ করে রাখত। অধ্যাপকরূপেও তাঁর খ্যাতি কিছুমাত্র কম ছিল না।

তদানীন্তন মেট্রোপলিটান কলেজে (বর্তমান বিদ্যাসাগর) তিনি ইংরাজীর অধ্যাপক ছিলেন। তিনি যখন শেক্সপীয়ার পড়াতেন তখন অন্যান্য কলেজ থেকেও বহু ছাত্র বিশেষ অনুমতি নিয়ে তাঁর লেকচার শুনতে যেতো। তাঁর মধ্যে এমন একটা আকর্ষণী ক্ষমতা ছিল যা খুব কম লোকের মধ্যেই দেখা যায়।

আর একটা জিনিস ছিল শিশিরকুমারের মধ্যে সেটা যাঁরাই তাঁর সংস্পর্শে এসেছেন তাঁরাই অনুভব করেছেন। সেটা হল তাঁর অসাধারণ ব্যক্তিত্ব। তিনি যা বলতেন তার ওপরে কথা বলার ক্ষমতা কারও হত না। তাঁর সঙ্গে মতের মিল না হলেও তাঁর সামনে মুখের ওপর প্রতিবাদ করার সাহস কেউ করত না। এক-একজন লোক একটা বিশেষ ক্ষমতা নিয়ে জন্মান যার ফলে তাঁরা চিরকাল শুধু হুকুম দিয়েই যান, কখনও কারও হুকুম তামিল করার কথা চিন্তাও করতে পারেন না। এমন কি কারও অধীনে কোন কাজ পর্যন্ত করতে পারেন না।

শিশিরকুমার ছিলেন সেই জাতের মানুষ। তা নইলে দেখুন তিনি সেই ১৯২০ সাল থেকে মৃত্যুকাল পর্যন্ত মঞ্চে ও চিত্র-জগতে যতগুলি নাটকে ও চিত্রে অভিনয় করেছিলেন, সবগুলিতেই সর্বাধিনায়করূপে কাজ করেছেন। বহু চিত্রনির্মাতা তাঁকে প্রচুর দক্ষিণা দিয়ে কোন কোন বিশেষ চরিত্রে তাঁকে অভিনয় করতে অনুরোধ করেছেন, কিন্তু সে সমস্তই তিনি প্রত্যাখ্যান করে-ছিলেন শুধু একটি কারণে। তিনি কারও অধীনে কাজ করবেন না। কারণ তাঁর মতে এমন কোন পরিচালক ছিল না যে তাঁকে কোনো নির্দেশ দিতে পারে। তা ছাড়া মঞ্চের তুলনায় চিত্রজগতের অভিনেতার অভিনয়ের সুযোগ সীমিত। মঞ্চের কলাকৌশল আর চিত্রের কলাকৌশল সম্পূর্ণ আলাদা। কিন্তু যেহেতু তিনি মঞ্চকেই ভালবাসতেন বেশী এবং মঞ্চই ছিল তাঁর তীর্থক্ষেত্র, সেইজন্য চিত্রজগতের এত বাঁধা-ধরার মধ্যে নিজেকে খাপ খাওয়াতে পারলেন না। তাই যদিও কয়েকটি মঞ্চসফল নাটকের চিত্ররূপে তাঁকে আমাদের পর্দার উপরে দেখার সৌভাগ্য হয়েছিল কিন্তু মঞ্চের মত যেন তিনি সাফল্যলাভ করতে পারেন নি। সত্যিকথা বলতে কি, রূপালী পর্দার মোহ তাঁকে বিশেষ আকর্ষণ করতেও পারেনি পাদ-প্রদীপের মায়া কাটিয়ে।

যাইহোক, বিগত প্রথম মহাযুদ্ধের পর ১৯১৯-২০ সালে শান্তি-উৎসব (peace celebration) উপলক্ষ্যে ইডেন উদ্যানে একটি দীর্ঘকাল ধরে মেলা হয়। সেই মেলায় সরকার পক্ষ থেকে তাঁর কাছে প্রস্তাব করা হয় ওখানে নাট্যানুষ্ঠানের আয়োজন করতে। শিশিরকুমার এ প্রস্তাবে সম্মত হন এবং মেট্রোপলিটান কলেজের অধ্যাপনা ছেড়ে দিয়ে নটনাথের সেবায় নিজেকে উৎসর্গ করেন।

তিনি নাটক নির্বাচন করলেন দ্বিজেন্দ্র-লাল রায়ের 'সীতা'। ইডেন উদ্যানেই স্টেজ বেঁধে 'সীতা'র অভিনয় চলতে লাগল। আমি প্রেমাঙ্কুর, মণিলাল, হেমেন্দ্র, চারু—এই কয়জন প্রায়ই যেতাম শিশিরকুমারের কাছে। তাঁর সঙ্গে আমার পরিচয় ক্রমশ ঘনীভূত হতে লাগল। আড্ডাকে আড্ডাও দেওয়া হোত, মাঝে মাঝে অভিনয়ও দেখতাম।

কিন্তু এই ধরনের একজিবিশান তো আর চিরকাল চলতে পারেন না। একদিন একজিবিশানের মেয়াদ ফুরিয়ে এল। তখন শিশিরকুমার ম্যাডান কোম্পানীতে যোগ দিলেন। কর্নওয়ালিস থিয়েটারে (বর্তমান শ্রী সিনেমা) শিশিরকুমারের 'সীতা' অভিনয় চলতে লাগল। আগেই বলেছি শিশিরকুমার ছিলেন বরাবরই একরোখা এবং স্বাধীনচেতা পুরুষ। ম্যাডান কোম্পানীর অধীনে কাজ করা বেশীদিন তাঁর পক্ষে সম্ভব হল না। তিনি তখন নিজে কর্নওয়ালিস স্টেজ ভাড়া নিয়ে সর্বাধিনায়ক হয়ে নিজের সম্প্রদায় নিয়ে নাট্যমন্দির নাম দিয়ে 'সীতা'র অভিনয় চালাবেন বলে স্থির করলেন।

মুস্কিল বাধলো 'সীতা' অভিনয়ের মঞ্চস্বত্ব নিয়ে। রীতিমত অভিনয় করার জন্য নাট্যকার বা তাঁর উত্তরাধিকারীর কাছ থেকে অনুমতি নেওয়া ছিল না। নাট্যকার দ্বিজেন্দ্র-লাল তার বেশ কিছুদিন আগেই গত হয়েছেন। সুতরাং অনুমতি নিতে হবে তাঁর পুত্রের কাছ থেকে।

খবর পাওয়া গেল দিলীপ রায় কলকাতা আসছেন। শিশিরকুমার তাঁর আগমন-প্রতীক্ষায় দিন কাটাচ্ছেন। এদিকে হল কি তাঁর আসার খবর পেয়ে তদানীন্তন আর্ট থিয়েটারের (স্টার) জনৈক ডিরেকটার হাওড়া স্টেশনে গিয়ে কলকাতায় পা দেবার আগেই ঐ স্টেশনেই অনুমতিপত্র লিখিয়ে নেন, তাঁরা অভিনয় করবেন বলে।

শিশিরকুমার তো মাথায় হাত দিয়ে বসলেন। মঞ্চ উদ্বোধনের তারিখের বেশী দেরী নেই অথচ তাঁর নাটকটাও হাতছাড়া হয়ে গেল। কিন্তু শিশিরকুমার দমবার পাত্র নন, তাঁর জিদ আরও বেড়ে গেল। তিনি ঠিক করলেন 'সীতা'ই তিনি মঞ্চস্থ করবেন তবে দ্বিজেন্দ্রলালের নয়।

যোগেশ চৌধুরীকে দিয়ে নিজে সবরকম সহযোগিতা করে 'সীতা' নাটক লেখালেন। এই নাট্যরূপে আরও অনেকে সহযোগিতা করলেন। হেমেন্দ্রকুমার লিখলেন গান, মণিলাল নৃত্যপরিকল্পনা করলেন, চারু রায় শিল্পনির্দেশনার ভার নিলেন। আরও বহু জিনিস গতানুগতিকতা থেকে সরে এসে নবযুগের সূচনা করলেন। যেমন ধরুন, চারু রায় দৃশ্যপরিকল্পনায় মঞ্চে ত্রিমাত্রিক ভাবধারা (3 Dimensional effect) সৃষ্টি করলেন। জিনিসটা আর একটু পরিষ্কার করে বলি।

আগে যাঁরা দৃশ্য (scene) আঁকতেন—তাঁদের বলা হোত, একটা মাঠের পথ, কিংবা নদী, কিংবা প্রাসাদ, কিংবা জঙ্গল, কিংবা দরবার আঁকতে হবে। তাঁরা সেই অনুযায়ী কাপড় জুড়ে উল্লিখিত জিনিসগুলি এঁকে দিতেন। আঁকা হয়ে গেলে স্টেজের উপরে সেগুলি ঝুলিয়ে দেওয়া হোত। অভিনেতা-অভিনেত্রীরা তার সামনে দাঁড়িয়ে অভিনয় করতেন। তাতে অনেক সময় দেখা যেত শিল্পীদের সঙ্গে দৃশ্যের perspective ঠিক মিলছে না। চারু প্রথম প্রবর্তন করল দৃশ্যের সঙ্গে শিল্পীদের উপযুক্ত সমতা সৃষ্টি করা। তারপর আরও হোল—পোশাকের ধারা পরিবর্তন। আগে অভিনেতারা সব চোগা-চাপকান পরতেন। 'সীতা'য় প্রথম দেখা গেল কুশীলবদের ধুতি পরতে। তারপর ছেলেমেয়ে একসঙ্গে প্রেক্ষাগৃহে বসার ফ্যাশানও শিশিরকুমার প্রথম চালু করেন। নাটক আরম্ভ হবার আগে দারুণ উৎসাহে কনসার্ট বাজতো। এই নাটকে তাও বন্ধ হল।

একসঙ্গে এতগুলি পরিবর্তন তো হলই, তার ওপর হল অভিনয়ের ধারার আমূল পরিবর্তন। অত্যন্ত স্বাভাবিক ও স্বচ্ছন্দ-ভাবে সংলাপ বলার রীতিও এই 'সীতা'য় প্রথম প্রবর্তিত হল। এরপর শিশিরকুমার করলেন আলমগীর, ষোড়শী, রমা, শেষরক্ষা, শঙ্খধ্বনি। এবং প্রত্যেকটি নাটকই কি প্রযোজনার দিক থেকে, কি অভিনয়ের দিক থেকে স্বকীয় বৈশিষ্ট্যে হয়ে উঠল সমুজ্জ্বল। সত্যিই শিশিরকুমার যুগ-প্রবর্তক। নাট্য-জগতে শিশিরকুমারের প্রতিভা চিরস্মরণীয়।

এই শিশির-সম্প্রদায়ের জন্য অন্য যেসব শিল্পীরা ছিলেন তাঁরা শিশিরকুমারের অভিনয়-শিক্ষার গুণে পরবর্তী যুগে অবিসম্বাদী প্রতিষ্ঠা অর্জনে সক্ষম হয়ে-ছিলেন। যেমন প্রভা দেবী, জীবন গাঙ্গুলী, মনোরঞ্জন ভট্টাচার্য, যোগেশ চৌধুরী, রবি রায় প্রভৃতি। এই নাটকে আমরা বিখ্যাত অন্ধ গায়ক কৃষ্ণচন্দ্র দে'র সঙ্গেও পরিচিত হই।

তবে হ্যাঁ, একটা কথা এখানে না বলে পারছি না। শিশিরকুমারের প্রযোজিত নাটকগুলিতে তিনিই সব—অন্যান্য শিল্পীরা নিষ্প্রভ হয়ে যেত তাঁর প্রতিভার দ্যুতিতে। শেষে লোকে শিশিরকুমারকেই দেখতে যেত, নাটকের অন্য কোন শিল্পীকে নয়। লোকে বলত শিশিরকুমার দাম্ভিক। কিন্তু আমার আজও বিশ্বাস, এরকম লোকের দম্ভ শোভা পায়, কারণ তিনি একা যে-কোন নাটককে টেনে নিয়ে যাবার শক্তি রাখতেন—তাঁর অভিনয়ে এবং ব্যক্তিত্বে।

(ক্রমশঃ)

গোঁসাইকুণ্ডর ডায়েরি

ভক্তি বিশ্বাস

(পূর্ব প্রকাশিতের পর)

(৯)

১৮ই অক্টোবর। আজকের দিনটি বিশেষভাবে স্মরণীয়। প্রত্যুষে বন্ধুর ডাকাডাকিতে ঘুম ভাঙলো, কিন্তু উঠবার তাগিদ মোটেই বোধ করলাম না। প্রচণ্ড শীত, তার উপর কাল প্রায় সারারাত সমানে তুষারপাত হয়েছে। আজকের সকালে চারিদিক নির্মল, শান্ত, স্তব্ধ। নির্মেঘ নীলাকাশ। সামনের তুষারঢাকা পাহাড়ের চূড়া বেয়ে ধীরে ধীরে সূর্যালোক গড়িয়ে নামছে। দেখবার জন্য বন্ধুর হাঁকডাকের অন্ত নেই। হাঁকডাক করুক, ওরা সে সৌন্দর্য দেখুক প্রাণভরে—এত শীতে উঞ্চ বিছানা ছেড়ে এখন আমি নড়ছি না। রোদ্দুর ঘরে এসে না ঢোকা অবধি আমি অমনি স্লিপিং ব্যাগের ভিতর পড়ে থাকব!

ওদের কলকলানির চোটে অস্থির। তবু আমি কোনরূমেই নড়ছি না। ওরা চা খাচ্ছে, আমি শুয়েই চা খাবো। পুরি আর খাবো না। আজও খাবার ইচ্ছে হয়নি।

ঘরের ভিতর এক ঝলক রোদ ঢুকতেই গা-ঝাড়া দিয়ে উঠে পড়ি। বাইরে বেরিয়ে চারিদিকের দৃশ্য দেখে চোখ জুড়িয়ে গেল। বিশাল নীল লম্বা হ্রদের চারি-দিকে তুষার-ঢাকা পাহাড়। কাল রাতের তুষারপাতে আজ আর কোথাও কোন অনাচ্ছাদিত পাথর নেই। সেই তুষারাবৃত পাহাড়ের ছায়া পড়েছে নীল হ্রদের বুকে, ঠিক যেমন আরসীতে ছায়া পড়ে তেমনি। অবর্ণনীয় সৌন্দর্য।

নেপালীরা বলে, পরিষ্কার দিন হলে দেখা যায় হ্রদের জলে নারায়ণ শুয়ে আছেন। আমরা কই তা তো দেখতে পাচ্ছি না। মনে হয়, পরিষ্কার দিনে চারিদিকের পাহাড়ের যে প্রতিবিম্ব জলে পড়ে, সেই প্রতিবিম্ব দেখে হয়তো ওদের অনন্তশয্যায় নারায়ণকে মনে পড়ে, যেমনটি আছে পশু-পতিনাথের মন্দিরের চত্বরে, যেমন আছে "বুড়া নীলকণ্ঠের" মন্দিরে।

খুব ভালো লাগছে। সূর্যের উত্তাপের স্পর্শ পেয়ে দেহের সঙ্গে সঙ্গে মনও সতেজ হয়ে উঠেছে। চারিদিকে ঘুরে ঘুরে অনুপম সৌন্দর্য উপভোগ করছি?

মিঃ বিশ্বাস লামাকে বললেন, রান্না সেরে নাও, স্নান খাওয়া সেরে আমরা একেবারে বেলা দশটা নাগাদ রওনা হয়ে বিকেল অবধি হাঁটবো।

লামা ব্যস্ত হয়ে রান্নায় মন দিয়েছে, আমরা স্নানে। এত শীতে স্নান করাও কঠিন। হ্রদের তীরে সূর্যালোকে পাথরের উপর বসে ওদের দুজনের দিকে দেখি, ওরা কি করে। ওমা! ওরা মামা-ভাগ্নে যে গলা জড়াজড়ি করে হ্রদের জলে ডুব দিচ্ছে। আমি তাড়াতাড়ি দুই বীরপুরুষের ছবি তুলে নিলাম।

মিঃ বিশ্বাস আমাকে বললেন, "তুমি জলে নেবো না যেন। এত ঠান্ডা জল যে জমেই যাবে।"

হবেই তো! তুষারগলা জল, তুহিন শীতল। তার স্পর্শ পেতেও আমার দেরী হয় না। তবে ওঁর কথার পর জলে নামবার সাহস সঞ্চয় করে উঠতে পারি না। তীরে বসেই স্নান সেরে নিই।

কি তৃপ্তি! দেহের মনের সব অবসাদ কেটে গেল। এমনি তৃপ্তিই বোধহয় নীল-কণ্ঠ শিব পেয়েছিলেন, কালকূটজনিত গাত্রদাহ প্রশমিত হয়েছিল তাঁর।

মগটা মেজে পরিষ্কার করে জল নিয়ে উপরে উঠি শিবলিঙ্গের মাথায় ঢালবো বলে। বন্ধু সঙ্গে সঙ্গে এলো। জলের বোতলগুলি ভরে কুণ্ডর পূতবারি নেওয়া হল, দেশে নিয়ে যাবো।

চারিদিকের অনুপম প্রাকৃতিক সৌন্দর্য ছেড়ে নড়তে ইচ্ছে করছে না। কুন্ডের তীর থেকে আর ওঠাই হল না। ঘরে আর ঢুকলাম না। ওই ঘরের জন্য কাল আকুলি-বিকুলির অন্ত ছিল না, আজ বাইরের সৌন্দর্যের মোহে আচ্ছন্ন হয়ে আমরা সেই পরম আকাঙ্ক্ষিত ঘরকে অবহেলা করতেও বাধছে না। বাইরে হ্রদের তীরে পাথরের উপর বসে বসেই খিচুড়ি ও পাঁপরভাজা খাওয়া হ'ল। বন্ধু কুলিদের সহায়তায় মাল গুছিয়ে ফেলেছে।

দলপতির নির্দেশমত, বেলা দশটার মধ্যে ফিরবার জন্য সকলে তৈরী হয়ে নিয়েছি। আজ বিকাল পর্যন্ত একটানা হেঁটে প্রথম গ্রামে পৌঁছাতে হবে। তা না পারলে অন্ততঃ তার কাছাকাছি নিশ্চয়ই পৌঁছাবো। এখন আর পথে বিশেষ চড়াই পাবো না, উৎরাই পথে অনেকদূর একটানা চলা সম্ভব হবে।

সহজ সুন্দর পথ, কিন্তু ছেড়ে যেতে ইচ্ছে করে না। বারবার পিছন ফিরে তাকিয়ে তাকিয়ে দেখি। তারও কয়েকটা কুণ্ডের তীর ধরে চলবার পথ। বড় কুণ্ডের জলধারা ঝরনার মত তীব্রবেগে বয়ে এসে নীচে অন্য একটা কুণ্ডে পড়ছে। এটার পরও আরও একটা কুণ্ড, সেখান থেকে জল একটা জল-প্রপাতের আকারে নীচে নদীর দিকে বয়ে চলেছে। এই ধারা ত্রিশূলীগণ্ডকী নদীর একটি উৎস। অন্য উৎস তিব্বতে আছে।

চলবার কালে দুটি পথের সংযোগস্থলে মানবাহাদুর দেখায়—ওই যে পথটা উঁচুতে পাহাড়ের উপর উঠে গেল, ওইটি ল্যাঙট্যাং হিমল যাবার রাস্তা। এক সাহেবের সঙ্গে গত বছর সে এপথে এসেছিল, সাহেবের নাম সে বলতে পারল না। আমরা নীচের পথ ধরেছি।

এই অঞ্চলের পর্বতমালার নাম ল্যাঙট্যাং হিমল। ল্যাংট্যাং-লিরুং (উচ্চতা ২৩,৭৭১ ফুট) এর উচ্চতম শিখর। এখনো এই শিখরটিতে মানুষের পদার্পণ ঘটে নি।

আমাদের ভাগ্যে পথ বেশীক্ষণ সহজ রইল না। খানিকটা এগিয়ে গিয়ে দেখি মস্ত মস্ত পাথর ছড়ান দুর্গম অঞ্চল। পাহাড়ের উঁচু থেকে নীচ অবধি যতদূরে চোখ যায় একই রকম পাথর ছড়িয়ে আছে। এই রকম বড় বড় পাথরের উপর দিয়ে চলা অতিশয় কঠিন। আমরা গঙ্গোত্রী হিমবাহ অঞ্চলের অরোয়া উপত্যকায়ই কেবল এমন বড় বড় পাথর দেখেছি। এর উপর দিয়ে চলা অত্যন্ত কষ্টসাধ্য, তার উপর পথের দাগ কোথাও পড়ে নি। কুলিরা তাদের অভ্যস্ত পদক্ষেপে এই অঞ্চল তাড়াতাড়ি করে হেঁটে পার হয়ে গেছে, তাদের চলার পথের কোন চিহ্ন দেখতে পাচ্ছি না। তুষার জমেছে কোথাও কোথাও। তারই উপর ফেলা ওদের পদচিহ্ন লক্ষ্য করে করে চলেছি। কিন্তু অধিকাংশ জায়গায়ই তুষার জমতে পায় নি, গড়িয়ে ফাটলে পড়ে গেছে। তাছাড়া লামাদের কারুরই পায়ে জুতো নেই, ওরা তাই পারতপক্ষে তুষারে পা দিয়ে চলে না। তাই কদাচিৎ এক-আধটা দাগ দেখতে পাচ্ছি।

'লামা—লামা—লামা' সমস্বরে তিনজনা চেঁচাচ্ছি। কোন উত্তর নেই। কি আর করা যায়। অনির্দিষ্টভাবে সামনের দিকে এগিয়ে চলি। আর চলাকালেই এক এক করে ওদের সকলের নাম ধরে ডাকতে থাকি।

এমনি দুর্গম পথে অনিশ্চয়তার মধ্যে আধ ঘন্টারও উপর চলেছি। হঠাৎ আমাদের ডাকের উত্তর আসে। আমরা তাহলে ঠিক দিকেই চলেছিলাম, লামা ফিরে এসেছে।

আমাদের অনুযোগের উত্তরে লামা বলে, ওরা দাঁড়াবার জায়গা পর্যন্ত পায় নি, তাই মাল নামাতে পারে নি। থামাও তাই সম্ভব হয় নি। এখন অল্প দূরে সকলে মাল নামিয়ে বিশ্রাম করতে বসেছে। ও পথ দেখা-বার জন্য ফিরে এসেছে। এই দুর্গম পথ যে আমরা সহজে পার হতে পারব না, ওরা বুঝেছিল, কিন্তু উপায় ছিল না।

এবার আর ছাড়াছাড়ি নয়। ওদের ধীরে ধীরে চলতে আদেশ করেন মিঃ বিশ্বাস। আমাদের সঙ্গে সঙ্গেই চলে ওরা। সুবিধা-মত জায়গা পেলে মাল নামিয়ে রেখে বিশ্রাম নেয় আমাদেরই সঙ্গে। দুর্গম উৎরাই পথে মানবাহাদুর মাঝে মাঝে আমার হাত ধরে লাফিয়ে নামতে সাহায্য করছে।

একেকটি উৎরাই এত কঠিন যে, মনে হয় ৮০ ডিগ্রির খাড়াই নেমে আসছি। নীচের দিকে তাকাতে ভয় হয়, মাথা ঘুরে ওঠে। লামারা এখন সর্বদাই আমাদের সঙ্গে সঙ্গে আছে, তাই মনে খুব ভরসা পাচ্ছি।

খুব ধীরে সাবধানে চলেছি, অনেকটা উপায়-হীনের মত। ত্রিশূলীর পথে যদি গোসাঁই-কুণ্ড আসতাম, তবে এই পথে কি করে যে চড়াই উঠতাম কে জানে!

চলার ফাঁকে ফাঁকে পিছন ফিরে তাকাই বারবার। ল্যাংট্যাং হিমল ও গণেশ হিমল পর্বতমালার তুষারশুভ্র গিরিশৃঙ্গগুলি মেঘের ফাঁক দিয়ে সূর্যকিরণে উজ্জ্বল হয়ে উঠেছে। থেমে যে দু মিনিট দেখবো তার উপায় নেই, অমনি চলবার তাড়া আসে। তবু বারে বারে বিশ্রাম করবার নাম করে পিছনের সেই অপরূপ রূপময় শৃঙ্গাবলীর দিকে তাকিয়ে থাকি। না তাকিয়ে পারি না যে।

ধীরে ধীরে বেলা গড়িয়ে এল। এবার একটা আশ্রয়ের খোঁজ করতে হয়। পাহাড়ের উঁচু থেকে দেখছি, বেশ খানিকটা নীচে মস্ত একটা ময়দান, তার মাঝখানে দু-তিনটি বড় ও ভাল ঘর। কিন্তু লামা বললে ওখানে জল পাওয়া যাবে না। কি করে জানল, ওরাই জানে। আরও এগিয়ে চললাম।

এখনো আমরা তৃণভূমি অঞ্চলেই আছি। এখানে ঘাস ও ছোট্ট ছোট্ট জুনিপারের ঝোপ ছাড়া আর কোন গাছ নেই। বাকী সব পাথর আর পাথর। তবে অদূরেই নীচের পাহাড়ে বড় গাছপালার রাজ্য শুরু হয়ে গেছে।

অসমান পাথরের পথে ক্রমাগত এগিয়ে চলা। পাহাড়ের ঢেউ একটার পর একটা আসছে, আমরা একটার পর একটা পার হয়ে চলেছি। বেলা সাড়ে চারটা নাগাদ একটা বড় ও ভাল খুপরির সন্ধান পাওয়া গেল। পথ ছেড়ে খানিকটা উঁচুতে উঠে সেখানে পৌঁছাতে হল।

মস্ত বড় ঘরখানি। বাঁশের বেড়া দিয়ে দুই ভাগ করা আছে। একটা বোধহয় পশু-দের থাকবার। পাথরের দেয়ালে তিন-চারটি ছোট ছোট কুলুঙ্গী আছে। ঘরের মাঝখানে ছাদ থেকে দড়ি ঝুলান, তাতে লণ্ঠন ঝুলোনো চলবে।

লামা তার দলবল নিয়ে মালপত্র ঘরের এক পাশে রেখে তাড়াতাড়ি আগুন জ্বালাবার ব্যবস্থা করে ফেলেছে। তারও অসুবিধা নেই, ঘরের ভিতরই অনেক শুকনো সরু সরু বাঁশঝাড় জমা করা আছে। দেখতে দেখতে মস্ত আগুনের শিখা প্রায় ঘরের ছাদ অবধি উঠে গেল। কিন্তু জল? জল কই?

উত্তরে লামা মৃদু হেসে বলে—'পানি হ্যায় নেই।'

'বারে মজা! পানি নেই, তব ইধর রুখা কেঁও?' সবাই রুক্ষভাবে জিজ্ঞাসা করি।

ওরা কিন্তু মোটেই বিব্রত হয় না। বরং মিটিমিটি হাসে। ভাল করে উত্তরও দেয় না। যেন উত্তর দেবার প্রয়োজনই নেই ওদের।

আমরা অসন্তুষ্ট মনে বিছানা তিনটি পাতবার ব্যবস্থা করে ফেলি। আজ তাহলে আর খাওয়া হবে না। একটু চা? তা-ও 'ক হবে না? সঙ্গের বোতলগুলি ভরা গোসাঁই-কুণ্ডের জল আছে, কিন্তু সে তো কলকাতাতে নিয়ে যাব বলে। তাতে তো আর চা করা চলবে না।

অগত্যা বিরস বদনে আমরা আগুনের ধারে বসে হাত-পা গরম করি। এই হত-ভাগাদের পাল্লায় পড়ে আর কত যে দুর্ভোগ ভুগতে হবে কে জানে! ওদিকে কৃষ্ণবাহাদুর কম্বল মুড়ি দিয়ে কোঁকাচ্ছে। ঠাণ্ডা লেগে তার জ্বর এসেছে। হবে না? এই ঠাণ্ডা, বরফ পড়ছে, তার মধ্যে কত অল্প জামা-কাপড়। ওদের সবাইকে যে একসঙ্গে নিমোনিয়ায় ধরে নি তাই ঢের।

লামা ইঙ্গিত করে। আমরা চুপচাপ বসে বসে দেখি। ওরা বালতি ডেকচি, মগ ইত্যাদি যত কিছু বাসনপত্র ছিল সব বের করে নিয়ে চলেছে। কেবল বাচ্চা কৃষ্ণবাহাদুর শুয়ে রইল।

'কি ধর যাতা?' এবার প্রশ্ন করেন উনি।

'বরফ লানে হোগা।'

অল্পক্ষণের মধ্যেই ওরা যাবতীয় বাসন ভর্তি করে তুষার তুলে নিয়ে এসেছে। সেই তুষার আগুনে গলিয়ে জল হল, চা-ও তৈরী হয়ে গেল। খিচুড়িও চেপেছে শুধু তুষার গলান জলেই।

(১০)

প্রচণ্ড শীত। সন্ধ্যার পর থেকেই আবার তুষারপাত শুরু হল। আগুনের ধার ছেড়ে আর নড়া যায় না। তুষারপাত আর থামল না, সারা রাত সমানে তুষার পড়ল। আজ আমরা ভাল ঘরে, আগুনের ধারে শুয়েছি, তাই কোন অসুবিধা বোধ করি নি। কিন্তু সকালে বাইরে কি ঠাণ্ডা। চারি-দিক সব তুষারে ঢেকে গেছে। পথঘাট সব একাকার। জুনিপার গাছগুলি তুষারে ঢেকে চেনা যাচ্ছে না।

সকালে, শুরু হতেই তুষারে পা ফেলে ফেলে চলা, ক্রমাগতই পিছলে যাচ্ছি। পথ চেনাও মুস্কিল। লামা পথ দেখিয়ে দেখিয়ে নিয়ে চলেছে। আজ আশা করছি, এ পথের প্রথম গ্রাম 'ফুলুং'-এ ঘণ্টাখানেকের মধ্যেই পৌঁছাব। উৎরাই পথ, পথও অনেকটা ভাল। কেবল সব পাহাড়টা তুষারে ঢাকা বলে পথ-রেখা বোঝা যাচ্ছে না। তাছাড়া কোন অসুবিধা নেই। চলা শুরু করতেই শীতের ভাব অনেকটা কেটে গেছে।

কাল রাত্রে উনি কৃষ্ণবাহাদুরকে ওষুধ দিয়েছিলেন, তার জ্বর ছেড়ে গেছে। আজ তার আর কোন অসুবিধা নেই। সকলের সঙ্গে সমান মাল নিয়ে সে চলেছে।

উৎরাই পথে হুড়হুড় করে নেমেই চলেছি। ওদের পিছু ছাড়ছি না। কোনক্রমে একটা জায়গায় পৌঁছে বন্ধু দেখায়, দু দিকে দুটো পাহাড়ের উপত্যকা দেখা যাচ্ছে। দুটো পথ দুই পাহাড়ের দুটো গিরিশিরা ধরে এগিয়ে গেছে। বন্ধু বলে, আমরা নিশ্চয় ওই ডান দিকের পথটা ধরব। ত্রিশূলী নদী তো ওই ডান দিকেই বয়ে চলেছে।

না, তা হোল না। লামা এগিয়ে এসে বাঁ দিকের পথটা ধরল। আমরা তার পিছু পিছু চললাম।

খাড়া উৎরাই পথ, ক্রমাগত নেমেই চলেছি। নামাটা যেন নিজের ইচ্ছার উপর নির্ভর করছে না। কে যেন নীচের দিকে টেনে নামাচ্ছে। গিরিশিরার উপর পৌঁছে আমরা খানিক বাদেই বেলা সাড়ে ন'টার সময় একটা খুপরির কাছে পৌঁছে গেলাম। এতদূর এলাম, পথে একটাও ঝরনার দেখা পেলাম না। এখানেও জল নেই। জলের বোতলে গোসাঁইকুণ্ডের জল ভরা। অগত্যা একটা ছোট বোতল বার করে তাই থেকে জল খেয়ে তৃষ্ণা নিবারণ করতে হ'ল।

'ফুলুং আউর কেৎনা দূর?' নিঃশ্বাস লামাকে জিজ্ঞাসা করেন।

নির্বিকারভাবে লামা উত্তর দিল—'আভি ফুলুং আউর নেহি যায়েগা, বাট ভুল হো গিয়া। আভি বরাম্বর সিধা রাস্তাসে 'ঘাড়াং' যায়েগা।'

সে কি কথা? রাস্তা কোথায় ভুল হ'ল? বন্ধুর দেখানো পথটা যেখানে ছিল সেখানে নয় তো? সে তো আমরা অনেক আগেই ফেলে এসেছি। তারপর অন্ততঃ এক হাজার দেড় হাজার ফিট হুড়হুড় করে নেমে ছ।

আমাদের মুখ শুকিয়ে গেল। এরা পথ ভুল করেছে, আবার বলে কিনা সিধা রাস্তায় ঘাড়াং যাবে। উনি চিন্তান্বিত হয়ে প্রশ্ন করেন—

'ঠিক সে বাতাও, ইধরসে ঠিক ঠিক ত্রিশূলীবজার যানে সেকে গা তো?'

'জরুর যায়েগা।' প্রবল আত্মপ্রত্যয়ের সঙ্গে লামা বলে। আমাদের দুশ্চিন্তা দেখে একটু মিটিমিটি হাসে।

অগত্যা উনি হুকুম করেন, আপাততঃ একটা জলের ধারা খুঁজে নিয়ে রান্নার ব্যবস্থা কর।

আমরা গিরিশিরা ধরে চলে আধ ঘণ্টা পর একটা জায়গায় থেমেছি। লামা মাল নামিয়ে এদিক-ওদিক কি দেখছে। কখনো ডান দিকে সোজা বনের মধ্যে যাবার চেষ্টা করে, কখনো উপরে উঠে আবার সামনে বাঁ দিকে দেখে আসে। ডান দিকে কোন পথ নেই, কিন্তু বাঁ দিকে একটা পথ নীচের দিকে নেমে গেছে।

মনবাহাদুর সেই পথেই এগোয়। ওর পিছু পিছু লামারাও চলা শুরু করে। বাঁ দিকের পথ একটু পরই সোজা বনের মধ্যে নেমে গেছে। বন গভীর হতে গভীরতর হচ্ছে, চলা কষ্টকর। দিনের বেলাতেই সূর্যা-লোক প্রবেশ করতে পথ পাচ্ছে না। বেশীর ভাগ রডোডেনড্রন ও পাইন গাছ, অন্যান্য গাছও কিছু কিছু আছে। উঁচু থেকে গভীর বনের মধ্যে দূরে দুটো-একটা ভাঙা কুঁড়ে দেখতে পাই, সে-ও দূর থেকেই। সেখানেও জল নেই, ওরা জানায়।

খুব ক্লান্ত হয়ে পড়েছি, তৃষ্ণায় কণ্ঠ শুকিয়ে গেছে। সঙ্গে কুণ্ডের জল মাত্র সম্বল, তাই মায়া করে দু-এক ঢোকের বেশী খেতেও পারছি না। ও'রা দুজন তো জল খাওয়া পরিত্যাগই করেছেন। অনেকক্ষণ চলবার পর পথের পাশে বিশ্রাম করে এক টুকরো করে চকোলেট খেয়ে দু ঢোক জল খেয়ে চাঙ্গা হয়ে আবার চলা শুরু করেছি।

বেলা বারোটার সময় বনের মধ্যে একটা ঝরনার আওয়াজ পাওয়া গেল। ধড়ে প্রাণ এলো। তার কাছেই একটা কুঁড়ের ধ্বংসাবশেষ, সেখানেই থামা হল।

এদিকে তুমুল বৃষ্টি শুরু হয়ে গেছে। তার সঙ্গে ছোট ছোট শিলও পড়ছে। তুষার-ঢাকা পথ আমরা অনেক আগেই শেষ করে এসেছি। এখানে আছে কেবল ঘন কুয়াশা, সঙ্গে প্রবল আকাশভাঙা বৃষ্টি। ছাতা মাথায় দিয়ে ওই ভাঙা কুঁড়ের ভিতর একেকটা পাথরের উপর বসে থাকি। ওরা বৃষ্টির মধ্যেই বাঁশ-ঝাড় জ্বালিয়ে মস্ত আগুন জ্বালিয়ে ফেলেছে। ওই বৃষ্টির মধ্যেই রান্নাও বসিয়ে দিয়েছে। কাল রাত্রে জলাভাবে ওদের রান্না হয় নি, আজ তাই তাড়াতাড়ি ওদের ভাত রান্না করে নিচ্ছে।

সামান্য ঝিরঝিরে বৃষ্টির মধ্যে ছাতা মাথায় দিয়েই খিচুড়ি খেতে হল। লামা একেবারে কাকভিজে হয়ে গেছে। বৃষ্টি থামতেই আগুনে জামা-কাপড় শুকিয়ে নিচ্ছে। অন্যান্য সবাই প্লাস্টিক চাদর মাথায় ঢাকা দেওয়াতে অতটা ভেজে নি।

একটুক্ষণ বিশ্রাম, বসে বসেই। খানিক বাদে আবার হাঁটা শুরু। আশা আছে অল্পক্ষণের মধ্যেই গ্রামে পৌঁছে যাব। আমাদের দুঃখ-কষ্টের শেষ হবে, লোকজনের দেখা পাব।

মিনিট পনেরো চলার পর দেখি পথের পাশে লামা ও মনবাহাদুরের মাল পড়ে আছে। কোথায় গেল ওরা?

'লাম—লামা।' একবার, দুবার ডাকতেই লামার সাড়া মেলে। উঠে এসে কাঁচুমাচু মুখে লামা জানাল—

'আউর বাট ছই না, বাট টুট গিয়া।'

তার মানে? আমরা ভাবলাম, এখানে বুঝি পাহাড় ধ্বসে রাস্তা ভেঙে গেছে। পাহাড়ী পথের এই তো মস্ত বিপদ।

উনি বলেন, 'বাট টুট গিয়া তো ক্যা, উপর সে চলো, উপরমে বাট মিল যায়েগা।'

'নেহি, নেহি, বাট বিলকুল হ্যয়ই নেই।' লামা বোঝাতে চেষ্টা করে। আমরা অবিশ্বাসের ভঙ্গীতে ওদের পিছু পিছু এগিয়ে গিয়ে দেখি, যে পথ ধরে আমরা এতক্ষণ এসেছি, বনের মধ্যে একটা খোলা জায়গায় এসে সে পথ শেষ হয়ে গেছে। ধ্বস কোথাও নেই। চারিদিক খুঁজে কোন দিকে কোন পথের চিহ্নই দেখা গেল না। সম্মুখে এগিয়ে বনের প্রান্তভাগে, পাহাড়ের খাড়া উৎরাইর কাছে এসে দেখি নিশ্চিদ্র বনভূমি সম্মুখে প্রসারিত। তার কোন দিকে কোথাও মনুষ্য-পদচিহ্ন পড়বার চিহ্ন নেই।

বনের মধ্যে ঢুকে অবধি যে পথ ধরে এসেছি, সে পথ কোন গ্রামে পৌঁছায় নি। পাহাড়ীরা গরু ভেড়া মোষ চরাবার সময় চলে চলে সে পথের সৃষ্টি হয়েছে, এ সেই পথ। ওদের যতদূর চলা প্রয়োজন হয়েছে, পথও ততটুকুই সৃষ্টি হয়েছে। প্রয়োজনও ফুরিয়েছে তাই পথও 'ছইনা' হয়ে গেছে; আমাদের মাথায় আকাশ ভেঙে পড়লো। এখন কি করা যায়?

উনি লামাকে বলেন, গ্রামে যাবার কোন পথ নিশ্চয়ই আছে। তোমরা সকলে মিলে খুঁজে বের কর। দেখ নীচে নিশ্চয়ই কোন-না-কোন গ্রাম আছে, একটু নামলেই তার পাত্তা মিলবে।

বন্ধুর উল্লাসভরা ডাক কানে আসে, 'ও ছোটমামা! কুকুরের ডাক শুনতে পাচ্ছি। নিশ্চয়ই কাছেই কোন গ্রাম আছে।'

'কই! কই!' সবাই চুপ করে কুকুরের ডাক শুনবার জন্য কান পেতে থাকি।

'ছোট বাচ্চার কান্নাও শোনা যাচ্ছে'—সমস্বরে সকলে বলে উঠি।

কুয়াশা ধীরে ধীরে অপসারিত হচ্ছে। অ-নে-ক নীচ আমাদেরই পাহাড়ের গায়ে, বনের মধ্যে যেন খানিকটা পরিষ্কৃত জায়গা দেখা গেল। বেশ নীচে বলে তেমন স্পষ্ট বোঝা যাচ্ছে না। কিন্তু কুকুরের ডাক ও বাচ্চার কান্না এখন সকলেই স্পষ্ট শুনতে পাচ্ছি। খুব অস্পষ্ট হলেও কুয়াশার মধ্য দিয়েই ঘরবাড়ীও যেন দেখা যাচ্ছে বোধ হল।

আশান্বিত হয়ে লামা তার দলবল নিয়ে বনের মধ্যে নেমে গেল। কিছুদূর নীচে নেমে দেখবার চেষ্টা করে, গ্রামে পৌঁছবার পথের কোন হদিশ যদি পাওয়া যায়। আমরা তিনজন প্রচণ্ড উৎকণ্ঠা নিয়ে দাঁড়িয়ে আছি।

কয়েক মিনিটের মধ্যেই চারজনা ফিরে এল।

"বাট ছইনা।" পথ নেই!

ঘন কুয়াশা আবার এগিয়ে এসে আমাদের ঘিরে ধরেছে।

লামাকে মিঃ বিশ্বাস হুকুম দেন, ওই গ্রামের লোকদের ডাক দাও, রাস্তা বাতলাতে বলো। ওরা নিশ্চয় সাড়া দেবে। আমরা তো নেপালী ভাষা জানি না, তুমিই ডাক।

লামা দু'টো একটা ডাক দেয়, নেহাৎ অনিচ্ছাতে, মিঃ বিশ্বাসের বার-বার পীড়াপীড়িতে। সে-ও জানে, আমরাও জানি। এ ডাক বৃথা, ওরা কেউ শুনতে পাবে না!

কি আর করা! সাড়ে তিনটা বেজে গেছে, ফেরা ছাড়া উপায়ও নেই। কিন্তু ফিরেই বা যাবো কোথায়? আজ ভোর থেকেও কম করেও অন্ততঃ পক্ষে চার হাজার ফিট খাড়া উৎরাই নেমেছি। পরশু গোঁসাই-কুণ্ড ছাড়বার পর পথের কোথাও জলের চিহ্নও পাইনি, কেবল এই একটি জায়গা ছাড়া, যেখানে আমরা দুপুরে খেয়েছি। সুতরাং সেই পর্যন্ত ফেরাই ঠিক হল। আশঙ্কা, দুশ্চিন্তা ও অবসাদে আমাদের অবস্থা অবর্ণনীয়।

ঝরনার অনতিদূরে বনের মধ্যে একটা পরিষ্কৃত জায়গা দেখে লামা থামলো। মাথার ঘন চুলের মধ্যে যেন টাক পড়েছে। সেখানেই আজ রাত্রের মত থাকা ঠিক হল। একটা ঘরের "ইসারাও" পাওয়া গেল। অতীতে কোন ভেড়াওয়ালা ঘর বানিয়েছিল, তার দুটি কয়েক লাঠিমাত্র অবশিষ্ট আছে, দেয়াল পর্যন্ত নেই! সেখানেই আস্তানা তৈরী করে নিতে হবে। লামারা সকলে কুকরী হাতে বনের মধ্যে ঢুকে পড়লো। রডোডেনড্রন ও পাইনগাছের ডাল দিয়ে থাকবার ঘর তৈরী করতে হবে। ল্যাংট্যাংবাহাদুর একবোঝা শুকনো বাঁশ সংগ্রহ করে এনেছে, আগুন জ্বালবে বলে।

আগুন জ্বালানোও কষ্টকর। এখন সময় বুঝেই যেন আবার ঝম্‌ঝম্‌ করে চেপে বৃষ্টি এল। ঘরের "ইসারাতে" পাথরের উপর আমরা ছাতি মাথায় দিয়ে বসে থাকি। বন্ধু ছাতি মাথায় দিয়ে ঠায় দাঁড়িয়ে আছে। বাহাদুরেরা ওই বৃষ্টির মধ্যেই ডাল কেটে এনে ঘর তৈরীর চেষ্টা করছে।

"এমন বৃষ্টি থাকলে এমনি করে ছাতি মাথায় দিয়ে বসে বসেই আমাদের ষোল ঘণ্টা কাটাতে হবে। বন্ধু তুই আর কতক্ষণ দাঁড়িয়ে থাকবি; এসে এই পাথরখানায় বোস।" মিঃ বিশ্বাস করুণস্বরে বন্ধুকে ডাকেন।

বন্ধু রাজী হচ্ছে না, বলে, "দেখা যাক্, কতক্ষণ পারি।"

পাহাড়ের গা বেয়ে বেয়ে জলের ধারা হুড়-হুড় করে নেমে এসে আমাদের বসবার পাথরগুলি পর্যন্ত ভাসিয়ে দিয়েছে। প্রচণ্ড শীত, ঠক্‌ঠক্‌ করে কাঁপছি। বৃষ্টির ছাটে দাঁড়ানো বন্ধুও কতকটা ভিজে গেছে।

ঘণ্টাখানেকের মধ্যেই লামারা গাছের পাতাশুদ্ধ বড় বড় ডাল কেটে এনে পুঁতে একটা বেড়ার মত খাড়া করলো। তার উপর আরও ডালপালা চাপিয়ে নীচু একটা ঘরের মত ঝুপরি তৈরী করে ফেলেছে। সেই ঘরই আমাদের আজকের রাতের আশ্রয়।

হায় রে ঘর! কলকাতায় কত ভালো ঘর আমাদের জন্য অপেক্ষা করে আছে! তুলতুলে নরম গদিওলা বিছানা পাতা আছে, আর আমরা আজ কোথায়? কি ঘরে থাকবার আয়োজন করেছি। কি প্রচণ্ড শীতে কষ্ট পাচ্ছি! বসবার একটা শুকনো ভালো আসন পর্যন্ত নেই!

ডালপালা সব ভিজে, তাই আগুন জ্বালানো কষ্টসাধ্য। এদিকে কুলিরা ডাল কাটতে গিয়ে ভিজে জব্‌জবে হয়ে গেছে। লণ্ঠন থেকে কেরোসিন ঢেলে নিয়ে তারই সাহায্যে মস্ত একটা আগুন জ্বালানো হল। দেখতে দেখতে সেই আগুনে ওদের স্বল্প পরিচ্ছদ শুকিয়ে গেল।

আমাদের একেবারে ভিজিয়ে দিয়ে দেড় ঘণ্টা পর বৃষ্টি থেমে গেল। ঘরও তৈরী হয়েছে। যদিও তার রোদ-বৃষ্টি-হাওয়ার কোনটাই রোধ করবার ক্ষমতা নেই, তবু ঘর তো বটেই। আগুনও জ্বলেছে। সে শুধু সামান্য আগুন নয়, মস্ত বড় আগুন জ্বলেছে। আমাদের জামাকাপড় এখনো ভিজে। লামারা সকলে কেউ ডেকচি, কেউ বালতি হাতে জল আনতে রওনা হয়ে গেল। নেতার আদেশ, সন্ধ্যা ঘনিয়ে আসছে, তার আগেই খাবার জলের বন্দোবস্ত করে রাখতে হবে।

ওদের অনুপস্থিতির সুযোগে আমরাও আমাদের কাপড়জামা শুকিয়ে নিচ্ছি। তত্র-সমাজে বাস করি, এখনো পাহাড়ী বন্য হয়ে

উঠিনি, তাই ওদের সামনে কাপড়জামার সর্বাঙ্গ শুকনো করা চলেনি। ভিজে মোজা ও জুতোও শুকনো হল। উত্তপ্ত হয়ে মনে যেন খানিকটা আত্মপ্রত্যয়ও ফিরে এসেছে।

কুয়াশা খানিকটা কেটে গেছে। এখন মাঝে মাঝে উপত্যকার নীচ অবধি দেখা যাচ্ছে। উপত্যকার ওদিকের পাহাড়ে ধোঁয়া দেখা যাচ্ছে। ওটা কি ধোঁয়া, না মেঘ? বুঝতে পারছি না কেউ। কিন্তু কুয়াশা সরে যাওয়াতে নীচের গ্রামখানি এখন স্পষ্ট দেখা যাচ্ছে।

আবার কুকুরের চিৎকার শোনা গেল, আবার বাচ্চার কান্না।

এখনো অন্ধকার নেমে আসেনি। বন্ধু নীলরঙের রুমাল উড়িয়ে আবার ডাকাডাকি শুরু করেছে—

"ও নেপালী ভাইয়োঁ! হাম্‌লোক পর্‌দেশী, ইধর বাট ভুল কর্‌ আগিয়া, বাট বাতাও। ও নেপালী ভাইয়োঁ, ও নেপালী ভাইয়ো-ও-ও-ও"—

'বন্ধু একটা মশাল জ্বালিয়ে নেড়ে-নেড়ে ডাক দে।' উনি উপদেশ দেন। আমি বন্ধুর হাতে গোলাপী রঙের প্লাস্টিকের চাদর দিয়ে দিই, পরামর্শ দিই, ওইখানা উড়িয়ে ডাকতে। সহজে চোখে পড়বার মশাল তৈরি করা হাঙ্গামা, কাজেই বন্ধু গোলাপী প্লাস্টিকের চাদর উড়িয়ে আবার চিৎকার করে ডাকাডাকি শুরু করেছে

"— নেপালী ভাইয়োঁ—"

আশঙ্কায়, ভয়ে ওর মুখখানা ঝুলে পড়েছে। তার উপর কদিন ধরে দাড়ি কামানো হয়নি সুযোগের অভাবে, কেমন যেন অসুস্থ, অসহায় দেখাচ্ছে ওকে। মাতৃ-পিতৃদায়-গ্রস্থ যেন। ওদের মামা-ভাগ্নের চিন্তা সবচেয়ে বেশী আমার জন্য, বেশ বুঝতে পারছি। কি জানি, বনের মধ্যে পথ না পেলে কদিন ঘুরতে হবে এমনিভাবে, কে জানে!

বালোমুজী গাঁওএ আমাদের আশ্রয়দাতা গল্পচ্ছলে বলেছিলেন, এদিকের বন বড় ভয়ানক। কোন এক সাহেব পথ হারিয়ে চারদিন বনে বনে ঘুরেছিলেন। চারদিন পর গ্রামে পৌঁছাতে পারেন। আমি ভাবছি, চারদিন ধরে এমনি অনির্দিষ্টভাবে ঘুরতে আমাদের কেমন লাগবে! আজকের দিনটি তো কাটল। এর মধ্যে ঘন জঙ্গলের ডালপালার মধ্য দিয়ে চলতে গিয়ে এবং কদিন ধরে পাথরে পাথরে ছেঁচড়ে চলতে চলতে আমার শাড়ীগুলির একটিও আর আস্ত নেই। সেগুলি আবার রোজই হাওয়া-নিরোধক পর্দা হিসেবে ব্যবহার করছি। এপথে শাড়ী পরে আসাই ভুল হয়েছে।

এখন আরও একটা কথা বার-বার মনে পড়ছে। মনে পড়ছে কাঠমণ্ডুর ট্যুরিস্ট অফিসার মানসিংএর সাবধানবাণী। এদিকের জঙ্গলে একটি নরখাদক নেকড়ে বেরিয়েছে, ইতিমধ্যে সাতজন গ্রামবাসীকে হত্যাও করেছে!

উনি বলছেন, সংখ্যাটা আমাদের বেলাতেও ঠিকই আছে। আমরাও সংখ্যায় সাতজনাই আছি। ব্যাঘ্র মহোদয়ের আবির্ভাব [illegible] [illegible] কোন অসুবিধা হবে না।' কথা যাহোক, আমরা সম্পূর্ণ নিরস্ত্র চলেছি, যদিও লামাদের সকলের কোমরে মস্ত মস্ত নেপালী কুকরী গোঁজা আছে।

মিঃ বিশ্বাস লামাকে জিজ্ঞাসা করছেন, "কাল কেয়া হোগা?"

"ওয়াপস যানে হোগা"—অত্যন্ত সহজ-ভাবে লামা উত্তর দেয়। আমার মনশ্চক্ষে সেই দুর্দান্ত চড়াইপথের চেহারাটা ভেসে ওঠে, গলা শুকিয়ে যায়!

কতদূর 'ওয়াপস' যেতে হবে কে জানে! উৎরাই পথেই আমাদের একবেলা লেগেছে, চড়াইপথে চলতে পুরো একটি দিন লেগে যাবে যে!

মিঃ বিশ্বাস একটু কঠোরভাবে বলেন, এইরকম ভুলপথে চলা আর হবে না। কাল সকালে আমরা ফিরে যাব। যেখানে রাস্তা ভুল হয়েছে, ততদূরে অবধি যেতে হবে। যদি মনে হয় আগাগোড়াই ভুল পথে এসেছি, তবে আবার গোঁসাইকুণ্ড ফিরে গিয়ে সুন্দরী জলের পথ ধরবো।

লামা চুপ করে থাকে। উত্তর দেবার কি-ই বা আছে?

তোমরা রান্না করে নাও, খাও। আমরা আজ কফির সঙ্গে বিস্কুট চিজ ইত্যাদি খাবো, আমাদের জন্য রান্না করতে হবে না— নেতা লামাকে বলেন।

আজকে বন্ধুর পর্যন্ত খাওয়ার উৎসাহ নেই।

"হামলোকগা বাস্তে কাল দুপরকা খানা হোগা, আউর চাবল হ্যয় নেই—ব্যস।" লামা বলে।

'আর আমাদের?' আতঙ্কিত হয়ে প্রশ্ন করি।

'আপলোগকা বাস্তে তো চার রোজকা সে ভি জিয়াদা চাবল হ্যয়। আপলোক খুশীসে কাঠমাণ্ডু চলা যায়েগা।'

আমরা ওদের চেয়ে অনেক কম খাই। আমাদের খাবার থেকে যদি ওদের দিতে হয়, তবে একদিনেই সব চাল শেষ হয়ে যাবে। অতএব, ভবিষ্যৎ অন্ধকার! মুখ শুকনো করে সকলেই চুপ করে বসে থাকি।

আগুনের উত্তাপে পাতার ঘরখানি বেশ উত্তপ্ত হয়ে উঠেছে। রাত্রে বৃষ্টি আর হবে বলে মনে হয় না। আকাশ পরিস্কার হয়ে গেছে। 'ঘরের' ভিতর থেকেই আকাশের তারাগুলি খুব উজ্জ্বল দেখাচ্ছে।

রাত্রে বৃষ্টি হবে না, এই ভরসাতে দুখানা বিছানা পেতে তিনজনা জড়াজড়ি করে শুয়ে পড়লাম। এয়ার ম্যাট্রেস ফোলানো গেল না—স্থানাভাব। স্লিপিংব্যাগ পেতে তার উপর কম্বল চাপা দিয়ে শুয়ে পড়লাম। আমার পিঠের তলায় মস্ত একটা পাথর ফুটতে লাগল। উপায় নেই। উসখুস করতে করতে আধা ঘুম আধা জাগরণে আমাদের দুশ্চিন্তার রাত্রি অবসান হল।

প্রত্যুষে উঠেই দল-নেতা বলেন, "আমি সারারাত ধরে চিন্তা করে কি ঠিক করেছি শোন!"

"আজ একটাই [illegible] রান্না করা হোক। পেটভরে খেয়ে নিয়ে আটটার মধ্যে আমরা চলা শুরু করব। লামা এগিয়ে যাবে। ও গিয়ে যেখানে পথ হারিয়েছি বলেছে, সেই খুপরির কাছ পর্যন্ত গিয়ে মাল নামিয়ে রেখে পথ খুঁজে বার করবে। আমরা পিছন পিছন গিয়ে সেই খুপরিতে ওর জন্য অপেক্ষা করব। রাস্তা খুঁজে পেলে আবার হাঁটা শুরু, নয়তো কোন খুপরিতে রাত কাটানো। পরের দিনও যদি রাস্তা না পাই, তবে গোঁসাইকুণ্ডের পথে ফিরবো।"

ভালো প্রস্তাব। লামা বলে, আমি একা একা যাবো না, কৃষ্ণবাহাদুরও থাকবে।

বেশ ভালো কথা, উনি তৎক্ষণাৎ রাজী হয়ে যান।

তাড়াতাড়ি রান্না করা হল। ভাতে ভাত ঘি দিয়ে পেটভরে খেয়ে নিয়ে আমরা আটটার মধ্যে রওনা হয়ে পড়ি। লামা ও কৃষ্ণ আগেই খেয়ে-দেয়ে রওনা হয়ে গেছে। আবার সেই ঘন বনের মধ্য দিয়ে দুর্গম পথে চলা। তবে কাল উৎরাই নেমে এসেছিলাম, আজ চড়াই উঠছি। কাল যে অনেকটাই নেমেছিলাম, আজ বেশ মর্মে মর্মে বুঝতে পারছি। কালকের দু'ঘণ্টার পথ চলতে আজ চার ঘণ্টারও বেশী লাগবে।

মাত্র দু'টি ঘণ্টা হেঁটেছি। সেই খুপরির কাছাকাছিও নয় অথচ দেখি পথের ধারে কৃষ্ণবাহাদুর বসে আছে, লামার মাল তার কাছে রাখা।

"ইধার কেঁও? লামা কিধর?", মিঃ বিশ্বাস প্রশ্ন করেন।

"উ বাট দেখনে গিয়া" কৃষ্ণ উত্তর দিল।

"ইধর বাট কিস্তরফ হ্যয়, আউর আগারী চলো।"

"কেয়া জানে"—নিশ্চিন্ত সুরে উত্তর দিয়ে কৃষ্ণ গুনগুন করে গান ধরে।

আমরা পথের ধারে কেউ ঘাসের উপর, কেউবা পাথরের উপর বসে পড়েছি। উনি গজগজ করছেন। অল্পক্ষণের মধ্যেই লামা ফিরে এল।

"বাট মিলা?" উনি জিজ্ঞাসা করেন।

"নেহি মিলা।"

"তব্‌ আউর আগারী চলো। কাল যিধর বাট ভুল্‌ গিয়া উধর চলো। উধরসে ঠিক বাট মিলেগা।"

"এত্‌না দূর কোন্‌ যায়েগা?" ঠোঁট উল্টে লামা বলে।

"তব্‌ কেয়া করেগা, বাতাও।"

"যিধরসে আয়া উধরই ফিন্‌ যায়গা। উধরই গাঁও দেখাই যাতা"—লামা বলে।

ঘাড়াং "দেখাই যাতা"—কৃষ্ণ যোগ দেয়।

উনি এবার চটে উঠেছেন, "উধর যাকে ক্যা হোগা"—ও'র কথা শেষ হতে পায় না, দেখতে দেখতে টক্‌টক্‌ করে কুলিরা মাল পিঠে তুলে নিয়ে লামার পিছু পিছু অদৃশ্য হয়ে যায়। নিরুপায় আমরাও ওদের অনু-সরণ করি।

যে-পথে কাল গিয়েছি, আজ ফিরে এসেছি, আবার তৃতীয়বার সেই একই পথে চললাম। অসহায় বোধ করছি। কি আর

করা। কোন কোন ব্যবহার করছে লামা। স্পষ্ট করে বলেও তো না কিছু।

কুলিদের পিছু পিছু আমরা চলেছি। মিনিট-দশেক চলে উঁচুতে উঠে এলাম। এটা একটা গিরিশিরা। এখানেই পথ দুভাগে বিভক্ত হয়ে গেছে। গতকাল আরও এগিয়ে বাঁদিকের রাস্তা ধরে বনের মধ্যে নেমেছিলাম, আজ লামা পাহাড়ের ডানদিকের পথ ধরে নিয়ে চললো।

কৃষ্ণবাহাদুরের আবার বলে, সে নাকি থাড়াংগাঁও দেখতে পাচ্ছে। উনি ভীষণ চটে গেছেন, ও'র ধমক খেয়ে আর কথা সরে না ওর মুখে।

"আমাদের কপালে আরও অনেক দুঃখ আছে।" বলি। ওরা সকলে চুপ।

ঘন বনের মস্ত মস্ত গাছের নীচ দিয়ে পথ। এত গভীর বন যে, এখনকার দুপুর-বেলার রোদ্দুরও প্রবেশ করতে পারছে না। আমরা লামাদের পিছু পিছু ছুটে চলেছি। উনরাই পথ পেলে ওরা প্রায় ছুটেই চলে। পথ হারানোর ভয়ে তাই আমরা ওদের চোখের আড়াল হতে দিই না। একটু দূরে গেলেই চেঁচিয়ে ডাকতে থাকি। ওরা মাঝে মাঝে থেমে সাড়া দিয়ে আমাদের সঙ্গে যোগ-স্থাপন করে আবার ছুটে চলে। কখনো কখনো আমাদের জন্য অপেক্ষা করতে হয়। বিশ্রাম করা নেই, কোথাও থামাও নেই, ক্রমাগত হেঁটে চলেছি। ঘন বন হলেও পথ বেশ চওড়া। অনেক লোকের আনাগোনা আছে মনে হয়। তবে নেপালের পথ তো, সমান
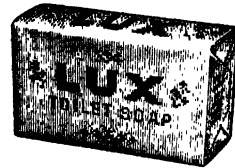
কোথাও নেই। সর্বত্র এবড়ো-খেবড়ো। কোথাও কোথাও বড় বড় গাছের শিকড়গুলিকে সিঁড়ির মত ব্যবহার করা হয়েছে। এদিক ওদিক থেকে বেরিয়ে আসা কাঁটাগাছ বা ঝোপে আটকে গিয়ে আমার শাড়ী ছিঁড়ে যাচ্ছে। বন্ধু সর্বদাই পিছনে চলছে। কাপড় আটকালেই সে তার ছাতির ডগা দিয়ে সেটা ছাড়িয়ে দিচ্ছে। হাত বাড়িয়ে ছাড়ানোর সামর্থ্য ও সময় কারু নেই।

পাহাড়ের ঢেউ একটার পর একটা এগিয়ে আসছে। আমরাও সেগুলি একটার পর একটা পার হয়ে চলেছি। মাঝে মাঝে ঢেউ-এর খাঁজে খাঁজে ঝরনার ধারা পাচ্ছি। দেখলেই থেমে যাচ্ছি। একটু জিরানোর ফাঁকে আকণ্ঠ জল খেয়ে নিচ্ছি। বোতলগুলি জলে ভরে আছে আজ। কোথাও জল না খেলেও স্পর্শ করবার আনন্দলাভে বঞ্চিত হতে মন চায় না। কাল, পরশু দুদিনের শুকনো দিনদুটির কথা তখন বারবার করে মনে পড়ে। গোঁসাইকুণ্ড ছাড়বার পর পথে এতগুলি ঝরনা এবং এত প্রচুর জল আর কোথাও পাইনি। মমতাভরে জলস্পর্শ করে মুখে মাথায় বুলিয়ে দিই।

অনেকক্ষণ ধরে হেঁটেছি। এবার একটু বিশ্রাম করা যাক। একটা মস্ত ঝরনার ধারে কয়েকটা মস্ত মস্ত পাথর পাওয়া গেল। কয়েক টুকরো চকোলেট খেয়ে পেটপুরে জল খেয়ে নিলাম। বন্ধু চকোলেট স্পর্শও করে না। ওটুকুতে কি হবে তার? মিছিমিছি খিদে বাড়ানো, দরকার নেই কিছু।

ঝরনা পার হয়ে দুটো পথ দুদিকে গেছে। মনবাহাদুর নীচের পথ ধরেছে, লামা উঁচুর দিকের পথে। আমাদেরই বিপদ।

"কি ধরসে যায়গা?" উনি নায়ক লামাকেই প্রশ্ন করেন।

লামা অবহেলাভরে উত্তর দেয়—"নীচেসে আও!" অগত্যা আমরা মনবাহাদুরকে অনুসরণ করে চলেছি। লামা ও কৃষ্ণবাহাদুর ক্রমাগত উঠেই চলেছে, আমরা বাকি পাঁচজনা নেমে যাচ্ছি। আমাদের মধ্যের দূরত্ব ধীরে ধীরে ক্রমশঃ বেড়ে চলেছে।

খানিকক্ষণ পরে আমরা দেখি, আমাদের সামনে আর পথ নেই। লামার পথটাই ঠিক পথ, আমরা ভুল পথে এসেছি। উনি খুব চটে গেছেন। ভুল, ভুল, ক্রমাগতই ভুল। এমন করে আর কতো পারা যায়!

কিন্তু পারা না গেলেই বা চলবে কি করে? অগত্যা আমরা লামাদের পথে পৌঁছানোর জন্য গভীর বনের চড়াই বেয়ে গাছের ডালপালা হাত দিয়ে সরিয়ে সরিয়ে হাঁচড়েপাঁচড়ে উঠতে থাকি। কোথাও কোথাও উঠবার জন্য চার হাত-পায়ের সাহায্য নিতে হয়। অসম্ভব কঠিন। লামার নির্দেশই এমনটি হল। উনি লামার উদ্দেশে বকাবকি করতে থাকেন। কিন্তু অন্য উপায় নেই। এইভাবে উঠতে আধঘণ্টার উপর নষ্ট হল কেবল পাহাড় বেয়ে উঠে ঠিক পথে পৌঁছাতে।

খানিকটা এগিয়ে দেখি, বনের মধ্যে খানিকটা পরিষ্কার জায়গা, অনেকটা ময়দানের মত। মাঝখান দিয়ে একটা টলটলে ঝরনা বয়ে চলেছে। তার পাশে বেশ ভালো একটি খুপরি। আজ আর আমাদের খুপরির প্রয়োজন নেই। আজ গ্রাম চাই। চাই-ই চাই। লোকজন দেখতে চাই। আজ ছ'দিন ধরে আমাদের দলের সাতজন ছাড়া বাইরের লোক কারুকে দেখিনি।

চলতে চলতে দেখি, বনের মধ্যে কাঠুরেদের কাটা কাঠ স্তূপীকৃত হয়ে আছে। তাহলে গ্রাম আর বেশী দূরে নেই। কিন্তু কই? গ্রাম তো দূরের কথা, এই বনেরও তো অন্ত দেখছি না।

"ওই—ওই যে আকাশ দেখা যাচ্ছে, বনের বুঝি শেষ হল এবার।" বলে উঠি।

"কই?" সকলে সমস্বরে প্রশ্ন করে।

বড় বড় গাছের ঘন পাতার ফাঁক দিয়ে বিদ্যুচ্চমকের মত একটু নীল আকাশ উঁকি দেয়। একটু এগিয়ে কিন্তু হতাশ হতে হল। আমরা পাহাড়ের ঢেউ-এর বাইরের দিকে এসেছি, তাই বনের ফাঁকে আকাশ দেখতে পাচ্ছি। ঢেউ ঘুরে যেতেই অসীম অন্ধকারে আবার ডুবে যাই—আবার ঘন গাছপালার মধ্য দিয়ে একটা সরু পাথর ছড়ানো লাল মাটির পথ মাত্র, সবটাই উৎরাই।

উৎরাই পথ, কিন্তু উৎরাইও কঠিন হতে বাধা নেই। এখনকার পথ বেশ কঠিন। একটু অসাবধানেই পা পিছলে পড়ে যাবার সম্ভাবনা। তবু আমরা সাধ্যমত দ্রুত চলেছি। আজ গ্রাম পেতেই হবে।

আরও কয়েকটা খুপরি, মনে মনে হিসাব করি, অর্থাৎ মাইল দুয়ের মধ্যে কোন গ্রাম নেই।

পথের ধারে আবার স্তূপীকৃত কাঠ। ঘর তৈরি করবার যোগ্য করে কাটা। আমরাও ক্রমাগত নেমে চলেছি।

হঠাৎ মিঃ বিশ্বাস চেঁচিয়ে ওঠেন—"ওরে বন্ধু! এ যে টাটকা গোবর!"

"কই? কই?" আমি আর বন্ধু মিঃ বিশ্বাসের ঘাড়ের উপর উপুড় হয়ে পড়ি। টাটকা গোবর, অর্থাৎ হয়তো আজই গরু চরেছে এখানে। অর্থাৎ গ্রাম আর দূরে নেই।

আর আধঘণ্টা হাঁটতেই আকাশের সবটা দেখা গেল। মস্ত মস্ত পাইন-দেওদারের বনও শেষ হলো। জঙ্গলের শুরু এখানে। অনেক দূর হলেও নীচে মস্ত একটা গ্রামের সবগুলি ঘরবাড়ী জঙ্গলের ফাঁকে দেখা গেল। দেখেও যেন বিশ্বাস হচ্ছে না।

জঙ্গল শেষ হতেও বেশী দেরী হল না। জঙ্গলের প্রান্ত থেকেই ক্ষেত শুরু হয়েছে, তার আগেই মস্ত একটা বৌদ্ধস্তূপ বা চোর্টেন। উঁচু উঁচু বাঁশে অনেকগুলি পতাকা উড়ছে। চোর্টেনের পাথরে খোদাই করা 'ওঁ মণি পদ্মে হুঁ!'

ধাপে ধাপে ক্ষেত নেমে গেছে যেন একেবারে ত্রিশূলী নদীর তীর অবধি। গ্রাম নিস্তব্ধ। লোকজনের হাঁকডাক নেই, বাচ্চার কান্না শোনা যাচ্ছে না। কুকুরের ডাক পর্যন্ত না।

উনি বলেন, "নিশ্চয় এটি পরিত্যক্ত গ্রাম। নাহলে এমন নিস্তব্ধ হয়? ওখানে কেউ আছে বলে তো মনে হচ্ছে না।"

নতুন প্রশ্ন। দুরু দুরু বক্ষে দ্রুত হেঁটে চলেছি। আরও আধঘণ্টা নেমে এসে তিনজনা প্রায় একসঙ্গে প্রথম ঘরখানার দরজার সামনে এসে দাঁড়ালাম, তখন পোনে তিনটা বেজেছে।

"একটা বাচ্চা দেখছি।" খুশীর হাসি হেসে বন্ধু বলে।

"কয়েকজন লোকও।" আমি বলি।

"তবে এটা ডেসার্টেড্ নয়?" মিঃ বিশ্বাস বলেন। সকলেই খুশী হয়ে উঠেছি। ছ'দিন পর আজ প্রথম বাইরের লোকের মুখ দেখলাম।

"গাঁও কা নাম ক্যা?" বন্ধু একজন গ্রামবাসীকে জিজ্ঞাসা করে।

"থুলুজে—" অপরিচিত স্বরে উত্তর আসে।

কুণ্ড থেকে ত্রিশূলী বাজারের রাস্তায় দ্বিতীয় গ্রামে এসে পৌঁছলাম। প্রথম গ্রাম কুলাং-এর পথও এখান থেকে স্পষ্ট দেখা যাচ্ছে। যে-বন পার হয়ে এসেছি, তার অনেক নীচ দিয়ে বনের প্রান্ত ঘেঁসে পথ।

মস্ত একটা মনাস্টারী এটা। একটা ঘরে বিরাট একটি বুদ্ধমূর্তি আছে। এককালে যে খুব সাজানো ছিল, তার চিহ্ন বর্তমান। সামনে মস্ত খোলা চত্বর। চত্বরের সামনের দিকে ছাত থেকে মোটা শিকল দিয়ে মস্ত একটা পিতলের ঘণ্টা ঝোলান। বিগত গৌরব তাই এখন অবহেলায় অনাদৃতপ্রায় পড়ে আছে। প্রচুর ধুলো জমেছে। চত্বরের একটি কোণে বাঁশের বেড়া দিয়ে একখানা ঘর তৈরি করে এক বুড়ো সপরিবারে বাস করে। সে কিন্তু বিশেষ দেখাশোনা করে বলে মনে হল না।

মস্ত একটা দুঃস্বপ্ন কাটলো। সামনে একটা ছোট সবজীক্ষেত আছে। অনেক অনুনয়-বিনয় করে সেখান থেকে বীন, সিম, শসা, কুমড়ো সংগ্রহ করা গেল। সারাদিন যেন কোন পরিশ্রমই করিনি, এখন পুর্ণোদ্যমে রান্নাবান্নার উদ্যোগ করছি। এখানে শীত অনেক কম। আজকের আশ্রয়টাই মস্তবড় সৌভাগ্যের কথা।

ইতিমধ্যে আমি কয়েকটা মোমবাতি বের করে বন্ধুর হাতে দিলাম। সে বুদ্ধদেবের আসনের নীচে জ্বালিয়ে দিল। বাতির আলোতে সোনালী বুদ্ধমূর্তি যেন ঝলমল করে উঠলো। সেই ঘরেই মেঝেতে বুদ্ধদেবের পায়ের কাছে আমাদের বিছানা তিনখানি সেই পেতে ফেলেছে। বহুদিন পর আজ আমরা ঘরে আরাম করে শোব। খুপরি খোঁজার পালা শেষ হয়ে গেছে।

সন্ধ্যার পর মনাস্টারীর একমাত্র লামা সেই মস্ত ঘণ্টাটা বাজিয়ে দিনের শেষের বিদায়ধ্বনি জানালো। বিছানায় শুয়ে শুয়ে শুনেছিলাম, প্রত্যুষে আবার সেই ঘণ্টার গম্ভীর নিনাদ। তাহলে ঘণ্টাটি ব্যবহৃত হয়।

কুলিরা মাল নামিয়ে কোথায় চলে গেছে। লামা বলে ওরা চা খেতে গেছে। পরে দেখলাম, শুধু চা নয়, ওরা আমার স্বামীর কাছ থেকে রেশন কেনার নাম করে টাকা নিয়ে প্রচুর মদ খেয়ে এসেছে। তাই গভীর রাত অবধি ওদের আর সাক্ষাৎ মিলল না।

(আগামী সংখ্যায় সমাপ্য)

জ্বলা নেভা সাইন বোর্ড

অভিত্ত মুখোপাধ্যায়

বড় সুন্দর গাড়ীটি দেবরাজের। যেমন ঘন মেঘের রং, তেমন সুষ্ঠু গড়ন। ঠিক এই গড়নের গাড়ীগুলি নূপুরের পছন্দ, খুব পছন্দ। কাঁটাতারের গায়ে গাড়ীটি লক করে দুজনে নামল। রোদ ভরে আছে কালো পিচে, সবুজ পাতায়, ঘাসে সর্বত্র। রোদে বড় বড় রুপোলি পাখিগুলি ঝিকঝিক করছে। কোনোটা বিশ্রাম করছে হাজার হাজার মাইল ডেঙে এসে, কোনোটা হাজার হাজার মাইল অতিক্রম করার আশায় অধীর, প্রপেলার ঘুরছে। ফরবিডন এরিয়া। কিন্তু কাঁটাতারের বেড়ায় কোনো কোনো জায়গায় বড় গহ্বর। মাথা নীচু করে সহজেই ঘাসে গিয়ে বসা যায়।

কেন এল নূপুর দেবরাজের গাড়ীতে চেপে।

ওর সুন্দর গাড়ীটিতে কয়েক ঘণ্টা চেপে আরামে স্বাদ গ্রহণ করার জন্য?

উত্তর দিতে পারবে না নূপুর।

দেবরাজ ওকে কেন ডেকেছে, দেবরাজ এই নির্জনতার ফাঁকে কী বলবে, নূপুর কি ভাবতে পারে নি? খুব পেরেছে।

কৌতূহল।

ওকে নূপুরের ভালো লাগে না। এত বড় লোক কিন্তু দেখতে সুন্দর হলেও যেন কেমন কেমন। ছ্যাবলা ছ্যাবলা। মেয়েদের সঙ্গে কথা বললে কীরকম অস্বাভাবিক চাঞ্চল্য জাগে ওর হাত-পা মুখ আর চোখে। বারবার কানের কাছে মুখ এনে ভীড়ের মাঝেও যেন কত গোপন কথা শোনায়। অথচ মোটেই গোপনীয় কিছু নয়।

ওর কোনো চিন্তা নেই, ছায়া নেই চোখের কোলে, ভাঁজ নেই সরু প্যান্টে, জড়তা নেই উচ্চারণে।

সঙ্কোচের লেশমাত্র নেই ওর কাজে।

কী দোষ দেবরাজের, নূপুর ঠিক খুঁজে পায় না। ওর চরিত্রে কোনো বিশ্রী দাগ দেখতে পায় নি, ওর সম্বন্ধে কেউ নূপুরের কাছে অভিযোগ পেশ করে নি। কেউ কেউ বলে, বড় ডাঁট। তা দেবরাজের ডাঁটের যথেষ্ট কারণ আছে। বরং না থাকলেই যেন অঙ্গহানি হত। কাকে ভালোবাসে কেউ জানে না।

এইটাই একমাত্র দোষের ব্যাপার মনে হয় নূপুরের।

নিশ্চয় ও কাউকে না কাউকে, কিম্বা অনেককে একসঙ্গে ভালোবাসে।

কাউকে হয়তো এখনো ভালোই বাসে নি—এও সম্ভব।

না অসম্ভব।

আসল কথা দেবরাজের জগত নূপুরের জগতের কাছ থেকে অনেক দূরের। ভীষণ অজানা। সেইটাই হয়তো ওর প্রতি অনীহা জাগাবার একমাত্র কারণ।

বেশ কদিন নূপুর দেবরাজের আমন্ত্রণে সায় দেবে কি দেবে না ভাবছে। শেষ পর্যন্ত দেবরাজের আমন্ত্রণ গ্রহণ করতে বাধ্য হয়েছে।

অশেষকে বলেছে নূপুর। ওকে না বলে থাকতে পারে নি। অশেষকে বলা নূপুর কর্তব্য মনে করেছে। অশেষের কাছে সে কিছু গোপন করতে পারবে না। তার জীবনে গোপন করার মত কোনো পাপ নেই। সহজ সাধারণভাবে রক্ষণশীল পরিবারের কড়া আওতায় তার শিক্ষাদীক্ষা বেড়ে উঠেছে। শাসন এমন প্রখর যে ফাঁকফোকর গলিয়ে খারাপ কিছু করা অসম্ভব। স্কুল আর বাড়ি, বাড়ি আর স্কুল। কলেজেও তাই। সন্ধ্যের অনেক আগে বন্ধুর বাড়ি থেকে ফেরা। বড় কড়া ওর মা। অবিশ্বাসের বাঁধনে মেয়েকে কষে বেঁধে রেখেছেন। নূপুরের কখনো কখনো অসহ্য মনে হলেও ভালোই লাগে। কেন না, কোনো কোনো বন্ধুকে গোপনে নার্সিংহোম থেকে ঘুরে এসে দু'তিন দিন শুয়ে থাকতে দেখে প্রেমের প্রতি তার তীব্র ঘৃণা জন্মেছে। সবচেয়ে খারাপ লাগে মেয়েটি জানে না তাকে নিয়ে অন্য সবাই কী আলোচনাই না করে। কী সব বিশ্রী আলোচনা। ধরা পড়ে দু'একজন এমন গোপনীয় কাণ্ড করে। কিন্তু নূপুরের জানতে বাকি নেই, ডুবে ডুবে কে না জল খায়। না, সে খায় না, খায় নি কোনোদিন। বিয়ের আগে ও-সব সে খুব ঘেন্না করে।

নূপুর ছেলেদের সহ্য করতে পারে না। ওদের গায়ে পড়া ভাবে পা ঘিনঘিন করে। অশেষের ব্যবহার যে দোষ থেকে মুক্ত। এত কম বয়সে ওর চোখ কত নিস্পৃহ, নির্লোভ। অর্কেস্ট্রা পার্টিতেই আলাপ। যেখানে দেবরাজ বঙ্গ বাজায়। অশেষ যেন কার সঙ্গে দেখতে আসে মাঝে মাঝে। ওর চোখে কালি, মুখে তারুণ্য কিন্তু ভারি ভারি ভাব। ওর পোশাকও নিভাঁজ কিন্তু গাম্ভীর্য আছে পোশাকে। কী সহজে আলাপ করে। ধীরে নীচু স্বরে কথা বলে কিন্তু কথা চলে যায় গভীরতম প্রদেশে। ওর কাছে যত যাওয়া যায় মনে হয় তার চাইতে অনেক বেশি কাছে চলে গেছে নূপুর। অশেষ মোটেই কাছে টানে না। ঠেলে রাখার জন্য সর্বদাই উদ্‌গ্রীব। অশেষকে যখন ভালোবাসার কথা বলতে বাধ্য হল নূপুর তখনে অশেষ হাসতে থাকল।

অশেষ বলল, ভীষণ দুর্ঘটনা!

কেন এমন বলছেন।

দয়া করে তুমি আমাকে ভালোবেসো না।

নূপুর গঙ্গার অন্ধকার জোয়ারের দিকে তাকিয়ে থাকল। খুব কান্না পাচ্ছে।

অশেষ জানে এবং বিশ্বাস করে নূপুর জীবনে আর কাউকে ভালোবাসেনি। এই তার প্রথম ভালোবাসা। বি-এ পাশ করা অব্দি একটি মেয়ে আজ ভালো না বেসে থাকতে পারে, নূপুর তার আশ্চর্য ব্যতিক্রমের উদাহরণ, নূপুর এতদিন যার জন্য তার সব কিছুকে ঝকঝকে করে রেখেছে সেই লোকটিকে অশেষ কিছুতেই নিজের সঙ্গে মেলাতে পারছে না।

নূপুর গাল মুছে বলল, তোমার...মানে আপনি কি আমাকে ..মানে...

না ভালোবাসি না।

তবে অমন করে কথা বলেন কেন,

কেমন করে?

মনে হয় কত অন্তরঙ্গ।

ওটাই আমার কথা বলার ধরন।

উঃ তাহলে দেবরাজ কী অন্যায় করেছে, ভাবল নূপুর।

অশেষ কোন এ'দো গলির মেসে থাকে। হাওড়ায় কোন ইঞ্জিনীয়ারিং কোম্পানির সাধারণ চাকুরে। খুব সাধারণ ওদের অবস্থা। সদ্য বিশ্ববিদ্যালয় থেকে পাশ করে বেরিয়েছে। কফি হাউস আর রেস্টুরেন্টে কাটাই ওর বুদ্ধির বাহাদুরি। ছোটখাট চেহারা। সুন্দর একমাথা চুল ও মুখটি বড় কমনীয়। যাকে বলে একেবারে আধুনিকতম যুবক। বাইরের অস্থিরতা ছাড়া সব কিছুই আছে। ভিতরে ওর অস্থিরতা আছে কিনা নূপুর বলতে পারে না। মনে হয় নেই।

অভিনেতা হবার তপস্যা করে অশেষ।

নূপুর ওই আশার কথা শুনেও ওকে ভালো বেসে ফেলেছে।

গতকাল এই যেখানে দেবরাজ তাকে গাড়ি করে এনে বসিয়েছে, সেখানে অশেষ বসেছিল, নূপুর তার কোলে মাথা রেখে শুয়েছিল। সন্ধ্যের কিছু পরে। কৃষ্ণপক্ষ। রাত্রি অন্ধকার। আকাশে সার্চ লাইটের ছন্দোবন্ধ আঁচড়। এখানে বসলে বহু দূরের সঙ্গে নিঃশব্দ আলাপ জমে ওঠে। কাছের আলাপ সোচ্চার হলেও কোন অর্থ করা যায় না।

নূপুর বলল, আমি তোমাকে ভালোবাসি তার কী হবে।

কয়েকদিন নূপুর নিজেকে সংহত ও তীক্ষ্ণ করে তুলেছে। ওর কথা শুনে অশেষ চিন্তায় পড়ল। সে যতই সুন্দর হোক অন্যের চোখে, যত কমনীয় দেখাক তাকে, তার নীতিহীনতা সে কোথায় ঢাকবে। অনেক মেয়েকে সে আদর করেছে কয়েক দিনের আলাপে। নূপুরের একাগ্রতায় অশেষ কখনো তার গায়ে হাত দিতে পারেনি নয়, চায়নি। নূপুর নিজেই ধুপ করে তার কোলে মাথা রেখেছে।

অশেষ ধীরে ওর মাথা ধরে বসিয়ে দিল।

বলল, বড় অন্যায় করে ফেলেছি নূপুর। তোমার ভালোবাসা আমার প্রাপ্য নয়। আর কাউকে ভালোবাস।

কেন।

সে অনেক ব্যাপার।

আর কাউকে ভালোবাসব কি না, এ আমার নিজস্ব ব্যাপার। আমি দেখব। দয়া করে তোমায় উপদেশ দিতে হবে না।

অশেষ সিগারেট ধরাতে নূপুর বলল, আমি কি বাজে মেয়ে?

আমি বাজে ছেলে। তুমি তো আমায় চেন না, আমার সম্বন্ধে কিছু জান না।

জানতে চাই না।

ওটা গোঁয়ার্তুমি। জানলে যদি ভালোবাসতে পার তখন বুঝব তোমার কেমন ভালোবাসা।

আবেগের ঝোঁকে নূপুর বলে বসল, তুমি যত খারাপই হও, আমার কিছু যায় আসে না।

নূপুর ভাবল কত খারাপ হতে পারে অশেষ। এমন সুন্দর এমন কোমল যার স্বভাব। এমন মিষ্টি যার গলার স্বর, এমন মার্জিত গভীর যার ভাষা। অশেষের সব ধাপ্পা। পরীক্ষা করতে চায় নূপুরকে। হয়তো সাধারণ মধ্যবিত্ত ঘরের মেয়েকে অশেষ প্রেমিকার মর্যাদা দিতে চায় না। অবশ্য সে রকম আভাস অশেষ কখনো দেয়নি।

ঝপ করে নূপুর প্রশ্ন করল, আর কাউকে ভালোবাস?

না। তবে বেসেছি। অনেককে অনেক ভালোবেসেছি।

কী হল।

কিছুই হল না। অশেষের কণ্ঠে হতাশের স্বর। তারপর থেকে ভালোবাসার অস্তিত্বেই আমি বিশ্বাস করি না। ওসব রমরমে উপন্যাসেই মেলে।

নূপুর বেশ জোর দিয়ে বলল, তোমার জীবনে ভালোবাসা দেখতে পাওনি বলে কি ভালোবাসাই নেই এমন কথা বলা চলে?

আমার জীবনে ও আমার জানা চেনা সবার জীবনেই দেখেছি ভালোবাসা-টাসা নেই। একজন ছেলের সঙ্গে আরেকজন মেয়ের যে সম্বন্ধ সেটা প্রয়োজনের। প্রয়োজনের আঠায় একজন অপরকে, এক বস্তু অপর বস্তুকে ধরে রেখেছে।

তাহলে কেন আমি দেবরাজকে ভালোবাসতে পারলাম না? ওর কাছ থেকে তোমার চাইতে অনেক বেশি প্রয়োজন আমার মিটবে।

সেটা তোমার রোমান্স। কাঁচা বয়স তাই।

পাকা বয়সে আর রোমান্স থাকবে না বলছ?

হ্যাঁ।

তুমি আমার মা বাবাকে দেখনি অশেষ। মা বাবা ছাড়া, বাবা-ও মা ছাড়া আর কাউকে জানেন না।

নূপুরের সারা শরীরে কাঁপুনি। সে খুব উত্তেজিত হয়ে পড়েছে। উত্তেজনার স্রোতে বাপ মায়ের সম্বন্ধে কিছু বলে ফেলার পর মুহূর্তে লজ্জা পেয়ে গেছে।

অশেষ বড় বড় চুলগুলো ঝাঁকুনি দিয়ে বিন্যস্ত করে।

জানি না। জানি না নূপুর। আমি দেখিনি। আমার চতুর্দিকে যেখানে তাকিয়েছি যার গভীরে গিয়েছি কোথাও এক বিন্দু ভালোবাসা দেখিনি। সেই জন্য ...সেই জন্য...

একটা যাত্রীবাহী বিমান সগর্জনে অশেষের কথার মাঝখানে নেমে এসে ওকে বাঁচিয়ে দিল কিছুক্ষণ।

শব্দ থিতিয়ে পড়তে অশেষ দাঁড়াল। নূপুরও।

অশেষ বলল, আমি সেই জন্য খারাপ হয়ে গেছি।

বিশ্বাস করি না। সব তোমার মিথ্যে কথা। আমায় এড়িয়ে যাবার জন্য।

না নূপুর।

আমি চাকরি করব। তোমার ঘাড়ে চাপব না।

না না সেজন্য নয়।

জানি তুমি যা রোজগার কর তোমার একার স্বচ্ছলতা বজায় রাখার জন্য সেটাই খুব যথেষ্ট নয়।

না-না নূপুর। স্বাচ্ছল্য কে না চায়। আমিও চাই। কিন্তু কারুর জন্য কষ্ট পেতে হয়তো আমার ভালোই লাগবে—মানে বিশেষ কারুর জন্য। তোমার আন্তরিকতার বহর দেখে আমার লোভ হচ্ছে হয়তো এ জগতে ভালোবাসা বেঁচে আছে, হয়তো তোমার এখনকার মনের জোর আমৃত্যু তাজা ও টাটকা থাকবে। কিন্তু নিজের দিকে তাকিয়ে ভয়ে কুঁকড়ে যাচ্ছি।

তোমার কোনো কথা শুনব না।

আশ্চর্য, মাত্র তোমার সঙ্গে তিনমাস দশ দিনের আলাপ। তুমি অত সুন্দর সেতার না বাজালে হয়তো বেঁচে আলাপও করতাম না। আচ্ছা তোমার বাবা-মা এত রক্ষণশীল, ছেলেদের অর্কেস্ট্রায় তোমাকে যেতে দ্যান কী সাহসে?

মা নিজে ভালো সেতার বাজাতেন। আর বিকেলে তো যাই। বাজে কথা থাক...... আমাকে বলতে হবে তোমার কী খারাপ।

কালকে দেবরাজবাবু তো এখানে আসছেন?

আসুন না...সোজা বলে দেব।

না না দেবরাজকে ছেড়ো না।

মুখ সামলে এক ভদ্রমহিলার সম্বন্ধে অমন কথা বলবে।

কী যে ঝামেলায় পড়েছে অশেষ। আচ্ছা ছেলেমানুষ! এমন ছেলে মানুষের পাল্লায় পড়ে তার নাকানি চোবানি। অসম্ভব। তরুণ যৌবনের আবেগের ঢলে তাকে ভেসে যেতে দিতে পারে না। এর কোনো মানে হয় না। এর প্রচণ্ড উত্তাপের আওতা থেকে তাকে সরে পড়তে হবে। পাছে একে সোহাগ জানালে গলে জল হয়ে ডুবিয়ে মারে সে জন্য বরাবর ছোঁয়াচ বাঁচিয়ে চলেছে অশেষ। জেনেশুনেই প্রেম নিবেদন করে সে। মেয়েরা এক-

যার প্রমে পড়লে যেন একশো হাত গজায় তাদের। আবার কয়েক মাস বাদে তাদের পঙ্গু হতেও দেখে। নূপুরের একশো হাত গজিয়েছে কিন্তু পঙ্গু হবে না বলা যায় সহজে। এর কথা বিশ্বাস করলে বলতে হয় নূপুরের রক্তে রক্তে ভালোবাসা। এসবে অশেষের বিশেষ শ্রদ্ধা নেই। ভালোবাসাতেই শ্রদ্ধা নেই তো রক্তগত ভালোবাসায়? হাসি পায়।

ওকে চোখে আঙুল দিয়ে দেখাতে হবে।

বেশ, নূপুর পরশু—কাল তো দেবরাজ......

দেবরাজ দেবরাজ করছ কেন?

আচ্ছা পরশু তুমি কালীবাড়ির মোড়ে থাকবে। সাড়ে পাঁচটায়।

এখন সাড়ে চার বাজল। নূপুর ভাবছে কাল সাড়ে পাঁচটায় অশেষ কী বলে নূপুরের হাত থেকে রেহাই পাবে। কী সে তৈরি করার সময় নিল।

দেবরাজ ঠিক সেখানে এসে বসেছে যেখানে বসেছিল অশেষ। দেবরাজ যথাসম্ভব গাঢ় নিপুণ গলায় একথা সে কথার বুনুনিতে ঠিক সেই বক্তব্য তুলে ধরল যা ভেবেছিল নূপুর। এছাড়া এক যুবক যুবতীকে আর কী বলবে। দেবরাজের দিকে একবারও তাকাতে পারল না নূপুর। ছেলেরা মেয়েদের দিকটা না চিন্তা করে কেমন করে এত সহজে এত বাচালের মত প্রেম নিবেদন করতে পারে। এ কি দোকানদারের সঙ্গে দর কষাকষি, দশ টাকার মাল দু'টাকায় দেবেন তো দিন নইলে চললাম। প্রেম নাকি কেনা যায়। এই বর্তমানের ধারণা, বদ্ধমূল ধারণা। মেয়েরা নাকি শাড়ি গাড়ী আর আরামের জন্য যেকোনো মুহূর্তে ধরাশায়ী হতে পারে? ইচ্ছে করে নূপুরের, এমন কথা যে বলে, এমন লেখা যে লেখে তার গলায় সরু সরু তীক্ষ্ণ নখ বসিয়ে খুন করে।

আচ্ছা, সে যেমন, আর সবাই তো তেমন নাও হতে পারে। নূপুর কেন কেবল নিজেকে দিয়ে সবাইকে বিচার করছে। দেহ-মনে সততা ক'জনের। ক'জন ভালোবাসার আদর্শে বিশ্বাসী। নূপুর অবশ্যই ত জানে না। এ নিয়ে কেউ গণনা করে নি। কেউ জানে না। সবাই আন্দাজে ঢিল ছোঁড়ে। সবাই নিজের ধারণাটাকে অন্যের ধারণার মাথায় চাপাতে ভলোবাসে। সে যাই হোক অন্তত নূপুর জানে নিজেকে। সে অশেষকে যথোচিত জবাবও দিয়েছে, দিয়েও যাবে।

দেবরাজকে নূপুর বলল, কাল এখানে অশেষের কোলে মাথা রেখে শুয়েছিলাম।

দেবরাজের চোখমুখ রক্তবর্ণ ধারণ করল। নিমেষে গাড়ীতে চেপে স্টার্ট দিল। আস্তে আস্তে বাস স্টপেজের দিকে পা বাড়াল নূপুর।

কালীবাড়ির মোড়ে অশেষ ট্যাক্সিতেই বসে ছিল, নূপুর সাড়ে পাঁচটায় যেতেই ট্যাক্সির দরজা খুলে দিল সে।

হ্যাঁ, ভালো কথা বাড়িতে বলে এসেছ, দেরি হতে পারে।

আজ্ঞে হ্যাঁ। বুদ্ধিমতীর মত হাসল নূপুর, তোমার সঙ্গে যেদিন বেরোই সেদিনই মায়ের হাতে পায়ে ধরে বেশি সময় চেয়ে নিই।

স্থির ও অস্থির জগতের সঙ্গে পাল্লা দিয়ে চলেছে ট্যাক্সি, ট্যাক্সি করতে গেলে কেন?

তোমাকে ভিড়ের নোংরামি থেকে বাঁচাতে।

আহা! ভিড়ে যেন থাকি না। নোংরামি সরে গেছে।

না, নোংরামি সরে যায়নি। তোমাদের মিথ্যে কথা।

মানে!

মানে, নোংরামির মাঝখানে একটা অদৃশ্য বিন্দুর মত তোমরা নিজেকে ভাব। যে বিন্দুর অস্তিত্ব নেই।

অর্থাৎ আমরাও নোংরা!

আ-মি তো-মাদের বল-ছি না।

সামনা-সামনি বলার সাহস নেই।

তা আছে।

তুমি কী?

আমি নোংরামিতে থাকি, নোংরামি আমার খাদ্য, নোংরামি আমার আনন্দ নোংরামিই আমার স্বর্গ।

নোংরামি বলতে কী বোঝাচ্ছ অশেষ?

বোঝাচ্ছি যা আমরা মুখে ভালো বলে জাহির করি, কাজে করি ঠিক তার উল্টো।

যেমন?

মিথ্যেবাদী বললে আমরা চটে উঠি, কিন্তু অবিরাম মিথ্যে কথা বলতে আমাদের কপাল একটুও ঘামে না। মদ খাওয়াকে ঘৃণা করি কিন্তু নিজে মাতাল হতে লজ্জা নেই।

সবাই ওরকম!

এক দোষে নয়, কিন্তু কোনো না কোনো দোষে।

ভালো-মন্দ নিয়ে জগত।

যখন ভালো আর মন্দ সমান সমান তখন ও কথাটা খাটে। এক মন্দ নিয়েই জগত।

নূপুর নাকফুলে আঙুল বুলোল। নড়ে-চড়ে বসে শাড়ির শব্দ করল। নূপুর জগতের সমস্ত নোংরামির কথা শুনেছে, কে না শুনেছে। কিন্তু তার চোখের সামনে একবারও জঘন্য নোংরামি সংঘটিত হতে দেখেনি; যেমন সে খুন দেখেনি। ঝগড়াঝাঁটি তীব্র বিদ্বেষ দেখেছে। কিন্তু সংসারে পাঁচজনে পাঁচ রকম হবেই। ঝগড়া-ঝাঁটি কলহ বিদ্বেষ থাকবেই। থাকবে ভাব এবং ভালোবাসাও। সবাই খুনী নয়, সবাই মুখ থুবড়ে রাস্তায় পড়ে থাকে না, সবাই মেয়েদের ইজ্জত নষ্ট করে না। সবাই লোকের পকেট কাটে না। সবাই বউকে ঠেঙ্গায় না। যারা এসবের নায়ক তাদের সংখ্যা গুটি কয়।

দেখ নূপুর, অশেষ বলল, ভালো আছে।

সেজন্য এতক্ষণ ভাবছিলে! ব্যঙ্গ করল নূপুর।

হ্যাঁ। তবে নতুন। সবাই আমরা নতুন নতুন অবস্থায় কেতাবি ঢঙে লাফালাফি করি। কিছুদিন গেলেই তাতে ভাটা পড়ে।

জ্বলা-নেভা আলোর সামনে ট্যাক্সি থামল। ভিতর থেকে বিজাতি বাজনার শব্দ রাস্তায় এসে পড়ছে। এর মধ্যেই দোকানে খদ্দেরের ভিড়। ট্যাক্সির ভাড়া চুকিয়ে অশেষ নূপুরের হাত ধরল।

তোমার কোনো ভয় নেই। শুধু দেখে যাবে।

সিঁড়ির ধাপে অশেষ পা রাখতেই ওর জামা চেপে ধরল নূপুর।

যাব না বললেই পারতে?

বিশ্বাস করছিলে না যে। এসো, বেশিক্ষণ থাকব না।

ওদের দুজনকে ঢুকতে দেখে সবাই যেন অবাক হয়ে তাকাল। অশেষের সঙ্গে পেন্ট করা মুখ থাকলে অন্য কথা ছিল। এই সাপভ্রষ্ট দেবী আবার কোন পাপে?

গন্ধের চোটে নূপুরের গা গুলিয়ে উঠল। বমি-টমি করে ফেললে কেলেঙ্কারী।

কোন টেবিলে গেলাস ভাঙার ঝনঝন শব্দের সঙ্গে কেউ যেন এক পেট বমি করে ফেলল সত্যি-সত্যি। ওদিকে কেউ তাকাল না। পাশের টেবিলে কে যেন বলল, ব্যাটা পেট-খারাপ।

হল ভর্তি পেন্ট করা নারীগুলি নূপুরকে দেখতে লাগল যখন পুরুষরা পুনরায় পানে মনোনিয়োগ করল। ভদ্রমহিলাদের এখানে আসা মোটেই বিস্ময়কর নয়। কিন্তু নূপুর যে তাদের থেকেও ভিন্ন এ বোধ সবাইকারই আছে। নূপুরকে তাই মেয়েরাও প্রতিদ্বন্দ্বিনীর চোখে দেখতে লাগল। হয়তো কেউ কেউ ক্ষেপেও গেল।

গঙ্গাবক্ষে ফটো : মণি চক্রবর্তী

একা একটি বব-করা-চুল অতি মন্থর গতিতে পান করে চলেছিল। অশেষের দিকে প্রায় এগুটে এল সে।

হ্যালো চাউড্রি।

অশেষ বলল, মেয়েটিকে, ওর চোখ-ঠারার জবাবে, মাই ইনোসেন্ট ফ্রেন্ড।

হ্যাভ এ পিস অব ফরগুট, কামান...

মেয়েটি অশেষকে প্রায় কোলে করে নিয়ে চলে গেল।

দুজনে নাচল। কিছুক্ষণ অশেষ উশখুস করছে। নূপুর বয়কে প্রত্যাখ্যান করল। এ নরকে সে জলস্পর্শও করতে পারবে না। ওর ইচ্ছে করছিল এই মুহূর্তে এখান থেকে ছুটে পালিয়ে যায়। কিছু সময় কাটতে উত্তেজনাটা একটু থিতোল। তখন সে গোটা ঘরটা ভালো করে চোখ বুলিয়ে দেখল। সবাইকে বেশ বড় ঘরের অথবা বড় চাকরে মনে হচ্ছে। নূপুর জানে বিভিন্ন স্তরের লোকের জন্য বিভিন্ন শ্রেণীর প্রমোদাগার আছে। এটা অভিজাতদের জন্য। এখানে অশেষ জুটল কীভাবে কে জানে। নূপুর যা ভেবেছিল, অশেষের চোখ উঁচুর দিকে, সেইটাই ঠিক বোধ হয়।

বব করা চুল অশেষকে টেনে নিয়ে বসল একটি টেবিলে।

কী বলে অশেষ পালিয়ে এল নূপুরের কাছে।

অরেঞ্জ স্কোয়াশ নেবে?

নূপুর নীরব চোখে তাকিয়ে থাকল, বিতৃষ্ণায় ভরা তার দুচোখ। তারপর একেবারে রাস্তায় এসে খোলা হওয়ার কী অমূল্য দাম অনুভব করল নূপুর।

ওর দুচোখে জল নামল হাঁটতে-হাঁটতে। দীর্ঘ সময় ও কথা বলতে পারল না।

ফুঁপিয়ে উঠে নূপুর বলল,, কেন এসব কর অশেষ। কেন এসব জায়গায় আস?

নোংরামির হাত থেকে পালিয়ে পাগল হবার চাইতে নোংরামির মধ্যে ডুবে মরার জন্য। এই মৃত্যুতে আনন্দ আছে কি না জানি না। উত্তেজনা আছে।

খুনেও উত্তেজনা আছে।

খুন করতে আমারও মাঝে মাঝে ইচ্ছে করে।

কাকে।

তা জানি না।

নূপুরের চোখে তীব্র ভয় দেখে অশেষ হেসে উঠল।

তারপর বাসের স্টপেজ পর্যন্ত চুপচাপ হাঁটল দুজনে।

নূপুর বাসে উঠে চলে গেল আগে। অশেষ দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে মনে মনে আবার খুব হাসতে লাগল। তারপর গম্ভীর হয়ে কিছুক্ষণ সিগারেটের ধোঁয়া উড়িয়ে পানের নেশাটা অনুভব করল। জ্বলা-নেভা সাইনবোর্ডের তলা অব্দি এসে ঢুকতে পারল না।

দিন সাতেক পরে অফিসে অশেষ নূপুরের ফোনে ওর কয়েকটা দীর্ঘনিশ্বাস শুনল। কেন ফোন কী ব্যাপার বলতে পারল না নূপুর। ফোনে নাকি সে বলতে পারবে না।

কাঁটা তারের গহ্বরে মাথা গলিয়ে ভরা দুপুরে এরোড্রামে যখন নূপুরের পিছনে অশেষ মাঠে গিয়ে দাঁড়াল তখন সে বেশ চিন্তান্বিত। খারাপ হতে চাইলে তার আপত্তি নেই। যে খারাপ হতে চায় নিজে থেকে তাকে খারাপ করার পাপ লাগে না। যে ভালো, আর নূপুরের মত ভালো তাকে খারাপ করতে অশেষ পারবে না। তাই নিজের চরিত্রের রূপ ওর কাছে তুলে ধরেছে। নূপুর সহজে মায়া কেড়ে নিতে জানে।

খালি কোঠির কোনটা এখন পাওয়া যেতে পারে, যখন অশেষ ভাবছিল, তখন নূপুরের দিকে তাকিয়ে ভাবনা আচমকা থামাতে হল।

নূপুর বদলায়নি মনে হচ্ছে। তার চোখের কমনীয়তা বেশ ঝকঝকে।

বলল, দাঁড়িয়ে কেন, বস।

আস্তে আস্তে বসল অশেষ নূপুরের ছোঁয়াচ বাঁচিয়ে। মেয়েদের এই মুহূর্তকে চেনা অসম্ভব, ওদের গায়ে হাত লাগলে গালে চটি বসিয়ে দিতে পারে।

ভালোবাসায় তোমার সত্যিই বিশ্বাস নেই?

আমতা আমতা করে অশেষ বলে, না নেই। তার চেয়ে তোমায় বেশি বিশ্বাস করি।

আমার একটা কথা শুনবে?

কী।

তুমি খুব খারাপ এটা আমি বুঝতে পেরেছি। কিন্তু তুমি আমার মতে চলবে?

বললাম তো, তোমায় আমি বিশ্বাস করি।

উত্তর হল না। বল, চলবে কি চলবে না?

ধর চললাম, কিন্তু কখনো কখনো যদি আমার মাথায় পোকাটা নড়ে চড়ে ওঠে? আর অন্যের মতে তো কেউ চিরকাল চলতে পারে না। যে নোংরা একবার হজম করেছে তার খিদে কখনো না কখনো নোংরার জন্য চনচনিয়ে উঠবেই।

তখন তুলসীপাতা খাইয়ে খিদে চাপা দেব।

ওতে যদি মন না ভরে? —অশেষ চোখ কুঁচকোল।

একদৃষ্টে বহুক্ষণ নূপুর অশেষের দিকে তাকিয়ে থাকল। অশেষের শিরায় শিরায় কী যে ছড়িয়ে ছড়িয়ে পড়ছে, তিক্ত কষায় জ্বালা সব মিশ্রিত এক স্বাদ। আকাশ থেকে ওই বিমান যদি হঠাৎ নীচে নামে তীব্র বেগে তখন যেভাবে স্নায়ুতে শিরায় কাঁপুনি জাগে, অনেকটা সে রকম মৃত্যুর ভীষণ ভয় থেকে সমতলে নেমে আসার রোমাঞ্চে অশেষ নূপুরের জানুতে দুহাত চেপে ধরল।

তোমায় বিশ্বাস করি নূপুর. ওই তো বললাম।

ভিসুভিয়াস
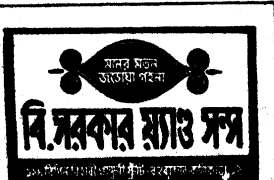
নামোচ্চারণের সঙ্গে সঙ্গেই ইতালীর মত আর কোন দেশ ভ্রমণকারীদের কল্পনাকে অতখানি উদ্দীপিত করে তোলে না। কারণ ইতালীকে প্রকৃতি যেমন একদিকে সৌন্দর্যের ডালি অকৃপণভাবে উজাড় করে সাজিয়েছে, অন্যদিকে তেমনি মানব ইতিহাসের শ্রেষ্ঠতম শিল্পী, স্থপতি ও ভাস্করেরা তার প্রতিটি নগর ও জনপদে গির্জা, প্রাসাদ, মিনার, তোরণ, দুর্গ, সেতু, ফোয়ারা, যাদুঘর, চিত্রশালা ও উদ্যান গড়ে তুলে সভ্যতার উদয়লগ্ন থেকে আজ পর্যন্ত অতুল ঐতিহ্যে ও ঐশ্বর্যে মহিমান্বিত করে রেখেছে।

অতএব এ বছরে জুনের শেষের দিকে লণ্ডনে কমনওয়েলথ প্রেস ইউনিয়নের সম্মেলন শেষে জেনিভায় আন্তর্জাতিক প্রেস ইন্সটিটিউটের সম্মেলনে যোগদান করতে যাবার আগে শ্রদ্ধেয় শ্রীতুষারকান্তি ঘোষ যখন আমাকে বললেন যে দেশে ফেরার পথে অমৃতবাজার পত্রিকার আগামী বছরের শতবার্ষিকী উপলক্ষে এবং বর্তমানেরও কয়েকটি বিষয়ে ব্যবস্থার জন্যে তিনি ইতালী ঘুরে যেতে চান এবং ইচ্ছে করলে আমি তাঁর সঙ্গে যেতে পারি তখন মনটা আনন্দে নেচে উঠলো। —গত দশ বছরের মধ্যে তাঁর সঙ্গে ইতালী সমেত ইউরোপের আরো অনেক দেশ কয়েকবার ঘুরেছি। তাঁর সঙ্গে ঘোরা এবং নিজে ঘোরার মধ্যে পার্থক্য বিপুল। তার কারণ শুধু এইটাই নয় যে আমার অর্থবল নিতান্ত সীমিত। প্রকৃতপক্ষে বৈদেশিক মুদ্রার ব্যাপারে ভারত সরকারের অতিশয় সমর্থনযোগ্য কড়াকড়িতে তুষারবাবুর পাথেয়ও রীতিমত মাপা। আসলে আজ ভারতবর্ষে তাঁর মত খ্যাতি ও মর্যাদাসম্পন্ন সাংবাদিক আর কেউ নেই। তাই যে দেশেই তিনি যান সেই দেশের সরকার ও সংবাদপত্র সংস্থাগুলি তাঁকে সর্বতোভাবে সাহায্য ও সহযোগিতার জন্যে ব্যগ্র। দেশভ্রমণে, বিশেষ করে, যে দেশের ভাষা ও দস্তুর জানা নেই, সেই দেশে তার মূল্য কতখানি তা অভিজ্ঞ মাত্রেই জানেন। দ্বিতীয়ত, কোন দেশ ভ্রমণের আগে তিনি যতখানি মানসিক প্রস্তুতি করে

বিশ্বনাথ মুখোপাধ্যায়
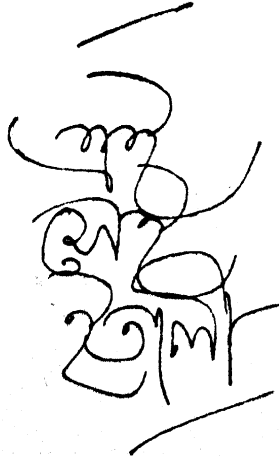
আসেন তাও এক বিস্ময়ের ব্যাপার। তাঁর সঙ্গে কোন প্রসিদ্ধ স্থান দেখতে গেলে গাইডের প্রয়োজন হয় না। যাবার আগেই তিনি সেটি সম্পর্কে সব তথ্য জেনে যান। তা ছাড়া তাঁর স্নেহময় সাহচর্য ও সরস বিচিত্র কাহিনীর নিঃসীম ভাণ্ডারের আকর্ষণও কম নয়।

এবার আমাদের পর্যটনসূচীতে ছিল দক্ষিণ ইতালীর দুটি ভুবনবিখ্যাত ভ্রমণকেন্দ্র—ভূমধ্য সাগরোপকূলবর্তী নেপলস্ এবং তারই অদূরে মোত্তরা অতিকায় প্রমোদতরীর মত নয়নাভিরাম দ্বীপ কাপ্রি।

নিরুপমা নেপলস

যদিও ইতালীর প্রায় সর্বত্র প্রকৃতির বৈভবে নয়নমন এক অনির্বচনীয় তৃপ্তিতে ভরে ওঠে, তবু তার বিশ্রুত ও প্রাচীন নগরগুলিতে,—রোম, ফ্লোরেনস্ কিম্বা মিলানে মহাশিল্পীদের অমর শিল্পকৃতিগুলিই মানুষের মুখ্য আকর্ষণ হয়ে ওঠে, অমন লাবণ্যময়ী প্রাকৃতিক পরিবেশ উপেক্ষিত হয়। দর্শকেরা ঐতিহাসিক গির্জা, গম্বুজ, চিত্রশালে-যাদুঘরে ভিড় করে।—এমন কি ইতালীর পূর্ব-উপকূলে আড্রিয়াটিক উপসাগরে যেন ইন্দ্রজালে ভাসমান কয়েক শত দ্বীপের মানিকে গাঁথা মণিহারের মত ভেনিস,—যা অর্ধেক নগরী আর অর্ধেক কল্পনা,—তাও তার ব্যতিক্রম নয়। তার পাঁচশতাধিক দ্বীপকে সংযোগ করা দু' শত বিক সুন্দর সেতু, তার খালগুলিতে জল-বিহারের জন্যে চমৎকার গ্যান্ডোলা, সর্বোপরি রেনেসাঁর শেষার্ধের ভেনিসীয় শিল্পীদের

সালফাটেরায় গাইড এবং শ্রীতুষারকান্তি ঘোষ

আঁকা বর্ণ-বহুল চিত্রাবলীর কয়েকটি মিউজিয়াম এবং মধ্যযুগের অতুল ঐশ্বর্য-শালী সওদাগরদের অপরূপ প্রাসাদগুলি ভেনিসের তেজ-মরুৎ-ব্যোম পরিবেশকে অনেক-খানি গৌণ করে দেয়।

অথচ নেপলস্ ইতালীর তৃতীয় কি চতুর্থ বৃহত্তম নগরী হলেও সেখানে অবশ্য-দর্শনীয় কোন স্থাপত্য, চিত্রশালা কিম্বা ফোয়ারা নেই। যদিও তার অনেক আপাত-সাধারণ দৃশ্যের অন্তরালে, পথের বাঁকে প্রান্তরের বুকে, পাহাড়ের গায়ে, বন-নীলিমার পেলব সীমানায় অনেক-অনেক শতাব্দী ধরে মানুষের ও প্রকৃতির খেয়াল-খুশির ভাঙা-গড়ার ইতিহাস মৌন কিম্বা মুখর।

তাই মহাকবি গোয়েটে বলেছেন, "রোমে গেলেই কাউকে যদি অতি অবশ্য শিক্ষা-লাভই করতে হয় তবে, নেপলসে এসে উপভোগ করবে সে বাঁচার আনন্দ।" শেলির কাছে নেপলস The Metropolis of ruined Paradise।

আকাশ কিম্বা সমুদ্রপথে অথবা স্থলপথে রেলে কিম্বা মোটরে করে নেপলস্ যাওয়া যায়। আমরা রোম থেকে নেপলস্ যাই 'ফ্রেসিয়া ডেল বেসুভা' নামক ট্রেনে। এ ট্রেন 'র‍্যাপাডো' অর্থাৎ অতিশয় ক্ষিপ্রগামী ও বিরতিবিহীন। সময় লাগে মাত্র দুঘন্টা। দুধারে উত্তাল সবুজ পাহাড়, খেত-খামার ও ছোট-ছোট গ্রামের মধ্যে দিয়ে কয়েকটি হ্রদের পাশ কাটিয়ে এই রেলপথটি ইউরোপের একটি আকর্ষণীয় ও শৌখীন যাত্রাপথ।

বিকেল পাঁচটায় নেপলসের 'সেন্ট্রালে' অর্থাৎ কেন্দ্রীয় স্টেশনে পৌঁছে দেখি হোটেলের উর্দিপরিহিত ড্রাইভার আমাদের জন্যে অপেক্ষা করছে। হোটেলের নাম বিসুভিয়াস। জগতের একটি অন্যতম বিখ্যাত ও আরামপ্রদ হোটেল।

স্টেশন থেকেই গাইড-ড্রাইভাররা শহর দেখাতে নিয়ে যাবার জন্যে ঝুলোঝুলি শুরু করেছিল। ঘন্টা দুই পরে হোটেলে এসে আমাদের সঙ্গে দেখা করতে বলে আমরা হোটেল-প্রেরিত-গাড়ীতে উঠে পড়লাম। কিন্তু নাছোড়বান্দা গাইড-ড্রাইভারদের কেউ কেউ আমাদের পিছু নিল।

খানিকটা বিশ্রাম ক'রে নিয়ে, চা খেয়ে নীচে নেমে এসে দেখি গাইড-ড্রাইভাররা ওঁৎ পেতে আছে। হোটেলের রিসেপ্শানে শহর দেখানোর জন্যে ট্যাক্সীর ভাড়া কত হতে পারে একটা আন্দাজ নিয়ে হবু গাইড-ড্রাইভারদের সঙ্গে দর কষাকষির পাঞ্জা লড়াই শুরু করলাম। ইতালীতে তার প্রয়োজন আছে। শেষ পর্যন্ত যার সঙ্গে রাজি হওয়া গেল তার নাম গ্র্যান্ডে অর্থাৎ গ্র্যান্ড বা চমৎ-কার। গ্র্যান্ডে সুপুরুষ, সুচতুর, নানা বিষয়ে ওয়াকিবহাল এবং সবচেয়ে বড় কথা, তার ইংরাজি প্রায় অনর্গল। পরে পরিচয় হতে গ্রাণ্ডেকে তুষারবাবুর খুব পছন্দ হয়ে গেল। তিনি গ্রাণ্ডেকে পরের দিনের পুরো সময়ের জন্যে আমাদের গাইড-ড্রাইভার করে নিলেন।

ইউরোপের গ্রীষ্মের অতি দীর্ঘ অপরাহ্নে আমরা নেপলস দেখতে বেরুলাম। নেপলসের পথগুলি ঊর্মিল, কখনো চড়াইয়ে গাড়ীর বনেট্টা পেছনের সীট থেকেও প্রায় পুরো দেখা যাচ্ছে, গ্র্যান্ডে প্রায় বুকের ওপরে রেখে স্টীয়ারীং ঘোরাচ্ছে। কখনো গাড়ী উৎরাই নামছে, আমরা প্রায় ঝুঁকে পড়ছি, গ্রাণ্ডে যেন উপুড় হয়ে স্টীয়ারীংয়ে পাক দিচ্ছে। গ্রাণ্ডের ড্রাইভিং সত্যি সুনিপুণ।

গ্রাণ্ডে দেশপ্রেমিকও বটে! তার নেপলসের পথ-চলতি বর্ণনা অপরূপ হৃদয়-গ্রাহী। গ্রাণ্ডে খানিক পরেই সমুদ্রের তীর-ছোঁয়া সর্পিল পথ ধরলো। সেদিনের কনে দেখা আলো নেপলসের উপকূলধৌত ভূমধ্যসাগরের ওপর কী মায়াজালই না বিস্তার করেছিল! হঠাৎ গাড়ী থামিয়ে গ্রাণ্ডে সমুদ্র-তীরের একটি গ্রামের দিকে অঙ্গুলি সঙ্কেত করে বলল, "এই নগণ্য ধীবরপল্লীতেই সোফিয়া লোরেন জন্মেছিলেন"। ভুবন-মোহিনী চিত্রতারকা সোফিয়া লোরেন আজ পৃথিবীর অন্যতমা ধনী মহিলা।

গ্রাণ্ডের জমকালো মার্সেডিস বেঞ্জ আবার ঊর্ধ্বগামী হলো। এবার চলেছি শহরের বুকের ওপর জাগ্রত আগ্নেয়গিরি সাল-ফাটেরা (Salfatara) দেখতে।

সালফাটেরা সংরক্ষিত এলাকা। তার ভেতরে যেতে গেলে দক্ষিণা লাগে। প্রবেশ-পত্র সংগ্রহ করতে যেতেই পুরোনো নোংরা স্যুট পরিহিত এক বৃদ্ধ বেরিয়ে এলেন। তিনিই সেখানের গাইড। তাঁর পারিশ্রমিক শুনে আমরা বললাম যে গাইড না নিয়েই আমরা সালফাটেরা দেখে আসতে পারবো। কিন্তু গ্রাণ্ডে বলল যে গাইড নিয়ে যাওয়াই ভালো, কারণ জায়গাটা বিপদজনক। কিন্তু

তখন কি একবারও ভেবেছিলাম যে গাইড নিয়েই আমাদের বিপদ ঘটবে।

ভস্মবহুল বামন পাহাড়ে ঘেরা জীবন্ত আগ্নেয়গিরি সালফাটেরা। এখানে-ওখানে বিজ্ঞপ্তি দেওয়া, —এই সীমানা অতিক্রম করা বিপদজনক। একটা জায়গায় এসে একটি বড় গোল পাথর তুলে নিয়ে গাইড মাটির ওপর ছুঁড়ে ফেল্লেন। বাড়ীর ছাদের ওপর ভারী জিনিস পড়লে যেমন শব্দ হয় তেমনি ঢক্ করে শব্দ হলো। গাইড বললেন এখানে দশ ফিট মাটির ছাদ, তার তলাতেই সব ফাঁপা। অর্থাৎ আগ্নেয়গিরির জঠর। পনেরো-বিশ গজ এগিয়ে গিয়েই গাইড খেলার মার্বেল আকৃতির কয়েকটা ছোট নুড়ি তুলে নিয়ে মাটিতে ছুঁড়ে মারলেন। এবার টং করে শব্দ হলো। গাইড বললেন এখানে মাটির ছাদের গভীরতা মোটে তিন ফিট। আরো খানিকটা এগিয়ে গিয়ে গাইড একটি কাঠি দিয়ে মাটিতে কয়েক ইঞ্চি ছেঁদা করলেন। পেঁচিয়ে-পেঁচিয়ে ধোঁয়া উঠতে লাগলো। আরো কয়েক জায়গায় ছেঁদা করে গাইড তেমনি করে ধোঁয়া বের করলেন। আরো এগিয়ে দেখা গেল তারের বেড়া দিয়ে ঘেরা একটি জায়গায় একটা লাভার পুকুর টগ্‌বগিয়ে ফুটছে। এইবার গাইডের খেল শুরু হলো। তাঁর দুহাতে দুটি পাকানো কাগজ গোড়া থেকেই ছিল। একটি দেশলাইয়ের কাঠি জেলে পাকানো কাগজ দুটিতে আগুন লাগিয়ে দোলাতে লাগলেন। আর আচম্বিতে চারদিকে দৃশ্য পাল্টে গেল। লাভার পুকুরটা যেন ক্ষিপ্ত হয়ে উঠলো। এখানে-ওখানে-সেখানে,—যেখানেই জঠরের লাভা ভূস্তর পর্যন্ত উঠে এসে সেই চক্রাকৃতি আগ্নেয়গিরির মুখে ক্ষতের সৃষ্টি করেছিল, সবগুলোই গেঁজিয়ে উঠলো। ফুটতে লাগলো। এমন কি খানিক আগে গাইডের করা ফুটোগুলো পর্যন্ত ধোঁয়ার পিচকারী ছাড়তে লাগলো। যেন মানুষের হাতে আগুনের ছেলেখেলা দেখে ধরিত্রীর গর্ভে অগ্নিদেবতা রুদ্র হয়ে উঠলেন।

গাইড পাকানো কাগজের আগুন দুটি নিভিয়ে ফেললেন। আমরা সভয়-বিস্ময়ে জিজ্ঞাসা করলাম 'একি? এ রকম কেন হলো ?'

গাইড মুরুব্বীচালে বললেন, "প্রফেস'র কেন্ নট্ এক্সপ্লেন।' —প্রফেসার, অর্থাৎ জনৈক ভূতত্ত্ববিদ অষ্টপ্রহর আগ্নেয়গিরি-মুখে পর্যবেক্ষণে নিযুক্ত ছিলেন। সেদিনও ছিলেন। অদূরে দাঁড়িয়ে দূরবীন দিয়ে চারিদিক নিরীক্ষা করছিলেন। সঙ্গে বোধ হয় তাঁর বালকপুত্র ও স্ত্রীও ছিলেন।

গাইড একটি সিগারেট ধরিয়েই চট করে দেশলাইটি নিভিয়ে ফেললেন। তোয়াজ করে ধোঁয়া ছাড়লেন। তারপর মাটিতে কাঠি দিয়ে একটি আলগা ছেঁদা করলেন। খুব অল্প, প্রায় অস্পষ্ট ধোঁয়া বেরুতে লাগলো। নিজে আঙুল দিয়ে সেটা দেখে তুষারবাবুকেও আঙুল দিয়ে পরীক্ষা করতে বললেন। সরল বিশ্বাসে তুষারবাবু তাই করলেন। ও মা! লোকটা চট্ করে মুখ থেকে সিগারেটটা বের করে সেই ছেঁদাটার ইঞ্চিখানেক দূরে ধরলো।

ফুটন্ত সালফাটেরা

অমনি ফুটন্ত কেটলির নলের মুখ দিয়ে বাষ্পের মত উর্ধ্ববেগে সেই ছেঁদা দিয়ে ধোঁয়া ফিনকি দিয়ে উঠলো। তুষারবাবুর আঙুলটা ঝলসে দিল। তীব্র যন্ত্রণায় তিনি হাতটা টেনে নিলেন।

সমস্ত ঘটনাটা এত আচম্বিত, এত অপ্রত্যাশিত যে ঐ বেআক্কেল লোকটার মতলব কি বোঝবার আগেই তা ঘটে গেল।

আমি ক্রুদ্ধ হয়ে বললাম, 'এর মানে কি?—প্রফেসার না হয় ব্যাখ্যা করতে পারে না। কিন্তু আপনি তো জানতেন যে ওখানে আঙুল দিলে তা পুড়ে যাবে।"

সেই অদ্ভুত বৃদ্ধ লোকটি কাঁধ দুলিয়ে অবলীলাক্রমে উত্তর দিল, "এক্সপিরিয়ান্স। —ইউ উইল রিমেমবার"। অর্থাৎ আমাদের চিরদিন মনে রাখবার মত একটা অভিজ্ঞতা দেবার জন্যেই তিনি কান্ডটি করেছেন।

আমি এবার আরো কড়া কিছু বলতে যাচ্ছিলাম। তুষারবাবু আমাকে বাধা দিয়ে বাংলায় বললেন, "ছেড়ে দাও। লোকটার বোধ হয় মাথা খারাপ।"

সালফাটেরার একদিকে কয়েকটি উষ্ণ প্রস্রবণ আছে। সেই প্রস্রবণের জলে স্নান করলে বাত ও নানা জাতের চর্মরোগ সারে। তাই সেখানে স্নানার্থীদের জন্যে কয়েকটি কুটির। আর জমাট লাভা থেকে তৈরী ছোটো-খাটো গয়না ও ঘর-সাজানোর সামগ্রীর দোকান।

বিসুভিয়াস

পরের দিনটা আমাদের জীবনস্মৃতিতে অবিস্মরণীয় হয়ে থাকবে। ঐ দিন সকালে আমরা লাভাগর্ভ পর্বত বিসুভিয়াস দেখতে গেলাম। নেপলস ও তার চারপাশের বহু দূর-দূরান্ত স্থান থেকেও প্রায় চার হাজার ফিট উঁচু ঐ ধূম্রল আগ্নেয়গিরি দেখতে পাওয়া যায়। সমস্ত অঞ্চলটার ওপর যেন ঐ ভয়াল পর্বত এক ভীষণ সুন্দর আধিপত্য বিস্তার করে আছে এবং শতাব্দীর পর শতাব্দী ধরে ভূকম্পন ও অনল উদ্গীরণে অবলুপ্ত করে দেবার শাসানি দিচ্ছে। বিসুভিয়াস শেষ বার অনল উদ্গীরণ করেছে মাত্র সে দিন, ১৯২৬ সালে। ঐ অঞ্চলের হাজার হাজার অধিবাসী-দের মনে সে স্মৃতি আজো জ্বলন্ত।

মোটরে করে বিসুভিয়াসের প্রায় স্কন্ধ-দেশ অর্থাৎ তিন হাজার ফিটেরও ওপর যাওয়া যায়। রাস্তা সর্পিল এবং দারুণ চড়াই। ভ্রমণকারীদের আকর্ষণের জন্যে

বেনিতো মুসোলিনী এই ব্যয়বহুল ও কঠিন-সাধ্য পথটি তৈরী করেন। বাকি হাজারখানেক ফিট উঠতে হয় লিফ্‌ট চেয়ারে বা লৌহ-রজ্জুবাহিত চেয়ারে বসে। ওপরে বেশ ঠান্ডা। কুমারবাবু সেটা অনুমান করে আমাকে সতর্ক করে দিয়েছিলেন। বহুবারের মত এবারও তাঁর কথা না শুনে ঠকতে হলো। পাতলা ওভারকোটটা গাড়ীতে রেখে এসে-ছিলাম বলে লিফ্‌ট চেয়ারে উঠতে উঠতেই শীত-শীত করতে লাগলো।

কিন্তু বিসুভিয়াসের চূড়ায় পদক্ষেপ করেই সব ভুলে যেতে হয়। সে এক অনবদ্য অনির্বচনীয় দৃশ্য। নিজের মহিমায় ও বিভীষিকায় স্বতন্ত্র এই পর্বতের গাত্র তরু-বিরল। যুগান্ত ধরে তার উদ্গীরিত লাভার ঢল দূরে, অতি দূরে পর্যন্ত গড়িয়ে পড়ে জমাট হয়ে আছে। পর্বতের একদিকে প্রায় দুহাজার বছর আগে সেই উদ্গীরণে-ধ্বংস পম্পাই নগরীর অবশেষ। আরেক দিকে কালাব্রিয়ান পর্বতমালা। আর সামনে, লিফ্‌ট চেয়ার স্টেশনের দিকে মুখ করে দাঁড়ালে প্রভাতসূর্যে ঝিলিমিলি অনন্তপার সমুদ্র। আর সেই সমুদ্রের কোলে সবুজ ইসকিয়া ও কাপ্রিদ্বীপ।

বিসুভিয়াসের বিশাল গোলাকৃতি অগ্নিমুখের রঙ গাঢ় খয়েরী। তার কিনারে গিয়ে দাঁড়ালে বুকটা যেন দুরু দুরু করে ওঠে, শরীরে কেমন যেন শিহরন জাগে। আফিংখোর সিংহের মুখে সার্কাসবালা যখন মাথা পুরে দেয় তখন তাদের সেই অনুভূতির সঙ্গে এই অনুভূতির মিল আছে নাকি!

বিসুভিয়াসের চূড়া দেখা শেষ করে খানিকটা ইতস্ততঃ ঘুরলাম। সেই পর্বত-চূড়াতেও কাফে এবং কর্ড ও লাভা দিয়ে তৈরী গহনার দোকান।

আবার লিফ্‌ট চেয়ারে বসে নামা। চেয়ারগুলি জোড়ায়-জোড়ায়। আরামপ্রদ ও সম্পূর্ণ নিরাপদ, মাটি অর্থাৎ পর্বতগাত্র থেকে কখনোই খুব উঁচুতে নয়। লিফ্‌ট চেয়ার স্টেশনেও কাফে, কার্ড ও মনোহারী দোকান। স্টেশনটি থেকে গাড়ী পর্যন্ত নামবার পথে কয়েকটি ছোট ছোট ছেলে দেখি আমাদের প্রায় পা জড়িয়ে ধরার মত করছে এবং কি যেন বলছে। কি ব্যাপার? —না ওরা আমাদের জুতোর ধুলো ঝেড়ে দিয়ে কিছু পয়সা পেতে চায়। ইউরোপে স্কুলের ছোট-ছেলেমেয়েরা অবসর সময়ে সৎপরিশ্রমের দ্বারা যদি সামান্য কিছু রোজগার করে তবে তা লজ্জার কিছু নেই। শ্রমের মর্যাদা এখানে এতখানি।

সাত-পাঁচ

চন্দ্রশেখর মুখোপাধ্যায়

ইতিহাসকে ফিরে পাওয়া

মানুষ ইতিহাসকে ভালবাসে। মানুষ যখন অতীত ইতিহাসের সাক্ষী মর্মরপ্রাসাদ, ভগ্ন দেব-দেউল, অতীতের গির্জা মসজিদ মন্দিরের সামনে এসে দাঁড়ায়, তখন মনে করতে চেষ্টা করে ইতিহাসের ছেঁড়া পাতার হারিয়ে যাওয়ার কাহিনী।

মানুষের এই ইতিহাসপ্রিয়তাকে কাজে লাগিয়ে পৃথিবীর দেশে দেশে নতুন যে প্রমোদের অনিন্দ্যসুন্দর আয়োজন ইদানীং হচ্ছে, তারই কিছু বিবরণ এখানে হাজির করছি।

এই নতুন প্রমোদোপকরণের আবিষ্কর্তা হলেন একজন ফরাসী স্থপতি, নাম পল রবার্ট হুডিন। প্যারিস শহরে দুই মহা-যুদ্ধের মধ্যবর্তী সময়টাতে শহরের প্রধান প্রধান বাড়ি ও দর্শনীয় স্থাপত্যগুলি আলোকমালায় সজ্জিত করে রাখা হত। ফ্রান্স এ-ব্যাপারে সব দেশের তুলনায় অগ্রণী ছিল। আইফেল টাওয়ার, আর্চ অফ ট্রায়াম্প, নোতরদামের গীর্জা রাত্রে আলোকমালায় সুশোভিত হয়ে শহরবাসী ও বিদেশী পর্যটকদের মনোহরণ করত। যুদ্ধের সময় এই ব্যবস্থা বন্ধ হয়ে যায়, কিন্তু যুদ্ধের পরে আরও বহু ঐতিহাসিক প্রাচীন প্রাসাদ আলোকিত করা হল। শুধু আলো দেখবার জন্যে ষাট হাজার দর্শক এল ফ্রান্সের লয়ার অঞ্চলে, যেমন সাধারণতন্ত্র দিবসে কলকাতার বা দিল্লীতে শহরতলীর ও গ্রামের মানুষ ভেঙে পড়ে। কিন্তু উৎসাহ স্বাভাবিকভাবেই কমে যায় নিষ্প্রাণ আলোকসজ্জা দেখবার জন্যে।

পল হুডিন ছিলেন চামবোর্ড প্রাসাদের কিউরেটার। এক সন্ধ্যায় ঝড়-জলের মধ্যে বাইরে আটকা পড়ে হঠাৎই তাঁর লক্ষ্য পড়ল, বিদ্যুতের ক্ষণ-বিচ্ছুরিত আলোয় তাঁর পরিচিত প্রাসাদটির যেন রূপান্তর ঘটে গেছে। যেন তিনি সেই মুহূর্তে ফিরে গেছেন অতীত দিনে। যাদুস্পর্শে প্রাসাদের পাথরগুলি প্রাণময় হয়ে উঠেছে।

হুডিনের এই অভিজ্ঞতা প্রথম রূপ পেল ১৯৫২ সালে চামবোর্ডে। অদৃশ্য শব্দ-প্রক্ষেপণ যন্ত্রে ইতিহাসের নায়ক-নায়িকাদের কণ্ঠস্বরে, সংগীত ও আলোর পরিকল্পিত প্রয়োগে চামবোর্ডের প্রাসাদ রঙ্গমঞ্চের সজীব সেট হয়ে উঠল। পনের মিলিয়ন ফ্রাঙ্ক খরচ করা হল এই প্রয়োজনের জন্যে, কিন্তু অদ্ভুত এই আনন্দ উপভোগের জন্য দর্শকরা এক বছরের মধ্যেই তা ফিরিয়ে দিল দর্শনীতে। রবার্ট হুডিন প্রদর্শিত এই নতুন প্রমোদায়োজনে ফ্রান্স ছাড়াও বহু দেশ উৎসাহের সঙ্গে তাই এগিয়ে এসেছে। ইতি-হাসের পুরনো দিনে ফিরে যাবার এই অপূর্ব আকর্ষণ কেউই এড়াতে পারেন না। তাই দেশে দেশে পর্যটন বিভাগ এ-বিষয়ে তৎপর।

ফরাসী দেশে গিয়ে ভার্সেইলিস প্রাসাদের সামনে সহস্র সহস্র দর্শকের সঙ্গে কোন রাত্রে গিয়ে দাঁড়ালে দেখা যাবে ফরাসী দেশের তিন যুগের ইতিহাসের যে-কোন খণ্ড ইতিহাস কাহিনী।

আলোছায়া মেশানো ভার্সেইলেস প্রাসাদ নিস্তব্ধ। শোনা যাবে সেই নিস্তব্ধতা ভঙ্গ করে ট্রাম্পেটের আওয়াজ। দর্শকদের বিস্মিত সচকিত করে দিয়ে ভেসে আসবে শিকারী কুকুরের চিৎকার, শিকারীর শিঙা বাজানোর শব্দ, রাজারাণী, পারিষদবর্গের আলাপ, যুদ্ধের দামামা, যুদ্ধের কোলাহল, শান্তির নীরবতা...আলো আর বাণীতে ইতিহাসের কয়েকটি পাতা মুগ্ধ দর্শকের সামনে যেন উঠে আসবে। শোনা যাবে রাজার আগমন-বার্তা, তারপর রাজার হাতে-ধরা বেতটির প্রাসাদের মেঝেতে শব্দ করে ঘুরে বেড়ানোর অস্থির শব্দ।

দর্শক শুনবেন বিদ্রোহী ফ্রান্সের সেই অবিস্মরণীয় ক'টি দিনের কাহিনী, শুনতে পাবেন রাজদ্রোহীদের হাত থেকে পরিত্রাণ পাবার জন্য মেরী আটোনেয়েতের আকুল আবেদন...আর বিদ্রোহীদের যতকিছু ভেঙে ফেলার সেই রক্তরাঙা ক্রুদ্ধ গর্জন! (কে জানে মুর্শিদাবাদের লালবাগ বা পলাশীর আম্রকাননে ইতিহাসের এই প্রদর্শনী দেখার সুযোগ আমরাও পাব...বাংলা ছবি সুভাষ-চন্দ্রে এর চিত্ররূপ দেখেছি কিছুটা)।

ফ্রান্সের ভার্সেইলেস প্রাসাদে প্রযোজিত বহু ঐতিহাসিক কাহিনীর মধ্যে মৃত নেপোলিয়নের মরদেহের শোভাযাত্রা অবি-স্মরণীয় এক দৃশ্য বলে কথিত। ড্রামের আওয়াজ, কামানের অভিবাদন, রাইফেলের প্রেজেণ্ট অফ আর্মস, মরদেহ বহনকারী শকটের চাকার আওয়াজ, রাস্তার পাথরে ঘোড়ার ক্ষুরের শব্দের প্রেক্ষাপটে মনে হয় শববাহকদের বুঝি স্পষ্ট দেখা যাচ্ছে। দর্শকেরা বোধহয় সেই শোভাযাত্রার গতি-পথের অনুসরণ করছে বাস্তব ঘটনার মত।

বৃটেন ত বটেই, লেবানন, এথেন্স, মিশর, রোম, স্পেন, হল্যান্ড যেখানেই ইতিহাস ছড়িয়ে আছে ফেলে-রাখা প্রাসাদ, পিরামিড, গির্জার দেওয়ালে, সেখানেই এই ধরনের প্রদর্শনী দর্শকদের নতুন করে ইতিহাসকে ভালবাসতে শেখাচ্ছে।

বঙ্গ রঙ্গমঞ্চে ইতিহাস-নির্ভর নাটক আমাদের জাতীয় সংগ্রামে একদিন উদ্বুদ্ধ করেছে, আজও জাতির সংকটে ইতিহাসকে কাজে লাগানো সবিশেষ প্রয়োজন। একাধারে আনন্দ ও শিক্ষার এই নতুন বাহনটির দিকে আমাদের সংস্কৃতি-জগতের চিন্তাবিদদের দৃষ্টি আকর্ষিত হওয়া তাই উচিত।

(৪০)

জগদানন্দ পণ্ডিত

গৌরাঙ্গের নবদ্বীপলীলার অন্তরঙ্গ সঙ্গী, ব্রাহ্মণ, নিবাস কুমারহট্টে, শিবানন্দ সেনের বাড়ির কাছে। প্রভুর সমস্ত মুখ্য লীলায়, কাজী-দমনে, নগর-কীর্তনে বা জগাই-মাধাই উদ্ধারে একজন পার্শ্বচর।

তারপর নীলাচলের সহযাত্রী।

রন্ধনে নিপুণ, জগদানন্দই পথে রান্না করে খাওয়ায় সকলকে। রন্ধনে যেমন পটু পরিবেশনেও তেমনি অজস্র।

সর্বক্ষণ কেবল প্রভুকে স্বাচ্ছন্দ্যে রাখবার চেষ্টা। তার প্রীতির আধিক্যে প্রভু সংকুচিত। কখনো কখনো তার সেবার আড়ম্বরকে প্রত্যাখ্যান করতে হয়েছে। আমি যে সন্ন্যাসী, এত আরাম-আয়োজনে থাকলে আমার বৈরাগ্যধর্ম নষ্ট হবে। সন্ন্যাসীর পক্ষে লোকনিন্দা ভয়ের বস্তু।

এই জন্যে প্রায়ই প্রভুর সঙ্গে জগদানন্দের কলহ হয়। এ কলহ প্রেমকলহ।

জগদানন্দ প্রভুর দণ্ডখানি বয়ে বেড়ায়।

নিত্যানন্দের কাছে দণ্ড গচ্ছিত রেখে জগদানন্দ ভিক্ষার সন্ধানে বেরিয়েছে। ভিক্ষা সেরে এসে দেখল দণ্ড ভাঙা, তিন টুকরো।

দণ্ড কে ভেঙেছে? জগদানন্দ গর্জে উঠল।

নিত্যানন্দ হাসল : যাঁর দণ্ড তিনিই ভেঙেছেন।

আসলে নিত্যানন্দই ভেঙেছে। নিত্যানন্দ ছাড়া আর কে এমন শক্তিমান আছে যে প্রভুর দণ্ড ভেঙে ফেলতে পারে?

জগদানন্দ ভিক্ষেয় বেরিয়ে গেলে নিত্যানন্দ দণ্ডের সঙ্গে কথা বলতে বসল। দণ্ড, যাকে আমি হৃদয়ে বয়ে নিয়ে বেড়াচ্ছি, সে তোমাকে বয়ে নিয়ে বেড়াবে এ ঠিক নয়। তুমি এবার বিদায় হও। তোমাতে কারো প্রয়োজন নেই। বলে দণ্ডকে তিন টুকরো করে দিল।

সেই তিনটি টুকরো নিয়ে জগদানন্দ প্রভুর কাছে হাজির হল।

কে ভাঙল?

নিত্যানন্দ।

নিত্যানন্দকে ডাকো।

নিত্যানন্দ এলে প্রভু জিজ্ঞেস করলেন, কেন আমার দণ্ড ভাঙলে?

ও তো একটা বাঁশ মাত্র। ওটাকে ভাঙলে কী হয়?

আমি আজ নিঃসঙ্গ হলুম। এই দণ্ডই আমার একমাত্র সঙ্গী ছিল। কৃষ্ণের ইচ্ছায় আমার সেই দণ্ডও আজ ভেঙে গেল।

দণ্ড তো শাসন করবার জন্যে, পীড়ন করবার জন্যে। প্রভুর সন্ন্যাস তো প্রেম-বিতরণের জন্যে। প্রেমে দণ্ড কোথায়? ভয় কাকে?

বাৎসল্য সখ্য দাস্য ও মধুর এই চার ভাবেই প্রভু বশীভূত। পরমানন্দ পুরীর বাৎসল্য, রামানন্দের সখ্য, গোবিন্দের দাস্য আর জগদানন্দ গদাধর আর স্বরূপ দামোদরের মধুর।

জগদানন্দের প্রেমে আবার রাগ আছে, অভিমান আছে, তিরস্কার করতেও তা পরাঙ্মুখ নয়। যেমন তা অকপট তেমনি অকৃপণ। কথা যদি না শোনো, কথা কওয়া ছেড়ে দেব। প্রভুকে তাই ভয়ে-ভয়ে কথা শুনতে হয়। একবার তো প্রভুর উপর রাগ করে তিন দিন কথা বন্ধ করেছিল। কিন্তু প্রভুকে দিয়ে 'বিষয় ভুলানো' কি ভালো?

প্রভুর আদেশে জগদানন্দ নবদ্বীপে এসেছে, শচীমাতা থেকে সুরু করে সবাই তার মুখে শুনছে চৈতন্য-কথা। জগদানন্দকে পেয়ে সবাই বলছে এই তো আমরা চৈতন্যকেই পেলাম। যে গৌরের প্রেম-পাত্র সে গৌর ছাড়া আর কে!

জগদানন্দ শিবানন্দের বাড়ি এসেছে।

সেখানে এক কলস চন্দনাদি তেল প্রস্তুত করেছে। এ একরকম আয়ুর্বেদিক তেল, ব্যবহার করলে বায়ু ও পিত্তের প্রকোপ প্রশমিত হয়। মনে করেছে এ তেল ব্যবহার করলে প্রভুর অনেক উপকার হবে। কত উপবাস করেন, রাত জাগেন, কীর্তনের মত্ততায় শরীরের উপর কত ক্লেশ সইতে হয় তাঁকে, এ তেল মাখলে হয়তো কিছু উপশম হবে। তেলে আবার সুগন্ধ মিশিয়ে নিল যাতে ব্যবহারে স্পৃহা জাগে।

যত্ন করে তেলের কলস নিয়ে গেল নীলাচল। দ্বারপাল গোবিন্দের কাছে জিম্মা করে দিল। বললে, এ তেল প্রভুর মাথায় অল্প অল্প মেখে দিও, বায়ু-পিত্তের শান্তি হবে।

গোবিন্দ তাই বললে প্রভুকে। গৌড় হতে বহু যত্নে নিয়ে এসেছে। এক কলসীতে প্রায় ষোল সের তেল।

প্রভু বললেন, সন্ন্যাসীর এমনিতেই তেলে অধিকার নেই, তায় আবার সুগন্ধি তেল। এ বিষম লজ্জার কথা।

তবে এ তেল কী করব?

জগন্নাথকে দিয়ে দাও। এ তেলে তাঁর মন্দিরে দীপ জ্বলবে। তাতেই জগদানন্দের সমস্ত শ্রম সার্থক হবে বলে দিও।

গোবিন্দ জগদানন্দকে জানাল প্রভু কী বলেছেন। জগদানন্দ কোনো উত্তর দিল না, চুপ করে রইল।

দিন দশেক বাদে গোবিন্দের কাছে গিয়ে আবার আবেদন করল। প্রভুকে বলো এ তেল যেন তিনি অঙ্গীকার করেন। কত কষ্ট করে তৈরি করে এনেছি গৌড় থেকে।

গোবিন্দ আবার জানাল প্রভুকে।

প্রভু রুষ্ট হলেন। সক্রোধে বললেন, তা হলে তেল মালিশ করবার জন্যে লোক রাখো। এই সুখের জন্যেই তো আমি সন্ন্যাস করেছি! হাসছ কী! তোমাদের পরিহাস আর আমার সর্বনাশ! পথে লোকে যখন আমার গায়ে তেলের গন্ধ পাবে, তখন কী ভাববে? আমাকে 'দারী সন্ন্যাসী' ভাববে। ভাববে আমি কোনো স্ত্রীলোকের মনোরঞ্জনের জন্যে গায়ে-মাথায় গন্ধ-তেল মেখেছি। লোকের কাছে আমি মুখ দেখাব কী করে?

গোবিন্দ স্তব্ধ হয়ে রইল।

ভোরবেলা প্রভু নিজেই জগদানন্দের বাড়ি গেলেন। বুঝিয়ে বললেন, গৌড় থেকে তুমি যে তেল এনেছ তা দিয়ে জগন্নাথের মন্দিরের দীপ জ্বালাও। আমি সন্ন্যাসী, আমি তা মাখি কী করে?

প্রণয়রোষে বক্রোক্তি করল জগদানন্দ। আমি গৌড় থেকে তেল এনেছি এ মিথ্যে কথা তোমাকে কে বললে? আমি কোনো তেল আনিনি। বলে তেলের কলসীটা প্রভুর সামনেই উঠোনে ছুঁড়ে ভেঙে ফেলল।

প্রভুর কাজে যখন লাগল না তখন এ তেল আনা আর না-আনা সমান। কলসীতে থাকলেও যা, মাটিতে গড়িয়ে গেলেও তাই।

তারপর দরজায় খিল দিয়ে ঘরে শুয়ে রইল।

দুদিন পর প্রভু এসে দরজায় ঘা দিলেন। পণ্ডিত, ওঠো। আজ দুপুরে আমি এখানে খাব। তুমি উঠে রান্না করো। আমি মন্দিরে দর্শন সেরে আসি।

জগদানন্দ উঠে স্নান করে বিচিত্র ব্যঞ্জন রান্না করল। মধ্যাহ্নে প্রভু এসে খেতে বসলে কলাপাতায় শালি-চালের সঘৃত অন্ন স্তূপ করে সাজিয়ে দিল। কলার ডোঙায় সাজিয়ে দিল ব্যঞ্জন। অন্ন-ব্যঞ্জনের উপর রাখল তুলসীমঞ্জরী।

প্রভু বললেন, আরেক পাতে ভাত বাড়ো। তুমিও আমার পাশে বসে খাবে। বলে হাত তুলে বসে রইলেন।

জগদানন্দ বললে, তুমি আগে খাও, পরে আমি খাব। তোমার আগ্রহ কি আমি উপেক্ষা করতে পারি?

প্রভু তখন আশ্বস্ত হয়ে ভোজ্যদ্রব্যে হাত দিলেন। বললেন, 'ক্রোধ সত্ত্বেও তুমি এমন সুন্দর রান্না করেছ, তার মানেই তোমার উপর কৃষ্ণের প্রসাদ আছে। কৃষ্ণ নিজে খাবে কিনা, তাই তোমার হাত দিয়ে অমৃত ঢেলে দিল।'

জগদানন্দ তৃপ্তমুখে বললে, এখানে যে খাবে সেই রাঁধুনে। কৃষ্ণ নিজে খাবেন বলে নিজেই রান্না করেছেন।

আর তুমি?

আমি শুধু জোগানদার। আমার শুধু সামগ্রী-সংগ্রহ। 'পণ্ডিত কহে যে খাইবে সে-ই পাক-কর্তা। আমি সব কেবলমাত্র সামগ্রী-আহর্তা।'

জগদানন্দ বারে বারে অন্নব্যঞ্জন পরিবেশন করতে লাগল। পাছে সে অসন্তুষ্ট হয় সেই ভয়ে প্রভু খেতে লাগলেন। অসন্তুষ্ট হলেই তো জগদানন্দ উপোস করে থাকবে। সে এক ত্রাসের ব্যাপার। তার চেয়ে জগদানন্দ যা খেতে দিচ্ছে খেয়ে যাওয়াই ভালো।

কিন্তু না বলে পারলেন না। বিনয়-সম্মান করে বললেন, পণ্ডিত, এবার থামো। দশ গুণ বেশি খেলাম। আর কত খাওয়াবে?

জগদানন্দ তখন নিবৃত্ত হল।

এবার তবে তুমি আমার সামনে বসে খাও, আমি দেখি।

আমার এখনো আরো কাজ আছে। যারা রান্নার কাজে সাহায্য করেছে, রামাই আর রঘুনাথকে খাওয়াতে হবে। তোমার গোবিন্দকেও বাদ দেব না। তুমি এখন গিয়ে বিশ্রাম করো।

প্রভু গোবিন্দকে বললেন, তুমি এখানে থাকো। পণ্ডিত খেতে বসলে আমাকে খবর দিও। বলে চলে গেলেন বিশ্রাম করতে।

সে কী, তুমি এখানে দাঁড়িয়ে থেকো না। জগদানন্দ গোবিন্দকে তাড়া দিল : তুমি গিয়ে প্রভুর পা টেপো। জিজ্ঞেস করলে বোলো পণ্ডিত এই ভোজনে বসল। আমি খেতে না বসলে তাঁর যে বিশ্রাম হবে না। যাও, তোমার জন্যে প্রভুর প্রসাদ রেখে দেব। প্রভু ঘুমিয়ে পড়লে ফের চলে এস।

গোবিন্দ আবার প্রভুর কাছে যেতে প্রভু তাকে ফেরত পাঠালেন। দেখ দেখ জগদানন্দ খেল কিনা।

গোবিন্দ গিয়ে দেখল জগদানন্দ খেতে বসেছে। জগদানন্দের খেতে না বসা পর্যন্ত যে প্রভুর বিশ্রাম নেই।

এই প্রভুর অবশেষ তোমার জন্যেও রেখে দিয়েছি, তুমিও বসে পড়ো। তারপর প্রভুকে গিয়ে সংবাদ দাও।

ভোজনের সংবাদ পেয়ে প্রভু স্বস্তিতে শয়ন করলেন।

শুধু খাওয়া নয়, শোয়ার দিকেও জগদানন্দ মনোযোগ করল। দেখল প্রভু কলার শরলা পেতে শোন। কৃশ শরীর, শরলাতে হাড়ে নিশ্চয় ব্যথা লাগে। সে-ব্যথা লাগে গিয়ে ভক্তপ্রাণে। জগদানন্দের কাছে অসহ্য মনে হয়।

সে সূক্ষ্ম বস্ত্রে খোল তৈরি করাল। গৈরিকে রাঙাল সেই খোল। তারপর তাতে তুলো ভরল। দিব্যি তোষক বানিয়ে দিল: শুধু তোষক নয়, বালিশেরও ব্যবস্থা করল।

তোষক-বালিশ গোবিন্দের হাতে পৌঁছিয়ে দিল। প্রভুকে তাতে শুইয়ো।

স্বরূপকে বললে, আপনি অনুরোধ করলে প্রভু 'না' করতে পারবেন না।

তোষক-বালিশ দেখে প্রভু চটে উঠলেন। গোবিন্দকে জিজ্ঞেস করলেন, এসব কে করিয়েছে?

গোবিন্দ নাম বললে। আর কে? জগদানন্দ।

নাম শুনে সংকুচিত হলেন প্রভু। দান প্রত্যাখ্যান করলে জগদানন্দ আবার না অনশন সুরু করে। কিন্তু উপায় নেই। গোবিন্দকে দিয়ে তুলোর জিনিস দূর করে দিলেন। আগের মত শুলেন সেই কলার শরলায়।

স্বরূপ বললে, পণ্ডিতের শয্যা না নিলে পণ্ডিত দারুণ আহত হবে।

তাহলে সেই সঙ্গে একটা খাটও নিয়ে এস। প্রভু বিরক্ত হলেন। আমি সন্ন্যাসী মানুষ, আমার ভূমিতে শয়ন। আমার জন্যে খাট, আমার জন্যে তোষক-বালিশ?

তখন স্বরূপ এক উপায় বার করল। কলার শরলা নখ দিয়ে সরু করে-করে চিরল, পুরোনো বহির্বাস দিয়ে খোল বানাল, তারপর সেই খোলের মধ্যে সরু করে চেরা শরলা ঢুকিয়ে দিব্যি লেপ-তোষক তৈরি করল। কী, এতে তো আপত্তি নেই। তোমারই বহির্বাস, তোমারই কলার শরলা।

অনেক অনুনয়-বিনয়ের পর প্রভু সেই শয্যা অঙ্গীকার করলেন। সকলেই সুখী হল। কিন্তু জগদানন্দের অন্তরে সুখ নেই। অথচ ক্রোধ দেখাতে গেলেও তো প্রভু দুঃখিত হবেন। প্রভুকে স্বাস্থ্যে-স্বাচ্ছন্দ্যে রাখাই তো তার একমাত্র কাজ। প্রভু কম খাবেন, কষ্টে শোবেন এ যে তার সহ্যের বাইরে। তার কথা কে বোঝে।

রামচন্দ্র পুরীর শাসনও তো সে মানেনি।

রামচন্দ্র মাধবেন্দ্র পুরীর শিষ্য। সেই সূত্রে ঈশ্বর পুরীর গুরু-ভাই। সেই অর্থে প্রভুর গুরুস্থানীয়। একবার জগদানন্দের নিমন্ত্রণে তার বাড়ি খেতে এসেছিল রামচন্দ্র। নিজে প্রচুর খেল, পরে নিজে পরিবেশন করে জগদানন্দকেও প্রচুর খাওয়াল। তারপরে চৈতন্যের নিন্দা করতে বসল—চৈতন্যের দলের লোকগুলো নিজেরা যেমন বেশি খায়, তেমনি অন্য সন্ন্যাসীদেরও বেশি খাওয়ায়। অতিভোজন যে বৈরাগ্যের শত্রু এ খবর তারা রাখে না। তাদের মধ্যে বৈরাগ্যের বাষ্পও নেই।

রামচন্দ্রের এই নিন্দুক স্বভাব। নিজের ইচ্ছায় বেশি খেল, বেশি খাওয়াল, দোষ হল জগদানন্দের, দোষ হল জগদানন্দ শ্রীচৈতন্যের। কিন্তু সে নিন্দা প্রভু গ্রাহ্য করলেন না, তাঁর লৌকিক-লীলায় অতিভোজন করে জগদানন্দের সাধ মেটালেন।

এখন আবার ভক্তের সুখের জন্যে লেপ-তোষকে সম্মত হয়েছেন। স্বরূপ সুন্দর মীমাংসা করে দিয়েছে।

নীলাচলে সনাতন গোস্বামী এসেছে। তার গায়ে কণ্ডু। তা সত্ত্বেও প্রভু তাকে আলিঙ্গন করছেন। সেই কারণে সনাতন অত্যন্ত কুণ্ঠিত। সেই দুঃখের কথাই বলছে জগদানন্দকে। আমার গায়ের কণ্ডুরস প্রভুর শরীরে লাগছে, আমার এ অপরাধের বুঝি নিস্তার নেই। আমি দূরে সরে থাকতে চাইলেও দূরে থাকতে দিচ্ছেন না, বারে বারেই বুকে টেনে নিচ্ছেন।

জগদানন্দ বললে আপনি এক কাজ করুন, বৃন্দাবনে চলে যান।

প্রভুকে সেই কথাই বলতে এল সনাতন। অনুমতি করুন রথযাত্রার পর আমি বৃন্দাবনে চলে যাই।

এ কার যুক্তি?

জগদানন্দের।

প্রভু ক্রুদ্ধ হয়ে কঠোর বাক্যে জগদানন্দকে তিরস্কার করতে লাগলেন। সেদিনের ছোকরা জগা, তার এত অহংকার সে তোমাকে উপদেশ দেয়। তুমি গুরুতুল্য সম্মানিত মহাজন, তোমাকে পরামর্শ! নিজের কদর জানে না, বালকের মত ব্যবহার করে। যে তুমি আমার উপদেষ্টা, সেই তোমাকেই কিনা উপদেশ!

সনাতন বললে, এতক্ষণে বুঝলাম জগদানন্দ তোমার কত আপনার জন! তার কী সৌভাগ্য, তোমার মুখের তিরস্কার পায়। তার জন্যে আত্মীয়তার সুধা, আমার জন্যে গৌরবস্তুতির তিক্ততা।

শেষ পর্যন্ত জগদানন্দই বৃন্দাবন চলল।

প্রভু বললেন, আমার উপরে রাগ করে যাচ্ছ?

না, তা কেন? বৃন্দাবন দেখিনি এখনো, দেখে আসি। তুমিই তো এতদিন যেতে দাওনি। এবার আর বাধা দিও না।

প্রভু হাসলেন। দিলেন অনুমতি। পথ-ঘাটের সুবিধে-অসুবিধে বুঝিয়ে দিলেন। আর বললেন, সনাতন মথুরায় আছে, তার সঙ্গে যেন সে থাকে।

সনাতনকে আরো বোলো, আমিও শিগগিরই যাচ্ছি।

জগদানন্দ সনাতনের সঙ্গে এসে মিলল মথুরায়।

একদিন সনাতনকে আহারে নিমন্ত্রণ করল জগদানন্দ।

সনাতন খেতে এল, মাথায় তার রক্তবর্ণ কাপড় বাঁধা। জগদানন্দ মনে করল এ বুঝি প্রভুর প্রসাদী বস্ত্র। মনে করতেই প্রেমাবেশ হল।

জিজ্ঞেস করল, এ রাতুল বসন কোথায় পেলে?

মুকুন্দ সরস্বতী দিয়েছে।

কে দিয়েছে?

মুকুন্দ সরস্বতী।

তার মানে তুমি অন্য সন্ন্যাসীর বহির্বাস মাথায় বেঁধেছ? আমার প্রভুর পরিহিত বসন নয়? জগদানন্দ ভাতের হাঁড়ি তুলে সনাতনকে মারতে গেল।

সনাতন লজ্জিত মুখে স্তব্ধ হয়ে রইল। তার এই নতনম্র ভঙ্গি দেখে জগদানন্দও স্তব্ধ হল।

একেই বলে চৈতন্যনিষ্ঠা। বললে সনাতন। এ দেখবার জন্যেই অন্য সন্ন্যাসীর বস্ত্র মাথায় বেঁধে এসেছি। পণ্ডিত, দেখলাম কাকে বলে প্রেম, কাকে বলে নিয়তনিষ্ঠা।

দুজনে আহারে বসল। দুজনের এক তৃপ্তি। তারপর আহারান্তে প্রভুমিলন-ক্ষুধায় দুজনে কাঁদতে বসল। দুজনের আবার এক বিরহ।

প্রভু এখানে আসবেন বলেছেন। তুমি তাঁর জন্যে জায়গা করে রেখো।

দু' মাস ব্রজমণ্ডলে থেকে জগদানন্দ নীলাচলে ফিরে চলল। সনাতন প্রভুর জন্যে কিছু উপহার পাঠাল। কিছু রাসস্থলীর বালি, গোবর্ধনের শিলা, পাকা শুকনো পীলু ফল আর গুঞ্জামালা।

তারপর প্রভু তাকে নবদ্বীপে পাঠালেন শচীদেবীকে তাঁর প্রণাম দেবার জন্য। আমার হয়ে তুমি তাঁর পাদপদ্ম স্পর্শ কোরো। বোলো, আমি তাঁর সেবা ছেড়ে যে সন্ন্যাস নিয়েছি, এতে আমি পাগলের মত কাজ করেছি, আমার ধর্মনাশ হয়েছে। আরো বোলো, তিনি যেন তাঁর অবোধ ছেলের অপরাধ মার্জনা করেন। আমি তো চিরদিন তাঁরই অধীন। তাঁরই আদেশে আমি নীলাচলে আছি, যতদিন মর্তকায়ায় জীবন আছে, ততদিন নীলাচল ছাড়ব না। বোলো, রোজ আমাকে মা যেমন স্মরণ করেন, তেমনি আমিও রোজ তাঁর কাছে গিয়ে তাঁকে প্রণাম করি। মায়ের যেদিনই ইচ্ছে হবে আমাকে খাওয়াবেন সেদিনই আমি তাঁর হাতের রান্না খেয়ে আসব। তার আমার মায়ের জন্যে জগন্নাথের প্রসাদী বস্ত্র নিয়ে যাও, নিয়ে যাও মহাপ্রসাদ।

মাতৃভক্তগণের প্রভু হয়ে শিরোমণি।
সন্ন্যাস করিয়া সদা সেবেন জননী।।

জগদানন্দ একমাস থাকল নবদ্বীপে, তারপর ফিরে যাবার সময় শচীদেবীর অনুমতি নিয়ে অদ্বৈতের কাছে অনুমতি চাইল। প্রভুকে জানাবার জন্যে অদ্বৈত দুই পয়ারে অর্থাৎ চার ছত্রে একটি তর্জা রচনা করে দিল। সেই আউল-বাউলের তর্জা। জগদানন্দ মুখস্ত করে নিল, কিন্তু প্রভু ছাড়া সে প্রহেলিকার অর্থ কেউ বুঝল না।

সেই তর্জার মধ্যে আছে বুঝি প্রভুর তিরোধানের ইঙ্গিত।

বাউলকে বোলো, লোকে বাউল হয়েছে। হাটে আর চাল বিকোয় না। কারো আর কাজে ব্যস্ততা নেই। এ কথা আরেক বাউলই বলে পাঠাচ্ছে সেই বাউলকে।

জগদানন্দের মুখে তর্জা শুনে প্রভু অল্প একটু হাসলেন। বললেন, আচ্ছা, তাই হবে।　　　　(ক্রমশঃ)

(প্রশ্ন)

বালুচরী শাড়ী বাংলাদেশের কোথায় প্রথম তৈরি হয়? এখন কোন কোন স্থানে তৈরি হোচ্ছে? বালুচরী শাড়ীর সংক্ষিপ্ত ইতিহাস কি?

প্রভাত সান্যাল
এন সি সি অফিস
বিষ্ণুপুর, বাঁকুড়া

●

(১) গুগ্‌লী বলের স্রষ্টা কে?
(২) শ্রেষ্ঠ গুগ্‌লী বোলার কে?
(৩) কতজন ভারতীয় সাঁতারু ইংলিশ চ্যানেল পার হয়েছেন?

বরুণ বন্দ্যোপাধ্যায়
জুলিয়া চা বাগান
ঢেকিয়াজুলি, দরং, আসাম

●

(উত্তর)

১৮ই শ্রাবণ সংখ্যার 'অমৃতে'র 'জানাতে পারেন' বিভাগের কয়েকটি প্রশ্নের উত্তর দিচ্ছি।

১। গণতন্ত্র সর্বপ্রথম পাকাপাকিভাবে প্রতিষ্ঠিত হয় ১৭৮৩ খৃঃ আমেরিকায়। আমেরিকা ছিল বৃটেনের উপনিবেশ। কিন্তু বৃটেনের নানা শোষণ ও দমননীতির প্রতিবাদে ১৭৭৩ খৃঃ বোস্টন বন্দরে বৃটিশ চা-বাহী জাহাজ আমেরিকানরা ডুবিয়ে দেয়। ১৭৭৫ খৃঃ জর্জ ওয়াশিংটনের নেতৃত্বে ইংরেজদের বিরুদ্ধে আমেরিকান উপনিবেশগুলির স্বাধীনতাযুদ্ধ শুরু হয়। ১৭৭৬ খৃঃ ৪ঠা জুলাই উপনিবেশগুলো নিজেদের স্বাধীন বলে ঘোষণা করে। ১৭৮১ খৃঃ ইংরেজ মার্কিনদের কাছে পরাজয় স্বীকার করে ও ১৭৮৩ খৃঃ ভার্সাই-এর সন্ধি হয় ও বৃটেন আমেরিকার স্বাধীনতা স্বীকার করে। এইভাবে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে গণতন্ত্রের প্রতিষ্ঠা হয়। এর প্রেরণায় এর পরেও নানা স্থানে গণ-অভ্যুত্থান ঘটে।

এছাড়া বহু পূর্বে প্রাচীন যুগেও ভারতবর্ষে গণতান্ত্রিক উপায়ে রাজা বা শাসক নির্বাচিত করা হত বলে কথিত আছে। যেমন, বৌদ্ধ যুগে লিচ্ছবীদের নানা জনপদে গণ-নির্বাচন দ্বারা শাসক নির্বাচিত হতেন বলে শোনা যায়। এও জানা যায় যে, বাংলাদেশের গোপালদেব জনতার দ্বারা নির্বাচিত হয়ে সিংহাসন লাভ করেছিলেন।

৬। সুভাষচন্দ্র ১৯২০ খৃঃ আই সি এস পাশ করেন ও সরকারী চাকুরী পান। দেশ-সেবায় আত্মসমর্পণের জন্য তিনি দেশ-বন্ধুকে পত্র লেখেন। দেশবন্ধুর সমর্থন পেয়ে সুভাষচন্দ্র সরকারী পত্রিকায় ভারতীয়দের প্রতি অবমাননাসূচক একটি কথায় প্রতিবাদের অজুহাতে ১৯২১ খৃঃ চাকুরী প্রত্যাখ্যান করেন।

৭। কেন্দ্রীয় তথ্য ও বেতারমন্ত্রীর পুরো নাম কোকরাদাস কালিদাস শাহ।

অলকরঞ্জন বসুচৌধুরী
জামসেদপুর—১

●

'অমৃত' ৭ম বর্ষ, একুশ সংখ্যাতে ত্রিপর্ণা দাশগুপ্তের এক নম্বর প্রশ্নের উত্তরে জানাই প্রখ্যাত সাহিত্যিক শ্রীতারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায় ১৯৪৭ সালে তাঁর "হাঁসুলীবাকের উপকথা" উপন্যাসের জন্য 'শরৎচন্দ্র স্মৃতি পুরস্কার' পান। ১৯৫৫ ও ১৯৫৬ সালে "আরোগ্য নিকেতন"এর জন্য যথাক্রমে 'রবীন্দ্র পুরস্কার' ও 'আকাদমী পুরস্কার' লাভ করেন। ১৯৫৯ সালে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় তাঁর সাহিত্য-কর্মের জন্য "জগত্তারিণী পদক" দ্বারা সম্মানিত করেন। ১৯৬৩ সালে তিনি "মতিলাল পুরস্কার" অর্জন করেন। ১৯৬৬ সালে "গণদেবতা" উপন্যাসের জন্য "জ্ঞানপীঠ সাহিত্য পুরস্কার" লাভ করেন। এই পুরস্কারটি এই বছর দেওয়া হয় এবং এর মূল্য একলক্ষ টাকা। উল্লিখিত পুরস্কারগুলি প্রাপ্তির পরিপ্রেক্ষিতে তিনি অসংখ্য পুরস্কার, মানপত্র এবং সম্বর্ধনা লাভ করেন।

বাবুল দাশগুপ্ত
ব্রহ্মপুর, ২৪-পরগণা।

পুরনো পাতা

বঙ্গের গুপ্ত কথা

অম্বিকাচরণ গুপ্ত

মেদিনীপুরের ম্যাজিস্ট্রেটসাহেব আপন জেলায় ইংরেজিনবিশ দারোগা বহাল করিবার সখ করিয়া হুগলীর ম্যাজিস্ট্রেটকে একজন ইংরাজী-জানা লোক পাঠাইবার জন্য অনুরোধ করেন,—হুগলীর ম্যাজিস্ট্রেট আপন আমলাদিগের মধ্যে সকলকেই মেদিনীপুরের ম্যাজিস্ট্রেটের অভিপ্রায় অবগত করিয়া তাহাদের কেহ যাইতে ইচ্ছা করেন কিনা জানিতে চাইলে, অনুপচন্দ্র প্রার্থনা করেন। এবং সে-কালের সেবদুর্লভ দারোগা-গিরি লইয়া মেদিনীপুরে যাত্রা করেন। বৈকালে জল-ঝড়ের সময় অনুপচন্দ্র নৌকা করিয়া উলুবেড়ের পৌঁছেন—জল-ঝড় থামিলে আহারাদির পর সেই রাত্রেই ডাক-পাল্কীতে কয়েকজন চৌকিদার সঙ্গে মেদিনীপুর যাত্রা করেন, এবং উলুবেড়ে ছাড়িয়া রাত্রি আন্দাজ দুই-তিনটার সময় দামোদর-তীরে উপস্থিত হন। তখন নৌকা পরপারে ছিল। ডাকের পাল্কী শুনিয়া মাঝি তাড়াতাড়ি পশ্চিম পাড় হইতে নৌকা পাড়ি দিল; নৌকা যতই কিনারার নিকট আসিতে লাগিল, ততই একটা চীৎকার শব্দ শোনা গেল। অনুপচন্দ্র পাল্কীতে নিদ্রা যাইতে-ছিলেন, চীৎকার শব্দে তাঁহার নিদ্রা ভাঙ্গিল। অনুপচন্দ্র পাল্কী হইতে মুখ বাহির করিয়া দেখিলেন, নৌকাখানি দামোদরের মাঝামাঝি আসিয়াছে। নৌকার উপরে একটি পাল্কী—পাল্কীর চতুর্দিক বেষ্টন করিয়া একদল লাঠিয়াল লাঠি খাড়া করিয়া দণ্ডায়মান আছে—পাল্কীর নিকট একটি ভদ্রবেশধারী পুরুষ, সগর্বে দণ্ডায়মান—নৌকাখানি ক্রমশঃ কূলের অতি নিকটে আসিল; তখন স্পষ্টই বুঝিতে পারা গেল সেই চীৎকার পাল্কীর ভিতর হইতেই বাহির হইতেছিল—"কেহ থাকেন স্ত্রীলোকের সতীত্ব রক্ষা করুন.—দস্যু—দস্যু—দস্যু"—এই শব্দে অভিনব দারোগা অনুপচন্দ্র নূতন কার্যক্ষেত্রে আপনার গুণ-গরিমার সুন্দর পরিচয় দিবার সুবিধা পাইলেন। তিনি আপনার চৌকিদার-দিগকে বলিলেন, "এই সমস্ত লোককে গ্রেপ্তার করতে হবে"—ইতিপূর্বে তাঁহার ডাকে পাল্কীর বেহারা পরিবর্তন হইয়াছিল। পরিবর্তিত বেহারা সমেত ষোলজন তাঁহার সঙ্গে। তাহাদিগকে বলিলেন, 'গ্রেপ্তার করিতে পারিলে তিনি পুরা বকশিস দিবেন।' তাঁহার সঙ্গে একজন বরকন্দাজও ছিল। তাহাকে দিয়া নিকটবর্তী ফাঁড়িতে বলিয়া পাঠাইলেন যে, একদল চৌকিদার লইয়া ফাঁড়িদার তাঁহার সাহায্যার্থে ত্বরায় উপস্থিত হয়—বরকন্দাজ দৌড়িল; বেহারা-চৌকিদার সারি বাঁধিয়া নদীর ধারে খাড়া হইয়া গেল। আর তিনি আপনি একটি রিভলবারে টোটা পুরিয়া দাঁড়াইলেন। নৌকা তীরে আসিয়া লাগিল। তখন নদীতে ভাটা। নদীর জল কমিয়া কূলভূমির অনেক নীচে গিয়াছিল। অনুপচন্দ্র সদলে কিনারার উপরে দণ্ডায়মান, নীচে নৌকা—নৌকা হইতে যে অবিশ্রান্ত চীৎকার শব্দ আসিতে-ছিল, তাহার উত্তর দিয়া তিনি বলিলেন, "ভয় নাই, ঈশ্বর রক্ষা করবেন।"

চীৎকার শব্দ আবার বলিল, "ভগবান কি এ-অভাগীর দিকে মুখ তুলে চাইবেন?"

অনু। স্থির হন, উপায় হচ্ছে।

—এই বলিয়া তিনি বন্দুকে একটা আওয়াজ করিলেন; সেই নিস্তব্ধ নিশীথে বন্দুকের শব্দে বায়ু কাঁপিল, কাঁপিতে কাঁপিতে যতদূর গেল সেই শব্দকে বহিয়া ছুটিল; গ্রামবাসীদিগকে জাগ্রত করিল, অনুপ সদম্ভে বলিলেন, "সৎ হও, অসৎ হও—ডাকাইত হও, দস্যু হও, ধীরে ধীরে নৌকা হতে নামিয়া এস,—নতুবা নিস্তার নাই'—এই কথায় লাঠিয়ালদিগের মধ্যে এক-জন নৌকার মাঝিকে সাংঘাতিক আঘাত করিয়া নদীর জলে ফেলিয়া দিল, আপনি হাল ধরিয়া দক্ষিণ দিকে নৌকা ভাসাইয়া দিল। ভাটার জোরে নৌকা দক্ষিণমুখে ভাসিয়া চলিল। দারোগাবাবু অনুচরগণ সহিত কিনারা দিয়া অনুধাবন করিলেন। অনুপ যুবা পুরুষ, নূতন ক্ষেত্রে নূতন উদ্যমে অসীম সাহসে, বিপুল বলে ছুটিতে লাগিলেন,—লক্ষ্যে-অলক্ষ্যে গুলী চালাইতে লাগিলেন—নৌকা হইতে তিন-চারিজন অচেতন বস্তুর ন্যায় ঝুপঝুপ জলে পড়িয়া গেল; নৌকাস্থিত ভদ্রবেশী পুরুষটি উপায়ান্তর না দেখিয়া পাল্কীখানিকে নৌকা হইতে জলে ফেলিয়া দিয়া আপনিও পড়িল; তখন গ্রামের লোক নদীর উভয় তীরে দাঁড়াইয়া গিয়াছে—অনুপ গ্রামবাসীদের সাহায্যে পাল্কীখানি জল হইতে তুলিলেন, আপনি নদীতে নামিয়া চৌকিদারদিগকে লইয়া সাতজন লাঠিয়ালের সহিত যুবাকে গ্রেপ্তার করিলেন। সকলকে বাঁধিয়া লইয়া ঘাটে পৌঁছিলেন। ইতিপূর্বেই পাল্কী খুলিয়া দেখা হইয়াছিল যে, তাহার মধ্যে একটি যুবতী মুমূর্ষুপ্রায়। পশ্চাৎ বেহারা-গণ পাল্কীখানিকে লইয়া ঘাটে পৌঁছিল।

অনুপচন্দ্র স্ত্রীলোকটার সেবা-শুশ্রূষা করিলে তিনি বমন করিতে আরম্ভ করিলেন; বারম্বার বমনের পর তাঁহার চেতনা সঞ্চার হইল। অনুপচন্দ্র তখন দস্যু যুবককে একটি গাছতলায় লইয়া গিয়া সমস্ত বৃত্তান্ত জিজ্ঞাসা করিয়া বলিলেন, সত্য কথা বলিলে তাহাকে নিষ্কৃতি দিবেন। দস্যু যুবা উত্তর করিল, "স্ত্রীলোকটি তাহার বনিতা—গত রাত্রির পূর্ব রাত্রিতে শ্বশুর প্রভৃতি পরিবারস্থ সকলের অসম্মতিতে পিত্রালয়ে পলায়ন করিতেছিল, সে সন্ধান পাইয়া জল ঝড়ের সময় রূপনারায়ণের তীরে এক দোকানে একটি ভদ্রলোকের আশ্রয়ে আমি তাহাকে খুঁজিয়া পাইয়া সেখান হইতে ধরিয়া আসিবার কালে সমস্ত পথ সে চীৎকার করিয়া আসিতেছিল।"

অনু। তোমার নাম কি?

দস্যু। বিপিনবিহারী।

অনু। কোথায় বাড়ী?

দস্যু। জগদীশপুরে।

অনু। কি জাতি?

বিপি। ব্রাহ্মণ!

অনু। নৌকার মাঝিকে জলে ফেলে দিয়ে নৌকা নিয়ে পালাতে গেলে কেন?

বিপি। আপনার বন্দুকের গুলীতে সে জলে পড়ে গিয়েছে।

অনু। ভাল,—পালাচ্ছিলে কেন?

বিপি। এপথে বড় দস্যু ভয় আছে, আপনাকে দস্যু মনে করে পালাচ্ছিলাম—

অনু। পাল্কী কেন জলে ফেলে দিলে?

বিপি। দস্যু হাতে মরতেই যদি হ'লো তবে স্ত্রী-পুরুষে দুজনেই মরা শ্রেয়, এই বিবেচনায়—

প্রত্যুত্তরে অনুপচন্দ্র হাসিয়া বলিলেন, "দস্যুকে ত তুমি পেয়েছ, পুলিশে দিবে না?"

বিপি। একটু সুস্থ হইলেই থানায় গিয়া এজাহার দিব।

অনু। থানায় যেতে হবে না, এখানেই দারোগা আসবেন।

অনুপচন্দ্র স্ত্রীলোকটার নিকট গিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "আপনি কি একটু সুস্থ হলেন?"

তিনি অবগুণ্ঠনে মুখ ঢাকা দিয়া বলিলেন, "আজ্ঞা হাঁ। আপনার অনুগ্রহে জীবন পেলাম।"

অনু। আমার অনুগ্রহে নয়, ঈশ্বরের; বিপন্নকে তিনি ভিন্ন কেহ উদ্ধার কত্তে পারে না; মনুষ্য অবলম্বন মাত্র।

স্ত্রী। আপনিই আমার মনুষ্যরূপী ঈশ্বর—নতুবা এমন সঙ্কটাপন্ন অবস্থায় কে রক্ষা কত্তে পারে?

অনু। আপনার নাম কি?

স্ত্রী। সৌদামিনী।

অনু। আপনার নিবাস কোথায়?

স্ত্রী। শ্রীরামপুর রিষড়া।

অনু। কোথায় যাচ্ছিলেন?

স্ত্রী। স্বামী মেদিনীপুরে চাকরী করেন, সেইখানে যাচ্ছিলাম—

অনু। কিসে যাচ্ছিলেন?

স্ত্রী। পাল্কীতে।

অনু। ডাক-পাল্কীতে?

স্ত্রী। না, দেশ হতে বেহারা আনছিলাম, সঙ্গে একজন ঝি আর দুজন হিন্দুস্থানী দরওয়ান ছিল।

অনু। তারা কোথায়?

স্ত্রী। তাদিকে খুন করেছে—

অনু। কোথায় খুন করেছে।

স্ত্রী। রূপনারায়ণের তীরে।

অনু। কেমন দিনে?

স্ত্রী। গত রাত্রিতে দুই-তিন দণ্ডের সময়, যখন খুব ঝড়-বৃষ্টি হয়—আমি পলাইয়া একটি ভদ্রলোকের আশ্রয় লই, বোধ হয় তিনিও একজন পথিক; এরা তার কাছ থেকে আমাকে জোর করে এনেছে।

অনু। সেই ভদ্রলোকটিকে চিনতে পারেন?

স্ত্রী। ভালরূপ নয়—তখন আমি অজ্ঞান ছিলাম, ভাল করে তাঁকে দেখি নাই—

অনু। আপনি লেখাপড়া জানেন?

স্ত্রী। জানি। সামান্যরূপে—

অনু। আপনার স্বামীর নাম লিখিয়া দেন দেখি,—অনুপচন্দ্র আপনার পাল্কী হইতে কাগজ-কলম আনিয়া লিখিতে দিলেন। স্ত্রীলোকটি তাহার স্বামীর নাম "বিপিনবিহারী মুখোপাধ্যায়, হেড কেরাণী ওয়াটসন কোম্পানীর—গড়বেতা, এই-মাত্র লিখিয়া দিলেন। নামটি পাঠ করিয়া অনুপচন্দ্র শিহরিয়া উঠিলেন—বিষাদ-হর্ষে তাহার চক্ষে জল আসিল। রিষড়ার বিপিন তাহার সহধ্যায়ী ছিলেন, তাঁহারই বিপদ—সেই বিপদে তিনি উদ্ধারকর্তা। যুবতী জিজ্ঞাসা করিল, নাম শুনিয়া আপনার চক্ষে জল আসিল কেন?

অনু। সেকথা এখন আপনার শুনে কাজ নেই—পরে শুনবেন। আপনি এই যুবা দস্যুকে কখনও দেখেছিলেন?

স্ত্রী। উনি আমার স্বামীর সম্বন্ধে ভ্রাতুষ্পুত্র। অনেকদিন হতে আমার প্রতি আসক্ত—সময়ে সময়ে আমার সতীত্ব অপহরণেরও প্রয়াস পায়—স্বামী বিদেশে থাকেন, তাঁকে পত্রে লিখি, এতদিন তিনি আমাকে আপনার কাছে লইয়া যান এমন সুবিধা পাননি, অল্প বেতন পেতেন, এখন বেতন বেড়েছে—

অনু। আপনার স্বামীর ভ্রাতুষ্পুত্রের নাম কি?

স্ত্রী। বিনোদ।

থানার দারোগা মহাশয় যখন রূপনারায়ণের তীরে পৌঁছিলেন তখন বেলা পাঁচটা বাজিয়াছে। তিনি যাইবার পূর্বে রূপনারায়ণের তীরে লোক ধরে না—এগারটা খুন—নানা ভাবনায় গ্রামের কাহারও বাড়ীতে সে রাত্রি হাঁড়ি চড়ল না। দারোগা মহাশয় পাল্কী হইতে অবতীর্ণ হইয়া সৌদামিনীর এজাহার লইলেন, তাহাকে দিয়া লাশ সনাক্ত করাইলেন, সৌদামিনী একে একে আপনার দারওয়ান, বেহারা ও দাসীর লাশ চিনিলেন। যে দোকানে পলাইয়া গিয়া আশ্রয় লইয়াছিলেন তাহাও দেখাইয়া দিলেন—খুনী মোকর্দমার তদন্ত চলিতে লাগিল।

অনুপচন্দ্র রাত্রিতে আহারান্তে মেদিনীপুর রওনা হইবেন। চক্‌কমলা গ্রামের জমিদার একজন কায়স্থ—তাহার বাড়ি দারোগা তেজচন্দ্র ঘোষের আদি অবস্থিতি। গ্রামের জমিদার নজরবন্দী, এবং মণ্ডল, গোমস্থা, পাইক সকলে এক দাঁড়িতে বন্ধ পড়িলেন; যতক্ষণ মোকর্দমার কিনারা না হয়, ততক্ষণ তাহাদিগের গ্রহ সুপ্রসন্ন নহে।

জমিদার বাড়িতে দারোগা মহাশয় ও অনুপবাবু আহারাদি সমাপন করিলেন।

সৌদামিনী সীতারামের অন্তঃপুরে থাকিলেন। চক্‌কমলা গ্রামের তালুকদার সীতারামের বাটীতে দারোগা-মহোৎসবের দুইদিন কাটিয়া গেল। স্থির হইল সকাল সকাল দারোগাবাবুদিগের স্নানের আয়োজন করিয়া দিবেন। এমন সময় দারোগা তেজচন্দ্রের বরকন্দাজ দুমন সিং ধীরে ধীরে তাহার নিকট আসিয়া দাঁড়াইল। দারোগা তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "কি দুমন সিং, খাবার-দাবার কোন অসুবিধে হচ্ছে না ত?"

—"আজ্ঞে না। বিশ্বাস মশায়ের এখানে আমাদের কখন কষ্ট হয় না।" দারোগার পানে চাহিয়া বলিল, "আপনাকে একবার আসতে হবে, একটা কথা আছে।"

দুমন দারোগা মহাশয়কে বাটীর বাহিরে আনিয়া অনেক দূরে লইয়া গিয়া তাহার মুখপানে চাহিয়া কিয়ৎক্ষণ স্থির হইয়া রহিল,—কোন কথা কহিল না, দারোগা তাহার ভাবভঙ্গি দেখিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "দুমন সব ভাল তো?"

দুম। আজ্ঞা না। ভারি বিপদ, এতদিন আপনার কাছে আছি, এমন কখন হয় না। বড় বড় দায় চলে গেছে—তায় কিছু ভাবনা করি না, আজ ভাবিয়েছে।

দার। ব্যাপারটা কি বল দেখি—

দুম। এমন কিছু সঙ্গীন ব্যাপার নয়, তবে এই বেকারবারী নূতন লোকটা থেকেই গোল বেঁধেছে—নাহলে সব চুকে যেতো—

দার। হয়েছে কি?

দুম। আসামী ক'টা কাল রাত্রে সরেছে—

দারা। সে কি দুমন, খুনী-মোকর্দমার আসামী পালায়, কি? কখন?

দুম। কাল রাত্রে।

দার। রাত্রে ত জানি। কেমন সময়?

দুম। তা জানতে পারা গেলে কি ধরা পড়তে বাকী থাকে।

দার। কে পাহারায় ছিল?

দুম। এই গ্রামের সাত বেটা চৌকিদার ছিল।

দার। দুমন, শেষ বয়সটায় বড়ই বিপদ দেখছি, দুটো বছর গেলে পেন্সন নিয়ে বার হতেম, তা আর অদৃষ্টে ঘটলো না বোধ হচ্ছে।

দুম। আপনি অত ভাববেন না। এই দুমন থাকতে আপনার কিছু হবে না।

দার। তা তো জানি। কিন্তু আসামী কোথা পাব? এখন সাক্ষীদেরও সনাক্ত করা হয়নি,—তাই ত, কি হবে?

দুম। আমি ত চৌকিদার দিয়ে ধরতে পাঠিয়েছি।

এই সকল কথা কহিতে কহিতে দারোগা তেজচন্দ্র বসিয়া পড়িলেন, তাঁহার মাথা ঘুরিয়া গেল। বড় ভয়ানক কথা, খুনী মোকর্দমার আটজন আসামী ফেরার। দারোগা আকাশ-পাতাল ভাবিতে লাগিলেন। তাঁহার ভাবনা দেখিয়া দুমন বলিল বাবু, ভাববেন না, একটা উপায় করা আছে।

দারোগা। কি বল দেখি?

দুম। একবার এদিকে আসুন।

দুমন দারোগা মহাশয়কে সঙ্গে লইয়া যেখানে আসামীরা আবদ্ধ ছিল সেইখানে লইয়া গেল। গৃহের মধ্যে প্রবিষ্ট হইয়া দারোগা মহাশয় দেখিলেন আটজন লোক আবদ্ধ রহিয়াছে। তাহারা দারোগা মহাশয়কে দেখিয়া মাত্র বলিয়া উঠিল, "দোহাই দারোগা মহাশয়, আমরা কাশীজোড়া পরগণার লোক, গঙ্গামায়িদর্শনে যাচ্ছিলাম, আমাদিগে ধরে এনেছে—ধর্ম অবতার আমরা কিছুই জানি না, আপনি আমাদের মা-বাপ।" এই সকল কথা শেষ না হইতে হইতে দুমন বলিল 'চুপ রও,—ঘাবরাও মৎ।"

দারোগা মহাশয় গৃহ হইতে বাহির হইয়া দুমনকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "এরা একরার করে না?' দুমন উত্তর করিল, "চেষ্টা হচ্ছে।—"

দার। একবার কল্লেও টিকবে না—সাক্ষীরা ত সোনাক্ত করবে না—

দুম একরার ত করুক, তাহলে সাক্ষীরা আর কতক্ষণ সোনাক্ত না করে থাকতে পারে—

দার। সোনাক্ত অনুপবাবুর সোনাক্ত—ত। ওই ও দুজন লোকও জল ঝড়ের দিন রাত্রে ঘোর অন্ধকারে দেখেছিল, তাও চকিতের ন্যায়—সে সোনাক্ত ততটা প্রমাণ-যোগ্য নয়।

দুম। অনুপবাবুও ত পুলিশ। তিনি কি আর অন্য কথা বলতে পারেন—

দুমনের অবলম্বিত পন্থা তাহার প্রীতিকর হইল না। কিন্তু না হইলেও আপনি মারা পড়েন, কি করিবেন, সাত-পাঁচ ভাবিতে ভাবিতে আপনার চৌকীতে গিয়া বসিলেন। চৌকীদারেরা পূর্ববৎ আসামী-দিগের সতৈল হস্তে তাহার অঙ্গসেবা করিতে লাগিল। দারোগা মহাশয় অনুপের সঙ্গে কথা কহিতেছেন বটে সর্বদাই অন্য-

মনস্ক,—প্রাচীন দারোগা লোকটা বড় বিচক্ষণ, বিশেষ সাবধান লইতেছেন, অনুপ কোনমতে তাঁহাকে ধরিতে না পারেন।

দারোগা মহাশয় পান চিবাইতে চিবাইতে ফরসীর মুখনল চুম্বন করিতেছেন—পার্শ্বে অনুপবাবু একটা তাকিয়া হেলান দিয়া কাত হইয়া পড়িয়া আছেন। সম্মুখে দারোগা মহাশয়ের মুন্সী লক্ষণের ফল ধরার ন্যায় কাগজ-কলম ধরিয়া বসিল। দমন যে আসামীটিকে আনিল তাহার নাম "রমানাথ গুছাইত।"

দমন বলিল, রমানাথ যা যা করেছিস দারোগা মহাশয়ের কাছে সব বল। কিছু ভয় নাই।

রমানাথ দমনের মুখের দিকে চাহিল, তাহার পর কাঁপিতে কাঁপিতে বলিল, "তবে বলবো?"

দম। "হাঁ বলবি বই কি, খুব সাহস করে বল, ভয় কি?"

রমা। 'বলবো?'

দম। "বলবি বই কি"

রমা। তবে বলি, আমার নাম রমানাথ (থামিল)।

দম। বল, বল, ভয় কিসের?

রমা। চুপ—আমি হাজিরা বিপিনবাবুর সঙ্গে এদেশে এসে (থামিল)

দম। বলতে বলতে থামিস কেন?

রমা। খুন করেছি,—

দারোগা। সে বিপিনবাবু কই?

দমন। এই আসামীকে পরিষ্কার কাপড়-চোপড় পরাইয়া বাহ্যিক সভ্যভব্য করিয়া আনিয়াছিল, দ্বিতীয় আসামীকে আনিয়া দমন রমানাথকে বলিল, এর দিকে চেয়ে দেখ দেখি?

রমা উত্তর করিল—"ও আমার পিসতুতো ভাই, হয়ে জানা।"

দমন তখন বলিল, "বেশ করে দেখ?"

রমা বলিল, "বেশ করে দেখেছি, ওর সঙ্গে ছেলেবেলা থেকে গোরু চরিয়েছে, একত্রে হাল করেছি, আর আমার চিনতে দেরী লাগবে!

দমন। "এই যে তুই আমার কাছে বল্লি ওর নাম বিপিনবাবু"—

রমা। "হাঁ, হাঁ বিপিন"—

দম। "তুই ব্যাটা কি ন্যাকাম করবি নাকি?"

দারোগা মহাশয় দমনকে চক্ষুর ইঙ্গিতে বলিলেন, রমানাথকে যেন স্থানান্তর করা হয়।

অনুপবাবু একটু আশ্চর্য হইয়া বলিলেন, "এত বিপিন নয়,—বরকন্দাজ তবে আর কাকেও এনে থাকবে।"

তেজচন্দ্র উত্তর করিলেন, "এ উৎকণ্ঠার সময় কাজ নাই, আহারান্তে তখন দেখা যাবে।"

অনুপ একটু বিরক্ত হইয়া বলিলেন "আমি আর থাকতে পারছি না, আপনি আজ রাত্রে বিদায় করে দিন।'

পরবর্তী সংখ্যায়
ললিত-সৌদামিনী
তারকনাথ গঙ্গোপাধ্যায়

দার। 'আপনাকে আজ রাত্রেই বিদায় দেব।'

আহারের পর সীতারামের বৈঠকখানায় অনুপ শয়ন করিয়া আছেন, এমন সময় এক ব্যক্তি তাহার নিকট আসিয়া বলিল, 'শুনেছেন মোকর্দমা ফায়ের।'

অনুপ। সে কেমন?

—আসামী সব কাল রাত্রে সরেছে।

অনুপ তাকিয়ায় মাথা দিয়াছিলেন, উঠিয়া বলিলেন, কেমন করে?

—বরকন্দাজ-চৌকিদার সকলে ঘুমুচ্ছিল, ফাঁক পেয়ে তারা পিট্টান দিয়েছে—ভোরের সময় এক চৌকীদার জেগে উঠে দেখে যে আসামী নাই—তারপর বরকন্দাজকে জাগায়, সে উঠে চৌকীদারকে সঙ্গে করে নিয়ে কটক রোডের ধার হতে কতকগুলো নিরীহ লোককে ধরে এনে পুরেছে—

অনু। ঠিক—ঠিক—আমিও ত তাই ভাবি—এসকল আসামী নূতন লোক; আমি যাদিগের গ্রেপ্তার করেছি, তাদের চেহারা আমার বেশ মনে আছে—কাল, মোটা মোটা লোক তারা, তাদের এক-একজনে দশ-দশ জনকে কাত করতে পারে—আর এরা নিতান্ত ভুক্কের জীব—।

এই সকল কথাবার্তা চলিতেছে, এমন সময় দারোগা মহাশয় আসিয়া পৌঁছিয়া গেলেন।

দার। একবার কেবল সৌদামিনীকে এসে বাবুদের সোনাক্ত নিতে হবে তাহলেই আর কিছু বাকি রহিল না।

অনু। আসামীদিগে চিনবেন না।

দার। প্রয়োজন নাই।

অনু। সে কি মশায়, ওরা প্রধান সা

দার। ওদের সাক্ষী তত দূর বি যোগ্য হবে না—

অনু। তবে সৌদামিনীর সোনাক্ত করে বিশ্বাসযোগ্য হবে?

রূপনারায়ণের তীরে এক দোকানে ভদ্রলোকের আশ্রয়ে সৌদামিনী পাইয়াছিল—সেই বসন্তবাবু ও ব উপস্থিত করা হইয়াছিল।

দার। বসন্তবাবু ক্ষণেকের জন্য কালে আসামীদের দেখেছিলেন, মুহূর্তের মধ্যে তাদিগে চিনে রেখে একথা শুনলেই হাকিমদের অবিশ্বাস মোকর্দমা খাস হয়ে যাবে।

দারোগা মহাশয় সীতারামকে ব অবিলম্বে অবগুণ্ঠনবতী সৌদামিনী আসিলেন। আসিয়া বসন্ত ও ব দেখিয়া বলিলেন, "হাঁ, বোধ হয় সে রাত্রিতে আমার প্রাণদান করেছিলে

বসন্তকুমারের অনুরোধে সৌ রাত্রির ঘটনা আনুপূর্বিক সমস্তই ব তখন বসন্ত এবং বলরাম তাহা ঠিক স্বীকার করিলেন।

অনুপ, দারোগার অভিসন্ধি পারিয়া বড়ই অসন্তুষ্ট হইয়াছিলেন, তাঁহার চাতুরী সাধারণ্যে প্রকাশ পায়, বিশেষ প্রয়াস পাইতে লাগিলেন। ব দারোগা মহাশয়, এই সময় একবার বি আনলে হয়, —সে কি বলে দেখা যেতে

দার। রহস্য দেখাবার কাজ নয় ভদ্রলোকের সমক্ষে তাকে এনে করতে ইচ্ছে করি না।

অনুপ। ভালোই বিবেচনা কিন্তু আপনার বরকন্দাজ দমন বিপিনকে এনেছিল, সে আমার গো আসামী বিপিন নয়—

দার। সে কি কথা বলেন, ম আপন মুখে একবার স্বীকার করেছে আপনি 'না' বল্লেই 'না' হবে? যদি তাহলে আপনাকেই মিথ্যাবাদী হতে হবে।

'মিথ্যাবাদী' শব্দটীতে অনু মর্মবেদনা পাইলেন, বলিলেন, কে বাদী আদালতে সাব্যস্ত হবে? সকল লোকই জানে—আপনি কখন গোপন রাখতে পারবেন না, আগুন কাপড় চাপা দিয়ে লুকান যায় না।

দার। শেষ কালটার আপনি ব্যবহার করবেন, স্বপ্নেও চিন্তা ক

অনুপ সীতারামকে ডাকিয়া আপনি অনুগ্রহ করে আমাদের ব্যবস্থা করে দিন আমরা এখনই বেহারা-পাল্কী আনাইতে সন্ধ্যা রাত্রির আহার সমাপন করিয়া বলরাম, বসন্ত, সৌদামিনী চককমলা হইতে বিদায় লইলেন।

অমৃত পাবলিশার্স প্রাইভেট লিঃ-এর পক্ষে শ্রীসুপ্রিয় সরকার কর্তৃক পত্রিকা প্রেস, ১৪, আনন্দ চাটার্জি লেন, কলিকাতা—৩ হইতে মুদ্রিত ও তৎকর্তৃক ১১।১, আনন্দ চাটার্জি লেন, কলিকাতা—৩ হইতে প্রকাশিত।